বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

প্রথম খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
কর্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান

প্রথম পৃষ্ঠাগুলির সূচি

বিষয় — পৃষ্ঠানং

পরিচিতি

মওলানা শামছুল হক (রঃ) কর্তৃক লিখিত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَعَلٰى

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اٰثَرُوا الدِّيْنَ عَلَى الدُّنْيَا وَاٰثَرُوْهُ بِعَيْنِهٖ

সারাবিশ্বের মানুষ-জাতির কল্যাণ কামনা নয় শুধু, কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল মুসলিম জাতির এক জাতি এবং এক ভাষার কর্মসূচী। প্রাথমিক যুগের বীর মুসলিমগণ তাঁদের কর্তব্য পালন করিয়া কর্মসূচী অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, ইরাক, লেবানন, মিশর, তিউনিস, আলজেরিয়া—এমনকি স্পেন পর্যন্ত সকলের ভাষা একই ভাষা একই আরবী ভাষা হইয়া গিয়াছিল। সকলেই এক জাতি এবং এক ভাষাভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। একটু যখন দুর্বলতা ও শিথিলতা আসিল তখন পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ভাষা দেশীই রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অক্ষর একই আরবী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু হতভাগা আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যাহারা নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আরবী ভাষা ত দূরের কথা আরবী অক্ষরেও দেশী ভাষাকে লিখিয়া দেশের লোকের নিকট সমাদৃত করিতে পারি নাই। এমনকি বহু অগ্রে যে কাজ করার দরকার ছিল যে, দেশে যে ভাষা বা যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত আছে তাতেই কোরআন হাদীছ অনূদিত করিয়া দেশের লোকদের চাহিদা মিটানো হউক এবং আলো দান করা হউক, তাহাও করা হয় নাই। পরম পরিতাপের বিষয়—আজও বাংলা ভাষায় কোরআনের বা হাদীছের এমন কোন তরজমাকারক নাই বলিলেও চলে যাহাকে সর্বদিক দিয়া বিশস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যাইতে পারে। বিশস্ত বলা যায় তাকে যার আগে থেকে কোরআনের এবং হাদীছের বিরুদ্ধে মতবাদ না আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় তাকে যার সব দিক দিয়া পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা আছে—যিনি চৌদ্দশ' বছর আগের ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্তমান যুগের মানুষের ভাষায় অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন।
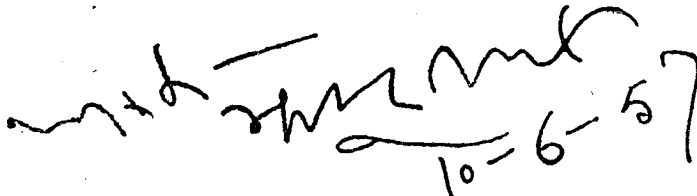
প্রায় দশ বৎসর আগে আমি বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বোখারী শরীফের তরজমার কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। দেশের ও জাতির চাহিদা অতি বেশী, প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সে জন্য বারবার মনে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু সাহস পাই নাই। ক্ষুধার্ত যদি সুখাদ্য না পায়, তবে শেষে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে।

আর দুনিয়াতে একদল লোক যে কুখাদ্য লইয়া বসিয়াও আছে—এই ভাবনায় মনে মনে বহুবার ব্যথিত হইয়াছি, তাহা সত্বেও এত বড় বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ন্যায় কাজে হাত দিতে সাহস পাই নাই।

আল্লাহ দর্জা বলন্দ করিয়া দিন আমার পরম দোস্ত মওলানা আজিজুল হক সাহেবের যে, তিনি এত বড় বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস করিয়াছেন। তিনি জওয়ানে ছালেহ—তিনি বাস্তবিকই এই কাজের যোগ্যতা রাখেন। যতদূর আমার জানা আছে—বোখারী শরীফ বর্তমান যুগে বাংলাদেশে তাঁহার চেয়ে অধিক যত্নসহকারে এবং আদ্যোপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং বোখারী শরীফের খেদমতও এতদূর কেহ করেন নাই। তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহে আলাইহের খাছোল-খাছ শাগের্দ। পড়ার জামানাতেই তিনি ১৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শরাহ উর্দু ভাষায় লিখিয়াছেন। স্বয়ং হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁহার লেখা সঙ্গে সঙ্গে আদ্যোপান্ত দেখিয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। (বর্তমানে উহা পাকিস্তানে ছাপা হইয়াছে।) বোখারী শরীফ পড়ার পরও প্রায় এক বৎসর হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে থাকিয়া এছ্‌লাহে-নফছ ও তজকিয়ায়ে-বাতেনের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বোখারী শরীফের শরাহ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার যোগ্যতায় এবং বিশ্বস্ততায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অতঃপর কয়েকবার বোখারী শরীফ এবং অন্যান্য ছেহাহ্‌-ছেত্তা হাদীছের কেতাব দরছ দেওয়ার পর যখন বাংলাদেশের অভাব মিটানোর জন্য বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করা তিনি শুরু করিয়াছেন তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই।

আল্লার শোকর করিয়াছি, মক্কা শরীফে গিয়া—হাতীমে, মাতাফে, মাকামে-ইব্রাহীমে দোয়া করিয়াছি, মদীনা শরীফে রওজা পাকে দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়াছি—এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক তাঁহার দ্বারা নিন; বাংলার মুসলমানের জরুরত মিটান। মওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া লিখিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন; অনেক জায়গা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, অনেক জায়গা দেখিয়া কিছু কিছু সংশোধন তাঁহার দ্বারাই করাইয়াছি। আল্লাহ পাক তাঁহার দর্জা বলন্দ করুন, কবুল করুন, পাঠকগণকে ইহা হইতে ফয়েজ দান করুন, ইহ-পরকালের ভাল করুন—আমি গোনাগার আল্লাহ পাকের মহান দরবারে করুন-স্বরে দোয়া করি। আমীন। ছোম্মা আমীন।।

10-6-57

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গুজারেশ

অনেক সময় দেখা যায়, জ্ঞান চর্চ্চায় উপযুক্ত এবং সেই আখড়ার বীর পুরুষগণও নিজেদের অক্ষমতা ও নগণ্যতা প্রকাশ করেন। বস্তুত: কোন মহা মনীষীর পক্ষেও এইরূপ করা অতিরিক্ত গণ্য হইবে না, কারণ জ্ঞান-সমুদ্র এতই সুগভীর, বিশাল ও সুপ্রশস্ত যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যে কোন বীরের বীরত্ব ও মহানের মহত্ব এই অথই সমুদ্রে খড়-কুটার ন্যায়ই বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন— وما اوتيتم من العلم الا قليلا "মানবকে জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মাত্র যৎকিঞ্চিতই দান করা হইয়াছে।"

কিন্তু উপযুক্ত ও মহান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নগণ্যতা প্রকাশের রীতি বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত অনুপযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও বাস্তবে নগণ্য ব্যক্তিদের বেলায় সমস্যার উদ্ভব হয় যে, তাহারা কিরূপে স্বীয় বাস্তব নগণ্যতা প্রকাশ করিবে? ভাষায় প্রকাশ করা নিষ্ফল; কারণ, মানুষ হিসাবে যতটুকু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী হওয়া সম্ভবপর উহার অধিকারীগণও নগণ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্যারই আমি আমার বাস্তব নগণ্যতাকে প্রকাশ করিতে ভাষার আশ্রয় বিফল বিবেচনা করিলাম।

তদুপরি পাঠকদের সম্মুখে আমার অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের ঝুলি ছড়ান থাকিল। উহা যে, কি সমস্ত কানাকড়ি ও অচল বস্তুসমূহের সমবায়, তাহা আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফ বিশ্ববাসীর অন্তরে যে উচ্চাসন লাভ করিয়া আছে, উহা তাহার বাস্তব মর্য্যাদার কিয়দাংশ মাত্র। কিন্তু আমি অধমের জ্ঞানবিন্দু যে, সেই কিয়দাংশের মর্য্যাদানুপাতিক পিপাসাটুকু মিটাইতে কোন সাহায্য করিতে পারে না তাহা অতি সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় নরাধমের পক্ষে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া "মন্ত্র না জানিয়া সাপের গর্ত্তে হাত দেওয়া" এরই শামিল। এই সমস্ত জানিয়া-বুঝিয়াও আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করিয়াই এই সুমহান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। রহমতে-ইলাহীর দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। তদুপরি আল্লাহ পাক এমন কতিপয় মহামনীষীর অছীলা আমাকে প্রদান করিয়াছেন যাঁহারা এই ময়দানের দার্শনিক এবং অপরাজেয় বীরপুরুষ।

তন্মধ্যে একজন—শায়খুল ইসলাম মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)। তাঁহার নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের বাসনায় আমি বঙ্গদেশ হইতে সুদূর বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী ডাভেলস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ছুটিয়া যাই; এক বৎসর তাঁহার খেদমতে অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণমালার প্রতি দৃষ্টিপাতের শক্তি আমাদের কোথায় ছিল?

তবে তাঁহার অধ্যাপনার সময় তাঁহার বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনাসমূহকে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং পরবর্ত্তী বৎসর দেওবন্দস্থিত তাঁহার বাসভবনে তাঁহারই ছোহবতে থাকিয়া ঐ পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন কার্য্য সমাধা করি। এইরূপ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বয়ং উহার সংশোধন করত: পূর্ণভাবে দেখিয়া যাইতেন। তাঁহারই প্রদত্ত মণি-মুক্তা সমূহ যথারীতি সুবিন্যস্ত দেখিয়া তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং উহার একটি নকল নিজ হেফাজতে রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শায়খুল ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের চেষ্টা করা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের পরিচয় দেওয়ার সমতুল্য। তাঁহার সঙ্কলিত

মোসলেম শরীফের শরাহ, পবিত্র কোরআনের তফছীর এবং অন্যান্য অমূল্য সংকলন সমূহ ব্যতীত তাঁহার স্বনামখ্যাত বিরাট ব্যক্তিত্বই তাঁহার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

শায়খুল ইসলাম (রঃ)-এর নিকট বোখারী শরীফের অধ্যয়ন আমার জন্য এই মহান কিতাবের দ্বিতীয়বার অধ্যয়ন ছিল। এর পূর্বের বৎসর আমি প্রখ্যাত আলেমকুল শিরোমণি মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি যে কত বড় বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাহা তাঁহার এই যুগের অদ্বিতীয় গ্রন্থ "এ'লাউন-সুনান"-এর ন্যায় হাদীছের মহান কিতাব দেখিলেই অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত শুধু পাক-ভারতেই নহে, বরং মুসলিম জাহানে তিনি এতই সুপরিচিত যে, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু লিখিব তাহা রেশমের জামায় চটের তালিরূপেই পরিগণিত হইবে।

তদুপরি অনুবাদ কার্য্যের যাঁহার অতুলনীয় দান, সাহায্য ও সক্রিয় সহায়তা বিশেষরূপে লাভ করিয়াছি তিনি হইলেন ইসলামী চিন্তাধারার অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক ও স্বনামখ্যাত মোর্শেদ-কামেল মওলানা শামছুল হক (রঃ), যিনি আমার রুহানী পিতা এবং আমার অদ্বিতীয় মুরব্বী। বাল্যকাল হইতেই আমি তাঁহার স্নেহ-শীতল ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছি। তাঁহার পরিচয় বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি ধর্মভীরু মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ মহিমা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার শাগের্দান সারা বাংলা পরিবেষ্টিত করিয়া আছে।

বোখারী শরীফ অনুবাদের মহান কার্য্য একমাত্র তাঁহার ফয়েজ ও বরকতের অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়—ঈমান ও দ্বিতীয় অধ্যায়—এল্‌ম প্রায় সম্পূর্ণই তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। অপরাপর অধ্যায়েও তাঁহার এইরূপ দান রহিয়াছে যে, বস্তুতঃ এই অনুবাদকে কলমের ন্যায় আমার হাতে তাঁহারই অবদান বলা চলে। অনুবাদ কার্য্যে যাহা কিছু কৃতিত্ব রহিয়াছে উহার সবটুকু তাঁহারই ফয়েজ। ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সবটুকুই এই নরাধমের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রসূত। আমার দ্বারা কোন ত্রুটিবিহীন বিষয়বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকিলে তাহা তাঁহারই দোয়ার ফল।

মানুষ মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। আমার ন্যায় নালায়েকের পক্ষে তাহা অবশ্যম্ভাবী। পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে পণ্ডিতবর্গ এবং আলেমকুলের প্রতি অনুরোধ—ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইলে আমাকে অবহিত করিয়া অশেষ ছওয়াবের ভাগী হইবেন; আমি উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার সর্বশেষ আরজ—এই অনুবাদ কার্য্য চলাকালীন আমার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। আমার পিতা শ্রদ্ধাভাজন মরহুম হাজী এরশাদ আলী আমার এই কাজের প্রতি সবিশেষ আগ্রহশীল ও অনুরাগী ছিলেন। আমাকে দীনের এল্‌ম শিক্ষাদানে তিনি অতিশয় যত্ন নিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম শয্যায় আমি এই কার্য্যের ছওয়াব ও সুফল লাভের বড় অংশীদার রূপে তাঁহাকে বহু আশা দিয়া থাকিতাম। আপনারা দোয়া করিবেন, আল্লাহ তায়ালা আমার আব্বাকে জান্নাতবাসী করেন এবং দয়ার দরিয়া মাবুদ আমাকে যেই কার্য্যের তৌফিক দান করিয়াছেন সেই কার্য্যের চেষ্টাকে কবুল করিয়া আমার আব্বা ও আম্মার রূহকে ইহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দেন। হে আল্লাহ! তোমারই অপার রহমতে এই নরাধমের দ্বারা যাহা কিছু চেষ্টা-সাধ্য সম্ভবপর হইয়াছে, তুমি স্বীয় করুণাবলে উহাকে কবুল কর। আমীন।

পবিত্র হজ্জের সফরে, — আরজ-গুজার

চট্টগ্রাম—১৫।৬।৫৭ ইং, — আজিজুল হক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বোখারী শরীফের অধিকাংশ হাদীছের এক একটি হাদীছ একাধিক—৫।১০ জায়গায় বর্ণিত আছে। কারণ, এক একটি হাদীছে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন মছআলাহ থাকে; সে সূত্রে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে একটি হাদীছই বিভিন্ন ছনদে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে। সেমতেই আড়াই হাজার মূল হাদীছ প্রায় আট হাজারে পরিণত হইয়াছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহাও যে, স্থানের বিভিন্নতায় একটি হাদীছের অংশাবলীর মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা আসিয়াছে। সমুদয় স্থান হইতে মূল হাদীছটির বাক্যাবলী একত্রিত করিলে উহার কলেবর যাহা দাঁড়ায় সেই কলেবর একত্রে বোখারী শরীফের এক স্থানে পাওয়া বিরল। কিন্তু অনুবাদের সৌন্দর্য্য এবং পাঠকের পক্ষে অধিক উপকারী ব্যবস্থা একমাত্র ইহাই যে, প্রতিটি হাদীছ উহার সমুদয় অংশ সম্বলিতরূপে একত্রিত আকারে অনূদিত হয়। কিন্তু বার শত পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ গ্রন্থে ২, ৪, ১০, ২০ স্থানে বিক্ষিপ্তরূপে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত এক একটি হাদীছের বিভিন্ন অংশ খুঁজিয়া বাহির করা কতই না কঠিন। এই নরাধমের জন্য ত অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত—এমন একখানা কেতাব আমার হস্তগত হয় যাহাতে ঐরূপ প্রতিটি হাদীছের প্রত্যেকটি স্থান নিরুপণ ও পৃষ্ঠার সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে; এই বিষয়েই কেতাবখানা রচিত। ঐ কেতাবখানা ব্যতিরেকে বোখারী শরীফ অনুবাদের সৌন্দর্য্য সাধন এই যুগে সম্ভব নহে। ঐ কেতাবের রচয়িতা শেখ আবদুল আজিজ (রঃ)। পাঠকদের নিকট বিশেষ অনুরোধ, সকলে তাঁহার জন্য ফেরদাউস-বেহেশতের দোয়া করিবেন।

অত্র আলোচনা দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, যেই পরিচ্ছেদে যেই হাদীছ অনূদিত আছে মূল গ্রন্থের সেই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত উক্ত হাদীছের অনুবাদে অতিরিক্ত বাক্যাবলী বা বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধনী না থাকিলে মনে করিবেন—এই বাক্য বা অংশ মূল গ্রন্থের কোন স্থানে নিশ্চয় উল্লেখ আছে।

আরজ-গুজার

আজিজুল হক

পরম সম্পদ

ছাইয়্যেদী ছনদী মওলানা শামছুল হক (রঃ) ১৯৫৬ সনে হজ্জ করিতে যান। সেই বৎসরই রমযান মাসে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজ নরাধমের হাতে আরম্ভ হয়। চরম ও পরম সৌভাগ্য যে, তিনি হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যেক স্থানেই এ বিষয়ে নরাধমের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং লিখিত অনেক কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে—তাঁহার পবিত্র মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে বসিয়া তাহাজ্জুদের সময় তিনি যে দোয়া করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা লিখিতরূপে পাইয়াছি। ইহা আমার নিকট নিঃসন্দেহে কএঅতুলনীয় পরম সম্পদবিশেষ। তাই বরকতের জন্য নিম্নে উহারই ফটো ব্লক দেওয়া হইল।

1-8-56

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده - والصلوة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده

[illegible]

মুখবন্ধ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের সময় হইতেই জগদ্বাসীর এক বিরাট অংশ তাঁহার আলো ও নূরে-হেদায়েত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি আস্থাহীন রহিয়াছে। তাহাদের এই অনাস্থা বিস্ময়ের কিছু নহে। কারণ তাহারা কাফের তাহারা ইসলামের দাবীদার নয়; অতএব তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর তথা তাঁহার আদর্শ ও তাঁহার বাণীর প্রতি আস্থাবান হইবে কেন? কিন্তু যাহারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার —যাহারা আল্লার উপর, কোরআনের উপর, আল্লার রসুলের উপর ঈমান রাখার দাবী করিয়া থাকে এবং "আশহাদু-আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" কলেমা পড়িয়া মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সত্য রসুলরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাঁহার আদর্শ ও সুন্নাত তথা তাঁহার বাণী ও হাদীছকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতে পারে না।

হাদীছ তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বাণীরূপে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দশত বৎসর হইতে বিশ্বব্যাপী মোসলেম জাতির মধ্যে বিরাজ করিতেছে সেই অমূল্য রত্নকে নানা ছলে-বলে ও অপকৌশলে এনকার ও অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করা অযৌক্তিক বৈ নহে? মোসলেম জাতি যে যুগে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত ছিল, যখন তাহাদের গুণ ও জ্ঞান বিশ্বজয়ী ছিল এবং যে যুগ ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাধিক উজ্জ্বল যুগ ছিল সেই সোনালী যুগে এরূপ কোন উক্তির আভাষ কোথাও পাওয়া যায় নাই। ধর্মীয় আকর্ষণ ও জ্ঞান-মর্য্যাদার দুর্বলতম—বর্তমান যুগে ঐধরণের কোন উক্তি শুনা গেলে তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ও অনুতাপের যোগ্য হইবে এবং উহাকে মোসলেম সমাজের মধ্যে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ও সমাজ দেহে এক ব্যধির প্রাদুর্ভাব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ক্ষেত-খামার যখন শস্য-শ্যামল না থাকে তখনই উহার মধ্যে অবাঞ্ছিত আগাছাসমূহ আপনা-আপনিই মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং মানব দেহ যখন জীবনীশক্তি ও শোধিত রক্ত হারাইয়া ফেলে তখনই উহাতে খোস-পাঁচড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আ'লেমুল গায়েব—তিনি পূর্ব হইতে সব কিছু অবগত আছেন; তাঁহার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ এ সব অবাঞ্ছিত মনোভাবের মুখোশ খুলিয়া দিয়া স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। যথা—

أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.........

অর্থাৎ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—হে মুসলমান! সতর্ক থাকিও; সেই যুগ দূরে নহে যেই যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা গোঁপে তেল মাখিয়া

তোমাদের মধ্যে প্রচারণা চালাইবে যে—কোরআন শরীফের মধ্যে যতটুকু হালাল-হারাম উল্লেখ আছে, ততটুকুর উপরই আমল কর। (নবী (দঃ) বলেন—)

হুশিয়ার। আমি সতর্ক করিয়া যাইতেছি—তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া-বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে—আল্লার রসুল অর্থাৎ আমি যে বস্তুকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিব উহাও ঐরূপ হারামই গণ্য যাহার হারাম হওয়ার ঘোষণা কোরআন শরীফে আছে। (কোরআন আল্লার বাণী এবং রসুল যাহা বলিবেন তাহাও স্বয়ং আল্লার তরফ হইতেই অহী মারফৎ প্রাপ্ত। যেমন,) আমি ঘোষণা দিতেছি, গৃহ পালিত গাধা এবং হিংস্র জন্তু (খাওয়া) হারাম (আবু দাউদ শরীফ)। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবাণীর হাদীছ আরও অনেক আছে।

দুনিয়ার বিলুপ্তি বা কেয়ামত যতই নিকটবর্তী হইতেছে, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী এক একটি করিয়া বাস্তবায়িত হইতেছে। তাই মোমেন-মোসলেম ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা সতর্ক থাকিবে; যখনই এরূপ কোন ছলনাময়ী উক্তি শুনিবে যে—কোরআন শরীফে যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট তাহাই মানিয়া চলিব; হাদীছ (নামে যেই জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দশত বৎসর হইতে প্রচলিত তাহা) মানিতে প্রস্তুত নহি ইত্যাদি, তখনই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করতঃ ঐ প্ররোচনা হইতে দূরে থাকিবে।

কোরআন মানিয়া চলার ধুয়া তুলিয়া বা যুক্তির ভাওতা দিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ অস্বীকার করা বস্তুতঃ কোরআনের বিরোধিতা ও যুক্তির অবমাননাই বটে।

সংক্ষেপে কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হইতেছে এবং সরল যুক্তির কয়েকটি ধারা বর্ণিত হইতেছে, যদ্বারা হাদীছ নামে প্রচলিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অপরিহার্য্যতা এবং নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হইবে। সুধীগণ সুষ্ঠু পরিবেশে নির্মল মস্তিষ্কে চিন্তা করিবেন ইহাই আশা।

وما علينا الا البلاغ "আমাদের কর্তব্য—খাঁটী কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

হাদীছ কাহাকে বলেঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে, উহাকে হাদীছ বলে।

হাদীছের মর্য্যাদাঃ হাদীছের মর্য্যাদা নির্ণয় করা আল্লার রসুল বা পয়গাম্বরের মর্য্যাদা উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। পয়গাম্বর কে হন? তাঁহার মর্তবা কত উর্দ্ধে? এসব প্রশ্ন এত জটিল যে, ইহা বুঝিতে সুষ্ঠু ও পবিত্র মস্তিষ্কের এবং গভীর ও প্রশস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন।

রসুল বা নবীর মর্তবাঃ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এত কর্মক্ষমতা ও উন্নতির শক্তি দান করিয়াছেন যে, সেই শক্তি সৃষ্টিকর্তা আল্লার তুলনায় সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইলেও উহা এত ব্যাপক যে, উহাকে ব্যাপকতার দিক দিয়া পর্য্যাপ্ত বরং অসীম তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেই পর্য্যাপ্ত শক্তি বলে মানুষ বিরামহীন পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিতে পারে, উচ্চ দরের বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ও সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক হইতে পারে। এমনকি খাঁটী ও একনিষ্ঠ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিশ্বস্রষ্ঠা—সারা জগতের আলো, জ্ঞান ও শক্তির মালিক আল্লাহ তায়ালার সহিত তাঁহার জেকর, তায়া'ত এবং স্মৃতি-ভক্তি ও আনুগত্যের দ্বারা দৃঢ় গোপনসূত্র স্থাপন করিয়া লওয়া যায় তবে মানুষ "বেলায়েতের" এবং মা'রেফাতের তথা আল্লার ওলী হওয়ার মর্তবায় পৌঁছিতে পারে। আল্লার ওলীর মর্তবা অনেক উর্দ্ধে। এই মা'রেফাত ও বেলায়েতের মধ্যেও আবার অনেকগুলি স্তর আছে। এক একটি স্তর অন্যটি হইতে এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, তাহা অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ওলীর দর্জা হইতে বহু উর্দ্ধে শহীদ ও ছিদ্দিকের দর্জা। ওলী, শহীদ,

ছিদ্দিক এসবের দর্জা বহু উর্দ্ধে হইলেও ইহা মানুষের সাধনার মাধ্যমে হাসিল হইয়া থাকে। এই সব মানুষের আয়ত্তের বাহিরে নয়।

কিন্তু নবুওতের মর্তবা এত উর্দ্ধে যে, তাহা ওলী, শহীদ, ছিদ্দিক সকলেরই নাগালের বাহিরে। কেহই সাধনার বলে নবুওত পাইতে পারে না। নবী একমাত্র আল্লার রহমতেই নবুওত পাইয়া থাকেন, সাধনায় উহা অর্জিত হয় না; অবশ্য উহার জন্য এবং উহা রক্ষণের জন্য ও উহার হক আদায় করার জন্য বিরামহীনরূপে সর্বাধিক কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়।

নবী ও রসুলের জ্ঞান সর্ব উর্দ্ধে: বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ওলী ও নবীগণের দর্জা ও মর্তবার ব্যবধান অনুযায়ী তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও ব্যবধান আছে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের জ্ঞান হইতেছে শুধু কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান; সেই জন্যই উহাতে সত্যতা থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বহু ভুল এবং অসত্যও থাকিয়া যায়। ওলীদের জ্ঞান তার চেয়ে উর্দ্ধে; কারণ তাঁহাদের জ্ঞান কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান নহে, বরং সমস্ত জ্ঞানের আকরের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আহরিত জ্ঞান। কিন্তু তাঁহাদের সেই জ্ঞান অহরণের পথ পূর্ণ পরিষ্কার পরিপক্ক ও সুরক্ষিত নয়, তাই তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও অতিক্রম ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু নবীদের জ্ঞান আল্লার নিকট হইতে সরাসরি প্রাপ্ত অহীর জ্ঞান—উহাতে কোন দিক দিয়াই সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জ্ঞান সর্ব উর্দ্ধে: নবীদের মধ্যেও বিভিন্ন মর্তবা বিদ্যমান আছে; স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ "আমি রসুলগণের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছি।" সর্ব উর্দ্ধে হইলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। তাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই এই সাক্ষ্য দিতেছেন—وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বা কল্পনা হইতে বলেন না; আমি যাহা বলিয়া দেই ঠিক অবিকল তাহাই তিনি বলেন। এই বিষয়টি মওলানা রুমী (রঃ) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبد الله بود

"আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যই ঠিক ঠিক অবিকলরূপে রসুলের কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী জলীল ও জব্বার আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ........

অর্থাৎ যদি সে (মোহাম্মদ (দঃ)) কোন একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বানাইয়া বলিত তবে আমার সর্বগ্রাসী হস্তে তাহাকে ধরিয়া যখন তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রীকে ছিঁড়িয়া দিতাম।

অহীর পরিপক্কতা: নবীদের জ্ঞান-প্রাপ্তির সুত্র ও পথ হইল অহী। অহীবাহক হইলেন জিব্রাঈল ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য—কোটি কোটি ফেরেশতাদের সর্বপ্রধান চারিজনের মধ্যে প্রধানতম। সমুহ কুপ্রবৃত্তি ও অপকর্মের ইচ্ছাশক্তি হইতে পূর্ণ পবিত্ররূপে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তা ছাড়া জিব্রাঈল (আঃ) "আমীন" অর্থাৎ আল্লার আমানত বাহক বলিয়া পরিচিত। ফেরেশতাদের শক্তি সামর্থও কল্পনাতীত; বিশেষতঃ হযরত জিব্রাঈলের শক্তি। এতদসত্বেও যখন জিব্রাঈল ফেরেশতা আল্লার তরফ হইতে রসুলুল্লার প্রতি অহী বহন করিয়া আনিতেন তখন বাহ্যিক বা স্থুল সতর্কতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপ হইত তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

অর্থাৎ অহী এত সুরক্ষিতরূপে এত সুবন্দোবস্তের সহিত আসে যে, আল্লাহ তায়ালা বহু সংখ্যক ফেরেশতা প্রহরীর দ্বারা আদ্যোপান্ত পাহারা নিযুক্ত করিয়া রাখেন,† (যাহাতে আল্লার প্রেরিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শয়তান বা নফসের বিন্দুমাত্র দখল আসিতে না পারে, বিন্দুমাত্র কল্পনা বা ভুল, মিথ্যা ও ব্যতিক্রম-অতিক্রমের লেশমাত্র তার সঙ্গে মিশ্রিত হইতে না পারে। এইরূপে সুদৃঢ় রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অহী প্রেরণের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করেন) যদ্বারা জগদ্বাসীকে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারেন যে—আল্লার বাণী, আল্লার অহী তাঁহারা (অহী বাহকগণ) অবিকল ঠিক ঠিকরূপে পৌছাইয়াছেন, বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন উহাতে হয় নাই বা উহাতে মানুষের রচনার ও কল্পনার লেশমাত্র নাই।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন অহী কত সুরক্ষিত বস্তু। ইহাই হইতেছে নবীগণের আহরিত জ্ঞানের একমাত্র পথ ও সূত্র। তাই নবীর জ্ঞান. নবীর বাণী, নবীর সমস্ত কথাবার্তা এবং কার্য্যকলাপ খাঁটী ও সত্যের প্রতীক। উহাতে অখাঁটী ও অসত্যের বিন্দুমাত্র অবকাশ আসিতেই পারে না। কারণ নবী স্বয়ং নিষ্পাপ, তাঁহার প্রতিটি বাণী এবং প্রতিটি কার্য্য ও জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রতিটি বিষয়বস্তু আল্লার নিকট হইতে রসুলের নিকট পৌছিবার একমাত্র সূত্র অহী; তাই এক্ষেত্রে খাঁটী ও অসত্যের সম্ভাবনায় কোন ছিদ্রপথই কোথাও নাই।

কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য: এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসুলের হাদীছও যদি অহীর মারফৎ আল্লার তরফ হইতে হইয়া থাকে তবে কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআন ও হাদীছে পার্থ্যক নাই বলা যাইতে পারে এই অর্থে যে, উভয়ই আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অহী মারফৎ নবীকে দান করা হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এই যে—কোরআনের অর্থ ও ভাষা (Text) উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে অহী মারফৎ আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং জিব্রাঈল কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, তাই কোরআনের আয়াত ও বাক্য নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এবং ইহাকে "অহী মত্‌লু" ও আল্লার কালাম বলা হয়। হাদীছের অর্থ ও বিষয়বস্তু আল্লার তরফ হইতে অহী মারফৎ প্রাপ্ত বটে, কিন্তু উহার শব্দ ও বাক্য রসুলের রচিত। কোরআন-হাদীছের আসল উৎস একই। তাই কোরআন আল্লার বাণী যেমন নির্ভুল, হাদীছও তদ্রুপ নির্ভুল। ইহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য যাহারা রসুলের সেই বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাদের মধ্যে পরবর্তী যুগীয় কোন বহনকারীর দ্বারা কৃত্রিম বা মিথ্যা রচনার সন্দেহ থাকিতে পারে বটে। সেই জন্যই হাদীছবিশারদ

---

† আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ; তাঁহার জন্য কোন কিছু ব্যবস্থারই আবশ্যক হয় না। কিন্তু মানুষ স্থূলজগতে বাস করে; তাহাদের দৃষ্টি বাহ্যিক ও স্থূল ব্যবস্থাদির প্রতিই ধাবিত ও নিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য জগদ্বাসীর ভাবধারা ও ভঙ্গিমার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহা তাহাদেরই রুচিসম্মত বলিয়া প্রকাশও করিয়া দেন। নতুবা স্বয়ং কাদেরে মোত্‌লাক, আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ এ সবের প্রত্যাশী মোটেই নহেন।

মোহাদ্দেছগণ জাল ও কৃত্রিম সন্দেহের হাদীছগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং সত্য ও শুদ্ধ হাদীছসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

রসুলের পায়রবী তথা হাদীছের অনুসরণ অপরিহার্য্য প্রমাণে পবিত্র কোরআন:

কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত। কতিপয় আয়াত এই—

(১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ:—হে মোসলমান জাতি। রসুলুল্লার জীবনের মধ্যে—তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর নমুনা ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে;

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা মানবকে বহু আদেশ-নিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে তাহার উপর এই গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন যে, সে যেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাকে সর্বদা সন্তুষ্ট ও রাযী রাখিয়া জীবন-যাপন করে। মানব যাহাতে এই গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তায়ালা বহু ব্যবস্থাই করিয়াছেন' এমনকি নমুনাও পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই নমুনার তৈরী ও গঠিত হও তবেই আমার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য যে—ফরমাইশ দাতার নমুনাকে উপেক্ষা করিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করা দূরের কথা উপেক্ষাকারী অমার্জনীয়, দোষী ও শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শেষ যুগে আল্লার সেই মনোনীত নমুনা হইলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) এবং যেরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কোন যুগ, কাল বা দেশ ও জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নহেন, তদ্রূপ মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:)ও কাল, যুগ, দেশ ও জাতি নির্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলের জন্যই আল্লার মনোনীত নমুনা।

মানুষ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ-প্রদত্ত নমুনা তথা রসুলের আদর্শে স্বীয় জীবনকে গঠন ও পরিচালিত করিতে হইবে—যাহা একমাত্র হাদীছের মাধ্যমেই পাওয়া যাইতে পরে। হাদীছ-ভাণ্ডার গৃহীত না হইলে আয়াতের মর্ম বৃথা প্রতিপন্ন হইবে।

(২) اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ

অর্থ—তোমরা আল্লার আদেশ পালন কর এবং রসুলের আদেশ পালন কর।

কোরআনের বহু আয়াতেই আল্লার আনুগত্য ও তাঁহার আদেশাবলীর অনুসণের তাকিদ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানেই ঐ সঙ্গে রসুলুল্লার আনুগত্য ও অনুসরণের উপর সমপরিমাণ জোর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মানব কল্যাণের জন্য উভয়টি একই পর্য্যায়ভুক্ত।

(৩) وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ—যে ব্যক্তি আল্লার ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ অবলম্বন করিবে সে-ই অতি মহান কামিয়াবি ও সাফল্যের অধিকারী হইবে।

اطاعت। এতাআ'ত অর্থ অনুসরণ করা; এই একটি শব্দই আল্লাহ ও আল্লার রসুল উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব যেমন আল্লার এতাআ'তের অর্থ কোরআনের অনুসরণ এবং উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের কর্তব্য, তেমনি রসুলের এতাআ'তের অর্থ হাদীছের অনুসরণ এবং ইহাও কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য।

(৪) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থ—হে মোহাম্মদ (দঃ)। আপনি আমার পক্ষ হইতে স্পষ্ট ঘোষণা শুনাইয়া দিন যে—হে মানব। তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসার (ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করায় সচেষ্ট বলিয়া) দাবী করিতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে (তোমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে যে—) স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে—আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিভাজন হওয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের উপর সম্যকরূপে নির্ভর করে।

(৫) وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ—রসুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশরূপে দান করিয়াছেন তাহা পূর্ণরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লও এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাক।

(৬) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থ—হে মোহাম্মদ (দঃ)! আমি আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য শান্তিবাহকরূপে পাঠাইয়াছি। (আপনার অনুসরণ ও অনুকরণে জগদ্বাসী প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে।)

(৭) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রসুলরূপে পাঠাইয়াছি।"

হাদীছের অপরিহার্য্যতার যুক্তি ঃ (১) মোসলমান মাত্রই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে, ইহা অবধারিত। এই ঈমানের তাৎপর্য্য কি শুধু এতটুকু বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি যে, তিনি একজন নবী ও রসুল ছিলেন? ইহা কখনও হইতে পারে না, কারণ এই বিশ্বাস ত হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতিই স্থাপন করা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় ও অপরিহার্য্য অঙ্গ; ইহা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মোসলমান হইতে পারে না। তবে মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বিশেষত্ব কি রহিল? যে কারণে اشهد ان محمدا رسول الله। মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কালেমা ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ পরিগণিত, অথচ اشهد ان موسى رسول الله وعيسى رسول الله। মুছা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের কলেমাকে সেই মর্য্যাদা দান করা হয় নাই। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক আকিদারূপে এবং কোরআনের অকাট্য আয়াতসমূহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোহাম্মদ (দঃ) স্বীয় যুগ হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত—স্থান, কাল ও জাতি নির্বিশেষে বিশ্বমানবের জন্য রসুল ও নবী; পূর্ববর্তী নবীগণ এরূপ নহেন; এই পার্থক্যের তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ কি হইবে?

এই সমস্ত বিষয়ের মূলে একটিমাত্র তত্ত্ব রহিয়াছে যে—মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ এতা'আত এত্তেবা—অনুকরণ ও অনুসরণ কেয়ামত পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যেক নাজাতকামীর জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য—বর্ত্তমানে পূর্ববর্তী নবীগণের মোটামুটি সমর্থ যে, তাঁহারা আল্লার খাঁটী পয়গাম্বর ছিলেন, এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বেলায় শুধু এতটুকু যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার আদেশসমূহকে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। আর ইহা স্পষ্ট যে, হাদীছ-ভাণ্ডার গ্রহণ ব্যতিরেকে এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন সম্ভব নহে।

(২) শরীয়ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা কোরআনের মধ্যে মূলনীতিরূপে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু ঐসব মূলনীতিসমূহকে কার্যে পরিণত করা এবং একটি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব কর্মপদ্ধতি, কার্য্যধারা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রসুলের হাদীছের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কোরআন শরীফে নামাযের উল্লেখ আছে اقيموا الصلوة। "নামায আদায় কর।" কিন্তু নামায কত ওয়াক্ত, কোন্ কোন্ সময় কি কি পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে, উহার শুদ্ধ-অশুদ্ধতার বিধি-বিধান কি কি এবং আল্লার নির্দেশিত নামায কি আকারের হইবে তাহা রসুলের বর্ণনা হাদীছেই পূর্ণরূপে জানা যাইতে পারে। তদ্রূপ কোরআন শরীফে আছে—واتوا الزكوة "যাকাত দান কর" কিন্তু কি পরিমাণ মালে কি পরিমাণ দিতে হইবে? কত দিন পর পর দিতে হইবে? তাহা একমাত্র রসুলের বর্ণনা হাদীছের মাধ্যমেই জানা যায়। এইরূপে হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের হুকুম-আহকাম কোরআন শরীফে শুধুমাত্র মূলতঃ উল্লেখ হইয়াছে। এরূপ বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেওয়া হয় নাই যাহা কার্য্যক্ষেত্রে যথেষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ কোরআন শরীফে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকার আবশ্যকও ছিল না, কারণ নমুনা ও ব্যাখ্যাকারী রসুল সঙ্গে সঙ্গেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাহী ফরমান ও মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, হাদীছ-কোরআন হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, বরং কোরআনেরই ব্যাখ্যা। যেমন কোরআন শরীফে ঈমানের বর্ণনা করা হইয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার আরও বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী হাদীছ বিশারদগণ ১০, ২০, ৫০, ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ সমস্ত হাদীছ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং "ঈমানের অধ্যায়" নামে নাম দিয়াছেন। এইরূপে কোরআন শরীফে অতি সংক্ষেপে নামাযের উল্লেখ হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার কর্মপদ্ধতি এবং কার্য্যবিধির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ঐসব হাদীছকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া "নামাযের অধ্যায়" নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে অজুর অধ্যায়, গোছলের অধ্যায়, যাকাতের অধ্যায়, রোযার অধ্যায়, হজ্জের অধ্যায়, বিবাহের অধ্যায়, তালাকের অধ্যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়, জেহাদের অধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অধ্যায় হাদীছের কিতাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তের প্রত্যেকটিরই মূলবস্তু কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে, উহারই কার্য্যপদ্ধতি ও বিস্তারিত বিবরণ হাদীছের দ্বারা দেখান হইয়াছে। বোখারী (রঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিতের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ বিষয় সম্বলিত কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া পরে তৎসম্বন্ধীয় হাদীছসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকন্তু কোরআনের মধ্যে শত শত আয়াত এরূপ আছে যে, শুধু আমাদের উপর উহাদের মর্ম গ্রহণের ভার ছাড়িয়া দিলে সঠিকভাবে উহার উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য হইত না, বরং শরীয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে আমরা নিশ্চয় ভুল করিতাম। যেমন—কোরআন শরীফে আছে—فاعتزلوا النساء في المحيض "ঋতুবর্তী স্ত্রী হইতে দূরে থাক।" নিছক এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা ইহার অর্থ এই বুঝিতাম যে, স্ত্রীদিগকে ঐ সময় সর্বপ্রকার দূরে রাখ—তাহাদের সঙ্গে আহার, নিদ্রা, উঠা-বসা কিছুই করিও না। অথচ ইসলামের বিধান ও শরীয়তের নির্দেশ এইরূপ নহে, বরং ইহা ইসলাম বিরোধী ইহুদীদের রীতি। ইহার সঠিক তত্ত্ব একমাত্র রসুলের দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন —افعلوا كل شئ الا النكاح। "সহবাস ছাড়া আহার-নিদ্রা, উঠা-বসা ইত্যাদি সবই ঋতুবর্তী স্ত্রীর সহিত করিতে পারে।" ইহাই শরীয়তের সঠিক বিধান। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ উক্ত আয়াতের শব্দগুলি ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরআনের এরূপ ব্যাখ্যা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনার সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে; তাছাড়া অন্য কাহারও

এরূপ ব্যাখ্যা দিবার অধিকার নাই। আরও দেখুন, কোরআন শরীফে আছে—

ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله.....

"যাহারাই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিয়া রাখিবে, উহাকে আল্লার রাস্তায় খরচ না করিবে তাহাদের ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।" এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে—কেহই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা রাখিতে পারিবে না, প্রয়োজনাবশিষ্ট দান করিবে। অথচ ইসলামের বিধান এরূপ নহে। এই আয়াতের বাস্তব উদ্দেশ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ব্যাখ্যা দ্বারাই সাব্যস্ত হইতে পারে। তাঁহার হাদীছে প্রমাণিত আছে, ما ادى زكوته فليس بكنز "যে ধনের যাকাত দেওয়া হয় উহা উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত নহে।"

এই ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআনের উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভবই নহে এবং এই ব্যাখ্যা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। এই জন্যই হাদীছকে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়: এই ব্যাখ্যার অপরিহার্য্যতা কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

আলোচ্য বিষয়ের আরও একটি সরল প্রমাণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কয়েকটি গুণ ও করণীয় কার্য্য প্রকাশ করত: বলেন—

يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -

"আল্লাহ তায়ালা আরববাসীদের মধ্য হইতে এমন একজন রসুল পাঠাইয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লার (কালামের) আয়াতসমুহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন, তাহাদিগকে আল্লার কিতাব—কোরআন এবং হেকমত তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন।" এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় সুবিজ্ঞ সেকালের আরববাসীগণের নিকট আরবী ভাষায় কোরআনের আয়াত (يتلو عليهم) পাঠ করিয়া শুনাইবার পর (ويعلمهم الكتاب) ঐ কোর-আনের শিক্ষাদান করার তাৎপর্য্য কি? আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের যে শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের ন্যায় মোসলমগণের জন্য সেই শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোন্ বস্তুর দ্বারা মিটিয়া যাইবে।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি তথ্যমুলক বিষয় রহিয়াছে—উহা এই যে, এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যক্রমরূপে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআনের আয়াতসমুহ জগদ্বাসীকে পাঠ করিয়া শুনান। (২) মানব জাতিকে পবিত্র করা। (৩) তাহাদিগকে আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দান করা। (৪) এবং হেকমত শিক্ষা দান করা। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই চারিটি কার্য্যক্রম কোরআন শরীফের বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা অতিসুস্পষ্ট যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির জন্য আল্লার পক্ষ হইতে আল্লার কিতাব—পবিত্র কোরআন ভিন্ন আরও একটি জিনিস বিতরণ ও শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন যাহাকে 'হেকমত' বলা হইয়াছে।

অতঃপর বিশ্বভাণ্ডারে তল্লাশী চালাইলে দেখা যাইবে যে, মানব জাতি রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আল্লার কিতাব ভিন্ন আরও যাহা লাভ করিয়াছে তাহা হইল একমাত্র সুন্নাহ, যাহাকে হাদীছ বলা হইয়া থাকে। প্রায় ১৩০০ বৎসর পুর্বে সংকলিত এবং আজ পর্যন্ত বিশ্ব মোসলেম কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত ইমাম মালেক মদনীর 'মোয়াত্তা' নামক কিতাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বাণী এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে যে—

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন, "আমি তোমাদের নিকট দুইটি মহান বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, সেই বস্তুদ্বয়কে যাবৎ তোমরা আঁকড়াইয়া থাকিবে তাবৎ কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না—(১) আল্লার কিতাব ও (২) আল্লার রসূলের সুন্নত।"

হাদীছের অপরিহার্য্যতা বর্ণনার পর এখন আমরা দেখাইতে চাই যে, ঐ অপরিহার্য্য জ্ঞান-ভাণ্ডার—হাদীছে-রসুল (দঃ) সর্ববাদী সম্মত প্রমাণের বিধানেই নির্ভরশীলরূপে বিদ্যমান আছে।

হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার যুক্তি-যুক্ত সূত্র : দুনিয়াতে কোন ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার পর বা কোন কথা ব্যক্ত হওয়ার পর পরবর্তী কালে প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঐ ঘটনা বা কথা প্রমাণিত হইবার জন্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও যুক্তি-জ্ঞান অনুসারে কি কি সূত্র আছে যদ্দারা উহা তর্কাতীত, নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বের যুক্তিবাদী, জ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ এক বাক্যে ইহাই বলিবেন যে, ঐরূপ ঘটনা বা কথার প্রমাণের জন্য একমাত্র সূত্র হইল সাক্ষ্য; এবং সাক্ষ্য দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকার প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষ শ্রোতার মৌখিক সাক্ষ্য, দ্বিতীয় প্রকার তাহাদের লিখিত সাক্ষ্য। ইহাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই যে, উভয় প্রকারের সাক্ষ্যই সর্বক্ষেত্রে অবলম্বিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্য লিখিত সাক্ষ্য হইতে কোন দিক দিয়াই কম নহে, বরং আইন-আদালতে মৌখিক সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য। কোন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য লিখিয়া আদালতে পত্রাকারে পাঠাইলে মৌখিক সাক্ষ্যের ন্যায় উহা সরাসরি গ্রহণীয় হয় না। অধিকন্তু লিখিত সাক্ষ্যও মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, কারণ লেখকের মৃত্যুর পর উহা লেখকের স্বলিখিত হওয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যই একমাত্র পথ।

বিশ্বের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার ইতিহাস-শাস্ত্র, মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই রচিত হইয়াছে। মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হইলে বিশ্বের সব কিছুই অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি বংশ পরিচয়—মাতা-পিতার পরিচয় ইত্যাদি মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা মানুষের জীবন মরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিত কালেও তাঁহার হাদীছসমূহ মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার ছাহাবী ছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেন এবং নানা দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেকটি হাদীছকে প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার সুযোগ হওয়া সম্ভব ছিল কি? তিনি বিভিন্ন দেশে স্বীয় মোবাল্লেগ (প্রচারক) পাঠাইতেন, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন; তাঁহারা তাঁহার বাণী-সমূহ প্রচার করিয়া থাকিতেন এবং ঐরূপে সেই সকল মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সমস্ত জগতে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছিল; সুতরাং মৌখিক সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা অতি সুস্পষ্ট। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার বাণীর মধ্যে বড় ছোট প্রত্যেকটি বাণীই রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের পর্য্যন্ত পরম্পর ঐ মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ কি? হাদীছ প্রমাণিত করিতে সূত্র পরম্পরা মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের তালিকাকেই ইসলামী পরিভাষায় "সনদ" বলা হয় এবং প্রত্যেক সাক্ষীকে "রাবী" বলা হয়। রাবী শুধু সাক্ষ্য দিয়াই চলিয়া যান নাই বরং রীতিমত শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং শ্রোতাগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সাক্ষ্যদাতা ওস্তাদ এবং শ্রোতা শাগেদ´ পরিগণিত হইয়াছেন। যে কোন মহামনীষী কর্তৃক

হাদীছ বলিয়া বর্ণিত কোনও বাক্যকে সনদ ব্যতিরেকে রসুলুল্লার (দঃ) হাদীছ বলিয়া ইসলাম কস্মিন-কালেও অনুমোদন করে নাই। একটি শব্দ সম্বন্ধেও হাদীছ বলিয়া দাবী করিলে সেখানে সনদ বা সাক্ষ্যের বিবরণ দিতে হইবেই। তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি হাদীছই সর্ববাদী সম্মত নীতি ও যুক্তি অনুযায়ী তথা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ তথা সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা ও পরিপক্কতা :

যে কোন সাক্ষ্যের মধ্যেই মিথ্যা প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। মৌখিক সাক্ষ্যের তুলনায় লিখিত সাক্ষ্যের মধ্যে এই সম্ভাবনার অবকাশ কোনও অংশে কম নহে। মৌখিক কাহারও প্রতি মিথ্যারূপে কোন বিষয়ের বা কথার সম্পর্ক আরোপ করা অপেক্ষা লিখিত ভাবে উহা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নহে। তদুপরি অনিচ্ছাকৃত ভাবে লেখার মধ্যে ভুল হওয়া বা লিখিত বস্তু পর্য্যায়ক্রমে নকল হইয়া আসার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া যাওয়া নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক। যাহা হউক লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার সাক্ষ্যের মধ্যেই অসত্যের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়াতে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া গত্যন্তর নাই, অন্যথায় সারা জগৎ অচল হইয়া পড়িবে। অবশ্য মিথ্যা সাক্ষ্য এড়াইবার জন্য সর্বক্ষেত্রেই সাক্ষ্যদাতার প্রতি নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

সনদের সত্যতা : হাদীছের সাক্ষ্য অর্থাৎ "সনদ" গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মোহাদ্দেছ—হাদীছ-বিশারদগণ বহুমুখী শর্ত-শরায়েত ও অতি কড়াকড়ি আরোপ করিয়া যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিয়াছেন উহা অন্যত্র একেবারেই বিরল। এমনকি বিশ্বে উহার নজীর কেহই কোথাও দেখাইতে পারিবে না। ঐ সমস্ত কড়াকড়ি দৃষ্টে বিশ্ববাসীকে এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা যাইতে পারে যে, হাদীছের প্রামাণিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নাই।

ঐ সমস্ত নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করিয়া "উসুলে-হাদীছ" বা হাদীছের প্রামাণিকতা পরীক্ষা করার নিয়ম-কানুন নামে একটি বিশেষ শাস্ত্র সংকলন করা হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রে বহু কিতাব লেখা আছে। নিম্নে ঐ সকল নিয়ম-কানুনের কতিপয় ধারা ও উপধারা উদ্ধৃত হইল :—

হাদীছরূপে গ্রহণীয় হইবার জন্য সাধারণতঃ উহার সনদে চারিটি প্রধান বিষয়ের প্রতি সর্ব-প্রথমে নজর দিতে হইবে। যথা—(১) শত শত বা হাজার হাজার বৎসর পরেই হউক না কেন, নবী (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সূত্র-পরম্পরায় পর্য্যায়ক্রমে যতজন সাক্ষীর মাধ্যমে হাদীছখানা পৌঁছিয়াছে, এক এক করিয়া সমস্ত সাক্ষীর পরিচিত নামের তালিকা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, কোন একজনের নামও বাদ না পড়ে, নতুবা হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না। ✽ এই ধারাটির সহিত আবার দুইটি উপধারাও রাখা হইয়াছে।

✽ মোহাদ্দেছগণ প্রত্যেক হাদীছের সঙ্গে উহার সনদ বা সাক্ষীগণের তালিকা উল্লেখ করেন, যথা—ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, মোহাদ্দেছ হোমায়দী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সুফিয়ান নামক মোহাদ্দেছের মুখে শুনিয়াছেন, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়ীদ আনছারীর মুখে শুনিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তায়মীর নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি আল'কামা ইবনে আবী ওকাছের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছেন, তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি......انما الاعمال بالنيات। (পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(ক) উক্ত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে প্রতিটি সাক্ষী বা রাবী তাঁহার পূর্বের সাক্ষ্যদাতার নাম উল্লেখ করার সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিবেন যে, আমি "অমুকের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন" বা "অমুকে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।" কোন একজন সাক্ষীও যদি ঐরূপ স্পষ্ট শব্দ না বলিয়া কোন অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন এরূপ বলেন যে—"সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে" একটি সাক্ষীর বেলায়ও এইরূপ অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হইলে ঐ সনদ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বহু রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। ইমাম বোখারী (রঃ) এরূপ সনদ গ্রহণ ব্যাপারে সর্বাধিক কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন।

লক্ষ্য করুন! কতদুর সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; যে—"সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে" এরূপ বলিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, সলীম সরাসরি কলীমের মুখে শুনিয়াছে। বরং এরূপও হইতে পারে যে, অন্য কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে শুনিয়াছে, অথচ ঐ ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ নাই, ইহাতে ১ নম্বর ধারা লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এইরূপ সামান্য সন্দেহের অবকাশও যেন না থাকিতে পারে, তজ্জন্য এই উপধারা রাখা হইয়াছে। এমনকি, যদি কোন রাবীর বিষয় এরূপ প্রমাণিত হয় যে, সে এরূপ অস্পষ্ট ভাষার আড়ালে প্রকৃত প্রস্তাবেই ১ নম্বর শর্ত লঙ্ঘন করিয়া হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে তবে হাদীছের পরিভাষায় তাহাকে "মোদাল্লেস" বলা হইবে। এরূপ ব্যক্তি সর্বস্থানে সন্দেহজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক সাক্ষী ও তাঁহার পূর্ববর্তী উপরের সাক্ষী উভয়ের জীবনকাল ও বাসস্থান এরূপ পর্য্যায়ের হইতে হইবে যেন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা অসম্ভব না হয়।

(২) সাক্ষ্যদাতাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীছ বিশারদগণের নিকট নাম ঠিকানা, গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্র এবং কোন্ কোন্ ওস্তাদের নিকটে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পরিচিত হইতে হইবে। সাক্ষ্যদাতাদের একজনও অপরিচিত হইলে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় নহে।

(৩) আগাগোড়া প্রতিটি সাক্ষীই জ্ঞানী, খাঁটী সত্যবাদী,* সচ্চরিত্র, মোত্তাকী, পরহেজগার, শালীনতা ও ভদ্রতাসম্পন্ন, সৎ-স্বভাবের হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি জীবনে মাত্র একবার হাদীছ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা উক্তির জন্য ধরা পড়িলে ঐ ব্যক্তির শুধু ঐ মিথ্যা হাদীছই নহে, বরং তাহার সারা জীবনের সমস্ত হাদীছই অগ্রাহ্য হইবে। তওবা করিলেও তাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাছাড়া অন্য কোন বিষয়েও মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলে বা শরীয়ত বিরোধী আকিদা বা কার্য্যকলাপে লিপ্ত প্রমাণিত হইলে বা অসৎ প্রকৃতির লম্পট ও নীচ-স্বভাবের লোক হইলে তাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না।

লক্ষ্য করুন। একটি বিষয়কে হাদীছরূপে প্রমাণ করিতে বোখারী (রঃ) স্বীয় ওস্তাদ হইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্ত সাক্ষ্যদাতাদের পূর্ণ তালিকা বর্ণনা করিলেন। এইরূপেই মোহাদ্দেছগণ সনদযুক্ত বর্ণনা করেন। বোখারী শরীফের প্রত্যেকটি হাদীছ সনদসহ বর্ণিত আছে। সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে অনুবাদে সনদ উল্লেখ করা হয় নাই।

* মোহাদ্দেছ—হাদীছ বর্ণনাকারী ও হাদীছ শিক্ষাদানকারী বা হাদীছের সাক্ষীগণের সত্যবাদীতার পরীক্ষা কঠোরভাবে করা হইত। উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন কতিপয় আলেম পরীক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তির স্ব-গ্রাম ও স্ব-গোত্রে যাইয়া তাহার সত্যবাদিতা যাচাই করিতেন। এই ব্যক্তি জীবনে কখনও

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৪) প্রত্যেকটি সাক্ষী তাঁহার স্মরণশক্তি সম্পর্কে অতিশয় পাকাপোক্ত, সুদক্ষ ও সুদৃঢ় সংরক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে× এবং ইহাও সুপ্রমাণিত হওয়া আবশ্যক যে, প্রতিটি সাক্ষী তাঁহার পূর্ববর্তী সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে হাদীছখানা পূর্ণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করতঃ সবিশেষ মনোযোগের সহিত মুখস্ত করিয়া বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ের প্রমাণ এইরূপে

মিথ্যা বলে নাই প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করতঃ মোহাদ্দেছ বা হাদীছ বর্ণনাকারী ও শিক্ষাদানকারীরূপে গ্রহণ করা হইত; নতুবা নহে।

এরূপ পরীক্ষার একটি নজীর চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু হাতেম—মোহাম্মদ ইবনে হাব্বান روضة العقلاء কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠায় সনদযুক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

রিবয়ী ইবনে হেরাশ (রঃ) যিনি প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—যখন তাঁহার পরীক্ষা হইল এবং তাঁহার বস্তি ও গোত্রের লোকগণ এক বাক্যে তাঁহার সততার সাক্ষ্য দিল তখন একজন শত্রু তাঁহার মোহাদ্দেছ গণ্য হওয়ার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করিল। সে তৎকালীন শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে বলিল, রিবয়ী' ইবনে হেরাশ আজ মোহাদ্দেছ শ্রেণীভুক্ত হইবেন; তাঁহার বস্তি ও গোত্রের সকলে তাঁহার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিয়াছে। আপনি একটু লক্ষ্য করিলেই তিনি একটু মিথ্যায় জড়িত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার দুইটি ছেলেকে আপনি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আদেশ করিয়াছেন, তাহারা নিজ গৃহেই পলাতক আছে। তাহাদের পিতা রিবয়ী' ইবনে হেরাশ তাহা অবগত আছেন। আপনি তাঁহাকে ছেলেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিবেন। সে ভাবিয়াছিল, হাজ্জাজ অতি ভয়ঙ্কর শাসনকর্তা, তাই রিবয়ী' ইবনে হেরাশ নিশ্চয় সন্তানদ্বয়ের প্রাণ রক্ষার্থে বলিবেন, আমি ছেলেদ্বয়ের খবর জ্ঞাত নহি। এইভাবে তিনি মিথ্যায় জড়িত হইয়া পড়িবেন।

সেমতে শাসনকর্তা হাজ্জাজ তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রিবয়ী'? তিনি বলিলেন, হাঁ। আপনার ছেলেদ্বয়ের খবর জানেন কি? তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, তাহারা গৃহের মধ্যেই পলাতক রহিয়াছে। এইভাবে তিনি সত্যবাদীতার দ্বারা হাজ্জাজের ন্যায় পাষাণ আত্মাকেও জয় করিয়া ফেলিলেন। হাজ্জাজ তাঁহার পরিপক্ক সত্যবাদীতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সততা ও সুনামের ঘোষণা করিয়া দিলেন।

× পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কোন মোহাদ্দেছ হাদীছের শিক্ষা ও সাক্ষ্যদাতা গণ্য হইবার জন্য তাঁহার সত্যবাদিতা পরীক্ষিত হইত। তদ্রূপ তাঁহার স্মরণশক্তিও পরীক্ষা করা হইত। স্বয়ং বোখারী (রঃ)কে এরূপ পরীক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) প্রথম জীবনে বাগদাদে উপস্থিত হইলে স্থানীয় হাদীছবিশারদগণ তাঁহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা একশতটি হাদীছ তৈয়ার করিলেন; ঐ হাদীছ সমূহের মূল হাদীছ ও সনদের মধ্যে গড়মিল এবং আরও নানা-প্রকার উলট-পালট করিয়া সাজাইলেন। অতঃপর দশ জন আলেম নির্দিষ্ট করা হইল যাঁহারা ঐ ভুল হাদীছ সমূহের দশটি করিয়া পর পর ইমাম বোখারীর সম্মুখে পেশ করিবেন এবং তাঁহার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহা করা হইল। প্রত্যেকটি হাদীছের সঙ্গে তিনি শুধু এতটুকু বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, এরূপ কোন হাদীছ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। একশত গড়মিল হাদীছ পেশ করা শেষ হইলে পর তিনি ঐগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, অমুক ব্যক্তি প্রথমে এই হাদীছটি পেশ করিয়াছেন, উহাতে এই এই ভুল আছে, উহার প্রকৃত রূপ এই।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হইবে যে, উক্ত সাক্ষী যে যে হাদীছ আজীবন শত শত বার বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন কোন সময়ই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য বা কোনরূপ গড়মিল পরিলক্ষিত হয় নাই।+ যখন যে সাক্ষীর বর্ণনা মধ্যে এইরূপ গড়মিল দেখা যাইবে তখন হইতে আর ঐ সাক্ষীর বর্ণনার কোন হাদীছ সঠিক প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ধারা অনুসারেই বহু বড় বড় গণ্যমান্য হাদীছ বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পর তাঁহাদের ঐ অবস্থায় বর্ণিত হাদীছ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয় নাই। তাছাড়া যাহাদের সাধারণ কথাবার্তায় বেশী ভুল দেখা গিয়াছে তাহাদের হাদীছও গ্রহণীয় হয় নাই।

হাদীছ পরীক্ষার এই চারিটি প্রধান শর্ত। আরও বহু খুটিনাটি বিষয়াদি আছে যাহা সুবিজ্ঞ আলেমগণ অবগত আছেন। যাহার দ্বারা হাদীছের প্রামাণিকতা আরও অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

এইভাবে একশত হাদীছের বিষয়ে মন্তব্য করিলেন; ঐ ভুল হাদীছগুলি তাঁহার সম্মুখে যে ধারাবাহিকতায় পেশ করা হইয়াছিল উহাতেও কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

কী স্মরণশক্তি! একশত ভুল হাদীছ একবার মাত্র শুনিয়া অবিকলরূপে এবং তরতীব সহ কণ্ঠস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন; পরীক্ষকগণের নিকট এই বিষয়টি অতি বিস্ময়কর ছিল।

+ ইমাম বোখারী (রঃ) সংকলিত "কিতাবুল-কুনা" ৩৩ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর হাদীছ কণ্ঠস্থ রাখার ক্ষমতা পরীক্ষার গোপন উদ্দেশ্যে নানারূপ ছলে-বলে তাঁহার দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করাইলেন এবং মারওয়ানের সেক্রেটারী পর্দার আড়ালে থাকিয়া গোপনে ঐ সব হাদীছ অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পর মারওয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ)কে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন এবং সেক্রেটারীকে পূর্বে লিখিত লিপি সহ আড়ালে বসাইলেন। অতঃপর আবু হোরায়রা (রাঃ)কে এক বৎসর পূর্বে বর্ণিত হাদীছসমূহ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি এক একটি করিয়া বর্ণনা করিলেন। সেই সেক্রেটারীর সাক্ষ্য যে, দীর্ঘ এক বৎসর ব্যবধান সত্ত্বেও এত বেশী সংখ্যক হাদীছের বর্ণনার মধ্যে একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম ছিল না।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট হেশাম কর্তৃক এইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; ইমাম জাহাবীর সংকলিত "তাজকেরা" কেতাবের প্রথম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আমার ছেলের জন্য কতকগুলি হাদীছ লিখাইয়া দিন। তিনি একজন সরকারী কেরাণীকে ডাকিয়া চারি শত হাদীছ লিখাইয়া দিলেন। প্রেসিডেন্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে এক মাস কাল পরে ডাকিয়া পূর্বে লিখিত লিপিখানা হারাইয়া যাওয়ার ভান করিয়া ঐ চারি শত হাদীছ পুনরায় লিখাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন, বস্তুতঃ পূর্বের লিপি হারাইয়া ছিল না। চারি শত হাদীছের নূতন পুরাতন লিপিদ্বয়ে এক অক্ষরেরও পার্থক্য হইল না।

• মোহাদ্দেছগণ স্মরণশক্তির প্রতি কত সতর্ক থাকিতেন সে সম্পর্কে ইমাম তিরমিযির (রঃ) একটি ঘটনা আছে। তিরমিজি (রঃ) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ছিলেন, তবুও হাদীছ শিক্ষা দিতেন, এমনকি ভ্রমণাবস্থায়ও তাঁহার সঙ্গে হাদীছ পিপাসুগণ থাকিতেন। একদা উষ্ট্রে আরোহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন; পথিমধ্যে একস্থানে তিনি অল্প সময়ের জন্য মাথা নত করিয়া রাখিলেন। সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ঐ স্থানে মাথা নত করিলেন কেন? তিনি বলিলেন, ঐ স্থানে কি একটি বৃক্ষ রাস্তার উপর ঝুকিয়া পড়ে নাই যে, উষ্ট্রারোহীদের মাথা উহাতে আঘাত পাইবে? সকলেই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এইরূপ শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাদীছ বিশারদগণের মধ্য হইতেই যুগে যুগে এক শ্রেণীর মনীষীবৃন্দ এক বিরাট ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যাহার মূল্য বর্তমান যুগের আপন-ভোলা মোসলেম সমাজ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিজাতীয়গণ, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবীদার—ইউরোপবাসীরাও নতশিরে মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই অমূল্য রত্ন—মহান ইতিহাস-ভাণ্ডার একমাত্র মোসলমানদেরই অমরকীর্তি। ইহার নজীর অন্য কোন জাতি কোন কালে দেখাইতে সক্ষম হয় নাই এবং হইবেও না। সেই অমূল্য রত্নটি হইল এক বিশেষ শাস্ত্র যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় (اسماء الرجال) "আছমাউর-রেজাল" অর্থাৎ হাদীছের সাক্ষ্যদাতা ও রাবীগণের জীবনেতিহাস বা জীবন-চরিত বলা হইয়া থাকে। তাহাতে উল্লিখিত চারিটি ধারা এবং উহা ছাড়াও হাদীছের সাক্ষ্যদাতাদের বিষয়-সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়াদি রহিয়াছে, সে সব দৃষ্টে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিটি রাবী তথা হাদীছের সাক্ষ্যদাতার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত ও অপরিচিত নাম, বংশ-পরিচয় বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীছ-বিশারদগণ কর্তৃক তাঁহার প্রতি মন্তব্য সমূহ এবং তাঁহার সংগুণাবলী বা দোষ-ত্রুটির বিস্তারিত বিবরণ এবং তিনি যে সমস্ত লোকের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের ফিরিস্তি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই শাস্ত্রের শুধু প্রসিদ্ধ ও সচরাচর প্রচলিত কিতাব সমূহের মধ্যে উল্লিখিত আকারে ৮৫০০০ হাজার রাবী বা সাক্ষ্যদাতার জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধকারে বিশ্ব-ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) কর্তৃক চার খণ্ডে সঙ্কলিত "আল-এসাবাহ্" নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহারই একাদশ খণ্ডে সঙ্কলিত "তাহ্জীবুত-তাহ্জীব" কিতাবে ১২৪৫৫ সংখ্যক লোকের বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁহার পূর্বে হাফেজ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন ও হাফেজ শামছুদ্দীন জাহাবীর ন্যায় বড় বড় মনীষী এই বিষয়ে বহু কিতাব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন।

এই শাস্ত্রে সর্বমোট ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ রাবী বা হাদীছ বর্ণনাকারী সাক্ষীদের বিস্তারিত জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (তদবীনে হাদীছ)

প্রসিদ্ধ জার্মানী ডঃ স্প্রেঙ্গার যিনি ১৮৫৪ ইং সনে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন এবং আরবী সহ বিভিন্ন ভাষার অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোন জাতি অতীতেও হয় নাই, বর্তমানেও নাই যে জাতি মোসলমানদের ন্যায় "আছমাউর-রেজাল" শাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবনেতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়।" (উপরোল্লিখিত আল-এসাবাহ নামক কিতাবের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এই কথা লিখিয়াছেন।)

বলিল, ঐ স্থানে কোন বৃক্ষই নাই। তিনি বলিলেন, বহু দিন পূর্বে চক্ষু ভাল থাকাকালীন আমি এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময় এই পথে একটি বৃক্ষ ছিল, আমি ঐ স্থানটিকে সেই বৃক্ষতল মনে করিয়া মাথা নত করিয়াছি। তোমরা ঐ স্থান-সংলগ্ন বস্তির লোকদের নিকট সঠিক তথ্য অবগত হও। ঐ স্থানে কোন সময় ঐরূপ বৃক্ষ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া না গেলে আমি হাদীছ বর্ণনা করা বন্ধ করিয়া দিব; মনে করিব, আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

সত্য সত্যই ঐ বস্তির বয়োবৃদ্ধদের নিকট জানা গেল, পূর্বকালে ঠিক এই স্থানে ঐরূপ বৃক্ষ ছিল। তখন তিনি স্বীয় স্মরণশক্তি বহাল থাকায় আল্লার শোকর আদায় করিলেন।

বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফের বিশেষত্ব :

পূর্বেই বলা হইয়াছে—যে চারিটি ধারার বিষয় আলোচনা হইল, ঐ কয়টি হইল সাধারণ ধারা। অর্থাৎ কোন হাদীছকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বলিতে হইলে ঐ সব ধারা উহার সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট হাদীছ-বিশারদগণ তাঁহাদের কোন কোন গ্রন্থের জন্য উক্ত চারিটি ধারা সম্বলিত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও অন্যান্য গুণাবলী দৃষ্টে আরও শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন। তদুপরি আরও বহু বিশিষ্ট গুণাবলীর শর্ত আরোপ করিয়াছেন। আটা বা ময়দা সাধারণতঃ প্রথমে মোটা চালুনী দ্বারা চালা হয়, তারপর উহা সূক্ষ্ম চালুনীতে চালা হয়; কেহ কেহ আবার উহাকে কাপড়ে ছাকিয়া ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় ঐ আটা বা ময়দার মধ্যে যেমন কোন প্রকার আবর্জনা থাকিতে পারে না; তেমনি হাদীছের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা ভেজাল থাকিতে না পারে তজ্জন্য হাদীছের রাবী বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণী বিভক্তির দিক দিয়া যিনি যেই গ্রন্থের জন্য যত বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার বিশ্লেষণে অতিশয় কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সেই গ্রন্থ তত পরিপক্ক ও বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই দিক দিয়া সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছেন, ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁহার শাগের্দ ইমাম মোসলেম (র:)। এবং উক্ত মহামনীষীদ্বয় কর্তৃক সঙ্কলিত দুইখানা গ্রন্থ—"বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফ" দুনিয়ার বুকে আজ বার শত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে এই শ্রেণীর সমুদয় গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহারা সর্বমোট ৫০০০০০ রাবী বা বর্ণনাকারী—হাদীছের সাক্ষীদের মধ্যে সচরাচর পরিচিত ৮৫০০০ রাবী বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া ২৪০৪ জন রাবীকে সূক্ষ্মদর্শীতার কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দুগ্ধ হইতে মাখন বাহির করার ন্যায় বাছিয়া লইয়াছেন।

বোখারী শরীফের বিশেষত্ব :

ইমাম বোখারী (র:) ও ইমাম মোসলেম (র:) এই দুইজন ওস্তাদ শাগের্দের মধ্যে সাধারণ নিয়মকেই আল্লাহ তায়ালা বজায় রাখিয়াছেন। ওস্তাদ ইমাম বোখারী (র:) ও তাঁহার গ্রন্থখানাই বিশ্বের বুকে অগ্রগণ্য হইয়াছে। তিনি আরও সূক্ষ্মতমভাবে যাচাই করিয়া বোখারী শরীফ গ্রন্থের জন্য ২৪০৪ জন হইতে ৬২০ জনকে বাদ দিয়াছেন। তাই তাঁহার এই গ্রন্থখানা সর্বাধিক উচ্চতর শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বে প্রবাদরূপে স্বীকৃত রহিয়াছে—

اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخارى

অর্থাৎ আল্লার কিতাব—কোরআন শরীফের পরেই বিশ্বস্ততার সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বোখারীর এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ বোখারী শরীফ। এবং এই জন্যই ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে হাদীছ-শাস্ত্রের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বোখারী (র:) পর্য্যন্ত যে সকল সাক্ষ্যদাতা বা রাবীর মাধ্যমে এই গ্রন্থের মধ্যে হাদীছ গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মোট সংখ্যা হইল প্রায় ১৮০০।ক তন্মধ্যে ১৩৫৪ জন হইলেন এইরূপ যাঁহাদের মাধ্যমে ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম

ক এই ১৮০০ শতের মধ্যে ১০১ জন হইলেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী। ছাহাবীগণ বিশ্বস্ততায় প্রশ্নের উর্দ্ধে; তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও সত্যবাদিতা পূর্বাপর মোসলেম জাহানের সর্ববাদী সম্মত বিষয়। অবশিষ্ট ১৬৯০ সংখ্যার অধিকাংশই তাবেয়ীন বা তাবয়ে-তাবেয়ীন তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটতম সোনালী যুগের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উভয়েই হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা সকলেই শীর্ষস্থানীয় পরিগণিত। অবশিষ্ট ৪০০ হইতে কিছু অধিক সংখ্যক রাবীর নিকট হইতে শুধু বোখারী (রঃ) হাদীছ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐসব রাবী বা সাক্ষ্যদাতা ইমাম বোখারীর সুক্ষ্মতম বাছনীর মধ্যে গ্রহণীয়রূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শুধু ইমাম মোসলেমও প্রায় ৬২০ সংখ্যক রাবী হইতে হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহাদেরকে সুক্ষ্মতম বাছনীতে তাঁহার বিশেষ গ্রন্থ বোখারী শরীফের ক্ষেত্রে বাদ দিয়াছেন।

মোট ২৪০৪ জন মানুষের জীবনেতিহাস কোনও অসাধ্য বা অপ্রকাশ্য বস্তু নহে, বরং পূর্বালোচিত "আছমাউর-রেজাল" শাস্ত্রের কিতাবসমূহে আলেখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া শত শত বৎসরকাল হইতে জগদ্বাসীর হাতে ও তাহাদের দৃষ্টিগোচরে বিদ্যমান রহিয়াছে; তদুপরি শুধু এই ২৪০৪ জন মানুষের পূর্ণ জীবনী সঙ্কলিত ও সুরক্ষিত আছে—যাহার জন্য قرة العينين في رجال الصحيحين নামক একখানা কিতাবও পূর্বকাল হইতেই বিশ্বের বুকে প্রচলিত রহিয়াছে। উল্লিখিত বিষয়াবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করিতেছি, সুষ্ঠুরূপে প্রত্যেকটি রাবীর জীবনী অনুধাবন করতঃ তাঁহারাই বিচার করুন এই সমস্ত লোকদের দ্বারা কোনও মিথ্যা বর্ণনা প্রদান বা কোনরূপ মিথ্যানুষ্ঠান কতদূর সম্ভব।

রসুলুল্লার আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য

অধুনা কোন কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মুখেও এরূপ প্রশ্ন শোনা যায় যে, দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসরের পুরাতন আদর্শাবলী, বিশেষতঃ পর্বতমালা বেষ্টিত মরু অঞ্চল-অধিবাসী অনুন্নত যুগ ও অনুন্নত দেশের একটি লোক যে আদর্শ গড়িয়াছিলেন বর্তমান প্রগতিশীল ও উন্নতিশীল জগতে তাহা চলিবে কেন? বর্তমান জগত বহুদূর আগে বাড়িয়া গিয়াছে, এই অসাধারণ প্রগতির যুগে—এই বিজ্ঞানের যুগে পিছনের পুরাতন আদর্শ অচল হইতে বাধ্য। এত অগ্রগামী যুগের চাহিদা এত পশ্চাতের আদর্শ কিরূপে মিটাইতে পারে?

ইসলামী আদর্শের সুফল এবং অনৈসলামিক রীতিনীতির কুফল যাহা বাস্তব জগতেই প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে উহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া নিয়া শুধু মাত্র মৌখিক বিতর্কের উপর উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, হযরত মোহাম্মদ—রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাবই হইল এই প্রশ্নের মূল। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে শুধু মাত্র দুইটি তথ্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি, অকপট চিত্তে উহার বাস্তবতা অনুধাবন করিতে পারিলে মূল প্রশ্নের অসারতা সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠিবে।

প্রথম তথ্য—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্থূল বিজ্ঞানের হিসাবে যতই অনুন্নত দেশের অনুন্নত যুগের এবং যতই পুরাতন কালের হউন না কেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আদি-অন্ত সকল দেশ ও সকল পরিবেশের সৃষ্টিকর্তা আল্লার রসুল। এবং আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল যুগ, দেশ ও পরিবেশের প্রতিটি বস্তুর অবস্থার পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন—لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير। "যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি সৃষ্টি সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাত থাকিবেন না? অধিকন্তু তিনি সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব ও সুক্ষ্ম বিষয়ের এবং অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানের আকরও বটে।"

তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের সম্মুখে নূতন-পুরাতন, অতীত-ভবিষ্যৎ বলিতে কিছু নাই, সব কিছুই সমান ভাবে তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রের বিন্দু। সেই মহান স্রষ্টার সঙ্গে ছিল হযরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৃঢ় যোগসূত্র এবং তাঁহার প্রতিটি বাক্য ও চিন্তাধারার উৎস ছিলেন সেই মহান স্রষ্টা; এই ঘোষণাই পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিয়াছে—

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى "মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিজের মনোবৃত্তি হইতে কিছুই বলেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া সেই অহীর বিকাশ সাধন করেন মাত্র।" সুতরাং তাঁহার আদর্শ বস্তুতঃ তাঁহার রচিত বস্তু নহে, বরং বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্বনিধি সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বস্তু। উহার পাওয়ার ও শক্তিকে আমাদের নিজেদের রচিত আদর্শের পাওয়ার ও শক্তির মাপকাঠিতে পরিমাণ করা নিতান্তই ভুল হইবে; মণকে তোলার পাথরে পরিমাপ করা অপেক্ষা অধিক বোকামী হইবে।

দ্বিতীয় তথ্য :—বাক্য-বচনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জ্ঞান ও আদর্শ বিতরণ করা সম্পর্কে বিশ্বনবী ও সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি ও গুণ দান করিয়াছিলেন যাহা অন্য কোন মানুষ ত দূরের কথা পূর্ববর্তী কোন নবীকেও আল্লাহ তায়ালা উহা দান করিয়াছিলেন না।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে এই বিষয়টির প্রতি বিশ্ববাসীকে সজাগ ও সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন—

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.... وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ-

হাদীছখানা মোসলেম শরীফ ১৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল নবীগণের উপর ছয়টি বস্তুর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মূল হাদীছের মধ্যে পূর্ণ ছয়টির উল্লেখই রহিয়াছে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু তিনটি—) (১) আমাকে আল্লাহ তায়ালা "জাওয়ামেউল-কালেম" গুণ দান করিয়াছেন; (৫) আমি সারা বিশ্বমানবের রসুল-রূপে প্রেরিত হইয়াছি। (৬) নবীগণের আগমন আমার উপরই শেষ, আমার পরে কোন নবী আসিবেন না। (২১৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ছয়টি বস্তুর প্রথম বস্তুটি হইল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ঃ অর্থাৎ "জাওয়ামেউল-কালেম।" "জাওয়ামে" শব্দটি বহুবচন, ইহার অর্থ "ব্যাপক পরিধিময় বস্তু।" "কালেম" শব্দটিও "কলেমা" শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ (১) শব্দ (২) চিন্তাধারা—মনন, চিন্তন বা অন্তরের আলোচনা ও গবেষণা (৩) আদর্শ বা নীতি নির্দ্ধারক বাক্য ও বচন। যেমন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"কে "কলেমা তৈয়্যব" বলা হয়।

হযরত (দঃ) বলিতেছেন—ব্যাপক পরিধিময় চিন্তা বলে ব্যাপক পরিধিময় আদর্শ ও নীতি ব্যাপক অর্থের শব্দাবলীতে রচিত ও প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি ও গুণ আল্লাহ তায়ালা খাছ ভাবে আমাকে দান করিয়াছেন, অন্য কোন নবীরও এই ক্ষমতা বা গুণ ছিল না।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সারগর্ভময় উক্তিটির সঠিক মর্য্যাদা দান করিলেই মূল প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যায়। মনে হয় যেন হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত তথ্যটি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ও গুণ হইতে নিঃসৃত চিন্তাধারা, আদর্শ ও বাক্যাবলীর ব্যাপক পরিধি দেশ, কাল ও যুগ নির্বিশেষে

সকলকে বেষ্টিত করিবে ইহাই হইল হযরতের উক্ত সারগর্ভময় উক্তিটির সার্থকতা এবং এই জন্যই হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই ধরণের গুণ অন্যান্য নবীগণের জন্য আবশ্যকও ছিল না, কারণ তাঁহাদের আবির্ভাব বিশেষ জাতি ও কালের জন্য সীমাবদ্ধ রূপের ছিল। পক্ষান্তরে (১) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)এর আবির্ভাব হইল দেশ, কাল, জাতি, যুগ নির্বিশেষে বিশ্ব-মানব জাতির জন্য (২) এবং তাঁহার রেছালত, নবুয়ত ও পয়গাম্বরী কায়েম থাকিবে জগৎ-জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত। এই দুইটি বিষয়কেই হযরত (দঃ) পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরতের আদর্শ যদি দেশ, কাল, যুগ ও জাতি নির্বিশেষের জন্য না হয় তবে এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের সংবিধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

হাদীছ সংরক্ষণে বিশেষ তৎপরতা

হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতেই তাঁহার প্রতিটি হাদীছ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। ছাহাবীগণ অত্যধিক তৎপরতার সহিত হাদীছ কণ্ঠস্থ ও সংরক্ষণের প্রতি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। অবশ্য বিশেষ কারণাধীনে উহা ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত না। কারণটি এই যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় কোরআন শরীফ ক্রমান্বয়ে নাযিল হইতেছিল এবং ব্যাপকভাবে কোরআনের প্রতিটি অক্ষর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইত। এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) সদা-সর্বদা চারজন বিশেষজ্ঞ লেখককে এ কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখনই কোন আয়াত নাজেল হইত তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের একজনকে ডাকিয়া উহা লিপিবদ্ধ করাইতেন। এই চারজন ছাড়া আরও অনেকেই লিখিয়া রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মোসলমানই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। অবশ্য সেই যুগের রীতি অনুযায়ী অস্থি, বৃক্ষ-পত্র, প্রস্তর, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর উপরে ঐ সকল আয়াত লিখিয়া রাখা হইত। কিতাব বা পুস্তক আকারে একত্র সন্নিবেশিত-রূপে লেখা হইত না। যেহেতু কোরআন শরীফ বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত থাকিত, একত্রিতভাবে পুস্তক আকারে সুবিন্যস্ত ছিল না, সেই জন্য কোরআনকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখার অভিপ্রায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বিশেষ ব্যবস্থা ও সতর্কতামূলক পন্থা হিসাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে—কোরআন শরীফের ন্যায় ব্যাপকভাবে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকেও লিপিবদ্ধ করা সাময়িকভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ সর্বসাধারণের ভাষা ও বক্তব্য ইত্যাদি এবং কোরআনের ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে গুণ, মর্য্যাদা ও বিশেষত্বের দিক দিয়া তারতম্য ও পার্থক্য করা যেরূপ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ ও কোরআনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় ততটা সহজ বোধগম্য ও স্পষ্ট নহে। যেমন, আরবী ভাষার গুণাগুণ ও মর্য্যাদা আলোচনার বিশেষ শাস্ত্র এল্‌মুল-বালাগাতেও এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কোরআন ও হাদীছ উভয়ের আসল উৎস-মূল একই; যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। এবং ভাষাগুণও আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিশেষভাবে দান করিয়াছেন—او تيت جوامع الكلم। সুতরাং এইরূপ নিকটতম সৌসাদৃশ্যমূলক দুইটি বস্তু যদি একই সময়ে তাও আবার প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা কিতাবের আকারে নয়, বরং সেকালের রীতি অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ধরণের চর্ম-খণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড,

অস্থি-খণ্ড বা পত্র ইত্যাদিতে লিখিত ও সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদবস্থায় উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল। অতএব, এই সাময়িক অজুহাতের দরুণ অর্থাৎ কোরআনকে পূর্ণ সতর্কতার সহিত স্বতন্ত্র ভাবে প্রথমে ভালরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম ও পরিচিত করাইবার জন্য হাদীছ ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় ব্যাপকভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

বলা বাহুল্য—এই নিষেধাজ্ঞাই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুরাগী ছাহাবীদের জন্য হাদীছ সংরক্ষণের কাজে বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রতি অধিক সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)এর প্রতিটি হাদীছকে অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে অত্যধিক সচেষ্ট হইলেন। এমনকি যেহেতু হাদীছ লিপিবদ্ধ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার অর্থ ছিল যে, কোরআন শরীফের ন্যায় ব্যাপকভাবে লেখা যাইবে না, সেই জন্য কোন কোন ছাহাবী হাদীছ লিখিয়া মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন এবং দরকার অনুযায়ী সুনিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পুনরায় শুনাইয়া পরিপক্ক ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। আনাছ (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা বলিতেন—

هذه احاديث سمعتها من رسول الله وعرضتها عليه

"এই সমস্ত হাদীছ আমি নিজে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মুখে শুনিয়াছিলাম ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম।" আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—আমার নিকট যত বেশী হাদীছ সংরক্ষিত আছে ইহার চাইতে অধিক হাদীছ অন্য কোনও ছাহাবীর নিকট আছে বলিয়া মনে করি না। তবে হাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট অধিক হাদীছ থাকিতে পারে। কারণ তিনি হাদীছ লিখিয়া রাখিতেন, আমি হাদীছ লিখিতে বিশেষ তৎপর ছিলাম না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ যাহা পরবর্তী মোসলেম সমাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহার সংখ্যা ৫৩৭৪। আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজেই বলিতেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা আমার হাদীছের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমরের এই ঘটনা প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণিত আছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট হইতে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হাদীছ সমূহ এক একটি করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এমনকি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ। আপনার মুখ হইতে শ্রুত সমুদয় বার্তাই কি লিখিয়া রাখিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ও ক্রোধাবস্থা উভয় অবস্থার বার্তা সবই লিখিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ; এবং তিনি স্বীয় ঠোঁটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, এই ঠোঁটদ্বয়ের মধ্য হইতে কোন অবস্থাতেই না-হক কথা বাহির হয় না।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানে তাঁহারই নির্দেশে যে, বহু সংখ্যক হাদীছ লিখিয়াছিলেন তাহা কিতাব বা পুস্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল, সেই কিতাবের নাম ছিল—"ছাদেকাহ" সত্যের প্রতীক; যাহার হাদীছ সংখ্যা ৫৩৮৪ এরও উর্দ্ধে হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগের প্রবাহ সেই অমূল্য রত্ন পুস্তিকাখানা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু উহার সঙ্কলক আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীছ পূর্ব যুগের মোহাদ্দেছগণের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত প্রায় ৭০০ হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

বিশ্বের ন্যায়-বিচারক ও জ্ঞানীগণ চিন্তা করুন। দুনিয়ার কোন সাক্ষ্যদাতা কি তাঁহার সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুকে এরূপ তৎপরতার সহিত সংরক্ষণ করিয়া থাকে? অথচ দুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্যের উপর

নির্ভরশীল। ছাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে'-তাবেয়ীগণ বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব, তাঁহাদের সাক্ষ্যের দ্বারা হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা সীমাহীন ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব বর্ণনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানেই হাদীছ লিখিত হইয়া থাকিত, এমনকি স্বয়ং তাঁহার আদেশে পুস্তিকা আকারেও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যাবৎ কোরআন শরীফ গ্রন্থাকারে একত্রিতরূপে সংরক্ষিত এবং প্রতিটি আয়াতের সহিত মোসলমানগণ পূর্ণরূপে পরিচিত না হইয়াছিল তাবৎ নবী (দঃ)-এর নিষেধ অনুযায়ী হাদীছকে ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং পুস্তক আকারে প্রচার করার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই। বরং ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিরূপে রক্ষিত অবস্থায় এবং সাধারণ্যে পূর্বালোচিত সন্দেহমুক্ত মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সূত্র-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল।

হাদীছ সংরক্ষণের দ্বিতীয় ধাপ :

তারপর যখন প্রথমে আবু বকর (রাঃ) এবং পুনরায় তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) কোরআন শরীফকে সরকারী পরিচালনাধীনে একটি পূর্ণ গ্রন্থাকারে একত্রিত করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং মোসলমানগণ দিন দিন কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সহিত পূর্ণ পরিচিত হইয়া গেলেন, এদিকে মোসলমান শাসনকর্তা খলীফাগণও ইসলামী রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাতের সমস্ত রকমের ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঝামেলা হইতে মুক্ত হইলেন, তখন ৯৯ হিজরী সনে অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর এন্তেকালের শতাব্দীর মধ্যেই মাত্র ৮৯ বৎসর পরে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁহার মহত্ত্ব ও গুণাবলী আজ চৌদ্দশত বৎসর পরেও বিশ্ব-ইতিহাসের আকাশে দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জল ও ভাস্কর। এবং তাঁহার অসাধারণ গুণরাজি ও মহত্ত্বের দরুণ বিশ্ববাসী তাঁহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় চারি-রত্ন খোলাফায়ে-রাশেদীনের সংলগ্নস্থানে অভিষিক্ত করতঃ পঞ্চম খোলাফায়ে-রাশেদীন উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

এই স্বনামধন্য মহান ব্যক্তি খলীফা হওয়ার পর, তিনি এক মহান কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোরআন শরীফ পূর্ণরূপে স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া মোসলমানদের নিকট পূর্ণ পরিচিতির আসন লাভ করিয়াছে এবং এক স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব আকারে একত্রিত হইয়া সর্বত্র পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহার মধ্যে আর কোন প্রকার সংমিশ্রণের আশঙ্কা আদৌ নাই। সুতরাং তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন হিসাবে সরকারীভাবে স্বীয় পরিচালনাধীনে রসুলুল্লাহ (দঃ)এর ছাহাবীগণ এবং তাঁহাদের শাগের্দগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে এবং কণ্ঠস্থরূপে রক্ষিত হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া একত্র করার কার্য্যে অগ্রণী হইলেন। যেহেতু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের প্রধান কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা, সেই জন্য খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত গভর্ণর আবু বকর ইবনে হযমকে এই আদেশ পাঠাইলেন—

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه
فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

"আমার আদেশ—আপনি তন্ন তন্ন করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক একটি হাদীছকে খুঁজিয়া বাহির করুন এবং লিপিবদ্ধ করিতে থাকুন। আমার ভয় হইতেছে, এরূপ না করিলে কালক্রমে এই জ্ঞান-ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক—ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।" (বোখারী শরীফ)

সুধীবর্গ। লক্ষ্য করুন—সেকালে বিশ্ব-মোসলেম একটি রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। সেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা খলীফাতুল-মোসলেমীন—তাও প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্র যেখানে সর্বক্ষমতার একমাত্র অধিকারী প্রেসিডেন্ট হইয়া থাকেন, সেই প্রেসিডেন্ট নিজ পরিচালনাধীন স্বীয় নিযুক্ত গভর্ণরগণের নিকট এরূপ লিখিত আদেশ পাঠাইয়া যে কার্য্য পরিচালনা করিলেন উহা যে কি ধরণের হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর প্রথম শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই হাদীছসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের যুগ আরম্ভ হইল এবং সরকারী পরিচালনাধীনেই তাহা আরম্ভ হয়। কথিত আছে—الناس على دين ملوكهم। "রাষ্ট্রের নীতি ও গতির দ্বারা অন্যান্য সমস্ত জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।" সুতরাং সমগ্র মোসলেমজাতিই এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল এবং ঘরে ঘরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ খোঁজ করতঃ সাক্ষ্যদাতাদের নিকট হইতে হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কার্য্যে ব্যাপক সাড়া পড়িয়া গেল। মদীনাবাসী ইমাম মালেক হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আহমদ ইবনে-হাম্বল, ইমাম আওযায়ী, ইমাম যোহ্‌রী, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাছায়ী প্রমুখ শত শত বিশিষ্ট ইমামগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)এর হাদীছসমূহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মোয়াত্তা" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেক কিতাবই আজ তের শত বৎসরের অধিক কাল হইতে বিশ্বের বুকে গ্রহণীয় হইয়া আসিতেছে।

সেই যুগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ খুঁজিয়া বাহির করার কিরূপ প্রেরণা মোসলেম সমাজে জাগিয়াছিল তাহার নমুনা বোখারী শরীফের ১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছের ঘটনা পাঠ করিলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঘটনাটি এই—একজন লোক একটি মাত্র হাদীছের জন্য স্বীয় আবাসভূমি মদীনা হইতে প্রায় ৬০০ শত মাইল অতিক্রম করিয়া দামেস্ক শহরে আবুদ-দারদা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হাজির হইলেন, ঐ একটি মাত্র হাদীছ-রসুল ছাহাবীর মুখে শুনিয়া আসাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ছায়ীদ ইবনে-মোছাইয়েব—বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদ্দেছ বলেন, আমি এক একটি হাদীছের তালাশে একাধারে কয়েক দিন ও কয়েক রাত্র ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছি।

আবুল-আলীয়া নামক মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের যুগের হাদীছ পিপাসুগণের এরূপ পিপাসা ছিল যে, তাঁহারা বছরা শহরে বসিয়া তথাকার লোক মারফৎ কোন একটি হাদীছ লাভ করার পর যদি শুনিতে পাইতেন যে, এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী এখনও মদীনায় জীবিত আছেন; তবে সরাসরি ঐ ছাহাবীর মুখে হাদীছটি শুনিবার উদ্দেশ্যে বছরা হইতে সুদুর মদীনায় উপস্থিত হইতেন। বছরা হইতে মদীনার দুরত্ব বহু শত মাইল। তদুপরি স্বয়ং ছাহাবীদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাও লক্ষ্য করুন—বোখারী শরীফের ১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, ছাহাবী জাবের (রাঃ) স্বয়ং ছাহাবী হইয়াও একটি মাত্র হাদীছ হাসিল করার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং জাবের (রাঃ) উক্ত ঘটনার বিবরণ দানে বলিয়াছেন, লোক মুখে শুনিতে পাইলাম, সিরিয়ায় অবস্থিত একজন ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে একটি বিশেষ হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই খবর শুনামাত্র আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং উহার উপর সওয়ার হইয়া দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করতঃ মদীনা হইতে সিরিয়ায় পৌঁছিলাম। খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম—ঐ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস আনছারী (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি লোক

মারফৎ এই খবর পাঠাইলাম যে, জাবের আপনার দ্বারে অপেক্ষারত দণ্ডায়মান। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি আবদুল্লার পুত্র জাবের? আমি বলিলাম—হাঁ। এই খবর শুনামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ ছাহাবী বাহির হইয়া আসিলেন, আমরা উভয়ে কোলাকুলি করিলাম এবং বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি বিশেষ একখানা হাদীছ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা শুনিবার জন্য মদীনা হইতে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি, কারণ ঐ হাদীছখানা আমি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিতে পারি নাই। অতঃপর সেই ছাহাবী ঐ হাদীছখানা আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। (জামেউল-বয়ান ১৩ পৃঃ)

এইরূপে আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ), আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং আরও ছাহাবীর নামে অধিক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁহারা স্বীয় কণ্ঠস্থ হাদীছের এক একটি বাক্য শুদ্ধির জন্য মদীনা হইতে মিশরে অবস্থানকারী সঙ্গী ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়াছেন। আমরা এ ধরণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া কল্পনা করিব, কারণ ইসলামের প্রাণবস্তু—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আমাদের হ্রাস পাইয়াছে।

সেই যুগের ইমামগণ এইরূপভাবে শত শত, হাজার হাজার সাক্ষ্যদাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লক্ষ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই লক্ষ লক্ষ সংগৃহিত হাদীছ হইতে সূক্ষ্মতমরূপে এক একখানা হাদীছ-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১০,০০০০০ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বাছিয়া ৩০,০০০ হাজার হাদীছ সম্বলিত একখানা হাদীছ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ৬,০০০০০ লক্ষেরও অধিক হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮০০ শত জন সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে প্রায় ৪০০০ হাজার হাদীছ বাছিয়া একত্রিত করিয়া বক্ষ্যমান গ্রন্থ "ছহীহু-বোখারী" সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, ইহারও মূল হইল শুধু মাত্র ২৬০২ বা ২৫১৩টি হাদীছ ✿। এইরূপে বহু সংখ্যক হাদীছ গ্রন্থ আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে।

ইমাম বোখারীর শিক্ষকতায় ৯০,০০০ হাজারেরও অধিক লোক বোখারী শরীফ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে এক লক্ষ লোক তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

✿ ৪০০০ এবং ২৬০২ সংখ্যাদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, এস্থলে দুইটি জিনিষ—একটি হইল মূল হাদীছ তথা রসুলের বাণী ইত্যাদি, দ্বিতীয় হইল উক্ত হাদীছের সাক্ষ্যদাতাগণের নামের ফিরিস্তি তথা সনদ। বলা বাহুল্য—একটি হাদীছের বিভিন্ন সনদ থাকে, এমনকি এক একজন সাক্ষ্যদাতার বিভিন্নতায় একটি মূল হাদীছের এক এক শত সনদও হইয়া থাকে। হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় মূল হাদীছ ও সনদের সমষ্টিকে হাদীছ বলা হয়; এই সূত্রে একটি মূল হাদীছ এক শত বা ততোধিক হাদীছ পরিগণিত হইতে পারে। মোহাদ্দেছগণের সংগৃহীত হাদীছের যে সংখ্যা বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা এই পরিভাষার ভিত্তিতেই। বোখারী শরীফে মূল হাদীছের সংখ্যা ২৬০২ কাহারও গণনায় ২৫১৩। উক্ত সংখ্যক মূল হাদীছই পরিভাষিক সঙ্গা মতে প্রায় ৪০০০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে বহু সংখ্যক হাদীছ একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; প্রত্যেক স্থানের হাদীছকে ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে বোখারী শরীফের হাদীছ সংখ্যা হইবে ৭২৭৫।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে

হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্ব-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত ইমাম বোখারীর আসল নাম ছিল মোহাম্মদ। তিনি পরিচিত ছিলেন—আবু আবদুল্লাহ নামে। পিতার নাম ছিল—ইসমাঈল, পিতামহের নাম ছিল ইব্রাহীম, প্রপিতামহের নাম ছিল—মুগীরা। ১৯৪ হিজরী ১৩ই শওয়াল শুক্রবার, জুমার নামাযের বাদ তিনি বোখারা শহরে ভূমিষ্ট হন। ২৫৬ হিজরী ১লা শওয়াল শনিবার রাত্রে (শুক্রবার দিবাগত রাত্রে) সমরকন্দের অন্তর্গত খরতঙ্গ নামক গ্রামে ইহ-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পর দিন (ঈদের দিন) জোহরের নামাযান্তে সেই গ্রামেই সমাহিত হন। তাঁহার বয়স তখন ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর ছিল। মৃত্যুকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন, প্রপিতামহ মুগীরা পারস্য হইতে খোরাসানের বোখারা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই ইমাম বোখারীর পিতা মারা গিয়াছিলেন। তিনি মাতার নিকটই প্রতিপালিত হন। আহমদ নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইমাম বোখারীর পিতাও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইমাম বোখারীর উপর আল্লার বিশেষ রহমত দেখা যাইতে ছিল। বোখারী (রঃ) বাল্যাবস্থায়ই অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার মাতা সে জন্য আল্লার দরবারে দোয়া করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা ইব্রাহীম (আঃ)কে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি বলিতেছেন, তোমার কান্নাকাটির দরুণ আল্লাহ তোমার ছেলের চক্ষু ভাল করিয়া দিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিতে পাইলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি লেখা-পড়া আরম্ভ করার পর দশ বৎসর বয়সে আমার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এল্‌হাম হয় যে, আমি যেন হাদীছ কণ্ঠস্থ করায় তৎপর হই। তখন হইতেই আমি অন্য সব কিছু ছাড়িয়া হাদীছ শিক্ষার প্রতি ধাবিত হইলাম। হাদীছ শিক্ষার জন্য সিরিয়া, মিশর, আল-জাযায়ের, বছরা, কুফা, বাগদাদ, হেজাজ ইত্যাদি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিলাম। ১৮ বৎসর বয়সে আমি বিবিধ গ্রন্থ সঙ্কলনে ব্যাপৃত হই এবং মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া, হাদীছের সাক্ষ্যদাতা বা রাবীগণের জীবনেতিহাস রচনায় একখানা কিতাব সঙ্কলন করি। ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৬ বৎসর বয়সে নিশাপুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হাদীছের দরস বা শিক্ষা দান করিতেন। দেশময় সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল; ইহাতে তথাকার কোন কোন মানুষের মধ্যে একটু রেশারেশির ভাব উদিত হইল। তাই বোখারী (রঃ) নিশাপুর ত্যাগ করতঃ বোখারার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের জনগণ ইমামকে পুনরায় স্বদেশে পাইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত রাজ্যের শাসনকর্তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

ঘটনা এই ছিল যে—খালেদ ইবনে আহমদ নামক বোখারার তৎকালীন শাসনকর্তা ইমাম বোখারীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, স্বয়ং তিনি বা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইমাম বোখারীর সঙ্কলিত কিতাব অধ্যয়ন করিতে চাহেন। ইমাম বোখারী (রঃ) যেন সেই শাসনকর্তা—আমীরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া এই কার্য্য সমাধা করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইলেন—

انی لا اذل العلم ولا احمله الی ابواب السلاطين فان كانت له حاجة الی شئ منه فليحضرنی فی مسجدی اوفی داری فان لم يعجبك هذا فانت سلطان فامنعنی من المجلس ليكون لی عند الله عذر يوم القيامة انی لا اكتم العلم -

"দেখুন। আমি কখনও এলেমকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিব না। (লক্ষ লক্ষ গরীব জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া) এই মহান রত্ন—এল্মকে আমীর-ওমরাদের দরওয়াজার প্রত্যাশী বানাইতে পারিব না। অতএব আমীর সাহেব যদি এল্মের প্রতি অনুরাগী ও আকৃষ্ট হইয়া থাকেন তবে তিনি যেন আমার মসজিদ বা বাড়ীতে উপস্থিত হন। আর যদি তিনি আমার এই ব্যবস্থাবলম্বনে অসন্তুষ্ট হন এবং আমার শিক্ষাদান কার্য্যে বাধা প্রদানের মনস্থ করেন তবে আমি সে বিষয় আদৌ শঙ্কিত নহি। কারণ, তাঁহার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যদি আমার এই কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় তবে আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বলিয়া ক্ষমার্হ গণ্য হইতে পারিব যে—আমি স্বেচ্ছায় এল্‌ম চর্চা বন্ধ করিয়া দেই নাই।"

শাসনকর্তা আমীর এই নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনার দ্বারা সুফল লাভ না করিয়া কুফলের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং শুধু নিজেরই নহে বরং সমস্ত বোখারাবাসীদের দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিলেন। তিনি ইমাম বোখারীর এই ন্যায় সঙ্গত উত্তরে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি বিভিন্ন ছলাকলায় আশ্রয় গ্রহণে বোখারী (র:)কে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিলেন।

হাদীছে-কুদসীতে আছে—من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত শত্রুতা ধারণ করে, তাহার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি!" এখানে ঠিক তাহাই হইল—ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই কিছু দিনের মধ্যে আল্লার অভিশাপে পতিত হইল। কিন্তু ইমাম বোখারী (র:) আর দেশে রহিলেন না। তিনি বোখারা হইতে 'বাইকান্দ" নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময় সমরকন্দের লোকেরা ইমাম বোখারী (র:)কে সমরকন্দ আগমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। সেমতে তিনি সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে "খরতঙ্গ" নামক গ্রামে যেখানে তাঁহার কিছু আত্মীয়-স্বজনের বসবাস ছিল, তথায় তিনি অবস্থান করিলেন। অত:পর তিনি সমরকন্দ মুখী পুন: যাত্রা করিবেন—এমতাবস্থায় সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার আগমন সম্পর্কে সমরকন্দবাসীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত দু:খিত হইলেন এবং সেই যাত্রা ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

ইমাম বোখারী (র:) উল্লিখিত ঘটনা সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের পর এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিলেন—

اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت فاقبضنى اليك

"হে আল্লাহ! এই সুপ্রশস্ত জগৎ আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে আপন কোলে উঠাইয়া লও।" আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব—ইমাম বোখারীর এই ডাক ব্যর্থ হইতে দিলেন না। তাঁহার আবদার পুরণ করা হইল এবং মাত্র এক মাসের মধ্যেই হাদীছ শাস্ত্রের সুনির্মল গগণ হইতে এই জ্যোতিষ্মান সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল।

رحمه الله تعالى وادخله جنة الفردوس

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আদম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন—এক রাত্রে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি স্বীয় ছাহাবীগণের এক জমাত সহ একস্থানে অপেক্ষমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? আমি রসুলুল্লাহ (দ:)কে সালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দ:)! আপনি কাহার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের অপেক্ষা করিতেছি। স্বপ্ন বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন পরে

যখন আমি ইমাম বোখারীর মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমি যে সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়ই ইমাম বোখারীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইমাম বোখারীর পবিত্র আত্মা ইহকাল ত্যাগ করিয়া পরকালের অতিথি হইলে পর স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে লইয়া এই অতিথির অভ্যর্থনা করেন। হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই দেখিয়া থাকে ; কেননা শয়তান কখনও আমার রূপ ধারণ করিতে পারে না।

গালেব ইবনে জিব্রিল নামক খরতঙ্গ গ্রামবাসী—ইমাম বোখারী (রঃ) যাঁহার আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—ইমাম বোখারীকে কবরের মধ্যে রাখা মাত্রই কবরের চতুষ্পার্শ্বে মেশ্‌কের ন্যায় সুঘ্রাণ ও সুবাস ছড়াইতে লাগিল এবং ঐ সুবাস বহুদিন স্থায়ী ছিল। দেশ-বিদেশের লোক জেয়ারতের জন্য আসিয়া ২থাকার মাটি নেওয়া আরম্ভ করিল, এমনকি আমরা অবশেষে ঐ কবরকে মজবুত বেষ্টনী দ্বারা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে একদা স্বপ্নে দেখিলাম—আমি একটি পাখা হাতে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং ঐ পাখার দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে মশা-মাছি ইত্যাদি হটাইয়া রাখিতেছি। ভাল একজন তা'বীর বর্ণনাকারীর নিকট এই স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি এমন কোন কাজ করিবে যদ্দারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মৌজু' বা জাল ও মিথ্যা হাদীছের সম্বন্ধ করার মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমার মনে প্রেরণা জাগিল যে, আমি এমন একখানা কিতাব লিখিব যাহার মধ্যে সন্দেহমুক্ত ছহীহ্ হাদীছ থাকিবে ; যে হাদীছ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিবে উহা গ্রহণ করিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া আমি পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদে-হারামে বসিয়া এই কিতাব লিখিতে আরম্ভ করি।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই কিতাবের মধ্যে প্রতিটি হাদীছ এতদুর সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি যে, আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতা, জ্ঞান, এল্‌ম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিটি হাদীছকে সূক্ষ্মরূপে বাছিয়া ও পরখ করিয়া লওয়ার পরেও প্রত্যেকটি হাদীছ লিখিবার পূর্বে গোছল করত: দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট এস্তেখারা করার পর যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই হাদীছটি সন্দেহ-লেশহীন ও ছহীহ্ তখনই আমি উহাকে আমার এই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, ইহার পূর্বে নহে। এই কিতাবের পরিচ্ছেদ সমূহ পবিত্র মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্তী বসিয়া সাজাইয়াছি এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদ লিখিতেও দুই দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। এইরূপে আমি স্বীয় কণ্ঠস্থ ছয় লক্ষ হাদীছ হইতে বাছিয়া ষোল বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছি—এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে, আমি যেন এই কিতাবখানাকে লইয়া আল্লার দরবারে হাজির হইতে পারি।

আরও কতিপয় শুভ স্বপ্ন :

নজ্‌ম ইবনে ফোজাইল নামক বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় রওজা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে হাঁটিতেছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যে যে স্থানে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে ঠিক ঠিক ঐ স্থান সমূহে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন। বোখারা নিবাসী আবু হাতেম নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন।

ইমাম বোখারীর একজন বিশিষ্ট শাগের্দ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রসুলুল্লাহ (দ:)কে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট যাইতেছি। হযরত (দ:) বলিলেন, তাঁহাকে আমার সালাম বলিও।

আবু যায়েদ মারওয়াযী নামক প্রসিদ্ধ একজন মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি পবিত্র কা'বা-ঘরের সংলগ্ন স্থানে শুইয়াছিলাম, তদবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম—রসুলুল্লাহ (দ:) আমাকে বলিতেছেন, হে আবু যায়েদ। তুমি কত কাল ইমাম শাফেয়ীর কিতাব পড়াইতে থাকিবে, আমার কিতাব পড়াও না কেন? আমি আরজ করিলাম—হুজুর! আপনার কিতাব কোন্‌টি? হযরত (দ:) উত্তরে ফরমাইলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল যে কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছেন উহাই আমার কিতাব।

একটি জিজ্ঞাসার উত্তর

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ ইং মর্ণিংনিউজ ইংরাজী দৈনিকে বাংলা অনুবাদ বোখারী শরীফের মুখবন্ধ হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি লইয়া কুমিল্লার জনৈক মুসলিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইমাম বোখারী তাঁহার সংগৃহিত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে অত্র গ্রন্থে অল্প সংখ্যক গ্রহণ করিলেন অপরগুলি বাদ দিলেন কেন?

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং তারিখের দৈনিক আজাদে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হইয়াছিল; পাঠকদের উপকারার্থে নিম্নে উহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। মূল প্রশ্নের উত্তরে যে সব তথ্যের আবশ্যক প্রথমে তাহা ক্রমিক নম্বরে বর্ণনা করা হইতেছে—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে হাদীছ উহাই যাহা রসুলে করীম (দ:)-এর তরফ হইতে আসিয়াছে। আর রসুলে করীমের তরফ হইতে পাওয়া গিয়াছে—সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত ঐরূপ একটি বাক্যও উপেক্ষা করার অবকাশ মোসলমানদের জন্য নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে সাক্ষীগণ তথা রাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নামে যাহা কিছু বর্ণনা করেন প্রাথমিক আলোচনায় ঐ সবকেই হাদীছ আখ্যায় ব্যক্ত করা হয়।

(২) দুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, কোন কোন সাক্ষ্য মিথ্যা কৃত্রিম, জালও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজুহাতে সত্য সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করিলে জগত অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং সব সাক্ষ্য গ্রহণ করাও যায় না আবার সব সাক্ষ্য উপেক্ষা করাও যায় না। বরং সত্যের মাপকাঠিতে সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে বাছনী করিতে হয়।

(৩) বহু সংখ্যাকে সাক্ষ্যের বাছনী করিতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই উহার মধ্যে বিভিন্ন রকম ও প্রকার পরিলক্ষিত হইবে যথা—সত্য ও বিশুদ্ধ সাক্ষ্য, মিথ্যা ও জাল সাক্ষ্য এবং দুর্বল সাক্ষ্য—এর মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণী পাওয়া যাইবে।

হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণ চুলচেরা বিচারে হাদীছ প্রাপ্তির সাক্ষ্য বাছনির মধ্যে নিম্ন রকম বিভক্তি করিয়াছেন। সাক্ষ্যদাতার গুণাবলী ও উহার মান এবং সাক্ষ্য প্রদানের সুষ্ঠুতার ভিত্তিতেই এই বিভক্তি যথা (ক) যে সাক্ষ্যে সত্য ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠির সমুদয় গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় এবং উচ্চমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (খ) যে সাক্ষ্যে ঐ গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু সাক্ষ্যদাতার স্মৃতিশক্তি ঐ শ্রেণীর উচ্চমান অপেক্ষা কিঞ্চিত হাল্‌কা। (গ) যে সাক্ষ্যের মধ্যে ঐসব গুণাবলীর অভাব রহিয়াছে, কিন্তু মিথ্যা গণ্য হওয়া বা সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোন হেতু তথায় নাই। (ঘ) যে সাক্ষ্যের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন ত্রুটি বা হেতু রহিয়াছে। (ঙ) যে সাক্ষ্যে এমন কোন সাক্ষ্যদাতা রহিয়াছে যাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে নয়, কিন্তু অন্য কোথাও মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে। (চ) যে সাক্ষ্যে এমন কোন সাক্ষ্যদাতা রহিয়াছে যাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনায় সারা জীবনে একবারও কোন

ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে—এইরূপ ব্যক্তি হাজার তওবা করিলে তাহার সাক্ষ্যে কখনও কোন একটি হাদীছও গ্রহণীয় হইবে না।

(৪) সাক্ষ্যের প্রকার ও শ্রেণী বিভক্তির দ্বারাই পরবর্তী লোকদের জন্য হাদীছরূপে প্রাপ্ত বর্ণনা সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—"ক" গ্রুপের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হাদীছ সমূহকে ছহীহ্ (বিশুদ্ধ) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ এইগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবেই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। "খ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছ 'ক' গ্রুপের নিকটবর্তীই কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরে; এই হাদীছকে হাছান (ভাল) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ ইহা সম্পর্কেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে, ইহা রসুলুল্লারই (দঃ) হাদীছ। "গ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে জয়ীফ (দুর্বল) তথা দুর্বল প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "ঘ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মরদুদ—উপেক্ষণীয়, মোয়াল্লাল—ত্রুটিযুক্ত প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "ঙ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মত্রুক—বর্জনীয় প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। "চ" গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মৌজু'—জালিয়াত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়।

(৫) কালেক্সন—সংগ্রহ করা, ভেরীফিকেশন—বাছনি করা, সিলেক্সেন—গ্রহণ করা এইসব ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কাজ। সংগ্রহের সময় মোহাদ্দেছগণ সাধারণতঃ হাদীছ নামে প্রচারিত ও বর্ণিত অনেক কিছুকেই কুড়াইয়া লইতেন। সংগ্রহের স্বাভাবিক নিয়মও তাহাই। অতঃপর বাছনি ও গ্রহণের সময় এক এক মোহাদ্দেছ এক এক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই নীতি পালনের মাধ্যমেই সংগৃহীত সংখ্যার বিরাট অংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য—উক্ত নীতির কঠোরতার তারতম্যের ভিত্তিতেই বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদের নিকট রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য কৃত্রিম, বর্জনীয়, উপেক্ষণীয় ও দুর্বল শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টেই হাদীছ নামে বর্ণিত বহু বর্ণনাকে জয়ীফ, মৌজু', মোন্কার, মত্রুক ইত্যাদি নামের আখ্যা দেওয়া হয় এবং ঐ সবকে এড়াইয়া চলা হয়। নতুবা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত একটি অক্ষরকেও ঐরূপ আখ্যার দ্বারা স্পর্শ করা মোসলমানের পক্ষে অসম্ভব।

(৬) ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার সংগৃহিত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে বাছনি করিয়া শুধু ঐ হাদীছ সমূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন যাহা "ক" গ্রুপের সাক্ষ্যে প্রমাণিত, অন্য কোন গ্রুপের হাদীছকে তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে শামিল করেন নাই। তার ফলেই ইমাম বোখারীর সর্বমোট সংগৃহিত হাদীছ সংখ্যা এবং এই গ্রন্থের গৃহিত হাদীছের সংখ্যা—উভয় সংখ্যায় বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে এবং এত বড় কঠোর বাছনিই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ একজন স্বর্ণকার বা স্বর্ণবণিক তাহার পেশাগত সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া হাজার হাজার স্বর্ণ-খণ্ডের মান নির্ণয় ও বাছনি করতঃ অল্প সংখ্যক খণ্ড গ্রহণ করেন। তাহার সেই পেশাগত দীর্ঘ সাধনায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতায় বাছনি কার্য্যের রহস্যকে পত্র-পত্রিকা মারফৎ হাতড়ানো যে বৃথা চেষ্টা তাহা অতি সুস্পষ্ট। হাদীছ শাস্ত্র ত কত মহান, কত উর্দ্ধের কত সূক্ষ্ম, কত গভীর, কত প্রশস্ত এবং কত বিস্তীর্ণ। এই বিশাল ময়দানে ঐরূপ উদ্যোগ গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করি।

——(•)——

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

শায়খুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর

—একটি আশার বাস্তব রূপ—

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে বোখারী শরীফের বাংলা তরজমা প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম পিপাসু পাঠক সমাজে যেরূপ দ্রুত গতিতে উহার প্রসার লাভ হয় এবং যেরূপ ব্যাপকভাবে উহা বাংলার মোসলমান ভাইদের নিকট সমাদৃত হয় তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন যাবৎ উহার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারাই অপরিসীম জনপ্রিয়তার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

এতদ্ভিন্ন সর্বোপরি বিস্ময়ের বিষয় হইল—আমার ন্যায় বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, জ্ঞানশূন্য অযোগ্য লোকের হাতে উহার সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হওয়া। আমার বাংলা ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা শুধুমাত্র গ্রাম্য মসজিদের প্রভাতী মুন্সিয়ানা মক্তবে কলা পাতার শ্রেণী পর্য্যন্ত। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোখারী শরীফের ন্যায় মহান কিতাবের বিষয়বস্তু সমূহকে বাংলা ভাষায় শুধু রূপদান করাই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অতএব যাহারা আমার ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আর বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

এইরূপে চতুর্দিক হইতেই কিছু কিছু বিস্ময়ের ঝড় ও আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আমি লক্ষ্য করি নাই এমন নহে, কিন্তু আমি তাহাতে মোটেই বিস্মিত হই নাই, বরং এই সবের অন্তরালে সীমাহীন রহমতের অতল সমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারে এমন একটি বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে আমি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।

বিগত ১৯৪৪ সনের ঘটনা—আমি স্বদেশ হইতে সুবিজ্ঞ ওস্তাদগণের অধ্যাপনায় ছেহাহ্-ছেত্তা তথা আরবী বিদ্যালয় সমূহের সর্বশেষ ক্লাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় কেবলমাত্র ছেহাহ্-ছেত্তা হাদীছসমূহ বিশেষরূপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে বাহির হই। তখনও আমি শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহ আলাইহের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ সমূহ যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় বিরাজমান ছিল এবং তাঁহার অতুলনীয়

মনোমুগ্ধকর গুণাবলীর প্রতিভা যাহা পাক-ভারত বরং বিশ্ব-আলেম সমাজকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; এই সবের আকর্ষণে আমি তাঁহার প্রতি ছুটিয়া যাইবার আকাঙ্খায় ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলি। অতঃপর যখন তাহার দেওবন্দস্থিত বাস ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হইল তখন আমার অন্তরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

তারপর তথা হইতে আমি বোম্বাইর নিকটস্থিত সুরাত জিলার অন্তর্গত 'ডাভেল' নামক স্থানে অবস্থিত সুবিখ্যাত মাদ্রাসায় পৌছিলাম। মনে বড় আশা যে, শায়খুল-ইসলাম (রঃ)-এর নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করিব, কারণ তিনি সেই মাদ্রাসায় এই মহান কিতাবখানার অধ্যাপক। কিন্তু আল্লার কুদরতের শান যে, অবলীলাক্রমে আমার সে আশা পূরণে নানারূপ বাধা-বিপত্তি ও দীর্ঘ-সূত্রিতার সৃষ্টি হইতে লাগিল যাহা কিছুতেই শেষ হইতে ছিল না। এমনকি সেই দীর্ঘ-সূত্রিতার কারণে তথা হইতে ফিরিয়া আসার দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল। প্রায় দীর্ঘ চার মাস কাল এইরূপে আশা-নিরাশার তরঙ্গ দোলায় হাবুডুবু খাইতেছিলাম। কিন্তু আল্লার শোকর যে, এরই মধ্যে নানাপ্রকার শুভ স্বপ্ন আমার ঐসব দুশ্চিন্তার লাঘব করিয়া আমাকে স্বীয় আশা-আকাঙ্খা হইতে পদস্খলনে প্রবলরূপে বাধা প্রদান করিতেছিল।

একটি স্বপ্ন ত আমার শুভ ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সুসংবাদ বহনে আশ্চর্য্যজনক ভাবে বাস্তবায়িত হইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল। যাহার বিবরণ এই—

দেওবন্দ মাদ্রাসার হাদীছ শিক্ষক মাওলানা ছৈয়্যদ আছগর হোসাইন (রঃ) যিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ওলীউল্লাহ বুজুর্গ ছিলেন। মোজাদ্দেদে-জমান মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) শ্রেণীর ওলী-উল্লাহগণের সময়ে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মুরব্বী শ্রেণীর ওলীউল্লাহ বুজুর্গ গণ্য করা হইত। আমার দেশীয় ওস্তাদগণের এবং দেওবন্দী সমস্ত আলেমগণের তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনায় আমি নরাধমেরও তাঁহাকে দেখার পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ ছিল। তিনি ওলামাদের মুখে হযরত মিঞা সাহেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেশ হইতে "ডাভেল" যাওয়ার পথে কিছু দিন আমি থানাভবন খানকায় ছিলাম; তখন মাওলানা থানভী রহমতুল্লাহে আলাইহের ওফাত হইয়াছে অল্প কিছুদিন পূর্বে। খানকায় অনেক অনেক বুজুর্গেরই গমনাগমণ; হযরত মিঞা সাহেবও তথায় তশরীফ আনিয়াছেন। এই সর্বপ্রথম আমি তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। খানকার মসজিদে তিনি নামায পড়িতেছিলেন আমি তাঁহাকে পাখার বাতাস দেওয়ারও সুযোগ পাইয়াছিলাম। খানকায় অবস্থানরত "তুরশাহ" নামক এক মজযুব বুজুর্গ আমার হাত হইতে পাখা ছিনাইতে চাহিলে হযরত মিঞা সাহেব তাঁহাকে বাধা দিলেন এবং পাখা করার সৌভাগ্য আমার জন্যই থাকার আদেশ করিলেন।

"ডাভেল" মাদ্রাসায় পৌঁছিয়া শায়খুল-ইসলাম (রঃ)কে পাইবার আশা-নিরাশার টানা-হেঁচরায় জীবনের সর্বাধিক ব্যাকুলতায় কাল কাটিতেছিলাম। তখন একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি, আমি ডাভেল যাত্রার পথে এক মসজিদে উপস্থিত হইয়াছি এবং হাতের সুটকেস সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছি। নামাযান্তে মসজিদের এক প্রান্তে কিছু লোক জামায়েত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ স্থানে কি? এক ব্যক্তি বলিল, ঐ স্থানে হযরত মিঞা সাহেব আছেন। আমি সুটকেসটা ফেলিয়াই তথায় যাইয়া বসিলাম। মজলিস শেষ হওয়ার পর আসিয়া দেখি, আমার সুটকেসটা চুরি হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া হযরত মিঞা সাহেবকে বলিলাম, আমি ডাভেল যাইতেছি; আপনার মজলিসে বসিয়াছিলাম; আমার সুটকেসটা চুরি হইয়া গেল; ডাভেল যাত্রা অশুভ মনে হয়। হযরত মিঞা সাহেব স্বপ্নে যে উত্তর দিয়াছিলেন আজও উহার শব্দ আমার কাণে ধ্বনিত মনে হয়। তিনি বলিলেন جاؤ نتیجہ اچھا هوگا "যাও; শেষ ফল ভাল হইবে।"

এই শুভ স্বপ্নের আলিঙ্গনে আশার প্রাবল্য নিরাশাকে পরাস্ত করার উপক্রম; এরই মধ্যে একদিন দেখি, ডাভেল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ডাভেল গ্রাম সংলগ্ন "সিম্‌লক" গ্রামে হযরত মিঞা সাহেব আসিয়াছেন। আজ আমি নিদ্রায় নহি, বাস্তব দেখিতেছি। আমিও ছুটিলাম; হযরত মিঞা সাহেবের মজলিসে যাইয়া বসিলাম। কিছু সময় পর লোকজন চলিয়া যাইতে লাগিল; সর্বশেষ মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেব এবং আমার পালা; তখন তথায় অন্য কেহ নাই। মোহতামেম সাহেব হযরত মিঞা সাহেবের খেদমতে আমার প্রতি ইশারা করিয়া অভিযোগ পূর্বক বলিলেন, হযরত এই ছেলেটি মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের ছাত্র, আমাদের মাদ্রাসায় আসিয়াছে; সে চলিয়া যাইতে চায়; তাহাকে একটু নছিহত করুন। হযরত মিঞা সাহেব মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের প্রসংশা করতঃ আমার প্রতি স্মিথ তাকাইয়া বলিলেন, جاؤ مت اچھا هوگا যাইও না; ভাল হইবে।

স্বপ্ন আর বাস্তবের এই অপূর্ব মিল; আমি ইহাতে অভিভূত হইয়া আশার আনন্দে ডাভেল মাদ্রাসায় স্থিরপদ হইয়া রহিলাম।

আমার আশার প্রভাত উদীয়মান হইতে দেখা যাইতে লাগিল। শায়খুল ইসলাম (রঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন। মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ আমরা সকলেই আনন্দে আত্মহারা। আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম এবং সকলে মোছাফাহা করিলাম। সকলের মধ্যে তিনি আমাকে ঠাহর করিতে পারিলেন না, কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য যে, পূর্বে অনেক চিঠিপত্র লেখার দরুন নরাধমের নামটা তাঁহার মনে গাথা ছিল। রাত্রিবেলা অন্যান্য ছাত্রদের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিজুল হক নামের তালেব-এলম

এখানে আছে কি? সকলেই বলিল—জী হাঁ। (তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ আমাকে দেওয়া হইল। শায়খুল-ইসলামের মুখে আমার নাম! আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। স্নেহভরে তিনি আমার প্রতি তাকাইলেন। তখন হইতেই তাঁহার আন্তরিক স্নেহ আমাকে সৌভাগ্যশালী করিল।

সেই জীবনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি স্নেহপূর্ণ বাক্য আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন। বাক্যগুলির প্রতিটি অক্ষর আমার অন্তরে খচিত রহিয়াছে। উহার প্রতিটি অক্ষর কিরূপে বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি তাহা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্যই উল্লিখিত ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। একদা তিনি আমাকে বলিলেন—

"بہت اچھا ہوا کہ تم اس سال میرے پاس پڑھنے آئے ہو میں اس سے پہلے غالباً دس دفعہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں میرا خیال ہے کہ پچھلے تمام سالوں کا مجموعہ میں اس سال پڑھاؤں گا اور شاید یہی میرا آخری پڑھانا ہے"

অর্থ—"এই বৎসর আমার নিকট অধ্যয়নে তোমার আগমন অত্যন্ত শুভ ও সময়োচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি অন্ততঃ আরও দশবার বোখারী শরীফ পড়াইয়াছি। আমার ইচ্ছা—বিগত দশ বৎসরের সমুদয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি আমি এই বৎসর শিক্ষাদান করিব। মনে হয়, ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর।

ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید "আল্লার প্রিয় বান্দাগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহা যেন চাক্ষুস দেখিয়াই বলিয়া থাকেন।"

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) সম্ভাব্যাকারে যে কথাটি প্রকাশ করিলেন যে, "মনে হয়—ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর" তাঁহার উক্তিটি যেন নির্দ্ধারিত সত্যের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর—তিনি ঐ বৎসর বিশেষ যত্নের সহিত বোখারী শরীফের অধ্যাপনা শেষ করিলেন। অতঃপর বৎসর শেষে মাদ্রাসা বন্ধ হইলে তিনি দেওবন্দস্থিত স্বীয় বাস-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম, এমনকি আমাকে তিনি অতি যত্ন ও আদরের সহিত স্বীয় বাস-ভবনেই রাখিলেন। আমি প্রায় এক বৎসর তাঁহার স্নেহ মমতার সাহচর্য্যে থাকিলাম। অধ্যাপনার সময় তাঁহার বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনা সমূহ যাহা আমি পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়াছিলাম উহার পুনর্লিখন কার্য্য করিতেছিলাম এবং তাঁহার সংশোধনও গ্রহণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, যেই রোগে তিনি দীর্ঘ

এগার মাস রোগ শয্যায় শায়িত রহিলেন। এই দিকে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঝড় বহিতে লাগিল। মোসলেম সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকগণ তাঁহাকে রোগ শয্যায় অবসর দিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি মোসলেম সমাজের রাজনৈতিক জীবন-মরণ সমস্যার একমাত্র সমাধান পাকিস্তান আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী অগ্রদূতগণের অন্যতম প্রধানরূপে তিনি কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অতএব দীর্ঘ এগার মাস কাল পর তিনি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গোটা জীবন রাজনৈতিক যুদ্ধে মোসলেম জাতিকে রক্ষা করার কার্য্যে উৎসর্গ হইয়া গেল। পাকিস্তান কায়েম হইল, তিনি পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সার্বভৌম পরিষদের প্রধানতম সদস্য মনোনীত হইলেন।

এইরূপে তাঁহার জীবন-সমুদ্রের গতি অধ্যাপনার দিক ছাড়িয়া অন্য দিকে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে অবকাশ পাইলেন না। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তিনি ভাওয়ালপুর সফর করিলেন। তথায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিরতরে এই জ্যোতির্ময় সূর্য্য ১৯৪৯ সনে অস্তমিত হইয়া গেল।

১৯৪৪ সনে তিনি যে বলিয়াছিলেন, "মনে হয়—এই বৎসরের অধ্যাপনাই আমার শেষ অধ্যাপনা।" তাঁহার সেই ধারণাই বাস্তবে রূপায়িত হইল—

قلندر هرچه گوید دیده گوید "আল্লার অলিগণ যাহা কিছু বলিয়া থাকেন তাহা যেন চাক্ষুশ দেখিয়াই বলিয়া থাকেন"। বাস্তবিকই ১৯৪৪ সনের পর তাঁহার অধ্যাপনার যুগ আর ফিরিয়া আসে নাই।

১৯৪৪ সনে তিনি এই নরাধমকে লক্ষ্য করিয়া আরও একটি কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাটিই এখানে বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

امید ہے تمہارے ذریعہ سے بنگال میں میری کچھ باتیں پہنچے گی

"আমি আশা করি আমার বর্ণিত কিছু বিষয়বস্তু বাংলাদেশে তোমার দ্বারা প্রসার লাভ করিবে।" দীর্ঘ ১৪ বৎসর পূর্বে ১৯৪৪ সনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহে উল্লিখিত উক্তিটি আমার কানে এখনও ধ্বনিত মনে হয়। ১৯৫৭—৫৮ সন হইতে বোখারী শরীফের বাংলা তরজমা বাংলার মোসলমান ভাইবোনদের হস্তে সমাদৃত হওয়া আরম্ভ করিলে পর শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহের উল্লিখিত উক্তিটির বাস্তবরূপ আমার চোখে ভাসিয়া উঠিল।

বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছে-কুদসীতে বর্ণিত আছে—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "কোন বান্দা যখন আমার প্রিয় হইয়া যায় তখন সে আমার নিকট যাহাই প্রত্যাশা করে আমি তাহাই তাহাকে দান করিয়া থাকি।"

রসুল ও নবীগণ মানবের হেদায়েতের প্রতি কিরূপ লালায়িত থাকেন কোরআন শরীফের একাধিক আয়াতে উহার আভাস পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলেন—لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين "মক্কার ধুরন্ধর কাফেররা ঈমান আনিতেছে না সেই অনুতাপে আপনি নিজেকে হালাক করিয়া দিবেন মনে হয়।" রসুল ও নবীর নায়েব—আল্লার ওলী ও খাটী আলেমগণ সাধারণতঃ সেই প্রকৃতিরই হইয়া থাকেন।

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহের অন্তরে বাংলার মোসলেম সমাজের প্রতি আকৃষ্টতার উদয় হইল, কিন্তু তিনি বাংলাভাষী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার মনের এই আকর্ষণের অছিলায় আমি নরাধমের অদৃষ্ট-নক্ষত্র চমকিয়া উঠিল।

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এখানে উহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নেহাত মামুলী ও স্বাভাবিক ভাবে যে উক্তিটি করিয়াছিলেন আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান তাঁহার সেই উক্তি নিষ্ফল ও প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে দিলেন না। বরং তাঁহার সেই উক্তি ও আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার বাস্তব ব্যবস্থা ও অছিলা সৃষ্টি করিলেন। কি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা! আমার ন্যায় অযোগ্য নরাধম যাহার বাংলা ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা ও বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে; এতদসত্ত্বেও এই অযোগ্য নরাধমকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অপার করুণা বলে এতটুকু তৌফিক দান করিলেন যে, নিতান্ত মামুলী সাধারণভাবে হইলেও বাঙ্গালা ভাষী মুসলিম ভাইবোনদের বোধগম্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে মহান কিতাব বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ পেশ করিতে সক্ষম হইলাম। (সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ তায়ালার।)

মান-মর্যাদার ভাষা বলিতে আমার অনুবাদে মোটেই নাই, কিন্তু আমার ন্যায় অযোগ্য, বাংলা ভাষায় দখলহীন ব্যক্তির পক্ষে বোখারী শরীফের মত মহান কিতাবকে বাংলা ভাষায় রূপ দানই নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

এতদ্ব্যতীত বোখারী শরীফের অনুবাদ বাংলায় মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে এবং যে প্রকার বিদ্যুৎ গতিতে ইহার প্রসার লাভ ঘটিয়াছে তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই সবই সম্ভবপর এবং সহজ-সাধ্য হইয়াছে এই কারণে যে, এই সবের মূলে ছিল বিগত ১৯৪৪ সালে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহের আশা-আকাঙ্খা মূলক বাক্যের রূপায়ণ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে—

ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা (নিজ উক্তিতে) কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা অবশ্যই পূরণ করেন।"

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে যে সেইরূপ বান্দাদের একজন, বোখারী শরীফের বাংলা তরজমার ঘটনাবলী উহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ।

প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহের পবিত্র আত্মার প্রতি ছাওয়াব-রেছানী এবং দোয়া করিয়া তাঁহার হক আদায় করিতে সচেষ্ট হন ; প্রত্যেক পাঠকেরই তিনি ওস্তাদ।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিব যে আমার পিতা মরহুম হাজী এরশাদ আলীকে দোয়ার সময় ভুলিবেন না। তাঁহার অছিলা ও আপ্রাণ চেষ্টা এবং খালেছ নিয়তের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনাদের খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছেন। আখেরাতের দৌলত ও সৌভাগ্য লাভের অছিলা—দোয়া ইত্যাদি লাভ করার সুযোগ দেখিলেই মরহুম মাতা-পিতার কথা আমার মনে জাগিয়া উঠে এবং মনে চায় সেইরূপ সুযোগের সম্পূর্ণটুকুই মরহুম মাতা-পিতার জন্য উৎসর্গ করি। বোখারী শরীফ বাংলা তর্জমার পাঠক পাঠিকাগণের প্রাণে আমি নরাধমের প্রতি স্নেহ-মমতার উদয় হইবে বলিয়া আমি আশা পোষণ করি, তাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, প্রত্যেকেই আমার মরহুম মাতা-পিতার রূহের প্রতি ছওয়াব-রেছানী ও দোয়া করিবেন।

হে আল্লাহ ! আমি নরাধমের এই নগণ্য খেদমতটুকু কবুল কর, ইহার দ্বারা মোসলেম সমাজকে উপকৃত কর এবং ইহাকে আমার ও আমার মরহুম মাতা-পিতার মাগফেরাতের অছিলা বানাইয়া দাও। আমীন—আমীন—আমীন।

——*——

সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সঃ)-এর দরবারে মানপত্র ও সৌভাগ্য লাভের উসিলা

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ড অনুবাদকালে ১৯৬০ ইং সালে পবিত্র মদীনায় বিশেষভাবে নবীজীর রওজা পাকে পঠিত ঃ

التوسل بمدح خير الرسول

قِفَا نَحْظَ مِنْ ذِكْرٰى حَبِيْبٍ وَّمَنْزِلٍ ـ سَقَتْهُ السَّوَارِىْ وَالْغَوَادِىْ بِسَلْسَلٍ

বন্ধুগণ! অপেক্ষা করুন, আমরা প্রিয়পাত্র ও তাঁহার দেশের আলোচনায় আস্বাদ উপভোগ করি। সকাল-বিকালের মেঘমালাগুলি ঐ দেশকে ঠাণ্ডা রাখুক!

وَمَهْلاً عَلٰى تَذْكَارِ اٰثَارِ طَيْبَةٍ ـ مَدِيْنَةِ مَحْبُوْبٍ كَرِيْمٍ مُفَضَّلٍ

থামুন! "তায়বা" শহরের নিদর্শনগুলির স্মরণে; তাহাই সর্বাধিক মর্যাদাবান বন্ধুর শহর "মদীনা"।

بِهَا قُبَّةٌ خَضْرَاءُ فِىْ رَوْنَقِ الضُّحٰى ـ تَلَئْلَاَ نُوْرًا فَوْقَ بَدْرٍ مُكَمَّلٍ

ঐ শহরে সবুজ গম্বুজ উজ্জ্বলরূপ নিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে অধিক দীপ্ত।

بِهَا مَرْقَدُ الْمَوْلٰى الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ ـ يَفُوْقُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُعَلّٰى وَيَعْتَلِىْ

সেই গম্বুজের ভিতরই রহিয়াছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শয্যাস্থান- তাঁহার শয্যার ভূখণ্ডের মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক।

يُذَكِّرُنَا اٰثَارُهَا وَدِيَارُهَا ـ وَتُبْدِىْ لَنَا مَالاَنَـرَاهُ وَنَجْتَلِىْ

ঐ শহরের ঘরবাড়ী ও নিদর্শনসমূহে এমন বস্তু স্মরণ করায় যাহা আমরা বর্তমান দেখিতেছি না।

نَشُمُّ بِهَا رَيَّا الْحَبِيْبِ كَاَنَّهٗ ـ عَلٰى ظَهْرِهَا ثَاوٍ وَلَمْ يَتَرَحَّلٍ

ঐ শহরে এখনও প্রিয়পাত্রের সুবাস এইরূপে ছড়ান রহিয়াছে যে, মনে হয়- তিনি এখনও তাহার ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত- কোথাও যান নাই।

حَبِيْبُ اِلٰهِ الْعٰلَمِيْنَ مُحَمَّدٌ ـ رَفِيْعُ الْعُلٰى خَيْرُ الْبَرَايَا وَاَفْضَلٍ

তিনি বিশ্ব জগত প্রভুর প্রিয়পাত্র, সর্বোচ্চ মর্তবার অধিকারী, সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক মর্যাদাবান।

اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ رَسُوْلٌ مُعَظَّمٌ ـ وَسَيِّدُ كَوْنَيْنِ عَدِيْمُ الْمُمَثَّلٍ

তিনি সমস্ত নবীর ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, দোজাহানের সর্দার, তাঁহার কোন তুলনা নাই।

شَفَاعَتُهٗ تُرْجٰى لَدٰى كُلِّ غُمَّةٍ ـ وَكَرْبٍ وَّهَوْلٍ وَّاقْتِحَامِ الْغَوَائِلِ

বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত ইত্যাদির সময় সুপারিশের আশার স্থল তিনি।

تَرٰى بِاسْمِهٖ يُشْفٰى السَّقَامُ وَاِنَّهٗ ۔ لَحِرْزٌ عَظِيْمٌ مِنْ جَمِيْعِ النَّوَازِلِ

তাঁহার নামের বরকতে অনেক অনেক রোগের উপশম দেখিতে পাইবে এবং তাঁহার নাম সব রকম বিপদ হইতে অতি বড় রক্ষাকবচ।

وَلَوْ كَانَتِ الْاٰيَاتُ تَعْدِلُ قَدْرَهٗ ۔ لَكَانَ اسْمُهٗ يُحْيِىْ رَمِيْمَ الْمَفَاصِلِ

তাঁহার মর্যাদানুপাতিক মোজেযা যদি তাঁহাকে প্রদান করা হইত, তবে তাঁহার নামের বরকতে ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন অঙ্গসমূহ জীবিত হইয়া উঠিত।

هُوَ النُّوْرُ وَالْبُرْهَانُ طٰهٰ وَشَاهِدٌ ۔ وَصَاحِبُ اِسْرَاءٍ عَظِيْمُ الشَّمَائِلِ

পবিত্র কোরআনে নূর (আলো), বোরহান (উজ্জ্বল প্রমাণ), শাহেদ (সাক্ষী) এবং 'তোয়া-হা' বলিয়া তাঁহাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারী এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর আকর।

دَعَاهُ الْاِلٰهُ بِالْبُرَاقِ وَمِعْرَاجٍ ۔ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَاَعْلَى الْمَنَازِلِ

স্বয়ং আল্লাহ বোরাক এবং উড়ন্ত সিংহাসন পাঠাইয়া ঊর্ধ্বস্থানীয় জগতের এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের প্রতি তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া নিয়াছিলেন।

فَسَارَ اِلَى الْعَرْشِ وَمَا شَاءَ رَبُّهٗ ۔ لِرُؤْيَةِ اٰيَاتٍ عِظَامِ الدَّلَائِلِ

সেমতে তিনি পরিভ্রমণ করিলেন মহান আরশ পর্যন্ত এবং যে পর্যন্ত পরওয়ারদেগারের ইচ্ছা হইয়াছিল, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং তাঁহার প্রভুত্বের বড় বড় প্রমাণ পরিদর্শন করিবার জন্য।

وَزَارَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَالَمْ يُفَسَّرُ ۔ وَحَازَ الْكَرَامَاتِ وَمَا لَمْ يُفَصَّلُ

এবং তিনি পরিদর্শন করিলেন এমন এমন মহান নিদর্শনসমূহ, যাহা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং তিনি এমন এমন সম্মান লাভ করিলেন যাহা বর্ণনাতীত

وَنَالَ الْعُلٰى فَوْقَ الْخَيَالِ وَخَاطِرٍ ۔ وَعِزًّا وَّاِجْلَالًا وَّكُلَّ الْفَضَائِلِ

এবং উচ্চ মর্তবা, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত এই পর্যায়ের লাভ করিলেন যাহা ভাবনা বা ধারণায়ও আসিতে পারে না।

دَنَا فَتَدَلّٰى قَابَ قَوْسَيْنِ رَبُّهٗ ۔ فَاَوْحٰى اِلَيْهِ مِنْ عِظَامِ الْمَسَائِلِ

তিনি প্রভুর নৈকট্য লাভ করিলেন যতদূর সৃষ্ট ও সৃষ্টার মধ্যে সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, অতপর বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বহু সার্কুলার তাঁহাকে প্রদান করিলেন

وَصَارَ نَجِيًّا لِلْحَبِيْبِ حَبِيْبُهٗ ۔ وَجِبْرِيْلُ نَاءٍ فِى الْوَرَاءِ بِمَعْزِلِ

এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ হইল, তখন জিব্রাঈল পর্যন্ত তথা হইতে বহু পিছনে ছিলেন।

هَدَانَا اِلَى الْخَيْرِ وَجَنَّةِ رَبِّنَا ۔ اَتَانَا مِنَ اللّٰهِ بِدِيْنٍ مُعَدَّلٍ

তিনি আমাদিগকে উন্নতি ও বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পারিপাট্য-বিশিষ্ট দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।

لَقَدْ جَاءَ وَالنَّاسُ فِىْ قَعْرِ ظُلْمَةٍ ـ ضَلَالٍ وَّاِشْرَاكٍ وَفِىْ كُلِّ بَاطِلٍ

তাঁহার আবির্ভাব হইল যখন মানুষ ভ্রষ্টতা, শেরক ও সব রকম কুসংস্কারে নিমজ্জমান ছিল।

بَشِيْرًا نَذِيْرًا لِلْاَنَامِ وَرَحْمَةً ـ رَؤُوْفًا رَحِيْمًا مِثْلَ عَذْبِ الْمَنَاهِلِ

তিনি সুসংবাদবাহক ও সতর্কবাণীবাহক হইয়া আসিলেন বিশ্ব মানবের জন্য এবং রহমত, মেহেরবান, দয়ালু ও পিপাসা নিবারক সুমিষ্ট ঝর্ণারূপী হইয়া আসিলেন।

سِرَاجًا مُنِيْرًا مِثْلَ شَمْسِ ظَهِيْرَةٍ ـ كَرِيْمًا جَوَادًا مِثْلَ غَيْثٍ مُحَفَّلٍ

দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় দীপ্ত প্রদীপ হইয়া আসিলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালার ন্যায় দাতা হইয়া আসিলেন।

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ مَحَبَّةً ـ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ لَنْ تَرَوْ مِنْ مُمَاثِلٍ

বিশ্ব মানবের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ যে, তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু তিনি একেবারেই বরদাশত করেন নাই এবং তাহাদের জন্য এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাহার কোন তুলনা নাই।

وَدَاعٍ اِلَى الْخَيْرِ بِوَعْظٍ وَّحِكْمَةٍ ـ وَهَادٍ اِلَى اللّٰهِ بِقَوْلٍ مَدَلَّلٍ

নসীহত ও হেকমতের দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে মঙ্গলের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং দলীল প্রমাণ মারফত আল্লাহর প্রতি পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন।

وَبِالْبَيِّنَاتِ مِنْ دَلَائِلِ رَبِّهٖ ـ وَبِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْجَلَائِلِ

এবং স্বীয় প্রভুর পক্ষ হইতে প্রদত্ত উজ্জ্বল প্রমাণ, প্রকাশ্য বড় বড় অলৌকিক ঘটনা মারফত–

تَشَقَّقَ بَدْرٌ مِنْ اِشَارَةِ اِصْبَعٍ ـ تَكَسَّرَ صَخْرٌ مِنْ اِشَارَةِ مِعْوَلٍ

তাঁহার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল এবং গেতীর ইশারায় বিরাট পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

وَسَلَّمَ اَحْجَارٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةً ـ عَلَيْكَ سَلَامُ اللّٰهِ دَوْمًا تَقَبَّلِ

পাথরসমূহ তাঁহাকে সালাম করিয়াছিল যে, আপনার প্রতি সর্বদা আল্লাহর তরফ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক– এই সালাম কবুল করুন।

وَجَاءَ عِدَاهُ بِالْحِجَارَةِ قُبْضَةً ـ فَنَادَتْ نِدَاءً فِىْ شَهَادَةِ مُرْسَلٍ

শত্রুদল কাঁকর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত হইল, ঐ কাঁকর উচ্চ স্বরে তাঁহার রেসালতের সাক্ষ্য দিল।

تَفَلَّتَ اَشْجَارٌ اِلَيْهِ مُلَبِّيَةً ـ وَقَامَتْ لَدَيْهِ مِثْلَ عَبْدٍ مُذَلَّلٍ

তাঁহার আদেশ পালনে কতিপয় বৃক্ষ ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে অনুগত দাসের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল

تَجَمَّعَ اَغْصَانٌ اِلَيْهِ مُظِلَّةً ـ وَسَارَ الْغَمَامُ مِثْلَ سَقْفٍ مُظَلَّلٍ

গাছের ডালা তাঁহাকে ছায়া দানের জন্য একত্রিত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল এবং মেঘমালা ছায়া প্রদানকারী ছাদের ন্যায় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল।

وَحَنَّتْ اِلَيْهِ نَخْلَةٌ مِنْ مُحَبَّةٍ ـ فَاَنَّتْ وَرَنَّتْ كَالْيَتِيْمِ وَاَرْمَلِ

এবং তাঁহার বিচ্ছেদে কাষ্ঠ বিচ্ছেদ-যাতনা প্রকাশ করিয়া এতীম ও বিধবার ন্যায় কাঁদিয়াছিল।

فَلَمَّا اَتَاهَا هَادِءًا مُتَعَطِّفًا ـ لَغَاضَ بُكَاهَا كَالْوَلِيْدِ الْمُعَلَّلِ

অতপর যখন তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিলেন এবং স্নেহ দেখাইলেন, তখন সান্ত্বনা প্রদত্ত শিশুর ন্যায় তাঁহার ক্রন্দন ক্ষান্ত হইয়া গেল।

تَشَكَّتْ اِلَيْهِ بِالْمَظَالِمِ نَاقَةٌ ـ وَكَلَّمَ ظَبْيٌ مِثْلَ ثَكْلٰى بِمَامَلِ

উষ্ট্রী আসিয়া তাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগ তাঁহাকে জানাইয়াছিল এবং হরিণ তাঁহার নিকট সন্তানহারা মায়ের ন্যায় স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল।

اَتَتْ عَنْكَبُوْتٌ بِالْبُيُوْتِ وِقَايَةً ـ عَلَيْهِ مِنَ الْاَعْدَاءِ تَحْمِىْ بِمَقْتَلِ

মাকড়সা ঘর বানাইয়া তাঁহাকে শত্রু হইতে হেফাযত করিয়াছিল যখন তাঁহার প্রাণের ভয় ছিল।

وَجَائَتْ تَقِيْهِ مِنْ عَدُوٍّ حَمَامَةٌ ـ يَقُوْلُ لِثَانٍ لَاتَخَفْ وَتَوَكَّلِ

এবং শত্রু হইতে রক্ষা করার জন্য কবুতরও আসিয়াছিল– তিনি নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, ভয় পাইও না– আল্লাহর উপর ভরসা কর।

وَقَدْ قَالَ يَا اَرْضُ خُذِيْهِ لِفَارِسٍ ـ فَلَمْ يَتَخَلَّصْ قَبْلَ اَمْرِ مَبَدِّلِ

একবার এক অশ্বারোহী শত্রুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মাটি! এই ব্যক্তিকে পাকড়াও কর, অতপর সে আর ছুটিয়া যাইতে পারিল না, যাবত না তিনি ছাড়িবার নির্দেশ দিলেন।

طُيُوْرٌ وَوَحْشٌ وَالْخَلَائِقُ كُلُّهَا ـ لَتَدْرِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دُوْنَ التَّئَامُلِ

পশুপক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহর রসূলকে বিনা দ্বিধায় চিনিয়া থাকিত।

دَعَا قَوْمَهٗ يَوْمًا اِلَى اللّٰهِ دَعْوَةً ـ وَاَنْذَرَهُمْ هَوْلَ الْعَذَابِ الْمُعَجَّلِ

একদা তিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী আযাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করিলেন।

فَنَادٰى نِدَاءً يَا مَعَاشِرَ مَكَّةٍ ـ هَلُمُّوْا اِلٰى قَوْلِ النَّذِيْرِ الْمُهَوِّلِ

সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মক্কার বিভিন্ন গোত্র! তোমরা ভয়ঙ্কর সংবাদদাতা সতর্ককারীর কথার প্রতি ধাবিত হও।

فَعَمَّ قُرَيْشًا وَالْعَشِيْرَةَ كُلَّهَا ـ وَخَصَّ مِنَ الْقُرْبٰى بِقَوْلٍ مُفَصَّلِ

তিনি কোরায়েশ তথা স্বীয় বংশধরের সকলকে এবং বিশেষভাবে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন–

اَلَا تَعْلَمُوْنِىْ صَادِقًا اِنْ اَخَفْتُكُمْ ـ بِجَيْشٍ اَتَاكُمْ عَنْ قَرِيْبٍ مُعَجَّلِ

"আমি যদি এইরূপে সতর্ক করি যে, অতি সত্বর নিকটবর্তী স্থান হইতে এক দল শত্রু সেনা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে– তবে কি আমাকে সত্যবাদী গণ্য করিবে"?

فَقَالُوْا بَلٰى لَمْ تَاْتِ زُوْرًا وَلَمْ نَرَ ـ بِكَ الْكِذْبَ يَاخَيْرَ الْاَمِيْنِ الْمُعَوَّلِ

তাহারা সকলে এক বাক্যে বলিল, নিশ্চয়– কারণ আপনি কখনও মিথ্যা অবলম্বন করেন নাই এবং হে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী! আপনার মধ্যে কখনও আমরা মিথ্যা পাই নাই।

فَقَالَ اسْمَعُوْا ثُمَّ اسْمَعُوْنِيْ فَاِنَّنِيْ ـ نَذِيْرٌ لَّكُمْ قَبْلَ الْعَذَابِ الْمُخَجِّلِ

তখন তিনি বলিলেন, তোমরা শুন, পুনঃ বলিতেছি– তোমরা কথা শুন, অপদস্থকারী আযাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

اَلَا فَاعْبُدُوْا رَبًّا وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ ـ وَلَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ اِلٰهٍ مُسَوَّلِ

তোমরা সতর্ক হও– সৃষ্টিকর্তার এবাদত কর এবং তাঁহার সঙ্গে শরীক করিও না গর্হিত মাবুদের এবাদত করিও না।

اَلَا فَاهْجُرُوْا رِجْزًا وَاَوْثَانَ قَوْمِكُمْ ـ وَمَا يَعْبُدُ الْاٰبَاءُ اَجْلَ الْمَجَاهِلِ

তোমরা মূর্তি ও গোত্রীয় দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের বাপ-দাদা অজ্ঞতার দরুন যাহাদের পূজা করিত ঐসবও পরিত্যাগ কর।

فَرَاغُوْا اِلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ كُلُّهُمْ ـ وَهَمُّوْا بِهٖ شَرًّا بِكُلِّ الْوَسَائِلِ

তখন তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি শত্রুতার ব্যবহার আরম্ভ করিল এবং সব রকমের ব্যবস্থাবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হইল।

سَعٰى كُلَّ سَعْيٍ فِيْ هِدَايَةِ قَوْمِهٖ ـ وَلٰكِنْ تَلَقَّوْهُ بِشَرٍّ مُسَلْسَلِ

তিনি স্বীয় জাতিকে হেদায়াত করার জন্য সব রকমের চেষ্টাই করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহারই করিতে লাগিল।

فَصَارَ يَجُوْلُ فِيْ الْمَجَامِعِ تَارَةً ـ وَطَوْرًا يَدُوْرُ فِيْ بُطُوْنِ الْقَبَائِلِ

তখন তিনি বিভিন্ন লোক সমাগমের স্থানে বিভিন্ন গোত্রের শাখাসমূহের নিকট সত্যের ডাক নিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন

وَيَعْرِضُ دِيْنَ اللّٰهِ فِيْ كُلِّ مَحْضَرٍ ـ وَيَدْعُوْا عِبَادَ اللّٰهِ فِيْ كُلِّ مَحْفِلِ

এবং তিনি প্রত্যেক সুযোগেই আল্লাহর দ্বীনকে লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সভা-সমিতিতে তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে আহ্বান জানাইতে লাগিলেন।

اَتَا طَائِفًا يَدْعُوْ اِلٰى دِيْنِ رَبِّهٖ ـ وَيَرْجُوْ بِاَهْلِيْهَا لِعَوْنٍ مُؤَمَّلِ

এই পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ নগরে স্বীয় পরওয়ারদেগারের দ্বীনের আহ্বান নিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি তায়েফবাসী হইতে আশানুরূপ সাড়া পাইবার ভরসা করিতেছিলেন

وَلٰكِنْ اَتَوْهُ بِالْجَفَاءِ وَغَدْرَةٍ ـ وَجَوْرٍ وَّاِيْلَامٍ وَجُرْحٍ مُقَتِّلِ

কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অসদ্ব্যবহার, অত্যাচার, দুঃখ-যাতনা প্রদান এবং প্রাণনাশক আঘাত লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল

وَادْمَوْهُ ضَرْبًا بِالْحِجَارَةِ صِبْغَةً ـ وَاٰذَوْهُ اِيْذَاءً بِمَا لَمْ يُمَثَّلِ

এবং তাহারা পাথর মারিয়া তাঁহাকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিল এবং দৃষ্টান্তহীন কষ্ট-যাতনা দিল।

فَسَالَتْ دِمَاءٌ مِّنْ جَبِيْنٍ مُّبَارَكٍ ـ وَصَارَتْ عَلَى الرِّجْلِ كَخُفٍّ مُّنَعَّلٍ

তাঁহার মোবারক মুখ-মণ্ডলের রক্ত বহিয়া পায়ের উপর মোজা ও জুতার ন্যায় হইয়া গেল।

لِيَمْسَحُ وَجْهًا مِّنْ دِمَاءٍ وَمَدْمَعٍ ـ وَيَمْشِىْ غَشِيًّا فِىْ هُجُوْمِ الْبَلَابِلِ

তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত ও অশ্রু মুছিতে লাগিলেন এবং দিশাহারা হইয়া বিপদের তুফানের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

فَجَاءَ اِلَيْهِ مِنْ مَلَائِكِ رَبِّهٖ ـ لِاِهْلَاكِ قَوْمٍ بِالْعَذَابِ الْمُنَكِّلِ

এমতাবস্থায় তাঁহার প্রভুর ফেরেশতা আসিল ঐ দেশবাসীকে আযাব দানে ধ্বংস করার জন্য।

لِاِهْلَاكِهِمْ بَيْنَ الْجِبَالِ بِطَائِفٍ ـ بِسَحْقٍ وَّرَضٍّ بَيْنَهَا مِثْلَ فِلْفِلٍ

তায়েফ নগরীর পাহাড়সমূহের মধ্যে মরিচের ন্যায় পিষিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য।

وَلٰكِنْ دَعَا رَبِّىْ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ ـ اِذَا يَعْرِفُوْنِىْ لَنْ يُّصِيْبُوْا بِخَرْدَلٍ

কিন্তু তিনি তাহাদের ধ্বংস চাহিলেন না বরং দোয়া করিলেন, হে প্রভু! এই জাতিকে হেদায়াত দান করুন। তাহারা চিনিতে পারিলে আমাকে সরিষার দানার আঘাতও করিবে না।

وَاِنْ كَانَ اُوْلٰى كَذَّبُوْنِىْ فَنَسْلُهُمْ ـ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَا مُؤْمِنِيْنَ فَاجْمِلِ

তিনি আরও বলিলেন– তাহারা যদিও আমাকে অমান্য করিতেছে; কিন্তু আশা করি তাহাদের বংশের মধ্যে ঈমানদার সৃষ্টি হইবে, অতএব তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন।

فَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَاْتِىْ بِشَفْقَةٍ ـ عَلٰى مَنْ يَجُوْرُ مِنْ عَدُوٍّ وَّقَاتِلٍ

এই ছিলেন আল্লাহর রসূল– প্রাণঘাতী শত্রু অত্যাচারীর প্রতিও তিনি দয়া প্রদর্শন করিতেন।

وَيَدْعُوْلَهُمْ بِالْخَيْرِ حُبًّا وَّرَحْمَةً ـ يُسَكِّنُ غَضْبَ اللّٰهِ حِيْنَ التَّنَزُّلِ

এবং তাহাদের প্রতিও দয়াপরবশ হইয়া মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া করিতেন– আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার মুহূর্তে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন।

مُعِيْنٌ لِخَلْقِ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ غُمَّةٍ ـ شَفِيْعُ الْعُصَاةِ فِىْ شَدِيْدِ الْمَازِلِ

প্রত্যেক কষ্ট-যাতনার স্থানেই তিনি আল্লাহর বান্দাদিগকে সাহায্যকারী এবং ভীষণ কঠিন স্থানে গোনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী।

وَسَاقِىْ عِطَاشِ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ مَحْشَرٍ ـ مِنَ الْحَوْضِ اَحْلٰى مِنْ حَلِيْبٍ مُعَسَّلٍ

হাশরের দিন তিনি তৃষ্ণাতুর মানুষকে এমন হাউজ হইতে পান করাইবেন যাহার পানীয় দুগ্ধ ও মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

شَرَابًا طَهُوْرًا مَنْ يُّصِبْ مِنْهُ جُرْعَةً ـ يَجِدْ رِيَّةً تَبْقٰى وَلَمْ تَتَزَيَّلِ

এমন পবিত্র শরবত যেব্যক্তি এক ঢোক লাভ করিবে সে চিরজীবনের জন্য তৃপ্তি লাভ করিবে।

يَجِيْءُ اِلَى الْعَرْشِ وَيَسْجُدُ رَبَّهٗ ـ اِذَا النَّاسُ سَكْرٰى فِيْ شَدِيْدِ التَّمَلْمُلِ

যখন (কিয়ামতের মাঠে) মানুষ ভীষণ চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পতিত হইবে, তখন তিনি আরশের নীচে আসিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে সেজদা করিতে থাকিবেন

اِذَا النَّاسُ سَكْرٰى مِنْ شَدَائِدِ مَحْشَرٍ ـ حَيَارٰى كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ بِمَوْجَلِ

যখন মানুষ হাশরের মাঠের বিপদের ভয়ে পতঙ্গ দলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটি করিতে থাকিবে

يَفِرُّ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ وَّاَقْرَبٍ ـ بِيَوْمِ حِسَابٍ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُّعَوَّلِ

হিসাবের দিন সর্বাধিক নিকটস্থ আত্মীয় পরস্পর একে অন্য হইতে পলাইয়া যাইবে, কাহাকেও ভরসাস্থলরূপে পাওয়া যাইবে না

وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَبْكِيْ لِاُمَّةٍ ـ وَيَدْعُوْا لِاِلٰهٗ بِابْتِهَالِ التَّذَلُّلِ

কিন্তু রসূল (সঃ) উম্মতের জন্য কাঁদিবেন ও কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবেন।

اِلٰهِيْ تَرَحَّمْ وَاغْفِرَنْ كُلَّ اُمَّتِيْ ـ وَاَدْخِلْهُمُ الْجَنَّاتِ فِيْ خَيْرِ مَنْزِلِ

হে আল্লাহ! আমার প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা কর, রহমত কর, তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল কর।

ثِمَالٌ مَلَاذٌ فِيْ ثَلٰثِ مَوَاطِنٍ ـ صِرَاطٍ وَّمِيْزَانٍ وَنَشْرِ الرَّسَائِلِ

তিনি বিশেষরূপে তিনটি জায়গায় আশ্রয়স্থল– পুলসেরাতে, নেকী-বদী ওজনের পাল্লার স্থানে এবং আমলনামা বণ্টনের স্থানে।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبُ الْمُكَرَّمُ ـ تَحِيَّةُ مُشْتَاقٍ اِلَيْكَ وَاٰمِلِ

আপনার প্রতি সালাম হে (আল্লাহর) সম্মানী হাবীব! ইহা আপনার দ্বারে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষাধারীর সম্ভাষণ।

اَتَيْتُ بِاٰمَالٍ وَّشَوْقٍ وَرَغْبَةٍ ـ رَجَاءِ اِلَيْكُمْ وَابْتِغَاءَ التَّوَسُّلِ

আশা ও আগ্রহ নিয়া আমি আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি– আপনার উসিলা লাভের উদ্দেশে।

فَرَبُّكَ سَاعٍ فِيْ رِضَاكَ وَمُسْرِعٌ ـ وَيُعْطِيْكَ مَا تَرْضٰى بِدُوْنِ التَّمَثُّلِ

আপনার পরওয়ারদেগার আপনার সন্তুষ্টি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং যথাসত্বর আপনার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন।

وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ جِئْتُكَ تَائِبًا ـ وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّيْ لِذَنْبِي الْمُذَلِّلِ

আপনি আল্লাহর রসূল, আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট তওবা করত এবং আমার অপদস্থকারী গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করত আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি।

فَلَوْ اَنَّكَ اسْتَغْفَرْتَهُ لِىْ وَجَدْتُهُ ـ رَحِيْمًا وَّتَوَّابًا فَهَلْ اَنْتَ مُجْمِلِىْ

আপনি যদি আমায় মাগফেরাতের দোয়া করেন তবে নিশ্চয় আমি পরওয়ারদেগারকে তওবা গ্রহণকারী মেহেরবানরূপে পাইব, আপনি কি সহানুভূতি করিবেন?

وَهٰذَا لَوَعْدٌ يَارَسُوْلُ مُحَقَّقٌ ـ بِوَحْيٍ اِلَيْكَ مِثْلُهُ لَمْ يُبَدَّلٖ

হে আল্লাহর রসূল! উক্ত বিষয়টি আল্লাহ তাআলার অকাট্য ওয়াদা, যাহা আপনার প্রতি ওহী দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে– তাহার বরখেলাপ হইবে না।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَاشَفِيْعُ الْمُشَفَّعُ ـ شَفَاعَتُكَ الْعُظْمٰى نَجَاةُ لِنَائِلٖ

আপনার প্রতি সালাম হে গ্রহণীয় সুপারিশকারী। আপনার মহান শাফাআত যে লাভ করিবে তাহার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَارَؤُفُ وَمُشْفِقٌ ـ ثِمَالٌ مَلَاذٌ لِلْحَيَارٰى وَعُوَّلٖ

আপনার প্রতি সালাম হে মেহেরবান স্নেহশীল। আপনি বিপদগ্রস্ত আতঙ্কগ্রস্তের আস্থার স্থল।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَارَسُوْلُ الْمُعَظَّمُ ـ جَزَاكَ الْاِلٰهُ بِالْمَزِيْدِ وَاَكْمَلٖ

আপনার প্রতি সালাম হে শ্রেষ্ঠ রসূল। আল্লাহ আপনাকে অধিক অধিক প্রতিদান দান করুন।

شَهَادَتُنَا اَنْ قَدْ هَدَيْتَ جَمِيْعَنَا ـ وَبَلَّغْتَ مَا اُوْتِيْتَ مِنْ كُلِّ مُنْزَلٖ

আমরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছি– আপনি আমাদের সৎপথ দেখাইয়াছেন এবং যাহা কিছু আল্লাহর তরফ হইতে লাভ করিয়াছেন সব আপনি আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

وَاَدَّيْتَ وَاللّٰهِ اَمَانَةَ رَبِّنَا ـ فَصِرْنَا عَلٰى دِيْنٍ مَّتِيْنٍ مُسَهَّلٖ

খোদার কসম– আপনি পরওয়ারদেগারের সমস্ত আমানত পূর্ণরূপে আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাই আমরা একটি সহজ ও মজবুত দ্বীনের সন্ধান পাইয়াছি।

اَتَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْمَلَاذِ زِيَارَةً ـ وَمُسْتَشْفِعًا كَالْعَائِدِ الْمُتَوَسِّلٖ

হে সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়ের স্থান! উসিলা ও আশ্রয়ের আশা নিয়া সুপারিশ প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি।

تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ يَابَحْرَ رَحْمَةٍ ـ وَيَا مَرْجِعِ الْعَاصِىْ وَيَا خَيْرَ مَؤْئِلٖ

হে দয়ার দরিয়া– হে গোনাহগারের উপস্থিতির স্থল, হে সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল! আপনি আমি "আজিজুল হকের" প্রতি দয়া করুন।

عَلَيْكَ اُلُوْفٌ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّرَحْمَةٍ ـ وَاٰلَافُ تَسْلِيْمٍ مِنَ الْعَبْدِ فَاقْبَلٖ

আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদও আল্লাহর রহমত এবং লক্ষ লক্ষ সালাম এই গোলামের পক্ষ হইতে কবুল করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমণিকা

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মানবরূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি রসূল ছিলেন; এমন রসূল যে, বিশ্ব বুকে আল্লাহ প্রেরিত এক লক্ষ বা দুই লক্ষের অধিক সংখ্যক রসূলের সেরা ও সর্দার বা সর্ব ঊর্ধ্বের রসূল ছিলেন তিনি।

নবী-রসূলগণ মানব জাতির মধ্যে সর্ব ঊর্ধ্বের এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব ঊর্ধ্বের হইলেন নবীজী (সঃ)। এই ঊর্ধ্বের সীমা কি তাহা একমাত্র আল্লাহ তাআলাহ জানেন।

তবে হিন্দুদের ন্যায় দেবত্ববাদ তথা গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও পূজনীয় গণ্য করা– ইসলামে ইহার স্থান নাই। উপাসনা এক আল্লাহ তাআলার জন্যই সীমাবদ্ধ– এই অতি ঊর্ধ্বের মর্যাদা অন্য কাহারও নাই। তাই হযরত (সঃ) সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ এই পরিচয় উল্লেখ করেন, عبده ورسوله আবদুহু ওয়া রসূলুহু "আল্লাহর বান্দা– উপাসক; দাস এবং আল্লাহর রসূল"।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া অর্থে অতিমানুষ বা অলৌকিক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিলেন না; কিন্তু সকল সৃষ্টির সর্ব ঊর্ধ্বের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় তাঁহার ছিল এবং তাঁহার এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন ও প্রকাশরূপে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার জন্য অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এই সূত্রে তাঁহাকে মহামানুষ, এই অর্থেই তাঁহাকে অতি মানুষ বলিলে তাহা শুধু ভাষার প্রয়োগ হইবে। ভাষা হিসাবে মহামানুষ ও অতিমানুষ এই দুইয়ের মধ্যে এত বড় বিরাট ব্যবধান আছে কিনা যে, অতিমানুষ শব্দ দেবত্বের মতবাদ বুঝায়– তাহা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিতে পারেন। জনসাধারণের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা চাই যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মর্যাদা ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্বে ছিল। কিন্তু উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার মর্যাদা তাঁহার ছিল না মোটেই। সেইরূপ ধারণা থাকিলে তাহা অবশ্যই শেরক অংশীবাদ গণ্য হইবে। ইহার মর্ম এই আয়াতের انما انا بشر مثلكم "আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ বৈ নহি।" অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা তথা উপাসক দাস– উপাস্য, পূজনীয় মোটেই নহি।

এই আয়াতের সূত্র ধরিয়া নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অতিমানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার আড়ালে একটি ইসলাম বিরোধী মতের ফাঁক বাহির করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর লোক নবী-রসূলগণের মোজেযা, যাহা অলৌকিক ঘটনাবলী হইয়া থাকে, তাহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। ঐ শ্রেণীর লোকেরাই এই জিগির তোলায় খুব উৎসাহী যে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতিমানুষ বা অলৌকিক মানুষ ছিলেন না। এই জিগিরের সঙ্গে ইহা মিশাইয়া দেওয়া তাহাদের জন্য জন্য সহজ হয় যে, তিনি যেহেতু অলৌকিক মানুষ ছিলেন না, তাই তাঁহার কোন ঘটনা বা কার্যও অলৌকিক হইবে না। এই ভাব প্রবণতায় তাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লারে মোজেযার অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকের গণ্ডিভুক্ত করিতে অস্বাভাবিক হেরফের ও গোঁজামিলের পিছনে ছুটা ছুটি করে। শুধু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কেই নহে, নবীগণের সকলের মোজেযার ব্যাপারে, তাহাদের এই হাল। যেমন স্বভাবের ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ মরহুম। নবীর মোজেযা সম্পর্কে উল্লিখিত প্রবণতাটা খাঁ মরহুমের বাতিক ব্যাধিরূপ ছিল। পবিত্র কোরআনের পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবীগণের মোজেযা শ্রেণীর যেসব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার তফসীর নামীয় কোরআনের অপব্যাখ্যায় তিনি ঐসবের বিকৃতি সাধনে যেসব অস্বাভাবিক

হেরফের ও গোঁজামিলের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা ঐসবের কঠোর সমালোচনায় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহার বিভিন্ন অংশ বাংলা বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ডের বিভিন্ন পাদটীকায় বিদ্যমান আছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযাসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম ঐ পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিখ্যাত বিখ্যাত মোজেযা, যেমন- মে'রাজ, বক্ষবিদারণ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা এবং নবীজীর হিজরত সফরের বিভিন্ন মোজেযার ঘটনা ইত্যাদিকে হয় অস্বীকার করিয়াছেন, না হয় আজগবীরূপে বিকৃত করিয়াছেন। বিশেষত নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মান প্রদর্শনে এবং নবুয়তের আভাস দানে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল সেসবের সহিতও তিনি ঐ ব্যবহারই করিয়াছেন। তাঁহার অপচেষ্টার কোন কোনটার সমালোচনা বিভিন্ন পাদটীকায় আমরা করিব।

খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপচেষ্টার পথ পরিষ্কারে স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দুইটি জঘন্য বিষ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। একটি হইল- মুসলিম জাতির গৌরব, ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুরক্ষক, অতন্দ্রপ্রহরী কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ পূর্ববর্তী মহান ইমামগণকে শুধু উপেক্ষা ও কটাক্ষ করাই নহে বরং তাঁহাদিগকে সমাজের নিকট পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করিার জন্য অশালীন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি হইল, ঐ মনীষী ইমানমগণের জীবন সাধনালব্ধ মূল্যবান জ্ঞান-গবেষণার প্রতিও সমাজের আস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই অপকর্ম অপচেষ্টায় খাঁ মরহুমের মতলব সিদ্ধি হইবে বটে, কারণ মোজেযার অনেক ঘটনা অস্বীকার করিতে বা বিকৃত করিতে বিরাট বাধা প্রতিবন্ধক সম্মুখে এই আসে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে পূর্বাপর সাধক গবেষকগণ সকলে একবাক্যে ঐসব ঘটনাবলীর স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং তাহা গুরুত্বসহকারে লিখিয়াছেন। অতপর শত শত বৎসর হইতে তাঁহাদের সঙ্কলন মুসলিম সমাজে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ঐ সব সঙ্কলনে প্রতি আস্থা বিনষ্ট করিতে পারিলে সহজেই ঐ বাধা অপসারিত হইল; কিন্তু ইহার পরিণাম অতি মারাত্মক। জাতীয় সাধক গবেষকগণ এবং তাঁহাদের সঙ্কলন জ্ঞানভাণ্ডার জাতির অমূল্য ধন; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে জাতি রিক্তহস্ত এবং এতীম হইয়া পড়িবে।

সভ্য ও প্রগতিশীল জগতের অবস্থা লক্ষ্য করুন। হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণের রায়সমূহ সরকারীভাবে গেজেটরূপে প্রকাশিত এবং বিশেষ যত্নের সহিত সুরক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের বিচারপতিগণ পরস্পর ঐসব রায়ের পূর্ণ মর্যাদা দিয়া থাকেন। উকিল-মোক্তারগণ ঐসব রায়ের বরাত বা রেফারেন্স দানের ক্ষেত্রে কেহই তাহাকে উপেক্ষা করেন না।

খাঁ মরহুম ঐ বিষাক্ত বস্তুদ্বয়কে তাঁহার পাণ্ডিত্যের রং-পলিশ এবং ভাষার লালিত্যের সাজ-সজ্জায় এত সুন্দর রূপ দিয়াছেন যে, বুঝমান মানুষও তাহা বরণ করিতে দ্বিধা করিবে না। পাণ্ডিত্যে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ও প্রতিভাবান এবং প্রকাশ ভঙ্গির ছল-চাতুরীতে তাঁহার ন্যায় পটু কোন মানুষ তাঁহার মোকাবিলায় আসিলে তিনি যেভাবে অসত্যকে সুন্দর সাজে সত্যবেশী বানাইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার বিপক্ষ অন্ততঃ সত্যকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। আমরা শুধু সংক্ষেপে খাঁ মরহুমের মাকালরূপী কোন কোন বক্তব্যের সামান্য ইঙ্গিত এবং তাহা খণ্ডনে আলোচনা প্রদানের চেষ্টা করিব।

খাঁ মরহুম প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী সীরাত সঙ্কলনসমূহের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন- "মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় প্রায়ই দেখা যায় যে, কিংবদন্তী-সঙ্কলক, ঐতিহাসিক ও অন্ধ ভক্তগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী পর্বত পরিমাণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জনা রাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ ও খৃষ্টানদের যীশু খৃষ্টের নাম উল্লেখ করা যায়। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্বন্ধেও অবস্থা কতেকটা ঐরূপ। (নাউযু বিল্লাহ)

কী জঘন্য দৃষ্টান্ত ও মহাপাপের উক্তি! হিন্দুদের এবং শ্রীকৃষ্ণের তুলনার ন্যায় ঈমানহীনতার বেআদবী ত দূরের কথা– হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত হওয়ার দাবীদার খৃষ্টানদের উল্লেখও এই ক্ষেত্রে রাত্র ও দিনের ন্যায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাতিরে আল্লাহ তাআলা একটি বিশেষ নিশ্চয়তা দিয়া দিয়াছেন– নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত সত্যের বিপরীতের উপর একমত হইবে না। খাঁ মরহুম তাঁহার ঐ জঘন্য ভাবধারাকে উক্ত পরিচ্ছেদের শেষ লাইনগুলিতে আরও অধিক উলঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন– "যিনি হযরতের জীবনী আলোচনায় সত্য-মিথ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে চান তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা বেশী আয়াসসাধ্য নহে। তবে বাপ-দাদার কথা, পূর্বতন আলেমগণের নজির, মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারা ইত্যাদির চোখ-রাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।"

আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করুন! তের শত বৎসর পরে মুসলিমগণের নজির লক্ষ্য করিলে তাহা মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিতুল্য হইবে– এইরূপ উক্তি করা খাঁ মরহুমেরই দুঃসাহস হইতে পারে। শুধু ঐ উক্তি নহে, তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণকে যেভাবে গালিগালাজ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাকালরূপী কতগুলি যুক্তি সত্যের আবরণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই যুক্তিগুলির ভিতরেও বিষ ঢুকাইয়াছেন অনেক; যদ্দারা তিনি সীমাহীন ধৃষ্টতায় পৌছিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার ভাষায় ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব পূর্বতন আলেম এবং ইমামগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন– "বোজর্গানে দীন ও ছলফে-ছালেহীন' বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল 'তাগুতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সর্বনাশের মূল।"

পাঠক! মুসলিম সমাজের 'বুজর্গানে দ্বীন' কোন্ কোন্ শ্রেণী খাঁ মরহুম পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি–"অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর বলিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন– ইহারা হইতেছেন বোজর্গানেদ্বীন।" এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা গেল– ইমাম, আলেম, পীর– ইহারাই বোজর্গানে দ্বীন।

সল্ফে সালেহীন অর্থও বুঝুন! 'সলফ' অর্থ পূর্বতন, আর 'সালেহীন' অর্থ নেক্কার ব্যক্তিবর্গ; সলফে সালেহীন অর্থ পূর্বতন নেক্কার ব্যক্তিবর্গ।

এই সুধী শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, 'তাগূত'। এই শব্দটির অর্থে বাংলা শব্দ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে মুসলিম সমাজ খাঁ মরহুমের মুখে কি দিত তাহা বলা যায় না, তবে তিনি ক্ষমা পাইতেন না নিশ্চয়। 'তাগূত' শব্দটি পবিত্র কোরআনের আয়াতুল কুরসীতে উল্লিখিত রহিয়াছে। কাফের-মোশরেক পৌত্তলিকগণের পূজনীয়দের উদ্দেশে 'শয়তান' বা দেবদেবী অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেমতে খাঁ মরহুমের উক্তির অর্থ দাঁড়ায়– ইমাম, আলেম, পীর ও নেককার ব্যক্তিবর্গ বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল শয়তান বা দেবদেবীর সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্বনাশের মূল। এই জঘন্য উক্তির প্রতিবাদের ভাষা জগতে আছে কি?

পাঠক! আপনারা ভাবিতে পারেন এবং খাঁ মরহুম এই ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেনও বটে যে, তাঁহার কটাক্ষ ও আক্রোশ শুধু কল্পিত ও ভুয়া বুজুর্গদের সম্পর্কে এবং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত রচিত অপ্রামাণিক উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি চটি বই-পুস্তক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ।

খাঁ মরহুমের পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার আবরণে অসংখ্য ধোঁকা-ফাঁকির ইহাও একটি । তাঁহার অসার পেঁচালো মন্তব্যসমূহে তিনি ঐরূপ হাবভাব দেখাইয়া এবং ঐ শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করিয়া সমাজের ধিক্কার ও ক্ষোভ হইতে গা-ঢাকা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উদ্দেশ্য ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

প্রথমতঃ পূর্ব যুগে 'ইমাম' আখ্যার ভুয়া কল্পিত পাত্র ছিল বলিয়া কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে আলেম ও পীর নামের ভুয়া লোক থাকা স্বাভাবিক। জগতের অন্যান্য শ্রেণীতেও তাহা আছে; যেমন–

ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিভিন্ন প্রশাসক ইত্যাদিতেও ভুয়া ব্যক্তি আছে; সেই জন্য তাহাদিগকে শ্রেণীগতভাবে গালি দিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উক্তি কি ক্ষমার যোগ্য হইবে?

অধিকন্তু পূর্ব যুগে, মুসলমানদের সোনালী আমলে– যখন ইসলামী শাসন প্রচলিত ছিল, তখন আলেম পীর ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষার ঊর্ধ্বতন আখ্যাসমূহ ভুয়ারূপে নিতান্ত কমই অবলম্বিত হইতে পারিত; যেমন– বর্তমান যুগে ভুয়া সামরিক অফিসার ও উচ্চস্তরের ভুয়া প্রশাসক ইত্যাদি হওয়া কি সহজ ব্যাপার? ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবময় শাসন আমলে সামরিক অফিসার বা প্রশাসকদের আখ্যাসমূহ অপেক্ষা 'আলেম' 'পীর' ইত্যাদি আখ্যা বহু পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ ইমাম, আলেম ও পীর শ্রেণীর যেসব বিশিষ্ট মনীষীর জ্ঞান ভান্ডার রচনা ও সঙ্কলন আকারে জাতীয় রত্নরূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ত ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব এবং অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয়ত ঃ খাঁ মরহুম প্রকৃত প্রস্তাবে ভুয়া ও কল্পিত বুজুর্গ নামীয় চুনোপুঁটি আটকাইবার জন্য সুবৃহৎ উপক্রমণিকার জাল ফেলেন নাই; তিনি ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিমের ন্যায় বড় বড় মোহাদ্দেছ, ইসলাম ও মুসলমান জাতির গৌরব– রুই-কাতলা আটকাইবার উদ্দেশে ঐ জাল ফেলিয়াছেন। তিনি উর্দু-ফার্সী চটি বই মুছিবার জন্য এত পাণ্ডিত্য ব্যয় করেন নাই। তিনি ৬০০–৭০০ বৎসর হইতে প্রচলিত ৪০০০–৬০০০ পৃষ্ঠায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও মোফাসসেরগণের জ্ঞানগর্ভময় জাতীয় সম্পদ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীকে উপেক্ষণীয় ও প্রক্ষিপ্ত সাব্যস্ত করার কুমতলব আঁটিয়াছেন। এই সত্যের মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন–

(১) কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার কুদরতে আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চন্দ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন– আমরা যথাস্থানে এই মো'জেযার প্রামাণিক সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করিব।

খাঁ মরহুম মোস্তফা চরিত রচনা করিয়াছেন; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কিত কোন আলোচনা তাহাতে নাই। এমনকি এই বিখ্যাত মোজেযাটিরও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না, এত বড় মোজেযাও বর্ণনা না করা তাঁহার অভিরুচি মনে করিতাম। কিন্তু মোজেযা অস্বীকারের বাতিক খাঁ মরহুমকে এই এ ক্ষেত্রেও রেহাই দেয় নাই। তিনি তাঁহার উপক্রমণিকায় কৌশলের সহিত তাহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন–

"আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তিধারা এই যে, আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আজগবী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন; যথা– যে আল্লাহ চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি চাঁদকে দু'টুকরা করিতে পারেন না? –আমরা এই বন্ধুদের যুক্তি স্বীকার করিয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ করিতে পারেন সব– তোমাকে বা আমাকে পাগল করিতে পারেন। তাই তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল গণ্য করিব? ইহা যে ঘটিয়াছে– ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ দাও।"

ধৃষ্টতার সীমা আছে কি? বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফসহ অসংখ্য কিতাবের হাদীসসমূহে প্রমাণিত এবং হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত সীরাত শাস্ত্রের বড় বড় প্রামাণিক কিতাবে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ মোজেযাটিকে খাঁ মরহুম আজগবী ঘটনা বলিতে সাহস করিয়াছেন। আরও আশ্চর্যজনক এই যে, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফ কিতাবসমূহে এই মোজেযার প্রমাণে সুস্পষ্ট হাদীছ এবং অসংখ্য সীরাত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবী করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়া পিতার পরিচয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের সাক্ষ্য, এমনকি মাতার রেজেস্ট্রীকৃত বিবাহের কাবিন নামাও উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবী উত্থাপন অপেক্ষা অধিক আজগবী ও আশ্চর্যজনক দাবী তাহা নহে কি? বাকপটু চতুর খাঁ মরহুম সরলপ্রাণ পাঠকদেরকে ধোকা দেওয়ার কী অপচেষ্টা করিয়াছেন! তাঁহার বর্ণনার হাবভাবে মনে হয়– আল্লাহর কুদরতে চাঁদ দু'টুকরা হওয়া শুধু সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বাপর মুসলিম সমাজ উক্ত মোজেযায় বিশ্বাস করিয়া নিয়াছে। অথচ বহু সংখ্যক হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ

বিদ্যমান আছে, এমনকি বোখারী শরীফের দুই স্থানে এই মোজেযাটির আলোচনা রহিয়াছে এবং একাধিক সুস্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে– যথাস্থানে আমরা তাহা পেশ করিব। খাঁ মরহুম ঐসব দলীল-প্রমাণ হইতে পাশ কাটিয়া বিভ্রান্তিকর উক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; এতদপেক্ষা ধৃষ্টতা কি হইতে পারে!

পাঠক! আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন কি, খাঁ মরহুম তাঁহার কোন কোন বক্তব্যে এই ধূম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃষ্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগবী গল্প-গুজবের পুস্তকাবলী এবং বীর হনুমানের পুঁথি ও বিভিন্ন পঞ্জিকা শ্রেণীর সীরাত সঙ্কলনসমূহের খণ্ডন করিতে চাহেন। আর ভণ্ড, ভুয়া, কল্পিত আলেম ও পীরদিগকে নাজেহাল করিতে খাঁ মরহুমের এই হাব ভাব এবং এই শ্রেণীর কথা ধোকা ও ফাঁকি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি এই সব বলিয়াছেন মানুষকে ধোকায় ফেলিয়া পানি ঘোলাটে করার জন্য এবং সেই ঘোলা পানিতে বড় বড় রুই-কাতল শিকার করার উদ্দেশে। নতুবা তিনি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা অস্বীকার করিলেন কেন? তাহা ত গল্প-গুজবের ও পুথি-পুস্তকের বর্ণনা নহে, তাহা ত বড় বড় হাদীছ গ্রন্থের এবং বড় বড় সীরাত-সঙ্কলনসমূহের বর্ণনা, তাহা ত অনেক সংখ্যক সহীহ-শুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

দেখুন! বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি পাক-পবিত্র গ্রন্থাবলী কি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃষ্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগবী গল্প-গুজবের বই? ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ)সহ অসংখ্য সীরাত সঙ্কলক ইমামগণ কি ভুয়া কল্পিত শ্রেণীর ইমাম ও আলেম!

হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে বরণীয় ঐসব পাক-পবিত্র মহাগ্রন্থবালীতে বর্ণিত এবং ঐসব পবিত্রাত্মা ইমামগণের প্রামাণিক বর্ণনায় প্রাপ্ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে অস্বীকার কেন করা হইল? ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবীর ধুয়া ত এই ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর; হাদীছ গ্রন্থাবলীর মর্যাদা ও প্রামাণিকতা ইতিহাস অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ ঊর্ধ্বের। এতদ্ভিন্ন তাহা সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনাও ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে।

খাঁ মরহুমের ধৃষ্টতা শুধু এই একটি মোজেযা সম্পর্কেই নহে; শক্কে সদর বা বক্ষ বিদারণ মোজেযা সম্পর্কেও তিনি সেই অপকর্মই করিয়াছেন। বোখারী, মুসলিম ও মেশকাতসহ বহু হাদীছ গ্রন্থে এবং সীরাত শাস্ত্রের সমস্ত প্রামাণিক কিতাবসমূহেই উক্ত মোজেযাটি বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু খাঁ মরহুম হাদীছ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকদের সম্মুখে যুক্তি ও পরীক্ষার ভাঁওতা ধরিয়া মিথ্যার সমাবেশ করত ঐ মোজেযা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মিথ্যা সমাজের নজরে ধরাইয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে, কিন্তু খাঁ মরহুমের এই শ্রেণীর কুকর্ম এতই অধিক যে, ঐ সবের শুধু ফিরিস্তি লিখিতে গেলেও সীরাতও সঙ্কলনের কাজ বাদ দিয়া বসিতে হইবে।

সওর পর্বত গুহার মোজেযা এবং হিজরত সফরের অন্যান্য মোজেযাসমূহকে তিনি একই অপকৌশলে অস্বীকার করিয়াছেন। মে'রাজ শরীফের ন্যায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রখ্যাত মোজেযাকে খাঁ মরহুম স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া স্বাভাবিকতার গণ্ডিভুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য নবীগণের মোজেযাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন– যাহার নমুনা বোখারী চতুর্থ খণ্ডের বিভিন্ন নোটে বর্ণিত আছে।

খাঁ মরহুম মোজেযা অস্বীকার করেন– সরাসরি এই মতবাদ তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই; বরং তাহার বিপরীতই হয় ত লিখিয়া থাকিবেন; নতুবা ধোকার ধূম্রজাল ত পূর্ণ হইবে না এবং সমাজও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু কার্যতঃ তিনি কি করিয়াছেন তাহা দেখা প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী নবীগণের মোজেযায় বর্ণিত আয়াতসমূহের বিকৃতি সাধনে এই মোজেযাসমূহের যেভাবে খণ্ডন তিনি করিয়াছেন তাহা অতীব দুঃখজনক। আর নবী (সঃ)-এর কি কি মোজেযা তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া যাইবে। তাঁহার মোস্তফা চরিতে মোজেযা খণ্ডন করা ছাড়া

মোজেযা বয়ানের কোন পরিচ্ছেদ নাই। খাঁ মরহুমের দৌরাত্ম্য আরও সম্প্রসারিত; এই সম্প্রসারিত দৌরাত্মে তিনি মুসলমানদের এত বড় ক্ষতি করিয়াছেন যাহা কোন অমুসলিমও করিতে সাহস পায় নাই।

মুসলমান জাতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এবং ছাহাবীগণের পরে হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত ইসলাম লাভ করিবে দুইটি মহাবস্তুর মাধ্যমে- একটি পবিত্র কোরআন আর একটি সুন্নাহ বা হাদীছ। মুসলিম সমাজ কোরআনও লিপিবদ্ধাকারে লাভে করিয়াছে। হাদীছও বিভিন্ন গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। প্রচলিত বিশিষ্ট হাদীছ গ্রন্থসমূহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাত্র দুই-আড়াই বা তিন শত বৎসর পরেই সঙ্কলিত হইয়াছে। তখন ইসলামের সোনালী যুগ ছিল, যাহা দীর্ঘ দিন চলিয়াছে। তখন হইতে হাজার হাজার হাদীছ বিশারদ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ চুলচেরা অনুসন্ধানে দুইখানা হাদীছ গ্রন্থকে সহীহ্- বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতায় সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। (১) সহীহ্ বোখারী শরীফ (২) সহীহ্ মুসলিম শরীফ- সহীহ্ বা শুদ্ধ গুণবাচক শব্দ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নামের অংশরূপে হাজার বৎসরের অধিককাল হইতে বিশ্ব মুসলিম কর্তৃক প্রচলিত। মুসলিম সমাজ নির্দ্বিধায় এই গ্রন্থদ্বয় হইতে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেছে।

দীর্ঘ হাজার বৎসরের অধিককাল পর খাঁ মরহুম সবুজ-শ্যামল ঘাসে আচ্ছাদিত গোবর স্তূপতূল্য তাঁহার উপক্রমণিকায় বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত মহান গ্রন্থদ্বয়ও সংশয়মুক্ত নহে; উক্ত গ্রন্থদ্বয়েও অশুদ্ধ, অপ্রকৃত ও ভুল হাদীছ রহিয়াছে।

পাঠক! খাঁ মরহুমের লেখা পড়িলে ভাবিতে পারেন- তিনি ত দলীল-প্রমাণ দিয়াই দেখাইয়াছেন, বোখারী শরীফে ভুল হাদীছ আছে। তাঁহার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণের স্বরূপ এখনই দেখিতে পাইবেন। তবে প্রথমে একটি সরল কথা অনুধাবন করুন। হাফেজে হাদীছ ইবনে-হাজার (রঃ) লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ৬০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার সাধনাময় জীবনের বিরাট অংশ বোখারী শরীফের গবেষণায় ব্যয় করিয়া প্রায় ৭০০০ পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপই হাফেজে হাদীছ আঈনী (রঃ) প্রায় ২০,০০০ পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কাস্তালানী (রঃ) ৫,০০০ পৃষ্ঠা ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কেরমানী (রঃ)-ও ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। হাদীছ শাস্ত্রের গবেষণায় জীবন ব্যয়কারী এই মহামনীষীগণ বোখারী শরীফের উপর সুদীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া তাহার এত বড় বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া গেলেন, অথচ তাঁহারা এই সব ভুল হাদীছ দেখিলেন না, যেগুলি পণ্ডিত খাঁ মরহুম দেখিতে সক্ষম হইলেন! এই সহজ-সরল সত্যের আলোতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রকারান্তরে খাঁ মরহুমের সমালোচনা শুধু ইমাম বোখারী (রঃ)-কেই ঘায়েল করে নাই; ৬০০ বৎসর হইতে প্রচলিত উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের রচনাকারী মহামনীষীগণকেও বোকা বানাইয়াছে।

ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা থাকিতে পারে কি? খাঁ মরহুম মাকড়সার জালের আশ্রয় লইয়া পাহাড়ের সহিত টক্কর দেওয়ার ন্যায় যেসব ছুতা তার আঁচল ধরিয়া বোখারী শরীফের হাদীছকে ভুল সাব্যস্ত করিয়াছেন, ঐসব কোনটাই তাঁহার আবিষ্কার নহে। মুসলিম জাতির ঈমানী বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্বল করার সম্ভাব্য চেষ্টারূপে যেসব ছল-ছুতার জন্ম দেওয়া যাইতে পারে, উম্মতের হিতৈষীগণ পূর্ব আমলেই সেই সবের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফের গবেষণাকারীগণ নিজ নিজ রচনায় ঐ সবের ধূম্রজাল ছিন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত খাঁ মরহুম কোথাও বিষজনিত ঐসব ছল-ছুতার খোঁজ পাইয়াছেন; কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার দৌড় তাঁহাকে বোখারী শরীফের উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। ফলে তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিষেধক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছেন এবং বাংলাভাষী ভাইদের জন্য ঐ বিষ আমদানী করিয়াছেন। বাংলাভাষী পাঠক ভাইগণ হাদীছ শাস্ত্রের কী জ্ঞান রাখেন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে প্রতিষেধক খোঁজ করিয়া বাহির করিবেন। আরও পরিতাপের বিষয়- ভাষা সম্রাট বাকপটু পণ্ডিত খাঁ মরহুম

নিজ প্রতিভা দ্বারা উক্ত বিষকে এমন সুন্দর সাজে সাজাইয়াছেন, হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠক তাহা গলধঃ করিবেই। সুতরাং খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপকর্ম দ্বারা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন; তাহাদের জন্য শুধু বিষের দোকান সাজাইয়া গিয়াছেন।

নবীগণের মো'জেযা অস্বীকারের ন্যায় খাঁ মরহুম আরও অনেক সত্যকে অস্বীকার করিতেন। যথা- জিন জাতির অস্তিত্ব, ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য; ঈসা আলাইহিস সালামের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। বোখারী, মুসলিম শরীফ এবং হাদীছ ভাণ্ডারের অনেক হাদীছ ঐ সত্য অস্বীকার করার অন্তরায় হয়; সে বাধা অপসারণে খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থাবলীকে ঘায়েল করার এই অপচেষ্টা করিয়াছেন। এতভিন্ন খাঁ মরহুমের তফসীর নামে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং "মোস্তফা চরিত" পাঠ করিলে মনে হয় যেন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থসমূহের হাদীছ অস্বীকার ও ভুল সাব্যস্ত করিয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইবার স্বাদ অনুভব করিতেন। যেমন— কেহ পিতাকে খুন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করার আনন্দ উপভোগ করে।

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ঐরূপ কোন কোন হাদীছ অস্বীকার এবং তাহা খণ্ডনের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে শুধু ঐ হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা হইবে যাহা তিনি মোস্তফা চরিতের উপক্রমণিকায় তাঁহার কথিত হাদীছ "পরীক্ষার নূতন ধারা" পরিচ্ছেদে ভুল হাদীছের নমুনারূপে পেশ করিয়া বলিয়াছেন- "সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছগুলি নির্দোষ, প্রকৃত এবং সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না।" বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ সম্পর্কে এই দাবী যে, সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না; তাহাও নেহাত তুচ্ছ হেতুর অজুহাতে- ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে।

খাঁ মরহুমের ভাষায় "প্রথম প্রমাণ" অর্থাৎ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে যে ভুল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা "আনাছ (রাঃ) বলিতেছেন, يايها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى 'হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর ঊর্ধ্বে চড়াইও না।" এই আয়াতটি নাযিল হইলে সাবেত বিন কায়স ছাহাবীর খুব ভয় হইল; তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। তাই তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন না, বাড়ীতে থাকেন। কয়েক দিন ঐভাবে অতীত হইলে হযরত (সঃ) সা'দ-বিন-মোআয নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবেতকে দেখি না কেন, তাহার কি অসুখ হইয়াছে? সা'দ বিন মোআয সাবেতের বাড়ীতে গমন করিলেন ও সাবেতকে হযরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। সাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের নরকী হওয়ার আশঙ্কা জানাইলেন। সা'দ বিন মোআয সাবেতের আশঙ্কা প্রকাশ নবীজী (সঃ)-কে জ্ঞাত করিলেন । তিনি বলিলেন, বরং সে বেহেশতী।

খাঁ মরহুমের বক্তব্য, এই হাদীছটি সত্য হইতে পারে না- কারণ, ঘটনায় উল্লিখিত আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়, আর সা'দ বিন মো'আযের মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে।

পাঠক! হাদীছখানাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটি ভিত্তি হইল, হাদীছটির আলোচ্য আয়াত নবম হিজরী সনে নাযিল হইয়াছে- এই বিষয়টি বিতর্কমূলক। প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীছ ইবনে হাজার (রঃ) ভিন্ন মতের অবকাশ দেখাইয়াছেন।

খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ের যে হাদীছের বরাত দিয়াছেন, বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায়ই হাফেয ইবনে হাজারের অবকাশ প্রকাশের সমর্থন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিতর্কমূলক একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছকে অবাস্তব-অসত্য বলা ক্ষমাহীন অপরাধ নহে কি? আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল যে, ৬০০ শত বৎসর পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে প্রশ্নের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রশ্নের মৃত লাশ বাহির করিয়া হাদীছ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতাহীন বাংলাভাষী পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে- ইহা অপরাধ নহে কি?

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে ধারায় প্রশ্নের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা হাদীছ ও তফসীরের শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আমরা অন্য একটি সরল-সহজ পয়েন্ট পেশ করিতেছি– তাহাও পূর্ব আমলের গবেষকগণই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফের দুই স্থানে ৫১০ ও ৭১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে একই সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে। মুসলিম শরীফে হাদীছখানা একই জায়গায় পর পর ৬টি সনদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব হাদীছখানার মোট সাক্ষ্য সূত্র বা সনদ হইল পাঁচটি। পাঠক! ইহা একটি মহাসত্য যে, হাদীছকে তাহার আসল জায়গায় সরাসরিভাবে গবেষণা না করিয়া শুধু ধার করা জ্ঞানে তথা উদ্ধৃতি বা অনুবাদ দেখিয়া কোন হাদীছ সম্পর্কে মুখ খোলা মহাপাপ। এই মহাপাপের পরিণাম এখানে লক্ষ্য করুন। মরহুম খাঁ সাহেব একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও স্বভাব-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বোখারী শরীফ মূল গ্রন্থ হইতে দূরে থাকিয়া শুধু উদ্ধৃতি দেখার ধার করা জ্ঞানে দূর হইতেই ঢিল ছুঁড়িয়াছেন। নতুবা তিনি উল্লিখিত হাদীছের সমালোচনা করিতে বোখারী শরীফের নাম মুখে বা লিখনীতে আনিতেন না। কারণ, তাঁহার সমালোচনার দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল হাদীছটির বর্ণনায় সা'দ বিন মোআযের উল্লেখ; যেহেতু তাঁহার মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে। পাঠক! শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, বোখারী শরীফের দুই স্থানে হাদীছখানা বর্ণিত, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই সা'দ বিন মোয়াযের নাম নাই। বরং আছে فقال رجل انا اعلم অর্থাৎ নবীজী (সঃ) সাবেত বিন কায়সের আলোচনা করিলে এক ব্যক্তি বলিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাঁহার সংবাদ জানিয়া আসিব।"

পাঠক! লক্ষ্য করুন– সমালোচনার ভিত্তিটাই যখন বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান নাই, তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, "বোখারী ও মুসলিমে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে"– ইহা কতটুকু ঈমানদারী তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর আসুন! মুসলিম শরীফে হাদীছখানার অবস্থা দেখুন! পূর্বেই বলা হইয়াছে– শুধু উদ্ধৃতি দেখার ন্যায় ধার করা জ্ঞানে হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা নিতান্তই অবান্তর। খাঁ মরহুমের সমালোচিত হাদীছখানা মুসলিম শরীফে চারিটি সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে উল্লেখ হইয়াছে ঐ সাক্ষীর বর্ণনা যাহার বর্ণনায় খাঁ মরহুমের সমালোচনার ভিত্তি বস্তু তথা "সা'দ বিন মোআয" নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক আশ্চর্যান্বিত হইবেন, মুসলিম (রঃ) বিভ্রান্তি হইতে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহা হইতে খাঁ মরহুম নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া এবং পাঠককে অজ্ঞ রাখিয়া সেই বিভ্রান্তিতে নিজেও পতিত হইয়াছেন এবং অপরকেও পতিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কেলেঙ্কারির একমাত্র কারণ হইল মুসলিম শরীফ মূলগ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা।

দেখুন! মুসলিম শরীফে বিভ্রান্তি অবসানের কী সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটি সাক্ষীসূত্রে ঐ সমালোচনার বস্তু সম্বলিত বিবরণ উল্লেখের সাথে সাথেই ঐ হাদীছটির অপর তিনটি সাক্ষ্যসূত্র বর্ণিত রহিয়াছে। এই সাক্ষীগণের বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে–

ليس فى حديثه ذكر سعدبن معاذ - لم يذكر سعدبن معاذ

"এই সাক্ষীর বর্ণনায় সা'দ-বিন-মোআযের উল্লেখ নাই। এই সাক্ষ্য সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখ করেন নাই।" ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় প্রতীয়মান হইল যে, মূল হাদীছটির তথ্য অসত্য বা অপ্রকৃত বলা যাইতে পারে না। কারণ শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনায় একটি নাম উল্লেখের বিভ্রাট থাকিলেও অপর তিন জন সাক্ষীর বর্ণনায় ঐ বিভ্রাটমুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাঠক! একটি ঘটনা সাব্যস্ত করিতে বাদী যদি পাঁচটি সাক্ষী পেশ করে– সে ক্ষেত্রে বিবাদী একটি সাক্ষীর বর্ণনায় দোষ দেখাইতে পারিলে ঘটনাটি মিথ্যা হইয়া যাইবে? ইমাম মুসলিম বিভ্রাট খণ্ডনের জন্য প্রথমে বিভ্রাটযুক্ত সাক্ষ্যসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভ্রাটমুক্ত তিনটি সাক্ষ্য সূত্র উল্লেখ করিয়া

প্রথমটির দোষ নির্ণয় এবং তাহার খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার দোষ হইল?

মুসলিম শরীফের চারি সাক্ষ্যসূত্র এবং বোখারী শরীফের এক সাক্ষ্য সূত্র- এই পাঁচটি সাক্ষ্যসূত্রের একটি সাক্ষ্যসূত্র বিতর্কমূলক; চারিটি সাক্ষ্য সূত্র সম্পূর্ণ নির্মল নির্দোষ, এমতাবস্থায় আইনে বা বিচারে কি উক্ত ঘটনা মিথ্যা বলার অবকাশ আছে?

অতপর সুধী মহল সম্মুখে আরও একটি তথ্য বিতর্কের জন্য নহে, বিচারের জন্য পেশ করিতেছি। একটি সাক্ষীর বর্ণনায় যে সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখের বিভ্রাট রহিয়াছে তাহাও অতি নগণ্য। ছাহাবীগণের নাম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন সা'দ বিন মোআজ, আর একজন ছিলেন আদ বিন মোআয, আর একজন ছিলেন সা'দ বিন ওবাদা।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সা'দ বিন ওবাদা, যাঁহার মৃত্যু নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক পরে। সুতরাং তাঁহার নামের বেলায় কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন- ছাহাবীদের যুগে নহে; ইহারও পরে তথা ঘটনার অনেক বৎসর পরে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানবান অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সা'দ নামও ঠিক বলিয়াছিলেন, শুধু কেবল বিন ওবাদা স্থলে বিন মোআয বলিয়া পিতার নাম ব্যতিক্রম বলিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উক্ত সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তিন জন সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যতিক্রমটা ধরাইয়াও দিয়াছেন। এখন শুধু ঐ ব্যতিক্রম পুঁজি করিয়া অন্য সব রকম দোষমুক্ত একটি সুদীর্ঘ হাদীছের সর্বময় বিবরণকে অপ্রকৃত ও অসত্য বলা এবং ইমাম মুসলিম কর্তৃক ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দেওয়ার কথা গোপন করিয়া বোখারী মুসলিমে অসত্য হাদীছ আছে বলা কত দূর ঈমানদারী তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

খাঁ মরহুম তাঁহার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের জন্য পথ পরিষ্কারের উদ্দেশে খেয়াল-খুশীমত হাদীছ এন্‌কার-অস্বীকার করার জন্য "পরীক্ষার নূতন ধারা" নামে একট ফাঁদ তৈয়ার করিয়াছেন। মাকড়সার জালে তৈয়ারী সেই ফাঁদে তিনি বোখারী শরীফ মুসলিম শরীফের ন্যায় শক্তিশালী গ্রন্থাবলীর হাদীছ আটকাইতে যাইয়া দশটি নমুনা প্রমাণরূপে পেশ করিয়াছেন।

তাঁহার সবগুলি প্রলাপের উত্তর দিতে গেলে অহেতুক সময় অপচয়ের যাতনা পোহাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাদীছ শাস্ত্র এবং বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠকদের চোখে তাঁহার প্রলাপগুলি পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার প্রলেপে সুন্দর দেখাইবে বটে, কিন্তু যেকোন খাঁটি আলেমের নিকট হইতে ঐ সব প্রলাপের সুষ্ঠু সুরাহা প্রত্যেকই লাভ করিতে পারেন। যেমন- নবী (সঃ)-এর বয়সের সংখ্যার তিনটি হাদীছের কোন দুইটি অসত্যই মনে হইবে। কিন্তু তাহার খণ্ডন অতি সহজ। নবীজী (সঃ)-এর বয়স আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইব।

হাদীছ মোটেই না বুঝিয়া, এমনকি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মূলগ্রন্থ তলাইয়া দেখার যোগ্যতার অভাবে অজ্ঞ থাকায় যেসব প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখিলে ত গাত্রদাহ এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে। যথা-

বোখারী শরীফের একটি হাদীছ প্রথম খন্ডে ৪ নম্বরে অনূদিত- তাহাতে সূরা কেয়ামার একটি আয়াতের শানে নযুল বর্ণিত আছে। ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম যুগে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল, জিব্রীল ফেরেশতা ওহী পঠনকালে নবীজী (সঃ) তাহা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়া পড়িতে থাকিতেন। নবীজী (সঃ)-কে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে এই আয়াত নাযিল হইল لا تحرك به لسانك

لتعجل به "তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ করার জন্য মুখ নাড়িয়া এই ওহী (সদ্য অবতারিত কোরআনের আয়াত)সমূহকে আপনার পড়িতে হইবে না; আমার দায়িত্বে থাকিল আপনাকে তাহা কণ্ঠস্থ করানো এবং পঠনের শক্তি দেওয়া।"

হাদীছে আছে, উক্ত বিবরণটি বর্ণনা করিতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় শার্গেদকে বলিয়াছেন, আমি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেভাবে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি সেইভাবে আমিও তোমাকে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব।

খাঁ মরহুম বুঝিয়াছেন– এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যে নবীজী (সঃ) ওহী সংরক্ষণে ঠোঁট নাড়িতেন অর্থাৎ যেই ঠোঁট নাড়া উপলক্ষ করিয়া তাহা বন্ধ করার জন্য উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) যেই ঠোঁট নাড়াই দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন। এই বুঝের বশেই খাঁ মরহুম লাফাইয়া পড়িয়াছেন উক্ত হাদীছকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে এবং বলিয়াছেন যে, "সূরা কেয়ামা (উক্ত সূরার উল্লিখিত আয়াত) যখন নাযিল হইয়াছিল তখন ইবনে আব্বাসের জন্মই হয় নাই। অতএব উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কোরআন নাযিল হওয়ার সময় হযরতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সনদের হিসাবে হাদীছ সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।"

নিজের আন্দাজ না করিয়া বড় কথা বলার পরিণামে এইভাবে মানুষ বিড়ালের মূত্রে আছাড় খায়। খাঁ মরহুম এস্থলে নিজেই ভুল বুঝিয়াছেন এবং সেই ভুল বুঝের পরিণামে বোখারী শরীফের হাদীছকে অসত্য বলার অভিশাপে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীছের সঠিক তাৎপর্যে সংশয়ের অবকাশ নাই। হাদীছটির তাৎপর্য এই–

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের প্রাক্কালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিণত বয়সের নিকটবর্তী ছিলেন মাত্র; তবুও পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে তিনি এতই পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) পর্যন্ত কোরআনের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়া থাকিতেন (১৭১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। ইবনে আব্বাসের এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম সূত্র ছিল এই যে, তিনি নবীজী (সঃ) হইতে কোরআনের আয়াতসমূহের জ্ঞান আহরণে সদা সর্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সেই তৎপরতা ধারায় কোন একদিন সূরা কেয়ামার আলোচ্য আয়াতটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বুঝিতে চাহিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে উক্ত আয়াতের মর্ম ব্যাখ্যা করিতে আদ্যপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বুঝাইলেন। তখন আয়াতটির শানে নযুল বা মূল উদ্দেশ্য– জিব্রাঈলের সঙ্গে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখ নাড়িয়া পঠনের বিষয়টিও উল্লেখ করিলেন। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যে মুখ নাড়িয়া জিব্রাঈলের সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, তাহার দৃশ্যও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দেখাইয়াছিলেন। সেই দেখানো প্রসঙ্গে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। পরবর্তীকালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় শার্গেদকে বলিয়াছেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে তাঁহার ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য দেখাইবার সময় আমি তাঁহাকে যেইরূপে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি, তোমাকেও আমি ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব। এই বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ শার্গেদক ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইলেন। এমনকি পরম্পরা প্রত্যেক ওস্তাদ নিজ নিজ শার্গেদকে এই হাদীছ পড়াইতে ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইয়াছেন। সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর যাবত এই হাদীছ শিক্ষাদানে ঐ ঠোঁট নাড়িবার নীতি বজায় রহিয়াছে। আমাদের ওস্তাদ আমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছেন; আমরা আমাদের শার্গেদগণকে তাহা দেখাইয়া থাকি। এইভাবে এই হাদীছটির মধ্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মোবারক স্মৃতি চৌদ্দ শত বৎসর হইতে চলমান রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই হাদীছখানাকে "মোসালসাল বি-তাহ্‌রীকিশ শাফাতাইন" অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে ঠোঁট নাড়িবার স্মৃতি বহনকারী হাদীছ বলা হয়।

হাদীছটির এই ব্যাখ্য নূতন আবিষ্কার বা খাঁ মরহুমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নহে। ছয় শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির প্রমাণ দ্বারা এই ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

অপবাদের আশ্রয়

খাঁ মরহুমের রচনাবলীতে বহু সত্যের অস্বীকৃতি রহিয়াছে। সত্যের শক্তি এত প্রবল যে, একটি সত্য অস্বীকার করিতে অনেক রকমের মিথ্যা জোটাইতে হয়। খাঁ মরহুমের দশা তাহাই হইয়াছে। সত্য শুদ্ধ সহীহ হাদীছ অস্বীকার করার অভিনব ফাঁদ– তিনি নাম রাখিয়াছেন "পরীক্ষার নূতন ধারা"। সত্য অস্বীকারের এই ফাঁদের ভিত্তিরূপে একটি মহা মিথ্যা জোটাইয়া আনিতে হইয়াছে তাঁহাকে। তিনি পূর্বতন মোহাদ্দেসবৃন্দের প্রতি ভিত্তিহীন অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা হাদীছকে সহীহ-শুদ্ধ সাব্যস্ত করিতে শুধু সনদের যাচাই করিতেন; হাদীছের আভ্যন্তরীণ দার্শনিক দিক যাচাই করিতেন না।

খাঁ মরহুম নিজেই এক পরিচ্ছেদে " দেরায়াত"-এর আলোচনা করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন– আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং পূর্বতন বহু মোহাদ্দেসগণের এই পন্থার যাচাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। দেখুন! তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন, মোহাদ্দেসগণ হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাইও করিতেন। এই স্বীকৃতির সম্মুখে পূর্বোল্লিখিত মিথ্যা অপবাদ টিকাইয়া রাখিতে চতুর খাঁ মরহুম স্বীকৃতির মধ্যে ফাঁক রাখিয়াছেন– হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাই না করার দোষটা ছাহাবীদের পরে জমাট বাঁধা অন্ধকারময় মধ্যযুগীয় মোহাদ্দেসগণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে।

খাঁ মরহুমের কথা মানিয়া প্রশ্ন করিব, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম– তাহারা ত ১২০০ বৎসরের অধিক পূর্বের– ছাহাবীদের যুগের দেড় শত বৎসর ব্যবধানের মোহাদ্দেস। তাঁহাদের যাচাই-বাছাই করা হাদীছে আপনি বাড়াবাড়ি কেন করিলেন?

খাঁ মরহুমের যুক্তি ইহাও যে, পূর্বতন মোহাদ্দেসগণ হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাই করিয়াছেন– তাহা দেখিয়া আমিও করিলাম। এই সীমাহীন ধৃষ্টতা খণ্ডনেও অনীহা সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এই বলা যায়, পাঁচ-দশ লাখ হাদীছ কণ্ঠস্থকারী, হাদীছ গবেষণায় আজীবন সাধনাকারী মনীষীগণের ভূমিকায় আপনার অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম তাই, যেই পরিণাম বাঁদরের হইয়াছিল অভিজ্ঞ সূতার মিস্ত্রীর অনুকরণে অবতীর্ণ হইয়া।

খাঁ মরহুম তাঁহার উপক্রমণিকায় নীতি নির্ধারণরূপে অনেকগুলি কথাই 'নিয়ম' নামে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। কথাগুলি সুন্দর-সঠিক মনে হইবে, কিন্তু তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মণ ওজনের বস্তুকে ছটাকের পাত্রে রাখিতেন। যথা– "প্রথম নিয়ম কোরআনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাসে বা চরিত পুস্তকে– এমনকি হাদীছের রেওয়ায়াতেও যদি তাহার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয় তবে কোরআনের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য-অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্ধারণ করিব।" তাঁহার এই নিয়মের কথাটা খুবই সুন্দর ও সঠিক, কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, বিপরীত হওয়াটা সাব্যস্ত করিবে কে এবং কিরূপ লোকে? খাঁ মরহুমের ন্যায় ভ্রান্ত মতবাদ ও মনোবিকারগ্রস্ত স্বল্প এলেমধারী লোককেও কোরআনের বিপরীত বিষয় সাব্যস্ত করার সুযোগ দেওয়া হইলে কোন নবীর কোন মোজেযা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৫৩৭৪ খানা হাদীছ কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এই সত্যের একটি নমুনা লক্ষ্য করুন–

খাঁ মরহুম আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষেপা; ইহার কারণ জানা নাই। তাঁহাকে ঘায়েল করিবার জন্য খাঁ মরহুম অযথা তাঁহার হাদীছকে কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত করিতেন। যথা– আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ মুসলিম শরীফে আছে। তাহার বিষয় হইল– নবী (সঃ)-এর বয়ান যে, যমীন-আসমান এবং তাহার মধ্যস্থ পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিয়াছেন শনিবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবার। খাঁ মরহুম এই হাদীছকে কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত করিয়া আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীকে গাল-মন্দ করিতেন। খাঁ

মিয়া বলেন, উক্ত হাদীছ মতে সৃষ্টির দিনগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭। অথচ পবিত্র কোরআনে ২১ পারা সূরা সেজদার ৪র্থ আয়াতে সৃষ্টির দিনের সংখ্যা সুস্পষ্টরূপে ৬ বলা হইয়াছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি মনোবিকারগ্রস্ত খাঁ মিয়া তলাইয়া দেখেন নাই যে, উক্ত আয়াতে আসমান-যমীন ও মধ্যবর্তী বস্তু সৃষ্টির দিনগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে, আদম সৃষ্টির কথা তাহাতে নাই, ফলে দিনের সংখ্যা তথায় ৬ হয়। পক্ষান্তরে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিতে আদম সৃষ্টির একটি দিনও উল্লেখ হইয়াছে, তাই দিনের সংখ্যা ৭ হইয়াছে।

ইহা ত হাদীছ অগ্রাহ্য করার নমুনা। নবীর সীরাত শাস্ত্রের বিবরণ অগ্রাহ্য করার কাহিনী অধিক মর্মান্তিক এবং ইসলামের উপর বাঙ্গালী পণ্ডিতদের এইরূপ অত্যাচার একা আকরম খাঁ মরহুমের নহে, আরও অনেক আছেন। মরা লোকের গ্লানি করার ইচ্ছা হয় না, তবুও প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ মরহুমের কথা বলিতে হয়। তাঁহার মতবাদ ছিল যে, পরকালের মুক্তির জন্য ইসলাম সরল পথ বটে, একমাত্র পথ নহে; অথচ এইরূপ বিশ্বাসে ঈমান নষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় খাঁ মরহুমের মৃত্যুমুখে হাসপাতালের জীবনে তাঁহার প্রবন্ধ পত্রিকায় আসিল। তিনি "মোহরে নবুয়ত" অস্বীকার করেন এই দলীলে যে, তাহা থাকিলে নবীজীর জননী বা দাই-মা তাহা অবশ্যই দেখিতেন এবং বয়ান করিতেন; তাঁহাদের হইতে ঐরূপ বর্ণনা নাই। বোখারী শরীফসহ হাদীছের ও সীরাতের কিতাবে প্রমাণিত বস্তুটি তিনি ঐ দলীল দ্বারা মুছিয়া দিলেন। কি দুঃখজনক দলীল! প্রথমতঃ মোহরে নবুয়ত নবীজীর জন্মের অনেক পর বা নবুয়ত প্রাপ্তি লগ্নে প্রকাশ হওয়ার মতামতই প্রবল। জন্ম হইতে থাকিলেও অতি ছোট ছিল, কেহ তাহার গুরুত্ব দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জননী বা দাই-মাতা হইতে হযরত সম্পর্কে এক-দুইটা কথা ছাড়া কিছুই বর্ণিত নাই। সুতরাং হযরতের কি কিছুই ছিল না! হাদীছে আছে, নবী (সঃ) অতি সুশ্রী সুন্দর ছিলেন। এই খাঁ মিয়ার দলীলে বলা যায় যে, তাহা ঠিক নহে; নতুবা জননী বা দাই-মা তাহা বয়ান করিতেন। এই দলীলে ত নবীজীর শত শত প্রমাণিত গুণ মুছিয়া ফেলা যাইবে।

এই হইল বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের হাল। তাঁহারা পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের বলে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, যেহেতু তাহার অভিজ্ঞতা নাই। একমাত্র ইসলাম ও কোরআন-হাদীছই এমন লা-ওয়ারিস বস্তু যাহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছাড়া কথা বলা দোষ নহে। বাংলাভাষী জনসাধারণ ভাইদের ঈমান আল্লাহ তাআলাই হেফাযত করুন! আমীন।

———আজিজুল হক

আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। এই দ্বীন-ইসলাম সর্ব্বশেষ দ্বীন; কেয়ামত পর্য্যন্ত এই দ্বীনের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। আল্লাহ তায়ালার অনুমোদিত ও পছন্দিত দ্বীনরূপে এই দ্বীনই প্রবর্ত্তিত থাকিবে—ইহা পবিত্র কোরআনেরই ঘোষণা (৬ পাঃ ৫ রুঃ দ্রষ্টব্য)।

দ্বীন-ইসলাম দুইটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল, আল্লার কেতাব—পবিত্র কোরআন, আর রসুলের ছুন্নত—হাদীছ। সুতরাং দ্বীন-ইসলামের স্থায়িত্ব ও অপরিবর্ত্তিত থাকা নির্ভর করে কোরআন ও হাদীছের স্থায়িত্ব ও অপরিবর্ত্তিত থাকার উপর। পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম, উহার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালাই করিয়া দিয়াছেন; সারা পৃথিবীজোড়া অসংখ্য অগণিত গ্রন্থাকারে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করার সাথে সাথে যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠেও উহাকে স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহার কোন একটি অক্ষরকেও বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত করা সম্ভবই নহে। আর কোরআন আল্লার কালাম; আল্লার অস্তিত্বে এবং গুণাবলীতে কোন পরিবর্ত্তনের অবকাশ নাই; আল্লার কালাম আল্লার গুণাবলীরই একটি, উহাতেও পরিবর্ত্তনের কোন অবকাশ নাই। এই অকাট্য সত্য ছাড়াও পবিত্র কোরআনের দীর্ঘ চৌদ্দ শত বৎসরের জাগতিক জীবনও চাক্ষুষরূপে প্রমাণিত করে যে, পবিত্র কোরআনে কোন পরিবর্ত্তন আদৌ সম্ভব নহে।

দ্বীন-ইসলামের স্থায়িত্বের অপর স্তম্ভ রসুলের হাদীছ সুসংরক্ষণের ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা করিয়া দিয়াছেন। রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় হইতেই ব্যাপক হারে মোসলমানগণ তাঁহার হাদীছ কণ্ঠস্থ করিতে থাকেন; লিপিবদ্ধাকারেও রক্ষিত হইতে থাকে। তাঁহার পরে সময়ের গতি অপেক্ষা দ্রুতবেগে হাদীছ কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত হইতে থাকে। এমনকি রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পর শতাব্দি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধাকারে হাদীছ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দ্রুত অগ্রসর হয়। যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে হাদীছ সংরক্ষণ আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে। এই অভিযানে হাদীছ সমূহ মোহাদ্দেছগণের কণ্ঠস্থেই নয় শুধু, বরং লিখিত সংরক্ষণেরও আয়ত্তে আসিয়া যায়।

অতঃপর ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার শত্রুদের ময়দানও বিশালরূপে সম্প্রসারিত হয়। প্রকাশ্য ও মোনাফেক শত্রুরা শক্তি ও অস্ত্রবলে ইসলামের গতি রোধ করায় ব্যর্থ হইয়া ইসলামকে বিকৃত করায় সচেষ্ট হয়। সেই পরিকল্পনায় জাল হাদীছ গড়াইবার পন্থাও তাহারা অবলম্বন করে। এমনকি একশত বৎসরের ব্যবধানে জাল বা কৃত্রিম হাদীছ এড়াইবার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেমতে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের সর্বসম্মত কষ্টি-পাথর—সাক্ষী-পরম্পরা তথা ছনদ দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গ্রহণীয় সাব্যস্ত হয় শুধু এইরূপ হাদীছ সঙ্কলনে মোহাদ্দেছগণ বিশেষ তৎপর হন। এই অভিযানে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ-শিরে বিজয়ের মর্য্যাদা লাভ করেন ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে।

যেই সাধনা ইমাম বোখারী (রঃ) এই গ্রন্থ সঙ্কলনে করিয়াছেন উহা ছিল অতি কঠিন ও দীর্ঘ। কারণ, হাদীছ গৃহিত হওয়া নির্ভর করে সাক্ষীর উপর। সাক্ষী নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বিচার বিভাগীয় আইনে যে সব শর্ত্ত রহিয়াছে, হাদীছের সাক্ষীর নির্ভরতার জন্য উহা ছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে আরও অনেক শর্ত্ত রহিয়াছে। উভয় শ্রেণী শর্ত্তের উচ্চমান সম্বলিত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছকে "ছহীহ্ হাদীছ" বলা হয়। ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থকে সর্ব্বোচ্চমানে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে হাদীছের সাক্ষী তথা রাবীদের মধ্যে আইনগত ও শাস্ত্রগত শর্ত্তাবলীর সহিত অধিক নির্ভরযোগ্যতার জন্য আরও কিছু বিশেষ সূক্ষ্ম শর্ত্ত সংযোগ করেন। যাহার কারণে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের এই গ্রন্থ হাদীছ-গ্রন্থাবলীর সর্ব্বোচ্চের আসন অধিকার করিতে সর্ব্বসম্মত রায় লাভে সমর্থ হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় সঙ্কল্পের বাস্তবায়নে এই ত্রিবিধ শর্ত্তাবলী সম্বলিত সাক্ষীযুক্ত হাদীছ চয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টা যে কত কঠিন এবং কত সাধনা ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই অনুভব করা যায়।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের কণ্ঠস্থ ৬,০০০০০ সাক্ষী-পরম্পরা তথা ছনদ মাধ্যমে বহু সংখ্যক মূল হাদীছ ছিল। প্রতিটি ছনদে ছাহাবী পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ৩, ৪, ৫ জন মাধ্যম ছিল; দুই জনের মাধ্যম অতি বিরল। এক একটি ছনদ পরীক্ষার জন্য উহার মাধ্যম সমূহের প্রতিটি লোকের জীবন-ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা আবশ্যক। এইরূপে ৬,০০০০০ ছনদকে ত্রিবিধ শর্ত্তাবলীর কষ্টিতে যাচাই করিয়া প্রায় ১৬০০ শত মাধ্যম বা রাবীর ছনদ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইহা ছিল ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্যের বাহ্যিক দৃষ্টির দুর্গম পথ।

তিনি শুধু ইহা বিজয়ের উপরই ক্ষান্ত হন নাই, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অনেক করিয়াছেন। বাহ্যিকরূপে পরীক্ষিত এক একটি ছনদকে গ্রহণ করার জন্য উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এস্তেখারাহ্ করিয়াছেন। "এস্তেখারাহ্" অর্থ উত্তমটি নির্দ্ধারণে আল্লাহ তায়ালার সরাসরি সাহায্য প্রার্থনা। এই এস্তেখারায় গৃহিত হওয়ার যোগ্য প্রতিপন্ন হইলে পর ইমাম বোখারী (রঃ) গোছল করতঃ দুই রাকাত নামায পড়িয়া উক্ত ছনদের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল হাদীছকে স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় বাছাইকৃত ৪০০০ ছনদের মাধ্যমে ২৬০২ বা ২৫১৩ খানা মূল হাদীছ অত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ছয় লক্ষ ছনদের প্রতিটি মাধ্যম তথা রাবীকে ত্রিবিধ শর্ত্তে যাচাইয়ের দুর্গম ও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাবলী সম্পন্ন পূর্ব্বক এই মহাগ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের অমূল্য জীবনের ১৬টি বৎসর তথা প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) দিন ব্যয় হইয়াছিল। এত বড় জটিল ও কঠিন এবং সুদীর্ঘ কাজকে ১৬ বৎসরে সমাপ্ত করিতেও মহাত্মা ইমাম বোখারী (রঃ)কে কিরূপ অসাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছিল তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ ও অসাধারণ সাধনার ফলই হইল মহাগ্রন্থ—"ছহীহ্ বোখারী শরীফ"।

বিগত ১৩৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৪ ইংরাজী সনের পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে ছের-তাজ রুহানী পিতা মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহের অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহারই সক্রীয় সাহায্যকে সম্বল করিয়া শায়খুল-ইসলাম হযরত মাওলানা শব্বীর আহমদ (রঃ) এবং হযরত মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)—এই দুই মহামনীষীর ফয়েজ ও বরকতের ছায়া-তলে এই নরাধম মহাগ্রন্থ ছহীহ বোখারী শরীফ অনুবাদের কঠিন ও সুদীর্ঘ কার্য্যে আত্মনিয়োগের সূচনা করে। রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার অপার কৃপায় ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৯৭১ ইংরাজী সনের প্রথম ভাগে সেই অনুবাদ সর্বমোট সাত খণ্ডে সমাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এস্থলেও পূর্ণ বৎসরের সংখ্যা ষোলই দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কৃপাবলেই যেন ষোল সংখ্যার সামঞ্জস্যের দ্বারা এই অধমকে তাঁহার এক অতি মহাসাধক বান্দার সহিত জড়াইয়া দিয়াছেন। কেয়ামতের দিনও যদি সেই মহাসাধক ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের অসাধারণ মান-মর্য্যাদা ও মর্ত্তবার অণু-কণার সহিত এই অধমকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করুণাবলে জড়াইয়া দেন তবে অধমের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে কি?

وما ذلك على الله بعزيز

"আল্লাহ তায়ালার পক্ষে ইহা মোটেই অসাধ্য ও কঠিন নহে।"

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা বোখারী শরীফের ইহা সর্ব্বশেষ খণ্ড। এই খণ্ডের সমাপ্তিতে একটি সুদীর্ঘ পরিশিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত পরিশিষ্টটি মূল বোখারী শরীফের অনুবাদ নহে। অবশ্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছের বিবরণকে ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক রূপদানে পরিশিষ্টটি অনুবাদক কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে।

মুল বোখারী শরীফেরই বক্তব্য ও হাদীছের সহিত বিষয়বস্তুটির সম্পর্ক থাকায় সমাজের উপকারার্থে মুল গ্রন্থ হইতে ভিন্ন পরিশিষ্ট আকারে বোখারী শরীফের সঙ্গে উহাকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

আজিজুল হক

জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা।

জ্ঞাতব্য ও সতর্কবাণী

মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফের অনুবাদ তথা বাংলা বোখারী শরীফের পঞ্চম খন্ড সীরাতুন নবী সঙ্কলনরূপে প্রকাশ করা হইল। মূল বোখারী শরীফে এই শিরোনামার কোন অধ্যায় নাই, এমনকি "নবী কাহিনী" যে অধ্যায় আছে তাহার অংশরূপেও নহে। তবে এই সঙ্কলনের এক মৌলিক পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে রহিয়াছে। যথা– ৫০০ হইতে ৫১৩, ৫৪৩ হইতে ৫৬১ এবং ৬২৬ হইতে ৬৪১ পর্যন্ত পৃষ্ঠাসমূহে তাহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে বোখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে।

নবী কাহিনী অধ্যায়ের অনুবাদ চতুর্থ খণ্ড লেখার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলোচনার প্রতি মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মূল গ্রন্থের উল্লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ তাহাতে অধিক উৎসাহ যোগাইল। কারণ, ঐ পৃষ্ঠাগুলির বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদসমূহ অনুবাদ করিলে উল্লিখিত প্রিয় আলোচনার বিরাট অংশ তাহাতে আসে। তাই অন্তরে আবেগ জন্মিল ক্রমিকবিহীন পৃষ্ঠাগুলি হইতে প্রিয় আলোচনার পরিচ্ছেদসমূহ ভিন্ন করিয়া একত্রে বিন্যস্তরূপে অনুবাদ করার।

এর সঙ্গে আর একটি দুঃসাহসের প্রতিও মন আকৃষ্ট হইল যে, নবীজী (সঃ)-এর ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত আলোচনা– যাহা পূর্বাপর সীরাত সঙ্কলকগণ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা। ইহা করিতে যাইয়া বহু পরিচ্ছেদ ও বিষয় এমনও আলোচিত হইয়াছে যাহার উল্লেখ মূল বোখারী শরীফে নাই, এমনকি সে সম্পর্কে কোন হাদীছও বোখারী শরীফে নাই; অন্যান্য কিতাবে তাহার আলোচনা রহিয়াছে। নবীজী (সঃ)-এর মোবারক আলোচনাকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের মানসে আমি তাহা করিয়াছি। তাই একটি বিভ্রাট সৃষ্টির অভিযোগে আমি অপরাধী।

পবিত্র কোরআনের পরে বোখারী শরীফ সর্বোচ্চ; সাধারণ গ্রন্থাবলী বা তাহাতে বর্ণিত সব হাদীছ বোখারীর মর্যাদার নহে। সুতরাং আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি–

এই সঙ্কলনে মূল বোখারী শরীফের অতিরিক্ত যেসব বিষয় বা হাদীছ রহিয়াছে, যাচাই ছাড়া তাহার প্রামাণিকতা বোখারী শরীফের তুল্য নহে। অবশ্য প্রত্যেকটির প্রমাণ সঙ্গে রহিয়াছে।

যথাসাধ্য পার্থক্যের জন্য আমি একটি নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি। যে সমস্ত পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে আছে তাহা পৃষ্ঠা-নম্বরসহ বড় অক্ষরে রহিয়াছে। তদ্রূপ যেসব হাদীছ মূল বোখারী শরীফ হইতে অনূদিত, তাহার উপর ক্রমিক নম্বর রহিয়াছে। ক্রমিক নম্বরবিহীন যেসব হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে তাহা বোখারী শরীফের নহে।

——আজিজুল হক

সূচী-পত্র

আজানের বিবরণ

—(•)—

সূচী-পত্র

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

সূচী পত্র

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

সূচি সমাপ্ত

সূচীপত্র

কোরআন শরীফ অবতরণ ও সংরক্ষণ বৃত্তান্ত ১৬১

বিংশতিতম অধ্যায়

২২তম অধ্যায়

সূচী পত্র

হৃদয় গলানো উপদেশাবলী :

রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যায়

পরিশিষ্টের সূচীপত্র

ইমাম বোখারী (রঃ) পর্য্যন্ত অনুবাদকের সনদ

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রঃ)

১। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী (রঃ)
২। " আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ সরখসী (রঃ)
৩। " আবদুর রহমান ইবনে মুজাফ্ফর দাউদী (রঃ)
৪। " আবদুল আউয়াল ইবনে ঈসা সিজযী (রঃ)
৫। " আস সেরাজুল হোসাইন ইবনুল মোবারক যবীদী (রঃ)
৬। " আবুল আব্বাস—আহমদ ইবনে আবু তালেব (রঃ)
৭। " ইব্রাহীম ইবনে আহমদ তনূখী (রঃ)
৮। " শেহাবুদ্দীন—আহমদ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ)
৯। " যায়নুদ্দীন—যাকারিয়া আনছারী (রঃ)
১০। " শামছুদ্দীন রমলী (রঃ)
১১। " আহমদ ইবনে আবদুল কুদ্দুস শান্নাবী (রঃ)
১২। " আহমদ আল-কোশাশী (রঃ)
১৩। " ইব্রাহীম আল-কুর্দী (রঃ)
১৪। " আবু তাহের--মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রঃ)
১৫। " শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)
১৬। " আবদুল আজীজ দেহলভী (রঃ)
১৭। " মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (রঃ)
১৮। " আবদুল গণী মোজাদ্দেদী (রঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (রঃ)—১৯। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব (রঃ)
শায়খুল-হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রঃ)—২০। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)
মাওঃ শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)—২১। মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)

আজিজুল হক

অনুবাদকের দুইজন ওস্তাদ—মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ও মাওলানা জফর আহমদ (রঃ) উভয়ের মধ্যস্ততায় দুইটি সনদ দেখানো হইল—যাহা শাহ আবদুল গণীর উপর মিলিত হইয়াছে।

তৃতীয় একটি সনদ যাহার মাধ্যম সংখ্যা কম হওয়ায় উচ্চমানের পরিগণিত।

ইমাম মোহাম্মদ ইসমাঈল বোখারী—(১) মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী (২) ইয়াহয়্যা ইবনে আম্মার ইবনে মোকবেল ইবনে শাহান খাত্তলানী (৩) মোহাম্মদ ইবনে শাজবখত (৪) বাবা ইউসুফ হেরাবী (৫) হাফেজ নূরুদ্দীন আবুল ফাতুহ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ (৬) কুতুবুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আহমদ নহরওয়ালী (৭) আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল-ইজল (৮) মোহাম্মদ ইবনে ছান্নাহ (৯) ছালেহ ইবনে মোহাম্মদ আল ফাল্লানী (১০) শায়খ আবেদ ছিন্দী (১১) শাহ আবদুল গণী মোজাদ্দেদী (১২) মাওলানা খলীল আহমদ সাহারণপুরী (১৩) মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী—আজিজুল হক।

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمٰوٰتُ وَبِاسْمِهٖ تُبْدَأُ

الصَّالِحَاتُ وَبِحَمْدِهٖ تَتِمُّ الْحَسَنَاتُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

نَبِيِّنَا اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ

بَلَّغُوْا عَنْهُ كُلَّ اٰيَاتٍ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ فِىْ

تَبْلِيْغِ الدِّيْنِ اِلَى الْاٰفَاقِ وَالْجِهَاتِ -

اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنَا بِهِمْ فِى الدَّارَيْنِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ وَالذُّرِّيَّاتِ

اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যাঁহার আদেশে সপ্ত আকাশ সৃষ্ট ও স্থিত। যাঁহার নামে সকল শুভ কার্য্যের শুভ আরম্ভ হয়—যাঁহার প্রশংসা দ্বারা সকল শুভ কার্য্যের পূর্ণতা লাভ হয়।

দরূদ ও সালাম আমাদের নবীজীর প্রতি যিনি সকল সৃষ্টের সেরা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের প্রতি যাঁহারা তাঁহার প্রতিটি হাদীছকে পৌঁছাইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা দ্বীন-ইসলামকে সকল প্রান্তে ও সকল দিকে পৌঁছাইতে ছাহাবীগণের পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহাদের দলভুক্ত করুন এবং তাঁহাদের অনুসারী বানাইয়া রাখুন এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরে পরিণত করুন। আমীন! আমীন!!

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং

السَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ●

সালাম সমস্ত নবী ও রসুলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্ব্বশেষ নবী—তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ। আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্ব্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْنَ ! اٰمِيْنَ !! اٰمِيْنَ !!!

আমীন। আমীন।। আমীন।।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি অহী এবং উহার প্রাথমিক অবস্থা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ

"আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছি—যেমন নূহ (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছিলাম।" অর্থাৎ মানব জাতির সংস্কার ও জীবন গঠনের যে নীতি ও আদর্শ আপনার নিকট প্রেরণ করা হইতেছে ইহার ছেলছেলাহ্ বা ক্রমানুবর্ত্তন হযরত নূহ (আঃ) হইতে শুরু হইয়া তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ভাবে আপনার প্রতিও আসিয়াছে। আল্লার তরফ হইতে এরূপ নীতি ও আদর্শ নাযেল হওয়া নূতন বিষয় নহে, যাহা দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে।

হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অহী সাধারণতঃ জাগতিক প্রয়োজন ও জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্য-পদ্ধতি শিক্ষা দানের বিষয়েই বেশী মাত্রায় অবতীর্ণ হইত, ধর্মীয় বিষয় মোটামুটি ও মৌলিক আকারে থাকিত। ইহজীবনেই পরকালের অধিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা—শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ ও আহকাম নূহ (আঃ) হইতেই নাযেল হওয়া আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে উহা রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সম্পূর্ণতা লাভ করে, তাই এখানে হযরত নূহের প্রতি প্রেরিত অহীর তুলনা উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। হাদীছ :— عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ـ وَاِنَّمَا لِامْرِا

مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى

مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ *

---

* এই হাদীছ খানা বোখারী শরীফের সাত জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে হাদীছ খানা অসম্পূর্ণ উল্লেখ হওয়ায় ৯৯০ পৃষ্ঠা হইতে সম্পূর্ণ হাদীছ খানা এখানে উদ্ধৃত হইল।

অর্থ—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় জানিও—আল্লার নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়্যত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তাহার কাজের ফলাফল আল্লার নিকট তদ্রূপই পাইবে যদ্রূপ সে নিয়্যত করিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে, সে আল্লার এবং রসুলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই পাইবে। পক্ষান্তরে (এত বড় কষ্টের নেক কাজটিও ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন হীনস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া করিলে—যেমন, কিছু) টাকার লোভে বা কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার এবং কামরিপু চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে করিলে তাহার ফল তদ্রূপই সে পাইবে যদ্রূপ সে নিয়্যত করিয়াছে।

নিয়্যত অর্থ ঃ—মনে মনে চিন্তা করতঃ উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া কাজ করা।

হিজরত অর্থ ঃ—যে কোন স্থানে, যে কোন সংসর্গে বা যে কোন পরিবেশে থাকিয়া আল্লার দ্বীন পালন করা দুষ্কর হইয়া পড়িলে আল্লার আদেশ মতে সেই স্থান, সেই পরিবেশ পরিত্যাগ করা। প্রথম যুগে মোসলমানগণ মক্কায় তাহাদের ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আল্লার তরফ হইতে তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে। এই মহান কাজকে কোরআন-হাদীছের ভাষায় "হিজরত" বলা হয়।

সরল ব্যাখ্যা ঃ—মানুষ যখনই কোন কাজ করে, সে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য মনে মনে ঠিক করিয়া ঐ কাজের প্রতি অগ্রসর হয়—ইহা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তাহার কর্মের ফলাফল আল্লার নিকট পাইবে। যেমন, "হিজরত" অতি বড় পুণ্যের কাজ—অতি কঠোর ফরজ কাজ; এতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী সবকিছু পরিত্যাগ করিতে হয়। কোরআন-হাদীছে হিজরতের অনেক ছওয়াব, অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ এই কঠিন আমলের জন্য প্রস্তুত হইবে, নিশ্চয় সে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়া অগ্রসর হইবে। যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় এই মহান ত্যাগের দ্বারা আল্লাহকে এবং আল্লার রসুলকে সন্তুষ্ট করা এবং মদীনাতে থাকিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, তবে সে তাহার এই কর্মের ফল তাহার উদ্দেশ্য ও নিয়্যত অনুসারেই পাইবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও ফজিলতের অধিকারী হইবে, আল্লার নিকট বড় মর্তবা পাইবে, তাহার এই দেশত্যাগ সার্থক হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়া হিজরত করিবে, যেমন সুখ্যাতি লাভ করা, টাকা উপার্জন করা, কোন রমণীর প্রেম করা বা এই জাতীয় অন্য কোন হীন স্বার্থ হাসিল করা, সে কোনরূপ ছওয়াব বা ফজিলত পাইবে না, বরং আল্লার নিকট তাহার হিজরত অনর্থক হইবে। যেরূপ নানারকম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা হয়, তাহার জন্য মদীনায় আসাও তদ্রূপই গণ্য করা হইবে। আল্লার নিকট হিজরতরূপে গৃহীত হইবে না। এত কষ্ট, এত ত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়্যত খালেছ ও শুদ্ধ না হওয়ার কারণে আল্লার নিকট এত কঠিন আমলেরও কোন মূল্য হয় না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে হিজরতকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, হিজরত এত বড় মহৎ কাজ ও মহান ত্যাগ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিয়্যতের তারতম্যের কারণে তাহার ফলাফলেও কতদূর পার্থক্য হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেকটি কাজেই নিয়্যতের তারতম্যের কারণে পার্থক্য থাকিবে। যেমন—অন্য এক হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (একদল লোক হইতে) সর্বপ্রথম বিচারের জন্য কেয়ামতের দিন এমন একজন লোককে হাজির করা হইবে, যে স্বীয় জীবন কোরবান করিয়া শহীদ হইয়াছিল। সে আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত নেয়ামত সমূহ উপভোগ করিয়াছে (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, আহার, বিবেক বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি) সেই সমস্ত তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি এই সমস্ত নেয়ামতের শোকর কি করিয়াছ? শোক্‌রিয়া স্বরূপ কি কি কাজ করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, হে প্রভু! আমি তোমার দ্বীনের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত কোরবান করিয়াছি, জেহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছি, তোমার ইসলামের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি নাই। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ—তুমি আমার জন্য বা আমার দ্বীন ইসলামের জন্য জেহাদ কর নাই, তুমি জেহাদ করিয়াছ নাম ও যশের জন্য, বড় বীর পুরুষ বলিয়া অভিহিত হওয়ার জন্য। তুমি সে ফল পাইয়াছ, অর্থাৎ লোকে তোমাকে "বড় বীর পুরুষ" বলিয়াছে। আমার জন্য তুমি কোন কাজ কর নাই, সুতরাং আমার এখানে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আদেশ পাইয়া তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন আলেমকে হাজির করা হইবে। তিনি কোরআন-হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে বাহ্যিক ভাবে তদ্রূপ আমলও করিতেন, তাহাকেও পূর্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি উত্তর দিবেন, দয়াময় প্রভু! আমি জীবনভর আপনার কোরআন এবং আপনার রসূলের হাদীছ শিক্ষা করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়াছি—এ সবই একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে আলেম সাহেব, হাফেজ সাহেব, মাওলানা সাহেব বলিয়া সম্মান করুক, (হাদিয়া নজরানা পেশ করুক ইত্যাদি) সে সব তুমি পাইয়াছ। লোকে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান ও তাজীম করিয়াছে। তুমি আমার জন্য বা আমার ইসলামের জন্য কিছুই কর নাই; কাজেই আমার নিকট তোমার কোন পুরস্কারও নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাহাকেও হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন ছখী দানশীল ধনীকে উপস্থিত করা হইবে। তাহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করা হইবে এবং সে উত্তর করিবে, হে দয়াময় প্রভু! যে যে স্থানে দান করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, সে সমস্ত জায়গায় আমি দান-খয়রাত করিয়াছি—একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলিবেন—তুমি মিথ্যুক, তোমার নিয়্যতে ছিল যে, তোমার নাম হউক; লোকে তোমাকে দাতা বলুক, লোকে

তাহা বলিয়াছে। সত্যিকারভাবে তুমি আমার উদ্দেশ্যে কিছুই কর নাই; কাজেই আমার কাছে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর তাহাকেও ঐরূপে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। (মোসলেম শরীফ)

পাঠকবর্গ! হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যেকটি কার্য্য এবং প্রত্যেকটি বাক্যের ভিতর জগদ্বাসীর জন্য অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শ মূলনীতি নিহিত থাকে। আলোচ্য হাদীছটির ভিতরেও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তার জীবন গঠন ব্যাপারে অতি মূল্যবান একটি মূলনীতি রহিয়াছে। এখান হইতে উহা চয়ন করিয়া লইয়া জীবনের কর্মসূচীর মূলে ইহাকে স্থান দান করাই স্বীয় জীবনকে স্বার্থক করার একমাত্র উপায় এবং ইহা ব্যতিরেকে তাহার জীবন ব্যর্থ হইতে বাধ্য—এই সতর্কবাণীও প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত।

সেই মূলনীতিটি হইল এহ্‌লাহে-নিয়্যাত অর্থাৎ নিয়্যাত দুরস্ত করা। এতদ্বারা দুইটি বিষয় বুঝায়; প্রথমতঃ—কার্য্যের পূর্বে উদ্দেশ্য স্থির করা, গাফলতীর সহিত লক্ষ্যহীন অবস্থায় কোন কাজ না করা। দ্বিতীয়তঃ—উদ্দেশ্য স্থির হওয়ার পর উহাকে আল্লাহ ও রসুলের নির্দ্ধারিত কষ্টি পাথরে ঘসিয়া দেখা যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ ও রসুল সন্তুষ্ট হইবেন, কি অসন্তুষ্ট। মোটকথা, কর্ম জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এরূপ সতর্কতামূলক হওয়া চাই যেমন বাবলা কাঁটার গভীর জঙ্গলে নগ্ন পা রাখিতে হইয়া থাকে। সদা শঙ্কিত থাকিবে, যেন আমার প্রভু আমাকে এরূপ কোনও উদ্দেশ্য চয়নে না দেখেন যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

এই মূলনীতির প্রভাব অতি ব্যাপক। মানব জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত ক্ষেত্রের যত কাজ সম্মুখে আসিবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ তাহাকে অতি সতর্কতা সহকারে এই মূলনীতি সামনে রাখিয়া উহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, আন্দোলনের ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, শিল্প ব্যবসায় ও চাকুরী জীবনের দায়িত্ব পালনে এই মূলনীতির দ্বারা মানব সমাজ বহু উন্নতি সাধন করিবে, এই আশায়ই স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার পরে তাঁহার সুযোগ্য খলীফা ওমর (রাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া সর্বসাধারণ্যে এই হাদীছখানা এবং এই মূলনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়—বর্তমান কালের নেতৃত্ব দখলকারী লীডারগণ এবং আন্দোলনকারী কর্মীগণ সকলেই এই মূলনীতিকে বাদ দিয়া এই মহা-মূল্যবান আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া নেতৃত্ব ও আন্দোলন চালাইলেন। তারই ফলে যে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতিটি কর্মীর প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত, মহান, অতি উন্নত এবং কামিয়াব হওয়া উচিত ছিল, সেই উম্মত নামধারীদের প্রতিটি কাজই আজ বিফল ও দুর্নীতিপূর্ণ হইতেছে। দুর্নীতি দূর করার বহু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা হইতেছে বটে, কিন্তু সেই প্ল্যান প্রোগ্রামই আবার দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জাতি ও দেশকে বাঁচাইতে হইলে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের ভিতর এই মূলনীতির আদর্শ অনুযায়ী এখলাছ, লিল্লাহিয়্যাত—আল্লার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, আখেরাতের হিসাবের ভয় করা,

আল্লার দীন-ইসলামের ও মোসলেম জাতির উন্নতি সাধনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং আল্লার বান্দাদের সেবার জন্য কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ, মনোবল ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই হাদীছে বর্ণিত মূলনীতির আদর্শ যেমন বড় বড় কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়সমূহেও প্রযোজ্য এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এই আদর্শের অনুসরণ করিলে প্রকৃত উন্নতির পথ খুজিয়া পাওয়া যাইবে।

ইমাম গায্যালী (রঃ) দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন আতর ইত্যাদি সুগন্ধি যদি কেহ শুধু সুগন্ধ উপভোগের বা সুন্দর পরিপাটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে উহা একটি "মোবাহ" কাজ হইবে; উহাতে ছওয়াব বা গোনাহের প্রশ্নই আসে না। আর যদি কেহ নিজের অহঙ্কার বা লোক সম্মুখে নিজের বড়ত্ব ও অন্যান্য লোকদের হেয়ত্ব প্রকাশার্থে অথবা উহা হইতেও জঘন্য—বেগানা নারী বা পুরুষদের চিত্তাকর্ষণার্থে ব্যবহার করে, তবে এই সুগন্ধি এবং সুপারিপাট্য তার পক্ষে অতি বড় গোনাহে পরিণত হইবে। আর যদি কেহ এই সব জিনিস ব্যবহার করে রসুলুল্লাহ (দঃ) সুগন্ধি পছন্দ করিতেন এই উদ্দেশ্যে বা লোক সমাজে গেলে খারাব গন্ধে তাহাদের কষ্ট হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এবং সুগন্ধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা নিজের মন-মস্তিষ্ক প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ থাকিবে, নিজের কর্তব্য কাজ, দায়িত্ব পালন, এবাদত-বন্দেগী ভাল ভাবে করা যাইবে—এই উদ্দেশ্যে তবে এই সাধারণ কাজের জন্যও সে বহু ছওয়াব আহরণ করিতে পারে। এইরূপ আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমন, মেহনত ইত্যাদি জীবন ধারণের কাজ-কর্মে আল্লার নির্দ্ধারিত দায়িত্ব পালন ও আল্লার বন্দেগী সমাধা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয়ের নিয়্যত করিলে এ সমস্ত কার্য্য সমূহও এবাদতে পরিণত হয়। বিবাহ কার্য্য এবং স্ত্রী ব্যবহারে যদিও স্থূল দৃষ্টিতে কামরিপু চরিতার্থ করাই হয় তবুও নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখা, কুপথ ও কু-কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, নেক সন্তান হাসিল করা, আখেরাতের পথে এবং কর্তব্য পালনে সাহায্যকারী সংগ্রহ করা, সুন্নতের পায়রবী করা ইত্যাদি সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়্যত করিলে এই সব কাজও বড় বন্দেগীরূপে গণ্য হয় এবং অনেক ছওয়াব হাসিল হয়।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! চিন্তা করুন, সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়্যত করাতে এবং একটু চিন্তা করিয়া দেলের নিয়্যতটা খাঁটী করিয়া লওয়াতে খাদ্যের স্বাদ বদলাইয়া যায় না, পরিশ্রমের আয়-রোজগার কম হইয়া যায় না, স্ত্রী ব্যবহারে আনন্দও কমিয়া যায় না—সবই পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু শুধু দেলটা ঠিক করিয়া নিয়্যতটা একটু খোদার দিক করিয়া লওয়াতে কত নেকী কত ছওয়াব হাসিল হইয়া থাকে; কাজের মূল্য ও উৎকর্ষতা কত বাড়িয়া যায়। সত্য বলিতে গেলে পিতল সোনায় পরিণত হয়।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা এমনই অমূল্য রত্ন যে, এই শিক্ষার ভিতর দিয়া দুনিয়ার কোন কাজে, দুনিয়ার কোন উন্নতি প্রগতির ব্যাপারে আদৌ কোন ক্ষতি হয় না—অথচ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী

জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথ খুলিয়া যায়। এমনকি সাধারণতঃ যে সমস্ত কাজ-কর্মকে ভোগ-বিলাস মনে করা হয়, উহার ভিতর দিয়াও খোদাকে পাইবার এবং আখেরাতের দৌলত উপার্জনের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এখানেই কোরআন-হাদীছের শিক্ষার মাহাত্ম্য যে, ইহাতে দুনিয়া নষ্ট না করিয়াই আখেরাতের পথ দেখান হইয়াছে। আর বর্তমান যুগের জড়বাদী মতবাদগুলিতে চিরস্থায়ী জীবনের আখেরাতকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া শুধু ক্ষণস্থায়ী জীবন এই দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা হইতে অজ্ঞ থাকার দরুন প্রতি মুহূর্তে শত শত নেকী হাসিলের সুযোগ হইতে আমরা মাহরূম ও বঞ্চিত থাকিতেছি।

এখানে একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের যাবতীয় কার্য্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:—(১) মা'ছিয়াত অর্থাৎ মন্দ কাজসমূহ, (২) হাছানাত অর্থাৎ ভাল ও সৎ কাজসমূহ, (৩) মোবাহাত অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের কাজসমূহ— যাহাতে ধরা বাঁধা ছওয়াব বা গোনাহ নাই।

যে সমস্ত কাজ কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় গোনাহ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে "মা'ছিয়াত" বলা হয়। যথা:—ঘুষ লওয়া, চুরি করা, জেনা করা, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া, শরাব পান করা, আমানতে খেয়ানত করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, রোযা না রাখা, আল্লার রসূলের বা কোরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ইত্যাদি সমস্তই পাপ এবং মন্দ কাজ। নিয়্যতের দ্বারা এই শ্রেণীর কাজ সমূহকে কিছুতেই ভাল বা ছওয়াবের কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু যদি কেহ পাপ কাজ ছওয়াবের নিয়্যতে করে তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে আল্লার নিষিদ্ধ কাজ করে অথচ মুখে বলে যে আমি এই কাজ করিতেছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যেমন কেহ নিমের ফল খাইতেছে আর বলিতেছে আমি মিষ্টির স্বাদ পাইবার জন্য নিমের ফল খাইতেছি। এইরূপ ব্যক্তিকে শুধু বোকা নয় পাগল বলিতে হইবে। এই জন্যই শরীয়তের ভাষায় এরূপ ব্যক্তিকে শুধু ফাছেকই নয় বরং কাফের বলা হইবে। কারণ সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে।

যে সমস্ত কাজকে শরীয়তে ভাল বা জরুরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাকে "হাছানাত" বলা হয়। যেমন—নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, সত্য কথা বলা, ন্যায় বিচার করা, মেহমানের খেদমত করা, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা, গরীবের সাহায্য করা, মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, দায়িত্ব পালন করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, সতীত্ব রক্ষা করা, মুরব্বীকে মান্য করা ও ছোটদিগকে স্নেহ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। হাছানাত বা সৎকার্য্যাবলী অবশ্য করণীয়— না করিলে শাস্তি হইবে এইরূপ অপরিহার্য্য পর্য্যায়ের হইলে তাহাকে "ফরয" বা "ওয়াজেব" বলা হয়। করিবার জন্য তাকীদ থাকিলে তাহকে "সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ" বলা হয় এবং ভাল

কাজ বলিয়া প্রশংসা করা হইলে বা করিবার জন্য আদেশ না করিয়া শুধু উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহাকে মোস্তাহাব বা নফল বলা হয়। হাছানাত পর্য্যায়ের কাজগুলি সুষ্ঠু নিয়্যত ব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন এবং নিষ্ফল হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লার নিকট ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য থাকে না। বরং অপনিয়্যতের দরুণ হাছানাত অপকর্মে ও মা'ছিয়াতে পরিণত হইয়া যায়। যেমন—সবচেয়ে বড় হাছানাহ (নেক কাজ) হইতেছে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থাৎ আল্লার এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব এবং আল্লার বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী হাদীছের সত্যতা স্বীকার করা। ইহাও যদি কেহ শুধু মুখে মুখে স্বীকার করে কিন্তু দেলে দেলে আল্লাহ ব্যতীত হীনস্বার্থ ইত্যাদি অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য রাখে তবে তাহাকে বলে মোনাফেক। মোনাফেকের জন্য দোযখের সর্বনিম্ন স্তর এবং সবচেয়ে বেশী শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। নামায ইসলামের প্রধান রোকন; ইহা যদি কেহ বিনা নিয়্যত তথা অন্ততঃ মনের মধ্যে নামায পড়ার এরাদা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে পড়ে তবে আদৌ কোন মূল্য নাই, নামায হইবে না। আর যদি কেহ অপনিয়্যতে অর্থাৎ রিয়াকারী—লোক-দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি হীনস্বার্থের নিয়্যতে পড়ে তবে তাহাতে ছওয়াবের পরিবর্তে ভীষণ আজাব—ওয়ায়েল নামক দোযখের শাস্তি হইবে। পবিত্র কোরআন শরীফে ৩০ পারা ছুরা মাউনে আছে—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ......

"ওয়ায়েল-দোযখ ঐ শ্রেণীর নামাযীদের জন্য যাহারা নামাযের ব্যাপারে গাফেল—সময় সময় পড়িলেও উদাসীনরূপে পড়ে; যাহারা লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে নামায পড়ে।"

প্রত্যেক নেক কাজেই নিয়্যত খালেছ করার একান্ত প্রয়োজন আছে। নিয়্যত খালেছ না হইলে আজাবের কারণ হইবে। যেমন মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে সব কাজে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার দিয়াছেন তাহাকে বলে মোবাহাত। যেমন—খাওয়া, পরা, শোওয়া, কথা বলা, দেখা, শোনা, হাটা, চলা, জীবিকা উপার্জন করা, কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করা, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বিজ্ঞানে উন্নতি করা, বিভিন্ন দেশ পর্যটন করা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা ইত্যাদি। নিয়্যতের তারতম্য বিশেষভাবে মোবাহ পর্য্যায়ের কার্য্যসমূহেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। মোবাহ পর্য্যায়ের যে কোন একটী কাজ আল্লার সন্তুষ্টি ও আল্লার দাসত্বের ধ্যান করতঃ নিয়্যত ঠিক করিয়া করিলে তখন আর ঐ কাজটি শুধু মোবাহ থাকে না, উহা একটি উচ্চ পর্য্যায়ের ছওয়াবের ও এবাদতের কাজে পরিণত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐ কাজটিকেই কোন অপনিয়্যতে করিলে উহা মা'ছিয়াত বা গোনাহের কাজে পরিণত হইয়া যায়। যেমন ইমাম গায্যালীর (রঃ) বর্ণনায় দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত মোবাহ কাজসমূহকে নেক কাজে

বা গোনাহতে পরিণত করা নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে। এই হাদীছের ইহাই তাৎপর্য্য যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য একদিকে যেমন মা'ছিয়াত ও হাছানাতের ময়দানের চেয়ে মোবাহাতের ময়দানকে অধিক প্রশস্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ এইসব মোবাহাত অর্থাৎ দুনিয়াদারীর সামান্য সামান্য পিতলের জিনিষকে কিরূপে সোনায় পরিণত করিয়া ক্ষণস্থায়ী ইহজীবনের শান্তির ও উন্নতির সহিত চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনের অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ লাভের উপায় করিতে হইবে, সেই ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

এই হাদীছ খানাতে অহী সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা হয় নাই। তা সত্ত্বেও ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাকে অহীর বর্ণনার শিরোনামাভুক্ত কেমন করিয়া করিলেন? এ বিষয়ে সমালোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। সোজা কথা এই যে, যেহেতু দ্বীন ও সত্য ধর্মের ভিত্তিপাত হয় অহীর দ্বারা এবং মানুষের জীবন গঠন আরম্ভ হয় নিয়্যতের দ্বারা। দেল ঠিক করিয়া মকছুদ ও লক্ষ্য স্থির করিয়া—যে আমার একমাত্র মকছুদ ও জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা—এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করার দ্বারাই হয় মানুষের জীবন গঠনের ভিত্তিপাত। সেই জন্য নিজে আমল করিয়া দেখাইবার জন্য এবং পাঠকবর্গকেও তদনুরূপ আমল করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কেতাব আরম্ভ করার ও অহীর কথা বর্ণনা করার পূর্বে নিয়্যত সম্বন্ধে হাদীছ খানা বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। **হাদীছঃ**— عن عائشة رضى الله تعالى عنها سئل هشام بن حارث

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِىْ مِثْلَ

صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهٗ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا

يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهٗ

يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيُفْصَمُ

عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهٗ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন, কোন সময় এমন হয় যে, একটি (চিত্তাকর্ষক) টুণ, টুণ, শব্দ আমি শুনিতে পাই। (সেই আওয়াজ আমাকে এই জগতের অনুভূতি হইতে উদাসীন করিয়া অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া নেয়। তখন আল্লার বাণী আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত

হইতে থাকে এবং ঐ আওয়াজ বন্ধ হইতে না হইতেই যাহা বলা হয় সব কিছুই আমি অন্তরস্থ করিয়া লই।) এই প্রকারের অহী আমার জন্য বড়ই শ্রান্তিদায়ক হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আল্লার বাণী আমাকে বলিয়া দেন, আমি তাহা মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই। (এই দ্বিতীয় প্রকারের অহীতে বিশেষ কোন শ্রান্তি বা কষ্ট হয় না) প্রথম প্রকারের অহী সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি অতি প্রচণ্ড শীতের সময়ও নবী (দঃ)কে অহী নাযেল হওয়ার সময় ঘর্মাক্ত হইতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ—صلصلة الجرس অর্থ ঘণ্টার অবিরাম টুণ্‌ টুণি আওয়াজ। এই আওয়াজ অহী আসার সঙ্কেত স্বরূপ ছিল। ইহা কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। যেমন ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—অহী নাযেল হওয়ার সময়ে আমরা মৌমাছির ঝাঁক্ উড়িয়া বেড়াইবার সময় যেমন এক প্রকার বিরতি বিহীন গুঞ্জন শুনা যায়, ঐরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। অহী নাযেল হওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক কোন কষ্ট শ্রম হইত কি-না; এবং কেন? প্রথম প্রকার অহীর দরুণ যে, রসুলুল্লার দেহে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইত তাহা বিবি আয়েশার চাক্ষুষ সাক্ষ্যে যে, প্রচণ্ড শীতের সময় হযরতের চেহারা মোবারক এবং দেহ হইতে ঘাম ঝরিতে থাকিত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মানুষের সাকার দেহ নশ্বর জড়পিণ্ড তাহার নিরাকার অনন্ত অসীম আত্মার জন্য এক প্রকার খাঁচার মত। এই খাঁচার সহিত আত্মার একটা যোগাযোগ নিশ্চয়ই থাকে। এই যোগাযোগকে ছিন্ন করিয়া যখন সকল আত্মার আত্মা যিনি, তাঁহার দিকে তাহার পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়, তখন তাহার নিশ্চয়ই কষ্ট ও শ্রান্তি হয় কিন্তু এই শ্রান্তি যে, কি মধুর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এই যোগাযোগ যখন পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, তখন দেহের উপর যে, কি চাপ পড়ে তাহা একজন ছাহাবীর বর্ণনায় কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন—একদিন আমি হযরতের পাশাপাশি বসিয়াছিলাম; হযরতের উরু সামান্য পরিমাণে আমার উরুর উপর ছিল। এই অবস্থায় মাত্র ২।৩ শব্দের একটি অহী নাযেল হওয়াতে আমি মনে করিতেছিলাম যে, হয়ত আমার উরুর সমস্ত হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। চাক্ষুষ জগতে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত হইতে পারে যে, একটি সাধারণ লোহার বা তামার তারের সহিত বিদ্যুৎ শক্তির যোগাযোগ করিয়া দিলে ঐ তারটির বাহ্যিক পরিবর্তন না হইয়াও তাহার ভিতর এক ভীষণ চাপের ঢেউ খেলে। তাহাতে ঐ তারটির ভিতরে যে অপরিসীম শক্তি ও তাপ মাত্রার সঞ্চার হয় তাহা-বাহ্যতঃ দৃশ্য না হইলেও তারটিকে স্পর্শ করিলেই তাহা অনুভূত হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, অহী নাযেল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত—তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত।

৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অহী আসার ভূমিকা ও প্রাথমিক সূচনা আরম্ভ হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন আকারে—স্বপ্নে তিনি যাহা দেখিতেন ঠিক তাহাই দিবালোকের মত প্রকাশ পাইত।✿ কিছুকাল এই অবস্থা চলার পর নিজ হইতেই হযরতের অন্তরে লোকালয় হইতে সংস্রবহীন হইয়া নির্জনে থাকার প্রেরণা উদিত হইল। তিনি (হেরা) নামক পর্বত গুহায় (মক্কা শহরের লোকালয় হইতে তিন মাইল দূরে) যাইয়া নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খাইবার জন্য প্রত্যহ বাড়ী আসিতেন না, পানাহারের জন্য সামান্য কিছু সম্বল লইয়া যাইতেন এবং তথায় একাদিক্রমে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিয়া যাপন করিতেন। অনেক দিন পর একবার বিবি খাতিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং আবার ঐরূপ একসঙ্গে অনেক রাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে রত হইবার জন্য কিছু পানাহারের সম্বল সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে তিনি হেরা পর্বত গুহায় নির্জনে আল্লার ধ্যান ও এবাদতে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন হেরা গুহার ভিতরেই তাঁহার নিকট প্রকৃত সত্য আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—আল্লার তরফ হইতে জিব্রিল ফেরেশতা অহী (আল্লার বাণী) বহন করিয়া প্রকাশ্যভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, আপনি পড়ুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—আমি ত পড়া শিখি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—তখন সেই ফেরেশতা (হযরত জিব্রিল (আঃ)) আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিলেন যে, আমার (প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার মত) কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন—আপনি পড়ুন। আমি প্রথম বারের মতই বলিলাম, আমি ত কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—তখন ঐ ফেরেশতা পুনরায় দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার (প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার ন্যায়) কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, আপনি পড়ুন। আমি (এইবারও) বলিলাম, আমি ত কোন দিন পড়া শিখি নাই। তিনি তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গন করিয়া চাপিয়া ধরিলেন* এবং ছাড়িয়া দিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন।

✿ এই অবস্থা হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাসের ঘটনার ছয় মাস পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। এর পূর্বেও কোন কোন ঘটনা সময় সময় প্রকাশ পাইত। মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, সময় সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ও আলো দেখিতেন। রাস্তায় চলার সময় গাছপালা তাঁহাকে ছালাম করিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—আমি এখনও মক্কায় সেই সব গাছপালাগুলিকে চিনি যেগুলি আমাকে নবুয়তের পূর্বে সালাম করিত।

* এইরূপে আলিঙ্গনের দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভিতরে ফয়েজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আসিতেছিল। তাই তৃতীয়বার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তিনি পড়িতে পারিলেন; পড়াও যেমন তেমন পড়া নয়—মানে, মতলব, হকিকত, গুরুত্ব মূলতত্ত্ব সহ পড়া।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -**

** প্রথম বারে এই ছুরার উক্ত পাঁচটি আয়াতই নাযেল হয়। আয়াত কয়টির অর্থ এই ;— আপনি আপনার সেই মহাপ্রভু পালনকর্তার নাম লইয়া পড়ুন, (নিজ শক্তিতে নয় ; সর্বশক্তির আকর যিনি তাঁহার নামের বরকতে আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইবে।) যিনি সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষত; তিনি মানুষের মত জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ এত উচ্চদরের জীবনকে অতি নিকৃষ্ট পদার্থ জমাট রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি পড়ুন ; আপনার প্রভু দয়ার সাগর, অত্যন্ত দয়ালু (তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ; মানুষ কিছুই জানিত না) তিনিই (বুদ্ধিহীন, বাকশক্তিহীন, জীবনীশক্তি বিহীন) কলমের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আপনি বুদ্ধি-বিবেক, জীবনীশক্তি সব কিছু রাখেন। আপনাকে জ্ঞান ও পড়ার ক্ষমতা তিনি নিশ্চয় দিতে পারিবেন ; সেই শক্তি লাভের সূত্ররূপে সেই মহাপ্রভুর মহান নামের বরকত ও অছিলা গ্রহণ করত: পড়িবার জন্য প্রস্তুত হউন ; এখন হইতে যত কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইবে সবই পড়িবার জন্য প্রস্তুত ও সাহসী হউন। ভবিষ্যতে আর কোন কিছু পড়িতে সাহস হারা হইবেন না। শুধু পড়াই নয়, প্রতিটি কর্তব্য কাজে মহাপ্রভুর নামের অছিলায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার অমোঘ ব্যবহার করত: সাহসী হইয়া দাঁড়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তিনবার ফেরেশতার আহ্বান—"আপনি পড়ুন" সেখানেও আরবী শব্দ "একরা" ছিল ; উহা মূল অহী তথা কোরআনের আয়াতভুক্ত ছিল না ; উহা ছিল ফেরেশতার কথা। উক্ত তিনবারের "একরা—পড়ুন" ক্রিয়াপদের কর্মপদই ছিল চতুর্থবারে পঠিত আয়াতখানা। আর এই আয়াতে যে "একরা" রহিয়াছে উহা আল্লার কালাম—কোরআনের অংশ ; এই ক্রিয়াপদের কর্মপদ হইল—যত কিছু পড়ার মত তোমার সম্মুখে আসিবে। উপস্থিত রসুলকে সম্বোধন করিয়া পড়ায় অক্ষমতা প্রকাশের ঘটনা লক্ষ্যে পড়কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করত: মানব গোষ্ঠীকে বলা হইয়াছে, কোন কর্তব্য কাজে সাহস হারা না হইয়া মহাপ্রভুর সূত্রে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনার অসিলা ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ছোট বড় প্রত্যেক কাজেই তাহা করিবে, কারণ প্রত্যেক কাজেই প্রভুর সাহায্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনের এই উপদেশ কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। একটি দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তিকে তাহার মুরব্বির তরফ হইতে লিপি পৌছাইবার সময় আপনি বলিলেন, পড়। উক্ত লিপিতে লেখাছিল, সর্বদা মনোযোগের সহিত পড়। আপনার আহ্বান—"পড়" এবং লিপিতে লেখা উপদেশ—"মনোযোগের সহিত পড়" অর্থাৎ সর্বদা মনোযোগের সহিত পড়িবা ; উভয় "পড়" শব্দের তাৎপর্যে যে ব্যবধান তদ্রূপ ব্যবধানই রহিয়াছে জিব্রিল ফেরেশতার আহ্বান—"পড়ুন" এবং আল্লাহ তায়ালার কালামের অংশ—"মহাপ্রভুর নামে পড়ুন"—এই উভয় "পড়ুন" এর মধ্যে। আরও সরল দৃষ্টান্ত—শিক্ষক ছাত্রকে বলে, পড়—একরা বিস্মে রাব্বেকা "মহা "প্রভুর নাম লইয়া পড়।" এই উভয় "পড়"-এর মধ্যে যে পার্থক্য তদ্রূপই আলোচ্য স্থলে।

এই পাঁচটি আয়াত (মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া) লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বাড়ী ফিরিলেন। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে এখনও তাঁহার হৃদয়যন্ত্র থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল+। তাই তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া (গৃহ-সঙ্গিনী পতি সর্বস্ব প্রাণ) খাদিজার কাছে আসিলেন এবং (জ্বরাক্রান্তির আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায়) বলিলেন—আমার গায়ে কম্বল দাও। খাদিজা (রাঃ) কম্বল আনিয়া গায়ে দিলেন। কিছু সময় পর ঐ জ্বর-জ্বর ভাব এবং ভয়-ভয় ভাব চলিয়া গেল। অতঃপর হযরত (দঃ) খাদিজাকে সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। হযরত (দঃ) (বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মস্ত বড় ভারি বোঝা তাঁহার উপর চাপান হইবে বোধ হইতেছে, তাই তিনি বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে—আমার জীবনে কুলাইবে কি না? আমার শরীরে সহ্য হইবে কি না, না জীবন বাহির হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। খাদিজা (রাঃ) (অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রায় বাল্যকাল হইতেই জানিতেন এবং দীর্ঘ পনর বৎসর হইতেও একেবারে অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপেই বসবাস করিয়াছেন। তিনি) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, كلا والله ما يخزيك الله ابدا খোদার কসম, কিছুতেই নয়, আল্লাহ্ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করিবেন না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করিবেন—আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা মানবতার চরম উৎকর্ষের মূল সাতটি খাছলতই আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। যথা:—)

১। انك لتصل الرحم —আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মীয়তার হক আদায় করতঃ আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেন না এবং সম্পর্ক ছেদন করেন না*

+ এই অবস্থায় কম্পন বা ভয় কোন অস্বাভাবিক বস্তু নয়। হঠাৎ অতি বড় একটি বোঝার চাপ তাঁহার উপর পড়িয়াছে—জিব্রিল ফেরেশতার সহিত মোলাকাত; যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং সর্বশক্তিমান অসীম অফুরন্ত শক্তির আকরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা অত্যাধিক ফয়েজের চাপ, সর্বোপরি ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্ব ভারের চাপ—এতগুলি চাপ হঠাৎ এক সঙ্গে। কাজেই রক্ত মাংসের শরীরে জ্বর, কম্পন ইত্যাদি না হইয়া পারে না। রসুলুল্লার আধ্যাত্মিক শক্তি যত বড়ই হউক না কেন দেহটি ত মানুষেরই দেহ ছিল।

* সাধারণতঃ লোক সমাজে মামু-ভাগ্নে, চাচা-ভাতিজা, চাচাত ভাইদের সঙ্গেই বিষয় সম্পত্তির সহিত জড়িত থাকার কারণে ঝগড়া-বিরোধ মনোমালিন্য বেশী হয়। কিন্তু হযরত রসুলুল্লার শিক্ষা এই যে, এই সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা জন্মান যাইবে না। তাদের সঙ্গে মিলন ও সৌহার্দ বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বভাব হযরতের নবুয়ত পাওয়ার পূর্বেই ছিল, তার প্রমাণ খাদিজার এই সাক্ষ্য। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন কথা এবং স্বজন-প্রীতি যাহা অতীব দূষণীয় তাহা হইতেছে এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া, আমানতের খেয়ানত করিয়া, বিচার ক্ষেত্রে অথবা ষ্টেটের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের চাকুরী পদ বা টাকা-পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পক্ষপাতিত্ব করা, ইহা হারাম। পক্ষান্তরে নিজের ব্যক্তিগত জান মাল দিয়া যথাসম্ভব আত্মীয়গণের হক আদায় করা জরুরী এবং ফরয।

২। وتصدق الحديث—আপনি সদা সত্যবাদী; মিথ্যা কথা বলেন না।*

৩। وتؤدي الامانة—আপনি চিরকাল পূর্ণ মাত্রায় অতিশয় বিশ্বাসী আমানতদার; আমানতের খেয়ানত আপনি কখনও করেন নাই। (ব্যক্তিগত লেনদেনের আমানত, পারিবারিক আচার-ব্যবহারের আমানত, সামাজিক বিচার অথবা খেদমত ও সেবার আমানত সবই উদ্দেশ্য।)

৪। وتحمل الكل—যে সব অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অন্ধ খঞ্জ আছে, আপনি তাহাদের বোঝা বহন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জন করার ক্ষমতা নাই তাহাদের রুজির, খাওয়া-পরার ও থাকার বন্দোবস্ত আপনি করিয়া দেন।

৫। وتكسب المعدوم—আপনি বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জন ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অভাবগ্রস্ত; আপনি তাহাদের কাজের ব্যবস্থা উপার্জনের সংস্থান করতঃ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

৬। وتقري الضيف—আপনি অতিথি-সেবা, মেহমানের খেদমত করিয়া থাকেন।

৭। وتعين على نوائب الحق—আপনি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগক্ষেত্রে দুস্থ জনগণের সাহায্য কল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন।

মানবতার উৎকর্ষ এই গুণগুলি যেই মানুষের মধ্যে আছে সেই মানুষ সফলকাম না হইয়া পারে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে কখনও অকৃতকার্য্য করেন না।

খাদিজা (রাঃ) এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া হযরতকে লইয়া বংশের বৃদ্ধ মুরব্বি চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। অরাকা সত্যান্বেষী সুজ্ঞানী লোক ছিলেন, অতি বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জাহেলিয়াতের যমানাতেই তিনি সত্য ধর্মের তালাশে সিরিয়া দেশে যাইয়া ঈসায়ী ধর্মীয় এক খাঁটী আলেমের নিকট খাঁটী ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এবরানী ভাষা লিখিতেন এবং এবরানী হইতে ইঞ্জিল কেতাবের আরবী তরজমাও করিতেন। (তাহাতে পুর্বের আসমানী কেতাব সমূহে তাঁহার দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি নবীগণের প্রতি অহী ও অহীবাহক ফেরেশতা জিব্রিলের বিষয় জানিতেন।) খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে বলিলেন, হে চাচা-পুত্র ভ্রাতা! আপনার ভাই-পো কি বলেন একটু শুনুন। খাদিজা (রাঃ) ঘটনার কিছু বর্ণনাও দিলেন। অতঃপর অরাকা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন! আপনি কি দেখেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমস্ত ঘটনা অরাকাকে খুলিয়া বলিলেন। অরাকা বলিলেন, এ-ত সেই মঙ্গলময় আল্লার দুত জিব্রিল ফেরেশতা—যাঁহাকে আল্লাহ মুছা আলাইহেচ্ছালামের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। হায় আফছুছ! যদি সেদিন আমি যুবক হইতাম—যেদিন আপনি আল্লার বাণী প্রচার করিবেন। হায় আফছুছ; যদি সেদিন আমি জীবিত থাকিতাম—যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িবে। শেষের বাক্যটি শুনিয়া হযরত স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, কি?

---

* এই বাক্যটি বোখারী শরীফের ৭৪০ পৃষ্ঠায় এবং পরবর্তী বাক্যটি ফতহুলবারী কেতাবে উল্লেখ আছে।

আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করিবে। অরাকা বলিলেন—হাঁ, হাঁ,। যে সত্য ধর্ম আপনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন এইরূপ সত্য ধর্ম-বাণী যে কেহ দুনিয়াতে লইয়া আসিয়াছেন দুনিয়াবাসী তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া ছাড়ে নাই। যদি আমি সেই দিন পাই (অর্থাৎ জীবিত থাকি) তবে আমি প্রাণপণে যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব।*

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই অরাকা এন্তেকাল করিলেন। হেরা পর্বত-গুহার এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য অহী বন্ধ থাকিল।×

অহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা বর্ণনা পূর্বক জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন (অহী বন্ধ থাকাবস্থায় যখন আমি অতি ব্যস্ত ও অস্থির ছিলাম✿ তখনকার ঘটনা)—একদা আমি পথ চলিবার কালে হঠাৎ উর্দ্ধ দিকের একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন উর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি, সেই ফেরেশতা (জিব্রিল) যিনি হেরা-পর্বতের গুহায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন তিনিই আসমান জমিন পৃথিবীর মাঝখানে (অতিশয় জমকালো সোনার কুরসীতে আকাশ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এত বড় বিরাট

---

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে কাহারও নিকট যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই বা যাইতে উদ্যতও হন নাই। বিবি খাদিজাই তাঁহাকে অরাকার নিকট লইয়া গিয়াছেন। ইহা মাতৃজাতির স্বভাব সুলভ কোমলতা যে, তাঁহার প্রিয়জনের কোনরূপ অস্থিরতা দেখিলে প্রাচীন পারদর্শী জ্ঞানীদের কাছে যাতায়াত করিয়া অতি শীঘ্র প্রিয়জনের অস্থিরতা দূর করিতে চেষ্টা করেন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদৌ কোনরূপ অস্থির ছিলেন না, বরং সব ব্যাপারেই তিনি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। নবুওতের পদ-মর্য্যাদা, ফেরেশতার পরিচয়, অহীর হকিকত সব কিছুই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য নূতন নূতন—প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক কিছু কষ্ট এবং গুরু দায়িত্বের বোঝার চাপের দরুণ মনেও নানা কথার উদয় হইতেছিল এবং প্রাণপ্রিয়া খাদিজার কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। খাদিজার বুদ্ধিমত্তা এবং হামদারদীর উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। খাদিজার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সঙ্গে অরাকার নিকট যাইতেও কোন ওজর আপত্তি করেন নাই। অরাকাও কোন খারাপ কথা বলেন নাই বা খারাপ লোক ছিলেন না। বরং অরাকা রসুলুল্লার উম্মতের মধ্যে শামিল কি না এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে 'মোমেন' ছিলেন এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে অরাকাকে বেহেশতের নহরকূলে সাদা রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি; নবীর স্বপ্ন অহী।

× এক রেওয়ায়েত আছে—অহী প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল এবং অন্য একজন ফেরেশতাকে হযরতের তত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হযরত জিব্রিল (আঃ)ও মাঝে মাঝে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু যেহেতু প্রথমবারের অহীর ভারে হযরতের অনেক কষ্ট হইয়াছিল তাই তিন বৎসর যাবৎ আর অহী আনেন নাই। বরং অহী বন্ধ হওয়ার কারণে মনোবেদনা ও বান্ধবের মিলনের বিচ্ছেদ-যাতনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। সাময়িক ভাবে অহী বন্ধ করিয়া এইরূপ আগ্রহ ও মিলনাকাঙ্খা বর্দ্ধিত করাই আল্লার হেকমত ছিল। সাধারণতঃ বলা হয় অহী ছয় মাস কাল বন্ধ ছিল। (✿ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আকারে দেখিলাম যে,) তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম* এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া এইবারও বলিলাম—دثرونى دثرونى "আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও, আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও। এই দিন এই পাঁচটি আয়াত বা পূর্ণ ছুরা নাযেল হয়—

يَآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ- +

☼ অহী প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবের সহিত মিলন-সূত্র। বান্ধবের মিলনের যে কি স্বাদ তাহা একমাত্র প্রেমিকজন ব্যতীত অন্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। যাঁহারা আল্লার প্রেমিক হইয়া খাঁটী পীরের কাছে তালকীন লইয়া আল্লার জেকের মোজাহাদা করতঃ আল্লার প্রেমকে সত্যিকার ভাবে খাঁটী ও স্থায়ী করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা আল্লার প্রেমের মিলনের স্বাদের কিঞ্চিৎ নজীর বা নমুনা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। এত বড় স্বাদের জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের মন কত উতলা এবং কত উৎকণ্ঠিতই না হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী বন্ধ থাকাকালে এইরূপ বিচ্ছেদ যাতনাই ভোগ করিতে-ছিলেন এবং বিচ্ছেদ যাতনা সময় সময় এত চরমে পৌঁছিয়া যাইত যে, তিনি হেরা পর্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিয়া তথা হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু পরম প্রেমিক তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমাগ্নিও বাড়াইতেন। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধ জগতের বাণী আসিত—يا محمد ! انك لرسول الله ! হে মোহাম্মদ! কি করেন আপনি? আপনি যে আল্লার রসুল—প্রেরিত দূত। সাধারণ দূত নহেন, আল্লার প্রতিনিধি দূত: আপনাকে যে সেই প্রতিনিধিত্বের সমস্ত গুরুদায়িত্ব বহন করিতেই হইবে।

* শৈশবাবস্থায় উস্তাদকে, পীরকে বা অন্য কোন মুরুব্বিকে দেখিয়া ছেলেরা ভয় পায়। কিন্তু সে ভয় কোনরূপ ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় হয় না, স্বয়ং বড়দের আদব যাদের অন্তরে আছে তাদের উপর প্রাথমিক অবস্থায় এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত শক্তিমত্তার প্রভাব পতিত হয়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয় ছিল, অন্য কিছুই নহে।

\+ ইহা ২৯ পারা ছুরা মোদ্দাচ্ছেরের প্রথম পাঁচটি আয়াত। অর্থ:—হে কমলীওয়ালা! (কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া থাকার সময় নাই।) আপনি উঠুন, লোকদিগকে (তাদের 'রব' প্রভু সম্বন্ধে, প্রভুর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং আখেরাতে যে প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইয়া এই সব দায়িত্বের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দিন। (মানব সমাজের কল্যাণ সাধন এবং তাহাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাহাদেরই হিতের জন্য তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য বাণী প্রচার করাই ইসলাম ধর্মের প্রথম আদেশ।) এবং আপনি (নামায কায়েম করিয়া—প্রভুকে সেজদা করিয়া প্রভুর নিকট মাথা নত করতঃ) প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। কাপড় জামা, দেহ ও আত্মা পবিত্র করুন। (এক আল্লার হইয়া যান;) যাবতীয় অপবিত্রতা—বিশেষতঃ মূর্তি পূজা গায়রুল্লার পূজা এবং এক আল্লার প্রেম আল্লার ভক্তি ব্যতিরেকে আল্লাহ-বিরোধী যত কামনা বাসনা প্রেম ভক্তি অর্চনা আরাধনা আছে সব চিরতরে বর্জন ও ত্যাগ করিয়া থাকুন—এ পর্য্যন্ত যেরূপ পাক-পবিত্র রহিয়াছেন চিরকালই তদ্রূপ থাকিবেন।

তারপর আর অহী বন্ধ হয় নাই, অনবরত পর পর অহী আসিতে লাগিল।

৪। **হাদীছ** ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—প্রথম প্রথম যখন অহী নাযেল হইত তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক কষ্ট করিতেন। এমনকি, জিব্রিল ফেরেশতা যখন অহী পড়িয়া শুনাইতেন, তখন হযরত (দঃ) সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়িয়া পড়া আরম্ভ করিতেন; × (যাহাতে অহীর একটি অক্ষরও ছুটিয়া না যায় বা বেশী কম না হইতে পারে। ইহাতে রসুলুল্লাহর (দঃ) অনেক কষ্ট হইত।) যাহা লাঘব করার জন্য কোরআনের এই চারিটি আয়াত নাযেল হয়।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ - اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ - فَاِذَا قَرَاْنَاهُ

فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ - ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ -

অর্থৎ—(হে প্রিয় রসুল!) আপনি অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার জন্য (এত কষ্ট করিবেন না—) সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়িবেন না, জিব্রিল যখন পড়েন আপনি মন দিয়া কান লাগাইয়া শুনিবেন। সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়ার এবং পুনরায় আপনার মুখে অবিকলরূপে পড়াইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর ন্যস্ত, ইহার জিম্মাদার আমি। অতএব, আমি যখন (জিব্রিলের মুখে আমার অহী) পড়িব তখন আপনি শুধু মনোযোগের সহিত অনুধাবন ও শ্রবণ করিবেন। পুনরায় বলিতেছি, ঐ অহী পূর্ণরূপে আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করান ও নির্ভুলরূপে পড়াইয়া দেওয়া আমার জিম্মায় রহিয়াছে। (ছুরা কেয়ামাহ্)

এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। শুধু জিব্রিল যখন যাহা পড়িতেন খুব মনোযোগ দিয়া পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে তাহা কান লাগাইয়া শুনিতেন। তাহাতেই সব কিছু তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত এবং জিব্রিল চলিয়া যাওয়ার পর অবিকলরূপে তিনি উহা পড়িতে পারিতেন, একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হইত না।

৫। **হাদিছ** ঃ—ইবনে আব্বাস রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানব জগতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অপেক্ষা বড় দাতা আর হয় নাই হইবেও না; তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করিয়া যখন রমজান শরীফ আসিত—যখন জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন, তখন তাঁহার দানশীলতার সীমা পরিসীমা থাকিত না। জিব্রিল (আঃ) পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যহ আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরআন দওর করাইতেন।†

ইবনে আব্বাস (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ফয়েজ, বরকত ও আধ্যাত্মিক) দান-দৃষ্টি জীবনীশক্তি-বাহী বসন্তের মলয় বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল ছিল।

× ইহা বড়ই কঠিন কাজ। কারণ ইহাতে জিহ্বা, ঠোঁট, কান ও মন চারটি অঙ্গকে একই সঙ্গে কর্মব্যস্ত রাখিতে হয়। († অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ব্যাখ্যা:—এই হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত মানব জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা সর্বশ্রেষ্ঠ ছখী বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দানশীল ছিলেন। হাদিছ শরীফে উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কখনও কোন সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি "না" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে; দুনিয়ার ধন-দৌলত তাঁহার মর্যাদার তুলনায় অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু। এই সব বস্তু দান করা ত তাঁহার নিকট খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই হাদীছে যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ছখী ও দাতা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে, বরং আরও ব্যাপক। অর্থাৎ যে দানের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পশুত্বের স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের জড়পিণ্ড ও মাটির আধ্যাত্মিক উন্নতির কারনে ফেরেশতারও উর্দ্ধে উঠিয়া যায় সেই আধ্যাত্মিক ফয়েজ দানেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ফয়েজ কত শক্তিশালী কত ব্যাপক ছিল তাহা কিঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি করিবার জন্য বসন্তের মলয় বায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দুনিয়ার বুকে বসন্তের বায়ুর দ্বারা কি ব্যাপক পরিবর্তনই না আছে। হিম-ঋতুর প্রকোপে গাছের পাতা ঝরিয়া গাছগুলি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় থাকে, তরু-লতা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় বিবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া যায়, সমস্ত পশু-পক্ষী এমনকি মানুষের মনের পুলক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যখনই ঋতুরাজ মধুকাল বসন্তের হাওয়া জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে থাকে—তখনই পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, গাছপালা সকলেই নূতন জীবন ধারণ করিয়া উঠে। বসন্তের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ুর বদৌলতে গাছপালার শুষ্ক ডালগুলি নূতন পাতায় ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, অগ্নিদগ্ধ মাটি সবুজ ঘাসে ছাইয়া যায়, সকলের প্রাণেই উল্লাসের ঢেউ খেলিতে থাকে। তেমনই ভাবে যুগ যুগান্তব্যাপী মৃতবৎ আত্মসমূহ এবং মেঘাচ্ছন্ন অন্তকরণগুলি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ছোহবতের ও শিক্ষার ফয়েজ ও বরকতের কল্যাণে শুধু সজীব, জীবন্ত ও আলোকিতই নহে—বরং এমন সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন, জীবনদাতা ও আলোদাতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা

---

† দওর করানোর অর্থ—পরস্পর একে অন্যকে পাঠ করিয়া শুনানো। যেমন বর্তমানেও হাফেজদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, একজন হাফেজ সাহেব প্রথমে পড়েন, অন্য হাফেজ সাহেব শুনিতে থাকেন—যাহাতে একটি জের জবরেরও ভুল না হয়; তারপর দ্বিতীয় হাফেজ সাহেব পড়েন, প্রথম হাফেজ সাহেব শুনেন। এইরূপে পুরা কোরআান শরীফ একে অন্যকে শুনাইয়া থাকেন এবং পুরা কোরআান শরীফের হেফজ কায়েম রাখেন। এইরূপেই জিব্রিল (আঃ) পড়িয়া শুনাইতেন হযরতকে, আবার হযরত পড়িয়া শুনাইতেন জিব্রিলকে। প্রত্যেক রমজানেই এইরূপ করিতেন—এমনকি যে বৎসর রসুলুল্লাহ (দঃ) এন্তেকাল করেন সেই বৎসর সম্পূর্ণ কোরআান শরীফ দুইবার দওর করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছের এই অংশই অত্র পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, অহী সংরক্ষণে কিরূপ বাহিক সুব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা রাখিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআান অহীরই প্রধান বস্তু।

সমস্ত জগতকে নূতন জীবনের ও নূতন আলোকের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। এই তথ্যটি কোন এক কবি কি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।

در فشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

অর্থাৎ রসুলুল্লার ফয়েজ ও শিক্ষা সমূহ কি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিল যে, তিনি বিন্দুকে সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানে ও গুণে নগণ্য বিন্দুবৎ ছিল তাহাদিগকে তিনি সাগর সমতুল্যরূপে গড়িয়াছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে আলোকপূর্ণ ও অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে তিনি শুধু জীবিতই নহে—জীবনদাতারূপে গঠন করিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরাই পথ পথভ্রষ্ট—তাহাদিগকে তিনি গঠন করিয়াছিলেন সারা জগতের পথ প্রদর্শক ও পরিচালকরূপে।

আলোচ্য হাদিছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক সৃষ্টিজীব ও সৃষ্টবস্তু যেরূপ বসন্তের সুশীতল মলয় বায়ুর দ্বারা জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আধ্যাত্মিক ফয়েজের সামান্য ছিটা ফোটার দ্বারা তার চাইতে অধিক জীবনীশক্তি জগদ্বাসী লাভ করিয়াছে ও কেয়ামত পর্যন্ত তাহা লাভ করিতে থাকিবে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন এই দুনিয়াতে ছিলেন তখন তাঁহার ছোহবত ও সাহচর্য্য দ্বারা এবং মজলিসের দ্বারা এই ফয়েজ বিতরিত হইত। উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাত্রসমূহ তদ্দারা ফজিলত ও ফুলিত হইত। হানযালা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী একদিন হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া এই অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ বর্ণনা করিয়াছেন। হানযালা (রাঃ) হযরতের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার ছোহবতে ও সাহচর্য্যে যখন আমরা থাকি তখন আমাদের মনের এমন অবস্থা হয় যে আমরা আল্লাকে, আখেরাতকে এবং বেহেশত-দোজখকে যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যখন আপনার দরবার হইতে উঠিয়া স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যাইয়া মিশি তখন আর দেলের ঐরূপ অবস্থা থাকে না; ঈমানের আভা যেন কম হইয়া যায়। এরূপ পরিবর্তনের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। হযরত বলিলেন—আমার মজলিসে তোমাদের দেলের যে অবস্থা হয় ঐ অবস্থা সব সময় থাকিলে তোমরা এত উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে যে, ফেরেশতাগণ রাস্তাঘাটে এবং তোমাদের শয়ন-শয্যায় তোমাদের সঙ্গে মোছাফাহা করিতেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এন্তেকালের পর এই নেয়ামত হইতে দুনিয়া মাহরূম হইয়া গিয়াছে। কারণ, এই মোবারক দরবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এই

সেই মোবারক নজরও উঠিয়া গিয়েছে। আনাস (রাঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমরা হযরত রসুলুল্লার (দঃ) দাফন কার্য্য সমাধা করিতে না করিতেই আমাদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হইয়াছে। ছাহাবী আনাসের উক্তির অর্থ এই নয় যে, ছাহাবীগণের ঈমা- পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। না, না, ঈমানের জ্যোতি ও আভার উপর কিঞ্চিৎ মলিনতা আসিয়া গিয়াছে এই কথাটিই মাওলানা রুমী এইভাবে বুঝাইয়াছেন :—

گر زباغ دل خلالے کم بود — بر دل سالك هزاراں غم بود

অর্থাৎ আল্লার আশেক যাঁহারা তাঁহাদের অন্তর-উদ্যান হইতে একটি মাত্র তৃণ কমিয়া গেলেই তাঁহারা অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়েন যে, হায়! আমাদে ঈমান বুঝি নষ্ট হইয়া গিয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান নষ্ট হয় না। ঈমানের আভা ও জ্যোতি কিছু কমিয়া যায় মাত্র।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ফয়েজ তাঁহার পর তাঁহার প্রদত্ত কোরআন হাদীছের এলেমের ও আলেমের মাধ্যমে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا وَاَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ -

অর্থাৎ আল্লার চেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আর কেহ নাই। তারপর মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আমি। আমার পরে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা সেই আলেম ব্যক্তি যিনি এলেম হাসিল করিয়াছেন এবং দুনিয়ায় মত্ত না হইয়া সেই এলেম প্রচার ও প্রসারেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এই বিষয়টিই মাওলানা রুমী এইরূপে বুঝাইয়াছেন :—

چونکه خورشید رفت و ما را کرد داغ - چاره نبود در مقامش از چراغ
چونکه گل رفت و گلستاں شد خراب - چاره نبود در مقامش از گلاب

অর্থাৎ সূর্য্য যখন আমাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া অস্তমিত হইয়া যায় তখন চেরাগ জ্বালাইয়া কিঞ্চিৎ আলো হাসিল করা ব্যতিরেকে আমাদের আর গত্যান্তর থাকে না। গোলাপ ফুল যখন দুনিয়াতে পাওয়া যায় না এবং গোলাপ ফুলের উদ্যান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন গোলাপী আতর ও গোলাপের পানি হইতে সুগন্ধি লাভ করা ব্যতিরেকে গোলাপ ফুলের সুগন্ধি হাসিল করার অন্য কোন উপায় থাকে না। এইরূপ নবী (দঃ) যখন দুনিয়াতে নাই, নবীর মজলিস নাই, নবীর দৃষ্টি নাই, তখন নবীর খাঁটি নায়েবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের মজলিসে নবীর বাণী শ্রবণ করা ব্যতিরেকে মানব মুক্তির অন্য কোনও পথ নাই।

৬। হাদীছ :—* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—আবু সুফিয়ান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, † ছোলেহ্-হোদায়বিয়ার + পর তিনি বাণিজ্য করিতে সিরিয়া দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মক্কার কাফের কোরায়েশ দলের আরও অনেক সওদাগর ছিল। তিনি বলেন, এই সময় হঠাৎ একদিন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। হেরাক্লিয়াস তখন ইলিয়া শহর (বায়তুল-মোকাদ্দাসে) আসিয়াছিলেন। ‡ সেখানে তিনি দরবার সাজান এবং দরবারে তাঁহার পরিষদবর্গের সম্মুখে একসঙ্গে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান; দোভাষীর মারফৎ কথাবার্তা হয়। হেরাক্লিয়াস দোভাষী মারফৎ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশে যে লোকটি নবুয়তের দাবী করিতেছেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় আপনাদের মধ্যে কেহ আছেন কি? যদি থাকেন, তিনি কে? আবু সুফিয়ান বলেন—আমি বলিলাম, হাঁ আছে, আমিই তাঁহার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হেরাক্লিয়াস তখন আমার সম্বন্ধে বলিলেন, এই লোকটিকে আমার নিকটে বসাও এবং তাহার অন্যান্য সাথীদিগকে তাহার নিকটবর্তী পিছনে বসাও। তারপর হেরাক্লিয়াস দোভাষীকে বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে) বল, আমি ইহার নিকট (আবু সুফিয়ানের নিকট) নবুয়তের দাবীদার লোকটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি কোন কথা মিথ্যা বলেন, তবে আপনারা তাহার

---

* এই হাদীছখানার তরজমা মদীনা শরীফে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে—রওজা সংলগ্ন "রওজাতুম মিন্ রিয়াজিল জান্নাহ"তে বসিয়া লেখা হইয়াছে।

† আলোচ্য ঘটনাটি যখন সংঘটিত হইয়াছিল তখন আবু সুফিয়ান কাফের ছিলেন কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মোসলমান অবস্থায় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

+ ষষ্ঠ হিজরীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবা সঙ্গে লইয়া "ওমরা" করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর মক্কার নিকটবর্তী "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে কোরায়েশগণ কর্তৃক তিনি মক্কায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধের হুঙ্কার শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ একটি মীমাংসায় উপনীত হইয়া দশ বৎসরের মেয়াদে একটি সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি চুক্তিই ইতিহাসে "ছোলেহ-হোদায়বিয়া" নামে পরিচিত। ইহার বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তৃতীয় খণ্ডে রসুলুল্লার জেহাদ সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণে বর্ণিত হইবে। ছোলেহ-হোদায়বিয়ার দ্বারা শান্তি হইয়া কোরায়েশদের জন্য সিরিয়ার বাণিজ্য পথে মোসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট অবরোধ দূর হইল এবং তাহারা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরারম্ভ করিল।

‡ রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছিল। রোম সম্রাট খৃষ্টান হেরাক্লিয়াস মান্নত মানিয়া ছিলেন যে, যদি রোমানগণ এই যুদ্ধে জয়ী হয় তবে তিনি পদব্রজে পবিত্র ইলিয়া (বায়তুল মোকাদ্দাস) জেয়ারত করিবেন। যুদ্ধে রোমানগণ জয়ী হইলে সম্রাট হেরাক্লিয়াস বায়তুল মোকাদ্দসে উপস্থিত হন।

মিথ্যাটুকু আমাকে ধরাইয়া দিবেন। আবু সুফিয়ান (এখন মোসলমান অবস্থায়) বলিতেছেন যে, খোদার কসম—যদি তখন আমার সঙ্গীগণ কর্তৃক আমি মিথ্যাবাদীরূপে প্রচারিত হওয়ার লজ্জা আমাকে বাধা প্রদান না করিত তাহা হইলে আমি রোম সম্রাটের নিকট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অবশ্যই মিথ্যা বলিতাম। (তাঁহার মিশনকে ব্যর্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়িতাম না।)

হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর :

হেরাক্লিয়াস—এই লোকটির জন্ম কিরূপ বংশে ?

আবু সুফিয়ান—তাঁহার জন্ম অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে।

হেরাক্লিয়াস—এইরূপ কথা অর্থাৎ নবুয়তের দাবী আপনাদের বংশে তাঁহার পুর্বে অন্য কেহ করিয়াছেন কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার দলভুক্ত হয় বেশী, না—গরীব জনসাধারণ ?

আবু সুফিয়ান—গরীব জনসাধারন।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার দলের লোক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, না—কমিতেছে ?

আবু সুফিয়ান—কমিতেছে না, বরং ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়িতেছে।

হেরাক্লিয়াস—কেহ তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্মের আভ্যন্তরীণ কোনও দোষ-ত্রুটি দেখিয়া সে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করে কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—নবুয়তের দাবী করিবার পুর্বে কখনও কি এই লোকটির কোন মিথ্যাবাদিতা আপনাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—এই লোক কি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ?

আবু সুফিয়ান—না।

কিন্তু আমরা সম্প্রতি একটি সন্ধিচুক্তি করিয়াছি; জানি না ঐ ব্যাপারে তিনি কি করেন।× (আবু সুফিয়ান বলেন,) এই কথাটুকু ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার মত সুযোগ আমি আর পাই নাই।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার (দলের) সঙ্গে আপনাদের কোনও যুদ্ধ হইয়াছে কি ? এবং হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে ?

× আবু সুফিয়ানা এখানে চুক্তিভঙ্গের যে আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রসুলুল্লার কোনও ত্রুটির দরুণ নহে বরং কোরায়েশগণই সন্ধির শর্তের বরখেলাফ রসুলুল্লাহ পক্ষীয় এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজ পক্ষীয় দলকে গোপনে সমর-সাহায্য করিয়া চুক্তিভঙ্গের সূচনা করে। আবু সুফিয়ান নিজেদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফলের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন।

আবু সুফিয়ান—হাঁ যুদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধে কখনও তিনি জয়ী হন, আমরা পরাজিত হই (যেমন বদরের যুদ্ধ)। কখনও আমরা জয়ী হই, তিনি পরাজিত হন (যেমন ওহোদের যুদ্ধ)।

হেরাক্লিয়াস—তিনি আপনাদিগকে কি কি আদেশ করিয়া থাকেন?

আবু সুফিয়ান—তিনি আমাদিগকে এই কাজসমূহের আদেশ করিয়া থাকেন—

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا

بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَبِوَفَاءِ الْعَهْدِ

وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَالصِّلَةِ ۝

১। এক আল্লার বন্দেগী কর, অন্য কাহারও পূজা করিও না, কাহাকেও আল্লার সহিত শরীক করিও না (—মানুষ-পূজা, মুর্ত্তি-পূজা, দেব-দেবীর পূজা, পীর-পয়গাম্বর পূজা ইত্যাদি করিও না) এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ কর।

২। নামায কায়েম কর। (ঐ তৌহিদকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করিতে কাহাকেও সেজদা না করিয়া এক আল্লাহকে সেজদা করতঃ নামায পড়।)

৩। যাকাৎ ❁ দান (করিয়া গরীবের উপকার) কর। (গরীবের প্রতি দয়ালু হও)।

৪। সত্যবাদী হও (মিথ্যা বলিও না, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বিশ্বস্ত প্রমাণিত হও)।

৫। সংযমী হও। (চরিত্রের সততা ও সতীত্ব রক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন-যাপন কামরিপু ও লোভরিপু দমন করিয়া যাবতীয় দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা বর্জন করিয়া চল)।

৬। আমানতের পূর্ণ হেফাজত করিয়া প্রত্যেকের হক নিজ দায়িত্ব স্থানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও (আমানাতে খেয়ানত বা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করিও না)।

৭। মানুষের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী হইও না, বরং প্রত্যেকের সাথে মধুর ব্যবহার দ্বারা মিল মহব্বত কায়েম রাখ। বিশেষতঃ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, মামু-ভাগ্নে, ফুফু-খালা এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, যাহাদের সহিত সকল সময় মেলামেশা ও উঠাবসা হইয়া থাকে তাহাদের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিও না; সর্বাবস্থায় তাহাদেব সহিত ভাল ব্যবহার দ্বারা পরস্পর মিল-মহব্বত কায়েম রাখিয়া চল।*

❁ الزكوة। বোখারী শরীফ ১৮৭ পৃষ্ঠায় وفاء العهد। ফতহুলবারীতে এবং اداء الامانة মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।

* আরবী ভাষায় الصلة। শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, এত দীর্ঘ অনুবাদ করিয়াও আমার মনে হইতেছে না যে, শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আবু সুফিয়ান বলেন—এই দশটি প্রশ্ন ও উত্তরের পর হেরাক্লিয়াস প্রতিটি উত্তরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোভাষীকে বলিলেন—তুমি বুঝাইয়া দাও যে, আমি প্রথম প্রশ্ন তাঁহার (রসুলুল্লাহ) বংশ সম্বন্ধে করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, তাঁহার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লার রসুলগণ উচ্চ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছি যে, ইতিপুর্বে আপনাদের মধ্যে এই দাবী কেহ করিয়াছে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি এরূপ কথা ইতিপুর্বে কেহ বলিয়া থাকিত, তবে আমি মনে করিতাম যে, লোকটি অন্যের অনুকরণ করিতেছে; অন্যের দেখাদেখি একটা কথা বলিতেছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার বাপ-দাদা পুর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ রাজা বাদশা ছিলেন কি না? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি তাঁহার পুর্বপুরুষের মধ্যে কেহ রাজা-বাদশাহ থাকিতেন তবে সন্দেহ করা যাইত যে, হয়ত তিনি তাঁহার বাপ-দাদার সিংহাসন লাভ করিতে চাহেন। চতুর্থ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, উক্ত লোকটি এই কথা বলার পুর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দাবী করার পুর্বে কখনও কোন কথায় তাঁহাকে আপনারা মিথ্যাবাদীরূপে পাইয়াছেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার ধারণা এই যে, যে লোক জীবন ভর মানুষের বেলায় মিথ্যা পরিহার করিয়া আসিয়াছেন তিনি যে হঠাৎ আল্লার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন ইহা অবান্তর। পঞ্চম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুগামী হইতেছে বেশী, না—গরীব জনসাধারণ? আপনি বলিয়াছেন যে, গরীব জনসাধারণ। আমার মন্তব্য এই যে, সাধারণতঃ গরীব জনসাধারণই প্রথমে সত্য নবীগণের অনুগামী হইয়া থাকে। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, না—কমিতেছে? আপনি বলিয়াছেন, বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা মন্তব্য এই যে, বাস্তবিক পক্ষে সত্য ধর্ম এবং সত্য ঈমানের ইহাই লক্ষণ যে, ক্রমান্বয়ে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে উহা পুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সপ্তম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কেহ সেই ধর্মের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় অপছন্দ করিয়া ধর্ম পরিত্যাগ করে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ঈমান ও সত্যিকারের ধর্ম যখন মানুষের অন্তঃস্থলে বদ্ধমুল হইয়া

আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার করা তাহাদের উপকার করা, বিপদে তাহাদের সাহায্য করা ইহা মানব চরিত্রের অতি উচ্চ স্তরের স্বভাব, ইহাকে স্বজন-তোষণ বলা যায় না। নিন্দনীয় স্বজন-তোষণ ও ঘৃণিত স্বজন-প্রীতির অর্থ এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মীয়ের মন রক্ষা করা। যেমন, রাষ্ট্রীয় আমানতের মাল বা পদ উপযুক্ত স্থানে ও যোগ্যতর ব্যক্তিকে না দিয়া নিজের অযোগ্য আত্মীয়কে দেওয়া। নিজের মাল আত্মীয়কে দেওয়া দুষণীয় নহে এবং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে নয়, বরং যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাপিয়া যদি কোন যোগ্যতম আত্মীয়কে রাষ্ট্রীয় পদ বা মাল দেওয়া তাহা হইলেও দুষনীও হইবে না।

যায়, তখন সে উহার এত আস্বাদ লাভ করে যে, সে আর তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। অষ্টম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, এই লোকটি বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্য নবীগণ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। নবম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, আপনাদের সঙ্গে তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি? আপনি বলিয়াছেন—যুদ্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধে কখনও তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, আবার কখনও পরাজিতও হইয়াছেন। আমার মন্তব্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থিব ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা জয়ী হওয়া পয়গাম্বরের কোন বিশেষত্ব নহে; বরং কষ্ট, সাধনা, তিতিক্ষা, পরাজয় ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া পরিণামে জয়যুক্ত হওয়াই তাঁহাদের সাধরণ নিয়ম। দশম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তিনি কি কি আদেশ ও নিষেধ করিয়া থাকেন? আপনি বলিয়াছেন যে, তিনি এক আল্লার বন্দেগী করিতে আদেশ করেন, কাহাকেও আল্লার শরীক করিতে নিষেধ করেন—(মূর্তি বা দেব দেবীর পূজা বা মানুষ পূজা করিতে নিষেধ করেন।) আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িতে, সত্যবাদী হইতে এবং বিশ্বস্ত, সদাচারী ও সংযমী হইতে পরোপকারী, সদয় ও সদ্ব্যবহারকারী হইতে বলেন। আমার মন্তব্য এই যে, আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন বাস্তবিকই যদি সে সব সত্য হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, এই ব্যক্তি অতি শীঘ্র আমার পায়ের তলার এই দেশ পর্য্যন্ত জয় ও অধিকার করিয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (অর্থাৎ আখেরী পয়গাম্বর—শেষ যামানার নবী) আসিবেন। কিন্তু আমার এই ধারণা ছিল না যে, তিনি আপনাদের আরববাসীদের মধ্য হইতে হইবেন।+ যদি আমি বুঝি যে, আমি তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিব, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিব। আর যদি আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ও সাহচর্য লাভ জোটে তবে তাঁহার পদ ধৌত করিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য প্রকাশ করার পর হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত পত্রখানা আনাইলেন এবং উহা পাঠ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পত্রখানা দেহ্ইয়া কল্বী নামক ছাহাবীর হাতে বোছরার* শাসনকর্তার মারফৎ হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানার ভাষা ও মর্ম এই ছিল:

+ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে আমাদের হজরত (দঃ) সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে সকল কথা বর্ণিত ছিল। কিন্তু পাদ্রিগণ আসল কিতাবের বর্ণনা ও শব্দাবলী পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। হেরাক্লিয়াস আসল কিতাবের প্রকৃত বর্ণনা দেখেন নাই। পরিবর্তিত বর্ণনা দেখিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, আখেরী পয়গাম্বর আরব দেশে পয়দা হইবেন।

* বর্তমান জর্দানের অন্তর্গত তৎকালীন একটি শহরের নাম বোছরা।

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ - سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ - اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ - فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْيَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

"বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহীম"

প্রেরক—আল্লার দাস, আল্লার নিয়োজিত ও প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ।

প্রাপক—রোমান জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি হেরাক্লিয়াস।

সম্ভাষণ—শান্তি তাহাদের জন্য যাহারা সত্য পথের অনুসারী। অতঃপর—

আমি আপনাকে ইসলামের আকুল আহ্বান জানাইতেছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন (স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আনুগত্য স্বীকার করুন)। তাহা হইলেই আপনি শান্তি (ও মুক্তি) লাভ করিতে পারিবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (পরকালের মুক্তি এবং ইহকালের রাজত্বের সম্মান ও সুখ ভোগ) দান করিবেন।* যদি আপনি আমার এই আহ্বানে সাড়া না দেন, তবে (আপনার পাপ ত আপনার থাকিবেই, তদতিরিক্ত) আপনার প্রজাবর্গ ও অনুচরবর্গের পাপের বোঝাও আপনার উপর পড়িবে। (আল্লাহ তাঁহার স্বীয় পবিত্র বাণীর মধ্যে নবী ও নবীর উম্মতগণের পক্ষ হইতে ফরমাইয়াছেন) হে কেতাবধারী জ্ঞানীগণ! আসুন; (সংস্কার পরিহার করিয়া ও স্থির মস্তিষ্ক লইয়া আমরা চিন্তা করি—) আপনাদের ও আমাদের মধ্যে (পার্থক্য কতটুকু?) যতটুকু ঐক্যমত ততটুকুর মধ্যে আমরা সকলে এক হইয়া যাই। আপনারাও নাস্তিক নন আমরাও নাস্তিক নই। আপনারাও সাকারবাদী

---

* হেরাক্লিয়াস নাছরানী ছিলেন। ইহুদী বা নাছরানী ইসলাম গ্রহণ করিলে হাদীছ অনুযায়ী সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনুকরণ করিয়া অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে কারণেও তিনি অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবেন।

মূর্তিপুজক বা দেব-দেবীর পূজারী নন—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী এবং আমরাও সাকারবাদী নই, মূর্তিপুজক বা দেব দেবীর পূজারী নই—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী। আসুন আমরা সকলে একত্র ও একতাবদ্ধ হইয়া এক নিরাকার খোদার বন্দেগী করি; এক খোদার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরীক না করি; এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও—কোন মানুষকে বা কোন সৃষ্ট পদার্থকে আমরা খোদা রূপে গ্রহণ না করি। (মুখের কথায় বা অন্যকে বুঝাইতে অনেকেই সততার পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু যাহার মধ্যে কার্য্যতঃ ও স্বার্থের বিপক্ষে সততা পাওয়া যায় সে-ই প্রকৃত মানুষ। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে,) তোমাদের আন্তরিক আহ্বানেও যদি তাহারা সাড়া না দেয়, তবে খবরদার! তোমরা যেন স্রোতে ভাসিয়া না যাও। একতা লাভ করিতে গিয়া মূলমন্ত্র যেন ভুলিয়া না যাও। যদি তাহারা তোমাদের এই সরল সত্য ডাকে সাড়া না দেয় তবে তোমরা (আদৌ কোনরূপ ভয়, দুর্বলতা বা হীনমন্যতা—Inferiority complex নিজেদের মধ্যে আসিতে দিও না।) দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা কিন্তু অটল অনড়—এক খোদারই উপাসক এক খোদারই আনুগত্য স্বীকারকারী।

আবু সুফিয়ান বলেন—হেরাক্লিয়াস যখন তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং পত্র পড়া শেষ হইল, তখন লোকদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল ও হৈ হোল্লা পড়িয়া গেল। (আর কোন কথা হইতে পারিল না;) আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে আসিয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম ওহে! আমার মনে হয় আবু কাবশার পুত্রের+ (মনোবাঞ্ছা যেন পুরা হইয়া যাইবে,) তাঁহার মিশন এত শক্তিশালী হইয়াছে যে, শ্বেতাঙ্গদের রাজা রোম সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করে। আবু সুফিয়ান বলেন—সেই দিন হইতেই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে মোহাম্মদ (দঃ)-এর মিশন বিজয়ী ও সফলকাম হইবে—এমনকি মক্কাবিজয়ের সময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক ও সামর্থ দান করিলেন।

ইবনে নাতুর* হেরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা এবং প্রধান পাদ্রী ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত হেরাক্লিয়াসের বন্ধুত্বও ছিল। তিনি বলিয়াছেন—

+ রসুলুল্লার আদি পুরুষদের মধ্যে কোন একজন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম ছিল আবু কাবশাহ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার দুধ-বাপের এই নাম ছিল। মক্কার কাফেরগণ রসুলুল্লার প্রতি শত্রুতামূলক-ভাবে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই অপরিচিত লোকটির সহিত সম্পৃক্ত করিয়া রসুলুল্লাহকে অভিহিত করিত। "মোহাম্মদ" শব্দের অর্থ প্রশংসিত তাছাড়া কোরায়েশ বংশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির দ্বারা পরিচয় করাইলে রসুলুল্লার মর্য্যাদা বাড়িয়া যায় তাই তাহারা ঈর্ষা বশে রসুলুল্লাহকে ইবনে আবু কাবশাহ তথা আবু কাবশার বংশধর বা পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত।

* ইবনে নাতুর একজন প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হেরাক্লিয়াস যখন ইলিয়া (বায়তুল-মোকাদ্দাস) আসিয়াছিলেন, তখন একদিন সকাল বেলায় তাঁহাকে খুবই বিষন্নচিত্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখাইতেছিল। তখন দরবারের একজন পাদ্রী বলিলেন, আমরা আপনাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখিতেছি। (কারণ কি?) ইবনে নাতুর বলেন, হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যখন দরবারের লোকেরা চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আজ রাত্রে আমি জ্যোতিবিদ্যার গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, খত্নাধারী জাতির বাদশাহ জয়লাভ করিয়াছেন।† অতএব দেখা দরকার বর্তমান জাতি নিচয়ের মধ্যে কোন্ জাতি খত্না করে। দরবারের সকলেই বলিল, ইহুদী জাতি ভিন্ন অন্য জাতি খত্না করে না। কিন্তু ইহুদী জাতি এত দুর্বলচেতা, বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ যে, ইহাদের জন্য আপনি মোটেই চিন্তা করিবেন না। অবশ্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তাগণকে আপনি লিখিয়া পাঠান যে, ইহুদী জাতিকে যেন সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা হইতেছিল এমন সময় হেরাক্লিয়াসের দরবারে একজন লোককে উপস্থিত করা হইল যাহাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠাইয়াছিলেন; সেই লোকটি রসুলুল্লার খবর বলিতেছিল। সেই লোকটির নিকট যখন হেরাক্লিয়াস সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন দরবারের লোকদিগকে আদেশ করিলেন, দেখ—এই লোকটির খাত্না করান কি না? সকলে অনুসন্ধান করিয়া বলিল, হাঁ—সে খাত্না করানো এবং তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, আরবজাতি সকলেই খত্না করিয়া থাকে। অতঃপর হেরাক্লিয়াস বলিলেন, ইহারাই বর্তমান যুগের বাদশাহ। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ইহাদেরই বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে।

---

† হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তদ্বারাই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখা যায় কদাচিৎ উহার কোনও কোনটা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গেও খাপ খাইয়া যায়। যেমন, এই ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল—ঐ সময় কোরায়েশগণ রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে ছোলেহ-হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছোলেহ ও সন্ধিই রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা মোসলেম জাতির বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্বে কোথাও মোসলেম জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল না। হোদায়বিয়ার ঘটনাতে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় কোরায়েশগণ দলবদ্ধভাবে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায় স্বাধীন জাতি ও শক্তি হিসাবে মোসলমান জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। এখান হইতেই রসুলুল্লার (দঃ) তথা মোসলেম জাতির জয়ের সুচনা হয়। হেরাক্লিয়াস জ্যোতিবিদ্যার দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন পন্থীদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ পন্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ)র আবির্ভাব ও বিজয়বার্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেন কাহারও কোন ওজর আপত্তির সুযোগ না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা অনেক গ্রহ-নক্ষত্রকে নানারূপ পরিবর্তন ও বিষয় বস্তুর আবির্ভাবের আলামত ও নিদর্শন বা কার্যকারণ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন গ্রহ নক্ষত্রের এই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তারপর হেরাক্লিয়াস রোম শহরে তাঁহার জনৈক বন্ধু—তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে হেরাক্লিয়াস সমতুল্য বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখিলেন এবং ইলিয়া হইতে হেমছ শহরে গমন করিলেন। হেমস শহরে থাকা অবস্থায়ই রোমের সেই বন্ধুর উত্তর পাইলেন। উত্তরে তিনি হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে একমত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, আখেরী যমানার নবী আবির্ভূক্ত হইয়াছেন এবং আরবের তিনিই সেই নবী।

অতঃপর হেমস শহরেই হেরাক্লিয়াস রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া আনিলেন, একটি দ্বিতল রাজপ্রাসাদের চত্বরে তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া বাহিরে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস উপরতলা হইতে লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে রোমবাসিগণ। যদি ইহ-পরকালের মুক্তি ও মঙ্গল চাও এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা কর, তবে তোমরা এই নবীর হাতে 'বায়আত'—দীক্ষা গ্রহণ কর; তাঁহার আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হইয়া যাও। মাত্র এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবারস্থ লোকগণ জংলী গাধার ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বহির্গমনের জন্য ছুটিয়া চলিল, কিন্তু দরওয়াজাসমূহ বন্ধ থাকায় তাহারা বাহির হইতে পারিল না; যেহেতু পূর্ব হইতেই এই ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেরাক্লিয়াস এই

প্রভাবকে আল্লাহ তায়ালা চাক্ষুস প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন—যেমন সূর্য্যের তাছির ও কার্য্যকারিতায় দিবা-রাত্রির আবর্তন ঘটে ও ঋতুর পরিবর্তন হয়, চন্দ্রের তাছিরে জোয়ার ভাটা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অনেক গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা জাগতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ রাখিয়াছেন। কোনও একজন পয়গাম্বরকে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয় বিস্তারিত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু পূর্বেই এই বিদ্যার আসল বিষয় বস্তুগুলি জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায়। পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণ এ বিষয় তাহাদের জ্ঞানের দাবী করে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। কারণ, আসল বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সঠিকভাবে গণনা করার ক্ষমতা কাহারও হইতে পারে না। তাই অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় জ্যোতিষীদের গণনা শতকরা নিরানব্বইটাই মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত হয়। আন্দাজে ঢিল ছোড়ার ন্যায় কোনও একটা হয়ত লক্ষ্য বস্তুতে লাগিয়া যায় এবং প্রচারের সময় ঐ একটাই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তা-ছাড়া এসব বিষয়ের চর্চায় সাধারণ্যে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর ধারণার সূত্রপাত এই হয় যে, জাগতিক পরিবর্তন ও সাধারণ ঘটনা সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত নগণ্য সৃষ্ট পদার্থগুলির অপরিহার্য্য প্রভাব, শক্তি, ক্ষমতা ও দক্ষতার ধারণাই মনের কোণে জাগিয়া উঠে। এরূপ ধারণা শেরেক ও কুফুরী। এক হাদীছে আছে—"কোন এক রাত্রে বৃষ্টিপাত হইল, আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক এই বৃষ্টির ব্যাপারে কাফের সাজিবে—তাহারা বলিবে যে, "অমুক নক্ষত্রের দ্বারা বৃষ্টিপাত হইয়াছে"। প্রচলিত জ্যোতিবিদ্যায় এরূপ অত্যাধিক ভুল, মিথ্যা ও শেরেক এবং কুফুরীর সূত্রসমূহ বিদ্যমান থাকায় উহা শিক্ষা ও বিশ্বাস করা শরীয়তে একেবারে হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

দৃশ্য দর্শনে লোকদের ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গেলেন। (তিনি নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইলেন যে, রসুলুল্লার প্রতি তাঁহার যে, ভাবের উদয় হইয়াছে এবং যেই ভাবাবেগের ফলে তিনি পূর্ব মন্তব্যসমূহ করিয়াছিলেন সেই ভাবের উপর চলিতে থাকিলে তাঁহার হাতে রাজত্ব থাকিবে না। তাই তিনি রাজত্বের লোভে ও ক্ষমতার মোহে তাঁহার সেই উপস্থিত ভাবকে বিসর্জন দিয়া দেশবাসীকে যেই সত্য কথা বলিয়াছিলেন উহার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন।) তিনি পুনঃ লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ওহে! আমি তোমাদিগকে ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছি তদ্বারা তোমাদের নিজ ধর্মের উপর কতটুকু আস্থা ও দৃঢ়তা আছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছি। সেমতে আমি দেখিতেছি, স্বীয় ধর্মের প্রতি তোমাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং সমবেতভাবে তাঁহাকে সেজদা করিয়া চলিয়া গেল। এই ছিল হেরাক্লিয়াসের শেষ অবস্থা।✿

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—অধুনা অনেকেই এই বিষয়টি বুঝিতে মারাত্মক ভুল করিয়া থাকে। অর্থাৎ হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি যে প্রকাশ্য আহ্বান জানাইলেন যে, যদি তোমরা ইহ-পরকালের মুক্তি কামনা কর, তবে এই নবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর। এতদসত্ত্বেও হেরাক্লিয়াস মোমেন ও মুসলমান বলিয়া গণ্য হন নাই। এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, (এই ঘটনার

✿ এখানে একই ঘটনার তিনটি খণ্ড উল্লেখ করা হইয়াছেঃ (১) আবু সুফিয়ানের বর্ণনা (২) ইবনে নাতুরের বর্ণনা (৩) হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপ। একই ঘটনা প্রবাহের এই তিনটি অংশ। এখানে একটি কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত আরববাসী লোকটি ও দেহ্ইয়া কালবী নামক পত্রবাহক ছাহাবী একই ব্যক্তি। তদ্রূপ গাসসানের শাসনকর্তা বোছরার শাসনকর্তাও একই ব্যক্তি। পূর্ণ ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এই যে, সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইলিয়া শহরে থাকাকালীন অবস্থায় জ্যোতিবিদ্যার দ্বারা খত্‌নাধারী জাতির বাদশার জয় অনুভব করিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনায় রত ছিলেন। এদিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পত্রখানা লইয়া আরবাসী দেহ্ইয়া কালবী বোছরায় নিযুক্ত গাসসান কবিলার শাসনকর্তা মারফত তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন, তখন দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা ঘটিল। হেরাক্লিয়াস তখন পত্র প্রেরকের পরিচয় মোটামুটি জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হাল হকিকত পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য পত্র খুলিয়া পাঠ করিবার পূর্বেই আবু সুফিয়ানের দলকে ডাকা হয় এবং প্রথম বর্ণিত ঘটনা ঘটে। হট্টগোলের ভিতর দিয়া হেরাক্লিয়াসের দরবার ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কথা জনসাধারণ গ্রহণ করিবে না। তাই তিনি রোম নিবাসী নাছারাদের প্রসিদ্ধ আলেম সর্বশ্রেষ্ঠ পাদ্রীর নিকট বিস্তারিত বিষয় লিখিয়া চিঠি দিলেন এবং ইলিয়া ত্যাগ করিয়া দেশের বিশিষ্ট শহর হেমসে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া ঐ পাদ্রীর নিকট হইতে উত্তর পাইলেন। পাদ্রীকে তাঁহার সহিত একমত দেখিয়া দেশবাসীকে এই সত্য নবীর আনুগত্যের আহ্বান জানাইবার সাহস করিলেন এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইল।

আনুমানিক দুই বৎসর পর) তবুকের যুদ্ধের সময় হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি নিজেকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিয়া বলিয়াছেন—

كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على نصرانيته

'মিথ্যাবাদী খোদার দুষমন। ধোকাবাজী করিয়াছে; সে কস্মিনকালেও মুসলমান নহে; বরং সে এখনও নাছরানী ধর্মের উপরই রহিয়াছে। এখানে অনেকের মনেই প্রশ্ন উদয় হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি এত সুন্দর মর্য্যাদাপূর্ণ সম্মানসূচক মন্তব্যকারী হেরাক্লিয়াসের ন্যায় ব্যক্তি মুসলমান বলিয়া গণ্য হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইসলাম ও ঈমানের পূর্ণ হাকিকত ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

ঈমানের হাকিকত বা তাৎপর্য্যঃ

মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান ও বিবেক বস্তুই নহে—বরং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুও আছে। যাঁহারা সাধনা করিয়া সংযম অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের দ্বারা রিপুকে জয় করিতে পারেন তাঁহারাই মানুষ হইতে পারেন; নতুবা শুধু জ্ঞান অর্জনের দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। হেরাক্লিয়াস ইতিপূর্বে আসমানী কেতাবের বা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে ভাবাবেগ বশতঃ যাহা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন তাঁহার মূলে শুধু তাঁহার জ্ঞান ও পরিচয় লাভই ছিল। কিন্তু ঈমান রত্ন হাসিলের জন্য শুধু ভাবের উদয় ও জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, বরং উদীয়মান ভাব ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি, মোহ ও লালসা এবং সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কার ইত্যাদিকে বিসর্জন দিয়া ত্যাগ স্বীকার করতঃ পূর্ণভাবে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং জীবনের সর্বস্তরে সেই আনুগত্য প্রয়োগের প্রস্তুতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে ঈমানও হাসিল হয় না, মুক্তিও পাওয়া যায় না। স্বার্থোদ্ধার বা স্বার্থহানির অপচিন্তা কিম্বা সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কারের মোহ ইত্যাদির সংঘর্ষের সময় নফছের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার এবং মনে-প্রাণে সেই আনুগত্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে যে ঈমান হাসিল হয় না তাহার প্রমাণ কোরআন শরীফেই পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে—يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ অর্থাৎ—"ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাহাদের রসুলুল্লার পরিচয় ও জ্ঞান এরূপ হাসিল রহিয়াছে যেরূপ তাহাদের স্বীয় সন্তান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিচয় হাসিল আছে।"

কিন্তু যেহেতু তাহারা এই পরিচয় ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নাই, তাই তাহারা ঈমানদার গণ্য হয় নাই—কাফেরই রহিয়া গিয়াছে।

হেরাক্লিয়াসের জ্ঞান ছিল, ভাবাবেগও অত্যধিক ছিল, কিন্তু স্বার্থের অর্থাৎ রাজত্বের চিন্তা ছিল ততোধিক। যদি তিনি এই স্বার্থের লোভ ও রাজত্বের মোহকে সত্যের

খাতিরে ত্যাগ করিতে পারিতেন তবেই তিনি মুক্তি পাইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে, রাজত্ব চলিয়া যাইবে, তখনই তিনি উদীয়মান ভাবকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং কথাবার্তার মধ্যে "যদি আমি বুঝি" ইত্যাদি দুর্বলতাসূচক ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্বউদিত ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিলেন এবং দেশবাসীকে যে সত্যের ডাক শুনাইয়াছিলেন উহার বিকৃত অর্থ করিয়া অবিচলিত চিত্তে সত্যধর্ম গ্রহণ করার মত সৎসাহস হইতে বিরত রহিলেন। কাজেই তিনি ইসলাম ও ঈমান রত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে অবিচলরূপে অকাতরে এবং নির্ভয়ে সত্যকে গ্রহণ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হেরাক্লিয়াসেরই বন্ধুর ঘটনায় সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়; যাহা ছিল প্রকৃত ঈমান।

হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনা:

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, রোম শহরে হেরাক্লিয়াসের এক বন্ধু ছিলেন, যাঁহার নিকট হেরাক্লিয়াস সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই বন্ধুটির নাম ছিল "জাগাতের"। হেরাক্লিয়াস তাঁহার নিকট পত্র লিখার পর পত্রবাহক ছাহাবী দেহ্ইয়া (রাঃ)কে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, রোম শহরে একজন বড় পাদ্রী আছেন তাঁহার নাম জাগাতের। রোমবাসীগণ তাঁহার অত্যধিক অনুগত। আপনি তাঁহার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা নিয়া উপস্থিত হউন। তিনি রোমবাসীগণকে আহ্বান জানাইলে আশা করা যায় তাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। দেহ্ইয়া (রাঃ) পত্রখানা লইয়া জাগাতের নিকট উপস্থিত হইলেন। জাগাতের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা পাঠ মাত্র রসুলুল্লার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তাঁহার মন-প্রাণ ভরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি খৃষ্টানী পোষাক ত্যাগ করিয়া নূতন পোষাক পরিধান করতঃ কোনরূপ ইতস্ততঃ ব্যতিরেকে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান পূর্বক খোলাখুলি ভাবে রোমবাসীদিগকে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। রোমবাসীগণ সংস্কারাচ্ছন্ন থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহারে মারিয়া ফেলিল দেহ্ইয়া (রাঃ) হেরাক্লিয়াসের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জাগাতেরের সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হেরাক্লিয়াস উহা শুনিয়া বলিলেন, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমার ভয় হয়, ইসলাম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানগণ আমাকে মারিয়া ফেলিবে। দেখুন জাগাতের রোমবাসীদের নিকট আমার তুলনায় অধিক শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তবুও তিনি বাঁচিতে পারিলেন না। (ফতহুল-বারী ১—৩৬)

আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা:

দেহ্ইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রোমবাসীগণ হেরাক্লিয়াসের দরবার হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং একজন প্রধান পাদ্রীকেও ডাকাইয়া আনিলেন।

সমস্ত রোমবাসীদের উপর এই পাদ্রীর অতিশয় প্রাধান্য, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা দেখা মাত্রই বলিলেন—ইনিই সেই আখেরী যামানার নবী যাঁহার শুভাগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা (আঃ) দিয়াছিলেন। যে যাহাই বলুক, অথবা আমাকে মারিয়া ফেলুক, আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিবই এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার অনুসরণ করিবই। হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আমি এইরূপ করিলে ত আমার রাজত্ব থাকিবে না। তখন ঐ পাদ্রী পত্রবাহক দেহ্‌ইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই পত্রদাতা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁহার খেদমতে আমার সালাম পেশ করিয়া এই সংবাদ দিবেন যে, আমি "আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" পড়িয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছি। রোমবাসী আমার কথা মানে নাই। এই বলিয়া তিনি রোমবাসীকে সত্য ধর্মের আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। (ফতহুল-বারী ১—৩৬)

পাঠকবৃন্দ। লক্ষ্য করুন, "জাগাতের" ও এই পাদ্রী স্বীয় প্রাধান্য, মান-সম্মান, ভয় ভীতি বা সংস্কার ইত্যাদির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইসলাম গ্রহণ-পূর্বক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনুগত্য মানিয়া লইতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করিলেন না, ইহাকে বলে প্রকৃত ঈমান। হেরাক্লিয়াস কিন্তু এইরূপ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্বদাই "রাজত্ব চলিয়া যাইবে" এই ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি পত্রবাহক দেহ্‌ইয়া (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—আমি জানি যে, তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য নবী, কিন্তু আমি আমার দেশবাসীকে ভয় করি, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে এবং আমার রাজত্ব চলিয়া যাইবে, নতুবা আমি তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিতাম। (ফতহুল-বারী ১—৩১)

হেরাক্লিয়াসের অবস্থা এই ছিল যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমুহের প্রমাণাদি ও জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শনাবলীর প্রভাবেই তাঁহার অন্তরে ঐ প্রকার ভাবাবেগের উদয় হইয়াছিল। পরন্তু তিনি ইচ্ছাকৃত কিছুই করেন নাই, পক্ষান্তরে তিনি ঐ স্বউদিত ভাবকে চাপিয়া রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনাও করিয়াছিলেন। (ফতহুল-বারী ১— ৩১)

এতদ্ভিন্ন ৯ম হিজরী সনে যে, স্বয়ং নবী (দঃ) ত্রিশ সহস্র মোজাহেদ লইয়া তবুকের জেহাদে প্রায় তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন উক্ত জেহাদের প্রতিপক্ষ মূলতঃ রোমান-বাহিনীই ছিল। এবং তখনও রোমের শাসনকর্তা এই হেরাক্লই ছিল; সে মদীনা আক্রমণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

নবী (দঃ) ঐ পরিস্থিতিতেও তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়া দ্বিতীয় আর এক-খানা পত্র এই দেহ্‌ইয়া (রাঃ) মারফৎই পাঠাইয়াছিলেন। তখনও তিনি অম্লান চিত্তে

ইসলাম গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি নবীজীর পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, "ইন্নী মোছলেমোন"—অর্থাৎ আমি ইসলাম গ্রহণকারী হইয়াছি। কিন্তু নবী (দঃ) তাঁহার এই দাবীকে মোনাফেকী সাব্যস্ত করাপূর্বক বলিয়াছিলেন, كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على نصرانيته—আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে, সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরং সে খৃষ্টানই রহিয়াছে। (ফতহুল বারী ১—৩১)

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুফল ঃ

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার অতি প্রিয় মাহবুব; তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিফল যায় না। তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষাকারীকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দিয়া থাকেন; সে কাফের হইলে চির জাহান্নামী হওয়া হইতে অব্যাহতি পায় না, কিন্তু জাহান্নামে আজাব ভোগ অবস্থায়ও উহার ফল ভোগ করিতে পারে। যেমন, আবু লাহাবের ন্যায় মৃত কাফের যাহার চিরআজাবগ্রস্ত হওয়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত; সে প্রতি সোমবারে তাহার দুইটি অঙ্গুলীর মধ্য হইতে শীতল পানীয় পাইয়া থাকে, শুধু এই জন্যে যে, হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদে আনন্দিত হইয়া সুসংবাদ প্রদানকারিণী ক্রীতদাসীকে ঐ দুইটি অঙ্গুলীর ইশারা করতঃ মুক্তি দিয়াছিল।

হেরাক্লিয়াস স্বীয় দোষে ঈমান হইতে মাহরূম ও বঞ্চিত রহিয়াছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চিঠিকে সে সম্মান করিয়াছিল, তজ্জন্য শুধু তাহাকেই নয়, তাহার বংশধরকেও আল্লাহ তায়ালা উহার সুফল প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হেরাক্লিয়াস কর্তৃক তাঁহার পত্রের সম্মান প্রদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ثبت الله ملكه "আল্লাহ তাহার রাজ্যকে কায়েম রাখুন।" আল্লার প্রিয় নবীর এই আশীর্বাদ বাণী বৃথা যায় নাই। বরং এই সৎকার্য্যের ফলেই রোমানদের রাজ্য ধ্বংস হয় নাই, বহুকাল তাহাদের মধ্যে রাজত্ব চলিয়াছিল। কারণ তাঁহার ঐ পত্রখানাকে রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া সোনার সিন্দুকে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল এবং বংশ পরম্পরায় তাহারা একে অন্যকে এই অছিয়ত করিয়া যাইত যে, এই পত্রখানা বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিও। যাবৎ ইহা আমাদের হাতে থাকিবে তাবৎ আমাদের রাজত্ব কায়েম থাকিবে। পক্ষান্তরে পারস্য সম্রাট হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রের অবমাননা করিয়াছিল, রাগান্বিত হইয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ শুনিয়া বদ দোয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলুন।" ফলে অল্পকালের মধ্যেই পারস্য সম্রাট সবংশে জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। (ফতহুলবারী)

— — ● — —

প্রথম অধ্যায়

ঈমান

পাঁচটি মৌলিক জিনিসের উপর ইসলাম ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। উহাদের মধ্যে সর্ব প্রধান হইতেছে 'ঈমান'। ঈমান কাহাকে বলে?

আল্লার নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা কিছু বহন করিয়া আনিয়া কোরআনরূপে এবং হাদীছের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করিয়াছেন ঐ সবকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকার করিয়া কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত থাকাকে 'ঈমান' বলে। অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া মুখে স্বীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার সমুদয় আদেশ নিষেধগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে পরিণত করার নাম ইসলাম। সমস্ত আদেশ নিষেধগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার সৌকর্য্য এবং আন্তরিক বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতিফলনের তারতম্য অনুপাতে ঈমানের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই উন্নতি ও অবনতির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ ছাড়া ঈমানের বহু শাখা প্রশাখাও আছে। যেমন—আল্লার প্রিয় ব্যক্তি, বস্তু ও কার্য্যকে ভালবাসা এবং আল্লার অপ্রিয় যাবতীয় বস্তুকে অপছন্দ করা ঈমানের একটি শাখা। স্বীয় চরিত্রে ঐ শাখা-প্রশাখার উন্মেষ ও অস্তিত্বের কম বেশী হওয়ার দরুনও ঈমানের উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে।

আরবী ভাষায় ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু যে ঈমান মানব জাতির কল্যাণের উৎস এবং পরকালের নাজাত, মুক্তি ও সুখ-শান্তির একমাত্র পথ সে ঈমান শুধু মাত্র বিশ্বাসের নামই নহে। বরং সেই ঈমান-রত্ন বহু সাধনার ধন। সাধনা ব্যতিরেকে ঐ অমূল্য রত্ন হাসিলও হয় না, রক্ষিতও হয় না। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্যই বোখারী (রঃ) কয়েকজন মনীষীর কয়েকটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করিতেছেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের অনুরূপ খলীফা ও বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার আলজেরিয়াস্থ গভর্ণরকে একটি হেদায়েত-নামা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন—"নিশ্চয় জানিও ঈমানের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্য্যায়ের অনেকগুলি বিষয়বস্তু রহিয়াছে—(১) ফরয ও ওয়াজেবসমূহ, (যেগুলি অবশ্য করণীয়, যেমন—আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার করতঃ কলেমা পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাৎ দান করা, হজ্জ করা, দ্বীনের এলম শিখা, জেহাদ করা ইত্যাদি।) (২) মশরু" বা জায়েয বিষয়সমূহ (যেগুলির উপর মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে)। (৩) নির্দ্ধারিত সীমা সমূহ, (অনেক স্থলে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দেন নাই। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা সীমা নির্দ্ধারিত

করিয়া দিয়াছেন সেই সকল সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি মোটেই নাই। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চক্ষু দান করিয়াছেন এবং তদ্বারা জাগতিক কাজকর্ম দেখা ও আল্লার সৃষ্টি জগতের নৈপুণ্য দেখিয়া জ্ঞান আহরণ করার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তু দেখিতে পারিবে না। যেমন—অন্যের ছতর (গুপ্তস্থান) দেখা; বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। এইরূপে মানুষের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ও শক্তিকে পরিচালিত করিবার অনুমতি আল্লাহ তায়াল দিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ঐ নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা মহাপাপ) (৪) সুন্নাহ—অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার খোলাফায়ে-রাশেদীনের আদর্শসমূহ। (এই আদর্শসমূহ হইতে আদবকায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সাধনা, ভজনা, ও এবাদত বন্দেগীর জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রভৃতিকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ঐ পবিত্র আদর্শকে মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করা চলিবে না।) যাহারা ঈমানের অঙ্গ স্বরূপ উপরোক্ত চারিটি বিষয়-বস্তুকে পূর্নরূপে আয়ত্ব ও রক্ষা করিবে তাহাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা এইগুলিকে যত্ন ও সাধনার সহিত পূর্ণ না করিবে তাহাদের ঈমান অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব বুঝা গেল যে ঈমান কেবলমাত্র বিশ্বাসের নামই নহে; কর্মময় জীবনের অন্তহীন সাধনা ও প্রযত্ন উহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এ কথাও উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে—যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি ঈমানের এই সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দান করিব, যাহাতে জনসাধারণের পক্ষে উহা বুঝিতে ও তদনুযায়ী আমল করিতে সহজ হয়। আর যদি আমি মরিয়া যাই, তবে জানিয়া রাখিও—তোমাদের সংসর্গে থাকিয়া হুকুমত করার আদৌ কোন অভিপ্রায় আমার নাই।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন— لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

অর্থাৎ আমি আমার অন্তরের সমস্ত অছ্অছাহ্ (মানবীয় দুর্বলতা) দূর করতঃ একীন ও বিশ্বাসকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া ঈমানের উন্নতি সাধন করিতে চাই।

ছাহাবী মোয়ায (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতেন—ভাই! একটু বস; কিছুক্ষণ আমরা (দ্বীনের কথা, আল্লাহ ও রসুলের কথা আলোচনা করিয়া) ঈমানকে বর্দ্ধিত ও উন্নত করি।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিতেন—প্রতিবন্ধকতায় কর্মজীবন এবং ত্যাগ তিতিক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশের পরীক্ষার ভিতর দিয়া যে অটল বিশ্বাস প্রমাণিত হয় উহাই আসল পূর্ণাঙ্গ ঈমান। ঐরূপ বিশ্বাস ব্যতিরেকে শুধু মুখে বুলি আওড়ানো বা ভাবাবেগ প্রকাশের নাম ঈমান নহে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন—প্রত্যেক জিনিসেরই কোন না কোন গুণাগুণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকিবেই; এই সব গুণাগুণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই জিনিষটির পরিচয় হয়। সেমতে ঈমানেরও কতিপয় গুণ এবং প্রতিক্রিয়া আছে—উহা এই যে, ঈমানদার ব্যক্তির আল্লার উপর বিশ্বাস এবং ভয় ও ভক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, (আল্লার স্পষ্ট আদিষ্ট কাজগুলি ত করেই এবং নিষিদ্ধ কাজগুলিও চিরতরে বর্জন করে। এতদ্ব্যতীত) যে কোন কাজে বা কথায় তাহার মনে যদি সামান্য মাত্র খটকা বা সংশয়ের উদয় হয় যে, হয়ত এই কাজটি বা কথাটি পরিণামে আল্লার অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে বা ইহাতে আল্লার অনুমোদন না থাকিতে পারে, ঈমানের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাও সে বর্জন করিয়া চলে। মানুষের জীবনে এই অবস্থা যখন উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে এবং খাঁটী তাকওয়া তাহার হাসিল হয়। কোরআন শরীফের একটি আয়াতে আছে:—

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِیْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

অর্থ:—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মুছা ও ঈছাকে (এতদ্ভিন্ন সমস্ত পয়গাম্বরগণকে) একই ধর্ম এবং একই ঈমান ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদেশ করিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই মূল ধর্মকে সকলে ঠিক রাখ—ইহাতে বিভিন্ন মত পোষণ করিও না।

অন্য এক আয়াতে আছে:— لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

অর্থ:—তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন তরিকা ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিগত তৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন নবীগণের শরীয়তের ধর্ম পালনের পদ্ধতি ও প্রণালীর এবং ধর্মাচরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে হয়ত পার্থক্য আছে বটে; কিন্তু মূল ধর্মের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই। এক আল্লার দাসত্ব স্বীকার করতঃ একান্ত অনুগত হইয়া তাঁহার আদেশ পালনার্থে প্রতিযোগিতা করিয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়াই ঈমানের আসল মূল। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও আচরণের পার্থক্য স্বরূপ বলা যায়—যেমন নামায কায়েম করার হুকুম প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই ছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করার হুকুম হইয়াছে শুধু শেষ নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তে।

অন্য এক আয়াতে আছে:— قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّیْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ

অর্থ:—তোমরা যদি আমার প্রভু আল্লাহকে না ডাক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা না কর, তবে তাহাতে আমার প্রভুর কোনই ক্ষতি নাই।

আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এখানে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা (দোয়া) করাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ঈমান রত্ন কত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত এবং কত খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ঈমান শুধু বিশ্বাস করার নামই নহে।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর

৭। হাদীছ :— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔

অর্থ :—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত। (১) এক আল্লাহই মাবুদ, অন্য কোনও মাবুদ (পুজনীয়) নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল; ইহা প্রকাশ্য-ভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া লওয়া, (২) নামায পূর্ণরূপে আদায় করা, (৩) যাকাৎ দান করা, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার যে সমস্ত পন্থা আছে বা যত প্রকার নেক ও সৎকাজ আছে উহার প্রত্যেকটিই মূল ঈমানের শাখা প্রশাখা; অতএব, ঈমানের শাখা অনেক। ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে কোরআনের ছুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে মানব জাতির কল্যাণের ও সত্যিকারের মানুষ হওয়ার পন্থারূপে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি মোটামুটি কাজ আঙ্গুলের উপর গণনা করিয়া দিয়াছেন। সেই হিসাবে আয়াত ছুইটি অতি মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে উহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে করা হইতেছে। প্রথম আয়াত :—

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ۔

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ۔ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ

اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ۔ اُولٰٓئِكَ

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ۔

অর্থ :—প্রকৃত প্রস্তাবে নেক ও সৎকাজ এইগুলি :—(১) সর্ব প্রথমে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা দেল ও অন্তরকে ঠিক করিতে হইবে—(ক) আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া ভয় ও ভক্তির সহিত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আল্লাহই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতেই আমরা আসিয়াছি। (খ) আবার একদিন আমাদের সকলকেই আল্লার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে। চোখ, কান, হাত, পা, জ্ঞান, বুদ্ধি, আলো-বাতাস ধন-দৌলত ইত্যাদি যাহা কিছু নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, আমরা উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছি কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহার হিসাব দিতে হইবে। সেই শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের সদ্ব্যবহার করতঃ হিসাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। (গ) ফেরেশতাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা নিষ্পাপ, ত্রুটিহীন; কখনও আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করেন না, বা তাঁহাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা আল্লার বাণী পয়গাম্বরগণের নিকট অবিকলরূপে পৌছাইয়া দিয়াছেন, বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এবং ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। (ঘ) আল্লার কোরআনকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে. ইহার অন্তর্গত কোন একটি অক্ষরের মধ্যেও আদৌ কোনরূপ সন্দেহ দোষ বা ভুল-ত্রুটি নাই। (ঙ) আল্লার নবীগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা আল্লার প্রেরিত সম্পূর্ণ নিষ্পাপ মানুষ ও সত্য পথ প্রদর্শক ছিলেন। যে যুগের, যে দেশের বা যে জাতির জন্য যিনি নবী হইয়া আসিয়াছেন—সেই যুগের, সেই দেশের সমগ্র জাতি তাঁহাকেই আদর্শ পথপ্রদর্শকরূপে মানিয়া চলিতে হইবে, যেমন—কেয়ামত পর্য্যন্ত শেষ যুগের জন্য সমগ্র বিশ্বমানবের পয়গাম্বর হইলেন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলকে একমাত্র তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

(২) পার্থিব ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পত্তির দিকে স্বভাবগত ভাবে মানুষের মনের মায়া ও আকর্ষণ থাকা সত্বেও আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধন-সম্পত্তি যথাস্থানে দান করিতে হইবে। যথা—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগকে, (পিতৃহীন, কর্মশক্তিহীন অসহায়) এতিম বালক বালিকাদিগকে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদিগকে (যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও অভাব মোচনে অক্ষম) পথিকদিগকে, (যাহারা প্রবাসে অভাবে পড়িয়াছে), যাচ্ঞাকারী ভিক্ষুকদিগকে, (যে সব অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আতুর ইত্যাদি কর্মশক্তিহীনতার দরুণ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে।) এবং দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে, (তাহাদের মুক্তির জন্য) দান করিতে হইবে ❋

(৩) আল্লার নির্দেশিত এবং তাঁহার রসুলের (দঃ) প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী আল্লার দাসত্বের প্রতীক নামায কায়েম (পূর্ণাঙ্গে আদায় ও জারী) করিতে হইবে।

❋ এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যাকাৎ ভিন্ন এই সমস্ত দানের স্থান সমূহ বর্ণিত হইল। ইহার পর যথাস্থানে যাকাতের উল্লেখ হইয়াছে।

(৪) স্বীয় ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাৎ স্বরূপ দিতে হইবে।

(৫) অঙ্গীকার করিলে উহা রক্ষা করিতে হইবে। (আল্লার সহিত অঙ্গীকার বা মানুষের সহিত অঙ্গীকার—সমস্ত অঙ্গীকারই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে)।

(৬) ধৈর্য্যধারণের অভ্যাস করিতে হইবে। ভীষণ অভাবের তাড়নার সময়, দুর্বিসহ রোগ যাতনার সময় এবং শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি ভীষণ বিপদের সময়।

যাহারা এই সৎগুণাবলী অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই খাঁটী সত্যবাদী এবং তাহারাই প্রকৃত ঈমানদার ও মোত্তাকী পরিগণিত হইবে। (২ পারা ৬ রুকু)

দ্বিতীয় আয়াত:—(১৮ পারা ১ রুকু)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ط اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ - اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ - الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ - الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আটটি গুণ অর্জনের শর্ত উল্লেখে বলিতেছেন:

স্বীয় জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছে তাহারা—

(১) যাহারা (আল্লাহ ও আল্লার রসুলকে মান্য করিয়া কেয়ামতের হিসাব নিকাশ, বেহেশত-দোযখকে বিশ্বাস করিয়া) ঈমানদার হইয়াছে।

(২) যাহারা ভয় ও ভক্তির সহিত, আল্লার দরবারে কাকুতি-মিনতির সহিত নামায কায়েম করিয়াছে।

(৩) যাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা হইতে বিরত রহিয়াছে। (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, কর্মশক্তি, চলনশক্তি চিন্তাশক্তি, প্রভৃতি যে সব অমূল্য শক্তির সমারোহ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করিয়াছেন, ঐগুলিকে জীবনের স্থায়ী উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্যয় করিবে। অবনতির বা অনর্থক কাজে অপচয় করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে)।

(৪) যাহারা পবিত্রতা সাধন করিয়াছে। (আত্মার পবিত্রতা, দেহের পবিত্রতা, বস্ত্রের পবিত্রতা, স্ত্রীর পবিত্রতা, অর্থের পবিত্রতা, ইত্যাদি সর্ব প্রকারের পবিত্রতাই ইহার অন্তর্ভুক্ত। হিংসা, বিদ্বেষ, নির্দয়তা নিষ্ঠুরতা, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, স্বার্থান্ধতা, ক্রোধান্ধতা, কপটতা, মোহান্ধতা, ইত্যাদি অপবিত্র স্বভাব সমূহ হইতে আত্মাকে শোধিত রাখিতে হইবে। সুদ, ঘুষ, শোষণ, দুর্নীতি, চুরি-জুয়াচুরি, ধোকাবাজী ইত্যাদি সর্ব প্রকার হারাম উপায় হইতে অর্থকে পবিত্র রাখিতে হইবে। তদুপরি শরীয়ত অনুযায়ী যাকাৎ দান করিতে হইবে। অর্থের উপরই মানুষের সর্বস্ব নির্ভর করে, তাই অর্থের অপবিত্রতা তাহার প্রতিটি স্তরকেই অপবিত্র করিয়া দেয়। কাজেই অর্থের পবিত্রতা ব্যতিরেকে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।)×

(৫) যাহারা সংযম অভ্যাস করিয়া কাম-রিপুকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ দেহের রাজা ও জীবনীশক্তির মূলধন বীর্য্যের অপচয় বা অপব্যয় করে নাই। অবশ্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা রমণী অথবা (এর চেয়েও অধিক আধিপত্য যাহার উপর স্থাপিত হইয়াছে ; বিবাহের ন্যায় শরীয়ত অনুমোদিত অপর সূত্র—) স্বত্ব সূত্রে অর্জিত রমণীর গর্ভে মানব বীজ বপনোদ্দেশ্যে যদি বীর্য্য ব্যয় করে তবে তাহা দূষণীয় নহে। এতদ্ব্যতীত যাহারা অন্য কোনও গর্হিত উপায়ে (হস্ত মৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন, বেগানা স্ত্রী দর্শন, স্পর্শন বা ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা) বীর্য্য ব্যয় করিবে ও কাম-রিপু চরিতার্থ করিবে তাহারা নিশ্চয়ই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হইবে।

(৬, ৭) যাহারা নিজেদের নিকট গচ্ছিত আমানতের এবং নিজেদের ওয়াদা অঙ্গীকারের পুরাপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। আমানতের অর্থ—দায়িত্ব গ্রহণ করা। দায়িত্ব অনেক প্রকারের আছে—যথা আল্লার আমানত+, সামাজিক আমানত, রাষ্ট্রীয় আমানত, চাকরী ও পদের আমানত, ব্যক্তিগতভাবে গচ্ছিত টাকা-পয়সা, জমি-জমা বা গোপনীয় কথার আমানত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অঙ্গীকার এবং শপথও অনেক প্রকারের—আল্লাহ তায়ালার নিকট শপথ, সমাজের নিকট শপথ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পশপথ, ব্যক্তিগত ওয়াদা রক্ষার শপথ ইত্যাদি।

× এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন কোন ব্যক্তি অসহায় আশ্রয়হীন ও বিপদগ্রস্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাহার ডাক শোনেন না, কারণ তাহার পানাহারের বস্তু ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি প্রত্যকটিই হারাম এবং অসদুপায়ে অর্জিত।

+ আল্লার আমানতের অর্থ:—আল্লার আদেশ ও নিষেধাবলী অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিতি করার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করা। এই গুরুদায়িত্বকেই কোরআন শরীফের ২২শে পারা ৫ম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা আমানত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালাকে আমার আমানত বা বিশেষ একটি গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাইলে উহারা সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিল, কিন্তু মানব জাতিকে সেই আহ্বান জানান হইলে তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া নিল।

(৮) যাহারা আজীবন নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান রহিয়াছে।

অর্থাৎ কখনও সে সাধনায় ক্ষান্ত হয় নাই—স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে কোনও বাধা বিপত্তি লক্ষ্য না করিয়া চিরজীবন একনিষ্ঠ সাধনা করিয়াই গিয়াছে।

যাহারা এই গুণগুলি অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহারাই হইবে ফেরদৌস বেহেশতের অধিকারী, তাহারা তথায় অমর জীবন লাভ করিয়া অনন্তকাল অফুরন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করিবে।

৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَّالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা ষাট হইতে অধিক এবং লজ্জা শরম ঈমানের অন্যতম শাখা।

ব্যাখ্যা :—অন্য এক হাদীছে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তর হইতেও অধিক বলিয়া উল্লেখিত আছে। কোন কোন হাদীছে সাতাত্তরের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে- ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইল ইহা স্বীকার করা যে—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনও মা'বুদ নাই। সর্বাপেক্ষা ছোট শাখা—কষ্টদায়ক বস্তুকে চলাচলের পথ হইতে অপসারিত করা।

লজ্জা-শরমকে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা বলা হইয়াছে। কারণ, ঈমান যেমন মানুষকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করে, তদ্রূপ লজ্জা-শরমও মানুষকে অনেক কুকর্ম হইতে বিরত রাখে।

লজ্জা-শরম মানব চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। দুর্বলতা ও পবিত্রতা এই দুইয়ের সংমিশ্রনে ঐ গুণটির উৎপত্তি। নিন্দিত হইবার আশঙ্কায় যে কোনও কাজ করিবার বা কথা বলিবার প্রতি মানুষের মনে যে একটা অনিচ্ছা ও সঙ্কোচভাব এবং দুর্বলতা স্বভাবতঃ উদিত হয় তাহাকেই হা'য়া বা লজ্জা-শরম বলা হয়।

প্রকার ভেদে লজ্জা-শরমও কয়েক প্রকার। যথা—ভাল কাজ করিতে বা কোনও ভাল কথা বলিতে যদি শরম বোধ হয় তবে উহা প্রকৃতপক্ষে শরম নহে, রবং উহা এক প্রকার দুর্বলতা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; এরূপ শরমকে ঈমানের শাখা বলা হয় নাই। যেমন—কোন দরকারী কথা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে এই ভাবিয়া শরম বোধ হয় যে এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে কি মনে করিবে? বা কোনও কামেল পীরের সাহচর্য্যে থাকিতে এই মনে করিয়া লজ্জা করা যে, লোকে বলিবে, মোল্লা তাবেদার হইয়া গিয়াছে। কিম্বা কোনও গরীব অসমর্থ ব্যক্তি তাহার বোঝাটা মাথায় উঠাইয়া দিবার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে সাহায্য করিতে শরম বোধ হয় এই ভাবিয়া যে, লোকে কি মনে করিবে? এইগুলিকে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হয় নাই, রবং এইগুলি এক প্রকারের অহঙ্কার-সঞ্জাত হীনমন্যতা (Inferiority complex) অর্থাৎ মনের নীচতা ও দুর্বলতা মাত্র।

যে শরমকে হাদীছে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে উহা এই—নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতামূলক কাজকরিতে বা অভদ্র ব্যবহার করিতে বা ফাহেশা ও পাপের কাজ করিতে বা প্রকাশ্যে স্বামী স্ত্রী সুলভ ব্যবহার করিতে বা পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্তা বলিতে ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্য্যে যে শরম বোধ হয়। বস্তুতঃ এই পর্য্যায়ের শরমকেই প্রকৃত প্রস্তাবে লজ্জা-শরম বলা যাইতে পারে। কারণ, এসবের মধ্যে পবিত্রতার প্রাধান্য রহিয়াছে, শুধু দুর্বলতা ও অশক্তিই নহে।

এক হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লার শোকর—আমরা ত আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা সাধারণতঃ যতটুকু লজ্জা করিয়া থাক, শুধু ঐটুকুই আমার উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করার দাবী রাখে, তাহার কর্তব্য—স্বীয় মাথার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি আছে (যথা—স্মরণশক্তি, বিবেচনাশক্তি চিন্তাশক্তি ইত্যাদি) এবং মাথা সংলগ্ন ইন্দ্রিয়গুলি, যথা—চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদিকে কুকর্ম ও কুপথ হইতে বিরত রাখা। পেট এবং পেট-সংলগ্ন রিপু (নফছ ও গুপ্তাঙ্গ)কে তদ্রূপ রক্ষা করা, (অর্থাৎ হারাম খাওয়া ও ব্যভিচারী হইতে বিরত থাকা।) তদুপরি তাহার আরও কর্তব্য হইবে যে, মৃত্যু তথা এই অস্তিত্বের বিলুপ্তিকে স্মরণ করতঃ আখেরাতের দিকে ধাবিত হওয়া এবং দুনিয়ার মোহ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করা। যে ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ পুরাপুরি সাধন করিবে, সে-ই আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। (তিরমিজী শরীফ)

একজন মহামনীষী লজ্জার ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন—তোমার সর্বস্বের মালিক (আল্লাহ তায়ালা) যেন তোমাকে এমন জায়গায় বা এমন কাজে দেখিতে না পান, যেখানে যাইতে বা যাহা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন—ইহাই প্রকৃত লজ্জা।

এই সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত লজ্জা শরম কাহারও হাসিল হইলে সে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হইতে পারে। এই সূত্রেই 'হায়া' বা লজ্জা শরমকে ঈমানের একটি অন্যতম বিশিষ্ট শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোসলমান কে?

৯। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ

وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার কোনও কথা বা কার্য্যের দ্বারা অন্য

মোসলমানদের কষ্ট না ঘটে। মোহাজের ঐ ব্যক্তি যে আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ ও বর্জন করিয়াছে।

ব্যাখ্যা :—"মোসলেম" শব্দের মধ্যে শান্তির অর্থ নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং যাহার দ্বারা অন্যের অশান্তি ঘটে, তাহাকে মোসলেম বলা যাইতে পারে না। তদ্রূপ মোহাজের অর্থ "ত্যাগী"। যে আল্লার নিষিদ্ধ বস্তুকে পরিত্যাগ না করিবে, তাহাকেও ত্যাগী বলা যাইতে পারে না। অন্য এক হাদীছে আছে—"মোমেন ঐ ব্যক্তি যাহার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের আস্থা থাকে এবং তাহার তরফ হইতে সমস্ত লোক নির্ভয়ে ও নিরাপদে থাকিত পারে!" "মোমেন" শব্দের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থাভাজন হওয়ার অর্থ নিহিত আছে; সুতরাং যাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা না যায় ও যাহার তরফ হইতে মানুষ নির্ভয়ে নিরাপদে থাকিতে না পারে, তাহাকে "মোমেন" বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ মোসলেম বা মোমেন শব্দের দাবীদারদের মধ্যে চরিত্রগুণ উল্লিখিত পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা সে ঐ নামের উপযুক্ত নহে।

লক্ষ্য করুন—ইসলাম কত বড় মহান ধর্ম যে, উহার নির্দ্ধারিত প্রতিটি নামবাচক শব্দের মধ্যেও শান্তি, শৃঙ্খলা, সততা এবং সংযম ইত্যাদি গুণের মহান আদর্শ সমূহের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইসলামের উত্তম স্বভাব কি ?

১০। **হাদীছ :**—ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট মোসলমান ? হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহার কোনও কথা বা কার্য্য দ্বারা অন্য মোসলমানের কোন কষ্ট না হয়।

ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ অন্ন দান :

১১। **হাদীছ :**— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

অর্থাৎ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্ন দান করা এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা।

ব্যাখ্যা :—সালামের উদ্দেশ্য শুধু মুখে "আসসালামু আলাইকুম" বলাই নহে, মুখে বলার সঙ্গে কার্য্য ও চরিত্রের দ্বারা উহার অর্থকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—পরিচিত অপরিচিত সকলকেই শান্তি, নিরাপত্তা ও আশীর্বাদ প্রদান করিতে হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে অন্যত্র আরও তিনটি গুণের উল্লেখ আছে, যথা—মিষ্টভাষী হওয়া কর্কশভাষী না হওয়া, স্বীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং গভীর রাত্রে যখন অন্য সকলে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করতঃ নামায পড়া।

ঈমানের একটি বিশেষ শাখা

১২। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না যাবৎ না সে অন্য মোসলমান ভাই-এর জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহারপ ছন্দ করে, যেরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য একটি হাদীছের দ্বারা এই হাদীছটির তাৎপর্য্য আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে চাই, কিন্তু আমি জেনা (ব্যভিচার) হইতে বিরত থাকিতে অক্ষম। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে স্নেহভরে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার মা বোন বা মেয়ের সঙ্গে অপর কেহ জেনা করে? সে রক্তাক্ত চোখে উত্তর করিল—ইহা কার্য্যে পরিণত করা ত দুরের কথা কেহ এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা মাত্রই আমি তাহাকে তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করিয়া ফেলিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি যে মহিলার সঙ্গে জেনা করিবে সেও ত কাহারও মা, বোন বা মেয়ে হইবে!

কি সুন্দর শিক্ষা ও কত যুক্তিপুর্ণ উপদেশ। এর সুফল কত ব্যাপক। এই আদর্শের ভিত্তিতে সকল প্রকার ঝগড়া, বিবাদ, দ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, খেয়ানত, ধোকাবাজী, কাহারও অনিষ্ট করা ইত্যাদি এমনকি চুরি, ডাকাতি সকল প্রকার ব্যভিচারের অবসান হইতে পারে।

রসুলুল্লার (দঃ) মহব্বৎ ঈমানের মুল

১৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার জান—তোমাদের কেহ মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ না আমার প্রতি তাহার মহব্বৎ ও ভালবাসা তাহার মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক হয়!

১৪। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ

اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার অর্থাৎ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে এবং জগতের সমস্ত লোক অপেক্ষা অধিক মহব্বৎ ও ভালবাসা আমার সঙ্গে রাখিবে।

ব্যাখ্যা :—এক হাদীছে বর্ণিত আছে, একদা ওমর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন—আপনার প্রতি আমার মহব্বৎ সকলের চাইতে বেশী আছে, কিন্তু নিজের জীবন হইতে বেশী মনে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, তা হইবে না; নিজের জীবন হইতেও অধিক মহব্বৎ আমার প্রতি রাখিতে হইবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন, এখন স্বীয় জীবন হইতেও অধিক মহব্বৎ আপনার সঙ্গে আমার হাসিল হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন আপনি মোমেন হইতে পারিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিজের প্রতি অধিক মহব্বতের আদেশ স্বীয় কোনও স্বার্থের জন্য করেন নাই; বরং মানবের কল্যাণের জন্যই এই আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা রসুল (দঃ)কে স্বীয় সন্তুষ্টি ও পছন্দের নমুনা বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রসুল (দঃ)-এর অনুসরণের উপরই মানব জাতির কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে। পরন্তু, পূর্ণ অনুসরণ মহব্বৎ ও ভালবাসা ব্যতিরেকে হয় না।

এখন মহব্বতের অর্থ রসুল হিসাবে ভক্তি ও ভালবাসা; তাহাও শুধু মৌখিক ও ভাবাবেগের বা আত্মীয়তার মহব্বৎ উদ্দেশ্য নয়। বরং রসুল হিসাবে এরূপ গভীর মহব্বৎ যাহার দরুন রসুলুল্লার (দঃ) অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ জন্মে। কোন প্রকার স্বার্থ, মোহ, ভয় বা কষ্টই তাঁহার অনুসরণ ও আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম না হয়। সাধারণ ভালবাসা বিভিন্ন কারণে অনেক কাফেরের মধ্যেও দেখা যায়, যেমন—রসুলুল্লার (দঃ) চাচা আবু তালেব রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। কিন্তু আবু তালেবের সেই ভালবাসা কেবলমাত্র স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বা নিজ গোষ্ঠির ভাল ছেলে হিসাবে ছিল, আল্লার রসুল হিসাবে নহে।

ঈমানের স্বাদ লাভ করার উপায়

১৫। হাদীছ :— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ -

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন---এমন তিনটি গুণ আছে যে, কাহারও ভিতরে ঐ তিনটি গুণের সমাবেশ হইলে সে ঈমানের মাধুর্য্য ও সুস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে। (১) আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্বাধিক মহব্বৎ হওয়া, অর্থাৎ পার্থিব আকর্ষণ অপেক্ষা আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্বাধিক মনের টান ও প্রাণের আকর্ষণ হওয়া। (২) কাহাকেও ভালবাসিলে তাহা একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই হওয়া। অর্থাৎ আল্লার প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং আল্লার অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যেই অপ্রিয় গণ্য করা; কাহারও সহিত কাম-ভাবের বশে বা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভালবাসা না করা। (৩) ইসলাম ও ঈমানের প্রতি এত গাঢ় অনুরক্ত হওয়া যে, ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া কুফুরির দিকে যাওয়াকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া তুল্য অপছন্দনীয় গণ্য করা।

ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন

১৬। হাদীছ :— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ-

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আনছারদের (মদীনাবাসী ছাহাবীদের) সঙ্গে মহব্বৎ রাখা ঈমানের আলামত ও নিদর্শন। তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মোনাফেকীর পরিচায়ক।

ব্যাখ্যা :—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে "আনসার"—দ্বীনের সহায্যকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই হিসাবে যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তবে সে নিশ্চয় মোনাফেক হইবে। আর মিত্রভাব পোষণ করিলে নিশ্চয় উহা তাহার ইসলামের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হইবে।

ইসলামী জীবনের শপথ ও অঙ্গীকার

১৭। হাদীছ :—ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ছাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আমার নিকট শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ কর এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, আল্লার সহিত কোনও বস্তুকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, জেনা (ব্যভিচার) করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না*, কাহারও উপর মিথ্যা

---

* ইসলাম-পূর্ব যুগে আদিম বর্বর আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ে সন্তান হওয়াকে তাহারা অপমান মনে করিত; এমনকি কোনও নিষ্ঠুরাত্মা পিতা স্বীয় কন্যা সন্তান জীবিতাবস্থায়ই মাটি চাপা দিয়া দিত। কেহ কেহ আবার অধিক খরচে পড়িয়া অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেলে মেয়ে উভয় শিশু সন্তান মারিয়া ফেলিত। এই সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মূলে ইসলাম কুঠারাঘাত হানিয়াছে—এই সবের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফের একাধিক আয়াত নাযেল হইয়াছে; রসুলুল্লাহ (দঃ)ও ঐরূপ কুসংস্কার হইতে বিরত থাকার অঙ্গীকার লইয়াছেন।

দোষারোপ করিবে না—ভিত্তিহীন অপবাদ ও অভিযোগ আনিবে না এবং আমার (তথা শাসন কর্তৃপক্ষের) বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—ঐ সব বিষয়ে যাহা আল্লার বিধান বিরোধী না হয়। (রসুল (দঃ) আরও বলিলেন—)

যে ব্যক্তি এই সব অঙ্গীকার অনুযায়ী চলিবে, নিশ্চয়ই সে আল্লার নিকট তাহার সুফল ও পুরস্কার পাইবে। পরন্ত, যদি কেহ কোনও নিষিদ্ধ কাজ করিয়া ফেলে এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাস্তি তাহার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই শাস্তি (গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কারণ, ঐ শাস্তি) তাহার গোনাহের কাফ্ফারা হইবে, কিন্তু যদি তাহার ঐ কাজ জনসমাজে প্রকাশ না হওয়ায় শরীয়তের বিধানগত জাগতিক শাস্তিভোগ হইতে সে রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে গোনাহের বিচারের ভার আল্লার উপর ন্যস্ত থাকিবে, আখেরাতে তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন মাফও করিতে পারেন। সেমতে ছাহাবীগণ এই শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন।

দ্বীন রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করা বড় ধর্ম

১৮। হাদীছঃ— عن ابى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَّتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ

الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ -

অর্থঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই দিন অতি নিকটবর্তী—যখন একজন মোসলমানের জন্য উত্তম সম্পদ হইবে মাত্র কয়েকটি বকরী, যেগুলিকে লইয়া সে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায়—যেখানে বৃষ্টির পানিতে ঘাস-পাতা জন্মায় এমন স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেখানেই বসবাস করিবে। (সমস্ত জগৎ তখন ফেৎনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হইবে, তাই) সে স্বীয় দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লোকালয় হইতে সরিয়া পড়িবে।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য হইল দ্বীন ও ধর্মকে সর্বাগ্রে ও সকলের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া। যখন চতুর্দিকের ফেৎনা-ফাসাদের দ্বারা স্বীয় দ্বীন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইবে তখন দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য ধন-জন, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলে নির্বাসিত জীবন যাপনেও কুণ্ঠিত হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে ও প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে।

আল্লার মা'রেফাত অনুপাতে তাঁহার প্রতি ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে

'আল্লার মা'রেফাত'-এর অর্থ—আল্লাকে চেনা ও আল্লার তত্ত্ব জ্ঞান হাসিল করা। ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন ও আয়ত্তাধীন ক্রিয়াবিশেষ। অবশ্য বাহ্যিক অঙ্গের ক্রিয়া নহে, বরং ইহা অন্তরের ঐকান্তিক সাধনার প্রক্রিয়া। সুতরাং উহা নিজে নিজেই উৎপত্তি হয়

না, বরং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উহা অর্জন করিতে হয়। প্রথমতঃ দেলের ময়লা সমূহ (হীন স্বার্থ-চিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি)কে দূর করিতে হইবে। এই সকল আবিলতা ও কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া দেল যখন আয়নার মত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং তদবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতঃ আল্লার ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়, তখন দেলের মধ্যে আল্লার মহৎ গুণাবলী প্রতিবিম্বিত ও বিকশিত হইয়া থাকে। আল্লার ঐ মহৎ গুণাবলীকে দেলের মধ্যে ধরিয়া ও ভরিয়া রাখা এবং হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখার নামই "মা'রেফাত"। আল্লার এই মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান হাসিল করাই মানব জীবনের চরম কাম্য বস্তু। ইহা হাসিল করা মানুষের ক্ষমতা ও আয়ত্তের নয়, ইচ্ছা করিলে সাধনা করিয়া হাসিল করিতে পারে। কারণ, মানুষের বাহ্যিক অঙ্গের প্রক্রিয়াগুলি যেমন তাহার ইচ্ছাধীন; তাহার আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সৎ বা অসৎ ক্রিয়াগুলিও তেমনি তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বহির্ভূত নহে+। তাই মানুষের চেষ্টা ও সাধনার তারমধ্যে আল্লার মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান কম বা বেশীরূপে হাসিল হইয়া থাকে। এবং এই মা'রেফাত লাভের তারতম্য অনুপাতেই মানুষের ভিতরে আল্লার ভয়ের সঞ্চার হয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীছটিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্যটিই স্বীয় অবস্থার দ্বারা সম্যক ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৯। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীদিগকে কোন আমলের আদেশ করিতে এমন আমলের আদেশ করিতেন যাহা সর্বদা সহজে করিয়া যাওয়া সম্ভব হয়। সে জন্য তিনি যথাসম্ভব অল্প ও সহজ আমলের শিক্ষা দিতেন। ছাহাবীগণ নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন; তাঁহারা বেশী বেশী ও কঠিন কঠিন এবাদৎ ও সাধনা নিজেদের উপর টানিয়া লইবার চেষ্টায় থাকিতেন এবং মনে মনে এরূপ ভাব পোষণ করিতেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষ্পাপ, তাঁহার মর্তবা অতি উর্দ্ধে; সেই জন্য এবাদতের প্রয়োজন তাঁহার নাই। এই ভাবিয়া) তাঁহারা কোন কোন সময় বলিয়া ফেলিতেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমরা ত আপনার মত নই; আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ—পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ-ই আপনার জন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তাই আপনার ন্যায় আমাদের কম এবাদৎ করিলে চলিবে কেন? এরূপ উক্তিকে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন; তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর রাগের নিদর্শন প্রকাশ পাইত। তারপর ঐ ভুল ধারণা নিরসনে বলিতেন, নিশ্চয় জানিও—আল্লাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করিয়া থাকি। কারণ, আল্লার মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী আছে আমার।

+ এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন—ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم অর্থাৎ—তোমাদের অন্তকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে যে সকল ক্রিয়া সমাধা করিবে তজ্জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন, যদি অন্তরের ক্রিয়াকলাপ মানুষের আয়ত্তাধীন না হইত, তবে উহার দরুণ সে দায়ী হইত না।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ—আমার মর্তবা বড় সে জন্য আমি খোদাকে ভয় কম করিব, তাঁহার এবাদৎ বন্দেগী কম করিব, শুইয়া শুইয়া আরামে জীবন যাপন করিব। না, না—তাহা কখনই নহে। আল্লাহ যেমন মর্তবা বড় করিয়াছেন, আমাকে তাঁহার মা'রেফাত এবং তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী দান করিয়াছেন। সেই অনুপাতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয়ও সকলের চেয়ে বেশী করিয়া থাকি। তবে আমি তোমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য এমন নীতি, এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাই, যাহা সকলে সর্ব সময় অনায়াসে করিতে পারে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশী এবাদৎ করিতেন, যেমন এক হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত, কোন কোন সময় পা ফাটিয়াও যাইত। এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ত নিষ্পাপ, আপনি কি জন্য এত কষ্ট করেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন—"যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ করিয়াছেন, আমি কি তজ্জন্য তাঁহার শোকর আদায় করিব না?"

পাঠকবৃন্দ! উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে—আল্লার মা'রেফাত যাহার মধ্যে যত বেশী হইবে আল্লার ভয়ও তাহার মধ্যে তদনুপাতে বেশী হইবে। অধুনা অনেকেই মা'রেফাত দাবী করিয়া থাকে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার ভয়, আল্লার এবাদৎ বন্দেগী, সাধনা আরাধনা ইত্যাদিতে তাহাদিগকে সেরূপ অগ্রণী দেখা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ভুয়া দাবীদারদিগকে ধোকাবাজ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঈমানের প্রতি কিরূপ অনুরাগ আবশ্যক

ইমাম বোখারী (রঃ) ১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন মোসলমানকে ঈমানের প্রতি এরূপ আসক্ত ও দৃঢ় অনুরাগী হইতে হইবে যাহার ফলে ঈমানের বিপরীত তথা কুফরের প্রতি তাহার ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, অসন্তোষ এবং ভীতি ও ত্রাস ঐরূপ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয় যেরূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রতি হইয়াছে। এই অবস্থাটা মূল ঈমানের বিশেষ অঙ্গ; যাহার মধ্যে এই অবস্থা নাই তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং এই অবস্থার পরিমাণ অনুপাতেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ হইবে। ঐ অবস্থা ব্যতিরেকে ঈমান অত্যন্ত ক্ষীণ ও মৃতবত।

ঈমানের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার প্রমাণ

২০। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন—যাহাদের অন্তরে অন্তত: সরীষা-বীজ

পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে এমন অবস্থায় দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন যে, তাহারা অনবরত আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদিগকে আবে-হায়াতের (জীবনী-শক্তির) নদীতে ফেলা হইবে। সেখান হইতে তাহারা নুতন জীবন লাভ করতঃ অতিশয় সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের দ্বারা ঈমান একটি পরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তু হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং উহার পরিমাণে কম বেশী হওয়াও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অন্য এক হাদীছে ঈমানের কম-বেশী হওয়া সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে যে—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে বলিবেন, দোযখবাসীদের মধ্যে যাহাদের অন্তরে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমিত ঈমানের অস্তিত্ব দেখিতে পাও তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আইস। দ্বিতীয়বার বলিবেন, যাহাদের অন্তরে অর্দ্ধ দীনার পরিমিত ঈমান খুঁজিয়া পাও, তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। তৃতীয়বার বলিবেন, যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্বও পাও, তাহাকেও বাহির করিয়া লও। তারপরেও এমন এক শ্রেণীর লোক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে যাহাদের অন্তরে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তাহাদের সেই ঈমান এতদুর সূক্ষ্ম হইবে যে, উহার অস্তিত্ব নবী ও ফেরেশতা-গণের অনুভূতির আওতায় আসিবে না; তাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দোযখ হইতে বাহির করিবেন।

লজ্জা-শরম ঈমানের শাখা

২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জনৈক আনছারী ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে লজ্জা-শরমের ব্যাপারে নছিহত ও ভৎর্সনা করিতেছিল (যে, তুমি লজ্জা কর কেন?) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে এ বিষয়ে রাগ করিও না; (লজ্জা শরম ভাল জিনিষ) যেহেতু লজ্জা-শরম ঈমানের একটি শাখা।

ব্যাখ্যা ঃ—লজ্জা-শরম এক জিনিষ এবং হীনমন্যতা বা আত্মাভিমান প্রসূত মনের নীচতা ও দুর্বলতা (Inferiority complex) ভিন্ন জিনিষ। এ বিষয়ে ৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। লজ্জা-শরমের বিষয়ে কাহাকেও রাগ বা তিরস্কার করা চাই না; যেমন এই হাদীছে বর্ণিত হইল। কিন্তু মনের নীচতা ও দুর্বলতা পরিহার করার শিক্ষা দিবে।

ইসলামের স্বীকারোক্তি এবং নামায ও যাকাৎ আদায় করিলে তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে মোসলমান গণ্য হইবার জন্য এবং মোসলমান হিসাবে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও দাবীদাওয়ার যোগ্যতা

লাভ করিবার জন্য তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ তাহার কোন কার্য্য বা কথা ইসলামের স্বীকারোক্তির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে নামায ও যাকাৎ আদায় করার ব্যাপারে সে ত্রুটিহীন হয়। এই দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব কাহারও মধ্যে পাওয়া গেলে তাহাকে মোসলমান দলভুক্তরূপে মানিয়া লইতে হইবে। এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্য্যায়ের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারাদি দানের ব্যাপারে তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হইবে না; সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দেওয়ার জন্য সে আল্লার নিকট দায়ী থাকিবে। অবশ্য যদি কোনও ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহাকে পার্থিব শাস্তি বিধানও করা হইবে। ইসলামী সংবিধানের উল্লিখিত ধারাটি কোরআন ও হাদীছ উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত।

কোরআনের আয়াত—

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

অর্থ:—অতঃপর (হে মোসলমানগণ! তোমাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে—) যদি তাহারা (কাফেরগণ) ইসলামদ্রোহিতা—কুফর* এবং শেরক বর্জনপূর্বক (খাঁটী তৌহিদের দিকে অর্থাৎ এক আল্লাহকে, আল্লার বাণীকে, আল্লার প্রেরিত পয়গাম্বরকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লওয়ার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাৎ আদায় করে, তবে তাহাদিগকে মুক্ত পরিবেশের সুযোগ দান কর—তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা দান কর। (১০ পাঃ ৭ রুঃ)

২২। হাদীছ:— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

অর্থ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লার তরফ হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন বিপথগামী জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—জেহাদ করিয়া যাই যে পর্য্যন্ত না তাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে যে, এক আল্লাহই মাবুদ ও উপাস্য; তিনি ভিন্ন অন্য কোনও মাবুদ

---

* 'কুফর' অর্থ আল্লাহকে, আল্লার বাণীকে, আল্লার রসুলকে স্বীকার ও গ্রহণ করার মতবাদ উপেক্ষা করা। 'শেরক' অর্থ আল্লাহকে স্বীকার করার সঙ্গে মাবুদরূপে অন্য কাউকে কিম্বা আল্লাহ বিরোধী বস্তু ও মতবাদকে স্বীকার করিয়া চলা—উভয়টিই তৌহিদ বিরোধী।

বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রসুল এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাৎ দান করিবে। যাহারা এই কয়টি কাজ পূর্ণ করিবে তাহারা (মোসলমান হিসাবে) জান মাল রক্ষার অধিকার পাইবে। অবশ্য ইসলামের বিধান লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। (আর উল্লেখিত বাহ্যিক কার্য্যাবলীর দ্বারা শুধুমাত্র পার্থিব আত্মরক্ষার অধিকার পাইবে।) আন্তরিক অবস্থার জন্য (অন্তর্য্যামী) আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী থাকিবে। (তদনুসারেই পরকালে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহার হিসাব-নিকাশ হইবে।)

ব্যাখ্যা:— যে ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে সে জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হইবে, কিন্তু ইসলামী আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ যাহা শরীয়তে বিধিবদ্ধ আছে উহা তাহার উপর অবশ্যই প্রবর্তিত হইবে। যেমন—চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে, জেনা করিলে 'ছঙ্গ-ছার' (প্রস্তরাঘাতে প্রাণ নাশ) করা হইবে, খুনের বদলে খুন করা হইবে, ধর্মীয় কর্তব্য ও অনুষ্ঠান সমুহ পালন না করিলে তজ্জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করা হইবে ইত্যাদি।

স্মরণ রাখিবে প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্তি ইহকালের জন্য রক্ষাকবচ বটে, কিন্তু অন্তরে কুটিলতা রাখিয়া বাহ্যিক দলভুক্তির দ্বারা কেহ কখনও মোমেন হইতে পারিবে না এবং পরকালে নাজাত ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; বরং মোনাফেকের অধিক আজাব হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"মোনাফেকগণ দোযখের সর্বনিম্ন তলায় থাকিবে।" (৫ পারা শেষ রুকু দ্রষ্টব্য)

ঈমান একটি (ইচ্ছাকৃত ও উপার্জিত) প্রধান আমল

উপরোক্ত শিরোনামার তাৎপর্য্য এই যে—ঈমান যেহেতু একটি আন্তরিক বস্তু, ইহা কোনও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অর্জিত হয় না, তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করাও নিতান্ত ভুল হইবে যে, ঈমান হাসিল করার ব্যাপারে মানুষের নিজস্ব কিছু করণীয় বা চেষ্টা চরিত্রের প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ, প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান একটি প্রধান "আমল"। আমল কাহাকে বলা হয়? আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেচনা শক্তি দান করিয়াছেন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পরিচালনার দ্বারা সকল প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য কর্মশক্তিও দান করিয়াছেন। সেই বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনও অঙ্গের দ্বারা কোনও কার্য্য সমাধা করাকেই আমল বলে। এতদৃষ্টে ঈমানও একটি আমল। কারণ, ঈমানের উৎপত্তিস্থল "কল্‌ব" অর্থাৎ দেল বা অন্তকরণ। কল্‌ব মানুষের একটি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। মানুষ স্বীয় বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া তাহার কল্‌ব অঙ্গের দ্বারা ঈমান রত্ন অর্জন করিতে পারে। বরং এরূপ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জিত ঈমানকেই শরীয়তে উত্তম ঈমান গণ্য করা হয়। সুতরাং ঈমান নিছক একটি ঐচ্ছিক ও অর্জনীয় আমল, শুধু তাহাই নহে বরং সর্বপ্রধান আমল।

কারণ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ধর্মীয় কার্য্যাবলী ঈমানেরই ডাল পালা ও শাখা প্রশাখা স্বরূপ। ঈমানের মূল ও শিকড় অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত এবং উহার শাখা-প্রশাখা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই নাজাতকামীদের কর্তব্য হইবে সর্বদা মূল ঈমানের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমবায়ে উহাকে সরস, সতেজ ও শ্যামল রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। আলোচ্য শিরোনামার বিষয়টির প্রমাণে কতিপয় কোরআনের আয়াত ও একটি হাদীছ উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম আয়াত :—وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"(আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদিগকে জাগতিক জীবনে তাহাদের কৃত সাধনার প্রতি সন্তুষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ বলিবেন, (হে বেহেশতবাসী!) তোমাদিগকে এই বেহেশতের দ্বারা পুরস্কৃত করা হইয়াছে তোমাদের কৃত আমলের বদৌলতে। (২৫ পাঃ ১৩ রুঃ)

এখানের আমল দ্বারা ঈমানকেও বুঝাইয়াছে, বরং বেহেশতের অধিকারী হইবার জন্য ঈমানই সর্ব প্রধান নির্ভরস্থল। যদি ইহা ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা অর্জিত না হইত, তবে ইহার উপর প্রতিদান বা পুরস্কার কিরূপে হইতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াত :—فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"আল্লাহ তায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা (মানব) জীবনভর কি আমল করিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসাবাদ করিব এবং বিচার করিব। (১৪পাঃ ৬রুঃ)

অনেক ইমামগণ এখানে "আমল" শব্দের উদ্দেশ্য ঈমান বলিয়াছেন—অর্থাৎ প্রত্যেক মানবকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—"মাবুদ বা উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কোনও মাবুদ নাই"—এই স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার-বাক্যের উপর সে পূর্ণরূপে আমল করিয়াছে, না অন্য কাহাকেও মাবুদ বানাইয়া সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করিয়াছে।

উল্লেখিত জিজ্ঞাসা বস্তুটিই ঈমান; ঈমান মানুষের ইচ্ছা ও অর্জন-ক্ষমতাভুক্ত না হইলে উহার জন্য প্রশ্ন করা হইবে কেন; কেনই বা সে উহার জন্য দায়ী হইবে?

২৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হইল, সর্বোৎকৃষ্ট আমল কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের প্রতি খাঁটী বিশ্বাস স্থাপন করা—অর্থাৎ ঈমান। পুনরায় আরজ করা হইল—তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। আবার আরজ করা হইল—তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ (আদব, মহব্বৎ, ভক্তি, ভজনা ও সাধনার সহিত) হজ্জ করা যাহা আল্লার দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—জেহাদ, হজ্জ ইত্যাদির ন্যায় ঈমানও একটি আমল, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল—যাহা যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনায়ই হাসিল হইতে পারে।

খাঁটী ও অখাঁটী ইসলামের বিশ্লেষণ

যদি খাঁটীভাবে সর্বান্তকরণে ইসলামকে গ্রহণ করা না হয়, শুধু আত্মরক্ষামূলক বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাহ্যিক দলভুক্তি ও আনুগত্য দেখান হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ইসলামের আদৌ কোনও মূল্য হইবে না। এরূপ ইসলামের নামধারী ব্যক্তি মোমেন হওয়ার দাবীও করিতে পারে না, তাহাকে মোমেন বলিয়া আখ্যায়িতও করা যাইবে না।

পবিত্র কোরআনেই আছে—

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ -

অর্থাৎ :—একদল গ্রাম্যলোক যাহাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লোক দেখানো ভাবে কিছু বাহ্যিক আমল তাহারা করিত ; তাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঈমানের দাবীদার হইল। আল্লাহ তায়া । এই আয়াতে রছুলুল্লাহ (দঃ)কে আদেশ করিলেন, "আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা মিথ্যাবাদী— তোমরা ঈমানদার হও নাই ; তবে হাঁ, প্রকাশ্যে ইসলামের আনুগত্য দেখাইতেছ, এইটুকু দাবী করিতে পার। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই। (২৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হইল - পার্থিব লোভ, স্বার্থোদ্ধার বা ভয় ইত্যাদির দরুণ মৌখিক স্বীকারোক্তি ও বাহ্যিক আমলের ইসলাম আল্লার নিকট মূল্যহীন হইবে।*

---

* বর্তমান কালের ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষা ও বিধর্মীয় সভ্যতার অনুকরণ-প্রিয়তার যুগে এক প্রকার মোসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা শুধু বংশগত ভাবেই মোসলমান। অর্থাৎ মোসলমান পূর্বপুরুষ ও মুসলিম বাপ দাদার ঔরষজাত হিসাবে মোসলমান বলিয়া পরিচিত। সামাজিক বাধা বাধকতা বা শুধু স্ফুর্তি উপভোগ ও দলভুক্তি হিসাবে ঈদ, কোরবাণী ইত্যাদি এমনকি, হজ্জ-যাত্রার স্থায় মোসলমানদের বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানাদিতেও যোগদান করে, কিন্তু স্বীয় বিবেচনাশক্তি দ্বারা পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া এরূপ মনোবল ও দৃঢ়তা অর্জন করে নাই যে, একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত মতবাদ ও আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণীয় বিধায় আমি সর্বান্তকরণে উহাকেই গ্রহণ করিতেছি এবং অন্য সমস্ত মতবাদ বর্জনীয়, অতএব আমি সে সব বর্জন করিতেছি। এহেন বংশানুক্রমিক মোসলমানদের সতর্ক হওয়া এবং উক্ত আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

মদীনায় ঐ গ্রামবাসী মোনাফেকের দল যাহারা কেবল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও ঈমানের দাবী করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের উপর প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম ও ঈমানের কোনই প্রভাব ছিল না এবং ইসলামের প্রতি তাহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাও ছিল না। পক্ষান্তরে তাহারা ইসলামকে অচল হেয় মনে করিত, এমনকি খাঁটি মোসলমানদিগকে বোকা, নির্বোধ ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। এই সকল মোনাফেক মোসলমানীর দাবী-

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাহ্যিক স্বীকারোক্তি ও আমলের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটীভাবে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও নিষ্ঠার সহিত ইসলামের যাবতীয় অনুশাসনকে গ্রহণ করার দৃঢ় প্রস্তুতি থাকিলে সেই ইসলামই আল্লার নিকট গ্রহণীয় হইবে। একমাত্র এই প্রকার ইসলামকে উদ্দেশ্য করিয়াই কোরআনের ঘোষণায় রহিয়াছে—إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "আল্লার মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না।

২৪। **হাদীছঃ**—ছাহাবী সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, তিনি একদল লোককে দান করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে এমন একজন লোককে তিনি কিছুই দিলেন না, যাহাকে আমি ঐ দলের মধ্যে সর্বোত্তম (দ্বীনদার-পরহেজগার) বলিয়া মনে করিতাম। এতদৃষ্টে আমি আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি অমুক ব্যক্তিকে দান করিলেন না? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে "মোমেন"। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (এরূপ দৃঢ়ভাবে) "মোমেন" বলিও না, "মোসলেম" বল। আমি কিছু সময় চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আমার মনে ঐ খেয়াল ও ধারণা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আমি পুনরায় ঐরূপ বলিলাম; তিনিও পুনরায় ঐরূপই বলিলেন—"মোমেন" বলিও না, "মোসলেম" বল। তৃতীয়বার ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হে সায়া'দ। (অনেক সময়) আমি অপছন্দনীয় ব্যক্তিকেও দান করি শুধু এই কারণে যে, (তাহার ঈমান এখনও দুর্বল ;) আমার আশঙ্কা হয় (তাহাকে দান করিয়া স্বচ্ছল না রাখিলে অভাবে পড়িয়া) সে হয়ত (ইসলাম ত্যাগ পূর্বক) দোযখের পথে চলিয়া যাইতে পারে। ×

দারদের সহিত বর্তমান যুগের নামধারী বংশগত মোসলমানদের তুলনা করিলে মোটেই অতিরঞ্জিত বা অন্যায় হইবে না। কারণ, ইহারা শুধু যুগ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক, পঞ্চায়েতী নেতৃত্ব ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমূহকে এই বিরাট মোসলেম সমাজের নিকট হইতে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্য নিজেদেরকে মোসলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামের কোনও প্রভাবই তাহাদের উপর নাই এবং ইসলামের প্রতি কোনরূপ দরদ, শ্রদ্ধা দৃঢ়তা বা একীন তাহাদের অন্তরে নাই।

× কোনও ব্যক্তিকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী তাহার মন রক্ষা করিয়া চলাকে শরীয়তের পরিভাষায় "তালীফে-কুলুব" বলা হয়। শরীয়তে এরূপ মনস্তুটি বিধান করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ঈমান-রত্নের বিকাশ সকলের অন্তরেই মাত্র এক দুই দিনেই হইয়া যায় না। খাঁটি মোমেনদের সংশ্রবে থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে উহা হাসিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে জন্যই ঐরূপ ব্যক্তির সন্তুষ্টিবিধান করতঃ তাহাকে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা :—"মোমেন" শব্দের অর্থ ঈমানদার। খাঁটীভাবে ভয় ও ভক্তির সহিত বিশ্বাস করতঃ সেই বিশ্বাসানুপাতিক জীবন যাপনের আন্তরিক প্রস্তুতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করাকে ঈমান বলা হয়। ইহা কোনও বাহ্যিক অথবা দৃশ্য বস্তু বা ক্রিয়া নহে। ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রস্তুতি এ সবই অন্তরের অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণ বিশেষ—যাহা বাহ্যদৃষ্টির আওতাভুক্ত নহে। অতএব কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নিশ্চিতরূপে "মোমেন" বলার অধিকার অন্তর্যামী আল্লারই থাকিতে পারে। অন্য কেহই এই অধিকার পাইতে পারে না।

"মোসলেম" অর্থ ইসলাম গ্রহণকারী। শরীয়তের আদেশ নিষেধ, হুকুম আহকামের প্রতি স্বীকারোক্তি ও ঐগুলিকে বাহ্যতঃ পালন করার নাম "ইসলাম"। ইহা অবশ্যই কতকগুলি প্রকাশ্য ক্রিয়া-কলাপ এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিবিশেষ। তাই ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পরস্পর একে অন্যকে দৃঢ়তার সহিতও "মোসলেম" বলিতে পারে।

সায়া'দ (রাঃ) তাঁহার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে শপথ করিয়া দৃঢ়তার সহিত "মোমেন" বলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অনধিকার চর্চা ছিল—কারণ, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে এরূপ দৃঢ়ভাবে মোমেন বলার অধিকার আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দ (রাঃ)কে বাধা দান করিয়া বলিলেন—অদৃশ্য ও অন্তকরণ সম্পর্কিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ এবং সাব্যস্তমূলক উক্তি করা বাঞ্ছনীয় নহে। হয়ত ঐ ব্যক্তি অন্তরে অন্য ভাব পোষণ করিয়া থাকিতে পারি। তবে হাঁ তাহার প্রতি তোমার ভাল ধারণা থাকিলে তুমি তাহাকে দৃঢ়ভাবেও মোসলেম বলিতে পার। কারণ, ইসলাম কোনও অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য বস্তু নহে, উহার অনুভূতি মানুষের প্রকাশ্য দৃষ্টির আওতাভুক্ত।

পাঠকবর্গ! এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন যে—"মোমেন" ও "মোসলেম" শব্দদ্বয়ের মূল "ঈমান" ও "ইসলামের" মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন এবং এই দুইটির ব্যবহারিক তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ উপলব্ধি করানো—ইহাই ছিল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাধাদানের উদ্দেশ্য। নতুবা যে ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথাবার্তা হইতেছিল তিনি অতি বড় মর্তবার ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—জোয়াইল (রাঃ)। অন্য স্থানে স্বয়ং নবী (দঃ) তাঁহার বহু ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দেখান হইল যে, খাঁটী ইসলামের দ্বারা "মোমেন" আখ্যা লাভ করা ত দূরের কথা খাঁটি ইসলাম ক্ষেত্রেও "মোমেন" আখ্যার ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা সাপেক্ষ।

ব্যাপকভাবে সালাম জারী করা ঈমানের একটি শাখা

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) বলিয়াছেন—তিনটি স্বভাবকে যে আয়ত্ব করিতে পারিবে সে সর্বাঙ্গীন ঈমানের অধিকারী হইবে। (১) নিজ হইতেই নিজের ইনসাফ করা, অর্থাৎ

নিজের উপর আল্লার বা বান্দাদের যে হক আছে, প্রত্যেকটি হক কাহারও দাবী ব্যতিরেকেই পূর্ণরূপে আদায় করা। (২) পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম* করা। (৩) গরীব হওয়া সত্ত্বেও সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজে দান করা।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য শিরোনামায় ১১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

কুফরের শাখা-প্রশাখা পরস্পর ছোট-বড় হয়

অর্থাৎ :—যেমন নেক কাজসমূহ ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং উহা পরস্পর ছোট-বড় হয়, তদ্রূপ গোনাহের কাজসমূহ কুফরের শাখ-প্রশাখা এবং উহাও পরস্পর ছোট-বড় হয়।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—যেমন আল্লার হক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকে কুফরের শাখা বলা যায়, তেমনি কোন মানুষের হক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকেও কুফরের শাখা বলা যাইবে।

২৫। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে দোযখ দেখানো হইয়াছে। তখন আমি দেখিয়াছি—দোযখীদের অধিকাংশই নারী। কারণ, তাহারা "কুফরী" বেশী করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কি আল্লার কুফরী করিয়া থাকে? নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, স্বামীর কুফরী (অর্থাৎ না-শোকরী ও নেমক-হারামী) এবং এহ্সান ও উপকারের কুফরী করিয়া থাকে। নারী জাতির স্বভাব এই যে, যদিও তুমি তাহার প্রতি আজীবন এহ্সান, সদ্ব্যবহার ও উপকার কর, কিন্তু তোমার কোনও একটি মাত্র ত্রুটির সে (সব কিছু ভুলিয়া গিয়া তোমার সকল উপকার অস্বীকার করতঃ) বলিবে—আমি জীবনে কখনও তোমার নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইলাম না।

● এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ঐ হাদীছটি "ঋতু অবস্থায় রোযা রাখিতে পারিবে না" শিরোনামায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। সেই হাদীছে নারী জাতির আরও দুইটি মারাত্মক দোষের কথা উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল যে—নারী জাতি স্বভাবতঃ কথায় কথায় অভিশাপ ও তিরস্কার অত্যন্ত বেশী করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়টি হইল এই যে, নারী স্বভাবতঃই অতি ছলনাময়ী হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন—নারী জাতি সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা তরলমতি ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্না হইয়াও শুধু ছলনার দ্বারা অতিশয় হুশিয়ার, চালাক চতুর পুরুষের বুদ্ধিকেও ঘোলাটে করিয়া দিতে সর্বাধিক পটু দেখা যায়।

পাঠকবর্গ। আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নহে। বরং নারী জাতির ত্রুটি সংশোধন ও চরিত্র গঠন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। রসুলুল্লাহ

---

* মৌখিক সালামের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ সালাম তথা শান্তিও দান করা চাই।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ জাতি গঠন ও জাতীয় চরিত্র সংশোধনে অতি ব্যপক ও সুদূরপ্রসারী। হযরত (দঃ) জাতীর ক্ষুদ্রতম ছিদ্র পথেও প্রবেশ করতঃ উহার গলদ দুর করার প্রতি তৎপর হইয়াছেন এবং জাতিকেও তদনুযায়ী শিক্ষা দান করিয়াছেন। নারী জাতির উপরই সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা সব কিছু নির্ভর করে। তাহাদের ছলনায়, তাহাদের অভিশাপ ও ভৎর্সনার দাপটে এবং তাহাদের না-শোকর-গোজারীপূর্ণ কর্কশ ব্যবহার বহু স্বামীর সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। অনেক সময় ইহার বিষময় ফলাফল ও বিধ্বংসী পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ভয়াবহতার মুল কারণ—উপরোক্ত দোষগুলির প্রতি সংস্কারের অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। এমনকি, ঐ দোষগুলিকে অত্যন্ত কঠোর শব্দ "কুফর" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অপরিসীম দুরদর্শিতারই পরিচায়ক।

প্রত্যেকটি গোনাহ কুফুরীর শাখা

অর্থাৎ গোনাহ যত ছোটই হউক না কেন, উহাকে মামুলী গণ্য করা চাই না এবং উহা হইতে দুরে থাকিবার প্রতি তৎপর হওয়া চাই। কারণ, উহা কুফুরীর একটি শাখা। যেরূপভাবে প্রত্যেকটি নেক আমলকে ঈমানের শাখা বলা হইয়াছে।

গোনাহ সমূহ কুফুরীর শাখা ও কুফুরী যুগের প্রথা হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কুফুরীর শাখা-প্রশাখা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন কোনও ব্যক্তিকে "কাফের" বলা যাইবে না—যে পর্য্যন্ত না সে আল্লার, আল্লার রসুলের বা আল্লার বাণীর প্রতি স্বীকারোক্তি হানিকর কোনও কাজ বা উক্তি করিবে। তবে হাঁ, সাধারণ গোনাহ সমূহের অনুষ্ঠানকারী কাফের সাব্যস্ত না হইলেও তাহার মধ্যে কুফুরীর শাখা আছে বলিতে হইবে। যেমন, বলা হয়—সে চোর না হইলেও চোরাই মাল তাহার ঘরে আছে।

কুফুরীর শাখা-প্রশাখা—গোনাহসমূহ মাফ হওয়ার উপযোগী। অর্থাৎ তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হয়। কিন্তু আসল কুফর ও শেরক আল্লাহ তায়ালা কখনও মাফ করিবেন না। উহা বর্জন পূর্বক ইসলাম গ্রহণ করিলেই উহা মাফ হইতে পারে; উহা মাফ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। (৫ পাঃ ১৫ রু)।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থ:—আল্লার সঙ্গে শরীক করা (অংশীদবাদিতা ইহা) আল্লাহ কিছুতেই মাফ করিবেন না। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।

এই আয়াতে শুধু শেরেকই উল্লেখ আছে, কিন্তু কুফরও তদ্রূপই অক্ষমার্হ। কারণ, বস্তুতঃ শেরেক ও কুফর পরস্পর বিজড়িত। "শেরক" অর্থ কাহাকেও আল্লাহকে, আল্লার রসুলকে বা আল্লার বাণীকে অস্বীকার করা। আল্লার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা হইলে সে ক্ষেত্রে আল্লাকে অস্বীকারই করা হয়, কারণ প্রকৃত পক্ষে যিনি আল্লাহ তিনি ত

ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু– তিনি এক, অদ্বিতীয় তাঁহার কোন শরীক বা দোসর নাই। তদ্রূপ আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার বাণীকে অস্বীকার করিলেও নিশ্চয় অন্যকে আল্লার সঙ্গে শরীক করা হইয়া থাকে। কারণ, কোনও লোক যখন আল্লার অস্তিত্বকে বা রসুলের ও কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করে, তখন সে নিশ্চয়—হয়ত অন্য কাহারও অনুকরণে উহা করে কিম্বা স্বীয় প্রবৃত্তির বশে উহা করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাও আল্লার সঙ্গে শরীক করারই নামান্তর। কেননা, মানুষ বিনাশর্তে বশ্যতা স্বীকার করিবে, ইহা একমাত্র আল্লারই সার্বভৌম অধিকার। অথচ ঐ ব্যক্তি আল্লার সেই অলঙ্ঘনীয় অধিকার অন্য মানুষকে বা স্বীয় প্রবৃত্তিকে অর্পন করিয়াছে, তাই এক্ষেত্রেও শেরক করা হইল।

এখানে ইহাও প্রকাশ পায় যে, প্রতিটি গোনাহ শেরকেরও শাখা, তাই গোনাহকে অন্ধকার যুগের কাজ বলা হইবে। কারণ, প্রতিটি গোনাহে স্বীয় প্রবৃত্তির বশ্যতা থাকে ; অথচ মানবের কর্তব্য হইল—একমাত্র আল্লার বশ্যতায় চলা। ইহারই ইঙ্গিত এই আয়াতে রহিয়াছে—

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ ۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

"হে রসুল! বলুন ত—যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে মাবুদ বানাইয়াছে। আপনি লইতে পারেন কি তাহার সংশোধনের দায়িত্ব?" (১৯ পাঃ ২ রুঃ)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া চলিয়াছে, তাহাও সৃষ্টিকর্তাপালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণে তাহার সংশোধন হইবে কিরূপে?

২৬। **হাদীছঃ**—আবুযর গেফারী ছাহাবীর শাগেরদ মা'রুর (রঃ) বর্ণনা করেন—একদা আমি আবুযর গেফারীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পরিধানে একজোড়া কাপড় এবং তাঁহার ক্রীতদাসের পরিধানেও অবিকল ঐরূপ একজোড়া কাপড়। আমি তাঁহাকে ভৃত্যের সহিত এরূপ সমতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একদা আমি আমার ভৃত্যকে গালি দিতে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, হে আবুযর! তাহাকে তাহার মাতার সঙ্গে জড়াইয়া গালি দিতেছ? তোমার মধ্যে কুফরী যুগের স্বভাব রহিয়াছে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"এই সব ক্রীতদাস (বা ভৃত্যগণ) তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। অতএব, যে কোনও মোসলমানের অধীনে তাহারই

অন্য এক ভাই (তথা তাহারই মত একজন মানুষ ভৃত্য শ্রমিক বা ক্রীতদাস রূপে) থাকিবে; সেই মোসলমানের কর্তব্য হইবে—ঐ ভাইকেও তদ্রূপই খাওয়ানো, পরানো যদ্রূপ সে নিজে খাইয়া ও পরিয়া থাকে। আর সাবধান! তোমরা কখনও ঐ ভাই এর উপরে এতদুর গুরুভারের কাজ চাপাইয়া দিও না, যাহা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি কখনও এরূপ কোন কাজ তাহার দ্বারা করাইতে হয়, তবে তোমরা নিজেরাও ঐ কাজে তাহার সাহায্য করিবে।"

ব্যাখ্যা:—আবুযর (রাঃ) নবীজীর উক্ত আদেশের পূর্ণ আনুগত্যে স্বীয় ভৃত্যকে নিজের সহিত পূর্ণ সমতা দান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভাবাবেগ ও নবীজীর আনুগত্যে চরম উৎসর্গ-প্রীতি ছিল। নতুবা অন্যান্য দলীল-প্রমাণে সাব্যস্ত হয় যে উক্ত আদেশটির মূল উদ্দেশ্য সমতা নয়, বরং উদারতা (ফতহুল বারী)।

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে আছে—তোমার ভৃত্য তোমার জন্য খাবার তৈরী করিলে উহা হইতে অন্ততঃ এক গ্রাস তাহাকেও দিও।

২৭। হাদীছঃ— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ ـ

অর্থঃ—আবু বক্‌রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—দুই দল মোসলমান যখন তরবারি হাতে লইয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! হত্যাকারী ব্যক্তি দোযখের উপযুক্ত হইবে ইহা বোধ-গম্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি দোযখের উপযুক্ত হইবে কেন? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন—কারণ, নিহত ব্যক্তিও যখন তরবারি হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল, তখন তাহারও ইচ্ছা এই ছিল যে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবে, (সুতরাং সেও দোযখেরই উপযুক্ত)।

এই হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মোসলমানদের পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করা কুফরীর একটি শাখা, তাই এই কাজের পরিণাম ফল উভয়ের জন্যই দোযখ। অন্য এক হাদীছে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে—سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ

"মুসলমান মুসলমানকে গালি দিলে গালিদাতা ফাছেক হইয়া যায় এবং মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করিলে তাহা কুফরী কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।"

তবে এখানেও সেই পূর্বোল্লিখিত বিধানটি প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে কুফরী অনুষ্ঠানকারী, কুফুরীর শাখা প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইবে। কাফের বলা যাইবে না। বোখারী (রঃ) ইহার প্রমাণে কোরআন শরীফের একটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ـ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰى

هُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ

অর্থঃ—যদি মোমেন-মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইটি দল পরস্পর লড়াই-ঝগড়ায় ব্যাপৃত হইতে উদ্যত হয়, তবে (হে মোসলেম জাতি! তোমাদের প্রতি আমার আদেশ এই যে—তদবস্থায় তোমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিও না বা গোপনে উস্কানি দিও না অথবা তাহাদের বিপদ দেখিয়া মনে মনে আত্মতুষ্টি লাভ করিও না, বরং) তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ছোলেহ্ (মীমাংসা) ও পুনর্মিলন সৃষ্টি করিয়া দাও। তোমাদের মীমাংসা-চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তন্মধ্যে একদল অন্য দলের উপর অত্যাচার করে, তবে তোমরা সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ও আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে আল্লার আদেশের (তথা মীমাংসা ও পুনর্মিলনের) প্রতি মাথা নত করিতে বাধ্য কর। (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, দুই দল মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া কুফুরী কাজ এবং কুফুরীর শাখা হওয়া সত্ত্বেও ইহার দ্বারা ঈমান একেবারে বিনষ্ট হইবে না। খাঁটী তওবা করিয়া প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকিবে এবং তাহাকে "কাফের" বলা যাইবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধরত উভয় দলকেই মোমেন বলিয়াছেন।

২৮। হাদীছঃ—ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাজিল হইল—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কোন প্রকার অন্যায়-অত্যাচার করে নাই, একমাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাওয়ার যোগ্য (৭ পাঃ ১৫ রুঃ)। তখন ছাহাবীগণ ভাবিলেন—আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশী কিছু অন্যায়-অত্যাচার (অর্থাৎ গোনাহ) নিশ্চয়ই আছে: তাহা হইলে এই আয়াতের মর্মানুসারে দেখা যাইতেছে, আমরা কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারি না। এই ভাবিয়া তাঁহারা (ভীত ও চিন্তিত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট) আরজ করিলেন—আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটিও অন্যায়-অত্যাচার (গোনাহ্) করে নাই? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—এই আয়াতে (যুলম শব্দটির দ্বারা) সাধারণ অন্যায়-অত্যাচার বা সাধারণ গোনাহ উদ্দেশ্য করা হয় নাই, বরং সব চেয়ে বড় অন্যায়-অত্যাচার "শেরক"কে

উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে— ان الشرك لظلم عظيم "নিশ্চয় জানিও "শেরক" সবচেয়ে বড় অন্যায়—বড় অত্যাচার।" (২১ পাঃ ১১ রুঃ)।

ব্যাখ্যা:—"যুলুম" শব্দের অর্থ অন্যায়-অত্যাচার। গোনাহ মাত্রই আল্লার নাফরমানী হওয়ার কারণে অন্যায় এবং নিজের প্রতি অত্যাচার। ছাহাবীগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে—কোনও গোনাহ করে নাই এমন নিষ্পাপ আমাদের মধ্যে কে আছে? অতএব দেখা যায় আমাদের মধ্যে কেহই, পরিত্রাণ পাইবার যোগ্য নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উক্ত আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে—এই আয়াতে সাধারণ গোনাহের অর্থে যুলুম শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, বরং এখানে "শেরক"কে যুলুম বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শেরক করা হইলে কেহই পরিত্রাণ পাইবে না ইহা ধ্রুব। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ "শেরক"কে যুলুম বা অত্যাচার মনে করে না, কিন্তু ইহা তাহাদের নিতান্ত মূর্খতা। বিশ্ব-প্রখ্যাত জ্ঞানী "লোকমান" স্বীয় পুত্রকে নছিহত ও উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যাহা কোরআন শরীফেও উল্লেখ আছে—

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"হে বৎস! আল্লার সঙ্গে শরীক করিও না; নিশ্চয় জানিও—শেরক অতি বড় যুলুম।" আলোচ্য হাদীছে নবী (দঃ) উক্ত আয়াত দৃষ্টের যুলুমের ব্যাখ্যা শেরকের দ্বারা করিয়াছেন।

মোনাফেকের নিদর্শন

২৯। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন……(১) কথায় কথায় মিথ্যা বলিবে, (২) ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করিবে, (৩) আমানতে খেয়ানত করিবে।

৩০। হাদীছ:— عن عبد الله بن عمرو قال النبى صلى الله عليه وسلم

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন চারিটি চরিত্রদোষ আছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে উহার সমষ্টি পাওয়া গেলে সে পুরাপুরি মোনাফেক পরিগণিত হইবে এবং উহার কোনও একটি পাওয়া গেলে তাহার মধ্যে মোনাফেকের খাছলত ও স্বভাব আছে বলা হইবে। (১) আমানতে খেয়ানত করা (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলা (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৪) কাহারও সঙ্গে মতানৈক্য বা বিরোধ হইলে তাহাকে গালাগালি করা।

ব্যাখ্যা :—মোনাফেক দুই প্রকার। (১) মতবাদীক মোনাফেক; অর্থাৎ অন্তরে মোটেই নাই, শুধু মৌখিক দাবীতে বা বাহ্যিক আসলে মোসলমানরূপী। এই শ্রেণী কাফের এবং প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা কঠিন আজাব ভোগ করিবে। (২) আমলী মোনাফেক; অর্থাৎ অন্তরে সঠিক ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইসলামের বরখেলাফ কাজ করিয়া থাকে এই শ্রেণী কাফের নয়, বরং ফাছেক; আজাব ভোগ করিতে হইলেও অবশেষে চিরবেহেশতী হইবে। উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকী উদ্দেশ্য।

লাইলাতুল-ক্বদরে এবাদত করা ঈমানের শাখা

৩১। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — مَنْ يَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লার নিকট ছওয়াব পাইবার আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া লাইলাতুলক্বদরে এবাদত করিবে, ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

জেহাদ করা ঈমানের শাখা

৩২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কেবলমাত্র এই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে বাহির হইবে যে, একমাত্র আল্লার উপর ঈমান ও তাঁহার রসুলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ সমর্থনই তাহাকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে (অন্য কোনও মোহে নহে)। আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রাখিয়াছেন—হয় তাহাকে ছওয়াব ও গণীমতের✽ মাল-দৌলত দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বগৃহে ফিরাইবেন,

---

✽ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে (ধর্মযুদ্ধে) জয়ী হইয়া শত্রু পক্ষ হইতে যে সকল মালামাল, অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি হস্তগত হইয়া থাকে, উহাকেই 'গণীমত' বলা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ববর্তী অন্য কোনও নবীর শরীয়তে এই সকল মাল

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নতুবা সোজাসুজি বেহেশতে পৌঁছাইবেন। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) যদি সকলের কষ্ট হইবে ইহা লক্ষ্য না করিতাম, তবে আমি প্রতিটি জেহাদকারী দলেই যোগদান করিতাম+। (জেহাদের প্রতি) আমার প্রাণের আকাঙ্খা এই—আল্লার রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হইয়া পুনরায় শহীদ হই এবং পুনরায় জীবিত হইয়া আবার শহীদ হই।

তারাবীর নামায (ফরয নয়, কিন্তু) ঈমানের শাখা

৩৩। হাদীছ:— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লার নিকট ছওয়াব পাইবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমজানের নামায (তারাবীহ) আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

রমযানের রোযা রাখা ঈমানের শাখা

৩৪। হাদীছ:— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমযানের রোযা রাখিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা:—লাইলাতুল কদর, রমযানের রোযা ও তারাবীহ ইত্যাদির বিশেষত্ব ও মর্তবা দৃশ্যও নহে বা ব্যবহারিক যুক্তি-প্রমাণে সাব্যস্ত হওয়ার বস্তুও নহে। এ সবের বিশেষত্ব মর্তবা একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ ও অকাট্য বিশ্বাস ও একীন

ভোগ করার অনুমতি ছিল না; বরং উহা একত্রিত করা হইত এবং ঐ যুদ্ধ আল্লার দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আকাশ হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐগুলি ভস্ম করিয়া দিত।

কিন্তু আমাদের শরীয়তে ঐ সকল মালামাল এই বিধান মতে উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সকল বিজিত ও প্রাপ্ত সম্পূর্ণ মাল ঐ যুদ্ধে নিয়োজিত আমীর অথবা রাষ্ট্রের খলীফার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি ঐ মালের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার বাইতুল মালে রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত মাল মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করিবেন।

+ রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কোনও জেহাদে যোগদান করিলে সেই জেহাদে বিশেষভাবে সকলেই যোগদানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অথচ সকলের জন্য সব সময় শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হইত না বিধায় তাহারা মর্মাহত হইত। তাহাদের এই মনোবেদনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রয়োজন না হইলে স্বয়ং সর্বদা জেহাদে শামিল হইতেন না।

স্থাপন করার উপরই নির্ভব করে। আল্লার ঘোষণা:—ليلة القدر خير من الف شهر "লাইলাতুল-কদরের এক রাত্রির এবাদৎ হাজার মাসের এবাদৎ অপেক্ষা উত্তম।" যে ব্যক্তি এই ঘোষণা ও ৩১ নম্বর হাদীছের প্রতি খাঁটী ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সেই বিশ্বাসই তাহাকে লাইলাতুল-কদরের এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট ও সক্রিয় করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাস অন্তরে থাকাবস্থায় কেহই ঐ রাত্রিকে নিদ্রায় কাটিতে দিতে পারে না। তদ্রূপই যে ব্যক্তি আল্লার ঘোষণা—كتب عليكم الصيام "তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে" এবং ৩৪ নম্বর হাদীছে পুর্ণ বিশ্বাসী হইবে, সে কখনও রোযা ভঙ্গ করিবে না। ঐ সকল ঘোষণার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসই তাহাকে রোযা রাখায় আকৃষ্ট করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি ৩৩ নম্বর হাদীছে বিশ্বাসী; ঐ বিশ্বাসই তাহাকে তারাবীর নামাযের প্রতি অনুপ্রাণিত করিবে।

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছের মধ্যে যে—ايمانا و حتسابا "ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া" বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য ইহাই যে—যে ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারের মোহ বা ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া নহে, বরং কেবলমাত্র আল্লাহ ও রসুলের উপরোক্ত ঘোষণাসমুহের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং নিছক ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই সব এবাদৎ করিবে কেবলমাত্র তাহারই জন্য পূর্ববর্ণিত সুসংবাদ।

প্রকাশ থাকে যে, আখেরাতের যাবতীয় আমলই তদ্রূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের আদেশ বা ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমল করিবে কেবলমাত্র সে-ই উহার পুরস্কার পাইবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কোন মোহে বা অন্য কোনও সাময়িক কারণে যত বড় নেক আমলই করা হউক না কেন, আখেরাতে উহার কোন ছওয়াব পাওয়া যাইবে না।

ইসলাম ধর্ম অতি সহজ

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ পছন্দনীয় দ্বীন ও ধর্ম এই দ্বীনে-মোহাম্মদী, যাহার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নাই এবং যাহা অতিশয় পবিত্র ও অতি সহজ।

৩৫। হাদীছ:— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهٗ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا

وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—দ্বীন (অর্থাৎ দ্বীনের বিধি-বিধান ও উহার পন্থাসমুহ) অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু যে কোনও ব্যক্তি দ্বীনের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করিবে সে পরাজিত হইবে। তাই সকলের

কর্তব্য হইবে, ঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত ইসলামের নির্দেশিত পথ অবলম্বন পূর্বক অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি না করিয়া ধীরস্থির গতিতে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা এবং আল্লার রহমত ও করুণার আশা পোষণ করা এবং সকাল-বিকাল ও শেষ রাত্রে নফল এবাদৎ দ্বারা (অধিক নৈকট্য লাভ ও উন্নতির পথে) সাহায্য গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহ সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সমস্ত ধারা ও উপধারা সমূহের সম্মিলিত ফরমুলা দৃষ্টে এই দাবী অনস্বীকার্য্য যে, ইসলাম ধর্মের বিধানাবলী ও পন্থাসমূহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। ইহার কোনও ধারা বা বিধান এরূপ কোনও নিয়ম বা ফরমুলায় গঠিত নয় যদ্দরুণ কেহ কোন সময় কোন অবস্থায় অচল হইয়া পড়িতে পারে বা কোন বিধান মানুষের সাধ্যের উর্দ্ধে যাইতে পারে। যেমন "নামায"—ইহার সাধারণ পন্থা ও বিধান হইল দাঁড়াইয়া পড়া, কিন্তু কেহ দুর্বল হইলে সে বসিয়া পড়িবে, আরও দুর্বল হইলে কাযা করিবে। এই কাযা আদায় করার সুযোগ না পাইয়া মরিয়া গেলে মাল দ্বারা ফিদ্‌য়্যা আদায় করিবে। সেই ফিদ্‌য়্যা আদায় করার মধ্যেও এরূপ সুযোগ-সুবিধার সুত্র আছে যে, উহা ধনী-গরীব কাহারও অসাধ্য হইবে না। নামাযের জন্য "অজু" করা অপরিহার্য্য, কিন্তু পানি ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মাটি, বালু বা পাথরের উপর তায়াম্মুম করিবে। সাধারণতঃ এই তিনটি বস্তু কোথাও দুর্লভ হয় না। তাহাও যদি অপ্রাপ্তব্য হয়, তখন মছআলাহ এই যে—নামাযের সময় অনুসারে বিনা অজুতেই নামাযের কার্য্য সমুহ সম্পাদন করিবে, পরে পানি বা তায়াম্মুমের বস্তু পাওয়া গেলে তখনকার অবস্থানুসারে ব্যবস্থাবলম্বন পূর্বক ঐ নামায কাযা পড়িবে। নামাযের জন্য ছুরা-কেরাত পাঠ করা অপরিহার্য্য, কিন্তু উহা জানা না থাকিলে আপাততঃ শিক্ষা করা সাপেক্ষে শুধু "ছোবহানাল, আলহামদুলিল্লাহ" পড়িয়া নামায আদায় করিবে। এইভাবে প্রতিটি এবাদতের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই সামর্থানুযায়ী ও সহজ সাধ্য হইবার জন্য সুযোগ সুবিধার কোনই অনটন নাই, আছে শুধু আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আগ্রহের অভাব।

এবাদৎ ছাড়া "মোয়া'মালাত" অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পার্থিব ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও বিধি-নিষেধগুলিও তদ্রূপ। শরীয়তের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম কানুন, ধারা-উপধারা সম্মিলিত ফরমুলা কোন ক্ষেত্রেই অসহজ বা উন্নতি ও প্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নহে।

অনেকে হয়ত এক্ষেত্রে ইসলামের অকাট্য বিধান "সুদ হারাম" বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিবেন যে, ইহা ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অন্তরায়। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা একটি সুফলদায়ক, বরং বর্তমান যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য একটি অপরিহার্য্য মাধ্যম। তদ্রূপ "ইন্সিওরেন্স বা বীমা" ব্যবস্থা; উহাও ইসলাম ও শরীয়তের বিধানে নিষিদ্ধ ও হারাম; অথচ এই ব্যবস্থাও বিপদগ্রস্ত, অনাথ এতিম-বিধবার জন্য এবং আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

এই শ্রেণীর সমালোচনা বস্তুতঃ ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রসূত। ব্যাঙ্কিং একটি আধুনিক ব্যবস্থা বটে, কিন্তু উহার জন্য সূদপন্থা ছাড়া শরীয়তে বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। তদ্রূপ বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার এবং উহার সুফল লাভেরও শরীয়ত সম্মত বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সূদপন্থার বিকল্প পন্থাটি সূদপন্থা অপেক্ষা এবং বীমা ব্যবস্থার বিকল্প পন্থাটি প্রচলিত হারাম পন্থা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনে অধিক সুফলদায়কও বটে। সংক্ষেপে একটি বিষয় অনুধাবন করুন।

দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে দেখা যায়, পুঁজিপতিত্ব তথা গরীবদেরকে দারিদ্রের যাতাকলে দাবাইয়া রাখিয়া তাহাদের শ্রম এবং মধ্যবিত্তদেরকে বিভিন্ন মারপেঁচের চাপাকলে পেঁচাইয়া দিয়া তাহাদের ধন শোষণ করতঃ কতিপয় লোক ধনে সম্পদে বিরাটকায় হওয়ার নীতি ভূপৃষ্ঠে আস্তানা জমাইয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিপতিদের পোষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুঁজিপতিত্বের মূল মনে করিয়া উহাকে নির্বিচারে খতম করিতে তাহারা মারমুখী হইয়া উঠে; ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে ধ্বংস ও বিপর্যয় নামিয়া আসে।

ইসলাম-পূর্ব যুগেও পুঁজিপতিত্বের অভিশাপ ও যাতাকল চালিত ছিল, তাই ইসলাম মানবীয় কল্যাণের স্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-মালিকানা সমর্থন করিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান এমনভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছে যাহাতে কোন পথেই পুঁজিপতিত্বের তথা ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ও গ্রুপবিশেষ অন্যদের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া শুধু নিজেদের ভুরি ভরার সুযোগ না পায়। অর্থ বণ্টন বা লাভের ভাগী করার ক্ষেত্রে যত দূর সম্ভব বেশী সংখ্যায় জনগণকে সুযোগ দান করাই ইসলামের নীতি। পুঁজিপতিত্বের চেষ্টা হইল কায়দা-কানুন করিয়া অন্যদের টাকার লাভ সম্পূর্ণ বা উহার সিংহ ভাগ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ করা। ইসলামের বিধি-বিধান ইহার সম্পূর্ণ অন্তরায়। পবিত্র কোরআন পরিস্কার বলিয়াছে—كيلا يكون دولة بين الاغنياء "ধন-সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যেই কুক্ষিগত না থাকে।" বড় শোষক তথা ক্ষমতাধিকারী শাষকদের বেতন ভাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধানে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইসলাম উক্ত নীতিরই বিকাশ সাধন করিয়াছে; বিস্তারিত বিবরণ সুদীর্ঘ; এখানে সেই নীতির দৃষ্টিতেই আলোচ্য বিষয়দ্বয়ের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা:—প্রচলিত পন্থায় এই ব্যবস্থাটি পুঁজিপতিত্বের একটি ফন্দি ও ফাঁদ। কতিপয় ধনী তাহাদের কিছু ধন একত্রিত করিয়া বা সিন্দুক এবং টেবিল-চেয়ার লইয়া বসে। মধ্যবিত্ত লোকদের কোটি কোটি টাকা একত্রিত হইলে নিজেদের টাকার শত গুণ বেশী টাকা লোন নিয়া ব্যক্তিগত বড় বড় ব্যবসা চালায়। তদুপরি ব্যাঙ্কেরও বড় বড় ব্যবসায় যে বিরাট লাভ হয় উহার মাত্র সামান্য অংশ সেভিংস এবং ফিক্স-ডিপোজিটার

দেরকে দিয়া লাভের সর ও সিংহ ভাগ কতিপয় বিত্তবান ডাইরেক্টারই নিয়া যায় এবং তাহারা এক একজন লক্ষপতি ও কোটিপতি হয়, আর মূল টাকার মালিক যাহারা, তাহারা নিজেদের অবস্থার উপরই থাকে। ইহা সম্ভব হয় একমাত্র সুদীবস্থার মাধ্যমে।

শরীয়তের বিকল্প ব্যবস্থা হইল এই যে, ব্যাঙ্কের সমুদয় লোন বা লগ্নি মিল-কারখানায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ ভিত্তিক না করিয়া সকলের ক্ষেত্রেই এমনকি ডাইরেক্টারদের লোনের ক্ষেত্রেও অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। তদ্রূপ ব্যাঙ্কের সকল সূত্রের আয়ের বন্টন কাহারও জন্য সুদ ভিত্তিক না করিয়া অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। ডাইরেক্টারগণ, সেভিংস ও ফিক্স-ডিপোজিটারগণ সকলে এক নির্দ্ধারিত ফরমুলার অধীনে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় কারেন্ট-একাউন্টারগণও কোম্পানী এবং লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অংশীদার গণ্য হইবে। কিন্তু প্রচলিত সাধারণ লিমিটেডের ন্যায় নয়—যে, ডাইরেক্টারগণ বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী ও জাকজমকের মাধ্যমে এবং কল-কৌশলে সব সর খাইবে; আর শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ডাইরেক্টারদের ইচ্ছাধীন রিবিট ঘোষণা করিবে। বরং প্রাইভেট লিমিটেডের ন্যায় সকল অংশীদার সম সুযোগে লাভবান হইবে। ইহাকে শরীয়তের পরিভাষায় "মোজারাবা" বলা হয়।

এই পন্থায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জায়েয ও শুদ্ধও হয় এবং উহার লাভে অধিক সংখ্যক জনগণ লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়। একে ত ডাইরেক্টার বা বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকগণ সামান্য সুদে ব্যাঙ্কের টাকা লগ্নি নিয়া নিজেরা অধিক লাভের অধিকারী হইতে পারে না; ব্যাঙ্কের টাকার অংশকে নিজের টাকার অংশের ন্যায় লাভের অংশীদার বানাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ—ব্যাঙ্কের টাকার সুযোগ-সুবিধা ও লাভের সিংহ ভাগ শুধু ২০।৫০ জন ডাইরেক্টারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না যে, তাহারা উহা দ্বারা ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিবে, বরং উহা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে সম অনুপাতে বন্টিত হইয়া থাকে।

বীমা ব্যবস্থা :—এই ব্যবস্থাটিও প্রচলিত পন্থায় পুঁজিপতিত্বের আর একটি কৌশল। জনগণের টাকা কুড়াইয়া উহার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ গুটী কয়েক ডাইরেক্টার ভোগ করিয়া থাকে। জনগণের টাকার লাভ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ বিলাস যোগাইবে ইহা অনুমোদন কেন করা হইবে? জনগণের টাকার লাভ সংগ্রহ করার সুযোগের অধিকারী হইল জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠান বাইতুল মাল—যাহার তত্ত্বাবধায়ক হইবে সরকার। সরকার সেই ব্যবসা ইত্যাদির শুধু পরিচালক হইয়া উহার লাভ বাইতুল মালের মাধ্যমে সর্ব-সাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় বাইতুল-মালের বীমা শাখা কিস্তি ও প্রিমিয়াম দাতাদের সাহায্য ও করিবেই, এতদ্ভিন্ন বীমা ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত লাভ যাহার দ্বারা বর্তমান পন্থায় গুটি কয়েক ডাইরেক্টার বিলাস বহুল গাড়ী-বাড়ী ভোগের সহিত লাখ লাখ কোটী কোটী টাকার পুঁজি করিতেছে; বাইতুল-মাল সেই লাভের টাকা ঐসব অনাথ

নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের সাহায্য খাতে ব্যয় করিবে যাহাদের অভিভাবক জীবিত থাকা-কালেও বীমার প্রিমিয়াম দানে অসমর্থ ছিল। এই হিসাবে বীমা ব্যবস্থার বর্তমান পন্থা অপেক্ষা ইসলাম অনুমোদিত পন্থা জন-কল্যাণে কত অধিক উন্নত তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ভাবিতে পারে। বর্তমান পন্থায় অনার্থ এতিম-বিধবাদের কল্যাণ অপেক্ষা পুঁজিপতি ডাইরেক্‌টারদের কল্যাণই অধিক। পক্ষান্তরে ইসলাম অনুমোদিত পন্থায় কল্যাণের সবটুকু জনগণের মধ্যে বিতরিত, এমনকি প্রিমিয়ামদানে অসমর্থ গরীব-দুঃখী নিরাশ্রয় এতিম বিধবাও সেই কল্যাণের ভাগী হইয়া থাকে।

অনাথ নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের কল্যাণ ও সহায়তায় ইসলামী বিধান এত অধিক অগ্রসর যে, উহাকে কোন কোম্পানীর উপর নির্ভরকারী রাখে নাই বা প্রিমিয়ামের টাকা জমা থাকার উপর সীমাবদ্ধ রাখে নাই। ইসলাম বিধানগত ভাবে এতিম বিধবার রক্ষণ-বেক্ষণ বাইতুল-মালের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعاً فَهُوَ اِلَىَّ

"কোনও ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহা তাহার উত্তরা-ধিকারীগণের জন্য; আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) উহাকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না। আর যদি কোনও ব্যক্তি অসহায়-নিরুপায় এতিম-বিধবা পরিবারবর্গ রাখিয়া মারা যায়, তবে আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) তাহার ঐ অসহায় পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিব"। ইহা কি ইসলামের অতুলনীয় সমাজ ব্যবস্থা নহে ? বিধানগত বহুমুখী আয়ের ভাণ্ডার বাইতুল-মালের মাধ্যমে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন শুধু সম্ভবই নহে সহজও বটে। অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি ? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরেও মোসলেম কর্ণধারগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ইসলামের এই সকল মহতী পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া চলিয়া-ছিলেন, ইহা শুধু কাগজ-কলমের পরিকল্পনাই ছিল না।

মোসলেম সমাজ ইসলামী শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া অনৈসলামিক শিক্ষা ও ভাবধারায় নিমজ্জিত হইবার পর তাহাদের আত্মগৌরব ও আত্মনির্ভরশীলতা লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং নিজেদের সহজ ও হালাল পরিকল্পনা সমূহ কার্য্যক্ষেত্র হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিজাতীয় শোষণ-নীতির অনুকরণে অসাধু উপায়ের হারাম পরিকল্পনা সমূহ প্রচলিত হইয়াছে। ইহা আমাদের কর্মের ফল। রসুলুল্লাহ (দঃ) সতর্কবাণী করিয়াছেন—যে ক্ষেত্রেই কোন সুন্নত (অর্থাৎ ইসলামী রীতি) উঠিয়া যাইবে সে ক্ষেত্রে ঐ সুন্নতের পরিবর্তে অন্য একটি বেদয়াৎ (অর্থাৎ অনৈসলামী রীতি) উহার স্থলাভিষিক্ত হইবেই।

ইসলামের সামগ্রিক প্ল্যান-পরিকল্পনার সুদীর্ঘ ফরমুলা হইতে কোনও একটি মাত্র ধারাকে বাছিয়া লইয়া উহা কঠিন হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করা নিতান্তই মূর্খতা। কেননা, যেমন কোন বিশিষ্ট ফরমুলায় তৈরী মিকশ্চার বা টনিকের পূর্ণ ফরমুলা পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র উহার দুই একটি উপাদান লইয়া ব্যবহার করিলে সেই মিকশ্চার বা টনিকের ফল পাওয়া ও দূরের কথা, উহা অসার ও তিক্ত বোধ হওয়া এবং উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি ভাবে ইসলামের অর্থ নৈতিক উন্নতি ও কল্যাণে বিধায়ক পরিকল্পনার ফরমুলা হইতে শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া "সুদ, জুয়া হারাম" এই বিধানটি তিক্ত ও কঠিন বোধ হইলে তজ্জন্য ইসলাম দায়ী হইবে না এবং ৩৫ নম্বরে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ সমালোচনার সম্মুখীন হইবে না। সে জন্য দায়ী ও দোষী হইবে উহারাই যাহারা ইসলামের ঐ সকল মহতী পরিকল্পনা ও ফরমুলাকে নিজেদের ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে অকেজো ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

নামায ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ

৩৬। **হাদীছঃ**— ছাহাবী বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিয়া ("কোবা" ত্যাগ করতঃ) প্রথম হইতে স্বীয় (বংশের) মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন প্রথমাবস্থায় তিনি ১৬ বা ১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে (কা'বা শরীফের বিপরীত) মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার প্রতি আকাঙ্খিত থাকিতেন। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করতঃ ষোল বা সতর মাস পর নূতন হুকুম প্রবর্তন করিলেন যে, কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ুন।) এই হুকুমের পর নবী (দঃ) (স্বীয় মসজিদে) সর্বপ্রথম আছরের নামায সকলকে লইয়া কা'বা শরীফের দিকে পড়িলেন। এক ব্যক্তি (নূতন প্রথায়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়া অন্য এক মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, ঐ মসজিদের মুছল্লিগণ পূর্ব নিয়মানুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহারা রুকু অবস্থায় থাকাকালে ঐ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, আমি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি এইমাত্র আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মক্কামুখী হইয়া নামায পড়িয়া আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ঐ নামাযীগণ রুকু অবস্থায়ই মক্কা শরীফের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

● মদীনার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইহুদী; তাহাদের কেবলা ছিল বাইতুল-মোকাদ্দাস। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়ায় এতদিন তাহারা গর্বিত ও সন্তুষ্ট ছিল। এখন যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কা'বামুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ হইল, ইহুদিরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নানা

প্রকার অযথা প্রশ্নাবলীর অবতারণা আরম্ভ করিয়া ছিল। (কিন্তু পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ঐ সকল প্রশ্নকারীদিগকে জ্ঞানশূন্য বোকা আখ্যায়িও করিয়া তাহাদের অযথা প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং উহার উত্তর দান করিয়াছিলেন*)।

ছাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন এই নূতন প্রথা প্রবর্তন হইবার পূর্বেই বাইতুল-মোকদ্দছ মুখী হইয়া নামায পড়াকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ছাহাবীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল যে, (তাঁহারা শুধু অস্থায়ী কেবলার দিকে মুখ করিয়াই নামায পড়িয়া গিয়াছেন, স্থায়ী কেবলা লাভের সুযোগ তাঁহারা পান নাই, সুতরাং) তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে। তখন এই আয়াত নাযেল হয়—وما كان الله ليضيع ايمانكم "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিবেন না"। (২ পারা ১ রুকু)

ব্যাখ্যা :— বাহ্যতঃ এই আয়াতে "ঈমান" শব্দটির উদ্দেশ্য নামায। কারণ নামায সম্পর্কীয় একটা ভাবনা খণ্ডনেই এই আয়াত নাযেল হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, নামায ঈমানের একটি এমনই অপরিহার্য্য অঙ্গ যে, কোরআন শরীফে নামাযকে সরাসরি ঈমান বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তবে প্রকাশ্যে নামায শব্দের পরিবর্তে ঈমান শব্দ ব্যবহার করারও একটি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা এই যে, বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ থাকাকালীন যাহারা সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ঈমান তাকিদে তথা আল্লার প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দরুনই তাঁহার আদেশানুযায়ী ঐ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ নামাযকে যদি বরবাদ ও বিফল গণ্য করা হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে। কারণ, তাঁহারা ঐ সময় একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার আদেশের প্রতি ঈমানের অনুরাগেই বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়টি বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় যে—তাহাদের ঐ নামাযকে বিফল সাব্যস্ত করার অর্থ প্রকারান্তরে তাহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কখনও তোমাদের (মোসলমানদের) ঈমানকে বিফল ও নিরর্থক করিবেন না।

---

* কোরআন শরীফের দ্বিতীয় পারা ঐ বিষয়েই আরম্ভ হয়। আল্লাহ বলেন—"অচিরেই যখন কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসিবে, তখন একদল নির্বোধ লোক এই প্রশ্ন করিবে যে, কোন্ জিনিস মোসলমানদের কেবলার পরিবর্তন সাধন করিল? আপনি বলিয়া দিন—(আল্লার আদেশই এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। ইহার উপর আর কোনও প্রশ্ন আসিতে পারে না। কারণ) সকল দিকের মালিকই একমাত্র আল্লাহ; (তিনি যখন যে দিক্‌কে ইচ্ছা কেবলা নির্দিষ্ট করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ প্রশ্নের অধিকার নাই। এইভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা-সূত্রের উত্তর দানের পর নিগূঢ় রহস্যময় উত্তর দিয়া) আল্লাহ আরও বলেন—"কেবলা পরিবর্তেন আদেশের মাধ্যমে আমি দেখিতে চাই, কোন্ ব্যক্তি (স্বীয় পূর্ব প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া) রসুলের (দঃ) অনুসরণ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইবে যে—কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) আদেশের অনুসারী এবং কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র রীতি ও প্রথার অনুরাগী"।

খাঁটি ইসলামের উপকারিতা

৩৭। হাদীছ :— سمع ابو سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِاَئَةِ ضِعْفٍ وَّالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلاَّ اَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ

অর্থ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে এবং তাহার ইসলাম-গ্রহণ খাঁটী ও পুর্ণাঙ্গ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার পুর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। পুর্বের হিসাব পরিষ্কার হওয়ার পরমুহূর্ত (তথা ইসলাম গ্রহণের পর) হইতে তাহার জন্য কার্য্যানুপাতিক প্রতিফল এই হিসাবে দান করা হয় যে, নেক কার্য্যে এক-এর পরিবর্তে দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত এবং গোনাহের কাজে সমান সমান (এক-এর পরিবর্তে একই) প্রতিফল দান করা হয়। কিন্তু যদি আল্লাহ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন, (তবে উহার কোনই প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে না)।

৩৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا ـ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ খাঁটী ও পুর্ণাঙ্গ হইবে, তাহার প্রতিটি নেক আমলের ছওয়াব দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত লেখা হইবে এবং গোনাহের কাজে সমান গোনাহ হইবে।

আল্লার নিকট ঐ পরিমাণ আমল অধিক পছন্দনীয় যাহা সর্বদা পালন করা যায়।

৩৯। হাদীছ :—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তথায় অন্য একটি মহিলা বসিয়া আছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটি কে? আয়েশা (রাঃ) তাহার পরিচয় বলার সঙ্গে ইহাও বলিলেন, এই মহিলাটি রাত্রিভর তাহাজ্জুদ নামায পড়েন—নিদ্রা যান না। ইহা শুনিয়া

নবী (দঃ) বলিলেন —এরূপ করা ভাল নয়; তোমরা এই পরিমাণ আমল অবলম্বন করিবে, যাহা সদা সর্বদা পালন করিতে পার। তিনি শপথ করিয়া ইহাও বলিলেন যে, (তোমরা বেশী পরিমাণ আমল করিলে) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ছওয়াব দান করিতে ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু (অবশেষে) তোমরাই ক্লান্ত হইয়া ঐ আমল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। যে পরিমাণ আমলকে সর্বদা বজায় রাখিয়া চলা যায় উহাই আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, আল্লার জিক্‌র-তছবীহ, নফল নামায-রোযা ইত্যাদি কিছু আমল অজিফা তথা সর্বদার অভ্যাসরূপে অবলম্বন করা আবশ্যক এবং উহা এই পরিমাণ অবলম্বন করা ভাল, যাহা যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায়—সব সময়েই বজায় রাখা সহজ হয়। অতি মাত্রার এবাদত স্বভাবতঃই ক্লান্তি বশতঃ কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং অধিক মাত্রায় অস্থায়ী এবাদৎ অপেক্ষা অল্প মাত্রায় স্থায়ী এবাদৎ অধিক পছন্দনীয়। কারণ, শেষফলে ইহারই পরিমাণ বেশী দাঁড়াইবে। কচ্ছপ ও খরগোসের প্রতিযোগিতার গল্প লক্ষ্যণীয়।

আমলের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানের মাত্রা কম-বেশী হয়

৪০। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—"মোওয়াহ্‌হেদ" বা মোমেনদের মধ্যে (যাহারা পাপী এবং পাপের শাস্তি ভোগে যাহাদিগকে দোযখে যাইতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে শাস্তি ভোগ করার পর) সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে চীনার দানা পরিমাণ বা অণু পরিমাণ ঈমান মওজুদ থাকিবে।

পাঠকবর্গ। উল্লেখিত বর্ণনার লোকেরা সকলেই একত্ববাদী মোমেন, অথচ তাহাদের ঈমানের পরিমাণ পরস্পর কম-বেশী দেখা যাইতেছে। ইহা শুধু তাহাদের আমলের কম-বেশীর দরুনই হইবে।

৪১। **হাদীছ** ঃ—একদা এক ইহুদী ব্যক্তি খলীফা ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনাদের কোরআনের মধ্যে (মোসলেম জাতির জন্য অতি বড় সুসংবাদের) একটি আয়াত রহিয়াছে। আমাদের ইহুদী জাতির জন্য যদি ঐরূপ একটি আয়াত নাযেল হইত তবে আমরা ঐ (সুসংবাদের) দিনটিকে (চিরস্মরণীয় করার জন্য) ঈদের দিন বানাইতাম। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? ইহুদী বলিল—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"হে মানব জাতি! আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন ও ধর্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত* সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম, আর আমি তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীন ও ধর্মরূপে পছন্দ ও মনোনীত করিলাম। (৬ পাঃ ৫ রুঃ)

ওমর (রাঃ) বলিলেন—কোন্ দিন কোন্ স্থানে এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক ঠিক রূপে জানিয়া রাখিয়াছি। (বিদায় হজ্জে) রসুলুল্লাহ (দঃ) আরাফার ময়দানে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় জুম্‌আ'র দিন এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। (অর্থাৎ এই আয়াত নাযেল হওয়ার দিনটি আমাদের ধর্মে পূর্ব হইতেই দুই ঈদ-বিশিষ্ট† দিনরূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং নূতনভাবে ঐ দিনকে ঈদের দিনে পরিণত করার প্রয়োজন আমাদের নাই।

● উল্লিখিত আয়াতটির দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধাবলী সম্পূর্ণ করাকেই দ্বীন সম্পূর্ণ করা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যাহার যতটুকু ত্রুটি থাকিবে তাহার দ্বীনও ততটুকু অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং যাহার মধ্যে ঐ হুকুম-আহকাম যে পরিমাণে পূর্ণ হইবে তাহার দ্বীনও সেই পরিমাণে উর্দ্ধে উঠিবে—ততটুকু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যাকাৎ দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ

৪২। **হাদীছ ঃ**—তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নজদবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। সুদূর প্রান্ত হইতে ছফর করিয়া আসায় তাঁহার মাথার চুল এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তিনি বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছিলেন। আমরা শুধু বিড় বিড় শব্দই শুনিতেছিলাম, কিন্তু কোন কিছুই বুঝিতেছিলাম না যে, তিনি কি বলিতেছেন। নিকটবর্তী হইলে পর বুঝা গেল, তিনি ইসলামের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইসলামের অঙ্গ কি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাত্র-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলামের অঙ্গ হিসাবে আমার যিম্মায় এই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত আরও কোন ফরয নামায আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য ফরয না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত কিছু নামায পড়েন (তবে উহা ইসলামের অঙ্গই হইবে বটে, কিন্তু ফরয অঙ্গ নহে, বরং নফল অঙ্গ)। তৎপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন এবং

---

* এখানে "নেয়ামত" শব্দ দ্বারা দ্বীন-ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপী ইসলামের সমস্ত আহকাম বিস্তারিতভাবে শিক্ষাদান করিয়া এবং মক্কা তথা সমগ্র আরব জাহানকে মোসলমানদের করতলগত করিয়া দিয়া বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা জাহেরী ও বাতেনী (ভিতর বাহির) দুইদিক দিয়াই তাঁহার একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে সম্পূর্ণতা দান করতঃ মোসলেম জাতির উপর অতি বড় কৃপাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

† শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদ আর ৯ই জিলহজ্জ দিনটি মহান হজ্জের আসল দিন এবং এই দিনটিই ঈদুল-আজহার প্রকৃত মূল যাহা পরবর্তী দিনে উদযাপিত হয়।

পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখা (ইহাও ইসলামের একটি ফরয অঙ্গ)। আগন্তুক পুনরায় তদ্রূপই জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি ইচ্ছা করিয়া নিজ খুশিতে অতিরিক্ত কিছু রোযা রাখেন (তবে উহা ইসলামেরই নফল অঙ্গ হইবে)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে যাকাতের বিষয়ে বলিলেন। আগন্তুক এবারও ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, যাকাতের ব্যাপারে আমার উপর অন্য আর কিছু ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি নিজের খুশিতে ও আগ্রহভরে দান-খয়রাত করেন (তবে উহা ইসলামের নফল অঙ্গ স্বরূপ হইবে।) অতঃপর ঐ ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন যে, কসম খোদার—আমি এ সবের মধ্যে একটুকুও বেশ-কম করিব না; (পূর্ণ মাত্রায় ঠিক ঠিক রূপে এই সকল আহকাম আদায় করিব।) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথার উপর অটল থাকে, তাহা হইলে তাহার নাজাত অনিবার্য্য এবং তাহার জীবন নিশ্চিতরূপে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

জানাযার সৎকারে* যোগদান করা ঈমানের একটি অঙ্গ

৪৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ

مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى

عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطٍ -

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ও ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও মোসলমানের জানাযার সহগামী হইবে এবং জানাযার নামায ও দাফন কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গেই থাকিবে, সে ব্যক্তি দুই "কীরাত" ছওয়াব —প্রত্যেক "কীরাত" ওহোদ পাহাড় সমান, হাসিল করিয়া বাড়ী ফিরিবে। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য্য সমাধার পূর্বেই শুধু নামায পড়িয়া চলিয়া আসিবে সে এক "কীরাত" পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে।

এই হাদীছটি আয়েশা (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন। এই হাদীছ শ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, পূর্বে আমি বহু সংখ্যক কিরাত ছওয়াব

---

* মোসলমান মৃতের গোছল দেওয়া, কাফনের কার্য্য সমাধা করা এবং জানাযার নামায পড়িয়া শবদেহ বহন করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া তারপর দাফন কার্য্য সমাধা করা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হেলায় হারাইয়াছি। তিনি উক্ত হাদীছ জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে অনেক সময় দাফনে শামিল না থাকিয়া শুধু জানাযার নামায পড়িয়াই চলিয়া আসিতেন। (১৭৭ পৃঃ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ সম্পর্কে ভূমিকাঃ

ইসলাম ও ঈমানের উন্নতির দিক একটি হইল জাহেরী বা স্থূল উন্নতি, অপরটি হইল বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

স্থূল উন্নতিগুলি মোটামুটি এই—(১) দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত কতকগুলি আমল, (২) বাক্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্বীকারোক্তি এবং (৩) অন্তরের কতিপয় বিশ্বাস।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানের এই স্থূল দিকটা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কারণ, মানুষের দেহ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক শক্তিসমূহ সবই আদি ও অন্ত উভয় দিক হইতেই সীমাবদ্ধ। তাই উহা দ্বারা সংঘটিত আমল সমূহও নেহাৎ সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মানুষের নিরাকার আত্মা যদিও আদির দিক হইতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তের দিক হইতে উহা অসীম অক্ষয় অব্যয় এবং অমর। মানুষের এই অদৃশ্য নিরাকার অসীম ও অমর আত্মার ক্রিয়াও দুই প্রকার। সীমাবদ্ধ এবং সীমাহীন। সীমাবদ্ধ প্রকার ক্রিয়া হইল – কতিপয় প্রকৃত সত্যের প্রতি অকাট্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করা। ইসলাম মানুষকে কতিপয় প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়া সেই সত্যগুলিকে অবিচলিতরূপে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়াছে। যথা—(১) আল্লাহ একজন আছেন—তিনি সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, পানাহার দাতা, বিধানকর্তা ও বিচারকর্তা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর সহিত আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে অটলরূপে বিশ্বাসী হইতে হইবে।

তদুপরি মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতার দ্বারা নির্ভুল কিতাব (কোরআন শরীফ) নিষ্পাপ রসুলের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নিষ্পাপ রসুল স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের কার্য্যাবলীর দ্বারা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া নির্ভুল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাই (২) আল্লার কিতাব, (৩) আল্লার ফেরেশতা এবং (৪) আল্লার রসুল ও তাঁহার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অক্ষম অচেতন জড় পদার্থরূপে সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাহাকে পরিমাণ মত ইচ্ছাশক্তি এবং কর্মশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, মানুষ তাহার লব্ধশক্তি সমুহের সদ্ব্যবহার করিয়াছে কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, ইহার হিসাব লওয়ার জন্য একটি সময়ও ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় আখেরাত বা পরকাল। সেই হিসাব-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে তাহাকে বেহেশত দান করিয়া পুরস্কৃত করা হইবে এবং অকৃতকার্য্য প্রমাণিত হইলে দোযখে শাস্তি দেওয়া হইবে। তাই (৫) আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং (৬) বেহেশত-দোযখের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যদিও মানুষের আত্মা সম্পর্কিত ক্রিয়া বটে, কিন্তু এসবই উহার প্রাথমিক ও সীমাবদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি ও বিশ্বাস সমূহের দ্বারা মানুষ তাহার জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে মাত্র। সুতরাং এই সকল বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা বা নড়চড় হইলে তাহার সামগ্রিক জীবন সৌধেরই ভিত্তিমূল নড়চড় হইয়া পড়িবে। ফলে সে তাহার ইসলামী জীবনের ইমারত রচনায় অগ্রসর হইতে কিম্বা উহার সাধনা করিতে সক্ষম হইবে না।

এ পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে—ইসলাম ও ঈমানের স্থূল উন্নতির মোটামুটি যে তিনটি বিষয়বস্তু রহিয়াছে, উহার প্রথম ও দ্বিতীয়টি বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কিত ক্রিয়া হওয়া বিধায় যেমন সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ তৃতীয় বিষয়টি আত্মার ক্রিয়া হওয়া সত্বেও উহা সীমাবদ্ধ এবং শুধু প্রাথমিক ক্রিয়া মাত্র।

ইহার পরেই আরম্ভ হয় মানুষের অসীম আত্মার সীমাহীন উন্নতির পর্য্যায় এবং উহাকেই বলা হয়, ইসলাম ও ঈমানের বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই পর্য্যায়ের উন্নতির দিকটা অতিশয় বিস্তীর্ণ ও বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীনও। এই অন্যতম প্রধান বস্তু হইতেছে—আল্লার খাঁটী এশ্‌ক বা প্রেম। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে বলেন—والذين امنوا اشد حبا لله অর্থাৎ—"প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার যাঁহারা তাঁহারা খাঁটীভাবে আল্লার প্রেমিক হইয়া থাকেন" (১ পাঃ ৩ রুঃ)।

এরূপ প্রেমিক তাঁহারা যে, আল্লার প্রেমের সঙ্গে অন্য প্রেমের মিশ্রণ বা ভেজাল তাঁহাদের অন্তরে মোটেই নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রেমের একনিষ্ঠতা প্রমাণিত না হইবে ততক্ষণ প্রেমকে খাঁটী বলা যাইতে পারে না; একনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম আনুগত্যেরও বিশেষ দরকার। ঈমানের স্থূল উন্নতির বিষয়বস্তুগুলির ভিতর দিয়াই সেই একনিষ্ঠতা ও অকৃত্রিম আনুগত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যথা—নামায (ভজন), রোযা (সংযম সাধনা), যাকাত (জন-সেবা), হজ্জ (আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্রে সকলে সমবেত ভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া আল্লার আনুগত্যের এবং প্রেমের পরিচয় দেওয়া), জেহাদ (আল্লার হুকুমত কায়েম করার জন্য জান-মাল কোরবান করা) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি এই সবের ভিতর দিয়া প্রেমিকের অন্তরে এরূপ আত্মতৃপ্তি, এতটা অহমিকতা আসিয়া যায় যে—সে স্বীয় কার্য্যকলাপের দ্বারা এরূপ নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে, তাহার অন্তরে প্রেমাস্পদের অসন্তোষের কোন ভয়ই আর উদিত হয় না, অথবা প্রেমাস্পদের তরফ হইতে তাঁহার সন্তুষ্টির নিদর্শন স্বরূপ পুরস্কারের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি ও অদম্য স্পৃহা জন্মে না, তবে সেই প্রেম কখনও প্রকৃত একনিষ্ঠ খাঁটী প্রেম নহে, বরং উহা কৃত্রিম এবং নামে মাত্র প্রেম বলিয়াই গণ্য হইবে। খাঁটী প্রেমের অধিকারী এবং প্রকৃত প্রেমিক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে প্রেমাস্পদের সন্তোষ বিধানের জন্য অকাতরে সব কিছু করিয়াও এক পলকের তরেও

তাঁহার অসন্তুষ্টির ভীতি হইতে নিশ্চিন্ত অথবা নির্লিপ্ত হইতে পারে না। কারণ, খাঁটী প্রেমের তেজস্ক্রিয়া এতই তীব্র যে, উহার গ্রাসে সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। তাই প্রেমিকের মনে সদা সর্বদা অসম্পূর্ণতাবোধ এবং যথোপযুক্তরূপে প্রেমাস্পদের জন্য হক আদায় না করিতে পারার চিন্তাই অনুক্ষণ জাগরিত হইতে থাকে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ -

অর্থাৎ—খাঁটী ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের অবস্থা এই যে, তাঁহারা আল্লার কাজ করিয়া কখনই গর্বিত হন না আত্মশ্লাঘাও অনুভব করেন না, বরং সর্বদাই তাঁহারা বিনয় ও নম্রতায় জড়সড় এবং ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকেন এই ভাবিয়া যে, আল্লার কার্য্যের যথাযোগ্য হক আমার দ্বারা আদায় হইল কি না। তাঁহারা আল্লার রাস্তায় যথাসাধ্য দান করেন, সাধ্যানুসারে আল্লার হুকুম-আহকাম পালন করেন এবং যথোচিতরূপে এবাদৎ-বন্দেগীও করিয়া থাকেন, কিন্তু এতদসত্বেও তাঁহাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতে থাকে এই ভাবিয়া যে, তাহাদিগকে একদিন স্বীয় প্রভুর দরবারে হাজির হইতে হইবে ও স্বীয় কৃতকর্মের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জওয়াবদেহী করিতে হইবে। না-জানি সেখানে কোন বিষয়ে কোন গোপন সূক্ষ্ম ত্রুটির কারণে বা কোন সূক্ষ্মতম উপধারা লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইতে হয় না কি। (১৮ পাঃ ৪ রুঃ)

প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নতি লাভ করিয়া চলেন, তাঁহারা কখনই স্বীয় কৃতকার্য্যতার দিকে তথা পিছপানে ফিরিয়া তাকাইবার ফুরছত বা সুযোগই পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্বদা উন্নতির দিকে তথা ঊর্দ্ধ দিকে এবং সম্মুখ পানেই নিবদ্ধ থাকে। প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টির ভীতি ও প্রেমপাত্রের সন্তুষ্টির কামনা, বাসনা ও স্পৃহা লইয়া তাঁহারা সর্বদা উন্নতির ময়দানে সম্মুখ পানে ধাবিত হইতে থাকেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে ছুরা আম্বিয়াতে তের জন পয়গাম্বরের সাধনাময় জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا - وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ

অর্থাৎ "তাঁহারা (পূর্বোল্লিখিত নবীগণ) সকলেই নেক কার্য্যাবলীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ও উৎসাহী ছিলেন এবং সৎকার্যাদি যথাসাধ্য শীঘ্র সমাধা করার জন্য আজীবন অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহারা আমার ভয় অন্তরে পোষণ করিয়া ও আমার ছওয়াবের (পুরস্কার দানের) প্রতি লালায়িত থাকিয়া আমার এবাদত-বন্দেগীতে সদা-নিরত থাকিতেন এবং আমার নিকট ভয়াতুর, সদাবিনয়ী, অহমবর্জিত ও বিনম্র থাকিতেন।"

(১৭ পাঃ ৪ রুঃ)

ইহাই হইতেছে খাঁটী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই উন্নতির ক্ষেত্র অতি বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীন ; ইহার কুল-কিনারা নাই। কারণ, ইহার মূল বস্তু হইল এশক বা প্রেম। আর এশক ও প্রেম সকল প্রকার রূপ রেখা এবং ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে এমনই এক বস্তু, যাহার কোনই সীমা পরিসীমা নাই, কুল নাই কিনারাও নাই।

খাঁটী প্রেমিকদের উৎসাহ, উদ্যম, কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তাধারা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে, যাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ অনুভব ও অনুমান করিতে পারে না। তাঁহাদের অনুভূতি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও গভীর হইয়া থাকে। যেমন, একদা কোনও এক প্রেমিক ব্যক্তি রাত্রিকালে নিদ্রা উপভোগ করিতেছিল। গভীর রাত্রে একটি কপোতের ক্রন্দন সুরে হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; তখন সে ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপের সুরে বলিল—

لقد هتفت فی جنح لیل حمامة — علی فنن وهنا وانی لنائم

وازعم انی هائم ذو صبابة — بسعدی ولا ابکی وتبکی الحمائم

کذبت وبیت الله لو کنت عاشقا — لما سبقتنی بالبکاء الحمائم

অর্থাৎ—"গভীর রাত্রে এই কপোতটি গাছের ডালে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ যাতনায় কাঁদিতেছে, আমি নিদ্রার কোলে অচেতন! আমি প্রেমিক বলিয়া দাবী করি, অথচ প্রেমাস্পদের জন্য আমার ক্রন্দন নাই, কিন্তু কপোত ক্রন্দন রত? খোদার কসম! নিশ্চয়ই আমি কপট ও কৃত্রিম, নতুবা কপোত আমার আগে কাঁদিতে সক্ষম হইত না।"

খাঁটী প্রেমিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীগণ সম্মুখে উন্নতির বিশাল সমুদ্র দৃষ্টে নিজেদের অকিঞ্চিৎকর সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ ধারণা পোষণ করিতে থাকেন যে—আমিত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। কারণ, বিশাল সমুদ্রের তুলনায় লক্ষ লক্ষ মণ পানিও বিন্দুবৎ নগণ্যই মনে হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা ভাবেন যে, আমিত এখনও বিন্দু পরিমিত উন্নতিও হাসিল করিতে পারি নাই। আমার কার্য্যক্রম অত্যন্ত নগণ্য, অথচ আমি মোমেন তথা আল্লার প্রেমিক বলিয়া দাবী করিয়া থাকি। দেখা যায়, আমার কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশী ও বড়। সুতরাং তাঁহারা অনেক সময় এরূপ বলিয়াও ফেলেন যে, আমি মোনাফেক (কপটচার)-এর পর্য্যায়ভুক্ত বটে। এমনকি, এ-পর্য্যায়ের ভয়-ভীতির নিকট পরাজিত হইয়া অনেক কাঁচা বয়সের প্রেমিকগণ আত্মহত্যা পর্যান্ত করিয়া বসেন। কিন্তু পাকা বয়সের প্রেমিকগণ ঐ ভয়-ভীতির নিকট ঐরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন না, বরং তাঁহারা চেষ্টা ও সাধনার ময়দানে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা কোথাও থামেন না, তাঁহাদের জেহাদ মোজাহাদা ত্যাগ তিতীক্ষা ও সাধনা ক্ষান্ত হয় না, অবিরাম গতিতে চলিতেই থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রূহানী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাওলানা রুমী ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

اے برادر بے نہایت درگہیست — ہرچہ بروے می رسی بروے مایست

"হে ভ্রাতা! খাঁটী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির ময়দান অতি বিশাল ও সীমাহীন—উহার কুল কিনারা নাই। যতটুকু অগ্রসর হইতে পার, হইতে থাক; কোথাও ক্ষান্ত হইও না।"

ইমাম বোখারী (রঃ) প্রথমে ঈমানের অনেকগুলি ছোট বড় অঙ্গ বা শাখা প্রশাখা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ প্রভৃতি এবং লাইলাতুল-ক্বদরের এবাদৎ, তারাবীর নামায ও জানাযার সৎকারে যোগদান করা ইত্যাদি। এ সবই সীমা নির্দ্ধারিত ও নির্দিষ্ট আইন-কানুন পর্য্যায়ের বিষয়াবলী। এ সবের দ্বারা প্রথম দিক—অর্থাৎ ঈমানের স্থূল বা যাহেরী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। নিম্নের পরিচ্ছেদ ও শিরোনামায় ইমাম বোখারী (রঃ) দ্বিতীয় দিক—অর্থাৎ ইসলাম ও ঈমানের আধ্যাত্মিক উন্নতির সন্ধান দিতেছেন এবং বড় বড় আল্লাহওয়ালা—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এখানে প্রমাণ করিতেছেন যে—তাঁহারা কত খাঁটী প্রেমিক ছিলেন। মাশুকে-হাকীকী বা প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লার প্রেম তাঁহাদের অন্তরে কত অধিক গাঢ় ছিল এবং একমাত্র সেই প্রেমের কারণেই তাঁহাদের মধ্য হইতে সকল প্রকারের গর্ব ও অহমিকা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া তাঁহাদের অন্তরে আল্লার ভয়-ভীতি কত প্রবল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছিল।

আল্লার মহব্বৎ এবং তদ্দরুন আতঙ্ক যে, অজ্ঞাতে নেক আমল বরবাদ হইয়া যায় নাকি! ইহা ঈমানের অঙ্গ:

ইব্রাহীম তাইমী (রঃ)✝ বলিয়াছেন—আমি যখনই আমার কথাকে (মোমেন হওয়ার দাবী) আমার আমলের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তখনই আমার মনে হয় যে, আমি মোনাফেক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাই নাকি! কারণ, আমি স্বীয় কথা ও কার্য্যের অসামঞ্জস্যের দ্বারা নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করিতেছি।

ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ)✣ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ত্রিশজন ছাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, তাঁহারা সর্বদা এই ভয়ে ভীত থাকিতেন যে, তাঁহারা মোনাফেক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান নাকি। (কেননা তাঁহারা ত মধ্যাহ্নের আলোকোজ্জ্বল দীপ্ত সূর্য্য অর্থাৎ রসুলুল্লাহর (দঃ) সময়ের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার তুলনায় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাও

✝ ইব্রাহীম তাইমী (রঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের নিকটবর্ত্তী ৯২ হিজরীর একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

✣ ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ) ১১৭ হিজরীর একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ বহু ছাহাবীর শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি।

অন্ধকার বলিয়া মনে হয়×)। তাঁহাদের কাহাকেও ঈমানের, পরহেজগারীর গর্ব ও বড়াই করতঃ এরূপ উক্তি করিতে শুনি নাই যে—আমার ঈমান জিব্রাঈল অথবা মিকাঈল ফেরেশতার ঈমানের সমতুল্য।

হাসান বছরী (রঃ)+ বলিতেন—(আমি যেই আল্লার তৌহিদের কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইয়াছি সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যত মোমেন অতীত হইয়াছেন ও বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন, সকলেই মোনাফেকীর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত*। পক্ষান্তরে যত মোনাফেক অতীত হইয়াছে ও বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সকলেই মোনাফেকী হইতে শঙ্কাহীন ও নিশ্চিন্ত। অতএব) মোমেন মাত্রই মোনাফেকে পরিগণিত হওয়ার ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যক্তি মোনাফেক, কেবলমাত্র সে-ই মোনাফেকী হইতে নিঃশঙ্ক-চিত্ত থাকিতে পারে।

অতীত কাল হইতেই "মোরজেয়া" নামক একটি ফের্কা বা দলের আবির্ভাব হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতবাদ ও বিশ্বাস এই যে, 'ঈমান অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস ঠিক থাকিলে অন্যান্য পাপ কার্য্যের দ্বারা ঈমানের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।" প্রথম দিকে যখন এই ফের্কার আবির্ভাব হয়, তখন কোন এক ব্যক্তি আবু ওয়ায়েল (রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ীকে ঐ প্রকার মতবাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহা ঠিক কিনা? আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলিলেন, এরূপ মতবাদ ও উক্তি নিছক ভুল ও মিথ্যা। আমার ওস্তাদ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নিজ কানে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ শুনিয়াছেন—

৪৪। হাদীছঃ— عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

× এইরূপ বিষয়েরই আরও কিছু বিশদ বিবরণ ৫নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

+ হাসান বছরী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মর্তবার তাবেয়ী ছিলেন। ওমর (রাঃ)এর খেলাফতের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ১১০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু ছাহাবী হইতে তিনি এলম হাসিল করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির কেবলমাত্র শেষ অংশটুকু ইমাম বোখারী (রঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। অমূল্যরত্ন হিসাবে আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ কথাটির অনুবাদ দিয়াছি। অতিরিক্ত অংশের অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি।

* খাটী মোমেন মাত্রই তাঁহার মনে সর্বদা এই ভয় সংশয়ের উদয় হইবে যে, আমি মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছি, মোমেনের লেবাছ-পোষাক পরিধান করিতেছি, মোমেনের সুরত-আকৃতি অবলম্বন করিতেছি—অথচ আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্রকে ও আধ্যাত্মিক অন্তরাত্মাকে তদ্রূপ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। আমার ভিতরকে বাহির অনুযায়ী, স্বভাবকে সুরত অনুযায়ী, কার্য্যকে কথা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছিনা। এমতাবস্থায় আমি মানুষকে প্রতারণাকারী মোনাফেক কপটাচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাই নাকি।

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান অপর মোসলমানকে গালি দিলে, সে ফাসেকের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং কোন মোসলমান অন্য মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি করিলে সে কাফেরের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

ব্যাখ্যা :—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের (দ:) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বীয় অবাধ্যতা প্রকাশ করে তাহাকে ফাসেক বলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুল (দ:)কে অস্বীকার করে তাহাকে কাফের বলা হয়। সাধারণ পাপের চেয়ে ফাসেকী কার্য্যের পাপ অপেক্ষাকৃত বড় এবং কুফুরী কার্য্যের পাপ তার চেয়েও বড়। এই হাদীছের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈমান শুধু দেলের বিশ্বাসের নামই নহে, বরং পাপের কাজ হইতে বিরত থাকাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অধুনা অনেকে বলিয়া থাকে ধর্ম ব্যক্তিগত Private বস্তু; সুতরাং সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাপ করিলে তাহাতে ধর্মের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, ধর্মের সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধারণা বস্তুতঃ অতীতের সেই "মোরজেয়া" ফের্কার ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। আলোচ্য হাদীছটির দ্বারা ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হইল। পাপ কার্য্য নিশ্চয় ঈমানের ও ধর্মের ক্ষতি সাধন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। পাপ কাজ হইতে তওবা ✽ না করিয়া মৃত্যু হইলে পরিণাম অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই কারণেই কোরআন শরীফে মোমেনদের পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ("যাঁহারা মোমেন) তাঁহারা সজ্ঞানে কখনও কৃত কুকর্মের উপর হট করেন না।" অর্থাৎ—কোন সময় কোনও কুকথা কুকাজ তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া পড়িলে, উহার উপর এক-গুঁয়েমী বা জেদ না করিয়া যথাশীঘ্র উহা হইতে তওবা করিয়া উহা বর্জন করেন এবং আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। (৪ পা: ৫ রু:)

৪৫। হাদীছ :—ওবাদা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (রমজান মাসে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "লাইলাতুল-কদর" সম্বন্ধে (নির্দিষ্টরূপে উহার তারিখ) জ্ঞাত করাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; পথিমধ্যে দুইজন মোসলমান বিবাদ করিতেছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দ:) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি "লাইলাতুল-কদর" সম্বন্ধে (উহার নির্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদির বিষয় সমুহের অহীপ্রাপ্ত হইয়া) তোমাদিগকে শুনাইবার ও জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়াতে আমার নিকট হইতে সেই অহীর দ্বারা প্রাপ্ত এলম

✽ পাপ কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্তন করত: পুনরায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকার নাম তওবা। স্বীয় কৃত পাপের জন্য মনে প্রাণে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া পুনরায় কদাপি ঐ পাপানুষ্ঠান না করার কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার করত: আল্লাহ তায়ালার নিকট সকাতরে ও আন্তরিকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে তওবা বলা হইবে।

উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। (এবং তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। এই কথা শুনিয়া ছাহাবীগণ অনুতপ্ত হইবেন, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—সেই এল্‌ম আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু (লাইলাতুল-ক্বদরের নির্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদি) এই শুভ রত্ন ও বরকত হইতে বর্তমানে বঞ্চিত হইতে হইলেও আগামীতে তোমরা সতর্ক হইয়া চলিলে (অর্থাৎ পরস্পর ঐরূপ ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি দ্বারা আল্লার রহমতের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিলে) আল্লার রহমত প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি ও উর্দ্ধগতির উপায় ও পথ পাইতে পারিবে। (এখন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অলসরূপে বসিয়া না থাকিয়া) সকলে নিরলসভাবে ও সতর্কচিত্তে রমজানের ২৫শে, ২৭শে এবং ২৯শে রাত্রে লাইলাতুল-ক্বদর অন্বেষণ কর। (অর্থাৎ এই রাত্রিগুলিতে এবাদৎ-বন্দেগী করতঃ আল্লার প্রতি রুজু ও ধাবিত হইয়া লাইলাতুল-ক্বদরের ফজিলত হাসিল করায় তৎপর হও। উহার মধ্য হইতেই কোনও একটি রাত্রি লাইলাতুল-ক্বদর হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে—জাতির ভিতরে সংঘর্ষ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সমাজের অভ্যন্তরে ঝগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ ও ফের্কা-বন্দী বা দলাদলি আরম্ভ হইয়া গেলে জাতির সীমাহীন উন্নতি ও অন্তহীন উর্দ্ধগতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। এমনকি ঐ অবস্থায় নেতৃ-স্থানীয় নবী বা নায়েবে-নবীগণ পর্য্যন্ত গায়েবী মদদ ও আল্লার এল্‌হামী পৃষ্ঠপোষকতা বা ঐশ্বরিক সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। যেমন আলোচ্য ঘটনায় দুইজন মোসলমানের কলহের দরুন রসুলুল্লার (দঃ) নিকট হইতে অহীপ্রাপ্ত বিশেষ ফলপ্রদ একটি বিষয়ের এল্‌ম ও তত্ত্ব উঠাইয়া নেওয়া হইল। এইরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও স্বীয় কোন অপকর্মের দরুণ নেক আমলের তৌফিক ও উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়, অনেক সময় নেক আমল বরবাদৎ হয়।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মূল বিষয় ইহাই ছিল যে, মোমেনের সর্বদা শঙ্কিত থাকা চাই যে, জীবনের কৃত আমল বিনষ্ট হইয়া যায় না—কি, আল্লার পথে উন্নতির দ্বার আমার জন্য রুদ্ধ হইয়া যায় না—কি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নেক আমল কায়দা-কানুন মতে শুদ্ধরূপের হইলে উহা বিনষ্ট কিরূপে হয়? নেক আমল করিতে থাকিলে উন্নতির দ্বার কেন রুদ্ধ হইবে? এই পরিচ্ছেদের হাদীছদ্বয়ে ইহারই উত্তর রহিয়াছে যে, অনেক গোনাহ আছে যাহার অভিশাপে কৃত নেক আমল বিনষ্ট হয়। যেমন—মোসলমানের পরস্পর লড়াই করা কুফরী তুল্য বড় গোনাহ; কুফুরী গোনাহের দ্বারা নেক আমল বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ নির্দিষ্ট তারিখ জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিত লাইলাতুল-ক্বদরের এবাদৎ দ্বারা উন্নতি লাভের পথ পরস্পর বিবাদের দরুন রুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপ অভিশাপময় আরও অনেক গোনাহই আছে, সুতরাং মোমেন বান্দার পথ সর্বদাই কণ্টাকাকীর্ণ, তাহার জীবন ভয়সঙ্কুল সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ইহা হইল ভয়-ভীতির সাধারণ ও স্থূল সূত্র। আর এশ্‌ক ও প্রেম ত নিতান্তই স্বতন্ত্র ভিত্তির; সে প্রেমাস্পদের ব্যাপারে ভয়-ভীতির জন্য কোন যুক্তি বা কারণ চায় না।

ঈমান, ইসলাম, এহসান ও কেয়ামতের তারিখ সম্পর্কে জিব্রিল ফেরেশতার জিজ্ঞাসায় রসুলুল্লার (দঃ) ব্যাখ্যা দান

নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি "হাদীছে জিব্রিল" নামে পরিচিত। অধিকন্তু হাদীছটিকে "উম্মুছ ছুন্নাহ" (সমস্ত হাদীছের জননী) বলা হইয়া থাকে। নবী (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসরের নবী-জীবনে মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির সন্ধান দানে যাহা কিছু কার্য্যকরীভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহার সার-নির্য্যাস এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের শেষ সময়ে একদা জিব্রিল ফেরেশতা অপরিচিত ব্যক্তির বেশে আসিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বিষয় কয়টির মূল্যবান ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন।

বৃক্ষের যেমন প্রাথমিক স্তরে উহার মূল ও শিকড়, দ্বিতীয় স্তরে ডালপালা এবং তৃতীয় স্তরে উহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে—তদ্রূপ ইসলাম ধর্মেরও তিনটি স্তর বা পর্য্যায় রহিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়—অন্তরে সন্দেহাতীত অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন, ইহা মূল ও শিকড় স্বরূপ। দ্বিতীয় পর্যায়—কাজে ও কথায় ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যক্রম ও উহার অনুসরণ, ইহা ডালপালা স্বরূপ। তৃতীয় পর্য্যায়—সীমাহীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন, ইহা ফুল ও ফল স্বরূপ। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) সংক্ষেপে উক্ত তিনটি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

৪৬। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال
كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ
مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ
بِالْبَعْثِ* قَالَ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ❁ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ
وَتُؤَدِّىَ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ✝ قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ

---

* মোসলেম শরীফে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত এই ঘটনার হাদীছটির মধ্যে স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত আছে। অনুবাদের মধ্যে ঐ বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে। নিম্নে ঐ সকল অতিরিক্ত বাক্যাংশগুলিও উদ্ধৃত হইল।

ঐ হাদীছে এই স্থানে ইহাও উল্লেখ আছে— وتؤمن بالقدر خيره وشره

❁ এখানে মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—

ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله -

✝ মোসলেম শরীফে ইহাও আছে— وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا

تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ مَتٰى السَّاعَةُ

قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا

وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا × وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فِىْ خَمْسٍ

لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ

السَّاعَةِ الْاٰيَةَ ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ عَلَىَّ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ

جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ ـ

অর্থ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রকাশ্য দরবারে সকলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন (অপরিচিত) লোক তাঁহার দরবারে আসিলেন এবং (অতি সরলভাবে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈমান কাহাকে বলে? [অর্থাৎ ঈমানের হকিকত বা মূল তত্ত্ব কি? +] রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঈমান [তথা যে বিশ্বাস দ্বারা জীবন-সাধনার প্রারম্ভ হইবে উহা] এই যে—(১) প্রথমতঃ আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে*। (২) তারপর আল্লার যে সকল বিশেষ বার্তাবহ দূত আছেন, তাঁহাদিগকে ফেরেশতা বলা হয়, সেই ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের

× মোসলেম শরীফের হাদীছে ইহাও আছে—

كانت الحفاة العراة رؤوس الناس ملوك الارض

\+ ঈমান শব্দের অর্থঃ—এমন অকাট্য আন্তরিক বিশ্বাস যাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা শিথিলতার অবকাশও না থাকে। সুতরাং মানব জাতির উন্নতি, শান্তি ও মুক্তি, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল—সেই বিশ্বাস যাহার-তাহার উপর ন্যস্ত করা যায় না। কি কি বিষয়-বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতঃ কর্মজীবন ও ধর্মজীবন গঠন করিলে মানুষের সামগ্রিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাই জিজ্ঞাস্য এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহারই সন্ধান দিয়াছেন।

* ফেরেশতাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। তাঁহারা আল্লার আদেশ যখন তখন পালনকারী ও আল্লার আদেশে দুনিয়ার সমুদয় কার্য্য পরিচালনাকারী। তাঁহারা আলোর তৈরী; তাঁহাদের মধ্যে অন্ধকার মোটেও নাই। পাপকার্য্য করার প্রবৃত্তি তাঁহাদের আদৌ নাই এবং তাঁহারা নির্ভুলভাবে আল্লার বাণী তাঁহার আদিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই বিষয়গুলির উপরও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে ※। (৩) আল্লার কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে [যে, উহা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং অবিসংবাদিতরূপে আল্লারই প্রেরিত কিতাব]। (৪) আল্লার পয়গাম্বরগণের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে হইবে [যে, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা আল্লার প্রেরিত সত্য নবী। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না এবং তাঁহারাই মানব জাতির আদর্শ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল আদর্শ]। (৫) তারপর ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে হইবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য ভাল-মন্দ কর্মফল ভোগ করার নিমিত্ত আল্লার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে ×। (৬) তারপর ইহাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন ও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে উহা আমাদের পছন্দনীয় হউক বা অপছন্দনীয় এবং মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ভাল-মন্দ যাহা কিছু করিয়া থাকে—সবের মধ্যেই সর্বশক্তিমান আল্লার কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং আদিকাল হইতেই আলেমুল গায়েব সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্বাহ্নে ঐ সঠিক তালিকাও প্রস্তুত রহিয়াছে*। উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম "ঈমান"। এই ছয়টি বিষয়ের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক মানুষের কর্ম-জীবন বা জীবন-সাধনা আরম্ভ করিবে]।

ঐ অপরিচিত আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশতা) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিলেন যে, ইসলাম কি বস্তু? ইসলাম ধর্ম কাহাকে বলে ণ? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, (১) খাঁটিভাবে আল্লাহকে এক বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা হয় সেই বিশ্বাসের প্রকাশ্য শপথ ও স্বীকারোক্তি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ পূর্বক এক আল্লার গোলামী অবলম্বন করিতে হইবে।

※ আল্লার একত্বে বিশ্বাস করার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে যে আল্লাহ একজন আছেন—মামুলীভাবে ইহা বিশ্বাস করা, বরং আল্লাহই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা, বিচারকর্তা এবং আল্লাহ-ই যে অনাদি-অনন্ত, চিরঞ্জীবন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী তাহা বিশ্বাস করা। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা আরও যে সকল মহৎ গুণাবলীর অধিকারী সেই গুণাবলীর সহিত আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে অটল বিশ্বাসী হইলেই প্রকৃত একত্ববাদী গণ্য হইবে।

× হিসাব-নিকাশে যাঁহারা সৎকার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাঁহারা আল্লার সন্তুষ্টভাজন হইয়া পুরস্কারের স্থান বেহেশতে চিরসুখময় অনন্ত জীবন-যাপন করিবেন এবং যাহারা মন্দ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহারা দোযখবাসী হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

* উপরোল্লিখিত ষষ্ঠ বিষয়টির নামই হইতেছে "তকদীর" অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি। ইহার বিবরণ মূল হাদীছটির পূর্ণ অনুবাদের শেষে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" আকারে দেওয়া হইবে।

ণ "ইসলাম" শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বা যে কোন বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম নহে। বরং একমাত্র আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আল্লার নির্দ্ধারিত বিষয়-বস্তুকে কার্য্যক্ষেত্রে পালন করতঃ ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তি লাভের পথ ইসলাম। সেই সকল বিষয়বস্তুগুলি কি কি, এখানে তাহাই জিজ্ঞাস্য—রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, বরং উহার বিপরীত সব কিছুকে বর্জনের ও অস্বীকৃতির স্পষ্ট ঘোষণা দান পূর্বক কার্য্যতঃও শেরেক তথা অংশীদারবাদকে এড়াইয়া চলিতে হইবে। মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রসুল বলিয়া অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঐ বিশ্বাসেরও তদ্রূপ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হইবে। [ইহাই কালেমা শাহাদতের সারমর্ম ;] "আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা-লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু"। অর্থ—আল্লারই বন্দেগী ও দাসত্ব করিব ; আল্লার সহিত তাহাকেও শরীক করিব না, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বিশিষ্ট বান্দা ও রসুল।" [অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে উহা ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে প্রমাণিত করাও অপরিহার্য্য ; তাই] (২) দৈনিক পাঁচটি নির্দ্ধারিত সময়ে, আল্লার দরবারে হাজির হইয়া আল্লার নির্দ্ধারিত আদেশ ও রসুলের নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে। (৩) [স্বীয় অর্থের ও আত্মার পবিত্রতা সাধনের মানসে এবং আল্লার সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী] যাকাত দান করিতে হইবে। (৪) [সংযম অভ্যাস করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু দমনের জন্য] পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। (৫) [প্রত্যেক মোসলমানের আকাঙ্খা রাখিতে হইবে যে,] সামর্থ্যবান হইলেই হজ্জব্রত পালন করার জন্য আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্র—মক্কাস্থিত কা'বা গৃহে পৌছিতে হইবে।

সেই অপরিচিত আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশতা) তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন এই যে—"এহসান" কি ? [এখানে "এহসান" শব্দের অর্থ—ভালর চাইতে ভালরূপে এবং উত্তমের চাইতেও উত্তমরূপে কর্তব্য কার্য্য সমাধা করা। অর্থাৎ মানুষের জীবন-সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে যেমন তাহাকে ছয়টি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং পাঁচটি সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করিয়া যাইতে হইবে, তদ্রূপ তাহার সীমাহীন আত্মার অসীম উন্নতি সাধন করতঃ ভালর চাইতে ভাল এবং তার চাইতে অধিক ভাল হইতে হইলে তাহার পক্ষে কি করা কর্তব্য তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্য*। আল্লার রসুল (দঃ) এখানে তাহারই পথ দেখাইতেছেন এবং সে সন্ধানই দিতেছেন।] রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—"এহ্‌সান" তথা সেই অসীম উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে হইলে, তোমাকে আল্লার গোলামী করিয়া চলায় আজীবন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে, আর সেই সাধনা হইবে এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনা যেন তুমি স্বয়ং খোদা তায়ালাকে দেখিতেছ। কেননা, যদিও তুমি খোদাকে দেখিতেছ না, কিন্তু খোদা ত তোমাকে দেখিতেছেন।

---

* "মানুষ" শুধু রক্ত মাংশ ও অস্থিমজ্জায় গঠিত জড়পিণ্ডের নাম নহে, বরং অসীম আত্মা ও সসীম দেহ এই দুই-এর প্রকৃত সমন্বয় সাধনের নাম মানুষ। মানুষের স্থুল দেহ ফুলিয়া ফাঁপিয়া মেদবহুল ও মোটা হইলে বা ৫।৭ গজ লম্বা হইলেই তাহাতে মানুষের উন্নতি লাভ হয় না। মানুষের উন্নতি হয় তাহার অসীম আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা। সেই উন্নতির উপায় ও পথকেই এখানে "এহসান" নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) উহারই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

[তাই তোমাকে বিরামহীনরূপে সেই একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। মনিবের সম্মুখে অন্ধ ভৃত্য—যদিও সে মনিবকে দেখিতে পায় না তবুও মনিবকে দেখা অবস্থার ন্যায়, বরং অধিক একাগ্রতার সহিত বিরামহীন সাধনা করিয়া চলে; কারণ সে জানে যে, মনিব তাহাকে দেখিতেছেন—যাহা বিরামহীনরূপে ঐকান্তিক সাধনায় ব্রতী থাকার মূল কারণ। মানবের অবস্থা আল্লার সম্মুখে তদপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল নয় কি? অতএব তাহার সাধনা বিরতি ও শৈথিল্য বিহীন হইবে না কেন?

এই সাধনা কেবলমাত্র নামায বা মসজিদেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না; এই সাধনার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র এবং তাৎপর্য্য হইবে এই যে—নামায, রোযা ইত্যাদি নেক আমল সমূহে, তদুপরি হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে, কথা-বার্তায়, বক্তৃতায় এবং লেখনী বা মস্তিষ্ক চালনায় ও চিন্তাধারায় অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্য্যায়ে, প্রতিটি স্তরে ও প্রত্যেক পদক্ষেপে এমনকি উঠা-বসা, চলা-ফেরা পানাহার ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যসমূহে এরূপভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে এবং এমনভাবে কর্মজীবন যাপন ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তুমি একটা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ভট, স্বেচ্ছাচারী দানব-বিশেষ নহ। বরং তুমি আল্লার অনুগত আল্লার গুণে গুণান্বিত আল্লারই একজন দাস, এমন দাস যে স্বীয় মনিবকে সম্মুখে চাক্ষুষ দেখিতেছ। বলা বাহুল্য—কোন ভৃত্য বা ক্রীতদাস যখন কর্তব্যরত অবস্থায় স্বীয় মনিব ও মাওলাকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তখন তাহার অন্তরে কতই না ভয় ও ভক্তির ভাব জাগ্রত থাকে এবং সেই ভয় ও ভক্তির আড়ালে একাগ্রচিত্তে ও সুষ্ঠুরূপে কার্য্য সমাধা করার কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে; মানব তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবে, ইহারই নাম "এহসান"+ ।]

ঐ আগন্তুক চতুর্থ প্রশ্ন এই করিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে আসিবে এবং উহার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ কবে? (অর্থাৎ—মানুষ যে সকল কর্তব্যাকর্তব্য পালন করিবে ও

+ সাধারণতঃ এই হাদীছের অর্থে যদিও নামাযের মধ্যে এহসানের মর্তবা তথা উপরে বর্ণিত অবস্থা হাসিলের কথা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল তাহাই নহে, বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি করার নাম "এহসান"। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত الله । تعبد শব্দের অর্থ নিজেকে আল্লার দাসরূপে রূপায়িত করিয়া তদনুযায়ী সামগ্রিক জীবনকে সুগঠিত ও পরিচালিত করা। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই মর্মই ব্যক্ত হইয়াছে— ان تخشى الله كانك تراه । অর্থাৎ সর্বদা তোমার অন্তরে আল্লার ভয়-ভক্তি এরূপ জাগ্রত রাখ, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ। (পরন্তু, যদিও তাঁহাকে দেখিতেছ না, কিন্তু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন)।

উল্লিখিত এহসানের পর্য্যায়ে পৌছার পথকে সহজ করার জন্যই "তাছাওফ" বা তরীকতের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পর্য্যায় হাসিল করাই মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।

কঠোর সাধনা করিয়া কর্মজীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টারত থাকিবে, উহার ফলাফল নিশ্চয় একদিন প্রকাশিত হইবে এবং সেই দিন ও সময়টি কখন আসিবে তাহা নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিতরূপে বলিয়া দিন।)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমি আপনার চাইতে অধিক কিছু জানি না। কেননা কেয়ামত বা ইহজগতের প্রলয়ের নির্দিষ্ট তারিখ সম্বন্ধে আপনি যেমন অজ্ঞ আমিও তদ্রূপই অজ্ঞ। অবশ্য ঐ সময় বা মহাপ্রলয়ের দিনটি নিকটবর্তী হওয়ার আলামত বা নিদর্শন আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি।

যখন সন্তান-সন্ততিগণ মাতা-পিতার ঔরষজাত হওয়া সত্ত্বেও উহারা তাহাদের অবাধ্য তাহাদের নাফরমান, তাহাদের প্রতি চাকর-চাকরানীর ন্যায় ব্যবহারকারী হইবে এবং যখন চরিত্রহীন ও অতিশয় নিম্নস্তরের ইতর প্রকৃতির রাখাল মজুর শ্রেণীর লোকদের হাতে কর্তৃত্ব ও রাজ্য শাসনের ভার চলিয়া যাইবে এবং ধন-দৌলত অর্থ-সামর্থ্যও ঐ শ্রেণীর লোকদের হাতেই চলিয়া যাইবে এবং তাহারা ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক ভাবে বড় বড় মহল—অট্টালিকাদি তৈয়ার করিবে এবং উহাতেই গৌরব বোধ করিবে। এই সবই হইবে কেয়ামত তথা জগৎ ধ্বংসের পূর্ববর্তী আলামত। (অর্থাৎ কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের নিকটবর্তী জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ও ওলট-পালট দেখা দিবে। ছেলে-মেয়েরা মুরব্বীদের সঙ্গে এমনকি জননী মাতার সহিত মেয়ে পর্য্যন্ত এরূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিবে যেন ছোটরাই মুরব্বী। চরিত্রহীন ইতর প্রকৃতির লোকেরাই তখন প্রবল হইয়া উঠিবে এবং সংলোকের অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিবে। মূল প্রশ্ন কেয়ামত কবে আসিবে, উহার নির্দিষ্ট তারিখ কেহই বলিতে পারে না। কারণ,) ইহা ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটি যাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না। এই শেষ প্রশ্নের সমর্থনে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন— ✽ ان الله عنده علم الساعة

✽ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কাফেররা পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, উহারই উত্তরে এই আয়াত নাযেল হয়।

আয়াতের অর্থ:—(১) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন; (তাই কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইবে এসব বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব সঠিকরূপে ও সরাসরি ভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন। মানুষ এই বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারে উহা শুধু আবহাওয়া সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঋতু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে বা যান্ত্রিক সাহায্যে সম্ভাব্যমূলক নিদর্শনাদি অনুভব করিয়া কেবল আনুমানিক ধারণা জন্মায় মাত্র; উহা কখনই সুনিশ্চিত বা সরাসরি অবগত হওয়া নহে)। (৩) মাতৃগর্ভে অবস্থিত সন্তান—ছেলে, কি মেয়ে তাহাও সঠিক-ভাবে এবং নির্দিষ্টরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। (৪) ভবিষ্যতে কে কি করিবে এবং (৫) কোথায় কাহার মৃত্যু হইবে, তাহাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক অভ্রান্তরূপে অবগত আছেন। (বস্তুত কেবলমাত্র এই পাঁচটি বিষয়েরই নহে, বরং পৃথিবী ও আকাশের সমুদয় বিষয়ের সুনির্দিষ্ট গায়েবী-এল্‌ম বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা; নিশ্চয় তিনি অন্তর্য্যামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। (২১ পারা, ছুরা লোকমান, শেষ রুকু

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তরের পর ঐ আগন্তুক চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—তাঁহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন। কিন্তু আগন্তুক মুহূর্তে কোথায় চলিয়া গেলেন, ছাহাবীগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ঐ আগন্তুক জিব্রিল ফেরেশতা ছিলেন। (প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া) তোমাদিগকে দ্বীন ও ধর্মের প্রধান বিষয়সমুহ জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—("তকদরী কি? উহার তাৎপর্য্য ও বিবরণ—)

জাগতিক কার্য্যক্রম ও ঘটনা-প্রবাহ সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যাহা মানুষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে স্বভাবতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যাহা মানুষের দ্বারা এবং তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে মানবিক কার্য্যক্রম বা মানুষের দ্বারা সম্পাদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত উভয় প্রকারের সমস্ত বিষয় ও ঘটনাসমূহ যত বড় বা যত ছোটই হউক না কেন, প্রতিটি কার্য্য ও ঘটনার মধ্যেই (১) সর্বশক্তিমান আল্লার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তদুপরি আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ, আলেমুলগায়েব; তাই (২) অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে কোন প্রকারের যাহা কিছু ঘটিবে, বা যাহার দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, অনাদিকাল হইতেই আল্লাহ তায়ালা সে সব জানেন। এমনকি আল্লার সেই অভ্রান্ত জ্ঞান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট টাইম-টেবল (Time table—রেল কোম্পানীর সময় নির্দ্ধারক তালিকা)-এর ন্যায় পূর্ব হইতেই সব কিছুর পূর্ণ তালিকা পর্য্যন্ত তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (৩) যেহেতু আল্লার এল্‌ম (জ্ঞান) ও জানা কখনই ভ্রমাত্মক বা অপ্রকৃত—অবাস্তব হইতে পারে না, সুতরাং ঐ তালিকার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নামই হইয়াছে "তকদীর" অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে—"তকদীর" বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র। উহার একটি হইতেছে "কুদরত" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমান হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে "এল্‌ম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনাদিকাল হইতেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হওয়া।

জাগতিক ঘটনা প্রবাহের প্রথম প্রকারের ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে তকদীরের বিষয়ে বিশেষ কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের উদয় ছিল না। এমনকি এই প্রকারের কোনও ঘটনা কোনরূপ বাহ্যিক কারণ ও হেতুর আবরণে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, যেহেতু কার্য্য কারণ পরম্পরায় শেষ পর্য্যন্ত ঐ কারণের কারণ তস্য কারণ হাতড়াইয়া পাওয়া যায় না কিম্বা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উহার রহস্যজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তাই বাধ্য হইয়া সেখানে তকদীরকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং নিজেদের পরিভাষায় উহাকে "প্রাকৃতিক" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যক্রম সম্বন্ধে তক্দীরের বিষয়ে নানা প্রকার সংশয়ের উদয় হইয়া থাকে। তাই এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষণীয় যে—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থরূপেও সৃষ্টি করেন নাই, কিম্বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সক্ষম, সর্বশক্তিমান করিয়াও সৃষ্টি করেন নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নেহাৎ স্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জ্ঞানশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ সকল প্রদত্ত শক্তিসমূহকে আল্লাহ তায়ালা একান্তই স্বীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার কর্তৃত্বের বিধানে ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে—মানুষ তাহার শক্তিসমূহ কোন ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করিলে উহাতে আল্লার তরফ হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করার কোনও বাধ্যবাধকতা মোটেই থাকিবে না। অন্যথায় কর্ম জগতের মুল রহস্য—"পরীক্ষা" অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

মানবকে উল্লিখিত শ্রেণীর শক্তিতে শক্তিমান করিয়া, ভাল-মন্দ চিনিবার জন্য শরীয়তকে মাপ-কাঠিরূপে প্রদান করতঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (মানবকে) কর্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন ; لينظر كيف تعملون "পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য যে—হে মানব ; তোমরা কোন্ পথ অবলম্বন কর।" এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, মানুষ নিশ্চিতরূপে স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবে না কেন ? নিশ্চয় ভোগ করিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানবকে যে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতাটুকু দান করিয়াছেন—যদ্দ্বারা মানব জাতি অপরাপর অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন পরিগণিত হয় ; ঐ শক্তি ও ক্ষমতাকে সৎ বা অসৎ—ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করার জন্য মানবই দায়ী। এতদ্দৃষ্টে তক্দীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে কোনও বাধার সৃষ্টি হইতে পারে কি ?

তক্দীর বলিতে আল্লার যে অসীম কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও শক্তিমত্তা বুঝায়, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা বহু সুফল প্রতিফলিত হইতে পারে। যথা—(১) কর্মক্ষেত্রে মানুষ নিজকে বাহ্যতঃ যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতাবান দেখিতে পাইলেও সে নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ তথা অবিমিশ্র শক্তির অধিকারী বলিয়া ধারণা করিবে না। যেরূপভাবে ফেরাউন-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজেদের সম্পর্কে ঐ প্রকার ধারণা পোষণ করতঃ উহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া বহু অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। (২) আল্লাহ তায়ালা যে, মহান ও সর্বশক্তিমান তাহা সর্বদা মনে জাগ্রত থাকিবে এবং নিজকে সর্বদাই তাঁহার মুখাপেক্ষী, সাহায্য-প্রার্থী ও দয়ার ভিখারীরূপে গণ্য করিয়া জীবনের সকল কার্য্য পরিচালিত করিবে। (৩) কোনও কার্য্যে শত চেষ্টার পরেও অকৃতকার্য্য বা বিফল হইলে তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একেবারে মনে ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবে না, বরং স্বীয় মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দান করিবে যে—সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেই এরূপ হইয়াছে এবং নিশ্চিতই ইহার অন্তরালে হয়ত আল্লাহ তায়ালার এমন কোনও সুফল প্রসূ ইঙ্গিত অথবা

মঙ্গল-সূচক ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, যদ্দরুন ইহাই আমার জন্য তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাই ইহাতে আমাদের কিছুই করিবার নাই; আমরা ত তাঁহার গোলাম মাত্র। অতএব, মনিবের যাহা ইচ্ছা গোলামের প্রতি করিতে পারেন। মনের মধ্যে এই প্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। (৪) কোনও বিষয়ে বাহ্যতঃ স্বীয় চেষ্টা ও শক্তির দ্বারা কৃতকার্য্য ও সফলকাম হইলেও, তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি ফেরাউন প্রকৃতির হইবে না, বরং মনে মনে আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও শোকরগোজার হইবে এই ভাবিয়া যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার অপার করুণা-বলে আমাকে এই সাফল্য লাভের তৌফিক ও সুযোগ দান করিয়াছেন; ফলে তাহার স্বভাবে নম্রতা আসিবে; উগ্রতা ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হইবে না, আল্লার বান্দাদের প্রতি সে বিনয়ী ও সদয় হইবে।

এসবই হইতেছে তক্দীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনিবার্য্য ও বাস্তব প্রতিক্রিয়ার সুফল। ইহার পরিবর্তে কেহ যদি তক্দীরের নামে স্বীয় কর্মজীবনে দুর্বলতা টানিয়া আনে, অর্থাৎ অকর্মণ্য, নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন হইয়া পড়ে তবে তাহা ঐ ব্যক্তির নিজের ত্রুটি ও শয়তানের ধোকা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

তক্দীরের যে সংজ্ঞা ও তাৎপর্য্য বর্ণিত হইল এবং তক্দীরের উপর ঈমান স্থাপনের যে ফলাফল ব্যক্ত হইল—এই সব তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেই সংক্ষেপে ইশারা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ - وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

অর্থঃ- ভূপৃষ্ঠে যে কোন বিপদ-আপদ, দুর্য্যোগ-দুর্ভোগের আগমন হয় এবং উহার যে কোনটা কোন মানুষের উপর আসে উহার প্রত্যেকটাই কিতাবে তথা লৌহে-মাহ্ফুজে লিখিত আছে—উক্ত বিপদ ও দুর্য্যোগকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই, বরং ঐ মানুষটিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই। (তদ্রূপই জগতে যখন যে সুযোগ-সুদিন, সুখ-সমৃদ্ধির সঞ্চার হয় এবং উহা যে কাহারও জীবনে সমাগত হয় উহারও প্রত্যেকটাই কিতাবে লিখিত আছে—উহাকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই।) এইরূপে লিখিয়া রাখা (আমি) আল্লার পক্ষে নিতান্তই সহজ ব্যাপার। এই তথ্যটা তোমাদিগকে জ্ঞাত করান হইল শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা কেহ কোন মনোবাঞ্ছা হইতে বঞ্চিত বা উহা লাভে ব্যর্থ হইলে কিম্বা কোন ধন-জনহারা হইলে সে যেন ক্ষোভ-বিহ্বল বা শোক-বিহ্বল হইয়া না পড়ে। (ধৈর্য্যধারণ

করিয়া মনোবল অক্ষুন্ন রাখে) এবং কেহ আল্লার তরফ হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে যেন ঔদ্ধত্যে, দম্ভে ও খুশিতে উন্মত্ত না হয়; (শুকুরগোজার—আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হয়।) কোন অহঙ্কারী দাম্ভিককে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (২৭ পারা ১১ রুকু)

তকদীরের উপর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে অপরিহার্য্য, তাহা মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত। হাদীছটি এই:—

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমাদের দেশে নূতন মতবাদের একদল লোক আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা একদিকে বেশ কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে এবং জ্ঞান-চর্চা তথা ধর্মীয় গবেষণাদিও করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যদিকে তাহারা তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী নহে, বরং তাহারা তকদীরকে অস্বীকার করিয়া থাকে। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে বলিয়া দিও যে, আমাদের তথা খাঁটী মোসলেম জাতির সহিত তাহাদের কোনই সংশ্রব নাই; তাহারা মোসলেম জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন। আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যত প্রকার ও যত বড় নেক আমলই করুক না কেন, এমনকি পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণও যদি তাহারা আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত করে, তথাপি উহা আল্লার দরবারে কবুল হইবে না; তাহারা উহার কোন ছওয়াবই পাইবে না যাবৎ না তাহারা উক্ত ইসলাম বিরোধী ধারণা ও মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া তকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপন করে।×

পাঠকবর্গ। এখানে তকদীরের যে ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই উক্তি অত্যন্ত সঙ্গত। তকদীরকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালার দুইটি বিশেষ ছেফৎ ও গুণকে বা উহার ব্যাপকতাকে অস্বীকার

× আরও এক হাদীছে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না যাবৎ না সে (নিম্নে বর্ণিত) চারিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। (১) আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (২) আমি (আল্লার রসুল;) সত্য ও খাঁটী দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। (৩) মৃত্যু অনিবার্য্য এবং তৎপর হিসাব দিবার জন্য পুনরুজ্জীবিত হইতে হইবে। (৪) তকদীর বরহক্। (তিরমিজী শরীফ)

এই সব হাদীছ দৃষ্টে প্রত্যেক নাজাতকামী মোসলমানের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, "বুঝ ও যুক্তিতে আসে না" ইত্যাদি কোন অজুহাতে তকদীরকে অস্বীকার করা নাজাতের পরিপন্থী হইবে। কেহ আবশ্যক মনে করিলে যুক্তি-যুক্তরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে, আজীবন সেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অজুহাত দেখাইয়া উহাকে এনকার করার কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য তকদীরের কোন ভুল ব্যাখ্যা মনে গাঁথিয়া লইয়া কর্মজীবনে হাত-পা গুটাইয়া নিরুৎসাহ, নিষ্কর্মা হইয়া বা চেষ্টা ও তদবীরবিহীন হইয়া বসিয়া থাকাও সমর্থনীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে তকদীরের ভুল ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের প্রতি নানাপ্রকার দোষারোপ করিতেও শুনা যায়, উহার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

করা। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, তকদীর বলিতে যাহা কিছু বুঝায় বস্তুতঃ উহা আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র। বলা বাহুল্য, যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনও একটি ছেফৎ বা গুণকে অস্বীকার করিলে ঈমান ও ইসলাম বহাল থাকিতে পারে না।

সন্দেহজনক কাজ হইতে সংযমী হওয়ার ফজিলত ও সুফল

৪৭। হাদীছঃ—عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم—

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الْمُشْتَبِهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِىْ اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ✝

অর্থ:—নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে—"হালাল" স্পষ্ট এবং "হারাম" স্পষ্ট। আর এই দুইটির মধ্যস্থলে কতগুলি "সন্দেহ জনক" শ্রেণীর বিষয়বস্তুও রহিয়াছে। ঐগুলি কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তাহা অধিকাংশ লোকেরাই নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক বিষয়গুলি হইতে সংযমী হইবে (ঐগুলিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে) একমাত্র তাহারই দ্বীন ঈমান ও আবরু-ইজ্জত সুরক্ষিত ও কলুষমুক্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়বস্তু সমূহে লিপ্ত হইবে, তাহার অবস্থা এরূপ—যেমন কোন রাখাল তাহার পশুপালকে (সরকারী বা কাহারও) সংরক্ষিত স্থান (Protected area) এর নিকটবর্তী চরাইয়া থাকে; তদবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পশুগুলি ঐ সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকিয়া পড়িবে (এবং তদ্দরুন রাখাল বিপদগ্রস্ত হইবে। তদ্রূপ মধ্যস্থলীয় সন্দেহ-জনক বিষয়বস্তুগুলি হইতে যে ব্যক্তি সংযমী না হইবে এবং উহা হইতে দূরে না থাকিবে,

---

✝ এই হাদীছটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছ। মানুষ কি উপায়ে স্বীয় দ্বীন ও ধর্মজীবনকে রক্ষা ও হেফাজত করিতে এবং মানবতার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহারই উপায় এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া এই হাদীছটির আরও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাই প্রথমতঃ সরল অনুবাদ তৎপর ব্যাখ্যা এবং তারপর "বিশেষ দ্রষ্টব্য" আকারে ইহার একটি সুক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইবে।

অচিরেই অনিবার্যরূপে তাহার নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তি স্পষ্ট হারামে লিপ্ত হইয়া পড়িবে, ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে অপদস্থ হইবে)। তোমরা শুনিয়া রাখ, প্রত্যেক বাদশারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে (যেখানে অন্য সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে)। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু সমূহই দুনিয়ার বুকে তাঁহার সংরক্ষিত স্থান তুল্য; (সেখানে কাহারও প্রবেশ করিতে নাই, অধিকন্তু উহার নিকটবর্তী হওয়া তথা সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হওয়াও উচিত নহে।

সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু হইতে স্বীয় দ্বীন ধর্ম ও আবরু-ইজ্জতকে কলুষমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রাখিতে এবং মানবতার উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধগামী হইতে সহজে সক্ষম হওয়ার জন্য) আরও শুনিয়া রাখ, মানুষের অজুদের ভিতরে অর্থাৎ মানব দেহের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে যে, সেই অংশটি যখন যথার্থরূপে ঠিক হইয়া যায়, তখন মানুষের পুর্ণ অজুদই ঠিক হইয়া যায়। (অর্থাৎ সম্পুর্ণ মানব দেহটিই তখন সঠিক-ভাবে পরিচালিত হইতে থাকে।) পক্ষান্তরে সেই অংশটি যখন খারাপ হইয়া পড়ে, তখন সমস্ত অজুদটিই খারাপ হইয়া যায় (অর্থাৎ মানব দেহের কোন অংশ বা কোন অঙ্গই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না)। বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, সেই অংশটি হইতেছে আ'কল বা বিবেক।*

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম (আদেশ-নিষেধাবলী) চারি প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। কোরআন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াছ। উহার যে কোনও একটি দ্বারা যে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টরূপে "হালাল" বৈধ ও গ্রহণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হালাল এবং যে কোন বিষয় সুস্পষ্টরূপে "হারাম" নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হারাম। এতদৃষ্টে হালাল ও হারাম অতি স্পষ্ট বস্তু এবং ঐ সকল দলীল, প্রমাণ ও মাপকাঠি দ্বারা উভয়কে বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ। অধিকন্তু ইহাও স্পষ্ট যে, হালালকে গ্রহণ করা যাইবে এবং হারামকে বর্জন করিতে হইবে—ইহাতে কোন প্রকার মতদ্বৈধতা বা কোন প্রকার দুর্বলতা বশতঃ এদিক সেদিক বিন্দুমাত্রও নড়চড় করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু হালাল ও হারাম পর্য্যায়দ্বয়ের মধ্যবর্তী আরও কতিপয় বিভিন্ন পর্য্যায় রহিয়াছে। যথা—(১) মকরূহ, (২) খেলাফে-আওলা বা অবাঞ্ছনীয়, (৩) ইমাম ও খাঁটী ওলামাদের মতবিরোধমূলক বিষয়াদি। এতদ্ব্যতীত এমন আরও বহু বিষয়াদি আছে যাহা শরীয়তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহা ছাড়াও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া প্রায়শই এরূপ বিষয়াদি আমাদের সম্মুখবর্তী হইতে থাকে যাহা নির্দিষ্টভাবে হালাল বলিয়াও নিশ্চিত হওয়া যায় না, কিম্বা হারাম বলিয়াও স্থির করা যায় না—এই সকল অনিশ্চিত

* قلب "কলব" শব্দের প্রকৃত অর্থ দেল বা হৃদয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হইল উহার মধ্যে নিহিত আ'কল বা বিবেক, এমনকি কেহ কেহ বলেন যে, এস্থলে কলব শব্দটি সরাসরি আ'কল বা বিবেক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (ফতহুলবারী)

ও সন্দেহমূলক বিষয়গুলিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, এই সমস্ত সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু সমুহ হইতে বিরত থাকিলে এক দিকে জাগতিক ব্যাপারে যেমন লাভবান হওয়া যায়, কারণ সন্দেহের স্থানে পা রাখিলেই স্বীয় মান-মর্য্যাদা বলুষিত হওয়ার এবং নানা প্রকার কুৎসা রটিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। অন্য দিকে তেমনি দ্বীনের ব্যাপারেও লাভের সীমাই থাকে না, কারণ যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্‌ছ ও প্রবৃত্তিকে সন্দেহের স্থান হইতে বিরত রাখিতে অভ্যস্ত হইবে সে নিশ্চয়ই যাবতীয় কুপ্রলোভনের বস্তু হইতে, যাবতীয় কুকর্ম হইতে এবং যাবতীয় হারাম কার্য্য হইতে স্বীয় নফছকে ফিরাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে।

হারাম ও সন্দেহজনক কার্য্যাবলী হইতে বাঁচিতে চাহিলে সর্বপ্রথম স্বীয় আক্কল ও বিবেককে যথার্থরূপে সুষ্ঠু ও ঠিক করিতে হইবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর (Electric motor) স্বরূপ। মোটর ঠিকভাবে চালু থাকিলে কারখানার প্রতিটি শাখা, উহার প্রত্যেকটি অংশ ও সমস্ত কল-কব্জার চাকাগুলিই রীতিমত চলিতে থাকিবে। আর মোটরে গোলযোগ থাকিলে উহার সহিত সংযোগ রক্ষা-কারী সমস্ত মেশিন ও উহার অংশগুলির মধ্যেও গোলযোগ দেখা দিবে। অবশ্য মোটরের সহিত চাকাগুলির সক্রিয় সংযোগ রক্ষার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা মেশিনের বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ বিহীন শুধু মোটর চালাইয়া বসিয়া থাকিলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না এবং ঐ প্রকার নিরর্থক ও অনিয়মিত পরিচালনার ফলে কারখানা ফেল (Fail) হইয়া যাইবে। অতএব মেশিনের সমস্ত কলকব্জা ও উহার বিভিন্ন অংশ-গুলিকেও রীতিমত চালু রাখিয়া মোটরের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ উহার ভাল-মন্দের প্রভাব সমস্ত কারখানার উপর পড়িয়া থাকে। তদ্রূপ মানবের কর্তব্য তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে সুষ্ঠু করিয়া তারপর সেই সুষ্ঠু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছটিকে হাদীছে-তাওকয়া, হাদীছে-হালাল-হারাম, হাদীছে এছ্‌লাহে-কালব বা আধ্যাত্মিক শুদ্ধি লাভের হাদীছ বলা হয়। নবী (দঃ)-এর হাদীছ সমুহের মধ্যে চারিটি হাদীছ এমন আছে যাহাকে সমস্ত শরীয়ত ও তরীকত তাছাওফের মুল উৎস বলা যাইতে পারে। হাদীছগুলি এই :—

১ম—নিয়তের হাদীছ (সর্বপ্রথমে—১ নম্বরে যে হাদীছটির অনুবাদ হইয়াছে))

২য়—دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ "সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া নিঃসন্দেহ বিয়য়কে অবলম্বন কর।"

৩য়—اِزْهَدْ فِيْمَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ "মানুষের হাতের কোন কিছুর আশা ও লিপ্সা রাখিও ন." ৪র্থ—উপরে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছটি।

এই হাদীছের শেষ অংশ...... الا ان فى الجسد مضغة "মানবদেহের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ আছে যাহার উন্নতি-অবনতির উপর সম্পূর্ণ দেহের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে" এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাতে মানুষের সৃষ্টি-তত্ত্ব ও দেহ-তত্ত্বের ইঙ্গিত দানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং সতর্ক করা হইয়াছে যে—স্থুল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মার উন্নতির উপরই মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য উন্নতি নির্ভর করে। আত্মার উন্নতি সাধিত না হইলে মানব জীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

উপরোক্ত বাক্যটি পূর্ণরূপে অনুধাবন করার জন্য মানব-দেহ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্যমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; যাহা অতিশয় উচ্চ পর্য্যায়ের ও গবেষণামূলক। তাই মনোযোগের সহিত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষের অজুদ বা অস্তিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—"স্থুলদেহ" যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে বা যান্ত্রিক সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং "সূক্ষ্ম আত্মা"+ যাহা ঐরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। মানুষের স্থুলদেহে সৃষ্টির মূলে যেরূপ বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে, যথা—পানি, মাটি, বায়ু ও অগ্নি সেরূপ তাহার এই ভৌতিক দেহাভ্যন্তরে পাঁচ প্রকারের আত্মাও রহিয়াছে। ১ম—পশুর আত্মা; যদ্দারা খাওয়া-শোওয়া, কামরিপু চরিতার্থ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ২য়—হিংস্র জন্তুর আত্মা; যদ্দারা দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ও রাগের বশীভূত হইয়া মারামারি কাটাকাটি করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে; ৩য়—শয়তানের আত্মা; যাহার প্ররোচনায় পাপাচার, অহঙ্কার, মিথ্যা ও সূক্ষ্ম কুট-কৌশলের দ্বারা মানুষকে ধোকা দেওয়া ইত্যাদির প্রবৃত্তি উদিত হয়। ৪র্থ—ফেরেশতা-আত্মা; যদ্দারা সদাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সত্যতা, পরোপকারিতা ও আল্লার বশ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদির আগ্রহ ও আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। ৫ম—মনুষ্যত্বের আত্মা; যাহার কর্তব্য হইতেছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মাকে বশ করতঃ উহাদিগকে কুপ্রবৃত্তির দিক হইতে

+ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটি প্রাণী বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ কেবলমাত্র নিম্ন জগতের ভৌতিক পদার্থের দ্বারাই সৃষ্ট নয়। মানুষের দেহ ভৌতিক পদার্থে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ-মধ্যস্থ মাটী, পানি, আগুন ও বায়ু জাতীয় পদার্থ নিচয়ের সংমিশ্রণে যে বাষ্প বা বিদ্যুৎ জাতীয় সূক্ষ্ম ও শক্তি-শালী পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই বাষ্পের দ্বারাই মানুষের নফছে-আম্মারা (প্রবৃত্তি) সৃষ্ট। ইহা অতি শক্তিশালী পদার্থ, এমনকি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও বেশী শক্তিশালী। কিন্তু উহা ভাল-মন্দ বিবেচনা ও পরিণাম-চিন্তা বিবর্জিত। তদুপরি মানবদেহের সৃষ্টি মূলে উর্দ্ধ জগতের একটি জিনিষও মিশ্রিত রহিয়াছে। তাছাওফের পরিভাষায় সেই জিনিষটির নাম হইতেছে "রুহ"। উহাই মানবাত্মা এবং উহাই বিবেক ও আক্কলের আকর। "রুহ" উর্দ্ধ জগৎ হইতে আল্লার আদেশে মানুষের ভিতরে আবির্ভূত হয়।

ফিরাইয়া দিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে গুণান্বিত ও পরিচালিত করা এবং আল্লার মা'রেফাত ও মহব্বত হাছেল করতঃ দুনিয়াতে আল্লার খেলাফত তথা আল্লার হুকুম-আহকাম জারীর পরিবেশ কায়েম করা।

প্রথমোক্ত তিনটি আত্মাকেই তাছাওফের পরিভাষায় "নফ্‌ছে আম্মারা" বলা হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুইটিকে রুহ, আ'ক্বল বা লতিফা বলা হয় এবং এইটিই হইতেছে বিবেক, বুদ্ধি ও মানবাত্মা। এতদদৃষ্টে দেখা গেল যে—ঐ পাঁচ প্রকারের আত্মাই তাছাওফের পরিভাষায় দুই নামে পরিচিত হইয়াছে। একটি হইল—নফ্‌ছে আম্মারা; ইহার তিনটি বিভাগ যথা—পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা ও শয়তানের আত্মা। দ্বিতীয় হইল—রুহ অর্থাৎ মানবাত্মা বা বিবেক ও আ'ক্বল; ইহার দুইটি বিভাগ যথা—ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যত্বের আত্মা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) الا ان فى الجسد مضغةً বলিয়া মানব দেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন, সে অংশটিই হইতেছে এই রুহ্ বা আ'ক্বল ও বিবেক। ইহার উন্নতিতে পূর্ণ মানব দেহের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে সম্পুর্ণ মানব দেহের অবনতি ঘটিয়া থাকে; তাহাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ

অর্থাৎ রুহ বা জ্ঞান-বিবেক রত্নটির উন্নতি সাধিত হইলে সমগ্র মানব দেহেরই উন্নতি হইবে এবং উহার অবনতিতে সমগ্র মানব দেহেরই অবনতি ঘটিবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ অংশটির উন্নতির অর্থ কি? বস্তুতঃ প্রতিটি জিনিষের উন্নতি বা অবনতির বিচার করা হয় উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুষ্ঠুতার দ্বারা। তাই এখানে দেখিতে হইবে যে রুহ বা বিবেকের উপর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, রুহ্—মানবাত্মা বা বিবেক বলিয়া যে দুইটি আত্মার নামকরণ হইয়াছিল অর্থাৎ ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যত্বের আত্মা উহাদের কর্তব্য ছিল সদাচার, সততা, সত্যতা ও আল্লার বশবর্তীতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নফ্‌ছের মধ্যে যে অপর তিনটি শক্তি বা আত্মা আছে উহাদিগকে বশে আনিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে পরিচালিত করা, অতএব রুহ বা বিবেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও তাহাই হইবে। এই মহান কর্তব্য পালনে রুহ্—মানবাত্মা বা বিবেক যতটুকু উন্নতি করিতে পারিবে, পূর্ণ মানব দেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করিবে। এমনকি অবশেষে ঐ রুহ্—মানবাত্মা যে উর্দ্ধ জগৎ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সে মানবদেহকে লইয়া সেই উর্দ্ধ জগতে অর্থাৎ—বেহেশতে যাইয়া পৌছিবে। পক্ষান্তরে রুহ্—মানবাত্মা নিজের ঐকর্তব্যে ত্রুটি করতঃ নিজেই যদি নফছ তথা ঐ তিন প্রকার আত্মার বশ্যতা স্বীকার করার অবনতিতে পতিত হয়, তাহা হইলে পূর্ণ মানবদেহই অবনতির তিমির গর্তে পতিত হইবে। অবশেষে ঐ রুহ্—মানবাত্মা মানবদেহকে লইয়া সর্ব নিম্ন জগতে তথা জাহান্নামে পৌছিবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিশারদগণ রুহ্ বা বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, রুহ্—মানবাত্মা বা আ'কল ও বিবেককে তাছাওফের পরিভাষায় "লতিফা" নামেও নামকরণ হইয়া থাকে। সেই অনুসারেই রুহের উন্নতির পাঁচটি স্তরের নিম্নলিখিতরূপে নামকরণ করা হইয়াছে। যথা—(১) লতিফায়ে-ক্বাল্ব; মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লার নাম উচ্চারণ করতঃ জেকের করে তখন সে এই লতিফায়ে-ক্বাল্বের কর্তব্য পালন করে। (২) লতিফায়ে-রুহ্; মানুষ যখন আল্লার মহৎ গুণাবলীর ধ্যান করে এবং ঐ ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যেও ঐ গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করে, যেমন—আল্লাহ দয়ালু, দয়াময় ইহার ধ্যান করতঃ এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যে, আমাকেও দয়ালু হইতে হইবে এবং দয়ালুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে; তখন হয় লতিফায়ে রুহের কর্তব্য পালন। (৩) লতিফায়ে-সের´; মানুষ যখন আল্লার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে হাসিল করায় সচেষ্ট হয় তখন তাহার ছিনার অভ্যন্তরে আল্লার মা'রেফাতের তথা আল্লার গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-সের´-এর কর্তব্য। (৪) লতীফায়ে-খফী; মানুষের মধ্যে যখন আল্লার মা'রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় তখন মানুষ আল্লার গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া আল্লার আশেক ও প্রেমিকে পরিণত হইয়া যায় এবং নিজের নফ্ছের সব কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া যায় এবং সেগুলিকে ফানা ও বিলুপ্ত করিয়া দেয়—অর্থাৎ সেগুলিকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-খফীর কর্তব্য। (৫) লতিফায়ে-আখ্ফা; মানুষ ফানা-ফিল্লাহ অর্থাৎ নফ্সের সমুদয় কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দখল ও দমন করার সামর্থ্য লাভ করার পর, বকা-বিল্লাহ্ তথা আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্তবায় পৌছে, যাহাকে আল্লার খেলাফত লাভ বলে; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-আখ্ফার মর্তবা ও মর্য্যাদা। এই অবস্থাতেই রুহ্ বা বিবেক ও আ'ক্বলের পূর্ণ শুদ্ধি হইয়া যায়। এই অবস্থার পরে আর বিবেক ও আ'খলাক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইতে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) মানবকে স্বীয় আ'ক্বল ও বিবেককে সঠিক করার যে প্রেরণা দান করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির উচ্চ পর্য্যায়।*

গণীমতের× পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটকে দেওয়া এবং উহা উসুল করা ইসলামের একটি অঙ্গ

পাঠকবৃন্দ। দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকারের ধর্মমত ও তৎসম্পর্কিত মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহার কোনটিতেই মানুষের পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন বা জীবন যাপন প্রণালীর

* উল্লেখিত হাদীছের বিস্তারিত তথ্যাবলী মাওলানা শামছুল হক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত।

× গণীমতের মাল কাহাকে বলে—৩২নং হাদীছের ফুটনোট দেখুন।

পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেখা যায় না। কোনটিতে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক এবাদৎ-বন্দেগী অর্থাৎ পরলৌকিক জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু জাগতিক জিন্দেগী সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা নাই। আবার কোনটিতে শুধু পার্থিব জীবন অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন ব্যবস্থাই উহাতে নাই। ইসলাম যেহেতু কোনও মানুষের মনগড়া মতবাদ নয়, বরং ইহা সমস্ত জগতের মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণকর ও সম্যকরূপে মঙ্গল বিধায়ক এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যাহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লার দরবার হইতে তাঁহারই নিয়োজিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রতিনিধি রসুল (দঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত। তাই ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা সম্বলিত মানবধর্ম। ইহাতে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন একটি দিকও বাদ পড়ে নাই বা কেবলমাত্র কোনও একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অন্য দিককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাই দেখা যায়—ইসলাম ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক চরম উন্নতি সাধনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক তথা—পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমন—প্রকৃত শান্তিদাতা আল্লার আইন জারী করতঃ দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য জেহাদকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, চাকুরী বা মজদুরী ইত্যাদি দ্বারা হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিবাহের দ্বারা শুদ্ধরূপে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক দুনিয়া আবাদ করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তদ্রূপ ইসলামী ষ্টেটের বহনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার আয়ের পথকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে গণীমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটে জমা দেওয়া এবং উহা রাষ্ট্রীয় আয়রূপে উসুল করাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে তাহাই একটী হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

৪৮। **হাদীছঃ**— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন— (তদানীন্তন আরবে) আবদুল কায়েস নামক একটি গোত্র ছিল (তাহারা বাহরাইন নামক স্থানে বসবাস করিত)। তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিল। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইবার পূর্বেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ।✽ তাহারা আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! জিল্‌কদ, জিলহজ্জ, মোহার্‌রম ও রজব এই চারিটি বিশেষ সম্মানিত মাস ব্যতীত অন্য সময় আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইতে

✽ অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার পূর্বেই অনুগত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ। নতুবা লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে হইত এবং এখন সাক্ষাতে উভয়েরই লজ্জা বোধও হইত।

অক্ষম। কারণ, আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পথিমধ্যে "মোজার" গোত্রীয় কাফেরদের বাসস্থান, (তাই অন্য সময় যাতায়াত করা আমাদের জন্য সম্ভবপর ও নিরাপদ নহে+)। আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্টতর উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ বলিয়া দিন, যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে বেহেশত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত তাহারা (সেকালের) প্রচলিত পানীয় সমূহের (মধ্যে হালাল-হারামের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন—(১) এক আল্লার উপর ঈমান আনার আদেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক আল্লার উপর "ঈমান" কাহাকে বলে জান কি? তাহারা আরজ করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই (দঃ) তাহা ভালরূপ বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন, উহার অর্থ এই—কায়মনোবাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রেরিত ও মনোনীত মতবাদ—ইসলামই একমাত্র গ্রহণীয়, আমি উহাকেই গ্রহণ করিতেছি।) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও মা'বুদ নাই (অর্থাৎ—অন্য সকল প্রকার মতবাদ বর্জনীয়, সুতরাং সে সব আমি বর্জন করিতেছি।) এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল ✝ (অর্থাৎ—তাঁহার বর্ণিত সকল আদেশ-নিষেধ ও প্রদর্শিত আদর্শসমূহ আল্লার তরফ হইতেই প্রেরিত ও মানব জাতির জন্য নির্দ্ধারিত প্রকৃত সত্য আদর্শ; এতদ্ব্যতীত অন্য সকল প্রকার আদর্শই বাতিল ও বর্জনীয়।) (২) নামায উত্তমরূপে আদায় করা। (৩) যাকাত দান করা। (৪) রমজান মাসের রোযা রাখা এবং গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে জমা) দেওয়া। ইহা ছাড়া রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (ব্যবহার করিতে) নিষেধ করিলেন×—(সেকালে আরব দেশে চারি প্রকার পাত্র প্রসিদ্ধ ছিল যাহাতে মদ্য তৈরী করা হইত। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ঐ সকল পাত্রে তৈরী পানীয় বস্তু, এমনকি যে কোন কার্য্যে ঐ সমস্ত পাত্রের ব্যবহারও নিষেধ করিলেন; যেন পাত্র দেখিয়া মদের

+ সে কালের কাফের মোশরেকরাও উক্ত চারিটি মাসকে সম্মানিত গণ্য করিত। এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি হত্যা-লুণ্ঠন হইতে সকলেই বিরত থাকিত।

✝ এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে আল্লার সাচ্চা রসুলরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লওয়াকে আল্লার উপর ঈমান আনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। কারণ "এক আল্লার উপর ঈমান"এর ব্যাখ্যা দুইটি বিষয়ের যুগপৎ সমন্বয়ের দ্বারা করা হইয়াছে অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কেও সত্য রসুলরূপে মানিয়া লওয়া। সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ)কে রসূলরূপে মানিয়া লওয়া ব্যতিরেকে শুধু তাওহীদ অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করাকে "আল্লার উপর ঈমান" গণ্য করা হইবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে।

× হাদীছের মধ্যে ঐ চারিটি পাত্রের নাম নিম্নলিখিতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—حنتم এক প্রকার সবুজ রঙ্গের কলসী। نقير খেজুর গাছের গুলির মধ্যস্থল খোলা করিয়া মটকার ন্যায় তৈরী এক প্রকার পাত্র। دباء শুকনা কদুর খোলা বা বাওয়াস। مقير مزفت চতুষ্পার্শে বার্নিশ করা, চিনা মাটির তৈরী বোয়েম বিশেষ। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা মনে পড়িয়া না যায় বা কেহ অন্য জিনিষের ছলনায় মদ্য তৈরী করিতে না পারে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন, এই সব আদেশ-নিষেধকে আপনারা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবেন।

ছওয়াবের নিয়্যতে কাজ করার উপরই আমলের ছওয়াব নির্ভর করিয়া থাকে

নেক কাজের নিয়্যতেও ছওয়াব হয়, যেমন হাদীছে আছে ولكن جهاد ونية মক্কা নগরী মোসলমানদের করতলগত হওয়ার পর যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করার মত অতি বড় একটি ছওয়াবের কাজের হুকুম রহিত হইল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—জেহাদ করিয়া ছওয়াব হাসিলের পথ এবং জেহাদের নিয়্যত ও প্রয়োজন হইলে হিজরত করিব এই নিয়্যত দ্বারা ছওয়ার হাছিলের পথ সর্বদাই খোলা থাকিবে।

৪৯। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—যখন কেহ ছওয়াব হাসিলের নিয়্যতে স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য টাকা পয়সা খচর করে, তখন তাহার ঐ খরচ ছদকারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৫০। হাদীছ:—সা'দ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যাহা কিছু খরচ করিবে উহার ছওয়াব নিশ্চয় পাইবে ; এমনকি স্ত্রীর (প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার) মুখে লোক্‌মা (খাদ্য-গ্রাস) তুলিয়া দেওয়াতেও ছওয়াব হইবে।

অর্থাৎ সাধরণ দৃষ্টিতে যাহাকে ছওয়াবের আমল গণ্য করা হয় না, কিন্তু সঠিক নিয়্যত দ্বারা উহাতেও, এমনকি শরীয়ত অনুমোদিত আনন্দ উপভোগের কাজেও ছওয়াব হাসিল হয়।

হিত ও মঙ্গল কামনা বড় ধর্ম

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—হিত কামনা করা এবং মঙ্গল কামনা করাই ধর্ম। আল্লার (দ্বীনের) মঙ্গল কামনা করা, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (আদর্শ ও মিশনের) মঙ্গল কামনা করা, (খাঁটী) মোসলমান শাসনকর্তাদের মঙ্গল কামনা করা ও সর্বসাধারণ মোসলমানদের মঙ্গল কামনা করা।

ব্যাখ্যা:—আল্লার দ্বীনের মঙ্গল কামনার অর্থ আল্লার দ্বীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ পূর্বক জীবনের প্রতি স্তরে উহাকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিফলিত করা এবং উহার তবলীগ অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রচার ও বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া, প্রয়োজনে জেহাদ করিয়া উহার উপর যাবতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা।

প্রাচীনকালে আরবদেশে এই সকল পাত্রে শরাব অর্থাৎ মদ্য তৈয়ার করা হইত, কারণ এগুলির মধ্যে পানীয় বস্তুতে দ্রুত মাদকতা সৃষ্টি হইতে। মদ্যপান হারাম (নিষিদ্ধ) হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় ঐ সকল পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল, পরে অবশ্য শুধু মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণ কার্য্যে ঐ সব পাত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা মনছুখ বা রহিত হইয়াছে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মঙ্গল কামনার অর্থ তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ পূর্বক অবিচলিত ভাবে উহার অনুসরণ করিয়া যাওয়া ও সর্বদা তাঁহার অনুগত থাকা এবং তাঁহার আদর্শকে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করতঃ তাঁহার আদর্শ ও মিশনকে সারা বিশ্বে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় ব্রতী থাকা।

খাঁটী মোসলমান শাসনকর্তার মঙ্গল কামনার অর্থ এই—ন্যায় বিচারক ও সদাচারী মোসলমান শাসনকর্তার সর্বপ্রকার ন্যায় নীতি ও আইন-কানুনের অনুগত থাকা এবং ন্যায় কাজে সহযোগীতা করিয়া যাওয়া, অন্যায়ভাবে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী না হওয়া।

মোসলমান জনসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ তাহাদের সর্বপ্রকার হক আদায় করা, তাহাদের মধ্যে "আম্‌র-বিল-মারূফ ও নিহি আনিল-মোনকার" অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও কুপথ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা সর্বদা করিয়া যাওয়া। সর্বাবস্থাতেই সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলা। বিশেষতঃ স্বীয় গুণ বা পদমর্য্যাদা ও সাধ্যানুসারে সর্ব-সাধারণের উপকার ও উন্নতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। যেমন—কোন ব্যক্তি ডাক্তার হইয়াছে, সে ডাক্তারি করিয়া শুধু টাকা উপার্জন করিলেই চলিবে না। বরং সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে এবং গরীব-দুঃখীর উপকারার্থে সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হইবে। অথবা কোন ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়াছে, সে শুধু নিজের পেটই ভরিলে, এমনকি কেবলমাত্র যাকাৎ, ফেৎরা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। তাহাকে সর্বসাধারণের উপকার ও গরীব কাঙ্গালের সাহায্য যথাসাধ্য করিয়া যাইতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও হক রহিয়াছে। কোরআন শরীফে ২ পারা ৬ রুকুতে আছে—

.... وآتى المال على حبه ذوى القربى .... "খাঁটী মোমেন উহারাই, যাহারা নামাজ কায়েম করে, যাকাৎ দান করে, এতদ্ভিন্ন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিছকিন, অসহায়-পথিক ও যাচ্ঞাকারীকে দান করে।"

হাদীছে আছে—"মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও অনেক হক আছে।" (তিরমিজী)

হাদীছে আরও আছে—ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه

অর্থ:—"ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে—যে নিজে পেট ভরিয়া খায় ও তাহার প্রতিবেশী তাহার নিকটেই অনাহারে দিন কাটায়।" (মেশকাত শরীফ)

এইরূপে যে ব্যক্তি আলেম তাহার কর্তব্য দ্বীনের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া যাওয়া এবং সর্বসাধারণকে সৎপথে পরিচালিত করার আন্তরিক আগ্রহের সহিত লাগিয়া থাকা—যেমন রসুলুল্লাহ (দঃ) করিতেন। মানবজাতিকে সৎপথে আনয়নে তাঁহার কি অপরিসীম আগ্রহ ও বিরামহীন চেষ্ঠা যত্নই না ছিল। যদ্দরুণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

"মনে হয় আপনি এই অনুতাপে প্রাণ দিয়া দিবেন যে, কাফেররা কেন ঈমান আনে না।" (১৫ পারা ১৩ রুকু)

এইরূপে শারীরিক শক্তি সামর্থ্য দ্বারাও জনগণের বিপদ উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা করা চাই। এ সবই হইল সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও দুইটি শাখা আছে। যথা—

প্রথমতঃ এই যে, কোনও সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কার্য্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে নির্বাহ করতঃ সর্বসাধারণের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী হইলে সেই ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপব্যবহার না করিয়া স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুর্নীতি ত্যাগ পূর্বক জনগণের একনিষ্ঠ খাদেমরূপে কাজ করিয়া যাওয়া।

৫১। হাদীছ ঃ—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'ত ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে—নামায যথাসাধ্য উত্তমরূপে আদায় করিব, যাকাৎ দান করিব, প্রত্যেক মোসলমানের খায়েরখাহী বা হিত সাধন ও মঙ্গল কামনা করিব।

৫২। হাদীছ ঃ—ছাহাবী মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) কুফার শাসনকর্তা ছিলেন, হঠাৎ তিনি এন্তেকাল করেন। তখন জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক ছাহাবী যাহাতে রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে এক শুভেচ্ছামূলক বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আল্লার প্রশংসা করিয়া তারপর বলিলেন—মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এক খোদার ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিবেন এবং সর্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। যাবৎ নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া না আসেন আপনারা এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নূতন শাসনকর্তা অতি সত্বরই নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। তারপর বলিলেন—আপনারা মৃত শাসনকর্তার জন্য মাগফেরাতের (ক্ষমা প্রাপ্তির) দোয়া করুন। তিনি ক্ষমা করা ভাল বাসিতেন, আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি বলিলেন—আমার এই বক্তৃতা করার একমাত্র কারণ এই যে, আমি যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে বায়আ'ত করিয়াছিলাম, তখন নবী (দঃ) আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, "সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে।" আমি সেই শর্তে বায়আ'ত করায় আপনাদের বর্তমান পরিস্থিতির যোগ্য মঙ্গল কামনা করিয়া এই বক্তৃতা করিলাম। এই বলিয়া তিনি নিজের ও সকলের জন্য এস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

● এই বক্তৃতায় মৃত শাসনকর্তার মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাঁহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিজেও করিলেন এবং অন্য সকলকে উহার আহ্বান জানাইলেন। সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাহাদিগকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির হাত হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়*

এল্‌ম

এ'লেমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

কোরআন শরীফে আছে—

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থ:—যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং বিশেষত: এল্‌ম হাসিল করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অনেক উচ্চাসনের অধিকারী করিবেন (২৮ পা: ২ রু:)।

এল্‌ম ব্যতীত মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দ:)কে এল্‌মের উন্নতি এবং জ্ঞান বর্দ্ধনের দোয়া শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং সেই দোয়া করার আদেশ করিয়াছেন। (১৬ পা: ১৫ রু:)

قل رب زدنى علما "আপনি বলুন—হে প্রভু। আমার এল্‌ম বর্দ্ধিত করিয়া দিন।

এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— انما يخشى الله من عباده العلماء "আল্লার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণের অন্তরেই খোদার ভয় থাকে।"+ (২০ পা: ১৬ রু:)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন (২৩ পা: ১৫ রু:)—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"এল্‌মের অধিকারীগণ এবং এল্‌মহীনগণ কখনও সমপর্য্যায়ের হইতে পারে কি?"

আরও আছে— قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

"দোযখবাসীরা এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে, হায়। (দুনিয়ায় থাকাকালে) যদি আমরা (দ্বীনের কথা) অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিক্ষা করিতাম বা অন্তত: বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম-জ্ঞান লাভ করিতাম, তবে (আজ) আমরা দোযখীদের দলভুক্ত হইতাম না" (২৯ পারা ১ রুকু)

---

* এই অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলির আসল বিষয়বস্তু ঠিক রাখিয়া পাঠকদের সুবিধার্থে উহার ধারাবাহিকতার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শিরোনামা একত্রিকরণও হইয়াছে।

+ এই আয়াতের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটী এল্‌মের নিদর্শন বা আলামত এইরূপে নির্দ্ধারিত হয় যে—যে জ্ঞান ও এল্‌ম আল্লার ভয়-ভক্তির বাহক ও অছিলা হয় এবং যদ্দারা মানুষের মনে আল্লার ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়, উহাকেই প্রকৃত জ্ঞান ও এল্‌ম বলা যাইতে পারে।

হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—(১৬ পৃ:)

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهٖ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ -

উপরোক্ত হাদীছটি একখানি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এইরূপ—দামেস্ক শহর মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে আবুদ-দরদা (রা:) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বাস করিতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবুদ-দরদা (রা:)! আমি মদীনা হইতে দীর্ঘ ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি, আপনি হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে একখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসি নাই। তখন আবুদ-দরদা (রা:) বলিলেন, আমি হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(১) যে ব্যক্তি এল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ তায়ালা সেই অছিলায় তাহার জন্য বেহেশতের পথ সহজ ও স্থগম করিয়া দিবেন। (২) নিশ্চয় জানিও, দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণকারী তালেবে-এল্‌মকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফেরেশতাগণ তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় পাখা ও ডানা বিছাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন (এবং ফেরেশতাগণ তালেবে-এল্‌মদের খেদমতে রত থাকেন।) (৩) সাত আসমান ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল জীব এমনকি পানির মধ্যে অবস্থানকারী মৎস্য জাতীয় জীবজন্তু পর্য্যন্ত আলেমের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে*। (৪) একজন শরীয়তের পায়রবীকারী খাঁটী আলেম যিনি সর্বদা এল্‌ম চর্চায় রত থাকার দরুন অন্য কোনও নফল এবাদৎ বা অজিফা ইত্যাদির জন্য সময় পান না, তাঁহার মর্য্যাদা ও ফজিলত একজন এল্‌মহীন আবেদ—নফল এবাদৎ-বন্দেগীতে মশগুল ব্যক্তির তুলনায় এরূপ, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্য্যাদা

---

* কারণ খাঁটী আলেমগণ দ্বারা দুনিয়াতে আল্লার দ্বীনের উন্নতি হওয়ায় তাঁহাদের অছিলায় দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হয়, যদ্দ্বারা দুনিয়ায় অবস্থানকারী সকল প্রাণীই লাভবান হইয়া থাকে। যেমন সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত না হইলে পশু পাখী, মৎস্য ইত্যাদি সকল জীবই নিস্তেজ ও অধীর হইয়া পড়ে এবং নববর্ষের বৃষ্টি বর্ষণে প্রাণী মাত্রই সতেজ, আনন্দমুখর ও পুলকিত হইয়া উঠে। দুনিয়াতে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আল্লার রহমত খাঁটী আলেমগণের দ্বারা আল্লার দ্বীন জারী হওয়ার বদৌলতেই হইয়া থাকে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত অনুভূতির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীই আল্লার রহমতের সেই অছিলাকে উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়া তাহারা সেই অছিলা তথা আলেমগণের জন্য ক্ষমা ও মাগফেরাতের দোয়া করিয়া থাকে।

সাধারণ নক্ষত্রের উপর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (৫) নিশ্চয় জানিও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। এই পৃথিবীতে নবীগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি একমাত্র এল্‌ম। যে ব্যক্তি উহা হাসিল করিয়াছে সে অতি মূল্যবান সম্পদ লাভ করিয়াছে (মেশকাত শরীফ)। বোখারী শরীফে উল্লেখিত হাদীছটির শুধু ৫ নং ও ১নং বিষয় দুইটি উল্লেখ আছে।

বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবু-জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমাকে কতল বা হত্যা করার জন্য যদি তোমরা আমার গর্দানের উপর তরবারি রাখিয়া দাও এবং আমি বুঝিতে পারি যে, তরবারি চালিত করিয়া আমার কতল ক্রিয়া সম্পন্ন করার পূর্ব মুহূর্তে আমি এতটুকু সময় ও সুযোগ পাইব যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মাত্র বাণী তাঁহার উম্মতগণকে শিক্ষাদান করিতে বা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিব, তবে তাহাও আমি অবশ্যই করিব, ততটুকু সুযোগও আমি কখনও হাতছাড়া হইতে দিব না।

ওমর (রাঃ) বলিতেন, تفقهوا قبل ان تسودوا "সর্দার বা নেতা নির্বাচিত অথবা কর্মকর্তা নিয়োজিত হইবার পূর্বে তোমাদের তাফাক্কোহ অবশ্যই হাসিল করিতে হইবে।" (১৭ পৃঃ)

এখানে 'তাফাক্কোহ' হাসিল করার অর্থ কেবলমাত্র এল্‌ম হাসিল করাই নহে, বরং কোরআন ও রসুলের (দঃ) সুন্নত তথা হাদীছের ভিতরে সমুদয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সহ জাগতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যে আলো দান করা হইয়াছে এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার যে সব সমাধান তাহাতে দেওয়া হইয়াছে এবং রসুলের (দঃ পরবর্তী যুগত্রয়ে অর্থাৎ ছাহাবাগণের যুগে, তাবেয়ীগণের যুগে ও তাবয়ে-তাবেয়ীগণের যুগে পরবর্তী সমস্যা সমূহের যে সব সমাধান তাঁহারা কোরআন ও হাদীছের আলোতে দান করিয়া গিয়াছেন সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এক একটি করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে এবং এসবকে জ্ঞানের মূলধনরূপে হাতে লইয়া ভবিষ্যৎ-কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; যাহাতে সেই মূলধনরূপী জ্ঞান-প্রদীপের আলোতে সম্মুখবর্তী প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুজিয়া পাওয়া যায় এবং সর্বস্তরেই ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা সৎ-অসৎএর বিচার বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। খলীফা ওমর (রাঃ) কর্তৃক এই আদেশ জারীর পর হইতেই তাফাক্কোহ হাসিলের ট্রেনিং প্রথা চালু করা হইয়াছিল। নৈতিক ট্রেনিং এর সঙ্গে সঙ্গে বৈবয়িক ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা ছিল।

কথার মধ্যভাগে প্রশ্নের উত্তরদানে বিলম্ব করা

৫৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন মজলিসে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক আসিয়া (ঐ আলোচনারত অবস্থায়ই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে আসিবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) (ঐ প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া) স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ কেহ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হয়ত প্রশ্নটি শুনিয়াছেন, কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করা নাপছন্দ করিয়াছেন। আর কেহ কেহ মন্তব্য করিল

যে, হয়ত তিনি প্রশ্নটি আদৌ শুনিতে পান নাই। কিন্তু বক্তব্য শেষ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রশ্নকারী কোথায়? সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমি উপস্থিত আছি ইয়া রসুলাল্লাহ।*

নবী (দঃ) বলিলেন—যখন আমানতের খেয়ানত করা হইতে থাকিবে (তথা দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত ও দায়িত্ব পালনের ত্রুটি হইতে থাকিবে) তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করা। (অর্থাৎ তখন মনে করিবে যে, কেয়ামত বা জগতের ধ্বংস ও প্রলয় নিকটবর্তী হইয়াছে)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমানতে খেয়ানতের রূপ কি হইবে? উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, বিশেষতঃ হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা বা শাসন ক্ষমতার ভার যখন অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হইবে, অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত লোকদিগকে যখন রাষ্ট্রীয় কার্য্যে ও ক্ষমতায় নির্বাচন বা নিযুক্ত করা হইবে, তখন জগৎ ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—সকল প্রকার আমানতের খেয়ানত কেয়ামত বা জগৎ ধ্বংস নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। বিশেষতঃ শাসকগোষ্ঠির দ্বারা জনসাধারণের অর্থের অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্যে দায়িত্ব পালনের প্রতি অবজ্ঞা ও শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রক্ষকের নামে ভক্ষকের অভিনয় ইত্যাদি বিশেষ ভাবে কেয়ামতের আলামতরূপে পরিগণিত।

এলমের কথা দরকার বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলা†

৫৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সফরে পথ চলিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের পেছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। আমরা আছর নামাযের প্রায় শেষ ওয়াক্তে এক স্থানে অজু আরম্ভ করিলে হযরত আমাদের নিকট পৌঁছিলেন। আমরা তাড়াহুড়া বশতঃ পূর্ণাঙ্গ পা না ধুইয়া কেবলমাত্র মুছিয়া ফেলার ন্যায় অসম্পূর্ণভাবে পা ধুইলাম, পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকিল; উহাতে পানি পৌঁছিল না। নবী (দঃ) আমাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত পায়ের (শুষ্ক) গোড়ালী দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; দুই-তিনবার এইরূপ বলিলেন।

ওস্তাদ কর্তৃক শাগের্দগণের পরীক্ষা করা

৫৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ খেজুর গাছের মাথি (গাছের মাথার অভ্যন্তরস্থ মিষ্ট কোমল অংশ) আনিয়াছিল। হযরত তাহা খাইতে লাগিলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য

---

* কাহারও বক্তব্য শেষ করার পূর্বে কথার মধ্যভাগে প্রশ্ন করা যদিও বে-আদবী বটে, কিন্তু যেহেতু ঐ ব্যক্তি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক ছিল, তাই হযরত তাহার এই প্রকার প্রশ্নে তাহাকে তিরস্কার করেন নাই। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বক্তব্য শেষে উত্তর দিয়াছেন।

† নবী (দঃ) সাধারণতঃ নীচ স্বরে কথা বলিতেন এবং ইহাই সুন্নত।

করিয়া বলিলেন, এক প্রকার গাছ আছে যাহার পাতা কখনও ঝড়িয়া পড়ে না। মোমেন ব্যক্তির সাথে ঐ গাছের তুলনা হইতে পারে, (অর্থাৎ মোমেন ব্যক্তি যেমন সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে—সর্বাবস্থায় স্বীয় প্রভুর ভক্ত ও অনুরক্ত থাকে এবং পরোপকারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ঐ গাছটিও সর্বাঙ্গীন পরোপোকারী এবং কোন ঋতুতেই উহার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসে না।) বল দেখি! সেই গাছটি কোন্ গাছ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সকলেরই ধারণা জঙ্গলের বিভিন্ন প্রকার গাছের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। আমার মনে ধারণা হইল যে, উহা খেজুর গাছ হইবে; কিন্তু ঐ মজলিসের মধ্যে আমি সকলের চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম, বড়দের সম্মুখে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। ছাহাবীগণ শেষ পর্য্যন্ত বলিতে অপারগ হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি বলিয়া দিন, উহা কি গাছ। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা খেজুর গাছ। তখন আমি আমার পিতা ওমর (রাঃ)কে আমার ঐ মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহা বলিয়া দিতে, তাহা হইলে আমি এতদুর সন্তুষ্ট হইতাম যে, দুনিয়ার কোনও শ্রেষ্ঠ ধন সম্পত্তি পাইলেও তদ্রূপ সন্তুষ্টিলাভ হইত না। (কারণ, তাঁহার মনের উত্তর সঠিক উত্তর ছিল। হযরত (দঃ) উহা শুনিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে তিনি তাঁহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইতেন।)

দ্বীনের কথা যোগ্য লোক দ্বারা যাচাই করিয়া লইবে

৫৬। হাদীছঃ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর দ্বারা কোন কোন ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিয়া তুলিলে ঐ সম্পর্কে কোরআন শরীফের একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হয়; যদ্দ্বারা ঐ প্রশ্নাবলী হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং কোনও বুদ্ধিমান বিদেশী আগন্তুকের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। (কারণ নুতন আগন্তুক এই সকল বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার দরুন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করিবে, রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উত্তর দিবেন ও ছাহাবীগণ সেই উত্তর শুনিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞান ও এল্‌ম হাসিল করিবেন।)

একদা আমরা মসজিদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মজলিসে বসিয়া ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া আসিল এবং উট হইতে অবতরণ করিয়া উহাকে বাঁধিল; তারপর মসজিদের ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে? (আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ সময়) নবী (দঃ) হেলান দেওয়া অবস্থায় আমাদের মধ্যস্থলে বসিয়াছিলেন। আমরা উত্তর করিলাম—এই যে হেলান দেওয়া উপবিষ্ট নূরানী চেহারাওয়ালা। অতঃপর সে নবী (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিব এবং কড়াকড়ির সহিত জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তজ্জন্য মনে ব্যথিত হইবেন না। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা—মন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন সে বলিল, আপনার প্রেরিত

এক ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছে, আপনি ইহা দাবী করিয়া থাকেন যে—আল্লাহ আপনাকে রসূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সে সত্য এবং ঠিকই বলিয়াছে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আসমান কে সৃষ্টি করিয়াছে? হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই সবের মধ্যে উপকারী বস্তুনিচয় কে সৃষ্টি করিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে বলিল, আমি আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা যিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই সবের মধ্যে অসংখ্য উপকারী বস্তুনিচয় রাখিয়াছেন—তাঁহার কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি রসূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন—আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি তাঁহার রসূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর ঐ লোকটি বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন আমি আপনাকে সেই আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, দিবা-রাত্রে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন—আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহই দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার আদেশ করিয়াছেন। লোকটি ঐরূপেই বলিল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। লোকটি বলিল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের মালদারের নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, ধনীদের নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে। লোকটি এইরূপে হজ্জের বিষয়ও প্রশ্ন করিল এবং নবী (দঃ) পূর্বোক্ত ঐরূপেই উত্তর দিলেন।

তারপর লোকটি বলিল, আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছি। আমার নাম জেমাম-ইবনে ছা'লাবাহ। লোকটি প্রত্যাবর্তনকালে শপথ করিয়া বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন, সেই মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, (আপনি যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,) আমি উহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিব না। লোকটির দৃঢ়তা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী প্রমাণিত হয় তবে নিশ্চয়ই সে বেহেশতবাসী হইবে।

অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে কিছু লিখিয়া বা বিশ্বস্তসূত্রে পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ যোগ্য

এই পরিচ্ছেদের মধ্যে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতেছে এই যে, একে অন্যের নিকট কোনও বিষয় ব্যক্ত করার তিনটি স্তর আছে, যথা—সাক্ষ্য, শিক্ষা ও সংবাদ। সাক্ষ্যের পর্য্যায়টি সকলের উপরে। কেননা সাক্ষ্যের দ্বারা অন্যের উপর একটি জিনিষ বাধ্যতামূলকরূপে চাপাইয়া দেওয়া হয়। সেই জন্যই সাক্ষ্য পর্য্যায়ের মধ্যে শুধু সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়াই যথেষ্ট নহে, বরং তৎসঙ্গে সংখ্যারও আবশ্যক হইবে। অন্ততঃপক্ষে বিশ্বস্ত দুই জন পুরুষ বা এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদানকারী হইতে হইবে। ইহার কম হইলে সাক্ষ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। সাক্ষ্যের জন্য আরও একটি বিষয় অত্যাবশ্যক যে, সাক্ষীকে সাক্ষ্য গ্রহণকারী সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হইবে, অসাক্ষাতে লিখিত পত্ররূপে বা টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন, ইত্যাদি পন্থায় প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না *। দ্বিতীয় পর্য্যায় হইল শিক্ষা; শিক্ষাদানকারী সত্যিকারের জ্ঞানী ও প্রকৃত জ্ঞানদানেচ্ছু খাঁটী ও বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, সে তাঁহার দান করা বিষয় সমূহকে পুর্ণ মর্য্যাদা সহকারে গ্রহণ করে কিনা, মনোযোগের সহিত শ্রবণ ও গ্রহণ করতঃ উহার অর্থ, মর্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্যকরূপে অনুধাবন করতঃ (মুখস্থ করার বিষয়াবলী) যত্নের সহিত মুখস্থ করিয়া রাখে কি না। তৃতীয় পর্য্যায় হইল সংবাদ; ইহার জন্য আবশ্যক হইল সংবাদদাতা পুর্ণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হওয়া। শিক্ষা ও সংবাদ পর্য্যায়দ্বয়ের জন্য সংখ্যারও আবশ্যক হয় না, সাক্ষাতেরও প্রয়োজন হয় না।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বিশ্বস্ত সূত্রে লিখিত আকারে যদি কোন জ্ঞান দান করা হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা গ্রহণযোগ্য ✿। কারণ,

* সাক্ষ্যের জন্য এই দুইটি বিশেষ শর্ত মোটামুটিরূপে লেখা হইল। এ বিষয়ে আরও বহু বিস্তারিত তথ্য আছে যাহার পুর্ণ বিবরণ ফেকার কিতাব সমূহে পাওয়া যাইবে।

✿ লিখিত আকারে এল্ম সাক্ষাতে দান করা বা প্রেরণ করা (যদি প্রেরকের লেখা চিনিতে পারে) বা লোক মারফৎ এল্ম প্রেরণ করা, এ সবই যদি খাঁটী বিশ্বস্তসূত্রে হয় তবে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে, কিন্তু যেহেতু হাদীছ শাস্ত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় সেজন্য উল্লিখিত কোনও সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছকে আখ্বারানা "اخبرنا" হাদ্দাছানা "حدثنا" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা যাইবে না। কারণ এই শব্দ দুইটি একমাত্র সাক্ষাতে নিজ কানে শ্রবণ করা অর্থাৎ শিক্ষাদাতা ওস্তাদ স্বয়ং পড়িয়াছেন, শিক্ষার্থী শাগের্দ মনযোগের সহিত ওস্তাদের শব্দগুলি শ্রবণ করিয়াছেন বা ওস্তাদের সম্মুখে শাগের্দ পড়িয়াছে, ওস্তাদ পুর্ণ একাগ্রতার সহিত শুনিয়াছেন এবং স্বীয় কণ্ঠস্থ বা লিপির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে শাগের্দের ভুল ত্রুটির প্রতি পুর্ণ খেয়াল রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র এই সূত্রদ্বয়ে প্রাপ্ত হাদীছকেই "ছান্দাহানা বা আখ্বারানা" বলিয়া ব্যক্ত করা হয়।

ইহা শিক্ষা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় বিষয়সমূহে বিশ্বস্ত হওয়ার প্রথম শর্তই হইল, জ্ঞানদাতা আল্লার আইন মান্যকারী অর্থাৎ মোসলমান হওয়া ; তারপর পরিচিত ও সত্যবাদী হওয়া।

(১) রসুলুল্লাহ (দঃ) কোথাও সৈন্যদল প্রেরণ করিলে (গোপণীয়তা রক্ষার্থে গন্তব্য স্থানের নাম প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতেন না, বরং সেনাপতির হাতে একটি লিপি দিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থানের নাম বলিয়া দিতেন যে, ঐ স্থানে পৌছিয়া লিপি পাঠ করিবে, উক্ত লিপিতে সঠিকরূপে গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকিত এবং তদনুযায়ী সৈন্য পরিচালিত হইত এবং সকলেই উহা মানিয়া চলিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—বিশ্বস্তরূপে প্রাপ্ত লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য।

(২) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার খেলাফৎ আমলে ওমর ফারুক (রাঃ) এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহাদের সর্বসম্মত পরামর্শে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন আকারের লিখিত পবিত্র কোরআনের ছুরা ও আয়াত সমুহকে বিশেষ সতর্কতার সহিত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে এক জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়াছিলেন। উহা স্বয়ং খলীফার তত্ত্বাবধানে সরকারী হেফাজতে রাজধানী মদীনা শরীফে রক্ষিত ছিল। খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফত-কালে ঐ কোরআন শরীফের জেলদখানাকে সম্মুখে রাখিয়া তদুপরি পুনরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতঃ সাত জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের নিকট এক এক জেলদ পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে—আমার প্রেরিত কোরআন শরীফ জেলদের কোনরূপ ব্যতিক্রমে কাহারও নিকট কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা অগ্নিদাহ পূর্বক নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) দেখাইতে চাহেন যে—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক লিখিতরূপে প্রেরিত কোরআন শরীফ সমস্ত ছাহাবা ও তাবেয়ীগণই বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছিলেন, এমনকি তিনি "জামেউল কোরআন" রূপে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বস্তসুত্রে লিখিতরূপে প্রাপ্ত বিষয়-বস্তু গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সাধারণতঃ খলীফা ওসমান (রাঃ)কে "জামেউল-কোরআন" অর্থাৎ কোরআন সঙ্কলক বলা হয়। এতদ্ভিন্ন খলীফা ওসমান (রাঃ) আদেশ জারী করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার প্রেরিত কোরআন শরীফের ব্যতিক্রমে কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা যেন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই দুইটি কথাকে মূলধন করিয়া ইসলামের শত্রু কুচক্রিরা নানা অবান্তর বিষ ছড়াইয়া থাকে এবং নানা প্রকার কল্পনার অবতারণা করিয়া প্রতারণার সূত্র যোগায়।

কোরআন সঙ্কলনের প্রকৃত ইতিহাস এই যে—কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় উপায়ে উহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইত। আয়াত নাযেল হওয়ার সাথে সাথে উহা রসুলুল্লার (দঃ) কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ হওয়ার ভার স্বয়ং আল্লাহ

তায়ালাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন ৪ নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর ছাহাবীগণ কর্তৃক মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করা হইত। তদুপরি রসুলুল্লাহ (দঃ) চারজন সুদক্ষ লেখক নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কাহাকেও ডাকিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে উহা লেখাইয়া রাখিতেন* এবং অন্যান্য ছাহাবীগণও যথাসম্ভব লিখিয়া লইতেন। এইরূপে দীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল কোরআনের আয়াতসমূহ ধীরে ধীরে নাযেল হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা মুখস্থরূপে ও লিখিত আকারে সুরক্ষিত হইয়া রসুলুল্লার (দঃ) বর্তমান থাকা কালেই হাজার হাজার ছাহাবীদের মুখে মুখে তেলাওয়াত হইতে থাকে। তদুপরি প্রতি বৎসর যতটুকু নাযেল হইত বৎসর শেষে রমজান মাসে ফেরেশতা জিব্রাইলের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সম্পূর্ণ অংশটুকু দওর করিতেন—একে অন্যকে শুনাইতেন, এমনকি ২৩শ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ কোরআন শরীফ ঐরূপে দুইবার দওর করেন, যেমন ৫নং হাদীছে এই বিষয়টি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপে হযরত রসুলুল্লার (দঃ) বর্তমানেই যাবতীয় উপায় অবলম্বনের সহিত লিপিবদ্ধরূপে পূর্ণ কোরআন শরীফ সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু লিখিত আয়াত ও ছুরা সমূহ ধারাবাহিক ভাবে একত্রিত বা গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্তরূপে ছিল না, বরং বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন বস্তুর উপর লিখিত ছিল। কারণ, প্রথমতঃ সে কালের সাধারণ রীতিই হয়ত এই ছিল। তা ছাড়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ) বর্তমানে অহীর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিতেন তখন উহা বাদ দিতে হইত। আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে—কয়েকটি বিভিন্ন ছুরার আয়াত সমূহ এককালীন নাযেল হইতে থাকিত। যেমন এখন এক ছুরার একটি আয়াত নাযেল হইল আর একবার অন্য ছুরার অন্য একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অন্য ছুরার অন্য একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অন্য ছুরার, আর একবার ঐ প্রথম ছুরার আর একটি আয়াত নাজেল হইল। এইরূপে বিভিন্ন ছুরার আয়াত এককালীন নাযেল হইত। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) লেখকদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন যে—এই আয়াতটি অমুক ছুরার অমুক স্থানে লিখিয়া রাখ। তদুপরি সময়, স্থান, শানে নুযুল ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরের আয়াত আগে, আগের আয়াত পরে নাযেল হইত; কোরআন নাযেল হওয়ার সময় প্রকৃত ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। এমতাবস্থায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে উহাকে সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে তৈরী করা সম্ভবই ছিল না।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি বিষয় ছিল, তাহা এই যে—বাংলা দেশেও যেমন সচরাচর দেখা যায়—পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে এক বাংলা ভাষার মধ্যেই উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বিভিন্নতা ও ব্যবধান থাকে।

যেমন—পানি, পানকে অঞ্চল বিশেষ হানি, হান এবং ঘোড়া, দড়িকে ঘোরা, দরি বলা হইয়া থাকে। একটি তরকারি গাছকেই পর্য্যায়ক্রমে ডাটা, ডাঙ্গা, মাইরা ইত্যাদি বলা হয়। পশ্চিম বঙ্গে "আমি যাব, সে যাবে" বলা হয়, পূর্ব বঙ্গে ঐ অর্থেই আমি যাইমু, সে যাইবে; বলা হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক ভাষার মধ্যে এরূপ কিছু আঞ্চলিক ব্যবধান থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা আসল অর্থে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্যের রূপের পরিবর্তন হইয়া থাকে। আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের মাতৃভাষা একই আরবী ভাষার মধ্যেও উল্লিখিত রূপের ব্যবধান ও ব্যতিক্রম বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) কর্তৃক হযরত রসুলুল্লার (দঃ) নিকট কোরআন শরীফ কেবলমাত্র কোরায়েশ গোত্রের ভাষার উচ্চারণ ও কায়দার উপরই নাযেল হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বৃদ্ধ-জওয়ান সব রকমের লোকই সবেমাত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে, এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যবস্থা সমীচীন ছিল না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ পূর্বক গোত্রের লোকদিগকে আরবী ভাষায়ই নিজ নিজ উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন শরীফ পড়িতে অনুমতি দিতেন। কারণ উহাতে অতি সামান্য ও নগণ্য পরিবর্তন হইত, তাও অর্থের পরিবর্তন বিন্দুমাত্রও ঘটিত না—শুধু কোন কোন শব্দের উচ্চারণ, রূপ ও বাক্যের আকার পরিবর্তন হইত মাত্র। আসল আরবী ভাষায় কোরআন অপরিবর্তিতই থাকিত।

মোট কথা এই—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানেই কোরআন শরীফ যাবতীয় উপায়ে সুরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ—জেল্‌দ বা গ্রন্থাকারে একত্রিত ছিল না, দ্বিতীয়তঃ—আরবী ভাষারই বিভিন্ন আকারের উচ্চারণ ও কায়দায় পড়ার অনুমতি ছিল।

খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণের সর্বসম্মত পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম দিকটি পূরণ করিলেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সতর্কতার সহিত কোরআন শরীফের সমস্ত আয়াত ও ছুরাসমূহকে একত্রিতরূপে এক জেল্‌দ বা গ্রন্থ আকারে লেখাইলেন এবং ঐ কোরআন শরীফ জেল্‌দকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দিলেন। উহা রাজধানী মদীনায়ই রহিল; উহা বা উহার অনুলিপি বিভিন্ন দেশে পাঠান হইল না। তাছাড়া খলীফা আবুবকর (রাঃ) কোরআন শরীফকে পূর্ণরূপে একত্রিত করার প্রতিই অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলেন—যেন একটি অক্ষরও বাদ না থাকিয়া যায়। কিন্তু ছুরা সমূহের তরতীব ও স্থান নির্ণয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। কারণ কোরআনের প্রতিটি ছুরা এক একটি অধ্যায় বা প্রবন্ধের মত; কোন গ্রন্থের অধ্যায় বা প্রবন্ধ সমূহের তরতীব ও সংবিধান ব্যবধান হইলে উহাতে অর্থ ও আসল বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। এই জন্যই কতিপয় ছাহাবীর নিকট ছুরাসমূহের স্থান নির্ণয় বা তরবীব বিভিন্ন রূপ ছিল। যথা ছাহাবী আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ছুরা "একরা"

তারপর "আল মোদ্দাছ্‌ছের" তারপর "আল-মোজাম্মেল" তারপর "তাব্বাত" তারপর ছুরা "তাকবীর"—এইরূপে কোরআন নাযেল হওয়া অবস্থার তরতীব রাখিয়াছিলেন। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে ছুরা "বাকারহ" তারপর "নেছা" তারপর "আল-এমরান" এইরূপে রাখিয়াছিলেন। এই বিভিন্নতায় কোন ত্রুটি আসে না, অবশ্য বাহ্যতঃ একটু বিশৃঙ্খল দেখায়।

তাই খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে খলীফা আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত কোরআন শরীফ জেল্‌দখানা সম্মুখে রাখিয়া সাত জেল্‌দ কোরআন শরীফ লেখাইলেন, উহাতে তিনি তৎপর হইলেন। প্রথমতঃ—অধিকাংশ ছাহাবীগণের মতামত লইয়া যতদুর সম্ভব নানা প্রকার প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে ছুরাসমূহকে প্রকৃত তরতীব ও বিন্যাস মতে রাখার চেষ্টা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—হযরত রসুলুল্লার (দঃ) যামানায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আরববাসী বিভিন্ন গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন পড়ার যে অনুমতি ছিল, সমস্ত ছাহাবীগণের এজ্‌মা দ্বারা ঐ অনুমতিকে শুধুমাত্র সাময়িক সুযোগ গণ্য করতঃ আগামীর জন্য চিরতরে ঐ অনুমতি রহিত করিয়া দিলেন। আর কোরায়েশ গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দা তথা কোরআনের (নাযেল হওয়ার) আসলরূপে লিখিত সাত জেল্‌দ কোরআন শরীফ বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া ইহাকে বাধ্যতামুলক করিয়া দিলেন। এবং অন্য কোন উচ্চারণ ও কায়দায় বা অন্য তরতীবে কাহারও নিকট কিছু লেখা থাকিলে উহা অগ্নিদাহ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন যেন সর্বত্র কোন রকম ব্যবধান ব্যতিরকে অবিকল একই রকম কোরআন শরীফ প্রচলিত হয় এবং অজ্ঞতা প্রসূত কোন বিতর্কের দ্বারা বিভেদের সৃষ্টি না হয়। ইহা খলীফা ওসমানের মহান কীর্তি ও অতি সুফলপ্রসূ পদক্ষেপ ছিল।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনের সঙ্কলন ও সংরক্ষণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। খলীফা আবুবকর উহাকে গ্রন্থরূপে একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থ আকারে সাধারণ্যে প্রচারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, বরং রাজধানী মদীনাতে স্বীয় তত্ত্বাবধানেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থাকারে সাধারণ্যে প্রচারের ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন খলীফা ওসমান (রাঃ)। তাই তিনি সর্বসাধারণের নিকট "জামেউল কোরআন" "কোরআনের একত্রিকরণকারী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৫৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পারস্য সম্রাট (পরবেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়াঁ) খুসরুর নিকট একখানা লিপি লিখিয়াছিলেন এবং লিপিখানা আবদুল্লাহ ইবনে হোজাফা ছাহাবীর হাতে অর্পণ করিয়া বাহরাইনের শাসনকর্তা (মোনজের ইবনে ছাওয়ার) নিকট পৌছাইতে বলিয়াছিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা ঐ লিপিবাহক সহ লিপিখানাকে পারস্য সম্রাট

খুসরুর নিকট পাঠাইলেন। খুসরু লিপি পাঠ করিয়া (ক্রোধে) উহা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহা শুনিয়া বদ-দোয়া করিলেন, হে খোদা! তাহারা যেমন আমার পত্রকে টুক্‌রা করিয়াছে তাহারাও যেন অনুরূপ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ধ্বংস হয়।*

৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৎকালীন বড় বড় রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান জানাইয়া পত্র পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট আরজ করা হইল যে, রাজা-বাদশাহগণ শীলমোহরযুক্ত লিপি না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। তখন নবী (দঃ) রৌপ্যের একটি অঙ্গুরীবিশেষ শীলমোহর তৈরী করাইলেন, উহার উপর اللہ / رسول / محمد "আল্লাহ, রসুল, মোহাম্মদ" এই শব্দ কয়টি তিন লাইনে অঙ্কিত ছিল।+ (আনাছ (রাঃ) বলেন) উক্ত অঙ্গুরী আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অঙ্গুলিতে পরিহিত দেখিয়াছি—এখনও উহা আমার চোখে ভাসিতেছে।

এলমের মজলিসে ভিতরে স্থান পাইলে তথায় বসিবে, নচেৎ পিছনেই বসিবে, ফিরিয়া যাইবে না।

৫৯। হাদীছ ঃ—আবু ওয়াকেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া মসজিদে বসিয়া (তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে) ছিলেন। এমন সময় তিন ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের দিকে আসিতেছিল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং দুই ব্যক্তি মজজিসে হাজির হইল। একজন ভিতরে সম্মুখভাগে জায়গা দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসিল এবং অপর ব্যক্তি (ভিতরে ঢুকিবার তৎপরতা দেখাইতে লজ্জা বোধ করিয়া) সকলের পেছনেই বসিয়া পড়িল। মজলিস খতম হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তিন ব্যক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিলেন—একজন (আল্লার রসুলের তথা) আল্লার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তৎপর হওয়ায় আল্লাহ তাহাকে নিকটেই স্থান লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (অপরকে কোনরূপ বিরক্ত করিতে) লজ্জা বোধ করিলেন; আল্লাহ তায়ালাও (তাহাকে মাহরুম ও বঞ্চিত রাখিতে) লজ্জা বোধ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে সুতরাং আল্লাহও তাহাকে (এই মজলিসের শিক্ষা ও বরকত হইতে) মাহরুম করিয়া দিয়াছেন।

---

* ইতিহাস সাক্ষী যে, রসুলুল্লার (দঃ) দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল; অচিরেই পারস্য জাতির সহস্র বৎসরের সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস হইয়া তথায় ইসলামী খেলাফত কায়েম হইয়াছিল।

+ নীচের দিক হইতে পড়া হইলে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" হয়।

ওস্তাদ অপেক্ষা শাগের্দ অধিক জ্ঞানী বা সংরক্ষণকারী হইতে পারে; তাই প্রত্যেকের একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

৬০। হাদীছ :— عن ابى بكرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

.........فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ* عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ وَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থ :—আবু বকরা (রা:) অতি উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ছাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—বিদায়-হজ্জে জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবাণীর দিন মিনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া ভাষণ দিতেছিলেন; আমি তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। (সেই ভাষণে যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ও মৌলিক দায়িত্বের একটি বিশেষ মুলনীতি বর্ণিত হইতেছিল; তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) স্বীয় বক্তব্য-বিষয়ের গুরুত্ব শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য) প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিকার দিনটি কোন্ দিন? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রশ্ন শুনিয়া আমরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, (আজিকার দিনটি কোন্ দিন ইহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তবে এই প্রশ্নের অর্থ কি?) বোধ হয় এই দিনটির প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ নাম "ইয়াওমুন-নহ'র" (কোরবাণীর দিন) বদলাইয়া দিয়া অন্য কোন নাম প্রবর্তন করিবেন। তাই আমরা মুল প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকিয়া শুধু এতটুকু আরজ করিলাম যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্বাধিক বেশী জানেন। তখন নবী (দ:) নিজেই বলিলেন, এই দিনটি পবিত্র "ইয়াওমুন নহ'র" নয় কি? (যেই দিনটিকে অতি মহান পবিত্র দিন গণ্য করত: পূর্বকাল হইতেই সর্ববাদী সম্মতরূপে এমনকি কাফের বর্বরগণ পর্য্যন্ত উহাতে কেহই কাহারও জান, মাল বা ইজ্জৎ-আবরু হরণ করাকে হালাল মনে করে না।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা পবিত্র ইয়াওমুন-ন'হর। তারপর নবী (দ:) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাসটি কোন্ মাস? আমরা সকলেই পূর্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ থাকিলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম বোধ হয় নবী (দ:) এই

* বোখারী শরীফ ১০৪৮ পৃষ্ঠায় واعراضكم وابشاركم ও উল্লেখ আছে।

মাসের প্রচলিত নাম বদলাইয়া দিবেন। তাই এবারেও আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল সর্বাধিক বেশী জ্ঞাত আছেন। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, এইটি পবিত্র জিলহজ্জ মাস নয় কি? (যে মাসের সর্ববাদীসম্মত পবিত্রতা রক্ষার্থে মানুষ তাহার জীবনঘাতী শত্রুকে পূর্ণ সুযোগে ও বাঘে পাইয়াও তাহাকে নিরাপত্তা দান করিয়া থাকে।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র মহান জিলহজ্জ মাস। তৃতীয়বার নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটি কোন্ এলাকা? এইবারও আমরা পূর্বের ন্যায়ই ভাবিলাম এবং নীরবতা অবলম্বন করতঃ ঐ আরজই করিলাম। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, ইহা পবিত্র মহান "হেরেম শরীফ" এলাকা নয় কি? (যে স্থানের সম্মান এত বড় যে, সেখানে কোন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং গাছ-পালা বা ঘাস-পাতার পর্য্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা আদি কাল হইতেই হারাম গণ্য হইয়া আসিতেছে।) আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা।

এইরূপে শ্রোতৃবর্গের মনকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করিয়া এবং তাহাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া, নবী (দঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা সকলে একাগ্রচিত্তে শুনিয়া মানসপটে অঙ্কিতরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের (তথা প্রত্যেকটি মোসলমানের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকের) রক্ত—তোমাদের জান, তোমাদের মাল-সম্পত্তি, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের শরীরের চামড়া পর্য্যন্ত যেরূপে আজিকার মহান ইয়াওমুন-ন'হরের দিনে, এই পবিত্র জিলহজ্জ মাসে, এই পবিত্র হেরেম শরীফে হারাম—সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত; ঠিক এইরূপেই সর্বদিনে, সর্বমাসে ও সর্বস্থানে হারাম ও সুরক্ষিত গণ্য হইবে। (একে অন্যের জান, মাল ও ইজ্জতের উপর আঘাত করিতে পারিবে না।) অচিরেই তোমরা আল্লার দরবারে হাজির হইবে; আল্লাহ তোমাদের সমুদয় আমলের হিসাব লইবেন।

বক্তব্য শেষে নবী (দঃ) শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মহান মূলনীতিটি স্পষ্টরূপে তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলাম ত? এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিল—হাঁ, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, হে খোদা। এই স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকিও। নবী (দঃ) আরও বলিলেন—এই মহান মূলনীতি যাহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছে তাহারা অনুপস্থিতবর্গকে এবং অতঃপর একে অন্যকে কেয়ামত পর্য্যন্ত শুনাইয়া, জানাইয়া, শিক্ষা দিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হইবে যে, আমার বাণীর মূল শ্রোতা (যে অন্যকে শুনাইতে যাইয়া ওস্তাদ হইবে সে) অপেক্ষা তাহার শাগের্দ ঐ বাণীকে অধিক সংরক্ষণ ও কার্য্যকরী করিতে এবং অধিক স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইবে।

অর্থাৎ—রসুলের (দঃ) এক একটি অমিয় বাণীর ভিতরে এমন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত থাকে যাহা কেহ বেশী বুঝিতে পারে, কেহ কম বুঝে, আবার কেহ মোটেই বুঝে না। তাই

এমন ব্যক্তি যিনি ঐ তত্বজ্ঞান কম রাখেন, তিনি যদি অন্ততঃ অবিকল শব্দগুলি মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া উপযুক্ত শাগের্দকে শিক্ষা দিয়া দিতে পারেন, তবে সেই উপযুক্ত শাগের্দ রসুলের (দঃ) এক একটি বাণী হইতে শত শত মাছআলাহ-মাছায়েল, রাষ্ট্রের মুলনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী আইন কানুন বুঝিয়া বাহির করতঃ উহা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে। তদুপরি একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা ঐ বিষয়টি অমর ও চিরস্থায়ী হওয়ার সুযোগ পাইবে। কারণ প্রথম শিক্ষা লাভকারী ব্যক্তি তাহার স্মৃতিশক্তি কম হওয়ায় সহজেই উহা ভুলিয়া যাইতে পারে। পরন্তু তাহার নিকট শিক্ষা লাভকারীর স্মৃতিশক্তি অধিক প্রখর হওয়ায় তাহার দ্বারা ঐ বিষয়টি বহুদিন স্থায়ী হইবে এবং প্রচার পরম্পরায় উহা অমর ও চিরস্থায়ী হইতে পারিবে।)

হযরত (দঃ) মোসলেম জাতিকে বিশেষভাবে আরও বলিলেন, (আমি তোমাদিগকে অন্ধকার যুগের মারামারি কাটাকাটি হইতে মুক্ত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ রাখিয়া যাইতেছি।) খবরদার! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফেরদের ন্যায় পরস্পর মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হইও না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছটি বিশ্বমানবের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এমন একটি সাংবিধানিক-ছনদ ও মুলনীতি যাহা বিশ্বের ইতিহাসে ইতিপুর্বে কোথাও শোনা যায় নাই। ইহা মানুষের কল্পিত বিষয় নহে, বরং ইহা বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত ও বিশ্বশান্তির অগ্রদুত আল্লার রসুল কর্তৃক প্রচারিত। পরবর্তী যুগে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রই ইহাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রনায়কদের মৌলিক দায়িত্বরূপে এবং রাষ্ট্রের মুলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

উল্লেখিত নিরাপত্তা-বিধান ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের মৌলিক দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার; যাহারা মোসলেম জাতিভুক্ত তাহাদের এই অধিকার ইসলাম ধর্ম সূত্রে প্রাপ্য এবং যাহারা মোসলমান নয় তাহাদের এই অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের বাধ্যতা ও আনুগত্য সূত্রে প্রাপ্য। অতএব, এই অধিকার সে পর্য্যন্তই অক্ষুন্ন থাকিবে যাবৎ কোন মোসলমান স্বীয় ধর্মমত পরিবর্তন পুর্বক "মোরতাদ" প্রমাণিত না হইবে এবং যাবৎ কোন অমোসলেম নাগরিক স্বীয় আনুগত্যের শপথ লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রমাণিত না হইবে।

এই মুলনীতির মধ্যে তিনটি বস্তুর নিরাপত্তা দান তথা এই তিনটি বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্বভার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে—একটি হইল নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার, ইহা রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাপ্য হক ও ন্যায্য দাবী। আর একটি হইল নিরাপত্তার দায়িত্বভার, ইহা রাষ্ট্রনায়কদের জিম্মাদারী ও তাহাদের ঘাড়ে চাপানো বোঝা। আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তথা কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী রাষ্ট্রনীতির মুল বস্তু হইবে "দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বজ্ঞান"। অর্থাৎ—রাষ্ট্রনায়কদের

এই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি নাগরিকের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত যেন নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। এমনকি প্রতিটি নাগরিকের শরীরের চামড়াটুকুও যেন নিরাপদে থাকে এবং অন্যায়রূপে উহার উপর সামান্যতম আঁচড়ও যেন আসিতে না পারে। এই দায়িত্বভার সুষ্ঠুরূপে বহন করাই হইল ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল বস্তু। যাহারা এই দায়িত্বভার বহন করিয়া কার্য্যতঃ স্বীয় যোগ্যতা দেখাইতে সক্ষম হইবে, একমাত্র তাহারাই রাষ্ট্রনায়কত্বের কুরছীতে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। অন্যথায় কেহ কুরছী আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

বর্তমান জগতের মনগড়া রাষ্ট্রনীতির মূলবস্তু সাব্যস্ত করা হয় অধিকারের দাবীকে। এমনকি শাসনতন্ত্রকে পর্য্যন্ত অধিকারের দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করা হইয়া থাকে। এইরূপে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ও দাবী-দাওয়ার আধিক্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে দুনিয়া হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব, শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী দায়িত্বজ্ঞান অর্জনের প্রতি সচেষ্ট হইতে হইবে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে অধিকার প্রাপ্তি আপনা আপনিই আসিতে বাধ্য।

এই হাদীছে তিনটি নিরাপত্তার উল্লেখ হইয়াছে—(১) জান, (২) মাল, (৩) ইজ্জত। ইসলামী আইন ও ধারা-উপধারার ভিত্তি এই মূলনীতির উপরই স্থাপিত।

জানের নিরাপত্তা ঃ

পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে—ইচ্ছাকৃত ঘটনায় খুনের বদলা খুন, কানের বদলা কান, নাকের বদলা নাক, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত এবং জখমের বদলা সমপরিমাণ জখম। ভুল বা অসতর্কতা বশতঃ এরূপ কিছু ঘটিলে তাহার শাস্তিও নির্দ্ধারিত আছে। আলোচ্য হাদীছে دماءكم তোমাদের রক্ত ও ابشاركم তোমাদের চামড়া বলিয়া ঐ নিরাপত্তাকেই বুঝাইয়াছে। ফেকাহ তথা ইসলামী আইন-শাস্ত্রে কিতাবুল-কেছাছ, কিতাবুদ-দিয়াত, কিতাবুল-জেনায়াত ও কিতাবুত-তা'যীরের কতক অংশে এই নিরাপত্তার ধারা-উপধারাই বর্ণিত হইয়াছে।

মালের নিরাপত্তা ঃ

প্রথমতঃ ইসলাম ধন-সম্পত্তি মাল-দৌলতের উপর মালিকের স্বত্বাধিকার ও ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দান করে। পবিত্র কোরআনের শত শত বিধান ও আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। যথা—এতিমের মাল-সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার কঠোর আদেশ এবং উহা আত্মসাৎ করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা, তদুপরি আত্মসাৎকারীর উপর ভীষণ আজাব ও শাস্তির সংবাদবাহী অনেক আয়াত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃত খরিদ-বিক্রি (ইত্যাদি) সূত্র ভিন্ন কাহারও ধন-সম্পত্তি গ্রাস করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত আছে। উত্তরাধিকারের বিধান, যাকাত ও হজ্জ ফরজ

হওয়ার বিধান কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এইরূপ আরও বহু বিধান কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের স্বীকৃতির স্পষ্টতর প্রমাণ। শত শত হাদীছও এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে اموالكم "তোমাদের ধন-সম্পত্তি" বলিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের সনদ দান পূর্বক উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব ও অধিকার বুঝান হইয়াছে। সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত চোরের হাত কাটার শাস্তি বিধান ও ডাকাতের হাত-পা উভয়কে কাটার শাস্তি-বিধান এবং ফেকাহ্ শাস্ত্রের "বাবুছ্ছারাকাহ্" ও বাবু-কাতয়েত্তরীক, "কিতাবুল গছব" ইত্যাদির মধ্যে বর্ণিত ধারা ও উপধারা সমূহ এই মালের নিরাপত্তার জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে।

অবশ্য অসদুপায়ে অবৈধরূপে অর্জিত ও সঞ্চিত ধনের মালিক ঐ উপার্জনকারী কখনও হইতে পারিবে না। বরং ঐ মাল আসল মালিককে ফেরৎ দিতে হইবে; ফেরৎ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার শত তওবাও কবুল হইবে না এবং আখেরাতে দ্বিগুণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।

ইজ্জতের নিরাপত্তা ঃ আলোচ্য হাদীছে اعراضكم "তোমাদের আবরু-ইজ্জত" এই শব্দটির দ্বারা উক্ত নিরাপত্তাকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত "হদ্দে-কজফ"—মিথ্যা যেনার তোহমতের দরুন ৮০টি বেত্রাঘাত এবং "হদ্দে-যেনা"—অবিবাহিত পুরুষ বা মেয়ের যেনার শাস্তি ১০০টি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের যেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা, তদুপরি ফেকাহ শাস্ত্রের কিতাবুল-হুদূদ ও কিতাবুত্তাযীরে বর্ণিত ধারা ও উপধারাসমূহ উক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপই প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ইসলামী ism বা নীতি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে উল্লিখিত তিনটি নিরাপত্তা সমান-দান করিয়া থাকে। ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মোসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলের জন্যই সমানভাবে এই তিনটি নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা কোরায়েশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন একটি মহিলার দ্বারা চুরি প্রমাণিত হইলে পর তাহার পক্ষে সমুদয় সুপারিশকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান পূর্বক তাহার হাত কাটিয়া দিলেন এবং সুপারিশকারীর প্রতি ভর্ৎসনা করতঃ ক্রোধস্বরে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন—(খোদা না করুন—) মোহাম্মদের (দঃ) মেয়ে ফাতেমাও যদি এইরূপ অপরাধ করে, তবে তাহারও হাত কাটিয়া দেওয়া হইবে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, পূর্ববর্তী অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সকলের জন্য সমান নিরপেক্ষ ইনসাফ ছিল না। গরীব অপরাধ করিলে তাহার বিচার ও পুরাপুরি শাস্তি হইত, কিন্তু বড় লোকেরা অপরাধ করিলে উহার কোনও বিচার অথবা শাস্তি হইত না কিম্বা হইলেও মনগড়া মতে হইত। যে জাতির মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক ইনসাফ হয় উহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

জ্ঞান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, মানুষের কথা ও কাজের পূর্বে এল্‌ম—জ্ঞান ও শিক্ষা আবশ্যক। মানুষ যে বিষয় বলিবে বা যে কাজ করিবে সে বিষয় প্রথম তাহার এল্‌ম—জ্ঞান ও শিক্ষা থাকিতে হইবে। অতএব মানুষের জন্য এল্‌ম—জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

অতঃপর বোখারী (রঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন যে, إنما العلم بالتعلم এল্‌ম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য যাহা অধ্যয়নলব্ধ হয়। স্বয়ম্ভু জ্ঞানী ও আলেম দ্বারা অসংখ্য ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতিই সাধিত হয়। যেরূপ স্বয়ম্ভু ডাক্তার মানুষের জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ।

দ্বীন ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচ্য তথ্যটি অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, দ্বীন ও ধর্ম আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রেরিত, তাই উহা রসুলের পরিত্যাজ্য সম্পদ†। উম্মতগণ সেই সম্পদ রসুল (দঃ) হইতে পরম্পরায় লাভ করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে। সুতরাং উহার এল্‌ম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য গণ্য হইবে যাহা পরম্পর সূত্রে রসুল (দঃ) পর্য্যন্ত সংযুক্ত হয় এবং তাহা একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই হইতে পারে। দ্বীন ও ধর্মে যাহারা সেই অধ্যয়ন ছাড়া স্বয়ম্ভু জ্ঞানীরূপে গজাইয়া উঠে তাহারা বস্তুতঃ মানুষের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। একটি সুন্দর প্রবাদ—স্বয়ম্ভু ডাক্তার জানের পক্ষে বিপদ, আর স্বয়ম্ভু ধর্ম-জ্ঞানী ঈমানের পক্ষে বিপদ। অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান সম্পর্কেও একটি উত্তম কথা বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন ৩ পারা ১৬ রুকুতে ধর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আদেশ রহিয়াছে كُونُوا رَبَّانِيِّينَ "তোমরা রব্বানী হও"। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "রব্বানী" অর্থ দ্বীন ও ধর্মে জ্ঞানী, আলেম, প্রজ্ঞাশীল ; অর্থাৎ "রব্বানী" আখ্যার শ্রেণী ভুক্তির জন্য দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে তিনটি গুণের প্রয়োজন—জ্ঞানী হইতে হইবে, আলেম হইতে হইবে এবং প্রজ্ঞাশীল হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বোখারী (রঃ) একটি চতুর্থ গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা "রব্বানী" শব্দের সহিত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রব্বানী শব্দের মূল "রব্ব" ; "রব্ব" অর্থ পোষক ও প্রতিপালক। শিশুদের লালন-পালনে, তাহাদেরে পানাহার দানে ধাপে ধাপে ছোট হইতে বড় ও নরম হইতে শক্তের প্রতি অগ্রসর হইয়া আদর-যত্ন ও কৌশলের সহিত তাহাকে আহার্য্য গলাধঃ করাইতে হয়। সেমতে "রব্বানী" আখ্যার যোগ্য শুধুমাত্র ঐ আলেম যিনি আল্লার বান্দাদিগকে দ্বীনের এল্‌ম ও শিক্ষা ঐরূপ সুকৌশল ও আদর-যত্নের সহিত গ্রহণ করাইতে সদা সচেষ্ট থাকেন। আলেম সম্প্রদায় এই চারিটি গুণধারী হইবেন, ইহাই উক্ত আয়াতের নির্দেশ।

---

† এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে একটি হাদীছের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছটির বিবরণ "এল্‌মের ফজিলত" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞান ও নছিহতের কথা এত বর্ণনা করিবে না যে, শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তি আসে

৬১। হাদীছ :— আবত্বল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমাদের বাসনা—আপনি প্রতি দিনই আমাদিগকে ওয়াজ শুনান। তিনি বলিলেন, প্রতিদিন ওয়াজ শুনাইতে এই জন্য বিরত থাকি যে, আমি পছন্দ করি না—তোমাদের মধ্যে ইহার দ্বারা কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা বিরক্তি উপস্থিত হউক। আমি তোমাদিগকে কয়েক দিন পর পর নছিহত করি; কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই ভাবেই ওয়াজ-নছিহত করিতেন যেন আমরা বিরক্ত হইয়া না পড়ি।

এই হাদীছ দ্বারা বোখারী (র:) এই মছআলাহও বয়ান করিয়াছেন যে, দ্বীন শিক্ষা দানে লোকদের সুবিধার্থে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করা জায়েয আছে; বেদাত নহে।

৬২ হাদীছ :— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

অর্থ :—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা (আল্লার বান্দাদের জন্য) সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করিও না। তাহাদিগকে খোশ খবরী শুনাইয়া আহ্বান জানাও, ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাড়াইবার পন্থা অবলম্বন করিও না।

ব্যাখ্যা :—অনেক ক্ষেত্রে কথার মূল উদ্দেশ্য ও স্থান বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করায় শুধু বাক্য ও শব্দের ব্যাপকতার দ্বারা নিছক ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই আলোচ্য হাদীছটি অনুধাবন করার জন্য প্রথমত: ইহার দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং ইহার স্থান বিশেষ কি ছিল তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দেশ-বিদেশে ছাহাবীগণকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ মোবাল্লেগ— দ্বীন প্রচারক, মোয়াল্লেম—দ্বীন শিক্ষাদাতা, আমেল—শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইতেন। ঐ সমস্ত প্রতিনিধিবর্গকে হযরত (দঃ) বিশেষ বিশেষ অমৃত উপদেশ দান পূর্বক বিদায় করিতেন। আলোচ্য হাদীছটি ঐ বিশেষ অমৃতময় উপদেশাবলীর অন্যতম একটি উপদেশ। এই উপদেশ দ্বারা হযরত (দঃ) স্বীয় প্রতিনিধিবর্গকে সর্বসাধারণের সম্মুখে দ্বীন প্রচার, সর্বসাধারণকে দ্বীন শিক্ষাদানে, সর্বসাধারণের উপর শান্তি-শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনার (Administration) ক্ষেত্রে সর্বাধিক জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন।

অনেক সময় দেখা যায়—কোন একটি উত্তম সুন্দর বিষয়কে প্রচার করা হয়, কিন্তু অনভিজ্ঞ প্রচারকের অনভিজ্ঞতা প্রসূত ত্রুটিপূর্ণ কর্কশ ও কঠোর ভাবধারা এবং অশোভন

অরুচিকর প্রচার পদ্ধতি ও তিক্ত ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদির দরুন মানুষ ঐ বিষয়টিকে আদৌ গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। উহাকে কঠিন বোঝা মনে করতঃ উহা হইতে ভাগিয়া থাকে, বরং উহার প্রকৃত স্বাদ ও সৌন্দর্য্য প্রচারকের তিক্ত উক্তি সমূহের অন্তরালে ঢাকিয়া যাওয়ায় মানুষের মধ্যে বিষয়টির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। অথচ অভিজ্ঞ প্রচারক হইলে সে তাহার ভাব-ভঙ্গিমা, হৃদয়গ্রাহী প্রচার-পদ্ধতি রুচিময় দৃষ্টান্ত ও উপমা সমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত—একটি অতি কঠিন ও কঠোর বিষয়কেও মানুষের প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। শিক্ষা দানের বেলায়ও তদ্রূপই—অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক সহজ শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন বিষয়কেও সহজ হইতে সহজতর করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ অযোগ্য শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরুন বোধগম্য বিষয়ও বিপরীত রূপ ধারণ করিয়া বসে, ফলে শিক্ষার্থীগণ উহাকে কঠিন মনে করিয়া উহা হইতে ভাগিয়া পলায়ন করে। এইরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন ক্ষেত্রেও ভাল ও সহজ সাধ্য আইন-কানুন বিধি-নিষেধ অনভিজ্ঞ অযোগ্য পরিচালকের অনভিজ্ঞতার ত্রুটিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার দরুন মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, আইনের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জন্মিয়া উঠে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। অথচ অভিজ্ঞ ও যোগ্য পরিচালক হইলে সে মানুষকে নিমের বড়িও চিনির ন্যায় খাওয়াইয়া তাহাদিগকে আইনের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয়।

ইমান অধ্যায়ে ৩৫ নম্বর হাদীছে হযরত (দঃ) দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন الدين يسر। "দ্বীন-ইসলাম অতি সহজ"। আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতিনিধিবর্গকে সতর্ক করিয়াছেন—দ্বীন-ইসলাম প্রচারের ও শিক্ষাদানের সময় উহাকে মানুষের সম্মুখে এরূপভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে যেন উহার প্রকৃত রূপ "সহজ হওয়া" স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, মানুষ উহাকে সহজে বুঝিয়া নিতে সক্ষম হয়, মানুষ উহার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। খবরদার! তোমার ভাব-ভঙ্গিমা, তোমার বর্ণনার দরুন আল্লার সেই সহজ মনোমুগ্ধকর দ্বীন-ইসলাম যেন আল্লার বান্দাদের নিকট কঠিন অবোধগম্য বিস্বাদ তিক্ত ও ঘৃণারযোগ্য পরিগণিত না হয়। তেমনি ভাবে ঐ দ্বীন-ইসলামের সহজ সুলভ বিধি-নিষেধগুলি পরিচালনা ও প্রয়োগ করিতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাহাতে মানুষ উহাকে রহমত মনে করিয়া উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান লাভে সচেষ্ট হয়। খবরদার। তোমার পরিচালন দোষে এবং প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটিতে আল্লার সহজ দ্বীনকে যেন কেহ কঠিন মনে না করে এবং উহার প্রতি আল্লার বান্দাগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া না উঠে।

সারকথা এই যে—আলোচ্য হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা একমাত্র এতটুকু যে, দ্বীন তথা শরীয়তের আদর্শ ও আদেশ-নিষেধাবলীর প্রচার ও শিক্ষাদান এবং উহা জনগণের উপর পরিচালন ও প্রয়োগ করিতে যথাসম্ভব সহজ মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কাট-ছাট করার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

ভালরূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে—"শরীয়ত" একটি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের নির্দ্ধারিত নির্দেশিত সমষ্টিগত বস্তু। উহাকে পূর্ণমাত্রায় সকলের গ্রহণীয় করাইবার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এ-কারণেই শরীয়তেব নির্দ্ধারিত কোন একটি সামান্যতর বিষয়ের উপর আঘাত হানিলে নিছক বোকামী বই আর কি হইবে? যেমন—কোন একটি মিক্শ্চার ঔষধ রোগীকে সহজে খাওয়াইবার জন্য উহার নির্দ্ধারিত প্রেস্ক্রিপ্শনের মধ্যে কোন প্রকার ছাট-কাট বা রদবদল করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ই হইবে। কোন ডাক্তার বরং কোন বুদ্ধিমান লোকই ঐরূপ করিতে অনুমতি দিবে না। হাঁ; প্রেস্ক্রিপ্শন অবিকলরূপে ঠিক রাখিয়া যে কোন উপায়ে সহজভাবে উহাকে রোগীর গলাধঃকরণ-ই হইল বুদ্ধিমানের কাজ। এই পরামর্শই আলোচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান আল্লার বিশেষ নেয়ামত

৬৩। হাদীছ :— عن معاوية رضى الله تعالى عنه يقول قال

النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللّٰهُ يُعْطِىْ وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ -

অর্থ :—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা যাহাকে (দুনিয়া-আখেরাতের) উন্নতি, সাফল্য ও মঙ্গল দানের ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের এল্‌ম ও ধর্মজ্ঞান দান করেন। নবী (দঃ) আরও বলেন, আমি বিতরণকারী বই নহি; জ্ঞান ও এল্‌মদাতা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, এই উম্মতের একদল লোক কেয়ামত পর্য্যন্ত দ্বীন ও হকের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিবে, কোন প্রকার বাধা বিপত্তিই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা :— "আমি বিতরণকারী" বাক্যটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য এই যে, এল্‌ম ও ধর্মজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করেন, কিন্তু যে কোন জ্ঞান ও এল্‌ম প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লার তরফ হইতে কি-না, তাহা প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য তখনই হইবে, যখন উহা নবীর (দঃ) মাধ্যমে আসিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। তাই কেবলমাত্র নবীর (দঃ) নিকট হইতে উপযুক্ত ওস্তাদ মাধ্যমে বিশ্বস্ত সূত্র-পরম্পরা অক্ষুন্ন রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিকরূপে শিক্ষা গ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটী এল্‌ম অর্জিত হইতে পারে। কেননা, আল্লার চিরাচরিত নিয়ম ও বিধানই এই যে, নবী এবং নায়েবে নবী—ওস্তাদ ও খাঁটী পীরের মাধ্যমেই জ্ঞান এল্‌ম ও ফয়েজ দান করিয়া থাকেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নবীকেই একমাত্র বিতরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং নবীর তরফ হইতেই উহা হাসিল করিতে হইবে,

অন্য কোথাও উহা পাওয়া যাইবে না। যেমন—সরকারী কন্ট্রোলের মাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডিলার ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে না।

দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম হাসিলে প্রতিযোগী হওয়া

قَدْ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও এল্‌ম হাসিল করিতেন।

৬৪। হাদীছ:— عن عبد الله بن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ

فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

অর্থ:—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মানব জগতে) প্রতিযোগিতা করিয়া হাসিল করার উপযোগী গুণ মাত্র ছুইটি—(একটি সাখাওয়াত বা দানশীলতা, দ্বিতীয়টি হেকমত বা সত্যিকারের ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ) (১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে উহা জমা করিয়া রাখে না, বরং আল্লার রাস্তায় খরচ করার কাজে আজীবন লিপ্ত থাকে। (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের এল্‌ম তথা সত্যিকারের ধর্মজ্ঞান দান করিয়াছেন, সে ঐ এল্‌মের দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান করে এবং লোকদিগকে অবৈতনিকভাবে উহা শিক্ষাদান করিতে থাকে এবং লোকদের মধ্যে উহা অযাচিতভাবে অনবরত বিতরণ করিতে থাকে। এই ব্যক্তিদ্বয়ের গুণদ্বয় বিশেষ প্রতিযোগিতার সহিত অর্জনযোগ্য।

এল্‌ম লাভের জন্য খিজিরের নিকট হযরত মুছার সমুদ্রপথে গমন

এই পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (র:) এল্‌ম হাসিলের গুরুত্ব দেখাইয়াছেন যে, মুছা (আ:) বড় মর্তবার হইয়াও তাঁহার অপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তি খাজা খিজিরের নিকট সঙ্কটময় সমুদ্রপথে গমন করিয়াছিলেন এল্‌ম হাসিলের জন্য; যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। ৯৭ নম্বরে অনুদিত সুদীর্ঘ হাদীছ খানা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে। হাদীছখানার অনুবাদ সম্মুখে আসিতেছে।

কোরআনের এল্‌ম দানের দোয়া করা

৬৫। হাদীছ:—আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের স্থানে গমন করিলেন; আমি তাঁহার জন্য পানি উপস্থিত করিয়া রাখিলাম। হযরত (দ:) উহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, পানি কে রাখিয়াছে? উত্তরে আমার নাম বলা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ *-

"হে আল্লাহ! তাহাকে কোরআনের এল্‌ম দান কর, পরিপক্ক জ্ঞান দান কর এবং দ্বীন-ইসলামের সঠিক বুঝশক্তি দান কর।"

কোরআনের এল্‌ম এবং দ্বীনের এল্‌ম ও জ্ঞান যে কত বড় অমূল্য রত্ন এবং উহা যে কত বড় ফজিলতের বস্তু তাহা এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পায়। কারণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় প্রিয়পাত্র স্নেহের ভ্রাতা (চাচার ছেলে) ইবনে আব্বাসের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার খেদমতের প্রতিদান স্বরূপ আল্লার দরবারে এল্‌মে-দ্বীনের জন্যই দরখাস্ত করিলেন। যদি ইহা অমূল্য ধন ও সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত না হইত তবে এই ক্ষেত্রে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার নিকট এই জিনিষের প্রত্যাশী হইতেন না।

কি বয়সে জ্ঞাত ঘটনার হাদীছ গ্রহণযোগ্য ?

৬৬। **হাদীছঃ**—মাহমুদ ইবনে রবী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার স্মরণ আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কূপের পানি ভরা ডোল হইতে পানি মুখে লইয়া (কৌতুক স্বরূপ) আমার চেহারার উপর কুল্লি করিয়াছিলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক।+

ব্যাখ্যাঃ—এখানে প্রমাণিত হইল যে, অপরিণত বয়সে এমনকি পাঁচ বৎসরের বালকও যদি তাহার স্মরণীয় বিষয় বর্ণনা করে যাহা তাহার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব, তবে উহা গ্রহণীয়।

এল্‌ম হাসিল করিতে বিদেশে যাওয়া

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) দীর্ঘ এক মাসের পথ ছফর করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়াছিলেন; একটি হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যাঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার "আদাবুল-মোফ্‌রাদ" নামক কেতাবে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা এই—

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই সংবাদ জ্ঞাত হইলাম যে, (সিরিয়ায় অবস্থানরত) একজন ছাহাবী একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যাহা তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)

---

* হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দোয়া পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ মোফাচ্ছের (কোরআন ব্যাখাকার) ও দ্বীনের জ্ঞানভাণ্ডার বানাইয়াছিলেন। বোখারী শরীফের কয়েক স্থানে হাদীছটি উল্লেখ আছে। অনুবাদে ৫৩১ ও ২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দোয়ার শব্দ একত্র করা হইল।

+ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই কুল্লির বরকতে অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও মাহমুদ ইবনে রবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চেহারার লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য কিশোরের ন্যায় ছিল।

হইতে শুনিয়াছেন (আমি উহা শুনি নাই)। তাই আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং সমুদয় প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক যাত্রা করিলাম। দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করিয়া সিরিয়ায় পৌঁছিলাম; ঐ ছাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দারোওয়ানকে বলিলাম, সংবাদ দাও যে, জাবের আপনার দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রশ্ন আসিল আবদুল্লার পুত্র? আমি বলিলাম, হাঁ। তৎক্ষণাৎ ঐ ছাহাবী ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম, একটি হাদীছ সম্পর্কে আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি উহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন; আমার আশঙ্কা হইল—উহা শুনিবার পূর্বে আমার মৃত্যু আসিয়া যায় না কি। অর্থাৎ উক্ত হাদীছখানা শুনিবার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং এক মাসের পথ ভ্রমণ করিয়া আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি।

যে হাদীছটি সম্পর্কে এই ঘটনা উহা বোখারী শরীফ ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—

ويذكر عن جابر عن عبد الله بن انيس قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الدَّيَّانُ

অর্থ:—জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হয়—তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সকল মানুষকে হাশর-মাঠে একত্রিত করিবেন। অতঃপর সকলকে সম্বোধন করিবেন। সেই সম্বোধনের ধ্বনি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই সমভাবে শুনিতে পাইবে×। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—একমাত্র আমিই সর্বাধিপতি, কর্মফল দানের ক্ষমতাবান একমাত্র আমিই।

× বোখারী শরীফ ৪৭০ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে—

يجمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس

"কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের দিন আল্লাহ তায়ালা পূর্বাপর সকলকে একত্রিত করিবেন এক বিশাল ময়দানে, এরূপ ময়দান যেখানের প্রত্যেক দর্শক উপস্থিত সকলকে দেখিতে পাইবে (কারণ উক্ত ময়দানে কোন প্রকার উচ-নীচ বা আড়াল থাকিবে না।) এবং প্রত্যেক আহ্বানকারী উপস্থিত সকলকে তাহার কথা শুনাইতে সক্ষম হইবে এবং সূর্য্য অতি নিকটবর্তী হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কালাম বা বাণী প্রদানকালে যাহাকে বা যাহাদিগকে বাণী দান করেন তাহাদের জন্য উহা শ্রবনে নিকটবর্তীতা ও দূরবর্তীতায় ব্যবধান হয় না।

পাঠকবৃন্দ। হাদীছ লাভের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করার আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। "এলমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা" পরিচ্ছেদে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে— এক ব্যক্তি একটি মাত্র হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল ভ্রমণ করিয়া দামেস্ক শহরে পৌঁছিয়াছিলেন।

শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান করার ফজিলত

৬৭। হাদীছ:— আবু মুছা আশয়ারী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও এল্‌ম দান করিয়া পাঠাইয়াছেন উহার দৃষ্টান্ত—(চৈত্র-বৈশাখ মাসের) প্রবল মৌসুমী বৃষ্টি। যখন উহা ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, তখন নরম ও উর্বর জমিগুলি শস্য-শ্যামল এবং সবুজ তরুলতা ও ঘাস পাতায় পরিপূর্ণ হয়, (যদ্দ্বারা ঐ জমি নিজেও সৌন্দর্য্য লাভে উপকৃত হয়, অপরকেও খাদ্য দান করিয়া উপকৃত করে।) আর যে জমিগুলি নীচু অথচ শক্ত, ঐ গুলিতে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকে, (ঐ জমির মধ্যে উর্বরাশক্তি না থাকায় সবুজ ঘাস বা শস্য-শ্যামলতার সৌন্দর্য্য হইতে নিজে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু অন্যে উহা হইতে উপকৃত হয়—) সকলে ঐ পানি পান করে পশুপালকে পান করায় এবং ঐ পানির দ্বারা অন্যান্য জমিতে চাষাবাদ করে। আর যে জমিগুলি উষর, পাথরের ন্যায় শক্ত ও সমতল; ঐগুলি (সমতল হওয়ার দরুন পানি জমাইয়া রাখিতে অক্ষম; সুতরাং কেহ উহা) হইতে কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারে না। (এবং অনুর্বর শক্ত পাথরের ন্যায় হওয়ার দরুন উহাতে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না, তাই) নিজেও সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত থাকে।

উল্লেখিত প্রথম দৃষ্টান্তটি ঐ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য যে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে— আল্লাহ তায়ালা যে এল্‌ম ও হেদায়েতের বাহকরূপে হযরত (দঃ)কে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিয়া নিজেও উপকৃত হইয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়া উপকৃত করিয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে সেই এল্‌ম ও হেদায়েতের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় নাই, উহা গ্রহণ করে নাই।

ব্যাখ্যা:—উল্লেখিত প্রথম প্রকারের জমি ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে নিজে হেদায়েত ও এল্‌মকে গ্রহণ করিয়া অপরকেও শিক্ষা দেয়; তৃতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ বদনছীব, যে সেই রত্নকে গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। হাদীছের মধ্যে স্পষ্টতঃ এই দুই শ্রেণীরই উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ আলেম-বে-আমল যে নিজে আমল করে না, অপরকে শিক্ষা দেয়। ঘৃণা প্রদর্শনার্থে হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করেন নাই।

দ্বীনের এল্‌ম উঠিয়া অজ্ঞতার প্রাবল্যের আশঙ্কা

রবীয়া (রঃ) নামক একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ✽ বলিয়াছেন—যাহার নিকট এল্‌ম আছে তাহার নিজকে ধ্বংস করা ঠিক নয়। অর্থাৎ আলেম হইয়া এল্‌ম বিতরণ না করা এবং দুনিয়ার লাভে ব্যাপৃত থাকা এবং উহার লালায়িত হওয়া আলেম হিসাবে নিজকে ধ্বংস করারই শামিল।

৬৮। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا -

অর্থ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের আলামত—এল্‌ম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, মদ্য পান আরম্ভ হইবে, যেনা বা ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি উহা আর লুক্কায়িত বস্তু থাকিবে না।

৬৯। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) একদা বলিলেন, আমি এমন একটি হাদীছ বয়ান করিব যাহা আমার পর (হযরত (দঃ) হইতে সরাসরি শ্রবণকারী) অন্য কেহ বয়ান করিবে না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের কতিপয় আলামত এই—এল্‌ম দুর্লভ হইয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, প্রকাশ্যে ব্যাভিচার হইবে, নারীর সংখ্যা অধিক হইবে, পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এমনকি এক একটি পুরুষের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশটি নারী আশ্রিতা হইবে।

৭০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের নিকটবর্তী) এল্‌ম উঠিয়া যাইবে অজ্ঞতা ও ফেৎনা-ফাসাদ তথা বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলার আধিক্য হইবে, অতি মাত্রায় কাটাকাটি মারামারি হইবে।

কিভাবে এল্‌ম উঠিবে ?

খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত শাসনকর্তাকে লিখিত নির্দেশ পাঠাইলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহকে অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ কর। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এল্‌ম বিলীন হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার বুক হইতে আলেমগণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন। তবে ছহীহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি লক্ষ্য করা উচিৎ নয়। (আর এল্‌মের প্রসারে তৎপর হওয়া একান্ত

✽ "রবীয়া" মদীনাবাসী একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ইমাম মোজতাহেদ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রসার এত বেশী ছিল যে, তিনি সেকালে "মহাজ্ঞানী রবীয়া" নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৩৬ হিঃ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্তব্য।) অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষা দানের জন্য বসিতে হইবে। এল্‌ম যখন মুষ্টিমের লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে, তখন এল্‌মের ধ্বংস অনিবার্য্য।

৭১। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এল্‌মকে তাঁহার বান্দাদের নিকট হইতে জবরদস্তি ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইবেন না, কিন্তু আলেমদিগকে উঠাইয়া নিয়া এল্‌ম উঠাইবেন। যখন দুনিবার বুকে আলেম থাকিবে না তখন জনগণ জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে সরদার নিযুক্ত করিবে এবং সেই সমস্ত জাহেল সরদারদের নিকটই সবকিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে। এবং উহারা কিছুই না জানা সত্বেও ফৎওয়া (—ধর্মীয় বিধানাবলীর রায় ও ফয়ছালাহ) দিবে; যদ্দ্বারা তাহারা নিজেও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইবে, অপরকেও গোমরাহ করিবে। (২০ পৃঃ)

অতিরিক্ত এল্‌ম হাসিল করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের উপর যে সব ফরজ-ওয়াজেব রহিয়াছে, ঐ সবের এল্‌ম এবং যে যে কাজ করিবে উহা সম্পর্কে হালাল-হারামের এল্‌ম হাসিল করা ত ফরজে আঈন; অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরই উহা ফরজ। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত এলমেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলে এইরূপ অন্ততঃ প্রয়োজনীয় মছলা মছায়েল জ্ঞাত হইতে পারে। ইহা ফরজে কেফায়া—প্রত্যেক অঞ্চলের সকলের উপর সমষ্টিগতভাবে ফরজ।

পশুর উপর থাকিয়া মছআলা বর্ণনা করা*

৭২। **হাদীছ**ঃ—আমর ইবনে আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় মিনার ময়দানে জমরা-আকাবার নিকটে (উটের উপর) সওয়ার ছিলেন। চতুষ্পার্শ হইতে সর্বসাধারণ তাঁহার নিকট মছআলা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি লক্ষ্য করি নাই—কোরবাণীর পূর্বেই চুল কামাইয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তজ্জন্য কোন গোনাহ হইবে না, এখন কোরবাণী কর। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি লক্ষ্য করি নাই—কঙ্কর মারিবার পূর্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাতে গোনাহ হইবে না, এখন কঙ্কর মার। ঐ সময় যত লোকই কার্য্যাদি অগ্র পশ্চাৎ করিবার মছআলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রত্যেককেই হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন—গোনাহ হইবে না, এখন করিয়া লও।+

---

* কোন কোন হাদীছে আছে—"কোন পশুকে বক্তৃতা মঞ্চ বানাইও না।" তাই বোখারী (রঃ) এখানে দেখাইতেছেন যে, উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, কোন পশুকে অধিক কষ্টে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া বক্তৃতা দিবে না, সেই আশঙ্কা না হইলে ঐরূপ করা যায়।

+ হজ্জের আহকাম সমূহে ভুল বশতঃ উলট-পালট করিয়া ফেলিলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু দম (জানোয়ার জবেহ করিয়া কাফ্‌ফারা) আদায় করিতে হইবে।

মাথা বা হাতের ইশারায় মছআলার উত্তর দেওয়া

৭৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—কঙ্কর মারার পূর্বে কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে কোনও গোনাহ হইবে না। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—কোরবাণীর পূর্বেই চুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিলেন—তজ্জন্য কোনও গোনাহ হইবে না।

নবী (দঃ) একটি প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও কতিপয় বিষয়ের এল্‌ম শিক্ষা দিয়া তাহাদের দেশবাসীকে উহা শিক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য—প্রত্যেক মোসলমান দ্বীনের এল্‌ম যতটুকু শিখিতে পারে উহা অপরকে শিখাইতে সচেষ্ট হওয়ার কর্তব্য নির্দেশ করা। এখানে ৪৮নং হাদীছের উল্লেখ হইয়াছে।

একটি মছআলার প্রয়োজনেও ছফর করা

৭৪। হাদীছ ঃ—ওক্‌বা (রাঃ) নামক ছাহাবী একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন। কিছু দিন পর অন্য একটি মহিলা আসিয়া বলিল, আমি ওক্‌বা ও তাহার স্ত্রী উভয়কে দুধ পান করাইয়াছিলাম। (অর্থাৎ তাহারা দুধ-ভাই বোন, তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে না।) ওক্‌বা বলিলেন, আমি এই ঘটনা জানি না এতদিন তুমি আমাকে এই খবর দেও নাই। (শ্বশুর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন; তাহারাও বলিল, আমাদের মেয়েকে সে দুধ পান করাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।) তখন ওক্‌বা (রাঃ) (মক্কা হইতে প্রায় ৩৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া) মদীনায় পৌঁছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উক্ত ঘটনা আরজ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর তুমি কিভাবে ঐ নারীকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? এই কথার উপর ওক্‌বা (রাঃ) তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন; পরে অন্য স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

পরস্পর পালাক্রমের ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করা

৭৫। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার এক প্রতিবেশী আনছারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে হাজির থাকার জন্য পালা-ক্রমের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। একদিন আমি হযরতের (দঃ) দরবারে হাজির থাকিতাম (সে আমার ও তাহার সাংসারিক কাজ-কর্ম দেখিত;) আর একদিন সে রসুলুল্লার (দঃ) দরবারে উপস্থিত থাকিত, আমি তাহার ও আমার সংসার দেখিতাম। যে দিন আমি উপস্থিত থাকিতাম সে দিন অহী ইত্যাদির সমুদয় খবর তাহাকে বাড়ী আসিয়া শুনাইতাম ও শিক্ষাদান করিতাম এবং যে দিন সে উপস্থিত থাকিত সে দিন সে আমাকে শিক্ষা দিত।

এক দিন ঐ ব্যক্তি তাহার পালার দিনে এশার (নামাযের) সময় এক ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়া দৌড়িয়া আমার বাড়ী উপস্থিত হইল এবং দরওয়াজায় প্রবল করাঘাত করিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিল। আমি হতভম্ব হইয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া আসিলাম; সে বলিল, এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। (ওমর (রাঃ) বলেন—) সে সময় আমাদের নিকট এরূপ সংবাদ আসিতেছিল যে, গাস্সান গোত্রীয় কাফের রাষ্ট্র মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনার উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি করিতেছে; আমরা সর্বদা ঐ বিষয়ে শঙ্কিত ও জল্পনা কল্পনারত থাকিতাম। তাই আমি ঐ প্রতিবেশীর আতঙ্কাবস্থা দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, গাস্সানী শত্রু চড়াও করিয়াছে কি? সে বলিল, না—তারচেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; রসুলুল্লার (দঃ) স্বীয় স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া দিতেছেন। তখন আমি (আমার মেয়ে—হযরতের এক স্ত্রী হাফছার নাম লইয়া) বলিলাম—হাফছার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, সে সর্বহারা ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আমি পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, এরূপ কিছু একটা ঘটা আসন্ন✣। অতঃপর আমি প্রস্তুত হইলাম এবং রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ফজরের নামায পড়িলাম। নামাযান্তে তিনি একটি (কাঁচা) দ্বিতল কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি হাফ্ছার নিকট যাইয়া দেখি, সে কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম, এখন কাঁদ কেন? আমি পূর্বেই তোমাকে সতর্ক করিয়াছিলাম×। রসুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন কি? সে বলিল, তালাক দেওয়ার বিষয় কিছু জ্ঞাত নহি, কিন্তু হযরত (দঃ) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া ঐ দ্বিতল কোঠায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পুনরায় মসজিদে আসিলাম; দেখিলাম, মিম্বরের চতুষ্পার্শে কিছু লোক বসিয়া কাঁদিতেছে; আমিও সেখানেই তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তালাক দানের বিষয় স্থিরকৃতরূপে অবগতির স্পৃহা আমার ভিতর প্রবল হইয়া উঠিল; তাই আমি হযরতের (দঃ) অবস্থানস্থল ঐ দ্বিতল কক্ষের নিকটবর্তী আসিলাম। সিঁড়ির নিকট একটি হাবশী গোলাম বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলাম—হযরতের (দঃ) খেদমতে আমার প্রবেশের অনুমতি-প্রার্থনা জানাও। সে ভিতরে যাইয়া কথা বলিল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি রসুলুল্লার (দঃ) খেদমতে আপনার আগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় মসজিদের মিম্বরের নিকটে লোকদের সঙ্গে আসিয়া বসিলাম। কিন্তু পুনরায় ঐ স্পৃহা আমার ভিতর অধিক প্রবল হইয়া উঠিল, আমি আবার ঐ কক্ষের নিকটবর্তী আসিয়া দারওয়ানকে ঐরূপ বলিলাম। এবারেও সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। আমি মসজিদে আসিয়া বসিলাম এবং তৃতীয়বার

✣ এই আশঙ্কার হেতু ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে।

× যে বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন এবং যাহা কিছু বলিয়াছিলেন—বিস্তারিত বিবরণ ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

পুনরায় ঐরূপই করিলাম, দারওয়ান এইবারও ঐ কথাই শুনাইল। এইবার যখন আমি কক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু দূরে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দারওয়ান আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিয়াছেন।

আমি ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখি—হযরত (দঃ) একটি খালি চাটাই-এর উপর খেজুর গাছের ছোবরা ভরা একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়া শায়িত অবস্থায় আছেন। চাটাই-এর উপর কোন বিছানা বা চাদর না থাকায় তাঁহার শরীরে উহার বুনটের রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বসিবার পূর্বেই সালাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর আপনি স্বীয় বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন কি? হযরত (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিলেন, না—তালাক দেই নাই। এতদশ্রবণে আমি উল্লসিত হইয়া আল্লাহু-আকবার বলিয়া হর্ষধ্বনি দিলাম। তারপর আমি তাঁহার মন আকর্ষণের জন্য দাঁড়ান অবস্থায়ই একটি ঘটনার বিবরণ দান করিতে আরম্ভ করিলাম যে—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ) দেখুন। আমরা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয়গণ এইরূপ অভ্যস্ত যে, পুরুষগণ সর্বদাই নারীদিগকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়া থাকি, নারীদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিউত্তর কখনও বরদাশত করা হয় না। কিন্তু মদীনার অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং আমরা যখন হইতে মদীনায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন হইতে ধীরে ধীরে আমাদের নারীগণ মদীনাবাসী নারীদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে শুরু করিয়াছে। ইহা শ্রবণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর বলিলাম, এমন কি একদিন আমার স্ত্রীকে আমি কোন একটি বিষয়ে ধমক দিলে সে আমাকে প্রতিউত্তর করিয়া উঠিল, তাহাতে আমি ভীষণ চটিয়া গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল, আমার একটি মাত্র প্রতিউত্তরেই আপনি এরূপ চটিয়া উঠিলেন। অথচ রসুলুল্লার (দঃ) স্ত্রীগণও ত তাঁহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়া থাকেন, এমনকি কখনও কখনও তাহাদের কেহ কেহ (গৃহের মধ্যে) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে পৃথক ও দূরে দূরে থাকিয়া দিন কাটাইয়া দেন। আমি আমার স্ত্রীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, যে-ই আল্লার রসুলের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে তাহার কপালপোড়া সর্বহারা হওয়া অনিবার্য্য। এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইয়া হাফছার নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? সে উহা স্বীকার করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি কপালপোড়া সর্বহারা হইয়াছ; তোমার কি ভয় হয় না যে, আল্লার রসুলের (দঃ) অসন্তুষ্টির দরুন তুমি আল্লার অসন্তুষ্টি ও অভিশাপে পতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে? আমি তোমাকে রসুলুল্লার (দঃ) অসন্তুষ্টি তথা আল্লার অসন্তুষ্টি ও গজব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। খবরদার। কখনও তুমি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট খোর-পোষ ইত্যাদি বৃদ্ধির

দাবী করিবে না, তাঁহার কোন কথার প্রতিউত্তর করিবে না, সর্বদা তাঁহার চরণতলে থাকিয়া জীবন কাটাইবে। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তুমি আমার নিকট দাবী জানাইবে। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ সন্তুষ্টি-ভাজন ও প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুন ঐরূপ কোন কিছু করেও তথাপি তাহার দেখা-দেখি তুমি কিন্তু খবরদার—কখনও ঐরূপ কিছু করিবে না। (এই বাক্যটি দ্বারা) বিবি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছিল; এখানেও হযরত (দঃ) মৃদুহাসি হাসিলেন।

ওমর (রাঃ) বলিতেছেন, তারপর আমি বিবি উম্মে সাল্‌মার (রসুলুল্লার (দঃ) এক স্ত্রী, ওমর (রাঃ)-এর দুর সম্পর্কীয় খালা) নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ নছীহত শুনাইতে লাগিলাম। তিনি আমার এই ধরণের কার্য্যকে অনধিকার চর্চা আখ্যায়িত করিয়া বলিলেন—আপনি সর্বস্থানেই স্বীয় অধিকার দেখাইতে চান। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার স্ত্রীবর্গের ব্যাপার সমূহের মধ্যেও অধিকার খাটাইতেছেন।* তাঁহার এই উত্তরে আমি আমার অভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমার ধারণা, ইচ্ছা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। বিবি উম্মে-সাল্‌মার এই ঘটনা শ্রবণে হযরত (দঃ) পুনরায় মৃদুহাসি হাসিলেন।✿

ওমর (রাঃ) বলেন—পুনঃ পুনঃ হযরতের (দঃ) হাসিমুখ দেখিয়া আমার মনে সাহসের সঞ্চার হইল, তখন আমি বসিয়া পড়িলাম। (তাঁহাকে আমি যে অবস্থায় শায়িত দেখিয়া ছিলাম তাহা পুর্বেই বর্ণিত হইয়াছে,) এখন আমি তাঁহার কক্ষের চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সেখানে তিনটি মাত্র কাঁচা চামড়া এবং চামড়া পাকা করার জন্য বাবলা গাছের পাতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় দরিদ্রবেশে থাকিতে দেখিয়া আমি আমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না—কাঁদিয়া ফেলিলাম; দর দর করিয়া আমার চোখের পানি বহিতে লাগিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ওমর! কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ। পারস্য সম্রাট "কেস্‌রা" রোম সম্রাট "কায়ছর" তাহারা আল্লার উপাসক নয়, আল্লার একত্ববাদীও নয়; তথাপি তাহারা কত রকম আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে রহিয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার সব কিছু দান করিয়াছেন।

---

* আল্লার রসুল (দঃ)কে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট করার বিষময় কুফল ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন তারচেয়ে অধিক বলিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু বিবি উম্মে-সালমা (রাঃ) যে সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন তাহাও একটি বাস্তব সত্য। স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের সুমধুর সম্পর্ক ও দাম্পত্য সূত্রের প্রবণতা দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধকে অপরাধ গণ্য করা হয় না বা বড় অপরাধকেও কতিপয় মামুলী বিষয়রূপে দেখা হয় এবং উহার দ্বারা সংঘটিত অসন্তুষ্টি হইয়া থাকে। যাহা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে মছআলাহও ভিন্ন ধরণেরই।

✿ হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত (দঃ) মৃদুহাসি অপেক্ষা বড় বা অধিক হাসিতেন না।

আর আপনি আল্লার রসুল, অথচ—দরিদ্রবেশী নিঃসম্বল। (ওমর (রাঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে—নিঃসম্বলতা ও দরিদ্রবেশ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইচ্ছাকৃত ছিল*; তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই বেশী কিছু বলিতে সাহসী না হইয়া ওমর (রাঃ) এই বলিলেন,) আপনি দোয়া করুন—আল্লাহ আপনার উম্মৎকে অধিক স্বচ্ছলতা দান করুন।

এযাবৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় শায়িত ছিলেন; ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটি শুনিয়া উহার উত্তরে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ওমরের এই উক্তির প্রতি অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক তেজোদৃপ্ত ভাষায় বলিলেন—

أَوَفِى شَكٍّ اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ - اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

হে খাত্তাবের পুত্র (ওমর)। তুমি এখনও (কি এহেন হীন ধারণার বশবর্তী রহিয়াছ যে—মোসলমানগণ আল্লার প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাহারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের অধিকারী হওয়া চাই? এবং তুমি) এই বিষয়টির প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই কি? যে—রোমীয়, পারসিক ইত্যাদি জাতিগণ যাহারা দুনিয়ার জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে যাহা কিছু সুখ-শান্তি দিবার, তাহা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই দান করতঃ সুখ-ভোগের অংশ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। (কারণ চিরস্থায়ী জীবনের বেলায় তাহাদের পক্ষে সুখ-শান্তির বিষয়ে কোন বিবেচনাই করা হইবে না।) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ

"তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও? যে, অমোসলমানদের জন্য সুখ শান্তি (পাওয়া ভাগ্যে থাকিলে) উহার স্থান হইল একমাত্র ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়; চিরস্থায়ী আখেরাতে সুখ-

---

* তিরমিজি শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইলেন যে—আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার জন্য তিনি মক্কা নগরীর কঙ্করময় ভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিতে চান। আমি আরজ করিলাম—হে আমার পালনকর্তা। আমি উহার আকাঙ্খা রাখি না, আমি ভালবাসি এই যে—একদিন আহার করিব, আর একদিন অনাহারে কাটাইব। অনাহারে থাকিয়া আপনাকে স্মরণ করিব, আপনার প্রত্যাশীরূপে আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিব এবং আহার করিয়া আপনার শোকর আদায় করিব।

শান্তির লেশমাত্র তাহারা পাইবে না। পক্ষান্তরে মোসলমানদের জন্য সুখ-শান্তির আসন্ন স্থান হইল আখেরাত; (আর দুনিয়ার অবস্থা তাহাদের বেলায় সাময়িক ব্যবস্থাধীন থাকে।)"

(ওমর (রাঃ) বলেন—হযরতের (দঃ) এই উত্তর শুনিয়া) আমি স্বীয় দুর্বল মনোবৃত্তিসূচক ও হীন ধারণাব্যঞ্জক উক্তির জন্য আল্লার নিকট আমার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ জানাইলাম।

● আলোচ্য হাদীছের মুল ঘটনার আসল তত্ত্ব এই ছিল যে—রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীবর্গের প্রতি কতিপয় পারিবারিক বিষয়ের দরুন রাগান্বিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পরিবারবর্গকে শায়েস্তা করার মানসে দীর্ঘ এক একমাস কাল তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকা অবলম্বন করিয়া ঐ দ্বিতল গৃহে একাকী অবস্থানরত হইয়াছিলেন; ইহা হইতেই "তালাক দান" খবরের সূত্রপাত হয়। এই ঘটনার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ তালাকের অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত আছে। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেখানে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটির উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত একটি অমুল্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধ্রুবসত্য বাস্তব তথ্যটি পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এবং আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত আছে। অধুনা এই বিষয়টির প্রতি মোসলমানদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসায় অনেক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সংশয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই এই বাস্তব তথ্যটিকে ভালরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে এই তত্ত্ব সম্বলিত আয়াত এবং আরও কতিপয় হাদীছ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

কোরআন শরীফের ২৫ পারায় একটি ছুরা আছে—"ছুরা যুখ্‌রুফ"। যুখ্‌রুফ শব্দের অর্থ—জাকজমকপুর্ণ ভোগ-বিলাস। সেই ছুরার দ্বিতীয় রুকুর শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْلَآ أَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ - وَلِبُيُوْتِهِمْ أَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ - وَزُخْرُفًا ط وَإِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থ—যদি এরূপ আশঙ্কা না হইত যে, (লালসার কবলে পতিত হইয়া) জনসাধারণ একই ধরণের (কাফের দলভুক্ত) হইয়া যাইবে, তবে আমি (নানাপ্রকার নিগূঢ় তত্ত্বময় রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে) কাফেরদিগকে ইহজগতের ধন-দৌলত আরও এত বেশী দান করিতাম

যে, তাহাদের গগণচুম্বী অট্টালিকা সমূহের ছাদ, সিঁড়ি ও দরজা-কপাট এবং খাট-পালঙ্ক সব কিছু রৌপ্য (এবং স্বর্ণের) দ্বারা নির্মিত হইত। তাছাড়া আরও কত কত ভোগ বিলাসের সামগ্রী তাহাদিগকে দান করিতাম। কিন্তু (হে মানব! স্মরণ রাখিও) এই সবই শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবনের সামগ্রী মাত্র। পক্ষান্তরে আখেরাতের চিরস্থায়ী অফুরন্ত সুখ-শান্তি (মোসলমান তথা) মোত্তাকীনদের জন্য পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে স্বীয় গৃহ গণ্য করিবে ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য চিরস্থায়ী আখেরাতে শান্তির স্থান নাই। দুনিয়ার ধন-সম্পত্তিকে ধন-সম্পত্তি গণ্য করিবে ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য আখেরাতে কোন ধন-সম্পত্তি নাই। দুনিয়াতে ধন সম্পত্তি জমা করায় ব্যাপৃত হইবে ঐ ব্যক্তি যাহার বুদ্ধি নাই। (মেশকাত শরীফ)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে ভোগ-বিলাসের মধ্যে দেখিয়া উহার প্রতি তুমি লালায়িত হইও না; তুমি জান না সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভীষণ কষ্টে পতিত হইবে। মৃত্যুতুল্য কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া যাইবে কিন্তু মৃত্যু ঘটিবে না। (মেশকাত শরীফ)

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য রাখিবেন, এই ধরণের আয়াত ও হাদীছ সমূহের তাৎপর্য্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য—মোসলমানদের অন্তর হইতে দুনিয়ার লালসা এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ও উহার আকাঙ্খা-স্পৃহার বিলুপ্তি সাধন পূর্বক প্রতিটি মোসলমানের অন্তরে এই ভাব সৃষ্টি করা যে, সে যেন আখেরাতের কামিয়াবি তথা আল্লার সন্তুষ্টিকে তাহার প্রকৃত উন্নতি ও একমাত্র লক্ষ্য বস্তু গণ্য করে। এই উদ্দেশ্যটি মানব কল্যাণের জন্য অমৃত তুল্য, পক্ষান্তরে দুনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা মানুষের জন্য বিষতুল্য—ইহা একটি বাস্তব সত্য। তদুপরি হাদীছ শরীফেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে—حب الدنيا راس كل خطيئة "দুনিয়ার লালসা তথা ভোগ-বিলাসের আকাঙ্খা-স্পৃহা সমস্ত অপরাধের মূল।" যত রকম অসৎকর্ম পাপাচার দুষ্কার্য্য ও দুর্নীতি আছে ঐ সবের মধ্যে দুনিয়ার লালসা তথা টাকা-পয়সা, নাম-ধাম, আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের স্পৃহা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করিয়া প্রিয় উম্মতকে দুনিয়ার লালসা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তদুপরি আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহ অন্য আরও এক দিক দিয়া বিশেষ সুফল দায়ক। যে ব্যক্তি এসব বর্ণনা ও তথ্যের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হইবে সে দারিদ্র্য বা যে কোন কষ্ট-ক্লেশে, আপদ-বিপদে বিচলিত হইয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে না বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টের আক্রমণে সে আখেরাতের পথচ্যুত হইবে না। বরং নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় বিশাল তরঙ্গমালার সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল তীরপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ইহাই হইল এই ধরণের আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য, কর্ম-জীবনে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বা আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও প্রগতির ময়দানে অগ্রসর না হওয়া এইসব আয়াত ও হাদীছের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধুনা মোসলমান সমাজের একদল লোক যাহারা কোরআন-হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধা কম রাখে, যাহারা কোরআন হাদীছ বুঝে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করে না। তাহারা না বুঝিয়া বা ইসলামের শত্রু কুচক্রিদের প্ররোচনায় লোকচক্ষে কোরআন-হাদীছকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ধরণের আয়াত ও হাদীছের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে যে—এই সব আয়াত ও হাদীছ মোসলমানদের উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা দান করিয়া থাকে। তাহারা যদি মোসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস হইতে অজ্ঞ না হইতে তবে কখনও এইরূপ কুউক্তি করিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা ইহার বিপরীত, কারণ এইসব আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রথম শ্রোতা ছাহাবায়ে-কেরামগণ অনাহারে থাকিয়া, পেটে পাথর বাঁধিয়া বাবলা গাছের পাতা খাইয়া, নগ্নপদে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতঃ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, শত শত দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়াও দুনিয়া-আখেরাতের যে বিরাট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন আমরা উহার স্বপ্নও দেখিতে পারিব না। এসব কাল্পনিক কাহিনী বা ভাবাবেগের প্রবণতা নহে, বরং বাস্তব সত্য ঘটনা। খন্দকের জেহাদ, যাতুর রেকার জেহাদ, জায়শুল-খাবাতের জেহাদ, তবুকের জেহাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ খুঁজিয়া দেখুন। ছাহাবা-কেরামদের মধ্যে এই প্রেরণা এবং এত কর্মক্ষমতা কিরূপে আসিয়াছিল? একমাত্র এই সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারাই ছাহাবীগণ দুনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা হইতে আত্মশুদ্ধি হাসিল করায় তাঁহাদের অন্তরে যে অপরাজেয় মনোবল এবং অদম্য জযবা ও অনুপ্রেরণা হাসিল হয় তদ্দ্বারাই তাঁহারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও কামিয়াবি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ফলকথা এই যে, এখানে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি হইল, দুনিয়ার লালসা ও ভোগ বিলাসের আকাঙ্খা-স্পৃহা। আর দ্বিতীয়টি হইল কর্মজীবনে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টার ময়দানে অগ্রসর হওয়া। আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল প্রথমটির বিলুপ্তি সাধন করা; দ্বিতীয়টির নহে। বরং যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে প্রথমটি হইতে পবিত্র ও শুদ্ধ করতঃ রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণিত তথ্যকে পূর্ণ অনুধাবন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, দুনিয়ার ধন দৌলত, টাকা-পয়সা তাঁহাদের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা যেহেতু আখেরাত তথা আল্লার সন্তুষ্টিকে স্বীয় লক্ষ্যস্থল রূপে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাই যেমন কোনও আপদ-বিপদ তাঁহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না তেমনিভাবে ধন-দৌলত সুদ-সম্ভোগও তাঁহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না। বরং তাঁহারা সমস্ত ধন-দৌলত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদকেও ঐ রাস্তায়ই নিয়োগ করিবেন। কোন এক কবি বলিয়াছেন—

نه مرد ست آنکه دنیا دوست دارد — اگر دارد برائے دوست دارد

"ঐ ব্যক্তি মানুষ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নয়, যে দুনিয়া তথা ধন-দৌলতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ ঐ ব্যক্তি যে ধন-দৌলত পাইয়া সর্বোপরি বন্ধু যে আল্লাহ সেই আল্লার রাস্তায় উহাকে নিয়োগ করিয়াছে। মাওলানা রুমী (রঃ) বলিয়াছেন—

آب در کشتی ہلاك کشتی است — آب اندر زیر کشتی پشتی است

"নৌকার ভিতরে পানি প্রবেশ করিলে সেই পানি নৌকার ধ্বংস টানিয়া আনিবে, কিন্তু নৌকার তলার নীচে থাকিলে উহা নৌকার জন্য সাহায্যকারী হইবে।

ধন-দৌলতের সহিত মানবের সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপই। হৃদয়ের বাহিরে (হাত পায়ের দ্বারা অর্জিত ও সঞ্চিত হইয়া সৎকাজে ব্যয়িত হইতে) থাকিলে উহার দ্বারা ইহ-জীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের উন্নতি সাধন কার্য্যে সাহায্য পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে হৃদয়ের ভিতরে অর্থের মায়া প্রবেশ করিয়া কারুনের ধনের মত কেবল পুঁজি হইয়া থাকিলে তদ্দ্বারা জীবনের ধ্বংস সাধনই হইবে।

শিক্ষা বা নছীহত দান কালে রাগ করা

৭৬। **হাদীছঃ**—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অভিযোগ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি জমাতে শামিল হইতে পারি না, কারণ সে নামায অত্যধিক লম্বা করিয়া পড়ে। এই কথা শুনিয়া নবী (দঃ) এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহাকে তদ্রূপ রাগান্বিত হইতে আর কখনও দেখি নাই। তিনি রাগতঃস্বরে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের অনেকে এরূপ কাজ করিয়া থাকে, যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে দ্বীনের কাজ হইতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এরূপ কার্য্য হইতে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নামায যেন অত্যধিক লম্বা হইয়া না পড়ে।* কারণ জমাতের মধ্যে রুগ্ন, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণও থাকে।

৭৭। **হাদীছঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পথে পাওয়া বস্তুর বিষয় মছআলাহ জিজ্ঞাসা

* দ্বীনের কাজের প্রতি অলসতা ও অবহেলার বর্তমান যুগে অনেকে এইরূপ হাদীছের দ্বারা ভুল ধারণা জন্মাইয়া লয় যে, "ইন্না আ'তাইনা", "কুলহু আল্লাহ" ইত্যাদি ছোট ছোট ছুরা দিয়াই নামায পড়াইতে হইবে। কিন্তু এরূপ হাদীছের পূর্ণ ঘটনা উপলব্ধি করিলেই ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়। এশার নামাযের মধ্যে আড়াই ছিপারা ব্যাপী ছুরা বাকারার মত লম্বা কেরাতের বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী ছিল এবং এই সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) নিজেই এশার নামাযের জন্য ১১, ১৫, ১৯, ২১ আয়াত বিশিষ্ট ছুরা সমূহের নাম বলিয়া উহা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য কেরাতের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সুন্নতরূপে নির্দ্ধারিত আছে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে নামায আদায় করা ইমামের কর্তব্য।

করিল। তিনি বলিলেন, (প্রকৃত মালিকের পরিচয় লাভের জন্য) থলিয়া ও উহার বন্ধনের দড়ি ইত্যাদি (নিদর্শন সমূহ) ভালরূপে দেখিয়া লও, তৎপর এক বৎসর পর্য্যন্ত ঢোল-শোহরত দ্বারা খবর করিতে থাক। অগত্যা মালিকের সন্ধান না পাইলে (নিজে গরীব হইলে বা অন্য কোন গরীবের প্রতি) উহা খরচ করিতে পার। কিন্তু খরচ করার পর যদি মালিক আসে তবে তাহাকে উহা আদায় করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি হারানো উট পাওয়া যায়? এই প্রশ্ন শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, উটের (মত এত বড় জানোয়ারের) বিষয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? উহা কখনও তোমার প্রত্যাশী নয়; উহার ভিতরে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, হাঁটিয়া চলিবার ক্ষমতা উহার আছে এবং সে নির্বিঘ্নে মাঠে-ঘাটে চরিয়া বেড়াইতে পারে। তুমি উহাকে আটকাইয়া রাখিও না অমনিতেই উহার মালিক উহার সন্ধান পাইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হারান বকরীর বিষয়ে কি বলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, (উহার হেফাজত করা চাই;) কারণ, হয় তুমি বা অন্য কেহ উহার হেফাজতকারী হইবে, নচেৎ উহা বাঘের খোরাক হইবে।

মুরব্বী ও ওস্তাদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা

৭৮। হাদীছঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অনাবশ্যক অতিরিক্ত প্রশ্নাবলীতে বিরক্ত হইয়া রাগান্বিত ভাবে) বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন, তোমার পিতা হোজাফাহ।✽ অপর এক ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার পিতা ছালেম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্রোধান্বিত হইয়া বার বার বলিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা কর। (আর সরল-মনা লোকগণ রসুলুল্লার (দঃ) ক্রোধাবস্থা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারার উপর রাগের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আরম্ভ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমরা (আল্লাহ ও রসুলের অসন্তুষ্টির কাজ হইতে) তওব করিতেছি; আমরা আল্লার প্রতি রব্ব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পয়গাম্বর হিসাবে পূর্ণ তুষ্টি লাভ করিতেছি। (তাঁহাদের আদেশ-নিষেধ সরল-সঠিকভাবে পালন করিয়া যাইব, অনাবশ্যক প্রশ্নাদি করিব না।) এইরূপ বলিতে থাকায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষান্ত হইলেন।

✽ এই প্রশ্নকারীর অবস্থা ছিল এই যে, তাহাদের আকৃতি তাহাদের পিতার ন্যায় না হওয়ায় ব্যঙ্গ করিয়া উপহাস স্বরূপ তাহাদিগকে অন্যের ঔরষজাত বলিয়া ইঙ্গিত করা হইত। সেই জন্যই তাহারা প্রশ্ন করিল; যেন রসুলুল্লাহ (দঃ)এর ফরমান অনুযায়ী সকলে ঐরূপ কথা হইতে বিরত থাকে।

প্রয়োজন বোধে কোন কথা পুনঃ পুনঃ বলা

৭৯। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন কিছু বয়ান করিতেন, তখন (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতাগণ যাহাতে তাঁহার বক্তব্য উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া লইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া) পুনঃ পুনঃ তিনি বর্ণনা করিতেন। আর কোন লোকদের নিকট আসিলে (ক্ষেত্র বিশেষ) তিনবার সালাম করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ— তিনবার সালাম কথা প্রসঙ্গটি বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য ; নিম্নে বর্ণিত স্থানসমুহ উহার উপযোগী গণ্য হইতে পারে। যথা—(১) কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করার পুর্বে দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া সালামের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করা শরীয়তের বিধান। সেস্থলে প্রথমবারে উত্তর না পাইলে দ্বিতীয়বার সালাম করিবে, তখনও উত্তর না পাইলে তৃতীয়বারও সালাম করা চাই। প্রথমবারেই ফিরিয়া আসা কিম্বা তৃতীয়বারের পরেও অনর্থক অপেক্ষা করা উচিত নয়। (২) গৃহাভ্যন্তরিস্থিত ব্যক্তির নিকট যাওয়াকালীন প্রথমে অনুমতি প্রার্থনার সালাম, সাক্ষাতে দ্বিতীয় সালাম এবং কার্য্য সমাপ্তে বিদায়কালে তৃতীয় সালাম করিবে। (৩) কোন বড় মজলিসে বা জনসভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে থাকাকালে সভার প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ এবং শেষভাগের প্রতি সালাম করিতে পারে। (৪) অনেক বড় সভায় দাঁড়াইয়া আবশ্যক বোধে ডাইনে বায়ে সম্মুখে সালাম করা যায়। (চতুর্থটি শরহে তারাজেম—শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর কেতাবে এই হাদীছেরই ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে।)

পরিবারবর্গকে এবং ভৃত্যকেও দ্বীন শিক্ষা দিবে

৮০। **হাদীছ** ঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। (১) যে ব্যক্তি ইহুদী বা নাছরানী ছিল, সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান আনিয়াছে (২) ঐ ক্রীতদাস গোলাম যে আল্লার হকও আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হকও আদায় করে। (৩) যাহার নিকট কোন ক্রীতদাসী ছিল (যাহাকে সে এমনিতেই ব্যবহার করিতে পারিত, কিন্তু) সে তাহাকে ভালরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছে, উত্তমরূপে দ্বীনের এলম শিক্ষা দিয়াছে, তারপর তাহাকে আজাদ করিয়া বিবাহ করতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দান করিয়াছে, ঐ ব্যক্তিও দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে!

এই হাদীছ বর্ণনাকারী একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'মের শা'বী (রঃ) তাঁহার ছাত্রদিগকে বলিতেন, তোমরা বিনা ক্লেশে এত বড় হাদীছ পাইলে ; পুর্বের যমানায় এর চাইতে ছোট একটি হাদীছের জন্যও মানুষ বহু দুর দেশ হইতে পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় আসিত।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম ব্যক্তি ঈমান ও দ্বীন ইসলাম গ্রহণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লার প্রতিটি হক তথা প্রতিটি ফরজ-ওয়াজেব ও শরীয়তের হুকুম পালনে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে। তৃতীয় ব্যক্তি ক্রীতদাসী আজাদ করায় দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে।

নারীদেরে দ্বীন শিক্ষা দানে বিশেষ তৎপরতা

৮১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ঈদের জামাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অবশ্য হযরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ আমার না থাকিলে আমার ভাগ্যে তাহা জুটিত না, কারণ তিনি বয়কনিষ্ঠ ছিলেন। এক ঈদের দিন আমি হযরতের সঙ্গেই বাহির হইলাম। যে স্থানে নিশান বা পতকা উড্ডীন ছিন— নবী (দঃ) ঐ স্থানে আসিলেন এবং নামায আদায় করিলেন, তারপর খোৎবা (তথা ইসলামী ভাষণ) প্রদান করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, পেছনে উপবিষ্টা মহিলাগণ হয়ত তাঁহার ভাষণ শুনিতে পায় নাই ; এই ভাবিয়া তিনি বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে নছীহত করিলেন ও আল্লার রাস্তায় খরচ করার আহ্বান জানাইলেন। নবী (দঃ) মহিলাদিগকে দানের প্রতি পুনঃ উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমাদের কল্যাণে উৎসর্গ। মহিলারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদের অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিতে লাগিল, আর বেলাল (রাঃ) ঐগুলিকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

নারীদের শিক্ষার জন্য ভিন্ন সময় নির্দ্ধারিত করা

৮২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা মহিলাগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, পুরুষদের জন্য আমরা আপনার নিকটবর্তী হইতে পারি না। অতএব আপনি কেবলমাত্র আমাদের জন্য একটি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। সেমতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে তাহাদের নিকট একদিনের ওয়াদা করিলেন। তিনি সেই দিন তাহাদের নিকট যাইয়া ওয়াজ নছীহত করিলেন এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী শুনাইলেন। তাহাদিগকে তিনি যে সব নছীহত শুনাইলেন তন্মধ্যে ছিল—তোমাদের মধ্যে যে কেহ তিনটি শিশু সন্তানকে কেয়ামতের দিনের জন্য পাঠাইয়া দিবে (অর্থাৎ শৈশবাবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হইলে যে মাতা ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিবে) তাহার জন্য ঐ শিশু সন্তানগুলি দোযখের অগ্নি হইতে ঢাল স্বরূপ রক্ষাকবচ হইয়া দাঁড়াইবে। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, দুইটি সন্তান হইলে ? রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন হাঁ—দুইটি সন্তান হইলেও ঐরূপ হইবে।*

---

* তিরমিজী শরীফে আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ; যাহার দুইটি শিশু সন্তানের মৃত্যু হইবে আল্লাহ তাহাকে ঐ মছিবতে ধৈর্য্য ধারণের প্রতিদানে বেহেশতে দাখেল করিবেন। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, একটি সন্তান মরিলে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, একটি সন্তান মরিলেও তদ্রূপই হইবে।

শ্রোতা কোন কথা না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে

৮৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে কোন বিষয় শুনিয়া অনুধাবন করিতে না পারিলে, পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন—(কেয়ামতে) যাহার হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিতেছেন—"যাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব অতি সহজ হইবে এবং সে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে হিসাবের ময়দান হইতে বেহেশতের দিকে চলিয়া আসিবে। (এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হিসাব-নিকাশ হওয়া সত্ত্বেও একদল লোক বেহেশতে যাইবে, কোনও শাস্তি ভোগ করিবে না)। নবী (দঃ) বলিলেন, এই আয়াতে যে বিষয়কে হিসাব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে হিসাব নহে, বরং উহা শুধু জ্ঞাত করানোর জন্য কৃত আমল-নামা উপস্থিত করা মাত্র। (উহার উপর জিজ্ঞাসাবাদ বা কৈফিয়ত তলব হইবে না। সে জন্যই উহাকে "সহজ হিসাব" আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কারণ উহা নামে মাত্র হিসাব। আসলে হিসাব লওয়া হইবে না।) কিন্তু (প্রকৃত প্রস্তাবে "হিসাবে লওয়া" বলা হয়) হিসাবদাতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ত তলব করা হইলে; (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন) সে পরিত্রাণ পাইবে না। (কারণ আল্লাহ তায়ালার নিকট এরূপ কড়াকড়িভাবের হিসাব দিয়া কে বাঁচিতে পারে?)

আলেমের নিকট কোন এলম লাভের সুযোগ পাইলে অনুপস্থিতকে তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য

দ্বীনের শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সক্রিয় হওয়ার কর্তব্য নির্দেশই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই পরিচ্ছেদের মূল বাক্য—ليبلغ الشاهد الغائب "উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌছাইয়া দিবে"—স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন। উক্ত ভাষণের হাদীছখানা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছখানা দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায়-হজ্জ পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। এতদ্ভিন্ন আবু বকর (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন যাহার অনুবাদ ৬০নং হাদীছরূপে হইয়াছে।

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণেও হযরত (দঃ) এই বাক্যটি বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭ নম্বরে উহা অনুদিত হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামে মিথ্যা বলা মহাপাপ

৮৪। হাদীছ :— سمعت عليا قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ .

অর্থ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার নামে মিথ্যা বলিও না, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলিবে সে নিশ্চয় দোযখে যাইবে।

৮৫। **হাদীছ**— যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আব্বা! আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে হাদীছ বর্ণনা করেন না কেন—যেমন অমুক অমুক ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি সর্বদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্যে থাকিতাম বটে, কিন্তু (আমি সতর্কতা স্বরূপ তাঁহার নামে হাদীছ কম বর্ণনা করিয়া থাকি। কারণ,) আমি শুনিয়াছি, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৬। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি (সতর্কতা হেতু) বেশী হাদীছ বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকি। কারণ, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৭। **হাদীছ**ঃ—عن سلمة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال

مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—ছালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

৮৮। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যারূপে কোন কিছু আমার সম্পৃক্ত করিবে সে যেন জানিয়া রাখে, নিশ্চয় তাহার ঠিকানা দোযখে হইবে।

এলমের বিষয় লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষণ করা+

৮৯। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণের মধ্যে কাহারও নিকট আমার চাইতে বেশী হাদীছ থাকিতে পারে না, তবে হাঁ—আবদুল্লাহ ইবনে আমরের

+ এই পরিচ্ছেদে একটি সন্দেহ দূর হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক এবং বিশেষ কারণাধীন ও ব্যাপক আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রতি ছিল। বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

নিকট হয়ত থাকিতে পারে✿। কারণ, তিনি লিখিয়া রাখিতেন; আমি তাহা করি নাই।

৯০। **হাদীছ**:—ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগকালীন অসুস্থতা যখন অধিক বাড়িয়া চলিল তখন তিনি বলিলেন—কাগজ কলম আন; আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়া দেই যদ্দ্বারা তোমরা পথভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে। (হযরতের যাতনা লক্ষ্য করিয়া) ওমর (রা:) (ভাবিলেন, রসুলুল্লার (দ:) রোগ যন্ত্রণা এই সময়ে চরমে পৌঁছিয়াছে, এমতাবস্থায় তিনি উম্মতের মহব্বতেই এরূপ বলিতেছেন; তবে তাঁহার কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করা আমাদের কর্তব্য। তাই তিনি) বলিলেন, আমাদের নিকট আল্লার কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে। (অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাখ্যা ও কর্ম-পদ্ধতির বিবরণ সহ যাহা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ:) দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন) সেই কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাপারে ছাহাবীগণের মতানৈক্য দেখা দিল এবং কথা কাটাকাটি বাড়িয়া গেল। তখন নবী (দ:) সকলকে বলিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও—আমার সম্মুখে বসিয়া বিবাদ করিও না। তোমাদের বিবাদের মীমাংসা অপেক্ষা উত্তম বিষয়ে তথা আল্লার সাক্ষাৎ-ধ্যানে আমি মগ্ন আছি; আমাকে এই অবস্থায়ই থাকিতে দাও।

তারপর ইহজগৎ ত্যাগের পুর্বে নবী (দ:) তিনটি বিষয়ের বিশেষ আদেশ করিলেন—(১) মোশরেক-পৌত্তলিদিগকে আরব ভূখণ্ড হইতে বহিষ্কার করিয়া দিও। (২) বহির্দেশ হইতে আগত প্রতিনিধি দলের অতিথিবৃন্দকে উপহার দিও যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম। তৃতীয়টি স্মরণ নাই।

ইবনে আব্বাস (রা:) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশেষ অনুতাপের সহিত বলিলেন—বড়ই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল যদ্দরুণ আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালীন লিপি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলাম।

ব্যাখ্যা:—এই ঘটনার পরও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৩ ৪ দিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু কিছু লিখিয়া দিবার অভিপ্রায় পরে আর প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ (দ:) যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কোনও নূতন বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। নতুবা কোন বাধাই রসুলুল্লাহ (দ:)কে উহা হইতে বিরত রাখিতে পারিত না। ওমর (রা:) ঠিক এইরূপ ভাবিয়াই রসুলুল্লার (দ:) কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করাকে অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার পর এই দিনই (আছাহ্হুছ-ছিয়ার দ্রষ্টব্য) অথবা শনি কিম্বা রবিবার জোহর নামাযান্তে হযরত (দ:) মাথায় পটি

✿ আমাদের নিকট যে সংখ্যার হাদীছ পৌঁছিয়াছে তাহাতে উক্ত সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত নহে। আবু হোরায়রার (রা:) হাদীছ সংখ্যা ৫৩৬৪। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা:) হাদীছ সংখ্যা ৭০০।

বাঁধিয়া অতিকষ্টে স্বীয় মসজিদে বিশেষ ভাষণও দান করিয়াছিলেন যাহা হযরতের শেষ ভাষণ ছিল। ঐ ভাষণে হযরত (দঃ) অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন; হয়ত যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সেই ভাষণেই হযরত বলিয়া দিয়াছেন। ভাষণটির বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে "শেষ নিংশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্বে" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত আছে।

এতদ্ভিন্ন মতানৈক্যের উক্ত ঘটনার পর নবী (দঃ) তিনটি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হাদীছেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; অতএব আরও কিছু তাঁহার বলিবার থাকিলে তাহা নিশ্চয় তিনি পরে বয়ান করিতেন।

মোসলেম শরীফে আছে—এই অসুস্থতার মধ্যেই একদিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা (রাঃ)কে আদেশ করিলেন, তোমার বাপ-ভাইকে ডাকিয়া আন; আমি (খেলাফতের বিষয়) লিখিয়া দিয়া যাই, যেন অন্য কেহ আকাঙ্ক্ষা না করে। কিন্তু পরে হযরত নিজেই বিরত থাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং মোসলমানগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও (খলীফারূপে) গ্রহণ করিবেন না।

এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়টির প্রমাণে আরও দুইটি হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে শরীয়তের কয়েকটি মছআলাহ লিখিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে আছে—আবু শাহ নামক ব্যক্তিকে হযরত (দঃ) তাঁহার ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণ লিখিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৩ নম্বরে প্রথম হাদীছটি এবং তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয়ের ভাষণে দ্বিতীয়টি অনুদিত হইবে।

জ্ঞানের কথা বা নছীহত রাত্রিকালে শিক্ষা দেওয়া

৯১। হাদীছঃ— উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রিবেলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিদ্রা হইতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ছোবহানাল্লাহ। এই রাত্রিকালে কত বিপদাপদ ও বিপর্য্যয়ের ঘনঘটা দুনিয়ার উপর নামিয়া আসিতেছে এবং কত প্রকার রহমতের ভাণ্ডারও খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। (অর্থাৎ—এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা ও রহমত লুটিবার প্রতি অসগ্রর হওয়া কত জরুরী। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় যে, মানুষ নির্বোধ বেখেয়ালের ন্যায় এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উপেক্ষা করিয়া সারা রাত্রি নিদ্রায় কাটাইতেছে।) ঘরে যাহারা শুইয়া আছে তাহাদিগকে (তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য) জাগাইয়া দাও। (অর্থাৎ—তোমরা সকলে এই সময় আল্লার প্রতি ধাবিত হইয়া এই সব বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা পাইবার ও আল্লার রহমত লুটিয়া আনিবার প্রতি সচেষ্ট হও।) বহু লোক এই দুনিয়াতে সাজ-শয্যা ও বেশ-ভূষায় আবৃত আছে, কিন্তু (তাহাদের নিকট নেক আমল না থাকায়) আখেরাতে তাহারা উলঙ্গ (অর্থাৎ একেবারে নিঃসম্বল) অবস্থায় উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ— দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি-নীতিতে দেখা যায়, রাত্রিকালে আগামী দিনের সমুদয় কার্য্যবলীর প্রোগ্রাম তৈরী করা হয় এবং দিনের বেলা ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ-কর্মের ব্যস্ততায় কাটে। সৃষ্টির স্বভাবও তদ্রূপই; সেই জন্যই বোধ হয় শরীয়তে প্রত্যেক রাত্রিকে উহার পরের দিনের সহিত গণনা করা হয়। আগামী দিনে দুনিয়ার বুকে যত প্রকার বিপর্য্যয় বা উন্নতি, আপদ-বিপদ বা সুখ-শান্তির ঘটনা ঘটিবে সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাকারী ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী উহার প্রোগ্রাম রাত্রিকালেই তৈয়ার করেন।

স্বাভাবিক কার্য্যপদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়, যখন যে উপলক্ষ্য দেখা যায় ঠিক তখনই সে উপলক্ষ্যের কাজ কর্মের উপযুক্ত সময় বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং রাত্রিকালে যখন আগামী দিনের ভাল-মন্দের প্রোগ্রাম তৈয়ার হইতে থাকে, তখন নিদ্রায় বিভোর না থাকিয়া আগামী জীবনের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও উন্নতি লাভের চিন্তা-সাধনায় মগ্ন হওয়া উচিত।

আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ায় যত সাধক, আওলিয়া দরবেশ আধ্যাত্মিক দৌলত লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকেই এই রাত্রিকালের সাধনা ও আরাধনার দ্বারাই সবকিছু সন্ধান পাইয়াছেন।* মুসলমানদের সোনালী যুগে ক্ষমতা বা ধন-সম্পদের অধিকারীগণও উন্নতির জন্য রাত্রিকালের ঐ মধুর সময় স্বীয় পালনকর্তার প্রতি একাগ্রচিত্তে মগ্নতা অবলম্বন পূর্বক সাধনা করিতেন। আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কোরআনে খাঁটী মোমেনদের স্বভাব বর্ণনায় বলেন—

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ـ

"মধুর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আরাম-আয়েশের বিছানা ত্যাগ পূর্বক তাহারা ভয়ের আতঙ্ক ও আশার আলো লইয়া পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

খোলাফায়ে-রাশেদীনের যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং তাঁদের পরেও অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী, ক্ষমতা ও পদের অধিকারী, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ এই নীতি অবলম্বনেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

---

* গওছে-আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)কে "সাঞ্জার" নামক দেশের বাদশাহ এই মর্মে এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—আমি আমার রাজ্যের "নিমরুজ" নামক বিরাট এলাকাকে আপনার খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ আপনার খানকার জন্য ওয়াক্ফ্ করিয়া দিতে চাই। গওছে আজম (রঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না, বরং উহার প্রতি উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ উত্তরে ইহাও লিখিলেন যে—

زآنگه که یافتم خبر از ملک نیم شب — من ملک نیم روز را بیک جو نمی خرم

"যখন হইতে আমি গভীর রাত্রির মধুর রাজত্বের খোঁজ পাইয়াছি, তখন হইতে আপনার নিমরুজের ন্যায় রাজত্বকে একদানা যবের মূল্যও দান করি না।"

শয়তান অতিশয় চতুর ও দুরদর্শী; আল্লাহ ও আল্লার রসুল (দঃ) যে পথ দেখাইয়া মানবকে উন্নতির দিকে নিয়া যাইতে চান, শয়তান ঠিক সেই পথটির মুখেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর আমরাও শয়তানের সেই বেড়াজালসমূহকে ছিন্ন করতঃ ঐ রাস্তায় অগ্রসর না হইয়া নির্বোধের মত ধ্বংসের পথেই পরিচালিত হইয়া থাকি। আজ আমরা সামান্য ধন-সম্পদ লাভ করিলেই বা কোন প্রকার ক্ষমতা ও পদের অধিকারী হইলেই উন্নতির উৎস ঐ রাত্রিকালের সময়কে ক্লাবে ও বেশ্যালয়ে মদ্যপান গান-বাজনা ও রং-তামাসা ইত্যাদিতে কাটাইয়া থাকি; এই অবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লার গজব নামিয়া আসিবে না কেন? কালক্রমে মুসলিম জাতির অধঃপতন এই পথেই ঘটিয়াছে।

রাত্রিবেলায় এল্‌ম চর্চা করা❁

৯২। **হাদীছ:—** ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ জীবনে একদা এশার নামাযান্তে আমাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ? এই রাত্রে দুনিয়ার বুকে যত মানুষ আছে (এমনকি এইমাত্র যে জন্মগ্রহণ করিল) আজ হইতে একশত বৎসরের মাথায় উহাদের একটি প্রাণীও জীবিত থাকিবে না।

ব্যাখ্যা:— মানুষের জন্য এই দুনিয়া যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সরল ও বাস্তব সত্যটির প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অন্য এক হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের বয়স "ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" সাধারণ বয়সের মাত্রা ইহাই, উর্দ্ধে উঠিলে একশতের মধ্যে; ইহার চাইতে অধিক অতিশয় নগন্য।

এল্‌ম কণ্ঠস্থ করায় তৎপরতা

৯৩। **হাদীছ:—** আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সকলেই বলে—আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বেশী বর্ণনা করে। মোহাজের ও আনছার ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে ঐ পরিমাণ হাদীছ বর্ণনা করেন না যে পরিমাণ আবু হোরায়রা বর্ণনা করে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লার নিকট সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে; কোরআন শরীফের দুইটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য না করিলে আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করিতাম না। তারপর তিনি ان الذين يكتمون ما انزلنا আয়াতদ্বয়+ তেলাওয়াত

❁ এক হাদীছে এশার পর রাত্রি জাগরণ নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা ইহাতে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইয়াছেন যে, এল্‌ম চর্চায় এশার পরেও রাত্রি জাগরণ দূষণীয় নহে। এল্‌ম চর্চাকারীগণ ফজর নামাযের লক্ষ্য নিশ্চয় রাখিবে।

+ আয়াতদ্বয়ের অর্থ:—মানব জাতির জন্য আমার প্রেরিত হেদায়েতের সরল ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে যাহারা লুকাইয়া রাখিবে, তাহাদের প্রতি আল্লার এবং সকলের লা'নত ও অভিশাপ। অবশ্য যাহারা ঐ স্বভাব হইতে তওবা করিয়া সংশোধিত হইবে এবং ঐ সব প্রকাশ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিবেন। (১ পারা ২ রুকু)

করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আমাদের মোহাজের ভাইগণ বাজারে বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকিতেন, আনছার ভাইগণ কৃষিকর্ম ও গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আর আমি (আবু হোরায়রা) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সর্বদা লাগিয়া থাকিতাম। অন্যেরা যখন অনুপস্থিত তখনও আমি উপস্থিত এবং অন্য কেহ যাহা না রাখিত আমি উহা (বিশেষ যত্নের সহিত করিয়া) স্মরণ রাখিতাম।

৯৪। **হাদীছঃ—** আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি আপনার অনেক হাদীছ শুনি, কিন্তু স্মরণ রাখিতে পারি না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদখানা বিছাইলাম, তিনি উহার উপর হাতের অঞ্জলি ভরিয়া কিছু দান (করার ন্যায় হস্ত চালনা) করিলেন এবং ঐ চাদরখানা আমার সীনার সঙ্গে মিলাইতে আদেশ করিলেন; আমি তাহাই করিলাম। এই ঘটনার পর আর আমি হযরতের কোন কথা ভুলি নাই।

আরও একটি ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিশেষ একটি বক্তব্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে বলিলেন, আমার বক্তব্য শেষ করা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় কাপড় বিছাইয়া রাখিবে, তারপর নিজ বক্ষে সেই কাপড়টি আলিঙ্গন করিবে সে আমার বক্তব্য কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ আমি গায়ের কম্বলটা বিছাইয়া রাখিলাম; বক্তব্য শেষে কম্বলটি বক্ষে আলিঙ্গন করিলাম; সত্য সত্যই হযরতের বক্তব্যের কিঞ্চিৎও আর আমি ভুলি নাই। (২৭৪ পৃঃ)

প্রথম ঘটনাটি ত স্পষ্টতই ব্যাপকরূপে হাদীছ স্মরণ রাখার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঐরূপই ছিল, কিম্বা শুধু ঐ বিশেষ বক্তব্যটি স্মরণ রাখার জন্য ছিল।)

৯৫। **হাদীছঃ—**আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এল্‌মের দুইটি থলিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। একটি থলিয়া (দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধীয়,) বিতরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় থলিয়াটি (এমন এল্‌ম যাহা প্রচার করিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করেন নাই; প্রকাশ করিলে সাধারণের বিশেষ কোন ফলও হইবে না, বরং উহা) প্রকাশ করিলে (এক শ্রেণীর লোকের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে; ফল কিছু হইবে না, বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া) আমার গলা কাটা যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ— দ্বিতীয় থলিয়ায় কি প্রকারের এল্‌ম ছিল তাহার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইতে হইবে না। স্বয়ং ছাহাবী আবু হোরায়রার নানাপ্রকার ইঙ্গিতেই উহা প্রকাশ পায়। রসুলুল্লাহ, ছাহাবী, খোলাফা বা শাসনকর্তাদের পর হইতে যে সমস্ত বিপথগামী ও অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব হইবে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সে সকলের নাম, ঠিকানা ও সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ঐ সকল নাম-ঠিকানা আবু হোরায়রার

কণ্ঠস্থ ছিল। ছাহাবী শাসনকর্তাদের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐ সমস্ত বিপথগামী শাসকদের সময় নিকটবর্তী হইলে পর আবু হোরায়রার মনে সব কিছু জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহা প্রকাশে ফল হইবে না, বরং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হইবে, তাই তিনি ঐ সবের বর্ণনা হইতে বিরত থাকেন।

আলেমগণের বক্তব্য চুপ করিয়া শুনা উচিত

৯৬। **হাদীছ**ঃ—জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, সকলকে চুপ থাকিতে বল। তারপর হযরত (দঃ) ফরমাইলেন হে মোসলমানগণ। আমার (দুনিয়া ত্যাগের) পরে তোমরা কাফের-দের কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করিতে আরম্ভ কর।

কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—কে বেশী এল্‌ম রাখে? তবে কি উত্তর দিবেন?

৯৭। **হাদীছ**ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—এক দিন মুসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইলেন। (তাঁহার ওয়াজে মুগ্ধ হইয়া) এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি অপেক্ষা বড় আলেম আর কেহ আছেন কি? এবং সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? মুছা (আঃ) বলিলেন, সবচেয়ে বড় আলেম আমি নিজকেই মনে করি। (প্রশ্নের উত্তর ঠিকই ছিল, কারণ মুছা (আঃ) নবী ছিলেন এবং দ্বীনের এল্‌ম নবীর সমান কাহারও হয় না। কিন্তু সরাসরি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিলেন না। ঐ প্রশ্নের উত্তর সর্বজ্ঞ আল্লার প্রতি হাওয়ালা ও ন্যস্ত করতঃ الله اعلم অর্থাৎ এ বিষয়ে আল্লাহই বেশী এবং ভাল জানেন; এরূপ উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু মুছা (আঃ) তাহা করেন নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ)এর প্রতি অহী পাঠাইলেন, হে মুছা! আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছে; দুই সমুদ্রের মিলনস্থানে তাঁহার দেখা পাইবে। তিনি তোমার চাইতে অধিক এল্‌ম রাখেন। মুছা (আঃ) আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ। কি করিয়া আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (তাঁহার তালাশে বাহির হও,) সঙ্গে থলিয়ার মধ্যে একটি ভাজা মৎস্য লইয়া লও। যে স্থানে যাইয়া ঐ মৎস্যটি জীবিত হইবে এবং তোমার নিকট হইতে নিখোঁজ হইয়া যাইবে ঠিক উহারই আশে-পাশে আমার ঐ বান্দাকে পাইবে। মুছা (আঃ) তাঁহার খাদেম "ইউশা"কে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া থলিতে একটি ভাজা মৎস্য লইলেন। মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিয়া দিলেন, মৎস্যটি নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সংবাদ দেওয়া তোমার বড় কাজ। খাদেম বলিল, আপনি আমাকে বেশী কাজের চাপ প্রয়োগ করেন নাই।

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় চলিতে চলিতে এমন এক-স্থানে পৌঁছিলেন যথায় একটি বিরাট পাথর ছিল। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা উভয়েই পাথরের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। (মুছা (আঃ) নিদ্রিতই ছিলেন, ইত্যবসরে ইউশা জাগিয়া দেখিতে পাইলেন,) মৎস্য জীবিত হইয়া থলি হইতে সমুদ্র বক্ষে লাফাইয়া পড়িল। আল্লার কুদরত—এই মৎস্য সমুদ্রের পানিতে যতদুর চলিল পানির মধ্যে একটি ছিদ্র রহিয়া গেল। খাদেম ভাবিলেন, মুছার (আঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিব না। (তিনি জাগ্রত হইলেই তাঁহাকে জ্ঞাত করিব। খোদার শান—এমন একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু মুছা (আঃ) জাগ্রত হইলে পর তাঁহার নিকট উহা বলিতে ইউশা ভুলিয়া গেলেন।) আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রি চলিয়া যখন ভোর হইল তখন মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিলেন, এবার চলিতে চলিতে খুব ক্লান্তি বোধ করিতেছি, নাশ্‌তা আন। মুছা (আঃ) মৎস্যের ঐ ঘটনার পূর্বে কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নাই। যেহেতু মৎস্যের ঘটনার স্থানটি তাঁহার নির্দেশিত গন্তব্যস্থল ছিল, উহা অতিক্রম করার পরই তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। খাদেম বলিল—হায়! আপনি ত জানেন না—আমরা যখন পাথরের নিকট শুইয়া ছিলাম তখন মৎস্যের এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; শয়তানই তাহা উল্লেখ করা হইতে আমাকে ভুলাইয়াছে। মৎস্যের পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। মৎস্যের চলন-পথে পানির মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, উহাই ত সেইস্থান, যে স্থানের খোঁজে আমরা বাহির হইয়াছি। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পুনরায় চলিত পথে ফিরিলেন এবং সেই পাথরের বরাবর আসিয়া দেখিলেন, গভীর সমুদ্রে পানির উপর সবুজ রং মখ্‌মলের বিছানায় আল্লার একবন্দা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন।* তিনি ছিলেন খাযের (আঃ) (সাধারণতঃ যাঁহাকে খিযির বলা হয়)। মুছা (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, (মোসলমান বিহীন) এই দেশে সালাম কিরূপে? মুছা (আঃ) বলিলেন, (আমি এদেশীয় নই) আমি মুছা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বনী-ইস্রায়ীলের নবী মুছা? মুছা (আঃ) বলিলেন—হাঁ। তারপর মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকিতে পারি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আপনার আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন? তিনি বলিলেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবেন না। কারণ, আল্লাহ আমাকে এক প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহার রহস্য

---

* আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফে ১২ জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে। ৬৮৯ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত রেওয়ায়েত হইতে আরও তথ্য অনুবাদে শামিল করা হইয়াছে।

আপনি অবগত নহেন এবং আপনাকে আল্লাহ অন্য প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহা আমি আপনার মত জানি না।✲

মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি আপনার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই থাকিব, আপনার কোন আদেশের ব্যতিক্রম করিব না। তখন খিযির (আঃ) মুছা (আঃ)কে বলিয়া দিলেন, আপনি আমার নিকট কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না, যে পর্য্যন্ত না আমি নিজে উহা ব্যক্ত করি। এই বলিয়া তাঁহারা সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পার হওয়ার জন্য নৌকার সন্ধান পাইতেছিলেন না, এমন সময় একটি নৌকা তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া যাইতেছিল, তাঁহারা নৌকা চালকের সঙ্গে আলাপ করিলেন। নৌকা-চালক খিযির (আঃ)কে চিনিতে পারিয়া বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়া লইল। নৌকা চলাকালীন একটি চড়ুই পাখী নৌকার বাতায় বসিয়া সমুদ্রের মধ্যে একবার কি দুইবার ঠোঁট মারিল। খিযির (আঃ) বলিলেন, হে মুছা! এই চড়ুই পাখীটার ঠোঁটে লাগিয়া সমুদ্রের যতটুকু অংশ আসিয়াছে আমার ও আপনার সমস্ত এল্‌ম আল্লাহ তায়ালার এল্‌মের তুলনায় ততটুকু অংশও হইবে না। তারপর খিযির (আঃ) নৌকার একখানা

✲ খিযির (আঃ)-এর নিকট যে বিষয়ের এল্‌ম ছিল, উহা ছিল সৃষ্টি-রহস্যের এল্‌ম। উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক তথা আখেরাতের কোনও উন্নতি ত হয়ই না, দুনিয়াতেও মানব কল্যাণ সম্পর্কীয় কোন উন্নতি, যথা—চরিত্র গঠন, নৈতিক চরিত্র সংশোধন বা দুনিয়াতে শান্তিরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিচালনার কোন উন্নতি সাধিত হয় না। তাই উহার গুরুত্ব কম এবং উহার সঙ্গে নবীগণের বিশেষ সম্পর্কের কোন আবশ্যকও হয় না। হযরত মুছার (আঃ) নিকট ছিল শরীয়ত তথা আল্লার আদেশ-নিষেধ এবং আল্লাহকে রাজী ও সন্তুষ্ট করার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, চরিত্র গঠন ও সংশোধন ইত্যাদির এল্‌ম—যাহার উপর মানবের সর্বাধিক কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে; উহার গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তায়ালা এই এল্‌ম প্রচারের জন্য বিশেষরূপে নবী ও রসুল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই এল্‌ম দুনিয়াতে নবী ও রসুলের নিকট অনেক বেশী থাকে এবং সেই হিসাবেই মূল ঘটনার প্রশ্নের উত্তরে মুছা (আঃ) বলিয়াছেন, সব চাইতে বড় আলেম আমি নিজেকেই মনে করি; আমার চাইতে বেশী এল্‌মওয়ালা কেহ নাই। যেহেতু উত্তরটা আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয় নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার এক বন্দা আছে যাহার নিকট তোমার চাইতে বেশী এল্‌ম রহিয়াছে। যদিও উহা বিশেষ এক বিভাগের; যে বিভাগ হযরত মুছার সম্পর্কীয় নহে এবং হযরত মুছার সম্পর্কীয় বিভাগ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। হযরত মুছার উল্লিখিত উত্তরে কোন বিভাগের উল্লেখ ছিল না, বরং উত্তরটা সামগ্রিক ও ব্যাপক আকারের ছিল, সুতরাং যে কোন বিভাগের এল্‌ম দ্বারা উহার খণ্ডন যুক্তিযুক্ত। অবশ্য হযরত মুছার উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের ছিল না, কিন্তু উত্তরের বাহ্যিক আকার ও রূপটাই আপত্তিকর ছিল। এতটুকু বিচ্যুতি সাধারণতঃ আপত্তিজনক না হইলেও নবীর পক্ষে উহাকে আল্লাহ তায়ালা নাপছন্দ করিয়াছেন।

তখ্‌তা খুলিয়া ফেলিলেন। (ভাঙ্গার পর অবশ্য পুনরায় গড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তখন) মুছা (আঃ) বলিলেন, ইহারা আমাদিগকে বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়াছিল, আর আপনি তাহাদের নৌকা ভাঙ্গিয়া নৌকারোহী সকলকে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! ইহা ভাল করেন নাই। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না। মুছা (আঃ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়া গিয়াছে; আশা করি এই জন্য আপনি আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না এবং আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। মুছা (আঃ) এইবার প্রকৃত পক্ষেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। এক স্থানে যাইয়া দেখেন, একটি ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করিতেছে। খিযির (আঃ) সেই ছেলেটির মাথার খুলি উঠাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, আপনি একটি নির্দোষ ছেলেকে মারিয়া ফেলিলেন? অথচ সে কাহাকেও মারে নাই। আপনি বড়ই অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছেন। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আপনি ধৈর্য্যহারা হইবেন; এইবার একটু শক্তভাবেই বলিলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, তৃতীয়বার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না, তখন আমারও আর কোন ওজর-আপত্তি থাকিবে না। এই বলিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং গ্রামবাসীগণকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী রাজী হইল না। তাঁহারা ঐ গ্রামে দেখিতে পাইলেন, একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। খিযির (আঃ) ঐ দেওয়ালটিকে হাতে ধরিয়া সিধা করিবার ন্যায় ইশারা করিলেন—আল্লার কুদরতে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটি সিধা হইয়া গেল। এইবার মুছা (আঃ) বলিয়া উঠিলেন, গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করিল না; সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে এই কার্য্যের জন্য তাহাদের হইতে পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। তখন খিযির (আঃ) পরিষ্কার বলিয়া বসিলেন—এইবার আপনার ও আমার সঙ্গ ভঙ্গ হইল। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং যাহা দেখিয়া আপনি ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন প্রত্যেকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেছি; শুনুন!

ঐ নৌকার ব্যাপার হইল এই যে, ঐ দেশে এক স্বৈরাচারী জালেম বাদশাহ আছে সে কোনও ভাল এবং নিখুঁত নৌকা দেখিলেই ছিনাইয়া লয়। উক্ত নৌকার মালিকগণ অত্যন্ত গরীব, তাই আমি ঐ নৌকাটিকে খুতযুক্ত দোষী করিয়া উহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছি। তারপর ছেলে হত্যার রহস্য হইতেছে এই যে, ছেলেটি অনিবার্য্যরূপে কাফের হইতে চলিতেছিল, অথচ তাহার মাতা-পিতা মোমেন। আমার আশঙ্কা হইল যে, এই ছেলের মমতার বন্ধন হয়ত মাতা-পিতাকেও কুফুরীর মধ্যে জড়িত করিয়া ফেলিবে। তাই আমার ইচ্ছা হইল—আল্লাহ তায়ালা এই ছেলের পরিবর্তে তাহাদিগকে স্নেহের যোগ্য কোনও সুসন্তান দান করেন। আর দেওয়ালের ঘটনার রহস্য এই যে, দেওয়ালটির

মালিক দুইটি এতিম ছেলে; তাহাদের পিতা অতি নেককার ছিলেন। তিনি ঐ শিশু দুইটির জন্য কিছু ধন-দৌলত ঐ দেওয়ালের নীচে পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল, এই সমস্তের হেফাজত করা, যেন এই এতিমদ্বয় বড় হইয়া তাহাদের ঐ প্রোথিত ধন বাহির করিতে পারে। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালারই ইঙ্গিত ছিল; আমার ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। ইহাই হইল উক্ত ঘটনাগুলির রহস্য, যাহার জন্য আপনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ মুছাকে রহম করুন! তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল হইত; তাঁহাদের আরও বহু ঘটনা আমরা শুনিতে পারিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের শিক্ষা এই যে, কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—"অধিক এল্‌ম কে রাখেন"? তবে বলিবে, "আল্লাহই তাহা ভাল জানেন।" আরও শিক্ষা এই যে, এল্‌ম হাসিল করার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদেশ সফরে বাহির হইতেও কুণ্ঠিত হইবে না। যেমন মুছা (আঃ) করিয়াছিলেন, এমনকি সঙ্কটপূর্ণ সামুদ্রিক ভ্রমণ পর্য্যন্ত সাগ্রহে কবুল করিয়াছিলেন।

আলোচ্য ঘটনায় উল্লেখিত দুই সমুদ্রের মিলনস্থলটি হইল লোহিৎ সাগর যে, সিনাই উপত্যকার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি উপসাগর শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—সুয়েজ উপসাগর এবং আকবা উপসাগর; উক্ত উপসাগরদ্বয়েরই মিলনস্থল যাহা লোহিত সাগরের অংশবিশেষ দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের উদ্দেশ্য ঐ উপসাগরদ্বয়ের মিলনস্থল। এই ঘটনা তথায়ই ঘটিয়াছে।

বসা আলেমকে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করা

৯৮। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লার রাস্তায় জেহাদ কি প্রকারে হয়? আমাদের কেহ যুদ্ধ করে রাগের বশীভূত হইয়া, কেহ বা জেদের বশীভূত হইয়া। ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, আর রসুলুল্লাহ (দঃ) বসিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহার প্রতি মাথা উঠাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, আল্লার দ্বীনকে বুলন্দ ও উন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা—একমাত্র উহাই আল্লার রাস্তায় জেহাদ গণ্য হইবে।

মছআলাহ ঃ—যদি কেহ কোন এমন এবাদতে রত থাকে যে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে সে ঐ এবাদতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না, এইরূপ স্থলে এবাদতরত ব্যক্তিকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায়। (২৩ পৃষ্ঠায় ৭২ হাদীছ)

মানুষকে এল্‌ম অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে

৯৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার এক জনশূন্য স্থানে চলিতেছিলাম: হযরতের

হাতে লাঠি স্বরূপ একখানা খেজুরের ডালা ছিল। এমতাবস্থায় তিনি একদল ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তখন তাহারা একে অন্যকে বলিতে লাগিল, রূহ বা আত্মা কি বস্তু সে বিষয় তাঁহাকে প্রশ্ন কর। এক ব্যক্তি বলিল, তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিও না; হয়ত তিনি ঐ উত্তরই দিয়া দিবেন যাহা তোমরা পছন্দ কর না। (অর্থাৎ এমন উত্তর দিতে পারেন যদ্বারা তিনি সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, অথচ ইহা তোমরা পছন্দ কর না।) অন্য এক ব্যক্তি বলিল, প্রশ্ন করিবই। এই বলিয়া এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলিল, হে আবুল কাসেম (দঃ)! রূহ্ কি বস্তু? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ থাকিলেন। আমি ভাবিলাম, এখন অহী আসিবে, এই ভাবিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বস্তুতঃ তখন অহী নাযেল হইল। অহী নাযেল হওয়ার পর হযরত (দঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۔

অর্থঃ—তাহারা আপনাকে রূহের বিষয় প্রশ্ন করে। আপনি বলিয়া দিন—রূহ্ (কোন উপকরণ-উপাদান ব্যতিরেকে শুধু) আল্লার হুকুমে সৃষ্ট একটি বিশেষ বস্তু; (বিষদ ব্যাখ্যা তোমরা অনুধাবন করিতে পারিবে না, কারণ) মানবকে এল্‌ম বা জ্ঞান অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে। (যদ্বারা উহার রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে)।

কোন মোস্তাহাব কার্য্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কায় উহা বর্জন করা

১০০। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তোমাদের বংশধর অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরায়েশগণ যদি সবেমাত্র নব মোসলেম না হইত, তবে আমি কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে তৈয়ার করিতাম। (উত্তর দিকে হাতীমরূপে) যে অংশ পরিত্যক্ত রহিয়াছে উহা সমেত তৈরী করিতাম এবং কা'বা ঘরের পোতা (বর্তমানের ন্যায় উঁচু না করিয়া) জমিন সমান করিয়া দিতাম এবং উহাতে দুইটি দরওয়াজা রাখিতাম; একটি প্রবেশ করার একটি বাহির হইবার। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের সময় এই অনুযায়ীই কা'বা-ঘরকে বানাইয়াছিলেন। (কিন্তু তিনি হাজ্জাজের হাতে শহীদ হইলে পর হাজ্জাজ আবার উহাকে ভাঙ্গিয়া পূর্বের ন্যায় কোরায়েশদের নির্মাণ আকারে বানাইয়া দেয়; এখন পর্য্যন্ত ঐরূপই আছে।)

ব্যাখ্যাঃ—কা'বা-ঘর ভাঙ্গিয়া উহার সংস্কারের অভিপ্রায় হযরতের জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি উহা কার্য্যকরী করিতে বিরত থাকেন। কারণ, কোরায়েশগণ তখন সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হযরতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আস্থা তখনও পর্য্যন্ত তত দৃঢ় হয় নাই। এমতাবস্থায় যদি তিনি খোদার ঘর ভাঙ্গা আরম্ভ করেন তবে তাহারা হয়ত বিরূপ ভাব

পোষণ করিবে। এই আশঙ্কায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, কারণ উহা কোন ফরজ বা ওয়াজেব কাজ ছিল না। এই হাদীছের বিষয়-বস্তুর আরও বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড "বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা" পরিচ্ছেদে রহিয়াছে।

শ্রোতার জ্ঞান অনুপাতে কথা বলিবে

১০১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উটের উপর সওয়ার ছিলেন; মোয়া'জ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন—হে মোয়া'জ। মোয়া'জ উত্তর করিলেন—নতশিরে হাজির, ইয়া রসুলাল্লাহ! এইভাবে তিনবার ডাকিয়া তৃতীয়বারে নবী (দঃ) বলিলেন, যে কোন ব্যক্তি খাঁটিভাবে আন্তরিকতার সহিত এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবে যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বূদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত মতবাদ—ইসলামই গ্রহণীয়; আমি উহা গ্রহণ করিতেছি)। অন্য কোন মা'বূদ নাই, (অর্থাৎ ইসলাম ব্যতীত সকল প্রকার মতবাদ বর্জনীয়, আমি তাহা বর্জন করিতেছি) এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিশ্চয়ই আল্লার রসুল; (অর্থাৎ তাঁহার বর্ণিত সকল হুকুম-আহকাম আল্লার পক্ষ হইতেই।) সেই ব্যক্তির উপর দোযখ হারাম হইয়া যাইবে। মোয়া'জ আরজ করিলেন, এই ঘোষণা ও সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেই যেন সকলেই সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে? নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করিলে সর্বসাধারণ ভরসা জন্মাইয়া বসিবে। (ভুল বুঝের বশীভুত হইয়া আমল করা ছাড়িয়া দিবে।) মোয়া'জ (রাঃ) জীবনভর এই হাদীছটি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর সময় (কয়েকজন বিজ্ঞ লোককে ডাকিয়া) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যেন হাদীছকে লুকাইয়া রাখার গোনাহ্ না হয়।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দঃ) এই হাদীছ সর্বসাধারণকে শুনাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন— যাহারা ইহার সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবে না। কিন্তু কাহাকেও এই হাদীছ শুনাইবে না এই উদ্দেশ্য হযরতের ছিল না; নতুবা হযরত (দঃ) নিজে মো'য়াজ (রাঃ)কে শুনাইতেন না।

এল্‌ম শিক্ষায় লজ্জা-শরম বাধা না হওয়া

মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণে লজ্জা বোধ করিবে অথবা অহঙ্কার বা তাকাব্বুরী করিবে সে এল্‌ম হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, মদীনার মহিলাগণ অত্যন্ত ভাল; দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ তাহাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

১০২। হাদীছ :—উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উম্মে-ছোলায়েম নামক এক মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া

রসুলাল্লাহ (দঃ)। আল্লাহ তায়ালা হক্ক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না; (অর্থাৎ সেরূপ আমিও লজ্জাবোধ না করিয়া একটি মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছি—) স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হইলে গোছল ফরজ হইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, (শুধু দেখিলেই হইবে না, বরং) বীর্য্য (বাহির হইয়াছে) দেখিলে গোছল করা ফরজ হইবে। উম্মে ছালামা (রাঃ) তখন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। স্ত্রীলোকদের কি স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে?* হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়; নচেৎ সন্তান মায়ের আকৃতি পায় কিরূপে? (অর্থাৎ সন্তান কোন সময় মায়ের আকৃতি পাইয়া থাকে; তদ্বারা বুঝা যায় যে, মাতৃজাতির বীর্য্যস্খলিত হওয়া স্বাভাবিক; স্বপ্নদোষে তাহাই হয়।)

লজ্জা-ক্ষেত্রে মছআলাহ অন্যের দ্বারা জানা

১০৩। **হাদীছ**ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমার অত্যধিক মজি× নির্গত হইত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সেই বিষয় মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিতে আমি লজ্জা বোধ করিলাম; কেননা তিনি আমার শ্বশুর। আমি মেকদাদ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল; তখন হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন— পুরুষাঙ্গ ধুইয়া ফেল এবং অজু করিয়া লও, গোসল করিতে হইবে না। (৪১ পৃঃ)

মছজিদে এল্‌মের চর্চা করা

১০৪। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমরা কোন্ স্থান হইতে এহরাম বাঁধিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, মদীনা দিকের বাসিন্দাগণ "জোহ্‌ফা" হইতে, নজদ এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "করণ" হইতে, ইয়ামান এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ "ইয়ালামলাম" হইতে।

জিজ্ঞাসিত বিষয়ের অধিক উত্তর দেওয়া

১০৫। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল—এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করিব? নবী (দঃ) বলিলেন, জামা পায়জামা, পাগড়ী, টুপী ব্যবহার করিতে পারিবে না; এবং কুসুম ফুলের বা জাফরানের রঙ্গীন কাপড়ও ব্যবহার করিবে না। (মোজাও ব্যবহার করিবে না, তবে) জুতা না থাকা বশতঃ চামড়ার মোজা ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উচু স্থান এবং গোছের নিম্ন ভাগে উভয় দিকের গিঁটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের সম্পূর্ণ অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

---

* পূর্বে তাঁহার স্বপ্নদোষ হয় নাই; পরে ত তিনি হযরতের (দঃ) বিবি, যাঁহারা উহা হইতে সুরক্ষিত।

× কাম স্পৃহার উত্তেজনায় লিঙ্গ দ্বারে বীর্য্য ছাড়া লালার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়—উহাই 'মজি'।

তৃতীয় অধ্যায়

অজু

অজুর বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

অর্থ—তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও, তখন সম্পূর্ণ মুখ-মণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত এবং দুই পা গিঁটদ্বয় পর্য্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মছেহ কর।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন—উক্ত অঙ্গগুলি ধৌত করার মাত্রা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক এক বার (সর্বনিম্ন); দুই দুই বার (উত্তম); তিন তিন বার (অতি উত্তম) দেখাইয়াছেন; তিন বারের বেশী তিনি কখনও করেন নাই। আলেমগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত এই সীমাকে লঙ্ঘন করা মকরূহ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অজু ব্যতিরেকে নামায হইবে না

১০৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যাহার অজু নাই, অজু না করা পর্য্যন্ত তাহার নামায হইবে না।

অজুর ফজিলত

১০৭। হাদীছ :— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا

مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—আমার উম্মতগণ হাত-প', মুখমণ্ডল উজ্জল ও নূরানী-অবস্থায় কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। অজুর ক্রিয়ায় তাহাদের ঐ অবস্থা হইবে। যে ব্যক্তি বর্দ্ধিত আকারে নূরানী হওয়ার আকাঙ্খী তাহার কর্তব্য—ঐ সব অঙ্গ ধোয়ায় (পুর্ণতার নিশ্চয়তা বিধানে) নির্দ্ধারিত সীমা অপেক্ষা অধিক ধোয়া।

নিশ্চিত অনুভূতি ছাড়া শুধু সন্দেহে অজু ভাঙ্গে না

১০৮। হাদীছ :—আব্বাস ইবনে তমীম (রঃ) তাঁহার চাচা হইতে বর্ণন করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলা হইল—কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে এরূপ অছওয়াছা (অমুলক সন্দেহ) অনুভব করে যেন তাহার অজু ভাঙ্গিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাবৎ শব্দ না শুনিবে বা দুর্গন্ধ অনুভব না করিবে (অর্থাৎ যাবৎ অজু ভঙ্গের দৃঢ় অনুভূতি না হইবে) নামায ছাড়িবে না।

ব্যাখ্যা :—এক হাদীছে আছে—অজুর মধ্যে নানাপ্রকার অছওয়াছা বা সন্দেহ সৃষ্টিকারী এক (দল) শয়তান আছে উহার (সদস্যদের) নাম "অলাহান"।

মানুষ যে পথের পথিক হয় শয়তান ঐ পথের পথিক সাজিয়া নানাপ্রকার কুপ্ররোচনা দ্বারা তাহাকে দ্বীন হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি পরহেজগার নামাযী তাহাকে সরাসরি নামাযে বাধা দিলে সে উহা হইতে ক্ষান্ত হইবে না। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকে। অজুর মধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহ একটার পর আর একটা সৃষ্টি করিতে থাকে, এইরূপে তাহাকে অজুর মধ্যে দীর্ঘ সূত্রিতার বেড়াজালে ফেলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই জমাত হইতে মাহরুম করিয়া দেয়। তারপর কিছু দিনের মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইতে বঞ্চিত করে। যদি সে কোন রূপে অজু করিয়া নামায আরম্ভ করিয়া দেয় তথাপিও ঐ শয়তান তাহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় না। এই বুঝি অজু ভাঙ্গিয়া গেল—ইত্যাকার নানা সন্দেহ সৃষ্টি করিতে থাকে, যদ্দরুন সে বার বার নামায ছাড়িতে থাকে ও বার বার অজু করিতে থাকে, অজুর মধ্যে ত দীর্ঘ সূত্রিতা আছেই। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি নামাযকে একটি বড় জঞ্জাল মনে করিতে বাধ্য হয়, আরও যে কি হয় তাহা বলা যায় না। তাই এরূপ অছওয়াছা একটি মারাত্মক রোগবিশেষ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন যে, স্পষ্ট নিদর্শন ও সুনিশ্চিত অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু মনের অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হইবে না।

আবু বকর সিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পৌত্র প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—নামাযের মধ্যে আমার নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইতে থাকে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? তিনি বলিলেন,

তুমি কোনরূপ সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নামায পড়িতে থাক। যাবৎ তুমি শয়তানকে এই বলিয়া তাড়াইয়া না দিবে যে, আমি অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ নামাযই পড়িব, তাবৎ শয়তান কিছুতেই তোমাকে ছাড়িবে না। (নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করিতেই থাকিবে, যদ্দ্বারা জামাত, ওয়াক্ত এমনকি নামায হইতে তোমাকে মাহ্‌রুম ও বঞ্চিত করিয়া দিবে।)

কারণ বশতঃ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অজু করা

১০৯। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায দেখার জন্য তাঁহার বিবি—আমার খালা মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু অনাহার ঘরে এক রাত্রে শুইয়া রহিলাম। (ইবনে আব্বাস তখন নাবালক ছিলেন এবং মায়মুনা (রাঃ) ঋতু অবস্থায় ছিলেন।) আমি বালিশের চওড়া দিকে শুইলাম এবং নবী (দঃ) ও তাঁহার বিবি লম্বা দিকে শুইলেন। আমি ঘুমের ভান করিয়া রহিলাম, কিন্তু ঘুমাইলাম না। নবী (দঃ) এশার নামায পড়িয়া ঘরে আসিলেন এবং চার রাকাত নফল নামায পড়িলেন, অতঃপর বিবির সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি অর্দ্ধেক বা তার চেয়ে একটু বেশী বা কম হইল, তখন তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং বসিয়া চোখ-মুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি আ'ল-এম্‌রান ছুরার শেষ দিকের দশটি আয়াত পাঠ করিলেন। তারপর তিনি একটা লটকানো পুরানা মশক হইতে পানি লইলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ও উত্তমরূপে অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়াইলেন। (ইবনে আব্বাস এ সব চুপি চুপি দেখিলেন,) তিনি বলেন, যখন দেখিলাম—নবী (দঃ) নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তখন আমিও উঠিলাম এবং নবী (দঃ) যেরূপ করিয়াছিলেন আমিও সেরূপ করিলাম এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নবী (দঃ) ডান হাতে আমার ডান কান ধরিয়া পেছন দিক দিয়া টানিয়া আনিয়া আমাকে তাঁহার ডান পার্শে দাঁড় করাইলেন, কানে একটু মোচড়ও দিলেন। নবী (দঃ) দুই দুই রাকাত করিয়া ছয়বার নামায পড়িলেন এবং পরে এক রাকাত দ্বারা বেতের পড়িলেন।* তারপর তিনি শুইয়া রহিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার নাকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ফজরের ওয়াক্ত হইয়া গেল, মোয়াজ্জেন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল; তিনি উঠিয়া ছোট কেরাতে দুই রাকাত (ফজরের ছুন্নত) পড়িলেন, তারপর মসজিদে যাইয়া (ফজরের) নামায পড়িলেন নূতন অজু করিলেন না।

---

* মোসলেম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে ثم اوتر بثلاث "তারপর তিন রাকাত বেতের পড়িলেন" স্পষ্ট উল্লেখ আছে; সেই অনুসারে আলোচ্য হাদীছের অস্পষ্ট বাক্যটির অর্থ এইরূপ হইবে—(ষষ্ঠ দুই রাকাতের) পরে এক রাকাত (কে ঐ দুই রাকাতের সঙ্গে মিলাইয়া) তিন রাকাত বেতের পড়িলেন।

ব্যাখ্যা :— ইমাম বোখারী (র:) এস্থানে একটি সন্দেহ দূর করিয়াছেন যে, নিদ্রার দরুন নবীগণের অজু ভঙ্গ হয় না। যেহেতু তাঁহাদের কাল্‌ব নিদ্রাবস্থায়ও জাগ্রত থাকে, কারণ তাঁহাদের প্রতি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নাকারে বস্তুত: অহী আসিয়া থাকে। যেমন ইব্রাহীম (আ:)-এর ঘটনায় আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইসমাঈল (আ:)কে কোরবানী করিতে দেখিয়া উহাকেই আল্লার নির্দেশ রূপে গ্রহণ করত: নিজের ছেলেকে কোরবানী করিতে উদ্যত হন। তাঁহার স্বপ্ন যদি অহী পর্য্যায়ের অকাট্য প্রমাণ পরিগণিত না হইত তবে তিনি এরূপ করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখিয়া কোন একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হওয়া যায় না।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত ছুরা আল-এমরানের দশটি আয়াত এই—

(১) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى
الْاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ
فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا - سُبْحٰنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ - (২) رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ - وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ اَنْصَارٍ ۝ (৩) رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا - رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْاَبْرَارِ ۝ (৪) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ (৫) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ - فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ

عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ (৬) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۝

(৭) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ - ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (৮) لٰكِنِ الَّذِيْنَ

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ -

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝ (৯) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ثَمَنًا قَلِيْلًا - اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(১০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থ :—[১] (এই বিশাল) ভূমণ্ডল ও (বিস্তীর্ণ) আকাশ সমূহের সৃষ্টি ও সৃষ্ট-নৈপুণ্যের মধ্যে এবং রাত্র ও দিনের গমনাগমন ও ছোট-বড় হওয়ার মধ্যে (আল্লার মা'রেফাত তথা তাঁহার একত্ব, তাঁহার অসীম কুদরত ও গুণাবলীর তথ্য-জ্ঞান লাভের) বহু নিদর্শন ও প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে; খাঁটি জ্ঞানীগণ উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। (প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানী তাহারা) যাহারা উঠা বসা, শোয়া (ইত্যাদি) সর্বাবস্থায় (তথা জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ও পালনকর্তা) আল্লাহকে স্মরণ করিয়া চলে। (অর্থাৎ সে যে প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লার দৃষ্টি-গোচরে আছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে—যে অবস্থাকে ৪৬নং হাদীছে "এহ্‌সান" নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা ও স্বীয় কর্তব্যবোধ তথা ঈমানের পরিপক্কতার উন্নতি সাধনের মানসে) জমীন ও আসমান সমূহের সৃষ্টি-রহস্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া এই সত্যকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি পূর্বক স্বীকার করিয়া লয় যে, হে আমাদের পালনকর্তা। এই বিরাট ভূ-খণ্ড ও বিস্তৃত আকাশ সমূহ তথা সমগ্র বিশ্ব জগতকে তুমি অযথা সৃষ্টি কর নাই। (আমরা যেন তোমার আজ্ঞাবহ দাস রূপে জীবন যাপন করি সেই উদ্দেশ্যে উহা আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ;) অযথা কাজ করা হইতে তুমি পাক-পবিত্র, মহান—অতি মহান। অতএব আমাদিগকে (তোমার দাস বানাইয়া) দোযখের আজাব হইতে পরিত্রাণ দান কর। [২] যাহাকে তুমি দোযখ

হইতে রক্ষা না করিবে সে চিরতরে লাঞ্ছিত হইতে বাধ্য ; (যে লাঞ্ছনাকে মানুষ পাপ করিয়া নিজেই নিজের উপর টানিয়া আনে) এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা যাহারা নিজেই নিজের উপর অত্যাচারী তাহাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী হইবে না।

[৩] হে আমাদের রক্ষাকর্তা পালনকর্তা। ঈমানের প্রতি আহ্বানকারীর (তথা আপনার কোরআন, আপনার রসুল ও নায়েবে-রসুলগণের) উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনিতে পাইলাম যে, "হে বিশ্ববাসীরা। তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তার উপর ঈমান আন" আমরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছি এবং আপনার প্রতি ঈমানকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। হে পালনকর্তা। আপনি আমাদের সমুদয় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন সৎলোকদের দলভুক্ত থাকিতে পারি এইরূপ তৌফিক দান করুন। [৪] হে আমাদের পালনকর্তা। আপনি আমাদিগকে ঐ জিনিষ দান করুন—পয়গাম্বরগণের মারফতে আপনি যে জিনিষের আশা আমাদেরে দিয়াছেন (অর্থাৎ চির সুখময় বেহেশত) এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনি স্বীয় ওয়াদা অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না। (কিন্তু আমাদের নিজেদেরই ভরসা নাই যে, আমরা আপনার ওয়াদার বস্তু বেহেশত লাভের উপযুক্ত মোমেন হইতে পারিব কি—না। তাই মনে সংশয়ের উদয় হয়, আশঙ্কা আসে এবং আপনার নিকট ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হই।)

[৫] (এইরূপে সাচ্চা দেলে যাহারা স্বীয় পালনকর্তার নিকট দোয়া করিয়া থাকে তাহাদের সেই দোয়া তিনি কবুল করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ বলেন—) আমি কোনও কর্মীর কোন কর্ম ও আমলকেই বিফল যাইতে দেই না ; এ বিষয়ে প্রত্যেক নর-নারীই সমান। কারণ উভয়ই (আল্লার বন্দা হিসাবে) সম পর্য্যায়ভুক্ত। তাই যাহারা আমার রাস্তায় নানাপ্রকার কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, দেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া হিজরত বরণ করে এবং জেহাদ করে ও শাহাদত বরণ করে তাহাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা আমি নিশ্চয় মাফ করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে বেহেশতে স্থান দান করিব, যাহার মহল সমূহ-সংলগ্নে সুশীতল নদী-নহর বহিতে থাকিবে। এসব সামগ্রী কর্ম-ফল স্বরূপ আল্লার নিকট পাওয়া যাইবে ; আল্লাহ প্রদত্ত কর্ম-ফল অতি উত্তম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

[৬] তোমরা কাফেরদিগকে জাঁকজমকের সহিত শহরে শহরে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ভুল ধারণার বশবর্তী হইও না (যে, তাহারা আল্লার প্রিয়পাত্র—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপযুক্ত। তাহা কখনও নহে) [৭] এ সব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী জাঁকজমক মাত্র ; এই জীবনের পরই তাহাদের একমাত্র বাসস্থান হইবে দোযখ বা নরক এবং উহা অতিশয় কষ্ট-ক্লেশের স্থান। [৮] কিন্তু যাহারা স্বীয় পালনকর্তার ভয়-ভক্তির অধীন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে তাহাদিগকে বেহেশত দান করা হইবে—যাহার মহল সমূহের সংলগ্নে

নদী-নহর প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সে বেহেশতে তাহারা আল্লার মেহমানরূপে চিরকাল বসবাস করিতে থাকিবে। নেক বান্দাদের জন্য আল্লার নিকট রক্ষিত সামগ্রী অতি উত্তম।

[৯] পূর্বের আসমানী কেতাবধারী লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা আল্লার উপর ঈমান রাখে এবং স্বীয় কেতাবের সঙ্গে মোসলমানদের প্রতি অবতারিত কেতাবের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখে এবং অন্তরে খোদার ভয়-ভীতি রাখিয়া থাকে। হীন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া আল্লার (কেতাবের) আয়াতসমূহকে বিকৃত করে না; তাহারা স্বীয় পালন-কর্তার নিকট তাহাদের কার্য্যের প্রতিদান লাভ করিবে। আল্লাহ অতি সত্বরই এই সব হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া দিবেন।

(১০) হে ঈমানদারগণ। ধৈর্য্যধারণকারী হও, (জেহাদের ময়দানে এবং দ্বীনের উপর) প্রতিযোগিতার সহিত অটল ও স্থির থাকিতে অভ্যস্ত হও, (বাহ্যিক ও আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষায় তৎপর থাক* এবং আল্লার প্রতি ভয়-ভক্তি রাখ: তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।

উত্তমরূপে অজু করা উচিৎ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, অজুর সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ময়লা ইত্যাদি হইতে পরিষ্কার করা উত্তম ও ভালরূপে অজু করার মধ্যে শামিল।

১১০। হাদীছঃ— উছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হজ্জের দিন) আরাফার ময়দান হইতে যখন রওয়ানা হইলেন, রাস্তায় এক স্থানে সওয়ারী হইতে নামিয়া পাহাড়ের এক বাঁকে যাইয়া প্রস্রাব করিলেন এবং তাড়া-তাড়ি অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। আমি তাঁহকে অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। আমি আরজ করিলাম, হুজুর নামায পড়িবেন কি? তিনি বলিলেন, নামাযের

---

* বাহ্যিক সীমান্ত রক্ষার অর্থ হইতেছে—ইসলামী রাষ্ট্র ও মোসলমানদিগকে হেফাজত ও কাফেরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য মোজাহেদরূপে সীমান্ত রক্ষাকার্য্যে যোগদান করা—ইহার বহু বহু ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে।

আন্তরিক সীমান্ত রক্ষা করার অর্থ হইতেছে—স্বীয় অন্তরকে নফ্‌ছ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে এবং কর্মজীবনকে নফ্‌ছ ও শয়তানের দখল হইতে রক্ষা করা। ইহার সহজ উপায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক হাদীছে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বিস্বাদময় তিক্ততার কারণসমূহ বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও পূর্ণ ও উত্তমরূপে অজু করায় অভ্যস্ত হওয়া, এক নামায পড়ার পর পরবর্তী নামাযের প্রতি আকৃষ্ট ও অপেক্ষারত অবস্থায় থাকা এবং বাসস্থান হইতে মসজিদ দূরে হইলেও সর্বদা মসজিদের জমাতে শরীক হওয়া (—এইভাবে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে নিজকে আল্লার গোলামীতে নিয়োজিত রাখা) ইহাই হইল (আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্ত রক্ষা। (তিরমিজী) (ইহা দ্বারা শয়তানের আক্রমণ হইতে অন্তর সুরক্ষিত থাকিয়া দেহ রাজ্য শয়তানের তাবেদারীমুক্ত থাকিবে।)

স্থান সম্মুখে×। এই বলিয়া পুনরায় সওয়ার হইয়া চলিলেন। মোজদালেফার ময়দানে পৌঁছিয়া খুব ভালরূপে অজু করিলেন, তারপর একামত বলা হইলে মাগরেবের নামায আদায় করিলেন। তারপর সকলে নিজ নিজ উট বাঁধিয়া আসিলে পুনরায় একামত বলা হইল এবং এশার নামায পড়িলেন; মধ্যভাগে কোনও নামায পড়েন নাই।

অজুর সময় উভয় হাতে মুখ ধৌত করিবে

১১১। **হাদীছ ঃ**—একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) অজু করিতে বসিলেন। এক হাতের আঁজলে পানি লইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর আবার পানি লইয়া উহার সঙ্গে দ্বিতীয় হাত মিলাইয়া দুই হাত দ্বারা মুখ ধুইলেন। তারপর এক হাতের অঞ্জলীতে পানি লইয়া ডান হাত (কনুই পর্য্যন্ত) ধৌত করিলেন এবং বাম হাতও এইভাবে ধুইলেন। তারপর মাথা মছেহ করিয়া এক আঁজল পানি লইয়া ডান পায়ের উপর ঢালিয়া দিয়া ধৌত করিলেন এবং ঐরূপে বাম পাও ধুইলেন। সর্বশেষে বলিলেন, "আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপে অজু করিতে দেখিয়াছি।"

প্রত্যেক কাজে এমনকি স্ত্রীসহবাসের পুর্বেও বিছমিল্লাহ বলা

১১২। **হাদীছ ঃ**— ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পুর্বে—*

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

এই দোয়াটি পড়িয়া লয় এবং ঐ মিলনের দ্বারা কোনও সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে শয়তান (দ্বীন ও দুনিয়ার) কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

পায়খানায় যাইতে কি দোয়া পড়িবে?

১১৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পায়খানায় যাইতে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ❁

× কারণ হজ্জের সময় আরাফার ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া এশার নামাযের ওয়াক্ত মোজদালেফায় পৌঁছিয়া সেখানেই মাগরেব এবং এশা উভয় নামাযই এশার ওয়াক্তে পড়িতে হয়। পথিমধ্যে মাগরেবের নামায আদায় করিলে সেই নামায শুদ্ধ হইবে না।

* দোয়াটির উচ্চারণ এই—বিছমিল্লাহে, আল্লাহুম্মা জান্নেব্‌ নাশ্‌-শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্‌-শায়তানা মা-রাজাক্‌তানা।

অর্থ—আল্লার নামে আরম্ভ। হে আল্লাহ। তুমি আমাদিগকে শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদিগকে যাহা দান কর উহাকেও শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

❁ দোয়াটির উচ্চারণ এই—আল্লাহুম্মা ইন্নী-আ'উজু-বিকা মিনাল্‌ খুব্‌ছে ওয়াল খাবায়েছে।

অর্থ—হে আল্লাহ। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সমস্ত দুষ্কৃতিকারী (ভুত-প্রেত ইত্যাদি) হইতে এবং সমস্ত রমকের অশ্লীল অভ্যাস ও দুষ্কৃতি হইতে।

মল-মুত্র ত্যাগের সময় কেবলামুখী বসিবে না অবশ্য সম্মুখে আড়াল থাকিলে

১১৪। হাদীছঃ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মল-মুত্র ত্যাগের সময় কেহ কেবলামুখী বসিবে না। কেবলা দিকে পিঠও দিবে না, পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হইয়া বসিবে।×

এই হাদীছ বর্ণনাকারী আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা কয়েকজন মোসলমান এক সময় সিরিয়া দেশে গেলাম (সিরিয়া তখন মোসলমান অধিকৃত দেশ ছিল না।) সেখানে দেখিলাম, সমুদয় পায়খানাগুলিই কেবলামুখী করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। আমরা অপারগ অবস্থায় ঐ পায়খানায় প্রবেশ করিতাম, কিন্তু সাধ্যানুযায়ী কেবলা দিক হইতে মোড় দিয়া বসিতাম এবং (যেহেতু পূর্ণ-মাত্রায় কেবলা দিক হইতে ফিরিয়া বসা সম্ভব হইত না, তাই) আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।+

ব্যাখ্যাঃ—হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী স্বয়ং এবং তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য হাদীছের মর্ম ও অর্থ অনুযায়ী কোন প্রকার আড়াল থাকা অবস্থায়ও, এমনকি তৈরী পায়খানার ভিতরেও কেবলামুখী হইয়া মল-মুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফার মজহাব ইহাই। আড়াল সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন উহার সূত্র হইল পরবর্তী হাদীছ—যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

পা-দানির উপর বসিয়া মল ত্যাগ করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য মল ত্যাগের জন্য পা-দানি বিশিষ্ট পায়খানা তৈরী করা উত্তম। রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে সেই ব্যবস্থা ছিল।

১১৫। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন, লোকেরা বলে, মল-মুত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী বা কেবলার দিকে পিঠ করিয়া বসিবে না। অথচ আমি একদা আমার ভগ্নি—হযরতের বিবি হাফ্‌ছাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ-ছাদে উঠিয়া ছিলাম; তথা হইতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল—রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পায়খানার ভিতর) পা-দানির উপর বসিয়া আছেন; হযরতের পিঠ কেবলার দিকে ছিল।

ব্যাখ্যাঃ—এই হাদীছ দৃষ্টেই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী এবং কোন কোন ইমামের মজহাব এই যে, পায়খানার ভিতর, এমনকি সম্মুখ বা পেছনে কোন আড়াল থাকিলেই মল-মুত্র ত্যাগে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা দুষণীয় নহে। ইমাম আবু হানিফার মজহাব প্রথমোক্ত হাদীছটির উপর স্থাপিত। তাঁহার মজহাবে কোন অবস্থাতেই

× পূর্ব-পশ্চিমমুখী বসিবার আদেশ মদীনাবাসীর জন্য। যাহাদের কেবলা দক্ষিণে।

+ হাদীছ বর্ণনাকারীর নিজ ঘটনার অংশটুকু বোখারী শরীফের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

মল-মূত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী হওয়া বা কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া জায়েয নহে। তিনি বলেন, ১১৪ নং হাদীছটি অতি সুস্পষ্ট এবং বিধানগত ঘোষণা স্বরূপ ব্যাপক আকারের মৌখিক উক্তি। পক্ষান্তরে ১১৫নং হাদীছের বিষয়টি হযরতের উক্তি নহে, অধিকন্তু উহা ধীর-স্থিরবিহীন অতি ক্ষীণ ও দ্রুত অপসারিত দৃষ্টির মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার একজনের এক নজরে অনুভূত বিষয়; ইহাতে প্রকৃত রূপের দ্বিধাহীন অবগতি হয় না। এত দুর্বল বিষয় দ্বারা ১১৪নং হাদীছে বর্ণিত সুস্পষ্ট মৌখিক উক্তি ও বিধানগত ব্যাপক আকারের ঘোষণার মধ্যে কোন প্রকার রদ-বদল করা যায় না।

ইমাম বোখারী (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বাড়ীর ভিতরে মল ত্যাগের জন্য বিশেষ স্থান তৈরী করার বাস্তবতা সম্পর্কেও একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন।

মল ত্যাগের জন্য নারীদের অরণ্যে-প্রান্তরে যাওয়া

উপরের পরিচ্ছেদে তৈরী পায়খানার মল ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, উহার পরে স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা না থাকিলে জনশূন্য মাঠে-জঙ্গলে, পাথারে-প্রান্তরে মল ত্যাগের জন্য যাইতে পারে। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমটি হইল—লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার স্থল না হয়। নৌকা চলাচলের নদী-খালের কূলে যেভাবে মল ত্যাগের জন্য বসা হয় উহা হারাম ; ঐরূপ ব্যক্তিদের প্রতি হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক লা'নৎ ও অভিশাপের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল—মালিকের আপত্তির জায়গা বা যেস্থানে মল ত্যাগ করিলে লোকদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা; যেমন—পথে, ঘাটে, ছায়ায় বা ফলের গাছের নিকটবর্তী ইত্যাদি স্থানেও মল ত্যাগ করিবে না। এই সব বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনে নারীগণও বিশেষ পর্দার সহিত বাহিরে মল ত্যাগের জন্য যাইতে পারে। অবশ্য নারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে শুধু রাত্রে যাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া চাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে মদীনা শরীফে পরবর্তী সময়ে মোসলমানগণ নিজ গৃহে পায়খানা তৈরী করিয়া নিতেন; হযরতের গৃহে তৈরী পায়খানা ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে অন্ধকার যুগের ব্যবস্থাই চলিত যে, বাড়ীতে মল ত্যাগের ব্যবস্থা থাকিত না।

১১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও মদীনার একটি বৃহৎ প্রান্তরে মল ত্যাগের জন্য যাইয়া থাকিতেন; তাঁহারা শুধু কেবল রাত্রেই বাহির হইতেন ; সাধারণভাবে তাঁহারা অভ্যাস করিয়া নিয়াছিলেন—রাত্রের পর আবার রাত্রেই মল ত্যাগে বাহির হইতেন । ওমর (রাঃ) হযরতের বিবিগণের (পর্দার সহিতও) বাহিরে যাওয়া বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) সেইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিতেন না। একদা হযরতের বিবি সওদা (রাঃ)

শরীয়তী পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর গভীর রাত্রে পর্দার সহিতই মল ত্যাগে বাহির হইলেন। ওমর (রাঃ) কোথাও বসিয়াছিলেন তথা হইতে তিনি সওদা (রাঃ)কে যাইতে দেখিলেন। সওদা (রাঃ) মোটা ও দীর্ঘ কায়া-বিশিষ্টা ছিলেন, তিনি পরিচিত লোকদের ঠাহরে আসিয়া যাইতেন; তাই ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ঠাহর করিয়া নিতে পারিলেন। ওমর (রাঃ) উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতর্ক হউন—হে সওদা। আপনি আমাদের জন্য অপরিচিত থাকিতে পারেন না, সওদা আপনাকে চিনিয়া ফেলিলাম। সুতরাং চিন্তা করুন! কি ভাবে আপনি বাহির হইতে পারেন? ওমর (রাঃ) ঐ অভিলাসই প্রকাশ করিতেছিলেন যে, হযরতের বিবিদের জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হউক।

সওদা (রাঃ) ফেরার পথে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন যে, ওমর আমাকে এই এই বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার গৃহে রাত্রের আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরতের হাতে তখন একখানা আহার্য্য গোশতের হাড় ছিল; এমতাবস্থায়ই হযরতের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অহী অবতীর্ণ করিলেন। কিছু সময়ের মধ্যে অহী অবতরণের সমাপ্তি হইল—তখনও ঐ হাড়খানা হযরতের হাতেই ছিল। হযরত (দঃ) তখন বলিতেছিলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন; তোমরা প্রয়োজনে (বিশেষ পর্দার সহিত) বাহির হইতে পারিবে। এই ব্যাপারে বিশেষ পর্দার বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নাযেল হইয়াছে।*

ব্যাখ্যাঃ—এস্থানে উদ্দেশ্য বিশেষ পর্দার আয়াতটি এই—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ -

„হে নবী! আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মোমেনগণের বউ-ঝি নারীদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন (প্রয়োজনে পর্দার সহিত বাহির হইলে অতিরিক্ত পর্দারূপে) ঘোমটা অধিক নীচ তথা লম্বা করিয়া দিয়া নেয়। (যাহাতে মাথার সহিত চেহারাও পূর্ণ পর্দায় থাকে।) (২২ পাঃ ৫ রুঃ)

পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা

১১৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই মল-মুত্র ত্যাগের জন্য বাহির হইতেন, আমি এবং আমার সঙ্গী আর

* হাদীছখানা ২৮, ৭০৮, ৭৮৮, এবং ৯২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে; অনুবাদে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

একটি ছেলে হযরতের এস্তেঞ্জার জন্য পানি লইয়া আসিতাম এবং সরু মাথার লোহা লাগান একখানা লাঠিও নিয়া আসিতাম।

(কারণ, রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ মল-মুত্র ত্যাগের পর অজু করিয়া থাকিতেন এবং অজু করার পরে তিনি নামাযও পড়িতেন, এবং বাহিরে নামায পড়াকালীন তিনি ঐ লাঠিখানাকে সম্মুখে ছোতরা বা আড়াল স্বরূপ গাড়িয়া লইতেন।)

ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ

১১৮। হাদীছঃ— আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কিছু পান করিবার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিবে না, মল-মুত্র ত্যাগের সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ছুঁইবে না এবং ডান হাত দিয়া এস্তেঞ্জা করিবে না।

কুলুখ ব্যবহার করা কর্তব্য

১১৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল ত্যাগের জন্য বাহির হইলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে রওয়ানা হইলাম। নবী (দঃ) পথ চলাকালীন এদিক ওদিক দেখিতেন, কাজেই আমি তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলাম (যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি দরকারী কোন ফরমায়েশ দিতে পারে।) নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, এস্তেঞ্জার জন্য কয়েকটি পাথরের টুক্‌রা আন। হাড্ডি বা লিদ্ (পশুর শুষ্ক মল) আনিও না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করিয়া কয়েকটি পাথরের টুক্‌রা তাঁহার নিকটবর্তী রাখিয়া দূরে সরিয়া পড়িলাম। তিনি মল ত্যাগের পর উহা ব্যবহার করিলেন।

লিদ্ দ্বারা কুলুখ ব্যবহার নিষিদ্ধ

১২০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের জন্য বাহির হইলেন এবং আমাকে তিনটি প্রস্তরখণ্ড আনিতে বলিলেন। আমি প্রস্তরখণ্ড দুইটি পাইলাম; আর না পাইয়া একটি শুষ্ক গোবরখণ্ড লইয়া আসিলাম। নবী (দঃ) প্রস্তরখণ্ড দুইটি গ্রহণ করিলেন, গোবরখণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এইটা নাপাক বস্তু।

প্রত্যেক অঙ্গ এক, দুই বা তিনবার ধুইয়া অজু করা

১২১। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (দরকার বশতঃ) এক একবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২২। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কোন সময়) দুই দুইবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২৩। হাদীছঃ— একদিন ছাহাবী ওসমান (রাঃ) পানির পাত্র আনাইলেন এবং দুই হাতের উপর তিনবার পানি ঢালিয়া ধৌত করিলেন, তারপর ডান হাত দ্বারা পাত্র

হইতে পানি উঠাইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখমণ্ডলকে তিনবার ধৌত করিলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, তারপর মছেহ করিলেন, তারপর দুই পা টাখ্‌নার উপর পর্য্যন্ত তিন তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত পড়িবে। অর্থাৎ—নামায পড়া কালীন দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি ধ্যান না করিবে তাহার পুর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, ওসমান (রাঃ) অজু করার পর বলিলেন, আমি একটি হাদীছ বয়ান করিব ; যদি কোরআন শরীফের একটি আয়াত না থাকিত তবে আমি উহা বয়ান করিতাম না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি— যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িবে ; নামায শেষ করা পর্য্যন্ত তাহার পুর্বের সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত হাদীছটি বয়ান করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছেন এই জন্য যে, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিয়া হাদীছটির পুর্ণ তথ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে যে, শুধু অজু ও দুই রাকাত নামায দ্বারা সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে ; অথচ কবিরা গোনাহ খাঁটি তওবা ছাড়া মাফ হয় না—ইহাই শরীয়তের বিধান।

প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হাদীছের মর্ম ইহা নয় যে, কবিরা গোনাহও তওবা ব্যতিরেকেই মাফ হইয়া যাইবে। কারণ হাদীছটির মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ বাক্য রহিয়াছে যে, "উত্তমরূপে অজু করিয়া" ; অজু উত্তম হওয়ার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কবিরা গোনাহ সংঘটিত হইয়া থাকিলে উহা হইতে তওবা করিয়া অজু করিবে। উত্তমরূপে অজু করার অর্থে বাহ্যিক অপবিত্রতা পানি দ্বারা ধুইয়া দুর করার ন্যায় আত্মিক অপবিত্রতা তওবা দ্বারা ধুইয়া দুর করাও নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই অজুর শেষে এইরূপ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"হে আল্লাহ। আমার তওবা কবুল কর এবং আমার পবিত্রতা কবুল কর।" তদুপরি পানি দ্বারা অঙ্গসমূহ ধোয়া শেষে তওবার পুনরোক্তি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"আয় আল্লাহ ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান করি। তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। তুমি এক—তোমার শরীক নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। এবং সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করিতেছি।" এই দোয়াটি অজু সমাপ্তে পড়িতে হয়।

ওসমান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীছেও একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা আছে যে, "নিয়মিত অজু করিয়া আল্লার প্রতি এরূপ একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে যে, নামায পড়াকালীন দুনিয়ার কোন খেয়াল যেন অন্তরে স্থান না পায়।" এই অবস্থা হাসিল করার চেষ্টা করিলেই বুঝে আসিবে, ইহা হাসিল করা কত কঠিন এবং কত সাধনা সাপেক্ষ। আর সাধনার আরম্ভই হইল—কবিরা গোনাহ হইতে সম্পূর্ণ বাঁচিয়া থাকা এবং কবিরা গোনাহ হইয়া থাকিলে উহা হইতে খাঁটি তওবা করা। কবিরা গোনাহের আবিলতাময় অন্তর কখনও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঐরূপে নিবেদিত হইতে পারে না।

এস্থলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা পদ্ধতির নৈপুণ্য উপলব্ধি করা যায়। নবী (দঃ) মানুষকে কোন আমলের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আমলের করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্য্যায়টা উহ্য রাখিয়া শুধু প্রাথমিক পর্য্যায়ের বাহ্যিক আকৃতি উল্লেখ করিতেন; আর উক্ত আমলের ফজিলতটা বর্ণনা করিতেন উহার সর্ব্বোচ পর্য্যায়ের। ইহাতে মানুষের মনোবল ও সাহস অক্ষুণ্ণ থ'কে এবং আশার আলোতে সে অগ্রসর হওয়ায় আকৃষ্ট হয়; অধিকন্তু সে আশায় বুক বাঁধিয়া ধাপে ধাপে সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ে পৌঁছিতেও সক্ষম হইবে। অবশ্য বর্ণনার মধ্যে করণীয় বিষয়ের সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ের প্রতিও ইঙ্গিত থাকে যেন কুটিল স্বভাবের লোকেরা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার অবকাশ না পায়।

এস্থানে উক্ত পদ্ধতিতেই কথা বলা হইয়াছে। ফজিলত বর্ণনায় অতি উচ্চ মানের অজু ও নামাযের ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে, অথচ আমলের বর্ণনায় শুধু অজু নামাযের নাম আছে—যাহা উহার প্রাথমিক পর্য্যায়কেও বলা যায়। কিন্তু অজু-নামাযের প্রাথমিক পর্য্যায়ের জন্য উক্ত ফজিলত নহে; উক্ত ফজিলত একমাত্র উচ্চ পর্য্যায়ের অজু ও নামাযের—যাহার ইঙ্গিত উল্লেখ করা হইয়াছে।

● যেই আয়াতটির দরুন ওসমান (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ বর্ণনায় বাধ্য হইয়াছেন; হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى ....

"অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত হেদায়েতবাণী গোপন রাখে তাহাদের প্রতি আল্লার লানৎ ও অভিশাপ......।" (২ পারা ২ রুকু)

ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরী উপদেশ লাভ হয়। যথা—

১। কোরআন হাদীছের জ্ঞান ও এল্‌ম আল্লাহ তায়ালা যাহাকে দান করিয়াছেন তাহার কর্তব্য হইবে নিজ দায়িত্ব বোধে উহা অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

২। কোরআন হাদীছ শিক্ষাদানে নিজকে শিক্ষার্থীদের প্রতি উপকারক গণ্য করিবে না, বরং স্বীয় কাঁধের বোঝা নামাইবার সুযোগস্থল গণ্য করিবে।

৩। আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া নিজ হইতেই কোরআন-হাদীছ শিক্ষা দানে উদগ্রীব হইয়া উঠিতে হইবে।

অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়া

১২৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—অজু করিলে নাকে পানি দিবে এবং কুলুখ বা ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে।

১২৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—অজুর মধ্যে নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে; ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করিয়া লইবে। কারণ, নিদ্রাবস্থায় হাত কোথায় লাগিয়াছে তাহা জানা নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইবলিসের বয়ানে একটি হাদীছে নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করাকালে বিশেষভাবে তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে ; মানুষের নিদ্রা-সময়ে তাহার নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে শয়তান অবস্থান করিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অজুর মধ্যে কুল্লিও করিতে হয় ; ১২৩নং হাদীছে উহার প্রমাণ রহিয়াছে।

অজুর সময় পায়ের গোড়ালী ভালরূপে ধৌত করিবে

১২৬। হাদীছ ঃ— একদা আবু হোরায়রা (রাঃ) কোথাও যাইতেছিলেন ; কয়েকজন লোক একটি পাত্র হইতে অজু করিতেছিল ; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—পূর্ণ ও উত্তম-রূপে অজু কর। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে সমস্ত গোড়ালী শুষ্ক থাকিবে ঐগুলি দোযখে পুড়িবে।

(৫৪ নম্বর হাদীছ দ্বারা এস্থলে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অজুর মধ্যে উভয় পা পূর্ণরূপে ধৌত করা আবশ্যক। ভিজা হাতে শুধু মুছিয়া নিলে চলিবে না।)

ইবনে ছীরীন (রঃ) আংটির স্থানও ভালরূপে ধৌত করিতেন।

চাপ্পলে পা রাখিয়া পা ধৌত করা যায় কিন্তু মছেহ করা যায় না

১২৭। হাদীছ ঃ—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনি চারিটি কাজ করেন যাহা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করিতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি কি? সে বলিল—(১) হজ্জের তাওয়াফ করার সময় কাবা শরীফের শুধু দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দুইটিকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অন্য কোণকে নয়। (২) পশমহীন চামড়ার চাপ্পল পায়ে দিয়া থাকেন। (৩) আপনি জরদ (কমলা) রং ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) মক্কায় থাকাকালীন আপনি ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকেন, অথচ সকলে প্রথম তারিখেই এহ্‌রাম বাঁধে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ দুই কোণ ব্যতীত অন্য কোণকে আলিঙ্গন করিতে দেখি নাই। পশমহীন চামড়ার চাপ্পল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

ব্যবহার করিতেন এবং উহা পায়ে রাখিয়া অজু করিতেন, তাই আমি উহাকে পছন্দ করি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জরদ রং ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি; সে জন্য আমিও উহা ব্যবহার করি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (মিকাৎ-স্থান হইতে) যাত্রা আরম্ভের পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধিতে দেখি নাই। (মক্কায় অবস্থান কালে হজ্জ করিলে হজ্জের জন্য যাত্রা ৮ তারিখেই আরম্ভ হয়—মিনার দিকে; তাই ৮ তারিখের পূর্বে আমি এহ্‌রাম বাঁধি না।)

অজু ও গোসলে ডান দিকের কাজ প্রথম করিবে

১২৮। হাদীছ:—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীকন্যা জয়নাব (রাঃ) মারা গেলে পর তাঁহার গোসলদানকারিণীদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিলেন—ডান পার্শ্ব এবং অজুর অঙ্গ সমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিও।

১২৯। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেক কার্য্যেই ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন—জুতা পায়ে দেওয়া, মাথা আঁচড়ান, অজু করা গোসল করা ইত্যাদি।

নামাযের সময় হইলে পানি তালাশ করিবে

১৩০। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘটনা দেখিয়াছি। একদা আছরের নামায উপস্থিত হইল, সকলেই পানি তালাশ করিয়া হয়রান, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে সামান্য একটু অজুর পানি হাজির করা হইল; তিনি স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে অজু করিতে আদেশ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের তালুর নীচ হইতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছিল এবং উপস্থিত সকলে উহা দ্বারা অজু করিতে সমর্থ হইল।

মানুষের চুল ভিজান পানি পাক

১৩১। হাদীছ:—ইবনে ছীরীন (রঃ) আবীদাহ্ নামক অতি প্রাচীন একজন তাবেয়ীকে বলিলেন, আমার নিকট নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক আছে, আমি উহা আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। আবীদাহ্ বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক হাসিল করিতে পারিলে সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন-দৌলত পাওয়ার চেয়েও অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

১৩২। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সময়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মাথা কামাইয়াছিলেন, তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ) (আনাছের মাতার ২য় স্বামী) সর্বাগ্রে হযরতের চুল মোবারক হাসিল করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—ইমাম বোখারী (রঃ) এই দুইটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মানুষের চুল পাক, সুতরাং উহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হয় না।

যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে উহা সাত বার ধুইবে

১৩৩। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কুকুর যদি কোন পাত্রে মুখ দেয় তবে উহাকে সাতবার ধুইবে।*

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, কুকুরের মুখ দেওয়া পানি ব্যতীত অন্য আর কোনও পানি না পাইলে ঐ পানি দ্বারাই অজু করিবে।

ইমাম ইফ্ইয়ান বলেন, এই মছআলাটি ঠিক, কারণ পানি থাকাকালীন অজু করিতেই হইবে। কিন্তু কুকুরে মুখ দেওয়া পানি পাক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয় বলিয়া ঐ পানি দ্বারা অজু করিয়া পরে তায়াম্মুমও করিবে।+

১৩৪। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পূর্বকালের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—সে কোথাও যাইতেছিল; পথিমধ্যে সে পিপাসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িল। একটি কূপ দেখিতে পাইল; (কিন্তু তথায় পানি উঠাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না:) সে কূপে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। কূপ হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইল, একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাইতেছে এবং কাদা চাটিতেছে। ঐ ব্যক্তি ভাবিল, কুকুরটিরও ঐরূপ কষ্ট হইতেছে যেরূপ আমার হইতেছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কূপে অবতরণ করিল এবং তাহার চামড়ার মোজা ভরিয়া পানি লইল। কূপ হইতে উঠিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; উভয় হাতের সাহায্যে উঠিতে হয়; তাই পানি ভরা মোজা মুখে কামড় দিয়া উঠাইতে হইল। এইরূপ কষ্টে পানি কূপ হইতে উঠাইয়া তৃষ্ণাতুর কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির এই পরিশ্রম ও কার্য্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, পশুর প্রতি সদ্ব্যবহারেও ছওয়াব হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, في كل كبد رطبة اجر "প্রত্যেক জীবের উপকার করায়ই ছওয়াব আছে।"

ব্যাখ্যা :—শরীয়ত দৃষ্টে কুকুর অতিশয় ঘৃণিত জীব, উহার সংশ্রব দূষণীয় ও ক্ষতিকারক। বোখারী ও মোসলেম শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা যায় না।" আরও আছে, "যে ব্যক্তি কুকুর পালিয়া রাখিবে প্রত্যহ তাহার নেকীর এক বিরাট অংশ বরবাদ হইতে থাকিবে।" কিন্তু সে জন্য কুকুরের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করাতে ছওয়াব না

---

* মোসলেম শরীফে আরও আছে—অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দন করিয়া ধুইবে।

+ ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমামগণের মতে কুকুরের মুখ দেওয়া পানি বড় নাপাক। উহা দ্বারা অজু কি হইবে? ঐ পানি যথায় লাগিবে তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

হইবার কোন কারণ নাই। দয়াল প্রভু আল্লাহ তায়ালা পরোপকার এবং দয়া ও করুণাকে অতি ভালবাসেন; এমনকি ঘৃণার পাত্রেও উহার বিকাশ পছন্দ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধিহীন জীব কুকুর কোন ক্ষতি করিয়া ফেলিলেও উহার উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা চাই না, যদিও উহা ঘৃণিত বস্তু। নিম্নের হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করুন।

১৩৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (প্রথম অবস্থায় যখন মোসলমানদের দারিদ্রের দরুন মসজিদ সমূহে দরওয়াজা ইত্যাদি লাগাইয়া হেফাজত করার সামর্থ্য ছিল না; তখন) মসজিদের ভিতর কুকুর আসা-যাওয়া করিত এবং সে জন্য মসজিদ ধৌত করার কোন ব্যবস্থা করা হইত না। (কারণ, মসজিদের জমি পাকা-পোক্তা ছিল না, উহাতে কোন বিছানাপত্রের ব্যবস্থা ছিল না; উহাতে ছিল শুধু মরুভূমির বালু বা কাঁকর যাহা শুষ্ক হইলেই পাক গণ্য হয়।)

মল-মূত্রের দ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে?

আ'তা (রঃ) তাবেয়ী বলিয়াছেন—মল বা মূত্র দ্বার দিয়া পোকা ইত্যাদি বাহির হইলে পুনঃ অজু করিতে হইবে। জাবের (রাঃ) ছাহাবী বলিয়াছেন—নামাযের মধ্যে হাসিলে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে, অজু পুনঃ করিতে হইবে না।*

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, চুল অথবা নখ কাটিলে অজু নষ্ট হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সব সময়ই (যুদ্ধের ময়দানে) যখম ইত্যাদি নিয়া নামায পড়িতেন। বহু আলেমগণ বলিয়া থাকেন, রক্ত বাহির হইলে অজু নষ্ট হয় না।† একজন আলেম, তাঁহার থুথুর সহিত রক্ত দেখা গেল, তিনি নামায পড়িয়া লইলেন।× শিঙ্গা লাগাইলে ক্ষতস্থান ধুইলেই চলিবে, (গোসল করিতে হইবে না)।

১৩৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া নামাযের অপেক্ষা করিতে থাকে ঐ সময়টুকু তাহার জন্য নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যাবৎ সে অজু ভঙ্গ না করে। এক ব্যক্তি আবু হোরায়রা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, অজু ভঙ্গকারী কি জিনিষ? তিনি বলিলেন, (যেমন) বায়ু বাহির হওয়া।

---

* কিন্তু সশব্দে জোরে হাসিলে ইমাম আবু হানিফার মতে অজুও ভঙ্গ হইবে।

† যদি শুধু রক্ত দেখা যায় এবং উহা ক্ষতস্থান হইতে বহিয়া পড়ার মত না হয় তবে উহা দ্বারা অজু নষ্ট হইবে না, নতুবা ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

× থুথুর সহিত অতি সামান্য রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু থুথু লালবর্ণ ধারণ করে নাই তবে অজু নষ্ট হইবে না, নচেৎ ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

অজুর সময় অন্যে পানি ঢালিয়া দেওয়া

১৩৭। হাদীছ ঃ—মুগীরা (রাঃ) এক ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন ; রসুলুল্লাহ (দঃ) মল ত্যাগ করিয়া আসিয়া অজু করিলেন, মুগীরা (রাঃ) তাঁহাকে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন, মাথা মছেহ করিলেন এবং চামড়ার মোজা পায়ে ছিল, উহার উপর মছেহ করিলেন।

অজু ছাড়া কোরআন শরীফ পড়া যায়

ইব্রাহিম নাখয়ী নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন, গোসলখানায় কোরআনের আয়াত পড়া যায় এবং বিনা অজুতে কোরআন শরীফের আয়াত সম্মিলিত বিষয় লিখিতে পারা যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, গোসলখানার ভিতর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিলে তাহাকে সালাম করা যায়। অন্যথায় সালাম করা চাই না।

উল্লিখিত পরিচ্ছেদের মূল মছআলাটি ১০৯ নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিদ্রা হইতে গভীর রাত্রে উঠিয়া দশটি আয়াত তেলাওত করিতেন।

বেহুশ না হইয়া মাথায় চক্র আসায় অজু নষ্ট হইবে না

১৩৮। হাদীছ ঃ—আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, আমি আমার ভগ্নি আয়েশার নিকট আসিয়া দেখিলাম—সকলেই নামায পড়িতেছেন। ঐ সঙ্গে আয়েশা (রাঃ)ও শরীক হইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার ? তিনি سبحان الله পড়িলেন এবং হাত দ্বারা আকাশের প্রতি ইশারা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লার কুদরতের বড় নিদর্শন (প্রকাশের কারণে এই নামায) ? তিনি ইশারায় বলিলেন, হাঁ। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়াইতেছিলেন ; আমিও নামাযে শরীক হইলাম। হযরত (দঃ) অত্যধিক লম্বা নামায পড়াইলেন। (দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে) আমার মাথায় চক্র আসিয়া গেল, এমন কি আমি আমার পার্শ্বস্থ একটি মশক হইতে মাথায় পানি দিতে লাগিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামায শেষ করিলেন তখন সূর্য্যগ্রহণ ছাড়িয়া গিয়াছিল। নামাযান্তে তিনি ওয়াজ করিলেন—আল্লার প্রশংসা ইত্যাদি করার পর বলিলেন, আল্লার সৃষ্টি যত কিছু আছে এই সময়ে সব কিছু আমাকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি বেহেশত-দোযখও দেখান হইয়াছে এবং আমাকে অহী দ্বারা খবর দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে কবরের মধ্যে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে—প্রত্যেককে কবরের মধ্যে (আমার প্রতি ইশারা করিয়া) প্রশ্নও করা হইবে—এই ব্যক্তির বিষয় কি জান ? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, তিনি

আল্লার রসুল, তিনি মোহাম্মদ (দঃ) ; তুনিয়াতে আমাদের নিকট আল্লার হুকুম-আহকাম ও হেদায়েত নিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে, আরামে শুইয়া থাকুন; প্রকৃত পক্ষেই আপনি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। আর যে মৃত ব্যক্তি মোনাফেক হইবে তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইলে সে বলিবে, আমি কিছুই বুঝি নাই, অন্যান্য লোকদিগকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমিও সেরূপ বলিয়াছিলাম। তখন ঐ মোনাফেকের উপর ভীষণ আজাব আরম্ভ হইয়া যাইবে।

অজুর মধ্যে পূর্ণ মাথা একবার মছেহ করা এবং টাখ্‌না পর্য্যন্ত পা ধোয়া

বিশিষ্ট তাবেয়ী সায়ীদ এব্‌নুল-মোছাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকও পুরুষের ন্যায় মাথা (একবারই) মছেহ করিবে।

১৩৯। **হাদীছ**ঃ— এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে বলিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু কিরূপে করিতেন তাহা আপনি দেখাইতে পারেন কি? তিনি বলিলেন হাঁ, এই বলিয়া পানি আনাইলেন এবং হাতের উপর পানি ঢালিয়া দুইবার হাত ধৌত করিলেন, তারপর তিনি কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখ ধুইলেন, দুই হাত দুইবার কনুই পর্য্যন্ত ধুইলেন, তারপর দুই হাত দ্বারা একবার মছেহ করিলেন—সম্মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পেছনের দিকে গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং পিছন হইতে সম্মুখ দিকে ঐস্থান পর্য্যন্ত আনিলেন যেস্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর দুই পা টাখ্‌না পর্য্যন্ত ধৌত করিলেন।

মছআলাহঃ— নারী-পুরুষ সকলের জন্যই অজুর মধ্যে মাথা মছেহ শুধু একবারই করা চাই; বিভিন্ন হাদীছে শুধু একবার মছেহ করাই উল্লেখ আছে। সুতরাং একবারের বেশী করিবে না।

● জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার মেছওয়াক ভিজান পানি দ্বারা অজু করিতে দিতেন।

অজুর ব্যবহৃত পানি অন্য কাজে ব্যবহার করা

১৪০। **হাদীছ**ঃ—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে একদা দ্বিপ্রহরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন। তাঁহার জন্য অজুর পানি আনা হইল; তিনি অজু আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইয়া শরীরে মলিতে লাগিল। নবী (দঃ) জোহরের নামায দুই রাকাত পড়িলেন,

আছরের নামাযও (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন; নামাযের সময় তাঁহার সম্মুখে একটি লাঠি খাড়া করা হইয়াছিল।

১৪১। **হাদীছ ঃ—** আবু মুছা (রাঃ) বলেন, যেয়েররানা নামক স্থানে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, বেলাল (রাঃ)ও সঙ্গে ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরতের (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে দান করিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, এখনই উহা পূরণ করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, (সত্বরই উহা পাইবার) "সুসংবাদ গ্রহণ কর", সে উত্তর করিল, "সুসংবাদ গ্রহণ কর" একথা আপনি বহুবার বলিয়াছেন। এই উত্তরে নবী (দঃ) রাগান্বিত অবস্থায় আবু মুছা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সে সুসংবাদ ফেরত দিল, তোমরা গ্রহণ কর। আমরা আরজ করিলাম, নিশ্চয় আমরা গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি একটি পাত্র ভরিয়া পানি আনিতে বলিলেন; আমরা তৎক্ষণাৎ আনিলাম। তিনি (অজু করিতে) ঐ পাত্রের মধ্যেই দু-হাত ও মুখ ধুইলেন এবং উহার মধ্যেই কুল্লিও ফেলিলেন, (পানি বেশী ছিল না।) তারপর বলিলেন, তোমরা দুইজন এই পানি পান কর এবং মুখ ও সীনার উপর ঢাল; আর (ইহ-পরকালের সুখ শান্তির) সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমরা ঐরূপ করিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-ছালমা (রাঃ) পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, তোমাদের মাতার (তথা আমার) জন্য এই পানি একটু রাখিও; আমরা রাখিয়া দিলাম।

এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু করাকালে ছাহাবীগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইবার জন্য ভীষণ ভীড় করিতেন।

১৪২। **হাদীছ ঃ—**ছায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আমাকে নিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! এ আমার ভাগিনা, অসুস্থ। নবী (দঃ) আমার মথার উপর হাত বুলাইলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এমতাবস্থায় তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে-নবুওত দেখিতে পাইলাম—পাখীর ডিম্বের সমান।

স্ত্রীর সঙ্গে এক পাত্রে বা কোন মহিলার ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা

ওমর ফারুক (রাঃ) গরম পানির দ্বারা অজু করিয়াছেন এবং তিনি দরকার বশতঃ এক নাছরানী মেয়েলোকের ঘর হইতে পানি লইয়া অজু করিয়াছিলেন।

১৪৩। **হাদীছ ঃ—**ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে অজু করিয়া থাকিত। (অর্থাৎ স্ত্রীলোক কোন পাত্রের পানি দ্বারা অজু করিলে অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য অজুর অনুপযোগী বিবেচিত হইবে না।)

অজুর ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে

১৪৪। হাদীছ :— জাবের (রা:) বলেন আমি অসুস্থ হইয়া বেহুশ অবস্থায় ছিলাম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং অজু করিয়া ব্যবহৃত পানি আমার উপর ঢালিয়া দিলেন আমার হুশ ফিরিয়া আসিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মীরাস কে পাইবে? আমার মাতা-পিতা বা কোন ছেলে-মেয়ে নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না। ঐ সময়ই মীরাসের আয়াত নাযিল হইল।

পাথরের, কাঠের বা পিতলের পাত্রে অজু করা

১৪৫। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের মজলিস সময়) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল; যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্য বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু লোক বাকী থাকিল, তাহাদের অজুর ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পাথরের একটি ছোট পাত্রে পানি হাজির করা হইল। পাত্রটি এতই ছোট ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার ভিতরে হাত ঢুকাইলেন, কিন্তু হাত মেলিতে পারিলেন না। তাঁহার অঙ্গুলির নীচ হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতে লাগিল; সকলেই ঐ পানি দ্বারা অজু করিল। আনাছ (রা:)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, আমরা আশি জন কিংবা আরও অধিক ছিলাম।

১৪৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে তশরীফ আনিলেন, আমরা একটি পিতলের পাত্রে পানি হাজির করিলাম। হযরত (দ:) ঐ পানি দ্বারা অজু করিলেন। মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করিলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত দুই দুইবার ধুইলেন এবং মাথা সম্মুখ হইতে পিছনের দিক, পিছন হইতে সম্মুখের দিক মছেহ করিলেন, তারপর পা ধৌত করিলেন।

এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা

১৪৭। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রায় চারি সের পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করিতেন এবং প্রায় এক সের পানি দ্বারা অজু করিতেন।

১৪৮। হাদীছ :—সায়াদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) ওমর (রা:)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই; সায়াদ (রা:) যাহা বর্ণনা করেন তাহা অন্য কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না।

চামড়ার মোজার উপর মাছেহ করা*

১৪৯। হাদীছ :— আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে চামড়ার মোজার উপর এবং পাগড়ীর উপর মছেহ করিতে দেখিয়াছি ❁

১৫০। হাদীছ :—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক ছফরে ছিলাম, তাঁহাকে অজু করাইবার সময় আমি তাঁহার চামড়ার মোজা খুলিবার জন্য উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন, মোজা খুলিতে হইবে না, আমি অজু অবস্থায় ইহা পায়ে দিয়াছিলাম, এই বলিয়া হযরত (দঃ) মোজার উপর মছেহ করিলেন।

গোশত ইত্যাদি খাইলে অজু নষ্ট হয় না

আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ গোশত খাইয়া নূতন অজু করিতেন না। (গোশত খাওয়ার পুর্বের অজুতেই নামায পড়িতেন।)

১৫১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন বকরীর গোশত খাইলেন এবং নূতন অজু না করিয়াই নামায পড়িলেন।

১৫২। হাদীছ :— আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বকরীর একটি ভুনা করা আস্তা রান হইতে ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইতেছিলেন, তাঁহাকে নামাযের জন্য খবর দেওয়া হইলে তিনি উহা ফেলিয়া নামাযের জন্য চলিয়া গেলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৩। হাদীছ :—মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বকরীর রানের গোশত খাইয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করেন নাই।

ছাতু, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইয়া কুলি করা আবশ্যক, পুনরায় অজু করিতে হইবে না+

১৫৪। হাদীছ :—সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধে যাইবার সময় উহার নিকটবর্তী ছাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িলেন। নামাযান্তে প্রত্যেককেই নিজ নিজ

---

* আমাদের দেশীয় সুতি, নাইলন বা পশমী মোজার উপর মছেহ করা কোন প্রকারেই জায়েয নহে; তাহা করা হইলে অজু শুদ্ধ হইবে না এবং নামাযও হইবে না। চামড়ার মোজার উপর মছেহ করাও অনেকগুলি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হয়।

❁ মাথার যে এক চতুর্থাংশ মছেহ করা ফরজ তাহা মাথার উপর অবশ্যই করিতে হইবে, বাকী সম্পূর্ণ মাথা মছেহ করা যাহা মোস্তাহাব তাহা পাগড়ীর উপর হইতে পারে।

+ উক্ত দুইটি শিরোনাম এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে, অগ্নিস্পর্শিত বস্তু খাইলে বা পান করিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়; সুতরাং এইখানে দেখানো হইল যে, প্রকৃত পক্ষে অজু ভঙ্গ হয় না। হাঁ—পুনরায় অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব।

খাবার বস্তু বাহির করিতে বলিলেন। সকলেই ছাতু আনিল এবং সব এক সঙ্গে পানি দ্বারা গোলা হইল; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খাইলেন এবং সকলেই খাইল। তারপর হযরত (দঃ) মাগরিবের নামাযের জন্য তৈয়ার হইলেন এবং শুধু কুল্লি করিয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুগ্ধ পান করিয়া কুল্লি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, ইহা তৈলাক্ত বস্তু। (সেই জন্য উহা পান করিয়া কুল্লি করা আবশ্যক)।

নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয়, তন্দ্রায় অজু নষ্ট হয় না

১৫৬। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও যদি নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে তবে নামায স্থগিত রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিৎ। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় নামায পড়িলে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এমনকি এস্তেগফার করিতে অর্থাৎ গোনাহ মাফ চাহিতে যাইয়া হয় তো বদ-দোয়ার শব্দ মুখে আসিয়া যাইবে। (কারণ তন্দ্রাবস্থায় পূর্ণ হুশ-জ্ঞান বহাল থাকে না।)

১৫৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও তন্দ্রা আসিলে শুইয়া পড়া উচিৎ। (পূর্ণ হুশ ফিরিয়া আসে এবং কি বলিতেছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে—এইরূপ অবস্থা লইয়া নামায পড়া চাই।

মছআলাহ ঃ—যদি বসা বা দাঁড়ান অবস্থায় তন্দ্রা আসিয়া শুধু মাথা নড়াচড়া করে কিম্বা নামাযে রুকু সেজদা অবস্থায় তন্দ্রা আসে, কিন্তু হাত-পা ঢিলা হইয়া রুকু সেজদার ছুন্নত আকার ভাঙ্গিয়া না পড়ে তবে অজু নষ্ট হইবে না।

শোয়া অবস্থায় তন্দ্রা আসিলে অজু ভঙ্গ হইবে। অবশ্য যদি এত হাল্কা তন্দ্রা হয় যে, নিকটের কথাবার্তা অধিকাংশই শুনিয়া ও বুঝিয়া থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে না। কিন্তু অনেক সময় শোয়া অবস্থায় মানুষ তাহার তন্দ্রাকে হাল্কা মনে করে, অথচ তাহার উপর এমন মুহূর্তও গিয়াছে যখন তাহার তন্দ্রা গাঢ় হইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময় ঐরূপ ছিল বলিয়া উহা তাহার লক্ষ্যে আসে নাই—এরূপ ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গ হইবে; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। (শামী, ১—১৩২)

অজু ভঙ্গ না হইলেও পুনঃ নূতন অজু করা*

১৫৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের সময়ই অজু করিতেন। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা (ছাহাবীগণ) কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা সাধারণতঃ এক অজু ভঙ্গ হইলেই নূতন অজু করিতাম।

(নোটটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা হইতে সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ

১৫৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি বাগানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় তিনি দুইটি কবরের মধ্য হইতে কবরবাসীদের বিকট চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন; তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ঐ কবরবাসীদিগকে আজাব করা হইতেছে; তাহা যদিও কোন কঠিন কাজের জন্য নয়, তবে গোনাহ অতি বড় ছিল। এক ব্যক্তি প্রস্রাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না।+ দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখোরী (গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে লাগানো-কাজ) করিত। এই বলিয়া তিনি একটি খেজুর ডালা দুই খণ্ড করিয়া দুই কবরে গাড়িয়া দিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, এরূপ কেন করিলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি ডালা দুইটি শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের আজাব আল্লার তরফ হইতে লাঘব করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রস্রাবের পরে পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। (৩৫ পৃঃ ১১৭ হাঃ)

মধ্যভাগে কাহারও প্রস্রাব বন্ধ করাইবে না

১৬০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বেদুইনকে দেখিলেন, মসজিদের কিনারায় প্রস্রাব করিতেছে; আর লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে এবং তাহার প্রতি ছুটিয়া যাইতেছে। নবী (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না, তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়। সে প্রস্রাব শেষ করিলে পর নবী (দঃ) এক ডোল পানি আনাইয়া ঐ প্রস্রাবের উপর বহাইয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হঠাৎ মধ্যভাগে প্রস্রাব বন্ধ করাইলে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব বন্ধের রোগ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সে ঐ অবস্থায় উঠিয়া দৌড়িলে মসজিদের অধিক স্থান নাপাক হইবে।

মসজিদের খালি মাটিতে প্রস্রাব করা হইলে

১৬১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক বদ্দু (বেদুইন) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আসিয়া এক কোণে প্রস্রাব করিতে লাগিল; ইহাতে সকলেই তাহাকে ধমক দিতে আরম্ভ করিল। নবী (দঃ) তাহাদিগকে এরূপ করা

---

* এক অজু দ্বারা কোনও এবাদত না করিয়া নূতন অজু করায় বাধা আছে, তবে হাঁ—কোন এবাদত করার পর ঐ অজু নষ্ট না হইলেও নূতন অজু করা যায়, বরং নূতন নূতন অজু দ্বারা প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পড়া উত্তম। তবে নূতন অজু না করিয়া পুরাতন অজু দ্বারাও নামায পড়া যায়; ১৫৪নং হাদীছে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

+ প্রস্রাবের পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার সরাসরিরূপে যদিও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তথাপি বর্তমানে নানাপ্রকার দৈহিক ও স্নায়বিক দুর্বলতার যুগে এই হাদীছের সতর্কবাণীর দ্বারাই উহা ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

হইতে বিরত রাখিলেন এবং বলিলেন, এই অবস্থায় তাহাকে বাধা দিও না। প্রস্রাব শেষ করার পর তিনি বেদুইনটিকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মসজিদ-সমূহ আল্লার জেকের, নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের স্থান; ইহাতে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করার অবকাশ নাই। অতঃপর ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, এক ডোল পানি আনিয়া এই স্থানে ঢালিয়া দাও। তোমরা (মুসলিম জাতি) জগদ্বাসীর প্রতি উদারতার আদর্শরূপে আবির্ভূত হইয়াছ; কর্কশ ব্যবহারের জন্য নয়। তারপর এক ডোল পানি ঐ স্থানে বহাইয়া দেওয়া হইল।

শিশুর প্রস্রাবও ধৌত করিতে হইবে

১৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি একটি কচি শিশু লইয়া হাজির হইল। (হযরত (দঃ) শিশুটিকে কোলে লইলেন) সে হযরতের কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া দিল। হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং প্রস্রাবের স্থানটুকুতে পানি ঢালিয়া দিলেন।

১৬৩। হাদীছ ঃ—উম্মে-কায়স নাম্নী মহিলা দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। নবী (দঃ) শিশুটিকে কোলে বসাইলেন, সে তাঁহার কাপড়ে প্রস্রাব করিল। তিনি পানি আনাইয়া মামুলীভাবে উহা ধুইলেন। অধিক তৎপরতার সহিত ধুইলেন না।

প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে নিকটে রাখিয়া প্রস্রাব করা

১৬৪। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। তিনি মহল্লার আবর্জনা ফেলিবার স্থানের নিকটে আসিয়া একটি দেওয়ালমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন। আমি দুরে সরিয়া যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে ইশারা করিয়া ডাকিলেন; আমি নিকটে হাজির হইয়া তাঁহার (পিঠের প্রতি পিঠ দিয়া বিপরীতমুখী) পায়ের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া রহিলাম। (সম্মুখ দিকের পর্দা ছিল দেওয়াল এবং পিছন দিকে হোযায়ফা (রাঃ)কে দাঁড় করাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্দার ব্যবস্থা করিলেন; দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার দরুণ কাপড় একটু বেশী উঠিবে।)

(ওজর বশতঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা

১৬৫। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) প্রস্রাবের সময় অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। (এমনকি প্রস্রাবের সূক্ষ্ম ছিটা হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি বোতলে প্রস্রাব করিতেন।) হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, সতর্কতা অবলম্বনের সীমা অতিক্রম না করাই উত্তম। আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি, লোকদের আবর্জনা ফেলিবার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন।

(উপরের হাদীছ এবং এই হাদীছ উভয় হাদীছে হযরতের একই ঘটনা।)

ব্যাখ্যা :—ঐ একবারই মাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন বিশেষ ওজর বশতঃ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন; নতুবা তিনি সর্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও নাছায়ী শরীফের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ এরূপ বলে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেন, তবে সে মিথ্যাবাদী। রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও ইবনে মাজা শরীফের আর একটি হাদীছে আছে—ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—হে ওমর! দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিও না। অতঃপর আমি আর দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি নাই। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা ইসলামী রীতি ও সভ্যতার পরিপন্থী।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই ১৬৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, অন্যের জায়গায় বিনা অনুমতিতে প্রস্রাব করা যায় যদি ঐরূপ জায়গা হয় যেখানে প্রস্রাব করায় সাধারণতঃ আপত্তি হয় না।

কোন স্থানে রক্ত লাগিলে উহা ধুইতে হইবে

১৬৬। হাদীছ :—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি নারী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হায়েজের রক্ত কাপড়ে লাগিলে কি করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথমে উহাকে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ফেলিবে; তারপর ঐ স্থানটি পানি দ্বারা মর্দন করিয়া ধৌত করিবে; এরূপ করিলে ঐ কাপড় দ্বারা নামায পড়িতে পারিবে।

কাপড়ে বীর্য্য লাগার স্থান ধুইয়া শুষ্ক হওয়ার পূর্বে নামায পড়া

১৬৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাপড় হইতে বীর্য্য ধুইয়া ফেলিতাম এবং ঐ ভিজা স্থান শুষ্ক হইবার পূর্বেই নবী (দঃ) ঐ কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িতে যাইতেন।

উট, বকরী ইত্যাদি হালাল জানোয়ারের প্রস্রাব*

মছআলাহ :— অধিকাংশ ইমামগণের মতে হালাল পশুর মূত্রও উহার মলের ন্যায় নাপাকই বটে, অতএব উহা হারাম পরিগণিত; খাদ্যে বা পানীয়ে উহার কিঞ্চিৎও যদি

---

* এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীছ সমূহের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় না যে, হালাল জানোয়ারের মল-মূত্র পাক। এতদ্ভিন্ন হাদীছে এরূপ বিবরণও আছে, যদ্দ্বারা হালাল ও হারাম সমস্ত জানোয়ারেরই মল ও মূত্র উভয়ই নাপাক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মিশ্রিত হয় তবে সেই খাদ্য ও পানীয় হারাম নাপাক হইয়া যাইবে। অবশ্য উহা ঔষধরূপে ব্যবহার সম্পর্কে বিধান উহাই যাহা হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্য শরীয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঐ মল-মূত্র যদি মাটিতে পড়ে এবং সেই মল-মূত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া মাটি শুষ্ক হইয়া যায়, মল-মূত্রের রং বা গন্ধ মাটির মধ্যে মোটেই না থাকে তবে সেই মাটির উপর কোন বিছানা ছাড়াও নামায শুদ্ধ হইবে। আর যদি মল-মূত্রের অস্তিত্ব বা রং-গন্ধ মাটিতে বিদ্যমান থাকে তবে সেই মাটি নাপাক; উহার উপর বিছানা ছাড়া নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য উহার উপর পাক বিছানা বিছাইয়া নিলে বিছানার উপর নামায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু নাপাক সমাবেশিত স্থানে নামায পড়া মকরূহ (শামী, ১—৩৫৩ দ্রষ্টব্য)। অতএব অতি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এইরূপ স্থানে নামায না পড়িয়া অন্যস্থানে নামায পড়াই শ্রেয় ও কর্তব্য।

উট-বকরি ইত্যাদি হালাল পশুর মল-মুত্র এবং ঘোড়ার শুধু মুত্র সম্পর্কে এবং তাহাও কেবল কাপড়ে বা শরীরে লাগিবার ব্যাপারে একটি বিশেষ বিবরণ আছে যে—উহা এমন নাপাক যাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় নাজাছাত-খফিফা বলা হয়। এই নাপাক শরীরের যেই অঙ্গে লাগে; যেমন—হাতে, পায়ে, মাথায় বা পিঠে। কিম্বা কাপড়ের যেই অংশে লাগে; যেমন—হাতায় বা সম্মুখের বা পেছনের অংশে; সেই অঙ্গের বা অংশের চতুর্থাংশের কম পরিমাণের হইলে উহা না ধুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে। অবশ্য উহাকে না ধুইয়া নামায পড়িতে থাকিলে নামায মকরুহ হইবে (বেহেশতী জেওর, ২—২)। উহা ধুইয়া ফেলা উত্তম (শামী, ১—২৯১)।

ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) একবার ছফরের সময় রাস্তায় ডাক বিভাগের বাংলায় নামায পড়িলেন; তথায় ডাকবাহী ঘোড়া বাঁধা হইত; (সেখানে উহার মল-মুত্র থাকা সম্ভব ছিল; এতদসত্ত্বেও তিনি ঐস্থানে নামায পড়িলেন।) নিকটেই খোলা ময়দান ছিল, তথায় যাওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; বলিলেন, এখানে কিম্বা ওখানে নামায পড়া একই বরাবর।

১৬৮। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া প্রথম প্রথম—মসজিদ তৈয়ারীর পূর্বে (দরকার বশতঃ সময় সময়) বকরী রাখিবার ঘরেও নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যাঃ—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আজকাল রেলগাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমন করার সময় অনেক লোককে দেখা যায় যে, কোনও উত্তম উপযুক্ত স্থান না পাওয়ার অজুহাতে নামায কাজা করিয়া ফেলে; ইহা শয়তানী ধোকা মাত্র। কারণ, উক্ত হাদীছ ও ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবস্থা ভেদে যখন যেরূপ

স্থান পাওয়া সম্ভব হয় তখন সেখানেই নামায পড়িতে দ্বিধা করা উচিত নহে, যাবৎ স্থানটি নাপাক প্রমাণিত না হয়।

পানি, ঘৃত ইত্যাদিতে নাপাক পড়িলে ?

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, নাপাক বস্তুর দ্বারা পানির স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তিত না হইলে পানি নাপাক হইবে না।❋ তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি বহু আলেমকে দেখিয়াছি—তাঁহারা মৃত হাতী প্রভৃতির হাড্ডি দ্বারা চিরুণী, তৈলের বাটি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতেন।

ইবনে ছীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, মৃত হাতীর দাঁতের ব্যবসা করা দুষণীয় নয়। ইমাম হাম্মাদ বলিয়াছেন, মৃত জানোয়ারের পশম পাক।

১৬৯। হাদীছ ঃ—মায়মুনা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঘৃতের মধ্যে ইঁদুর পড়িলে কি করিতে হইবে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, ইঁদুরটি ফেলিয়া দিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের ঘৃত ফেলিয়া দাও, বাকী ঘৃত খাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইহা জমাট ঘৃতের মছআলাহ্; উক্ত মছআলা কেবলমাত্র জমাট ঘৃতের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা, তরল ঘৃতের চারি পার্শ্ব হইতে ঘৃত ফেলিবার উপায় নাই।

অপ্রবাহিত বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা

১৭০। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বদ্ধ পানিতে কেহ প্রস্রাব করিও না কেননা, উহাতে গোসল ইত্যাদি করিতে হইবে।

নামাযরত অবস্থায় শরীরে নাপাক বস্তু পতিত হইলে ❋

১৭১। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কাবা শরীফের নিকট নামায পড়িতেছিলেন। দুষ্ট আবু জাহ্‌ল

❋ এ বিষয়ে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, পানি কম হইলে সামান্যতম নাপাকির দরুনও উহা নাপাক হইয়া যাইবে, যদিও নাপাক বস্তুর কোন নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া থাকে। অবশ্য পানি বেশী বা প্রবাহমান হইলে সে স্থলে নাপাক বস্তুর নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত পানি নাপাক হইবে না।

• আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ, মালেক প্রমুখ ইমামগণের সকলের মতই এই যে, নামাযের সময় নাপাকির সংস্পর্শন ঘটিলেই নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে, ঐ নাপাকি দূর করিয়া পুনরায় নামায পড়িতে হইবে। কারণ হাদীছের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে—"পাক হওয়া ব্যতীত নামায হইতে পারে না।" কিন্তু এখানে উল্লেখিত হাদীছে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে উহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ইহার পর শরীয়তের হুকুম-আহকামে অনেক রদ-বদল হইয়াছে, যেমন—প্রথমে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল, পরে উহা মনছুখ (রহিত) হইয়াছে।

ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা নিকটেই বসিয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, অমুক মহল্লায় আজ উট জবেহ করা হইয়াছে; ঐ উটের নাড়িভুঁড়িগুলি আনিয়া মোহাম্মদ যখন সেজদায় যায়, তখন তাহার পিঠের উপর কে রাখিয়া দিতে পারিবে? তাহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় হতভাগা ও দুষ্ট প্রকৃতির যে লোকটি ছিল, সে ঐ অপকর্মের জন্য অগ্রণী ও উদ্যত হইয়া অবিলম্বে উটের নাড়িভুঁড়ি লইয়া আসিল এবং যখন দেখিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) সেজদায় গিয়াছেন, তখন উহা তাঁহার পিঠের উপর রাখিয়া দিল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিতেছিলাম, কিন্তু উহাতে বাধা দানের কোন শক্তি ও সুযোগ আমার ছিল না। হতভাগারা ঐ দুষ্কর্ম করিয়া হাসিয়া একে অন্যের উপর লুটোপুটি খাইয়া পড়িতেছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখনও সেজদাতেই ছিলেন, (জুলুমের দৃশ্য এত বড় ভারী বোঝা হইতে তিনি) মাথা উঠাইতে ছিলেন না। ফাতেমা যোহরা (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং আঁতুড়ীটা হযরতের পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! কোরায়েশদিগকে ধ্বংস কর; এইরূপে তিনবার অভিশাপ দিয়া কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! আবু জাহ্‌লকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, শায়বা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, ওলীদ ইবনে ওৎবাকে ধ্বংস কর, উমাইয়া ইবনে খালাফকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে আবি মোয়াইতকে ধ্বংস কর, (ওমারাহ্ ইবনে ওলীদকে ধ্বংস কর। এই) সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন ৭ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহাদের নামে অভিশাপ করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে তাহাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংসাবস্থায় একটি গর্তে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি, যেখানে অন্যান্য কাফেরদেরও লাশ স্তুপীকৃত ছিল।

থুথু ও কফ লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে না

১৭২। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখস্থ দেওয়ালের মধ্যে কফ দেখিতে পাইয়া অত্যধিক রাগান্বিত হইলেন এবং স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি নামায অবস্থায় স্বীয় পালনকর্তার সহিত মোনাজাত ও কথাবার্তায় রত হয় এবং তাহার প্রভু-পওয়ারদেগার যেন সম্মুখে রহিয়াছেন। অতএব

---

৭ ঐ সকল ব্যক্তি ইসলামের প্রধান শত্রু ও উক্ত ঘটনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু নামাযের মধ্যে বাধাদান ও বিরক্ত করায় তিনি প্রাণে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। নতুবা সর্বদাই তাঁহাকে উৎপীড়ন করা হইত; কিন্তু তিনি এত কঠোর আর কখনও হন নাই।

কেবলার দিকে কখনও থুথু ফেলিবে না। থুথু ফেলার বিশেষ প্রয়োজন হইলে বাম দিকে বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে✲ কিম্বা (চাদর ইত্যাদি) কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া মলিয়া দিবে। (৫৮ পৃঃ)

কোন প্রকার মাদকীয় বস্তু দ্বারা অজু হইবে না

১৭৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত পানীয় বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকিবে উহা সবই হারাম।

প্রয়োজনে নারী স্বীয় পিতার শরীর স্পর্শ করিতে পারে

আবুল আলীয়া নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী তাঁহার পায়ে ব্যথা হইলে তিনি স্বীয় পুত্র-কন্যাগণকে আদেশ করিলেন, আমার পা মালিশ কর, ব্যথা হইতেছে।

১৭৪। হাদীছ ঃ— ছাহাবী ছাহ্ল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—(ওহোদ রণাঙ্গণে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আহত হইবার পর তাঁহাকে কি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল ? তিনি বলিলেন, এবিষয়ে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এখন আর কেহ নাই। আলী (রাঃ) ঢালের মধ্যে করিয়া পানি আনিতেছিলেন এবং ফাতেমা যোহরা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, রক্ত বন্ধ হইতেছে না, তখন চাটাই পোড়াইয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে ভরিয়া দেওয়া হইল।

মেসওয়াক করা

১৭৫। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি মেছওয়াক করিতেছিলেন এবং (জিহ্বা পরিষ্কার করিতে মেছওয়াক জিহ্বার উপর চালানোর দরুণ) "ওঃ ওঃ"—শব্দ করিতেছিলেন।

১৭৬। হাদীছ ঃ— হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া মেছওয়াক দ্বারা মুখ ভালরূপে পরিষ্কার করিতেন।

১৭৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মেছওয়াক করিতেছি; এমন সময় দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন অধিক বয়স্ক ও অপর জন অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক। আমি আমার মেছওয়াকখানা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিকে দিলাম। আমাকে আদেশ করা হইল মেছওয়াকটি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে দান করুন। (সে মুরব্বি, তাই মেছওয়াকের ন্যায় সম্মানিত বস্তু তাহারই প্রাপ্য। নবীর স্বপ্ন অহী; যদ্দারা মেছওয়াক সম্মানিত বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইল।)

✲ যেই মসজিদের জমিন পাকা নয় এবং বিছনা ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই সেইরূপ স্থানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

অজু অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত

১৭৮। হাদিছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তুমি শয়নের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিয়া লও, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়া পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ *

এইরূপ শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার জন্য সুসংবাদ যে, পয়গাম্বরগণের সুন্নত তরীকার উপর তাহার মৃত্যু হইল, কিন্তু শর্ত এই যে, উক্ত দোয়াটি নিদ্রা-পুর্বের শেষ বাক্য হওয়া চাই। (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর দুনিয়াদারীর কোন কথা নিদ্রার পুর্বে বলিবে না।) বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—এই দোয়াটি শিক্ষা করিয়া আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইতেছিলাম এবং بِنَبِيِّكَ এর স্থলে আমি بِرَسُوْلِكَ পড়িলাম। নবী (দঃ) বাধা দিয়া বলিলেন—بِنَبِيِّكَ বল (৯৩৪ পৃঃ)।

দোয়াটির অর্থ :—হে আল্লাহ! আমার জীবনকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, আমার গতি ও লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিলাম, আমার সর্বস্ব তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম এবং তোমার নেয়ামতের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত ও তোমার আজাবের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া তোমারই উপর ভরসা স্থাপন করিলাম; তোমার আজাব হইতে নাজাত ও রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থল তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রেরিত কিতাব এবং তোমার নিয়োজিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

---

* দোয়াটির উচ্চারণ এই :—আল্লাহুম্মা আছলামতু নফ্‌ছী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা, ওয়া-ফাওয়াযতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আল্‌জা'তু জাহ্‌রী ইলাইকা, রাগবাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা; লা-মালজাআ ওয়ালা-মানজাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমানতু বে-কিতাবেকাল্লাজী আনযাল্‌তা ওয়া বেনাবিয়্যে কাল্লাযী আরছাল্‌তা।

— —(০)— —

চতুর্থ অধ্যায়

গোসল

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে দুই স্থানে জানাবাতের গোসলের আদেশ বিশেষ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ছুরা নেছায় এবং ছুরা মায়েদায়। বোখারী (রঃ) প্রথমে ছুরা মায়েদার (৬ পারা ৬ রুকু) আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ....

(নিম্নস্তরের অপবিত্রতা দুর করার জন্য মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মছেহ করা, এইরূপে অজুর বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মোমেনগণ !) "আর যদি তোমরা জানাবাত (শুক্রস্খলনে অপবিত্রতা) যুক্ত হইয়া পড় তবে তোমরা (সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতঃ গোসল করিয়া) বিশেষরূপে তাহারাত ও পবিত্রতা হাসিল কর। অবশ্য যদি তোমরা রুগ্ন হও বা পথিক হও এবং তদবস্থায় অজু বা গোসলের আবশ্যকতার সম্মুখীন হও—অথচ পানি ব্যবহারে বা সংগ্রহে অক্ষম হইয়া পড়, তবে মুখ ও হাত মছেহ করতঃ তায়াম্মুম করার জন্য মাটি ব্যবহার কর।" উক্ত আদেশাবলী দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

অর্থাৎ :—(এ সমস্ত—অজু, গোসল ও তায়াম্মুম ইত্যাদির আদেশ জারি করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কষ্ট-ক্লেশের বোঝা চাপাইতে চান না, বরং তোমাদিগকে পাক-পবিত্র করার ইচ্ছা করেন এবং (দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ) নেয়ামত (তথা দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণ করিতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক। ছুরা নেছার (৫ পারা ৪ রুকু) আয়াতটি এই—

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

"জানাবাত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তীও হইবে না যাবৎ গোসল না কর।"

গোসলের পূর্বে অজু করা

১৭৯। হাদীছঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল করিতে প্রথমে দুই হাত ধৌত করিতেন, তারপর নামাযের অজুর ন্যায় অজু

করিতেন, তারপর হাত পানিতে ভিজাইয়া উহা দ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করিতেন। যখন মনে করিতেন যে, চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজিয়াছে তখন তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন।

এস্থানে ১৮৬ নং হাদীছখানাও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল করা

১৮০। হাদীছ ঃ— উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে গোসল করিতাম; আমরা একের পর অন্যে উহাতে হাত প্রবেশ করিয়া পানি উঠাইতাম। পাত্রটি কাঠের তৈরী ছিল যাহার মধ্যে প্রায় ১২ সের পানি সঙ্কুলান হইত।

১৮১। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) এক সঙ্গে একই পাত্র হইতে গোসল করিতেন।

গোসলের পানির পরিমাণ

১৮২। হাদীছ ঃ— আবু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক দুধ-ভাই, আয়েশার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইলাম। দুধ-ভাই আয়েশা (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। আয়েশা (রাঃ) প্রায় চার সের পরিমাণের একটি পাত্র আনিলেন এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া গোসল করিলেন। মাথার উপর হইতে পানি ঢালিলেন।

১৮৩। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ)কে গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন, প্রায় চার সের পানি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বলিল, আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলিলেন, অতি মহান ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল যিনি তোমার চেয়ে বহু উর্দ্ধে ছিলেন, তাঁহার মাথার চুলও তোমার চেয়ে বেশী ছিল (অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। অতঃপর জাবের (রাঃ) একটি চাদরে আবৃত হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন।

গোসলের সময় তিনবার মাথায় পানি ঢালা

১৮৪। হাদীছ ঃ— জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই হাত দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইতেন; "আমি এই-ভাবে মাথার উপর পানি ঢালিয়া থাকি।"

১৮৫। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বলেন, হাসান নামক ব্যক্তি তাঁহাকে ফরজ গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমার মাথায় চুল অধিক। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের চুল তোমার চেয়েও বেশী ছিল।

সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢালিয়া গোসল করা

১৮৬। হাদীছঃ— মায়মুনা (রাঃ) বলেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য পানি রাখিলাম এবং পর্দার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম; নবী (দঃ) ফরজ গোসল করিলেন। প্রথমে তিনি উভয় হাতে পানি ঢালিয়া দুই বা তিনবার উভয় হাত ধুইলেন, তারপর ডান হাতে পানি উঠাইয়া উহা বাম হাতে লইয়া গুপ্তস্থান এবং যে স্থানে নাপাকি লাগিয়াছে উহা পরিষ্কার করিলেন। তারপর ঐ হাত মাটির সঙ্গে ঘষিয়া ধৌত করিলেন, তারপর কুলি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করিলেন—তথা নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিলেন; পা ধোয়া বাকী রাখিলেন।* অতঃপর তিন বার মাথা ধৌত করিলেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিলেন এবং ঐ স্থান হইতে সরিয়া দুই পা ধুইলেন। তাঁহাকে একটি রুমাল দেওয়া হইল, কিন্তু উহার দ্বারা তিনি শরীর মুছিলেন না, হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলিয়া গেলেন। (৩৯ ও ৪২ পৃঃ)

দুধের হাঁড়ি ইত্যাদি পাত্রে পানি লইয়া গোসল করা

অর্থাৎ—যদি কোন পাত্র পাক জিনিষের গন্ধযুক্ত হয়, যেমন দুধের হাঁড়ি; উহাতে পানি লইয়া গোসল করা যায়।

১৮৭। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করিতেন তখন দুধের হাঁড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন পাত্রে পানি লইয়া ঐ পানি হাতে উঠাইয়া প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে, দ্বিতীয়বার মাথার বাম পার্শ্বে, তৃতীয়বার দুই হাতে পানি উঠাইয়া মাথার মধ্যভাগে ঢালিতেন।

হাতে নাপাকী না থাকিলে হাত ধুইবার পূর্বে পানির পাত্রে হাত দেওয়া যায়; সন্দেহ হইলে হাত ধুইবে

ইবনে ওমর (রাঃ) ও বরা (রাঃ) নামক ছাহাবীদ্বয় হাত ধোয়া ব্যতিরেকে পানির পাত্রের ভিতরে হাত দিয়া পানি উঠাইয়া অজু করিয়াছেন।

ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ফরজ গোসলের পানির ছিটাকে দূষণীয় মনে করিতেন না।

১৮৮। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসলের সময় (হাত নাপাকির সন্দেহ হইলে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে) ভালরূপে হাত ধৌত করিয়া লইতেন।

১৮৯। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে একই পাত্র হইতে (হাত দ্বারা পানি উঠাইয়া) জানাবাতের গোসল করিতেন।

---

* গোসলের স্থানটি সুব্যবস্থার ছিল না, তাই গোসল শেষে সেখান হইতে সরিয়া পা ধুইলেন।

একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমের পর গোসল করা

১৯০। হাদীছ ঃ—কাতাদাহ (রঃ) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) (সময়ে) একই রাত্রে বা দিনে পর পর (মধ বর্তী গোসল ব্যতিরেকে) এগার বিবির সহিত সঙ্গম করিতেন (নয় জন বিবাহ সূত্রের, দুই জন শরীয়তী স্বত্বাধিকার সূত্রের)।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত ছিলেন।

ফরজ গোসলের পুর্বেকার সুগন্ধির নিদর্শন বাকি থাকায় ক্ষতি নাই

১৯১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সফরে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি; তিনি স্ত্রীগণের সহবাসে গোসল করিয়া এহরাম বাঁধিয়াছেন—ঐ সময় শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল।

১৯২। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (গোসলের পুর্বে ব্যবহৃত) সুগন্ধির নিদর্শন (গোসলের পর) এহ্‌রাম অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথায় এখনও আমার নজরে ভাসে।

ফরজ গোসল ভুলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে স্মরণ হওয়া মাত্রই বাহির হইয়া আসিবে

১৯৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নামাযের একামত বলা হইল, সকলে দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিয়া বাঁধিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িবার জন্য আসিলেন। তিনি যখন মোছাল্লায় (জায়নামাযের) উপর দাঁড়াইলেন (নামায আরম্ভের পূর্বক্ষণে) হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ফরজ গোসল করেন নাই। তিনি সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোসল করিয়া আসিলেন। তাঁহার মাথার পানি তখনও ফোটায় ঝরিতেছিল। এমতাবস্থায়ই তিনি নামায আরম্ভ করিলেন এবং আমরা সকলেই তাঁহার সহিত নামায পড়িলাম।

প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধৌত করিবে

১৯৪। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ফরজ গোসল করিতে মাথায় তিনবার পানি ঢালিয়া প্রথমে ডান হাত দ্বারা মাথার ডান পার্শ্ব এবং তারপর বাম হাত দ্বারা বাম পার্শ্ব ধৌত করিতাম।

নির্জন গোসলে উলঙ্গ হওয়া যায়; তাহা না করাই শ্রেয়ঃ

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানবের জন্য আল্লার প্রতি লজ্জা শরমে তৎপর হওয়া লোকদের হইতে লজ্জা শরম করা অপেক্ষা অধিক বড় কর্তব্য।

১৯৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলরা একে অন্যের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত, মুছা (আঃ) কখনও ঐরূপ করিতেন না। তিনি গোপনে নির্জনে গোসল করিতেন। বনী ইস্রাঈলরা কুৎসা রটাইল যে, মুছা (আঃ) অণ্ডকোষ বৃদ্ধির Hybrocel রোগী, তাই তিনি আমাদের সহিত উলঙ্গ হইয়া গোসল করেন না।

একদা মুছা (আঃ) নির্জনে কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে ছিলেন, হঠাৎ ঐ পাথর আশ্চর্য জনক ভাবে কাপড় লইয়া দৌড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুছা (আঃ) হে পাথর! আমার কাপড়; হে পাথর! আমার কাপড়; বলিতে বলিতে (বিবস্ত্র হওয়ার খেয়াল-শূন্য অবস্থায়) উহার পিছু দৌড়াইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাথরটি একদল বনী-ইস্রাঈলের জনসমাবেশে আসিয় পৌঁছিল; তখন সকলেই মুছা (আঃ)কে নিরোগ দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের খণ্ডন হইয়া গেল। মুছা (আঃ) তাড়াতাড়ি পাথর হইতে কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন এবং পাথরে আঘাত করিতে লাগিলেন; পাথরের উপর ছয় বা সাতটি বেত্রাঘাতের রেখা পড়িয়া গেল।

১৯৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আইয়ুব (আঃ) কাপড় খুলিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল; তিনি ঐগুলিকে কুড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন! আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে (বিপুল ধন-দৌলত দান পূর্বক) এ সমস্ত হইতে পরিতৃপ্ত করি নাই? তিনি আরজ করিলেন, হে খোদা; তোমার তরফ হইতে বর্ষিত বরকতের বস্তু হইতে আমি কখনই অপ্রত্যাশী বা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না।

নির্জন না হইলে অবশ্যই পর্দাবস্থায় গোসল করিবে

১৯৭। হাদীছ ঃ— উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম। তিনি গোসল করিতেছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাঁহাকে কাপড় দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি সালাম করিলাম; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আসিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম, উম্মে-হানী। হযরত (দঃ) আমাকে "মারহাবা" বলিলেন এবং গোসলান্তে একটি চাদরে আবৃত হইয়া আট রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের পর আমি বলিলাম, এক ব্যক্তিকে আমি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়াছি; আমার ভাই আলী তাহাকে হত্যা করিতে চায়। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম। ঘটনাটি বেলা পূর্বাহ্নে ছিল।

(মায়মুনা (রাঃ) বর্ণিত ১৮৬ নং হাদীছও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে।)

নাপাক অবস্থার ঘাম এবং ঐ অবস্থায় চলাফেরা করা

১৯৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাস্তার মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার হাত ধরিলেন; আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কিছু দুর এক সঙ্গে চলার পর তিনি এক স্থানে বসিলেন, আমি গোপনভাবে পেছন হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং বাড়ী হইতে গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) সে স্থানেই বসিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম; ঐ অবস্থায় আপানার সঙ্গে উঠা-বসা ভাল নয় মনে করিয়া গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, মোমেন ব্যক্তি (ঐরূপ) নাপাক হয় না। (যে, তাহার সঙ্গে উঠাবসা করা বা তাহাকে ছোঁয়া যায় না।)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা বলিয়াছেন, নাপাক অবস্থায় নখ কাটা ও চুল কাটা যায়।

নাপাক অবস্থায় গৃহে অবস্থান বা শয়ন করিতে অজু করিবে

১৯৯। হাদীছ :— আবু সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি কোন সময় ফরজ গোসলের পূর্বে ঘুমাইতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ—কোন সময় ঐরূপ ঘুমাইতেন, কিন্তু অজু করিয়া ঘুমাইতেন।

২০০। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল না করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিলে গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া নামাযের জন্য অজুর ন্যায় অজু করিয়া লইতেন।

২০১। হাদীছ :— ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া যায় কি? নবী (দঃ) বলিলেন হাঁ, যদি অজু করিয়া নেয়।

২০২। হাদীছ :—আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ওমর (রাঃ) এই আলোচনা করিলেন যে, রাত্রে গোসল ফরজ হইলে (যখন গোসল না করিয়া) শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে কি করিতে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া অজু কর, তারপর ঘুমাইতে পার।

স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গ গ্রথনেই গোসল ফরজ হইবে

২০৩। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পুরুষ স্ত্রীর মুখোমুখী হইয়া লিঙ্গদ্বয়ের গ্রথনেই গোসল ফরজ হইয়া যাইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, এই হাদীছে বর্ণিত বিধানই অগ্রগণ্য।

২০৪। হাদীছ :— উবাই-ইবনে-কা'আব (রা:) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিল, কিন্তু বীর্য্য বাহির হইল না তখন কি করিতে হইবে ? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর গুপ্ত অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে উহা ধৌত করতঃ অজু করিয়া নামায পড়িতে পারে।

২০৫। হাদীছ :— যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (র:) ওসমান (রা:)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কেহ স্ত্রী-সহবাস করে কিন্তু বীর্য্য বাহির হয় নাই ; এমতাবস্থায় গোসল করিতে হইবে কি ? তিনি বলিলেন, গুপ্তস্থান ধুইয়া ফেলিবে এবং নামাযের ন্যায় অজু করিবে ; আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি বলেন, আমি এই মছআলাহ আলী (রা:), জোবায়ের (রা:), তালহা (রা:) এবং উবাই-এবন কা'আব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও ঐরূপ বলিলেন।

২০৬। হাদীছ :— আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক আনছারী ব্যক্তিকে লোক পাঠাইয়া ডাকিলেন। (ঐ ব্যক্তি তখন স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত ছিল, তখনও বীর্য্য বাহির হইয়া তাহার চরম পুলক-লাভ ঘটে নাই, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দ:) ডাকিতেছেন শুনা মাত্রই এত বড় কঠিন মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি গোসল করিল এবং) তৎক্ষণাৎ সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তাহার মাথার পানি ঝরিতেছিল ; হযরত (দ:) (তাহার অবস্থা অনুভব করিতে পারিয়া) বলিলেন, বোধ হয়—আমি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম ? সে আরজ করিল—হঁা, হুজুর। হযরত (দ:) বলিলেন, যখন (স্ত্রী-সহবাস ক্রিয়া) অসম্পূর্ণতার মধ্যে পরিত্যক্ত হয় তখন অজু করিলেই চলে। (৩০ পৃ:)

ব্যাখ্যা :—উল্লিখিত হাদী ত্রয়ে বীর্য্য বাহির না হওয়া অবস্থায় অজুর আদেশ রহিয়াছে, গোসলের উল্লেখ নাই। ২০৩নং হাদীছে এবং আরও হাদীছে নির্দেশ আছে যে, পুরুষাঙ্গের শুধু অগ্রভাগ স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেই বীর্য্য বাহির না হইলেও গোছল ফরজ হইবে।

খলীফা ওমর (রা:) তাঁহার খেলাফতকালে ছাহাবীগণকে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে এই মছআলাহ পর্য্যালোচনান্তে সর্ব-সম্মতি ক্রমে স্থির করিলেন যে, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোছল ফরজ হইবে ; এই সিদ্ধান্তের উপর ছাহাবীগণের "এজমা" হইয়া গেল। এমনকি খলীফা ওমর (রা:) এই সিদ্ধান্তের বিপরীত মতামত প্রকাশের উপর শাস্তির ঘোষণা করিলেন। অতএব এমতাবস্থায় গোছল করা ফরজ হইবেই এবং উহার বিরোধী হাদীছ সমূহ মনছুখ বা রহিত পরিগণিত।

ইমাম বোখারী (র:)ও ২০৩নং হাদীছ বর্ণনা করতঃ ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ফরজ গোসলের মধ্যে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ফরজ (৪০ পৃঃ ১০৬ হাঃ)। নাপাকী ও গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্কার করার পর হাত মাটি বা দেওয়ালে ঘষিয়া ধোয়া উত্তম (ঐ)। ● নাপাকী পরিষ্কার করিতে বাম হাতে পানি লইবে (ঐ)। ● অজু এবং গোসলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার মধ্যে লাগালাগি না হইয়া বিলম্বতা ঘটিলেও অজু-গোসল শুদ্ধ হইবে ;

একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অজু করিতে বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার পর পা ধুইতে এত বিলম্ব করিলেন যে, তাঁহার ধোয়া অঙ্গগুলি শুষ্ক হইয়া গেল (ঐ)। ● মজি বাহির হইলে গোসল করিতে হইবে না, কিন্তু অজু ভঙ্গ হইবে এবং শরীর হইতে মজি ধৌত করিতে হইবে (৪১ পৃঃ ১৩০ হাঃ)। ● ফরজ গোসল করিতে মাথায় পানি ঢালিবার পুর্বে চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজাইয়া লইবে (৪১ পৃঃ ১৭৯ হাঃ) ● ফরজ গোসলের জন্য প্রথমে অজু করিয়াছে ; পুর্ণ গোসলের সময় অজুর অঙ্গ সমুহে পুনরায় পানি ব্যবহার না করিলেও চলে (ঐ)। ● ফরজ গোসলের পর হাত ঝাড়া জায়েয। অর্থাৎ হাত ঝাড়ার পানি নাপাক নহে। ফরজ গোসলের সময় যেই অঙ্গে নাপাকী নাই সেই অঙ্গ-ধৌত পানির ছিটা নাপাক নহে। ● মহিলাদের স্বপ্নদোষে বীর্য্য নির্গত হইলে তাহাদের জন্যও গোসল করা ফরজ (৪২ পৃঃ)।

——(০)——

পঞ্চম অধ্যায়

হায়েজ বা ঋতু

হায়েজের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ - فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থ—তাহারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে ঋতুকালীন (স্ত্রী-সহবাসের) বিষয়। আপনি বলিয়া দিন, ঋতু অতিশয় ঘৃণিত ও অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঐ সময় স্ত্রী সহবাসে বিরত থাক, যাবৎ স্ত্রী পবিত্র না হয়। পবিত্র হওয়ার পর আল্লার আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীকে ব্যবহার কর। আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীকে পছন্দ করেন। (২পা: ১২রু:)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হায়েজ একটি এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত মহিলাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলে, ইহা প্রথমে বনী-ইস্রায়ীলদের উপর চাপান হইয়াছিল। বোখারী (র:) বলেন, এই দুই মতবাদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত মতবাদই অগ্রগণ্য ও গ্রহণীয় যে, হায়েজ আদম জাতের প্রথম হইতেই আরম্ভ।

● যেই হাদীছের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল• উহা আয়েশা (রা:) বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, বিদায় হজ্জে আমিও হযরতের সঙ্গে ছিলাম। মিকাত তথা এহরাম বাঁধার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে আমি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছিলাম। মক্কার অতি নিকটবর্তী আসিয়া আমার হায়েজ আরম্ভ হইয়া গেল। মক্কায় পৌঁছিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত (দ:) জিজ্ঞাসান্তে কাঁদার কারণ জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা দানে আমাকে বলিলেন— ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم "ইহা এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত নারীদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন, (ইহাতে কুণ্ঠিত হইও না)। হাদীছটির অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ডে হজ্জের অধ্যায় "হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় এহরাম বাধা" পরিচ্ছেদে আসিবে।

ঋতুবতী স্ত্রী স্বামীর মাথা ধুইয়া ও আঁচড়াইয়া দিতে পারে

২০৭। **হাদীছ:**—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায় থাকাকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছি।

২০৮। **হাদীছ ঃ**—ওর্‌ওয়া (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হায়েজ অবস্থায় নারী আমার খেদমত করিতে পারিবে কি? কিম্বা নাপাক অবস্থায় স্ত্রী আমার নিকট আসিতে পারিবে কি? তিনি উত্তর করিলেন—এর প্রত্যেকটিকেই আমি সহজ মনে করি, প্রত্যেকেই আমার খেদমত করিতে পারিবে; এজন্য কাহারও উপর দোষারোপ করা চলিবে না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ'তেকাফে থাকিয়া স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন, আয়েশা (রাঃ) হায়েজ অবস্থায় উহা আঁচড়াইয়া দিতেন।

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সংস্পর্শনে কোরআন তেলাওয়াত করা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল (রঃ) স্বীয় ক্রীতদাসীকে হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফ নিয়া আসার জন্য পাঠাইতেন, কোরআন শরীফের গেলাফের রশি ধরিয়া সে উহা নিয়া আসিত।

২০৯। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হায়েজ অবস্থায়ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতেন।

ঋতু অবস্থায় নারীদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করা

২১০। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মো'মেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদরের ভিতর শায়িত ছিলাম, হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। আমি নিঃশব্দে চাদরের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং ঋতুকালীন বিশেষ কাপড় পরিধান করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হায়েজ আরম্ভ হইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিলেন, আমি তাঁহার সহিত এক চাদরের নীচে শয়ন করিলাম।

২১১। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে পানি লইয়া জানাবাতের গোসল করিতাম। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) আমাকে হায়েজ অবস্থায় রীতিমত ইজার পরিধানের আদেশ করিতেন ও আমার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন এবং তিনি এ'তেকাফে থাকিয়া মসজিদ হইতে মাথা বাহির করিয়া দিতেন; আমি হায়েজ অবস্থায় তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ— এখানে "মোবাশারাহ্‌" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা একটি আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ—একত্রে আহার-নিদ্রা করা, খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও শয়ন ইত্যাদি একত্রে এক সঙ্গে করা। ইহুদীদের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন নারীর হায়েজ আরম্ভ হইলে বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাহাকে ভিন্ন কুঁড়ে ঘরে, ভিন্ন পেয়ালা-বাসনে, ভিন্ন গ্রাসে একেবারে অস্পৃশ্য ভাবে রাখিয়া দিত। কেহই তাহার সঙ্গে একত্রে আহার-বিহার ও উঠা-বসা করিত না, এমনকি স্বামীকেও এক

বিছানায় শয়ন করিতে দিত না। পক্ষান্তরে নাছারাদের প্রচলিত প্রথা ছিল, ইহুদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য কিম্বা বাছ-বিচার করিত না, এমনকি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিতেও বিরত থাকিত না। অথচ ঋতু অবস্থায় নির্দিষ্ট ব্যবহার-স্থানটি ঘৃণা উদ্রেককারী অপবিত্র ও নাপাকির স্থান হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় সঙ্গম করাতে নানা প্রকার কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিয়া উভয়েরই স্বাস্থ্যের অপকার ও ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ইসলাম সনাতন ধর্ম। উহার বিধি-ব্যবস্থাদি মধ্য পন্থীয়। নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা বর্বরতা এবং কুৎসিত, ঘৃণার্হতা ও কদর্যতা—এ সবকেই ইসলাম এড়াইয়া চলে। তাই এক দিকে ইহুদীদের অভিশপ্ত ব্যবস্থা ও অত্যাচারের প্রথা হইতে নারী জাতিকে রক্ষা করিতে ইসলামের বিধানে এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, ঋতু অবস্থায় একত্রে বসবাস, একত্রে আহার-নিদ্রা এমনকি রীতিমত ইজার পরিধানে স্বামীর সহিত এক বিছানায় শয়ন করা যাইবে; কোন প্রকার অস্পৃশ্যতার ভাব মনে আনিবে না। অন্যদিকে নাছারাবাদের কুৎসিত ঘৃণিত সীমা লঙ্ঘনকারী নীতির বিপরীত—ঋতু অবস্থায় সঙ্গম করা পরিষ্কাররূপে হারাম করিয়া দিয়াছে।

২১২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতুর প্রারম্ভিক তীব্রতার মুখে বিশেষ-ভাবে ইজার পরিধান করার জন্য তিনি আদেশ করিতেন এবং ইজার পরিধান অবস্থায় এক বিছানায় শয়ন করিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় দৃঢ় সংযমী আর কেহ হইতে পারে না, (তাই সর্বসাধারণকে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হইবে।)

২১৩। হাদীছ ঃ—মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তাহার সঙ্গে এক বিছানায় শয়নের ইচ্ছা করিলে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী তিনি রীতিমত ইজার পরিধান করিয়া লইতেন।

ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ

২১৪। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রোযার বা কোরবাণীর ঈদের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদগাহে উপস্থিত হইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মহিলাদের স্থানে যাইয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে বলিলেন—হে মহিলাগণ! তোমরা দান-খয়রাত কর, কারণ দোযখবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ তোমাদেরকে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি কারণে ইয়া রসুলাল্লাহ? তিনি বলিলেন, তোমরা লান-তান অভিশাপ অত্যধিক করিয়া থাক এবং স্বামীর না-শোকরি ও নিমকহারামি

করিয়া থাক। নারী জাতির স্বভাব এই যে, তাহাদের প্রতি আজীবন এহ্ছান ও সদ্ব্যবহার করার পর একটি ত্রুটি দেখা মাত্র বলিয়া ফেলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও আমি ভাল ব্যবহার পাই নাই। এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও একটি দোষ এই যে, নারী জাতি অত্যধিক ছলনাময়ী হইয়া থাকে। স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প নেক আমল লইয়া চালাক চতুর হুশিয়ার পুরুষের বুদ্ধি-বিবেকের উপর তোমরা যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পার এরূপ অন্য কেহ করিতে পারে তাহা দেখি না।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নেক আমল ও বুদ্ধি স্বল্প কিরূপে ইয়া রসুলাল্লাহ! তিনি বলিলেন—নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্দ্ধ নয় কি? (দুইজন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের স্যাক্ষ্যের সমান।) তাহারা বলিল, হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই স্বল্প বুদ্ধির প্রমাণ। হযরত (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে নামায-রোযা হইতে বিরত থাক না কি? তাহারা স্বীকার করিল—হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই নেক আমল কম হওয়ার প্রমাণ। (ঋতু অবস্থায় নামায পড়িতে ও রমযানের রোযা রাখিতে না পারায় গোনাহ না হইলেও ঐ সব কার্য্য সম্পাদনকারীগণ যে অসংখ্য ছওয়াব হাসিল করে উহ হইতে তাহারা বঞ্চিত নিশ্চয়ই থাকিবে অন্য উপায়ে ফজিলত হাসিলের ব্যবস্থা থাকিলেও নারী জাতি ঐ পরিমাণ নামায ও রমযানের মর্তবা ত পাইল না।)

ঋতুবতী তওয়াফ ভিন্ন হজ্জের সব কিছুই করিতে পারে

এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যাহার আলোচনা "হায়েজের আরম্ভ" পরিচ্ছেদে আছে। অত্র পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, ঋতু অবস্থায় সব রকম এবাদৎ নিষিদ্ধ নহে।

ইব্রাহীম নাখ্য়ী (রঃ) বলেন—হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফের এক আয়াত পরিমাণ পড়া যায় তার চেয়ে বেশী নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাবাত অবস্থায় মুখে মুখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্বাবস্থায় আল্লার জেক্র করিতেন (সর্বাবস্থার মধ্যে জানাবাতের অবস্থাও আসিয়া যায়।)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (সর্ববিধ নিরাপদ অবস্থা বর্তমান থাকায় এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বক্তব্য শ্রবণ করা নর-নারী প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্যবোধে) হায়েজ অবস্থার সময়েও নারীদিগকে ঈদগাহে যাইবার আদেশ করা হইত। তথায় তাহারা আল্লাহু আকবার ইত্যাদি জেক্র করিত এবং দোয়ার সময় দোয়ার মধ্যে শামিল হইত।

হাকাম নামক প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ বলেন, আমি জানাবাত অবস্থায়ও দরকার বশতঃ পশু-পক্ষী জবেহ করিয়া থাকি, জবেহ করার সময় বিছমিল্লাহ বলিতে হয়।

রসুল (দঃ) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন (৬নং হাদীছের বিবরণ) তাহাতে قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا এই আয়াতটি লিখিয়াছিলেন, অথচ সে কাফের ছিল। কাফের সর্বদাই নাপাক থাকে, এমনকি ফরজ গোসল পূর্ণরূপে করিতে তাহাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—হায়েজ, নেফাছ, জানাবাত অবস্থায় তছবীহ, তাহলীল, দোয়া, দুরূদ পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। এমনকি কোরআন শরীফের কোন আয়াত জেকের ও দোয়া হিসাবে পড়া; যেমন কার্য্যারম্ভে বিছমিল্লাহ……, হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ, সওয়ার হওয়ার সময় سبحان الذى سخر لنا هذا ইত্যাদি পড়াতে কোন প্রকার আপত্তি নাই। তেমনি ভাবে আরবী ভাষায় কথা বলিতে বা পত্র লিখিতে নিজের পক্ষেরই কোন বাক্য যদি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মিল খাইয়া যায় উহা লেখাতেও দোষ নাই। তেলাওয়াতরূপে কোরআনের আয়াত পাঠ করা বা কোরআন শরীফ ছুঁইয়া জায়েয নয়। যদি কেহ শিক্ষয়িত্রী হয় ও অন্য ব্যবস্থা না থাকে সে ক্ষেত্রে শব্দ আলাদা পড়াইয়া যাইতে পারে।

এস্তেহাজার (রোগজনিত রক্তস্রাবের) বয়ান

২১৫। **হাদীছ ঃ—** ফাতেমা নাম্নী একজন মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি সর্বদাই এস্তেহাজায় লিপ্ত থাকি সে জন্য কি আমি নামায ছাড়িয়া দিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এস্তেহাজার স্রাব কোন একটি রগ বা শিরা হইতে আসিয়া থাকে (অতএব ইহা একটি রোগ ও ব্যধিবিশেষ, এই স্রাব জরায়ু হইতে আসে না, সেজন্য ইহা হায়েজ নয়; (নামায ছাড়িতে পারিবে না।) এমতাবস্থায় তোমার হায়েজের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে তখন নির্দিষ্ট হায়েজের দিন কয়টিতে নামায ছাড়িয়া দিবে; ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলি অতীত হইলে গোসল করিয়া নামায পড়িও।

ব্যাখ্যা ঃ—এস্তেহাজা হায়েজের মতই একটি অবস্থাবিশেষ, কিন্তু হায়েজ একটি সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক রহস্যময় অবস্থা এবং উহার স্রাব জরায় হইতে আসিয়া থাকে। এস্তেহাজা একটি ব্যাধিবিশেষ, ইহার স্রাব রগ হইতে আসিয়া থাকে, যেমন ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়। হায়েজের দরুন যে সমস্ত কার্য্য হারাম হইয়া থাকে এস্তেহাজার দরুন ঐ সব কার্য্যে বাধার সৃষ্টি হয় না। হায়েজ ও এস্তেহাজার সঙ্গে অকাট্য হারাম ও হালালের মছআলাহ জড়িত। বাহ্যিক ভাবে এই দুই এর পার্থক্য অনেক সময় জটিল হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েদের কর্তব্য—যখন যাহার সম্মুখে যে অবস্থার উদ্ভব হয় সে অনুযায়ী বিজ্ঞ আলেম হইতে মছআলাহ জানিয়া লওয়া।

হায়েজের রক্ত পরিষ্কার প্রণালী

২১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কাপড়ের মধ্যে হায়েজের রক্তমাখা স্থানটুকুকে আঁচড়াইয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিশেষভাবে ধৌত করার পর সম্পূর্ণ কাপড়টাকেই মামুলীভাবে ধৌত করিতাম, তারপর উহা দ্বারা নামায পড়িতাম।

এস্তেহাজা অবস্থায় এ'তেকাফ করা

২১৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক বিবি তাঁহার সঙ্গে এস্তেহাজা অবস্থায় এ'তেকাফ করিয়াছিলেন। (এ অবস্থায় তিনি মসজিদে অতি সতর্কতার সহিত থাকিতেন, এমনকি) এক প্রকার বিশেষ পাত্রের উপর বসিতেন। (যেন মসজিদে কোন রকম নাপাকি লাগিতে না পারে।)

হায়েজ অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে নামায পড়া

২১৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় (মোসলমানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল, তখন) আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মাত্র কাপড় থাকিত, হায়েজের সময় উহাই পরা হইত; কোন স্থানে হায়েজের রক্ত লাগিলে থুথুর সাহায্যে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ঐ স্থানকে পানি দ্বারা ধুইয়া নামায পড়িতাম।

হায়েজের পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার ও শরীর মর্দন করা

২১৯। হাদীছ ঃ—উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদিগকে নিষেধ করা হইত—আমরা যেন স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোকাবেশ ধারণ না করি। স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার বা (আকর্ষণীয়) রঙ্গীন কাপড় পরিধান জায়েয নহে, কিন্তু এরূপ রঙ্গীন কাপড় যাহার সূতা পূর্ণ রঙ্গীন নহে, স্থানে স্থানে রং লাগান হইয়াছে (অর্থাৎ কোন প্রকার আকর্ষণীয় ধরণের রঙ্গীন নহে) উহা ব্যবহার করা জায়েয। এতদ্ভিন্ন ঐ সময় হায়েজ হইতে পাক-ছাফ হওয়া কালীন গোসলের সময় কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়েয করা হইয়াছে।* আমাদেরে অর্থাৎ নারী জাতিকে জানাযার সঙ্গে যাওয়াও নিষেধ করা হইয়াছে।

২২০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মহিলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হায়েজের গোসলের নিয়মাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

---

* এখানে, كست ا ظفا শব্দ আছে, ইহা এক প্রকার সুগন্ধির নাম। এরূপ সুগন্ধি হায়েজের গোসলে বিশেষতঃ স্রাব স্থানে ব্যবহার করা চাই। কারণ, হায়েজের রক্ত দুর্গন্ধময় হয়, সুগন্ধির দ্বারা উহা পূর্ণরূপে দুরীভূত হইবে। সেন্ট ইত্যাদি নাপাক সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না।

নবী (দঃ) নিয়মাবলী বর্ণনা করিলেন ও বলিলেন, মেশ্‌ক (অথবা তদ্রূপ কোন সুগন্ধি) যুক্ত তুলা (কিম্বা কাপড় ইত্যাদি) দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে। নবী (দঃ) লজ্জায় এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলিতে ছিলেন না; কিন্তু সেও ইহা বুঝিতে ছিল না। তখন আয়েশা (রাঃ) ঐ মহিলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন এবং পরিষ্কার-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সুগন্ধিময় তুলা বা কাপড় দিয়া স্রাব-স্থানকে মার্জিত করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে।

হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন

ছাহাবীযুগের নারীরা হায়েজকালে স্রাব-স্থানে ব্যবহৃত তুলা হলুদ রং অবস্থায় কৌটার মধ্যে ভরিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইয়া দিত। (তাহাদের ধারণা হইত যে, রক্তের রং লাল হয়, তাই হলুদ বর্ণের পদার্থটি হায়েজের রক্ত হইবে না, এই সন্দেহে মছআলাহ জানার জন্য প্রকৃত বর্ণের নমুনা পাঠাইয়া দিত।) আয়েশা (রাঃ) বলিয়া পাঠাইতেন, তাড়াহুড়া করিও না; যাবৎ না সাদা চুণের ন্যায় বস্তু দেখা যায়, হায়েজ হইতে পাক হওয়া যাইবে না।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মেয়ে শুনিতে পাইলেন, মহিলারা রাত্রিকালে বারংবার আলো জ্বালাইয়া দেখিতে থাকে—হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে কিনা, (এরূপ করিতে অত্যধিক কষ্ট হইত যাহার জন্য শরীয়ত বাধ্য করে নাই, তাই) তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ এরূপ করিত না।

ব্যাখ্যা ঃ—হায়েজ শেষ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে নামায রোযা ফরজ হওয়া এবং হারাম-হালাল ইত্যাদি বহু বিষয় জড়িত, তাই হায়েজ শেষ হওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের উত্তম যুগের নারীগণ কত সতর্ক থাকিতেন, উপরের দুইটি ঘটনায় উহা লক্ষ্যণীয়। এখানে ২১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, যে নারী সর্বদা এস্তেহাজা তথা রক্তস্রাব ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে তাহার হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন এই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাহার হায়েজের দিন ও সময় পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকিলে ব্যাধির সময় ঐ নির্দিষ্ট ও সময় হায়েজ গণ্য হইবে তদূর্দ্ধের স্রাব এস্তেহাজা হইবে।

হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামায পড়িতে হইবে না

২২১। হাদীছ ঃ—একটি নারী আয়েশা (রাঃ)কে প্রশ্ন করিল, হায়েজের পরবর্তী পবিত্রাবস্থার নামায আদায় করিলেই যথেষ্ট হয় (হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামাযের কাযা পড়িতে হয় না, অথচ হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা করিতে হয়) কেন? আয়েশা (রাঃ) তাহার উত্তরে রাগতভাবে বলিলেন, তুমি কি খারেজী ফের্কার লোক? আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে হায়েজ অবস্থার নামায কাযা পড়িতাম

না; তিনি আমাদিগকে ঐ নামায কাযা পড়ার হুকুমও দিতেন না (রোযা কাযা করার হুকুম দিতেন।)*

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক সময় কোন বিষয়ে কোরআন বা হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্বেও সেখানে যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে। এমনকি যুক্তিকে কোরআন ও ছুন্নার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সৎসাহস না করিয়া বরং উলটা কোরআন ও ছুন্নাকেই যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার দুঃসাহস ও অপচেষ্টা করা হয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ হইলে যুক্তিকে মাথায় নিয়াই অগ্রসর হইতে দেখা যায়—যেমন, কুফাস্থিত "হারুরা" এলাকায় আবির্ভূত খারেজী ফের্কার লোকগণ ছিল; তাহারা উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা এই মত পোষণ করিত যে, হায়েজ অবস্থার নামাযও রোযার ন্যায় কাযা পড়িতে হইবে। এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এর চেয়ে সরল যুক্তি বিদ্যমান আছে।× কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সেই যুক্তির আশ্রয় না নিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতঃ প্রশ্নকারিণীকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লার (দঃ) আদেশ এরূপই ছিল যে, হায়েজ অবস্থার রোযা কাযা করিতে হইবে, নামায কাযা পড়িতে হইবে না। একজন মোসলমানের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। কারণ দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তি একমাত্র কোরআন ও ছুন্নাহ অবশ্য চ্যালেঞ্জ করা যায় যে, কোরআন ও ছুন্নাহ যুক্তিহীন নয়, কিন্তু একই বিষয়ের বিভিন্নমুখী যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অতএব ঈমানদারগণের কর্তব্য কোরআন ও ছুন্নাহ মোতাবেক যুক্তি তালাশ করিয়া লওয়া এবং সেরূপ যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করার জ্ঞান ও সামর্থ না থাকিলে উহার জন্য বৃথা মাথা না ঘামাইয়া কোরআন-ছুন্নার প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকা।

ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে বা দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া

২২২। হাদীছ ঃ—হাফছাহ-বেনতে-ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদেরকে ঈদ-নামাযের ময়দানে যাইতে নিষেধ করিতাম। একদা এক মহিলা বসরা শহরে আসিয়া বর্ণনা করিল, তাহার ভগ্নিপতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বারটি জেহাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টিতে তাহার ভগ্নিও সঙ্গে ছিলেন। তাহার ঐ ভগ্নি বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জেহাদের সময় আহতদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান

---

* মোসলেম শরীফে হাদীছটির বর্ণনা মতে বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

× সেই যুক্তি এই যে, হায়েজের সর্বোচ্চ সময় দশ দিন এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন সময় পনর দিন। প্রতি মাসে দশ দিন হায়েজ থাকিলে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়। পনর দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায অতিরিক্ত পড়িতে থাকা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বিধায় নামাযের কাযা ফরজ হয় নাই। কিন্তু দশটি মাত্র রোযা এগার মাসের মধ্যে কাযা অতীব সহজ, তাই উহার কাযা করার নিয়ম রাখা হইয়াছে।

ও রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। সেই ভগ্নি একদিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে যদি কাহারও ওড়না না থাকে, তাহার জন্য (ঈদ ইত্যাদির জমাতে) না যাওয়াতে কি দোষ আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্য কাহারও ওড়নার সাহায্যে এছতেছকা, ঈদ ইত্যাদি দোয়ার সমাবেশে তাহারও শরীক হওয়া চাই। (হাফছাহ বর্ণনা করেন যে, অতঃপর বিশিষ্ট মহিলা ছাহাবী উম্মে-আ'তীয়া (রাঃ) আমাদের এখানে আসিলেন, আমি নিজে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে কিছু শুনিয়াছেন? তিনি তাঁহার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হযরতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আজমত প্রদর্শন করতঃ বলিলেন, প্রাপ্তবয়স্কা পর্দানশীন নারীগণ, এমনকি হায়েজ অবস্থায় হইলেও দোয়া উপলক্ষে বা নেক কাজের জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা নামাযের স্থল হইতে পৃথক থাকিবে। হাফছাহ বলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋতুবতী নারীগণও কি উপস্থিত হইবে? তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আরফার ময়দানে, মোজদালেফায়, মিনা ইত্যাদি স্থানে ঋতুবতী নারীরা (হজ্জ উপলক্ষে) উপস্থিত হইয়া থাকে না?

ব্যাখ্যা ঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ পর্দার সহিত চাদরে আবৃত হইয়া ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি, এমনকি পাঁচ ওয়াক্তী নামাযের জমাতেও উপস্থিত হইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিষয়ে আদেশও করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার অনেক রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ—নর-নারী সকলের মধ্যেই সততা অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোন প্রকার ফেতনার আশঙ্কা হইত না। দ্বিতীয়তঃ—ঐ সময় অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল, নূতন নূতন হুকুম-আহ্কাম নাযেল হইতে থাকিত। ঐ সময় শরীয়তের হুকুম-আহকামের বহুল প্রচার ও ঘরে বসিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না। সে সময় শিক্ষা প্রাপ্তির একমাত্র কেন্দ্র ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ); তাঁহার প্রতিটি কথা কাজ ইত্যাদি শরীয়ত ছিল। তিনি আপাদমস্তক শরীয়তের নমুনা ছিলেন, বিশেষতঃ ছোট বড় জনসমাবেশে ও অনুষ্ঠানাদিতে তাঁহার প্রতিটি বাক্যই শিক্ষা ও শরীয়ত হইত। প্রত্যেক নর-নারী ঐ সুযোগেই দ্বীন শিক্ষা করিত; এজন্যই ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে নারীদের উপস্থিতির আদেশ ছিল। সেই আদেশ নামাযের জমাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হইলে হায়েজ অবস্থার নারীদিগকেও উপস্থিত হওয়া হইত না, অথচ তাহাদের প্রতিও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ ছিল। রসুলুল্লার (দঃ) পরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা এ বিষয়ের আসল হেতু ছিল উহা বাকী থাকে নাই। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও দিন দিন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই কারণেই ছাহাবীগণের যুগের ঈদ বা পাঞ্জেগানা নামাযের জমাতে মহিলাদের যাওয়ার আদেশ ও অবকাশ রহিত পরিগণিত হইয়াছে। ওমর (রাঃ) উহাতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হইতেন বলিয়া বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে। বিবি আয়েশার (রাঃ) উক্তি সম্মুখে আসিতেছে।

অধিকন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার নারীগণ সততার প্রতীক ও সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বাহির হওয়ার জন্য এত কড়াকড়ি ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যখন কোন নারী মসজিদে উপস্থিত হইবে সে সুগন্ধি ছুঁইবে না। (মোসলেম শরীফ)

অন্য এক হাদীছে আছে- যে নারী মসজিদে আসার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করিবে তাহার নামায কবুল হইবে না—যাবৎ সে ফরজ গোসলের ন্যায় বিশেষরূপে উহা ধৌত করতঃ গোসল না করিবে (নাছায়ী শরীফ)। আরও এক হাদীছে আছে—যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া কোন জন-সমাবেশের নিকটবর্তী হইবে সে ভ্রষ্টা নারী। (আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিজ শরীফ)।

এ সমস্ত বিষয়ে নারীদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবল স্রোত যেরূপে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বিধি-ব্যবস্থা বর্তমান কদর্য্য যমানার বহু পূর্বেই স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অনুসারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) উহারই উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লার (দঃ) পর নারীগণের মধ্যে যে প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয় নারীদিগের মসজিদে যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। (বোখারী ও মোসলেম শরীফ)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার সংলগ্ন উত্তম শতাব্দীর নারীদের অবস্থা অনুপাতেই আয়েশা (রাঃ) উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই তুলনায় বর্তমান ফেতনার যুগের উল্লেখ কোথায় হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। সে জন্যই সমস্ত ইমামগণের ও আলেমগণের এজমা ও একমত যে, কিশোরী যুবতীদিগকে কোন ক্রমেই ঈদ, জুমা, জমাত ইত্যাদিতে শরীক হইতে দিবে না, এমনকি ইমামগণের পরের আলেমগণ বৃদ্ধাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—নারীদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না; কিন্তু বাড়ীতে নামায পড়াই তাহাদের জন্য শ্রেয়ঃ। (আবু দাউদ)

আরও এক হাদীছে আছে, নারীদের জন্য বারান্দা অপেক্ষা আন্দর বাড়ীর নামায উত্তম। তদুপরি খাস কুঠরীর নামায সর্বোত্তম। (আবু দাউদ শরীফ)

ঈদ ইত্যাদি নামাযের জন্য নারীদের ভিন্ন জমাতের ব্যবস্থা করা শরীয়ত দৃষ্টে একেবারেই ভিত্তিহীন ও ব্যঙ্গ তুল্য। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণের যমানায় এরূপ ব্যবস্থার কল্পনাও কোন সময় করা হয় নাই, অথচ বর্তমান যুগের তুলনায় ঐ যুগে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্টতা ও নেক কার্য্যের প্রতি আগ্রহ কত বেশী ছিল তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ববর্তী সকল আলেমই এরূপ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়াছেন।

হায়েজের সময় ছাড়া জরদ ও মেটে রং-এর স্রাব

২২৩। হাদীছ :— উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (দঃ) এর বর্তমানে তাঁহার সময়েই আমরা জরদ, মেটে বা ধূসর রঙ্গের নির্গত পদার্থকে(ঋতু সম্পর্কীয়) কিছুই গণ্য করিতাম না।

ব্যাখ্যা :— হায়েজকালীন বা হায়েজের সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে লাল, জরদ, ধূসর ও মেটে যে কোন রং-স্রাব হইবে উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে। যেমন "হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন" পরিচ্ছেদে আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হায়েজের সম্ভাব্য সময় ভিন্ন অর্থাৎ সর্বদার অভ্যাসগত নির্দ্ধারিত হায়েজের দিনগুলি বা হায়েজের সর্বোচ্চ দশদিন শেষ হইবার পর, তদ্রূপ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের অথবা অধিক বয়সের ঋতুবন্ধা মহিলাদের সময় সময় নানা রং এর কিছু স্রাব দেখা যায় উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে না।

এস্তেহাজার স্রাব রগবিশেষ হইতে নির্গত

২২৪। হাদীছ :— উম্মে-হাবিবাহ নাম্নী ছাহাবীয়া সাত বৎসর যাবৎ এস্তেহাজার ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে (চিকিৎসা স্বরূপ) অধিক গোসল করার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, ইহা একটি বিশেষ রগ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা হায়েজ নয়; এই স্রাব জরায়ু হইতে নির্গত হয় না। ইহা এস্তেহাজা ;) তাই তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করিয়া নামায পড়িতেন।

এস্তেহাজার অবস্থায় হায়েজ শেষ হইলে তাহার হুকুম

অর্থাৎ যদি কাহারও সর্বদাই এস্তেহাজার স্রাব হইতে থাকে তাহার জন্য হুকুম হইল— প্রতি মাসে তাহার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সেই পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনগুলি হায়েজ গণ্য হইবে। ঐ দিন কয়টি গত হইয়া গেলে সে হায়েজ হইতে পাক-পবিত্র গণ্য হইবে, যদিও স্রাব বন্ধ না হইয়া থাকে। কারণ এই স্রাব এস্তেহাজা গণ্য হইবে, সুতরাং এখন হায়েজ হইতে পবিত্রতা হাছিলের জন্য গোসল করিয়া নামায আদায় করিতে থাকিবে এবং তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পারিবে।

২২৫। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—(এস্তেহাজাভোগী নারী) হায়েজের সময় উপস্থিত হইলে নামায পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ সময় গত হইয়া গেলে গোসল করিয়া নামায পড়িবে।

ঋতুবতীর সংস্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না

২২৬। হাদীছ :— উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায়--নামায না পড়াকালীন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের নিকটবর্তী স্থানে শুইয়া থাকিতাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ঐ অবস্থায় চাটাইর উপর নামায পড়িলেন; যখন তিনি সেজদায় যাইতেন তাঁহার কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করিত।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হায়েজান্তে গোসলের সময় মাথা আচড়াইবে (৪৫ পৃঃ) ; যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিতে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। ● হায়েজান্তে গোসলের সময় চুলের খোপা বেণী ইত্যাদি ছাড়িয়া লইবে (৫৪ পৃঃ)। ● হায়েজ অবস্থায় হজ্জ এবং ওমরার এহরাম বাঁধা যায় (৫৬ পৃঃ)। ● বিশেষভাবে কাপড় পরিহিতা ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী এক বিছানায় শয়ন করিতে পারে (৫৪ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হায়েজ অবস্থার জন্য বিশেষ কাপড় যোগাড় রাখা ভাল (৪৫ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হজ্জের সময় তওয়াফে জিয়ারত করার পর হায়েজ আরম্ভ হইলে কোন ক্ষতি হইবে না (৪৭ পৃঃ) । (অর্থাৎ বিদায় তওয়াফ ছাড়াই হজ্জ পূর্ণ হইবে। ● নেফাছ অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জানাযা নামায প'ড়িতে হইবে (৪৭ পৃঃ)। এখানে আরও একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী গ্রহণযোগ্য।"

উহার ব্যাখ্যা এই যে, কোন নারী স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হইলে তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত করা ঐ নারীর উপর ফরজ ; তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ। সর্বনিম্ন কত দিনে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে সে বিষয় ইমাম বোখারীর (রঃ) মত এই যে, এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। এই মতের সপক্ষে তিনি আলী (রাঃ) ও কাজী শোরায়হের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহাদের সম্মুখে একটি মহিলা দাবী করিল, এক মাস পূর্বে স্বামী আমাকে তালাক দিয়াছিল, ইতিমধ্যেই তাহার তিন হায়েজ অতিবাহিত হইয়া ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজী শোরায়হ বলিলেন, যদি নিকটবর্তী আত্মীয় দ্বীনদার পরহেজগার লোক সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাহার তিন হায়েজ গত হওয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সে প্রত্যেক হায়েজের সময় নামায ত্যাগ করতঃ হায়েজান্তে পবিত্র হইয়া নামায পড়িয়াছে, এরূপ সাক্ষী পাইলে দাবী গ্রহণীয় হইবে। আলী (রাঃ)ও এই রায়ে একমত হইলেন।

অন্য কোন ইমামের মজহাবেই মাত্র এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে অন্ততঃ ৩৩ (তেত্রিশ) দিনে হইতে পারে। কারণ তাঁহার মতে হায়েজের সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত্র এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময় সর্বনিম্ন-পনর দিন। হানাফী মজহাব মতে কমপক্ষে ৩৯ (উনচল্লিশ) দিনে তিন হায়েজ গত হওয়া সম্ভব। কারণ হানাফী মজহাবে হায়েজের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন, দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময় পনর দিন। (ফতহুল-কাদীর)

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি ঐ নারী তালাকের পূর্বে হায়েজের এবং হায়েজের মধ্যবর্তী সময়ের নির্দ্ধারিত সংখ্যক দিনের অভ্যস্তা থাকে তবে তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী অবশ্যই অভ্যস্ত সংখ্যার সামঞ্জস্যে হইতে হইবে এই সম্পর্কে সকলেই একমত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তায়াম্মুম

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ

"তোমরা যদি পানি সংগ্রহ বা ব্যবহার করিতে অক্ষম হও তবে পাক মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর—মুখমণ্ডল ও দুই হাত ঐ মাটি স্পর্শনে মছেহ কর।" (৬ পাঃ ৬ রুঃ)

২৭। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক জেহাদের সফরে গিয়াছিলাম। বায়দা বা জাতুল-জায়শ নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমার গলার মালাটি ছিন্ন হইয়া কোথাও পড়িয়া যায়; ঐ মালার তালাশে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অপেক্ষা করিতে হয় এবং সকলেই অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই সকলে (আমার পিতা আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) নিকট যাইয়া) অভিযোগ করিতে লাগিল যে, আপনি দেখেন না—আয়েশা কি কর্ম করিয়াছে? রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুভূমিতে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে যেখানে পানির নাম নিশানা পর্য্যন্ত নাই এবং কাহারও সঙ্গেও পানি নাই। ইহা শুনিয়া আবুবকর (রাঃ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার উরুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন; আমার পিতা আমাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং আমার ভাগ্যে যাহা ছিল সব কিছু শুনাইলেন, এমনকি রাগান্বিত হইয়া আমাকে মুষ্টাঘাতও করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কোন প্রকার নড়াচড়াও করিতে পারিলাম না। এমতাবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘুম হইতে উঠিলেন, (ফজরের নামায সম্মুখে) পানির কোন ব্যবস্থা নাই, পানি তালাশ করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখনই আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের হুকুম বর্ণিত আয়াত নাযেল করিলেন। সকলেই তায়াম্মুম করিল। উছায়দ-ইবনে হুজায়ের নামক ছাহাবী (যাঁহাকে ঐ মালার তালাশে নিযুক্ত করা হইয়াছিল) এই খবর শুনিতে পাইয়া আনন্দ মুখর হইয়া বলিলেন, হে আবুবকর পরিবার! ইহা আপনাদের প্রথম বরকত নয়; আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করুন! খোদার কছম - যখনই আপনার উপর কোন প্রকার বিপদের আগমন হয় তখনই আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া দেন এবং মোসলেম সমাজকে উপকৃত করেন। (হাদীছখানা বোখারী শরীফের দশ জায়গায় আছে।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি যেই উটটির উপর সওয়ার ছিলাম ঐ উটটিকে বসা অবস্থা হইতে দাঁড় করান হইলে দেখা গেল, মালাটি ঐ উটের নীচে পড়িয়া আছে।

২২৮। **হাদীছ** :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কেহই উহা লাভ করিতে পারে নাই। (১) সুদূর এক মাসের পথ হইতে শত্রু পক্ষকে ভীত ও ত্রাসিত করার শক্তিশালী প্রভাব দান করা হইয়াছে*। (২) সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য নামাযের ও পবিত্রতা সাধনের উপযোগী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। + যে স্থানে নামাযের সময় উপস্থিত হয় সেখানেই আমার উম্মত নামায আদায় করিতে পারিবে। (৩) গণীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কোন পয়গাম্বরের উম্মতের জন্য উহা হালাল ছিল না।♣ (৪) শাফা'য়াতের সুযোগ আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে † (৫) আমি বিশ্ব মানবের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবী বিশেষ কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা পর পর বর্দ্ধিত হইতেছিল; নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য হযরত (দঃ)কে পর পর দেওয়া হইয়াছিল। যখন যাহা দান করা হইয়াছে হযরত (দঃ) তাহা জ্ঞাত করিয়াছেন। কারণ, এই সব বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং জটিল সমস্যার সমাধান হয়। যেরূপ মুখবন্ধের মধ্যে "রসুলুল্লাহ আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য" প্রবন্ধে ইসলামের উক্ত মৌলিক তথ্যটি হযরতের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই উহার জটিলতা খণ্ডন করা হইয়াছে। অনেক সময় হযরতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শরীয়তের

---

* খন্দকের জেহাদের পর আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেন। এর পর আর কখনও তাঁহার উপর মদীনায় আসিয়া আক্রমণ করার সাহস কাফেরদের হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "এখন হইতে আমরা তাহাদের তথা কাফেরদের উপর আক্রমণ করিব, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর আক্রমণে সাহসী হইবে না।"

\+ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য মসজিদ ভিন্ন অন্য কোথাও নামায শুদ্ধ হইত না এবং তায়াম্মুমের সুযোগ তাহাদের জন্য ছিল না।

♣ পূর্বের উম্মতদের জন্য এই বিধান ছিল যে, গণীমতের মাল একত্রিত করিবে; আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া উহা ভস্ম করিয়া যাইবে, ঐ মাল কাহারও ব্যবহার করা হারাম ছিল।

† শাফায়াতে-কোবরা—বড় শাফায়াৎ অর্থাৎ কঠিন হাশর-মাঠে যখন তথাকার সমস্ত লোক ভীষণ দুঃখ-যাতনায় থাকিবে এবং সমূহ কষ্ট-যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ উদ্দেশ্যে হিসাব আরম্ভের জন্য সুপারিশ চাহিয়া লোকগণ বড় বড় নবীগণের স্মরণাপন্ন হইবে। কিন্তু কোন নবীই সেই সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। সেই মুহূর্তের ঐ সুপারিশকেই "শাফায়াতে-কোবরা" বলা হয়—যাহা দ্বারা পূর্বাপর সমগ্র বিশ্বের উম্মতগণ উপকৃত হইবে। নবী (দঃ) ঐ শাফায়াৎ বা সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং কৃতকার্য্য হইবেন—ইহা তাঁহারই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া অতি সামান্য ঈমানধারী বড় বড় গোনাহগারের জন্য শাফায়াত করাও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)এর বৈশিষ্ট্য।

মছআলাহ ও জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তায়াম্মুমের বিধান, মসজিদ ভিন্ন অন্যত্র নামায শুদ্ধ হওয়া, গণীমতের মালামাল হালাল হওয়া জানা গেল। এতদ্ভিন্ন দুইটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত হওয়া গেল—একটি উপস্থিত সুসংবাদ, অপরটি কেয়ামত পর্য্যন্ত ঈমানের অংশ। উম্মতকে এই শ্রেণীর জ্ঞান দানের জন্যই হযরত (দঃ) আল্লাহ-প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ উম্মতকে জ্ঞাত করিতেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মোসলেম শরীফের বিভিন্ন হাদীছের সমষ্টিতে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—উহার দুইটির বর্ণনা মুখবন্ধে উল্লেখিত প্রবন্ধে আছে। তৃতীয়টি হইল—পূর্ব উম্মতগণের নামাযে মোক্তাদীদের ছফ তথা সুশৃঙ্খল কাতার-বন্দির বিধান ছিল না; ফেরেশতাদের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে। হযরতের উম্মতের জন্য আল্লাহ সেই নিয়মকে উহার মর্য্যাদা সহ প্রবর্তিত করিয়াছেন তথা এই উম্মতের নামাযের কাতারকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কাতাররূপ মর্য্যাদাবান সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের সর্বমোট সংখ্যা ষাট পর্য্যন্ত পৌঁছে বলিয়া একজন আলেম উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল-মোলহেম ২—১১৩)

অক্ষমতা ও আশঙ্কার ক্ষেত্রে বাড়ীতেও তায়াম্মুম করা যায়

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি—যে নড়াচড়া করিতে অক্ষম; পানি উপস্থিতকারী কাহাকেও না পাইলে তায়াম্মুম করিতে পারিবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক দুরের এক জায়গা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনা হইতে মাত্র এক মাইল ব্যবধানের এক স্থানে পৌঁছিলে আছরের ওয়াক্ত হইল; পানির ব্যবস্থা ছিল না, তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিলেন, কিন্তু সেই নামায পুনঃ দোহরাইলেন না।*

২২৯। **হাদীছঃ**— আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বীরে জামাল নামক স্থান হইতে আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। সে নবী (দঃ)কে সালাম করিল, তিনি সালামের উত্তর না দিয়া এক দেয়ালের নিকটবর্তী যাইয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা উহার সংস্পর্শনে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মছেহ (তথা তায়াম্মুম) করিলেন, তারপর ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন।

ফুঁক দিয়া হাতের অতিরিক্ত মাটি ফেলিয়া তায়াম্মুম করিবে

২৩০। **হাদীছঃ**— এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমার উপর গোসল ফরজ হয়, কিন্তু পানি পাওয়া না যায় তখন কি করিতে হইবে? আম্মার ইবনে ইয়াছের নামক ছাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন—আপনার কি স্মরণ নাই যে, আমি ও আপনি একবার সফরে ছিলাম, সে অবস্থার আমাদের

---

* পথিমধ্যে আছরের নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে তখন তাঁহার জানা ছিল না যে, তিনি পূর্ণ ওয়াক্ত থাকিতে মদীনায় পৌঁছিতে পারিবেন, নচেৎ মদীনায় পৌঁছিয়া অজু করিয়াই নামায পড়িতেন।

উভয়েরই গোসল ফরজ হয়; পানির ব্যবস্থা ছিল না। আপনি নামায পড়িলেন না,✿ কিন্তু আমি মাটির উপর শুইয়া গড়াগড়ি করিয়া সমস্ত শরীরে ধুলা মাখিয়া লইলাম+ এবং নামায পড়িলাম। তারপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলিয়া তাঁহার দুই হাত মাটির উপর মারিলেন এবং হাত উঠাইয়া উহাতে ফুঁক দিলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মছেহ করিলেন।

পাক মাটি পানির পরিবর্তে পবিত্রতা লাভের বস্তু

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এক বারের তায়াম্মুমই একাধিক নামাযের জন্য যথেষ্ট।* ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়াম্মুম অবস্থায় ইমামতী করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ী'দ (রঃ) বলিয়াছেন, লোনা মাটিতে নামায পড়া যায় এবং তদ্বারা তায়াম্মুমও করা যায়।

২৩১। **হাদীছঃ**—এমরান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন সফরে ছিলাম; আমরা সমস্ত রাত্রি চলিয়া (ক্লান্ত হইয়া) শেষ রাত্রে নিদ্রামগ্ন হইলাম; পথিকের জন্য ঐ নিদ্রা বড়ই মধুর হয়। (ফজরের সময় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিল না;) একমাত্র সূর্য্যতাপই আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। প্রথমে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং পর পর আরও দুই ব্যক্তি জাগ্রত হইলেন। নবী (দঃ) স্বয়ং নিদ্রোত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতাম না, কারণ সময় সময় হযরতের উপর নিদ্রাবস্থায় অহী নাযেল হইত, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

ওমর (রাঃ) নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সকলের এই অবস্থা দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার তকবীরের আওয়াজে হযরতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই হযরতের নিকট নিজেদের এই অবস্থার উপর আক্ষেপ ও অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বিচলিত হইও না, এখান হইতে চল। এই বলিয়া সকলকে নিয়া রওয়ানা হইলেন; কিছু দূর যাইয়াই অবতরণ করিলেন এবং অজুর পানি আনিতে বলিলেন ও অজু করিলেন। তারপর (ঐ ফজরের কাজা) নামাযের জন্য আজান দেওয়া হইল। সকলকে লইয়া তিনি নামায পড়িলেন; নামাযান্তে দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামাযে শরীক না হইয়া পৃথকভাবে বসিয়া আছে। নবী (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সকলের সঙ্গে নামাযে শরীক হইলে না কেন?

✿ কারণ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার হুকুম তখন তাঁহার জানা ছিল না।

+ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের হুকুম জানা ছিল না, কিন্তু অজুর তায়াম্মুমে হাত ও মুখ মছেহ করা হয়। এই তুলনায় গোসলের পরিবর্তে সমস্ত শরীরে মাটির সংস্পর্শ করিলেন।

* অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতনভাবে তায়াম্মুম করিতে হইবে না, অজুর ন্যায় এক তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া যায় যাবৎ তায়াম্মুম ভঙ্গের কোন কারণ উপস্থিত না হয়।

সে আরজ করিল, আমার উপর গোসল ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু পানির ব্যবস্থা নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া লও; উহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ওখান হইতে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে সকলেই তাঁহার নিকট পিপাসার অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি এক স্থানে অবতরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও এমরান (রাঃ)কে পানির তালাশে বাহিরে পাঠাইলেন। তাঁহারা পানির তালাশে বাহির হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, জনৈকা মহিলা উটের উপর দুই মশক পানি লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি কোথায়? সে বলিল, পানি এখান হইতে পূর্ণ একদিন এক রাত্রির পথ দূরে। আমাদের পুরুষগণ সকলেই বিদেশ গমন করিয়াছে; (সেই জন্যই আমি পানির জন্য বাহির হইয়াছি।) তাঁহারা বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল; সে বলিল, কোথায়? তাঁহারা বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট। সে বলিল—ঐ ব্যক্তি, যাহাকে স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয়? তাঁহারা বলিলেন, তুমি যাহাকে চিনিতে পারিয়াছ তিনিই; তুমি চল। তাঁহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। মহিলাটিকে উট হইতে নামানো হইল; রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি পাত্র আনাইলেন এবং মশক দুইটি হইতে সামান্য পানি ঢালিয়া (উহার মধ্যে কুল্লি করিলেন এবং ঐ কুল্লিযুক্ত পানি বাটির মধ্যে পুনরায় ঢালিয়া দিয়া) উহার ঐ মুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং পানি বাহির করার জন্য তলদেশের ছোট মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, সকলেই ইচ্ছানুযায়ী পানি পান কর, নিজের যানবাহন পশুগুলিকেও পান করাও। সকলে তাহাই করিল এবং ঐ ফরজ গোসলওয়ালা ব্যক্তিকেও একটি পাত্র ভরিয়া পানি দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন, যাও এই পানি শরীরে ঢালিয়া গোসল কর। ঐ মহিলাটি দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টে তাকাইতেছিল এবং তাহার পানি কি করা হইতেছে তাহা দেখিতেছিল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমরান (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, সকলেই পানি ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত হইলে পর মশক দুইটি পূর্বের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছিল। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে বলিলেন, মহিলাটির জন্য পারিতোষিক ও বখশীশ স্বরূপ কিছু সংগ্রহ কর। তখন খেজুর, আটা ও ছাতু ইত্যাদি খাদ্যবস্তু তাহার জন্য সংগ্রহ করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাকে উটের পিঠে বসাইয়া খাদ্যবস্তু পটুলিটি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ যে, আমরা তোমার পানি কম করি নাই, (তোমার মশকদ্বয় এখনও পরিপূর্ণ আছে,) তবে (আমরা যাহা খরচ করিয়াছি উহা) আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পান করাইয়াছেন। তারপর সে যখন নিজ বাড়ীতে পৌঁছিল, বাড়ী ফিরিতে গৌণ হওয়ায় বাড়ীর সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আবদ্ধ ছিলে যে কারণে তোমার ফিরিতে এত গৌণ হইল? সে উত্তর করিল, আশ্চর্য্য এক ঘটনা। রাস্তায় দুই

ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আমাকে ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া গেল যাহাকে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয়। এইরূপে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া সে শপথ করিয়া বলিল, আসমান-জমীনের মধ্যে তাঁহার তুল্য অলৌকিক ঘটনা কেহ দেখাইতে পারিবে না; নিশ্চয় তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য রসুল। তারপর হইতে মোসলমানগণ ঐ মহিলাটির গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে মোশরেকদেরে আক্রমণ করিত, কিন্তু তাহার গোত্রকে কিছুই বলিত না। এই ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মহিলা একদিন তাহার গোত্রীয় সকলকে ডাকিয়া বলিল, আমার ধারণা এই যে, মোসলমানগণ (ঐ পানির ঘটনার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করেন না; (এরূপ অমায়িক ধর্ম) ইসলামের প্রতি কি তোমাদের আগ্রহ হয়? সকলেই তাহার ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল।

জানাবাতের গোসলে মৃত্যু বা রোগের আশঙ্কা হইলে কিম্বা পানি ব্যয় করায় পানীয় পানির অভাব হইলে তায়াম্মুম করিবে

ছাহাবী আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ভীষণ শীতের প্রকোপময় এক রাত্রে জানাবাতের সম্মুখীন হইলেন। তখন তিনি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ দেখাইলেন—وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"তোমরা নিজকে মৃত্যুপথে টানিয়া নিও না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান; (তিনি সুযোগ-সুবিধা দিয়াছেন; উহা উপেক্ষা করিয়া বিপদ টানিয়া আনিও না।)"

আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ছাহাবীর উক্ত ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে বিপরীত কিছুই বলেন নাই।

২৩২। হাদীছ :—একদা আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি জানাবাতের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্তও পানির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সে কি তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে? (অর্থাৎ অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের ন্যায় ফরজ গোসলের পরিবর্তেও তায়াম্মুম হয় কি?) আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তাহার জন্য তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হইবে না। যে পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা করিতে না পারে নামায কাযা করিবে। দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা না হইলেও তাহাই করিবে। আবু মূসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি জানেন না যে, আম্মার (রাঃ) তাঁহার প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমার জন্য (জানাবাত অবস্থায়) এরূপ (তায়াম্মুম) করিয়া লওয়া যথেষ্ট।* এই বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই হাত মাটিতে মারিলেন এবং একটু ঝারা দিয়া ডান হাতের দ্বারা বাম হাত ও বাম হাতের দ্বারা ডান হাত এবং মুখমণ্ডল মছেহ করিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনি

* এখানে যে হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করা হইল উহা ২৩০নং হাদীছ।

দেখেন না যে, ঘটনার বর্ণনা শুনিয়া ওমর (রাঃ) উহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই+। তখন আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা—আম্মারের ঘটনা ধর্তব্য না ই হউক, কিন্তু কোরআন শরীফে ছুরা মায়েদার আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন— فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

অর্থাৎ অজু ভঙ্গ বা জানাবাত অবস্থায় "পানির ব্যবস্থা না হইলে তায়াম্মুম করিয়া লও।" আবদুল্লাহ (রাঃ) এই আয়াতের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি বলিলেন, জানাবাত অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের সুযোগ প্রদান করা হইলে শীতের দিনে পানি ঠাণ্ডা লাগায় তায়াম্মুমের সুযোগ নেওয়া হইবে। তখন আবু মূসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আচ্ছা। আপনি শুধু কেবল এই আশঙ্কায় জানাবাতের জন্য তায়াম্মুমের ফতওয়া দিতে চান না? তিনি বলিলেন, হাঁ।↑

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা মায়েদার আয়াতের অনুরূপ ছুরা নেছাতে যেই আয়াত রহিয়াছে উহাতেও জানাবাত তথা ফরজ গোসলের জন্য প্রয়োজনে তায়াম্মুম করিবে বলিয়া উল্লেখ আছে। ২৩০নং হাদীছেও বর্ণিত আছে যে, প্রয়োজনে ফরজ গোসলের জন্য তায়াম্মুম করিবে। সমস্ত ইমামগণের মজহাব ইহাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তায়াম্মুমে হাত ও মুখ উভয়কে মছেহ করিতে মাত্র একবার মাটি স্পর্শন যথেষ্ট।" দুইটি অঙ্গের জন্য দুইবার হাত মাটিতে মারিতে হইবে না। ইহা কোন কোন ইমামের মত, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমগণের মত এই যে, প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ দুইবার হাত মাটিতে মারিবে। এ সম্পর্কে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান আছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আরও দুইটি পরিচ্ছেদ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) "যদি কেহ পানি ও মাটি কোনটিরই ব্যবস্থা করিতে না পারে।" এমতাবস্থায় অজু ব্যতিরেকেই নামায পড়িবে। অবশ্য অধিকাংশ ইমামগণের মতে তাহাকে সুযোগ অনুযায়ী অজু বা তায়াম্মুম করিয়া পুনরায় ঐ নামায কাযাও পড়িতে হইবে।

(২) "তায়াম্মুম মুখমণ্ডল ও শুধু দুই হাতের কজা মছেহ করা"। ইহা কোন কোন ইমামের মত। কিন্তু একাধিক হাদীছ দৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অধিকাংশ ওলামাগণ বলেন, দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত মছেহ করিবে—যে পরিমাণ অজুতে ধৌত করিতে হয়।

+ ওমর (রাঃ) স্বয়ং ঐ ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলিয়া আম্মার (রাঃ) নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ওমর (রাঃ) পূর্ণ ঘটনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি ইহার গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু আম্মার (রাঃ)কে এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া মছআলাহ বয়ান করিতে বাধাও দান করেন নাই, বরং তাঁহার উপরই এই ঘটনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

↑ এই হাদীছখানা পর পর তিনবার উল্লেখ হইয়াছে; সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

নামায

নামায ফরজ হওয়ার বিবরণ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই নামায ফরজ হইয়াছিল। ৬নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, মক্কাবাসী আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে এই উক্তি করিয়াছিল যে, (এই নবী) আমাদিগকে নামায, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন।

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে নামায ফরজ হয়। প্রথমতঃ দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ণ আনুগত্যের সহিত উহা গ্রহণে আল্লার দরবার হইতে ফিরিলেন। পথিমধ্যে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ইহা আপনার উম্মতের জন্য কঠিন হইবে, ইহা হ্রাস করার জন্য আপনি আল্লার নিকট আবেদন করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন; এইবার পাঁচ ওয়াক্ত কম করিয়া দেওয়া হইল। মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি পুনরায় ঐ পরামার্শই দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় গেলেন, এইভাবে পুনঃ পুনঃ যাইতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম হইতে লাগিল। শেষবার যখন পাঁচ ওয়াক্ত থাকিয়া গেল, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিলেন, এই পাঁচ ওয়াক্তকে পূর্ণভাবে আদায় করিলে ইহাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছি—"পঞ্চাশ ওয়াক্ত" আমার নিকট (ছওয়াবের ক্ষেত্রে) তাহাই ঠিক রহিল। এইবারও মুসা (আঃ) আরও কম করার জন্য পুনরায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার পরও পুনরায় আল্লাহ তায়ালার নিকট আরও কম করার আবেদন করিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লজ্জা বোধ করিলেন।

মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ পূর্ণভাবে বিষদ ব্যাখ্যার সহিত ইনশা-আল্লহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে মে'রাজ শরীফের পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

২৩৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা নামায ফরজ করেন মুসাফির অবস্থায় ও বাড়ীতে থাকাকালীন—সর্বাবস্থায়ই (মগরেব ভিন্ন) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায দুই রাকাত। পরে সফর অবস্থার জন্য দুই রাকাত ঠিকই রহিল, কিন্তু বাড়ী থাকাকালীন অবস্থায় (তিন ওয়াক্ত) নামায চার চার রাকাত করিয়া দেওয়া হইল।

নামায পড়িতে কাপড় পরা ফরজ

অর্থাৎ নামায অবস্থায় ছতর (তথা বিশেষ অঙ্গসমূহ) ঢাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—خذوا زينتكم عند كل مسجد "প্রত্যেক নামাযেই কাপড় পরিবে।"

ছালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু অলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাস করিলেন, আমি শিকারে অভ্যস্ত। কোন সময় শুধু লম্বা একটি জামা পরিধান করিয়া থাকি, ঐ অবস্থায় নামায পড়িতে পারিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ— কিন্তু বুতামের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। বুতাম না থাকিলে কাটা দ্বারা হইলেও বুতাম পট্টি গাঁথিয়া লও, যেন বুকের উপর জামা উন্মুক্ত না থাকে। নতুবা রুকু করার সময় স্বীয় দৃষ্টি গুপ্তস্থানের উপর পড়িতে পারে।

উল্লেখিত হাদীছের সনদ তথা ক্রমিক সাক্ষীসমূহের একজন সাক্ষী দুর্বল, তাই ইহা দ্বারা কঠোর আদেশ প্রমাণিত হইবে না এবং নিজের দৃষ্টি নিজের ছতরের উপর পড়িলে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না। অবশ্য মকরূহ হইবে।

একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে উহা ঘাড়ের সঙ্গে গিরা দিয়া লইবে

ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িলে ঐরূপভাবেই পড়িতেন। কারণ, সমস্ত শরীর আবৃত করার উদ্দেশ্যে চাদরটিকে সীনার উপর বাঁধিলে চাদর খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ঐ আশঙ্কায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত থাকিবে—তাহার লক্ষ্য ও ধ্যান আল্লার প্রতি নিবদ্ধ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তাই রাসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ খুটিনাটি বিষয়ে এমন আদর্শের শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহাতে নামায অবস্থায় একাগ্রচিত্তে, কায়মনোবাক্য এক আল্লার প্রতি ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না হইতে পারে। যেমন পায়খান প্রস্রাবের বেগ লইয়া বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহারের প্রতি আগ্রহ লইয়া নামাযে দাঁড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২৩৪। হাদীছঃ— ছাহাবী জাবের (রাঃ) একদা একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয় ঘাড়ের সঙ্গে গিরা লাগাইয়া নামায পড়িলেন; অথচ তাঁহার অন্যান্য কাপড় সম্মুখে আলনার উপর রাখা ছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আপনি মাত্র এক কাপড়ে নামায পড়েন? তিনি বলিলেন হাঁ—আমি ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করিয়াছি; যেন তোমার মত বোকা মানুষ আমাকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দুই কাপড় ছিল?

ব্যাখ্যাঃ— শয়তান অতিশয় ধূর্ত; সে মানুষকে বাহ্যিকভাবে ভাল পথ দেখাইয়াও প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেক লোক নামায পড়ে না; জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, নামাযের জন্য কাপড়ের সু-ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য নামায পড়ি না। সামর্থ অনুযায়ী নামাযের জন্য কাপড়ের সু ব্যবস্থা রাখা ভাল কথা, কিন্তু শয়তান তাহাকে এই পথ দেখাইয়া কিরূপ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করিল যে, কাপড়ের ছুতা দিয়া তাহাকে নামায ছাড়াইয়া দিল, অথচ কাপড় একেবারে না থাকিলেও নামায

মাফ হয় না; উলঙ্গ অবস্থায়ই নামায পড়িতে হইবে। শয়তান মানুষকে সাধুতার সহিতও ধোকা দিয়া থাকে, সে জন্যই অনুকরণযোগ্য আদর্শ শ্রেণীর ব্যক্তিদের উচিত সর্ব-সাধারণকে দেখাইবার জন্য সময় সময় এরূপ কার্য্য করা যাহা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েযের গণ্ডিভুক্ত। যদিও উহা উত্তমের বিপরীত হয়। ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত ঘটনায় এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২৩৫। **হাদীছঃ**—মোহাম্মদ ইবনে মোনকাদের (রঃ) বলেন, আমি ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

লম্বা চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে চাদরের উভয় দিক দুই কাঁধের উপর পিছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে

অর্থাৎ—এক চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া নামায পড়িতে হইলে যদি চাদরটি বিশেষ লম্বা না হয় তবে উহার দুই মাথা ঘাড়ের উপর দিয়া গিরা লাগাইয়া দিবে। লম্বা হইলে চাদরের ডান বাম কাঁধে ও বাম দিক ডান কাঁধে পেছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে, গিরা দিতে হইবে না।

২৩৬। **হাদীছঃ**—ওমর ইবনে আবু ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চাদর উভায় দিক কাঁধের উপর ঝুলাইয়া পরিধান করতঃ নামায পড়িয়াছেন।

২৩৭। **হাদীছঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, এক কাপড়ে নামায পড়া কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি কাপড় থাকে? অর্থাৎ—এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয না হইলে অনেকের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অবশ্য সামর্থ থাকিলে পূর্ণ পোশাকে নামায পড়া উচিৎ।

২৩৮। **হাদীছঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়িবে অবশ্যই চাদরের ডানদিক বাম কাঁধে বামদিক ডান কাঁধে ঝুলাইয়া লইবে।

অপ্রশস্ত কাপড়ে কিরূপে নামায পড়িবে?

২৩৯। **হাদীছঃ**— ছায়ীদ ইবনে হারেছ বলেন, আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম এক কাপড়ে নামায পড়া যায় কি? তিনি বর্ণনা করিলেন, আমরা কোন এক জেহাদের ছফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাত্রিকালে আমি নিজের কোন প্রয়োজনে হযরতের নিকট আসিলাম; দেখিলাম, তিনি নামাযে মশগুল আছেন। আমার পরিধানে একটি মাত্র কাপড় ছিল, (কাপড়টি অপ্রশস্ত ও খাট ছিল,

তাই কুঁজোর ন্যায় হইয়া কোন প্রকারে) ঐ কাপড়টি পেঁচাইয়া পূর্ণ শরীর আবৃত করিলাম এবং হযরতের এক পার্শে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে কেন আসিয়াছ? আমি আমার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এভাবে কাপড় পরিয়াছিলে কেন? আরজ করিলাম, একটি মাত্র কাপড় (তাও খাট, পূর্ণ শরীর আবৃত করার জন্য বাধ্য হইয়াই এরূপ করিতে হইয়াছে)। হযরত (দঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়িতে হইলে, যদি প্রশস্ত হয় তবে উহার দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিবে, অপ্রশস্ত (খাট) হইলে উহাকে লুঙ্গির ন্যায় পরিবে।

২৪০। হাদীছ ঃ—ছহল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক পুরুষ এমতাবস্থায় নামায পড়িত যে, একটি মাত্র চাদর দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিয়া চাদরের দুই মাথা ঘাড়ের উপর গিরা দিয়া রাখিত—যেমন শিশুদেরকে চাদর পরান হইয়া থাকে। (এ অবস্থায় সেজদার সময় চাদরটি শরীরের নিম্ন অংশ হইতে ফাঁক হইয়া থাকার দরুন পেছনের দিকে ঝুলন্ত চাদরের তলদেশে ছতর দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকায়,) নামাযরত পেছনে উপবিষ্টা নারীদিগকে বলা হইত, যাবৎ পুরুষগণ সেজদা হইতে সোজা হইয়া বসিয়া না যায় তাবৎ তোমরা সেজদা হইতে মাথা উঠাইও না।

বিধর্মীদের তৈরী কাপড়ে নামায পড়া

হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, অগ্নি পূজকদের তৈরী কাপড়কে দুষণীয় মনে করা হইত না, (উহার উপর নামায ইত্যাদি পড়া জায়েয আছে)।

আলী (রাঃ) নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া উহা পরিধানে নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিধর্মীদের তৈয়ারী কাপড় বা নূতন কাপড় কোন প্রকার নাপাকি থাকিলে বা নাপাকির লক্ষণ দৃষ্ট না হইলে উহা ধৌত না করিয়া উহাতে নামায পড়া যায়। এরূপ সাধারণ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দেওয়া হইলে অছওয়াছা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইবে। আর যদি উহাতে নাপাকি থাকে তবে উহা ধৌত করার শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রণালীতে ধোয়ার পর উহা ব্যবহার করা এবং উহাতে নামায পড়া জায়েয আছে ইয়ামন দেশের তৈরী এক প্রকার রঙ্গিন কাপড় যাহা রং করিতে প্রস্রাব ব্যবহৃত হইত; ইমাম যুহরী (রঃ) উহা পরিধান করিতেন এবং উহাতে নামাযও পড়িতেন। (কিন্তু শরীয়তী প্রণালীতে পাক করিবার পর।)

২৪১ হাদীছ ঃ— মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, পানির পাত্র লও, আমি উহা লইলাম, রসুলুল্লাহ দঃ) নির্জন স্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং আমার অদৃশ্যে চলিয়া গেলেন। তারপর তিনি হাজত পুরা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অজু করিতে লাগিলেন। আমি অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। তাঁহার পরিধানে সিরিয়া দেশের

তৈরী একটি জুব্বা ছিল। উহার আস্তিনের মুহরী সরু ছিল, তাই উহা টানিয়া কনুই-এর উপর উঠানো সম্ভব হইল না, সে জন্য হস্তদয় ভিতর দিক হইতে টানিয় উহা হইতে বাহির করিয়া লইলেন এবং পূর্ণ অজু করিয়া পা ধোয়ার পরিবর্তে চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) শাম দেশের তৈরী জুব্বা পরিহিত ছিলেন; সে কালে শাম দেশের অধিবাসী অমোসলেম ছিল।

নামায এবং অন্য অবস্থায়ও উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ

২৪২। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবুয়তের পূর্বের ঘটনা—) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘর মেরামতের জন্য সকলের সঙ্গে কাঁধে বহন করিয়া পাথর আনিতে ছিলেন, তাঁহার পরনে লুঙ্গি ছিল। তাঁহার চাচা আব্বাস (সেই অন্ধকার যুগের রীতি অনুসারে) বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লুঙ্গি খুলিয়া কাঁধের উপর রাখিলে পাথর আনিতে কষ্ট হইত না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন; এই ঘটনার পর তিনি সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন।

জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া বা জুব্বা পরিধানে নামায পড়া

২৪৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি দুই কাপড়ের সামর্থ রাখে? আর এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এখন আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে সামর্থ্য দিয়াছেন, তাই তামাদের কর্তব্য সেই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা। প্রত্যেকের উচিত একাধিক কাপড়ে নামায পড়া। লুঙ্গি ও চাদর, ও লুঙ্গি ও জুব্বা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও জুব্বা, জাঙ্গিয়া ও জুব্বা, জাঙ্গিয়া ও (লম্বা) জামা বা জাঙ্গিয়া ও চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ছতর আবৃত করা পরিমাণ একটি মাত্র কাপড় পরিধানে নামায পড়া যায়, কিন্তু সামর্থ্য থাকিলে অন্তত দুইখানা কাপড়ে নামায পড়া ভাল, যেমন—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা উবাই (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের মতানৈক্য হইল—উবাই (রাঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া মকরূহ নহে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই মাছআলাহ ঐ সময়ের যখন একাধিক কাপড়ের সামর্থ্য মোসলমানদের ছিল না। খলীফা ওমর (রাঃ) এই মতানৈক্যের ফয়ছালা করিলেন যে, উবাই (রাঃ) মাছআলাহ ঠিকই বলিয়াছেন; তবে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)ও ভুল বলেন নাই।

ছতর আবৃত রাখা ফরজ

২৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি মাত্র চাদর দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া উহার এক দিক কাঁধের উপর উঠাইয় রাখা (যাহাতে ঐ পার্শ্ব দিয়া ছতর

খোলা থাকিয়া যায়) বা একটি মাত্র কাপড় (যেমন চাদর কিম্বা জামা বা লুঙ্গি) পরিধান করতঃ দুই হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যেন তলদেশ উন্মুক্ত থাকিয়া যায় এবং লজ্জাস্থানের উপর আবরণ না থাকে, রসুলুল্লাহ দঃ) এই উভয় অবস্থাকে নিষিদ্ধ (হারাম) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এইভাবে কাপড় পরিধান করা যাহাতে ছতর উন্মুক্ত থাকিয়া যায় বা উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ইহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সেকালের আরবগণ উল্লিখিত দুই ধরণের কাপড় পরিত যাহাতে ছতর উন্মুক্ত হইত, সে জন্যই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষভাবে ঐ দুইটি অভ্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন!

২৪৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (নবম হিজরীতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক) যখন আবু বকর (রাঃ) আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত হইলেন; সেই হজ্জের সময় মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন তিনি আমাকে এই ঘোষণা জারীর আদেশ করিলেন, কোন মোশরেক এই বৎসরের পরে আর হজ্জে শরীক হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যক্তি উলঙ্গাবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না। এদিকে রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকরের পিছনে পিছনে আলী (রাঃ)কে পাঠাইয়া দিলেন, বিশেষভাবে এই ঘোষণা জারী করার জন্য যে, কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির বাধ্যবাধকতা তুলিয়া লওয়া হইল * আলী (রাঃ) মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন এই ঘোষণাও জারী করিলেন যে, কোন মোশরেক এই বৎসরের পর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না।

উরু (জানুর উর্দ্ধভাগ) ছতরের অন্তর্ভুক্ত কি-না?

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাবহাদ এবং মোহাম্মদ ইবনে জাহ্‌শ (রাঃ) হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন হাদীছ দ্বারা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইমাম বোখারী (রঃ) ঐরূপ হাদীছের ইঙ্গিত দানে বলেন যে, উল্লিখিত ছাহাবীত্রয়ের বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী আমল করাই অবশ্য কর্তব্য। কেননা তাহা হইলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২৪৬। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে রওয়ানা হইলেন। খয়বরের নিকটে পৌঁছিয়া ফজরের নামায আউয়াল ওয়াক্ত অন্ধকার থাকিতেই পড়িলেন। তারপর শহরে প্রবেশ করিবার জন্য উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। আমি (আমার মাতার স্বামী—) আবু তালহার সঙ্গে এক উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম। নবী (দঃ) খয়বর শহরে প্রবেশ করিয়া শহরের পথসমূহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। (সরু রাস্তায় যানবাহনের অত্যন্ত ভীড়, যানবাহনগুলি ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া চলিতেছিল,

---

* সন্ধির বাধ্য-বাধকতা তুলিয়া লওয়ার ঘোষণা জারির বিষয়টি কোরআন শরীফে ছুরা বরাআতের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ঘোষণা প্রচারের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আলী (রাঃ)কে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

তাই) আমার হাঁটু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুতে স্পর্শ করিতেছিল; এতদ্ভিন্ন কোন এক মুহূর্ত হযরতের লুঙ্গি তাঁহার উরু হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল, এমনকি তাঁহার উরুর শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। +

ব্যাখ্যা:— যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ধারণা জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে এই হাদীছখানাই অন্যতম। ইহার দুইটি বাক্যের দ্বারা ঐ ধারণার সূত্রপাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বাক্যের দ্বারাই উরু ছতর নয় বলিয়া প্রমাণিত বাক্যটি— ركبتى لتمس فخذ نبى الله "(ভীড়ের কারণে যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে) আমার হাঁটু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরু স্পর্শ করিতেছিল।" এখানে উরু উন্মুক্ত হওয়ার কোনই উল্লেখ নাই; পরিধেয় কাপড়ের উপর উরু স্পর্শিত হওয়াকেও এরূপ বাক্যে ব্যক্ত করা যায়, তদুপরি ইমাম বোখারী (র:) এই হাদীছখানাকেই ৮৬পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন—সেখানে فخذ "উরু" শব্দের স্থানে قدم "পা" শব্দ উল্লেখ হইয়াছে—ان قدمى لتمس قدم النبى "আমার পা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা-কে স্পর্শ করিতেছিল।" সাধারণতঃ যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে আরোহীদের পায়ের স্পর্শনই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় বাক্যটি "حسر الازار عن فخذه" আরবী ভাষায় حسر শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—"খোলা বা উন্মুক্ত করা" এবং "খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হওয়া"। অধিকন্তু মোসলেম শরীফে এই হাদীছখানার মধ্যেই حسر শব্দের পরিবর্তে انحسر উল্লেখ হইয়াছে; যাহার একমাত্র অর্থ হইতেছে, "খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া।" সেই অনুসারে উক্ত বাক্যের অর্থ এই হয় যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরু হইতে লুঙ্গি সরিয়া পড়িল, উরু উন্মুক্ত হইল। ভীড়ের কারণে বা বাতাসের দরুন অনিচ্ছাকৃত এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তুত: উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নারীগণ কিরূপ বস্ত্রে নামায পড়িবে?

ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট শাগের্দ একরেমা (র:) বলেন, সমস্ত শরীরকে আবৃত করার মত একটি কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়া নারীদের জন্য জায়েয আছে।

২৪৭। হাদীছ:—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ:) জমাতে ফজরের নামায পড়িতেন, মোসলমান নারীগণ প্রশস্ত চাদরে আবৃত হইয়া জমাতে উপস্থিত হইতে এবং নামাযান্তে বাড়ী ফিরিবার সময়* তাহাদেরকে চেনা যাইত না।

+ এই হাদীছখানার মধ্যে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, বোখারী (র:) ইহাকে ৩৬ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এখানে শুধু এই স্থান সম্পর্কীয় অংশটুকু অনুবাদ করিলাম।

* এই রেওয়ায়েতে ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, من الغلس অর্থাৎ অন্ধকার থাকার দরুন নারীদিগকে চেনা যাইত না। কিন্তু ইবনে মাজা শরীফের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিবি আয়েশার উক্তি নহে। পক্ষান্তরে এক হাদীছে আছে যে, ফজরের নামায হযরত (দ:) শেষ করিলে প্রত্যেকে তাহার নিকটবর্তী মানুষকে চিনিতে পারিত।

নক্সী বস্ত্রে নামায পড়িলে নক্সার প্রতি ধ্যান করিবে না

২৪৮। হাদীছঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ডোরা-বিশিষ্ট চাদর পরিধানে নামায পড়িতে ছিলেন; হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঐ ডোরার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নামাযান্তে ঐ চাদরটিকে ঘৃণিতরূপে খুলিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, এই চাদরটি আবু জাহ্‌মকে ফেরৎ দাও এবং এর বদলে তাহার এক রঙ্গের মোটা পশমী চাদরটি নিয়া আস। এই ডোরাগুলি নামাযে আমার পূর্ণ ধ্যান ও মগ্নতার প্রতিবন্ধক হইতে ছিল।

নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি ঐ ডোরাগুলির উপর পতিত হয়, তাই আমার আশঙ্কা হয়, চাদরটি এইরূপে আমাকে নামাযের মগ্নতা হইতে বিরত না করিয়া ফেলে ×

ব্যাখ্যাঃ—নামাযে আল্লার প্রতি একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও মগ্নতা হাসিল করা একান্ত কর্তব্য যে কোন বস্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক হয় বা সেরূপ আশঙ্কা হয় উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ক্রুশ-চিত্রের বা অন্য কোন বিশেষ আকর্ষণীয় ছাপের কাপড় সম্পৃক্তে নামায পড়িবে না

জীবের ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করাই নিষিদ্ধ। নামায অবস্থায় উহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এমনকি কোন কোন আলেম বলেন, ঐরূপ কাপড় পরিধান করিয়া নামায হইবে না।

২৪৯। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নক্সী ছাপার একটি পর্দা ছিল যাহাকে তিনি ঘরের এক কোণে লটকাইয়া (উহার আড়ালে আসবাবপত্র রাখিতেন। একদিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন, পর্দাটিকে সরাইয়া ফেল ইহার নক্সাগুলি নামাযের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামে ইমাম বোখারী (রঃ) ক্রুশের আকৃতিকে নিষিদ্ধরূপে উল্লেখ করিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ক্রুশের ছবি কোন জীবের ছবি নয় বলিয়া শরীয়তের সাধারণ নীতি অনুসারে কেহ ইহাকে জায়েয মনে করিতে পারে সে জন্যই উহা নিষিদ্ধ হওয়া বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রুশ-চিহ্ন একটি বিধর্মীয় প্রতীক এবং উহা ব্যবহারে বিজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিধর্মীয় প্রতীক ও বিজাতীয় প্রভাব অবলম্বন করিয়াই মোসলেম জাতি চরম অধঃপতনে পড়িয়াছে। এই ক্রুশের প্রতীকধারী খৃষ্টানগণ এক সময়ে স্পেন, তারাব্‌লস ইত্যাদি সমস্ত

× এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ ডোরাগুলি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একাগ্রতায় প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শান ও মর্তবা দৃষ্টে উহা সম্ভবও নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হইয়া থাকে বলিয়া প্রিয় উম্মতকে সতর্ক করার জন্য স্বীয় কাঁধে ক্রুটির বোঝা নিয়া বুঝাইয়াছেন; স্নেহপূর্ণ মুরব্বি এইরূপই করিয়া থাকেন।

ইউরোপ হইতে মোসলেম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই ক্রুশের দোহাই দিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। এমনকি "জঙ্গে ছলীব" বা ক্রুশের যুদ্ধ নাম দিয়া তাহারা অগণিত মোসলেম নর-নারীর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। সে সব কাহিনী ভুলিয়া যাওয়া কোন মোসলমানের জন্য জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক হইবে না। আজও খৃষ্টানগণ আমাদের দেশে মোসলমানদের মন-মগজে সেই নরখাদক মনহুস অশুভ ক্রুশের প্রভাব বিস্তার করার হাজার হাজার ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টান পরিচালিত স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহে আজও সেই মোসলেম হৃদয়ে বর্শাঘাতকারী ক্রুশ মাথা উঁচু করিয়া আছে। সেখানেই আমাদের সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাছা বাছা বালক-বালিকা হইতে যুবক-যুবতী পর্য্যন্ত লালিত-পালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং সর্বদা তাহারা ঐ ক্রুশের মাথা উঁচু দেখিয়া প্রতিদিন উহার প্রতি ভক্তির প্রণাম দিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয় বরং এই বিষয়কে ব্যাপকভাবে মোসলেম সমাজে ঢুকাইবার জন্য শান্তি ও সাহায্যের প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও প্রতীক "রেডক্রস" (Redcroos)-এর ভিতর দিয়াও ক্রুশের প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। মোসলেম জ্ঞানীগণ ঐ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াই উহার পরিবর্তে তাঁহারা "রেডক্রিসেন্ট" (Redcresceni) নিজস্ব প্রতীক প্রচলিত করিয়াছিলেন।

প্রতিটি মোসলমানের ভিতর বিজাতীয় প্রতীকের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে। বোখারী শরীফের ৮৮০ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ঘরে ক্রুশ-চিহ্নযুক্ত কোন বস্তু দেখিলে উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেন।

রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়া

২৫০। হাদীছ ঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল (তখন রেশমী বস্ত্র ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম ছিল না)। তিনি উহা পরিধান করিয়া নামায পড়িলেন। কিন্তু নামায শেষে উহাকে ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, ইহা মোত্তাকীনদের জন্য সমীচীন নয়।

ব্যাখ্যা ঃ—রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার ইহা প্রথম পদক্ষেপ। এরপর রস্থলুল্লাহ (দঃ) পরিষ্কার বলিয়াছেন—দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র ঐ পুরুষই ব্যবহার করিতে পারে, আখেরাতে যাহার সুখ লাভের আদৌ কোন আশা নাই। "খলীফা ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ (দঃ) রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।" (বোখারী শরীফ ৮৬৭ পৃঃ)

লাল রঙ্গের কাপড় পরিধানে নামায পড়া

২৫১। হাদীছ ঃ—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদিন দেখিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চামড়ার তাঁবুতে উপবিষ্ট এবং বেলাল (রাঃ)

তাঁহার অজুর পানি আনিয়াছেন, সকলেই তাঁহার অজুর ব্যবহৃত পানির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছে। কেহ ঐ পানির কিছু অংশ লাভ করিয়া শরীরে মলিতেছে, কেহবা উহা লাভ করিতে না পারিয়া স্বীয় সঙ্গী হইতে শুধু আর্দ্রতা গ্রহণ করিতেছে। তারপর বেলাল (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লাঠিখানা গাড়িয়া দিলেন; নবী (দঃ) তাঁবু হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি এক জোড়া লাল রং-এর বস্ত্র ✝ পরিহিত ছিলেন; তাঁহার লুঙ্গি পায়ের গিরা হইতে অনেক উপরে ছিল। নবী (দঃ) ঐ লাঠিকে সম্মুখে রাখিয়া জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের সময় মানুষ ও জীব জন্তু ঐ লাঠির সম্মুখ দিয়া চলাচল করিতেছিল।

ছাদের উপর বা মিম্বর ও চৌকি ইত্যাদির উপর নামায পড়া

হাসান বাছরী (রঃ) বলেন, পুলের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়া দুষণীয় নয়। যদিও ঐ পুলের তলদেশে বা সম্মুখভাগে নাপাক বস্তু প্রবাহিত হইতে থাকে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার জমাতে শামিল হইয়া ছাদের উপর নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বরফের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ—এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য, মাটি ভিন্ন অন্য বস্তুর উপর নামায পড়া যায়। এক হাদীছে উল্লেখ হইবে, রসুলুল্লাহ (দঃ) চাটাই-এর উপরে নামায পড়িয়াছেন।

২৫২। **হাদীছঃ**—ছাহল ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বর গাবা নামক বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। ঐ মিম্বরটি যখন তৈরী হইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার সঙ্গে নামাযে শামিল হইল। হযরত (দঃ) ঐ মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া কেরাত পড়িলেন ও রুকু করিলেন পেছনের সকলেই রুকু করিল। তারপর তিনি রুকু হইতে উঠিয়া পশ্চাদপায়ে নামিয়া আসিলেন (কারণ মিম্বরের উপর সেজদা করা সম্ভব নয়, তাই) নীচে নামিয়া সেজদা করিলেন।

● ইমাম বোখারী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়—ইমাম মোক্তাদীদের অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়াইতে পারে।

এ সম্পর্কে সাধারণ মছআলা এই যে, এক হাত পরিমাণ উচা বা যাহাতে ইমাম সুস্পষ্টতঃ সকল হইতে উচ্চ দেখায় এরূপ উচা জায়গায় একা ইমাম দাঁড়ান বিশেষ কোন কারণ ছাড়া হইলে তাহা মাকরূহ। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীছ আছে (শামী, ১-৬০৪)।

✝ নবীজীর বস্ত্র জোড়া প্লেন লাল ছিল না, ঘন লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মতে প্লেন লাল বস্ত্র পরা নিষিদ্ধ। হাদীছে আছে—এক ব্যক্তি এক জোড়া লাল বস্ত্র পরিধান করিয়া চলাকালে নবী (দঃ)কে সালাম করিল। নবী (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন না। (মেশকাত ৩৭৫)

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যবহারিক বস্তুকে সর্বপ্রথম নামাযের দ্বারা ব্যবহার আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। মিম্বরটি তৈয়ার হইয়া আসিলে সই উদ্দেশ্যে এবং নামাযের আদর্শ শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে তিনি উহার উপর নামায পড়িয়াছিলেন। সামান্য উঠা-নামার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সম্ভাব আমলসমূহ মিম্বরের উপর আদায় করতঃ ঐ মহৎ উদ্দেশ্যদ্বয় পূর্ণ করিলেন।

২৫৩। **হাদীছ :**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় ঘোড়া হইতে পতিত হইয়া তাঁহার ডান পার্শ আঁচড়াইয়া (এবং পা মচকাইয়া) গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি (বিভিন্ন কারণে) রাগ হইয়া এক মাস তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন এবং একটি দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ কক্ষের সিঁড়িটি খেজুর গাছের ছিল। একদা ছাহাবীগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ কক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি সেখানেই সকলকে নিয়া জমাতে নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) বসিয়া এবং মোক্তাদিগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন ....

রসুলুল্লাহ (দঃ) উনত্রিশ দিন ঐ কক্ষে অবস্থান করার পর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ঐ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, আপনি এক মাস পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; হযরত (দঃ) বলিলেন, এই মাস উনত্রিশ দিনে হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—এখানে প্রমাণ করা হইল যে, মাটি হইতে এত উচ্চস্থান সেখানে সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয় সেখানেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছেন।

চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

জাবের (রাঃ) এবং আবু সায়ীদ (রাঃ) নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, সাধ্যানুযায়ী নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। তাহা সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়িবে এবং নৌকা কেবলামুখ হইতে ঘূর্ণমান হইয়া গেলে নামায অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণমান হইয়া কেবলামুখী থাকিবে, নতুবা নামায হইবে না।

২৫৪। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার দাদী একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। খাওয়া শেষে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন. দাঁড়াও তোমাদের (বরকতের) জন্য (তোমাদের ঘরে) নামায পড়িব। আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি একটি পুরাতন চাটাই আনিলাম, বহু দিন ব্যবহৃত হইয়া উহা কাল হইয়া গিয়াছিল আমি উহাকে পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর দাঁড়াইলেন, আমি ও আর একটি ছোট ছেলে তাঁহার পিছনে সারি বাঁধিলাম এবং আমার বৃদ্ধা দাদীও আমাদের পিছনে দাঁড়াইলেন—এইভাবে দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চলিয়া গেলেন।

২৫৫। হাদীছ ঃ— মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চাটাই-এর উপর নামায পড়িতেন। (২২৬নং হাদীছও এখানে উখেল্ল করা হইয়াছে।)

ফরাস ইত্যাদি বিছানার উপর নামায পড়া

২৫৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় (রসুলুল্লাহ (দঃ) শয়নের বিছানার উপর তাহাজ্জুদ নামায আরম্ভ করিতেন।) আমি হযরতের সম্মুখ ভাগে শায়িত থাকিতাম। সেইকালে ঘরে চেরাগ জ্বালাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই আমার পা তাঁহার সেজদাস্থানে চলিয়া যাইত; তিনি সেজদা করার সময় আমার পায়ের উপর হাত দ্বারা চাপ দিতেন। তখন আমি পা গুটাইয়া লইতাম। হযরত (দঃ) সেজদা হইতে উঠিলে আমার পা আবার লম্বা হইয়া যাইত।

২৫৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই বিছানায় তিনি এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শয়ন করিতেন—অনেক সময় হযরত (দঃ) সেই বিছানার উপর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন। হযরতের নামায অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) হযরতের সম্মুখে জানাযার ন্যায় আড়াআড়ি শুইয়া থাকিতেন; (হযরতের কক্ষ প্রশস্ত ছিল না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অতঃপর যখন হযরত (দঃ) বেতের নামায পড়িতেন তখন তিনি আমাকে জাগাইয়া দিতেন; আমি উঠিয়া বেতের নামায পড়িতাম।

অধিক উত্তাপে (পরিহিত) বস্ত্রাংশের উপর সেজদা করা

হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ অত্যধিক উত্তাপের সময় পাগড়ীর কাপড়ের উপর ও টুপির উপর সেজদা করিতেন এবং আস্তিনের ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া উহা মাটির উপর রাখিতেন। (সাধারণতঃ পাগড়ীর বা মোটা টুপির উপর সেজদা করা নিষেধ।)

২৫৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতাম; মাটি উত্তপ্ত হওয়ার দরুণ আমাদের অনেকে সেজদাস্থানে (পরিহিত) কাপড়ের অংশবিশেষ রাখিয়া উহার উপর সেজদা করিত।

চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

অপবিত্রতার সন্দেহ না হইলে এবং পায়ের অঙ্গুলী মাটিতে লাগায় বিঘ্নের সৃষ্টি না করিলে এরূপ চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয, নতুবা জায়েয নয়।

২৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়িতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ।

চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

২৬০। হাদীছ ঃ—হাম্মান ইবনে হারেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি প্রস্রাব করিলেন, তারপর অজু করিতে চামড়ার

মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামাযে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী (দঃ)কে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। জরীর ইবনে আবদুল্লার এই হাদীছ সকলের নিকট অতি পছন্দনীয় ছিল, কারণ তাঁহার ইসলাম গ্রহণ অনেক বিলম্বে ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—কোরআন শরীফে ছুরা মায়েদার যে আয়াতে অজুর বর্ণনা হইয়াছে সেখানে পা ধৌত করার আদেশ রহিয়াছে, মছেহ করার উল্লেখ নাই। জরীর (রাঃ) চামড়ার মোজার উপর মছেহ করার উল্লেখ করিলে এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিল যে, মছেহ করার ঘটনা হয় ত ছুরা মায়েদার আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বে হইবে, তাই উহা মনছুখ ও রহিত। এরূপ সন্দেহে জরীর ইবনে আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করা হইত, আপনি যে ঘটনা বর্ণনা করেন তাহা ঐ আয়াতের পূর্বে না পরে? তিনি বলিতেন, আমি মোসলমান হইয়াছি ঐ আয়াত অবতরণের বহু পরে। ইহা দ্বারা ঐ সন্দেহ খণ্ডন হইয়া যাওয়ায় এই হাদীছ-খানাকে বিশেষভাবে পছন্দ করা হইত।

কা'বা দিককে কেবলারূপে গ্রহণ করা ইসলামের জন্য অপরিহার্য্য

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, নামাযের মধ্যে সেজদার সময় এবং বসার সময় পায়ের অঙ্গুলীসমূহকে কেবলামুখী রাখিবে।

২৬১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়িবে, আমাদের কেবলাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিবে এবং আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে, তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের তরফ হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, সেই প্রতিশ্রুতিকে তোমরা ভঙ্গ করিও না।

২৬২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছি, বিশ্ববাসীর বিরুদ্ধে জেহাদ ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাবৎ তাহারা এই স্বীকারোক্তি না করিবে যে, এক আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। যাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে, নামায পড়িবে, আমাদের কেবলামুখী হইবে এবং আমাদের জবেহকৃত খাইবে তাহাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন আমাদের জন্য হারাম। হাঁ—শরীয়ত অনুযায়ী যদি সে কোন শাস্তির উপযোগী হয় উহা প্রবর্তন করা হইবে। আন্তরিক অবস্থার জন্য সে আল্লার নিকট দায়ী থাকিবে এবং সেই অনুসারেই তাহার হিসাব হইবে।

● আনাছ (রাঃ)কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, কিসের দ্বারা জান-মালের নিরাপত্তার অধিকার লাভ হয়? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইবে—একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং সে আমাদের কেবলামুখী হইবে, আমাদের

ন্যায় নামায পড়িবে, আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে—তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। সে মোসলমানের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে, মোসলমানদের আইন-কানুনই তাহার উপর প্রবর্তিত হইবে*

যেখানেই নামায পড়া হউক কেবলামুখী হইতে হইবে

২৬৩। হাদীছ:—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় আসিয়া প্রথম অবস্থায় ষোল বা সতর মাসকাল বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী নামায পড়িলেন, কিন্তু সর্বদাই তাঁহার আকাঙ্খা ছিল, কা'বা শরীফমুখী নামায পড়া। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আকাঙ্খাবস্থা ব্যক্ত করিয়া উহা পূর্ণ করতঃ আয়াত নাজেল করিলেন—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"আমি লক্ষ্য করিতেছি, আপনি (কা'বামুখী নামায পড়ায় আকাঙ্খিত হইয়া উহার জন্য অধীর প্রতীক্ষায়) পুনঃ পুনঃ আসমানের দিকে তাকাইতেছেন। আমি নিশ্চয় আপনার ভালবাসার কেবলামুখী হওয়ার আদেশ প্রবর্তন করিব। (এখনই করিয়া দিলাম—) আপনি মসজিদে-হারামের (তথা কা'বার) প্রতি মুখ করুন। (হে মোসলমানগণ!) তোমরা যে স্থানেই থাক স্বীয় মুখ ঐ মসজিদে-হারাম বা কা'বার প্রতি করিয়া নামায পড়িবে।" (২ পাঃ ১ রুঃ)

এই আয়াত নাযেল হইলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা শরীফমুখী নামায পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইহুদীরা মোসলমানদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ এবং অযথা প্রশ্নাবলী নিশ্চয় করিবে, তাই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই আয়াতও নাযেল হইল—(২ পাঃ ১ রুঃ)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ـ

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"একদল জ্ঞান বুদ্ধিশূন্য লোক এরূপ প্রশ্ন করিবে যে, মোসলমানগণ কি কারণে পূর্বাবলম্বিত কেবলা (বাইতুল-মোকাদ্দস) ছাড়িয়া দিল? আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, (এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নাই। কারণ,) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পূর্ব, পশ্চিম,

---

* ২২নং হাদীছখানাও এই বিষয়েই বর্ণিত হইয়াছে, সেমতে মোসলমানদের প্রতীক ও পরিচয় হিসাবে মোট পাঁচটি বিষয় হইল। (১) তৌহিদ ও রেছালতের স্বীকারোক্তি। (২) নামায। (৩) যাকাত। (৪) কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা। (৫) মোসলমানদের জবেহ করা জীব খাওয়া।

উত্তর ও দক্ষিণ সবদিকের মালিক; (মুখ করার আদেশ একমাত্র তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী প্রবর্তিত হইবে। আল্লার আদেশাবলীর অনুগত হওয়া, ইহাই সৎপথ;) আল্লাহ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন।"

২৬৪। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় তাঁহার যানবাহন যে দিকে চলিত সে দিক হইয়াই নফল নামায পড়িতেন। (কারণ, যানবাহনের পৃষ্ঠে অন্যদিক হইয়া নামায পড়া সম্ভব নয়,) কিন্তু ফরজ নামায পড়ার সময় যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ নির্দিষ্ট কেবলামুখী হইয়া নামায পড়িতেন।

কেবলা নয় এমন দিকে ভুলবশতঃ নামায শুদ্ধ হইবে৹

২৬৫। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মদীনার নিকটবর্তী) কোবা নামক স্থানের লোকগণ (অজ্ঞাত অবস্থায় পূর্ব বিধান অনুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করিয়া) ফজরের নামায পড়িতে ছিল। কোন একজন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, গত রাত্রেই (শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি—) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; যাহাতে তিনি কা'বামুখী হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা কা'বামুখী ফিরিয়া গেল।

ব্যাখ্যা :—ঐ ব্যক্তিগণ ফজরের নামায যে দিকে পড়িতেছিল ঐ সময় সে দিকে কেবলা ছিল না, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে এরূপ হওয়ায় নামায পুনরারম্ভ করিতে হইল না, বরং জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী নামায কেবলার দিক হইয়া পড়িয়া নিল এবং তাঁহাদের নামায দুরস্ত হইল।

মসজিদে থুথু ইত্যাদি দেখিলে নিজেই পরিষ্কার করা

২৬৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইয়া নামায পড়া অবস্থায় মসজিদের কেবলামুখী দেওয়ালে থুথু দেখিতে পাইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মসজিদে হাজিরানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক (মিম্বরের উপর) লোকদের মুখী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ নামায অবস্থায় সম্মুখ দিকে থুথু ফেলিবে না; নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিক আল্লার (বিশেষ রহমতের) দিক। অতঃপর হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

৹ ভুলবশতঃ কেবলাহীন দিকে নামায ছহীহ হয়, কিন্তু শর্ত এই যে, সঠিক কেবলা জানিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, এমনকি যদি কেবলা নির্দ্ধারণের কোন ব্যবস্থা না হয় তবে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেক খাটাইয়া খুব ভালভাবে চিন্তা করতঃ যে দিক কেবলা হওয়ার ধারণা প্রবল হইবে সেই দিকে নামায পড়িবে। পরে ভুল প্রকাশ হইলেও নামায দোহরাইতে হইবে না, কিন্তু চেষ্টা বা চিন্তা না করিয়া যে কোন এক দিকে নামায পড়িলে নামায ছহীহ হইবে না।

২৬৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে থুথু বা কফ দেখিতে পাইয়া উহাকে নিজে পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

মছআলাহ ঃ—নাকের শ্লেষ্মা ও কফ ইত্যাদি কোন ঘৃণ্য বস্তু মসজিদে দেখা গেলে উহা কোন বস্তুর সাহায্যে পরিষ্কার করিবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অশুষ্ক কোন ঘৃণ্য বস্তুর উপর দিয়া হাটিয়া আসিলে (মসজিদে প্রবেশ করিতে) পা অবশ্যই ধুইয়া লইবে। আর যদি উহা শুষ্ক হয় যাহা পায়ে লাগিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই সেক্ষেত্রে পা ধোয়া আবশ্যকীয় নহে।

নামাযে থুথু ফেলার আবশ্যক হইলে

২৬৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়া উহা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, (নামায অবস্থায়) থুথু ও কফ ফেলা হইতে গত্যন্তর না হইলে সম্মুখ দিকে বা ডান দিকে ফেলিবে না। বাম পার্শে (যদি কোন লোক না থাকে) বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে।*

এই বিষয়ে আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ১ ২নং হাদীছ বিশেষ লক্ষ্যণীয়; নামাযে থুথু ফেলার যে নিয়ম ২৬৮নং ও ২৭০নং হাদীছে বর্ণিত আছে, উহা ছাড়া তৃতীয় আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা উক্ত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে—স্বীয় কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া উহা মর্দন করিয়া দিবে।

মসজিদে থুথু মাটির নীচে পুঁতিয়া না দিলে গুনাহ মাফ হইবে না+

২৬৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ; ঐ গোনাহ মাফ হওয়ার শর্ত উহাকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া।

২৭০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় সে যেন সম্মুখ দিকে কখনও থুথু

---

* বামদিকে বা পায়ের নীচে থুথু ফেলিবার সুযোগ একমাত্র মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে বা ঐরূপ মসজিদে হইতে পারিবে যাহা আরবদেশের ন্যায় মরুভূমির গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে যে, উহার জমিন কেবলমাত্র মরুভূমির বালু; উহা পাকা-পোক্তা নয়, উহার উপর বিছানাও নাই। কেবল বালুর উপর নামায পড়া হইয়া থাকে, পূর্বকালে সাধারণতঃ মসজিদ এরূপই হইত।

+ এই মছআলার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে মসজিদের জমিন পাকা বা বিছানাযুক্ত উহাতে থুথু ইত্যাদি ফেলা কোন মতেই জায়েয নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে একমাত্র তৃতীয় ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়।

না ফেলে, কেননা নামাযরত থাকাকালীন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করিতেছে। ডান দিকেও ফেলিবে না, কারণ (নামাযের সময় বিশেষ সাহায্যকারী) ফেরেশতা ডান দিকে উপবিষ্ট থাকেন। আবশ্যক হইলে) বাম দিকে বা পায়ের নীচে ফেলিবে এবং উহাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া দিবে।

ত্রুটিগোচর মোক্তাদীদেরে নামাযান্তে সতর্ক করা ইমামের কর্তব্য

২৭১। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। তারপর মিম্বরে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং নামায ও রুকু-সেজদা সম্পর্কে নছীহত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা রুকু-সেজদা সুন্দর ও পূর্ণরূপে করিও; নামাযের মধ্যে এবং যখন তোমরা রুকু-সেজদা কর তখন আমি তোমাদিগকে পিছন দিকে ঐরূপই দেখিতে পাই যেমন সম্মুখে থাকাকালীন দেখিতে পাই।✿

কোন গোত্র-বিশেষের মসজিদ বলা যায় কি?

২৭২। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জেহাদের যোগ্যতা অর্জনে অভ্যস্ত বা উৎসাহিত করার জন্য) ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান করিতেন। বিশেষভাবে গঠিত ঘোড়াগুলির দৌড়ের জন্য "হাফ্‌ইয়া" নামক স্থান হইতে "ছানিয়াতুল-বেদা" স্থান পর্য্যন্ত (প্রায় সাত মাইল) নির্দিষ্ট করিতেন। আর সাধারণ ঘোড়ার জন্য (তদপেক্ষা কম) ছানিয়াতুল-বেদা হইতে মসজিদে বনী-জোরাইক+ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিতেন।

মসজিদে কোন বস্তু বণ্টন করা বা লোকদের জন্য খেজুর ছড়া রাখা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশছিল, প্রত্যেক বাগান হইতে যেন গরীব-দুঃখীদের জন্য কিছু খেজুর ছড়া মসজিদে লটকাইয়া রাখা হয়।

২৭৩। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বাহ্‌রাইন দেশ হইতে আগত বাইতুল-মালের ধন-দৌলত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছিলে তিনি ঐসব মালকে মসজিদের ভিতরে রাখিতে আদেশ করিলেন। উহা এত প্রচুর ছিল যে, এত প্রচুর মাল ইতিপূর্বে আর কখনও আসে নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন, কিন্তু ঐ ধন-দৌলতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। নামাযান্তে

✿ অনেক ইহার রূপক অর্থ বলিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। আর অনেকে বলিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবেই হযরত (দঃ) ইচ্ছা করিলে স্বীয় চোখে পেছন দিকেও দেখিতে পাইতেন, ইহা তাঁহার খোদা প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সাধারণতঃ কানের দ্বারা পেছনের শব্দও শুনা যায়।

+ এখানেই প্রমাণ হইল যে, কোন গোত্র বা ব্যক্তি অথবা কোন স্থান বিশেষের প্রতি নির্দিষ্ট করিয়া কোন মসজিদের নাম করা জায়েয, যেমন—বনী-জোরাইক গোত্রের বস্তির মসজিদকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় সাধারণ্যে মসজিদে বনী-জোরাইক বলা হইত।

ঐ মালের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং যাহাকেই দেখিতে পাইলেন তাহাকেই দান করিতে লাগিলেন। এমতবস্থায় হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমাকে দান করুন; আমি বদরের যুদ্ধের ঘটনায় নিজের এবং আমার ভ্রাতাষ্পুত্র আকীলের মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়া একেবারে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, নিজ হস্তে ইচ্ছানুযায়ী লউন। তিনি কাপড় বিছাইয়া তন্মধ্যে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া লইলেন, তারপর উহা কাঁধে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপারগ হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, হয় কোনও ব্যক্তিকে আমার বোঝা উঠাইয়া দিতে বলুন অথবা আপনি নিজে উঠাইয়া দিন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইবে না; (স্বীয় বহন-ক্ষমতা অনুযায়ী লইবেন।) তাই তিনি বোঝা কিছু কম করিয়া লইলেন এবং পুনরায় উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবারও উঠাইতে পরিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও ঐরূপই বলিলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় বোঝা কম করিলেন এবং অতি কষ্টে কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি দৃষ্টিগোচর ছিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মালের প্রতি তাঁহার স্পৃহা দেখিতে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন, যাবৎ সেখানে একটি দেরহাম (এক সিকি) অবশিষ্ট ছিল রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা হইতে উঠেন নাই; সমস্ত ধন সাধারণ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মসজিদে দাওয়াত করা এবং উহা কবুল করা

২৭৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আমাকে আবু তালহা (রাঃ) হযরতের নিকট পাঠাইলেন; আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি অন্যান্য অনেকের সহিত মসজিদে রহিয়াছেন; আমি সেখানে দাঁড়াইলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে আবু তাল্হা পাঠাইয়াছে কি? আমি বলিলাম হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার জন্য? বলিলাম হাঁ। তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন, সকলেই চল—এই বলিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। আমি (পথ প্রদর্শকরূপে) সম্মুখে চলিতে লাগিলাম।*

মসজিদে বিচার বিভাগীয় কাজ করা

২৭৫। হাদীছ ঃ—সাহ্ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখিতে পাইলে সে কি করিবে? তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে কি? (তারপর ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গেই এরূপ ঘটনা ঘটিল এবং সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। অন্য সাক্ষী ছিল না, তাই

---

* এই হাদীছটি রসুলুল্লাহ (দঃ) মো'জেযা সম্পর্কীয় ঘটনায় বর্ণিত বড় একটি হাদীছের এক অংশমাত্র। পূর্ণ হাদীছটি ৫ম খণ্ডে হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

শরীয়ত মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়া'নের হুকুম দেওয়া হইল) তাহারা উভয়ে মসজিদের মধ্যে "লেয়া'ন"✿ করিল।

আবাস গৃহে নামাযের স্থান রাখা চাই

বর ইবনে আযেব (রাঃ) স্বীয় গৃহে নামাযের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থানে জমাতের সহিত নামায পড়িয়াছেন।

২৭৬। **হাদীছঃ**—এত্‌বান ইবনে মালেক (রাঃ) যিনি বদরের জেহাদে শরীক ছিলেন একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)। আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি আমাদের মসজিদের ইমাম, কিন্তু যখন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় পানির স্রোত বহিতে থাকে তখন আমি মসজিদে উপস্থিত হইতে পারি না; (নিজ গৃহেই আমার নামায পড়িতে হয়।) আমার বাসনা, আপনি আমার গৃহে যাইয়া কোন একস্থানে নামায পড়িয়া আসুন; আমি ঐ স্থানটিকেই সর্বদার জন্য নামাযের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করিয়া লইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। এত্‌বান (রাঃ) বলেন, পরদিন একটু বেলা হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলেন। আমি তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাইলাম; তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরের কোন্ স্থানে নামায পড়িব? আমি ঘরের এক কোণ দেখাইয়া দিলাম. তিনি তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার পেছনে দাঁড়াইলাম। তিনি দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ নাস্তার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলাম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের খবর শুনিয়া আমার বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইল। আগন্তুকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, মালেক ইবনে দোখায়শেন কোথায়, সে কি এখানে উপস্থিত হয় নাই? অন্য একজন বলিয়া উঠিল, সে মোনাফেক— আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি সে অনুরাগী নয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, এরূপ বলিও না। তুমি জ্ঞাত নও যে, সে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর। আমরা তাহাকে মোনাফেকদের প্রতি হিতাকাঙ্খী দেখিয়া থাকি রসুলুল্লাহ (দঃ)

✿ কাহারও প্রতি যেনার তোহমত লাগাইয়া শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রমাণ পেশ করিতে না পারিলে তাহাকে ৮০ বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু যদি স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনার তোহমত লাগান হয় এবং স্বামী প্রমাণ দিতে না পারে সে স্থানে উভয়ে পাঁচবার করিয়া লা'নত তথা অভিশাপযুক্ত কসম খাইলে ঐ বেত্রাঘাত হইতে রেহাই দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদে বাধ্য করা হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাকে "লেয়ান" বলে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কোরআন-হাদীছে এবং ফেকার কিতাবে বিদ্যমান আছে; ষষ্ঠ খণ্ডে ইনশা-আল্লাহ পাইতে পারেন।

বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুটির জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাহারও ঘরে যাইয়া বাহ্যিক পবিত্রতা দৃষ্টে বা মালিকের নির্দেশিত স্থানে নামায পড়িবে; অহেতুক সন্দেহ করিবে না।

মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিবে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিতেন এবং বাহির হইবার সময় বাম পা প্রথমে বাহির করিতেন। (এখানে ১২৯নং হাদীছ উল্লেখ আছে।)

যে স্থানে কবর আছে তথায় নামায পড়া। এবং কাফেরদের কবর উচ্ছেদ পূর্বক সেই স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা

এখানে দুইটি মছআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—(১) কবরযুক্ত স্থানে অর্থাৎ কবরের উপর, কবরের নিকটে বা কবরমুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়া জায়েয নয়। কারণ, কবরের তাজিম ও শ্রদ্ধা বা উহার কোন বিশেষত্বের উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে নামায পড়িলে উহা কবর পূজারূপে গণ্য হইয়া কুফরী ও শেরেকী গোনাহ হইবে। এবং যদি কবরের তাজিম ও বিশেষত্বের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি না থাকে তবুও ঐরূপ স্থানে নামায পড়া দুষণীয়। কারণ ইহাতে ইহুদী ও নাছারাদের রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তাহাদের এই রীতি ছিল না, পীর-পয়গাম্বরদের কবরের উপর মসজিদ বানাইয়া নামাযে উহার তাজিম ও সম্মানের নিয়্যত রাখিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিয়াছেন। তদুপরি যদিও নিজ মনে কোন প্রকার কু-নিয়্যত না থাকে তবুও ইহা দ্বারা দর্শকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। অতএব নিয়্যত ঠিক রাখিয়াও কবরের নিকটবর্তী নামায পড়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ কবর যদি কেবলা দিকে দৃষ্টিগোচর অবস্থায় থাকে তবে সে ক্ষেত্রে অনেক বড় গোনাহ হইবে; যদিও নামায শুদ্ধ হইবে পুনঃ পড়িতে হইবে না। একদা আনাছ (রাঃ) অজ্ঞাতে কবরের নিকটে নামায পড়িলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে কবর বলিয়া সতর্ক করিলেন, কিন্তু নামাযকে পুনঃ পড়িবার আদেশ করিলেন না।

(২) কবর উচ্ছেদ করিয়া সে স্থানে মসজিদ তৈরী করা জায়েয কি না? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কবর যদি কাফেরদের হয় তবে এরূপ করা জায়েয। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করিয়া ঐরূপেই স্বীয় মসজিদ তৈয়ার করিয়াছিলেন। আর ঐ কবর যদি মোসলমানের হয় তবে ঐরূপ করা জায়েয নয়; কারণ কোন মোসলমানের কবর উচ্ছেদ করা জায়েয নয়। হাঁ—কবর যদি বহু প্রাচীন হয় যাহাতে মৃতদেহের হাড্ডি মাংস বর্তমান না থাকে, তবে সে স্থানে কবরের কোন চিহ্ন না রাখিয়া মসজিদ বানাইতে পারে এবং উহাতে নামায পড়ায় দোষ নাই

(কাওকাবুদ্দুররী—মাওলানা গঙ্গুহ, ১—৫৩)

২৭৭। হাদীছ ঃ—উম্মে হাবিব (রাঃ) এবং উম্মে ছালামাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ার "মারিয়া" নামক গির্জা ঘর দেখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে বহু রকমের ছবি ছিল। তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোগ-শয্যায় তাঁহার নিকট উহার উল্লেখ করিলেন। নবী (দঃ) শোয়া অবস্থায়ই মাথা উঠাইয়া বলিলেন, ইহুদী ও নাছারাদের রীতি ছিল, তাহাদের কোন নেক্কার পরহেজগার ব্যক্তি মারা গেলে তাহার কবরের উপর মসজিদ তৈয়ার করিয়া উহাতে ঐরূপ নেক্কার আওলিয়া-দরবেশ, পীর-পয়গাম্বরগণের ছবি রাখিয়া দিত। এ সমস্ত অপকর্মকারী কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট জঘন্য পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২৭৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালীন যখন মৃত্যু-যন্তনায় অস্থির ছিলেন সেই মুহূর্তে বলিয়াছেন, ইহুদী ও নাছারাদের উপর আল্লার লা'নৎ বর্ষিত হউক ; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদ (সেজদার স্থান) রূপে ব্যবহার করিয়াছে। এই বলিয়া হযরত (দঃ) স্বীয় উম্মতকে ঐরূপ অপকর্ম হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। (৬২ পৃঃ)

২৭৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অভিশাপ ও বদ-দোয়া করতঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদিগকে ধ্বংস করুন ; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। (৬১ পৃঃ)

২৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা স্বীয় আবাস গৃহে (নফল) নামায (ইত্যাদি) পড়িও ; (আল্লার জেকরের দ্বারা গৃহ আবাদ থাকিবে ;) গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত বাক্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, যে গৃহে নামায ইত্যাদি আল্লার জেকর নাই, সেই গৃহবাসী মৃত এবং সেই গৃহ কবরস্থান তুল্য। তাই তোমরা স্বীয় আবাস গৃহকে আল্লার জেকর হইতে খালি রাখিয়া কবরস্থানে পরিণত করিও না। বাহ্য দৃষ্টিতে এই বাক্যের অর্থে ইহাও অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আবাস গৃহে মৃতদেহ দাফন করিও না, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে, আবাস গৃহে নামায পড়িও ; অথচ কবরযুক্ত স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ। (৬২ পৃঃ)

২৮১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় অবস্থান করিয়া প্রথমে "বনু আমের ইবনে আউফ" নামক গোত্রের বস্তিতে চৌদ্দ দিন অতিবাহিত করিলেন। তারপর তাঁহার পিতামহের মাতুল বংশ—বনী নাজ্জার বংশীয় লোকদিগকে তিনি খবর দিলে পর (তাহারা তাঁহাকে জাকজমক পূর্ণ পরিবেশে অভ্যর্থনা করিয়া নেওয়ার জন্য) প্রত্যেকে নিজ নিজ স্কন্ধে তলওয়ার লটকাইয়া হাজির হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে পেছনে বসাইয়া উষ্ট্রে আরোহণ পূর্বক আসিতেছিলেন এবং বনী-নাজ্জার গোত্রীয় লোকগণ তাঁহার চতুষ্পার্শে ছিল। এইভাবে পথ চলিয়া আসিয়া (মদীনা শহরে) আবু আইউব আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীর নিকটবর্তী

হইলে হযরতের যানবাহন উটটি বসিয়া পড়িল। (অবশেষে তথায়ই তিনি অবস্থান করিলেন এবং তথায়ই তাঁহার আবাস গৃহ তৈরীর ব্যবস্থ হইল।)

রস্থলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হইত সেখানেই নামায পড়িয়া লইতেন, এমনকি বকরী রাখার স্থানেও নামায পড়িতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু মদীনায় যখন বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়া গেল তখন তিনি সেখানে মসজিদ তৈরীর আদেশ দিলেন। বনী-নাজ্জার বংশীয় একদল লোককে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমাদের এই বাগানটি আমার নিকট বিক্রয় কর, তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত আরজ করিল, আমরা ইহা বিক্রি করিব না, বরং দান করিয়া আল্লার নিকট ইহার মূল্যপ্রাপ্ত হইব। (অবশেষে তিনি উহা মূল্য দিয়াই ক্রয় করিলেন।) আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ বাগানের মধ্যে ছিল—মোশরেকদের কতকগুলি (পুরানা কবর, পুরাতন ঘর বাড়ীর ভাঙ্গা-চুরা অবশিষ্ট এবং খেজুর গাছ। রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুযায়ী ঐ কবরগুলি উচ্ছেদ করা হইল, ভাঙ্গা-চুরা সমতল করা হইল এবং খেজুরের গাছগুলি কাটিয়া মসজিদের আবরণ ও বেষ্টনী রূপে কেবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরওয়াজার চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইল। সকলেই মসজিদ তৈরীর জন্য পাথর আনিতেছিল এবং আনন্দ-মুখে এই তারানা গাহিতেছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

"হে খোদা! পরকালের জেন্দেগীই একমাত্র জেন্দেগী; ঐ জেন্দেগীর সুখ-শান্তির ব্যবস্থা স্বরূপ সমস্ত আনছার ও মোহাজেরদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও।"

বকরী, উট (ইত্যাদি) জন্তুর নিকটবর্তী নামায পড়া

২৮২। **হাদীছ**ঃ—নাফে' নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি স্বীয় উটকে (ছোতরা স্বরূপ) সম্মুখে বসাইয়া নামায পড়িলেন এবং বলিলেন—আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(২৮১নং হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (দঃ) বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িতেন।)

ব্যাখ্যাঃ—নামাযে "খুশু খুজু" অর্থাৎ নিবেদিত আত্মার সহিত আল্লার প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা আবশ্যক, তাই এমন পরিবেশে নামায আরম্ভ করা কর্তব্য যে স্থানে পূর্ণ একাগ্রতা হাসিলে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। সে অনুযায়ী কোন কোন হাদীছে আছে, "বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িও না"। অর্থাৎ বকরী ছোট জন্তু; উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির কারণ নাই, উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ দিকে ধাবিত হইবে না। কিন্তু উষ্ট্র অতি বিরাট জন্তু, অনেক সময় কামড় দেয়, অনেক সময় লাথি মারে; তাই উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হইবে এবং তাহার একাগ্রতা নষ্ট হইবে—সে জন্য

এই পার্থক্য করা হইয়াছে এবং অনাবশ্যকে বড় জন্তুর নিকটবর্তী নামায আরম্ভ করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইতে চাহেন যে, উষ্ট্রের নিকটবর্তী নামায নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, আসল কারণ হইল একাগ্রতা হাসিল করিতে বাধার সৃষ্টি হওয়া। অতএব যদি কোন স্থানবিশেষে সেই ভয় না হয় তবে উষ্ট্রের নিকটবর্তীও নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন—কাহারও পালা-পোষা স্বীয় ব্যবহারের উষ্ট্র উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির আশঙ্কা নাই, তাই উহার নিকটবর্তী নামায পড়া জায়েয।

আল্লার গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান এড়াইয়া নামায পড়িবে

আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বাবেল এলাকার বস্তীতে নামায পড়া মকরূহ বলিতেন ; ঐ এলাকার অধিবাসীকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বসাইয়া দিয়াছিলেন।

২৮৩। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (তবুকের জেহাদে যাইবার পথে "হজর" নামক বস্তী—যেখানে ছামুদ বংশীয় কাফেরদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়াছিলেন, উহার নিকটবর্তী হইলে পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিলেন—ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী লোকদের বস্তীর ভিতর (আল্লার আজাবকে স্মরণ করতঃ ও) ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করিবে। (এমন স্থানের নিকটবর্তী হইয়াও) যদি ক্রন্দনের সৃষ্টি না হয় তবে (এরূপ কঠিন হৃদয় লইয়া) ঐ স্থানে প্রবেশ করিবে না। নচেৎ আশঙ্কা আছে—তোমাদের উপরও সেইরূপ আজাব আসিয়া পড়িতে পারে যাহা ঐ বস্তীবাসীদের উপর আসিয়াছিল।

আশ্রয়হীন নারীকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া যায়

২৮৪। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে. আরবদেশেই কোন গোত্রে জনৈকা হাবসী ক্রীতদাসী ছিল। তাহারা উহাকে আজাদ করিয়া দিলেও সে তাহাদের সঙ্গেই থাকিত। একদা তাহাদের একটি অলঙ্কার পরিহিতা মেয়ে বাহিরে চলাফেরা কালে তাহার অলঙ্কারটি খসিয়া পড়িয়া গেল বা সে নিজেই কোথাও খুলিয়া রাখিল। এদিকে হঠাৎ একটি চিল আসিয়া ঐ অলঙ্কারটিকে মাংস খণ্ড ভরিয়া ছো মারিয়া লইয়া গেল। ঐ ক্রীতদাসীর বর্ণনা যে—তারপর উহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ না পাইয়া তাহারা আমাকেই দোষী মনে করিয়া তল্লাশী লইল, এমনকি আমার লজ্জাস্থানে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চালাইল। আমি তাহাদের সঙ্গেই ছিলাম, হঠাৎ ঐ চিল অলঙ্কারটিকে আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তখন আমি বলিলাম, তোমরা আমাকে যে বস্তুর জন্য সন্দেহ করিতেছিলে এই দেখ সেই বস্তু। এই ঘটনায় ঐ ক্রীতদাসী তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে চলিয়া আসিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর একটি তাঁবুর ন্যায় করিয়া

উহাতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইল। সে যখনই আমার নিকট আসিত কথাবার্তার মধ্যে এই ছন্দটি বলিত—

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا . ولكنها من دارة الكفر نجت .

"অলঙ্কার হারাইবার ঘটনা আল্লার কুদরতের একটি আশ্চর্য্যজনক লীলা। উহার অছিলায়ই আমি কুফরস্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি।" সর্বদা তাহার মুখে এই বাক্য শুনিয়া আমি একদিন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ণ ঘটনাটি আমার নিকট ব্যক্ত করিল।

প্রয়োজনে পুরুষ মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারে

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীদের মধ্যে একদল নিরুপায় নিরাশ্রয় সর্বহারা লোক ছিলেন। নিজস্ব বলিতে তাঁহাদের কিছুই ছিল না; তাঁহাদিগকে আছহাবে ছোফ্‌ফা বলা হইত। ছোফ্‌ফা অর্থ চবুতরা (বারান্দা)। তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের চবুতরায় দিবারাত্র কাটাইতেন এবং এলেম শিক্ষায় রত থাকিতেন।

২৮৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সত্তরজন আছহাবে-ছোফ্‌ফাকে এরূপ দরিদ্রাবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পরিধানে দুইটি কাপড় ছিল না। প্রত্যেকেই শুধু একটি লুঙ্গি পরিহিত বা একটি কম্বল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃতাবস্থায় থাকিতেন। ঐ কম্বল কাহারও শুধু হাঁটুর নীচে, কাহারও পায়ের গিরার নিকটবর্তী হইত এবং কম্বল ছোট হওয়ায় উহার উভয় কিনারা হাতে ধরিয়া রাখিতে হইত যেন ছতর খুলিয়া না যায়।

২৮৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যৌবন বয়সেও যখন তাঁহার নিজস্ব ঘর-বাড়ী ছিল না, বিবাহও করেন নাই—তিনি রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদে ঘুমাইতেন।

২৮৭। হাদীছ :—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কন্যা ফাতেমার গৃহে আসিলেন; জামাতা আলী (রাঃ)কে না পাইয়া কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ফাতেমা উত্তর করিলেন, আমার সঙ্গে তাঁহার কথা কাটাকাটি হওয়ায় রাগান্বিত হইয়া আমার নিকট কিছু না বলিয়াই তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, আলী কোথায় গিয়াছে তালাশ কর। সে খোঁজ করিয়া আসিয়া আরজ করিল, তিনি মসজিদে শুইয়া আছেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীরের এক অংশ খালি মাটির উপর রহিয়াছে। মাটি মাখা অবস্থায় তিনি নিদ্রামগ্ন আছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় হস্তে তাঁহার শরীর ঝাড়িয়া বলিলেন, উঠ হে—আবু তোরাব। ("আবু তোরাব" অর্থ মাটি-মাখা। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্নেহভরে এরূপ সম্বোধন করিলেন।)

বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়া সর্বপ্রথম নামায পড়া

কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই কোন সফর হইতে বাড়ী আসিতেন সর্বপ্রথম মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামায পড়িতেন।

২৮৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম; তিনি আমার এক দিন পরে বাড়ী পৌঁছিলেন। এবং প্রথমে মসজিদে আসিলেন।) আমি বেলা পূর্বাহ্নে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি মসজিদেই ছিলেন। তিনি আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করিলেন। তাঁহার নিকট আমার একটি উটের মূল্য পাওনা ছিল, তিনি সেই আসল পাওনা প্রদান করিয়া আরও বেশী দিলেন।

মসজিদে বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িবে*

২৮৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ মসজিদে প্রবেশ করিবে, বসিবার পূর্বে সর্বপ্রথম দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইবে।

মসজিদের ভিতর অজু ভঙ্গ করা দূষণীয়

২৯০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযী ব্যক্তি তাহার নামায স্থানে বসিয়া থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকেন—হে আল্লাহ! তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর রহমত নাযেল কর—যাবৎ না সে মসজিদে অজু ভঙ্গ করে।

মসজিদ তৈরী কিরূপ হওয়া ভাল

আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ছাদ খেজুর গাছের পাতায় তৈরী ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীকে প্রশস্ত করার আদেশ দিলেন। (মসজিদে সঙ্কুলান হয় না লোকেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রৌদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, তাই) তিনি বলিলেন, লোকদিগকে বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়া দাও। খবরদার! লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙ্গীন নক্সা করিও না; উহাতে নামাযীদের মন আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মগ্নতা ও একাগ্রতা নষ্ট হইবে।

আনাছ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—আমার উম্মতের উপর এমন এক যমানা আসিবে যে, তাহারা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক ভাবে (বড় বড়, সুন্দর সুন্দর) মসজিদ তৈরী করিবে, কিন্তু ঐ মসজিদসমূহ অতি সামান্যই আবাদ হইবে।

---

* এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল-মসজিদ বলা হয়। এই নামাজ মসজিদে যাইয়া বসিবার পূর্বে পড়িতে হয়, নতুবা ছওয়াব কম হইবে। অনেকে মসজিদে যাইয়া প্রথমে বসিয়া নেয়—ইহা ভুল।

অর্থাৎ—মসজিদ আবাদ হয় নামায ও আল্লার জেকরের দ্বারা। কেয়ামতের নিকটবর্তী মোসলমান সম্প্রদায় শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হইবে—তাহাদের মসজিদসমূহ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু নামাযীর সংখ্যা অতি নগণ্য হইতে থাকিবে। মোসলমানদের এই দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হে মুসলমানগণ। তোমরাও মসজিদসমূহের শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হইবে যেমন ইহুদী, নাছারাগণ করিত।"

২৯১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদ পাথর দ্বারা দেওয়াল ও খেজুরের ডালা দ্বারা ছাদ তৈরী ছিল এবং খেজুর গাছ দ্বারা উহার খুঁটি দেওয়া হইয়াছিল। (প্রথম দফায় খলীফা) ওমর (রাঃ) উহাকে সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের ন্যায় পাথর, খেজুর পাতা ও খেজুরের গাছ দ্বারাই তৈরী করিয়াছিলেন। (তৃতীয় খলীফা) ওসমান (রাঃ) উহাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন এবং উহার দেওয়াল নক্সা করা পাথর দ্বারা চুণা ও শুরকির গাঁথনীর সাহায্যে তৈয়ার করেন এবং থামগুলিও নক্সী পাথর দ্বারা করেন এবং ছাদের মধ্যে শাল কাঠ লাগাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মসজিদকে চিত্রাঙ্কিত নক্সী ও রঙ্গিন না করিয়া সাদা-সিদাভাবে তৈরী করা আবশ্যক। বিশেষতঃ সম্মুখ দেওয়ালে চিত্তাকর্ষক নক্সা-নমুনা করা চাই না; ইহাতে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ সবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হাঁ, আড়ম্বরহীন সাদা-সিদাভাবে পাকা-পোক্তা ও মজবুত করা বিশেষতঃ বর্তমান যমানায় দুষণীয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় মসজিদ খেজুর গাছের ও উহার পাতায় তৈরী ছিল বটে, কিন্তু সেই যমানায় মানুষের আবাস গৃহ সাধারণতঃ এর চেয়েও নিম্নস্তরের হইত। বর্তমান যমানায় যখন সাধারণ মানুষের আবাস গৃহও খেজুর গাছের নয়, অগণিত আলীশান ইমারতে পরিপূর্ণ; এই অবস্থায় মসজিদকে নিম্নস্তরের বানাইলে উহার মর্য্যাদাহানি হইবে। বোখারী শরীফের শরাহ ফতহুলবারী নামক কিতাবে একজন প্রসিদ্ধ আলেমের ফৎওয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناحب ان يصنع ذلك بالمساجد
صونا لها عن الاستهانة -

"যেহেতু মানুষের আবাস গৃহ জাকজমকপূর্ণ আলীশান হইয়াছে, তাই মসজিদসমূহ সেই তুলনায় তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যেন মসজিদের মর্য্যাদাহানি না হয়।"

তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের রূপকে পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মসজিদ তৈরী করিতে সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—(১০ পারা ৯ রুকু)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ—"মোশরেকরা আল্লার ঘরসমূহকে আবাদ করার সুযোগ পাইতে পারে না।" এই আয়াত উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য, মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ করিবে না। মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ জায়েয নহে। (ফয়জুল-বারী ২—৫২)

২৯২। হাদীছ ঃ—আবু সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লার (দঃ) মসজিদ তৈরীর সময়) আমরা এক একটি ইট আনিতেছিলাম, আম্মার (রাঃ) দুই দুইটি ইট আনিতে ছিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহার গায়ের মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিলেন, পরিতাপের বিষয়—বিদ্রোহী দলের লোক আম্মারকে হত্যা করিবে; সে তাহাদেরে আহ্বান করিবে বেহেশতের দিকে; আর তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিবে দোযখের দিকে। আম্মার (রাঃ) ইহা শুনিয়া এই দোয়া করিতে লাগিলেন, "আমি পথভ্রষ্টতা হইতে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ—আমি আল্লার নিকট আশ্রয় চাই, আমার যেন আত্মিক পরিবর্তন না ঘটে; বিপদের কারণে যেন আমি ভ্রষ্টতায় পতিত না হই।

ব্যাখ্যা ঃ—আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল। কিন্তু ইহার বহু পুর্বেই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে একটি সুসঙ্গবদ্ধ মোনাফেক দল রাফেজী ফের্কা নামের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গা-ঢাকা দিয়া মোসলমানদের মধ্যে শামিল ছিল। অতঃপর ষড়যন্ত্র মূলকভাবে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মোসলেম জাতির সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই বিদ্রোহী দলের সক্রিয় ষড়যন্ত্রেই তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হন। এই বিদ্রোহী দলের মূল—মোনাফেকদের সুপরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থক এবং আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী "জামালের যুদ্ধ" অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে উভয় পক্ষে দশ হাজার লোক শহীদ হয়। অতঃপর এই বিদ্রোহী দলটাই আলী (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে "সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ" সংঘটিত হয়। আলোচ্য আম্মার (রাঃ) সব সময়ই আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ছিলেন; তিনি সেই সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। আম্মার (রাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন—

يَا عَمَّارُ لَا يَقْتُلُكَ اَصْحَابِىْ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

"হে আম্মার। আমার ছাহাবী দল তোমাকে হত্যা করিবে না; তোমাকে হত্যা করিবে বিদ্রোহী দলের লোক" (মোসনাদে-বজ্জার হইতে "ওফাউল-উফা")।

এই তথ্য দৃষ্টে মনে হয়, ঐ মোনাফেকদের সৃষ্ট বিদ্রোহী দলের লোক পরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিফ্ফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহাদের উভয়ের দলেই গা-ঢাকা দিয়া পঞ্চম বাহিনীরূপে শামিল থাকে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষকে লোক-চোখে দোষী করার উদ্দেশ্যে আম্মার (রাঃ)কে শহীদ করে। কিম্বা তাহারা বাহ্যতঃ ছিল আলীর (রাঃ) পক্ষেই যে পক্ষে আম্মার (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আলী ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের কাহারও পক্ষে ছিল না; তাহারা ছিল পঞ্চম বাহিনী দল। তাহারা সুযোগপ্রাপ্তে আলী ও মোয়াবিয়া উভয় পক্ষের মোসলমানকেই হত্যা করিতেছিল—যেরূপ তাহারা জামাল যুদ্ধে করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাদেরই কোন লোকের হাতে আম্মার (রাঃ) শহীদ হন। এইভাবে আম্মার (রাঃ) সিফ্ফীনের যুদ্ধে বিদ্রোহী দল তথা মোনাফেকদের সৃষ্ট গোপন ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী দলের কোন সদস্যের হাতে নিহত হন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।

মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহার প্রকৃত সমর্থক পক্ষ যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত "বিদ্রোহী দল"-এর উদ্দেশ্য নহে, তাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত উক্তিতেই প্রকাশিত হয়। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) নিশ্চয় ছাহাবী—অহী লিখক বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন।

আম্মার (রাঃ) শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটিলে স্বয়ং মোয়াবিয়া (রাঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমি বা আমার কোন লোক আম্মার (রাঃ)কে হত্যা করে নাই। (মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (রঃ) পুস্তিকা হইতে গৃহীত।)

সার কথা—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত বিদ্রোহী দল বলিতে ঐ দল উদ্দেশ্য যাহারা মোসলমানদের শান্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারীরূপে সৃষ্টি হইয়া খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতঃ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া শহীদ করিয়াছিল। তারপরেও তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতে থাকে এবং মোসলমানদের মধ্যে লড়াই-যুদ্ধ সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং তাহাদের লোকের হাতেই আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। তাহাদের দলের এবং তাহাদের বিদ্রোহের ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই দলের যে প্রচেষ্টা ছিল তাহা যে দোযখের পথ এবং আম্মার (রাঃ)-এর প্রচেষ্টা যে বেহেশতের পথ তাহা সুস্পষ্ট।

মসজিদ বা উহার জিনিষ তৈরী করিতে কারিগরের সাহায্য

২৯৩। হাদীছঃ— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি স্ত্রীলোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, (মসজিদে খোৎবা ইত্যাদির সময়) বসিবার উদ্দেশ্যে আপনার জন্য কাঠের দ্বারা একটি আসন তৈরী করিতে ইচ্ছা করি; আমার একটি ক্রীতদাস আছে, সে মিস্ত্রী কাজ জানে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা

হইলে তাহা করিতে পারে। তারপর যথাসত্বর উহার কাজ সম্পন্ন করার জন্য হযরত (দঃ) নিজেও খবর পাঠাইলেন। সে একটি মিম্বর তৈরী করিল। ২৫২নং হাদীছেও উল্লেখ আছে।)

মসজিদ তৈরী করার ফজিলত

২৯৪। হাদীছঃ— ওসমান (রাঃ) যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের (উন্নয়নে) পরিবর্তন সাধিত করিলেন, তখন সাধারণ্যে উহার সমালোচনা হইতে লাগিল। এই সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী কাজে শরীক হইবে আল্লাহ তায়ালা সে অনুপাতে বেহেশতের মধ্যে তাহার জন্য ইমারত তৈরী করিবেন।

মসজিদের মধ্যে সতর্কতার সহিত চলিবে

২৯৫। হাদীছঃ—আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে বা বাজারে চলাফেরার সময় হাতে তীর ইত্যাদি থাকিলে উহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখিবে, যেন কোন মোসলমান ব্যক্তি উহার দ্বারা আঘাত না পায়।

২৯৬। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে তীর হাতে লইয়া আসিতেছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন, ইহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখ।

মসজিদের ভিতরে ভাল কবিতা পাঠ করা

২৯৭। হাদীছঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাছ্ছান (রাঃ)কে বলিতেন, হে হাছ্ছান! তুমি আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে (কবিতার দ্বারা কাফেরদের উক্তির) উত্তর দান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন—হে খোদা! জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্ছানকে সাহায্য কর।

ব্যাখ্যাঃ—আরবদেশে কবিতার খুবই প্রচলন এবং জন-সমাজে উহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। কাফের কবিরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুখ্যাতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কু-উক্তি করিয়া মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া কবিতা প্রকাশ করিত। মোসলমানদের মধ্যে ছাহাবী হাছ্ছান (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কাফেরদের উত্তরে কবিতা রচনা করিতে বলিতেন, এমনকি অনেক সময় মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া ঐ কবিতা পাঠের আদেশ করিতেন এবং তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন, হে খোদা! তুমি জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্ছানকে (এই কবিতা রচনায়) সাহায্য কর।

মসজিদে (জেহাদ শিক্ষার) অস্ত্র চালনা

২৯৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমার ঘরের দরওয়াজায় দণ্ডায়মান দেখিলাম। কয়েকজন হাবসী লোক মসজিদের

মধ্যে অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাদের ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

মসজিদে ঋণ আদায়ের তাগিদ করা

২৯৯। হাদীছ :—কা'য়াব (রাঃ) নামক ছাহাবী ইবনে হাদরাদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর নিকট পাওনাদার ছিলেন। একদিন মসজিদের মধ্যে উহা আদায়ের তাকিদ দিলে পর উভয়ের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কথা কাটাকাটি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ঘরের ভিতর হইতে উহা শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং দরওয়াজার পর্দা উঠাইয়া কা'য়াবকে ডাকিলেন। তিনি হাজির হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দাও। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) ইবনে হাদরাদ (রাঃ)কে আদেশ করিলেন—যাও এখনই ইহা আদায় করিয়া দাও।

মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করার ফজিলত

৩০০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি কৃষ্ণ বর্ণের পুরুষ বা স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়ু দিয়া থাকিত। তাহার মৃত্যু হইলে পর একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেই বলিল, সে মারা গিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমাকে খবর দেওয়া হয় নাই কেন ? উত্তরে সকলেই ঐ লোকটির প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, আমাকে তাহার কবর দেখাইয়া দাও। হযরত (দঃ) তাহার কবরের নিকট আসিয়া জানাযার নামায পড়িলেন ও দোয়া করিলেন।

মসজিদের জন্য খাদেম রাখা

পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মাতা বিবি মরয়্যামের জন্ম-বৃত্তান্তের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন—

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

"হে পরওয়ারদেগার। তোমার জন্য মান্নত মানিলাম, আমার গর্ভস্থ সন্তান মুক্ত হইবে।" অর্থাৎ তোমার সন্তুষ্টির কাজে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য দুনিয়ার কাজ-কর্ম হইতে সে মুক্ত হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফছীরে বলিয়াছেন, ঐ মান্নতের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদের খেদমতের জন্য মুক্ত হইবে।

সেকালে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এইরূপ মান্নতের রীতি শরীয়ত সম্মত ছিল। আমাদের শরীয়তে এইরূপ মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য মসজিদের খেদমত করা বড় ছওয়াবের কাজ।

কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধা

ইসলামের সোনালী যুগে বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ইত্যাদি অনেক কার্য্যবিধির কেন্দ্র ছিল মসজিদ। কারণ, তখন মোসলেম সমাজের কোন ক্ষেত্রেই দ্বীন ও দুনিয়া ভিন্ন

ভিন্নভাবে পরিচালিত হইত না, উভয়ই এক সঙ্গে চলিত এবং ইহাই ছিল মোসলমানদের উন্নতির উৎস। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। যেমন, পূর্বের একটি পরিচ্ছেদে আছে "মসজিদে বিচার বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করা"। রসুলুল্লার (দঃ) সময় খানকাহ, মাদ্রাসা, বিচারালয় এমনকি হাজত কেন্দ্রও মসজিদই ছিল। কারণ, আসামী ও কয়েদীদিগকে শুধু শাস্তি দান করিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করা যায় না, যাবৎ তাহাদের জন্য সৎ পরিবেশের ব্যবস্থা করা না হইবে। এখানে মসজিদকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল—সৎ পরিবেশের ব্যবস্থা করা; যার দ্বারা কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধন হইয়া তাহারা দোষমুক্ত হইতে পারিবে। যেমন—নিম্নের হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজতখানা আসামীকে কত উর্দ্ধে উন্নীত করিত এবং তাহার ভাব-ধারায় পরিবর্তন আনিয়া তাহার চরিত্রের কত সংশোধন করিত।

খলীফা ওমরের (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ বিচারক কাজি শোরায়হ্ (রঃ) অভিযুক্তকে মসজিদের খুঁটির সহিত আবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিতেন।

৩০১। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজদ দেশের প্রতি একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা ছুমামা ইবনে উছাল নামক তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া আসিল এবং (নবীজীর আদেশে) তাহাকে মসজিদে নববীর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমামা! তোমার ধারণা কি? সে উত্তর করিল আমার ধারণা ভালই (যে, আপনি কোন প্রকার জুলুম-অত্যাচার করিবেন না)। যদি আপনি আমাকে মারিয়া ফেলেন তবে স্মরণ রাখিবেন, ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে, আর যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। আর যদি আমার নিকট হইতে ধন আদায়ের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে যত ইচ্ছা আপনি বলুন; আমি উহা দিয়া দিব। ঐ দিন তাহাকে বাঁধা অবস্থায়ই রাখিয়া দেওয়া হইল। পরদিন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিলেন। সে উত্তর করিল, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি আজও তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। এই দিনও তাহাকে পূর্বাবস্থায়ই রাখা হইল। তৃতীয় দিনও রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঐ প্রশ্নই করিলেন। এবারও সে পূর্বের ন্যায়ই উত্তর দিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে চলিয়া গেল এবং সেখানে গোসল করিয়া মসজিদে ফিরিয়া আসিল ও ইসলামের কলেমা পড়িল—

"اشهد ان لا الـٰه الا الله واشهد ان محمدا رسول الله"

এবং বলিল, হে মোহাম্মদ (দঃ) আমার নিকট দুনিয়ার কোন বস্তু আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন একমাত্র আপনিই সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। কোন ধর্ম আপনার ধর্ম হইতে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন আপনার ধর্মের তুল্য প্রিয় ধর্ম আর নাই। আপনার দেশের চেয়ে অধিক ঘৃণিত দেশ আর ছিল না, কিন্তু এখন আপনার দেশের চেয়ে প্রিয় দেশ আর নাই।

আমি ওমরা করার জন্য মক্কা যাইতেছিলাম, এমতবস্থায় আপনার সৈন্যদল আমাকে লইয়া আসিয়াছিল। সেই ওমরার বিষয় আপনার আদেশ কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ ঘোষণা পূর্বক তাহাকে ওমরা করার পরামর্শ দিলেন। সে মক্কা আসিলে পর কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিল—তুমি ধর্মত্যাগী হইয়াছ? উত্তর করিল, না না —আমি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে মুসলমান হইয়াছি। আমি শপথ করিয়া ঘোষণা দিতেছি, মক্কাবাসীগণ (আমার দেশ) "ইয়ামামা" হইতে এক দানা খাদ্যও আর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে পাইবে না।

(নিরাশ্রয়) রুগ্নকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া

৩০২। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) শিরা-রগে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে তাঁহার জন্য তাঁবুর ন্যায় আশ্রয়স্থল তৈরী করিয়া দিলেন; যেন তিনি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখা-শুনা করিতে পারেন।

মসজিদে বাড়ীর দরওয়াজা কাটা বা যাতায়াতের রাস্তা করা

অর্থাৎ কাহারও আবাস-গৃহ মসজিদ সংলগ্ন, তাই সে ইচ্ছা করে যে, তাহার বাড়ী বরাবর মসজিদের দেওয়ালে ছোট-খাট দরওয়াজা করিয়া নেয়, যেন সোজাসুজি উহা দ্বারা মসজিদে প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ করা জায়েয নয়। তা-ছাড়া স্বীয় গৃহে যাতায়াতের জন্য মসজিদের ভিতর দিয়া কোনপ্রকার রাস্তা করিয়া লওয়াও জায়েয নহে।

৩০৩। **হাদীছঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম-রোগ অবস্থায় একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদের মিম্বরের উপর আসিয়া বসিলেন এবং আল্লার ছানা-ছিফত দ্বারা বক্তব্য আরম্ভ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ ছোবহানাহু তায়ালা এক বন্দাকে তাহার নিজ ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, সে দুনিয়াতে থাকিয়া দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে পারে অথবা আল্লার নিকটও চলিয়া যাইতে পারে। সেই বন্দা আল্লার নিকট চলিয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিয়াছে। (আবু সায়ীদ (রাঃ) বলেন,) ইহা শুনিয়া আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই বুড়া কাঁদে কেন? আল্লাহ তায়ালা এক বন্দাকে দুনিয়া ও আখেরাত তাহার নিজ ইচ্ছার উপর

ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ঐ বন্দা আখেরাতকে পছন্দ করিয়াছেন তাহাতে এই বুড়ার কি হইল? পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, ঐ "বন্দা" স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং (ঐ কথা তাঁহার দুনিয়ার ত্যাগের ইঙ্গিত ছিল—যাহা আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন।) সত্যই আমাদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ)কে কাঁদিতে দেখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, হে আবু বকর! তুমি কাঁদিও না এবং উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহার সঙ্গ ও জান-মাল আমাকে সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছে সে হইল একমাত্র আবু বকর। আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার ভিন্ন মানুষের মধ্য হইতে কাহাকেও আন্তরিক ভালবাসার পাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে নিশ্চয় আবু বকরকে গ্রহণ করিতাম। (কিন্তু তোমাদের এই রসুলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয়পাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন। [হাদীছের এই অংশটুকু মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।] তাই সেও অন্য কাহাকে বন্ধু বানাইতে পারে না।) তবে আবু বকর আমার সঙ্গী ও ইসলামী ভাই, সেই মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব তাহার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ও উত্তম আকারে রহিয়াছে।

(আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তখন) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—মসজিদের মধ্যে যত লোকই গৃহ-দরওয়াজা বাহির করিয়াছে প্রত্যেকের দরওয়াজাই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, একমাত্র আবু বকরের দরওয়াজা খোলা থাকিতে পারিবে।

মসজিদসমুহে কপাট ও তালা-চাবির ব্যবস্থা রাখা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফ নগরীতে বসবাস অবলম্বন করিয়া তথায় মসজিদ তৈরী করিয়াছিলেন; উহাতে মজবুত দরওয়াজা লাগাইয়াছিলেন।

মসজিদে সকলের সমান অধিকার থাকিলেও মসজিদের আসবাব-পত্র রক্ষার জন্য এবং অনাচার হইতে মসজিদের হেফাজতের জন্য মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ উহাতে কপাট লাগাইতে এবং উহা বন্ধের ব্যবস্থা করিতে পারে।

৩০৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পবিত্র মক্কা জয় করার পর কা'বা ঘরের কুঞ্জি-বরদার (চাবি সংরক্ষক) ওসমান ইবনে তাল্‌হাকে ডাকিয়া আনিলেন। সে আসিয়া কা'বার দরওয়াজা খুলিয়া দিলে নবী (দঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে বেলাল, উছামাহ এবং ওসমান ইবনে তাল্‌হাও ছিলেন।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কিছু সময় ভিতরে রহিলেন, তারপর সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরতের প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, নবী (দঃ) ভিতরে নামায পড়িয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন স্থানে নামায পড়িয়াছেন, বেলাল বলিলেন, পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ঐ দিকের দেওয়াল হইতে

প্রায় তিন হাত ব্যবধানে, ডান দিকে দুইটি খুঁটি ও বাম দিকে একটি খুঁটি এবং পিছনে তিনটি খুঁটির সারি রাখিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। ঐ সময় কা'বা ঘরের ছাদ মোট ছয়টি খুঁটির উপরই স্থাপিত ছিল; (তিন তিনটি খুঁটি দুই সারিতে ছিল, প্রথম সারিতে দক্ষিণ দিকের খুঁটিদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া হযরত (দঃ) নামায পড়িয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,) হযরত (দঃ) কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার স্মরণ ছিল না।

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা

৩০৫। হাদীছ ঃ— ছায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি মসজিদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম, এক ব্যক্তি আমার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিল, আমি তাকাইয়া দেখিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ)। তিনি আমাকে আদেশ করিলেন, ঐ দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন. তোমরা কোন্ দেশের লোক? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফবাসী। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা মদীনাবাসী হইলে আমি তোমাদিগকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতাম; তোমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বল।

মসজিদে উর্দ্ধমুখী হইয়া শোয়া

৩০৬। হাদীছ ঃ—আব্বাস ইবনে তামীমের চাচা আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মসজিদে উর্দ্ধমুখী শায়িত অবস্থায় দেখিয়াছেন। তখন হযরতের এক পা অপর পায়ের উপর রাখা ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—এই শয়ন নিদ্রার শয়ন নয়, বরং হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহের শান্তি ও অবসাদ দুর করণার্থে আরাম লাভের উদ্দেশ্যে শরীর লম্বা করা। যেমন—কেহ দীর্ঘ সময় মসজিদে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া এবাদত-বন্দেগী করিয়া দেহে অবসাদ ও শান্তি অনুভব করিয়াছে, আরও অধিক সময় মসজিদে অবস্থান করা তাহার ইচ্ছা। এমতাবস্থায় মধ্যভাগে অবসাদ দুর করণার্থে ঐরূপ শয়ন করিতে পারে এবং সেই শয়ন অবস্থায়ও মসজিদে অবস্থানের ছওয়াব তাহার লাভ হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৬)। এইরূপ শয়নে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—লোকদের সমাবেশে না হয় এবং পুর্ণরূপে ছতর আবৃত রাখায় যত্নবান হয়। ছতর আবৃত রাখায় শালীনতাময় সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপই হযরত (দঃ) ঐ অবস্থায় পাদ্বয় লম্বা করিয়া এক পা অপর পায়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ)ও ঐরূপ করিতেন বলিয়া বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

উর্দ্ধমুখী শয়নে উক্তরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু মসজিদের জন্যই নির্দিষ্ট নহে। সাধারণভাবেও উর্দ্ধমুখী শয়নে উহা অবশ্যক; বোখারী (রঃ) ৯৩০ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর এক হাদীছে উর্দ্ধমুখী শায়িত হইয়া এক পা অপর পায়ের উপর রাখা নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য উর্দ্ধমুখী শয়নে এক পা খাড়া করিয়া উহার উপর অপর পা উঠাইয়া রাখা। লুঙ্গি পরিধান অবস্থায় এইরূপ করিলে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; পায়জামা পরিধান অবস্থায়ও ইহা খুবই অসুন্দর দেখায়।

মসজিদে বা অন্যত্র তশ্‌বীক করা

"তশ্‌বীক" অর্থ পরস্পর এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করান। হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—নামাযের জন্য অজু করিয়া মসজিদে আসিতে হস্তদ্বয়ে তশ্‌বীক করিবে না। কারণ, ঐ সময়টি নামাযের মধ্যেই শামিল।

আর এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"নামায পড়াকালে কেহ তশ্‌বীক করিবে না; উহা শয়তানী কাজ। আরও স্মরণ রাখিবে, কোন মানুষ (নামাযের অপেক্ষায় বা নামাযান্তে আল্লার জেকর ও তাছবীহ ইত্যাদির জন্য) যাবৎ মসজিদে থাকে; মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত সে নামাযে গণ্য হয়।" (ফতহুল-বারী ১—৩৪৯)

নামায পড়াকালে তশ্‌বীক করা বস্তুতঃই শয়তানী কাজ তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজ। নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত আদায় করা শরীয়তের বিশেষ কাম্য। উহাতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় নামাযের প্রস্তুতির আরম্ভ হইতেই নিজকে নামাযীরূপে রূপান্তরিত করা এবং নামাযে শোভণীয় নয় এইরূপ অনাবশ্যক কার্য্যাবলী হইতে সংযত থাকা। তদ্রূপ নামাযান্তে নামাযে লব্ধ একাগ্রতা ও ধ্যান-ধারণার সহিত কিছু সময় জিকর ও তছবীহ পাঠ করা উত্তম এবং উহা নামাযের মধ্যে শামিল। এতদ্ভিন্ন এক নামায পড়িয়া অপর নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করিলে মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যেই গণ্য বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সেমতে ঐ সময়ও নামাযে শোভণীয় নয় এই শ্রেণীর আনাবশ্যক কার্য্য হইতে বিরত থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে নামাযের পূর্বে ও পরে উক্ত সময়দ্বয়েও তশ্‌বীক করা অপছন্দণীয়ই বটে। উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের সমষ্টিতে এই তিন সময়ে তশ্‌বীক করাকেই নিষেধ করা হইয়াছে—(১) নামায পড়াকালে; ইহাত মকরূহ তাহ্‌রিমী (শামী ১—৬০১)। (২) নামাযের পূর্বে—নামাযের জন্য অজু করার পর হইতে। (৩) নামাযের পরে অপর নামাযের অপেক্ষায় বা জিকর ও তছবীহ পাঠে মসজিদে বসা থাকা পর্য্যন্ত; এই দুই সময়েও তশ্‌বীক হইতে বিরত থাকা চাই—অবশ্য ইহা শুধু নামায সম্পৃক্তে তশ্‌বীকের মছআলাহ্।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে তশ্‌বীক সম্পর্কে এই বলিতে চাহেন যে, সাধারণভাবে অর্থাৎ উক্ত তিন অবস্থা ও তিন সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তশ্‌বীক করা নিষিদ্ধ নহে। এমনকি মসজিদের মধ্যেও উহা করিতে পারে। যেমন, বিশ্রাম লাভ উদ্দেশ্যে যদি কেহ তশ্‌বীক করিয়া বসে তবে তাহা জায়েয হইবে।

এ সম্পর্কে বোখারী (রঃ) এস্থলে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ; উহার অনুবাদ যথাস্থানে আসিবে। উক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযান্তে উঠিয়া যাইয়া মসজিদের এক পার্শ্বে বসিলেন ; তিনি তাঁহার বাম হাতের উপর ডান হাতকে তশবীকরূপে একত্রিত করিয়া ডান হাত দণ্ডায়মান করতঃ বাম হাতের কব্জিকে ডান কব্জির উপরে স্থাপন পূর্বক উহার পৃষ্ঠে মুখমণ্ডলের ডানপার্শ্ব রাখিয়া অস্বস্তিবোধকের ন্যায় বসিলেন।

এতদ্ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা আঙ্গুল সমুহের অবসাদ দূর করনার্থে তশবীক করিলে তাহাও জায়েয আছে, মকরূহ নহে (শামী ১—৬০১)।

তদ্রূপ কোন একটি বিষয় বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে তশবীক করিলে তাহাও মকরূহ হইবে না ; এ সম্পর্কেও ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হাদীছ যাহার অনুবাদ যথাস্থানে হইবে—উহাতে উল্লেখ আছে, মোসলমানদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ঐরূপ হওয়া চাই যেরূপ হয় একটি দেওয়ালের ইট সমুহের মধ্যে। ইহা উল্লেখের সময় হযরত (দঃ) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুল সমুহের মধ্যে অপর হস্তের আঙ্গুলসমূহ প্রবেশ করাইয়া দেওয়ালের ইটসমুহের গাথুনির দৃষ্টান্তও দেখাইলেন। দ্বিতীয় হাদীছটি এই—

৩০৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আম্র ! কি নীতি অবলম্বন করিবে যখন তুমি খোসা-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে ? এই হাদীছ বর্ণনার সময় হযরত (দঃ) স্বীয় হস্তের আঙ্গুলসমূহে তশবীক করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এই—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, (চালনী দ্বারা আটা ইত্যাদি চালিলে উহার ভাল অংশ নীচে পড়িয়া যায়, খোসা বা তুষ জাতীয় অংশই উপরে থাকে। তদ্রূপ কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ হইতে ভাল মানুষ নিঃশেষ হইয়া শুধু তুষ ও খোসা-শ্রেণীর মানুষ থাকিয়া যাইবে।) হে আবদুল্লাহ ! তুমি কি নীতি অবলম্বন করিবে ? যদি তুমি ঐ খোসা-জাতির লোকদের যুগে বর্তমান থাক—যাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকার ও আমানতদারী বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (তথা অঙ্গীকার রক্ষা করিবে না, আমানতে খেয়ানত করিবে) এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধে লিপ্ত হইয়া এইরূপে পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া পড়িবে। (এই বাক্য বলার সময়) ঐ লোকদের পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে হযরত (দঃ) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন (—যে অবস্থায় উভয় হস্তের আঙ্গুলসমুহ পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া থাকে।)

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) আরজ করিলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার আদেশ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন (ঐরূপ সময়ে) তুমি তোমার নিজের দ্বীন-ঈমানকে রক্ষা করায় দৃঢ় থাকিবে; যুগের লোকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইবে না।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে—হযরত (দঃ) বলিলেন, যুগের লোকদের হইতে ভালটা গ্রহণ করিবে, খারাবটা বর্জন করিবে। শুধু নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষায়ই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিবে; যুগের লোকদের জন্য মাথা ঘামাইবে না। (ফতহুল-বারী ২৩—৩১)

জন-সাধারণের দ্বীন-ঈমান রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা একটি বিশেষ ফরজ কাজ। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপরোক্ত হাদীছে যেই অবস্থার যুগের উল্লেখ করিয়াছেন সেইরূপ যুগের আবির্ভাব হইলে তখন উক্ত ফরজ রহিত হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে—তশবীকের মছআলাহ সম্পর্কে যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে আঙ্গুল ফুটাইবার মছআলাহ সম্পর্কেও সেই বিবরণ প্রযোজ্য। (শামী ১—৬০১)

মক্কা-মদীনার রাস্তায় মসজিদসমূহ ও রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায স্থান সমূহের বর্ণনা

৩০৮। **হাদীছ** ঃ—মুছা ইবনে ওক্‌বাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ছালেম ইবনে আবদুল্লাকে দেখিয়াছি, তিনি মক্কা-মদীনা যাতায়াতে রাস্তায় কতগুলি স্থানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ও ঐ স্থান সমূহে নামায পড়িয়া থাকেন এবং বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই স্থানসমূহে নামায পড়িতেন। কারণ, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই স্থান সমূহে নামায পড়িতে দেখিয়াছেন।

৩০৯। **হাদীছ** ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্য মদীনা হইতে মক্কা পানে যাওয়া কালে (মদীনার অনধিক দুরে অবস্থিত) জুল হোলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করিতেন। হযরতের অবতরণ স্থলটি বাবুল গাছের নীচে—পরবর্তী সময় যে স্থানে মসজিদ হইয়াছে তথায়ই অবস্থিত।.........

পাঠক বৃন্দ! ইহা একটি সুদীর্ঘ হাদীছে। এই হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কা-মদীনার তৎকালীন রাস্তায় কতকগুলি স্থানের নিদর্শন বর্ণনা করিয়া নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই পথ অতিক্রম করাকালে এই স্থানসমূহে নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন এই রাস্তায় যাতায়াত-কালীন এই স্থানসমূহ বিশেষভাবে নামায পড়িতেন। এমনকি উহার কোন কোন স্থানের নিকটবর্তী পরে মসজিদও তৈরী হইয়াছিল, তবুও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সেই মসজিদে নামায না পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পড়ার স্থানে নামায পড়িতেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবীদের এশক-মহব্বত এতই বিস্তীর্ণ ও সুগভীর ছিল যে, হযরতের সামান্যতম স্পর্শপ্রাপ্ত বস্তুসমূহের প্রতিও ছাহাবীগণ অতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হইতেন যে, দুনিয়াতে কোন বস্তুকেই উহার সমতুল্য গণ্য করিতে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ জুতা ব্যবহার করিয়াছেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন ঐরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই রং পছন্দ করিতেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন ঐ রং পছন্দ করিতেন। এইভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বস্তু ও কার্য্যের প্রতি ছাহাবীগণ জীবনের তরে আশেক হইয়া যাইতেন। কেহ কাহারও প্রতি খাঁটি আশেক হইলে স্বেচ্ছায়ই সে এই অবস্থায় পৌঁছে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

پائے سگ بوسید مجنوں خلق گفتند این چه بود -
گفت این سگ گاه گاه کوئے لیلی رفته بود -

"একদা মজনু একটি কুকুরের পা চুম্বন করিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ-কি করিতেছ? সে বলিল, এই কুকুর সময় সময় লায়লার গলিতে যাতায়াত করিত।"

লায়লার প্রতি মজনুর কেবলমাত্র পার্থিব এশক বা প্রেম ছিল। সেই এশকের দরুন সে লায়লার বাসস্থানের গলির প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ গলিতে যাতায়াতকারী কুকুরের প্রতিও অনুরাগী হইয়া পড়ে। এমনকি সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঐ কুকুরের পা চুম্বন করে; ইহাকেই বলে এশক ও মহব্বত বা প্রেম। অন্য এক কবি বলেন—

امر على الديار ديار ليلى — اقبل ذا الجدار وذا الجدار -
وما حب الديار شغفن قلبى — ولكن حب من سكن الديار -

"আমি আমার প্রেমাস্পদের বস্তী দিয়া যাতায়াতকালে উহার গৃহগুলিকে চুম্বন করি। আমি গৃহগুলির অনুরাগী নই, ঐ গৃহবাসীর ভালবাসা আমাকে আকৃষ্ট করে।"

ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের সময় সিরিয়া দেশ নূতন জয় হইলে পর তিনি ঐ দেশ পরিদর্শনে যাইয়া সেস্থানের বড় বড় লোকদের এক ভোজ সভায় যোগদান করিলেন। তিনি দস্তরখানার উপর একটি রুটীর টুক্‌রা দেখিতে পাইয়া সুন্নত তরীকা অনুযায়ী ঐ টুক্‌রাটি উঠাইয়া খাইলেন। সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ নগণ্য কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত করিলে তিনি গর্বভরে বলিলেন—

أأترك سنة حبيبى لاجل هذه الحمقاء -

"এ সমস্ত আহমক লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কি আমার মাহবুবের সুন্নত ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়। আশেকের চোখে মাশুক ও মাহবুবের বিরুদ্ধাচরণকারী

সমস্ত দুনিয়া আহমক বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সেই এশক ও মহব্বত নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার সুন্নতের প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িয়াছি।

ইমামের সম্মুখে ছোতরা মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে দিয়া যাতায়াত করা বড় গোনাহ। হাদীছ শরীফে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কবাণী রহিয়াছে; তাই খোলা জায়গায় নামায পড়িতে হইলে অন্ততঃ এক হাত উঁচু কোন বস্তু আড়াল স্বরূপ সম্মুখে রাখা আবশ্যক, যেন যাতয়াতকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়; উহাকেই ছোতরা বলা হয়। ছোতরার বাহির দিয়া গমন করিলে গোনাহ নাই।

৩১০। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনার মধ্যে (খোলা জায়গায় জামাতের সহিত দাঁড়াইয়া) নামায পড়িতেছিলেন; তাঁহার সম্মুখে কোন দেওয়াল ছিল না, (কোন বস্তু দাঁড় করা ছিল।) ঐ সময় আমি একটি গাধীর উপর আরোহিত তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়া কিছু অংশ অতিক্রম করতঃ গাধী হইতে অবতরণ করিয়া গাধীকে ঘাস খাইতে ছাড়িয়াদিলাম এবং আমি হযরতের পেছনে লোকদের সহিত নামাযে শরীক হইলাম। আমি তখন বয়ঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি; কিন্তু উক্ত কার্য্যে আমাকে কেহ মন্দ বলেন নাই।

ব্যাখ্যা :—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝমান হওয়ার বয়সে নামাযীদের সম্মুখে দিয়া চলিয়াছেন; বস্তুতঃ ইহা বাধা প্রদানের ও মন্দ বলার কাজ ছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন ছোতরা ছিল; খোলা জায়গায় নামায পড়িতে ইমামের সম্মুখে ছোতরা থাকিলে মোক্তাদীদের পক্ষেও উহা ছোতরা গণ্য হয়, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে কেহ মন্দ বলেন নাই।

৩১১। হাদীছ :— ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন ময়দানে আসিয়া, ছোট বর্শার ন্যায় এক প্রকার অস্ত্র (ছিল; উহাকে) সম্মুখে গাড়িয়া দিতে আদেশ করিতেন। তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতেন এবং সকলে তাঁহার পিছনে শরীক হইত। তিনি ভ্রমন অবস্থায়ও নামাযের সময় ঐরূপ করিতেন।

ছোতরা কতটুকু ব্যবধান রাখিবে ?

৩১২। হাদীছ :—ছাহ্‌ল ইবনে ছায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায-স্থান ও মসজিদের কেবলা-দিকের দেওয়ালের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান থাকিত যে, মধ্য দিয়া একটি বকরি যাতায়াত করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—নামায-স্থানে অর্থ সেজদার স্থান। ছোতরা এত নিকটেও রাখিবে না যে, সেজদার সময় মাথায় লাগে; এত দূরেও রাখিবে না যে, পথ সঙ্কীর্ণ হয়।

৩১৩। **হাদীছ ঃ**—সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে মিম্বর এবং সম্মুখস্থ দেয়াল—উভয়ের মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল যে, উহাতে একটি বকরি পথ অতিক্রম করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বর কাঠের তৈরী ছিল। হযরতের মসজিদে মেহরাব বা সোলতানখান ছিল না। হযরতের ডান পার্শ্বে তাঁহার নামাযের পদদ্বয়ের স্থান বরাবরে মিম্বর স্থাপিত ছিল এবং হযরত (দঃ) নামাযে দাঁড়াইতে এমন স্থানে দাঁড়াইতেন যে, স্বীয় অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক প্রশস্ততার সহিত সেজদা করায় দেয়াল যেন মাথায় না লাগে—একটু ব্যবধানে থাকে। সুতরাং উক্ত মিম্বর ও সম্মুখস্থ দেয়ালের মধ্যে যে ফাঁক ও ব্যবধান ছিল—সেই ফাঁকেরই পরিমাণ আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এতটুকু ফাঁকই হযরতের সেজদার স্থান এবং দেয়ালের মধ্যেও থাকিত। সেজদার স্থান ও ছোতরার মধ্যেও সাধারণতঃ ঐ পরিমাণ ফাঁকই থাকা চাই।

মসজিদের খুঁটি সম্মুখীন হইয়া নামায পড়া

ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নামায পড়িতে ইচ্ছা করিবে সে ব্যক্তি মসজিদের খুঁটি ও থাম সমূহের বরাবর স্থানের অধিকারী। যাহারা নামাযরত নয় তাহাদের উচিত ঐ স্থান হইতে সরিয়া পড়া, যেন নামাযী ব্যক্তি ঐ স্থানে নামায আরম্ভ করিতে পারে। নামাযীদের জন্য ছোতরা আবশ্যক, মসজিদের খুঁটি ও থাম উহার জন্য যথেষ্ট।

ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে দুই খুঁটির মধ্যস্থলে নামায আরম্ভ করিতেছে, তিনি তাহাকে খুঁটি-সম্মুখে আনিয়া বলেন, এখানে নামায পড়।

৩১৪। **হাদীছ ঃ**—ইয়াযিদ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী সালামাহ ইবনে আকওয়ার সঙ্গে মসজিদে আসিতাম। তাঁহাকে দেখিতাম, তিনি ঐ থামের নিকট নামায পড়েন, যে থামের নিকট (হযরতের পরে) সিন্দুকে কোরআন শরীফ রক্ষিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বিশেষভাবে এই থামের নিকটবর্তী নামায পড়েন কেন। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই থামের নিকট নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

আরোহণের পশু বা বৃক্ষ ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

যদি গাড়িবার কোন বস্তু না থাকে তবে যানবাহন বা এক হাত উচু কোন বস্তু সম্মুখে রাখিয়া কিম্বা বৃক্ষের সম্মুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, উহাই ছোতরা হইবে।

৩১৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বীয় আরোহণের উষ্ট্রকে সম্মুখে রাখিয়া উহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। যদি উষ্ট্র উপস্থিত না

থাকিত, কোথাও চলিয়া যাইত, তবে উহার উপর বসিবার গদিকে সম্মুখে রাখিয়া উহার দিকে নামায পড়িতেন। (গদির সঙ্গে পিছন দিকে এক বা সোয়া হাত উঁচু একটি খুঁটি থাকে।)

খাট, চৌকি ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

৩১৬। হাদীছ:—(এক হাদীছে আছে—"স্ত্রীলোক, কুকুর ও গাধা এর কোন একটি নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করিলে নামায নষ্ট হয়।"✿ এই হাদীছ দৃষ্টে এরূপ মত পোষণ করা হইত যে, উক্ত কারণে নামায ফাছেদ হইবে। এই মতবাদের লোকদের প্রতি তিরস্কার করিয়া) উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন— তোমরা আমাদিগকে (নারী সম্প্রদায়কে) কুকুর ও গাধার সমতুল্য বানাইয়াছ? অথচ অনেক সময় এরূপ হইত যে, আমি খাটের উপর শুইয়া থাকিতাম; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ খাটের মধ্যস্থল বরাবর মাটিতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিতেন। এমতাবস্থায় আমার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইত এবং আমি ওখান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম; নামায অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করা ভাল মনে করিতাম না বিধায় আমি শোয়া অবস্থায়ই পায়ের দিকের পথে সরিয়া পড়িতাম।×

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনে বাধা দিবে

ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযের শেষ অবস্থায় যখন আত্তাহিয়্যাত পড়িতে বসিতেন, তখনও যদি কেহ তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে উদ্যত হইত তাহাকে বাধা দান করিতেন এবং

✿ অধিকাংশ ইমামগণের মতে এক্ষেত্রে নামায নষ্ট হওয়ার অর্থ নামায বাতিল হওয়া নহে, বরং নামাযে একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই বস্তুত্রয়ের কোন একটি নামায অবস্থায় সম্মুখ দিয়া গেলে নামাযের একাগ্রতা ব্যহত হয়। কারণ, নারীর ব্যাপারে পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ মানবীয় দুর্বলতা স্বাভাবিক ভাবেই রহিয়াছে; সম্মুখ দিয়া নারীর গমন হইলে পুরুষের উপর চঞ্চলতার প্রতিক্রিয়া হয়; আর হাদীছ দৃষ্টে দেখা যায়, গাধা ও কুকুরের সহিত শয়তানের বিশেষ সংস্রব আছে, অতএব সম্মুখ দিয়া উহার গমনে বিচলতার আধিক্য হইবে। সুতরাং নামায আরম্ভ করিতে এই বস্তুত্রয়ের গমন আশঙ্কা এড়াইবার ব্যবস্থায় বিশেষ তৎপর হইবে।

বিবি আয়েশার ঘটনা হযরতের ব্যক্তিগত ঘটনা; নামাযে হযরতের সুদৃঢ় একাগ্রতার সহিত অন্যের তুলনা হইতে পারে না; এতদ্‌সত্ত্বেও আয়েশা (রাঃ) অতি প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যে, শোয়া অবস্থায় সম্মুখ হইতে এমন ভাবে সরিয়া পড়িতেন যাহাতে পূর্ণ পরিদৃষ্ট না হন এবং হযরতের একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটায় হযরত বিব্রত না হন। অবশ্য যদি নারীদের অতিক্রমে মূল নামাযই বাতিল সাব্যস্ত হইত তবে নিশ্চয় বিবি আয়েশা ঐরূপও করিতেন না এবং হযরত (দঃ) বিবি আয়েশার ঐরূপ ভাবে সরিয়া পড়াকেও নিষিদ্ধ বলিতেন।

× নামাযীর সম্মুখ অতিক্রম করা গোনাহ ও নিষিদ্ধ; সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়া ঐরূপ গোনাহ নহে। অবশ্য ইহাকেও সতর্কতামূলক মকরুহ বলা হয়।

কা'বা ঘরের ভিতরেও যদি কেহ এরূপ করিতে উদ্যত হইত তাহাকে বাধা দিতেন।*
তিনি ইহাও বলিতেন যে, যদি সাধারণ বাধায় বিরত না থাকে, তবে সজোরে আঘাত করিবে।

৩১৭। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ (রাঃ) জুমা'র দিন মসজিদের থাম ইত্যাদি কোন একটি বস্তুর বরাবর দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন; হঠাৎ এক যুবক উহার ভিতর দিয়া তাঁহার সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি তাহার বুকের উপর ধাক্কা দিলেন। সে এদিক ওদিক তাকাইয়া কোন সুযোগ না দেখিয়া পুনরায় ঐরূপ করিলে তিনি আরও জোরে ধাক্কা দিলেন। যুবক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিল এবং পরে শাসনকর্তা মারওয়ানের নিকট নালিশ দায়ের করিল; এমন সময় আবু সায়ীদ (রাঃ) সেখানে পৌছিলেন। মারওয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আপনারই এক মোসলমান ভাই-এর ছেলেকে কি দোষে এরূপ করিয়াছেন? আবু সায়ীদ (রাঃ) এক হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ ছোত্‌রা সম্মুখীন নামায পড়ে তখন যদি কোন ব্যক্তি উহার ভিতর দিয়া সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে তাহাকে বাধা দিবে। বাধা না মানিলে তাহার প্রতিরোধে লড়াই অর্থাৎ কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবে; সে নিশ্চয়ই শয়তান।

ব্যাখ্যা ঃ— এই হাদীছের অর্থ এই নয় যে, উভয়ে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিবে এবং ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, এরূও কার্য্য অত্যন্ত দুষণীয় এবং ঐ ব্যক্তি কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। তবে বাধাদানের নিয়ম এই যে, শুধু এক হাত দ্বারা তাহার বুকে ধাক্কা দিয়া তাহাকে সতর্ক করিবে, পুনরায় আবশ্যক হইলে জোরে ধাক্কা দিবে, এর চেয়ে বেশী কিছু করিতে যাইয়া দুই হাত ব্যবহার করিলে বা অধিক নড়াচড়া করিলে বা কেবলা দিক ব্যতিক্রম হইলে নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমন করা বড় গোনাহ

৩১৮। হাদীছ ঃ—আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাতায়াতকারী যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে, এরূপ করা কত বড় গোনাহ; তবে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বৎসর) দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলেও সে নামাযের সম্মুখ কাটিয়া কখনও যাইত না।

ছোট শিশুকে কাঁধে লইয়া নামায পড়া

৩১৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দৌহিত্রী (জয়নবের মেয়েকে) কাঁধে লইয়া নামায পড়িতেন। সেজদার সময় তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং দাঁড়াইবার সময় পুনঃ উঠাইয়া লইতেন।

---

* ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হেরেম শরীফেও নামাযের সম্মুখ কাটিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ—এই সমস্ত নড়াচড়া ইত্যাদি যদি শুধু এক হাতের সাহায্যে সামান্য ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তবে ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিতেন, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে তাঁহার মন ও ধ্যানকে এত দৃঢ়তার সহিত মগ্ন রাখিতেন যে, কোন বিষয়ই তাঁহার মন ও ধ্যানকে এদিক ওদিক ধাবিত করিতে পারিত না। সেরূপ অবস্থার অধিকারী না হইয়া শুধু এতটুকু দেখিলে চলিবে না যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে এরূপ ঝামেলার সংশ্রব রাখিয়াছেন। সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এরূপ করা মকরূহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে যে, শিশুর শরীর বা কাপড় যেন তাহার মল-মূত্র ইত্যাদির দরুন নাপাক না হয়, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শুধু লুঙ্গি পরিধান করিয়া শরীর আবৃত করার অন্য কোন কাপড় ব্যবহার ব্যতিরেকেই নামায শুদ্ধ হইবে (৫৩ পৃঃ)। ● নামায অবস্থায় স্বীয় কাপড় স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৫৫ পৃঃ ১২৬ হাঃ)। ● অমোসলেমরা যে সব বস্তুর পূজা করিয়া থাকে, যেমন—আগুন; অগ্নিপূজক কাফেররা উহার পূজা করে। কিম্বা অমোসলেমরা কোন বিশেষ বস্তুকে পূজনীয় বানাইয়া নিয়াছে; যেমন—কোন বৃক্ষ ইত্যাদি—এইরূপ কোন বস্তু নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে আছে; সে ক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও নিয়্যত পূর্ণ একাগ্রতার সহিত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলে তাহার নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু ঐরূপ বস্তু প্রকাশ্যভাবে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য আকৃতিবিশিষ্ট নয় এমন বস্তু—যেমন, পূজনীয় বট-বৃক্ষ বা অগ্নি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী পর্য্যায়ের) মকরূহ সাব্যস্ত হইবে। এমনকি বাতি-প্রদীপ, তন্দুর-চুলা ইত্যাদি কেবলা স্থলে রাখিয়া সোজাসুজি তদমুখী হইয়া নামায পড়াকেও মকরূহ বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ কোন বস্তু সম্মুখে অপ্রকাশ্য থাকিলে দুষণীয় হইবে না (৬১ পৃঃ)। আর আকৃতিবিশিষ্ট মূর্তি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে সেস্থলে নামায পড়া হারাম হইবে। ● গির্জা ইত্যাদি ইহুদ নাছারাদের এবাদৎ-খানায় নামায পড়াকে সাধারণভাবে মকরূহ বলা হইয়াছে এবং মকরূহ তাহরীমী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য গির্জার মধ্যে কোন ছবি বা মূর্তি, যেমন—বিবি মরয়্যামের বা ঈসা আলাইহেচ্ছালামেরও মূর্তি বা ছবি থাকিলে সেখানে নামায পড়া, বরং সাধারণভাবে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ।

খলীফা ওমর (রাঃ) একবার সিরিয়া পরিদর্শনে আসিলে তথাকার এক বিশিষ্ট নাছারাণী খৃষ্টান তাঁহার জন্য (গির্জা ঘরে) ভোজ-সভা অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি

বলিলেন, তোমাদের গির্জা সমূহে (পীর-পয়গাম্বরগণের) বিভিন্ন ছবি থাকে ; ছবি থাকার কারণে আমি তথায় যাইব না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রয়োজনে গির্জায় নামায পড়িতেন, কিন্তু ছবি থাকিলে তথায় নামায পড়িতেন না—বৃষ্টি হইলেও বাহিরে নামায পড়িতেন (৬২ পৃঃ ২৮৯ হাঃ)।

হিন্দুদের পূজার ঘর ভিন্ন জিনিষ ; উহা ত এবাদৎখানা মোটেই নহে, বরং উহা ত প্রকাশ্য শেরেক ও মূর্তি পূজার ঘর। তথায় কোন অবস্থায়ই নামায পড়িবে না।

● মসজিদের মধ্যেও দুনিয়াদারীর কথাবার্তা ত নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন দুনিয়াদারী বিষয় সম্পর্কে শরীয়তে মছআলাহ বর্ণনা করা এবং সেই উপলক্ষে উহার আলোচনা করা দুষণীয় নহে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মসজিদের মিম্বরে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক ঘটনায় হযরত (দঃ) মদের ব্যবস্থা হারাম হওয়ার মছআলাহ মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন (৬৫ পৃঃ)।

● কোন পশুকে মসজিদে প্রবেশ করান নিষিদ্ধ ; অবশ্য যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে প্রবেশ করাইতে পারিবে, কিন্তু উহার মল-মূত্রে মসজিদ অপবিত্র না হয় উহার সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন রাখিবে (৬৬ পৃঃ)। ● অমোসলেমকে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাবে নিষিদ্ধ। হানফী মজহাব মতে শুধু মোসলমান না হওয়ার কারণে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ নহে (৬৭ পৃঃ)। কিন্তু মসজিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন কারণ অমোসলেমের মধ্যে সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে ; যেমন, অপবিত্র শরীর বা কাপড় বহনকারীর মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অমোসলেমরা জানাবাতের গোসলে শরীয়ত সম্মতরূপে মোটেই তৎপর নহে, পায়খানা-প্রস্রাবে সৌচকার্য্য সম্পর্কেও তাহাদের যে রীতি তাহাদের শরীর ও কাপড় অপবিত্র থাকেই। এই দৃষ্টিতেই ফৎওয়ার মধ্যে মসজিদে অমোসলেমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ দেখা যায় (এমদাদুল ফৎওয়া ২য় খণ্ড)। ● মসজিদের মধ্যে গোলাকারে একত্রিত হইয়া বসা—ইহা যদি দ্বীনের শিক্ষা এবং ওয়াজ-নছিহত শুনিবার জন্য হয় এবং সাধারণ নামাযীদের চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটায় তবে জায়েয ; অন্যথায় জায়েয নহে (৬৮ পৃঃ)।

● জন-সাধারণের চলাচলের পথে মসজিদ তৈরী করা ? অর্থাৎ চলাচলের সাধারণ যাহা কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত নহে, এইরূপ পথ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশস্ত হয় তবে জনগণের চলাচল ব্যাঘাত না ঘটাইয়া ঐ পথের কিছু অংশে মসজিদ তৈরী করা জায়েয (ঐ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে নয় এবং সরকার কর্তৃক জনগণের প্রয়োজনে সংরক্ষিত এলাকাও নয় এইরূপ জায়গায় জনগণের প্রয়োজনে মসজিদ তৈরী করা জায়েয আছে এবং সেই মসজিদ বৈধ মসজিদ গণ্য হইবে। অবশ্য এইরূপ স্থানে

মসজিদ তৈরী করিতে যদি কোন ক্ষেত্রে জনগণের মতবিরোধ দেখা যায় তবে সে ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৫, ফয়জুল বারী ৩—৭১ দ্রষ্টব্য)।

● বাজার শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম স্থান, কিন্তু বাজারের কোন স্থানে বা বাজারে নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ মসজিদে নামায পড়া আবশ্যক, কিন্তু নিজ গৃহে নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে (৬৯ পৃঃ)।

মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে জমাতে নামায পড়িলে জমাতের ছওয়াব হাসিল হইবে, কিন্তু মসজিদের ফজিলত ও ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। (ফয়জুল-বারী ২—৭১)

● সম্মুখ দিয়া লোক যাতায়াতের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ স্থানে নামায পড়িলে সেজদাস্থলের সংলগ্নে কোন বস্তু দাঁড় করিয়া বা উঁচু বস্তু রাখিয়া নামাযে দাঁড়াইতে হয়—সেইরূপ বস্তুকে ছোতরা বলা হয়। ছোতরা অন্ততঃ এক হাত উঁচু যে কোন বস্তুই হইতে পারে, যেমন লাঠি বা বর্শা—যদি উহাকে গাড়িয়া লওয়া হয় (৭১ পৃঃ)। ● সব জায়গায়ই ছোতরা প্রয়োজন। নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে ছোতরা না থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবে না (৭২ পৃঃ)।

● মসজিদের খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে একাকী নামায পড়া জায়েয, কিন্তু অন্য মুছল্লিদের চলাচলে বিঘ্নের কারণ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

জমাতের সময় খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে এইভাবে কাতার বানান যে, খুঁটি ও থাম কাতার কর্তনকারী হয় তাহা দুষণীয়, যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয়। আর যদি জায়গার অভাবে ঐরূপ কাতার বাঁধার প্রয়োজন বোধ হয় তবে দুষণীয় নহে (৭২)। ● কাহারও মুখামুখী হইয়া নামায পড়া মকরূহ তাহ্‌রিমী। যদি নামাযী ব্যক্তিই কাহারও মুখামুখী নামাযে দাঁড়ায় তবে উহার গোনাহ নামাযী ব্যক্তির হইবে, আর নামায আরম্ভ করার পর কেহ তাঁহার মুখামুখী হইলে গোনাহ সেই ব্যক্তির হইবে (শামী ১—৬০২)।

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুখামুখী হওয়ার দরুন যদি নামাযী ব্যক্তি বিব্রত হয় তবে উহা মকরূহ হইবে, অন্যথায় নহে (৭৩ পৃঃ)। কিন্তু ফেকাবিদগণ সর্বাবস্থায়ই উহাকে মকরূহ তাহ্‌রিমী বলিয়াছেন। ● ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয আছে (৭৩ পৃঃ ২৫৭ হাদীছ)। ● নামাযের সময় সম্মুখে কোন মেয়েলোক ঋতুবতি থাকিলেও নামায নষ্ট হইবে না (৬৩ পৃঃ ২৫৬ হাঃ)। ● নামাযের সম্মুখ দিয়া যে কোন বস্তুর (কুকুর, গাধা বা কোন মেয়েলোকের) গমনে নামায নষ্ট হইবে না (৭৩ পৃঃ ৩১৭ হাদীছ) অবশ্য সেইরূপ সম্ভাবনার স্থলে সতর্কতা অবলম্বন না করায় ঐরূপ ঘটিলে মকরূহ গণ্য হইবে। ● নামায অবস্থায় স্ত্রী বা কোন মহ্‌রম নারীর স্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৭৪ পৃঃ)।

——↑——

নামাযের ওয়াক্তে নির্দ্ধারণ

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

"নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পড়াকে মোমেনদের উপর ফরজ করা হইয়াছে।

অর্থাৎ নামায যে কোন সময় পড়িয়া লইলেই ফরজ আদায় হইবে না, বরং নামাযের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত আছে সেই সময় মত নামায আদায় করিতে হইবে। (৫ পাঃ ১২ রুঃ)

৩২০। **হাদীছ ঃ**—ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) যখন বাদশাহ অলীদ ইবনে আবদুল মালেকের পক্ষ হইতে মদীনার শাসনকর্তা তখন) একদা (তিনি) আছরের নামায আদায় করিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ ওরাওয়াহ্ ইবনে জোবায়ের (রঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ইরাকের শাসনকর্তা থাকাকালীন এরূপ একদিন নামায পড়িতে বিলম্ব করিলে ছাহাবী আবু মসউদ আনছারী (রাঃ) তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিলেন এবং রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুগিরা! এ কি ব্যাপার ? আপনি জ্ঞাত নহেন যে, (নামাযের নির্দ্ধারিত সময় অবহেলার বস্তু নয়, উহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়াই উহার জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সময় নির্দ্ধারণ শুধু বর্ণনার দ্বারাও হইতে পারিত, কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা (তাহা না করিয়া উহার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রত্যেকটি নামাযের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিবার জন্য) স্বয়ং জিব্রীল ফেরেশতাকে পাঠাইলেন। তিনি প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্ত মত পড়িলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার সঙ্গে নামায পড়িলেন। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিলেন—আপনার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আপনি এই নির্দ্ধারিত সময় সমুহে নামায আদায় করিবেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এই বয়ান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, হে ওরওয়াহ্। চিন্তা করিয়া কথা বলুন। স্বয়ং জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া নামাযের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কি ? ওরওয়াহ্ (রঃ) বলিলেন—হাঁ, নিশ্চয়। এই ঘটনা বর্ণনাকারী আবু মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ছেলে বশীর তাঁহার পিতা হইতে এই ঘটনা আমাকে শুনাইয়াছেন; (ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।)

অতঃপর ওরওয় (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আরও একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আছর নামায এরূপ বিলম্বে পড়িতেন

না যেরূপ বিলম্বে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ঐ দিন পড়িয়াছিলেন। উক্ত হাদীছটির অনুবাদ ৩৩২ নম্বরে আসিবে।

ব্যাখ্যা :—অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে যে, মে'রাজের রাত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হইল। তিনি মে'রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর দিনের বেলা সূর্য্য আকাশের ঠিক মধ্য রেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রীল ফেরেশতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কা'বা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায পড়িলেন। এইরূপে পর পর আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেকটি নামাযের জন্যই জিব্রীল ফেরেশতা অবতরণ করিলেন এবং এই দিন প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সময়ের সর্বাগ্রভাগে আদায় করিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সর্বশেষ ওয়াক্তে আদায় করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকটি নামায এই দুই দিন যে দুই সময় আরম্ভ ও শেষ করা হইল এই সময়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়কে ঐ নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইল। পূর্বের নবীগণের জন্যও এইরূপই করা হইয়াছিল।

নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে

৩২১। **হাদীছ :**—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা খলীফা ওমরের নিকট (তাঁহার খেলাফত কালে) বসিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ সমস্ত বয়ান স্মরণ রাখিয়াছে কি যাহা তিনি "ফেৎনা" সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে ত এ বিষয়ে বড় সাহসী দেখা যায়; আচ্ছা, বল। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—) পরিবারবর্গ, ছেলেমেয়ে, পাড়া-পড়শী (তথা পরিবেশ) ও ধন-দৌলত দ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া বা এই সব জিনিষের ব্যাপারে শরীয়তের যে নীতি রহিয়াছে ইহাতে) মানুষ যে, ফেৎনায় পতিত হয় অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া ফেলে এবং নানারকম গোনাহ করে (যাহা সাধারণতঃ ছগিরা গোনাহ হয়) উহা নামায, রোযা, ছদকা, সৎকার্য্যে আকৃষ্ট করন ও অসৎ কার্য্যে বাধাদান (ইত্যাদি নেক কার্য্যে) সমূহের দ্বারা মাফ হয়।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই অর্থের ফেৎনার কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার জিজ্ঞাসা ঐ ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে যাহা (কালক্রমে) উত্থলিত সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় প্রচণ্ড ও ব্যাপক আকারে একের পর এক হু হু করিয়া সমাজে প্রবেশ করিবে এবং সমাজকে ধ্বংস করিবে। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন—হে আমিরুল-মোমেনীন! সে বিষয় আপনার চিন্তা করিতে হইবে না; ঐ ফেৎনা আপনাকে স্পর্শও করিতে পারিবে

না। আপনার (সময়কালের) মধ্যে এবং ঐসব ফেৎনার মধ্যে লৌহ নির্মিত বন্ধ দ্বার প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। খলীফা ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন (মোসলেম সমাজের দুর্ভাগ্যের সময় যখন ঘনাইয়া আসিবে তখন) ঐ বন্ধ দ্বার খোলা হইবে—না, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে ত উহা বন্ধ করার ব্যবস্থা কেয়ামত পর্য্যন্ত আর হইবে না।

(হোযায়ফা (রাঃ) বলেন—) মোসলেম সমাজে ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় এবং হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক দরওয়াজা স্বয়ং ওমর (রাঃ) নিজেই ছিলেন—যাহা তিনি নিজেও সন্দেহাতীতরূপে জানিতেন। (তিনি যে এক পারসীক মোনাফেক—হুর্মুযান রাজার ষড়যন্ত্রে দুর্বৃত্ত ঘাতকের হাতে শহীদ হইবেন, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছিল "দরওয়াজা ভাঙ্গা হইবে" বলিয়া। আর সেই সময় হইতেই ফেৎনার পত্তন হইল।)

ব্যাখ্যাঃ— "ফেৎনা" শব্দের দুইটি অর্থ আছে। প্রথম—ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিপথগামী হওয়া। দ্বিতীয়—বিপর্য্যয়, হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা। হোযায়ফা (রাঃ) প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ফরমান বয়ান করিলেন উহাতে ফেৎনা শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে বা বিভিন্ন মোহ ইত্যাদিতে বেষ্টিত হইয়া খোদাকে ভুলিয়া মানুষ পদে পদে যে অসংখ্য ছোটখাট গোনাহ করিতে থাকে যদিও উহার এক একটি ছোট ছোট হয়, কিন্তু উহা এত অগণিত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে যে, আপাদ-মস্তক গোটা মানুষটি তাহাতে ডুবিয়া জাহান্নামী হইবার জন্য যথেষ্ট হয় এবং এরূপ হইলে অতি নগণ্য সংখ্যক মানবই জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে। তাই মানবের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মেহেরবান হইয়া আশা দিয়াছেন যে, সতর্ক থাকিয়া যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত রকমের যত ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হইবে, উহা নেক আমল যথা—নামায, রোযা ইত্যাদির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মাফ হইতে থাকিবে।

হোযায়ফা (রাঃ) "ফেৎনা" শব্দের যে অর্থে হাদীছ শুনাইলেন সেই অর্থের ফেৎনার হাদীছ খলীফা ওমরের জিজ্ঞাস্য ছিল না, বরং তিনি ঐ শব্দের দ্বিতীয় অর্থের হাদীছ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে কালক্রমে মোসলেম সমাজে নানা কারণে যে বিপর্য্যয় এবং বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে, এমনকি পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি তুফান আকার ধারণ করিবে উহার বিষয় খলীফা ওমর অবগত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। এ সমস্ত বিষয় রসুলুল্লাহ (দঃ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নাম ও পরিচয় সহ তাহাদের আত্মপ্রকাশের সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনেক হাদীছে ঐরূপ তথ্য কিছু কিছু বর্ণিত আছে। যথা:—

হাদীছ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় অচিরেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সতর্ক থাকিও—তারপর আরও অধিক বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে বসা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হইতে উত্তম, যে হাঁটিয়া চলিবে সে ধাবমান হইতে উত্তম। (অর্থাৎ সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা হইতে যে যতটুকু সংযত ও বিরাগী হইবে সে ততটুকুই উত্তম গণ্য হইবে।) সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা যখন আরম্ভ হইবে তখন যাহার উট আছে সে নিজের উট লইয়া, যাহার বকরী আছে, সে বকরী লইয়া এবং যাহার জায়গা আছে সে উহা লইয়া লিপ্ত থাকাই তাহার কর্তব্য হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যাহার ঐ সব কিছুই নাই? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পাথর দ্বারা স্বীয় তরবারির ধার ভাঙ্গিয়া দিবে এবং সুযোগ থাকিলে দ্রুত ছুটিয়া পলাইবে। এই পর্য্যায়ে হযরত নবী (দঃ) দুইবার আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার কথা পৌঁছাইয়া দিলাম। এই ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিল, যদি আমি কোন দলের বল প্রয়োগে বাধ্য হই সেই দলে শামিল হইতে এবং কাহারও তরবারি বা তীরের আঘাতে আমার মৃত্যু হয়? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী (কেয়ামতের দিন) যে ভাবে নিজের গোনাহের বোঝা উঠাইবে তদ্রূপ তোমার গোনাহের বোঝাও তাহার উপর পতিত হইবে এবং সে দোযখে যাইবে। (মোসলেম)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন অচিরেই বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে শোয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তি হইতে, বসা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে, দণ্ডায়মান চলমান হইতে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান হইতে উত্তম গণ্য হইবে। সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রতি যে কেহ তাকাইয়া দেখিবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া লইবে, অতএব উহা হইতে দূরে থাকিবার আশ্রয়স্থল পাইলে আশ্রয় নিবে। (ঐ)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সুযোগ থাকিতে নেক আমল করিতে যত্নবান হও বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পূর্বে—যাহা অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় পুঞ্জিভূত হইয়া আসিবে। উহাতে সকাল বেলার মোমেন ব্যক্তি বিকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে, বিকাল বেলার মোমেন ব্যক্তি সকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে—সে দুনিয়ার লোভে নিজের দ্বীনকে বিক্রয় করিবে।

(মোসলেম—মেশকাত শরীফ)

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়া শেষ হইবে না—এইরূপ যুগ না আসা পর্য্যন্ত যখন হত্যাকারী নিজেও জানিবে না, কেন সে হত্যা করিল, নিহত ব্যক্তিও জানিবে না কেন তাহাকে হত্যা করা হইল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অত্যধিক রক্তারক্তির কারণে। (তখন অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ করায় উভয়ই বাতেলের উপর হইবে, ফলে) হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোযখী হইবে।

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, অচিরেই এরূপ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইবে যাহা সম্পূর্ণ বধির, বোবা ও অন্ধ হইবে। যে কেহ উহার প্রতি তাকাইবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া ধরিবে; উহাতে মুখের অংশগ্রহণ তরবারির অংশগ্রহণের ন্যায়ই গণ্য হইবে। (আবু দাউদ—মেশকাত)

পাঠকবৃন্দ। মোসলেম সমাজে বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার আগমনের আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর হাদীছ রসুলুল্লাহ (দ:) হইতে বর্ণিত আছে—সপ্তম খণ্ড "ফেৎনা-ফছাদ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা" পরিচ্ছেদে ঐরূপ বহু হাদীছের অনুবাদ রহিয়াছে। সেই বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল ও দলপতিদের পরিচয় হযরত (দ:) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। হাদীছে উহারও প্রমাণ আছে। যথা—

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যত দলপতি দুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হইবে—যাহার দলে মাত্র তিনশত বা কিছু বেশী লোকও হইবে এরূপ একজন দলপতিকেও রসুলুল্লাহ (দ:) বাদ দেন নাই; ঐরূপ প্রত্যেক জনের নাম, তাহার পিতার নাম এবং তাহার গোত্রের নামও রসুলুল্লাহ (দ:) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। (আবু দাউদ—মেশকাত শরীফ)

উল্লিখিত বয়ান-বর্ণনা বিক্ষিপ্ত আকারে ত হইতই; এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ে এক আনুষ্ঠানিক সুদীর্ঘ ভাষণও হযরত (দ:) দিয়াছেন। হোযায়ফা (রা:)ই উহার খোঁজ দানে বলিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ (দ:) আমাদের সমাবেশে ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন। কেয়ামত পর্য্যন্ত যত (বিশেষ বিশেষ এবং বিপর্য্যয়ের) ঘটনা ঘটিবে সবই সেই ভাষণে বয়ান করিলেন। যে স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে স্মরণ রাখিয়াছে, আর যে স্মরণ রাখিতে পারে নাই সে ভুলিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই বর্ণনার ঘটনা ঘটে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনা দেখিয়া হযরতের সেই বর্ণনা স্মরণ হয়। যেরূপ এক ব্যক্তি কাহারও আকৃতি দেখিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে, সে অন্যত্র চলিয়া গেলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু পুনরায় দেখিলেই পূর্বের পরিচয় স্মরণ আসে। (বোখারী শরীফ—মোসলেম শরীফ)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ভাষণ যে কত দীর্ঘ ছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখও মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে। আবু যায়েদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দ:) আমাদেরকে নিয়া ফজর নামায পড়িলেন। নামাযান্তে হযরত (দ:) মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হইল, হযরত (দ:) মিম্বর হইতে নামিয়া জোহরের নামায পড়িলেন এবং পুন: মিম্বরে চড়িলেন ও ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। আছরের ওয়াক্ত হইল; হযরত (দ:) মিম্বর হইতে নামিয়া আছরের নামায পড়িলেন; আবার মিম্বরে চড়িয়া ভাষণ আরম্ভ করিলেন এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভাষণ দিলেন। যত কিছু ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে সব বয়ান করিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) সকল ফেৎনা—বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের লৌহ-দ্বার ছিলেন বলিয়া এখানে যাহা উল্লেখ হইয়াছে তাহা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ রহিয়াছে; যেমন—ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা ওমর (রাঃ)কে "হে ফেৎনার তালা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ওমর (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম, আপনি সেই পথে গমন করিলেন; নবী (দঃ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি ফেৎনার জন্য তালা—যাবৎ জীবিত থাকিবে তোমাদের এবং ফেৎনার মধ্যে অতি মজবুত বন্ধ দরওয়াজা বিদ্যমান থাকিবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই বৈশিষ্ট্য তৌরাত কেতাবেও উল্লেখ ছিল। (ফতহুল-মোলহেম, ১—২৮৮।৮৯)

৩২২। **হাদীছঃ**— ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন এক নারীকে চুম্বন করিল; অতঃপর সে ভীষণ অনুতপ্ত হইল এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। (যেন তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাহাকে এই কর্মের শাস্তি দান করেন যাহাতে তাহার এই গোনাহ মাফ হইয়া যায়।) ঐ সময় কোরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হয়—

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -

অর্থ—"দিনের উভয় অর্দ্ধে (ফজর, জোহর ও আছর) এবং রাত্রের কিছু অংশে (মগরেব ও এশা) নামায আদায় কর। নিশ্চয় জানিও, নেক আমল গোনাহকে বিলীন করিয়া দেয়।" ঐ ব্যক্তি এই আয়াতের দ্বারা তাহার ঘটনার সমাধান পাইল; তখন সে আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ দঃ)! এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এই সুযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ— ছগীরা গোনাহসমূহে এই নিয়ম প্রযোজ্য যে, খাঁটি নেক আমলের দ্বারা উহা মাফ হইয়া যায়। কবীরা গোনাহ মাফ হইবার জন্য বিশেষভাবে তওবা করিতে হইবে। তওবার মূল হাকিকত এই যে, কোন গোনাহ অনুষ্ঠিত হইলে পর উহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ঐ গোনাহ না করার স্থির প্রতিজ্ঞা করা; যেমন উক্ত হাদীছে উল্লিখিত ব্যক্তির অবস্থা ছিল। সে স্বীয় গোনাহের উপর কত অনুতপ্তই না হইয়াছিল! এমন কি, সে অস্থির হইয়া নিজেকে মুরব্বির নিকট সমর্পণ করিয়াছিল, যেন তিনি শাস্তির বিধান করিয়াও গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষ মাত্রই গোনাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অনুতপ্ত ও অস্থির হওয়ার অর্থই তওবা এবং ইহাই মোমেনের নিদর্শন। যেমন, এক হাদীছে আছে—মোমেনের নিদর্শন এই যে, যখন কোন গোনাহ করিয়া ফেলে তখন সে ভয়ে এরূপ ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়ে যেন তাহার মাথার উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছে। আর মোনাফেকের অবস্থা ঐ যে. সে গোনাহের প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি বসিয়াছে, হাত নাড়িলেই উড়িয়া যাইবে।

ওয়াক্তমত নামায আদায় করার ফজিলত

৩২৩। **হাদীছ**:— ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম—কোন্ আমল আল্লার নিকট সর্বাধিক পছন্দীয়? হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? তিনি বলিলেন, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? তিনি বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত করা হইল; আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) আরও উত্তর দিতেন।

৩২৪। **হাদীছ**:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলত! কাহারও ঘরের দরওয়াজা সংলগ্ন যদি একটী প্রবাহিত নদী থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহার শরীরে কি ময়লা থাকিতে পারে? সকলে উত্তর করিল—না, না, কোন প্রকার ময়লাই থাকিতে পারে না। তখন হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থা তদ্রূপই; উহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মুছিয়া দেন।

ওয়াক্তমত নামায না পড়া নামাযকে নষ্ট করা

৩২৫। **হাদীছ**:—একদা আনাছ (রাঃ) অনুতাপ ও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (মোসলমানদের মধ্যে) যে সমস্ত (নেক আমল) দেখিয়াছিলাম এখন তাহার একটিও দেখিতে পাই না। এক ব্যক্তি বলিল, নামায এখনও বাকি আছে। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, দেখনা! তোমরা নামাযকে কিরূপ নষ্ট করিয়াছ!

৩২৬। **হাদীছ**:—ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—দামেস্ক শহরে একদা আমি ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাঁদেন কেন? তিনি অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, হায়! (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়) যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম এখন উহার কিছুই দেখি না। এমনকি, এই নামাযকেও নষ্ট করা হইতেছে। (ইহার প্রতিও মুসলমানদের লক্ষ্য ও আগ্রহ কম হইয়া যাইতেছে, যাহারা নামায পড়িয়া থাকে তাহারাও সময় ইত্যাদির কোনই পাবন্দি করে না)।

গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের তাপ কমিলে জোহর নামায পড়িবে

৩২৭। **হাদীছ**:— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তাপমাত্র বৃদ্ধিকালে (জোহরের) নামায (বিলম্বে) ঠাণ্ডা সময়ে পড়িবে। কারণ, অত্যধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ।

দোযখের অগ্নি একবার আল্লার দরবারে অভিযোগ করিল, হে পরওয়ারদেগার! (আমরা সর্বদা জাহান্নামে আবদ্ধ আছি, তোমার অনুমতি ব্যতীত বাহিরের দিকে আমরা নিশ্বাসও ফেলিতে পারি না। সুতরাং উত্তাপ বেষ্টনীর ভিতরই আবদ্ধ, তাই) আমরা একে অন্যের দ্বারা ভষ্ম হইতেছি। তখন আল্লাহ তায়ালা দোযখকে দুই রকম দুইটি নিঃশ্বাস বাহিরের দিকে ফেলিবার অনুমতি দিলেন—একটি গ্রীষ্মকালে, একটি শীতকালে। গ্রীষ্মকালের অত্যধিক উত্তাপ ঐ জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট এবং শীতকালের অধিক ঠাণ্ডার প্রকোপ ঐ জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ—জাহান্নাম আল্লার অভিশাপ কেন্দ্র, সেই অভিশাপ কেন্দ্রের উত্তেজনা যখন বাহিরে ছড়াইতে থাকে তখন নামায আদায় না করিয়া সেই উত্তেজনার উপশম হইলে পর নামায আদায় করাই বিবেচ্য ও বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ দুনিয়ার কোন বড় লোকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইলেও তাঁহার মেজাজ, মতি-গতি লক্ষ্য করিয়াই পেশ করা হয়, রাগ বা উত্তেজনার সময় উহা পেশ করা হয় না। নামায আল্লার দরবারে পেশকৃত দরখাস্ত; উহা পেশ করিতেও আল্লার ছেফতে-রহমত ও ছেফতে-গজবের বিকাশ-নিদর্শন দেখিয়া পেশ করা বাঞ্ছনীয়।

এই হাদীছের উপর প্রশ্ন হয় যে, অগ্নি একটি নির্জীব নির্বাক বস্তু। উহা কিরূপে অভিযোগ পেশ করিতে বা এরূপ আরজ করিতে পারে? উত্তর এই যে, অগ্নি আমাদের পক্ষে নির্জীব বটে. কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষে (Animate) বোদ্ধা, সচেতন জীব বিশেষ এমনকি যখনই আল্লার কোন আদেশ তাহার প্রতি আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে উহাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করিয়া ঐ আদেশ অনুযায়ী কার্য্য সামাধা করিয়া থাকে। যেমন—কোরআন শরীফে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে—ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনা। যখন নমরুদ তাঁহাকে মারিবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল তখন সেই অগ্নির প্রতি আল্লার আদেশ পৌছিল—

يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ -

"হে অগ্নি। তুমি ইব্রাহীমের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও।" (১৭ পাঃ ৫ রুঃ) অগ্নি আল্লার এই আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ্যে পালন করিয়া দেখাইয়াছে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, "দজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তাহার সঙ্গে বেহেশত নামধারী সুখ-শান্তির ব্যবস্থার একটি বস্তু এবং দোযখ নামধারী একটি অগ্নিকুণ্ড থাকিবে। দজ্জালকে যে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে সে তাহাকে ঐ বেহেশতে স্থান দিবে এবং যে তাহাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে না তাহাকে ঐ দোযখে নিক্ষেপ করিবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—স্মরণ রাখিও, তাহার ঐ বেহেশতে প্রকৃতপক্ষে দোযখের ন্যায় কষ্ট ও আজাব হইবে এবং যাহারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে

নিক্ষিপ্ত হইবে পক্ষান্তরে তাহারা ঐ স্থানে বেহেশতের ন্যায় শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতে থাকিবে।" দেখুন—অগ্নি কত বিচক্ষণ। সে আল্লার দোস্ত দুশমন সকলকেই চিনিতে পারে; আল্লার আদেশ অনুযায়ী সে কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। মাওলানা রুমী এ বিষয়ে কি সুন্দর বলিয়াছেন—

خاک وباد وآب وآتش بندہ اند ـ بامن وتو مردہ باحق زندہ اند

মাটি, বায়ু, পানি, অগ্নি ইহারা সকলেই আল্লার বন্দা; তোমার ও আমার পক্ষে ইহারা নির্জীব, কিন্তু আল্লার পক্ষে ইহারা সকলেই সজীব।

এই হাদীছের উপর আর একটি প্রশ্ন হয় যে, এখানে অধিক তাপমাত্রা ও শীতের প্রকোপের সম্বন্ধ দোযখের সঙ্গে বলা হইয়াছে, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা উহার সম্বন্ধ সূর্য্যের সঙ্গে দেখিয়া থাকি। সে জন্যই সূর্য্যের গতি পথের দূরত্ব অনুপাতে ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের তাপমাপে ও সময়ে বেশকম হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, সূর্য্য হইতেই যদি উত্তাপের বিস্তার ধরিয়া লওয়া হয় তবুও দেখিতে হইবে, সূর্য্যের মধ্যে সেই উত্তাপ কোথা হইতে আসিল? এরূপও হইতে পারে যে, জাহান্নামের সঙ্গে সূর্য্যের কোন সম্পর্ক আছে, যদ্দ্বারা জাহান্নামের নিঃশ্বাস দুনিয়ার বুকে একমাত্র সূর্য্যের পথে ছড়াইতে থাকে। যেমন কাহারও ঘরে যদি ইলেট্রিক হিটার থাকে তবে ঐ ঘরের মধ্যে উত্তাপ একমাত্র ঐ হিটার হইতে ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উত্তাপের কেন্দ্র পাওয়ার হাউসের সঙ্গে এই ঘরের হিটারের সঙ্গে একটি তারের যোগাযোগ ও সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে ঐ পাওয়ার-হাউসের উত্তাপ এই ঘরের হিটার হইতেই বিস্তীর্ণ হয়; সুতরাং এই ঘরের বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা হিটারের দূরত্বের অনুপাতেই হইবে।

আর একটি বিষয় এই যে, জাহান্নামের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুই প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রাখা আছে। একটি তব্‌কায়ে-নার—অগ্নিদগ্ধের শাস্তি-কেন্দ্র; আর একটি তব্‌কায়ে-যমহরীর—ভীষণ ঠাণ্ডার শাস্তি-কেন্দ্র। উভয়টি একত্রিত নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ের পরিমাণ এত বেশী যে, উহার লক্ষ্যাংশের এক অংশও সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের হইতে পারে না, কিন্তু সেখানে মৃত্যু নাই, তাই শুধু যাতনাই হইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাস্তি হইতে থাকিবে।

اَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ النَّارِ ـ

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দোযখ হইতে রক্ষা করুন।

পাঠকবৃন্দ। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করা হইল বর্তমান যুগের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া। নতুবা আল্লার ও আল্লার রসুলের বর্ণিত বিষয়সমূহের

জন্য প্রশ্নোত্তর ও বিতর্কের পথ মঙ্গলজনক নয় এবং তর্কের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সুরাহাও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা; প্রতিটি বস্তুর সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা একমাত্র তিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত। তিনি যখন স্বয়ং বা স্বীয় রসুলের মারফৎ কোন বস্তুর কোন অবস্থার খবর দেন, তখন উহা নিশ্চয় নিশ্চয় পূর্ণ সঠিক হইবে, বিন্দুমাত্রও নড়বড় হইবে না। কিন্তু উহা আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের আওতার বাহিরেও হইতে পারে; আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের মাত্রা যে কি তাহা বলা বাহুল্য। আল্লার সৃষ্ট মামুলী কোন বস্তু এমনকি আমরা নিজের সৃষ্টিরই কি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছি। এ অবস্থায় আল্লার বর্ণিত সংবাদের উপর প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক সৃষ্টির অনধিকার চর্চা করা ঐ নির্বোধ কাকের সমতুল্য নয় কি যে কাক তাহার নগণ্য ঠোঁট দ্বারা মহাসাগরের গভীরতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে? পক্ষান্তরে খাঁটি ভাবে চিন্তা করিলে আল্লার সৃষ্টি রহস্যের মহাসাগরের সম্মুখে আমাদের বিবেক বুদ্ধি ঐ পাতি কাকের ঠোঁট হইতেও নগণ্য। তাই এরূপ বিষয়সমূহে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের খবরের বিশ্লেষণের প্রতি মাথা ঘামান উচিন নয়। হাঁ, এখানে শুধু একটি বিষয় ভালভাবে দেখিয়া লইতে হইবে যে, এই খবরটি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বলিয়া সঠিক ও প্রামাণিক-রূপে সাব্যস্ত আছে কি না? এ বিষয় নিশ্চিত হইলে পর আর কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করা চলিবে না। যেমন, আবু হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্যকে আলোহীন সাদা বস্তুর ন্যায় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। হাসান বছরী (রঃ) প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্র-সূর্য্য কি পাপ করিয়াছে যে কারণে উহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে? আবু হোরায়রা (রাঃ) উত্তর করিলেন—

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ শুনাইলাম" অর্থাৎ হাদীছ শুনাইবার পর প্রশ্নের অবকাশ কি আছে? তখন হাছান বছরী (রঃ) আর কোন শব্দ করিলেন না। (মেশকাত)

زبان تازه کردن باقرار تو — نه انگیختن علت از کار تو -

কোন এক কবি বলিয়াছেন—তোমার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। কারণ বা হেতু জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার আমাদের নাই।

৩২৮। **হাদীছঃ**—আবু জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমরা কোন এক সফরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মোয়াজ্জেন জোহরের আজান দিতে চাহিলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দ্বিপ্রহরের উত্তাপ কম হওয়ার অপেক্ষা কর। কিছু সময় পর পুনরায় মোয়াজ্জেন আজান দিতে চাহিলে তিনি ঐরূপেই অপেক্ষা

করিতে বলিলেন, এমনকি এত বিলম্ব করিলেন যে, টিলাসমূহের ছায়া দেখা যাইতে লাগিলে। হযরত (দঃ) বলিলেন—অধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ, ঐ সময় নামায না পড়িয়া বিলম্ব করা চাই।

ব্যাখ্যা ঃ—অপ্রশস্ত দাঁড়ান বস্তু, যেমন—লাঠি, কঞ্চি, বাঁশ, থাম ইত্যাদির ছায়া সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইতে থাকে, কিন্তু ঐরূপ উঁচু বস্তু যাহার গোড়া তথা নীচের অংশ সুপ্রশস্ত, যেমন—টিলা ইত্যাদি, উহার ছায়া সূর্য্য অধিক পরিমাণ নীচে না আসা পর্য্যন্ত দেখা যায় না; উহার উপরি ভাগের ছায়া নিজের প্রশস্ত গোড়া ছাড়াইয়া যাইতে যথেষ্ট সময় লাগে। এবং গোড়া অতিক্রমের পূর্বে ছায়া দেখা যাইবে না। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জোহরের নামায অপেক্ষা করিতে করিতে বিলম্বে পড়িলেন।

৩২৯। **হাদীছ ঃ**—আবু বর্যা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ নামাযসমূহ কোন্ কোন্ সময়ে আদায় করিতেন? তিনি বলিলেন, জোহরের নামায পড়িতেন সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পর। আছরের নামায পড়িতেন এমন সময় যে, মদীনার শেষ প্রান্তের অধিবাসীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাথে আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য সতেজ থাকিতে বাড়ী ফিরিত। এশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশের পর পড়িতে ভালবাসিতেন এবং তিনি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া বা এশার নামাযান্তে কথাবার্তায় লিপ্ত হইয়া ঘুম নষ্ট করা খুবই নাপছন্দ করিতেন। (কারণ, প্রথম অবস্থায় এশার নামায ও দ্বিতীয় অবস্থায় ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।) ফজরের নামায এতটুকু আলো হওয়া অবস্থায় শেষ করিতেন যখন নিকটস্থ লোক চিনিতে পারা যাইত। হযরত (দঃ) এই নামাযে ষাট হইতে একশত পর্য্যন্ত কোরআনের আয়াত পাঠ করিতেন। (৭৮ পৃঃ)

৩৩০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জোহরের নামায এতটুকু উত্তাপ বাকী থাকিতে পড়িতাম যে, মাটির উপর কাপড় রাখিয়া সেজদা করিতে হইত।

ওজর বশতঃ জোহরের নামায বিলম্বে পড়া

৩৩১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা মদীনায় থাকা অবস্থায়ই জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশার নামায এক সাথে পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ সেদিন শহরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় বার বার মসজিদে উপস্থিত হওয়া সকলের জন্য খুবই অসুবিধাজনক হইবে সন্দেহ নাই। আবার মসজিদের জমাত ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল নয়, তাই বোধ হয় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, জোহরের শেষ সময়

মসজিদে উপস্থিত হইয়াছিলেন—যেমন জোহরের নামায আদায় করিলে পর সঙ্গে সঙ্গেই আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায় এবং ঐ সময় আছরের নামায পড়িলে প্রত্যেক নামাযই উহার নির্দ্ধারিত সময়ের ভিতরেই আদায় হইল। জোহরের নামায উহার শেষ ওয়াক্তে এবং আছরের নামায উহার আউয়াল ওয়াক্তে, অথচ দুই নামায একত্রে হইয়া গেল, বার বার মসজিদে আসিতে হইল না। মাগরেব ও এশার নামাযের ব্যবস্থাও তদ্রূপই করিলেন। এই নামাযসমূহের উভয়ের নির্দ্ধারিত ওয়াক্ত যেহেতু পরস্পর সংলগ্ন তাই এরূপ করিতে কোন বাধা নাই। সফরের সময়ও বার বার ভ্রমণ স্থগিত করায় অসুবিধা হইলে বা অন্য কোন সাময়িক ওজর বশতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

আছরের নামায পড়ার সময়

৩৩২। **হাদীছ ঃ**—ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে সময়ে আছর নামায পড়িয়া থাকিতেন তখন আমার ঘরের মেঝে রৌদ্র বিদ্যমান থাকিত অর্থাৎ রৌদ্র তথা হইতে উঠিয়া যাওয়ার পূর্বে—তখন তথায় ছায়া আসে নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনা শরীফে কেবলা দক্ষিণ দিকে। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘর মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে ছিল; ঘর মসজিদের সহিত সংযুক্ত ছিল না, অবশ্য সন্নিকটেই ছিল। ঘরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল এবং ঘরের দরওয়াজা ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে ছিল। সূর্য্য পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলে ঘর ও মসজিদের মধ্যস্থ উন্মুক্ত জায়গা-পথে ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিত এবং সেই রৌদ্র ঘরের মেঝে পতিত হইত। সূর্য্য অধিক নীচে নামিয়া গেলে রৌদ্র মেঝ হইতে উপরে উঠিয়া যাইত এবং মেঝে ঘরের দরওয়াজার সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় কোন প্রকার বেষ্টনী থাকিয়া থাকিলে উহার কিম্বা সম্মুখস্থ মসজিদের ছায়া আসিয়া যাইত। আয়েশা (রাঃ) এখানে বুঝাইতে চাহেন যে, আমার ঘরের মেঝ হইতে রৌদ্র চলিয়া গিয়া তথায় ছায়া আসিয়া যায়—সূর্য্য এতদুর নীচে যাওয়ার পূর্বেই হযরত (দঃ) আছরের নামায পড়িয়া থাকিতেন।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে—বয়োঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি বয়সের বালকের হাত ছাদ পর্য্যন্ত পৌছে—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ শুধু এতটুকুই উচু ছিল বলিয়া প্রমাণিত। আর হযরতের মসজিদের ছাদ খেজুর পাতা বিছানো ছিল—উহাও বেশী উচু ছিল না, সুতরাং উক্ত ঘরের মেঝে রৌদ্র থাকার জন্য সূর্য্য অধিক উপরে হওয়ার প্রয়োজন হইত না।

৩৩৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আছরের নামায এমন সময় পড়িতেন যখন সূর্য্যের কিরণ ও উহার তীক্ষ্ণতা পুরাপুরিই বজায় থাকিত এবং

---

* হাদীছের তরজমা ফতহুল-বারী ২—৩০ কেতাবের ব্যাখ্যা অনুপাতে করা হইল।

সূর্য্য এতটুকু উপরে থাকিত যে, মদীনার উর্দ্ধপ্রান্তবাসীগণ হযরতের সহিত আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য আকাশের নিম্নস্তরে আসিবার পূর্বেই বাড়ী ফিরিতে পারিত। আনাছ (রাঃ) বলেন, উর্দ্ধপ্রান্তের কোন কোন বস্তী খাস মদীনা হইতে চার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

৩৩৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে) আছরের নামায পড়িয়া আমাদের কেহ কেহ সূর্য্য নিম্নস্তরে আসার পূর্বেই কোবা পৌঁছিতে পারিত। (কোবা নগরীর ব্যবধান মদীনা হইতে প্রায় তিন মাইল)।

৩৩৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার মসজিদে) আছরের নামায পড়ার পর কোন কোন ব্যক্তি আম্র-বিন-আউফের বস্তীতে পৌঁছিয়া দেখিত তাঁহারা আছরের নামায পড়িতেছেন। (ঐ বস্তীই কোবা নগরী।)

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত তিনটি হাদীছ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আছরের নামায সকাল সকাল—প্রথম ওয়াক্তেই পড়া হইত; কিন্তু হযরতের সময়ই মদীনার অন্যান্য মসজিদে, যেমন—মসজিদে বনী-হারেছা, মসজিদে বনী-আম্র ইত্যাদিতে একটু বিলম্বে—মধ্য ওয়াক্তে পড়া হইত। ইহার কারণ এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, হযরতের সঙ্গে দূর প্রান্তের বস্তীসমূহের লোক জন নামায পড়িত এবং সূর্য্যাস্তের পূর্বে তাহাদের বাড়ী ফিরার আবশ্যক হইত। তাছাড়া মহল্লা ও বস্তীসমূহের লোকগণ কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকিত তাই তাহারা নিজ নিজ বস্তীর মসজিদে আছরের নামায একটু দেরীতে পড়িত। যেহেতু ইহার প্রতিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ সমর্থনই ছিল, তাই সাধারণ লোকদের অবস্থানুপাতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আছর নামায এরূপ বিলম্ব কিছুতেই করিবে না যে, সূর্য্য এতটুকু নিস্তেজ হইয়া আসে যে, উহার উপর দৃষ্টি স্থাপন করা সহজ হয়।

৩৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তোমাদের জিন্দেগী ও বয়স পূর্ববর্তী উম্মত ইহুদ ও নাছারাদের বয়সের তুলনায়—যেমন আছরের ওয়াক্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। (কিন্তু পরকালে তোমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক মর্তবা লাভ করিবে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দানপূর্বক বলেন—তোমাদের এবং ইহুদী নাছারাদের তুলনামূলক অবস্থা এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মজুরকে নির্দিষ্ট মজুরী "এক কীরাত" (যেমন—এক টাকা) ধার্য্য করিল; তাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর অন্য আর একদল মজুর ডাকিল, তাহাদের জন্যও ঐ পরিমাণ মজুরী ধার্য্য করিল, তাহারা দুপুর হইতে আছরের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর তৃতীয় আর একদল মজুর ডাকিয়া তাহাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় দলের দ্বিগুণ মজুরী ধার্য্য করিয়া বলিল,

তোমরা আছরের সময় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাজ করিবে। প্রথম দল ইহুদীদের দৃষ্টান্ত, যাহাদিগকে তৌরাত কেতাব দান করতঃ উহার আমল করিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল। (ইহুদীগণ তাহাদের পরবর্তী সকলের চেয়ে বয়স বেশী পাইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অন্যের তুলনায় তাহারা কোন প্রকার অগ্রগামী হইবে না)। দ্বিতীয় দল নাছারাদের দৃষ্টান্ত; যাহাদিগকে ইঞ্জিল কেতাব দিয়া সেই অনুযায়ী আমল করিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অগ্রগামী হইতে পারিবে না)। তৃতীয় দল তোমাদের (তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের) দৃষ্টান্ত; তাহাদিগকে কোরআন দেওয়া হইয়াছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করিতে বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে এই উম্মতের বয়স কম, কিন্তু) কেয়ামতের দিন এই উম্মতগণ অন্য সকল উম্মত হইতে অগ্রগামী হইবে। অন্যান্য উম্মত হইতে আমল করার সময় কম পাইয়াও অধিক ছওয়াব ও বড় বড় মর্তবার অধিকারী হইবে। তখন ইহুদ ও নাছারগণ আল্লার দরবারে অভিযোগ করিবে, হে প্রভু! আমরা (অধিক বয়স পাওয়ায়) কাজ বেশী করিয়াছি, মজুরী কম পাইয়াছি, ইহারা কাজ কম করিয়াছে, মজুরী বেশী পাইয়াছে—আমাদের দ্বিগুণ, ইহার কারণ কি? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাদের নির্দ্ধারিত মজুরী হইতে কি তোমাদিগকে এক-টুকুও কম দিয়াছি? তাহারা উত্তর করিবে—না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই তৃতীয় দলকে বেশী দেওয়া, আমার মেহেরবানী—অতিরিক্ত দান; যাহাকে আমার ইচ্ছা হয় দিয়া থাকি। (ইহাতে অভিযোগের অধিকার নাই)।

ব্যাখ্যা:— এই হাদীছের উদ্দেশ্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের ফজিলত বর্ণনা করা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি অন্য বিষয়েরও মীমাংসা হয়। সেই হিসাবেই এই হাদীছটি এখানে নামাযের সময় নির্দ্ধারণ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহুদীগণ যাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে. তাহাদের কার্য্য সময় তৃতীয় দলকে দেওয়া কার্য্য-সময় (আছর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) হইতে স্পষ্টতঃই বেশী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দল নাছারা, তাহাদের কার্য্য-সময় (জোহর হইত আছর পর্য্যন্ত) তৃতীয় দলের কার্য্য সময় হইতে বেশী. এই অভিযোগ সত্য ও সঠিক হওয়া নির্ভর করে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত অপেক্ষা স্পষ্টরূপে বড় হওয়ার উপর—এমন বড় যাহা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে এবং একেবারে নগণ্য না হয়, নতুবা একটা অভিযোগ খাড়া করা যাইতে পারে না। তাই এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত হইতে বড়, আছরের ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্ত হইতে ছোট। এতদ্দৃষ্টে আবু হানিফা (রঃ) ওয়াক্তদ্বয়ের সীমা এরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে আছরের ওয়াক্ত সর্বদা ছোট বলিয়াই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

৩৩৭। **হাদীছ:—** আবু উমামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সহিত জোহরের নামায পড়িলাম। তারপর আমরা ছাহাবী

আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সাক্ষাতে পৌছিলাম। আমরা তাঁহাকে আছর নামায পড়িতে পাইলাম; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চাচা মিঞা! আপনি এইটা কোন নামায পড়িলেন? তিনি বলিলেন, আছর নামায; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত যে আমরা আছরের নামায পড়িতাম তাহা এইরূপ সময়েই ছিল।

ব্যাখ্যা:— ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র:) তখন খলীফা হন নাই, বরং তিনি উমাইয়া গোত্রীয় শাসকের গভর্ণর ছিলেন এবং সময় সময় নামাযের জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন। যেমন, ৩২০নং হাদীছের ঘটনায় তিনি একদিন আছরের নামায বিলম্ব পড়ায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় তিনি জোহরের নামায তদ্রূপ বিলম্বে পড়িয়াছিলেন, ফলে আছর নামাযের ওয়াক্তের ব্যবধান খুব কমই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আছর নামাযের উত্তম সময় উপস্থিত হইয়া গেল, তাই আনাছ (রা:) নিজ গৃহে আছর নামায পড়িয়া নিলেন। কারণ, মসজিদের ইমাম শাসনকর্তা জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন।

আছরের নামায ছুটিয়া যাওয়ার ক্ষতি কত বড়!

৩৩৮। হাদীছ:— عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال—

اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তির আছরের নামায (কোন কারণ বশত:) কাজা হইয়া গিয়াছে তাহার এত বড় ক্ষতি হইয়াছে যেন তাহার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তি সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামায ছাড়িয়া দেওয়ার গোনাহ কত বড়।

৩৩৯। হাদীছ:— عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ‐ ....

অর্থ—আবুল মলীহ (র:) বর্ণনা করিয়াছে, আমরা বোরায়দা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে এক জেহাদে ছিলাম। মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল; তিনি বলিলেন, সতর্কতামুলকভাবে আছরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেও। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আছরের নামায ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামাযের ফজিলত

৩৪০। হাদীছ:—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম। একদা পুর্ণিমার রাত্রের চাঁদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হযরত (দ:) উপস্থিত ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা (বেহেশতে যাইয়া) আল্লাহ

তায়ালাকে এইরূপে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে যেমন এই পুর্ণিমার চাঁদকে দেখিতেছ—কোন প্রকার ভীড় ও কোলাহল ছাড়াই দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই নেয়ামত হাসিলের জন্য সূর্য্য উদয়ের ও অস্তের পূর্ববর্তী (ফজর ও আছর) নামাযদ্বয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩৪১। **হাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—দুনিয়ার কার্য্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দুইটি দল—রাত্রিকালের জন্য ও দিনের জন্য একের পর এক আসিয়া থাকেন। উভয় দলই ফজর ও আছরের সময় দুনিয়ার বুকে একত্রিত হন। নূতন দল দুনিয়ার উপর থাকেন, পুরাতন দল আল্লাহ তায়ালার নিকট চলিয়া যান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাহা সত্ত্বেও তিনি ঐ ফেরেশতা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বন্দাদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তর করিয়া থাকেন—আমরা যাইয়া তাহাদিগকে নামাযরত পাইয়াছিলাম, ফিরিয়া আসার সময় নামাযরতই দেখিয়া আসিয়াছি। (কারণ একদল ফজরের সময় আসিয়াছেন এবং আছরের সময় ফিরিয়াছেন। দ্বিতীয় দল আছরের সময় আসিয়াছেন, ফজরের সময় ফিরিয়াছেন।)

সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছর নামাযের ওয়াক্ত অল্প পাইলে ?

৩৪২। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ নামায পড়িবে এবং যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ ফজরের নামায আদায় করিবে।

ব্যাখ্যাঃ—এই হাদীছটি দ্বারা দুইটি মছআলাহ প্রতীয়মান হয়। প্রথম মছআলাহ—যে ব্যক্তির উপর নামায ফরজ ছিল না; সে নামায ফরজ হওয়ার উপযোগী এমন সময় হইয়াছে যখন বালেগ হইয়াছে বা ঋতুবর্তী এমন সময় পবিত্র হইয়াছে, পাগল এমন সময় ভাল হইয়াছে, কাফের এই সময় মোসলমান হইয়াছে এমতাবস্থায় তাহার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হইবে কি না ? এই হাদীছে প্রমাণ হইল যে ফরজ হইবে। দ্বিতীয় মছআলাহ—যে ব্যক্তির আছর ও ফজর নামায কোন কারণে এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে, এখন সূর্যাস্ত বা উদয়ের মাত্র সামান্য সময় বাকি আছে, যেমন—কাহারও এই সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল বা নামাযের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, সে নামায আরম্ভ করিয়া দিবে, না সূর্য্যাস্ত বা উদয়ের পরে কাজা পড়িবে? এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তখনই নামায আরম্ভ করিয়া পূর্ণ নামায আদায় করিবে। অবশ্য যেহেতু মশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় নামায ছহীহ হয় না সে জন্য সতর্কতামুলকরূপে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যাদয়ের পর ঐ নামায পুনরায় কাযাও পড়িয়া লইবে। (এ'লাউছ ছুনান)

মাগরেবের নামাযের ওয়াক্ত

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরেব এবং এশার নামায একত্রে পড়িতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ—জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশা এই দুই জোড়া নামাযের ওয়াক্ত পরস্পর লাগালাগি; কোন কোন ইমামের মতে ছফর, রোগ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে উক্ত চার ওয়াক্তের প্রতি দুই ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তে একত্রে পড়িয়া নেওয়া জায়েয। আ'তা রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাব সেইরূপ। হানফী মজহাব মতে উভয় নামাযকে একত্রিত করিবে, কিন্তু এক ওয়াক্তে নয়, প্রত্যেক নামাযকে বস্তুতঃ উহার ওয়াক্তের গণ্ডির ভিতরই পড়িবে—এক নামায উহার ওয়াক্তের সর্বশেষ অংশে এবং দ্বিতীয় নামায উহার ওয়াক্তের সর্ব প্রথম অংশে। যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি নামাযের প্রস্তুতি নিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়; এমতাবস্থায় দুই দুই বার যাতনা ভোগ না করিয়া সে এরূপ করিতে পারে যে, জোহর বা মাগরেব উহার সর্বশেষ ওয়াক্তে পড়িবে যেন নামায শেষ করিলে অনতিবিলম্বেই আছর বা এশার ওয়াক্ত হয় এবং উহা পড়িয়া নেয়। এইভাবে এক প্রস্তুতিতেই দুই নামায একত্রে পড়িবে, কিন্তু প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্তে; যদিও সাধারণ অবস্থায় উহা উত্তম ওয়াক্ত নহে।

৩৪৩। **হাদীছঃ**—রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মাগরেবের নামায পড়িয়া ফিরিবার সময়ও চতুর্দিক এতটুকু আলোকিত থাকিত যে, কেহ তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্যস্থল স্পষ্টই দেখা যাইত।

৩৪৪। **হাদীছঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায দুপুরের সময় পড়িতেন, আছরের নামায সূর্য্য নিস্তেজ হইবার পূর্বে পড়িতেন, মাগরেবের নামায সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, এশার নামায কখনও একটু বিলম্বে পড়িতেন, কখনও সত্বরই পড়িয়া লইতেন; যখন দেখিতেন, মুছল্লিগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছে তখন বিলম্ব না করিয়া এশার নামায পড়িয়া লইতেন; যখন তাহারা বিলম্বে আসিত তখন দেরীতেই পড়িতেন। ফজরের নামায একটু অন্ধকার থাকিতেই পড়িতেন।

৩৪৫। **হাদীছঃ**—ছালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত মাগরেবের নামায আরম্ভ করিতাম সূর্য্যাস্তের সঙ্গেই।

মাগরেবের নামাযকে এশার নামায বলিবে না

৩৪৬। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ্ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্ক করিয়াছেন, মাগরেবের নামাযের নামে গ্রাম্য কাফেরদের ভাষা যেন তোমাদের উপর প্রবল না হইতে পারে, তাহারা মাগরেবকে এশা বলে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়টি স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হইতে পারে, কিন্তু পক্ষান্তরে এখানে একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোসলমান জাতি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে তাহাদের নিজস্ব তামাদ্দুন, তাহজীব বৈশিষ্ট্য সব কিছু আছে। তাহাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও সমাজগত সব বিষয়সমুহই স্বতন্ত্র, এমনকি কথাবার্তার ভাষা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। মোসলমানদের নামসমূহ অন্য জাতি হইতে ভিন্ন, এমনকি শুধু মানুষের নামই নয়, বস্তুসমূহের নামেও ঐ স্বাতন্ত্র্য অতি স্পষ্ট ও ব্যাপক। প্রত্যেকটি মোসলমানের পক্ষে জাতিত্ববোধ অপরিহার্য্য এবং এই জাতিত্ববোধের প্রথম সিঁড়ি হইল এই যে, মোসলমানদের মধ্যে (বিশেষতঃ কোরআন হাদীছের ইঙ্গিত) যে নাম, শব্দ বা প্রথা প্রচলিত আছে উহা যত সাধারণই মনে হউক না কেন, কখনও উহা পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় বস্তু অবলম্বন করিবে না। যেমন, এই হাদীছে এবং মোসলেম শরীফে উল্লিখিত এই হাদীছেরই দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন—মোসলমানগণ সূর্য্যাস্তের পরের নামাযকে মাগরেব ও তার পরের নামাযকে এশা বলিয়া থাকে। কোরআন শরীফেও এই দ্বিতীয় নামাযটি "এশা" নামেই উল্লেখ আছে, কিন্তু আরবের গ্রাম্য কাফেরদের ভাষায় মাগরেবকে এশা এবং এশাকে "আতামাহ" বলা হইত (মোসলেম শরীফ)। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছেন—খবরদার! বিজাতীয়দের ঐ নাম যেন তোমাদের মধ্যে প্রচলিত না হইতে পারে।*

শরীয়ত সামান্য বিষয়েও জাতিত্ববোধের শিক্ষা দেয় এবং আমাদেরই এই সমস্ত অমুল্য আদর্শসমুহ দ্বারা বিজাতীয়গণ কত উন্নতি করিতেছে, আর আমরা নিজেদের আদর্শ হারাইয়া বিজাতীদের প্রতি তাকাইয়া আছি। বর্তমান যমানায় "জল, লবণ" ইত্যাদি বহু বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা এই হাদীছ অনুযায়ী অবাঞ্ছনীয় গণ্য হইবে।

এশার নামাযের ফজিলত

৩৪৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায পড়িতে বিলম্ব করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়া গেল, এখনও তিনি মসজিদে যান না, তাই ওমর (রাঃ) আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! শিশু ও নারীগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ এশার নামাযে আর কত বিলম্ব করিবেন?) তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিলেন এবং (এত রাত্র পর্য্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষারত মুছল্লিগণকে ধন্যবাদ স্বরূপ বলিলেন, তোমরা (মুষ্টিমেয় কয়েকজন) ব্যতীত দুনিয়ার বুকে এই সময় নামাযের অপেক্ষাকারী আর কেহ নাই; এই ফজিলতের

---

* পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এশার নামাযকে "আতামাহ" বলার অবকাশ দেখাইয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, উহা হারাম পর্য্যায়ের নিষিদ্ধ নহে।

অধিকারী শুধু তোমরাই। কারণ, (একমাত্র মোসলমানই নামায পড়িবে এবং) তখন মদীনার বাহিরে ইসলাম প্রসারিত হয় নাই (আর মদীনার অন্য সব মসজিদে পূর্বেই নামায শেষ হইয়াছে।)

৩৪৮। **হাদীছ :**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাহাজ যোগে মদীনায় আসিয়াছিলাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতাম। তাই আমরা দুই একজন করিয়া পালাক্রমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির থাকিতাম। একদা আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী তাঁহার খেদমতে পৌঁছিলাম, নবী (দঃ) কোন কাজে আবদ্ধ ছিলেন, তাই এশার নামায পড়িতে বিলম্ব হইল। নবী (দঃ) রাত্র অধিক হইলে পর মসজিদে আসিলেন এবং নামাযান্তে সকলকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা ধন্যবাদ ও মোবারাকবাদ গ্রহণ কর; তোমাদের উপর আল্লার অতি বড় নেয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মত এই সময় নামায পড়ে নাই। (এখনও দুনিয়ার বুকে এই সময় কেহ কোথাও নামায পড়িতেছে না)। আবু মুছা (রাঃ) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তি শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলাম।

ব্যাখ্যা :—সেখ সা'দী (রঃ) খুবই সুন্দর পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন—

منت منه که خدمت سلطان همی کنی -

منت شناس که بخدمت اوبداشت

"গর্ব করিও না যে, তুমি বাদশার খেদমতের সুযোগ পাইয়াছ। ইহা তাঁহারই দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তোমাকে তাঁহার খেদমতের সুযোগ দান করিয়াছেন।"

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এশার পূর্বে নিদ্রা যাইবে না

৩৪৯। **হাদীছ :**—আবু বরজা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অতিশয় নাপছন্দ করিতেন।

ঘুমের ভাবে বাধ্য হইলে এশার পূর্বে ঘুমাইতে পারে

ঐরূপ অবস্থায় এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাইতে পারে, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের ভিতরে নিদ্রা ভঙ্গের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐরূপ অবস্থায় এশার পূর্বে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য লোক নিয়োগ করিতেন—এই ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনে এশার পূর্বে নিদ্রা যাইতে তিনি দ্বিধা করিতেন না।

৩৫০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ প্রয়োজনে লিপ্ত থাকায় এশার নামাযে অনেক বিলম্ব করিলেন। এমনকি আমরা বসা অবস্থায় মসজিদে ঘুমাইয়া পড়িলাম, একবার জাগিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। তারপর জাগ্রত হইলে হযরত নবী (দঃ) নামাযের জন্য আসিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন এই সময় তোমরা ভিন্ন কেহ ভূপৃষ্ঠে নামাযের অপেক্ষারত নাই। (অর্থাৎ যদিও তোমাদের কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমরা এমন একটি ফজিলত পাইয়াছ যাহার একক অধিকারী তোমরাই।)

৩৫১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা এশার নামাযে অধিক বিলম্ব করিলেন, (মসজিদে উপস্থিত) লোকেরা (বসা অবস্থায়) বার বার ঘুমাইতে ও জাগ্রত হইতে লাগিল। তখন ওমর (রাঃ) যাইয়া হযরত (দঃ)কে নামাযের কথা বলিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) তখন গোছল করিয়া আসিতেছিলেন ; তাঁহার মাথা হইতে পানি ঝড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের কষ্ট হইবে এই আশঙ্কা না হইলে এশার নামায এই সময়েই পড়ার আদেশ করিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—এশার নামাযের উত্তম সময় বিলম্বে তথা রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশের পরে হইত, যদি নবী (দঃ) সেই আদেশ করিতেন। কিন্তু হযরত (দঃ) উম্মতের কষ্টের লক্ষ্য করিয়া সেই আদেশ করেন নাই। হযরতের এবং ছাহাবীগণের আমল ও নীতি ইহাই ছিল যে, তাঁহারা রাত্রের তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িতেন।

৩৪৭ নং হাদীছ বর্ণনান্তে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন—

وكانوا يصلون فيما ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول

"নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণ পশ্চিম আকাশের শুভ্রতা বিদুরিত হওয়ার পর রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায পড়িয়া থাকিতেন।" সুতরাং এশার নামাযের উত্তম ওয়াক্ত তৃতীয়াংশের মধ্যেই থাকিবে। উহার পরের সময় এশার নামায পড়া নবী (দঃ) কর্তৃকই পরিত্যক্ত। (৮১ পৃঃ)

নেছায়ী শরীফে আছে, হযরত নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা রাত্রের তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িবে।

এশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত থাকে*

৩৫২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়িলেন এবং নামাযান্তে বলিলেন, অন্যান্য বস্তীর লোকজন নামায পড়িয়াছে, তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ।

* মধ্যরাত্রের পর ছোবহে-ছাদেক পর্য্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু উহা মকরুহ ওয়াক্ত।

স্মরণ রাখিও, যে পর্য্যন্ত তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে নামাযরত গণ্য করা হইবে।

ফজরের নামাযের ফজিলত

৩৫৩। **হাদীছ :**—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা সময়ের (আছর ও ফজর) নামাযদ্বয় আদায়ে অভ্যস্ত হইবে, সে বেহেশতী হইবে।

ব্যাখ্যা :— হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফরমান শিরোধার্য্য। কারণ, সাধারণতঃ দেখিবেন, যে ব্যক্তি এই নামাযদ্বয়ে অভ্যস্ত হয়, সে অন্য তিন ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত নিশ্চয় হয় এবং যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে নামাযে অভ্যস্ত হয়, সে অন্যান্য দিক দিয়াও শরীয়ত অনুসারী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۝

"নামায মানুষকে অপকর্ম ও কুকর্ম হইতে বিরত রাখার সহায়ক। (২১ পাঃ ২ রুঃ)

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

৩৫৪। **হাদীছ :**—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহ্‌রী খাওয়ার একটু পরেই ফজরের নামাযে দাঁড়াইয়া গেলাম; সেহ্‌রী ও নামাযের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান ছিল।

৩৫৫। **হাদীছ :**—ছাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার বাড়ী হইতে সেহ্‌রী খাইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামায পড়িতে হইলে অতি দ্রুতবেগে আসিতে হইত।

(এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ২৪৭ নম্বরে দেখুন)

যে কোন নামাযের এক রাকাত পড়ার মত সময় পাইলেই ঐ নামায পূর্ণরূপে ফরজ হইয়া যাইবে

৩৫৬। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কোন ব্যক্তি যে কোন নামাযের মাত্র এক রাকাত পড়ার সময় পাইলেই ঐ নামায তাহার উপর ফরজ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের ব্যাখ্যার জন্য ৪৩২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন।

ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য্য পূর্ণ উদিত হওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়া নিষেধ

৩৫৭। **হাদীছ:**—ওমর (রা:) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধ করিয়াছেন—ফজরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ উদিত না হয় এবং আছরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্ত না যায়।

৩৫৮। **হাদীছ:**—ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন সূর্য্যের কিনারা উদিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ পূর্ণ উদিত না হয় এবং যখন সূর্য্যের কিনারা অস্ত যাইতে আরম্ভ করে তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্তমিত না হইয়া যায়।

৩৫৯। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দুই প্রকার পরিধান এবং দুই সময়ের নামায নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত এবং আছরের নামাযের পর সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। দুই হাত আবদ্ধ করিয়া চাদরে আবৃত করা হইতে এবং লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান করিয়া হাঁটুদ্বয়কে খাড়া করিয়া এরূপ অসাবধানভাবে বসা যে, তলদেশের কাপড় নীচে পড়িয়া ছতর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এরূপ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। একে অন্যের প্রতি বিক্রয় দ্রব্য নিক্ষেপ করা অথবা একে অন্যকে ছোঁয়ার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আসিবে)।

আছরের নামায পড়ার পর নফল পড়া নিষিদ্ধ

৩৬০। **হাদীছ:**—মোয়াবিয়া (রা:) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন একটি নামায পড়িয়া থাক যাহা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পড়িতে দেখি নাই, বরং তিনি উহা পড়িতে নিষেধ করিতেন—আছরের পরে দুই রাকাত নফল নামায।

সূর্য্য উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ

৩৬১। **হাদীছ:**—আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—ফজর নামাযের পর সূর্য্য উপরে উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং আছর নামাযের পর সূর্য্য অস্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৩৬২। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য উদয়ের সময় তোমরা নামাযের জন্য উদ্যত হইও না এবং অস্তের সময়ও নামাযের জন্য উদ্যত হইও না।

আছরের নামাযের পর কাযা নামায পড়া জায়েয

৩৬৩। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি নামায কখনও ছাড়িতেন না। প্রকাশ্যে বা গোপনে অবশ্যই উহা পড়িতেন—ফজরের পূর্বে দুই রাকাত ও আছরের পরে দুই রাকাত।*

৩৬৪। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে দিনই আছরের পর আমার নিকট আসিতেন ২ রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যাঃ— আছরের নামায পড়ার পরে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ বলিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে—যেমন পূর্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীছদ্বয় হইতে বুঝা যায়, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ইহার মীমাংসা করিবার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ আছরের পর দুই রাকাত নামায হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাজা স্বরূপ পড়িতেন—জোহরের ফরজ পড়ার পর দুই রাকাত ছুন্নত পড়া হয়, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক বিশেষ কর্মব্যস্ততার দরুন ঐ ছুন্নত পড়িতে পারেন নাই তাই উহা আছরের পর কাজা স্বরূপ পড়িয়াছেন। তারপর অবশ্য তিনি উহা সর্বদাই পড়িতে থাকেন, কিন্তু উহার প্রথম সূচনা সুন্নতের কাজা স্বরূপই হইয়াছিল।✣ দ্বিতীয়তঃ—যে কোন কারণেই হউক আছরের পর সর্বদা এই দুই রাকাত নামায পড়াকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, অন্য কেহ ইহা অবলম্বন করুক তাহা তিনি চাহিতেন না, বরং নিষেধ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীছদ্বয়ে উক্ত বিষয় দুইটির বয়ান রহিয়াছে।

৩৬৫। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ), মেছ্ওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীত্রয় কোরায়েব নামক খাদেমকে এই বলিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইলেন যে, তাঁহার নিকট আমাদের সালাম বলিবে এবং আছরের পর দুই রাকাত নামামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে যে, শুনিতে পাইলাম আপনি ঐ নামায পড়িয়া থাকেন, অথচ আমাদের নিকট এরূপ প্রমাণ পৌঁছিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমরের সহিত একমত হইয়া আমিও লোকদিগকে এই নামায হইতে বিরত রাখার জন্য শাস্তি দিয়া থাকিতাম।

---

* অবশ্য আছরের পরের দুই রাকাত সর্বদা গোপনেই পড়িতেন; যেমন ৩৬৬ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন। উহা সকলে দেখিত না—যেরূপ ৩৬০ নং হাদীছে উল্লেখ আছে।

✣ আছরের নামাযের পর এরূপ সুন্নতের কাজা অন্য কেহ পড়িবে তাহা এক হাদীছে হযরত (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ছোমে-বেছাল তথা দিবারাত্র মিলাইয়া একটানা একাধিক দিনের রোযা স্বয়ং হযরত (দঃ) রাখিতেন, অন্যের জন্য উহা নিষেধ করিয়াছেন, রাখিলে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ফরজ কাজা নামায আছরের নামাযের পর সকলেই পড়িতে পারে।

(তাই এবিষয় পূর্ণ অনুসন্ধান চালান দরকার মনে করিলাম।) কোরায়েব বলেন—আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং ছাহাবীত্রয়ের কথার পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে পৌঁছাইলাম। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টি বিবি উম্মে-ছালামার নিকট জিজ্ঞাসা কর; (তিনিই উহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত আছেন।) কোরায়েব ছাহাবী-ত্রয়ের অনুমতি লইয়া উম্মে ছালামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই নামায (আছরের পর) হইতে নিষেধ করিতে শুনিতাম, একদা তাঁহাকে আছরের পর এই নামায পড়িতে দেখিলাম। তখন আমি কর্মব্যস্ত থাকায় আমার গৃহকর্মিনীর মারফত জিজ্ঞাসা করাইলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনাকে এই নামায হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, এখন আপনাকে উহা পড়িতে দেখি। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আছরের পর দুই রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ? ঘটনা এই যে, আবদুল-কায়েছ গোত্রের একদল লোক আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে লিপ্ততার পরিস্থিতি এমনই হইয়াছিল যে, জোহরের ফরজান্তে দুই রাকাত সুন্নত পড়িতে পারি নাই; ইহা সেই দুই রাকাত নামায।

৩৬৬। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আছরের পর) দুই রাকাত নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও ছাড়েন নাই, সর্বদাই তিনি উহা পড়িতেন; কিন্তু মসজিদে কখনও পড়িতেন না—এই আশঙ্কায় যে তাঁহার উম্মত একটি অতিরিক্ত কষ্টে পড়িয়া যাইবে। তিনি সর্বদাই স্বীয় উম্মতের কষ্ট লাঘব করার প্রতি তৎপর থাকিতেন।

একদল লোকের নামায কাজা হইলে আজান ও জমাতের সহিত ঐ কাজা নামায পড়িতে পারে

৩৬৭। **হাদীছঃ**—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক ছফরে ছিলাম। একদা সমস্ত রাত্র ভ্রমণ করতঃ ক্লান্ত হইয়া শেষ রাত্রে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশ্রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হযরত বলিলেন, এখন আরাম করিলে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা আছে। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, (নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কায় সকলে নিদ্রা ভঙ্গ করার প্রয়োজন নাই;) আপনারা আরাম করুন, (আমি বসিয়া থাকি;) নামাযের সময় আপনাদিগকে জাগাইয়া দিব। তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেলাল (রাঃ) ছোবহে-সাদেকের অপেক্ষায় পূর্বদিকে তাকাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার চক্ষু বুজিয়া গেল, তিনিও নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। (সকলেই নিদ্রামগ্ন, নামাযের সময় চলিয়া গেল।) যখন সূর্য্য উদিত হইতেছিল, তখন সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রা ভাঙ্গিলে তিনি বেলালকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার কর্তব্য তুমি কি করিলে? বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নিদ্রা আমার উপর জীবনে কখনও চাপে নাই। আমাদের সকলের আত্মাই নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হাতে চলিয়া গিয়াছিল* যখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে পুনরায় উহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ—নামাযের জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল, এমতাবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও অনিচ্ছাকৃত নিদ্রা "ওজর" রূপেই গণ্য হইবে।) তারপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে বলিলেন, এইস্থানে শয়তানের আছর আছে, যদ্দরুন আমরা নামাযের ওয়াক্ত হইতে মাহরুম হইয়াছি। এখান হইতে সত্বর অন্যত্র যাইয়া সকলে অজু করিলে পর হযরত (দঃ) বলিলেন, হে বেলাল! লোকদিগকে একত্র করার জন্য আজান দাও। তারপর যখন সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়া লাল বর্ণ চলিয়া গেল তখন ঐ কাজা নামায সকলে জামাতে পড়িলেন।

৩৬৮। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) খন্দকের জেহাদরত অবস্থায় একদিন বিষণ্ণ মনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাফেরদের প্রতি ভৎ'সনা আরম্ভ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! অদ্য (কাফের শত্রুদলের প্রতিরোধে লিপ্ত থাকায়) আমি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের নামায পড়ার সুযোগ করিতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমরাও পড়িতে পারি নাই। সেমতে সূর্য্যাস্তের পরে আমরা সকলে ময়দানে একত্রিত হইয়া অজু করিলাম এবং প্রথমে (কাজা) আছরের পড়িলাম, তারপর মাগরেবের নামায আদায় করিলাম।

মছআলাহঃ—কোন ব্যক্তির ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাজা হইলে ঐ কাজা নামায যথাক্রমে প্রথমে পড়িয়া তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়িতে হইবে; অন্যথায় উপস্থিত ওয়াক্তের নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য যদি কারণ বশতঃ উপস্থিত নামায এমন সময় পড়িতে উদ্যত হয় যখন কাজা নামায পড়িতে গেলে উপস্থিত নামামের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবে তবে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত নামাযই প্রথমে পড়িবে। কাজা নামাযের কথা ভুলিয়া উপস্থিত নামায পড়িলে তাহাও শুদ্ধ হইবে। ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক নামায কাজা হইলে সে ক্ষেত্রে এই বাধ্য-ব্যধকতা নাই। উক্ত হাদীছের উপরই বোখারী (রঃ) এই মছআলাহটিও উল্লেখ করিয়াছেন।

মছআলাহঃ— কতিপয় নামায কাজা হইলে সেই নামায আদায় করিতে উহাদের মধ্যেও তরতীব তথা আগ-পাছের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আগের ওয়াক্ত আগে এবং পরের ওয়াক্ত পরে পড়িতে হইবে অন্যথায় সেই আদায় শুদ্ধ হইবে না।

---

* মানুষের দেহের সঙ্গে তাহার রূহের দুই প্রকার সংযোগ আছে—একটি দ্বারা মানুষ জীবিত থাকে, মৃত্যুর সময় উহা বিচ্ছিন্ন হয়; অপরটি দ্বারা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইয়া থাকে, নিদ্রাবস্থায় উহাই ছিন্ন হয় এবং জাগ্রত হইলে উহা পুনঃ স্থাপিত হয়।

অবশ্য এই মছআলাহ সর্বমোট ছয় ওয়াক্ত কাজা পর্য্যন্ত। যদি কাজার সংখ্যা ছয় ওয়াক্তের অধিক হয় তবে ঐ বাধ্য-বাধকতা থাকে না।

নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই নামায পড়িবে

৩৬৯। **হাদীছ:**—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায ভুলিয়া যায়, স্মরণ হওয়া মাত্রই উহা আদায় করিবে। উহা আদায় না করিলে ঐ গোনাহ মাফ করাইবার কোন উপায় নাই।

মছআলাহ:—কোন নামায ছুটিয়া গেলে তওবা-এস্তেগফার করত: নামায কাজা পড়িবে—একাধিক বার ঐ কাজা পড়িতে হইবে না। ইব্রাহীম নখয়ী (র:) বলিয়াছেন, এক ওয়াক্ত নামায দশ বৎসর কাজা থাকিয়া গেলেও সেই এক ওয়াক্তের কাজা একবারই পড়িতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— ৩৪৯ নং হাদীছ দ্বারা বোখারী (র:) মছআলাহ লিখিয়াছেন যে, এশার নামাযের পর গল্প করা ও কথাবার্তায় সময় ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অতঃপর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, দ্বীন শিক্ষার কথাবার্তায় এবং ওয়াজ-নছীহতের কথাবার্তায় লিপ্ততা এশার নামাযের পরে জায়েয আছে। নিম্নের পরিচ্ছেদেও ঐরূপ একটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন।

এশার পরে পরিবারবর্গ বা মেহমানের সহিত প্রয়োজনীয় কথা বলা

৩৭০। **হাদীছ:**—আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদুর রহমান (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক "আছহাবে-ছোফ্ফাহ"* নামে পরিচিত ছিলেন: তাঁহারা নিতান্ত গরীব ও অসহায় ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দ:) একদা সকলের প্রতি এই আহ্বান জানাইলেন—যাহার নিকট দুই জনের খানা আছে সে (আছহাবে ছোফ্ফাহ হইতে) একজনকে সঙ্গে লইয়া যাও। যাহার নিকট চার জনের খানা আছে

---

* "ছোফ্ফাহ" শব্দের অর্থ সংলগ্ন বারান্দা। এই ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের জন্য বাপ-দাদার ধন-সম্পত্তি সব কিছু ত্যাগ করত: এমন নি:সহায় নি:সম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মসজিদের বারান্দা ভিন্ন তাঁহাদের বাসস্থানের আর কোন ব্যবস্থা ছিল না; সে জন্যই তাঁহাদিগকে আছহাবে-ছোফ্ফাহ বলা হইত। এমনকি তাঁহাদের পরনের কাপড়টুকু পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে জুটিয়া উঠিত না। তাঁহারা দ্বীনের এলম শিক্ষা করার জন্য সর্বদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারেই থাকিতেন। রাত্রিকালে অবসর সময় এবাদতে কাটাইতেন, দিনের বেলা বন-জঙ্গল হইতে লাকড়ী কুড়াইতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত না। তাই রসুলুল্লাহ (দ:) তাঁহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন।

সে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ জনকে লইয়া যাও। রসুলুল্লাহ (দঃ) একাই দশজনকে লইয়া গেলেন। (আবদুর রহমান বলেন,) আমাদের ঘরে আমি, আমার স্ত্রী, আমার মা এবং বাবা আবু বকর ছিলেন, এবং সকলের জন্য একটি মাত্র চাকর ছিল। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়া) আমার পিতাও কয়েকজন মেহমান আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং আমাকে হুকুম করিলেন—তুমি এই মেহমানদের খেদমত-গোজারী করিও, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাইতেছি। আমার জন্য কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া মেহমানদের খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিও। এই বলিয়া আবু বকর (রাঃ) চলিয়া গেলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনেক সময় কাটাইলেন, এমনকি সেখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করিয়া এশার নামায পড়িলেন। তারপর যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘুমের সময় হইল তখন আবু বকর (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন। এদিকে আমি পূর্ব নির্দেশ-অনুযায়ী মেহমানদের খানা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীওয়ালা—মেজবান কোথায়? আমি অনুরোধ করিলাম আপনারা খাওয়া-দাওয়া করিয়া লউন। তাঁহারা বলিলেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমরা খাইব না। আমি বলিলাম, তিনি আসিয়া যদি দেখেন আপনাদের খাওয়া হয় নাই তবে তিনি আমার প্রতি অত্যধিক রাগান্বিত হইবেন। এত করিয়া বলা সত্ত্বেও তাঁহারা খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) যখন বাড়ী আসিলেন তখন আমি ভয়ে পালাইয়া রহিলাম। আমার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, মেহমানদিগকে ছাড়িয়া এত রাত্র কিরূপে কাটাইলেন? তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও কি মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া হয় নাই? মা বলিলেন, আমরা খাবার দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা খাইতে সম্মত হন নাই। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আমাকে পাজী বলিয়া ডাকিলেন এবং নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি চুপ করিয়া পলাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে কয়েকবার ডাকিয়া অবশেষে বলিলেন—সত্বর উপস্থিত হও, নতুবা ভাল হইবে না। তখন আমি উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, আপনি মেহমানদিগকে জিজ্ঞাসা করুন! তাঁহারা বলিলেন, এই বেচারা ঠিকই বলিতেছে—ইহার কোন দোষ নাই; আমাদের জন্য খাবার উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু আমরাই খাইতে স্বীকার করি নাই। তখন আমার পিতা বলিলেন, আপনারা খাইয়া লউন, কসম খোদার—আমি এই রাত্রে খাইব না। তখন মেহমানগণও শপথ করিয়া বসিলেন যে, আপনি না খাইলে আমরাও খাইব না। তখন আবু বকর একটু স্থিরতার মধ্যে আসিয়া বলিলেন, আজ রাত্রের ন্যায় এরূপ দুর্ঘটনা আর ঘটে নাই; আপনারা কেন খাবার গ্রহণ করিবেন না? এই বলিয়া খাবার উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন,

প্রথমে অর্থাৎ ক্রুদ্ধাবস্থার কথাবার্তার মুলে শয়তানের কারসাজি ছিল (যদ্বারা সকলেই ক্ষুধার্ত থাকার উপক্রম হইয়াছে।) এই বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই খাইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন যে, (আবু বকর (রাঃ) মেহমানগণের প্রতি যে তৎপরতা প্রদর্শন করিলেন এবং এমন উদারতা দেখাইলেন যে, তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় শপথ ভঙ্গ করিয়া কাফ্‌ফারার বোঝাও মাথায় লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং তৎক্ষণাৎ মেহমানদের অভিপ্রায় অনুযায়ী খাওয়া আরম্ভ করিলেন এবং মেহমানগণও সহানুভূতির পরিচয় দিলেন যে, আবু বকরকে ছাড়িয়া না খাওয়ার শপথ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষের এই সহানুভূতির ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হইল এবং উহার ফলাফল প্রকাশ্যে দেখা যাইতে লাগিল। আল্লাহ তায়ালা ঐ খাদ্যের মধ্যে এত বরকত দান করিলেন যে,) খোদার কসম—আমরা এক এক লোকমা পাত্র হইতে উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বস্তু মাত্রায় আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল, এমনকি উপস্থিত সকলে খাইয়া তৃপ্ত হইলেন; এদিকে খাদ্যবস্তু পূর্বের চেয়েও বেশী দেখা যাইতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) এ অবস্থা দেখিয়া স্বীয় স্ত্রীকে ডাকিলেন, তিনিও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন—বর্তমান খাদ্যবস্তু পূর্বের তুলনায় তিন গুণ বেশী। আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয় আল্লার তরফ হইতে বরকত নাযেল হইয়াছে; ইহা অতি মোবারক খাদ্য; (তাই যত খাওয়া যায় ততই ভাল। এই ভাবিয়া) তিনি আরও খাইলেন এবং স্বীয় ত্রুটির পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন:—ক্রুদ্ধাবস্থায় যে কসম খাওয়া হইয়াছিল তাহা শয়তানের তাছীরেই হইয়াছিল, এই বলিয়া আরও এক লোকমা খাইলেন। পাত্রে আরও খাদ্য অবশিষ্ট থাকিল। উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছাইয়া দিলেন। ভোর পর্য্যন্ত ঐ খাদ্য তাঁহার নিকটেই থাকিল।

ঘটনাক্রমে ইতিপূর্বে মোসলমানদের সঙ্গে অন্য কোনও এক আরব গোত্রের সন্ধি চুক্তি হইয়াছিল এবং উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ায় ঐ গোত্রের বারজন নেতৃস্থানীয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কয়েকজন করিয়া লোক ছিল, তাঁহারা সকলেই তৃপ্তি সহকারে ঐ খাদ্য খাইলেন।+

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, নামায ঈমানের এরূপ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে, নামায না পড়া মোশরেক কাফেরদের কাজ বলিয়া পরিগণিত (৭৫)। ● ইসলাম গ্রহণকারী হইতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে নামায পড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন (৭৫ পৃঃ ৫১ হাদীছ)। ● নামাযী ব্যক্তি বস্তুতঃ তাহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আবেদন-আরাধনায় মগ্ন হয় (৭৬ পৃঃ)। অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তির সব

+ হাদীছ খানা ৯০৬, ৯০৭ পৃষ্ঠায়ও আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

হাল-অবস্থা ঐ ধরণের হওয়া চাই। ● এশার নামাযের জমাত অনুষ্ঠানে মুছল্লীদের সমাগমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্র-পশ্চাৎ করা সুন্নত (৩৪৪ হাদীছ)। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সতর্কতামূলকভাবে নামায অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পড়িবে (৩৬৯ হাদীছ)। যাহাতে অজ্ঞাতে নামাযের ওয়াক্ত ছুটিয়া না যায়।

আজানের বিবরণ

মোসলমানদের মধ্যে আজানের প্রচলন

আজানের আলোচনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। যথা, আল্লাহ বলেন—

إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا......

"(হে মোসলমানগণ। দেখ—কাফেররা তোমাদের কত বড় ঘোর শত্রু ;) যখন তোমরা নামাযের প্রতি আহ্বান জানাও (অর্থাৎ আজান দাও) তখন তাহারা উহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসা করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা জ্ঞানশূন্য সম্প্রদায়। (নতুবা স্বীয় পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, জীবনদাতা আল্লার দিকে আহ্বানকে লইয়া কখনও এরূপ করিত না।) (৬ পারা ১৩ রুকু)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ

"জুমার দিন যখন তোমাদিগকে জুমার নামাযের জন্য ডাকা (অর্থাৎ আজান দেওয়া) হয় তখন তোমরা সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া আল্লার জেক্‌র অর্থাৎ নামাযের দিকে ধাবিত হও।" (২৮ পারা ছুরা জুমা)

৩৭১। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—মদীনায় মোসলমানদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে নামাযের সময় জ্ঞাত করার আলোচনা হইল; তখন ছাহাবীগণ উচ্চস্থানে অগ্নি জ্বালাইবার বা "নাকুস"✽ বাজাইবার প্রস্তাব করিলেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, এই সব ত ইহুদ-নাছারাদের প্রথা। তাই এই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। তারপর (আজান একামতের প্রথা সাব্যস্ত হইলে) রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে

✽ স্কুল, কলেজে কাঁশার তৈরী গোল আকারের ঘণ্টা হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া বাজান হয়। প্রাচীনকালে লম্বা আকারের কাঠ দ্বারা ঘণ্টা তৈরী হইত। ছোট আর একটি কাঠ দ্বারা পিটাইলে তাহাতে শব্দ হইত উহাই "নাকুস"; নাছারারা গির্জায় উহা ব্যবহার করিত।

আদেশ করিলেন—আজানের বাক্যগুলি দুই দুই বারে এবং একামতের বাক্যগুলি এক এক বার বলিবার জন্য। কিন্তু ক্বাদকামাতিছ্ছালাহ বাক্যটি একামতের মধ্যে দুই বারেই বলিবে।

ব্যাখ্যাঃ—হানফী মজহাব মতে একামতের বাক্যগুলি সংখ্যায় আজানের সমানই থাকিবে, তদুপতি "ক্বাদকামাতিছ্ছালাহ বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু যে সব বাক্য দুই দুই বার রহিয়াছে আজানের মধ্যে উহার প্রত্যেকবার পৃথক পৃথক শ্বাসে বলিতে হইবে এবং একামতের মধ্যে উহার দুই দুই বারকে মিলাইয়া এক সঙ্গে বলিতে হইবে। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম পদ্ধতিকে "তারাচ্ছোল" বলা হয় যাহা আজানের মধ্যে সুন্নত। এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে "হদর" বলা হয় যাহা একামতের মধ্যে সুন্নত।

৩৭২। **হাদীছ**ঃ— ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ (মক্কায় থাকাকালে প্রকাশ্যে ও জমাতে নামায পড়ার কোনরূপ ব্যবস্থাই করিতে পারিত না।) মদীনায় আসার পর তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে জমাতের সহিত মসজিদে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন নামাযের প্রতি আহ্বান জানাইবার কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ আন্দাজ মত মসজিদে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে সকলে একত্রিত হইলে পর কোন্ সময় নামায আরম্ভ করা হইবে তাহা পরামর্শ করিতেন; প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যই এরূপ করিতে হইত। একদা তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন যে, সর্বসাধারণকে নামাযের সময় জ্ঞাত করাইবার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, নতুবা ইহাতে সকলেরই অসুবিধা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিলেন, নাছারাদের ন্যায় নাকুস বাজান হউক; কাহারও মত হইল, ইহুদীদের ন্যায় শিঙ্গা বাজান হউক। ওমর (রাঃ) এই পরামর্শ দিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হউক, সে নামাযের সময় হইলে লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান করিবে। এই পরামর্শই সাময়িকভাবে গৃহীত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বেলাল (রাঃ)কে এই কার্য্যের আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—নামাযের সময় সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার কোনও নির্দিষ্ট পন্থা বা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে তখনও গৃহীত হইয়াছিল না; ঠিক এমনই সময়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আজান ও একামতের প্রতি একটি আশাতীত ইঙ্গিত আসিল, যাহার বিস্তারিত বিবরণ আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ছাহাবী বর্ণনা করেন—যখন নামাযের প্রতি লোকদিগকে একত্রিত করার জন্য কোন পন্থা অবলম্বনের আলোচনা হইতেছিল এবং এই প্রস্তাবও উপাপিত হইয়াছিল যে, একটি নাকুস তৈরী করা হউক, উহা বাজাইয়া লোকদিগকে সমবেত করা হইবে। তখনকার এক রাত্রের ঘটনা এই যে, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম—এক ব্যক্তি আমার নিকট ঘুরাফেরা করিতেছে, তাহার হাতে একটি নাকুস আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার বন্দা! তুমি কি এই

নাকুসটি বিক্রি করিবে? সে আমাকে প্রশ্ন করিল, আপনি ইহা দ্বারা কি করিবেন? আমি বলিলাম, ইহা বাজাইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান জানাইব। সে বলিল, এই কাজের জন্য আমি নাকুস বাজানো অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম—হাঁ, নিশ্চয়। সে বলিল, আপনি উচ্চৈস্বরে বলিবেন—

الله اكبر .. وكذا الى آخره আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এইরূপে আমাকে আজানের সমস্ত বাক্যগুলি পূর্ণরূপে শুনাইল এবং তারপর একামতও তদ্রূপই শিক্ষা দিল। সকাল বেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আমার স্বপ্নের ঘটনা পূর্ণ ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইন্‌শা-আল্লাহ ইহা নিশ্চয়ই খাঁটি সত্য স্বপ্ন; তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই বাক্যগুলি শিক্ষা দাও, সে এইরূপে আজান দিবে। কারণ, বেলালের স্বর তোমার চেয়ে উচ্চ। তখন আমি তাহাই করিলাম; বেলাল আজান দিতে লাগিল। এদিকে ওমর (রাঃ) তাঁহার বাসস্থান হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, অবিকল এই স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আল্লার শোক্‌রিয়া আদায় করিলেন (যে, আল্লাহ তায়ালা অতি সহজে একটি জরুরী বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সুন্দর ব্যবস্থা শিক্ষাদান করিয়াছেন।)

আজানের ফজিলত

৩৭৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন নামাযের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে দৌড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়, যেন আজানের আওয়াজ তাহার কানে প্রবেশ না করে। আজান শেষ হইলে লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখনও ঐরূপে দৌড়িয়া পালায়। একামত শেষ হইলে পুনরায় আসিয়া নামাযরত ব্যক্তিদের মনে নানা অছওয়াছাহ সৃষ্টি করে। তাহাদের দেলে এদিক-সেদিক হইতে নানা কথা টানিয়া আনিতে থাকে—যে সমস্ত কথা তাহাদের স্মরণেও ছিল না। এইরূপে শয়তান নামাযী ব্যক্তিকে নানা কথায় ফেলিয়া তাহার নামায ভুলাইয়া ফেলে। এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহাও স্মরণ থাকে না।

উচ্চৈঃস্বরে আজান দেওয়া উচিত

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মোয়াজ্জেনদিগকে বলিতেন, সাদাসিধা আজান দিবে, নতুবা এই পদ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে; কিন্তু আজান হইবে অতি সাদা ভাবের, উহাতে কোন প্রকার কৃত্রিম সুন্দর স্বর বানাইবার প্রয়োজন নাই।

৩৭৪। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) একজন লোককে বলিলেন, তোমাকে দেখি—তুমি বন-জঙ্গলে বকরি চরাইয়া বেড়াইতে ভালবাস। যখন তুমি এ অবস্থায় বন-জঙ্গলে থাক এবং আজান দেও (যদিও লোকালয় হইতে বহু দূরে, তবুও) তখন সাধ্যানুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে। কেননা, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি, মোয়াজ্জেনের সামান্য আওয়াজও যে কোন মানুষ, জ্বিন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা তরুলতা ইত্যাদি শুনিবে, সকলেই কেয়ামতের ভীষণ দিনে আজানদাতার পক্ষে (আজানের বাক্যাবলীর কর্ম অনুযায়ী ঈমানদার হওয়ার) সাক্ষ্য দান করিবে।

বস্তী হইতে আজান শুনা গেলে তথায় আক্রমণ করিবে না

৩৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী (দঃ) যখন আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোন বস্তীর দিকে জেহাদ করিতে যাইতেন, ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত উহার উপর আক্রমণ চালাইতেন না। ভোর হইলে লক্ষ্য করিতেন—যদি ঐ বস্তী হইতে আজানের শব্দ শুনিতে পাইতেন তবে আর আক্রমণ করিতেন না। যদি আজানের শব্দ না পাইতেন তবে আক্রমণ চালাইতেন। যেমন, আমরা খয়বরের জেহাদের জন্য রওয়ানা হইলাম; রাত্রিকালে উহার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলাম; ভোরে যখন সেখান হইতে আজানের শব্দ শুনা গেল না, তখন আক্রমণ চালাইবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) যানবাহনে আরোহণ করিলেন। আমি আমার মাতার স্বামী আবু তালহা ছাহাবীর সঙ্গে একই বাহনে আরোহণ করিলাম। আমরা খয়বর নগরীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। নগরবাসীরা প্রভাতে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি লইয়া বাহির হইল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"মোহাম্মদ ও তাঁহার সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে।" রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দেখা মাত্রই না'রায়ে তকবীর ও "খয়বর ধ্বংস হউক" ধ্বনি দিলেন এবং কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

"আমরা—মোসলমানগণ কোন বস্তী আক্রমণে উপস্থিত হইলে ঐ বস্তিবাসীর পরাজয় অনিবার্য্য।"

আজানের শব্দ শুনিয়া কি বলিবে

৩৭৬। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—আজানের শব্দ যখন তোমরা শুনিতে পাও তখন মোয়াজ্জেনের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ কর।

৩৭৭। হাদীছ ঃ— একজন ছাহাবী আজানের "হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ" শুনিয়া "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিলেন।

আজান শুনিয়া কি দোয়া পড়িবে?

৩৭৮। **হাদীছ :**—জাবের (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দ:) বলিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ) وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ (اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ) +

যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে, সে কেয়ামতে আমার শাফায়া'তের অধিকারী হইবে।

আজান দেওয়ার ফজিলত

৩৭৯। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ যদি জানিত আজান দেওয়ার মাহাত্ম্য ও ফজিলত কি তবে লটারি করিয়া হইলেও আজান দেওয়ার সুযোগ সন্ধানী হইত। জোহরের নামায জমাতে পড়ার ফজিলত জানিতে পারিলে উহার প্রতি ছুটিয়া আসিত এবং এশা ও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসিবার মর্তবা জানিতে পারিলে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই সময় মসজিদে উপস্থিত হইত।

ছাহাবীদের যুগে একবার ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, আজান দেওয়ার প্রার্থী অনেক হইল। এমনকি, উপস্থিত ছাহাবী সায়াদ (রা:) তাঁহাদের মধ্যে লটারি করিতে বাধ্য হইলেন।

আজানের মধ্যে কথা বলা

বোখারী (র:) উল্লেখ করিয়াছেন, সোলয়মান ইবনে ছোরাদ তাবেয়ী (র:) একদা আজানের মধ্যে কথা বলিয়াছেন। (হয় ত বিশেষ প্রয়োজনে সামান্য কথা হইবে।)

হাসান বছরী (র:) বলিয়াছেন, হাসিলে আজান বা একামত ভঙ্গ হইবে না।

মছআলাহ :— আজান বা একামতের মধ্যে সামান্য কথা বলাও মকরূহ. এমনকি যদিও উহা উত্তম কথা হয়। যেমন, সালাম করা বা আলহামদু-লিল্লাহ ইত্যাদি। আর

+ এই দোয়ার বন্ধনীর মধ্যবর্তী শব্দগুলি বোখারী শরীফ ভিন্ন অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে. দোয়াটির অর্থ এই :—হে খোদা! এই চরমোৎকর্ষ পরিপূর্ণ আহ্বানের ও তৎপরবর্তী নামাযের মালিক—তুমি (আমাদের প্রিয় নবী) মোহাম্মদ (দ:)কে বেহেশতের ঐ বিশিষ্ট স্থানটি দান কর যাহা একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী হইয়াছে এবং তাঁহাকে শীর্ষস্থানের অধিকারী কর এবং ঐ মর্য্যাদাপূর্ণ পদ দান কর, যেই পদের অধিকারী সমস্ত মখলুকাতের প্রশংসাভাজন হইবে, এ বিষয়ে তুমি নিজেই অঙ্গীকারাবদ্ধ। তুমি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

কথার পরিমাণ বেশী হইলে আজান ও একামত ফাছেদ হইয়া যায়! ঐরূপ আজান বা একামত দোহরাইতে হইবে (ফয়জুল-বারী ২—১৬৯)।

কেহ সময় বলিয়া দিলে অন্ধ ব্যক্তি আজান দিতে পারে

৩৮০। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন—বেলাল শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের নামাযের আজান দিয়া থাকে, তাই রোযার সময় বেলালের আজান শুনিয়া পানাহার বন্ধ করিও না, যাবৎ ইবনে-উম্মে-মাকতুমের আজান না হয়। ইবনে-উম্মে-মাকতুম একজন অন্ধ ছাহাবী ছিলেন, তিনি ফজরের আজান দিয়া থাকিতেন। কোন ব্যক্তি যখন তাঁহাকে খবর দিত, ভোর হইয়াছে তখন তিনি আজান দিতেন।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদে ফজরের পূর্বে রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের আজান দেওয়া হইত; এই উদ্দেশ্যে যে, যাঁহারা এখনও শুইয়া আছেন তাঁহারা সত্বর উঠিয়া কিছু তাহাজ্জুদ পড়িয়া লউন, ভোর হইতেছে। তাহাজ্জুদের এই আজান সাধারণতঃ বেলাল (রাঃ) দিয়া থাকিতেন। রোযার সময় ছেহ্‌রী খাইতে তাহাজ্জুদের আজান দ্বারা যেন বিভ্রান্তি না হয়, সেই জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা আর একটি মছআলাহ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফজরের আজান ছোবহে-সাদেকের পূর্বে দেওয়া যায় না। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ছোবহে-সাদেকের পূর্বের আজান তাহাজ্জুদের আজান হইয়া থাকে। ঐ আজান ফজরের জন্য যথেষ্ট নহে, ফজরের জন্য পুনরায় ছোবহে-সাদেকের পর আজান দিতে হইবে।

আজান ও একামতের ব্যবধানের পরিমাণ

আজান ও একামতের মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হওয়া চাই সে সম্পর্কে শরীয়তে পূর্ব নির্দ্ধারিত কোন পরিমাণের বাধ্যবাধকতা নাই। বোখারী (রঃ)ও কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করেন নাই। আজান ও একামতের মধ্যে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত ৩৮২ নং হাদীছটি বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান হওয়া চাই।

তিরমিজী শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, নবী (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে আদেশ করিয়াছিলেন—আজান ও একামতের মধ্যবর্তী এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিও যাহাতে পানাহারে লিপ্ত ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং মলমূত্র ত্যাগকারী তাহার প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া নামাযের জামাতে শামিল হইতে পারে।

অবশ্য মগরেবের আজান ও একামতের বিষয়টি উল্লিখিত হাদীছের মর্ম হইতে ভিন্ন। কারণ, আনাছ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ যাহা ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছেন, হাদীছটির অনুবাদ "অন্যান্য সুন্নত নামায" পরিচ্ছেদে হইবে, উক্ত হাদীছে উল্লেখ আছে, "মাগরেবের নামাযের আজান ও একামতের মধ্যে অতি সামান্য ব্যবধান হইত।"

উক্ত হাদীছে যে উল্লেখ আছে—"কিছু সংখ্যক ছাহাবী মগরেব নামাযের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়িতেন" সে সম্পর্কে বলা হয়, আজান আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাঁহারা উহা আরম্ভ করিতেন। (ফতহুল-বারী, ২—৮৫)

এ সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রের বিবরণ এইরূপ—আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান না রাখিয়া লাগালাগি আদায় করা সর্বসম্মতরূপে মকরূহ। উভয়ের মধ্যে এই পরিমাণ ব্যবধান বাঞ্ছনীয় যাহাতে সর্বদার মোক্তাদীগণ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু মগরেবের নামাযে আজান ও একামতের মধ্যে শুধু এতটুকু ব্যবধান রাখিবে যাহাতে কোরআন শরীফের ছোট ছোট তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়। (শামী, ১—৩৬২)

আজানের পর ঘরে থাকিয়া একামতের অপেক্ষা করা যায়

৩৮১। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—ফজর নামাযের ওয়াক্তে মোয়াজ্জেন আজান দিয়া ক্ষান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতেন এবং ছোবহে-সাদেকের পরে ফজরের পূর্বেকার সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন। তারপর মোয়াজ্জেন কর্তৃক একামতের জন্য তাঁহার নিকট না আসা পর্যন্ত তিনি ডান কাতের উপর আরাম করিয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত (দঃ) ফজরের আজানের পর পরই দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া নিতেন, অতঃপর ডান কাতে শুইতেন, কিন্তু এই শোয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত অভ্যাস ছিল না। "ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্তা বলা বা আরাম করা" পরিচ্ছেদের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) ফজরের সুন্নত পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন, আমি জাগ্রত না থাকিলে ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই শয়ন মসজিদের মধ্যে কখনও হয় নাই।

প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যে নফল পড়া ভাল

যে সমস্ত নামাযে ফরজের পূর্বে সুন্নত-মোয়াক্কাদা আছে—যেমন ফজর, জোহর ও জুমা এই ক্ষেত্রে ত আজান ও একামতের মধ্যে নামায নির্দ্ধারিত আছে। এতদ্ভিন্ন যে ওয়াক্তের পূর্বে কোন সুন্নত-মোয়াক্কাদা নাই; যেমন আছর ও এশা এই নামাযেও

ফরজের পূর্বে কিছু নফল নামায পড়া ভাল। মগরেবের ওয়াক্তে এই হুকুম পালনে কয়েকটি বাধাবিঘ্ন আছে বলিয়া ইমামগণের একটু মতভেদ আছে, ইহার বিবরণ "অন্যান্য সুন্নত নামায" পরিচ্ছেদে আসিবে।

৩৮২। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যবর্তী কিছু নামায পড়া উচিত। এই কথাটি পুনঃ পুনঃ তিনবার বলিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, ইহা ইচ্ছাধীন। (অর্থাৎ সুন্নত-মোয়াক্কাদা নয়, কিন্তু পড়া ভাল।)

ছফরেও আজান দিয়া জামাতে নামায পড়া উচিত

৩৮৩। **হাদীছ ঃ**—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক গোত্রের কতিপয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম, তথায় আমরা বিশ দিন কাটাইলাম। নবী (দঃ) বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা পরিবার-পরিজনের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি; তখন তিনি নিজেই বলিলেন, তোমরা বাড়ী ফিরিয়া যাও। সেখানে লোক-দিগকে দ্বীন শিক্ষা দিও, নামাযের পাবন্দি করিও এবং আমাকে যেরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছ সেইভাবে নামায পড়িও। সর্বাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইলেই একজনে আজান দিও এবং সর্বাধিক উপযুক্ত বা বয়স্ক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইয়া নামায আদায় করিও।

৩৮৪। **হাদীছ ঃ**— মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা সফরে বাহির হইলে পর যখন নামাযের ওয়াক্ত হইবে তখন যে কোন একজন আজান ও একামত বলিবে এবং যে বেশী উপযুক্ত বা বেশী বয়স্ক তাহাকে ইমাম বানাইয়া জমাতে নামায আদায় করিবে।

৩৮৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) একদা তুফান ও ভয়ঙ্কর শীতের রাত্রে নামাযের আজান দিলেন; আজান শেষে ইহাও বলিলেন যে, সকলে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়ুন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর অবস্থায় ভীষণ শীত বা বৃষ্টিপাতের রাত্রেও মোয়াজ্জেনকে আদেশ করিতেন, আজান দিতে এবং (সকলে একত্র হওয়া কষ্টকর, তাই) আজানের পর ইহাও বলিতে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়িয়া নেও।

ব্যাখ্যা ঃ—আজানের মধ্যে "হাইয়্যা-আলাছ্ছালাহ"—নামাযের প্রতি আস; "হাইয়্যা-আলালফালাহ"—(দ্বীন-দুনিয়ার) মঙ্গল ও কল্যাণের (তথা) নামাযের প্রতি আস; বিশেষ আদেশ রহিয়াছে। এই আদেশ মোয়াজ্জেনের মুখ হইতে নিসৃত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বিঘোষিত। আল্লার বান্দাগণ এই আহ্বান ও আদেশ

শুনিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ছাহাবীদের যামানার মোসলমানদের অবস্থা এইরূপই ছিল। উহার পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ শীত ও বৃষ্টিপাতের রাত্রে উক্ত আদেশ ও আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) জনগণের অধিক কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লার আদেশ ও আহ্বানের ঘোষণাকারী ঐ মোয়াজ্জেনের মুখে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়িয়া নেও।

আজান দিবার সময় মুখ উভয় দিকে ঘুরাইবে

বেলাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আজান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল দিতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ করিতেন না।

তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলেন, আজান অজু অবস্থায় দেওয়া সুন্নত ও আবশ্যক। তাবেয়ী ইব্রাহীম (রঃ) বলেন, বিনা অজুতে আজান দিলে ঐ আজান পুনঃ দিতে হইবে না; হাদীছে প্রমাণিত আছে, আল্লার জেকর সর্বাবস্থাই করা যায়, অজুহীন অবস্থায়ও করা যায়।

৩৮৬। হাদীছঃ— (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লমের মোয়াজ্জেন—) বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আজান দিবার সময় মুখ এদিক ওদিক করিতে দেখা যাইত।

নামাযে শরীক হইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না

৩৮৭। হাদীছঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতেছিলাম; নামাযরত অবস্থায় তিনি কিছু লোকের ছুটাছুটির শব্দ অনুভব করিলেন। নামাযান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? তাহারা আরজ করিল, আমরা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ কখনও করিও না। শান্তি, শৃঙ্খলা ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসিবে, তাহাতে যে কয় রাকাত ইমামের সঙ্গে পাওয়া যায় পড়িয়া লইবে, আর যাহা ছুটিয়া যায় উহা ইমামের নামাযের পরে পুরা করিয়া লইবে।

৩৮৮। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একামত শুনিয়া ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না; শান্তি শৃঙ্খলা ও গাম্ভীর্যের সহিত নামাযে আসিবে। (ইমামের সঙ্গে নামায) যতটুকু পাইবে পড়িবে, আর যাহা ছুটিয়া গিয়াছে উহা পরে পূরণ করিবে। (অবশ্য একামতের পূর্বেই জমাত স্থলে উপস্থিত থাকা চাই।)

মছআলাহঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, এইরূপ বলা মকরূহ যে—"আমার নামায ছুটিয়া গিয়াছে" বরং এইরূপ বলিবে "আমি নামায ধরিতে পারি নাই।"

ব্যাখ্যাঃ—উক্ত মছআলার উদ্দেশ্য বাক্য আওড়ানো নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ এই যে, নামাযের প্রতি প্রত্যেক মোসলমানের সর্বদা তৎপর ও সচেষ্ট থাকা চাই, মুহূর্তের জন্যও নামাযের প্রতি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসা চাই না। "ছুটিয়া গিয়াছে" বাক্যের

মধ্যে এইভাব প্রকাশ পায় যে, পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য না রাখায় বা অসাবধানতায় নামায হাত ছাড়া হইয়াছে। নামাযের প্রতি এইভাব বড়ই জঘণ্য। "ধরিতে পারি নাই" বাক্যে প্রকাশ পায় যে, সচেষ্ট থাকা সত্বেও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কোন মোসলমানের কোন নামায কাজা হইলে তাহা এই পর্য্যায়েরই হইতে পারে ; প্রথম পর্য্যায়ের কখনও হওয়া চাই না।

আলোচ্য মছআলার উদ্দেশ্য দ্বিতীয়তঃ এই যে, নামাযের প্রতি কার্য্যতঃ শৈথিল্য ও অবহেলা ত হওয়াই চাই না, কথায়ও ঐরূপ ভাব থাকা চাই না। কোন নামায কাজা হইলে উহার উক্তিও এমন বাক্যে করিবে যাহাতে নামাযের প্রতি শৈথিল্য ও অবহেলা-ভাবের আঁচও না থাকে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য মছআলাহটি উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন, কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ভাব প্রকাশ পাইতে পারে এরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণভাবে ঐরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন আলোচ্য পরিচ্ছেদে জমাতের সহিত রাকাত ছুটিয়া যাওয়ার মছআলাহ বর্ণনা করা ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে।

মোক্তাদি নামায আরম্ভের জন্য কোন্ সময় দাঁড়াইবে?

৩৮৯। হাদীছ :— আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন, একামত বলা হইলেও যাবৎ আমাকে হুজরাখানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে না দেখ তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিও না, শান্তভাবে অপেক্ষা করিতে থাক।

মছআলাহ :— ইমাম যদি একামতের পূর্বে মসজিদের বাহিরে থাকেন এবং নামায আরম্ভের সময় হইলে মসজিদে প্রবেশ করেন তবে ইমাম মসজিদে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইয়া যাইবে। আর যদি ইমাম প্রথম হইতেই নিজ মোছাল্লায় বিদ্যমান থাকেন তবে ইমাম দাঁড়াইবার সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইবে। ইহা উত্তম নিয়ম বটে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম করিলে গোনাহ হইবে না (ফয়জুলবারী ২—১৭৮)। অবশ্য ইমাম নামায আরম্ভ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণের নামায আরম্ভ করিতে হইবে এবং নামাযের কাতার ইহার পূর্বেই পূর্ণ ও সোজা করিতে হইবে, অতএব এই সব কাজের পরিমাণ সময় লইয়াই মোক্তাদীগণকে দাঁড়াইতে হইবে। স্মরণ রাখিবে—ইমাম নামায আরম্ভ করিলে তথায় কোন প্রকার শব্দ করা নাজায়েয, অথচ কাতার পূর্ণ ও সোজা করিতে পরস্পর কথা বলা স্বাভাবিক।

মছআলাহ :— ইমাম যদি মোক্তাদীগণকে তাঁহার অপেক্ষা করার জন্য বলেন তবে মোক্তাদীগণ অপেক্ষা করিবে (৮৯ পৃঃ ১৯৩ হাঃ)। অর্থাৎ ইমামের এতটুকু মর্যাদা ও প্রাধান্য থাকা চাই ; এরূপ ক্ষেত্রে ইমামের প্রতি কটাক্ষ বা বিরূপ ভাব প্রকাশ করা চাই না।

মছআলাহ:— মসজিদে আসিয়া বিশেষ প্রয়োজনে নামাযের পূর্বে মসজিদ হইতে বাহিরে যাওয়া জায়েয আছে (৮৯ পৃঃ ১৯৩ হাঃ)।

একামত হওয়ার পর ইমাম দরকারী কাজ করিতে ও দরকারী কথা বলিতে পারেন

৩৯০। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এশার নামাযের একামত বলা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে আসিতেছিলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল; তিনি তাহার সহিত মসজিদের এক কিনারায় জরুরী আলাপে মশগুল হইলেন। নামায আরম্ভে এত বিলম্ব হইল যে, মোক্তাদীগণের তন্দ্রা আসিয়া গেল।

মছআলাহ:— একামতের পরে নামায আরম্ভ করিতে বিলম্ব যদি সামান্য হয় তবে একামত পুনঃ বলিতে হইবে না। আর যদি বিলম্ব বেশী হয় তবে নামায আরম্ভের পূর্বে পুনঃ একামত বলিতে হইবে (ফয়জুলবারী ২—১৮৯)।

জমাতের সহিত নামায পড়া ওয়াজেব

হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহারও মাতা আদর করিয়া তাহাকে এশার জমাতে আসিতে নিষেধ করিলে ঐ নিষেধ তাহার অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

৩৯১। হাদীছ:— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আজানের পর কাহাকেও ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিবার আদেশ দেই এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করি যাহারা নামাযের জমাতে শরীক হয় নাই এবং কাহারও দ্বারা জ্বালানি কাঠ আনাইয়া ঐ ব্যক্তিগণ ঘরে থাকাবস্থায় তাহাদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, খোদার কসম—বহুলোক এমনও আছে যে, সামান্য কিছু শীরনী পাওয়ার আশা থাকিলে তাহারা রাত্রিকালে এশার সময়ও মসজিদে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। (কিন্তু জমাতের প্রতি ততটুকু আকৃষ্টও হয় না)।

জমাতের সহিত নামাযের ফজিলত

আছওয়াদ (রঃ) নামক তাবেয়ী এক মসজিদে জমাত না পাইলে অন্য মসজিদে যাইয়া জমাত পাইবার চেষ্টা করিতেন।

আনাছ (রাঃ) একদা এক মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে (তাঁহার সঙ্গে একদল লোক ছিল) তিনি আজান দিয়া, একামত বলিয়া জমাতে নামায আদায় করিলেন।

মছআলাহ:— যে মসজিদ কোন বস্তিতে অবস্থিত নহে—যেমন, বস্তি হইতে পৃথক কোন পথের ধারে অবস্থিত মসজিদ কিম্বা সাপ্তাহিক হাট বা সাময়িক বাজারে অবস্থিত মসজিদ—যাহার সংলগ্নে মুছল্লীগণ বসবাসকারী বা অবস্থানকারী হয় না, বরং যাতায়াত

পথে বা সমাবেশ সময়ে লোকেরা পর পর আসিতে থাকে এবং নামায পড়িতে থাকে। এইরূপ মসজিদে যখনই একদল লোক নামাযের জন্য উপস্থিত হইবে তাহাদের পক্ষে আজান ও একামতের সহিত জমাতে নামায পড়া উত্তম হইবে (শামী, ১—৫১৬)।

৩৯২। হাদীছ :— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাইশ গুণ বেশী ছওয়াব রাখে।

৩৯৩। হাদীছ :— عن ابى صالح سمعت ابا هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلَاتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسَةً وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘরে বা দোকানে নামায পড়া হইতে (মসজিদের) জমাতে নামায পড়া (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াবের পাত্র। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে চলিতে থাকে তখন তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক একটি গোনাহ মাফ হইয়া যায় এবং এক একটি মর্তবা বাড়ান হয়। তারপর সে যখন নামায পড়ে, (এমনকি নামাযান্তে যাবৎ নামায স্থানে বসিয়া থাকে,) ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন—"হে খোদা! তাহার গোনাহ মাফ কর, হে খোদা! তাহার উপর রহমত নাযেল কর" এবং সেই ব্যক্তি নামাযের জন্য যত সময় অপেক্ষায় থাকে—একমাত্র নামাযই তাহাকে বাড়ী চলিয়া আসা হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে; তাহার জন্য ঐ সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৩৯৪। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামাযের ছওয়াব একাকী নামায অপেক্ষা (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী।

৩৯৫। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জমাতের নামাযে একাকী নামাযের তুলনায় (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, জাগতিক কার্য্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা একদল ফেরেশতা দিনের বেলা ও অন্য একদল রাত্রি বেলা পাঠাইয়া থাকেন। উভয় দলই ফজরের সময় ভূ-পৃষ্ঠে একত্রিত হইয়া থাকেন।

কোরআন শরীফে আছে— ان قران الفجر كان مشهودا "ফজর নামাযের সময় ফেরেশতাগণ (উভয় দল ভূপৃষ্ঠে) একত্র হইয়া থাকেন।" (অতএব ফজরের নামায জমাতে পড়ায় বিশেষভাবে তৎপর হওয়া চাই)।

৩৯৬। হাদীছ :— عن ابى موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم
اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ -

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে যত বেশী দূর হইতে মসজিদে আসিবে, সে তত বেশী ছওয়াবের অধিকারী হইবে। মসজিদে আসিয়া যে ব্যক্তি ইমামের সহিত নামায পড়ার অপেক্ষায় থাকে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের অধিকারী যে (মসজিদে) একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী যাইয়া শুইয়া থাকে।

প্রখর রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৩৯৭। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—একদা এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। সে দেখিল, কাঁটাযুক্ত গাছের একটি ডাল রাস্তার উপর পড়িয়া আছে, সে উহা অপসারিত করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিফল দান করিলেন যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন—

اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ
وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

"শহীদ পাঁচ প্রকার। (১) প্লেগ—মহামারীতে মৃত। (২) কলেরা—উদরাময়ে মৃত। (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত। (৪) চাপা পড়িয়া মৃত। (৫) আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী নিহত।*

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, মানুষ যদি জানিত, আজান দেওয়ার ও জমাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ান কত ছওয়াব, তবে লটারি করিয়া হইলেও উহার সুযোগ হাসিল করিত। আরও যদি জানিত, প্রখর রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্য মসজিদে আসায় কি ছওয়াব, তবে নিশ্চয় উহার জন্য তৎপর হইত। আরও যদি জানিত, এশা ও ফজরের জন্য মসজিদে আসায় কি ছওয়াব, তবে সকলেই হামাগুড়ি দিয়া হইলেও মসজিদে আসিত।

মসজিদে আসিতে প্রতি পদে ছওয়াব লেখা হয়

অর্থাৎ—বাসস্থান মসজিদ হইতে দূরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হওয়া চাই, মসজিদের প্রতি যত বেশী পদক্ষেপ হইবে তত বেশী ছওয়াব লেখা হইবে।

৩৯৮। হাদীছ:— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনী-ছালেমা নামক গোত্রের বাসস্থান মদীনার শহরতলীতে ছিল। তাহারা সেখান হইতে উঠিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী বাসস্থান তৈরী করার ইচ্ছা করিল। নবী (দঃ) মদীনার শহরতলী জনশূন্য থাকা অপছন্দ করিলেন; তাই তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যে, শহরতলী হইতে আল্লার মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া থাক এই দুরত্ব অতিক্রম করার জন্য পদে পদে ছওয়াব লেখা হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য কর। (মসজিদের সংলগ্ন বসবাস করিলে এই পর্য্যায়ের ছওয়াব হারাইতে হইবে)। তখন তাহারা তাহাদের বস্তিতেই থাকিয়া গেল।

এশা ও ফজরের জমাতে হাজির হওয়ার তাকিদ

৩৯৯। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোনাফেকদের উপরই ফজর এবং এশা (নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়া) সর্বাপেক্ষা ভারী। (কারণ, ইহা অধিক কষ্ট সাপেক্ষ; আর ছওয়াবের উদ্দেশ্য ত তাহাদের নাই।) লোকেরা যদি ফজর ও এশার জমাতের ফজিলত জানিত তবে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযদ্বয়ের জমাতে হাজির হইত।

ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী হইলেই জমাত গণ্য হইবে

অর্থাৎ একজন ইমাম ও একজন মোক্তাদী—এই দুই জনের সমষ্টিই জমাত গণ্য হইবে এবং ইহাদের জমাতের অতিরিক্ত ছওয়াব হাসিল হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ৩৮৪ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই মর্মে একখানা স্পষ্ট হাদীছও বর্ণিত

---

* তৃতীয় খণ্ডে "জেহাদ ব্যতিরেকে শাহাদতের সওয়াব" পরিচ্ছেদে আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী ছাড়া ২১ প্রকার শহীদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

আছে। নবী (দঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি একা নামায আরম্ভ করিয়াছে। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, কেহ আছে যে এই ব্যক্তির উপকার করে, তথা তাহার সঙ্গে নামায পড়ে? সেমতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং ঐ লোকটির সহিত নামায পড়িল। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই দুই জনে জমাত হইয়াছে। (ফতহুল বারী ২—১১২)

মসজিদে নামায পড়া এবং নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বিলম্ব করা

৪০০। **হাদীছঃ**—عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লার (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে না তখন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দান করিবেন—(১) ন্যায় পরায়ণ শাসনকর্তা। (২) যে যুবক যৌবনের (ঢেউ-এর) মধ্যেও আল্লার বন্দেগী ও গোলামীতে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। (৩) ঐ ব্যক্তি যাহার মন মসজিদের সঙ্গে বা নামাযের ওয়াক্তের সঙ্গে লটকানো থাকে—তাহার মন ব্যস্ত থাকে যে, কখন নামাযের সময় উপস্থিত হইবে এবং সে মসজিদে যাইয়া নামায পড়িবে। (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছে একমাত্র আল্লার ভালবাসার দরুন, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে ভালবাসে বলিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যেও ভালবাসার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এমন খাঁটী ভালবাসা যে, সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সর্বদাই সেই ভালবাসা স্থায়ীভাবে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যাহাকে কোন একটি উচ্চবংশীয়া পরমা সুন্দরী যুবতী স্বয়ং আকৃষ্ট করিয়াছে ও ডাকিয়াছে, কিন্তু সে উত্তরে বলিয়াছে, আমি খোদাকে ভয় করি। (৬) ঐ ব্যক্তি যে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত গোপনভাবে করে—তাহার

ডান হাত যাহা করিয়াছে, বাম হাত উহা জানিতে পারে নাই। ঔ ব্যক্তি যে একাকী খোদাকে স্মরণ করে এবং (ভয় বা মহব্বতে) তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বহায়।

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য ৩৯৩ নং হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে।

সকালে-বিকালে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৪০১। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ - كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা বা বিকাল বেলা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রতি সকাল-বিকালের এই পরিশ্রমের প্রতিফলে বেহেশতের মধ্যে নিমন্ত্রণ-সামগ্রী তৈরী করিয়া রাখেন।

ফরজ নামাযের একামত হইলে সুন্নত বা নফল আরম্ভ করিবে না।

৪০২। **হাদীছ ঃ**—আবহুল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযের একামত হইলে এক ব্যক্তিকে ভিন্ন নামায পড়িতে দেখিলেন। (ঐ ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িতেছিল)। নামাযান্তে যখন সকলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী ঘিরিয়া বসিল তখন হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, ফজরের (ফরজ) নামায কি চারি রাকাত হয়?

অর্থাৎ একামতের পর ফরজ ভিন্ন অন্য নামায পড়া যায় না, তুমি ভিন্নভাবে দুই রাকাত ও জমাতে দুই রাকাত পড়িয়াছ; তুমি কি ফজরের ফরজ চার রাকাত পড়িলে?

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে, সে ভিন্নভাবে যে নামায পড়িয়াছে উহা ফজরের ফরজ নহে, কিন্তু ফরজ নামাযের একামত হইবার পর জমাতের সংলগ্ন স্থানে অন্য কোন প্রকার নফল বা সুন্নত নামায পড়া নিষিদ্ধ। ঐ ব্যক্তি এই মছআলার ব্যতিক্রম করিয়া একামতের পর জমাতের সংলগ্ন স্থানে সুন্নত আরম্ভ করায় ক্ষোভ প্রকাশ স্বরূপ রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার প্রতি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—ফজর ভিন্ন অন্য কোন নামাযের সুন্নত, এমনকি জোহরের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াক্কাদা আছে উহাও জমাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না। তদ্রূপ জুমার ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াক্কাদাও খোৎবার আজানের পূর্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না।

জমাতের সহিত ফরজ নামায আদায় করিয়া ঐ সুন্নত পড়িবে। কিন্তু ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত অতি উচ্চ পর্যায়ের সুন্নতে-মোয়াক্কাদা। কোন কোন ইমাম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। সেমতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) শুধু ফজরের সুন্নতের জন্য এতটুকু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, ফজরের জমাত আরম্ভ হওয়ার পরও যদি আশা করা যায় যে, সুন্নত পড়িয়া জমাতে শরীক হওয়া যাইবে তবে সুন্নত পড়িয়া লইবে। কিন্তু জমাতের সংলগ্ন স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে সুন্নত পড়িবে, নতুবা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষোভের পাত্র সাব্যস্ত হইবে। যদি দেখা যায় যে, সুন্নত পড়িলে জমাত শেষ হইয়া যাইবে তবে সুন্নত না পড়িয়া জমাতে শরীক হইবে এবং সূর্য্য উদয়ের পর ঐ সুন্নত পড়িবে।

কিরূপ অসুস্থ হওয়া সত্বেও জমাতে শামিল হওয়া উচিত

৪০৩। **হাদীছ ঃ**—বিশিষ্ট তাবেয়ী আছওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বসিয়া নামাযের গুরুত্ব ও উহার প্রতি তৎপরতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইবার পর একদিন যখন নামাযের সময় উপস্থিত হইল এবং আজান দেওয়া হইল তখন বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের খবর দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে জমাতে নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, তিনি (আবু বকর) অত্যন্ত কোমল হৃদয় মানুষ; যখনই তিনি আপনার স্থলে ইমামতির জায়গায় দাঁড়াইবেন, তখনই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়িবেন; মোক্তাদীদিগকে ছুরা-কেরাত কিছুই শুনাইতে পারিবেন না। যদি আপনি ওমর (রাঃ)কে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এ সমস্ত ওজর-আপত্তি না শুনিয়া পুনরায় ঐ আদেশই করিলেন যে, তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াইবার জন্য বল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হাফসাহ (রাঃ)কে* বলিলাম, আপনি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলুন যে, আবু বকর অতি নরম দেল মানুষ, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবেন; যদি ওমরকে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। হাফসাহ (রাঃ)ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ অনুরোধ জানাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় আদেশের বিপরীত পুনঃ পুনঃ ঐ উক্তি শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক পুনরায় ঐ কথাই বলিলেন, আবু বকরকে বল, জমাত পড়াইবার জন্য। (আবু বকর জমাত আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং কয়েক ওয়াক্ত নামায তাঁহার ইমামতিতে পড়া হইল।) অতঃপর একদা আবু বকরের ইমামতিতে নামায আরম্ভ হওয়ার পর হযরত (দঃ) একটু সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং

---

* উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা; হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন বিশিষ্টা পত্নী ছিলেন।

দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া জমাতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। (তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, পা উঠাইয়া চলার শক্তি ছিল না,) তাঁহার পা দুইটি মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে উপনীত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ইমামতী করা অবস্থায়ই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের আভাস পাইয়া ইমামের স্থান ছাড়িয়া পেছনের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন।× রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পূর্বাবস্থায় থাকিবার ইশারা করিলেন এবং তিনি আবু বকরের বাম পার্শ্বে আসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, আবু বকর তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া মোকাব্বের হইলেন, এইরূপে সকলে নামায আদায় করিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—এই হাদীছের আরও বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু শয্যায় যখন তাঁহার অসুস্থতা চরমে পৌঁছিয়া গেল, তখন একদা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত শেষ হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, এখনও জমাত হয় নাই। সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তখন তিনি বলিলেন, আমার জন্য টবের মধ্যে পানি রাখ। পানি রাখা হইলে তিনি একটু সুস্থিরতা হাসিলের আশায় গোসল করিলেন এবং জমাতে যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথায় চক্র আসিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি পুনরায় ঐরূপ গোসলের ব্যবস্থা করিলেন এবং গোসল করিয়া জমাতে যাওয়ার জন্য দাঁড়াইবা-মাত্র বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ তিন বার জমাতে যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেকবারেই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাই চতুর্থবার তিনি আবু বকরকে নামায পড়াইবার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

খাবার উপস্থিত, জমাতও আরম্ভ তখন কি করিবে?

এই বিষয়ে মোটামুটি মছআলাহ এই যে, যদি বিশেষ ক্ষুধা না থাকে এবং খাওয়ার প্রতি এরূপ আকর্ষণ না থাকে যাহাতে নামাযের অবস্থায় মন উহার প্রতি ধাবিত হয় তবে খাওয়ায় লিপ্ত না হইয়া জমাতে শরীক হইবে। নতুবা প্রথমে খাবার গ্রহণ করিবে তারপর একাগ্রচিত্তে নামায পড়িবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ অবস্থায় প্রথমে খাবার গ্রহণ করিতেন।

× আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আসিয়া ঐ নামাযের ইমাম হইলেন, আবু বকর মোক্তাদী হইয়া গেলেন। এরূপ করা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্যই খাছ ছিল।

আবু দরদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বলেন—মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, নামাযের পূর্বে তাহার সমস্ত প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া মনকে সমস্ত ধ্যান ও আকর্ষণ হইতে মুক্ত করতঃ একাগ্রচিত্তে নামাযে মগ্ন হয়।

৪০৪। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রিকালে খাবার উপস্থিত হয় এবং এদিকে নামাযের একামত বলা হয়, তখন প্রথমে খাবার গ্রহণ কর। (এই হাদীছের তাৎপর্য্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে)।

৪০৫। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন সময় রাত্রের আহার উপস্থিত করা হয় (এবং ক্ষুধার কারণে উহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়) তবে প্রথমে আহার গ্রহণ কর; যদিও (এরূপ ঘটনা) মগরেবের নামায পড়ার পূর্বে হয়। আহারের পূর্বে তাড়াহুড়া (করিয়া নামায আদায়) করিও না।

৪০৬। **হাদীছ**ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কাহারও রাত্রের আহার সম্মুখে রাখা হয় এবং ঐ সময় নামাযের জমাত আরম্ভ হয় তবে সে প্রথমে রাত্রের আহার গ্রহণ করিবে। আহার গ্রহণ না করিয়া নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করিবে না, যাবৎ না আহার গ্রহণ হইতে অবসর হয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাঁহার জন্য খানা উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ সময় নামাযের জমাতও দাঁড়াইয়াছে—এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আহার গ্রহণ হইতে অবসর না হইয়া জমাতে আসেন নাই, অথচ (নামাযের জমাত এত নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল যে,) তিনি ইমামের কেরাত-শব্দ শুনিতেছিলেন।

এখানে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীছও আছে যে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেহ খাওয়া আরম্ভ করিলে আবশ্যক পরিমাণ পূর্ণ না খাইয়া উঠিবে না, যদিও নামাযের জমাত আরম্ভ হয়।

সাংসারিক কাজের জন্য জমাত ছাড়িবে না

৪০৭। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ঘরের কাজ কর্মে লিপ্ত হইতেন, যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হইত, তখন তিনি সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—উল্লিখিত পরিচ্ছেদদ্বয়ের বিভিন্ন হাদীছসমূহের সমষ্টি দৃষ্টে মছআলাহ এই সাব্যস্ত হয় যে, মানবীয় প্রয়োজন কোন বিষয়ের তাকিদে মনের আকর্ষণ অন্য দিকে ধাবমান হইলে নামাযের পূর্বে সেই প্রয়োজন মিটাইয়া নেওয়া চাই; যদিও তাহাতে জমাত ছুটিয়া যায়। যেমন পেটে ক্ষুধা রহিয়াছে এবং খাদ্য উপস্থিত আছে। এমতাবস্থায় জমাত আরম্ভ হইয়া গেলেও প্রথমে ক্ষুধা নিবারণ করা চাই। পক্ষান্তরে যদি মনকে বিচলিতকারী ক্ষুধা না থাকে তবে উপস্থিত খাদ্য ছাড়িয়া জমাতের প্রতি ধাবিত হইবে।

এমনকি খাদ্য আরম্ভ করিলে উহা অসম্পূর্ণ ফেলিয়া চলিয়া যাইবে যেরূপ ১৫২ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মানবীয় প্রয়োজন ভিন্ন জাগতিক বা সাংসারিক কাজের জন্য জমাতের প্রতি মোটেই অবহেলা করিবে না। সব কিছু ছাড়িয়া জমাতের জন্য ছুটিয়া যাইবে, যেরূপ ৪০৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

বিশিষ্ট তাবেয়ী যুরারা ইবনে আবু আওফা (রঃ) তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। তিনি তাঁহার হাতুড়ী উঠাইয়া মারিবার পূর্বে আজান শুনিলে ঐ অবস্থায়ও হাতুড়ী ফেলিয়া নামাযে চলিয়া যাইতেন। (ফয়জুলবারী ২—২০৭)

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ক্ষুধার তাড়নায় জমাতের উপর আহার গ্রহণকে অগ্রগণ্য করার অনুমতি শুধু ক্ষুধার তীব্রতা নিবারণ পরিমাণের জন্য; পেট পুরিয়া খাওয়ার জন্য নহে। সুতরাং কয়েক গ্রাস গ্রহণের পর জমাত পাওয়ার অবকাশ থাকিলে সেই চেষ্টা অবশ্যই করিবে; সেই সুযোগ ছাড়িবে না।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই যে, ক্ষুধার তাড়নায় আহারের জন্য শুধু জমাত ছাড়া যায়, নামায কাজা করা জায়েয নহে। যদি নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ থাকে যে, আহারে লিপ্ত হইলে নামায কাজা হইয়া যাইবে; তবে প্রাণ বাঁচিয়া থাকার অবকাশে শত কঠোর ক্ষুধার কারণেও আহার করিতে নামায কাজা করা জায়েয নহে।

এল্‌ম ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হইবার জন্য অগ্রগণ্য

৪০৮। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহার অন্তিমকালের রোগ শয্যায় পতিত হইলেন এবং তাঁহার রোগের প্রকোপ বাড়িয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আবু বকর নরম-দিল মানুষ; তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া লোকদের নামায পড়াইতে সক্ষম হইবেন না। নবী (দঃ) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরোক্তি করিলেন। নবী (দঃ) ঐ কথাই বলিলেন—আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল, ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার নারীদের ন্যায় তোমরাও আমাকে প্রভাবিত করিতে চাহিতেছ। অতঃপর আবু বকরের নিকট সংবাদদাতা পৌঁছিল। তখন হইতে আবু বকর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায়ই নামায পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

৪০৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিম রোগ যখন বাড়িয়া গেল, তখন তাঁহাকে নামাযের জমাত সম্পর্কে বলা হইলে তিনি বলিলেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আবু বকর নরম দিলের মানুষ; তিনি (আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া) ক্রন্দনের দরুন কেরাতও পড়িতে পারিবেন না। হযরত (দঃ) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে

বল, নামায পড়াইতে। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন (এবং হাফছাহ (রাঃ)কেও তাঁহার সমর্থনকারিণী বানাইলেন)। হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, আবু বকরকে নামায পড়াইতে বল; তোমরা ত (হযরত) ইউসুফের ঘটনার নারীদের ন্যায় অর্থাৎ তাহারা যেরূপ ইউসুফ (আঃ)কে তাঁহার অভিরুচির বিপরীত জোলেখার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল, তদ্রূপ তোমরাও আমাকে আমার অভিরুচির বিপরীত কথা বলিতেছ।

মছআলাহ:—এল্‌ম, মর্যাদা ও কোরআন শরীফ পড়ার কতিপয় ব্যক্তি সমপর্যায়ের উপস্থিত; সে ক্ষেত্রে বয়সে যিনি বড় তিনিই ইমাম হওয়ার অগ্রগণ্য। (৯৪ পৃঃ ৩৮৩ হাঃ)

নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত না থাকায় অন্য ইমাম জমাত আরম্ভ করার পর প্রথম ইমাম আসিয়া পৌঁছিলে?

৪১০। **হাদীছ:**— ছাহল-ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমর-ইবনে আউফ গোত্রের একটি বিবাদ মিটাইবার জন্য তাহাদের বস্তিতে তশরীফ লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইল, এদিকে আছরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল, হযরতের মসজিদে ইমাম নাই। তখন মোয়াজ্জেন আবু বকর (রাঃ)কে অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আপনি জমাত পড়াইয়া দেন। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। জমাত আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তিনি পেছনের সারিসমূহ ভেদ করিয়া প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। (তিনি পেছনে থাকিলে তাঁহার সম্মুখের লোক বিচলিত হইত।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমন আবু বকর (রাঃ)কে অবগত করাইবার জন্য মোক্তাদীগণ হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিল। আবু বকর (রাঃ) নামাযে এত মগ্ন থাকিতেন যে, নামায অবস্থায় কোন কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না, কিন্তু এই ঘটনায় যখন অত্যধিক শব্দ হইতে লাগিল, তখন তিনি আড়-চোখে একটু লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পিছনের দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে এরূপ না করার প্রতি ইশারা করিলেন। আবু বকর (রাঃ) হযরতের এই আদেশে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লার শোকর করিলেন, কিন্তু ইমামতের স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীর সারিতে সরিয়া আসিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইমাম হইলেন; তাঁহারই ইমামতিতে নামায সমাপ্ত হইল। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আদেশ রক্ষা করিয়া ইমাম থাকিলেন না কেন? আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আবু কোহাফার পুত্র তথা (আবু বকরের) পক্ষে উচিত নহে, সে আল্লার রসুলের সম্মুখে ইমামতি করে।

এই উপলক্ষে হযরত (দঃ) মোক্তাদীদিগকে বলিলেন, তোমরা হাত মারিয়া শব্দ করিলে কেন? নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষগণ—سبحان الله (সোব্‌হানাল্লাহ্)

বলিবে—উহাতেই ইমামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে। অবশ্য মহিলাগণ এরূপ ক্ষেত্রে ডান হাত বাম হাতের পৃষ্ঠে মারিয়া শব্দ করিবে। (কারণ, মহিলাদের কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষকে শুনান চাই না।)

ব্যাখ্যা ঃ—এরূপ ঘটনার প্রকৃত মছআলাহ এই যে, যে ইমাম নামায আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই নামায সমাপ্ত করিবেন, নির্দ্ধারিত ইমাম মোক্তাদী হইয়া নামায পড়িবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপই করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবু বকর (রাঃ) যাহা করিয়াছিলেন উহা একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষত্ব ছিল ; অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ করা হইলে সকলের নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৪১১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার উপর হইতে পতিত হইয়া তাঁহার দেহের ডান পার্শ্ব ক্ষত হইয়া যায় এবং পা মচকিয়া যায়, তাই তিনি মসজিদে না যাইয়া স্বীয় অবস্থান গৃহেই নামায আদায় করিতেন। এমতাবস্থায় একদিন ছাহাবীগণ তাঁহার সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভ করিলেন, অসুস্থতার দরুন তিনি বসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। ছাহাবীগণ তাঁহার পেছনে নামাযে শরীক হইলেন, কিন্তু তাঁহারা দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের প্রতি ইশারা করিলেন যে, তোমরাও আমার অনুসরণে বসিয়া নামায পড় এবং নামাযান্তে বলিলেন, মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করিবে—এই উদ্দেশ্যেই ইমাম নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। যখন ইমাম রুকু করিবে তখন তোমরাও রুকু করিবে, যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইবে তখন তোমরাও মাথা উঠাইবে, যখন ইমাম বলিবে "ছামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ্" তখন তোমরা বলিবে "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" যখন ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িবে, তোমরাও বসিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইমামের অনুকরণ মোক্তাদীদের জন্য অপরিহার্য্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একটি বিষয়ে নয়, অর্থাৎ ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িলে মোক্তাদীগণ বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়িতে পারিবে না, তাহাদের দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হইবে যেরূপ ৪০৩নং হাদীছে আছে। অবশ্য ৪১১নং হাদীছখানা ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাই এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) ৪০৩নং হাদীছ খানা পুনরায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ হাদীছ খানাদ্বারা এই হাদীছ খানার হুকুম মনছুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে। কারণ, ৪১১নং হাদীছের ঘটনা বহু পূর্বের এবং ৪০৩নং হাদীছের ঘটনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ জীবনের। এই ঘটনাতে যখন আবু বকরের স্থলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, তখন তিনি অসুস্থতার দরুন বসিয়া নামায পড়িতেছিলেন ; আর মোক্তাদীগণ সকলেই হযরতের পেছনে নামাযে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরবর্তী হাদীছ পূর্বের হাদীছের বিপরীত হইলে পূর্ববর্তী হাদীছ মনছুখ (রহিত) পরিগণিত হয়।

মছআলাহ ঃ—মোক্তাদী রুকু-সেজদার মধ্যে ইমামের পূর্বে মাথা উঠাইয়া যদি দেখে যে, এখনও ইমাম মাথা উঠায় নাই তবে মোক্তাদী অবশ্যই পুনঃ রুকুতে ও সেজদায় চলিয়া যাইবে (৯৫ পৃঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ফতওয়া)।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি ইমামের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িতেছে, যেমন—ফজর নামায। ভিড়ের কারণে সে প্রথম রাকাতের সেজদা করার অবকাশ পায় নাই, এমনকি সম্মুখ কাতারের মুছল্লীদের পিঠের উপর সেজদা করারও সুযোগ পায় নাই এবং দ্বিতীয় রাকাতের সেজদাও ইমামের সহিত করিতে সুযোগ পায় নাই। ঐ ব্যক্তি যখনই সুযোগ পাইবে, এমনকি ইমামের সালাম ফেরার পরে হইলেও প্রথমে দুইটি সেজদা করিবে; ইহা তাহার দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা গণ্য হইয়া দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পূর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পূর্ণরূপে রুকু-সেজদা ইত্যাদির সহিত একা একা মাছবুকের ন্যায় আদায় করিবে।

মছআলাহ ঃ—ইমামের সহিত নামায পড়া অবস্থায় মধ্যভাগে (অজ্ঞাতে বা তন্দ্রা ইত্যাদি কোন কারণে) রুকু বা সেজদা পূর্ণই ইমামের সহিত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করিয়া তারপর ইমামের সহিত পুনঃ দাঁড়াইবে। (৯৫ পৃঃ হাসান বছরী (রঃ) তাবেয়ীর ফতওয়া)

সাবধান! নামাযের মধ্যভাগে নয়, বরং নামায আরম্ভ করার সময় ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে তখন অনেকে নিজে নিজে রুকু করিয়া ইমামের সহিত সেজদায় মিলিত হয় এবং মনে করে, সে ঐ রাকাত ইমামের সহিত পাইয়াছে—ইহা ভুল। ঐ রাকাত ইমামের সহিত গণ্য নহে, সুতরাং ইমামের ছালামের পর ঐ রাকাত পূর্ণ আদায় না করিলে নামায হইবে না।

মোক্তাদীগণ কোন্ সময় সেজদার জন্য নত হইবে?

৪১২। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে দাঁড়াইবার পর যাবৎ তিনি সেজদায় চলিয়া না যাইতেন তাবৎ আমরা সেজদার জন্য নত হইতাম না।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ মছআলাহ এই যে, রুকু সেজদা ইত্যাদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে। যেমন অন্য হাদীছের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত আছে। কিন্তু যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইমামের সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সেজদা করার ফলে মোক্তাদীগণ ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে, যেমন ইমাম যদি বয়ঃপ্রাপ্ত বা ভারী শরীরের হয় বা অন্য কোন কারণ বশতঃ রুকু, সেজদায় ধীরে ধীরে যাইয়া থাকেন, যদ্দরুন মোক্তাদীগণ সাধারণভাবে রুকু, সেজদা করিতে গেলে ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীছ অনুযায়ী আমল করিবে, এই হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই। ইহা হযরতের বয়ঃপ্রাপ্তিকালের ঘটনা।

রুকু সেজদা হইতে ইমামের পূর্বে উঠিবার পরিণতি

৪১৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু বা সেজদা হইতে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার মাথা বা তাহার আকৃতি গাধার ন্যায় করিয়া দিতে পারেন ?

ক্রীতদাস গোলামও ইমামতি করিতে পারে

৪১৪। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিরাছেন, প্রথম দিকে মোহাজেরীনদের যে দলটি মদীনায় আসেন তাঁহারা কোবা নগরীতে অবস্থান করিলেন। এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরত করিয়া আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ইমামতি করিতেন আবু হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস ছালেম (রাঃ)। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কোরআনের অধিক অভিজ্ঞ।

মছআলাহ ঃ—ক্রীতদাস, অবৈধ গর্ভজাত সন্তান এবং নিম্ন শ্রেণী (Uncivilized) লোক যদি শিক্ষা ও পরহেজগারীতে উন্নত হয় এবং এইগুণে তাহার সমকক্ষ অন্য লোক উপস্থিত না থাকে তবে তাহাদের ইমামতিতে কোন দোষ নাই (৯৬ পৃঃ)।

নাবালক ছেলের ইমামতি কোন কোন মজহাবে জায়েয আছে, কিন্তু হানফী মজহাব মতে সাবালকদের ফরজ নামায নাবালকের ইমামতিতে শুদ্ধ হয় না।

ইমাম নামায পূর্ণাঙ্গ করে নাই, মোক্তাদী পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে ঃ

৪১৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক (জবরদস্তিমূলক) ইমাম হইয়া তোমাদের নামায পড়াইবে। তাহারা যদি পূর্ণাঙ্গ সুন্দররূপে নামায পড়ায় তবে ত (তাহাদের এবং) তোমাদের (উভয়েরই) পূর্ণ ছওয়াব হইবে। আর যদি তাহারা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়ায় (কিন্তু তোমরা নিজেরা ত্রুটি না কর) তবে তোমাদের ছওয়াব পূর্ণই থাকিবে, ত্রুটির ক্ষতি শুধু তাহাদের উপর পড়িবে। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যাবলী ফতহুল বারী ২—১৪৯)।

ব্যাখ্যা ঃ— হাদীছের বাক্য "যদি তাহারা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়ায়" এই বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীছের উদ্দেশ্য মূল নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী বিষয়াবলী নহে, বরং যাহা নামাযে শুধু ত্রুটি অর্থাৎ নামাযের সৌন্দর্য্য বিনষ্টকারী পরিগণিত। যেমন, নামাযে 'খুশু-খুজু'—আল্লাহ তায়ালার প্রতি এক ধ্যানে একাগ্রচিত্তে ধীর-স্থিরতার সহিত নামায পড়া, প্রয়োজনের অধিক শুদ্ধরূপে দোয়া তছবীহ্ ও কেরাত পড়া ইত্যাদি বহু রকমের মছআলাহ রহিয়াছে। এই সব সম্পর্কে ইমাম এবং মোক্তাদী প্রত্যেকে নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্ন পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী

কোন কাজ শুধু ইমাম একা করিলে মোক্তাদীদের সকলের নামাযও ফাছেদ হইয়া যাইবে। এমনকি যদি ইমাম উহা পুনঃ আদায় না করে তবুও মোক্তাদীদের উহা পুনরায় পড়া ফরজ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য যদি মোক্তাদী ইমামের ঐ কার্য্য জানিতে না পারে তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমামের মোক্তাদী হওয়া

৪১৬। **হাদীছ**ঃ—আ'দী ইবনে খেয়ার (রাঃ) খলীফা ওসমানের (রাঃ) নিকট গেলেন, যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহে আবদ্ধ ছিলেন এবং মদীনার মসজিদে বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমাম ছিল। সেই বিষয়েই আ'দী ইবনে খেয়ার ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোসলমানদের প্রকৃত শাসনকর্তা আপনি; কিন্তু আপনার ত এই অবস্থা এবং বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমাম আমাদিগকে নামায পড়াইয়া থাকে; এই ইমামের পেছনে নামায পড়া আমরা গোনাহ মনে করি। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের ভাল কাজে যোগদান কর, মন্দ কাজে শরীক হইও না। সেমতে নামায মোসলমানদের সর্বোত্তম আমল, যখন সকলে এই আমলটি আদায় করে তখন তুমিও উহাতে যোগদান কর।

মছআলাহঃ—বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হয়। হাসান বছরী (রঃ)কে এই মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায পড় (জমাত ছাড়িও না); তাহার বেদাতের গোনাহ তাহার উপর থাকিবে।

এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। একটি এই যে—কোন ক্ষেত্রে কাহাকেও ইমাম বানাইতে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে যে, সে যেন বেদাতী না হয়। বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানান জায়েয নয়; যাহারা বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে তাহারা গোনাহগার হইবে। কিন্তু কোন মসজিদে বা কোন ক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি ইমাম হইয়াছে যে বেদাতী এবং ঐ বেদাতী ইমামের জমাতে শামিল না হইলে জমাতহীন একা নামায পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, এরূপ ক্ষেত্রে জমাত না ছাড়িয়া বেদাতী ইমামের জমাতে শামিল হইবে; হাসান বছরী রহমতুল্লাহে আলাইহের ফতওয়ার মর্ম ইহাই।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এস্থলে "বেদাত" বলিতে শুধু এরূপ গর্হিত কাজ উদ্দেশ্য যাহা ফাছেকী, কুফুরী বা শেরেকী গোনাহের কাজ বা ঐরূপ আকিদা ও মতবাদ ভিত্তিক কাজ নহে। ফাছেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়িবে না; কুফুরী ও শেরেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হইবে না।

মছআলাহঃ—ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলী স্বভাব চরিত্র, মেয়েলী বেশ-ভূষা মেয়েলী চালচলন অবলম্বনকারীর পেছনে নামায পড়া শক্ত মকরূহ; গত্যন্তরহীন অনিবার্য্য প্রয়োজন ছাড়া ঐরূপ লোকের পেছনে নামায পড়িবে না।

এরূপ দীর্ঘ কেরাত পড়িবে না যাহাতে কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ জমাতে যোগদানে বিরত থাকে

৪১৭। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) স্বীয় মহল্লার মসজিদে ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি সন্ধ্যার পর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতেন এবং এশার নামায পর্য্যন্ত তাঁহার খেদমতেই থাকিতেন। এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এশার জমাতে নামায পড়িয়া তারপর স্বীয় মহল্লার মসজিদে যাইয়া এশার নামাযের ইমামতী করিতেন। ইহাতে স্বভাবতঃই এই মসজিদে এশার নামায পড়িতে অধিক রাত্র হইয়া যাইত। একদা এই মহল্লাবাসী একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া সেও এই মসজিদে এশার নামাযের জমাতে আসিল। জমাতের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল একে ত মসজিদে উপস্থিত হইতেই বিলম্ব করিয়া থাকেন, তদুপরি অদ্য তিনি (আড়াই ছিপারা ব্যাপী সুদীর্ঘ) ছুরা বাকারা আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্রমিক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া জমাত ছাড়িয়া দিল এবং একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মসজিদের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) নামাযান্তে এই খবর শুনিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতি ভৎর্সনা করিলেন। ঐ ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং মোয়াজ এশার নামায পড়াইতে অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়া থাকেন, তদুপরি তিনি ছুরা বাকারার ন্যায় সুদীর্ঘ ছুরা আরম্ভ করেন; এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ ইবনে জাবালের প্রতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে মোয়াজ! তুমি কি লোকদিগকে নামায হইতে তাড়াইতে চাও? এই ভাবে তিনি তাঁহার প্রতি তিনবার কটাক্ষ করিলেন এবং সর্বদার জন্য সতর্ক করতঃ والشمس وضحها - سبح اسم ربك الاعلى - والليل اذا কয়েকটি মধ্য আকারের ছুরার নাম বলিয়া এই সমস্ত ছুরা দ্বারা নামায পড়াইবার আদেশ দিলেন। (ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমার সঙ্গে নামায পড়িয়া তারপর দীর্ঘ ইমামতী করিতে পারিবে না। হয় ত শুধু আমার সঙ্গেই নামায পড়িবে, না হয় শুধু ইমামতীই করিবে, কিন্তু দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে না) এবং বলিলেন, তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জমাতের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্তগণও থাকিতে পারে। (৭৬নং হাদীছও এখানে উল্লেখ আছে।)

মছআলাহঃ—কোন নামায একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার ঐ নামাযেরই ইমামতী করা জায়েয আছে (৮৯ পৃঃ ৪১৭ হাঃ)। ইহা কোন কোন ইমামের মত; হানফী মজহাব মতে ঐরূপ করা জায়েয নহে; ঐরূপ করিলে মোক্তাদীদের ফরজ নামায আদায় হইবে না। অবশ্য কোন নামাযের জমাত হইতেছে, এক ব্যক্তি অন্যত্র মোকাররূর ইমাম; সে ঐ জমাতে শামিল হইয়াছে, কিন্তু নফলের নিয়্যত করিয়া শামিল হইয়াছে, অতঃপর

নিজ মসজিদে যাইয়া ফরজের নিয়াতে ঐ নামাযের ইমামতী করিয়াছে—ইহা হানফী মজহাব মতেও জায়েয আছে এবং এই অবস্থায় মোক্তাদীদের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

মছআলাহ :— কোন ব্যক্তি তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বা ইমামের লম্বা নামায কারণ-বিশেষে তাহার পক্ষে অসহণীয়; সেই ব্যক্তি ইমামের লম্বা নামায ত্যাগ করতঃ একা নামায পড়িলে তাহার গোনাহ হইবে না। অবশ্য জমাতের স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে বা নিজ গৃহে আসিয়া পড়িবে (৯৭ পৃঃ)।

মছআলাহ :—ইমাম (নিয়মিত সুন্নত তরিকা অপেক্ষা) অধিক লম্বা নামায পড়াইলে সে সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা যায় (ঐ)।

একাকী নামায পড়িলে দীর্ঘ নামায পড়িতে পারে

৪১৮। **হাদীছ :—**আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন তুমি অন্য লোকদের ইমাম হও, তখন নামাযকে অধিক দীর্ঘ করিও না। কারণ, তাহাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও থাকে। আর যখন তুমি একাকী নামায পড় তখন যতদুর ইচ্ছা দীর্ঘ নামায পড়।

কম সময় নামায পড়িলেও আরকান-আহকাম সুষ্ঠু রূপে আদায় করিবে

৪১৯। **হাদীছ :—**আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জমাতের) নামায অল্প সময়ে শেষ করিতেন। কিন্তু অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে আদায় করিতেন।

কোন কারণে অল্প সময়ে নামায শেষ করিয়া দেওয়া জায়েয

৪২০। **হাদীছ :—**আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, আমি নামায আরম্ভ করি এবং উহা দীর্ঘরূপে পড়িতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আশ-পাশের শিশুদের ক্রন্দন শুনিয়া ঐ নামায অল্প সময়ে শেষ করিয়া দেই। কারণ, হয় ত ঐ শিশুদের মাতা জমাতে যোগদান করিয়াছে, সে বিচলিত হইবে।

৪২১। **হাদীছ :—**আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অল্প সময়ে নামায পড়িলেও যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করিতেন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি জমাতে নামায পড়ার সময় যদি আশ-পাশে শিশুদের ক্রন্দন শুনিতে পাইতেন, তবে অল্প সময়েই নামায শেষ করিয়া দিতেন। জমাতে যোগদান কারিণী ঐ শিশুর মাতা যেন বিচলিত না হয়।

নামাযে কাঁদিলে

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী, তিনি বলেন—আমি জমাতে নামায পড়িতেছিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ) ইমাম ছিলেন। আমি পেছনের সারিতে দাঁড়াইয়াছিলাম। ওমর (রাঃ) নামায অবস্থায় (খোদার ভয়ে) উদ্‌গত ক্রন্দন চাপিয়া রাখার দরুন তাঁহার সীনা ও কণ্ঠনালীর ভিতরে যে শব্দ হইতেছিল, আমি পেছনে থাকিয়াও তাহা শুনিতেছিলাম।

মছআলাহ :—আল্লাহ তায়ালার প্রতি কাতরতা অনুরক্তি বা ভয়ের প্রভাবে যে কোন প্রকারে কাঁদিলে নামায নষ্ট হইবে না। অন্য কারণে সশব্দে কাঁদিলে নামায ফাসেদ হইবে।

একামত আরম্ভেই কাতার সোজা করিবে, প্রয়োজন হইলে পরেও উহার জন্য তৎপর হইবে

৪২২। **হাদীছ :**— عن النعمان بن بشير ان النبى صلى الله عليه وسلم —

قَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ـ

অর্থ :—নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, খবরদার হুশিয়ার! তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা :—নামাযের মধ্যে কাতার বাঁকা করিয়া দাঁড়ান একটি সাধারণ বিষয় মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কুফল বড়ই মারাত্মক। ইহার দরুণ আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের বিরোধ, বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দেন। বর্তমান মোসলমানদের অবস্থা দেখিলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। পরস্পর বিভেদ ও বিবাদ বড় শাস্তি যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু স্থানে ইহুদ ও নাছারাদের উপর স্বীয় গজব ও আজাবের উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন—"আমি তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।"

মূল হাদীছটির অর্থ এরূপও বলা হয়, "তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি বিকৃত করিয়া দিতে পারেন।"

কাতার সোজা করিতে ইমাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে

৪২৩। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নামাযের একামত শেষ হইয়া গেলে পর, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সোজা সারিবদ্ধভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া দাঁড়াও। স্মরণ রাখিও, আমি পেছনের দিকেও তোমাদিগকে দেখি। (২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।)

কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

৪২৪। **হাদীছ** :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কাতার সোজা কর। কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৪২৫। **হাদীছ** :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও। কারণ, উহার উপর নামাযের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

কাতার সোজা এবং পূর্ণ না করা গোনাহ

৪২৬। **হাদীছ** :—(রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু দিন পর) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বছরা হইতে মদীনায় আসিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার অনুপাতে আমাদের মধ্যে কি কি দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান? তিনি বলিলেন অন্য কোন দোষ বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে চাই না, কিন্তু এই একটি দোষ যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কাতার ঠিক ও দুরস্ত কর না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এস্থানে ৩৯৭ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম কাতারের ফজিলত অনেক বেশী।

পরস্পর লাগালাগি হইয়া সারি বাঁধিবে ফাঁক রাখিবে না

ছাহাবী নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের (তথা ছাহাবীদের প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এবং পরস্পর পায়ের গিঁঠ মিলাইয়া নামাযে দাঁড়াইতেন।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জমাতে নামায পড়িতে) আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইতেন।

পাঠকবৃন্দ! একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পরস্পর পা মিলাইয়া দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বস্তুতঃ একে অন্যের পায়ের সহিত পা মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। সে জন্যই এখানে কাঁধের এবং পায়ের গিঁঠেরও উল্লেখ আছে; অথচ সারি বাঁধিতে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলানো সহজ ব্যাপার নহে এবং পায়ের গিঁঠে গিঁঠ মিলানো ত সম্ভবই নহে। এখানে এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা বস্তুতঃ দুইটি বিষয়ে তৎপর হওয়ার আদেশ করাই আসল উদ্দেশ্য। প্রথম—এই যে, খুব সোজাভাবে সারি বাঁধিবে; যেরূপ কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইলে স্বভাবতঃই উহা হইয়া থাকে এবং কাতার সোজা করার ইহা অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়—এই যে, যথাসাধ্য লাগালাগি দাঁড়াইবে; মধ্যভাগে ফাঁক ছাড়িবে না।

অনেক হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, মধ্যভাগে একটু ফাঁক থাকিলে শয়তান সেখানে আসিয়া প্রবেশ করে (নামাযীদের অন্তরে ওছ্‌ওয়াছার সৃষ্টি করে)।

আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তি কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলানর একমাত্র উদ্দেশ্য যে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আনাছ (রাঃ) তাঁহার উক্তির ভিত্তি নিম্নে বর্ণিত হাদীছটির উপর স্থাপন করিয়াছেন।

৪২৭। **হাদীছ:—** عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ

مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ......

অর্থ:—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কাতার খুব সোজা করিয়া দাঁড়াইবে; আমি আমার পেছন দিকেও দেখিয়া থাকি+। আনাছ (রাঃ) বলেন—সেমতে আমাদের প্রত্যেকেই কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলাইয়া থাকিত।

মহিলা একজন হইলেও একাই সকলের পেছনে দাঁড়াইবে

৪২৮। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের গৃহে (নফল) নামায পড়িলেন। আমি এবং অন্য একটি বালক—হযরতের পেছনে দাঁড়াইলাম, আর আমার মাতা উম্মে-ছোলায়ম আমাদের পেছনে দাঁড়াইলেন।

ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে আড়াল থাকিলে?

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে (ছোট) নালা থাকিলে দোষ নাই। আবু মেজ্‌লায (রঃ) বলেন, মধ্যভাগে (ছোট) রাস্তা বা দেওয়াল থাকিলেও ইমামের সঙ্গে এক্তেদা শুদ্ধ হইবে যদি ইমামের রুকু-সেজদা জানিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যাখ্যা:— মধ্যস্থলে বড় রাস্তা বা খাল ইত্যাদির ফাঁক রাখিয়া উহার অপর পারে দাঁড়াইয়া এক্তেদা করিলে সেই এক্তেদা শুদ্ধ হইবে না। এবং ইমামের আড়ালে এমন স্থানে এক্তেদা শুদ্ধ নহে যে স্থান হইতে ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা ইত্যাদি জ্ঞাত হইবার ব্যবস্থা নাই। যদি সেই ব্যবস্থা করা হয় বা ইমামের তকবীরের আওয়াজ শুনা যায় তবে এক্তেদা শুদ্ধ হইবে।

+ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছন দিকেও দেখা সম্পর্কে ২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।

৪২৯। **হাদীছ:**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহ সংলগ্ন যে ছাদহীন ঘেরাও করা স্থানটি ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। ঐ ঘেরাও-এর দেওয়ালটি নীচু ছিল; তাই একদা কয়েকজন লোক তাঁহাকে নামায পড়িতে দেখিয়া (দেয়ালের অপর পার্শ হইতে) তাঁহার সহিত এক্তেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল। সকাল বেলা তাহারা বলাবলি করিলে দ্বিতীয় রাত্রে আরও কয়েক জন লোক জুটিয়া গেল, তাহারাও এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়িল। দুই-তিন রাত্র তাহারা এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত তাহাজ্জুদ পড়িল। তারপরের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন না। সকালবেলা সকলেই তাঁহার নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করিলে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছিল, এরূপে সমবেতভাবে তাহরা তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাজ্জুদকে তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দিতে পারেন। (তাহাতে উম্মতের উপর ফরজের চাপ বাড়িয়া যাইত। হযরত (দঃ) সর্বদা উম্মতের জন্য সহজ পন্থা কামনা করিতেন।)

৪৩০। **হাদীছ:**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চাটাই ছিল; (মসজিদে এ'তেকাফ কালে) দিনের বেলা তিনি উহা বিছাইতেন এবং রাত্রিকালে উহা দ্বারা ঘেরাও করিয়া ভিতরে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। কয়েকজন লোক খোঁজ পাইয়া ঐ ঘেরাও-এর পেছন হইতে এক্তেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল।

৪৩১। **হাদীছ:**—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মসজিদে এ'তেকাফ করিলেন এবং মসজিদের ভিতরেই চাটাই দ্বারা ঘেরাও করিয়া উহাতে তিনি (রাত্রে তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন; ছাহাবী-গণও ঐ ঘেরাওয়ের বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে এক্তেদা করিয়া ঐ নামাযে শরীক হইতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি পূর্ব দিনের ন্যায় লোকগণ তাঁহার সঙ্গে শামিল হওয়ার সুযোগ পায় সেইরূপে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হইতে বিরত থাকিলেন; (এমনকি ছাহাবীগণ যখন দেখিলেন যে, তিনি আজ পূর্বের ন্যায় নামায আরম্ভ করিতেছেন না,) তাঁহারা ভাবিলেন—বোধ হয় তিনি আজ নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন বা অন্য কাজে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি। তাই তাঁহারা হযরতের নিকটবর্তী স্থান হইতে গলা খাকরান আরম্ভ করিলেন। (কিন্তু হযরত (দঃ) কিছুতেই সাড়া দিলেন না।) পরদিন হযরত (দঃ) সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে তোমরা যাহা করিয়াছ আমি সব উপলব্ধি করিয়াছি; (আমি যাহা করিয়াছি ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছি। ফরজ ভিন্ন অন্য নামাযের জন্য জমাতের এরূপ পাবন্দি আমি করি না। তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল) নামায তোমরা নিজ ঘরে পড়িবে ফরজ ভিন্ন অন্য নামায নিজ নিজ ঘরে পড়াই শ্রেয়ঃ।

নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে হাত উঠাইবে এবং হাত কতদূর উঠাইবে

৪৩২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—যখন নামায আরম্ভ করার জন্য তকবীর বলিতেন তখন তিনি উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইতেন; এত দূর যে, (হাতের তালু কাঁধ বরাবর উঠিত।× রুকুতে যাইবার জন্য তকবীর বলার সময়ও ঐরূপ হাত উঠাইতেন এবং রুকু হইতে উঠিয়া "ছামিয়াল্লাহু লেমান-হামিদাহ" বলার সময়ও হাত উঠাইতেন এবং "রাব্বানা ওয়া-লাকাল-হাম্দ্" বলিতেন। কিন্তু সেজদায় যাইবার সময় বা সেজদা হইতে উঠিবার সময় হাত উঠাইতেন না।

৪৩৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন এবং যখন রুকুতে যাইতেন ও রুকু হইতে উঠিতেন এবং দুই রাকাতের পর অর্থাৎ প্রথম আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসা হইতে যখন দাঁড়াইতেন তখনও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

৪৩৪। **হাদীছ ঃ**—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) যখন তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন, আর রুকুতে যাইবার পূর্বে এবং রুকু হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(এই হাদীছটি "নাছায়ী শরীফে" ছহীহরূপে বর্ণিত আছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ আছে, সেজদায় যাওয়ার পূর্বে এবং সেজদা হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন)।

ব্যাখ্যা ঃ—নামায আরম্ভ করার তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে ইহাতে দ্বিমত নাই। অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইবার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ভিন্ন অন্যান্য ইমামগণ ৪৩২নং হাদীছ অনুযায়ী আরও দুই স্থানে হাত উঠাইবার মত প্রকাশ করেন। আবু হানিফা (রঃ) প্রথম স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইতে বলেন না। তাঁহার দলীল এই যে—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এই বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ও কার্য্যে দেখাইয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভের তকবীরের সময় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে হাত উঠাইতেন না।✿

× নামাযের মধ্যে হাত কি পর্য্যন্ত উঠাইবে সে বিষয়ে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে—কানের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত, কানের লতি পর্য্যন্ত এবং কাঁধ পর্য্যন্ত। উক্ত হাদীছ সমূহ দৃষ্টে সর্বোত্তম পন্থা এই যে, হাত এতদূর উঠাইবে যে, হাতের বড় আঙ্গুলগুলি কানের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি পর্য্যন্ত এবং হাতের তালুর অংশ কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছে।

✿ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই হাদীছখানা নাছায়ী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হাদীছটি নিঃসন্দেহে ছহীহ প্রমাণিত হইয়াছে।

পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, এখানে ইমামগণের যে মতভেদ আছে ইহা অতি সামান্য। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য এই যে, প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি ছিল—রুকু, সেজদা ইত্যাদি প্রত্যেক উঠা-বসার ক্ষেত্রে হাত উঠান। যেমন—৪৩২, ৪৩৩ ও ৪৩৪নং হাদীছসমূহকে সমষ্টিগতভাবে লক্ষ্য করিলেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরে ৪৩২ নং হাদীছ দ্বারা ৪৩৩, ৪৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিকে শিথিল করা হয়। লক্ষ্য করুন—৪৩৪ নং হাদীছে সেজদার সময় হাত উঠাইবার বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২নং হাদীছে উহার বিপরীত উল্লেখ হইয়াছে এবং ৪৩৩ নং হাদীছে দুই রাকাত হইতে দাঁড়াইয়া হাত উঠাইবার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২ নং হাদীছে তাহা নাই। অতঃপর ৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিও পরিবর্তিত হয়, যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই ৪৩২ নং হাদীছ বর্ণনকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেই শেষ পর্য্যন্ত রুকু ইত্যাদিতে হাত উঠান ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ)ও তদ্রূপই করিতেন, আরও অসংখ্য ছাহাবী এইরূপই করিতেন। তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, সর্বপ্রথম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানসমূহে হাত উঠাইবার রীতি রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; উহা সুন্নত রূপে পরিগণিত থাকে নাই, তবে এখনও কেহ ঐরূপ করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।

অন্যান্য ইমামগণ ঐ একমাত্র ৪৩২ নং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, উক্ত হাদীছে বর্ণিত দুই স্থানে হাত উঠানও সুন্নতরূপে প্রচলিত আছে ও থাকিবে। তবে তাঁহারাও বলেন যে, কেহ এইরূপ না করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না। সুতরাং এই সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা অজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে।

নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে

৪৩৫। **হাদীছঃ**—সাহ্‌ল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এই আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নামাযের মধ্যে (দাঁড়ান অবস্থায়) লোকেরা ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে।

নামাযে আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতা বজায় রাখা কর্তব্য

৪৩৬। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি ধারণা করিয়া থাক যে, আমার দৃষ্টি একমাত্র কেবলার দিকে; (আমি পেছন দিকের খবর রাখি না?) আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমরা কিরূপ রুকু কর, আল্লার প্রতি কতটুকু ধ্যান ও মগ্নতা রাখ তাহা সবই আমি জ্ঞাত থাকি। আমি আমার পেছনেও দেখিতে পাই। তোমরা রুকু-সেজদা ভালরূপে আদায় করিও। (২৭১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।)

নামায আরম্ভ করিতে তকবীর বলার পর কি পড়িবে ?

৪৩৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীরে-তাহরীমা ও কেরাত আরম্ভ করার মধ্যে অল্প সময় চুপে চুপে কিছু পড়িতেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রস্থলাল্লাহ (দঃ)! আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ! আপনি চুপ থাকাবস্থায় কি পড়েন? তিনি বলিলেন, এই দোয়া পড়িয়া থাকি—

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - *

অর্থ ঃ—হে খোদা! আমাকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুকর্ম হইতে এত অধিক দূরে রাখ যেরূপ দূরত্ব সূর্য্য উদয় ও অস্তের স্থানদ্বয়ের মধ্যে আছে। (অর্থাৎ আমাকে পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আর যদি আমারই ত্রুটির দরুন কোন পাপ আমার দ্বারা সংগঠিত হইয়া যায়, তবে) হে খোদা! (আমার গোনাহসমূহকে মাফ করিয়া) আমাকে এরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়ের ময়লা দূর করিয়া পরিষ্কার করা হয়। (যাবৎ একটুকুও ময়লা বা দাগ থাকে উহার ধৌত কার্য্য ক্ষান্ত হয় না।) হে খোদা! আমার গোনাহসমূহকে ঠাণ্ডা পানি, বরফের পানি ও শিলের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও।

প্রশ্ন—ধৌত কার্য্যের জন্য ত গরম পানি শ্রেয়; ঠাণ্ডা ও বরফের পানি নয়।

উত্তর—লক্ষ্য করুন। আপনি একটি আমের আঁটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে কিছুদিন পর ঐ আমের আঁটিই আপনার সম্মুখে মাটির উপর আম গাছ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তেমনিভাবে ইহজগতে আমরা যে পাপ কার্য্য ও গোনাহ করিতেছি, পরকালে এ সমস্ত পাপ ও গোনাহসমূহই দোযখের আগুনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তাই গোনাহের পরিণতি ও আকৃতি হইল আগুন; আগুনকে সমূলে নির্বাপিত করিতে বরফ ও শিলার পানির ন্যায় ঠাণ্ডা পানিই শ্রেয়। অতএব গোনাহ ধৌতের ক্ষেত্রে শিলা ও বরফের পানির উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণই বটে।

---

* এখানে অন্যান্য দোয়াও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে; একাকী নামায পড়াকালে বিভিন্ন দোয়া পড়া চাই, অবশ্য জমাতের নামাযে যেহেতু দীর্ঘতা অবলম্বন না করা উত্তম, তাই জমাতের সময় এস্থানে হানাফীগণ "ছানা" অবলম্বন করেন যাহা তিরমিজী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে।

৪৩৮। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) নামাযের মধ্যে আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন হইতে কেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন।

ব্যাখ্যাঃ— কেরাত অর্থ সশব্দে পড়া। নামাযের মধ্যে "আলহামদু" হইতে সশব্দে পড়া আরম্ভ হয়। এর পূর্বে ছানা, তাআউজ, বিছমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া হইয়া থাকে। উপরোক্ত হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, আল্‌হামদু পূর্বে বিছমিল্লাহ ইত্যাদি সশব্দে পড়িতেন না। কিন্তু বিছমিল্লাহ ইত্যাদি চুপে চুপে পড়িতে হইবে তাহা অন্যান্য হাদীছে উল্লেখ আছে।

নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকান জায়েয নহে

৪৩৯। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ভীষণ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, যাহারা নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকায়, তাহারা অনর্থক এরূপ কেন করে ? নবী (দঃ) আরও বলিলেন, তাহারা যদি তাহাদের এই অভ্যাস হইতে বিরত না থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখা জায়েয নহে

৪৪০। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহার দ্বারা শয়তান মানুষের নামায হইতে ছোঁ মারিয়া কিছু অংশ লইয়া যায় (অর্থাৎ নামাযকে পঙ্গু করে)।

মছআলাহঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মোক্তাদী তাহার ইমামের প্রতি তাকাইলে নামায নষ্ট হয় না (১০৩)।

মছআলাহঃ— নামাযের মধ্যে কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে শুধুমাত্র কোণ-চোখে উহার দিকে লক্ষ্য করা বা নামাযান্তে কর্তব্য বিষয়ক সম্মুখস্থ কোন বস্তুর প্রতি শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাকান—যেমন, মসজিদের দেওয়ালে থুথু ইত্যাদি থাকিলে নামাযান্তে উহা পরিষ্কার করিতে হইবে, তাই উহার প্রতি তাকান জায়েয আছে।

(১০৪ পৃঃ ২৬৬, ৪১০ হাঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে ২৪৮ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দূরের কোন বস্তু নয়, স্বয়ং নামাযী ব্যক্তির শরীরের কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য করা যাহাতে নামাযের একাগ্রতার ত্রুটি আসে তাহাও বিশেষভাবে বর্জনীয়।

নামাযে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই কেরাত পড়া ওয়াজেব

৪৪১। **হাদীছঃ**— ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে আলহামদু ছুরা না পড়িবে তাহার নামায হইবে না।

ব্যাখ্যা :—ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ব্যতীত অন্যান্য অনেকেই ইমাম মোক্তাদী উভয়কেই এই হাদীছের আওতাভুক্ত করিয়া বলেন যে, ইমাম এবং ইমামের পেছনে প্রত্যেক মোক্তাদিকেই আলহামদু ছুরা পড়িতে হইবে; ইমাম বোখারী (রঃ)ও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু অন্য বড় বড় মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন, এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ঐ নামাযী ব্যক্তি যে কোন ইমামের সঙ্গে মোক্তাদি না হয়। কারণ, মোক্তাদীদের জন্য ভিন্ন দুইটি বিশেষ হাদীছ বর্ণিত আছে। প্রথম হাদীছটির মর্ম এই যে রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ইমামের সঙ্গে একতেদা করিলে কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়, যেমন—ইমাম "ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু" বলিলে মোক্তাদি উহা না বলিয়া তৎপরিবর্তে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলিবে। তেমনিভাবে وَاِذَا قَرَا فَاَنْصِتُوا ইমাম যখন পড়িবে তখন মোক্তাদিগণ (পড়ায় লিপ্ত না হইয়া) চুপ থাকিবে (মোসলেম শরীফ)। দ্বিতীয় হাদীছটি—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামের এক্তেদা করিবে, ইমামের কেরাতই তাহার পক্ষে কেরাত বলিয়া গণ্য হইবে (সে নিজে কেরাত পড়িবে না)। [ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

এই বক্তব্য অনুসারে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, মোক্তাদি ইমামের সাথে যেরূপ অন্য ছুরা পড়ে না তদ্রূপ আলহামদু ছুরাও পড়িবে না।

পাঠকবৃন্দ! এখানেও ইমামগণের মতভেদ অতি সামান্য বিষয়ে। ইহা শুধু নিয়ম ও পদ্ধতির বিভিন্নতা* উভয় নিয়মেই মূল নামায শুদ্ধ হইবে, ইহাতে দ্বিমত নাই।

---

* অন্যান্য ইমামগণ যে নিয়ম প্রবর্তন করিতে চাহেন উহা সুফলপ্রসূই বটে, কারণ মোক্তাদীগণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিলে তাহাদের মন নানা চিন্তা ও খেয়ালে মত্ত হইবে, তাহাদের অন্তরে নানা অছঅয়াছা উদয় হওয়ার সুযোগ পাইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত নিয়মের তাৎপর্য অতি গভীর যে—আলহামদু ছুরাটি হইল আল্লার দরবারে আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা। আলহামদু ছুরার অর্থ ইহাই প্রমাণ করে, তা ছাড়া ইহার দ্বিতীয় নাম হইল "তা'লিমুল-মছআলাহ্" অর্থাৎ দরখাস্তের মুসাবিদা। বাদশার দরবারে যখন একদল লোক কোন দরখাস্ত পেশ করিতে উপস্থিত হয় তখন অবশ্য দরবারের আদব-কায়দা সকলেরই আদায় করিতে হয়, কিন্তু আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা বা যাহা কিছু বলার দরকার হয় তাহা একমাত্র তাহাদের নেতাই বলিয়া থাকেন। সকলে এক সঙ্গে বলা আরম্ভ করে না, বরং তাহারা চুপ করিয়া বাদশার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং আরজ সমাপ্তে সমর্থনসূচক কোন একটি শব্দ বলিয়া দেয় মাত্র। এখানেও তদ্রূপ—তক্‌বীর, তছবীহ এবং রুকু-সেজদা ইত্যাদি সম্ভাষণ ও আদব-কায়দা সকলেরই তামীল করিতে হইবে। আলহামদু ছুরার দ্বারা আরজী ও দরখাস্ত শুধু নেতাই (ইমাম) পেশ করিবেন। মোক্তাদিগণ সকলে আল্লার দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকিবে এবং ইমাম কর্তৃক দরখাস্ত পড়ায় শব্দ শুনা গেলে উহার প্রতিটি অক্ষরের প্রতি একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য রাখিবে ও দরখাস্ত সমাপ্তে সম্মতিসূচক শব্দ 'আমীন' বলিবে। "আমীন" অর্থ—আমিও ইহাই চাই বা হে আল্লাহ কবুল করুন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিভিন্ন নামাযের মধ্যে কেরাতের বিবরণ

৪৪২। **হাদীছ ঃ**—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়িতেন ; সময়ে কোন আয়াত সশব্দে পড়িতেন (যদ্বারা আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম)। শেষের দুই রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পড়িতেন। আছরের নামাযেও তদ্রূপই করিতেন। ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পড়িতেন।

৪৪৩। **হাদীছ ঃ**—আবু মা'মার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি জোহর ও আছরের নামাযে কিছু পড়িতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা আপনারা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? (উক্ত দুই ওয়াক্তের নামাযে উচ্চৈস্বরে কিছু পড়া হয় না।) তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ি মোবারক যে নড়াচড়া করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম।

৪৪৪। **হাদীছ ঃ**—একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছুরা "ওয়াল-মোরসালাত" তেলাওয়াত করিলেন। তাঁহার মাতা উহা শুনিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র! তুমি আমাকে একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। এই ছুরাটি শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালের কথা আমার মনে পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

পাঠকগণ! লক্ষ্য করিবেন ; এখানে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য দুইটি বিষয়ের সমষ্টি। প্রথম—মোক্তাদি চুপ করিয়া থাকিবে ; আলহামদু ছুরা পড়িবে না। দ্বিতীয়—তাহার অন্তর আল্লার ভয়-ভক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবে পরিপূর্ণ রাখিবে, অছওয়াছাহ বা অন্য খেয়াল তাহার অন্তরে যেন বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। সে যেন আল্লার দরবারে হাজির হইয়াছে, সে যেন আল্লাহকে দেখিতেছে ; আল্লাহও তাহাকে দেখিতেছেন ; এই অবস্থা তাহার উপর প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। সে জন্যই হাদীছে বলা হইয়াছে— الصلوة معراج المؤمن। "প্রত্যেক মোমেনকে তাহার নামায মে'রাজ (আল্লার দরবারে উপস্থিতি) রূপে পরিগণিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিষয়টি ইমাম আবু হানিফার আসল উদ্দেশ্য। ইহারই প্রতি বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি ইমামের পেছনে থাকাকালীন আলহামদু ছুরা পড়িব কি? তিনি বলিলেন—ان لك فى الصلوة لشغلا "তোমার উপর নামাযের মধ্যে একটি অতি বড় বিশাল মগ্নতা ও ধ্যানের চাপ রহিয়াছে, তুমি উহাতেই নিয়োজিত থাক।"

আফছুছ! বর্তমান হানফী মজহাবের নামধারীরা প্রথম বিষয়টির প্রতি খুবই আগ্রহান্বিত ; কারণ উহা সহজ আরামদায়ক। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য আদৌ কোন চেষ্টা করে না, ইহাতে ইমাম আবু হানিফার মজহাবের অনুসরণ হয় না, বরং অবমাননা করা হয়।

অসাল্লামের সঙ্গে আমি যে নামায পড়িয়াছিলাম উহা মগরেবের নামায, সেই নামাযে তিনি এই ছুরাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

৪৪৫। হাদীছ ঃ—জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মগরেবের নামায পড়িতেছিলাম, সেই নামাযে তিনি (২৭ পারার) ছুরা "ওয়াত-তুর" পড়িলেন। ঐ ছুরার নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির বিষয়বস্তু এইরূপভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল যে, উহা শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেন আমার প্রাণ পাখী উড়িয়া চলিয়া যাইবে।

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ـ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ـ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ـ

অর্থ—(আল্লাহ তায়ালা এখানে নাস্তিকতার মতবাদ খণ্ডন পূর্বক তিরস্কার স্বরূপ বলিতেছেন—) জগদ্বাসী কি কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি হইয়াছে? বা তাহারাই কি পরস্পর একে অন্যকে সৃষ্টি করিয়াছে? এই সমস্ত আসমান, জমিনকেও তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে কি? (এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে,) কিন্তু তাহারা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারপর আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করুন যে—যে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ তাহারা ভোগ করিতেছে তাহা কি তাহারা তাহাদের পালনকর্তার ভাণ্ডার হইতে পাইতেছে, না সক্রিয় ভাবে তাহারাই উহার উৎস?

অর্থাৎ যাহারা নাস্তিক—যাহারা আল্লার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায় না তাহাদিগকে তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলুন। প্রথম প্রশ্ন—তাহারা কি সৃষ্ট না স্রষ্টা? যদি সৃষ্ট হয় তবে নিশ্চয় কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন; কারণ, কর্তা ব্যতিরেকে ক্রিয়া ও কর্ম হইতে পারে না। আর যদি তাহারা নিজেকেই (পরস্পর একে অন্যের) স্রষ্টা বলিয়া ধারণা করে তবে প্রশ্ন করুন যে, এই সপ্ত আকাশ ও বিশাল ভূমণ্ডলের স্রষ্টাও কি তাহারাই। আরও প্রশ্ন করুন, তাহারা জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত সম্পদ উপভোগ করিয়া থাকে; যেমন—অগ্নি, বায়ু, পানি, মাটি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সমস্ত দৈহিক ও ইন্দ্রিয়-শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে; যেমন—হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদির শক্তি এবং অর্থ সামর্থ্য। এতদ্ভিন্ন কৃষি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে উন্নতি করার জন্য ভিতরের বা বাহিরের যে সমস্ত শক্তি ও পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে; যেমন—বুদ্ধি-বিবেক, মস্তিষ্ক ও (Raw moterials) উপাদান পদার্থ সমূহ। এসব সম্পদ, শক্তি ও পদার্থ সমূহের উৎস কোথায়? তোমরা কি নিজে নিজেই সক্রিয় ভাবে এ সবের অধিকারী? না তোমাদের কোন পালনকর্তা আছেন যিনি তোমাদিগকে এসব যোগাইতেছেন এবং স্বীয় কৃপাবলে দান করিতেছেন?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এমন নয় যে, তাহাদের মনে উহা জাগে না। নিশ্চয় এ সবের সঠিক সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ঐ জাগ্রত ভাবকে অবহেলারূপে অবজ্ঞা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা। আপনারাও নির্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এই সকল প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিয়া দেখুন; আপনার মন আপনাকে যেই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি ধাবিত করে তাঁহার কি হক ও স্বত্ব আপনার উপর প্রবর্তিত হইতে পারে, তাহাও চিন্তা করুন। দেখিবেন আপনার হৃদয়-পাখীও যেন উড়িয়া যাইতে চাহিবে। যেমন উক্ত ছাহাবীর অবস্থা হইয়াছিল।

৪৪৬। **হাদীছ**:—ছাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) তাঁহাদের দেশের শাসনকর্তা মারওয়ানকে বলিলেন, আপনি মগরেবের নামাযের মধ্যে শুধু ছোট ছোট ছুরাই পড়িয়া থাকেন। অথচ আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মগরেবের নামাযে অতি দীর্ঘ ছুরা (আ'রাফ)ও পড়িতে শুনিয়াছি।

৪৪৭। **হাদীছ**:—ছাহাবী বরা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে ছিলেন। আমি তাঁহাকে নামাযের মধ্যে ছুরা "ওয়াত্তীন" পড়িতে শুনিয়াছি। তিনি যেরূপ শুদ্ধ কেরাত ও খোশ-এলহানে পড়িয়াছিলেন, ঐরূপ আর কাহারও মুখে শুনি নাই।

৪৪৮। **হাদীছ**:—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নামাযের সব রাকাতেই কোরআনের অংশবিশেষ পড়িতে হয়—যে সব নামাযে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশব্দে কেরাত পড়িতেন আমরাও সেই নামাযে ঐরূপই পড়িব। যে সব নামাযে তিনি নিঃশব্দে পড়িতেন সেই নামাযে আমরাও ঐরূপই পড়িব। (তিনি আরও বলেন—) তুমি যদি (অন্য ছুরা না জানার দরুন) শুধু আলহামদু ছুরা দ্বারা নামায পড় তবুও তোমার নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু (যথা সম্ভব) অন্য ছুরা (শিক্ষা করিয়া উহা) আলহামদুর সহিত মিলাইয়া নামায আদায় করাই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

৪৪৯। **হাদীছ**:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেকটি কাজ আল্লার হুকুম অনুসারেই করিতেন—যে স্থানে যাহা পড়িতেন (যেমন নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়িতেন) আল্লার আদেশেই তাহা পড়িতেন এবং যে স্থানে যাহা না পড়িতেন (যেমন—ফরজ নামাযে শেষ দুই বা এক রাকাতে শুধু আলহামদু পড়িতেন, অন্য ছুরা পড়িতেন না) তাহাও আল্লার আদেশেই করিতেন। (ইহা সর্বজন বিদিত সত্য যে,) আল্লার কোন কার্য্যেই ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাই জগদ্বাসীর জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শের ন্যায় (ত্রুটিহীন) উত্তম আদর্শ আর হইতে পারে না।

ছুরার অংশবিশেষ বা এক রাকাতে দুই ছুরা পড়া

● একদা নবী (দঃ) ফজরের নামাযের ছুরা "মুমেনুন" পড়া আরম্ভ করিলেন। উক্ত ছুরায় হযরত মুছা ও হারুনের কিম্বা হযরত ঈসার আলোচনার আয়াতে পৌঁছিলে হযরতের হাঁচি আসিল। হযরত (দঃ) ওখানেই কেরাত ক্ষান্ত করিয়া রুকুতে চলিয়া গেলেন।

● একদা ওমর (রাঃ) ফজরের প্রথম রাকাতে ছুরা বাকারা হইতে একশত বিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একশত আয়াত হইতে কম পরিমাণের অন্য একটি ছুরা পড়িলেন।

● একদা ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম রাকাতে ছুরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে শেষ ৪।৫ পারার মধ্য হইতে একটি ছুরা পড়িলেন।

● একটি ছুরা ভাল করিয়া উভয় রাকাতে পড়া বা প্রথম রাকাতে যেই ছুরা পড়িয়াছে দ্বিতীয় রাকাতে পুনরায় ঐ ছুরাই পড়া সম্পর্কে তাবেয়ী কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই; সবই আল্লাহ তায়ালার কেতাবের অংশ।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আহনাফ ইবনে কায়স (রঃ) প্রথম রাকাতে ছুরা কাহাফ, দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা ইউসুফ বা ছুরা ইউনুস পড়িয়াছেন ও বলিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের পেছনে এইভাবে ফজরের নামায পড়িয়াছেন।

● কেরাত লম্বা করার জন্য এক রাকাতে একাধিক সুরা পড়া জায়েয আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—কোন ছুরার অংশ বিশেষ পড়ায় দোষ নাই বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ এরূপ আয়াত হইতে আরম্ভ করা যাহার বিষয়বস্তুর জরুরী অংশ পূর্বের আয়াতে থাকিয়া গিয়াছে বা এরূপ আয়াতের উপর ক্ষান্ত করা যাহার বিষয়বস্তু নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—ইহা মকরূহ এবং স্থান বিশেষে ত এইরূপ অসম্পূর্ণতা অত্যন্ত তিক্ত ও অপ্রিয় হয়; এরূপ ক্ষেত্রে কঠিন মকরূহ সাব্যস্ত হইবে (ফতহুল বারী, ২-২০০)। সুতরাং অর্থ বুঝা ব্যতিরেকে যথেচ্ছাভাবে ছুরার অংশ কাটিয়া পড়া সমীচীন নহে।

প্রথম রাকাতে পরের ছুরা এবং দ্বিতীয় রাকাতে আগের ছুরা পড়া জায়েয আছে, কিন্তু মকরূহ। অবশ্য ছুরা সমূহের বিন্যাসে ছাহাবীগণের মতভেদ ছিল। পরবর্তী যুগে খলীফা ওসমানের বিন্যাসই প্রচলিত রহিয়াছে, তাই উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৫০। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন আনছারী ছাহাবী কোবা নগরীর মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি যে কোন রাকাতে আলহামদুর ছুরার পর অন্য ছুরা পড়িতেন সেই অন্য ছুরার পূর্বে ছুরা ইখলাছ অবশ্যই পড়িয়া লইতেন, তারপর ঐ অন্য ছুরা পড়িতেন। প্রতি রাকাতেই তিনি এরূপ করিতেন। মোক্তাদীগণ তাঁহার এই অভ্যাসের সমালোচনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আপনি ছুরা এখলাছ পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়েন কেন? হয় শুধু ছুরা এখলাছ পড়ুন, নতুবা শুধু অন্য ছুরাটিই পড়ুন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমি আমার এই নিয়ম ত্যাগ করিব না। তোমরা যদি ইহা

ভালবাস তবে আমি তোমাদের ইমামতী করিব, নচেৎ ইমামতী করিব না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম—ইমামতীর উপযুক্ত, তাই তাঁহারা অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইতে রাজী ছিলেন না। অতঃপর সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করতঃ অভিযোগ পেশ করিলেন। নবী (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সাথীদের পরামর্শ গ্রহণ কর না কেন? তুমি ছুরা এখলাছকে এরূপ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছ কেন? তিনি আরজ করিলেন, আমি এই ছুরাটিকে আমার প্রাণ দিয়া ভালবাসি। (কারণ, এই ছুরাটি আমার মা'বুদের ছানা-ছিফৎ ও গুণগানে পরিপূর্ণ।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই ছুরার প্রতি গভীর ভালবাসা তোমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইয়া দিয়াছে।

৪৫১। **হাদীছ** :—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাত্রে তাহাজ্জুদ-নামাযের মধ্যে এক রাকাতেই "ছুরা কাফ" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছুরাগুলি পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, কবিতার ন্যায় ফর ফর করিয়া পড়িয়া শেষ করিয়া থাকিবে। (মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই শুধু পড়িয়া গিয়াছ, কিন্তু এরূপ না করিয়া প্রতিটি বাক্যের মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অল্প পড়াও ভাল।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই যেই ছুরাগুলি একত্রে এক রাকাতে পড়িতেন আমি সেই ছুরাগুলি জানি। তিনি একত্রে (অর্থের দিক দিয়া) সমতুল্য দুইটি ছুরা পড়িতেন। (বেশী পড়িতেন না, কারণ তিনি মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িতেন।)

মছআলাহ :—জোহর, আছর ও এশার শেষ রাকাতদ্বয়ে এবং মগরেবের তৃতীয় রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িবে; উহার সঙ্গে আর কোন ছুরা বা আয়াত পড়িবে না। সুতরাং প্রথম রাকাতদ্বয় অপেক্ষাকৃত লম্বা হইবে। ফজরেও প্রথম রাকাত অধিক লম্বা করিবে।

মছআলাহ :— জোহর ও আছরে সম্পূর্ণ কেরাতই নিঃশব্দে পড়িবে। (১০১ পৃঃ)

মছআলাহ :—ইমাম যদি নিঃশব্দের নামাযে (স্বেচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য বশতঃ ছোট) এক আয়াত পরিমাণ সশব্দে পড়ে তবে তাহাতে দোষ নাই; (উহাতে সেজদা-ছহু দিতে হইবে না (১০৭ পৃঃ ৪৬১ হাঃ)। কিন্তু যদি বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ নিঃশব্দের স্থানে সশব্দে কিম্বা সশব্দের স্থানে নিঃশব্দে পড়ে; ইচ্ছাকৃত কিম্বা ভুলে তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সেজদা-ছহু দিতে হইবে। আর যদি উক্ত পরিমাণ হইতে কম ঐরূপ করে ভুলবশতঃ অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া ইচ্ছাকৃত তবে সেজদা-ছহু দেওয়া ওয়াজেব নহে, কিন্তু উত্তম। (শামী, ১—৬৯৫)

"আমীন" বলার ফজিলত ও নিয়ম

৪৫২। **হাদীছ** :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ইমাম আলহামদু ছুরা শেষ করিয়া আমীন বলিবে, তুমিও

তখন আমীন বলিও। (ঐ সময়) ফেরেশতাগণও আমীন বলিয়া থাকেন। যাহাদের আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সঙ্গে সঙ্গে হইবে তাহাদের পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। নবী (দঃ) আমীন বলিতেন।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) ইমাম ও মোক্তাদী উভয়ের জন্য "আমীন" সশব্দে পড়ার কথা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ জেহ্‌রী নামাযে) এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেন।

"আমীন" জেহ্‌রী নামাযে সশব্দে বলায় কোন ইমামের মজহাবেই নামায দূষিত হয় না এবং গোনাহ হয় না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফার মজহাবে "আমীন" নিঃশব্দে বলাই সুন্নত তরীকা এবং অন্যান্য ইমামের মজহাবে সশব্দে বলা সুন্নত তরীকা। উভয় নিয়ম সম্পর্কেই হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই সকলেই উভয় নিয়মকে জায়েয বলিয়াছেন।

ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্য দ্বারা ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ইমামের সহিত শরীক হইতে যদি কারণ বশতঃ বিলম্ব হইয়া পড়ে তবে যথাসাধ্য ইমামের আমীন বলার পূর্বে (তথা আলহামদু ছুরা সম্পূর্ণ করার পূর্বে, যেহেতু উহা সম্পূর্ণ করিয়াই ইমাম আমীন বলিবেন) ইমামের সহিত শরীক হইতে তৎপর হইবে। কারণ তাহা হইলে ইমামের সহিত আমীন বলার সুযোগ পাইবে যাহার অনেক ফজিলত।

কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধা

৪৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি মসজিদে পৌঁছিলেন—যখন নবী (দঃ) রুকুতে ছিলেন। (তিনি ভাবিলেন—ইমামের রুকু শেষ হইবার পূর্বে শরীক হইতে না পারিলে এক রাকাত নামায ছুটিয়া যাইবে এবং পূর্ণ জমাতের সওয়াব পাওয়া যাইবে না,) তাই তিনি তাড়াহুড়ার মধ্যে কাতারে শামিল না হইয়াই নামাযের নিয়্যত করিয়া ফেলিলেন। নামাযান্তে হযরতের নিকট ঘটনা বলা হইলে হযরত (দঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন—আল্লাহ তায়ালা তোমার (অধিক সওয়াব আহরণের চেষ্টা ও) আকাঙ্খাকে বর্দ্ধিত করুন। অতঃপর বলিলেন—কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধিয়াছ—এরূপ কখনও করিও না।

নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিবে

৪৫৪। **হাদীছ ঃ**—মোতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি এবং ছাহাবী এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বছরা শহরে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে নামায পড়িলাম। তিনি প্রত্যেক সেজদায় যাইতে এবং দুই রাকাতের পর বসা হইতে উঠিতে তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে ছাহাবী এমরান (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া (আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করতঃ) বলিলেন, তিনি আমাকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের রূপ স্মরণ করাইয়া দিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের প্রতিটি উঠা-বসায় তকবীর বলিতেন।

৪৫৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর শাগেদ একরেমা (রঃ) বলেন—আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে জমাতে নামায পড়িলাম। তিনি (চার রাকাত নামাযে) বাইশটি তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, এই বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য বলিয়া মনে হয়। (কারণ এতগুলি তকবীর বলার দরকার দেখা যায় না—রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় যাইতে এবং প্রথম সেজদা হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে তকবীর না বলিলেও চলে।) ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই দুনিয়া হইতে উঠিয়া যা; এই বৃদ্ধ যাহা করিয়াছেন তাহাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত। (ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) ছিলেন, একরেমা (রঃ) তাঁহাকে চিনিতেন না। সেই কালে উমাইয়া বংশের আমীর-ওমরারা ইমামতি করিতে তকবীরের সংখ্যা কম করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।)

৪৫৬। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন তকবীর বলিতেন। যখন রুকুতে যাইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং রুকু হইতে উঠিতে "ছামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ" বলিতেন এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া "রাব্বানা ওয়া লাকালহামদু" বলিতেন। তারপর প্রথম সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে, তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন। নামাযের শেষ পর্যন্ত এরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের পর বসা হইতে উঠিবার সময় তকবীর বলিতেন।

রুকু অবস্থায় হাঁটুর উপর হাতদ্বয়ের ভর করিবে

৪৫৭। হাদীছ :—মোছায়া'ব ইবনে সায়া'দ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে নামায পড়িতেছিলাম। আমি রুকু অবস্থায় আমার দুই হাত জোড় করিয়া হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে লটকাইয়া রাখিলাম। নামাযান্তে পিতা আমাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার প্রথমে এরূপ নিয়মই ছিল, কিন্তু (ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক) এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া দুই হাত হাঁটুর উপর রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে

রুকু ও সেজদা ভালরূপে না করার পরিণতি

রুকু ভালরূপে করার অর্থ এই যে—এরূপ শান্তভাবে রুকু করিবে যেন কোমর, পিঠ মাথা সমান বরাবর হয়, এই অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার "সোব্‌হানা রাব্বিয়াল আজীম" বলিয়া পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইলে যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে যাইয়া পৌঁছে।

সেজদা ভালরূপে করার অর্থও তদ্রূপই যে, নিয়ম অনুযায়ী সেজদায় যাইয়া নাক ও কপাল মাটিতে লাগাইয়া রাখা অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার "সোব্‌হানা রাব্বিয়াল-আলা" বলিয়া সোজা হইয়া বসিবে, তারপর পুনরায় সেজদায় যাইবে।

৪৫৮। হাদীছ :—ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে ভালরূপে রুকু-সেজদা করিতেছে না। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার নামায ঠিক হয় নাই। আরও বলিলেন, তুমি যদি এই অভ্যাসের উপরই থাক তবে আল্লাহ কর্তৃক রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত আদর্শ হইতে বিচ্যুত অবস্থায় তোমার জীবন অতিবাহিত হইবে।

রুকু ও সেজদাতে কত সময় অবস্থান করিবে?

৪৫৯। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রুকু, সেজদা ও দুই সেজদার মধ্যে এবং রুকু হইতে দাঁড়াইয়া—এই কয়টি অবস্থায় প্রায় সমপরিমাণ সময় ব্যয় করিতেন।

ভালরূপে রুকু ও সেজদা না করিয়া নামায পড়িলে ঐ নামায পুনরায় পড়িতে হইবে

৪৬০। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (দঃ) মসজিদের এক কিনারায় বসিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া নামায আরম্ভ করিল। (নবী (দঃ) তাহার নামাযের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন।) সে নামাযের রুকু ও সেজদা ভালরূপে ধীরে ধীরে আদায় করিতেছিল না।) লোকটি (এইরূপে) নামায শেষ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল এবং তাঁহাকে সালাম করিল। নবী (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমার নামায হয় নাই, তুমি পুনরায় নামায পড়িয়া আস। সে দ্বিতীয়বার নামায পড়িল (কিন্তু ঐ প্রথমবারের মতই পড়িল) এবং হযরতের নিকট আসিয়া সালাম করিল। এবারও তিনি ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমার নামায হয় নাই, তুমি পুনরায় নামায পড়িয়া আস। সে এইবারও ঐরূপ নামায পড়িল। হযরত নবী (দঃ) তাহাকে ঐরূপই বলিলেন। তিনবার এরূপ করার পর লোকটি আরজ করিল, হুজুর! যে আল্লাহ আপনাকে সত্য ধর্মের বাহকরূপে রসুল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সেই আল্লার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, আমি ইহার চেয়ে উত্তমরূপে নামায পড়িতে জানি না। আপনি আমাকে নামায পড়া শিখাইয়া দিন। অতঃপর নবী (দঃ) তাহাকে নামায শিক্ষা দিতে লাগিলেন—তিনি বলিলেন, নামাযের পুর্বে উত্তমরূপে অজু করিবে, তারপর কেবলাদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে, তারপর "আল্লাহু আকবার" বলিবে।* অতঃপর কোরআনের যাহা কিছু ছুরা পড়া তোমার পক্ষে

---

* "আল্লাহু আকবার" এর তাৎপর্য্য এই যে—এক আল্লাহই বড়, আর কেহই বড় নাই। আমি সেই আল্লারই দাসানুদাস। এই বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করত: মুখে প্রকাশ করিবে এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইয়া ঐ আল্লার মাহাত্ম্য ও নিজের দাসত্বের স্বীকারোক্তিকে প্রমাণ করিবে এবং উহাকেই বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এবং "ছানা" পড়িয়া আল্লার প্রশংসা করিবে। তারপর "আউজু" পড়িয়া আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করত: "বিছমিল্লাহ" পড়িয়া "আলহামদু" ছুরা পড়িবে।

সহজ ও সম্ভব হয় তাহা পড়িবে। তারপর আল্লাহু-আকবার বলিয়া মাথা ঝুকাইবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু করিবে।+ তারপর "ছামিয়াল্লাহুলেমান হামিদাহ"÷ বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পৌঁছিতে পারে। অতঃপর আল্লাহু-আকবার বলিয়া ধীরস্থিরভাবে উত্তমরূপে সেজদা করিবে।× তারপর মাথা উঠাইয়া স্থিরভাবে বসিবে। পুনরায় ঐরূপে সেজদা করিবে এবং সেজদা হইতে উঠিবে। এইরূপে (ধীরস্থিরভাবে ভক্তি ও মহব্বতের সহিত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নামায আদায় করিবে।

রুকু ও সেজদার মধ্যে দোয়া করা

৪৬১। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (শেষ বয়সে অনেক সময়) রুকু এবং সেজদার মধ্যে এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى -

"হে খোদা—আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই পবিত্রতার গুণগান করিতেছি এবং তোমারই প্রশংসা গাহিতেছি। তুমি আমার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দাও।"

প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া কোরআনের একটি আয়াতের অনুসরণ করিতেন।

ব্যাখ্যা :— ছুরা নছরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মক্কা বিজয়ের বিরাট সাফল্যের এবং ব্যাপক আকারে ইসলাম বিস্তারের সুসংবাদ প্রদান ও ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি বিষয়ের আদেশ দান করেন—

"আপনি স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা করতঃ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার জীবনের শেষ দিকে ঐ সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত দেখিয়া উক্ত আয়াতের আদেশত্রয়ের অনুসরণে ঐ দোয়া করিতেন।

+ উত্তমরূপে রুকু, সেজদা করার অর্থ ও নিয়ম ৪৫৮ নং হাদীছের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। রুকু, সেজদায় سبحان ربى العظيم ও سبحان ربى الاعلى পড়া হয়। উহার অর্থ—আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতার স্বীকারোক্তি এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেছি।

÷ ইহার অর্থ—"আল্লার প্রশংসা যে কেহই করুক, আল্লাহ তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া থাকেন"। ইহা বলার পর اللهم ربنا لك الحمد বলিবে। অর্থ—"হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকর্তা; সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই"।

× সেজদা আটটি অঙ্গ দ্বারা করিবে। আটটি অঙ্গ এই—দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত ও নাক এবং কপাল। এই অঙ্গগুলি জমীনের সহিত স্পর্শিত রাখিবে।

রুকু হইতে উঠাকালে ইমাম কি বলিবে এবং মোক্তাদী কি বলিবে?

৪৬২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে উঠিবার সময় "ছামিয়াল্লাহু-লিমান-হামিদাহ্" বলিতেন এবং সোজা হইয়া "আল্লাহুম্মা-রাব্বানা-ওয়া-লাকাল-হামদ্" বলিতেন।

৪৬৩। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম "ছামিয়াল্লাহু-লিমান-হামিদাহ্" বলিবেন তখন তোমরা (মোক্তাদীগণ) "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলিও। কারণ, ঐ সময় ফেরেশতাগণও উহা বলিয়া থাকেন। যাহার ঐ বাক্য ফেরেশতাদের ঐ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইবে তাহার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

৪৬৪। **হাদীছ ঃ**—রেফাআহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে নামায পড়িতেছিলাম। হযরত যখন ছামিয়াল্লাহু-লিমান হামিদাহ্ বলিয়া রুকু হইতে উঠিলেন, তাঁহার পেছনে একজন মোক্তাদী বলিল—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

অর্থাৎ—হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যে, আমাকে তোমার দরবারে হাজির হইবার সুযোগ দান করিয়াছ উহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার প্রাণে তোমার প্রতি বহু বহু আবেগ আছে যাহা প্রকাশ করিয়া শেষ করার মত নয় এবং আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে খাঁটীভাবে আমি তোমার বহু বহু প্রশংসা করিতেছি; সেই পবিত্র প্রশংসা অফুরন্ত যাহার অন্ত নাই।

নামাযান্তে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, (নামাযের মধ্যে পেছন দিক হইতে কতগুলি শব্দ-উচ্চারণ শ্রুত হইয়াছে; ঐ) শব্দগুলির উচ্চারণকারী কে? ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ঐ শব্দগুলি বলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ঐ শব্দগুলি এত বড় উচ্চ মর্য্যাদাপূর্ণ এবং আল্লার নিকট এত মধুর ও পছন্দনীয় ছিল যে, আমি ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছেন যে, কে ঐ শব্দগুলিকে সকলের আগে (আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌঁছাইবার জন্য) লিখিয়া লইতে পারেন।

রুকু হইতে উঠিয়া সোজা ও স্থিরভাবে দাঁড়াইবে উভয় সেজদার মধ্যেও তদ্রূপে বসিবে

৪৬৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য সময় সময় নামায পড়িতেন এবং বলিতেন, নবী (দঃ)কে যেইরূপ নামায

পড়িতে দেখিয়াছি, সেইরূপ নামায দেখাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আনাছ (রাঃ)কে সেইরূপ ক্ষেত্রে এমন একটি কাজ করিতে দেখিয়াছি যাহা তোমাদিগকে করিতে দেখি না। তিনি যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতেন তখন এরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইতেন যে, আমরা মনে করিতাম যেন তিনি সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং দুই সেজদার মধ্যেও এরূপ স্থিরভাবে বসিতেন—মনে হইত যেন দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (১২০ পৃঃ)

৪৬৬। **হাদীছঃ**—বিশিষ্ট তাবেয়ী আবু কেলাবা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) আমাদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য ফরজ নামাযের জমাতের সময় ছাড়া অন্য সময় (নফলরূপে) নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন।

একদা তিনি আমাদের মসজিদে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নামায পড়িব ; এখন আমার শুধু নামায পড়াই উদ্দেশ্য নহে ; নবী (দঃ)কে যিরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছি তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামায পড়িব।

আবু কেলাবা (রঃ) সেই নামাযের বর্ণনা দানে বলেন, যখন তিনি দাঁড়াইলেন তখন ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দররূপে দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। তারপর রুকু ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দরভাবে করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, তারপর সেজদা করিলেন, অতঃপর সেজদা হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে বসিলেন তারপর পুনঃ সেজদা করিলেন। (৯৩, ১১১, ১১৫ পৃঃ)

তকবীর বলার সঙ্গেই রুকু-সেজদার জন্য অবনত হইবে

৪৬৭। **হাদীছঃ**—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) ফরজ এবং অন্য নামায, রমজান শরীফে এবং অন্য সময়ে সব রকম নামাযেই এই নিয়মে তকবীর বলিতেন—প্রথম দাঁড়াইয়া তকবীর বলিতেন, রুকুতে যাওয়াকালে তকবীর বলিতেন, তারপর ছামিয়াল্লাহু লিমান-হামিদাহ্ এবং তৎপর রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্ বলিতেন—সেজদায় যাইবার পূর্বে। অতঃপর সেজদার জন্য নত হইয়া যাইতে আল্লাহু আকবার বলিতেন, তারপর সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন, দ্বিতীয় সেজদায় যাইতেও তকবীর বলিতেন এবং উহা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। নামাযের প্রতি রাকাতেই এইরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের বসা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপে নামায শেষ করিয়া বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের সর্বাধিক দৃষ্টান্তে নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগ করা পর্য্যন্ত এই আকারেই নামায পড়িতেন। (এই হাদীছে বর্ণিত আর একটি বিষয় ৫৪৭ নম্বরে অনূদিত হইবে।)

সেজদার মহত্ত্ব ও ফজিলত

এই পরিচ্ছেদে একটি সুদীর্ঘ হাদীছের উল্লেখ আছে; সেই হাদীছখানার পূর্ণ অনুবাদ সপ্তম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে আসিবে। হাদীছখানার বিষয়-বস্তু হইল হাশর-ময়দান, পুলছেরাৎ, দোযখ ও আখেরাতের নানা অবস্থার বয়ান। উক্ত হাদীছের বয়ানে রহিয়াছে যে, হাশর-ময়দানের হিসাব-নিকাশের পর প্রাথমিক পর্য্যায়ে অনেক মোমেন-মোসলমানও বিভিন্ন গোনাহের পরিণামে দোযখে যাইবে। তারপর শাফায়াত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঐ সব পাপী মোমেন-মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া হইবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা ঐ পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিতে থাকিবেন।

দোযখের মধ্যে চিরজাহান্নামী কাফেররা অগণিত সংখ্যায় হইবে। দুনিয়ায় কাফেরের অনুপাতে মোসলমান-সংখ্যা হাজারে একজন মাত্র; এই নগণ্য সংখ্যক মোসলমানও ভাগ হইয়া এক ভাগ বেহেশতে, এক ভাগ দোযখে গিয়াছে। কাফেররা ত সবই দোযখে গিয়াছে। দোযখে এই অসংখ্য কাফেরদের মধ্য হইতে অতি নগণ্য সংখ্যক পাপী মোমেন-মোসলমানকে ফেরেশতাগণ কর্তৃক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করার যে ব্যবস্থা হইবে উহার বর্ণনায় উক্ত হাদীছে আছে—

وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِاٰثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ اِبْنِ اٰدَمَ تَاْكُلُهُ النَّارُ اِلَّا اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيٰوةِ

"ফেরেশতাগণ দোযখের মধ্যে ঐ সব পাপী মোমেন মোসলমানদিগকে তাহাদের চেহারায় সেজদায় নিশান বা চিহ্ন দেখিয়া চিনিবেন। আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুনের জন্য অসাধ্য করিয়া দিবেন সেজদার নিশান ভস্ম করা। ঐ পরিচিতির দ্বারাই পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে বাহির করা হইবে। দোযখের আগুন মানুষের সবই ভস্ম করিবে, কিন্তু সেজদার নিশান ভস্ম ও বিকৃত হইবে না। তাহাদিগকে দোযখ হইতে এরূপে বাহির করা হইবে যে, আগুনে পুড়িয়া তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উপর জীবনী-শক্তির পানি বহাইয়া দেওয়া হইবে; ফলে তাহারা সোনালী রঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।"

মোমেন মোসলমান যাহারা নামাযী তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান থাকা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে— سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ "মোমেনের চেহারায় সেজদার নিশান হইল তাহাদের পরিচয়।" (২৬ পাঃ ১২ রুঃ)

চেহারায় সেজদায় নিশান বলিতে চেহারার উপর নূরের আভাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেজদার পরিমাণ হিসাবে এই আভার পরিমাণও কম-বেশী হয়, এমনকি যাহারা সর্বদা নামাযে অভ্যস্ত তাহাদের এবং বিশেষতঃ যাহারা তাহাজ্জুদ নামাযেও অভ্যস্ত তাহাদের চেহারার সেই আভা ত সচরাচর দৃষ্ট। সেজদার এই আভা আখেরাতের জীবনে অধিক দীপ্ত ও অক্ষয় রেখাপাতকারী হইবে। এমনকি হাশরের মাঠে মোমেনদের সেজদার আভায় তাহাদের সম্পূর্ণ মাথা সূর্য্যের স্থায় চমকিত হইবে (তফছীর মোজেহুল-কোরআন)। এই আভার বিন্দুও যাহার চেহারায় আছে সে খোদা-নাখাস্তা দোযখের আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেলেও তাহার সেই আভাবিন্দু অক্ষয় হইয়া থাকিবে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে। এই আভাবিন্দুর পরিমাণের তারতম্যে পরিচিতির মধ্যে অবশ্যই আগ-পাছ হইবে। এই তথ্য দৃষ্টে সেজদার মহত্ত্ব সহজেই অনুমেয়। সেজদার নিশান বলিতে বস্তুতঃ নূরের আভা বটে, কিন্তু সেজদার আধিক্যে সৃষ্ট কপালের দাগও সৌভাগ্যের বস্তুই; বিদ্রূপ বা উপেক্ষার বস্তু নহে।

সেজদাবস্থায় উভয় বাহু পাঁজরা হইতে ব্যবধানে রাখিবে

৪৬৮। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদাবস্থায় বাহুদ্বয়কে পাঁজরা হইতে এত দূর ব্যবধানে রাখিতেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দেখা যাইত।

সাতটি অঙ্গে সেজদা করিতে হইবে

৪৬৯। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করিতে আদেশ করিয়াছেন। (চেহারা, অর্থাৎ) কপালের সঙ্গেই নাককেও বিশেষভাবে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের সম্মুখ ভাগ। আরও আদেশ করিয়াছেন যে—কাপড় ও মাথার চুল (সেজদার সময় এলোমেলো হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য) টানিয়া রাখিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দ্বারা কয়েকটি মছআলাহ প্রমাণিত হইল—(১) সেজদার মধ্যে কপালের সঙ্গে নাককেও মাটিতে লাগাইতে হইবে এবং উভয় পাও মাটিতে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। ৪৭৫নং হাদীছে আছে যে সেজদাবস্থায় উভয় পা মাটির সঙ্গে এরূপে লাগাইয়া রাখিবে যেন পা-দ্বয়ের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী হইয়া থাকে। (২) সর্বাঙ্গ ও সর্বস্ব দ্বারা আল্লার হুজুরে সেজদা করিবে—সেই সময় কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদির পারিপাট্যের প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখিবে না। নতুবা মনে হইবে যেন সেজদার চেয়ে কাপড় ও চুলের পারিপাট্যের মূল্য বেশী।

অবশ্য বোখারী (রঃ) ১১৩ পৃষ্ঠায় একটি মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছতর খুলিবার আশঙ্কায় কাপড় টানিয়া রাখা বা গিরা ইত্যাদি দিয়া রাখা জায়েয আছে।

৪৭০। হাদীছ ঃ—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ছাহাবীর নিকট যাইয়া বলিলাম, চলুন; খেজুর বাগানে যাইয়া আমরা নবীজীর (দঃ) হাদীছ আলোচনা করি; সেমতে তিনি চলিলেন। আলোচনায় আমি তাঁহাকে লাইলাতুল-কদর সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের প্রথম দশ দিন এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তাঁহার অনুকরণে এ'তেকাফ করিলাম। (দশ দিন গত হইলে পর) জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, আপনি যে বস্তুর উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিয়াছেন (অর্থাৎ লাইলাতুল-কদর) উহা আরও সম্মুখে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মধ্যবর্তী দশ দিনেরও এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তদ্রূপ করিলাম। এবারও জিব্রাঈল (আঃ) ঐরূপ বলিলেন। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রমযানের বিশ তারিখের সকাল বেলা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহারা আমার সঙ্গে এ'তেকাফরত ছিল তাহারা আরও কিছু দিন এ'তেকাফরত থাকিবে, কারণ লাইলাতুল-কদর শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্রি সমূহের মধ্যে হইবে। আমাকে আল্লাহ তায়ালা উহা নির্দিষ্ট করিয়া (স্বপ্নে) জানাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি; স্বপ্নের কথা এতটুকু আমার স্মরণ আছে যে, আমি যেন লাইলাতুল-কদরের সকাল বেলা কাদার উপর সেজদা করিতেছি। হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—বিশ তারিখে সকাল বেলায় রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে এরূপ বলিলেন। ঐ দিনটি খুবই পরিষ্কার দিন ছিল, কোন প্রকার বৃষ্টি-বাদলের চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং একুশ তারিখে সারারাত্র বৃষ্টিপাত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে খেজুর পাতার চাল ছিল; তাঁহার নামায স্থানে পানি পড়ায় ঐ স্থান ভিজিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামায শেষ করিলে আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তাঁহার কপাল ও নাকের উপর স্পষ্টতঃ কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। (তখন চাক্ষুষরূপে আমরা তাঁহার স্বপ্নকে সপ্রমাণিত বুঝিয়া নিলাম)।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিজা জায়গার উপর পূর্ণ ও উত্তমরূপে সেজদা করিয়া কপাল ও নাককে কর্দমাক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সেজদা করার নিয়ম

৪৭১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তোমরা সুন্দররূপে স্থিরতার সহিত সেজদা করিও। সেজদার সময় দুই হাত কুকুরের হাতের ন্যায় জমিনের উপর বিছাইয়া দিও না। (১১৩ পৃঃ)

৪৭২। হাদীছ ঃ—মালেক ইবনুল হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছেন যে, তিনি প্রথম রাকাতে ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবার পর বসিয়া তারপর দাঁড়াইতেন; সরাসরি দাঁড়াইতেন না। (১১৩ পৃঃ)

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সেজদা হইতে দাঁড়াইবার নিয়ম

ব্যাখ্যা ঃ—বয়োপ্রাপ্তি বা অন্য কোন দুর্বলতার অবস্থায় এইরূপ করা সুন্নত তরীকার মধ্যে শামিল। সাধারণ অবস্থাতেও এরূপ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু না বসিয়া সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বোখারী শরীফের ৯৮৬ পৃষ্ঠার একটি হাদীছে উল্লেখ আছে এবং এতদ্ভিন্ন ছেহাহ ছেত্তার অন্যান্য কেতাবেও অনেক হাদীছ আছে। ছাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে সচরাচর সাধারণ অবস্থায় তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিয়া বসা হইত না বলিয়া বোখারী শরীফের এই ১১৩ পৃষ্ঠারই মধ্যভাগে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুই রাকাতের বৈঠক হইতে উঠিতে তকবীর বলিবে

৪৭৩। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনুল হারেছ (রাঃ) একদা ইমাম হইয়া নামায পড়াইলেন। সেজদায় যাইতে, সেজদা হইতে উঠিতে, দুই রাকআতের বসা হইতে দাঁড়াইতে সশব্দে তকবীর বলিলেন এবং বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

নামাযের মধ্যে বসিবার নিয়ম

৪৭৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি নামাযের মধ্যে আসন করিয়া বসেন। তাঁহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া আমিও এরূপ করিলাম; তখন আমি যুবক বয়সের। আমার পিতা আমাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—নামাযের মধ্যে সুন্নত তরীকায় বসা এই যে, ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা মোড়িয়া বসিবে। আমি বলিলাম, আপনি আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, আমি ওজরবশতঃ এরূপ করিয়া থাকি, কারণ আমার পাদ্বয় মচকিয়া যাওয়ায় উহার উপর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী বসা সম্ভব হয় না।

৪৭৫। হাদীছ ঃ—আবু হোমায়েদ সায়েদী (রাঃ) একদা বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা আমি তোমাদের তুলনায় বেশী জানি আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভ করার জন্য যখন তকবীর বলিতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্য্যন্ত উঠাইতেন (৪৩২নং হাদীছের নোট দেখুন) রুকুতে যাইয়া হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর শক্তভাবে রাখিতেন এবং পিঠকে সমতলরূপে ঝুঁকাইতেন (অর্থাৎ এরূপে রুকু করিতেন যেন পিঠ, কোমর ও মাথা এক বরাবর থাকে।) যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন, যেন মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যায়। যখন সেজদা করিতেন তখন উভয় হাত জমিনের উপর বিছাইয়াও দিতেন না বা শরীরের

সঙ্গে চিমটাইয়াও রাখিতেন না এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মোড়িয়া কেবলামুখী রাখিতেন। যখন দুই রাকাতের পর বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া দিয়া উহার উপর বসিতেন। যখন শেষ রাকাতে বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বাহির করিয়া নিতম্ব জমিনে রাখিয়া বসিতেন।

ব্যাখ্যা :—হানাফী মজহাব মতে নামাযের মধ্যে ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের উপর বসিবে, নিতম্বকে জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসিবে না, বরং বাম পা বিছাইয়া উহার উপর নিতম্ব রাখিবে—যেরূপ ৪৭৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ; নামাযের সব বসাতেই এই নিয়ম। উক্ত নিয়মে বসা অপেক্ষা নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাতে শরীর অপেক্ষাকৃত একটু অধিক গুটানো ও সঙ্কুচিত থাকে বিধায় হানাফী মজহাবেও মহিলাদের জন্য নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাকে উত্তম বলা হয় এবং উপরোল্লিখিত নিয়মকে শুধু পুরুষের জন্য উত্তম বলা হইয়াছে। হানাফী মজহাবে নামাযের মধ্যে পুরুষ ও নারীদের জন্য বসিবার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

যেই ইমামগণের মজহাবে পুরুষদের জন্যও নিতম্ব জমিনে লাগাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, যেরূপ ৪৭৫নং হাদীছে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের বসার নিয়ম একই হইবে। যেমন ইমাম বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী উম্মুদ-দরদা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে পুরুষের ন্যায়ই বসিতেন এবং তিনি একজন মছলা-মাছায়েল বিশেষজ্ঞা ছিলেন। ফল কথা—প্রত্যেক ইমামের মজহাবেই নারীদের জন্য নিতম্ব জমিনে ঠেকাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, অবশ্য পুরুষদের জন্য উত্তম নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ আছে।

নামাযে বসা অবস্থায় কি পড়িবে ?

৪৭৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (নামাযের বৈঠকে) এরূপ বলিতাম—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে, আস্‌সালামু আ'লা জিব্রাঈল, আস্‌সালামু আ'লা মিকাঈল ইত্যাদি ইত্যাদি। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে (আল্লার জন্য শান্তির দোয়া) বলিও না। আল্লাহ তায়ালাই ত শান্তিদাতা। নামাযে তোমরা এরূপ বলিবে—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ٥

অর্থ :—"মৌখিক ও শারীরিক এবং হালাল মাল খরচ করত: যে সব এবাদৎ করা হয়—সব রকম এবাদৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লার রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লার সমস্ত নেক ও সৎ বন্দা—মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি মনে প্রাণে অঙ্গীকার করিতেছি ও ঘোষণা দিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও ঘোষণা দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।" ইহার পর অন্য কোন দোয়া পড়িবে।

এরূপ বলিলে জিব্রাঈল, মিকাঈল সকলেই (শান্তির দোয়ায়) শরীক হইয়া যাইবেন, নাম লইতে হইবে না, অধিকন্তু অন্যান্য সকল সৎ বন্দাগণও শরীক হইবেন।

৪৭৭। **হাদীছ :**—* কায়া'ব ইবনে ওজরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম ত আল্লাহ তায়ালা (আপনার মুখে আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি আপনার আহলে বাইত সহ ছালাত বা দরুদ কিরূপে পাঠ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى
اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থ—হে আল্লাহ! বিশেষ বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন হযরত মোহাম্মদের উপর এবং হযরত মোহাম্মদের আহলে-বাইত—পরিবার-পরিজনের উপর যেমন আপনি বিশেষ রহমত বর্ষণ করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমের উপর এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

---

* এই হাদীছে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি সামান্য একটু শব্দগত বিভিন্নতার সহিত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) আবু হোমায়েদ সায়েদী (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে এবং ছাহাবীত্রয়ের হাদীছ তিনটি ইমাম বোখারী (রঃ) তিন স্থানে বয়ান করিয়াছেন—(১) নবীদের ইতিহাস অধ্যায়ে—হযরত ইব্রাহীমের বয়ান, (২) তফছীর অধ্যায়ে—ছুরা আহযাবের তফছীর, (৩) দোয়ার অধ্যায়ে—হযরতের প্রতি দরুদের বয়ান।

নামাযের অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই, আমরাও চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত এস্থলে এই হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছিলাম না। ইতিমধ্যে কোন কোন পাঠকের পত্রে তাহার বিভ্রান্তির সংবাদে উক্ত প্রথমস্থানে বর্ণিত হাদীছ খানা এস্থানে বয়ান করিয়া দেওয়া হইল।

আয় আল্লাহ। বরকত, কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন হযরত মোহাম্মদকে এবং হযরত মোহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে, যেমন বরকত দান করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমকে এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনকে, নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥

"নিশ্চয় আল্লাহ দরূদ (বিশেষ রহমত) পাঠাইয়া থাকেন এবং ফেরেশতাগণ দরূদ (বিশেষ রহমতের দোয়া) পড়িয়া থাকেন নবী—মোহাম্মদের প্রতি; হে মোমেনগণ। তোমরাও দরূদ (রহমতের দোয়া) পাঠ কর তাঁহার প্রতি এবং বিশেষ সালাম পাঠ কর।"

উক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক হযরতের প্রতি দরূদ ও সালাম অন্ততঃ একবার পাঠ করা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরজ। তার অধিক সর্বদার জন্য পাঠ করা অতিশয় ফজিলতের কাজ এবং সুন্নত, বিশেষতঃ নামাযের শেষ বৈঠকে। যেহেতু স্বয়ং হযরত (দঃ) আত্তাহিয়্যাতুর সঙ্গে তাঁহার প্রতি সালাম পাঠ শিক্ষা দিয়াছেন এবং ঐ সালাম শিক্ষা দেওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই ছাহাবীগণ "ছালাত" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাও উল্লেখিতরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সালাম ও ছালাত উভয়টিই বিশেষরূপে নামামের মধ্যে প্রযোজ্য থাকিবে। অধিকন্তু উক্ত ছালাত বা দরূদ শিক্ষা দান নামায সম্পর্কে ছিল বলিয়া অনেক হাদীছেও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (ফতহুলবারী ১১—১৩৬)

সালামের পূর্বে দোয়া করিবে

৪৭৮। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের মধ্যে (আত্তাহিয়্যাত ও দরুদের পরে) এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ۔

"হে আল্লাহ। আমি কবরের আজাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, অসৎ দজ্জালের ধোকা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর সময় সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর, আপনি ঋণ হইতে বিশেষ ও অধিকরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বলিতে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করে। (অর্থাৎ ঋণ অতি জঘন্য যাহা অনেক গোনাহের কারণ হয়।)

৪৭৯। **হাদীছ:**—আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন—আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দেন যাহা আমি নামাযের মধ্যে পাঠ করিব। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বলে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ:—হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অত্যধিক অত্যাচার (গোনাহ) করিয়াছি; একমাত্র তুমি ভিন্ন কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় করুণাবলে আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর; একমাত্র তুমিই ক্ষমাকারী।

মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সালাম করিবে

৪৮০। **হাদীছ:**—এত্বান ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি, হযরত (দঃ) যখন সালাম ফিরিয়াছেন আমরাও তখনই সালাম ফিরিয়াছি।

ব্যাখ্যা:—উক্ত হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ বলিয়াছেন যে, মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই সালাম ফিরিবে (অতিরিক্ত দোয়া-দরুদে লিপ্ত হইয়া সালাম ফিরিতে বিলম্ব করিবে না।) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বোখারী (রঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমামের সঙ্গেই মোক্তাদীদের সালাম ফেরাকে তিনি মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন যে, মোক্তাদীকে দুই সালামই করিতে হইবে; যেরূপ ইমাম দুই সালাম করিয়া থাকেন।

নামাযান্তে আল্লার জিকর করা

৪৮১। **হাদীছ:**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফরজ নামাযান্তে সশব্দে "আল্লাহু-আকবার" জিক্‌র করা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে ছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—উহা দ্বারা আমি নামায শেষ হওয়া উপলব্ধি করিতাম।

৪৮২। **হাদীছ:**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া এই অনুতাপ

প্রকাশ করিল যে, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ধন-দৌলত আল্লার রাহে খরচ করিয়া বড় বড় মর্তবা ও অফুরন্ত নেয়ামতসমূহের অধিকারী হইতেছে। কারণ, তাহারা আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, রোযা রাখে, তাছাড়া তাহাদের বেশী ধন-দৌলত আছে, যদ্বারা তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ করিয়া থাকে এবং ছদকা-খয়রাত করিয়া থাকে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে এমন ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিব যদ্দারা তোমরা অগ্রগামী ব্যক্তিগণের সমান হইতে সক্ষম হইবে এবং তোমরা সর্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐ ব্যবস্থা ও আমল অবলম্বন ব্যতীত কেহই তোমাদের বরাবর হইতে পারিবে না। (সেই আমলটি হইল—)

প্রতি নামাযের পর ছোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আল্‌হামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়িবে।

ব্যাখ্যা :— মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই হাদীছের সঙ্গে আরও একটু অংশ উল্লেখ হইয়াছে যে, কিছু দিন পর দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ পুনরায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আপনি আমাদিগকে যেই বিশেষ ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, আমাদের ধনাঢ্য ভাইগণ উহার খোঁজ পাইয়া তাঁহারাও উহা অবলম্বন করিয়াছেন। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নেক আমলের তৌফিক ও সামর্থ্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ মেহেরবানী ও দয়া; আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা দান করিয়া থাকেন। (সে বিষয়ে মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নাই; মানবের একমাত্র কর্তব্য হইল—স্বীয় শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করিয়া যাওয়া।)

৪৮৩। হাদীছ :—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ

وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ

لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

অর্থ :—একমাত্র আল্লাহ-ই মা'বুদ, তাঁহার কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, তিনিই জীবনদাতা, জীবন রক্ষক ও মৃত্যুদাতা এবং সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা দান করিবে তাহা কেহ বন্ধ করিতে পারে না, তুমি যাহা না দিবে তাহা কেহ দিতে পারে না। তুমি দান না করিলে ভাগ্যবানের ভাগ্যও তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।

নামাযান্তে ইমামের ডান বা বাম দিকে অথবা মোক্তাদীমুখী বসা

৪৮৪। **হাদীছ ঃ**—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া বসিতেন।

৪৮৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন স্বীয় নামাযের এক অংশ শয়তানকে দান না করে; এইরূপে যে, নামাযের পর ডান দিকে ঘুরিয়া যাওয়া জরুরী মনে করে। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনেক সময় বাম দিকেও ফিরিতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘৃণার কাজ ব্যতীত প্রত্যেক কাজেই বাম দিক অবলম্বন অপেক্ষা ডান দিক উত্তম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই "উত্তম"কে যদি কেহ জরুরী ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে তবে উহা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপের শামিল হইবে। তাই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এখানে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তদুপরি যে বিষয়কে জরুরী বলিয়া ধার্য্য করে নাই যদিও উহা উত্তম হয়, কিন্তু উত্তমকে জরুরী মনে করা শরীয়তের বিধান বহির্ভূত হওয়ায় উহা শয়তানের কারসাজি বলিয়াই গণ্য হইবে।

দুর্গন্ধময় বস্তু খাইয়া মসজিদে যাওয়া নিষেধ

৪৮৬। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ বা রসুন (ইত্যাদি দুর্গন্ধময় বস্তু) ব্যবহার করিয়াছে সে যেন মসজিদের নিকটেও না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে। সে যেন মসজিদ হইতে দুরে থাকে। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, মনে হয়— এস্থলে কাঁচা পেয়াজ-রসুনই উদ্দেশ্য এবং নিষেধাজ্ঞা উহার দুর্গন্ধের কারণে। জাবের (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে একটি পাত্রে খাদ্য উপস্থিত করা হইল যাহাতে (রসুন এবং উহার ন্যায় গন্ধময় "কর্‌রাছ" ইত্যাদি) বিভিন্ন তাজা সবজি (কুচিকাটারূপে) মিশ্রিত ছিল। হযরত (দঃ) উহার গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সবজিগুলির নাম বলা হইল; তখন হযরত (দঃ) এই খাদ্য তাঁহার অন্য এক সঙ্গীর সম্মুখে দেওয়ার জন্য বলিলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ না করায় ঐ ব্যক্তি উহা গ্রহণে অসম্মত হইল। এতদ্‌দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি খাও। আমার কথাবার্তা এমন জনের সঙ্গে হয় যাহার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয় না (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সঙ্গে)।

৪৮৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খায়বার যুদ্ধের সময়ে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রসুন জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।

৪৮৮। **হাদীছ** :—এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, রসুন সম্পর্কে আপনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কি বলিতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, এই জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইয়াছে, সে যেন আমাদের নিকটে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে।

ব্যাখ্যা :—৪৮৬নং হাদীছে ছাহাবী জাবের (রাঃ) স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, দুর্গন্ধের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। বিড়ি-সিগারেট ও হোক্কার দুর্গন্ধ যে কিরূপ তাহা সকলেই জানে, অতএব উহার অভ্যস্ত ব্যক্তিরা মসজিদে আসিবার পূর্বে উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে।

নারীদের মসজিদে যাওয়া

৪৮৯। **হাদীছ** :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কাহারও স্ত্রী যদি রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাহাকে অনুমতি দেওয়া চাই।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, নারীদের জন্য মসজিদে যাইতেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

৪৯০। **হাদীছ** :— উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে নারীগণ মসজিদে উপস্থিত হইত এবং সালাম ফিরা মাত্র বাহির হইয়া আসিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং পুরুষগণ বসিয়া থাকিতেন। (মহিলাগণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এরূপ অনুমান করিয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইলে পর পুরুষগণ দাঁড়াইতেন; এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) (এবং পুরুষগণ) মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই নারীগণ নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া সারিত। (১১৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছ দৃষ্টে বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, নারীদের জন্য মসজিদে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করার এবং নামায হইতে দ্রুত বাড়ী প্রত্যাবর্তন করার আদেশ ছিল। এই হাদীছে ইহাও সুস্পষ্ট যে, শুধু মাত্র মসজিদ-সংলগ্ন বাড়ী-ঘরের নারীরাই মসজিদে আসিত।

৪৯১। **হাদীছ** :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান যুগের নারীরা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা যদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জানিতেন তবে খোদার কসম—নিশ্চয় তিনি নারীগণকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন, যেরূপভাবে বনী ইস্রায়ীলের নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যাখ্যা :—আয়েশা (রাঃ) যেই যুগের নারীগণের প্রতি অভিযোগ করিতেছিলেন সেই নারীগণ হইলেন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার যুগের নারী, অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংলগ্ন যুগ, সেই যুগের পরেও উত্তম যুগ আরও একটি বা দুইটি বাকি ছিল। সেই যুগ হইতে দীর্ঘ তেরশত বৎসরের অধিক কাল পরের যুগ হইল বর্তমান যুগ। এই যুগের নারীদের অবস্থা আয়েশা (রঃ) দেখিলে কি বলিতেন? এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা জানিতে পারিলে কি করিতেন? উহা পাঠকগণের বিবেক-বুদ্ধির উপরই ছাড়া হইল।

২৯২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের এক স্ত্রী (রাত্রের অন্ধকারে) ফজর ও এশার নামাযের জমাতে মসজিদে যাইতেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আপনি কেন মসজিদে আসেন? অথচ জানেন যে, ওমর (রাঃ) ইহা নাপছন্দ করেন এবং ইহাতে ক্ষুব্ধ হন। স্ত্রী বলিল, ওমর (রাঃ) আমাকে (নিষেধ করেন না কেন?) নিষেধ করিতে বাধা কি? ঐ ব্যক্তি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ—"আল্লার বান্দাগণকে আল্লার মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।" (এই হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ওমর (রাঃ)কে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞায় বাধা দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ছাহাবীগণ নারীদের মসজিদে যাওয়ার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার আইন প্রয়োগ করিতেন না, কিন্তু যুগের পরিবর্তনে সকলেই উহাকে অবাঞ্ছিত গণ্য করিতেন। নারীদের মসজিদে বা ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কে জরুরী ও অধিক আলোচনা "ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে ও দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া" পরিচ্ছেদে ২২২নং হাদীছের ব্যাখ্যায় রহিয়াছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ঝড়-তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ইত্যাদির সময় মসজিদে বা জমাতে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নিবে (৯২ পৃঃ ৩৮৫ হাদীছ)।

● লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নামাযের নিয়ম দেখাইবার নামায পড়া জায়েয আছে (৯৩ পৃঃ ৪৬৬ হাদীছ)। এইরূপ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নামায প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যই গণ্য হইবে এবং উহাতে ছওয়াব লাভ হইবে।

● কোন মোক্তাদী যদি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ায়; (মোক্তাদীদের কাতারে শামিল হইলে সেই প্রয়োজন মিটে না,) তাহা জায়েয হইবে (৯৪ পৃঃ ৪০৩ হাদীছ)।

● রাষ্ট্রপ্রধান যেখানেই যাইবেন তথায়ই তিনি ইমামতী করিবেন (৯৫ পৃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, "কাহারও প্রাধান্যের স্থানে অন্য আগন্তুক ব্যক্তির ইমাম হওয়া চাই না।" উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াই বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাধান্য যেহেতু সর্বত্র ও সকলের উপর তাই তিনি সর্বাস্থলেই ইমাম হইবেন। সেমতে একস্থানে কাহারও প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানে যদি তাঁহার উপর প্রাধান্যের অধিকারী কেহ উপস্থিত হন, তবে ইমামতীর জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা উচিত।

● মোক্তাদী শুধু একজন পুরুষ হইলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইবে। সে ক্ষেত্রে ইমামের বরাবর সমরেখা পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকিতে হইবে (৯৭ পৃঃ ১০৭ হাদীছ)। সামান্য পরিমাণেও ইমাম হইতে অগ্রে হইলে মোক্তাদীর নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। অগ্র হওয়ার আশঙ্কামুক্ত থাকার জন্য সামান্য পেছনে থাকা ভাল।

● মোক্তাদী একজন, সে ইমামের বাম দিকে দাঁড়াইলে যদি ইমাম নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়া আসে, তাহাতে ইমাম মোক্তাদী কাহারও নামায নষ্ট হইবে না (৯৭ পৃঃ)। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে যে, মোক্তাদীকে ইমামের পেছন দিক দিয়া আনিবে এবং এমনভাবে আনিবে যাহাতে তাহার কেবলামুখী থাকা ভঙ্গ না হয়, অন্যথায় মোক্তাদীর নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

● কোন ব্যক্তি স্বীয় নামায আরম্ভ করিয়াছে ইমামতীর নিয়্যত করে নাই, তাহার সহিত পুরুষলোক একতেদা করিলে ইমাম মোক্তাদী সকলেরই নামায শুদ্ধ হইবে (৯৭ পৃঃ)। অবশ্য ইমামতীর যে বিশেষ ছওয়াব আছে তাহা লাভ করার জন্য ইমামতীর নিয়্যত করা আবশ্যক; প্রথম হইতে যদি কোন মোক্তাদী উপস্থিত না থাকে, তবে যখন মোক্তাদী আসে তখন মনে মনে ইমামতীর নিয়্যত তথা ইচ্ছা করিয়া নিবে। (শামী, ১-৩৯৫)

পুরুষ ইমামের সহিত মহিলার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ভিন্ন মছআলাহ। সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মতামত ইহাই যে, পুরুষ ইমাম বিশেষরূপে মহিলার ইমামতীর নিয়্যত যদি না করে তবে সেই ইমামের পেছনে মহিলার নামায হইবে না (শামী, ১—৫৩৯)। সেমতে মহিলারা যদি মসজিদে নামায পড়ে তবে এই ব্যাপারে তাহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

● ইমামতীর সময় কেরাত, রুকু-সেজদা ইত্যাদি অতি দীর্ঘ করিবে না, কিন্তু রুকু-সেজদা পূর্ণরূপে অবশ্যই করিবে (৯৭ পৃঃ ৭৬ হাদীছ)।

● (বিভিন্ন নামাযে কেরাতের যে পরিমাণ সুন্নত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার অধিক পড়িয়া বা প্রয়োজনাতিরিক্ত মন্থর ও ধীর গতিতে পড়িয়া) ইমাম নামায লম্বা করিলে মোক্তাদী ইমামের প্রতি অভিযোগ করিতে পারে (৯৭ পৃঃ)।

● ইমামের তকবীর সব মোক্তাদী শুনিতে পারিবে না বিধায় কোন মোক্তাদী কর্তৃক ইমামের সঙ্গে তকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলা মোকাব্বের হওয়া জায়েয আছে (৯৮ পৃঃ ৪০৩ হাঃ)।

মছআলাহ :—যে সব মোক্তাদী এমন স্থানে দাঁড়ায় যেস্থান হইতে তাহারা ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা সরাসরি অবগত হয় না সে ক্ষেত্রে ঐ মোক্তাদীগণ পরস্পর অন্য মোক্তাদীর অনুসরণে নামায আদায় করিবে এবং তাহাদের নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে (৯৯ পৃঃ ৪০৩ হাদীছ)।

অবশ্য ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে যে, আরকান আহকাম আদায়ে ইমামের সহগমন যেন রক্ষা হয় এবং রুকু-সেজদার ব্যাপারে ইমামই একমাত্র অনুসরণীয়। সুতরাং ঐরূপ দূরের কাতারে কোন মোক্তাদী যদি এমন সময় নামাযে শরীক হইয়া রুকুতে যায় যখন ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পেছনের মোক্তাদীগণ হয়ত তখন রুকুতে ছিল; এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি উক্ত রাকাত পাইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না। অতএব যে স্থান হইতে ইমামের অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ না হয় ঐরূপ স্থানে সঙ্কীর্ণ অবস্থায়

রুকুতে শরীক হইয়া উক্ত রাকাত প্রাপ্তি গণ্য করা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়; ইমামের সঙ্গে রুকু প্রাপ্তির সন্দেহ ক্ষেত্রে রুকুতে শামিল না হওয়া চাই।

● নামায অবস্থায় বা নামায শেষে মোক্তাদী কর্তৃক ইমামের ভুল ধরা হইলে বা কোন বিষয়ে ইমামের সন্দেহ হইলে সে ক্ষেত্রে ইমাম মোক্তাদীর কথা গ্রহণ করিবে।

● সাধারণতঃ ইমামের ডান দিক এবং মসজিদের ডান দিকের ফজিলত অধিক (১০১ পৃঃ)। আবু দাউদ শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাতার সমূহের ডান অংশের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত হয়, ফেরেশতাদেরও বিশেষ দোয়া হয়।

অবশ্য সম্মুখ কাতারের যে কোন অংশে জায়গা খালি থাকিলে পেছনে দাঁড়ান গোনাহ সুতরাং কাতারে খালি জায়গা দেখিয়া বাম দিকে হওয়া সত্ত্বেও উহা পূর্ণ করার তৎপর হইলে ইহারও বিশেষ ফজিলত রহিয়াছে। ইবনে মাজা শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মসজিদের বাম দিক খালি থাকিয়া যায়। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদের বাম দিকস্থ অংশের খালি জায়গা পুরণে যে ব্যক্তি তৎপর হইবে সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে (ফতঃ ২-১৬৯)।

● নামায আরম্ভ করিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং তকবীর বলা উভয়ই এক সঙ্গে পরিচালিত করিবে (১০২ পৃঃ ৪৩২ হাদীছ)।

● সেজদা অবস্থায় পা এইরূপে খাড়া রাখিবে যেন পায়ের আঙ্গুল মোড়িয়া কেবলামুখী হইয়া থাকে (১১২ পৃঃ ৪৭৫ হাদীছ)।

● নামাযের মধ্যে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে কাপড় সংযত রাখায় তৎপর হওয়া জায়েয (১১৩ পৃঃ ২৫০ হাদীছ)।

● নামাযের মধ্যে চুলের ভাজ ভাঙ্গিলে বা এলোমেলো হইলে নামাযের মধ্যেই উহা প্রতিরোধে লিপ্ত হইবে না (১১৩ পৃঃ ৪৬৯ হাদীছ)।

● প্রত্যেক রাকাতে উভয় সেজদার মধ্যেও শান্তভাবে বসিয়া তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইবে (১১৩ পৃঃ)।

● কপাল, নাক ইত্যাদিতে ধুলা-বালু লাগিলে নামাযের মধ্যেই উহা পরিস্কার করায় লিপ্ত হইবে না (১১৫ পৃ, ৪৭০ হাদীছ)।

● নামায পড়িয়াই ইমামকে নামাযের স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এমনকি ইমাম এবং যে কোন মুছল্লী তাহার ফরজ নামাযের স্থান হইতে মোটেও না সরিয়া সেই স্থানেই সুন্নত ও নফল ইত্যাদি নামায পড়িতে পারে; ইহাতে কোন দোষ নাই। বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফরজ পড়িয়া ঐ স্থানেই অন্য নামায পড়িতেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র বিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রঃ)ও ঐরূপ করিতেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর নামে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যে, ইমাম তাহার ফরজ, পড়ার স্থানে সুন্নত-নফল নামায পড়িবে না। এই হাদীছ বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নহে (১১৭ পৃঃ)। তবে এই ব্যাপারে একাধিক হাদীছ রহিয়াছে; অবশ্য উহার প্রত্যেকটি হাদীছেরই সনদ তথা সাক্ষ্য-সূত্র দুর্বল। অতএব উহাকে ভাল বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার বিপরীতটা মকরূহ সাব্যস্ত হইবে না। সুতরাং উহার জন্য অধিক তৎপরতা বা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ নিতান্তই বাড়াবাড়ি গণ্য হইবে।

● অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার উপর নামায ফরজ নহে, তদ্রূপ অজুও তাহাদের উপর ফরজ নহে, (শামী, ১—৮০)। অবশ্য তাহাদেরও নাময শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামায শুদ্ধের সমুদয় শর্ত বজায় থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে নামাযে অভ্যস্ত করা চাই; তখন নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পালনে এবং নামায নষ্ট হওয়ার কোন কারণ হইলে তদ্দরুন ঐ নামায পুনঃ পড়ায়ও তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিবে (শামী, ১—৩৮৩)। অজু গোসল একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই ফরজ হইবে (ফতহুল-বারী, ২—২৭৫)। বালকদের মসজিদে এবং ঈদগাহে যাওয়ায়ও অভ্যস্ত করিবে। অবশ্য দুইটি বিষয় সতর্ক থাকিবে—পাক-পবিত্র হওয়া এবং মসজিদের ও ঈদগাহের আদব-কায়দা রক্ষা করা তথা খেলা-ধুলা ও হট্টগোল হইতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা (১১৮ পৃঃ)।

——)*(——

জুমার দিন ও নামাযের আহকাম

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللهِ......

অর্থ :—হে মোমেনগণ। জুমার দিন জুমার নামাযের আজান দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য (ইত্যাদি লিপ্ততা) ত্যাগ পুর্বক আল্লার জিকর তথা নামাযের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকে তবে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। (২৮ পাঃ ১১ রুকু)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা হারাম। আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার আজানের পর শিল্পকার্য্যও হারাম। ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, জুমার আজান হইলে (অবস্থানরত) মুসাফিরও জুমার নামাযে উপস্থিত হইবে। (১০৪ পৃঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় একদা জুমার দিন এক দল লোক খোৎবার সময় খাদ্য ক্রয়ের সুযোগের প্রতি ধাবিত হইলে তাহাদের কটাক্ষ করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছিল। নিম্নের হাদীছে উহারই বিবরণ আছে।

৪৯৩। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জুমার দিন আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত নামাযের জন্য একত্রিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় একটি সওদাগরী দল আসিতেছিল; উপস্থিত লোকদের অনেকেই সেই দিকে ধাবিত হইল; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে শুধু বারজন লোক বাকি থাকিলেন। সেই ব্যাপারেই এই আয়াত নাযেল হইল—

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْلَهْوَنِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا

"এক শ্রেণীর লোক তাহারা যখন ব্যবসা বা তামাশার সুযোগ দেখিল, উহার প্রতি ধাবমান হইল— (খোৎবা দানে) দণ্ডায়মান অবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে। তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লার নিকট (সন্তুষ্টি ও ছওয়াব) আছে তাহা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রং-তামাশা অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং আল্লাহ সর্বোত্তম আহার যোগানদাতা। (১২৮ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :— জুমার আজানের সঙ্গে সঙ্গে খরিদ-বিক্রি ইত্যাদি লিপ্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এবং পূর্ণ খোৎবার সময় তথায় জমিয়া থাকার বিশেষ আদেশ পুর্বে বিজ্ঞাপিত হয় নাই; সে সম্পর্কের পূর্বোল্লিখিত আয়াতও নাযেল হইয়াছিল না। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে—আলোচ্য ঘটনার সময়কালে জুমার খোৎবা নামাযের পরে হইত—

যেরূপ ঈদের নামাযে এখনও হইয়া থাকে। তাই ছাহাবীগণ মূল নামায সমাপ্ত হওয়া দেখিয়া বিলম্বে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় খাদ্যক্রয়ে ছুটিয়া গিয়াছিলেন; তখন মদীনায় খাদ্যের অভাব ছিল। অতঃপর খোৎবা নামাযের পূর্বে হওয়ার বিধান আসে এবং আজানের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করার আদেশের আয়াতও নাযেল হয়। এই আয়াতে পূর্বের ঘটনার প্রতি কটাক্ষ করা হয়; উক্ত কটাক্ষের পরে ছাহাবীরা এরূপ সংশোধনই হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদেরই অবস্থার চিত্রাঙ্কনে নেক লোকদের গুণরূপে আল্লাহ বলিয়াছেন—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ـ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

"এমন লোকগণ যাহাদেরে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লার জিকর তথা স্মরণ হইতে এবং পূর্ণাঙ্গ নামায পড়া ও জাকাত দেওয়া হইতে অন্য-মনা করিতে পারে না। তাহারা ঐ দিনের ভয় রাখে যেদিন লোকদের কলিজা ও চক্ষু উল্‌টিয়া যাইবে। (১৮ পাঃ ১১ রুকু)

৪৯৪। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—অন্যান্য নবীগণের উম্মতদিগকে আল্লার কেতাব আমাদের পূর্বে দেওয়া হইয়াছে—ইহুদীগণকে তওরাত, নাছারাগণকে ইঞ্জীল। (অর্থাৎ জগতে তাহাদের আবির্ভাব আমাদের পূর্বে ছিল;) আমরা দুনিয়াতে তাহাদের পর আবির্ভূত হইয়াছি, কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরা সর্বাগ্রে থাকিব। আমাদের আর একটি ফজিলত এই যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্বের উম্মতগণকে প্রতি সপ্তাহে একটি দিন বিশেষরূপে এবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইবার আদেশ করিয়াছিলেন এবং আল্লার নিকট জুমার দিনটিই ঐ দিনরূপে পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মত ইহুদীগণ ইহার পরের দিন অর্থাৎ শনিবার এবং নাছারাগণ তাহার পরের দিন রবিবারকে বাছিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি মেহেরবান হইয়া স্বীয় পছন্দনীয় ঐ জুমার দিনটিকে আমাদের জন্য নিজেই মনোনীত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত এই ছিল যে, স্বীয় পছন্দনীয় দিনটিকে তিনি নিজেই প্রকাশ্যে তাহাদের জন্য নির্বাচিত করিয়া দেন। তদুপরি এই উম্মতের বিবেক বুদ্ধিকেও তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী পরিচালিত করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের পূর্বেই মদীনাবাসী কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছু মোসলমান মক্কা হইতে মদীনাতে হিজরত করিয়াও আসিয়াছিলেন। তখনও কোরআন শরীফে জুমার দিন বা জুমার নামাযের বিষয়ে কোন আয়াত নাযেল হয় নাই; কিন্তু মদীনার তৎকালীন

মোসলমানগণ সপ্তাহে একটি দিনকে বিশেষরূপে এবাদতের জন্য নির্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন! আল্লার মেহেরবানী—তাঁহাদের পরামর্শে এই জুমার দিনটিই নির্বাচিত হইয়াছিল।

জুমার দিনে গোসল করা

৪৯৫। **হাদীছ :—** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেকেরই জুমার নামাযে উপস্থিত হইবার পূর্বে গোসল করা আবশ্যক।

৪৯৬। **হাদীছ :—**ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) জুমার নামাযের খোৎবা দিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন মোহাজের ছাহাবী জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জুমার উপস্থিত হইবার সময় কি এখন? ছাহাবী উত্তর করিলেন, আমি একটি কাজে লিপ্ত ছিলাম, তাই আজানের পূর্বে বাড়ী ফিরিতে পারি নাই; এই মাত্র বাড়ী ফিরিয়া আজান শুনিলাম এবং অজু করিয়া উপস্থিত হইলাম। খলীফা ওমর (রাঃ) আশ্চর্যান্বিতরূপে বলিয়া উঠিলেন, (গোসল ব্যতিরেকে) শুধু অজু করিয়া আসিলেন? অথচ আপনি জানেন যে, হযরত (দঃ) আমাদিগকে (জুমার দিন) গোসল করিতে আদেশ করিতেন।

৪৯৭। **হাদীছ :—**তাউস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, লোকেরা বর্ণনা করে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জুমার দিন গোসল করিবে, ভালরূপে মাথা ধুইবে যদিও ফরজ গোসলের নাপাক না হও এবং সুগন্ধী ব্যবহার করিবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, গোসল সম্পর্কে আমারও এই আদেশ জানা আছে; সুগন্ধী সম্পর্কে আদেশ আমার জানা নাই। (১২১ পৃঃ)

৪৯৮। **হাদীছ :—**ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (রঃ) আমরাহ (রঃ)কে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (নবী আলাইহেচ্ছালামের যুগে) লোকদের (অভাব-অনটনের দরুন চাকর রাখার সামর্থ্য ছিল না, তাই) পরিশ্রমের কাজ-কর্মও নিজেদেরই করিতে হইত। (একদিকে সেই খাটুনি, অপরদিকে তাহাদের পরিধেয় ছিল দুম্বা-বকরীর লোমের তৈরী মোটা কম্বল; সুতরাং তাহাদের ঘর্মাক্ত শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইত;) সেই অবস্থায়ই তাহারা জুমার নামাযে আসিত; তাই তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—যদি তোমরা গোসল করিয়া জুমার নামাযে) আস তবে ভাল হয়। (১২৩ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আবু দাউদ শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনাই বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বিবরণী দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, জুমার দিন গোসল করা বিধানগত ওয়াজেব নহে, বরং পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

জুমার দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা

৪৯৯। হাদীছঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমার দিন গোসল করা ওয়াজেব* (তথা বিশেষ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ) এবং মেছওয়াক করিবে এবং সামর্থ্য হইলে সুগন্ধি ব্যবহার করিবে।

৫০০। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করিয়া যথাসম্ভব আউয়াল ওয়াক্তে জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হইবে সে (এত ছওয়াবের ভাগী হইবে) যেন একটি উট কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে যে আসিবে সে যেন একটি গরু কোরবাণী করিয়াছে। তারপর সময়ে যে আসিবে সে যেন একটি দুম্বা কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে যে আসিবে যে যেন একটি মোরগ কোরবাণী (অর্থাৎ আল্লার রাস্তায় ছদকা) করিয়াছে। তারপর পঞ্চমাংশে যে আসিয়াছে সে যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিয়াছে। (ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত এইরূপে শ্রেণী বিভক্ত হইবে;) তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হইবেন তখন ফেরেশতাগণ (ঐ বিশেষ ছওয়াব লেখা ক্ষান্ত করিয়া খোৎবার মধ্যে) আল্লার জিকর শুনিবার জন্য মসজিদে চলিয়া আসেন।

জুমার দিন তৈল ব্যবহার করা

৫০১। হাদীছঃ—সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করিবে, সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে এবং তৈল ব্যবহার করিবে অথবা নিজ ঘরে যদি সুগন্ধির ব্যবস্থা থাকে তবে উহা ব্যবহার করিবে, তারপর মসজিদে উপস্থিত হইয়া যেখানে স্থান পায় সেখানেই বসিয়া পড়িবে, কাহাকেও কষ্ট দিয়া মধ্যস্থলে বসিবে না, তারপর যথাসাধ্য নামায পড়িবে, ইমামের খোৎবা দানকালে চুপ থাকিবে—ঐ ব্যক্তির এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

জুমার দিন ভাল জামা-কাপড় পরিধান করা

৫০২। হাদীছঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) একদা দেখিতে পাইলেন, মসজিদের নিকটে রেশমী কাপড়ের পোষাক বিক্রী হইতেছে। তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ করিলেন, আপনি উহার এক জোড়া কাপড় ক্রয় করুন; জুমার দিন এবং বিদেশী প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষাৎদান করিবার সময় উহা ব্যবহার করিবেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন—রেশমী কাপড় একমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যবহার করিবে, যে আখেরাতে সুখ-শান্তির আশা রাখে না।

---

* প্রায় সকল ইমামগণই এস্থলে "ওয়াজেব" শব্দের অর্থ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ বলিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে কিছু দিন পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে রেশমী কাপড়ের কিছু পোষাক উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা সর্বসাধারণকে বিতরণ করিলেন, তন্মধ্যে এক জোড়া ওমর (রাঃ)কে দিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় পাইয়া দুঃখিত মনে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। আপনি আমাকে আজ এই কাপড় দান করিয়াছেন, অথচ রেশমী কাপড়ের বিষয় আপনি যাহা বলিবার বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন, এই কাপড় স্বয়ং তোমাকে ব্যবহার করিবার জন্য দেই নাই। সেমতে ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় জোড়া তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতাকে দিয়া দিলেন, সে কাফের ছিল এবং মক্কায় থাকিত।

জুমার দিন ফজরের নামাযে কোন্ ছুরা পড়া উচিৎ

৫০৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাযে ছুরা "আলীফ-লাম-মীম তানজীল" (الم تنزيل) এবং ছুরা হাল-আ'তা আলাল-ইনসানে (هل اتى على الانسان) পড়িতেন।

গ্রাম ও শহর উভয়ের মধ্যেই জুমা জায়েয

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে জুমা আরম্ভের পর অন্য মসজিদে জুমা পড়ার মধ্যে সর্বপ্রথম 'জুয়াসা' নামক স্থানে আবদুল কায়েশ গোত্রীয় মসজিদে জুমা হইয়াছিল। 'জুয়াসা' এলাকাটি বাহ্‌রাইন দেশভুক্ত একটি এলাকা।

● আয়লা এলাকার শাসনকর্তা 'রোযায়েক' তথাকার কেন্দ্রীয় শহর হইতে দূরে তাঁহার খামারে একদল শ্রমিক দিয়া কাজ করাইতেছিলেন। তথা হইতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাম্মেছ ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ)কে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, খামার এলাকায় শ্রমিকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়িব কি? ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ) লিখিয়াছিলেন, আপনি তথায় অবশ্যই জুমার নামায পড়িবেন।

জুমার নামাযে আদিষ্ট না হইলে সে গোসলের আদিষ্ট হইবে কি?

মহিলাগণ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকগণ—তাহাদের প্রতি জুমার নামাযের আদেশ নাই; জুমার দিনের গোসলের আদেশ তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে কি?

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার দিনের গোসলের কর্তব্য শুধু তাহাদের উপরই যাহাদের উপর জুমার নামায ফরজ।

৫০৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য প্রতি সাত দিনে এক দিন (জুমার দিন) গোসল করা। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী কথাটিও হাদীছেরই অংশ। ফতহুলবারী,২—৩০৬)

এই হাদীছ মর্মে মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও জুমার দিন গোসল করা কর্তব্য।

জুমার জমাতে উপস্থিতি অসাধ্য হইলে জুমা মাফ

৫০৫। **হাদীছ** :— একদা জুমার দিন ভীষণ বৃষ্টি ও কাদার সৃষ্টি হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং মোয়াজ্জেনকে হাইয়্যা-আলাস্সালাহ্ বলার সময়ে الصلوة فى الرحال। "নিজ নিজ ঘরে নামায পড়িয়া নেও" বলিবার আদেশ করিলেন। ইহাতে লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার এই ব্যবস্থায় চাঞ্চল্য দেখাইতেছ! নবী (দঃ) এইরূপ করিয়াছেন। জুমার নামায অবশ্য ফরজ বটে, কিন্তু এই বৃষ্টি ও কাদার অবস্থায় তোমাদিগকে গোনাহের ভাগী করিব যাহাতে তোমরা হাটু পর্য্যন্ত কাদা জড়াইয়া এই বৃষ্টির মধ্যে মসজিদে আসিবে—ইহা আমি ভাল মনে করি নাই।

ব্যাখ্যা :—"হাইয়্যা আলাস্সালাহ্" অর্থ নামাযের জন্য আস—এই আহ্বান ও আদেশ বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার—যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে উপস্থিত মুরব্বির পক্ষ হইতে মোয়াজ্জেনের মুখে উচ্চারিত হয়। উহা লঙ্ঘন করা মামুলী কথা নহে; আজানের ঐ বাক্যে মোসলমানদের জমাতে উপস্থিতি কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ এইরূপ অবস্থায় জুমার নামাযের জন্য আসার ফরজ মাফ হইয়া গিয়াছে, তাই বাড়ীতে নামায পড়ার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। জুমা মাফ হইলে বাড়ীতে নিয়মিত জোহর নামায পড়িতে হয়।

কতদূর ব্যবধান হইতে জুমায় উপস্থিত হওয়া উচিৎ

আ'তা (রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন—যখন তুমি এমন কোন বস্তিতে উপস্থিত থাক, যেই বস্তিতে জুমা হইয়া থাকে এবং যেখানে জুমার আজান দেওয়া হয় তখন জুমার নামাযে শরীক হওয়া তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য। আজানের আওয়াজ শুনিতে পাও অথবা না পাও।

বছরা শহর হইতে ছয় মাইল দূরে "যাবিয়া" নামক খুব নগণ্য বসতির স্থানে আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল; তথায় অবস্থান কালে তিনি কোন দিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া বছরা শহরে জুমার নামায পড়িতেন এবং কোন কোন দিন আসিতেন না।

৫০৬। **হাদীছ** :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ মদীনা হইতে দূর-প্রান্তে অবস্থিত নিজ নিজ বাড়ী হইতে এবং মদীনার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে জুমার নামাযের জন্য রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহারা ধূলা-বালী মাখা অবস্থায় আসিতেন, তদুপরি তাঁহাদের শরীরে ঘর্মও নির্গত হইত। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট ছিলেন তখন ঐরূপ একজন লোক তাঁহার নিকট আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন—জুমার দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিলে ভাল হয়।

জুমার নামাযের ওয়াক্ত

৫০৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর জুমার নামায পড়িতেন।

৫০৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জুমার নামায যথাসম্ভব শীঘ্র পড়িতাম এবং দ্বিপ্রহরের শয়নও জুমার নামাযের পরই হইত।

অর্থাৎ জুমার নামাযের জন্য বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা হইত; জুমার নামায না পড়িয়া কোন প্রকার আরামও করা হইত না। অবশ্য জুমার ওয়াক্ত হওয়ার পর তথা সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর যথাসম্ভব শীঘ্রই জুমার নামায পড়িয়া লওয়া হইত।

৫০৯। হাদীছ ঃ—ছালামাতুবনুল আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জুমা এমন সময় পড়িতাম যে, নামায শেষ করার পরেও দেওয়ালের ছায়া এতটুকুও হইত না যাহাতে রৌদ্র হইতে আশ্রয় নেওয়া যায়। (৫৯৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—জুমা অপেক্ষাকৃত প্রথম ওয়াক্তে যথাশীঘ্র পড়া হইত; ইহাই এই বর্ণনার মর্ম।

৫১০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঠাণ্ডার দিনে জুমার নামায অগ্রভাগে পড়িতেন এবং উত্তাপের দিনে বিলম্বে পড়িতেন।

জুমার জন্য ধাবিত হওয়ার আদেশ এবং পদব্রজে উপস্থিত হওয়া

৫১১। হাদীছ ঃ—আবাআ ইবনে রেফাআ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জুমার নামাযের জন্য হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আবু আবস্ (রাঃ) ছাহাবী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন— যাহার পা আল্লার রাস্তায় ধুলা মাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ দোযখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

জুমার দিন মসজিদে কাহাকেও উঠাইয়া তাহার স্থানে বসিবে না

কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসা কোন সময়ই বাঞ্ছনীয় নহে; বিশেষতঃ জুমার দিন।

৫১২। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—কেহ যেন অন্য মোসলমান ভাইকে তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজে ঐ স্থানে না বসে, তাহা জুমার দিন হউক বা অন্য কোন দিন এবং মসজিদে হউক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে।

জুমার আজান

৫১৩। হাদীছ ঃ—সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে জুমার নামাযের জন্য শুধুমাত্র

এক আজান দেওয়া হইত যাহা খোৎবার পূর্বে ইমাম মিম্বরে বসিলে দেওয়া হয়। খলীফা ওসমান (রাঃ)-এর সময়ে যখন মোসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া গেল (এবং মদীনার চতুষ্পার্শে বস্তি অনেক দুর পর্য্যন্ত বাড়িয়া গেল) তখন ওসমান (রাঃ) "যাওরা" নামক একটি উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া ঐ খোৎবার আজানের পুর্বে আর এক আজান দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— প্রত্যেক নামাযের যে আজান দেওয়া হয় তাহা উক্ত নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার জন্য, তাই সেই আজান জমাত আরম্ভের অনেক পুর্বে হয় এবং হইত। আর জুমার নামাযের আজান যাহা খোৎবা আরম্ভে দেওয়া হইত তাহা অবশ্যই নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিত জ্ঞাত করার জন্য ছিল না, নতুবা উহাও জমাত আরম্ভের অনেক পুর্বেই হইত। ঐ আজান জমাত-আরম্ভ জ্ঞাত করার জন্য ছিল, তাই উহা খোৎবার আরম্ভে দেওয়া হইত। কারণ, জুমার খুৎবা উহার নামাযের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত। প্রথম দিকে মোসলমান কম সংখ্যায় ছিলেন এবং তাঁহারা জুমার দিন বিশেষভাবে অনেক পুর্ব হইতেই নামাযের প্রস্তুতিতে তৎপর হইতেন, তাই ঐ নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার জন্য আজানের প্রয়োজন তখন ছিল না। যখন মোসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়া মদীনা শহরের দুর এলাকা পর্য্যন্ত মোসলমানদের বসতি স্থাপিত হইল তখন জুমার জন্যও নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার আজান দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সমস্ত ছাহাবীদের বর্তমানে অন্য নামাযের ন্যায় জুমার নামাযেরও ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার আজান খোৎবা আরম্ভের অনেক পুর্বে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হইল (ফতহুল-বারী, ২—৩১৫)।

উক্ত আজানের নিয়ম প্রবর্তিত হইলে খলীফা ওসমানের আমল হইতেই জুমার নামাযের মুল আজান (যাহা নবী (দঃ)-এর সময়ে খোৎবা-আরম্ভে দেওয়ার প্রচলন ছিল—সেই আজান) ইমাম মিম্বরে বসাবস্থায় ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় বলিয়া ফতহুল-বারী কেতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

ان عثمان احدثه لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة قياسا على بقية الصلوات فالحق الجمعة بها وابقى خصوصيتها بالاذان بين يدى الخطيب - (٢—٣١٥)

খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক এই রীতির প্রবর্তন সমস্ত ছাহাবীগণের বর্তমানেই ছিল। খলীফা ওসমানের রীতি অনুসারেই জুমার একটি আজান বর্দ্ধিত করণ গৃহীত হইয়াছে—যে আজান নবীজীর আমলে ছিল না। তদ্রূপ খোৎবার আজান ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতিও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ উভয় রীতিই এক সঙ্গে জড়িত ভাবে সমস্ত ছাহাবীগণের বর্তমানে খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত।

কিন্তু স্মরণ রাখিবে, ইমামের সম্মুখে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, মিম্বর ঘেষিয়া আজান দিবে। সাধারণ মুসল্লিদের প্রথম কাতারে ইমামের সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইয়া আজান দিবে—যেই অবস্থাকে সাধারণতঃ ইমামের সম্মুখ বলা যায়।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও লিখিয়াছেন যে, খোৎবা আরম্ভের আজানের সময় ইমাম মিম্বরে বসা থাকিবেন। অর্থাৎ আজান আরম্ভের পূর্বেই ইমাম মিম্বরে উঠিয়া বসিবেন এবং খোৎবা আরম্ভ লগ্নে আজান দেওয়া হইবে।

ইমাম মিম্বরের উপর বসিয়া আজানের উত্তর দিবেন

৫১৪। হাদীছঃ—আবু উমামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি শুনিয়াছি, ছাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বরের উপর বসিয়া মোয়াজ্জেনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আজানের শব্দসমূহকে উচ্চারণ করিলেন এবং আজান শেষে বলিলেন—হে লোক সকল! আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বসা অবস্থায় মোয়াজ্জেনের আজান শ্রবণে এইরূপই বলিতে শুনিয়াছি।

মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিবে

৫১৫। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মসজিদের মধ্যে একটি খেজুর গাছের থাম ছিল যাহার সংলগ্ন দাঁড়াইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিয়া থাকিতেন। যখন তাঁহার জন্য মিম্বর তৈয়ার করা হইল এবং তিনি ঐ খেজুর গাছের থাম ছাড়িয়া দিয়া মিম্বরের উপর খোৎবা দান আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা নিজ কানে ঐ থামের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, যেরূপ সদ্য প্রসবিতা উট স্বীয় বাচ্চার জন্য কাঁদিয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বর হইতে নামিয়া আসিয়া উহার উপর হাত বুলাইলে সে শান্ত হইল।

৫১৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দাঁড়াইয়া খোৎবা দিয়া থাকিতেন এবং মধ্যস্থলে একবার বসিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খোৎবা প্রদান করিতেন; যেরূপ বর্তমানেও হইয়া থাকে।

খোৎবা বা ভাষণ আল্লার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিবে

৫১৭। হাদীছঃ—আম্র ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে কিছু ধন-দৌলত বা অন্য কোন বস্তু আমদানী হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা বিতরণ করিয়া দিলেন। (প্রত্যেককে দেওয়ার পরিমাণ মাল ছিল না, তাই সকলকে না দিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে দিলেন।) তারপর হযরত (দঃ) শুনিতে পাইলেন যে, যাহারা উহার অংশ পায় নাই তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

তখন তিনি ভাষণ দান করিলেন—প্রথমে আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন, তারপর বলিলেন, আমি অনেক সময় একজনকে দান করি অন্য আর একজনকে দান করি না, অথচ যাহাকে দান করি না সে-ই আমার নিকট বিশেষ সন্তুষ্টিভাজন। এরূপ করার একমাত্র কারণ এই যে, একদল লোক এমন আছে যাহাদের মন এখনও ইসলামের প্রতি কাঁচা—তাহারা চঞ্চল; এখনও তাহাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি স্থিরতা আসে নাই, তাই তাহাদিগকে দান করিয়া থাকি। আর একদল লোক এমনও আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ় মনোবল দান করিয়াছেন এবং তাহাদের মনে-প্রাণে ঈমান সুদৃঢ়রূপে পাকা-পোক্তা হইয়াছে; সেই ভরসায় আমি তাহাদিগকে দান করি না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য হইতেই একজন আম্‌র ইবনে তাগলেব।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আম্‌র ইবনে তাগলেব শপথ করিয়া বলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ কথাটি আমার নিকট দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-দৌলত হইতেও অধিক সন্তুষ্টির বস্তু ছিল। (কারণ, আম্‌র ইবনে তাগলেব (রাঃ) দৃঢ় ঈমানদার ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার উপর এই কথাটি সনদ ও সাক্ষ্য স্বরূপ ছিল।)

দুই খোৎবার মধ্যে বসিতে হইবে

৫১৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন দুইটি খোৎবা দিতেন এবং খোৎবাদ্বয়ের মধ্যভাগে বসিতেন।

মনোযোগের সহিত খোৎবা শুনিবে

৫১৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—জুমার দিন একদল ফেরেশতা মসজিদের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া ধারাবাহিকরূপে আগন্তুক মুছল্লিগণের নাম লিখিতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে আসিল সে যেন একটি উট ছদকা করিল। তারপরের সময়ের আগন্তুক যেন একটি গরু তারপর যেন একটি দুম্বা, তারপর যেন একটি মোরগ, তারপর যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিল। তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হন তখন ফেরেশতাগণ সব কিছু গুছাইয়া খোৎবার মধ্যে আল্লার জেক্‌র শুনিবার জন্য চলিয়া যান।

ব্যাখ্যাঃ— জুমার ওয়াক্তের সর্বপ্রথম অংশ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর হইতে ইমামের খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়া পর্য্যন্ত সময়টুকুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সে অনুপাতে উল্লিখিত পর্য্যায়ে শ্রেণী স্থির করা হয়।

খোৎবার সময় আগত ব্যক্তির দুই রাকাত নামায পড়া

৫২০। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জুমার দিন এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হইল যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিতেছিলেন।

তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি নামায পড়িয়াছ? সে আরজ করিল, না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—একমাত্র এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যে, খোৎবা দানকালীন ঐ এক ব্যক্তিকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় বা খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের যমানায় এইরূপের ঘটনা দ্বিতীয় আর দেখা যায় নাই। অথচ খোৎবা প্রদানকালীন কাহারও উপস্থিত হওয়া একটি মামুলী ও অতি স্বাভাবিক বিষয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হইয়াছে, কিন্তু আর কখনও ঐরূপে নামায পড়ার আদেশ করা হয় নাই। এতদৃষ্টে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, এই ঘটনাটি কোনও বিশেষ কারণমূলক ছিল। বস্তুতঃ মছআলাহ এই যে—খোৎবা দানকালে নামায পড়া নিষিদ্ধ।

খোৎবার সময় হাত উঠানো

অনেক বক্তা বক্তৃতার সময় উগ্রমূর্তি বা ক্ষিপ্তা প্রকাশার্থে মুহুঃ মুহুঃ হস্ত উত্তোলন করিয়া থাকে। মোসলেম শরীফে এক হাদীছে এই অভ্যাসের প্রতি নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। বোখারী (রঃ) অত্র পরিচ্ছেদে একটি হাদীছ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এমন কোন বিষয়ের উপর যদি ভাষণদাতা হাত উঠায় যাহা শরীয়তে অনুমোদিত তবে তাহা নিন্দণীয় নহে। জুমার খোৎবায়ও এই মছআলাহ প্রযোজ্য। যেমন—খোৎবার সময় উপস্থিত কোন বিশেষ দোয়া করা ক্ষেত্রে যদি খোৎবার মধ্যে হাত উঠানো হয় তবে তাহা নিন্দণীয় হইবে না। এ সম্পর্কীয় হাদীছখানার অনুবাদ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

খোৎবার মধ্যে বিশেষ কোন দোয়া করা

৫২১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষ পড়িল। ঐ সময় নবী (দঃ) এক জুমার দিন খোৎবারত ছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে আসিল এবং হযরতের বরাবরে দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। অনাবৃষ্টির দরুণ (ঘাসের অভাবে) পশুপাল মৃতপ্রায়, (দুধের অভাবে) বাচ্চা-কাচ্চা অনাহারী এবং মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি আল্লার নিকট দোয়া করুন, আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করেন। তৎক্ষণাৎ হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং দোয়া করিলেন—اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا "হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন।" উপস্থিত লোকগণও আল্লার রসুলের সঙ্গে হাত উঠাইল এবং দোয়া করিল। ঐ সময় আকাশে মেঘের চিহ্নও ছিল না, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখনও হাত নামান নাই, ইতিমধ্যেই পর্বতাকৃতির মেঘমালা মদীনা এলাকার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নীচে আসিবার পূর্বেই এমন

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল যে, মসজিদের খেজুর পাতার ছাদ হইতে পানি পড়িয়া হযরতের দাড়ি মোবারকের উপর পানি বহিতে লাগিল। বৃষ্টির দরুন আমাদের বাড়ীতে পৌঁছা কষ্টকর হইয়া পড়িল। পরবর্তী জুমার দিন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইল; সাত দিন সূর্য্য দেখা গেল না। পরবর্তী জুমার দিন খোৎবার সময়েই ঐ ব্যক্তিই কিম্বা অন্য ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল এবং তাহার সঙ্গে সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। (অধিক বৃষ্টিপাতে) বাড়ী-ঘর ধ্বসিয়া যাইতেছে, পশুপাল পানিতে ডুবিয়া যাইতেছে, রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। হযরত (দঃ) স্মিত হাসিলেন এবং উভয় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ
الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

"হে আল্লাহ! আমাদের হইতে দূরের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বৃষ্টি বর্ষিত হউক, আমাদের উপরে নয়; বড় বড় পাহার-পর্বতের উপর, ছোট ছোট পাহাড়ে এবং পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে এবং বাগ-বাগিচা ও খেত-খামারে বর্ষিত হউক। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের ইশারার সাথে সাথে মেঘ-খণ্ডগুলি মদীনার আকাশ হইতে পার্শ্ববর্তী দিকে চলিয়া গেল এবং দূরবর্তী এলাকায় বর্ষিল। মদীনার আকাশে মেঘের চিহ্নও থাকিল না এবং এক ফোটা বৃষ্টিও আর রহিল না। নামাযান্তে আমরা রৌদ্রের মধ্যে বাড়ী ফিরিলাম। দূরবর্তী এলাকার বৃষ্টিপাতে "কানাত" নামক গিরি-প্রণালী এক মাস পর্য্যন্ত প্রবাহমান থাকিল। দূরবর্তী এলাকার প্রত্যেক আগন্তুকই বৃষ্টিপাতের সংবাদ দিতেছিল।

(১২৭, ১৩৭, ১৪৩ পৃঃ)

খোৎবা দানকালীন সকলকে চুপ থাকিতে হইবে

সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম খোৎবা প্রদান করে তখন সকলের চুপ থাকা উচিৎ।

৫২২। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে. হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জুমার দিন খোৎবা দানকালীন তুমি যদি কাহাকেও (মুখে শব্দ করিয়া) বল "চুপ কর" তবে তুমিও নিয়ম লঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হইবে (এবং এই কারণে তোমারও জুমার ছওয়াব কম হইয়া যাইবে)।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত বিষয়টি বড়ই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় —প্রথমে যে ব্যক্তি বলে তাহাকে বাধাদানের জন্য অধিক হট্টগোলের সৃষ্টি করা হয়; ইহা বোকামী ছাড়া আর কি হইতে পারে।

জুমার দিনের একটি মুল্যবান সময় আছে

৫২৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—এই দিনের মধ্যে এমন একটি মুল্যবান সময় আছে যে, সেই সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হউক আল্লাহ তায়ালা উহা কবুল করিয়া থাকেন। অবশ্য ঐ সময়টুকু খুবই অল্প—অধিক প্রশস্ত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ সময়টুকু জুমার দিনেই অনির্দিষ্টরূপে রহিয়াছে, যেমন লায়লাতুল-কদর রমজান মাসে অনির্দিষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ঐ সময়টুকুর অভিলাষী তাহাকে পুর্ণ দিনটিই তৎপরতার সহিত কাটাইতে হইবে। অবশ্য ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়াকাল হইতে সুর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে ঐ মুল্যবান সময়টি পাইবার সম্ভাবনা অধিক।

জুমার নামাযের পুর্বে ও পরে সুন্নত পড়া+

৫২৪। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের পুর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরেবের পরে স্বীয় গৃহে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন এবং জুমার নামাযের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

মছআলাহ ঃ—জুমার ফরজের পুর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত এক সালামে পড়া ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, যেরূপ জোহরের ফরজের পুর্বে চার রাকাত। (দোররুল মোখঃ)

জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া আমোদ-আনন্দে বিচরণ

জুমার দিন জুমার নামাযের প্রতি তৎপরতায় অন্য তৎপরতা ও লিপ্ততা যথাসাধ্য কম করিতে হয়। অবশ্য জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া অনুমোদিত লিপ্ততার অনুমতি রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

"যখন নামায সমাপ্ত হইয়া যায় তখন তোমরা ভুপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে পার।" নিম্নে এই শ্রেণীরই একটি হাদীছ উল্লেখ হইতেছে।

৫২৫। হাদীছ ঃ—ছাহাবী সাহ্ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে পানি প্রবাহিত হইবার নালীসমূহের কিনারায় তিনি "চুকান্দার" নামক সব্জী বপন করিতেন। জুমার দিন তিনি ঐ চুকান্দরের মুলগুলি উঠাইয়া আনিতেন এবং উহার সঙ্গে আটা মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈয়ার করিতেন। আমরা জুমার নামাযান্তে তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম, তিনি আমাদিগকে উহা খাইতে দিতেন। আমরা আনন্দের সহিত উহা চাটিয়া চাটিয়া খাইতাম। আমরা তাঁহার ঐ খাদ্যের আগ্রহে জুমার দিনের প্রতীক্ষায় থাকিতাম।

+ জুমার নামাযের পুর্বে সুন্নত পড়া বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিলেন, দলীল উল্লেখ করেন নাই। ফতহুল-মোলহেম দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯৯ পৃষ্ঠায় ইহার দলীল বর্ণিত আছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● জুমার দিন বিশেষভাবে মেছওয়াক করিবে। (১১২ পৃঃ ৫০০)

● মসজিদে এক জোটের দুইজন একত্রে বসা থাকিলে তাহাদের মধ্যে তৃতীয় পর ব্যক্তির বসা উচিৎ নহে। (১২৪ পৃঃ ৫০২ হাদীছ)

● খুৎবা দানকালে মুছল্লীদের লক্ষ্য ও ধ্যান ইমামের (খুৎবার) প্রতি হওয়া চাই। (১২৫ পৃঃ)

● জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনজনের জমাত শর্ত; ইমামের সঙ্গে তিনজন পুরুষ মোক্তাদী হইলে জুমার নামায হইবে অন্যথায় জুমার নামায হইবে না, সে ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া জোহরের নামায পড়িতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে জুমার নামায আরম্ভ করার পর পেছন হইতে মোক্তাদীগণ নামায ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—যদি তিনজন পুরুষ বাকি থাকিয়া থাকে তবে ইমামসহ সকলেরই জুমা শুদ্ধ হইয়া যাইবে (১২৮ পৃঃ)।

আর যদি তিনজনও বাকি না থাকে এবং তাহারা প্রথম রাকাতের সেজদার পূর্বেই চলিয়া যায় তবে ইমামের জুমাও ফাছেদ হইয়া যাইবে, পুনঃ নিয়্যত বাঁধিয়া জোহর পড়িতে হইবে। আর যদি সেজদার পরে যায় তবে ইমাম জুমারূপেই স্বীয় নামায পুরা করিবে। (শামী, ২-৭৬১)

শত্রুর অক্রমণ সম্ভাবনাবস্থায় জমাতে নামায পড়ার নিয়ম

জমাত ব্যতিরেকে একাকী ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে নামায পড়াকে শরীয়ত মোটেই পছন্দ করে না, একস্থানে উপস্থিত সমস্ত মোসলমান এক জমাতে নামায পড়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শত্রুর মোকাবেলায় একতা ও শৃঙ্খলা শত্রুপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু এদিকে সকলে একত্রে নামাযরত হইলে শত্রুপক্ষের সুযোগ পাওয়ার আশঙ্কা ও ভয় আছে, তাই শরীয়ত এমন ক্ষেত্রে জমাত কায়েমের বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সুদীর্ঘ বয়ান বিদ্যমান রহিয়াছে। (৫ পাঃ ১২ রুঃ দ্রষ্টব্য)

এতদ্দৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম ধর্ম কিরূপ পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, ব্যপক ও জীবন্ত ধর্ম—যাহার মধ্যে নিছক ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং গৃহকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেও বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং আপদ-বিপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটির অবস্থায়ও জীবনকে কিরূপে দ্বীন ও ধর্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা যায় তাহার সহজ পথও প্রদর্শন করা হইয়াছে।

৫২৬। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নজদ এলাকার কোনও জেহাদে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা শত্রুপক্ষের নিকটবর্তী অবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন এবং আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। এক দল শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখার কাজে নিযুক্ত রহিল, আর একদল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায আরম্ভ করিল। এইরূপে এক রাকাত নামায হইলে পর নামাযরত দল শত্রুর প্রতি চলিয়া গেল এবং শত্রুর প্রতি নিযুক্ত দল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে

শরীক হইল। যেহেতু (ছফর হিসাবে বা বস্তুতঃই দুই রাকাতওয়ালা নামায ছিল, তাই) দ্বিতীয় দলকে লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্বিতীয় রাকাত পড়ার পর রসুলুল্লার (দঃ) নামায পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি সালাম ফিরিলেন। কিন্তু মোক্তাদীগণের প্রত্যেক দলেরই এক এক রাকাত নামায হইল এবং এক এক রাকাত বাকী রহিল; ঐ এক রাকাতকে (প্রথম দল লাহেকের ন্যায়, দ্বিতীয় দল মসবুকের ন্যায়) তাহারা নিজে নিজে পড়িল।

৫২৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শত্রু দল যদি এত অধিক হয় যে, তাহাদের মোকাবিলায় মোসলমান সৈন্যদল বিভক্ত করিলে আত্মরক্ষায় যথেষ্ট হইবে না, তবে প্রত্যেকে মাটিতে দাঁড়ানো বা বাহনে আরোহিত নিজ নিজ অবস্থায়ই একা একা নামায আদায় করিবে। (এমনকি কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হইলে যেই দিকে সম্ভব সেই দিকেই এবং রুকু সেজদা সম্ভব না হইলে শুধু মাথার ইশারায় রুকু সেজদার কাজ করিয়া নামায আদায় করিবে।

(ফতহুল-বারী, ২—৩৪৬)

৫২৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোনও এক জেহাদের ঘটনায় আমরা নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইলেন, আমরা সকলেই একত্রে তাঁহার পেছনে এক্তেদা করিয়া নামাযে দাঁড়াইলাম। যখন তিনি রুকুতে গেলেন তখন প্রথম কাতারের লোকগণ তাঁহার সঙ্গে রুকু করিল, সেজদার সময় সেজদা করিল, কিন্তু পেছনের কাতারের লোকগণ সেই রুকু-সেজদা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং প্রথম কাতারের লোকগণ সেজদা হইতে উঠিবার পর পেছনের কাতারের লোকগণ রুকু-সেজদা করিল। (এইরূপে সকলেরই এক রাকাত হইল,) দ্বিতীয় রাকাতের সময় (প্রথম কাতারের লোকগণ পেছনে এবং) পেছনের কাতারের লোকগণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুর্বের ন্যায়ই দ্বিতীয় রাকাত পড়া হইল। (এইরূপে সকলেরই সমরূপে দুই রাকাত পুরা হইলে পর একত্রে সালাম করিল।) সকলেই এক জমাতে শরীক ছিল, কিন্তু একে অন্যকে পাহারাও দিতেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—শত্রুর ভয় ও আশঙ্কাবস্থায় নামায এক জমাতে পড়ার বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিভিন্নতা এই জন্য যে, শত্রুপক্ষের অবস্থান বিভিন্ন রূপের ছিল এবং শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই জমাতের নিয়ম ধার্য্য করা হইত। যেমন ৫২৬নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ মোসলমানদের সম্মুখদিকে তথা কেবলার দিকে ছিল না, বরং অন্যদিকে ছিল, তাহাদের মোকাবিলায় দাঁড়াইয়া থাকার জন্য যে দল নিযুক্ত হইল তাহারা ঐ অবস্থায় নামায আরম্ভ করিতে পারিল না, কারণ তাহারা কেবলা দিকে নয়। ৫২৮নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ কেবলা দিকে ছিল, তাই সকলে একত্রেই নামায আরম্ভ করিল। রুকু সেজদার সময় আশঙ্কা; তাই পেছনের কাতার পাহারায় রহিল। এইভাবে যখন যেইরূপে জমাত করা সম্ভব হইয়াছে, তখন সেই নিয়মেই জমাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইহা অতি স্পষ্ট যে, এসব নিয়ম নামাযের সাধারণ নিয়ম হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র ও পৃথক, কিন্তু যেহেতু এই স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের জন্য ইহার বিস্তারিত বিবরণ দান করতঃ কোরআন শরীফের প্রায় একটি রুকু নাজেল হইয়াছে এবং বহু হাদীছে ইহা বর্ণিত ; তাই এই স্বাতন্ত্র্যকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়া এক জমাতকে যথাসম্ভব রক্ষা করা হইয়াছে। কারণ, ইহা আল্লার নিকট অতি পছন্দনীয় এবং মোসলেম সমাজের জন্য আবশ্যকীয় বস্তু, তদুপরি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় একতা প্রদর্শন বিশেষ ফলদায়ক।

যুদ্ধ চলাকালীন বা বিজয় সংগ্রাম অবস্থায় নামাযের নিয়ম

ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি বিজয়ের সুচনা ও সম্ভাবনা সন্নিকটে দেখা যায় এবং এমতাবস্থায় কোন মতেই রুকু-সেজদা করিয়া জমাতে নামায পড়া সম্ভব না হয় তবে প্রত্যেকেই নামায শুধু মাথার দ্বারা ইশারায় পড়িবে, তাহাও না হইলে নামায কাজা করিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে) আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে 'সুস্তর' শহরের দুর্গ আক্রমণ করা হইল ; আমি সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম।

ভোর বেলায় আক্রমণ চলিল, যুদ্ধের এরূপ তীব্রতা ছিল যে, আমরা কোন মতেই ফজরের নামায পড়িতে সক্ষম হইলাম না। অধিক বেলা হইলে আমরা ফজরের নামায পড়িবার সুযোগ পাইলাম এবং অধিনায়ক আবু মুছা (রাঃ) ছাহাবীর সহিত নামায পড়িলাম। শহরটি আমাদের জয় হইল। (জেহাদের সঙ্কটময় অবস্থায় যে নামায পড়িয়াছিলাম যদিও উহা কাজা নামায ছিল তবুও উহাতে এতই অনুরক্তি লাভ করিয়াছিলাম যে,) ঐ নামাযের বিনিময়ে সমগ্র জগতের রাজত্ব ও ধন-সম্পদ আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

৫২৯। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ক্রুধাবস্থায় কাফেরদিগকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, কিন্তু অদ্য আছরের নামায পড়িতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমিও ত এখন পর্য্যন্ত নামায পড়িতে পারি নাই। এই বলিয়া হযরত (দঃ) একটি সমতল ভুমিতে গেলেন এবং অজু করিয়া সূর্য্যাস্তের পরেই আছরের নামায পড়িলেন তারপর ঐ ওয়াক্তের মগরেবের নামায পড়িলেন।

মছআলাহ ঃ—জেহাদের সময় শত্রুকে ধাওয়া করা বা শত্রু কর্তৃক তাড়িত হওয়াকালে যদি নামাযের সঙ্কীর্ণ সময় উপস্থিত হয় তবে আরোহিত অবস্থায় ধাবমান রূপেই মাথার ইশারায় নামায আদায় করিবে (১২৯ পৃঃ)। আর যদি পদব্রজে ছুটিতে থাকে তবে কোন কোন ইমামের মতে সেই দৌড়ের অবস্থায়ই মাথার ইশারার সহিত নামায আদায় করিবে ; হানফী মজহাবের মত এই যে, এই অবস্থায় নামায কাজা করিবে।

মছআলাহ ঃ—ভোর বেলা শত্রুর শহর বা দুর্গের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা হইলে সুযোগ প্রাপ্তে ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়িয়া নিবে। (১২৯ পৃঃ)

ঈদের দিন ও উহার নামায

ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদ করা

৫৩০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোরবাণী বা রোযার এক ঈদের দিন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আমার গৃহে আসিলেন।

وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين وتدففان وتضربان (১৩০ ও ৫০০)

ঐ সময় আমার নিকটে দুইটি মদীনাবাসী বালিকা সেই সব পদ্য গাহিতে ছিল যেই সব পদ্য মদীনাবাসীরা তাহাদের ইসলাম-পূর্ব ঐতিহাসিক বোয়াছ-যুদ্ধে উভয় পক্ষ নিজ নিজ গর্ব-রচনায় গাঁথিয়া ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, বালিকাদ্বয় কোন গায়িকা ছিল না। বালিকাদ্বয় দফ্ বা ডুগিও বাজাইতেছিল, লাফালাফিও করিতেছিল। নবী (দঃ) তখন বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) আমাকে এবং বালিকাদ্বয়কে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে শয়তানের বাঁশি? তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া আবু বকরের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়, তাহাদিগকে ছাড়; প্রত্যেক জাতিরই খুশীর দিন আছে। আজিকার দিন আমাদের খুশীর দিন। অতঃপর হযরত (দঃ) এই দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া নিলে আমি বালিকাদ্বয়কে টিপুনি দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম; তাহারা চলিয়া গেল।

আরও একটি ঘটনা—একদা ঈদের দিন কতিপয় হাব্‌শী লোক মসজিদে ঢাল-খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল। আমি নিজে বলিলাম কিম্বা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, খঞ্জর-খেলা দেখিতে চাও? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) আমাকে আড়াল করিয়া রাখিতেছিলেন। আমার গণ্ডদেশ হযরতের গণ্ডের সহিত লাগাইয়া আমি হাবশীদের অস্ত্র চালনা দেখিতেছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে ধমকাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়; আর ঐ খেলোয়াড় হাবশীদেরকে বলিলেন, ভয় নাই— তোমাদের কাজ করিয়া চল।

আমি নিজেই অবসাদ অনুভব করিলে হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মন ভরিয়াছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে চলিয়া যাও।

● ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদের দিন; মোসলমানদের আমোদ-প্রমোদ কি আকারের হইবে তাহাই হাদীছের ঘটনাদ্বয়ে দেখান হইয়াছে; একটি কচি-কাঁচাদের, অপরটি বড়দের।

প্রথম ঘটনায় বালিকাদ্বয় সুরের সহিত গর্ব-গাঁথার পদ্য বা কবিতা গাহিতেছিল; আবু বকর (রাঃ) ভাবিলেন, সুরের সহিত যাহাই গাওয়া হইবে তাহাই শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত-নিষিদ্ধ, তাই তিনি বাধা দিলেন। বস্তুতঃ আরবীতে সুরকেই "গেনা" বলা হয় যাহার অর্থ সুরের সহিত আবৃত্তি করা ; এই জন্যই সুন্দর সুরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকেও আরবীতে "গেনা" বলা যায়। সুর বিভিন্ন প্রকারের, গানের সুর, তারানার সুর কাব্যের সুর, কোরআন তেলাওয়াতের সুর। এর মধ্যে গানের সুর হইল শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ। উক্ত ঘটনায় বালিকাদ্বয়ের সুরে গান ছিল না, বরং যুদ্ধের তারানা বা পদ্য ও কবিতা ছিল যাহার স্পষ্ট উল্লেখ হাদীছে রহিয়াছে। এবং বালিকাদ্বয় সুর-শিল্পীও ছিল না বলিয়া আয়েশা (রাঃ) নিজেই স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, তাই ঈদের আমোদ ক্ষেত্রে বালিকাদ্বয়ের কার্য্যের প্রতি হযরত (দঃ) সমর্থন জানাইয়াছেন। এইত হইল সুর ও গাওয়া সম্পর্কে।

উক্ত ঘটনার দ্বিতীয় জিনিষটি ছিল "تدففان" বালিকাদ্বয় দফ্‌ বাজাইতে ছিল। "দফ্‌" মাটি, কাঠ ইত্যাদির খোলের একদিকে চামড়া অপর দিক খোলা—যাহাকে বাংলায় ডুগি বা বাঁয়া বলে ; বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতের আঙ্গুল পিটাইয়া উহা বাজান হয়। আনন্দ উপলক্ষে অন্য কোন বাদ্যের সঙ্গে মিলাইয়া নয় ; শুধু দফ্‌ বা ডুগি বাজান শরীয়তে জায়েয রহিয়াছে।

চলতি যুগের এলমহীন জ্ঞানবাগীশরা বলিতে চান, রসুলুল্লার যুগ ও দেশ তথা অনুন্নত যুগ ও দেশে এই এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রই ছিল, তাই এই শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র শরীয়তের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ বর্তমান আবিষ্কারের যুগের বাদ্যযন্ত্রসমূহ রসুলের যুগে থাকিলে এইগুলিও তাঁহার অনুমোদন লাভ করিত—ইহা হইল জ্ঞানবাগীশদের কেয়াছ। এই শ্রেণীর লোকদের জানা উচিৎ—ঢোল, সারিন্দা, বেহালা, দোতারা, ছেতারা এবং নানা রকমের বাঁশি তখনও প্রচলিত ছিল। নতুবা তৎকালীন আরবী অভিধানে এই সব নাম বিদ্যমান থাকিত না। হাদীছেও বিভিন্ন নামের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ এবং নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী রহিয়াছে। যথা—

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة

"রসুলুল্লাহ (দঃ) মদ, জুয়া, এবং ঢোল বা সারিন্দ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় ছাহাবী হইতে উক্ত বিষয়ের হাদীছ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে।

ঢোল এবং সারিন্দা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র উভয় অর্থেই আরবী ভাষায় "كوبة—কুবা" শব্দ ব্যবহৃত হয় (মেরকাত দ্রষ্টব্য)। আর এক হাদীছে আছে—

قال النبى صلى الله عليه وسلم امرنى ربى عزوجل بمحق المعازف والمزامير

"নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে আদেশ করিয়াছেন—সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং সকল প্রকার বাঁশীর উচ্ছেদ করিতে।" (মেশকাত—৩১৮)

উক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা ঢোল, সারিন্দা ও বাঁশী স্পষ্টরূপেই নিষিদ্ধ হইল।

এতদ্ভিন্ন "معازف—মায়া'যেফ" বহু বচন শব্দ দ্বারা সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উচ্ছেদের কথাই বলা হইয়াছে। যেরূপ দ্বিতীয় হাদীছে উল্লেখ আছে। আরও এক হাদীছে কেয়ামতের আলামত রূপে বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখে বলা হইয়াছে—

(মেশকাত—৪৭০) ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور

"গায়িকা এবং বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইবে, মদ্য পানের চর্চা হইবে।" ফেকাহশাস্ত্রে ত প্রত্যেক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ করতঃ নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে।

উক্ত ঘটনায় তৃতীয় একটি কার্য্য ছিল تضربان যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে "লাফা-লাফি" করিতেছিল; এই শব্দের মধ্যে নাচ-নৃত্যের অর্থ মোটেই নাই। "নাচ বা নৃত্য" অর্থে আরবী ভাষায় অতি প্রসিদ্ধ বিশেষ শব্দ রহিয়াছে, رقص; এস্থলে ترقصان "তাহারা নাচ ও নৃত্য করিতেছিল" বলা হয় নাই। ضرب শব্দের অর্থ পদক্ষেপণ, অতএব ترقصان না বলিয়া تضربان বলার তাৎপর্য্য ইহাই যে, সেস্থলে নাচ-নৃত্য ছিল না; ছিল শুধু এলোমেলো পদক্ষেপণ তথা বাল্যসুলভ লাফালাফি।

যাহারা গান-বাদ্য, নাচ-নৃত্য করিতে এবং করাইতে অভিলাসী, তাহারা লাগামহীন স্বাধীনতার যুগে তাহা করিবেন, কিন্তু এই সব আবর্জনার মধ্যে হাদীছকে টানিয়া আনিয়া হাদীছকে অপবিত্র করতঃ ঈমান হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? বিষ খাইতে ইচ্ছা হয় খাইবেন, কিন্তু ডাক্তারের নামে বিষ খাইবেন কেন? ডাক্তারের প্রিসক্রিপ্‌শনে যে, বিষ ছিল না; বরং যাহার দ্বারা বিভ্রান্তি হইয়াছে উহা ছিল শুধু (Colour) রং—তাহা প্রতিপন্ন করতঃ যাহারা মোসলমান থাকিতে চান তাঁহাদের ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় ঘটনায় হাবশীরা অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল, ওমর (রাঃ) উহাকে শুধু খেলাই গণ্য করিয়া মসজিদে উহার অনুষ্ঠানে বাধা দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত খেলায় জেহাদের প্রশিক্ষণ ছিল, তাই উহা এবাদতও ছিল। মসজিদের মূল উদ্দেশ্য নামাযের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া সব রকম এবাদতই তথায় করা যায়, তাই উহা হযরতের সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

ঈদুল-ফিৎরের দিন ঈদগাহে যাইবার পূর্বে কিছু খাওয়া উচিৎ

৫৩১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফেৎরের দিন অন্ততঃ কয়েকটি খুরমা না খাইয়া সকালে বহির হইতেন না এবং তিনি বে-জোড় সংখ্যায় খুরমা খাইতেন।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোরবাণীর ঈদের দিনও নামাযের পুর্বে সকাল বেলা খাওয়া জায়েয আছে।

ঈদগাহের ময়দানে মিম্বরের ব্যবস্থা আবশ্যক নহে

৫৩২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোরবানী বা রোযার ঈদের দিন ঈদগাহে যাইয়া সর্বপ্রথম নামায পড়াইতেন। নামাযান্তে সব লোক নিজ নিজ স্থানেই বসিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ-নছীহত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বয়ান করিতেন। তারপর কোথাও কোন সৈন্যদল প্রেরণের প্রয়োজন হইলে উহার ব্যবস্থা করিতেন বা কোন আদেশ জানাইবার দরকার হইলে জানাইতেন, তারপর বাড়ী চলিয়া যাইতেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর এই ব্যবস্থাই—প্রচলিত থাকে। কোন এক ঈদের দিন আমি মারওয়ানের সঙ্গে ময়দানে গেলাম, মারওয়ান তখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা ময়দানে আসিয়া দেখি, কাছীর-ইবনে ছলৎ নামক এক ব্যক্তি একটি মিম্বর তৈয়ার করিয়া উপস্থিত রাখিয়াছে এবং মারওয়ান নামায পড়িবার পূর্বেই উহার উপর আরোহণের জন্য উদ্যত হইতেছে। আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম, যেন সে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু সে ক্ষান্ত না হইয়া ঐ মিম্বরের উপর আরোহণ করিল (এবং নামাযের পূর্বেই খোৎবা প্রদান করিল)। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমরা সুন্নত তরীকা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছ। সে উত্তর করিল, হে আবু সায়ীদ! তোমরা যাহা শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছ এখন তাহা চলিবে না। তখন আমি বলিলাম, খোদার কসম—আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি—তাহাই উত্তম, উহার তুলনায় যাহা আমরা শিক্ষা করি নাই। তারপর মারওয়ান বলিল, জনসাধারণ নামাযের পরে বসিয়া থাকিয়া আমাদের খোৎবা শোনে না, তাই নামাযের পুর্বেই খোৎবা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি।

মছআলাহ ঃ—ঈদগাহে মিম্বর ব্যবহার জায়েয, তথায় মিম্বর তৈরী করা উত্তম।

ঈদের খোৎবা নামাযের পরে হইবে এবং ঈদের নামাযে আজান বা একামত বলা হইবে না

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন সময়ই কোন ঈদের নামাযের জন্য আজান দেওয়া হইত না।

৫৩৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফেৎরের দিন ঈদগাহে যাইয়া প্রথমে নামায পড়িয়াছেন—খোৎবার পুর্বেই।

৫৩৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ঈদের নামায পড়িয়াছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই ঈদের নামায খোৎবার পুর্বে পড়িতেন।

৫৩৫। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলেই ঈদের নামায খোৎবার পুর্বে পড়িতেন।

৫৩৬। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঈদুল-ফেৎরের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুই রাকাত নামায পড়িলেন। ঐ ছুই রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন (সুন্নত, নফল) নামায পড়েন নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে আসিলেন যে স্থানে নারীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ছদকা করার আহ্বান জানাইলেন, তখন নারীগণ নিজ নিজ কানের ও নাকের অলঙ্কারাদি ছদকা স্বরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিতে আরম্ভ করিল।

ঈদের দিন অস্ত্র বহন

ঈদের দিন ঈদগাহে বা পথে ঘাটে যেখান অধিক মানুষের সমাগম বা গমনাগমন হইবে এইরূপ স্থানে অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ; যাহাতে আঘাত লাগার ঘটনা না ঘটে। হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, ঈদের দিন অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ, যদি মোসলমানদের উপর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে।

৫৩৭। হাদীছ ঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় মিনার মধ্যে আমি আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে ছিলাম; হঠাৎ এক ব্যক্তির হাতের বর্শার লৌহ-ফলক তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হইল। আমি উহা তাঁহার পা হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। শাসনর্কতা হাজ্জাজ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, কে এই কাজ করিল জানিতে পারিলে শাস্তি দিতাম। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনিই আমাকে আঘাত দিয়াছেন। হাজ্জাজ বলিলেন, তাহা কিরূপে? তিনি বলিলেন? এই দিনে অস্ত্র-বহন করা হইত না, আপনি তাহা করিয়াছেন; (আপনাকে দেখিয়া অন্যেও করিয়াছে।) হরম শরীফে অস্ত্র লইয়া প্রবেশ করা হইত না, আপনি তাহাও করিয়াছেন।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন এবাদত করার ফজিলত

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, واذكروا الله فى ايام معلومات "কতিপয় সুপরিচিত দিনে বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার জিকর ও এবাদত কর" এই আয়াতে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনই উদ্দেশ্য।

আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত আয়াতের উপর আমল করনার্থে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন সময় সময় বাজারে যাইয়া তকবীর বলিতে থাকিতেন; জনগণও তাঁহার সঙ্গে তকবীর বলিয়া যাইত।

৫৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের এবাদত হইতে অধিক ফজিলতওয়ালা অন্য কোন

দিনের কোন এবাদতই হইতে পারে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—জেহাদও নয় কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—জেহাদও নয়। অবশ্য কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির জেহাদ যে স্বীয় জান-মাল ও সর্বস্ব লইয়া জেহাদের ময়দানে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথা হইতে তাহার কিছুই ফেরত আসে নাই।

ঈদগাহে এক পথে যাওয়া অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করা

৫৩৯। **হাদীছঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন এক পথে যাইতেন এবং অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

মছআলাহঃ—ঈদের দিন যথাসাধ্য ভাল পোষাক পড়া উত্তম (১০৩ পৃঃ ৫০৩ হাঃ)।

মছআলাহঃ—ঈদের নামায শীঘ্র পড়া উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) এশরাক নামাযের সময়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ সময়ে আমরা (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে) ঈদের নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতাম।

মছআলাহঃ—জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর-নামায হইতে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ আছর তথা সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত তকবীর বলিতে হয়।

পবিত্র কোরআনে আছে, واذكروا الله فى ايام معدودات "আল্লার জিক্‌র বিশেষভাবে কর কতিপয় নির্দ্ধারিত দিনে।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত তারিখগুলিই এই কতিপয় নির্দ্ধারিত দিনের উদ্দেশ্য।

এই তকবীরের একটি পর্য্যায় হইল ওয়াজেব; উক্ত পাঁচ দিন প্রত্যেক ফরজ নামাযের সংলগ্নে তকবীর বলিবে। অগ্রগণ্য ফতওয়া অনুসারে ইহা জমাতের মুছল্লী, একা মুছল্লী, নারী-পুরুষ; এমনকি মুসাফির—সকলের উপরই ওয়াজেব (শামী, ১—৭৮৭)। আর এক পর্য্যায় হইল মোস্তাহাব; চলায়-ফেরায়, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, শয়নে, উঠনে, বসনে, সকল নামাযের পরে তকবীর বলা। ● খলীফা ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে উক্ত দিনসমূহ স্বীয় তাবুতে থাকিয়া তকবীর বলিতেন; নিকটবর্ত্তী মসজিদের লোকেরা সেই তকবীরের শব্দ শুনিয়া তকবীর বলিত এবং সেই সঙ্গে বাজারের লোকেরাও তকবীর বলিয়া উঠিত; এইভাবে একত্রে সকলের তকবীরে সারা মিনা এলাকা গুঞ্জিত হইত। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত দিনসমূহে প্রত্যেক নামাযের পর এবং বিছানায় থাকিয়া, তাবুতে বসিয়া, উঠ-বসায়, চলা-ফেরায়—সর্বাবস্থায় পূর্ণদিনগুলিতেই তকবীর বলিতেন। ● উম্মুল-মোমেনীন (রাঃ) তকবীর বলিতেন; অন্যান্য মহিলারাও তকবীর বলিতেন। তকবীর যে কোন আকারে বলিলেই হয় তবে উত্তম এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

মছআলাহঃ—ঈদের নামাযেও ইমামের সম্মুখে ছোতরার ব্যবস্থা রাখা চাই।

মছআলাহ :—নারীদের এমনকি ঋতু অবস্থার নারীরও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া—এই মছআলার পুর্ণ বিবরণ ২২২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

মছআলাহ :—বালকদের ঈদেগাহে উপস্থিত হওয়া জায়েয ; প্রমাণে ইমাম বোখারী (রঃ) ৮১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। বালকদের ঈদগাহে যাওয়া বরকত লাভের জন্য এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য ; সুতরাং যে সব বালক নামায পড়ার উপযুক্ত নহে তাহারও যাইতে পারিবে, অবশ্য তাহাদের সঙ্গে এরূপ লোক থাকা বিশেষ প্রয়োজন যে তাহাদিগকে খেলা-ধূলা, হট্টগোল ইত্যাদি হইতে বিরত রাখিবে। (ফতহুলবারী ২—৩৩৭)

মছআলাহ :—ঈদগাহে মিম্বর থাকার প্রয়োজন নাই, আর দুর হইতে ঈদের নামাযের স্থান-পরিচিতিরূপে ঈদগাহে কোন নিশান বা পতাকা উড্ডীন করা জায়েয। (১৩৩ পৃঃ ৮১ হাঃ)

মছআলাহ :— যাহার ঈদের জমাত ছুটিয়া যায় ; কোথাও যাইয়া জমাতে শামিল হওয়ার সুযোগ না থাকে এবং যাহাদের প্রতি ঈদের নামাযের হুকুম নাই, যেমন—মেয়েলোক বা যে এলাকায় শুধু ২।৪ জন মুসলমান আছে ; এইরূপ লোকদের জন্য ঈদের দিন সূর্য্য মধ্যেকাশে আসিবার পুর্বে দুই রাকাত (হানফী মজহাব মতে চার রাকাত শামী ১—৮৭৩) নফল নামায সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তকবীর ব্যতিরেকে পড়িয়া নেওয়া ভাল। মহিলাদের জন্য এই নামায ঈদের জমাত শেষ হইলে পর পড়িতে হইবে (শামী, ১—৭৭৭)। ● সাধারণভাবে ঈদের জমাতের ব্যবস্থা না থাকার এলাকায় কিছু সংখ্যক মুসলমান একত্রিত হইলে তাহারা ঈদের জমাত করিতে পারে। আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল বছরা শহর হইতে ছয় মাইল দূরে "যাবিয়া" নামক স্থানে, সেখানে নগণ্য বসতি ছিল ; ঈদের জমাতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না। (আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ ; ১৬৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ দ্রষ্টব্য।) তিনি তাঁহার ছেলেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে নিয়া তথায় ঈদের জমাত করিয়াছেন (১৩৪ পৃঃ)।

মছআলাহ :— ঈদের নামাযের পুর্বে বা পরে নফল নামায পড়িবে না (১৩৫ পৃঃ ৫৬৬ হাঃ)। ঈদের নামাযের পুর্বে ঈদগাহ বা অন্যত্র কোথাও নফল নামায পড়িবে না, আর পরে ঈদগাহে পড়িবে না ; অন্যত্র পড়াতে কোন দোষ নাই (শামী ১—৭৭৮)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বোখারী (রঃ) ঈদের বিবরণে কোরবাণী সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কোরবাণী সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ অন্যত্র আছে, তথায়ই উহার অনুবাদ হইবে।

———●———

বেতের-নামাযের বিবরণ

৫৪০। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দুই রাকাত করিয়া তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে থাকিবে। যখন ছোবহে-ছাদেক নিকটবর্তী হইবে তখন এক রাকাত পড়িয়া লইবে যদ্দারা তাহার নামায বেতের হইয়া যাইবে।

ইবনে ওমরের খাদেম 'নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বেতের নামাযের দুই রাকাত এবং ঐ এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাইতেন, এমনকি কথাবার্তাও বলিতেন।

ইবনে ওমর শাগের্দ ও বিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যত লোকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ছাহাবীগণ) তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোককে দেখিয়াছি, (এক সঙ্গে) তিন রাকাত বেতের পড়িয়া থাকেন। এবং বেতের নামাযের উভয় নিয়মই শুদ্ধ; আমি আশা করি উহার কোনটিই দূষণীয় নহে।

৫৪১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামায (বেতের সহ) এগার রাকাত পড়িতেন। এক একটি সেজদা এত দীর্ঘ করিতেন যত সময়ে আমরা কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে পারি এবং ফজরের সুন্নত দুই রাকাত পড়িতেন, তারপর ডান পার্শ্বে শায়িত থাকিতেন; মোয়াজ্জেন খবর দিলে ফজরের নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

বেতের নামায পড়িবার নিয়ম

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, বেতের নামায নিদ্রার পূর্বেই পড়িবার জন্য।

৫৪২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির বিভিন্ন অংশে (—প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে) বেতের নামায পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ আমল ছিল শেষ রাত্রে বেতের পড়া।

৫৪৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, রাত্রির সমস্ত নামাযের শেষে বেতের পড়িবার জন্য।

মছআলাহ ঃ—বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়া নাজায়েয নহে, অতএব কেহ এশার নামাযের সহিত বেতের পড়িয়া তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হইলে তাহাজ্জুদ পড়িবে ইহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। অবশ্য যাঁহারা তাহাজ্জুদ নামাযে পাকা-পোক্তা অভ্যস্ত তাঁহাদের জন্য উত্তম হইল এশার সহিত বেতের নামায না পড়িয়া তাহাজ্জুদের শেষে বেতের নামায পড়া—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই (ফতহুল-বারী, ২—৩৮৫)। এতদ্ভিন্ন বেতের নামাযের পর দুই রাকাত নফল যাহা নবী (দঃ) বসিয়া পড়িয়াছেন;

মোসলেম শরীফের হাদীছে উহার উল্লেখ আছে—বেতের নামাযের পর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া সেই দুই রাকাত পড়ায়ও দোষ নাই; ঐ রাকাতদ্বয় বেতের নামাযের আনুষঙ্গিকরূপেই গণ্য।

যানবাহনের উপর থাকিয়া বেতের নামায পড়া

ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারী পশুর পিঠের উপর বসিয়া থাকিয়া রুকু-সেজদার সুযোগ অভাবে শুধু মাথার ইশারায় রুকু-সেজদা করিয়া, এমনকি কেবলা দিক ছাড়া নিজের সুযোগের দিকেই মুখ করিয়া সুন্নত-নফল নামায পড়া যায়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও ছাহাবীগণ তাহাজ্জুদ নামায পড়া অতি দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকিতেন। আরব দেশ যে দেশে অধিক উত্তাপ ও গরমের কারণে শুধু রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করা হয় সেই ভ্রমণ অবস্থায়ও তাহাজ্জুদ নামায ছাড়িতেন না; সব ক্ষেত্রে ভ্রমণ স্থগিত করাও কঠিন হইত—এমতাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায পশুর পিঠে বসিয়া উহার গতিমুখী মাথার ইশারায় আদায় করিতেন; তবুও তাহাজ্জুদ নামায নাগা করিতেন না। সব সুন্নত নফল নামাযের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা জায়েয রহিয়াছে। মোটর বাস, রেল, প্লেন, লঞ্চ জাহাজ ইত্যাদিতেও সুযোগের অভাব ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থায় সুন্নত-নফল নামায পড়া যায়। যাঁহারা তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত, এশরাক, আওয়াবীন নামাযের অভ্যস্ত স্বীয় আমল ভঙ্গ না করিয়া উক্ত সুযোগ ব্যবহার করিতে পারেন।

বেতের নামায সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে বলিয়াছেন, প্রাথমিক যুগে উহা সুন্নত ছিল, পরে নবী (দঃ) কর্তৃক উহা ওয়াজেব ঘোষিত হইয়াছে। উহা আর রুকু-সেজদা ও কেবলামুখী ছাড়া আদায় হইবে না। সেই প্রয়োজনে উহা আদায়ের জন্য যানবাহন হইতে অবতরণ করিতে হইবে, যেরূপ ফরজ নামায আদায়ের জন্য করিতে হয়। বেতের নামায ওয়াজেব হওয়ার পূর্বে উহাও অন্যান্য সুন্নত নফলের ন্যায় পশুর পিঠের উপর আদায় করা হইত। অবশ্য অন্যান্য ইমাম এবং অনেক ছাহাবীগণ বেতের নামাযকে সুন্নতই সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৫৪৪। **হাদীছ** ঃ—সায়ীদ ইবনে ইয়াছার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত মক্কার পথে ভ্রমণে ছিলেন। প্রভাত নিকটবর্তী হইলে আমি যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ বেতের নামায পূর্ণভাবে আদায় করিয়া দ্রুত তাঁহার সহিত শামিল হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, প্রভাত নিকটবর্তী; তাই অবতরণ করিয়া বেতের নামায পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ যথেষ্ট মনে কর না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) উটের উপর বেতের নামায পড়িয়াছেন।

৫৪৫। **হাদীছ** ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপরে যেদিকে উহার গতি হইত সেই দিকেই মাথার

ইশারায় তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, কিন্তু ফরজ নামায ঐরূপে পড়িতেন না। বেতের নামায সোয়ারীর উপর পড়িতেন।

দোয়া-কুনুৎ পড়ার স্থান

৫৪৬। **হাদীছ ঃ**—আ'ছেম (রঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে দোয়া-কুনুতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দোয়া-কুনুৎ পড়া পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রুকুর পূর্বে কি পরে? তিনি বলিলেন, রুকুর পূর্বে। আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তি বলিয়া থাকে, রুকুর পরে। তিনি বলিলেন, সে ভুল বলিয়া থাকে; অবশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এক মাসকাল রুকুর পরে দোয়া-কুনুৎ পড়িয়াছিলেন, (কিন্তু উহা বেতের নামাযের কুনুৎ ছিল না বরং অন্য বিষয়ের কুনুৎ ছিল, যাহা কারণ বিশেষে পড়া হইয়াছিল—) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তরজন কোরআনের সুদক্ষ ছাহাবীকে কোন এক এলাকায় শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। 'রেয়েল' ও 'জাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের একদল কাফের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকদের কার্য্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক দুঃখিত হইয়া তাহাদের প্রতি বদদোয়া (ও অভিশাপ) করতঃ এক মাসকাল মগরেব ও ফজরের নামাযে ঐ কুনুৎ পড়িয়াছিলেন। (ইহাকে "কুনুতে-নাযেলাহ্" বলা হয়।)

মছআলাহ ঃ—কাফেরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সংগ্রাম অবস্থায় বা কাফেরদের আক্রমণ আশঙ্কায় কিম্বা কাফের দল কর্তৃক মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার বা ক্ষয়ক্ষতি সাধনের ঘটনা উপলক্ষে মোসলমানদের ঈমান, সংহতি অটুট থাকার এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় লাভ ইত্যাদির দোয়া করা, আর কাফেরদের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, পদস্খলন, ধ্বংস আল্লাহ তায়ালার আজাব ও পাকড়াও ইত্যাদির বদদোয়া করা—এই দোয়া ও বদদোয়াকে কুনুতে নাযেলাহ্ বলা হয়। "নাযেলাহ্" অর্থ বিপদ; মোসলমানদের বিপদে ইহা পড়া হয়; কাহারও মতে মগরেব ও এশায়ও পড়া যাইবে। এই কুনুৎ শেষ রাকাতে রুকুর পরে পড়া হয়। পক্ষান্তরে বেতের নামাযের কুনুৎ সর্বাবস্থায় এবং রুকুর পূর্বে পড়া হইবে।

৫৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন কোন দিন (ফজর বা এশার নামাযের) শেষ রাকাতের রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া—ছামিআল্লাহু-লেমান হামিদাহ্, আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ বলার পর মক্কায় আবদ্ধ ও অত্যাচারিত দুর্বল মোসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া দোয়া করিতেন এবং অত্যাচারী কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করিতেন। সেই দোয়া বদদোয়ার অনুবাদ এই—

"হে আল্লাহ! (কাফেরদের কবল হইতে) আইয়্যাশ ইবনে আবু রবিয়াকে পরিত্রাণ দাও, সালামাহ ইবনে হেশামকে পরিত্রাণ দাও, ওলীদ ইবনুল ওলীদকে পরিত্রাণ দাও

এবং দুর্বল মোসলমানদিগকে পরিত্রাণ দাও! হে আল্লাহ! (ঐ সব মোসলমানদের প্রতি অত্যাচারী কোরায়েশদের মুল) মোজার গোত্রের উপর বিনাশ ও ধ্বংসের তীব্রতা বাড়াইয়া দাও। আয় আল্লাহ! ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের যুগে যেরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সাত বৎসর হইয়াছিল ঐরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোজার গোত্রের উপর চাপাইয়া দাও।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন সময় ফজর নামাযে কাফেরদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়াও হযরত (দঃ) বদদোয়া করিতেন। যখন এই আয়াত নাযেল হইল— ليس لك من الامر شئ "নির্দিষ্টরূপে কাহারও প্রতি বদদোয়া করা আপনার জন্য শোভা পায় না" তখন হযরত (দঃ) উহা ত্যাগ করিলেন।

মছআলাহ্ঃ—দোয়া করিতে নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করায় দোষ নাই, কিন্তু বদদোয়ায় নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ করিবে না।

এস্তেছকা নামাযের বিবরণ

"এস্তেছকা" অর্থ বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। সুতরাং এস্তেছকার মূল বিষয় হইল দোয়া; উহা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান বা বিশেষ নামাযের উপরই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামায ব্যতিরেকে শুধু বৃষ্টির জন্য কান্নাকাটা এবং দোয়া করিয়াও উহা সম্পন্ন করা যায়। এই বিষয়টি বোখারী (রঃ) কতিপয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন। "জুমার খোৎবার মধ্যে এস্তেছকা সম্পন্ন হইতে পারে", "মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া এস্তেছকা হইতে পারে", "বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া জুমার নামাযেই এস্তেছকা হইতে পারে"; এই সব পরিচ্ছেদের জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) ৫২১নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য বৃষ্টির অভাবের দরুন বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামাযের সহিত এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাও স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) হইতে এবং ছাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। এস্তেছকার অনুষ্ঠানের দৃশ্য সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) এস্তেছকার নামাযের জন্য বাহির হইলেন; অতি সাধারণ ও নগণ্যের বেশে, বিনয়ী নম্র হইয়া, আল্লার হুজুরে কান্নাকাটি ও রোদনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। এই অবস্থায় হযরত (দঃ) ময়দানে পৌঁছিলেন। (ফতহুলবারী, ২—৪০০)

এস্তেছকার নামাযের জন্য কোন দিন বা সময় নির্দ্ধারিত নাই; তবে যেই যেই সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ বা নফল নামায নিষিদ্ধ ঐ সময়গুলি অবশ্যই এড়াইতে হইবে।

৫৪৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার জন্য লোকদেরকে নিয়া ঈদগাহে গেলেন। হযরত (দঃ) লোকদের সম্মুখে থাকিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির জন্য দোয়া

করিতে থাকিলেন; এই সময় গায়ের চাদর উল্টাইলেন এবং উহার দিক বদলাইলেন। অতঃপর জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন; উহাতে কেরাত সশব্দে পড়িলেন।

● এস্তেছকার নামাযে আজান একামত হইবে না। আবু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) (কুফার গভর্ণর ছিলেন, তিনি) একবার এস্তেছকার জন্য ময়দানে গেলেন; তাঁহার সঙ্গে ছাহাবী বরা ইবনে আযেব (রাঃ) এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)ও ছিলেন। ইমামরূপে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) পায়ের উপর দাঁড়াইলেন—মিম্বর ব্যতিরেকে। এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। তারপর সশব্দে কেরাতের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িলেন। আজান একামত দেওয়া হয় নাই। (১৩৯ পৃঃ)

● বৃষ্টির অভাবে যেরূপ বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোয়া করা যায় তাহাকে এস্তেছকা বলে; তদ্রূপ অতি বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি আরম্ভ হইলে তখন বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য এবং প্রয়োজন এলাকায় বৃষ্টি হওয়া ও অধিক বৃষ্টির এলাকায় না হওয়ার জন্যও দোয়া করা যায়।

(১৩৮ পৃষ্ঠা ৫২১ হাদীছ)

৫৪৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের আমলে অনাবৃষ্টির দরুন জনগণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইলে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) দ্বারা দোয়া করাইতেন। ওমর (রাঃ) আল্লার দরবারে এইরূপ বলিতেন—হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতাম আপনি আমাদিগকে বৃষ্টির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি; আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন। অতঃপর (আব্বাস (রাঃ) দোয়া করিতেন এবং) সকলের জন্য পরিতৃপ্তির বৃষ্টি হইত।

ব্যাখ্যাঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় দোয়ায় বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা হযরতের নবুওয়তের পূর্বে হযরতের বাল্য বেলায়ও ঘটিয়াছিল।

একবার মক্কায় অনাবৃষ্টিতে লোকগণ বৃষ্টির জন্য একত্রিত হইল, আবু তালেব হযরত (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৃষ্টি হইল, হযরত (দঃ) তখন বালক ছিলেন। হযরতের প্রশংসায় আবু তালেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবিতার মধ্যে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

৫৫০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বৃষ্টির দোয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। হযরত (দঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া দোয়া করেন; আমি তখন আবু তালেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবিতার এই বয়েতটি স্মরণ করি—

وابيض يستسقى الغمام بوجهه - ثمال اليتامى عصمة للارامل

"তিনি এরূপ নূরানী যে, তাঁহার নূরানী চেহারার অছিলায় মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং অনাথ বিধবাদের রক্ষক।"

বয়েতটি স্মরণ করিয়া আমি হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইতে থাকি ; হযরত (দঃ) দোয়া শেষ করিয়া মিম্বর হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এমন বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, সকল ছাদ হইতে প্রবল বেগে পানি বহিতে আরম্ভ হয়।

মছআলাহ :— এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করায় মোক্তাদীগণও ইমামের সঙ্গে হাত উঠাইয়া দোয়া করিবে। (১৪০ পৃঃ ৫২১ হাদীছ)

৫৫১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার দোয়ার মধ্যে হাত এত অধিক উঠাইতেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দেখা যাইত ; অন্য কোনও দোয়ার মধ্যে হযরত (দঃ) হাত এতদূর উঠাইতেন না।

৫৫২। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মেঘ দেখিলেই এই দোয়া পড়িতেন—اللهم صيبا نافعا "হে আল্লাহ। আমাদের উপর সুফলদায়ক উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

বৃষ্টি-বর্ষণ শরীরে বরণ করা

বৃষ্টির জন্য দোয়া করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইলে হযরত নবী (দঃ) নিজ শরীরে সেই বৃষ্টি বরণ করিয়াছেন। যেরূপ ৫২১নং হাদীছের ঘটনায় দেখা যায়। দোয়ার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার ছিল, ছাদ হইতে বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ির উপর বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; হযরত (দঃ) উহা ইচ্ছাপূর্বক বরণ করিতেছিলেন, নতুবা উহা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতেন। (ফতহুলবারী, ১—৪ ৬)

মোসলেম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়ের কাপড় গুটাইয়া শরীরে বৃষ্টি বরণ করিলেন এবং বলিলেন, এই পানি সবে মাত্র প্রভু-পরওয়ারদেগারের (বিশেষ কুদরতের) সংস্পর্শ হইতে আসিয়াছে।

অধিক বেগে বায়ু বহিবার সময় দোয়া

৫৫৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অধিক বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারায় ব্যাকুলতার লক্ষণ দেখা যাইত।

ব্যাখ্যা :—পূর্ববর্তী অনেক উম্মত প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার আজাবে ধ্বংস হইয়াছে ; তাই ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস প্রবল বেগের বায়ু-বাতাস দেখিলে আল্লাহ তায়ালার আজাব স্মরণে হযরতের অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হইত ; তিনি এই দোয়াও পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ

"হে আল্লাহ! এই বাতাস তোমার তরফ হইতে উপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে আমি সেই উপকার তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং অপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে সেই অপকার হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাই।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ভূকম্প ইত্যাদি দুর্যোগের ঘটনা সম্পর্কেক ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়া যেরূপ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়া চাই যাহাকে এস্তেছকা বলা হয়। তদ্রূপ প্রতিটি দুর্যোগ-দুর্ভোগের সময়ই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়া চাই।

বৃষ্টি পাইয়া উহাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি সম্পৃক্ত করা বস্তুতঃ আল্লার নাশোকরী

৫৫৪। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিক হোদায়বিয়ার ময়দানে অবস্থান করা কালীন একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল। ফজরের নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি (এই বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি বলিয়াছেন ? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভাল জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিয়াছেন, ভোর হইলে আমার বন্দাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক আমার প্রতি ঈমান রাখার উপযোগী উক্তি করিবে, কিন্তু আর একদল লোক আমার প্রতি অস্বীকারোক্তিজনক কথা বলিবে। যাহারা বলিবে—আল্লার রহমত ও মেহেরবানীর বদৌলতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি ঈমানদার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যাহারা বলিবে—অমুক অমুক নক্ষত্রের দরুণ বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আল্লার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী প্রতিপন্ন হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আমাদের মধ্যে সচরাচর বলা হয়, অমাবস্যার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে বা পূর্ণিমার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে—এইরূপ উক্তিকে সঙ্কুচিত থাকা কর্তব্য।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণকালীন নামায

৫৫৫। **হাদীছ ঃ**— আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদের প্রতি রওয়ানা হইলেন। তাড়াতাড়ির কারণে তিনি নিজের শরীরের চাদরখানা পর্য্যন্ত ঠিকভাবে গায়ে না দেওয়াতে উহা মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। লোকগণও হযরতের প্রতি দ্রুত ছুটিয়া আসিল। হযরত (দঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন, এদিকে সূর্য্যের গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। নামাযান্তে তিনি বলিলেন, কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয় না; যখনই চন্দ্র বা সূর্য্যের এই অবস্থা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামাযরত হও, যাবৎ এই বিপদাবস্থা দুরীভূত না হয় সেই পর্য্যন্ত দোয়া করিতে থাক।

৫৫৬। হাদীছ :—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণে হয় না। বস্তুতঃ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নামাযের প্রতি ধাবিত হইও।

৫৫৭। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন—নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর বা জন্মের প্রভাবে সংঘটিত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানসমূহেরই দুইটি নিশান। যখনই তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখ নামায পড়।

৫৫৮। হাদীছ :—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রিয় পুত্র হযরত ইব্রাহীন (আলাইহে ওয়া আলা আবীহেছ-ছালাম) এন্তেকাল করিলেন সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইল। সকলে এরূপ বলাবলি করিতে লাগিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পুত্রের মৃত্যুতেই ইহা হইয়াছে। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার কুদরতের বিশেষ দুইটি নিশান। উহাদের গ্রহণ কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও সংঘটিত হয় না। যখন উহা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে আরম্ভ কর। যাবৎ গ্রহণ অবস্থা দুরীভূত হইয়া পরিষ্কার না হইয়া যায় নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে থাক।

৫৫৯। হাদীছ :— আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সূর্য্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের দুইটি নিদর্শন। উহা কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালা (এত বড় বৃহৎ ও তেজোময় আলোক দীপ্ত বস্তুদ্বয়কে এইরূপে কালিমাযুক্ত করিয়া) স্বীয় বন্দাদিগকে ভয় দেখাইয়া (ও সতর্ক করিয়া) থাকেন। (১৪৩ পৃঃ)

৫৬০। হাদীছ :—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় এখনই সংঘটিত হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি মসজিদে আসিলেন এবং অধিক লম্বা কেরাত, রুকু, সেজদা দ্বারা নামায পড়িলেন; এরূপ লম্বা আর কখনও করিতে দেখি নাই। তারপর বলিলেন, এই সব ঘটনা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ সংঘটিত করিয়া থাকেন। কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে এই সব কখনও ঘটে না, এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাগণকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করিয়া থাকেন। তাই যখন এরূপ কোন ঘটনা দেখ, তৎক্ষণাৎ ভয়-ভীতির সহিত আল্লার জিকর, দোয়া ও এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি ধাবিত হও।

৫৬১। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় একদা সূর্য্য গ্রহণ হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায

আরম্ভ করিলেন, (আড়াই পারা যুক্ত) ছুরা বাকরার ন্যায় লম্বা কেরাত পড়িলেন। তারপর অত্যধিক লম্বা রুকু করিলেন, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পুনরায় অতি লম্বা রুকু করিলেন; প্রথম রুকু হইতে একটু ছোট, তারপর সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় রাকাতও ঐরূপে পড়িলেন, এইরূপে দুই রাকার নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য গ্রহণও শেষ হইল। নামাযান্তে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্র (এবং উহাদের নানাপ্রকার পরিবর্তন) আল্লার কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না।* অতএব যখন ঐরূপ কিছু দেখ, তৎক্ষণাৎ আল্লার জেকরের প্রতি ধাবিত হইও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, এইস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় আমরা আপনাকে দেখিয়াছি—আপনি যেন হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু ধরিতে উদ্যত হইতেছেন; তারপর আবার দেখিলাম, আপনি পেছনে হাটিতেছেন। (এসবের কারণ কি ছিল?) হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, (আল্লার কুদরতে) আমি বেহেশতকে অতি নিকটবর্তী স্থানে দেখিতে পাইয়া উহা হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যদি উহা আনিতাম তবে তোমরা উহা দুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে পারিতে (কারণ, বেহেশতের সমুদয় বস্তু অক্ষুরন্ত)। দোষখকেও ঐরূপ নিকটবর্তী স্থানেই দেখিয়াছি; উহার মত এত বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই এবং উহার অধিকাংশ বাসিন্দা নারী জাতি দেখিয়াছি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন নারী জাতির এই অবস্থা কি কারণে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাদের কুফরীর কারণে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য কি আল্লার সঙ্গে কুফরী করা? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—(এখানে কুফরীর অর্থ নেমক-হারামি ও না-শোকর গোজারীর স্বভাব। তাহারা তাহাদের স্বামীদের নাশোকরী করিয়া থাকে, এহসান তথা উপকারের নেমক-হারামি করিয়া থাকে। জীবনভর তাহাদের কাহারও প্রতি যে ব্যক্তি উপকার করিয়াছে তাহার একটি মাত্র ত্রুটি দেখিলেই বলিয়া ফেলে—সারা জীবনে আমরা কোন ভাল ব্যবহার পাই নাই।

৫৬২। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সূর্য্যগ্রহণ হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্য একত্রিত হওয়ার আহ্বানকারী দিকে দিকে পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর সকলকে লইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। লম্বা কেরাত পড়িলেন, রুকুও লম্বা করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় লম্বা কেরাত পড়িলেন—প্রথম কেরাত হইতে একটু ছোট। তারপর সেজদায় না যাইয়া পুনরায় রুকু করিলেন—প্রথম রুকু হইতে ছোট, তারপর অনেক লম্বা সেজদা করিলেন, এইরূপেই দ্বিতীয় রাকাত পড়িলেন; এইভাবে চার রুকু ও চার সেজদায় দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। নামায পড়িতে পড়িতে সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইয়া গেল।

---

* অন্ধকার যুগে লোকদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণযুক্ত হইয়া থাকে। হযরত (দঃ) সেই আকিদারই খণ্ডন করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি ভাষণ দান করিলেন—আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান পূর্বক বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার অসীম কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও গ্রহণযুক্ত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ (আল্লাহ তাঁহার বন্দাদিগকে সতর্ক করার জন্য) ঘটাইয়া থাকেন। যখন ঐরূপ অবস্থা দেখ, তখন আল্লার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা আরম্ভ কর, তকবীর বল এবং নামায পড় ও দান-খয়রাত কর—যাবৎ তোমাদের সম্মুখ হইতে সূর্য্যের এই অবস্থা দুরীভূত না হয়।

(পরকালের) যত কিছুর সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছে; আমি আমার এই নামাযের মধ্যে ঐসবকে চাক্ষুষরূপে অবলোকন করিয়াছি। এমনকি আমি বেহেশত (দেখিয়া উহা) হইতে আঙ্গুর ছড়া হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছ। আমি দোযখকে দেখিয়াছি—উহার অগ্নি-শিখাগুলি কিলবিল করিতেছিল; তখন তোমরা আমাকে পেছনে হাটিতে দেখিয়াছ। সেই দোযখের মধ্যে আমি আম্‌র ইবনে লুহাই (মক্কাস্থিত আদিকালে এক কাফের)কে দেখিয়াছি; সে-ই ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে কোন পশু ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল।

হে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতগণ! আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কোন বন্দা-বান্দীকে যেনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত দেখিলে যেরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাখেন, অন্য আর কেহই কোন বস্তুকে ঐরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। হে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতগণ! (মানবের সম্মুখে যেই কঠিন সময়, কঠিন পথ, কঠিন সমস্যাবলী রহিয়াছে) যদি তোমরা জানিতে যেরূপ আমি জানি; শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তবে নিশ্চয় তোমরা হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী। (১৪২ ও ১৬১ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—অন্ধকার যুগে লোকদের বিশ্বাস ও মতবাদ এই ছিল যে, কোন মহা মানবের মৃত্যু বা জন্মলগ্নে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে সে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল উহা হযরতের তৎকালীন একমাত্র পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সংঘটিত হইয়াছিল। সেমতে লোকদের উপর তাহাদেরই মতবাদ ও বিশ্বাস সূত্রে হযরতের একটা বিরাট প্রভাব লাভের সুবর্ণ সুযোগ ছিল; লোকদের মুখে তাহা আসিয়াও ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মিথ্যা সুযোগকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যে অধিক তৎপরতার সহিত উক্ত গর্হিত মতবাদকে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া বার বার ইহা প্রচার করিলেন যে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কখনও কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে বা কাহারও জন্মলগ্নে হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মহা কুদরত ও সর্বশক্তির নমুনা দেখাইয়া মানবকে সতর্ক করিতে চাহেন। মানব যেন আল্লার ভয় অন্তরে জাগরিত রাখিয়া জীবন-যাপন করে।

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে আরও একটি অনেক বড় নিদর্শন এই রহিয়াছে যে, সূর্য্য ও চন্দ্র অতি বড় বিরাট বস্তু ও মহা উপকারী বটে, কিন্তু ইহা পূজনীয় হইতে পারে না; ইহা

মহান আল্লাহ তায়ালার নগণ্য সৃষ্ট। ইহার আলো ও জ্যোতিই ইহার অস্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—সেই আলোটুকুও উহার আয়ত্বে নহে, উহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীনে; এইরূপ বস্তু পূজনীয় কিরূপে হইতে পারে? পবিত্র কোরআনে আছে—

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

"আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসংখ্য নমুনারই অন্তর্ভুক্ত রাত্র এবং দিন; (অধিকন্তু দিবারাত্রের বিবর্তনের মূল বস্তুদ্বয়—) সূর্য্য এবং চন্দ্রও সেই কুদরতের নমুনারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা চন্দ্র-সূর্য্যের সেজদা বা পূজা করিও না, সেজদা ও পূজা কর ঐ আল্লার যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা বস্তুতঃ আল্লারই পূজারী হইয়া থাক (২৪ পারা, ১৯ রুকু; ইহা সেজদার আয়াত)। অর্থাৎ অনেকে বলিয়া থাকে চন্দ্র-সূর্য্যের পূজার মাধ্যমে আল্লারই পূজা মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার বলিয়া দিলেন, আল্লার পূজারী সাবাস্ত হইতে চাহিলে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা কোন স্তরেই করিবে না। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দ্বারা চাক্ষুষ ও সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হয় যে—উহা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রনাধীন বস্তু; এই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার এবাদতে লিপ্ত হওয়া উক্ত আয়াতের কতই না সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আরও একটি বিষয়ের নিশান ও নিদর্শন—তাহা হইল সারা বিশ্ব, বরং সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য সব কিছুর লয় তথা মহাপ্রলয়ের নিদর্শন। চন্দ্র ও সূর্য্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে এক শ্রেণীর মানুষ উহার পূজারী হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রলয় লগ্নে আল্লাহ তায়ালা উহার বৈশিষ্ট্য ছিনাইয়া নিয়া চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন যে, চন্দ্র-সূর্য্য ও উহার বৈশিষ্ট্য সবেরই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রনকারী আল্লাহ তায়ালা; সেই সূত্রেই মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে সারা সৌরজগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সূর্য্যের জ্যোতি ও কিরণমালাকে আল্লাহ তায়ালা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন; সূর্য্য একটি সাধারণ গোলাকার বস্তু হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরআনে ৩০ পারায় উল্লেখ আছে—اذا الشمس كورت "(মহাপ্রলয়ের সময় তখন—) যখন সূর্য্যের কিরণ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।" চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপই।

পবিত্র কোরআন শরীফে ২৯ পারায় আছে—

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ....

"বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে আসিবে? যখন অবস্থার ভয়াবহতার ত্রাসের দরুণ চক্ষু তাক লাগাইয়া যাইবে এবং চন্দ্র আলোহীন হইয়া যাইবে······তখন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার জায়গা আছে কি?"

সাধারণ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সেই মহা গ্রহণেরই নমুনা। এই জন্যই ৫৬৮নং হাদীছে আছে যে, সূর্য্যগ্রহণ হইলে পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আতঙ্কিত হইলেন যে, কেয়ামত আসিয়া গেল নাকি ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নামায সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে আদেশবোধক শব্দের উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে। অধিকাংশ ইমাম এই নামাযকে ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন এবং কেহ ওয়াজেব বলিয়াছেন। (ফতহুলবারী, ২—৪২১)

সূর্য্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একাধিক রুকু করা হযরত নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে; কেহ সেইরূপ করিলে তাহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। হানফী মজহাবে বলা হয় যে, হযরত (দঃ) কোন সাময়িক কারণে ঐ সময়ে উহা করিয়াছিলেন। যেরূপ উক্ত নামাযে হযরত (দঃ) এক সময় নিজের স্থান হইতে পেছনে হটিয়া ছিলেন, এক সময় হাত বাড়াইয়া কিছু ধরিতে চাহিয়াছিলেন (৫৬১ হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

উক্ত নামাযান্তে স্বয়ং হযরত (দঃ) লোকদিগকে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ অবস্থায় ফজর নামাযের ন্যায় নামায পড়িতে বলিয়াছেন—তাহা হাদীছে বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমল বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সূর্য্যগ্রহণের নামায ফজরের নামাযের ন্যায়ই পড়িয়াছেন (১৪২ ও পৃঃ)। তাই হানফী মজহাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের নামায প্রচলিত নিয়ম তথা প্রতি রাকাতে এক রুকু দ্বারাই পড়িতে বলা হয়।

৫৬৩। হাদীছ ঃ—আবু বকর তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। (কেরাত পড়িতে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করিলেন; রুকু হইতে উঠিয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন (এবং পুনঃ কেরাত পড়িলেন।) তারপর পুনরায় সুদীর্ঘ রুকু করিলেন; রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় গেলেন এবং দীর্ঘ সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় সেজদা হইতে দাঁড়াইয়া গেলেন; এইবারও দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেইন এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দীর্ঘ দুই রুকু ও দুই সেজদা করিয়া নামায শেষ করিলেন। নামায শেষে লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন যে, বেহেশতকে আমার এত নিকটবর্তী দেখান হইয়াছে যে, পুর্ণ সাহস করিলে বোধ হয়, উহার একটি আঙ্গুর ছড়া আনিতে পারিতাম। দোযখও অতি নিকটবর্তী দেখান হইয়াছে; এমনকি আশঙ্কাভিভূত হইয়া আমি (আল্লার রহমত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে) বলিয়াছি, হে পরওয়ারদেগার! আমি লোকদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই……(দোযখ তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিবে)? আমি দোযখের শাস্তিভোগে লিপ্ত একটি নারীকে দেখিয়াছি—একটি বিড়াল তাহাকে নখ দ্বারা আঁচড় দিতেছে। তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে ঐ বিড়ালটাকে বাধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলিয়া ছিল;

উহাকে খাদ্যও দেয় নাই, আবার ছাড়িয়াও দেয় নাই যে, সে নিজে খাদ্য জুটাইতে সক্ষম হয়। (১১৩ পৃঃ) এতদ্ভিন্ন ১৩৮ নম্বরেও এই হাদীছখানা অনূদিত হইয়াছে। তথায় আরও কিছু তথ্য উল্লেখ রহিয়াছে।)

৫৬৪। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যখন সূর্য্যগ্রহণ হইল, তখন সর্বত্র এই ধ্বনি দেওয়া হইল—নামাযের জন্য প্রস্তুত হও।

৫৬৫। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদি ভিখারিনী তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল এবং—اعاذك الله من عذاب القبر "আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন।" এই দোয়া করিল। (ইতিপূর্বে আয়েশা (রাঃ) কবরের আজাবের কথা শুনেন নাই, তাই) তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষদিগকে তাহাদের কবরে আজাব দেওয়া হইবে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (হাঁ—) আমি উহা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তারপর একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকাল বেলা কোন কাজে যানবাহনে চড়িয়া যাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিবিগণের (চেতনা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে তাহাদের) কক্ষসমুহের মধ্য দিয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং নামায আরম্ভ করিলেন। লোকেরা তাঁহার পেছনে কাতার বাঁধিয়া নামাযে শরীক হইল। তিনি (পূর্ব বর্ণিতরূপে দুই রাকাত) নামায শেষ করিয়া কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার আদেশ করিলেন।

৫৬৬। হাদীছ :—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের সময় ক্রীতদাস মুক্ত করিতে।

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে করণীয় আমলসমুহ :

● নামাযের ব্যবস্থা করিবে—নিজেও নামায পড়িবে এবং লোকদিগকে একত্রিত করায় ব্যবস্থা করিবে, এমনকি আহ্বানকারী পাঠাইয়া লোকদিগকে ডাকিয়া আনিবে, নিজের পরিবার-পরিজনকেও নামাযের জন্য সচেতন করিবে। নামায জমাতের সহিত মসজিদে পড়িবে—ইহা উত্তম; সেরূপ ব্যবস্থা না হইলে নিজ গৃহেই পড়িবে। যথাসাধ্য এই নামাযের কেরাত এবং রুকু-সেজদা সুদীর্ঘ করিবে। প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ করিবে। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের নামায এত দীর্ঘ করিবে যে নামায শেষ হইতে গ্রহণ ছুটিয়া যায়। নামাযান্তে যদি দেখা যায় গ্রহণ ছুটে নাই তবে অবশিষ্ট সময় দোয়া করিয়া কাটাইবে (ফতহুলবারী ২—৪২১) সূর্য্য গ্রহণের নামায শেষে ইমাম চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া ভাষণ দিবেন। সূর্য্য গ্রহণের নামাযে পুরুষদের জমাতে মহিলাদের শামিল হওয়া—এ সম্পর্কে পূর্ণ মছআলাহ এই যে, যদি

নিজ গৃহে পরিবারবর্গের জমাত হয় তবে শামিল হইতে পারে। মসজিদের জমাতে শামিল হওয়ার মছআলাহ উহাই যাহা "মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া" পরিচ্ছেদে এবং ১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

● বিভিন্ন দোয়ায় আত্মনিয়োগ করিবে। ● "আল্লাহু-আকবার" এবং বিভিন্ন রকমে আল্লার জেকর করিবে। ● বিশেষভাবে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিবে। ● গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট কান্নাকাটি করিবে।

● চন্দ্র গ্রহণেও নামায পড়িবে (১৪৫ পৃঃ)। অবশ্য সূর্য্য গ্রহণের নামায জমাতে পড়া মোস্তাহাব; চন্দ্র গ্রহণের নামাযে জমাত মোস্তাহাব নহে (শামী, ১—৭৭৮)। সূর্য্য গ্রহণের নামায রসুলুল্লাহ (দঃ) জমাতে পড়িয়াছেন; চন্দ্র গ্রহণের কোন ঘটনা হযরতের আমলে বর্ণিত নাই, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের গ্রহণের তাৎপর্য্য সমপর্য্যায়ের বর্ণনা করিয়া উভয়ের গ্রহণে নামায, জিক্‌র দোয়া, এস্তেগফার ও দান-খয়রাতের আহ্বান জানাইয়াছেন।

কোরআন শরীফে সেজদার আয়াতসমূহ

৫৬৭। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন—"ছুরা ছোয়াদ"-এর মধ্যে একটি সেজদার আয়াত আছে, উহার উপর সেজদা করা ফরজ ওয়াজেব না হইলেও আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিতে দেখিয়াছি।

৫৬৮। **হাদীছ :**— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "ছুরা-নাজম" তেলাওয়াত করিলেন; উহার একটি আয়াতের উপর তিনি সেজদা করিলেন এবং উপস্থিত সকল (এমনকি কাফেররা পর্য্যন্ত) সেজদা করিল; এক বৃদ্ধ (কাফের সে অতিশয় মোটা ছিল) সেজদা করিতে পারিল না, কিন্তু সেও এক মুঠি মাটি উঠাইয়া কপালে ছোঁয়াইল এবং বলিল, আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই লোকটি কাফের থাকাবস্থায়ই মোসলমানদের হাতে নিহত হয়।

৫৬৯। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরা নাজম তেলাওয়াত কালে সেজদা করিলেন। উপস্থিত মোছলমান, মোশরেক, জ্বিন ও সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহার সঙ্গে সেজদা করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—ঐ ক্ষেত্রে বহু কাফের সেজদা করিয়াছে, এমনকি এরূপ গুজব রটিয়া গেল যে, মক্কাবাসীরা মোসলমান হইয়া গিয়াছে। কাফেরদের এই সেজদার মূলে কি হেতু ছিল সে বিষয়ে কোন কোন ভিত্তিহীন ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃত ঐ সকলে বিশেষ একটি ঐশ্বরিক প্রভাব সকলকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলে, যদ্দরুণ সকলে সেজদা করিতে বাধ্য হয়। তাই অন্য এক হাদীছে আছে, ঐ সময় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত পর্য্যন্ত (নিজ নিজ পদ্ধতিতে) সেজদা করিয়াছিল।

এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লার সর্বশক্তিমত্তা ও স্বেচ্ছাধীন কুদরতের বিকাশ হইয়া থাকে; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها "আমি ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলক সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারি।"

এই কুদরতের নমুনাই আল্লাহ তায়ালা সময় সময় দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সর্বদার জন্য ও ব্যাপকভাবে আল্লাহ তায়ালা এই ইচ্ছাকে প্রয়োগ করেন না, কারণ উহাতে দুনিয়ার-সৃষ্টি রহস্য তথা "পরীক্ষা" অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

৫৭০। হাদীছ:— যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাতে ছুরা নাজম তেলাওয়াত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তখন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে) সেজদা করেন নাই।

৫৭১। হাদীছ:—আবু ছালামাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু হোরায়রা (রা:)কে দেখিয়াছি, তিনি "ছুরা এন্‌শাক্‌কাত" তেলাওয়াত করিলেন এবং সেজদা করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এখানে সেজদা করিতে না দেখিলে সেজদা করিতাম না।

৫৭২। হাদীছ:— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমাদের উপস্থিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিতেন এবং সেজদা করিতেন, আমরাও সেজদা করিতাম; যাহাতে এত ভীড় হইয়া যাইত যে, আমরা (একত্রে) প্রত্যেকে মাথা রাখিবার স্থান পাইতাম না।

৫৭৩। হাদীছ:—আবু রাফে' (র:) বর্ণনা করিয়ায়ছন—একদা আমি আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে নামায পড়িলাম, তিনি "ছুরা এন্‌শক্‌কাত" পড়িলেন এবং নামাযের মধ্যেই উহার সেজদাও করিলেন। নামাযান্তে আমি তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামাযের মধ্যে এইরূপে সেজদা করিয়াছি, তাই আমি আজীবন ইহা করিয়া যাইব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (র:) বিভিন্ন প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, সেজদার আয়াত পড়িয়া বা শুনিয়া সেজদা করা ফরজ-ওয়াজেব নহে; মোস্তাহাব। অবশ্য এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদীছ দেখা যায় না; বিভিন্ন হাদীছে শুধু এই বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (দ:) সেজদা করিতেন। হানফী মজহাবে সেজদার আয়াত যে পড়ে বা শুনে উভয়ের উপর সেজদা করা ওয়াজেব; অবশ্য তৎক্ষণাৎ না করিয়া পরে করিলেও চলে, একেবারেই না করিলে ওয়াজেবের তরকের কঠিন গোনাহ হইবে।

——:০:——

মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

৫৭৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছেন এবং সেই অবস্থানে নামায কছর পড়িয়াছেন। সুতরাং আমরা ভ্রমন অবস্থায় কোথায়ও উনিশ দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিলে কছরই পড়িব। অধিক অবস্থান করিলে পুর্ণ নামায পড়িব।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে মুছাফির ব্যক্তি (ঘণ্টার হিসাবে) পুর্ণ পনর দিন কোন স্থানে অবস্থানের নিয়্যত করিলে তখন হইতেই তাহাকে নামায পুর্ণ পড়িতে হইবে। এক ঘণ্টা কম পনর দিন এক শহরে অন্যান্য দিন অন্য এলাকায় কিম্বা নিয়্যত ব্যতিরেকে যত দিনই অবস্থান করিবে সে ক্ষেত্রে নামায কছরই করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে এই অবস্থাই অবধারিত।

৫৭৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনা হইতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত নামায দুই দুই রাকাত পড়িয়াছি। আনাছ (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমরা মক্কা শরীফে দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম।

৫৭৬। **হাদীছ ঃ**—হারেছা ইবনে ওয়াহব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মিনায় (চার দিন) অবস্থান কালে (কছর—চার রাকাত) নামায দুই রাকাত পড়িতেন। ঐ সময় মোসলমানদের পুর্ণ নিরাপদ অবস্থা বিরাজমান ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোসলমানদের জন্য নিজদের এলাকা হইতে দূরে সাধারণতঃ নিরাপত্তার অভাব বিরাজমান ছিল ; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথমতঃ কছরের বিধান প্রবর্তিত হয়, যেন ভয়-সঙ্কুল স্থানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করা হয় ; পবিত্র কোরআনে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু পরে কছরের বিধান ভয়ের অবস্থায় সীমিত থাকে নাই, বরং নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রত্যেক ছফর ক্ষেত্রের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে উহারই উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং ছাহাবীগণের সুদীর্ঘ জীবনে নিরাপদ ও শান্ত অবস্থায় ছফরে কছর ভুরি ভুরি নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৭৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে নামাযের জমাত পড়াইলেন ; তিনি নামায চার রাকাত পড়াইলেন (কছর করিলেন না) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট এই বিষয় উল্লেখ করা হইলে তিনি অত্যন্ত বিস্ময় ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত (হজ্জের ছফরে) মিনায় নামায (চারি রাকাতের কছর) দুই রাকাত পড়িয়াছি ; খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও তদ্রূপই এবং

খলীফা ওমরের সঙ্গেও তদ্রূপই; এমনকি খলীফা ওসমানের খেলাফতের প্রথম আমলেও তদ্রূপই। সুতরাং চার রাকাত স্থলে আল্লার দরবারে কবুল দুই রাকাতই আমার জন্য উত্তম।

ব্যাখ্যা :—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক খেলাফতের শেষ আমলে হজ্জের ছফরে কছর না করায় সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কছর পড়ার বিধান অলঙ্ঘনীয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছফর অবস্থায় কছরকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। স্বীয় কার্য্যের রহস্য উদঘাটনে নিজেই বলিয়াছেন, আমি মক্কা শহরে বিবাহ করিয়াছি এবং আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, কেহ কোন এলাকায় বিবাহ করিলে তথায় সে তথাকার বাসিন্দারূপে নামায পড়িবে। মক্কায় বিবাহ করার পূর্বে খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের ছফরে মিনার মধ্যে কছরই পড়িতেন। বোখারী (রঃ) ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) ছফর অবস্থায় কছর করিতেন না, পূর্ণই পড়িতেন। খলীফা ওসমানের ন্যায় তাঁহাকেও কৈফিয়ত দিতে হইয়াছে।

৫৭৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলা তিন দিন ভ্রমনের পথ ছফর করিতে পারিবে না যদি না তাহার সঙ্গে কোন মাহরম (বা নিজ স্বামী) থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মাহরম বা স্বামী ছাড়া তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমনের পথ ছফর করা মহিলাদের জন্য হারাম। এই মছআলাহ হইতেই নামায কছরের জন্য তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমনের পথ ছফর করা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে শ্রেণীর ভ্রমন উদ্দেশ্য সেই ভ্রমন অনুপাতে তিন দিনের ভ্রমন-পথ ৪৮ মাইল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চার "বরীদ" পথ ভ্রমনে নামায কছর করিতেন এবং রমজানের রোজা ভঙ্গ করিতেন। (এক "বরীদ" ১২ মাইল, অতএব চার বরীদ ৪৮ মাইল।)

মছআলাহ :—৪৮ মাইল ভ্রমন উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় গ্রাম বা শহর অতিক্রম করিয়া গেলেই কছর করা আরম্ভ করিতে হইবে।

খলীফা আলী (রাঃ) একদা ছফর উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানী শহর কুফা ত্যাগ করতঃ অনতিদূরে যাইয়াই (নামাযের ওয়াক্ত হইলে) নামায কছর করিলেন; অথচ শহরের বাড়ী-ঘর তখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচরে ছিল। তদ্রূপ প্রত্যাবর্ত্তনকালে কুফা শহরের অনতিদূরে থাকাবস্থায় (নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে) নামায কছররূপে আদায় করিলেন। তাঁহাকে বলাও হইল—এই ত কুফা শহর। অর্থাৎ কুফা শহর যেখানে আপনার বাড়ী উহা ত নিকটবর্ত্তীই। তিনি বলিলেন, আমাদের নামায পুরা পড়িতে হইবে না, যাবৎ না ছফর হইতে কুফা শহরে প্রবেশ করি।

এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণের হাদীছটি হজ্জের অধ্যায়ে অনুদিত হইবে। উহার মর্ম এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জের ছফরে মদীনা ত্যাগ করিয়া উহার নিকটবর্তী "জুল-হোলায়ফা" নামক স্থানে আছর নামায কছর করিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ। আলোচ্য হাদীছের মুল বিষয় তথা মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের ছফর তিন দিনের ভ্রমণ-পথ তথা ৪৮ মাইল হইলে তাহা হারাম। আর দুই দিনের পথ তথা ৩২ মাইল হইলে তাহাও নাজায়েয; এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ (৬৩৩ নং) বিদ্যমান আছে; বরং এক দিনের পথ তথা ১৬ মাইল ছফর করাও মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের জন্য মোটেই সমীচীন নহে। নিম্নের হাদীছে উহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ভিন নারীদের জন্য মাহরম বা স্বামী ছাড়া সব ছফরই নিষিদ্ধ বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি দ্বিতীয় খণ্ডে "নারীদের হজ্জ করা" পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

৫৭৯। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মহিলা আল্লার উপর এবং পরকালের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য হালাল নহে—মাহরম (বা স্বামী) সঙ্গে না থাকা অবস্থায় একদিন এক রাত্রের ভ্রমণ-পথ ছফর করা।

৫৮০। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, যখন তাঁহার তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রমের আবশ্যক হইত তখন তিনি (পথিমধ্যে মাগরেবের নামাযের শেষ ওয়াক্তে অবতরণ করিয়া) তিন রাকাত মগরেবের নামায পড়িতেন এবং সামান্য অপেক্ষা করিয়া (এশার নামাযের প্রথম ওয়াক্তে) দুই রাকাত এশার নামায পড়িতেন। এশার নামাযের পর কোন সুন্নত-নফল পড়িতেন না, মধ্যরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

৫৮১। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহিত থাকিয়া, কেবলার দিক ছাড়াই (ভ্রমণ দিকে) নফল নামায পড়িয়াছেন।

৫৮২। **হাদীছ :**—ইবনে ওমর (রাঃ) ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর থাকিয়া ভ্রমণের দিকেই শুধু মাথার ইশারা দ্বারা নফল পড়িতেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

৫৮৩। **হাদীছ :**—আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সওয়ারীর উপর ভ্রমণ দিকে শুধু ইশারা করিয়া নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি ফরজ নামাযে এরূপ কখনও করিতেন না।

৫৮৪। হাদীছ ঃ—ইবনে ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আনাছ (রাঃ) সিরিয়া হইতে বছরায় প্রত্যাবর্তনকালে আমরা তাহাকে স্বাগত জানাইতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তঁহিাকে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সোয়ারী গাধার পিঠে বসিয়া নামায পড়িতেছেন—কেবলার বাম দিক হইয়া। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কেবলা ভিন্ন অন্য দিকে নামায পড়িতেছিলেন—দেখিলাম। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে না দেখিলে আমি এরূপ করিতাম না।

৫৮৫। হাদীছ ঃ—তাবেয়ী হাফ্ছ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন,আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যে রহিয়াছি; তাঁহাকে দেখি নাই, ছফর অবস্থায় সুন্নত-নফল (সর্বদা ও তৎপরতার সহিত) পড়িতে।

মছআলাহ ঃ—ফরজের পুর্বে বা পরে যে সুন্নত-মোয়াক্কাদাহ নামায আছে উহার মধ্যে কছর নাই, কিন্তু ছফর অবস্থায় উহা সুন্নত-মোয়াক্কাদাহ থাকে না ; সাধারণ নফল পরিগণিত হয়। সুতরাং উহার জন্য মোটেই কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় না। তদুপরি নফল নামায সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, সোয়ারীতে আরোহিত যাত্রাভিমুখী অবস্থায় মাথার ইশারায় উহা পড়া যাইতে পারে। অতএব ফরজের সহিত সুন্নত পড়ায় লিপ্ত হইয়া নিজের বা সঙ্গীদের ব্যতিব্যস্ততার কারণ হওয়া কিম্বা কাহাকেও অধিক সময় সঙ্কীর্ণতায় পতিত রাখা মোটেই সমীচীন নহে। অবশ্য ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সম্পর্কে বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছফর অবস্থায়ও এই দুই রাকাত পড়িয়া থাকিতেন।

মছআলাহ ঃ—ছফর অবস্থায়, কিন্তু ভ্রমণ নহে—অবস্থানকালে যে কোন সুন্নত-নফল পড়ায় দোষ নাই। হযরত নবী (দঃ) মক্কা বিজয়ের ছফরে মক্কায় প্রবেশ করার পর আট রাকাত চাশ্তের নামায পড়িয়াছিলেন। তদ্রূপ ভ্রমণ অবস্থায়ও কাহারও কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেরূপভাবে সুন্নত-নফল পড়া যায়। নবী (দঃ) ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপর চলিতে থাকিয়া নফল নামায পড়িয়া থাকিতেন।

৫৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণবস্থায় জোহর ও আছরের নামায এবং মগরেব ও এশার নামাযকে এক সঙ্গে পড়িতেন।

৫৮৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ছফর অবস্থায় মগরেব ও এশা এই দুই নামায একত্রে পড়িতেন।

৫৮৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যদি সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার তথা জোহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভের পুর্বেই যাত্রা করিতেন তবে তিনি জোহর নামায পড়িতে আছরের সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব

করিতেন। তারপর অবতরণ করিয়া উভয় নামায এক সঙ্গেই পড়িতেন। আর যাত্রার পূর্বে সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিয়া গেলে যাত্রার পূর্বেই জোহরের নামায পড়িয়া অতঃপর যাত্রা করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমামগণ এই সব হাদীছের কার্য্যধারার ব্যাখ্যা দুই প্রকার করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ইহার অর্থ বস্তুতঃ জোহরকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ আছরের ওয়াক্তে একত্র করা এবং মগরেবকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ এশার ওয়াক্তে একত্র করা। সফর অবস্থার বিশেষ সুযোগ দানার্থে এরূপ অনুমতি আছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, এরূপ করিলে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করা হইবে; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

সেই জন্য উক্ত হাদীছের কার্য্যধারা এইরূপ যে—ভ্রমণ অবস্থায় পথিমধ্যে জোহরের নামাযের ব্যবস্থা উহার ওয়াক্তের শেষভাগে করিবে, যেন জোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরের নামাযেও আছরের ওয়াক্তেই প্রথম ভাগে পড়িয়া লওয়া যায়। মগরেব ও এশার নামাযের ন্যায়ও এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবে। যেমন, এই পরিচ্ছেদের ৫৮০নং হাদীছ যাহা এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত; উক্ত হাদীছে এরূপ ব্যাখ্যাই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর প্রত্যক্ষ আমলও এই ব্যাখ্যানুরূপই ছিল। নেছায়ী শরীফের হাদীছে উহার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মগরেবের নামায উহার ওয়াক্ত থাকিতে—এশার ওয়াক্ত আরম্ভের পূর্বেই পড়িয়াছেন এবং এশার নামায উহার ওয়াক্তে—মগরেবের ওয়াক্ত গেলে পরেই পড়িয়াছেন।

তদুপরি উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুসারে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন হয় না, অথচ সুযোগ-সুবিধাও ঠিকমতেই লাভ হয় যে—বারংবার নামাযের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইতে হইল না। সফর অবস্থায় সকলে একত্রিতরূপে জমাতের সহিত নামাযের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নহে এবং বারংবার ঐরূপ করায় অনেক সময় ব্যয় যাহা ভ্রমণ অবস্থায় ক্ষতিকরও বটে।

৫৮৯। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার অর্শ রোগ ছিল, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নামাযের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—প্রথমতঃ নামাযে দাঁড়াইয়া পড়ারই চেষ্টা কর, সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়, তাহাও সম্ভব না হইলে শোয়াবাস্থায় পড়।

৫৯০। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) অর্শ রোগে আক্রান্তছিলেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বসিয়া নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, দাঁড়াইয়া পড়া উত্তম; বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে, আর শুইয়া পড়িলে বসিয়া পড়ার অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দাঁড়াইবার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্বেও নফল নামায বসিয়া পড়িলে শুদ্ধ হয়, অবশ্য উহাতে অর্দ্ধেক ছওয়াব হয়, কিন্তু দাঁড়াইবার বা বসিবার সামর্থ্য থাকিলে শুইয়া নফল নামাযও শুদ্ধ হয় না। ফরজ নামায দাঁড়াইয়া পড়ার সামর্থ্য না থাকিলে বসিয়া (রুকু সেজদায় সামর্থ্য না হইলে মাথার ইশারায়) শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে, বসিয়া পড়ার সামর্থ্য (অন্যের সাহায্যেও) না থাকিলে শুইয়া পড়িবে তাহাতেও পূর্ণ ছওয়াবই হইবে।

আর এক অবস্থা এই যে, দাঁড়াইয়া পড়ার সাধারণ সামর্থ্য নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে দাঁড়াইয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্য শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে বসিয়া ফরজ বা নফল নামায শুদ্ধ হইবে এবং ছওয়াবও পূর্ণ হইবে। অবশ্য ঐ অবস্থায় যদি অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়ে তবে অধিক কষ্ট স্বীকার করার অধিক ছওয়াব যোগ হইয়া দ্বিগুণে পরিণত হইবে, ফলে ঐ অবস্থায় বসিয়া নামায পড়ার পূর্ণ ছওয়াবই এই দ্বিগুণ ছওয়াবের অর্দ্ধেকে পরিণত হইবে। তদ্রূপই যদি বসিয়া নামায পড়ার সাধারণ সামর্থ্য নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে বসিয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্য শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে শুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে; কিন্তু অধিক কষ্ট সহ্য করিয়া বসিয়া পড়িলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। আলোচ্য হাদীছে এই অবস্থার নামাযই উদ্দেশ্য।

শুইয়া নামায পড়িলে প্রথমতঃ কেবলামুখী কাত হইয়া শোয়ার চেষ্টা করিবে; সেই সামর্থ্য না হইলে কেবলা দিকে পা (সামর্থ্য হইলে হাটু খাড়া রাখিয়া) এবং পূর্ব দিকে মাথা এইভাবে চিত হইয়া শুইবে (কস্তুল্লানী-বারী, ২—৪৭০)। কিন্তু রুকু-সেজদা ইশারায় মাথা দ্বারা করিতে হইবে, শুধু চোখের ইশারা করিলে তাহাতে নামায হইবে না।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোগ ইত্যাদি কোন কারণে কেবলামুখী হওয়ার সামর্থ্য বা সুযোগ মোটেই না থাকিলে যেই দিকমুখী আছে সেই দিকেই নামায পড়িবে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এইরূপ হয়।

● দাঁড়াইতে সামর্থ্য ব্যক্তি বসিয়া রুকু সেজদার সহিত নামায আদায় করিতেছে; নামাযের মধ্যে দাঁড়াইতে সামর্থ্যবান হইয়া গেল—তাহাকে অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার নামায হইবে না। রুকু-সেজদায় অসমর্থ্য ব্যক্তি বসিয়া ইশারায় নামায আদায় করিতেছে, রুকু পূর্বে যদি সে রুকু সেজদায় সামর্থ্যবান হইয়া যায় তবে সে ঐ নামায ভঙ্গ না করিয়াই রুকু সেজদার সহিত উহা পূর্ণ করিবে। আর যদি ইশারায় রুকু আদায় করার পর সামর্থ্যবান হইয়া থাকে তবে সেই নামায ভঙ্গ করিয়া নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায রুকু-সেজদার সহিত আদায় করিতে হইবে। বসার অসামর্থ্য ব্যক্তি শুইয়া নামায পড়িতেছে; এইরূপ ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় বসিতে বা দাঁড়াইতে সামর্থ্য হইয়া গেলে তাহাকে নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায আদায় করিতে হইবে।

তাহাজ্জুদ-নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদ-নামায সুন্নত, কিন্তু অতি মঙ্গল ও কল্যাণময় নামায। তাহাজ্জুদ নামাযের বৈশিষ্ট্য অগণিত ও অপরিসীম। ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত পছন্দীয় এবাদত। ইসলামের প্রথম যুগে এই নামায ফরজ ছিল এবং পরিমাণও নির্দ্ধারিত ছিল—রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধ কিম্বা তৃতীয়াংশ; ইহার কম নহে। পবিত্র কোরআন ২৯ পারা ছুরা মোজাম্মেলে এই আদেশই হয়—

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِصْفَهٗ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝

اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

"হে কমলীওয়ালা। নামাযে দাঁড়াইয়া রাত্রে যাপন কর—রাতের অর্দ্ধ বা হইতে কিছু কম, কিম্বা অর্দ্ধেকে বেশী এবং কোরআন সুস্পষ্ট ও ধীরভাবে পড়িও।"

এই পরিমাণকে পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ রাখাও কম কঠিন নহে, বিশেষতঃ ঘড়ি-ঘন্টাবিহীন যুগে। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ সতর্কতা মূলকভাবে রাত্রের অধিক অংশই তাহাজ্জুদে কাটাইয়া দিতেন। এইরূপ কষ্ট ও যত্নের সহিত দীর্ঘ এক বৎসরকাল তাহাজ্জুদে-নামাযের ফরজ কর্তব্য আদায় করিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হইয়া বান্দাদের কষ্ট লাঘবের জন্য তাহাজ্জুদ-নামায ফরজ হওয়া রহিত করিয়া দেন এবং উহার নির্দ্ধারিত পরিমাণের বাধ্যবাধকতাও রহিত করিয়া দেন। উল্লেখিত ছুরারই শেষভাগে এই রহিতের বিধান সম্বলিত আয়াত রহিয়াছে; যাহা এক বৎসর পর অবতীর্ণ হইয়াছিল।

তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়া রহিতের পরও আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অতি আদরের ও সন্তুষ্টির নামায তাহাজ্জুদের প্রতি বান্দাদিগকে আকৃষ্ট ও যত্নবান রাখিবার জন্য স্বীয় রসুলকে সম্বোধন করার মাধ্যমে আদেশবোধক শব্দের সহিত এই আয়াতটি নাযেল করেন—(১৫ পাঃ ৯ রুঃ)

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ - عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

"আর রাত্রের অংশবিশেষ আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন—যাহা (পাঁচ ওয়াক্তের উপর) অতিরিক্ত (নামায); আপনার মঙ্গল ও লাভের জন্য। আশান্বিত থাকুন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে "মাকামে-মাহমুদ" দানে গৌরবান্বিত করিবেন।"

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা প্রিয়তম হাবীব সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলকে মর্য্যাদার সর্বোচ্চ চুড়ামণি "মাকামে মাহমুদ" লাভের আশা দান ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের সাহায্য-গ্রহণ উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুত: পরকালের উন্নতি ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে তাহাজ্জুদের ন্যায় অধিক ফলদায়ক এবাদত আর নাই। তাহাজ্জুদের বৈশিষ্ট বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا......

"নিশ্চয় (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠা নফছ বা রিপুকে আল্লাহ পানে বশ করিতে শক্ত প্রতিক্রিয়াবান এবং ঐ সময় মুখের বাক্যও অতি মার্জিত ও ক্রীয়াশীল হয়; (গভীর অন্তর হইতে বাহির হয়, মনের উপর রেখাপাত কর এবং দেহের ও চোখের উপরও ক্রিয়া করে)। দিনের বেলা বিভিন্ন লিপ্ততা থাকে; রাত্রে উহা থাকে না, তাই তখন আল্লার জিকর করত: সব কিছু হইতে কাটিয়া এক আল্লাহতে মগ্ন হও (ইহা তখন সহজ)।"

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, তাহাজ্জুদের যে সময় তথা রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগ ঐ সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নূর এবং রহমতের বিশেষ দৃষ্টি বন্দাদের অতি নিকটবর্তী হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মাফ করিবার জন্য, মনোবাঞ্ছা দানের জন্য, দোয়া করার জন্য বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকে (৬০৬ নং হাদীছ)।

এবাদতের জন্য নিশি-রাত্রের নিদ্রাত্যাগীদের প্রশংসায় আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যথা—

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ......فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ...

"আমার বিশিষ্ট বন্দাগণ এইরূপ হন—মধুর নিদ্রা ভঙ্গ করত: তাঁহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা পরিত্যাগ করে। তখন তাঁহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুরে অর্চনা-আরাধনায় নিমগ্ন হন আশা এবং ভয়ের মধ্যে। আর আমার দেওয়া ধন হইতে আমার জন্য ব্যয় করেন। অতএব আমি তাঁহাদের জন্য চোখ-জুড়ানো নেয়ামত কি কি এবং কি পরিমাণ রাখিয়া দিয়াছি (মানবীয় দৃষ্টি ও অনুমানের) অন্তরালে—তাহা কাহারও বোধগম্য নহে। (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ - إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ - كَانُوا

قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ০

"নিশ্চয় খোদাভীরু লোকগণ পরকালে বাগ-বাগিচা ও ঝরণা-ফোয়ারার মধ্যে স্থান লাভ করিবেন; উপভোগ করিতে থাকিবেন অসংখ্য নেয়ামত যাহা তাঁহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাদিগকে দিবেন। তাঁহারা জাগতিক জীবনে নেক্কার ছিলেন, রাত্রের কম অংশই তাঁহারা ঘুমাইতেন। এবং ভোর রাত্রে তাঁহারা তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।" (২৬ পাঃ ১৮ রুঃ)

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

"বেহেশতের অধিকারী খোদাভীরু লোকদের পরিচয়—তাঁহারা ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণু সৎ ও খাঁটী এবং এবাদত-বন্দেগীরত ও নেক কাজে ব্যয়কারী হন। আর তাঁহারা শেষ রাত্রে তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত হন।" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ নামায অত্যন্ত পছন্দনীয় নামায ছিল। হযরত (দঃ) শেষ জীবন পর্য্যন্ত ভ্রমণ বা সফর অবস্থায়ও এই নামাযের প্রতি তৎপর ছিলেন। হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ-নামায এত দীর্ঘ ও অধিক পড়িতেন যে তাঁহার পা-দ্বয় ফুলিয়া যাইত; কোন সময় ফাটিয়াও যাইত। মোসলেম শরীফ হাদীছে আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ফরজের পর সর্বাধিক ফজিলতের নামায তাহাজ্জুদ নামায (শামী, ১—৬৪০)।

৫৯১। **হাদীছঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া প্রথমে এই দো'য়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ـ
وَلِقَاءُكَ حَقٌّ ـ وَقَوْلُكَ حَقٌّ ـ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ـ وَالنَّارُ حَقٌّ ـ وَالنَّبِيُّوْنَ
حَقٌّ ـ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ـ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ـ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ
مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

● তাহাজ্জুদের সময় নবী (দঃ) বিশেষরূপে মেছওয়াক করিতেন। (১৫৬ পৃঃ ১৭৬ হাঃ)

৫৯২। **হাদীছঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যে কোন ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দেখিলে তাহা হযরতের নিকট বয়ান করিত। আমার অন্তরে সর্বদাই এই আকাঙ্খা ছিল যে, আমি যেন কোন স্বপ্ন

দেখি এবং উহা হযরতের নিকট বয়ান করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, আমার কোন সংসার ছিল না; আমি মসজিদে ঘুমাইতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম—আমার হাতে যেন একটি রেশমী কাপড়ের টুকরা, আমি বেহেশতের যে কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি ঐ রেশমী কাপড়ের টুকরাটি আমাকে লইয়া উড়িয়া যায়। আমি আরও দেখিলাম, যেন, দুই জন ফেরেশতা আমাকে ধরিয়া দোযখের নিকট লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম—দোযখ অতি গভীর, চতুপার্শ্বে ঘেরাও করা কূপের ন্যায় এবং উহার দুই দিকে দুইটি খুঁটিবিশেষ আছে। উহার মধ্যে কতিপয় মানুষ দেখিতে পাইলাম যাহাদিগকে আমি চিনি। তখন আমি বলিতে লাগিলাম— اعوذ بالله من النار "আমি দোযখ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" পরে তৃতীয় এক ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, আপনি ভীত হইবেন না।

আমি এই স্বপ্ন (আমার ভগ্নি হযরতের বিবি) হাফছাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তিনি উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বয়ান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ্ অতি ভাল লোক; যদি সে তাহাজ্জুদ-নামাযের অভ্যস্ত হয় (তবে আরও অধিক উত্তম গণ্য হইবে)। এই ঘটনার পর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খুব কম সময়ই ঘুমাইতেন; অধিকাংশ রাত্র তাহাজ্জুদ-নামাযেই কাটাইতেন।

তাহাজ্জুদের প্রতি লোকদিগকে আগ্রহান্বিত করা চাই

৫৯৩। হাদীছঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অধিক রাত্রিকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ও জামাতা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তশরীফ আনিলেন এবং তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহাজ্জুদ পড় না? আলী (রাঃ) বলেন—আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার আত্মা আল্লাহ তায়ালার হাতে; তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন আমাদিগকে জাগাইয়া দিবেন। এই উত্তর শুনিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আর কোন প্রতিউত্তর না করিয়া চলিয়া গেল এবং চলিয়া যাওয়াকালীন অনুতপ্ত হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন— وكان الانسان اكثر شيء جدلا "মানুষ বড়ই তর্কবাজ।"

৫৯৪। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এ'তেকাফ অবস্থায় একদা রাত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে নামায আরম্ভ করিলেন, কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার নামাযে শামিল হইল। ভোর হইলে লোকগণ এই নামাযের আলোচনা করিল, ফলে দ্বিতীয় রাত্রেও রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়িলেন তখন অধিক লোক সমবেত হইল। আজও ভোর হইলে পর লোকদের মধ্যে আলোচনা হইল, ফলে তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোকের সমাগম হইল এবং তাহারা হযরতের নামাযে শামিল হইয়া নামায

পড়িল। চতুর্থ রাত্রে অধিক লোকের সমাগম হইল যে, মসজিদে লোকের সঙ্কুলান হয় না। এই রাত্রে হযরত (দঃ) নামাযের জন্য আত্মপ্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিলেন; ফজরের নামাযের জন্যই এতেকাফ খানা হইতে বাহির হইলেন। ফজর নামায শেষে হযরত (দঃ) লোকদের মুখী হইলেন এবং ভাষণের আরম্ভে কলেমা শাহাদত পড়িয়া বলিলেন, অতঃপর—তোমাদের সমবেত হওয়া আমি অবগত ছিলাম, তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিল না। আমার আত্মপ্রকাশ করায় ইহাই একমাত্র বাধা ছিল যে, আমি আশঙ্কা করিয়াছি, তাহাজ্জুদ-নামায ফরজ করিয়া দেওয়া হয় নাকি! তখন তোমরা সর্বদা উহার পাবন্দী করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িবে; (ফরজ হইলে ত সর্বদা পাবন্দী করা অপরিহার্য্য হইবে।) এই ঘটনা রমজান শরীফে ঘটিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—তাহাজ্জুদ নামায আল্লাহ তায়ালার অতি পছন্দনীয় নামায; পূর্বে উহা ফরজই ছিল। মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তায়ালা ইহার ফরজ হওয়া রহিত করিয়াছিলেন। এখন সেই লোকদেরই এই অপূর্ব আগ্রহ এবং তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত আল্লাহ তায়ালা পুনঃ তাঁহার পছন্দনীয় তাহাজ্জুদকে ফরজ করিয়া দিতে পারেন, ফলে পরবর্তী লোকদের জন্য অধিক কষ্টের কারণ হইবে। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার তৎপরতাকে অহী অবতীর্ণের সময়ে বারণ করিয়াছেন। হযরতের পরে ওহী চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নূতনভাবে কিছু ফরজ হওয়ার অবকাশ থাকে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কত বেশী তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৫৯৫। হাদীছ ঃ—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে অধিক দাঁড়াইয়া থাকায় তাঁহার পা-দ্বয় ফুলিয়া যাইত (আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বর্ণনায় আছে—পদদ্বয় ফাটিয়া যাইত। এই বিষয় তাঁহাকে কিছু বলা হইলে তিনি এই উত্তর দিতেন, আমি কি আল্লার শোকর-গোজার—কৃতজ্ঞতা পালনকারী বন্দা হইব না?

৫৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায দাউদ আলাইহে-চ্ছালামের নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা দাউদ আলাইহেচ্ছালামের রোযা। দাউদ (আঃ) প্রথমে অর্দ্ধ রাত্রি ঘুমাইতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ নামায পড়িতেন, তারপর বাকি ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমাইতেন এবং একদিন রোযা রাখিতেন আর একদিন আহার করিতেন। (ইহাতে তাঁহার দৈহিক শক্তি অটুট থাকিত;) তিনি জেহাদে দৃঢ় থাকিতেন—পশ্চাদপদ হইতেন না।

৫৯৭। হাদীছ ঃ—মসরূক (রঃ) আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কেমন আমলকে অধিক পছন্দ করিতেন? তিনি বলিলেন, যে আমল

সর্বদা করা যায়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের জন্য কোন সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন? তিনি উত্তর করিলেন, মোরগের (প্রথম) বাঁগের সময়।

তাহাজ্জুদ-নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়া

৫৯৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামায আরম্ভ করিলাম। তিনি নামাযের মধ্যে (দীর্ঘ কেরাত পড়িতে) এত অধিক সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, আমার এই অশুভ ইচ্ছা উদিত হইতে লাগিল যে, আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ি।

নবী (দঃ) কত রাকাত তাহাজ্জুদ পড়িতেন?

৫৯৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বেতের ও ফজরের সুন্নত সহ) তাহাজ্জুদের নামায তের রাকাত পড়িতেন।

৬০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বেতের সহ) তাহাজ্জুদের নামায সাত রাকাত, নয় রাকাত বা এগার রাকাত পড়িতেন; ইহা ফজরের সুন্নত দুই রাকাত ব্যতীত (উহা সহ মোট তের রাকাত হইত।)

৬০১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া সর্বমোট) তের রাকাত নামায পড়িতেন; বেতের এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ইহারই মধ্যে শামিল।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ মূল তাহাজ্জুদ নামায আট রাকাত পড়িতেন—উহা অনেক লম্বা হইত যেমন ৫৯৮নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রুকু-তেজদাও দীর্ঘ হইত যেমন ৫৪১নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপ দীর্ঘ রাকাত এবং রুকুর কারণেই হযরতের পা' ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। এই আট রাকাতের পর বেতের তিন রাকাত পড়িতেন—মোট এগার রাকাত হইল; ৫৪৯নং হাদীছে এই সংখ্যাই উল্লেখ আছে। ফজরের দুই রাকাত সুন্নতও এর পরেই পড়িতেন—মোট তের রাকাত হইল; ৫৯৯নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ হইয়াছে; আলোচ্য হাদীছে তের সংখ্যার এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বেতের নামায সংলগ্নে দুই রাকাত নফল নামায বসিয়া পড়িতেন; ৬১৪নং হাদীছ দ্রষ্টব্য—মোট পনর রাকাত হইল। মোসলেম শরীফে আয়েশা (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে সুদীর্ঘ নামাযের প্রথমে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ারও উল্লেখ আছে; সেমতে সর্বমোট সতর রাকাত হইল। কোন কোন সময় মূল তাহাজ্জুদ চার রাকাত ছয় রাকাতও পড়িতেন; বার্দ্ধক্য বা অসুস্থতার দরুন অবসাদ অনুভবে এইরূপ করিতেন। কোন সময় নবী (দঃ) একই রাত্রে একাধিক বারও তাহাজ্জুদ পড়িয়াছেন।

৬০২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন মাসে একাধারে বে-রোযা দিন কাটাইতেন; আমরা ধারণা করিলাম, এই

মাসে তিনি রোযা রাখিবেন না (কিন্তু শেষে রোযা রাখিতেন)। কোন মাসে একাধারে রোযা রাখিতে থাকিতেন; আমরা ধারণা করিতাম, এই মাসে বে-রোযা থাকিতেন না, (শেষে বে-রোযাও হইতেন।) এবং তাঁহাকে রাত্রিকালে (ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) নিদ্রিতও দেখা যাইত, নামায পড়িতেও দেখা যাইত।

তাহাজ্জুদের পর নিদ্রা যাওয়া

৬০৩। **হাদীছ**:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমার গৃহে থাকার প্রতি দিনই দেখিয়াছি, তিনি রাত্রের শেষ অংশে নিদ্রা যাইতেন। (১৫২ পৃঃ)

ব্যাখ্যা:—তাহাজ্জুদের পর ফজরের নামাযের পূর্বে একটু সময় নিদ্রা গেলে শরীরের অবসাদ দূর হয়; হযরত (দঃ) অনেক সময় তাহা করিতেন। তবে ফজরের জমাতে কোন-রূপ ব্যাঘাত না ঘটে সেই লক্ষ্য ও ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে। কোন সময় হযরত (দঃ) স্বীয় বিবির সহিত কথাবার্তায়ও এই সময়টুকু কাটাইতেন। (৬১৫নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

রমযান মাসে হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ পড়িয়া সেহেরী খাইতেন, তৎপর না ঘুমাইয়া অনতিবিলম্বেই ফজর নামায পড়িতেন—৩৫৪নং হাদীছে বর্ণনা রহিয়াছে।

তাহাজ্জুদ না পড়িলে শয়তানের কু-মন্ত্র ক্রিয়া করে

৬০৪। **হাদীছ**:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিদ্রিত ব্যক্তির ঘাড়ের উপর শয়তান এই মন্ত্র পড়িয়া তিনটি গিরা লাগায়—عليك ليل طويل فارقد এখনও রাত্রি অনেক বাকী আছে, তুমি নিদ্রায় থাক।

প্রত্যেকটি গিরা লাগাইবার সময় উক্ত মন্ত্র পড়িয়া থাকে। যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া আল্লার নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি সে অজু করে তবে আর একটি গিরা খুলিয়া যায়, তারপর যদি নামায পড়ে তবে অবশিষ্ট গিরাটিও খুলিয়া যায় এবং হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে, পুলকিত মনে ও আনন্দের সহিত তাহার ভোর হয়। নতুবা কলুষিত অবস্থায় তাহার ভোর হয়।

● যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাক ইয়াদ ও হেফজের দৌলত দান করিয়াছেন তাহাদের বিশেষ কর্তব্য তাহাজ্জুদ পড়া এবং তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত করা। অন্যথায় যদি তাহারা বিভিন্ন বড় গোনাহের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয় তবে সেই সঙ্গে তাহাজ্জুদ না পড়ারও এক বিশেষ আজাব তাহাদের উপর হইবে যে—কবরের মধ্যে একটি পাথরের আঘাতে তাহাদের মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ হইতে থাকিবে। এই তথ্য সুদীর্ঘ হাদীছের অংশবিশেষ হাদীছটি কবরের আজাব পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

যে ব্যক্তি সারারাত্র নিদ্রামগ্ন থাকে শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করে

৬০৫। **হাদীছ**:—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির আলোচনা হইল। একজন তাহার প্রতি অভিযোগ

করিল, সে সারারাত্র নিদ্রায় কাটাইয়াছে, নামাযের জন্য জাগ্রত হয় নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে।

শেষ রাত্রে নামায পড়া ও দোয়া করা

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা (বেহেশত লাভকারী মোত্তাকীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনায়) বলিয়াছেনন—"তাঁহারা রাত্রে অতি কম নিদ্রা যাইয়া থাকিত এবং শেষ রাত্রে তাঁহারা গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফরিয়াদ করিয়া থাকিত।" (২৬ পাঃ ১৮ রুঃ)

৬০৬। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাত্রেই যখন উহার শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকিয়া যায় তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ তায়ালা বন্দাদের অতি নিকটবর্তী হন, এমনকি জমিনের) সর্বাধিক নিকটস্থ আসমানে তাঁহার অবতরণ তথা বিশেষ তাজাল্লী হয় (যাহা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোন সময় হয় না।) স্বয়ং তিনি স্বীয় বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকেন এবং ঘোষণাযুক্ত এই আহ্বান জানাইতে থাকেন—

مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهٗ ـ

"কে আমাকে ডাকিবে? আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার নিকট প্রার্থী হইবে? আমি তাহাকে দান করিব। কে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।"

ব্যাখ্যাঃ—প্রত্যেক ক্রিয়াপদের আকার, রূপ ও কৌশল প্রণালীর ধরণ ও রকম উহার কর্তাপদের উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই অবধারিত। এখানে ক্রিয়াপদ হইল يَنْزِل অর্থ অবতরণ করা, কর্তাপদ হইল رَبُّنَا অর্থ পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা নিরাকার, নিরাধার, অতুলন; তাই তাঁহার সঙ্গে যে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক হইবে সেই ক্রিয়াপদও অনুরূপই হইবে।

ইমাম মালেক (রঃ) এ বিষয়ে বলিয়াছেন—উঠা, বসা, অবতরণ করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যখন আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তখন লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এসব ক্রিয়াপদের মূল অর্থ সুস্পষ্ট, কিন্তু নিরাকার নিরাধার অতুলন কর্তাপদের সংযোগ হিসাবে উহার ধরণ ও রকম অবোধ্য; এই বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ বা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অবৈধ।

তাই মোসলমানগণ যেরূপ নিরাকার নিরাধার অতুলন আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে, তদ্রূপ এসব ক্রিয়াপদও যখন কোরআন বা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইবে তখন এই সবের প্রতিও অনুরূপ ঈমান রাখা মোসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য হইবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় শেষ রাত্রে

৬০৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রের প্রথম দিকে ঘুমাইতেন এবং শেষের দিকে তাহাজ্জুদ পড়িতেন, তারপর বিছানায় আসিতেন। (কোন দিন এইরূপ হইত যে, ঐ সময় হযরত (দঃ) স্ত্রী ব্যবহার করিতেন, অতএব) মোয়াজ্জেন ফজরের আজান দেওয়ার সাথে সাথে হযরত (দঃ) উঠিয়া যাইতেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল করিতেন, নতুবা শুধু অজু করিয়াই নামাযের জন্য যাইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায সমাপ্তের পর ফজরের জমাতে যাওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকুতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যক্রম তাঁহার শারীরিক অবস্থা, রাত্রের ঠাণ্ডা-গরম, নিদ্রা-অনিদ্রা এবং ছোট-বড় ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ছিল। অধিকাংশ সময় হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে ছাদেকের পুর্ব-মুহূর্তে সমাপ্ত করিতেন এবং ফজরের আজান হইলে পরই ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত পড়িতেন ; আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৩৮১ ও ৬১৮ নং হাদীছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত ৬২৫নং হাদীছে ইহাই উল্লেখ হইয়াছে। অতঃপর সাধারণতঃ গৃহিণী জাগ্রত থাকিলে বসা বা ডান কাতে শায়িত অবস্থায় তাঁহার সহিত কথাবার্তায় সময় কাটাইতেন, নতুবা ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬১৫নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক সময় এই অবকাশে হযরত (দঃ) নিদ্রাও যাইতেন ; আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬০৩নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কদাচিত হযরত (দঃ) এই সময় স্ত্রী-ব্যবহারও করিতেন ; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। সময়ে এরূপও হইয়াছে যে, হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে-সাদেক নিকটবর্তী হওয়ার পুর্বেই সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ফজরের ছুন্নত পড়ার পুর্বেই গভীর নিদ্রারত হইয়াছেন, অতঃপর ফজরের আজান দেওয়ার পর মোয়াজ্জেন হযরত (দঃ)কে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত পড়িয়া জমাতের জন্য গিয়াছেন ; ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৯নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। নিদ্রার পরে ফজরের নামাযের জন্য কোন কোন সময় হযরত (দঃ) পুনঃ নূতন অজু করা ব্যতিরেকে নিদ্রার পুর্বের অজু দ্বারাই ফজর নামায পড়িতেন। কারণ, নবীদের নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয় না : ১০৯ নং হাদীছে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। কোন কোন সময় নিদ্রার পর ফজরের নামাযের জন্য নূতন অজু করিতেন, আর গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল অবশ্যই করিতেন ; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ আছে। রমজানের সময় হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের হইতে অবসর হইয়া শেষ সময়ে সেহরী খাইতেন এবং সেহরী খাওয়ার অল্প পরেই ফজরের নামাযে যাইতেন ; আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ৩৫৪ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে।

মছআলাহ ঃ—তাহাজ্জুদ নামাযের সময় সাধারণতঃ শেষ রাত্রেই বটে, কিন্তু শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ্য বা ভরসা না থাকিলে এশার নামাযের পরে বেতেরের পূর্বে কিছু নফল পড়িবে ; এই নফল পড়িলে তাহাজ্জুদের ফজিলত হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে না।

মছআলাহ ঃ—কোন দিন শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছুটিয়া গেলে সূর্য্য উদয়ের পর জোহর নামাযের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহাজ্জুদের কাজা স্বরূপ স্বীয় অভ্যাসের পরিমাণে এবং অভ্যাস পরিমাণ কেরাতে নফলের নিয়্যতে নামায পড়িয়া নিবে ; আশা করা যায় এই নামায তাহার অভ্যস্ত তাহাজ্জুদের সমতুল্য পরিগণিত হইবে। (এলাউস সুনান ৭—৭৮)

রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৬০৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান শরীফের রাত্রে নামায কিরূপ পড়িতেন? আয়েশা (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি রমজান শরীফে এবং রমজান ছাড়া অন্য সময়ে (শেষ রাত্রে) এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না। প্রথম ধাপে (দুই দুই রাকাত করিয়া) চার রাকাত পড়িতেন যাহা বর্ণনাতীত সুন্দর ও লম্বা হইত। তারপর আবার (ঐরূপেই) চার রাকাত পড়িতেন, তারপর তিন রাকাত (বেতের) পড়িতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন—একদা আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি বেতের না পড়িয়া শুইয়া পড়েন? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হয়, কিন্তু কাল্‌ব (দিল) জাগ্রতই থাকে।

● ঐ সময় জমাতের সহিত নিয়মিতরূপে তারাবীহ পড়া হইত না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও বেতের নামায তাহাজ্জুদের সঙ্গেই পড়িতেন।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য রাখিবেন, বোখারী (রঃ) আলোচ্য হাদীছকেও তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃই এই হাদীছ তারাবীহ সম্পর্কে সাব্যস্ত নহে। কারণ, ইহাতে রমজান ও রমজান ছাড়া—উভয়েরই উল্লেখ হইয়াছে। অর্থাৎ অত্র হাদীছে এইরূপ নামাযের বর্ণনা করা হইয়াছে যে নামায রমজান ছাড়াও পড়া হয়। অতএব এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারে না; উহা রমজান ব্যতীত পড়া হয় না। হাঁ—তাহাজ্জুদ নামায উভয় সময়ে পড়া হয়, সুতরাং ইহাই এই হাদীছের উদ্দেশ্য এবং উহারই সংখ্যা আট রাকাত বলা হইয়াছে।

৬০৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কখনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামাযে বসিয়া কেরাত পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য বার্দ্ধক্যে পতিত হওয়ার পর হযরত (দঃ) বসিয়া কেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন, কিন্তু যখন ত্রিশ-চল্লিশ আয়াত বাকি থাকিত তখন দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং উহা পড়িয়া রুকু করিতেন।

প্রত্যেক অজুর পরে নামায পড়ার ফজিলত

৬১০। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল! বল ত, তোমার নিকট সর্বাধিক আশার যোগ্য আমল কি আছে? আমি বেহেশতে আমার আগে তোমার পদ চালনার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, ঐরূপ আমল আমার ধারণায় এই যে, আমি রাত্রে বা দিনে যে কোন সময় অজু করি তখনই ভাগ্যানুরূপ কিছু নামায পড়িয়া থাকি।

নফল এবাদতে প্রাবল্য ও কঠোরতা অবলম্বন করিবে না

৬১১। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি রশি টাঙ্গানো দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রশি এখানে টাঙ্গানো কেন? সকলেই উত্তর করিল, যয়নব (রাঃ) ইহা টাঙ্গাইয়াছেন; তিনি নামায পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদশ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করার কোনই প্রয়োজন নাই; রশি খুলিয়া ফেল। প্রত্যেকের উচিৎ, যতক্ষণ মনের প্রফুল্লতা থাকে, ততক্ষণ (নফল) নামায পড়িতে থাকা। যখন ক্লান্তি বোধ হয় তখন বিশ্রাম লইবে। (এখানে ৩৯ নং হাদীছও উল্লেখ আছে।)

তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা চাই না

৬১২। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! অমুক ব্যক্তির ন্যায় কখনও হইও না; সে তাহাজ্জুদ পড়িয়া থাকিত, কিন্তু এখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রিবেলা নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বা নিদ্রা না আসিলে নামায পড়া

৬১৩। **হাদীছ**ঃ—ওবাদাহ্ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এই দোয়া পড়িবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অতঃপর বলিবে "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ"

(ঐ ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায় পাক-সাফ হইয়া যাইবে। ফতহুল বারী, ৩—৩১)। আর ঐ সময় যে কোন দোয়া

করিলে তাহার দোয়া কবুল হইবে। তারপর অজু করিয়া নামায পড়িলে তাহার নামায বিশেষ ভাবে কবুল ও আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হইবে।

বেতেরের পর দুই রাকাত নামায বসিয়া পড়া এবং ফজরের সুন্নত না ছাড়া

৬১৪। হাদীছ:— আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দ:) এশার নামায ছাড়া রাত্রি বেলা আরও নামায পড়িয়াছেন। (তাহাজ্জুদ) আট রাকাত নামায পড়িয়াছেন, (অত:পর বেতের তিন রাকাত পড়িয়া—ফতহুল বারী, ৩—৩৩) দুই রাকাত (নফল) বসিয়া পড়িয়াছেন। ফজরের আজানের পর একামতের পূর্বে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নত) পড়িয়াছেন এবং এই রাকাতদ্বয় কখনও ছাড়িতেন না।

ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্তা বলা বা আরাম করা

৬১৫। হাদীছ:— আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ:) ফজরের সুন্নত পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন, নচেৎ ডান পার্শ্বের উপর কাত হইয়া থাকিতেন—নামাযের জামাতে যাওয়ার সংবাদ আসা পর্য্যন্ত।*

এস্তেখারার নামায

বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষে উহা আরম্ভ করার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতার সহিত নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িবে। তারপর উক্ত কার্য্য ধার্য্য করা বা না-করা যাহার প্রতিই অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে উহাতেই খায়ের-বরকত হইবে এবং এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকেই "এস্তেখারাহ" বলা হয়। এস্তেখারাহ শব্দের অর্থ আল্লার নিকট কার্য্যের ভাল দিক প্রার্থন করা।

৬১৬। হাদীছ:— জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে এস্তেখারাহ করার বিশেষ তাকিদ করিতেন এবং বিশেষ তৎপরতার সহিত এস্তেখারার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেরূপ পবিত্র কোরআনের ছুরাসমূহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজের প্রতি

---

* এই হাদীছে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া ডান কাতের উপর শোয়া ইহা নির্দ্ধারিত সুন্নত তারিকা নহে। কারণ, ইহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দিষ্ট অভ্যাস ছিল না। ৬০৭ নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যেও এ ক্ষেত্রে হযরতের বিভিন্ন রকম কার্য্যক্রম প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র শোয়া কার্য্যকে নিয়মিতরূপে অবলম্বন করা সুন্নত তরিকা গণ্য হইবে না। বিশেষত: মসজিদে ঐরূপ শোয়া মোটেই সুন্নত তরিকা নহে। রসুলুল্লাহ (দ:) মসজিদে ঐরূপ শুইয়াছেন এরূপ একটি ঘটনাও প্রমাণিত নাই।

অগ্রসর হইতে চায় তখন তাহার অবশ্য কর্তব্য এই—প্রথমে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে, অতঃপর এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ
اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ
فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ০

দুই স্থানে "هٰذَا الْاَمْر" উচ্চারণের সময় স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে।

দোয়াটির অর্থ—হে আল্লাহ! তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান উহাই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার কুদরত ও শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার মেহেরবানীর কিছু অংশ ভিক্ষা চাই। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান, আমার কোন শক্তি নাই, ভাল-মন্দ একমাত্র তুমিই জান, তুমিই সব গোপন অদৃশ্য বিষয়বস্তু ভালরূপে জান, আমি কিছুই জানি না।

হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীনের দিক দিয়া, দুনিয়ার দিক দিয়া ও শেষ ফলের দিক দিয়া এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্যই ভাল হইবে তবে এই কার্য্যটি সমাধা হওয়া আমার জন্য ধার্য্য করিয়া দাও এবং ইহাকে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং ইহার মধ্যে আমাকে বরকত—মঙ্গল দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীন-দুনিয়া, শেষ ফল এবং ইহকালের ও পরকালের দিক দিয়া ভাল নয় তবে এই কাজকে আমার হইতে দূরে রাখ, আমাকেও ইহা হইতে দূরে রাখ এবং যে স্থানের যাহা আমার জন্য ভাল হয় উহাকেই আমার জন্য নির্দ্ধারিত কর, অতঃপর উহার উপরই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।

ফজরের সুন্নতের প্রতি বিশেষ তৎপরতা

৬১৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ অন্য নামাযের মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের প্রতি সর্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ফজরের সুন্নতে কেরাত কিরূপ ?

৬১৮। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদ ও বেতের) তের রাকাত নামায পড়িতেন, তারপর ফজরের আজান শুনিলে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িতেন। (উহাতে ছুরা কুলইয়া এবং কুলহু আল্লাহু পড়িতেন। মোসলেম শরীফ)

৬১৯। হাদীছ :—আনাছ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফজরের ফরজের পূর্বে সুন্নত নামাযের রাকাতদ্বয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়িলে কিরূপে মনে করেন ? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামায) দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন, (সর্বশেষ দুই রাকাতের সঙ্গে) এক রাকাত (মিলাইয়া) বেতের নামায পড়িতেন এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত এরূপ সংক্ষিপ্ত পড়িতেন যেন তাঁহার কানে একামতের শব্দ পৌছিয়াছে। (১৩৫ পৃঃ)

৬২০। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত সংক্ষিপ্ত কেরাতে পড়িতেন, এমনকি আমি ধারণা করিতাম যে, বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত আলহামদু ছুরাও শেষ করেন নাই।

চাশতের নামায

৬২১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় কোন একটা আমল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভালবাসিতেন, কিন্তু নিজে বিশেষ তৎপরতার সহিত উহা করিতেন না, এই ভয়ে যে লোকেরা উহার প্রতি তৎপরতা অবলম্বন করিবে, ফলে হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহাকে ফরজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি নবী (দঃ)কে চাশতের নামায পড়িতে দেখি নাই, কিন্তু আমি উহা অবশ্যই পড়ি এবং পড়িব।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) চাশতের নামাযকে উত্তম আমলই গণ্য করিতেন। অবশ্য এই নামাযের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করার কোন প্রমাণ নাই, তাই চাশতের নামায ঐরূপ ব্যবস্থার সহিত গর্হিত নীতি বলিয়া সাব্যস্ত ; এই হিসাবেই ২৩৮ পৃষ্ঠায় "ওমরার বয়ান" পরিচ্ছেদে এক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) এই নামাযকে বেদআ'ত বলিয়াছেন।

৬২২। হাদীছ :—মোয়াররেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি অবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি চাশতের নামায পড়িয়া থাকেন কি ? তিনি বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওমর (রাঃ) পড়িয়া থাকেন কি ? বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু বকর (রাঃ) ? বলিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ? বলিলেন, তাঁহার পড়াও আমরা খেয়ালে পড়ে না।

ব্যাখ্যা :—বোখারী (রঃ) স্বীয় বর্ণনায় ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর উদ্দেশ্য মূল চাশতের নামায অস্বীকার করা নয়, বরং উহার জন্য অধিক তৎপরতা, এমনকি ভ্রমণ অবস্থায় সঙ্গীদেরকে বিচলিত রাখিয়াও চাশতের নামাযে লিপ্ত হওয়া—উহার জন্য এইরূপ তৎপরতাকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

৬২৩। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পরম প্রিয় নবী (দঃ) আমাকে তিনটি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি আজীবন উহা পালন করিয়া যাইব— (১) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা। (২) চাশতের নামায পড়া (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই বেতের পড়া ❀

৬২৪। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক আনছারী ছাহাবী অধিক মোটা ছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমি সব সময় আপনার সহিত জামাতে নামায পড়িতে সক্ষম হইনা, (তাই কোন সময় গৃহে নামায পড়িতে হয়, আপনি আমার গৃহে এক জায়গায় নামায পড়িয়া আসিলে আমি উহাকেই আমার নামাযের স্থান বানাইতাম।) সে মতে ঐ ছাহাবী হযরতের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া হযরত (দঃ)কে স্বীয় গৃহে দাওয়াত করিয়া আনিল এবং একটি বিছানার এক অংশ ধৌত করিয়া রাখিল, হযরত (দঃ) আসিয়া উহার উপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন। এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল হযরত (দঃ) কি চাশতের নামায পড়িতেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, এই দিন ছাড়া অন্য কোন দিন তাহা আমি দেখি নাই।

অন্যান্য সুন্নত নামায

৬২৫। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি লক্ষ্য রাখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিভিন্ন নামাযের সঙ্গে) দশ রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন—জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত মাগরেবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত—এই চার রাকাত গৃহে আসিয়া পড়িতেন এবং ফজরের পূর্বে (ঘরের ভিতরে) দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই সময়টি এমন সময় ছিল যে, তখন কোন লোক হযরতের নিকট ঘরের ভিতর যাইত না, কিন্তু আমার ভগ্নি, হযরতের বিবি হাফছাহ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছোবহে-ছাদেকের সময় মোয়াজ্জেন আজান দিবার পরক্ষণেই হযরত (দঃ) এই দুই রাকাত নামায পড়িতেন (ইহা ফজরের সুন্নত)।

❀ আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীছ কণ্ঠস্থ করিতে অধিক রাত্র জাগিতেন; তাহাজ্জুদের জন্য শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়া তাঁহার পক্ষে আশঙ্কাজনক ছিল; অতএব বেতের ও রাত্রের নফল পড়ায় এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

৬২৬। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বদা জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা:—বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়িতেন, হয়ত কোন সময় দুই রাকাতও পড়িয়াছেন।

৬২৭। হাদীছ:—আবদুল্লাহ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মগরেবের পূর্বে (নফল) নামায পড়, এইরূপ তিনবার বলিলেন, তৃতীয়বার ইহাও বলিলেন যে, যাহার ইচ্ছা হয় পড়িতে পার। ইহা এই জন্য উল্লেখ করিলেন, যেন মাগরেবের পূর্বের নামাযকে (অন্যান্য নামাযের সুন্নতের ন্যায় নিয়মিত) সুন্নত গণ্য না করা হয়×

৬২৮। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাগরেবের সময় মোয়াজ্জেন আজান দেওয়ামাত্র ছাহাবাদের কিছু লোক তাড়াতাড়ি মসজিদের থামসমূহের বরাবর দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ হইতে আসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই ওয়াক্তে আজান ও একামতের মধ্যে সময় অতি সামান্য থাকিত। (৮৭ পৃঃ)

মছআলাহ:—নফল নামায রাত্রে এবং দিনে দুই দুই রাকাতরূপে পড়া উত্তম (১৫৫ পৃঃ)। হানফী মজহাবের ফেকাহ-কেতাবে দিনের বেলা নফল চার রাকাতরূপে উত্তম বলা হইয়াছে।

মছআলাহ:—নফল নামায জমাতের সহিত শুদ্ধ হয়। (১৫৮ পৃঃ ৫৯৪, ২৫৪ ও ২৭৬ হাঃ)

মছআলাহ:—নিজ নিজ গৃহে নফল নামায পড়া চাই। আবাসিক গৃহকে নামায হইতে বঞ্চিত রাখা চাই না। (১৫৮ পৃঃ ২৮০ হাদীছ)

মক্কা ও মদীনার হরমের মসজিদে নামাযের ফজিলত

৬২৯। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (অধিক ফজিলত ও ছওয়াবের আশায় কোন বিশেষ মসজিদের প্রতি ছফর করিয়া যাইবে না। (কারণ, সব মসজিদই আল্লার ঘর সবেরই সমান ফজিলত।) কিন্তু তিনটি মসজিদ এমন আছে যাহার (ফজিলত বিশ্বের সমস্ত মসজিদ হইতে অধিক;

× মাগরেবের ওয়াক্তে ফরজ নামায পড়িবার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার বিবরটি হযরত (দঃ) নিজেই বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মাগরেবের ফরজ নামায উহার ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই পড়িয়া নেওয়া আবশ্যক, বিলম্ব করা মকরূহ। অথচ সকলেই যদি এই নফলে লিপ্ত হয় তবে ফরজ পড়িতে বিলম্ব ঘটিবেই। তাই হযরত (দঃ) এই নফল পড়ার অনুমতিদান এরূপ সতর্কতা ও সংকোচবোধ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং নবী (দঃ) নিজে ইহা পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। এতদদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সাধারণ লোকদের অসাবধানতা লক্ষ্য করিয়া মগরেবের ফরজের পূর্বে নফলে লিপ্ত হওয়া মকরূহ বলিয়াছেন।

তাই সুযোগ পাইলে উহার) প্রতি ছফর করিবে। (১) মক্কা শরীফের মসজিদুল-হারাম। (২) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ। (৩) বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে-আক্‌ছা।

ব্যাখ্যা:—মসজিদুল-হারামে অর্থাৎ কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করিয়া যেই মসজিদ তৈরী আছে উহাতে নামাযের ছওয়াব এক লক্ষ গুণ বেশী। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এক হাজার গুণ এবং বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদে পাঁচ শত গুণ। (ফত: ৩-৫২)

৬৩০। হাদীছ:— আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে একটিমাত্র নামায (মসজিদুল-হারাম ব্যতীত) অন্য মসজিদের এক হাজার নামায হইতে উত্তম। মসজিদুল-হারাম অবশ্য আরও বেশী ফজিলত রাখে।

৬৩১। হাদীছ:—ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি শনিবার হাঁটিয়া বা সওয়ার হইয়া কোবার মসজিদে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

৬৩২। হাদীছ:— عن عبد الله بن زيد ان رسول الله (ص)

قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার গৃহ মসজিদস্থিত আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানের একটি খণ্ড। (আবু হোরায়রা (রা:) হইতেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে)।

ব্যাখ্যা:—উল্লিখিত স্থান বা জায়গাটি বেহেশতের বাগানের অংশ বা খণ্ড হওয়ার তাৎপর্য্যে দুইটি বিষয় রহিয়াছে। একটি এই যে, এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশত হইতে ইহজগতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপরটি এই যে, পরজগত প্রতিষ্ঠিত হইলে এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশতের বাগানে স্থাপিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে কোনপ্রকার হের-ফের না করিয়া সরলভাবে উহার বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করাই উত্তম। কারণ আল্লাহ তায়ালার কুদরত অসীম এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মর্য্যাদা অতি মহান।

বেহেশত হইতে হযরত আদম (আ:)-এর জন্য পাথর (—কা'বা শরীফে স্থাপিত হজরে আসওয়াদ এবং হযরত ইব্রাহীম (আ:)-এর জন্য (অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে) পোষাক আসিতে পারিলে হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য বেহেশতের বাগানের একটি টুকরা আসিতে পারিবে না কেন? মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এই অংশটুকু এখনও চিহ্নিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬৩৩। হাদীছ:—আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে অতি সুন্দর চারটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন— (১) কোন মহিলা দুইদিন ভ্রমণ পরিমাণ

(তথা ৩২ মাইল) পথ ছফর করিতে পারিবে না সঙ্গে স্বামী বা কোন মহরম না থাকিলে (২) রোযার ঈদ এবং কোরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা যাইবে না। (৩) ফজর নামাযের পর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত (নফল) নামায পড়া যাইবে না। (৪) (অধিক ছওয়াব ও বৈশিষ্ট্যের আশায়) কোন মসজিদের প্রতি ছফর করা যাইবে না। তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল-হারাম, মসজিদুল-আক্‌ছা এবং আমার (তথা মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) মসজিদ : (প্রথম বিষয়টির জন্য ৫৭৮নং হাদীছের বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

নামাযের বিবিধ আহকাম

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ

৬৩৪। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায ফরজ হওয়ার প্রথমাবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায অবস্থায় সালাম করিতাম এবং তিনি উত্তরও দিতেন। আমরা আবিসিনিয়া হইতে (মদীনায়) আসিয়া পূর্বের ন্যায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে সালাম করিলাম; তিনি উত্তর দিলেন না, বরং নামাযান্তে তিনি বলিলেন, নামাযের মধ্যে (আল্লার প্রতি) মগ্নতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৬৩৫। **হাদীছ :**—যায়েদ ইবনে আরকাম (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলিতাম ; পরস্পর দরকারী কথা জানাইতাম। যখন এই আয়াত নাযেল হইল—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি, বিশেষরূপে আছরের নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নামাযের মধ্যে (কথাবার্তা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া) আল্লার প্রতি ধ্যানমগ্ন হও।" তখন আমরা কথাবার্তা ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলাম।

৬৩৬। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে কোন ঘটনায় ইমামকে সতর্ক করা আবশ্যক হইলে মহিলাগণ হাতের উপরত হাত মারিয়া শব্দ করিবে এবং পুরুষ "সোবহানাল্লাহ" বলিবে।

নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাক শুনিলে কি করিবে ?

৬৩৭। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পূর্বকালের একটি ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন। জোরায়েজ নামক এক ব্যক্তি সর্বদা লোকালয় হইতে দূরে এবাদৎখানার মধ্যে থাকিয়া এবাদতে মশগুল থাকিত।

একদা সে নামায পড়িতেছিল, তাহার মাতা তাহাকে ডাকিল, হে জোরায়েজ! সে মনে মনে ভাবিল, হে খোদা! একদিকে তোমার নামায, অন্য দিকে মাতার ডাক, এখন কি করিব? এই ভাবিয়া সে উত্তর দিল না, তাহার মাতা পুনরায় ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে ঐ ভাবিয়াই উত্তর দিল না। তৃতীয়বার আবার তাহার মাতা ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে উত্তর দিল না। এবার তাহার মাতা বিরক্ত হইয়া বদ-দোয়া করিল, হে আল্লাহ! জোরায়েজ (যখন আমার ডাকে সাড়া দিয়া আমার চেহারা দেখিল না, সে) যেন মৃত্যুর পূর্বে বদকার নারীর চেহারা চোখে দেখে। (মাতার বদ-দোয়া আল্লার নিকট কবুল হইল।)

তারপর ঘটনা এই ঘটিল যে, জোরায়েজের এবাদৎখানার নিকটবর্তী এক রাখালিনী নারী বকরি চরাইত এবং সেখানেই অবস্থান করিত। তাহার (স্বামী ছিল না, এমতাবস্থায় তাহার) একটি সন্তান জন্মিল। সকলেই তাহাকে ধরিল যে, বল্ কোন্ ব্যক্তির কু-কর্মে এই সন্তান জন্মিয়াছে? (খোদার কুদরত—) রাখালিনী (মিথ্যারোপ করতঃ) বলিল, জোরায়েজের; সে তাহার এবাদৎখানা হইতে নামিয়া আসিত। (জোরায়েজ বস্তুতঃ খাঁটী বুজুর্গ ছিলেন, কেবল একটি ত্রুটির দরুণ মাতার বদ-দোয়ার কারণে এই অপবাদের সম্মুখীন হইলেন। মাতার বদ-দোয়া পুরা হইয়া গেল, এখন আল্লাহ তায়ালা জোরায়েজের ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।) সকলে যখন জোরায়েজকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিল, (এমনকি তাঁহার বাসস্থানের উপর আক্রমণ চালাইল) তখন জোরায়েজ বলিলেন, কোথায় সেই নারী যে এই কথা বলিয়াছে? তখন সন্তান সহ ঐ রাখালিনীকে উপস্থিত করা হইল, জোরায়েজ ঐ সদ্য প্রসূত কচি শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালক! তোমার পিতা কে? শিশুটি বলিয়া উঠিল, অমুক রাখাল।

নামায অবস্থায় সেজদার স্থান পরিষ্কার করা

৬৩৮। হাদীছঃ—মোয়া'য়কীব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি সেজদায় যাইতে সেজদার স্থানকে সুসমতল করিত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, প্রয়োজন হইলে একবার করিতে পার। (বার বার করিও না)।

বিশেষ প্রয়োজনে নামায অবস্থায় সামান্য কোন কাজ করা

৬৩৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন, গত রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় একটি শয়তান (তথা অতি দুষ্ট জিন) আমার নামায নষ্ট করার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি উহাকে কাবু করিয়া ফেলিলাম এবং শক্তভাবে ধরিয়া খুব জব্দ করিলাম। ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, উহাকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখি,

যেন ভোর বেলা তোমরা উহাকে দেখিতে পার। কিন্তু তখন আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)এর এই দোয়াটি স্মরণ হইল— رب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى

"হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যাহা আমি ভিন্ন অন্য আর কেহ পাইতে না পারে।"* ফলে দ্বীন-ইসলামের জন্য সর্বত্র আমার অভিযানে যেন কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম না হয়।

(উপরোক্ত দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সোলায়মান (আঃ)কে মানুষ, জ্বিন ইত্যাদি সমস্ত বস্তুর উপর আধিপত্য দান করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য ঘটনায় ভাবিলেন যে, এই শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলে জ্বিনের উপর আধিপত্য চালান হয়, অথচ ইহা সোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের জন্য বিশেষ বস্তু ছিল,) তাই আমি শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলাম না; ছাড়িয়া দিলাম। আল্লাহ তায়ালা উহাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাড়াইয়া দিলেন।

নামাযের সময় যানবাহন—পশু ভাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে?

৬৪০। **হাদীছঃ**—আযরাক ইবনে কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহওয়ায এলাকায় গিয়াছিলাম; খারেজী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য। আমি একটি নহর বা খালের নিকটে ছিলাম; এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া (আছরের) নামায পড়া আরম্ভ করিলেন। (নামায অবস্থায়) তাঁহার যানবাহনের রজ্জু তাঁহার হাতেই ছিল। পশুটির টানাটানিতে ঐ ব্যক্তি স্থানচ্যুতও হইয়া যাইতেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ঐ লোকটি ছাহাবী আবু বরযাহ আসলামী (রাঃ)। (পশুর লাগাম তাঁহার হাতে রাখিয়াছেন দেখিয়া) এক খারেজী ব্যক্তি (যাহারা প্রকাশ্যে অতি ভক্ত মোসলমান দেখায়, আর বস্তুতঃ হয় মোনাফেক বা ভ্রষ্ট মতাবলম্বী—যে) ঐ ছাহাবীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, আল্লাহ এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করুন। (আমি খারেজী ব্যক্তিকে বলিলাম, চুপ থাক; আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন; তুমি জান ঐ ব্যক্তি কে? তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু বরযাহ (রাঃ)। আমার বিশ্বাস—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বীন-দুনিয়ায় অপমান করিবেন; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন ছাহাবীকে মন্দ বলিয়াছ। ফতহুলবারী, ৩—৩৬)

বৃদ্ধ ছাহাবী নামাযান্তে ঐ কটাক্ষের উত্তরে বলিলেন, আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাত-আটটি জেহাদে উপস্থিত রহিয়াছি। (এই অধিক সাহচর্য্যের মধ্যে) আমি হযরতের সহজ ও অনায়াসসাধ্য নীতি দেখিয়াছি এবং

---

* হযরত সোলায়মান (আঃ) এই দোয়া স্বীয় ভোগ-বিলাস বা স্বার্থের জন্য করিয়াছিলেন না, বরং ঘটনার পূর্ণ বিবরণে জানা যায় যে, আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর লোকদের গড়িমসি দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া তাহাদের মুখাপেক্ষা হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিয়াছি। যানবাহন পশুটির টানাটানিতে নড়চড় হওয়া আমার পক্ষে উত্তম—ইহা অপেক্ষা যে, আমি উহাকে ছাড়িয়া দিতাম; সে তাহার ইচ্ছামতে ঘাস-ক্ষেত্রে চলিয়া যাইত, ফলে আমি কষ্টে পড়িতাম। (আমার বাড়ী অনেক দূরে;) আমার ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে রাত্রে আমার বাড়ী পৌঁছাই সম্ভব হইবে না।

মছআলাহ:—এরূপ ঘটনায় যদি নামাযের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বক্ষদেশ পূর্ণরূপে কেবলাদিক হইতে ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যদি অনেক পরিমাণ হাটা-চলা করে তবুও নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (ফতহুলবারী, ৩—৬৬)

মছআলাহ:—কাতাদাহ (র:) বলিয়াছেন, নামায অবস্থায় যদি চোর কাহারও কাপড় লইয়া পালাইতে উদ্যত হয় তবে নামাযের নিয়্যত ছাড়িয়া চোরকে ধাওয়া করিবে। (১৬১ পৃ:)

তদ্রূপ যানবাহন ভাগিয়া যাওয়ার বা চার-ছয় আনা মূল্যের নিজস্ব কিম্বা অন্যের কোন বস্তুর ক্ষতির আশঙ্কা-ক্ষেত্রে উহা রক্ষার্থে নামাযের নিয়্যত করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—অত্র পরিচ্ছেদে এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বিধান ও মছআলার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যে, নামায বহির্ভূত কোন কাজ নামাযের মধ্যে করা হইলে যদি সেই কাজ সামান্য হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে না, আর যদি সেই কাজ বেশী হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে। "সামান্য" ও "বেশীর" তাৎপর্য্য এই—যে পরিমাণ বা যে শ্রেণীর কার্য্যরত ব্যক্তিকে সাধারণ দর্শক নামাযরত নয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকে উহাকে "বেশী" কার্য্য গণ্য করা হইবে এবং উহাতে নামায ভঙ্গ হইবে।

অনেকে বিষয়টি আরও সরল-সহজ করার জন্য এই ব্যাখ্যা করেন যে, যে কার্য্য সম্পাদনে সাধারণত: উভয় হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় উহাই "বেশী" এবং শুধু এক হাতে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে উহা "সামান্য" পরিগণিত। অবশ্য এই তাৎপর্য্যের সঙ্গে প্রথম তাৎপর্য্যটিও লক্ষণীয় থাকিবে।

নামাযের মধ্যে সালামের উত্তর দেওয়া চাই না

৬৪১। **হাদীছ:**—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে কোন একটি কাজে পাঠাইলেন। আমি সেই কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রসুলুল্লাহ (দ:)কে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনে চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় আমার বিলম্ব হওয়ায় হযরত (দ:) আমার উপর রাগান্বিত হইয়াছেন। পুনরায় সালাম করিলাম; এবারও তিনি উত্তর দিলেন না। আমার অন্তরে অধিক চিন্তার উদয় হইল। তৃতীয়বার সালাম করিলাম; এবার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন—প্রথম দুইবার উত্তর দিতে পারি নাই, কারণ আমি নামাযে ছিলাম।

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা

৬৪২। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায অবস্থায় কোমরের উপর হাত রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

নামাযের মধ্যে নামায ভিন্ন কোন বিষয়ের ধ্যান করা

জাগতিক অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কীয় কোন বিষয় নহে এইরূপ কোন বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যান নামাযের মধ্যে টানিয়া আনা কিম্বা আসিয়া গেলে উহাতে মগ্ন হওয়া অত্যন্ত দোষনীয়। উহাতে নামায ফাছেদ ও বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঐরূপ নামাযের বিশুদ্ধতা শুধু আইন ও বিধানগত ব্যাপার; উহাতে নামাযের রুহ বা আত্মা ক্ষুণ্ণ হয়। ঐরূপ নামায পরিত্যাগের বস্তু অবশ্যই নহে, কিন্তু ঐ দোষ সংশোধনের চেষ্টা একান্তই কর্তব্য। আর দ্বীনের কোন বিষয়, যথা—শরীয়তের কোন মছআলাহ, কোরআন-হাদীছের কোন তথ্য বা দ্বীনের কোন কর্তব্যের—যেমন, জেহাদের কোন বিশেষ পরিকল্পনা—এই সব এবাদতই বটে, কিন্তু নামায বহির্ভূত এবাদত। এই শ্রেণীর কোন বিষয়েরও খেয়াল বা ধ্যান নামাযে থাকিয়া নিজে টানিয়া না আনা এবং আসিয়া গেলে কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামাযরত অবস্থার সময় উহাতে ব্যয় না করাই উত্তম। আর যদি প্রয়োজন বোধ হয়, যেমন—মছআলাহ বা তথ্য কিম্বা পরিকল্পনাটি এইরূপ যে ঐ সময় উহাকে পূর্ণরূপে ধরিয়া ও মনে গাঁথিয়া না লইলে হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাইবে এবং পরে আর উহা মনে না-ও আসিতে পারে, অথচ দ্বীনের কিম্বা দ্বীনের জেহাদের জন্য উহা উত্তম বস্তু। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যানের জন্য নামায রত অবস্থার সময় ব্যয় করা উত্তমের পরিপন্থী নহে, এমনকি "খুশু-খুজু" তথা নামাযে আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহতে মগ্নতার বিপরীতও হইবে না। (মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ)এর বক্তব্য—আশ্রাফুশ-সাওয়ানেহ ১—১৩৬ পৃষ্ঠা।)

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নামাযের মধ্যে জেহাদে সৈন্য প্রেরণের পরিকল্পনা করি। (খলীফা ওমরের কার্যক্রম ঐ শ্রেণীরই যাহা উত্তম ও খুশু খুজুর পরিপন্থী নহে।)

অবশ্য এইরূপ খেয়াল ও ধ্যানের কারণে যদি নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটিয়া বা বিলম্বিত হইয়া যায় তবে সেজদা-ছুহু দিতে হইবে এবং কোন ফরজ ছুটিয়া গেলে নামায পুনঃ পড়িতে হইবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঐরূপ ঘটনায় একবার মগরেবের নামাযে প্রথম রাকাতের কেরাত ছুটিয়া গিয়াছিল, সেই নামায তিনি পুনরায় পড়িয়াছিলেন। (ফতহুলবারী, ৩—৬৯)

৬৪৩। **হাদীছ:**—ওকবা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আছরের নামায পড়িতেছিলাম। নামাযের সালাম ফেরা মাত্রই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পুনরায় মসজিদে আসিলেন। তাঁহার তাড়াহুড়ার দরুন মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব সৃষ্টি হইল। তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়া বলিলেন—নামাযের মধ্যে আমার স্মরণ হইল যে,

আমার ঘরে একটু স্বর্ণের টুকরা আছে; উহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকা আমি পছন্দ করি না, তাই আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।

৬৪৪। **হাদীছঃ**— সায়ীদ মাকবুরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বর্ণনা করেন। তাই আমি (ঐরূপ অভিযোগকারী) এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গত রাত্রে এশার নামাযে রসুলুল্লাহ (দঃ) কি ছুরা পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি হযরতের সহিত এশার জমাতে উপস্থিত ছিলেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ—উপস্থিত ছিলাম। আমি বলিলাম, আমি তাহা বলিতে পারি; নবী (দঃ) সেই নামাযে অমুক অমুক ছুরা পড়িয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, সকলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে যত্নবান হয় না, তাই অনেক হাদীছ বর্ণনা করিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে আমি হযরতের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে সর্বদা যত্নবান থাকি।

আলোচ্য হাদীছে প্রমাণিত হইল, মোক্তাদীগণ নামাযের মধ্যে ইমামের কেরাতের প্রতি ধ্যান জমাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার মহত্বের ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় অভ্যস্ত হইতে না পারিলে উক্ত মগ্নতাই উত্তম।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজনে হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে তাহার যে কোন অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। আবু ইসহাক (রঃ) নামায অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে স্বীয় টুপি মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়াছেন এবং উঠাইয়া দিয়াছেন। আলী (রাঃ) নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় এক হাতের কব্জি অপর হাতের কব্জির উপর রাখিতেন; অবশ্য প্রয়োজন বোধে হাত দ্বারা শরীর চুলকাইতেন এবং কাপড় সংযত করার প্রয়োজন হইলে তাহাও করিতেন (১৫৭ পৃঃ)। হাদীছে আছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে হযরতের একতেদা করিয়া তাঁহার বামদিকে দাঁড়াইলে হযরত (দঃ) হাত দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়াছিলেন।

নামাযে কোন প্রয়োজনে হাত ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিশেষ শর্ত ইমাম বোখারী (রঃ) সংযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত প্রয়োজন অবশ্যই নামাযের খাতিরে হওয়া চাই। অন্য কোন উদ্দেশ্যে হওয়া চাই না; যেমন কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদিকে এলোমেলো হওয়া হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য টানিয়া রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে: (৪৬৭ নং হাদীছ) অথবা বাহুল্য রূপেও হওয়া চাই না। নামাযের

উদ্দেশ্যে হওয়া যেমন—মাথায় অধিক গরম অনুভবে অস্থিরতার দরুণ নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ায় টুপি নামানো বা চুলকানির অধিক প্রয়োজনে অশান্তি ও গাত্রদাহ সৃষ্টি হওয়ায় নামাযে মনোযোগ রক্ষার জন্য চুলকানো, কিম্বা ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় সংযত করা ইত্যাদি। অনর্থক বা বদভ্যাসের দাস হইয়া হাত পা চালনা করা নামাযের মধ্যে অত্যন্ত অশোভনীয়। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ৬৩৮ নং হাদীছে বর্ণিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আর একটি বিশেষ কথা—প্রয়োজন ক্ষেত্রে হাত ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপরে উল্লিখিত সামান্য কাজ ও বেশী কাজের তাৎপর্য্য স্মরণ রাখিবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যদি বেশী কাজ অনুষ্ঠিত হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে; সেই নামায পুনঃ পড়িতে হইবে।

● নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি আল্লার কোন জিকির উচ্চারণে নামায নষ্ট হয় না। (১৬০ পৃঃ)

● কোন উপস্থিত লোককে সম্বোধনরূপে নয়—কাহাকেও সম্বোধন ছাড়া শুধু দোয়ারূপে সালাম উচ্চারণ করিলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ ৪৭৬ হাদীছ)। অবশ্য উপস্থিতকে সম্বোধন উদ্দেশ্যে সালাম করা বা তদ্রূপ সালামের উত্তর প্রদান নিষিদ্ধ; করিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ● নামাযের মধ্যে বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মুখের বা পেছনের দিকে স্থানচ্যুত হইলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ); তবে সামান্য ও বেশীর তাৎপর্য্য লক্ষ্য রাখিবে। ● নামাযের মধ্যে প্রয়োজন হইলে থুথু ফেলা জায়েয আছে। কিন্তু নামাযের স্থান ও কেবলা দিক চ্যুত হইয়া নয়, বরং ১৭২ নং হাদীছে বর্ণিত বিধান মতে।

মছআলাহ ঃ—নামাযের মধ্যে মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া—যদি উ…হ্ আ…হ্ শব্দের সহিত বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভাবনা-চিন্তায় বা কোন দুঃখ দরদ ইত্যাদির কারণে হয় তবে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি বেহেশত-দোযখ স্মরণে বা আল্লাহ তায়ালার ভয়ের প্রতিক্রিয়ার ঐরূপ হয় তবে নামায নষ্ট হইবে না (শামী, ১—৫৭৯)। সূর্য্য গ্রহণের নামায অবস্থায় হযরত (দঃ) বেহেশত-দোযখ দেখিয়া ছিলেন বলিয়া ৫৬১ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে; এক হাদীছে বর্ণিত আছে, সেই নামাযের সেজদার মধ্যে হযরত (দঃ) কাঁদিয়াছিলেন এবং উ…হ্, উ…হ্ শব্দের সহিত মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ছিলেন (ফতহুল-বারী, ৩—৩৬)।

ফরজ নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গেলে সেজদা-ছুহু দিবে

৬৪৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক (চার রাকাতওয়ালা) নামাযের দুই রাকাত পড়িয়া, না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। নামায যখন শেষ হইয়া আসিল—সকলে

সালাম ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছিল এমন সময় হযরত (দঃ) বসা অবস্থাই সালাম ফিরিবার পূর্বে দুইটি সেজদা করিলেন। প্রত্যেকটি সেজদা তকবীরের সহিত করিলেন; মোক্তাদীগণও সেজদা করিল। ভুলে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গিয়াছিল। উহারই পরিবর্তে এই সেজদা ছিল।

ভুলবশতঃ যদি পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলে†

৬৪৬। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিকট আরজ করা হইলে, নামাযের রাকাত কি বাড়িয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইহার কি অর্থ? তখন আরজ করা হইল যে, আপনি নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়াছেন, এতদ্-শ্রবণে হযরত (দঃ) সালাম ফিরার পর দুইটি সেজদা করিলেন। তারপর আবার সালাম (করিয়া নামায সমাপ্ত) করিলেন‡। নামাযান্তে বলিলেন, নামায সম্পর্কে নূতন কোন কিছু হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে উহা বলিয়া দিতাম। কিন্তু আমি মানুষই—আমারও ভুল হয় যেরূপ তোমাদের ভুল হইয়া থাকে। অতএব কোন সময় আমি ভুলিয়া গেলে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। আর তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইলে তাহার কর্তব্য হইবে চিন্তা করিয়া সঠিক দিক নির্দ্ধারিত করা সে উহার ভিত্তিতেই নামায পূর্ণ করিবে, অতঃপর সালাম করিয়া দুইটি সেজদা করিবে।

ভুলক্রমে শুধু দুই রাকাত পড়িয়াই যদি সালাম করে

৬৪৭। **হাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আছরের নামায দুই রাকাত পড়িয়াই সালাম ফিরিলেন তৎপর মসজিদের সম্মুখভাবে একটি কাষ্ঠ পতিত করা ছিল ঐ স্থানে যাইয়া উহার উপর হাত ভর করিয়া বসিলেন। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তাড়াহুড়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া মসজিদ হইতে চলিয়া গেল যে, নামাযের রাকাত কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল—যাহাকে "জুল-ইয়াদাইন" বলা হইত; সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ভুল করিয়াছেন না—নামাযই কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে? রসুল (দঃ) বলিলেন, কোনটাই হয় নাই। সে আরজ করিল, নিশ্চয়—

---

† চতুর্থ রাকাতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া অতঃপর দাঁড়াইয়া পঞ্চম রাকাত পড়িয়া থাকিলে সেজদা-ছুহু দ্বারা নামায শুদ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় ষষ্ঠ রাকাতও পড়িয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু চতুর্থ রাকাতের পর না বসিয়া পঞ্চম রাকাত পড়িলে পূর্ণ নামাযই ফাছেদ হইয়া যাইবে।

‡ ইহা নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয সময়ের ঘটনা। নতুবা ইমাম কথা বলার পর সেজদা-ছুহু দেওয়ার অবকাশ থাকে না। এই হাদীছ ৫১৮ পৃষ্ঠায়ও আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হুজুর আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নবী (দঃ) এ বিষয়ে অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই আরজ করিল, এই ব্যক্তি ঠিকই বলিতেছে। তখন নবী (দঃ) বাকি দুই রাকাত নামায পড়িলেন ও সালাম ফিরিয়া দুই সেজদা করিলেন।+

৬৪৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—তোমাদের মধ্যে কেহ যখন নামাযে খাড়া হয় তখন শয়তান আসিয়া নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। কেহ অবস্থার সম্মুখীন হইলে, শেষ বৈঠকে দুইটি সেজদা করিবে।*

মছআলাহ :—নামাযরত ব্যক্তিকে যদি কোন কথা বলা হয় এবং সে লক্ষ্য করিয়া শুনিয়া শুধু হাতের বা মাথার ইশারায় কোন বিষয় বুঝাইয়াও দেয় তবুও উহাতে সেজদা-ছহু দিতে হইবে না। (১০৪ পৃষ্ঠা)

+ ভুলবশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায শেষ করিয়া যদি কথাবার্তা বলিয়া ফেলে বা নামায ভঙ্গকারী অন্য কোন কার্য্য করে তবে হানফী মজহাব মতে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; সেজদা-ছহু দিলে চলিবে না। উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাকে মনছুখ বলা হইয়া থাকে; নামাযের মধ্যে যখন কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল উক্ত ঘটনা সেই কালের।

সেজদা-ছহু সালামের পরে হইবে, কিন্তু ঐ সালাম নামায সমাপ্তির সালাম নহে। নামায সমাপ্তির দুই সালাম সেজদা-ছহু পরেই হইবে, যেইরূপ পূর্বের হাদীছে উল্লেখ আছে।

* রাকাতের সংখ্যা যে ভুলিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে কি করিবে সেই মছআলাহ সুদীর্ঘ।

অষ্টম অধ্যায়

জানাযার বয়ান

"জানাযা" অর্থ শব, মৃতদেহ বা মৃত ব্যক্তি। এই অধ্যায়ে মানুষের মুমূর্ষু কাল হইতে পুনর্জন্মকাল পর্যন্ত সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও মছআলাহ-মছায়েল বর্ণিত হইবে।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছের মর্ম এই—যে ব্যক্তির ইহজীবনের শেষ বাক্য কলেমা-শাহাদৎ হইবে সে বেহেশতে যাইবে। অন্য এক হাদীছের মর্ম অনুরূপই—কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি। (ফতহুলবারী)

এই সমস্ত হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ দৃষ্টিতে ভুল ধারণা বা প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে যে, তবে শরীয়তের অন্যান্য আদেশ ও বিধি-বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দানেই ইমাম বোখারী (রঃ) একজন বিশিষ্ট তাবেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—

ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ (রঃ)কে উক্ত প্রশ্নই করা হইলে তিনি সংক্ষেপে ইহার উত্তর দান করিলেন—চাবি মাত্রই উহার কয়েকটি দাঁত থাকে; কোন দরওয়াজার তালা খুলিতে হইলে দন্তযুক্ত চাবি আনিতে হইবে, দন্তহীন চাবি দ্বারা তালা খোলা যাইবে না।

অর্থাৎ কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত ঐ চাবির দন্ত। বেহেশতের তালা খুলিতে হইলে তথা বেহেশতে যাইতে হইলে শরীয়তের বিধানাবলী সহ কলেমা-শাহাদৎ লইয়া যাইতে হইবে, নতুবা বেহেশতের দরওয়াজা খুলিবে না।

৬৪৯। হাদীছঃ— عن ابى ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اَتَانِىْ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهٗ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا

دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ -

অর্থঃ—আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এক বিশেষ দূত আসিয়া এই শুভ সংবাদের ঘোষণা শুনাইলেন—যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত শেরেকী গোনাহ হইতে পাক-পবিত্র থাকিবে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঈমানের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে) সে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে? রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে (তবুও সে বেহেশতে যাইতে পারিবে)।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের একমাত্র তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল—শেরেক বর্জন তথা তৌহীদ ও ঈমানের মহত্ব ও গুণাগুণ প্রকাশ করা যে, ইহা দ্বারা মানুষ বেহেশত লাভ করিতে পারে। যদি গোনাহের দ্বারা কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় তবে কোন প্রকার আজাব ভোগ না করিয়া প্রথম হইতেই সে বেহেশবাসী হইবে, নচেৎ গোনাহ পরিমাণ আজাব ভোগ করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে শেরেক বর্জন পূর্বক ঈমান অবলম্বন না করিয়া হাজার নেক আমল, যেমন—কোটী কোটী টাকা দান-খয়রাত করিলেও তাহার পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, অনন্তকাল সে আজাব ভোগ করিবে—চিরকাল সে দোযখেই থাকিবে।

৬৫১। হাদীছ :— عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ -

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন শেরেকী গোনাহের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে সে দোজখী হইবে।

জানাযার সঙ্গে যাওয়া

৬৫১। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে বিশেষরূপে সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন এবং সাতটি বস্তু নিষেধ করিয়াছেন। আদেশকৃত সাতটি কাজ এই—(১) জানাযার সঙ্গে যাওয়া, (২) রোগীকে দেখিতে যাওয়া এবং তাহার খোঁজ-খবর নেওয়া, (৩) কাহারও (ঠেকা উদ্ধারের বা সাদর) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৪) মজলুম-নির্য্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৫) শপথকারীর শপথ রক্ষা করা,✿ (৬) সালামের উত্তর দেওয়া, (৭) হাঁচিদাতার আলহামদু লিল্লাহ শ্রবণে يرحمك الله (ইয়ারহামু-কাল্লাহ) "আল্লাহ তোমার উপর (আরও) রহমত নাযেল করুন" এই বলিয়া তাহাকে দোয়া করা।✱ যেই সাতটি বস্তু (ব্যবহার) নিষিদ্ধ করিয়াছেন, উহা এই—(১) রৌপ্য (বা স্বর্ণ) নির্মিত অঙ্গুরী, (২) সাধারণ রেশমী বস্ত্র, (৩) মিহি রেশমী বস্ত্র, (৪) তসর, (৫) মোটা রেশমী বস্ত্র, (৬) লাল রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন।

✿ এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রা:)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুম্বন করিয়াছেন; মৃতের মুখের উপর তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছে। (তিরমিজী)

• হাঁচি আসা স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলদায়ক, তাই ইহা আল্লার একটি বড় নেয়ামত, এই নেয়ামতের উপর আলহামদু-লিল্লাহ বলিয়া যে ব্যক্তি আল্লার প্রশংসা করিল সে স্বীয় পালনকর্তার শোকরগুজারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। যে ব্যক্তি নেয়ামত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নেয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে অধিক নেয়ামত পাইবার উপযোগী। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন— لئن شكرتم لأزيدنكم "তোমরা যদি আমার নেয়ামতের প্রকৃত শোকরগুজারী কর তবে তোমাদের জন্য নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করিয়া দিব।" তাই তাহার জন্য এই দোয়া করা হয়।

৬৫২। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর পাঁচটি হক আছে—(১) সালামের উত্তর দেওয়া, (২) রোগী দেখা ও তাহার হাল-পুরছী তথা তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করা, (৩) শব যাত্রায় যোগদান করা, (৪) (দাওয়াত বা ঠেকা উদ্ধার) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৫) হাঁচিদাতার "আলহামদু-লিল্লাহ" শ্রবণে يرحمك الله "ইয়ারহামু-কাল্লাহ" বলা।

মৃতকে কাফন পরাইবার পূর্বে ও পরে দেখা যায়

কোন কোন আলেম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসলদাতা ও তাহার সহকর্মীগণ ব্যতীত কাহারও দেখা চাই না। বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে উহা খণ্ডন করিতেছেন। (ফতহুলবারী)

৬৫৩। **হাদীছ**ঃ—উম্মুল আ'লা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে যে সব মোসলমান নিঃসম্বলরূপে হিজরত করিয়া মদীনায় উপস্থিত হইতেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের জন্য মদীনাবাসী মোসলমানদের ঘরে ঘরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। (মদীনাবাসীগণ এ বিষয়ে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুণ ব্যালটের ব্যবস্থা করা হইত।) উম্মুল আ'লা (রাঃ) বলেন—একদা ব্যালটের দ্বারা আমাদের জন্য ওসমান ইবনে মজউ'ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম উঠিল। আমরা তাঁহাকে সাদরে ও সযত্নে আমাদের গৃহে স্থান করিয়া দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ও কাফন পরানর পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার নিকটবর্তী আসিলেন।*

উম্মুল আ'লা (রাঃ) বলেন—তখন আমি মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আবুছ-ছায়েব (ওসমান)! আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতেছি এবং শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্মানিত (অর্থাৎ বেহেশতবাসী) করিয়াছেন। এতদশ্রবণে নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি কিভাবে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছ, সে বেহেশতবাসী হইবে? আমি আরজ করিলাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! এই ব্যক্তি বেহেশতবাসী না হইলে আর কে বেহেশত-বাসী হইবে? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, (এই সম্পর্কে) নিশ্চিতরূপের সঠিক অবগতি এই ব্যক্তিরই লাভ হইয়াছে এবং আমি আশা করি, সে খুব ভালই পাইয়াছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লার রসুল, তথাপি আমি (অধিকাররূপে এবং অকাট্য ও অখণ্ডনীয়ভাবে) বলিতে পারি না যে, আমার প্রতি আল্লাহ কিরূপ করিবেন।

উম্মুল আ'লা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া আমি পণ করিলাম, কাহারও ভাল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে আর কখনও কোন উক্তি করিব না।

---

* এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুম্বন করিয়াছেন; মৃতের মুখের উপর তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছে। (তিরমিজি)

ব্যাখ্যা ঃ—সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা ; তিনি مالك يوم الدين "কর্মফল প্রদানের একচ্ছত্র মালিক।" لمن الملك اليوم لله الواحد القهار "সেদিন সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই সর্বশক্তিমান হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, এমনকি ইহকালের ন্যায় বাহ্যিক ক্ষমতাটুকুও কাহারও হাতে থাকিবে না।" তাই সেই কর্মফলের দিনের তথা পরকালের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ও দৃঢ়রূপে কোন কিছু বলিবার অধিকারী কেহই নহে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্য্যাদা ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন ; তিনি নিষ্পাপ, তদুপরি আল্লার ঘোষণা যে, মানুষ হিসাবে যদি আপনার কোনও ত্রুটি হয় আপনি পূর্বাহ্নেই সে সব হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনাতীত শান ও মান-মর্য্যাদা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে। কিন্তু জলীল ও জব্বার, সর্বাধিকারের অধিকারী সর্বক্ষমতায় ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়ালার অধিকার ও ক্ষমতা দৃষ্টে সব কিছুই বিলীন ও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তদুপরি কাহারও কোন সক্রিয় অধিকারও নাই। এসব অনুভূতি পরি-প্রেক্ষিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উপরোল্লিখিত তথ্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

বোখারী শরীফে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় হাদীছ বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কোন ব্যক্তি আমল-এবাদতের দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনিও পারিবেন না, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ) ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না যাবৎ আল্লার রহমত আমাকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া না লইবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে এরূপ বলিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন, যথা—

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ -

(কাফেরদের নানা প্রকার কুউক্তির প্রতিবাদে) আপনি বলিয়া দিন, আমি অতীতের রসুলগণ হইতে পৃথক ধরণের নহি, (তাঁহারা মানুষ ছিলেন, কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, আমিও তদ্রূপই। এমনকি) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার প্রতি বা তোমাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহাও আমি (নিশ্চিত ও দাবীরূপে কিছুই) বলিতে পারি না। (সব কিছু তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারই বাণীর উপর নির্ভর করিয়া হয়ত শুধু আশা রাখা যাইতে পারে, তদতিরিক্ত কাহারও কিছুই অধিকার নাই)। (২৬ পাঃ ১ রুঃ)

৬৫৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ চাদরে আবৃত করিয়া রাখা হইল, আমি উহার নিকটবর্তী আসিয়া চেহারার উপর হইতে কাপড় সরাইলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম। সকলেই আমাকে নিষেধ করিতেছিল, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

নিষেধ করিলেন না। আমার ফুফু ফাতেমাও আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা ক্রন্দন কর বা না কর, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি উচ্চ মর্তবা পাইয়াছে, এমনকি রণক্ষেত্রে শহীদ অবস্থায় পতিত থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহাকে স্বীয় ডানা দ্বারা ছায়া দিতেছিলেন—যাবৎ তোমরা তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া না আনিয়াছ।

আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদিগকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

কোন কোন হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত্যু সংবাদ দান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এখন ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাটির বিশ্লেষণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। অন্ধকার তথা কুফুরী যুগে এই রীতি ছিল যে, বড়-মানুষী প্রকাশার্থে ঢোল-শোহরত দ্বারা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হইত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ রীতির প্রতিই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন। নতুবা জানাযায় শরীক হইবার জন্য বা দোয়া-এস্তেগফার ইত্যাদির আশায় মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদের সংবাদ দান করাতে কোন দোষ নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ উদ্দেশ্যে মৃত্যু-সংবাদ দান করিয়াছেন।

৬৫৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে দিন আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর মৃত্যু হইল ঠিক সেদিনই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ (অহীর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া) সকলকে জানাইলেন এবং তাঁহার জন্য এস্তেগফার-ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) (জানাযা বা ঈদের নামায পড়ার) ময়দানে গেলেন এবং সকলকে লইয়া চার তকবীরের সহিত জানাযা পড়িলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— আবিসিনিয়ার প্রত্যেক অধিপতিই "নাজাশী" উপাধিতে পরিচিত হইত; আলোচ্য ঘটনার অধিপতির নাম ছিল "আছহা'মাহ"। তিনি ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন, তিনি বড়ই সৌভাগ্যশালী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আল্লাহ তায়ালা মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জ্ঞাত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত ছাহাবীগণকে জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার প্রতি এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেন যাহা চিরকাল তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতীক হইয়া থাকিবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ -

"অদ্য আবিসিনিয়া নিবাসী একজন নেক বান্দা ইহকাল ত্যাগ করিয়াছে, (যাহার নাম আছহামাহ) তোমরা সমবেতভাবে তোমাদের সেই ভ্রাতার জানাযার নামায আদায় কর।*

---

* মূল বাক্যটি বোখারী শরীফ ১৬৭ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত। এই হাদীছটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে; অনুবাদের মধ্যে উহার বিবরণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

আল্লার রসুলের মুখে কাহারও নেক বন্দা বলিয়া আখ্যায়িত হওয়া পরম সৌভাগ্যজনক ও একটি মূল্যবান সম্মানসূচক উপাধি। তদুপরি সুদূর মদীনা হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহার জানাযার নামায পড়িলেন। ইহাও অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এমনকি আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, এইরূপে দূরপ্রান্ত হইতে জানাযার নামায তাঁহার জন্য এক অসাধারণ বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। কারণ এরূপ ঘটনা একমাত্র তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ। অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের সময় অনেক মোসলমান ও মর্য্যাদাসম্পন্ন বক্তিবর্গ মদীনার বাহিরে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) বা খোলাফাগণ সচরাচার কাহারও উদ্দেশ্যে দূরপ্রান্ত হইতে জানাযার নামায পড়েন নাই। কদাচিৎ এরূপ আরও দুই একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে কিনা, তাহা সন্দেহযুক্ত। আরও একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং আরও ছাহাবী মদীনায় প্রাণত্যাগ করাকালীন অন্যান্য ছাহাবীগণ ও মোসলমানগণ দূর দূর প্রান্তে অবস্থানরত ছিলেন, কিন্তু কোথাও হইতে কেহ ঐ মহান ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে গায়েবানা-জানাযার নামায পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একটি দুইটি ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় শরীয়তের সাধারণ বিধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং প্রথারূপে ইহাকে অবলম্বন করা ত মোটেই সমীচীন নহে।

অবশ্য জানাযার নামাযের মূল বিষয়বস্তু হইল মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা, যাহা যে কোন স্থান হইতে করা যাইতে পারে এবং করিলে তাহা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা বিফলে যাইবে না, তাই এই বিষয় লইয়া বিবাদ সৃষ্টি করা পরিতাপের বিষয়।

জানাযার সৎকারে যোগদান করার জন্য সংবাদ দেওয়া

৬৫৬। হাদীছ:— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার অন্তিম শয্যাবস্থায় দেখা-শুনা করিতেন। ঐ ব্যক্তি একদা রাত্রিকালে প্রাণত্যাগ করিল। সেই রাত্রেই সকলে তাহার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বিষয় জ্ঞাত করান হইলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? তাহারা আরজ করিল—অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্র ছিল; তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া ভাল মনে করি নাই। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কবরের নিকটবর্তী আসিয়া দোয়া করিলেন বা পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা হযরতের পেছনে কাতার বাঁধিলাম; আমিও উহাতে শামিল ছিলাম।

ব্যাখ্যা:—ঐ ব্যক্তির নাম ছিল তাল্‌হা' (রাঃ)। তিনি মদীনাবাসী ছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য সকলের নিকট

বলিয়া গেলেন, তাল্‌হার অবস্থা ভাল নয়, তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী মনে হইতেছে। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ জ্ঞাত করিও। কিন্তু যখন রাত্রি হইল তখন তাল্‌হা (রা:) তাহার আপন লোকদিগকে বলিলেন, যদি আমি রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি তবে রাত্রেই আমার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিও, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ডাকিও না। কারণ, ইহুদীগণ তাঁহার পরম শত্রু; অন্ধকার রাত্রে তিনি আমার জন্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন। সেই রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল এবং দাফনকার্য্য সমাধা করা হইল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দ:)কে সম্পূর্ণ খবর অবগত করান হইলে তিনি সকলকে লইয়া তাঁহার কবরের নিকট আসিলেন এবং সমবেতভাবে হাত উঠাইয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন, দোয়াটি সংক্ষিপ্ত ছিল বটে, কিন্তু বড়ই তাৎপর্য্যপূর্ণ। হযরত (দ:) বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ وَتَضْحَكُ اِلَيْهِ -

"হে খোদা! তাল্‌হার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ এরূপভাবে হউক যেন সেও সন্তুষ্টচিত্তে হাসিয়া উঠে তুমিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ফতহুলবারী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় নবী (দ:) কবরের নিকটবর্তী আসিয়া শুধু দোয়া করিয়াছিলেন, না—পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারী (র:) স্থিরভাবে এই মতই পোষণ করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় নবী (দ:) পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামাযই পড়িয়াছিলেন। সেমতে বোখারী (র:) এই হাদীছের উপর কতিপয় মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য্য ধারণ ও ছওয়াবের আশা রাখার ফজিলত

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ

رٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ....

অর্থ—আপনি সুসংবাদ দান করুন ঐ সমস্ত ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিবর্গকে যাহারা আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও শোক-অশান্তির অবস্থায় (ধৈর্য্য ধারণ করতঃ মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া) এরূপ বলে যে—আমরা (ও আমাদের সর্বস্ব) আল্লার। এবং আমাদের সকলেই আল্লার নিকট যাইতে হইবে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিশেষ রহমত এবং তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

৬৫৭। হাদীছঃ— عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلَّا اَدْخَلَهُ

اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে।* ঐ শিশুদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে (ঐ শিশুর মাতা ও পিতাকে) বেহেশত দান করিবেন।

৬৫৮। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে সে দোযখে যাইবে না; অবশ্য সকলের ন্যায় তাহাদেরও দোযখের উপর প্রতিষ্ঠিত পোল-ছেরাত পার হইয়া যাইতে হইবে। কারণ, ইহা একটি অনিবার্য্য ও অবধারিত বিষয় যাহা ব্যতিরেকে কোন উপায়ান্তর নাই। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا -

"তোমাদের প্রত্যেকেরই দোযখ অতিক্রম করিতেই হইবে, ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও অকাট্যরূপে অবধারিত।" (১৬ পাঃ ৮ রুঃ) এখানে ৮২নং হাদীছও উল্লেখ আছে।

মৃতকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

৬৫৯। হাদীছঃ—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক কন্যার মৃত্যু হইল; আমরা তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে-ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন—(১) কুলপাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল দিবে। (২) তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার করিয়া গোসল দিবে; আবশ্যক হইলে আরও অধিকবার গোসল দিবে, কিন্তু বে-জোড় হওয়া চাই। (৩) শেষবার কর্পুর মিশ্রিত পানি ঢালিবে। (৪) ডান দিকের অঙ্গ এবং অজুর অঙ্গসমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিবে। গোসল সমাপনান্তে আমাকে সংবাদ দিবে।

গোসল সমাপনে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে খবর দিলাম। তিনি তাঁহার একখানা লুঙ্গি আমাদের নিকট দিলেন এবং বলিলেন, সর্বপ্রথম তাহাকে এই কাপড়টিতে আবৃত কর; যেন এই কাপড়টি তাহার শরীর স্পর্শ করিয়া থাকে। (বরকতের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন।)

উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবী কন্যাকে গোসল দেওয়াকালীন প্রথমে তাঁহার কেশগুচ্ছ বা কবরী ও খোঁপা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চুল আঁচড়াইয়া গোসলান্তে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া (পেছনের) দিকে রাখিয়া দিলাম।

---

* দুইটি বা একটি সন্তান মারা গেলে কি হইবে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায় ৮২নং হাদীছে দেখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নবী-কন্যার গোসলদানে অন্যতমা অংশ গ্রহণকারীণী উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) মৃত নবী-কন্যার চুল সম্পর্কে তিনটি কথা বলিয়াছেন—আমরা নবী-কন্যার চুল আঁচড়াইয়াছিলাম (১৬৭ পৃঃ), দুই পার্শ্বের চুলে দুইটি, মধ্য মাথার চুলে একটি—তিনটি বেণী করিয়া দিয়াছিলাম (১৬৮ পৃঃ), বেণীত্রয় পেছনের দিকে তথা পিঠের নীচে রাখিয়া দিয়াছিলাম (১৬৯ পৃঃ)

মোসলমানদের শব দেহের প্রতি সসম্মানে বিদায় দানের ভূমিকা প্রদর্শনই শরীয়তের নীতি। রোগশয্যায় সাধারণতঃ অযত্নের দরুণ মহিলাদের এবং পুরুষেরও বাবরি চুল জটলা ধরিয়া যায়। গোসলদানে পরিচ্ছন্নতার জন্য সেই জটলা ছিন্ন করিতে হইবে; সেই জন্য আবশ্যক হইলে চিরুণীও ব্যবহার করা জায়েয আছে, কিন্তু চুল ছিন্ন না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিবে। চুল এলোমেলো ও অসুন্দররূপে থাকিতে দিবে না, সুবিন্যস্ততার সহিত চুল রাখিবে; উহার জন্য প্রয়োজন মনে করিতে মোলায়েমভাবে বেণী করিয়া দিবে। হানফী মজহাবের ফেকার কিতাবেও বেণীর উল্লেখ আছে—ফতওয়া শামী, ১—৮০৮ দ্রষ্টব্য। বেণীর সংখ্যা ও রাখার স্থান সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও জায়েয, তবে সব দেহকে যথাসম্ভব নাড়াচাড়া উলট-পালট কম করার ব্যবস্থাই সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য; সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া হানফী ফেকার কেতাবে মহিলা মৃতের চুলকে দুই খণ্ডে বা দুইটি বেণী আকারে দুই পার্শ্ব দিয়া বক্ষের উপর রাখিয়া দেওয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া

৬৬০। **হাদীছ** :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহা সূতী, সাদা এবং ইয়ামান দেশের তৈরী ছিল।

ব্যাখ্যা :— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য ব্যবহৃত কাফনই আল্লাহ তায়ালার নিকটও পছন্দনীয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সাদা পোষাক ব্যবহার কর; ইহা পাক-পবিত্রতার দিক দিয়া উত্তম। (কারণ, রঙ্গিন কাপড়ে কোন কিছু লাগিলে তাহা সহজে নজরে পরে না) এবং সাদা কাপড়েই মৃতদিগকে কাফন দান কর। (তিরমিজি শরীফ)

মছআলাহ :—মহিলাদিগকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। চতুর্থটি হইল সিরবন্দ এবং পঞ্চমটি হইল সিনাবন্দ। সিনাবন্দ বগল হইতে কোমর ও রান বা জানুদ্বয় সহ দীর্ঘ হইবে; (কাফন পড়াইবার সময়) উহা পিরহানের নীচে থাকিবে; (ফলে পেচাইবার সময় পিরহানের উপরে থাকিবে।) ১৬৮ পৃঃ

মছআলাহ :—মৃতের মাথায় এবং দাঁড়িতে সুগন্ধি দিবে, আর শরীরের যে সব স্থান সেজদার সময় ব্যবহৃত হয় ঐ স্থানসমূহে কর্পূর দিবে (১৬৯ পৃঃ)।

এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন

৬৬১। **হাদীছ** :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করাকালীন এহরাম অবস্থায় আরাফার ময়দানে স্বীয়

সওয়ারী হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে কুলপাতা-যুক্ত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাহার (এহরামের) চাদরদ্বয় দ্বারা কাফন দাও; তাহাকে সুগন্ধি লাগাইও না, তাহার মাথা আবৃত করিও না, (যেরূপ জীবিত ব্যক্তি এহরামাবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে না, মাথা আবৃত করে না।) কারণ, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কবর হইতে (হাজীদের স্থায় এহরাম অবস্থায়) তল্‌বিয়া (লাব্বাইক) পড়িতে পড়িতে উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হানফী ও মালেকী মজহাব মতে এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন ইত্যাদি সাধারণ মৃতের স্থায়ই দিতে হইবে, কোন প্রকার ব্যবধান ও তারতম্য করার বিধান নাই। কারণ, কোরআন ও হাদীছ দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, মৃত্যুর দ্বারা প্রত্যেক আমলেরই সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার নামায পরিত্যক্ত হইয়া গেল; তাহাকে কেবলামুখী ইত্যাদি অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না। তদ্রূপ মোহরেম ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার এহরাম পরিত্যক্ত হইয়া গেল, তাই তাহাকে এহরামকালীন অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না।

উল্লিখিত যুক্তিবিদগণ আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য সম্পর্কে এই উক্তি করেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়সমূহ একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই বিশেষত্ব ছিল, সর্বক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই হাদীছের বিষয়াবলী বর্ণনাকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) যে ধরণের বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহা (আরবী ভাষার বিধান মতে) একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই ইহা শরীয়তের সাধারণ বিধান ও নিয়মরূপে বিবেচিত হইবে না।

সাধারণ তৈরী জামা কাফনে দিবে না, দিলে গোনাহ হইবে না

৬৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহার মধ্যে তৈরী জামা বা পাগড়ী ছিল না।

৬৬৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মোনাফেক দলের প্রধান) আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী যখন মারা গেল তখন তাহার ছেলে (যিনি অতি খাঁটি মোসলমান ও বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন, স্বীয় পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নাজাতের অছিলার ব্যবস্থা স্বরূপ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া এই আবেদন জানাইলেন যে, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি স্বীয় জামাখানা আমার পিতার কাফনের জন্য দিবেন এবং আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন এবং তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। নবী (দঃ) তাঁহার আবেদন রক্ষা করতঃ স্বীয় জামা দিয়া দিলেন (বা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন) এবং বলিলেন, সময় হইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি জানাযার নামায পড়াইয়া দিব। যখন জানাযা তৈয়ার হইল এবং নবী (দঃ) জানাযার

নামাযের জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পিছন হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন—এবং আরজ করিলেন, আপকি কি জানেন না যে, (সে আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক দিন এই এই বিষোদ্গার ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং সে ছিল সমস্ত মোনাফেকদের প্রধান।) আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের উপর জানাযার নামায পড়িতে তথা দোয়া-এস্তেগফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নবী (দঃ) কোন বাধা-বিপত্তি না শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই বিষয়ে স্পষ্টতঃ নিষেধ করেন নাই, বরং বাহ্যতঃ অবকাশ সূচক অর্থের বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

“মোনাফেকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন আল্লাহ তায়ালা কস্মিন-কালেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।” (১০ পাঃ ১৬ রুঃ)

এই বলিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ জানাযার নামায পড়িলেন। তৎপরেই স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াত নাযেল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

“মোনাফেকদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনি কখনও তাহার উপর জানাযার নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটবর্ত্তী দাঁড়াইবেন না।” (১০ পাঃ ১৭ রুঃ)

ব্যাখ্যা :— আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল ; এই শত্রুতার সে যে সমস্ত কুকীর্তি ও জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার সমালোচনায় বহু হাদীছ এবং কোরআনের বহু আয়াত নাযেল হইয়াছে। আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইবার জন্য একবার সে যে সমস্ত চক্রান্ত করিয়াছিল তাহার সমালোচনায় “ছুরা মোনাফেকুন” নামক একটি ছুরা নাযেল হয়। সে সর্বদাই কুচক্রান্ত দুরভিসন্ধি আঁটিতে থাকিত ; এমনকি সেই দুরাচার শয়তান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মান-মর্য্যাদার উপর আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকে নাই ; আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উপর মানহানীকর ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ রটাইবার ষড়যন্ত্রকারীও একমাত্র সেই ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ তাহার এসব কুকীর্তি অক্ষরে অক্ষরে অবগত ছিলেন। তাহার এক পুত্র ছিল, তাঁহার নামও ছিল আবদুল্লাহ, তিনি খাঁটি মোসলমান ছিলেন, তিনি স্বীয় পিতার কার্য্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত অনুতপ্ত, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ছিলেন, এমনকি অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইতেন, কিন্তু পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে নিষেধ করিতেন।

যেহেতু সে মোনাফেক অর্থাৎ প্রকাশ্যে মোসলেম দলভুক্তরূপে পরিচিত ছিল, তাহার মৃত্যু হইলে পর মোসলমানদের ন্যায় তাহার দাফন-কাফন ও জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পুত্র আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বাভাবিক পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া নাজাতের শেষ অছিলা ও চেষ্টা স্বরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে তাঁহার স্বীয় জামা প্রদানের ও জানাযার নামায পড়াইবার আবেদন করিলেন। দয়ার এবং স্নেহ মমতার মূর্তপ্রতীক রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রে অসীম ও তুলনাবিহীন দয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ঐ মোনাফেক সরদারের সমস্ত অপকর্ম হজম করিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রের আবেদনে তাহার জানাযার নামায পড়াইতেও সম্মত হইলেন। কারণ, তখনও আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হয় নাই। প্রথম আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল এবং উহাতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ ছিল না। অবশ্য উহার মূল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোনাফেকদের জন্য জানাযার নামায তথা এস্তেগফার করা বাহুল্য বুঝা যাইতেছিল এবং ব্যহুল্য কাজ না করাই চাই; তাই ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর প্রতি দ্বীনী ও ইসলামী আক্রোশে ক্রুদ্ধ হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন এবং এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু যেহেতু এই আয়াতে স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞার কোন শব্দই ছিল না বরং আয়াতের বাহ্যিক মর্ম শুধু এতটুকু ছিল যে, মোনাফেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বিফল হইবে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্ষান্ত না হইয়া নামায পড়ার প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার দয়ার সাগরে বান ডাকিয়া উঠিল—তিনি ইহাও বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তিনি ইহাদের ক্ষমা করিবেন না।" অতএব আবশ্যক হইলে আমি সত্তর বারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি কোনরূপ সাফল্যের আশা দেখা যায়। এই বলিয়া তিনি নামায পড়িলেন, তৎপর দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হইল এবং মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে জানাযার নামায, দোয়া-এস্তেগফার স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইল।

৬৬৪। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর মৃতদেহ তাহার গর্তে নামাইবার পরক্ষণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় পৌঁছিলেন এবং তাহাকে গর্ত হইতে উঠাইবার আদেশ করিলেন। তাহাকে উঠান হইল; হযরত (দঃ) তাহাকে স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার উপর থুতনী দিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় জামাও তাহাকে কাফনে পরাইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিধানে একত্রে দুইটি জামা ছিল; আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে বলিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার চর্ম স্পর্শিত জামাখানা আমার পিতাকে (কাফনে) পরাইবার জন্য দিবেন।

বদর যুদ্ধে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার গায়ে কাপড় ছিল না; আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী স্বীয় জামা তাঁহার গায়ে পরাইয়াছিল, (অন্য কাহারও জামা আব্বাসের গায়ের পরিমাপে ছিল না।) তাহার সেই উপকার পরিশোধেই হযরত (দঃ) স্বীয় জামা তাহার কাফনে দিয়াছিলেন, যেন তাহার উপকারের বোঝা হযরতের উপর থাকিয়া না যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী সম্পর্কে যে সব সহানুভূতি-সুলভ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার কারণ এক ত হযরতের স্বাভাবিক অসাধারণ অমায়িকতা ও উদারতা, আর দ্বিতীয়তঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে একনিষ্ঠ মোসলমান আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনস্তুষ্টি সাধন।

প্রয়োজনে এক কাপড়েই কাফন দিবে

৬৬৫। **হাদীছ** ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) ধনাঢ্য ছাহাবী ছিলেন, একদা তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতার সমাপনান্তে তাঁহার সম্মুখে খাবার উপস্থিত করা হইলে, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মোছয়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) যিনি আমার চেয়ে বড় মর্তবার ছিলেন, যখন তিনি শহীদ হইলেন তখন তাঁহার একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্দারা তাঁহার পূর্ণ শরীর আবৃত হইত না; পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত, মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত, সেই চাদরেই তাঁহার কাফন-দাফনও সেইরূপেই হইয়াছে।

তিনি আরও বলিলেন, এসব উচ্চ শ্রেণীর ছাহাবীগণ ঐরূপ দরিদ্রাবস্থায় জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তৎপর এখন আমাদের জন্য কত বড় লম্বা-চৌড়া সুখ শান্তির সুযোগ-সুবিধা দান করা হইয়াছে এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত, দ্রব্য-সামগ্রী অনেক কিছু দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে আমার ভয় ও আশঙ্কা হয় যে, আমাদের সুখ-ভোগের জাগতিক জীবনেই পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে না-কি? এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এমনকি রোযা থাকা সত্ত্বেও ইফতারের পরে আর ঐ খাদ্য গ্রহণ করিলেন না।

৬৬৬। **হাদীছ** ঃ—খাব্বাব (রাঃ) একদা বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে স্বীয় ঘর-বাড়ী, ধন-জন সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়াছি শুধু আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আশা করি আমাদের সেই আমলের ছওয়াব আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কোন কোন ভাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সেই ছওয়াবের কোন অংশই ইহজীবনে ভোগ করিয়া যান নাই, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়াই এই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম। আর কোন কোন ব্যক্তির জন্য ঐ আমলের প্রতিফল যেন পাকিয়া গিয়াছে এবং সে ইহজীবনেই উহার কিছু কিছু ভোগ করিতেছে; অর্থাৎ ধন-দৌলতের সুখ-সম্ভোগের জীবন লাভ করিয়াছে।

অতঃপর খাব্বাব (রাঃ) মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি যখন ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন তখন তাঁহার কাফনের

জন্য একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্দারা মাথা আবৃত করিলে পা খুলিয়া যায় এবং পা আবৃত করিলে মাথা খুলিয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই আদেশ করিলেন যে, চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করিয়া দাও এবং পায়ের উপর এজ্‌খের (এক প্রকার ঘাস) বিছাইয়া ঢাকিয়া দাও।

মছআলাহ :—দুইটি কাপড়ের সংস্থান হইলে দুই কাপড়েই কাফন দিবে।

জীবিতকালে স্বীয় কাফন তৈয়ার করিয়া রাখা

৬৬৭। হাদীছ :—ছাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা একজন নারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর লইয়া আসিল এবং আরজ করিল, এই চাদরটি আমি নিজ হস্তে বুনন করিয়া আপনাকে হাদিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছি। নবী (দঃ) চাদরটি গ্রহণ করিলেন ; তখন তাঁহার কাপড়ের আবশ্যকও ছিল। অতঃপর তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন, তাঁহার পরিধানে ঐ চাদরটি ছিল। এক ব্যক্তি চাদরটি দেখিয়া উহা পছন্দ করিল এবং বলিল, হুজুর। চাদরটি খুবই সুন্দর, ইহা আমাকে দান করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—তোমাকে দিয়া দিব। অতঃপর তিনি মজলিশ শেষে গৃহে যাইয়া চাদরটি ভাঁজ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলে ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি ভাল কাজ কর নাই ; কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রয়োজন ও আবশ্যকাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন তবুও তুমি তাঁহার নিকট উহা চাহিয়াছ ; (অথচ তুমি নিজেও ইহা জান যে, তিনি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। তখন) সে তাহার মনোগত মূল উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিল যে, চাদরটি পরিধান করার জন্য আমি প্রার্থী হই নাই, বরং এই জন্য ইহার প্রার্থী হইয়াছি যেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যবহৃত বস্ত্রে আমার কাফন তৈরী হয়।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তাহার উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তাহার মৃত্যু হইলে ঐ চাদর দ্বারাই তাহার কাফন দেওয়া হয়।

নারীদের জন্য শবযাত্রায় যোগ দেওয়া

৬৬৮। হাদীছ :—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ জোর তাকিদের সহিত না হইলেও (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়) আমাদিগকে (নারীগণকে) শববাহকের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করা হইত।

নারীদের জন্য শোক প্রকাশের নিয়ম

৬৬৯। হাদীছ :—মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মে-আতিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার একটি ছেলের মৃত্যু হইল, ঘটনার তিন দিন পর তিনি জরদ

রঙ্গের এক প্রকার সুগন্ধি আনাইয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের (নারীদের) জন্য একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন নিষিদ্ধ।

৬৭০। হাদীছ:—যয়নব বিনতে উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবি উম্মে-হাবিবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পিতা আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। সংবাদ পাওয়ার তৃতীয় দিন তিনি জরদ রঙ্গের সুগন্ধি আনিয়া হাতে ও মুখে মাখিলেন এবং বলিলেন, এখন সুগন্ধি ব্যবহারের আবশ্যক আমার ছিল না, কিন্তু আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে নারী আল্লার উপর ও কেয়ামতের উপর ঈমান রাখে, তাহার কর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া না থাকে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী বলেন, অতঃপর একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্য এক বিবি—যয়নব বিনতে জাহ্‌শ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছিল। তিনিও ঐরূপ করিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে ঐরূপ হাদীছ বর্ণনা করিলেন।

কবর যেয়ারত করা

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পূর্বে আমি (বিশেষ কারণ বশতঃ) কবর যেয়ারত করা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন কবর যেয়ারত করার আদেশ করিতেছি। কারণ, ইহা মানুষকে আখেরাত তথা পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অন্য এক হাদীছে আছে—ইহা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি মগ্নতা হইতে বিরত রাখে। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কবর যেয়ারত করিও; কারণ ইহা মানুষকে মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবশ্য নারীদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতা ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, তিরমিজি শরীফের হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কবর যেয়ারতে যাতায়াতকারিণী নারীদের প্রতি আল্লার লা'নত ও অভিশাপ রহিয়াছে।

কাজেই নারীদের কবর যেয়ারতে আদৌ তৎপর হওয়া চাই না। যদি কোন আপন-জনের কবর যেয়ারতের প্রতি বিশেষ আবেগ জন্মে, তবে প্রথমতঃ—কদাচিৎ এবং অতি অল্প সময়ের জন্য যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ণমাত্রায় ধৈর্য্য ও ছবরের সহিত যাওয়া চাই। তৃতীয়তঃ—পর্দা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। নতুবা উল্লিখিত হাদীছ অনুসারে আল্লাহ তায়ালার অভিশাপে অভিশপ্ত হইতে হইবে।

৬৭১। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখিলেন—একজন মহিলা একটি কবরের

নিকট বসিয়া কাঁদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, খোদাকে ভয় কর এবং ধৈর্য্যধারণ কর। মহিলাটি (রসুলুল্লাহ (দঃ) কে চিনিত না, তাই সে) উত্তর করিল, আপনি আমাকে কিছু বলিবেন না; কারণ, আপনি ত আমার দুঃখপ্রাপ্ত হন নাই এবং উহা অনুভব করিতে পারিবেন না। অতঃপর কোন এক ব্যক্তি মহিলাকে বলিল, তুমি যাহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়াছ তিনি নবী (দঃ)। (এতদশ্রবণে সে ভীষণ চিন্তিতা, ভীতা ও লজ্জিতা হইল।) অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে আসিল। সেখানে অন্যান্য রাজা-বাদশাদের ন্যায় দারওয়ান ও পাহারাদার ছিল না। সে হযরতের খেদমতে আরজ করিল, (আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম, আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম;) ঐ সময় আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, (আচ্ছা যাও, আমাকে চিনিতে না পারিয়া প্রতিউত্তর করাতে অসন্তুষ্ট নহি; কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ যাহাকে বলে উহার সময় চলিয়া গিয়াছে।) দুঃখপ্রাপ্তির প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলে উহাকেই প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ বলা যাইতে পারে। (কারণ, পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ভাবেই শোকাবেগ স্তিমিত হইয়া আপনা হইতেই ধৈর্য্য আসিয়া যায়)।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী (দঃ) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকটে উপস্থিত হওয়া তথা কবর যেয়ারত করার নিষেধ করিয়াছিলেন না; সে কাঁদিতেছিল, তাই ধৈর্য্যধারণের আদেশ করিয়াছিলেন।

কাহারও মৃত্যুতে ক্রন্দন করা

ক্রন্দন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার এই যে, দুঃখিত প্রাণের বেদনা ও যাতনায় চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু (মুখে শব্দ হয় না, হইলেও শুধু ক্রন্দনেরই শব্দ তা-ও উচ্চৈঃস্বরে নয় এবং) কোনরূপ বিলাপ খেদোক্তি বা মৃতের নানা-প্রকার গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করা হয় না। দ্বিতীয় প্রকার হইল উহার বিপরীত, অর্থাৎ বিলাপ ও খেদোক্তি করতঃ ক্রন্দন করা, মৃতের গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করতঃ উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করা।

প্রথম প্রকারের ক্রন্দনে কোন দোষ নাই, বরং উহা হৃদয়ের নম্রতা ও দয়ালু হওয়ার পরিচায়ক; যাহা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিয়া থাকেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় (৬৭২, ৬৭৩ নং) হাদীছদ্বয়ে উল্লিখিত ক্রন্দনের উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর ক্রন্দনই।

দ্বিতীয় প্রকারের ক্রন্দন নাজায়েয ও হারাম, এমনকি যদি মৃত ব্যক্তির দ্বারা এই প্রথা তাহার পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে, অথবা সে নিজের জন্য ঐ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়া থাকে, কিম্বা তাহার জীবিতকালে তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তবুও সে উহা নিষেধ করিয়া যায় নাই; তবে এরূপ ক্রন্দনের দরুণ ঐ মৃত ব্যক্তিও বিশেষভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে এবং আজাব ভোগ করিবে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম (৬৭৪, ৩৭৫, ৬৭৬ নং) হাদীছত্রয়ের তাৎপর্য্য ইহাই।

তদুপরি এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য বোখারী (রঃ) আরও তিনটি দলীলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(১) আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (২৮ পাঃ ১৯ রুঃ) قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে মোমেনগণ! তোমাদের নিজকে এবং পরিবারবর্গকে দোযখ হইতে রক্ষা কর।"

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোযখে যাওয়ার কারণসমূহ তথা কুকর্ম ও কুপ্রথা হইতে নিজে বিরত থাকা যেরূপ ফরজ ও অবশ্য কর্তব্য, তদ্রূপ স্বীয় পরিবারবর্গকেও বিরত রাখার চেষ্টা করা ফরজ। সাধ্যানুযায়ী এই চেষ্টা না করিলে উক্ত ফরজ তরককারী পরিগণিত হইয়া শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

(২) নবী (দঃ) বলিয়াছেন—كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... "তোমাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়; স্মরণ রাখিও—প্রত্যেক কর্তাকেই স্বীয় অধীনস্থদের কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী হইতে হইবে। গৃহস্বামী পরিবারবর্গের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী, তাই পরিবারবর্গের কার্য্যকলাপের জন্য তাহার দায়ী হইতে হইবে।"

(৩) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত সারা বিশ্বে যত না-হক খুন ও অন্যায় হত্যা অনুষ্ঠিত হইবে, আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল প্রত্যেকটি হত্যার জন্য গোনাহের ভাগী হইবে। কারণ, তাহার দ্বারাই সর্বপ্রথম অন্যায় নরহত্যা প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল।

উল্লিখিত দলীলত্রয়ের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে হারাম তরীকার ক্রন্দনের প্রথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে স্বীয় পরিবারবর্গকে উহা হইতে বিরত করিয়া না যাইয়া থাকে বা তাহার দ্বারা কিম্বা তাহারই সম্মতিক্রমে ঐ প্রথা পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে তবে মৃত ব্যক্তি ঐ হারাম কার্য্যের গোনাহের ভাগী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে।

৬৭২। হাদীছ ঃ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কন্যা (যয়নব রাঃ) তাঁহার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমার একটি ছেলে অন্তিম অবস্থায় পতিত হইয়াছে; আমার অনুরোধ—আপনি একটু তশরীফ আনিবেন। নবী (দঃ) তদুত্তরে সালাম এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিয়া থাকেন, উহা হইতে যতটুকু উঠাইয়া নেন তাহা তাঁহারই প্রদত্ত বস্তু উঠাইয়া নেন। তদুপরি জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবই (নির্দ্ধারিত) সময় অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে (ম ক্ষুণ্ণ বা শোক-বিহ্বল না হইয়া) ধৈর্য্যধারণ কর এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুঃখ-বেদনার ছওয়াবের প্রতীক্ষা কর। নবী-কন্যা স্বীয় পিতাকে পুনরায় সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে, আপনাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আসিবেন। এবার রসূলুল্লাহ (দঃ) কয়েক জন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় কন্যার গৃহে

উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন তাহার আত্মা ধড়ফড় করিতেছিল যেন এখনই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন হযরতের সঙ্গী সায়া'দ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, ইহা কি? ইয়া রসুলাল্লাহ! রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, ইহা দয়া। আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে "দয়া" প্রদান করিয়াছেন, (যাহারা খোদাপ্রদত্ত ঐ দয়াকে স্বীয় চরিত্রে ও কর্মক্ষেত্রে বিকশিত করিয়া থাকে সেই) দয়ালু ব্যক্তিগণের প্রতিই আল্লাহ তায়ালাও দয়াবান হইয়া থাকেন।

৬৭৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা এক নবী-নন্দিনীর দাফন কার্য্যে উপস্থিত ছিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কবরের কিনারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অদ্য রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গম করে নাই। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকেই কবরে নামিতে বলিলেন। তিনি শব রাখিতে কবরে নামিলেন।

৬৭৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের ক্রন্দনের দরুন মৃত ব্যক্তি আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

৬৭৫। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি স্বীয় পরিবারবর্গের কোন কোন ক্রন্দনের দরুন আজাব ভোগ করে।

৬৭৬। হাদীছ ঃ—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্মরণ রাখিও, আমার প্রতি মিথ্যারোপ অন্য কাহারও প্রতি মিথ্যারোপের ন্যায় নহে; যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিথ্যারোপ করিবে অনিবার্য্যরূপে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

মুগিরা (রাঃ) বলেন, (উক্ত হাদীছ জানা ও শুনা সত্ত্বেও বলিতেছি—) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার মৃত্যুতে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা হইবে তাহাকে ঐ ক্রন্দনের দরুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আলোচিত ক্রন্দনের দুই প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার ক্রন্দনের বিষয়ে যদি মৃত ব্যক্তি কোন প্রকার দোষী হয় অর্থাৎ তাহার দ্বারা ঐ প্রথা তাহার পরিবারবর্গে প্রচলিত হইয়াছিল বা সে তাহার জন্য এইরূপ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়াছিল কিম্বা তাহাদের পরিবারে এই প্রচলন ছিল তবুও সে উহা নিষেধ করে নাই ইত্যাদি; তবে সে বস্তুতঃ গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি সে এ বিষয়ে দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হয়, তবে সে গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে

না বটে, কিন্তু স্বীয় পরিবারবর্গের হারাম তরীকার ক্রন্দনের দরুণ তাহার আত্মা অনুতপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিবে। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে এরূপও হয় যে, ক্রন্দনকারীণীগণ যখন বিলাপ-সুরে মৃত ব্যক্তির গুণ-গান করিতে থাকে এবং স্বভাবতঃই অনেক কিছু অত্যুক্তি, অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলে, তখন ফেরেশতাগণ ধমক ও ভৎর্সনার স্বরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন সত্যই কি তুমি এরূপ ছিলে? এভাবের নিন্দাসূচক প্রশ্নাবলীর দ্বারা মৃত ব্যক্তি দুঃখ অনুভব করিবে। তিরমিজী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ ইত্যাদি কিতাবের কয়েকখানা হাদীছ দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে। (ফতহুল-বারী)

এতদ্দৃষ্টে মৃত ব্যক্তির প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল তাহাদের জন্য এ সব কার্য্যকলাপ হইতে দূরে থাকাই প্রকৃত সহানুভূতির পরিচায়ক হইবে।

৬৭৭। **হাদীছ:**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদী নারীর কবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি তাহার আত্মীয়বর্গের ক্রন্দন শুনিয়া বলিলেন, ইহারা তাহার জন্য কাঁদিতেছে, অথচ সে কবরের মধ্যে ভীষণ আজাবে আক্রান্ত হইয়াছে।

মছআলাহ:— নাজায়েযরূপে ক্রন্দনরত ব্যক্তিকে সাধ্যমতে নিষেধ করা এবং বাধা দেওয়া কর্তব্য। (২৭৪ পৃঃ ৬৭১ হাদীছ)

শোক প্রকাশে কয়েকটি অপকর্ম

৬৭৮। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শোক প্রকাশ মুখের উপর, কপালের উপর থাপ্পর মারিবে (খামচি কাটিবে) বা খেদোক্তি, বিলাপে—অন্ধকার যুগের রীতি-নীতিতে নিজের মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদির অশুভ আহ্বান করিবে সে আমাদের তথা ইসলামের তরীকা বহির্ভূত।

● কোন কোন হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ সব অপ-কর্মকারিণীদের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন। (ফতহুল-বারী)

● খালেদ ইবনে ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার আত্মীয়বর্গ কাঁদিতেছিলেন তখন কোন এক ব্যক্তি আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ)কে জানাইল এবং ক্রন্দনকারিণীগণকে নিষেধ করিতে বলিল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, তাহাদিগকে কাঁদিতে দাও, যাবৎ ধুলা-বালী না ছিটায় বা চীৎকার ও হুঙ্কার না দেয়।

কাহারও মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করা

৬৭৯। **হাদীছ:**—সায়া'দ ইবনে আবি ওয়াকাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালীন মক্কা শরীফে থাকাবস্থায় আমি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকিতেন। একদা আমি আরজ করিলাম, আমার রোগ

সঙ্কটময়, আমার অনেক ধন-সম্পত্তি আছে, আমার কোন ছেলে সন্তান নাই; আমার ইচ্ছা হয়, আমি স্বীয় ধন-সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ ছদকা (করার অছিয়ত) করিয়া যাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিলেন। আমি আরজ করিলাম, অর্দ্ধাংশ? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না, বরং এক তৃতীয়াংশ—ইহার অধিক না। তুমি স্বীয় ওয়ারেসদিগকে স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাও, ইহা তাহাদিগকে দুরাবস্থার সম্মুখীন রাখিয়া যাওয়া হইতে উত্তম। (ছদকা করাতেই ছওয়াব সীমাবদ্ধ নহে;) স্মরণ রাখিও—আল্লার সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কিছু খরচ করিবে উহাতেই তোমার ছওয়াব হাসিল হইবে, এমনকি (আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত কর্তব্য—স্বীয় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খাতিরে) স্ত্রীর মুখের প্রতিটি লোকমার সংস্থান করাতেও তোমার ছওয়াব হইবে।

অতঃপর আমি আক্ষেপ করিয়া বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! মনে হয়, আমি আমার সঙ্গীগণের সহিত প্রিয় মদীনায় আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না, (স্বীয় দেশ মক্কাকে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন এখানে মৃত্যু হইয়া এখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—না (এখন তোমার মৃত্যু হইবে না,) তুমি আরও বাঁচিয়া থাকিয়া যত অধিক নেক আমল করিবে তদ্বারা তোমার মর্তবা বাড়িতে থাকিবে। আমি আশা করি তুমি আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবে। তোমার দ্বারা অনেক লোকের (তথা মোসলমানদের সাহায্য হইবে এবং অনেক লোকের (তথা কাফের-দের) ধ্বংস সাধিত হইবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীগণের জন্য দোয়া করিলেন—
اللهم امض لاصحابى هجرتهم "হে আল্লাহ! ছাহাবীগণের হিজরত (—তোমার সন্তুষ্টির জন্য দেশত্যাগ)কে চিরতরে বজায় রাখ, (কোন সময় ও কোন রকমেই) তাহাদের হিজরত বানচাল না হয়—তাহাদের অবস্থায় অবনতি না ঘটে।"

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সায়া'দ ইবনে খাওলা (রাঃ) ছাহাবীর মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মক্কা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা:—যেই দেশ (মক্কা নগরী)কে একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ছাহাবীগণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই দেশকে পুনরায় গ্রহণ করা দুরের কথা, প্রয়োজনের অধিক এক মুহূর্ত সেখানে অবস্থান করাও ছাহাবীগণ কোন মতেই পছন্দ করিতেন না। এমনকি ক্ষমতা বহির্ভূত মৃত্যু আক্রান্ত হইয়া সেখানে থাকিয়া যাওয়াকে পর্য্যন্ত মনক্ষুণ্ণকারী গণ্য করা হইত।

শোক প্রকাশে মাথার চুল ফেলিয়া দেওয়া নিষেধ

৬৮০। হাদীছ:—আবু মুছা (রাঃ) রোগাক্রান্ত হইয়া একদা মুর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার কোনও এক আত্মীয়ের কোলে হেলান দিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সেই অবস্থায় তিনি বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ণ

হুশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেরূপ ব্যক্তির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন আমিও তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করি। (শোকাভিভূত হইয়া) যে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কাঁদে, মাথা মুড়িয়া ফেলে, জামা-কাপড় ফাড়িয়া ফেলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার প্রতি স্বীয় সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।

কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া

৬৮১। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর শাহাদাৎ সংবাদ পাইলেন তখন তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন; আমি (আয়েশা) দরওয়াজার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জানাইল যে, জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মহিলাগণ কাঁদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। দ্বিতীয়বার আসিয়া ঐ ব্যক্তি অভিযোগ করিল, তাহারা আমার নিষেধ মানিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও বলিয়া দিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় আমল দেয় নাই। (যেহেতু তাহারা কোনরূপ সীমা অতিক্রম করে নাই, অথচ সদ্য শোকাবিষ্টা ছিল—যখন ক্রন্দন আসা অতি স্বাভাবিক, তাই ঐ ব্যক্তির এরূপ পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) (বিরক্তি স্বরূপ) বলিলেন—(যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে) তাহাদের মুখ মাটি-চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া আস।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শোকাবস্থায় বার বার বিরক্ত করায় আমার ক্রোধ আসিয়া গেল। আমি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম, আল্লার রসুল যাহা বলেন তাহা পূর্ণ করার ক্ষমতা হয় না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি হইতে অব্যাহতিও দিতেছে না।

৬৮২। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ঘটনায় সত্তরজন কোরআন বিশারদ ছাহাবী একদল বিশ্বাসঘাতক দস্যুর হাতে শহীদ হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত ঐ দস্যুদের প্রতি অভিশাপ করতঃ নামাযের মধ্যে দোয়া-কুনুত পড়িলেন এবং এত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, অন্য কোন সময় তাঁহাকে ঐরূপ দেখি নাই।

শোকাবস্থায় শোকপ্রকাশ হইতে না দেওয়া

মোহাম্মদ ইবনে কায়া'ব (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি খারাব ধারণা পোষণ এবং মুখে খারাব কথা বলা—ইহা শোক নহে, বরং ইহা ত অধৈর্য্য; যাহা গোনাহ। (বস্তুতঃ "শোক" হইল—শুধু মনের বেদনা ও ব্যথা।)

৬৮৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ছেলে অসুস্থ ছিল। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহিরে কোথাও গিয়াছিলেন—এমতবস্থায় ছেলেটি প্রাণ ত্যাগ করিল। আবু তাল্‌হার (রাঃ) স্ত্রী ভাবিলেন, স্বামী রোগা অবস্থায় বাহিরে গিয়াছিলেন, ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিবেন, সেই মুহূর্তে ছেলের মৃত্যুর কথা জ্ঞাত হইলে কোনক্রমেই খানা-পানি গ্রহণ করিবেন না; বেহাল হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি) মৃত ছেলেটির গোসল দান ও কাফন পরান সম্পন্ন করিয়া উহাকে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটির অবস্থা কিরূপ? তাঁহার স্ত্রী উত্তর করিলেন—সে এখন সুস্থির ও শান্ত আছে; আশা করি সে এখন আরামেই আছে। আবু তাল্‌হা (রাঃ) স্ত্রীর উত্তরকে বাহ্যিক অর্থে সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণ শান্তির সহিত রাত্রি যাপন করিলেন, এমনকি রাত্রে স্ত্রী সঙ্গমও করিলেন। ভোরবেলা গোসল করিয়া যখন ঘর হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ স্পষ্টরূপে জানাইলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িলেন এবং ছেলে ও স্ত্রীর সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) (তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধি ও সীমাহীন ধৈর্য্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া দোয়া করিলেন এবং) বলিলেন—আশা করি আল্লাহ তোমাদের এই রাত্রি যাপনে বিশেষ বরকত দান করিবেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়া ও সুসংবাদ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল; সেই উপলক্ষেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু তাল্‌হা জন্ম-গ্রহণ করিলেন। একজন মদীনাবাসী ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—ঐ স্ত্রীর পক্ষে আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৯টি সন্তান হইয়াছিল; তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কোরআন বিশারদরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

শোকপ্রাপ্তির প্রথম ভাগে ছবর ও ধৈর্য্যের ফজিলত

শোক ও দুঃখ-কষ্টে ছবর ও ধৈর্য্যধারণের ফজিলত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোর-আনে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

اَلَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○

اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ـ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

"যাহারা শোক ও দুঃখ-কষ্ট পৌঁছিলে এই ভাবিয়া ধৈর্য্যধারণ করে যে, আমরা সকলেই আল্লার অধীন এবং আমাদের সকলেরই আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে—ঐ সকল লোকদের প্রতি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ (Thanks) এবং বিশেষ রহমত ও করুণা, আর (এই স্বীকৃতি যে,) তাহারাই হেদায়েত ও সৎপথের উপর।"
(২ পাঃ ৩ রুঃ)

এই আয়াতে ছবর ও ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য তিনটি সুসংবাদ রহিয়াছে—(১) আল্লার তরফ হইতে ধন্যবাদ (Thanks)। (২) আল্লার বিশেষ রহমত ও করুণা। (৩) হেদায়েত ও সৎপথের উপর হওয়ার স্বীকৃতি। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথম দুইটি ত উত্তম সুসংবাদ আছেই তৃতীয়টি তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীকৃতি সৎপথের পথিক হওয়ার—ইহাও আর একটি উত্তম সুসংবাদ।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ . وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ......

"দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সহজ সুলভ হওয়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ কর ছবর—ধৈর্য্য ও নামাযের দ্বারা; নিশ্চয় ছবর ও নামায কঠিন কাজ, কিন্তু যাহারা আল্লার সম্মুখে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখিয়া আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগরিত রাখে তাহাদের জন্য উহা কঠিন থাকে না" (১ পাঃ ৫ রুঃ)। এই আয়াতের মর্ম এই যে, ছবর ও ধৈর্য্য এত বড় রত্ন যে, ইহার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সহজ ও সুলভ হয়।

এইভাবে কোরআন-হাদীছে ছবর ও ধৈর্য্যের যত ফজিলত ও উপকার বর্ণিত হইয়াছে—সবই একমাত্র ঐ ছবর ও ধৈর্য্যের যাহা শোকের প্রথম আঘাতেই অবলম্বন করা হয়। বস্তুতঃ ছবর ও ধৈর্য্য একমাত্র উহাই; কারণ সময়ের অতিক্রমে স্বভাবতঃই শোক স্তিমিত হইয়া আসে, এমনকি বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন আর ছবর ও ধৈর্য্য অবলম্বনের কোন অর্থ থাকে না। অতএব একমাত্র শোকের প্রথম আঘাত হইতে ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিলেই ফজিলত ও উপকার লাভ হইতে পারে। আনাছ (রাঃ) কতৃক বর্ণিত ৬৭১নং হাদীছে হযরত নবী (দঃ) اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى "ছবর হয় শোকের প্রথম আঘাতে" বলিয়া উক্ত তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শোকবাক্য মুখে উচ্চারণ করা

৬৮৪। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু সাইফ কাইনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তির গৃহেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশু পুত্র ইব্রাহীম (রাঃ) প্রতিপালিত হইতেছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পুত্র ইব্রাহীমকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন এবং বিশেষরূপে আদর করিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় একদিন ঐরূপে উপস্থিত হইলেন, ঐদিন ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ ছাহাবী বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনিও.........(কাঁদেন)? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে

বলিলেন, হে ইবনে আ'উফ! ইহা দয়ার নিদর্শন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় অশ্রুবর্ষণপূর্বক বলিলেন, নয়নে অশ্রু, প্রাণে বেদনা; কিন্তু মুখে আল্লার অসন্তুষ্টির কোনও শব্দ উচ্চারিত হইবে না। হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত।

রোগীর নিকট বসিয়া কাঁদা

৬৮৫। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) অন্তিমশয্যায় পতিত হইলেন। একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিনজন ছাহাবীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, না—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরতকে কাঁদিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—স্মরণ রাখিও, নয়নের অশ্রু ও প্রাণের বেদনার দরুণ আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না, কিন্তু মুখের দরুণ শাস্তি দিবেন (যদি ক্রন্দনে বা খেদ প্রকাশের শরীয়ত বিরোধীরূপে উহাকে পরিচালনা করা হয়।) অথবা রহমত নাযেল করিবেন (যদি উহার দ্বারা ভাল কথা বাহির হয়, যেমন—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" বলা।)

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—স্মরণ রাখিও, (শরীয়ত বিরোধীরূপে) ক্রন্দনকারী শুধু নিজেই শাস্তি পাইবে না, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিও (ঐরূপ) ক্রন্দনে শাস্তি ভোগ করিবে।

৬৮৬। হাদীছ:—উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (কতিপয় মহিলা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বায়আ'ত তথা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকালে তিনি বিশেষরূপে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমরা কাহারও মৃত্যুতে বিলাপের ক্রন্দন করিব না।

জানাযা আসিতে দেখিলে দাঁড়াইয়া যাইবে

৬৮৭। হাদীছ:—আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি জানাযা আসিতে দেখে তখন যদি সে উহার সঙ্গে যাইতে না পারে তবে তাহার কর্তব্য হইবে দাঁড়াইয়া থাকা, যাবৎ উহা অতিক্রম করিয়া না যায় বা নামাইয়া রাখা না হয়।

৬৮৮। হাদীছ:—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন জানাযা দেখ তখন দাঁড়াইয়া যাও এবং যে ব্যক্তি উহার সঙ্গে চলিবে, উহা নামাইয়া না রাখা পর্য্যন্ত সে বসিবে না।

৬৮৯। হাদীছ:—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি জানাযা আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। উহা দেখিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়া-

ইলেন। আমরা আরজ করিলাম—ইহা ইহুদীর জানাযা, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! তিনি বলিলেন, যখন কোন জানাযা দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে।

৬৯০। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে লায়লা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাহ্‌ল ইবনে হোনাইফ (রাঃ) ও কায়স ইবনে সায়াদ (রাঃ) একদা একস্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল, ইহা একজন (অমোসলেম জিম্মির জানাযা। তাঁহারা উভয়েই বর্ণনা করিলেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল—ইহা একজন ইহুদীর জানাযা; তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, প্রাণী নয় কি?

ব্যাখ্যাঃ—কোন অমোসলমানের জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার হেতু কি তাহার প্রতিই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইহুদী হইলেও সে একটি প্রাণী ছিল এবং প্রাণী মাত্রের মৃত্যুই একটি ভয়-ভীতির বিষয়। অতএব উহা দেখিয়া অটলভাবে ধীরস্থির হইয়া থাকা পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বরং যে কোন প্রাণীর মৃত্যু দেখিয়া স্বীয় মৃত্যুকে স্মরণ করতঃ শিহরিয়া উঠা উচিত। যেমন মোসলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে—ان الموت فزع মৃত্যু একটি ভয়জনক এবং শিহরিয়া উঠার বস্তু।

● মোসলেম শরীফে আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার আদেশ মনছুখ—রহিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নবী (দঃ) বসিয়া থাকিতেন দাঁড়াইতেন না। সেমতে অধিকাংশ ইমামগণের মত, মোসলমানের জানাযা দেখিয়াও দাঁড়াইবে না।

জানাযার সহযাত্রীরা বাহকদের স্কন্ধ হইতে জানাযা নামাইবার পূর্বে বসিবে না; কেহ বসিলে দাঁড়াইতে বলিবে

৬৯১। হাদীছঃ—সায়ীদ মাক্‌বুরীর পিতা কাইসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একটি জানাযার সহযাত্রী ছিলাম। আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং (মদীনার শাসনকর্তা) মারওয়ান একত্রে হাত ধরিয়া ঐ সঙ্গে চলিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে জানাযা রাখিবার পূর্বে বসিয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ আবু সায়ীদ (রাঃ) (শাসনকর্তা) মারওয়ানের হাত ধরিয়া বলিলেন, উঠুন—দাঁড়াইয়া পড়ুন এবং আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, কসম খোদার—তিনি জানেন, নবী (দঃ) আমাদিগকে এইরূপ বসা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ)ও বলিলেন, আবু সায়ীদ (রাঃ) সত্যই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ—অধিকাংশ আলেমের মতে জানাযা নামাইয়া রাখার পূর্ব পর্য্যন্ত সহযাত্রীদের দাঁড়াইয়া থাকা মোস্তাহাব; বসিয়া পড়া মকরূহ। কোন কোন আলেম ওয়াজেবও বলিয়াছেন। এই সবই মৃত মোমেন ব্যক্তির সম্মানার্থে। মোমেন মোসলমান মৃত্যুর পরও সম্মান পাইবার অধিকারী। (ফতহুল বারী, ৩—১৩৯)

জানাযা লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিবে

৬৯২। হাদীছ :— عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ

فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জানাযা লইয়া দ্রুত চলিবে। কারণ, মৃত ব্যক্তি যদি নেক্‌কার হয় তবে তাহার জন্য নেয়ামত সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে; যথাসত্বর তাহাকে উহার জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। আর যদি সে বদকার হয় তবে ইহা একটি অতি জঘন্য বস্তু; যথাসত্বর উহাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে অপসারিত করিয়া দিতে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মছআলাহ :—শুধু পুরুষই শব বহন করিবে; নারীরা করিবে না। (১৭৫ পৃঃ)

মছআলাহ :—জানাযা লইয়া চলার সময় উহার সঙ্গীগণ জানাযার পিছনে চলিবে ইহাই অধিক উত্তম। অবশ্য (দ্রুত চলার কর্তব্যে ব্যাঘাত ঘটিলে) কিছু সংখ্যক লোক সম্মুখেও চলিলে উহাতে দোষ হইবে না। (শামী; ১—৮৩৪)

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে জানাযার সঙ্গীগণ। তোমরা জানাযার বিদায়-সম্মান প্রদর্শনকারী। (প্রয়োজনে) তোমরা উহার সামনে পিছে, ডানে-বামে চলিতে পার।

অন্য এক জন ছাহাবী বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গীগণ জানাযার কাছাকাছি চলিবে; এরূপ দুরে দুরে চলিবে না যে, উহার সঙ্গী বলিয়া মনে না হয়। (১৭৫ পৃঃ)

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযাকে তোমার সম্মুখে রাখ, তোমার দৃষ্টি উহার প্রতি নিবদ্ধ কর; উহা তোমার জন্য উপদেশ ও আখেরাতের স্মারক এবং তোমাকে শিক্ষা দানকারী।

মৃত ব্যক্তি কি বলিয়া থাকে ?

৬৯৩। হাদীছ :— ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا

الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ - فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِى وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ

صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا

الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ -

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, যখন মৃতদেহ শবাধারে রাখিয়া অন্যান্য পুরুষগণ উহাকে কাঁধের উপর বহন করিয়া চলিতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি যদি নেক্‌কার হয় তবে বলিতে থাকে—আমাকে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর কর। আর যদি সে বদকার হয় তবে সে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বিকট চীৎকারের সহিত বলিতে থাকে, ইহারা এই নরাধমকে কোথায় লইয়া যাইতেছে ?

তাহার এই চীৎকার মানুষ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রাণীই শুনিতে পায়, মানুষ ঐ চীৎকার শুনিলে স্থির থাকিতে সক্ষম হইত না, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইত।

জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

● সাধারণ নামাযে মোক্তাদীগণ যেরূপ সুবিন্যস্ত ও সোজা কাতার বাঁধে জানাযার নামাযেও তদ্রূপ কাতার বাঁধিবে; এলোমেলোভাবে দাঁড়াইবে না। উপস্থিত লোকদের দ্বারা তিনটি বা তদূর্দ্ধে বেজোড় সংখ্যায় কাতার বাঁধিবে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছে বর্ণিত আছে, তিন কাতার লোক যাহার জানাযার নামায পড়ে, সেই নামাযীদের দোয়া তাহার জন্য অবশ্যই কবুল হয় এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া যায় (ফতহুলবারী ৩—১৪৫)।

● নাবালেগ ছেলেরাও জানাযার নামাযের জমাতে শামিল হইয়া নামায পড়িবে (১৭৭ পৃঃ)। ছেলেরা সকলের সঙ্গেই কাতারে দাঁড়াইতে পারে (১৭৬ পৃঃ)।

● জানাযার নামাযে রুকু-সেজদা নাই, কিন্তু ইহা নামাযই বটে; (নামাযের বিশেষ বিশেষ সাধারণ বিধান ইহাতেও প্রযোজ্য। যথা—কথা বলা নিষিদ্ধ, তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং সালাম ফিরিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে। অজু ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না, সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময় পড়া যাইবে না, তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে (প্রথম তকবীরে ত অবশ্যই উঠাইবে; অপর তিন তকবীরে ইচ্ছাধীন)।

● পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ইমামকেই জানাযার নামাযে ইমামতী করা উত্তম। জানাযার নামায এবং ঈদের নামায ঐ নামায যাহার জমাত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং যদি আশঙ্কা হয় যে, অজুতে লিপ্ত হইলে জানাযার বা ঈদের নামাযের জমাত শেষ হইয়া যাইবে এমতাবস্থায় পানি থাকা সত্ত্বেও দ্রুততার জন্য তায়াম্মুম করিয়া জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য সম্পূর্ণ জমাত ছুটিবার আশঙ্কায় তাহা করা জায়েয; অজু করিয়া কিছু অংশও পাওয়ার আশা থাকিলে অজু করিয়া শামিল হইবে। (শামী ১—২২৩)

● জানাযার নামাযের জমাত কিছু অংশ হইয়া যাওয়ার পর কেহ শামিল হইতে চাহিলে ইমামের তকবীরের অপেক্ষা করিবে; ইমাম যে কোন তকবীর বলার সঙ্গে এই ব্যক্তি তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে এবং ইমামের ইহা কোন তকবীর তাহা জ্ঞাত থাকিলে সে অনুপাতেই

দোয়া-দরুদ পড়িবে। আর তাহা জ্ঞাত না থাকিলে তাহার তকবীরকে প্রথম গণ্য করিয়া ছানা তারপর দরুদ তারপর দোয়া পড়িবে। ইমামের সালামান্তে সে তাহার বাকী তকবীর আদায় করিবে। আর যদি ইমামের চার তকবীর শেষ করার পর সালামের পূর্বক্ষণে উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তকবীর বলিয়া শামিল হইবে এবং ইমামের সালামান্তে তিন তকবীর বলিয়া সালাম করিবে (শামী—৮৩০, ৮৩১)। ইমামের সালামান্তে যে তকবীর আদায় করিবে উহাতে দোয়া-দরুদ পড়িবে যদি শবদেহ উঠাইয়া নেওয়ার আশঙ্কা না হয়; সেই আশঙ্কা হইলে শুধু তকবীর পূর্ণ করিবে (শামী, ১—৮১৪)।

ইবনুল-মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, রাত্রে-দিনে ছফরে ও বাড়ীতে সর্বাবস্থায়ই জানাযার নামাযের চার তকবীর। ● জানাযার নামায ঈদগাহে জায়েয আছে এবং মসজিদেও জায়েয (১৭৭ পৃঃ ৬৫৫ হাদীছ)। অবশ্য হানফী মজহাব মতে কোন রকম ওজর ব্যতিরেকে মসজিদে জানাযার নামায মকরূহ—অনেকে মকরূহ তানযীহ বলিয়াছেন। বৃষ্টিকে ওজর বলা হইয়াছে এবং জানাযার জন্য ভিন্ন জায়গা না থাকা বা সহজ সাধ্য না হওয়াকেও ওজর সাব্যস্ত করা হইয়াছে। চলাচলের সড়ক বা রাস্তা জানাযার নামাযের জায়গা গণ্য হইবে না—যেহেতু উহা পাক-পবিত্র হওয়ার নিশ্চয়তা নাই, বরং নাপাক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; এমতাবস্থায় উহাতে জানাযার নামায শুদ্ধও নহে। শবদেহ মসজিদের বাহিরে রাখিয়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া হইলে হানফী মজহাব মতেও অনেকে মকরূহ নয় বলিয়াছেন।
(শামী ১—৮২৭×৮২৯)

● হোমায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আনাছ (রাঃ) আমাদিগকে নিয়া জানাযার নামায পড়িলেন; তিনি ভুলবশতঃ তিন তকবীর বলিয়াই সালাম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্ঞাত করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কেবলামুখী অবস্থায়ই চতুর্থ তকবীর বলিলেন, তারপর পুনঃ সালাম ফিরিলেন। (১৭৬ পৃঃ) ● শবদেহ দাফন হওয়ার পর কবরের নিকটবর্তী জানাযার নামায আদায় করা যায়; যদি নামায ছাড়া দাফন করা হইয়া থাকে। আর যদি জানাযার নামায হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মৃতের অলী তথা গার্জিয়ান শামিল ছিল না তবে গার্জিয়ান ইচ্ছা করিলে কবরের নিকট পুনঃ জানাযার নামায পড়িতে পারে। নবী (দঃ) প্রত্যেক মোসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ গার্জিয়ান, তাই তিনি ক্ষেত্র বিশেষে ঐরূপ করিয়াছেন যেমন ৬৫৬নং হাদীছে এবং ৩০০নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের নিকটবর্তী নিয়মিত জানাযার নামায আদায় করার জন্য শর্ত এই যে, শবদেহ ফাটিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই এরূপ অবস্থায় হইতে হইবে। দেহ পঁচিয়া-গলিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে নিয়মিত জানাযার নামায হইতে পারে না।

দাফনকার্য্যে যোগদানের ছওয়াব

এই বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা ৪৩নং হাদীছে হইয়াছে। ● যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযার নামাযে শামিল হইলে তোমার কর্তব্য আদায় হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলমান মৃতের জানাযার নামায এবং তাহার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ফরজে-কেফায়াহ—কিছু লোক আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় হইয়া যায়। কিন্তু জানাযা আসিলে উপস্থিত লোকদের উপর মৃত মোসলমান ভাইয়ের প্রাপ্য হক তাহার জানাযার নামাযে শামিল হওয়া। নামাযে শামিল হইলে সেই বিশেষ হক আদায় হইয়া হায়। দাফনের জন্য জানাযার সঙ্গে যাওয়াও একটি হক বটে যাহার বয়ান ৬৫১ ও ৩৫২নং হাদীছে হইয়াছে, কিন্তু এই হক নামাযে শামিল হওয়া অপেক্ষা হাল্কা। অবশ্য উহাতেও অনেক ছওয়াব রহিয়াছে যাহার বয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৪৩নং হাদীছে রহিয়াছে।

● হোমায়দ ইবনে হেলাল (রঃ) বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। অবশ্য শুধু নামায আদায় করিয়া চলিয়া গেলে সঙ্গে যাইয়া দাফন সম্পন্ন করা অপেক্ষা অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে।

জানাযার নামাযে ইমামের দাঁড়াইবার স্থান

৬৯৪। **হাদীছ ঃ**—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে একটি মহিলার জানাযার নামায পড়িয়াছি। সন্তান প্রসব সংক্রান্তে মহিলাটির মৃত্যু হইয়াছিল। নবী (দঃ) মহিলাটির মধ্য বরাবরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযার নামাযে ইমাম মৃতের বক্ষ্য বরাবর দাঁড়াইবেন।

জানাযার নামাযে আলহামদু ছুরা পড়া

৬৯৫। **হাদীছ ঃ**—তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে জানাযার নামায পড়িলাম। তিনি উহাতে ছুরা-ফাতেহা পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের জানা উচিৎ, ইহা সুন্নতই বটে।

ব্যাখ্যা ঃ—জানাযার নামাযে প্রথম তকবীর বলিয়াই "ছানা" তথা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার দোয়া পড়া সুন্নত। ছুরা ফাতেহার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া প্রশংসার বর্ণনা রহিয়াছে, তাই উহাও অতি উত্তম "ছানা"। অতএব উহা পাঠে ছানা পড়ার সুন্নত অবশ্যই আদায় হইবে।

মছআলাহ ঃ—জানাযার নামাযের প্রথম তকবীরের পর "ছানা" পড়িতে হয়। ছানা অর্থ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা। ছুরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সুদীর্ঘ প্রশংসা রহিয়াছে, অতএব প্রথম তকবীরের পর ছানারূপে ছুরা ফাতেহা পাঠ করিলে দোষ নাই।

● হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, শিশুর জানাযার নামাযেও ছুরা ফাতেহা (বা ছানা) পড়িবে এবং (তৃতীয় তকবীরের পর) এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّاَجْرًا۔

কবরকে সম্মুখে রাখিয়া বা কবরের উপর নামায পড়া, কিম্বা কোন কবরকে কেন্দ্র করিয়া উহার প্রতি তা'যীম ও শ্রদ্ধা উদ্দেশ্যে উহাকে নামায স্থান করিয়া নেওয়া বা উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা

এই মছআলার বিষয়ে বোখারী (রঃ) নামায অধ্যায়ে ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ২৭৭, ২৭৮ ও ২৭৯ নম্বরে তিনটি হাদীছ অনুদিত হইয়াছে। বক্ষমান অধ্যায়েও ইমাম বোখারী (রঃ) ১৭৭ এবং ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টিকে এস্থলে একটি পরিচ্ছেদরূপে দেওয়া হইল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছ ছাড়াও এই বিষয়ে এস্থানে উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছও লক্ষণীয়।

৬৯৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছেন, ইহুদ-নাছারাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকে সেজদার স্থান বানাইবার আশঙ্কা না থাকিলে উহা উন্মুক্ত রাখা হইত। আশঙ্কা হয়, উহাকে সেজদার স্থান করা হইবে। (লোকেরা উহাকে সেজদা করিবে, তাই উহাকে আবদ্ধ রাখা হয়।) (১৭৭ পৃঃ)

পবিত্র ও বরকতের স্থানে সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করা

৬৯৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,) মূসা আলাইহেচ্ছালামের প্রতি মউতের ফেরেশতা আযরাঈল (আঃ) প্রেরিত হইলে মূসা (আঃ) তাঁহাকে এমনি এক চপেটাঘাত করিলেন যাহাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। আযরাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বন্দার প্রতি পাঠাইয়াছিলেন যিনি মৃত্যুবরণ করিকে ইচ্ছুক নহেন। আল্লাহ তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিয়া পুনরায় যাইবার আদেশ করিলেন এবং মূসা (আঃ)কে এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন যে, আপনি একটি বলদের পৃষ্ঠে হাত রাখুন, আপনার হাতের নীচে যতগুলি লোম ঢাকা পড়িবে ঠিক তত বৎসরের বয়স আপনাকে প্রদান করা হইবে।

আযরাঈল ফেরেশতা তাহাই করিলেন। মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রব্ব! তত বৎসর বয়সের পর কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। তখন মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, অবশেষে মৃত্যু যখন অনিবার্য্যই তাহা হইলে এখনই মৃত্যু সংঘটিত হউক। মূসা (আঃ) তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে বাইতুল-মোকাদ্দাসের অতি নিকটবর্তী করিয়া দিন।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ)-এর উক্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহার সমাধি বাইতুল-মোকাদ্দাসের নিকটেই।) আমি তথায় থাকিলে তোমাদিগকে তাঁহার সমাধিস্থলটি দেখাইতে পারিতাম; রাস্তার এক পার্শ্বে লাল বর্ণ একটি টিলার নিকটে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা ঃ—নবীগণের মর্তবা অতিশয় উচ্চ ও অতি উর্দ্ধে, এমনকি বড় বড় ফেরেশতাগণও তাঁহাদের খাদেম স্বরূপ। বিশেষতঃ হযরত মুসা (আঃ) জালালী তবীয়তের অতি বিশিষ্ট নবী ও রসুল ছিলেন। বিশেষ কোন কারণেই তিনি আযরাঈল ফেরেশতার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আযরাঈল ফেরেশতা তাঁহার ঐ ব্যবহারে ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, প্রকৃত কথা তাহা নহে। সুতরাং এই বিষয়টিকে প্রকাশিত করিবার জন্যই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় আযরাঈলকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং এত অসংখ্য বৎসর বয়সের সুযোগ দান করা সত্ত্বেও মুসা (আঃ) উহাকে তুচ্ছ মনে করতঃ নিজেই উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন এবং স্বেচ্ছায় তখনই মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মুসা (আঃ) আযরাঈলের সহিত কেন ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে কৈফিয়ত আল্লাহ তায়ালাই যখন তলব করেন নাই তখন সে বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া অনধিকার চর্চা বই নহে।

শহীদের জন্য জানাযার নামায

৬৯৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কাফনের কাপড়ের অভাবে) ওহোদ জেহাদের শহীদগণের দুই দুইজনকে এক কবরে চাদরের নীচে দাফন করিয়াছিলেন। দুইজনের মধ্যে যাহার কোরআন শরীফ অধিক কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইত তাঁহাকে প্রথমে কবরে রাখিতেন। এইরূপে সকলের দাফন সমাপ্ত করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কেয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে রক্তাক্ত শরীরেই দাফন করার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে গোছল দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হয় নাই।*
জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ও চাচাকে এক সঙ্গে একটি চাদরের নীচে দাফন করা হইয়াছিল, উভয়েই ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতার সঙ্গে এক কবরে যিনি দাফন হইয়াছিলেন তিনি বস্তুতঃ তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন না, বরং তাঁহার পিতার বিশেষ বন্ধু ও ভগ্নিপতি ছিলেন। এখানে জাবের (রাঃ) মুরব্বি হিসাবে তাঁহাকে চাচা বলিয়াচেন, তাহার নাম আমর ইবনুল জামুহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মছআলাহ ঃ—প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন কবর না করিয়া প্রশস্ত এক কবরে একাধিক শবদেহ রাখা যায়, তখন কোরআনের এল্‌ম যাঁহার বেশী তাঁহাকে প্রথমে রাখা হইবে।

---

* হানফী মজহাব মতে শহীদের উপর জানাযার নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে; এ সম্পর্কে হাদীছে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমাণ আছে। আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জানাযার নামায পড়া হইয়াছিল না। রণাঙ্গণে মৃতের সংখ্যা বেশী থাকায় দশ দশজনের নামায এক সঙ্গে পড়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

৬৯৯। **হাদীছ**ঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ইহকাল ত্যাগের নিকটবর্তী সময়ে) একদা ওহোদের শহীদানগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং জানাযার নামাযের ন্যায় তাঁহাদের কবরের নিকটবর্তী নামায পড়িলেন (শহীদের মৃতদেহ অবিকৃতই থাকে।)* অতঃপর মসজিদে আসিয়া মিম্বরে উপবিষ্ট হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষ হইতে (আখেরাতের পানে) তোমাদের অগ্রদূত স্বরূপ যাইতেছি; আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হইব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, (কেয়ামতের ভীষণ ময়দানে আমার উম্মতকে সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হাওজে-কাওছার বিশেষরূপে দান করিয়াছেন সেই) হাওজে-কাওছারকে বর্তমান অবস্থাতে এখান হইতেই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি আরও বলিলেন, (স্বপ্নযোগে এবং নবীর স্বপ্ন অহী) আল্লার তরফ হইতে বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে। (অর্থাৎ আনতিকালের মধ্যেই বিশ্বের আধিপত্য এই উম্মতের করতলগত হইবে; তাই পুনঃ শপথ করিয়া বলিতেছি,) আমি তোমাদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা করি না যে, তোমরা (অর্থাৎ মোসলেম সমাজ) ইসলাম ত্যাগ করতঃ মোশরেক—পৌত্তলিক হইয়া যাইবে। পরন্তু এই আশঙ্কা আমার ভিতরে অতি প্রবল যে, (দুনিয়ার ধন-সম্পদ তোমাদের উপর বিস্তৃত হইল) তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া উহাতে মত্ত ও লিপ্ত হইতে থাকিবে, (এবং ধন-সম্পদে মত্ত হইয়া আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে, উহাতেই তোমাদের ধ্বংস সাধিত হইবে।)

মছআলাহঃ—শহীদ মৃতকে গোসল দিবে না; রক্তাক্ত দেহে এবং রক্তাক্ত কাপড়েই দাফন করিবে। তাঁহার সম্মানার্থে কিছু নূতন কাপড়ও কাফনে দিবে।

কারণ বশতঃ মৃতদেহকে কবর হইতে বাহির করা

৭০০। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ওহোদের জেহাদের প্রস্তুতি হইল, আমার পিতা (জেহাদ আরম্ভের পূর্বেই) রাত্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার মনে হইতেছে, আমি এই জেহাদের সর্বপ্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইব। তিনি আরও বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র আমার নিকট আর কেহ নাই। অতএব, আমার উপর যে সকল ঋণ আছে সেগুলি তুমি পরিশোধ করিবে+ এবং আমি তোমাকে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি, তুমি তোমার ভগ্নিদের প্রতি ভাল দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

---

* কাহারও মতে হযরত (দঃ) নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদেই ওহোদের শহীদানগণের জন্য শুধু বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন, অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

+ জাবের (রাঃ) স্বীয় পিতার আদেশ ও অছিয়ত পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মোজেযাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

পরদিন জেহাদ আরম্ভ হইলে সত্য সত্যই আমার পিতা প্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইলেন এবং তখনকার উপস্থিত ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাকে অন্য একজন শহীদের সঙ্গে এক কবরে দাফন করা হইল।

(জাবের (রাঃ) বলেন—আমি ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না যে, আমার পিতা এক কবরের মধ্যে অন্যের সঙ্গে থাকুন ; তাই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পর কবর খুঁড়িয়া আমি আমার পিতাকে বাহির করিয়া লইলাম। দীর্ঘ ছয় মাস পর তাঁহার সব বাহির করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার দেহ দাফন করার দিন যেরূপ ছিল তখনও ঠিক তদ্রূপই আছে, কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই ; শুধুমাত্র এক কানের লতির মধ্যে সামান্য একটু দাগের ন্যায় দেখা যায়। অতঃপর আমি তাঁহাকে ভিন্ন একটি কবরে পুনরায় দাফন করিয়া দিলাম।

ব্যাখ্যা :— আল্লার রাস্তায় জেহাদে যাঁহারা শাহাদৎ বরণ করেন তাঁহারা সাধারণ মৃতের ন্যায় নহেন, এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا . بَلْ اَحْيَاءٌ ......

অর্থ—যাঁহারা আল্লার রাস্তায় শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, তোমরা কখনও তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিও না, বরং তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা বিশেষরূপে নেয়ামত ও সামগ্রী উপভোগ করিতেছেন।

আল্লাহ রাস্তায় শহীদগণ যে মৃত নহেন, তাহার একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে, শহীদের দেহ মাটিতে নষ্ট হয় না। যেমন কোনও জীবিত ব্যক্তি মাটির উপর শুইয়া থাকিলে তাহার দেহকে মাটি গ্রাস করিবে না। উক্ত প্রতিক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ নমুনা ছহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত আলোচ্য ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হইল।

জাবের (রাঃ) ছাহাবীর পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁহার বন্ধু সম্পর্কে ইমাম মালেক (রঃ) "মোয়াত্তা" নামক কেতাবে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই শহীদদ্বয়কে দাফন করার দীর্ঘ ছয়চল্লিশ বৎসর পর পার্বত্য বন্যার স্রোত হইতে রক্ষার জন্য (দ্বিতীয় বার) তাঁহাদিগকে কবর হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল ; তখনও তাঁহাদিগকে এইরূপ পাওয়া গিয়াছিল যেন এইমাত্র দাফন করা হইয়াছে।

ঐ বন্ধু সম্পর্কে ঐ কেতাবে আশ্চর্য্যজনক এই ঘটনাও উল্লেখ আছে—"৪৬ বৎসর পরেও দেখা গেল, তিনি যেই আঘাতে শহীদ হইয়াছিলেন ঐ আঘাত স্থানের উপর তাঁহার একখানা হাত স্থাপিত রহিয়াছে। লোকেরা ঐ হাতখানাকে সোজা করিয়া দিল, কিন্তু পুনরায় উহা আঘাত-স্থানের উপর চলিয়া গেল।

নাবালেগ বালক ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহা শুদ্ধ

● নাবালেগ বালক ইসলামকে বুঝিয়া গ্রহণ করিলে তাহার ইসলাম শুদ্ধ হইবে ; সর্বক্ষেত্রে সে মোসলমান গণ্য হইবে। এমতাবস্থায়ই তাহার মৃত হইলে তাহার নিয়মিত

কাফন-দাফন এবং জানাযার নামায পড়া হইবে। এজন্যই যেখানে অমোসলেমদের ইসলাম বুঝাইয়া গ্রহণের আহ্বান জানান হয় সেখানে বুঝমান নাবালেগ বালককেও ইসলামের আহ্বান জানাইতে হইবে।

মাতা-পিতার একজন মোসলমান হইয়াছেন, অপর জন অমোসলেম—তাহাদের নাবালেগ সন্তানরা আইনগত অধিকারে মোসলমান জনের প্রাপ্য সেই নাবালেগ মারা গেলে তাহার প্রতি মোসলমান মৃতের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইসলামের বিধান।

ইমাম ইবনে শেহাব যুহ্‌রী (রঃ) বলিয়াছেন, মোসলমান মাতার অবৈধ গর্ভজাত সন্তানও মোসলমান পরিগণিত; সেই সন্তানও জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে। তদ্রূপ অমোসলেম মাতার গর্ভজাত সন্তান মোসলমান গণ্য হইবে যদি পিতা মোসলান হয় (১৮১ পৃঃ)। কারণ, ইসলমান সর্বক্ষেত্রে উপরস্থ থাকিবে। এমনকি ইমাম যুহ্‌রী ও ইমাম মালেকের মতে কোন মোসলমান পুরুষ অমোসলমান নারীর সহিত জেনা করায় সন্তানের জন্ম হইলে সেই সন্তানও মোসলমান পরিগণিত হইবে (ফতহুল-বারী, ৩—১৭২)।

মোসলমান পরিগণিত শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইলে যদি আত্মার সহিত ভূমিষ্ট হওয়ার কোনও নিদর্শন পরিদৃষ্টে হইয়া থাকে তবে তাহার জানাযার নামায এবং নিয়মতি কাফন-দাফন অবশ্যই করিতে হইবে। আত্মার সহিত ভূমিষ্ট হওয়ার কোনই নিদর্শন অনুভূত না হইয়া থাকিলে তাহার জানাযার নামায পড়া হইবে না (এবং নিয়মতি কাফনের প্রয়োজন নাই; একটি কাপড়ে জড়াইয়া দাফন করা হইবে, চাপামাটি দেওয়া যাইবে না।) (১৮১ পৃঃ)।

৭০১। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এক ইহুদী বালক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিত। সে অন্তিমশয্যায় পতিত হইলে নবী (দঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে বলিলেন; তুমি মোসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার প্রতি তাকাইল, তাহার পিতাও তাহাকে এই পরামর্শই দিল যে হযরতের আদেশ গ্রহণ কর। সে ইসলাম কবুল করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, الحمد لله الذى انقذه من النار "আল্লাহ তায়ালার শোকর ও প্রশংসা তিনি তাহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করিলেন" এই বলিয়া হযরত (দঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় কাফের কলেমা পড়িলে গ্রাহ্য হইবে

৭০২। হাদীছঃ— মোছাইয়্যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আবু তালেবের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্বে হইতেই আবু জহ্‌ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী-উমাইয়া কাফের সরদারদ্বয়ও তাহার নিকটে বসিয়া ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, চাচাজান। আপনি

لا اله الا الله কলেমার স্বীকারোক্তি করুন, তবেই আমি উহা লইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার জন্য দাঁড়াইতে পারিব এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইব। তখন আবু জহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া বলিল, হে আবু তালেব! তুমি কি জীবনের শেষ মুহূর্তে স্বীয় পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করিবে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে পুনঃ পুনঃ দ্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কাফেরদ্বয় বার বার তাহাকে ঐ কথা বলিতে লাগিল। এমনকি আবু তালেবের শেষ বাক্য এই যে, সে আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরেই আছে এবং لا اله الا الله কলেমা বলিতে অস্বীকার করিল। আবু তালেবের এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম—যাবৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিষেধ না করিবেন আমি পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাইব। এই উপলক্ষেই আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ......

অর্থ—নবী এবং মোমেনদের জন্য অনুমতি নাই, তাহারা কাফের-মোশরেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়—তাহার জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার (তথা কাফের অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার) পর (১১ পাঃ ৩ রুঃ)।

মছআলাহঃ—কোন ব্যক্তি সারা জীবন কাফের-মোশরেক থাকিয়া মৃত্যুক্ষণে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ পূর্বক কলেমার (বা উহার মর্মের) স্বীকৃতি জানাইলে সে মোসলমানরূপে জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে।

● ঈমান ও ইসলামহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জন্য জানাযার নামায পড়া পড়া নিষিদ্ধ; ঐরূপ ব্যক্তির জন্য কোন ভাল দোয়া করাও নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বিবৃতি। আয়াতটি উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের উপর ডালা ইত্যাদি গাড়িয়া দেওয়া

বোরায়দা আসলামী (রাঃ) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, তাঁহার কবরে যেন দুইটি ডালা পুঁতিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়টি ১৯৫ নং হাদীছেও প্রমাণিত আছে।

আত্মহত্যাকারীর অবস্থা কি হইবে?

৭০৩। **হাদীছঃ**—ছাবেত ইবনে জাহ্হাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্মী হওয়ার শপথ করিবে (তাহার এত বড় গোনাহ হইবে যেমন সে প্রকৃতই বিধর্মী হইয়া

গিয়াছে।* এবং যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবে সে তাহার এই কর্মের দরুন জাহান্নামের অগ্নিতে শাস্তি ও আজাব ভোগ করিবে।

৭০৪। হাদীছ:— জুন্দুব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির শরীরে ঘা ছিল; যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিল। তাহার এই কার্য্যে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বন্দা (তাহার চেষ্টা ও কার্য্যে) স্বীয় প্রাণ বাহির করায় যেন আমার হইতে অগ্রগামী হইয়াছে; অতএব আমি তাহার জন্য বেহেশতকে হারাম করিয়া দিলাম।

৭০৫। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিবে সে দোযখের মধ্যেও গলায় ফাঁসি দেওয়ার আজাব ও যাতনা ভোগ করিবে এবং যে ব্যক্তি বর্শা (ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, সে দোযখের মধ্যেও বর্শাঘাতের আজাব ও যাতনা ভোগ করিবে।

মৃতের প্রতি সর্বসাধারণের প্রশংসা

৭০৬। হাদীছ:— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الْاَرْضِ -

অর্থ—আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবীগণ একটি জানাযার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করিলেন; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর অন্য আর একটি জানাযার নিকট দিয়া চলার সময় ছাহাবীগণ মৃত ব্যক্তির নিন্দা করিলেন; এই-বারও নবী (দঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথম মৃতের প্রতি তোমরা প্রশংসা করিয়াছ, সে অনুযায়ী তাহার জন্য বেহেশত নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মৃতকে তোমরা খারাব বলিয়াছ, সে অনুযায়ী তাহার জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তোমরা (সর্বসাধারণ নেক্‌কার মোসলমান) দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী স্বরূপ। (অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সাক্ষ্য অনুপাতেই আল্লাহ তায়ালা ফয়ছলা করিয়া থাকেন)।

---

* যেমন—কেহ বলিল, আমি অমুক কাজ করি নাই, যদি করিয়া থাকি তবে আমি ইহুদী বা নাছরানী বা হিন্দু বা কাফের অথচ সে উহা করিয়াছে এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করিতেছে।

৭০৭। **হাদীছ ঃ**—আবুল আসওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদীনা শরীফে আসিলাম, তখন সেখানে এক প্রকার মহামারী দেখা দিয়াছিল। আমি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বসিয়াছিলাম, আমাদের নিকট-পথে একটি জানাযা যাইতেছিল, ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতিও প্রসংশা করা হইল ; ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতি খারাব মন্তব্য করা হইল ; ওমর (রাঃ) এবারও বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! কি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তিনি বলিয়লন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিলাম। নবী (দঃ) বলিয়াছেন--

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ -

অর্থ—যে কোন মোসলমান মৃত ব্যক্তির পক্ষে চারজন লোক তাহার সৎ বা নেক হওয়ার সাক্ষ্য দান করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি তিন জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, তিন জন হইলেও তদ্রূপই হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি দুই জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, দুইজন হইলেও তদ্রূপই হইবে। অতঃপর আমরা একজন সাক্ষীর বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত সাক্ষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা স্বার্থ বিবর্জিত সাধারণ সৎ লোকগণ, এমনকি ঐরূপ দুই চার জনও মৃত ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ও গুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাহার জন্য বেহেশতের ফয়ছালা করিবেন। তাহার দোষ-ত্রুটি থাকিলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহারে সর্বসাধারণ সৎ লোকদের ক্ষতি হয় বা মনে কষ্ট হয় যদ্দরুণ তাহার নাম আসিলেই লোক মুখে তাহার কুৎসা বর্ণিত হয় সে বস্তুতঃই অসৎ সাব্যস্ত ; সে আল্লার প্রিয় হইতে পারে না।

আলোচ্য হাদীছসমূহে একটি বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ রহিয়াছে যে, সৎচরিত্র, সৎস্বভাব, সদ্ব্যবহার ও পরোপকারীতার মূল্য ইসলামে অনেক বেশী। মানবের উচিৎ জীবিতকালে উহার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া, যেন তাহার মৃত্যুর পর মানুষের মুখে স্বতঃস্ফূর্ত তাহার সুকীর্তি ও নেকনামী ফুটিয়া উঠে। এই সুখ্যাতি ও নেকনামীর সাক্ষ্য মানুষের জন্য নাজাতের অছিলাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অছিলা।

কবরের আজাব

বাহ্যিক ও স্থূল যুক্তিবাদী লোকদের স্বভাব এই যে, তাহারা সাধারণ দৃষ্টি ও স্থূল যুক্তির গণ্ডির বাহিরের বিষয়বস্তুর প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে। তাহাদের এই স্বভাব জাগতিক বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে সহনীয় হইত। কিন্তু তাহাদের আস্ফালন সীমার ধার ধারে না বলিয়া তাহারা ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য অ-জড় জগতের নিয়মাবলীকেও ঐ একই স্থূল যুক্তি এবং বাহ্যিক দৃশ্য বস্তুর মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে চায়; ইহা অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কবরের আজাব বা সুখ-শান্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহকেও যুক্তির পূজারীগণ পূর্ণরূপে তাহাদের স্বীয় যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার দাবী জানাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, কবর তথা আলমে-বরযখ (বরযখী-জগৎ) ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি অ-জড় জগৎ—যাহা আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। আখেরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ শুধু "আখেরাত" শব্দটিকে অনুধাবন করা নয়, বরং আল্লার ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছ দ্বারা আখেরাতের যে সব হাল-অবস্থা ও বিষয়াবলী প্রমাণিত হইয়াছে ঐ সবকে পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়াই আখেরাতের উপর ঈমান আনার প্রকৃত অর্থ। কোরআন ও হাদীছ অবশ্য অবশ্যই খাঁটী যুক্তি ও বিজ্ঞানের বরখেলাফ নহে, কিন্তু ইহা ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন ও হাদীছের মধ্যে এমন বহু বিষয়াবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে-সবকে আমাদের মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি আয়ত্বে আনিতে ও জয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, আমরা ইহজগতের প্রাণী, তাই অনিবার্য্যতঃ আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞান কেবলমাত্র ইহজগতের বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে কোরআন ও হাদীছ ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগতের বিষয়াবলীর আলোচনা করে। পরজগৎ তথা আখেরাত আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের উর্দ্ধে ও অজেয়। সেই জগৎ সম্পর্কে হাল্‌কা যুক্তি ও বিজ্ঞানের নিস্ফল হাতড়ানি নিছক অবান্তর।

আখেরাতের বিষয়াবলীর সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছের সহিত। তাই বোখারী (রঃ) "কবরের আজাব"কে প্রমাণিত করার জন্য প্রথমতঃ কোরআনের কতিপয় আয়াত, তারপর কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে ভূমিকা স্বরূপ তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ— কবর বলিতে ইসলামী পরিভাষায় "আলমে-বরযখ" বুঝায়, কেবলমাত্র মৃতদেহকে পুঁতিয়া রাখার গর্তই বুঝায় না। "আলমে-বরযখ" ইহজগৎ হইতেও অসংখ্য গুণ প্রশস্ততর একটি আলম বা জগৎ; ইহজগৎ বা হাশরের মধ্যবর্তী সময়ে মানব ইহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। মানবের মৃত্যুর অর্থ এই যে, সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আলমে-বরযখে চলিয়া গিয়াছে। ইহজগতে থাকাকালীন সে যেরূপ জীবিত এবং তাহার সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাহার

উপর সৃষ্টিকর্তার সমুদয় আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফত) কার্য্যকরী হইয়া থাকে; তদ্রূপ আলমে-বরযখবাসীগণও তথাকার জীবনে জীবিত। তথায় তাহাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফৎ) কার্য্যকরী হইতে থাকে।†

দ্বিতীয়তঃ—মানুষ তিনটি বস্তুর সমষ্টি, (১) জিছমে-ওনছুরী বা ভৌতিক-দেহ যাহা চারি পদার্থে গঠিত, (২) জিছমে-মিছালী বা মধ্যবর্তী দেহ, (৩) রূহ বা আত্মা। রূহ বা আত্মা পদার্থীয় দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুদরতী বস্তু। পদার্থীয় দেহের সহিত উহার সম্পর্কের জন্য জিছমে-মিছালী রহিয়াছে, যেরূপ মানব দেহের হাড্ডি অতিশয় শক্ত এবং মাংস অতি কোমল; উভয়ের সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার জন্য মধ্যস্থলে মাংসপেশী অবস্থিত। জিছমে-মিছালী মানব দেহের সমপরিমাণ ও সমাকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক পদার্থীয় নহে বলিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় না। মানবের মৃত্যু হইলে তাহার পদার্থীয় দেহ হইতে রূহ ও জিছমে-মিছালীর প্রধান সম্পর্ক তথা দেহকে সক্রিয় ও সজীব রাখার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং আত্মা ও জিছমে-মিছালী আলমে-বরযখে স্থানান্তরিত হয়। পদার্থীয় দেহটি পঁচিয়া-গলিয়া বা ভস্ম হইয়া বা কোনও জন্তুর পেটে হজম হইয়া মল আকারে বাহির হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া, অণু-পরমাণু ও কণায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ রাখিবেন যে, উহার মৌলিক অস্তিত্ব কখনও কোন অবস্থাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—মানুষ ইহজগতে থাকাকালীন সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বা আরাম ইত্যাদি হাল-অবস্থা তাহার পদার্থীয় দেহের উপর প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়, আর ইহার সহিত

---

† এখানে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা মোটেই কোন জটিলতার সৃষ্টি করিবে না যে, আলমে-বরযখ নামক জগৎটি কোথায় অবস্থিত এবং উহার ভৌগলিক বিবরণ কি?

ইসলামের মূল—কোরআন-হাদীছের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর সম্মুখে এরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, বেহেশত-দোযখ যাহা এই ইহজগৎ হইতে কোটি কোটি গুণ বড়, কোরআন-হাদীছের স্পষ্টতর প্রমাণাদি দৃষ্টে পূর্ব হইতেই সৃষ্ট। আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের হাতড়ানি সেই বেহেশত-দোযখের ভৌগলিক সমস্যার কি সমাধান করিতে পারিয়াছে? এসব ত ইহজগৎ হইতে পৃথক পরজগতের কথা; কিন্তু কোরআন-হাদীছে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ যাহাদের সংখ্যা সমুদয় মানব জাতির সংখ্যা হইতে প্রায় হাজার গুণ উর্দ্ধে তাহাদের বাসস্থান এবং কোরআন শরীফে বর্ণিত জুল-কারনাঈন বাদশাহ কর্তৃক তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করার লৌহ ও তাম্র নির্মিত প্রাচীর ইত্যাদি সবই ইহজাগতিক স্থান ও বস্তু; কিন্তু ভৌগলিক-জ্ঞান ঐ সবকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে কি?

আর কোরআন-হাদীছে অবিশ্বাসীরা বলুন—১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভূগোল-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকার ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের খোঁজ রাখিত কি? ইতিপূর্বে (Antartica) আন্টার্কটিকার ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের বিষয় তাহারা কি জানিত? চন্দ্রে বিশাল জগতের খোঁজ করা হইতেছে, পূর্বে এই চিন্তা ছিল কি? এতদ্দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, যেই মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন এত ক্ষুদ্র; সেই মানব সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণী কোরআন ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি রসূলের হাদীছে বর্ণিত স্থান, বস্তু ও বিষয়সমূহকে কোন যুক্তি বলেই অস্বীকার করিতে পারে না।

সম্পর্কের দরুন রূহ এবং জিছমে-মিছালীও শাস্তি প্রাপ্ত বা ব্যথিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর আলমে-বরযখের অবস্থা ইহার বিপরীত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ এমনকি উঠা-বসা ইত্যাদি হাল-অবস্থা বস্তুতঃ রূহ ও জিছমে-মিছালীর উপরই প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। অবশ্য পদার্থীয় দেহের অণু-পরমাণু ও কণারাশি যেখানে যতটুকু যে অবস্থায়ই থাকে ঐগুলির সঙ্গে আত্মার ও জিছমে-মিছালীর প্রধানতম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরও এমন একটি সূক্ষ্মতম সম্পর্ক বজায় থাকে যদ্দারা রূহ ও জিছমে-মিছালীর সুখ-দুঃখের অনুভূতিসমূহ পদার্থীয় দেহের অংশরাশি পর্যন্তও সংক্রমিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। ❁

❁ আলমে-বরযখের সমুদয় অবস্থা সরাসরিভাবে শুধু রূহ ও জিছমে-মিছালীর উপরে প্রবর্তিত হওয়া—ইহা ছুফিয়া তথা তাছাওফবাদীদেরও সিদ্ধান্ত (ফয়জুলবারী ২—৪৯২)।

মানুষের এই ভৌতিক দেহ ছাড়াও তাহার অপর একটি দেহ আছে—এই তথ্য মোসলেম দার্শনিক সাধক মনীষীদেরই আবিষ্কার; এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কারের যোগ্যতা অন্য কাহারও হইতে পারে না। কারণ, আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্য যেরূপ চর্ম-চোখের আওতা বহির্ভূত তদ্রূপ সৃষ্টিকর্তার সহিত আত্মার গভীর যোগ-সূত্র ব্যতীরেকে উহা জ্ঞান-চোখের পক্ষেও অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়। দার্শনিক সাধক মহামনীষী মাওলানা রুমী (রঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই জিনিষটিই ভিক্ষা চাহিতেন—

قطرهٔ دانش که بخشیدی زپیش × متصل گردان بدریا هائے خویش

"প্রভু হে। যে জ্ঞানবিন্দু তুমি আমাকে সৃষ্টিগতভাবে বা বাহ্যিক শিক্ষা চর্চায় দান করিয়াছ উহাকে তুমি তোমার অকূল সমুদ্রের সহিত যোগ করিয়া দাও।"

সৃষ্টিকর্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের সহিত যোগসূত্র-কেন্দ্রের প্রবেশ-পথ হইল একমাত্র ইসলাম; সেই পথ অবলম্বনে বিরামহীন সাধনা-ভজনা ও আল্লাহ-ধ্যানের অতল-ধ্যানের অতল সমুদ্রে লুপ্ত থাকার মাধ্যমে লাভ হয় সৃষ্টিকর্তার সহিত যোগসূত্র। এইরূপ যোগসূত্র সৃষ্টিকারী অসংখ্য মহামনীষীর আবির্ভাব মোসলেমদের মধ্যে হইয়াছিল। যেমন—ইবনে আরবী, শা'রাণী, জিলানী, জোনায়েদ, শিবলী, রুমী, গাজালী (রহমতুল্লাহে আলাইহিম)। তাঁহারা উক্ত যোগসূত্র লাভে কিরূপ ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন উহার প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থরাজী জ্ঞানসিন্ধুসমূহের মধ্যেই প্রস্ফুটিত; শুধু মুখের দাবী নহে। ঐ শ্রেণীর মনীষীবৃন্দই উক্ত যোগসূত্রে আহরিত জ্ঞান ও আলোর সাহায্যে "তাছাওফ বা ছুফিবাদ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য আধ্যাত্মিক তথ্যাবলীর খোঁজ দিয়াছিলেন। দার্শনিক মহাসাধক বিশিষ্ট মনীষী শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ) ঐ শ্রেণীর বহু তথ্যাবলীর উদ্ঘাটনে "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ" নামক এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; যাহা ইংরাজী সহ বহু ভাষায় অনুদিত হইয়া বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

মোসলমান মনীষীগণের আবিষ্কৃত ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ)এর গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ" ইংরাজী অনুবাদ হইল। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান আহরণ-প্রিয় শ্বেতাঙ্গ জাতির অনেক লোক আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী (Study) অধ্যয়ন করিল এবং উক্ত গ্রন্থাবলীর একটি নগণ্য অংশ আহরণ করিল। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আলমে-বরযখে ঐ অবস্থায়ই কাল অতিক্রম হইবে। অতঃপর মানবের পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত সময়টি উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ইস্রাফীল (আঃ) ফেরেশতা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। তখন প্রত্যেকটি মানব-দেহের সমুদয় কণারাশি মুহূর্তের মধ্যে একত্রিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতী বৃষ্টিপাতের দ্বারা প্রত্যেক দেহের সঙ্গে উহার রূহ ও জিছমে মিছালীর পূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহজগতের ন্যায় মানুষের মধ্যে যে তিনটি বস্তুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বস্তুত্রয় একত্রিতরূপে পুনর্জীবিত হইয়া পূর্ণ জীবন্ত অবস্থায় মানুষ হাশর-ময়দানের দিকে ধাবিত হইবে।

ছুফীবাদীর গ্রন্থাবলীর মূল বিষয় হইল—আত্মাকে মার্জিত ও উন্নত করার এবং আল্লাহ পানে উহাকে দ্রুতগামী করার উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন করা। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্তার সহিত যোগসূত্রলব্ধ জ্ঞানে আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্যাবলী উক্ত গ্রন্থাবলীতে আছে। ইংরেজরা প্রথম বিষয় তথা মূল বিষয়টি বাদ দিয়া শুধু দ্বিতীয় তথা নগণ্য বিষয়টিকে আহরণ করে। উহা হইতেই কিছু দিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশে "থিওসফী" নামক নূতন এক অধ্যাত্মবিদ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে। সেই পাশ্চাত্যবিদ্যাবাগীশদের আলোচনায়ও আমাদের উল্লেখিত "জিছমে-মিছালী" তথ্যটি স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে "মোস্তফা চরিত", ২—১০০ হইতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

থিওসফীর মতে মানুষের এই জড়দেহই (Physicani body) একমাত্র দেহ নয়, স্থূল দেহ ছাড়া তাহার জ্যোতির্দেহ (Astral body) রহিয়াছে।......এই অ-জড় দেহকে "Etheric double" (ইথারিক ডবল) বলা হয়। স্থূল দেহের সঙ্গে ইথারিক দেহ মিশিয়া থাকে। স্থূল দেহ জড় জগতের উপাদান দ্বারা গঠিত (—যেমন, মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস)। আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতি বা ইথার দ্বারা। সার্ট, কোট যেমন আমাদের দেহের পোশাক, দেহগুলি তেমনই আমাদের আত্মার পোশাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোশাক ছাড়িয়া পাতলা পোশাক পরি; আত্মাও তেমন জড়দেহ ছাড়িয়া শুধু ইথারিক দেহ ধারণ করিতে পারে।

মানুষের আত্মিক শক্তি প্রবল হইলে সে সহজেই দেহগুলিকে বশ করিয়া লইতে পারে। জড়দেহের অক্ষুন্নতা বজায় রাখিয়াও অপর দেহকে উহা হইতে ভিন্ন করিয়া উহা বহনে সে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। এমনকি সে এই সূক্ষ্ম দেহকে অপরের দৃষ্টি গোচরও করিতে পারে। এই জন্যই একই মানুষ একই সময়ে একাধিক স্থানে দেখা যাইতে পারে। এই তথ্য থিওসফীর ভাষাতেই শুনুন—

If any person be observed who is much more developed, say one who is accustomed to function in the astral world and to use the astral body for that purpose, it will be seen that when the physical body goes to sleep and the astral body sleeps out of it, we have the man himself before us in full consciousness; the astral body is clearly outlined and definitely organised, bearing likeness of the man and the man is able to use it as a vehicle a vehicle for more convenient than the physical.

(Man and His Bodies, by Annie Besant, P. 49)

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রথম ও তৃতীয় বিষয়রূপে যাহা বলা হইয়াছে উহা মৃত্যুর পরের সাধারণ অবস্থা। কদাচিৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জগদ্বাসীকে সতর্ক বা উৎসাহিত করার জন্য কবর নামীয় গর্তের মধ্যে এই পদার্থীয় দেহের উপরও শাস্তি বা আজাবের কোন দৃশ্য প্রকাশিত করেন—উহা খর্কে-আদৎ বা অদৃশ্য কুদরতের নিদর্শন মাত্র।

কবরের আজাব এবং কোরআন-হাদীছে বর্ণিত উহার অবস্থাসমূহ দৃষ্টে যে সমস্ত প্রশ্নাবলীর উদয় হয়, উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের প্রতি লক্ষ রাখিলে সে ধরণের বহু প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। যথা—যে সমস্ত মৃতদেহ সমাহিত না হয়; যেমন ময়না তদন্তের জন্য বা মেডিকেল ছাত্রদের প্রাকৃটিসের জন্য রক্ষিত মৃতদেহ এবং যে সমস্ত মৃতদেহের অস্থি-মাংস পর্যন্ত হঠাৎ বিলীন হইয়া যায়; যেমন বম, গোলা-বারুদ ইত্যাদিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হিংস্র জীব-জন্তুর ভক্ষিত ইত্যাদি অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াল-জওাব ইত্যাদি কিরূপে করা হয়?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর সহজ, যে—মৃত্যুর পর ছওয়াল-জওয়াব ইত্যাদির স্থান কবর বলিতে সমাধিস্থল গর্ত উদ্দেশ্য নহে, বরং কবরের অর্থ আলমে-বরযখ বা বরযখী-জগৎ। এবং বরযখী-জগতের সমুদয় বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্কে রূহ—আত্মা ও জিছমে-মিছালীর সঙ্গে। রূহ ও জিছমে-মিছালী যে কোন প্রকার মৃত্যুর দরুণ পদার্থীর দেহ হইতে ছিন্ন

অর্থাৎ—জ্যোতির্দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কার্যক্ষম যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থূল দেহ যখন ঘুমায় এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষেরই হুবহু প্রতিকৃতি হইয়া পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তাহার বাহন স্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থূল দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।

বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন স্থূল দেহেরও তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, স্থূল দেহের সহিত তাহাব যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জ্যোতির্দেহ লইয়া মানুষ যে কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখেও উদয় হইতে পারে।

> A person who has complete mastery over the astral body can, of course, leave the physical at any time and go to a friend at a distence. If the person thus Visited be clairvoyant, i. e. has developed astral sight, he will see his friend's astral body: if not, such a visitor might slightly densify his vehicle by drawing into it from the surrounding atmosphere particles of matter and thus materialise sufficiently to make himself visitable to physical sight. [Ibid : P, 55]

অর্থাৎ--কোন ব্যক্তি যদি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে সে যে কোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী কোন বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির জ্যোতির্দৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা না হয়, তবে আগন্তুক তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জড়প্রকৃতি হইতে কিছু কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমন-ভাবে ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্ম চোখেই চিনিতে পারে।

হইয়া ইহজগৎ ত্যাগ করত: বরযখী-জগতে চলিয়া যায়। রূহ্ ও জিছমে-মিছালী ভক্ষিত বা ভস্ম হয় না এবং পদার্থীয় দেহ হইতে ছিন্ন হওয়ার পর কোন প্রকারেই ইহজগতে রক্ষিত বা আবদ্ধও হয় না, বরং অক্ষত ও অক্ষুন্ন অবস্থায় বরযখী জগতে পৌঁছিয়া সমুদয় বিষয়াবলীর সম্মুখীন হয়।

কবর তথা বরযখী-জগতের অবস্থা ও বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে। তাই উহা ভস্ম, ভক্ষিত ইত্যাদি হওয়ায় কোন সমস্যারই সৃষ্টি হয় না। ঐসব অবস্থা ও বিষয়ের সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে যতটুকু থাকে ততটুকুর জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পদার্থীয় দেহ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই উহা বিলুপ্ত ও অস্তিত্বহীন হয় না, পুনরুত্থান কালে উহার বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রিকরণ হইবে মাত্র।*

এতদ্ভিন্ন মৃত ব্যক্তিকে কবরে ফেরেশতাগণ কর্তৃক উঠানো, বসানো এবং মৃত ব্যক্তির চীৎকার ইত্যাদি হাল-অবস্থার বর্ণনাসমূহও সাধারণ দৃষ্টিতে এক জটিল সমস্যা পরিগণিত। এই সমস্যার সমাধানও এই যে, ঐসব হাল-অবস্থার স্থান ইহজগতের সমাধিস্থল গর্ত নহে, বরং বরযখী-জগৎ এবং ঐ সকলের সম্পর্ক গোচরীভূত পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে, বরং অদৃশ্য আত্মা ও জিছমে মিছালীর সঙ্গে এবং জিছমে-মিছালী মানব সমপরিমাণ ও সমাকৃতি বিশিষ্ট।

এই পরিচ্ছেদে বোখারী (রঃ) কোরআনের ৩টি আয়াত এবং কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যদ্দারা কবরের আজাব অথবা শাস্তি প্রমাণিত হয়। আয়াত ৩টি এই—

(১) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ

أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ......

অর্থ:—বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইবে যখন পাপীগণ মৃত্যু যাতনার ভীষণ চাপে পতিত হইবে এবং সে অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাহাদের চেহারা ও গর্দানের উপর প্রহার করত: তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন যে তোমরা রেহাই পাইবে না;

---

* মানবীয় জড়দেহ যতই সূক্ষ্মতর অণু-কণা হইয়া যত দূর-দুরান্তের ব্যবধানেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হউক না কেন—এক এক দেহের সমুদয় অণু-কণাকে মুহূর্ত অপেক্ষা দ্রুত একত্রিত করা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের সম্মুখে সহজ হইতেও সহজতর। আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার ন্যায় বুঝানের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান পর্ব অনুষ্ঠানের বহু পূর্বেই ঐ কুদরতের নমুনা আল্লাহ তায়ালা অনুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বীয় রসূল মারফত উহার যুক্তিগত বিবরণ বিশ্ব মানবের জন্য প্রচারও করিয়া দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সেই বাস্তব ঘটনাটি পুন: পুন: উপলব্ধি করা বিশেষ ফলদায়ক। পূর্ণ ঘটনার হাদীছটি সপ্তম খণ্ডে "আল্লার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা" পরিচ্ছেদে ২৪৪৯ নম্বরে অনুদিত আছে।

এখনই তোমাদের আত্মা বাহির করিয়া লওয়া হইবে এবং আজ হইতেই তোমাদিগকে অসহনীয় শাস্তি ও আজাব দান আরম্ভ করা হইবে; যেহেতু তোমরা আল্লার প্রতি মিথ্যারোপ করিতে এবং আল্লার আদেশাবলী হইতে ঘাড় মোড়াইয়া থাকিতে। (৭ পাঃ ১০ রুঃ)

এখানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রহিয়াছে যে পাপীদেরকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি ও আজাব দেওয়া হইবে; অথচ আখেরাত তথা দোযখের আজাব হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পরে হইবে যাহার অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল পরে হইবে।

(২) سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ -

অর্থ:—মোনাফেকদিগকে অচিরেই দুইবার আজাব প্রদান করিব; তৎপর তাহাদিগকে এক মস্ত বড় ভীষণ আজাবে পতিত করা হইবে। (১১ পাঃ ১২ রুঃ)

ব্যাখ্যা:—প্রথম আজাব হইল, মোনাফেকদিগকে ইহজগতে আপমান-অপদস্থ করা। আল্লাহ তায়ালা কিছুদিন পর্য্যন্ত মোনাফেকদের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন, প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম্য সীমা অতিক্রম করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধিমুলক অপকর্মসমূহকে অহীর মারফৎ প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত এবং অনেককে বাহ্যিক শাস্তির সম্মুখীন করিলেন; ইহা প্রথমবারের আজাব। দ্বিতীয়বারের আজাব হইল, মৃত্যুর সংলগ্ন কবর তথা আলমে-বরযখের মধ্যে শাস্তি; এই দুইবারের আজাবকে নিকটবর্ত্তী আজাব বলা হইয়াছে। তৎপর দোযখের আজাব হইবে, উহাকেই ভীষণ আজাব বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা সর্বাধিক ভীষণ ও অসীম হইবে।

(৩) وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ - اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا -
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -

অর্থ:—ফেরাউন ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা (মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই) কঠিন আজাবে বেষ্টিত হইয়া গেল। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে দোযখের নিকটবর্ত্তী করা হইয়া থাকে, (যদ্দ্বারা তাহারা কঠিন আজাব ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের উপর এই শাস্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে) এবং যেদিন কেয়ামত তথা হাশরের হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হইবে সেদিন ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিবেন—ফেরাউন ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে ভীষণ আজাব (তথা দোযখের) মধ্যে নিক্ষেপ কর। (২৪ পাঃ, ৪ রুঃ)

লক্ষ্য করুন। উল্লিখিত প্রত্যেকটি আয়াতেই মৃত্যুর পর এবং হিসাব-নিকাশের দ্বারা দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে একটি আজাব বা শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে; উহাই আলমে-বরযখ তথা কবরের আজাব।

৭০৮। হাদীছ:— عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال*

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا - وَاِنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ - وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ -

অর্থ:—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন,× যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং শব বাহকগণ দাফন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিবার পথে রওয়ানা হয় মাত্র, এমনকি তখনও তাহারা এতটুকু সন্নিকটে যে, তথা হইতে তাহাদের পাদুকার শব্দ কর্ণগোচর হয়; এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির নিকট দুইজন ফেরেশতা+ উপস্থিত হইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং প্রশ্ন করেন—

---

* বোখারী (রঃ) হাদীছখানা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন, অনুবাদে বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফ ও বিভিন্ন কিতাব হইতে বর্দ্ধিত করিয়া বন্ধনীর মধ্যে এবং ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে।

× একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাস্থিত নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করিলেন, (তথায় কতগুলি কবর ছিল।) তিনি সেখানে বিকট শব্দ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কবর কাহাদের? ছাহাবীগণ আরজ করিলেন ইসলাম-পূর্ব অন্ধকার যুগে কতিপয় কাফের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এসব তাহাদের কবর। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা কবরের আজাব এবং দজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা (অর্থাৎ কবরের আজাব) কি? ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। ছাহাবীগণের এই প্রশ্নের উত্তরেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিস্তারিত বিবরণের হাদীছখানা বর্ণনা করিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

\+ ফেরেশতাদ্বয়ের বিকট কাল মূর্তি, চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণ এবং তাঁহাদের বড় বড় দাঁত অতি ভয়ঙ্কর; তাঁহাদের সঙ্গে বিরাট ভারী গুর্জ্জ থাকিবে এবং তাঁহাদের গর্জ্জন বজ্রপাতের ন্যায় অতি বিকট, তাঁহাদের একজনকে মোন্‌কার দ্বিতীয় জনকে নাকীর বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ব্যক্তিগত নাম নহে, শ্রেণীগত আখ্যা।

[(১) مَنْ رَّبُّكَ . مَا كُنْتَ تَعْبُدُ .

"তুমি কাহাকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ও বিধানকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলে, তথা কাহার বন্দেগী করিয়া থাকিতে?" মৃত ব্যক্তি যদি খাঁটী মোমেন হইয়া থাকেন তবে তিনি সঠিক উত্তর দিবেন যে, আমি একমাত্র আল্লাহকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা ও বিধানকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তথা একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিয়াছি।

(২) مَا دِيْنُكَ তুমি কোন্ দ্বীন বা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলে? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, আমি ইসলামকে দ্বীন ও ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম।]

(৩) مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ফেরেশতাদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করিবেন—তুমি তাঁহার প্রতি কি আকিদা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলে?" মোমেন ব্যক্তি উক্তি করিবে—اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ "আমার অকাট্য বিশ্বাস এই ছিল যে, তিনি আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।" [তিনি আমাদের নিকট আল্লার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী লইয়া আসিয়াছিলেন, আমাদিগকে সৎপথে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছিলাম।

(৪) وَمَا يُدْرِيْكَ "তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে যে, তিনি আল্লার রসুল? মোমেন ব্যক্তি উত্তর করিবে, আমি আল্লার কেতাব কোরআন শরীফ পড়িয়াছি, উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, উহার প্রতিটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি ঠিক ঠিকই বলিয়াছ; তুমি খাঁটি বিশ্বাসের উপরই ছিলে, উহার উপরই মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং উহাকে লইয়াই তুমি ইন্‌শা-আল্লাহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছ? সে বলিবে, দুনিয়াতে কাহারও জন্য আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব হয় নাই।]

অতঃপর দোযখের দিকে একটি ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ পথে ইশারায় দেখাইয়া তাহাকে বলা হইবে, ঐ দেখ, দোযখের মধ্যে তোমার জন্য ঐ স্থানটি তৈয়ার করা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি নেক্‌কার হওয়ায় আল্লাহ পাক উহার পরিবর্তে বেহেশতের মধ্যে একটি স্থান তোমাকে দান করিয়াছেন * [সে দোযখের প্রতি তাকাইয়া দেখিবে, উহার অগ্নিশিখাগুলি কিলবিল

---

* হাদীছে বর্ণিত আছে—প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন এবং দোযখের মধ্যেও একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। কেয়ামতের দিন মোসলমানদের দোযখস্থ স্থানগুলি কাফেরদিগকে দেওয়া হইবে এবং উহার বদলে কাফেরদের বেহেশতস্থিত স্থানগুলি মোসলমানদের অধিকারে দিয়া দেওয়া হইবে। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

করিতেছে। অতঃপর তাহাকে তাহার বেহেশতের স্থানটিও দেখান হইবে। তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকিবে না, সে আনন্দে বলিয়া উঠিবে, আমাকে ছাড়িয়া দিন আমার পরিবারবর্গকে এসব বিষয়ের সুসংবাদ দিয়া আসি। তখন তাহাকে বলা হইবে, এ কথা বলিবেন না।

অতঃপর আসমান হইতে তাহার পক্ষে একটি ঘোষণা জারী করা হইবে যে, আমার বন্দা ঠিক ঠিকই উত্তর দান করিয়াছে, তাই তাহার জন্য বর্তমান বাসস্থানের মধ্যে বেহেশত হইতে বিছানা আনিয়া দাও এবং বেহেশতের দিকে দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে বেহেশতের পোষাক পরিধান করাইয়া দাও। তখন তাহার বাসস্থানে বেহেশতের সুবাস ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে] এবং তাহার বাসস্থানকে দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে [এবং পূর্ণিমা রাত্রের ন্যায় আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং সবুজ বাগ-বাগিচা দ্বারা পূর্ণিমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে বলা হইবে, আপনি নূতন দুলার ন্যায় আরামের নিদ্রা উপভোগ করিতে থাকুন—হাশর-ময়দানের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত। সে উপরোক্ত আরাম আয়েশের মধ্যেই (আলমে-বরযখে) জীবন কাটাইতে থাকিবে।]

মোনাফেক-কাফেরকেও প্রশ্ন করা হইবে। [ফেরেশতাদ্বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, (১) তোমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিধানদাতা কে ? —তুমি কাহার এবাদৎ-বন্দেগী করিয়াছ ? সে বলিবে, (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না। (২) তোমার দ্বীন ও ধর্ম কি ? সে বলিবে, (হায় হায়।) আমি কিছু জানি না।] (৩) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করা হইবে যে, তাঁহার প্রতি তোমার কি আকিদা ও উক্তি ছিল ? সে বলিবে (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না, তবে অন্যান্য লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে কোন উক্তি করিতে শুনিয়া আমিও সেই উক্তি করিতাম। তখন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলা হইবে—কোরআন নিজে বুঝও নাই, পড়ও নাই, কিম্বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুসরণও কর নাই।

অতঃপর তাহাকে লোহার গুর্জ দ্বারা ভীষণ আঘাত করা হইবে (ঐ গুর্জ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হইলে, পাহাড় বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়া যাইত আঘাতের চোটে সে এত বড় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিবে যাহা তাহার আশে-পাশের সকলে (বরং দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই) শুনিতে পাওয়ার যোগ্য ; অবশ্য মানুষ ও জিন জাতি তাহা শ্রবণ করে না। [এবং তাহার উপর সর্বদার জন্য একটি জীবকে নিয়োজিত রাখা হইবে, উহার হাতে একটি জ্বলন্ত অঙ্গারের চাবুক থাকিবে, তদ্দারা সে

উক্ত ঘটনার ইঙ্গিতেই কোরআন শরীফে কেয়ামতের দিনকে "ইয়াওমুত্‌তাগাবুন" তথা হার-জিতের দিন বলা হইয়াছে। মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ঐ দিন যে ভাগাভাগি ও বিনিময় অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে মোসলমানদের জিত হইবে যে, দোযখের স্থানের পরিবর্তে বেহেশত লাভ করিবে এবং কাফেরদের হার হইবে যে, বেহেশতের স্থানের পরিবর্তে দোযখের স্থান পাইবে।

তাহাকে অবিরাম আঘাত করিতে থাকিবে। জীবটি বধির হইবে তাই তাহার চীৎকার শ্রবণে কোন প্রকার করুণা প্রদর্শনের সম্ভাবনাই থাকিবে না। এবং বেহেশতের দিকে একটি খিড়কী খুলিয়া তাহাকে দেখান হইবে এবং বলা হইবে, তুমি যদি খাঁটী মোমেন হইতে তবে তুমি এই বেহেশত স্বীয় বাসস্থানরূপে লাভ করিতে, কিন্তু তুমি কাফের হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের পরিবর্তে তোমার স্থান ঐ দোযখে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া দোযখের দিকে জানালা খুলিয়া তাহাকে দোযখ দেখান হইবে। তখন তাহার হায়-আফছুছ—অনুতাপ আক্ষেপ ও নিজের প্রতি ধিক্কারের সীমা থাকিবে না। তাহার বাসস্থানকে অত্যধিক সংকীর্ণ করা হইবে, যাহার চাপে তাহার পাঁজর এক দিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যাইবে। আসমান হইতে আদেশ জারী করা হইবে যে—তাহার জন্য দোযখের বিছানা আনিয়া দাও, তাহাকে দোযখের পোষাক পরাইয়া দাও এবং দোযখের প্রতি তাহার বাসস্থানের দরওয়াজা খুলিয়া দাও, যদ্দারা তাহার প্রতি দোযখের ভীষণ তাপ আসিতে থাকিবে।

৭০৯। **হাদীছ :**—বরা ইবনে আজেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যখন মোমেন ব্যক্তিকে কবরে বসান হয় এবং তথায় ফেরেশতা উপস্থিত হয়, তখন সে (প্রশ্নের উত্তরে) সঠিকরূপে বলিতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহই আমার মা'বুদ এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার রসুল। এই বিষয়টিই এই আয়াতের তাৎপর্য্য—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ—খাঁটী মোমেন ব্যক্তি যেহেতু স্বীয় জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যটিকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, আল্লাহই একমাত্র মাবুদ অন্য কেহই মাবুদ নয় এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল; ইহার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ঐ সত্যের উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করেন অর্থাৎ কলেমা-শাহাদতের উপর তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর-জীবনেও তাহাকে উহার উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ কবরের মধ্যে প্রশ্নাবলীর উত্তরে সে ঐ কলেমা শাহাদতের উক্তিকে ঠিক ঠিকরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়।

ব্যাখ্যা :—পরকালের জীবনে প্রত্যেকের উপর প্রকৃত, খাঁটী ও বাস্তব বিষয় আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। সেখানে কোন প্রকার কৃত্রিমতা বানাউটি জালিয়াতি চলিবে না বা কোন বাস্তব বিষয় লুক্কায়িত থাকিবে না। অতএব যে ব্যক্তি ইহকালীন জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ অন্য কোন মাবুদ নাই, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসুল; সেই ব্যক্তি পরকালীন জীবনে পৌছিবার পথে এবং পর-জীবনে পৌছিয়া সর্বক্ষেত্রে ঐ সত্যই তাহার মুখে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে তাহার কোন বেগ পাইতে হইবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে ইহ-জীবনে নিজের উপর প্রতিফলিত করে নাই সে যতই পটু, যতই বিজ্ঞ ও চতুর হউক না কেন মৃত্যুর পর কখনও ঐ সত্য তাহার মুখে প্রকাশ পাইবে না।

৭৭০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফের সর্দারদের মৃত দেহগুলি নিকটবর্তী একটি গর্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করিয়া আসার পূর্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ গর্তের কিনারায় দাঁড়াইয়া মরা লাশগুলির প্রতি উঁকি দিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের যে সতর্কবাণী ছিল (যে, সত্য ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ না করিলে ইহ-জীবনে তোমাদের ধ্বংস হইতে হইবে এবং পর-জীবনে আজাব ও শাস্তির সীমা থাকিবে না) তাহা কি তোমরা বাস্তবে ঠিক ঠিক পাইয়াছ? আমরা ত আমাদের পরওয়ারদেগারের ওয়াদাকে (যে, তিনি সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন) বাস্তব ঠিক ঠিক পাইয়াছি। ঐ সময় ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিতেছেন? যাহাদের কোন শ্রবণশক্তিই নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, তাহারা তোমাদের ন্যায়ই শ্রবণ করে, কিন্তু তাহাদের উত্তর দিবার শক্তি নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এই হাদীছখানা উল্লেখ করার সঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) উহার ব্যাখ্যা আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, উল্লিখিত ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি তাহাদিগকে পূর্বে অর্থাৎ তাহাদের জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত সতর্কবাণী শুনাইয়া থাকিতাম ঐ সময় তাহারা সে সবের প্রতি কর্ণপাত করিত না, সে সবকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা মনে করিত, কিন্তু এখন তাহারা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, আমার সে সব সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) যে বলিয়াছেন ঐ মরা লাশগুলি শ্রবণ করিয়া থাকে, উহার অর্থ বস্তুতঃ শ্রবণ করা নয়, বরং উপলব্ধি করা।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তি ইহ-জগতের কথাবার্তা শুনিবার শক্তি রাখেনা বলিয়া কোরআন শরীফেই প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—انك لا تسمع الموتى "আপনি মৃতদিগকে কোন কথা শুনাইতে পারিবেন না।"*

---

* মৃত ব্যক্তি ইহজগতের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া থাকে কি না, সে বিষয়ে পূর্ব হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। ছাহাবীগণেরও মতভেদ ছিল। তাই এ বিষয়ে সঠিকরূপে কিছু বলা অসাধ্য; ইহা কোন আবশ্যকীয় বিষয়ও নহে। বোখারী (রঃ) ২৮৮ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া থাকে; প্রমাণে ৭০৮নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে শববাহকদের পাদুকা চালনার শব্দ শুনিবার উল্লেখ আছে;

৭৭১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী বৃদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আজাবে-কবরের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার জন্য দোয়া করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন। এতদশ্রবণে আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আজাবে-কবর বাস্তব বিষয়, উহা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐদিন হইতে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযান্তেই কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি।

৭৭২। **হাদীছ ঃ**—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রকাশ্য সভায় ওয়াজ করিতেছিলেন। কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ও তিনি বর্ণনা করিলেন; উপস্থিত মোসলমানগণ (অভিভূত হইয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! সতর্ক থাকিও, তোমরা নিশ্চয় দজ্জালের দ্বারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার ন্যায় কবরের মধ্যেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।

৭৭৩। **হাদীছ ঃ**—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিকাল বেলা ভ্রমণে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া বলিলেন, এক ইহুদীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। (ইহা উহারই শব্দ)

কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৭৭৪। **হাদীছ ঃ**—সায়ীদ ইবনে আ'ছ (রাঃ)-এর পৌত্রী বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

৭৭৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ

فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

অর্থ :—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুকালে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং অসৎ দজ্জালের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া হইতে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কবরের আজাব হইতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাওয়ার সঙ্গে নিজকে সংযত রাখায়ও সচেষ্ট হইতে হইবে; বিশেষতঃ ঐসব গোনাহ হইতে সতর্ক থাকিবে যে সব গোনাহ কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—প্রস্রাব হইতে পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্ক না থাকা বা চোগলখোরী করা। এই গোনাহদ্বয় বিশেষভাবে কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে (১৫৭নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

মৃত ব্যক্তিকে সকাল-বিকাল তাহার স্থান দেখান হয়

৭১৬। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পর তাহার বাসস্থান প্রতি সকাল-বিকাল দেখান হইয়া থাকে। যদি সে বেহেশতের উপযুক্ত হয়, তবে বেহেশতের বাসস্থান, আর যদি দোযখের যোগ্য হয় তবে দোযখের বাসস্থান। এবং তাহাকে বলা হইয়া থাকে—হিসাব-নিকাশের দিন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ইহাই তোমার বাসস্থান হইবে।

মোসলমানের সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যু হইলে ?

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, এই সন্তানগণ বেহেশতী হইবে। বোখারী (রঃ) ৮২ নং হাদীছ দ্বারা এই মতকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। কারণ, যাহাদের অছিলায় মাতা-পিতাগণ উক্ত হাদীছের বর্ণনা মতে বেহেশত লাভ করিবেন, স্বয়ং তাহারা বেহেশত লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

০ আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যাইবে তাহারা তাহার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হইবে এবং সে বেহেশত লাভ করিবে।

৭১৭। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশুপুত্র ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের মৃত্যু হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছিলেন, তাহার জন্য বেহেশতে একজন দাই নিযুক্ত করা হইবে।

কাফেরদের নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হইলে ?*

৭১৮। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট মোশরেকদের ঔরষজাত নাবালেগ সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইয়াছিলেন—আল্লাহ তাহাদের সৃষ্টি করাকালীন অবগত ছিলেন, তাহারা (বাঁচিয়া থাকিলে) কি প্রকারের আমল করিত। (তাহাদের বিচার উহার ভিত্তিতে হইবে, অতএব আল্লাহই জানেন, তাহাদের পরিণাম কি হইবে।)

৭১৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মোশরেকদের নাবালেগ মৃত সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভালভাবেই জানেন, (বাঁচিয়া থাকিলে) তাহারা কি প্রকার আমল করিত। (অর্থাৎ সেই অনুপাতেই তাহাদের পরিণাম নির্দ্ধারিত হইবে।)

---

* আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং বহু আলেমগণের মত এই যে, এ বিষয়ে কোনও দিক নির্দিষ্ট না করিয়া ইহার শেষ ফয়ছালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন—এই বিশ্বাস অবলম্বন করতঃ সমস্ত আলোচনা হইতে বিরত থাকিবে।

৭২০। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেকটি মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আল্লার তরফ হইতে এমন একটি শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়া থাকে যে, যদি সে কোন আকর্ষণ বা বাধার বেষ্টনে পতিত না হয়, তবে ঐ শক্তিটি তাহাকে হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করিবে। কিন্তু কাহারও ইহুদী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে ইহুদী বানায়, কাহারও নাছরানী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে নাছরানী বানায় এবং কাহারও অগ্নিপূজক মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে অগ্নিপূজকে পরিণত করিয়া থাকে। যেমন, পশুপালের বাচ্চা সাধারণতঃ অক্ষত কানযুক্তই প্রসবিত হইয়া থাকে; উহার কান কাটা বা ছিদ্র করা থাকে না, কিন্তু পরে উহার মোশরেক মালিক উহার কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া (উহাকে মনগড়া মাবুদ তথা দেব-দেবীর নামে ছাড়িয়া) থাকে।

ব্যাখ্যা :— সেকালে আরব দেশে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির বাচ্চাকে কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া দেব-দেবীর নামে ছাড়িবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই উহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানবকে সত্য ও হকের প্রতি ধাবিত করার সমস্ত রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনাই আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন; ঘাড়ে ধরিয়া বলপূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে হকের উপর পরিচালিত করেন নাই বটে। কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টিজগতের মূল রহস্য "পরীক্ষা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ইহা ছাড়া অন্য সব ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। নবী-রসুল পাঠান হইয়াছে, কেতাব নাজিল করা হইয়াছে; তদুপরি সৃষ্টিগত-ভাবে মানবের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে যেরূপ এক একটি কাজের শক্তি দান করা হইয়াছে কোনও বাধার সৃষ্টি না হইলে আপনা-আপনিই প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার কাজ সম্পন্ন হইতে থাকিবে। যথা, চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, কান দ্বারা শুনা যায় ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগত ভাবেই মানবকে এমন একটি শক্তি দান করতঃ পরীক্ষাকেন্দ্ররূপী জগতে পাঠাইয়াছেন যে, কোনও প্রভাব বা বাধার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ঐ শক্তিটি মানবকে সত্য ও হকের প্রতি লইয়া চলিবে। কিন্তু মানব দুনিয়াতে আসিবার পর নানাপ্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, নানারূপ বেড়াজালের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে তাহার ঐ শক্তিটি নিস্তেজ হইতে থাকে এবং ক্রমে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ আকর্ষণ ও বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে—মাতা-পিতা তথা

পরিবেশ, সোসাইটি (Society) ও সংসর্গ। এসব বেড়াজালকে ভেদ করার জন্যও আল্লাহ তায়ালা অন্য একটি শক্তি দান করিয়াছেন উহা হইতেছে আকলে-ছলীম বা সুস্থ বিবেক।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা একটি অতি মূল্যবান উপদেশ লাভ হয় যে, যাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে সৎ বানাইবার আকাঙ্খা রাখেন তাহাদের প্রথম কর্তব্য হইবে, সন্তানকে খারাপ সোসাইটি, অসৎ সংসর্গ ও অবাঞ্ছিত পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখা, যেন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিটি নষ্ট না হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য হইবে, সন্তানকে ভাল পরিবেশে ভাল সোসাইটিতে, সৎ সংসর্গে প্রতিপালিত করা, যেন ঐ শক্তিটির আরও অধিক উন্নতি লাভ হইতে পারে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা ছেলে-মেয়েদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ত দূরের কথা বরং তাহাদের সহিত ডাকাত ও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। দ্বীন ও ইসলামের পক্ষে বিষ তুল্য পরিবেশে নিজেরাই তাহাদেরে দিয়া দেই।

৭২১। হাদীছ ঃ—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন খাব দেখিয়াছে কি ? কেহ কিছু দেখিয়া থাকিলে সে উহা বর্ণনা করিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিতেন।

একদা নবী (দঃ) সেই অনুসারে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি ? সকলেই আরজ করিল, আজ আমরা কিছুই দেখি নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি উহা বর্ণনা করিলেন যে, দুই ব্যক্তি আমাকে এক পাক-পবিত্র স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া দেখিলাম, একটি লোক বসিয়া আছে, অপর একজন লোক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে ; দাঁড়ান ব্যক্তির হস্তে একখানা বক্র মাথা বিশিষ্ট লোহার শিক (যেরূপ শিকের দ্বারা তন্দুর হইতে রুটি উঠান হয়)। সে তাহার ঐ লোহার বক্র অংশ ঐ বসা ব্যক্তির মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া তাহার মুখের চিবুক ফাড়িয়া গর্দান পর্যন্ত লইয়া যায়। তদ্রূপ নাকের এক ছিদ্রে ঐ লোহার বক্র মাথা প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায় এবং চোখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এইভাবে এক পার্শ্বের চিবুক, নাক ও চোখ ফাড়িবার পর অপর পার্শ্বও ঐরূপে ফাড়ে। এক পার্শ্ব ফাড়িয়া অপর পার্শ্ব ফাড়িতে ফাড়িতে প্রথম পার্শ্ব পূর্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া যায় ; এবং উহাকে পুনরায় ফাড়া হয়। পুনঃ পুনঃ উভয় পার্শ্বকে এইভাবে ফাড়িতেছে। (মানুষটিকে কিছু সময় বসাইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়, আবার কিছু সময় উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়।) আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার ? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, একজন লোক চিত হইয়া শুইয়া আছে, অপর একজন লোক

বিরাট ভারী একটি পাথর হাতে লইয়া আছে এবং ঐ পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। পাথরটি এত জোরে মারা হয় যে, উহার আঘাতে মাথা চূর্ণ হইয়া পাথরটি ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া পড়ে; ঐ পাথরটিকে লইয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার মাথা পূর্বের ন্যায় অক্ষত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, পুনরায় তাহাকে ঐরূপে আঘাত করা হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাহাকে আঘাত করা হইতেছে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে এক-স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তন্দুরের ন্যায় একটি অগ্নিকুণ্ড; উহার মুখটি সঙ্কীর্ণ এবং অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় প্রশস্ত। উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে এবং উহাতে ভয়ঙ্কর চীৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাইতেছে; আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে কতকগুলি উলঙ্গ নর-নারী রহিয়াছে। যখন অগ্নি-শিখাগুলি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও উপরের দিকে চলিয়া আসে, মনে হয় যেন তাহারা উহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িবে, কিন্তু অগ্নিশিখা স্তিমিত হইলে আবার তাহারা উহার তলদেশে পড়িয়া যায়। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কোন্ লোক? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। এবার আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছিলাম! ঐ নদীটিতে পানি ছিল না, বরং রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; ঐ নদীর মধ্যস্থলে একটি লোক অবিরাম সাঁতার কাটিতেছে এবং অপর একটি লোক সেই নদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে বহু পাথর-খণ্ড স্তূপীকৃত। এমতাবস্থায় মধ্যস্থলীয় লোকটি সাঁতার কাটিয়া কিনারার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, যখন সে কিনারার নিকটবর্তী হইয়া নদী হইতে উঠিয়া আসিবার প্রয়াসী হয় তখন ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি পাথর দ্বারা তাহার মুখের উপর ভীষণ জোরে আঘাত করে যাহার ফলে সে তাহার পূর্বের স্থান—নদীর মধ্যস্থলে চলিয়া যায়। যতবার ঐ ব্যক্তি সেই রক্তের নদী হইতে বাহির হইয়া আসার চেষ্টা করে ততবার ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি তাহাকে ঐরূপে আঘাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাঁহারা বলিলেন, সম্মুখে চলুন। এবার আমরা একটি সুন্দর সবুজ বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, উহার মধ্যে একটি বিরাট বৃক্ষ। বৃক্ষটির গোড়ায় একজন সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধলোক অনেকগুলি ছেলে-মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছে এবং ঐ বৃক্ষটির কিছু দূরেই অপর এক ব্যক্তি অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির; সে তাহার সম্মুখস্থ বিরাট অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া ঐ বৃক্ষটিতে আরোহণ করিলেন। উর্দ্ধপানে একটি শহরে উপস্থিত হইলাম—যাহার অট্টালিকাসমূহ এবং রাস্তা ঘাট ইত্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত; সেই শহরে এমন একদল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের শরীরের অর্দ্ধাংশ অতি সুন্দর ও সুশ্রী, কিন্তু বাকী অর্দ্ধাংশ অতি জঘন্য কুৎসিত ও বিশ্রী। আমার সঙ্গীদ্বয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ প্রবাহমান

খালে অবতরণ করিয়া ডুব দাও। তাহারা তাহা করিল এবং আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল; তখন তাহাদিগকে দেখিলাম, তাহারা পূর্ণাঙ্গে অতিশয় সুন্দর সুশ্রী হইয়া গিয়াছে (৬৭৪ পৃঃ)।

অতঃপর আমরা বৃক্ষটির আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম; তখন সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া এমন সুন্দর সুরম্য একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন যে, তার চেয়ে অধিক সুন্দর কক্ষ আমি কখনও দেখি নাই; উহার ভিতরে অনেক বৃদ্ধ, যুবক, নর-নারী ও ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা আমাকে ঐ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষটির আরও উপরে আরোহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এই কক্ষটি প্রথমটি হইতেও অধিক সুন্দর ও মনোরম, উহার মধ্যে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক রহিয়াছে।

আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, সারারাত্র আপনারা আমাকে ভ্রমণ করাইলেন, এখন আমাকে ঐসব ঘটনা খুলিয়া বলুন যাহা আমি দেখিয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, হাঁ—সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। সে এমন এক একটি মিথ্যা গড়াইয়া বলিত যাহা তাহার মুখ হইতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। আপনি যাহা দেখিয়াছেন উহা তাহারই শাস্তি। হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ঐরূপ শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। আপনি পাথর দ্বারা যাহার মাথা চূর্ণ করিতে দেখিয়াছেন সে ঐ ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এল্‌ম দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সর্বদা সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইয়াছে, উহা তেলাওয়াত করে নাই এবং দিনের বেলায়ও উহার আমল করে নাই, তাহাকেও এই আজাব কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত দেওয়া হইতে থাকিবে। আর যাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দেখিয়াছেন তাহারা জেনাকার—ব্যভিচারী নর-নারী। আর যাহাকে রক্তের নদীর মধ্যে দেখিয়াছেন, সে সুদখোর দলের একজন। স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত শহরে যে একদল লোক দেখিয়াছেন যাহাদের অর্দ্ধ শরীর সুশ্রী, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমল বা কার্য্যকলাপ ভাল-মন্দ ও নেক-বদে মিশ্রিত। পরে আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও রহমতের শ্রোতে তাহাদের সমুদয় গোনাহ ভাসিয়া গিয়া তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষের গোড়ায় যে সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধ লোকটি দেখিয়াছেন, তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম এবং তাঁহার আশে-পাশের ছেলে-মেয়েগুলি মানুষের ঐসব ছেলে-মেয়ে, যাহারা নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর বৃক্ষের নিকটবর্তী যিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন তিনি হইলেন "মালেক" নামক ফেরেশতা যিনি দোযখের (এন্তেজামকারীদের) সরদার।

আর বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া পর পর যে কক্ষদ্বয় দেখিয়াছেন—প্রথম কক্ষটি সর্বসাধারণ মোসলমানদের বেহেশত এবং দ্বিতীয় কক্ষটি শহীদদের বেহেশত। আর আমি জিব্রাঈল এবং আমার সঙ্গী মিকাঈল। এখন আপনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখুন। আমি উপর দিকে তাকাইলাম; আমার উপরের দিকে বহু উপরে একটি বালাখানা সাদা শুভ্র মেঘ পুঞ্জের ন্যায় দেখিতে পাইলাম। সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, উহা আপনার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত বেহেশতের বাসস্থান। তখন আমি বলিলাম, আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার

বাসস্থানে প্রবেশ করি। তাঁহারা বলিলেন, এখনও আপনার পার্থিব জীবন অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, উহা পূর্ণ হইলেই আপনি নিজ বাসস্থানে চলিয়া আসিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—নবীগণের স্বপ্ন অহী, উহা অকাট্য সত্য ও বাস্তব বিষয়। অতএব এই হাদীছ দ্বারা কবর তথা আলমে-বরযখের আজাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। কারণ, আলোচ্য ঘটনায় বর্ণিত সমস্ত আজাবই হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

সোমবার দিন মৃত্যু হওয়া

৭২২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (অন্তিমশয্যাবস্থায় তাঁহার) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তোমরা কয়টি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, তিনটি সাদা সূতি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলাম, যাহার মধ্যে (সাধারণ রকমের) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লার কোন্ দিন ওফাত পাইয়াছিলেন? আয়েশা (রাঃ) উত্তর করিলেন, সোমবার দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আজ সোমবার। তখন তিনি বলিলেন, সম্মুখের রাত্র পর্য্যন্ত আমিও আশা করি—(ইহলোক ত্যাগ করিব।) এই বলিয়া তিনি পরিধেয় কাপড়টির প্রতি তাকাইলেন, উহাতে জাফরানের দাগ ছিল। তিনি বলিলেন, এই কাপড়টি ধৌত কর এবং ইহার সঙ্গে আরও দুইটি কাপড় মিলাইয়া আমার কাফন দিয়া দিও। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন এই বস্ত্রটি পুরাতন। তিনি বলিলেন, নূতন কাপড় জীবিতদেরই উপযোগী, কাফনের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐদিন প্রাণ ত্যাগ করিলেন না; মঙ্গলবার বিকালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ভোর হইবার পূর্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

৭২৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)। আমার মাতা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কোন কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। আমার ধারণা হয়, তিনি অন্তিমকালে কথা বলিতে পারিলে কিছু ছদকা করার অছিয়ত করিতেন। এখন আমি তাঁহার পক্ষে ছদকা করিলে তিনি কি উহার ছওয়াব পাইবেন? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ।

——)০(——

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ এবং আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবরের বিবরণ

৭২৪। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষায় এই বলিতে থাকিতেন, অদ্য আমি কোন্ স্ত্রীর গৃহে আছি? আগামী কল্য কোন্ স্ত্রীর গৃহে থাকিব? এইরূপ বলিয়া তিনি আয়েশা (রাঃ) গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হযরতের বিবিগণ তাঁহার মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি রোগ-শয্যায় সর্বদা আয়েশার গৃহেই থাকুন। আমরা এখানে আসিয়া আপনার খেদমত করিব। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, বিবিগণের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পালাক্রমে নির্দ্ধারিত দিনসমূহের মধ্যে আমার জন্য নিরূপিত দিনে, আমার কক্ষে এবং আমার বক্ষ ও গলগণ্ডের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার কক্ষে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাদীছে প্রমাণিত আছে, পয়গাম্বরকে ঐ স্থানেই সমাহিত করা অবশ্য কর্তব্য যে স্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (শামায়েল-তিরমিজী)। সুতরাং ছাহাবীগণ রসুলে করিম (দঃ)কে সেই তৈরী কক্ষেই সমাহিত করিয়াছিলেন এবং উহা সাধারণতঃ আবদ্ধ অবস্থায়ই থাকিত। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬১৬ নম্বর হাদীছে আছে—ইহুদ নাছারারা পয়গাম্বরগণের কবরকে সেজদা করায় তাহাদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নৎ ও অভিশাপ করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ বর্ণনা পূর্বক আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকেও সেজদার স্থান করিয়া নেওয়া হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উহাকে পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন কেহ ঐ স্থানে নামায পড়িতে বা সেজদা করিতে না পারে; নতুবা উহা উন্মুক্তই রাখা হইত।

হিজরী ৮৬ হইতে ৯৬ সাল—মোতাবেক ইংরাজী ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক মোসলমানদের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার আমলে মসজিদে-নববীর সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল। যেহেতু পূর্ব হইতেই উক্ত মসজিদ হযরতের বিবিগণের আবাস গৃহ-সংলগ্ন ছিল, তাই মসজিদ সম্প্রসারণ কল্পে অধিপতি ওলীদ ঐ সকল

গৃহ বিবিগণের ওয়ারিসান হইতে ক্রয় করেন এবং তৎকালীন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজের তত্ত্বাবধানে ঐ সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া মসজিদকে প্রশস্ত করেন। সেই সময় হযরতের রওজাস্থল—বিবি আয়েশার কক্ষের পুরাতন দেওয়াল সমূহও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং নূতনভাবে দেওয়াল নির্মাণ করিয়া হযরতের রওজা শরীফকে ঘেরাও করিয়া দেওয়া হয়। কালক্রমে ১২৭১ হিজরীতে তুরস্কের তদানীন্তন সুলতান আবদুল মজিদ খান মরহুম মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মাণ করেন এবং প্রয়োজনে উহাকে অধিক প্রশস্ত করা হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রওজা শরীফ মসজিদের ভিতরে, কিন্তু এক কোণে আসিয়া পড়ে।

আল্লার লাখ লাখ শোকর যে, মোসলমানগণ কখনও ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফকে সেজদাস্থল বা তদ্রূপ কোনও অনৈসলামিক কার্য্যস্থলরূপে ব্যবহার করে নাই। এমনকি কোন সময়েই যেন উহার সুযোগ না হয় তদুদ্দেশ্যে রওজা শরীফকে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার উল্লেখ আয়েশা (রাঃ) করিয়াছেন।

বর্তমান রওজা শরীফের চতুর্দিকে যে দেওয়াল রহিয়াছে, উহার ভিতরের সঠিক অবস্থা দেখা যায় না, কিন্তু ঐ দেওয়াল হইতে প্রায় ১৫/২০ হাত ব্যবধানে চতুর্দিকে লৌহ-জালীর দ্বারা উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ঘেরাও করতঃ পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ মসজিদের যে অংশে দাঁড়াইলে রওজা শরীফ মুছল্লিগণের সম্মুখে হয়, সেইদিকে ঐ লৌহ বেষ্টনী কবর শরীফের দেওয়াল হইতে প্রায় ২৫/৩০ হাত দূরে অবস্থিত। তদুপরি সেই লৌহ বেষ্টনীর পর একট স্থান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের স্থান বলিয়া প্রকাশ; সেই ২৫/৩০ হাত পরিমিত স্থানকেও রেলিং দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। অনাবশ্যকে তথায় দাঁড়াইয়াও নামায পড়িতে দেওয়া হয় না।

মক্কা-মদীনা তথা হেজাযের অধিপতি সউদী গভর্ণমেণ্টকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে-খায়ের দান করুন: এই গভর্ণমেণ্ট হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ সম্পর্কিত সম্ভাব্য সকল প্রকার শেরেক বেদ্‌আ'তকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্বে বহু পুলিশ সর্বদা মোতায়েন থাকেন; ঐ পুলিশগণ প্রত্যেকেই শরীয়তের মছআলা-মাছায়েল সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ দীনদার। তাঁহারা দিবারাত্র সর্বদাই এই বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখিয়া থাকেন। আমি যখন রওজা শরীফের সংলগ্ন "রওজাতুম-মিন্ রিয়াজিল্ জান্নাহ্" নামক স্থানে বসিয়া এই বিষয়টি লিখিতে-ছিলাম তখনকার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা—এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার পার্শ্বে বসিয়া রওজা শরীফের দিকে মুখ করিয়া মোনাজাত করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশ তাহাকে ঐকার্য্যে বাধা দিলেন এবং স্বহস্তে ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া বসাইলেন, আর বলিলেন—"এই দিকে কেবলা এই দিকে মোনাজাত কর।"

আর একদিন আমি নিজে রওজা শরীফের সংলগ্ন ঐ বিশেষ স্থানে বসিয়া বোখারী শরীফের অনুবাদ কার্য্য করিতেছিলাম, তখন আমি পূর্ণরূপে কেবলামুখী হইয়া না বসিয়া কিঞ্চিৎ রওজা শরীফমুখী হইয়া বসিয়াছিলাম, একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে পিছন হইতে ধরিয়া ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া দিলেন।

বর্তমান গভর্ণমেণ্ট ও উহার কার্য্য-পরিচালকগণ সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকে যে, তাঁহারা রওজা শরীফের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তা'জীম করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ সকল অভিযোগ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার নিজস্ব একটি ঘটনা এ স্থলে বয়ান করিলেই ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একদিন আমি রওজা শরীফের সংলগ্ন স্থানে বসিয়া অনুবাদ করিতেছিলাম। রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্ব প্রায় অর্দ্ধ হাত পরিমিত উঁচু পাকা ভিটির ন্যায়। আমি ঐ উঁচু ভিটির উপর নেহাত মামুলীভাবে আল্‌গোছে বাম হাতের কনুই রাখিয়া একটু হেলান দেওয়ার ন্যায় বসিয়া লিখিতেছিলাম। একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে বলিলেন "ভিটা হইতে আলগ হইয়া বসুন; ইহা কি হেলান দেওয়ার বস্তু"? আমি তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দানে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একটি রিয়াল বখ্‌শিশ দিলাম।

বর্তমান অধিপতি সুলতান সাউদকে আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘজীবি করুন, তিনি মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মাণ ও সম্প্রসারণের যে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করিয়াছেন এবং মসজিদে-নববীকে যেভাবে অদ্বিতীয় শান-শওকতপূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রাণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আজ্‌মত ইজ্জত ও অগাধ মহব্বতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত অভিযোগাদি নেহাৎ অমূলক।

৭২৫। হাদীছ :—সুফিয়ান তাম্মার নামক দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবর শরীফকে (কোন সুযোগে) দেখিয়াছি; উহা উটের পিঠের আকারে একটু (মাত্র চারি আঙ্গুল) উঁচু।

৭২৬। হাদীছ :—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের আধিপত্যকালে যখন (মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মানের সময়) রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্বের দেওয়ালেরও পুনঃ নির্মাণ কার্য্য হইতেছিল, তখন (দেওয়ালের গর্ত খুঁড়িবার সময় জমিন ধ্বসিয়া) শব দেহের একটি পা খুলিয়া গেল; ইহাতে সকলেই আতঙ্কিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। (এমনকি তদানীন্তন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজ স্বয়ং কার্য্যস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।) সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নাকি? এ বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত হইবার জন্য তাঁহারা কাহাকেও পাইলেন

না। অতঃপর ওরওয়া (রঃ) আসিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিলেন, কখনও নয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা কস্মিনকালেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নহে, বরং ইহা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পা।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের খাছ হুকুম অনুসারে নবী (দঃ)কে আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে সমাহিত করায় ঐ কক্ষ কবরস্থানে পরিণত হইলে পর হযরতের উত্তর পার্শ্বে খালি জায়গায় হযরতের কোমর মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া আবু বকর (রাঃ)কে দাফন করা হয়। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উত্তর পার্শ্বে হযরতের পা মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া ওমর (রাঃ)কে দাফন করা হইয়াছে। সেখানে কেবলা দক্ষিণ দিকে, তাই তাঁহাদের সকলেরই পা পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং পূর্বদিকের দেওয়ালস্থলেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেহেতু সে দিকে খলীফা ওমরের পা-ই সর্বাধিক অগ্রগামী ছিল; তাই ওরওয়া (রঃ)-এর বয়ান নিশ্চিতরূপেই সঠিক ছিল।

আয়েশা (রাঃ) স্বীয় ভাগিনা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে আমার সঙ্গীনী হযরতের অন্যান্য বিবিগণের নিকটবর্তী মদীনার সাধারণ কবরস্থান জান্নাতুল-বাকীর মধ্যেই দাফন করিও; রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী দাফন করিও না। কারণ, ইহা আমি ভাল মনে করি না যে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আমি অন্যান্য বিবিগণের তুলনায় উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্না বলিয়া পরিগণিত হই।

● খলীফা ওমর (রাঃ) অন্তিম শয্যায় স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ কর যে, খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার খেদমতে সালাম পাঠাইয়াছে; খবরদার—আমার নামের সঙ্গে তখন "আমীরুল-মোমেনীন" বলিও না। অতঃপর তাঁহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে যে, আমি আমার মুরব্বিদ্বয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে দাফন হইতে আরজু রাখি। এই খবর পৌঁছিলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই সৌভাগ্যটি আমি নিজের জন্য আশা করিয়াছিলাম।✝ এখন আমার নিজের আশার উপর ওমরের আরজুকেই প্রাধান্য দিব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলে ওমর (রাঃ) অতিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন—হে আমীরুল-মোমেনীন, আপনার জন্য তিনি অনুমতি দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টিই আমার বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল।

অতঃপর বলিলেন, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর আমাকে কাফন পরাইয়া কাঁধে করিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লইয়া যাইবে এবং পুনঃ আরজ

✝ ইহা তাঁহার পূর্বেকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও ইহার বিপরীত অছিয়ত করিয়াছেন; যেরূপ একটু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

করিবে—খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, (আপনার কক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী দাফন হইবার জন্য।) যদি তিনি অনুমতি দান করেন তবে আমাকে ঐ স্থানে দাফন করিও, নতুবা আমাকে সর্বসাধারণ মোসলমানদের কবরস্থানেই দাফন করিও। (সময় উপস্থিত হইলে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।)

মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাব উক্তি করা চাই না

৭২৭। **হাদীছ:—** عن عائشة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا -

অর্থ:—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—মৃত ব্যক্তিদেরে গালি-গালাজ করিও না। তাহারা স্বীয় আমলের প্রতিফল ভোগের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। (যাহা হইবার সেখানে হইবেই; তাহারা দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এখন আর তাহাদেরে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ উক্তি ও তাহার কুৎসা না করা সম্পর্কে হাদীছ ও পরিচ্ছেদ বর্ণনার পর ইমাম বোখারী (র:) আর একটি পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহারা দ্বীন-ইসলামের শত্রু, যাহারা দ্বীন-ইসলামকে ঘায়েল করিয়াছে এবং উহার ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তথা তাঁহার (Mission) মিশনের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে—এই শ্রেণীর লোকদিগকে মানব চোখে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং তাহাদের হইতে লোক সমাজকে সতর্ক করা ও দূরে রাখার জন্য তাহাদের কুৎসা করা এবং তাহাদের মৃত্যুর পরও তাহাদের কুৎসা জারী রাখা বিশেষ কর্তব্য। এই সম্পর্কে বোখারী (র:) একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটির বিস্তারিত অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে হযরতের জীবনী অধ্যায়ে "নবুওতের তৃতীয় বৎসর" বিবরণে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা আসিবে। হাদীছটির মর্ম এই যে—হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) তাঁহার মিশনের কার্য্য ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে আরম্ভ করার পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ মতে একদা কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ সুপরিচিত ছাফা পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া নিজের গোত্রীয়দেরকে ডাকিলেন। ঐ সময় গোত্রীয় প্রধান এবং নিকটতম আত্মীয়দিগকেও বিশেষভাবে ডাকিলেন। সকলে সমবেত হইলে রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাদিগকে তাঁহার মিশনের সম্ভাব্য শত্রুতার ভয়াবহ পরিণতি হইতে সতর্ক করতঃ এক আল্লার বন্দেগীর প্রতি আহ্বান জানাইলেন। হযরতেরই চাচা আবু লাহাব সেই আহ্বানে ক্ষুব্ধ হইয়া এই বাক্যে হযরতের প্রতি বিষোদগার করিল—تبالك سائر اليوم الهذا دعوتنا "সারাদিন তোমার ধ্বংস সাধিত হউক; এই কথার জন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে?"

আবু লাহাব সেই মুহূর্ত হইতে হযরতের মিশনের শত্রুতায় লাগিয়া গেল ; তাহার স্ত্রীও এই কাজে তাহার কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, বরং অগ্রগামিনী হইয়া চলিল। আল্লাহ্ তায়ালা আবু লাহাবেরই উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে তাহাদের উভয়ের ইহ-পরকাল ধ্বংস ও উৎসন্নের সংবাদ প্রচার করতঃ তাহাদের কুৎসায় "তাব্বাত ইয়াদা" ছুরা পবিত্র কোরআনের অংশরূপে অবতীর্ণ করিলেন।

আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কুৎসা ও অভিশাপের এই ছুরা কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী আবৃত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলের ও তাঁহার মিশনের সমস্ত দুশমনকেই এইরূপে ধ্বংস ও উৎসন্ন করুন—আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَلَاذِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى ٥

২৭ মোহাররাম, ১৩৭৭ হিজরী,
২৩ আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ,
শুক্রবার,
পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ্—
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের
রওজা শরীফের সংলগ্ন—বেহেশতের বাগান।

সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

নবম অধ্যায়

যাকাত

নামায যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ ও অপরিহার্য্য ফরজ, যাকাতও তদ্রূপ ইসলামের একটি স্তম্ভ ও ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু আয়াতে ফরমাইয়াছেন— اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "তোমরা নামায কায়েম কর অর্থাৎ উহাকে অতি উত্তমরূপে আদায় কর এবং যাকাত দান কর।"

যাকাতও নামাযের ন্যায় হিজরতের পূর্বেই ফরজরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৩নং হাদীছের মধ্যে এই দাবীর প্রমাণ রহিয়াছে। আবু সুফিয়ানের বর্ণনার মধ্যে ছিল— يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ অর্থাৎ ঐ নবী হওয়ার দাবীদার ব্যক্তি "আমাদিগকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়া থাকেন।" আবু সুফিয়ান হিজরতের পূর্বের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছিলেন।

৭২৮। হাদীছ :— قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن

اِنَّكَ سَتَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْالَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ

অর্থ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশে (শাসনকর্তারূপে) পাঠাইতেছিলেন; তখন তিনি তাঁহাকে (তাঁহার কার্য্যধারার উৎকৃষ্ট পন্থা শিক্ষাদান পূর্বক কতকগুলি উপদেশ ও সতর্ক-বাণী দান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এমন এক দেশে চলিয়াছ যে দেশবাসী কেতাবধারী কাফের—ইহুদী-নাছারা; (তাহাদিগকে সহজ উপায়ে দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিতে) প্রথমে তাহাদিগকে ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি অর্থাৎ তৌহীদ ও রেছালাতের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার প্রতি আহ্বান জানাইবে, তথা কলেমা—لا الـه الا الله محمد رسول الله "একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার বাণীবাহক সাচ্চা রসুল" এই স্বীকারোক্তির প্রতি আহ্বান জানাইবে। যদি তাহারা ইহা শীরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লয় তবে (তাহারা মোসলমান জামায়াত ভুক্ত হইল।) তৎপর তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা (সকল মোসলমানের ন্যায়) তাহাদের উপরও প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। যদি তাহারা ইহা গ্রহন করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা (সকল মোসলমানদের ন্যায়) তাহাদের উপরও মালের যাকাত ফরজ করিয়াছেন; যাহা তাহাদের (ধনীদের) হইতে উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করা হইবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে এইরূপ সতর্কও করিয়া দিলেন যে, তাহারা যাকাত দানে স্বীকৃত হইলে খবরদার! কখনও তাহাদের ধন-সম্পত্তির মধ্য হইতে ভাল ভালগুলি বাছিয়া লইও না।

তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিলেন যে, (খবরদার! কাহারও প্রতি কোনরূপ জুলুম বা অন্যায়-অত্যাচার করিয়া) মজলুমের বদ দোয়ার ভাগী হইও না। কারণ, মজলুমের (আ…হ্ ও) বদ-দোয়া বিনা বাধায় সরাসরি আল্লার দরবারে তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়া যায়। (সাধারণতঃ ট্যাক্স আদায়কারীগণ জুলুম করিয়া থাকে; সেই জুলুমের কারণেই রাষ্ট্রের এবং জাতির পতন আসে; উহার প্রতিরোধের জন্যই এই সতর্কবাণী।)

৭২৯। হাদীছ :— ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم

أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ

وَتُؤْتِىْ الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ -

অর্থ :—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন*—(একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে উষ্ট্রে আরোহিত ছিলেন।) এক ব্যক্তি (জনতার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া হযরতের উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া বসিল এবং) আরজ করিল, আপনি আমাকে এমন আমল বা কর্ম বলিয়া দেন যাহা করিলে আমি (দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে এবং) বেহেশত লাভ করিতে পারি। ঐ ব্যক্তির কার্য্যক্রমে সকলেই বিরক্তি প্রকাশে বলিতে লাগিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার কি হইয়াছে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা কি বুঝিবে--তাহার কি হইয়াছে? সে ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়া আসিয়াছে। (এই বলিয়া হযরত আকাশের প্রতি তাকাইলেন, অতঃপর প্রশ্নকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিষয়টি অতি বড়। আমি উত্তর দিতেছি; তুমি মনোযোগের সহিত শুন এবং উপলব্ধি কর।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে চারিটি বিষয় বলিয়া দিলেন।) (১) এক আল্লার এবাদৎ করিবে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁহার (এবাদতের মধ্যে তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে বা গুণাবলীর মধ্যে) শরীক বা অংশীদার করিবে না। (২) নামায কায়েম করিবে। (৩) যাকাত আদায় করিবে। (৪) আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের হক রক্ষা করিয়া চলিবে। (এই বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন আমার উটের লাগাম ছাড়িয়া দাও।)

ব্যাখ্যা :—"আল্লার এবাদৎ করিবে" অর্থাৎ এক আল্লার বন্দেগী করিবে, একমাত্র তাঁহারই গোলামী অবলম্বন করিবে, সর্বদা সর্বাবস্থায় তাঁহার আদেশ-নিষেধসমুহ জীবনের প্রতি স্তরে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহার বাধ্যগতরূপে চলিবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মানুষের পারলৌকিক পরিত্রাণ দুই স্তরের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হইল আকিদা অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও মুখের বাচনিক আনুগত্য ও স্বীকৃতির স্তর, যাহাকে "ঈমান" বলা হয়; ইহা পরিত্রাণের মূল ভিত্তি। দ্বিতীয়টি হইল আমল বা কর্ম ও জীবন-যাপন পদ্ধতির স্তর। প্রথম স্তরের বিষয়সমুহের বিস্তারিত বিবরণ ঈমানের অধ্যায়ে এবং মোটামুটি বিবরণ ৬৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মোমেন ও মোসলম'ন মাত্রই এই প্রথম স্তরের বিষয়সমুহের সম্পর্কধারী হইতে হয়; অতঃপর তাহার দ্বিতীয় স্তরে আজীবন বিরামহীন সাধনা করিয়া চলিতে হয়।

আলোচ্য হাদীছে প্রশ্নকারী ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে প্রথম স্তরের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা অনাবশ্যক, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই ঈমানের দৌলত হাছিল করিয়াছেন। তাই হযরত (দঃ) এখানে শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্তরের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাও অতি সংক্ষিপ্তরূপে।

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু সমূহ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে। (ফতহুলবারী দ্রষ্টব্য)

প্রথমতঃ জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহূর্তে সংযত রাখার সুদূর প্রসারী এবং সুগভীর ও বিস্তির্ণ ক্রিয়াবিশিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বলিলেন যে, কর্ম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে নিজকে এক আল্লার দাস ও গোলামরূপে পরিচালিত করিবে। কোন ব্যক্তি বা শক্তি বা স্বীয় নফছের খাহেস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোলামী করতঃ তাহার বাধ্যতায় চলিয়া বা তাহার পূজা করিয়া আল্লার শরীক সাব্যস্তকারী হইবে না।

অতঃপর নামায, যাকাত আত্মীয়তা রক্ষা এই তিনটি বিষয়কে এক এক প্রকার বিশেষ সতর্ককরণ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিয়াছেন: তাহা এই যে, আল্লার দাসত্ব ও গোলামী শুধু নিয়্যত-এরাদা ও উদ্দেশ্যের পর্য্যায়ে করিলে চলিবে না। অর্থাৎ আল্লার দাসত্ব এইরূপে করিলে চলিবে না যে, কর্ম ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ স্বীয় মনগড়ারূপে স্থির করিয়া উহাকে আল্লার দাসত্বের এরাদা ও উদ্দেশ্যযুক্ত করিয়া দিবে—এই পন্থা মোটেই চলিবে না, বরং এরাদা, উদ্দেশ্য, কর্ম এবং কর্মপন্থা ও আদর্শ সর্ব পর্য্যায়েই আল্লার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্বীয় কিতাবে ও স্বীয় প্রতিনিধি বা রসুল মারফত মানবের জন্য আল্লার দাসত্বের প্রতীক স্বরূপ যে সব কার্য্যক্রম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং কর্মপন্থা বাতলাইয়া দিয়াছেন এবং মানব জীবনের জন্য স্বীয় রসুলের মারফৎ যে সব আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, আল্লার দাসত্বের উদ্দেশ্যে সেই সব কার্য্যক্রমগুলিকে ঐ কর্মপন্থার মাধ্যমে পূর্ণরূপে আদায় করিয়া স্বীয় জীবনকে ঐ আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে; ইহাই হইল প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার দাসত্ব বা আল্লার এবাদত। ঐ সমস্ত কার্য্যাবলী ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ বিভিন্ন বিভাগীয়। কারণ মানুষের জীবন-সম্বন্ধ বিভিন্ন স্তরের; যেমন—পারিবারিক ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত বিভাগের মধ্যে আবার দৈহিক-আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক-আধ্যাত্মিক। ইহা ছাড়া আরও বহু বিভাগ আছে, কিন্তু এই তিনটি বিভাগ প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রতি মুহূর্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগে আবার বিভিন্ন কার্য্যাবলী আছে। এইখানে উদাহরণ স্বরূপ এক একটি উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনের দৈহিক-আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে নামায। এই পর্য্যায়ের কার্য্যক্রম আরও আছে, যেমন রোযা, জেকের ইত্যাদি। কিন্তু উহাদের মধ্যে নামাযই প্রধান এবং প্রত্যহ বার বার উহা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়িবে স্বভাবতঃ সে রোযা, ইত্যাদিও পালন করিবে। তাই এই বিভাগের মধ্যে নামাযই উল্লেখযোগ্য। এইরূপে ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক-আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমে আত্মীয়বর্গের হক রক্ষা করার আদর্শ উল্লেখ করিয়াছেন।

মূলকথা এই যে, প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ শরীয়ত বর্ণনা করা কখনও সমীচীন বা সংগত নহে, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে পূর্ণ শরীয়তের প্রতিই ইঙ্গিত

দিয়াছেন এবং অতি সুন্দররূপে ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রথমতঃ অতি সংক্ষেপে এমন একটি বাক্য বলিয়াছেন যাহার প্রভাব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহূর্তে সংযত রাখিবে। অতঃপর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লার দাসত্ব করার একমাত্র অর্থ ও নিয়ম এই যে, তাঁহারই নির্দেশিত কার্য্যাবলী তাঁহারই নির্দ্ধারিত পন্থায় তাঁহারই দাসত্বের উদ্দেশ্যে করিয়া যাইবে এবং তাঁহারই বর্ণিত আদর্শে নিজেকে পরিচালিত করিবে। এসবের সমষ্টির নামই হইল ইসলাম বা শরীয়ত এবং এখানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঐ শরীয়ত বা ইসলামের বিস্তীর্ণ কার্য্য-বিভাগ সমূহের এক একটি উদাহরণ মাত্র। অতএব বেহেশত লাভের আকাঙ্খাপূরণ মাত্র উল্লিখিত তিনটি কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অধুনা কোন কোন লোককে অজ্ঞতা বা ভ্রান্তধারণা বশতঃ এরূপ উক্তি করিতে শুনা যায় যে, তৌহীদ—একত্ববাদ এবং এক আল্লার উপাসনা মানবের নাজাত ও পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। হযরত মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। কেহ কেহ আরও পরিস্কার সুরে বলিয়া ফেলে যে, পরকালে পরিত্রাণ বা ভাল কর্মের ভাল ফল পাইবার জন্য ইসলাম ধর্মের কোনই বাধ্য-বাধকতা নাই, বরং যে কোন ধর্মে বা অবস্থায় থাকিয়া আল্লার উপাসনা আরাধনা করিলে পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে এবং ভাল কাজ করিলে বেহেশত লাভ করা যাইবে।

মোসলমান ভাইগণ! সাবধান ও সতর্ক থাকিবেন—এইরূপ মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণ স্পষ্ট কুফুরী। এইরূপ মতবাদ পোষণকারী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং হাজার এবাদত-বন্দেগী করিলেও তাহার জীবনের সমস্ত নেক আমল ঐ একটি মাত্র ভুল মতবাদের দরুন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, যেরূপ স্তুপীকৃত ছন ও খড়-কুটা একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ফলে তাহার চিরজাহান্নামী নরকবাসী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বিধর্মী অমোসলেম কাফেররা অবশ্য ঐরূপ আকিদাধারী হইয়া থাকে, নতুবা কাফের থাকিবে কেন? কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কোরআন ও হাদীছের প্রতি বিশ্বাসী মোসলমান হওয়ার দাবীদার কোন কোন মানুষও ঐরূপ উক্তি করিয়া ফেলে। সেজন্য মোসলমানদের সাবধান ও সতর্ক থাকা কর্তব্য।

এ বিষয়ে যুক্তির দিক দিয়া সংক্ষেপে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, চৌদ্দশত বৎসরকাল হইতে স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, কোরআন শরীফ আল্লার কালাম তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত আল্লার বাণী কিতাব ও ফরমান এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেরিত আল্লার রসূল ও প্রতিনিধি। বিশ্বের বুকে আল্লার প্রেরিত ও নিয়োজিত এই মহান ব্যক্তি ও মহাবাণীর আবির্ভাবকালে

বিশ্ববাসীর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ—বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, ধার্মিক-অধার্মিক, সবল-দুর্বল, বড়-ছোট, রাজা-প্রজা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায়দা কৌশলে উক্ত দাবীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, কেহই উহাকে বানচাল করিতে সক্ষম হয় নাই। উক্ত দাবীদ্বয়ের প্রামাণ্যতা অটুট ও অক্ষুন্ন রাখার যথেষ্ট প্রমাণ সর্বদার জন্যও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে। মোসলেম সমাজ ঐ দাবীদ্বয়ে সর্বপ্রকার তর্কের প্রতিউত্তর দানে সর্বদা প্রস্তুত; সুতরাং উল্লেখিত বিষয় ও দাবীদ্বয় স্থিরীকৃত ও অবধারিত।

অত:পর ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, কাহাকেও স্বীয় মনীব স্বীকার করিয়া তাঁহার ফরমান ও প্রতিনিধিকে অস্বীকার করিলে সেই মনীবের সন্তুষ্টিভাজন হওয়া এবং তাঁহার নিকট পুরস্কৃত হওয়াকে কোন যুক্তিই সমর্থন করে না।

যুক্তির দিক দিয়া আর অধিক কিছু না বলিয়া মুসলমান সমাজকে সতর্ক রাখার জন্য তাহাদের প্রাণ-বস্তু কোরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোতে নিম্নলিখিত কতিপয় মোটামুটি বিষয় প্রমাণিত করা হইতেছে। যদ্দারা পূর্বোল্লিখিত ভ্রষ্টতাপূর্ণ মতবাদের অসাড়তা উজ্জ্বলাকারে প্রতীয়মান হইবে।

(১) কাফের ব্যক্তির জন্য কস্মিনকালেও পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ নাই। কাফের হওয়ার অপরাধ ও পাপে সে অনন্তকাল আজাব ভোগ করিবে।

(২) যে ব্যক্তিই হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান না আনিবে সে অনিবার্য্যত: কাফের পরিগণিত হইবে এবং অনন্তকালের জন্য নরকবাসী হইয়া আজাব ভোগ করিবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি কোরআন শরীফের উপর ঈমান না আনিবে সে কাফের হইবে এবং চিরকাল দোযখের আজাব ভোগ করিবে।

(৪) একমাত্র মোমেনের জন্যই পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত এবং পছন্দনীয় ও গ্রহণীয় ধর্ম; অন্য কোন ধর্মই আল্লার নিকট গ্রহণীয় নহে।

(৫) মোমেন বা মুসলমান পরিগণিত হওয়ার জন্য রসুল ও কোরআন উভয়ের প্রতি, বরং আরও কতিপয় বস্তুর প্রতি ঈমান ও স্বীকারোক্তি আবশ্যক।

(৬) যে কোন নেক আমল তথা ভাল কর্ম আল্লার নিকট গ্রহণীয় অর্থাৎ পরকালে বেহেশতের নেয়ামত-লাভ ও পরিত্রাণের সূত্র হওয়ার জন্য ঐ আমলকারী ব্যক্তির মোমেন মোসলমান হওয়া আবশ্যক।

(৭) কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে একেবারেই নিস্ফল প্রতিপন্ন হইবে। এমনকি ছওয়াব ও পুণ্যের উদ্দেশ্যে যত ধন-দৌলতই খরচ করুক পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণে সে উহার কোনই সুফল পাইবে না।

এইসব সত্য ও তথ্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা মুক্তিদাতা ও প্রতিফল দানের মালিক আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত আইনের সুস্পষ্ট ধারা। এই ধারাসমূহ কোরআন শরীফের বহু সংখ্যক আয়াত ও অনেক অনেক হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ প্রত্যেকটি ধারার সহিত কতিপয় প্রমাণ উল্লেখ করা হইবে।

১। কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই :

(১) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ.

অর্থ :—নিশ্চয় জানিও, যাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত কাফের রহিয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ থাকিবে এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত লোকদের পক্ষ হইতেও অভিশাপের পাত্র তাহারা হইবে। সেই অভিশাপের (আজাবের) মধ্যে তাহারা চিরকাল থাকিবে; মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের আজাব বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে একটুও অবকাশ দেওয়া হইবে না। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

(২) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيٰٓؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ. هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ :—যাহারা কাফের তাহাদের বন্ধু হয় শয়তান; শয়তানের দল তাহাদিগকে (ঈমানের) আলো হইতে (কুফুরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়া যায়; তাহারা নরকবাসী; চিরকাল তাহারা সেই নরকেই থাকিবে। (৩পাঃ ২ রুঃ)

(৩) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ.

অর্থ :—কাফেরদের ধন-জন তাহাদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাচাইবার জন্য বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহারা দোজখের জ্বালানী হইয়া থাকিবে। (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

(৪) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِافْتَدٰى بِهٖ ـ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

অর্থ :--যাহারা কাফের এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের এক একজন জগৎভর্তি স্বর্ণও যদি মুক্তি পাইবার জন্য আল্লার রাস্তায় খরচ করে তাহাও গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন সহায়তাকারী থাকিবে না। (৩ পা: ১৭ রু:)

(৫) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ :--নিশ্চয় যাহারা কাফের তাহাদের ধন-জন আল্লার আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং তাহারা নরকবাসী হইবে, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। (৪ পা: ৩ রু:)।

(৬) اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অর্থ :—নিশ্চয় যাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরী অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের (লক্ষ-কোটি কাফেরী-শেরেকী) কার্য্য-কলাপে আল্লার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না, পরন্তু তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পা: ৯ রু:)

(৭) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ـ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ـ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ـ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ

অর্থ :---শহরে-বন্দরে কাফেরদিগকে (জাকজমকের সহিত) চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধোকা খাইও না; ইহা অতি সল্পকালীন সুখ, অতঃপর তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, উহা অতি কষ্টের বাসস্থান। (৪ পা: ১১ রু:)

(৮) وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

অর্থঃ—আমি কাফেরদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (৫ পাঃ ৩ রুঃ)

(৯) إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

অর্থঃ—আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। (৫ পাঃ ১২ রুঃ)

(১০) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ـ

إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ـ

অর্থঃ—যাহারা কুফরীর ন্যায় অন্যায় করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমাকারী হইবেন না এবং জাহান্নামের পথ ব্যতীত অন্য পথ তাহাদিগকে দিবেন না। জাহান্নামের মধ্যেই তাহারা চিরকাল অনন্তকাল থাকিবে। (৬ পাঃ ৩রুঃ)

(১১) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ

لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ـ

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ـ

অর্থঃ—কাফের ব্যক্তিরা যদি সমস্ত জগৎবাসী ধন-সম্পত্তির দ্বিগুণের মালিকও হয় এবং উহা খরচ করিয়া পরকালের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে তাহাদের সেই চেষ্টাও বৃথা হইবে। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা দোযখ হইতে বাহির হওয়ার জন্য লালায়িত থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না। তাহাদের জন্য এমন আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে যাহার সমাপ্তি নাই। (৬ পাঃ ১০ রুঃ)

(১২) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ـ

অর্থঃ—যাহারা কাফের তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে হাকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। (৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ - (১৩)

অর্থ :—কাফেররা জাহান্নামের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। (১০ পা: ১৩ রু:)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ - (১৪)

অর্থ :—আমি কাফেরদিগকে সল্পকালের জন্য ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুযোগ-সুবিধা দান করিব, অতঃপর তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের মধ্যে পতিত হইতে বাধ্য করিব। (২১পা: ১২রু:)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۔ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم (১৫)

مِّنْ عَذَابِهَا ۔ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ -

অর্থ :—কাফেরদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তথায় তাহাদিগকে মরিতে দেওয়া হইবে না—মৃত্যুকে অনুমতি দেওয়া হইবে না তাহাদেরে স্পর্শ করিতে, সুতরাং মৃত্যু তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং জাহান্নামের আজাব তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না। প্রত্যেক কাফেরকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দান করিব। (২২ পা: ১৬ রু:)

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (১৬)

অর্থ :—কাফেরদের প্রতি তোমার প্রভু প্রবর্তিত বিশেষ নির্দেশ (Ruling) ইহাই যে, তাহারা নরকবাসী। (২৪ পা: ৬ রু:)

وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (১৭)

অর্থ :—কাফেরদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (২৫ পা: ৪রু:)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ (১৮)

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ -

অর্থ :—কাফেরদিগকে দোযখের সন্নিকটে দাঁড় করাইয়া বলা হইবে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহের মজা উড়াইয়াছ এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ

করিয়াছ। এখন তোমাদিগকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক আজাব ভোগ করিতে হইবে যেহেতু তোমরা দুনিয়াতে অনধিকাররূপে অহংকারে মত্ত হইয়া (সত্য ধর্ম হইতে) ঘাড় মোড়াইয়াছিলে এবং (আমার নির্দ্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করিতেছিলে। (২৬ পাঃ ২ রুঃ)

(১৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ

الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ـ

অর্থ:—যাহারা কাফের তাহারা (হয়ত দুনিয়াতে কিছু) সুখ ভোগ করিবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, কিন্তু শেষ ঠিকানা ও বাসস্থানরূপে দোযখই তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত। (২৬ পাঃ ৬ রুঃ)

(২০) اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ـ

অর্থ:—কাফেরদের জন্য আমি অসংখ্য শিকল, গলাবদ্ধ এবং প্রজ্জলিত ভীষণ অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (২৯ পাঃ ১৯ রুঃ)

২। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর উপর ঈমান না আনিলে ?

(১) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا

وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ

অর্থ:—যাহারা আল্লার নাফরমানী করিবে এবং আল্লার রসুলের নাফরমানী করিবে এবং আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবে আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামে দাখেল করিবেন। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তাহাদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পাঃ ১৩ রুঃ)

(২) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ

الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ـ

অর্থ:—যে ব্যক্তি রসুলের বরখেলাফ চলিবে—হেদায়েতের পথ তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল হওয়ার পরে, অর্থাৎ মোমেনদের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ অবলম্বন করিবে। (পরীক্ষা ক্ষেত্র দুনিয়াতে) আমি তাহার জন্য তাহার অবলম্বিত পথে বাধার সৃষ্টি করিব না, কিন্তু (ফল ভোগের সময় পরকালে) তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইব। (৫ পাঃ ১৪ রুঃ)

আয়াতটি কত স্পষ্ট ও বিস্তারিত!

(৩) وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ـ

অর্থ:—যাহারা আল্লার সঙ্গে কুফ্‌রী করিবে, তাঁহার ফেরেশতাদের সম্বন্ধে কুফ্‌রী করিবে, তাঁহার কিতাবসমূহ সম্বন্ধে কুফ্‌রী করিবে, তাঁহার রসূলগণ সম্বন্ধে কুফ্‌রী করিবে পরকালের দিন সম্বন্ধে কুফ্‌রী করিবে নিশ্চয় তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া সত্য পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। (৫ পারা ১৭ রুকু)

(৪) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ

وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ـ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ـ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

অর্থ:—যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসূলগণের সঙ্গে কুফ্‌রী করে এবং চায় যে, আল্লার মধ্যে এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) পার্থক্য প্রবর্তন করে এবং এইরূপ উক্তি করে যে, আমরা কতেকের উপর (যেমন আল্লার উপর) ঈমান রাখি এবং কতেকের উপর (যেমন, রসূলের উপর) ঈমান রাখি না এবং এইরূপে (কাটছাট করিয়া কতেক বাদ দিয়া কতেক রাখিয়া) মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বন করার অভিপ্রায় রাখে তাহারা নিঃসন্দেহে কাফের। এই সব কাফেরদের জন্য আমি এমন আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যেই আজাবে তাহারা চিরকাল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকিবে। (৬ পারা ১ রুকু)

(৫) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ـ

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ....

অর্থ:—হে মানব! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পক্ষ হইতে সত্য (ধর্ম) নিয়া তাঁহার রসূল তথা তাঁহার প্রতিনিধি তোমাদের নিকট পৌছিয়াছেন। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা (সেই রসূলকে এবং তিনি যে সত্য ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন উহাকে) মানিয়া ও

গ্রহণ করিয়া লও। তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। আর যদি তোমরা তাঁহাকে অমান্য ও অগ্রাহ্য কর তবে তাহা হইবে কুফরী। কুফরী করিলে স্মরণ রাখিও, (আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। কারণ,) জমিন-আসমানের মালিক আল্লাহ; এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন। (কে কোথায়, কবে কুফরী করিয়াছে সব তিনি অবগত। অবশ্য হয়ত শাস্তি-বিধান যখন তখন করেন না বা অন্য কাহারও মতামত অনুযায়ী করেন না; যেহেতু তিনি) সর্বাদিক বুদ্ধিমান (তাই অন্যের প্রভাবে তিনি শাস্তি-বিধান করেন না! তিনি যে নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারিত রাখিয়াছেন সেই অনুসারে শাস্তি দিবেন।) (৬ পারা ৩ রুকু)

(৬) وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ

وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ:—যে ব্যক্তি আল্লার বরখেলাফ চলিবে এবং আল্লার রসুলের বরখেলাফ চলিবে (তাহার জন্য) আল্লাহ ভীষণ শাস্তিদাতা। (শাস্তি ভোগে বাধ্য করার সময় তিরস্কার স্বরূপ ঐ শ্রেণীর লোকদেরে বলা হইবে,) এই শাস্তি ভোগ করিতে থাক এবং জানিয়া রাখ, (তোমাদের ন্যায়) কাফেরদের জন্য দোযখের আজাবই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

(৭) اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

অর্থ:—তাহারা কি জানে না যে, যে কেহই আল্লার বরখেলাফ চলিবে এবং তাঁহার রসুলের বরখেলাফ চলিবে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, অনন্তকাল সে সেই জাহান্নামের আগুনে থাকিবে। (১০ পাঃ ১৪ রুঃ)

(৮) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا.

অর্থ:—ঐ দিনকে স্মরণ কর, যে দিন অত্যাচারকারী কাফের স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া নিজের হাত কামড়াইতে থাকিবে এবং বলিবে, আ...হ! যদি আমি রসুলের সঙ্গে থাকার পথ অবলম্বন করিতাম! (১৯ পাঃ ১ রুঃ)

(৯) اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا. خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا.

لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ

اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا.

অর্থ :—আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের প্রতি অভিশাপের ঘোষণা জারী করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা চিরকাল অনন্তকাল উহার মধ্যে থাকিবে। সেখানে তাহারা কোন পক্ষ সমর্থনকারী বা সাহায্যকারী পাইবে না। যে দিন দোযখের মধ্যে তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব অগ্নি দগ্ধ করা হইবে, সে দিন তাহারা অনুতপ্ত হইয়া বলিবে, আ হা! যদি আমরা আল্লার ফরমাবরদারী-বশ্যতা স্বীকার করিতাম এবং রসুলের ফরমাবরদারী করিতাম! (২২ পাঃ ৫ রুঃ)

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ـ (১০)

অর্থ :—যুগে যুগে কাফেরদের অবস্থা একই রূপ হইয়াছে—তাহারা সকলেই রসুলের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর আজাব ও শাস্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। (২৩ পাঃ ১০ রুঃ)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ـ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ (১১)
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ـ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ـ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ـ فَبِئْسَ
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ـ

অর্থ :—কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। তাহারা জাহান্নামের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর উহার দরওয়াজা খোলা হইবে এবং জাহান্নামের কার্য্যপরিচালকগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট তোমাদেরই স্বজাতি (মানুষ) রসুলরূপে আসিয়াছিলেন না কি? তাঁহারা তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর (কিতাবের) আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন না কি? এবং তোমাদের সম্মুখে এই দিনটি উপস্থিত হইবে বলিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন না কি? তাহারা উত্তর করিবে—হাঁ, আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আল্লার আজাবের আইন (আমাদের ন্যায় বদ-নছীব) কাফেরদের উপর প্রয়োগ হওয়ার ছিল তাহা হইয়াছে।

অতঃপর তাহাদের প্রতি আদেশ জারী হইবে যে, দোযখের ফটক সমূহে প্রবেশ কর, তোমাদের দোযখেই থাকিতে হইবে। (রসুলের প্রচারিত সত্য ধর্ম হইতে) অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী অহংকারীদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান; জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ এবং কষ্টের স্থান। (২৪ পাঃ ৫ রুঃ)

(১২) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ۔

وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا۔

অর্থ—যে ব্যক্তি আল্লার ফরমাবরদারী করিবে, আল্লার রসুলের ফরমাবরদারী করিবে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইবেন, সেখানে আরামের জন্য নদী ও নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ ফরমাবরদারী হইতে বিরত থাকিবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা কষ্টদায়ক আজাব দিবেন। (২৬ পাঃ ১০ রুঃ)

(১৩) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا

অর্থঃ—যাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিবে এবং তাঁহার রসুলের নাফরমানী করিবে তাহাদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, সেখানে তাহারা চিরকাল অনন্তকাল থাকিবে। (২৯ পাঃ ১২ রুঃ)

* মোসলেম শরীফের ৮৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ আছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার যুগের বিশ্বমানবের যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত এমনকি ইহুদ ও নাছারা (যাহারা আল্লাহ-প্রেরিত ধর্ম আল্লার রসুল ও কিতাবের অনুসারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে) তাহাদের মধ্যে হইতেও যে কোন ব্যক্তি আমার আবির্ভাবের সংবাদ অবগত হইয়া আমার আনীত দীন ও ধর্মের প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে অনিবার্য্যরূপে দোযখী হইবে।

৩। পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান না আনিলে?

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থঃ—যাহারা আল্লার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার না করিবে তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৩ পাঃ ৯ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ۔

অর্থ :—যাহারা (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার করিবে না অচিরেই আমি তাহাদিগকে দোযখের আগুনে ঢুকাইব। যতবার তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইয়া পাকিয়া যাইবে—পাকিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্তে নূতন চামড়া আমি বদলাইয়া দিব। এইরূপ এই জন্য করা হইবে, যাহাতে তাহারা আজাবের কষ্ট ভালরূপে ভুগিতে থাকে। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۔ (৩)

অর্থ :—আল্লাহ্ (পবিত্র কোরআনে) যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবে তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফের। (৬ পাঃ ১১ রুঃ)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ (৪)

يَصْدِفُونَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۔

অর্থ :—যাহারা আল্লার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার করে না এবং উহা হইতে ফিরিয়া থাকে তাহাদের চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কেহ নাই, তাহাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেহ নাই। যাহারা আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহ হইতে ফিরিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমি তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার দরুণ প্রতিফল স্বরূপ কঠিন আজাব ভোগাইব। (৮ পাঃ ৭ রুঃ)

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ (৫)

অর্থ :—যে কোন দলের লোক কোরআনকে না মানিবে তাহাদের জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১২ পাঃ ২ রুঃ)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (৬)

অর্থ :—যাহারা আল্লার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান না আনিবে এবং উহাকে স্বীকার না করিবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে হেদায়েত দান করিবেন না, অর্থাৎ অনিবার্য্যতঃ তাহারা পথভ্রষ্ট থাকিয়া যাইবে এবং তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি ও আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১৪ পাঃ ১০ রুঃ)

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي (৭)

أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۔

অর্থ ঃ—যখন তাহাকে আমার কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হয় তখন সে উহা গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক এইরূপে পাশ কাটিয়া চলিয়া যায় যেন সে উহা শুনেই নাই, যেন তাহার কানের মধ্যে ডাট পুরিয়া রাখা হইয়াছে। (এই ধরণের লোক যাহারা) তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দিন। (২১ পাঃ ১০ রুঃ)

(৮) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ـ

"যাহারা স্বীয় প্রভুর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিবে তাহাদের জন্য ঘৃণিত ও ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।" (২২ পাঃ ১১ রুঃ)

(৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

অর্থ ঃ—যাহারা আমার কোরআনের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা দোযখী। (২৭ পাঃ ১৮ রুঃ)

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ ঃ—যাহারা আমার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা দোযখী হইবে, চিরকাল তাহারা দোযখে থাকিবে। (২৮ পাঃ ১৫ রুঃ)

বিশেষ লক্ষ্যণীয় ঃ প্রথম শিরোনাম—"কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই" ইহার প্রমাণে ২০টি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, দ্বিতীয় শিরোনামের ১৩টি আয়াত, তৃতীয় শিরোনামের ৯টি আয়াত এবং চতুর্থ শিরোনামের ২নং আয়াতও প্রথম শিরোনামের বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং "কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের নাজাত ও মুক্তি নাই" এই সত্যের পক্ষে মোট ৪৩টি আয়াত পবিত্র কোরআন শরীফে বিদ্যমান আছে।

৪। মোমেনদের জন্যই মুক্তি—একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লার নিকট গ্রহণীয়।

(১) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ ঃ—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে একমাত্র তাহারাই বেহেশতবাসী, তাহারা চিরকাল সেখানে থাকিবে। (১ পাঃ ৯ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ -

অর্থ :—যাহারা কাফের তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়াছে একমাত্র তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার। (২২ পাঃ ১৩ রুঃ)

(৩) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার নিকট গ্রহণীয় ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

(৪) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থ :—যে কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন—ধর্ম অবলম্বন করিবে তাহার সেই অবলম্বিত ধর্ম কস্মিনকালেও গ্রহণীয় হইবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। (৩ পাঃ ১৭ রুঃ)

বোখারী শরীফ ৪৩১ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ আছে—বেলাল (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশক্রমে ঢোল-শোহরতের সহিত এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ

"ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মোসলমান হইয়াছে—কেবলমাত্র সেই মোসলমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না।"

মোসলেম শরীফে ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন--

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا

অর্থ :—যে আল্লার হাতে আমার জান তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, মোমেন না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে না।

৫। মোমেন ও মোসলমান হওয়ার জন্য কি কি আবশ্যক?

(১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থঃ—হে ঈমানের দাবীদারগণ! তোমাদিগকে ঈমান আনিতে হইবে আল্লার প্রতি, আল্লার রসুলের প্রতি এবং ঐ কেতাবের প্রতি যে কেতাব আল্লাহ স্বীয় রসুলের উপর নাযেল করিয়াছেন। (৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ ... فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ

وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

অর্থঃ যাহারা রসুলে-উম্মীর প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহার সহযোগিতা করিবে এবং ঐ আলোর অনুসরণ করিবে যে, আলো তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে; একমাত্র তাহারাই মুক্তি এবং জীবনের সফলতা লাভ করিবে (আলো অর্থাৎ কোরআন)। (৯ পাঃ ৯ রুঃ)

আলোচ্য ৫নং বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ বোখারী শরীফ ১ম খণ্ডে ৪৬ নং হাদীছে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছের মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিব্রাঈল ফেরেশতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঈমান ও ইসলামের বিবরণ দান করিয়াছেন। উক্ত হাদীছকে হাদীছে-জিব্রাঈল বলা হয়। বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফ প্রত্যেক কিতাবেই ঐ হাদীছখানা বর্ণিত আছে।

৬। যে কোন আমল আল্লার নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

অর্থঃ—যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাল কাজ—নেক আমল করিবে, যদি সে মোমেন হয় তবেই তাহার সেই সৎ কার্য্যগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে এবং তাহার সে সাধনা বৃথা যাইবে না এবং আমি তাহা লিখিয়া রাখিব। (১৭ পাঃ ৭ রুঃ)

৭। কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম আখেরাতে নিষ্ফল হইবে।

(১) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ

حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ- وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

অর্থঃ—কাফেরগণ (পুণ্য ও পরকালের ভাল প্রতিদানের আশায়) ইহকালীন জীবনে যাহা কিছু দান-খয়রাত করিয়া থাকে (তাহাদের কাফের হওয়ার দরুণ ঐ দান-খয়রাত পরকালে নিষ্ফল ও বরবাদ প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে) উহার অবস্থা ঐ ফসলে পরিপূর্ণ

জমীনের ন্যায় যাহার মালিক কাফের এবং ঐ জমীনের **উপর** ভীষণ হীমবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় বরফ জমিয়া সমুদয় ফসল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (কাফেরদের দান-খয়রাতের এই পরিণতি সংক্রান্তে) আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অন্যায় বা জুলুম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে---নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

পাঠকবর্গ! কি উজ্জল দৃষ্টান্ত! ফসলে পরিপূর্ণ জমীনের সমুদয় ফসল বরফ-বায়ুর দরুণ নষ্ট হইয়া যায়; উহা হইতে একটি দানাও লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। তদ্রূপ কাফের ব্যক্তির সমুদয় দান-খয়রাত তাহার কাফের হওয়ার দরুণ নষ্ট ও নিস্ফল প্রতিপন্ন হইবে।

দৃষ্টান্তের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ফসলের জমীর মালিক কাফের উল্লেখ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু মোসলমানগণ আপদে-বিপদে ছওয়াব ও পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন মোসলমান ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইলে দুনিয়ার দিক দিয়া যদিও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ফসল জন্মাইতে তাহার শ্রম ও তাহার চেষ্টাসমূহ নিস্ফল হয়, কিন্তু পরকালে সে এই ক্ষতির প্রতিদানে ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে কোন কাফের ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইয়া গেলে সে ঐরূপ প্রতিদানের উপযুক্ত নয় বলিয়া ঐ ফসল জন্মাইতে তাহার যত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার সমুদয় পরিশ্রম ও চেষ্টা সর্বদিক দিয়াই বৃথা ও নিস্ফল হইয়া যায়---দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক দিয়া। অতএব, কাফেরদের দান-খয়রাত পরকালে সম্পূর্ণরূপে বৃথা নিস্ফল প্রতিপন্ন হওয়া বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তে জমির মালিক কাফের বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা কাফেরদের দান-খয়রাত বৃথা ও নিস্ফল প্রতিপন্ন করিয়া স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন—"(তাহাদের দান-খয়রাত বৃথা ও নিস্ফল প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে।" (যেহেতু তাহারা দান-খয়রাত ইত্যাদি আমল আল্লার নিকট গ্রহণীয় হওয়ার অন্যতম শর্ত ঈমান অবলম্বন করে নাই।)

(২) وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থঃ---যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করিবে তাহার সমুদয় আমল ও নেক কার্য বরবাদ হইয়া যাইবে এবং সে পরকালে সর্বহারা ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত হইবে। (৬ পাঃ ৫ রুঃ)

(৩) مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ -

অর্থ :—যাহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে অস্বীকার করিয়া কাফের হইয়াছে তাহাদের সমুদয় আমল এবং সৎকাজ সমূহের অবস্থা এইরূপ, যেমন—কতগুলি ছাই-ভস্ম যাহার উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। (এমতাবস্থায় যেরূপ ঐ ছাই-ভস্মের অণু-পরমাণুগুলি কোথাও কাহারও হাতে আসিতে পারে না, তদ্রূপ) কাফের স্বীয় কৃতকর্মের সুফল লাভ করার কোন সুযোগই পাইবে না। (১৩ পাঃ ১৫ রুঃ)

(৪) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً

অর্থ :—কাফেরদের কৃতকর্মসমূহ মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়; যাহাকে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি দূর হইতে পানি মনে করে, কিন্তু দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তখন উপলব্ধি করিতে পারে যে, ইহা পানি নয় যাহা পান করিয়া সে প্রাণ রক্ষা করিবে, বরং ইহা সেই মরুভূমির ভীষণ উত্তাপ—যাহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (তদ্রূপ কাফের ব্যক্তি এই জগতে অনেক কার্য্য এরূপ করিয়া থাকে যাহাকে সে নিজের জন্য পরকালে সুফল প্রদায়ক মনে করে, কিন্তু পরকালে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইয়া সে দেখিতে পাইবে যে, উহা তাহার জন্য কোন প্রকার সুফল প্রদায়কই নয়, বরং সেই কঠিন সময়ে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত তথা চির-আজাবের সম্মুখীন হইবে।) (১৮ পাঃ ১১ রুঃ)

(৫) وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

অর্থ :—আল্লাহ বলেন— (কাফেররা যাহা কিছু আমল তথা ভাল কর্ম করে উহা আমার নিকট গ্রহণীয় নয় বলিয়া) আমি তাহাদের আমল বা ভাল কর্মসমূহকে ধুলা-বালুর অণু-কণার ন্যায় বিলীন করিয়া দিব—ধর্তব্যের আওতা হইতে বাদ দিয়া দিব; (উহার উপর প্রতিফল দানের প্রশ্নই উঠিবে না।) (১৯ পাঃ ১ রুঃ)

(৬) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ـ

অর্থ :—(কাফেরদের আজাব ও দুর্দশা এই জন্য হইবে যে,) তাহারা ঐ কেতাবকে অগ্রাহ্য করিয়াছে যে কেতাব আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিয়াছেন; সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমুদয় আমল এবং সৎ কার্যাবলীকে নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (২৬পাঃ ৫রুঃ)

পাঠকবর্গ! উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনায় কোরআনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত দেখিতে পাইলেন যে, পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং কোরআনের প্রতি ঈমান অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। বরং আল্লার কোরআন ও রসূলের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আরও কতিপয় বস্তুর প্রতিও ঈমান আবশ্যক। বস্তুতঃ রসূলের হাদীছ ও আল্লার কোরআন ইহাই ইসলাম; এই ইসলাম ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই।

● কোরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আসিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে অন্য বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঈমানের কথা উল্লেখ হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থানে ঈমানের বিষয়বস্তুগুলিকে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ না করিয়া শুধু ঈমান বা ঈমানের শুধু মূল জিনিষ উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐরূপ কোন আয়াত বা হাদীছের বাক্য দেখিয়া কোন কোন লোক ধোকায় পড়িয়াছে যে, একমাত্র আল্লার প্রতি ঈমান থাকিলেই দোযখ হইতে মুক্তি লাভ হইবে—যদিও রসুল ও কোরআন ইত্যাদির প্রতি ঈমান না থাকে। যেমন কোরআনের ১ম ছিপারায় একটি আয়াত আছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

এই আয়াতটি দ্বারা এমন অনেকে ধোকা খাইয়া থাকে, যাহারা নিজকে তফছীরকার-রূপে প্রকাশ করে, অথচ তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষা লাভ করে নাই। বরং অভিধান বা অনুবাদ দেখিয়া এবং শব্দার্থের অনুবাদের সাহায্যে তফছীরকার সাজিয়াছে। ফলে তাহারা ঐ মানুষ-মারা ডাক্তারের ন্যায় তফছীরকার হইয়াছে—যে ডাক্তার অভিজ্ঞ ডাক্তার-শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ না করিয়া শুধু অভিধান ও অনুবাদের সাহায্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নামিয়াছে। এরূপ কার্য্যের কুফল যে কি মারাত্মক তাহা অতি সুস্পষ্ট। আর এক শ্রেণীর তফছীরকার আছে যাহারা সাত অন্ধ কর্তৃক হাতীর আকার নির্ণয়ের ন্যায় মুক্তি ও পরিত্রাণের মূল শর্ত ঈমানকে শুধুমাত্র এইরূপ সংক্ষিপ্ত দুই চারিটি আয়াত দ্বারাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সব অগণিত আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না, যে সবের দ্বারা ঈমান রত্নের বিস্তারিত বিবরণ উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মোসলমান সমাজের ঈমান রক্ষার্থে উক্ত আয়াতটির বিস্তারিত বিবরণ সহ তফছীর করা হইতেছে। যে তফছীর শুধু আজই নয়, বরং শত শত বৎসর পূর্ব হইতে বহু বহু তফছীর-কারগণের তফছীর-কেতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন।

এই আয়াতটি মদীনায় নাযেল হইয়াছে। অর্থাৎ ইসলামের দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে—যখন মোসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তখন নাযেল হইয়াছিল। তখন মদীনা শরীফে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাই শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর উন্নত ছিল। পবিত্র কোরআনেরই বর্ণনায় দেখা যায়, ইহুদীদের এবং নাছারা-খৃষ্টানদের এই আকিদা এবং দাবী ছিল যে, আমরা (ইহুদী-নাছারাগণ) নবীর বংশ, তাই আমরা আল্লার অতি আদরণীয় এবং প্রিয়পাত্র। এই আকিদা সূত্রে তাহারা এই দাবীও করিত যে,

আমরা কোন অবস্থাতেই দোযখে যাইব না। যদিই বা একান্ত যাইতে হয় তবে মাত্র অল্প কয়েক দিন সেখানে থাকিতে হইবে; তৎপর আমরা বেহেশত পাইব।

উল্লিখিত আকিদা ও দাবীর দ্বারা স্পষ্টতঃই আভাস পাওয়া যায় যে, তাহারা যেন আল্লাহ তায়ালার সংগে ঔরস বা নীরাস জাতীয় সম্বন্ধের ন্যায় কোন সম্বন্ধের মালিকানায় বিশ্বাসী। এমনকি তাহারা নিজকে "ابناء الله—আবনাউল্লাহ" আল্লার সন্তান-সন্ততি বলিয়া আখ্যায়িত করিত। এই বিশ্বাসের কুফল এই ফলিয়াছিল যে, ইহুদীবাদের ও নাছরাণীবাদের সমাপ্তি এবং হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুওয়াত অকাট্য ও স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বুক ফুলাইয়া তাঁহার বিরোধীতা করিতে প্রয়াস পাইত এবং তাঁহার আনীত দীনকে গ্রহণ না করার বিষময় ফলের আইনগত শাস্তির ঘোষণা যখন দেওয়া হইত, তখন উহার প্রতিবাদে তাহারা নির্ভীক চিত্তে উল্লিখিত দাবী ও আকিদা প্রকাশ করিয়া থাকিত। লক্ষ্য করুন—ঐ ভুল ধারণা ও মিথ্যা আকিদার ফলাফল কত মারাত্মক ছিল! তাই ইহুদীদের এবং নাছারাদের ঐ দাবীর অসারতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তায়ালা মুক্তি ও পরিত্রাণের ব্যাপারে স্বীয় নীতি উল্লেখ করতঃ এই আয়াতখানা নাযেল করেন এবং এরূপ ব্যাপক আকারের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেন, যাহাতে বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও সকল সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ করিতে এই নীতিই যথেষ্ট হয়। কেহই যেন আর ঐ ইহুদীবাদের বা নাছরাণীবাদের ন্যায় শুধু জন্মগত, বংশগত, বর্ণগত, ভাষাগত বা দলগত ভরসায় বসিয়া না থাকে, বরং প্রত্যেকেই যেন তাহার নাজাত এবং সাফল্য নিজের ঈমান ও আমলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উপলব্ধি করে।

এই আয়াতে বর্ণিত নীতিটি হইল এই যে, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালার এমন কোন সম্বন্ধ নাই যাহার ভিত্তিতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দেওয়া হইবে, বরং মুক্তির জন্য দুইটি গুণ অর্জনের আবশ্যক। একটি হইল ঈমান, দ্বিতীয়টি হইল আমলে-ছালেহ বা সৎকাজ। এই দুইটি গুণের উপরই নির্ভর করে মানুষের মুক্তি এবং জীবনের সাফল্য। অবশ্য যে যুগে এই গুণদ্বয় যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, মুক্তিও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু মুক্তির এই সীমাবদ্ধতা এই জন্য কখনও হইবে না যে, ঐ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আল্লার সঙ্গে আছে---যেমন ইহুদী ও নাছারাগণ ধারণা জন্মাইয়া রাখিয়াছে। বরং এই জন্য হইবে যে, মুক্তির শর্তদ্বয় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

এই বর্ণনা হইতে একটি বিষয় ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন যে, কোরআন-হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত ইসলাম ধর্মের অতি আবশ্যকীয় এই আকিদা যে—একমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যে তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এবং কোরআনকে মানিয়া চলার মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে, অন্য কোন পথে ও মতে মুক্তি পাওয়া

যাইবে না। এই আকিদা এবং পূর্বোল্লিখিত ইহুদীদের আকিদার মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য এই যে, ইহুদীগণ বিশেষ সম্বন্ধের ভিত্তিতে অর্থাৎ বংশের ভিত্তিতে এবং দলভুক্তির ভিত্তিতে মুক্তির আশা ও আকিদা রাখে এবং এই কারণেই অকাট্যরূপে ইহুদীয় ধর্মমতের যুগের পরিসমাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার পরেও তাহারা সত্য ইসলাম ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইহুদী নামের এবং বংশের জোর দেখাইয়া মুক্তির দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে মোসলমানগণের আকিদার মূল হইতেছে এই যে, মুক্তির শর্ত ও ভিত্তি হইল ঈমান ও (গ্রহণীয়) আমলে ছালেহ; কোন বংশ, সম্প্রদায় বা দল নহে। অবশ্য সেই শর্ত এই যুগে অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীনে-ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সে জন্য কেয়ামত পর্য্যন্ত মুক্তিও এই ধর্মেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই উভয় সীমাবদ্ধতার প্রমাণ পূর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

অতঃপর আরও একটি জরুরী বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, মুক্তি ও পরিত্রাণের মূল শর্ত ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ যাহা কোরআন ও হাদীছের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, আল্লাহ, আল্লার রসূল, আল্লার কেতাব, আল্লার ফেরেশতা এবং পরকাল ও তকদীরের উপর ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। যেমন পূর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের ২, ৩ ও ৪নং বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআন-হাদীছের কোন কোন স্থানে ঐ ঈমান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ হওয়া অতি স্বাভাবিক, কারণ কোন একটি প্রশস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইলে উহা কোন কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। তাই সৎ-নিয়্যত ও বুদ্ধিমান লোকের কাজ হইবে মুক্তির ব্যাপারে কোরআন-হাদীছের সমুদয় বিবরণকে সম্মুখে রাখিয়া তৎপর মুক্তির পথ নির্দ্ধারণ করা। পূর্বালোচিত ৫৬টি আয়াত ও ৫ খানা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত সাতটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা করুন, তবেই মুক্তির পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি ঐ বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শুধু সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আয়াতসমূহের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মুক্তির পথ নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করেন, তবে আপনি হাতীর আকার নির্ণয়কারী সাত অন্ধের ন্যায় হাস্যস্পদ একজন অন্ধরূপে পরিগণিত হইবেন এবং গোমরাহীর তিমিরময় গর্তে নিপতিত হইয়া স্বীয় মুক্তির পথ হারাইয়া বসিবেন।

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ

আমাদের কর্তব্য—সত্য কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতের সরল অর্থ ঃ

মোমেন অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়, ইহুদী সম্প্রদায়, নাছরানী সম্প্রদায় এবং ছাবেয়ী সম্প্রদায় (ইত্যাদি -- বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের মধ্য হইতে) যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি (খাঁটিভাবে) ঈমান স্থাপনকারী এবং সৎ কার্য্যাদি অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য স্বীয় পালনকর্তার নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং তাহারা পরকালে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিবে।

এই আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নাই, বরং উহার বিষয়বস্তু সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। কারণ এইস্থানে বর্ণনার আসল বিষয়বস্তু ঈমানের বিস্তৃত বিবরণ নহে, বরং এইস্থানের আসল বিষয়বস্তু হইয়াছে ফের্কা-বন্দির এবং দলীয় নাম জারীর ভুল ধারণাকে সংশোধন করা। অবশ্য কোরআন ও হাদীছের সমুদয় বিবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই সংক্ষেপের মধ্য হইতেই ঈমান সম্বন্ধীয় সব কিছু ফুটিয়া উঠিবে। প্রধানতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখা ; ইহা আল্লার প্রতি ঈমান রাখার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষতঃ এই কারণে যে, রসুল আল্লারই প্রতিনিধি। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৪৮নং হাদীছেও ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে— উক্ত হাদীছের চতুর্থ পাদটিকা দ্রষ্টব্য। তদ্রূপ কোরআনের প্রতি ঈমানও আল্লার প্রতি ঈমানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কারণ কোরআন শরীফ আল্লারই ফরমান ও বাণী। অতঃপর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানও এই সঙ্গে জড়িত। কারণ আল্লার বাণী কোরআন তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের নিকট ফেরেশতার মারফতেই পৌঁছিয়াছে। তকদীরের প্রতি ঈমানও আল্লার উপর ঈমানেরই অংশ। প্রথম খণ্ডে ৪৬নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার দুইটি গুণ বা ছেফতের সমষ্টি হইতেই তকদীর নামক বিষয়ের উৎপত্তি, সুতরাং ঐ ছেফতের উপর ঈমান রাখা আল্লার উপর ঈমান রাখারই অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা এই যে, মুক্তির মূল শর্ত ঈমানের ছয়টি বিষয়বস্তুর প্রথমটি অর্থাৎ "আল্লার প্রতি ঈমান" এর মধ্যেই আরো চারিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। (১) রসুলের প্রতি ঈমান (২) কোরআনের প্রতি ঈমান (৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান (৪) তকদীরের প্রতি ঈমান। এই সবের বিস্তারিত বর্ণনা এবং উহা ঈমানের অঙ্গ হওয়া কোরআন-হাদীছের বহু স্থানে উল্লেখ হইয়াছে ; অবশ্য সংক্ষেপ করার জন্য কোন কোন স্থানে ঐ কতিপয় বস্তুর সমষ্টির উপর একটি শিরোনামার ন্যায় আল্লার প্রতি ঈমানকে উল্লেখ করা হইয়াছে--যেহেতু অন্য চারিটি উহার অন্তর্ভুক্ত। কুচক্রিরা এই সংক্ষিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে।

তাহারা এই আয়াতে আরও একটি প্রতারণার ফন্দি এইরূপে গ্রহণ করে যে, একমাত্র মোসলমানগণের জন্য মুক্তি সীমাবদ্ধ হইলে ইহুদী, নাছারা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বরাবরে الذين امنوا "যাহারা মোমেন হইয়াছে" বলিয়া মোসলমান সম্প্রদায়কে কেন উল্লেখ করা হইল ?* এই প্রশ্নের মীমাংসা পূর্ববর্তী তফছীরকারকগণ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুচক্রিগণ সেই পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম কোথায় ? তাহাদের বিদ্যার সীমা অভিধান বা অনুবাদ।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে মোমেন তথা মোসলেম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করার মধ্যে অতি বড় দুইটি তথ্যপূর্ণ বিষয় ও উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথম এই যে, ان الذين امنوا "যাহারা মোমেন" ইহার উদ্দেশ্য হইল—যাহারা মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছে। এই মোমেন হওয়ার দাবীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মোনাফেক ছিল এবং সব যুগেই এরূপ থাকে। মোনাফেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাহারা প্রকাশ্যে মোমেন ও মোসলেম দলভুক্ত হইলেও ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় চিরতরে মুক্তি হইতে বঞ্চিত। তাই ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় মোমেন নামধারী মোনাফেকগণকেও সতর্ক করা আবশ্যক যে, খাটিভাবে ঈমান আনিয়া আমলে-ছালেহ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে নতুবা নহে। মোনাফেকগণ কোনও ভিন্ন সম্প্রদায়রূপে নির্দিষ্ট থাকে না, বরং বাহ্যতঃ মোমেন সম্প্রদায়রূপেই পরিচিত হইয়া থাকে, তাই ইহুদ-নাছারাদের বরাবরে সতর্কবাণীর আওতাভুক্ত করিয়া মোমেন সম্প্রদায়কেও উল্লেখ করা নিতান্ত সমুচিতই হইয়াছে। বন্ধুত্ব ভিত্তিক সতর্কবাণীর মধ্যে বন্ধুদের উল্লেখ বাহ্যতঃ আবশ্যক মনে না হইলেও বস্তুতঃ এই জন্য উহার আবশ্যক রহিয়াছে যে, বন্ধুত্বের মুখোসধারীরা ইহার দ্বারা সতর্ক হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় তথ্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা এই যে, এই আয়াত নাযেল হওয়াকালে মোমেন-মোসলমানগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়রূপে পরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা একমাত্র এই ভিত্তিতে যে, মুক্তি ও পরিত্রাণের মুল শর্ত ঈমান এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহুদীদের ন্যায় এরূপ ধারণা যে, আল্লার সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রহিয়াছে

* এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারা আরও একটি বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে যে—ইহুদী, নাছারা, ইত্যাদি সম্প্রদায় সমূহের সঙ্গে الذين امنوا "যাহারা ঈমান আনিয়াছে" বলিয়া মোমেন সম্প্রদায়কে উল্লেখ করা হইল—অথচ এখানে এই কথার উপর বাক্য শেষ করা হইয়াছে যে, যে কেহ ঈমান ও আমলে-ছালেহ করিবে সে-ই মুক্তি পাইবে। এই ঘোষণা ইহুদী, নাছারা, ইত্যাদি ঈমানহীন সম্প্রদায়গণের প্রতি প্রবর্তিত করা বোধগম্য, কিন্তু পূর্ব হইতে যাহারা ঈমানদার তাহাদের প্রতি এই ঘোষণা কেন ?

তাহার ভিত্তিতে তাহারা মুক্তির হকদার তাহা কখনও নহে। পরন্তু ঐরূপ ইহুদীবাদের মূল উচ্ছেদের জন্যই এখানে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নীতি ও মুক্তির আইন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই নীতি ও আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বিধায় ইহুদীদের সঙ্গে সেই যুগের অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহকেও উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় এখানে মোমেন বা মোসলেম নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করাও আবশ্যক। কারণ এই সম্প্রদায়ও আল্লাহ তায়ালার ঐ নীতি ও আইনের বহির্ভূত নহে। মোমেন ও মোসলেম সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি ইহুদীদের ন্যায় ধারণা জন্মাইলে সেই ব্যক্তিও বিকৃত গণ্য হইবে এবং সেও নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।* অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, ইহুদীবাদ ভিন্ন কথা এবং মুক্তির শর্ত মোমেন মোসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি ও পরিত্রাণ তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কথা। এবং ইহাও অতি স্পষ্ট যে, নীতি বা আইন কখনও সীমাবদ্ধাকারে ঘোষিত হয় না বটে, কিন্তু উহার ফলাফল বাস্তব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধরূপেই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন বাদশাহ স্বীয় নীতি ও আইন এইরূপে ঘোষণা করে যে—শত্রু-মিত্র যে-ই আমার খাটী অনুগত হইবে আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব। লক্ষ্য করুন, এই ঘোষণা যাহা একমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধেই ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে মিত্রের উল্লেখ কতইনা সুন্দর হইয়াছে! আলোচ্য আয়াতকে এই দৃষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা করুন।

উল্লিখিত বিবরণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতের সারমর্ম এই—"যাহার মধ্যে খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ গুণদ্বয় পাওয়া যাইবে, সে-ই মুক্তি পাইবে; চাই সে প্রথম হইতেই মোমেন সম্প্রদায়ভুক্ত আছে বা ইহুদ, নাছারা, হনুদ, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; সকলেই খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ-এর ভিত্তিতে মুক্তি লাভ করিবে।"

৭৩০। হাদীছ :— إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ

---

* যেরূপ হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ফুফু ছফিয়্যা (রাঃ)কে এবং স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)কে প্রকাশ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন ডাকিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—

انقذى نفسك من النار لا اغنى عنك من الله شيئا

দোযখ হইতে নিজকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তোমার নিজেকেই করিতে হইবে; আমি তোমাকে আল্লার আজাব হইতে রক্ষা করায় কোন সাহায্য করিতে পারিব না। অর্থাৎ তুমি নিজে রক্ষা পাওয়ার মূল ব্যবস্থা ঈমান ও আমল অবলম্বন না করিলে শুধু আমি আল্লার রসূলের সম্বন্ধ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান ইহাই যে, ঈমান না হইলে কোন সম্বন্ধই মুক্তির জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। পক্ষান্তরে ইহুদী-নাছারাগণ নবীর সঙ্গে বংশ-সম্পর্কের দ্বারা নাজাত বা মুক্তির দাবীদার ছিল।

شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ

قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا۔

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা একজন গ্রাম্য লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল—আপনি আমাকে এমন আমল ও কর্ম বাতলাইয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে আমি বেহেশত লাভ করিতে পারি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উত্তরে বলিলেন এক আল্লার এবাদত ও গোলামী করিবে, কোন বস্তুকেই তাঁহার শরীক ও অংশীদার করিবে না এবং নামায ভালরূপে আদায় করিবে যাহা ইসলাম ধর্মের একটি বিশিষ্ট ফরজ এবং যাকাত আদায় করিবে, উহাও একটি বিশিষ্ট ফরজ এবং রমজান মাসের রোযা রাখিবে। ঐ ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, যে আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, আমি এইসব কার্য্যগুলি সমাধা করিতে কোনরূপ বেশ-কম করিব না। অর্থাৎ আদেশ পালন করিতে ব্যতিক্রম করিব না এবং তাহা অতিক্রমও করিব না; ত্রুটিহীনরূপে ঐ কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন করিতে থাকিব। এই বলিয়া যখন সে চলিয়া যাইতেছিল তখন নবী (দঃ) উপস্থিত লোকদেরে বলিলেন, কাহারও বেহেশতী মানুষ দেখিবার খাহেশ থাকিলে এই ব্যক্তিকে দেখিতে পারে।

৭৩১। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহজগৎ ত্যাগ করার পর যখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আরববাসীদের কয়েকটি দল (ইসলাম বা ইসলামের কোন কোন বিধানের) বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিল। (তন্মধ্যে একটি দল এরূপও ছিল যাহারা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি ঠিক ঠিকরূপেই ঈমানদার ছিল এবং ইসলামের সমুদয় বিধি-নিষেধের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু একটি মাত্র বিধান অর্থাৎ যাকাত আদায় করা ইসলামের বিধানরূপে মান্য করিতে তাহারা অস্বীকার করিল। আবু বকর (রাঃ) তখন গভীর রাজনীতিবিদের সুষ্ঠু পরিচালনাশক্তির ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন যে, ঐসব বিদ্রোহী ও বিরোধীদের প্রতি সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। এমনকি যে দলটি সর্বাঙ্গীন ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল শুধু যাকাতের বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিত, তাহাদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইতে উদ্যত হইলেন।) তখন ওমর (রাঃ) (তাঁহাকে এই অভিযান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আপনি ঐ লোকদের প্রতি কিরূপে অভিযান চালাইবেন (যাহারা যাকাতকে ইসলামের বিধানরূপে না মানিলেও আল্লার প্রতি, আল্লার

রসুলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে ? অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আমি যেন জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—যাবৎ না তাহারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"—কলেমা-তাইয়্যেবার অনুগত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি উহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবে সে ব্যক্তি স্বীয় জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হইয়া যাইবে। (তাহার কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হওয়া কখনও ইসলাম অনুমোদন করিবে না।) অবশ্য ইসলামের বিধান মতেই যদি সে কখনও শাস্তির উপযোগী সাব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার উপর সেই বিধান প্রয়োগ করা হইবে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, ইসলামের মুলবস্তু কলেমা-তাইয়্যেবার প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ও বাহ্যিক স্বীকৃতির দ্বারা সে নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে। তাহার আন্তরিক অবস্থার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইবে। ওমরের এই উক্তির প্রতিউত্তরে আবু বকর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি সংগ্রাম চালাইব—যাহারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে। (অর্থাৎ যাকাতকেও নামাযের ন্যায় ইসলামের অপরিহার্য্য ফরজ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে,) এমনকি যদি তাহারা সামান্য একটি বকরীর বাচ্চা বা একগাছি দড়ি যাহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাকাতরূপে আদায় করিত, এমন যদি উহা আদায় করিতে অস্বীকার করে তবে খোদার কসম—তাহাদের বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয় যুদ্ধ চালনা করিব।

ওমর (রাঃ) বলেন, আবু বকরের দৃঢ়তা দেখিয়া আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, ইহা তাঁহার সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত। তখন আমিও (গভীরভাবে চিন্তা করিয়া) বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই বিশুদ্ধ ও বাস্তব পন্থা।

ব্যাখ্যা ঃ—আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবিক পক্ষে বিচক্ষণতাপূর্ণ ও অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। কারণ, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী শক্তিসমূহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে মোসলমানদের বিন্দুমাত্র দুর্বলতার আভাস অনুভূত হইলে শত্রু পক্ষের মনোবল উথলাইয়া উঠিত এবং উহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইত। এতদ্ব্যতীত শরীয়তের মছআলাও ইহাই যে, ইসলামের কোন সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে কোন দল ও শক্তির আবির্ভাব হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া মোসলমানদের রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য—ফরজ।

ওমর (রাঃ) এখানে যে হাদীছটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঐ হাদীছটি এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে। পূর্ণ হাদীছটি আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত ও কার্য্যধারার অনুকূলে স্পষ্ট প্রমাণ। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ২২ নম্বরে ঐ হাদীছখানাই বিস্তারিত উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (তৌহীদ বা একত্ববাদ)-এর সঙ্গে "মোহাম্মাদুর

রসুলুল্লাহ''-এর স্বীকৃতি এবং নামায ও যাকাত আদায়ের উল্লেখ স্পষ্টতঃই রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টি মোসলেম শরীফে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারেও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِـهٖ

অর্থাৎ...... "যাবৎ না তাহারা আল্লার একত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি এবং (আল্লার তরফ হইতে) যেসব আদেশ-নিষেধাবলী আমি নিয়া আসিয়াছি ঐ সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনিবে" তাবৎ সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আদেশ বলবৎ থাকিবে।

যাকাত আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণ

নবী (দঃ) ঈমানের অঙ্গীকার লওয়ার স্থায় নামায পুর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী করার এবং যাকাত আদায় করারও অঙ্গীকার বিশেষভাবে লইতেন (৫১নং হাঃ)।

অল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

"অমোসলেমরা যদি শেরেকী-কুফরী বর্জন পূর্বক ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী করে, যাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই পরিগণিত হইবে।" (১০ পাঃ ৮ রুঃ)

উক্ত আয়াতের পূর্ব রুকুতে এইরূপ আরও একটি আয়াত রহিয়াছে (যাহার উদ্ধৃতি প্রথম খণ্ড ২২নং হাদীছ পরিচ্ছেদে আছে) সেই আয়াতে বলা হইয়াছে, যদি অমোসলেমরা ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করে তবে তাহাদিগকে জান-মাল ইত্যাদির সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দান কর।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মে দেখা যায়, মোসলমান দলভুক্ত ও মোসলমানদের ধর্মীয় ভাই পরিগণিত হওয়ার জন্য এবং মোসলমানরূপে জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হওয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ ঈমানের সঙ্গে বাহিক আমলরূপে নামাযের প্রয়োজনীয়তার স্থায়ই যাকাত আদায়ের প্রয়োজনও রহিয়াছে। যাকাত ফরজ হওয়া অস্বীকার করিলে সে মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে না এবং যাকাত আদায়ে অসম্মত হইলে সে জান-মালের নিরাপত্তা হইতে বঞ্চিত হইবে।

যাকাত না দেওয়ার গোনাহ ও শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ

وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

অর্থ ঃ—যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য* পুঁজি করিয়া রাখে এবং উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করে না, তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের সংবাদ জানাইয়া দিন। (এই আজাব তাহাদের উপর ঐ দিনই হইবে) যেদিন ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যগুলি জাহান্নামের অগ্নিতে আগুণতুল্য উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠ দাগান হইবে** (এবং তিরস্কার করিয়া বলা হইবে) ইহা ঐসব ধনরাশি যাহা তোমরা নিজ সম্পদ ও উপভোগের বস্তুরূপে পুঁজি করিয়া রাখিয়াছিলে; (উহার যাকাত পর্য্যন্ত আদায় কর নাই এই ভয়ে যে, কম হইয়া যাইবে।) এখন ঐসব ধন পুঁজি করিয়া রাখার শাস্তি ভোগ কর। (১০ পাঃ ১১ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের বর্ণনায় এই হাদীছের বিষয়বস্তু এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যের (মধ্যে আল্লার) হক্ক তথা যাকাত আদায় করিবে না তাহাদের শাস্তির জন্য কেয়ামতের দিন ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যকে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা বড় চাদর ও পাতরূপে তৈরী করিয়া উহাকে জাহান্নামের আগুনে অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহার দ্বারা ঐ মালিকের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠ দাগান হইবে। বার বার উহাকে গরম করিয়া দাগান হইতে থাকিবে। তাহার এই শাস্তি দোযখে যাইবার পূর্ব্বেই—কেয়ামতের দিন তথা হিসাব-নিকাশের ঐ দিনে হইবে, যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে। অতঃপর যখন সকলের হিসাব-নিকাশ ও ফয়ছালা শেষ হইয়া যাইবে তখন ঐ ব্যক্তিকে হয়ত বেহেশতের পথের সুযোগ দেওয়া হইবে। (যদি তাহার এই শাস্তি ভোগে ঐ গোনাহের সমাপ্তি হয় এবং সে অন্য গোনাহের দরুণ দোষখী না হয়।) অথবা দোযখের প্রতি হাঁকানো হইবে।

---

* স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য মালামালের যাকাত না দিলে উহার জন্যও আলোচ্য শ্রেণীর আজাব এইরূপে হইতে পারে যে, উক্ত মালামালের মূল্য পরিমাণের স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা এই প্রণালীতে আজাব দেওয়া হইবে। অবশ্য পশুপালের যাকাত না দিলে সেক্ষেত্রে পশুপালের দ্বারা ভিন্ন প্রণালীতে আজাব দেওয়ার উল্লেখ সম্মুখের হাদীছে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধন-সম্পদের যাকাত না দেওয়ার আজাব ভয়ানক বিষাক্ত অজগরের দ্বারা দেওয়াও ৭৩৪ নং হাদীছে বয়ান রহিয়াছে।

** যাকাত দানে বিরত কৃপণ ব্যক্তির এই শাস্তি অত্যন্ত সমীচীন। কারণ কোন গরীব মিস্কীন সাহায্য প্রার্থনাকারী তাহার সম্মুখে আসিলেই বিরক্তিভরে তাহার কপালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া যাইত। অতঃপর আরও বিরক্ত হইয়া পার্শ্ব ফিরিয়া উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত। অতঃপর আরও বিরক্ত হইয়া রাগান্বিত অবস্থায় তাহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্য দিকে চলিয়া যাইত। তাই শাস্তি দানে এই তিনটি অঙ্গের বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য।

৭৩২। হাদীছঃ— سمع ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَيَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ -

অর্থ ও ব্যাখ্যা—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতদানে বিরত থাকার শাস্তি বর্ণনা করিলে পর জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রসুলাল্লাহ! উষ্ট্রের যাকাত দান না করিলে তখন কি অবস্থা হইবে? নবী (দঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে) ফরমাইয়াছেন, উষ্ট্রপালের উপর আল্লাহ তায়ালার যে হক আছে সেই হক আদায় করা না হইলে ঐ উষ্ট্রের মালিককে কেয়ামতের দিন হাশরের বিশাল ময়দানে শোয়ানো হইবে। তৎপর ঐ উষ্ট্রগুলি এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইবে যে, উহার প্রত্যেকটি উষ্ট্র দুনিয়ায় থাকাকালীন সর্বাপেক্ষা অধিক মোটা তাজা ছিল (এবং ঐ উষ্ট্রগুলির একটিও, এমনকি একটি বাচ্চাও বাদ থাকিবে না, সবগুলিই উপস্থিত হইবে।) এবং সারি বাধিয়া ঐ মালিককে পদদলিত ও পিষ্ট করিতে থাকিবে এবং (কামড়াইতে থাকিবে)। (অতঃপর গরু-ছাগলের বিষয়েও জিজ্ঞাসা করা হইল। উত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐরূপই ফরমাইলেন যে, গরু) ছাগলের উপর আল্লার যে হক আছে সেই হক আদায় করা না হইলে উহার মালিককে কেয়ামতের দিন এক বিশাল ময়দানে শোয়ানো হইবে এবং ঐ গরু-ছাগল পালের সবগুলি অতি মোটা তাজারূপে উপস্থিত হইবে, (প্রত্যেকটি বক্রতাবিহীন ধারাল শিংযুক্ত হইবে) এবং ঐ মালিককে পিষ্ট ও পদদলিত করিতে থাকিবে এবং শিং দ্বারা ভীষণ আঘাত করিতে থাকিবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, এসব পশুপালের উপর আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত হক আছে তাহার মধ্যে একটি হক ইহাও যে, (গরীব-দুঃস্থদিগকে প্রচলিত দেশ-প্রথানুযায়ী প্রাপ্য সাহায্যের সুযোগ দানার্থে) পশুপালকে পানি পানের জন্য

যেখানে একত্রিত করা হয় সেখানেই দুগ্ধ দোহন করিবে (এবং গরীবদিগকে কিছু কিছু দুগ্ধ দান করিবে)।

এই বাক্যটির ব্যাখ্যা এই যে, আরব দেশে সচ্ছল ব্যক্তিগণ পশুপাল রাখিত। ঐ পশুপাল ময়দানে পাহাড়ে চরিয়া বেড়াইত। সে দেশে যেখানে-সেখানে পানি পাওয়ার উপায় নাই। কোন কোন স্থানে পানির ব্যবস্থা থাকে এবং চতুর্দিকের পশুপাল সেখানেই জমা হয়। এইভাবে এক একটি পানির স্থানে বহু পশুপালের ভীড় জমে এবং সেখানে গরীব দুঃখী অনাথ এতিমগণও চতুর্দিক হইতে আসিয়া ভীড় জমাইতে থাকে। তাহাদের আশা এই থাকে যে, এখানে বহু পশুপাল একত্রিত হইবে, তাই প্রত্যেকটি হইতে একটু-আধটু দুধ পাইলেই গরীবের একটি অঞ্জলি হইয়া যাইবে। পশুপালের যে সমস্ত মালিক উদার প্রকৃতির তাহারা বিশেষভাবে স্বীয় পশুপালের দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা ঐ পানির স্থানেই করিয়া থাকিত, যেন গরীব দুঃস্থগণ ঐ সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয়। পক্ষান্তরে কৃপণ প্রকৃতির মালিকরা উহার বিপরীত—ঐ স্থানে দুগ্ধ দোহন হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট হইত, যাহাতে দুঃখীদের দ্বারা বিব্রত হইতে না হয়।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বাক্যটির দ্বারা সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পশুপালের মালিকগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যাকাত দান করা ত ফরজ আছেই; তদতিরিক্ত গরীব-দুঃখীকে সাহায্য পৌঁছাইবার উল্লিখিত আকারের রীতিও রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক।

ইসলাম যে কিরূপ জন-দরদী ও গরীব-কাঙ্গালের স্বার্থ সংরক্ষক নীতি সমূহের সমষ্টি, আলোচ্য বাক্যটি উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য বাক্যে বর্ণিত অনুশাসনের মূলনীতিটি এই যে, গরীব-কাঙ্গালগণের জন্য শরীয়ত যে হক ফরজরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যেমন যাকাত-ফেৎরা উহা ছাড়াও শরীয়তি আইনের বাধ্য বাধকতা ব্যতীত দেশ-প্রথা ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গরীব-কাঙ্গালগণ ধনাঢ্যদের ধন হইতে যে সব সাহায্য, সহায়তা ও সুযোগ পাইয়া থাকে, ইসলাম ঐ সমস্ত সাহায্য ও সুযোগকে কায়েম রাখার পক্ষপাতী, শুধু পক্ষপাতীই নহে বরং ঐ সমস্ত গরীব-তোষণ, কাঙ্গাল-পোষণ রীতি ও প্রথাসমূহকে রক্ষা করিয়া চলার উপর কড়াকড়ি আরোপ করিয়া থাকে। যেমন প্রথম খণ্ড "ঈমানের শাখা প্রশাখা" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ আয়াতের মধ্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন "হিত ও মঙ্গল কামনা" পরিচ্ছেদেও এই বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হইয়াছে।

ইসলাম ধন-দৌলতের ব্যাপারে উদারতা এবং ইনসাফ দ্বারা উভয় পক্ষের সীমা রক্ষা করিয়াছে। গরীব কাঙ্গালের সহায়তায় বহুমুখী ব্যবস্থা কায়েম করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে

এবং মালিকের মালিকানাকেও স্বীকৃতি দিয়াছে। ঐ রূপ নীতি সমূহই ইসলামের মধ্যপন্থী হওয়ার তথা ছেরাতুল-মোস্তাকীমের স্বরূপ।

পশুপালের যাকাত না দেওয়ার উল্লিখিত শাস্তি দোযখে যাইবার পূর্বে কেয়ামত তথা হিসাব-নিকাশের দিন হাশরের ময়দানেই হইতে থাকিবে। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

হাশর-মাঠে হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্বের জন্য যে দিনটির অনুষ্ঠান হইবে সেই দিনটি পঞ্চাশ হাজার কিম্বা এক হাজার বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইবে বলিয়া পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। যাকাত না দেওয়ায় সেই দীর্ঘ দিনের আজাবের বর্ণনাই এই হাদীছে রহিয়াছে; দোযখের শাস্তি ইহার পরে।

পশুপালের যাকাত না দেওয়ার গোনাহের দরুণ ঐ পশুপাল দ্বারাই শাস্তি প্রাপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে হাশরের ময়দানে উষ্ট্র, গরু, ছাগল ইত্যাদি দ্বারা অন্য কারণে শাস্তির বর্ণনার একটি হাদীছের প্রতিও এখানে বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেই হাদীছটি মূল গ্রন্থের ৪৩২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। উহার বিবরণ এই—

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা গণীমতের মালে খেয়ানত করার শাস্তি বর্ণনা করিয়া বিশেষ ভাষণ দান পূর্বক বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে সতর্ক থাকিও—কেহ যেন এই অবস্থার সম্মুখীন না হও যে, কেয়ামতের দিন ঘাড়ের উপর ছাগল চড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে বা ঘোড়া চড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে—এই অবস্থায় কেহ আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিব যে, আমি এখন কোন সাহায্যই করিতে পারিব না, আমি দুনিয়ার জীবনে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম।

"কিম্বা ঘাড়ের উপর উট সওয়ার হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে আমি ঐরূপেই তাড়াইয়া দিব। অথবা অন্য কোন মাল ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে, এমতাবস্থায় আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে আমি ঐ বলিয়া তাড়াইয়া দিব। কিম্বা ঘাড়ের উপর কাপড় উড়িতে থাকে এমতাবস্থায় আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেও ঐরূপে তাড়াইয়া দিব।

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের দ্বারা বিজিত মালকে গণীমতের মাল বলা হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ জেহাদে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকগণের হক, আমীর কর্তৃক উহা তাহাদের মধ্যে বন্টন হইবার পর তাহারা নিজ নিজ অংশের মালিক সাব্যস্ত হইবে। আমীর কর্তৃক বন্টনের পূর্বে উহা হইতে কেহ কোন বস্তু গোপনে হস্তগত করিলে তাহাই গণীমতের মালে খেয়ানত গণ্য হইবে। সেই খেয়ানতের শাস্তিই উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ আমানতে খেয়ানত এবং স্বীয় অংশীদারের হক খেয়ানত করার

পরিণতি হইার সঙ্গে তুলনা করিয়া উপলব্ধি করা অতি সহজ। কারণ, এইসব খেয়ানত গণীমতের মালে খেয়ানত অপেক্ষা অধিক জঘণ্য; কারণ, গণীমতের মালে ত অনির্দ্ধারিত হইলেও নিজের অংশ থাকে। তদ্রূপ অন্যের হক গোপনে আত্মসাৎ করা আরও অধিক জঘণ্য।

মছআলাহঃ—গরু, ছাগল, উষ্ট্র ইত্যাদি পশুপালের উপর যাকাত ফরজ হয়, কিন্তু এই বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ শর্ত আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কেতাবে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ আমাদের বাংলাদেশে ঐসব শর্ত বিরল।

৭৩৩। হাদীছঃ—আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; নবী (দঃ) তখন কাবা শরীফ গৃহের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। নবী (দঃ) বলিতেছিলেন, কাবার মালিকের কসম—তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কাবার মালিকের কসম—তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি আতঙ্কিত হইলাম যে নবী (দঃ) আমার কোন খারাব অবস্থা দেখিয়াছেন কি? আমি বসিয়া পড়িলাম। নবী (দঃ) ঐ কথাই বার বার বলিতেছিলেন। আমি আর চুপ থাকিতে পারিলাম না; আল্লাহ তায়ালাই জানেন, কিরূপ ভাবনা-চিন্তা আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, ঐ লোক কাহারা? নবী (দঃ) বলিলেন, যাহাদের ধন-দৌলত বেশী; (তাহারাই কেয়ামতের দিন অধিক বিপদগ্রস্ত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকার্য্যসমূহে ধন খরচ করিতে থাকে ডানে, বামে এবং সম্মুখ দিকে (তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে না।) (৯৮২ পৃঃ)

নবী (দঃ) আরও বলিলেন, কসম ঐ আল্লার যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই—যে কোন মানুষ তাহার উটের দল বা গরুর দল কিম্বা ছাগলের দল রহিয়াছে এবং সে ঐ সম্পদের উপর আল্লার যে হক আছে তাহা আদায় করে না; কেয়ামতের দিন (হাশরের মাঠে) সেই উট বা গরু অথবা ছাগলগুলি সর্বাধিক বড় ও মোটা-তাজারূপে উপস্থিত করা হইবে। ঐগুলি সারিবদ্ধরূপে সেই ব্যক্তিকে পদদলিত করিয়া পিষ্ট করিতে এবং শিং দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে। সারির শেষ মাথা যাইতে না যাইতেই উহার প্রথম মাথা ঘুরিয়া পুনঃ আসিয়া যাইবে। (এইভাবে ঐ পশুগুলি দ্বারা হাশরের মাঠে সেই ব্যক্তি আজাব ভোগ করিতে থাকিবে—) সমস্ত লোকদের হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্ব শেষ করা পর্য্যন্ত। (তারপর তাহার হিসাব ও বিচারের পর তাহার জন্য বেহেশত বা দোযখ যাহা হয় সাব্যস্ত হইবে।) ১৯৬ পৃঃ

৭৩৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ

مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ - ثُمَّ تَلَا

لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করে না; কেয়ামতের দিন তাহার ঐ ধন-দৌলতকে বিকট আকারের অতি বিষাক্ত অজগররূপে রূপান্তরিত করা হইবে, যাহার মুখের উভয় পার্শ্বে বিষ দাঁত থাকিবে। ঐ অজগরটিকে কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির গলায় গলাবন্ধরূপে পরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ঐ অজগরটি উভয় চিবুক দ্বারা পূর্ণ মুখে ঐ ব্যক্তিকে কামড় দিয়া বিষোদগার করিতে থাকিবে এবং বলিবে, "আমি তোমারই ধন-সম্পদ, আমি তোমারই রক্ষিত পুঁজি।"

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বক্তব্যের পর ইহার সমর্থনে কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ - سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

অর্থ :—যাহারা আল্লাহ তায়ালারই দয়ায় দেওয়া ধন-সম্পদে কৃপণতা করে তাহারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, তাহাদের এই কৃপণতা বা এই ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য হিতকর ও মঙ্গলজনক হইবে। বরং ইহা তাহাদের জন্য অতি জঘন্য ও বিষময় ফলদায়ক হইবে। অচিরেই কেয়ামতের দিন এই কৃপণতার ধন-সম্পদকে তাহার গলায় গলাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। (তোমরা কেন কৃপণতা কর? অথচ—) বিশ্বের সব কিছু আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাধীনে থাকিয়া যাইবে (তুমি রিক্ত হস্তে চলিয়া যাইবে, সঙ্গে কিছুই নিতে পারিবে না)। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিটি কর্মের খোঁজ রাখেন। (৪ পাঃ ৯ রুঃ)

৭৩৫। হাদীছ :—তাবেয়ী আহ্নাফ-ইবনে-কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি (পবিত্র মদীনায় মসজিদের মধ্যে কোরায়েশ বংশীয় কয়েকজন লোকের মজলিসে বসিলাম। এমন সময় অতি সাধারণ বেশধারী একজন লোক মজলিসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সালাম করিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহারা ধন-দৌলত পুঁজি করিয়া রাখে তাহাদিগকে

এই সংবাদ জানাইয়া দাও যে, তাহাদের প্রত্যেককে পরকালে এই শাস্তি দান করা হইবে যে, এক খণ্ড পাথর জাহান্নামের অগ্নিতে ভীষণ উত্তপ্ত করিয়া উহাকে বুকের উপর স্তনস্থলে* রাখা হইবে; সেই পাথর খণ্ড বুকের হাড্ডি-মাংস ইত্যাদি ভস্ম করতঃ সব কিছু ভেদ করিয়া পিঠের দিকে বাহির হইয়া আসিবে। পুনরায় পিঠের দিকে রাখা হইবে এবং ঐরূপে ভেদ করিয়া বুকের দিকে বাহির হইয়া আসিবে।"

এই বলিয়া ঐ লোকটি সে স্থান হইতে দূরে সরিয়া মসজিদের একটি থামের নিকটবর্তী যাইয়া বলিলেন, আমিও তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। আমি কিন্তু তখনও তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত নহি। (লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু-জর গেফারী (রাঃ)। তখন আমি বিশেষভাবে তাঁহার সন্নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে যাহা শুনিয়াছি কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করিয়াছি।) আমি বলিলাম, আপনার বক্তব্যের প্রতি উপস্থিত লোকদিগকে বিশেষ সন্তুষ্ট মনে হইল না। তিনি বলিলেন, এই সকল ব্যক্তিরা নির্বোধ। (অতঃপর এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করিলেন যে, একদা) আমার মাহবুব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, হে আবু-জর! তুমি ওহোদ পাহাড় দেখিতেছ কি? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—দেখিতেছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার নিকট হইলে তাহাও আমি আমার জন্য জমা রাখিব না, উহার সম্পূর্ণ (আল্লার রাস্তায়) দান করিয়া দিব, শুধু মাত্র তিনটি মুদ্রা রক্ষিত রাখিব—(একটি পরিবারবর্গের খরচের জন্য, একটি ঋণ পরিশোধের জন্য, একটি গোলাম আজাদ করার জন্য)।

(আবু-জর (রাঃ) বলিলেন,) এ সমস্ত ব্যক্তিরা জ্ঞান-শূন্য বুদ্ধিহীন; এরা টাকা জমা করিতেছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমি কখনও তাহাদের ধনের প্রত্যাশী হইব না (তাই আমি তাহাদের অসন্তোষে ভীত নহি) এবং তাহাদের নিকট আমি ধর্ম বিষয়ও শিখিতে যাইব না। (কেননা আমি স্বয়ং রসুলুল্লার নিকট হইতে ধর্মজ্ঞান অর্জন করিয়াছি।)

ব্যাখ্যা ঃ—আবু-জর গেফারী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ধন-দৌলতের প্রতি অতিশয় বিরাগী ও বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন, এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতের মধ্যে উক্ত গুণের প্রতীক রূপে আবু-জর গেফারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবু-জর (রাঃ) সাধারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পত্তির পুঁজিপতি হওয়া নাজায়েয বলিতেন; পূর্বালোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহকে সরাসরি অর্থের উপরই

---

* এই বরাবরই অন্তর বা হৃদয় অবস্থিত। এই শাস্তির জন্য উক্ত স্থানটির বিশেষত্ব অতি সমীচীন; কারণ যাকাত না দেওয়া ও দান-খয়রাত না করার মূল হেতু ধন-দৌলতের মোহ, এবং উহা এই অন্তরেই জড়ানো থাকে।

পরিচালিত করিতেন যে, অতিরিক্ত ধন-দৌলতের পুঁজিপতি প্রত্যেকেই শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হইবে। তিনি তাঁহার এই মতের প্রতি অতিশয় দৃঢ়, অবিচল ও অটল ছিলেন। এমনকি তিনি সকলকে স্বীয় মতের অনুসারী করার চেষ্টায় সক্রিয় থাকিতেন, যদ্দরুণ সময় সময় বিতর্কের সৃষ্টি হইত। এতদ্দৃষ্টে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শে তিনি স্বীয় বাসস্থান দামেশক, তৎপর মদীনা শহর ত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছায় মদীনার দূরে "রাবাযা" নামক জনশূন্য স্থানে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থান করিয়া দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খলীফার আদেশ মান্য করা ফরয; তাঁহার পরামর্শ ছিল, আমি যেন শহরতলীতে বাস করি। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় উহার ঊর্দ্ধে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছি।

কিন্তু শরীয়তে আবু-জর (রাঃ)-এর মতামতের ন্যায় কড়াকড়ি আরোপ না করিয়া এই বিধান বলবৎ করা হইয়াছে যে, যাকাত দান করিয়া অবশিষ্ট-অংশ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলেও উহা জমা রাখা জায়েয। পূর্বোল্লিখিত আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত শাস্তি ঐ পুঁজিপতিদের প্রতি প্রযোজ্য যাহারা যাকাত ইত্যাদি আদায় না করিবে। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছদটি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, যাকাত ভিন্ন গরীব-কাঙ্গালদিগকে আরও বহুমুখী সাহায্য দানের নির্দেশ শরীয়তে বলবৎ রহিয়াছে, ইতিপূর্বে উহার কিছু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐসব সাহায্য দানের প্রতি সক্রিয় থাকাও ধনাঢ্যদের কর্তব্য। তদুপরি সদা-সর্বদা দুঃখী-দরিদ্র, গরীব-কাঙ্গালের সাহায্যে অকাতরে ধন লুটাইতে থাকাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি প্রশংসনীয়। এই বিষয়টির ব্যাখ্যায়ও ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যে ধন দান করাতে অগ্রণী হওয়া চাই, এবং ৬৪নং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

যে ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়া হইবে উহা কঠোর শাস্তির ধন-সম্পদের শ্রেণীভুক্ত নহে

৭৩৬। হাদীছঃ— খালেদ ইবনে আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম। এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোরআন শরীফের যেই আয়াতে এরূপ বলা হইয়াছে যে, "যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহা আল্লার রাস্তার খরচ করিবে না তাহাদিগকে উহার দ্বারা দাগান হইবে" এই আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে—যে ব্যক্তি ধন-দৌলত পুঁজি করিয়া রাখিবে এবং উহার যাকাত আদায় না করিবে তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি; শরীয়ত কর্তৃক যাকাতের নিয়ম বলবৎ হওয়ার পর যাকাতকে ধন-দৌলতের পবিত্রকারক তথা উহার সঞ্চয় বৈধকারক গণ্য করা হইয়াছে।

৭৩৭। হাদীছ :—যায়েদ ইবনে ওয়াহব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি "রাবাজাহ্" এলাকা দিয়া যাইতেছিলাম। তথায় আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি এই এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি ত সিরিয়ায় থাকিতাম! সেখানে (তথাকার শাসনকর্তা) মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আমার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়; আমি তথায় এই আয়াত পড়িয়া বেড়াইতাম—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিতেন, এই আয়াত ইহুদ-নাছারা পাদ্রীদের (হারাম পন্থায় ধন সঞ্চয়ের) ব্যাপারে নাযেল হইয়াছিল। আর আমি বলিতাম, মোসলমানদের ধন সঞ্চয়ের ব্যাপারেও এই আয়াত প্রযোজ্য। আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের দরুণ বিতর্কও বাধিয়া থাকিত। মোয়াবিয়া (রাঃ) আমার প্রতি অভিযোগ রূপে বিষয়টি খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সেমতে আমার মদীনায় চলিয়া আসিবার জন্য খলীফা ওসমান (রাঃ) আমাকে লিখিলেন। আমি মদীনায় চলিয়া আসিলাম। মদীনায় আমার নিকট লোকদের ভিড় হইতে লাগিল, তাহারা যেন পূর্বে আর আমাকে দেখে নাই। খলীফা ওসমান (রাঃ)কে আমি এই অবস্থা জানাইলাম; তিনি বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে শহর হইতে সরিয়া নিকটবর্তী শহর-তলীতে অবস্থান করিতে পারেন। (আমি বলিলাম, আমাকে রাবাজায় বসবাসের অনুমতি দিন। পূর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। ওসমান (রাঃ) অনুমতি দিলেন। ফতহুলবারী ৩—২১২।) এই ঘটনাই আমাকে এই এলাকার বাসিন্দা বানাইয়াছে। একটি হাবশী গোলামকেও আমার উপর খলীফা নির্বাচিত করা হইলে আমি তাঁহার কথা মানিয়া চলিব এবং তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিব।

ব্যাখ্যা :—মূল ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় জরুরী তথ্য—

● রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পর অনেক ছাহাবীর পক্ষেই রসুলুল্লাহ্ (দঃ) ছাড়া মদীনায় বসবাস অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহারা বিভিন্ন এলাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বেলাল (রাঃ)কে শত চেষ্টা করিয়াও মদিনায় রাখা যায় নাই, তিনি সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আবু-জর গেফারী (রাঃ)ও তদ্রূপ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

● আবু-জর গেফারী (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবনকে ভালবাসিতেন। নবী (দঃ) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—ابوذر مسيح هذه الامة আবু-জর এই উম্মতের সন্ন্যাসী। কোন কোন

বস্তু ও অবস্থা ব্যক্তিগতরূপে স্থানে স্থানে উত্তম ও ভালই পরিগণিত হয়, কিন্তু ঐ বস্তু ও অবস্থাই ব্যাপক আকারে হওয়া অনুমোদিত হয় না। বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবন তদ্রূপই। আবু-জর গেফারী (রাঃ) ছাহাবীর জন্য হযরত (দঃ) উহাকে প্রশংসারূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপক আকারে এবং সাধারণ নীতিরূপে উহার সম্প্রসারণকে হযরত (দঃ) মোটেই অনুমোদন করেন নাই। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—لا رهبانية في الاسلام—বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-জীবন ইসলামের নীতি নহে।

আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের উপর বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের অত্যধিক প্রাবল্য ছিল, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সর্বত্র এই অবস্থাকেই দেখিতে চাহিতেন। এমনকি এই অবস্থার সমর্থনে তিনি পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিও ব্যবহার করিতেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"যাহারা স্বর্ণ-চান্দি (তথা ধন-দৌলত) জমা করিয়া রাখে এবং উহাকে আল্লার নির্দ্ধারিত পথে খরচ করে না তাহাদিগকে ভীষণ যাতনাদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দাও।" এই আয়াতে আজাবের সাবধানবাণী রহিয়াছে; যেই শ্রেণীর লোকদের জন্য এই সাবধানবাণী তাহাদের সম্পর্কে আয়াতে স্পষ্টরূপে দুইটি ক্রিয়াপদ উল্লেখ আছে—একটি হইল, "য়্যাক্‌নেযুনা" অর্থাৎ ধন-দৌলত জমা করিয়া রাখে। অপরটি হইল, "লা-য়্যুন্‌ফেকুনাহা ফী ছাবীলিল্লাহ্" অর্থাঃ আল্লার নির্দ্ধারিত পথে তথা আল্লার প্রবর্তিত বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না। আবু-জর গেফারী (রাঃ) স্বীয় বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের অনুকূলে উক্ত আয়াতকে দাঁড় করাইবার জন্য উল্লেখিত দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটির উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের সাব্যস্ত করিতেন—যে, সঞ্চিত ধন আল্লার রাস্তায় ব্যয় তথা সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া না দিলে উহা আজাব ভোগের কারণ হইবে। অপর দিকে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ছাহাবীগণ আয়াতে উল্লেখিত উভয় ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যা এই করিতেন যে, যাহারা ধন জমা করিয়া রাখে এবং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না তাহাদের জন্য আজাবের সাবধানবাণী। সুতরাং ধন জমা রাখিলেই আজাব হইবে না, বরং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যাতিরেকে জমা রাখিলে আজাব হইবে। এতদ্ভিন্ন এই আয়াত সম্পর্কে আর একটি বাহ্যিক সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ও ছিল যাহা মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, ইহুদ-নাছারা পাদ্রীদের হারাম উপায়ে ধন সঞ্চয়ের বয়ান প্রসঙ্গে এই আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে এই আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও ইহা প্রমাণ করে।

আবু-জর গেফারী (রাঃ) যাহা বলিতেন, উহা আয়াতের প্রকৃত ও বাস্তব তফছীর ছিল না, বরং তাঁহার ভাবাবেগের সামঞ্জস্যে আয়াতের মর্ম চয়ন করা ছিল মাত্র। নতুবা যদি কোন অবস্থাতেই ধন জমা রাখার বৈধতা না থাকা এই আয়াতের মর্ম হয় তবে এই আয়াত পবিত্র কোরআনেরই অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত যাকাতের বিধান, হজ্জের বিধান ও মীরাছ বা পরিত্যক্ত ধন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের বিধান ইত্যাদির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, ধন জমা না থাকিলে যাকাত কিসের হইবে? হজ্জ কাহার উপর ফরজ হইবে? মিরাছ বন্টন কিসের উপর হইবে?

আবু-জর গেফারী (রাঃ) স্বীয় ভাবাবেগে অনুমোদিত ধনধারীদের সহিতও বিতর্ক করিতে থাকিতেন, স্থানে স্থানে কঠোরতাও প্রয়োগ করিতেন। তিনি প্রবীণতম ছাহাবী ছিলেন; সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই তাঁহার বিতর্ক ও কঠোরতায় অনেকের সম্মুখে জটিলতার সৃষ্টি হইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওসমানের নিকট সমুদয় ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান সকলের উপরে মুরব্বী।

● মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধ ও বিতর্ক শুধু এই একটি আয়াতের ব্যাপারেই ছিল না। আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবে অনাড়ম্বরতার সহিত সরলতাও ছিল। হিজরী ২৫সনে এক ইহুদী বাচ্চা আসদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকরূপে মোসলমানদের দলভুক্ত হইয়া মোসলেম জাতীর মূলে কুঠারাঘাত হানার জন্য একটি ষড়যন্ত্রকারী দল সৃষ্টি করিয়াছিল; যে দলটি ইতিহাসে খারেজী দল নামে পরিচিত—যাহাদের ষড়যন্ত্রের বিরাট ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। সেই দলটির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মোয়াবিয়া (রাঃ)। সেই ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী দলের লোকেরা আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সরলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অতি সহজেই উত্তেজিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) তৎকালীন বৃহত্তম প্রতিবেশী শত্রু রোমানদের সীমান্ত দেশ সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন; সেই শত্রুকে প্রভাবান্বিত রাখার জন্য তিনি শাসন পরিচালনায় এবং নিজের উপরও আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যবস্থা খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময় হইতেই ছিল; মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওমর কর্তৃকই সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োজিত ছিলেন। খলীফা ওমর তাঁহার এই ব্যবস্থার জন্য কৈফিয়তও তলব করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যকে বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখিয়া ওমর (রাঃ) তাঁহাকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা বৈরাগ্যাভিলাষী সন্ন্যাসী-স্বভাবপূর্ণ আবু-জর

গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এতদিন পেছনে খোচানেওয়ালা কেহ ছিল না, তাই সেই দিকে তাঁহার লক্ষ্যপাত হয় নাই। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দলের খোচানিতে তাঁহার চক্ষু জাগ্রত হইতেই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপুল সংখ্যক দোষ তাঁহার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার উপর অভিযোগের পর অভিযোগ আনিতে লাগিলেন। সেই সব অভিযোগ তাঁহার সন্ন্যাস-স্বভাবের দৃষ্টিতে মোটেই অবাস্তব ছিল না। আবার মোয়াবিয়া (রাঃ)ও তাঁহার শাসনপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে ঐ সব ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য ছিলেন, যদ্দরুণ খলীফা ওমরের ন্যায় কঠোর ব্যক্তিও ঐ ব্যাপারে তাঁহাকে অভিযোগমুক্ত রাখিয়াছিলেন। মোয়াবিয়া (রাঃ)ও আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; তাঁহার অভিযোগসমূহের দ্বারা জটিলতা সৃষ্টির আশংকায় তিনি সর্বময় ব্যাপার খলীফা ওসমান (রাঃ)কে লিখিয়াছিলেন এবং খলীফার পরামর্শ অনুযায়ী বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন ইত্যাদির সহিত আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মদীনায় পৌঁছার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

● মদীনায় পৌঁছিবার পর আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট লোকদের খুবই ভিড় হইতে লাগিল। কারণ, তিনি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে এমন কথা বলিতেছিলেন যাহার সমর্থনে অন্য আর কোন ছাহাবীই ছিলেন না। লোকদের ভীড় করায় তিনি নিজেই উত্যক্ত হইয়া খলীফা ওসমানের নিকট বিরক্তি প্রকাশ করতঃ ঐ অবস্থার আলোচনা করিয়াছিলেন। তখনও খলীফা তাঁহাকে মদীনা ত্যাগের কোন আদেশ মোটেই দেন নাই, বরং আবু-জর (রাঃ)কে তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর পূর্বক তাঁহার বিরক্তিকর অবস্থার অবসানের জন্য পরামর্শ দান-স্বরূপ বলিয়া ছিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে মদীনার শহর হইতে সিরিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে বসবাস করিতে পারেন। তাঁহার নিজস্ব মনোভাবরূপে এই পরামর্শ দানকালেও খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জর (রাঃ)কে মদীনার সংলগ্ন নিকটবর্তী শহরতলীর কোন স্থানে থাকিবার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আবু-জর (রাঃ) নিজেই উহার বিপরীত অভিপ্রায় নিজের সুবিধার্থে পেশ করিলেন। মদীনা শহর হইতে মক্কার পথে প্রায় ৪০।৫০ মাইল দূরে "রাবাযা" নামক একটি স্থান ছিল; পূর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। তিনি সেইখানে বসবাস করা পছন্দ করিলেন; ইহা খলীফা ওসমানের অভিপ্রায়ের পরিপন্থি ছিল বিধায় আবু-জর (রাঃ) খলীফার নিকট উহার অনুমতি চাহিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জর (রাঃ)কে তাঁহার নিজের পছন্দের উপর রাখা ভাল মনে করিয়া অনুমতি দিলেন। সেমতে আবু-জর (রাঃ) মদীনা হইতে রাবাযায় চলিয়া গেলেন। বাকি জীবনটুকু সেই এলাকায়ই কাটাইয়া তথায়ই চিরনিদ্রা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মাজার এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

● মোসলেম জাতির চিরশত্রু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দল আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে সম্মুখে রাখিয়া মোসলমানদের জাতীয় ঐক্যে আঘাত করার কুচেষ্টা অনেকই করিয়াছিল। কিন্তু আবু-জর (রাঃ) সরল হইলেও মোসলেম জাতির ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির বিষময় ফল ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেন। তাই তিনি তাহাদের সেই প্রস্তাবে তাহাদের মুখ কালা করিয়া তাহাদেরে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের ষড়যন্ত্রকারী দলটির তৎকালীন কেন্দ্র ছিল "কুফা" অঞ্চলে।

প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থ তবকাতে-ইবনে সাআদে বর্ণিত আছে—কুফা অঞ্চলের কতিপয় লোক রাবাযা এলাকায় আসিয়া আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহারা তাঁহাকে বলিল, এই লোকটা (অর্থাৎ খলীফা ওসমান) আপনার সহিত কত কত অসৌজন্য ব্যবহার করিয়াছে! আপনি আমাদের পতাকাবাহী হইয়া দাঁড়ান, আমরা আপনাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। উত্তরে আবু-জর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) যদি আমাকে দেশান্তরিত করিয়া দুনিয়ার শেষ প্রান্তেও পাঠাইয়া দেন তবুও আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ও অনুগত থাকিব (ফতহুলবারী, ৩—২১২)। বোখারী শরীফের মূল আলোচ্য হাদীছেও সর্ব শেষ বাক্যে আবু-জর (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সেই শুভ মতবাদ ও সেনোত্মী আদর্শের উক্তিই করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে পরের ধন ছিনাইবার মতবাদধারীরা আবু-জর গেফারী (রাঃ)কে নিয়া খুব টানা হেঁছড়া করে, কিন্তু ঐ শ্রেণীর লোক তাঁহার উল্লিখিত আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। এতভিন্ন ঐ লোকেরা পরের ধন ছিনাইবার জন্য ত আবু-জর (রাঃ)কে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দুষ্ট দলের ন্যায় সম্মুখে পাতাকাবাহীরূপে দেখাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিজের জীবনের উপর যেই বৈরাগ্য ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ছিল ঐ লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে উহার লেশমাত্র নাই।

আবু-জর (রাঃ) নিজে এত অধিক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, মৃত্যু সময় তাঁহার নিকট কাফনের ব্যবস্থাও ছিল না। মৃত্যুশয্যায় তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছিলেন। মুমূর্ষ অবস্থায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? তিনি বলিলেন, কাঁদি এই জন্য যে, আপনি ইহজগৎ ত্যাগ করিলে আপনাকে কাফন দেওয়ার কি ব্যবস্থা করিব? আবু-জর (রাঃ) স্ত্রীকে বলিলেন, সেই চিন্তা তুমি করিবে না। আমার মৃত্যু হইয়া গেল তুমি পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া সজোরে বলিও—الا ان اباذر قد مات হায়! আবু-জরের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে!!

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতীক্ষমান মুহূর্ত আসিয়া গেল। অছিয়ত অনুযায়ী তাঁহার স্ত্রী পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া ঐ ধ্বনি দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সহ এক দল লোক ঐ পথে যাইতেছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে ঐ ধ্বনি পৌঁছিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আবু-জর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাসস্থানে উপস্থিত

হইলেন এবং আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নিজের পাগড়ী দ্বারা তাঁহার কাফন দিলেন। এই ছিল আবু-জর গেফারীর ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের রূপ। আর তাঁহার জীবনের এইরূপের মূলে যাহা ছিল তাহা ছিল খোদাভীরুতার অদমনীয় অগ্নি—যাহার আভাস নিম্নের হাদীছে পাওয়া যায়।

আবু-জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কসম খোদার—(মৃত্যুর পর মানুষ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হইবে) যদি তোমরা উহা জানিতে, যেরূপ আমি জানি তবে নিশ্চয় তোমরা সারা জীবন হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী এবং বিবি লইয়া আরামের বিছানায় সুখভোগ করিতে না; নিশ্চয়ই তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে-ময়দানে চলিয়া যাইতে। আল্লার নিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে। আবু-জর (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া আবেগপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিতেন—يا ليتنى كنت شجرة تعضد হায়…! কতই না ভাল হইত যদি আমি একটা গাছরূপে হুনিয়াতে জন্ম নিতাম যাহা কাটিয়া ফেলা হয়!! অর্থাৎ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ মানুষের জন্য। অতএব তাহার সম্মুখেই সঙ্কট; গাছ-বৃক্ষ লতা-পাতারূপে হুনিয়ায় জন্ম নিলে কোন ভয় বা সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইত না। উহা কাটিয়া ফেলা হইত; তাহার উপরই উহার সমাপ্তি ঘটিত; হিসাব-নিকাশের বালাই তাহার সম্মুখে আসিত না। (মেশকাত শরীফ ৪৫৭)

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন—এই শ্রেণীর সন্ন্যাস-স্বভাব ও হুনিয়ার সব কিছু হইতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত সরল মানুষের ভাবাবেগ লইয়া ছিনিমিনি খেলা সঙ্গত হইবে কি? এবং যেই স্বভাব ও অনাসক্তির প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার ঐ ভাবাবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল সেই স্বভাব ও অনাসক্তিকে আয়ত্ব করা ব্যতিরেকে ঐ মানুষটির শুধু ভাবাবেগের উক্তি লইয়া মাঠে নামিয়া পড়া ছল-চাতুরী বৈ আর কি হইবে?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রাঃ) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের সাবধানবাণী ও আজাবের সংবাদ ঐ লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যতিরেকে ধন জমা করে। ইহাই সমস্ত ছাহাবীগণের মত। একমাত্র আবু-জর গেফারী (রাঃ) তাঁহার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-স্বভাবের প্রভাবে উহার ব্যতিক্রম বলিতেন, উহা ইসলামের বিধান ও নীতি নহে। অবশ্য আল্লার বিধানগত মাল খরচের ক্ষেত্র হুই প্রকার—এক প্রকার নির্দ্ধারিত যেমন, যাকাত। দ্বিতীয় প্রকার অনির্দ্ধারিত, যাহার প্রতি ইঙ্গিত দানে ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন—উহা বিশেষ লক্ষণীয়।

——(০)——

মালের উপর যে সব হক আছে সেই সব হক আদায়ের ক্ষেত্রে মাল খরচ করা

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বীয় ধন হইতে দান করার ব্যাপারে আল্লার বিধানগত ক্ষেত্র দুই প্রকার—নির্দ্ধারিত, যেমন যাকাত; আর এক হইল অনির্দ্ধারিত। আলোচ্য পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় তথা মাল দানে আল্লার বিধানগত অনির্দ্ধারিত ক্ষেত্র আলোচনাই উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দুইটি আয়াত বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(১) وَلٰكِنَّ الْبِرَّ .... وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى

وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ ...... وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ......

ইসলাম ও ঈমানের চাহিদা বা দাবী এবং কর্তব্যাবলীর বর্ণনায় ইহা একটি বিশেষ আয়াত। আয়াতটির পূর্ণ তফছীর প্রথম খণ্ডে ঈমানের অধ্যায়ে "ঈমানের শাখা-প্রশাখা পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামের কর্তব্যরূপে প্রথম দিকে বলা হইয়াছে—"ধনের মহব্বৎ স্বভাবতঃ অন্তরে গ্রথিত থাকা সত্ত্বেও ধন দান করিবে আত্মীয়দেরকে, এতীমদিগকে, দরিদ্রদিগকে, নিঃসম্বল পথিককে এবং ভিক্ষুককে, আর দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে মুক্ত করিতে। তারপর শেষের দিকে আর এক কর্তব্যরূপে বলা হইয়াছে—যাকাত আদায় করিবে।" এই বর্ণনায় ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, ধন দানে প্রথমোক্ত কর্তব্যটি যাকাত নামের নির্দ্ধারিত কর্তব্য হইতে পৃথক কর্তব্য। এই তথ্যটি এই আয়াতের বরাত দানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ধনীদের মালের উপর যাকাত ভিন্ন অন্য হকও রহিয়াছে। নবী (দঃ) তাঁহার এই উক্তির প্রমাণে আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছেন।

(২) وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (২৭ পাঃ ১৮ রুঃ)

ঠিক এই শব্দাবলীর মাধ্যেমেই ২৯ পারা ৭ রুকুতেও একখানা আয়াত রহিয়াছে। উভয় স্থানেই আল্লাহ তায়ালা কোন্ শ্রেণীর লোক বেহেশত লাভ করিবে উহার বর্ণনা দানে বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে এই গুণটিও উল্লেখ করিয়াছেন—"তাহাদের ধনের মধ্যে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের হক রহিয়াছে—সেই লক্ষ্য তাহারা রাখে।"

প্রথম আয়াতটির মর্ম বর্ণনায় রসুলের মুখেই "হক" শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে—যাহা মালের উপর যাকাত ভিন্ন প্রবর্তিত; দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লার কালামেই "হক" শব্দ ব্যবহৃত আছে। ধনীদের মালের উপর সেই হকের আলোচনায়ই বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদটি

বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হক্কের ক্ষেত্র প্রথম আয়াতে ছয়টি উল্লেখ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে উহা হইতেই দুইটির উল্লেখ হইয়াছে—ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত; বঞ্চিত বলিতে প্রথম আয়াতে উল্লেখ্য দরিদ্রই উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্র সমূহে মাল দান করার দুইটি পর্য্যায় আছে—একটি হইল মোস্তাহাব তথা অধিক ছওয়াব লাভ ও আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রশংসণীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে সর্বদা দান-খয়রাত করার প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায় হইল ফরজ তথা শরীয়ত কর্তৃক বাধ্যতামূলক। এই পর্য্যায়টি বিশেষ অবস্থায় প্রযোয্য। যথা—কেহ অনাহারে বা অভাবের দরুন কিম্বা অন্য কোন এমন কারণে যাহার প্রতিকার টাকা-পয়সা দ্বারা হইতে পারে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে সে ক্ষেত্রে সামর্থবান ব্যক্তির উপর ফরজ হইবে তাহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করা। এমনকি দেশে এরূপ অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করিলে উহার প্রতিকারের জন্য সুশৃঙ্খলপে ধনধারীদের উপর প্রয়োজন পরিমাণ কর আরোপের বিধানও ইসলামের আছে। অবশ্য এক্ষেত্রে শরীয়তের অন্য দুইটি বিষয় বিশেষরূপে পালণীয়।

প্রথম :—দেশের জলজ, বনজ ও খনিজ ইত্যাদি সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ইসলামী বিধানে গরীব কাঙ্গালের জন্য এক বড় অংশ রক্ষিত ও নির্দ্ধারিত আছে; তদুপরি রাষ্ট্রিয় বিভিন্ন আয় ও অধিকারে গরীব-কাঙ্গালের জন্য অংশ রক্ষিত আছে। প্রথমতঃ দেশের দারিদ্র দূরীকরণে এবং উহার প্রতিরোধে ঐ সব নির্দ্ধারিত অংশ সমূহ নিয়মিত উহার পাত্র সমূহে ব্যয়িত হইতে থাকিবে। আর দেশের সকল সামর্থবান হইতে নিয়মিত যাকাত এবং খামারের মালিকদের হইতে নিয়মিত ওশর উহার পাত্র সমূহে ব্যয়িত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন জাতীয় ধনভাণ্ডার বাইতুল-মালকে ইসলামী বিধান মতে জনগণের অভাব মোচনে নিয়মিত চালু রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় :—বেকারদিগকে কাজ করিতে এবং রোজগারীদেরকে তাহাদের আয় অপচয় ও অপব্যয় হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

দেশের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় আয় রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী মণ্ডলী এবং হোমরা-চোমরাদের বড় বড় বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী, বিভিন্ন এলাউন্সে ও ভোগ-বিলাসে খরচ করা হইবে, দেশের বাজেটে গরীব-কাঙ্গালের কোন খাত থাকিবে না—আর দেশের অভাব মোচনের জন্য বৈধ ধনধারীদের ধন কাড়িয়া আনা হইবে—ইসলাম এই নীতি সমর্থন করে না। তদ্রূপ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি কাজ না করিয়া কিম্বা স্বীয় উপার্জন মদ-তাড়ি, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি পথে ব্যয় করিয়া বঞ্চিত সাজিবে; আর তাহাদের অভাব মোচনে বৈধরূপে ধন সঞ্চয়কারীদের ধন ছিনাইয়া আনা হইবে—ইহাও ইসলাম সমর্থন করে না।

——(*)——

খ্যাতি অর্জন ও লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করার পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا. لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا. وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করিও না—উপকার গ্রহণকারীকে কষ্ট দিয়া বা তাহার উপর কটাক্ষ পূর্বক উপকার করার বুলি আওড়াইয়া; ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রিয়া—খ্যাতি অর্জন বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানও রাখে না। (তদ্দরুণ তাহার দান-খয়রাত বিনষ্ট হইয়া পরকালে নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন হইয়া যায়।) তাহার দান-খয়রাতের অবস্থা এরূপ যেমন—একটি মসৃণ পাথরের উপর কিছু ধুলা-বালু জমিয়াছে, অতঃপর উহার উপর প্রবল বারিপাত হইয়া ঐ পাথরটিকে পরিষ্কারভাবে ধৌত করিয়া দিয়াছে। (এ ক্ষেত্রে যেরূপ ঐ পাথরের উপর ধুলা-বালুর নাম নিশানও বাকি থাকিতে পারে না যাহার উপর কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে—তদ্রূপ পরকালে ঐ ব্যক্তির দান-খয়রাতেরও কোন নাম-নিশানা থাকিবে না যাহার উপর সে ছওয়াব লাভ করিতে পারে, তাই) ঐ ব্যক্তি স্বীয় কৃত দান খয়রাতের ফলাফল কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। যাহারা আল্লার নীতি ও নির্দেশকে অস্বীকার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে (বেহেশতের) পথ দান করিবেন না। (৩ পাঃ ৪ রুঃ)

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, চারিটি কারণে দান-খয়রত নিষ্ফল ও বিনষ্ট হয়। যথা—(১) যাহাকে দান করা হইয়াছে তাহার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করতঃ তাহাকে কষ্ট দেওয়া। (২) যাহাকে দান করা হইয়াছে তাহার উপর কটাক্ষ করতঃ দান করার ও উপকার করার বুলি আওড়ান—খোঁটা দেওয়া। (৩) রিয়া—খ্যাতি অর্জন করা বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করা। (৪) দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি ঈমানহীন কাফের হওয়া।

হারাম মালের দান-খয়রাত আল্লার নিকট গ্রহণীয় নয়

একমাত্র হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-দৌলতের দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় হইয়া থাকে। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى - وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

অর্থ—যাচ্ঞাকারীকে মিষ্ট ভাষায় ফিরাইয়া দেওয়া এবং তাহার উৎপীড়নে ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐরূপ দান-খয়রাত হইতে উত্তম, যদ্দারা কাহাকেও কষ্ট দেওয়া এবং মর্মাহত করা হয়। আল্লাহ কাহারও প্রত্যাশী নহেন (তবুও মানুষকে শুধু তাহাদের নিজ স্বার্থেই দান-খয়রাতের প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন) এবং তিনি অতি সহিষ্ণু; (তাই তিনি অনেক সময় স্বীয় বিরুদ্ধাচরণকারীকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেন না (৩ পাঃ ৩ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ - وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ -
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থ—সুদে অর্জিত মালকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকেন। আর দান খয়রাতকে আল্লাহ তায়ালা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন—অর্থাৎ পরকালে উহার প্রতিদান দান করিবেন এবং সেই প্রতিফল সম পরিমাণ হইবে না, বহুগুণ বেশী হইবে। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে বিশেষতঃ নামায উত্তমরূপে আদায় করিয়াছে, যাকাত দান করিয়াছে তাহাদের জন্য প্রতিফল নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকট এবং তাহারা কোন আশঙ্কার সম্মুখীন হইবে না এবং চিন্তিত হইবে না। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সুদে অর্জিত ধনের দান-খয়রাত গ্রহণীয় নহে। কারণ সুদ ধ্বংসের সম্মুখীন, আর দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের বস্তু। তদ্রূপ কোন প্রকার হারাম মালের দান-খয়রাতই গ্রহণীয় নহে।

৭৩৮। **হাদীছঃ—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

وَلَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهٖ

كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত একটি খুরমা তুল্য বস্তু দান করিবে; স্মরণ রাখিও, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র হালালকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ দানকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া দানকারীকে প্রতিফল দানের নিমিত্ত উহাকে অতি যত্নের সহিত লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। যেরূপ তোমাদের মধ্যে ঘোড়ার মালিক স্বীয় ঘোড়ার বাচ্চাকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এমনকি (প্রতিপালনের দ্বারা) ঐ সামান্য দানের ফলাফল পাহাড় সমতুল্য হইয়া যাইবে।

দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হওয়া চাই; এক সময় দান গ্রহণকারী লুপ্ত হইয়া যাইবে

৭৩৯। হাদীছ:— حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِىْ

الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْجِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ

لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِىْ بِهَا ـ

অর্থ—হারেছ ইবনে ওহাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যথাসাধ্য তোমরা দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হও; তোমাদের সম্মুখে এমন এক সময় আসিবে যখন এক একজন দাতা স্বীয় দানের বস্তু লইয়া ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে, কিন্তু উহা গ্রহণকারী পাইবে না। কাহাকেও গ্রহণ করার অনুরোধ করিলে সে উত্তর করিবে, গতকাল এই দান আমি গ্রহণ করিতাম; অদ্য ইহার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই।

৭৪০। হাদীছ:— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ

فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهٗ وَحَتّٰى يَعْرِضَهٗ فَيَقُوْلُ الَّذِىْ

يَعْرِضُهٗ عَلَيْهِ لَا اَرَبَ لِىْ ـ

অর্থ---আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে---নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের তথা মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে নিশ্চয় এই অবস্থা হইবে যে, তোমাদের নিকট ধন-দৌলতের আধিক্য হইয়া যাইবে। এমন কি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইবে যে, তাহাদের দান গ্রহণকারী কে হইবে? কাহাকেও দানের অনুরোধ করিলে সে বলিবে, আমার প্রয়োজন নাই।

৭৪১। হাদীছঃ---আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দুই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন দারিদ্র্যের অভিযোগ করিল, অপর ব্যক্তি (জান, মাল ও মহিলাদের মান-ইজ্জৎ সম্পর্কে) রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার অভিযোগ জানাইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার ক্লেশ সত্বরই দূরীভূত হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই (ইসলামের শাসন ও প্রভাব বিস্তারের দ্বারা) দেখিতে পাইবে---মদীনা হইতে সুদূর মক্কা নগরী পর্য্যন্ত বণিক দল নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া যাইবে, পথের নিরাপত্তার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গোপন খবর সরবরাহকারী প্রহরী স্বরূপ কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে না। (আরও দেখিতে পাইবে, (ইরাকের কুফা এলাকার) হীরা শহর হইতে (কম-বেশ ১০০০ মাইল) একজন মহিলা একা ভ্রমণ করতঃ মক্কায় আসিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া যাইবে---আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ভয় তাহার করিতে হইবে না।)

দরিদ্রতার বিষয়ে স্মরণ রাখিও যে, কেয়ামত আসিবে না এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত যে, এক এক ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভরিয়া লইয়া দান-খয়রাত করার জন্য ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিবে, উহা গ্রহণকারী পাইবে না।

(আ'দী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, "হীরা" শহর হইতে একটি মহিলা মক্কায় আসিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া গিয়াছে---আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ভয় তাহার করিতে হয় নাই। তোমাদের সম্মুখ জীবনে নবীজীর ভবিষ্যৎবাণী---স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভরিয়া লইয়া ঘোরাফেরা করাও অচিরেই দেখিতে পাইবে। (১০০ হিজরীতে---খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আমলে বাস্তবিকই উহা দেখা গিয়াছে।)

× আর একটি বিষয় ভালরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং দোভাষী বা উকিলের মারফৎ নয়, বরং সরাসরি

× রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, ধন-দৌলত অস্থায়ী বস্তু এবং ধন-দৌলত সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখও অস্থায়ী। তাই এসবের সমাধানে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা আখেরাতের নাজাত, কামিয়াবী ও সুখ-শান্তির জন্য অধিক সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে আখেরাতের জীবনের একটি অবস্থাকে বিশেষরূপে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হইতে হইবে। আখেরাতের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ সম্বল হইল দান-খয়রাত।

আল্লাহ তায়ালার প্রশ্ন সমূহের উত্তর তোমার নিজেরই দিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছিলাম নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তর দিবে, হাঁ—নিশ্চয় নিশ্চয় দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমার প্রতি রসুল পাঠাইয়াছিলাম নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তর দিবে—হাঁ। ঐ সময় ডানে বামে তাকাইয়া দোযখের আগুন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। (ঐরূপ কঠিন সময়কে স্মরণ করিয়া) প্রত্যেকের আশু কর্তব্য—(সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করিয়া) দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিয়া যাওয়া; একটি খুরমার অংশমাত্র দান করার সামর্থ থাকিলে তাহাও করিবে। কোন কিছু দানের সামর্থ না থাকিলে, অন্ততঃ উপকারজনক কথা বলিয়া ঐরূপ ছওয়াব হাসিল করিবে। (যেমন—উপদেশমূলক কথা, বিবাদ মিটানোর কথা ইত্যাদি)

৭৪২। হাদীছঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرٰى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهٗ اَرْبَعُوْنَ امْرَئَةً يَلُذْنَ بِهٖ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন এক একজন লোক স্বর্ণের বোঝা লইয়া দান-খয়রাত করার জন্য ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু উহা গ্রহণকারী খুঁজিয়া পাইবে না। এবং পুরুষের সংখ্যা লোপ পাইয়া নারীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, এক একটি পুরুষের ভরণ-পোষণে চল্লিশ জন নারী আশ্রিতা হইবে।

ব্যাখ্যাঃ— উল্লিখিত হাদীছ সমূহে দান-খয়রাত গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, উহা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হইবে এবং ধন-দৌলতের আধিক্যের ভবিষ্যদ্বাণীও তখনই প্রকাশিত হইবে। অন্তিম শয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে স্বীয় জীবনী শক্তির সর্বশেষ অবশিষ্টাংশটুকুর সর্বস্ব একযোগে প্রকাশ করিয়া দেয়, যদ্দরুন ঐ ব্যক্তিকে মুহূর্তের জন্য সুস্থবৎ দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ উহাই তাহার অবলুপ্তির সর্বশেষ নিদর্শন। কারণ, জীবনী শক্তির কণামাত্রও তখন আর তাহার দেহাভ্যন্তরে অবশিষ্ট নাই, সে উহার সবটুকুই বাহির করিয়া দিয়াছে। তদ্রূপ ভূমণ্ডলও তাহার অন্তিম সময় স্বীয় বক্ষে প্রোথিত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি খনিজ ধন-দৌলত এবং উদ্ভিদ উৎপাদনের শক্তি ও ক্ষমতার সমগ্র অবশিষ্টাংশটুকু একযোগে প্রকাশ ও বাহির করিয়া দিবে। যাহার ফলে উদগীর্ণ বস্তুর ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্যের পাহাড় উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিবে। ভূমির উর্বরা শক্তির প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের এত উন্নতি ও প্রাচুর্য্য হইবে যে, এক একটি আনার চল্লিশজনের আহারের জন্য যথেষ্ট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এই সবের বিবরণ ইন্‌শা-আল্লাহ্ তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে।) এমতাবস্থায় কে দান-খয়রাতের প্রত্যাশী হইবে? এতদ্ব্যতীত তখন বিশ্বমানব ভয়-ভীতি ও বিভীষিকাবস্থায় জর্জরিত থাকিবে। তেমন অবস্থায় ধন-দৌলতের স্পৃহা থাকিবে না—ইহার পূর্বে দান-খয়রাতই প্রশংসনীয়।

দান-খয়রাত অল্প হইলেও নিয়্যত খালেছ হইলে উহার প্রতিফল অনেক বেশী

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থ—যাহারা স্বীয় ধন-দৌলত দান করিয়া থাকে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজকে নেক কার্য্যে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে, তাহাদের দানকৃত বস্তুর অবস্থা ঐ বাগিচার ন্যায় যে বাগিচা পাহাড়ি অঞ্চলের কোন উঁচু টিলার উপর অবস্থিত, (যাহার উর্বরাশক্তি অত্যন্ত বেশী হয়) এবং উহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত হইয়াছে, ফলে উহার উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ঘটনাক্রমে কোন সময় যদি উহার উপর প্রবল বারিপাত না হইয়া অল্প বৃষ্টিও হয় তবুও উহাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে, (যেহেতু ঐরূপ জমি অতিশয় উর্বরা)। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কর্মের খোঁজ রাখেন। (৩ পাঃ ৪ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—আয়াতের তাৎপর্য্য এই যে, খালেছ নিয়্যতে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত উল্লিখিত জমি তুল্য। তাই খালেছ নিয়্যতে অধিক পরিমাণে আল্লার রাস্তায় দান করিলে অত্যধিক প্রতিফল লাভে কোন সন্দেহই নাই। আর অল্প পরিমাণ দান খালেছ নিয়্যতে করিলে উহাতেও যথেষ্ট প্রতিফল লাভ হইবে, যেরূপ উর্বরা জমিতে বৃষ্টি কম হইলেও ফসল যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

৭৪৩। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন দান-খয়রাতের বিশেষ ছওয়াব ও ফজিলত বর্ণিত আয়াত সমূহ নাজেল হইল, তখন আমরা দান-খয়রাতের প্রবল আগ্রহে মাতিয়া উঠিলাম। এমনকি, বোঝা বহন ইত্যাদি গায়ে খাটা পারিশ্রমিক দ্বারা দান-খয়রাতের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইলাম। (আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নামক

ধনী ব্যবসায়ী) এক ছাহাবী একদা অনেক মাল খয়রাত করিলেন। মোনাফেকরা দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, সে লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে দান করিতেছে। (আবু আকীল (রাঃ) নামক) আর এক ছাহাবী (বোঝা উঠাইয়া সেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পারিশ্রমিক দ্বারা) প্রায় চারি সের খাদ্যবস্তু খয়রাত করিলেন। তখন মোনাফেকরা এরূপ বিদ্রূপোক্তি করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এই অল্প পরিমাণ দানের প্রত্যাশী নহেন।

মোনাফেকদের ঐরূপ কু-উক্তির নিন্দায় এই আয়াতটি নাজেল হইল—

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۔ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

অর্থাৎ—উহারা মোনাফেক, যাহারা ঐসব মোমেনগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, যাহারা মনের খাহেশ ও উৎসাহে সন্তুষ্টচিত্তে (অধিক মাল) দান-খয়রাত করিয়া থাকে এবং ঐ মোমেনগণের প্রতিও কটাক্ষ করে যাহারা অতি কষ্টে অর্জিত (অল্প পরিমাণ) পারিশ্রমিক হইতে অধিক কিছু দান করিতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ অল্প পরিমাণ দান-খয়রাত করিয়া থাকে; দুরাচার মোনাফেকরা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপোক্তি করিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা ঐসব দুরাচারদিগকে তাহাদের এই কু-কর্মের প্রতিফল ভোগে বাধ্য করিবেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। (১০ পাঃ ১৬ রুঃ)

৭৪৪। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করিলে সে উৎসাহে মাতিয়া উঠিত; এমনকি হাটে বাজারে যাইয়া মোট বোহন ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করিয়া সামান্য কিছু উপার্জন করিয়া আনিত (এবং উহা দান করিত। সেই যমানার সাধারণতঃ ছাহাবীদের জমা করা ধন-দৌলত ছিল না।) আজ এক একজন মোসলমান লক্ষপতি। (কিন্তু দান-খয়রাতের সেই আগ্রহ ও উৎসাহের শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে।)

৭৪৫। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি ভিখারিণী দরিদ্রা নারী আমার ঘরে আসিল, তাহার সঙ্গে তাহার দুইটি শিশু কন্যাও ছিল। আমি তাহাকে একটি মাত্র খুরমার অধিক আর কিছুই দিতে পারিলাম না। ঐ খুরমাটি পাইয়া সে নিজে উহার একটু অংশও খাইল না, কন্যাদ্বয়কে দিয়া দিল; অতঃপর সে চলিয়া গেল। এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ ঘটনা শুনাইলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মেয়েদের ভরণ-পোষণ জোটানোর জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে ঐ ব্যক্তির জন্য সেই মেয়েগণ দোযখ হইতে পরিত্রাণের অবলম্বন হইবে।

ধনের প্রতি আকর্ষণ ও প্রয়োজন থাকাবস্থায় দান করা অধিক প্রশংসনীয়

অর্থাৎ—অনেক সময় মানুষ এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তখন দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু হইতে সে বিচ্ছেদ ও বিদায় অতি সন্নিকটে দেখিতে থাকে। এমতাবস্থায় কোন বস্তুর প্রয়োজন বা কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাহার অন্তরে স্থান পায় না। তেমন অবস্থায় দান-খয়রাত করিলেও ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থার পূর্বেই দান-খয়রাত করা অধিক প্রশংসনীয়, উহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

অর্থ—তোমরা আমারই প্রদত্ত ধন হইতে আমার রাস্তায় দান কর মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বে। নতুবা মৃত্যু উপস্থিত হইলে পর তখন অনুতপ্ত হইয়া এক একজন এই উক্তি করিবে, হে পরয়ারদেগার! কেন আমাকে আরও কিঞ্চিৎ সময় ও সুযোগ দান করিলেন না, তবেই ত আমি দান-খয়রাত করিতাম এবং নেক কাজ করিয়া নেক লোকদের দলভুক্ত হইতাম? স্মরণ রাখিও—কোন প্রাণীর মৃত্যু-সময় উপস্থিত হইলে পর তাহাকে আর (বাঁচিয়া থাকিবার জন্য) এক মুহূর্ত সময়ও দান করা হইবে না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কৃত কর্মের খোঁজ রাখেন (২৮ পাঃ ১৪ রুকু)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! আমার দেওয়া ধন হইতে আমার রাস্তায় খরচ কর ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন প্রকার খরিদ-বিক্রী তথা ব্যবসায়ের সুযোগ থাকিবে না এবং শুধু বন্ধুত্ব বা সুপারিশ কার্য্যকরী হইবে না। (৩ পাঃ ২ রুঃ)

৭৪৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ দান-

খয়রাতের ছওয়াব বেশী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, এমন অবস্থায় দান খয়রাত করা যখন তুমি সুস্থ সবল আছ, ধনের প্রতি তোমার আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয়-ভীতিও আছে এবং তুমি ধনাঢ্য থাকার প্রতি লালায়িত আছ—এইরূপ অবস্থায় দান করার ছওয়াব বেশী।

দান-খয়রাত করিতে এরূপ বিলম্ব করিও না যে, যখন তোমার শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া গিয়াছে, তখন তুমি (দরিদ্র-মিছকীনদের নাম লইয়া) বলিতে থাক, অমুককে এত দিলাম, অমুককে এত দিলাম। অথচ তুমি যে অবস্থায় পৌছিয়াছ সে অবস্থায় স্বীয় ধন-দৌলতের উপর হইতে তোমার কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়া উহার উপর উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। (এমতাবস্থায় তুমি সমুদয় ধন দান করিয়া ফেলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না)।

মছআলাহঃ—মানুষ মৃত্যুশয্যায় পতিত হইলে পর তাহার সত্বাধিকার ও কর্তৃত্ব স্বীয় ধন-সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়,বাকি দুই তৃতীয়াংশের সঙ্গে উত্তরা-ধিকারিগণের স্বত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়। উল্লিখিত হাদীছে এই বিষয়েই উল্লেখ আছে।

৭৪৭। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক বিবি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, (আপনি যদি আমাদের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান তবে) আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আমাদের মধ্য হইতে অগ্রগামিনী কে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হস্ত অধিক লম্বা সে-ই আমার সহিত মিলনে অগ্রগামিনী হইবে। এতদশ্রবনে বিবিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত কঞ্চি দ্বারা মাপিলেন। দেখা গেল, ছওদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার হস্ত সর্বাধিক লম্বা। (তখন সকলেই ভাবিলেন, তিনিই সর্বাগ্রে মিলন লাভে সৌভাগ্যবতী হইবেন), কিন্তু পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাক্যে—"যাহার হস্ত অধিক লম্বা" এর উদ্দেশ্য ছিল অধিক দানশীলতা। কারণ হযরতের ইহজগত ত্যাগের পর বিবিগণের মধ্য হইতে যিনি সর্বাগ্রে হযরতের মিলন লাভ (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ) করেন তিনি হইলেন যয়নব (রাঃ); অথচ যয়নব (রাঃ) বিবিগণের মধ্যে খর্বকায় ছিলেন, তাঁহার হস্তও খাটছিল। কিন্তু তিনি সর্বাধিক দানশীলা ছিলেন। (তিনি নানাবিধ হস্ত কার্যের দ্বারা উপার্জন করিয়া তাহা দান-খয়রাত করিতে অভ্যস্তা ছিলেন। দান-খয়রাতের প্রতি তাঁহার ন্যায় অনুরাগিণী আর কেহই ছিলেন না)।

প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

অর্থ---যাহারা স্বীয় ধন (আল্লার রাস্তায়) দান করিয়া থাকে রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায়, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, তাহাদের জন্য তাহাদের (কর্মের) পুরস্কার তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং তাহারা কোন ভয়ের সম্মুখীন হইবে না এবং দুশ্চিন্তারও সম্মুখীন হইবে না। (৩ পাঃ ৬রুঃ)

গোপনে দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۔ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -

অর্থ---যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে তাহা অত্যন্ত ভাল কাজ, আর যদি গোপনভাবে গরীব দুঃস্থকে দান কর তবে তাহা অধিক উত্তম এবং দান-খয়রাত তোমাদের গোনাহের বিলুপ্তি সাধন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কৃতকর্মের খবর রাখেন। (৩ পাঃ ৭ রুঃ)

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রথম খণ্ডে অনূদিত ৪০০নং হাদীছখানার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অজ্ঞাতসারে অনুপযুক্ত পাত্রে দান করিলে ?

৭৪৮। হাদীছঃ---আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন---এক ব্যক্তি একদা রাত্রিবেলায় এই পণ করিল যে, এই রাত্রে আমি কিছু দান-খয়রাত করিব। এই পণ করিয়া সে দানের বস্তু লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং একজনকে দান করিল। ঘটনাক্রমে ঐ দানগ্রহণকারী একজন চোর ছিল। ভোর হইলে পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল রাত্রিবেলায় এক চোরকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। ঐ দানকারী ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করিল (যে, এরচেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তাহার দান প্রদত্ত হয় নাই)। পরদিন রাত্রে পুনরায় সে ঐরূপ পণ করিল এবং দানের বস্তু লইয়া বাহির হইল। আজ তাহার দান একটি পতিতা নারীর হাতে পড়িল। ভোর হইলে পর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, অদ্য রাত্রে এক অসতী পতিতা নারীকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করিল (যে, এরচেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তাহার দান প্রদত্ত হয় নাই)। পরদিন রাত্রে আবার সে ঐরূপ পণ করিয়া দানের বস্তু লইয়া বাহির হইল। আজ তাহার

দান এক ধনাঢ্য ব্যক্তির হাতে পড়িল (যে দান-খয়রাতের যোগ্য পাত্র নহে)। ভোর হইলে লোকের মধ্যে এই কথাবলি হইতে লাগিল যে, অদ্য রাত্রে এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। এইবার ঐ দানকারী ব্যক্তি ঘটনা জানিতে পারিয়া এই উক্তি করিল যে, হে আল্লাহ্! আমার দান চোরের হস্তে, অসতী নারীর হস্তে এবং দানের অযোগ্য ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে—সর্বাবস্থায়ই তোমার প্রশংসা ও শোকর যে, তুমি আমাকে তৌফিক দান করিয়াছ। (কিন্তু সে ভাবিল, তাহার দান যোগ্য ও শুদ্ধ পাত্রে প্রদত্ত না হওয়ায় তাহার দান নিষ্ফল হইয়াছে।) স্বপ্নের মধ্যে কেহ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান পূর্বক বলিয়া গেল, স্মরণ রাখিও! তোমার যে দান চোরের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে (তাহা আল্লার দরবারে কবুল হইয়াছে, কারণ) উহা দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ চোর এই ধন পাইয়া চুরি পরিত্যাগ করতঃ সাধু হইয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ যে দান পতিতার হাতে প্রদত্ত হইয়াছে (তাহাও কবুল হইয়াছে, কারণ) উহার এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ পতিতা এই ধনের অছিলায় স্বীয় পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সৎ হইয়া যাইতে পারে। অতঃপর যে দান ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে পড়িয়াছে (উহাও কবুল হইয়াছে, কারণ) উহার দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে যে, ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি দান করার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করিয়া যে স্বীয় ধন আল্লার রাস্তায় খরচ করায় অভ্যস্ত হইতে পারে।

অজ্ঞাতসারে স্বীয় পুত্রকে দান-খয়রাত করিলে

৭৪৯। **হাদীছ**ঃ—ইয়াযীদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর পুত্র মা'আন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার পিতা ও পিতামহ আমরা সকলে একত্রেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং আমার বিবাহ প্রস্তাব দান করিয়াছিলেন এবং বিবাহ পড়াইয়াছিলেন। (অর্থাৎ হযরতের সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল;) একদা আমি তাঁহার খেদমতে নালিশ করিলাম যে, আমার পিতা কতগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা খয়রাত করার নিয়্যতে (যোগ্য পাত্রে উহা দান করার জন্য) মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি আমার পরিচয় জানিত না এবং আমিও এই মুদ্রাগুলি আমার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম না। আমি নিঃস্ব গরীব ছিলাম; নিজস্ব কোন সম্পদ আমার ছিল না, তাই ঐ ব্যক্তি ঐ স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি আমাকে দান করিলেন, আমিও উহা গ্রহণ করিলাম। আমার পিতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, এই মুদ্রা তোমাকে দান করার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। (অর্থাৎ আমার নিয়্যতের পরিপন্থী হওয়ায় ইহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।) আমি উহা ফেরৎ দিতে রাজি না হইয়া রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করিলাম। হযরত (দঃ) আমার পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি যে, দান করার নিয়্যত করিয়াছ তাহার ছওয়াব পুরাপুরিই লাভ করিবে (যদিও অজ্ঞাতসারে উহা তোমারই পুত্রের হস্তগত হইয়াছে) এবং আমাকে বলিলেন, তুমি যাহা লইয়াছ তুমি উহার মালিক সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছ।

নছিহতঃ—যাকাত, ফেৎরা ইত্যাদি ফরয ওয়াজেব দান অবশ্যই শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত পাত্রে দিতে হয়। যাকাত গ্রহণের অযোগ্য পাত্র যেমন—নেছাব পরিমাণ মালের মালিক বা স্বীয় সন্তান-সন্ততি বা পিতা-মাতা ইত্যাদিকে যাকাত, ফেৎরা দিলে আদায় হইবে না। আলোচ্য হাদীছের দান যাকাত ছিল না, নফল ছদকা ছিল, নফল ছদকা নিজের গরীব সন্তানকে দেওয়া যায়।

স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে দান করিবে

শরীয়ত অনুমোদিত দান-খয়রাত উহাই যদ্দরুণ নিজে কাঙ্গাল হইতে না হয় বা কোন ওয়াজেব হক আদায় করিতে ব্যাঘাত না ঘটে। দান-খয়রাত করিয়া নিজে ভিখারী হওয়া বা স্বীয় পরিবারবর্গকে ভিখারী করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। তদ্রূপ ঋণ পরিশোধ না করিয়া খয়রাত করা, দান করা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী। এমনকি, কোন ব্যক্তি ঋণে পূর্ণ পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলে অর্থাৎ তাহার সম্পূর্ণ সম্পত্তির সমান ঋণ থাকিলে মহাজনদের অভিপ্রায় অনুসারে শাসন পরিচালক কাজী ঐ ব্যক্তির উপর দান-খয়রাত ইত্যাদি হস্তান্তর কার্য্যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিবেন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রযোজ্য গণ্য হইবে না, বরং মহাজনের হক রক্ষার্থে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত দান-খয়রাতের বস্তু ফেরত লওয়া হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি ধ্বংস হওয়ার বদ-দোয়া করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়ের দলীল এই—কা'আ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী এক ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, আমি স্বীয় গোনাহ হইতে তওবা করার সঙ্গে ইহাও করিতে চাই যে, আমার সমুদয় ধন-সম্পত্তি আল্লার রাস্তায় দান করিয়া দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, সমুদয় ধন দান না করিয়া কিছু সম্পত্তি নিজের জন্যও রাখ, ইহাই তোমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ পন্থা। তখন তিনি তাহাই করিলেন।

কোন ব্যক্তি যদি (নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে) আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কাল ও ভরসা স্থাপন করায় শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় এবং তাহার ধৈর্য্যগুণ অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রবল হয় তবে এরূপ ব্যক্তিবিশেষের জন্য এই প্রকার দান-খয়রাত করা জায়েয আছে যে, নিজের খাবার ব্যবস্থা না রাখিয়া গরীবের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সর্বস্ব দান করিয়া দেয়। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়া আবু বকর (রাঃ) এইরূপ করিয়াছিলেন। (যথাস্থানে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইবে)।

৭৫০। হাদীছ :— قال ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম দান-খয়রাত উহা যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে করা হইয়া থাকে। স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের জন্য ব্যয় কর যাহাদের ভরণ-পোষণ তোমার জিম্মায় রহিয়াছে।

৭৫১। হাদীছ :— عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ

بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ

يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ -

অর্থ—হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উপরের (অর্থাৎ দানকারী) হস্ত নীচের (অর্থাৎ গ্রহণকারী) হস্ত অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ তুমি দানকারী হইবার চেষ্টা কর: দান গ্রহণকারী হইও না। স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের প্রতি ব্যয় কর যাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার তোমার উপর ন্যস্ত। উত্তম দান-খয়রাত উহা—যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু হইতে করা হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভিক্ষা করা এবং নিম্ন হস্ত তথা দান গ্রহণকারী হওয়া এড়াইয়া চলায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন যেন সে ঐসব মলিনতা হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি প্রত্যাশা পরিহার করায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপ্রত্যাশী থাকার ব্যাপারে সহায়তা করিবেন।

৭৫২। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়াইয়া দান-খয়রাত করা ও ভিক্ষা না করার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উপরের হাত দানকারীর হাত এবং নীচের হাত ভিক্ষুকের হাত।

দান করিয়া খোঁটা দেওয়ার পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا

اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থ—যাহারা আল্লার সন্তুষ্টি লাভে তাহাদের মাল (দান করায়) ব্যয় করে তারপর সেই দানের উপর খোঁটা না দেয় এবং উৎপীড়ন না করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং আখেরাতে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না। এবং চিন্তারও কারণ থাকিবে না—(৩ পাঃ ৪ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে, কাহাকেও দান করিয়া তাহাকে খোঁটা দেওয়া হইলে বা উৎপীড়ন করা হইলে সেই দানের কোন ফল আল্লাহ তায়ালার নিকট পাওয়া যাইবে না।

এই মর্মে আরও একখানা আয়াত ৩ পারা ৫ রুকু হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দান-খয়রাতের জন্য সুপারিশ করা

৭৫৩। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন ভিক্ষুক বা অভাবগ্রস্ত প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তি আসিলে তিনি উপস্থিত লোকদেরকে আদেশ করিতেন, তোমরা এই ব্যক্তির অভাব মোচনের জন্য আমার নিকট সুপারিশ ও অনুরোধ কর, ফলে তোমরাও ছওয়াব লাভ করিবে। অবশ্য আল্লাহ তালায়া আমাকে যেরূপ তৌফিক দান করিবেন (সর্বাবস্থায়—তোমাদের সুপারিশ ব্যতিরেকেও) আমার মুখে ঐরূপের উত্তরই বাহির হইবে। (কিন্তু তোমরা স্বীয় কার্য্যের ছওয়াব লাভ করিবে।)

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বদা এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকিতেন যদ্দারা তাঁহার উম্মতগণ অতি সহজে পুণ্য ও ছওয়াব হাসিল করিতে পারে। উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত শিক্ষাটি ঐরূপ একটি ছওয়াব হাসিলের অন্যতম উপায়। কত সুন্দর উপায়। একজন লোক মনস্থ করিয়াছে দশটি টাকা এক ভিক্ষুককে দান করিবেন এমতাবস্থায়ও যদি কেহ সুপারিশকারী হয় এবং সুপারিশের পরেও সে দশ টাকাই দান করে, এ স্থলে ঐ সুপারিশের দ্বারা কোন অতিরিক্ত ফলোদয় না হওয়া সত্ত্বেও সুপারিশকারী ছওয়াবের ভাগী হইবে। এমনকি, কোন স্থলে দানকারী স্বীয় দান হইতে বিরত থাকিলেও সেস্থলে সুপারিশকারী ছওয়াব লাভ করিবে। ইসলামের বিধান এই যে, নেক কাজের প্রতি আহ্বানেও ছওয়াব লাভ হয়। উল্লিখিত হাদীছের শিক্ষানুযায়ী একটি দানের অছিলায় অনেক লোক ছওয়াব লাভে সক্ষম হইবে।

৭৫৪। হাদীছ ঃ—আছমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার ধনের থলিয়া গরীব-দুঃখী হইতে বাঁধিয়া রাখিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালাও স্বীয়-ধন-ভাণ্ডার তোমার জন্য বন্ধ করিয়া দিবেন। আল্লার রাস্তায় খরচ করা বন্ধ করিও না এবং কড়া ক্রান্তি হিসাব করিও না। (—হিসাব অপেক্ষা বেশী দাও।) নতুবা আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবেন। যথাসাধ্য আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর।

অমুসলিম থাকা অবস্থায় কৃত দান-খয়রাত

৭৫৫। হাদীছঃ—হাকীম ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছওয়াব ও পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে যে সব দান-খয়রাত ইত্যাদি করিয়া থাকিতাম, আমরা কি উহার ছওয়াবের অধিকারী হইব? তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, اسلمت على ما سلف من خير "ইসলামের প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী ভাল কার্য্য সমূহের উপর প্রবর্তিত হইয়া থাকে।"

ব্যাখ্যাঃ—আল্লাহ তায়ালার অপার রহমত ও অসীম করুণা যে, কোন ব্যক্তি জীবনের এক বড় অংশ তাঁহার বিদ্রোহীতায় কাটাইবার পর যখন সে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আসে—তথা ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাহার জন্য ইসলামের দুইটি দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে—(১) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে যে সকল আল্লাহদ্রোহীতা ও গোনাহের কাজ করিয়াছে ইসলামের বদৌলতে সে সবই মাফ হইয়া যাইবে—الاسلام يهدم ما كان قبله "ইসলাম পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহের বিলুপ্তি সাধন করে। (২) এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বহু প্রমাণাদির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, দান-খয়রাত ইত্যাদি যে কোন নেক ও ভাল কাজ আল্লাহ তায়ালার দরবারে গ্রহণীয় হইবার এবং উহার ছওয়াব ও সুফল পাইবার জন্য প্রথম শর্তই হইল ঈমান। ঈমানহীন ব্যক্তির কোন ভাল কাজই গ্রহণীয় নহে। অমুসলিম ব্যক্তি দান-খয়রাত ইত্যাদি ভাল কাজ যতই করিয়া থাকুক, এ শর্তানুসারে সবই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূর্বকৃত ঐসব নিষ্ফল ভাল কাজসমূহ সজীব, সতেজ ও সফল হইয়া উঠিবে এবং সে উহার ছওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হইবে। উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য ইহাই।

দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালকের ছওয়াব

মালিকের অনুমতি ও আদেশানুযায়ী দান-খয়রাত কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালক ব্যক্তিও ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে।

৭৫৬। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا

غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন স্ত্রী যদি স্বীয় স্বামীর খাদ্য সামগ্রী হইতে স্বামীর অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে স্বামী যেরূপে মালিকানা স্বত্বে ছওয়াবের অধিকারী তদ্রূপ

স্ত্রীও দান কার্য পরিচালিকারূপে ছওয়াবের অধিকারিণী হইবে। এমনকি, কোষাধ্যক্ষ পর্যন্ত ঐ দানের ছওয়াব লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা:—অনেক স্থলে দেখা যায়, প্রকৃত মালিক দান-খয়রাতের আদেশ বা অনুমতি দিয়া থাকে, কিন্তু কোষাধ্যক্ষ ম্যানেজার বা কার্য পরিচালকগণ স্বীয় কৃপণতার প্রবৃত্তি বা অন্য কোন অজুহাতের দরুণ উহাতে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে, ফলে সেস্থলে দান-খয়রাত কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, যদি তাহারা ঐ কু-প্রবৃত্তি মুক্ত হইয়া মালিকের ন্যায় উদারতার সহিত দান-খয়রাত কার্য পরিচালনা করে তবে তাহারাও ছওয়াব লাভ করিবে।

৭৫৭। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ

مَا اُمِرَ بِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهٖ نَفْسُهٗ فَيَدْفَعُهٗ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهٗ

بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ـ

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে আমানতদার মুসলমান কোষাধ্যক্ষ স্বীয় মনীবের আদেশানুযায়ী উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতার সহিত আদেশকৃত পাত্রে আদেশকৃত পরিমাণ পুরোপুরিরূপে দান-খয়রাত কার্য পরিচালনা করে, সেই কোষাধ্যক্ষও একজন বিশেষ দানশীলরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন দান করা

৭৫৮। হাদীছ:— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهٗ مِثْلُهٗ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهٗ بِمَا اكْتَسَبَ

وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘর হইতে গরীব-দুঃখীকে অন্ন দান (বা অর্থ দান) করে, অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন পর্যায়ে নহে, তখন সে স্ত্রী স্বীয় দান-কার্যের ছওয়াবের অধিকারীণী হয় এবং স্বামীও স্বীয় অর্জিত অন্ন বা ধন খরচ হওয়ার ছওয়াব লাভ করে। এমনকি, সেই ধনের কোষাধ্যক্ষও ছওয়াব লাভ করে।

দান-খয়রাতের সুফল

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ـ

অর্থ—যে ব্যক্তি দান-খয়রাতকারী হইয়াছে, (আমার) ভয়-ভক্তি অর্জন করিয়াছে এবং ভাল বস্তু (দীন-ইসলাম)কে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, আমি অচিরেই তাহার জন্য (দীন-দুনিয়ার) উন্নতি ও সুযোগ সুবিধার পথ সুগম ও সহজ-সাধ্য করিয়া দিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতাবলম্বী হইয়াছে (আমার) ভয়-ভক্তির আওতা বহির্ভূত হইয়াছে এবং ভাল বস্তু (দীন-ইসলাম)কে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, অচিরেই আমি তাহার জন্য (দীন-দুনিয়ার) অবনতি ও কষ্ট ক্লেশের পথ সুগম করিয়া দিব। (৩০ পাঃ ছুরা আল্-লাইল)

৭৫৯। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানবের জাগতিক জীবনের প্রতিটি দিনে দুইজন ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা এক প্রকার বিশেষ দোয়া করেন। একজন বলেন—"হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় দানকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর।" অপরজন বলেন—"হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নির্ধারিত কর।"

দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তিদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টান্ত

৭৬০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ—যেমন দুই ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের গায়ে কড়া-বিশিষ্ট লোহার জামা, যাহা তাহাদের গর্দান ও গলা হইতে সীনা ও বক্ষস্থল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। (যেরূপ পাঞ্জাবী, পিরহান গায়ে দেওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় হয়।) অতঃপর এক ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যে, তাহার জামার কড়াগুলি আবশ্যক মত শিথিল ও ঢিলা হইতে থাকায় জামাটি প্রশস্ততর হইয়া সঠিকরূপে তাহার পূর্ণ শরীরকে আবৃত করিয়া লইয়াছে। এমনকি হাতের দিকে নখগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং পায়ের দিকে মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। (ইহা হইল দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত।) পক্ষান্তরে

দানশীলতার স্বভাব তাহার হস্তকে সম্প্রসারিত করে ; সে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে দান-খয়রাতের প্রতি অধিক অগ্রণী হইতে থাকে।)

অপর ব্যক্তির অবস্থা এই যে, তাহার জামার কড়াগুলি কঠিন শক্ত ও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকায় তাহার জামা তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে সে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিতে পারিতেছে না এবং তাহার জামাও প্রশস্ত হইতেছে না। (ইহা হইল—কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ; সে কোন সময় খুশী-অখুশী ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দান করার প্রতি একটু অগ্রসর হইতে চাহিলেও তাহার কৃপণাত্মক প্রবৃত্তি তাহাকে অগ্রণী হইতে দেয় না, বরং তাহার হাত পা চাপিয়া রাখে।)

স্বীয় ধন হইতে উত্তম জিনিষ দান করা চাই

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۔

অর্থ—হে ঈমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় অর্জিত হালাল মাল হইতে এবং জায়গা-জমিতে যাহা কিছু আমি তোমাদের জন্য উৎপাদন করি উহা হইতে উত্তম জিনিস (আমার রাস্তায়) ব্যয় কর। ঐ সব মাল-সম্পদ হইতে নিকৃষ্ট বস্তুকে দান-খয়রাতের জন্য বাছিয়া লইও না। (বড়ই অনুতাপের বিষয় হইবে যে, তুমি নিকৃষ্ট বস্তুকে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিতে বাছিয়া লও) অথচ ঐরূপ বস্তু কেহ তোমাকে অর্পণ করিলে তুমি তাহা কস্মিনকালেও বিনা দ্বিধায় খুশী মনে গ্রহণ করিবে না ; বা নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবে। স্মরণ রাখিও—আল্লাহ তায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী রহিয়াছেন। (৩ পারা, ৫ রুকু)

দান খয়রাত প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য। ধনের সামর্থ না থাকিলে অন্য উপায়ে উপকার করিবে

৭৬১। হাদীছ :— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبى

اللّٰهِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ

قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ

وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهٗ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দান-খয়রাত করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! যাহার সামর্থ্য নাই সে ব্যক্তি কি করিবে? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, শারীরিক পরিশ্রম করিবে এবং সেই পারিশ্রমিক দ্বারা নিজেও উপকৃত হইবে এবং দান-খয়রাতও করিবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেরূপ কোন সুযোগ না পায়? নবী (দঃ) বলিলেন, কষ্ট-ক্লেশে পতিত বিপদগ্রস্ত অসহায়কে সহায়তা করিবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেরূপ ক্ষমতা, শক্তি এবং সুযোগও না পায়? নবী (দঃ) বলিলেন, সৎ ও ভাল কাজ (নিজেও) করিবে (অপরকেও উহার প্রতি আহ্বান জানাইবে, অসৎ কার্য্যে বাধা দান করিবে) এবং (ততটুকু ক্ষমতা না থাকিলে নিজে) মন্দ ও অসৎ কার্য্য হইতে সংযমী হইবে, ইহাই তাহার জন্য দান গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা :—মানুষ প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার শত শত নেয়ামত উপভোগ করিতেছে, তাই আল্লার বন্দাদের উপকার করা তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—"তুমি জগদ্বাসীদের প্রতি সদয় হও, সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সদয় হইবেন।"

অন্যের উপকার করার বিভিন্ন শ্রেণী আছে যথা—টাকা পয়সা দান করা। কাহারও কোন কার্য্য উদ্ধার পূর্বক তাহার কষ্টের লাঘব করিয়া দেওয়া। নিজে সৎপথ অবলম্বন করতঃ অন্যকে সৎপথের প্রতি আহ্বান করা। অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করা। এমনকি সর্বশেষ পর্য্যায়ের পরোপকার হইল—অসৎ কার্য্য হইতে নিজে বিরত থাকা ও সংযমী হওয়া। কারণ, তাহাতে অন্য সকল তাহার পক্ষ হইতে সর্ব প্রকারের অনিষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে।

কি পরিমাণ মালে যাকাত ফরজ হয়

৭৬২। হাদীছ :— ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উট পাঁচটির কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরজ হইবে না এবং (কাহারও নিকট অন্য কোন মাল না থাকিয়া শুধু মাত্র রৌপ্য থাকিলে) পাঁচ উকিয়া অর্থাৎ দুই শত দেরহাম (সিকি পরিমাণের সামান্য উর্দ্ধের রৌপ্য মুদ্রা) পরিমিত রৌপ্যের কম হইলে উহাতে যাকাত ফরজ হইবে না এবং পাঁচ অছক (প্রতি অছক ছয় মনের উর্দ্ধে)-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে ছদকা—ওশোর* (দশমাংশ বা তদ্-অর্দ্ধ) দান করা ফরজ হইবে না।

যে কোন বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করা

মোয়া'জ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামন দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইয়ামনবাসীকে এই নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের উৎপন্ন দ্রব্য—যব, চীনা ইত্যাদির যাকাতরূপে দেয় অংশের পরিবর্তে তোমরা জামা, চাদর ইত্যাদি কাপড় দান কর। ইহা তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য (কারণ তৎকালে সে দেশে বস্ত্র শিল্পের আধিক্য ছিল) এবং (এই সব জিনিষ যাকাত গ্রহণকারী) মদীনাবাসী—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের জন্যও অধিক উপযোগী। (কারণ মদীনা কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় তথায় কাপড়ের অভাব ছিল।)

যাকাতের ব্যাপারে অপকৌশল অবলম্বন করিবে না

৭৬৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা আবু বকর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্দ্ধারিত যাকাতের যে সনদ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে—যাকাতের ভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মালকে একত্রিত করিবে না এবং একত্রিত মালকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে না।

ব্যাখ্যাঃ— যাকাত এড়াইবার জন্য কোন প্রকার অপকৌশলের আশ্রয় লওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত কার্য্য। যথা—দুই ভ্রাতা প্রত্যেকের নিকট চল্লিশটি করিয়া বকরী আছে, উভয় ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন; এমতাবস্থায় দুই ভাই-এর উপর যাকাত দুইটি বকরী আসিবে। বকরীর যাকাতে এই বিধান আছে যে, চল্লিশ হইতে এক শত বিশ পর্য্যন্ত একটি বকরীই আসে; উক্ত ভ্রাতাদ্বয় এই বিধানের সুযোগ গ্রহণার্থে উভয়ের চল্লিশ চল্লিশটি বকরী একত্রে আশিটি একত্রিতভাবে দেখায় যেন উহাতে দুইটির স্থলে একটি বকরী যাকাত হয়। কিম্বা কাহারও নিকট এই পরিমাণ টাকা আছে, যাহার উপর যাকাত ফরজ হইবে; উহা এড়াইবার জন্য কিছু টাকা বে-নামারূপে অন্যকে দিয়া রাখিল যেন নেছাব পূর্ণ না হয় এবং যাকাত ফরজ না হয়—এরূপ কোন অপকৌশলে যাকাত এড়াইতে পারিবে না।

---

* কৃষি ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাতের ন্যায় আল্লার রাস্তায় দান করার বিধান শরীয়তে আছে—উহাকে ওশোর বলে।

বিভিন্ন বস্তুর যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরজ হয়

৭৬৪। **হাদীছঃ**—প্রথম খলীফা আমীরুল-মোমেনীন আবু বকর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে বাহরাইন দেশের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করাকালে তাঁহাকে যাকাত বিষয়ে নিম্নরূপ একটি সনদ-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন—*

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীয় রসুলের প্রতি নির্দেশিত এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বিশ্ব মোসলেমের উপর নির্দ্ধারিত যাকাতের হার ও বিধান নিম্নরূপ। মোসলমানগণ এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত দানে বাধ্য থাকিবে এবং এই হারের অধিক দাবী করা হইলে সেই দাবী অগ্রাহ্য হইবে।

উটের যাকাত+ঃ

(পাঁচ হইতে) চব্বিশটা পর্য্যন্ত উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হইবে—প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী দিতে হইবে।

পঁচিশ হইতে পয়ত্রিশটি উটের জন্য পূর্ণ এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হইবে।

ছয়ত্রিশ হইতে পয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত পূর্ণ দুই বৎসরের একটি মাদী উট দিবে হইবে।

ছয়চল্লিশ হইতে ষাট পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।

একষট্টি হইতে পচাত্তর পর্য্যন্ত চার বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে।

ছিয়াত্তর হইতে নব্বই পর্য্যন্ত দুই বৎসরের দুইটি মাদী উট দিতে হইবে।

অতঃপর প্রতি চল্লিশটিতে একটি দুই বৎসরের এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি তিন বৎসরের এক একটি হারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

শুধুমাত্র চারিটি উট থাকিলে উহার কোন যাকাত দিতে হইবে না, হাঁ—পাঁচটি পুরা হইলে পর উহাতে একটি বকরী যাকাত দিতে হইবে।

বকরীর যাকাতঃ

দলবদ্ধ ভাবে মাঠে-জঙ্গলে চরিয়া বেড়ায় এরূপ বকরীর জন্য চল্লিশ হইতে একশত বিশ পর্য্যন্ত একটি (এক বৎসর বয়েসর) বকরী দিতে হইবে।

---

* সনদ-পত্রের অংশগুলি ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্ত অংশগুলি একত্র করিয়া এক স্থানে অনুবাদ করা হইয়াছে।

+ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি পালিত পশুপালের উপর যাকাত ফরজ হইবার জন্য কতিপয় শর্ত আছে। সেই সব শর্ত আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিরল। অবশ্য পশুপাল যদি ব্যবসায়ের জন্য হয়, তবে উহার যাকাতের নিয়ম অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় মুল্য হিসাবে হইবে।

অতঃপর দুইশত পর্য্যন্ত দুইটি বকরী দিতে হইবে। তিনশত হইলে তিনটি বকরী দিতে হইবে। অতঃপর প্রতি শতে একটি করিয়া বর্দ্ধিত হইবে। চল্লিশ হইতে একটি কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরজ হইবে না, মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে।

রৌপ্যের যাকাতঃ

রূপা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত দিতে হইবে। কিন্তু (যাকাতের অন্য কোন দ্রব্য না থাকিয়া শুধুমাত্র রৌপ্য থাকিলে দুইশত দেরহাম (তথা ৫২॥ তোলা) হইতে মাত্র এক কম—একশত নিরানব্বই দেরহাম ওজনের হইলেও উহাতে যাকাত ফরজ হইবে না। অবশ্য মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে।

কোন ব্যক্তির উপর এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাতরূপে ফরজ হইয়াছে. (অর্থাৎ তাহার নিকট পঁচিশটি উট আছে) কিন্তু ঐরূপ উট তাহার নিকট নাই, বরং তাহার দুই বৎসর বয়সের একটি মাদী উট আছে, এমতবস্থায় ঐ দুই বৎসর বয়সের উটটি তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু বিশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বা দুইটি বকরী তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু দুই বৎসর বয়সের উটটি মাদী না হইয়া নর হইলে উহাকে গ্রহণ করা হইবে এবং কিছুই ফেরত দেওয়া হইবে না। (কারণ নর উটের মূল্য মাদী উট অপেক্ষা কম। তাই নরের বড় এবং মাদীর ছোট সমান গণ্য হইবে।) এইরূপে তিন বৎসর বয়সের স্থলে চার বৎসর বয়সের থাকিলে তদ্রূপই করা হইবে এবং যদি ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ বড়র স্থলে ছোট থাকে তবে ছোটই গ্রহণ করা হইবে এবং উহার সঙ্গে বিশ দেরহাম বা দুইটি বকরীও ওয়াসিল করা হইবে।

মালিক কর্তৃক যাকাতের পরিমাণ কম করার উদ্দেশ্যে বা যাকাত আদায়কারী কর্তৃক যাকাতের পরিমাণ বেশী করার উদ্দেশ্যে (হিসাবের মধ্যে কোন প্রকার হের-ফের বা হিলা-বাহানা) সংযোগ বা বিভক্তি-করণ জায়েয হইবে না।

যদি দুইজনের এজমালী মাল হইতে যাকাত ওয়াসিল করা হইয়া থাকে, তবে উহা প্রত্যেকের অংশ অনুযায়ী হইবে। সেই হিসাব অনুসারে একে অন্যের নিকট কিছু পাওনা হইলে পরস্পর উহা আদায় ওয়াসিল করিয়া লইবে।

যাকাতের জন্য নর ও বৃদ্ধা বা কোন প্রকার দোষত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হইবে না, অবশ্য—যদি যাকাত ওয়াসিলকারী ঘটনাস্থলে বাস্তব দৃষ্টিতে উহাকেই গ্রহণ করা উত্তম মনে করে, তবে সে তাহা করিতে পারিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) উল্লিখিত সন-পত্রটি লিখিয়া নিম্নে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সীলমোহর আংটি দ্বারা ছাপ দিয়া দিলেন। যাহার উপর "মোহাম্মদ, রসুল, আল্লাহ" শব্দ কয়টি খচিত ছিল।

আত্মীয়বর্গকে খয়রাত যাকাত দান করা

৭৬৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে ছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নারীদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—স্বীয় অলংকারাদি দিয়া হইলেও তোমরা দান-খয়রাত কর। যয়নব (রাঃ) (হস্ত শিল্পিনী ছিলেন—যদ্দারা তিনি কিছু ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ উপার্জন করিতেন। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার কতিপয় এতিম অসহায় ভাগিনা-ভাগিনী ছিল এবং তাঁহার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদও রিক্তহস্ত ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত ধন) স্বীয় স্বামী আবদুল্লাহ (রাঃ) ও পোষ্য এতিমগণের জন্য খরচ করিয়া থাকিতেন। যয়নব (রাঃ) মসজিদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত আদেশ শুনিয়া পরে স্বীয় স্বামীকে বলিলেন, আপনি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, আমি আপনার এবং আমার লালন-পালনাধীন এতিমগণের জন্য যে ব্যয় বহন করিয়া থাকি উহা কি আমার প্রতি দান-খয়রাত করার আদেশ পালনে যথেষ্ট হইবে? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজেই যাইয়া হযরতের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। যয়নব (রাঃ) বলেন, সেমতে আমি হযরতের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার গৃহে ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মদীনাবাসীনী একজন নারী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে; সেও আমার ঐ জিজ্ঞাস্য বিষয়টিই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। আমরা ফটকের নিকট অপেক্ষারত ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট দিয়া বেলাল (রাঃ) যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, আপনি আমাদের এই বিষয়টি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, কিন্তু আমাদের নাম বলিবেন না! বেলাল (রাঃ) হযরতের নিকট পূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুল জিজ্ঞাসাকারিণীদ্বয় কাহারা? বেলাল বলিলেন, যয়নব। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন যয়নব—আবদুল্লার স্ত্রী যয়নব? বেলাল (রাঃ) উত্তর করিলেন—হাঁ। তখন নবী (দঃ) মুল প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, হাঁ—স্বীয় স্বামী ও এতিমগণের প্রতি ব্যয় করাও দান-খয়রাতের আদেশ পালনের ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে, বরং এইরূপ ব্যয়ে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। (১৯৮ পৃঃ)

৭৬৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তালহা (রাঃ) মদীনাবাসী ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহার সর্বোত্তম সম্পত্তি ছিল "বাইরুহা" নামক খেজুর বাগানটি। ঐ বাগানটি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সময় সময় ঐ বাগানে তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং উহার কুপের সুস্বাদু মিঠা পানি পান করিয়া থাকিতেন।*

---

* বর্তমানে ঐস্থানে বাগান নাই; দালান-কোঠায় পরিপুর্ণ, কিন্তু কুপটি উত্তম অবস্থায়ই রহিয়াছে। বহুবার উহার পানি পানের সৌভাগ্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, যখন কোরআন শরীফের এই আয়াত নাজেল হইল— لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون অর্থাৎ—"তোমরা পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে না, যাবৎ তোমাদের স্বীয় পছন্দনীয় ভালবাসার বস্তু আল্লার সন্তুষ্টি লাভে ব্যয় না কর।" আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন, ভালবাসার বস্তু দান না করিলে পূর্ণ ছওয়াব লাভ হইবে না। আমার সর্বাধিক বালবাসার সম্পত্তি এই "বাইরুহা" বাগানটি। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি বাগানটি দান করিয়া দিলাম। আমি উহার প্রতিদান ও প্রতিফল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকটেই লাভ করিবার আকাঙ্খা রাখি। (এখন ঐ বাগানটিকে আপনি আল্লাহ তায়ালার মর্জি ও খুশী অনুযায়ী ব্যয় করুন।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বেশ বেশ; উহাত অতিশয় লাভজনক সম্পত্তি। আমি তোমার কথা শুনিয়াছি। আমার অভিমত এই যে, তুমি উহাকে আপন আত্মীয়বর্গের মধ্যে ব্যয় কর। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, তাহাই করিব। সেমতে তিনি ঐ বাগানটিকে তাঁহার চাচার বংশধর এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

৭৬৭। হাদীছঃ—ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী যয়নব (পুনরায়) একদা রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জ্ঞাত করা হইল যে, যয়নব ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন যয়নব? বলা হইল সে ইবনে মসউদের স্ত্রী। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আসিতে বল। সে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হে আল্লার নবী। আপনি অদ্য (পুনরায়) দান-খয়রাত করার আদেশ করিয়াছেন। আমার নিকটে কিছু অলংকার আছে—আমি উহা দান করার ইচ্ছা করিয়াছি। আমার স্বামী ইবনে মসউদ রিক্তহস্ত মানুষ। স্বামী বলিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার সন্তানগণ আমার দানের অগ্রাধিকারী। (তাঁহার এই দাবী বস্তুতঃ সঠিক কি—না, তাহা ভালরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমি আপনার খেদমতে পুনরায় আসিয়াছি।) তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইবনে মসউদ ঠিকই বলিয়াছে। তোমার স্বামী ও সন্তানগণ তোমার দানের সর্বাগ্রে হকদার।

৭৬৮। হাদীছঃ—উম্মে ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—আমারই পূর্ব স্বামী আবু ছালামার পক্ষে আমার যে সন্তানগণ আছে, তাহারাও আমারই সন্তান; তাহাদের জন্য যদি আমি কিছু ব্যয় করি, তাহাতে কি আমার ছওয়াব হইবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদের জন্য ব্যয় কর; তাহাদের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ ছওয়াব তুমি লাভ করিবে।

মছআলাহ ঃ—স্বীয় অভাবগ্রস্ত সন্তান-সন্ততি তথা ছেলে-মেয়ে ও তাহাদের বংশ এবং স্বীয় পিতা-মাতা ও তাঁহাদের পিতা-মাতা পূর্বপুরুষ—নিজের এই দুই ধারার কাহাকেও যাকাত ফেৎরা ইত্যাদি ফরজ এবং ওয়াজেব দান হইতে দেওয়া হইলে উহা আদায় হইবে না, কিন্তু নফলরূপে দান করিলে পূর্ণ, বরং দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাইবে। স্বামী স্ত্রীকে নিজের যাকাত-ফেৎরা দিলে তাহাও আদায় হইবে না। স্ত্রী স্বামীকে দিতে পারে কি না—মতভেদ আছে; ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, দিতে পারে না; ইমাম আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ (রঃ) বলেন, দিতে পারে—দিলে আদায় হইয়া যাইবে। (শামী ২—৮৭)

ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত ফরজ নয়

৭৬৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমানের উপর তাহার ক্রীতদাস ও ঘোড়ার যাকাত ফরজ হয় না। (১৯৭ পৃঃ)

যে ধন-দৌলত হইতে দান করা না হয় উহা অশুভ

৭৭০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং আমরা তাঁহার সম্মুখে জমায়েত হইয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমার ইহকাল ত্যাগ করার পর তোমাদের জন্য আমি যে বস্তুকে বিশেষরূপে ভয় ও আশংকার কারণ মনে করি তাহা হইল—দুনিয়া তথা ধন-দৌলতের আধিক্য ও জাকজমক; যাহা তোমাদের উপর বিস্তৃত ও প্রসারিত হইবে। এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (ধন-দৌলত ত) ভাল জিনিষ (তাহা) কিরূপে মন্দের (তথা আশংকা ও ভয়ের) কারণ হইতে পারে? নবী (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। কেহ কেহ প্রশ্নকারী ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার করিয়া বলিল, তুমি কেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর কথা বলিলে? তিনি ত তোমার কথার কোনই উত্তর দিলেন না! অতঃপর আমরা অনুভব করিলাম, হযরতের প্রতি অহী নাযেল হইতেছে। তৎপর তিনি ঘর্ম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? হযরত (দঃ) উক্ত প্রশ্নকে প্রশংসার যোগ্য গণ্য করিলেন, এবং বলিলেন,ভাল জিনিষ (স্বভাবতঃ) মন্দের কারণ হয় না সত্য, কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কর। বসন্তকালের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ু ও তদসহ বৃষ্টিপাতের দ্বারা যে নূতন ঘাস-পাতা জন্মিয়া থাকে, উহা পশুপালের জন্য (কতই না ভাল ও উত্তম বস্তু। কিন্তু কোন পশু যদি উহাকে সুস্বাদু পাইয়া কেবল খাইতেই থাকে, নিয়মানুবর্তিতার ধার না ধারে, তবে ঐ উত্তম, ভাল ও সুস্বাদু বস্তুই সেই পশুর জন্য) পেট ফাপিয়া মৃত্যু বা মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য যে পশু নিয়ম মাফিক সবুজ ঘাস খায় এবং যখন পেট ভরিয়া আসে তখন সে পশুপালের স্বভাবগত অভ্যাস অনুযায়ী সূর্যমুখী হইয়া বসে এবং (**Ruminant**)

রোমন্থন—চর্বিতচর্বণ করিয়া জাবর কাটিয়া ভক্ষিত বস্তুসমূহ হজম করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করে। অতঃপর পুনরায় ঐ ঘাস খাওয়া আরম্ভ করে; (সেই অবস্থায় ঐ পশুর জন্য ঘাস-পাতা কোন ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ হয় না।) স্মরণ রাখিও! ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বস্তু। যে মোসলমান ব্যক্তি এতিম, মিছকিন, অসহায় পথিককে দান করায় অভ্যস্ত তাহার জন্য ঐ ধন-দৌলত অতি উত্তম সহায়ক ও সাথী। কিন্তু (প্রথম প্রকারের পশুর ন্যায়) যে ব্যক্তি উহা অবৈধ অনিয়মিতরূপে হাসিল করিবে ও পুঁজি করিতে থাকিবে, তাহার ভাগ্যে তৃপ্তিলাভ জুটিবে না; (ইহকালের শান্তি হইতে সে বঞ্চিত হইবে।) এবং পরকালে এই ধন-দৌলতই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে।(১৯৮ পৃঃ)

৭৭১। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাকাত ওয়াসিল করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের নিকট অভিযোগ জানাইল যে, ইবনে জমীল নামক ব্যক্তি যাকাত দেয় নাই। এবং খালেদ (রাঃ) এবং আব্বাছ (রাঃ) ও দেন নাই। (ইবনে জমিল মোসলমান দলভুক্ত হইবার পূর্বে দরিদ্র ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ চেষ্টায় সে বাহ্যিকরূপে ইসলাম কবুল করে এবং আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণের অছিলায় তাহাকে ধন-দৌলতের মালিক বানান, কিন্তু সে ছিল মোনাফেক। তাই সে যাকাত দিতে গড়িমসি করে।) হযরত (দঃ) (তাহার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া) বলিলেন, ইবনে জমীল কর্তৃক যাকাত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে পূর্বে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলের অছিলায় তাহাকে ধনাঢ্য বানাইয়াছেন, (তাই সে এখন আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আদেশকৃত যাকাত দিতে চায় না। অর্থাৎ তাহার নিমকহারামী ব্যতীত যাকাত না দেওয়ার অন্য কোন কারণ নাই)।

খালেদ (রাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তোমরাই (হয়ত কোন) অন্যায় করিয়া থাকিবে, নতুবা খালেদ ত স্বীয় ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত আল্লার রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করিয়া রাখিয়াছে। আব্বাছ (রাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তিনি আমার মুরুব্বী—চাচা; (তাঁহার ব্যাপারে চিন্তা নাই। এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার যাকাতের জিম্মা লইয়া লইলেন এবং বস্তুতঃ তিনি তাঁহার যাকাত অগ্রিম আদায় করিয়া দিয়াছিলেন।)

ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাকা

৭৭২। **হাদীছঃ**—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কয়েকজন মদীনাবাসী ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দান করিলেন। তাহারা পুনরায় সাহায্য চাহিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও দান করিলেন। এমন কি, তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল বারংবার দান করিয়া তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, আমার নিকট টাকা-পয়সা কিছু থাকিলে তাহা তোমাদিগকে না দিয়া আমি নিজের নিকট কখনও জমা রাখি না; (অর্থাৎ বারংবার এরূপ করার কোন প্রয়োজন হয় না।) স্মরণ রাখিও—যে ব্যক্তি যাচ্ঞা ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাকায় সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকার সুযোগ ও তৌফিক দান করিবেন। যে ব্যক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পরমুখাপেক্ষীতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি কষ্টে-ক্লেশে আপদে-বিপদে দুঃখ-যাতনায় ধৈর্য্যধারণে সচেষ্ট হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বনে সাহায্য করিবেন। ধৈর্য্যের ন্যায় প্রশস্ত ও উত্তম নেয়ামত দুনিয়াতে আর কিছুই নাই।

৭৭৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ

خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّاْتِىَ رَجُلًا فَيَسْاَلَهٗ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য অন্যের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাওয়া এবং তথা হইতে কাঁধে করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ বহন করতঃ উহা দ্বারা উপার্জন করা অতি উত্তম। অন্যের নিকট হাত পাতিলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। (এই অপমান বরণ করা উচিৎ নয়।)

৭৭৪। হাদীছঃ— عن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَاْتِىَ بِحُزْمَةِ

حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ

النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ

অর্থ—যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ কাঁধে বহন করিয়া আনা এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের অছিলায় আল্লার সাহায্যে স্বীয় মান-ইজ্জত রক্ষা করা মানুষের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা অনেক উত্তম। কারণ মানুষের নিকট হাত পাতিয়া হয়ত কিছু পাইতেও পারে, আবার নাও পাইতে পারে (কিন্তু অপমান অনিবার্য্য)।

৭৭৫। **হাদীছ ঃ**— হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিলাম; তিনি আমাকে দান করিলেন। পুনরায় চাহিলাম; পুনরায় দান করিলেন। আবার চাহিলাম; আবার দান করিলেন এবং বলিলেন, হে হাকীম! স্মরণ রাখিও, ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু! লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধা মুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি উহা আহরণ করিবে সে-ই উহাতে বরকত (সৌভাগ্য অল্পে তুষ্টি ও অল্পে প্রাচুর্য) লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধার বশীভূত হইয়া উহা আহরণে লিপ্ত হইবে, সেই ধনের দ্বারা তাহার ভাগ্যে বরকত লাভ জুটিবে না। তাহার অবস্থা এই হইবে যে, খাইতেছে, কিন্তু তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হইতেছে না। স্মরণ রাখিও! উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারী) নীচের হাত (অর্থাৎ গ্রহণকারী) অপেক্ষা উত্তম।

হাকীম (রাঃ) বলেন, এতচ্ছ্রবণে আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি ঐ মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যিনি আপনাকে সত্য ধর্মবাহক রূপে প্রেরণ করিয়াছেন—অতঃপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কাহারও নিকট কিছু চাহিব না। (আমার হাত কাহারও হাতের নিচে আসিবে না।)

হাকীম (রাঃ) স্বীয় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞার উপর এরূপ দৃঢ় থাকিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) খলীফা হইয়া বায়তুল-মাল হইতে তাঁহার প্রাপ্য অংশ লইবার খবর দিলেন; তিনি উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) খলীফা হইয়া পুনরায় তাঁহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন, তিনি এবারও গ্রহণে সম্মত হইলেন না। এমনকি, ওমর (রাঃ) সর্বসাধারণকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! আমি হাকীম (রাঃ)কে বায়তুল-মাল হইতে তাহার প্রাপ্য অংশ পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি উহা গ্রহণে সম্মত হন নাই।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবর্তমানেও হাকীম (রাঃ) এইরূপে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্য্যন্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পে অটল থাকিয়া ইহজগত ত্যাগ করিলেন।

লিপ্সা ও বাঞ্ছা ব্যতিরেকে বৈধরূপে কোন কিছু হাসিল হইলে তাহা গ্রহণ করিবে

৭৭৬। **হাদীছ ঃ**—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হইত যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে কিছু দান করিতেন; আমি আরজ করিতাম, ইহা এমন ব্যক্তিকে দান করুন যাহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ইহা গ্রহণ কর। ধন-সম্পদ যখন লিপ্সা, প্রত্যাশা এবং প্রার্থী হওয়া ব্যতিরেকে কোন শুদ্ধ সূত্রে লাভ হয়, তখন উহা গ্রহণ কর এবং নিজকে এরূপ অভ্যস্ত কর যে, কোন ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের কোন সুযোগ হাত-ছাড়া হইয়া গেলে যেন বিচলিত ও অস্থির হইয়া উহার পিছনে ছুটাছুটি না কর।

ধন সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভিক্ষা করার পরিণতি

৭৭৭। হাদীছঃ— قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْاُذُنِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِىْ حَتّٰى يَاْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔

অর্থঃ—আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যাচ্ঞা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়া যাচ্ঞা ও ভিক্ষা করিতে থাকে (যদ্দারা দুনিয়াতে তাহার মান-ইজ্জৎ বিনষ্ট হয় এবং মর্য্যাদশূন্য সম্ভ্রমহীন হইয়া পড়ে। ইহারই প্রতিক্রিয়া পরজগতেও তাহার উপর পরিলক্ষিত হইবে।) কেয়ামত দিবসে যখন সে উপস্থিত হইবে তখন তাহার মুখমণ্ডলের হাড়গুলি উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যাইবে; উহার উপর গোশত কিম্বা চর্মের আবরণ থাকিবে না।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কেয়ামতের দিনের ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা দান পূর্বক বলিলেন, সে দিন সূর্য্য তাহার বর্তমান অবস্থান অপেক্ষা অতি নিকটবর্তী হইবে। (যদ্দরুণ অত্যধিক উত্তাপে মানুষের শরীর হইতে ঘামের স্রোত বহিবে।) এমনকি, এক এক ব্যক্তির অর্দ্ধ কান পর্য্যন্তও ঘামের স্রোতে ডুবিয়া যাইবে এবং মানুষ অধীর ও অস্থির হইয়া আদম (আঃ), মুছা (আঃ) প্রমুখ নবীগণের প্রতি ছুটাছুটি করিবে। অবশেষে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সমবেত হইবে। তিনি অগ্রসর হইয়া হিসাব-নিকাশ আরম্ভের জন্য) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবেন। (তাঁহার সুপারিশে হিসাব আরম্ভ হইলে) আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল মানব-মণ্ডলীর প্রশংসা অর্জনের গৌরব তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা দান করিবেন।

কেমন মিসকীনকে দান করিবে?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ - تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا -

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيمٌ -

অর্থ :— দান-খয়রাতের উপযুক্ত পাত্র ঐ গরীব দরিদ্রগণ যাহারা আল্লার দীনের খেদমতে আবদ্ধ রহিয়াছে ; (যদ্দরুণ) তাহারা (জীবিকা অর্জনে) কোথাও যাইতে পারে না। তাহারা কাহারও নিকট হাত পাতে না বলিয়া অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে ধনাঢ্য মনে করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ধনাঢ্য নহে, বড়ই দরিদ্র। (এমনকি,) তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিলে তাহাদের চেহারার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের অভাব অনুভব করিতে পারিবে। তাহারা (স্বীয় অবস্থার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে ;) হঠকারী হইয়া কাহারও নিকট হাত বিছায় না। তোমরা যাহা কিছু ধন ব্যয় করিবে উহা আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় জানিবেন। (৩ পাঃ ৫ রুঃ)

৭৭৮। হাদীছ :— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ

وَالْأُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বস্তুতঃ মিসকীন নয় যে এক-দুই লোক্মা (গ্রাস) পাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, কিন্তু মানুষের নিকট হাত পাতায় লজ্জা বোধ করিয়া উহা হইতে বিরত থাকে।

৭৭৯। হাদীছ :— قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا قِيلَ

وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

অর্থ :—মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয়কে অত্যধিক নাপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত এবং ভিত্তিহীন কথা বলা বা অযথা তর্ক-বিতর্ক করা। (২) ধন-সম্পদ অপব্যয় ও বিনষ্ট করা (৩) অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করা বা (অভাবের তাড়নায় হইলেও প্রয়োজন হইতে) অতিরিক্ত যাচ্ঞা করা।

৭৮০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নহে যে এক-দুই লোকমা বা এক-দুইটি খুরমার জন্য লোকদের নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় না, যাহাতে তাহাকে দান-খয়রাত করা যাইতে পারে। নিজেও লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে দাঁড়ায় না।

৭৮১। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ ثُمَّ يَغْدُوَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া পাহাড় হইতে জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া আনিয়া উহা বিক্রয়লব্ধ উপার্জন হইতে নিজে খাওয়া এবং অন্যকে দান করা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তম।

ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ফল-ফুলাদি, শাক-সব্জি, তরিতরকারী, খাদ্য-শস্য ইত্যাদি—সবের উপরও যাকাত আছে। উহাকে পরিভাষায় "ওশর" বলা হয়। "ওশর" অর্থ দশমাংশ। ঐ সকল বস্তুর উপর যাকাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশমাংশ হারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাই উহাকে "ওশর" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"ওশর" ফরজ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত আছে এবং উহাতে ইমামগণের মতভেদও রহিয়াছে। মোহাক্কেক আলেম হইতে বিস্তারিত বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

কাহারও ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন হইলে বা বাগানে ফল জন্মিলে উৎপন্নের দশমাংশ যাকাতরূপে বাইতুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে দিতে হইবে। কিন্তু উহা আদায় ওয়াসিল করা হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য কাটিয়া আনার পর। তাই এই স্থলে দুইটি সমস্যা দেখা দেয়—প্রথম এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মালিক উৎপন্নের কিছু অংশ লুকাইয়া

ফেলিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ফল-ফুলাদি পরিপূর্ণ রূপে পাকিবার পূর্বেও মালিকগণের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। অথচ যাকাত হয় পূর্ণ উৎপন্নের এবং ঐ সময় ফল পাকিলে সম্পূর্ণ এক সঙ্গে কাটা হইবে।

অতএব, শরীয়তের বিধান এই যে, সরকারের পক্ষ হইতে পরিমাণ নির্ধারণে ও অনুমান কার্যে অভিজ্ঞতাপূর্ণ লোকদিগকে নিয়োগ করা হইবে। ঐ সমস্ত লোকেরা প্রত্যেক ক্ষেত ও বাগানে যাইয়া প্রাথমিক অবস্থায়ই পরিমাণ ও অনুমান করিয়া আসিবে যে, কোন্ ক্ষেতে বা বাগানে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে বা ফল-ফুলাদি জন্মিতে পারে। এই পন্থায় ঐ সমসস্যাদ্বয়ের সমাধান হইয়া যাইবে। ইহাতে মালিকের প্রাণে ভয়ের চাপ থাকিবে এবং মালিকগণ সম্পূর্ণ উৎপন্ন কাটিয়া আনিবার পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে যাহা কিছু খাইবে তাহারও একটি হিসাব থাকিবে। অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ উৎপন্নজাত দ্রব্য স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যও শরীয়তে বিধান আছে

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পূর্বাহ্নে অনুমান করা *

৭৮২। হাদীছঃ—আবু হোমাইদ সায়েদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে ওয়াদিল-কোরা নামক স্থানে পৌছিয়া আমরা এক বৃদ্ধার একটি খেজুরের বাগান দেখিতে পাইলাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এই বাগানটির উৎপন্নের অনুমান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও অনুমান লাগাইলেন যে, দশ অছক (প্রায় ৬০ মণ) হইবে এবং বৃদ্ধাকে বলিলেন, খেজুর কাটা হইলে হিসাব স্মরণ রাখিও। অতঃপর যখন আমরা তবুক নামক স্থানে পৌছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, অদ্য রাত্রে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইবে। কেহ যেন রাত্রে বাহির না হয় এবং যাহার সহিত উষ্ট্র আছে সে যেন উহাকে ভালরূপে বাঁধিয়া রাখে। আমরা নিজ নিজ উষ্ট্র বাঁধিয়া রাখিলাম। সত্যই রাত্রিকালে প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। এক ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে উড়াইয়া নিয়া বহুদূরে এক পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। (আমরা সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম, কিন্তু শত্রুপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় কোনরূপ যুদ্ধ হইল না।) অবশ্য নিকটবর্তী "আইলা" নামক একটি এলাকার শাসনকর্তা (মোসলমানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া) জিযিয়া কর দানে রাজী হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের দেশ তাহাদের

---

* পূর্বাহ্নেই কোন উৎপন্নের পরিমাণ করা সাধারণ দৃষ্টিতে গায়েবের খবর বলার ন্যায় দেখা যায়, অথচ যাকাতের ব্যাপারে শরীয়ত উহার পরামর্শ দিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরতের ঘটনা দ্বারা উহার বৈধতা প্রমাণ করিলেন যে, ইহা বস্তুতঃ গায়েবের খবর নহে, বরং অবস্থা দৃষ্টে পরিণামের ধারণা ও অনুমাণ করা মাত্র।

স্বায়ত্ব শাসনে থাকার সনদ লিখিয়া দিলেন। হযরতের প্রসিদ্ধ যানবাহন "বাগালা-বায়জা" (শ্বেত বর্ণের খচ্চর) এবং হযরতের জন্য পোশাক পরিচ্ছদ তাহারা উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করিল।

তবুক হইতে মদীনায় ফিরিবার পথে সেই ওয়াদিল-কোরা নামক স্থানে পৌছিয়া ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার বাগানে কি পরিমাণ খেজুর হইয়াছে? সে বলিল, দশ অছক। ইহা সঠিকরূপে ঐ পরিমাণই ছিল যাহার অনুমান পূর্বেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লাগাইয়াছিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছিব, অন্য কাহারও সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আমার সঙ্গে চলিতে পার। নিকটবর্তী পথ হইতে যখন মদীনা দৃষ্টিগোচর হইল তখন হযরত (দঃ) স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন—ঐ যে "তাবাহ" (মদীনার অপর নাম) এবং ওহুদ পাহাড় দেখিয়া বলিলেন, এই স্নেহময় পাহাড়টি আমাদিগকে ভালবাসে. আমরাও উহাকে ভালবাসি।

অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাদিগকে মদীনাবাসী বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা জ্ঞাত করিব। আমরাও ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সর্বোত্তম গোত্র "বনু-নাজ্জার" গোত্র, অতঃপর "বনু-আবু-আশহাল" অতঃপর "বনুল-হারেছ" গোত্র, অতঃপর "বনু-সায়েদাহ্" গোত্র। অতঃপর বলিলেন, মদীনাবাসী প্রত্যেকটি গোত্রই উত্তম।

উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাতের পরিমাণ

৭৮৩। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সমস্ত জমি বৃষ্টিপাতে, নদী-নালা বা প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ও রসের সাহায্যে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে উহার উৎপন্ন দ্রব্যে দশমাংশ যাকাতরূপে দান করিতে হইবে। আর যে সমস্ত জমি ব্যয় সাপেক্ষ সেচ প্রণালীর সাহায্যে শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে উহার উৎপন্ন দ্রব্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগ দান করিতে হইবে।

শস্য, ফল ইত্যাদি কাটার সময় যাকাত আদায় করিবে

৭৮৪। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খেজুর কাটার মৌসুম উপস্থিত হইলে লোকজন নিজ নিজ যাকাত-পরিমিত খেজুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া আসিত। ঐ সময় তাঁহার নিকট খেজুরের স্তুপ লাগিয়া যাইত। শিশু হাসান হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ঐ খেজুর নাড়াচাড়া করিয়া খেলা করিতেন। একদা তাঁহাদের একজন একটি খেজুর হঠাৎ মুখে দিয়া ফেলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখা মাত্র তৎক্ষণাৎ খেজুরটি তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, তুমি জাননা যে, মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বংশধররা ছদকার বস্তু খাইতে পারে না?

স্বীয় দানকৃত বস্তু পুনরায় ক্রয় করা

৭৮৫। হাদীছ :—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটী ঘোড়া এক ব্যক্তিকে আল্লার ওয়াস্তে দান করিলাম। ঐ ব্যক্তি ঘোড়াটিকে ভালরূপে যত্ন করিত না। একদা দেখিতে পাইলাম, ঘোড়াটি বিক্রি করিবার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। তখন আমি উহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু আমার মনে এই ধারণা জাগিল যে, সে আমার দানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার নিকট ইহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের প্রার্থী হইবে। তাই আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, (এমতাবস্থায়) তুমি উহা ক্রয় করিও না এবং স্বীয় দানকৃত বস্তু ফেরত লইও না। (অর্থাৎ দানকারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে পরিমাণ মূল্য কম লওয়া হইবে সেই পরিমাণের অংশ যেন দান করার পর পুনরায় ফেরত লওয়া হইল।) যদি সে উহা তোমার নিকট একটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিতে রাজি হয়, তবুও উহা গ্রহণ করিও না। কারণ দানকৃত বস্তু ফিরাইয়া লওয়া এরূপ জঘন্য ও ঘৃণিত কার্য, যেরূপ কেহ স্বীয় বমি পুনঃ ভক্ষণ করে।*

মছআলাহ :—অন্যের দানকৃত বস্তু দান গ্রহণকারী হইতে ক্রয় করা নির্দ্বিধায় জায়েয।

দানকৃত বস্তু উপযুক্ত গ্রহণকারীর মালিকানায় যাওয়ার পর সাধারণ মালের ন্যায় বিবেচিত হইবে।

অর্থাৎ—যেমন কোন "গরীবকে" যাকাত, ফেৎরা বা দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে, যাহা সরাসরিরূপে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বা সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু ঐ গরীব ঐ মালের মালিক সাব্যস্ত হওয়ার পর ঐ মাল অন্যান্য সাধারণ মালের ন্যায় গণ্য হইবে। যদি সে ঐ মালকেই কোন ধনাঢ্য বা সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তির প্রতি দান করে তবে উহা জায়েয হইবে।

৭৮৬। হাদীছ :—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন খাবার কিছু আছে কি ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আপনি ছদকার মাল হইতে নুছাইবা (রাঃ)কে যে একটি বকরী দিয়াছিলেন, নুছাইবা ঐ বকরীর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়ারূপে আমাদের ঘরে পাঠাইয়াছে, সেই গোশ্‌ত আছে, (কিন্তু আপনি ত ছদকার বস্তু ব্যবহার করেন না ;) অন্য আর কিছুই নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, (বকরীটি প্রথম অবস্থায় ছদকার মাল ছিল

---

* উল্লিখিত হাদীছের বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, স্বীয় দানকৃত বস্তু যদি উহা ঠিক মূল্য হইতে কমে দিবার আশঙ্কা না হয় এবং উহাতে গরীবেরই সাহায্য হয় তবে উহা ক্রয় করাতে কোন দোষ হইবে না।

কিন্তু মুছাইবাহ দরিদ্রা নারী, তাহাকে যখন ঐ বকরীটি দান করা হইয়াছে তখন উহা) উপযুক্ত স্থানে (দেওয়া হইয়াছে ; উহা মুছাইবার মালিকানায়) যাওয়ার পর সাধারণ মালে পরিণত হইয়াছে। (উহা ছদকার মাল থাকে নাই ; অতএব, এখন সকলের জন্য সমভাবে উহা হালাল পরিগণিত হইবে)।

৭৮৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে কিছু গোশত উপস্থিত করা হইল যাহা বরীরা (রাঃ)কে ছদকা স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই গোশত যখন বরীরাকে দেওয়া হইয়াছিল তখন ছদকা ছিল। কিন্তু যখন বরীরা (উহার মালিক সাব্যস্ত হইয়া) আমাদিগকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়াছে তখন ইহা হাদিয়ারূপেই গণ্য হইবে।

সরকার ধনীদের যাকাত বাধ্যতামূলক উসুল করিয়া গরীবদেরকে পৌঁছাইবে—গরীব যথায়ই থাকুক

অর্থাৎ সরকারের অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে ধনীদের হইতে যাকাত উসুল করার, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর দায়িত্বও রহিয়াছে—সেই যাকাত গরীবদেরকে তাহাদের স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া, গরীব যথায়ই অবস্থান করুক। এমনকি যে এলাকায় যাকাত সংগ্রহ করা হইয়াছে তথায় গরীবের অবস্থান না থাকিলে যথায় অভাবী গরীব পাওয়া যাইবে সরকার কর্তৃক তথায় গরীবকে যাকাতের মাল পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

মছআলাহঃ—প্রত্যেক অঞ্চলের যাকাত সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলের অভাবীদের অভাব মোচনেই ব্যয় করিতে হইবে ; কোন কোন ইমামের মজহাবে এরূপ করাই ওয়াজেব— ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নহে ; ইমাম আবু হানীফার মজহাবে উহার ব্যতিক্রম করা মকরূহ। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করিতে কোন দোষ নাই—(১) যাকাতদাতার আত্মীয় গরীব অন্য অঞ্চলে থাকিলে তাহার জন্য এই ব্যক্তির যাকাত প্রেরণ করা যায়। (২) কোন অঞ্চলে অভাব অধিক হইলে, অন্য অঞ্চল হইতে তথায় যাকাত প্রেরণ করা যায়। (৩) এলম শিক্ষার্থী এবং অভাবগ্রস্ত আলেম ও অভাবগ্রস্ত নেক লোকদের জন্য এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রদান করা যায়। (শামী, ২—৯৩)

ছদকা-খয়রাত দানকারীর জন্য দোয়া করা

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"লোকদের মাল হইতে ছদকা—যাকাত গ্রহণ করুন যদ্দারা তাহাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সাধন হইবে আর তাহাদের জন্য দোয়া করুন।"

৭৮৮। হাদীছঃ— অবু-আওফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ যাকাত, ছদকা-খয়রাত লইয়া আসিলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিতেন। একদা আমার পিতা আবু-আওফা ছদকা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, হযরত (দঃ) তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ! আবু-আওফার পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযেল কর।

কতিপয় বস্তুর উপর বাইতুল-মালের হক

সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তু যেমন—মতি, আম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে। কোন কোন ইমাম বলেন, ঐরূপ প্রাপ্তদ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে দান করিতে হইবে। কোন কোন ইমামের মত এই যে, সামুদ্রিক দ্রব্যের উপর ঐরূপ দান বাধ্যতামূলক নহে।

মাটি খননে ভূগর্ভে প্রাচীনকালের প্রোথিত ধন-দৌলত হস্তগত হইলে উহার পঞ্চমাংশ বাইতুল-মালে দান করিতে হইবে; ইহা সর্বসম্মত বিধান।

ভূগর্ভস্থিত প্রাকৃতিক খনিজ দ্রব্যাদি হস্তগত হইলে উহা সম্পর্কে সামুদ্রিক দ্রব্যের ন্যায় ইমামগণের মতভেদ আছে।

"মধু" সম্পর্কে অধিকাংশ ইমামগণের মতে উহার কোন অংশ দান করা বাধ্যতামূলক নহে, কোন কোন ইমামের মতে উহার দশমাংশ বাইতুল-মালকে দিতে হইবে।

যাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলকারীদের হইতে সরকার কর্তৃক কড়া হিসাব লওয়া আবশ্যক

৭৮৯। হাদীছঃ—আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "আসাদ" গোত্রের এক ব্যক্তিকে এক এলাকায় যাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলের জন্য নিয়োগ করিলেন। ঐ ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ হিসাব লইলেন। হিসাব দান কালে সে বলিল, এই পরিমাণ মাল সরকারী বিভাগের ওয়াসিল হইয়াছে এবং এই পরিমাণ মাল ব্যক্তিগতরূপে উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এতচ্ছ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ী বসিয়া থাকিলে কি কেহ তোমাকে উপঢৌকন দিতে আসিত? (অর্থাৎ এই সব উপঢৌকন সরকারী পদের প্রভাবেই তোমাকে দেওয়া হইয়াছে) সুতরাং ইহা সরকারী তহবিলে জমা হইবে; ইহা তুমি পাইতে পার না। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য নামায বাদ মসজিদের মিম্বরে উঠিয়া তেজোদৃপ্ত ভাষায় ভাষণ দানে বলিলেন—আমরা রাষ্ট্রিয় কার্য্যে লোকদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকি। পরিতাপের বিষয়

যে, কোন কোন ব্যক্তি কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হিসাব দিয়া থাকে যে, এই পরিমাণ মাল সরকারী বিভাগের এবং এই পরিমাণ মাল আমার ব্যক্তিগত উপঢৌকন। সে নিজের বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে কি কেহ তাহাকে উপঢৌকন দিয়া থাকিত ?

আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার মুষ্টির ভিতরে আমার (মোহাম্মদের) প্রাণ—তোমাদের যে কেহ এইরূপ খেয়ানত ও অসাধু উপায় অবলম্বন পূর্বক (জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের) কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবে, কেয়ামতের দিন ঐ বস্তু তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। এমনকি, ঐ বস্তু কোন জন্তু হইলে উহা তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। ভাষণ শেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় হাত উপরের দিকে এতদূর উত্তোলন করিলেন যে, তাহার বগল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল এবং বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক—আমি উম্মতকে ভালরূপে বুঝাইয়া ব্যক্ত করিয়া দিলাম।

ঘটনা বর্ণনাকারী আবু হোমাইদ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ শ্রবণকারীদের মধ্যে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) রহিয়াছেন; কাহারও ইচ্ছা হইলে এই হাদীছ তাঁহার নিকটে যাইয়া শুনিতে পারে।

যাকাতের বস্তু চিহ্নিত করা যেন অপাত্রে ব্যয় না হয়

৭৯০। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবু তাল্হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সদ্য প্রসূত শিশু ছেলে আবদুল্লাহকে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; হযরতের মুখের চিবান খেজুর সর্বপ্রথম তাহার মুখে দিয়া বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাকাত-ছদকা রূপে সংগৃহীত বাইতুল-মালের উটসমূহকে চিহ্নিত করিতেছেন।

ছদকায়ে-ফেৎর

আতা (রঃ) ও ইবনে ছীরীন (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, ছদকায়ে-ফেৎর আদায় করা ফরজ। হানফী ফেকার কেতাবে ওয়াজেব লেখা হয়; ওয়াজেব কার্য্যতঃ ফরজই বটে, উভয়ের মধ্যে শুধু সূক্ষ্ম মর্মগত সামান্য পার্থক্য আছে।

৭৯১। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا

مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অর্থঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছদকায়ে-ফেৎর নিম্নরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন—এক ছা' (প্রায় চার সের) খেজুর বা যব প্রত্যেক মোসলমান ব্যক্তি আজাদ বা ক্রীতদাস, পুরুষ বা নারী, বড় বা ছোট এর পক্ষ হইতে। এবং আদেশ করিয়াছেন, উহা যেন লোকদের ঈদুল-ফেতরের নামাযে যাইবার পূর্বেই আদায় করা হয়।

৭৯২। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় ঈদের দিন ছদকায়ে-ফেৎর এই পরিমাণে আদায় করিতাম—এক ছা' খাদ্যবস্তু কিম্বা এক ছা' খেজুর কিম্বা এক ছা' যব কিম্বা এক ছা' কিশমিশ। আমাদের তথা মদীনায় খাদ্য-বস্তু তখন যব, কিশমিশ, পনির এবং খেজুরই ছিল।

মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন সিরিয়া দেশে গম আমদানী হইল তখন তিনি বলিলেন, উল্লিখিত বস্তুসমূহের এক ছা'-এর স্থলে উহার অর্ধ পরিমাণ গম-ই আমি যথেষ্ট মনে করি।

ব্যাখ্যাঃ— জব, খেজুর ও কিশমিশ দ্বারা ফেৎরা পূর্ণ এক ছা' পরিমাণের দিতে হয়। গমের দ্বারা ইমাম আবু হানিফার মতে অর্ধ ছা' যথেষ্ট, কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ গম হইলেও পূর্ণ এক ছা' দিতে বলেন। অত্র চার প্রকার বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারাও ফেৎরা আদায় করা যায়। কিন্তু উহার কোন পরিমাণ নির্দ্ধারিত নাই, বরং এই চার প্রকার বস্তুর নির্দ্ধারিত পরিমাণের মূল্য হিসাবে উহা দিতে হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় মদীনায় খাদ্য-বস্তু কি ছিল তাহা উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের খাদ্য-বস্তু ছিল—যব, কিশমিশ পনির এবং খেজুর। গমের অস্তিত্ব প্রায় না থাকার ন্যায় অতি বিরল ছিল। তাই অন্যান্য খাদ্য বস্তুর দ্বারা যে পরিমাণ ফেৎরা দিতে হয় অর্থাৎ এক ছা' সাধারণতঃ ফেৎরায় পরিমাণ তাহাই প্রসিদ্ধ ছিল। মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে যখন গমের প্রাচুর্য্য দেখা দিল তখন গমের পরিমাণ অর্দ্ধ ছা' হওয়ার মছআলাহও প্রসার লাভ করিল। শুধু একা মোয়াবিয়া (রাঃ)-ই নহেন, বরং বহু ছাহাবী এই মছআলার সমর্থক হইলেন। কারণ, গমের দ্বারা অর্দ্ধ ছা' পরিমাণ নির্দ্ধারণ—এই মছআলাহ শুধু কেয়াছ, যুক্তি বা মূল্যের হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বরং এই বিষয়ে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ফতহুল-মোল্‌হেম নামক (মোসলেম শরীফের শরাহ) কিতাবে বিদ্যমান আছে।

মছআলাহঃ— ঈদের নামাযের পূর্বেই ফেৎরা আদায় করিয়া দেওয়া উচিৎ, অন্ততঃ ভিন্ন করিয়া রাখিবেই। যদি কেহ তাহা না করে, অন্ততঃ ঐ দিনের মধ্যে আদায় করিবে এবং উহা আদায় না করা পর্য্যন্ত নিজের জিম্মায় ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে। অতএব যথাসম্ভব উহা আদায় করিতেই হইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● দান-খয়রাত ডান হাতে দেওয়া চাই (১৯১ পৃঃ)। অর্থাৎ দানকারী ব্যক্তির কর্তব্য দানকৃত ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যবহার না করা এবং তাহাকে হেয় মনে না করা; এই সব কার্য্যে দানের ছওয়াব বিনষ্ট হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দান বিফলও হইয়া যায়। ● স্বীয় ভৃত্য বা অধীনস্থের মাধ্যমে দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া (১৭২ পৃষ্ঠা ৭০১, ৭০২ হাদীছ)। অর্থাৎ দানকৃত ব্যক্তিকে হেয় মনে করিয়া নয় বা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশে নয়, বরং প্রয়োজনে বা স্বাভাবিকভাবে দান-খয়রাত করায় ঐরূপ মাধ্যমের ব্যবহারে কোন দোষ নাই, বরং ঐ মাধ্যম ছওয়াব লাভের সুযোগ পাইবে। ● দান-খয়রাত যথাসম্ভব সম্পন্ন করা উত্তম (১২৯ পৃষ্ঠা ৩৪৮ হাদীছ)। অর্থাৎ দান-খয়রাতের কোন কিছু থাকিলে উহা যথাসম্ভব গরীবদেরকে দিয়া দেওয়া সুন্নত, বিলম্ব করিবে না। ● দান-খয়রাতে গোনাহ মাফ হইয়া থাকে (১৮৩ পৃঃ ৩২৫ হাঃ)। ● যাকাত বা দান-খয়রাত কোন এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ দেওয়া যায়? নফল দান খয়রাত এক ব্যক্তিকে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্তও দেওয়া যায়। যাকাতও এক ব্যক্তিকে বিশেষতঃ ঋণগ্রস্ত বা অভাবী পরিবার বহনকারী হইলে তাহাকে উপস্থিত এক সঙ্গে যে পরিমাণ ইচ্ছা দেওয়া যায় তাহাতে দোষ নাই। অবশ্য একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে— একজন গরীবকে নেছাব পরিমাণের অধিক টাকা এক সঙ্গে দিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত নেছাব পরিমাণে টাকা দিয়া ঐ টাকা তাহার হাতে জমা থাকাবস্থায় পুনঃ তাহাকে যাকাত দেওয়া যাইবে না। অবশ্য যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় বা পরিজনকে দিয়া ফেলিয়া থাকে কিম্বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ব্যয় করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে দিতে পারে। ঋণ বা অভাবী পরিবার বিহীন এক ব্যক্তিকে এককভাবে নেছাব পরিমাণ মাল এক সঙ্গে দেওয়াকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মকরূহ বলিয়াছেন। ● যাকাত উসুল করিতে লোকদের শুধু ভাল ভাল জিনিস বাছিয়া লইবে না। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের মালের যাকাত যদি কেহ টাকা-পয়সা দ্বারা না দিয়া ঐ মালেরই চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিয়া দিতে চায়—সে ক্ষেত্রে যেমন যাকাত দাতার কর্তব্য যে, খারাপ জিনিস বাছিয়া দিবে না; তদ্রূপ সরকারের পক্ষ হইতে যাকাত উসুল করা হইলে তাহারও কর্তব্য যে, শুধু ভাল মাল বাছিয়া না লয়। (১৯৬ পৃষ্ঠা ৬৭৬ হাদীছ) ● কাহারও নিকট কোন বস্তু আছে যাহার উপর যাকাত ফরজ হইয়াছে; ঐ ব্যক্তি উহা হইতে যাকাত আদায় না করিয়া উহা সম্পূর্ণই বিক্রি করিয়া ফেলিল এবং অন্যত্র হইতে যাকাত আদায় করিল—ইহা জায়েজ আছে। (২০১ পৃষ্ঠা)

● নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধর তথা বনী-হাশেম বংশের লোকদের জন্য যাকাত এবং ছদকায়ে-ফেৎর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, উহা তাঁহাদেরকে দেওয়া হইলে আদায় হইবে না (২০২ পৃঃ)। ● দান-খয়রাত কৃত বস্তুর উৎপন্নও দানই পরিগণিত হইবে; উহা দানের পাত্রেই ব্যয়িত হইবে। (২০৩ পৃষ্ঠা)

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছদকায়ে-ফেৎর ছোট-বড় প্রত্যেকের পক্ষ হইতে আদায় করিতেন। অর্থাৎ—ছেলে-মেয়ে নাবালেগ হইয়া গেলে যদি তাহাদের নিজস্ব মাল থাকে তবে সেই মাল হইতে তাহাদের ছদকা-ফেৎর আদায় করিতে হইবে। যদি তাহাদের নিজস্ব মাল না থাকে তবে তাহাদের ছদকা-ফেৎর ওয়াজেব থাকে না ; এমনকি পিতার উপরও তাহাদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা ওয়াজেব হয় না : পিতার উপর শুধু নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর ওয়াজেব হয়।

অবশ্য যে সব বালেগ ছেলে-মেয়ের নিজস্ব মাল নাই : পিতার ভরণ পোষণেই থাকে—সে ক্ষেত্রে উক্ত ছেলে-মেয়েদের পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা পিতার জন্য মোস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাই করিতেন। (২০৫ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বালেগ সন্তানের নিজস্ব মাল আছে তাহার ফেৎরা পিতা আদায় করিলে এবং স্ত্রীর নিজস্ব মাল আছে তাহার ফেৎরা স্বামী আদায় করিলে যদি তাহা অনুমতি তথা তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা সাব্যস্ত করা ছাড়া হয় তবে সাধারণ বিধান মতে উহা আদায় না হওয়াই সাব্যস্ত। অবশ্য এক অন্নভুক্ত থাকিলে আদায় হইয়া যায় বলিয়া ফৎওয়া রহিয়াছে (শামী, ২—১০৩) ; সুতরাং সর্বাবস্থায় তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই তাহাদের ফেৎরা আদায় করা উত্তম। এক অন্নভুক্ত মালদার ভাই-বেরাদরের মছআলাহও তদ্রূপই (ঐ)।

● ছাহাবীদের যুগে ছদকা-ফেৎর ঈদের এক-দুই দিন পূর্বেই দেওয়া হইত। ইমাম বোখারী (রঃ) এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ছদকা-ফেৎর গরীব-দুঃখীজনকে সুষ্ঠুরূপে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সরকার ছদকা-ফেৎর সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করিত। সংগৃহীত ছদকা-ফেৎর যাহাতে সময় মত ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই গরীব-দুঃখীকে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে ঈদের এক-দুই দিন পূর্ব হইতেই সংগ্রহ অভিযান পরিচালন করা হইত এবং ছদকা-ফেৎরদাতা জনগণ সেই এক-দুই দিন পূর্ব হইতেই উক্ত সংগ্রহকারীদের নিকট নিজ নিজ ছদকা-ফেৎর অর্পণ করিতে থাকিত।

মছআলাহ :—ছদকা-ফেৎর ঈদের দিনের পূর্বে আদায় করা জায়েয ; তবে দান করার সময় ছদকা-ফেৎর দানের নিয়্যত সুস্পষ্টরূপে মনে উপস্থিত রাখিবে। অনেকের মতে রমজান মাসের পূর্বেও আদায় করা যায়। (শামী, ২—১০৬)

এতিম তথা নাবালেগ ছেলে-মেয়ে যাহাদের পিতা জীবিত নাই, উত্তরাধিকার সূত্রে বা যে কোন সূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের মাল থাকিলে তাহাদের ছদকা-ফেৎর আদায় করা ওয়াজেব। মুরব্বীরা আদায় না করিলে বালেগ হওয়ার পর হিসাব করিয়া সমুদয় বকেয়া ছদকা-ফেৎর তাহাদের আদায় করিতে হইবে। (২০৫ পৃষ্ঠা)

● পাগল—বালেগ হউক বা নাবালেগ তাহার নিজস্ব মাল থাকিলে উহা হইতে তাহার ছদকা-ফেৎর আদায় করা হইবে। যদি তাহার মাল না থাকে, কিন্তু মালদার পিতা জীবিত থাকে, তবে পাগল সন্তান বালেগ হইলেও তাহার পক্ষ হইতে ছদকা-ফেৎর আদায় করা পিতার উপর ওয়াজেব। (২০৫ পৃষ্ঠা)

হজ্জ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۔
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۔

"আল্লার (আদেশ পালনার্থে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আল্লার ঘর—কা'বা শরীফের হজ্জব্রত পালন করা ফরজ—ঐ ব্যক্তিদের উপর, যাহারা সেই ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ রাখে। কোন ব্যক্তি (আল্লার উপাসক না হইয়া) কাফের হইলে (আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি হইবে না ;) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্ট জগত হইতে বে-পরোয়া (কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন)।" (৪ পারা ১ রুকু)

৭৯৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের* সময় (আমার ভ্রাতা) ফজল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে একই যানবাহনের উপর আরোহিত ছিল। এমতাবস্থায় "খাসআ'ম" গোত্রের একটি যুবতী নারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে ফজল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং যুবতীটিও ফজলের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হস্তে ফজলের চেহারা বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলেন (এবং বলিলেন, সুন্দর যুবক ও সুন্দরী যুবতীদের পরস্পারের মধ্যে শয়তানের ওছওয়াছাহ হইতে নিরাপদ হওয়া যায় না)। ঐ স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ ! হজ্জ ফরজ হওয়ার আদেশ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় বলবৎ হইয়াছে যখন তিনি এরূপ বৃদ্ধ যে, তিনি যানবাহনের উপর বসিয়া থাকিতে সক্ষম নহেন। (অর্থাৎ এই অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বা হজ্জ ফরজ হওয়ার মত ধনের মালিক হইয়াছেন)। এমতাবস্থায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারি কি ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—হাঁ।

শুদ্ধ হজ্জের ফজিলত

৭৯৪। হাদীছ ঃ—একদা আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! জেহাদকে আমরা সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ আমলরূপে গণ্য করিয়া থাকি, তাই আমরা (নারী সমাজও

---

* হিজরতের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি হজ্জ করিয়াছেন যাহা ১০ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে হজ্জের অনতিকাল পরেই তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সেই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ বলা হয়।

পুরুষগণের ন্যায়) জেহাদে শরীক হইলে তাহা ভাল হয় না কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু স্মরণ রাখিও—(তোমাদের জন্য) সর্বোত্তম জেহাদ শুদ্ধ হজ্জ, যাহা আল্লাহ তায়ালার দরবারে মকবুল—গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী।

৭৯৫। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ

يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি আল্লার (সন্তুষ্টি) উদ্দেশ্যে হজ্জ করিতে যাইবে এবং সর্বপ্রকার অশোভনীয় কাজ ও গোনাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, ঐ হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সেই ব্যক্তির অবস্থা এমন হইবে যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে এরূপ বে-গোনাহ হইয়া গিয়াছে যেরূপ বে-গোনাহ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক প্রকার গোনাহ আছে, যাহা সাধারণতঃ তওবা ব্যতিরেকে মাফ হয় না, কিন্তু উল্লিখিত পর্য্যায়ের হজ্জকালে আল্লার দরবারে কান্নাকাটা ও তওবা অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। আর হকুল-এবাদ অর্থাৎ কোন মানুষের কোন প্রকার হক তাহার উপর থাকিলে ঐ হকদারের নিকট হইতে মুক্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে

মিক্বাত বা এহরামের স্থান

৭৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিভিন্ন দেশবাসীদের জন্য মিক্বাত নিম্নরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন, যথা—নজদবাসীদের জন্য "ক্বরন" নামক স্থান। মদীনাবাসীদের জন্য জুল-হোলায়ফা ও সিরিয়াবাসীদের জন্য "জোহফা" নামক স্থান।

৭৯৭। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিক্বাত নিম্নরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। যথা—মদীনাবাসীদের জন্য "জুল-হোলায়ফা" নামক স্থান, সিরিয়াবাসীদের জন্য "জোহফা" নামক স্থান, নজদবাসীদের জন্য "ক্বরনুল-মানাযিল", ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালমলম্ নামক পর্বত।+ এই সমস্ত মিক্বাত উল্লিখিত দেশবাসীদের জন্য এবং তাহাদের পথে আগন্তুকদের জন্য; যাহারা হজ্জ বা ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে আসিবে। আর যাহারা এই সব মিক্বাতের

\+ হিন্দুস্থান, পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের হাজীগণ সমুদ্র পথে আদন তথা ইয়ামনের পথে যাইয়া থাকে, তাই তাহাদের জন্য এহরামের স্থান ইয়ালমলম্ পাহাড় বরাবর।

অভ্যন্তরে বসবাস করে তাহাদের মিকাত হরম শরীফের সীমার বাহিরে যে কোন স্থান এবং মক্কাবাসীদের জন্য এহরামের স্থান মক্কানগরী।

৭৯৮। হাদীছ ঃ--আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ইরাকস্থিত কুফা ও বছরা শহরদ্বয়ের এলাকা মুসলমানদের আধিপত্যে আসিল এবং সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হইল তখন তথাকার বাসিন্দাগণ খলীফা ওমর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) (আমাদের নিকটবর্তী) নজদবাসীদের জন্য "করন" নামক স্থানকে মিকাত নির্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু উহা আমাদের প্রচলিত পথ হইতে দূরে অবস্থিত। আমরা সেই পথে যাতায়াত করিলে তাহা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা স্বীয় প্রচলিত পথে ঐ "করন" বরাবর স্থান নির্ধারিত কর। অতঃপর তিনি তদন্ত করিয়া "জাত-এরক্" নামক স্থানটি নির্ধারিত করিলেন।

৭৯৯। হাদীছ ঃ-- ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ("জুল-হোলায়ফা"* এলাকাস্থিত) ওয়াদি আকিক নামক স্থানে রাত্রি যাপনকালে (নিদ্রাবস্থায়) অহীর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল, (আপনি অতি মোবারক—উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছেন।) এই মোবারক এলাকায়ই আপনি দুই রাকাত নামায পড়িয়া (এহরাম বাঁধাকালে) হজ্জ ও ওমরা উভয়ের উল্লেখ করিবেন।

হজ্জের ছফরে পাথেয় গ্রহণ করা চাই

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى "হজ্জের ছফরে পাথেয় অবশ্যই গ্রহণ করিবে; পাথেয় গ্রহণের বড় সুফল এই যে, (ভিক্ষা করার বা অসদুপায়ের গোনাহ হইতে) নিস্তার পাওয়া যায়। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

৮০০। হাদীছ ঃ—ছাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানবাসীদের মধ্যে কুপ্রথা ছিল যে, তাহারা পাথেয় তথা পথের সম্বল না লইয়া হজ্জ করিতে যাইত। তাহারা বলিত, আমরা আল্লার উপর ভরসা স্থাপনকারী। অতঃপর মক্কায় পৌছিয়া লোকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। উক্ত ভ্রান্ত রীতির বিরুদ্ধে এই আয়াত নাজেল হয়—

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

---

* এই স্থানটি এখন মদীনার শহরভুক্ত এবং ওয়াদি-আকিক সংলগ্ন। বর্তমানে উহাকে বীরে আলী নামে অভিহিত করা হয়। এখানে হাজীদের গাড়ী থামাইবার মঞ্জিল আছে এবং মঞ্জিলের নিকটবর্তীই একটি মছজিদ আছে, যে স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

সুগন্ধি বা সুগন্ধময় কাপড় এহরামকালে ব্যবহার করিবে না কিম্বা ধৌত করিয়া লইবে, যেন সুগন্ধ না থাকে

৮০১। হাদীছ :—ছাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ইয়া'লা (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি অহী নাযেল হওয়াকালীন তাঁহার অবস্থা আমাকে দেখাইবেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) "জেয়ে'ররাণা" (মক্কা নগরী হইতে ১১/১২ মাইল দূরে অবস্থিত) স্থানে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। লোকটির পরিধানে একটি জুব্বা ছিল এবং উহা খালুক—জাফরান মিশ্রিত তৈরী সুগন্ধি মাখানো ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ওমরার এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি মাখানো জামা গায়ে থাকিলে কি করিতে হইবে? এবং আমি ওমরা কিরূপে আদায় করিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের প্রতি অহী নাযেল হওয়া আরম্ভ হইল এবং তাঁহাকে একটি চাদর দ্বারা ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইল। তখন ওমর (রাঃ) ইয়া'লা (রাঃ)কে তাঁহার পূর্ব অনুরোধ অনুসারে ইশারা করিয়া ডাকিলেন। তিনি আসিয়া ঐ ঘেরাও-এর ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দেখিতে পাইলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ এবং তাঁহার কণ্ঠনালী হইতে একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছে। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁহার ঐ অবস্থা দূরীভূত হইল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরার বিষয় প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? তখন ঐ ব্যক্তিকে সংবাদ দিয়া উপস্থিত করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার পরিধানের জুব্বাটি খুলিয়া ফেল, (কারণ এহরাম অবস্থায় তৈরী জামা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; তদুপরি ইহা সুগন্ধ যুক্তও বটে।) এবং (এই জাফরান মিশ্রিত) সুগন্ধ (তোমার জুব্বাটি হইতে) তিনবার ধৌত করিয়া ফেল। (কারণ, জাফরানের রং পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।) আর হজ্জ অবস্থায় যেরূপ চলিয়া থাক ওমরা অবস্থায়ও তদ্রূপই চল।

এহরামের পূর্বক্ষণে (শরীরে) সুগন্ধি ব্যবহার করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় ফুল শোঁখিতে পারে,* আয়নায় চেহারা দেখিতে পারে। যে সব বস্তু মূল সুগন্ধি নহে, বরং উহা মূলতঃ অন্য ব্যবহারের; যথা—আহার্য্য বস্তু; যেমন তৈল, ঘি এরূপ সুগন্ধময় বস্তু শরীরে ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। আর যাহা মূলতঃ সুগন্ধি যেমন জাফরান, কস্তুরী ইত্যাদি উহা শরীরে প্রয়োজনে ঔষধরূপে ব্যবহারেও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে (শামী, ২—২৭৭)।

---

* ফুল বা সুগন্ধি শুধু শোঁখিলে কাফ্ফারা দিতে হয় না, কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা করা মাকরূহ-তাহরিমী।

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় অঙ্গুরি ব্যবহার করিতে পারে এবং টাকা পয়সা রাখিবার জন্য "জালি" নামে যে লম্বা থলিয়াবিশেষ কোমরে পেঁচাইয়া বাঁধা হয়— উহাও এহরাম অবস্থায় কোমরে বাঁধিতে পারে।

মেহনত ও শক্তির কাজে শ্রমিকরা লুঙ্গির নীচে লেঙ্গট পড়িয়া থাকে। × আয়েশা (রাঃ) ঐরূপ ক্ষেত্রে এহরাম অবস্থায় সেই লেঙ্গট পরা জায়েয বলিয়াছেন।

৮০২। হাদীছঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইব্রাহীম (রঃ)কে বলিলাম—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এহরামের প্রস্তুতিকালে (শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয মনে করিতেন না, যেহেতু তাহা করিলে এহরামের পরেও সুগন্ধ বিদ্যমান থাকিবে, অতএব তিনি ঐ সময়) সুগন্ধবিহীন সাধারণ তৈল ব্যবহার করিতেন। ইব্রাহীম (রঃ) বলিয়াছেন, তুমি (সুস্পষ্ট হাদীছ বিদ্যমান থাকাবস্থায়) তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিবে কেন?

আসওয়াদ (রঃ) আমার নিকট আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে (এহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণে আমি) তাঁহার মাথার আঁচড়ানো চুলের মধ্য রেখায় (সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়া ছিলাম;) এহরাম অবস্থায় সেই সুগন্ধির উজ্জ্বল চিহ্ন আমি দেখিয়াছি; এখনও যেন উহা আমার চোখে ভাসে।

৮০৩। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ হস্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি:* এহরামের প্রস্তুতির সময় এবং এহরাম খোলার পর—তওয়াফে জেয়ারতের পূর্বে।

মাথার বড় চুল থাকিলে এহরাম বাঁধিতে উহা জমাইয়া দিবে, যেন এলোমেলো না হইতে পারে

৮০৪। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তলবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি; তখন তাঁহার মাথার চুল জমানো ছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর এহরাম স্থান

৮০৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিল-হোলায়ফার (পরবর্তীকালে নির্মিত তথাকার) মসজিদের নিকট হইতেই এহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

× এক হয় "জাঙ্গিয়া" যাহা খাট হাফপেন্টের ন্যায় শরীরের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী থাকে; উহা এহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয নহে। আর এক হয় লেঙ্গট, যাহা শরীরের কোন অংশের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী নহে, বরং উহা কোন বিশেষ গঠনবিহীন শুধু লম্বা লেজবিশিষ্ট হয়; কোমরে পেঁচাইয়া উহা পরা হয়—যেমন কুস্তিগীররা পরিয়া থাকে। উহা এহরাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয আছে।

* শরীরে সুগন্ধি লাগাইবে, কিন্তু কাপড়ে লাগাইবে না, নতুবা ঐ কাপড়ে এহরাম বাঁধিতে পারিবে না।

এহরাম অবস্থায় কি কি কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ

৮০৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরামওয়ালা ব্যক্তি কি কি কাপড় ব্যবহার করিতে পারে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এহরামওয়ালা (পুরুষ) ব্যক্তি কোন প্রকার জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধান করিতে পারিবে না। মোজাও ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি জুতার ব্যবস্থা না থাকে তবে চামড়ার মোজা পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উঁচু স্থান এবং গোছের নিম্নে উভয় দিকের গিঁঠদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহা (জুতার স্থায়) ব্যবহার করিতে পারিবে। আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিও যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই 'অরস' (একপ্রকার উদ্ভিদ জাতীয় রং করার বস্তু) বা জাফরানে রং করা কাপড় ব্যবহার করিও না।

হজ্জের কার্য্য সম্পাদনে যানবাহন ব্যবহার করা

৮০৭। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরফা হইতে মোজদালেফা আসাকালে উসামা (রাঃ)কে স্বীয় যানবাহনে বসাইয়া ছিলেন এবং মোজদালেফা হইতে মীনা আসাকালে ফজল (রাঃ)কে বসাইয়া ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জামরা আকাবার রমী করা (অর্থাৎ বড় শয়তানকে ১০ তারিখে কঙ্কর মারা) পর্য্যন্ত তলবিয়া পড়িয়াছেন।

এহরাম অবস্থায় পরিধেয়

● এহরাম অবস্থায় চাদর এবং লুঙ্গি* পরিধান করিবে।

● পুরুষ এহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকিতে পারিবে না। মহিলার মাথা যেহেতু তাহার ছতরের অন্তর্ভুক্ত, তাই উহা অবশ্যই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু মহিলাদের চেহারা যেহেতু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাই এহরাম অবস্থায় উহাকে পরিধাক বিহীন রাখিতে

---

* এহরাম অবস্থায় সেলাই করা লুঙ্গিও পড়া জায়েয। কারণ এহরাম অবস্থায় যে, পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় নিষিদ্ধ উহার উদ্দেশ্য যাহা শরীর বা অঙ্গের গঠন আকৃতিতে সেলাই করা হয়; যেমন—জামা, পায়জামা। লুঙ্গির শুধু দুই মাথা জুড়িয়া দেওয়া হয়, উহা শরীরের গঠন আকৃতির নহে। আমাদের দেশের হাজীগণ সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে যাইয়া বার বার কবিরা গোনাহ এবং অতি জঘন্য লজ্জাকর অবস্থায় পতিত হয়। কাপড়ের হিসাবের বেলায় লুঙ্গির হিসাব চার হাত ঠিক রাখিয়া সেলাই বিহীন পরে, ফলে চলা-ফেরায় এবং শয়নে বা সামান্য বাতাসেও ছতর খুলিয়া যাইতে থাকে যাহা হারাম কবিরা গোনাহ। এত বড় গোনাহ দিবারাত্র অসংখ্য বার সংঘটিত হইতে থাকে; ইহার প্রতি লক্ষ্য করা কতই না আবশ্যক! সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ হাত এবং মোটা শরীর হইলে ছয় হাত লম্বা লইবে, অন্যথায় লুঙ্গি সেলাই করা ব্যবহার করিবে।

হইবে ; এই কারণেই বোরকা পরিধান করিতে উহার নেকাব সাধারণভাবে চেহারার উপর পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ছাড়িয়া দেওয়া বা শুধু চোখ খোলা রাখিয়া নাক-মুখ পর্যন্ত কাপড় জড়াইয়া দেওয়া এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। কিন্তু নারীদের জন্য বেগানা পুরুষ হইতে স্বীয় চেহারা পর্দায় রাখা ওয়াজেব, তাই নারীদেরকে এহরাম অবস্থায়ও বেগানা পুরুষদের সম্মুখে স্বীয় চেহারার পর্দা অবশ্যই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মাথার সঙ্গে কোন বস্তু রাখিয়া (যেমন ক্রিকেট খেলোওয়াড়দের ললাটের উপর থাকে) উহার উপর নির্দ্বিধায় বোরকার নেকাব ঝুলাইয়া দিতে পারে ; ইহাতে চেহারার পর্দা হইবে এবং যেহেতু নেকাব চেহারা হইতে আলগ থাকিবে, তাই উহা পরিধেয় গণ্য হয় না ; এহরাম অবস্থায় ঐরূপ ব্যবহার জায়েয। (বেগানাদের সম্মুখে চেহারার পর্দা করা এহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য ওয়াজেব (শামী, ২—২৬০)

● আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মহিলারা এহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান করিতে পারে, মোজা পরিতে পারে।

● নারী-পুরুষ কেহই সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে না, অবশ্য যদি সেই কাপড় হইতে সুবাস সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গিয়া থাকে তবে উহা পরা জায়েয।

● কাল, গোলাবী ইত্যাদি সাধারণ যে কোন রঙ্গের রঙ্গীন কাপড় নারী-পুরুষ সকলেই এহরাম অবস্থায় বিনা দ্বিধায় পরিতে পারে ; তাহাতে দোষ নাই।+

● ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় পরিধেয় কাপড় বদলাইতে পারিবে ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিবে।

৮০৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছেন মাথা আঁচড়াইয়া তৈল ব্যবহার করিয়া (—পারিপাট্টের সহিত)। তাঁহার পরিধানে লুঙ্গি ও চাদর ছিল। নবী (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণ এই পোশাকেই ছিলেন। এবং কোন প্রকার চাদর ও লুঙ্গি পরিধানেই নিষেধ করেন নাই ; অবশ্য জাফরান (ইত্যাদি সুগন্ধ বস্তুর) রঙ্গে

+ আমাদের দেশের হাজীগণ সাদা কাপড় পরে, কিন্তু লজ্জা-শরমের কোনই ধার ধারে না। অনেকে কম মূল্যের শিথিল বুননের কাপড় পরে, এহরাম অবস্থায় গায়ে জামা থাকে না, তাই শুধু ঐ কাপড়ে নির্লজ্জতার ছায়া সর্বদাই প্রকাশ পাইতে থাকে এতদ্ভিন্ন সাদা কাপড় পরিয়াই সকলে বিশেষতঃ জাহাজের মধ্যে এক সঙ্গে গোসল করিতে থাকে। সাদা কাপড় ভিজিলে কিরূপ জঘন্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তাহা সহজেই অনুমেয় এবং অপেক্ষমান লোক সমাবেশের সম্মুখে ঐ দৃশ্যে দাঁড়াইয়া গোসল করিতে থাকে—এ সব আমার চোখের দেখা অবস্থাবলী। হজ্জের ছফর অত্যন্ত পাক-পবিত্র ছফর ; এ সময় সংযত থাকা অধিক প্রয়োজন ! গোসলের জন্য একটি রঙ্গিন কাপড় অবশ্য রাখিবে। এহরাম অবস্থায় সাদা কাপড় উত্তম বটে, কিন্তু ভাল বাইনের কাপড় সংগ্রহ করিতে না পারিলে রঙ্গিন কাপড় পরিবে।

রঞ্জিত কাপড়—যদি উহার রঙ্গ শরীরে লাগে তবে (অবশ্যই উহার সুবাস তখন কাপড়ে বিদ্যমান থাকিবে, তাই ঐ অবস্থায়) উহা নিষিদ্ধ। নবী (দঃ) (জোহর নামাযান্তে মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া) জুলহোলায়ফা নামক স্থানে (পৌঁছিয়া আছর নামায পড়িলেন এবং তথায়ই রাত্রি যাপন করিয়া) প্রভাত করিলেন। (এবং তথায়ই দিনের বেলায় - ফতহুলবারী, ৩—৩২২) এহরাম বাঁধিলেন।) তথা হইতে যাত্রা আরম্ভে তিনি উটে আরোহণ করিলেন এবং সংলগ্ন ময়দানে পৌঁছিলে নবী (দঃ) ও ছাহাবীগণ সজোরে তলবিয়া পড়িলেন এবং নবী (দঃ) নিজ সঙ্গের কোরবানীর পশুগুলির গলায় (কোরবানীর নিদর্শনস্বরূপে) মালা পরাইয়া দিলেন। তখন জিলকদ চাঁদের পাঁচ দিন বাকি ছিল। জিলহজ্জ চাঁদের চার তারিখ (শনিবার দিন ভোরের দিকে) হযরত (দঃ) মক্কায় পৌঁছিলেন; প্রথমেই বাইতুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করিলেন এবং ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিলেন। নবী (দঃ) এহরাম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন যেহেতু তাঁহার সঙ্গে কোরবানীর পশু নিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর নবী (দঃ) "হাজুন" মহল্লায় অবস্থান করিলেন। তিনি হজ্জের এহরাম অবস্থায়ই ছিলেন। আরফা হইতে প্রত্যাবর্তনের (তথা জিলহজ্জের ১০ তারিখের) পূর্বে নবী (দঃ) আর তওয়াফ করিতে বাইতুল্লাহ্ শরীফের নিকটে আসেন নাই। ছাহাবীদিগকে কিন্তু তওয়াফ ও ছায়ী করার পরই মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। এমনকি যাহার সঙ্গে স্ত্রী ছিল স্ত্রী ব্যবহার হালাল হইল এবং সুগন্ধি ও জামা-কাপড় ইত্যাদি সবই ব্যবহার করা হালাল হইয়া গেল। এই নির্দেশ শুধু তাহাদের জন্য ছিল যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না।

ব্যাখ্যাঃ—যাঁহারা তওয়াফ ও ছায়ী করতঃ চুল কাটিয়া হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উক্ত তওয়াফ ও ছায়ী ওমরা পরিগণিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা জিলহজ্জের আট তারিখে পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া মিনায় যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন।

হজ্জের এহরাম ভঙ্গ প্রসংগটি সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী; শুধু ঐ এক বৎসরই বিশেষ কারণাধীন রসূলের আদেশে হইয়াছিল। এবং তাহাদিগকে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় নাই। আমাদিগকে সাধারণ নিয়মই পালন করিতে হইবে; যে কোন কারণে হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিলে তাহাকে এহরাম ভঙ্গের কাফ্ফারা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

এহরাম বাঁধার সময় তল্বিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলা

৮০৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে যাত্রাকালে) মদীনা শহরে জোহরের নামায পূর্ণ চারি রাকাত আদায় করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং জুলহোলায়ফার এলাকায় পৌঁছিয়া আছরের নামায দুই রাকাত কছর পড়িলেন। পরদিন ঐ এলাকায় যখন এহরাম বাঁধিলেন তখন

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে উচ্চৈঃস্বরে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নামে তলবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি।

তল্‌বিয়া

৮১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তল্‌বিয়া এইরূপ ছিল—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থ—গোলাম উপস্থিত হইয়াছে, হে আল্লাহ! গোলাম উপস্থিত হইয়াছে। গোলাম উপস্থিত হইয়াছে; তুমিই একমাত্র প্রভু, তোমার কোন শরীক নাই। গোলাম উপস্থিত হইয়াছে; সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য; যত নেয়ামতরাশি উপভোগ করিতেছি সবই তোমার এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র রাজত্ব তোমার। তোমার কোনও শরীক নাই।

৮১১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি জ্ঞাত আছি, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তল্‌বিয়া কিরূপ পড়িতেন—

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা-শরীকা-লাকা লাব্বাইকা।

ইন্নাল্‌-হাম্‌দা ওয়ান্‌-নে'মাতা লাকা' (ওয়াল্‌-মুল্‌কা লাকা। লা-শরীকা-লাকা*)।

মছআলাহ ঃ—এহরাম বাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া দশ তারিখ সকাল বেলায় জমরা-আকাবাহ তথা বড় শয়তানকে কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত এই তল্‌বিয়া সঘন পড়িয়া যাইবে। (১৩১ পৃঃ ৮০৭ হাদীছ)

এহরাম বাঁধিবার সময় আল্লার প্রশংসা করা তছবীহ পড়া এবং তকবীর বলা

৮১২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জে যাত্রার প্রাক্কালে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায মদীনাতে পূর্ণ চারি রাকাত পড়িলেন এবং জুল-হোলায়ফা এলাকায় আছরের নামায কছর দুই রাকাত পড়িলেন এবং সেই এলাকায়ই রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর হইলে পর (দিনের বেলা) তিনি যানবাহনের উপর আরোহণ করিলেন। যানবাহন যখন তাঁহাকে লইয়া "বায়দা" নামক ময়দানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন—

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্য এই হাদীছে উল্লেখ নাই; ইহা সংক্ষিপ্ত তল্‌বিয়া প্রথমোক্ত হাদীছে এই বাক্যও আছে, উহা পূর্ণ তল্‌বিয়া।

"ছোবহানাল্লাহ" বলিয়া আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বয়ান করতঃ আল্লাহু আকবার বলিয়া আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের এহরাম বাঁধিলেন, (আমার নিকটস্থ) অন্যান্য সকলেও ঐ উভয়ের এহরামই বাঁধিল।

কেবলামুখী হইয়া এহরাম বাঁধা

৮১৩। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ অভ্যস্ত ছিলেন যে, হজ্জের জন্য যাত্রাকালে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে ফজরের নামায শেষ করিয়া যানবাহন প্রস্তুত করার আদেশ করিতেন। অতঃপর উহার উপর আরোহণ করিতেন। যানবাহন যখন তাহাকে লইয়া দাঁড়াইত তখন তিনি কেবলামুখী হইয়া তল্‌বিয়া পড়িতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় এহরাম বাঁধা যায়

৮১৪। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমরাও ছিলাম। মিকাত হইতে আমি শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ছিলাম। (মক্কা হইতে ১০/১২ মাইল দূরে) সারেফ নামক জায়গায় পৌঁছিয়া নবী (দঃ) সাথীগণকে নির্দেশ দিলেন, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা (শুধু ওমরার এহরামে থাকিলে) ওমরার সঙ্গে হজ্জের এহরামও বাঁধিয়া নিবে এবং হজ্জ সমাপ্তে উভয় এহরাম হইতে এহরাম মুক্ত হইবে। যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু নাই (হজ্জের এহরাম থাকিলেও) তাহারা এহরামকে কার্য্যতঃ ওমরার উপরই ক্ষান্ত করিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হায়েজে লিপ্ত হইয়া পড়িলাম ; (আমার ওমরার কার্য্যাবলী হইল না ;) বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিতে পারিলাম না, তাই ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতে পারিলাম না। নবী (দঃ) আমার নিকট তশরীফ আনিলেন—আমি কাঁদিতে ছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, হে বোকা! কাঁদ কেন! আমি বলিলাম আমি ত ওমরা আদায় করিতে অপারগ রহিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, নামায না পড়ার অবস্থা আমার হইয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন তোমার কোন ক্ষতি হইবে না ; তুমি আদম জাতেরই একজন মহিলা ; আদম-জাত সকল মহিলাদের উপর যাহা আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার উপরও তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, মাথার চুল খুলিয়া ফেল, মাথা আঁচড়াইয়া নেও (অর্থাৎ ওমরার এহরাম ভাঙ্গিয়া ফেল) ও ওমরা ছাড়িয়া দাও এবং হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া নেও : হাজীদের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাও, শুধু বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ পবিত্রতা লাভের পূর্বে করিও না। আমি তাহাই করিলাম। আমার হায়েজ অবস্থা আরফার দিন পর্য্যন্ত থাকিল ; আরফা হইতে মিনায় আসিয়া আমি পাক হইলাম।

তখন মিনা হইতে আসিয়া হজ্জের ফরজ তওয়াফ করিয়া গেলাম। মিনায় অবস্থানের দিনগুলি পূর্ণ করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ বিদায় তওয়াফের জন্য হযরত (দঃ) মিনা হইতে যাত্রা করিলেন আমিও তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। মোহাছ্ছাব নামক জায়গায় হযরত (দঃ) অবতরণ করিলেন, আমরাও অবতরণ করিলাম। তথায় রাত্রে আমি আরজ করিলাম, সকলে ওমরা ও হজ্জ উভয়টি লইয়া বাড়ী যাইবে, আর আমি শুধু হজ্জ লইয়া যাইব! তখন হযরত (দঃ) আমার ভ্রাতা আবদুর রহমানকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার ভগ্নিকে নিয়া হরম সীমার বাহিরে তানয়ীমে যাও। সে তথা হইতে ওমরার এহরাম বাঁধিবে। তারপর তোমরা ওমরার কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিয়া এ-স্থানেই আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে; আমি তোমাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। সেমতে ভ্রাতার সঙ্গে আমি বাহির হইলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া ওমরা সমাপ্ত করিয়া (চুল কর্তনে এহরাম খুলিয়া) শেষ রাত্রে হযরতের নিকট পৌঁছিলাম; তিনি তখন বিদায় তওয়াফ করিয়া ফিরিয়াছেন মাত্র। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরা সমাপ্ত করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই ওমরা তোমার পরিত্যক্ত ওমরার স্থলে হইল। অতঃপর হযরত (দঃ) সকলকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন; সকলে মদীনা পানে যাত্রা করিল।

অন্যের এহরাম দ্বারা নিজের এহরাম নির্দ্ধারণ

হজ্জ তিন প্রকার—এফরাদ, ক্বেরাণ ও তামাত্তো'। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে। এফরাদ হইলে এহরাম বাঁধিবার সীমানা হইতে শুধু হজ্জের নিয়্যত করিতে এবং শুধু উহারই এহরাম বাঁধিতে হয়। তামাত্তো' হইলে সেই সীমানা হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিতে হয়। ক্বেরাণ হইলে হজ্জ ও ওমরা একত্রে উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিতে হয়। নিয়্যত ও এহরাম বাঁধার সময় উক্ত তিন প্রকারের একটি নির্দ্ধারণ করে যদি এরূপ বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির এহরামের ন্যায় এহরাম বাঁধিলাম, তবে তাহার নিয়্যত ও এহরাম শুদ্ধ গণ্য হইবে এবং কার্য্য আদায় আরম্ভ পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তির এহরাম কোন্ প্রকারের তাহা জানিতে পারিলে তাহার এহরাম ঐ প্রকারেরই সাব্যস্ত হইবে; সে ঐ অনুপাতেই আমল করিবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তির এহরামের খোঁজ না পায় তবুও তাহার মূল এহরাম শুদ্ধ হইবে, কার্য্যারম্ভে তাহাকে উক্ত তিন প্রকারের কোন এক প্রকার নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুপাতে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। শামী, ২—২১৭

৮১৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জ উপলক্ষে হজ্জের এহরামের সহিত মক্কাভীমুখে চলিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম। মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত নবী (দঃ) সকলকে তাকিদ দিলেন যে, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আনা হয় নাই তাহারা নিজ

নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিয়া ফেল। (অর্থাৎ তাহারা ওমরার কার্য্য সমাধা করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিবে।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল।

আলী (রাঃ) ইয়ামানে ছিলেন, তথা হইতে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তোমার স্ত্রী (ফাতেমা রাঃ) আমার সঙ্গে আসিয়াছে। আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি এহরাম বাঁধিতে এইরূপ বলিয়াছি—নবী (দঃ) যে প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছেন আমারও তাহাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি এহরাম অবস্থায়ই থাক; আমাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে। ৬২৪ পৃঃ

৮১৬। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) রাষ্ট্রিয় দায়িত্বে ইয়ামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তথা হইতে তিনি মক্কায় পৌছিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি বলিয়াছি—

لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

"রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হজ্জ অনুরূপ হজ্জের নিয়্যতে আমি তলবিয়া পড়িতেছি।" নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি নিজ সঙ্গে কোরাবনীর পশু অবলম্বনকারী পরিগণিত থাক; তথা এহরাম অবস্থায়ই থাক—যেরূপ আছ। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য কতিপয় কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন এবং নবী (দঃ) তাঁহাকে কোরবানীর পশুর মধ্যে অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন। (৩৩১ ও ৬২৪ পৃঃ)

৮১৭। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে মক্কায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার এহরাম বাঁধিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি এরূপ বলিয়াছিলাম, যে প্রকার এহরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের, আমারও তাহাই। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গে কোরবানীর পশু না থাকিলে আমি এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিতাম।

৮১৮। হাদীছ ঃ— আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আমার দেশ ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন। (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমি তথা হইতে মক্কায় পৌছিলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ এহরাম বাঁধিয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমি এরূপ বলিয়াছি—

"আমি তলবিয়া পড়িতেছি এহরামের উদ্দেশ্যে—ঐরূপ এহরাম যেরূপ এহরাম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাঁধিয়াছেন"। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কোরবানীর পশু আছে কি? আমি বলিলাম, না। নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, কা'বা শরীফের তওয়াফ কর এবং ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কর অতঃপর এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেল। আমি তাহাই করিলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া আমার বংশীয় এক মহিলার নিকট আসিলাম, সে আমার মাথা ধোয়ার ও আঁচড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল—আমি এহরাম ভঙ্গ করিলাম। (৬৩১ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবানী করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬৩টা নবী (দঃ) স্বয়ং মদীনা হইতে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন, আর ৩৭টা আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে নিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত পশু জবেহ করার সময় স্বীয় বয়সের বৎসর সংখ্যায় ৬৩টি স্বয়ং নবী (দঃ) নিজ হাতে জবেহ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলি আলী (রাঃ)কে জবেহ করিতে দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রতিটি উট হইতে সামান্য অংশ গোশত একত্র করতঃ উহা পাকাইয়া নবী (দঃ) ও আলী (রাঃ) উভয়ে তাহা আহার করিয়াছিলেন। এই সব তথ্য মোছলেম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে। সেমতে দেখা যায় আলী (রাঃ) কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিতেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীক ছিলেন। উহা জবেহ করা এবং আহার করায়ও তাঁহার শরীক ছিলেন। তদুপরি ৮০৬নং হাদীছে ইহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে স্বীয় কোরবানীর পশুর মধ্যে শরীক বা অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন। সুতরাং আলী (রাঃ) কোরবানী পশু সঙ্গে অবলম্বনকারী পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাই এহরাম ভঙ্গের নির্দেশ তাঁহার প্রতি হয় নাই; তাঁহার জন্য এহরাম অবস্থায় থাকারই নির্দেশ ছিল যেরূপ নবী (দঃ) ছিলেন। ছাহাবী আবু মুছার অবস্থা তদ্রূপ ছিল না, তিনি কোরবানীর পশু সঙ্গে অবলম্বনকারী ছিলেন না, তাই সকলের ন্যায় তাঁহাকে এহরাম ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। কারণ, ঐ বৎসর কোরবানীর পশু সঙ্গে থাকা না থাকার উপরই এহরাম রাখা বা ভঙ্গ করা আরোপিত ছিল।

হজ্জের সময়

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ۔

অর্থ—হজ্জ (তথা হজ্জের এহরাম) সম্পাদন করার জন্য একাধিক নির্দিষ্ট মাস আছে। যে ব্যক্তি ঐ মাসের মধ্যে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া নেয় তাহার অবশ্য কর্তব্য হইবে, সে যেন হজ্জ তথা এহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারের তথা মুখে উচ্চারণও না করে এবং কোন

প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্য্য না করে এবং কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। (যদিও হজ্জের বিশিষ্ট কার্য্যসমূহ জিলহজ্জ মাসের ৫।৬ দিনে মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি যখন এহরাম বাঁধা হইয়াছে তখন হইতেই সে হজ্জের মধ্যে পরিগণিত হইবে)। (২ পাঃ ৯ রুঃ) আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

অর্থ—কাফেররা আপনাকে (বিব্রত করার জন্য) জিজ্ঞাসা করে প্রতি মাসেই চন্দ্রের মধ্যে (ছোট বড় হওয়ার বিরাট) পরিবর্তন কেন হইয়া থাকে? আপনি বলিয়া দিন, এই পরিবর্তনের দ্বারা (মাস সৃষ্টি হইয়া থাকে; মাসের দ্বারাই) বিশ্ববাসী তাহাদের ক্রিয়া কার্য্যসমূহের হিসাব স্থির করিয়া থাকে এবং হজ্জের সময়ও উহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

(২ পারা ৮ রুকু)

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হজ্জের মাস এই—শাওয়াল, জুলকাদাহ এবং জুল-হেজ্জার প্রথম দশ দিন।

● আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছুন্নত তরিকা এই যে, হজ্জের মাসের পূর্বে এহরাম বাঁধিবে না।

● ওসমান (রাঃ) এহরামের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বে অন্য স্থান হইতে এহরাম বাঁধা মকরূহ বলিয়াছেন।

হজ্জের প্রকার

হজ্জ তিন প্রকার—(১) হজ্জে এফ্‌রাদ, (২) হজ্জে কেরাণ, (৩) হজ্জে তামাত্তো'। নিয়্যত করা তথা এহরাম বাঁধার সময় শুধু হজ্জেরই এহরাম বাঁধা এবং শেষ পর্য্যন্ত শুধু হজ্জের কার্য্যাবলী সমাপন করা উহাকে হজ্জে-এফ্‌রাদ বলে।

নিয়্যত করা ও এহরাম বাঁধার সময়েই হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম একত্রে হইলে, কিম্বা প্রথমে হজ্জ বা ওমরা একটির নিয়্যত ও এহরাম বাঁধিয়া উহার কার্য্য আরম্ভের পূর্বে যে কোন সময় এমনকি মক্কায় পৌঁছিয়াও অপরটির নিয়্যত সঙ্গে করিয়া নিলে উহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয়। ইহার জন্য অতিরিক্ত কাজ হইল—হজ্জের ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত তওয়াফ ছাড়া অতিরিক্ত ওমরার নিয়্যতে সাত চক্কর তওয়াফ করা এবং হজ্জের ওয়াজেব ছাফা-মারওয়ার সায়ী ছাড়াও অতিরিক্ত ওমরার নিয়্যতে সায়ী করা, আর ১০ই জিলহজ্জ নিয়মিত কোরবানী ছাড়া হজ্জে-কেরাণের নিয়্যতে কোরবানী করা। আরও প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে কেরাণকারী ওমরা ও হজ্জ উভয়ের এহরাম এক সঙ্গে রাখিয়াছে, তাই হজ্জ সমাপ্তির পূর্বে ওমরার তওয়াফ ও ছায়ী করার পরও এহরাম অবস্থায় থাকিবে।

আর প্রথম হইতে শুধু ওমর'র এহরাম বাঁধিয়া মক্কায় পৌঁছিয়া হজ্জের নির্ধারিত মাস সমূহের মধ্যে ওমরার নিয়্যতে তওয়াফ, ছায়ী করার পরে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের দিন সমূহে হজ্জ সমাপনা করা হইলে উহাকে হজ্জে-তামাত্তো' বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে-তামাত্তো'তে যেহেতু ওমরার এহরামের সঙ্গে হজ্জের এহরাম থাকে না, তাই ওমরার কার্য্যাবলী তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়াই (সাধারণ অবস্থায়) চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া নিবে এবং ৮ই জিলহজ্জ মিনায় যাত্রার পূর্বে হজ্জের এহরাম বাঁধা পর্য্যন্ত এহরাম বিহীনই থাকিবে। হজ্জে-কেরাণের স্থায় এক্ষেত্রেও হজ্জে-তামাত্তো'র নিয়্যতে কোরবানী করিতে হইবে। হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জেতামাত্তোর মধ্যে পার্থক্য দুইটি—(১) হজ্জে-কেরাণ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত প্রথম হইতে বা কার্য্য আরম্ভের পূর্বে একত্রিত হয়, পক্ষান্তরে হজ্জে-তামাত্তো'তে প্রথম হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত করা হয়; ওমরা শেষ করিয়া তারপর হজ্জের এহরাম ও নিয়্যত করা হয়। (২) হজ্জে-কেরাণে এহরাম বাঁধিবার পর মধ্যভাগে এহরাম খোলার কোন ব্যবস্থা নাই, হজ্জ সমাপ্তেই এহরাম খুলিবে, তাই ইহাতে দীর্ঘ দিন এহরাম অবস্থায় থাকিতে হয় যাহা একটি এবাদৎ এবং কষ্টসাধ্য হওয়ায় অধিক ছওয়াবের আমল। পক্ষান্তরে হজ্জে-তামাত্তো'তে মক্কায় পৌঁছিয়া ওমরার তওয়াফ, ছায়ী করতঃ চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া ফেলা হয়, পুনরায় ৮ই জিলহজ্জে দুই দিনের জন্য এহরাম বাঁধিতে হয়—ইহাই সাধারণ তামাত্তো-এর নিয়ম।

অধিক এবং সাব্যস্ত রকমের প্রমাণ অনুসারে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় হজ্জ, হজ্জে-কেরাণ ছিল। হানফী মজহাব মতে হজ্জে-কেরাণই সর্বোত্তম কিন্তু হজ্জের তারিখের অধিক পূর্বে এহরাম বাঁধা হইলে সে ক্ষেত্রে হজ্জে-কেরাণ এবং হজ্জে-এফরাদও সঙ্কটাপূর্ণ ও ভয় সঙ্কুল; এমতাবস্থায় হজ্জে-তামাত্তো' করাই কর্তব্য, ইহা হজ্জে-এফরাদ হইতে উত্তমও বটে।

৮১৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ধকার যুগে আরবের লোকদের আকিদা ও বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, হজ্জের মাস সমূহের× যে কোন দিনে ওমরা

× হজ্জের মাস সমূহ হইল—শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহাজ্জের দশ তারিখ পর্য্যন্ত। হজ্জের মূল কার্য্য—আরাফায় অবস্থান শুধু নয় তারিখেই নির্দ্ধারিত; অপর মূল কার্য্য তথা হজ্জের ফরজ নিয়্যতে তওয়াফ, ইহার জন্য নিয়মিত সময় দশ তারিখ শুধু সহজ করার উদ্দেশ্যে; ইহা পরে করিলেও জায়েয হয়। এতদসত্ত্বেও হজ্জের মাস শাওয়াল হইতে ধরা হইয়াছে, কারণ মানুষ বহু দুর-দুরান্ত হইতে হজ্জ করিতে আসিবে; তাহাদের জন্য মক্কা হইতে বহু দুরে দুরে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন স্থান "মীকাত"রূপে শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত রহিয়াছে; তথা হইতে হজ্জকারীগণকে বাধ্যতামূলক এহরাম বাধিয়া আসিতে হইবে। সেই এহরাম অবশ্যই হজ্জের মূল কার্য্য আদায়ের দিন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

করা প্রত্যেকের জন্যই অতি বড় জঘন্য পাপ। তাহারা বলিত, হজ্জের দীর্ঘ ছফরে সৃষ্ট উটের পৃষ্ঠের ঘা সুস্থ হওয়ার এবং শ্রান্তি দূর হওয়ার পর—জিলহজ্জ মাসের পরে আরও একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওমরাকারীর জন্য ওমরা শুদ্ধ হইবে। উক্ত গর্হিত আকিদা চিরতরে খণ্ডন-উদ্দেশ্যে নবী (দঃ) বিদায় হজ্জ উপলক্ষে জিলহজ্জ মাসের চার তারিখের ভোরে মক্কায় পৌঁছিয়াই সকলকে তাকিদ দিলেন তাহাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় পরিণত করার জন্য।

হজ্জের দিন নিকটবর্তী অবস্থায় হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিতে ছাহাবীদের মনে আতঙ্ক হইল; তাঁহারা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরাম ভঙ্গ কি রকমের হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, পূর্ণরূপে এহরাম ভঙ্গ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ— উল্লিখিত অন্ধকার যুগের আকিদাটি ইসলামী বিধানের পরিপন্থিত ছিলই, অধিকন্তু উত্তম প্রকারের হজ্জ—হজ্জে-ক্বেরাণ ও হজ্জে-তামাত্তো' এরও অন্তরায় ছিল। মোসলমানগণ সঠিক বিধান ও মছআলাহ সাধারণভাবে জ্ঞাত ছিল; বিদায় হজ্জ যাহা হজ্জের মাসেই ছিল—ঐ সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আরও অনেকে হজ্জের সহিত ওমরার নিয়্যত করিয়াছিলেন, অনেকে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত ভ্রান্ত আকিদাটি এত দৃঢ় এবং ব্যাপক ভাবে প্রচারিত ছিল যে, উহা খণ্ডনের জন্য নবী (দঃ) উহার বিপরীত বিরাট আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবী (দঃ) তাঁহার লক্ষাধিক সঙ্গীদের মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল তাঁহারা ছাড়া ব্যাপকভাবে সকলকে নিজ নিজ হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করার আদেশ করিলেন। মক্কা হইতে ৯।১০ মাইল ব্যবধানে "সারেফ" নামক মঞ্জিলে অবতরণ করিয়া নবী (দঃ) এই আদেশ জারী করেন এবং মক্কায় পৌঁছিয়া উহার প্রতি পুনঃ পুনঃ তাকিদ দেন; উহাতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যাহার বিবরণ পরবর্তী হাদীছে আসিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ লোকের হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করিয়া হজ্জের মাসে ওমরা করার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ঐ সব লোকের হজ্জ, হজ্জে-তামাত্তো' রূপে আদায় হয়। হজ্জের এহরাম

হইতে বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে: কারণ এহরামের নির্দ্ধারিত স্থান তথা "মীকাত" সমূহ মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এহরাম হজ্জের সর্বপ্রথম কাজ—এই কাজটি যদি হজ্জের সময়ভুক্ত না হয় তবে তাহা অসুন্দর দেখাইবে, তাই এহরামের সাধারণ সম্ভাব্য সময়কে হজ্জের সময়ের গণ্ডিভুক্ত করার জন্য শাওয়াল মাস হইতে হজ্জের সময় গণ্য করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত ছিল, এমনকি অন্ধকার যুগে কাফেরদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত ছিল। কোরআন শরীফে ২ পাঃ ৯ রুকুতে যে উল্লেখ আছে—'হজ্জের সময় হইল কতিপয় নির্দ্ধারিত মাস' উহার উদ্দেশ্যও এই যে, শরীয়ত কর্তৃক উক্ত মাস সমূহই হজ্জের কার্য্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে ভঙ্গ করিলে সাধারণ বিধান মতে কাফ্ফারা আদায় করিতে হয়, কিন্তু ঐ বৎসর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশে এহ্রাম ভঙ্গকারীরা উক্ত কাফ্ফারা হইতে রেহায়ী পায়।

৮২০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের প্রায় সকলেই হজ্জে-এফরাদের ছিল। আমরা "লাব্বাইকা বিল-হজ্জে" বলিয়া স্পষ্টরূপে হজ্জের উল্লেখ পূর্বক এহ্রাম বাঁধিয়া ছিলাম। আমাদের কাহারও সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না—শুধুমাত্র নবী (দঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) (এবং আর কতিপয় নগণ্য সংখ্যক লোক) ছাড়া। আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও কোরবানীর পশু ছিল। (যাহাদের সঙ্গে পশু ছিল না তাহাদের) সকলকে নবী (দঃ) আদেশ করিলেন, তোমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সায়ী (তথা শুধু ওমরা) আদায় করিয়া চুল কর্তন পূর্বক হজ্জের এহ্রাম ভঙ্গ করিয়া ফেল, ৮ তারিখে পুনঃ হজ্জের এহ্রাম বাঁধিবে। এই ভাবে তোমরা যে, হজ্জের নিয়্যত করিয়া আসিয়াছ উহাকে হজ্জে-তামাত্তো'রূপে রূপান্তরিত কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আমরা বর্তমান এহ্রামকে ভাঙ্গিয়া হজ্জে তামাত্তো'-এর ওমরায় পরিণত করিব কিরূপে, অথচ আমরাত এহ্রাম বাঁধিবার সময় স্পষ্টরূপে হজ্জের এহ্রাম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি যাহা আদেশ করিয়াছি তাহা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে না আনিলে আমিও তোমাদের ন্যায় এহ্রাম ভঙ্গ করিতাম। অনেকের মনে এরূপ সঙ্কোচেরও উদয় হইল যে, হজ্জ আরম্ভের দিন সম্মুখে আগত, আমরা এখন এহ্রাম ভঙ্গ করিয়া সাধারণভাবে স্ত্রীও ব্যবহার করিতে পারি—সেমতে স্ত্রী ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ সমাপনে মিনায় যাত্রা করিব; ইহা কিরূপ হইবে? এই সব ইতঃস্ততার সংবাদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরীভূত হইল। নবী (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি, অনেকে এই, এই কথা বলিতেছে। আল্লার কসম—আমি নেক কাজকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী ভয় করি। (ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনের জন্য এহ্রাম ভঙ্গের) যে প্রয়োজনীয়তা আমি পরে অনুভব করিয়াছি তাহা পূর্বে অনুভব করিলে আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিতাম না এবং আমার সঙ্গে ঐ পশু না থাকিলে অবশ্যই আমিও এহ্রাম ভঙ্গ করিতাম। অতঃপর আমরা সকলে আমাদের হজ্জের এহ্রাম ও নিয়্যতকে ওমরায় রূপান্তরিত করিয়া নিলাম। সোরাকাহ ইবনে মালেক (রাঃ) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইহা (অর্থাৎ হজ্জের মাসে ওমরা করার বৈধতা) শুধু আমাদের উপস্থিতগণের জন্য, না—কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদার জন্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের জন্যই নয় শুধু, বরং সর্বদার জন্য।

৮২১। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোকগণ (আপনার নির্দেশে) তাহাদের হজ্জের এহরাম ভঙ্গ করিয়া ওমরায় রূপান্তরিত করিয়াছে, আপনি কি সেরূপ ওমরা করতঃ এহরাম ভঙ্গ করিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি এহরামকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করিয়া কোরবানীর নিদর্শনযুক্ত পশু সঙ্গে আনিয়াছি। সুতরাং কোরবানী না করা পর্যান্ত আমি এহরাম ছাড়িতে পারি না।

৮২২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, বিদায়-হজ্জ কালে আমরা সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম বাঁধিয়া চলিলাম; মক্কায় পৌঁছিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তাকিদ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় পরিণত করিয়া নেও—তাহারা ছাড়া যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে। সেমতে আমরা তওয়াফ ও সায়ী করিয়া (এহরাম ভঙ্গ করতঃ) স্ত্রী ব্যবহার, জামা-কাপড় ব্যবহার করিলাম। যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তাহারা (১০ তারিখে) কোরবানী না করিয়া এহরাম ছাড়িতে পারিবে না। অতঃপর ৮ই জিলহজ্জ তারিখে দুপুরের পর আমাদিগকে (এহরাম ভঙ্গকারীদিগকে) পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধার আদেশ করিলেন।

অতঃপর আমরা হজ্জের কার্য্যাবলী সমাপ্ত করিলে আমাদের উপর একটি কোরবানী ওয়াজেব হইল যেরূপ কোরআনের আয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। এই সময় সকলে একই বৎসর এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরা উভয়টি আদায় করিল; ইহার বিধান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে নাযেল করিয়াছেন এবং নবী (দঃ) উহার আদর্শ স্থাপন করিয়া লোকদের জন্য উহাকে বৈধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা মক্কাবাসী ভিন্ন অন্য লোকদের জন্যই বৈধ। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—"ইহা (তথা হজ্জ ও ওমরা এক সঙ্গে করা) শুধু মাত্র ঐ লোকদের জন্য যাহাদের পরিবারবর্গ মক্কা নিবাসী না হয়" (২ পাঃ ৮ রুঃ)।

মছআলাহ্ ঃ— যে প্রকার হজ্জের নিয়্যত ও এহরাম বাঁধা হয় এহরাম বাঁধাকালীন "লাব্বাইকা" পড়িতে উহার উল্লেখ করা উত্তম। যথা—হজ্জে এফরাদকারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ...... (১০৩ পৃঃ ৮২০ হাদীছ)

এবং হজ্জে-তামাত্তো'কারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ....

এবং হজ্জে-কেরাণকারী বলিবে—

لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ .... (৯৪ পৃঃ ৮০৯ হাদীছ)

মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোছল করা

৮২৩। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) (হরম শরীফের নিকটবর্তী আসার পূর্ব পর্য্যন্ত শুধু তল্‌বিয়া পড়িতেন, কিন্তু) হরম শরীফের নিকটবর্তী হইলে পর (শুধু) তল্‌বিয়া পড়িতেন না (বরং অন্যান্য দোয়া-দরূদ পড়ায়ও মশগুল হইতেন) এবং "জি-তুয়া" নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন। তথায় ফজরের নামাজ আদায় করিতেন, অতঃপর গোসল করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

কোন্ পথে মক্কায় প্রবেশ করিবে

৮২৪। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা শরীফে ছানিয়াতুল-ও'ল্‌ইয়া—উর্দ্ধ প্রান্তের "কাদা" নামক পথে প্রবেশ করিয়াছিলনে এবং ছানিয়াতুছ-ছোফলা—নিম্ন প্রান্তের পথে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ...... اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

অর্থ—এই বিষয় লক্ষ্য রাখিও যে, আমি বাইতুল্লাহ শরীফকে বিশ্ব-মানবের জন্য এবাদতের স্থান এবং শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এবং এই আদেশ করিয়াছি যে, বিশেষরূপে মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় কর। আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার ঘরকে পাক-পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, তথায় এবাদতরত অবস্থানকারীদের জন্য এবং নামায আদায়কারীদের জন্য। ইহাও স্মরণ রাখিও যে, ইব্রাহীম (আঃ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে পরওয়ারদেগার! এই শহরটিকে শান্তিময় ও নিরাপত্তার স্থান বানাইয়া দাও এবং শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় তাহাদের জন্য ফল-ফলাদি ও খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া দাও। (কারণ, ইহা এরূপ পাথরময় স্থান যে, উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (ইহজগতের জন্য আমার যে নীতি প্রচলিত আছে সেই নীতি অনুসারে) জাগতিক জীবনে কাফেরদের জন্যও আমি খাদ্য জোটাইব, কিন্তু পরকালে তাহাদিগকে অনিবার্য্যতঃ দোযখের আজাবে নিক্ষিপ্ত করিব; উহা অতিশয় কষ্টদায়ক জঘন্য স্থান। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন ও দেয়াল প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন তখন তাঁহারা অতি নম্রতা ও কাকুতি-মিনতির সহিত এই

আরাধনা ও প্রার্থনা করিতেছিলেন—হে আমাদের পালনকর্তা প্রভু! তুমি আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল কর। তুমি আমাদের প্রার্থনা ইত্যাদি সব কিছু শ্রবণ করিয়া থাক এবং আমাদের অন্তরের এখলাছ—নিষ্কাম আগ্রহ-আকাঙ্খা সব কিছু জ্ঞাত আছ। হে প্রভু! আমরা—পিতা-পুত্রদ্বয়কে এবং আমাদের বংশধরকে তোমার দাস, তোমার একান্ত অনুগত আজ্ঞাবহ বানাও এবং তোমার এই ঘরের হজ্জের নিয়মাবলী শিক্ষা দান কর এবং আমাদের সমুদয় গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া আমাদের প্রতি রহম কর; তুমি নিশ্চয় তওবা কবুলকারী দয়ালু। (১ পারা ১৯ রুকু)

৮২৫। **হাদীছ ঃ**—*আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হাতীমের স্থানটুকু× বাইতুল্লাহ শরীফের অংশ কি না? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বাইতুল্লারই অংশ। আমি আরজ করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফ তৈয়ারীর সময় এই অংশকে উহার শামিল করা হয় নাই কেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান না যে, তোমার বংশীয় কোরায়েশরা যখন এই বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করিল, তখন (তাহারা এই পণ করিল যে, হারাম ও জুলুম অত্যাচার এবং জুয়া, লুট ও ডাকাতি ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ এই ঘর নির্মাণের কার্য্যে ব্যয় করিবে না। অথচ সেকালে তাহাদের অধিকাংশ উপার্জন ঐসব উপায়েই ছিল, অতএব) তাহাদের (হালাল) মাল সম্পূর্ণ ঘরের ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ হইতে কম হইয়া গেল। (তাই তাহারা ঘরের প্রকৃত মাপ হইতে উত্তর দিকে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া ঘরটিকে ছোট আকারে নির্মাণ করিল এবং ঐ পরিত্যক্ত অংশটুকুই হইল হাতীম। আয়েশা (রাঃ) বলেন—) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজা এত উপরে স্থাপিত হইয়াছে কেন? (যে, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রায় ৫।৬ হাত সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয়)। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের বংশীয় লোকেরা এই উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিল যেন বাইতুল্লাহ শরীফের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র তাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকে; যাহাকে ইচ্ছা করিবে প্রবেশ করিতে দিবে, আর যাহাকে ইচ্ছা করিবে বঞ্চিত রাখিবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বংশীয় কোরায়েশরা যেহেতু সদ্য ইসলামী দলভুক্ত এবং সবেমাত্র অন্ধকার যুগের শৃঙ্খলমুক্ত নবাগত মোসলমান—তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের পরিবর্তন সাধন করিলে তাহাদের অন্তরে নানাপ্রকার সংশয়ের উদয় হইবে। (হয়ত তাহারা মনে করিবে, আল্লার রসুল হওয়ার দাবী করিয়া এখন আল্লার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল।) নতুবা আমি নিশ্চয়

---

* এখানে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কতিপয় হাদীছ একত্রে অনুবাদ করা হইয়াছে।

× বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ছোট দেয়ালে ঘেরাও করা স্থানকে হাতীম বলে।

বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিতাম এবং ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নির্মিত পরিমাপ অনুযায়ী হাতীমস্থিত অংশও ঘরের মধ্যে শামিল করিয়া দিতাম এবং উহার দরওয়াজা নীচু করিয়া দিতাম (যেন সিঁড়ির সাহায্য ব্যতিরেকেই উহাতে প্রবেশ করা যায়)। এবং (বর্তমান অবস্থার—এক দরওয়াজাবিশিষ্ট না করিয়া) পশ্চিম দিকে অপর একটি দরওয়াজা খুলিয়া কা'বাকে দুই দরওয়াজাবিশিষ্ট নির্মাণ করিতাম। (কারণ প্রবেশ করার ও বাহির হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরওয়াজা হইলে তাহাতে ভীড় এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত না।)

(আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগিনা—) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) খলীফা হইবার দাবী করিয়া মক্কা নগরী এলাকার শাসন ক্ষমতা লাভ করতঃ ৬৪ হিজরী সনে যখন বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের পুনঃ নির্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া উহার পুনঃ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন স্বীয় খালা আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছ অনুসারে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় অনুযায়ী হাতীমের অংশকে ঘরের শামিল করিয়া নীচু আকারের দুই দরওয়াজাবিশিষ্ট রূপে ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এই হাদীছ ও বর্ণনা তাঁহার আপন ভাগিনা ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনাকারী এযীদ ইবনে রুমান বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং এই কার্য্য পরিচালনা করিলেন। তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিমূলের চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করার জন্য খনন কার্য্য চালাইলেন, কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল না, তাই তিনি বিচলিত হইতেছিলেন। অবশেষে মানুষ পরিমাপের দেড়গুণ খনন করার পর বড় বড় পাথরে নির্মিত ভিত্তিমূল দৃষ্টিগোচর হইল। বর্ণনাকারী বলেন—আমি স্বয়ং নিজ চক্ষে ঐ ভিত্তি দেখিয়াছি; উহার পাথরগুলি উটের পিঠের ন্যায় ছিল।

এই প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারীর শাগের্দ জরীর (রঃ) বলেন, আমি স্বীয় ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখনও কি আপনি ঐ ভিত্তিমূলের স্থানটি আমাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারিবেন? তিনি বলিলেন, এখনই চল তোমাকে দেখাইব। তখন আমি তাঁহার সঙ্গে হাতীমের বেষ্টনীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। তিনি একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে সেই ভিত্তি অবস্থিত।

জরীর (রঃ) বলেন—আমি ঐ ভিত্তিস্থান হইতে বর্তমানে নির্মিত বাইতুল্লাহ-ঘরের সীমার মধ্যবর্তী স্থানটুকুর পরিমাপ করিলাম, তাহাতে আমার অনুমান হইল—ঐ স্থানটি (উত্তর দক্ষিণে) ছয় হাত পরিমিত দীর্ঘ হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের যমানায় ক্রোধান্বিত ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিচালিত সর্বগ্রাসী তুফানের ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল্লাহ

শরীকের পূর্ব নির্মিত ঘরেরও বিলুপ্তি সাধন করে। যেরূপ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শন আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাধি, পীর-পয়গাম্বর, নবী-রসুল সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে। আল্লার কুদরত সর্বতোমুখী, তাই বাইতুল্লার ঘর বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু আল্লার কুদরত আবার উহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট দ্রব্যাদিকে হেফাজতও করিয়াছিল। অতঃপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ইব্রাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ঐ ঘরের পুনঃ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কোরায়েশগণ কর্তৃক উহা পুনঃ নির্মিত হয় এবং ছোট আকারে নির্মিত হয়, যাহার ঘটনা উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত আছে। তৎপর আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক সঠিকরূপে স্বর্ণ মাপে পুনঃ নির্মিত হয়। কিন্তু আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের ক্ষমতার পতনের পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবছুল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ভাবিল, বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ চির জাগরুক এই নিদর্শন আমাদের শত্রু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রূপে কায়েম থাকা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে না। এই ভাবিয়া সে স্বীয় আমীরের আদেশ লইয়া ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া পুনরায় কোরায়েশদের নির্মিত আকারে তৈরী করে। যুগের পরিবর্তন সাধনকারী শক্তির ধ্বংসলীলার স্রোত প্রবাহে ঐ সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তিরা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া গেলে অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বাদশাহ হারুনুর-রশীদ বা অন্য কোনও বাদশাহ হাজাজ কর্তৃক কোরায়েশদের নির্মিত আকারে তৈরী ঘরকে পুনরায় ভাঙ্গিয়া আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় অনুসারে নির্মিত ঘরের আকারে তৈরী করার ইচ্ছা করিয়া আলেম সমাজের মতামত প্রার্থী হইলেন। তদানীন্তন মদীনাবাসী খ্যাতনামা ইমাম মালেক (রঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ইহাতে বাধা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ করিতে গেলে বাইতুল্লাহ শরীফ অবশেষে রাজা-বাদশাদের খেল্‌নার বস্তুতে পরিণত হইয়া যাইবে। ইমাম মালেকের এই বিজ্ঞোচিত উক্তি সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব-মোসলেমের নিকট অখণ্ডনীয় বিষয়রূপে গ্রহণীয় হইয়া আসিয়াছে। তদবধি আজ যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের ঘর সেই হাজ্জাজ কর্তৃক কোরায়েশদের নির্মিত ছোট আকারে তৈরী অবস্থায়ই রহিয়াছে। বর্তমানেও উহা এক দরওয়াজাবিশিষ্ট উঁচু দরওয়াজাযুক্ত রহিয়াছে এবং হাতীমও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে যেরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় কোরায়েশদের নির্মিত অবস্থায় ছিল। (ফতহুলবারী)

হরম শরীফের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শিক্ষা দেওয়া উক্তির উদ্ধৃতি দানে বলিয়াছেন—

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ -

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ :—(আপনি ঘোষণা করুন,) বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি যেন ঐ সর্ব-শক্তিমান প্রভুর এবাদৎ—বন্দেগী ও দাসত্ব অবলম্বন করি যিনি এই মহান নগরীর প্রভু, যিনি এই মহান নগরীকে অতি উচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন এবং সমস্ত চীজ-বস্তুর একমাত্র মালিক তিনিই। আমি তাঁহার অনুগত থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি (২০ পাঃ ৩রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন -

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا

مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ :—(আমি মক্কাবাসীদের প্রতি কত কৃপাই না করিয়াছি! দেখ—) আমি কি তাহাদিগকে এমন এক নগরীর অধিকারী করি নাই—যে নগরী অতি মহান মর্য্যাদা সম্পন্ন, শান্তিময়, নিরাপত্তার স্থান—যে নগরে আমার কৃপায় দেশ-বিদেশের সর্বপ্রকার ফল-ফুলাদি আমদানী হইরা থাকে? কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (সত্যিকারের জ্ঞান তাহাদের নাই, নতুবা তাহারা এরূপ কৃপাময় দয়াল মাবুদের বিদ্রোহিতা করিত না)। (২০ পাঃ ৯ রুঃ)

৮২৬। হাদীছঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই মক্কা এলাকাকে পবিত্র হরম শরীফ সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন—সপ্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করার দিন হইতেই। অতএব আল্লাহ তায়ালার সেই সাব্যস্ত অনুসারেই উহা সেইরূপ পবিত্র হরম শরীফ হওয়া অক্ষুন্ন থাকিবে কেয়ামত পর্য্যন্ত। সেমতে ঐ এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার পূর্বেও হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কাহারও জন্য হালাল হইবে না। একমাত্র আমার পক্ষে শুধু এক দিনের অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা হালাল করা হইয়াছিল। (সেই সময়ের পর মুহূর্ত হইতে পূর্বের ন্যায় কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা হরম শরীফ পরিগণিত থাকিবে।) উহার কোন গাছের একটি কাঁটা ভাঙ্গাও নিষিদ্ধ, উহার কোন বন্য জন্তুকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ এবং উহার পথে পাওয়া কোন বস্তু, মালিকের সন্ধান লাভের জন্য বিশেষরূপে ঢোল-শোহরত করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে উঠাইয়া লওয়াও নিষিদ্ধ। উহার কোন ঘাস-পাতা তৃণ-লতা ছিন্ন করাও নিষিদ্ধ। তখন আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! 'এজখের' নামীয় ঘাসকে এই নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত রাখুন; কারণ উহা আমাদের গৃহের জন্য এবং কর্মকারদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। নবী (দঃ) বলিলেন আচ্ছা—এজখের ঘাস এই নিষেধাজ্ঞার বাহিরেই থাকিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বন্য জন্তু তাড়া করার মধ্যে ইহাও শামিল যে, কোন একটি পশু বা পক্ষী কোন ছায়া স্থলে বিশ্রাম নিয়াছে, তুমি তথায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উহাকে তাড়াইয়া দিবা ইহাও নিষিদ্ধ।

হরম শরীফের মসজিদে সকলের সমান অধিকার

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন (১৭ পাঃ ৩রুঃ)—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ. وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থঃ—যাহারা কুফুরী করে এবং আমার (দীনের) রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং মসজিদে-হারামের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে (যেরূপ হোদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কার কাফেররা করিয়াছিল;) যে মসজিদে আমি প্রত্যেকের সমান অধিকার দিয়াছি—নিকটবর্তী বাসিন্দা হউক বা দূরপ্রান্তের আগন্তুক হউক। স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি ঐ মসজিদের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে নিয়ম বিরোধী কার্য্য করিবে তাহাকে কষ্টদায়ক আজাব ভোগে বাধ্য করিব।

মক্কাস্থিত হযরতের বাড়ী

৮২৭। হাদীছ ঃ—উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) (মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বা বিদায় হজ্বের সময় মক্কা নগরীতে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আগামী কল্য মক্কায় প্রবেশ করিয়া কোথায় অবস্থান করিবেন, আপনার (পৈত্রিক) বাড়ীতে অবস্থান করিবেন কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার পৈত্রিক বাড়ী আছে কোথায়? (চাচা আবু তালেবের ছেলে) আকীল বাড়ী-ঘর সব বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লা'মর পিতামহ—আবদুল মোত্তালেব স্বীয় পিতা হেশাম ইবনে আবদে-মনাফ হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে একখানা বাড়ী লাভ করেন। আবদুল মোত্তালেব বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রদ্বয়—আবদুল্লাহ (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পিতা) এবং আবু তালেবের মধ্যে ঐ বাড়ীখানা বণ্টন করিয়া দেন। ঐ বাড়ীতেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পিতার অংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার চাচার ছেলে আকীল সম্পূর্ণ বাড়ীটি দখল করিয়া বিক্রি করিয়া ফেলে।

হযরতের চাচা অবু তালেবের চার পুত্র ছিল। আকীল, তালেব, জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। তন্মধ্যে জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) মোসলমান ছিলেন, আকীল ও তালেব অমোসলেম। অতএব, কেবলমাত্র শেষোক্ত দুইজন আবু তালেবের উত্তরাধিকারী গণ্য হয়, জাফর ও আলী (রাঃ) উত্তরাধিকারী গণ্য হন নাই। (অতঃপর তালেব নিখোঁজ হইয়া গেলে সম্পূর্ণ বাড়ী ঘরের উত্তরাধিকারী একমাত্র আকীল থাকিয়া যায়।)

ওমর (রাঃ) বলিলেন, উক্ত ঘটনার দ্বারাও এই মছআলাহ প্রমাণিত হয় যে, মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বহাল থাকে না।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۔ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۔ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۔ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۔ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۔

অর্থ—স্মরণ রাখিও, ইব্রাহীম (রাঃ) আল্লার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, হে প্রভু! তুমি এই (মক্কা) শহরটিকে শান্তিময় নিরাপত্তার শহর বানাইয়া দাও এবং আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপুজা হইতে বাঁচাইয়া রাখ। হে প্রভু! এসব মূর্তি বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে। (তাই এই প্রার্থনা জানাইলাম; তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে উহা হইতে

বাঁচিতে সক্ষম হইব না। সকল প্রকার মূর্তিপূজা হইতে দূরে থাকার চেষ্টায়) যে আমার অনুসারী হইবে সে আমার দলভুক্ত, আমার দোয়া তাহারই জন্য। পক্ষান্তরে যে আমার বিরোধী হইবে (সে কাফের হইবে, কাফেরের জন্য ক্ষমার দোয়া করা যায় না।) তুমি ক্ষমাকারী দয়ালু। (দয়াবলে তাহাদেরে ক্ষমার যোগ্য করিয়া লইয়া ক্ষমা করিতে পার।)

হে আমাদের প্রভু! আমি আমার স্ত্রী ও কচি শিশু-পুত্রকে তোমার মর্য্যাদাপূর্ণ ঘরের নিকটবর্তী উৎপাদনে অক্ষম প্রস্তরময় এক নির্জন ময়দানে (তোমার আদেশে) রাখিয়া যাইতেছি। হে প্রভু! তাহাদিগকে নামায কায়েম করার তৌফিক দান করিও এবং এই জনশূন্য ময়দানকে তুমি আবাদ করিয়া দিও এবং ফল-ফুলাদি খাদ্য বস্তুর ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিয়া দিও; এই সব নেয়ামতের অছিলায় তাহারা শোকর আদায় করার সুযোগ লাভ করিবে।

হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব অবস্থাই অবগত আছ। আল্লাহ তায়ালার নিকট আসমান-জমিনের কোন বস্তুই লুকায়িত নাই। আল্লাহ তায়ালার জন্য সমুদয় প্রশংসা যে, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইস্‌হাক পুত্রদ্বয় দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু দোয়া কবুল করেন।

হে প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কায়েমকারী হওয়ার তৌফিক দান করিও। হে প্রভু! আমাদের দোয়া কবুল কর।

হে প্রভু! তুমি আমার এবং আমার মাতা-পিতার এবং সমস্ত মোমেনগণের (মধ্য হইতে ক্ষমার যোগ্যদের) প্রতি হিসাবের দিন ক্ষমা প্রদর্শন করিও। (১৩ পাঃ ১৮ রুঃ)

কা'বা শরীফ ইহজগতের স্থিতির ধারক

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ

"সম্মানিত ঘর কা'বা শরীফকে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির স্থিতির ধারক বানাইয়াছেন।" (৭ পারা ৩ রুকু)

অর্থাৎ যত দিন এই সম্মানিত গৃহ ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকিবে ততদিনই মানব জাতি এবং ইহার জন্য সারা বিশ্বজগৎ বিদ্যমান থাকিবে। সম্মানিত কা'বা গৃহের বিলুপ্তির অনতি ব্যবধানেই মহাপ্রলয়ে ইহজগতের অবসান হইবে। এই তথ্যের অধিক বিবরণ "বাইতুল্লাহ শরীফের বিনাশ সাধন" পরিচ্ছেদে দেখুন।

৮২৮। হাদীছ ঃ—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ-মাজুজ দলের আবির্ভাব হওয়ার পরেও বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও ওমরা অনুষ্ঠিত হইবে। বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জব্রত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় আসিবে না।

বাইতুল্লাহ্ শরীফকে গেলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা

৮২৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোরায়েশরাও আশুরার রোযা রাখিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও তখন ঐ রোযা রাখিতেন এবং মদীনায় আসিয়াও রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে এই আশুরার রোযা নিজেও রাখিয়াছেন, সকলকে এই রোযা রাখার আদেশও করিয়াছেন। কারণ, ঐ দিনটি এই হিসাবেও মাহাত্ম্যপূর্ণ ছিল যে, প্রাচীনকাল হইতেই (প্রতি বৎসর) ঐ দিনে বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ প্রদান করা হইত।

রমজানের রোযা ফরজ হইবার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আশুরার রোযা ইচ্ছা হইলে রাখা যাইবে এবং ইচ্ছা হইলে ছাড়াও যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) যিনি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও হাফেজে-হাদীছ তিনি লিখিয়াছেন, আশুরার দিন বাইতুল্লাহ শরীফের উপর নুতন গেলাফ দেওয়ার রীতি পরিবর্তিত হইয়া এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে যে, হজ্বের মৌসুমে কোরবাণীর দিন যখন সমস্ত লোক মিনার ময়দানে হজ্ব উদযাপনে ব্রতী থাকে, সেই দিন বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ দেওয়া হয়। বর্তমানেও এই নিয়মই প্রচলিত।

ফতহুলবারী নামক কিতাবে উল্লিখিত কতিপয় রেওয়ায়েতের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের উপর গেলাফ প্রদান বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এমনকি, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) হইতেই ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। অধিকন্তু ইহারও প্রমাণ আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলেও এই রীতি বিদ্যমান ছিল এবং সর্বদা মোসলমান বাদশাহগণ ইহার প্রচলন অব্যাহত রাখিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গের রেশমী গেলাফ দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয় এবং সর্বশেষ বারে কাল রেশমী গেলাফ প্রদান করা হয়, তদবধি ঐ নিয়মই প্রচলিত থাকে। এমনকি ৭৪৩ হিঃ সনে সুলতান ছালেহ—ইসমাঈল ইবনে নাছের কর্তৃক মিশরের একটি এলাকা উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; মিশর হইতে ঐ গেলাফ তৈরী হইয়া আসিত। এখন সৌদী আরবেই উহা তৈরী হয়; জিদ্দা হইতে মক্কার পথের কিনারায় ঐ গেলাফ তৈরীর বিশেষ কারখানা আছে।

কা'বা শরীফের বিশেষ সম্মানে যেরূপ একমাত্র উহারই বৈশিষ্ট্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে উহাকে মূল্যবান গেলাফে আচ্ছাদিত করা; তদ্রূপ প্রাচীনকালে কা'বা শরীফের নামে স্বর্ণ-চান্দি ইত্যাদি মূল্যবান ধন-রত্ন নজর-নেয়াজরূপেও প্রদত্ত হইত এবং সেই সব ধন-রত্ন রক্ষিত থাকিত। ইসলাম পূর্বকালে কা'বা গৃহের নব নির্মাণের সময় লোকেরা ঐ ধন-রত্ন

কা'বা গৃহের সুউচ্চ পোঁতায় পোঁতিয়া রাখিয়াছে। অদ্যাবধি উহা ঐ অবস্থায়ই আছে; কা'বা গৃহের পোঁতা মানব দৈর্ঘ অপেক্ষাও অধিক উচু। নিম্নের হাদীছে উক্ত তথ্যের বর্ণনা রহিয়াছে—

৮৩০। হাদীছ ঃ—শায়বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয়—কা'বা শরীফের পোঁতার মধ্যে ভুগর্ভে যে সোনা চান্দি পোঁতা রহিয়াছে উহা বাহির করিয়া গরীব মোছলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এরূপ করার অধিকার আপনার নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? আমি বলিলাম, আপনার মুরুব্বিদ্বয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ইহা করেন নাই। (অথচ তাঁহারাও ইহার খোজ রাখিতেন এবং আপনার অপেক্ষা তাঁহাদের সময়ে মোসলমানদের ধনের প্রয়োজন অধিক ছিল।) ওমর (রাঃ) নতশিরে বলিলেন, সত্যই—তাঁহারা দুইজন অবশ্যই অনুসরণীয়; আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্কে চলিব।

ব্যাখ্যা ঃ—কা'বা শরীফে প্রোথিত ধন-রত্ন স্থানান্তর না করা যুক্তিযুক্ত এবং কল্যাণকরই হইয়াছে। যদিও প্রয়োজনে কা'বা শরীফের সংস্কার ইত্যাদির ব্যয়ভার বহনের জন্য মোসলমানদের মধ্যে সর্বদাই লোক পাওয়া যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, যেরূপ অদ্যাবধি হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কা'বা শরীফকে প্রত্যাশী না রাখিয়া স্বাবলম্বী রাখাই উহার সম্মানের পক্ষে শ্রেয়। এতদ্ভিন্ন কা'বার নামে পূর্ব রক্ষিত নজর-নেয়াজ মোসলমানগণ নিজেদের জন্য ব্যয় করিলে তাহা বিধর্মীদের চোখে মোসলেম সমাজের উপর নিন্দার কারণ হইত। তাই পূর্ব হইতে যাহা জমা ছিল উহাকে রক্ষিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু সর্বদার জন্য ঐ প্রথা চালু রাখার প্রয়োজন মোটেই নাই; অতএব ছাহাবীদের যুগ হইতেই কা'বা শরীফের নামে নজর-নেয়াজ গ্রহণের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। কা'বা শরীফের জন্য নির্দিষ্ট যুগ-যুগান্তের খাদেম-বংশধর ওসমান ইবনে তালহা হাজাবী (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র—আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট তাবেয়ী শায়বা (রঃ) জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত ঐরূপ নজর-নেয়াজ গ্রহণ না করিয়া তাহাকে আলোচ্য হাদীছ শুনাইয়াছেন (ফতহুলবারী ৩—৩৫৭)। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কা'বা শরীফে যে ধন রক্ষিত আছে উহাই যথেষ্ট; আরও অধিক ধন সংরক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। কা'বা শরীফের জন্য দেওয়া নজর-নেয়াজের ধন গরীবদের মধ্যে বিতরণই শ্রেয়ঃ। ফেকার কিতাবেও মছআলাহ রহিয়াছে—দান-খয়রাতের নজর-মান্নত কা'বা শরীফ ইত্যাদি যে কোন বিশেষ স্থান বা পাত্রের জন্য নির্ধারিত করা হইলেও উহা অন্যত্র যোগ্য পাত্রে ব্যয় করা হইলে সেই নজর-মান্নত আদায় হইয়া যায়।

কা'বা শরীফের বিনাশ সাধন

৮৩১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন (কেয়ামত বনাইরা আসিলে এবং পৃথিবীর ধ্বংস ও বিলুপ্তি নিকটবর্তী

হইলে দস্যু প্রকৃতির) এক হাবশী—নিগ্রো লোক যাহার পায়ের গোছা অপেক্ষাকৃত সরু হইবে, সে বাইতুল্লাহ শরীফকে বিধ্বস্ত করিবে।

৮৩২। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাইতুল্লাহ বিধ্বস্তকারী ব্যক্তির আকৃতি-প্রকৃতি ও তাহার হুলিয়া এত স্পষ্টরূপে আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যকলাপ যেন আমার চোখে ভাসিতেছে—) আমি যেন দেখিতেছি, কৃষ্ণবর্ণ বাঁকা গোছাযুক্ত ব্যক্তিটি বাইতুল্লাহ শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

ব্যাখ্যাঃ—জাগতিক নিয়মাধীনেও সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, কোনও রাজা-বাদশাহ যখন কোন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং ঐ আয়োজন অনুষ্ঠানের পরিবেশে কোন মঞ্চ ইত্যাদি বিশিষ্ঠ স্থান নির্মাণ করেন; সে অবস্থায় যাবৎ বাদশাহ ঐ অনুষ্ঠানকে অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়ার এবং অক্ষুন্ন রাখার ইচ্ছা করেন তাবৎ কোন ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপে নির্মিত ঐ স্থান বা মঞ্চটির কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে অগ্রসর হওয়াত দূরের কথা উহাকে কেহ স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় না। কোন অশুভ শক্তি উহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে বাদশাহ তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতাবলে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া সমুচিত শিক্ষা ও শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ঐ শাহী মর্য্যাদাপূর্ণ মঞ্চটিকে অহরহ সযত্নে রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ উহার মান-মর্য্যাদাহানিকর কোন কার্য্য বা সামান্যতম প্রচেষ্টাকেও তিনি বরদাশত করেন না।

কিন্তু অবলীলাক্রমে যখন ঐ অনুষ্ঠানের অবসান করতঃ উহার সমাপ্তির সময় আসে, তখন বাদশার জ্ঞাতসারেই ঐ আয়োজিত অনুষ্ঠানের অন্যান্য আনুসঙ্গিক পরিবেশ বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে ঐ সুরক্ষিত মঞ্চটিকেই সর্ব প্রথমে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করতঃ অনুষ্ঠান সমাপ্তির সুচনা করা হয় এবং অতি সাধারণ লোক কামলা-মজুরের হস্তেই উহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করা হইয়া থাকে।

অনুরূপভাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটিও সর্বশক্তির আধার—সমগ্র বাদশাহগণের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার অনুষ্ঠানবিশেষ। এবং বাইতুল্লাহ শরীফ হইতেছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বরূপ মহান মর্য্যাদপুর্ণ মঞ্চ সদৃশ। তাই যাবৎ এই সুবিশাল অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীকে অক্ষুন্ন ও বিদ্যমান রাখার ইচ্ছা আছে, তাবৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আজ অবধি যে কোনও অশুভ শক্তি ঐ মহান মঞ্চের মর্য্যাদা হানিকর কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, উহাকেই আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আবরাহার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং অপরাজেয় শক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার ঘটনা কোরআন শরীফের মধ্যেই বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছও উহার আর একটি দৃষ্টান্ত বহন করে।

পক্ষান্তরে যখন এই সমগ্র অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে, তখন ঐ সুরক্ষিত মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফকেই সর্বপ্রথমে বিধ্বস্ত করা হইবে এবং অতি সাধারণ লোকের হস্তেই উহার বিলুপ্তি ও ধ্বংস-কার্য্য সাধিত হইবে।

৮৩৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট একদল লোক বাইতুল্লাহ শরীফের উপর আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোন একটি ময়দানে ময়দানস্থিত তাহাদের সকলকে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সকলকেই কেন ধ্বসানো হইবে? অথচ সেখানে এমন এমন লোকও ত থাকিতে পারে যাহারা সেস্থানে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসিয়াছে বা জবরদস্তিরূপে তাহাদিগকে উক্ত দলে শামিল করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঐ সময় সকলকেই ধ্বসানো হইবে। পরে কেয়ামতে হিসাব-নিকাশের দিন নিয়্যতের তারতম্য রক্ষা করা হইবে। (২৮৪ পৃঃ)

হজরে-অস্ওয়াদ চুম্বন করা

৮৩৪। **হাদীছ ঃ**—আবেছ ইবনে রবীয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) একবার হজর-আসওয়াদের প্রতি অগ্রসর হইয়া উহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, (তোমরা ভালরূপে শুনিয়া ও উপলব্ধি করিয়া রাখিও, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—হে হজরে-আসওয়াদ!) আমি জানি ও দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র; কাহারও কোন ভাল বা মন্দ করিবার কোনরূপের ক্ষমতা তোমার আদৌ নাই। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করিয়াছেন। (সে সূত্রে তোমাকে চুম্বন করা শরীয়তের একটি নিয়ম; তাই আমি তোমাকে চুম্বন করিলাম;) নতুবা আমি তোমাকে কখনই চুম্বন করিতাম না। (অর্থাৎ তোমাকে খোদার অংশীদার বা আমার ভাল মন্দের মালিক-মোখতাররূপে চুম্বন করি না, শুধু আল্লার রসুলের অনুসরণে চুম্বন করি।)

সুধী পাঠক! ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তিটি অতিশয় সারগর্ভ এবং অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। ঈমান ও কুফর, তৌহীদ ও শেরক, একত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধানের রহস্য ও তত্ব উদ্ঘাটন কল্পেই তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

ইসলাম অনুমোদিত ও শরীয়ত নির্দ্ধারিত কোন কোন এবাদতের রীতি নীতির বিশেষতঃ হজ্জের অধিকাংশ কার্য্যাবলী ও আমলের বাহিক ধারা ও গতি-প্রকৃতি দৃষ্টে শয়তান অতি সহজে ধোকা দেওয়ার বা মানুষের অন্তরে নানারূপে কু-প্ররোচনামূলক

অছওয়াছা উদিত করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। যেহেতু অন্যান্য বিধর্মী কাফের মোশরেকরা যেরূপ নানাপ্রকার জড় বস্তুকে ভজনা উপাসনা করিয়া থাকে মোসলমানদের হজ্জব্রতের রীতি এবং ধারাসমূহও আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রায় অনেকটা ঐরূপ দেখায়। যথা—বাইতুল্লাহ শরীফের চতুঃসীমা ঘুরিয়া তওয়াফ করা। হজ্‌রে-আসওয়াদ তথা বিশেষ পাথর খণ্ডকে ভক্তিভরে চুম্বন করা। বিভিন্ন ময়দানে অবস্থান করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐরূপ কু-অছওয়াছার মুলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তি। কিন্তু উহার বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটি যুক্তিগত বিষয় উপলব্ধি করা আবশ্যক। বিষয়টি এই—

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বস্তুর মধ্যে রাত্র-দিন অপেক্ষাও অধিক পার্থক্য এবং ব্যবধান থাকে; হয়ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বস্তুদ্বয়ের মৌলিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করিয়া কিম্বা উহাকে নগণ্য মনে করিয়া সেই বস্তুদ্বয়কে সমপর্য্যায়ের গণ্য করা নিতান্তই বোকামী। যেমন—একটি ঘুমন্ত মানব-দেহ এবং আর একটি মৃত মানব-দেহ পাশাপাশি পতিত আছে। বাহ্যিক সাদৃশ্য দৃষ্টে উভয়কে সম-পর্য্যায়ের গণ্য করা কিম্বা সামান্য একটু বায়ু তথা শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হওয়া না হওয়ার পার্থক্যকে নগণ্য ভাবিয়া উভয়ের ব্যবধানকে উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামী। এস্থলে সামান্য বায়ুটুকুর পার্থক্য এতই ক্রিয়াশীল যে, উহার দরুন উক্ত দেহ দুইটির মধ্যে আইন, বিধান এবং বাস্তবেও রাত্র-দিন অপেক্ষা অধিক ব্যবধান সর্বজনীন স্বীকৃত। তদ্রূপ বিবাহিতা নারী ও পর-নারী উভয়ের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ রহিয়াছে; সেই প্রভেদকে নগণ্য মনে করিয়া উহাকে উপেক্ষা করা কতই না বোকামী! উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্যের পরিবর্তন না আসিলেও নীতিগত প্রভেদ ও পার্থক্যের দরুণ উভয়ের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতালের ব্যবধানই না রহিয়াছে! এই দৃষ্টিতেই মূল আলোচ্য বিষয়টা লক্ষ্য করা আবশ্যক—

কাফের-মোশরেকরা যে, দেব-দেবী বা বিভিন্ন বস্তুর পূজা করিয়া থাকে; আর মোমেন-মোসলমানগণ কোন বস্তুকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত-বন্দেগী করিয়া থাকে—এই সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যক্রমের মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্যটা বস্তুতঃ রাত্র-দিন আলো-অন্ধকার এবং মৃত-ঘুমন্তের ব্যবধান অপেক্ষাও অধিক। কারণ, উভয় কার্য্যক্রমের মধ্যে নীতিগত, উদ্দেশ্যগত ও গভীর ক্রিয়াশীল নিগুঢ় তত্বজনক পার্থক্য এবং সুপ্রশস্ত ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে; যদ্দরুণ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত, একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্য প্রকাশার্থেই ওমর (রাঃ) উল্লিখিত উক্তি করিয়াছিলেন। সেই ব্যবধান ও পার্থক্যের বিবরণ হইল এই যে, কোনও জড় বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এবাদত বা উপাসনা করার তিনটি পর্য্যায় আছে। যথা—

প্রথম—আল্লাহ তায়ালাকে যেরূপ ভাবে সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার এবাদৎ ও উপাসনা করা হয় ঐ বস্তুটিকে তদ্রূপ সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া এবাদৎ ও উপাসনা করা।

দ্বিতীয়—আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর এবাদত উপাসনা এই ভাবিয়া করা যে, আল্লাহ তায়ালা অতি মহান। তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য ঐ বস্তু-বিশেষকে আল্লাহ তায়ালা হইতে নিম্ন শ্রেণীর মাবুদরূপে কল্পনা করিয়া উহার এবাদত ও উপাসনা করা। অর্থাৎ—এবাদৎ ও উপাসনা করা হইবে আল্লাহ ভিন্ন ঐ নিম্ন শ্রেণীর মাবুদেরই জন্য, অবশ্য সেই বস্তুবিশেষ—নিম্ন শ্রেণীর মাবুদের পূজা ও উপাসনার উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা।

এই উভয় পর্য্যায়ের উপাসনাই কুফরী ও শেরক। কাফের ও মোশরেকরা যে নানা প্রকার ব্যক্তি, বস্তু বা মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে তাহা এই দুই পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়—কোনও জড় বস্তুকে কেন্দ্র করা হইয়া থাকিলেও মূল এবাদৎ ও বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়া থাকে। বন্দেগীর মধ্যে কোন পর্য্যায়েই ঐ বস্তুর প্রতি এবাদতের সামান্যতম উদ্দেশ্যও নিহিত রাখা হয় না, বরং সামগ্রিক বন্দেগী ও এবাদৎ খাঁটীরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য করা হয়। আর এবাদতের আনুষঙ্গিকরূপে যে বস্তুকে কেন্দ্র করা হয় তাহাও একমাত্র আল্লাহ বা আল্লার প্রতিনিধি রসুলের আদেশক্রমেই করা হয়। এমনকি, ঐ বস্তুকে কেন্দ্র করার যুক্তি এবং সুফল বুঝে আসিলে বা না আসিলে—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ অনুসারেই উক্ত বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া আল্লার এবাদৎ ও বন্দেগী করা হয়। তাই এই বস্তু-বিশেষকে কেন্দ্র করার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালারই বন্দেগী ও দাসত্ব পরিস্ফুটিত হয়। এই তথ্যটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিম্নে বর্ণিত আয়াতে বলিয়াছেন—

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ـ

অর্থ—কেবলাকে নির্দ্ধারিত করার উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমি দেখিতে চাই—কোন ব্যক্তি আমার প্রতিনিধি রসুলের (আদেশ তথা আমার) আদেশের অনুসারী হয় আর কোন্ ব্যক্তি উহার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করে। (২ পাঃ ১ রুঃ)

এই তৃতীয় পর্য্যায়টিই হইল মোমেন ও মোসলমানগণের কার্য্যধারা এবং ইহারই প্রতি ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

অবশ্য হজরে-আছওয়াদ, বাতুল্লাহ শরীফ, ইত্যাদি বস্তু ও স্থান সমূহকে তাজীম করা তথা উহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেও মোসলমানগণ অত্যাবশ্যক মনে করেন। কারণ, আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত কেন্দ্রসমূহ সম্মানের উপযুক্ত হওয়া অতি স্পষ্ট বিষয়, ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, মুসলমানগণ ভ্রম ক্রমেও ইহাদিগকে উপাস্য সাব্যস্ত করতঃ উহাদের প্রতি তাজীম-প্রদর্শন করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য, তাজীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা ভিন্ন জিনিষ এবং এবাদৎ তথা উপাসনা ভিন্ন জিনিষ।

মোমেন-মোসলমান এবং কাফের-মোশরেক সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যধারার বিরাট ব্যবধানকে পবিত্র কোরআন আরও কত বিরাট আকারে প্রকাশ করিয়াছে যে—

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَالْاَمْوَاتُ ـ

"অন্ধ এবং দর্শক সমান নহে, অন্ধকার এবং আলো সমান নহে, ঠাণ্ডা এবং গরম সমান নহে। আর জীবন্ত এবং মৃতও সমান নহে।" বিভিন্ন শ্রেণীর বিপরিতমুখী দুই দুইটি বস্তুর দৃষ্টান্ত দানে মোমেন ও মোশরেক সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্য্যধারার ব্যবধান এবং পার্থক্য ও প্রভেদকে বুঝান হইয়াছে।

সুধী সমাজ! স্মরণ রাখিবেন—সামগ্রিক ভাবে এবাদৎ ও উপাসনার পাত্র একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সাব্যস্ত করা—ইহাই সমস্ত আমল এবং আমলকারীর আত্মা স্বরূপ। কারণ, মানবের সৃষ্টি ইহারই জন্য; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

"জিন এবং মানবকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই জন্য যে, তাহারা আমার এবাদত করিবে; অর্থাৎ অন্য কাহারও নহে।" সুতরাং যে সব কার্য্যধারায় এবং কার্য্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা নাই উহারা মৃত; আর যে কার্য্যাধারায় এবং কার্য্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা বিদ্যমান আছে উহারা জীবন্ত ও শ্বাসত। অতএব, মোমেন-মোসলমান এবং তাহাদের কার্য্যধারা আর কাফের-মোশরেক এবং তাহাদের কার্য্যধারার মধ্যে ততটুকুই পার্থক্য ও ব্যবধান রহিয়াছে, যতটুকু পার্থক্য ও ব্যবধান মৃত ও জীবন্তের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

অতঃপর কোন কাফের-মোশরেক যদি উল্লিখিত বক্তব্য শুনিয়া এই দাবী করিয়া বসে যে, আমরা যে সমস্ত বট-বৃক্ষ, গঙ্গা-যমুনা, পাথর-নুড়ি, কীট-পতঙ্গ, গরু-মহিষ, মুণী-ঋষী দেব-দেবী বা মূর্তি ইত্যাদিকে পূজা করিয়া থাকি তাহাও তৃতীয় পর্য্যায়রূপেই করিয়া থাকি অন্য পর্য্যায়ে নহে।

এরূপ দাবীর অসারতা ধর্মীয় বিধানাবলীর বিবরণ বিচার করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং কোন ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দানের পর ঐ ধর্মের অনুশাসন ব্যতীত অন্য কাহারও কোন নিজস্ব নীতি ও ধারার প্রতি কর্ণপাত করা যাইতে পারে না, বরং ঐ ধর্মের অনুশীলন-বিধি অনুসারেই সব কিছু স্থির করা হইবে, নতুবা তাহাকে ঐ ধর্ম পরিত্যাগের ঘোষণা দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন ঐরূপ দাবীর অসারতা প্রমাণের প্রধান সূত্র এই যে—যদি উপাসনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হন, তবে কোন বস্তুকে আনুসঙ্গিকরূপে

সেই উপাসনার কেন্দ্র করা একমাত্র তাঁহার আদেশানুক্রমেই হইতে হইবে; যাহা একমাত্র তাঁহারই প্রেরিত সত্য বাণী বা খাঁটী প্রতিনিধির মারফতেই বান্দাদের নিকট পৌঁছিতে পারে। তৃতীয় পর্য্যায়ের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঠিক পরিচয় ও নিদর্শন ইহাই। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র মৌখিক দাবী করিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ, উহা একটি নিয়মতান্ত্রিক বাস্তব কর্মপন্থা ও কার্য্যধারা। যেরূপ ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে চিঠীপত্র বাক্সে ফেলিবার একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থা এই যে, উহা ডাক বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট বাক্স সমূহেই ফেলিতে হইবে, তবেই উহা ডাক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইবে। অন্যথায় নিজস্ব বা সমাজগত মনগড়া বাক্সে পত্র ফেলিয়া যদি কেহ দাবী করে যে, ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে ফেলিয়াছি তবে উহা পাগলামীই গণ্য হইবে।

অতঃপর ঐ পরিচয় ও নিদর্শন তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্টকৃত হওয়া প্রমাণ করার জন্য যে প্রামাণ্য বস্তুর আশ্রয় লইয়া যাইতে পারে উহা হইল একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু ধর্ম বা ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইবার পূর্বে উহার সত্যতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করিতে হইবে। এই ময়দানের একমাত্র বিজয়ী হইল ইসলাম। ইসলাম উহার প্রথম দিন হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়ের জন্য ঐরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। যাহার উল্লেখ কোরআন মজীদের কতিপয় স্থানে স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়া

৮৩৫। হাদীছ ঃ— নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া সোজা সম্মুখের দিকে এতদূর অগ্রসর হইতেন যে, সম্মুখস্থ দেয়াল প্রায় তিন হাত ব্যবধানে থাকিত এবং তথায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এইরূপে কাজ করিয়া বস্তুতঃ সেই স্থানকে অবলম্বনের চেষ্টা করিতেন যে স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে খোঁজ দিয়াছিলেন। অবশ্য কা'বা শরীফের ভিতরে যে কোন স্থানে নামায পড়া কাহারও জন্য দুষণীয় নহে।

বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ না করা

● ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক হজ্জ করিয়াছেন, বহুবার তিনি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন নাই।

৮৩৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরার নিয়্যত করিয়া মক্কায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর প্রথমে তওয়াফ করিলেন এবং পরে মকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। (সেই সময় তথায় শত্রুদের আশংকা বিদ্যমান থাকায়) সতর্কতামূলক

ভাবে তাঁহার সঙ্গে কিছু লোক নিয়োজিত ছিল। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, ঐ সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি? তিনি বলিলেন ঐ ওমরাকালীন তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন নাই।

মছআলাহ ঃ—বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা জায়েয বটে, উহার প্রমাণ উপরোক্ত ৮৩৫নং হাদীছে স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহা কোন স্তরেই অত্যাবশ্যক আমল নহে। তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব, বে-আদবীসূচক হুড়াহুড়ি, দস্তাদস্তি করিয়া কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে উহার কোণ-সমুহে তকবীর উচ্চারণ করা

৮৩৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা বিজয়কালীন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কা'বা গৃহের ভিতরে কাফের-দের উপাস্য মূর্তিসমুহ বিদ্যমান থাকাবস্থায় উহাতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ঐ সকল মূর্তিসমুহ বাহির করিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। তন্মধ্যে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দুইটি মূর্তিও বাহির করা হইল। উহাদের হাতে (জুয়া জাতীয় ভাগ বন্টনের এবং যাত্রার শুভাশুভ নির্ধারণ বা ভাগ্য পরীক্ষা করার প্রতীক স্বরূপ) কতকগুলি তীর ছিল।* রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের কুকাণ্ডের এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহারা ভালরূপেই জানে যে, ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) (এই মক্কাবাসী কাফেরদের ন্যায়) কখনও জুয়া জাতীয় কোন প্রকার ভাগ-বন্টন করিতেন না। (তাহারা মিথ্যা এই দৃশ্য দেখাইয়াছে।) অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং উহার প্রত্যেক কোণে তকবীর উচ্চারণ করিলেন।

তওয়াফের মধ্যে রমল করা

৮৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে সপ্তম হিজরী সনে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরাতুল-কাজা

---

* কাফেরদের মধ্যে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল, যেমন—দশজন লোকে একত্রে সমান সমান বিশ টাকা হারে জমা করিয়া দুই শত টাকা দ্বারা একটি উট ক্রয় করিল। কিন্তু উহার গোশত বন্টনের বেলায় সমভাবে বন্টন করার পরিবর্তে ঐ মূর্তির হাতের তীর সমুহের নির্দেশ অনুসারে বন্টন করা হইত। ঐ তীরগুলির মধ্যে বিভিন্ন নিদর্শন থাকিত এবং সেই নিদর্শন অনুযায়ী কেহ বেশী পাইত, কেহ কম পাইত, কেহ ফাকা ও শূন্য হস্তে যাইত।

করিতে আসিলেন। পূর্বাহ্নে মক্কাবাসী মোশরেকেরা অপবাদ রটাইল যে, (আমাদের দেশত্যাগী) একদল লোক আসিতেছে যাহারা মদীনায় থাকিয়া তথাকার জ্বরে-তাপে দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। (শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে দুর্বল পরিগণিত হওয়া বিপদের কারণ,) তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করিবে অর্থাৎ বীরদর্পে বাহাদুরীপূর্ণ গতি (Motion) প্রদর্শন করিয়া চলিবে এবং পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকরূপে চলিবে। * ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পূর্ণ সাত চক্করেই ঐরূপে চলা কঠিন হইবে; তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দয়া পরবশে শুধু তিন চক্করের মধ্যে ঐরূপে চলিবার আদেশ করিয়াছেন।

৮৩৯। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরা উভয়ের জন্যই মক্কা শরীফে আসিয়া প্রথমে তওয়াফের মধ্যে হজরে-আছওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন এবং তিন চক্করে সজোরে বীরের ন্যায় চলিয়াছেন।

৮৪০। **হাদীছঃ**—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (৮৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত উক্তির পর প্রথমে) বলিয়াছেন যে, বর্তমানে আমাদের জন্য রমল করার আবশ্যকতা কি? আমরা কেবলমাত্র মক্কার কোরায়েশদিগকে স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করিয়া থাকিতাম, এখন তাহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) নিজেই পুনরায় বলিলেন, (হাঁ, প্রয়োজন আছে বৈ কি! কারণ ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্য একটি বিশেষ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা এই যে, বিদায়-হজ্জকালীন ঠিক এইরূপ অবস্থায়—যখন মক্কা নগরীতে মোশরেকদের অস্তিত্ব ছিল না তখনও) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমল করিয়াছিলেন। এই কারণেই উহা পরিত্যাগ করাকে আমরা পছন্দ করিতে পারি না।

ব্যাখ্যাঃ—তওয়াফের মধ্যে রমল তথা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া চলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য মোশরেকদের সম্মুখে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করা ছিল বটে, কিন্তু একটি কর্মের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারণের সমন্বয় থাকা বিচিত্র নহে। কাজেই যদিও তখন রমল করার উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও কারণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবুও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেহেতু পূর্বাপর এমনকি, ইসলাম ও মুসলমানদের শৌর্য্য-বীর্য ও শান-শওকতপূর্ণ অবস্থায়—বিদায় হজ্জকালীন অন্য যে কোনও কারণ বশতঃ রমল

---

* পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয় সম্পর্কে এই স্থানে যাহা বলা হইল তাহা একমাত্র ঐ ওমরাতুল-কাজার ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদায়-হজ্জকালীন স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন চক্করের পূর্ণ চক্করেই রমল করিয়াছেন এবং পূর্বাপর ইহাই সুন্নতরূপে প্রচলিত।

করিয়াছিলেন; তাই উহা শরীয়তের একটি বিশেষ বিধানরূপে নির্ধারিত হয়। উহার প্রতিই ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং রমল করাকে ছুন্নতরূপে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৮৪১। **হাদীছ ঃ—** নাফে (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কা'বা শরীফের এই (তথা দক্ষিণ দিকের) কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিবই; (ভিড়ের কারণে) কঠিন হউক বা সহজ হউক—যখন হইতে দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিয়াছেন।

নাফে (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, (তওয়াফের মধ্যে রমল করা তথা সজোরে চলা কালে) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক রকমে চলিতেন কি? নাফে (রঃ) উত্তরে বলিলেন, (ভিরের সময়) স্বাভাবিক রকমে চলিতে বাধ্য হইতেন সহজে এসতিলাম করার জন্য।

মছআলাহ ঃ—সমস্ত তওয়াফের প্রতি চক্করে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়কে এসতিলাম করা সুন্নত। অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ এসতিলাম করার আকার হইল—উক্ত কোণকে ভক্তিভরে উভয় হাতে স্পর্শ করা। ভক্তিভরে হাত স্পর্শ করাও শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি সাধারণ প্রথা; যেরূপ কদমবুসী তথা মুরব্বির পদদ্বয় ভক্তিভরে হাতে স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে "হজরে-আসওয়াদ" স্থাপিত রহিয়াছে; উহাকে এসতিলাম করার আকার হইল—ভক্তিভরে উহাকে চুম্বন করা। অবশ্য ভিড়ের দরুণ চুম্বন করা সম্ভব না হইলে অন্য ব্যবস্থার বয়ান পরে আসিতেছে।

মছআলাহ ঃ—রমল করা বস্তুতঃ পূর্ণ চক্করেই করিতে হয়। অবশ্য দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বভাবতঃই ভিড় থাকে, তাই সেস্থানে রমলের মধ্যে শিথিলতা আসিতে পারে।

ছড়ির সাহায্যে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

৮৪২। **হাদীছ ঃ—**ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জকালে একদা উষ্ট্রের উপর আরোহিত অবস্থায় তওয়াফ করিলেন। হজরে-আসওয়াদের কোণ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক বারেই হযরত (দঃ) তকবীর বলিতেন এবং ছড়ির সাহায্যে ইশারা করতঃ হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিতেছিলেন।

মছআলাহ ঃ—বিশেষ ওজর বশতঃ যানবাহনের উপর ছওয়ার হইয়া তওয়াফ করা জায়েয বটে; কিন্তু বাইতুল্লাহ শরীফ যেহেতু মসজিদে-হারামের মধ্যে অবস্থিত, তাই তওয়াফ কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে মসজিদের ভিতরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অথচ মসজিদের মধ্যে কোন পশুকে লইয়া যাওয়া জায়েয নহে; কেননা, উহাদের মলমূত্র ত্যাগের সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযা স্বরূপ তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া থাকিত। তদনুযায়ী

তাঁহার স্বীয় যানবাহন উটের প্রতি ঐ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তাই তিনি উহাকে মসজিদের ভিতরে লইয়া গিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ— বেয়াদবী হয় বা অন্যকে কষ্ট দিতে হয় এরূপ হুড়াহুড়ি না করিয়া হজরে-আস্ওয়াদকে সরাসরি চুম্বন করা সহজসাধ্য হইলে তাহাই করিবে। যেমন ৮৪৬নং হাদীছে বর্ণিত হইবে।

চুম্বন করার নিয়ম—"হজরে-আস্ওয়াদ" অর্থ কৃষ্ণবর্ণের পাথর। আদি আমলে উহা একটি আস্ত পাথরখণ্ড ছিল, কিন্তু পূর্বকাল হইতেই উহা আর আস্ত পাথরখণ্ড থাকে নাই; ছোট ছোট টুকরায় বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কা'বা শরীফের গায়ে—উহার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে, মানুষের বুক সমান উপরে, মাথা প্রবেশ করা যায় এই পরিমাণ খোড়ল আছে যাহার ভিতরে হজরে-আস্ওয়াদ বর্ণেরই বিশেষ মসলার মধ্যে হজরে-আস্ওয়াদের টুকরা সমূহ বিদ্ধ রহিয়াছে। টুকরাগুলি অধিকাংশই ছোট ছোট—আঙ্গুলের মাথা পরিমাণের; এক-দুইটা টুকরা বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় আছে।

নামাযে সেজদা কালে যে ভাবে উভয় হাত জমিনের উপর রাখা হয় ঐ ভাবে উভয় হস্ত উক্ত খোড়লের ভিতর এমনভাবে রাখিবে যেন হস্তদ্বয়ের মধ্য ফাঁকে হজরে-আস্ওয়াদের কোন টুকরা ভাসমান থাকে। খোড়লের ভিতরে হস্তদ্বয়ের উপর মুখমণ্ডল ঠেকাইয়া হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থ হজরে-আসওয়াদ টুকরাকে এমন সতর্কতার সহিত চুম্বন করিবে, যেন উহাতে মুখের লালার কোন আদ্রতা না লাগে, হজরে-আসওয়াদ টুকরার উপর কপালও স্পর্শ করিবে। এইরূপে সরাসরি চুম্বনের সুযোগ না পাইলে উভয় হাত বা ডান হাত দ্বারা হজরে-আসওয়াদ খণ্ডকে শুধু স্পর্শ করিবে এবং হাতকে চুম্বন করিবে। ইহারও সুযোগ না হইলে ছড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন বস্তু হজরে-আসওয়াদ খণ্ডে স্পর্শ করিয়া ঐ বস্তুকে চুম্বন করিবে। ঐরূপ করারও সুযোগ না হইলে দূর হইতেই হজরে-আসওয়াদের প্রতি মুখ করতঃ তকবীর, কলেমা-তৈয়্যেব ও দরূদ পড়িবে এবং হস্তদ্বয়ের তালু উহার মুখী করিয়া হস্তদ্বয় উহার উপর রাখার ন্যায় ইশারা করিবে, অতঃপর হস্তদ্বয়কে চুম্বন করিবে। (শামী)

বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ ভক্তিভরে স্পর্শ করা

৮৪৩। হাদীছ ঃ—আবুশ-শা'ছা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের প্রত্যেক কোণকেই স্পর্শ করিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, (উত্তর দিকের) কোন দুইটি স্পর্শ করার বিধান নাই। তদুত্তরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, বাইতুল্লার কোন অংশই পরিত্যক্ত নহে।

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)ও প্রত্যেক কোণকে স্পর্শ করিতেন।

৮৪৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয় ব্যতীত অন্য কোনও কোণকে স্পর্শ করিতে দেখি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি কার্য্যপদ্ধতি অনুধাবন ও অনুসরণের প্রতি সর্বদা বিশেষ তৎপর থাকিতেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বয়ং এই রীতি অনুযায়ী আমলও করিয়াছেন—তিনি উত্তর কোণদ্বয়কে কোন সময়ই তওয়াফকালে স্পর্শ করিতেন না। তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ করেন নাই। হযরত রসুলুল্লাল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ না করার কারণ স্বরূপ তিনি বর্ণনা করিয়া থাকিতেন যে, আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত (৮২৫ ও ৮৪৫ নং) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের সীমানার বাহিরে উত্তর পার্শ্ব-সংলগ্ন—"হাতীম" নামক স্থানটুকু বস্তুতঃ কা'বা শরীফ ঘরেরই অংশবিশেষ। কিন্তু বর্তমান কা'বা গৃহের নির্মাণকালে ঐ স্থানটুকু পরিত্যাগ করিয়া কা'বা-ঘর ছোট আকারে তৈরী করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা গেল যে, উত্তর পার্শ্বস্থ বর্তমান কোণদ্বয় বাইতুল্লাহ শরীফের প্রকৃত কোণ নহে, বরং উহা প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যবর্তী একটি স্থান বটে। বস্তুতঃ যেখানে বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেখানে কোণ স্থাপিত হয় নাই। এই কারণেই এই দিকের বর্তমান কোণদ্বয়কে স্পর্শ করা হয় নাই। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

৮৪৫। **হাদীছ ঃ**—মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীকে আয়েশা (রাঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণিত শুনাইলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, এই তথ্য তোমার জানা নাই কি যে, তোমার বংশধররা যখন কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিল তখন তাহারা ইব্রাহীম আলাইহে ছ্ছালামের স্থাপিত ভিত্তির পরিমাণ হইতে কা'বা গৃহকে ছোট করিয়া দিয়াছিল?

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি কা'বা ঘরকে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া পুনঃ নির্মাণ করিবেন কি? তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার বংশের (অধিকাংশ) লোকেরা যদি ইসলামে নবদীক্ষিত না হইত তবে আমি তাহা করিতাম।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত হাদীছ শ্রবণে বলিলেন, আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে যে তথ্য শুনিয়াছেন উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হাতীমের দিকের তথা কা'বা-ঘরের উত্তর দিকের কোণদ্বয়ের এস্তিলাম—ভক্তিভরে স্পর্শ করেন নাই একমাত্র এই কারণেই যে, (কোরায়েশগণ কর্তৃক পুনঃ নির্মাণকালে) ঐ উত্তর দিকে বাইতুল্লাহ শরীফকে ইব্রাহীম আল্লাইহেচ্ছামের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

যথাসাধ্য হজরে-অলওয়াদকে চুম্বন করা

৮৪৬। হাদীছ ঃ—একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বন করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি দেখিয়াছি—রসুলুল্লাল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহাকে ভক্তি ও মহব্বতের সহিত চুম্বন করিয়া থাকিতেন। ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, বলুন ত যদি ভিড় হয় কিংবা যদি চুম্বন করিতে কষ্ট হয় তবে কি করিব? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, তোমার "বলুনত" বাক্যটি তোমার দেশ ইয়ামানে রাখিয়া আস, আমি উহা শুনিতে চাই না। আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজরে-আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—ভিড় থাকা অবস্থায় যথাসাধ্য নিজে কষ্ট করিয়া হইলেও হজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বনে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু অন্যকে কষ্ট দিয়া বাইতুল্লাহ শরীফ ও হজরে-আস্‌ওয়াদের সম্মান ও আদবের বরখেলাফ করিয়া চুম্বনের জন্য হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি করিবে না। কারণ, চুম্বন করা সুন্নত এবং ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত কর্ম হারাম। ছুন্নত হাসিলের জন্য হারাম কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায় না।

মক্কায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম তওয়াফ করা

৮৪৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কায় পৌছিয়া সর্বপ্রথম অজু করিলেন, অতঃপর তওয়াফ করিলেন।

৮৪৮। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্য প্রথম তওয়াফের তিন চক্করে "রমল" করিতেন এবং অবশিষ্ট চারি চক্করে স্বাভাবিকরূপে চলিতেন। অতঃপর (মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী ওয়াজেবুত-তওয়াফ) দুই রাকাত নামায পড়িতেন। তৎপর ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সায়ী করিতেন।

নারী-পুরুষ একই সময়ে তওয়াফ করিতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে

৮৪৯। হাদীছ ঃ—ইবনে জোরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী প্রথম শতাব্দীর ঘটনা—তৎকালীন বাদশাহ হেশাম-ইবনে আবদুল মালেক কর্তৃক নিয়োজিত হজ্জ-কার্য্য পরিচালনার প্রধান তথা আমিরুল-হজ্জ) ইব্রাহীম ইবনে হেশাম যখন নারীগণের প্রতি পুরুষের সঙ্গে একত্রে তওয়াফ করার নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন, তখন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিলেন, নারী-পুরুষের এক সময়ে তওয়াফ করাকে কিরূপে নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে? অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও পুরুষদের তওয়াফ করা কালেই (একই সময়ে) তওয়াফ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি নারীদের প্রতি পর্দার আদেশ জারী হওয়ার পরের ঘটনা? তিনি বলিলেন—

নারীগণ পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। (আমি দেখিয়াছি,) আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের তওয়াফ করার সময়ে তওয়াফ করিতেন বটে, কিন্তু পুরুষগণ হইতে পৃথক থাকিয়া তওয়াফ করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন না। (একদা) এমতাবস্থায় একটি নারী তাঁহাকে বলিল, হে উম্মুল মোমেনিন! চলুন, আমরা হজরে-আসওয়াদ চুম্বন করিয়া আসি। (যেহেতু হজরে-আসওয়াদের নিকটবর্তী স্থানে পুরুষদের ভিড় হইতে বাচিয়া থাকা কঠিন ছিল, তাই) আয়েশা (রাঃ) উহা অস্বীকার করিলেন এবং রাগান্বিত স্বরে বলিলেন—দুর।

আতা (রঃ) আরও বলিলেন, আমি দেখিয়াছি—নারীগণ বিশেষরূপে রাত্রিকালে পর্দার সহিত আসিতেন এবং পুরুষদের তওয়াফ করাকালীন কেনারায় কেনারায় তওয়াফ করিতেন। কিন্তু নারীগণ বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহারা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেন এবং পুরুষগণকে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত, (তৎপর নারীগণ প্রবেশ করিতেন)।

মছআলাহ্ঃ—নারীগণের পক্ষে পুরুষদের সহিত হুড়াহুড়ি করিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ করা জায়েয নহে।

তওয়াফ করার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা

৮৫০। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা তওয়াফ করাকালে এক ব্যক্তির নিকটস্থ পথে চলিবার সময় দেখিতে পাইলেন—সে নিজকে একটি দড়ি দ্বারা বাধিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি ঐ দড়ি ধরিয়া পশুর ন্যায় তাহাকে টানিয়া নিতেছে*। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বহস্তে ঐ দড়ি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আবশ্যক হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাও।

ফজর ও আছরের পরে তওয়াফ করা

ফজর ও আছরের নামাযের পরে তওয়াফ করা জায়েয; ইহাতে কোন দ্বিমত নাই বলা যায়। অবশ্য তওয়াফের পরে যে, দুই রাকাত নামায পড়িতে হয় সেই নামায ফজর নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য্যাস্তের পূর্বে পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মতাভেদ রহিয়াছে।

উক্ত দুই সময়ে ফরজ কাজা নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ। সে মতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মজহাব মতে তওয়াফের নামায ঐ সময় পড়িতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ফজর নামাযের বা আছর নামাযের পরে তওয়াফ করে তবে তাহাকে তওয়াফের নামায সূর্য্য উদয়ের বা অস্তের পরে পড়িতে হইবে।

---

* অন্ধকার যুগে এরূপ করাকে পূণ্য মনে করা হইত এবং নানাপ্রকার আপদ-বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার বা বিবিধ মকছুদ হাসিলের জন্য এরূপ করার মান্নত মানা হইত।

অন্য ইমামগণের মতে উদয়-অস্তের পূর্বেই তওয়াফের নামায পড়িতে পারিবে। এ সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যে উভয় রকম আমলই দেখা যায়।

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তওয়াফের নামায সুর্য্য উদয়ের পূর্বে পড়িতেন, অবশ্য ঠিক উদয়ের সময় পড়িতেন না।

● একদা ওমর (রাঃ) ফজর নামাযান্তে তওয়াফ করিলেন; তওয়াফের নামায ঐ সময় পড়িলেন না, বরং "জি-তুয়া" নামক স্থানে পৌঁছিয়া (সূর্য্য উদয়ের পরে) তওয়াফের নামায পড়িয়াছেন।

৮৫১। হাদীছঃ—ওরওয়াহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় ব্যক্তি ফজর নামাযান্তে তওয়াফ করিল, অতঃপর তাহারা ওয়াজ শুনিতে বসিল, সূর্য্যোদয়ের নিকটবর্তী সময় তাহারা তওয়াফের নামাযে দাঁড়াইল। তখন আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাহারা বসিয়াছিল—তবুও নামাযের জন্য মকরূহ সময় থাকিতেই নামাযে দাঁড়াইল।

ব্যাখ্যাঃ—আয়েশা (রাঃ) উল্লেখিত অবস্থায় সূর্য্য উদয়ের পরে তওয়াফের নামায পড়িতে আদেশ করিতেন।

অসুস্থতার দরুণ কোন কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ করা

৮৫২। হাদীছঃ—উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা পানে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন; উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)ও যাত্রার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি বিদায়-তওয়াফ করেন নাই। তিনি হযরতের নিকট স্বীয় অসুস্থতার উল্লেখ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, ফজর নামাযের জমাত দাঁড়াইলে লোকগণ নামাযে থাকিবে তখন তুমি উটে চড়িয়া লোকদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিয়া নিও। তিনি তাহাই করিলেন এবং তওয়াফের দুই রাকাত নামায অন্যত্র বাহিরে কোথাও পড়িয়া নিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি যখন তওয়াফ করিতেছিলাম তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্নে নামায পড়িতে ছিলেন; হযরত (দঃ) ছুরা "ওয়াততুর" পাঠ করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—মদীনায় যাত্রার সময় হযরতের বিবি উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) অসুস্থ হওয়ায় তিনি বিদায়-তওয়াফ করিতে পারেন নাই; বিদায়-তওয়াফ ওয়াজেব। মক্কা হইতে যাত্রার প্রক্কালে উহা আদায় করিতে হইবে, তাই নবী (দঃ) তাঁহাকে স্বীয় উট দিলেন এবং উহাতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে বলিলেন। উটে চড়িয়া তওয়াফ করার পরিবেশ লাভের জন্য নবী (দঃ) তাঁহাকে ফজর নামাযের জমাত হওয়াকালে তওয়াফ করার পরামর্শ দিলেন। নামাযীদের যেন বিব্রত হওয়ার কারণ না হয়, তাই তাহাদের পেছন দিয়া তওয়াফ করিতে বলিলেন। অধিকাংশ হাজী মক্কা ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তখন ফজরের জমাতে যে

পরিমাণ লোক ছিল তাহাদের পেছন দিয়া উটের সাহায্যে তওয়াফ করা সহজ সাধ্যই ছিল। মসজিদের ভিতরে উট ইত্যাদি পশু নেওয়া বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষিদ্ধ; কারণ উহার মল-মূত্র ত্যাগের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই—যাহাতে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযারূপে তাঁহার উট নির্ভরযোগ্য ছিল যে, মসজিদে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না, তাই হযরতের বিবি সেই উট মসজিদের ভিতরে নিয়া উহার উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন ৮৪২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, স্বয়ং নবী (দঃ)ও বিশেষ কারণে স্বীয় উটের উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন।

সর্ব-সাধারণের জন্যও মাছআলাহ রহিয়াছে—অসুস্থতার দরুণ হাটিয়া তওয়াফ করিতে সক্ষম না হইলে পশু ভিন্ন অন্য কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে পারে। বর্তমানে দেখিয়াছি—ছোট চৌকির ন্যায় তৈরী কাঠের উপর রুগ্ন-অচল ব্যক্তিকে বসাইয়া বা শোয়াইয়া ঐ কাঠ দুইজন শ্রমিক মাথায় বহন করতঃ তওয়াফ আদায় করাইয়া থাকে। ছাফা-মরওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করার মছআলাহও রুগ্ন-অচলদের জন্য তদ্রূপই, বর্তমানে সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ চৌকি ভিন্ন ছোট হাত গাড়ীও ব্যবহার করা হয় এবং এই কাজের জন্য অনেক শ্রমিক চৌকি বা গাড়ী নিয়া মোতায়েন থাকে।

মছআলাহ ঃ—তওয়াফ করা অবস্থায় কোন গর্হিত কাজ হইতে দেখিলে সে কাজে বাধা দিতে এবং উহা রহিতের ব্যবস্থা করিতে পারে। ৮৫৩ হাদীছ

তওয়াফ ও উহার নামাযের বিভিন্ন মাছআলাহ

মছআলাহ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তওয়াফ করিতেছে এমতাবস্থায় সাত চক্কর পূর্ণ হইবার পূর্বেই নামাযের জমাত আরম্ভ হইয়া গেল কিম্বা অন্য কোনও কারণে তওয়াফ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইল; তখন সে ব্যক্তি নামাযান্তে বা বাধা মুক্তির পর অবশিষ্ট তওয়াফ ঐ স্থান হইতে পুনরারম্ভ করিবে যথা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছে। ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) তাঁহারাও এইরূপ ফতোয়া দিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—প্রতি সাত চক্কর তওয়াফ পূর্ণ করার পর দুই রাকাত নামায পড়িবে। এমনকি, তওয়াফের সংলগ্ন কোনও ফরজ নামায পড়িলে তাহাতে ঐ তওয়াফের নামায আদায় হইবে না, বরং ভিন্নভাবে তওয়াফের জন্য দুই রাকাত ওয়াজেব নামায পড়িতে হইবে। (২২০)

মছআলাহ ঃ—মসজিদে-হরমের বাহিরে, এমনকি হরম শরীফের সীমার বাহিরেও যদি তওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে জায়েয হইবে। কিন্তু এই দুই রাকাত নামায মকামে ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া পড়া উত্তম।

মছআলাহ ঃ—মক্কা শরীফে পৌঁছিয়াই অনতিবিলম্বে তওয়াফ করা কর্তব্য। যদি শুধু হজ্জের এহরাম থাকে তবে সেই তওয়াফ হইবে "তওয়াফে কুদুম" যাহা ছুন্নত, আর শুধু

ওমরার এহরাম থাকিলে সেই তওয়াফ হইবে ওমরার ফরজ তওয়াফ। আর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের তথা হজ্জে-কেরাণের এহরাম থাকিলে প্রথমে ওমরার ফরজ তওয়াফ আদায় করা ওয়াজেব অতঃপর ওমরার সায়ী করিবে, তারপর হজ্জের ছুন্নত তয়াফে-কুদুম করিবে। তারপরেও যত সময় মক্কায় থাকিবে বেশী পরিমাণে নফল তওয়াফ করা উত্তম, এমনকি মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য নফল নামায অপেক্ষাও নফল তওয়াফ অগ্রগণ্য। অবশ্য যদি নফল তওয়াফ না করে এবং শুধু ১০ তারিখে বা উহার পর ফরজ তওয়াফ—তওয়াফ-যেয়ারত করে তবুও গোনাহ হইবে না। হযরত (দঃ) বিদায়-হজ্জে নফল তওয়াফ করিয়াছিলেন না। হযরত (দঃ) হজ্জের মাত্র চার দিন পূর্বে মক্কায় পৌঁছিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে দ্বীনি প্রয়োজন আনেক ছিল। এতদ্ভিন্ন হযরতের সঙ্গে যে অসংখ্য লোকের কাফেলা ছিল—চার দিনের মধ্যে তাহাদের সকলের প্রাথমিক তওয়াফ আদায় করার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল, হয়ত সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই হযরত (দঃ) নফল তওয়াফে যান নাই। কারণ, তাহা হইলে নফল তওয়াফকারীদের ভীড় অধিক হইয়া যাইবে।

(২২০ পৃষ্ঠা ৮৩৮ হাদীছ)

মছআলাহ ঃ—তওয়াফ অজুর সহিত করা কর্তব্য ; অধিকাংশ ইমামগণের মতে অজু-বিহীন তওয়াফ শুদ্ধই হয় না।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে মক্কায় পৌঁছিয়াই অজু করিয়া কা'বা শরীফের তওয়াফ করিয়াছিলেন। ৮৭৪ হাদীছ

হাজীদেরে পানি পান করাইবার খেদমত

৮৫৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, হাজীদের পানি পান করানের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের নির্দিষ্ট ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ সমূহের রাত্রিবেলা আমি মক্কায় থাকিতে চাই। (হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানো তাঁহাদের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য ছিল।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—মিনা অবস্থানের তারিখসমূহে মিনাতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজেব। কিন্তু হাজীদের পানি পান করানোর খেদমতে এতই ফজিলত যে, উহার জন্য আব্বাস (রাঃ) সেই ওয়াজেব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

৮৫৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জকালীন মক্কায়) হাজীদের জন্য বিশেষরূপে পানি পানের ব্যবস্থাপনার স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পানি পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পুত্র ফজলকে আদেশ করিলেন—তোমার মাতার নিকট হইতে রসুলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খাছ পানি নিয়া আস। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সর্ব-সাধারণের পানি হইতেই পান করান। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই পানির এবং এই পাত্রের মধ্যে সর্ব-সাধারণ সকলেই হাত ভিজাইয়া থাকে, আপনার জন্য বিশেষ পানির ব্যবস্থা করিতেছি। হযরত (দঃ) পুনরায় বলিলেন, সর্ব-সাধারণের জন্য প্রস্তুত পাত্র হইতেই আমাকে পান করান। হযরত (দঃ) সেই পাত্র হইতেই পানি পান করিয়া "যমযম" কূপের নিকটবর্তী আসিলেন। তথায় বহু লোক পানি পান করিতেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক পরিশ্রম করিয়া পানি পান করাইতেছিল। তাহাদিগকে নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা অতি উত্তম কাজ করিতেছ। তোমাদের উপর সকলের ভিড় হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমিও দড়ি লইয়া (যমযম কূপ হইতে পানি উত্তোলন পূর্বক) তোমাদের সঙ্গে পানি পান করানোর কার্য্যে যোগদান করিতাম।

যমযমের পানি দাঁড়াইয়া পান করা

৮৫৫। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে যমযমের পানি পান করাইয়াছি। তিনি উহা দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করা ওয়াজেব

৮৫৬। হাদীছঃ—ওরওয়াহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আয়েশা (রাঃ)কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এই আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۝

অর্থ—নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত একটি এবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ বা ওমরা করিবে, তাহার জন্য দুষণীয় হইবে না ঐ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করা। (২ পাঃ ৩ রুঃ)

ওরওয়াহ (রঃ) বলেন, এই আয়াতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছায়ী করা ওয়াজেব নহে, ঐ ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না। নতুবা আল্লাহ তায়ালা এরূপ বলিতেন না যে, ছায়ী করা দুষণীয় নহে।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ যে, "ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না" যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ তায়ালা এখানে এইরূপ বলিতেন—"দুষণীয় হইবে না ছায়ী না করা।" কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহা বলেন নাই।

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—(ছায়ী করা বস্তুতঃ ওয়াজেব কিন্তু) "ছায়ী করা দুষণীয় নহে" এখানে এই ধরণের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে কাফেররাও নানারূপ গর্হিত ও কল্পিত নিয়মানুসারে হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। ঐ সময় মদীনা-বাসী একদল লোক "কোদায়েদ" নামক স্থানের সম্মুখে "মোশাল্লাল" নামক একটি টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত "মানাত" নামক একটি মূর্তিকে মা'বুদরূপে উপাসনা করিত। তাহারা ঐ মূর্তির উদ্দেশ্যে এবং উহার উপাসনারূপেই হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। তখন ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপরও দুইটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মদীনাবাসীরা উক্ত মূর্তিদ্বয়কে মাবুদরূপে মান্য করিত না এবং উহাদের উপাসনাও করিত না। এই কারণে তাহারা ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ছায়ী করাকে গোনাহ মনে করিত।

কালক্রমে মোসলমান হওয়ার পর তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিট জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা ত পূর্বে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ ভাবিয়া উহা হইতে বিরত থাকিতাম, এখন আমাদের প্রতি কি আদেশ ?

তাঁহাদের এই প্রশ্ন উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় এবং তাঁহাদের পূর্বেকার এই ভুল ধারণা যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী গোনাহের কাজ—ইহা খণ্ডন করার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয় যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা দুষণীয় নহে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও নির্দেশিত একটি বিশেষ ধর্মীয় বিধান। সুতরাং কাহারও জন্য উহা হইতে বিরত থাকার অনুমতি নাই।

এতদ্ব্যতীত মদীনাবাসীদের বিপরীত আচরণকারী অন্য একদল লোকও উক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল ছিল। তাহারা হইল মক্কাবাসী ও তাহাদের অনুসারীগণ। (ছাফা পাহাড়ের উপর "এছাফ" নামের একটি মূর্তি এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর "নায়েলা" নামে অপর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ধকার যুগে মক্কাবাসীরা ঐ মূর্তিদ্বয়ের পূজারী ছিল এবং ঐ মূর্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও উপাসনা রূপেই তাহারা ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়া থাকিত। তাহারাও মোসলমান হওয়ার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই মনোভাব ব্যক্ত করিল যে, আমরা পূর্বে একটি জঘন্য কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতাম। এখন আমরা মোসলমান হইয়া ঐ কাজ করাকে গোনাহ মনে করি।) এবং আল্লাহ তায়ালা কা'বা-ঘরের তওয়াফের আদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, ছাফা-মারওয়ার উল্লেখ করেন নাই (১৭ পাঃ ছুরা-হজ্জ ২৯ আয়াত দ্রষ্টব্য)। এমতাবস্থায় ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কারায় গোনাহ হইবে কি? উক্ত দলের প্রশ্ন এবং মনোভাবকেও এই আয়াতের দ্বারা রদ করা হইয়াছে যে, হজ্জ বা ওমরার মাধ্যমে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করা নিতান্ত ভুল ও অহেতুক। কারণ, হজ্জ বা ওমরা বস্তুতঃ একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব, উহার মাধ্যমে ছায়ীও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং উহা গোনাহ বা দুষণীয় হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বিপরীত মতবাদের দুই দল লোকের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রসূত একই ভুল ধারণাকে রদ করতঃ প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপনার্থে এই আয়াতটি নাযেল হয়। আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতের মূল বিষয় বস্তু উল্লেখ করার পূর্বে অতি সুন্দর একটি ভূমিকার উল্লেখ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বহু পূর্ব হইতে ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষ এবাদতের স্থান। যাহারা কোন মূর্তির উদ্দেশ্য ও উপসনারূপে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় গোনাহ ও শেরেকী কাজ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই পাহাড়দ্বয়কে আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত এবাদতের স্থানরূপে আল্লার নির্দেশিত বিধান হিসাবে একমাত্র আল্লার এবাদৎ বন্দেগী উদ্দেশ্য করিয়া ছায়ী করা—ইহাই ছিল এই পাহাড়দ্বয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া অন্ধকার যুগের কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হইয়াছ। অতএব, পূর্ব উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষত্বকে রূপায়িত করার মধ্যে এখন কি দোষ থাকিতে পারে? এবং যাহারা অন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করিত তাহারাও এখন আর উহাকে গোনাহ মনে করিতে পারে না। কারণ, ইসলাম সমস্ত কুসংস্কারেরই মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে। মূর্তি দুর করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। গর্হিত মূর্তির কারণে মূল জিনিস নষ্ট হইবে না। মূল জিনিস আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই বলবৎ আছে এবং থাকিবে।

৮৫৭। **হাদীছ ঃ**— আমর ইবনে দীনার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন ব্যক্তি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছে; অতঃপর ওমরার দুইটি কাজ তথা তওয়াফ ও ছায়ী হইতে শুধু বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়াছে; ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করে নাই; সে এহরামের বিপরীত কাজ—স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারে কি? অর্থাৎ ছাফা-মারওয়ার ছায়ী ব্যতিরেকে তাহার ওমরা পূর্ণ হইয়াছে কি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জকালে মক্কায় আসিয়া সাত চক্কর তওয়াফ করিয়াছেন এবং মকামে-ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন এবং ছাফা-মারয়ার সাত ফেরা ছায়ী করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "তোমাদের জন্য রসূলুল্লার কার্য্যাবলীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।" অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) ছায়ী করিয়াছেন, সুতরাং সকল মোসলমানকে হজ্জ এবং ওমরায় ছায়ী অবশ্যই করিতে হইবে; উহা ব্যতিরেকে হজ্জ বা ওমরা সম্পন্ন হইবে না। অতএব ছায়ী করার পূর্বে এহরামের বিপরীত কাজ—স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

আমর ইবনে দীনার (রঃ) আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়টি আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি সরাসরি স্পষ্টই বলিলেন—ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করার পূর্বে কিছুতেই স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবে না।

মছআলাহ্ঃ—হজ্জ এবং ওমরায় ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ছায়ী করা একটি বিশেষ ওয়াজেব। ইহা আদায় না করা পর্য্যন্ত হজ্জ ওমরা পূর্ণ হইবে না। ইহার বিধানগত সময় হইল ওমরার তওয়াফের সঙ্গে এবং হজ্জের যে কোন তওয়াফের সঙ্গে করা। যদি ঐরূপ না করিয়া থাকে তবে পরে যে কোন সময় অবশ্যই আদায় করিবে, এমনকি যদি উহা না করিয়া এহরাম ভাঙ্গিয়াও ফেলিয়া থাকে তবুও উহা আদায় করিতে হইবে। অবশ্যই উহা জিম্মায় ওয়াজেব থাকিবে। এই ওয়াজেব আদায় করার জন্য পুনরায় তাহাকে হজ্জ বা ওমরার নিয়্যতে মক্কা শরীফে আসিয়া উহা আদায় করিতে হইবে। কিম্বা একটি কোরবানীর টাকা কাহারও হাতে মক্কা শরীফ পাঠাইতে হইবে এবং কাফ্ফারারূপে সেই কোরবানী হরম শরীফের সীমার ভিতর জবেহ করা হইলে উক্ত ওয়াজেব আদায় না করার বিনিময় আদায় হইয়া নিস্কৃতি লাভ হইবে।

৮ই জিলহাজ্জ জোহরের নামায কোথায় পড়িবে ?

৮৫৮। হাদীছ ঃ—আবদুল আজিজ ইবনে রোফায় (রঃ) আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৮ই জিলহাজ্জ জোহর ও আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন—মিনায়। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, "আবতাহ্" নামক স্থানে। (যাহাকে "মোহাচ্ছাব" বলা হয়, যাহার বর্ণনা ৯০৫নং হাদীছে উল্লেখ আছে।) অতঃপর আনাছ (রাঃ) আরও একটি কথা বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে—এই বিবরণের অনুসরণ ছুন্নত বটে, কিন্তু উহা সুযোগ-সুবিধা সাপেক্ষ—ওয়াজেব বা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ নহে।

মছআলাহ্ঃ—মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি ৮ই জিলহজ্জের পূর্বেও এহরাম বাঁধিতে পারে; ৮ই জিলহাজ্জ এহরামের শেষ তারিখ। সে মক্কার সব স্থানেই এহরাম বাঁধিতে পারিবে। (১২৪ পৃঃ)

আরফায় অবস্থানের দিন রোযা না রাখা

৮৫৯। হাদীছ ঃ—উম্মুল-ফজল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আরফায় অবস্থানের দিন সকলের মনেই এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোযা রাখিয়াছেন কি-না ? (কারণ, সাধারনতঃ আরফার দিনের নফল রোযা অনেক ফজিলত রাখে।) তখন আমি প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য হযরতের নিকট পানীয়রূপে কিছু দুধ পাঠাইয়া দিলাম। হযরত (দঃ) পান করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন—তিনি রোযা রাখেন নাই।

মছআলাহ্ঃ—আরফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ চাঁদের নবম তারিখে রোযা রাখার অতিশয় ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণিত আছে। কিন্তু যাহারা হজ্জ উপলক্ষে আরফার ময়দানে অবস্থানরত থাকিবে তাহারা ঐ রোযা রাখিবে না। আরফার ময়দানে বেশী বেশী দোয়া-এস্তেগফার ও জিকির-তছবীহ এবং নফল নামায ইত্যাদি এবাদৎ অধিক উত্তম ; রোযার দরুন উহা ব্যহত হইবে।

মিনা হইতে আরফায় যাওয়ার পথে

৮৬০। হাদীছঃ—এক ব্যক্তি আনাছ(রাঃ)কে মিনা হইতে আরফায় যাওয়াকালীন জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা এই দিন অর্থাত জিলহজ্জের নবম তারিখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালীন কি কি কাজ করিতেন? আনাছ(রাঃ) বলিলেন, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ লাব্বাইকা......বলিতে থাকিত, তাহাতে বাধা দেওয়া হইত না এবং কেহ কেহ তকবীর-তশরীক বলিত, তাহাতেও বাধা দেওয়া হইত না।

আরফার ময়দানে

জিলহজ্জের ৯ তারিখে বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সাধারণতঃ আরফার ময়দানে পৌঁছা হয়। আরফায় পৌঁছিয়াই দোয়া-দরূদ, জিকর, তলবিয়া এবং নফল নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকিবে; সময় মোটেই নষ্ট হইতে দিবে না।

জোহরের নামাযের পর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পূর্ণ সময়টুকু আরফার দিনের বিশেষ সময় এবং গোটা হজ্জব্রতের বরকত ও মঙ্গল কুড়াইবার সময়, আল্লাহ তায়ালার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করাইবার সময়, দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে চাহিয়া লইবার সময়, কবরের আজাব, হাশরের কষ্ট, পোলছেরাতের বিপদ ও দোযখ হইতে উদ্ধারের এবং বেহেশত লাভের আবেদন-নিবেদন আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করার সময়। এই সময়টুকুকে ওকুফে-আরফাহ বা আরাফায় অবস্থানের সময় বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ আরফার ময়দানে আল্লার দরবারে কান্নাকাটা করা, তওবা-এস্তেগফার করা, দোয়ায় লিপ্ত হওয়া—যাহা আরফার ময়দানে অবস্থানের মুল উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য সমাপন করার সময় ইহাই। এই উদ্দেশ্য সমাপনের সময়কে সুদীর্ঘ করার জন্য শরীয়তের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও মহআলাহ বোখারী (রঃ) ২২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) আরফার দিন জোহরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেওয়া। (২) জোহরের সঙ্গেই আছর নামাযও পড়িয়া নেওয়া (শর্ত সাপেক্ষ—বিবরণ সম্মুখে)। (৩) জোহর নামাযের পূর্বক্ষণে খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধির ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়া। (৪) যথা সম্ভব সত্বর আরফায় অবস্থানের উপরোল্লিখিত মুল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা।

৮৬১। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ কঠোর প্রকৃতির মানুষ মক্কার) গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে তাহার রাষ্ট্রপতি আবদুল মালেক আদেশ-নামা লিখিয়া পাঠাইলেন—গভর্ণর যেন হজ্জের সমুদয় ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর পরামর্শে চলেন; তাঁহার কথার বাহিরে না চলেন। তাই গভর্ণর হাজ্জাজ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট আরফার ময়দানের কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

সালেম বলেন, সেমতে পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফার দিন সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিতেই আমাকে সঙ্গে নিয়া হাজ্জাজের তাঁবুর নিকটবর্ত্তী আসিয়া তাঁহাকে

ডাকিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ছুন্নত আদায় করিতে চাহিলে এখনই জোহর নামাযের জন্য চলুন। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মুহূর্তে? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হাজ্জাজ বলিলেন, সামান্য অবকাশ দিন; সংক্ষিপ্ত গোসল করিয়াই আমি বাহির হইতেছি। আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় বাহন হইতে নামিলেন; ইতিমধ্যেই হাজ্জাজ বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমার ও আমার পিতা আবদুল্লাহর মধ্যে হাজ্জাজ—এই অবস্থায় আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি হাজ্জাজকে বলিলাম, আজিকার দিনের ছুন্নত তরীকা পালন করিতে চাহিলে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করিবেন, জোহরের নামায অবিলম্বে যথা সম্ভব সত্বর পড়িবেন এবং আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য-কার্য্যে যথারীতি আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার কথা শ্রবণে হাজ্জাজ পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের প্রতি তাকাইলেন। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সে ঠিকই বলিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, আরফার দিন জোহরের আউয়াল ওয়াক্তে আছরের নামাযকেও জোহরের নামাযের সঙ্গে একত্রে পড়িয়া নেওয়ার রীতি মোসলমানগণ রসুলের আদর্শ মতে এই উদ্দেশ্যেই পালন করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য-কার্য্যের সময়কে প্রশস্ত করার জন্য।

সালেমের শাগের্দ ইমাম জুহরী সালেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরফার দিন জোহরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া নেওয়া—ইহাকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) করিয়াছেন? সালেম বলিলেন, এইরূপ ব্যাপারে মোসলমানগণ একমাত্র রসুলের আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ—পূর্বোল্লিখিত চারিটি বিষয়ের দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ আরফার দিন আছরের নামায জোহরের সঙ্গে পড়িয়া নেওয়া যাহার বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন উহা বিশেষ শর্ত সাপেক্ষ। আরফার ময়দানের মসজিদে-নামেরাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার নিয়োজিত প্রতিনিধীর ইমামতীতে জমাতের সহিত জোহর নামায পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরেরও জমাত পড়া হইবে। অন্য স্থানে নামায পড়া হইলে বা অন্য ইমামের জমাতে কিম্বা একা নামায পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে জোহর নামাযের ওয়াক্তে আছর নামায শুদ্ধ হইবে না। আছর নামায উহার নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। বর্তমান যুগেও আরফার দিন মসজিদে-নামেরায় জোহর নামায বাদশার প্রতিনিধির ইমামতীতে জমাতে হইয়া থাকে, কিন্তু তথায় যাইয়া জোহর নামায পড়া বাংলাদেশের লোকের ন্যায় দুর্বলদের জন্য অসম্ভব ও অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল দেখিয়াছি। আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য নিজ নিজ তাবুতে জোহর আছর নামায নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। অবশ্য দুপুরের প্রারম্ভেই গোসল করতঃ আউয়াল ওয়াক্তে জোহর পড়িয়া যথা শীঘ্র দোয়া-কালামে আত্মনিয়োগ করা চাই এবং আছরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া পুনঃ দোয়া-কালামে রত হইয়া যথা সম্ভব অধিক সময় দোয়া-কালামে রত থাকা চাই। জীবনের এই অতি অসাধ্য সুযোগের এক মুহূর্তও অপব্যয় করা চাই না।

আরফার ময়দানে প্রত্যেক হাজীকেই অবস্থান করিতে হইবে

৮৬২। **হাদীছঃ**—ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্ধকার যুগের রীতি ছিল কোরায়েশ বংশের লোকগণ ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা'বা শরীফ তওয়াফ করিত। কোরায়েশ বংশের লোকেরা অন্য লোকদেরকে কাপড় দিয়া সাহায্য করিত—পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে; ঐ কাপড় যাহারা পাইত তাহারা অবশ্য সেই কাপড় পরিয়া তওয়াফ করিত। যাহারা কোরায়েশদের হইতে কাপড় না পাইত তাহারা সকলে উলঙ্গ তওয়াফ করিত।

অন্ধকার যুগে কোরায়েশদের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সকল লোকই (জিলহজ্জের নয় তারিখে) আরফায় অবস্থান করিত এবং তথা হইতে ঐ দিন সন্ধ্যা বেলায় মোযদালেফার দিকে প্রত্যাবর্তন করিত, কিন্তু কোরায়েশরা আরফার ময়দানে মোটেই যাইত না, তাহারা মোযদালেফায়ই থাকিয়া যাইত এবং দশ তারিখ প্রভাতে তথা হইতে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিত।

ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরায়েশদের উক্ত গর্হিত কার্য্যের খণ্ডনেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—

ثم افيضوا من حيث افاض الناس "হে কোরায়েশরা! তোমরাও ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে যে স্থান হইতে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।" অর্থাৎ সকলে যেরূপ আরফায় পৌছিয়া তথা হইতে মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে; তোমরাও আরফায় পৌছিয়া তথা হইতে নয় তারিখ সন্ধ্যায় মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দশ তারিখ ভোরে মিনায় প্রত্যাবর্তন করিবে।

৮৬৩। **হাদীছঃ**—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) তাঁহার ইসলাম-পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে একবার আমার একটি উট হারাইয়া গেলে উহার তালাশে আমি আরফার ময়দানে পৌছিয়া ছিলাম; তখন হজ্জের দিন। আমি দেখিলাম, নবী (দঃ) আরফায় অবস্থানরত; আমি ভাবিলাম, এই ব্যক্তি ত কোরায়েশ বংশের—তিনি কেন এখানে আসিয়াছেন?

ব্যাখ্যাঃ—নবী (দঃ) নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে অন্যান্যদের ন্যায় হজ্জ করিয়াছেন; তখনও তিনি এই সত্যটি পালন করিয়াছেন যে, কোরায়েশ বংশ সহ প্রত্যেক হাজী আরফার ময়দানে অবশ্যই যাইবে। নবুওতের পূর্বে নবী (দঃ) এই একটি সাধারণ ব্যাপারেও কাফেরদের গর্হিত নীতির বিরুদ্ধে সত্যকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আরফা হইতে মোযদালেফা যাত্রা

৮৬৪। **হাদীছঃ**—উসামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে আরফা হইতে মোযদালেফায় প্রত্যাবর্তনে কিরূপ চলনে চলিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, সাধারণ দ্রুত চলনে। আর পথ ফাঁকা পাইলে অধিক দ্রুত চলিয়াছেন;

আরফা-মোযদালেফার পথিমধ্যে প্রয়োজনে অবতরণ করা

৮৬৫। **হাদীছ** ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফা হইতে মোযদালেফা যাওয়া কালে পথিমধ্যে পাহাড়ের সেই বাঁকে যাইতেন যথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রস্রাব ত্যাগে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া প্রস্রাব করিতেন এবং অজু করিতেন, কিন্তু নামায পড়িতেন না; মগরেব নামায মোযদালেফায় পৌঁছিয়া পড়িতেন।

আরফা হইতে মোযদালেফার পথে শান্তি শৃংখলার সহিত চলিবে

৮৬৬। **হাদীছ** ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে আরফা হইতে মোযদালেফায় আসার পথে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। নবী (দঃ) পেছন দিকে উট দৌড়াইবার হাঁকাহাঁকি ও পিটাপিটির শব্দ শুনিতে পাইয়া চাবুক হস্তে ইশারা করতঃ লোকদিগকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে আদেশ করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তোমাদের বিশেষ কর্তব্য; উট দ্রুত হাঁকাইবার মধ্যে কোন ছওয়াব ও পুণ্য নাই।

মোযদালেফায় নামাযের সময়

মছআলাহ ঃ- সূর্য্যাস্তের পর আরফা হইতে মোযদালেফা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হইতে হয় এবং মগরেবের নামাযের সাধারণ ওয়াক্ত হইয়া যায়, কিন্তু ঐ দিন মগরেবের নামাযের ওয়াক্ত মোযদালেফায় পৌঁছার পর এশার নামাযের সহিত একই সঙ্গে হইয়া থাকে। অতএব মগরেবের নামাযের নিয়মিত ওয়াক্তে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পরেই আরফার ময়দানে বা পথিমধ্যে মগরেবের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, এরূপ করিলে মগরেবের নামায ঐ দিনের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পূর্বে পড়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এ সম্পর্কে প্রথম খণ্ডের ১১০নং হাদীছ অতি সুস্পষ্ট, যাহা এখানেও উল্লেখ আছে।

৮৬৭। **হাদীছ** ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন একামত দ্বারা একই ওয়াক্তে পড়িয়াছেন এবং উভয় নামাযের মধ্যবর্তী বা শেষে কোন (ছুন্নত বা নফল) নামায পড়েন নাই।

৮৬৮। **হাদীছ** ঃ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে (আরফার দিন) মগরেবের ও এশার নামাযদ্বয় একত্রে এশার সময়ে মোযদালেফায় পড়িয়াছেন।

মছআলাহ ঃ- মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামায একত্রে পড়িবে। এমনকি, অনাবশ্যক কোন কাজে লিপ্ত হইয়া উভয় নামাযের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিবে না এবং সেই ক্ষেত্রে উভয় নামাযের জন্য আজান একবারই দিতে হইবে। অবশ্য একামত ভিন্ন ভিন্ন বলিবে এবং মধ্যস্থলে কোনরূপ ছুন্নতও পড়া হইবে না।

মোযদালেফায় শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতি বিশেষ তৎপর হওয়া চাই। এমতাবস্থায় বেতের নামায ইত্যাদি শেষ রাত্রেই আদায় করিবে। এশার নামাযের পর নফল, বেতের ইত্যাদি নামাযে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যক হয় না, বরং এশার নামাযান্তে যথা সত্বর একটু আরাম করার ব্যবস্থা করিবে, যেন শেষ রাত্রে বিশেষরূপে তাহাজ্জুদ নামায, দোয়া, এসতেগফার, তলবিয়া, তাকবীরে-তশরীক ইত্যাদি পড়া সহজসাধ্য হয় এবং বেতের নামাযও তখনই পড়িবে। এমনকি, ঐ অবস্থায় মুসাফির হওয়ার দরুণ মগরেব ও এশার ছুন্নত তখন ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা থাকে না বলিয়া শেষ রাত্রে বেশী এবাদতের আশায় এশার নামাযের পর দ্রুত আরাম করার উদ্দেশ্যে ঐ ছুন্নত সঙ্গে সঙ্গে না পড়িলেও দোষ নাই।

কিন্তু শেষ রাত্রে উঠিয়া এবাদৎ করার ভরসা না থাকিলে মগরেব ও এশার ছুন্নত এশার ফরজের পরেই পড়িবে (অবশ্য উহা না পড়িলেও চলিবে) এবং তৎপর বেতের নামায পড়িবে।

৮৬৯। **হাদীছঃ**—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) একবার হজ্জ করিলেন, আমরা তাহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরফা হইতে মোযদালেফায় এমন সময় পৌছিলাম, যখন এশার নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে আজান দিতে বলিলেন। সে আজান দিল, তৎপর একামত বলিল। তখন তিনি মগরেবের নামায পড়িলেন, তৎসঙ্গে দুই রাকাত ছুন্নতও পড়িলেন। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া করিলেন। তৎপর পুনরায় এক ব্যক্তিকে আজান দিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি আজান দিয়া একামত বলিল, তিনি এশার নামায (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন।

রাত্রি শেষে ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি কেহ বলিতেছিল, ছোবেহ-ছাদেক উদিত হইয়াছে; কেহ বলিতেছিল, উদিত হয় নাই। (অর্থাৎ ফজরের নামাযের একেবারে আউয়াল ওয়াক্তে—যখন যথেষ্ট অন্ধকার থাকিয়া যায়,) তখন তিনি বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধারণতঃ ফজরের নামায এরূপ আউয়াল ওয়াক্তে পড়িতেন না, * কিন্তু এই দিন এই স্থানে ফজরের নামায এই সময়েই পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) অতঃপর বলিলেন, কেবলমাত্র এই মোযদালেফার মধ্যেই দুই ওয়াক্ত নামায নিয়মিত সাধারণ সময় হইতে ব্যতিক্রম করিয়া পড়া হয়। প্রথম—মগরেবের নামায; উহাকে উহার আসল ওয়াক্ত সূর্য্যাস্তের সংলগ্ন সময় হইতে সরাইয়া এশার নামাযের সময়ে পড়া হয়। দ্বিতীয়—ফজরের নামায; উহাকে সাধারণ মোস্তাহাব ওয়াক্ত তথা ছোবেহ-ছাদেকের পর আলো আসার পূর্বে অন্ধকার থাকিতেই পড়া হয়। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।

---

* কারণ ছোবহে-ছাদেক উদিত হওয়ার পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার যাইয়া আলো আসিলে পর সাধারণতঃ ফজরের নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই স্থানে (অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে হাজীদের জন্য মোযদালেফায়) একই সময় দুইটি নামাযকে উহার নিয়মিত সাধারণ ওয়াক্ত হইতে সরানো হইয়াছে। মগরেবের নামায যাহা এশার সময় পড়া হয়; লোকগণ মোযদালেফায় এশার সময়ই পৌঁছিয়া থাকে। আর ফজরের নামায যাহা এই সময় (ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলো হইবার পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে) পড়া হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ফজর নামাযান্তে "ওকুফ" করিলেন—অর্থাৎ মোযদালেফায় অবস্থানের মূল কার্য্য—নির্ধারিত সময় তথা ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর দোয়া-এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পূর্ণরূপে আলো হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে রত রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমীরুল-মোমেনীন এখন (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে) মিনা যাত্রা করিলে নিয়মিত ছুন্নত সঠিকরূপে পালনকারী হইবেন। তিনি যখন এই কথা বলিতে ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই—যেন উহারও পূর্বক্ষণে আমীরুল-মোমেনীন ওসমান (রাঃ) মিনার দিকে যাত্রা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ১০ তারিখে জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারা পর্য্যন্ত তলবিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন।

মছআলাহ ঃ—মোযদালেফায় অবস্থানের ওয়াজেব আদায়ের নির্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর হইতে আরম্ভ হয় এবং ছোবেহ-ছাদেকের আলো পূর্ণতা লাভ করিলে, কিন্তু সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্বে মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে যাত্রা করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ যদি মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদ্বয়ের মধ্যস্থলে কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয় যদ্দরুণ মগরেবের নামায পড়ার পর এশার নামায পড়িতে কিছুটা বিলম্ব ঘটিবে, এমতাবস্থায় উভয় নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আজান একামত বলায় এবং মগরেবের ছুন্নত উহার ফরজের সংলগ্ন পড়ায় কোনও দোষ হইবে না।

মোযদালেফা হইতে মিনা রওয়ানা হওয়ার সময়

৮৭০। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হজ্জের সময় আমি ওমর (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখিয়াছি, তিনি মোযদালেফায় আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ার পর অপেক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, অন্ধকার যুগে কাফের-মোশরেকরা এই রীতিতে হজ্জ করিত যে, তাহারা মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে সূর্য্য উদয়ের পূর্বে যাত্রা করিত না। তাহারা "ছবীর" নামক পাহাড়ের উপর সূর্য্যের কিরণ দৃষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় থাকিত। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি তাহাদের রীতির বিপরীত ছিল। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মোযদালেফা হইতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ২২৮ পৃঃ

৮৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে (নারী এবং অল্প বয়স্ক ইত্যাদি দুর্বল লোকদের সঙ্গে) রাত্রি বেলায়ই মোযদালেফা হইতে মিনা পাঠাইয়াছিলেন।

৮৭২। হাদীছ ঃ—আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খাদেম আবদুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাঃ) মোযদালেফায় অবস্থান করাকালীন রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম—না। তিনি পুনরায় নামায আরম্ভ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম—হাঁ! তিনি বলিলেন, এখনই মিনার দিকে রওয়ানা হও। আমি তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম এবং আমরা মিনায় পৌছিয়া "জাম্‌রা আকাবায়" কঙ্কর মারা সম্পন্ন করিলাম। অতঃপর তিনি তাঁবুতে আসিয়া ফজরের নামায পড়িলেন। আমি বলিলাম, আমার মনে হয় নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমরা মোযদালেফা হইতে আসিয়াছি এবং কংকর মারিয়াছি; তিনি বলিলেন, হে বৎস! রস্থলুল্লাহ (দঃ) নারীদের জন্য এরূপ করার অনুমতি দান করিয়াছেন।

৮৭৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জে) আমরা মোযদালেফায় অবস্থানরত হইলে পর (হযরতের বিবি) ছওদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—লোকজনের ভিড় হওয়ার পূর্বে রাত্রেই মোযদালেফা হইতে মিনায় চলিয়া আসার জন্য। কারণ, ছওদা (রাঃ) অপেক্ষাকৃত মোটা শরীর বিশিষ্টা ছিলেন। রস্থলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন; তিনি ভিড়ের পূর্বে রাত্রেই চলিয়া আসিলেন। আমরা মোযদালেফায় থাকিলাম; ফজরের নামাযের পর রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আসিলাম। আমরা ভিড়ের দরুণ বহু অস্থবিধার সম্মুখীন হইলাম এবং উপলব্ধি করিলাম যে, আমিও যদি ছওদা (রাঃ)-এর ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করিতাম তবে আমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ ছিল।

মছআলাহ ঃ—ওকুফে-মোযদালেফা ওয়াজেব এবং সেই ওয়াজেব আদায় হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল ছোবেহ-ছাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সমস্ত রাত্রি মোযদালেফায় অবস্থান করিয়া ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে তথা হইতে চলিয়া আসিলে সেই ওয়াজেব আদায় হইবে না। তাই ওয়াজেব আদায় করার জন্য হইলেও মোযদালেফায় অইস্থান করিতে হইবে। অতএব, ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে মোযদালেফা হইতে কিছুতেই আসা যাইবে না, অন্যথায় ওয়াজেব আদায় হইবে না। কিন্তু নারী, নাবালেগ, বৃদ্ধ, রোগী ইত্যাদি দুর্বল ব্যক্তিগণ ভিড় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মোযদালেফায় অবস্থান পূর্বক তথা হইতে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে চলিয়া আসিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই কংকর মারার কাজ সম্পন্ন করিয়া লইলে তাহাদের জন্য ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য তাহাদের জন্যও সূর্য্যোদয়ের

পর কংকর মারা উত্তম; আর তাহাদিগকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মিনায় পৌঁছিয়া কংকর মারা যেন ছোবেহ-ছাদেকের মুহূর্ত পূর্বেও অনুষ্ঠিত না হয়। কারণ দশ তারিখে কংকর মারা যে ওয়াজেব উহা আদায় হওয়ার নির্দ্ধারিত সময় হইল সূর্য্যোদয়ের পরে। অবশ্য দুর্বলদের জন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উহা আদায় করার অনুমতি আছে, কিন্তু ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে কংকর মারিলে তাহা বাতিল গণ্য হইবে।

৮৭৪। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বল লোকদিগকে আগে রাখিতেন। তাহারা নয় তারিখ দিবাগত রাত্রে মোযদালেফায় মাশয়ারুল-হারাম নামক পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিয়া নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লার জিকর করিত। অতঃপর তথায় রাষ্ট্রিয় প্রতিনিধি আসিবার পূর্বে এবং মিনার দিকে তাঁহার যাত্রা করার পূর্বে ঐ দুর্বল লোকগণ মিনার দিকে যাত্রা করিত। তাহাদের কেহ ফজর নামাযের সময় মিনায় পৌঁছিত কেহ আরও একটু পরে পৌঁছিত। তাহারা মিনায় পৌঁছিয়াই জামরা আকাবায় কংকর মারিত। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বলদের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা করিয়া বলিতেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। (২২৭ পৃঃ)

তামাত্তো' হজ্জ

সাধারণতঃ তামাত্তো'-হজ্জে মক্কা শরীফ উপস্থিত হইয়া ওমরার সংক্ষিপ্ত কার্য্য আদায় করতঃ এহরাম ভঙ্গ করা হয়। এই এহরাম ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া অনেকে তামাত্তো'-হজ্জের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাহা অবাস্তব—ইহাই নিম্নের হাদীছে ব্যক্ত করা হইতেছে।

৮৭৫। হাদীছঃ—আবু জামরা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তামাত্তো'-হজ্জ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে ঐ হজ্জ করার আদেশ করিলেন। তামাত্তো'-হজ্জে একটি কোরবাণী করিতে হইবে বলিয়া কোরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখ আছে (২ পাঃ ৮ রুঃ দ্রষ্টব্য); আমি তাঁহাকে সেই কোরবাণী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একটি উট বা গরু বা বকরী কিম্বা উট-গরুর সপ্তম অংশ। (ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আদেশ মতে আমি তামাত্তো'-হজ্জ করিলে) কিছু সংখ্যক লোক উহা নাপছন্দ করিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছে, হজ্জও কবুল এবং তৎসঙ্গের ওমরাও কবুল (অর্থাৎ তামাত্তো-হজ্জ কবুল হইয়াছে।) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া আমি তাঁহার নিকট আমার স্বপ্ন ব্যক্ত করিলাম। তিনি আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন, তামাত্তো'-হজ্জ আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরই ছুন্নত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে তাঁহার অতিথি হওয়ার জন্য বলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নিজস্ব মাল হইতে পুরস্কার দিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, ঐ স্বপ্নের দরুণ যাহা তুমি দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ—বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) নিজে হজ্জে-কেরাণ করিয়াছিলেন, সাথীদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না তাহাদের হজ্জ তামাত্তো-হজ্জ করার আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তামাত্তো'-হজ্জ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত এবং ইহা হজ্জে-এফরাদ তথা শুধু হজ্জ হইতে উত্তম। এই একটি সুন্নতের প্রতি লোকদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। উল্লিখিত ঘটনায় স্বপ্নের দৈব বাণীতে ছুন্নতটির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তির খণ্ডন হইয়াছে, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এত আনন্দিত। ছাহাবীদের নিকট ছুন্নতের মর্য্যাদা কিরূপ ছিল তাহা লক্ষণীয়!

কোরবাণীর উট সঙ্গে লইলে প্রয়োজনে আরোহণ করা

৮৭৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, (সে অতি কষ্টে হাটিয়া চলিতেছে, অথচ) তাহার সঙ্গে হরম শরীফে কোরবাণী দেওয়ার নিয়্যতে একটি উট রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ(দঃ) তাহাকে উহার উপর আরোহণের আদেশ করিলেন। সে বলিল—ইহাত কোরবানীর জানোয়ার! রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় তাহাকে উহাই বলিলেন। তৃতীয়বার ক্রোধ স্বরে বলিলেন, আরোহণ কর।

৮৭৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে কোরবাণীর উট হাকাইয়া চলিয়াছে; (আর সে অতি কষ্টের সহিত পায়ে হাটিতেছে; উটটির উপর আরোহণ করে না।) নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটির উপর আরোহণ কর। সে বলিল, ইহাত কোরবাণীর জন্য! নবী (দঃ) বলিলেন, উহার উপর আরোহণ কর—এইরূপে তিনবার বলিলেন।

মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার চিহ্নিত করা এবং অন্যের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া

৮৭৮। হাদীছ ঃ—মেছওয়ার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ষষ্ঠ হিজরী সনে) ওমরা করার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় হাজার ছাহাবীগণকে লইয়া মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া নিজের সঙ্গে পরিচালিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের গলায় নিদর্শনরূপে মালা লটকাইয়া দিলেন এবং উহাদের পিঠের কুঁজের এক পার্শ্বের চামড়া চিরিয়া চিহ্নিত করিয়া দিলেন। অতঃপর ওমরার এহরাম বাঁধিলেন।

৮৭৯। হাদীছ ঃ—গভর্ণর যেয়াদ আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কোরবাণীর পশু মক্কা শরীফে কোরবানী করার জন্য পাঠাইয়া দেয় উক্ত পশু কোরবাণী না হওয়া পর্য্যন্ত

ঐ ব্যক্তির উপর ঐ সব কার্য্য হারাম থাকে যাহা হাজীদের উপর এহরাম অবস্থায় হারাম হয়। এই কথার প্রতিবাদে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের গলার মালা দিবার জন্য আমি নিজ হস্তে দড়ি পাকাইয়া দিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ দড়ি দ্বারা স্বয়ং উহাদের গলায় মালা বানাইয়া দিয়াছেন এবং আমার পিতা আবু বকরের সঙ্গে ঐ সব জানোয়ার মক্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। (ইহা নবম হিজরী সনের ঘটনা) রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনাতেই অবস্থান করিয়াছেন এবং এহরাম অবস্থায় নয়, বরং সাধারনরূপে অবস্থান করিয়াছেন— কোরবাণীর জানোয়ার মক্কায় প্রেরণের দরুণ কোন রকমের বাছ-বিচার মোটেই করেন নাই।

ব্যাখ্যা :—প্রাচীনকাল হইতেই এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, শত দুষ্ট প্রকৃতির লোক হইলেও সে মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহকে আক্রমণ করিত না, এমনকি উহাদের সঙ্গী রক্ষণাবেক্ষণকারীকেও কোন প্রকার কষ্ট দিত না। এই সুফল লাভের জন্য প্রত্যেকেই ঐরূপ জানোয়ারকে দেশ প্রথানুযায়ী নিদর্শনযুক্ত করিয়া লইত, যাহাতে সকলেই সহজে উহার পরিচয় পাইতে পারে। মালা দেওয়া হইলে পুরাতন জুতার চামড়া ইত্যাদি অতি মামুলী বস্তুর মালা দেওয়া হইত ; কারণ উহা শুধু নিদর্শনরূপেই ব্যবহৃত হইত।

কোরবাণীর জানোয়ার-সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি খয়রাত করা

৮৮০। হাদীছ :—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন—যে সব উট তিনি হজ্জ উপলক্ষে কোরবাণী করিয়াছিলেন উহাদের চামড়া এবং জুল্ (ঘোড়া, উট ইত্যাদির পিঠের উপর আবরণের জন্য চাদররূপে যে বস্ত্র বা কম্বল দেওয়া হয়—ঐ সব) খয়রাত করিয়া দিবার জন্য।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কর্তৃক কোরবাণী করা

৮৮১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জি-কা'দা চান্দের পাঁচ দিন বাকী থাকিতে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম। হজ্জ সমাপনান্তে দশই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন আমার নিকট গোশত উপস্থিত করা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গোশত কিসের ? গোশত উপস্থিতকারী ব্যক্তি বলিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বিবিগণের পক্ষ হইতে গরু কোরবাণী করিয়াছেন, ইহা উহারই গোশত।

মছআলাহ :—স্ত্রীর উপর যদি কোরবাণী ওয়াজেব থাকে এবং স্বামী সেই কোরবাণী দেয় —এরূপ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর সহিত তাহার কোরবাণী দেওয়া সম্পর্কে কথাবার্তা পূর্বেই সাব্যস্ত করিয়া নিয়া থাকে তবে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি পূর্বে কথা সাব্যস্ত না করিয়া স্ত্রীর কোরবাণী দেয় তবে সেই কোরবাণী স্ত্রীর পক্ষে আদায় হওয়া

সম্পর্কে মতভেদ আছে; ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলিয়াছেন, সেই কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি স্ত্রীর কোরবাণী স্বামী কর্তৃক আদায় করার নিয়ম উভয়ের মধ্যে প্রচলিত হয় তবে ত যুক্তিযুক্তরূপেই তাহা আদায় হইয়া যাইবে (শামী, ৪—২৭৫)।

অবশ্য পূর্বাহ্নে স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা সাব্যস্ত করিয়া তারপর তাহার কোরবাণী আদায় করাই কর্তব্য। কারণ, অধিকাংশ ইমামগণের মতে পূর্বাহ্নে কথা সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইবে না, বরং সে ক্ষেত্রে অন্য শরীকদেরও কোরবাণী শুদ্ধ হইবে না।

প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের উপর ওয়াজেব কোরবাণী পিতা কর্তৃক আদায় করিয়া দেওয়ার মাছআলাহও এইরূপই।

হাজীদের কোরবাণী মিনায় হইবে

৮৮২। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে কোরবাণী করিতেন।

৮৮৩। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় কোরবাণীর পশু মোযদালেফা হইতে শেষ রাত্রে অন্য হাজীদের সহিত পাঠাইয়া দিতেন; সেই পশু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে পৌছানো হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—মোযদালেফা হইতে যাত্রা করার নির্দ্ধারিত সময় হইল রাত্রি শেষ হইয়া ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর। অবশ্য মহিলা, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের জন্য উহার পূর্বে রাত্র থাকিতেই মোযদালেফা হইতে যাত্রা করা জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত স্বীয় কোরবাণীর পশু মোযদালেফা হইতে রাত্রেই পাঠাইয়া দিতেন। কারণ, তিনি নিজে নির্দ্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেকের পরে আসিবেন; তখন অধিক ভিড়ের দরুণ পশু লইয়া চলা কঠিন হইবে।

● হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থান হইল জামরা-আকাবাহ তথা ১০ই জিলহজ্জ তারিখে সর্বপ্রথম কংকর মারার স্থানের নিকটবর্তী। সেই নির্দিষ্ট স্থানে কোরবাণী করা উত্তম বটে যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিতেন, কিন্তু মিনার যে কোন স্থানে কোরবাণী করিলেই সুন্নত আদায় হইবে (শামী, ২—৩৪৪)।

নিজ হস্তে কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ করা

৮৮৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে সাতটি * উট কোরবাণী করিয়াছেন। প্রতিটি উটকে দাঁড়ান অবস্থায় উহার

---

* হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবাণী করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৩টি নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছে সাতটির উল্লেখ রহিয়াছে উহা বর্ণনাকারীর উপস্থিতি ও চাক্ষুষ দর্শন অনুসারে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

গলার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিয়াছেন। (এই ব্যবস্থাকে "নহ'র" বলা হয়; উট জবেহ করার এই ব্যবস্থাই ছুন্নত।) এতদভিন্ন (মদীনা শরীফে হযরত (দঃ) এক সময় যে) দুইটি হৃষ্ট-পুষ্ট সুন্দর দুম্বা কোরবাণী করিয়াছিলেন, তাহাও নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন।

৮৮৫। হাদীছঃ—যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে একটি উটকে বসাইয়া উহার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে। ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটিকে দাড় করাও এবং উহার বাম পাওটি মুড়িয়া বাঁধিয়া দাও, তৎপর উহার গলদেশে ছুরি বিদ্ধ কর; ইহাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত।

ব্যাখ্যাঃ—গরু, ছাগল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জবেহ করার নিয়ম সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে। উট ব্যতীত সমস্ত জীবকে ঐরূপেই জবেহ করা চাই। উল্লিখিত হাদীছে যে ব্যবস্থা বর্ণিত হইল তাহা একমাত্র উটের জন্য উত্তম।

কোরবাণীর জানোয়ারের কোন অংশ কসাইকে দিবে না

৮৮৬। হাদীছঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে তাঁহার কোরবাণীর জানোয়ার সমুহের সুব্যবস্থা করার জন্য পাঠাইলেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে গোশতসমূহ বন্টন করিলাম এবং ঐ জানোয়ারগুলির চামড়া এবং উহাদের পিঠের উপর আবরণস্বরূপ ব্যবহার্য্য কম্বল বা কাপড়গুলিকেও দান করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, কসাইকে যেন (তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ) উহা হইতে কোন অংশ দেওয়া না হয়।

ব্যাখ্যাঃ— চুক্তি বা দেশ-প্রথারূপে কসাইকে বা যে কোন পরিশ্রমীকে তাহার পারিশ্রমিক কোরবাণীর জানোয়ার হইতে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য তাহার পারিশ্রমিক ভিন্নরূপে আদায় করিয়া একজন মোসলমান ভাই হিসাবে অন্যান্যের ন্যায় তাহাকেও খাইবার জন্য গোশত দান করা জায়েয আছে।

৮৮৭। হাদীছঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) এক শতটি উট কোরবাণী দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে উহার গোশত বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি সমুদয় গোশত বন্টন করিয়া দিলাম; উহাদের পিঠের উপরে ব্যবহৃত জুলও (গরীবদের মধ্যে) বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম; উহার চামড়াগুলিও বন্টন করার আদেশ করিলেন আমি তাহাও বন্টন করিয়া দিলাম।

যে কোরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, (এহরাম অবস্থায় কোন বন্য পশু-পক্ষী বধ করা হারাম, তাহা করিলে শাস্তি ভোগ স্বরূপ) বধকৃত

জানোয়ার অনুপাতে কোরবাণী দেওয়া ওয়াজেব হয়; সেই কোরবাণীর গোশত, (তদ্রূপ এহরাম অবস্থায় নিয়ম-কানুন প্রতিপালনে ব্যতিক্রম হইলেও নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে কোরবাণী ওয়াজেব হয় এবং হজ্জের নিয়মাবলীর মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যও কোরবাণী ওয়াজেব হইয়া থাকে। এই সব কোরবাণী) এবং নজর বা মান্নতকৃত কোরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারিবে না। সাধারণ নিয়মিত কোরবাণীর গোশত সে খাইতে পারিবে।

আতা (রঃ) বলিয়াছেন, তামাত্তো' বা কেরাণ হজ্জে যে কোরবাণী করা ওয়াজেব হয় উহার গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে।

১০ই জিলহজ্জের ৪টি আমলের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ করা

৮৮৮। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমি (১০ তারিখে কংকর মারার পূর্বেই "তওয়াফে-যিয়ারত" করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, কোরবাণী দেওয়ার পূর্বে চুল ফেলিয়া দিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তজ্জন্যও কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, (১০ তারিখে) কংকর মারার পূর্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি! নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতেও কোন গোনাহ হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ—১০ই জিলহজ্জ একের পর এক ৪টি আমল করিতে হয়—(১) কংকর মারা (২) কোরবাণী করা (৩) মাথা মুণ্ডান (৪) তওয়াফে-যিয়ারত করা। এই তরতীবের খেলাফ অজানাভাবে অথবা ভুলক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ করার দরুণ কোনও গোনাহ হইবে না বটে, কিন্তু হানাফী মজহাব মতে আসল নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি জানোয়ার কোরবাণী করিতে হইবে।

এহরাম খুলিবার সময় মাথা মুড়াইয়া ফেলা

৮৮৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জকালীন (১০ তারিখে এহরাম খোলার সময়) মাথা মুড়াইয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং ছাহাবীদের মধ্যেও অনেকেই মাথা মুড়াইয়া ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক চুল কাটিয়া ছিল।

৮৯০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! যাহারা (হজ্জের এহরাম খুলিতে) মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ায় শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও হযরত (দঃ) এই দোয়াই করিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথা কামাইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও শামিল করুন। তৃতীয় বা চতুর্থবারে হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও।

৮৯১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—اللهم اغفر للمحلقين! "হে আল্লাহ হজ্জ উপলক্ষে যাহারা মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিন।" ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ার মধ্যে শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও হযরত (দঃ) ঐরূপ দোয়াই করিলেন—হে আল্লাহ! যাহারা মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিন। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদেরেও শামিল করুন। তৃতীয়বারের পর রসুলুল্লাহ (দঃ) وللمقصرين "এবং যাহারা চুলের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ সমূহও মাফ করিয়া দিন" এই বলিয়া উভয়কেই দোয়ার মধ্যে শামিল করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দ্বারা হজ্জ উপলক্ষে পুরুষের জন্য মাথা মুড়াইয়া ফেলার ফজিলত প্রমাণিত হইল। মাথা মুড়াইয়া ফেলিলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিন বা চারবারের দোয়া লাভ হইবে। যে ব্যক্তি চুলের শুধু কিছু অংশ কাটিবে সে মাত্র একবারের দোয়া লাভ করিবে। মহিলাদের মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ। তাহারা চুলের মাথা কর্তন করিবে—এত গুলি চুলের মাথা যাহা পূর্ণ মাথার চুলের অন্ততঃ চতুর্থাংশ হয়।

৮৯২। হাদীছ ঃ—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (একবার ওমরার এহরাম খোলাকালে) আমি ধারাল লৌহ-ফলক দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চুল কাটিয়া দিয়াছিলাম।

মছআলাহ ঃ—চুল যদি কাটা হয় তবে অন্ততঃ মাথার চতুর্থাংশ পরিমাণের চুলের আগা সুস্পষ্ট পরিমাণে কাটা ওয়াজেব। (শামী, ২—২৪৮)

মছআলাহ ঃ—১০ই জিলহজ্জ দিনে জামরা-আকাবায় কংকর মারা এবং কোরবাণী করা এবং চুল কাটিয়া এহরাম খোলার পর মিনার মধ্যে কাজ থাকে শুধু ১১ই তারিখে তিনটি জামরায় কংকর মারা এবং ১২ই তারিখেও তিনটি জামরায় কংকর মারা। সেই কংকর মারার সময় হইল দিনে; তবুও মধ্যবর্তী দুইটি রাত্র মিনাতেই অবস্থান করিতে হইবে। রাত্রে অন্যত্র থাকিয়া দিনের বেলা আসিয়া কংকর মারার কাজ সমাধা করা ইহা নিয়ম বিরোধী কাজ; অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে তাহা করা যাইতে পারে।

কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিভিন্ন মছআলাহ

৮৯৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর বেলার পর কংকর মারিয়াছেন এবং অবশিষ্ট কয়দিন দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর কংকর মারিয়াছেন!

৮৯৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল (১০ই তারিখের পর) কংকর কোন সময় মারিব? তিনি বলিলেন, শাসনকর্তা কোনও

বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাঁহার সহিত (তথা তাঁহার প্রবর্তিত ব্যবস্থানুসারে) তুমিও কঙ্কর মারার কাজ সম্পন্ন কর। ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমরা (ছাহাবীগণ) অপেক্ষারত থাকিতাম; যখন সূর্য্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইত তখন কঙ্কর মারিতাম।

মছআলাহ্ঃ—হানাফী মজহাব মতে এরূপ অপেক্ষা করিয়া সূর্য্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করার পর কঙ্কর মারা ওয়াজেব, ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নহে।

৮৯৫। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারার সময় নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অনেক লোক উর্দ্ধ প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার উপর (হজ্জের বিধি-নিষেধ সম্বলিত) কোরআন শরীফের ছুরা-বাকারা নাযেল হইয়াছিল অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই স্থানে অর্থাৎ নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিয়াছেন।

৮৯৬। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি এইরূপে দাঁড়াইয়া জামরা-আকাবাকে সাতটি কঙ্কর মারিয়াছেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফের দিক তাঁহার বাম-পার্শ্বে এবং মিনার দিক তাঁহার ডান-পার্শ্বে ছিল এবং প্রতিটি কঙ্কর মারিবার সময় "আল্লাহ আকবার" ধ্বনি দিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার উপর ছুরা বাকারাহ নাযেল হইয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)) এইরূপই করিয়াছেন অর্থাৎ মক্কা শরীফকে বাম দিকে মিনাকে ডান দিকে রাখিয়া জামরার দিকে মুখ করিয়া কঙ্কর মারিয়াছেন।

৮৯৭। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) "প্রথম জামরা"কে সাতটি কঙ্কর মারিতেন; প্রতিটির সঙ্গেই "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন। অতঃপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া নিম্ন প্রান্তে দীর্ঘ সময় কেবলামুখী হইয়া দাড়াইয়া হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। তারপর "মধ্যম জামরা"কে ঐরূপেই কঙ্কর মারিতেন এবং বাম দিকে আসিয়া নিম্ন প্রান্তে কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইতেন এবং দীর্ঘ সময় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। অতঃপর "জামরা-আকাবা"কে নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিতেন উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

মছআলাহ্ঃ—দশই জিলহজ্জ জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারা এবং চুল ফেলিয়া এহরাম খোলার পর তাওয়াফে-যেয়ারত তথা হজ্জের ফরজ তওয়াফ আদায় করার পূর্বেই সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে। (২৩৬ পৃঃ ৮০৩ হাদীছ)

ফরজ তওয়াফ করার পূর্বে শুধুমাত্র স্ত্রী ব্যবহার ছাড়া আর সবই করিতে পারে। একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—অনেকে ভুল করে। মাথার চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে জামা-কাপড় পড়া বা সুগন্ধি ব্যবহার করা কিম্বা নখ কাটা ইত্যাদি যে কোন কাজ করিলে কাফ্ফারা ওয়াজেব হইয়া যাইবে। চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে ঐরূপ কিছুই করা যাইবে না; চুল ফেলিতে যত বিলম্বই হউক। চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পরেই ঐসব কাজ করা জায়েয হইবে—পূর্বে নহে।

বিদায় তওয়াফ

৮৯৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সকলের প্রতিই এই আদেশ যে, প্রত্যেকেরই মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে বিদায়ের সময় বাইতুল্লার সহিত শেষ মোলাকাত তওয়াফের দ্বারা অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাকে বিদায় তওয়াফ বলে। অবশ্য ঋতুবতী নারীকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

৮৯৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মিনা ত্যাগের দিন) জোহর, আছর, মাগরেব ও এশার নামায মোহাচ্ছাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তথায় কিছু সময় আরাম করার পর বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইয়া (বিদায়) তওয়াফ করিয়াছিলেন।

তওয়াফে-জেয়ারতের পর এবং বিদায়-তওয়াফের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে সেই নারী কি করিবে?

৯০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জের সময় হযরতের বিবি—) ছফিয়্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার (বিদায়-তওয়াফের পূর্বে) ঋতু আরম্ভ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা অবগত হইয়া বলিলেন, সে কি আমাদের সকলকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবে? (হযরত (দঃ) ভাবিয়াছিলেন, তওয়াফে-জেয়ারত যাহা ফরজ হয়ত তিনি তাহাও শেষ করেন নাই। তাই ঐ তওয়াফের জন্য ঋতু শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য হযরতেরও অপেক্ষা করিতে হইবে, ফলে সকলকেই অপেক্ষমান থাকিতে হইবে।) কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে জানাইল যে ছফিয়্যা (রাঃ) পূর্বেই তওয়াফে-জেয়ারত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আর অপেক্ষা করিতে হইবে না।

মছআলাহ ঃ—তওয়াফে-জেয়ারত যাহা কোরবাণী দেওয়ার পর আদায় করা হয় উহা ফরজ। উহা ব্যতিরেকে হজ্জ পূর্ণ হয় না। তাই উহা আদায়ের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতু শেষে ঐ তওয়াফ না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেই।

বিদায়-তওয়াফ যাহা হজ্জ-কার্য্য সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় করা হয় উহা ফরজ নহে, ওয়াজেব বটে, কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর উপর উহা ওয়াজেবও থাকে না। তাই উহার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক নহে।

৯০১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন মহিলা যদি তওয়াফে জেয়ারত করিয়া থাকে তবে ঋতু অবস্থায় বিদায় তওয়াফের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রথমে ইহার বিপরীত বলিয়া থাকিতেন, কিন্তু পরে তিনিও বলিয়াছেন যে, সত্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঋতু অবস্থায় নারীদের জন্য ঐ অনুমতি দান করিয়াছেন।

মোহাচ্ছাবে অবতরণ করা

মিনা ও মক্কা শহরের মধ্য ভাগে একটি স্থানের নাম "মোহাচ্ছাব"। অতীতে মক্কা শহর-সম্প্রসারণ ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল না, সম্পূর্ণ এলাকা জনশূন্য ফাঁকা ময়দান ছিল। বিদায়-হজ্জে রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনায় অবস্থান সমাপ্ত করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে বিদায় তওয়াফের জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায তথায়ই পড়িয়াছিলেন, কিছু সময় নিদ্রাও গিয়াছিলেন। অতঃপর মক্কায় আসিয়া বিদায় তওয়াফ করিয়াছিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ৮৯৯ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা আছে।

মক্কা হইতে মদীনার পথ মোহাচ্ছাব এলাকা দিয়াই ছিল, তাই বিদায় তওয়াফের জন্য মক্কা শহরে আসিবার কালে নবী (দঃ) মাল-আছবাব মোহাচ্ছাবেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং বিদায় তওয়াফের পর মোহাচ্ছাবেই ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতেই মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৩ তারিখ মিনা হইতে মক্কায় আসাকালে যে, নবী (দঃ) মোহাচ্ছাবে অবতরণ করিয়াছিলেন এ সম্পর্কে অনেক ছাহাবী এবং বিভিন্ন ইমামগণের মত এই যে, ইহা একটি স্বাভাবিক অবতরণ ছিল; হজ্জের নিয়মিত এবাদতের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

৯০২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবতাহ্ তথা মোহাচ্ছাব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছিল—শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তথায় মাল-ছামান রাখিয়া তথা হইতে মদীনা পানে যাত্রা সহজ ছিল।

৯০৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মোহাচ্ছাবে অবতরণ শরীয়তের কোন হুকুম নহে। উহা শুধু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছিল।

● ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, উক্ত অবতরণ হজ্জের একটি সুন্নত এবাদৎ।* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উহাকে হজ্জের একটি সুন্নতই গণ্য করিতেন এবং তথায় অবতরণে সচেষ্ট হইতেন। (মোসলেম শরীফ)

৯০৪। **হাদীছ ঃ**—ওবায়দুল্লাহ (রঃ)কে মোহাচ্ছাবে অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নাফে (রঃ) হইতে বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং খলীফা ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় অবতরণ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায পড়িতেন এবং কিছু সময় নিদ্রা যাইতেন—এই সব আমল নবী (দঃ) করিয়াছেন, বলিয়াও বর্ণনা করিতেন।

৯০৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় কোরবাণীর পর (১২ তারিখে) মীনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আগামীকল্য মিনা হইতে রওয়ানার দিন (১৩ তারিখে) আমরা (বিদায় তওয়াফের জন্য মিনা হইতে মক্কা যাওয়ার পথে) মক্কা সংলগ্ন খায়ফে-বনী কেনানা তথা "মোহাচ্ছাব" নামক স্থানে অবতরণ করিব। সেস্থানেই মক্কার বৃহৎ বৃহৎ শক্তি ও গোত্রদ্বয়—কোরায়েশ ও কেনানা (অঙ্কুরেই ইসলামকে বিলুপ্ত ও আল্লার রসুলকে পর্যুদস্ত করার জন্য আল্লার রসুলের সহায়তাকারী) হাশেম বংশ ও মোত্তালেব বংশের বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রতিষ্ঠার উপর শপথ করিয়াছিল। তাহারা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে কেহই হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয় কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি করিতে পারিবে না—যাবৎ তাহারা মোহাম্মদ (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে আমাদের হস্তে সমর্পন না করে। (২১৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—নবুওত প্রাপ্তি তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল নিয়োজিত হওয়ার সপ্তম বৎসরের ঘটনা ইহা। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাফল্য কোরায়েশ ও মক্কাবাসীকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করিবে ইহাই স্থির করিল। হযরতের প্রধান সহায়তাকারী স্বীয় চাচা আবু তালেব এই সংবাদ অবগত হইয়া হাশেম

---

* ১৯৫০ ইং সনে আমি নরাধম হজ্জ উদযাপনে মিনা হইতে মক্কায় পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম। তখন মোহাচ্ছাব এলাকাটি ফাকা ময়দানই ছিল; শুধু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণস্থলে একটি মসজিদ ছিল। আমরা অতি সহজেই তথায় অবতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ১৯৫৮ ইং সনে দেখিলাম, মক্কা শহর সম্প্রসারিত হইয়া উক্ত সমুদয় এলাকা শাহী মহল সহ বড় বড় সুরম্য দালান কোঠায় ঘিরিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত মছজিদখানা এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাড়ী-ঘরের ঘেরাও এর মধ্যে আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ পায়ে হাঁটিয়া খোঁজ করিলে বাহির করা সম্ভব হইতে পারে।

ও মোত্তালেব বংশীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন। এই বংশদ্বয় কোরায়েশ গোত্রের মধ্যে হযরতের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই তাহারা স্বীয় প্রথা ও রীতি অনুযায়ী অন্যান্যদের বিরুদ্ধে স্বীয় ঘনিষ্ঠের রক্ষা ও সহায়তায় উদবুদ্ধ হইল এবং আবু তালেবের কথায় হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাকে নিজেদের বস্তিতে নিয়া আসিল।

অন্যান্য কোরায়েশগণ হাশেম ও মোত্তালেব বংশদ্বয়ের এই আচরণে ক্ষুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। এমনকি, মক্কার প্রভাবশালী অধিবাসী—অন্যান্য কোরায়েশ ও কেনানা গোত্রদ্বয় "মোহাচ্ছাব" নামক ময়দানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে এই অসহযোগিতার উপর শপথ গ্রহণ করিল। অসহযোগিতার বিষয়বস্তু একটি শপথনামা আকারে লিখিত হইল এবং তৎকালীন প্রথানুযায়ী বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশার্থে ঐ শপথনামার একটি নকল আল্লার ঘরে লটকাইয়া রাখা হইল।

হাশেম ও মোত্তালেব বংশদ্বয় স্ব স্ব প্রতিজ্ঞার উপর অটল রহিল; কোন ভয়-ভীতিই তাহাদিগকে দমাইতে পারিল না। তাহারা স্বীয় বস্তির মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে লাগিল। সমগ্র দেশ তাহাদের প্রতি অসহযোগিতায় মাতিয়া উঠিল। জীবন-ধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য দুরূহ হইয়া উঠিল। এমনকি, তাহারা বৃক্ষপত্রের সাহায্যে জীবনধারণে বাধ্য হইল, কিন্তু তথাপিও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইল না—হযরত (দঃ)কে শত্রুদের হাতে অর্পণ না করায় অটল থাকিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবু তালেব এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বংশদ্বয়ের লোকজন দীর্ঘ তিন বৎসরকাল এইরূপে বন্দী-জীবনের ন্যায় সমগ্র দেশ-খেশ হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা স্বীয় চাচা আবু তালেবকে এই সংবাদ শুনাইলেন যে, তাহারা শপথ নামার যে দুইটি কপি লিখিয়াছিল, উহার একটি নিজেদের নিকট রাখিয়াছিল এবং অপরটি কা'বা ঘরে লটকাইয়া রাখিয়াছিল। উহার একটির মধ্যে প্রারম্ভিক ও শপথ ইত্যাদিতে লিখিত আল্লার নামসমূহ এবং অপরটির মধ্যে আল্লার নাম ব্যতীত অন্যান্য লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ ঘুণ পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। (ইহার মধ্যে বোধ হয় এরূপ ইঙ্গিত নিহিত ছিল যে—আল্লাহ দ্রোহিতামূলক অন্যায় অত্যাচারের অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত রাখা হইল না।)

আবু তালেবের নিকট ইহা বহু পরীক্ষিত ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন সংবাদ অবাস্তব হয় না। তাই তিনি তাঁহার এই সংবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ কয়েক জন সঙ্গীকে লইয়া মসজিদে-হারামে উপস্থিত হইলেন এবং কোরায়েশ-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ভাতিজা আমাকে একটি আশ্চর্যজনক অদৃশ্য সংবাদ জানাইলেন। আমি মনে করি, এই সংবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার উপরই তাঁহার সম্পর্কিত

বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। তিনি খবর দিয়াছেন, তোমাদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত অবস্থায় বাকী থাকে নাই। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে তোমাদের আশু কর্তব্য এই যে, তোমরা স্বীয় গোড়ামী পরিত্যাগ কর। স্মরণ রাখিও—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কস্মিনকালেও তাঁহাকে তোমাদের নিকট অর্পণ করিব না। হাঁ—যদি ঐ সংবাদ অবাস্তব হয় তবে এখনই আমরা তাঁহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। এই মীমাংসায় তাহারা সম্মত হইয়া শপথনামা খুলিয়া দেখিতে পাইল সত্য সত্যই ঐ অবস্থাই সংঘটিত হইয়াছে। এই ঘটনা দৃষ্টে তাহারা তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ইহাকে হযরতের যাদুবিদ্যার ক্রিয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কয়েক জন লোকের প্রচেষ্টায় এই পরীক্ষার উপর শপথ ছিড়িয়া ফেলা হইল এবং অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইল। (ফতহুল-মোলহেম)

তৎপর সুদীর্ঘ প্রায় ষোল বৎসর পরে ইসলামের উন্নতি ও প্রভাব বিস্তারের চরম অবস্থায় বিদায়-হজ্জকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) অতীত জীবনের দুঃখ-যাতনার অবস্থাসমূহ স্মরণ করতঃ বর্তমান জীবনের উপর প্রাণ ভরিয়া স্বীয় মাবুদের শোকরিয়া আদায় করার জন্য সেই "মোহাচ্ছাব" ময়দানে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কেয়ামত পর্য্যন্ত হযরতের উম্মতগণেরও কর্তব্য—হজ্জের সফরকালে ঐ স্থানে অবতরণ করতঃ হযরতের সাধনার লক্ষ্য করা এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চরম দুদিনের বিনিময়ে ইসলামের চরম সুদিনের উপর আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করা।

"জু-তুয়া" স্থানে অবতরণ

৯০৬। হাদীছঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় প্রবেশ করিতে "জু-তুয়া"* নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন এবং ভোর বেলায় মক্কা শহরে প্রবেশ করিতেন। আর মক্কা হইতে যাত্রাকালেও জু-তুয়ার পথেই যাইতেন এবং ভোর পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

---

* পূর্বোল্লিখিত "মোহাচ্ছাব" স্থানটি বাইতুল্লাহ শরীফ তথা মক্কা শহরের কেন্দ্রীয় স্থান হইতে এক মাইলের অধিক দূরে। আর আলোচ্য "জু-তুয়া" স্থানটি বাইতুল্লাহ শরীফের অনতি দূরেই। হযরতের যুগে হযরত এই স্থানটি মক্কার শহরতলী ছিল, কিন্তু এখন উহা মক্কা শহরেরই একটি মহল্লা। আমরা ইহাকে এই নামেই পরিচিত পাইয়াছি। উক্ত মহল্লায় মসজিদ আছে, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের স্থল ঐ মসজিদের স্থানে নয়। উহার নিকটবর্তীই একটি কূপ; সেই কূপের নিকটেই হযরত (দঃ) অবতরণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত। উক্ত কূপকে কেন্দ্র করিয়া তথায় একটি গুম্বজের ন্যায় নির্মিত ১৯৫০ ইং সনে দেখিয়াছি।

রসুলুল্লার (দঃ) বিদায়-হজ্জ*

হিজরতের পূর্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক হজ্জই করিয়াছেন, এমনকি হয়ত প্রতি বৎসই হজ্জ করিয়া থাকিতেন। হিজরতের পর অষ্টম হিজরী পর্য্যন্ত ত হজ্জ করা হযরতের জন্য অসাধ্য ছিল; যেহেতু মক্কা শত্রু কবলিত ছিল। অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে মক্কা জয় হইল; ঐ বৎসর তিনি হজ্জের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। নবম হিজরীর বৎসরও নবী (দঃ) নিজে হজ্জে গেলেন না, আবু বকর (রাঃ)কে আমীরুল-হজ্জ নিয়োজিত করিলেন; তিনি হজ্জ গমনেচ্ছু মোসলমানদিগকে নিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া আসিলেন। হযরতের হজ্জে এই বিলম্বের হেতু ও কারণ হয়ত অনেকই ছিল, কিন্তু এই সুযোগে বিশেষ দুইটি সুফলও ফলিয়াছিল।

(১) নবম হিজরী পর্য্যন্ত আরবে কাফের-মোশরেকরা অবাদে চলাফেরা করিত, এমনকি কাফের-মোশরেক অমোসলেমরাও হজ্জ করিতে আসিত। নবম হিজরী সনে পবিত্র কোর-আনে ছুরা তওবার এক বিশেষ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আরব ভূখণ্ডকে একমাত্র আল্লার অনুগত মোসলেম জাতির জন্য সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ হিসাবে তথায় কাফের-মোশরেকদের অবস্থান ও অবাধ চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ঘোষণার তারিখ নবম হিজরী ১০ই জিলহজ্জ হইতে চার মাসের অবকাশ প্রদান করা হইল। এমনকি যাহাদের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের সহ-অবস্থান চুক্তি সম্পাদিত ছিল তাহাদিগকে শুধু চার মাস নিরাপত্তা দানের সহিত ঐরূপ সমুদয় চুক্তি বাতিল ঘোষিত হইল। ছুরা তওবার উক্ত ঐতিহাসিক ঘোষণাকে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিশেষতঃ নবম হিজরী সনের হজ্জ উপলক্ষে পূর্ব নীতি অনুযায়ী সমাগত সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জারী করার জন্য হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে নিজস্ব যানবাহনে করিয়া বিশেষ প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন। নিয়মতান্ত্রিক আমীরুল-হজ্জ আবু বকর (রাঃ) সকলকে নিয়া মক্কা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন; তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) মারফত আদিষ্ট হইয়া হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে বিশেষরূপে উক্ত দায়িত্ব দিয়া মক্কায় পাঠাইলেন। ঘোষণাটি বিশেষভাবে ঢোল-শোহরত করা হইল এবং স্পষ্ট ভাষায় এই ঘোষণাও দেওয়া হইল— لا يحجن بعد العام مشرك "এই বৎসরের পর কোন কাফের-মোশরেক অমোসলেম হজ্জ করিতে আসিতে পারিবে না।" সুদীর্ঘ হজ্জের কার্য্য বিধি সকলকে প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য উন্মুক্ত ও বাহিক নিরাপদ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল; উল্লিখিত ব্যবস্থা সেই প্রয়োজনেরই সমাধান হইল।

(২) মোসলমানদের সারা জীবনে একবারের একটি বিশেষ ফরজ, যাহার কার্য্যাবলী সুদীর্ঘ এবং জটিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রত্যক্ষরূপে উহার শিক্ষা লাভ করিতে ব্যাপক হারে অধিক সংখ্যায় লোকদের সুযোগ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল যাহা সময় সাপেক্ষ। এক

* হজ্জ অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদটি রাখেন নাই। ৬৩১ পৃষ্ঠায় অন্য প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসর অধিক সময় পাওয়াতে চতুর্দিকে ব্যাপকহারে লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করার প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হইল। হযরতের পক্ষ হইতেও ব্যাপক ভাবে অধিক প্রচারণা চালাইবার সুযোগ হইল। ফলে (সংখ্যা নির্দ্ধারণকারীদের কাহারও মতে) এই হজে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মোসলমানের সমাবেশ হইল ; ঐ সময় মোসলমান শুধু আরবের বিভিন্ন এলাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) দশম হিজরী সনে হজ্জ করিবেন বলিয়া সর্বত্র লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাইলেন। ফলে চতুর্দিক হইতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইল ; সকলেরই উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া তাঁহার অনুকরণে হজ্জ আদায় করিবে। হযরত (দঃ) স্বীয় উটের উপর ছওয়ার হইলেন, আমি তাঁহার কাফেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম ; এত অধিক সংখ্যক লোকের কাফেলা ছিল যে, হযরতের ডানে, বামে সম্মুখে ও পেছনে আমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত লোক ছিল। সকলের মধ্যভাগে ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ)। হযরতের উপর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইতে ছিল ; তিনি স্বীয় আমল ও কার্য্যের দ্বারা পবিত্র কোরআনের কার্যকরী ব্যাখ্যা দেখাইতে এবং আমরা তাঁহার অনুকরণে কাজ করিয়া যাইতে ছিলাম।

হজ্জ অধ্যায়ের প্রায় সমুদয় হাদীছই বিভিন্ন ছাহাবী কর্তৃক সেই বিদায়-হজ্জেরই খণ্ড খণ্ড বর্ণিত হাদীছসমূহ। "বিদায়-হজ্জ" আরবী ভাষায় "হজ্জাতুল-ওয়াদা"-এরই অর্থ। এই আখ্যাটি হযরতের সময়েই ছাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই হজ্জের পরে অনতিবিলম্বেই ইহজগত হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণই এই আখ্যার মর্ম ছিল। এই হজ্জের পূর্বক্ষণে এবং সমাপনের মধ্যে হযরত (দঃ) ইহজগত ত্যাগ আসন্ন হওয়ার বিভিন্ন ইঙ্গিত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পাইয়াছিলেন—যাহার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে "হযরতকে ইহজগত ত্যাগের সূচনা জ্ঞাপন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। উহা লক্ষ্যেই হয়ত হযরত (দঃ) নিজেই এই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ আখ্যা দিয়াছিলেন। এই হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে হযরতের সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের আরম্ভে হযরত (দঃ) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৎসর পরে এই দিনে এই স্থানে হয়ত তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ আর হইবে না। এইভাবে সকলকে বিদায় দানের ভঙ্গিমায় হযরত (দঃ) সেই ভাবণে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাই ছাহাবীগণও সেই আখ্যা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই আখ্যার অর্থ তখনই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যখন উহার মর্ম—ইহজগত হইতে হযরতের বিদায় বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

৯০৭। হাদীছ ঃ—✕ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমাদের মধ্যে থাকা সময়েই আমরা কথা-বার্তায় হজ্জাতুল-ওয়াদা'—বিদায়-হজ্জ আখ্যাটি ব্যবহার করিতাম। অবশ্য ঐ সময় আমরা লক্ষ্য করিতাম না, বিদায়-হজ্জ আখ্যার মর্ম কি।

✕ এই হাদীছের প্রথম অংশ ৬৩২ পৃষ্ঠা হইতে এবং অবশিষ্ট ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে অনূদিত।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জের সময় হজ্জ এবং ওমরা এক সঙ্গে করার সুযোগ নিয়াছিলেন (যাহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয় *।) হযরত (দঃ) নিজের সঙ্গে (৬৩টি) কোরবাণীর উটও নিয়াছিলেন। (মদীনার অনতি দূরে মদীনার দিকের মিকাত) জুল-হোলায়ফা হইতে নিয়মিত ভাবে কোরবাণীর পশুগুলি সঙ্গে পরিচালিত করার বিশেষ ব্যবস্থা * করিয়াছিলেন। তথা হইতে এহরাম বাঁধাকালে প্রথম ওমরা তারপর হজ্জ উভয়টির উল্লেখ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুকরণে আরও কিছু সংখ্যক লোক ওমরা ও হজ্জ একত্রে করার সুযোগ নিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরবাণীর পশু সঙ্গে লইয়া ছিল; আর কেহ কেহ তাহা সঙ্গে লয় নাই। মক্কায় পৌছিয়া হযরত (দঃ) লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যে, যাহারা কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে তাহারা ত হজ্জ সমাপ্ত পর্য্যন্ত নিজ নিজ এহরামের উপর স্থির থাকিবে। কিন্তু যাহারা কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই তাহারা ওমরার দুইটি কার্য্য তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়া মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করিবে। অতঃপর (৮ তারিখে) পুনরায় হজ্জের এহরাম বাঁধিবে। (এইরূপে মধ্যস্থলে এহরাম ভঙ্গ করিয়া একই ছফরে প্রথমে ওমরা তৎপর হজ্জ করাকে "হজ্জে-তামাত্তো" বলা হয়। এই প্রকার হজ্জে ১০ তারিখে একটি কোরবাণী করা ওয়াজেব হয়।) যদি কেহ সেই কোরবাণীর জন্য পশু সংগ্রহ করিতে সক্ষম না হয়, তবে হজ্জ অবস্থায় (১০ তারিখের পূর্বে) তিনটি রোযা এবং বাড়ী আসিয়া সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় পৌছিয়া তওয়াফ করিলেন তওয়াফের সময় হজরে-আসওয়াদ চুম্বন করিলেন, তিন চক্করে রমল করিলেন এবং চার চক্করে সাধারণরূপে চলিলেন। তওয়াফ পূর্ণ করিয়া মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর ছাফা পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন এবং ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ছায়ী করিলেন। (সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ওমরার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যেহেতু তিনি কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই জন্য তিনি এহরাম ছাড়িতে পারিলেন না;) তিনি এহরাম অবস্থায়ই রহিলেন। দশ তারিখে কোরবাণীর দিন হজ্জের সমুদয় কার্য্য আদায় করিয়া এবং কোরবাণীর পশু জবেহ করিয়া এবং তওয়াফে জেয়ারত আদায়

---

* হযরতের নিজস্ব বিদায়-হজ্জ হজ্জে-কেরাণ ছিল—ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ৮০৯ ও ৮১২ নং হাদীছে রহিয়াছে এবং আরও প্রমাণাদি আছে।

* মক্কা শরীফে কোরবাণী করার জন্য কোন পশু সঙ্গে লইলে কোরবাণীর জন্য নির্দ্ধারিত হওয়ার নিদর্শনরূপে অতি সাধারণ বস্তু—পুরাতন চামড়া ইত্যাদি গাথিয়া মালারূপে সেই পশুর গলায় লটকাইয়া দেওয়া উত্তম। এতদ্ভিন্ন উক্ত নিদর্শনের আরও ব্যবস্থা আছে। হযরত (দঃ) তাহাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

করিয়া পূর্ণরূপে এহরাম খুলিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার ন্যায় কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়া ছিল তাহারাও তাঁহার ন্যায় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিল।

ব্যাখ্যা ঃ—মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসিলে মক্কায় তওয়াফ ও ছায়ী করার পর এহরাম ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু হজ্জ বা হজ্জ ও ওমরা উভয় তথা হজ্জে-কেরাণের এহরাম বাঁধিলে সাধারণ মছআলাহ এই যে, কোরবাণীর পশু সঙ্গে না আনিলেও সে হজ্জের সমুদয় কার্য্য পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত এহরাম ছাড়িবে না। নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জ কালে এই সাধারণ মছআলার বিপরিত অর্থাৎ কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই এমন সকল ব্যক্তিকেই এহরাম ভঙ্গ করিবার আদেশ দিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কারণবশতঃ ছিল; যাহা "হজ্জের প্রকার" পরিচ্ছেদে ৮১৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এরূপ করিতে স্বয়ং নবী (দঃ)ই নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আমাদের সাধারণ মছআলাহ অনুযায়ীই চলিতে হইবে; অন্যথায় কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হজ্জের মধ্যে খলীফা তথা মোসলেম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁহার নিয়োজিত বিশেষ প্রতিনিধি আমীরুল হজ্জকে তিন দিন ভাষণ দিতে হয়। (১) জিলহজ্জের সাত তারিখ মক্কায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ। (২) নয় তারিখ আরাফার মসজিদে নামেরাতে জোহর ও আছর একত্রে জোহরের ওয়াক্তে পড়াকালে; নামাযের পূর্বক্ষণে জুমার নামাযের ন্যায় আজানের সহিত দুই খুৎবার ন্যায় দুইটি ভাষণ। (৩) এগার তারিখ মিনায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জে উক্ত তিন দিন এবং দশ তারিখেও ভাষণ দিয়া ছিলেন। হযরতের সেই সব ভাষণ যে কিরূপ ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা বলার প্রয়োজন নাই। ঐ সব ভাষণে হযরত (দঃ) দ্বীন-ইসলামের বিশেষ বিশেষ বৈপ্লবিক নীতি ও আদর্শের বর্ণনা দিয়াছেন; যাহা ইসলামী ইতিহাসের এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনী আলোচনা শাস্ত্রের বিশেষ বিষয়বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন বিষয় বিশেষতঃ মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মূল নীতিটি উক্ত ভাষণ সমূহের প্রত্যেকটিতেই বিঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত ভাষণ সমূহের কোনটিই পূর্ণ ও ধারাবাহিকরূপে একজনের বর্ণনায় একত্রিত নাই। বরং উহার বিশেষ বিশেষ খণ্ড সেই ভাষণের অংশ হওয়া উল্লেখের সহিত হাদীছরূপে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। উহার কোন কোন বর্ণনা বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে; উহা ছাড়া আরও কিছু বর্ণনা বিভিন্ন কেতাবে রহিয়াছে। বোখারী শরীফ অনুবাদ কার্য্যে ফয়েজ ও বরকত দানের মূল কেন্দ্র মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে একটি ছোট পুস্তিকায় এই সম্পর্কে অনেকগুলি বর্ণনার সমাবেশ করিয়াছিলেন। এখানে প্রথমে বোখারী শরীফে বিদ্যমান বর্ণনার অনুবাদ হইবে, অতঃপর উক্ত পুস্তিকার বর্ণনাগুলিও উদ্ধৃত হইবে এবং উহাতে অতিরিক্ত অনেক বর্দ্ধিত অংশও আছে যাহা 'আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ' কিতাব হইতে গৃহিত

৯০৮। হাদীছঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জে ১০ই জিলহজ্জ) কোরবাণীর দিন ভাষণ দিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

يا ايها الناس اى يوم هذا

قالوا يوم حرام قال فاى بلد هذا

قالوا بلد حرام قال فاى شهر هذا

قالوا شهر حرام قال فان دماءكم

واموالكم واعراضكم حرام

كحرمة يومكم هذا فى بلدكم

هذا فى شهركم هذا - فاعادها

مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم

هل بلغت اللهم هل بلغت لا ترجعوا

بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب

بعض - فليبلغ الشاهد الغائب -

হে জনমণ্ডলী! আজিকার দিনটি কিরূপ দিন? সকলেই বলিল, বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিন কোন প্রকার মারামারি কাটাকাটি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ—হারাম বলিয়া সর্বস্বীকৃত)। হযরত (দঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, এই এলাকাটি কোন্ এলাকা? সকলেই বলিল, হরম শরীফের এলাকা (যাহার সম্মান আদিকাল হইতেই সর্ব-স্বীকৃত)। হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ মাস? সকলেই বলিল, (সর্ব সম্মত ও সুপরিচিত) বিশেষ সম্মানিত মাস। (এই ভাবে সম্মানের দিন, সম্মানের মাস, সম্মানের এলাকা একত্রে সমাবেশিত হওয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক) হযরত (দঃ) বলিলেন, এই মাসের, এই এলাকার, এই দিনের সমষ্টিতে যে সম্মান এবং পরস্পরের মারামারি কাটাকাটি যেরূপ কঠোর হারাম, প্রত্যেক মোসলমানের জান, মাল, আবরু-ইজ্জত সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রূপ সম্মানিত এবং উহার ক্ষতি সাধন তদ্রূপ কঠোর হারাম। হযরত (দঃ) এই সতর্কবাণী পুনঃ পুনঃ কয়েকবার দোহ্‌রাইলেন। তারপর উর্দ্ধপানে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও—আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও—আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। খবরদার, খবরদার—তোমরা আমার তিরোধানের পরে কাফেরী কার্যে লিপ্ত হইও না যে, একে অন্যকে হত্যা কর। হে লোক সকল! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে আমার এই সতর্ক বাণী পৌছাইয়া দিও।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهٗ اِلٰى اُمَّتِهٖ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে বলিয়াছেন, ঐ আল্লার কসম যাহার হাতে আমার জান—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বাণী স্বীয় উম্মতের প্রতি তাঁহার ওছিয়্যত—শেষ বিদায়ের বাণী ; সযত্নে উহা রক্ষা করা উম্মতের বিশেষ কর্তব্য। (২৩৪ পৃঃ)

৯০৯। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বিদায়-হজ্জে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে বলিলেন—

হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন্ মাসকে অধিক সম্মানিত মনে কর (যে মাসে সর্বপ্রকার ঝগড়া-লড়াই ও লুট-ছিনতাই কঠোর হারাম গণ্য করিয়া থাক)? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই মাস। হযরত (দঃ) বলিলেন, কোন্ এলাকাকে অধিক সম্মানিত গণ্য কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই এলাকা। হযরত (দঃ) বলিলেন কোন্ দিনকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই দিন—জিলহজ্জের ১০ তারিখ।

اَلَا اَىُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا شَهْرُنَا هٰذَا قَالَ اَلَا اَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا بَلَدُنَا هٰذَا قَالَ اَلَا اَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا يَوْمُنَا هٰذَا ـ

হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ—তোমাদের জান, মাল, আবরু-ইজ্জৎ সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রূপ সুরক্ষিত—পরস্পর উহার ক্ষতি সাধনকে আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম করিয়া দিয়াছেন যেরূপ এই দিনের, এই এলাকার, এই মাসের সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। অবশ্য শরীয়তের বিধান মতে যে হক উহার উপর প্রবর্তিত হইবে তাহা উসুল করা হইবে *।

قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ـ

তোমরা লক্ষ্য কর। আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম ত? এই কথাটি তিনবার

اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ

* যেমন—জানের উপর হদ্দ ও কেছাছ, মালের উপর যাকাত ইত্যাদি, আবরু-ইজ্জতের উপর তা'যিরাত তথা শরীয়ত নির্ধারিত বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

يَجِيْبُوْنَهُ اَلَا نَعَمْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

বলিলেন! প্রত্যেক বারই লোকেরা উত্তর দিতেছিল, নিশ্চয় হাঁ। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, খবরদার—আমার তিরোধানের পরে তোমরা কাফেরী কাজে লিপ্ত হইয়া যাইও না যে—তোমাদের একে অন্যকে হত্যা করে।

(বোখারী শরীফ ১০০৩ পৃঃ)

৯১০। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر وقف النبى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ وَقَالَ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জে ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন মিনায় কংকর মারিবার জায়গা সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইলেন এবং সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

اَتَدْرُوْنَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ-

তোমরা জান কি—এইটা কোন্ এলাকা? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা হরম শরীফের এলাকা (যথায় মারামারি কাটাকাটি কঠোর হারাম এবং অতি জঘণ্য বলিয়া সর্বস্বীকৃত।) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন দিন? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভাল ভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিনে খুন-খারাবী করা কঠোর হারাম ও অতি জঘণ্য বলিয়া সর্ব স্বীকৃত)। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন্ মাস? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ সম্মানিত মাস (যে মাসে কোন অন্যায় অত্যাচার করা কঠোর হারাম ও অতি জঘণ্য বলিয়া সর্ব স্বীকৃত)।

قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا. هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهٖ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

হযরত (দঃ) বলিলেন, জানিয়া রাখ—নিশ্চয় তোমাদের জান, মাল, আবরু-ইজ্জতকে পরস্পর ক্ষতি সাধন করা আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র ও সর্বদার জন্য ঐরূপ হারাম করিয়াছেন, যেরূপ হারাম এই দিনের এই মাসের এই এলাকার সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। (পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত) হজ্জে-আকবার তথা মহান হজ্জের একটি বিশেষ দিন এই দিনটি; (এই মহান দিনে এই বিদায়ী বাণী।) অতঃপর হযরত নবী (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও (আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম।) এই বলিয়া নবী (দঃ) লোকদেরকে শেষ বিদায় দিতে লাগিলেন, সেই সূত্রেই লোকেরা ইহাকে বিদায় হজ্জ আখ্যা দিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত তিনটি হাদীছের ন্যায় আবু বকরাহ (রাঃ) হইতেও হাদীছ বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ প্রথম খণ্ডে ৬০ নং হাদীছে হইয়াছে। উক্ত হাদীছের অনুবাদে দেখান হইয়াছে যে, মানুষের শরীরের চামড়াটুকুর নিরাপত্তার বিষয়টিও এই ঘোষণায় উল্লেখ রহিয়াছে। জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত হাদীছ এই বিষয়ে বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ ৯৬ নং হাদীছে হইয়াছে। এই হাদীছ সমূহের মূল বিষয়বস্তু একই; অবশ্য শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনের ভূমিকা বর্ণনায় কিছু বিভিন্নতা রহিয়াছে; উহার দরুণ ছাহাবীগণের বর্ণনায় গড়মিলের ধারণার বিভ্রান্তি হওয়া চাই না। কারণ, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ মক্কায়, আরফায়, মিনার—বিভিন্ন দিনে হইয়াছে; তদুপরি লক্ষ্যের অধিক লোকের সমাবেশ, গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ; যথা-সাধ্য সকলকে শুনাইবার প্রয়োজন, অতএব অন্ততঃ মিনার মধ্যে যথায় হজ্জের কোন সুদীর্ঘ আমলের ব্যস্ততা নাই—সেখানে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের একটি বৈপ্লবিক মূল নীতি (Fundamenutal right) "মানুষের জান, মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাকে খণ্ড খণ্ড সমাবেশে বিশেষ ভাষণরূপে শুনাইয়া ছিলেন এবং বিভিন্ন সমাবেশে শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনে বস্তুতঃই বিভিন্নতা ছিল; বর্ণনাকারীগণ এক একজনে এক এক সমাবেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ই তিন সমাবেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলামের গৌরবোজ্জল মুল নীতি—

● মানুষের জানের নিরাপত্তা, এমনকি তাহার শরীরের এবং উহার চামড়াটুকুরও নিরাপত্তা, ● মানুষের মালের নিরাপত্তা, এবং ● মানুষের আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তা— এই ব্যাপক নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার দানই ছিল ইসলামের একটি বিশেষ মূল নীতি যাহার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়াছিলে বিশ্ব নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বত্র। বিশেষতঃ তাঁহার বিদায়-হজ্জের বিদায় বাণীর প্রতিটি ভাষণে তিনি উক্ত অধিকারের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা দিয়াছেন। হযরত (দঃ) ১০ই জিলহজ্জ মিনার ভাষণের মধ্যে উক্ত নিরাপত্তাকে অত্যন্ত কঠোর এবং বিশেষরূপে মজবুত প্রতিপন্ন করার জন্য ভাষণ দানের দিন, কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ তাৎপর্য্যপুর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক এই বাস্তবটি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, এই দিনটি মহান কোরবাণীর দিন--যেই দিনটিতে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করাকে অতীত কাল হইতেই সর্ববাদী সম্মতরূপে, এমনকি তৎকালীন খুন-খারাবী লুটপাটকারী দুর্দ্ধর্ষ স্নেহহীন আরব জাতির ধর্ম মতেও অত্যন্ত জঘন্য ও অবৈধ গণ্য করা হইত। তদ্রূপ এই মহান জিলহজ্জ মাস--মহা সম্মানের চার মাসের একটি যাহার পবিত্রতাও ঐরূপই। তদ্রূপ এই এলাকাটি মহা পবিত্র হরম শরীফের এলাকা—যেই এলাকার পবিত্রতাও ঐরূপই। এই তিনটি মহা পবিত্রের একত্রে সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক হযরত (দঃ) তাঁহার মূল উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পবিত্রের সমাবেশে মানুষের জান-মালকে যেরূপ সুরক্ষিত গণ্য করা হইয়া থাকে, ইসলামের বিধানে প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মাসে, প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত পরিগণিত—উহার উপর সামান্য আচড়ও হারাম নিষিদ্ধ। উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে আরও অধিক সুকঠিনরূপে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ভুমিকা স্বরূপ প্রথমে আরও একটি তথ্য হযরত (দঃ) ব্যক্ত করিয়াছেন যাহার উল্লেখ মোসলেম শরীফে আবু বকরাহ (রাঃ)-এর হাদীছে রহিয়াছে—

"শুনিয়া রাখ, কালের চক্র ঘুর্ণায়মান হইয়া উহার ধারা-পরম্পরা ঐ অবস্থায় আসিয়াছে যে অবস্থা উহার ছিল ঐ দিন হইতে যেই দিন আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎসর বার মাসের; তন্মধ্যে চারটি মাস মহা সম্মানিত;

أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ

যাহার তিনটি একের পর এক মিলিত— ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ
জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহরম। আর একটি
হইল রজব যাহা শাবানের পূর্বে।" الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ۔

ব্যাখ্যা ঃ— চারটি মহা সম্মানিত মাস যাহার মধ্যে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করা সকলেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ গণ্য করিত। অন্ধকার যুগে খুন ও লুটের ব্যবসায়ী আরব জাতিরা নিজেদের উক্ত ব্যবসার সুবিধার জন্য ঐ সম্মানিত মাসগুলির বিশেষতঃ ধারাবাহিক মাস তিনটির অবস্থানে রদ-বদল করিত। যেমন—জিলকদ মাসে খুন-লুট হইতে বিরত থাকায় অভাব দেখা দিয়াছে; পরবর্তী আরও দুই মাস ঐরূপে বিরত থাকিলে খাওয়া জুটিবে না, তাই সাব্যস্ত করা হইত যে, জিলহজ্জ বা মহরম তাহার অবস্থান তথা জিলকদের পর পর আসিবে না, বরং দুই বা চার মাস পরে আসিবে। এইভাবে জিলকদের পর বস্তুতঃ জিলহজ্জ সম্মানিত মাসের অবস্থান বা তারপর সম্মানিত মাস মহরমের অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও উহাকে অন্য মাসের নামকরণ করিয়া তখন খুন ও লুটের কাজ চালাইয়া নিত এবং সুযোগ মতে অন্য যে কোন সময় জিলহজ্জ বা মহরম মাস উদযাপন করিত। এই শ্রেণীর রদ-বদল দ্বারা মাস সমূহের ধারা-পরম্পরা ও ক্রমিকতায় বিরাট গড়মিল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল; যদ্দরুণ ইতিপূর্বে হজ্জও উহার যথাসময়ে উদযাপিত হইত না। কোন অন্য মাসের উপর জিলহজ্জের নামকরণে হজ্জ হইত। অতএব কারণেই উক্ত রদ-বদলকে "নাছী" নামে আখ্যায়িত করিয়া পবিত্র কোরআন উহাকে অতিরিক্ত কুফুরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হজ্জের বৎসর ঘটনাক্রমে রদ-বদলের ঘূর্ণিচক্র মাসগুলিকে প্রকৃত ধারা ও ক্রমিকতার উপর আনিয়া দিয়াছিল। অনেকে লিখিয়াছেন, অষ্টম হিজরীতে ইসলামে হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও নবম হিজরীতে নবী (দঃ) হজ্জ করেন নাই। দশম হিজরী সনে ঘূর্ণিচক্র উক্ত ক্রিয়া করিবে এবং হজ্জ উহার সঠিক সময় প্রকৃত জিলহজ্জ মাসে উদযাপিত হইবে উহারই অপেক্ষায় আল্লার কুদরত হযরতের হজ্জকে এক বৎসর বিলম্বিত করিয়াছিল।

ঘূর্ণিচক্রের উক্ত প্রতিক্রিয়ার তথ্যটি প্রকাশ করিয়া নবী (দঃ) এই কথাটিও বুঝাইয়াছেন যে, বর্তমান জিলহজ্জ মাস কৃত্রিম—শুধু নামের জিলহজ্জ মাস নহে, বরং প্রকৃত জিলহজ্জ মাস এবং কোরবাণীর দিনটির দিনটিও তদ্রূপ প্রকৃত কোরবাণী দিন। এই প্রকৃত জিলহজ্জ মাসে এবং কোরবাণীর দিন মানুষের জানমাল যেরূপ সর্ববাদী এবং সর্ব সম্মতভাবে সুরক্ষিত গণ্য; ইসলামের বিধানে প্রতি দিনে ও প্রতি মাসে উহা তদ্রূপই সুরক্ষিত গণ্য।

উম্মতের কল্যাণের আরও অনেক কিছু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই বিদায় বাণীর ভাষণে বলিয়াছেন। যথা—

৯৯১। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হজ্জের উল্লেখ করতঃ বলিলেন, নবী (দঃ) ভাষণ দানে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। তারপর দজ্জালের আলোচনা করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهٗ اَنْذَرَهٗ نُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاِنَّهٗ يَخْرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهٖ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّهٗ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهٗ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثًا وَيْلَكُمْ اُنْظُرُوْا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

যত নবী আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই নিজ উম্মতকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন, এমনকি নূহ (আঃ)ও স্বীয় উম্মতকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণ ত করিয়াছেনই! (পূর্বে কোন উম্মতেই দজ্জালের আবির্ভাব হয় নাই;) তোমাদের মধ্যে অবশ্যই তাহার আবির্ভাব হইবে। (সে খোদায়ী দাবী করিবে, কিন্তু সে যে খোদা নয় উহার প্রমাণে) তাহার বিভিন্ন অবস্থাবলী তোমাদের সাধারণ বুঝে সুস্পষ্ট না হইলেও ইহা ত নিশ্চয় সুস্পষ্ট হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা ত সর্বময় দোষ-ত্রুটিমুক্ত, আর দজ্জালের চোখও দোষী হইবে—(বাম চোখটা ত একেবারেই লেপাপোছা দৃষ্টিহীন হইবে এবং) ডান চোখটা স্ফীত হইবে, যেমন আঙ্গুরের ছড়ায় কোন একটি আঙ্গুর বহির্ভূত থাকে।

জানিয়া রাখ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরস্পর তোমাদের জান-মালকে সর্বদার জন্য ঐরূপ কঠোর ভাবে হারাম করিয়া রাখিয়াছেন যেরূপ এই মহান দিনে, এই এলাকায় এই মাসে উহা (সর্ব স্বীকৃতরূপে) কঠোর হারাম। হে লোক সকল! আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিলাম ত! সকলেই সমবেত কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল—হাঁ। হযরত (দঃ) তিন বার বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে লোক সকল! তোমাদের ধ্বংস হইবে—লক্ষ্য রাখিও, তোমরা আমার তিরোধানের পর কাফেরীরূপ ধারণ করিও না যে—একে অন্যের গলা কাটিবে। (৬৩২ পৃঃ)

● অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐতিহাসিক বিদায়-হজ্জের ভাষণ সমূহের যে সব খণ্ড বিভিন্ন কেতাব হইতে মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে পুস্তিকাকারে একত্রিত করিয়া গিয়াছেন উহা বদ্ধিতাকারে উদ্ধৃত হইল—

أَيُّهَا النَّاسُ اِسْمَعُوا فَاِنِّي لَا اَدْرِىْ لَعَلِّي لَا اَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هٰذَا فِي مَوْقِفِي هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا ـ

হে লোক সকল! আমার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিও! বোধ হয়—এই বৎসরের পরে এইরূপ মহান হজ্জের সুযোগে এই মহান মাসে এই মহান জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত আর ঘটিবে না।

● اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ـ

(১) তোমরা সকলে ভালভাবে—শুনিয়া রাখ—বর্বর ও অন্ধকার যুগের সমস্ত কুসংস্কার* আমি পদদলিত ও বাতিল করিলাম।

● دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ـ

(২) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বর্বর ও অন্ধকার যুগের রীতি** পদদলিত ও বাতিল। হত্যার ঐরূপ প্রতিশোধের সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত ঘটনা আমাদের নিজেদের একটি ঘটনা—রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের খুনের ঘটনা।+ সে বাল্যাবস্থায় বনুসায়াদ গোত্রীয় দাই মাতার গৃহে থাকিয়া দুধ পান করিত; বনুহোজায়েলদের কাহারও নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে সে তথায় নিহত হইয়া ছিল।

● وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

(৩) সুদ ব্যবসা যাহা অন্ধকার যুগের গহিত ব্যবস্থা উহা সম্পূর্ণ বাতিল। অবশ্য ঋণের আসল টাকা প্রাপ্য হইবে; (পাওনাদার খাতকের নিকট হইতে মূল ঋণের অধিক উশুল করার) অন্যায় তোমরা করিতে পারিবে না;

---

* অন্ধকার যুগের কুসংস্কার বলিতে সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম, লুটপাট, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ্যপান, নাচ-গান বাদ্য এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজা। আর নারীদের বেপর্দা বেহায়ারূপে অবাধ চলাচলকে ত পবিত্র কোরআনেই সুস্পষ্টরূপে অন্ধকার যুগের কুসংস্কার বলা হইয়াছে (২২ পাঃ ১রুঃ দ্রষ্টব্য)

** পিতার অপরাধে পুত্রকে, পুত্রের অপরাধে পিতাকে এইরূপ একজনের অপরাধে তাহার আত্মীয়-কুটুম্বের বা বংশের কিম্বা দেশের অন্যকে প্রতিশোধ গ্রহণে হত্যা করার নীতি অন্ধকার যুগে প্রচলিত ছিল।

+ "রবিয়া" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-এর ছেলে ছিলেন, তাঁহার ছেলে বনুহোজায়েল গোত্রের কোন লোকের দ্বারা নিহত হইয়া ছিল; তাই বর্বর যুগের রীতি অনুযায়ী রবিয়ার গোষ্ঠি বনুহোজায়েল গোত্রের যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় ছিল। নবী (দঃ) সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যাহৃত বাতিল ঘোষণা করিলেন।

وَلَا تُظْلَمُوْنَ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ.

তোমাদের উপরও (আসল টাকা না দেওয়ার) অন্যায় করা হইবে না। সুদ বাতিল করার ঘোষণা সর্বপ্রথম আমাদের উপর বাস্তবায়িত করিতেছি। (আমার চাচা) আব্বাস-পুত্র আবদুল মোত্তালেবের সুদের পাওনা টাকা বাতিল করিয়া দিলাম। তাঁহার সমস্ত সুদ প্রত্যাহার বাতিল হইয়া গেল×।

● اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

(৪) ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, সাময়িক কাজ উদ্ধারের জন্য চাহিয়া আনা জিনিষ আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে এবং দুগ্ধবতী পশুকেও সাময়িকভাবে দুধ খাওয়ার সাহায্য স্বরূপ দিলে সেই পশুও আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে ÷। কেহ কোনরূপ জামিন হইলে সে দায়ী হইবে।

● اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

(৫) হে জনমণ্ডলী! তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা একই এবং আদি পিতাও একই। সুতরাং কোন আরবী কোন অ-আরবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না, কোন অ-আরবী কোন আরবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। সাদা কালোর প্রতি এবং কালা সাদার প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। হাঁ—খোদাভক্তি ও খোদা-ভিরুতার চরিত্রগুণে মানুষের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইলে; সেই গুণ যাহার বেশী হাসিল হইবে সে আল্লার নিকট অধিক মর্য্যাদাবান হইবে।

× আইনের শাসন প্রবর্তনে সোনালী আদর্শের উজ্জল দৃষ্টান্ত নবী (দঃ) এখানে দেখাইয়াছেন। শাসনকর্তাকে প্রতিটি আইন সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিতে হয়।

হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আদর্শ আইন প্রবর্তন করিতে যাইয়া নবী (দঃ) দেশের প্রচলিত রীতিকে বাতিল ঘোষণা করিলেন এবং সেই আইনকে সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিলেন—আপন ভাতিজার দাবীকে উক্ত আইনে বাতিল করিয়া দিলেন। তদ্রূপ সুদের পাওনা বাতিল করার আইন নবী (দঃ) সর্বপ্রথম নিজ চাচার উপর প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) লগ্নির ব্যবসা করিতেন; লোকদের নিকট সুদের বহু টাকা তাঁহার পাওনা ছিল। সেই সব টাকার দাবীকে নবী (দঃ) বাতিল করিয়া দিলেন।

÷ অর্থাৎ শুধু ভোগ দখলের দ্বারা মালিকানা সত্ত কায়েম হইবে না।

● اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ اِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَاِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ وَعَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يَاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَقَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِاَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا وَاِنَّكُمْ اِنَّمَا اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ۔

(৬) পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, অতএব হে পুরুষগণ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখিও। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, স্ত্রীদেরও হক তোমাদের উপর রহিয়াছে। তোমাদের বড় হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানায় অন্যের স্থান দিবে না যাহা তোমাদের অসহনীয় (স্বীয় সতীত্ব পূর্ণরূপে রক্ষা করিবে।) এবং এই হক যে, তাহারা এমন কোন কাজ করিবে না যাহা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, ফাহেসা ও বেহায়াপনা; যদি ঐরূপ কাজ করে তবে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে, শয্যায় তাহাদের হইতে বিমুখ বিরাগী হইয়া থাকা; আরও প্রয়োজন হইলে শাস্তিও দিতে পার, কিন্তু আঘাত জনিত প্রহার করিতে পারিবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় যদি নির্লজ্জ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় তবে ভদ্রোচিত খোরপোশের পূর্ণ অধিকার তাহাদের জন্য প্রবর্তিত থাকিবে। আমার বিশেষ নির্দেশ নারীদের সম্পর্কে পালন করিও যে, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখিবে; তাহারা তোমাদের স্বামীত্বের বন্ধনে আবদ্ধা রহিয়াছে, স্বেচ্ছাধীন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে গ্রহণ করার সুযোগ তাহাদের নাই। তোমরা তাহাদিগকে লাভ করিয়াছ আল্লার আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্বকে নিজের জন্য হালাল করিতে পারিয়াছ আল্লার বিধানের অধীনে। (সেই আল্লার রসুল আমি তাহাদের সম্পর্কে তোমাদেরে এই সব নির্দেশ দিলাম।)

● لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

(৭) কোন মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সংসারের কোন কিছু ব্যয় করিবে না। প্রশ্ন করা হইল, খাদ্যবস্তুও নয়—ইয়া রসুলুল্লাহ!

وَلَا الْأَنْعَامِ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহাত উত্তম মাল পরিগণিত। (আল্লারই রসুল—আমি তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই সব নির্দেশ দিলাম।)

● فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا. أَمْرًا بَيِّنًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

(৮) হে জনমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা ভালভাবে বুঝিয়া রাখ। আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিয়াছি, তদুপরি এমন জিনিষ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি যে, যাবৎ তোমরা উহাকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া থাকিবে কিছুতেই কস্মিন কালেও তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে না; উহা অতি পরিস্কার উজ্জল জিনিষ—আল্লার কেতাব (কোরআন শরীফ) এবং আল্লার নবীর ছুন্নাহ (হাদীছ)।

● أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي وَاعْقِلُوهُ تَعْلَمُنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخُ الْمُسْلِمِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ أَخِيهِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

(৯) হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়া শোন এবং উহাকে পুর্ণরূপে উপলব্ধি কর। জানিয়া রাখিও—প্রত্যেক মোসলমান অপর মোসলমানের ভাই এবং সকল মোসলমান পরস্পর ভাই ভাই, কাহারও জন্য স্বীয় ভ্রাতার কোন জিনিষ হস্তগত করা জবর দখল করা হালাল নহে, অবশ্য যদি কেহ নিজ মনের খুশিতে কোন কিছু দিয়া দেয়।

● إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا حَتَّى تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا.

(১০) নাক-কান কাটা কালা হাবশী গোলামকেও যদি কোন কাজে তোমাদের উপরস্থ নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লার কেতাব কোরআন তথা শরীয়ত অনুযায়ী তোমাদিগকে পরিচালিত করে তবে তোমরা তাহার কথা মানিয়া চলিবে এবং তাহার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করিবে, যাবৎ না সুস্পষ্ট আল্লার নাফরমানী দেখিতে পাও।

● أَرِقَّائَكُمْ أَرِقَّائَكُمْ أَطْعِمُوهُمْ

(১১) সতর্ক থাকিও, সতর্ক থাকিও দাস-দাসী (এবং করতলগত ভৃত্য-মজদুরদের) সম্পর্কে।

مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ ـ

তোমরা যেরূপ খাইবে তাহাদেরও অবশ্যই খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। তোমরা যেরূপ পরিবে তাহাদেরও অবশ্যই পরার ব্যবস্থা করিবে।

● اَلَا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يُّعْبَدَ فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهٗ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهٖ ـ

(১২) তোমাদের এই পবিত্র ভূখণ্ডে শয়তান-পূজা পুনঃ প্রচলিত হইবে—ইহা হইতে শয়তান চিরতরে হতাশ হইয়াছে; কিন্তু তোমরা যাহা ছোট বা হাল্কা গণ্য কর সেইরূপ পাপেও শয়তান সন্তুষ্ট হইবে। (আর শয়তানকে সন্তুষ্ট করিলে ধাপে ধাপে তোমাদের উপর ধ্বংস নামিয়া আসিবে।)*

● اَلَا لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ ـ

(১৩) খবরদার—তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইও না—(দলাদলি, মারামারি স্বার্থের লড়াই করিয়া একে অন্যকে আক্রমণ ও) হত্যা করিও না। অচিরেই তোমাদিগকে আল্লার দরবারে হাজির হইতে হইবে; আল্লাহ তোমাদের কার্য্যাবলীর হিসাব নিবেন।

● اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاٰتُوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ـ

(১৪) তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, পাঞ্জেগানা নামায পড়িবে, রমজান মাসের রোযা রাখিবে, নিজ নিজ মালের যাকাত আদায় করিবে, উপরস্থের নিয়মানুবর্ত্তী থাকিয়া শান্তি বজায় রাখিবে—এই সবই হইল, প্রভু-পরওয়ারদেগারের বেহেশত লাভের অবলম্বন।

● اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ اَدّٰى اِلٰى كُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ وَاِنَّهٗ لَايَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ (وَلَا اِقْرَارٌ) وَالْوَلَدُ

(১৫) হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা মিরাস বন্টনে প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য (পবিত্র কোরআনে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; কোন ওয়ারেসের জন্য (উহার অতিরিক্ত বেশী পাইবার সুযোগ দানার্থে) কোন প্রকার অছিয়্যত

* এই অবস্থা সর্ব ক্ষেত্রেই। যেখানে ইসলামী সমাজ মজবুতরূপে গড়িয়া উঠিবে এবং মূর্তি ও দেব-দেবী ইত্যাদির শয়তানী পূজা বন্ধ হইয়া যাইবে সেখানেও সকলকে সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হইবে যে, অন্যান্য পাপাচার দ্বারা যেন শয়তানকে সন্তুষ্ট করা না হয়। অন্যথায় সেখানেও ধাপে ধাপে ধ্বংস নামিয়া আসিবে।

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْتَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لَهٗ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔

কার্য্যকরী হইবে না। (কোন স্বীকৃতিও কার্য্যকরী হইবে না।) কোন নারীর বৈধ সম্পর্ক যে পুরুষের সহিত থাকিবে উক্ত নারীর সন্তানের বংশ তাহার সঙ্গেই গণ্য হইবে; প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে তাহাদের হিসাব আল্লার নিকট হইবে। ব্যাভিচারের দ্বারা বংশ-সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না, পক্ষান্তরে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি নিজের পিতা তথা জন্মের বংশ ছাড়িয়া নিজকে অন্য বংশের সম্পৃক্ত করিবে এবং উহার নামে আত্মপরিচয় দিবে বা নিজের মনিব ছাড়িয়া অন্য মনিবের পরিচয় দিবে তাহার উপর আল্লার লা'নৎ এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সকল লোকদের লা'নৎ হইবে; তাহার ফরজ নফল কোনও এবাদত আল্লাহ কবুল করিবেন না। (এই জালিয়াতির প্রতারণা ও ভ্রান্তি সুদুর-প্রসারি।)

● قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

(১৬) আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা ধর্মকে সম্পূর্ণতার পর্য্যায়ে পৌছাইয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ নেয়ামত ইসলামকে পূর্ণত্ব দান করিলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থারূপে তোমাদের জন্য পছন্দ করিয়া নিলাম। (সুতরাং কোন রকম পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন ব্যতিরেকে তোমরা একমাত্র এই দ্বীন-ইসলামের অনুসরণ করিবে।)

● اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْىُ۔

(১৭) আমি সর্বশেষ নবী; আমার পরে আর কোন নবী আসিবে না। আমার পরে অহী চিরতরে বন্ধ। (সুতরাং দ্বীন-ইসলামের কোন অংশে Amendment সংযোজন Correction সংশোধন Modify বদলানো, Change রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা ও অবকাশই থাকিল না।)

● أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

(১৮) হে জনমণ্ডলী! আমি মানুষই বটি; হয়ত অচিরেই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দুত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য আমার নিকট পৌঁছিবে, আমি তখন প্রভুর ডাকে সারা দিব। অতএব (সমুদয় দায়িত্ব আমার হইতে বুঝিয়া রাখিয়া) প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌছাইয়া দিবে।

● إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ - لَا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا.

(১৯) চারটি বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ১। কোন বস্তুকে আল্লার তুল্য (পূজনীয় বা সঙ্গী-সাথী) গণ্য করিবে না, ২। আল্লার নিষিদ্ধ—না-হক্‌রূপে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে না, ৩। ব্যভিচার করিবে না, ৪। চুরি করিবে না।

আরফার দিন ভাষণের শেষ দিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

● وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا عَلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ

(২০) ভাই সকল। আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হইবে (যে, আল্লার দ্বীন পৌঁছাইবার কর্তব্য আমি কিরূপ আদায় করিয়াছি।) তোমরা তখন কি বলিবে? উপস্থিতবর্গ বলিয়া উঠিল, আমরা সাক্ষ্য দিব, নিশ্চয় আপনি দ্বীনকে পূর্ণরূপে পৌছাইয়াছেন; আপনার কর্তব্য পূর্ণ আদায় করিয়াছেন, আমাদের সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রচেষ্টা আপনি করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) স্বীয় শাহাদতের অঙ্গুল আকাশের প্রতি উর্দ্ধমুখী এবং লোকদের প্রতি নিম্নমুখী করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ। সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ। সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ। সাক্ষী থাকিও—এইরূপ তিনবার করিলেন।

ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সম্মুখে যে স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দানের অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে মোসলমানগণ পবিত্র মদীনায় হযরতের রওজা পাকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরূদ ও সালাম পাঠ লগ্নে উক্ত স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার প্রদানের উক্তি করিয়া থাকে। এই রীতি পূর্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে এবং থাকিবে; দরূদ-সালাম পাঠ শিক্ষা দান ক্ষেত্রে অবশ্যই উহার উল্লেখ থাকে।

হজ্জ উপলক্ষে এবং বিধর্মীদের হাট-বাজারে ব্যবসা করা

৯১২। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল-মাজায" "ওকাজ" ইত্যাদি নামক অন্ধকার যুগের কতিপয় হাট বা মেলা ছিল যাহা হজ্জ উপলক্ষে মক্কার নিকটস্থ বা মক্কার পথে অনুষ্ঠিত হইত। বিভিন্ন দেশের লোকজন হজ্জ উপলক্ষে এই সব হাট-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; ইসলাম আবির্ভাবের পর মোসলমানগণ ঐরূপে হজ্জের ছফরে ব্যবসা করাকে অসঙ্গত ভাবিতে লাগিল। সেই ধারণা খণ্ডনে কোরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হইল—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ -

অর্থ:—তোমরা (হজ্জ উপলক্ষেও) হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করিতে পার, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

ওমরা করা আবশ্যক এবং উহার ফজিলত

● ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেককেই হজ্জ ও ওমরা উভয়ই করা চাই।

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন শরীফে হজ্জের সঙ্গে ওমরাও উল্লেখ আছে, যথা—وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ "হে মোসলমানগণ! তোমরা আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় কর।"

৯১৩। হাদীছ:— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ -

অর্থ:—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার ওমরা করার পর দ্বিতীয়বার ওমরা করার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং আল্লার দরবারে গ্রহণীয় তথা শুদ্ধ হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হইল বেহেশত।

হজ্জের পূর্বে ওমরা করা

৯১৪। হাদীছ ঃ—একরেমা ইবনে খালেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজ্জের পূর্বে ওমরা করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, উহাতে দোষ নাই এবং ইহাও বলিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ করার পূর্বে ওমরা করিয়াছেন।

৯১৫। হাদীছ ঃ—কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি ওমরা করিয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, চারটি ওমরা করিয়াছেন—(১) (ষষ্ঠ হিজরী সনে ঐতিহাসিক) হোদায়বিয়ার ঘটনার ওমরা (২) (সপ্তম হিজরী সনে) উক্ত হোদায়বিয়ার ঘটনার অসম্পন্ন ওমরার কাজা-ওমরা (৩) (অষ্টম হিজরী সনে) হোনায়নের জেহাদে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে ১৩।১৪ মাইল দূরে অবস্থিত "জোয়েররানা" নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। তথা হইতেও তিনি (রাত্রে মক্কায় আসিয়া) একটি ওমরা করিয়াছেন *। (৪) বিদায়-হজ্জে হজ্জের পূর্বেকার ওমরা। প্রথম তিনটির প্রত্যেকটি (সংশ্লিষ্ট বৎসরের) জি-কা'দা মাসে এবং চতুর্থটি হজ্জের সঙ্গেই জিলহজ্জ মাসে করা হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম ওমরা তথা হোদায়বিয়ার ওমরাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যান্য ওমরার সহিত গণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা অনুষ্ঠীত হইতে পারে নাই। মক্কায় পৌছিবার পূর্বে মক্কা হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরগণ কর্তৃক মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি ওমরার কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া ঐ স্থানেই ওমরার এহরাম ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ঘটনার বিবরণ (ইনশা আল্লাহ তায়ালা) তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোরবাণীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া মিকাত হইতে এহরাম বাঁধিয়া চলিতে থাকেন। শত্রুগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ ওমরা সম্পন্ন করিতে তাঁহারা সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু ওমরা করার সমুদয় চেষ্টা ও ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়াছিলেন সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার পূর্ণ ছওয়াব লাভ হওয়া স্থিরকৃত। তাই উহাকে একটি ওমরা গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য বাহ্যিক কার্য্যে উহা সম্পন্ন হয় নাই; সন্দরুণ হযরত (দঃ) ঐ ঘটনায় সন্ধিপত্রের সুযোগ অনুযায়ী পর বৎসর ঐ অসম্পূর্ণ ওমরার কাজা করিয়াছেন; যাহাকে দ্বিতীয় ওমরা গণনা করা হইয়াছে।

---

* বর্তমানেও হাজীগণ তথা হইতে ওমরা করিয়া থাকেন। আমি নরাধমও তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বর্তমান সময় সাধারণ্যে ঐ স্থান হইতে এহরাম বাধিয়া ওমরা করাকে বড় ওমরা বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ--হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জে-তামাত্তো' প্রকারের হজ্জকারীদের হজ্জের পূর্বে ওমরা আদায় করিতে হয়; হজ্জের পূর্বে এই ওমরা আদায় করা সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশই নাই। উল্লিখিত হাদীছ সমূহে যে, হজ্জের পূর্বে হযরতের ওমরার উল্লেখ আছে তাহা ঐ শ্রেণীর ওমরাই ছিল। কারণ, হযরত (দঃ) হজ্জে-কেরাণকারী ছিলেন। কিন্তু কোরবাণীর পশু বিহীন হজ্জে-তামাত্তো'কারী ব্যক্তি মক্কায় উপস্থিত হইয়া ওমরা আদায় করিয়া হজ্জের পূর্ব পর্য্যন্ত এহরামবিহীন মক্কায় অবস্থান করে—সেই সময় ঐ ব্যক্তি "তানয়ীম" ইত্যাদি স্থান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া যদি ওমরা করিতে চায় যেরূপ হজ্জের পরে সচরাচর সকলেই করিয়া থাকে তাহা জায়েয কি-না ?

এই মছআলাহ ফতওয়া শামী দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৮ ও ১৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হজ্জের পূর্বে ঐরূপ ওমরা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে উহা নিষিদ্ধ মকরূহ এবং কাহারও মতে উহা দোষমুক্ত জায়েয।

অবশ্য—দলীল প্রমাণের দিক দিয়া জায়েয হওয়াই অগ্রগণ্য দেখা যায়, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে ঐরূপ করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কার্য্য ক্ষেত্রে উহা না করাই অগ্রগণ্য দেখা যায়।

রমজান মাসে ওমরা করার ফজিলত

৯১৬। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা নিবাসী একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে হজ্জ করিতে যাও নাই কেন ? সে আরজ করিল, আমাদের দুইটি মাত্র উট আছে। উহার একটিকে লইয়া আমার স্বামী ও পুত্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল এবং দ্বিতীয়টি পানি বহনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। (অতএব আমার কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া আমি হজ্জে যাইবার সুযোগ পাই নাই।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, (সুযোগ হইলে পর) রমজান শরীফে ওমরা করিয়া নিও; রমজান শরীফের ওমরা হজ্জ সমতুল্য।

"তানয়ীম" নামক স্থান হইতে ওমরা করা

৯১৭। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন (স্বীয় ভগ্নি) আয়েশা (রাঃ)কে নিজ বাহনে বসাইয়া "তানয়ীম" নিয়া যান এবং তথা হইতে তাহার ওমরা সম্পন্ন করাইয়া দেন।

৯১৮। হাদীছঃ—আছওয়াদ (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার সঙ্গীগণ সরাসরি হজ্জ ও ওমরা দুইটি আমল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, আর আমি শুধু হজ্জ নিয়া যাইতেছি। আয়েশা (রাঃ)কে বলা হইল, তুমি পবিত্র হইলে পর তানয়ীমে যাইও এবং তথা হইতে ওমরার

এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওমরা আদায় করিও। কিন্তু ব্যয় ও কষ্টের পরিমাণেই ওমরার ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ওমরার এহরাম হরম শরীফের সীমার বাহিরে বাঁধিতে হয় এবং হরমের সীমা মক্কার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পরিমাণের দূরত্বে অবস্থিত। "তানয়ীম" নামক স্থানটি মক্কার সন্নিকটে—প্রায় তিন মাইল দূরে হরমের সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং এই দিকেই হরমের সীমার দূরত্ব কম। এই জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে তথায় যাইয়া ওমরার এহরাম বাঁধার পরামর্শ দিলেন। ঐ ঘটনায় একা আয়েশা (রাঃ)ই ওমরা করিয়াছিলেন না। আবদুর রহমান (রাঃ)ও ওমরা করিয়াছিলেন বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। অতএব ঐরূপ ওমরার ফজিলত অবশ্যই আছে।

বর্তমানেও হাজীগণ সেই স্থানে যাইয়া ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ওমরা করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধারণ্যে ছোট ওমরা বলা হয়, কারণ ঐ স্থানটি মক্কা নগরীর নিকটবর্তী মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে মসজিদে আয়েশা বলা হয়; ঐ স্থান হইতেই আয়েশা (রাঃ) এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। মক্কা নগরী হইতে বার-তের মাইল ব্যবধানে "জেয়েররানা" নামক আর একটি স্থান আছে। তথা হইতে একবার রসুলুল্লাহ (দঃ) ওমরা করিয়াছিলেন। তথা হইতে ওমরা করাকে সাধারণ্যে বড় ওমরা বলা হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হজ্জের পরে ওমরা করা জায়েয এবং এই মছআলাহও প্রমাণিত হইয়াছে যে, এরূপ ওমরার জন্য কোরবাণী করিতে হইবে না বা রোজাও রাখিতে হইবে না (২৪০ পৃঃ)। অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে ওমরা করিয়া হজ্জ করিলে সেই হজ্জ "হজ্জে-কেরাণ" বা "হজ্জে-তামাত্তো" হইয়া থাকে এবং উহার জন্য একটি কোরবাণী দেওয়া আবশ্যক হয়। কোরবাণী দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার আশা না থাকিলে কোরবাণীর ঈদের দিনের পূর্বে তিনটি এবং বাড়ী ফিরিয়া সাতটি মোট দশটি রোজা রাখিতে হয়। এই সকল ব্যবস্থা তখনই অবলম্বিত হইবে যখন ওমরা হজ্জের পূর্বে করা হয়। কিন্তু হজ্জের পরে ওমরা করিলে ঐ কোরবাণী বা রোজার কোনই প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য ছওয়াবও সেই অনুপাতে কম বেশী হইবে।

শেষ বাক্যটির মর্ম এই যে, হজ্জ ছাড়া শুধু ওমরার জন্য বাড়ী হইতে দীর্ঘ ব্যয় ও পথ অতিক্রম করতঃ মক্কায় পৌছিয়া ওমরা করা উত্তম এবং উহার ছওয়াব অনেক বেশী—ঐ ওমরা অপেক্ষা যেই ওমরা হজ্জের ছফরেই আদায় করা হয়। তদ্রূপ হজ্জের ছফরেই হজ্জের পূর্বে ওমরা করতঃ হজ্জে-কেরাণ বা হজ্জে-তামাত্তো করা যাহাতে কোরবাণী বা রোযা ওয়াজেব হয় উহাতে ছওয়াব বেশী হইবে হজ্জের পরে ওমরা করা অপেক্ষা।

মছআলাহ ঃ—শুধু ওমরা সমাপনান্তে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে বিদায় তওয়াফ করার প্রয়োজন হয় না। (১৪০ পৃঃ)

কি কি কার্য্যে ওমরা পূর্ণ হয়

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—নিজ নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিবার জন্য। (বাইতুল্লাহ শরীফ) প্রদক্ষিণ (তথা তওয়াফ ও ছাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ তথা ছায়ী) করিয়া তারপর মাথার চুল ফেলিয়া হালাল হইতে।

৯১৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী সাত সনে কাজা ওমরা আদায় করাকালে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করিলেন; আমরাও তাঁহার সহিত ওমরা করিলাম। মক্কায় আসিয়া হযরত (দঃ) তওয়াফ করিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত তওয়াফ করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) "ছায়ী" তথা ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণে আসিলেন; আমরাও তাঁহার সহিত আসিলাম। আমরা হযরত (দঃ)কে ঘিরিয়া রাখিতাম যেন কোন কাফের হযরত (দঃ)কে কিছু নিক্ষেপ করিতে না পারে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, নবী (দঃ) কি ঐ উপলক্ষে কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না। ঐ ব্যক্তি আরও বলিল, হযরত নবী (দঃ) উম্মুল-মোমেনীন খাদীজা (রাঃ) সম্পর্কে যে বিশেষ সুসংবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা খাদীজার জন্য সুসংবাদ শুনিয়া রাখ—বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ কক্ষের যাহা একটি মতি খনন করিয়া তৈরী করা হইবে; তথায় সুখ শান্তিই বিরাজমান থাকিবে কোন প্রকার কোলাহল বা অশান্তির লেশমাত্র থাকিবে না।

৯২০। হাদীছঃ—আবুবকর (রাঃ) তনয়া আসমার খাদেম আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাঃ) যখনই (মক্কা শহরস্থিত) "হাজুন"* এলাকা দিয়া গমন করিতেন তখনই বলিতেন—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দিন তাঁহার রসুলের প্রতি—আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দিন (হযরত) মোহাম্মদের প্রতি।" তিনি বলিতেন, এই স্থানেই আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (বিদায়-হজ্জে)

---

* "হাজুন" মক্কা শহরের একটি মহল্লা। ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল; তখনও উহা এই নামে পরিচিত ছিল। নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে মক্কায় প্রবেশ করিয়া উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তখন তথায় হযরতের বিশেষ পতাকা উড্ডিন করা হইয়াছিল। বর্তমানে উক্ত স্থানে একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহাকে "মসজিদে রায়াহ" বলা হয়। "রায়াহ" শব্দের অর্থ পতাকা; মনে হয়—উল্লেখিত পতাকা স্থলেই মসজিদ তৈরী হইয়াছে, তথায় নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা সাধারণতঃ জনটনের মধ্যে ছিলাম—আমাদের সম্বল কম ছিল, যানবাহনেরও অভাব ছিল।

আমি এবং আমার ভগ্নি আয়েশা (রাঃ) এবং স্বামী যোবায়ের (রাঃ) এবং অমুক অমুক আমরা (মিকাত—এহরামের নির্দ্ধারিত সীমানা হইতে) ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ছিলাম। আমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ (এবং উহারই আনুসঙ্গিক—ছাফা-মারওয়ার ছায়ী) সমাপ্ত করিয়া হালাল—এহরামমুক্ত হইয়াছিলাম। তারপর বিকাল বেলার দিকে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছিলাম।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মৃতি-চিহ্ন "হাজুন" এলাকায় পৌঁছিলেই আবু বকর (রাঃ)-তনয়া আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রাণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মরণে কাঁদিয়া উঠিত এবং হযরতের প্রতি মহব্বতের অগ্নি তাঁহার প্রাণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। আসমা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ সেই স্মৃতিকে এবং সেই স্মৃতি দর্শনের প্রতিক্রিয়াকে দরূদ পাঠে স্বাগত জানাইতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মহব্বৎ তাঁহার যে কোন উম্মতের অন্তরে থাকিবে তাহার অবস্থা তদ্রুপ হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। মক্কা-মদীনায় হযরতের অসংখ্য স্মৃতি ও স্মরণ-স্বাক্ষর চিরবিদ্যমান রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন হযরতের মোবারক নাম, হযরতের হাদীছ, হযরতের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং হযরতের যে কোন আলোচনা সবই হযরতের স্মৃতি ও স্মরণ-স্বাক্ষর। প্রত্যেক উম্মতকে সেই সব ক্ষেত্রসমূহে আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভূমিকা ও আদর্শের অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ

عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

হজ্জ বা জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালের দোয়া

৯২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জেহাদ হইতে কিম্বা হজ্জ বা ওমরা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে চলার পথে কোন উচু টিলা অতিক্রম করিলে ঐ স্থানে তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

---

* হজ্জ উপলক্ষে মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া মক্কায় পৌঁছিলে ওমরার কার্য্যদ্বয় আদায় করিলেই চুল ফেলিয়া ওমরার এহরাম খুলিয়া ফেলিতে হয়। তারপর হজ্জের জন্য নূতন এহরাম বাঁধিতে হয়, উহার সর্বশেষ তারিখ হইল ৮ই জিলহজ্জ; ইহার পূর্বেও এহরাম বাঁধা যায়। আসমা (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে তাঁহাদের এই এহরাম জিলহজ্জের চার কিম্বা পাঁচ তারিখে ছিল।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ۔

অর্থ :—আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, তিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা (তাঁহারই কৃপায়) প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হইয়াছি। আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে তাঁহার দরবারে তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা তাঁহার এবাদৎ বন্দেগী ও দাসত্ব শৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ থাকিব, তাঁহার বরাবরে চিরকাল সর্বাঙ্গে ও সর্বান্তঃকরণে নত থাকিব।

আমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্তা পালনকর্তার গুণগান করিব। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় বন্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং শত্রুদলসমূহকে একমাত্র নিজ শক্তি ও ক্ষমতা বলে পরাজিত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরোক্ত দোয়ার শেষ বাক্য কয়টির মধ্যে বস্তুতঃ একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। খন্দকের জেহাদের ঘটনা—আরবের সমস্ত বস্তি ও গোত্রের লোকেরা একত্র হইয়া স্থির করিল যে, প্রত্যেক গোত্র ও বস্তি হইতে বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী যোদ্ধাগণের সমবায়ে একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদল গঠন করা হইবে। অতঃপর অতর্কিতে এক সঙ্গে সমগ্র মদীনার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া লইয়া আক্রমণ পরিচালনা করা হইবে। এইরূপে মোসলমানদের বিরুদ্ধে ১৫।২০ হাজার শত্রু সেনার এক বিভীষিকাপূর্ণ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। সারা মদীনায় তখন মোসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৩০০০ তিন হাজার। মদীনার শক্তিশালী ও ধনী অধিবাসী ইহুদীরা এত দিন মোসলমানদের মিত্র ছিল, এই সুযোগে তাহারাও শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে মোসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিল। এইরূপে মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মোসলমান ভিতর ও বাহিরের বিরাট ও শক্তিশালী শত্রুদলের কবলে পড়িয়া তাহাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়িল।

এইরূপ অসহায় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে শুধু রক্ষাই করিলেন না বরং শত্রুদলকে এরূপ বেকায়দায় ফেলিলেন যে, বহিঃশত্রুদল অসহনীয় কষ্ট ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল এবং গৃহশত্রুদল—ইহুদীরা মোসলমানদের হাতে পরাজিত হইয়া লাঞ্ছিত ও নিশ্চিহ্ন হইল। (ঘটনার বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।) খন্দক-জেহাদের মূল শত্রু পক্ষ পলায়ণ করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বাক্যসমূহ দ্বারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ছফর ও ভ্রমণ অবস্থায় নানা কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম করুণার প্রতীক ঐ ঘটনার স্মৃতি স্মরণ পূর্বক উহার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই এখানে ঐ বাক্যগুলি শামিল করা হইয়াছে।

হাজীদের আগমন এবং প্রত্যাবর্তনে অগ্রগামী হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা

৯২২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জে) মক্কায় পৌঁছাকালে আবদুল মোত্তালেব বংশীয় কতিপয় তরুণ তাঁহাকে অগ্রগামী হইয়া সম্বর্দ্ধনা জানায়। নবী (দঃ) স্বীয় বাহনে তাহাদের একজনকে সম্মুখে আর একজনকে পেছনে বসাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন।

হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে বাড়ী উপস্থিত হওয়া

শুধু হজ্জই নহে, বরং সর্বক্ষেত্রেই বিদেশ হইতে আগমনে গভীর রাত্রে বাড়ী না পৌঁছিয়া পারিলে তাহাই উত্তম এবং নবী (দঃ) সেই পরামর্শই দিয়াছেন; এক হাদীছে তাহা উল্লেখ আছে। হাদীছটি ষষ্ঠ খণ্ডে—كتاب النكاح বিবাহ অধ্যায়ে ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা অনূদিত হইবে। বিদেশ হইতে বাড়ী উপস্থিত হওয়ার উত্তম সময় সকাল বেলা কিম্বা বিকাল বেলা।

৯২৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কার যাত্রাকালে মদীনার অনতিদূরে জুল-হোলায়ফায় (বর্তমান বাবুল) গাছের নিকটস্থ মসজিদ স্থানে (আছর) নামায পড়িয়াছেন। আর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনে সেই জুল-হোলায়ফার নিম্ন প্রান্তরে ভোর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং তথায় নামায পড়িয়াছেন।

৯২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদেশ হইতে গভীর রাত্রে পরিবার-পরিজনে আসিতেন না; সকাল বেলা কিম্বা বিকাল বেলা আসিতেন।

৯২৫। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মদীনাবাসীদের (একটি কুসংস্কার খণ্ডন) সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। মদীনাবাসীরা হজ্জের ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা স্বীয় ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিত না, বরং পশ্চাদ দিকে পথ করিয়া সেই পথে ঘরে প্রবেশ করিত। একজন মদীনাবাসী

ছাহাবী প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘরের সম্মুখ দিকেরই দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিল; সেজন্য তাহার নিন্দা করা হইল। তাই এই আয়াত নাজেল হইল--

لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

"ঘরের পশ্চাত দিক দিয়া প্রবেশ করা কোন নেক কাজ নহে, পরহেজগারী অবলম্বন কর হইল নেক কাজ, ঘরে প্রবেশ করিতে উহার দরওয়াজা দিয়াই প্রবেশ কর।" (২ পাঃ ৮ রুঃ)

৯২৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বিদেশ ভ্রমণ অতি কষ্টকর; পানাহারে ব্যাঘাত ঘটায়, নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। অতএব প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে যথাসত্বর পরিবার-পরিজনে ফিরিয়া আসিবে।

ব্যাখ্যাঃ—কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে বা শরীয়ত সম্মত কোন উত্তম উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা প্রয়োজনের মধ্যেই শামিল।

এহরাম বাঁধার পর কাবা শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে প্রতিবন্ধকের সম্মুখী ব্যক্তি কি করিবে?

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

অর্থঃ—যদি তোমাদের কেহ (হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধিবার পর প্রতিবন্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌছিতে) অক্ষম হইয়া পড়ে তবে তাহাকে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে একটি সহজসাধ্য কোরবাণীর জানোয়ার এবং যাবৎ ঐ কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ হওয়ার নির্দ্ধারিত স্থানে (—হরম শরীফের সীমার ভিতর পৌছিয়া জবেহ হইয়া) না যায় তাবৎ সে ব্যক্তি মাথার চুল মুড়াইতে তথা এহরাম ভঙ্গ করিতে পারিবে না। (২ পাঃ ৮ রুঃ)

আতা (রঃ) নামক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বলিয়াছেন—শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বা রোগগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি যে কোন প্রতিবন্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম হইলে উক্ত আয়াতের আদেশ কার্য্যকরী হইবে।

৯২৭। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র ওবায়দুল্লাহ (রঃ) এবং সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া বংশের সিরিয়া কেন্দ্রিক শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পবিত্র মক্কা নগরীতে ভিন্ন শাসন ক্ষমতা

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উমাইয়া বংশের আমীর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় তাহার প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর আক্রমণ চালাইতেছিল; সেই ঘটনা প্রবাহের বৎসর আমাদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্জ করিতে উদ্যোগী হইলেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, এই বৎসর হজ্জ না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না; (আপনি এই বৎসর হজ্জ হইতে বিরত থাকুন।) আমাদের আশংকা হয়, আপনি এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন না। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আশঙ্কা আমাকে বিরত রাখিতে পারিবে না। (কারণ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফের শত্রুগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) আমারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলাম। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছিলে পর কাফেররা আমাদিগকে বাধা প্রদান করিল, আমরা কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। আমরা সকলেই এহরাম অবস্থায় ছিলাম এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোরবাণীর জানোয়ারও ছিল। (আমরা মক্কায় পৌছিয়া ওমরা আদায় করিতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ স্থানেই এহরাম ভঙ্গের ব্যবস্থা করিলাম।) নবী (দঃ) স্বীয় কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ করিলেন এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম ভঙ্গ করিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকিও— আমি ইন্‌শা আল্লাহু তায়ালা ওমরা করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিতেছি। যদি কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরা আদায় করিব এবং যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে আমিও ঐরূপই করিব যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উপরোক্ত ঘটনার সময় করিয়াছিলেন। অতঃপর জুল-হোলায়ফা তথা মদীনাবাসীদের মিকাতে পৌছিয়া তিনি ওমরার এহরামই বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ পর বলিলেন, কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম হইলে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য একই বিধান রহিয়াছে। (তখন যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী,) তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমরার সঙ্গে হজ্জে-কেরাণের নিয়্যত করিলেন।

অতঃপর তাঁহার মক্কায় পৌঁছিতে কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হইল না। তিনি হজ্জে কেরানের সমুদয় কার্য্যাবলী সমাধা করিয়া ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণী করার পর ওমরা ও হজ্জ উভয় এহরাম হইতে মুক্ত হইলেন।

ব্যাখ্যাঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এখানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন উহা ষষ্ঠ হিজরী সনের ঘটনা। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন

এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম খুলিতেছেন। নবীর স্বপ্ন অকাট্য সত্য—অহী, উহা মিথ্যা হইতে পারে না। মক্কা নগরী তখন রক্ত পিপাসু শত্রু কাফেরদের করতলগত থাকা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং প্রায় পনর শত ছাহাবী তাঁহার সহগামী হইলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মক্কার অনতিদূরে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে* পৌঁছিলে পর তখন মক্কায় পৌঁছিবার সমুদয় চেষ্টা তদবীরই বিফল হয়। অতএব তিনি ওমরা আদায় না করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং (ঐ ময়দানের কিয়দাংশ যেহেতু হরম শরীফের সীমানাভুক্ত; সুতরাং) সেই স্থানেই কোরবাণীর জন্য আনিত জানোয়ার জবেহ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

নবীগণের স্বপ্ন অকাট্য সত্য—অহী হইয়া থাকে এবং এই ঘটনায়ও তাহাই ঘটিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে শুধু ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। পরন্তু ইহা কোন সময় বা কোন বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে তাহা স্বপ্নে ব্যক্ত হইয়াছিল না। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নের অনতিকাল পরেই ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করায় অনেকেই এই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, স্বপ্নের মর্ম এই বৎসরই প্রতিফলিত হইবে। তাঁহাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু হযরতের মূল স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনা উপলক্ষে উভয় পক্ষ একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বৎসর হযরত (দঃ) ওমরা করিলেন। তৎপরবর্তী বৎসর অষ্টম হিজরী সনে ত মক্কা জয় করিয়া উহার সমুদয় কর্তৃত্বই হস্তগত করিলেন। এইরূপে অহী পরিগণিত স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার ঘটনা" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধার পর কোন ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছিয়া হজ্জ বা ওমরা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে প্রথমতঃ তাহার এই চেষ্টাই করিতে হইবে যে, অন্ততঃ মক্কা শরীফ যাইয়া তওয়াফ ও ছায়ী করার সুযোগ লাভ করিতে পারে কি না। যদি পারে তবে তাহা করিয়া মাথা মুড়াইলে এহরাম মুক্ত হইরা যাইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে তাহার জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এবং কি করিতে হইবে? এই বিষয়ে হানাফী মজহাব মতে কতিপয় মছআলাহ লেখা হইতেছে।

মছআলাহঃ— শুধু হজ্জ বা শুধু ওমরার এহরামে যদি হরমের এলাকা হইতে দূরে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তবে সে এক বৎসর বয়সের ছাগল বা দুই বৎসর বয়সের গরু, মহিষ বা পাঁচ বৎসর বয়সের উট বা ঐরূপ কোন একটি গৃহপালিত পশু হরম শরীফে ক্রয় করার মূল্য কোন আস্থাবান মানুষের মারফৎ হরম শরীফে পাঠাইবে এবং সেই পশুটি হরম শরীফের

এলাকায় জবেহ করার জন্য সম্ভাব্য রকমের তারিখ ও সময় ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে। ঐ ব্যক্তি এই সব বিষয় সম্মত হইয়া মক্কাভিমুখে চলিয়া যাওয়ার পর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এহরাম অবস্থায়ই অপেক্ষমান থাকিবে। উল্লিখিত পশু জবেহ করার নির্দ্ধারিত তারিখ ও সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর সে স্বীয় এহরাম হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে, ঐ সময় এহরাম ভঙ্গের সাধারণ নিয়ম—মাথা মুড়াইয়া ফেলা উত্তম।

মছআলাহ ঃ—যদি হজ্জে-কেরাণ অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের একত্র এহরামে ঐ অবস্থা হয় তবে উল্লিখিত রকমে দুইটি পশু জবেহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ব্যক্তির জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় উহাই যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ একটি পশু হরম শরীফের এলাকায় জবেহ করায় ব্যবস্থা করা *। ইহা ব্যতীত এহরাম মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় নাই, তাই এই ব্যবস্থার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি উহা কোন প্রকারেই সম্ভব না হয় বা ঐ কার্যের জন্য কোন লোক পাওয়া না যায় তবে কোন কোন আলেমের এরূপ মত আছে যে, সাময়িকরূপে প্রতিবন্ধকতার বা সম্ভাব্য স্থানেই একটি পশু জবেহ করিয়া এহরাম মুক্ত হইবে। অতঃপর হরম শরীফে জবেহ করার সুযোগ প্রাপ্তে পুনরায় আর একটি ঐরূপ পশু হরম শরীফে জবেহ করিবে।

মছআলাহ ঃ—উল্লিখিত আকারে পশু জবেহ করিয়া শুধু এহরাম মুক্ত হইবে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত এহরাম নফল বা ফরজ যে কোন প্রকারের হজ্জ বা ওমরার এহরামই হইয়া থাকুক না কেন উহার কাজা অবশ্য অবশ্যই করিতে হইবে, যাহার নিয়ম নিম্নরূপ। যদি শুধু ওমরার এহরাম ছিল তবে উহার কাজা একটি ওমরাই করিতে হইবে। যদি শুধু হজ্জের এহরাম ছিল, চাই ফরজ বা নফল, তবে অন্য বৎসর উহার কাজা করিতে একটি হজ্জ ও একটি ওমরা করিতে হইবে। অবশ্য পরিত্যক্ত এহরাম ফরজ হজ্জের থাকিলে অন্য বৎসর উহা পূরণ করার সময় কাজার নিয়্যত করিবে না। যদি পরিত্যক্ত এহরাম হজ্জে কেরাণ তথা হজ্জ ও ওমরার এহরাম ছিল তবে অন্য বৎসর একটি হজ্জ ও দুইটি ওমরা করিতে হইবে। ইহা হানাফী মজহাবের মছআলাহ; কোন কোন ইমামের মজহাবে ফরজ হজ্জ না হইলে উহা কাজা করা বাধ্যতামূলক নহে।

---

* ইহা হানাফী মজহাবের সিদ্ধান্ত: অন্য মজহাবে উক্ত পশু জবেহ করা হরম শরীফের সীমার ভিতর নির্দ্ধারিত নহে, বরং প্রতিবন্ধকের স্থানে বা যথায় সম্ভব হয় তথায়ই জবেহ করিবে। ইমাম বোখারী (রঃ) উভয় মজহাবই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত হাদীছের ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই ময়দানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় পশু জবেহ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ হোদায়বিয়ার ময়দান উহার এক অংশ হরম শরীফের বাহিরে বটে, কিন্তু অপর অংশ হরম শরীফের সীমার ভিতরেই অবস্থিত।

৯২৮। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হিজরী ছয় সনে) ওমরা করিতে যাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলে স্বীয় কোরবাণীর পশু জবেহ করতঃ মাথার চুল ফেলিয়া এহরাম ভাঙ্গিয়া দিলেন। (তখন সব কিছুই তাঁহার জন্য হালাল হইয়া গেল;) তিনি স্ত্রী-ব্যবহারও করিতে পারিলেন। অতঃপর পরবর্তী বৎসর ওমরা আদায় করিলেন।

প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন ব্যক্তিকে মাথার চুল কাটিবার পূর্বে কোরবাণী করিতে হইবে

৯২৯। হাদীছঃ—মেছওয়ার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (ষষ্ঠ হিজরী সনের ওমরায় বাধাপ্রাপ্ত হইলে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (এহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য) মাথার চুল ফেলিবার পূর্বেই পশু জবেহ করিয়াছিলেন। নিজেও তিনি তাহা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গী ছাহাবীদেরকেও ঐরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

রোগ বা মাথায় উকুনের আধিক্যে চুল ফেলিতে হইলে?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

অর্থঃ কোন ব্যক্তি রোগের দরুণ বা মাথায় কষ্টদায়ক বস্তুর আবির্ভাবে (মাথা মুড়াইতে) বাধ্য হইলে (সে এহরামে থাকাবস্থায় মাথা মুড়াইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে এই সুযোগ গ্রহণের) কাফফারা আদায় করিতে হইবে, তথা রোযা রাখিবে বা খয়রাত দান করিবে বা কোরবাণী করিবে। (২ পাঃ ৮ রুঃ)

৯৩০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কায়া'ব ইবনে ওজরা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট বসিলাম এবং তাঁহাকে মাথা মুড়ানোর কাফ্‌ফারা আদায় করার বিধানযুক্ত (উপরোল্লিখিত) আয়াতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আয়াতের বিধান সকলের জন্য বটে, কিন্তু উহা আমারই অবস্থা দৃষ্টে নাযেল হইয়াছিল। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম অবস্থায় ছিলাম; আমার মাথায় অত্যধিক উকুন জন্মিয়া গেল, (আমার মনে হইতেছিল; প্রতিটি চুল আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত উকুনে ভরিয়া গিয়াছে, এমন কি মাথার উকুন আমার নাকে-মুখে ঝরিয়া পড়িতেছিল।) এমতাবস্থায় আমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কষ্ট যেরূপ দেখিতেছি তদ্রূপ আমি ভাবিয়াছিলাম না। এই উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল

হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি মাথা মুড়াইয়া ফেল এবং তিনটি রোযা কর কিম্বা প্রতি মিছকীনকে অর্দ্ধ ছা' (এক সের চৌদ্দ ছটাক) হিসাবে ছয়জন মিছকীনকে তিন ছা' পরিমাণ খাদ্য বস্তু (গম) দান কর কিম্বা একটী কোরবাণী (করিয়া দান) কর।

হজ্জের সফরে সংযমশীল হওয়া আবশ্যক

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ -

অর্থ—হজ্জ করাকালীন অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় বিশেষরূপে নির্লজ্জ কার্য্য বা কথাবার্তা—এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রী-সুলভ ব্যবহার ও কথাবার্তা হইতে এবং অন্যায় অবিচার ও ঝগড়া-বিবাদ হইতে সংযমী থাকিতে হইবে। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

এতদ্ভিন্ন ৭৯৫ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে হজ্জের যে ফজীলত—সারা জীবনের গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়া; এই ফজীলত হাসিল হওয়ার শর্ত হইল পূর্ণ সংযমশীলতার সহিত হজ্জ সমাপন করা; হজ্জের সময় কোন প্রকার গালাগালি না করা, ফাহেশা কথা না বলা।

এহরাম অবস্থায় বন্যজীব বধ করিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ - وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ - وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! তোমরা এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব হত্যা করিতে পারিবে না।। তোমাদের কেহ ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করিলে বধকৃত জীবের সমপরিমাণ (মূল্যের) কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। সেই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন দুইজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেই

পয়সার (দ্বারা একটী জীব ক্রয় করিয়া) জীবটি কোরবাণী (তথা ছদকাহ) স্বরূপ কাবা তথা হরম শরীফের এলাকায় পৌঁছিতে (ও তথায় জবেহ হইতে) হইবে। কিম্বা (ঐ পয়সার দ্বারা ক্রয় করিয়া) মিছকীনদিগকে খাদ্য (প্রতি মিছকীনকে এক সের চৌদ্দ ছটাক হিসাবে গম বা উহার দ্বিগুণ অন্য বস্তু) কাফ্‌ফারারূপে দান করিবে। কিম্বা প্রতি মিছকীনের প্রাপ্যের হিসাবে এক একটি রোযা রাখিবে। এই কাফ্‌ফারা আদায়ের আদেশ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যেন সে স্বীয় কর্মের কুফল ভোগ করে। (এই বিধান ঘোষিত হইবার পূর্বে) যে যাহা কিছু করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বিধান ঘোষিত হওয়ার পর) পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার শাস্তি বিধান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, শাস্তি-বিধানের মালিক।

পানির জীব শিকার করা ও খাওয়া তোমাদের জন্য (এহরাম অবস্থায়ও) হালাল করা হইয়াছে; তোমাদের সকলের—বিশেষতঃ পথিক ও মুছাফিরদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে। কিন্তু এহরাম অবস্থায় বন্যজীব হত্যা তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। সকলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় রাখিও যাঁহার সম্মুখে তোমাদের সকলেরই বিচারের জন্য একত্রিত হইতে হইবে। (৭ পাঃ ৩ রুঃ)

এহরামহীন ব্যক্তির শিকারকৃত বন্যজীবের গোশত এহরামযুক্ত ব্যক্তি খাইতে পারিবে

৯৩১। হাদীছঃ—আবু কাতাদাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন ষষ্ঠ হিজরী সনে ওমরার জন্য (মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন তখন আমার পিতা কাতাদাহ (রাঃ)ও তাঁহার সংগী ছিলেন। সকলেই নির্দিষ্ট স্থান জুল হোলায়ফা হইতে এহরাম বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতা (মক্কা পর্য্যন্ত যাইবেন ও ওমরা করিবেন এই বিষয় নিশ্চিত ছিলেন না বলিয়া) এহরাম বাঁধেন নাই। কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ একটি সংবাদ পাইলেন যে, একস্থানে কাফের শত্রুদল একত্রিত হইয়া আছে; তাহাদের আকস্মিক আক্রমণের আশংকা হয়। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্কতা স্বরূপ একদল লোক সেদিকে পাঠাইয়া দিলেন; তন্মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। আমার পিতা এহরামহীন এবং সঙ্গীগণ এহরামযুক্ত। আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন—পথিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ একটি বন্য গাধা দেখিতে পাইলেন। আমি যখন অনুভব করিলাম যে, আমার সঙ্গীগণ কোন বস্তু দেখাদেখি করিতেছেন, তখন আমি লক্ষ্য করিলাম এবং আমিও গাধাটিকে দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিলাম; আমার চাবুকটি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গীগণকে উহা

উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, আমরা এহরাম অবস্থায় আছি, তাই শিকারের জন্য আমরা কোন প্রকার সাহায্যই করিতে পারি না। তখন আমি ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া চাবুক উঠাইলাম এবং ঘোড়ায় পুনঃ আরোহণ করিয়া গাধাটির প্রতি ধাবিত হইলাম এবং উহাকে বর্শাঘাতে কাবু করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর উহাকে লইয়া সঙ্গীগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। কেহ কেহ ইহা খাইতে রাজি হইলেন, কেহ কেহ এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খাওয়া যায় না ধারণা করিয়া বিরত রহিলেন।

এদিকে আমরা দীর্ঘ সময় রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইতে লাগিলাম, তাই আমি স্বীয় ঘোড়া দ্রুতবেগে হাঁকাইলাম। পথিমধ্যে একজন লোক মারফত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার খোজ পাইয়া দ্রুত সেইস্থানে যাইয়া পৌঁছিলাম এবং আরজ করিলাম ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার সঙ্গী—আপনার ছাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন. আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

অতঃপর আমি বন্য গাধা শিকারের ঘটনা বলিলাম, সঙ্গীগণও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আবু কাতাদাহ এহরাম বাঁধে নাই, সে একটি বন্য গাধা শিকার করিয়াছিল; আমরা উহা হইতে কিছু খাইয়াছি, অতঃপর আমরা সন্দিহান হইলাম যে, এহরাম অবস্থায় আমরা শিকারের গোশত কিরূপে খাইতে পারি? এই ভাবিয়া অবশিষ্ট গোশত আমরা খাই নাই, সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ আবু কাতাদাহকে শিকার করার আদেশ করিয়াছিল কি? বা তাহাকে শিকারের প্রতি ইশারা করিয়াছিল কি? (বা কেহ তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিল কি? বা শিকার বধ করিতে কেহ কোনরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল কি?) সকলেই না, না—বলিয়া উত্তর করিল। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে উহা খাইবার অনুমতি দান করিলেন।

মছআলাহ্ঃ—এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব শিকার করা হারাম, কোন শিকারীকে শিকারের প্রতি ইশারায় দেখাইয়া দেওয়াও হারাম, শিকারের আদেশ করা বা শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম।

মছআলাহ্ঃ—এহরাম অবস্থার ব্যক্তিরা কোন শিকার দেখিয়া হাসা-হাসি করিল যাহাতে এহরামহীন ব্যক্তি শিকার সম্পর্কে বুঝিয়া ফেলিল এবং উহা শিকার করিল—ইহাতে দোষ হইবে না।

মছআলাহ্ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গৃহপালিত জীব—উট, বকরী, গাভী, মুরগী ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় জবেহ করা জায়েয।

এহরামওয়ালা ব্যক্তি জীবিত বন্যজীব গ্রহণ করিবে না।

৯৩২। হাদীছ ঃ—ছায়া'ব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পথিমধ্যে একটি (জীবিত) বন্য গাধা হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) দাতার চেহারার উপর হাদিয়া গ্রহণ না করার প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করিতে পারিয়া তাহাকে প্রবোধ দিলেন যে, তোমার হাদিয়া গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা এহরাম অবস্থায় আছি।

এহরাম অবস্থায় এবং হরম শরীফে যে সব জীব বধ করা যায়েজ

৯৩৩। হাদীছ ঃ— عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ

وَالْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহা এহরাম অবস্থায়ও বধ করা জায়েজ— (১) কাক, (২) চিল, (৩) ইঁদুর (৪) বিচ্ছু ও কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৪। হাদীছ ঃ— عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ

وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহার প্রত্যেকটিই দুষ্ট প্রকৃতির; উহাদিগকে হরম শরীফের সীমার ভিতরেও বধ করা যায়েজ—(১) কাক, (২) চিল, (৩) বিচ্ছু, (৪) ইঁদুর ও (৫) কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৫। হাদীছ ঃ—হাফছাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে, যাহা যে কেহই বধ করিতে পারে—তাহাতে গোনাহ হইবে না। কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু এবং কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জের নবম তারিখের রাত্রে) আমরা মিনাস্থিত কোন এক পাহাড়ের গর্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম; হঠাৎ তাঁহার প্রতি ছুরা "ওয়াল-মোরছালাত" নাযেল হইল। হযরত (দঃ) ঐ ছুরাটি আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিলেন এবং আমরা তাঁহার নিকট হইতে উহা মুখস্থ করিয়া লইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের সম্মুখে একটি সর্প বাহির হইয়া আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, উহাকে বধ কর। সকলেই উহার প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু সর্পটি দ্রুত পলাইয়া রক্ষা পাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেরূপ উহার দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হও নাই; তদ্রূপ সেও তোমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল না।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছ ব্যতীত অন্যান্য হাদীছেও হরম শরীফে এবং এহরাম অবস্থায় সর্প মারার অনুমতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত জীবসমূহ হরম শরীফে এবং এহরাম অবস্থায় বধ করার অনুমতি স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত আছে। আরও কি কি কষ্টদায়ক দুষ্ট প্রকৃতির জীব হত্যা করা জায়েয তাহা নির্দ্ধারণের মধ্যে ইমামগণের মতভেদ আছে; তাই বিবেক খাটাইয়া কোন জীব মারিবে না।

হরম শরীফের সীমায় ঘাস-পাতা, তরুলতা, বট-বৃক্ষ কাটিবে না উহার কোন অংশও ছিন্ন করিবে না*

৯৩৭। **হাদীছ ঃ**—আবু শোরাইহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর দিন একটি বিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। ভাষণ দানকালে আমি নিজ চোখে হযরত (দঃ) কে দেখিয়াছি, নিজ কানে তাঁহার সেই ভাষণ শুনিয়াছি এবং বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়াছি।

ভাষণের প্রথমে তিনি আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এই মক্কা নগরীকে হরম শরীফ তথা বিশেষ সম্মানিত ও সুরক্ষিত স্থানরূপে সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মক্কা নগরীর এই বিশেষত্ব কোন মানুষের সাব্যস্তকৃত নহে; অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হইবে তাহার জন্য কখনও জায়েয বা হালাল হইবে না যে, সে মক্কা নগরীর মধ্যে কোন প্রকার হত্যা-কার্য্য করে বা উহার কোন উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে। (হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়া দিলেন যে—) কোন ব্যক্তি যদি আল্লার রসুল কর্তৃক যুদ্ধ পরিচালনার ঘটনা দ্বারা নিজের জন্যও ঐরূপ করা জায়েয মনে করিতে প্রয়াস পায়, তবে তাহাকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিও যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য বিশেষরূপে ঐ অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তোমাদের পক্ষে মুহূর্তের জন্যও ঐরূপ অনুমতি দান করেন নাই। আমার জন্য যে অনুমতি দান করা হইয়াছিল

* রোপন ও বপন করা বা রোপন ও বপন জাতীয় বৃক্ষে ও উদ্ভিদে এই আদেশ প্রযোজ্য নহে।

তাহাও শুধু নির্দিষ্ট দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর এই নগরীর সেই মহত্ব এবং বিশেষরূপে সম্মানিত ও সুরক্ষিত হওয়া পূর্বের ন্যায় (আমার এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য) বলবৎ হইয়াছে এবং ইহা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। (অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন—) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একটি বিশেষ কর্তব্য এই হইবে যে, আমার এই ভাষণের বিষয় বস্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পৌঁছাইতে থাকে।

মছআলাহ ঃ—হরম শরীফের কোন বন্যজীবকে তাড়া করা জায়েয নহে। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাগের্দ একরেমা (রঃ) বলিয়াছেন, হরম শরীফের সীমার মধ্যে কোন পশু পক্ষী কোন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে থাকিলে তথা হইতে উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া জায়েয নহে। (২৪৭ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—হরম শরীফের সীমার ভিতর লড়াই করা জায়েয নহে।

এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী স্বীয় পুত্রের জন্য তাহার এহরাম অবস্থায় তপ্ত লৌহের দ্বারা দাগ লাগানোর চিকিৎসা-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় সুগন্ধবিহীন যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

৯৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে বোহায়না (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় 'লাহয়্যে-জামাল' নামক স্থানে পৌঁছিয়া (মাথার ব্যথার দরুণ) স্বীয় মাথার মধ্যস্থলে রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—যে কোন প্রকারের চিকিৎসাই এহরাম অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে, চুল বা লোম কাটা না পড়ে। চুল বা লোম কাটার আবশ্যক হইলে নির্দ্ধারিত বিধান মতে উহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবে।

এহরাম অবস্থায় বিবাহ করা

৯৩৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মাইমুনা (রাঃ)কে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিবাহের শুধু ইজাব-কবুল সম্পন্ন করা এহরাম অবস্থায় জায়েয।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

৯৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করার আদেশ করেন? তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ব্যবহার করিও না এবং যদি কাহারও জুতা না থাকে তবে চামড়ার মোজা পায়ের পৃষ্ঠের উঁচু হাড় এবং দুই পার্শ্বের গিটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইভাবে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আর এমন বস্ত্র ব্যবহার করিবে না

যাহাকে জাফরান বা "ওয়ারস" নামক উদ্ভিদ জাতীয় বস্তুর রং স্পর্শ করিয়াছে। (কারণ উক্ত বস্তুদ্বয় সুগন্ধিময়।) নারীগণ বিশেষ পর্দার জন্য সাধারণতঃ মুখের উপর পর্দা (ব্যবহার করে) এবং হাত মোজা (ব্যবহার করিয়া থাকে; এহরাম অবস্থায় সে ঐ সব) ব্যবহার করিবে না।

মছআলাহ ঃ—নারীদের জন্য মুখের উপর যে পর্দা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য ঐরূপ পর্দা যাহা মুখের উপর লাগিয়া থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "এহরাম অবস্থায় পরিধেয়" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

এহরাম অবস্থায় গোসল করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা সম্বলিত গোসল খানায় গোসল করিতে পারে।*

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এহরাম অবস্থায় শরীর চুলকানোকে দূষণীয় মনে করিতেন না।×

৯৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মেছওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) এর মধ্যে মতানৈক্য হইল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে। মেছওয়ার (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু-আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি কূপের নিকট গোসল করিতেছেন এবং তাঁহাকে পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন; আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আপনার নিকট এই বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় মাথা কি প্রকারে ধৌত করিতেন। তখন তিনি পর্দার কাপড়টি হাত দ্বারা চাপিয়া একটু নীচ করিয়া দিলেন যেন তাঁহার মাথা আমি দেখিতে পাই। তৎপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার মাথার উপর পানি ঢালিতে বলিলেন; সে তাঁহার মাথায় পানি ঢালিয়া দিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত দ্বারা সম্মুখের দিক হইতে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক হইতে সম্মুখের দিকে মাথার চুল নাড়া দিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

---

* অবশ্য অন্যান্য আলেমগণ এহরাম অবস্থায় শরীর মর্দন করতঃ ময়লা উঠাইয়া ফিটফাটের সহিত গোসল করা মকরূহ বলিয়াছেন।

× অবশ্য লক্ষ্য রাখিবে যে, লোম, চুল যেন ছিড়িয়া বা ঝরিয়া পড়িতে না পারে।

এহরামে পরিধানে চাদর না থাকিলে কি করিবে ?

৯৪২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরফার মধ্যে যে খোৎবা তথা ভাষণ দিয়াছিলেন উহাতে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, পরিধেয় চাদর না থাকিলে পায়জামা পরিবে এবং জুতা না থাকিলে মোজা পায়ে দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—জুতা না থাকাবস্থায় চামড়ার মোজা পায়ে দিতে পারিবে, কিন্তু উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে যাহার বিবরণ পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি পরিধেয় চাদর না থাকিলে পায়জামা পরিবে, কিন্তু বিশেষ ধরণের ঢিলা পায়জামা হইলে উহাকে কাটিয়া চাদরের ন্যায় করিয়া লইবে, যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে পায়জামার আকারেই পরিধান করিবে, কিন্তু উহার জন্য ফিদ্ইয়া আদায় করিতে হইবে। যেমন ওজর বশতঃ মাথার চুল কামাইতে হইলে ফিদ্ইয়া আদায় করার মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে।

এহরাম অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী একরেমা (রঃ) বলিয়াছেন, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করিবে, কিন্তু সেই জন্য নির্দ্ধারিত ফিদ্ইয়া দিতে হইবে। ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, ফিদ্ইয়া দেওয়ার বিষয়ে অন্য কোন আলেম তাঁহার সঙ্গে একমত হন নাই। অর্থাৎ অন্যান্য সকল আলেমগণের মত এই যে, অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করার দরুণ ফিদ্ইয়া দিতে হইবে না।

৯৪৩। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার প্রসিদ্ধ ঘটনা—) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিলকদ মাসে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (মক্কা হইতে মাত্র ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে পৌছিলে পর কাফেররা নবী (দঃ)কে মক্কায় পৌছিতে বাধা দিল। শেষ পর্য্যন্ত) উভয় পক্ষে একটি সন্ধিপত্র লিখিত হইল, যাহার শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, মোসলমানগণ এই বৎসর এই স্থান হইতেই মদীনায় ফিরিয়া যাইবে। আগামী বৎসর ওমরা করার জন্য মক্কায় আসিতে পারিবে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খোলা অবস্থায় লইয়া আসিবে না—তরবারী ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার ঘটনার কিয়দাংশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ইহার পূর্ণ বিবরণ ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উল্লিখিত হাদীছে বলা হইয়াছে, পর বৎসর মোসলমানগণ তরবারি ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে। ইহা দ্বারা এহরাম অবস্থায় অস্ত্র বহন জায়েয প্রমাণিত হয়।

এহরাম ব্যতীত হরম শরীফের সীমায় প্রবেশ করা

৯৪৪। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাঁহার মাথা লোহার টুপী দ্বারা আবৃত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয়ের সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরামহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মাথা আবৃত ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন এহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

আলোচ্য মছআলার বিষয়ে ইমাম বোখারীর মত, এই যে, হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতরে এমনকি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেও এহরাম বাঁধা আবশ্যক হইবে না, এহরাম শুধু ঐ ব্যক্তিদের জন্য যাহারা হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিবে।

কিন্তু এই মছআলার মধ্যে বিভিন্ন ইমামগণের মতভেদ আছে। হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই যে, মিকাতের সীমানার বাহিরের কোন লোক যে কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছায় যাত্রা করিলে তাহার জন্য মিকাত হইতে ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসা আবশ্যক। ঐরূপ ব্যক্তির জন্য এহরামহীন অবস্থায় মিকাত অতিক্রম করা জায়েয নহে। অবশ্য যাহারা মিকাতের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারী তাহারা হরম শরীফে এবং মক্কা নগরীতে বিনা এহরামে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উল্লিখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহা সম্পর্কে হানাফী মজহাবের আলেমগণ বলেন যে, উহা হযরতের জন্য মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল ; যে রূপ হরম শরীফের সীমার ভিতরে এবং মক্কা নগরীতে যুদ্ধ পরিচালনা করার অনুমতি ঐ সময়ে তাঁহার জন্য একটি বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। হযরতের পর অন্য কেহই ঐরূপ করিতে পারিবে না—এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (দঃ) মক্কা বিজয়ের বিশেষ ভাষণে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন। ৯৩৭ নং এবং আরও একাধিক হাদীছে উহা বর্ণিত আছে।

মছআলাহ না জানায় এহরাম অবস্থায় জামা পরিলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে ?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, ভুলে বা অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান করিলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে তাহাকে কাফ্ফারা বা দম দিতে হইবে না।

এখানে হানাফী মজহাব এবং আরও বহু আলেমের মত ভিন্নরূপ। তাঁহারা বলেন, বর্তমানে শরীয়তের বিধানসমূহ স্থিরিকৃত হইয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মোসলমানের জন্য উহা শিক্ষা করা ও জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি কেহ উহাতে ত্রুটি করে তবে সে দ্বিগুণ দোষী সাব্যস্ত হইবে। অতএব এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি শরীয়তের বিধান বিরোধী কার্য্যের প্রতিফল ভোগ করা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না, বরং তাহাকে শরীয়তের নির্দেশিত শাস্তি ভোগ স্বরূপ কাফ্ফারা বা দম আদায় করিতে হইবে। তদ্রূপ ভুলবশতঃ ঐরূপ করিলেও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে; যেরূপ নামাযের মধ্যে ভুলে কথা বলিলে নামায নষ্ট হয়।

হজ্জের পথে মৃত্যু হইলে

মছআলাহ্ঃ—হজ্জ করিতে যাত্রা করিয়াছে, অতঃপর হজ্জ পূর্ণ করার পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে- সে ক্ষেত্রে যদি ৯ই জিলহজ্জ উকুফে-আরফা করার পর মৃত্যু হইয়া থাকে তবে তাহার হজ্জ সম্পূর্ণ গণ্য হইবে (৭৬৬ হাদীছ; উক্ত হাদীছের ঘটনায় হযরত (দঃ) মৃত ব্যক্তির হজ্জ পূর্ণ করার আদেশ দেন নাই)। যদিও হজ্জের দ্বিতীয় ফরজ—তওয়াফে-জেয়ারত সে না করিয়া থাকে; তাহার তওয়াফে-জেয়ারতের জন্য কিছুই করিতে হইবে না। অবশ্য যদি সে অছিয়ত করিয়া যাইয়া থাকে তাহার হজ্জ পূর্ণ করার, তবে তওয়াফে জেয়ারতের বদলায় একটি উট বা গরু কোরবাণী করা ওয়াজেব (শামী, ২—৩৩২)। আর যদি উকুফে-আরফার পূর্বে মৃত্যু হয়, এমনকি যদি মক্কায় পৌঁছিয়াও তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে তবে শরীয়তের হুকুমে তাহার হজ্জ হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং যদি সে তাহার হজ্জ করাইবার জন্য অছিয়ত করিয়া থাকে তবে তাহার ওয়ারেছদের কর্তব্য হইবে তাহার সমুদয় পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ হইতে তাহার জন্য হজ্জে-বদল করান। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যে পর্য্যন্ত সে পৌঁছিয়াছিল তথা হইতে হজ্জে-বদল করাইলেই চলিবে, অতএব যদি সে মক্কায় পৌঁছিয়া মরিয়াছিল তবে অতি সামান্য খরচে মক্কা হইতে তাহার হজ্জে-বদল করাইলেই যথেষ্ট হইবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাহার সমুদয় ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ যদি তাহার নিজ বাড়ী হইতে হজ্জে-বদলের ব্যয়ে যথেষ্ট হয় তবে অবশ্যই তাহার বাড়ী হইতে হজ্জ করাইতে হইবে যদিও তাহার মৃত্যু মক্কায় পৌঁছিয়া হইয়া থাকে। অন্যথায় তাহার অছিয়তের হজ্জ আদায় হইবে না এবং ওয়ারেছগণ কর্তব্য মুক্ত হইবে না। অবশ্য যদি তাহার ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশে বাড়ী হইতে হজ্জের ব্যয় সঙ্কুলান না হয় তবে উহা দ্বারা যথা হইতে সম্ভব তথা হইতেই হজ্জে-বদল করাইবে (ফতহুল-কাদীর, ২—৩১৯)। আলোচ্য মৃত ব্যক্তির হজ্জটি যদি তাহার এই মৃত্যুর বৎসরের পূর্বেই ফরজ হইয়াছিল অর্থাৎ এই বৎসরের পূর্বেই হজ্জ ফরজ হয় পরিমাণ ধনের মালিক সে হইয়াছিল, কিন্তু হজ্জ যাত্রায় সে বিলম্ব করিয়াছিল তবে হজ্জে-বদল

করাইবার অছিয়ত করা তাহার উপর ফরজ হইবে। আর যদি ঐ বৎসরই তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছিল কিম্বা তাহার উপর হজ্জ আদৌ ফরজ হইয়াছিল না উক্ত হজ্জ তাহার নফল হজ্জ ছিল তবে অছিয়ত করার প্রয়োজন হইবে না। (শামী, ২—৩৩২)

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় মৃত্যু হইলে হানফী মজহাব মতে তাহার কাফন সাধারণ নিয়মেই করিতে হয়। কোন কোন ইমামের মজহাবে এহরাম অবস্থার ব্যক্তির ন্যায় তাহার মাথা অনাবৃত রাখিতে হয় এবং সুগন্ধিও দেওয়া যায় না; (২৪৯ পৃঃ)

মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা

৯৪৫। **হাদীছ** ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা "জোহায়না" নামক গোত্রের একটি নারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার মাতা হজ্জ করিবার মান্নত মানিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করিতে পারেন নাই, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে; এখন আমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারি কি? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর। তোমার মাতার উপর কাহারও ঋণ থাকিলে তাহা তুমি কি আদায় করিতে না? তদ্রূপ আল্লার ঋণও আদায় করিয়া দাও। আল্লার ঋণকে অগ্রাধিকার দান করা কর্তব্য।

ভ্রমণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা

৯৪৬। **হাদীছ** ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জ কালে "খাছআম" গোত্রীয় একটি মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় হজ্জ ফরজ হইয়াছে যখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, যানবাহনের উপর স্থির হইয়া বসিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এমতাবস্থায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিলে তাঁহার হজ্জ আদায় হইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হাঁ (তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর)

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী বদলা হজ্জ করিতে পারে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের হজ্জ

৯৪৭। **হাদীছ** ঃ—ছায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জ কালে আমার মাতা-পিতা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমাকে হজ্জ করাইয়াছেন; আমার বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য বিষয়ে আরও স্পষ্টতর হাদীছও বিদ্যমান রহিয়াছে। মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা এক মহিলা তাহার স্বীয় শিশু ছেলেকে উত্তোলন করতঃ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই ছেলের হজ্জ কি শুদ্ধ

হইবে? রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—শুদ্ধ হইবে এবং (তুমি যে তাহাকে সাহায্য করিবে সে জন্য) তুমিও ছওয়াবের ভাগী হইবে।

মছআলাহ্ঃ—নাবালেগ ছেলে-মেয়ের হজ্জ শুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বালেগ হওয়ার পর তাহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইলে সেই হজ্জ পুনঃ আদায় করিতে হইবে। নাবালেগ অবস্থায় কৃত হজ্জের দ্বারা ফরজ আদয় গণ্য হইবে না।

নারীদের হজ্জ করা

ইব্রাহীম (রঃ) নামক মোহাদ্দেছ স্বীয় পিতার মাধ্যমে পিতামহ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইব্রাহীম (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (স্বীয় খেলাফতকালে নবী-পত্নীগণকে (নফল) হজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যেই হজ্জ তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ ছিল সেই হজ্জের সময় তিনি নবী-পত্নীগণকে হজ্জে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুব্যবস্থার জন্য ওসমান (রাঃ) ও আবহুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—নবী-পত্নীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সকলেই হজ্জ আদায় করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহাদের হজ্জ করা নফল ছিল।

হজ্জের ছফর অতি কষ্ট-ক্লেশের ছফর। তদুপরি বড় শঙ্কট এই যে, ইহার আরকান-আহকাম আদায় করার সময় প্রতি পদক্ষেপে ভীষণ ভিড় হইয়া থাকে, যাহা এড়াইবার উপায় নাই। নারী জাতির জন্য যে সব বিধি-নিষেধ শরীয়ত কর্তৃক ফরজ, ওয়াজেব ও হারামরূপে বলবৎ রহিয়াছে, হজ্জের আরকান-আহকাম আদায় করাকালে সে সব বিধি-নিষেধ রক্ষা করিয়া চলা সহজ সাধ্যত মোটেই নহে, সম্ভবপর হওয়াও অতিশয় দুরূহ। এতদ্দৃষ্টে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় খেলাফত কালে নবী-পত্নীগণকে পুনঃ হজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অনুমতি দান করেন এবং ওসমান (রাঃ) ও আবহুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের ন্যায় ব্যক্তিত্বশালী দুইজনের তত্ত্বাবধানে নবী-পত্নীগণের হজ্জে গমণের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন, এসব কোন্ যমানার কাহিনী? তেরশত বৎসর পূর্বের কাহিনী এবং মক্কা হইতে মদীনা মাত্র প্রায় তিনশত মাইল ব্যবধানের কাহিনী।

বর্তমানে নারী জাতির যে অবস্থা দাড়াইয়াছে বিশেষতঃ মিশর, সিরিয়া, জাওয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বোম্বাই, গুজরাট, ইউপি, সি-পি, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানের নারীগণ পবিত্র মক্কা মদীনাতে আসিয়াও যেরূপ বে-পর্দা বেহায়া ও বে-পরওয়াভাবে চলাফেরা করে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নারীদের জন্য পর্দা সর্বস্থানেই ফরজ এবং বে-পর্দাভাবে চলা হারাম। আরও স্মরণ রাখিবেন—পবিত্র মক্কা মদীনায় নেক কার্য্যের ছওয়াব যেরূপ অধিক পাওয়া যায়—এক

রাকাত নামাযে লক্ষ্য রাকাতের ছওয়াব হয়; গোনাহের বেলায়ও ঠিক সেই হিসাব লাগাইতে হইবে। পবিত্র মক্কায় কোন শরীয়ত বিরোধী হারাম কার্য্য করিলে তাহার গোনাহ এবং শাস্তি ভীষণ ও অত্যধিক হইবে। কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হরম শরীফের মধ্যে আল্লাহদ্রোহিতা ও শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ করিবে আমি তাহাকে ভীষণ আজাব ভোগে বাধ্য করিব। (১৭ পাঃ ১০ রুঃ)

কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরজ হইলে তাহাকে সেই ফরজ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পর্দা ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তের বিধান অনুসরণ ফরজ। উহার ব্যতিক্রম করিলে তাহা হারাম হইবে এবং পবিত্র মক্কায় হারাম কার্য্য করিলে উহার গোনাহ ও শাস্তি অধিক হইবে। তাই এক ফরজ আদায় করিতে অন্য ফরজের ব্যবস্থাও পূর্ণরূপে বজায় রাখিবে।

অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য কঠিন পথে যাত্রা করিলে তাহাতে কাহারও দ্বিধা বোধ হয় না। কিন্তু আবশ্যকাতিরিক্ত কার্যের জন্য কঠিন ও আশঙ্কাযুক্ত পথে যাত্রা করিতে দেখিলে দ্বিধা বোধ হওয়া স্বাভাবিক। অতএব মহিলাদের নফল হজ্জে বাধা দেওয়া অহেতুক নহে। তবে হাঁ—যদি স্বামী বা কোন মাহ্‌রাম ব্যক্তি যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা অবলম্বনের শক্তি সামর্থ ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হয় এবং সে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

শেখ সা'দী (রঃ) কত সুন্দর কথাই না বলিয়াছেন—"রাজ দরবারের দান সামগ্রী প্রচুর বটে, কিন্তু গলা কাটা যাওয়ার আশঙ্কাও সমধিক।"

আমাদের দেশীয় মা-বোনদেরে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন মক্কা মদীনায় যাইয়া নানা দেশীয় নারীদের শরীয়ত বিরোধী বে-পরোওয়া চাল-চলনের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া না যান। স্মরণ রাখিবেন—শরীয়তের বিধি-বিধান অতি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়। উহা স্রোতে বহিয়া যাওয়ার মত বস্তু নহে।

৯৪৮। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, কোন নারী স্বীয় মাহরাম ব্যক্তি (বা স্বামী) কে সঙ্গে না লইয়া কোন ছফরে বা ভ্রমণ যাত্রায় বাহির হইবে না এবং কোন নারীর সন্নিকটে কোন পর-পুরুষ (যে কোন প্রয়োজনে) আসিতে পারিবে না, যদি তাহার সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির কোন মাহরাম (বা স্বামী) না থাকে।

এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্। অমুক জেহাদের জন্য সংগৃহীত সৈন্যদলের মধ্যে (আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং উহাতে যোগদানের জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী হজ্জ গমনে ইচ্ছা করিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি স্বীয় স্ত্রীর সহিত হজ্জে গমন কর।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বীয় স্ত্রীকে সৎকার্য্যে সৎপথে সহায়তা করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য ঘটনার অবস্থা দৃষ্টে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রতি স্ত্রীকে হজ্জব্রত পালনের সাহায্যার্থে উপস্থিত জেহাদের সুযোগ গ্রহণ করা মুলতবী রাখার অনুমতি দিলেন। কারণ, নারীদের সম্মুখে বহু বাধা বিপত্তি রহিয়াছে; তাহাদের জন্য যে কোন সময় ইচ্ছাধীনরূপে হজ্জে গমন করা সম্ভব হয় না। পুরুষদের জন্য জেহাদ সাধারণতঃ সেরূপ নহে। এই জন্য স্ত্রীর উপস্থিত সুযোগকে স্বামীর উপস্থিত সুযোগের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লিখিত হাদীছে নিষিদ্ধ ভ্রমণের দূরত্ব নির্দ্ধারণে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে। এক হাদীছে একদিন ভ্রমণের উল্লেখ হইয়াছে। আর এক হাদীছে দুই দিনের ভ্রমণ উল্লেখ আছে, কোন কোন হাদীছে তিন দিন ভ্রমণ উল্লেখ হইয়াছে। মুল উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য এই যে, নারীদের জন্য মাহ্‌রাম বা স্বামীর সঙ্গ ব্যতীত দূর পথের ভ্রমণে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। একদিন ভ্রমণের দূরত্ব হইলেও নিষিদ্ধ এবং দুই দিন ভ্রমণের দূরত্ব হইলে ততোধিক জঘণ্য নিষিদ্ধ, তিনদিন দূরত্ব হইলে একেবারে হারাম।*

আলোচ্য মছআলায় ভ্রমণের ব্যাখ্যা ঐরূপই যেরূপ শরীয়তের অন্যান্য বিধানসমূহে যথা—ছফরে নামায কছর করা ইত্যাদিতে গণ্য। সেমতে তিন দিন তিন রাত্র ভ্রমণের দূরত্ব মাত্র ৪৮ মাইল গণ্য করা হয়।

মছআলাহ ঃ—ঋতুবতী নারী হজ্জের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবে; একমাত্র তওয়াফ ঋতু অবস্থায় করিতে পারিবে না। (২২৩ পৃঃ)

---

* প্রখ্যাত আলেম ও মোহাদ্দেছ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রঃ) বলিয়াছেন, হানাফী মজহাবের সমস্ত কেতাবেই লিখিত আছে, মহিলাদের জন্য (স্বামী বা) মাহ্‌রাম ছাড়া ছফর করা নাজায়েয নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার মতে মাহ্‌রাম ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ তত্ত্বাবধায়কের সহিতও ছফর করিতে পারে—যে ক্ষেত্রে (honesty) সততা ও সাধুতার বিন্দুমাত্র অভাবের আশঙ্কা না থাকে এবং ফেৎনা তথা চারিত্রিক নোংরামির কোন খেয়াল দৃষ্টিরও আদৌ সম্ভাবনা না থাকে। আমার এই মতের সমর্থন অনেক হাদীছেই পাওয়া যায়। গায়েব-মাহ্‌রামের সঙ্গে মহিলার ছফরে সাধারণতঃ ঐরূপ কোন নোংরামি বা উহার খেয়াল সৃষ্টির সম্ভাবনা ও অবকাশ থাকে বলিয়াই সচরাচর উহাকে নাজায়েয বা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে (ফয়জুলবারী, ২—৩৯৭)। অবশ্য ধরা-ছোয়ার প্রয়োজন হইবে—এইরূপ ছফরে স্বামী বা মাহ্‌রাম সঙ্গে থাকিতেই হইবে।

হাঁটিয়া কা'বা শরীফে যাওয়ার মান্নত করা

৯৪৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বৃদ্ধকে দেখিলেন, সে (স্বীয় অক্ষমতার দরুণ) তাহার দুই পুত্রের কাঁধে ভর করিয়া চলিতেছে। নবী (দঃ) তাহার এই যাতনা ভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রদ্বয় উত্তর করিল, সে কা'বা শরীফে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার মান্নত মানিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এই বৃদ্ধ স্বীয় আত্মাকে এরূপ যাতনা ভোগে বাধ্য করুক আল্লাহ তায়ালা ইহার প্রত্যাশী নহেন। এই বলিয়া বৃদ্ধকে যানবাহনে আরোহণের আদেশ করিলেন।

৯৫০। **হাদীছ ঃ**—ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ভগ্নী বাইতুল্লাহ শরীফে পায়ে হাঁটিয়া পৌছিবার মান্নত করিলেন। (কিন্তু তিনি মোটা শরীর-বিশিষ্টা ছিলেন। এতদূর হাঁটিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই) তিনি আমাকে এই বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদেশ করিলেন। আমি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পায়ে হাঁটিয়া চলিবে এবং (যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে তখন) যানবাহনে আরোহণ করিবে।+

মছআলাহ ঃ—পায়ে হাঁটিয়া মক্কা শরীফে যাওয়ার মান্নত করিলে সহজ সাধ্য হইলে পায়ে হাঁটিয়াই ওমরা বা হজ্জ করা চাই। অবশ্য তাহা না করিলে কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া অসাধ্য হইলে যানবাহনের সাহায্য লইতে পারিবে, কিন্তু এমতাবস্থায় তাহাকে দম আদায় করিতে হইবে।

+ আলহামদু লিল্লাহ! ১৩৭৭ হিঃ ১৯৫৮ ইং হজ্জের সফরে ২১শে জিলহজ্জ ৮ই জুলাই পবিত্র মক্কা নগরীতে মেছফালাহ নামক মহল্লায় হজ্জের পরিচ্ছেদ লেখা শেষ করা হইল।

মদীনার চতুঃসীমাস্থ এলাকা হরম শরীফ

৯৫১। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِّنْ كَذَا اِلٰى كَذَا

لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ

اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার এই সীমা (—"আয়ের" নামক পাহাড়) হইতে ঐ সীমা (—ওহদ পাহাড়ের সংলগ্ন "ছওর' নামক ছোট পাহাড়) পর্য্যন্ত "হরম" পরিগণিত। উহার বৃক্ষাদি কাটা যাইবে না, (ঘাস-পাতা, তরু-লতা, উদ্ভিদ সমূহের ক্ষতি সাধন করা যাইবে না উহার কোন বন্যজীবকে শিকার করা যাইবে না) এবং মদীনার মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার, অশান্তি, ব্যভিচার শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ ও অন্দোলন সৃষ্টি করা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম। যে ব্যক্তি পবিত্র মদীনার এলাকায় এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিবে (বা এরূপ কার্য্য) সৃষ্টিকারীকে স্থান দিবে (অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার সহযোগিতা বা সমর্থন করিবে) তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার ও সমুদয় ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ।

অর্থাৎ—এরূপ কার্য্য যে করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অভিশাপের ঘোষণা জারী করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি সেই ঘোষণা অনুসারে আল্লার অভিশাপে পতিত হইবে এবং এরূপ কার্য্যকারীর প্রতি ফেরেশতাগণ সর্বদা অভিশাপ ও বদ-দোয়া করিয়া থাকেন; ফেরেশতাগণের সেই অভিশাপ তাহার উপর পতিত হইবে। আর ঐ ব্যক্তি এমনই জঘণ্য যে, তাহার প্রতি অভিশাপ করা সমগ্র বিশ্ববাসীর আশু কর্তব্য।

৯৫২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى لِسَانِىْ قَالَ وَاَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى الْحَارِثَةِ فَقَالَ اُرَاكُمْ يَا بَنِىْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِّنَ

الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ فِيْهِ ـ

---

* এই অধ্যায়টি ১৯৫৮ ইং সনের হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় লেখা হইয়াছে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার সীমানাস্থ এলাকাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) "হরম" বলিয়া আমার মারফৎ ঘোষণা করা হইয়াছে।

বনু-হারেছা নামক গোত্র (যাহাদের বসতি ওহদ পাহাড়ের নিকটস্থ ছিল) তাহাদের নিকট একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আসিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা হইতেছে, তোমরা (মদীনার) হরমের এলাকা হইতে বাহিরে বসতি অবলম্বন করিয়াছ। অতঃপর বলিলেন, না—তোমরা হরমের সীমার ভিতরেই আছ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিভিন্ন হাদীছে মদীনা শরীফের নির্দ্ধারিত সীমাকে "হরম" বলা হইয়াছে। অনেক ইমামের মতে ওয়াজেব রূপেই উহা হরম শরীফ; যেরূপ মক্কাস্থিত সীমা হরম শরীফ; উভয়ের মছআলাহ সমানই। হানাফী মজহাব মতে মদীনার সীমা "হরম" হওয়ার অর্থ বিশেষ বিশেষ সম্মান ও মান-মর্য্যাদার স্থান। মদীনার বৃক্ষাদি কাটা জায়েয আছে যেরূপ ৮৫৪নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য সাধারণতঃ উহা না কাটাই উত্তম। ৯৫১নং হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

৯৫৩। হাদীছ ঃ— عن على رضى الله تعالى عنه قال

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ........

অর্থ—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে শুধু আমাকে কোন বিষয় জ্ঞাত করাইছেন—এমন) কোন বিষয়—বস্তু আমার নিকট নাই। হাঁ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাহা আমার নিকট আছে তাহা আল্লার কিতাব কোরআন শরীফ এবং একখানা লিপি যাহার মধ্যে শরীয়তের এই কয়েকটি আদেশ ও বিধান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১) পবিত্র মদীনা "আয়ের" নামক পাহাড় হইতে অমুক সীমানা পর্য্যন্ত "হরম" পরিগণিত। মদীনার মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি বা শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করিবে কিম্বা ঐ কার্য্য অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে কোন প্রকারে সমর্থন করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ ও সমস্ত ফেরেশতাগণের অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং সে সমগ্র বিশ্ববাসীর অভিশাপযোগ্য হইবে। তেমন ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদৎ

(আল্লার দরবারে) কবুল ও গ্রহণীয় হইবে না। (২) ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মতে কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দানের ক্ষমতা ও অধিকার সকল মোসলমানেরই সমান। যে কোন একজন মোসলমান কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিলে সমস্ত মোসলমানের পক্ষে উহা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যে কোন মোসলমান অন্য এক মোসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ এবং ফেরেশতাগণ ও সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ। ঐ ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদত আল্লার দরবারে কবুল হইবে না।

(৩) যে কৃতদাস স্বীয় মনিবের পরিচয় গোপন করিয়া অন্য মনিবের প্রতি নিজের সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পিতার পরিচয় গোপন রাখিয়া অন্য কাহারও প্রতি স্বীয় সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ। ঐ ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদত কবুল হইবে না।

ব্যাখ্যা :—বর্তমান যুগের পীর-মুরশিদ নামধারী ভণ্ড ও ধোকাবাজদের একদল লোক বলিয়া থাকে যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট দীন ইসলামের এমন অনেক বিষয়বস্তু ছিল যাহা ছিনা-বছিনা আমরা পাইয়াছি ; ঐ সব বিষয়বস্তু কোরআন-হাদীছে ব্যক্ত হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সব বিষয় বিশেষরূপে আলী (রাঃ)কে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন, অন্য কাহাকেও তাহা জ্ঞাত করান নাই। বস্তুতঃ এই সকল বে-ঈমানী ধোকাবাজীর কথা পূর্ব হইতে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা কল্পিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এমনকি, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্তমানেও এরূপ কুকথার বিষ লোকদের মধ্যে ছড়াইতেছিল। এইরূপ বিষময় কুকথার বিরুদ্ধে, উহার মুলোচ্ছেদ কল্পে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বারংবার আলোচ্য হাদীছের অস্বীকৃতি-যুক্ত কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এমনকি, এই অস্বীকৃতির উপর তিনি কঠোর ভাষায় শপথ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ২১ পৃষ্ঠায় এই হাদীছটি বর্ণিত আছে, সে স্থানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন লিপি আছে কি? ২২৮ পৃষ্ঠায় আছে, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, অহী দ্বারা প্রেরিত বিষয়াবলীর কোন বিশেষ বস্তু আপনার নিকট খাছভাবে বিদ্যমান আছে কি? ১০২০ পৃষ্ঠায় আছে, এরূপ প্রশ্ন করিল যে, কোরআন শরীফে নাই বা অন্য কোন মানুষের নিকট নাই এমন কোন বিষয়বস্তু আপনার নিকট আছে কি? মোসলেম শরীফের হাদীছে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে—একদা এক ব্যক্তি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনার নিকট কি কি বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু চুপি চুপি বলিয়া গিয়াছেন? আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণে

ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কখনও অন্য লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া আমার নিকট চুপি চুপি কিছুই ব্যক্ত করেন নাই; হাঁ—কয়েকটি বিষয় তিনি আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা এই লিপির মধ্যে লিখিত আছে। এই বলিয়া তিনি স্বীয় তরবারীর খাপ হইতে একখানা লিপি বাহির করিলেন। লিপিখানার মধ্যে (মূল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিষয় কয়টির সহিত ইহাও) লিখিত ছিল যে—(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামের উপর কোন জীবজন্তু জবেহ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (২) যে ব্যক্তি পথ ও রাস্তার চিহ্ন বা জায়গা-জমীনের সীমানার চিহ্ন ইত্যাদি চুরি করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বিধান ও তরীকা ছাড়া অন্য তরীকা সৃষ্টি করিবে বা ঐরূপ তরীকার আন্দোলনকারীর প্রতি কোন প্রকার সমর্থন রাখিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ।

এতদ্ভিন্ন ঐ লিপির মধ্যে আরও লিখিত ছিল যে, মোসলমান ছোট-বড় ধনী দরিদ্র সকলেরই জানের মূল্য সমান। অর্থাৎ কোন ধনী ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে না-হক খুন করিলে বা কোন ভদ্র ব্যক্তি কোন ইতর ব্যক্তিকে না-হক খুন করিলে ঐ ধনী ভদ্র ব্যক্তিকে খুনের বদলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। মদীনার হরম শরীফের সীমার বিষয় লিখিত ছিল যে—ঐ সীমার মধ্যে কোন ঘাস-পাতা, তরু-লতার ক্ষতি সাধন করা যাইবে না, উটের আহার্য্য যোগান ব্যতীত কোন গাছ কাটা যাইবে না, কোন মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র হাতে লওয়া যাইবে না এবং উহাতে ছিল—বিভিন্ন অঙ্গে ও বিভিন্ন পরিমানে জখম করার শাস্তি ও দণ্ডের বিবরণ এবং কোন কোন প্রকারের খুনের বদলে বিভিন্ন বয়সের যে বহু সংখ্যক উট প্রদান করিতে হয় উহার বিবরণ। এবং উহাতে ছিল—ক্রীতদাস মুক্তি দানের ফজিলত এবং উহাতে এই বিধান লিখিত ছিল যে, (ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা নয় এমন) অমোসলেমদের হত্যা করার দায়ে কোন মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না এবং কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দান করা হইলে সেই অবস্থায় তাহাকে হত্যা করা যাইবে না।

৯৫৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام ـ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়া থাকিতেন—মদীনার এলাকায় হরিণ-পাল অবাধে ঘুরা-ফেরা করিতেছে দেখিলে আমি উহাদেরকে কোন ভয়ও দেখাইব না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার উভয় পার্শ্বস্থ সীমার মধ্যবর্তী এলাকা হরম শরীফ।

মদীনার বৈশিষ্ট্য

৯৫৫। হাদীছ :— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِىَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ـ

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এমন একটি বস্তিকে স্বীয় বাসস্থানরূপে অবলম্বন করার আদিষ্ট হইয়াছি সে বস্তি অন্যান্য বস্তি সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। অনেকে উহাকে "ইয়াছরেব" নামে অভিহিত করে, কিন্তু উহার সুযোগ্য নাম মদীনা। সেই বস্তি অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমার ভিতর হইতে বাছিয়া বাহির করিবে যেরূপ কর্মকারের অগ্নি-চুলা লোহা হইতে উহার জং ও মরিচাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা :—বিশ্বের উপর মদীনা শরীফের প্রাধান্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাহাবীদের যুগে স্পষ্টতঃই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ সে যুগে মোসলেম জাতি বিশ্বের বুকে সর্বাধিক শক্তিশালী জাতিরূপে খ্যাতি লাভ করিতেছিল এবং তৎকালীন সেরা রাষ্ট্রসমূহ মোসলমানদের ভয়ে কম্পমান ত ছিলই, তদুপরি শেষ পর্য্যন্ত উহার প্রত্যেকটিই মোসলমানদের হস্তে উচ্ছেদ হয়। সেকালে মোসলেম জাতির সম্মুখে মাথা উচু করার কোন শক্তি ও জাতি অবশিষ্ট ছিল না। সেই বিশ্ববিজয়ী মোসলেম জাতির প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা-তাইয়্যেবা।

এতদ্ভিন্ন মর্তবা বা ফজিলতের দিক দিয়া সমগ্র বিশ্বের উপর পবিত্র মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত। এমনকি সমগ্র নগরী হিসাবে কোন কোন আলেম মক্কা নগরীর ফজিলতের তুলনায়ও মদীনা নগরীর ফজীলতকে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য মক্কা নগরীর মধ্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হরম শরীফের মসজিদ এবং অতি মহান বাইতুল্লাহ শরীফ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু মদীনা নগরীতেও যে ভূখণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশরীরে অবস্থানরত রহিয়াছেন, বিশেষরূপে সেই ভূখণ্ডকে আল্লাহ তায়ালা কাবা হইতে, বরং আরশ হইতেও অধিক মর্তবা ও ফজীলত দান করিয়াছেন—ইহা আলেমগণের ঐক্যমত পূর্ণ সিদ্ধান্ত। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রভূ আল্লাহ তায়ালার নিকট কিরূপ প্রিয় ও মাহবুব ছিলেন,

উল্লিখিত বিষয়টি তাহারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন এবং আলেমগণ সেই হিসাবেই উল্লিখিত বিষয়টির উপর নিজেদের ঐক্যমত স্থাপন করিয়াছেন।

এই হাদীছের মধ্যে মদীনা শরীফের একটি বিশেষত্ব এই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়া পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে--যখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে। সেই সময় দাজ্জাল শহরসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া তৎকালীন অধিকাংশ লোকদিগকে নিজ দলে শামিল করিয়া লইবে, কিন্তু সে পবিত্র মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য সে মদীনার নিকটবর্তী এক বস্তিতে আসিবে এবং মদীনার মোনাফেক-কাফের ব্যক্তিরা মদীনা হইতে বাহির হইয়া দজ্জালের দলভুক্ত হইবে; (এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ৯৬২নং হাদীছে বর্ণিত হইবে।) তখনই পবিত্র মদীনার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে। অবশ্য পবিত্র মদীনার এই বিশেষত্বটি ঐ বিশেষ সময়ের পূর্বেও সময় সময় স্থান বিশেষে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়ও এইরূপ ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে ঘটিয়াছে। ৯৬৪নং হাদীছে এক বেদুইনের ঘটনা বর্ণিত হইবে—সে স্বীয় বস্তি ছাড়িয়া মদীনায় আসিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু পর দিনই সে জ্বরাক্রান্ত হইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং সে তাহার ইসলাম ফেরৎ লইবার জন্য হযরতের নিকট বার বার দাবী জানাইতে থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করতঃ মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার এই ঘটনার উপর নবী (দঃ) পবিত্র মদীনার আলোচ্য বিশেষত্বেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পবিত্র মদীনার স্নেহময় কোলে এবং উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন। এমনকি, শেষ শয়নের স্থানটুকুও পবিত্র মদীনায়ই দান করুন এবং পবিত্র মদীনা হইতে বিতাড়িত হওয়ার বদ-বখ্‌তি হইতে বাঁচাইয়া রাখুন—আমীন!

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةِ — فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِىْ

মদীনায় স্থান লাভ হউক—ইহাই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আমার আকাঙ্খা। আমার সু-নছীব—যদি মদীনায় এক হাত জায়গাও কবরের জন্য আমার ভাগ্যে জুটে।"

رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةِ — فَاَرْقُدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرَ

প্রভুর নিকট আমার আকাঙ্খা—আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; তবেই আমি প্রাণ প্রিয়ের ছায়ায় চির নিদ্রিত থাকিতে এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশর ময়দানে যাইতে পারিব।

মদীনার অপর নাম 'তাবাহ'

৯৫৬। হাদীছ :— عن ابى حميد رضى الله تعالى عنه قال

اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوْكَ حَتّٰى اَشْرَفْنَا عَلَى

الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهٖ طَابَةٌ ـ

অর্থ :—আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদ হইতে ফিরার পথে চলিতেছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া যখন মদীনা দেখা যাইতেছিল তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ইহা 'তাবাহ' বা 'তায়বাহ'।

ব্যাখ্যা :— মদীনার অপর নাম 'তাবাহ' এবং 'তায়বাহ'। উভয় আরবী শব্দেরই আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও প্রীতি প্রকাশার্থে উহাকে এইসব নাম দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র মদীনাকে এই সব নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পবিত্র মদীনার বসবাস ত্যাগ করা দুঃখজনক

৯৫৭। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(এক সময়) লোকেরা মদীনাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে মদীনায় ভাল অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্বেও। এমনকি অবশেষে উহার বাসিন্দা শুধুমাত্র বন্য পশু-পক্ষী যাহারা ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজ নিজ আহার্য্য যোগায় উহারাই থাকিবে। (অর্থাৎ পোষিত পশু-পক্ষীও তথায় থাকিবে না, কারণ পোষণকারী মানুষের অস্তিত্ব তথায় থাকিবে না।) মদীনার প্রতি সর্বশেষ আগন্তুক মোযায়না গোত্রের দুই রাখাল তাহাদের ছাগলপাল হাঁকাইতে হাঁকাইতে মদীনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে থাকিবে; বাহিরে থাকিতেই অনুভব করিবে যে, মদীনা জনশূন্য—তথায় বন্য পশু-পক্ষী ভিন্ন আর কিছু নাই। মদীনায় প্রবেশ পথের দারস্থ 'ছানিয়াতুল-বেদা' নামক স্থানে তাহাদের পৌঁছা মাত্রই (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের শিঙ্গা-ফুঁক আরম্ভ হইয়া যাইবে;) তাহারা তথায় অধঃমুখী পতিত হইয়া মরিয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যা :—সারা ভূপৃষ্ঠে একটি মানুষ 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা জগতের উপর মহাপ্রলয় আসিবে না; যখন 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী একটি মানুষও সারা জগতে বিদ্যমান থাকিবে না তখনই জগতের ধ্বংস বা মহাপ্রলয়

আসিবে (হাদীছ—মোসলেম শরীফ)। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, কেয়ামতের পূর্বক্ষণে সমগ্র জগতে শুধুমাত্র কাফেরদেরই অবস্থান হইবে; কোথাও একটি প্রাণী মোসলমানের অস্তিত্ব থাকিবে না। এমনকি আল্লার ঘরের শহর মক্কায়ও তখন কাফেরই থাকিবে। তাহারা কাবা শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া কাবা শরীফকে ধ্বংস করিয়া দিবে (হাদীছ—বোখারী শরীফ)। ঐ সময়কালে মদীনায় কি অবস্থা বিরাজ করিবে? যদি তথায় মানুষ থাকে তবে তাহারাও কাফের হইবে এবং সেই অবস্থায় তথায় বর্তমান হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ তথা তাঁহার আরাম-কক্ষের সহিত ঐ ব্যবহারের আশঙ্কা অতি সুস্পষ্ট যে ব্যবহার কাফেররা কাবা শরীফের সহিত করিবে বলিয়া হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। কাফেররা হযরতের অবমাননার চেষ্টা চিরকালই করিয়া আসিয়াছে। মদীনার ইতিহাসে বিদ্যমান ঘটনা—মক্কা-মদীনা যখন সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী রহমতুল্লাহে আলাইহের শাসন ও হেফাজতে, তখন ইহুদীরা হযরত (দঃ)কে মদীনা হইতে অপহরণের এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তৎকালীন ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট মদীনা শহরের এক নিভৃত কোণে হযরতের রওজা শরীফের অদূরে দরবেশ ছদ্মবেশী দুই ইহুদী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের ভান ধরিয়া নির্জন বাসস্থান তৈরী করে। তথা হইতে ধীরে ধীরে অতি গোপনে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ করিয়া হযরতের রওজা শরীফের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উদ্দেশ্য সাধনের অনতিদূরে পৌঁছিলে সুলতান নূরুদ্দীন (রঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, এই লোক দুইটি আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। স্বপ্ন হইতে নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান স্বীয় ওজীরকে ডাকাইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে ওজীর বলিলেন, নিশ্চয় মদীনায় কোন অঘটন ঘটিতেছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ ওজীরকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করতঃ মদীনায় পৌঁছিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল এই যে, স্বপ্নে দেখান ব্যক্তিদ্বয়ের দৃশ্য ত সুলতানের স্মরণ রহিয়াছে; তাহাদের আর কোন পরিচয় জানা নাই; এমতাবস্থায় তাহাদেরকে শহর হইতে কিরূপে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। বাদশাহ ওজীরের পরামর্শে বিরাট এক ঘেরাও-এর মধ্যে মদীনায় অবস্থানকারী সকলকে এক সঙ্গে দাওয়াতে সমবেত হওয়ার বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিলেন। ঘেরাও-এর ভিতর গমনাগমনের একটি মাত্র পথ রাখা হইল; তথায় বাদশাহ বসিয়া থাকিলেন। প্রত্যেকটি লোককে দেখা হইল; কিন্তু স্বপ্নে দেখা আকৃতি পাওয়া গেল না। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর বাদশাহকে বলা হইল, মদীনায় দুইজন দরবেশ নির্জনে অবস্থান করেন; তাঁহারা জন-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাই তাঁহারা এই দাওয়াতে যোগদান করেন নাই। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহাদেরকে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাহাদেরকে নিয়া আসা হইতেছিল তখন দূর হইতে তাহাদেরকে দেখামাত্র বাদশাহ চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, এই সেই আকৃতি যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। বাদশাহ ব্যক্তিদ্বয়কে মৃত্যুদণ্ড

দিলেন এবং রওজা শরীফের চতুর্দিক সাধ্য পরিমাণ গভীর গর্ত করিয়া সীসা ভরিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে হযরতের রওজা শরীফ ভূগর্ভেও সীসার দেওয়ালে সুরক্ষিত হয়।

শহীদদের পদার্থীয় দেহ অবিকৃত বিদ্যমান থাকে—যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ড "ওহোদের জেহাদ" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। হযরতের সন্নিকটে সমাহিত খলীফা ওমরের কবর দীর্ঘ ৬৮০ বৎসর পরে মসজিদে নববী পুনঃ নির্মাণে খননকালে পায়ের দিকের জমি ধ্বসিয়া পা খুলিয়া গিয়াছিল। খলীফা ওমরের পা তখনও অবিকৃত দেখা গিয়াছে। উপস্থিত বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) শপথের সহিত সে পা খলীফা ওমরের বলিয়া সনাক্ত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের শেষে "হযরতের ও খলীফাদ্বয়ের কবরের বিবরণ" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেহ মোবারকের কথা আলোচনার উর্দ্ধে; ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্বাধিক সুরক্ষিত। শহীদের বরযখী-জীবন অপেক্ষা হযরতের বরযখী-জীবন লক্ষ-কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী।

সমস্ত জগতে যখন কাফেরই কাফের থাকিবে যাহারা কাবা শরীফকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে ঐ সময় তাহারা মদীনায় থাকিলে হযরতের রওজা পাকের সহিত কি করিবে তাহা সহজেই বোধগম্য এবং হযরত (দঃ) তাঁহার রওজায় বরযখী-জীবনে জীবন্ত।

ঐ সময় কাবা শরীফের সুরক্ষণের প্রয়োজন ত থাকিবে না যাহার বিবরণ "কাবা শরীফের বিনাশ সাধন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্য্যাদা এবং তাঁহার রওজা শরীফের সুরক্ষণ ত কোন মুহূর্তেই নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, তাই ঐ সময়ের প্রয়োজন নির্বাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা এই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐ সময় মদীনায় কোন মানুষের বসবাস মোটেই থাকিবে না, সম্পূর্ণ মদীনা এলাকা ঐ কালে জনশূন্য অবস্থায় ভাব-গম্ভীররূপে বিরাজমান থাকিবে। উহার সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তথা ফল-ফলাদির বাগ-বাগিচা, সেই বাগ-বাগিচার সবুজ-শ্যামলতা উহাতে বন্য পশু-পক্ষীর কোলাহল ইত্যাদি সবই বিরাজমান থাকিবে, থাকিবে না শুধু মানুষের বসবাস। কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবীর এলাকায় অবস্থানের উপযোগী তাহার অনুরাগী মোমেন-মোসলমানের অস্তিত্বই তখন ভূপৃষ্ঠে থাকিবে না। আর রসুলের শত্রুদেরকে ত একচ্ছত্র ভাবে তথায় বসবাসের সুযোগ দেওয়া যায় না; সুতরাং ঐ সময় সোনার মদীনা তাহার সোনালী সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ফল-ফলাদি ও বাগ-বাগিচার বাহক হওয়া সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় থাকিবে। এই অবস্থা ত অকস্মাৎ হঠাৎ একদিনে সম্পন্ন হইয়া যাইবে না, উহার জন্য প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিবে যে, ঐ সময়কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিলে কোনরূপ অভাব-অভিযোগ ব্যতিরেকেই মদীনাবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে; যাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্মুখের হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। মদীনার অধিবাসীগণ মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং

মদীনার প্রতি নূতন আগন্তুকের আগমণ হইবে না—এইভাবে মদীনা জনশূন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে। সেই কেয়ামতের পূর্বক্ষণের বিশেষ সময় কালের অবস্থারই ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে আলোচ্য হাদীছটিতে*। উল্লিখিত প্রয়োজন সমাধানে যে, আল্লার কুদরতে ঐ সময়ের নিকটবর্তীকালে মদীনাবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে থাকিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উহার বর্ণনা দানে তাঁহার আক্ষেপ অনুভাগের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি মদীনার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণের প্রিয় সোনার মদীনা ত্যাগীদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুঃখজনক ভাব কিরূপ হইবে এবং এই শ্রেণীর লোক যে কিরূপ ভাগ্য বিতাড়িত তাহা অতি সুস্পষ্ট। ইহাই ছিল আলোচ্য হাদীছের পরিচ্ছেদের মর্ম।

আয় আল্লাহ! এই নরাধম দীন-হীনকে সদা সোনার মদীনার প্রতি আসক্ত অনুরক্ত রাখিও, মদীনার জিন্দেগীর সুযোগ দান করিও এবং জীবনের শেষ সময় মদীনার আশ্রয়ে থাকিয়া মৃত্যুর পর মদীনার কোলেই কবরের স্থান লাভ করা নছীবে জোটাইও! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

৯৫৮। হাদীছ :— عن سفيان بن ابى زهير رضى الله تعالى عنه

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتى قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون -

অর্থ—ছুফিয়ান ইবনে যোহায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই কথা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, (এমন এক সময় সম্মুখে আসিতেছে, যখন) ইয়ামান দেশ মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং মদীনাবাসী কিছু সংখ্যক লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিপ্সায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া দ্রুতবেগে ইয়ামান দেশে ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, অতি উত্তম। হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত!

---

* আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মদীনা জনশূন্য হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইমাম নববী (রঃ) বলিয়াছেন, জগতের আয়ুষ্কালের শেষ দিকে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই অবস্থা ঘটিবে। (ফতহুলবারী, ৪—৭২)

এইরূপে সিরিয়া অঞ্চল মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং একদল লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লালসায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া দ্রুতবেগে সিরিয়ায় ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, অতি উত্তম। হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত।

এইরূপে ইরাক দেশ মোসলমানদের করতলগত হইবে। তখন একদল লোক স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিপ্সায়) দ্রুতবেগে মদীনা ত্যাগ করতঃ ইরাকে চলিয়া আসিবে, কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য সর্বোত্তম; হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—শেষ যমানায় তথা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালার কুদরতেই মদীনা শহর জনশূন্য হইবে; সেই জন্য দুনিয়ার লিপ্সায় মদীনা ত্যাগ করা দুঃখজনক হইবে না—তাহা নহে। উক্ত হাদীছে উহারই বর্ণনা রহিয়াছে।

মদীনাবাসীকে ধোকা দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি

৯৫৯। হাদীছ ঃ— عن سعد رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبىَّ صلّى الله عليه وسلّم يقول لا يكيد اهل المدينة احدٌ الا انماع كما ينماع الملح فى الماء ـ

অর্থ—সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ফন্দি আটিবে, সে অনিবার্য্যতঃ এরূপ ধ্বংস হইবে যেরূপ নিমক পানির মধ্যে গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না

৯৬০। হাদীছ ঃ— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه عن النبىِّ صلّى الله عليه وسلّم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجّال لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان ـ

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনায় দজ্জালের প্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না। যখন দজ্জালের প্রভাব বিস্তার হইবে সেই সময় মদীনা শহরে সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকিবে, প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে দুই দুইজন ফেরেশতা পাহারারত থাকিবেন।

৯৬১। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ

لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ .

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার প্রতি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন; প্লেগের মহামারী এবং দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৯৬২। হাদীছঃ— حدث انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ

اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ

يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللّٰهُ كُلَّ

كَافِرٍ وَّمُنَافِقٍ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দজ্জাল সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিবে, কিন্তু মক্কা ও মদীনা নগরদ্বয়ে আসিতে পারিবে না; মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ কাতার বাঁধিয়া পাহারা দিতে থাকিবেন। ঐ সময় মদীনা শহরে পর পর তিনবার ভূমিকম্প হইবে—যদ্দরুন মদীনায় অবস্থানরত প্রত্যেকটি কাফের ও মোনাফেক মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিবে (এবং দজ্জালের দলভুক্ত হইবে)।

৯৬৩। হাদীছঃ— ان ابا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا عَنِ الدَّجَّالِ

فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهٖ اَنْ قَالَ يَاْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَّدْخُلَ

نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ

رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا عَنْكَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن
قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم
يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم
فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه ـ

অর্থ— আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা শুনাইলেন। তাঁহার বয়ানের মধ্যে ইহাও ছিল যে, দজ্জাল (মদীনার উদ্দেশ্যে) যাত্রা করিবে, কিন্তু মদীনার রাস্তায় প্রবেশ করা তাহার জন্য অসাধ্য হইবে। (অপারগ হইয়া) সে মদীনার নিকটবর্তী কোন একটি লোনা জমিনে অবতরণ করিবে। এমতাবস্থায় একজন নেককার সৎলোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিবেন—আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুই সেই দজ্জাল যাহার বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। তখন দজ্জাল স্বীয় সাঙ্গো-পাঙ্গোদেরকে বলিবে, আমি যদি বেটাকে হত্যা করতঃ পুনরায় জীবিত করিতে পারি তবুও কি আমার খোদায়ী দাবীর প্রতি তোমাদের কোন সন্দেহ বাকি থাকিবে? তাহারা সকলেই উত্তর করিবে—না, না। তখন দজ্জাল ঐ লোকটিকে বধ করিয়া (দুই খণ্ড করিয়া) ফেলিবে; অতঃপর জীবিত করিয়া দিবে। ঐ নেককার ব্যক্তি জীবিত হইয়াই বলিয়া উঠিবেন—আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুই-ই যে দজ্জাল সেই বিষয়ে বর্তমান সময়ের ন্যায় এত দৃঢ় বিশ্বাস আমার আর কখনও জন্মে নাই। তখন দজ্জাল পুনরায় তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিবে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তাহার আর হইবে না।

মদীনা অসৎ লোকদিগকে বাহির করিয়া দেয়

৯৬৪। হাদীছ ঃ— عن جابر رضي الله تعالى عنه قال

جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد
محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي
خبثها وينصع طيبها ـ

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করিল। দ্বিতীয়

দিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দীক্ষা ফেরৎ দেওয়ার দাবী জানাইল। নবী (দঃ) তাহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এইরূপ তিনবার তাহার কথা প্রত্যাখ্যাত হইল। অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, মদীনা কর্মকারের অগ্নি-চুলার ন্যায়; সে অসৎ লোককে বাহির করিয়া দেয় এবং সৎলোকগণই সেখানে থাকিয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র মদীনার এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বদাই বিদ্যমান আছে, অবশ্য ইহ-জগৎ পরীক্ষার স্থল বলিয়া সর্বদা তাহা প্রয়োগ হয় না। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এই বিশেষত্বের পূর্ণ বিকাশ দজ্জালের আবির্ভাবের সময় হইবে, যেমন ৯৬২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সর্বদাই ইহা প্রকাশ পাইতে পারে ও হইয়া থাকে—যেরূপ আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় ঘটিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মদীনার এই ভাল-মন্দ বাছাই-এর গুণটির ক্রিয়া ক্ষেত্র বিশেষে শুধু ইহাও হয় যে, মন্দকে মন্দরূপে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়; যদিও তাহারা মদীনায়ই থাকিতে পারে, কিন্তু মন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া; ভাল-মন্দে পরিচয়হীন মিশ্রিত রূপে নয়; মন্দ হওয়ার পরিচয়ে চিহ্নিত হইয়া থাকিতে পারে। যেমন—ওহোদ-জেহাদের সময় তিনশত মোনাফেক লোক মোসলমান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আসিল এবং একটা জঘন্য ছুতা ধরিয়া মাঝ পথ হইতে ফিরিয়া চলিয়া গেল—যাহাতে সকলের সম্মুখে তাহাদের মোনাফেকী স্পষ্ট হইয়া গেল এবং তাহারা মোনাফেক বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেল। তাহাদের সম্পর্কে নবী (দঃ) মদীনার এই গুণটি উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া এক হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। হাদীছটি তৃতীয় খণ্ড "ওহোদের জেহাদ" পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। এই মোনাফেক দল মদীনায়ই বসবাস করিত, কিন্তু মোনাফেক হওয়ার পরিচয় ও চিহ্নের সহিত।

যেহেতু পবিত্র মদীনার এই গুণ ও বিশেষত্ব সর্বদাই বিদ্যমান আছে এবং সময় সময় ক্ষেত্রবিশেষে উহা প্রয়োগও হইয়া থাকে, তাই সকলের আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকা আশু কর্তব্য। যেরূপ শক্তিশালী পাহলোয়ান ব্যক্তি যদিও সর্বদা সকলের উপর স্বীয় বল প্রয়োগ করে না, কিন্তু সকলেই তাহার শক্তিমত্তা হইতে সর্বদা আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকে।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে প্রিয় মদীনায় অবস্থানের সুযোগ ও তৌফিক দান কর; বিশেষতঃ মৃত্যুর পর কবরের স্থানটুকু যেন তথায়ই লাভ হয়—আমীন!

মদীনার জন্য হযরতের দোয়া ও অনুরাগ

৯৬৫। **হাদীছ ঃ—** عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ـ

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন—হে আল্লাহ্! মক্কা নগরীর মধ্যে যত বরকত দান করিয়াছ মদীনা নগরীতে উহার দ্বিগুণ বরকত দান কর।

৯৬৬। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَاِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের বিদেশ হইতে ফিরার পথে যখন মদীনার বস্তি দৃষ্টিগোচর হইত তখন হযরত (দঃ) মদীনার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মহব্বত ও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া মদীনার প্রতি স্বীয় যানবাহনকে দ্রুত পরিচালিত করিতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মদীনা শহরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বলিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার শহরতলী বস্তিহীন করাও পছন্দ করিতেন না। যেরূপ ৪০৩নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈমান মদীনার প্রতি ধাবিত হয়

অর্থাৎ মোসলমান ব্যক্তি যেখানেই বসবাস করুক পবিত্র মদীনার প্রতি তাহার অনুরাগী ও আকৃষ্ট হওয়া এবং সর্বদা সর্বাবস্থায় মদীনার প্রতি তাহার প্রাণে আবেগ ও আকাঙ্খার ঢেউ খেলিতে থাকা ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন।

৯৬৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا .

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় ঈমান মদীনার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসিবে যেরূপ সর্প স্বীয় গর্তের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসে।

ব্যাখ্যা :—ঈমানের আলো একমাত্র পবিত্র মদীনা হইতেই বিশ্বের কোণে কোণে ছড়াইয়াছে, তাই এই আলো কাহারো অন্তরে বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন সে তাহার কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেই। যেরূপ সর্প স্বীয় গর্ত হইতে বাহির

হইয়া যেখানে যত দূরেই চলিয়া যাউক না কেন সে নিশ্চয় স্বীয় কেন্দ্র গর্তের প্রতি আকৃষ্ট হইবেই হইবে। খাঁটী ঈমানের নিদর্শন এই হইবে যে, মোমেন ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের প্রতিক্রিয়া ও আকর্ষণে উহার কেন্দ্র পবিত্র মদীনার প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। যাহার অন্তরে এই আকর্ষণ নাই বুঝিতে হইবে, তাহার অন্তরে খাঁটি ঈমান নাই।

যাবৎ আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পবিত্র মদীনার ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থানরত ছিলেন তাবৎ এই আকর্ষণের কোন সীমাই ছিল না; যে কোন ব্যক্তি যেখানে যত দূরে ঈমানের আলো লাভ করিয়াছে সে-ই সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ মদীনার প্রতি পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, এরূপ ঘটনার শত শত নজীর ছাহাবীগণের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যদিও বাহ্যিক মৃত্যুর আবরণে ঢাকিয়া যাওয়ার দরুন সাধারণ দৃষ্টিশক্তির সঙ্কীর্ণ আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরতে বরযখী-জীবনে জীবিত অবস্থায় মদীনার মাটিতে অবস্থানরত আছেন। তদুপরি বেহেশতের বাগান সম্বলিত তাঁহার মসজিদ তথায় বিদ্যমান; যাহার এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামাযের অধিক ছওয়াব হয়, তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু নিদর্শন উহাতে উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় উদিত রহিয়াছে। মদীনার ভিতরে বাহিরে অলিতে-গলিতে প্রিয় নবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জেন্দেগীর শত শত নিদর্শন এবং ঐ সবের বরকত হাসিল করার সুযোগ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই এই সোনার মদীনা—প্রাণের প্রিয় শহরের প্রতি মোমেনের প্রাণ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেই। ঈমানের আলো পবিত্র মদীনা হইতে আসিয়াছে সে কখনও প্রিয় মদীনাকে ভুলিবে না। তাই খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিও পবিত্র মদীনাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে, আজীবন উহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকিবে।

জগতের বুকে বেহেশতের বাগান সোনার মদীনায়

৯৬৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ

رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ -

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মসজিদ সংলগ্ন) আমার গৃহ এবং (মসজিদে অবস্থিত) আমার মিম্বার এই

উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান ও ভূখণ্ড বেহেশতের বাগান সমূহ হইতে একটি বাগান এবং আমার এই মিম্বার (হাশরের ময়দানে) আমার হাওজে-কাওসারের কিনারায় স্থাপিত হইবে।

● আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযনী (রাঃ) বর্ণিত ৬৩২ নম্বরে অনুদিত হাদীছখানাও ঠিক এই মর্মেই বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠক! আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিশিষ্ট মোবারক স্থানে বসিয়াই হাদীছ খানার তরজমা ও অনুবাদ করা হইল।

যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফে অবস্থিত হজরে-আসওয়াদ পাথরখানা বেহেশত হইতে পাঠাইয়াছেন; তিনি স্বীয় মাহবুবের মসজিদে বেহেশতের উদ্যান হইতে একটি খণ্ড আনিয়া দিবেন ইহাতে বৈচিত্রের কি আছে?

স্বীয় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও অনুভবশক্তির সঙ্কীর্ণতা স্মরণ রাখিয়া আল্লার অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সুযোগ প্রাপ্তে প্রাণ ভরিয়া বেহেশতের বাগানের স্বাদ গ্রহণ করিবে—সঙ্কীর্ণতার বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিবে না।

হে আল্লাহ পাক-পরওয়ারদেগার! আমি নরাধমকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তুমি স্বীয় কৃপাবলে তোমার মাহবুবের জন্য প্রেরিত বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সুযোগ দান করিয়াছ, চিরস্থায়ী আখেরাতেও তুমি তোমার অসীম কৃপাবলেই বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিও। তোমার কৃপা ভিন্ন নরাধমের আর কোন অছিলা নাই। হে খোদা! তোমার প্রেরিত বেহেশতের বাগানে তোমার প্রিয় নবীর দরবারে বসিয়া তোমার নিকট আমার এই আরজ তোমার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় কবুল কর—আমীন!

স্থূল ও বাহ্যিক পারিপার্শিকতায় আবদ্ধ দৃষ্টি, ভাবধারা ও অনুভবশক্তি যদি এই বেহেশতের বাগানকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিয়া লইতে সক্ষম না হয় তবে দৃঢ়রূপে এতটুকু বিশ্বাস ত নিশ্চয় রাখিবে যে, এই স্থানে এবাদত-বন্দেগী বেহেশতের বিশেষ স্থান ও বাগান লাভে এতই শক্তিমান সহায়ক যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই স্থানকে বেহেশতের বাগান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাই সুযোগ প্রাপ্তে ঐ স্থানে অধিক এবাদৎ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করতঃ মদীনায় পৌঁছিয়া প্রথমে মদীনার সংলগ্ন "কোবা" নামক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং তথায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করার পর খাস মদীনায় আসিবার মনস্থ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাদার মাতুল বংশ বনী-নাজ্জার গোত্রের লোকগণ জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার সহিত হযরত (দঃ)কে কোবা হইতে মদীনায় লইয়া

আসিলেন। প্রত্যেকের প্রাণেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাঙ্খার ঢেউ খেলিতেছিল। কিন্তু হযরত (দঃ) সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, আমার যানবাহন উটের প্রতি আল্লার আদেশ আছে—আল্লার মর্জি যেই স্থানে সেই স্থানেই সে বসিবে। অবলীলাক্রমে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উট আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (দঃ) সেই বাড়ীতে অবতরণ করিলেন, অতঃপর মসজিদ তৈরীর ব্যবস্থা করিলেন। আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী সংলগ্ন নাজ্জার গোত্রীয় লোকদের একটি খেজুর বাগান মসজিদের স্থানরূপে নির্বাচন করিলেন। তথায় মসজিদ তৈরী হইল। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাস গৃহও মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই তৈরী হয় এবং সেই আবাস গৃহেই আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষের মধ্যে ইহজগতের নির্দিষ্ট জীবনকালের শেষ দিনগুলি নবী (দঃ) অতিবাহিত করেন এবং তথায়ই সমাহিত হইয়া জীবিত অবস্থায়ই এখনও তথায় বাস করিতেছেন। (ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া-আলা আলিহী ওয়া-আছহাবিহী ওয়া-বারাকা অসাল্লাম)।

উক্ত আবাসগৃহ এবং মসজিদে অবস্থিত মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীছটি। ঐ স্থানটি বেহেশতের বাগান-খণ্ড হওয়া আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের লীলা। আমাদের জ্ঞান, বোধশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি অতি নগণ্য ও নেহাৎ সীমাবদ্ধ।

নবীজীর (দঃ) অবতরণ-স্থান—আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী কিছুক্ষণ পূর্বে জেয়ারত করিয়া আসিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাসগৃহ সম্বলিত বর্তমান মসজিদে-নববীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণ বরাবর রাস্তার অপর পারে; বর্তমানে তথায় তিনতলা দালান রহিয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বার ঝাউ কাঠের তৈরী ছিল। কালক্রমে উহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে; যেরূপ মানবদেহের বিলুপ্তি ঘটে। পরকালে মানবদের ন্যায় উক্ত মিম্বারও পুনরুত্থানরূপে হাওজে-কাওছারের কূলে স্থাপিত হইবে এবং হযরত (দঃ) উহার উপর উপবেশন পূর্বক হাওজে-কাওছারের পানি পান করাইবেন। আলোচ্য হাদীছের শেষাংশের মর্ম ইহাই।

মদীনার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ

৯৬৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার সঙ্গীগণ সহ) মদীনায় আসিলে পর আবু বকর (রাঃ) এবং বেলাল (রাঃ) জরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্বরের উত্তাপ যখন অধিক হইত তখন তিনি এই বয়েতটি বলিতেন—

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِى أَهْلِهِ — وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

"প্রত্যেক মানুষই স্বীয় স্ত্রী-পুত্রবর্গের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকে, অথচ মৃত্যু তাহার নিকটবর্তী—অতি নিকটবর্তী।"

বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জ্বর উপশমে এই বয়েত দুইটি বলিতেন—

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً — بِوَادٍ وَحَوْلِى إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ — وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِى شَامَةٌ وَطَفِيلٌ

অর্থাৎ---তিনি মক্কা নগরীর দুই প্রকার তৃণ-লতার নাম উল্লেখ করিয়া অনুতাপের সহিত বলিতেছেন, হায়! পুনরায় এই সব তৃণ-লতার মধ্যে অবস্থানের সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কা নগরীর একটি ঝর্ণা বা কূপের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ঐ ঝর্ণার পানি পুনঃ পান করিবার সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কার নিকটবর্তী দুইটি পাহাড়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, পুনরায় উহা আমার নয়নে দেখিতে পাইব কি?

(মক্কা নগরীর বিচ্ছেদে বেলালের এই ব্যথা ও অশান্তির ভাব লক্ষ্য করতঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়া বিতাড়নের ভূমিকায় অগ্রণী মক্কার কতিপয় দুষ্ট কাফেরের নাম উল্লেখ পূর্বক অভিশাপ করিলেন—হে আল্লাহ। শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া এবং উমাইয়া ইবনে খলফ—তাহারা আমাদের মাতৃভূমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া জ্বরের মহামারীর দেশে আসিতে বাধ্য করিয়াছে, তুমি তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ বর্ষণ কর।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا

وَفِى مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ.

"হে আল্লাহ। আমাদের অন্তরে মদীনার প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দাও, যেরূপ প্রীতি ও মহব্বত মক্কা নগরীর প্রতি ছিল, বরং আরও অধিক। হে আল্লাহ! আমাদের (মদীনার) উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বরকত দান কর এবং মদীনা নগরীকে স্বাস্থ্যকর স্থান করিয়া দাও এবং জ্বরের মহামারী মদীনা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া (মদীনার দূরে) জোহ্‌ফা (নামীয়) বস্তিতে পাঠাইয়া দাও।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন মোসলমানগণ মদীনায় আসিয়াছিলেন তখন মদীনা জ্বর ইত্যাদি রোগের মহামারীর স্থান ছিল। কারণ উহার সংলগ্ন "বোত্‌হান" এলাকার পানি দূষিত ছিল, মদীনার আবহাওয়াও দূষিত থাকিত।

পাঠকবর্গ! আল্লাহ তায়ালা মদীনার প্রতি স্বীয় প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়াসমূহ অক্ষরে অক্ষরে কিরূপে পূর্ণ করিয়া দিয়া মদীনাকে সোনার মদীনায় পরিণত করিয়াছেন তাহা চোখে দেখিবার ও ব্যবহারে অনুভব করিবার বস্তু, মুখে বা কাগজে কলমে বুঝাইবার বস্তু নহে।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, তিনি এই নরাধমকে অত্র বিষয় বস্তু লেখাকালীন তৃতীয়বার সোনার মদীনায় হাজির হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়ার ফলাফল নয়ন জুড়াইয়া দেখিবার এবং প্রাণ ভরিয়া খাইবার ও অনুভব করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন। সবকিছু স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বজ্ঞানে অনুভব করিয়াই সামান্য ইঙ্গিত স্বরূপ ইহা লিখিলাম।

৯৭০। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন হাফ্ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা খলীফা ওমর (রাঃ) এই দোওয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .)

উচ্চারণ :— আল্লাহুম্মার-যুক্নী শাহাদাতান ফী-ছাবীলেকা, ওয়াজ্‌আল মৌতী ফী বালাদে রাসূলেকা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।)

অর্থ—হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শহরে (পবিত্র মদীনায়) অনুষ্ঠিত কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আউফ ইবনে মালেক নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি একদা স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শহীদ করা হইয়াছে এবং তিনি শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন। এই স্বপ্ন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ব্যক্ত করা হইলে পর প্রথমে তিনি আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া নৈরাশ্য স্বরে বলিয়া উঠিলেন, শাহাদতের সুযোগ আমি কিরূপে পাইতে পারি? (বর্তমান বিশ্ব-বিজয়ী মোসলেম জাতির সর্বশক্তি-কেন্দ্র) আরব দেশের মধ্যে আমি (খলীফাতুল-মোসলেমীনরূপে) অবস্থান করিতেছি। আমি (বর্তমানে) কোথাও যুদ্ধ-জেহাদে যাই না, সর্বদা মোসলেম জাহানের বেষ্টনীর ভিতর অবস্থান করিতেছি। অতঃপর তিনি এই উক্তির বিপরীত বলিলেন, হাঁ হাঁ—আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায়ও আমার শাহাদৎ ঘটাইতে পারেন। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি উক্ত দোয়া করিয়া থাকিতেন।

মনে হয়—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে শাহাদৎ নছীব হওয়ার সুসংবাদের আনন্দকে এই আশঙ্কা মলিন ও ঘোলাটে করিয়া দিয়াছিল যে, হায়! প্রাণের প্রিয়

সোনার মদীনার বাহিরে মৃত্যু বরণ করিতে হয় না—কি ; কারণ মোসলেম জাহানের রাজধানী মদীনা—যেখানে সর্বশক্তি মোসলমানদেরই। এমন স্থানে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় খলিফাতুল-মোসলেমীনের শহীদ হওয়ার কোন ব্যবস্থা সম্ভবের আয়ত্বে দেখা যাইতেছিল না, তাই তিনি আতঙ্কিত। শাহাদতের মর্তবা অতি বড় অতি উচ্চ বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রদত্ত এত বড় মর্তবার সুসংবাদেও ওমর (রাঃ) প্রাণের প্রিয় সোনার মদীনায় মৃত্যু নছীব হওয়ার মর্তবা ও স্বাদকে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। উভয় নেয়ামতই আল্লাহ তায়ালার বড় দান, তাই তিনি সর্বশক্তিমান মাবুদের দরবারে উভয় নেয়ামত লাভ করার জন্য দরখাস্ত পেশ করা আরম্ভ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান ; তাঁহার রহমতের অন্ত নাই, তিনি ওমরের ন্যায় প্রিয় বান্দাকে বিমুখ করিবেন কেন।

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস সকলেই জ্ঞাত-আছেন যে, তিনি পবিত্র মদীনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ভিতরে মেহ্‌রাবের মধ্যে নামাযরতঅবস্থায় শাহাদৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় মাহবুব হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আরাম-কক্ষে স্থান লাভ করিয়া স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب - السلام عليك يا شهيد المحراب - السلام عليك يا خليفة رسول الله - السلام عليك يا صهر نبى الله المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رضى الله تعالى عنك وارضاك وجعل الجنة مثواك -

"হে আমাদের সম্মানিত মহামনীষী ওমর ইবনুল খাত্তাব! আপনার প্রতি সালাম ; হে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের মেহরাবে শাহাদৎ বরণকারী ! আপনার প্রতি সালাম ; হে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খলীফা—স্থলাভিষিক্ত ! আপনার প্রতি সালাম।

হে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শ্বশুর ! আপনার প্রতি সালাম ! আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন ; আর আপনার স্থান বেহেশতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করুন—আমীন !*

---

* আলোচ্য বিষয়টি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র কবর শরীফের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া লেখা হইল, তাই সেই আনুপাতিক আদব ও রীতি অনুসারেই তাঁহার প্রতি সালাম লিখিয়া দেওয়া হইল।

পাঠকবর্গ! ওমর (রাঃ) যে আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকিতেন এবং যে দোয়া তিনি করিয়া থাকিতেন; ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে-তাবেয়ীন ও আওলিয়া কেরামগণের মধ্যে বহু মহামনীষী এই আকাঙ্খা ও দোয়া করিয়া গিয়াছেন।

আমি নরাধম আল্লাহ তায়ালার হাবীবের মসজিদে বিশিষ্ট স্থান—বেহেশতের বাগানে বসিয়া আল্লার দরবারে এই দোয়া করিতেছি—হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদৎ ও পবিত্র মদীনায় মৃত্যু দান কর এবং পবিত্র জান্নাতুল-বাকির মধ্যে আমাকে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় নবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় আমি নরাধমের এই আরাধনা কবুল কর—আমীন! ×

مُنًى كُنَّ فِي قَلْبِي غَرَسْتُ بِطَيْبَةٍ — فَأَسْقِي بِدَمْعٍ وَّالدِّمَاءِ لِتَجْتَدِي

অন্তরে বহু আশা-আকাঙ্খার বীজ ছিল—উহা পবিত্র মদীনায় বপন করিয়াছি। এখন চোখের পানি এবং রক্ত-অশ্রু দ্বারা উহার সিঞ্চন করিব যেন উহাতে ফল আসে।

وَهَلْ لَذَّةٌ لِي فِي الدُّنَى وَنَعِيْمِهَا — إِذَا أَنَا نَاءٍ مِّنْ مَّدِيْنَةِ سَيِّدِي

দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রী-সম্ভার কি আমার নিকট স্বাদময় হইতে পারে—যখন আমি আমার মহানের মদীনা হইতে দূরে থাকি?

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَّبِّي جِوَارَ مَدِيْنَةٍ — فَيَا لَيْتَ لِي فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِي

মদীনার আশ্রয়ই আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট বিশেষভাবে কামনা করিয়াছি। হায়...! আমার কবরের জন্য মদীনার মধ্যে এক হাত জায়গা আমার ভাগ্যে জুটিবে কি?

رَجَائِي بِرَبِّي أَنْ أَمُوْتَ بِطَيْبَةٍ — فَأَرْقُدُ فِي ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَأُحْشَرُ

আমার প্রভুর দরবারে আমার আকাঙ্খা এই যে, আমার মৃত্যু যেন মদীনায়ে-তায়েবায় হয়; তাহা হইলে আমি প্রাণ-প্রিয় হাবীবের ছায়ায় চিরনিদ্রা যাইতে পারিব এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশরে যাইতে পারিব।

إِلٰهِي عَلٰى بَابِ الْحَبِيْبِ رَجَوْتُهُ — فَهَلْ أَنْتَ تُعْطِيْنِيْهِ حَتْمًا مُّقَدَّرًا

হে আমার মাবুদ! হাবীবের দরওয়াজায় অর্থাৎ তাঁহার মসজিদে তাঁহার রওজা পাকের নিকটে থাকিয়া তোমার দরবারে এই আকাঙ্খা রাখিলাম; তুমি নিশ্চিতরূপে আমার এই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন আমার ভাগ্যে রাখিবা ত?

× ১লা আগষ্ট ১৯৫৮ ইং পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ।

একাদশ অধ্যায়

রোযা

রমজান শরীফের রোযা ফরজ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল। রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন মোত্তাকী—খোদাভীরু ও সংযমী হইতে পার।

৯৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (১০ই মহরম—) আশুরার দিনের রোযা নিজে রাখিয়াছেন এবং উক্ত রোযা রাখিবার আদেশও করিয়াছেন; (সে মতে উহা ফরজ ছিল।) অতঃপর যখন রমজানের রোযা ফরজ করা হইল তখন আশুরার রোযা ফরজ হওয়া পরিত্যক্ত হইল।

এই বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ৮২৯ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে।

রোযার ফজীলত

৯৭২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّىْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى الصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রোযা (দোজখের আজাব হইতে বাঁচাইবার পক্ষে) ঢাল স্বরূপ। (ঢাল দুর্বল হইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষা করা কঠিন। অতএব প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য, যে সব কারণে রোযা দুর্বল হয় তাহা হইতে বিরত থাকা।) সুতরাং রোযাদার ব্যক্তি গালি-গীবত ইত্যাদি কোন খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ করা হইতে বা কোন খারাপ কাজ করা হইতে বিশেষরূপে বিরত থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ বা গালাগালি করে তবে (তাহার কর্তব্য হইবে—কোন প্রকার প্রতিউত্তর না করিয়া নিজেকে পূর্ণ সংযমী রাখিবে এই ভাবিয়া যে, আমি রোযাদার আমি এরূপ কার্য্য বা কথার প্রতিউত্তর করিতে পারি না; আবশ্যক বোধে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষান্ত করিবার জন্য মুখেও ইহা) প্রকাশ করিয়া দিবে যে, আমি রোযাদার (আমি ঝগড়ায় লিপ্ত হইব না। প্রয়োজন হইলে একাধিক বার এইরূপ বলিবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলেন—যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, রোযাদার ব্যক্তি না খাইয়া থাকার দরুণ তাহার মুখে যে বিকৃত গন্ধ সৃষ্টি হয় (মূল্য ও প্রতিদানের দিক দিয়া) উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশক ও কস্তুরীর সুগন্ধি অপেক্ষা উত্তম গণ্য হইবে।

(রোযাদারের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তাহার প্রশংসা স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বলিয়া থাকেন—এই বন্দা) আমার আদেশ পালনার্থে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বীয় খাদ্য, পানীয় ও কাম-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছে। সে মতে রোযা খাছ আমার জন্য—আমার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমিই (আমার মনঃপুত ও মনোমত) উহার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিব।

নেক আমলের প্রতিফল দানে সাধারণ নিয়ম এই রাখা হইয়াছে যে, দশগুণ (হইতে সত্তর গুণ পর্য্যন্ত) দেওয়া হইয়া থাকে। (কিন্তু রোযার প্রতিদানের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ম রাখা হয় নাই; রোযার জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণা, রোযা আমার জন্য; উহার প্রতিদান আমিই দিব।)

ব্যাখ্যা :- রোযাদার ব্যক্তির মুখের বিকৃত গন্ধের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, দুনিয়াতে রোযার দ্বারা মুখকে দুর্গন্ধযুক্ত করার ফলে বেহেশতে মেশকের খোশবুর চেয়েও উত্তম এবং অধিক মূল্যবান সুগন্ধ রোযাদারের মুখে দান করা হইবে।

রোযার বিষয় আল্লাহ তায়ালা যাহা বলিয়া থাকেন উহার প্রথম বাক্যটি হইল 'রোযা আমার জন্য"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে--যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয় এবাদতই আল্লাহ তায়ালার জন্য তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু রোযা এবং অন্যান্য এবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে অন্যান্য এবাদত

সমূহের ক্রিয়া-কলাপ আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতি এইরূপ যে, মুখে প্রকাশ না করিয়াও উহার মধ্যে রিয়া তথা লোকদেখানো ভাব সৃষ্টি হইতে পারে এবং অনেক সময় আবেদ তথা এবাদতকারীর অন্তরে, তাহার অনুভূতির অন্তরালে ঐ ভাবটি লুকাইয়া থাকে। সে উহা অনুভব করিতে না পারিলেও অন্তত: উহা তাহার ভিতরে থাকে, যদ্দরুণ তাহার নফছ এক প্রকার স্বাদও গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে রোযা এমন পদ্ধতির এবাদত যে, রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে প্রকাশ না করিলে সাধারণত: উহা একমাত্র অন্তর্য্যামী আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত লোক-সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার মত নহে। তাই রোযার মধ্যে আল্লার সন্তুষ্টি ব্যতীত নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহার আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে নাই। তবে কোন বদ-নছীব যদি মুখে গাহিয়া স্বাদ লাভ করিতে চায় তবে সে কথা স্বতন্ত্র। এই পার্থক্যটির প্রতিই এক হাদীছের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—

كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لى وانا اجزى به

"প্রত্যেক এবাদতই এবাদতকারী ব্যক্তির জন্য। (অর্থাৎ প্রত্যেক এবাদতই এইরূপ নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতির যে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও এবাদতকারীর নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।) পক্ষান্তরে রোযা—উহা একমাত্র আমার জন্য। (অর্থাৎ রোযার নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া এবাদতকারী রোযাদারের নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে নাই।)

এতদ্ভিন্ন রোযা হইল—খাদ্য, পানীয় ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকা; তথা না-করণ কার্য্য যাহা অদৃশ্য আমল। গোপনে পানাহার বা কামস্পৃহা চরিতার্থ করিলে তাহা অন্য লোকে জানিতে পারে না, সুতরাং মানবীয় প্রবৃত্তির অতি লোভণীয় বস্তু পানাহার ও কামস্পৃহাকে চরিতার্থের লোভকে খাঁটীভাবে সংবরণ করার কষ্ট-সহিষ্ণুতা একমাত্র আল্লার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আসক্তি ব্যতিরেকে কেউ স্বীকার করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ বলেন, রোযা একমাত্র আমার জন্য—অর্থাৎ বস্তুতঃ রোযা খাছভাবে আমার ভক্তি ও আসক্তিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যটি হইল "উহার প্রতিদান আমিই দান করিব"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সমস্ত এবাদতের প্রতিদানই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিবেন; তিনিই "مالك يوم الدين—প্রতিফল দান দিবসের একচ্ছত্র মালিক"; এবং সর্বক্ষেত্রেই কর্ম অনুপাতে প্রতিফল বহুগুণে বেশী দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রত্যেক নেক কার্য্যের প্রতিফল দানের ব্যাপারেই কর্ম ও কর্মফল উভয়ের মধ্যে আনুপাতিক হিসাব ও নিয়মের একটি

ধারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহা স্বীয় বাণী ও রসুলের মারফত ব্যক্তও করিয়া দিয়াছেন যে, প্রতি নেক কাজে দশগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত বা ততোধিক গুণ নেকী ও তাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

রোযার প্রতি আল্লাহ তায়ালার স্বীয় আদর, প্রীতি ও অনুরাগ প্রকাশার্থে ঘোষণা করেন যে, উহার প্রতিদান আমি দয়ালু অফুরন্ত খাজানার মালিক নিজ ইচ্ছা, আভিরুচি ও তৃপ্তি পরিমাণ মনঃপুত ও মনোমতরূপে দান করিব—যাহার মধ্যে কোন নিয়ম বা আনুপাতিক হিসাবের সীমাবদ্ধতা থাকিবে না। কি দিব? কত দিব? তাহা আমিই জানি।

● আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঝগড়া-বিবাদ বারণ করা ইত্যাদি উত্তম উদ্দেশ্যে যদি নিজের রোযাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করে তবে তাহা দোষণীয় নহে। (২৫৫ পৃঃ)

৯৭৩। হাদীছঃ— عن سهل رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ .

অর্থ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বিভিন্ন বেহেশত এবং সেই) বেহেশতের (বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার ও ফটক সমূহের মধ্যে প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত) একটি ফটকের (এবং উহার এলাকাস্থ বেহেশতটির) নাম হইল "রাইয়্যান"। পরকালে সেই ফটক দ্বারা একমাত্র ঐ মোমেনগণ প্রবেশ করিতে পারিবে যাঁহারা (দুনিয়াতে) রোযার অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিলেন।* অন্য কেহ ঐ ফটকে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোযাদারগণকে বিশেষরূপে আহ্বান করা হইবে এবং তাঁহারা (সেই ফটকের প্রতি) অগ্রসর হইবেন, অন্য কেহ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোযাদারগণ উহাতে প্রবেশ করার পর উহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; অন্য কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

---

* "রাইয়্যান শব্দের আভিধানিক অর্থ পিপাসামুক্ত। রোযাদারগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ করতঃ রোযা রাখিয়াছিল, সেই আমলের স্মরণে উহার প্রতিদানে সুখের বাসস্থানকে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে।

৯৭৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি এক জোড়া জিনিস আল্লার রাস্তায় দান করিবে তাহাকে বেহেশতের যতগুলি গেট আছে প্রত্যেকটি গেট হইতে ডাকা হইবে—হে আল্লার খাছ বন্দা! (এদিকে আসুন;) এইটি ভাল।

অতঃপর যাঁহারা আহ্‌লে-ছালাত হইবেন তথা যাঁহাদের নামাযের সঙ্গে বেশী মহব্বত এবং বৈশিষ্ট্য ছিল—অর্থাৎ যাঁহারা ফরজ এবাদৎ সমূহ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল নামায পড়িতে বেশী ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকে বাবোছ্‌-ছালাত তথা নামায-গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-জেহাদ হইবেন অর্থাৎ জেহাদ বেশী ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকে বাবোল-জেহাদ তথা জেহাদ-গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-ছিয়াম হইবেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্যান্য এবাদৎ ফরজ পরিমাণ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল রোযা করিতে বেশী অনুরাগী ছিলেন তাঁহাদিগকে বাবোর-রাইয়্যান তথা রাইয়্যান নামক গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-ছদকা হইবেন অর্থাৎ দান-সাহায্যকারী তাঁহাদিগকে বাবোছ্‌-ছদকা তথা দান-গেট হইতে ডাকা হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! একজন লোককে সমস্ত গেট হইতে ডাকা হউক, ইহার প্রয়োজন ত নাই, কিন্তু (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন,

প্রকৃত প্রস্তাবেই কি সেইরূপে) কোন লোককে সমুদয় গেট হইতে ডাকা হইবে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—সেইরূপও হইবে এবং আশা করি, আপনি ঐ দলেরই একজন হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এখানে তিনটি বিষয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আবশ্যক।

(১) আল্লার রাস্তায় দান করার তাৎপর্য্য (২) এক জোড়া জিনিসের তাৎপর্য্য (৩) এবং বেহেশতের গেট সমূহের বিষয় উক্তি "এইটি ভাল" ইহার তাৎপর্য্য।

● আল্লার রাস্তায় দান করার অর্থ আল্লার দীন জারী করার এবং দীন জারী রাখার যে কোন কাজে দান করা। আল্লার দীন জারী করাতে বাধা দেয় যে কাফের শত্রুগণ তাহাদের সঙ্গে জেহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে হউক বা আল্লার দীন শিক্ষাদান কার্য্যে হউক বা মৌখিকভাবে কিম্বা লিখিত আকারে আল্লার দীন প্রচার করার কাজে হউক। আল্লার দীন অর্থে আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার দরবার হইতে আনিয়া মানব জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে দান করিয়াছেন—কোরআন আকারে বা হাদীছ আকারে তথা রসুলের কথা ও কার্য্য দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা আকারে। যেহেতু দীন জারী করার মধ্যে দীনের সব শাখাই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আল্লার দীন জারী করার কাজে সাহায্যকারী ও দানকারীকে সব গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। এবাদৎ সমূহের ফরজ পরিমাণ আদায়ের পর নফল পর্য্যায়ে যাহার যে প্রকার এবাদতের প্রতি মহব্বত এবং অধিক অনুরাগ ছিল তাহাকে সেই সংশ্লিষ্ট গেট হইতে আহ্বান করা হইবে।

নামাযের প্রতি যাহার অধিক মহব্বত, অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে নামায-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। দান-ছাখাওয়াত, খয়রাত, যাকাতের প্রতি এবং খেদমতে-খাল্ক ও পরোপকারের প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ, মহব্বত ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে যাকাত-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। রোযার প্রতি যাহার বেশী মহব্বত এবং অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে রোযার দরওয়াজা—রাইয়্যান নামক গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। জেহাদের প্রতি যাহার বেশী মহব্বত ছিল অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে যে অধিক অনুরাগী ছিল তাহাকে জেহাদ-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে।

এইরূপে যেই ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এবং বরাবর আল্লার নিকট তওবা এস্তেগফার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বেশী ভালবাসিত তাহাকে বাবোত-তওবা তথা তওবা-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অধীনস্থ ত্রুটিকারীকে ক্ষমা করিতে এবং ক্রোধ দমন করিয়া রাখিতে অধিক অভ্যস্ত ছিল তাহাকে বাবোল-কাযেমীনাল-গয়য, অল আফীনা আনিন্নাছ তথা ক্রোধ দমনকারী ক্ষমাকারীদের গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

অধিক পরিমাণে করিয়া থাকিত এবং কষ্ট-ক্লেশ অবস্থায়ও ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করতঃ শান্ত, সন্তুষ্ট ও তুষ্ট থাকিত তাহাকে বাবোর্-রাযীন তথা তুষ্ট ও শান্তদের গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। বেহেশতের এই আটটি গেট বা দরওয়াজার বিষয়ই হাদীছে উল্লেখ আছে।

● এক জোড়া জিনিস নিজের তহবিল হইতে বাহির করিয়া দান করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বারই যখন দান করে—যে কোন জিনিসই দান করুক না কেন, তখন একটি মাত্র জিনিসই দান করে না, বরং এক জোড়া জিনিস দান করে। যেমন—এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ঘোড়া, এক জোড়া ঢাল-তলওয়ার ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক বারই পূর্বের দানের কথা ভুলিয়া গিয়া বর্তমানের একবারের সঙ্গে ভবিষ্যতের আরও একবারকে মিলাইয়া জোড়া বানাইবার নিয়ত ও আশা রাখে। দানকারীর জন্য পূর্বকৃত দান ভুলিয়া যাওয়াই অধিক ভাল এবং আগামীতে আরও এইরূপ দান করিবে এই আশা ও নিয়্যত করাই অধিক ফজিলতজনক। কিন্তু দান গ্রহীতার জন্য ইহার বিপরীত অর্থাৎ পূর্বের কিঞ্চিৎ দানও জীবনে কখনো ভুলিয়া যাওয়া চাই না এবং ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ দান গ্রহণের আশা বা ইচ্ছা মনে পোষণ করা চাই না।

● বেহেশতের গেট ও দরওয়াজা সমুহের প্রত্যেকটির বিষয় এই উক্তি যে, "এইটা ভাল" ইহার অর্থ এই যে, বেহেশত সবই ভাল, সেখানে মন্দের নাম-নিশানও নাই, কিন্তু যে ফেরেশতা যেই গেট ও দরওয়াজার তত্ত্বাবধায়ক তিনি সেইটিকেই সবচেয়ে ভাল মনে করিতেছেন এবং এই অনুসারেই ইহা বলিতেছেন।

রমজান মাসের মর্য্যাদা

৯৭৫। হাদীছঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ

السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রমজান মাস আরম্ভ হয় তখন হইতে উর্দ্ধ জগতের (তথা রহমতের) দরওয়াজা সমুহ খুলিয়া দেওয়া হয়, (সেমতে বেহেশতের দরওয়াজাসমূহও খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং জাহান্নামের সমুদয় দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং (অধিক দুষ্ট, নেতৃস্থানীয়) শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যাঃ—আলোচ্য রেওয়ায়েতে উর্দ্ধ জগতের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়ার উল্লেখ হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে রহমতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে এবং এক রেওয়ায়েতে

বেহেশতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে। সব রেওয়ায়েতের মূল তাৎপর্য্য একই। রমজান মাসে বিশেষরূপে অতি মাত্রায় এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়া সর্বদা আল্লার রহমত নাযেল হইতে থাকে। তাই আকাশে আল্লার রহমত-বাহক ফেরেশতা নাযেল হওয়ার দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রধান কেন্দ্র বেহেশতের দরওয়াজাসমূহ রমজান মাসের সম্মানার্থে খুলিয়া রাখা হয়।

● রমজান মাসের বিশেষত্ব হিসাবে জগদ্বাসীর প্রতি যেরূপ রহমত নাযেল করার ব্যবস্থা রাখা হয় তদ্রূপ রহমতের বিপরীত আল্লাহ তায়ালার গজব ও আজাবের কারণ তথা শয়তানী আন্দোলন ও কার্য্যকলাপ কম করার ব্যবস্থাও করা হয় যে—বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। শয়তানী আন্দোলন ও কার্য্যকলাপকে সমূলে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করিলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাহা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে জাগতিক জীবনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য পণ্ড হয়, তাই আল্লাহ তায়ালা তাহা করেন না। এই জন্যই ইবলিসের সাধারণ অনুচরবৃন্দ এবং মানুষের আকৃতিতে শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ এবং মানুষের নফছে-আম্মারা তদুপরি এগার মাস শয়তানী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সক্রিয়তা বন্ধ করা হয় না। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসের সম্মানার্থে স্বীয় বন্দাগণকে বিশেষ সুযোগ প্রদানার্থে নেতৃস্থানীয় বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেন। যদ্দরুণ আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়ার পথ ধরা সহজ হইয়া যায়। মানব যেন এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় না হারায় সেজন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন ফেরেশতা পবিত্র রমজান মাসে আল্লার বন্দাদিগকে প্রতি দিন এই আহ্বান জানাইতে থাকেন, يا باغى الخير اقبل ويا باغى الشر اقصر "হে সত্যান্বেষী সুপথের পথিক! (এই পবিত্র রমজানের সুবর্ণ সুযোগে) দ্রুত সম্মুখপানে অগ্রসর হও, উন্নতি লাভ কর। হে কু-পথগামী! (হেলায় এই সুযোগ হারাইও না। এই পবিত্র রমজানে স্বীয় আত্ম-সংশোধন ও পবিত্রতা লাভে সচেষ্ট হও এবং কু-কার্য্য হইতে) ক্ষান্ত হও, সতর্ক হও।"

অর্থাৎ—যেহেতু পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ তায়ালার রহমতের দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে, রহমত লাভ করা সহজ সুলভ হয়; তাই এই সুযোগের প্রতিটি মুহূর্তকে স্বীয় উন্নতির সম্বলরূপে গ্রহণ কর। আপন জীবনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও, অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর, যেরূপ কোন ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসায়ের জন্য মৌসুম, সুযোগ ও হাট-ঘাট, মেলা বা প্রদর্শনীকে উন্নতির বিশেষ সহায়ক ও সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে রমজান মাসে অসত্যের ও কু-পথের বড় বড় আন্দোলনকারীরা আবদ্ধ রহিয়াছে, কু-পথ হইতে ফিরিয়া আসা ও কু-কার্য্যকে ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে, অসংখ্য বাধা-বিপত্তির উপশম হইয়াছে, ফিরার পথের বেড়াজাল সমূহের লাঘব ঘটিয়াছে।

এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারাইও না, এই সোনালী সময়কে চৈতন্যহীন অবস্থায় অতিবাহিত করিও না। সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, অতীত জীবনের অন্ধকারময় পথে আর অগ্রসর হইও না, থাম। এই সুযোগেই পশ্চাদে পরিত্যক্ত আলোর পথে ফিরিয়া আস।

আল্লাহ তায়ালা কত মেহেরবান করুণাময়! স্বীয় বন্দাদিগকে সুযোগ দান করিয়া সেই সুযোগের ঘোষণা এবং আহ্বানও জানাইয়া দিতেছেন। শুধু এক দুই বার নয়, বরং সুযোগের প্রতিটি দিনেই এই আহ্বান আসিতে থাকে। যাঁহাদের রুহানী শ্রবণশক্তি আছে, তাঁহারা সরাসরি সেই আহ্বান শুনিতে পারেন। যাহারা সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সত্য রসুলের মারফৎ সেই আহ্বানের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

পরীক্ষাক্ষেত্রের অনুপযুক্ত—পরীক্ষা-বিষয়ে পরীক্ষার্থীর স্বায়ত্বশাসিত স্বাধীনতাকে খর্বকারী—বাধ্য-বাধকতামূলক ব্যবস্থা ব্যতীত পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। কোন ব্যক্তি যদি এসব ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় ভ্রষ্টতাকেই আঁকড়াইয়া থাকে তবে তাহার পক্ষে এসব সুযোগের কোন মূল্যই হইবে না।

রোযা অবস্থায় মিথ্যায় লিপ্ত হওয়ার বিষময় ফল

৯৭৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ

لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ .

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্য্য পরিত্যাগ না করিবে ঐ ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার কোনই মূল্য আল্লার নিকট নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের উদ্দেশ্য মিথ্যাবাদীকে রোযা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া নহে। বরং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা পরিত্যাগ করতঃ রোযার পূর্ণ সুফল লাভ করার প্রতি আহ্বান করাই এই হাদীছের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেরূপ কোন চিকিৎসক স্বীয় রোগীকে ঔষধ প্রদান করতঃ সতর্ক করিয়া দিয়া থাকে যে—অমুক অমুক কু-পথ্য ব্যবহার করিলে ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল হইবে না। এই সতর্কবাণী শুনিয়া যদি ঐ সকল কু-পথ্যকেই আঁকড়াইয়া থাকে এবং নিষ্ফল মনে করিয়া ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

রোযাদারের আনন্দ

৯৭৭। হাদীছ :— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهٗ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন······যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহাদের জন্য আনন্দ উপভোগের বিশেষ দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। প্রথমতঃ—এফ্‌তার করার সময়। দ্বিতীয়তঃ—যখন স্বীয় পালন-কর্তার নিকট উপস্থিত হইবে তখন রোযার (প্রতিফল প্রত্যক্ষরূপে দেখা ও উপভোগ করার) দরুন সে আনন্দিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—প্রথম আনন্দের কারণ স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার তৌফিক দানে রোযা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সামগ্রী উপভোগ করার অনুমতি লাভ হইয়াছে। এই প্রথম আনন্দেরও দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। প্রথম হইল প্রতিদিন এফ্‌তারের সময় যখন ঘরে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় হইল যখন সমগ্র রমজান মাসের রোযা সম্পূর্ণ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য এফতার করা হয় অর্থাৎ ঈদুল-ফেতরের দিনে; যখন ঘরে-বাহিরে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, সমগ্র দেশময় ও সমগ্র মোসলেম জাতির ভিতরে বাহিরে আনন্দ উল্লাসের স্রোত বহিয়া যায়। নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের মুখেই হাসি-খুশীর ঢেউ খেলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় আনন্দ—ইহাই স্থায়ী এবং পূর্ণ ও আসল আনন্দ। উহা লাভ হইবে যখন পরজগতে যাইয়া আল্লাহর দরবার হইতে তাঁহারই বিঘোষিত الصوم لى وانا اجزى به "রোযা আমার বস্তু, উহার প্রতিদানে আমি আমার মনঃপুত ও মনোমত প্রতিফল দান করিব" এই প্রতিফল লাভ করিবে।

যৌন উত্তেজনা রোধে রোযা

৯৭৮। হাদীছ :— قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهٗ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَهٗ وِجَاءٌ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি বলিলেন, যাহার বিবাহ করার সামর্থ আছে, তাহার বিবাহ করা কর্তব্য। কারণ, বিবাহ চক্ষুর দৃষ্টিকে সংযত রাখিতে এবং যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখিতে বিশেষ সহায়ক হয়। যে ব্যক্তি অপারক; বিবাহের (খরচ ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের) সামর্থ্য রাখে না তাহার কর্তব্য হইবে রোযা রাখিয়া যাওয়া—ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া যাওয়া। ধারাবাহিক রোযার দ্বারা তাহার কাম-রিপুর দমন সাধিত হইবে, যৌন উত্তেজনার উপশম হইবে।

চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদ নির্ভরশীল

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (অর্থাৎ ২৯শে শা'বান চাঁদ দেখার কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু সম্ভাবনা সূত্রে) রমযানের রোযা রাখিবে, সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবাধ্য গণ্য হইবে।

৯৭৯। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى

تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের আলোচনা করতঃ বলিলেন, যাবৎ (রমজানের) চাঁদ দেখা (প্রমাণিত) না হয় তাবৎ রোযা রাখিও না। তদ্রূপ যাবৎ (শওয়ালের) চাঁদ দেখা (প্রমাণিত) না হয় রোযা পরিত্যাগ করিও না। যদি (নূতন) চাঁদ প্রকাশিত না হয় তবে (রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে ত্রিশ দিনে মাসের) হিসাব গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৮০। হাদীছ :— عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ

فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে, কিন্তু (শা'বানের উনত্রিশ তারিখে) চাঁদ না দেখা পর্য্যন্ত রোযা রাখিও না। যদি (সেই দিন) চাঁদ প্রকাশ না হয় তবে ত্রিশ দিনের গণনা পূর্ণ কর।

৯৮১। হাদীছ :— يقول ابن عمر قال النبى صلى الله عليه وسلم

اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَخَنَسَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রোযার মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনেও হয় এবং এইরূপে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন—উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ উন্মুক্ত করিয়া তিনবার দেখাইয়াছেন, কিন্তু তৃতীয়বার একটি আঙ্গুল আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

৯৮২। হাদীছ :— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُبِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا

عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং (শওয়ালের) চাঁদ দেখিয়া রোযা পরিত্যাগ কর। যদি (রমজানের) চাঁদ (শা'বানের ২৯ তারিখে) প্রকাশ না হয় তবে (শা'বানের) গণনা ৩০ দিন পূর্ণ কর।

৯৮৩। হাদীছ :— عن ابى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوا الْحِجَّةِ

অর্থ—আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই ঈদের দুই মাস অর্থাৎ রমজান মাস ও জিলহজ্জ মাস (কোন অবস্থাতেই) অসম্পূর্ণ গণ্য হয় না।

ব্যাখ্যা :—রমজান মাস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মাসই অতি ফজিলতের মাস। জিলহজ্জ মাসও তদ্রূপ; ইহার প্রথম দশ দিন ত বিশেষ ফজিলতের আছেই, সম্পূর্ণ মাসেরও অপেক্ষাকৃত ফজিলত আছে। এই মাসদ্বয়ের ফজিলত ত্রিশ দিন হইলে যেরূপ উনত্রিশ দিন হইলেও তদ্রূপ। উনত্রিশ দিন হইলে এইরূপ ধারণা করা ভুল হইবে যে, এ বৎসর এই মাস অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বর্তমান যুগে রমজান মাস উনত্রিশ দিনের হইলে কোন কোন লোককে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে শুনা যায় যে, এবার আমাদের রমজান পুরা হইল না। এরূপ উক্তি ও অনুতাপ আলোচ্য হাদীছের পরিপন্থী, এরূপ করা চাই না।

৯৮৪। হাদীছ:— عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِى مَرَّةً

تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ -

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে বহু লোক বিদ্যাহীন নিরক্ষর আছে এবং হইবে—যাহারা লেখা-পড়া এবং (নক্ষত্রের ভ্রমণ ও তিথির) হিসাব-নিকাশ হইতে অজ্ঞ। অতঃপর হযরত (দঃ) ইশারা করিয়া দেখাইলেন--মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনের হয় এবং কোন সময় ত্রিশ দিনেও হয়।

ব্যাখ্যা:—শরীয়তের অধিকাংশ বিষয় চাঁদের হিসাবের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, কারণ চাঁদ অতিশয় স্পষ্ট ও উজ্জল দীপ্তিমান বস্তু এবং এরূপ প্রকাশ্য পরিবর্তনশীল যে, বিশেষ কোনও হিসাব-নিকাশ বা দৃষ্টির অগোচর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া উহার দ্বারা মাসের হিসাব নির্ধারিত করা যায়। উহার হিসাব সর্ব-সাধারণের জন্য সহজ সাধ্য এবং অকাট্য। তাই চাঁদের হিসাবের উপরই ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম স্থাপন করা হইয়াছে, কারণ উম্মতের মধ্যে অনেক লোক শিক্ষা-দীক্ষাহীন হইবে যাহারা লেখা-পড়া হিসাব-কিতাব হইতে অজ্ঞ। অদৃশ্য সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের উপর শরীয়তের হুকুম স্থাপন করা হইলে অধিকাংশের জন্যই তাহা সহজ সাধ্য হইত না।

রমজানের চাঁদ দেখার পূর্বেই রোযা আরম্ভ করা নিষিদ্ধ

৯৮৫। হাদীছ:— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ

رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার! কোন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার এক দুই দিন পূর্ব হইতে রোযা রাখা আরম্ভ করিবে না। হাঁ—যদি কোন ব্যক্তির স্থিরকৃত ও রোযায় অভ্যস্ত দিন ঐরূপ তারিখে হয়, তবে সে ঐ দিন রোযা রাখিতে পারে। (যেমন কোন ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখায় অভ্যস্ত। ঘটনাক্রমে কোন সপ্তাহের এই দুইটি বার রমজানের এক দুই দিন পূর্বে আসিল, সেই ব্যক্তি ঐ দিনের রোযা রাখিতে পারিবে।)

রমজানের রাত্রে পান-আহার ইত্যাদি জায়েয

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

অর্থ—রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী ব্যবহার করা জায়েয ও হালাল করা হইল। স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অভীপ্সা, অনুরাগ ও তার সম্পর্ক এরূপ যেন পরস্পর একে অন্যের পরিবেশ পোষাক, (যদ্দরূণ) তোমাদের (কাহারও কাহারও সেই আকর্ষণের ফলে শরীয়ত বিরোধী) নিজের ক্ষতিকারক কার্য্যে পতিত হওয়ার ঘটনা আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত হইয়াছেন। তাই তিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমাদের তওবা কবুল করিয়াছেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন (এবং শরীয়তের বিধান বদলাইয়া দিয়াছেন)। এখন হইতে তোমরা (রমজানের রাত্রে) স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিতে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ভাগ্যানুপাতিক বস্তু (সন্তান) লাভের চেষ্টা করিতে পার। (২ পাঃ ৭ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোযার নিয়ম ও বিধান এই ছিল যে, নিদ্রামগ্ন হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই রোযা আরম্ভ হইয়া যাইত। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। ফলে কোন কোন ছাহাবীর দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, তারাবীহ ইত্যাদি হইতে অবসর হইয়া অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার স্ত্রীর নিদ্রা আসিয়া গেল। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া সে স্বীয় স্ত্রীর নিদ্রামগ্নতাকে বৃথা অজুহাত মনে করতঃ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিল, অথচ স্ত্রীর নিদ্রামগ্ন হওয়ার দরূণ তাহার রোযা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে সহবাসে বাধ্য করা শরীয়ত বিরোধী কার্য্য ছিল। তাই এইরূপ ঘটনা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ পরে শীতল মস্তিষ্কে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার পর ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া নিজে নিজেও তওবা করিলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারেও ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ ঘটনার উপরই উল্লিখিত আয়াত নাযেল হইল এবং চিরতরে শরীয়তের বিধান এই বিষয়ে সহজ করিয়া দেওয়া হইল যে, ছোবেহ-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রামগ্ন হওয়ার পরও পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস জায়েয এবং ছোবেহ-ছাদেক হইতে রোযা আরম্ভ হইবে।

৯৮৬। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের উপর (রোযা ফরজ হওয়ার প্রাথমিক যুগে) এই বিধান বলবৎ ছিল যে, কোন রোযাদার এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ্‌তারের বস্তু সম্মুখে রাখিয়া এফ্‌তার করার পূর্ব মুহূর্তে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলে সে পরবর্তী দিবসের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন প্রকার পানাহার করিতে পারিত না। (কারণ, রাত্রের যে কোন অংশের নিদ্রা হইতে পরবর্তী দিবসের সুর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রোযার সময় নির্দ্ধারিত ছিল।)

কায়েস ইবনে ছেরমা আনছারী (রাঃ) নামক (এক বৃদ্ধ) ছাহাবী রোযাদার ছিলেন। এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইলে পর তিনি গৃহে আসিয়া স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? স্ত্রী বলিল, উপস্থিত কিছুই নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে যাইতেছি। কায়েস ইবনে ছেরমা (রাঃ) সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হইয়া গেল। এদিকে তাঁহার স্ত্রী (কিছু খাদ্য বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া) উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় দেখিয়া অনুতাপ করতঃ বলিল, আপনার ত কিসমত কাটা গিয়াছে। (নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া স্ত্রী তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের তথা শরীয়তের আদেশ লঙ্ঘনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ কোন কিছু না খাইয়া দ্বিতীয় দিনের রোযা রাখিয়া দিলেন।) দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে তিনি বেহুশ—অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হইল। এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল যাহার অংশ বিশেষ এই—

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

"এবং রমজানের রাত্রে তোমরা পানাহার করিতে পার যাবৎ কালো রেখা (রাত্রের অন্ধকার) শেষ হইয়া সাদা রেখা (প্রভাতের আলো) উদিত না হয়।"

৯৮৭। হাদীছঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআন শরীফে অবতারিত এই আয়াতটি আমি পাঠ করিলাম—

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

এবং خيط "খায়েত" শব্দের অভিধানিক অর্থ হইল—সূতা বা তাগা। যে অনুসারে আয়াতের অর্থ হয়—"তোমরা রমজানের রাত্রে পানাহার করিতে পার যাবৎ সাদা সূতা কাল সূতা হইতে পৃথক হইয়া দৃষ্ট না হয়"। তাই আমি একটি সাদা তাগা এবং একটি কাল তাগা আনিয়া তাগাদ্বয়কে আমার বালিশের নীচে রাখিয়া দিলাম এবং রাত্রির

অন্ধকারে উহাদের প্রতি বারবার দেখিতে লাগিলাম, রাত্রের অন্ধকার পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া দিনের আলো আসিবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাগাদ্বয়ের পূর্ণ পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইতে ছিল না; (এবং আমি সেহেরী খাওয়াও ক্ষান্ত করিতেছিলাম না।) ভোর বেলা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে বুদ্ধিমান! এখানে الخيط الابيض "আল খায়তুল আবয়্যাজু"—সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাতের আলো রেখা এবং "আল-খায়তুল আছওয়াদ"—কাল তাগার উদ্দেশ্য হইল রাত্রের অন্ধকার রেখা। অর্থাৎ যাবৎ রাত্রের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া প্রভাতের আলো-রেখা—ছোবহে-ছাদেক উদিত না হয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পারিবে।

৯৮৮। হাদীছ :—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমে যখন—

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

নাযেল হইল তখন من الفجر বাক্যটি—(যদ্দারা الخيط الابيض "সাদা তাগা"-এর উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য "প্রভাত" উহা) নাযেল হইয়াছিল না, তাই সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই الخيط الابيض ও الخيط الاسود-এর আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী রোযার সময় একটি সাদা তাগা এক পায়ে এবং একটি কাল তাগা অপর পায়ে বাঁধিয়া রাখিল। যাবৎ সাদা তাগা ও কাল তাগা পৃথকরূপে দৃষ্ট না হইত তাবৎ তাহারা পানাহার করিত। তাহাদের এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য পরে من الفجر বাক্যটি নাযেল হয়, অর্থাৎ الخيط الابيض সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাত বা ছোবহে-ছাদেক। অতঃপর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, সাদা ও কাল তাগার উদ্দেশ্য যথাক্রমে প্রভাতের আলো অর্থাৎ ছোবহে-ছাদেক ও রাত্রির অন্ধকার।

তাহাজ্জুদ নামাযের আজান সেহেরী খাওয়ার প্রতিবন্ধক নহে

৯৮৯। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বেলাল (রাঃ) ছোবহে-ছাদেকের (ঘণ্টাখানেক) পূর্বে—রাত্রি বাকি থাকাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্যে আজান দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে জ্ঞাত করিয়া দিলেন যে, যাবৎ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম আজান না দেয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পার। কারণ, সে-ই ফজরের আজান দিয়া থাকে। (তাঁহার পূর্বে বেলাল (রাঃ) যে আজান দেন, উহা তাহাজ্জুদ নামাযের আজান হইত)।

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া

৯৯০। হাদীছ :—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার ঘরে সেহেরী খাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমাকে দ্রুতবেগে যাইতে হইত।

সেহেরী খাওয়া ও ফজর নামাযের মধ্যকার ব্যবধান

৯৯১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) একদা বর্ণনা করিলেন, আমরা এমন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহেরী খাইয়াছি যে, সেহেরী শেষ করিয়াই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আনাছ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ফজরের নামাযের আজান ও সেহেরী শেষ করার মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল? তিনি বলিলেন—কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত (সাধারণরূপে) তেলাওয়াত করা যায় এই পরিমাণ সময় ছিল।

সেহেরী খাওয়া ওয়াজেব না হইলেও উহাতে বরকত লাভ হয়

৯৯২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিরতি না ঘটাইয়া লাগালাগি রোযা রাখিলেন। (অর্থাৎ এফতার, সেহেরী এবং রাত্রের কোন অংশে কোন প্রকার পানাহার না করিয়া পর পর কতিপয় রোযা রাখিলেন।) ছাহাবীগণও এইরূপ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য এরূপ করা অত্যাধিক কষ্টকর হইল। তাই নবী (দঃ) তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনি ত এরূপ করিয়া থাকেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়—আমাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) পানাহার (-এর শক্তি) দান করা হইয়া থাকে।

৯৯৩। হাদীছ ঃ— قال انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সেহেরী খাও; কারণ সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত লাভ হইবে।

দিনের বেলায় রোযার নিয়্যত করিলে?

উম্মুদ-দরদা (রাঃ) স্বীয় স্বামী—বিশিষ্ট ছাহাবী আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অভ্যাস ছিল—তিনি (সকাল বেলা নাস্তার সময় বাড়ী আসিয়া) জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের নিকট কিছু খাদ্য বস্তু তৈয়ার আছে কি? যদি বলিতাম, কিছুই নাই, তবে তিনি বলিতেন—তাহা হইলে আমি (নফল) রোযার নিয়্যত করিয়া নিলাম।

আবু তালহা (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হোজায়ফা (রাঃ) ও এইরূপ করিতেন।

৯৯৪। হাদীছ ঃ—সালামাতুব-নুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা (১০ই মহরম) আশুরার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—তোমাদের যে ব্যক্তি ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর কিছু পানাহার করিয়াছে (তাহার রোযা হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও) সে বাকি দিন পানাহার হইতে বিরত থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এখন পর্য্যন্ত পানাহার করে নাই, সে রোযার নিয়্যত করিয়া লইবে (অদ্য আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘটনা এই ছিল যে, একবার জিলহজ্জ মাসের ২৯ তারিখে মহরমের চাঁদ সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতে ছিল না। যেই দিনকে মহরমের নয় তারিখ ধারণা করা হইতেছিল ; সেই দিনের কিছু অংশ কাটিয়া যাওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ প্রমাণ উপস্থিত হইল যদ্বারা তিনি ঐ দিনকে দশ তারিখ আশুরার দিন বলিয়া সাব্যস্ত এবং উল্লিখিত ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ, সেকালে রমজানের রোযা ফরজ হইয়াছিল না, বরং আশুরার রোজা ফরজ ছিল। বর্তমানে রমজানের রোযার ব্যাপারে উল্লিখিত বিধানই বলবৎ আছে।

মছআলাহ ঃ—নফল ও রমজানের নিয়্যত দিনের বেলা করা যায়। কিন্তু তাহা অবশ্যই সেহেরীর শেষ সীমা হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্য ভাগের পূর্বে হইতে হইবে। অন্ততঃ দ্বিপ্রহরের পূর্বে হইলেও কোন কোন আলেমের মতে রোযা শুদ্ধ হইবে।

রোযাদার ব্যক্তির জানাবত অবস্থায় প্রভাত করা

৯৯৫। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) ও উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামা (রাঃ) উভয়েই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহাজ্জুদের পর) স্বীয় স্ত্রী ব্যবহার করায় জানাবত অবস্থায় ছোবহে-ছাদেক হইয়া যাইত। অতঃপর গোছল করিতেন এবং (ফজরের নামায পড়িতেন ও) রোযা রাখিতেন।

রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-সুলভ ভালবাসা ও আসক্তির আচার-ব্যবহার করা

৯৯৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় স্ত্রীকে) রোযা অবস্থায় চুম্বন করিতেন এবং এক সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন (অতঃপর আয়েশা (রাঃ) সাধারণ লোকদিগকে হুশিয়ার করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে,) নবী (দঃ) স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বাধীনে রাখিতে যেরূপ সক্ষম ছিলেন অন্য কেহ তদ্রূপ সক্ষম নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত একমাত্র সহবাস ব্যতীত অন্য রকম আচার-ব্যবহারের অনুমতি আছে বটে, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন

যে—সাধারণ লোক স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং পূর্ব হইতেই সাবধান ও সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে এক বিছানায় অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে শোওয়া অথবা চুম্বন করা হইতে বিরত থাকিবে।

৯৯৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সত্য যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোযা অবস্থায় এক স্ত্রীকে চুম্বন করিয়াছেন; ইহা বর্ণনা করিয়া আয়েশা (রাঃ) হাসিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ আছে, আয়েশা (রাঃ) হইতে ইসলামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মছলা-মাছায়েল বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালাও তাঁহাকে সুযোগ দিতেন বেশী; নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আয়েশার বিছানায় অহী যত আসে অন্যত্র তত আসে না। আয়েশা (রাঃ) উম্মতকে মছলা-মাছায়েল পৌছাইতেও অত্যধিক তৎপর ছিলেন।

রোযাদারের জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা রোযা ভঙ্গকারী নহে এই মছআলাহটি হযরতের প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ ও বর্ণনা করায় আয়েশা (রাঃ)কে তাঁহার লজ্জাবোধ বাধা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিরত রাখিতে পারে নাই। আপন ভাগিনাকে শিক্ষা দান সুযোগে শালীনতার সহিত তিনি উহা প্রকাশ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

রোযা অবস্থায় গোসল করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় একটি কাপড় ভিজাইয়া (ঠাণ্ডার জন্য) উহাকে শরীরের উপর রাখিয়াছেন।

শা'বী (রঃ) রোযা অবস্থায় হাম্মাম খানায় (গোসল করার জন্য) গিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় (আবশ্যক বশতঃ) কোন বস্তুকে জিহ্বা দ্বারা চাখা ও আস্বাদন করাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (কিন্তু গলার ভিতরে উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। সুতরাং অতি প্রয়োজন ও বিশেষ সতর্কতা ছাড়া এইরূপ করিবে না।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় কুলি করা বা যে কোন উপায়ে শীতলতা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযার সময় শরীরে বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা এবং মাথা আচড়ান চাই। (অর্থাৎ রোযার সময় এলোমেলো ভাবে থাকা ভাল নয়)।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার একটি পাথরের তৈরী টব আছে। উহাতে পানি ভরিয়া রাখি এবং রোযা অবস্থায় বিশেষ উত্তাপ অনুভব করিলে আমি উহাতে নামিয়া শীতলতা হাসিল করিয়া থাকি।

মছআলাহ ঃ—চুম্বন করায় বা উভয়ের অঙ্গাআঙ্গী করায় বা শুধু ধরা-ছোয়ায় যদি বীর্য্য বাহির হইয়া যায় তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এমনকি যদি দুই জন পুরুষ বা দুইজন নারীর মধ্যেও পরস্পর ঐরূপ হয়। তদ্রূপ হস্তমৈথুনেও বীর্য্য বাহির হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে। (শামী, ২—১৪২)

মছআলাহ ঃ—কোন প্রকার ধরা-ছোয়া ব্যতিরেকে শুধু কল্পনা করায় বা দৃষ্টি করায় যদিও গুপ্ত অঙ্গের প্রতিই দৃষ্টি হউক—উহাতে বীর্য্য বাহির হইলেও রোযা ভঙ্গ হয় না; রোযা চালু রাখিতেই হইবে। যেরূপ বীর্য্যপাত ব্যতিরেকে চুম্বন বা অঙ্গাআঙ্গী করায় রোযা ভঙ্গ হইবে না, রোযা চালু রাখিতে হইবে। (শামী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—প্রথম মছআলায় রোযা ভঙ্গ হওয়ায় উহার শুধু কাজাই করিতে হইবে; কাফ্ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু একদিন ঐরূপে রোযা ভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ রোযা ভঙ্গের পরওয়া না করিয়া ঐরূপে রোযা ভঙ্গের কাজ করিলে সে ক্ষেত্রে কাফ্ফারাও আদায় করিতে হইবে। (শামী, ২—৪৫)

আনাছ (রাঃ) হাছান বছরী (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) তাঁহারা রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করাকে দোষণীয় মনে করিতেন না।

৯৯৮। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে কোন দিন (অনিচ্ছাকৃত) স্বপ্নদোষের দরুণ নয়, বরং ইচ্ছাকৃত (ছোবেহ্-ছাদেকের পূর্বে স্ত্রী ব্যবহারের দরুণ) জানাবত অবস্থায় রাত্রি ভোর করিয়াছেন এবং তৎপর গোছল করিয়া রোযা রাখিয়াছেন।

রোযা অবস্থায় ভুলবশতঃ পানাহার করা

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, নাকে পানি দেওয়ার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানি গলায় চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (ইহা কোন কোন আলেমের অভিমত। কিন্তু হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই ঃ—রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ভাবেও গলার ভিতর পানি চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, হঠাৎ মাছি হলকুমের ভিতর চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

হাসান বছরী (রঃ) ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, ভুল বশতঃ স্ত্রী-সহবাস করিলেও রোযা ভঙ্গ হইবে না।

৯৯৯। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার করিলে (তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে না ;) সে ঐ রোযা পূর্ণ করিবে। কারণ, এই পানাহার আল্লাহর তরফ হইতে হইয়াছে। (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে হয় নাই, সুতরাং দোষণীয়ও হয় নাই।)

রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা

আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করিতে দেখিয়াছি—অসংখ্য বার যাহার গণনা নাই।

শুষ্ক বা কাঁচা তাজা ও পানিতে ভিজা ইত্যাদি সব রকম মেছওয়াক দ্বারাই রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা যায়।

ইবনে সিরীন (রঃ) বলিয়াছেন, কাঁচা ডালের মেছওয়াক করায় রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কোন ব্যক্তি বলিল, উহার ত আস্বাদ আছে। তিনি বলিলেন, পানিরও ত আস্বাদ আছে, অথচ তুমি রোযাবস্থায় কুল্লি করিয়া থাক (২৫৮ পৃঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় দিনের প্রথম ও শেষ উভয় দিকেই মেছওয়াক করিতেন (২৫৭ পৃঃ)। তিনি বলিয়াও থাকিতেন, রোযাদার দিনের প্রথম ও শেষ উভয় ভাগেই মেছওয়াক করিতে পারে ; তবে মেছওয়াক করার থুথু গিলিবে না। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, যদি থুথু গিলিয়া ফেলে তবে রোযা ভঙ্গ হইবে বলি না। (ফতহুলবারী, নোসখার বোখারী ২—১২৪ পৃঃ)। কাতাদাহ (রঃ) ও আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, (মেছওয়াক করা) থুথু গিলিতে পারে। অবশ্য যদি মেছওয়াকের কুচি খসিয়া থাকে এবং উহা নগণ্য না হয় তবে উহা গিলিবে না, উহা অবশ্যই ফেলিয়া দিবে (ফতহুলবারী, ২—১২৮ পৃঃ)।

রোযা অবস্থায় নাকে পানি দেওয়া

নাকের ছিদ্রের শুধু বহিরাংশে পানি দেওয়াতে দোষ নাই; অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়ার আদেশ অনেক হাদীছেই উল্লেখ আছে এবং সেখানে রোযা-বেরোযার পার্থক্য করা হয় নাই। অবশ্য যথাসাধ্য ছিদ্রের উপর অংশেও পানি পৌছাইতে তৎপর হওয়ার আদেশ বর্ণনার হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রোযাদার তাহা করিবে না। (ফতহুলবারী, ২—১২৯)।

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, নাকের ভিতর ঔষধ বা তৈলের ফোটা বহাইলে উহা যদি নাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, উহার কিঞ্চিৎ অংশও হলকুম বা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত না ছড়ায় তবে রোযার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না।

অবশ্য সাধারণতঃ মস্তিষ্কে পৌছাইবার জন্যই তৈল বা ঔষধ নাকে ঢালা হইয়া থাকে এবং অতি সহজে ও অবিলম্বেই উহা হলকুম ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাই ফেকার কেতাবসমূহে কোন প্রকার বিভক্তি ছাড়াই বলা হইয়া যে, নাকের মধ্যে ঔষধ

বা তৈল ঢালিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং সাধারণভাবে তাহাই প্রযোজ্য, অবশ্য যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হইয়া উহা নাকের সীমা অতিক্রম না করার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা এবং সে ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ না হওয়া বস্তুতঃই সুস্পষ্ট।

কানে ঔষধ বা তৈল বহাইলে তদ্রূপই রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু অনিচ্ছায় হঠাৎ কানের ভিতর পানি প্রবেশ করিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য নিজে কানের ভিতর পানি প্রবেশ করাইলে রোযা ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রোযা ভঙ্গ হওয়ার মতামতই অগ্রগণ্য ও অধিক বিধেয় (ফতোয়া কাজিখান, ফতহুল-কাদীর ২—৭৩)।

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, কুল্লির পানি মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া তারপর থুথু গিলিলে রোযার ক্ষতি হইবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মুখে পানির অংশ অতি নগণ্যই থাকে। যাহা থাকে তাহা মুখে লাগিয়া থাকা অংশ মাত্র; উহাতে রোযার ক্ষতি হইবে না।

"গোন্দ" নামীয় এক প্রকার বস্তু যাহা শত চিবাইলেও কোন রস বা স্বাদ নির্গত হয় না এবং উহার কোন অংশও ছিন্ন হয় না—যেরূপ "রবার"; সাধারণতঃ মহিলারা উহা চিবাইয়া থাকে। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় উহা চিবাইয়া থুথু গিলিলেও রোযা ভঙ্গ হইবে বলি না, কিন্তু ঐরূপ করা নিষিদ্ধ।

রমযানে স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি রোযা ভঙ্গকারী কার্য্য করিলে

আবু হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের একদিন কোন প্রকার ওযর বা অসুস্থতা ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করিবে, সে ঐ একদিন রোযা ভঙ্গের ক্ষতি এক যুগ রোযা রাখিয়াও পূরণ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, রমযানের এক একটি রোযা এমনই অমূল্য রত্ন যে, উহা হেলায় হারাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দীর্ঘ এক যুগের রোযার দ্বারাও হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উহার কাযা করিতে হইবে না। কাযা এবং কাফ্‌ফারার মছআলাহ শরীয়তে যাহা নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে তাহা করিতে হইবে। যেমন কোন সাধারণ ব্যক্তি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সকলেই এই কথা বলিবে যে, এই ব্যক্তির ন্যায় হাজার জনকে ফাঁসি দিলেও মৃত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইবে না যে, আদালত কর্তৃক নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে আসামি অব্যাহতি পাইয়া যাইবে।

১০০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত আরজ করিল "এই বদনছীব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে আরজ করিল, আমি রমযানের রোযার মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি একজন ক্রীতদাস আজাদ করার

ক্ষমতা আছে? সে আরজ করিল—না। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে সক্ষম হইবে কি? সে আরজ করিল—না। তারপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ষাট জন মিছকীনকে খানা দেওয়ার সামর্থ তোমার আছে কি? সে আরজ করিল না। এই প্রশ্নোত্তরের পর কিছু সময়ের মধ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক বড় পাত্র ভরা খেজুর (কাহারও পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ) উপস্থিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, এই খেজুরগুলি তুমি লইয়া যাও এবং স্বীয় গোনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ ছদকা করিয়া দাও। তখন সে আরজ করিল—ইহা কি আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্তকে দান করিব? ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই নগরীর চতুঃসীমার ভিতরে আমার পরিবারবর্গ হইতে অধিক অভাবগ্রস্ত কোনও পরিবার নাই। এতচ্ছ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় স্বভাবগত মৃদু হাসি হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হাসিয়া উঠিলেন। (কারণ, তিনি ঐ ব্যক্তির মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলেন)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—ইহা তোমার পরিবারবর্গকেই খাইতে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ মছআলাহ এই যে, কাফ্‌ফারার বস্তু নিজ পরিবারকে দিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। অবশ্য স্বীয় পরিবারবর্গ যদি অনাহারী হয় তবে কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে পরিবারবর্গের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে এবং কাফ্‌ফারা জিম্মায় থাকিবে। সুযোগ পাইলেই ঐ কাফ্‌ফারা আদায় করিবে।

এই হাদীছ দ্বারা এই মছআলাহও বুঝা যায় যে, ছদকাহ এবং দান সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু দ্বারাও রোযার কাফ্‌ফারা আদায় করা যায়।

রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা বা বমি আসা

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, বমি আসিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কোন বস্তু ভিতর হইতে বাহির হওয়ার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয় না, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও এইরূপ বলিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—বমি যদি ইচ্ছাকৃত না হয়—অনিচ্ছায় স্বষ্ট উদবেগের কারণে হয় তবেই উহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বুট বা ছোলার এক দানা পরিমাণ অংশও ঐ বমির ইচ্ছাকৃত গলধঃ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছাকৃত উপায়ে বমি করিলে সেই বমি করায়ও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে—কাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না (শামী, ২—১২৫)।

ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিতেন। কিন্তু পরে তিনি রোযা অবস্থায় দিনের বেলা রক্তমোক্ষণ করা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে রাত্রে করিতেন। (কারণ, ইহার দ্বারা রোযা অবস্থায় দুর্বলতা আসার আশঙ্কা থাকে)। আবু মুছা (রাঃ) (রোযা অবস্থায় দুর্বলতা আশঙ্কায়) রক্তমোক্ষণ রাত্রে করিতেন।

সায়াদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উম্মে-সালামা (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সম্মুখে রক্তমোক্ষণ রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় হইয়াছে, তিনি নিষেধ করেন নাই।

কোন কোন ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে এবং যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়।

এই বর্ণনা যদি হাদীছরূপে ছহীহ হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রোযা অবস্থায় এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা চাই। ইহাতে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে। কেননা যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় তাহার দুর্বলতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং যে রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে সে মুখের সাহায্যে উহা করিয়া থাকে বলিয়া তাহার রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

অবশ্য যদি কাহারও পূর্ণ আস্থা থাকে যে, তাহার রক্তমোক্ষণ করা হইলে কোনও দুর্বলতা আসিবে না এবং রোযার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না, তবে রোযা অবস্থায়ও সে রক্তমোক্ষণ করিতে পারে।

১০০১। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন।

১০০২। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আপনারা রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ অসঙ্গত গণ্য করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না—অবশ্য যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টির আশঙ্কা হয়।

সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা

১০০৩। হাদীছঃ ইবনে-আবী-আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক সফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, বিশ্রামের জন্য অবতরণ কর এবং আমার জন্য শরবত তৈয়ার কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, (এফতারের সময় হয় নাই) সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে দ্বিতীয়বার ঐরূপ আদেশ করিলেন; সে ব্যক্তি পুনঃ ঐ উক্তিই করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়বার তাহাকে ঐ আদেশ করিলেন। এইবার সে অবতরণ করিল এবং শরবত তৈয়ার করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা পান করতঃ (এফতার) করিলেন এবং (পূর্ব দিকে) ইশারা করিয়া বলিলেন, ঐ দিক হইতে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে দেখ তখন মনে কর, রোযাদারের এফতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

১০০৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হামযা-ইবনে-আমর আছলামী (রাঃ) নামক ছাহাবী যিনি অনেক বেশী রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আমি অধিক রোযা রাখিয়া থাকি; সফরের অবস্থায়ও কি রোযা রাখিব? নবী (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা করিলে না-ও রাখিতে পার।

বাড়ীতে অবস্থানকালে রমযান আরম্ভ হওয়ায় কয়েক দিন রোযা রাখিয়া সফরে বাহির হইলেও সফরে রোযা ভঙ্গের অনুমতি থাকিবে

১০০৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য রমজান মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। যখন মক্কার নিকটবর্তী 'কাদিদ' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি রোযা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণও রোযা পরিত্যাগ করিল।

মছআলাহ :—ছোবেহ-ছাদেক তথা রোযা আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে বাড়ীতে অবস্থানরত থাকিয়া অতঃপর সফরে বাহির হইলেও ঐ দিনের রমযানের রোযা রাখা ফরয, সফরের জন্য ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে।

পক্ষান্তরে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে সফরে বাহির হইয়া পড়িলে সফর অবস্থায় থাকার দরুণ রোযা কাযা করার অনুমতি আছে। কিন্তু সফর অবস্থায়ও দিনের প্রথম দিকে একবার রমযানের রোযার নিয়্যত করিয়া লইলে তৎপর সফরের দরুন ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে। অবশ্য জেহাদের সফর হইলে তাহার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কারণ, জেহাদের সম্মুখীন অবস্থায় দুর্বলতার আশঙ্কায় রোযা ভঙ্গ করা যায়।

উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাটি জেহাদের সফরই ছিল।

১০০৬। হাদীছ :—আবুদ্-দারদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (জেহাদের) এক সফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীষ্মের উত্তাপ অতি ভীষণ ছিল। এমনকি, মাথার উপর অন্ততঃ হাত রাখিয়া ছায়া গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ্য হইতেছিল। (তখন রমযান মাস ছিল, কিন্তু) আমাদের মধ্যে একমাত্র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেহই রোযাদার ছিল না।

সফর অবস্থায় অধিক কষ্টের রোযা নিষিদ্ধ

১০০৭। হাদীছ :—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সফরে ছিলেন; এক স্থানে জনতার ভিড় এবং এক ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা দেখিতে পাইলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? সকলেই আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এক

রোযাদার ব্যক্তির বেহুশ হওয়ার ঘটনা। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন— ليس من البر الصيام فى السفر "সফর অবস্থায় (এরূপ অসহণীয় কষ্টের মধ্যে) রোযা রাখা নেক কাজ গণ্য নহে।"

১০০৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সফর করিয়া থাকিতাম। সফর অবস্থায় রোযাদারগণ রোযা ভঙ্গকারীগণকে কোন প্রকার দোষারোপ করিতেন না এবং রোযা ভঙ্গকারীগণও রোযাদারগণকে দোষারোপ করিতেন না।

১০০৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয় উপলক্ষে) মদীনা হইতে মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন; তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। যখন 'ওছফান' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন পানি আনিবার আদেশ করিলেন এবং সকলকে দেখাইয়া পানি পান করিলেন; মক্কায় পৌঁছা পর্য্যন্ত তিনি আর রোযা রাখিলেন না। এই ঘটনা রমজান মাসে ঘটিয়াছিল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সফর অবস্থায় রোযা রাখিয়াছেন এবং ভঙ্গও করিয়াছেন।

সামর্থবান লোককে রমযানের রোযা রাখিতেই হইবে

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় নূতন নূতন অনেকের রোযা অতিশয় কঠিন বোধ হইত। তাই তখন সাময়িক ভাবে এই অনুমতি ছিল যে, রোযা রাখিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখিয়া প্রতি রোযার পরিবর্তে এক জন মিসকিনকে দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়াইয়া দিবে। কোরআন শরীফের আয়াত—

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

ইহার অর্থ কোন কোন মোফাচ্ছের উক্ত বিষয়ের উপরই স্থাপিত করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, উক্ত মছআলাহ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, কিন্তু উহা ঐ সময়েই রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং কোরআন শরীফের একাধিক স্থানে উক্ত মছআলার রহিতকরণ মূলক আদেশ বিদ্যমান আছে। যথা—

(১) وان تصوموا خير لكم অর্থাৎ প্রথমে তোমাদিগকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখা বা রোযা না রাখিয়া (তৎপরিবর্তে) ফিদ্‌ইয়া (এক মিসকীনের খোরাক) দানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, এখন তোমাদের জন্য রোযা রাখাই সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে-আবী-লাইলা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু সংখ্যক ছাহাবী আমাদের অনেকের নিকট এই বিবরণ দান করিয়াছেন যে, রমযান শরীফের এক মাসের রোযা ফরয হওয়ার আয়াত নাযেল হইলে উহা লোকদের নিকট কঠিন বোধ হইল; তখন এই অনুমতি দেওয়া হইল যে, শক্তিমান ব্যক্তিও রোযা না রাখিয়া প্রতিদিন এক মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত খাওয়াইয়া দিতে পারে। পরে এই অনুমতি রহিত ও প্রত্যাহার করা হয় এই আয়াত দ্বারা—وان تصوموا خير لكم "তোমাদের জন্য রোযা রাখাই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা হইল।" সেমতে শক্তিমান সকলেই নির্দ্ধারিতরূপে রোযা রাখায় আদিষ্ট হইল।

(২) فمن شهد منكم الشهر فليصمه অর্থাৎ পূর্বে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এখন আদেশ করা হইতেছে যে, "রমযানের মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে।"

ইহার সমর্থনে ইমাম বোখারী (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত অনুমতি যে রহিত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

১০১০। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি فدية طعام مسكين আয়াত তেলাওয়াত করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, এই আয়াতের মর্ম (فمن شهد منكم الشهر فليصمه—"রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে" আয়াত দ্বারা) মনছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত হইয়া গিয়াছে।

১০১১। হাদীছ:—* ছালামাতুবনুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাযেল হইল—وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين তখন যাহার ইচ্ছা হইত সে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া আদায় করিয়া দিত। পরে পরবর্তী আয়াত নাযেল হইয়া উক্ত আয়াতের মর্মকে মনছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত সাব্যস্ত করিয়া দিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—তফছীরের বিধান শাস্ত্রে একটি বিধান রহিয়াছে যে, কোরআনের কোন আয়াতের আদেশ বা মর্ম সম্পর্কে কোন ছাহাবী উহা মনছুখ বলিয়া উক্তি করিলে তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রাপ্ত বলিতে হইবে। এই সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবনুল-আকওয়া (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের উক্তি নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত দুইটি হাদীছ গণ্য হইবে।

---

* এই হাদীছ খানার ইঙ্গিত ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছখানা ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন।

রমযানের কাযা রোযা আদায় করার নিয়ম

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারও উপর কতিপয় রোযা কাযা থাকিলে দুই একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহা আদায় করিতে পারিবে।

সায়ীদ ইবনুল মোছাইয়েব (রঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন নফল রোযা রাখা—যাহা অতি ফজীলতের রোযা; কাহারও উপর রমযানের রোযা কাযা থাকিলে সে ঐ সময় নফলের পরিবর্তে রমযানের কাযা রোযা আদায় করিবে।

ইব্রাহীম নখ্‌য়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা আদায় করিতে এতদুর বিলম্ব করিয়াছে যে, দ্বিতীয় রমযান উপস্থিত হইয়া গিয়াছে, এই বিলম্বের দরুণ তাহার কোনও কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঐরূপ বিলম্বের দরুণ প্রতি রোযার কাযা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে (এক মিছকীনের খোরাক) কাফ্‌ফারাও দিতে হইবে।

১০১২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সময় সময় আমার উপর রমযানের কাযা রোযা বাকী থাকিয়া যাইত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আমার কর্তব্য পালনে কোন সময় বাধার সৃষ্টি না হয়—উহার জন্য সর্বদা আমার প্রস্তুত থাকার দরুণ ঐ কাযা রোযা আদায় করিতে বিলম্ব হইয়া যাইত; শা'বান মাসে উহা আদায় করিতাম।

হায়েয অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা করিতে হইবে

বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুয্‌যেনাদ (রঃ) বলিয়াছেন, শরীয়তের বিধান অনেক সময় সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির উর্দ্ধেও দেখা যাইতে পারে, কিন্তু ইসলামের প্রতি স্বীকৃতি দানের পর উহাকে লঙ্ঘন করার কোন উপায় থাকিতে পারে না। যথা—হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা আদায় করিতে হয়, কিন্তু নামাযের কাযা করিতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডে "হায়েজ অবস্থায় কাযা নামায পড়িতে হইবে না"—পরিচ্ছেদে অনূদিত ১২৫ নং হাদীছ খানা বিশেষ অনুধাবণ যোগ্য; তথায় আলোচ্য বিষয়ের সুন্দর যুক্তিও বর্ণিত হইয়াছে।

কাযা রোযা আদায় করার পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, (সম্পূর্ণ রমজান মাসের রোযা কাযা রাখিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে) ত্রিশ ব্যক্তি এক একটি করিয়া রোযা রাখিলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উহার কাযা আদায় হইয়া যাইবে।

১০১৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কাযা রোযা বাকি রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার পক্ষ হইতে সেই রোযা আদায় করিবে।

১০১৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার উপর এক মাসের রোযা কাযা রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে উহা আদায় করিতে পারি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করিয়া দেওয়া আশু প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ আলেমগণের মতে আলোচ্য হাদীছ সমুহে বর্ণিত উত্তরাধিকারি কর্তৃক রোযা আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, ফিদইয়া তথা প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিছকিনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইবে বা ছদকায়ে-ফেতের পরিমাণের বস্তু বা উহার মূল্য গরীবকে প্রদান করিবে।

এফ্‌তারের সঠিক সময়

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সূর্য্য-গোলক অস্তমিত হইলেই এফ্‌তার করিতেন।

১০১৫। হাদীছ ঃ— عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم ○

অর্থ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন; এই (পূর্ব) দিক হইতে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে এবং ঐ (পশ্চিম) দিক হইতে দিন চলিয়া যায় তথা সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যায় তখনই রোযাদারদের এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়।

সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ্‌তারে বিলম্ব না করা

১০১৬। হাদীছ ঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

অর্থ—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ মোসলমানগণ এফ্‌তার করার মধ্যে বিলম্ব না করিয়া সময়মত যথাসত্বর এফ্‌তার করিবে তাবৎ তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গল বিরাজমান থাকিবে।

এফ্‌তার করার পর সূর্য্য দেখা গেলে

১০১৭। হাদীছঃ— আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা এফ্‌তার করিলাম। এফ্‌তার করার পর সূর্য্য পুনরায় দেখা গেল। হাদীছ বর্ণনাকারীণীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই ঘটনার দিনের রোযার কাযা আদায়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় কাযা হইতে অব্যাহতি আছে কি?

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখা

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল—সে রমজান মাসে দিনের বেলায় শরাব পান করিয়াছিল। ওমর (রাঃ) তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও রোযা রাখিয়া থাকে। অতঃপর তাহার প্রতি ৮০টি বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

১০১৮। হাদীছঃ— রুবাইয়্যে বিন্‌তে মোয়া'ওয়েজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার মোহাররমের দশ তারিখ আশুরার দিনটি পূর্ব হইতেই সন্দেহযুক্ত ছিল। কিন্তু দিন আরম্ভ হওয়ার পর ঐ দিনই আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দিনের প্রথম ভাগেই মদীনাবাসীদের মহল্লা সমূহে খবর পাঠাইয়া দিলেন যে, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাই) যে ব্যক্তি সন্দেহের দরুন রাত্র হইতে রোযার নিয়্যত না করিয়া রোযাহীন প্রভাত করিয়াছে (তথা পানাহার করিয়াছে) তাহার কর্ত্তব্য হইবে এই দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার হইতে বিরত থাকা এবং যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়াছে সে তাহার রোযা পূর্ণ করিয়া লইবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী ছাহাবিয়া বর্ণনা করেন (আশুরার রোযার প্রতি এরূপ তাকিদ দেখিয়া) সর্বদা এই রোযাটি আমরা রাখিতাম এবং আমাদের ছেলে-মেয়েদিগকেও রাখাইতাম। এমনকি, এই উদ্দেশ্যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তুলা দ্বারা খেলনা তৈয়ার করিয়া রাখিতাম; খাওয়ার জন্য কাঁদিলে ঐ খেলনা তাহাদিগকে খেলিবার জন্য দিতাম—যেন খেলায় দিন কাটিয়া গিয়া এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়।

রোযা রাখিয়া সূর্য্যাস্তের পরে—রাত্রে পানাহার করা চাই

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—ثم اتموا الصيام الى الليل "ছোবহে-ছাদেকের পর হইতে পরবর্তী রাত্র আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শুধুমাত্র রাত্রি আসা পর্য্যন্তই রোযা রাখার আদেশ; অতঃপর রাত্রেও পানাহার ত্যাগ করতঃ রোযা রাখার বিধান শরীয়তে নাই।

রাত্রিকালের পানাহার ত্যাগ করতঃ লাগালাগি একাধিক রোযা রাখা হইতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, এরূপ করিলে অনর্থক অধিক কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা নিষেধ করিয়াছেন।

শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি ব্যতীত নিজের তরফ হইতে কোন নিয়ম অবলম্বনে কষ্ট ভোগ করাকে মকরূহ ও অপছন্দণীয় গণ্য করা হইয়াছে।

১০১৯। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُوَاصِلُوْا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ

لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى۔

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। ছাহাবীগণের মধ্যে কেহ আরজ করিলেন, আপনি ত ঐরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত তোমাদের তুলনা চলে না; আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) প্রদান করা হয়।

১০২০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া মধ্যে ইফ্‌তার না করিয়া লাগালাগি রোযা রাখিতে নিষেধ করিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি ঐরূপ লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ন্যায় না। আমার রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হয় যে, আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) দান করা হয়।

১০২১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখা হইতে একাধিকবার সকলকে নিষেধ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি ত ঐরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার ন্যায় তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমার পালনকর্তা আমাকে রাত্রি বেলায় (বিশেষরূপে) পানাহার (-এর শক্তি) দান করিয়া থাকেন। তোমরা সহজ-সাধ্যের আমলে সচেষ্ট থাক।

কোন কোন ছাহাবী বেশী ছওয়াবের আকাংখায় ঐরূপ রোযা হইতে বিরত থাকিলেন না। তখন হযরত (দঃ) ঐরূপ লাগালাগি রোযা রাখা আরম্ভ করিলেন—একদিন চলিল, দুই দিন চলিল অতঃপর ঈদের চাদ উঠিয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, যদি ঈদের চাদ বিলম্বে উঠিত তবে আমি আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত

রোযা চালাইয়া যাইতাম। যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেখাদেখি লাগালাগি রোযা রাখিতেছিল তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য হযরত (দঃ) এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখা

১০২২। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বলিলেন, তোমরা (অনাহারে রাত্রি কাটাইয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। যদি কাহারও ঐরূপ করার বিশেষ আকাংখা হয় তবে সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখিতে পার। লোকেরা বলিল, আপনি ত অনাহারে লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ন্যায় নহি; আমার রাত্রি এইভাবে কাটে যে, আমাকে আহার (-এর শক্তি) দানকারী বিদ্যমান থাকে।

বন্ধুকে নফল রোযা ভঙ্গের কসম দেওয়া

১০২৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সালমান (রাঃ) এবং আবুদ-দরদা (রাঃ) উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। (আবুদ-দরদা (রাঃ) বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না।) সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদার স্ত্রীকে বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ বিশ্রী কাপড় পরিধান কর কেন? সে উত্তর করিল, আপনার বন্ধু আবুদ-দরদা দুনিয়ার কোন সম্বন্ধই রাখেন না। (অর্থাৎ আমার পরিপাটির প্রয়োজনই নাই।) ইতিমধ্যেই আবুদ-দরদা (রাঃ) বাড়ী পৌছিলেন এবং স্বীয় বন্ধু সালমান (রাঃ)কে দেখিয়া খানা তৈয়ার করিলেন এবং তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণের অনুরোধ করিলেন। সালমান (রাঃ) আবুদ-দরদা (রাঃ)কে তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি। সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্ তায়ালার কসম দিয়া বলিতেছি—রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। আপনি আহার না করিলে আমিও আহার করিব না। আবুদ-দরদা (রাঃ) বন্ধুর কথায় (নফল) রোযা ভাঙ্গিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর যখন রাত্রি হইল আবুদ-দরদা (রাঃ) রাত্রের প্রথম ভাগেই তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন ঘুমাইয়া পড়ুন। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুনরায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন এইবারও সালমান (রাঃ) তাঁহাকে ঘুমাইয়া পড়িতে বলিলেন। যখন রাত্রির শেষ ভাগ উপস্থিত হইল তখন সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। তখন উভয় বন্ধুই তাহাজ্জুদের নামায আদায়

করিলেন। অতঃপর সালমান (রাঃ) আবুদ দরদা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—আপনার উপর আপনার পালনকর্তার হক্ আছে, আপনার উপর আপনার আত্মার হক আছে এবং আপনার স্ত্রীরও হক আছে, (আপনার মেহমানেরও হক আপনার উপর আছে। অতএব আপনি কোন দিন রোযা রাখুন, কোন দিন রোযাহীনও থাকুন এবং কিছু সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন, কিছু সময় ঘুমাইয়া থাকুন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকটও থাকুন। এইরূপে) আপনি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।

আবুদ-দরদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া সালমান (রাঃ)-এর সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সালমান ঠিকই বলিয়াছে।

শা'বান মাসে রোযা রাখা

১০২৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একাধারে (নফল) রোযা রাখিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত, তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোযাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রমযান শরীফ ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসের ন্যায় এত বেশী (নফল) রোযা অন্য কোন মাসে রাখিতে দেখি নাই।

১০২৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা অন্য কোন মাসে রাখিতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় সম্পূর্ণই রোযা রাখিতেন।

তিনি স্বীয় উম্মতকে পরামর্শ দানে বলিতেন, (নফল) আমল তোমাদের জন্য যে পরিমাণ সহজ-সাধ্য হয় উহা সেই পরিমাণই অবলম্বন করিবে। আল্লাহ তায়ালা (বেশী আমলের) ছওয়াব দানে অপারগ হইবেন না, কিন্তু (বেশী আমল অবলম্বন করিলে শেষ পর্য্যন্ত) তোমরাই উহা হইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নফল নামায ঐ পরিমাণই পছন্দ করিতেন যে পরিমাণ সর্বদা আদায় করা যায়—যদিও উহা পরিমাণে কম হয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি কোন সময় নামায পড়িলে (শুধু দুই-একদিন পড়িয়াই উহা ত্যাগ করিতেন না, বরং) সর্বদা ঐ সময় নামায আদায় করিতেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নফল রোযা রাখার নিয়ম

১০২৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযান ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতেন না।

নবী (দঃ) একাধারে রোযা রাখিয়া যাইতেন, এমনকি প্রত্যেকেই ধারণা করিত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোযাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি ধারণা হইত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না।

১০২৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একাধারে রোযা ছাড়া আরম্ভ করিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা রাখিবেন না। আবার একাধারে রোযা রাখা আরম্ভ করিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা ছাড়িবেন না।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তুমি রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে এবং নিদ্রা অবস্থায় দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।

১০২৮। হাদীছ ঃ—হোমায়েদ (রঃ) নামক তায়েবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একই মাসের মধ্যে তাঁহাকে রোযা অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম এবং রোযাহীন দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম। (অর্থাৎ হযরত (দঃ) প্রতি মাসের কিছু দিন রোযা রাখিতেন এবং কিছু দিন রোযাহীন কাটাইতেন।) রাত্রে তাঁহাকে তাহাজ্জুদ রত দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম এবং নিদ্রাবস্থায় দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম। (অর্থাৎ রাত্রের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়িতেন এবং কিছু অংশ নিদ্রায় কাটাইতেন।) কোন প্রকার সিল্ক বা রেশম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাত অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই। কোন প্রকার মুশ্‌ক-কস্তুরী বা আম্বর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুগন্ধের তুলনায় অধিক সুগন্ধ পাই নাই।

নফল রোযা রাখিতে দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

১০২৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল-আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে বিশিষ্ট কুলীন বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা পুত্রবধুর খোঁজ-খবর লইয়া থাকিতেন; তাহাকে তাহার স্বামী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেন। পুত্রবধূ তাহার স্বামী (তথা আমার সম্পর্কে) বলিত, মানুষ হিসাবে তিনি খুবই ভাল মানুষ; তবে আমার বিছানায়ও আসেন না, আমার পর্দায়ও হাত লাগান না—যাবৎ তাঁহার নিকট আসিয়াছি এই অবস্থাই চলিয়াছে। আমার পিতা বহুবার এই অভিযোগ শুনিলেন; একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উহার আলোচনা করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।

এতদ্ভিন্ন আমি বলিয়া থাকিতাম, আল্লার কসম—যত কাল বাঁচিয়া থাকি প্রতি দিন রোযা থাকিব এবং প্রতি রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া কাটাইব। এই কথার সংবাদও নবী (দঃ)কে

জ্ঞাত করাইল। তদুপরি আমি যে, সর্বদা রোযা রাখি এবং সারা রাত্র নামায পড়ি— এই খবরও নবী (দঃ) পাইলেন। তারপর নবী (দঃ) আমার নিকট লোক পাঠাইলেন অথবা আমিই হযরতের খেদমতে পৌছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সংবাদ পাইয়াছি— তুমি সর্বদা রোযা রাখিয়া থাক, রোযা একদিনও ছাড় না এবং সারা রাত্র নামায পড়িয়া থাক, নিদ্রা যাও না। আমি আরজ করিলাম, জি-হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, জীবনী শক্তি লোপ পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি সারা বৎসর রোযা রাখে তাহার রোযা যেন হয়ই না। (কারণ, সর্বদা রোযা রাখা শরীয়তে অপছন্দনীয়।) হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোযা কিভাবে রাখিয়া থাক? আরজ করিলাম, প্রতি দিন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন কিভাবে পড়— (কত রাত্রের তাহাজ্জুদে কোরআন খতম করিয়া থাক?) আরজ করিলাম, প্রতি রাত্রে এক খতম করি। নবী (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নাকি বলিয়া থাক, আল্লার কসম—যতদিন বাঁচি প্রতি দিন রোযা রাখিব, সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া কাটাইব। আমি আরজ করিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার চরনে উৎসর্গ—আমি ইহা বলিয়াছি।

(এইরূপে একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) নিজে হযরতের খেদমতে হাজির হইলে হয়ত মোটামুটি কথাবার্তা এবং সংক্ষিপ্ত নছিহত করণ হইল। অতঃপর বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া আর একদিন স্বয়ং হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে তশরীফ আনিলেন (ফতহুলবারী ৪—১৭৭)। যাহার বিবরণে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমার রোযার আধিক্যের চর্চ্চা হইলে একদা হযরত (দঃ) আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন। আমি হযরতের জন্য একটি গাও-তাকিয়া উপস্থিত করিলাম, যাহা খাজুর-ছোবরা ভর্তি চামড়ার তৈরী ছিল। হযরত (দঃ) মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন এবং তাকিয়াটি হযরতের ও আমার মধ্যস্থলে থাকিল। (দুই দিনের সর্বমোট কথোপকথন এবং হযরতের নছিহত নিম্নরূপ ছিল—)

হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি ঐরূপ করিও না, তুমি উহা নির্বাহ করিতে পারিবে না। তোমার লক্ষ্য রাখা উচিৎ তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক আছে, তোমার উপর তোমার জানের হক আছে, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার বালবাচ্চা আত্মীয়-স্বজনের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে। তুমি বয়স বেশী পাইতে পার; (বৃদ্ধ বয়সে এত অধিক এবাদৎ চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।) অতএব তুমি কিছু দিন রোযা রাখ এবং কিছু দিন রোযাহীন থাক; (রাত্রে) কিছু সময় নামায পড় এবং কিছু সময় নিদ্রা যাও।

(তদুপরি হযরত (দঃ) ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রত্যেকটি বিষয়ের সহজ পরিমাণের পরামর্শ দিলেন। রোযা সম্পর্কে বলিলেন—) প্রতি মাসে তিনটি করিয়া (নফল) রোযা রাখ; নেক কাজে প্রতিটায় দশ নেকী; অতএব (তিনে ত্রিশ এই হিসাবে) প্রতি মাসে তিন রোযাই সারা বৎসরের রোযার ন্যায় হইয়া যাইবে। তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিন রোযা যথেষ্ট নয়? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আরও অধিক সক্ষম, হযরত (দঃ) বলিলেন, পাচটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, সাতটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, নয়টি। আমি বলিলাম ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, এগারটি। এইভাবে আমি কঠোর আমল অবলম্বন করিতে চাহিলাম; অগত্যা আমাকে কঠোর আমলের অনুমতি দেওয়া হইল। এক পর্য্যায়ে হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, একদিন রোযা, দুইদিন রোযাহীন। আমি বলিলাম, আমি আরও বেশী সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিন রোযা। আমি আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলাম; আমাকে কঠোর ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হইল— আমি বলিলাম, আরও বেশী পরিমাণে আমি সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযা রাখ। জিজ্ঞাসা করিলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কিরূপ ছিল? হযরত (দঃ) বলিলেন, বৎসরের অর্দ্ধেক; উহা সর্বোত্তম রোযা। জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীন থাকিতেন। (এইভাবে তিনি রোযার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিও অক্ষুন্ন রাখিতেন, ফলে আল্লার রাস্তায় জেহাদের পূর্ণ শক্তিমান থাকিতেন—) শত্রুর মোকাবিলা হইলে কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না।

এইভাবে বাড়াইতে বাড়াইতে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমিও একদিন রোযা রাখ একদিন রোযাহীন থাক। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লার নবী! ঐরূপ জেহাদের গুণ আমি কোথা হইতে পাইব। (রোযার মধ্যেই) আরও অধিক ও উত্তম ব্যবস্থার শক্তি আমার আছে; হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা হইতে উত্তম আর কোন স্তর নাই! নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি সদা রোযা রাখে (উহা এতই অপছন্দনীয় যে,) সে যেন রোযা রাখে নাই—এই কথা নবী (দঃ) দুইবার বলিলেন।

(রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের পরিমাণ সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, দাউদ (আঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামায আল্লার নিকট সর্বাধিক মাহবুব ও পছন্দনীয়। দাউদ(আঃ) অর্ধ রাত্র ঘুমাইতেন, অতঃপর রাত্রের তৃতীয়াংশ পরিমাণ তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, তারপর আবার ষষ্ঠাংশ পরিমাণ ঘুমাইতেন (৪৮৬ পৃঃ)।

(কোরআন শরীফ খতম সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (তাহাজ্জুদ নামাযে কোরআন শরীফ ধীরে ধীরে এবং সারা

রাত্রের স্থলে অল্প পড়িবে—এক মাসে একবার কোরআন শরীফ খতম করিবে। আমি আরজ করিলাম, আমার আরও অধিক সামর্থ আছে। সেমতে হযরত (দঃ) কোরআন খতমের সময়ের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে সর্বশেষে বলিলেন, তিন রাত্রে খতম করিবে। কিন্তু পরে আবার বলিয়াছেন, কোরআন সাত রাত্রে একবার খতম করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক (তাড়াতাড়ি এবং বেশী) পড়িবে না (৭৫৬ পৃঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, আমার জন্য কতই না ভাল হইত যদি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহজ করার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিতাম। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, দুর্বল হইয়া গিয়াছি, (যে কঠোর আমলের অনুমতি আমি চাহিয়া লইয়াছিলাম উহা নির্বাহ করা এখন আমার জন্য অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কোরআন শরীফের সপ্তমাংশ যাহা শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদে পড়িবেন তাহা দিনের বেলা ইয়াদ করিয়া পরিবারের কাহাকেও শুনাইতেন যেন রাত্রে সহজে পড়িতে পারেন। রোযার ব্যাপারেও যদি (অধিক দুর্বলতা অনুভবের কারণে) শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ করিতেন তবে (একদিন পর একদিন রোযা না রাখিয়া) ধারাবাহিক কয়েকদিন রোযাহীন থাকিতেন, কিন্তু একদিন পর একদিন রোযার হিসাবে ঐ দিনগুলিতে পরিত্যক্ত রোযার সংখ্যা গণিত রাখিতেন এবং পরে ঐ পরিমাণ সংখ্যা ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া পূর্ণ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহা অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন যে, নবী (দঃ) তাঁহাকে যে পরিমাণ এবাদৎ বন্দেগীর উপর রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই পরিমাণের কিঞ্চিতও ছাড়িবেন (৭৫৫ পৃঃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—ছাহাবীগণের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ছিল, দ্বীন ও এবাদতের যে অবস্থা ও পরিমাণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অবলম্বন করিয়াছিলেন হযরতের তিরোধানের পরও যেন সেই অবস্থা ও পরিমাণ অক্ষুন্ন থাকে, উহাতে বিন্দুমাত্র নিম্নগতি না আসে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নফল এবাদৎ অবলম্বন করতঃ সর্বদা নির্বাহ করিয়া চলার প্রচেষ্টা উত্তম প্রচেষ্টা। হাদীছ শরীফে আছে—নফল এবাদৎ ঐ পরিবাণ উত্তম যাহা সর্বদা নির্বাহ করা হয়। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্যেই হযরত (দঃ) নফল এবাদতের পরিমাণে সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্য ছাহাবীগণকে তাকিদ করিতেন। কারণ, সহজ ও কম পরিমাণের এবাদতও উক্ত প্রচেষ্টার পন্থায় বেশীতে পরিণত হয়।

এই আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, উল্লিখিত হাদীছে এবাদৎ কম করার যে শিক্ষা ও পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র সর্বদার অভ্যাসরূপে নফল এবাদত অবলম্বন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ যাহারা আবদুল্লাহ ইবনে আমর

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় বজ্রকঠিন শপথ তুল্য অভ্যাস অবলম্বন করা ত দূরের কথা কোন স্তরেই নফল এবাদতের অভ্যাসই হয় না, বরং সাময়িক মনের কোন গতির প্রভাবে বা সুদিন সুরাত্রির সুযোগে নফল এবাদৎ করা ভাগ্যে জুটিয়া থাকে—এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য উক্ত শিক্ষা ও পরামর্শ নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাময়িক উচ্ছাসকে উত্তম সুযোগ গণ্য করিয়া উহার ধাক্কায় যতদুর অগ্রসর হওয়া যায় এবং যত অধিক সুযোগ গ্রহণ করা যায় তাহাই সৌভাগ্যের অবলম্বন পরিগণিত হইবে।

তদ্রূপ যাঁহারা পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝিতে সক্ষম তাঁহাদের বিশেষ কর্তব্য নামাযে বা সাধারণ রূপে কোরআন তেলাওয়াত করিতে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং পবিত্র কোরআনের মর্মকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করিয়া উহার ভাবে ভাবান্তরিত হইয়া পাঠ করা। তাহাতে নিশ্চয়ই পঠনের গতি ধীর ও মন্থর হইবে। উল্লিখিত হাদীছে কোরআন তেলাওতের পরিমাণে যে পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র এই দৃষ্টির ভিত্তিতেই। অতএব যাহারা অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত তাহাদের জন্য এই পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যকীয় নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও শুদ্ধ এবং স্পষ্টরূপে পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্যথায় পবিত্র কোরআনের লা'নত ও অভিশাপগ্রস্থ হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ঘটনা ছাহাবীগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকেই অধীর হইয়া তাঁহার এই হাদীছ শুনিবার জন্য আসিতেন; তিনিও হযরতের অমোঘ আদর্শের শিক্ষাটিকে অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি পূর্ণ বিবরণটি খণ্ড খণ্ডরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন খণ্ড তাহাও নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন; ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্য রচনায় কিম্বা বিবরণ ধারায় গরমিলের ধারণা জন্মে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণের সমষ্টির মধ্যে মোটেই কোন গরমিল নাই। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বিভিন্ন বর্ণনার হাদীছ সমূহ বোখারী (রঃ) ১৫৪, ২৬৫, ৪৮৫, ৭৭৬, ৭৮৩, ৯০৫ ও ৯২৮ পৃষ্ঠায় সর্বমোট ১৮ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব সমষ্টির অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে একত্রে করা হইয়াছে।

কাহারও সাক্ষাতে যাইয়া তাহার খাতিরে নফল রোযা ভঙ্গ করা আবশ্যক নহে

১০৩০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার মাতা) উম্মে-ছোলায়েমের গৃহে তশরীফ আনিলেন। উম্মে-ছোলায়েম তৎক্ষণাৎ কিছু খুরমা ও মাখন উপস্থিত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মাখন ও খুরমা স্ব স্ব পাত্রে রাখিয়া দাও; আমি রোযা রাখিয়াছি। অতঃপর নবী (দঃ) গৃহের এক কিনারায় দাঁড়াইয়া নফল নামায পড়িলেন এবং উম্মে-ছোলায়েম ও

তাঁহার গৃহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন। উম্মে ছোলায়েম আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার এক জন বিশেষ প্রিয় পাত্র আছে। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন সে কে? উম্মে ছোলায়েম বলিলেন, আপনার আজ্ঞাবহ খাদেম—আনাছ।

(আনাছ (রাঃ) বলেন—) তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার জন্য ইহ-পরকালের সমুদয় কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নতির দোয়া করিলেন এবং এই দোয়াও করিলেন—হে আল্লাহ। আনাছকে ধনে-জনে বাড়াইয়া দাও। সেই দোয়ার বরকতেই আমি মদীনা-বাসীদের মধ্যে অন্যতম ধনী এবং আমার বড় মেয়ে উমায়মা বলিয়াছে, যে বৎসর হাজ্জাজ বছরার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসে সেই বৎসর পর্য্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা একশত কুড়িরও অধিক ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উম্মে-ছোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এতীম ছেলে ছিলেন আনাছ (রাঃ)। মাতা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বারা স্বীয় এতীম পুত্রের জন্য দোয়া করাইলেন। সেই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইল। উহারই দুইটি নমুনা আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে। ধনের দিক দিয়া তাঁহার অসাধারণ উন্নতি লাভ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, সাধারণতঃ খেজুর গাছে বৎসরে একবার ফল আসিয়া থাকে, কিন্তু আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেজুর বাগানের গাছ সমূহে প্রতি বৎসর দুইবার ফল আসিত। জনের দিক দিয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এরূপ উন্নতি দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ৮০।৮২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জীবিত ছেলে-মেয়ে পৌত্র-পৌত্রির সংখ্যা প্রায় একশত ছিল এবং শুধু ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা মৃত এক শত কুড়িরও অধিক ছিল। এই বয়সের পরে তিনি আরও প্রায় ১০।১৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

প্রতি মাসের শেষভাগে রোযা রাখা

১০৩১। হাদীছ ঃ—ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি (তোমার অভ্যাসানুরূপ) গত শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রাখ নাই? ছাহাবী উত্তর করিলেন না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে উহার পরিবর্তে দুইটি রোযা করিয়া নিও।

ব্যাখ্যা ঃ—ব্যক্তিগত নফল এবাদত বন্দেগীতে সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অতি সুফলদায়ক হয় যে, এবাদত সমূহের মধ্য হইতে স্বীয় শক্তি ও সামর্থানুযায়ী কিছু পরিমাণ এবাদত স্বীয় অভ্যস্ত করিয়া লওয়া চাই। অতঃপর সেই অভ্যাসকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করা চাই। এরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সেই মানুষকে অলসতা অবহেলা বা অমনো-যোগিতার মধ্যে ফেলিবার সুযোগ পায় না এবং কোন প্রকার ছুতা-নাতার আড়ালে

তাহাকে এবাদত হইতে মাহরুম রাখিতে সক্ষম হয় না। এই উদ্দেশ্যেই এবাদত-বন্দেগীর উন্নতিকামীগণ নফল এবাদতের কিছু পরিমাণকে স্বীয় অজিফারূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেন। এমনকি, যদিও নফল এবাদতের কাযা আদৌ আবশ্যকীয় নহে তবুও তাঁহারা এরূপ করেন যে, যদি কোন দিন কোন সময় ঐ অজিফা ও নির্দিষ্ট এবাদত কোন বিশেষ কারণে সময় মত আদায় করা না যায়, তবে উহাকে অন্য সময় আদায় করিয়া লন। ইহাতে নফছ-শয়তান কর্তৃক অবহেলা, অমনোযোগিতা ও অলসতা টানিয়া আনার ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে। যেমন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত যে, কাহারও তাহাজ্জুদ বা রাত্রের কোন অজিফা কোন দিন ছুটিয়া গেলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে উহা আদায় করিয়া নিবে। এরূপ আরও অনেক নজীর বিদ্যমান আছে। বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই শা'বান মাসের শেষভাগে নফল রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ নিয়ম হইতে প্রতি মাসের শেষ ভাগে রোযা রাখার অভ্যস্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। যাহার বিবরণ ৯৮৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনাটি এই শ্রেণীরই একটি ঘটনা। ঐ ছাহাবী স্বীয় অজিফা স্বরূপ এই অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের শেষ ২।৩ দিন নফল রোযা রাখিতেন। শা'বান মাসের শেষভাগে সাধারণতঃ নফল রোযা নিষিদ্ধ হইলেও পূর্বাপর মাসসমূহের শেষভাগে নফল রোযা রাখায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা নিষিদ্ধ নহে। আলোচ্য ঘটনায় ঐ ছাহাবী যে কারণেই হউক শা'বান মাসে স্বীয় অভ্যস্ত রোযা আদায় করেন নাই; তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে স্বীয় অজিফা বহাল রাখার প্রতি তৎপরতা শিক্ষাদানার্থে এই পরামর্শ দিলেন যে, অন্য মাসে এই রোযা আদায় করিয়া লও।

মছআলাহ ঃ—আইয়্যামে বীজ তথা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখাও বিশেষ ফজিলতের আমল। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম খণ্ডে অনুদিত ৬২৩ নং হাদীছখানা বয়ান করিয়াছেন।

শুধু শুক্রবার রোযা রাখার অভ্যাস নিষিদ্ধ

১০৩২। হাদীছ ঃ—মোহাম্মদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জাবের (রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি শুক্রবার রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ—শুধুমাত্র শুক্রবার দিন বিশেষ করিয়া রোযা রাখা নিষেধ করিয়াছেন।

১০৩৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন বিশেষ করিয়া শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে, যাবৎ না উহার সঙ্গে পূর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা রাখে।

১০৩৪। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন জোয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন, আমি সেদিন রোযা রাখিয়াছিলাম। তিনি (তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকল্যও রোযা রাখিয়াছিলে কি? আমি উত্তর করিলাম—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামীকল্য রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ কর কি? আমি আরজ করিলাম—না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ অবস্থায় তুমি অদ্যকার রোযা ভাঙ্গিয়া ফেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুক্রমে তিনি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—শয়তান বড় চতুর ও দুরদর্শী। যাহাকে দীনদার পরহেজগার দেখে তাহাকে সেই পথেই ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। শরীয়তের বিধানে যে কার্য্য-বিধি বিদ্যমান নাই, শুধু মনগড়ারূপে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরা যদিও সেই কার্য্য-বিধি ভাল কাজ সংশ্লিষ্ট হয় তবুও এরূপ করা দ্বীন-ইসলামের মূলে ভীষণ আঘাত হানার একটি চিরাচরিত সূত্র ও ছিদ্রপথ। এই সূত্র ও ছিদ্রপথেই পূর্বেকার নবীগণের শরীয়তের মধ্যে তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তন ও বিকৃত করণ ঘটিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হইয়াছে যে, কোন প্রকারে যেন ঐ সূত্র ও ছিদ্রপথের অবকাশ সৃষ্টি হইতে না পারে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহটি সেই বিশেষ দৃষ্টিরই একটি প্রতিক্রিয়া। শুক্রবার দিনটি দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তের মধ্যে ফজীলতের দিনরূপে ধার্য্য হইয়াছে এবং উহার মধ্যে এবাদৎ করায় বিশেষ ছওয়াব আছে। কিন্তু এই দিনের জন্য বিশেষ এবাদৎ যাহা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা হইল জুমার নামায। যেরূপ রমযান শরীফের জন্য বিশেষ এবাদৎ ফরজ রোযা ও তারাবীহ এবং আশুরা, আরাফার তারিখ, শাওয়াল মাসের ছয় দিন, প্রতি মাসের আইয়্যামে-বীজ ইত্যাদি অনেক অনেক দিনে নফল রোযা বিশেষ এবাদতরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু শুক্রবারের জন্য নফল রোযা শরীয়ত কর্তৃক বিশেষ এবাদতরূপে প্রবর্তিত হয় নাই। এমতাবস্থায় নফল রোযাকেও জুমার নামাযের ন্যায় শুক্রবার দিনের বিশেষ এবাদতরূপে গণ্য করা দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তকে বিকৃত করণের একটি পদক্ষেপ বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? যদি কেহ ঐরূপ কোন ধারণা অন্তরে স্থান না দিয়া শুক্রবারের রোযা অবলম্বন করে তবুও তাহা নিষেধ করা হইবে। কারণ, আন্তরিক ধারণা দৃষ্টিগোচর হয় না, কার্য্যক্রমের প্রতিই বাহ্যিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বিশেষরূপে শুক্রবার দিন রোযা রাখিলে ঐ ধারণারই সূত্রপাত হইবে এবং সাধারণ্যে তাহার কার্য্যের দ্বারা ঐ ধারণা বিস্তার লাভ করিবে। তদুপরি শয়তান তাহার

দ্বারা আরও নষ্ট স্থানে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করাইবার ছিদ্রপথ পাইয়া বসিবে এবং ধাপে ধাপে দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার সুযোগ করিয়া দিবে।

বলাবাহুল্য শরীয়ত ও দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে শুক্রবার দিনের বিশেষত্ব ও ফজীলত বিদ্যমান আছে। সেই বিশেষত্ব ও ফজীলতের ভিত্তিতেই উপরোল্লিখিত ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা উজ্জ্বল ও প্রবল হইয়া উঠে। অন্যান্য দিনের যেহেতু সেই বিশেষত্ব ও ফজীলত নাই, তাই সে স্থলে ঐ ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা অতি দুর্বল। যেরূপ কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা, বিশেষত্ব ও প্রাধান্য থাকিলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য করা হয়। আর যে ব্যক্তির মধ্যে সেই বিশেষত্ব নাই তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হয় না।

অবশ্য শুক্রবার দিন বিশেষ ফজীলতের দিন, ঐ দিন রোযা রাখার অভিলাষ জন্মিলে তাহা পূরণ করারও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, উহার পূর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা সংযোগ করিবে, যাহাতে উল্লিখিত ধারণা জন্মিবার সূত্র নিপাত হইয়া যায়। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছে ইহারই নির্দেশ রহিয়াছে।

কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা

১০৩৫। হাদীছ ঃ—আলকামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি স্বীয় (স্থিরকৃত) আমলের প্রতি পাবন্দী ও স্থিতিশীলতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার ন্যায় আমল করার সামর্থ কাহারও আছে কি?

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিতেন না, সাধারণতঃ তাঁহার অভ্যাস ইহাই ছিল। অবশ্য কোন কোন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সপ্তাহের মধ্যে এই দুই দিন প্রত্যেকের আমল-নামা (ইল্লিয়ীনের—নেককারদের আমল-নামা রাখার স্থানের প্রতি) উঠানো হয়। আমি ভালবাসি যে, আমি রোযা অবস্থায় আমার আমল-নামা উঠানো হউক।

ইয়াওমে-আরাফা ৯ই জিলহজ্জের রোযা

১০৩৬। হাদীছ ঃ—উম্মুল মোমেনীন মাইমুনাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়হজ্জে) আরফার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযা সম্পর্কে লোকদের দ্বিধাবোধ হইল। আমি দুধের পেয়ালা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিলাম; নবী (দঃ) তখন আরফার ময়দানের বিশেষ স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। নবী (দঃ) ঐ দুগ্ধ প্রকাশ্যে পান করিলেন, উপস্থিত লোকগণ তাহা অবলোকন করিয়াছিল।

মছআলাহ ঃ—৯ই জিলহজ্জকে ইয়াওমে-আরফা বলা হয়, কারণ সেদিন হাজীগণ আরফার ময়দানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দিনের রোযা বিশেষ ফজিলত ও ছওয়াবের রোযা। কিন্তু হাজী—যাহারা আরফার ময়দানে উপস্থিত আছেন তাহাদের জন্য ঐ দিনের রোযা সুন্নত নহে।

মছআলাহ ঃ—আলোচ্য ফজীলতের রোযাটি বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চলে তথায় জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা হিসাবে ৯ তারিখের জন্য সাব্যস্ত। মক্কা শরীফের ৯ তারিখ তথা প্রকৃত আরাফার দিনকে অন্য অঞ্চলে সাব্যস্ত করিলে তাহা ভুল হইবে। এবং ঐ হিসাবে অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা অনুসারে ৯ তারিখ ভিন্ন অন্য তারিখে রোযা রাখিলে এই ফজীলত লাভ হইবে না।

ঈদের দিন রোযা রাখা

১০৩৭। হাদীছ ঃ—আবু ওবাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এক ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—রমযানের রোযার শেষে ঈদের দিন এবং কোরবানীর গোশত খাওয়ার ঈদের দিন।

১০৩৮। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই কার্য্যগুলি নিষেধ করিয়াছেন—রোযার ঈদের দিনে এবং কোরবানীর দিনে রোযা রাখা, চাদর এরূপে গায়ে দেওয়া যে, হাত বাহির করা কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়ে, (লম্বা) জামার নীচে পায়জামা ইত্যাদি অন্য কোন কাপড় না থাকা অবস্থায় হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যে, তলদেশ উন্মুক্ত থাকে। আর ফজর ও আছর নামায পড়ার পর (নফল) নামায পড়া।

১০৩৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষ হইতে) দুই প্রকার রোযা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—রোযার ঈদের দিনের রোযা ও কোরবানীর ঈদের দিনের রোযা এবং দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—ক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তু হাতে ছোয়াকে এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তু ক্রেতার উপর নিক্ষেপ করাকে বাধ্যতামূলক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা।

অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার খর্বকারক সূত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

১০৪০। হাদীছ ঃ—যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ-ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি

যদি কোন বিশেষ দিনের রোযা রাখার—যেরূপ নির্দিষ্ট সোমবার রোযা রাখার মান্নত করে এবং ঐ দিন ঈদের দিন হইয়া পড়ে তবে সে কি করিবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন আল্লাহ তায়ালা মান্নত পূরণ করার আদেশ করিয়াছেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিনে রোযা নিষেধ করিয়াছেন। (শরীয়তের উভয় আদেশ-নিষেধকেই রক্ষা করিতে হইবে।)

মছআলাহঃ—এইরূপ মান্নতের দ্বারা রোযা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু ঈদের দিন রোযা রাখিবে না, ঈদের পর অন্য কোন দিন রোযা আদায় করিবে।

মছআলাহঃ—কোরবানীর ঈদের দিনের পরে ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখায় মতভেদ আছে। হানফী মজহাব মতে এই তিন দিনেও রোযা নিষিদ্ধ। এই দিনে রোযার মানত অন্য দিনে আদায় করিতে হইবে।

আশুরার—মোহরমের দশ তারিখের রোযা

১০৪১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আশুরার দিন বলিলেন, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দিন রোযা রাখিতে পারে।

১০৪২। হাদীছঃ— عن حميد انه سمع معاوية يقول سمعت

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

অর্থ—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—এই যে আশুরার দিন, এই দিনের রোযা তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি এই দিন রোযা রাখিব। যাহার ইচ্ছা হয় সে এই রোযা রাখিতে পারে এবং কাহারও ইচ্ছা হইলে এই রোযা ছাড়িতেও পারে।

১০৪৩। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া ইহুদীগণকে আশুরার রোযা করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই রোযা কি উদ্দেশ্যে? তাহারা বলিল, এই দিনটি বিশেষ বরকতের দিন, এই দিন আল্লাহ তায়ালা বনী-ইস্রাইলকে তাহাদের শত্রু ফেরাউনের কবল হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করণার্থে এবং সেই মহান নেয়ামত স্মরণার্থে) মুছা আলাইহেচ্ছালাম এই দিন রোযা রাখিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মুছা আলাইহেচ্ছালামের সহযোগিতার জন্য আমরা অধিক আগ্রহশীল। এই বলিয়া নবী (দঃ) (পূর্বের ন্যায়) এই দিনের রোযা রাখিলেন এবং সকলকে রোযা রাখিতে আদেশও করিলেন।

১০৪৪। **হাদীছঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদিরা আশুরার দিন ঈদের দিনের ন্যায় আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করিত (এবং উহার সম্মানার্থে রোযা রাখিত)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানগণকে আদেশ করিলেন, তোমারও এই দিনের রোযা রাখ।

১০৪৫। **হাদীছঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আশুরার দিনে এবং রমজান মাসের রোযাকে যেরূপ অগ্রাধিকার ও ফজিলত দান করিয়া থাকিতেন, অন্য কোন দিনকে বা অন্য কোন মাসকে এরূপ ফজিলত দান করিতে আমি দেখি নাই।

১০৪৬। **হাদীছঃ**—ছালামা-ভুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রের এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন নয় ধারণা করিয়া) যাহারা পানাহার করিয়াছে তাহারা দিনের বাকি অংশ রোযার ন্যায় অনাহারে কাটাইবে। যাহারা এখনও পানাহার করে নাই, তাহারা রোযা রাখিবে; অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ—রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিনের রোযা এই উম্মতের জন্য নবী (দঃ) ফরজ রূপে আদেশ করিয়াছিলেন; এই তথ্য আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৮২৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছের নির্দেশটি ঐ সময়েরই। আশুরার রোযা ফরজ হওয়া রহিত হইয়া যাওয়ায় এই আদেশও রহিত হইয়া গিয়াছে।

পাঠকবর্গ! আশুরার দিন মোহারম চাঁদের দশ তারিখ, তাই কেহ ধারণা করিতে পারে যে, ইমাম হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনার সঙ্গে আশুরার রোযার কোন সম্পর্ক রহিয়াছে। এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা-প্রসুত। কারণ, ঐ ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বহু পরে ঘটিয়াছে, অথচ এই আশুরার রোযা নবী (দঃ) স্বয়ং রাখিয়াছেন এবং ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই মোসলমানগণকে এই রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, বরং তাঁহারও বহু পূর্বে মুছা আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক এই রোযা রাখাও প্রমাণিত হইয়াছে, বরং ইহারও বহু পূর্বে নুহ (আঃ) ও এই দিনের রোযা রাখিয়াছিলেন। কারণ, মহাতুফান ও প্লাবন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার তরী এই দিনই 'জুদী' পর্বতের উপর দাঁড়াইয়াছিল।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু

● রমযান আরম্ভের চাঁদ এবং রমযান শেষ হওয়ার চাঁদ দেখায় তৎপর হইবে (২৫৫ পৃঃ)। ইসলামের বিশেষ ফরজ—রোযা ইহার উপর নির্ভরশীল।

● রমযান শরীফের রোযা শুধু কেবল গতানুগতিক ভাবে রাখিবে না, বরং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমানের তাগিদে আল্লার আদেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত ছওয়াব লাভের প্রেরণা এবং ফরজ আদায়ের নিয়্যতকে অন্তরে উপস্থিত রাখিয়া প্রতিটি রোযা আরম্ভ করিবে। (২৫৫ পৃঃ)

● নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযান মাসে (রূহানী ও বাহ্যিক উভয় প্রকার দানে) অধিক দানশীল হইতেন (২৫৫ পৃঃ)। অতএব রমযান মাসে বাহ্যিক দান-খয়রাতে এবং আল্লার বন্দাদের মধ্যে দ্বীন বিতরণে অধিক তৎপর হওয়া সুন্নত।

● ঝগড়া প্রতিরোধ এবং গালিগালাজ বারণ করার জন্য এরূপ বলা যে, আমি রোযা আছি—দোষনীয় নহে। (২৫৫)

● পানি বা সহজসাধ্য যে কোন বস্তু দ্বারাই ইফতার করা যায়। (২৬৩ পৃঃ) এমনকি অগ্নিস্পর্শে তৈরী বস্তু দ্বারাও ইফতার করা যায়। (১০০৩ নং হাদীছের ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাতুর সরবৎ দ্বারা ইফতার করিয়াছিলেন।) জব ইত্যাদির ছাতু তৈরী করিতে প্রথমে উহাকে আগুনে ভাজা করিতে হয়। অগ্নিস্পর্শ বিহীন বস্তু শুধু পানি হইলেও উহা দ্বারাই ইফতার করা উত্তম।

● নফল রোযা রাখিতে মেহমানের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দেহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বদা রোযা রাখা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়। নফল রোযার আধিক্যের সর্বশেষ সীমা হইল—একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখা; দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নফল রোযার রীতি ইহাই ছিল (২৬৫ পৃঃ)। এই বিষয় কয়টি একই হাদীছে প্রমাণ করা হইয়াছে; হাদীছটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। নফল নামায-রোযা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে নীতি নির্ধারনী পরামর্শও উক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছটির বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ অনুবাদ ১০২৯ নম্বরে হইয়াছে।

তারাবীর নামায

১০৪৭। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাত্রে উহার বিশেষ নামায (অর্থাৎ তারাবীর নামায—এই অর্থ সমস্ত ইমামগণের সিদ্ধান্ত। বোখারী শরীফের শরাহ আইনী ও মোসলেম শরীফের শরাহ নববী দ্রষ্টব্য।) ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যোহরী (রঃ) উক্ত হাদীছ উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে তারাবীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এবং উহার ফজিলত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে, উহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হইত না। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালেও তারাবীর নামাযের অবস্থা ঐরূপই ছিল। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের প্রথম দিকেও ঐ অবস্থাই ছিল। (কারণ তখন লোকগণ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই অধিক বন্দেগী করিত।)

একদা ওমর (রাঃ) রমযান শরীফের রাত্রে মসজিদে আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন লোকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারাবীর নামায পড়িতেছেন—কেহ কেহ একাকী পড়িতেছেন, কাহারও সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোক জমাআত করিয়া পড়িতেছেন। এতদৃষ্টে ওমর (রাঃ) এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, সকলকে সমবেতভাবে এক ইমামের পেছনে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং ইহা উত্তম হইবে। অতঃপর সেই ইচ্ছাকে তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করিলেন—সকলকে প্রধানতম ক্বারী উবায়ী-ইবনে-কায়াব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সমবেতভাবে নামায পড়ার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর আর একদিন তিনি মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, সকলে সমবেতভাবে এক ইমামের সঙ্গে তারাবীহ পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও ইহা একটি নূতন ব্যবস্থা কিন্তু অতি উত্তম ব্যবস্থা।

অতঃপর তিনি বলিলেন, (যদিও ইহা উত্তম, কিন্তু) রাত্রের প্রথম ভাগের নামায হইতে শেষ ভাগের নামায উত্তম।

(ওমর (রাঃ) রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের সময় তারাবীর নামায পড়াকে অগ্রাধিকার দান করিতেন এবং তিনি নিজে তাহাই করিতেন।) সাধারণতঃ অন্য সকলে তারাবীর নামায রাত্রের প্রথম ভাগে পড়িয়া থাকিতেন।

১০৪৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা রমযানের মধ্যে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন এবং নামায পড়িতে লাগিলেন; কতেক লোক তাঁহার সঙ্গে নামাযে শরীক হইল। ভোর হইলে পর সকলের মধ্যেই এই বিষয় চর্চা হইল, তাই দ্বিতীয় দিন আরও অধিক লোকের সমাবেশ হইল এবং তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িল। ঐ দিন ভোরে আরও অধিক চর্চা হইল এবং তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোক সমবেত হইল; ঐ দিনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে আসিয়া নামায পড়িলেন এবং উপস্থিত সকলেই তাঁহার সহিত একত্রে জমায়াতে নামায পড়িল। চতুর্থ রাত্রিতে লোকের সমাগম এত অধিক হইল যে, মসজিদের মধ্যে সঙ্কুলান সম্ভব হইল না; (কিন্তু ঐ দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন না।) যখন ফজর নামাযের সময় উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) মসজিদে আসিলেন, ফজরের নামাযান্তে সকলকে সম্বোধন করিয়া খোৎবা পাঠে ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন—তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত রহে নাই। কিন্তু আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, (এই বিশেষ নামাযটির

প্রতি এত অধিক আগ্রহ দৃষ্টে) উহা তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। সে অবস্থায় (ফরজ নামাযের প্রতি প্রযোজ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ, যেমন—সর্বদা পাবন্দীর সহিত আদায় করা, সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে কখনও অবহেলার অবকাশ না থাকা; সর্বদা উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা অবলম্বন করা ইত্যাদি এই সুদীর্ঘ নামাযের ক্ষেত্রে বজায় রাখিয়া চলিতে) তোমরা অক্ষম হইয়া পড়িবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজীবন পর্য্যন্ত (রমযানের বিশেষ নামায তারাবীর) অবস্থা এইরূপই রহিল (যে, উহার বাধ্যবাধকতার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই)।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত দুইটি হাদীছের দ্বারা তারাবীর নামাযের ইতিবৃত্ত প্রকাশ পাইল যে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই নামাযের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। উহার অনেক অনেক ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং উহা পড়িয়াছেন, অন্য লোকদিগকে তাঁহার সহিত জমায়াতরূপে শরীক হওয়া সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা সর্বদা চালাইয়া যান নাই বটে, তাহা বিশেষ কারণাধীন ছিল। কারণটি উপরোল্লিখিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই নামাযের প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রদর্শনে আশঙ্কা আছে উহা ফরজ করিয়া দেওয়ার। সেই কারণ তিনি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, সেই কারণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবন-কাল পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার পরে সেই কারণের আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পর অহী চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়, নূতনভাবে কোন বিষয় ফরজ হওয়ার অবকাশ নাই। ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের প্রথম অংশে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন বড় বড় সমস্যায় পতিত ছিলেন। উহা অতিক্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়া যখন তিনি কতিপয় মছআলাহ ও বিষয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন এই তারাবীর প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া দৃষ্টে তারাবীর জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করিলেন, রাকাত সংখ্যা ২০ সাব্যস্ত করিলেন এবং জমায়াতের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে তারাবীর প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎকালীন সোনালী যুগে বিদ্যমান হাজার হাজার ছাহাবীগণও আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ব্যবস্থা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিলেন। ছাহাবীগণের এজমার দ্বারা এই বিষয়টি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

তারাবীর নামাযের রাকাত-সংখ্যা ঃ

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ প্রমুখগণ এক বাক্যে তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়াছেন। ইমাম মালেক হইতে ২০ এবং ৩৬ উভয় সংখ্যাই বর্ণিত আছে, অনেকে ২০ রাকাতের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য বলিয়াছেন। সেমতে তারাবীর নামায ২০ রাকাত হওয়াকে এজমা বলা হয়। (আওজাযুল-মাছালেক দ্রষ্টব্য)।

কলুষমুক্ত বিবেকে চিন্তা করিয়া বলুন—মদীনার ইমাম মালেক, মক্কার ইমাম শাফী, দশ লক্ষ হাদীছের হাফেজ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহ ইমাম আবু হানীফা—সকলের একই সিদ্ধান্ত যে, তারাবীর নামায ২০ রাকাত হইতে কম নহে—এই সিদ্ধান্ত কিরূপ শক্তিশালী এবং বিশ্ব-বরণ্য ইমামগণের ঐক্যমত পূর্ণ; এইরূপ সিদ্ধান্তের মূল্য কি হইতে পারে তাহা বিবেকের নিকটই জিজ্ঞাসা করুন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদ্দেছ আ'তা (রঃ) যাহার মৃত্যু ৮০ বৎসর বয়সে; নবীজীর মাত্র ১০৫ বৎসর পরে। ছাহাবীগণের যুগের এই মহাদ্দেছ তাঁহার দীর্ঘ ৮০ বৎসরের পূর্ণ জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত বস্তুরূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—আমি সকল লোকদেরকেই দেখিয়াছি, তাঁহারা (জমাতের সহিত) বেতেরের সঙ্গে (তারাবীর নামায) ২০ রাকাতই পড়িতেন (ইবনে-আবী শায়বা)।

এই মহাত্মন মোহাদ্দেছ দীর্ঘ জীবনে যাহাদিগকে দেখিয়াছেন—তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী বা তাঁহাদেরই শাগির্দান—তাবেয়ী ছিলেন।

সুধী পাঠক! এক শ্রেণীর লোক হাদীছের নাম লইয়া আস্ফালন দেখায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—হাদীছ নিঃসন্দেহে সকলের উর্দ্ধে; সেই জন্য এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ হাদীছের যে অর্থ বুঝিবে এবং সাব্যস্ত করিবে তাহাও কি বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের এবং ছাহাবী ও তাবেয়ী—তথা নবীজি হইতে শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তাঁহার নিকটতম যুগের জ্ঞানীগণের বুঝ ও সাব্যস্তের উর্দ্ধে হইবে? আর যদি তাহারা পূর্ববর্তী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণের দাবী করে তবে বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, বরং তাঁহাদের কুৎসা গাহিয়া এমন লোকদের অনুসরণ করা বোকামী নয় কি যাহারা আমাদের তুলনায় লক্ষ-কোটি গুণ উর্দ্ধের হইলেও ঐ বিশ্ব-বরণীয় ইমাম ও আলেমগণ অপেক্ষা হাজার গুণ নিম্নে?

এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেমগণের অধিকাংশই তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়া গিয়াছেন। এই সত্য শুধু আমাদের কথা নহে, ছেহাহ্-ছেত্তা তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয় কেতাবের এক কেতাব তিরমিযী শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وقال الشافعى وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

ইমাম তিরমিযী (রঃ) তারাবীর রাকাত-সংখ্যায় মতভেদ ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন—"আলী (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যান্য ছাহাবীগণ হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ আলেমগণ ২০ রাকাতের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। ছুফিয়ানে ছৌরী, ইবনুল মোবারক এবং ইমাম শাফীর সিদ্ধান্তও

ইহাই। ইমাম শাফী আরও বলিয়াছেন যে, আমি আমাদের দেশ মক্কা এলাকায় ইহাই পাইয়াছি যে, লোকগণ তারাবীর নামায ২০ রাকাতই পড়েন।

এতদ্ভিন্ন তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে হাদীছের প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, হাদীছের বিধান-শাস্ত্রের ধারা আছে যে, সীমা বা সংখ্যা নির্ণয়ে কোন ছাহাবীর কার্য্যে বা কথায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নাম উল্লেখ না থাকিলেও উহাকে নবী করীমের শিক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে সাতটি হাদীছ প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। একটি হাদীছ স্পষ্টতঃ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল ও ক্রিয়ারূপে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং বেতের পড়িতেন।

আর তিনটি হাদীছ খলীফা ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তারাবীর সুব্যবস্থা করার সাথে উহা ২০ রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একটি হাদীছ আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে কোরআন বিশেষজ্ঞগণকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্দ্ধারিত করিলেন ২০ রাকাত তারাবী পড়াইবার জন্য।

একটি হাদীছ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং তিন রাকাত বেতের পড়িতেন।

একটি হাদীছ উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মদীনা শরীফে রমযান মাসে ২০ রাকাত নামায পড়ার ইমামতী করিতেন।

এই সমস্ত হাদীছ অনেক অনেক হাদীছের কেতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই হাদীছ সমূহ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীগণও স্বীকার করে যে, ইহার কোনটিই জাল বা মিথ্যা নহে। অবশ্য তাহারা হইাতে দুই রকম দোষ বাহির করিয়া থাকে। কোনটি সম্পর্কে ত শুধু এতটুকু দোষ যে, উহার ছনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে। অর্থাৎ পরম্পরা রাবী বা বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এরূপ আছে যে, এক রাবী অপর রাবী হইতে সরাসরি শোনেন নাই—কোন মাধ্যমে শুনিয়াছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ, ঐ রাবীদ্বয় উভয়ে পূর্ণ বিশ্বস্ত হইলে হাদীছ-পরীক্ষা শাস্ত্রের বিধান মতে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় বটে। এবং আলোচ্য হাদীছ সমূহের ঐ অবস্থা ক্ষেত্রে উভয় রাবী পূর্ণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার দোষ এই বাহির করে যে, কোন কোন হাদীছের ছনদে কোন রাবী বা বর্ণনাকারী দুর্বল আছে।

এই সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ—হাদীছ পরীক্ষা-শাস্ত্রের বিধান রহিয়াছে যে, দুর্বল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও এক মর্মে বর্ণিত হইলে তাহা গ্রহণীয় হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সাতটি হাদীছ একত্রিত—একই মর্মে তথা তারাবী ২০ রাকাত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে; ইহা অবশ্যই গৃহীত হইবে।

উক্ত সত্যকে এড়াইবার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের নিকট ৮ রাকাত তারাবীর পক্ষে দোষ-ত্রুটি বিহীন একটি হাদীছ রহিয়াছে। হাদীছখানা বোখারী শরীফেই আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে—প্রথম খণ্ডে ৬০৮ নম্বরে অনূদিত। উক্ত হাদীছকে ৮ রাকাতওয়ালারা জঘন্য রকমের কারচুপির সহিত ছাটকাট করিয়া এইরূপে প্রকাশ করে যে, আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—নবী (দঃ) রমযানের রাত্রে কিরূপ নামায পড়িতেন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না।" বিরুদ্ধবাদীরা বুঝাইতে চাহে যে, এই এগার রাকাতে বেতের তিন রাকাত আর তারাবী আট রাকাত।

বিরুদ্ধবাদীদের ভয় করা উচিৎ; উক্ত হাদীছে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উত্তরটা পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হইলে তাহাদের ধাঁধা ও কারচুপি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং ধামাচাপার আবরণ খুলিয়া যাইবে। পূর্ণ উত্তর ছিল এই—

ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة

"আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, নবী (দঃ) রমযানে এবং গায়রে-রমযানে তথা রমযান ছাড়া অন্য সময়েও এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না।"

লক্ষ্য করুন! আয়েশা (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে গায়রে-রমযান—রমযান ছাড়া অন্য সময়ের রাত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনিবার্য্যতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য এমন নামায সম্পর্কে এগার রাকাত বলা যাহা রমযান এবং রমযান ছাড়া অন্য সময়ও পড়া হইয়া থাকে। তারাবী কি রমযান ছাড়া অন্য সময় পড়া হয়? অতএব এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারেই না। ইহার উদ্দেশ্য রাত্রের ঐ নামায যাহা রমযান ছাড়াও পড়া হয়—তাহা হইল তাহাজ্জুদ-নামায। আয়েশা (রাঃ)কে রাত্রের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সাধারাণতঃ তাহাজ্জুদকেই রাত্রের নামায বলা হয়, তাই আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিয়াছেন, নবী (দঃ) তাহাজ্জুদ-নামায রমযানে ও গায়রে-রমযানে একই রকম—বেতের সহ এগার রাকাত পড়িতেন। তাহাজ্জুদ-নামাযের পরিমাণ তিনি রমযানে বেশী করিতেন না। আলোচ্য হাদীছের এই তাৎপর্য্যই ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে ১৫৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন—"রমযানে ও গায়রে-রমযানে নবীজির তাহাজ্জুদ" উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি এই হাদীছখানাই উল্লেখ করিয়াছেন।

খাছ তাহাজ্জুদ ভিন্ন রমযানের রাত্রে সর্বমোট নামায এগার রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া—ইহা ত আয়েশা (রাঃ) বলিতেই পারেন না। কারণ, স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) রমযান মাসে নবীজির অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন—'রমযান আসিলেই আল্লার দরবারে দোয়া ও কান্নাকাটায় নবীজির চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার নামাযের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়া যাইত (বায়হাকী)।

আর তাহাজ্জুদ ও তারাবী উভয় নামাযকে যে, বিরুদ্ধবাদীরা একই নামায বলে ইহা ত নিতান্তই অবান্তর। বোখারী (রাঃ)ও নামায-অধ্যায়ে তাহাজ্জুদের বয়ান রাখিয়াছেন; আর তারাবীর জন্য রোযা-অধ্যায়ে ভিন্ন বয়ান রাখিয়াছেন। এমনকি মিশরীয় ছাপার বোখারী শরীফে তারাবী-নামাযের শিরোনামা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকারে রহিয়াছে। বলা হইয়াছে, "তারাবীর নামাযের অধ্যায়"। তারাবীর নামাযকে পরিচ্ছেদ আকারে বর্ণনা করা হয় নাই।

এই সুদীর্ঘ আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য হাদীছখানা ছহীহ্ বটে, কিন্তু তারাবীর নামাযের সঙ্গে দূরের কোন সম্পর্কও ইহার নাই।

আট রাকাতওয়ালাগণ অন্য দুইটি হাদীছও পেশ করিয়া থাকে। একটি ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যে, তিনি বেতের সহ এগার রাক.ত পড়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ! স্মরণ রাখিবেন—তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ওমর (রাঃ) হইতে তিন জনের বর্ণনা হাদীছের কেতাবে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন ২০ রাকাত বলিয়াছেন; আর একজন দুই রকম বলিয়াছেন—২০ রাকাত এবং ৮ রাকাত।

এমতাবস্থায় এই বর্ণনাকারীর ৮ রাকাত বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় কি?

আর একখানা হাদীছ নবী (দঃ) সম্পর্কে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ হাদীছ খানার ছনদ দোষী এবং নিতান্তই দুর্বল—ইহা যথাস্থানে প্রমাণিত আছে। অথচ ইহার সমর্থনে আর কোন হাদীছ নাই; অতএব এই দুর্বল ছনদের হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ২০ রাকাত সম্পর্কে সাত খানা হাদীছ রহিয়াছে।

লাইলাতুল-ক্বদরের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে একটি বিশেষ ছুরা নাযেল করিয়াছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ

مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ.

سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থ—তোমরা জানিয়া রাখিও, আমি এই পবিত্র কোরআনকে কদরের রাত্রে নাযেল করিয়াছি; লাইলাতুল-কদর কিরূপ ফজিলতের রাত্র তাহা জান কি? লাইলাতুল-কদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম। সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং জিব্রাইল (আঃ) আল্লার আদেশানুক্রমে (দুনিয়ার বুকে) অবতরণ করিয়া থাকেন—সমস্ত কমের মঙ্গল ও কল্যাণ লইয়া। সেই রাত্রটি প্রভাত পর্য্যন্ত শান্তিই শান্তি।

লাইলাতুল-কদরের সম্ভাব্য সময়

১০৪৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছাহাবী স্বপ্নে লাইলাতুল-কদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের স্বপ্ন (বিভিন্ন রকম হইলেও) এই বিষয়ে এক দেখিতেছি যে, লাইলাতুল-কদর রমযানের শেষ সাত দিনে অবস্থিত। সেমতে উহার অভিলাষী ব্যক্তি যেন উহাকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে পাইবার চেষ্টা করে।

১০৫০। হাদীছঃ— عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ○

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্র সমূহে তালাশ কর।

১০৫১। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা লাইলাতুল-কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

১০৫২। হাদীছঃ— عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقٰى

فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى ○

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর—একুশ তারিখে, তেইশ তারিখে এবং পঁচিশ তারিখে।

ব্যাখ্যাঃ—লাইলাতুল-কদরকে তালাশ করার অর্থ উহার সম্ভাব্য তারিখ সমূহে বিশেষরূপে এবাদত-বন্দেগীর প্রতি তৎপর হওয়া এবং যথাসাধ্য এবাদত-বন্দেগী করতঃ রাত্রি যাপন

করা। উহার বিশেষ সম্ভাব্য সময় রমযান মাসের কুড়ি তারিখের পর হইতে মাসের শেষ পর্য্যন্ত; তন্মধ্যে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখগুলি অন্যতম। বিভিন্ন হাদীছ সূত্রে এতদূরই প্রমাণিত হয়। লাইলাতুল-কদরের উদ্দেশ্যেই রমযানের শেষ দিনগুলির এ'তেকাফ করা হইয়া থাকে।

রমযানের শেষ দশ দিনে এবাদতে বিশেষ তৎপরতা

১০৫৩। হাদীছ:— عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيَا لَيْلَهُ

وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ ○

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রমযানের শেষ দশ দিন আরম্ভ হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অধিক এবাদত-বন্দেগীর জন্য তৎপরতা অবলম্বন করিতেন এবং এবাদত বন্দেগীতে রাত্র যাপন করিতেন, পরিবারবর্গকেও তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ (করতঃ এবাদত-বন্দেগীর প্রতি ধাবিত) করিতেন।

এ'তেকাফের বয়ান

১০৫৪। হাদীছ:—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন।

১০৫৫। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় জীবনে প্রতি বৎসর রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণও ঐরূপ এ'তেকাফ করিয়াছেন।

এ'তেকাফ অবস্থায় বাড়ী আসিবে না

১০৫৬। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে এ'তেকাফরত অবস্থায় স্বীয় মাথা আমার প্রতি ঝুকাইয়া দিতেন; আমি তাঁহার মাথা আচড়াইয়া দিতাম, অথচ আমি তখন ঋতু অবস্থায় থাকিতাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) (মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি) মানবীয় আবশ্যক ব্যতীত এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাড়ী আসিতেন না।

রাত্রে এ'তেকাফের মান্নত মানিলে?

১০৫৭। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে

এই মান্নত করিয়াছিলাম যে, আমি হরম শরীফের মসজিদে (একদিন) এক রাত্র এ'তেকাফ করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাঁহার মান্নত পূর্ণ করার পরামর্শ দিলেন।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে শুধু এক রাত্রি এ'তেকাফ করার মান্নত করিলে সেই মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য নফলরূপে তাহা করিয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু একাধিক রাত্রের সংখ্যা উল্লেখ করিয়া—যেমন দুই, তিন বা চার রাত্রের এতেকাফ করার মান্নত করিলে উক্ত রাত্র সমুহ উহার দিন সহ এবং রোযার সঙ্গে এ'তেকাফ করা ওয়াজেব হইবে; রাত্র আগে দিন পরে হিসাব ধরিতে হইবে (ফতওয়া কাজিখান)। অবশ্য যদি মান্নতে স্পষ্টরূপে নিয়্যত থাকে যে, দিন নয়—শুধু রাত্রেই এ'তেকাফ করিব তবে সেই মান্নত ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি এক বা ততোধিক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে এবং স্পষ্টরূপে নিয়্যত করে যে, শুধু দিনেই এ'তেকাফ করিব রাত্রে নয়, তবে সেক্ষেত্রে মান্নত ওয়াজেব হইবে এবং রোযার সহিত শুধু দিনে এ'তেকাফ করিতে হইবে। ঐরূপ স্পষ্ট নিয়্যত না করিলে দিনের সহিত ঐ সংখ্যক রাত্রেরও এ'তেকাফ করিতে হইবে এবং রাত্র দিনের পূর্বে ধরিতে হইবে। (ফতওয়া আলমগিরী)

এ'তেকাফ করিতে মসজিদে জায়গা ঘেরাও করা

১০৫৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং আমি তাঁহার জন্য মসজিদে তাবুর ন্যায় করিয়া একটু স্থানকে ঘেরাও করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাম। তিনি ফজর নামাযান্তে সেই ঘেরাও -এর ভিতর প্রবেশ করিতেন (এবং তথায় এবাদত বন্দেগী করিতেন।) একবার আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং নিজেও এ'তেকাফ করার জন্য ঐরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি চাহিলেন; নবী (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর হাফছা রাজিয়াল্লাহু আনহাও ঐরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি চাহিলেন, আয়েশা (রাঃ) তাহার জন্য অনুমতি আনিয়া দিলেন, তিনিও তৃতীয় আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন। জয়নাব (রাঃ) উহা দেখিতে পাইয়া তিনি চতুর্থ আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন। ভোরবেলা নবী (দঃ) মসজিদের মধ্যে চারটি ঘেরাও দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কি? তখন পূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে অবগত করান হইল। হযরত (দঃ) (ঘেরাও সমূহের দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ হইয়া নামাযীদের অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কা পূর্বক স্বীয় ঘেরাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং) বলিলেন—(মসজিদে নামাযীদের অসুবিধা করিয়া) তাহারা নেকী হাসিল করিতে চায়? এই বলিয়া এ'তেকাফ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি পরবর্তী শাওয়াল মাসে পুনঃ দশ দিনের এ'তেকাফ করিলেন।

এ'তেকাফরত স্বামীর সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ

১০৫৯। **হাদীছ**:—উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মসজিদে উপস্থিত হইলেন; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন রমজানের শেষ দশ দিনে মসজিদের মধ্যে এ'তেকাফরত ছিলেন। উভয়ে কিছু সময় কথাবার্তা বলার পর ছফিয়া (রাঃ) ঘরে ফিরার জন্য দাঁড়াইলেন; সঙ্গে সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও দাঁড়াইলেন এবং ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে মসজিদের দরওয়াযা পর্যন্ত আসিলেন। তথায় নিকটস্থ পথে দুইজন মদীনাবাসী ছাহাবী কোথাও যাইতেছিলেন; তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সালাম করিলেন (এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকা অবস্থায় তাঁহারা সম্মুখে পড়িয়া যাওয়ায় লজ্জাবোধে দূরে সরিয়া পড়ার জন্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইও না (দাঁড়াও এবং এখানে আস)। আমার সঙ্গস্থ মহিলাটি আমারই স্ত্রী—ছফিয়া। (ছাহাবীদ্বয় অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একজন নারীর সঙ্গে দেখিয়া শয়তানের ধোকায় ও কারসাজিতে কোন কুধারণার বশীভূত হইয়া স্বীয় দীন-ঈমান বরবাদ করিয়া বসি না-কি—এই আশঙ্কায় রসুলুল্লাহ (দঃ) এই উক্তি করিয়াছেন। তাই) তাঁহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ·· ইয়া রসুলাল্লাহ! (আমরা আপনার প্রতি কোন কুধারণার বশীভূত হইতে পারি কি?) রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাহাদের জন্য পাহাড়তুল্য মনে হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, উপস্থিত তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণা নয়, কিন্তু জানিয়া রাখিও, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলিতে সক্ষম। (তাই আশঙ্কা আছে যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে না-কি—উহারই পথ বন্ধ করিয়া দিলাম।)

রমযানের কুড়ি দিন এ'তেকাফ করা

১০৬০। **হাদীছ**:—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) সাধারণতঃ প্রতি রমযানে দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। কিন্তু যেই বৎসর তিনি ইহকাল ত্যাগ করিবেন, সেই বৎসর তিনি কুড়ি দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

- ঋতুবতী স্ত্রী এ'তেকাফরত স্বামীর খেদমতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে।
- এ'তেকাফ অবস্থায় শরীর বা অঙ্গ ধৌত করা যায় (২৭২ পৃঃ)। কিন্তু উহার জন্য কিম্বা সাধারণ গোসল করার জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ফরজ গোসলের

জন্য বাহির হইতে হইবেই। সাধারণ গোসলের প্রয়োজন হইলে পেশাব-পায়খানার জন্য বাহির হওয়ার সুযোগে সেই পথেই অল্প সময়ে গোসল করিতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও গোসলের জন্য অন্যত্র যাওয়া কিম্বা শরীর মর্দনে বা কাপড় ধোয়ায় বিলম্ব করা জায়েয নহে।

● নারীদের জন্য এ'তেকাফ করা জায়েয (হাদীছ ১০৫৮ দ্রষ্টব্য)। উক্ত হাদীছে হযরতের বিবিগণের মসজিদে এ'তেকাফ করার উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ড ২২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে নামাযের জন্যও নারীদের মসজিদে উপস্থিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ'তেকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান ত আরও গুরুতর। সেমতে নারীদের এ'তেকাফের ব্যবস্থা হইল—গৃহাভ্যন্তরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিলে সে স্থানে; আর ঐরূপ নামাযের নির্দিষ্ট স্থান না থাকিলে গৃহাভ্যন্তরে কোন একটি স্থানকে এ'তেকাফের জন্য সাময়িকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া লইবে (হেদায়াহ, ফতহুল-কাদীর)। তথায় মসজিদে অবস্থানের ন্যায়ই অবস্থান করতঃ এ'তেকাফ উদযাপন করিবে; পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়া একাগ্রতার সহিত এবাদত বন্দেগীরত থাকিবে।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি তাহার সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জনে কথাবার্তা বলিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ এ'তেকাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলায় দোষ নাই।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি কোন কাজের প্রয়োজনে (মসজিদ হইতে বাহির হইয়া নয়,) মসজিদের দরওয়াজা পর্যন্ত আসিতে পারে। (২৭২ পৃঃ)

● এসতেহাজাগ্রস্তা মহিলাও এ'তেকাফ করিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—যে অবস্থাকে শরীয়তে ওজরগণ্য করা হইয়াছে, যেমন কাহারও প্রস্রাব ঝরার ব্যধি আছে সে মসজিদে এ'তেকাফ করিতে পারে। অবশ্য মসজিদকে কোন রকম অপবিত্র করা হইতে অবশ্যই পূর্ণ সতর্ক থাকিতে হইবে এবং উহার জন্য সুব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

● এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রি মসজিদে যাপন করিয়া ভোর বেলায় মসজিদ হইতে বাহির হওয়া (২৭৩ পৃঃ)। এস্থানে একটি সুন্দর বিষয় অনুধাবন যোগ্য— সাধারণতঃ এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রিটি ঈদের রাত্রি। ঈদের রাত্রকে এবাদৎ বন্দেগীতে যাপন করার বিশেষ ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে। সুতরাং যদি এ'তেকাফ সমাপ্ত করিয়া ঐ রাত্রিটিও ঐ সঙ্গে মসজিদেই উদযাপন করিয়া আসে তবে সেই বিশেষ ফজিলতও হাসিল হয়।

● শাওয়াল মাসে তথা রমযান ছাড়া অন্য মাসেও এ'তেকাফ করা যায় (২৭৩ পৃঃ)। বিশেষতঃ রমযানে এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া কোন কারণে উহা ত্যাগ করিলে একদিনের এ'তেকাফ ওয়াজেবরূপে এবং অতিরিক্ত মোস্তাহাবরূপে কাজা করিতে হয়; সেই কাজা এ'তেকাফ রমযান ছাড়া অন্য মাসে করা যায়।

● রোযাবিহীনও (নফল) এ'তেকাফ করা যায় (২৭৪ পৃঃ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এ'তেকাফ তিন প্রকার—ওয়াজেব, সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ, নফল। মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজেব—যাহা এক দিনের কম হয় না। রমযানের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফ সাধারণ ভাবে রাখা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ কেফায়াহ্। মান্নত এবং এই দশদিন ছাড়া অন্য সময়ের এ'তেকাফ নফল।

হানফী মজহাব মতে ওয়াজেব এবং সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ্ এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত; রোযা ব্যতিরেকে উহা আদায় হইবে না, এমনকি মান্নতের সময় যদি উল্লেখও করে যে, রোযাবিহীন দুই দিনের এ'তেকাফ করিব তবুও ঐ এ'তেকাফ রোযার সহিত করিতে হইবে। নফল এ'তেকাফ যাহা অল্প সময়ের জন্যও হইতে পারে উহা রোযা ছাড়াই শুদ্ধ হইবে।

● অমোসলেম থাকাবস্থায় এ'তেকাফের মান্নত থাকিলে মোসলমান হইয়া উহা আদায় করা উত্তম (২৭৩ পৃঃ)। অন্যান্য নেক আমলের মছআলাহও এইরূপই।

● এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া উহা ভঙ্গ করিলে কি করিতে হইবে?

মছআলাহ্ :—যদি এ'তেকাফ মান্নতকৃত ছিল এবং মান্নত ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের—যেমন, পনর দিনের কিম্বা অনির্দিষ্ট এক মাসের সে ক্ষেত্রে উক্ত সংখ্যক দিনের বা যে কোন এক চন্দ্র মাসের এ'তেকাফ রোযার সহিত একটানা ভাবে রাখিতে হইবে। উহা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এমনকি সর্বশেষ দিনও যদি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় তবে পুনরায় প্রথম হইতে উক্ত সংখ্যক বা এক মাসের এ'তেকাফ আদায় করিতে হইবে। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট মাস যেমন মহরম মাসের এ'তেকাফ মান্নত করিয়াছিল; সে ক্ষেত্রেও ঐ এক মাস একটানাভাবে এ'তেকাফ করা ওয়াজেব; কিন্তু যদি উহার কোন দিন এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় তবে শুধু ভঙ্গকৃত দিনের এ'তেকাফ কাজা করিলেই চলিবে (ফতহুল-কাদীর)। যদি সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ তথা রমযানের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া এ'তেকাফে বসে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ করে তবে ঈদের পর পুনরায় দশ দিনের এ'তেকাফ করা উত্তম। অন্ততঃ একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব।

তদ্রূপ যদি নফল রূপেও নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের অথবা এক দিনেরই এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া এ'তেকাফ আরম্ভ করার পর উহা পূর্ণ করার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ করে সে ক্ষেত্রেও একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব হইবে (ফতওয়া-কাজিখান)। অবশ্য যদি পূর্ণ দিনের নয়, বরং কম সময়ের এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া থাকে সে ক্ষেত্রে কোন কাজা করিতে হইবে না।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি মসজিদে থাকিয়া স্বীয় মাথা নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ স্বীয় অবস্থান মসজিদে অক্ষুন্ন রাখিয়া শুধু কেবল কোন অঙ্গ মসজিদের বাহির করা, এমনকি স্বীয় গৃহ মসজিদ সংলগ্ন থাকিলে কোন অঙ্গকে সেই গৃহে প্রবেশ করিলে দোষ হইবে না।

তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্য

ভূমিকা—

ইউরোপবাসী বা হিন্দু পণ্ডিতগণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তাহা আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ আমাদের ধর্মের বেলায় কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাহারা ধর্ম শব্দ ব্যবহার করে অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে। তাহারা বলে, মানুষ আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে এবং আল্লাহকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু সময় তাঁহার ধ্যান করিবে বা তাঁহার নাম জপিবে, গুন-কীর্তন করিবে বা তাঁহার নামে কোন ভোগ দিবে বা কোন অনুষ্ঠান করিবে—ধর্ম বলিতে শুধু এইটুকুই বুঝায় এবং ধর্মীয় প্রয়োজন ও প্রক্রিয়া এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের নিকট হইতে ধর্ম আর কিছু চায় না এবং ধর্ম মানুষকে অন্য আর কিছুর জন্য বাধ্যও করে না। কিন্তু আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করি ব্যাপক অর্থে। আমাদের অকাট্য বিশ্বাস ও আকিদা এই যে, মানুষের জীবনে যতগুলি পর্য্যায়, যতগুলি স্তর আছে—সর্ব পর্য্যায়ে, সর্বস্তরে আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ আল্লার আনুগত্যের ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা এই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হইল ধর্মের তাৎপর্য্য।

ধর্মের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা মানবের নিমিত্ত স্বীয় মনোনীত ধর্মকে 'ইসলাম' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ—گردن نهادن بطاعت "সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করা।" মানব তাহার জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লার দাসত্ব এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে অর্থাৎ আল্লার বাণী কোরআন ও আল্লার রসুল বা প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত আইন-কানুন ও আদর্শ তথা শরীয়ত অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে সীমাবদ্ধাকারে পরিচালিত করিবে ইহাই হইল ইসলাম ধর্মের মূল বস্তু ও তাৎপর্য্য। তাই ইসলাম ও শরীয়তের প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই বিস্তার লাভ করিবে।

যাহারা ইসলামকে শুধু মাত্র এবাদৎ-বন্দেগী ও উপাসনার নিয়ম-কানুন সম্বলিত মনে করিয়া থাকে বস্তুতঃ তাহারা ইসলামের শব্দার্থটুকুও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা উহার আভিধানিক অর্থের আওতাভুক্তি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছে।

মানুষ ইতর প্রাণী নহে। মানুষ একদিকে তাহার স্রষ্টার অতি আদরের প্রতিনিধি বা খলীফা—ফেরেশতার চেয়েও অধিক ঊর্দ্ধে তাহার আসন। আর অন্য দিকে সে সামাজিক জীব। সেই হেতু তাহার বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের প্রয়োজন আছে। সে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী। মানুষের জীবন ছয়টি স্তরে বিভক্ত।

ছয় স্তরে বিভক্ত জীবন-বিশিষ্ট মানবের ইহ-পরকালীন কল্যাণবাহক পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থারূপে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা 'ইসলাম ধর্মকে' মনোনীত করিয়াছেন, ইহা মানুষের মনগড়া ইযম বা মতবাদ নহে। সুতরাং 'ইসলামের' তফসিল ও অনুশাসন ছয় ভাগে বিভক্ত। বলা বাহুল্য—ইসলাম তথা আল্লাহতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ বিকাশের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান নির্ধারিত করিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় 'শরীয়ত'। 'শরীয়ত' শব্দের অর্থও রাজপথ। অতএব শরীয়তও ইসলামের ন্যায় ছয় ভাগে বিভক্ত।

(১) প্রথম বিভাগ—আকিদা, মতবাদ ও বিশ্বাস শ্রেণীর—যে সব বিশ্বাস ও শপথের উপর মানব স্বীয় কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবে। মানব কোন সাধারণ ইতর-প্রাণী নিকৃষ্ট জীব নহে। মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব; স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য কাহারও অধীনতা বা দাসত্ব সে স্বীকার করিয়া নিতে পারে না। সারা বিশ্ব তাহার অধীন; সে শুধু এক বিশ্বপতির অধীন; অন্য কাহারও অধীন সে নহে। মানবের দেহ নশ্বর ও মরণশীল বটে, কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর, অমর, চিরস্থায়ী।

ইসলামের মূল এই যে, হে মানব! তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, বিধানকর্তা আছেন। তাঁহার অধীনে তাঁহার বিধানে তুমি স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ খেলাফত পাইয়াছ। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের বিধান সমূহ তিনি পবিত্র কোরআনের ভিতর দিয়া এবং উহা ছাড়া আরও অসংখ্য অহীর মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মারফত তোমাকে দান করিয়াছেন। যদি তুমি খেলাফতের দায়িত্ব পালন না কর আল্লার নির্ধারিত সীমা-রেখা লঙ্ঘন কর, তবে তুমি পাপী হইবে। আর যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া খেলাফতের হক পালন কর তবে তোমার পূণ্য বা ছওয়াব হইবে। পাপ পুণ্য বিচারের জায়গা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নহে। উহার একটা পৃথক জগৎ নির্ধারিত আছে। উহার নাম আখেরাত বা পরকাল। পরকালে পাপের শাস্তির জন্য দোযখ এবং পুণ্যের পুরস্কারের জন্য বেহেশত নির্ধারিত আছে। মোটামুটি এই বিশ্বাস কয়টি ভিত্তি করিয়া মানুষের জীবন গঠিত ও পরিচালিত হইলে দুনিয়াতে শান্তি আসিতে পারে। কাজেই মানুষের সর্বাগ্রে এই কয়টি সত্য বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন পূর্বক এইগুলির উপর শপথ করিয়া তাহার জীবন যাত্রা শুরু করিতে হইবে। এইসব মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও মৌখিক শপথ গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহ ঈমানের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বিভাগ- এবাদৎ বন্দেগী বা রুহানিয়ত ও আধ্যাত্মিক শ্রেণীর। মানুষ যেহেতু আবিলতাপূর্ণ দুনিয়াতে বাস করে, তাই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলিয়া যায়, তাহার আত্মা ময়লাযুক্ত হইয়া পড়ে। মানব যাহাতে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া না যায়, তাহার আত্মা যাহাতে ময়লাযুক্ত হইয়া না পড়ে সেই জন্য এবং তাহার রূহানিয়তকে নির্মল ও উন্নত করার ও রাখার জন্য দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে স্মরণ এবং তাঁহার সমীপে আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে। সংযম অভ্যাসের নিমিত্ত অন্ততঃ এক মাস দিবাভাগে রোযা রাখিতে হইবে। যাহা কিছু অর্থ উপার্জন করিবে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ সৃষ্টিকর্তার নামে দীন-দুঃখী সৃষ্টজীবকে দান করিতে হইবে। তাঁহার নাম ও বিধানকে দুনিয়াতে চালু রাখার ও প্রাধান্য দান করার জন্য আজীবন জীবনপণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার গ্রন্থ এবং তাঁহার রসুলের জীবনের আদর্শগুলি সর্বদা গভীরভাবে অধ্যয়ন (study) ও প্রচার করিতে হইবে। এইসব কার্য্যক্রমগুলিই এবাদৎ বন্দেগী বা রূহানিয়ত নামে অভিহিত। নামায, যাকাৎ, হজ্জ ও রোযার অধ্যায় সমূহে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং জেহাদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

(৩) তৃতীয় বিভাগ---এক্‌তেছাদিয়াত তথা অর্থ-ব্যবস্থা—বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, শ্রম ইত্যাদি কিভাবে পরিচালিত করিবে? সে সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত সীমা নির্দ্ধারণকারী বিধান অনুসারে চলিতে হইবে, নিজের খাহেশ মতে চলা যাইবে না।

(৪) চতুর্থ বিভাগ—আখ্‌লাকিয়াত তথা আচার-ব্যবহার বা স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এবং সৃষ্টজীবের সঙ্গে আচার ব্যবহারের বেলায় সদাচারী মিতাচারী হইতে হইবে।

(৫) পঞ্চম বিভাগ—মোয়াশারাত বা সমাজ-ব্যবস্থা; পরিবারবর্গকে কিরূপে গঠন ও উন্নত করিতে হইবে? পরিবার নিয়া কিরূপে চলিতে হইবে? সমাজে ছোট-বড়, গরীব-ধনী, আপন-পর, নর-নারী পথিক-বিপদগ্রস্ত এদের কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন উহার তুলনায় অধিক ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না।

(৬) ষষ্ঠ বিভাগ—ছিয়াছিয়াত তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; শাসন কিভাবে করিতে হইবে? বিচার পদ্ধতি কি হইবে? শাসনকর্তা এবং শাসিতদের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে? শাসনকর্তা নিয়োগের ধারা কি হইবে? আদর্শ কি হইবে? ইত্যাদি সম্পর্কে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার যে বিধান আছে উহার তুলনায় উত্তম বিধান আর নাই।

তৃতীয় বিভাগীয় বিষয় সমূহই আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। অবশিষ্ট বিষয়সমূহ মূল কিতাবের পরবর্তী খণ্ডসমূহে বর্ণিত হইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনের সমুদয় বিভাগের ন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমুহেরও নীতি-নির্দ্ধারক এবং তৎসম্পর্কে বৈধ-অবৈধের সীমা প্রতিষ্ঠাতা হইলেন একমাত্র সর্বাধিকারী বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালা—অর্থাৎ তাঁহার বাণী কোরআন শরীফ তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথা শরীয়ত।

১। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—احل الله البيع وحرم الربو "আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা বাণিজ্যকে হালাল ও বিধেয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন ও বিধান-সম্মত ঘোষনা করিয়াছেন এবং সুদ প্রথাকে হারাম ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন বিরোধী ও বিধান বহির্ভুত ঘোষণা করিয়াছেন।"

এই আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ক্রয়-বিক্রয় প্রথা হালাল—জায়েয বা শরীয়ত অনুমোদিত, আর সুদ হারাম এবং বিধি বহির্ভুত। সুদ লভ্যাংশযুক্ত আদান-প্রদান হওয়ায় উহা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় মনে হয়, তবুও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা উহাকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

সুদ এবং ক্রয়-বিক্রয় বস্তুদ্বয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাহারও নিকট এক পর্য্যায়ের মনে হইলেও আল্লাহ কর্তৃক হারাম ও হালাল ঘোষিত হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। ইসলামের প্রতিক্রিয়া ও মোসলমান ব্যক্তির কার্য্য হইবে সেই ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে হারাম ঘোষিত সুদকে বর্জ্জনীয় এবং হালাল ঘোষিত ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণীয় মনে করা এবং সেই অনুসারে আমল করা। আল্লার বান্দা হইয়া যদি কেহ ঐ বিরাট ব্যবধানকে ব্যবধান মনে না করে তবে সে বস্তুতঃ জ্ঞানশূন্য পাগল বিবেচিত হইবে এবং তাহার বিবেক-বুদ্ধির উপর নফছ ও শয়তানের ভূত ছওয়ার হইয়াছে বলিতে হইবে।

আজ তাহারা নিজকে যুক্তিবিদ জ্ঞানী মনে করিলেও আখেরাতে তাহাদের পাগলাকৃতি ও ভুতাক্রান্ত প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰو لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰو . وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبٰو .

অর্থ—যাহারা সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা (কবর হইতে) ঐ উন্মাদ পাগলের ন্যায় উঠিবে যাহাকে জ্বিন-ভুতের আছরে উন্মাদ করিয়া দিয়াছে। কারণ, তাহারা এরূপ

বলিয়া থাকিত যে, ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ একই পর্য্যায়ের। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তেজারতকে আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন হালাল এবং সুদকে করিয়াছেন হারাম। (৩ পারা ৬ রুকু)

হালাল-হারামের বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কাফেররা স্বার্থান্ধ হইয়া সাধারণ মানুষের চোখে ধুলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিত, ব্যবসায়ের মধ্যেও যেমন পাঁচ মণ ধান ৫০'০০ টাকায় ক্রয় করিয়া ৬০'০০ টাকায় বিক্রি করিলে ১০'০০ টাকা লাভ হয়; তদ্রুপ ৫০'০০ টাকা নগদ একজনকে ধার দিয়া তাহার উপকার করিয়া তাহার নিকট হইতে ৫৫'০০ টাকা গ্রহণ করিলে ৫'০০ টাকা লাভ হয়; এমতাবস্থায় ইহা কতই না বেখাপ্পা কথা যে, ৫০'০০ টাকায় ১০'০০ টাকা লাভ করা ত জায়েয ও হালাল, অথচ ৫০'০০ টাকায় ৫'০০ টাকা লাভ করা হারাম, নিষিদ্ধ ও অপবিত্র আর আইন বিরোধী। যেমন একজন বলে, একটা বাঘেরও চারখানা পা একটা গরুরও চারখানা পা, বরং গরুর আরও দুইখানা শিং আছে এতদসত্ত্বে কেন বলা হয় যে, খবরদার—বাঘের কাছে যাইও না, বাঘের গোশত খাইও না, উহা হারাম ও অখাদ্য, কিন্তু গরুর কাছে যাইতে নিষেধ করা হয় না; উহার দ্বারা হাল চাষ করা হয়, উহার গোশত সুখাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঠিক এইরূপেই সুদ ত মানুষ জাতিকে খাইয়া সর্বনাশ করে, আর ব্যবসা জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তাহারা সুদ আর ব্যবসাকে একই রকমের মনে করিত। ইহা পাগলের উক্তি নয় কি? যেরূপ বাঘ ও গরুকে একই পর্য্যায়ের গণ্য করা। তাহারা সাধারণ মানুষের চোখের থেকে সুদের অপকারিতা ও নৃশংসতার দিকটা এবং ব্যবসায় লাভ-লোকসানের চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ ও শ্রমকরণের দিকটা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। ইহাও তাহাদের পাগলামি। এই জন্যই কেয়ামতের মাঠে তাহাদিগকে প্রথমে ত পাগলের আকারে উঠান হইবে, তারপরে যেহেতু সুদের দ্বারা তাহারা লোকের রক্তশোষণ করিত, সেই জন্য অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির নিয়মানুসারে রক্তের নদীর মধ্যে আটক করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

২। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

ধারে ক্রয় বা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যাহার উপর পাওনা থাকে তাহার হইতে লিখিত একরারনামা গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দানে পবিত্র কোরআনের সর্বাধিক দীর্ঘ আয়াত "আয়াতে মোদায়ানাহ" বিদ্যমান আছে (৩ পাঃ ৭ রুঃ)।। উল্লেখিত আয়াত-খণ্ড উহারই অংশবিশেষ। ইহাতে বলা হইয়াছে, ক্রয়-বিক্রয় ছোট হউক বা বড় হউক ধারে হইলে উহা লিখিতে অবহেলা করিও না—"অবশ্য পরস্পর নগদ লেন-দেনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

হইলে” সে ক্ষেত্রে না লেখায় দোষ নাই; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয়কালে সাক্ষী রাখার পরামর্শ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

● পশুর ক্রয়-বিক্রয়ে বয়নামা এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্যাশমেমোর প্রচলন ইহা হইতেই। লেখার ব্যবস্থা অতীতকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে লেখার স্থলে সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছিল; বর্তমানে সাক্ষী অপেক্ষা লেখা সহজ, তাই ক্যাশ-মেমোর প্রচলন হইয়াছে।

৩। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

ব্যাখ্যা ঃ—শুক্রবার দিন জুমার নামাযের প্রতি আহ্বান তথা আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির লিপ্ততা ত্যাগ করতঃ নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়ার আদেশ করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন “অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যাইবে তখন তোমরা এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে এবং আল্লার নেয়ামত উপার্জনে লিপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু এই অর্থ উপার্জনের সময়েও এবং কর্ম-ক্ষেত্রেও অধিক পরিমাণে আল্লার জিক্‌র করিবে, তবেই উন্নতি লাভ করিতে এবং কামিয়াবি হাসিল করিতে সক্ষম হইবে।” (২৮পাঃ ১২রুঃ)

এই আয়াতের দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয়ের তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি, বরং আদেশ প্রমাণিত হইল। কারণ, উহাও আল্লার নেয়ামত উপার্জনের একটি পথ। কিন্তু ইহাও প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা করিতে হইবে। যেমন—জুমার নামাযের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা বন্ধ করার আদেশ করা হইয়াছে। তদুপরি আল্লার জিক্‌র তথা আল্লার আদেশ পালনের প্রতিবন্ধক রূপে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত ও মগ্ন হইবে না।

৪। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“হে মোমেনগণ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের কোন মাল গ্রাস করিও না। হাঁ—পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা তথা ক্রয়-বিক্রয় সূত্রে গ্রহণ কর। (৫ পাঃ ১০ রুঃ)

১০৬১। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম তখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লাম আমার এবং মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে রবী'র মধ্যে মোয়াখাত অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করিয়া দিলেন। আমার সেই ভ্রাতা সায়াদ (রাঃ) এরূপ উদার ছিলেন যে, তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমি অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমার ধনের অর্দ্ধাংশ আপনাকে দান করিতেছি। এবং আমার দুই স্ত্রী আছে, আপনি যাহাকে পছন্দ করিবেন আপনার জন্য আমি তাহাকে ত্যাগ করিব, ইদ্দতের পর আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) (ভ্রাতার এই অসীম উদারতার শুকরিয়া আদায় পূর্ব্বক দোয়া করিয়া) বলিলেন—আপনার ধনের আবশ্যক আমার হইবে না; এখানে ব্যবসা কেন্দ্র কোন বাজার আছে কি? ভ্রাতা বলিলেন, 'কায়নুকা' নামক একটি বাজার আছে। ভোর বেলায় আবদুর রহমান (রাঃ) সেই বাজারে চলিয়া গেলেন এবং ঐ দিনের ব্যবসায়ের লাভ দ্বারা কিছু পনির ও ঘৃত ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। এইরূপে প্রতিদিন ভোরে তিনি সেই বাজারে যাইয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলেন। (কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অনেক টাকার মালিক হইয়া এবং টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া বিবাহ করিয়া নিলেন।) একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরে (নব-বধূর ব্যবহৃত) রঙ্গীন সুগন্ধির চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাদী করিয়াছ কি? তিনি উত্তর করিলেন—জী, হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহাকে? তিনি বলিলেন; মদীনার এক মহিলাকে। জিজ্ঞাসা করিলেন—মহরানা কত দিয়াছ? তিনি বলিলেন, এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, একটি বকরি জবেহ করিয়া হইলেও অলিমার (বিবাহের দাওয়াতের) ব্যবস্থা কর।

১০৬২। **হাদীছ ঃ—**ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"ওকাজ", "মাজান্নাহ" ও "জুল-মাজায" নামক কয়েকটি প্রসিদ্ধ মৌসুমী বাজার বা মেলা ছিল; (হজ্জের মৌসুমে উহা অনুষ্ঠিত হইত।) অন্ধকার যুগ হইতেই ঐগুলি প্রচলিত ছিল, উহাতে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ইসলামের যুগে ছাহাবীগণ ঐসব বাজারে ব্যবসা করা গোনাহ মনে করিলেন। তখন এই আয়াত নাযেল হইল—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা স্বীয় পালনকর্তার নেয়ামত উপার্জনে তৎপর হইবে, (যদিও হজ্জের মৌসুমে হয়) তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না।"

এতদ্ভিন্ন প্রথম খণ্ডের ৯৩ নং হাদীছখানা এস্থানে উল্লেখ হইয়াছে। এই সব হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) দেখাইয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে

ছাহাবীগণ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন এবং কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নাই; অতএব উহা জায়েযের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহারই আকৃতি সূদ—উহা হারাম।

হালাল-হারামের বাছ-বিচার আবশ্যক

১০৬৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي

الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ

অর্থ—আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করার মধ্যে কোন বাছ-বিচার করিবে না—যে, হালাল সূত্রে হাসিল হইল, না—হারাম সূত্রে হাসিল হইল। (নবী (দঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে—তোমরা ঐরূপ হইও না।)

অর্থাৎ কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে, নানা প্রকার অন্যায় ও কুকর্মের সৃষ্টি হইবে। উহার মধ্যে একটি অন্যায় সৃষ্টি হইবে এই যে, মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করায় এতই মোহগ্রস্ত ও লোভ-লালসায় অন্ধ হইয়া পড়িবে যে, হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার করিবে না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে, তোমরা সেরূপ করিও না যদিও তোমাদের সেই স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় বিশেষ জরুরী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম তিনি বলিয়াছেন, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়া শরীয়তে "হালাল" অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। তদ্রূপ "হারাম"ও অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। এই দুইটি পর্যায় ও স্তরের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি পর্য্যায়ও আছে; উহা হইল—সন্দেহজনক পর্য্যায়; অর্থাৎ উহাকে হারামও সাব্যস্ত করা যায় না; সেইরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই, আবার হালালও সাব্যস্ত করা যায় না, উহারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। এই তথ্য প্রমাণে প্রথম খণ্ডের ৪৭ নং হাদীছখানা উল্লেখ হইয়াছে। সন্দেহজনক পর্যায়ের অনেক কিছু ফেকা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যাহাকে শরীয়তে "মকরূহ" বলা হইয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক ক্ষেত্রে ইমাম ও আলেমগণের মতভেদের দরুণও বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুকে সন্দেহজনক সাব্যস্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে দৈনন্দিন এরূপ অনেক কিছু পেশ আসে যাহা সম্পর্কে হালাল বা হারাম হওয়া স্থিররূপে সাব্যস্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) "সন্দেহজনক" হওয়ার সংজ্ঞা নিরূপণেরও চেষ্টা করিয়াছেন

—যাহার সারমর্ম এই যে, সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান থাকে এইরূপ বিষয় ও বস্তুকে সন্দেহজনক পর্য্যায়ের গণ্য করা হইবে। যেমন প্রথম খণ্ডে ৭৪ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—একজন ছাহাবী এবং তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে একটি মহিলা সাক্ষ্য দিল যে, আমি তোমাদের উভয়কে আমার দুগ্ধ পান করাইয়াছি; অর্থাৎ তোমরা উভয়ে দুধ ভাই-বোন; তোমাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। বহু খোঁজাখুজির পরও এই সাক্ষীর কোন সহযোগী পাওয়া গেল না। ঐ ছাহাবী মক্কা হইতে প্রায় ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর কিভাবে তুমি তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? ঐ ছাহাবী সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন; অন্যত্র তাহার বিবাহ হইল।

উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী হারাম সাব্যস্ত হয় না। কারণ ঐ মহিলা তাহার দুধ-বোন হওয়ার গ্রহণীয় সাক্ষী ছিল না। দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষের সঙ্গে দুইজন নারী সাক্ষ্যদাতা হইলে উহা হয় গ্রহণীয় সাক্ষী। কিন্তু অসম্পূর্ণ হইলেও ঐ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি সাক্ষী ছিল, এই কারণে তথায় স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় ও দ্বিধা জন্মে—যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত নবী (দঃ) ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

অপর একটি ঘটনা—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমার বিছানার উপর পতিত খোরমা (শুষ্ক খেজুর) দেখিতে পাই, কিন্তু (জানা-শুনা ব্যতিরেকে) উহা আমি খাই না; এই আশঙ্কায় যে, উহা ছদকা-খয়রাতের খোরমা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান আছে যে, ঐ খোরমা ছদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু হযরতের গৃহে ছদকা-খয়রাতের খোরমা আসিয়া থাকিত; হযরত (দঃ) উহা গরীবদিগকে দিয়া দিতেন। নবীর জন্য ছদকা-খয়রাত খাওয়া জায়েয নহে।

আর এক হাদীছে আছে—একদা পথে পতিত একটি খোরমা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা ছদকা হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমি নিজেই উহা উঠাইয়া খাইতাম (যেন আল্লার নেয়ামতের অপচয় না হয়)। এক্ষেত্রেও সংশয়ের স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান আছে যে, উহা ছদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু সচরাচর ছদকা-খয়রাতের খোরমা লইয়া লোকেরা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকিত; তাই ঐ সংশয় ও সন্দেহ স্বাভাবিক।

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, (হারাম হইতে ত বাঁচিতে হইবেই, অধিকন্তু) সন্দেহজনক বিষয় এবং বস্তু হইতেও বাঁচিতে হইবে।

অতঃপর বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, সন্দেহজনক হওয়া এবং অছওয়াছাহ (অমুলক দ্বিধা) ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। উভয়ের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন—সন্দেহজনক

জিনিষ পরিহার করিতে হইবে; অছওয়াছাহজনক জিনিষ পরিহার করার মোটেই প্রয়োজন নাই। উভয়ের পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। সন্দেহজনক বলা হইবে ঐ ক্ষেত্রে যে স্থানে সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান আছে। আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই সেই ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টি হইলে উহাকে "অছওয়াছাহ" বলা হইবে। ইহার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নের হাদীছটিতে উল্লেখ হইয়াছে—

১০৬৪। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোকেরা আমাদের নিকট জবাইকৃত গোশত বিক্রি করার জন্য নিয়া আসে। আমরা জানি না—তাহারা জবেহ করার সময় "বিছমিল্লাহ" বলিয়াছে কি-না। তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বিছমিল্লাহ বলিয়া উহা খাও।

ব্যাখ্যাঃ—এক্ষেত্রে বিছমিল্লাহ বলা সম্পর্কে সংশয়ের স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই; যেহেতু জবেহ করার সময় মোসলমান ব্যক্তির বিছমিল্লাহ না বলা অস্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার পাত্র "সন্দেহজনক" ও পরিহার্য্য গণ্য হইবে না, বরং "অছওয়াছাহজনক" গণ্য হইবে যাহা পরিহার্য্য নয়, বরং অছওয়াছাহ পরিহার্য্য। পক্ষান্তরে পথে পতিত খোরমা সম্পর্কে ছদকা-খয়রাত হওয়ার আশঙ্কা তদ্রূপ নহে, কারণ ছদকা-খয়রাতের খোরমা লইয়া যেই পথে যাতায়াত ও চলাচল হয় ঐ পথে উহার এক-দুইটি পতিত হওয়া নেহায়েত স্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র "সন্দেহজনক" গণ্য হইবে এবং পরিহার্য্য হইবে। হযরতের বিছানায় পতিত খোরমা সম্পর্কে ছদকা-খয়রাত হওয়ার আশংকাও তদ্রূপই। কারণ, ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য লোকেরা হযরতের গৃহে দিয়া যাইত; এতদ্ভিন্ন লোকদের অনেক অনেক ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণে হযরত (দঃ) বিশেষভাবে জড়িত হইতেন; হযরতের কাপড়-চোপড়ে জড়াইয়া এক-দুইটা খোরমা চলিয়া আসা এবং বিছানায় পতিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র "সন্দেহজনক" ও পরিহার্য্য গণ্য হইবে। ৭৪ নং হাদীছের ঘটনায় ত সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির কারণটা স্বাভাবিক হওয়া অতি সুস্পষ্ট। সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ায় সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া একটি শরীয়তী বিচারনীতির বিধানগত ব্যাপার, উহা হইলে ত অকাট্য হারামই সাব্যস্ত হইত। অসম্পূর্ণ কিন্তু সুস্পষ্ট সাক্ষ্যে অন্ততঃ সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টি হওয়া ত নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং উহার ক্ষেত্র ত "সন্দেহজনক" এবং পরিহার্য্য সাব্যস্ত হইবেই।

সারকথা এই যে, যেক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক বিষয় হইবে সে ক্ষেত্রকে সন্দেহজনক ও পরিহার্য্য গণ্য করা হইবে, আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক নহে সে ক্ষেত্রকে অছওয়াছাহজনক গণ্য করা হইবে—উহা পরিহার্য্য নহে।

যেরূপ কোন দালানের ছাদ যদি বেশী ফাটা হয়, কড়ি-বরগা বিনষ্ট ও দুর্বল হয় এবং সেই কারণে ছাদ পতিত হওয়ার আশঙ্কা করা হয় এই আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র সন্দেহজনক গণ্য হইবে এবং ঐ গৃহ পরিহার্য্য হইবে। পক্ষান্তরে ছাদ যদি ভাল ও মজবুত থাকে, উহার কড়ি-বরগাও অক্ষত থাকে সে ক্ষেত্রে যদি আশঙ্কা করা হয়—হইতে পারে ছাদ পড়িয়া যায় না কি; এইরূপ আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধা "অছওয়াছাহ" গণ্য হইবে এবং ইহার ক্ষেত্র মোটেই পরিহার্য্য হইবে না।

১০৬৩ নং হাদীছে ব্যবসা-বাণিজ্যে হারামকে পরিহার করার তাকিদ করা হইয়াছে; ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত পরিচ্ছেদ সমূহের ইঙ্গিতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, হারামের ন্যায় সন্দেহজনক ক্ষেত্রকেও পরিহার করিতে হইবে। অতঃপর কতিপয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, হারাম ও সন্দেহজনক ক্ষেত্রকে পরিহার করিয়া সব রকম জিনিসের ব্যবসাই করা যায়। এবং দেশ-বিদেশে এমনকি সুকঠিন সামুদ্রিক ছফর করিয়া বিদেশে যাইয়াও ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। এরই মধ্যে এক পরিচ্ছেদে বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত উল্লেখ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আয়াতটি এই—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ـ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ـ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

প্রকৃত ও খাঁটি মোমেনদের একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন— "এমন সব লোক যে, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু সেই লিপ্ততা তাহাদিগকে আল্লার জিকর ও আল্লার ইয়াদ হইতে এবং (আল্লার হুকুম পালন তথা) নামায সুষ্ঠুরূপে আদায় করা হইতে, যাকাত প্রদান করা হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনযোগী করিতে পারে না। (বাণিজ্যে লিপ্ততার সময়েও) তাহাদের অন্তরে ভয় জাগ্রত থাকে কেয়ামতের হিসাবের দিনের—সেই দিন ভীষণ আতঙ্কের দরুন মানুষের প্রাণ থর থর কাঁপিতে থাকিবে এবং চক্ষুদ্বয় উলটিয়া যাইবে। (ঐ দিনের অনুষ্ঠান হইবে) এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তায়ালা লোকদিগকে তাহাদের ভাল আমলের পুরস্কার দান করিবেন এবং তাহাদের আমল অপেক্ষাও অধিক দান করিবেন নিজ রহমতে। (নামায, যাকাত আল্লার জিকর ইত্যাদিতে ব্যবসার উন্নতি ব্যহত হয় না; সর্বপ্রকার উন্নতি আল্লাহ তায়ালার হাতে;) আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অসংখ্য ও বে-হিসাবরূপে রিজিক দিয়া থাকেন। (১৮ পাঃ ১১ রুঃ)

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত আয়াতের আলোচনা দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল ও জায়েয বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে—উহা যেন কোন ক্ষেত্রেই আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামায, যাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনোযোগী করিতে না পারে—মোসলমান মাত্রেরই এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ্ (রঃ) বলিয়াছেন, আমরা মোসলমান সমাজের অবস্থা এই পাইয়াছি যে, তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের সম্মুখে আল্লার নির্দেশিত কোন নির্দেশ আসে তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাঁহাদিগকে আল্লার স্মরণ হইতে অমনোযোগী রাখিতে পারে না; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আল্লার নির্দেশ পালন করতঃ উহা আল্লার হুজুরে পেশ করেন।

উক্ত বিবরণের সমর্থনে বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ তফছীরকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) ছাহাবী আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা বাজারে ছিলেন; নামাযের জমাত খাড়া হওয়া নিকটবর্তী হইলে লোকেরা নিজ নিজ দোকান-পাট বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। তখন আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ লোকদের প্রশংসায় বলিলেন, এই শ্রেণীর লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়াই কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; এই বলিয়া তিনি উপরোল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। (ফতহুল বারী, ৪—২৩৮)

ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে দান-খয়রাত করা চাই

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...... وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লার নামে খরচ কর ঐ সব হালাল মাল হইতে যাহা তোমরা কামাই কর এবং ঐ সব হইতে যাহা আমি তোমাদের জন্য জমিন হইতে জন্মাইয়া থাকি। আর উহার নিকৃষ্টটার প্রতি যাইও না যে, আল্লার রাস্তায় খরচ করিতে শুধু নিকৃষ্ট বস্তুই খরচ কর, অথচ ঐরূপ নিকৃষ্ট বস্তু তোমাকে দেওয়া হইলে তুমি একমাত্র চোখ বুজিয়াই উহা গ্রহণ করিতে পার—সন্তুষ্টির সহিত তুমি উহা গ্রহণ করিবে না। স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অপ্রত্যাশী প্রশংসিত। শয়তান তোমাদিগকে ভয় দেখায়—(দান-খয়রাতে) ধন কম হইয়া যাওয়ার এবং তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় অবাঞ্ছিত কাজ করার, আর আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করার এবং রহমত দানের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া থাকেন। আল্লার ভাণ্ডার অসীম এবং তিনি সর্বজ্ঞ।" (৩ পাঃ ৫ রুঃ)

হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! বেচা-বিক্রি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে বেহুদা কথা এবং অনাবশ্যক কসমের অবতারণা হইয়া থাকে; অতএব ব্যবসার সঙ্গে দান-খয়রাতকে জড়াইয়া রাখিও। (মেশকাত ২৪৩)

রিজিক কোশাদাহ হওয়ার আমল

১০৬৫। হাদীছ:— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ

رِزْقُهُ اَوْيُنْسَأَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তির আকাংখা থাকে যে, তাহার খাওয়া পরায় স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-সম্পদে প্রশস্ততা লাভ হউক এবং তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার সুনাম বাকি থাকে তাহার কর্তব্য হইবে আত্মীয়দের সহিত সুষ্ঠুরূপে আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলা।

নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা

১০৬৬। হাদীছ:— عن المقدام ان النبى صلى الله عليه وسلم قال

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللهِ

دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .

অর্থ—মেকদাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও জন্য স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য গ্রাস অপেক্ষা উত্তম খাদ্য বস্তু আর কিছু হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর দাউদ (আঃ) নিজ হস্তের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

এখানে ৭৭৩ এবং ৭৭৪ নং হাদীছদ্বয়ও উল্লেখ হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে কোমল ব্যবহার করা উচিত

১০৬৭। হাদীছ:— عن جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى .

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সেই লোকের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত যে ব্যক্তি বিক্রয়, ক্রয় এবং স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করা কালে লোকের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

সক্ষম খাতককে সময় দেওয়া

১০৬৮। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতের এক ব্যক্তির রূহ—আত্মা ফেরেশতাগণ কবজ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিশেষ নেক আমল তুমি করিয়াছ কি ? সে বলিল, আমি আমার ব্যবসা ক্ষেত্রে সক্ষম খাতকদেরকেও সময় ও অবকাশ দিতাম, তাহার ওজর আপত্তি গ্রহণ করিতাম। আর অক্ষম খাতকদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। এতদ শ্রবণে ফেরেশতাগণও তাহার সহিত তাহার দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য না করার ব্যবহার করিলেন।

অক্ষম খাতককে মাফ করিয়া দেওয়া

১০৬৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهٖ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ

لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিল—সে লোকদিগকে বাকী ও ধার দিয়া থাকিত। যদি কোন ব্যক্তিকে দেখিতে যে, তাহার জন্য দেনা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তবে স্বীয় কর্মচারীগণকে আদেশ করিত, এই ব্যক্তিকে মুক্তি ও রেহাই দান কর, এই অছিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে মুক্তি ও রেহাই দিতে পারেন। ফলে সত্যই আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে মুক্তি ও রেহাই দান করিয়াছেন।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সরলতা ও সত্যবাদিতা আবশ্যক
গোপন হিলা বা ধোঁকাবাজী করা চাই না

আদ্দা ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট হইতে ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ বায়নামা সম্পাদন করিয়াছিলেন: এই এই বিবরণের ক্রীতদাসটিকে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদের পুত্র আদ্দার নিকট হইতে ক্রয় করিলেন—মোসলেম ব্যক্তিদ্বয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে—যেখানে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয় দোষ থাকে না, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

● কোন কোন বেপারী ও দালাল ব্যক্তি স্বীয় আস্তাবল (ঘোড়ার ঘর) কে ঐ সমস্ত স্থানের নামে নামকরণ করিয়া রাখিত যে স্থানের ঘোড়া উত্তম ও প্রসিদ্ধ। যেমন কেহ স্বীয় ঘোড়ার ঘরকে 'খোরাসান' বা 'সিজিস্তান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের নামে নামকরণ

করিত ; অতঃপর ঐ সকল আস্তাবল হইতে স্বদেশজাত ঘোড়া সমূহকে বিক্রয় জন্য বাজারে উপস্থিত করিয়া ক্রেতাদিগকে এইরূপে প্রলুব্ধ করিত যে, এই ঘোড়া সবেমাত্র খোরাসান বা সিজিস্থান হইতে আনা হইয়াছে অর্থাৎ এই পশু ঐ প্রসিদ্ধ নামের স্থান হইতে নূতন আমদানী করা হইয়াছে। ক্রেতাগণ এই ঘোড়াকে ঐসব নামের সুপ্রসিদ্ধ দেশ ও স্থানের মনে করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইত ; বস্তুতঃ উহা ঐ দেশ বা ঐ স্থানের নহে, বরং এই নামে নামকৃত বিক্রেতার নিজস্ব আস্তাবল হইতে আনীত দেশী ঘোড়া। এইরূপে ধোকা দিয়া মিথ্যা এড়াইবার ফন্দি করা হইত।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইব্রাহীম নখয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহের নিকট উল্লিখিত উপায় অবলম্বনের মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহাকে অতিশয় জঘন্য ও ঘৃণিত না-জায়েয (হারাম) বলিয়া উক্তি করিলেন।

● ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মানুষের জন্য এরূপ করা জায়েয ও হালাল নহে যে, স্বীয় বিক্রয় বস্তু—পণ্যের মধ্যে দোষ ত্রুটি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সে উহা প্রকাশ না করে।

১০৭০। হাদীছঃ— عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ

صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

(فَعَسٰى اَنْ يَّرْبَحَا رِبْحًا وَ) مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

অর্থ—হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা পূর্ণরূপে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া না লয় (জবান না দিয়া ফেলে) তাবৎ উভয় পক্ষের লওয়া-না-লওয়া ; দেওয়া না-দেওয়ার ক্ষমতা ইচ্ছাধীন থাকে। (কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর এক তরফারূপে জবান ফিরাইয়া লওয়ার ক্ষমতা থাকে না—আদান-প্রদান বাধ্যতামূলক হইয়া যায়। এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে) যদি উভয় পক্ষ সততা অবলম্বন করে এবং স্বীয় বস্তুর দোষ ত্রুটি গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় তবে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত ও মঙ্গল হইবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মিথ্যার আশ্রয় নেয় সেই ক্রয়-বিক্রয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত লাভ দেখিবে, কিন্তু উহাতে বরকত ও মঙ্গলের চিহ্নও থাকিবে না।

আলোচ্য হাদীছের উক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী এই মছআলাহ প্রমাণিত হইবে যে, বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর কোন মূল্য নির্দিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু এখনও ক্রেতা উহা গ্রহণ করে নাই,

এমতাবস্থায় বিক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। তদ্রূপ—ক্রেতা কোন মুল্য নির্দ্ধারণ করিলে বিক্রেতা কর্তৃক উহা গ্রহণের পূর্বে ক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। উভয় পক্ষ হইতে গ্রহণের পরে উহা বাধ্যতামূলক হইয়া যায় এক তরফাভাবে কোন পক্ষ তাহার কথা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না। কিন্তু উভয় পক্ষেব একে অপরের কথা গ্রহণ এক বৈঠকে হইতে হইবে, নতুবা নহে—ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী মছআলাহরূপে বর্ণিত হইতেছে।

আলোচ্য হাদীছের অন্য একটি ব্যাখ্যাও করা হয় যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পরেও যাবৎ তাহারা স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথক হইয়া না যায়—কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার স্থানেই বিদ্যমান থাকে তাবৎ উভয় পক্ষের ঐ ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করার ক্ষমতা থাকে।

উল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও ঐ স্থানে থাকা পর্য্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করার ক্ষমতা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এক পক্ষ উহা ত্যাগ করিলে অপর পক্ষ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে উক্ত ক্ষমতা বাধ্যতামূলক নহে বরং সৌজন্যমূলক। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পর উভয় পক্ষ ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, নতুবা মানুষের মুখের বাক্যের কোন মূল্যই থাকে না। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া এখনও বিলম্ব হয় নাই, বরং এখনও উভয় পক্ষ ঐ স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এক পক্ষ ঐ ক্রয়-বিক্রয় হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে অপর পক্ষকে উহা মানিয়া লওয়া উচিত; মানুষের মধ্যে পরস্পর এতটুকু সৌজন্য ভাব বিদ্যমান না থাকিলে 'মানুষ' নামের অবমাননা হইবে।

মছআলাহ ঃ—বিক্রেতা তাহার বস্তুর মূল্য ১০ টাকা বলিয়াছে ক্রেতা আট টাকা বলিয়াছে, বিক্রেতা তাহাতে স্বীকৃতি দেয় নাই, অতঃপর ক্রেতা কথাবার্তার স্থান ত্যাগ করার পর বিক্রেতা ঐ বস্তু আট টাকা মূল্যে প্রদান করিতে রাজি হইয়া তাহাকে ডাকে; এমতাবস্থায় ক্রেতা ঐ বস্তু তাহার স্বীকৃত আট টাকা মূল্যেও গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না। এক পক্ষ কোন মূল্য বলিলে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ মূল্য গ্রহণ করার সুযোগ অপর পক্ষের জন্য শুধুমাত্র ঐ সময় পর্য্যন্ত থাকে যাবৎ উভয় পক্ষ কথাবার্তার স্থানে ও অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ইজাব ও কবুলের পূর্বে কোন পক্ষে ঐ স্থান বা অবস্থা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার (ক্রয়-বিক্রয়ের) সমস্ত কথাবার্তা ও স্বীকৃতি ভঙ্গ হইয়া যায়।

বর্তমানে শহর, বন্দর, হাট-বাজারের দোকানদারগণ এই মছআলাহ জানে না বলিয়া উক্ত অবস্থায় ক্রেতা স্বীয় স্বীকৃত মূল্যে ক্রয় করা প্রত্যাখান করিলে তাহার প্রতি অসৌজন্য বরং জঘন্য ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা নিতান্তই শরীয়তের বরখেলাফ মস্ত বড় অন্যায় ও গোনাহ।

ভাল-মন্দে মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি করা

মছআলাহ্ঃ—কাহাকেও ধোঁকা দিয়া নয়, বরং প্রকাশ্যে ভাল-মন্দ মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি করা জায়েয আছে।

১০৭১। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বাইতুল-মাল হইতে) আমাদিগকে ভাতা দেওয়া হইত মিশ্রিত খোরমা। আমরা উহার দুই ধামা (ভাল খোরমা) এক ধামার বিনিময়ে বিক্রি করিতাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এক জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে (পরিমাণে বেশকম করা—) এক ধামার বিনিময়ে দুই ধামা প্রদান করা বা এক দেহরামের বিনিময়ে দুই দেহরাম প্রদান করা জায়েয নহে।

ব্যাখ্যাঃ—একই জাতীয় বস্তু ভাল-মন্দের পার্থক্য হইলেও পরস্পর বিনিময়ে পরিমাণের বেশকম করিলে তাহা সুদ ও হারাম গণ্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সমতা রক্ষা করার উদারতা কার্য্যকরী করা না যায় তবে সরাসরি উক্ত বস্তুদ্বয়ের বিনিময় করিবে না, বরং একটাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করিয়া সেই নগদ মূল্য দ্বারা অপরটা ক্রয় করিবে—এই-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন খরিদ-বিক্রয়ের অনুষ্ঠান করিবে। সম্মুখে এই মছআলার বিবরণ আসিতেছে।

সুদ নিষিদ্ধ, বর্জনীয় ও হারাম*

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً - وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -

---

* সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালার অকাট্য বাণী কোরআন শরীফে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত প্রতিনিধি বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত—হাদীছ শরীফে সুদ প্রথাকে স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করতঃ যে সব কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং সুদের পরিণামে যে সব কুফল ও কঠিন শাস্তির বর্ণনা দান করা হইয়াছে, এতদব্যতীত মোসলমান জনসাধারণের অন্তরে সুদের যে ঘৃণ্য রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে সুদের যে বাস্তব রূপ পরিস্ফুটিত ও প্রকটিত হয় মানবীয় জ্ঞানের যুক্তি ও মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজ্ঞানে রচিত শত শত কারণ ও হেতু বর্ণনা করিয়া সুদের সেই বাস্তব রূপের কিয়দংশও প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থ—হে ঈমানদারগণ। তোমরা সুদ গ্রহণ করিও না (সুদ কত জঘন্য প্রথা যে, সময়ের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে) উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া কত কত গুণ বাড়িয়া যায়। (এমনকি ঋণ গ্রহীতাকে সর্বহারা পর্য্যন্ত করিয়া দেয়।) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর; ইহাতেই তোমাদের উন্নতি ও সাফল্য নিহিত রহিয়াছে এবং দোযখকে ভয় কর, উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর; বস্তুতঃ দোযখ আল্লাহ-বিরোধী কাফেরদের জন্য তৈরী হইয়া রহিয়াছে। (তোমরা আল্লার বিরোধীতা এড়াইয়া জীবন যাপন করিলেই দোযখ হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবে।) এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আনুগত্য অবলম্বন কর, ইহাতে তোমাদের প্রতি আল্লার করুণা ও দয়া হইবে। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

শরীয়তে হারাম ঘোষিত বিষয়-বস্তু সমূহের প্রতি নজর করিলে এই বাস্তব তথ্যটির আরও বহু নজীর পাওয়া যাইবে। যেমন যেনা বা ব্যভিচার, ইহা যে স্তরের ঘৃণ্য এবং ইহ-পরকালে যেরূপ কঠোর শাস্তির কারণ এবং সর্বসাধারণের অন্তরে ইহার যে ঘৃণ্যরূপ বিদ্যমান, সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে যেনার যে বাস্তব রূপ রহিয়াছে, শুধু যুক্তির দ্বারা যেনার সেই বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত হইতে পারে না।

লক্ষ্য করুন। কেবলমাত্র মৌখিক কয়েকটি স্বীকৃতিমূলক বাক্য উচ্চারণ ও কতিপয় সামাজিক রছম-রেওয়াজ পুরণ করা ব্যতীত বিবাহিতা নারী ও অবিবাহিতা নারীর মধ্যে শুধু যুক্তির দ্বারা কি পার্থক্য উদঘাটন করা যায় যদ্বারা স্ত্রীসহবাস হইতে যেনার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া যেনার জঘণ্যতা ও ঘৃণ্য কদর্য্যতার বাস্তবরূপের এক শতাংশও প্রকাশ পায়?

বলা বাহুল্য—লাগামহীন পৈশাচিক যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত রূপও ধারণ করিয়া বসে। যেমন জনৈক পাপিষ্ঠ নরপিশাচ নগ্ন যুক্তিবাদী নিজ মাতার সহিত ব্যভিচার করিত এবং ইহার সমর্থনে এই যুক্তির অবতারণা করিত যে, যে দ্বার ও পথ বহিয়া আমার সম্পূর্ণ শরীর বাহির হইয়াছে, সেই দ্বার ও পথে আমার শরীরের একটি অংশ মাত্র পুনঃ প্রবেশ করিবে ইহা দোষনীয় কেন?

অন্য এক হতভাগা যুক্তিবাদী নরপশু স্বীয় যুবতী মেয়ের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইত এবং এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিত যে, আমি নিজ পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বহনের দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করিয়াছি, উহাতে ফল ধরিয়াছে এবং উহা পাকিয়াছে এখন উহাকে উপভোগ করার অধিকারী আমি ভিন্ন অন্য কেহ কেন হইবে?

মানবতা ও সৃষ্টিকর্তার শাসনতন্ত্র তথা শরীয়তের নির্দেশ ইত্যাদি কোন কিছুর ধার না ধারিয়া শুধু যুক্তি তর্কের এহেন তীক্ষ্ণ হাতিয়ার কি আছে, যদ্বারা উপরোক্ত নগ্ন যুক্তিবাদীদের ঘৃণ্য যুক্তি খণ্ডন পূর্বক তাহাদের কুকার্য্যের বাস্তব স্বরূপ উদঘাটন করা যায়?

অতএব যে কোন বিষয় বর্জনীয় বা গ্রহণীয় এবং ঘৃণ্য বা উত্তম হওয়ার উপলব্ধি করা উপলক্ষে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা ও মানবের জীবন যাত্রার নীতি নির্দ্ধারণের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের তথা শরীয়তে নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ও সর্বাধিক নিরাপদ পন্থা। বস্তুতঃ মানব রচিত জাগতিক শাসনতন্ত্রকেও অনুরূপ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক ঘোষিত শাসনতন্ত্রকে ততটুকু মর্য্যাদা দানে কুণ্ঠিত হওয়া বড়ই অনুতাপের বিষয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—........ الذين يأكلون الربو পূর্ণ আয়াত ও উহার অর্থ আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লিখিত প্রথম আয়াতের বিবরণে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের লেন-দেন ও সংশ্রব যাহা কিছু বাকি আছে সব পরিত্যাগ কর যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। তোমরা এই আদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া রাখ। (৩ পা: ৬ রু:)

ঐরূপেই বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, শৃগাল, কুকুর, শূকর ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়া এতদ্ভিন্ন পশু-পক্ষীর গলগণ্ডের চারটি রগ আল্লার নামে কাটিলে তাহা হালাল হওয়া এবং অন্য উপায়ে বধকৃত হারাম হওয়া ইত্যাদি বহু নজীরই বিদ্যমান আছে। এই বক্তব্যের তাৎপর্য ইহা নহে যে, হারাম বস্তু ও বিষয় সমূহের বর্জনীয় হওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ও হেতু থাকে না। অবশ্যই কারণ ও হেতু থাকে বটে, কিন্তু শুধু যুক্তি বা বিজ্ঞান রচিত কারণ ও হেতুর উপর নির্ভর করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম বস্তুর বাস্তব রূপ আংশিক রূপেও উদ্ভাসিত না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। যেরূপ দশ মণ ওজনের কোনও বস্তুকে এক তোলা পরিমিত পাথর দ্বারা পরিমাপ করিলে উহার ওজনের বাস্তব পরিমাণ কখনই প্রকাশ পাইবে না। সুতরাং হারাম বিষয়-বস্তু সমূহের বর্জনীয়তা ও ঘৃণাস্পদতাকে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নীতি ও নিষেধাজ্ঞার মাপ-কাঠিতে পরিমাপ করিবে শুধু যুক্তির মাপকাঠিতে নহে। এবং অমোসলেমদের মোকাবিলায় আমরা সর্বপ্রথমে ধর্মের সত্যতার চ্যালেঞ্জের পথ গ্রহণ করিব।

অবশ্য যুক্তি সঙ্গত কোনও কারণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে উহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কারণের উপর হারাম বিষয় বস্তুর বর্জনীয়তা ও ঘৃণাস্পদতা নির্ভর করিবে না। এবং সেই কারণের তুলনায় উহার পরিমাপও করা হইবে না। যেরূপ—সুদ হারাম হওয়ার বিষয় বলা হইয়া থাকে যে, একদিকে এক গরীব অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কোন এক ধনাঢ্যের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার আনে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন সামান্য জায়গা জমি, ঘর বাড়ীটুকু পর্যন্ত বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে। অপরদিকে ঐ দুরাচার স্বীয় আসল টাকার উপর সুদের হিসাব যোগ করিতে থাকে। এমনকি অবশেষে দেনার দায়ে গরীবের সর্বস্ব গ্রাস করিয়া নেয়। এহেন মানবতা বিরোধী নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় নৃশংস ও ধ্বদর্য্য কার্য্য কি হইতে পারে? ইসলামের ন্যায় শাসত সনাতন ধর্মে এরূপ কার্য্যের অনুমতি থাকিতে পারে না। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থাৎ যদি তোমরা ঐ আদেশ অনুসরণ না কর তবে প্রমাণিত হইবে যে, তোমরা আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী দলভুক্ত হইয়াছ; ইহার ভয়াবহ পরিণতি কি হইবে তাহা তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰو وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ـ

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্দ্ধিত করেন। আল্লাহ তায়ালা কোন বিদ্রোহী পাপীকে পছন্দ করিবেন না। (৩পা: ৬রু:)

ব্যাখ্যা ঃ—সুদকে ধ্বংস করার পরলৌকিক পর্য্যায় ত অতিশয় সুস্পষ্ট। তদুপরি সুদে অর্জিত মালের দ্বারা অনুষ্ঠিত নেক কার্য্যের উপর কোনও ছওয়াব ও ফলাফল প্রতিফলিত হইবে না এবং আখেরাতে সুদখোর ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজগৎ যেহেতু পরীক্ষার স্থল—নেকী বদী উভয়ের সুযোগ প্রাপ্তির স্থান; তাই কোন কোন সময় উক্ত আয়াতের তথ্যের বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণত: তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। প্রায়শ: এইরূপ দেখা যায়, মোসলমান সুদের দ্বারা উন্নতি লাভ করিলেও অচিরেই তাহার ধ্বংস সাধিত হয়।

সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই ধরণের যুক্তি ও কারণ উল্লেখ করা হইলে তাহা উপেক্ষা করা হইবে না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা শয়তানের ধোকায় পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক। প্রথম এই যে, মানবীয় জ্ঞান ও মানব মস্তিষ্কের চিন্তার চাষ দ্বারা সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কারণ রচিত হয় বা হইতে পারে, সুদ হারাম হওয়ার সমুদয় বাস্তবিক কারণ ও হেতু উহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এরূপ ধারণা কখনও অন্তরে স্থান দিবে না। শয়তান এরূপ ধারণায় পতিত করার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার ফাঁদে কখনও পড়িবে না। বরং দৃঢ়ভাবে এই কথা মনে গাঁথিয়া রাখিবে যে, ঐ সব যুক্তির কারণ ও হেতু ব্যতীত আরও কারণ আছে, যাহা আলেমুল-গায়েব সর্বজ্ঞ, আলীম ও হাকীম—সর্বজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতেই জ্ঞাত ছিলেন যদ্দরুন তিনি স্বীয় বাণী ও প্রতিনিধির মারফৎ ভয়ঙ্কর উক্তি ও কঠোর ভাষায় সুদকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

এই বিষয়টি কোন বেখাপ্পা কথা নহে বরং বাস্তব সত্য। কারণ মানবের জ্ঞান-বিন্দু অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, "শুধু বিন্দুবৎ জ্ঞানই তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে।" অতএব, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে যে সব রহস্য, কারণ ও হেতু রহিয়াছে, আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান-বিন্দুতে সে সবের সঙ্কুলান হইতে পারে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা এই যে, কোরআন-হাদীছে সুদ হারাম বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর উহা শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

দান-খয়রাতকে বৰ্দ্ধিত করার পরলৌকিক পর্য্যায়ের তথা ছওয়াব বৰ্দ্ধিত করার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অনেক অনেক আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, যথা—পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে আছে, একটি ধান বা গমের বীজ হইতে এক গুচ্ছ ধান বা গম গাছ জন্মে যাহার মধ্যে কতকগুলি ছড়া হয়, এক এক ছড়ায় শত শত ধান বা গম হয় এইরূপে এক একটি বস্তু দান-খয়রাত করাতে বহু বহু ছওয়াব লাভ হইবে। একাধিক হাদীছে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক একটি খোরমা দান করায় আখেরাতে পাহাড় তুল্য ছওয়াব লাভ হইবে।

একটি আইনরূপে গণ্য রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কোন যুক্তি বা বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ আইনকে বিকৃত বা খণ্ডন করার অধিকার কাহারও নাই। ইহা একটি ন্যায় সঙ্গত যুক্তিযুক্ত অনস্বীকার্য্য শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—হয়ত রেলওয়ে কোম্পানী আইন করিয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেক যাত্রী পঁচিশ সের ওজনের আসবাবপত্র নিজ সঙ্গে বিনা ভাড়ায় বহন করিতে পারিবে। কোন কাবুলি ব্যক্তি যদি এক-দেড় মণ ওজনের আসবাবপত্র সঙ্গে বহন করত: টিকেট মাষ্টারের সঙ্গে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করে যে, পঁচিশ সেরের আইন বাঙ্গালী লোকদের জন্য করা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল—সাধারণত: পঁচিশ সেরের অধিক তাহারা নিজে বহন করিতে সক্ষম হয় না; তাই রেলওয়ের আইনে এই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আমরা কাবুলী অতি শক্তিশালী—আমরা সাধারণত: নিজে এক দেড় মণ বহন করিতে সক্ষম; তাই আমাদের জন্য অধিক সুযোগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এমতাবস্থায় কাবুলি ব্যক্তির এইরূপ যুক্তির দ্বারা কি কোম্পানীর আইন বদলিয়া যাইবে? তাহা কখনও সম্ভব নহে।

সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে বর্তমান যুগের ব্যাংকিং (Banking) ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

যদিও ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা; কিন্তু অমোসলেম জাতি কর্তৃক উহা প্রণীত হওয়ায় উহা সুদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যাংকিং ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু যাহারা এরূপ বলিতে চায় যে, সুদ ব্যবস্থা ব্যতীত ব্যাঙ্ক চলিতে পারে না—তথা ইসলামী আইন ও বিধানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার কোনও সুনির্দিষ্ট পন্থা নাই; আমরা কঠোর ভাষায় তাহাদের এই ভুল ধারণার বিরোধীতা করিব এবং এই ধারণাকে ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা প্রসূত আখ্যায়িত করিব।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামে এমন এমন ব্যবস্থাও রহিয়াছে যে ব্যবস্থায় ও পন্থায় উন্নত ধরণের এবং অধিক কল্যাণমূলক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত করা যায়। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করা হইয়াছে। আনন্দের বিষয়—আমরা তথায় যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি উহার বিস্তারিত বিবরণ একটি পুস্তিকা আকারে দেখিতে পাইলাম। মিশরীয় এরাবিক ব্যাঙ্কের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী "আলীউল-আউজী" কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ঐ পুস্তিকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মূল প্রবন্ধটি মিশরীয় আরবী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ) কর্তৃক অনূদিত হইয়া বিগত ২৪।৪।৬০ বাংলা তারিখের "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে ত বাংলাদেশে ও আরবদেশ সমূহে এবং পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাঙ্কই উন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহজগতেও দান-খয়রাতের দ্বারা বরকত, মঙ্গল ও ধনে-জনে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। অনেক সময় সেইরূপ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু দান-খয়রাতের দ্বারা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের অনেক বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়।

সুদখোরের শাস্তি সম্পর্কে ৭২১ নং হাদীছের অংশবিশেষ লক্ষণীয়।

সুদ দাতা ও গ্রহীতা এবং সুদের সাক্ষী ও লিখক প্রত্যেকেই গোণাহের ভাগী

১০৭২। **হাদীছ:—** عن عون بن ابى جحيفة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَأَيْتُ اَبِى اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ

وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبٰو وَمُوْكِلَهٗ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔

অর্থ—আবু জোহায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া আনিলেন। ক্রীতদাসটির রক্তমোক্ষণ (সিঙ্গা লাগান) কার্য্যে দক্ষতা ছিল, (তাহার নিকট সেই কার্য্যের যন্ত্রপাতিও ছিল। আমার পিতা সেই সব যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।) আমি আমার পিতাকে ঐসব ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারের অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করিয়াছেন—(১) রক্তমোক্ষণ কার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করা। (২) কুকুর বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা। ক্রীতদাসীকে ব্যাভিচারে লিপ্ত করিয়া অর্থ উপার্জন করা। এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন—(১) যে ব্যক্তি মানুষের শরীরে সুচী বিদ্ধ করিয়া চিত্র অঙ্কনের কার্য্য ও ব্যবসা করে। (২) যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরে ঐ চিত্র-অঙ্কন গ্রহণ করে। (৩) যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে। (৪) যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে। এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছবি প্রস্তুতকারীর প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:—রক্তমোক্ষণ কার্য্য তথা সিঙ্গা লাগান একটি অতিশয় নিম্নস্তরের এবং ঘৃণিত কার্য্য। অন্য ব্যক্তির শরীরের বদ-রক্ত মুখে টানিয়া বাহির করা—যাহা চোখে দেখিলেও অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। মোসলমান পাক পবিত্র ও সম্মানিত জাতি, তাহাদের জন্য এরূপ ব্যবসা অবলম্বন করা উচিৎ নহে।

কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে আরও একটি বিশেষ মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান যুগেও অনেককে এরূপ করিতে দেখা যায় যে, হাতের উপর বা শরীরের নানা স্থানে এক প্রকার সূঁচযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে চামড়া চিরিয়া স্বীয় নাম বা অন্য কিছু অঙ্কন করে বা জীব-জন্তু, লতা-পাতার ছবি আঁকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ শরীরে ইহা গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি এই কার্য্য ও ব্যবসা করিয়া থাকে, উভয়ের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

সুদের ব্যাপারে এই হাদীছে দাতা ও গ্রহীতার প্রতি লা'নত ও অভিশাপ উল্লেখ হইয়াছে, মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং সুদের দলিল লিখক ইত্যাদি সকলের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া

১০৭৩। **হাদীছঃ**—আবদুল্লা ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার বিক্রয়-বস্তু বাজারে উপস্থিত করিল; অন্য এক মোসলমান ব্যক্তি উহা ক্রয় করার জন্য আসিল; তখন বিক্রেতা তাহাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খাইয়া বলিল, আমার এই বস্তুটির এত মুল্য বলা হইয়াছে—অথচ উহার ঐ মুল্য বলা হয় নাই। তখন ঐরূপ মিথ্যা কসম খাওয়ার বিষময় ফল বর্ণিত হইয়া এই আয়াতটি নাযেল হয়—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ...... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থ—যাহারা (মিছামিছি) আল্লার নিকট ঠেকা থাকিবে বলিয়া এবং আল্লার নামের কসম খাইয়া দুনিয়ার সামান্য ধন অর্জন করিবে, আখেরাতে তাহাদের ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না এবং আল্লার রহমতের বাণী, রহমতের দৃষ্টি তাহারা পাইবে না এবং আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না) এবং তাহাদের জন্য ভীষণ যাতনাদায়ক আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

১০৭৪। **হাদীছঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْحَلْفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ

مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মিথ্যা কসম বিক্রয়-বস্তুকে চালু করিয়া দেয় বটে, কিন্তু (ধন-দৌলত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের) বরকত ও উন্নতি মুছিয়া ফেলে।

মছআলাহ :—ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া মস্ত বড় গোনাহ ত আছেই, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সত্য কসম খাওয়াও মকরূহ। (ফতহুল বারী)

দোষী বস্তু ক্রয় করিয়া ক্রেতা যদি উহা রাখায় সম্মত হয় তবে রাখিতে পারে

১০৭৫। হাদীছ :—আম্‌র ইবনে দীনার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের এখানে এক ব্যক্তি ছিল "নাওয়াছ" নামের। তাহার একটি উট ছিল সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত (যে রোগকে সংক্রামক ও ছোঁয়াচে গণ্য করা হয়)। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ উটটি উক্ত ব্যক্তির অংশীদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি অংশীদারের নিকট আসিল এবং সেই উটটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অংশীদার বলিল, উহা বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছি; সে জিজ্ঞাসা করিল, কাহার নিকট বিক্রি করিয়াছ? অংশীদার ক্রেতা ব্যক্তির আকৃতি বর্ণনা করিলে সে বলিল, তোমার সর্বনাশ! তিনি ত ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার অংশীদার সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত একটি উট আপনার নিকট বিক্রি করিয়াছে; সে আপনাকে চিনিতে পারে নাই। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তা হইলে উটটি তুমি ফেরত নিয়া যাও! ঐ ব্যক্তি যখন উটটি ফেরত লইয়া রওয়ানা হইল তখন তিনি বলিলেন, উটটি থাকিতে দাও। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিলাম। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যধি ছোঁয়াচে ও সংক্রামক নাই।

রক্তমোক্ষণ ব্যবসা করা

১০৭৬। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু-তায়বাহ্ (নামক এক গোলাম পেশাদারী রক্তমোক্ষণকার) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রক্তমোক্ষণ করিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে এক ধামা খোরমা দেওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার মালিককে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার উপর উপার্জনের বোঝা কিছু কম করিতে।

১০৭৭। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং রক্তমোক্ষণকারকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়াছেন। যদি সেই কাজের পারিশ্রমিক হারাম হইত তবে হযরত (দঃ) উহা দিতেন না।

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

১০৭৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে দেখিয়াছি, যাহারা বাজার-বন্দর হইতে অগ্রসর হইয়া এবং বাহিরে যাইয়া আমদানীকারকদের নিকট হইতে লট বা সমষ্টি হিসাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিত নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি লোক পাঠাইয়া দিতেন—যাহারা

তাহাদিগকে বাধা দান করিত, তাহারা যেন তাহাদের ক্রয়-বস্তু ক্রয়-স্থল হইতে বহন করতঃ বাজার-বন্দরে ঐ বস্তুর বিক্রয়কেন্দ্রে তাহাদের প্রকাশ্য দোকানে উপস্থিত না করিয়া ক্রয়স্থলেই বিক্রয় না করে। এমনকি এই বাধা-নিষেধের ব্যতিক্রম করিলে তাহাদের প্রতি বেত্রদণ্ডের শাস্তিও প্রয়োগ করা হইত। (হাদীছটি ২৮৬ পৃষ্ঠায় এবং ২৮৭ পৃষ্ঠায় দুইবার উল্লেখিত হইয়াছে, সমষ্টির অনুবাদ হইল)।

ব্যাখ্যাঃ—দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা মানুষের কষ্ট হউক, ইহা প্রতিরোধের প্রতি শরীয়তে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের কষ্টের এই যাঁতাকল সাধারণতঃ দুইটি কারণে অতি সহজে সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক হইল—পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্যদ্রব্য গোপন ও গুদামজাত করতঃ বাজার-বন্দরের সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে ও প্রকাশ্য দোকানে পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার দ্বারা। আর এক হইল—সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে সাধারণ দোকানদার ও সাধারণ বিক্রেতাদের নিকট পণ্য দ্রব্য পৌছিবার পূর্বেই পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্যের সমষ্ঠি হস্তগত করার দ্বারা। কারণ, এই পন্থায় জনসাধারণের নিকট পণ্যদ্রব্য পৌছিতে অধিক হাত বদল হয়, ফলে অনিবার্য্যই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উভয় পথে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। একে ত ক্রয়-স্থলে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রয়স্থলে বিক্রয় না করিয়া তথা হইতে বহন করিতে হইলেই বিরাট ঝামেলা আসিয়া যায়; পুঁজিপতিগণ উহাকে ভয় করে। তাহারা ত চায় শুধু টাকার জোরে হাত বদলের মাধ্যমে সিংহ ভাগ লাভ লুটিয়া নিয়া আসা। টাকার জোরে শুধু মাত্র হাত-বদলের মাধ্যমে লাভ করার সুত্র বন্ধ করার জন্য সরাসরিভাবে হাদীছে নিশেধ করা হইয়াছে—পণ্যদ্রব্য সাধারণ বাজারে পৌছিবার পূর্বে অগ্রগামী হইয়া কেহ ক্রয় করিবে না। বিস্তারিত বিবরণ ১০৯৩ ও ১০৯৪ নং হাদীছের বর্ণনায় আসিতেছে।

আর এক হইল—ক্রয়কৃত পণ্য সাধারণ বাজারে প্রকাশ্যে দোকানে উপস্থিত করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই আর গুদামজাত ও পণ্যদ্রব্যের গোপন ভাণ্ডার সৃষ্টির সুযোগ থাকিবে না যদ্দারা কৃত্রিম অভাবের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ—এই গুদামজাত করার এবং গোপন ভাণ্ডারে পণ্য জমা রাখার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হাদীছে অনেক কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। যথা—

১। পণ্যদ্রব্য গুদামজাত যে-ই করিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

২। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করিয়া মোসলমানদিগকে কষ্টে ফেলিবে, পরিণামে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্রে পতিত করিবেন।

৩। যে ব্যক্তি পণ্য আমদানী করিয়া লোকদের অভাব মিটায় সে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে, আর যে পণ্য গুদামজাত করে তাহার প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হইবে।

৪। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করিয়া রাখিবে তাহার সম্পর্ক আল্লাহ হইতে এবং আল্লার সম্পর্ক তাহার হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

৫। যে ব্যক্তি পণ্য গুদামজাত করিবে এই উদ্দেশ্যে যে, জনসাধারণ মোসলমানকে এই সুত্রে মুল্য বৃদ্ধির ফাঁদে ফেলিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। (ফতহুল বারী ৪—২৭৭)

প্রকাশ থাকে যে, মুল্য বৃদ্ধির ফাঁদরূপে পণ্য গুদামজাত করণ হারাম এবং উহা সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ সমূহে কঠোর বাণী রহিয়াছে। যেমন—উল্লিখিত ২ ও ৫ নং হাদীছে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক ব্যবসারূপে পণ্য গুদামজাত করিলে এবং অভাব দেখা দিলে সাধারণ লাভে বাজারে পণ্য ছাড়িয়া দিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই।

ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ

মছআলাহ ঃ—ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের মধ্যে এবং পরেও এক পক্ষ অপর পক্ষের অনুমতিক্রমে স্বীয় চুক্তি তথা ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিতে পারে। যথা—এরূপ বলিতে পারে যে, তিন দিন পর্য্যন্ত ক্রয় বা বিক্রয় ভঙ্গ করার অধিকার আমার থাকিবে। এই ক্ষেত্রে অধিকার সংরক্ষণকারী পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই ক্রয় বা বিক্রয় নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে। ইহাকে পরিভাষায় খেয়ারে-শর্ত বলা হয়।

১০৭৯। হাদীছ ঃ—

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِىْ بَيْعِهِمَا

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْيَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا........

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যাবৎ ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে সাব্যস্ত না করে তাবৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন না করার অধিকার উভয় পক্ষেরই থাকে। (কিন্তু উভয় পক্ষ কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ফেলার পর উভয়ের আদান-প্রদান বাধ্যতামূলক হইয়া যায়।) অবশ্য চুক্তি নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণের সহিত ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে—(সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও বাধ্যতামূলক হয় না; ক্ষমতা সংরক্ষণকারী চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে।)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করিতে উহা তাঁহার মনঃপুত হইলে যথা-সত্তর বিক্রেতার সহিত কথা সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্ত করিয়া চলিয়া আসিতেন। (২৮৩ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছটির অন্য আর এক ব্যাখ্যাও করা হয়, বিস্তারিত বিবরণ ১০৭০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

"খেয়ারে-শর্ত" বা চুক্তি নাকচের ক্ষমতা সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক মছআলাই ফেকা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) এখানে দুইটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন—

● চুক্তি ভঙ্গের ক্ষমতা সংরক্ষণ কত দিন মেয়াদের হইতে পারে?

এই ব্যাপারে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু প্রচলন ও ফৎওয়া ইহাই যে, উভয়ের মধ্যে যতদিনের মেয়াদ নির্দ্ধারিত হইবে ততদিন সেই ক্ষমতা থাকিবে। অবশ্য সর্বদার জন্য ঐরূপ রাখিলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিই অশুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী, ৩—৩৫)

● যদি নির্দ্ধারিত কোন মেয়াদের উল্লেখ না করিয়া চুক্তিভঙ্গের ক্ষমতা রাখে তবে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে কি?

উত্তর :—ঐ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত বলিয়া পরিগণিত হইবে না, (ফলে যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যাতিরেকেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় নাকচ করিয়া দিতে পারে।) অবশ্য যাহার পক্ষে ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল সে যদি উক্ত ক্ষমতা পরিত্যাগ করে কিম্বা সে ক্রয় বস্তুর ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে যাহা ক্রয়-চুক্তি গ্রহণ করা বুঝায় বা চুক্তি ভঙ্গের পূর্বে সে মরিয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে। (আলমগীরী, ৩–৫৩)

ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই কোন পক্ষ তাঁহার কথা হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে সেই অধিকার তাহার থাকিবে

উল্লেখিত ১০৭৯ নং হাদীছের এক অর্থ এই মছআলাহ বর্ণনায়ই করা হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট কতিপয় তাবেয়ী ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) উক্ত অধিকারকে বাধ্যতামূলক বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষের অসম্মতি ক্ষেত্রেও উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। অবশ্য বিক্রয় সম্পাদনের পর যদি এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, "সম্মতি দিন" অপর পক্ষ বলিল, "সম্মতি দিলাম" ইহার পর আর ঐ অধিকার থাকে না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মুল আলোচ্য অধিকারকে সৌজন্যমুলক বলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের দেশে এই ব্যাপারে বিশেষতঃ ক্রেতা ফিরিয়া গেলে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়া থাকে; ইহা অতি জঘন্য।

যে জিনিষ এখনও হস্তগত হয় নাই উহা বিক্রি করা নিষেধ

১০৮০। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهٗ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন খাদ্যবস্তু স্বীয় হস্তাধীনে ও আয়ত্তে আনিবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১০৮১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেহ কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করিলে বিক্রেতার নিকট হইতে উহা উসুল করিয়া লওয়ার পূর্বে বিক্রি করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ। মছআলাটি এই—এমন কোন বস্তু যাহা এখনও তোমার হস্তাধীন ও নিজ আয়ত্তে আসে নাই উহার বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। এমনকি তুমি এক মণ চাউল বা একটি গাভী বা এক খান কাপড় ক্রয় করিয়াছ এবং উহার মূল্যও পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু বিক্রেতা এখনও উহা তোমাকে অর্পণ করে নাই এবং তুমি এখনও উহা গ্রহণ কর নাই; এমতাবস্থায় তোমার জন্য উহা বিক্রয় করা দুরুস্ত হইবে না।

মূল হাদীছের মধ্যে খাদ্য বস্তুর উল্লেখ থাকিলেও উক্ত মছআলাটি খাদ্যবস্তু এবং অন্য সকল প্রকার বস্তুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

কোন বস্তু ক্রয় করিলে উহা উসুল করা ও হস্তগত করার যে সঙ্কীর্ণ অর্থ সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, উহা স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ করা—এক্ষেত্রে উহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষেত্রে হস্তগত ও উসুল করার অতি প্রশস্ত অর্থ উদ্দেশ্য; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকা শাস্ত্রে রহিয়াছে। বিশেষতঃ প্রত্যেক জিনিষের—যেমন, বাড়ী-ঘর আর গরু ঘোড়া ইত্যাদি হস্তগত করার আকার বিভিন্ন। নিম্নে কতিপয় মছআলার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল যদ্দ্বারা হস্তগত করার অর্থের প্রশস্ততা অনুমিত হয়; যথা—

● কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা উক্ত বস্তুকে ক্রেতার হস্তগত করার জন্য মুক্ত করিয়া ও বলিয়া দিলেই সর্বসম্মতরূপে উহা হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। এমনকি যদি এমতাবস্থায় ঐ পণ্যবস্তু বিক্রেতার ঘরেই থাকে তবুও উহা হস্তগতই গণ্য হইবে (আলমগীরী, ৩—২২)। ● একটি পাখী বিক্রেতার দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত গৃহে উড়ন্ত অবস্থায় রহিয়াছে কিন্তু ঘর আবদ্ধ; দরওয়াজা না খুলিলে উহা বাহির হইতে পারে না; এমতাবস্থায় ক্রেতাকে উহা ধরিয়া নেওয়ার অনুমতি দিয়া দিলেও সে ক্ষেত্রে উহা

হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ঘরের দরওয়াজা বাতাসে খুলিয়া যাওয়ায় পাখী বাহির হইয়া গেলে ক্রেতার মূল্য দিতে হইবে না। ক্রেতা কর্তৃক দরওয়াজা খোলার কারণে পাখী বাহির হইলে তাহাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে (আলমগীরী, ৩—২৪)। নির্দ্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতা বস্তা বা পাত্র দিয়াছে, বিক্রেতা সেই বস্তায় বা পাত্রে উক্ত পণ্য রাখিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে। এমনকি ক্রেতার অসাক্ষাতে রাখিলে সে ক্ষেত্রেও হস্তগত করা গণ্য হইবে (ঐ ২৫ পৃঃ)। গুদামে রক্ষিত পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার হস্তে গুদামের চাবি অর্পণ পূর্বক পণ্য নেওয়ার অনুমতি দিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা গণ্য হইবে, এমনকি এখনও উহা মাপিয়া ওজন না করিরা থাকিলেও ঐ ক্ষেত্রে শুধু চাবি গ্রহণ করাই হস্তগত করা গণ্য হইবে। (ঐ ২২ পৃঃ) ● মাঠে চরা অবস্থায় একটি গরু বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতাকে গরু দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ আপনার গরু, নিয়া যান; ইহাতেই হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে (শামী ৪—৫৮)। অবশ্য উহা নিকটে না থাকায় উহা পর্যন্ত পৌছিতে সম্ভব হওয়ার পূর্বেই যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায় তবে ক্রেতার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে না (আলমগীরী, ৩—২৫)।

একজনের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন অন্য জনের কথা বলা নিষিদ্ধ

১০৮২। হাদীছ:— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন অন্য কেহ কথা চালাইবে না—ঐরূপ করা জায়েয নয়।

১০৮৩। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِىْ اِنَائِهَا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—(১) গ্রাম্য ব্যক্তিগণ খাদ্যবস্তু তরিতরকারী ইত্যাদি শহরে বিক্রয় করার জন্য নিয়া আসিলে শহরস্থিত দোকানদারগণ

বাজার দর উচু রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের হস্তে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিদের চিজ-বস্তু বিক্রয় করিতে চায়, ইহা নিষিদ্ধ। (২) প্রকৃত ক্রেতাদেরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য অধিক বলা (যেন প্রকৃত ক্রেতা এই ভাবিয়া যে, বিক্রেতা যখন এই পরিমাণ মূল্যে সম্মত হয় না তখন আমি আরও কিছু বেশী মূল্য বলি—এইরূপে প্রতারিত হইয়া ক্রেতা অধিক মূল্য বলিয়া বসে এবং বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া যায়; এরূপ অসদুপায় অবলম্বন করা) নিষিদ্ধ। (বর্তমানে শহরে-বন্দরে অসাধু দোকানদারগণ এই উদ্দেশ্যে স্বীয় সাঙ্গ-পাঙ্গ জোটাইয়া রাখে; এরূপ কার্য্য হারাম, শরীয়তী আইনে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের ও শায়েস্তা করার বিধান আছে)। (৩) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা নিষিদ্ধ। (৪) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক কোথাও বিবাহের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও বিবাহের প্রস্তাব দান করা নিষিদ্ধ। (৫) স্বামীর সর্বস্ব একা ভোগ করার অভিলাসে এক স্ত্রী বা ভাবী স্ত্রী কর্তৃক অন্য স্ত্রীর তালাক দাবী করা নিষিদ্ধ।

নিলাম প্রথায় বিক্রয় করা

১০৮৪। **হাদীছ:**—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস ছিল; (সেই ব্যক্তি অত্যধিক দরিদ্র হওয়া সত্বেও) তাহার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি আজাদ হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিল। অতঃপর সে অত্যন্ত দুরবস্থায় ও দুর্দশায় পতিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় বিশেষ অধিকার বলে তাহার ঐ কথা রদ করতঃ) সেই ক্রীতদাসটিকে বিক্রয় করার জন্য (নিলাম প্রথায়) বলিলেন—আমার নিকট হইতে এই ক্রীতদাসটিকে কে ক্রয় করিবে? তখন নোয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) উহাকে ক্রয় করিলেন, নবী (দ:) ক্রীতদাসটিকে তাহার নিকট অর্পণ করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আলোচ্য বিষয়ে আরও অধিক স্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত আছে—আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী একজন ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে কোন বস্তু নাই কি? সে উত্তর করিল (মেষ, ছাগল ইত্যাদির লোম দ্বারা বুনান) একটা মোটা চাদর আছে, (শীতকালে) আমি উহার এক অংশ গায়ে দেই আর এক অংশ বিছাইয়া থাকি এবং

---

* শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ ঘোষণাযুক্ত ক্রীতদাসকে 'মোদাব্বার' বলা হয়। সাধারণ নিয়মে মছআলাহ এই যে, ঐরূপ ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা চলে না, বরং মনিবের মৃত্যুর পর সে মুক্ত ও আজাদ হইয়া যায়। আলোচ্য ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার বিশেষ অধিকার বলে তাহা বাতিল করিয়া উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।

একটি বাটি আছে যাহাতে পানি পান করিয়া থাকি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ঐ বস্তুদ্বয় আমার নিকট উপস্থিত কর। ছাহাবী তাহাই করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বস্তুদ্বয়কে নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে কে এই বস্তু দুইটি ক্রয় করিবে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমি এই বস্তু দুইটিকে এক দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দ্বারা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। নবী (দঃ) বলিলেন, এক দেরহামের অধিক দিতে পারে কে? এইরূপে দুই বা তিনবার বলার পর এক ব্যক্তি বলিল, আমি বস্তু দুইটিকে দুই দেরহামে ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বস্তু দুইটি তাহার নিকট বিক্রয় করিলেন এবং মুদ্রা দুইটি ঐ ভিক্ষা প্রার্থীর হাতে দিয়া বলিলেন, একটি দেরহাম দ্বারা কিছু খাদ্যবস্তু ক্রয় করিয়া পরিবারবর্গকে দিয়া আস, দ্বিতীয় দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া নিয়া আস; ঐ ছাহাবী তাহাই করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে কুড়ালটির হাতল লাগাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, কুড়ালটি নিয়া যাও এবং জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে থাক। পনর দিন পর্যন্ত যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই; (অনবরত তুমি এই কাজেই লিপ্ত থাকিবে।) সেই ছাহাবী তাহাই করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি দশটি মুদ্রা উপার্জন করিলেন, উহা হইতে কতেক মুদ্রার কাপড় এবং কতেক মুদ্রার খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হইতে অতি উত্তম হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তির দরুন কেয়ামতের দিন তোমার চেহারার উপর কাল দাগ ছাইয়া যাইত। স্মরণ রাখিও—তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ভিক্ষা করা বৈধ ও দুরুস্ত নহে। (১) যে ব্যক্তি দরিদ্রতার দরুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি সর্বহারা হইয়া দেনার তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি খুনের দায়ে পড়িয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবার উপক্রম হইয়াছে। (জীবন-বিনিময় প্রদান করিয়া বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহার সেই সামর্থ নাই।)

(আবু দাউদ শরীফ)

ক্রেতাদিগকে ধোঁকা দেওয়া

১০৮৫। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত ক্রেতাদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য উর্দ্ধে উঠানোর অসদুপায় অবলম্বন করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

● ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐরূপ অসদুপায় অবলম্বনকারী সুদখোর তুল্য, অসৎ, ভণ্ড, প্রতারক এবং ঐ কার্য্য হারাম পরিগণিত, জঘন্য ধোঁকা ও প্রতারণা, (এরূপ প্রতারকদের প্রতি আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ)। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতারণার প্রতিফল দোযখের শাস্তি ভোগ করা।

● যে ব্যক্তি স্বীয় পণ্যদ্রব্যের খরিদ-মূল্য মিথ্যারূপে অধিক প্রকাশ করিয়া থাকে সেও উল্লিখিত প্রতারক রূপের অপরাধী, পাপী ও অভিশপ্ত।

যেই বস্তু এখনও অস্তিত্বহীন উহা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ

১০৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কোন পশুর বাছুরের বাছুর বিক্রি করাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আরব দেশে অন্ধকার-যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, কাহারও কোন ঘোড়া বা উষ্ট্র ইত্যাদি পশু উত্তম জাতের হইলে উহার প্রতি অধিক লোকের আগ্রহ থাকায় উহার বাছুর বরং বাছুরের বাছুর পর্য্যন্ত জন্ম লাভের বহু পূর্বেই বিক্রি হইয়া থাকিত। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

কোন বস্তুকে বিক্রি করিয়া উহা ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ এরূপে নির্দ্ধারণ করা, যাহাতে সঠিকরূপে উহা নির্দিষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ পরিগণিত। যেরূপ অন্ধকার যুগের প্রথা ছিল, কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র বিক্রি করিত, কিন্তু উহা ক্রেতার নিকট অর্পণ করার দিন-তারিখ এইরূপে নির্দ্ধারণ করিত যে, যখন ইহার বাচ্চা জন্মলাভ করিবে বাছুরের বাছুর জন্মলাভ করিবে তখন ইহাকে তোমার নিকট অর্পণ করা হইবে এরূপ ক্রয় বিক্রয়ও নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ।

যেইটাকে স্পর্শ করিবে সেইটা বিক্রয় সাব্যস্ত হইবে—এই প্রথা নিষিদ্ধ

১০৮৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, ক্রয় বস্তু না দেখিয়া কঙ্কর, কাঠি ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া কাঠি যেইটার উপর পড়িবে সেইটা বিক্রি সাব্যস্ত করা অথবা ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়-বস্তু স্পর্শ করাকেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা, এমনকি ঐ বস্তুকে দেখিয়া উহার দোষ-ক্রটি বিবেচনা করতঃ সম্মতি-অসম্মতির সুযোগ প্রদান না করা—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধতার প্রধান বিষয় হইতেছে—দোষ-ক্রটির বিচার করতঃ উভয়ের সম্মতি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া। এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে সেই আদান-প্রদান জুয়া পরিগণিত। কারণ জুয়া প্রথাই এরূপ যে, উহাতে উভয়ের সম্মতির বা বিবেচনার ধার ধারা হয় না, শুধু বাজি ধরা হয়। যেমন--যে বস্তুর উপর ক্রেতার

হাত লাগিয়া গেল উহারই বিক্রয় তাহার সঙ্গে সাব্যস্ত হইয়া গেল বা ক্রয় বস্তুর উপর যাহার নিক্ষিপ্ত বস্তু পতিত হইল তাহারই সঙ্গে উহার বিক্রয় সাব্যস্ত হইল ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবস্থা—যেখানে উভয় পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট বস্তুর উপর বিচার-বিবেচনার পর সম্মতি স্থাপনের ধার ধারা হয় না; এরূপ ব্যবস্থাসমূহ জুয়া প্রথার অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ।

গরু ছাগল বিক্রির পূর্বে ওলান বড় দেখাইবার উদ্দেশ্যে ওলানে দুগ্ধ জমা রাখা

১০৮৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَاِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْتَلِبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন—কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র বা ছাগলের (ওলান বড় দেখা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি করার পূর্বে দুই-চার দিন দুগ্ধ দোহন না করিয়া) দুগ্ধ জমা রাখিয়া প্রতারণা করিতে পারিবে না। (এরূপ প্রতারণার ফন্দি অবলম্বন করিয়া যদি কেহ ঐরূপ পশু বিক্রয় করে, তবে এরূপ অবস্থায় ক্রেতা উহা ক্রয় করার পরও এরূপ ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে যে, দুগ্ধ দোহন করার পর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ইচ্ছা করিলে উহা রাখিতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে ফেরত দিতে পারিবে। ফেরত দেওয়া অবস্থায় (ব্যবহৃত দুগ্ধের বিনিময়ে) চার সের পরিমাণ এক ধামা খোরমা প্রদান করিবে।

১০৮৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কৃত্রিম রূপের বড় ওলান দেখিয়া বকরি (ইত্যাদি পশু) ক্রয় করে অতঃপর উহা ফেরত দেয় তাহার কর্তব্য হইবে, বকরি ফেরত দেওয়া কালে চার সের পরিমাণ এক ধামা খোরমাও দেওয়া। নবী (দঃ) ইহাও নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বাজারের বিক্রয় কেন্দ্র হইতে অগ্রগামী হইয়া কোন আগন্তুক পণ্য ক্রয় করিবে না।

গ্রাম্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের নিজ বস্তু শহরে বিক্রি করার সুযোগ প্রদান করা চাই

১০৯০। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, গ্রাম্য লোকগণ কর্তৃক শহরে আনীত চীজ-বস্তু স্বয়ং তাহাদিগকে বিক্রি করার সুযোগ প্রদান না করিয়া শহরস্থিত দোকানদারগণ কর্তৃক একচেটিয়া ভাবে উহা বিক্রি করার অধিকার স্থাপন করাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

১০৯১। **হাদীছ** ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে নিষেধ করা হইত—শহরী লোকেরা যেন গ্রাম্য লোকদের আনীত চীজ-বস্তু নিজেদের আয়ত্বে বিক্রি করার অপকৌশল না করে।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ গ্রাম্য সরল লোকগণ অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে তাহাদের কৃষিজাত চীজ-বস্তু বিক্রি করিয়া চলিয়া যায়, ইহাতে শহরস্থিত সর্বসাধারণ লাভবান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ গ্রাম্য বিক্রেতাগণ তাহাদের চীজ-বস্তু শহরে ঢুকিয়া বিক্রি করিলে তাহারা বাজার দরে কিছু বেশী দাম পাইতে পারে। এমতাবস্থায় শহরস্থিত দোকানদারগণ এক-চেটিয়া ভাবে ঐ সব চীজ-বস্তুর বিক্রয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতঃ সর্বসাধারণকে কোণঠাসা করিয়া বাজার মূল্য উচু রাখার ফন্দি আটিতে চাহে বা গ্রাম্য লোকদিগকে শহরে নিজ হাতে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা পূর্বক প্রতারণা সুত্রে তাহাদিগকে ন্যায্য মূল্য হইতে ঠকাইতে চাহে—সেই সুযোগ দেওয়া হইবে না।

উল্লিখিত হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য ইহাই। নতুবা যদি সর্বসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করা না হয় এবং গ্রাম্য বিক্রেতাগণকে প্রতারিত করা না হয়, বরং সাধারণরূপে শহরস্থিত ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকদের পণ্য বিক্রি করিয়া ন্যায্য ব্যবসা করিতে চায় তবে সে ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ নাই।

১০৯২। **হাদীছ** ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করিও না। গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে তাহাও করিও না। ইহার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য বিক্রয়ে শহরের মানুষ দালাল বা শোষণকারী সাজিবে না।

বিভিন্ন প্রান্তের লোক নিজেদের পণ্য শহরে উপস্থিত করিয়া বিক্রি করায় বাধার সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

১০৯৩। **হাদীছ** ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একজনের পক্ষ হইতে একটি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা-বার্তা চলাকালীন আর একজন ঐ বস্তু ক্রয়ের প্রস্তাব করা নিষিদ্ধ এবং পণ্যদ্রব্য আমদানী হওয়া কালে বিক্রয় কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি করতঃ সেস্থানেই উহা ক্রয় করিতে সচেষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ। পণ্যদ্রব্য বাজার-বন্দরের বিক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে পর উহা ক্রয় করিবে।

ব্যাখ্যাঃ—প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে যেই বিষয়টি নিষেধ করা হইয়াছে উহা নিষিদ্ধ হওয়ার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ বিভিন্ন লোকগণ কর্তৃক বাজারে পণ্য আমদানী হইলে বিক্রেতা অধিক হওয়ায় বাজার মূল্য নিম্ন গতিতে থাকিবে যাহা সর্বসাধারণের জন্য লাভজনক। পক্ষান্তরে সমস্ত পণ্য মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে আবদ্ধ হইলে সর্বসাধারণের সেই লাভের সুযোগ পণ্ড হইল, এমনকি পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্য গুদামজাত করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার জঘন্য সুযোগও এই পন্থায়ই হয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রাম্য গরীব দুঃখী কৃষক-শ্রমিক ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবস্থায় প্রতারিত হইবে। কারণ, বাজারে না আসিতে পারায় তাহারা বাজার-মূল্য অবগত হওয়ার সুযোগ পাইবে না এবং ঐরূপ ক্রেতাগণ মিছামিছি বাজার মূল্যের ভাওতা দিয়া প্রতারণার ফন্দি আটিতেই সচেষ্ট থাকে।

১০৭৪। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয় করা হইতে এবং গ্রাম্য লোকদের পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে—এরূপ ব্যবস্থা হইতে।

আলোচ্য বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৭২ নং হাদীছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণিত ১০৮৯ নং হাদীছেও উল্লেখ আছে।

মছআলাহঃ—উল্লিখিত ব্যবস্থায় যদি বস্তুতঃই বাজার-দর মিথ্যা বলিয়া আমদানী-কারকদেরে প্রতারিত করিয়া থাকে তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না; বিক্রেতার অধিকার থাকিবে উহা নাকচ করার।

মছআলাহঃ—উক্ত ব্যবস্থায় যদি একচেটিয়াভাবে পণ্য হস্তগত করিয়া বা গুদামজাত করিয়া মূল্যের উর্দ্ধগতি সৃষ্টির ইচ্ছা করা হয় বা উহাতে জনসাধারণের জীবন যাত্রায় সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হয় তবে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হারাম হইবে এবং সরকার কর্তৃক ঐরূপ ক্রয়কে নাকচ করার শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগের অবকাশ আছে।

উল্লিখিত মিথ্যা ও অসদুপায়ের সহিত জড়িত না হইলে সে ক্ষেত্রে ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু উহা পরিহার্য্য।

এক জাতীয় বস্তুদ্বয়ের বিনিময়ে সমতা ও উপস্থিত আদান-প্রদান আবশ্যক

১০৯৫। হাদীছ:— قال عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّاهَاءَ وَهَاءَ ـ

অর্থ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ দ্বারা হইলে কথাবার্তার স্থলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের দেয় বস্তুর আদান-প্রদান করিতে হইবে, নতুবা সেই বিনিময় (হালাল ক্রয়-বিক্রয় গণ্য না হইয়া হারাম) সুদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব এবং খুরমার বিনিময়ে খুরমাও তদ্রূপই।

১০৯৬। হাদীছ:— قال ابوبكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ـ

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময় স্থলে উভয় পক্ষে ওজনে পূর্ণ সমতা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তদ্রূপই রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়। অবশ্য স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ইচ্ছানুসারে ওজনের বেশ-কমে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে।

১০৯৭। হাদীছ:— عن ابى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ـ

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ উভয়ের সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে, এক পক্ষের পরিমাণ অপর পক্ষের তুলনায় বেশ কম হইতে পারিবে না। রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়েও তদ্রূপই সমতা ব্যতিরেকে জায়েয নহে। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ে এক পক্ষ নগদ অপর পক্ষ বাকি—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নহে।

ব্যাখ্যাঃ—স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, এর জন্য সমতা প্রয়োজন সেই বিষয়ে বোখারীর শরাহ্—ফতহুল বারী কিতাবে উল্লেখ আছে।

يدخل فى الذهب جميع اصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ
وصحيح ومكسر- وحلى وتبر وخالص ومغشوش -

অর্থাৎ ভাল ও খারাব, কারুকার্য খচিত ও সাদা, আস্ত ও গুড়া, তৈরী অলঙ্কার ও ঢাকা এবং খাটী ও অখাটী কোন প্রকার গুণাগুণের ভেদাভেদে কম-বেশ করা যাইবে না; স্বর্ণে স্বর্ণে বিনিময় হইলে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে।

যদি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় তবে অন্য জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করিতে হইবে। রৌপ্যে রৌপ্যে বিনিময় হইলেও তদ্রূপই। এতদভিন্ন যে কোন এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা হইলে সে স্থলে গুণাগুণের ভেদাভেদের কারণে বেশ-কম করা চলিবে না। গুণের তারতম্য করিতে হইলে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শরীয়তের আইন ও বিধান ইহাই।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন এক ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অতি উত্তম রকমের কিছু খেজুর উপস্থিত করিলেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এলাকার কি সব খেজুর এইরূপই হইয়া থাকে? ছাহাবী উত্তর করিলেন, না—আমি ভালমন্দ মিশান দুই টুকরি খেজুরের বিনিময়ে এই বাছা ও উত্তম খেজুর এক টুকরি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই বিনিময় ত সূদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তুমি এরূপ কেন করিলে না যে—প্রথমে স্বীয় দুই টুকরি খারাপ খেজুর মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া অতঃপর সেই মুদ্রা দ্বারা এক টুকরী উত্তম খেজুর ক্রয় করিতে!

বোখারী শরীফের মধ্যেও একটু সম্মুখে এই হাদীছটি বর্ণিত হইবে।

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ও রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

১০৯৮। হাদীছঃ— عن براء بن عازب وزيد بن ارقم قالا

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

অর্থ—বরা ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

১০৯৯। **হাদীছ**ঃ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বাকি বিক্রয় অবশ্যই সুদ গণ্য হইবে।

অর্থাৎ—স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পর বিনিময়ে ওজনে বেশ-কম ত হবেই এবং তাহা জায়েযও বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু হওয়া সত্বেও বাকি বিক্রয় করিলে তাহা নিষিদ্ধ তথা হারাম হইবে।

তদ্রূপ এক জাতীয় বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে উভয় দিকে সম পরিমাণ দিয়াও যদি বাকি বিক্রয় করা হয় তাহাও নিষিদ্ধ তথা হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পরস্পর বিনিময় ছাড়া অন্য যে কোন দুই জাতীয় দুই বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে যে কোনরূপে বাকি বিক্রয় করিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ হইবে না।

বৃক্ষের ফল বা জমিনের ফসল অনুমান করিয়া সেই জাতীয় তৈরী বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা

১১০০। **হাদীছ**ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—"মোযাবানাহ" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণ উৎপন্নের উপর বর্গা দেওয়া হইতে।

১১০১। **হাদীছ**ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—নির্দ্ধারিত পরিমাণ উৎপন্নের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে এবং "মোযাবাহান" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে। (২৯১ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ—"মোযাহাবানাহ" ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ ব্যাখ্যা উহাই করা হয় যাহা আলোচ্য পরিচ্ছদের বিষয়। অর্থাৎ গাছের ফল গাছেই রাখিয়া পরিমাণ করতঃ সেই পরিমাণ প্রস্তুত ঐ জাতীয় ফলের বিনিময়ে গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করা। তদ্রূপ জমিনের ফসল না কাটিয়া উহা পরিমাণ করতঃ ঐ জাতীয় সেই পরিমাণ বস্তুর বিনিময় করা—ইহা নিষিদ্ধ।

এতভিন্ন উহার অপর একটি ব্যাখ্যাও করা হয় যে, যে ফসল গাছে নয় বরং স্তুপকৃত রহিয়াছে উহার ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য নির্দ্ধারিত সংখ্যক ধামা বা পরিমাণের উপর সাব্যস্ত করিয়া ধামার মাপ বা ওজন করা ব্যতিরেকে স্তুপটি এই বলিয়া গ্রহণ করা যে বেশী হইলে আমার লাভ, কম হইলেও আমারই ক্ষতি। এই ভাবের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে। হাঁ—প্রথম হইতেই ধামার সংখ্যা বা ওজনের পরিমাণ হিসাবে নয়, বরং স্তুপ হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই শুদ্ধ ও জায়েয। কিন্তু প্রথমে ধামা বা ওজন হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করিয়া পরে ওজন করা ব্যতিরেকে স্তুপকে ঐ ওজনের অনুমান হিসাবে মূল্য দানে ক্রয় করা জায়েয নহে।

১১০২। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ

إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ

كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ ـ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; খেজুর গাছে খেজুর আছে, উহা শুষ্ক হইয়া কি পরিমাণ খুরমা হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া ঐ পরিমাণ শুষ্ক খুরমার বিনিময়ে ঐ গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা আঙ্গুর গাছে আঙ্গুর আছে, উহা শুষ্ক হইয়া কি পরিমাণ কিশমিশ হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া শুষ্ক কিশমিশের বিনিময়ে ঐ গাছের আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা জমিনের মধ্যে ফসল আছে (যেমন ধান) উহা কাটিয়া আনিলে পর কি পরিমাণ খাদ্য (ধান) হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া সেই পরিমাণ প্রস্তুত খাদ্য বস্তুর (ধানের) বিনিময়ে ঐ জমিনের ফসল ক্রয়-বিক্রয় করা—এইসব রকমের ক্রয়-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। (২৯৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—একই শ্রেণীর বস্তুদ্বয়ের পরস্পর বিনিময়ে যেমন—ধান-চাউল, খুরমা-খেজুর, কিশমিশ-আঙ্গুর ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুদ্বয়ের পরস্পর বিনিময়ে এই বিধান নহে। যেমন, কিশমিশের বিনিময়ে খেজুর ক্রয় করা। এস্থলে গাছের খেজুরকে অনুমান করিয়া সেই অনুপাতে কিশমিশের বিনিময়ে ঐ খেজুর ক্রয় করা যায়েয আছে। তদ্রূপ গাছের খেজুরকে গাছে রাখিয়া নগদ মূল্যেও ক্রয় করা জায়েয আছে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে নির্দ্ধারিত ওজন বা পরিমাণের উল্লেখ করিতে পারিবে না—উপস্থিত সমষ্টিরূপে ক্রয় করিবে।

১১০৩। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের ফল পোক্ত হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গাছের ফল গাছে রাখিয়া বিক্রি করিলে টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর প্রস্তুত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিলে ত তাহা হারাম হইবে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে বা টাকা পয়সার বিনিময়ে হইলে জায়েয হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গাছের ফল বা ক্ষেতের ফসল অনুমান করিয়া ঐ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিত বিনিময় এক ক্ষেত্রে জায়েয আছে। তাহা এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার বাগানের এক দুইটা গাছ বা খামারের এক টুকরা জমি সম্পর্কে কোন গরীব বা শ্রদ্ধেয় লোককে এই বলিয়া দিল যে, ইহার উৎপন্য আপনাকে দিলাম; আপনি তাহা ভোগ করিবেন।

অতঃপর সেই উৎপন্ন পূর্ণরূপে পাকিয়া কাটিবার উপযোগী হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উক্ত লোকের জন্য অসুবিধাজনক হইয়া পড়ায় গাছের বা জমির মূল মালিকের সঙ্গে সেই উৎপন্নকে অনুমান করিয়া ঐ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিতই বিনিময় করিয়া নেয়—এই বিনিময়কে শরীয়তের পরিভাষায় "আ'রিয়্যা" বলা হয় ; ইহা জায়েয। কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রয় ও বিনিময় ব্যবস্থা বাহ্যত দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় নহে, বরং দান বা হাদিয়ার পরিবর্তন মাত্র যাহা জায়েয।

১১০৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন যাহা পাঁচ ধামা বা উহার কম পরিমাণে হইয়া থাকে। (অর্থাৎ উক্ত বিনিময় বা পরিবর্তন সাধারণতঃ কম পরিমাণেরই হয়।

১১০৫। হাদীছ ঃ—সাহল ইবনে হাছমা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের খেজুর অনুমান করিয়া খুরমার সহিত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিনিময়ে অনুমতি দিয়াছেন—যেখানে অনুমানের উপরই বিনিময় হয়।)

১১০৬। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যার ক্ষেত্রে অনুমাণের উপর ধামা হিসাবে বিনিময়ের অনুমতি দিয়াছেন।

কোন বৃক্ষের ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১০৭। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ

صَلَاحُهَا نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—বৃক্ষস্থিত ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।

● জাবের (রাঃ) হইতেও এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের ফল রং চড়িবার পূর্বে এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১১০৮। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় লোকদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহারা বাগানস্থিত ফল (ছোট ছোট থাকাবস্থায়) ক্রয় করিয়া লইত। অতঃপর যখন ফল পাকার ও

কাটায় মৌসুম উপস্থিত হইত এবং বিক্রেতার পক্ষ হইতে মূল্য আদায়ের তাগাদা আসিত তখন কোন কোন ক্রেতা এরূপ আপত্তি জানাইত যে, এই বৎসর নানা প্রকার দুর্যোগ দুর্ঘটনায় বৃক্ষের ফল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, (অতএব আমি মূল্য পরিশোধ করিব না, বিক্রেতা উহাতে সম্মত হইত না, ফলে বিবাদ সৃষ্টি হইত)। এরূপ বহু ঝগড়া-বিবাদের অভিযোগ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকায় তিনি এই নীতি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বৃক্ষের ফল বিক্রি করিবে না।

১১০৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বৃক্ষের ফল পোক্তা হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (সে মতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, পোক্তা হওয়ার অর্থ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (খেজুর সবুজ বর্ণ হইতে) লাল বর্ণ হওয়া। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিয়াছ কি যে, প্রাথমিক অবস্থায় ফল বিক্রি করিলে যদি ঐ বৎসর (কোন দুর্যোগের কারণে) ঐ বৃক্ষে ফল না হয়, তবে স্বীয় মুসলমান ভাই—ক্রেতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করা কিসের বিনিময়ে হইবে?

মছআলাহ ঃ—গাছের ফল ক্ষুদ্র ও ছোট থাকাবস্থায় এই শর্তে বিক্রি করা যে, ফল পূর্ণ বড় হওয়া ও পাকা পর্য্যন্ত গাছেই থাকিবে—ইহা নাজায়েয। এই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না এবং ফল বিনষ্ট হইয়া গেলে বিক্রেতা মূল্যের অধিকারী হইবে না। আর যদি এই রূপ হয় যে, ফল সাধারণ ভাবে যতটুকু বড় হওয়ার তাহা হইয়া সারিয়াছে, শুধু কেবল পাকা বাকি রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে যদি পাকা পর্য্যন্ত গাছে থাকার শর্তেও ক্রয় করিয়া থাকে তবুও উহা শুদ্ধ ও জায়েয হইবে—ইহাই ফতওয়া। (আলমগীরি, ৩—১৪৮)

● প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বৃক্ষের ফল ছোট থাকাবস্থায় ক্রয় করে অতঃপর কোন দুর্যোগে উহা নষ্ট হইয়া যায় তবে উহার ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষে গণ্য করা হইবে।

ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১১০। হাদীছ ঃ—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু খাদ্যবস্তু ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মূল্যের পরিবর্তে তিনি তাহার নিকট স্বীয় লৌ-বর্ম বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

এক জাতীয় বস্তুর ভাল-মন্দের মধ্যে বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিলে কিরূপে করিবে?

১১১১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছাহাবীকে 'খয়বরে' তসীলদার বানাইয়া পাঠাইলেন।

একদা ঐ ছাহাবী উত্তম রকমের কিছু খেজুর লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, খয়বরের সব খেজুরই কি এইরূপ উত্তম হয়? ঐ ছাহাবী বলিলেন, না—ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা এই উত্তম খেজুর এক ধামা সাধারণ খেজুর দুই-তিন ধামার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, (এইরূপ বিনিময় ত সুদের অন্তর্ভুক্ত!) এইরূপে ক্রয় করিও না। খারাপ খেজুর প্রথমে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর, অতঃপর ঐ মুদ্রার বিনিময়ে উত্তম খেজুর ক্রয় কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল এইরূপ; যথা—প্রথমে খারাপ খেজুর দুই ধামা ২০ টাকায় বিক্রি করিবে অতঃপর সেই ২০ টাকার বিনিময়ে ভাল খেজুর এক ধামা খরিদ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, উভয় ক্রয়-বিক্রয়ই ভাল খেজুর ও খারাপ খেজুর বিনিময়কারী দুই জনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহাতে দোষ নাই। এমনকি নির্দ্ধারিত ২০ টাকা উভয়ের কাহারও লেন দেনেরও প্রয়োজন নাই। দুই জনের মধ্যে দুইবার মৌখিক বিনিময়-বন্ধন (আক্‌দ-বায়) অনুষ্ঠিত হইলেই উহা জায়েযের গণ্ডিভুক্ত হইয়া যাইবে। যথা—খারাপ খেজুরওয়ালা ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে আমার দুই ধামা খেজুর আপনার নিকট ২০ টাকায় বিক্রি করিলাম—এই বলিয়া তাহার দুই ধামা খারাপ খেজুর ভাল খেজুরওয়ালাকে প্রদান করিবে। অতঃপর সে ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে আমার দুই ধামা খেজুরের মূল্য ২০ টাকা আপনার নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে উক্ত ২০ টাকা দ্বারা আমি আপনার ভাল এক ধামা খেজুর ক্রয় করিলাম—এই বলিয়া এক ধামা ভাল খেজুর হস্তগত করিবে। টাকা ২০টির লেন-দেন একবারও আবশ্যক নহে। সার কথা এই যে, দুই ধামা খারাপ খেজুরের সহিত এক ধামা ভাল খেজুরের সরাসরি বিনিময়-বন্ধন অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সুদের অন্তর্ভুক্ত হারাম গণ্য হইবে, আর উল্লিখিত আকারে দুইটি পৃথক পৃথক বিনিময় বন্ধন দ্বারা সেই দুই ধামায়ই এক ধামা হস্তগত করিলে তাহা জায়েয হইবে। উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফল একই বটে, তথা দুই ধামা খারাপ খেজুর দ্বারা এক ধামা ভাল খেজুর সংগ্রহ করা। কিন্তু উভয় ব্যবস্থার মধ্যে বিধানগত পার্থক্য দিবা-রাত্রের ন্যায় রহিয়াছে। কারণ; প্রথম তথা হারাম সাব্যস্তের ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন শুধু একবার রহিয়াছে; পক্ষান্তরে জায়েয সাব্যস্ত ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন দুইবার হইয়াছে।

শরীয়তের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহারা উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফলে ব্যবধান না দেখিয়া হালাল-হারামের পার্থক্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু উহা তাহাদের বোকামী হইবে। কারণ, হারাম-হালাল ইহাও বিধানগত বিষয় বটে, নতুবা হারাম ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেজুরের যেই স্বাদ হালাল ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেজুরেরও সেই স্বাদ

উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং একটি বিধানগত বিষয় তথা হারাম-হালাল-এর ভিত্তি যদি অপর একটি বিধানগত পার্থক্যের উপর স্থাপিত হয় তবে তাহা উপেক্ষণীয় হইবে কেন ?

দৃশ্যগত ব্যবধান ব্যতিরেকে (আক্দ) তথা বিধানগত বন্ধনের পার্থক্যে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য হওয়া ইহা শুধু ইসলামী শরীয়তের বিষয়ই নহে, নিছক মানবতার বিষয়ও বটে। একজন বান্ধবী এবং নিজ স্ত্রী—উভয় মহিলার মধ্যে বিধানগত বন্ধনের পার্থক্য ছাড়া আর কি পার্থক্য আছে ? কিন্তু স্ত্রীর সহিত সহবাস সকল ধর্মে সকল সমাজেই বৈধ এবং সন্তান হইবে হালাল। আর বান্ধবীর সহিত সহবাস সকল স্তরেই অবৈধ এবং সন্তানকে গণ্য করা হইবে হারামজাদা।

ফলদার বৃক্ষ বিক্রি করিলে ফলের মালিক কে হইবে ?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী নাফে' (রঃ) বলিয়াছেন, ফল বাহির হইবার পর বৃক্ষ বিক্রি হইলে ফলের মালিক সে-ই হইবে যে উহার ব্যবস্থা করিয়াছে অর্থাৎ বিক্রেতা। তদ্রূপ কোন ফসলযুক্ত জমিন বিক্রি হইলে ফসলের মালিক বিক্রেতাই হইবে।

১১১২। হাদীছ:— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

অর্থ—আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ খেজুর গাছ বিক্রি করে যাহার (ফল বাহির হইয়াছে এবং) ফলের উন্নতির ব্যবস্থাও সে করিয়াছে সেই বিক্রেতাই ঐ ফলের মালিক থাকিবে। অবশ্য যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, ফলের মালিক ক্রেতা হইবে তবে উহার মালিক ক্রেতা হইবে।

খাদ্যোপযোগী শুষ্ক ফল বা ফসল কাঁচা ফল-ফসলের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়

মছআলাহ:—শুষ্ক কিম্বা কাঁচা ফল বা ফসল টাকা-পয়সার বিনিময়ে বা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে যথা, খোরমার বিনিময়ে আঙ্গুর—এই ক্রয়-বিক্রি সর্বসম্মতরূপে শুদ্ধ ও জায়েয।

যে সমস্ত ফল-ফসল শুষ্ক হইলে ওজনে, বরং আকারেও কমে এবং কিছু ছোট হইয়া যায়—যেমন, খেজুর শুষ্ক হইয়া খোরমা হয়, আঙ্গুর শুষ্ক হইয়া কিশমিশ বা মনাক্কা হয়। আমাদের দেশের ধানও এইরূপই বটে।

এই শ্রেণীর ফল-ফসলের শুষ্কটা একই জাতীয় কাঁচা ও তাজাটার সহিত পরস্পর বিনিময় করা অধিকাংশ ইমামগণের মতে কোন রকমেই জায়েয নহে—বেশ-কমেও নহে, সমান সমানেও নহে; ইহাকেও তাঁহারা ১১১১ নং হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত গণ্য করেন। এমনকি তাঁহাদের মতে ঐ শ্রেণীর ফল-ফসলের কাঁচাটা ঐ জাতীয় কাঁচাটার সহিত সমান-সমানেও বিনিময় জায়েয নহে; কারণ শুষ্ক হইলে উভয়ের পরিমাণে পূর্ণ সমতা থাকিবে না।

হানফী মজহাব মতে এক জাতীয় ফসলেরও কাঁচাটার বিনিময়ে কাঁচা সম পরিমাণ এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে জায়েয হইবে। এমনকি শুষ্কটার বিনিময় কাঁচাটা সম পরিমাণে এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে তাহাও ইমাম আবু হানিফার মতে শুদ্ধ এবং জায়েয।

অবশ্য যদি শুষ্ক ও কাঁচার পার্থক্য করিতে হয় তবে উভয়ের সরাসরি বিনিময় জায়েয হইবে না। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে পৃথক পৃথক দুইটি বিনিময়-বন্ধন সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহা সর্বসম্মতরূপে জায়েয হইবে।

ক্ষেত-খামারের নির্দিষ্ট শস্য-ফসল উহার দানা পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা

১১১৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—(১) নির্দ্ধারিত পরিমাণ (যথা দশ মন) উৎপন্নের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে। (২) দানা পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রি করা হইতে। (৩) ছোঁয়া বা স্পর্শ দ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত করার প্রথা হইতে। (৪) যাহার কঙ্কর বা কাঠি যেই বস্তুর উপর পতিত হইবে তাহার সঙ্গে ঐ বস্তুর বিক্রয় বাধ্যতামূলক ভাবে সাব্যস্ত হওয়ার প্রথা হইতে। (৫) "মোযাবানাহ" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে।

ব্যাখ্যাঃ—২ নম্বরে আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। ৩ ও ৪ নং বিষয়দ্বয় ১০৮৭ নং হাদীছে এবং ৫ নং বিষয়টি ১১০২ নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

অমোসলেমের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১১৪। হাদীছঃ—আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ভ্রমণ.ত ছিলাম, আমাদের সংখ্যা একশত ত্রিশ জন ছিল। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কাহারও নিকট খাদ্যবস্তু আছে কি? দেখা গেল, একজনের নিকট চার সের পরিমাণ হইতেও কম আটা আছে। ঐ আটাটুকু ছেনা হইল। অতঃপর দীর্ঘদেহী এক অমোসলেম মোশরেক পথিক এক দল বকরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। নবী (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বকরীগুলি কাহাকেও হাদিয়া দিবার জন্য আনিয়াছ, না—বিক্রি করার জন্য? সে বলিল, বিক্রির জন্য আনিয়াছি। নবী (দঃ) তাহার নিকট হইতে একটা বকরী ক্রয় করিলেন। উহাকে

জবেহ করিয়া উহার গোশত তৈয়ার করা হইল। নবী (দঃ) উহার দিল-কলিজা ভাজি করার আদেশ করিলেন। (ঐ ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অলৌকিক বরকতের ঘটনা এরূপ ঘটিয়াছিল যে,) আমাদের একশত ত্রিশজন লোকের মধ্যে প্রত্যেকেই ঐ দিল-কলিজার অংশ প্রাপ্ত হইল, এমনকি যাহারা ঐ সময় উপস্থিত ছিল না তাহাদের জন্য অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল। (আরও অলৌকিক ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে,) এই অল্প পরিমাণ আটা ও একটি মাত্র ছাগল দ্বারা তৈরী খাদ্য দুই বর্তনে দেওয়া হইল। আমরা একশত ত্রিশজন লোক পেট পুরিয়া উহা হইতে আহার করিলাম এবং অবশিষ্ট রহিয়া গেল—উহা সঙ্গে লইয়া তথা হইতে আমরা যাত্রা করিলাম।

মৃত পশুর কাঁচা চামড়া বিক্রি করা

মছআলাহ ঃ—মৃত পশুর চামড়া কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করা প্রচলিত মজহাব সমুহের ইমামগণের মতে জায়েয নহে। অবশ্য ইমাম জুহরী (রঃ) এবং ইমাম বোখারী (রঃ) উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয বলেন। (ফতহুলবারী, ৪—২৩)

১১১৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গমন পথে একটি মৃত ছাগল দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ইহার চামড়া দ্বারা লাভবান হইলে না কেন? সকলেই বলিল, ইহা ত মৃত। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেজন্য উহা কেবল খাওয়া হারাম।

১১১৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) অবগত হইলেন, এক ব্যক্তি মদ বিক্রি করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের সর্বনাশ করুন; সে কি জানে না? রসুলুল্লাহ (দঃ) (বদ-দোয়া করতঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর (আজাব স্বরূপ হালাল জীবেরও) চর্বি (কোন আকারে ব্যবহার করা) হারাম করা হইয়াছিল। তাহারা সেই চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মদ বিক্রেতা ভাবিয়াছিল, আমি ত মদ খাইলাম না; উহার পয়সা খাইলাম। ওমর (রাঃ) দেখাইলেন, ইহুদীদের জন্য চর্বি খাওয়া হারাম ছিল; তাহারা উহা সরাসরি না খাইয়া উহার পয়সা খাইত; সেই জন্য তাহাদের প্রতি হযরতের অভিশাপ হইয়াছে। এই সূত্রেই মদের ক্রয়-বিক্রয় ও উহার ব্যবসা হারাম; ১১১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

১১১৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। তাহারা চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া উহার মূল্য ভোগ করিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মৃত পশু-পাখির মাংস বা চর্বি ব্যবহার নিষিদ্ধ; উহার ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ—উক্ত মাংস ও চর্বির যদি রূপও পরিবর্তন করা হয় তবুও নিষিদ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উপরোক্ত পরিচ্ছেদত্রয়ের বিভিন্ন মছআলার ব্যাপারে মৃতের সংজ্ঞা সম্পর্কে ফেকাহ শাস্ত্রে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সে দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতামুক্ত হওয়ার অবকাশ লাভ হইতে পারে। যথা—

(ক) শুকর ব্যতীত অন্য যে কোন হারাম পশুও জবেহকৃত হইলে উহার চামড়া সর্বসম্মতরূপে পাক; অনেক আলেমের মতে উহার গোশত এবং চর্বি ইত্যাদিও পাক পরিগণিত হয়। (সে মতে উহা খাওয়া হালাল না হইলেও উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে।) অবশ্য রক্ত ত নাপাক হইবেই। (আলমগীরী, ১—২৫ পৃঃ)

(খ) খাদ্যে হালাল হইবার জন্য নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার জন্য অনেক আলেম এরূপ মত ও ফতওয়াকে ছহীহ গণ্য করিয়াছেন যে, শরীয়তী জবেহ তথা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মের জবেহ হইতে হইবে না— অর্থাৎ জবেহকারী মোসলমান বা কেতাবী হইতে হইবে না, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গলার রগ কাটা এবং অপর ক্ষেত্রে যে কোন অংশে ধারালো অস্ত্রে জখম করার শর্তও হইবে না। (শামী, ১—১৮৯)।

ফতওয়া শামীর উল্লেখিত উদ্ধৃতিটি অতি গুরুত্বপূর্ণ: কারণ, উক্ত মতামত অনুযায়ী অমোসলেমের হাতে জবেহ বা ঘায়েলকৃত জীব মৃত গণ্য হইবে না। সেমতে শুধু কেবল রোগে কিম্বা পতিত হওয়ার ভীষণ চোটে বা কোন কারণে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে মৃতই এক্ষেত্রে* মৃত গণ্য হইবে।

এক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রে আরও একটি মছআলাহ সঙ্কীর্ণতা লাঘব করিবে।

মছআলাহ ঃ—তৈলের মধ্যে মৃত জীবের চর্বির তৈল মিশ্রিত হইলে—যদি পবিত্র তৈলের অংশ বেশী হয় তবে উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, আর মৃতের চর্বির তৈল বেশী হইলে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয হইবে। (আলমগীরী, ৩—১৬১)

ছবির ব্যবসা করা

১১১৮। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে আবুল হাসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম; এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে আবুল আব্বাস! আমি একজন দরিদ্র লোক; আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হইল আমার হস্তশিল্প—আমি ছবি আঁকিয়া

---

* এক্ষেত্রে তথা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আর ইহা অবধারিত যে, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়া শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাক গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে যাহা মৃত পরিগণিত ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেও শুধু উহাই মৃত গণ্য হইবে।

থাকি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি নিজ কানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি। আমি তাঁহাকে এই বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে ঐ ছবির মধ্যে আত্মা দেওয়ার আদেশ করিবেন, (এবং আত্মা দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দান করিতে থাকিবেন,) কিন্তু সে উহার আত্মা দিতে কখনও সক্ষম হইবে না।

এই হাদিছ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি শিহরিয়া উঠিল ; তাহার চেহারা জরদ হইয়া গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যদি অগত্যা এই কাজ করিতেই চাও তবে জীবের ছবি না আঁকিয়া বৃক্ষাদির ছবি আঁকিও।

শরাব তথা মদের ব্যবসা হারাম

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শরাবের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

১১১৯। হাদীছ :— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ছুরা-বাকারার মধ্যে বর্ণিত (সুদ হারাম হওয়ার) আয়াতসমূহ নাযেল হইল হযরত (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন (এবং সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনাইলেন, তখন মদ্য পান হারাম হওয়া পুনঃ ঘোষণা করতঃ) মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার ঘোষণাও শুনাইলেন।

কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার ভয়াবহ পরিণতি

১১২০। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—কেয়ামতের দিন স্বয়ং আমি তিন প্রকার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাদী হইব। (:) যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করিয়া

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি স্বাধীন ও মুক্ত (অর্থাৎ শরীয়ত মতে ক্রীতদাস নয় এমন) মানুষ বিক্রি করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি কোন মজুর দ্বারা কাজ করাইয়া তাহার পারিশ্রমিক দেয় নাই।

মৃত প্রাণী এবং মূর্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ

১১২১। **হাদীছ:—** عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কা নগরীতে এই ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন—তোমরা স্মরণ রাখিও! নিশ্চয় আল্লাহ এবং আল্লার রসুল মদ বিক্রি করা, মৃত পশু-পক্ষী বিক্রি করা, শূকর বিক্রি করা এবং মূর্তি বিক্রি করা হারাম করিয়াছেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! মৃতের চর্বি নৌকায় লাগান হয়, (মশক ইত্যাদির) চামড়ায় লাগান হয় এবং উহা দ্বারা চেরাগ জ্বালান হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, উহা (বিক্রি করা) জায়েয নহে—হারাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সময় ইহাও বলিলেন, ইহুদিদের প্রতি আল্লার গজব নাযেল হউক; আল্লাহ তায়ালা (শাস্তি স্বরূপ) তাহাদের প্রতি (হালাল জানোয়ারেরও) চর্বি হারাম হওয়ার আদেশ জারী করিলেন, তখন তাহারা ঐ চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া উহার মূল্যের টাকা-পয়সা খাদ্য (ইত্যাদিতে) ব্যবহার করিল। (এইরূপে ফন্দি করিয়া নিষিদ্ধ বস্তু—চর্বি ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহারা অভিশপ্ত।) ২৯৮ পৃঃ

কুকুর বিক্রি করা এবং উহার অর্জিত অর্থ

১১২২। হাদীছ :— عن ابی مسعود رضی الله تعالی عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ـ

অর্থ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারে অর্জিত আয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—(১) কুকুর বিক্রির টাকা-পয়সা। (২) বেশ্যাবৃত্তি—যেনা ও ব্যাভিচারে অর্জিত অর্থ। (৩) গণক (গণনাকারী)কে প্রদত্ত শিন্নি ও ভেঁট।

ব্যাখ্যা :—অধুনা যেরূপ সৌখিনতারূপে কুকুর পোষার হিড়িক দেখা যায় অন্ধকার যুগেও তদ্রুপ ছিল। অথচ কুকুরের সংশ্রব মানবকে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও নূর হইতে বঞ্চিত রাখে, তাই কুকুর পোষার সৌখিনতার স্রোতকে বন্ধ করার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুকুরের ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যে কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা নিষিদ্ধ ছিল, ব্যাপক ভাবে কুকুর মারিয়া ফেলার আদেশ ছিল, কুকুর ক্রয় বিক্রয় এবং উহার দ্বারা অর্থ উপার্জন কঠোরতার সহিত নিষিদ্ধ ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। মোসলমানগণ কর্তৃক অন্ধকার যুগের ঐ সৌখিনতার কু-অভ্যাস পরিত্যাক্ত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে সুযোগ দানার্থে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃকই সেই কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু মোসলমানদিগকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুকুর আল্লার ফেরেশতাদের নিকট এবং আল্লার রসুলের নিকট অতি জঘন্য ও অতি ঘৃণিত, তাই যথাসাধ্য উহার সংশ্রব পরিহার করিবে।

মছআলাহ :—কুকুর বিক্রি করা এবং উহার মুল্য হালাল হওয়া সম্পর্কে বর্তমানে শরীয়তে বিধানগত কোন বাধা-নিষেধ নাই, তবে উহা মকরুহ বটে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● যানবাহন যথা ঘোড়া এবং গাধা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। অর্থাৎ হারাম পশু পক্ষীও খাওয়া ভিন্ন অন্য উপকারের জন্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (২৮১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—শূকর ভিন্ন সকল পশু-পক্ষী ও কীট পতঙ্গ যাহা কোনও উপকারে ব্যবহৃত হয়—সবেরই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (আলমগীরী, ৩—১৫৮)

● অমোসলেমদের হাটে-বাজারে ব্যবসা করা জায়েয (২৮২ পৃঃ)। ● শান্তি অশান্তি সর্বাবস্থায়ই অস্ত্র বিক্রয় করা জায়েয। এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা অবস্থায় অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়াছেন (২৮২ পৃঃ)। যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা হয় তাহাদের নিকট অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। মৃগনাভী বা কস্তুরী এবং সকল প্রকার সুগন্ধিই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (২৮২ পৃঃ)। ● যে শ্রেণীর কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে উহার ব্যবসা জায়েয (২৮২ পৃঃ) ● পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ মালিকেরই অধিকার (২৮৩ পৃঃ)। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক মূল্য নির্দ্ধারণের তথা কন্ট্রোল করার অধিকার আছে। বিস্তারিত বিবরণ ফতওয়া আলমগীরী, ৩—২৭৭ ● ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর উপর স্বীয় অধিকারের কার্য্য প্রয়োগ করিতে পারে। বিশিষ্ট তাবেয়ী তাউস (রঃ) বলিয়াছেন, ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্রেতা উক্ত পণ্য বিক্রয় করে, তবে ক্রেতাই উহার লাভের অধিকারী হইবে (২৮৪ পৃঃ)। ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল প্রকার ধোঁকা-ফাঁকি নিষিদ্ধ (২৮৪ পৃঃ)। বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয (২৮৪ পৃঃ)। অর্থাৎ বাজার ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট স্থান বটে, কিন্তু সেজন্য তথায় ব্যবসা-বাণিজ্য নাজায়েয নহে। ● হাটে-বাজারে যাইয়া (স্বীয় গাম্ভির্য্য ও শালিনতা অবশ্যই বজায় রাখিবে;) চেচাইয়া কথা বলা নিষিদ্ধ (২৮৫ পৃঃ)। ● পণ্য ওজন করার ব্যয় সাধারণ ভাবে বিক্রেতার উপর বর্তিবে (২৮৫ পৃঃ)। ● পণ্যের লট্ তথা সমষ্টি ক্রেতার প্রতি (প্রয়োজন বোধে) নিষেধাজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে যে, স্বীয় দোকানে না পৌছাইয়া উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে দণ্ডের বিধানও করা যায় (২৮৬ পৃঃ)। ১০৭৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণও আছে। ● ক্রেতা তাহার ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নিকট থাকিতে দিয়াছে—এখনও উহা হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, এমতাবস্থায় যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায়—যেমন উহা কোন জীব ছিল তাহা মরিয়া গিয়াছে, কিম্বা বিক্রেতা উহা অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলে এক্ষেত্রে কি হইবে? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন জীবিত ও উপস্থিত বিদ্যমান বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করার পর উহার মৃত্যু হইলে তাহা ক্রেতারই পণ্য হইবে; অর্থাৎ তাহাকে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবেই (২৮৭ পৃঃ)। অবশ্য এক্ষেত্রে আবু হানিফা (রঃ) শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হইলেও ক্রেতার হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদনের পূর্বে যাহা কিছু

হইবে সবই বিক্রেতার পক্ষে গণ্য হইবে। সুতরাং অন্যত্র বিক্রির লাভের অধিকারী সে-ই হইবে এবং মরিয়া গেলে উহার ক্ষতি তাহার উপরই বর্তিবে--উহার মূল্যের অধিকারী সে হইবে না, মূল্য উসুল করিয়া থাকিলে তাহা ফেরত দিতে হইবে। এমনকি যদি কোন রুগ্ন পশুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদন ব্যতিরেকে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলিয়াছে, পশুটি অদ্য রাত্র আপনার গোয়ালেই থাকিবে; অতঃপর রাত্রে বিক্রেতার গোশালার উহা মরিয়া গিয়াছে. তবে এক্ষেত্রেও উহার ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষেই হইবে ক্রেতার পক্ষে নহে (আলমগীরী, ৩-২১)। অবশ্য ক্রেতার হস্তগত করা সম্পন্ন হওয়ার পরে যে কোন অবস্থাতেই উহার মৃত্যু হউক, এমনকি বিক্রেতার বাড়ীতেই মৃত্যু হউক, ক্ষতি ক্রেতার পক্ষে হইবে; মূল্য আদায় না করিয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে; যেমন, পশু বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলিল, এই আপনার পশু আপনাকে নেওয়ার জন্য বলিতেছি, আপনি নিয়া যান—যেরূপ বাক্য ও শব্দাবলীর মাধ্যমেই হউক এই ব্যবস্থা ও ভাব সম্পাদনের পর* যদি ক্রেতা উক্ত পশুকে নিয়া না যায় এবং উহা বিক্রেতার বাড়ীতে মারা যায় সে ক্ষেত্রে ক্ষতি ক্রেতার পক্ষেই হইবে (ক্রীতদাস বিক্রয় দৃষ্টান্তে এই মছআলাহ্ বর্ণিত হইয়াছে, আলমগীরী, ৩—২২পৃঃ)

এইরূপ ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা উহা অন্যত্র বিক্রি করে এবং লাভ হয় তবে সেই লাভের অধিকারী ক্রেতাই হইবে—এমনকি বিক্রেতাকে সম্মত রাখিয়া যদি ক্রেতা এখনও মূল্য পরিশোধ না-ও করিয়া থাকে। অবশ্য যদি বিক্রেতা মূল্যের জন্য পশুকে আটক দিয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে লাভ-লোকসান উভয়ই বিক্রেতার পক্ষে হইবে। ● কোন বস্তুর ক্রয় বা বিক্রয় মহিলার দ্বারা সম্পাদিত হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে (২৮৮ পৃঃ)। ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়ত বিরোধী শর্ত করা হইলে? (২৯০ পৃঃ)। এ সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনই করা হয় ঐরূপ শর্তের সহিত তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইবে; পুনরায় ঐরূপ শর্ত ছাড়িয়া বিক্রি সম্পাদন করিতে হইবে। আর যদি বিক্রি সম্পাদনকালে নয়, উহার পূর্বে সেই শর্তের আলোচনা হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে বিক্রি শুদ্ধ হইবে, শর্ত বাতিল গণ্য হইবে। ● খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং উহা খাওয়া (২৯৬ পৃঃ ৫৫ হা)। অর্থাৎ খেজুর গাছের মাথির মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ মাদকতার ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য উহা খাওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় করা দোষণীয় নহে। ● ক্রয় বিক্রয়, লেন-দেন ইত্যাদি বিনিময়-বন্ধনে দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গৃহীত হইবে (২৯৪ পৃঃ)। অর্থাৎ—ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েরই নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ হয় না; সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ ও নিষ্পন্ন পরিগণিত হইবে এবং

---

* প্রকাশ থাকে যে, ক্রেতার হস্তগত করার যে অর্থ শরীয়তে উদ্দেশ্য তাহা ১০৮১ নং হাদীছের ব্যাখ্যার ফুটনোটে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেমতে পশুটি বিক্রয়ের পর ঐরূপ কথা ও ব্যবস্থা সম্পাদনে ক্রয়কৃত পশু ক্রেতার হস্তগত করা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যদিও উহা স্পর্শও করে নাই।

অনুল্লেখ বিষয়ে দেশ-চল অর্থই প্রযোজ্য হইবে। যেমন, "সের"-এর পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ—৮২৸/০, ৮০ তোলা, ৬০ তোলা, কোন দেশে ৪০ তোলা। ক্রয়-বিক্রয়কালে সাধারণতঃ শুধু সের উল্লেখ হয়, উহার ব্যাখ্যা ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ উল্লেখ হয় না, সে জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধতায় কোন ত্রুটি হইবে না এবং প্রত্যেক দেশে দেশ-চল অর্থই প্রযোজ্য হইবে, উহার ব্যতিক্রম দাবী প্রত্যাখ্যান হইবে। তদ্রূপ জমির পরিমাপ বোধক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ এবং বিভিন্ন বস্তুর সংখ্যা নির্দ্ধারক পারিভাষিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। এক্ষেত্রেও প্রত্যেক অঞ্চলে তথাকার দেশ-চল ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হইবে। এরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রেই দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হওয়াই সাব্যস্ত। যেমন—হাসান বছরী (রঃ) একদা এক ব্যক্তি হইতে একটি গাধা এক রোজের জন্য বিনিময় নির্দ্ধারিত করিয়া কেরায়া নিলেন; পরের দিনও পূনরায় ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার গাধাটা দাও; সে দিয়া দিল; উভয়ের মধ্যে এই বিনিময় নির্দ্ধারণে কোন কথা হইল না। এরূপ ক্ষেত্রে কেরায়া নিষ্পন্ন ও সিদ্ধ সাব্যস্ত হইবে এবং পূর্ব দিনের বিনিময় পরিমাণই প্রযোজ্য হইবে। কারণ, এরূপ লাগালাগি আদান-প্রদান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বারে নুতন কোন কথা উল্লেখ করা না হইলে সচরাচর প্রথমবারের অনুরূপই সাব্যস্ত হইয়া থাকে। ● জমি, বাড়ী বা যে কোন বস্তুর মধ্যে নিজের অংশ ভাগ বন্টনের পূর্বে অংশীদারের নিকট বা অন্যের নিকট বিক্রি করা জায়েয আছে (২৯৪ পৃঃ)। ● কেহ অন্য কোন ব্যক্তির জিনিষ বিক্রি করিয়া দিল অতঃপর সেই মালিক ব্যক্তি উহাতে সম্মতি দান করিল—উক্ত ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে (২৯৪ পৃঃ)। কোন অমোসলেম এমনকি যদি সে বিদেশীও হয় সে তাহার মালিকানার কোন জিনিষ বিক্রয় করিলে বা দান করিলে সেই দান শুদ্ধ পরিগণিত হইবে (২৭৫ পৃঃ)। অর্থাৎ অমোসলেমদের মধ্যে মালিকানা সত্ব লাভের প্রথা ও রীতি-নীতি শরীয়ত বিরোধীও রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম সূত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে; এতদসত্তেও বাস্তবে উহা অন্যের হক বলিয়া প্রমাণ ও দাবী না থাকিলে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্পাদিত লেন-দেন শুদ্ধ গণ্য হইবে।

● শুকর ক্রয়-বিক্রি মোসলমানের জন্য হারাম। কোন মোসলমানের সত্বাধিকারে শুকর থাকিলে উহা যে কেহ মারিয়া ফেলিতে পারিবে; তাহার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। ● শাসন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলে তাহাকে তাহার জায়গা-জমি ইত্যাদি বিক্রি করায় বাধ্য করিতে পারে। নবী (দঃ) মদীনার বিভিন্ন ইহুদী গোত্রকে তাহাদের সম্পাদিত সহ-অবস্থান ও শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করার এবং উস্কানীমূলক কার্য্য কলাপের অপরাধে মদীনা হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত তাহাদিগকে অবগত করিয়া তাহাদের মালামাল বিক্রি করার আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যাহা বাকি থাকিবে তাহা রাষ্ট্রয়াত্ব করা হইবে (২৯৭ পৃঃ)। ● পশুর বিনিময়ে পশু বিক্রয় করতঃ এক পক্ষের নগদ তথা উপস্থিত প্রদান অপর পক্ষের বাকি—ইমাম বোখারীর

মতে জায়েয (২৯৭ পৃঃ)। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব এই যে, উভয় পক্ষের পশু যদি এক জাতীয় না হয় এবং বাকি পক্ষের পশুটাও নির্দিষ্টকৃত হয়—শুধু হস্তান্তর বাকি থাকে সে ক্ষেত্রে বিনিময় শুদ্ধ হইবে ; আর যদি এক জাতীয় হয় কিম্বা বাকি পক্ষের পশুটা নির্দিষ্টকৃত না হয় শুধু কেবল বর্ণনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তবে জায়েয ও শুদ্ধ হইবে না। কারণ, পশু এমন বস্তু যাহা বর্ণিত গুণাবলীর মধ্যে থাকিয়াও মূল্যমানে পার্থক্য হইয়া থাকে, অতএব বাকিটা আদায় করার বেলায় বিবাদের সৃষ্টি হইবে। এই জন্যই টাকার বিনিময়েও অনির্দিষ্ট পশু বাকি ক্রয় করা, যেমন—নির্দ্ধারিত বিবরণের দশটি গরু বা বকরি খরিদ করিল যাহা সম্মুখে উপস্থিত নাই, বিক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দিবে ; এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ তথা বাধ্যতামূলক হয় না। উপস্থিত নির্দিষ্ট পশুর বিক্রয় সব রকমেই শুদ্ধ ও জায়েয হয়, এমনকি একটি ভাল গরু তিনটি মন্দ বা ছোট গরুর সহিত বিনিময় করা জায়েয আছে। উভয় দিকে একই জাতীয় পশু হওয়া সত্ত্বেও বেশ-কমরূপে বিনিময় করা জায়েয, অথচ ফল বা ফসল কিংবা ধাতব জিনিষের বিনিময়ে উভয় দিক এক জাতীয় হইলে বেশ-কমরূপে বিনিময় জায়েয হয় না—যাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে শরীয়তের পরিভাষায় "বাইয়ে-সলম" বলে। বাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত আছে যাহা বিভিন্ন সুস্পষ্ট হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়া ফেকাহ শাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায়, ঐ সমস্ত শর্তের লঙ্ঘন হইয়া থাকে। শর্ত লঙ্ঘন হইলে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হয়—বাধ্যতামূলক হয় না ; যে কোন পক্ষ উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

১১২৩। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال

قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ

فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْءٍ فَفِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলেন তখন মদীনা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে খেজুরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত ছিল, এমনকি তাহারা দুই-তিন বৎসরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যে কেহ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিবে তাহাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ওজনের মধ্যে করিতে হইবে এবং বিক্রয় বস্তু প্রদানের দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পরিমাণ ও ওজনের নির্দিষ্টতা দুই প্রকারে হইবে—সংখ্যার দিক দিয়া, যে—কত মণ বা কত সের বা কত ধামা এবং পরিমাণের দিক দিয়া অর্থাৎ কোন অঞ্চলে যদি বিভিন্ন পরিমাণের ওজন ও পরিমাপ প্রচলিত থাকে যেমন সেরের ওজন ৮২৷৷৵০, ৮২, ৬০, ৪০—তোলা সে স্থলে একটি পরিমাপ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি শুধু একই পরিমাণ প্রচলিত হয় তবে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করিতে হইবে না, প্রচলিত পরিমাণই সাব্যস্ত হইবে।

তারিখের নির্দিষ্টতা এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকার অনির্দিষ্টতার অবকাশ না থাকে। যদি এইরূপ নির্দিষ্ট করে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন বাড়ী আসিবে বা যে দিন মালের পার্শ্বেলে আসিবে সেদিন প্রদান করিব তবে উহা শুদ্ধ হইবে না। ক্রয় বিক্রয় চূড়ান্ত করার সময় নির্দিষ্ট দিন-তারিখ অবশ্যই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

১১২৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় ছাহাবীগন গমের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিতেন কি? তিনি বলিলেন, আমরা সিরিয়াস্থ এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে গম, যব এবং যাইতুনের তৈল নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দিষ্ট তারিখে অগ্রিম ক্রয় করিতাম।

জিজ্ঞাসাকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার নিকট হইতে সেই বস্তু অগ্রিম ক্রয়-করিতেন তাহা কি সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিদ্যমান ও প্রস্তুত থাকিত? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বিক্রেতাদের নিকট আমরা সেই প্রশ্ন করিতাম না।

জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি এই বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে আব্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও ঐরূপই বলিলেন যে—(আমরা) ছাহাবীগণ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অগ্রিম ক্রয় করিতাম, কিন্তু বিক্রেতা-দের নিকট এই প্রশ্ন আমরা করিতাম না যে, এই (বিক্রিত) ফসল তোমাদের নিকট মৌজুদ আছে কি—না?

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য বাইয়ে-সলম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি বিশেষ শর্ত এই যে, ক্রয়কৃত বস্তুটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা চাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বিক্রেতার স্বহস্তে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বরং সেই অঞ্চলে বা এমন স্থানে বিদ্যমান থাকা যথা হইতে আমদানী করা বিক্রেতার জন্য সম্ভব সাধ্য হয়। বিক্রেতার নিজ হস্তে বিদ্যমান থাকা যে আবশ্যক নহে তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি যাহার জমি নাই সেও শস্য ফসল শ্রেণী বস্তু অগ্রিম বিক্রি করিতে পারে, যাহার বাগান নাই সেও ফল-শ্রেণীর বস্তু অগ্রিম বিক্রয় করিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য বাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাতটি সর্ত আছে— (১) ক্রয় বস্তু কি জাতীয় হইবে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা।

(২) ক্রয় বস্তুর গুণাগুণ পূর্ণরূপে বর্ণনা ও নির্দ্ধারণ করা। (৩) ক্রয় বস্তুর পরিমাপ ও ওজন বা সংখ্যা পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করা। (৪) ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করা (৫) ক্রয় বস্তু সেই অঞ্চলে প্রাপ্তির সুযোগ থাকা। (৬) বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট ক্রয় বস্তু অর্পণের স্থান নির্দিষ্ট হওয়া—যদি উহা স্থানান্তর করা ব্যয়সাপেক্ষ হয়। (৭) অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা কর্তৃক মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিয়া দেওয়া।

এই সমস্ত শর্তের কোন একটি লংঘন করা হইলে সে স্থলে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং প্রত্যেকেই স্বীয় বাক্য হইতে সরিয়া যাওয়ার অধিকারী থাকিবে; কোন পক্ষই অপর পক্ষকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর বাধ্য করিতে পারিবে না।

একটি বিশেষ মছআলাহ:—

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রয় বস্তু শ্রেণীগত, রূপগত এবং গুণাগুণগত যথাসাধ্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক। কিন্তু উহাকে নির্দিষ্ট করা, যেমন—এই গাছের বা এই বাগানের ফল কিম্বা এই জমিনের ধান; এইভাবে নির্দিষ্ট করিয়া অগ্রিম বিক্রয় করা; সেই ফল ও ফসলের জন্ম হইয়া থাকুক কি না হইয়া থাকুক উভয় অবস্থাতেই নাজায়েয। কারণ জন্মিয়া না থাকিলে সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বস্তু উহার অস্তিত্ব ছাড়া বিক্রয় করা হইল; আর জন্মিয়া থাকিলে অগ্রিম ক্রয়ের অর্থ এই যে, ফল বা ফসল পাকা পর্য্যন্ত গাছে বা জমিনে থাকার শর্তে ক্রয় করা হইয়াছে—উভয়টিই নাজায়েয। নিম্নের হাদীছে এই মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে—

১১২৫। হাদীছ:—আবুল বখতারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)কেও ঐ মছআলাই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করিতে নবী (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর বিক্রয় উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ই হইতে পারে; আর উহার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

মছআলাহ:—নির্দিষ্ট (Bill of Loading তথা) ফর্দ বা তালিকার মাল, কিম্বা নির্দিষ্ট জাহাজে বহিত মাল অথবা নির্দিষ্ট কল বা কারখানার তৈরী মাল ইত্যাদি কোন বিশেষ প্রকার নির্দ্ধারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা পণ্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয; সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না।

মছআলাহ:—মূল্য নগদ পরিশোধ করিয়া অগ্রিম ক্রয় ক্ষেত্রে ক্রয় বস্তু পাইবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জামিন বা বন্ধক গ্রহণ করা যায়।

হক্বে-শোফার বিবরণ

(১) একটি বাড়ী বা জমিনের উপর কতিপয় অংশীদার মালিক আছে তন্মধ্যে কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে অংশীদারগণ (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামুলক বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ ঐ পরিমাণ মূল্যে সেই অংশ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। (২) কতিপয় ব্যক্তির বাড়ী বা বাগান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নই আছে, কিন্তু ঐ বাড়ীতে বা বাগানে যাতায়াতের রাস্তা-ঘাট এক ও এজমালী, তাহাদের কোন ব্যক্তি স্বীয় বাড়ী-বাগান কোন অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে, ঐ এজমালী রাস্তা-ঘাট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকার থাকিবে যে, (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ ঐ মূল্যে তাহারা সেই বাড়ী বা বাগানকে ক্রয় করিয়া লয়। (৩) একটি বাড়ী বা জমিনের পড়শী আছে ঐ বাড়ী বা জমিন সেই পড়শী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট বিক্রিত হইলে ঐ পড়শী (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ সম মূল্যে ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

উক্ত তিন প্রকার অধিকারকে "হক্বে-শোফা" বলা হয়। এই অধিকারত্রয় শ্রেণী পর্য্যায়ে বলবৎ হইবে। অর্থাৎ প্রথম নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী সর্বাগ্রে, অতঃপর দ্বিতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী, অতঃপর তৃতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারীকে হক্বে-শোফার অধিকার দান করা হইবে।

১১২৬। হাদীছ ঃ— عن جابر رضى الله تعالى عنه قال

قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ -

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই হুকুম ও ফয়ছালা জারী করিয়াছেন যে, এজমালী বাড়ী বা জমিনের উপর (অংশীদারী) হক্বে-শোফার অধিকার থাকিবে যাবৎ উহা ভাগ বন্টন করা না হয়। প্রত্যেকের অংশ ভাগ-বন্টন করিয়া সীমানাযুক্ত করিয়া এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ রাস্তা-ঘাট ভিন্ন করিয়া লওয়ার পর (অংশীদার সম্বন্ধীয়) হক্বে-শোফার অধিকার বাকি থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—পুর্বেই বলা হইয়াছে, হক্বে-শোফার অধিকার তিন প্রকারে হইয়া থাকে। অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ-বন্টন এবং রাস্তা-ঘাট ভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকে না, অবশ্য তৃতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকিবে।

হক্বে-শোফার অধিকারীকে প্রথম আহ্বান করা

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, হক্বে-শোফার অধিকারী অন্যের নিকট বিক্রি করার অনুমতি দিলে সেক্ষেত্রে তাহার হক্বে-শোফার অধিকার থাকিবে না।

শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, হক্কে-শোফার অধিকারীর সম্মুখে ঐ বাড়ী বা জমিন বিক্রি হইতেছে, সে তাহাতে বাধা দেয় না, তবে তাহার হক্কে-শোফা খর্ব হইবে।

১১২৭। হাদীছঃ—আমর ইবনে শরীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সায়াদ ইবনে আবি অক্কাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম, মেসওয়ার (রাঃ)ও তখন ঐ স্থানে পৌছিলেন; এমতাবস্থায় আবু রাফে (রাঃ) তথায় পৌছিলেন এবং সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলিলেন, আপনার বাড়ী সংলগ্ন আমার ঘর দুইটি আপনি ক্রয় করিয়া লউন। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কস্মিনকালেও উহা ক্রয় করিব না। (তখন আবু রাফে (রাঃ) মেছওয়ার (রাঃ)কে এই বিষয়ে সাহায্যের অনুরোধ জানাইলেন।) সেমতে মেছওয়ার (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খোদার কসম—আপনি অবশ্যই উহা ক্রয় করিয়া লইবেন। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কিন্তু—চার হাজার রৌপ্য মুদ্রার উর্দ্ধে উহার মূল্য দিব না—তাহাও কিস্তিতে আদায় করিব। তখন আবু রাফে' (রাঃ) বলিলেন, এই ঘরদ্বয়ের বিনিময়ে অন্য লোকে আমাকে নগদ পাচ শত স্বর্ণ মুদ্রা (যাহার মূল্য চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা হইতে অনেক অধিক) দিতেছিল, কিন্তু আমি যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে না শুনিতাম যে, "পড়শী তাহার নিকটবর্তীতার হক, তথা হক্কে-শোফার মধ্যে (দুরস্থিত লোকদের তুলনায়) অগ্রগণ্য" তবে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা লাভের সুযোগ পাওয়া অবস্থায় চার হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কখনও এই ঘর দিতাম না। এই বলিয়া তিনি সায়াদ (রাঃ)কে ঘর দিয়া দিলেন।

মছআলাহঃ—হক্কে-শোফার অধিকারী অপর ক্রেতার সমমূল্য প্রদানে রাজী না হইলে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনায় হযরতের হাদীছের প্রতি বিশেষ অনুরুক্তি বসে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে—অন্যের অপেক্ষা কম মূল্যে দিয়াও প্রতিবেশীকে অগ্রগণ্য করা হইয়াছে।

মছআলাহঃ—বাড়ীর একাধিক পড়শীর ক্ষেত্রে যাহার বাড়ীর সদর দরজা অধিক নিকটবর্তী তাহাকে অগ্রগণ্য করা হইবে।

পারিশ্রমিক প্রদানে কাহারও দ্বারা কাজ নেওয়া

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে একটি ঘটনার বর্ণনা দানে বলিয়াছেন—

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"সর্বোত্তম শ্রমিক শক্তিশালী আমানতদার বিশ্বস্ত শ্রমিক" এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক নিয়োগ করা কালীন শ্রমিক সৎ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

মোসলমান শ্রমিক না পাইলে অমোসলেম নিয়োগ করা

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'খয়বর' জয় করিয়া উহার ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তথাস্থিত বাসিন্দা ইহুদীদিগকেই উৎপন্নের ভাগীরূপে কাজ করার জন্য দিয়াছিলেন। (কারণ তথায় মোসলমানদের বসবাস ছিল না)।

১১২৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) হিজরত করা কালীন বনী-দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে মজুরী দানে তাঁহাদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শকরূপে যাওয়ার জন্য সাব্যস্ত করিলেন; ঐ ব্যক্তি অমোসলেম ছিল, উহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল, তাই তাঁহারা তাঁহাদের যানবাহন ঐ ব্যক্তির হাওয়ালা করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, (আমরা অদ্যই রওয়ানা হইব,) তিন রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের যানবাহন লইয়া তুমি 'ছওর' পাহাড়ের গুহার নিকট উপস্থিত হইও। ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল—তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর যানবাহন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সমুদ্র-কূলের পথে মদীনা যাত্রা করিল।

শ্রমিক মজুরী না নিয়া চলিয়া গেলে উহা তাহার প্রাপ্য থাকিবে

১১২৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, পূর্বকালের কোন এক উম্মতের তিন ব্যক্তি একদা ভ্রমণে বাহির হইল এবং পথিমধ্যে বৃষ্টিপাত আরম্ভের দরুন তাহারা একটি পাহাড়ীয় গুহার ভিতর আশ্রয় নিল এবং তথায় তাহারা নিদ্রার ব্যবস্থাও করিল। হঠাৎ একটি বিরাট পাথর পাহাড় হইতে পিছলিয়া পড়িয়া গুহার মুখকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দিল এবং ঐ তিন ব্যক্তি গুহার ভিতর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সর্বোত্তম নেক আমল উল্লেখ পূর্বক উহার অছিলা ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর, ইহা ব্যতিরেকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখা যায় না।

অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এইরূপে দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া আমার স্ত্রী-পুত্র, চাকর-চাকরানীকে খাইতে দিতাম না। এক দিনের ঘটনা এই যে, আমি কোন জিনিসের তালাশে বহু দূরে চলিয়া যাই, তথা হইতে আমার ফিরিতে রাত্র হইয়া যায়। আমি বাড়ী আসিয়া দুগ্ধ দোহন করতঃ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি তাঁহারা উভয়েই নিদ্রামগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের পূর্বে আমার স্ত্রী-পুত্র চাকর-চাকরানীকে আহার করিতে দেওয়া আমি ভাল মনে না করিয়া দুগ্ধের পেয়ালা

হাতে লইয়া আমি তাঁহাদের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমি তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছিলাম; সারা রাত্র আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এদিকে আমার ছেলেমেয়েরা ঐ দুগ্ধ পানের জন্য আমার পায়ে পড়িয়া চিৎকার করিতেছিল। এই অবস্থায় রাত্র প্রভাত হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা নিদ্রোত্থিত হইলেন এবং সেই দুগ্ধ পান করিলেন। মাতা-পিতার খেদমতে এইরূপে আত্মনিয়োগ করা—হে অন্তর্য্যামী খোদা। তুমি জান যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই করিয়াছি, তাই তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদের হইতে এই পাথরের বিপদ দূর করিয়া দাও। এই দোয়া করার পর পাথরটি কিছু পরিমাণ গুহা-মুখ হইতে সরিয়া পড়িল, গুহা-মুখ অল্প পরিমান উন্মুক্ত হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ প্রশস্ত নহে।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমার চাচার সম্পর্কীয় একটি ভগ্নি ছিল; আমি তাঁহার প্রতি অত্যাধিক আসক্ত ছিলাম। আমি তাহাকে বহুবার আমার মনোবাঞ্ছা পুরণের আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু সে কখনও আমার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই, সর্বদা সে নিজকে পবিত্র রাখিয়াছে। অতঃপর এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের বৎসর সে আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে এক শত কুড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলাম এই শর্তে যে, সে নিজেকে আমার জন্য ছাড়িয়া দিবে। সে তখন অগত্যা রাজী হইল। আমি যখন দীর্ঘ দিনের কামনা পূরণের জন্য উদ্যত হইয়া তাহার মুখামুখী বসিলাম তখন সে আমাকে বলিল, হালাল ও জায়েয সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া চিরজীবনের অস্পর্শিত বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করিতে আমি তোমাকে সম্মতি দেই না, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তখন এই কার্য্যকে গোনাহ ও পাপ বলিয়া উপলব্ধি করার সুবুদ্ধি আমার উদয় হইল এবং পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচিবার মানসে তাহাকে স্পর্শ না করিয়া সরিয়া পড়িলাম, অথচ সে আমার অত্যাধিক আসক্তির বস্তু ছিল, এবং ঐ একশত কুড়িটি স্বর্ণ-মুদ্রা তাহাকে দিয়া দিলাম। হে অন্তর্য্যামী আল্লাহ! তুমি জান, একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি স্বীয় বাসনা পুরণের সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদমুক্ত কর। তখন গুহার মুখ আরও উন্মুক্ত হইল, কিন্তু এইবারও মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ হইল না।

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমি কতিপয় মজুরকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় মজুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একজন তাহার মজুরি না লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মজুরি ছিল এক ধামা ধান। আমি ঐ ধানকে বপন করিলাম এবং উহার উৎপন্নের আয় দ্বারা উট ক্রয় করিলাম এইরূপে গরু, ছাগল এবং ক্রীতদাস ক্রয় করিলাম। কিছুদিন পর ঐ মজুর আসিল এবং মজুরির দাবী জানাইল। আমি তাহাকে বলিলাম,

এই সব গরু, ছাগল, উট ও ক্রীতদাস সমস্তই তোমার। সে বলিল, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিবেন না; আমি বলিলাম, বিদ্রূপ আমি মোটেই করি না (—এই বলিয়া তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা বলিলাম।) তখন সে ঐ সব লইয়া চলিয়া গেল। হে আল্লাহ! তুমি জান, আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছিলাম; তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর। তৎক্ষণাৎ গুহার মুখ পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল তাহারা গুহা হইতে বাহির হওয়ায় সক্ষম হইল।

ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্যের বিনিময় গ্রহণ করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময় গ্রহণ করার তুলনায়) আল্লার কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার সুস্পষ্ট।

বিশিষ্ট তাবেয়ী শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কালাম শিক্ষা দানকারী বিনিময়ের শর্ত করিতে পারিবে না। শর্তহীন অবস্থায় তাঁহাকে কিছু দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, শিক্ষকতার বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয বা মকরুহ নহে।

ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, ভাগ-বণ্টনকারী আমিন ইত্যাদিকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দান করা দোষণীয় নহে; ইহাকে উৎকোচ বলা হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—বিচার কার্য্যে বাদী বিবাদীর নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে উহাকে উৎকোচ বলা হইবে—যাহা হারাম। এবং উহা সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, উৎকোচের ধন উপভোগকারীর দেহ জাহান্নামের অগ্নিরই উপযোগী।

কোন কোন আলেমের মতে জরিপ কার্য্যের দ্বারা ভাগ-বণ্টন করা বিচার বিভাগীয় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই এই কাজের ব্যক্তিগণ সরকারীভাবে নিয়োজিত হইবে। পক্ষদ্বয়ের নিকট হইতে তাহারা কিছু গ্রহণ করিবে না।

১১৩০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ত্রিশ জন) ছাহাবীর একটি দল (জেহাদের জন্য) ভ্রমণ অবস্থায় (রাত্রিবেলা) কোন এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বস্তিবাসিদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইলেন। বস্তিবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার সহায়তা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমতাবস্থায় বস্তির সর্দার সর্প দংশিত হইল এবং বস্তিবাসিগণ তাহার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-তদবীর করিল; কোন ফল লাভ হইল না। তখন তাহাদের কেহ কেহ এরূপ পরামর্শ দিল যে, রাত্রিবেলা যে একদল বিদেশী পথিক আসিয়াছিল তাহাদের খোজ করিয়া দেখা যাউক; তাহাদের নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর থাকিতে পারে। অতঃপর বস্তিবাসিদের এক প্রতিনিধি দল ছাহাবীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল

যে, আমাদের বস্তির সর্দার সর্প দংশিত হইয়াছে এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর বিফল গিয়াছে; আপনাদের কাহারও নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর আছে কি? ছাহাবীদের মধ্য হইতে একজন (দাঁড়াইলেন—যাহাকে আমরা ঝাড়-ফুঁককারী ধারণা করিতাম না; তিনি) বলিলেন, হাঁ—আমি ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলাম আপনারা তাহাতে সম্মত হন নাই, এখন আমি ঝাড়-ফুঁক করিব না—যাবৎ আমাকে বিনিময় দান না করিবেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে এক দল (ত্রিশটি) বকরি দান করা সাব্যস্ত হইল এবং ঐ ছাহাবী সেই দংশিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া "আলহামদু" সুরা পাঠ করতঃ তাহার উপর (সাতবার) ফুঁক দিলেন। দংশিত ব্যক্তি পূর্ণ মুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ চলাফেরা করিতে লাগিল; সে যেন পূর্বে অসুস্থই ছিল না। তখন বস্তিবাসীগণ নির্দ্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করিয়া দিল। ঐ ছাহাবী ফিরিয়া আসিলে সকলেই অবাক হইলেন এবং বলিলেন, আপনি ত ঝাড়-ফুঁকের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না। ছাহাবীগণের কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, এই সব বকরি আমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ঝাড়-ফুঁককারী ছাহাবী বলিলেন, এখন কিছুই করিবেন না, যাবৎ আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত না করি এবং এই ব্যাপারে তাঁহার অভিমত না শুনি।

ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি কিরূপে জান যে, এই সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়? (ছাহাবী বলিলেন, আমার মনে এরূপ জাগিয়াছিল।) নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা কোন অশুদ্ধ কাজ কর নাই; (সৌজন্যমূলক ভাবে) সকলে ইহা বন্টন করিয়া লও এবং হাসিমুখে বলিলেন—আমার জন্যও এক অংশ রাখ।

রক্তমোক্ষণ কার্য্যের পারিশ্রমিক

১১৩১। হাদীছ:—তাবেয়ী আমর ইবনে আমের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করাইতেন এবং (রক্তমোক্ষণকারী) কাহাকেও তাহার পারিশ্রমিক কম দিতেন না।

ব্যাখ্যা:—পূর্বে এক হাদীছে রক্তমোক্ষণ কার্য্যের উপার্জনকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অথচ উল্লিখিত হাদীছ এবং ১০৭৬ ও ১০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বয়ং এই কার্য্যের পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। রক্তমোক্ষণ সম্পর্কীয় হাদীছ দৃষ্টে দুইটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়—প্রথম এই যে, রক্তমোক্ষণ কার্য্যের উপার্জন নিষিদ্ধ অর্থাৎ পছন্দনীয় নহে অবশ্য হারামও নহে। দ্বিতীয় এই যে, গ্রহীতার জন্য এরূপ উপার্জনে লিপ্ত না হওয়া চাই, কিন্তু দাতার কর্তব্য এই যে, কোন মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইবে না।

ষাড়ের পাল ও প্রজননের মজুরি

১১৩২। হাদীছ:— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ـ

অর্থ—আবছল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ষাড় দ্বারা পাল প্রজনন (Breeding) দিয়া উহার বিনিময় ও মজুরি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন— উক্ত কার্য্যের বিনিময় ও মজুরী গ্রহণ নিষিদ্ধ ও হারাম। ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন— এই নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক এবং মোসলেম জাতি ও সমাজের বৈশিষ্টতা-সুলভ নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ মোসলেম জাতি মহান ও উচ্চতর জাতি; তাঁহাদের কার্য্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জন ও আচার-ব্যবহার উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত কার্য্যের দ্বারা পরোপকার করার সুযোগ কোন মোসলমানের থাকিলে বিনিময় ব্যতিরেকেই সেই কার্য্য সমাধা করিয়া দিবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শ্রমিকের অগ্রিম বিনিয়োগ শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেমন--অদ্য বিনিয়োগ সাব্যস্ত হইল, কিন্তু কাজে যোগ দিবে তিন দিন, এক মাস বা এক বৎসর পর—এরূপ চুক্তি শুদ্ধ ও বাধ্যতামুলক হইবে। কাজে যোগদানের নির্দ্ধারিত সময় আসিলে উভয়ে চুক্তি রক্ষায় বাধ্য থাকিবে (৩০১ পৃ:)। ● কাজের চুক্তি না করিয়া সময়ের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা জায়েয। (ঐ) ● সময়ের চুক্তি না করিয়া নির্দ্ধারিত কাজের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করাও জায়েয। (ঐ)।

সময়ের চুক্তিতে সময়ের নির্দ্ধারণ আবশ্যক; যে কোন সূত্রেই নির্দ্ধারণ হউক। যেমন, অর্দ্ধ দিন বা আছরের নামায পর্যন্ত (৩০২ পৃ:)। ● শ্রমিকের পারিশ্রমিক না দেওয়া এত বড় গোনাহ যে, কেয়ামতের দিন ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বাদী হইবেন (ঐ)। ● সাধারণ্যে সময় নির্ধারণ যে সূত্রে বুঝিতে পারে উহা দ্বারাই সময়ের চুক্তি শুদ্ধ হইবে। যেমন—আছর হইতে রাত্র পর্যন্ত (ঐ)। ● কোন জিনিষ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে দালালী করার পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি এরূপ চুক্তি করে যে, আমার এই কাপড় বিক্রি করিয়া দাও, মুল্য এত টাকার উপরে যাহা হইবে তাহা তোমার—ইহা জায়েয। ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, এরূপ চুক্তি করা জায়েয যে, আমার এই জিনিয এত টাকায় বিক্রি কর; ইহাতে লভ্যাংশ আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টিত হইবে (৩০৩ পৃ:)। ● কোন মোসলমান

বিশেষ প্রয়োজনে অমোসলেমদের চাকুরী করিতে পারে। (৩০৪ পৃ:)। (অবশ্য এরূপ কাজের চাকুরী করিতে পারিবে না যে কাজ মোসলমানের জন্য করা জায়েয নহে বা যে কাজে মোসলেম জাতির ক্ষতি সাধন হয়। সকল ইমামগণেরই মজহাব এই যে, মোসলমান দেশে কোন মোসলমান অমোসলেমের এরূপ চাকুরী গ্রহণ করিবে না যাহা অতি নিম্নস্তরের কাজ ; যেমন, বাড়ী-ঘরে সাধারণ কাজ-কর্মের চাকর বা ভৃত্য হওয়া।) (ফতহুলবারী, ৪—৩৫৭)।

● বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন হারাম ; তদ্রূপ যে কাজ শরীয়তে নাজায়েজ উহার উপার্জনও নাজায়েজ (ঐ)। ● কোন কিছু কেরায়ার উপর গ্রহণ করা হইলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কোন পক্ষের মৃত্যু হয় তাহাতে চুক্তি ভঙ্গ হইবে না, চুক্তির মেয়াদ পর্য্যন্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে। মৃত্যু পক্ষের উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে (৩০৫)। (ইহা অধিকাংশ ইমামগণের মত। হানাফী মজহাব মতে যে কোন এক পক্ষের মৃত্যুতে সাধারণতঃ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে ; তাহার উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য হইবে না, যদিও চুক্তির মেয়াদ বাকি থাকে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে চুক্তি বলবৎ থাকিবে। এনায়াহ্—শরহে হেদায়াহ দ্রষ্টব্য)।

এক জনের দেনা অন্য জনের উপর বরাত দেওয়া

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, একজনের ঋণ অপর জনের উপর দেওয়া তখনই শুদ্ধ হইবে যখন ভার অর্পণকালে অর্পিত ব্যক্তি উক্ত ঋণ আদায়ের সামর্থবান হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ পরস্পর সম্পত্তি এইরূপে বণ্টন করিয়াছে যে, একজনে নগদ মালামাল নিয়াছে এবং আর একজনে অপরের নিকটে পাওনা ঋণ বুঝিয়া নিয়াছে। সে ক্ষেত্রে যদি ঐ ঋণ উসুল না হয় সেজন্য সে নগদ মালামাল গ্রহণকারীর উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না (৩০৫)।

১১৩৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দেনা পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারকে ঘুরানো প্রকৃত প্রস্তাবে জুলুম ও বড় অন্যায়। কাহারও পাওনা পরিশোধে দেনাদার কর্তৃক কোন সামর্থবান ব্যক্তির বরাত দেওয়া হইলে সেই বরাত গ্রহণ করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার গছিয়া লওয়া

১১৩৪। হাদীছ ঃ—সালামা-ভুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইল এবং সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে জানাযার নামায পড়াইবার অনুরোধ করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। হযরত (দঃ) তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইলে সকলেই হযরত (দঃ)কে জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর কোন ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—হাঁ। তিনটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে। হযরত (দঃ) তাহারও জানাযার নামায পড়াইলেন।

অতঃপর তৃতীয় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইল এবং সকলেই নবী (দঃ)কে তাহার জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ—তিন দিনার। তখন নবী (দঃ) (স্বয়ং তাহার জানাযার নামায পড়াইতে অস্বীকার করতঃ) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন, তোমরা তাহার জানাযার নামায পড়। এই অবস্থা দৃষ্টে আবু কাতাদা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিন, তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গছিয়া নিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু কাতাদা (রাঃ)কে বলিলেন, এই দিনার কয়টি পরিশোধ করা তোমার জিম্মায় রহিল এবং মৃত ব্যক্তি খালাস পাইয়া গেল? আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন---হাঁ। হযরত তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাৎ হইত; তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, দিনার কয়টির কি করিয়াছ? একদা আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! উহা পরিশোধ করিয়া দিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দান করিয়াছ।)

কোন ব্যাপারে জামিন হওয়া বা জামিন গ্রহণ করা

আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) হামজা ইবনে আমর (রাঃ)কে কোন এক এলাকার তশীলদার রূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় এরূপ একটি ঘটনা অবগত হইলেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সঙ্গে যেনা করিয়াছে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে যেনার শাস্তি দান

করিতে চাহিলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকগণ বলিল, এই ঘটনা পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) ইহার শাস্তি দান করিয়াছেন। হামযা ইবনে আমর (রাঃ) আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হইতে উক্ত বিষয়ের সঠিক তথ্য জ্ঞাত হওয়া সাপেক্ষে আসামীর নিকট হইতে এক ব্যক্তির জামিন গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ স্থানীয় লোকগণের খবর সত্যই ছিল—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন।

জ্ঞাতব্য—আসামী ব্যক্তি বিবাহিত ছিল, তাই তাহার উপর যেনার শাস্তি এই ছিল যে, তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করা হউক, কিন্তু এখানে শরীয়তের উপধারা অনুযায়ী উহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তির ধারণা এই ছিল যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের চিজ-বস্তু ব্যবহার করিতে পারে, সেই সূত্রে সে স্ত্রীর ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েয বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। এরূপ একটি স্বাভাবিক হেতুজনক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কার্য্য হওয়ায় তাহার প্রতি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত হইয়া যায়, কিন্তু এরূপ আবশ্যকীয় মছআলাহ হইতে অজ্ঞ থাকায় তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধি কাজীর বিবেচনানুযায়ী তাহাকে একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয়।

● হারেছা ইবনে মোজাররাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একস্থানে প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে ফজরের নামায পড়িলাম (তিনি তখন ঐ এলাকার শাসনকর্তা)। নামাযান্তে এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই বিষয় খবর দিল যে, আমি বনী-হানিফা গোত্রের মসজিদে গিয়াছিলাম; তথাকার (ইমাম ও সরদার) আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহার মোয়াজ্জেনকে "আশহাদু আন্না মোসায়লামাতা রসুলুল্লাহ" (অর্থাৎ মোছায়লামাহ আল্লার রসুল) বলিতে শুনিয়াছি।* আবদুল্লাহ ইবনে

---

* মোছায়লামাহ নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার ছিল, তাই তাহাকে মোছায়লামাহ কাজ্জাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী মোছায়লামাহ বলা হইত। সে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এই মিথ্যা দাবী করিয়াছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ পান নাই। আবু বকর (রাঃ) স্বীয় খেলাফৎ কালে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করেন এবং জেহাদের ময়দানে তাহাকে হত্যা করা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল মনোবৃত্তির নামধারী মোসলমানগণের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তখন একদল মোসলমান নামধারী লোক ইসলামের সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ সেই মিথ্যা দাবীদার মোছায়লামার দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই দলই সময় সময় এক এক স্থানে মাথাচাড়া দিয়া উঠিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপর কুঠারাঘাত হানা হইত। এইরূপেই ছাহাবীগণ ঐ দলকে ভু-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন।

মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে এবং তাহার দলবলকে ধরিয়া আমার সন্মুখে উপস্থিত কর। তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে কতল করার আদেশ করিলেন; তাহাকে হত্যা করা হইল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই দলীয় অন্যান্য (একশত সত্তর জন) লোকদের বিষয় সকলের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) ছাহাবী তাহাদিগকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও আশআ'ছ ইবনে কায়েস (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, না, না, তাহাদিগকে হত্যা করার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাদিগকে কুপথ হইতে তওবা করিয়া সৎপথের প্রতি ফিরিবার সুযোগ দান করুন এবং সেই তওবা অনুযায়ী সঠিকরূপে চলিবার উপর তাহাদের গোত্রীয় সকলকে জামিন সাব্যস্ত করুন। এই পরামর্শই গ্রহণ করা হইল। তাহারা সকলে তওবা করিল এবং তাহাদের গোত্রীয় সকলে তাহাদের জামিন হইল যে, তাহারা ঐ ইসলাম বিরোধী পথে আর যাইবে না, সর্বদা সঠিক ইসলামের পথে থাকিবে।

পাঠকবর্গ! এই ঘটনা প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন—একটি বিষয় এই যে, কাফেররা ইসলামের উন্নতি বিস্তারের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস না পাওয়ার এবং যে কোন ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে ইসলামের ছায়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্র রূপে সমগ্র বিশ্ব তৈরী হয়—এই উদ্দেশ্যে জেহাদ ইসলামের একটি অঙ্গ ও ফরজ রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তরবারি দ্বারা কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নয়। এই দাবীর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বিজিত দেশের অধিবাসিগণকে মোসলেম রাষ্ট্রের প্রতি বিধান-সম্মতরূপে অনুগত হইয়া স্বীয় ধর্মমতের উপর থাকিয়া রক্ষিত অবস্থায় অজস্র সুযোগ-সুবিধা ভোগ পূর্বক শান্তি ও সুখে বসবাস করিতে দেওয়া ইসলামের একটি স্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে—কাহাকেও তরবারি দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না—ইহা ইসলামের বিধান, কিন্তু ইসলামত্যাগীকে তরবারি, বরং যে কোন কঠোর শাস্তি দ্বারা শায়েস্তা করাও ইসলামের একটি বিধান। ইসলাম কাহাকেও জবরদস্তিমূলক স্বীয় দলভুক্ত করিতে চায় না, কিন্তু স্বীয় দলের মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দুর্বলতাও দেখাইবে না। তাই মোরতাদ বা ইসলাম-ত্যাগীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে। শক্তি সামর্থ্য ও মান-মর্য্যাদাধিকারী ন্যায়পরায়ণতার নীতি ইহাই।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হাম্মাদ (রঃ) বলিয়াছেন, কেহ কোন ব্যক্তির জামিন হওয়ার পর ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে না। হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।* (নোটটি পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

১১৩৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা পূর্বকালের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বনী-ইস্রায়ীলের মধ্যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার—স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাহিল। ধারদাতা বলিল, এমন কতেক জন লোক ডাকিয়া আন যাহাদিগকে আমি সাক্ষী করিতে পারি। ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিলাম এবং তিনিই যথেষ্ট। ধারদাতা বলিল, এমন কোন লোক আন যাহাকে জামিন বানাইতে পারি। ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে জামিন বানাইলাম এবং তিনিই যথেষ্ট। ধারদাতা বলিল, আচ্ছ—তোমার কথাই ঠিক; এই বলিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট তারিখে ঐ দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার শর্তে (এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা) ধার দিয়া দিল। ধার গ্রহীতা ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া তথা হইতে রওয়ানা হইল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেল। এদিকে ঐ কর্জ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ নিকটবর্তী হইল; সেই তারিখ মতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধারদাতার নিকট পৌছার জন্য সে সমুদ্রকুলে আসিল, কিন্তু সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল না। তখন ঐ ব্যক্তি একটি কাষ্ঠ আনিয়া উহার মধ্যস্থলে খনন করতঃ উহার মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা এবং একখানা লিপি রাখিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিল। (লিপিখানার বিষয়বস্তু এই ছিল—অমুকের পক্ষ হইতে অমুকের প্রতি। অতপর—আমি আপনার প্রাপ্য টাকা আমার জামিনের নিকট বুঝাইয়া দিলাম—যিনি আমাদের জামিন ছিলেন।) এই ব্যবস্থা করিয়া ঐ ব্যক্তি কাষ্টটি হাতে লইয়া সমুদ্রকুলে উপস্থিত হইল এবং বলিল হে আল্লাহ। তুমি জ্ঞাত আছ, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা ধার লইয়াছিলাম এবং ঐ ব্যক্তি আমার নিকট জামিনের দাবী করিলে আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা জামিন রহিলেন, তিনিই জামিনের জন্য যথেষ্ট। ধারদাতা আমার সেই কথার উপরই সম্মত হইয়াছিল এবং সাক্ষীর প্রস্তাব করিলে আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী থাকিলেন, তিনিই যথেষ্ট। সে উহার উপরও সম্মত হইয়াছিল। আমি নৌকার সন্ধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছি যাহাতে আমি তাহার প্রাপ্য তাহার নিকট পৌছাইতে পারি, কিন্তু আমার কোন চেষ্টা সফল হইল না। এখন আমি তাহার প্রাপ্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে সোপর্দ করিতেছি। এই বলিয়া সে ঐ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সম্বলিত কাষ্ঠখানা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। কাষ্ঠখানা সমুদ্র বক্ষে পতিত হইল এবং ঐ ব্যক্তি তথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে কিন্তু এখনও

---

* হানাফী মজহাব মতে এই মসআলার মীমাংসা এই যে, যাহার পক্ষে জামিন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ আসিবে না। কিন্তু যদি এই কথার উপর জামিন হইয়া থাকে যে, অমুক দিন তাহাকে হাজির করিব, অন্যথায় তাহার উপর প্রাপ্যের জন্য আমি দায়ী হইব। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে জামিন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

শান্ত হইতে পারে নাই—এখনও সে নৌকার সন্ধানে আছে; সঠিকরূপে নিজ হস্তে ঋণদাতার নিকট ঋণ প্রত্যার্পণ করার উদ্দেশ্য।

এদিকে ধারদাতা ব্যক্তিও নির্দিষ্ট তারিখে সমুদ্রকূলে আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছিল এবং তাকাইতে ছিল, কোন নৌকা দেখা যায় কি—না? সে কোন নৌকা দেখিতে ছিল না। হঠাৎ দেখিল, একখানা কাষ্ঠখণ্ড সমুদ্রে ভাসিতেছে; সে উহাকে তুলিয়া লইল এবং জ্বালানিরূপে ব্যবহারের জন্য বাড়ী নিয়া আসিল। উহাকে যখন খণ্ড খণ্ড করিল তখন উহার ভিতরে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সহ লিপিখানা পাইয়া সমুদয় বিষয় অবগত হইল।

কিছু দিনের মধ্যেই ধার গ্রহীতা ব্যক্তি নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধারদাতার নিকট উপস্থিত হইল। (ধারদাতা বলিল, আমার প্রাপ্য কোথায়? আপনি বিলম্বে পৌছিয়াছেন। তখন সে তাহার নিকট) ওজর আপত্তি জানাইতে ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল যে, আমি আপনার নিকট আসিয়া আপনার প্রাপ্য পরিশোধ করার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও এ-যাবৎ সফলকাম হইতে পারি নাই বলিয়া এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি আপনার প্রাপ্য আমার জামিনের হাওয়ালা করিয়া দিয়াছিলাম; এখন পুনঃ এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া তাহাকে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিল। ধারদাতা বলিল, আমি ইহা গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান না করেন। (ধারদাতা ইহাও জিজ্ঞাসা করিল,) আচ্ছা—আপনি কি কোন বস্তু পাঠাইয়া ছিলেন? তখন ঐ ব্যক্তি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল যে, আমি সময় মত নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, সেই জন্য একটি কাষ্ঠ মারফৎ আপনার প্রাপ্য ধন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ধারদাতা বলিলেন, কাষ্ঠ মারফৎ প্রেরিত ধন আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। আপনার এই অপর এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সম্পূর্ণ ফেরৎ লইয়া যান।

মছআলাহ :—কেহ কোন মৃত ব্যক্তির ঋণের জামিন হইলে সেই ঋণ তাহাকে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে; দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না। (৩০৬ পৃঃ)

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

১১৩৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে মোহাজেরগণ যখন মদীনাতে পৌছিতে ছিলেন তখনকার সময় মোহাজের (মক্কা হইতে আগত) এবং আনছার (মদীনাবাসী)-এর মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেন সেই সূত্রে উভয়ে একে অন্যের উত্তরাধিকারী গণ্য হইতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযেল হইল, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ—প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়াছি।" (সেই নির্দ্ধারিতগণের বর্ণনা ৪ পাঃ ১৩ রুঃ দ্রষ্টব্য।)

এই আয়াত দ্বারা উক্ত ব্যবস্থাকে রহিত করত: স্ববংশীয় লোককে উত্তরাধিকারী সত্ব দান করা হয় এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের বিষয়ে এই আয়াত নাযেল হয়—

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের উত্তরাধিকার সত্বের বিলোপ সাধন করা হইলেও তাহাদের প্রতি সাহায্য, উপকার, মঙ্গল ও হিত কামনা ইত্যাদি সদ্ব্যবহার বিশেষরূপে চালু রাখিতে হইবে এবং তাহাদের উত্তরাধিকারের সত্ব বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য অছিয়ত করা যাইবে।

১১৩৭। **হাদিছ** :—আনাছ (রা:)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জ্ঞাত আছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—لَا حِلْفَ فِى الْاِسْلَامِ "পরস্পর সাহায্য সমর্থনের জোট গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই" ?

আনাছ (রা:) বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে মক্কা হইতে আগত কোরায়েশ বংশীয় মোহাজের ও মদীনাবাসী আনছারকে পরস্পর সাহায্য সমর্থন ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—আনাছ (রা:) যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্য। মোহাজেরগণ স্বীয় সর্বস্ব মক্কায় ফেলিয়া নি:সহায় নি:সম্বল অবস্থায় নূতন দেশ নূতন স্থান অপরিচিত পরিবেশ মদীনায় উপস্থিত হইলে পর এক এক জন মোহাজেরকে এক এক জন মদীনাবাসী ছাহাবীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থা হযরত (দ:) করিয়া দিতেন, যেন নূতন দেশে অপরিচিত পরিবেশে পতিত হইয়া মোহাজেরগণ অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

অবশ্য ইহাও সত্য যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সাহায্য সমর্থন ও জোট গঠনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই। এই কথার দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে—প্রথম এই যে, অন্ধকার ও বর্বতার যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, ঐরূপ জোট গঠন ও অঙ্গীকার আবদ্ধ হওয়ার ফলে ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক; সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা কোন কিছুর বাছ-বিচার না করিয়া এবং জুলুম-অত্যাচার, অবিচার অনাচার কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর সাহায্য ও সমর্থন করিয়া যাওয়া হইত। ইসলামে এরূপ রীতির স্থান নাই। দ্বিতীয় এই যে স্বয়ং ইসলাম ধর্মই বন্ধুত্ব, সাহায্য ও সমর্থনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইসলামের দরুনই মোসলমানদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বভাব, বন্ধুত্বের ব্যবহার সাহায্য ও সমর্থন করা আবশ্যক। নূতনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং উহার প্রতীক্ষায়ও থাকা চাই না। ইসলামের প্রথম যুগে মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা হইত বটে, কিন্তু তাহা শুধু কার্য্য পরিচালনার সুবিধা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে; নতুবা ছাহাবীগণ কখনও

অন্ধকার যুগের ন্যায় অন্ধ সমর্থনের রীতি অনুসরণ করিতেন না এবং ন্যায়রূপে পরস্পর সাহায্য ও সমর্থনে ঝাপাইয়া পড়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধের প্রতীক্ষায়ও থাকিতেন না।

উকিল তথা কার্য্যনির্বাহক মনোনীত বা নিয়োগ করা

মছআলাহ ঃ—অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও পত্র যোগে বা লোক মারফত খবর পাঠাইয়া উকিল নিয়োগ করা যায়। (৩০৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিল যে, আমার মাল হইতে দান-খয়রাত করিতে পার, কিন্তু দানের পরিমাণ উল্লেখ করিল না; সে ক্ষেত্রে সর্বদিক লক্ষ্য করিয়া যে স্থানে, যে পরিমাণ দেওয়ার অনুমতি সাধারণ জ্ঞানে বোধিত তাহাই উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হইবে; খামখেয়ালী করিতে পারিবে না। (৩০৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—মালামালের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইল; সে কোন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিল বা কাহাকেও ধার দিল তাহার এইসব কাজের বৈধতা মালিকের সম্মতি সাপেক্ষ থাকিবে।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কাহাকেও নিয়োগ করা হইলে সে নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় উহা হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে—ন্যায্য পরিমাণে; তাহার অধিক নহে। (৩১১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—বিবাহে উকিল বানানো জায়েয আছে।

কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন—

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ـ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ـ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ـ

অর্থ—তোমাদের ক্ষেত-খামারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? উহার চারা ও উৎপন্ন কি তোমরা সৃষ্টি করিয়া থাক, না—আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি? (এই প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট যে, একমাত্র আমিই ইহা জন্মাইয়া থাকি, যাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে) আমার ইচ্ছা হইলে আমি (শস্য নষ্ট করিয়া দিয়া উৎপন্ন হইতে বঞ্চিত করতঃ) শস্যকে খড়-কুটায় পরিণত করিয়া দিয়া থাকি, তখন তোমরা আক্ষেপ ও অনুতাপে জর্জরিত হইয়া যাও। (কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবার কাহারও ক্ষমতা হয় না। ২৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

প্রিয় পাঠক! বর্তমান যুগে মানব বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের হাতড়ানি শুধু পেটের ধান্ধা তথা পশুত্ব-স্বভাব চরিতার্থের উপরে নিবদ্ধ রাখে। এই ধান্ধা অনাবশ্যক বা মন্দ নয় বটে, কিন্তু এই ধান্ধার উপরই স্বীয় চেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখা নির্বোধ পশুর স্বভাব হইতে পারে, কারণ তাহার কাঁধে কোন দায়িত্ব চাপান

নাই, পানাহারই তাহার লক্ষ্যের শেষ সীমা, কিন্তু মানব সেরূপ নয়, পানাহার শুধু তাহার জীবন ধারনের উদ্দেশ্যে। স্মরণ রাখিবেন এবং বুঝিয়া উপলব্ধি করিয়া লইবেন যে মানবের জীবন ধারণ পানাহারের উদ্দেশ্যে নহে। তাহার কাঁধে মস্ত বড় দায়িত্ব চাপান রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে সেই দায়িত্ব পালনের হিসাব-নিকাশ ও ফলাফল ভোগের জন্য এমন এক জীবন রহিয়াছে যাহার অন্ত নাই—শেষ নাই।

তাহাকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার, পালনকর্তার খোঁজ ও পরিচয় লাভ করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে স্বীয় সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হইতে হইবে এবং সেই সম্পর্ক অনুপাতে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার খোঁজ লাভ করার এবং তাঁহার সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হওয়ার অভিজ্ঞান ও নিদর্শন এবং পরিচায়ক রূপে জগৎ ও বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন এক মণীষী কি সুন্দর বলিয়াছেন—

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقے دفتریست از معرفت کردگار

"এই বিশাল ভুমণ্ডলের আচ্ছাদক সবুজ সবুজ বৃক্ষরাজি, তৃণ-লতার পাতায় পাতায় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার পরিচয় ও খোঁজের পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দানে প্রত্যেকটি পাতাই যেন এক একটি বড় বড় গ্রন্থ।"

আরবী ভাষায় বিশ্ব-জগৎকে عالم "আলম" বলা হয়, বরং সৃষ্ট জগতের প্রতিটি শ্রেণী বা জাতিকেও "আলম" বলা হয়। "আলম" শব্দের আভিধানিক অর্থ নিদর্শন ও পরিচায়ক। বিশ্ব-জগৎ এবং প্রতিটি সৃষ্ট জাতি সৃষ্টিকর্তার পালনকর্তার পরিচয় দানের নিদর্শন ও পরিচায়ক, তাই এসবকে "আলম" বলা হইয়া থাকে। অতএব জাগতিক চীজ-বস্তু সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিজ্ঞানের শেরা বিজ্ঞান হইল সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পরিচয় দানে এবং তাঁহার সম্পর্কের জ্ঞান দানে সহায়ক ও সাহায্যকারী বিজ্ঞান।

ইমাম বোখারী (রঃ) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীর বর্ণনার পরিচ্ছেদে সর্বাগ্রে উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, কৃষি-বিজ্ঞানে অন্যান্য বিষয়াবলী ও তথ্য পর্য্যালোচনার পুর্বে ইহার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ কর, তাঁহার সম্পর্ক জ্ঞাত হও এবং সে অনুপাতে স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারিত কর—ইহাই হইল কৃষি-বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান পাঠ।

বৃক্ষ রোপণের ফজিলত

১১৩৮। হাদীছঃ— عن انس قال النبى صلى الله عليه وسلم

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ

اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করিল বা বপণ করিল, অতঃপর উহা হইতে কোন পশু বা মানুষ কিছু অংশ খাইল তাহাতে ঐ ব্যক্তি দান-খয়রাত করার ছওয়াব লাভ করিবে।

লাঙ্গল-জোঁয়াল লোকদের মান নিম্নস্তরে নিয়া যায়

১১৩৯। হাদীছঃ— عن ابى امامة رضى الله تعالى عنه

وَرَاٰى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ ـ

অর্থ—ছাহাবী আবূ উমামা (রাঃ) কোথাও লাঙ্গল-জোঁয়াল দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এই জিনিষ যেই সব লোকদের ঘরে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাদের উপর সম্মানের লাঘব ও নীচতা নামিয়া আসিবে।

ব্যাখ্যাঃ—বস্তুনিচয়ের যেরূপ সৃষ্টিগত তাছীর ও প্রতিক্রিয়া আছে তদ্রূপ কার্য্যাবলী, বৃত্তি ও পেশা সমুহেরও স্বাভাবিক তাছীর-প্রতিক্রিয়া আছে। লাঙ্গল-জোঁয়াল, গরু-বলদ দ্বারা চাষাবাদের পেশায় স্বাভাবিক রূপেই এই তাছীর ও প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে যে, ঐ পেশাদারদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং চিন্তাধারা (Mood of thought) নিম্ন পর্যায়ে চলিয়া আসে।

উহার কতিপয় বাহ্যিক কারণও রহিয়াছে, যথা—লাঙ্গল-জোঁয়ালের পেশাদারগণ সর্বদা এমন শ্রেণীর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকে যাহাতে তাহাদের জ্ঞান-দর্শন উন্মেষের অবকাশ থাকে না, ফলে তাহাদের মানসিক উন্নতি হয় না। এমনকি সাধারণতঃ তাহারা নিজেদের কচি-কাঁচাদের মন-মগজও ঐ ছাচেই গড়িয়া তোলে, যদ্দরুণ জাতির একটি বিরাট অংশ পঙ্গু হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন লাঙ্গল-জোঁয়ালের পেশাদারদের সর্বদা গরু-বলদের সাহচর্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, ফলে তাহাদের মানসিক মানের নিম্ন গতি না আসিয়া পারে না; তদুপরি গরু বলদের সাহচর্য্যতার প্রাকৃতিক তাছীর ও প্রতিক্রিয়া ত আছেই।

মোসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও উন্মেষের পেশা অবলম্বন করুক, এমনকি কৃষি কাজ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলে তাহাও লাঙ্গল-জোঁয়াল, গরু বলদের মাধ্যমে না করিয়া উন্নত শ্রেণীর কৃষি অবলম্বন করুক—সেই উৎসাহ দানই এই হাদীছের উদ্দেশ্য। এস্থলে লাঙ্গল-জোঁয়ালের তথা গরু-বলদের সাহচর্যের পেশার প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে; কৃষির প্রতি নহে। এতদ্ভিন্ন এই হাদীছে একটি বাস্তব সত্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে মাত্র; গোনাহ্-ছওয়াব, জায়েয-নাজায়েয বা আবশ্যক অনাবশ্যকের কথা বলা হয় নাই এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে মান-মর্য্যাদা ভিন্ন কথা, আর প্রয়োজন ভিন্ন কথা। আবশ্যক বশতঃ তিক্ত

জিনিষ খাইলে উহা তিক্তই থাকিবে উহার তিক্ততার লাঘব হইবে না। বাধ্য হইলে তিক্ত জিনিষ গলাধঃ করিতে হয় এবং তিক্ততা ভোগও করিতে হয়।

বৃক্ষাদি বা বাগানের সেবার বিনিময়ে উৎপন্নের অংশে দেওয়া

১১৪০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদীনাবাসী ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদীনায় আগত মোহাজেরগণকে সাহায্য সহায়তা করিবেন। সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থে) মদীনাবাসী ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাদের সম্পত্তি খেজুর বাগান এবং জায়গা-জমিসমুহ আমাদের ও মোহাজের ভ্রাতাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। নবী (দঃ) বলিলেন, বণ্টন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন, মোহাজেরগণ আমাদের বাগানের সেবা-শুশ্রষা করিবেন তৎপরিবর্তে তাঁহারা উৎপন্নের অংশীদার হইবেন—এই ব্যবস্থার উপর সকলে সম্মত হইলেন।

বর্গা প্রথা জায়েয

ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ গরীবদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ও নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বর্গা প্রথা অবলম্বন করিতেন।

১১৪১। হাদীছ ঃ—তাবেয়ী আমর (রঃ) তাউস (রঃ) তাবেয়ীকে বলিলেন, আপনি স্বীয় জমিন বর্গা প্রথায় দিয়া থাকেন, ইহা পরিত্যাগ করিলে উত্তম হইত; লোক-মুখে জানা যায়, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এতশ্রবণে তাউস (রঃ) বলিলেন, বর্গা ব্যবস্থায় জমিন দানে আমার উদ্দেশ্য লোকদিগকে সাহায্য করা। আপনি যে নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই বিষয় আমি অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেন নাই। তাঁহার (যেই বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ধারণা হয় সেই বাক্যের মুল) উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় (অভাবগ্রস্ত) মোসলমান ভ্রাতাকে নিজের জমিন চাষ করার জন্য দিলে বিনিময় প্রথা অপেক্ষা বিনিময় ব্যতিরেকে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া উত্তম ও শ্রেয়।

● তাউস (রাঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইয়ামান দেশে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রেরিত শাসনকর্তা ছাহাবী মোয়াজ ইবনে-জাবাল (রাঃ) প্রজাদের মধ্যে বর্গা ব্যবস্থা বলবৎ ও চালু রাখিয়াছিলেন। (ফতহুল বারী)

১১৪২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর দেশ জয় করার পর (তথাকার ভূমি ও জায়গা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে

শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করেন নাই।) তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে তথা হইতে তাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহাদের অনুরোধ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তথায় তাহাদিগকে বসবাস করিতে দিলেন এবং জায়গা জমি বর্গা প্রথায় চাষাবাদ করার জন্য তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। হযরতের জীবনকাল এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল। (কিন্তু ইহুদীরা ইসলাম ও মোসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না, এমনকি সুযোগ প্রাপ্তে মুসলমানকে হত্যার চেষ্টা এবং গোপনে হত্যা করার বহু ঘটনাও তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকিত। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও তাহাদের এই তৎপরতার ঘটনা প্রমাণিত হয় এবং তখন তিনি তাহাদিগকে তথা হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন)।

১১৪৩। হাদীছঃ—রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা যোহাইর (রাঃ) একদা আমাকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এমন একটি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যাহা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল ছিল না। (কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুসারে আমরা বিনা দ্বিধায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছি।) আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অলঙ্ঘনীয়।

অতঃপর ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা স্বীয় জায়গা-জমির ব্যবস্থা কিরূপ করিয়া থাক? আমি আরজ করিলাম, জমিনের (উত্তম ও ভাল অংশ যেমন) পানি প্রবাহিত হওয়ার নালার কিনারাবর্তী অংশের শস্য নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য নিজেদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া বাকি শস্যের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য অন্যকে জমি দিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ, তোমরা এরূপ করিও না। হয়ত তোমরা নিজেরাই চাষাবাদ কর, কিংবা (শুদ্ধ ব্যবস্থায়) অন্যকে চাষাবাদ করিতে দাও; না হয় জমিকে চাষহীন রাখিয়া দাও। (কিন্তু শরীয়ত বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না। "জমিকে চাষহীন রাখিয়া দাও" বাক্যটি শুধু রাগ প্রকাশার্থে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উল্লিখিত পন্থাদ্বয় ছাড়া একমাত্র এই পন্থাই আছে, যাহা বস্তুতঃ নিতান্ত নিন্দনীয়।)

ইমাম বোখারী (রঃ) বরং তাঁহার পরবর্তী হাদীছ ও শরীয়ত বিশারদগণ উল্লিখিত হাদীছের নির্দেশিত বিধানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—যেইরূপ ব্যবস্থায় কোন এক পক্ষের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় উহা নিষিদ্ধ। যেমন এক পক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া লইল, আমাকে দশ মণ দিতে হইবে, অথচ সম্পূর্ণ জমির মোট উৎপন্ন ঐ দশ মণই হইতে পারে; এমতাবস্থায় অপরপক্ষ বঞ্চিত থাকিবে। কিম্বা এক পক্ষ নির্দিষ্ট অংশের উৎপন্নের শর্ত করিল, অথচ এরূপও হইতে পারে যে, অপরাপর অংশ সমূহের শস্য নষ্ট হইয়া যায় কিম্বা শুধু এই অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যায়; এমতাবস্থায়ও এক পক্ষ বঞ্চিত থাকিবে, তাই এরূপ ব্যবস্থা সমূহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মূল বর্গা-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ নহে।

১১৪৪। হাদীছ:—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ও অর্দ্ধাংশের বিনিময়-ব্যবস্থায় বর্গা দান করিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

অর্থ—যাহার জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা অন্যকে সহায়তা স্বরূপ উহা চাষ করিতে দিবে। যদি তাহা করিতে না চায় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে। (জমি কেহ অনাবাদ ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।)

১১৪৫। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা স্বীয় মোসলমান ভাইকে সহায়তা স্বরূপ চাষ করিতে দিবে। যদি সে উহাতে রাজি না হয় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে।

ব্যাখ্যা:—ইমাম বোখারী (র:) এই শ্রেণীর হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সহায়তা স্বরূপ অন্যকে জমি চাষ করিতে দেওয়ার পরামর্শ দান শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক; বাধ্যতামূলক নহে এবং শরীয়ত সম্মতরূপে বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। ইমাম বোখারী (র:) এই ব্যাখার প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছেন—

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ

قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا.

অর্থাৎ—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐ আকারের হাদীছ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উদ্দেশ্য বর্গা-ব্যবস্থাকে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ করা নহে, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতাকে জমি চাষ করিতে দিয়া তাহার নিকট হইতে নির্দ্ধারিত অংশ উসুল করা অপেক্ষা সহায়তা স্বরূপ তাহাকে চাষ করিতে দেওয়া অধিক উত্তম। (৩১৫ পৃ:)

● ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অনেকেই বর্গা ব্যবস্থায় জমি দান করিয়া থাকিতেন (৩১৩ ও ৩১৪ পৃ:)। এমনকি জাতীয় কোষাগার বাইতুল-মালের স্বত্ব সরকারী

ও রাষ্ট্রীয় দখলের জমিও খলীফা—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বর্গা-ব্যবস্থায় দান করা হইত। দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে যখন সিরিয়া দেশ জয় করা হইল তখন ওমর (রাঃ) ঐ বস্তিসমূহ গণিমতের মালরূপে জেহাদকারী গাজিগণের মধ্যে বণ্টন করিলেন না, বরং ঐ সব বস্তিসমূহ জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রিয় ও জাতীয় সম্পদরূপে রাখিয়া দিলেন (এবং উহা বস্তিবাসীদিগকে বর্গা-ব্যবস্থারূপে দান করিলেন।) অতঃপর বলিলেন, ভবিষ্যৎ মোসলেম সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন না থাকিলে প্রত্যেক বিজিত দেশের সমুদয় এলাকা আমি গাজিদের মধ্যে গণিমতের মালের ন্যায় বণ্টন করিয়া দিতাম। (৩১৪ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—জেহাদের ময়দানে যে সব অবস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহা গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণ্য হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ গাজিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়, এক অংশ বাইতুল মালে তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারে রক্ষিত রাখিতে হয়। কিন্তু বিজিত দেশের স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ভূমি ও জায়গা জমি গণিমত গণ্য হয় না। উহা খলীফাতুল-মোসলেমীনের বিবেচনাধীন থাকে জাতীয় সম্পদরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া, এমনকি ওয়াকফরূপেও রাখিতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে গাজিদের মধ্যে বণ্টনও করিতে পারেন; ইহা খলীফার এখতিয়ার, কিন্তু খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে নয়, জাতীয় আমানতরূপে।

১১৪৬। হাদীছ :—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে, খলীফা ওসমানের আমলে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্গা-প্রথায় জমি দিয়া থাকিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নামে এরূপ বর্ণনা শুনা গেল যে, নবী (দঃ) বর্গা প্রদানে নিষেধ করিয়াছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বর্গা-প্রথায় জমি দানে নিষেধ করিয়াছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলের প্রথম দিকে আমরা নালার কিনারা (তথা নির্দ্ধারিত) স্থানের ফসল এবং খরের নির্দ্ধারিত অংশের বিনিময়ে বর্গা দিয়া থাকিতাম। অর্থাৎ হযরতের নিষেধাজ্ঞা সেই রীতির প্রতিই।

১১৪৭। হাদীছ :—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে অবশ্যই জমি বর্গায় দেওয়া হইত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আশঙ্কা বোধ করিলেন যে, হয়ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ব্যাপারে কোন নূতন নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জানিতে পারেন নাই। এতটুকু মাত্র আশঙ্কা বোধে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জমি বর্গা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—বর্গা-প্রথা জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফতওয়া এবং অধিকাংশ ইমামগণের মত, স্বপক্ষেই রহিয়াছে। অবশ্য সতর্কতামূলকভাবে তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা উত্তমই হইবে; যেরূপ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)ও বর্গা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করিতেন।

টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেওয়া

১১৪৮। হাদীছ :—হানজালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার দুই চাচা আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় জমির নির্দিষ্ট অংশের শস্য বা ঐ জমির উৎপন্নের নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন—দশ মণ) শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। *

হানজালা (রাঃ) বলেন, তখন আমি রাফে রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া কিরূপ? তিনি বলিলেন, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া দোষণীয় নহে।

জমিনের নির্দিষ্ট স্থানের শস্যের শর্তে বর্গা শুদ্ধ নহে

১১৪৯। হাদীছ :—রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমরা সর্বাধিক জমিনের মালিক ছিলাম। আমরা বহু জমি বর্গা দিয়া থাকিতাম। আমাদের বর্গার নিয়ম এই ছিল যে, জমিনের নির্দিষ্ট অংশের শস্য জমিনের মালিক পাইবে, বাকি অংশের শস্য বর্গাদার পাইবে। কোন সময় সেই নির্দিষ্ট অংশে শস্য হইত, বাকি অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, আবার কোন সময় নির্দিষ্ট অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, বাকি অংশের শস্য ভাল থাকিত। (তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদিগকে ঐ প্রথার বর্গা নিষেধ করা হইল। স্বর্ণ-রৌপ্যের (মুদ্রার) বিনিময়ে জমিন কেরায়া দেওয়া (জায়েয বটে, কিন্তু) সেই যমানায় ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। (৩২৩ পৃঃ)

উৎপন্নের অংশের বিনিময়ে বর্গা বা ক্ষেতের কাজ করা

● কায়েস ইবনে মোসলেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাস্থিত প্রত্যেক মোহাজের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের উপর বর্গা লইয়া থাকিতেন। ● ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই ব্যবস্থায় বর্গা দিয়া থাকিতেন যে, তিনি বীজ দান করিলে শস্যের অর্দ্ধাংশ লইবেন এবং বর্গাদার বীজ দান করিলে (অর্দ্ধ হইতে কম) এত অংশ

---

* যদি কোন বস্তু, এমনকি ধান, পাট, গম, যব ইত্যাদি শস্য-জাতীয় জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ জমির উৎপন্ন হিসাবে নহে, বরং টাকা-পয়সার ন্যায় জমির কেরায়া হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়, তবে উহা জায়েয হইবে। (মোছাওয়া শরহে মোয়াত্তা)

লইবেন। ● বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) ও ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহারও জমি অন্যকে এই শর্তে দেওয়া যে, সমুদয় খরচ উভয়ের মধ্যে বন্টিত হইবে—ইহা জায়েয। ● হাসান বছরী (রঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, অর্ধাংশের বিনিময়ে গাছের তুলা চয়ন ও সংগ্রহ করা জায়েয আছে। ● ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ), আতা (রঃ), হাকাম (রঃ), যুহরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে নিজ তুলা অন্যকে কাপড় বুননের জন্য দেওয়া জায়েয আছে। ● বিশিষ্ট ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বীয় শস্য ইত্যাদি স্থানান্তরিত করার জন্য উঁহার তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে অপরের পশু কেরায়া করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা:—উল্লিখিত শেষ তিনটি বিষয় একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ অন্তর্ভুক্ত—উহা এই যে, কোন বস্তু সম্পর্কীয় কার্য্যে এইরূপে মজুর নিয়োগ করা যে, প্রত্যেক মজুর ঐ বস্তুর হইতেই স্বীয় শ্রমে আহরিত পরিমাণের নির্দিষ্ট অংশ মজুরীরূপে পাইবে, যাহার মোট পরিমাণ মজুর নিয়োগের কথাবার্তায় নির্দিষ্ট হয় না। যেরূপ বর্তমানে ধান কাটা, মরিচ তোলা ইত্যাদি কার্য্যে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে।

মজুরের মজুরী পূর্বাহ্নে নির্দিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক, অথচ উল্লিখিত ব্যবস্থায় অংশ নির্দ্ধারিত আছে; সর্বমোট পরিমাণ নিয়োগকালে নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাই ঐরূপ ব্যবস্থা শরীয়ত মতে শুদ্ধ, না—অশুদ্ধ সে বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ ঐ ব্যবস্থাকে অশুদ্ধ বলেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং উপরোল্লিখিত তাবেয়ীগণ এই ব্যবস্থাকে শুদ্ধ বলিয়াছেন।

যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিনের জন্য বর্গা

অর্থাৎ যদি বর্গা সম্পাদনে নির্দ্ধারিত সময়ের চুক্তি করা না হয়, বরং বলা হয়, যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিন তোমাকে রাখিব; তবে এক বৎসরের অধিক বাধ্যতামূলক হইবে না, উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে। যেরূপ—যদি বলে, যখন আমার ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া দিব। বস্তুতঃ প্রথম বাক্যের অর্থও ইহাই।

১১৫০। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কে খয়বরবাসীদের কেহ গৃহের ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল যাহাতে তাঁহার পায়ের জোড়া স্খলিত হইয়া গিয়াছিল। তখন খলীফা ওমর (রাঃ) বিশেষ ভাষণ দানে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের ইহুদীদিগকে তাহাদের জায়গা-জমির উপর বর্গাদাররূপে অবস্থিত রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যত দিন আল্লাহ রাখেন ততদিনই আমরা তোমদিগকে রাখিব। এখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ খয়বরস্থিত তাহার বাগান ও জমি দেখার জন্য তথায় গিয়াছিল, রাত্রিবেলা সে গৃহের ছাদের উপর শুইয়াছিল; ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে কেহ ছাদের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছে যাহাতে তাহার উভয় হাত ও পা-এর জোড়া স্খলিত হইয়া গিয়াছে। খয়বরের ইহুদী সম্প্রদায়

ছাড়া তথায় কেহ আমাদের শত্রু নাই; তাহাদের উপরই আমাদের দাবী ও সন্দেহ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি ইহুদীদেরকে খয়বর হইতে বহিষ্কৃত করার।

খলীফা ওমর (রাঃ) যখন এই সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় হইয়া গেলেন তখন এক বিশিষ্ট ইহুদী ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমাদেরে বহিস্কার কিরূপে করিতে পারেন? আমাদেরকে ত স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের জায়গা জমির উপর আমাদের সঙ্গে বর্গা সম্পাদন করিয়াছেন! খলীফা ওমর (রাঃ) উত্তরে তাহাকে বলিলেন, তুমি মনে কর, আমি ভুলিয়া গিয়াছি ঐ কথা যাহা তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন—"কি অবস্থা হইবে তোমার যখন তুমি খয়বর হইতে বহিষ্কৃত হইবে; তোমার উট তোমাকে বহন করিয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে থাকিবে।" ইহুদী ব্যক্তি বলিল, ইহা ত তাঁহার কৌতুকরূপী কথা ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী খোদার দুশমন! (ইহা তোমাদের বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—যাহা আমি বাস্তবায়িত করিব।) শেষ পর্যন্ত খলীফা ওমর (রাঃ) ইহুদীদেরকে খয়বর হইতে বহিস্কৃত করিলেন। জায়গা-জমি বাগ-বাগিচার বর্গা হিসাবে উহার উৎপন্নে তাহাদের প্রাপ্য যে অংশ ছিল উহার বিনিময়ে নগদ টাকা, উট, উটের পিঠে বিছাইবার গদী এবং উহা বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়া দিলেন যাহা দ্বারা তাহারা খয়বর হইতে সিরিয়ায় পৌছিতে পারে। (৩৭৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা:—মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় প্রবল ছিল; নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাদের প্রতি সর্ব প্রকারে সৌজন্যের হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহার মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করে নাই। মোসলমানদের প্রতি ইহুদীদের সেই ঘোর শত্রুতার খবর স্বয়ং আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তায়ালা দিয়াছেন (পবিত্র কোরআন ৬ পারা শেষ আয়াত দ্রষ্টব্য)। বনু-নজীর ও বনু-কোরায়জার ইতিহাস এবং কায়াব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে ইত্যাদি ব্যক্তিদের ঘটনাবলী সেই শত্রুতা বাস্তবায়নের অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

মদীনায় সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাইতে হয় তাহারা ছিল ইহুদীদের বনু-নজীর গোত্র। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইয়া তাহাদেরে পরাজিত করিলেন। ঐ অবস্থায়ও এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করা সত্বেও নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন যে, একটি লোককেও প্রাণে মারিলেন না; অবশ্য মোসলমানদের কেন্দ্রীয় শহর মদীনা হইতে এই শ্রেণীর বিদ্রোহীদের অপসারণ জরুরী হওয়ায় মদীনা হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে খয়বর এলাকায় তাহাদেরে স্থানান্তরিত করিলেন। ইহা হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা।

মদীনা হইতে বহিষ্কৃত ইহুদীরা খয়বরে থাকিয়াও অন্তর হইতে মোসলেম-বিদ্বেষী স্বভাব দূর করিল না। তাহারা তথায় তাহাদের স্বজাতিদের মিলনে অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া খয়বরকে মোসলমানদের শত্রুতার দুর্গ রূপে গড়িল। সপ্তম হিজরীতে হযরত (দঃ)

খয়বরের প্রতি অভিযান চালাইতে বাধ্য হইলেন। খয়বরের পতন হইল। এইবারও হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কার করার ইচ্ছা করিলেন। তথাকার ইহুদীরা হযরত (দঃ)-এর নিকট দরখাস্ত করিল, আমাদিগকে বহিষ্কার করিবেন না; আমাদের জায়গা-জমি, বাগ-বাগিচা সবই আপনাদের মালিকানাভুক্ত থাকিবে; আমরা বর্গাভাগী হিসাবে উহার চাষাবাদ করিয়া যাইব। হযরত (দঃ) তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন; হযরত (দঃ) ভাবিলেন, তাহাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিলে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু কয়লা শতবার দুধ দ্বারা ধুইলেও উহার কালিমা দূর হইবার নয়; তদ্রূপ ইহুদীদের সর্বরকম বিপর্য্যয়েও মোসলেম-বিদ্বেষের কালিমা তাহাদের অন্তর হইতে দূর হইল না। খয়বর যুদ্ধে পর্যুদস্ত ইহুদীরাই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি উদারতা প্রকাশার্থে তাহাদের দাওয়াত গ্রহণ করিলেন। সেই দাওয়াতের খাদ্যে তাহারা বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল এবং ধরাও পড়িল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন। তারপরও তাহাদের শত্রুতা দস্তুর মতে চলিতেই লাগিল। এখন তাহারা গুপ্ত হত্যা চালাইল। তাহাদের এলাকায় কোন মোসলমানকে একা পাইলেই তাঁহাকে হত্যা করিত। হযরতের সময়েই বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রাঃ)কে একা পাইয়া তাঁহাকে জবাই করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই গুপ্ত হত্যার কাজ সুদীর্ঘকাল চলিল, এমনকি খলীফা ওমরের শাসন আমলে স্বয়ং খলীফা তথা প্রেসিডেন্ট ওমরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা স্বীয় জায়গা জমি দেখার জন্য খয়বরে গেলেন। গরমের দিন রাত্রিবেলা তিনি এক গৃহছাদের উপর শুইয়াছিলেন। ইহুদীরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। তিনি অস্বাভাবিকরূপে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহার হাত পা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

খয়বরের ইহুদীদের দুঃসাহস এইরূপে চরমে পৌছিয়া গেলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাদেরে আরও দূরে দেশান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করিলেন।

ইহুদী সম্প্রদায় বনু-নজীরকে প্রথমবার স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন। তখন পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার আমল ছিল। উক্ত ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে স্থান লাভ করিয়াছে (২৮ পারা ছুরা হাশর দ্রষ্টব্য)। সেই ইহুদী সম্প্রদায়কেই দ্বিতীয়বার খলীফা ওমর (রাঃ) খয়বর হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন; তখন কোরআন নাযেল হওয়া বন্ধ; তাই উহার উল্লেখ কোরআনে স্পষ্টরূপে নাই বটে, কিন্তু প্রথমবারের ঘটনার উল্লেখে উহাকে "প্রথম বহিষ্কার" বলিয়া পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে—যাহার বাস্তবায়ন ওমর (রাঃ) করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ)ও এই পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—যাহার বর্ণনা ওমর (রাঃ) দিয়াছেন।

বেহেশতে যাইয়া জমি চাষ করার ঘটনা

১১৫১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) একদা বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট এক বেদুঈন উপস্থিত ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, বেহেশতবাসী এক ব্যক্তি একদা স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে কৃষিকার্য্যের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি স্বীয় সমুদয় ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খাকে উপস্থিত পাইতেছ নয় কি? (এমতাবস্থায় তোমার কৃষিকার্য্যের আবশ্যক কি?) সেই ব্যক্তি বলিবে, আমি সব কিছুই পাইতেছি বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্য করার অভিলাষ আমার জন্মিয়াছে। সেই ব্যক্তি জমিনে বীজ বপন করিবে। চোখের পলক অপেক্ষা দ্রুত বীজ হইতে চারা জন্মিয়া, গাছ বড় হইয়া শস্য পাকিয়া ও প্রস্তুত হইয়া পাহাড় পরিমাণ স্তুপ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদমজাত! এই লও—তোমার অভিলাষ! তোমার আকাঙ্খার সমাপ্তি হয় না।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটস্থ বেদুঈনটি বলিয়া উঠিল—ঐ ব্যক্তি মক্কা হইতে আগত (কৃষিকার্য্যে লিপ্ত) মোহাজের বা মদীনাবাসী হইবেন; তাঁহারাই কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত। বেদুঈনরা কৃষিকর্মে অভ্যস্ত নয়। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) হাসিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শস্য-ফসলের হেফাজতে কুকুরকে কাজে লাগান জায়েয আছে (৩১২ পৃঃ)।

● বর্গার চুক্তি কত বৎসরের জন্য করা যাইতেছে তাহা নির্দ্ধারিত না করিলেও বর্গা শুদ্ধ হয়, (কিন্তু উহা শুধু এক বৎসরের জন্য বাধ্যতামুলক হয়, তারপর উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ (৩১৩ পৃঃ)।

● অমোসলেমকে বর্গা দেওয়া জায়েয (ঐ)। ● কোন ব্যক্তি অন্যের বীজ তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারই উপকারার্থে বপন করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে লাভ হইলে তাহা বীজের মালিকের হইবে (৩১৩ পৃঃ। অবশ্য জমিওয়ালা জমির কেরায়া রাখিতে পারিবে।) আর যদি বীজের ক্ষতি হইয়া যায় তবে ঐ বপনকারী ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকিবে।

অনাবাদ ভূমিকে যে আবাদ করিবে

মছআলাহ ঃ—যে ভূমি কাহারও মালিকানাভুক্ত নহে এবং উহাতে পানির কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় বা অতিরিক্ত পানির কারণে বা যে কোন কারণে অনাবাদ পড়িয়া আছে, কোন ব্যক্তি উহা আবাদ করিলে সেই ব্যক্তি উহার মালিক সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে দুইটি শর্ত আছে, প্রথম—ঐ ভূমি এমন স্থানে অবস্থিত না হয় যাহার সঙ্গে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির অনুমতি প্রাপ্তে আবাদ করিতে হইবে।

● আলী (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তাঁহার রাজধানী কুফা নগরী হইতে দূরে অবস্থিত অনাবাদ ভূমিসমূহে ঐরূপ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন।

● ওমর (রাঃ) ও স্বীয় খেলাফতকালে ঐ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন।

● আমর ইবনে আউফ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমি আবাদ করিবে যদি পূর্ব হইতে ঐ জমির উপর কাহারও কোন স্বত্ব না থাকে তবে ঐ আবাদকারীই উহার মালিক হইবে, অন্য ব্যক্তি ঐ জমি দখল করিতে চাহিলে তাহাকে অত্যাচারী ও অন্যায়কারী সাব্যস্ত করা হইবে; তাহাকে সেই স্থানে হক দেওয়া হইবে না।

● জাবের (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমিকে আবাদ করিবে সেই জমিতে তাহারই স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই ব্যক্তি এই কার্য্যের ছওয়াবও লাভ করিবে। উহা আবাদ করতঃ উহাতে রোপিত বৃক্ষাদির ফল যাহা পশু-পক্ষী ভক্ষণ করিবে তাহা ঐ ব্যক্তির পক্ষে ছদকা—দান খয়রাত গণ্য হইবে।

১১৫২। হাদীছঃ— عن عائشة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ ভূমি আবাদ করিবে যাহা কাহারও মালিকানায় নহে, সেই ব্যক্তি ঐ ভূমির হকদার—মালিক সাব্যস্ত হইবে। (৩১৪ পৃঃ)

সেচ ও পানি সম্পর্কীয় বিষয়ের বিবরণ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

যাহারা কাফের—যাহারা সঠিকরূপে আল্লাহ তায়ালার একত্ব প্রভুত্ব অবলম্বন করে না তাহাদের প্রতি তিরস্কার করতঃ তাহাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়া আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়া বলেন—"(বিশ্ব জগতের অগণিত) জীবন্ত বস্তুসমূহের প্রতিটি বস্তুকে আমি পানির দ্বারা সৃষ্টি ও উহার অস্তিত্ব বজায় থাকার ব্যবস্থা করিয়াছি। (আমার অবিমিশ্র একনায়কত্ব অসীম কুদরতের এরূপ নিদর্শনসমূহ তাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে,) তবে কেন তাহারা (আমার একত্বের স্বীকারোক্তি এবং আমার প্রভুত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ পূর্বক) ঈমান আনিতেছে না"? (১৭ পাঃ ৩ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ـ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ........

অর্থ—তোমরা পানি সম্পর্কে লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে পানি তোমরা (জীবন ধারণের জন্য) পান করিয়া থাক (এবং যেই পানির বারিপাতের উপর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে—) মেঘমালা হইতে সেই পানি তোমরা বর্ষণ করিয়া থাক, না—আমি বর্ষণ করি? (এই প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট যে, আমিই উহা বর্ষণ করিয়া থাকি। অতঃপর ইহাও লক্ষ্য কর যে, আমি ঐ পানিকে তোমাদের ব্যবহারোপযোগী মিষ্টি পানিরূপে বর্ষণ করি;) আমি যদি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে ব্যবহারে অনুপযোগী লোনা পানিতে পরিণত করিয়া দিতে পারি। (বাধা দেয়ার সাধ্য কাহারও নাই, যেরূপ সমুদ্রের সমুদয় পানিকে আমি লোনা করিয়া রাখিয়াছি। আমার এ সমস্ত নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খাঁটি ও পূর্ণরূপে) আমার প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হও না? (২৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—বৈজ্ঞানিকগণ পানি সম্পর্কে কত গবেষণাই না করিয়া থাকে! কিন্তু যাহারা উল্লিখিত বিষয় সমূহে গবেষণা করিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার খোঁজ ও পরিচয় লাভ করতঃ অসীম অতুলনীয় কৃপা ও করুণা জ্ঞাত হইয়া স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারণ ও পালন না করে বস্তুতঃ তাহারা পানি সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হইতেই অজ্ঞ ও অন্ধ।

পানির সত্বাধিকারী স্বীয় প্রয়োজনে অগ্রগণ্য

ব্যাখ্যা ঃ—ব্যক্তিগত সত্বাধিকারের পানি দুই প্রকার।

প্রথম—যে পানি কোন বড় বা ছোট পাত্র ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত পরিশ্রম বা ব্যয় বহনে সংরক্ষিত হইয়াছে; এইরূপ পানির মালিক ও স্বত্বাধিকারী একমাত্র সংরক্ষণকারীই সাব্যস্ত হইবে, উহাতে অন্য কাহারও স্বত্ব থাকিবে না।

দ্বিতীয়—যে পানি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও ব্যয়-বহনে পাত্র ইত্যাদিতে সংরক্ষিত হয় নাই, বরং প্রাকৃতিকরূপে এক স্থানে জমা হয়, কিন্তু পানির সেই স্থান ব্যক্তিগত স্বত্ব এবং মালিকানাভুক্ত—কূপ, পুকুর, দীঘি ইত্যাদি। এইরূপ পানির উপর মালিকের এমন অধিকার নাই যে, সে মানুষকে বা পশুপালকে সেই পানি পান করা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে। এমনকি—যদি মালিক স্বীয় এই অধিকার খাটাইতে চায় যে, পানি হইতে কাহাকেও নিষেধ করি না, কিন্তু আমার এলাকায় ও জমিনে অন্যকে যাতায়াত করিতে দিব না। এমতাবস্থায় যদি নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে ঐ কূপ বা পুকুর ভিন্ন পানি পানের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে মালিককে বলা হইবে যে, এই পানি তোমার এলাকার বাহিরে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর, নতুবা ঐ ব্যক্তিকে পানি নিয়া যাওয়ার অনুমতি দাও। অবশ্য যাতায়াতের দ্বারা কূপ বা পুকুরের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, নতুবা মালিক বাধাদান করিতে পারিবে। মোট কথা এই যে, কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও মালিকানাভুক্ত হয় তবুও উহার পানি পান করার অধিকার অন্য সকলের থাকিবে। হাঁ—নদী-নালার পানির ন্যায় ঐ পানির দ্বারা ক্ষেত-খোলা, বাগ-বাগিচা সেচনের অধিকার মালিক ভিন্ন অন্য কাহারও থাকিবে না।

এই দ্বিতীয় প্রকারের পানি সম্পর্কেই বলা হইতেছে যে, মালিক অগ্রাধিকারী গণ্য হইবে। অর্থাৎ অন্য লোকের পশুপালের পানি পান করার অধিকার ঐ পানির উপর আছে বটে, কিন্তু মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যে পানি থাকিবে সেই পানির মধ্যে অন্য লোকের পান করার অধিকার থাকিবে। মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অন্যের অধিকার স্থাপিত হইবে না। এমনকি, যদি অন্য লোক বা অন্যের পশুপালের এত ভিড় হয় যে, কূপ বা পুকুর শুষ্ক হইয়া যাওয়ার আশংকা হয় তবে মালিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

পশুপালের খাদ্য ঘাস-পাতার মছআলাও পানির মছআলার অনুরূপ—উহাও তিন প্রকার। (১) মালিকানা স্বত্বহীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস নদী-নালা সমুদ্র ইত্যাদির পানির ন্যায়; উহার উপর সকলের সমান অধিকার থাকে—কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না। (২) মালিকানাধীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস-পাতা—ইহা কূপ, পুকুর দীঘি ইত্যাদির পানির ন্যায়; জমির মালিকের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে উহার উপর অন্য লোকের অধিকার থাকে, অবশ্য তাহার জমিনের কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে সে বাধা দান করিতে পারে। (৩) স্বীয় জমিনে বপনকৃত বা স্বীয় পরিশ্রমে বা ব্যয়-বহনে সংগৃহীত ঘাস-পাতা, ইহা পাত্রে সংরক্ষিত পানির ন্যায়; ইহাতে কাহারও অধিকার নাই।

মছআলাহ্ঃ—পানির কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও সাধারণতঃ বিপদ সঙ্কুল বটে, কিন্তু নিজ স্বত্বের ভূমিতে উহা খননের অধিকার আছে, এমনকি যদি উহাতে পতিত হইয়া কেহ মারা যায় তাহার জন্য মালিক দায়ী হইবে না। (৩১৭ পৃঃ)

১১৫৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (যেই ঘাসের উপর অন্য লোকের অধিকার থাকে সেই ঘাসের নিকটবর্তী স্থানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কূপ বা পুকুর থাকিলে সেই) ঘাস হইতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে পানির স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে নিষিদ্ধ করার অধিকার নাই।

আবশ্যকাতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে বঞ্চিত করা

১১৫৪। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন প্রকার মানুষ আছে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভীষণ কঠিন দিনে দৃষ্টিপাত (অনুগ্রহ) করিবেন না, (তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া) তাহাদিগকে পাক পবিত্র (করতঃ বেহেশত লাভের সুযোগ দান) করিবেন না এবং ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১) ঐ ব্যক্তি যাহার

মালিকানায় পথিমধ্যে তাহার নিজ আবশ্যকাতিরিক্ত পানির ব্যবস্থা আছে, সে পথিকদিগকে ঐ পানি ব্যবহার করিতে দেয় না। (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যেই পানি তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে না—সেই পানির অতিরিক্ত অংশ হইতে তুমি অন্যকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলে ; তদ্রূপ আজ তুমি আমার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকিবে)। ঐ ব্যক্তি—যে কোন নেতা বা শাসনকর্তার আনুগত্য বা সমর্থন (নিঃস্বার্থরূপে আদর্শ ভিত্তিক না করিয়া) দুনিয়ার অর্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, পরে যদি সেই স্বার্থ সিদ্ধ হয় তবে সমর্থন বহাল রাখে, নতুবা বিদ্রোহী হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। (৩) ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় বিক্রয় বস্তু বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করিয়াছে, (সে এত বড় দুরাচার যে,) আছরের নামাজের পর (—যে সময়টি বিশেষ ফজিলতের সময় ; সেই মোবারক সময়ের মধ্যে বিনা দ্বিধায়) এরূপ মিথ্যা শপথ করে যে, যেই আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি, এই বস্তুটির এত টাকা মূল্য বলা হইয়াছে ; (বস্তুতঃ তাহার ঐ বস্তুর তত টাকা মূল্য বলা হয় নাই, সে অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এরূপ মিথ্যা বলিয়াছে ;) অন্য এক ব্যক্তি তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে এবং ধোঁকায় পড়িয়া বেশী মূল্য দান করিয়াছে।

তৃতীয় রকম ব্যক্তির কুফল বর্ণনায় হযরত (দঃ) নিম্নের আয়াতটিও তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

অর্থ—যাহারা আল্লার নামে (মিথ্যা) ওয়াদা বা (মিথ্যা) শপথ করিয়া উহার বিনিময় হাসিল করে যাহা জাগতিক নগণ্য বস্তু, (অর্থাৎ সাধারণভাবে সে যে পরিমাণ বিনিময় হাসিল করিতে পারিত না মিথ্যা কসম ও শপথ বা আল্লার নামে ওয়াদা করিয়া উহা হাসিল করে।) তাহাদের জন্য আখেরাতে সুখ ভোগের কোন সুযোগই থাকিবে না। (৩ পাঃ ১৬ রুঃ)

নদী-নালার গতি রোধ করিয়া উর্দ্ধ প্রান্তের জমি সেচের প্রয়োজনান্তে নিম্নপ্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দিতে হইবে

অর্থাৎ প্রাকৃতিক নদী-নালার মধ্যে অপর্যাপ্ত পানি হইলে ; যেরূপ বর্ষাহীন শুষ্ক অঞ্চলের পাহাড় পর্বতের ঝর্ণা হইতে প্রবাহমান নদী নালা—এ সবের পানি ব্যবহারে উর্দ্ধ প্রান্তের জমিওয়ালাদের হক অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু উহাকে সর্বদার জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার হক কাহারও নাই, বরং সাধারণ নিয়ম ও পরিমাণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সেচন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন প্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য উর্দ্ধপ্রান্তের লোকদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় হক হাসিল করার জন্য সাময়িকরূপে উহার গতিরোধ করার অনুমতি আছে।

১১৫৫। হাদীছঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফুফাত ভাই—বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে প্রবাহমান পানির গতিরোধ নিয়া মদীনাবাসী একজন লোকের বিবাদ ঘটিল। প্রাবাহিত নালার উর্দ্ধপ্রান্তে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুর খেজুর বাগান ছিল, তিনি উহা সেচনের জন্য ঐ প্রবাহমান পানির গতিরোধ করিয়া থাকিতেন। অপর পক্ষ মদীনাবাসী লোকটির জমি ঐ নালার নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত সে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক পানির গতিরোধে বাধা দিত; এইরূপে তাহাদের বিবাদ ঘটে এবং উভয়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে এই বিবাদের মীমাংসা প্রার্থনা করেন।

নবী (দঃ) যোবায়ের (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তোমার আবশ্যক পরিমাণ পানি সেচনের পর স্বীয় পড়শীর জন্য পানি ছাড়িয়া দিও। মদীনাবাসী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সে রাগান্বিত হইয়া বলিল, যোবায়ের আপনার ফুফাত ভাই কি না! (তাই আপনি তাহার পক্ষে মীমাংসা করিলেন।) তাহার এই কটাক্ষ পূর্ণ উক্তিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি যোবায়ের (রাঃ)কে পুনঃ ডাকিয়া বলিলেন, যাবৎ তোমার বাগানের বাঁধ ও বেষ্টনী পরিমাণ পানি না হয় তাবৎ নালার গতি রোধ করিয়া রাখার অধিকার তোমার থাকিবে। (প্রথমে হযরত (দঃ) উভয়ের মধ্যে মীমাংসামূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন যাহাতে মদীনাবাসী ব্যক্তিরই মঙ্গল ছিল, কিন্তু সে তাহা লক্ষ্য না করিয়া উল্টা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কটাক্ষ করিল। পরে নবী (দঃ) তাহার দুর্বুদ্ধিকে শায়েস্তা করার জন্য এবং বস্তুতঃ তিনি কাহার মঙ্গল করিয়া ছিলেন তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ঐ পরামর্শাকারের আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া দ্বিতীয়বার আইন সম্মত হক যাহা বস্তুতঃ উর্দ্ধ প্রান্তওয়ালা ব্যক্তি পাইবার অধিকারী, যোবায়েরকে সেই অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন।)

যোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই ঘটনানুরূপ বিষয়েই এই আয়াতটি নাযেল হয়—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ......

অর্থ—আপনার প্রভুর শপথের সহিত ঘোষণা করা হইতেছে, কোন ব্যক্তি মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ আপনাকে স্বীয় সমুদয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির পূর্ণ অধিকারীরূপে গ্রহণ না করিবে, অতঃপর আপনার আদেশ ও রায়কে বিনা দ্বিধায় সংশয়হীনরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া না লইবে। (৫ পাঃ ৬ রুঃ)

তৃষ্ণাতুরকে পানি দান করার ফযীলত

প্রথম খণ্ডে অনুদিত ১৩৪ নং হাদীছখানা এস্থানে বিশেষ লক্ষণীয়।

১১৫৬। হাদীছ :— قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَ خَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ۔

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একটি বিড়াল সম্পর্কে একজন নারীর প্রতি শাস্তি ও আজাবের আদেশ হইয়াছে। ঐ নারী একটি বিড়ালকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় সে উহাকে পানাহার প্রদান করে নাই, ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিড়ালটি মরিয়া যায়। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা তাহার শাস্তিবিধানে বলিলেন, তুমি উহাকে আবদ্ধ রাখাবস্থায় পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেও নাই এবং ছাড়িয়াও দেও নাই; যে, মাটিতে পড়া বস্তু হইতে সে তাহার আহার জোটাইতে পারে।

পতিত জমির গোচরণ ভুমির কোন অংশ ব্যক্তিগতরূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়ার অধিকার নাই

১১৫৭। হাদীছ ঃ—ছায়াব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পতিত জমির গোচরণ ভুমির কোন অংশ নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়ার অধিকার কাহারও নাই; শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সেই অধিকার আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—যে জমি কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে নহে এবং উহার অবস্থান এমন প্রান্তে যে, ঐ এলাকার জনসাধারণ নিজেদের পশুপাল চারণ ইত্যাদি প্রয়োজনে উহার উপর নির্ভরশীল—এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত জমির কোন অংশ কেহ নিজের জন্য—যেমন, নিজের পশুপাল চরাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইবে; অন্যের পশুকে তথায় চরিতে দিবে না এই অধিকার কাহারও নাই, এমনকি বাদশা, খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানেরও এই অধিকার নাই।

আল্লাহ ও আল্লার রসুলের জন্য উক্ত অধিকার থাকার অর্থ এরূপ ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীছের ব্যবহারিক ভাষায়—দেশের ও দেশবাসী সমগ্র জনগণের সর্বময় কল্যাণ-কেন্দ্র সরকারী বাইতুল-মালের অধিকারকে বুঝাইয়া থাকে।

বাইতুল-মাল কাহারও ব্যক্তিগত ধন-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে না; উহা সমগ্র জনগণের সকল প্রকার কল্যাণ ও প্রয়োজনে সাহায্য সহায়তা দানের ভাণ্ডার। রাষ্ট্র-প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে উহার মালিক নহে, তাই উহার মালিকানাকে আল্লার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়; রসুল আল্লার প্রতিনিধি, তাই রসুল ঐ বাইতুল-মালের পরিচালক। তদ্রূপ রসুলের স্থলাভিষিক্ত খলীফা তথা তাঁহার সরকার সেই বাইতুল মালের পরিচালক।

বাইতুল মালে জনগণের কল্যাণের জন্য সব রকম জিনিসই স্থায়ীভাবেও থাকে এবং সরবরাহের জন্য আমদানী হইয়া বন্টন সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবেও থাকে। বাইতুল-মালের সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন পশুপালও হয়; সেই সব পশুপালের জন্য যদি উক্ত ভুমির কোন এলাকা নির্দিষ্ট করা হয় তবে তাহা বিধেয় এবং সেই অধিকার সরকারের আছে। আলোচ্য হাদীছের শেষ বাক্যের মর্ম ইহাই। ইহারই দৃষ্টান্ত পেশ করিতে যাইয়া ইমাম

বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, হাদীছের মাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই—নবী (দঃ) বাইতুল-মালের উক্ত প্রয়োজনে "নকী" নামক মদীনার উপকণ্ঠে এক এলাকাকে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন এবং খলীফা ওমর (রাঃ) "শারাফ" ও "রাবাজাহ" নামক বিশেষ এলাকাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন (৩১৯ পৃঃ)।

● উল্লিখিত শ্রেণীর ভূমি যাহার উদ্ভিদ কাহারও জন্য নির্দিষ্ট নহে উহার ঘাস বা খড়ি কেহ কাটিয়া আনিলে উহা তাহার সত্ব হইবে ; সে উহা বিক্রি করিতে পারে (৩১৯ পৃঃ)। ● ঐরূপ আকারেই নদ-নদী, খাল-বিলও সমভাবে জনগণের থাকিবে ; যে কোন মানুষ বা জীব উহার পানি পান করিতে পারিবে, মাছ ধরিতে পারিবে।

পতিত জমি কাহাকেও দেওয়া

পতিত জমি যদি বস্তি এলাকার জনসাধারণের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্নরূপে থাকে তবে সরকার উহা পাইবার প্রকৃত পাত্র ব্যক্তিদেরকে উক্ত জমি প্রদান করিতে পারে এবং উহা লিখিতরূপে দেওয়া চাই।

১১৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বাহ্‌রাইন এলাকা মোসলমানদের অধীনস্থ হইলে পর) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী মোসলমানগণকে ডাকিলেন ; বাহ্‌রাইন এলাকার পতিত জমি তাহাদের নামে লিখিয়া দেওয়ার জন্য। মদীনাবাসীগণ বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের কোরায়শী মোহাজের ভাইদের জন্য ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই পরিমাণ জমি ছিল না যে, তিনি তাহা করিতে পারেন।

নবী (দঃ) (মদীনাবাসীদের এই উদারতা ও মহামতির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, অচিরেই আমার পরে তোমরা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রবর্তীতা দেখিবে ; (তখনও এরূপ উদারতার সহিত) তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিও।

মছআলাহ ঃ—কাহারও পানি ব্যবহারের অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকানা সত্বাধিকারভুক্ত কূপ বা পুকুরে থাকিলে, তদ্রূপ কাহারও পথ চলিবার অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকানা সত্বের জমিতে থাকিলে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে (৩২০ পৃঃ)। এমনকি উক্ত অধিকারী ব্যক্তি যেই বাড়ী বা জমির দরুণ উক্ত অধিকার লাভ করিয়াছে সেই বাড়ী বা জমির সহিত উক্ত অধিকারও সর্বসম্মতরূপে হস্তান্তর ও উহার মূল্য গ্রহণ করিতে পারে। আর ঐ বাড়ী বা জমি ব্যতিরেকে শুধু উক্ত অধিকার হস্তান্তর ও উহার বিনিময় গ্রহণও কিছু সংখ্যক আলেমগণের মতে শুদ্ধ ও বৈধ বটে। এতদ্ভিন্ন পুকুর বা পথের মূল মালিক এবং উক্ত অধিকারী উভয়ে যদি সম্মত হইয়া সেই পুকুর বা পথ উক্ত অধিকার সহ বিক্রি করে সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতরূপে উক্ত অধিকারী মূল্যের অংশীদার হইবে যদিও পুকুর এবং পথে তাহার মালিকানা স্বত্ব না থাকে। (ফতহুল কাদীর ৫—২০৫)

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلٰى أَهْلِهَا.........

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, তোমরা আমানতসমূহ তথা অন্যের হক, সত্ব ও প্রাপ্যকে প্রাপকের নিকট অর্পণ করিবে এবং যখন লোকদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর তখন ইনছাফের সহিত বিচার-মীমাংসা করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যে সব নছীহত করিতেছেন তাহা কতই না উত্তম ও ভাল। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

১১৫৯। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ

أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছার সহিত মানুষের ধন ঋণরূপে গ্রহণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেই ঋণ পরিশোধে সাহায্য করিবেন। আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিবেন।

১১৬০। হাদীছঃ—আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি দূর হইতে ওহোদ পাহাড়টি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই পর্বতটি যদি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়া হয় তবে (আমি তিন দিনেই উহা সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া দিব), তিন দিনের অতিরিক্ত একটি মুদ্রা পরিমাণও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকাকে আমি পছন্দ করিব না। হাঁ—যদি আমার ঋণ থাকে তবে উহা পরিশোধ করা পরিমাণ রাখিব বটে। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহারা (দুনিয়াতে) অধিক বিত্তশালী তাহারাই (কেয়ামতের দিন) অধিক অভাবগ্রস্ত হইবে। হাঁ—যে বিত্তশালী আল্লার রাস্তায় সৎকাজে চতুর্দিকে ধন-সম্পদ ব্যয় করে (তাহারা ব্যতীত।) কিন্তু এরূপ বিত্তশালীর সংখ্যা অতি নগণ্য।

অতঃপর নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর এবং তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অনতিদূরেই আমার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেন। হযরত (দঃ) যেই দিকে গিয়াছিলেন সেই দিক হইতে আমি (কথাবার্তার) শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাই আমি তাঁহার উপর কোন বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার নিকটে আসিতে ইচ্ছা করিলাম।

কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল যে, আমি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তুমি এই স্থানে অবস্থান করিবে, এই আদেশ স্মরণ করিয়া আমি নিবৃত্ত রহিলাম। হযরত (দঃ) ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি শব্দ শুনিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এই সুসংবাদ নিয়া আসিয়াছিলেন যে, আপনার উম্মতের যেই ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা হইতে পবিত্র থাকিয়া মৃত্যু বরণ করিবে সে বেহেশত লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমি আরজ করিলাম, (ইয়া রসুলাল্লাহ!) যদিও সে এই এই গোনাহ করিয়া থাকে? (—যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, চুরি করিয়া থাকে?) হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—যদিও সে যেনা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহগার হইলেও বেহেশত লাভে সক্ষম হইবে, অবশ্য তাহার গোনাহ ক্ষমা না হইলে সেই গোনাহের শাস্তি ভোগান্তে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে ঈমান না থাকিলে বেহেশত লাভ হইবে না, যদিও বাহ্যিক সৎকার্য করিয়া থাকে। কারণ, ঈমান না থাকিলে কোন সৎকার্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় নয়।

মহাজন বা প্রাপকের তাগাদায় ক্ষুব্ধ হইবে না

১১৬১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا وَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট (বাইতুল-মালের জন্য) ধার লইয়াছিলেন। একদা ঐ ব্যক্তি নবী (দঃ)কে তাগাদা করিল এবং অতি কঠোর ভাষায় তাগাদা করিল। ছাহাবীগণ তাহার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না, প্রাপকের অধিকার আছে তাগাদা করার। নবী (দঃ) তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, একটি উট ক্রয় করিয়া তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দাও। (এমতাবস্থায় বাইতুল-মালের মধ্যে কয়েকটি উট ওয়াসিল হইয়া আসিল, তখন সেই উট হইতেই পরিশোধের আদেশ করিলেন।) তাঁহারা বলিলেন, এই ব্যক্তির প্রাপ্য উট অপেক্ষা

উত্তম ব্যতীত সমপরিমাণ উট পাওয়া যাইতেছে না। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা উত্তমই তাহাকে প্রদান কর। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে উত্তম হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত ঘটনায় হযরত (দঃ) উক্ত ধার বা কর্জ নিজের জন্য করিয়াছিলেন না, বরং জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বাইতুল-মালের জন্য করিয়াছিলেন। কোন গরীব অসহায়কে বাইতুল-মাল হইতে একটি উট দ্বারা সাহায্য করার উপস্থিত প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু বাইতুল-মালে তখন উট ছিল না, তাই এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট ধার আনিয়া অসহায় লোকটিকে দিয়াছিলেন। পরে বাইতুল-মালে উট আমদানী হইলে যে ব্যক্তির নিকট হইতে উট আনিয়াছিলেন তাহাকে তাহার উট অপেক্ষা বড় একটি উট দিয়া দিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাইতুল-মালের জন্য লেন-দেন একটির স্থলে একাধিক দিলেও জায়েয হয়। কারণ, বাইতুল-মাল একক বা গ্রুপ বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা নহে। উহার ধন-সম্পদ সকল মোসলমানের জন্য।

সাধারণভাবে গরু-বকরী, হাঁস-মোরগ ইত্যাদি জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া বিভিন্ন ইমামগণের নিকট জায়েয আছে, কিন্তু হানাফী মজহাবে কোন জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া জায়েয নহে। প্রয়োজন হইলে বাকি মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবে।

দেনার কিছু অংশ পরিশোধ করিয়া বাকি অংশ মাফ লইতে পারিলে রেহাই পাওয়া যাইবে

১১৬২। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তিনি (একা আমার উপর) ছয়টি মেয়ে এবং (১৭০ মণ খেজুরের) ঋণ রাখিয়া গেলেন।

আমাদের যে খেজুর বাগান ছিল তাহা ঋণদাতাগণকে দেখাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম যে, তাহারা যেন আমার পিতার ঋণের পরিশোধে বাগানের এই মৌসুমের সমুদয় ফল নিয়া নেয় এবং পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না; তাহারা ভাবিতেছিল, ইহা ঋণের পরিমাণ হইবে না। এমনকি তাহারা কঠোরতা অবলম্বন করিলে পর আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা সুপারিশ করাইলাম। নবী (দঃ) মহাজনকে ঐরূপই বলিলেন যে, বাগানের সমুদয় ফল গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে যেন ঋণ হইতে মুক্তি দান করে, কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। নবী (দঃ) আমাকে বলিয়া দিলেন যে, ফলসমূহ কাটিয়া আনিয়া স্থান বিশেষে স্তূপকৃত কর; এক এক শ্রেণীর খেজুর এক এক স্তূপে রাখিও। তারপর আমাকে খবর দিও। আমি তাহাই করিলাম। নবী (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তথায় তশরীফ আনিলেন। মহাজনগণ হযরত (দঃ)কে দেখিয়া আমার প্রতি

যেন বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নবী (দঃ) সর্ব বড় বা মধ্যম শ্রেণীর একটি খেজুর স্তূপের উপর বসিয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, মহাজনগণকে ডাকিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পূর্ণ মাপিয়া দিতে থাক। আমি তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কার্য করিলাম, এমনকি আমার পিতার উপর আর কাহারও ঋণ বাকি থাকিল না। সকলের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পরও প্রায় ৪০ মণ উত্তম ও ৩৩ মণ ভাল-মন্দ মিশাল মোট প্রায় ৭৩ মণ খেজুর উদবৃত্ত থাকিল। অথচ আমি এই ঋণ পরিশোধের জন্য বাগানের সমুদয় খেজুর প্রদানে রাজি ছিলাম, কিন্তু ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা উহা কম হইবে বলিয়া মহাজনগণ তাহাতে সম্মত হইয়াছিল না। অতঃপর আমি মগরেবের নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে তাঁহার সঙ্গে পড়িলাম এবং নামাযান্তে সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে অবগত করিলাম। হযরত (দঃ) হাস্যমুখে বলিলেন, আবু বকর ও ওমরকে এই ঘটনা জ্ঞাত কর। আমি তাঁহাদিগকে ঘটনা জ্ঞাত করিলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন এই বিষয়ে স্বীয় কার্যকলাপ (খেজুর স্তূপের উপর বসিয়া বরকতের দোয়া) করিয়াছিলেন তখনই আমরা একীন করিয়াছিলাম যে, কোন অলৌকিক ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে।

ঋণ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা

১১৬৩। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাইবার পূর্বক্ষণে দোয়া-মাছুরা স্বরূপ যেই) দোয়া পড়িতেন (উহাতে ইহাও উল্লেখ থাকিত)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ٥

"হে আল্লাহ! সর্বপ্রকারের গোনাহ ও ঋণ হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"*

সামর্থ্য সত্বেও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা বড় অন্যায়

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তি টালবাহানা করিলে তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা এবং (বিচার বিভাগ কর্তৃক) তাহাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় সঙ্গত গণ্য হইবে।

মছআলাহঃ—শুধু এক-দুই দিনের অবকাশ নেওয়াকে টালবাহানা গণ্য করা হইবে না। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা সমীচীন নহে।

১১৬৪। হাদীছঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ـ

---

* উল্লিখিত দোয়াটি ৪৭৮ নং হাদীছে বর্ণিত পূর্ণ দোয়ার অংশবিশেষ।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা অতি বড় অন্যায়।

দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কাহারও মাল থাকিলে ?

১১৬৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট কেহ স্বীয় মালিকানা স্বত্বের বস্তু নির্দিষ্টরূপে পাইলে ঐ বস্তু একমাত্র সেই মালিকেরই গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—বিভিন্ন লোকের ঋণে ঋণগ্রস্ত থাকাবস্থায় ধন-সম্পদের লাঘব ঘটার দরুন সরকারীভাবে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার জীবিকা নির্বাহাতিরিক্ত যে পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে সরকার কর্তৃক উহা মহাজনগণের মধ্যে তাহাদের ঋণের পরিমাণ অনুপাতে বন্টনের ব্যবস্থা করার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু এমতাবস্থায় সেই দেউলিয়ার নিকট ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা স্বত্বের কোন বস্তু নির্দিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিলে সেই বস্তুটি একমাত্র ঐ মালিকেরই স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, অন্যান্য মহাজনগণ এই বস্তু-বিশেষের উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না। আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য ইহাই, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা স্বত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহার প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমানতরূপে গচ্ছিত বস্তু বা আ'রিয়ত তথা সাময়িক কার্য্য উদ্ধারের জন্য ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় কাহারও নিকট হইতে গৃহীত বস্তু ইত্যাদি। তদ্রূপ দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পূর্বে তাহার নিকট কাহারও বিক্রিত বস্তু যাহার মূল্য এখনও সে পরিশোধ করে নাই এবং ঐ বস্তুর কোন পরিবর্তনও সে সাধন করে নাই—এই বস্তুটিও ঐ বিক্রেতার ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের আওতাভুক্ত পরিগণিত, সুতরাং ঐ বস্তুটি একমাত্র তাহারই প্রাপ্য হইবে।

হানাফী মজহাব মতে আমানত ও আ'রিয়ত ইত্যাদি রকমের বস্তুসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু কাহারও বিক্রিত বস্তু কোন অবস্থাতেই ঐরূপ গণ্য হইবে না। বরং বিক্রিত বস্তু দেউলিয়া ব্যক্তির স্বত্ব গণ্য হইবে এবং বিক্রেতা উহার মুল্যের পাওনাদার হিসাবে অন্যান্য মহাজনগণের ন্যায় একজন মহাজন গণ্য হইবে। বস্তুতঃ এই বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত, কারণ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া ক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তু গৃহীত হওয়ার পর উহার উপর ক্রেতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, যদিও ধারে বিক্রি হইয়া থাকে। বিক্রেতার স্বত্ব উহার উপর বাকী থাকে না, বরং সে ঋণ-মুল্যের পাওনাদার থাকে।

মছআলাহঃ—কোন ব্যক্তির উপর ঋণ এই পরিমাণ যে, তাহা আদায় করিতে তাহার ধন-সম্পদের সম্পূর্ণই প্রয়োজন; তাহার ঋণ আদায় করিলে সে নিঃস্ব; তাহার ধন-সম্পদের কিছুই থাকে না। সে ক্ষেত্রে পাওনাদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজী তথা ইসলামী আইনের বিচারক ঐ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ তাহার ধন-সম্পদের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। এমনকি ঐ ব্যক্তি নিজে ঋণ পরিশোধার্থে ধন-সম্পদ বিক্রি করায় সম্মত

না হইলে কাজী ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রি করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন। যদি উহা সমুদয় ঋণের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে যে পরিমাণই হয় উহা সকল পাওনাদারদের উপর প্রত্যেকের পাওনা অনুপাতে বন্টন করিয়া দিবেন।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি নিতান্তই নির্বোধ ; ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া নিঃস্ব হওয়ার পথে ; এইরূপ ব্যক্তির উপরও কাজী তাহার ধন-সম্পদে তাহার হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব তথা তাঁহার নিজের, তাহার স্ত্রীর, তাহার নাবালেগ সন্তানাদির ও যে সব লোকের ভরণ-পোষণ শরীয়ত মতে তাহার দায়িত্ব, সেই সবের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বহনে কাজী ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রিও করিতে পারেন। (৩২৩ পৃঃ)

ধন-সম্পদের অনিষ্ট সাধন নিষিদ্ধ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, والله لا يحب الفساد "অনিষ্ট সাধন আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়।"

ভ্রষ্ট বা বোকা মানুষ অনেক সময় এরূপ ধারণা করে যে, আমার ধন-সম্পদের মালিক আমি, সুতরাং আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী সেই ধন-সম্পদের মধ্যে স্বীয় অধিকার খাটাইব ; যথায়-তথায় যদ্রূপ ইচ্ছা তদ্রূপ খরচ ও ব্যয় করিব।

এই ধারণা নিতান্তই বোকামি, কারণ ধন-সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত, সুতরাং উহা ব্যয় করিতে আল্লাহ ও আল্লার প্রতিনিধি রসুলের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতার অধিকার কাহারও নাই।

হযরত শোয়া'য়েব (আঃ)-এর ভ্রষ্ট উম্মতদের ঐরূপ একটি কু-উক্তি ও কু-যুক্তির সমালোচনা কোরআন শরীফেও উল্লেখ রহিয়াছে। তাহারা কুফর ও শিরকের সহিত এই কু-অভ্যাস ও কু-কর্মেও লিপ্ত ছিল যে, পরস্পর লেন-দেনের মধ্যে মাপ ও ওজনে কম দিয়া থাকিত। শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ........

অর্থ—হে আমার জাতি! তোমরা আল্লার একত্ববাদ ও তাঁহার গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ হও ; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার কু-অভ্যাস বর্জন কর ; আমি দেখিতেছি, তোমরা স্বচ্ছল অবস্থায় আছ ; (এমতাবস্থায় তোমাদের অসদুপায় অবলম্বন করা দ্বিগুণ দোষণীয়, তাই) আমার আশঙ্কা হয়, কোন দিন সর্বগ্রাসী আজাব তোমাদিগকে গ্রাস করিয়া না লয়।

হে আমার জাতি! মাপ ও ওজন সূক্ষ্মরূপে পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিও না এবং মানুষকে তাহার প্রাপ্যে ঠকাইও না এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইও না। আল্লার বিধান মতে তথা সদুপায়ে যে লভাংশ হাসিল হয় তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও

মঙ্গলজনক। তোমরা যদি খাটি মোমেন হও (নিজেই তোমরা ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।) (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

ভ্রষ্ট উম্মতগণ হযরত শোয়া'য়েব আলাইহেচ্ছালামের এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কু-যুক্তির ও কু-উক্তির অবতারণা করিল। আল্লার একত্ববাদ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এই উক্তি করিল যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের রীতি আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার বিষয়ে এই যুক্তির উল্লেখ করিল যে, আমাদের মালিকানা স্বত্বের ধন-সম্পদে আমরা নিজ ইচ্ছাধীন স্বীয় অধিকার খাটাইব—যাহা ইচ্ছা তাহা করিব যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করিব, তাহাতে কাহারও বাধা দানের কি অধিকার থাকিতে পারে?

এসব কু-উক্তি ও কু-যুক্তির ধ্বজাধারীরা শোয়া'য়েব (আঃ)কে বলিল—

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ ...... اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۔

"হে শোয়া'য়েব! আপনার সাধুতা—আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা স্বীয় পূর্বপুরুষদের মাবুদকে ত্যাগ করি বা আমরা স্বীয় ধন-সম্পদে অধিকার প্রয়োগ ত্যাগ করি?" (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বুঝ-প্রবোধ দানে সতর্ক করিলেন যে—

يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ ......

"হে আমার জাতি! আমার বিরোধীতায় উন্মত্ত হইয়া তোমরা স্বীয় ধ্বংসের পথ অবলম্বন করিও না। সতর্ক থাকিও—পূর্ববর্তী নূহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, হুদ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, ছালেহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মতের উপর যেরূপ ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছিল তোমাদের উপরও যেন সেইরূপ ধ্বংস নামিয়া না আসে; আর এক দল দুষ্কৃতিকারী—লুত (আলাইহেচ্ছালাম)এর উম্মতের ঘটনা তোমাদের নিকটবর্তীই ঘটিয়াছে; এই সব লক্ষ্য করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক ও সংযত হও।" (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

এইরূপ হৃদয় বিদারক বক্তৃতাও তাহাদের পাষাণ হৃদয়ের উপর কোন ক্রিয়া করিল না, তাহারা স্বীয় দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির উপর অটল রহিল এবং বলিল—

يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

"হে শোয়া'য়েব! তোমার এসব কথা আমাদের যুক্তিতে আসে না এবং আমাদের মধ্যে তুমি ত দুর্বল, আমাদের উপর তোমার কোন প্রভাব নাই।"

অতঃপর তাহারা শোয়া'য়েব (আঃ)কে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে উহাই ঘটিল যাহার সতর্কবাণী শোয়া'য়েব (আঃ) করিয়াছিলেন—

وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ

"দুষ্কৃতিকারীদের উপর ধ্বংসের করাল ছায়া নামিয়া আসিল, তাহারা নিজ নিজ বস্তিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া রহিল এবং তাহাদের অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে এরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল যেন তাহারা এই ধরা-পৃষ্ঠে কখনও অবস্থান করে নাই। পূর্ববর্তী দুষ্কৃতিকারী ছামুদ বংশের দুর্ভাগ্যই মাদয়্যানস্থিত হযরত শোয়া'য়েব আলাইহেচ্ছালামের দুষ্কৃতিকারী উম্মতগণও বরণ করিল এবং ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

এস্থানে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত ঘটনার আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ধন-সম্পদের উপর মালিকানা স্বত্বের যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বেচ্ছা-চারীতার দাবী করা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। যাহারা মালিকানা স্বত্বের গর্বে অপব্যয় ও ধন-সম্পদের অনিষ্ট করে তাহারা ভ্রষ্ট এবং ধ্বংসের সম্মুখীন।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন— وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ

"যাহারা বুদ্ধিহীন বোকা তাহাদের হাতে ধন-সম্পদ দিও না"। (৪ পাঃ ১২ রুঃ)

কোরআন শরীফের এই আদেশেরও তাৎপর্য্য ইহাই যে, ধন-সম্পদকে অনিষ্টতা হইতে রক্ষা করা অবশ্যক, তাই উল্লিখিত আদেশ বলবৎ করা হইয়াছে। এমনকি ধন-সম্পদকে অনিষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধে শরীয়তে একটি বিশেষ বিধান রাখা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বুদ্ধিহীনতা বা কু-বুদ্ধির দরুন ধন-সম্পদের অপব্যয়ী ও অনিষ্টকারী প্রমাণিত হইলে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক তাহার নিজ ধন সম্পদের উপর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হইবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি ঐ পর্য্যায়ের অনিষ্টকারী না হয়, বরং ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকিয়া যাওয়ার মত জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবী হয় তাহার জন্যও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা।

১১৬৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজের বিষয়ে এই অভিযোগ করিল যে, সে (লেন-দেনে ও কাজ-কারবারে) ঠকিয়া যায়। (কারণ, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা খুবই কম, এমনকি তাহার আত্মীয়-স্বজনগণও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহার প্রতি ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সুপারিশ জানাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন; সে আরজ করিল, আমি ক্রয়-বিক্রয় হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।) তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এই ব্যবস্থা শিক্ষা দিলেন যে, যখন তুমি কোন ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা বলিবে, তখন ইহাও বলিয়া দিও—"ঠকাইবার কার্য্য করিবেন না" (আমার অধিকার থাকিবে এই

ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করার)। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এই বলিয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের পরও তিন দিন পর্য্যন্ত তোমার অধিকার বাকি থাকিবে। (তুমি এই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিতে পারিবে।) সেমতে ঐ ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—নিজের ধনেরও অপচয় বা ক্ষতি সাধন শরীয়তে নিষিদ্ধ। অনিচ্ছাকৃত ঠকের ক্ষতি হইতেও বাঁচিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঠকের ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য সরকার বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিত করিতে পারে।

১১৫৭। হাদীছ ঃ— عن المغيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ

وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

অর্থ—মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ভালরূপে জ্ঞাত থাকিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তিনটি কার্য্য হারাম করিয়া দিয়াছেন—(১) মাতার না-ফরমানি করা, (২) মেয়ে হইলে উহাকে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া দেওয়া, (৩) (কৃপণতা, ও লালসা বশে) নিজে (কর্ত্তব্য কাজে ব্যয় করা বা দান করা হইতে) বিরত থাকিয়া অন্য লোকদের নিকট হইতে ওয়াসিল করায় তৎপর থাকা। এতদ্ভিন্ন তিনটি কার্য্যকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে নাপছন্দ করিয়াছেন—(১) অযথা তর্ক-বিতর্ক বা ভিত্তিহীন কথায় লিপ্ত হওয়া (২) বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্যের নিকট হাত পাতা ও ভিক্ষায় লিপ্ত হওয়া বা অধিক প্রশ্নের অবতারণা করা (৩) ধনের অপচয় করা।

ব্যাখ্যা ঃ—মাতা-পিতা উভয়ের নাফরমানিই আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ। নারী জাতির দুর্বলতা দৃষ্টে মাতা সম্পর্কে সতর্ক করার আবশ্যকতা অধিক। এতদ্ভিন্ন মাতা সন্তানের উপর অধিক হকদার। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক হকদার ও অধিকারী কে? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবারও বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? এইবারও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? এইবার হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, অতঃপর তোমার পিতা এবং অতঃপর তোমার আত্মীয়-স্বজন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ক্রেতার নিকট ক্রয়ের মূল্য নাই বা উপস্থিত নাই সে ক্ষেত্রেও (বাকি মূল্যে) ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে (৩২১ পৃঃ)। অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট বিক্রয় বস্তু না থাকিলে তাহার জন্য উহা বিক্রি করা জায়েয নহে—পূর্বে বলা হইয়াছে; ক্রেতার ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। ● খাতককে তাগাদা করিতে শালীনতা ও কোমলতা রক্ষা করিবে (ঐ)। ● ধার বা কর্জ পরিশোধ করিতে ধারে গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া জায়েয (৩২২পৃঃ)। কিন্তু ধার গ্রহণে উত্তমটি দ্বারা পরিশোধের শর্ত করা হারাম এবং সেই শর্ত পালনীয় হইবে না। তদ্রূপ সংখ্যায় বা মাপে ধারের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দেওয়া-লওয়াও জায়েয নহে, যদিও শর্ত ব্যতিরেকে হয়। ধারে গৃহিত বস্তু জাতীয় বস্তুর দ্বারা ধার পরিশোধ করিতে নির্দ্ধারিত সংখ্যা বা পরিমাপে না দিয়া আন্দাজ ও অনুমানের উপর দেওয়া হইলে তাহাও জায়েয হইবে না; কারণ, সে ক্ষেত্রে বেশী হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র পরিমাণ বেশী হইলে পরিশোধকারীর স্বেচ্ছায় হইলেও তাহা সুদরূপে হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য যদি পরিশোধীয় বস্তুর পরিমাণ নিশ্চিতরূপে মূল ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয় এবং পাওনাদার ব্যক্তি ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিয়া বাকিটা মাফ করিয়া দেওয়ারূপে গ্রহণ করে তবে তাহা জায়েয হইবে। (৩২২ পৃঃ। ফতহুলবারী, ৫—২৬)। ● ঋণ পরিশোধ বা উহার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মৃত্যু হইলে তাহার জানাযার নামায পড়া কিরূপ? (৩২৩ পৃঃ)। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইতুল-মালের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এরূপ ব্যক্তির জানাযার নামায নবী (দঃ) নিজে পড়িতে চাহিতেন না; অন্য লোকদেরকে পড়ার আদেশ করিতেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ঐরূপ অভাবী ব্যক্তি যে হৃতসর্বস্ব অবস্থায় ঋণ রাখিয়া মারা যাইবে তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং নবী (দঃ) ঐরূপ ব্যক্তির জানাযা নিজেও পড়েন। উক্ত সূত্রেই বর্তমানে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত নাই সে ক্ষেত্রে অপরিশোধীয় ঋণী ব্যক্তির জানাযার নামায গণ্যমান্য বিশিষ্ট আলেম ব্যক্তিকে না পড়ার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, যেন ঋণের প্রতি লোকের ভয় থাকে। ● বিলম্বিত নির্দিষ্ট তারিখে আদায়ের কথার উপর ধার-কর্জ গ্রহণ করা জায়েয। অর্থাৎ উভয় পক্ষের একই জাতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় সাধারণ বিনিময় ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমপরিমাণ হইয়াও একদিক বাকি থাকিলে সেই বিনিময় অশুদ্ধ হারাম গণ্য হয়। ধার-কর্জের ক্ষেত্রেও এক প্রকার বিনিময়ই হয় এবং উভয় পক্ষে একই জাতীয় বস্তু হইয়া থাকে এতদসত্ত্বেও একদিকে নগদ অপরদিকে বাকি—ইহা জায়েয। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, ধার-কর্জে একই জাতীয় বস্তুর বিনিময় হয় এবং কর্জ দেওয়ার দিকে নগদ আর পরিশোধের দিকে বিলম্বে দেওয়া সাব্যস্ত হয়—ইহা শুধু ধার-কর্জে জায়েয। এমনকি পরিশোধের পক্ষ হইতে যদি গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া হয় তাহাও জায়েয,

যদি উত্তম দেওয়ার শর্ত না থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সংখ্যায় বা মাপে সমান রাখিয়া শুধু গুণের হিসাবে উত্তম হওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু একই জাতীয় বস্তুর দ্বারা কর্জ পরিশোধে সংখ্যায় বা মাপে বেশী দিলে শর্ত ছাড়াও তাহা জায়েয হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ধার-কর্জের মধ্যে পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখ অধিকাংশ ইমামগণের মতে উভয়ের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। হানাফী মজহাব মতে ধারদাতার স্বীকৃতির সহিত হইলেও পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখ ধারদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হয় না। অর্থাৎ ধারদাতা ঐ তারিখের পূর্বেও আইনগতরূপে পরিশোধের দাবী করিতে পারে। অবশ্য তাহার স্বীকৃতিতে তারিখ নির্দ্ধারিত হইলে উহা তাহার ওয়াদা ও অঙ্গীকারভুক্ত হইবে এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে তাহার গোনাহ হইবে, কিন্তু ওয়াদা-অঙ্গীকার আইনের আওতায় আসে না; যেমন এক ব্যক্তি কাহারও নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে, আমি তোমাকে একশত টাকা দ্বারা সাহায্য করিব; পরে যদি সে তাহার অঙ্গীকার রক্ষা না করে সেই জন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন বস্তু বাকি ক্রয় করে; ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের সম্মতিতে এইরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মূল্য দশ দিন পরে আদায় করা হইবে—সে ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সময় উভয় পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক হইবে। অর্থাৎ বিক্রেতা সেই নির্দ্ধারিত দিন আসিবার পুর্বে মূল্যের দাবী করিলে তাহার দাবী আইনতঃও অগ্রাহ্য হইবে (৩২৪ পৃঃ)। ● ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসমর্থ হয় সে ক্ষেত্রে ঋণের অংশবিশেষ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ঋণদাতার নিকট সুপারিশ করা সুন্নত। (৩২৪ পৃঃ)।

মামলা-মকদ্দমা সম্পর্কে

কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে বিচারক তাহার উপস্থিতি-আদেশ জারি করিতে পারেন। কোন অমোসলেম কোন মোসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে সে ক্ষেত্রেও একই রূপে বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১১৬৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মোসলমান ও একজন ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় মোসলমান ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর এইরূপ শপথ করিল, ঐ আল্লার শপথ যিনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। ইহুদী ব্যক্তিও তাহার কসমের ক্ষেত্রে বলিয়া উঠিল—"ঐ আল্লার শপথ যিনি মুছা (আলাইহেচ্ছালাম)কে সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে মোসলমান ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া ইহুদী ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করিলেন। ইহুদী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করতঃ মোসলমান ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করিল—সে সত্য ঘটনাই বয়ান করিল।

নবী (দঃ) (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং) বলিলেন, তোমরা আমাকে মুছা (আঃ) বা অন্য কোন নবীর উপর (এইরূপ) প্রাধান্য দিও না। (যাহাতে অন্য নবীর প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও তাছিল্যের ভাব বা ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন নবী কোন কোন বিশেষত্বের অধিকারী থাকেন। যেমন ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে) সমস্ত (জীবিত মৃত ও সমস্ত মৃতের রুহ—আত্মা) বেহুঁশ অচৈতন্য হইয়া যাওয়ার পর (দ্বিতীয় ফুঁকের দ্বারা আত্মা সমুহ চৈতন্য লাভ করতঃ আত্মা ও দেহের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে) যখন সকলে চেতনা লাভ করিবে, তখন আমি হইব সর্বপ্রথম সচেতন ব্যক্তি। কিন্তু প্রথম সচেতন হইয়া আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় মহান আরশের কিনারা ও পায়া ধরিয়া রহিয়াছেন। জানি না, তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিম্বা (সিঙ্গার প্রথম ফুঁকের) অচৈতন্যতা হইতে রক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিভিন্ন নবীগণের পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবধান একটি অবধারিত বিষয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "রসুলগণের মধ্যে আমি কাউকে কারুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।" অতঃপর ইহাও নিশ্চিত ও অবধারিত যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত নবীগণের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইলেন, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। এমনকি সর্বসম্মতরূপে তিনি سيد الانبياء সাইয়ে-দুল আম্বিয়া "সমস্ত নবীগণের সরদার ও প্রধান" سيد المرسلين সাইয়ে-দুল মোরসালীন "সমস্ত রসুলগণের সরদার বা প্রধান" উপাধিতে ভুষিত। তাই অন্যান্য যে কোন নবীর উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দান করায় কোনরূপ বাধা বিঘ্নের অবকাশ থাকিতে পারে না। তবে আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, কোন নবী আলাইহেচ্ছালামের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করাকে শরীয়ত অনুমোদন করে না। উল্লিখিত ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ছাহাবীকে এই বিষয়েই সতর্ক করিয়াছিলেন যে, তোমার ভাবভঙ্গি ও ব্যবহারে মুছা আলাইহে-চ্ছালামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা নিষিদ্ধ।

সমুদয় সৃষ্ট জগতের ধ্বংস সাধনকালে ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেস্তার সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে অচৈতন্যতা সম্পর্কে কোরআন শরীফে এইরূপ উল্লেখ আছে—

وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

"সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, যদ্দরুন আকাশ সমুহে অবস্থিত এবং ভুপৃষ্ঠের সকল প্রাণী অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, অবশ্য যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে তাঁহারা ঐ অচৈতন্যতা হইতে রক্ষা পাইবেন।" (২৪ পাঃ ৪ রুঃ)

এই রক্ষা প্রাপ্তগণ হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ। মুছা আলাইহে-চ্ছালামও তাঁহাদের ন্যায় রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন না-কি উহার সম্ভাবনা সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণও বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ সাক্ষাতকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া অভিহিত করতঃ মুছা (আঃ)কে নিকটবর্তী একটি পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার আদেশ করিলেন এবং সেই পর্বতের উপর আল্লাহ তায়ালার নূরের জ্যোতি ও ঝলকের কিঞ্চিৎ উদ্ভব হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্বত ভস্মীভূত চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল এবং মুছা (আঃ) অচৈতন্য হইয়া ভূপাতিত হইয়া গেছেন। এই ঘটনার বিবরণ কোরআন শরীফের বর্ণিত আছে। (৯ পাঃ ৭ রুঃ দ্রষ্টব্য)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ঘটনায় মুছা (আঃ)-এর অচৈতন্য হওয়ার বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ তাঁহাকে সিঙ্গা-ফুঁকের অচৈতন্যতা মুক্ত রাখিবেন। ঐ সময় তাঁহাকে আরশবাহী ফেরেশতা-গণের সাথেই রাখিবেন। হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি আরশের পায়া ধরিয়া আছেন।

১১৬৯। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি এই অভিযোগ নিয়া উপস্থিত হইল যে, আপনার এক ছাহাবী আমার মুখের উপর চপেটাঘাত করিয়াছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি? সে বলিল, মদীনাবাসী অমুক ছাহাবী। নবী (দঃ) সেই ছাহাবীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে মারিয়াছ? ছাহাবী (স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে ছিলাম; তখন শুনিতে পাইলাম এই ইহুদী ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর (এইরূপে কসম খাইতেছে "ঐ আল্লার কসম যিনি মুছা (আঃ)কে বিশ্ব-মানবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।" তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে খবীস! মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরও কি (মুছা (আঃ)কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে)? এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্রোধে বেশামাল হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছি। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, নবীগণের মধ্যে কাউকে কাউর উপর (এই ধরণের) প্রাধান্য দিও না (যাহাতে কোন নবীর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হয়)।

স্মরণ রাখিও—কেয়ামত তথা মহা প্রলয়ের সময় (সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে সকল প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং) আত্মাসমূহ অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁকে সকলে সচেতন হওয়াকালে সর্বাগ্রে আমিই সচেতন হইব, কিন্তু চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) মহান আরশের একটি খাম জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। জানি না—তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিম্বা তাঁহার পূর্বেকার অচৈতন্যতাকে তখনকার অচৈতন্যতার পরিবর্তে গণ্য করিয়া লওয়ায় তখন তিনি অচৈতন্য হইবেন না।

বিচারকের নিকট অভিযুক্তের দোষ বলা

১১৭০। হাদীছ :— عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ....

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মোসলমানের কোন বস্তু গ্রাস করার জন্য মিথ্যা কসম খাইবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত থাকিবেন।

আশয়াছ (রাঃ) ছাহাবী এই হাদীছ-বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সতর্কবাণী আমারই এক ঘটনা উপলক্ষে ছিল।

আমার এবং এক ইহুদী ব্যক্তির মালিকানায় একটি জমিন ছিল। ইহুদী ব্যক্তি পরে আমার স্বত্বের অস্বীকার করিল। আমি এই বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ পেশ করিলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাক্ষী আছে কি ? তোমাকে দুই জন সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, নতুবা অপর পক্ষকে কসম খাইতে বলা হইবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সাক্ষী নাই। তখন তিনি ইহুদী ব্যক্তিকে স্বীয় অস্বীকারুক্তির উপর কসম খাইতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাকে এই সুযোগ দেওয়া হইলে সে নির্ভয়ে (মিথ্যা কসম খাইয়া বসিবে এবং আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। আমাদের এই ঘটনা উপলক্ষেই হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খাইয়া পরের সম্পত্তি অধিকার করিবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর ভয়ঙ্কর রাগান্বিত হইবেন।

হযরতের উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের এই আয়াতটি নাযেল হইল—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ ....

অর্থ—যাহারা আল্লার নামে মিথ্যা কসম ও অঙ্গীকার করিয়া মূল্যহীন দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ হাসিল করিবে পরকালে সুখ-শান্তির লেশমাত্রও তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। (তাহাদের প্রতি ক্রোধের দরুণ) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাদের সঙ্গে কোন মেহেরবানীর কথাই বলিবেন না, তিনি তাহাদের প্রতি নেক দৃষ্টিও করিবেন না, তাহাদের ক্ষমাও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব রহিয়াছে। (৩ পাঃ ১৬ রুঃ)

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া গেলে সেই প্রতিনিধি মৃত ব্যক্তির পক্ষে দাবী-দাওয়া ইত্যাদি করিতে পারে (৩২৬ পৃঃ)। ● কোন অভিযুক্ত বা অপরাধী সম্পর্কে পলায়ন বা দুষ্কৃতির আশঙ্কা করা হইলে তাহাকে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার শাগের্দ একরেমাকে কোরআন শরীফ ও শরীয়তের এলম শিক্ষা দানের জন্য পায়ে বেড়ি লাগাইয়া দিতেন। ● যাহারা কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় বা বিবাদ সৃষ্টি করে এরূপ লোককে মুরব্বি ঘর হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যুতে তাঁহার ভগ্নি নাজায়েযরূপে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন (৩২৬ পৃঃ)। ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই ইঙ্গিত করা হইতে পারে যে, কোন এলাকায় কোন ব্যক্তি বা দল দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কার্য্যের তৎপরতা সৃষ্টি হইলে বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইলে শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে ঐ ব্যক্তি বা দলের প্রতি ঐ অঞ্চল হইতে দেশান্তরের আদেশ প্রবর্তন করিতে পারে। ● অভিযুক্ত অপরাধীকে আবদ্ধ করার জন্য সরকার হাজতখানা তৈরী করিতে পারে। এমনকি মক্কা শরীফ যেখানে জংলী পশু-পক্ষি পর্য্যন্ত আবদ্ধ করা জায়েয নহে, সেখানেও হাজতখানা তৈয়ার করা যায়। খলীফা ওমরের নির্দেশে মক্কা শরীফে হাজতখানার জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহার খেলাফত কালে মক্কা শরীফে হাজতখানা বানাইয়াছিলেন (৩২৭ পৃঃ)।

স্বীয় প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করা

১১৭১। হাদীছঃ—খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আমার সেই পূর্ব ব্যবসা সূত্রে আছ ইবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির নিকট আমার কিছু প্রাপ্য ছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আমি ঐ ব্যক্তির নিকট স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করিতে উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলিল, যাবৎ আপনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর প্রতি স্বীয় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতঃ তাঁহার দল ও ধর্ম ত্যাগ না করিবেন আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিব না। আমি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলাম, (কেয়ামত পর্য্যন্ত তথা) তুমি মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়া পর্যন্তও আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর হইতে ঈমান প্রত্যাহার করিব না। এতচ্ছ্রবণে সে বলিল, আমার পুনঃ জীবিত হওয়া সত্য হইলে আপনি অপেক্ষা করুন—মৃত্যুর পর জীবিত হইয়া আমি ধন-জন লাভ করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। তাহার এইরূপ দম্ভ ও দুরাশাপূর্ণ উক্তির প্রতি তিরস্কারে এই আয়াত নাযেল হয়—

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا...... وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

অর্থ—তোমরা ঐ ব্যক্তির দুরাশা, দম্ভোক্তি ও আস্ফালনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? (তাহার আশা ও উক্তি কি আশ্চর্যজনক!) সে আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে উপরন্তু সে এই আশা ও আস্ফালন প্রকাশ করে যে, (পুনঃ জীবিত হওয়ার পর কেয়ামতের দিন) আমাকে ধন-জন দান করা হইবে। সে কি এই সব বিষয় অগ্রিম জানিয়া ফেলিয়াছে বা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে এই বিষয়ের কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে? (তাহার আশায় ছাই, তাহার দম্ভোক্তি ও আস্ফালন সব ভিত্তিহীন।) তাহার এই সব দম্ভোক্তি আমি লিখিয়া রাখিতেছি এবং তাহার আশার বিপরীত আমি তাহার জন্য আজাব ও শাস্তি বর্দ্ধিত করিব। (পুনর্জীবনের পর নূতন ধন-জন লাভ করা ত দূরের কথা, তাহার বর্তমান ধন-জনও তাহার থাকিবে না।) তাহার ধন-সম্পদ ত আমার (বিধি-বিধানের) আওতায় আসিয়া যাইবে এবং সে নিঃসঙ্গ একা আমার দরবারে হাজির হইতে বাধ্য হইবে। (১৬ পাঃ ৮ রুঃ)

পথে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে

১১৭২। হাদীছঃ—উবাই ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একটি থলিয়া পাইলাম, উহাতে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। উহার কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। নবী (দঃ) আমাকে উহার সম্পর্কে এক বৎসর পর্যন্ত ঢোল-শোহরতে প্রচার করার আদেশ করিলেন। আমি তাহা করিলাম, কিন্তু মালিকের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। হযরত (দঃ) আমাকে পুনরায় ঐরূপ আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম, কিন্তু প্রকৃত মালিকের কোন খোঁজ পাইলাম না। তৃতীয় বার আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। এইবার নবী (দঃ) বলিলেন, স্বর্ণ-মুদ্রাগুলির সংখ্যা ইত্যাদি সঠিকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখ এবং থলিয়াটির সমুদয় গুণাগুণ, এমনকি মুখ বাঁধিবার রজ্জুটি পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে স্মরণ রাখ। যদি মালিক উপস্থিত হয় (অর্থাৎ কোন দাবীদার যদি প্রাপ্ত বস্তুর সঠিক বিবরণ দেয়) তবে উহা তাহাকে দিয়া দিবে। নতুবা তুমি উহা খরচ করিতে পার।

ব্যাখ্যাঃ—প্রাপ্ত বস্তুর গুরুত্ব ও মুল্যমান অনুপাতে কম বেশী সময় শোহরত করা আবশ্যক এবং শোহরত করার স্থান—হাট-বাজার, সভা-সমিতি, মসজিদের সম্মুখ ইত্যাদি জন-সমাবেশের স্থান সমূহ। মালিক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ আবশ্যক। অবশ্য তাহার বিবরণ দৃষ্টে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে-ই প্রকৃত মালিক তবে তাহাকে দেওয়া যাইবে। মালিকের খোঁজ না পাওয়া অবস্থায় যদি প্রাপক স্বয়ং দরিদ্র হয় তবে সে-ই মালিকের পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ উহা ভোগ করিতে পারে। যদি প্রাপক দরিদ্র না

হয় তবে মালিকের পক্ষে ছদকার নিয়্যত করিয়া দরিদ্রকে দান করিবে। ধনী প্রাপক উহা নিজেও খরচ করিতে পারে, কিন্তু ধার বা কর্জরূপে এবং তাহা কাজী তথা ইসলামী আইনের জজের অনুমতি গ্রহণে হইতে হইবে (আলমগীরী, ২—৩১৬)। প্রত্যেক অবস্থাতেই ঐ বস্তু খরচ হইয়া যাওয়ার পর মালিক উপস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এমনকি ছদকা করার ক্ষেত্রে মালিক ছদকায় সম্মত না হইলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং নিজে ছদকার ছওয়াব পাইবে।

১১৭৩। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে-ঘাটে প্রাপ্ত বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, বৎসরকাল উহার ঢোল-শোহরত কর, অতঃপর উহার সমুদয় নিদর্শন ভালরূপে স্মরণ রাখ। যদি দাবীদার উপস্থিত হয় (এবং তাহার দাবী প্রমাণিত হয়) তবে তাহাকে উহা প্রদান করিবে। নতুবা তুমি স্বয়ং উহা ভোগ করিতে পারিবে।

ঐ ব্যক্তি হারানো ছাগল-বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, উহাকে তুমি রক্ষা করিবে বা অন্য কেহ রক্ষা করিবে, নতুবা বাঘের খোরাক হইবে। (অর্থাৎ উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কর্তব্য। কারণ উহা ছোট জানোয়ার, উহার হেফাজত না করিলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা আছে।)

অতঃপর ঐ ব্যক্তি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এমনকি তাঁহার মুখ মণ্ডলের উপর অসন্তুষ্টির নিদর্শন ফুটিয়া উঠিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সহিত উটের (ন্যায় এত বড় হারানো জন্তুর) সম্পর্ক কি? (সে তোমার প্রত্যাশী নহে;) সে নিরাপদে হাটিয়া বেড়াইতে সক্ষম এবং সে নিজেই পানি পান করিতে, এমনকি কতেক দিনের পানি স্বীয় অভ্যন্তরে রক্ষিত রাখিতে ও গাছের লতা-পাতা খাইয়া বেড়াইতে সক্ষম। তুমি উহাকে আবদ্ধ না রাখিলে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে এবং তাহার মালিক সহজেই উহার খোঁজ পাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সোনালী যুগের পরে গরু-ঘোড়া, উট, ইত্যাদি বড় জানোয়ারের ব্যাপারেও দুষ্কৃতিকারী মানুষের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় ইমাম আবু হানীফার মজহাবে মালিকের নিখোঁজ বড় জানোয়ারকেও হেফাজত করার আদেশ করা হইয়াছে।

১১৭৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) এর বর্ণনা, একদা নবী (দঃ) পথ চলাকালীন মাটিতে পতিত একটি খুরমা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, যদি এই খুরমাটি ছদকা-খয়রাতের মাল হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত তবে আমি নিজেই উহা খাইতাম।

১১৭৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি বাড়ী আসিয়া বিছানায় এক দুইটি খুরমা পতিত দেখি। আমি উহা খাইবার ইচ্ছায় উঠাইয়া লই, কিন্তু পরে উহা ছদকার বস্তু বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাই উহা রাখিয়া দেই।

ব্যাখ্যা :—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য নফল ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাওয়াও হারাম ছিল। তাই নবী (দঃ) অধিক সতর্কতা অবলম্বত করিতেন। অন্য লোক ধনী হইলেও তাহার জন্য নফল দান-খয়রাতের বস্তু হারাম নহে, তাই সকলের জন্য এই সতর্কতা প্রয়োজনীয় নহে।

প্রতিটি বস্তু উহা যত ছোটই হউক না কেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত হিসাবে অতি বড় এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কদর করা আশু কর্তব্য। যে কোন নেয়ামতের বে-কদরী করা দুর্ভাগ্যের কারণ। কোন বস্তু নষ্ট হওয়ার উপক্রম অবস্থায় দেখিলে যাহাতে উহার অপচয় না হয় সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উল্লিখিত হাদীছ দুইটি দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, পথে ঘাটে এক দুইটি খেজুর ইত্যাদি অতি সামান্য বস্তু পতিতাবস্থায় পাওয়া গেলে উহা কি করা হইবে? বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ ফতহুল-বারী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ঐরূপ সামান্য বস্তু পথে-ঘাটে পাওয়া গেলে অপচয় হইতে রক্ষা করার জন্য উহা উঠাইয়া লইবে; স্বয়ং উহা খাইতেও পারিবে। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত হাদীছখানাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে আছে—নবী পত্নী মাইমুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা একদা একটি খেজুর পতিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহা উঠাইয়া খাইলেন এবং বলিলেন, কোন বস্তুর অপচয়কে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

মছআলাহ :—পথে ঘাটে যদি এরূপ সামান্য বস্তু পাওয়া যায় যাহার প্রতি সাধারণতঃ মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকে না—এইরূপ বস্তু পাইলে উহার ঢোল-শোহরত করার প্রয়োজন নাই এবং প্রাপক নিজেই উহা ব্যবহার করিতে পারে (হেদায়াহ, ফতহুল-কাদীর)।

মছআলাহ :—নদী-খালে খড়ি ইত্যাদি নগণ্য মূল্যের কাষ্ঠ শ্রেণীর বস্তু পাওয়া গেলে তাহা প্রত্যেক প্রাপকের জন্যই হালাল গণ্য হইবে, সে উহা বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করিতে পারিবে। আর যদি উহা এরূপ মূল্যের হয় যাহার প্রতি মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকিতে পারে তবে পথে পাওয়া মূল্যমানের বস্তুর মছআলাহভুক্ত হইবে (শামী, ৩—৪৪৬)। অবশ্য যদি উহা মালিকবিহীন হওয়া সাব্যস্ত হয়—যেমন, প্রবল বন্যায় ভাসমান পাহাড়ী অঞ্চল বা বন-জঙ্গলের বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে অধিক মূল্যমানের হইলেও প্রত্যেক প্রাপকই উহা ব্যবহার করিতে পারিবে (আলমগীরী ২—৩১৫)।

মছআলাহ ঃ—যে স্থানে সাময়িক জনসমাবেশ হয় এবং দূর দুরান্ত হইতে লোকের সমাগম হয়—যেমন, মক্কা শরীফে হজ্জের মৌসুম বা কোন মেলা ইত্যাদি এইরূপ স্থানেও যদি সমাবেশ সমাপ্তির পর কোন বস্তু পাওয়া যায় উহারও পূর্ণ ঢোল-শোহরত এবং প্রচার অবশ্যই করিতে হইবে (৩২৯)।

মছআলাহ ঃ—পূর্ণ ঢোল-শোহরত করার পর দীর্ঘ দিন এমনকি বৎসরেরও অধিককাল পর মালিক উপস্থিত হইলে (মূল্যবান) পাওয়া বস্তু তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে; ব্যয় করা হইয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে। (৩২৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—পাওয়া বস্তু সম্পর্কে যদি দৃঢ় আশঙ্কা হয় যে, উহার হেফাজত না করা হইলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে বা আত্মসাতকারীর হাতে পড়িবে সে ক্ষেত্রে উহার হেফাজত করা ফরজ হইবে (৩২৯ পৃঃ, আলমগীরী, ২—৩১৪)।

অনুমতি ব্যতিরেকে অপরের পশুর দুগ্ধ দোহাইবে না

১১৭৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কাহারও পশুর দুগ্ধ দোহাইয়া আনিবে না। হযরত (দঃ) (এই নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ ইহা ভালবাসিতে পারে কি যে—অন্য কেহ তোমার গৃহে রক্ষিত গোলাজাত ধান-চাউল খাদ্যবস্তু গোলা ভাঙ্গিয়া হরফ করিয়া নেয়? (তাহা কখনও নহে) তদ্রূপ মানুষের পশুসমূহের স্তন তাহাদের দুগ্ধ-ভাণ্ডার স্বরূপ। তাই তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া আনিলে না।

মছআলাহ ঃ—যদি কোন দেশে এরূপ মহানুভবতা প্রচলিত থাকে যে, তাহাদের পশু-পাল হইতে পথিকের জন্য প্রয়োজনে দুধ দোহাইবার অনুমতি আছে—সে ক্ষেত্রে পথিক সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে (৩২৯ পৃঃ)।

অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের পরিণতি

সর্বাধিক বড় অন্যায় ও অবিচার হইল স্বীয় প্রভু সৃষ্টিকর্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি রসুল ও তাঁহার বাণী ও আহ্বানকে অবজ্ঞা করা। তাই উহার পরিণতিও ভয়াবহ।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ . اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

فِيْهِ الْاَبْصَارُ ..... وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ .

অর্থ—তোমরা কখনও এই ধারণা করিও না যে, আল্লাহ তায়ালা পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। (তিনি তাহাদের সমুদয় কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া

থাকেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি বিধান না করিয়া) তাহাদের পুর্ণ শাস্তি একমাত্র ঐ দিন পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়া থাকেন যেই দিন (ভয়ঙ্কর অবস্থা দৃষ্টে) সকলের চক্ষু উলটিয়া যাইবে। সকলেই (আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া) মাথা উঁচু করিয়া তাকাইয়া থাকিবে; কেহই চোখের পাতা মারিবে না এবং সকলেই ভীত, নিরাশ এবং হুঁশ-হারা হইবে। (হে আমার রসুল!) আপনি বিশ্ববাসীকে ভীষণ আজাব হইতে সতর্ক করিয়া দিন। যেই দিন ঐ আজাব উপস্থিত হইবে সেই দিন পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীরা এই বলিয়া আর্তনাদ করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে পুনঃ কিছু সময়ের সুযোগ দান করুন; এইবার আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং আপনার প্রেরিত রসুলগণের অনুসারী হইব।

(আল্লাহ তায়ালা তিরস্কার পুর্বক তাহাদিগকে বলিবেন,) তোমরা শপথ করিয়া বলিয়া থাকিতে নয় কি যে, তোমাদের ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইবে না? অথচ তোমরা পুর্ববর্তী পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীদের পরিত্যক্ত জগতে বসবাস করিয়াছ এবং ইহাও ভালরূপে জ্ঞাত ছিলে যে, আমি সেই সব অন্যায়কারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্তকারে সেই সব পাপিষ্ঠদের বহু ঘটনার উল্লেখও করা হইয়াছিল। সেই সব পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীরা (আল্লার দিনের বিরুদ্ধে) কত রকমের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের দুরভিসন্ধিগুলি পাহাড় পর্বত নিশ্চিহ্নকারী তুল্য ছিল, (কিন্তু তাহাদের সে সব দুরভিসন্ধি আল্লাহ তায়ালার অজ্ঞাত ছিল না; তিনি ঐ সবকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ছিলেন।) তোমরা ভাবিও না, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না, (নিশ্চয় তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

সকলে ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেই দিন এই আসমান-জমিন ধ্বংস হইয়া উহার স্থলে ভিন্ন আসমান-জমিন সৃষ্টি হইবে এবং সকলেই হিসাব-নিকাশের জন্য পরাক্রমশালী এক আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সেই দিন পাপিষ্ঠ অপরাধীদের পা লৌহ বন্ধনীতে আবদ্ধ দেখিতে পাইবে। আলকাতরার ন্যায় পেট্রোল জাতীয় বস্তু দ্বারা তাহাদের সর্ব শরীর আবৃত করা হইবে এবং তাহারা আপাদমস্তক জাহান্নামের অগ্নিতে বেষ্টিত হইবে। সেই দিনের অনুষ্ঠান এই উদ্দেশ্যেই হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তাহার কর্মফল দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইবে না।

বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই ঘোষণা—তাহাদিগকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাহারা যেন মনে-প্রাণে দৃঢ়তার সহিত বুঝিয়া ও গ্রহণ করিয়া নেয় যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই মাবুদ ও উপাস্য এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানব যেন এই সতর্কবাণীকে উপদেশরূপে গ্রহণ করিয়া নেয়। (১৩ পাঃ ১৯ রুঃ)

বেহেশত লাভকারীদের পরস্পর অন্যায়-অবিচার সমুহের কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে

১১৭৭। হাদিছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণ দোযখের (উপরস্থ পুল-ছেরাত অতিক্রম করিয়া) শেষ প্রান্তে পৌছিলে পর অবতরণের পুর্বে তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখা হইবে। জাগতিক জীবনে তাঁহাদের পরস্পরের অন্যায়-অবিচারগুলি কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে। পরস্পর কর্তনের দ্বারা যখন প্রত্যেকেই পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে মোহাম্মদের প্রাণ—মোমেনগণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিকট বেহেশতস্থিত স্বীয় বাড়ী-ঘর জাগতিক বাড়ী-ঘর অপেক্ষা অধিক পরিচিত হইবে।

মোসলমান পরস্পর জুলুম ও অত্যাচার করিতে পারে না

১১৭৮। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। এক মোসলমান অন্য মোসলমানের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে না, সে তাহাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় রক্ষা করার চেষ্টা না করিয়া পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টায় রত হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মোসলমানের সম্মানহানিকর বিষয়বস্তু গোপন রাখিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন।

মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য করা

১১৭৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য কর—সে অত্যাচারী হউক বা অত্যাচারিত হউক। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাকে অত্যাচারিত

হওয়া অবস্থায় ত সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারী হওয়া অবস্থায় কিরূপে সাহায্য করিব? নবী(দঃ) বলিলেন, অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখা এবং বাধা দেওয়াই তাহাকে সাহায্য করা।

১১৮০। **হাদীছ :**—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণের পরস্পর সম্পর্ক এইরূপ হওয়া চাই যেরূপ একটি দেয়ালের ইটসমূহ; তাহারা একে অন্যের দ্বারা শক্তিশালী হইবে। অতঃপর নবী (দঃ) এক হাতের অঙ্গুলিসমূহ অপর হাতের অঙ্গুলির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখাইলেন, (মোসলমানগণ এইরূপে একতার সহিত একে অন্যের বলবর্দ্ধক হইয়া থাকিবে।)

অত্যাচারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

অর্থাৎ খারাব বিষয় (এমনকি কাহারও কোন দোষের কথা যদিও উহা বাস্তব সত্য হয়) প্রকাশ করাতে আল্লাহ তায়ালা নারাজ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অবশ্য যদি কেহ কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হয়—(এমতাবস্থায় অত্যাচারীর অত্যাচারকে প্রকাশ করার অনুমতি আছে।)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -

অর্থাৎ—মোসলমানদের স্বভাব এই যে, তাহারা নিষ্পেষিত ও পদদলিত হওয়া অবস্থায় বসিয়া থাকে না; অত্যাচারীকে তাহারা সমুচিত জবাব দিয়া থাকে।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, মোসলমানগণ অপমান অবলম্বন পূর্বক বসিয়া থাকে না; হাঁ—ক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষমাকারী ও বিনয়ী হয়।

অত্যাচারিত হইয়াও ক্ষমা করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

অর্থাৎ তোমরা যে কোন নেককাজ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কর (আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতিফল দান করিবেন।) কিম্বা (প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে) কাহারও কোন ত্রুটি, অন্যায়, অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা কর (উহারও প্রতিদান তোমরা পাইবে। ক্ষমা করা কর্তব্য, কারণ) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান হইয়াও ক্ষমাকারী।

এক হাদীছে আছে—এক ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসকে মারিতেছিল, পেছন হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, اللّٰه اقدر عليك منك عليه
স্মরণ রাখিও—ক্রীতদাসের উপর তোমার ক্ষমতা অপেক্ষা তোমার উপর আল্লার ক্ষমতা অধিক।

এক হাদীছে আছে-- ارْحَمُوا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

"আল্লার বান্দাদের প্রতি তুমি দয়ালু হও ; আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি দয়াল হইবেন।"

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন--

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ......

অর্থ—অন্যায়ের প্রতিশোধ সমপরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে এবং তিক্ততা পরিত্যাগ করতঃ উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি করিবে তাহার এই কার্য্যের প্রতিদান ও প্রতিফল আল্লাহ তায়ালার নিকট সে অনিবার্য্যতঃ লাভ করিবে। আল্লাহ তায়ালা অন্যায়কারী অত্যাচারীর প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া (সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহার উপর অভিযোগ প্রবর্তিত হইবে না। অভিযুক্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইবে ঐরূপ ব্যক্তিরা যাহারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে এবং জগতের বুকে সীমা অতিক্রম করিয়া বেড়ায়—যাহা করিবার অধিকার তাহার মোটেও নাই ; এরূপ ব্যক্তিদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করিবে এবং অপরের ক্রটি, অপরাধ মার্জনা ও ক্ষমা করিবে বস্তুতঃ তাহার এই কার্য্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ পরিগণিত হইবে। (৫ পাঃ ৫ নুঃ)

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মানিত করিবেন ও সাহায্য দান করিবেন। (ফতহুল-বারী)

অত্যাচারের বিষময় ফল

১১৮১। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ--আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, (তোমরা জুলুম অত্যাচার হইতে সংযমী হও ;) জুলুম-অত্যাচার কেয়ামতের দিন অত্যাচারী ব্যক্তিকে নানা রকম (কঠিন বিপদের) অন্ধকারে পতিত করিবে।

মজলুমের বদ-দোয়াকে ভয় করা

১১৮২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, মজলুমের বদ-দোয়া ও অভিশাপকে ভয় ও পরিহার করিয়া চলিবে। (অর্থাৎ কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না ; কাহারও প্রতি জুলুম করিলে নিশ্চয় সে বদ-দোয়া ও অভিশাপ করিবে।) মজলুমের বদ-দোয়া সরাসরি আল্লার দরবারে পৌছিয়া থাকে। কোন কিছুই উহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

অন্যের হক মাফ করাইয়া লওয়া

১১৮৩। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির উপর তাহার অন্য মোসলমান ভাইয়ের মানহানি বা অন্য কোন বস্তু সম্পর্কীয় হক থাকে তাহার কর্তব্য হইবে—ইহজীবনেই উহা হইতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা। তাহার সম্মুখে এমন এক দিন আসিবে যেই দিন কাহারও নিকট কোন প্রকার ধন-দৌলত থাকিবে না। যদি তাহার নিকট নেক আমল থাকে তবে ঐ হক অনুপাতে তাহার নেক আমল ছিনাইয়া লওয়া হইবে। আর যদি তাহার নিকট নেক আমল না থাকে তবে হকদারের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) প্রকৃত গরীব ও দরিদ্রের ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিয়াছেন—আমার উম্মতগণের মধ্যে প্রকৃত গরীব ও দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাৎ ইত্যাদির নানারকম এবাদত-বন্দেগী লইয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে স্বয়ং উহার ফলাফল ভোগ করার সুযোগ মোটেই পাইবে না। বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার এবাদৎ ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। কাহাকেও সে গালি গালাজ করিয়াছিল, কাহাকেও অন্যায়রূপে খুন করিয়াছিল, কাহারও ধন-সম্পদ সে আত্মসাৎ করিয়াছিল; এইসব লোক কেয়ামতের দিন নিজ নিজ হকের ক্ষতিপুরণ ওয়াসিল করিতে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার নেক আমলসমুহ হইতে তাহাদিগকে ক্ষতিপুরণ দান করা হইবে। যদি সকলের ক্ষতিপুরণ পরিশোধের পুর্বেই তাহার নেক আমল সমূহ নিঃশেষ হইয়া যায় তবে অতঃপর হকদারগণের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপান হইবে। এইরূপে সে সমুদয় নেক আমল হারাইয়া রিক্তহস্তে গোনাহের বোঝা লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে।

মছআলাহঃ—কাহারও উপর অন্যের গীবৎ-শেকায়েত বা নিন্দা ও অপবাদ সম্পর্কীয় হক থাকিলে তাহা মাফ করাইবার জন্য হকদারের নিকট অবপাদের বিবরণ দানে ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক নহে; বিবরণ ব্যতিরেকে অনির্দিষ্টরূপে সাধারণভাবে ক্ষমা করানো যথেষ্ট হইবে।

মছআলাহঃ—এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদের হক তথা প্রাপ্য আছে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, আমার উপর আপনার যত রকম হক বা প্রাপ্য তাহা আমাকে মাফ করিয়া দেন—ছাড়িয়া দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আপনার উপর আমার যত হক বা প্রাপ্য আছে সব আমি ছাড়িয়া দিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাঁহার প্রাপ্য ধন-সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন থাকিয়া এরূপ বলিয়া থাকে তবে সর্বসম্মতরূপে ছুনিয়া-আখেরাতে প্রথম ব্যক্তি উক্ত হক হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবে শুধু ছুনিয়ার বিচারে প্রথম ব্যক্তি রেহায়ী পাইবে, আখেরাতের রেহায়ী সম্পর্কে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে সে আখেরাতেও রেহায়ী পাইবে—এই মতের উপরই ফতওয়া; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদের মতে আখেরাতে রেহায়ী পাইবে না। (আলমগীরী ৪—৩৮৬, কাজীখান)

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন দৌলতের হক বা প্রাপ্য রহিয়াছে দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে, কিন্তু পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জ্ঞাত নহে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়াছে, আমার নিকট আপনার যাহাই প্রাপ্য রহিয়াছে উহা হইতে আমাকে আপনি রেহায়ী দান করুন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছে, দুনিয়া আখেরাতে তোমাকে রেহায়ী দিয়া দিলাম। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিচারে সে সম্পূর্ণ ঋণ হইতেই মুক্তি পাইবে, কিন্তু আখেরাতে শুধু ঐ পরিমাণ ঋণ হইতে সে মুক্তি পাইবে যে পরিমাণ রেহায়ীদাতার ধারণায় প্রাপ্য ছিল; প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহার ধারণা অপেক্ষা প্রাপ্যের পরিমাণ অনেক বেশী হয় তবে উহা প্রকাশ করতঃ মুক্তি লাভ না করিলে ঐ বেশী পরিমাণ হইতে রেহায়ী লাভ হইবে না (আলমগীরী ৪—৩৮)।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তির কোন বস্তু জবরদস্তি মুলক বা গোপন ভাবে অন্যে হস্তগত করিয়াছে; অতঃপর ঐ মালিক ব্যক্তি তাহার সমুদয় হক বা প্রাপ্য হইতে কিম্বা বিশেষ ভাবে ঐ বস্তু হইতেই হস্তগতকারীকে রেহায়ী দান করিয়াছে—এক্ষেত্রে যদি ঐ বস্তু পুর্বেই ব্যয় বা বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তবে উহার ক্ষতিপুরণ দান হইতে সে মুক্তি পাইবে। যদি ঐ বস্তু এখনও বিদ্যমান থাকে তবে উহা মালিককে ফেরত দিতে হইবে; ফেতর না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা তাহার হাতে আমানত পরিগণিত হইবে (আলমগীরী ৪—২৮৭)। অবশ্য যদি বিদ্যমান আছে জানিয়াও মালিক দাবী ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

মছআলাহ ঃ—যে কোন শ্রেণীর পাওনাদার তাহার প্রাপ্য হইতে ঋণী ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিলে সেই মুক্তিদান নাকচ করার ক্ষমতা তাহার থাকে না; সে আর এই প্রাপ্যের দাবী করিতে পারিবে না (৩৩১ পৃঃ এবং কাজীখান)।

● কেহ তাহার নিজের জিনিষ অপরকে ভোগ করিতে দিল বা উহা তাহার জন্য হালাল বলিয়া দিল, কিন্তু কোন বিবরণ উল্লেখ করিল না—এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত কথাবার্তা ও আলোচনা ইত্যাদি দৃষ্টে কোন বিবরণ ও পরিমাণ উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাই গৃহিত হইবে। ঐরূপ কোন কিছু সাব্যস্ত করার সূত্র বিদ্যমান না থাকিলে সচরাচর এরূপ ক্ষেত্রে যাহা উদ্দেশ্য হয় তাহাই গৃহিত হইবে। ফেকার কেতাব হইতে এরূপ কতিপয় নজির—

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি বলিল, আমার মাল তোমার জন্য হালাল। এই ক্ষেত্রে শুধু টাকা-পয়সার ব্যাপারে অনুমতি হইবে; অন্য বিষয়-সম্পদ—যেমন, ফল-ফসল ও পশুপাল ইত্যাদির জন্য অনুমতি হইবে না (ফতওয়া বজ্জাযিয়া)।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি বলিল, তোমার জন্য আমার মাল হইতে খাওয়া, নেওয়া এবং দান করা হালাল করিয়া দিলাম এই ক্ষেত্রে তাহার নিজে খাওয়াত সর্বসম্মতরূপে হালাল ; আর নেওয়া ও দান করার অনুমতি সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে—ফতওয়া বজ্জাযিয়ায় হাঁ এবং কাজীখানে না রহিয়াছে।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনুমতি দিল, তুমি আমার বাগানে যাইয়া আঙ্গুর নিতে পার। এক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পেট ভরা পরিমাণ নিতে পারিবে ; (কাজীখান)

জায়গা-জমি অন্যায়রূপে দখল করা

১১৮৪। হাদীছ ঃ—ছায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি (অন্যের) ভূমির কিছু অংশও অন্যায় রূপে গ্রাস করিবে (কেয়ামতের দিন) সাত তবক জমি হইতে সেই পরিমাণ জমিন তাহার গলায় ফাঁদরূপে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্যান্য হাদীছে আছে, পরকালে শাস্তিভোগী ব্যক্তিদেরকে বিরাট আকারে গঠিত করা হইবে ; তাহাদের এক একটি দাঁত পর্বত সমতুল্য হইবে।

১১৮৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে কাহারও জায়গা-জমিনের কোন অংশ দখল করিবে সে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনের নীচ পর্য্যন্ত ধ্বসিত হওয়ার শাস্তি ভোগ করিবে।

অনুমতি লইয়া অন্যের হক ভোগ করা

১১৮৬। হাদীছ ঃ—জাবালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময়ে আমরা ইরাকবাসী কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আমাদের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার হইতে খুরমা প্রদান করিয়া থাকিতেন।

তদাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী যখনই আমাদের নিকটবর্তী যাতায়াত করিতেন তখনই আমাদের নিকট এই হাদীছখানা বর্ণনা করিতেন---রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি একত্রে খুরমা (ইত্যাদি) খাইতে বসিলে একজন একত্রে দুই দুইটি খুরমার গ্রাস লইবে না। হাঁ—যদি অপর ব্যক্তি হইতে অনুমতি লয় তবে ঐরূপ করিতে পারিবে।

১১৮৭। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী এক ছাহাবীর একটি ক্রীতদাস ছিল ; সে খানা পাকাইতে খুব পটু ছিল। একদা তাহার মনিব তাহাকে বলিলেন, তুমি পাঁচজন লোকের উপযোগী খানা তৈয়ার কর। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অন্য চার জন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিতে চাই ; আমি তাঁহার ক্ষুধার্ত

রূপ অনুধাবন করিয়াছি। অতঃপর ঐ ছাহাবী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার সঙ্গে আরও চারজন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিলেন। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত একজন তাঁহাদের সঙ্গী হইল--যাহার দাওয়াত ছিল না। নবী (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন, এই ব্যক্তি অতিরিক্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার জন্য দাওয়াতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কি? ঐ ছাহাবী বলিলেন, হাঁ—অনুমতি আছে।

ঝগড়া-বিবাদকারী ব্যক্তির পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে মোনাফেকদের নিদর্শন উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা অধিক ঝগড়া-বিবাদকারী হইয়া থাকে।

১১৮৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে অধিক ঝগড়া-বিবাদকারী হয়।

মিথ্যা মোকদ্দমা করার পরিণতি

১১৮৯। হাদীছঃ—উম্মে-ছালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় গৃহ-দ্বারের নিকট বাদী-বিবাদীর তর্ক-বিতর্কের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসার জন্য) হযরত (দঃ) গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদের উভয়কে বলিলেন, স্মরণ রাখিও—আমি একজন মানুষ (আমি আল্লাহ তায়ালার ন্যায় অন্তর্যামী বা সর্বজ্ঞ নহি)। বাদী-বিবাদীর নালিশ আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ (তাহার দাবী মিথ্যা হওয়া সত্বেও সে) বাগ্মী এবং বাক-পটু হওয়ার দরুণ হয় ত আমি তাহার পক্ষেই রায় দান করিতে পারি।

তোমরা জানিয়া রাখিও, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি যদি ঐরূপে কাহাকেও অপরের কোন হক ও সত্ব প্রদান করি তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে—আমি যেন তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড প্রদান করিলাম। এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া সে ঐ জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড গ্রহণ করিবে বা পরিত্যাগ করিবে।

অন্যায়রূপে আত্মসাৎকারীর ধন হইতে স্বীয় হক ওয়াসিল করার সুযোগ পাইলে?

১১৯০। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সুফিয়ান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী হেন্দা (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিলেন, আমি সন্দেহাতীত রূপে বলিতেছি, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান কৃপণ স্বভাবের লোক। তিনি উদারতার সহিত পরিবারবর্গের প্রতি খরচ করেন না। এমতাবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতে আমি তাঁহার ধন হইতে ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করিলে তাহাতে আমার গোনাহ হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করিলে তাহাতে তোমার গোনাহ হইবে না।

১১৯১। হাদীছ :—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই অভিযোগ জানাইলাম যে, আপনি আমাদিগকে দুর দেশে পাঠাইয়া থাকেন, আমরা পরদেশে নিরাশ্রয়রূপে স্থানীয় লোকদের অতিথি স্বরূপ তাহাদের নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু তাহারা এমতাবস্থায় আতিথেয়তার কর্তব্য পালন করে না। রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকগণ তোমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করিলে তোমরা তুষ্ট থাক, যদি তাহারা তোমাদের সহায়তা করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে আতিথেয়তার হক আদায় করিতে পার।

ব্যাখ্যা :—উল্লিখিত ব্যবস্থা এই সুত্রে প্রবর্তিত হইত যে কোন দেশ বা কোন জাতির সঙ্গে চুক্তি বা সন্ধি করাকালীন এইরূপ শর্ত আরোপ করা হইয়া থাকিত যে, মোসলমান মোজাহেদগণকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে হইবে। তাই ইহা একটি আইনগত ও ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য হক ছিল। প্রয়োজন স্থলে উহা প্রদানে সকলকে প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে হুমকি স্বরূপ এই অনুমতি প্রচার করা হইয়াছিল যে, ঐ আইনগত প্রাপ্য প্রদানে গড়িমসি করা হইলে তাহা বাধ্যতামুলক উশুল করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত ব্যবস্থা প্রয়োগের আরও একটি স্থান আছে—কোন ব্যক্তি পরদেশে এরূপ নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, স্থানীয় লোকদের সহায়তা ব্যতিরেকে উপস্থিত তাহার জীবন বাঁচান অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পার্বত্য এলাকার কঠিন পথে বিচ্ছিন্ন বস্তি সমুহে যাতায়াতে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

এতদ্ভিন্ন ইসলামের দৃষ্টিতে আতিথেয়তা বিশেষ জরুরী কার্য্য, এমনকি কোন কোন আলেম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। অন্যান্য ইমামগণের মতে সাধারণতঃ উহা ওয়াজেব না হইলেও উহা বিশেষ একটি ছুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ। তাই উহার প্রতি বিশেষ তাকিদ প্রয়োগ উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার কর্তব্য হইবে অতিথির সেবা করা।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির গৃহে তাহার অতিথি অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে অন্য মোসলমানগণের কর্তব্য হইবে ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ হইতে অতিথির হক ওয়াসিল করিয়া দেওয়া।

অবশ্য কতিপয় হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত আছে যে, অতিথির হক—শুধু মাত্র এক দিন এক রাত্র বিশেষরূপে তাহার সেবা করা। আর অতিরিক্ত দুই দিন সাধারণ রূপে আহার যোগান। অতঃপর আতিথেয়তা থাকিবে না, বরং দান-খয়রাত ও ছদকা প্রদান স্বরূপ গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহ সম্পর্কে হানাফী মজহাব মতে (বিশেষ সতর্কতাবলম্বন স্বরূপ) সাধারণতঃ শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, স্বীয় প্রাপ্য

বস্তু জাতীয় কোন বস্তু যদি হস্তগত হয় তবেই উহা হইতে স্বীয় হক উসুল করিতে পারিবে। কিন্তু যদি অন্য জাতীয় বস্তু হস্তগত হয় তবে সে স্থলে মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে স্বীয় হক্কের বিনিময় রাখিয়া লওয়া জায়েয হইবে না। কারণ, এই ক্ষেত্রে হস্তগত বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক হয়, অথচ প্রাপকের এই অধিকার নাই যে, সে অন্য মালিকের বস্তুর মুল্য নিজ ইচ্ছামতে নির্দ্ধারণ করে। পক্ষান্তরে হস্তগত বস্তু, প্রাপ্য বস্তু জাতীয় হইলে সেই ক্ষেত্রে মুল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন আসে না, তাই উহা হইতে স্বীয় প্রাপ্য পরিমাণ রাখিতে পারিবে। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ এবং হানাফী মজহাবের পরবর্তী আলেমদের মতে (মূল্য নির্দ্ধারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে) সব রকম হস্তগত বস্তু হইতেই স্বীয় প্রাপ্যের পরিমাণ উসুল করিতে পারিবে। (ফয়জুলবারী দ্রষ্টব্য)

প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

১১৯২। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর দেওয়ালের উপর আবশ্যক বোধে আরকাঠ বা কড়িকাঠ ইত্যাদি রাখিতে চাহিলে উহাতে বাধা দেওয়া চাই না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছখানা বর্ণনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে একটু বিরূপভাব লক্ষ্য করিতে পারায় তাহাদিগকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নিশ্চয় এই হাদীছখানা বর্ণনা করিবই।

রাস্তা-ঘাটে বসা

চলাচল পথের ধারে নিজের জায়গায় বা নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় বসিতেও অনেক দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

১১৯৩। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা রাস্তার কিনারায় বসিও না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন (দরিদ্রতার দরুন আমাদের বাড়ী-ঘরে কোন সুব্যবস্থা না থাকায়) রাস্তার কিনারায় বসা পরিত্যাগ করিতে আমরা অপরাগ; আমরা পরস্পর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ঐরূপ স্থানে বসিয়াই বলিয়া থাকি। এতচ্ছ্রবনে নবী (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় যখন তোমরা বস তখন রাস্তা ও পথের হক আদায় করিও। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পথের হক কি কি? তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, পথের হক এই—(১) স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী ও সংযত রাখা, (পথিক নারীদের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।) (২) অপরের কষ্ট হয় এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা, (৩) সালামের উত্তর দেওয়া, (৪) সৎ উপদেশ দান করা ও কু-কার্য্যে বাধা দেওয়া।

[এতদ্ভিন্ন (৫) পথিককে পথ প্রদর্শন করা, (৬) হাঁচিদাতার "আলহামদু লিল্লাহে" শুনিলে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা, (৭) বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, (৮) পথহারাকে পথ বাতলাইয়া দেওয়া, (৯) মজলুমের সাহায্য করা, (১০) বোঝা বহনকারীর সাহায্য করা (১১) আল্লার জেকের অধিক পরিমাণে করা। (ফতহুল-বারী)]

পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা দান-খয়রাত সমতুল্য।

১১৯৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَذَهٗ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَ لَهٗ ○

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি পথিমধ্যে চলিতেছিল; সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালা পথিমধ্যে দেখিয়া উহা অপসারণ করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

পথের পরিমাপ

মছআলাহঃ—কোথাও একটি প্রশস্ত ভু-খণ্ড বসতি বিহীন রহিয়াছে যাহার উপর সর্বসাধারণ লোকদের চলাচলের পথও আছে, কিন্তু সেই পথের চিহ্নিত পরিমাপ বিদ্যমান নাই। উক্ত ভুখণ্ডের উপর উহার মালিকগণ ঘর-বাড়ী তৈরী করিতে চায়। সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সাত হাত প্রশস্ত পথ রাখিতে হইবে।

১১৯৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন পথের সংস্কার বা আবিষ্কারে বা নূতন বস্তি আবাদকালে পথ প্রতিষ্ঠায় ঐ পথের পার্শ্বস্থিত লোকদের বিরোধ মীমাংসায় স্মরণ রাখিবে,) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মতবিরোধের ক্ষেত্রে পথের পরিমাপ সাত হাত ধার্য্য করিয়াছেন।

কাহারও মাল লুট করিয়া বা ছিনাইয়া নেওয়া

নবী (দঃ) বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন লুট না করা সম্পর্কে। এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি অন্যের মাল লুট করে সে ঈমানশূন্য হইয়া যায়।

১১৯৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, লুটপাট করা হইতে এবং কোন জীবকে উহার অঙ্গহানী করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতে।

মদের পাত্র ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা

মদের মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলা, মদের মশক ছিড়িয়া ফেলা, মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা, (শেরেক-বেদআত কার্য্যের বস্তু যেমন) ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা, (গান বাদ্যের যন্ত্র) দোতারা,

ছেতারা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা—এই সব বিষয় ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়া উহার মছআলাহ্ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছেন—

ছাহাবীগণের যুগের খ্যাতনামা কাজী বা বিচারপতি শোরায়হ্ রহমতুল্লাহ আলাইহের একটি রায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে যে, দোতারা বা ছেতারা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার একটি মোকদ্দমায় তিনি আসামীকে বে-কসুর খালাস দিয়াছিলেন।

বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফতহুল বারী" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রথম হাদীছটি এই— মদ হারাম ঘোষিত হইলে পর আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি কতিপয় এতিমের পক্ষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদ ক্রয় করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, মদ ফেলিয়া দাও এবং মদের মটকা ভাঙ্গিয়া ফেল।

দ্বিতীয় হাদীছটি এই— মদ হারাম ঘোষিত হইলে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরি হাতে লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সিরিয়া হইতে আমদানী কৃত মদের মশকসমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

১১৯৭। হাদীছ ঃ—ছালামতবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের যুদ্ধের সময় একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করতঃ জানিতে পারিলেন যে, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হইতেছে। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, পাত্র ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা ধৌত করিয়া লও।

১১৯৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বীয় ঘরে মাচাংএর সম্মুখে লটকাইবার একটি পর্দার ব্যবস্থা করিলাম, উহা ছবিযুক্ত ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা দেখিয়া উহাকে ফাড়িয়া ফেলিলেন; উহার খণ্ড সমূহ দ্বারা আয়েশা (রাঃ) দুইটি বসিবার গদী তৈয়ার করিলেন।

স্বীয় ধন রক্ষার্থে নিহত হইলে?

১১৯৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন রক্ষায় খুন হইবে সে শহীদ গণ্য হইবে।

অপরের কোন বর্তন পেয়ালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে?

১২০০। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক পত্নীর ঘরে ছিলেন, অপর এক পত্নী তাঁহার ভৃত্যের হাতে তথায় কিছু খাদ্যবস্তু পাঠাইলেন। যেই পত্নীর ঘরে নবী (দঃ) ছিলেন সেই পত্নী রাগান্বিত হইয়া ভৃত্যের হাতে আঘাত করিলেন; খাদ্যবস্তুর পাত্রটি তাহার হাত হইতে পতিত

হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। নবী (দঃ) ভগ্ন পাত্রটির খণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া উহার মধ্যে পতিত খাদ্যবস্তু উঠাইলেন এবং উপস্থিত সকলকে খাইতে বলিলেন এবং ভৃত্যকে অপেক্ষা করার আদেশ করিলেন। পানাহার শেষ করিয়া ভগ্নকারিণী পত্নীর নিকট হইতে একটি ভাল পাত্র লইয়া ভৃত্যের হাতে দিলেন এবং ভগ্ন পাত্রটি সেই ঘরে রাখিয়া দিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● কাহারও সঙ্গে বিতর্কে ফাহেশা কথা ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা মোনাফেকের পরিচয় (৩৩২ পৃঃ)। ● ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজবিশেষের তৈরী বাংলো, বারান্দা বা চাতাল ইত্যাদি যাহা সাধারণতঃ লোকজনের বৈঠকখানারূপে তৈরী হয় তথায় মালিকের অনুমতি ছাড়া বসা যায়। (৩৩৩ পৃঃ)। ● পথে-ঘাটে এমন কোন বস্তু ফেলা যাহাতে পথের কোন ক্ষতি না হয় এবং চলাচলকারীদের জন্য কোন প্রকার কষ্টের বা বিঘ্নের কারণ না হয়—তাহা জায়েয (ঐ)। ● সাধারণ পথের পার্শ্বে কূপ করা জায়েয যদি যাতায়াতকারীদের কষ্ট ও ক্ষতির কারণ না হয় (ঐ)। পথে কষ্টদায়ক জিনিষ থাকিলে উহা যাহারই হউক অপসারণ করা যায় (৩৩৪ পৃঃ)। উচু বা দ্বিতলে তৃতলে কক্ষ বা বারান্দা বহির্মুখী বা অবহির্মুখী তৈরী করা (৩৩৪ পৃঃ)। অর্থাৎ নিজ জমিতে এইরূপ গৃহ তৈরীর অধিকার আছে, কিন্তু পড়শীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা— নিজ বাড়ীর ছাদে চড়িলে যদি পরশীর আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হয় সে ক্ষেত্রে পড়শীর অধিকার আছে ছাদে চড়িতে নিষেধ করার—যাবৎ না ছাদে পর্দার বেষ্টনী দেওয়া হয়। আর যদি ছাদ হইতে অপরের আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্তু অপর ছাদে মানুষ উঠিলে তাহা উচু ছাদ হইতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে উচু ছাদে চড়িতে নিষেধ করার অধিকার নাই (আলমগীরী, ৫—৪০৮) ● মসজিদের সম্মুখে মসজিদের সীমার বাহিরে যাতায়াত ও সাধারণ ব্যবহারের জায়গায় মসজিদে আগমনকারী স্বীয় যানবাহন বাঁধিতে পারে (৩৩৫ পৃঃ)। ● কাহারও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐরূপ দেওয়াল বানাইয়া দিতে হইবে (৩৩৭ পৃঃ)। অর্থাৎ কাহারও কোন বস্তু বিনষ্ট করিলে সে ক্ষেত্রে অন্য বস্তুর দ্বারা ভরতক দেওয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা; প্রথমতঃ ঐ বস্তুর স্থান পূরণ করার চেষ্টাই করিতে হইবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(বিভিন্ন বিষয়ে)

অংশীদারীর বয়ান

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ব্যবসা করার জন্য অংশীদারীরূপে পুঁজি বিনিয়োগে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া, কিম্বা নিজ নিজ শ্রম বা প্রভাবের দ্বারা আয়-উপার্য্যনে অংশীদাররূপে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া—অর্থাৎ মূল অংশীদারী কোন বস্তুর উপর নহে ; ভবিষ্যৎ ব্যবসা বা কার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অংশীদারী প্রতিষ্ঠা করা—ইহাকে শরীয়তের ভাষায় "শিরকতে-আক্দ" তথা পরস্পর স্বীকৃতি-বন্ধনের মাধ্যমে অংশীদারী বলা হয়। আর এক হইল—নির্দিষ্ট বস্তু বা বস্তুসমূহের মালিকানা সত্বে অংশীদারী সৃষ্টি হওয়া ; যেরূপ মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অংশীদারী হইয়া থাকে। বা ঐরূপ অংশীদারী সৃষ্টি করা ; যেরূপ নিজেদের কোন চিজ-বস্তু একত্রিত করিয়া সকলে শরীক হওয়া—ইহাকে শরীয়তের ভাষায় "শিরকতে মিল্‌ক" তথা মালিকানা সত্বে অংশীদারী বলে। উভয় শ্রেণীর অংশীদারীর বিধানগত ধারা-উপধারায় পার্থক্য আছে, যাহা ফেকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। বোখারী (রঃ) এখানে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর অংশীদারীর বিভিন্ন মছআলাহ আলোচনা করিয়াছেন।

অংশীদারদের ভাগ-বণ্টনের সাধারণ একটি মছআলাহ এই যে, প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশ পরিমাণ ভাগ পাইবে। আরও একটি মছআলাহ এই যে, যদি বণ্টনের জিনিষ এক জাতীয় বস্তু হয় ; যেমন, চাউল বা খেজুর তবে আন্দাজ ও অনুমান করিয়া উহা ভাগ বণ্টন করা জায়েয হইবে না ; সঠিকরূপে নাপ বা ওজনের মাধ্যমে উহা ভাগ করিতে হইবে।

ভাগ-বণ্টনের উক্ত মছআলাহদ্বয়কে একটি ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক শিথিল করা হইয়াছে। উক্ত ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বোখারী (রঃ) আলোচনা করিয়াছেন ; যাহা এই—

কতিপয় সহযাত্রী, সহকর্মী বা সহবাসী সঙ্গী-সাথী নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বা পরস্পর সহানুভূতির উদ্দেশ্যে নিজেদের খাদ্য-খাবার বা সকলের যে কোন ব্যয় ও খরচের বস্তু একত্রিত করিয়া পরে নিজেদেরই মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে বা ব্যয় করে, এই ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত মছআলাহদ্বয়ের বাধ্যবাধকতা প্রযোয্য নহে। এই ক্ষেত্রে ভাগ-বণ্টনে

প্রত্যেক অংশীদারের ভাগ তাহার অংশ পরিমাণে হওয়ার প্রয়োজন নাই; যেমন একত্রিত করার সময় কেহ এক সের, কেহ তিন পোয়া, কেহ আধ সের, কেহ এক পোয়া দিয়াছে; বণ্টনের সময় প্রত্যেকে সমপরিমাণ আধ সের করিয়া গ্রহণ করিলে তাহা জায়েয হইবে। তদ্রূপ একত্রিত করার সময় প্রত্যেকজন সমপরিমাণ এক সের হিসাবে দিয়াছে। বণ্টনের সময় প্রত্যেকে নিজ প্রয়োজন পরিমাণ—কেহ সোয়া সের কেহ তিন পোয়া, কেহ এক পোয়া গ্রহণ করিয়াছে ইহাও জায়েয। এতদভিন্ন এইরূপ ক্ষেত্রে বণ্টনের বস্তু একই জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও ভাগ-বণ্টনে মাপ-ওজনের প্রয়োজন নাই; আন্দাজ ও অনুমানের উপর ভাগ-বণ্টন করা জায়েয।

১২০১। হাদীছ:—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক দল সৈন্যকে কোরায়েশদের এক দল বণিকের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তায় পাঠাইলেন এবং আবু ওবায়দা-তুবনুল-জার্‌রাহ (রাঃ)কে আমীর ও প্রধান কর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সৈন্য দলের সংখ্যা তিন শত ছিল এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। পথিমধ্যেই আমাদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল। তখন আমাদের আমীর আবু ওবায়দা (রাঃ) আদেশ করিলেন, প্রত্যেকের নিকট যাহা কিছু খাদ্যবস্তু আছে সব একত্রিত করা হউক। তাহাই করা হইল এবং দুই বস্তা খেজুর মওজুদ হইল। অতঃপর তিনি স্বয়ং প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া খাদ্য আমাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। এতদসত্ত্বেও উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, এমনকি আমরা মাথাপিছু মাত্র একটি খুরমা পাইতেছিলাম। ঘটনা বর্ণনাকারী জাবের (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, মাত্র একটি খুরমায় একটি লোকের কি হইত? জাবের (রাঃ) বলিলেন, যখন ঐ একটি হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হইল তখন ঐ একটিরই মূল্য বোধ হইল।

ইতিমধ্যেই আমরা সমুদ্রের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া সমুদ্র তীরের অদূরে একটি বিরাট বালুচরের ন্যায় দেখিলাম। আমরা উহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, উহা একটি বিরাটকায় মৎস্য; যাহার নাম "আম্বর"। প্রথমে আমাদের আমীর উহাকে একটি মৃতজীব বলিয়া উহা খাইতে ইতস্ততঃ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগকে বলিলেন, ইহা খাইতে দ্বিধা বোধ করার কারণ নাই, যেহেতু আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত লোক এবং আল্লার রাস্তায় বাহির হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন তোমরা সকলেই খাদ্যাভাবে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছ, তাই তোমরা ইহা খাইতে পার। সেই স্থানে আমাদের দীর্ঘ এক মাস কাল অবস্থান করিতে হইল। আমরা তিন শত সৈনিক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ মৎস্যটিই খাইতেছিলাম, এমনকি ঐ মৎস্য খাওয়ার ফলে আমাদের শরীর মোটা-তাজা হইয়া গেল।

আমরা উহার চোখের গর্ত হইতে সূর্য্য-তাপে উহার গলিত তৈল কলস ভরিয়া ভরিয়া উঠাইতাম এবং এত এত কলস উঠাইয়াছিলাম। একদা আমাদের সেনাপতি আমীর

আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাদের মধ্য হইতে তেরজন লোককে উহার চোখের গর্তের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। অন্য এক দিন তিনি উহার একটি পাঁজরের কাঁটা উঠাইয়া ধরিলেন এবং আমাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে সর্বাধিক উঁচু একটি উটের উপর আরোহণ করাইয়া ঐ কাঁটাটির তলদেশে যাতায়াত করাইলেন, তাহাতে কাঁটাটির বাঁক তাহার মাথা স্পর্শ করিল না। অতঃপর আমরা তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি করিলাম এবং সঙ্গে ঐ মৎস্যের কিছু মাংস-খণ্ড নিলাম। মদীনায় আসিয়া আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পূর্ণ ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ রিজিক ও খাদ্য সামগ্রী ছিল। তোমাদের নিকট উহার কোন অংশ থাকিলে আমাকেও খাইতে দাও। আমরা কিছু অংশ তাঁহার জন্য পাঠাইয়াদিলাম, তিনি উহা খাইলেন। (মাছ যত বড়ই হউক, মরা হইলেও উহা হালাল।)

ব্যাখ্যা ঃ— আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে, সৈন্য দলের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করতঃ একত্র করা হয়, অতঃপর উহা হইতে সকলকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় সন্দেহের কারণ হয়। প্রথম এই যে, অনেক সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে গৃহীত বস্তু সমপরিমাণ হয় না। দ্বিতীয় এই যে, অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিমাণে খাইয়া থাকে। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও এইরূপ এজমালী কার্য্য পরিচালনাকে জায়েয গণ্য করা হইয়াছে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে কড়া-ক্রান্তির হিসাব সম্ভব নহে। এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্থলে স্বভাবতঃ প্রত্যেকেই সৌজন্যমূলক বা প্রয়োজনের তাকিদে ঐ বিভিন্নতাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া থাকে।

১২০২। হাদীছ ঃ—সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোন এক জেহাদের সফরে) সকলের খাদ্যবস্তুই নিঃশেষ হইয়া আসিল। সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া যানবাহন উট জবেহ করিয়া খাইবার অনুমতি লইয়া গেল। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর সকলেই তাঁহাকে এই অনুমতির সংবাদ জ্ঞাত করিল। তিনি বলিলেন, যানবাহন শেষ হইয়া গেলে (পথি মধ্যে) তোমাদের বাঁচিবার উপায় কি ? এই বলিয়া ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটও উপস্থিত হইলেন এবং ঐ কথাই বলিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার যুক্তি গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, সকলকে জানাইয়া দাও—প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ খাদ্যবস্তু আমার নিকট উপস্থিত করে। অতঃপর একটি চামড়ার দস্তরখান বিছান হইল; সকলেই নিজ নিজ খাদ্যবস্তু উহাতে একত্রিত করিল (—যাহা নিতান্তই অল্প ছিল)। নবী (দঃ) উহার নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর সকলকে খাদ্যবস্তু সংগ্রহের পাত্র লইয়া উপস্থিত হইতে বলিলেন। সকলে উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরিয়া নিজ নিজ পাত্র ভরিল। এই অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে নবী (দঃ) বলিলেন, (বাস্তবিক) আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রসুল।

১২০৩। **হাদীছঃ**—আবু মুছা আশআ'রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআ'র গোত্রের লোকগণ অত্যন্ত ভাল। তাহাদের অভ্যাস এই যে, ভ্রমণ অবস্থায় তাহাদের খাদ্যবস্তুর ঘাটতি দেখা দিলে বা বাড়ীতে উপস্থিত থাকাবস্থায় পরিবারবর্গের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাদ্যবস্তু একত্রিত করিয়া অতঃপর সমপরিমাণে বন্টন করিয়া লয়। এই সমস্ত লোকগণ বস্তুতঃ আমার পছন্দনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসি।

ব্যাখ্যাঃ—হাসান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা নিজ নিজ ব্যবহারিক বস্তু একত্রিত করিয়া এজমালীরূপে ব্যবহার কর, ইহা অধিক বরকতের কারণ এবং সদাচার ও সুচরিত্রের পরিচায়ক।

কোন বস্তু ক্রয়ে অংশীদার হওয়া

১২০৪। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে শিশুকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিয়া আরজ করিলেন—ইয়া রসুলুল্লাহ। আমার এই ছেলেকে দীক্ষা দান করুন; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে-ত শিশু। অতঃপর তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং (বরকত ও উন্নতির) দোয়া করিলেন।

উক্ত আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম ছাহাবীর পৌত্র বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমার দাদা আমাকে লইয়া ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারে যাইতেন এবং কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতেন, এমতাবস্থায় বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন, আপনার এই ক্রীত বস্তুর মধ্যে আমাদিগকে অংশীদার করিয়া লউন; রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনার জন্য বরকত ও উন্নতির দোয়া করিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই দোয়ার ফলে তিনি এক এক ব্যবসার লভ্যাংশে এক একটি উট উপার্জন করিয়া বাড়ী পাঠাইতেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ভাগ-বন্টনে বিভিন্ন জিনিষের মূল্যমান নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইলে তাহা করিবে, কিন্তু ন্যায়-পরায়ণতার সহিত তাহা করিবে (৩৩৯ পৃঃ) ● ভাগ বা খণ্ডসমূহ নির্দ্ধারণের পর অংশীদারদের মধ্যে তাহা বিতরণে প্রয়োজন হইলে লটারি করা যায় (ঐ) ● ভাগ-বাটোয়ারা গ্রহণ করার পরে কোন অংশীদার উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না (ঐ)। ● অমোসলেমের সহিত কৃষিকর্মে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদার হওয়া যায় (৩৪০ পৃঃ)। ● ভাগ-বন্টনে দশটি বকরী একটি একটি উটের সমান ধরা যায় (৩৪১ পৃঃ)। অর্থাৎ ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর একত্রিত বস্তুর বন্টনে মূল্যমানের ভিত্তিতে অংশ নির্দ্ধারণ করা যায়।

● এক সঙ্গে খাওয়া কালে সাথীদের অনুমতি ব্যতিরেকে এক গ্রাসে দুইটি খেজুর খাইবে না (৩৩।৮ পৃঃ)। অর্থাৎ শরীক বা অংশীদারদের হক একটি বড় আমানত; সর্বক্ষেত্রে ইহার পূর্ণ লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্তব্য। এমনকি যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রে খাইতে বসে এবং খাদ্য সামগ্রিতে তাহাদের সকলের হক সমান হয়—যেমন অন্য কেহ তাহাদের সকলের জন্য খাদ্য প্রদান করিয়াছে; সে ক্ষেত্রে যদি খাদ্য সীমিত হয় এবং একজনে বেশী খাইলে অপর জনের তৃপ্তি লাভ হইবে না আশঙ্কা থাকে—এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর একে অন্যের চেয়ে বেশী খাওয়ার পন্থা অবলম্বন করা, যেমন অন্যের তুলনায় বড় গ্রাস গ্রহণ করা অন্যায় ও অপরাধ পরিগণিত হইবে।

রেহেন বা বন্ধক রাখা

১২০৫। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একবার স্বীয় পরিবারের জন্য মদীনাস্থিত এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু জব বাকি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উহার মূল্যের জন্য তিনি স্বীয় লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

(নবী (দঃ) সদা দান-খয়রাত করিয়া রিক্ত হস্ত থাকিতেন; এমনকি) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বলিলেন, অদ্য বিকালে মোহাম্মদের পরিবারবর্গের নিকট গম বা অন্য কোন খাদ্যবস্তু চার সের পরিমাণও নাই, অথচ হযরতের পরিবারে নয়টি সংসার ছিল। (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।)

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে ১১১০ নং হাদীছখানাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বন্ধক বস্তুকে ব্যবহার বা ভোগ করা

রেহেনী বস্তুর মালিক যেহেতু রেহেনদাতা, তাই ঐ বস্তুর আয় ও উৎপন্নের মালিক ও অধিকারী একমাত্র রেহেনদাতা। রেহেন গ্রহীতা ঐ বস্তুর কোন আয়-উৎপন্ন ভোগ করিতে পারিবে না বা ঐ বস্তুকে ব্যবহারও করিতে পারিবে না। যেমন কোন গাভী, ছাগল ইত্যাদি পশু রেহেন রাখা হইয়াছে, উহার দুগ্ধ বা উহার উপর আরোহণ করা, কিম্বা কোন জমি রেহেন রাখিয়াছে উহার ফল-মূল ইত্যাদি সব কিছুর মালিক ও অধিকারী রেহেনদাতা হইবে, রেহেন গ্রহীতা এই সব বস্তুর কোনরূপ স্বত্বাধিকারী হইবে না, ইহা শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান। যদি রেহেন গ্রহীতা নিয়মতান্ত্রিক বিনিময় ব্যতিরেকে ঐরূপ কোন বস্তু ভোগ করে তবে তাহা সুদ গণ্য হইবে। তবে—রেহেন গ্রহীতা ঐসব উৎপন্ন রেহেনদাতাকে তখনই দিয়া দিতে বাধ্য নহে; উহাকে আসল বস্তুর সহিত রেহেনরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে। এমনকি যদি উহা পচনশীল বস্তু হয়, যেমন বাগানের ফল, পশুর দুগ্ধ ইত্যাদিকে রেহেনদাতা মালিকের মাধ্যমে এবং সে রাজী বা উপস্থিত না হইলে কাজী তথা জজের মাধ্যমে বিক্রি করিয়া বিক্রয়লব্ধ বস্তু রেহেনরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

অবশ্য রেহেনী বস্তুর অস্তিত্ব যদি ব্যয় সাপেক্ষ হয়, যেমন—কোন পশু, যাহার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় ঐ ব্যয় সমূহও রেহেনদাতাকেই বহন করিতে হইবে, এমনকি উহার তত্ত্বাবধানের জন্য যদি কোন চাকর নিয়োগ করিতে হয় তবে তাহার ব্যয়ও ঐ রেহেনদাতাকেই বহন করিতে হইবে। যদি রেহেনদাতা এই ব্যয়ভার বহনে অস্বীকৃত হয় তবে রেহেন গ্রহীতা (জজের অনুমতি লইয়া) রেহেনী বস্তুর ব্যয়ভার বহন করতঃ উহাকে সেই পরিমাণ ব্যবহার এবং সেই পরিমাণে উহার আয় ভোগ করিতে পারিবে। একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থাকেই নিম্নে বর্ণিত হাদীছের তাৎপর্য্য সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

১২০৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রেহেনী পশুর উপর আরোহণ করা যাইবে এবং উহার দুগ্ধ পান করা যাইবে উহার ব্যয়ের বিনিময়ে।

মছআলাহ ঃ—অমোসলেমের নিকটও রেহেন রাখা যায় (৩৪১ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—রেহেনদাতা ও রেহেন গ্রহীতার মধ্যে কোন বিষয়ের বিরোধ সৃষ্টি হইলে দাবীদার যে হইবে তাহাকে সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, অন্যথায় অস্বীকারকারী কসম খাইবে (৩৪২ পৃঃ)।

ক্রীতদাস আজাদ ও মুক্ত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—……… فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِى

অর্থাৎ যে সমস্ত আমলের দ্বারা মানুষের পরকালীন উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু উহা কঠিন বোধ হয় তাহা এই—দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করা অথবা অভাবের দিনে বুভুক্ষু আত্মীয় এতিমকে বা নিরুপায় অভাবী মিছকীনকে খাদ্য দান করা।

১২০৭। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا إِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ۝

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ মোসলমানকে আজাদ ও মুক্ত করিবে আল্লাহ তায়ালা সেই লোকটির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিবেন।

হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আলী (রাঃ) উক্ত হাদীছ শুনিতে পাইয়া তাঁহার এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিলেন যেই ক্রীতদাসটির মূল্য এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দেওয়া হইতেছিল।

কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম

১২০৮। হাদীছ :—আবু-জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সর্বোত্তম আমল ও নেক কার্য্য কি? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লার প্রতি ঈমান স্থাপন করা এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? নবী (দঃ) বলিলেন, অধিক মূল্যবান ও মালিকের নিকট অধিক পছন্দনীয় ক্রীতদাস।

এজমালী ক্রীতদাস হইতে স্বীয় অংশ মুক্ত করিলে?

১২০৯। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করতঃ এইরূপ ফতওয়া দিতেন যে, এজমালী ক্রীতদাস-দাসী হইতে কোন অংশীদার স্বীয় অংশ আজাদ করিলে ঐ ক্রীতদাসের সম্পুর্ণকে আজাদ করা তাহার জিম্মায় ওয়াজেব হইবে—এইরূপে যে, অভিজ্ঞ লোকের বিবেচনা অনুযায়ী ঐ ক্রীতদাসের মুল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে এবং অংশীদারগণের অংশ পরিমাণ মুল্য ঐ ব্যক্তি পরিশোধ করতঃ পূর্ণরূপে মুক্তিদান করিবে। (কিছু অংশ মুক্ত কিছু অংশ গোলাম—এই অবস্থা স্থায়ী হওয়া শরীয়তের বিধান বিরোধী।)

১২১০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এজমালী ক্রীতদাসের অংশ যে ব্যক্তি আজাদ করিবে বাকি অংশ মুক্ত করা তাহারই কর্তব্য হইবে—যদি তাহার সামর্থ থাকে; নতুবা ক্রীতদাসটির মুল্য নির্দ্ধারিত করিয়া অবশিষ্ট অংশের মুল্য স্বয়ং ক্রীতদাস সাধ্যানুসারে উপার্জন করিয়া পরিশোধ করিবে।

১২১১। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হইয়া (রাত্রির অন্ধকারে) স্বীয় বস্তি অতিক্রম করতঃ মদীনার প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটি ক্রীতদাস ছিল। পথিমধ্যে তাঁহারা একে অন্যকে হারাইয়া ফেলিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্বক একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন। হঠাৎ হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! ঐ দেখ—তোমার ক্রীতদাসটি আসিতেছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন—ক্রীতদাসটি আজ হইতে আজাদ ও মুক্ত।

আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বীয় বস্তি ত্যাগ করার রাত্রিটির অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ এই বয়েতটি বলিয়া থাকিতেন।

يا ليلة من طولها وعنائها .... على انها من دارة الكفر نجت

অর্থ—সেই রাত্রিটি কতই না প্রশস্ত ছিল এবং সেই রাত্রে কতই না কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সবই অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে, যেহেতু ঐ রাত্রিটিই আমাকে আল্লাদ্রোহিতার দেশ হইতে পরিত্রাণ দিয়াছে।

যে দাস-দাসী পরওয়ারদেগারের বন্দেগী সুষ্ঠুরূপে করে এবং মনীবের সেবাও সুচারুরূপে করে?

১২১২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দাস-দাসী যখন একনিষ্ঠতার সহিত মনীবের সেবা করে এবং সর্ব শ্রদ্ধার পাত্র স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের বন্দেগীও সুষ্ঠুরূপে করে তখন সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়।

দাসীকে ভালরূপে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করা

১২১৩। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীর চরিত্র সংশোধন ও শিক্ষা দান সুন্দরভাবে করিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়াছে এবং স্বীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে সে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিবে। আর যে দাস আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবদেরও হক আদায় করে তাহারও দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে।

এই পরিচ্ছেদে ৮০নং হাদীছটিও উল্লেখ হইয়াছে।

১২১৪। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সৎ ও নেককার ক্রীতদাস নেক কাজে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা, আল্লার দরবারে গ্রহণোপযোগী হজ্জ করা ও মাতার খেদমত করা—এই সব বড় বড় নেক কার্য্যে (দাসত্বের দ্বারা) বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না হইত তবে আমি কৃতদাস থাকিয়া মৃত্যু হওয়ার অভিলাষী হইতাম।

১২১৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ

رَبِّهٖ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهٖ ۝

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ (ক্রীতদাস) ব্যক্তির অবস্থা কতই না ভাল—যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার এবাদৎ উত্তমরূপে করিয়া থাকে এবং স্বীয় মনীবের প্রতিও মঙ্গলকামী হয়।

দাস-দাসীর উপর ঔদ্ধত্যের ভাষা ব্যবহার করিবে না

১২১৬। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজের সম্পর্কে (ভৃত্যকে আদেশ করিতে) এইরূপ বলিবে না—"তোমার প্রভুকে খানা আনিয়া দাও, তোমার প্রভুকে অজুর পানি আনিয়া দাও, তোমার প্রভুকে পানীয় আনিয়া দাও।" (কারণ ইহাতে ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার প্রকাশ পায়, কিন্তু) ভৃত্য মনীবকে সম্মান দেখাইবে এবং এইরূপ বলিবে—"আমার মনীব, আমার সাহেব। এবং কেহ (স্বীয় ভৃত্যকে) আমার দাস; আমার দাসী বলিবে না; আমার সেবক, আমার সেবিকা বলিবে (আরবী ভাষায়) গোলামও বলা যায় (যাহার অর্থ যুবক)।

ব্যাখ্যা :—ইসলাম ও ঈমানের মূল হইল তৌহিদ—এই তৌহিদ বা একত্ববাদকে অন্তরে গাঁথিয়া আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই তৌহিদের উপর মুখে শপথ গ্রহণ পূর্বক স্বীকারোক্তি করা ও ঘোষণা দেওয়া ইসলাম ও ঈমানের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তু। অতঃপর সর্বদা বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্তরকে সেই তৌহিদের বরখেলাফ ও বিপরীত ভাবধারা খেয়াল ও কল্পনা হইতে পবিত্র ও সংযত রাখায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তদ্রূপ মুখকেও সেই তৌহিদের বরখেলাফ ও বিপরীত বাক্য উচ্চারণ করা হইতে সংযত রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই শরীয়ত যেরূপ আন্তরিক বিশ্বাস ও ভাবধারার ব্যাপারে বাছ-বিচার ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বাক্য, বচন, শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারেও সতর্কতা ও সাবধানতার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন—আলী বখ্‌শ, হোছাইন বখ্‌শ, রসুল বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ, ইত্যাদি নাম রাখা নিষিদ্ধ। কারণ, "আলী" বলিতে সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায়, "আলী বখ্‌শ" অর্থ আলীর দানকৃত "হোছাইন বখ্‌শ" অর্থ হোছাইনের দানকৃত এবং "রসুল বখ্‌শ" অর্থ রসুলের দানকৃত এবং "পীর বখ্‌শ" অর্থ পীরের দানকৃত। অথচ সন্তান-সন্ততির দাতা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। সেই দৃষ্টিতে উল্লিখিত নামের অর্থসমূহ তৌহিদের বিপরীত। তদ্রূপ "আবদুন-নবী", "আবদুর-রসুল" নামও নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ—নবীর বন্দা। অথচ মানুষ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বন্দা।

সারকথা এই যে, সৃষ্টিকর্তার কোন বিশেষ গুণবাচক শব্দ বা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মধ্যেকার সম্পর্ক-সূচক কোন শব্দ বা বাক্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ব্যবহার করাকে শরীয়তে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে কতিপয় শব্দ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত পর্যায়েরই। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা ব্যবহারিক বোধ্য অর্থানুসারে বলবৎ হইয়া থাকে। তাই উহাতে ভাষা, দেশ, কাল ও পরিবেশের তারতম্যের পার্থক্য হইবে।

আরবী ভাষায় "রব্" শব্দটির অর্থ পালনকর্তা-প্রভু; এই শব্দটি কোন বস্তু বিশেষের সম্পর্ক যুক্তরূপে ব্যবহৃত না হইলে উহার অর্থ বুঝায়—পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা। তাই

কোন ক্রীতদাসের জন্য তাহার মালিককে "রব্" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ "আব্‌দ" শব্দটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সৃষ্টিজাত মানবের সম্পর্ককে বুঝায়; যেমন—আবদুল্লাহ অর্থ আল্লার বন্দা এবং "আমাত" শব্দটি ঐ অর্থের স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব মালিকের জন্য ক্রীতদাসকে 'আবদ" ও ক্রীতদাসীকে "আমাত" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার এবং নৈতিক ব্যবহার-ভিত্তি যেহেতু তৌহিদেরই উপর স্থাপিত, কাজেই সমাজ ব্যবস্থায় তৌহিদ ভিত্তিক তাহজীব, আখলাক ও আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মনীব নিজকে প্রভু বলিবে না, দাস-দাসীকে চাকর-চাকরাণীকে দাস-দাসী বা চাকর-চাকরাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে না। কারণ, ইহাতে একত নিজের ভিতরে অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্য আসে—যাহা তৌহিদের বিপরীত, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন গণ্য হয়। কিন্তু দাস-দাসী চাকর-চাকরাণীর বিশেষ কর্তব্য যে, বে-আদব বে-তমিজ হইবে না; তাহারা মনীব হইতে স্নেহ পাইয়া অধিক নম্র, অধিক ভক্ত হইবে; তাই তাহারা ব্যবহারেও আদব দেখাইবে, ভাষায়ও আদব দেখাইবে যে, মালিককে "মনীব" বা "সাহেব" ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিবে। অবশ্য এত আদব করিবে না যাহা হয়ত শেরেকের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, উল্লিখিত নিষিদ্ধ শব্দসমূহ কদাচিৎ কোন কোন হাদীছের ভাষায় ব্যবহৃত পাওয়া যায়। এই ইঙ্গিত দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা সতর্কতামূলক। পক্ষান্তরে যদি কেহ স্বীয় প্রাবল্য প্রকাশার্থে নয়, বরং শুধু সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে ঐরূপ কোন শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করে তবে তাহাকে তৌহিদ ত্যাগী বা অহঙ্কারী বলা হইবে না। অবশ্য এইরূপ অর্থেও ঐ শব্দসমূহ অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে সঙ্কুচিত থাকিবে। কারণ, সদা সর্বদা যেরূপ শব্দ ও বাক্য মুখে উচ্চারিত হয় অন্তরের উপর ধীরে ধীরে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া স্থান লাভ করিতে থাকে। নফছ ও শয়তান ত সর্বদা ছিদ্রপথের খোঁজে আছেই।

ক্রীতদাসের প্রতি সহানুভূতি

১২১৭। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও খাদেম—সেবক বা ভৃত্য তাহার জন্য খানা তৈয়ার করিয়া আনিলে সেই খাদেমকে নিজের সঙ্গে এক পাত্রে বসাইয়া খাওয়াইবার মত উদারতা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ ঐ খাদ্য হইতে এক-দুই লোকমা সেই খাদেমকে অবশ্যই দান করিবে। কারণ, ঐ খাদ্য প্রস্তুত করার সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ সে সহ্য করিয়াছে।

কাহাকেও চেহারার উপর মারিবে না

১২১৮। **হাদীছ :**— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ○

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ (নিজ সন্তান-সন্ততি, ছাত্র বা সাধারণ ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি কাহাকেও শাসন ইত্যাদির প্রয়োজনে) প্রহার করার ইচ্ছা করিলে তাহার চেহারার উপর প্রহার করিবে না।

ক্রীতদাসের প্রতি মিথ্যা অপবাদের পরিণতি

১২১৯। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবুল-কাসেম (মোহাম্মদ) ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রীতদাসের উপর জেনার তোহমত লাগাইবে, অথচ সে উহা করে নাই; সেই ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন মিথ্যা তোহমতের শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি ক্রীতদাস বাস্তবিকই সেই দোষে দোষী হয়, (তবে তাহাকে শায়েস্তা করা আবশ্যক)। (১০১৩ পৃঃ)

মছআলাহ :— যেরূপ তালাকের শব্দ সজ্ঞান স্বামীর মুখে যে কোনরূপে উচ্চারিত হইলেই স্ত্রীর প্রতি তালাক হইয়া যাইবে; তদ্রূপ দাস-দাসীকে মুক্তি দানের শব্দ মনিবের মুখে যে কোনভাবে উচ্চারিত হইলেই দাস-দাসীর মুক্তি হইয়া যাইবে—যদিও অনিচ্ছায় বা ভুলে তাহা হইয়া থাকে। ইহা ইমাম আবু হানীফার মজহাব। ইমাম বোখারীর মতে অনিচ্ছা বা ভুলের ক্ষেত্রে তালাক বা মুক্তিদান সম্পন্ন হইবে না (৩৪৯ পৃঃ)।

মছআলাহ :— শরীয়তের বিধান এই যে, ইসলামী জেহাদের বন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক জিম্মীরূপে মুক্তও রাখিতে পারেন এবং তাহাদের দাসত্বের ফরমানও জারী করিতে পারেন। অবশ্য ঐরূপ বন্দী যদি আরববাসী লোক হয় এবং পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মজহাবে ঐ বন্দীর জন্য উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের কোনটিরই সুযোগ দেওয়া হইবে না। ঐরূপ বন্দীর জন্য ইসলাম গ্রহণ না করিলে প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত; কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্ম ছিল আরবে। পবিত্র কোরআনও আরবী ভাষায়। অতএব তাহাদের পক্ষে ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট এবং ইসলামের বিরোধিতা তাহাদের পক্ষে নিছক অন্ধ-বিরোধিতা; যদ্দরুণ সে ইসলামের প্রতি হুমকি স্বরূপ। সুতরাং সে আর কোন সুযোগ পাওয়ার উপযোগী নহে; একমাত্র ইসলাম গ্রহণই তাহার রক্ষাকবচ হইতে পারে। অন্যথায় তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অবশ্য নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক আরববাসী হইলেও দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইবে। কারণ, তাহাদের হইতে ইসলামের কোন আশঙ্কা নাই। ইমাম বোখারীর মতে আরববাসী প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষও অন্যদের ন্যায় দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইতে পারে। (৩৪০ পৃঃ)

মোকাতাবের বয়ান

দাস-দাসী মুক্ত করার প্রতি ইসলাম সর্বপ্রকারে আকৃষ্ট করিয়াছে। এমনকি দাস-দাসীর যত্নে ও প্রতিপালনে ধন খরচ করায় সেই দাস-দাসীকে মুক্তিদানে যদি মনীবের আগ্রহ

কম হয় কিম্বা স্বাভাবিক ভাবেই মনীব টাকা পাইলে মুক্তিদানে আগ্রাহান্বিত হইবে এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়ত এই ব্যবস্থার সুযোগ রাখিয়াছে যে, মনীব ও দাসের মধ্যে চুক্তি হইবে—দাস কোন প্রকারে ব্যবস্থা করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া নির্দ্ধারিত পরিমাণের ধন মনীবকে প্রদান করিতে পারিলে সে মুক্ত হইয়া যাইবে; ইহাকেই মোকাতাব-ব্যবস্থা বলা হয়। পবিত্র কোরআনেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ........ وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ

"যে সব দাস-দাসী মোকাতাব-ব্যবস্থার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাদিগকে উহার সুযোগ দাও যদি তাহাদের মধ্যে (ধন সংগ্রহের যোগ্যতা ইত্যাদি) সুলক্ষণ অনুভব কর। আর আল্লাহ তোমাদিগকে যে ধন দিয়াছেন উহা দ্বারা ঐরূপ দাস-দাসীর সাহায্য কর।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, দাস-দাসীকে ধন সংগ্রহে সক্ষম দেখিলে তাহাকে মোকাতাব-ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ওয়াজেব।

আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দাস ছিল সীরীন, সে কোন সূত্রে অনেক ধন লাভ করিয়া ছিল বা ধন সঞ্চয়ের যোগ্যতা তাহার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। সে মোকাতাব-ব্যবস্থার কথা বলিলে আনাছ (রাঃ) অস্বীকার করিলেন। সে খলীফা ওমরের নিকট যাইয়া অভিযোগ করিলে ওমর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে সুযোগ দেওয়ার জন্য বলিলেন। এইবারও আনাছ (রাঃ) অস্বীকার করিলেন; ওমর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে বেত্রাঘাত করতঃ উল্লেখিত আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন; এইবার আনাছ (রাঃ) সম্মত হইলেন।

হেবা তথা সৌহার্দ্য স্বরূপ কিছু প্রদান করা

১২২০। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ۝

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমান নারীগণকে বলিয়াছেন, প্রতিবেশীদেরে সৌহার্দ্য সূত্রে আদান-প্রদানে কুণ্ঠিত হইও না। অতি সামান্য বস্তু—যেমন, বকরীর পায়াও দেওয়ার সুযোগ হইলে উহাকে সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিবে না।

১২২১। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে যদি দাওয়াত করা হয় রানের গোশত খাওয়ার জন্য সেই দাওয়াত আমি গ্রহণ করিব এবং যদি শুধুমাত্র পায়ের একখানা নালার হাড্ডির জন্য দাওয়াত করা হয় আমি সেই দাওয়াতও গ্রহণ করিব। তদ্রূপ যদি আমাকে একটি মাত্র

রান বা একখানা নালার হাড্ডি হাদিয়া দেওয়া হয় উভয়কেই আমি সমভাবে গ্রহণ করিব।

অর্থাৎ মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে সৌহার্দ্য ও মহব্বত-সূত্রে যাহাই প্রদান করা হউক—বেশী বা কম বড় বা ছোট সবই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করাই সুন্নত; মহব্বতের ক্ষুদ্র জিনিসকেও তুচ্ছ করা চাই না।

আপন জনের নিকট কোন কিছুর ফরমাইশ করা

১২২২। হাদীছ :—সাহ্ল (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন মোহাজের নারীর একটি ছুতার মিস্ত্রী ক্রীতদাস ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট খবর পাঠাইলেন যে, তোমার ক্রীতদাসকে বল, আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করিতে। সেই স্ত্রীলোকটি তাহার ক্রীতদাসকে উহা বানাইবার আদেশ করিল। সে ঝাউগাছ কাটিয়া আনিল এবং উহার কাষ্ঠ দ্বারা মিম্বর তৈরী করিল। মিম্বর প্রস্তুত হইলে পর স্ত্রীলোকটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, মিম্বর প্রস্তুত হইয়াছে। নবী (দ:) উহা পাঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কতেক জন লোক উহাকে লইয়া আসিল। অতঃপর নবী (দ:) নিজ হস্তে উহাকে তাঁহার মসজিদের বিশেষ স্থানে বসাইয়া দিলেন।

কাহারও নিকট পানীয় বস্তু চাওয়া

অর্থাৎ সর্বদার প্রয়োজনীয় কোন সাধারণ বস্তু, যেমন পানি কাহারও নিকট চাওয়া হইলে তাহা যাঞ্চা ও ভিক্ষা গণ্য হইবে না।

১২২৩। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের এই বাড়ীতে তশরীফ আনিলেন এবং পানীয় উপস্থিত করার জন্য বলিলেন। আমরা তাঁহার জন্য আমাদের বকরী দোহন করিয়া আনিলাম এবং আমাদের এই কূপের পানির দ্বারা দুধের শরবত তৈরী করিয়া দিলাম। তাঁহার বাম পার্শ্বে আবু বকর (রা:) ছিলেন এবং ওমর (রা:) তাঁহার সম্মুখে ছিলেন এবং তাঁহার ডান পার্শ্বে ছিল একজন গ্রাম্য লোক।

হযরত (দ:) পান করার পর (যখন অবশিষ্ট অন্যকে দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন) ওমর (রা:) বলিলেন, এই যে আবু বকর (তাঁহাকে প্রদান করুন), কিন্তু নবী (দ:) ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, ডান দিক হইতে একের পর এককে দেওয়া হইবে। তোমরাও এইরূপে ডান দিক হইতেই দেওয়া আরম্ভ করিও। আনাছ (রা:) বলিয়াছেন, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত।

হাদিয়া গ্রহণ করা

১২২৪। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, "মাররোজ্জাহরান" নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ দেখিতে পাইলাম। সকলেই উহাকে দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া গেল, আমি উহাকে ধরিতে সক্ষম হইলাম। আমি উহাকে ধরিয়া আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা

আনছর নিকট নিয়া আসিলাম। তিনি উহাকে জবেহ করিলেন এবং উহার একটি পিছনের রান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন।

১২২৫। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ খাদ্য-বস্তু উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা কি হাদিয়া—না ছদকা? যদি বলা হইত ছদকা; তবে ছাহাবীগণকে বলিতেন, ইহা তোমরা খাও; স্বয়ং তিনি উহা খাইতেন না। যদি বলা হইত—ইহা হাদিয়া, তবে সকলের সঙ্গে হযরত (দঃ)ও শরীক হইতেন।

১২২৬। **হাদীছ** ঃ—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি উম্মে-আতিয়াকে ছদকার বকরী হইতে যে বকরী দান করিয়াছিলেন সে ঐ বকরীর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়া স্বরূপ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। (অর্থাৎ যেহেতু উহা আসলে ছদকার বস্তু, তাই উহা আপনি খাইবেন, কি—না?) নবী (দঃ) বলিলেন, ছদকার বস্তুটি উহার উপযুক্ত স্থানে পৌঁছিয়া (ছদকা আদায় হইয়া) গিয়াছে। (অর্থাৎ সেই স্থান হইতে উহা হাদিয়ারূপে প্রেরিত হওয়ায় এখন আর ছদকা থাকে নাই।)

হাদিয়া দেওয়ায় কোন বিশেষত্বের লক্ষ করা

১২২৭। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে দুইটি দল ছিল। এক দলে ছিলেন—আয়েশা (রাঃ). হাফছা (রাঃ), ছফিয়া (রাঃ) ও ছাওদা (রাঃ)। অপর দলে ছিলেন—উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) এবং বাকি বিবিগণ। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক মহব্বতের বিষয় ছাহাবীগণ জ্ঞাত ছিলেন, তাই কাহারও কিছু হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইলে সে প্রতীক্ষায় থাকিত—যেই দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে হইতেন সেই দিন ঐ হাদিয়া পাঠাইত। উম্মে ছালামাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দলের বিবিগণ (ইহা উপলব্ধি করিয়া বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহারা) সকলেই স্বীয় দলের প্রধান উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এই বিরক্তিকর বিষয়টি নিয়া আলোচনা করুন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করুন, তিনি যেন সকলকে বলিয়া দেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কাহারও হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইলে, তিনি যে কোন বিবির ঘরে থাকা অবস্থায়ই যেন দেওয়া হয়।

উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বিষয়টি হযরতের নিকট পেশ করিলেন। হযরত (দঃ) কোন উত্তর করিলেন না। দলের বিবিগণ উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম; কিন্তু হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। তাঁহারা বলিলেন, আপনি পুনরায় এই বিষয় আলোচনা করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন উম্মে ছালামার ঘরে আসিলেন তখন তিনি পুনরায় ঐ বিষয় পেশ করিলেন। এইবারও হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না। দলের বিবিগণ তৃতীয়বার তাঁহাকে বলিলেন। উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) এইবারও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ বিষয় আলোচনা করিলেন। এইবার হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করিও না। (আয়েশার যে বিশেষত্ব আছে অন্য কাহারও সেই বিশেষত্ব নাই—) আমি আয়েশার বিছানায় থাকাকালীন অহী (বেশী) আসিয়া থাকে, কিন্তু অন্য কোন বিবির বিছানায় থাকাকালীন (সেইরূপ) অহী আসে না। এতদশ্রবণে উম্মে ছালামাহ (রাঃ) বিনয় স্বরে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টির কার্য হইতে আল্লার দরবারে তওবা করিতেছি।

অত:পর তাঁহার দলের বিবিগণ ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং এই বিষয় আলোচনার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট যাইয়া বলিলেন, আপনার বিবিগণ অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি অবশ্যই আবু বকর তনয়া ও তাঁহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবেন; ফাতেমা (রাঃ) এই বলিয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, স্নেহের বেটী! আমি যাহাকে মহব্বত করি তুমি তাহাকে মহব্বত করিবে না কি? ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়ই। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আয়েশাকে মহব্বত কর।) ফাতেমা (রাঃ) বিবিগণের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ফাতেমা (রাঃ) অস্বীকার করিলেন।

অত:পর বিবিগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে পাঠাইলেন। তিনিও উহাই বলিলেন যে, আপনার বিবিগণ আপনার নিকট অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি আবু বকর তনয়া ও তাঁহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবেন, এই বলিয়া যয়নব (রাঃ) উচ্চৈ:স্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। এমনকি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতিও কটাক্ষ আরম্ভ করিলেন; আয়েশা (রাঃ) নিকটেই বসিয়াছিলেন। যয়নব (রাঃ) ঐরূপ করিতেছিলেন আর রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশার প্রতি তাকাইতে ছিলেন যে, তিনি উত্তর দেন, কি—না। (আয়েশা (রাঃ)ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তাকাইতে ছিলেন যে, প্রতিউত্তরের অনুমতি দেন, কি—না। অনুমতি অনুভব করিয়া) আয়েশা (রাঃ) এরূপ প্রতিউত্তর করিলেন যে, যয়নব (রাঃ) নিরুত্তর হইয়া গেলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক খুশিতে চমকিয়া উঠিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বাহবা দিয়া বলিলেন, হাঁ—এইত আবু বকরের বেটী।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কিরূপ মধুর স্বভাব, মিষ্ট ব্যবহার ও কোমল চরিত্রের ছিলেন তাহারই আভাস এই ঘটনায় পাওয়া যায়। আর বিবিগণের

পক্ষ হইতে এই ঘটনায় যে উৎপীড়ন মূলক কার্য্য করা হইতেছিল তাহা দাম্পত্য সুলভ স্থলে মোটেই অস্বাভাবিক ও অমার্জনীয় নহে।

সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া

১২২৮। হাদীছ ঃ— আযরা ইবনে ছাবেত (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহ তাবেয়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে সুগন্ধি দিতে চাহিলেন; আমি বলিলাম—আমি সুগন্ধি লইয়াছি। তিনি বলিলেন, বিশিষ্ট ছাহাবী আনাছ (রাঃ)কে সুগন্ধি দেওয়া হইলে তিনি তাহা ফেরত দিতেন না এবং তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা ফেরত দিতেন না।

হাদিয়ার প্রতিদান দেওয়া উত্তম

১২২৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন এবং উহার প্রতিদান দিয়া থাকিতেন।

এক ছেলেকে কিছু হেবা ও দান করা

১২৩০। হাদীছ ঃ— নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) একদা মিম্বরের উপর বসিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আমার পিতা বশীর (রাঃ) আমার মাতা আম্‌রা-বিন্‌তে-রাওয়াহার অনুরোধে আমাকে একটি ক্রীতদাস দান করা সাব্যস্ত করিলেন। আমার মাতা বলিলেন, যাবৎ এই দানের উপর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সাক্ষী না করা হইবে তাবৎ আমি সন্তুষ্ট হইব না। তখন আমার পিতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আমার স্ত্রী আম্‌রা-বিন্‌তে-রাওয়াহার পক্ষের ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দান করা সাব্যস্ত করিয়াছি। আমার স্ত্রী আপনাকে ঐ দানের সাক্ষী বানাইবার জন্য বলিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অন্য সন্তান আছে কি ? আমার পিতা বলিলেন হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এইরূপ দান করিয়াছ কি ? পিতা বলিলেন—না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি অন্যায় কার্য্যের উপর সাক্ষী হইব না। এইরূপ কার্য্য হইতে আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চল; (যেরূপ তুমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সমভাবে সদ্ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর। তুমি স্বীয় দান ফেরৎ লইয়া লও।) সেমতে আমার পিতা তথা হইতে আসিয়া ঐ দান ফেরৎ লইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নিজ সন্তান—ছেলে-মেয়ে এবং যে কোন ওয়ারেছকে মৃত্যু শয্যায় কিছু দান করিলে সেই দান কার্য্যকরীই হয় না। সুস্থ অবস্থায় দান করিলে সে দান কার্য্যকরী হয়; সেই ক্ষেত্রে উত্তম এই যে, নিজ সন্তান সকলকেই দান করিবে এবং ছেলে ও মেয়ে সকলকেই সম পরিমাণ দিবে। কোন কোন আলেমের মতে এইরূপ সমতা

রক্ষা করা ওয়াজেব এবং ব্যতিক্রম করা গোনাহ। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সন্তানদেরকে দান করায় সমতা বজায় রাখিও। অধিকাংশ ইমামগণের মতে সন্তানদের সকলকে না দিয়া শুধু একজন বা কতিপয়কে দেওয়া নাজায়েয না হইলেও মকরূহ—দোষণীয় বটে (ফতহুলবারী ৫—১৬৩)। ইমাম আবু হানিফার মতেও ইহা মকরূহই (কাজীখান)। অবশ্য উহা মকরূহ ও দোষণীয় একমাত্র ঐ ক্ষেত্রে যেখানে কোন সুষ্ঠু কারণ ব্যতিরেকে শুধু কেবল কোন সন্তানের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সকল সন্তানেরই অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া যদি কোন সন্তানকে কারণাধীনে কিছু বেশী দেওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে মোটেই কোন দোষ হইবে না। (দোররুল-মোখতার—শামী ৪—৭০৭)। সুষ্ঠু কারণ বিদ্যমান থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ; যথা—(১) এক সন্তান ফাছেক বদকার অপর জন নেককার; নেককারকে বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (ফয়জুল-বারী)। (২) কোন সন্তান দ্বীনদারীতে অধিক অগ্রগামী তাহাকে বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (কাজীখান)। (৩) কোন সন্তান দ্বীনের এল্‌মে আত্মনিয়োগকারী তাহাকেও বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (আলমগীরী ৪—৩৯৭)। (৪) কোন সন্তান তাহার বাল-বাচ্চা অধিক—তাহাকেও বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (ফয়জুল-বারী)। (৫) কোন সন্তান অঙ্গহীন অক্ষম তাহাকেও বেশী দিতে পারে (ফতহুল-বারী ৫—১৬৩)। (৬) কিছু সংখ্যক সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ-শাদী সম্পন্ন হইয়াছে কিছু সংখ্যকের তাহা হয় নাই; তাহাদেরকেও বেশী দেওয়ায় দোষ নাই (এমদাদুল-ফতাওয়া)। এইরূপের আরও অন্য কোন সঙ্গত ও সুষ্ঠু কারণাধীনে কোন সন্তানকে কিছু বেশী দেওয়া হইলে তাহাতে দোষ হইবে না।

এখানে বোখারী (রঃ) আরও একটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, পিতা পুত্রকে কোন কিছু হেবাহ বা দান করিলে তাহা ফেরত লইতে পারে কি না?

ইমাম বোখারী সহ বিভিন্ন ইমামগণের মতে ফেরত লইতে পারে। হানাফী মজহাব মতে ফেরত লইতে পারে না। অবশ্য পুত্রের উপর পিতার বিশেষ হক রহিয়াছে। প্রয়োজনবোধে পুত্রকে পিতার ব্যয় বহন করিতে হয়; সেই প্রয়োজনে পিতা পুত্রের নিজস্ব মাল হইতেও স্বীয় ব্যয় গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে তাহার প্রদত্ত মালও সেই প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হেবা ও দান

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে হেবা ও দান অনুষ্ঠিত হইলে (এবং হস্তান্তরিত হইয়া হেবা সম্পন্ন হইয়া গেলে) উহা অখণ্ডনীয়। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)ও বলিয়াছেন, ঐ হেবা খণ্ডন করা যাইবে না।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলিল—তোমার মহরানার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ হেবা করিয়া দাও, (স্ত্রী তাহাই করিল;) অতঃপর সে তাহাকে তালাক দিয়া দিল, তাই স্ত্রী তাহার স্বীয় হেবা রদ করিয়া দিল। যদি সেই ব্যক্তি স্ত্রীকে ঠকাইবার ইচ্ছায় এরূপ করিয়া থাকে তবে স্ত্রী হেবা রদ করতঃ স্বীয় মহর ওয়াসিল করিতে পারিবে। আর যদি বস্তুতঃই সন্তুষ্টচিত্তে হেবা করিয়া থাকে, স্বামীর প্রতারণায় নহে, তবে উহা খণ্ডন করা যাইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হেবা-দান সম্পর্কে ইমামগণের সাধারণ মত্‌ এই যে—হস্তান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর উহা খণ্ডন করার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু স্বামীর প্রভাবাধীন থাকে, তাই কোন কোন ইমাম বিশেষ ব্যাখ্যার সহিত ঐ হেবা রদ করার ক্ষমতা দিয়াছেন—যেরূপ, ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, ছাহাবীগণের যুগের প্রসিদ্ধ কাজি শোরায়হ (রঃ)ও এক ঘটনায় ঐরূপ রায় দিয়াছিলেন—একটি নারী স্বামীকে কোন বস্তু হেবা করিয়াছিল, স্ত্রী সেই হেবা খণ্ডন করতঃ কাজী শোরায়হের নিকট মকদ্দমা করিল। কাজী শোরায়হ (রঃ) স্বামীকে বলিলেন, তোমাকে দুইজন সাক্ষী আনিতে হইবে যে, তোমার কোন প্রভাব, উৎপীড়ন ব্যতিরেকেই তোমার স্ত্রী তোমাকে হেবা করিয়াছিল। নতুবা স্ত্রী যদি শপথ করিয়া বলে যে, আমি তাহার প্রভাবের দরুন হেবা করিয়াছিলাম তবে আমি তাহার শপথ গ্রহণ করিব অর্থাৎ তাহার হেবার খণ্ডন বলবৎ করিয়া দিব।

ওমর (রাঃ) ঘোষণা দিয়াছিলেন, সাধারণতঃ নারীগণ (স্বামীর) প্রলোভন বা ভয় ও আতঙ্কে (স্বামীকে) হেবা করিয়া থাকে, তাই কোন স্ত্রী স্বামীকে হেবা করার পর উহা খণ্ডন করিতে চাহিলে খণ্ডন করিতে পারিবে।

মালেকী মজহাবের মতামতও এইরূপই যে, স্ত্রী যদি ঐরূপ প্রমাণ দিতে পারে যে, সে স্বামীর প্রভাবে পড়িয়া হেবা করিয়াছে তবে তাহার দাবী গ্রাহ্য করা হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী হেবার পরিবর্তে তালাক তথা "খোলাতালাক" গ্রহণ করিলে হেবা খণ্ডন করিতে পারিবে না। (ফতহুল বারী)

স্বামীর অনুমতি না লইয়া নিজের মাল দান করা

১২৩১। হাদীছ ঃ— আছমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমার স্বামী যোবায়ের (রাঃ) আমাকে যাহা কিছু (টাকা-পয়সা, চিজ-বস্তু) দিয়া থাকেন উহা ব্যতীত আমার আর কোন ধন-সম্পদ নাই, আমি উহা হইতে দান-খয়রাত করিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি দান-খয়রাত কর; দান-খয়রাত বন্ধ করিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি তাঁহার দান বন্ধ করিয়া দিবেন।

১২৩২। হাদীছ :— উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (তিনি হযরতের নিকট হইতে একটি ক্রীতদাসী চাহিয়া নিয়াছিলেন। অতঃপর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি না লইয়াই তিনি সেই ক্রীতদাসীটিকে আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন! রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই দিন তাঁহার ঘরে আসিলেন সেই দিন তিনি হযরত (দঃ)কে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি ক্রীতদাসীটি আজাদ করিয়া দিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে আজাদ করিয়া দিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি ক্রীতদাসীটি তোমার মামুগণকে দান করিলে অধিক ছওয়াব লাভ করিতে।

মছআলাহ :—স্ত্রী যদি একেবারেই জ্ঞানশূন্য হয় যে শরীয়তের বিধানে সে জ্ঞানহীন পরিগণিতা; তবে তাহার দান কার্য্যকরী হইবে না।

হাদিয়া, দান ইত্যাদির মধ্যে অগ্রাধিকার

১২৩৩। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। আমি হাদিয়া দেওয়ার বেলায় কাহাকে অগ্রাধিকার দিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহার গেট—বাড়ীর প্রবেশ দ্বার তোমার অধিক নিকটবর্তী।

উপযুক্ত কারণে হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা

ফোরাত ইবনে মোসলেম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) (যিনি আমিরুল মোমেনীন—ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি) আপেল বা ছেব ফল খাওয়ার খায়েশ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট এমন কিছু (টাকা পয়সা) ছিল না যাহা দ্বারা তিনি আপেল ক্রয় করিতে পারেন। অতঃপর আমরা তাঁহার সঙ্গে কোথাও যাত্রা করিলাম। এমন সময় একজন ক্রীতদাস একটি খাঞ্চা ভরা আপেল লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। (যাহা কাহারও পক্ষ হইতে হাদিয়া স্বরূপ ছিল।) তিনি উহা হইতে একটি আপেল হাতে উঠাইয়া নাড়াচাড়া করিলেন এবং উহার সুঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর উহা খাঞ্চার মধ্যেই রাখিয়া দিলেন।

আমি তাঁহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ করিলাম, তিনি বলিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না। আমি বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করিতেন না কি? তিনি বলিলেন, তাঁহাদের যুগে তাঁহাদিগকে দেয় হাদিয়া বস্তুতঃই হাদিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর (সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে ইহাই বলিতে হয় যে,) শাসন-ক্ষমতাধারীদের জন্য হাদিয়া নামীয় বস্তুসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে ঘুষ-রেশওয়াত ও উৎকোচ হইয়া গিয়াছে। (ফতহুল-বারী দ্রষ্টব্য)

দানের ওয়াদা পুরণের পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে

১২৩৪। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, বাহরাইনের এলাকা হইতে বাইতুল-মালের ধন-সম্পদ ওয়াসিল

হইয়া আসিলে আমি তোমাকে এইরূপে দিব (উভয় হাতের অঞ্জলি দ্বারা তিনবার ইশারা করিয়া দেখাইলেন।) কিন্তু বাহরাইনের ধন-সম্পদ মদীনায় পৌঁছা পর্য্যন্ত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগতে রহিলেন না। তাঁহার পর আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্বাচিত হইলেন এবং বাহরাইনের শাসনকর্তা আলা-ইবনুল হযরমী রাজিয়াল্লাহু তয়ালা আনহুর পক্ষ হইতে বহু ধন-সম্পদ মদীনায় পৌঁছিল। তখন আবু বকর (রাঃ) এই ঘোষণা করিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কাহারও কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার বা ঋণ পাওনা থাকিলে সে আমার নিকট উপস্থিত হউক।

(জাবের (রাঃ) বলেন—) এই ঘোষণা শুনিয়া আমি খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উভয় হাতের অঞ্জলি দ্বারা তিনবার ইশারা করিয়া আমাকে (বাইতুল-মাল হইতে) দান করার আশ্বাস দিয়াছিলেন।

আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (সুযোগের অপেক্ষায় বা যে কোন কারণে দুইবার তাঁহাকে ফিরাইলেন। তৃতীয়বার আসিলে পর) অঞ্জলি ভরিয়া (মুদ্রা) দিলেন এবং বলিলেন, গণনা করিয়া দেখুন কত হয়। আমি গণনায় দেখিলাম, পাঁচ শত। তিনি বলিলেন, আরও দুই পাঁচ শত নিয়া যান।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ আশ্বাস ব্যক্তিগত হইলে তাহা পুরণ করা ওয়াজেব নহে, অবশ্য মুরব্বির এইরূপ আশ্বাস পুর্ণ করার চেষ্টা উত্তম। আর ষ্টেটের পক্ষ হইতে উপযুক্ত কারণে ওয়াদা করিলে পরবর্তী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উহা প্রদান করা কর্তব্য।

মছআলাহ :—হেবাকৃত বস্তুও গ্রহীতাকে সোপর্দ করার পুর্বে হেবাকারীর মৃত্যু হইলে সে ক্ষেত্রে হেবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং ঐ বস্তু হেবাকারীর ওয়ারেছদের স্বত্ব পরিগণিত হইবে। অবশ্য গ্রহীতার প্রেরিত বা মনোনীত কোন ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে হেবা সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

যে বস্তুর ব্যবহার পছন্দনীয় নয়—উহা অন্যকে দেওয়া

১২৩৫। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিলেন, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। আলী (রাঃ) বাড়ী আসিলেন এবং (ফাতেমা (রাঃ)কে চিন্তিত দেখিলেন ;) ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার নিকট ঐ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার অবস্থা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি তাহার ঘরের দরওয়াজার উপর নক্সাদার পর্দা লটকান দেখিয়াছি। (অর্থাৎ অনাবশ্যক জাঁকজমক আমি পছন্দ করি না, তাই ফিরিয়া আসিয়াছি)।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, দুনিয়ার জাঁকজমকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আলী (রাঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, এই পর্দাটি সম্পর্কে হযরত (দঃ) আমাকে যেই আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। হযরত (দঃ) বলিলেন, পর্দাটি অমুক অমুক পরিবারের লোকদেরকে দান করিয়া দাও।

১২৩৬। হাদীছ:—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে ডোরাওয়ালা রেশমী এক জোড়া কাপড় দিলেন। আমি উহা পরিধান করিলাম, কিন্তু (রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য জায়েয না হওয়ায়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলের উপর অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাই আমি ঐ কাপড় জোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী পরিধেয় বানাইয়া দিলাম।

অমোসলেমের হাদিয়া গ্রহণ করা

"আয়লা" নামক দেশের (অমোসলেম) শাসনকর্তা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং একটি চাদর উপঢৌকন দিয়াছিলেন; নবী (দঃ) উক্ত এলাকাকে ঐ শাসনকর্তার অধীনস্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১২৩৭। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দওমাতুল-জন্দল নামক এলাকার শাসনকর্তা ওকায়দের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি মসৃণ রেশমী জুব্বা উপহার দিয়াছিলেন। রেশমী জুব্বা ব্যবহার করাকে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। (তাই স্বয়ং তিনি উহা ব্যবহার করেন নাই)। সেই কাপড়টির চাকচিক্য সকলকেই মুগ্ধ করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেই আল্লার হস্তে (আমি) মোহাম্মদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি—সায়াদ ইবনে মোয়াজ বেহেশতের মধ্যে যে সাধারণ গামছা লাভ করিয়াছে সেই গামছা এই জুব্বার কাপড় হইতে অধিক সুন্দর এবং অধিক মূল্যবান।

কোন অমোসলেমকে উপঢৌকন দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ

دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْآ اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٥

অর্থ—যে সব অমোসলেম দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নহে (তথা তাহারা তোমাদের প্রজা বা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ) তাহাদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ ও কৃপা প্রদর্শন করিবা এবং তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার (তথা তাহাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদের ন্যায্য হক প্রদান) করিবা তাহাতে আল্লাহ

তায়ালা তোমাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না। ন্যায় ও ন্যায্য হক প্রদানকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাফের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এবং তোমাদিগকে ভিটা-বস্তি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে বা উচ্ছেদ কার্য্যে সাহায্য-সহায়তা করিয়াছে তাহাদের প্রতি বন্ধু-ভাব প্রদর্শনে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এইরূপ স্থলে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে তাহারা নিশ্চয় অন্যায়কারী জালেম। (২৮ পাঃ ৮ রুকু)

১২৩৮। হাদীছ ঃ—আবূ বকর-তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মাতা মোশরেক থাকা অবস্থায় একবার আমার নিকট (মদীনায়) আসিলেন। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমার মাতা আমার নিকট আসিয়াছেন ; মনে হয় তিনি আমার নিকট হইতে সহানুভূতি পাইবার আশা রাখেন। আমি কি তাঁহার প্রতি সাহায্য-সহায়তা করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তুমি তোমার মাতার প্রতি সহানুভূতি দেখাও।

হেবা ও দানকৃত বস্তু ফেরৎ লওয়া

১২৩৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষেই কুৎসিত কার্য্যক্রম অবলম্বন করা নিতান্ত অশোভণীয়। যে ব্যক্তি হেবা ও দানকৃত বস্তুকে ফেরৎ লয় তাহার (এই কার্য্যক্রমের) অবস্থা ঐ কুকুরের ন্যায় যেই কুকুর স্বীয় উদগার ভক্ষণ করে। (এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হওয়া মোসলমানের জন্য শোভণীয় নহে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নিয়মতান্ত্রিকরূপে হেবা সম্পন্ন হওয়ার পর হেবাকৃত বস্তু ফেরত লওয়া বিভিন্ন ইমামগণের মতে জায়েয নহে। হানাফী মজহাব মতে যদি হেবা মাতা-পিতার সিঁড়ি, ছেলে-মেয়ের সিঁড়ি, ভাই-বোনের সিঁড়ির কেহ বা খালা, ফুফু, চাচা কিম্বা স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি হয় সে ক্ষেত্রে হেবাকৃত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে বা ইসলামী শরীয়তের কাজী তথা জজের অনুমতি ক্রমে হেবার বস্তু ফেরত লইতে পারে, কিন্তু তাহা মকরূহ হইবে। অবশ্য ফেকা শাস্ত্রে অনেক কারণ বর্ণিত আছে, যাহাতে হেবা ফেরত লওয়ার অবকাশ সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। ছদকারূপে প্রদত্ত বস্তু কোন ক্ষেত্রেই কাহারও মতে ফেরত লওয়া জায়েয নহে।

হেবা সম্পন্ন হইলে উত্তরাধিকারদের জন্যও অধিকার অটুট থাকিবে

১২৪০। হাদীছ ঃ— ছোহায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সন্তানগণ (মদীনাস্থ) দুইটি ঘর ও উহার চাতাল সম্পর্কে দাবী করিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা ছোহায়েব (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তৎকালীন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত দানের সংবাদ বহনকারী কে আছে? তাহারা বলিল, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তাঁহাকে ডাকা হইল; তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি ঘর ও উহার চাতাল ছোহায়েব (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তাঁহার সংবাদের ভিত্তিতে শাসনকর্তা মারওয়ান দাবীদারদের দাবীর স্বীকৃতি ও উহা প্রদানের আদেশ দিয়াছিলেন।

কাহাকেও কোন জিনিষ তাহার জীবন সময়ের জন্য দিয়া দেওয়া

১২৪১। হাদীছঃ— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরারূপের হেবা সম্পর্কে ফয়ছালা দিয়াছেন যে উহা গ্রহীতার জন্য স্থায়ীভাবে হইয়া যাইবে।

১২৪২। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওমরারূপে কৃত হেবা চিরস্থায়ী হেবা পরিগণিত।

ব্যাখ্যাঃ— "ওমরা" আরবী শব্দ; উহার ব্যাখ্যা হইল কোন বস্তু কাহাকেও হেবা করা এবং সেই হেবাকে তাহার জীবনকালের জন্য সীমিত করিয়া দেওয়া। এই ক্ষেত্রে হেবা চিরস্থায়ীরূপে হইয়া যাইবে এবং সীমিত করার কথা বাতিল হইবে, এমনকি সীমিত করার শর্ত যতই স্পষ্টরূপে বলা হউক না কেন উহা বাতিল হইবে এবং হেবা চিরস্থায়ী হইয়া গ্রহীতার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধীকারীগণ ঐরূপ হেবাকৃত বস্তুর মালিক হইবে। যেমন, খালেদ সায়ীদকে বলিল, এই বাড়ীটা আমি তোমাকে দিয়া দিলাম—তোমার বা আমার জীবনকালের জন্য কিম্বা তুমি বা আমি জীবিত থাকা পর্য্যন্তের জন্য। তোমার মৃত্যুর পর উহা আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে বা আমার মৃত্যুর পর আমার উত্তরাধী-কারীদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। এইরূপ বলার ক্ষেত্রেও হেবা চিরস্থায়ী হইবে সায়ীদের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণই উহার মালিক হইবে। (আলমগীরী, ৪—৩৭৯)। অবশ্য হেবা না করিয়া সাময়িক ব্যবহারে জীবনকালের জন্য দিলেও উহা মূল মালিকেরই থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"রোকবা"; উহার ব্যাখ্যা এই যে, মুল হেবার উপস্থিত সম্পাদন হয় না, বরং হেবাকে শর্ত সাপেক্ষ রাখা হয় দাতার মৃত্যু গ্রহীতার পূর্বে হওয়ার উপর। যেমন—খালেদ সায়ীদকে বলিল, আমার মৃত্যু তোমার পূর্বে হইলে আমার এই বাড়ীটি তোমার হইবে; আর তোমার মৃত্যু আমার পূর্বে হইলে বাড়ীটি আমারই থাকিবে। এই বলিয়া যদি ঐ বাড়ীটা সায়ীদের হস্তে অর্পণও করিয়া দেওয়া হয় তবুও উহা হেবা গণ্য হইবে না। এমনকি খালেদের মৃত্যু সায়ীদের পূর্বে হইলেও সায়ীদ এই বাড়ীর মালিক হইবে না। ঐ বাড়ীর মালিক খালেদ এবং তাহার পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণ হইবে। অবশ্য সায়ীদের হস্তে বাড়ী অর্পণ করা হইয়া থাকিলে সায়ীদ উহাকে "আরিয়ত" তথা সাময়িক ও অস্থায়ীরূপে শুধু ব্যবহার করিতে পারিবে, খালেদ যখন ইচ্ছা করিবে ফেরত নিতে পারিবে।

অবশ্য যদি উপস্থিত হেবা সম্পাদনের কথা বলিয়া মৃত্যু কথাটাকে শর্তরূপে উল্লেখ করা হয়; যেমন সায়ীদকে বলা হইল—এই বাড়ীটা তোমাকে দিয়া দিলাম; তবে যদি তোমার মৃত্যু আমার পূর্বে হয় তাহা হইলে বাড়ীটা আমার থাকিবে, আর আমার মৃত্যু তোমার পূর্বে হইলে উহা তোমারই থাকিয়া যাইবে; এই ক্ষেত্রে হেবা চিরস্থায়ী হইয়া শর্তটি বাতিল গণ্য হইবে (কাজীখান)।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হেবা সম্পন্ন হওয়ার জন্য হেবাকৃত বস্তুকে গ্রহীতা কর্তৃক স্বীয় দখলে নেওয়া শর্ত। যদি কোন বস্তু পূর্ব হইতেই তাহার দখলে ও ব্যবহারে থাকে এবং ঐ অবস্থায় ঐ বস্তু তাহাকে হেবা করা হয় তবে সেই হেবা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। এক এক শ্রেণীর বস্তুর দখল সেই বস্তু অনুপাতেই হইবে; স্থাবর সম্পত্তির দখল একরূপ এবং অস্থাবর বস্তুর দখল ভিন্নরূপ; অস্থাবরের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। দখলে নেওয়ার পূর্বে উহার উপর গ্রহীতার কোন সত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না; দাতা ইচ্ছা করিলে উহা না দিতেও পারে। অবশ্য গ্রহীতা কর্তৃক কার্যতঃ দখলে নেওয়াই যথেষ্ট—গ্রহণের স্বীকৃতি মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই। (৩৫৪ পৃঃ)

● পাওনাদার খাতককে স্বীয় পাওনা হেবা করিতে পারে (৩৫৪ পৃঃ) এবং এই হেবা হইতে দাতার পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া তথা হেবা ভঙ্গ করার কোন অবকাশ থাকে না (আলমগীরী ৪—৩:৬)। এই হেবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গ্রহীতা তথা খাতক কর্তৃক হেবা গ্রহণের স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন নাই, অবশ্য সে উহা ঐ বৈঠকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলে হেবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (আলমগীরী ৪—৩৮৯)

● এজমালিরূপে কোন বস্তু একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা যায় (ঐ)। বন্টনযোগ্য কোন বস্তুর অংশ বিশেষ ভাগ না করিয়া উহা কাহাকেও হেবা করা হইলে হানফী মজহাব মতে সেই হেবা শুদ্ধ হয় না, কিন্তু একক মালিকের পূর্ণ বস্তু এজমালীরূপে একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা হইলে তাহা জায়েয হইবে (আলমগীরী ৪—৩৮২)। একাধিক ব্যক্তির এজমালী কোন বস্তু উহা বন্টন ব্যতিরেকে একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না (ঐ)। অবশ্য এজমালি বস্তুর সমস্ত মালিক যদি একত্রে পূর্ণ বস্তুটি এক ব্যক্তিকে হেবা করে তবে তাহা শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী ৪—৩৮৩)।

● কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কিছু হেবা করা হইলে সে-ই উহার সত্বাধিকারী হইবে। হেবা করা কালে তথায় অন্য লোক উপস্থিত থাকিলেও তাহারা উহার অংশীদার হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহার অংশীদার হইবে। (সৌজন্য রক্ষা পর্য্যায়ে এই কথা শত সিদ্ধ হইলেও বিধানরূপে উহা বাধ্যতামূলক হওয়া শুদ্ধ নহে ৩৫৫ পৃঃ)।

"আরিয়ত" তথা কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু সাময়িক কার্য্যোদ্ধারের জন্য আনা

১২৪৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সর্ব গুণের অধিকারী ছিলেন—তিনি) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা ছিলেন এবং তিনি সর্বাধিক বাহাদুর ও সাহসী ছিলেন। একদা রাত্রিবেলা মদীনা শহরে ভীষণ একটি শব্দ ও কোলাহল শুনা গেল; সকলেই উহাকে শত্রুর আক্রমণের ধ্বনি মনে করিয়া শঙ্কিত হইল। (অন্য কেহ একাকী ঘটনার তদন্তে যাইতে সাহস করিল না, কিন্তু) নবী (দঃ) তলওয়ার কাঁধে ঝুলাইয়া আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়ার উলঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক একা একা মদীনা শহরের চতুঃপার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। এদিকে ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কার্য্যক্রমের অজ্ঞাতে একত্রিত দল বাঁধিয়া সেই ধ্বনির তদন্ত করার জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও, আশঙ্কার কোন কারণ নাই; (আমি সব তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি)।

এই ঘটনায় একটি অলৌকিক ঘটনা ইহাও ঘটিল যে—আবু তালহার ঐ ঘোড়াটির গতি অতি মন্থর ও ধিমা ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংস্পর্শনে উহা দ্রুতগামী হইয়া গেল, এমনকি তিনি বলিলেন, ঘোড়াটিকে নদীর খর স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পাইয়াছি! আবু তালহার ঘোড়াটি নবী (দঃ) আরিয়তরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর বা কনের সজ্জায় অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু লওয়া

১২৪৪। হাদীছ :—আয়মন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে পাঁচ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) মুল্যের একটি মোটা সুতি চাদর যাহা তাঁহার ব্যবহারে ছিল উহা সম্পর্কে বলিলেন, আমার ঐ ক্রীতদাসীর প্রতি লক্ষ্য কর—সে ভিতর বাড়ী থাকা অবস্থায় এই চাদরটি পরিধান করিতে অসন্তুষ্ট। অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমার এইরূপ কাপড়ের একটি জামা ছিল; মদীনার প্রত্যেক নব বধুর জন্য লোক পাঠাইয়া উহা আমার নিকট হইতে আরিয়তরূপে গ্রহণ করা হইত।

দুগ্ধবতী পশু সাহায্যার্থে সাময়িকভাবে দেওয়া

১২৪৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ভাল একটি দুধালো উট দ্বারা সাহায্য করা কতই না উত্তম এবং ভাল। একটি দুধালো বকরীও তদ্রূপ; প্রতিদিন সকালে এবং বৈকালে এক হাড়ি দুগ্ধ দিয়া থাকে। (অবশেষে সর্বমোট বহু দুগ্ধ হয়, যাহা এক সঙ্গে দান করা সহজ হয় না।)

১২৪৬। হাদীছ :— يقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ ○

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিযাছেন, চল্লিশ প্রকারের সৎকার্য্য আছে, যেইগুলির মধ্যে দুধালো বকরী সাময়িক দান করা একটি প্রধান। ঐ কার্য্যগুলির কোন একটিকে যে ব্যক্তি উহার ছওয়াবের আশায় আকৃষ্ট হইয়া এবং ঐ কার্য্যের বিঘোষিত প্রতিদানে আস্থাবান হইয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, (তাহার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে) ঐ কার্য্যের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন।

ব্যাখ্যা :—মূল হাদীছে ঐ চল্লিশ প্রকারের সৎ কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ দান করা হয় নাই। বিভিন্ন হাদীছে বহু সৎকার্য্যের বিবরণ দান করা হইয়াছে যাহার সংখ্যা চল্লিশ হইতেও অধিক। সম্ভবতঃ সেই সবের প্রতি তৎপরতার উদ্দেশ্যেই উক্ত চল্লিশটিকে নির্দিষ্ট-রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাচ্ছান ইবনে আতিয়া (রঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি উল্লেখ করিয়াছেন—(১) হাঁচিদানে "আলহামদুলিল্লাহ" বলার উত্তরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা। (২) পথ-ঘাট হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। কোন কোন মোহাদ্দেছ আরও কুড়িটির বিবরণ দান করিয়াছেন—(৩) পুঁজিহীন কর্মদক্ষ ব্যক্তিকে পুঁজিদানে সাহায্য করা। (৪) কার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহার কার্য্যে সাহায্য করা। (৫) কাহারও পাদুকার দোয়াল ছিন্ন হইয়া সে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সেই অসুবিধা দুরীভূত করা। (৬) মোসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ না করা। (৭) মোসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। (৮) মোসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা। (৯) একত্র বসা অবস্থায় অন্যের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা। (১০) সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করা। (১১) মিষ্টভাষী হওয়া। (১২) বৃক্ষ রোপণ দ্বারা লোকের উপকার করা। (১৩) শস্য রোপণ দ্বারা উপকার করা। (১৪) অন্যের কার্যোদ্ধারে সুপারিশ করা। (১৫) রুগ্নকে সেবাশুশ্রূষা ও দেখা-শুনা করা। (১৬) দোয়া সহ মোছাফাহা করা। (১৭) আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লার দোস্তের সঙ্গে মহব্বত করা। (১৮) আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লার দুশমনের প্রতি দুশমনি রাখা। (১৯) আল্লার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পর একতাবদ্ধ হওয়া। (২০) পরস্পর সাক্ষাৎ-মোলাকাত করা। (২১) সকল লোকের হিত ও মঙ্গল কামনা করা। (২২) মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

১২৪৭। **হাদীছ**ঃ—আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক গ্রাম্য ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট হিজরতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, হিজরত অতি কঠিন কাজ; (তোমার জন্য উহার আবশ্যক নাই, যেহেতু তোমার দেশে ইসলামের কাজে বাধা নাই।) অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি উটের পাল আছে? সেই ব্যক্তি বলিল—হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহার যাকাৎ ইত্যাদি আদায় করিয়া থাক ত? সে বলিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাময়িক সাহায্য স্বরূপ কাহাকেও উহার কোনটা দিয়া থাক কি? সে বলিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি পানের স্থানে উহা দোহন (করতঃ তথাকার উপস্থিত গরীব মিছকীনকে সাহায্য) করিয়া থাক কি? সে বলিল—হাঁ। অতঃপর হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, (মদীনা হইতে) বহু দূরে সমুদ্রসমূহের অপর পারে অবস্থান করিয়া হইলেও তুমি নেক কাজ করিয়া যাও; আল্লাহ তায়ালা ছওয়াব দানে কম করিবেন না।

১২৪৮। **হাদীছ**ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পথিমধ্যে একটি জমি দেখিতে পাইলেন যাহার শস্য অতি চমৎকার ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই জমিটি কোন ব্যক্তির? সকলেই উত্তর করিল, ইহার মালিক অমুক, কিন্তু সে উহা কেরায়া রূপে দিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, সাহায্য স্বরূপ প্রদান করা বিনিময় গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম ছিল।

সাক্ষ্যদান বিষয় সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ....

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় ও ইনসাফের উপর দৃঢ় থাক এবং আল্লার জন্য তথা স্বার্থবশে নয়, বরং পরের উপকার করিয়া আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দান কর; যদিও সে সাক্ষ্য নিজের স্বার্থ বিরোধী বা মাতা পিতা ও খেশ-কুটুম্বের স্বার্থ বিরোধী হয়। (কাঁহাকেও ধনাঢ্য দেখিয়া তাহার মান সম্মান দৃষ্টে বা কাহাকেও দরিদ্র দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সত্য সাক্ষী এড়াইবার চেষ্টা করিও না, বরং) ধনাঢ্য হউক বা দরিদ্র হউক (তাহারা আল্লার বন্দা হিসাবে) তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক (তোমার তুলনায়) অধিক দৃঢ়; (এতদসত্ত্বেও যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সত্য সাক্ষ্য দান কর, এমতাবস্থায় তোমার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া) তুমি প্রবৃত্তির বশীভূত সাব্যস্ত হইও না, নতুবা তুমি বিপথগামী পরিগণিত হইবে। যদি তুমি অর্থাটী সাক্ষ্য দাও বা সত্য সাক্ষ্য দানে

বিরত থাকার চেষ্টা কর, তবে স্মরণ রাখিও—(আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমার অপচেষ্টা গোপন থাকিবে না) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সকলের কার্যকলাপের খোঁজ রাখেন। (৫ পারা ১৭ রুকু)

সাক্ষীদের সৎ হওয়া আবশ্যক

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— واشهدوا ذوى عدل منكم "তোমাদের (তথা মোসলমানদের) মধ্য হইতে এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও যাহারা সৎ হয়।"

১২৪৯। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওত্‌বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিতকালে যখন অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল তখন কোন কোন সময় কোন কোন মানুষের (সৎ-অসৎ হওয়ার) গুপ্ত অবস্থা অহীর দ্বারা প্রকাশ হইয়া যাইত। বর্তমানে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগ করার পর অহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এখন কাহাকেও সৎ-অসৎ গণ্য করার জন্য একমাত্র পথ হইল তাহার বাহ্যিক দৃশ্য অবস্থা। যে ব্যক্তি সৎ বলিয়া প্রমাণিত হইবে সে বিশ্বস্ত গণ্য হইবে এবং তাহাকে গ্রহণ করিব। তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য আমরা দায়ী হইব না, বরং সেই অবস্থার জন্য সে-ই আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী হইবে। আর যে ব্যক্তি অসৎ প্রমাণিত হইবে সে বিশ্বস্ত গণ্য হইবে না এবং সে গ্রহণীয় হইবে না, যদিও সে দাবী করে যে, তাহার আন্তরিক অবস্থা ভাল।

সত্য সাক্ষ্য গোপন করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—والذين لا يشهدون الزور কিরূপ লোক বেহেশতের উপযোগী গণ্য হইবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সুদীর্ঘ আলোচনায় কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি গুণ এই উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যেই বন্দাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

অর্থ—তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না; যে ব্যক্তি উহা গোপন করিবে তাহার অন্তঃকরণ (তথা বাস্তবরূপে সে) পাপী সাব্যস্ত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কার্য্যকলাপ জ্ঞাত থাকেন। (৩ পাঃ ৭ রুঃ)

১২৫০। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوقُ

الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ه

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, (কার্য্যকলাপ বা কথাবার্তায়) কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তুল্য মর্য্যাদা কাহারো জন্য প্রকাশ করা, মাতা-পিতার অবাধ্য চলা, কাহাকেও খুন করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

১২৫১। হাদীছঃ— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوْا

بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ

مُتَّكِئًا فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ٥

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বড় বড় কবিরা গুনাহগুলি জ্ঞাত করিব কি? এইরূপে (আমাদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করার জন্য) তিনবার প্রশ্ন করিলেন। উপস্থিত সকলেই আরজ করিল, নিশ্চয় ইয়া রসুলাল্লাহ। নবী (দঃ) বলিলেন, (কার্যকলাপ বা কথাবার্তায় কোন বিষয়ে) (১) আল্লাহ তায়ালা তুল্য মর্য্যাদা কাহারও জন্য প্রকাশ করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য চলা। এই পর্যান্ত তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর তিনি (বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে) উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, স্মরণ রাখিও—(৩) মিথ্যা কথা বলা। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন—) এই তৃতীয় বিষয়টি নবী (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন, এমনকি আমরা তাঁহার ক্ষান্ত হওয়ার আগ্রহ করিতে লাগিলাম; (যেন তিনি ক্লান্ত হইয়া না পড়েন।)

অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য

মছআলাহঃ—কাহারও উপর কোন দাবী ও স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণ ব্যাপারে—যেমন আজান দেওয়া যাহা নামাযের বা এফতারের ওয়াক্ত উপস্থিতির সাক্ষ্য বটে—এইরূপ ক্ষেত্রে অন্ধের সাক্ষ্য সর্বসম্মতরূপে গ্রহণীয়।

নামাযের ওয়াক্ত বা এফতারের ওয়াক্ত যদিও সূর্য্যের উপর নির্ভরশীল যাহা দেখা পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তি অন্যের সাহায্যে তাহা অবগত হইতে পারে। (দৃষ্টিহীন অবস্থায়) ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজস্ব ব্যক্তিকে সূর্য্যাস্ত দেখায় নিয়োজিত করিতেন এবং তাহার সংবাদে এফতার করিতেন; ছোবহে-ছাদেক প্রত্যক্ষ করার জন্যও ঐরূপ লোক নিয়োগ করিতেন এবং তাহার সংবাদে তাহাজ্জুদ ক্ষান্ত করিয়া ফজরের ছুন্নত পড়িতেন।

এই সকল ক্ষেত্রে যেহেতু কাহারও উপর কোন দাবী, স্বত্ব বা অধিকার চাপাইয়া দেওয়ার ব্যাপার নহে, তাই অন্যের সংবাদে সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ উপেক্ষা করা হয় নাই।

কাহারও উপর দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও কোন কোন ইমাম ঐ অবকাশের ভিত্তিতেই অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা অন্যের সংবাদে আহরিত জ্ঞানে যে দুর্বলতা রহিয়াছে উহা লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ ইমামগণ দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অন্ধের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অবশ্য সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু যদি এরূপ হয় যাহা শুধু শ্রবণ পর্য্যায়ের এবং সাক্ষ্য প্রদান কালে ঐ বস্তুকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন না আসে সেই শ্রেণীর দাবীর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট শাগের্দ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) সহ অনেকেই অন্ধের সাক্ষ্যকে গ্রহণীয় বলিয়াছেন। কারণ, অন্ধের শ্রবণশক্তি ত্রুটিহীনই বটে এবং শ্রবণ পর্য্যায়ের বস্তুর জ্ঞান ও নির্দ্ধারণ শুধু শ্রবণে সম্ভব। এই তথ্যের সমর্থনেই বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৫২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেছিলেন : ঐ সময় আব্বাদ (রাঃ) ছাহাবী মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার কেরাত পড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! ইহা কি আব্বাদের আওয়াজ? আমি বলিলাম, হাঁ। নবী (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন হে আল্লাহ! আব্বাদের প্রতি তোমার বিশেষ করুণা দান কর।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কণ্ঠস্থ কোন একটি কোরআনের আয়াত তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্হিত হইয়াছিল ; আব্বাদ (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে ঐ আয়াতটি তেলাওয়াত করিলে নবী (দঃ) সেই তেলাওয়াতের শব্দ শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজে হযরতের অন্তর্হিত সেই আয়াতটি তাঁহার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তাই হযরত (দঃ) আব্বাদ (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নামে দোয়া করিলেন।

এস্থলে ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই যে, একজন লোককে না দেখিয়া শুধু তাহার শব্দ ও আওয়াজ শ্রবণে নবী (দঃ) ও আয়েশা (রাঃ) লোকটিকে নির্দিষ্ট করিতে পারিলেন। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি না দেখিলেও শব্দ শ্রবণে লোক চিনিতে ও ঘটনা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, অতএব অন্ধ ব্যক্তি এই সূত্রে সাক্ষ্য দিতে পারে। অধিকাংশ ইমামগণ উত্তরে বলেন যে, এই উপলব্ধি যেহেতু সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত নয়, তাই উহার ভিত্তিতে কাহারও উপর কোন দাবী স্বত্ব বা অধিকার চাপানো যাইতে পারে না।

কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা

১২৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি ত স্বীয় বন্ধুর (—যাহার প্রশংসা করিয়াছ তাহার) গলা কাটিয়াছ, তুমি ত

স্বীয় বন্ধুর গলা কাটিয়াছ—বারবার এইরূপ বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, মোসলমান ভাইয়ের প্রশংসা করার প্রয়োজন হইলে এরূপ বলিবে—"আমি তাহাকে এইরূপ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমি আল্লার পক্ষে তথা বাস্তব অবস্থারূপে কাহারও গুণগান করি না, বরং অমুক ব্যক্তির উপর আমার এই এই ধারণা।"

এইরূপে প্রশংসা করার অনুমতিও শুধু ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতি বাস্তবিকই ঐ ধারণা থাকে। (নতুবা মিছামিছি এইরূপ বলাও নিষিদ্ধ।)

১২৫৪। হাদীছ :— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِى عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِى مَدْحِهِ

فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ -

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে অত্যাধিক ও অতিরঞ্জিতরূপে প্রশংসা করিতে শুনিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তির মেরুদণ্ড কর্তন করিয়াছ—তাহার ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছ।

ব্যাখ্যা :—এইরূপ প্রশংসার দরুণ মানুষের মধ্যে আত্মগৌরব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা ধ্বংসের মূল।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● লুকাইয়া কাহারও স্বীকৃতি শ্রবণ করিয়া থাকিলে সেই স্বীকৃতির সাক্ষ্য দেওয়া যায় (৩৫৯ পৃঃ)। যেমন, সলীমের উপর কলীমের কোন প্রাপ্য আছে যাহার কোন সাক্ষী নাই। সলীম কলীমের নিকট তাহার প্রাপ্য স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু কোন লোক সম্মুখে সলীম স্বীকার করে না; তাই কলীম সলীমের স্বীকৃতির সাক্ষী লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত। কলীম গোপন ব্যবস্থায় কোন ঘরের বিশেষ কক্ষে দুইজন লোক লুকাইয়া রাখিয়া সলীমকে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল এবং তাহার প্রাপ্যের আলোচনা করিল। সলীম ধারণা করিল, ঐস্থানে কোন লোক নাই, তাই সে স্বীকার করিল এবং তাহার স্বীকৃতি লুকায়িত লোকদ্বয় শ্রবণ করিল। যদিও এইরূপ ঘটনায় প্রবঞ্চনার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সাধারণতঃ প্রবঞ্চনাময় কার্য্য সাক্ষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু সলীমেরই দোষে কলীম তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত থাকিতেছে, তাই ঐরূপ গোপন ব্যবস্থা কাহারও পক্ষে দোষণীয় গণ্য হইবে না—সাক্ষীদের উপর এই দোষের জেরা চলিবে না। অবশ্য সাক্ষীগণ কর্তৃক সলীমের স্বীকৃতি শ্রবণের সঙ্গে ছিদ্র-পথে হইলেও সলীম তাহাদের দৃষ্টিগোচরে হওয়া আবশ্যক, নতুবা সলীমের স্বীকৃতি বলিয়া তাহারা কিরূপে সাক্ষ্য দিবে? শুধু কণ্ঠস্বর দ্বারা ব্যক্তি নির্দিষ্ট করণ অকাট্য হয় না, অথচ সত্য ও খাঁটী সাক্ষ্যের জন্য অতিশয়

দৃঢ় জ্ঞান লাভ আবশ্যক। তাই হানফী মজহাব মতে কোন ব্যক্তির উপর স্বীকৃতির সাক্ষ্য দানে স্বীকারোক্তির সময় ঐ ব্যক্তি সাক্ষীদের দৃষ্টিগোচরে হওয়া কিম্বা কণ্ঠস্বর ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্বীকৃতি দানকারী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দৃঢ় জ্ঞান আবশ্যক, অন্যথায় সাক্ষীগণ নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দিতে পারিবে না (আলমগীরী, ৩—৫২৫)।

মছআলাহঃ—সাক্ষ্য দানের বিধান একমাত্র ইহাই যে, দেখার বস্তু সরাসরি প্রত্যক্ষ রূপে দেখিয়া এবং শুনার বস্তু সরাসরি নিজে মূল সাক্ষ্যবস্তুটা শ্রবণ করিয়া সাক্ষ্য দিবে; অন্য লোকের মুখে ঘটনা শুনিয়া সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় রহিয়াছে যে সবের ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়াও সর্বজন প্রসিদ্ধ খবর যাহা মিথ্যা হওয়াকে জ্ঞান বিবেক প্রত্যাখ্যান করে—ঐরূপ খবর শুনিয়া, এমনকি স্থান বিশেষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী যাহারা সর্বত্র নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী পরিগণিত তাহাদের সাক্ষ্যে খবর শুনিয়াও সাক্ষ্য দিতে পারে (আলমগীরী, ৩—৫৩০)।

ঐরূপ বিষয় কি কি তাহা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) ঐ শ্রেণীর তিনটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (২৬০ পৃঃ)।

(১) নছব বা বংশ পরিচয়—যেমন, অমুকের পিতা অমুক, অমুকের দাদা অমুক বা অমুকের ছেলে অমুক ইত্যাদি। (২) কাহারও দীর্ঘদিন পূর্বের মৃত্যু সংবাদ। এই দুইটি বিষয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়া এবং না দেখিয়া উল্লিখিত রূপের খবর শুনিয়া সাক্ষ্য দেওয়া যায়—ইহা সর্ববাদী সম্মত। ইমাম বোখারী (রঃ) তৃতীয় আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"রাজায়াৎ" অর্থাৎ শিশু বয়সে কোন মহিলার দুগ্ধ পান করা যদ্বারা মা-বোন, খালা-ফুফু ইত্যাদির ন্যায় অনেক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যায়। দীর্ঘ দিন পূর্বের সেই রাজায়াৎ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তাহা প্রত্যক্ষরূপে দেখা ছাড়া উল্লিখিত আকারে খবর শুনিয়াও সাক্ষ্য দেওয়া যায়—ইহা ইমাম বোখারীর মত। অন্য ইমামগণের মতে "রাজায়াৎ" সম্পর্কে প্রত্যক্ষরূপে দেখা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না। এমনকি হানফী মজহাব মতে সাধারণ বিষয়াবলীর ন্যায় রাজায়াৎও দুই জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার প্রত্যক্ষরূপে দেখা সাক্ষ্য ব্যতীত প্রমাণিত হইবে না।

● অসৎ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে—যেমন চোর, ব্যভিচারী। অবশ্য তাহারা যদি তওবা করিয়া সৎ হইয়া যায় এবং তাহাদের সততার উপর এই পরিমাণ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় যাহাতে সাধারণভাবে বিশেষতঃ বিচারকের বিবেকে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হওয়া সাব্যস্ত হয় তবে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে—ইহাতে কোন দ্বিধা নাই। বিশেষ একটি বিষয় আছে যাহার ক্ষেত্রে কাহাকেও শরীয়ত মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করিলে হানফী মজহাব মতে পরবর্তী জীবনে সে তওবা করিলেও তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না; চিরদিনের জন্য তাহার সাক্ষ্য পরিত্যক্ত ও বিবর্জিত হইয়া

থাকিবে। সেই বিষয়টি হইল—কোন মোসলমানের প্রতি জেনা বা ব্যভিচারের অপবাদ লাগাইয়া এই ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ বিধান মোতাবেক প্রমাণ দানে অসমর্থ হইলে শরীয়ত তাহাকে সে ক্ষেত্রে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করে। কোন ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর ঘটনায় মিথ্যুক সাব্যস্ত হইয়া ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি ভোগ পূর্বক সেই মিথ্যার কলঙ্ক তাহার উপর বিধানগত রূপে বলবৎ হইয়া যাওয়ার পর তাহার জীবনে আর তাহার সাক্ষ্য কখনও গৃহীত হইবে না। এমনকি শত তওবা করিলেও হানফী মজহাব মতে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। অন্যান্য ইমামগণের ভিন্ন মত রহিয়াছে; ইমাম বোখারীর মতেও তওবার পর তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। অবশ্য যদি ঐরূপ অপবাদ লাগাইয়াছে, হয়তো প্রমাণ দিতেও অসমর্থ, কিন্তু ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি তাহার উপর পড়ে নাই; হয়ত বাদী তাহার বিরুদ্ধে মামলাই দায়ের করে নাই সে ক্ষেত্রে তওবা করিলে হানফী মজহাব মতেও তাহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে।

● নাজায়েয বা অন্যায় কাজের উপর সাক্ষী হওয়া নিষিদ্ধ (৩৬১ পৃঃ)।

● **নারীদের সাক্ষ্যঃ**—এ সম্পর্কে সাধারণ বিধান এই যে, শুধু নারীদের সাক্ষ্যে কোন দাবী প্রমাণিত হইবে না এবং একজন পুরুষের সহিত একজন নারীর সাক্ষ্যেও দাবী প্রমাণিত হইবে না—যেরূপ শুধু একজন পুরুষের সাক্ষ্যে কোন দাবী প্রমাণিত হয় না; সেই পুরুষ যে কেহই হউক না কেন। সাধারণতঃ যে কোন দাবী প্রমাণিত হওয়ার জন্য বা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একজন পুরুষের সহিত দুইজন মহিলার সাক্ষ্য আবশ্যক। ইহা পবিত্র কোরআনের বিধান (৩ পাঃ ৭ রুঃ দ্রষ্টব্য)।

তবে মেয়েদের যে সব অবস্থা পুরুষের অবগত হওয়ার নহে, ঐরূপ বিষয়ে শুধু বিশ্বস্তা নারী একজনেরও সাক্ষ্য যথেষ্ট হয়। (আলমগীরী, ৩—৫২৩)

যে সব ব্যাপারে প্রাণদণ্ড হয়—যেমন, খুনের বদলা খুন এবং বিবাহিত লোকের জেনা বা ব্যাভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড; কিম্বা অঙ্গহানীর শাস্তি হয়; তদ্রূপ যে সব ব্যাপারে শরীয়তে বেত্রদণ্ড নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—যেমন, মদ্য পানের শাস্তি ৮০ বেত্রদণ্ড অবিবাহিত লোকের জেনার শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। এইসব ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নহে। উল্লেখিত তিন শ্রেণীর বিষয়ে বিধান সম্মত রূপের সাক্ষ্য শুধুমাত্র পুরুষের সাক্ষ্যই হইবে। ফতওয়া-শামী ৪—৫১৩

● সাক্ষীদের সৎ-সাধু হওয়া সম্পর্কে আস্থা লাভ করা বিচারকের বিশেষ কর্তব্য। যদি প্রাণদণ্ড বা নির্দ্ধারিত অঙ্গহানী কিম্বা নির্দ্ধারিত বেত্রদণ্ডের ব্যাপার হয় তবেত প্রকাশ্যে ও গোপনে সাক্ষীদের সম্পর্কে পূর্ণ যাচাই করিয়া উক্ত আস্থা অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। এমনকি বিচারকের বিবেকে সাধারণ দৃষ্টিতে সৎ-সাধু বিবেচিত হইলেও

সেই যাচাই করিতে হইবে। আর যদি ঐ শ্রেণীর দণ্ড ব্যতীত অন্য বিষয়ের বিচার হয় সে ক্ষেত্রেও অন্ততঃ গোপন যাচাই অবশ্যই করিতে হইবে। তবে যদি সাক্ষীদের দোষী হওয়া সম্পর্কে কোন অভিযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে যাচাই ব্যতিরেকে সাধারণ দৃষ্টিতে সাক্ষীদের সৎ-সাধু বিবেচিত হওয়ার উপর বিচারক নির্ভর করিতে পারেন (আলমগীরী, ৩—১৯৯)।

সাক্ষীদের অবস্থার সেই গোপন যাচাইয়ে একজন আস্থাশীল নির্ভরযোগ্য পুরুষের তথ্য দান যথেষ্ট হইবে (৩৬৬ পৃঃ)। এমনকি ঐরূপ একজন নারী (যদি তাহার বাহিরের অভিজ্ঞতা থাকে তবে) তাহার তথ্য দানও যথেষ্ট হইবে (৩৬৩ পৃঃ)। অবশ্য যদি ভাল-মন্দ উভয় রকম তথ্য প্রকাশ পায় সে ক্ষেত্রে ভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে (ফতওয়া কাজীখান দ্রষ্টব্য)।

ঐরূপ তথ্যদান ক্ষেত্রে তথ্যদানকারী অন্যের দোষগুণ বর্ণনায় সতর্কতামূলক উক্তি করতঃ যদি বলে যে, আমি তাহার সম্পর্কে এই জানি। অর্থাৎ সে বাস্তবে এইরূপ বা তাহার এই এই দোষ বা গুণ রহিয়াছে—এরূপ সাব্যস্তমূলক উক্তি না করিলেও তাহার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যাইবে। (৪৫৯ পৃঃ)

খলীফা ওমরের শাসনামলে আবু জমিলা নামক এক ব্যক্তি সদ্য প্রসূত লাওয়ারেস একটি শিশু কোথাও পতিত পাইল।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর লাওয়ারেসের প্রতিপালন সরকারের দায়িত্ব, তাই ঐ ব্যক্তি উহাকে সরকারের নিকট অর্পণ করিতে চাহিলে খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাতে কোন গোলমাল থাকিতে পারে। অর্থাৎ হয়ত শিশুটি প্রকৃত প্রস্তাবে লাওয়ারেস নয়, বরং এই ব্যক্তিরই শিশু; সে উহার ব্যয়ভার সরকারের উপর চাপাইবার জন্য এই ফন্দি করিয়াছে; তাই ইহা তদন্ত সাপেক্ষ। তদন্তকালে ঐ ব্যক্তির গোত্রীয় সর্দার তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিল যে, লোকটি সৎ সাধু। সেমতে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন, শিশুটির লালন-পালন তুমিই কর, ব্যয়ভার সরকার বহন করিবে (৩৬৬ পৃঃ)।

● নাবালেগের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে (৩৬৬)। ছেলে বা মেয়েদের স্বপ্নদোষ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে বীর্য্য বাহির হইলে বালেগ গণ্য হইবে। তদ্রূপ মেয়ের হায়েজ আসিলে বা হামল হইলেও বালেগ গণ্য হইবে। এই সব না হইয়া বয়সেও বালেগ হইতে পারে এবং সেই বয়স সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই পনর বৎসর বয়সের সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। নয় বৎসরের কম বয়সে কেহ বালেগ হইতে পারে না; তাই এর পূর্বে কোন মেয়ের শ্রাব দেখা গেলে তাহা রোগজনিত গণ্য হইবে। বয়স ইত্যাদি বালেগ হওয়ার আলামত সবই অপ্রকাশ্য বস্তু, অতএব যদি কোন ঘটনায় বালেগ-নাবালেগের পার্থক্য উপস্থিত কার্য্যক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা অপরিহার্য্য হইয়া পরে এবং ঐ সব আলামত সাব্যস্ত করার বিশ্বাসযোগ্য সূত্র না থাকে সে ক্ষেত্রে গুপ্ত লোমকে সাময়িকভাবে বালেগ পরিগণনার প্রতীক সাব্যস্ত করা যায়।

● কেহ কোন দাবী বা অভিযোগ পেশ করিলে তাহাকে সাক্ষী সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হইবে (৩৬৭)। ● শপথ বা কসম প্রদানে উহাকে কঠোর করার জন্য উহার অনুষ্ঠান কোন বিশেষ সময়ে—যেমন, আছরের পরে করা যায় (৩৬৭)। কিন্তু বিচারালয় বা ঘটনাস্থল ছাড়া অন্যত্র—যেমন, মসজিদে যাইয়া কসম করার জন্য বাধ্য করা চলিবে না (ঐ)। ● বাদী সাক্ষী উপস্থিত না করায় বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইয়াছে; অতঃপর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে। সে ক্ষেত্রে বাদীর সাক্ষী গ্রহণ করা হইবে (৩৬৮ পৃঃ)। এমনকি যদি বাদী স্পষ্ট বলিয়া থাকে, আমার সাক্ষী নাই এবং তাহারই কথায় বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইয়াছে অতঃপর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে সে ক্ষেত্রেও বাদীর সাক্ষী গ্রহণ করাই অগ্রগণ্য (আলমগীরী, ৩—৪৩৬)। ● কোন মোসলমানের বিরুদ্ধে কোন অমোসলেমের সাক্ষ্য গৃহিত নহে। অমোসলেমদের পরস্পর তাহাদের সাক্ষ্য গৃহিত হইবে। কোন কোন ইমামের মতে তাহাদের মধ্যেও এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের সাক্ষী গৃহিত নহে। (৩৬৯ পৃঃ)

কসম ও শপথ শুধু বিবাদীর পক্ষ হইতেই গ্রহণযোগ্য

অর্থাৎ—বাদী পক্ষের দাবী প্রমাণিত হওয়ার একমাত্র উপায় হইল সাক্ষী, বাদী পক্ষের কসম ও শপথ দ্বারা তাহার দাবী প্রমাণিত হইবে না। বাদী পক্ষ সাক্ষী উপস্থিত করায় অক্ষম হইলে বিবাদী পক্ষকে স্বীয় বক্তব্যের উপর শপথ করিতে বলা হইবে, তাহার শপথকেই গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার শপথ অনুসারেই রায় দান করা হইবে। অবশ্য সে কসম ও শপথ করিতে অসম্মত হইলে বাদী পক্ষের দাবী অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ১১৭০ নং হাদীছের ঘটনায় বাদীকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে, নতুবা বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একমাত্র বিবাদীর পক্ষেই শপথ গ্রহণ করার নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বাদী পক্ষের শপথ তাহার দাবী প্রমাণে গ্রহণীয় নহে।

কসম খাওয়ায় অগ্রাধিকারে প্রতিযোগিতা হইলে

১২৫৫। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ঘটনায় কতিপয় লোককে কসমের কথা বলিলে তাহাদের প্রত্যেকেই অপরের পূর্বে কসম সমাপ্ত করিয়া অবসর হইতে চাহিল। তখন নবী (দঃ) তাহাদের মধ্যে কে কাহার পূর্বে কসম খাইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য লটারী করার আদেশ দিলেন।

ব্যাখ্যাঃ— ইসলামী আইনে কাহারও দাবী প্রমাণিত হওয়ার সূত্র হইল সাক্ষী; দাবীদার সাক্ষী সংগ্রহে অপারক হইলে উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অপর পক্ষের

উপর শপথ বা কসম প্রবর্তিত হইবে; শপথ করায় অস্বীকার করিলে দাবীদারের দাবী সাক্ষী ব্যক্তিরেকেই সাব্যস্ত হইয়া যাইবে; অপর পক্ষ শপথ করিয়া নিলে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। সুতরাং ইসলামী আইন মতে দাবীদারের উপর সাক্ষী এবং দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অপর পক্ষের উপর শপথ বা কসম প্রবর্তিত হয়। কোন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই পরস্পর দাবীদার হয় এবং দুই এর অধিকও হয়। যথা একটি জমি যাহার একশত জন দখলদার রহিয়াছে; প্রত্যেকেই উহা ষোল আনার মালিক হওয়ার দাবী করে, কাহারও কোন সাক্ষী প্রমাণ নাই। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিবে, আমি ভিন্ন অন্য কাহারও স্বত্ব এই জমিতে নাই। সকলে এইরূপ শপথ করিলে উক্ত জমি তাহাদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শপথ না করিবে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যাইবে। এই একশত লোকের কসম খাওয়া সাব্যস্ত হইলে যদি তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং প্রত্যেকেই অপরের আগে কসম খাওয়া সমাপ্ত করিয়া অবসর হইতে চায়, তবে বিচারক নিজ অধিকার বলে তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ করিলে যাহাদেরকে পেছনে ফেলা হইবে তাহারা বিচারকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ধারণা করিবে—ইহাও বিচারকের পক্ষে কলঙ্ক, তাই সুন্নত তরিকা এই যে, ঐরূপ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও বিচারক নিজ অধিকার না খাটাইয়া পক্ষপাতিত্বের ধারণার অবকাশ বিহীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। যেমন, লটারী দ্বারা শৃঙ্খলা সাব্যস্ত করিবে।

লটারী দ্বারা কাহারও কোন দাবী সাব্যস্ত করা যায় না। তদ্রূপ স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করিতে লটারীর কোনই মূল্য নাই, কিন্তু পক্ষপাতিত্বের ধারণা দূর করতঃ সকলের মন রক্ষা করার ন্যায় মামুলী ব্যাপারে লটারীর ব্যবহার উত্তমই বটে। যেমন—এক ধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সম ব্যবহার করা স্বামীর উপর ফরজ, কিন্তু ছফরে যাওয়া কালে যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়ার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে, উহা নির্বাচনেও স্বামী সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতদসত্ত্বেও স্বামীর জন্য সুন্নত তরিকা হইল, লটারীর সাহায্যে একজন নির্বাচন করা।

১২৫৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করিলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিতেন। তাঁহার মধ্যে যাঁহার নাম লটারীতে আসিত তাঁহাকেই হযরত (দঃ) সঙ্গে নিতেন। (বাড়ী থাকাবস্থায়) হযরত (দঃ) প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য সমভাবে দিবা-রাত্রির বন্টন করিয়া থাকিতেন। অবশ্য সওদা (রাঃ) স্বীয় বন্টকের দিন ও রাত্রি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে আয়েশা (রাঃ)কে দিয়া দিয়াছিলেন। (৩৭০ পৃঃ)

● হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মাতা বিবি মরিয়ম যিনি স্বীয় মাতা কর্তৃক তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদের জন্য উৎসর্গীতা ছিলেন; তাঁহার প্রতিপালনের জন্য কতিপয় লোকের প্রতিযোগিতা হইলে তাঁহাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা

করা হইল। প্রত্যেকে তৌরাত কেতাব লিখিবার নিজ নিজ কলম পানিতে ফেলিবে; যাহার কলম স্রোতের বিপরীত চলিবে সে-ই জয়ী গণ্য হইবে। এই কথার উপর প্রতিযোগীগণ নিজ নিজ কলম পানিতে ফেলিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সকলের কলমই স্রোতের অনুকূলে চলিল; এক মাত্র পয়গাম্বর জাকারিয়া আলাইহেচ্ছালামের কলম স্রোতের বিপরীত চলিল। সেমতে তিনিই বিবি মরিয়মের লালন-পালনকারী সাব্যস্ত হইলেন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—৩ পাঃ ১৩ রুঃ দ্রষ্টব্য। (৩৬৯ পৃঃ)

ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করা

অঙ্গীকার রক্ষা করা কোন কোন ফেকাবিদের মতে ওয়াজেব (ফতহুলবারী ৫—৩২১)। এমনকি অঙ্গীকার রক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি "কাজা" তথা বিধানগত বিচারাধীন বা আদালতের এখতিয়ার ভুক্ত হওয়ার পক্ষেও মত্ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। সেমতে অঙ্গীকার রক্ষায় বাধ্য করার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ বিধেয় হইবে।

মালেকী মজহাব মতে অঙ্গীকার যদি অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি বাস্তবায়িত হইলে অঙ্গীকার পুরণ করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যেমন—বলা হইল, তুমি বিবাহ কর; আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। এই ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে এক হাজার টাকা প্রদান বাধ্যতামূলক ওয়াজেব হইবে (ফতহুলবারী ৫—৩২১)। অধিকাংশ ইমামগণ সাধারণতঃ অঙ্গীকার রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাকে আদালতের আওতাধীন গণ্য করেন নাই। কেহ অঙ্গীকার পুর্ণ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না।

অবশ্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে সকলেই গোনাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোরআন-হাদীছেও উহার প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। কোরআন শরীফে আছে—كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون "যাহা কার্য্যে পরিণত করিবে না তাহা বলা আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় জঘন্য ও ঘৃণ্য (২৮ পাঃ ৯ রুঃ)। প্রথম খণ্ডে ২৯নং হাদীছেও বলা হইয়াছে মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন; তন্মধ্যে একটি—অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। অবশ্য অঙ্গীকার করিয়া উহা রক্ষা করার সর্বসাধ্য চেষ্টা চালাইয়াও যদি অকৃতকার্য্য হয়, সে ক্ষেত্রে গোনাহ হইবে না। পক্ষান্তরে রক্ষা না করার ইচ্ছা পোষণ করতঃ অঙ্গীকার করা হারাম। আর রক্ষা করার ইচ্ছায় অঙ্গীকার করিয়া অবহেলায় উহা ভঙ্গ করাও গোনাহ বটে। এমনকি পরস্পর ছোট ও বড় দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি পুরণ করার অঙ্গীকার হইলে সেক্ষেত্রে ছোটটি পুর্ণ করার অধিকার আছে, কিন্তু বড়টি পুর্ণ করাই উত্তম—ইহাই নবী ও রসুলগণের সুন্নত।

হযরত মুছা (আঃ) বিবাহ করার সময় শ্বশুরের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীর মহরানা আদায়ে (তাহার সম্মতি সূত্রে তাহাদের সংসারের) ছাগলপালের রক্ষণাবেক্ষণে

আট বা দশ বৎসর কাজ করিবেন (পবিত্র কোরআন ২০ পাঃ ৬ রুঃ দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত ঘটনায় আট ও দশ সংখ্যাদ্বয়ের বড় তথা দশ সংখ্যার বৎসরই মূছা (আঃ) পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১২৫৭। **হাদীছ** ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হীরা নিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—মূছা (আঃ) তাঁহার অঙ্গীকারে উল্লিখিত সময়ের দুই সংখ্যার কোন্ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, আমি তাহা জানি না; তবে আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার নিকট এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিব। সেমতে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, উভয় সংখ্যার বড় সংখ্যাই পূর্ণ করিয়াছিলেন—যাহা অপর পক্ষের অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ তায়ালার রসুলগণ অঙ্গীকার বাধ্যতামূলক না হইলেও তাহা পূর্ণ করিতেন।

বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ
اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ........

অর্থ—পরস্পর ছলা-পরামর্শ ও কানা-ঘুষায় কোন সুফল নাই; হাঁ—যদি দান-খয়রাত বা সৎকাজ বা লোকদের বিবাদ মিটাইবার সম্পর্কে হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে বিবাদ মিটাইবার কার্য্যে সচেষ্ট হইবে আমি তাহাকে অচিরেই অতি বড় প্রতিফল দান করিব। (৫ পাঃ ১৪ রুঃ)

১২৫৮। **হাদীছ** ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ করা হইল যে, (মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী গোত্রদ্বয়ের খাজরাজ গোত্রীয় সর্দার—) আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈ (কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বুঝাইবার জন্য) তাহার নিকট পৌঁছিলে ভাল মনে হয়। সেমতে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি গাধায় চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। কতিপয় ছাহাবীও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। সেই এলাকাটি লোনা প্রকৃতির ছিল (তাই ধুলা-বালু সহজেই উড়িয়া থাকিত)। নবী (দঃ) গাধা দৌড়াইয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈ এর সম্মুখে পৌঁছিলে সেই বদ-বখত্ বলিল, আপনি আমার নিকট হইতে সরিয়া যান; আপনার গাধার দুর্গন্ধে আমার কষ্ট হয়। মদীনাবাসী ছাহাবীগণের একজন তদুত্তরে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গাধা তোর হইতে অধিক সুগন্ধ। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈ এর পক্ষে একজন

ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বাকবিতণ্ডা বাঁধিয়া গেল। উভয়ের সঙ্গে নিজ নিজ দলের লোকও যোগ দিল। (এমনকি যেহেতু উভয় দলের সংগঠন বংশ-ভিত্তিক ছিল, তাই উভয় পক্ষেই কোন কোন মোসলমানেরও যোগ-দান হইল)। উভয় দলের মধ্যে মারিমারিও হইল। এইরূপ ঘটনা প্রসঙ্গেই নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল—

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۝

"মোমেন মোসলমানদের দুই দলের মধ্যে বিবাদ বাঁধিলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও" (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)। এখানে ৪১০ নং হাদীছও উল্লেখ হইয়াছে।

বিবাদ মিটাইতে অতিরঞ্জিত কথা বলা

১২৫৯। হাদীছ:— উম্মে-কুলছুম বিনতে ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন—যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশ্যে এক জনের পক্ষ হইতে অপর জনের নিকট কোন সুনামের কথা বা অন্য কোন ভাল কথা অতিরঞ্জিতরূপে বলে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী পরিগণিত হইবে না।

বিবাদ মিটাইতে স্বয়ং আগ্রহ প্রকাশ করা

১২৬০। হাদীছ:—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "কোবা" নগরবাসীদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল, এমনকি-তাহাদের পরস্পর ঢিল ছুড়াছুড়ি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনা জানিতে পারিয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমাকে লইয়া চল; তাহাদের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিব।

উভয় পক্ষের সম্মত মীমাংসাও শরীয়ত বিরোধী হইলে বর্জনীয় হইবে

১২৬১। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে একটি বিষয় আল্লার বিধান মোতাবেক মীমাংসা করিয়া দেন। অপর ব্যক্তিও তাহাই বলিল যে, হাঁ—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান মতে মীমাংসা করিয়া দেন। অতঃপর প্রথম ব্যক্তি বলিল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির গৃহে ভৃত্য ছিল, সে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে জেনা—ব্যভিচার করিয়াছে। সকলেই বলিল, আমার ছেলেকে শাস্তি স্বরূপ প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে হইবে। তাই আমার ছেলের শাস্তির পরিবর্তে আমি এই ব্যক্তিকে একশত বকরী ও একটি ক্রীতদাসী প্রদান করিয়া আমার ছেলের মুক্তি লাভ করিয়াছি। অতঃপর আলেমগণের

নিকট জানিতে পারিলাম, (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বস্তুতঃ তাহার স্ত্রীর উপর হইবে, আর) আমার ছেলের উপর শাস্তি ছিল, একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর হওয়া।

ঘটনা শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান মতেই মীমাংসা করিতেছি। প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার প্রদত্ত একশত বকরী ও ক্রীতদাসীটি ফেরৎ লও এবং তোমার ছেলের শাস্তি এই যে, তাহাকে একশত বেত্রাঘাত লাগান হইবে এবং সে এক বৎসর কালের জন্য দেশান্তরিত হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে (যেহেতু প্রয়োজনীয় সাক্ষী ছিল না, তাই) উনাইস (রাঃ) নামক ছাহাবীকে আদেশ করিলেন, তুমি তাহার নিকট যাইয়া বিষয়টি তদন্ত কর। যদি সে স্বীকার করে তবে তাহার প্রতি প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করিও। সেই ছাহাবী তথায় পৌঁছিলেন এবং ঐ ব্যক্তির স্ত্রী স্বীকার করিল, তাই তাহাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা হইল।

ব্যাখ্যা :—অবিবাহিত ব্যক্তির জেনার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত তদুপরি প্রয়োজন বোধে এক বৎসরের জন্য দেশান্তর। বিবাহিত ব্যক্তির জেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা। আলোচ্য ঘটনায় নবী (দঃ) সেই বিধান অনুসারেই আদেশ করিলেন। ইহাই শরীয়তের বিধান। প্রথমে উভয় পক্ষ এই বিধান বিরোধী মীমাংসা করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

অমোসলেমের সহিত সন্ধি করা

১২৬২। **হাদীছ :**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ষষ্ঠ হিজরীর) জিলকদ মাসে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিল। অবশেষে নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে একটি সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিলেন। সন্ধি-চুক্তির লেখক ছিলেন আলী (রাঃ)। উহাতে এরূপ লেখা হইতেছিল—"অত্র সন্ধিপত্রের বিষয়-বস্তুর উপর চুক্তিবদ্ধ হইতেছেন মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।" মক্কার মোশরেকরা এই বাক্যে বাধা দিয়া বলিল, এই বাক্যের মর্মকে আমরা স্বীকার করি না; আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লার রসুল তবে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না, আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতাম না। অতএব "মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" লেখা যাইবে না। আপনি আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহও এবং আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদও। অতঃপর আলী (রাঃ)কে বলিলেন, "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিয়া ফেল। আলী (রাঃ) শপথ করিয়া বসিলেন, আমি আপনার এই মূল পরিচয়কে কস্মিন কালেও মুছিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হাতে মুছিয়া দিলেন এবং লেখা হইল—এই সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ হইতেছেন মোহাম্মদ যিনি আবদুল্লার পুত্র......(বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড "হোদায়বিয়ার সন্ধি" পরিচ্ছেদে আসিবে।)

বিতর্কের ক্ষেত্রে মুরব্বি মীমাংসার পরামর্শ দিবে

১২৬৩। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় গৃহ-দ্বারের সন্নিকটে বিবাদমান দুই ব্যক্তির উচ্চৈঃস্বর শুনিতে

পাইলেন; তাহাদের এক জন অপর জনকে তাহার প্রাপ্য কম নেওয়ার এবং কৃপা প্রদর্শনের কথা বলিতে ছিল; অপর জন বলিতেছিল, কসম খোদার—আমি ইহা করিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, একটি ভাল কাজ না করার উপর আল্লার নামে কসম ব্যবহারকারী কোথায়? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ইয়া রসুলাল্লাহ। (এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সাথে) সাথে ইহাও বলিল, সে আমার নিকট যে পরিমাণ কৃপা চায় তাহাতেই আমি সম্মতি দিলাম।

মছআলাহ—দেনাদার পাওনা দায়ের সঙ্গে দেনার পরিমাণ হইতে কম দিয়া মীমাংসা করিলে তাহা জায়েয হইবে। এমনকি দেনা ও পরিশোধ একই শ্রেণীর বস্তু হইলেও জায়েয হইবে এবং পরিশোধীয় বস্তু পরিমাপ করা ব্যতিরেকে হইলেও জায়েয হইবে—যদি উহা অবশ্যই দেনা অপেক্ষা কম হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। অন্যথায় পরিমাপ করা ব্যতিরেকে এক শ্রেণীর বস্তু দ্বারা পরিশোধের ক্ষেত্রে মীমাংসা জায়েয হইবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন প্রকার দুই শরীক বা অংশীদারের মধ্যে তাহাদের মতৈক্য ও মীমাংসার দ্বারা একজন শুধু নগদ অপরজন পাওনা ঋণ নিয়া পরস্পর ভিন্ন হওয়া জায়েয এবং ঋণ আদায় না হইলে অপরজন দায়ী হইবে না। (৩৭৪ পৃঃ)

ইনসাফের সহিত মীমাংসা করার ফজিলত

১২৬৪। হাদীছঃ—عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَالَ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ -
يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (৩৬০টি জোড়া আছে, উহার) প্রতিটি জোড়ার জন্য প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি ছদকা দান আবশ্যক হয়, (যেহেতু সারা রাত্র উহা বন্ধ থাকার পর ভোর বেলা পুনরায় সঠিকভাবে উহা চালিত হইতেছে, তাই এই নেয়ামতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এইরূপ ছদকা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আল্লাহ তায়ালার করুণা বলে সাধারণ সাধারণ নেক কার্য্যসমূহ ছদকারূপে গণ্য হইয়া থাকে, যেমন—) লোকদের মধ্যে পরস্পর ন্যায় সঙ্গতরূপে মীমাংসা করিয়া দেওয়া ছদকা গণ্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ—বক্ষমান হাদীছটি বোখারী শরীফে আরও দুই স্থানে বর্ণিত আছে। সেই দুই স্থানে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় কার্য্যের ছদকা গণ্য হওয়া উল্লেখ আছে—(১) কোন ব্যক্তিকে স্বীয় যানবাহনে আরোহণের সুযোগ দিয়া বা তাহার বোঝা স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া তাহার সাহায্য করা (২) কোন ভাল কথা বলা (৩) নামাযের প্রতি প্রতিটি পদক্ষেপ (৪) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ (৫) কাহাকেও পথ দেখাইয়া দেওয়া।

এতদ্ভিন্ন মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় কার্য্যের উল্লেখ আছে— (৬) প্রত্যেক বারের ছোবহানাল্লাহ্ (৭) প্রত্যেক বারের আলহামদুলিল্লাহ (৮) প্রত্যেক বারের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (৯) প্রত্যেক বারের আল্লাহু আকবার (১০) সৎ কাজের প্রতি আহ্বান করা (১১) অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করা। আবু দাউদ শরীফের হাদীছে আরও একটি কার্য্যের উল্লেখ আছে—(১২) মসজিদের কোন স্থানে শ্লেষ্মা ইত্যাদি দেখিতে পাইলে উহা মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া তথা মসজিদকে পরিচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া।

মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে আর একটি এমন কার্যের উল্লেখ আছে যে, ঐ একটি কার্য্যের দ্বারাই তিনশত ষাটটি ছদকা এক সঙ্গে আদায় হইয়া যায়—
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "সমুদয় কার্য্যের পরিবর্তে চাশ্‌তের দুই রাকাত নামায ৩৬০টি ছদকা আদায়ে যথেষ্ট হয়।"

কোন বিষয় শর্ত আরোপ করা সম্পর্কে

১২৬৫। হাদীছঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ হইতে মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনায় সোহায়ল ইবনে আমরের মধ্যস্ততায় সন্ধিপত্র লেখা হইয়াছিল। সোহায়েল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিল—(এখন হইতে) আমাদের যে কোন লোক আপনার সঙ্গে মিলিত হইবে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে, যদিও সে আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়। (আর আপনাদের কোন লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।) মোসলমানগণ এই শর্তকে ঘৃণা করিল, ইহার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিল; কিন্তু সোহায়ল উহা প্রত্যাহারে অস্বীকৃত হইল। নবী (দঃ) এই শর্তেই সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন করিলেন এবং ঐ দিনই আবু জন্দল (রাঃ)কে এই শর্ত অনুযায়ী তাঁহার পিতা সোহায়লের প্রতি ফেরত পাঠাইলেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত সন্ধি-চুক্তি বলবৎ থাকা পর্যন্ত যে কোন পুরুষ ব্যক্তি হযরতের নিকট আসিয়াছেন—মোসলমান হইয়া আসিলেও তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়াছেন। ঐ সময়ে কিছু সংখ্যক মহিলাও ঈমান গ্রহণ পূর্বক হযরতের নিকট আসিয়াছিলেন। ঐ সময়েই উম্মে-কুলসুম নাম্নী এক যুবতী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার লোকজন নবী (দঃ)-এর নিকট আসিল এবং তাঁহাকে ফেরত চাহিল। নবী (দঃ) তাঁহাকে ফেরত দিলেন না। ঐরূপ মহিলাদের সম্পর্কে একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ....

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

"হে মোমেনগণ! মহিলাগণ ঈমান গ্রহণ পূর্বক হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; আল্লাহ তাহাদের ঈমানের অবস্থা ভালভাবেই জানিবেন। (অতএব পরীক্ষা শুধু তোমাদের অবগতির জন্য—) তোমরা যদি পরীক্ষায় তাহাদেরে খাঁটী ঈমানদার সাব্যস্ত কর তবে তাহাদিগকে কাফেরদের প্রতি ফেরত দিবে না। এই মহিলাগণ এখন কাফেরদের স্ত্রী থাকে নাই, কাফেররাও এই মহিলাদের স্বামী থাকে নাই।......এই মহিলাদেরকে তোমরা (মোসলমানগণ) বিবাহ কর তাহাতে কোন বাধা নাই। তোমরা মোসলমানরাও কাফের নারীদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখিবে না।......এই সব আল্লার আদেশাবলী যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর প্রবর্তন করিয়াছেন।"

উল্লিখিত আয়াতের শেষ অংশের আদেশ দৃষ্টে ওমর (রাঃ) তাঁহার মক্কাস্থিতা দুইজন স্ত্রী কোরায়বা বিন্‌তে আবী উমাইয়্যা এবং বিন্‌তে-জারওয়ালকে পরিত্যাগ করিলেন।

(মহিলাদের পরীক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে উহার নিয়ম এবং বিষয়বস্তুও বর্ণিত হইয়াছে।) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ মহিলাদেরকে উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করিতেন। আয়াতটি এই—

يَآيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ

بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ...... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ০ (২৮ পাঃ ৮ রুঃ)

"হে নবী! ঈমান গ্রহণকারিণী মহিলারা আপনার নিকট যদি আসে এই দীক্ষা গ্রহণ করতঃ যে, তাহারা আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে (এবাদৎ বা ক্ষমতায়) শরীক ও অংশীদার বানাইবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, (অভাবের আশঙ্কায় সন্তানদেরে বা অপমানের ধারণায় মেয়ে) সন্তানদের হত্যা করায় সম্মত হইবে না, মিথ্যা অপবাদ গড়ানের কাজ করিবে না এবং আপনার ন্যায়সঙ্গত আদেশাবলীর ব্যতিক্রম করিবে না। তবে আপনি তাহাদের দীক্ষা মঞ্জুর করুন, তাহাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করুন; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী দয়ালু।"

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে মহিলা উল্লিখিত শর্তগুলির অঙ্গীকার করিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, তোমার দীক্ষা মঞ্জুর করিলাম।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহিলাদের দীক্ষা গ্রহণে হযরত (দঃ) শুধু মৌখিক কথার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। খোদার কসম—দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে কখনও কোন মহিলার হাত হযরতের হাতকে স্পর্শ করে নাই; মহিলাদের দীক্ষা অনুষ্ঠান হযরত (দঃ) শুধু মৌখিক ভাবেই সম্পন্ন করিতেন।

ব্যাখ্যাঃ—দীক্ষা গ্রহণে গুরুর হাতে শিষ্যের হাত দিয়া অঙ্গীকার করার নিয়ম রহিয়াছে। যে কোন পুরুষের জন্য (প্রাণ যাওয়ার ভয়াবহ আশঙ্কা ব্যতিরেকে) কোন

বেগানা মহিলার শরীরের কোন সামান্য অংশও স্পর্শ করা হারাম। তাই ইসলামে দীক্ষা সম্পন্ন করায় মহিলাদের ব্যাপারে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে যে, কোন প্রকার স্পর্শ ছাড়া শুধু মৌখিক বচনে দীক্ষা সম্পন্ন করিবে। বৈরাগী-সন্ন্যাসী, এমনকি ভণ্ড পীরও দীক্ষা গ্রহণে পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও হাতে হাত দেয়। আয়েশা (রাঃ) ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের বিরুদ্ধে কসমের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় পাক-পবিত্র মহত্তের মহান ব্যক্তিও দীক্ষা গ্রহণে কোন সময় কোন মহিলার হাত স্পর্শ করিতেন না, শুধু মৌখিক বচনে দীক্ষা সম্পন্ন করিতেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শর্ত করা যায় (৩৭৫)। অবশ্য খরিদ-বিক্রয়ের বিধানগত প্রতিক্রিয়ার বিপরীত কোন শর্ত আরোপ করিলে সেই খরিদ-বিক্রি অশুদ্ধ হইয়া যায়; উহা ভঙ্গ করা ওয়াজেব হয়; উহা ভঙ্গ না করিলে ওয়াজেব ছাড়িবার গোনাহ হইবে। যেমন—খরিদ-বিক্রির বিধানগত প্রতিক্রিয়া এই যে, ক্রেতা বিক্রীত বস্তুর চিরস্থায়ী মালিক হইয়া যাইবে, উহার উপর বিক্রেতার কোন দাবী কোন সময় উত্থাপিত হইবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তাহার জমি বিক্রি করে এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুল্য ফেরত দিলে ক্রেতা জমি প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই শর্তের কারণে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইয়া যাইবে: উহা ভঙ্গ করা উভয় পক্ষের উপর ওয়াজেব হইবে। কোন কোন আলেমের মতে এরূপ ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে, কিন্তু শর্ত বাতিল গণ্য হইবে; বিক্রেতা কখনও এই প্রকার দাবী করিতে পারিবে না।

● বিবাহে শর্ত আরোপ করা জায়েয এবং উহা পূর্ণ করা কর্তব্য (৩৩৬ পৃঃ)। অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপন্থী শর্ত করা হইলে তাহা করণীয় হইবে না। কোন কোন শর্ত এরূপও আছে যাহা বিবাহে আরোপ করা জায়েয নহে। যেমন এক হাদীছে আছে, কোন মেয়ের পক্ষ হইতে বিবাহের সময় শর্ত করিবে না যে, এই মেয়েটির অপর মোসলমান ভগ্নি যে ঐ স্বামীর বিবাহে পূর্ব হইতে আছে—তাহাকে তালাক দিতে হইবে যেন সে স্বামীকে একা ভোগ করিতে পারে। (ঐ)

অর্থাৎ কোন পুরুষের বিবাহে কোন একটি মোসলমান নারী আশ্রিতা রহিয়াছে এমতাবস্থায় ঐ পুরুষ তোমাদের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়; তোমরা যদি তোমাদের মেয়ের জন্য সতিনীর সংসার পছন্দ না কর তবে তোমাদের মেয়ে তথায় বিবাহ দিও না; তোমাদের মেয়ে বিবাহ দিবে এবং সতিনীর সংসার এড়াইবার জন্য শর্ত করিবে যে, প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে—ইহা নিষিদ্ধ।

● শরীয়তে কোন নিষিদ্ধকে শর্তের দ্বারা শুদ্ধ করার কল্পনা নিঃতান্তই অবান্তর (ঐ)। যেমন বর্তমানে দেখা যায়, তালাক দেওয়া হারাম স্ত্রীকে লইয়া ঘর-সংসার করার ব্যাপারে পাঞ্চায়েতীরা শর্ত করে যে, গ্রামের লোকদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলে তোমার

কাফ্ফারা হইয়া যাইবে এবং তুমি ঐ স্ত্রীকে লইয়া ঘর-সংসার করিতে পারিবে। ইহা সম্পূর্ণ গর্হিত কথা এবং হারাম কাজ। (ঐ)

● কাহারও সঙ্গে শর্তে আবদ্ধ হওয়ার জন্য মৌখিক কথা যথেষ্ট; লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে (৩৭৭ পৃঃ)। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের শর্ত কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কেতাব তথা শরীয়ত বিরোধী যত শর্ত হইবে সবই বাতিল পরিগণিত হইবে; ঐরূপ শর্ত শত বার প্রয়োগ করিলেও শুদ্ধ হইবে না (৩৮১পৃঃ)।

● কাহারও জন্য কোন কিছুর স্বীকৃতি দানে একটি সংখ্যা উল্লেখ করতঃ সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইতে কিছু বাদ বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে। যেমন বলিল, আমার নিকট সে পাইবে—একশত টাকা; দশ টাকা কম।

কাহারও সঙ্গে কোন কার্য্য সম্পাদনে কোন শর্তের স্বীকৃতি দিলে তাহা বাধ্যতামূলক হইবে। যেমন—কাহারও সঙ্গে তাহার ঘোড়া ভাড়া নেওয়ার কথা সাব্যস্ত করিতে বলিল, তোমার ঘোড়াটা আজ হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত আমার জন্য রাখিবে; যদি আমি তোমার ঘোড়া কাজে নাও লাগাই, তবুও তুমি একশত টাকা পাইবে। অতঃপর সে ঐ ঘোড়াটি কাজে লাগাইল না। এরূপ ক্ষেত্রে ছাহাবী যুগের প্রসিদ্ধ বিচারপতি শোরায়হ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বেচ্ছায় যে স্বীকৃতি দিয়াছিল সেমতে তাহাকে এক শত টাকা দিতে হইবে।

এক ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তুর ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া উহা গ্রহণ করিল না, বরং বলিয়া গেল—আমি বুধবার না আসিলে আমাদের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ মনে করিবে; সে বুধবার না আসিলে তাহার কোন দাবী থাকিবে না (৩৮২)।

● ওয়াক্ফ করাকালে কোন শর্ত করিলে সেই শর্ত বলবৎ থাকিবে (ঐ)।

অছিয়্যত করার আদেশ

১২৬৬। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন এমন মোসলমান যাহার নিকট অছিয়্যত করার মত কোন বস্তু আছে তাহার জন্য এক-দুইটি রাত্রিও এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়া সঙ্গত নহে যে, ঐ সম্পর্কে অছিয়্যতনামা তাহার নিকট লিখিত আকারে বিদ্যমান না থাকে।

ব্যাখ্যাঃ— যদি নিজের উপর অপরের কোন হক থাকে বা কোন ফরজ-ওয়াজেব আদায় করা বাকি থাকে এইরূপ অবস্থায় সেই সম্পর্কে অছিয়্যত করা ফরজ-ওয়াজেব গণ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি ঐরূপ কোন হক বা ফরজ-ওয়াজেব তাহার উপর না থাকে তবে স্বীয় উত্তরাধিকারীগণের স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য স্বীয় ধন-দৌলতের তৃতীয়াংশের, বরং উহা হইতে কিছু কম পরিমাণ ধন নেক কার্য্যে খরচ করার অছিয়্যত করিয়া যাওয়া উত্তম।

১২৬৭। **হাদীছ** :—তালহা ইবনে মোছাররেফ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবহুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অছিয়্যত করিয়াছিলেন কি? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, তবে কিরূপে লোকদের প্রতি অছিয়্যতের আদেশ ও বিধান বলবৎ হইল? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) লোকদেরকে আল্লার কিতাব—কোরআন অনুসরণের আদেশ করিয়া গিয়াছেন। (এবং পবিত্র কোরআনে অছিয়্যতের বিধান রহিয়াছে।)

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিরিক্ত কোন ধন-সম্পদ রাখিয়াই ছিলেন না যাহা সম্পর্কে তিনি অছিয়্যত করিতেন। পঞ্চম খণ্ডে একটি হাদীছ বর্ণিত হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগ কালে নগদ একটি মুদ্রাও রাখিয়াছিলেন না। শুধুমাত্র যানবাহন এবং জেহাদের কিছু অস্ত্র তাঁহার ছিল, আর ছিল কিছু খেজুর বাগান যাহার উৎপণ্যের দ্বারা বিবিগণের ব্যয় বহন করিতেন। এই সবও তাঁহার পরে ছদকা পরিগণিত ছিল। নবী (দঃ) পূর্ব হইতেই বলিয়াছিলেন—আমাদের নবী-সম্প্রদায়ের পরে কেহ তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হয় না; আমাদের পরিত্যাজ্য সবই ছদকাহ পরিগণিত হয়।

উত্তরাধিকারীগণকে সচ্ছল রাখিয়া যাওয়া উত্তম

অর্থাৎ—মৃত্যুকালে স্বীয় পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের কিছু অংশ নেক কার্য্যে খরচ করা বা অছিয়্যত করিয়া যাওয়া উত্তম ও ভাল। কিন্তু এই সম্পর্কে উত্তরাধিকারীগণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। এইরূপ অছিয়্যত করিবে না যাহাতে উত্তরাধিকারীগণ কাঙ্গাল হইয়া দুরাবস্থায় পতিত হয়। বস্তুতঃ উত্তরাধিকারীগণের জন্য তাহার যে সম্পত্তি থাকিবে উহার অছিলায়ও সে ছওয়াব লাভ করিবে। এই জন্য শরীয়তে শুধু তৃতীয়াংশ অছিয়্যত করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বরং আরও কম অছিয়্যত করাই সুন্নত। এমনকি ওয়ারেসগণ সচ্ছল হইলেও তৃতীয়াংশের কম অছিয়্যত করা উত্তম। বোখারী (রঃ) এখানে প্রথম খণ্ডের ৬৭৯নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন; উহাতে এই পরিচ্ছেদের বিষয় স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

মছআলাহ :— অধিকাংশ আলেমগণের মতে ওয়ারেসগণ স্বীয় অংশের দ্বারা সচ্ছল হইতে পারিবে না—এইরূপ অবস্থায় অছিয়্যত না করা উত্তম, যেরূপ স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সচ্ছল না হইলে অপরকে দান না করিয়া তাহাদিগকে দান করা উত্তম। এতদ্ভিন্ন যদি সন্তান-সন্ততি ছোট হয় এমতাবস্থায়ও সাধারণতঃ অছিয়্যত না করাকেই উত্তম বলা হইয়াছে। (রদ্দুল-মোহতার)

অছিয়্যত স্বীয় মালের তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমোসলেমও তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়্যত করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রহিয়াছে, আপনি অমোসলেম

নাগরিকদের মধ্যেও আল্লার দেওয়া বিধান বলবৎ করুন। সেমতে অমোসলেম নাগরিকদের প্রতিও এই বিধান থাকিবে যে, তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়্যত করিতে পারিবে না। অছিয়্যত শুধু তৃতীয়াংশে সীমিত হওয়া আল্লার দেওয়া তথা ইসলামী শরীয়তের বিধান।

১২৬৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা তৃতীয়াংশ হইতেও কম—চতুর্থাংশ অছিয়্যত করিবে ইহা উত্তম। কারণ, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়াংশকে অধিক বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়াছেন উহা ৬৭৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা নিষিদ্ধ

১২৬৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র তাহার পুত্রই হইয়া থাকিত। মাতা-পিতাকে কিছু প্রদানের ইচ্ছা হইলে তাহাদের জন্য অছিয়্যত করার নিয়ম ছিল। (অছিয়্যত ব্যতিরেকে মাতা-পিতা বা অন্য কেহ অংশীদার হইত না।) অতঃপর কোরআন পাকের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা এই বিধান প্রবর্তিত হয় যে— ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের দ্বিগুণ পাইবে এবং মাতা পিতার প্রত্যেকে (মৃতের সন্তান থাকাবস্থায়) ষষ্ঠাংশ পাইবে। স্ত্রী অষ্টমাংশ বা চতুর্থাংশ এবং স্বামী অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ পাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জের বিশেষ ভাষণে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেকের প্রাপ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতঃপর কোন ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা শুদ্ধ হইবে না। (তিরমিজি শরীফ)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত কার্য্যকরী হইবে না, হাঁ—যদি অন্যান্য ওয়ারেসগণ (সাবালেগ হয় এবং তাহারা) সম্মত হয়। (ফতহুলবারী)

মছআলাহ ঃ— মৃত্যুশয্যার ব্যক্তি যদি তাহার কোন ওয়ারেসের জন্য ঋণের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অন্য ওয়ারেসগণ সেই স্বীকৃতি গ্রাহ্য না করে তবে উক্ত স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে না, * অবশ্য যদি উক্ত ঋণ সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ থাকে তবে উহা সেই সূত্রে প্রতীয়মান হইবে

---

* অবশ্য স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর দেন-মহরের স্বীকৃতি দেয় যে, আমি তাহার মহর আদায় করি নাই—উহা আমার উপর ঋণ রহিয়াছে; সেই স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু অসঙ্গত পরিমাণের স্বীকৃতি এরূপ ক্ষেত্রেও গ্রহণীয় নহে। তদ্রূপ যদি স্ত্রী পূর্বে মরিয়া যায় এবং তাহার সন্তান থাকে—সে ক্ষেত্রে যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় উক্ত মৃত স্ত্রীর মহরের ঋণের স্বীকৃতি দেয় সেই স্বীকৃতি অন্য ওয়ারেসদের গ্রাহ্য করা ছাড়া কার্য্যকরী হইবে না। (শামী ৪—৬৪২)

স্বীকৃতি সূত্রে নহে—ইহা হানফী মজহাবের মত। অনেক ইমামের মতে ঐরূপ স্বীকৃতি সর্বাবস্থায়ই গ্রহণীয় হইবে; ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতও ইহাই (৩৮৪ পৃঃ)।

মছআলাহঃ— মৃত্যুশয্যার ব্যক্তি তাহার কোন ওয়ারেসের নিকট তাহার প্রাপ্য ঋণ হইতে সেই ওয়ারেসকে রেহায়ী দিলে যদি অন্য ওয়ারেসগণ সেই রেহায়ী দান গ্রাহ্য না করে তবে উহা কার্য্যকরী হইবে না। এমনকি স্ত্রী যদি মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে মহর হইতে রেহায়ী দেয় এবং স্ত্রীর ওয়ারেসগণ তাহা গ্রাহ্য না করে তবে হানফী মজহাব মতে স্বামীর রেহায়ী হইবে না (শামী ৪—৬৩৮)। ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অনেক ইমামের মতে সেই রেহাই-দান কার্য্যকারী হইবে (৩৮৪ পৃঃ)।

মছআলাহঃ— স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় যদি স্বীকৃতি দেয় যে, আমি স্বামীর নিকট হইতে আমার মহর উসুল পাইয়াছি তবে এই স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে (৩৮৪ পৃঃ)। সাধারণতঃ কোন ওয়ারেসের নিকট প্রাপ্য ঋণ সম্পর্কে মৃত্যুশয্যায় উহা উসুল হওয়ার স্বীকৃতি (সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে) অন্য ওয়ারিসদের গ্রাহ্য করা ছাড়া কার্য্যকারী হয় না (শামী, ৪—৬৫০)। যদি স্ত্রী ঋণগ্রস্থা হয় এবং সে মৃত্যুশয্যায় স্বামী হইতে মহর উসুল পাওয়ার স্বীকৃতি দেয় তবে খাতকের ঋণ পরিশোধের পূর্বে সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার সেই স্বীকৃতি কার্য্যকরী হইবে না (আলমগীরী, ৪—১৮০)।

মছআলাহঃ— স্ত্রীর ব্যবহারে যে সমস্ত চিজ-বস্তু থাকে এবং স্বামী উহার মালিক হওয়া সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, ঐরূপ চিজ-বস্তু সম্পর্কে স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় বলে যে, ঐ জিনিষগুলি স্ত্রীরই স্বত্ব, তবে সেই উক্তিকে অবাস্তব বলা যাইবে না। (৩৮৪ পৃঃ)

অন্যের ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা

১২৭০। হাদীছঃ—সায়াদ ইবনে ওবাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইন্তেকাল করেন। (শেষ সময় মাতার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকায় তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছেন; মৃত্যু সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম না। আমি তাঁহার জন্য দান-খয়রাত করিলে তাহাতে তিনি লাভবান হইবেন কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—হাঁ। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার "মেখরাফ" নামক বাগানটি ছদকা করিয়া দিলাম উহার ছওয়াব আমার মাতা লাভ করুন।

মিরাস বণ্টন কালে কিছু অংশ দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ

فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

"মিরাস বণ্টনকালে যদি আত্মীয়স্বজন এবং এতিম মিছকীনরা উপস্থিত হয় তবে তাহাদেরকে উহার কিছু অংশ দান কর। (আর ওয়ারেসগণ নাবালেগ হওয়ার কারণে দানে অক্ষম হইলে) তাহাদেরে নরম কথা বলিয়া দাও।" (৪ পাঃ ১২ রুঃ)

১২৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকেরা বলিয়া থাকে এই (উপরোক্ত) আয়াতটি মনছুখ তথা ইহার নির্দেশটি রহিত হইয়া গিয়াছে; কখনও নয়—খোদার কসম, ইহা মনছুখ হয় নাই। অবশ্য ইহার অনুসরণে লোকেরা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ভাগ-বণ্টনকারীরা সাবালক ওয়ারেস হইলে তাহারা দান-খয়রাত করিবে। আর ভাগ-বণ্টনকারীরা নিজেরা ওয়ারেস না হইয়া নাবালক ওয়ারেসদের পক্ষে ভাগ-বণ্টন সম্পাদনকারী হইলে উপস্থিত দান প্রার্থীদেরকে নরম কথায় বুঝাইয়া দিবে যে, এই মাল-সম্পত্তির মালিক নাবালক হওয়ায় আমরা তোমাদেরকে কিছু দিতে অক্ষম।

আকস্মিক মৃতের জন্য দান-খয়রাত করা এবং মৃতের মান্নত আদায় করা

১২৭২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করিয়াছেন। আমার ধারণা হয়, তিনি মৃত্যুকালে কথা বলার সুযোগ পাইলে দান-খয়রাত করিতেন। আমি তাঁহার জন্য ছদকা করিব কি? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তাহার জন্য তুমি ছদকা কর।

১২৭৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি বলিলেন, আমার মা ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার একটি মান্নত অপূরণ রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি তাহার তরফ হইতে মান্নত আদায় করিয়া দাও।

দুইটি পরিচ্ছেদের বিষয়

● রোগ শয্যায় বা মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি কথায় কিছু না বলিয়া সুস্পষ্ট ইশারার দ্বারা কোন বিষয় প্রকাশ করে তবে তাহা গৃহিত হইবে (৩৮৩ পৃঃ)। অর্থাৎ এই আকারেও অছিয়্যত বা স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—من بعد وصية يوصى بها او دين অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ মিরাসের অধিকারী হইবে অছিয়্যত পূরণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর।

এই আয়াতের প্রকাশ ভঙ্গিতে ধারণা করা হইতে পারে যে, অছিয়্যত পূরণ করা ঋণ পরিশোধ হইতে অগ্রগণ্য; প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণ পরিশোধ করা অছিয়্যত হইতেও অগ্রগণ্য। আয়াতের মধ্যে ঋণের পূর্বে অছিয়্যতের উল্লেখ শুধু অছিয়্যতের প্রতি বিশেষ তাকিদ প্রদর্শনের জন্য হইয়াছে; কারণ, অছিয়্যতের প্রতি সাধারণতঃ শিথিলতার আশঙ্কা অধিক।

একাধিক হাদীছে নবী (দঃ) অছিয়্যত পূরণের পূর্বে ঋণ পরিশোধের আদেশ করিয়াছেন। (৩৪৮ পৃঃ)

এতিমদের হক ও ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ......

অর্থ—এতিমগণের ধন-সম্পদ (তোমাদের নিকট থাকিলে) তাহাদিগকে তাহাদের হক (পুরাপুরি) প্রদান করিও, (এমনকি শুধু গণনা ঠিক রাখিয়া) স্বীয় মন্দ বস্তুর দ্বারা পরিবর্তন ও বিনিময় সাধন করিও না এবং স্বীয় মালের সঙ্গে তাহাদের মাল জড়িত করিয়া (ছলে-বলে, কলে-কৌশলে) তাহাদের মাল আত্মসাৎ করিও না। এইরূপ করা অতিশয় বড় গুনাহ। (এতিমদের সর্ব রকমের হকের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এমনকি যদি কাহারও প্রতিপালনে এমন কোন এতিম মেয়ে থাকে যাহার সঙ্গে বিবাহ শুদ্ধ হয় এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি ঐ এতিম মেয়েকে বিবাহ করিতে মনস্থ করে তবে তাহাকে ঐ মেয়ের মহরানার হক পূর্ণরূপে আদায় করিতে হইবে। নিজ আয়ত্বের মেয়ে বলিয়া মহর কম দেওয়া জায়েয হইবে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে) যদি আশঙ্কা হয় যে, (সুযোগ দৃষ্টে স্বীয় মনোবলকে দৃঢ় রাখিয়া ঐ মেয়ের) পূর্ণ মহরানা দিতে সক্ষম হইবে না, তবে ঐ মেয়ের বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া অন্য কোন হালাল সূত্রের নারী বিবাহ করিবে। (পবিত্র কোরআন ৪ পাঃ ১২ রুঃ)

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই আয়াতের মর্ম এই যে—কোন এতীম মেয়ে যদি এমন কোন ব্যক্তির প্রতিপালনে থাকে (যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ শুদ্ধ হয়), সেই ব্যক্তি ঐ মেয়ের ধন-সম্পদে বা রূপে-গুণে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করার মনস্থ করে, কিন্তু নিজ আয়ত্বের মেয়ে বলিয়া তাহার মহরানা পূর্ণ দিতে চায় না, এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ মেয়েকে পূর্ণ মহর না দিয়া বিবাহ করায় বাধা প্রদান করা হইয়াছে এবং পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, অন্য নারী বিবাহ কর।

অন্ধকার যুগে নারীদের প্রতি অন্যায় করা এবং তাহাদের কোন হক ও প্রাপ্য তাহাদিগকে না দেওয়া একটি স্বাভাবিক রীতি ছিল। সেই রীতির অভ্যস্ত লোকগণ ইসলামের উল্লিখিত বিধানকে মনোপুত দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিয়া তাহারা ঐ বিধানের বিলুপ্তির লালসায় পুনঃ পুনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে নারীদের মিরাস-স্বত্ব ও পূর্ণ মহরানা ইত্যাদি হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল যে, তাহা কি বাধ্যতামূলক প্রদান করিতেই হইবে?

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐরূপে জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরেই এই আয়াতটি নাযেল হয়—

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ ۔ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ......

অর্থ---অনেকেই আপনার নিকট নারীদের পূর্ণ হক ও প্রাপ্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তায়ালা নারীদের বিষয়ে পূর্ব বর্ণিত পূর্ণ হক প্রদানের বিধানকেই বলবৎ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ঐ সম্পর্কে কোরআনের যেই আয়াত তাহাদের সম্মুখে পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইতেছে উহাই উক্ত জিজ্ঞাসাবাদের শেষ মীমাংসা।

আল্লাহ তায়ালার আদেশটির তাৎপর্য্য বর্ণনায় আয়েশা (রা.) একটি সাধারণ যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কাহারও অধীনস্থ এতিম মেয়ে সম্পত্তির অধিকারীণী ও রূপসী না হইলে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি কোন প্রকার আকর্ষণেই ঐ ব্যক্তি সেই মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তবে কেন সেই মেয়ে রূপসী বা ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া অবস্থায় তাহার হক ও প্রাপ্য লাঘব করতঃ মহর কম দিয়া ঐ ব্যক্তির আকৃষ্টতা পুরণের সুযোগ দেওয়া হইবে? কখনও নহে। আকৃষ্টতার স্থলে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ণ হক প্রদানেই গ্রহণ করিতে পারিবে, নতুবা নহে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ........

অর্থ---এতীমের ধন-সম্পদ তোমার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকিলে উহা তাহার হস্তে অর্পণ করার পূর্বে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি ও হাল-অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া লও। (এতীম নাবালেগ থাকাবস্থায় তাহার হস্তে ধন অর্পণ করিবে না,) এতীম যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যদি তাহার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পাও তবে তাহাকে তাহার ধন-সম্পদ অর্পণ কর। সাবধান! এতীমদের ধন অযথা খরচ করিও না এবং সে বড় হইয়া স্বীয় ধন হস্তগত করিয়া নিবে---এই ভয়ে উহা হজম করিয়া ফেলার জন্য তৎপর হইও না। এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী যদি স্বচ্ছল হয় তবে এতীমের ধন ব্যবহার করা হইতে পূর্ণ সংযমী হইবে। হাঁ—যদি সে নিঃসম্বল হয় তবে সে এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণে লিপ্ততানুপাতিক পারিশ্রমিক স্বরূপ সাধারণ নিয়মের পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে।

যখন এতীমের ধন তাহাকে অর্পণ কর তখন অন্যান্য লোকগণকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত রাখ। (কিন্তু কোন প্রকার কৃত্রিম হিসাব-নিকাশের দ্বারা ছলে-বলে, কলে-কৌশলে লোক-চোখে নির্দোস থাকিয়া এতীমকে ঠকাইবার চেষ্টা করিবে না; ঐরূপ চেষ্টা বৃথা ও নিস্ফল। কারণ,) আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে হিসাব দানকালে বাস্তব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে না।

পুরুষগণ যেরূপ পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইয়া থাকে তদ্রূপ নারীগণও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইবে; ঐরূপ সম্পত্তি পরিমাণে কম হউক বা বেশী হউক উহাতে প্রত্যেকের অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে (৪ পাঃ ১২ রুঃ)। পরবর্তী আয়াতে আছে—

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۝

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়াতের মর্ম হইল—এতীমের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী স্বচ্ছল অবস্থার না হইলে সে এতীমের মাল সম্পর্কে স্বীয় পরিশ্রমানুপাতিক সাধারণ নিয়মের পরিমাণ ঐ মাল ভোগ করিতে পারিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي ....

অর্থ—যাহারা এতীমের মাল অন্যায়রূপে ভোগ করে তাহারা বস্তুতঃ অগ্নি দ্বারা পেট পূর্ণ করিতেছে এবং (পরিণামে) তাহারা অচিরেই ভীষণ প্রজ্জ্বলিত দাউ দাউ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে (৪ পাঃ ১২ রুঃ)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ - قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ ....

অর্থ—অনেকেই আপনার নিকট এতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে (যে—এতীমের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা একত্রে করা যায় কি—না? এস্থলে সন্দেহের কারণ এই যে, এতীমের জন্য তাহার মাল হইতে যে পরিমাণ লওয়া হইয়াছে, হয়ত সে ঐ পরিমাণ পূর্ণ ব্যবহার করে নাই। যেমন তাহার জন্য তাহার মাল হইতে এক পোয়া চাউল সকলের চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একত্রে পাক করা হইল, কিন্তু সে পূর্ণ এক পোয়া চাউলের ভাত খাইল না, বরং কিছু অংশ বন্টিত হইয়া অন্যান্যদের ভাগে খরচ হইয়া গেল; বস্তুতঃ এই অবস্থায় এতীমের মাল খাওয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়, অথচ এতীমের মাল খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর, তাই উল্লিখিত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সূচনা হইল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—) আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, এতীমদের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা, হিত ও লাভজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উত্তম, (এতদদৃষ্টে যদিও একত্রে খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করায় এতীমদের পক্ষে সামান্য ক্ষতি দেখা যায়, কিন্তু ঐ ব্যবস্থার বিপরীত যদি তাহার জন্য সব কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে তাহার পক্ষে বহু গুণ খরচ বাড়িয়া যাইবে—যাহার তুলনায় ঐ নগণ্য ক্ষতি বস্তুতঃ কোন ক্ষতিই নহে। অতএব একত্রিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু এই একত্রিত ব্যবস্থার সুযোগ পাইয়া নানাপ্রকার ছল-চাতুরী, কল-কৌশলে এতীমের মাল অধিক ব্যয় করিয়া স্বয়ং লাভবান হওয়ার কু-চেষ্টা করিবে না। কারণ ছল-চাতুরী ও কল-কৌশল দ্বারা লোক-চোখে নির্দোষ থাকা সম্ভব বটে, কিন্তু অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বাস্তব অবস্থা গোপন থাকা সম্ভব নহে); আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টরূপে জানিয়া থাকিবেন—কে (এতীমের পক্ষে) শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কে (তাহার) অনিষ্টকারী! (৫ পাঃ ১১ রুঃ)

● মোহাম্মদ ইবনে সিরীন (রঃ) বলিয়াছেন, এতীমের মাল সম্পর্কে একা একা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না, এতীমের হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষী কতিপয় ব্যক্তি একত্রে চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া উত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

● প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—আ'তা (রঃ)কে এতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি এই আয়াতখানা স্মরণ করাইয়া দিতেন—والله يعلم المفسد من المصلح "কে হিতাকাঙ্খী এবং কে অনিষ্টকারী তাহা আল্লাহ ভালরূপ জানিয়া থাকিবেন।"

তিনি ইহাও বলিতেন যে, ছোট-বড় কতিপয় এতিম একত্রিত থাকিলে প্রত্যেকের পক্ষে তাহার অংশ হইতে তাহার প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় করিবে।

১২৭৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সাত প্রকার ধ্বংসকারী গোনাহকে তোমরা বিশেষরূপে পরিহার করিয়া চল। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ! উহা কি কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (১) স্বীয় কার্য্য বা কথায় আল্লার শরীক প্রতীয়মান করা। (২) যাদু করা। (৩) ইসলামের বিধানানুসারে নিরাপত্তার অধিকারী মানুষকে অন্যায়রূপে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) এতীমের ধন আত্মসাৎ করা। (৬) জেহাদের ময়দান হইতে পলয়ান করা। (৭) সৎ ও সাধু প্রকৃতির মোসলেম নারীর সতীত্বের উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করা।

মছআলাহঃ— এতীমের দ্বারা কোন কাজ লওয়া বা তাহার খেদমত ও সেবা গ্রহণ করা ঐ ক্ষেত্রে জায়েয হইবে যে ক্ষেত্রে খেদমত ও সেবার মাধ্যমে এতীমের উপকার ও উন্নতি লাভ হয় (৩৮৮ পৃঃ)।

ওয়াক্‌ফ-সম্পর্কে কতিপয় বিষয়

১২৭৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ওমর (রাঃ) বিজিত 'খায়বর' এলাকায় কিছু জমি লাভ করিলেন। তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি খায়বর এলাকায় অতি উত্তম জমি লাভ করিয়াছি, ইহাই আমার সর্বোত্তম সম্পত্তি। (আমি ইহাকে আল্লার রাস্তায় দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।) এই সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করি। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে মুল জমিটি ওয়াক্‌ফ করিয়া উহার উৎপন্ন দান-খয়রাতে ব্যয় করিতে পারেন। ওমর (রাঃ) তাহাই করিলেন এবং এইরূপে ওয়াক্‌ফনামা

লিখিলেন—আমার অমুক জমি (কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্বদার জন্য) ওয়াক্‌ফ; মূল জমিটি বিক্রি করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না, উহার উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্থাপন করা যাইবে না। (উহার উৎপন্ন) গরীব-মিছকিন, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা হইবে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদের মধ্যে ব্যয় করা হইবে এবং অতিথি ও পথিক মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা যাইবে। যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হইবে সেও ঐ উৎপন্ন হইতে প্রয়োজন পরিমাণ খাইতে পারিবে এবং আবশ্যক বোধে স্বীয় বন্ধুকেও খাওয়াইতে পারিবে, কিন্তু নিজ সম্পদরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১২৭৬। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি ইহজগৎ ত্যাগকালীন কোন ধন-সম্পদ রাখিয়া গেলে আমার উত্তরাধিকারিগণ উহা ভাগ-বণ্টন করিয়া নিতে পারিবে না। আমার স্ত্রীগণের ভরণ-শোষণ এবং কার্য্য পরিচালনকারীর ব্যয় বহনাতিরিক্ত আমার পরিত্যক্ত সমুদয় বস্তু ছদকা গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা:—ইহা নবীগণ সম্পর্কীয় একটি বিশেষ বিধান যে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, উহা ওয়াক্‌ফ রূপে ছদকা ও দান পরিগণিত হইয়া থাকে।

মছআলাহ:—ওয়াক্‌ফকারী যদি এইরূপে ওয়াক্‌ফ করে যে, আমার জীবনকাল পর্য্যন্ত আমিই ইহার সমুদয় আয়-উৎপন্ন ভোগ করিব, বা প্রয়োজন পরিমাণ আমি নিজের জন্য ব্যয় করিব, আমার পরে ইহা বা ইহার সম্পূর্ণ আয়-উৎপন্ন দান পরিগণিত হইবে। এই ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হইবে এবং ওয়াক্‌ফকারী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত উহার আয়-উৎপন্ন সম্পূর্ণ বা প্রয়োজন পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে। তাহার মৃত্যুর পর উহা সাধারণ গরীবদের জন্য বা তাহার নির্দ্ধারিত পাত্রের জন্য ছদকা ও দান গণ্য হইবে (৩৮৯ পৃঃ)।

মছআলাহ:—ওয়াক্‌ফকারী স্বয়ং নিজে ওয়াক্‌ফের মোতাওল্লী হইতে পারে। অবশ্য সে যদি ওয়াক্‌ফ পরিচালনায় খেয়ানতকারী বা দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে অপসারিত করা যাইবে (৩৮৫ পৃঃ)।

মছআলাহ:—মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে (৩৮৯ পৃঃ)।

মছআলাহ:—অস্থাবর জিনিষ—যেমন, জেহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদি ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে (ঐ)।

মৃত্যুকালে অছিয়্যত করায় সাক্ষী রাখা

১২৭৭। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তামীম-দারী ও আদি ইবনে বাদ্দা নামক (খৃষ্টান) দুই ব্যক্তি সিরিয়া দেশে বাণিজ্য করিতে গেল। তাহাদের সঙ্গে বোদায়েল সাহ্‌মী নামক তৃতীয় এক মোসলমান ব্যক্তিও বাণিজ্য করিতে

গেলেন। তথায় পৌঁছিয়া মোসলমান ব্যক্তি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন সিরিয়া দেশে মোসলমানের বসাবাস ছিল না এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ও অমোসলেম ছিল। (অগত্যা মোসলমান ব্যক্তির মৃত্যুকালে যাহা কিছু অছিয়্যত করার ছিল তাহা অমোসলেম সঙ্গীদ্বয়ের সম্মুখেই করিয়া যাইতে হইল এবং তিনি তাহার সমস্ত মাল তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্বও সঙ্গীদ্বয়ের উপরই ন্যাস্ত করিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মাল সমুহের মধ্যে প্রধানতম বস্তু ছিল একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য নির্মিত পেয়ালা। সঙ্গীদ্বয় ঐ পেয়ালাটি গোপনে এক সহস্র রৌপ্য-মুদ্রায় বিক্রি করিয়া দিল এবং উভয়ে ঐ এক সহস্র মুদ্রা বণ্টন করিয়া নিল। অন্যান্য) সমুদয় মাল তাহারা দেশে ফিরিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। (মৃত ব্যক্তি স্বীয় সমুদয় মালের হিসাব ও বিবরণ লিখিত একটি কাগজ সঙ্গীদ্বয়ের অগোচরে স্বীয় মাল-ছামানের ভিতরে রাখিয়া দিয়াছিল। ঐ কাগজখানা উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হইল।) তাহারা পেয়ালার বিষয় অবগত হইয়া অছিয়্যতকারীর সঙ্গীদ্বয়কে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। (সঙ্গীদ্বয় ঐ পেয়ালার বিষয় কিছু অবগত নহে বলিয়া মিথ্যা উক্তি কবিল।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তিনি কসম খাইবার আদেশ করিলেন; তবুও তাহারা সত্য বিষয় স্বীকার করিল না; মিথ্যা উক্তির উপরই তাহারা কসম খাইয়া রেহায়ী পাইল। অতঃপর সেই রৌপ্য নির্মিত পেয়ালাটি মক্কার বাজারে বিক্রি হইতে দেখা গেল।

মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ পেয়ালার বিক্রেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা ইহা কোথা হইতে পাইলে? তাহারা বলিল, তামীম-দারী ও আদী-ইবনে বাদ্দার নিকট হইতে ইহা আমরা ক্রয় করিয়া লইয়াছি। (অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এবার বলিল যে, আমরা মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলাম। এই ঘটনা দ্বিতীয়বার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল।) এতদসম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল; যাহার মর্ম এই ছিল যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি কসম খাইবে।

তদানুসারে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল, প্রথমে বিবাদী পক্ষ যেই কসম খাইয়াছিল (যে, পেয়ালা সম্পর্কে আমরা কিছু জ্ঞাত নহি সেই কসমের বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায়) আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের সেই কসম সঠিক ছিল না এবং (তাহাদের ক্রয় করার দাবীর উপর কোন প্রমাণ না থাকায়) আমাদের এই কসম অগ্রগণ্য যে, ঐ পেয়ালা আমাদের আত্মীয় মৃত ব্যক্তিরই স্বত্ব।

(অতঃপর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের কসমকেই অগ্রগণ্য করা হইল এবং তাহাদের পক্ষেই রায় প্রদান পূর্বক পেয়ালা তাহাদিগকে দেওয়া হইল। এই ঘটনার পরে তামীম-দারী (রাঃ) মোসলমান হইয়া ছাহাবী হইয়াছিলেন।)

চতুর্দশ অধ্যায়

জেহাদ

"জেহাদ" বলিতে সাধারণতঃ আমরা অস্ত্র ধারণ—যুদ্ধ লড়াই বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ উহার অর্থ তদপেক্ষা অতিশয় ব্যাপক। "জেহাদ" একটি আরবী শব্দ, "জাহ্‌দ" ধাতু হইতে নির্গত। "জাহ্‌দ" অর্থ দুঃখ-যাতনা ভোগ, তাই "জেহাদ" শব্দের মূল অর্থ (উদ্দেশ্য সাধনে) কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-যাতনা ভোগ করতঃ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যাওয়া। ইহা একটি ব্যাপক ক্রিয়া পদ। ইহা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন সূত্র ও ক্ষেত্র আছে। সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ ক্ষেত্র হইল অস্ত্র ধারণ বা যুদ্ধ ও লড়াই, যাহাতে দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না; এমনকি প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ঘটনাক্রমে বা আবশ্যকবোধে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রটির জন্য আরবী ভাষায় বিশেষ শব্দ রহিয়াছে "কেতাল"।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের বাস্তব ও খাঁটি বিকাশন তথা আল্লার দ্বীন—দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, বরং উহার এবং বিশ্ব স্রষ্টা কর্তৃক নির্দ্ধারিত উহার সর্বময় অনুশাসন সমূহ প্রবর্তনের জন্য সারা বিশ্বকে বাধামুক্ত নিরাপদ ক্ষেত্ররূপে তৈরী করার কর্তব্য পালনে আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা চালাইয়া যাওয়ার প্রতিটি সূত্র ও ক্রিয়া জেহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যাপক অর্থেই জেহাদ মোসলমানদের উপর ফরজ।

যুদ্ধ লড়াই বা অস্ত্রধারণ জেহাদের একটি অন্যতম বিশিষ্ট বিভাগ, এমনকি সাধারণের ভাষায় জেহাদ শব্দ এই অর্থকেই বুঝায় এবং বিশেষরূপে এই বিভাগটি ফরজ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই অর্থের জন্য আরবী ভাষার বিশেষ শব্দ "قتال—কেতাল" শব্দের মাধ্যমে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। অতএব "জেহাদ" উহার মূল ব্যাপক অর্থেও ফরজ এবং বিশেষরূপে অস্ত্রধারণ অর্থেও ফরজ। যাহারা জেহাদকে শুধু অস্ত্রধারণ অর্থে ফরজ মনে করিয়া থাকেন তাঁহারা যেরূপ ভুল করিতেছেন তদ্রূপ যাহারা অস্ত্রধারণকে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত না মানিয়া শুধু অন্যান্য রকমের চেষ্টা তদবীরকেই জেহাদের উদ্দেশ্যরূপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন তাহারাও বিজাতীয় প্রভাব-প্রসূত মারাত্মক ভুলে পতিত আছেন।

জেহাদ অস্ত্রধারণ অর্থেও ফরজ হওয়ার প্রমাণে কোরআন শরীফের বহু আয়াত এবং অনেক অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে। যথা—

(১) وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

অর্থ—অমোসলেম কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ—যুদ্ধ-লড়াই চালাইতে থাক যাবৎ দ্বীন-ইসলাম ও উহার বিধান প্রবর্তনে বাঁধা-বিঘ্ন সৃষ্টিকারক শক্তি ও ক্ষমতা বিলুপ্ত ও অপসারিত না হয় এবং একমাত্র আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়।

(৯ পারা শেষে এবং ২য় পারা আট রুকুতেও অনুরূপ আয়াত আছে।)

(২) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

অর্থ—আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখিও, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন। (মুখের কথা, হাত-পায়ের কার্য্যধারা ও অন্তরের নিয়্যত খালেছরূপে আল্লার দ্বীনের জন্য না হইলে তাহা জেহাদ গণ্য হইবে না।)

(৩) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا ○

অর্থ—(কাফেররা) যাহারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই যথা-সর্বস্ব মনে করিয়া উহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে (আখেরাতের জীবনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই) তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ কর। আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে যাহারা শহীদ হইবে বা জয়ী হইবে অচিরেই তাহাদিগকে অতি বড় পুরস্কার দান করিব। (৫ পাঃ ৭ রুঃ)

(৪) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ……

অর্থ—(পূর্বকাল হইতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্য্যন্ত শরীয়তের বিধান মতে চাঁদের হিসাবে বৎসরে চারিটি বিশিষ্ট মাসে—জিলকদ, জিলহজ্জ, মোহার্‌রম ও রজব এই চার মাসে এবং চুক্তি করিয়া থাকিলে চুক্তির সময় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার যুদ্ধ-জেহাদ করা নিষিদ্ধ ছিল। ঐ মাস কয়টিকে সম্মানিত মাস বলা হইত; সেই) বিশিষ্ট মাস কয়টি এবং চুক্তি হইয়া থাকিলে চুক্তির সময়টি অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর (হরবী তথা দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্যের অস্বীকারকারী বিদ্রোহী) মোশরেকদেরকে যথা পাও হত্যা কর; তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আন। (আবশ্যক বোধে) তাহাদের বস্তি ঘেরাও করিয়া আবদ্ধ রাখ এবং তাহাদের দমন উদ্দেশ্যে প্রতিটি সুযোগস্থলে ঘাটি স্থাপন করতঃ ওৎ পাতিয়া থাক। অতঃপর তাহারা যদি ইসলাম-দ্রোহিতা ত্যাগ করতঃ ইসলামের বিশিষ্ট ফরজ—নামায, যাকাত অবলম্বন করে তবে তাহাদিগকে রেহাই দান কর। (১০ পাঃ ৭ রুঃ)

(৫) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ

مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

অর্থ—যে সমস্ত কিতাবধারী কাফের (ইহুদ ও নাছারা) আল্লার উপর (সঠিকরূপে) ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও আল্লার রসুল কর্তৃক ঘোষিত হারামসমূহ বর্জন করে না, সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাও যাবৎ না তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করতঃ অধীনস্তরূপে নিজ হাতে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায় করে। (১০ পাঃ ১০ রুঃ)

(৬) يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ....

অর্থ—হে নবী! কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যান এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাহাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান জাহান্নাম হইবে। (১০ পাঃ ১৬ রুঃ ও ২৮ পাঃ ছুরা তাহরীম)

(৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ ....

অর্থ—হে মোসলমান জাতি! তোমরা (প্রথমে) স্বীয় সীমান্ত সংলগ্ন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাও এবং তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা দেখিতে পায়। (১১ পা ৫ রুঃ)

(৮) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ....

অর্থ—তোমাদের মনে চাউক বা না-চাউক, অল্প এবং অধিক (যাহা সাধ্যে জুটে) সমর-সাজে সজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চল এবং স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিয়া আল্লার রাস্তায় জেহাদ কর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই শ্রেণীর আয়াতসমূহের মর্ম দৃষ্টে কোন কোন মানুষের মন ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, বিবেক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম; ইসলামে লড়াই-ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তির অবকাশ থাকিবে কেন—উহা ফরজ তথা ইসলামের অপরিহার্য্য বিধান কেন হইবে?

এইরূপ শান্তির ধ্বজাধারীদের বুঝা উচিৎ যে, ইসলাম বলিষ্ঠ ধর্ম, স্বভাবের পটভূমিতে উহার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহা আছে। সংগ্রামের প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। জালিমকে বাধা দাও, মজলুমকে রক্ষা কর। ন্যায় এবং সত্য ও আদর্শের জন্য তরবারি ধর—প্রয়োজন হইলে মার এবং মর—ইহাই স্বভাব, ইহাই

ইসলামে রহিয়াছে। ইসলামে তরবারির স্থান রাখা হইয়াছে স্থায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের জন্য, আদর্শ বিস্তারের জন্য, আদর্শহীনতা প্রতিরোধের জন্য।

সত্যের সহিত শক্তি—এই দুই এর সমন্বয় ও মিলন কতইনা সুন্দর! শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াইতে পারে না, আবার সত্যহীন শক্তি জুলুমে পরিণত হয়। উভয়ের সমন্বয়েই আসে মঙ্গল ও কল্যাণ। সত্যের দ্বারা শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং শক্তির সাহায্যে সত্য উন্নত শিরে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পায়। শক্তি সত্যাশ্রয়ী না হইলে সেই শক্তি ঘটায় দুর্গতি ও অকল্যাণ, আবার সত্য শক্তির সাহায্য না পাইলে সেই সত্য টানিয়া আনে ভীরুতা।

তরবারির জোরে ইসলাম বিস্তার বা বলপ্রয়োগে মোসলমান করা ইসলাম-অনুমোদিত নয়, তদ্রূপ কাপুরুষের স্থায় ভীরু হৃদয়ের শুধু মিনতিও ইসলামে নাই।

সত্য ও শক্তি, দ্বীন ও দুনিয়া এই দুই-এর চমৎকার মিলনই ইসলামের বৈশিষ্ট। ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইব—এই রীতি ইসলামে নাই, তদ্রূপ ইসলাম শুধু কাকুতি মিনতির উপর নির্ভরশীল এবং শত্রুদের দয়ার ভিক্ষারী হইয়া থাকিবে—ইহাতেও ইসলাম রাজী নহে। ইহারই অর্থ এই প্রবাদের—"এক হাতে কোরআন অপর হাতে তলওয়ার"। কোরআন তথা সত্যের আলো দেখাইবে পথ, বাঁচাইবে সকল মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে; সঙ্গে সঙ্গে তলওয়ার যোগাইবে সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিবার শক্তি, সামর্থ্য এবং সৎসাহস ও বলিষ্ঠ মনোবল।

মক্কার জীবনে রসুলুল্লাহ (দঃ) শক্তি ও তলোয়ার ছাড়া সত্যকে দাঁড় করাইবার কতইনা চেষ্টা করিয়াছিলেন—এক গালে চড় খাইলে প্রতিশোধের পরিবর্তে অপর গাল ফিরাইয়া দিয়াও সত্য এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার কামনা ও বাসনা করিয়াছিলেন। নবীজী (দঃ) দীর্ঘ ১৩ বৎসর এই নীতিতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য ও আদর্শকে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করা দুরের কথা রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার ভক্তগণ তথায় টিকিয়াও থাকিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে মদীনায় আসিয়া হযরত (দঃ) সত্যকে তরবারির আশ্রয় দিয়াছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তির সাহায্য যোগাইয়াছেন; ফলে সেই ১৩ বৎসর সময়েই মক্কা সহ সমগ্র আরবে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সিরিয়ায় পর্য্যন্ত সত্যের পতাকা উড্ডিন হইতে পারিয়াছিল; পরবর্তী দশকে ত সত্য তথা ইসলাম বিশ্ববিজয়ীর মর্য্যাদা পাইয়াছিল। কোরআন ও তলোয়ার, সত্য ও শক্তি এই দুই-এর মিলনের স্বাভাবিক স্বর্ণফলই ইহা।

সত্যকে তরবারীর সাহায্য ও শক্তির আশ্রয়ের সুযোগ উদ্দেশ্যেই ছিল হিজরতের প্রয়োজন। তাই হিজরতের অর্থ পলায়ণ বা আত্মগোপন নহে সাধনায় সাফল্যের সুযোগ সন্ধান মাত্র।

মক্কায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি ইসলামের স্থায়ী নীতি নহে; বিপক্ষকে সত্য বুঝিবার অবকাশ দান মাত্র বা প্রয়োজন বোধে সুযোগের প্রতিক্ষায় সাময়িকভাবে অত্যাচার সহিয়া যাওয়া মাত্র। তদ্রূপ হিজরতও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে গিয়া উদ্দেশ্য সাধনের নূতন পথ খোঁজার কৌশল মাত্র।

জেহাদের যৌক্তিকতা :

কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত, ইহার প্রমাণ কোরআন শরীফেরই বহু স্থানে এমন পদ্ধতিতে উল্লিখিত রহিয়াছে যাহা সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপেই ঐ বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট। স্বপক্ষের বা বিপক্ষের যে কোন ব্যক্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত ঐ পদ্ধতি অনুসারে কোরআন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত হওয়া সপ্রমাণিত দেখিয়া লইতে পারে।

সেই কোরআন দ্বারাই স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, দুনিয়ার স্থায়িত্বের শেষ সীমা—মহাপ্রলয় তথা কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্ব-মানবের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও স্থিরকৃতরূপে মনোনীত দ্বীন ও ধর্ম একমাত্র দ্বীন-ইসলাম। তাই ভূ-পৃষ্ঠে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে দ্বীন-ইসলামও শুধু বাঁচিয়া থাকিবে—তাহা কাম্য নহে, বরং সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি ও অন্তরায় মুক্তরূপে সম্ভাব্য সকল প্রকার আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্নের উর্দ্ধে থাকিয়া বিশ্বের প্রতি কোণে কোণে আল্লার দ্বীন—দ্বীন ইসলাম প্রবল দ্বীনরূপে বিরাজমান থাকিবে, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে ইহাই দ্বীন ইসলাম সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত দ্বীন হওয়ার বাস্তব প্রতিক্রিয়া ও মূল তাৎপর্য্য।

অতঃপর লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, দ্বীন-ইসলাম শুধুমাত্র গুটি কয়েক এবাদত-বন্দেগী, উপাসনা-প্রার্থনা, তপ-যপ জাতীয় কার্য্য ও অনুষ্ঠানাদির সমষ্টির নাম নহে, তথা সন্নাস ও বৈরাগ্য ধরুণের ধর্ম দ্বীন-ইসলাম নহে, বরং ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি মানব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকেই দ্বীন-ইসলাম নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। দ্বীন-ইসলামের মধ্যে এবাদত-বন্দেগীর সঙ্গে সঙ্গে সতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত উহার বিশেষ শাসনতন্ত্র রহিয়াছে যাহাকে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বিশ্বে চালু করিতে হইবে।

অতএব দ্বীন-ইসলামের বাস্তব প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরায় মুক্তরূপে উহা কার্য্যকারী হওয়ার জন্য দারুল-ইসলাম—ইসলামী ষ্টেট তথা ইসলামের সমুদয় অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্তরায়হীন—বাধামুক্ত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দ্বীন-ইসলাম বা আল্লার দ্বীন যেরূপ বিশ্বের কোণে কোণে প্রবল দ্বীনরূপে বিরাজমান থাকা আবশ্যক তদ্রূপ বিশ্বের কোণে কোণে দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়াও আবশ্যক এবং কাফের-হরবী তথা ইসলামের আধিপত্যের বিদ্রোহী শত্রুকে শায়েস্তা করাও আবশ্যক ; যাহাতে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট মানবের কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামের ছায়াতলে আসিতে এবং ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত জীবন-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা পূর্ব বর্ণিত (১) আয়াতে এই সবের স্পষ্ট ইঙ্গিতই করিয়াছেন—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ٥

জেহাদের উদ্দেশ্য ঃ

উল্লিখিত বিবরণ সমূহে স্পষ্টতই বুঝা গিয়াছে যে, অমোসলেমদিগকে তরবারী দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জেহাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহজগত পরীক্ষারস্থল; ইসলাম গ্রহণকে প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন রাখিলেই পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

জেহাদের উদ্দেশ্য, বিশ্ব স্রষ্টার মনোনীত দ্বীন—দ্বীন-ইসলামের জন্য সারা বিশ্বকে বাধামুক্ত এবং অন্তরায়হীন ময়দান রূপে গড়িয়া তোলা। তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যে জেহাদের উদ্দেশ্য নয় তাহার চাক্ষুস প্রমাণ এই যে, কোন দেশ বা কোন এলাকার বাসিন্দাগণ যদি দ্বীন-ইসলামের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনার ব্যয়ভার তথা রাষ্ট্রিয় ট্যাক্স বহন করে, তবে তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। তাহাদের ধর্ম-মতের সহিত তাহাদের নাগরিকত্ব দান পূর্বক তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ও ফরজ হইয়া দাঁড়ায়।

হাঁ—কোন কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না বটে, কিন্তু কাফের তথা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থার অবাধ্য ব্যক্তিবর্গকে ইসলাম ও উহার বিধানসমূহ প্রবর্তনে বাধা দেওয়ার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হইবে না। নতুবা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রবর্তনে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা ও আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। সেই আশঙ্কা দুরীভুত করার জন্যই জেহাদের প্রবর্তন হইয়াছে; যেমন—সাপ, কাহাকেও দংশন না করিয়া গর্তের ভিতর থাকিলেও উহাকে নিধন করায় সচেষ্ট হওয়া কর্তব্যই বটে। সেই জন্যই শুধু আশঙ্কার স্থল—কাফের-হরবী তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ দান করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাফের—অমোসলেম ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছে তাহাদের ক্ষমতা না থাকায় আশঙ্কাও নাই, তাই তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদও হইবে না।

জেহাদ সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জন ঃ

জেহাদ বলিতে যেহেতু অস্ত্রধারণ ও বল প্রয়োগ বুঝায়, তাই ইসলামের ন্যায় শান্তি-প্রিয় ও ন্যায়পরায়ন ধর্মে জেহাদের নির্দেশকে শোভণীয়রূপে গ্রহণ না করার আশঙ্কায় কোন কোন লিখক এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শরীয়তের ফরজ একমাত্র আত্মরক্ষামুলক জেহাদ। ইসলামে আক্রমণাত্মক জেহাদের স্থান নাই।

তাহাদের আবিষ্কৃত এই অভিনব পন্থা নিতান্ত ভুল। জেহাদ ফরজ হওয়ার প্রমাণে কোরআন শরীফের যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত হইয়াছে ঐ আয়াতসমূহ এবং উহা ব্যতীত আরও বহু প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, জেহাদ ফরজ হওয়া কোন বিশেষ অবস্থাধীন নহে। যাহারা জেহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় সীমাবদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করেন তাঁহারা Inferiority Complex-এর বশীভূত হইয়া বা অপরের প্রশ্নাবলীর আশঙ্কার প্রভাবে কোরআন-হাদীছের দ্বারা প্রকাশ্যরূপে প্রমাণিত ফরজকে বাদ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ

শরীয়তের বিধানে হস্তক্ষেপ করা, কিন্তু সোজাসুজি নয়; ঘুরাইয়া ফিরাইয়া। এক দিকে শত্রুদের কটাক্ষপাতের ভয়, অপর দিকে স্বজাতি মুসলমানদের ভয়। এই দুই ভয়ে পড়িয়া তাঁহারা জেহাদকে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই, শুধু আত্মরক্ষামূলক অবস্থার গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

"আক্রমণ" শব্দটি সাধারণ্যে এক প্রকার ঘৃণিত ও কলুষময় অর্থের ধারণা সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই তাঁহারা ইসলামের আদর্শ ও বিধানকে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে কলুষমুক্ত করার অভিপ্রায়ে জেহাদকে আত্মরক্ষামূলক পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের প্রতি তাহাদের এই পন্থার হামদর্দি ঐ বৃদ্ধার হামদর্দির ন্যায়—যেই বৃদ্ধা বাদশার পোষিত একটি বাজ পাখীকে হাতে পাইয়া উহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহার লম্বা নখগুলি এবং বাঁকা ঠোঁটটি কাটিয়া দিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা নিজ জ্ঞানে ঐ বাজের প্রতি সহানুভূতিই প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে সে উহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বোল্লিখিত জেহাদের মুল উদ্দেশ্য ও জেহাদ ফরজ হওয়ার মুল কারণ ও তাৎপর্য্য যাহা কোরআন ও হাদীছের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত আছে, উহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয় যে, জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশ্য হইতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ একটি বিশেষ সংস্কারমূলক ব্যবস্থা। সংস্কারমুলক ব্যবস্থা কখনও আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় বিভক্ত হয় না। ডাক্তারগণ রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার দ্বারা দুষিত রক্ত বাহির করিয়া দুষিত অংশকে কাটিয়া ফেলিয়া রোগীর দেহের সংস্কার সাধন করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আল্লাদ্রোহী, আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য স্থাপনের অন্তরায়—কাফের-হরবীগণ সৃষ্ট বিশ্ব দেহে বদ-রক্ত ও পচা অংশ। অস্ত্রোপচার দ্বারা বিশ্ব দেহের সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক। শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অবাধ্য দস্যু দলকে শায়েস্তা করার জন্য অভিযান চালান হয়। এইসব ক্ষেত্রের ব্যবস্থাসমুহ যেরূপ সংস্কারমুলক এবং এস্থলে আত্মরক্ষামুলক বা আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রশ্ন আসে না, বরং সর্বাবস্থায়ই উহা সংস্কারমূলক এবং সমর্থনীয় ও প্রশংসণীয়; তদ্রূপ আল্লাহদ্রোহী কাফের-হরবীগণ আল্লার সৃষ্ট ভু-পৃষ্ঠে দস্যুদল স্বরূপ; তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। এই সংগ্রামের নামই জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ, সুতরাং জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহও সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমূলক; উহা সর্বাবস্থায়ই সমর্থনীয় ও প্রশংসণীয়।

যাঁহারা আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামুলক রূপের শ্রেণী-বিভক্ত করিয়া জেহাদের বিধানকে দোষমুক্ত ও কলুষমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন বস্তুতঃ তাঁহারা জেহাদকে ঐরূপ সংগ্রাম মনে করিয়াছেন যেরূপ কেহ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়া থাকে—ইহা নিছক ভুল। মোসলমানগণও যদি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা শুধু রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে তবে উহাকে জেহাদ বলা হইবে না। ইসলামের বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রসুল (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। বোখারী শরীফের হাদীছ—

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ

وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ—একজন লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেহ যুদ্ধ করে মাল ও দৌলত হাছেল করার জন্য, কেহ যুদ্ধ করে খ্যাতি লাভের জন্য, কেহ যুদ্ধ করে তাহার বীরত্ব দেখাইবার জন্য, এর মধ্যে জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ কোনটি? নবী (দঃ) বলিলেন, শুধু সেই ব্যক্তির যুদ্ধ জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ গণ্য হইবে যাহার নিয়্যত (অন্য কিছু নহে—) "শুধু আল্লার দ্বীনের প্রধান্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা"। (তাছাড়া রাজ্য বিস্তার, নিজস্ব প্রাধান্য বিস্তার, ধন-দৌলত সংগ্রহ, মার্কেট প্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজের প্রাধান্য স্থাপন, নাম করা, যশ করা ইত্যাদি কিছুই তাহার উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লার সৃষ্ট সব মানুষ আল্লার আইনকে মানিয়া নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবে—শুধু ইহাই যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য একমাত্র সে যুদ্ধকেই জেহাদ পর্য্যায়ভুক্ত করা হইবে, অন্য যুদ্ধকে জেহাদ বলাও যাইবে না বা আল্লার নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য এবং ছওয়াবের উপযুক্তও হইবে না।)

জেহাদের অনুমতিদানে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের যেই আয়াত নাযেল হইয়াছে উহাতেও এই বিষয়টির উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا

بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

অর্থ—(মোসলমানগণকে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে—) যেহেতু তাহারা ভূ-পৃষ্ঠে আধিপত্য ও শাসন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে নামায কায়েম করিবে, যাকাত-ব্যবস্থা চালু করিবে, সর্বত্র সকল প্রকার সৎকর্ম জারী করিবে এবং সকল প্রকার কুকর্মের ও জুলুম-অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবে। সর্ব বিষয়ের চুড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হস্তে ন্যস্ত। (কাজেই তিনি তাঁহার সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সংস্কারমুলক জেহাদের অনুমতি দিতে পারেন; তাহাতে আপত্তি করার কাহারও অধিকার নাই।) ১৭ পাঃ ১৩ রুঃ

সার কথা এই যে, বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিশ্ব-মানবের জন্য মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে সারা বিশ্বে অন্তরায়হীন ও বাধামুক্ত করা সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে সৈনিকরূপে কাজ করিয়া যাওয়াই হইল জেহাদের একমাত্র

তাৎপর্য্য, তাই এস্থলে আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক-এর প্রশ্নই অবান্তর। জেহাদ একমাত্র সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অন্য কিছু নহে।

শরীয়ত জারী হওয়ার তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বহু পরে—দীর্ঘ প্রায় ১২০০ বার শত বৎসর পরেও যখন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোজাহেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) স্বীয় খলীফা ও মুরিদগণের সহযোগিতায় বিদেশী বিজাতীয় দখল ও শাসন হইতে দেশকে ও জাতিকে মুক্ত করতঃ ইসলামী শাসন ও ইসলামী-নেজাম জারী করিয়া মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য ভারতের বুকে শেষ জেহাদ পরিচালিত করিয়াছিলেন, তখন জেহাদের প্রতি লোকদিগকে আহ্বানের জন্য একটি কবিতা উর্দ্দু ভাষায় লিখিয়া প্রচার করা হইয়াছিল—যাহা "রেছালা-জেহাদী" নামে অভিহিত। ইসলামী জেহাদের রূপ-রেখা নির্দ্ধারণে সেই কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করিতেছি—

واسطے دین کے لڑنا ہے نہ طمع بلاد۔

اہل اسلام اسے کہتے ہیں جہاد۔

দ্বীনের তরে লড়াই করা, রাজ্য লোভে নয়।
শোন মোমিন শরীয়তে একেই জেহাদ কয়।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ দুনিয়ার ধন-দৌলত, রাজ্য লাভ ইত্যাদি হীন স্বার্থে জেহাদ করেন নাই। শুধুমাত্র দ্বীন-ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত মানব জাতির কল্যাণ সাধনকারী জীবন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সংস্কারমূলক জেহাদই করিয়াছেন; ইসলামে উহাকেই ফরজ করা হইয়াছে।

জেহাদ সম্পর্কে যে সব তথ্য এখানে প্রকাশ করা হইল ইহা প্রশ্নাবলী এড়াইবার নিমিত্ত বা ভাবাবেগ প্রসূত বা মুখের জোর ও লেখনীর বাড়াবাড়ি নহে, এইসব বিবরণ বাস্তব তথ্য ও জেহাদের প্রকৃত রূপ—যাহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণ কার্য্য ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মোসলেম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একখানা হাদীছ লক্ষ্যনীয়। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন সৈন্যবাহিনী কোথাও পরিচালিত করিলে সেই বাহিনীর অধিনায়ককে বিশেষরূপে কতিপয় বিষয়ের নির্দেশ দান করিতেন—অধিনায়ককে বিশেষরূপে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, (১) সর্বদা অন্তরে আল্লার ভয় জাগ্রত রাখিবে। (২) সঙ্গীগণের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-শান্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে, প্রতিটি ব্যক্তির শুভাকাঙ্খী হইবে। (৩) অতঃপর আল্লার নামে আল্লার রাস্তায় জেহাদ আরম্ভ করিবে। (৪) আল্লাহ-বিদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। (৫) জেহাদের ময়দানে যে ধন-সম্পদ হস্তগত হইবে উহার কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবে না। (৬) শত্রু পক্ষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। (৭) শত্রু পক্ষের কাহারও নাক-কান কাটিয়া অবমানা করিবে না। (৮) শিশুকে, নারীকে বা দুনিয়ার

সংস্রব বিহীন সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করিবে না। (৯) কাফের মোশরেক শত্রুদের প্রতি অস্ত্রধারণ করার পূর্বে তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করিবে। প্রথমত: তাহাদিগকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে; যদি তাহারা সেই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাহাদের পক্ষে ইসলামকে গ্রহণীয় গণ্য করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। যদি তাহারা ইসলামের প্রতি আহ্বানে সাড়াদানে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদিগকে "জিযিয়া" তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের আদেশ করিবে। যদি সেই আদেশ মান্য করে তবে তাহাদের সেই আনুগত্য গ্রহণীয় গণ্য করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থাবলম্বন পরিত্যাগ করিবে। যদি সেই আদেশের প্রতিও কর্ণপাত না করে তবে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা পূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

বোখারী শরীফের একটি হাদীছে উল্লেখ আছে, খায়বরের যুদ্ধ যাহা বর্তমান যুগের ইসলাম বিরোধী, শরীয়তের কুৎসাকারীদের সঙ্কীর্ণ ভাষায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে—সেই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রণক্ষেত্রের সর্বাধিনায়করূপে নিয়োজিত হইয়া রণক্ষেত্রে যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াইয়ে ঝাপাইয়া পড়িব এবং তাহারা আমাদের ন্যায় মোমেন মোসলমান না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার ঐ মনোভাবে বাধা দান করিয়া বলিলেন, অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে কার্য্য চালাইবে। তাহাদের বস্তির নিকটবর্তী অবতরণ করিয়া প্রথমত: তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের কর্তব্য জ্ঞাত করিবে। তোমার দ্বারা একটি ব্যক্তিও আল্লার পথ প্রাপ্ত হইলে তাহা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হইতে অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

এইসব শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, জেহাদ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একটি নিছক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা; একমাত্র সংস্কারের উদ্দেশ্যেই জেহাদের বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহারই ফলে এক আশ্চর্য্যজনক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দীর্ঘ দশ বৎসর জীবন কালের মধ্যে ছোট বড় প্রায় একশত ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হয়; তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যুদ্ধের সংখ্যাও প্রায় সাতাশটি। এতগুলি যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয় নিহতদের সংখ্যা মাত্র দুই শতের উর্দ্ধে নহে। মদিনার বাসিন্দা বনু-কোরায়জা গোত্রের প্রাণদণ্ড তাহাদের আন্তর্জাতিক আইনগত মারাত্মক অপরাধের কারণে ছিল। মোসলমানদের ভয়াবহ বিপদের সুযোগে তাহারা সহঅবস্থানের সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মোসলমানদের নারী-শিশুদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়াছিল— এই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক স্থানেই জেহাদের পর যুদ্ধোত্তরকাল অপেক্ষা অধিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্তমান যুগের সভ্য জাতিগণের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধও লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বাসিন্দাদের প্রাণ-বলি হইয়া থাকে। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা কচিকাঁচা শিশুর প্রাণও রক্ষা পায় না, দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসে, যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিষময় পরিণাম—বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা ঘরে ঘরে স্থায়ীরূপে বিরাজমান দেখা যায়। এই শ্রেণীর সভ্যগণ জেহাদকে চোখের কাঁটারূপে দেখিবে এবং উহার প্রতি দোষারোপ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বস্তুতঃ ইহা তাহাদের হিংসাত্মক কার্য্যের মাপকাঠিতে সংস্কারমূলক কার্য্যকে পরিমাণ করার পরিণতি।

জেহাদের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে এই ঘোষণা জানাইয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ؕ

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের বিনিময়ে মোমেনগণের জান-মাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন। (এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয়-বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের এই ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে,) তাহারা (স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিয়া আল্লার দ্বীনদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে সংগ্রাম করিয়া যাইবে; (নিজের সর্বস্ব জান মাল সেই সংগ্রামে নিয়োগ করিয়া দিলেই বিক্রিত বস্তু ক্রেতার হস্তে সমর্পণ পরিগণিত হইবে।) অতঃপর তাঁহারা বিপক্ষকে হত্যা করুক বা নিজে শহীদ হউক; (উভয় অবস্থাতেই বিক্রিত বস্তু সমর্পণকারী গণ্য হইয়া উহার বিনিময় তথা বেহেশত লাভের অধিকারী হইয়া যাইবে। এবং এই বিনিময় প্রদান সম্পর্কে ক্রেতার তথা) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার (বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অঙ্গীকার আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত) তৌরাৎ কিতাব ও ইঞ্জিল কিতাব এবং কোরআন শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষাকারী আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা অধিক আর কে হইতে পারে?

হে মোমেনগণ! আল্লাহ তায়ালা'র সঙ্গে যেই ব্যবসা করার সুযোগ তোমরা পাইয়াছ সেই ব্যবসার সুসংবাদে তোমরা আনন্দিত হও (এবং অগ্রগামী হইয়া এই ব্যবসায় অবতীর্ণ হও;) বস্তুতঃ ইহা অতি বড় সাফল্য। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

১২৭৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا اَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ ـ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهٖ فَيُكْتَبُ لَهٗ حَسَنَاتٍ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—আমাকে এমন কোন আমলের সন্ধান দিন যাহা জেহাদের সমতুল্য হয়। হযরত (দ:) বলিলেন, এমন কোন আমল আমি পাইনা যাহা জেহাদের সমতুল্য হইতে পারে।

অত:পর হযরত (দ:) বলিলেন, মোজাহেদ (জেহাদে আত্মনিয়োগকারী) যখন হইতে জেহাদের জন্য যাত্রা করিল তখন হইতে (তাহার বাড়ী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত) তুমি মসজিদে অবস্থান করিয়া সর্বদা নামাযে লিপ্ত থাক, মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত না হও এবং রোযা রাখিতে থাক রোযা ভঙ্গ না কর—এইরূপ থাকিতে পার কি? সে বলিল, এমন কে আছে যে এই কার্য্যে সক্ষম হইবে?

আবু হোরায়রা (রা:) আরও বলিয়াছেন, মোজাহেদ ব্যক্তির ঘোড়া দড়িতে বাঁধা থাকাবস্থায় দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করিয়া থাকে ইহাতেও মোজাহেদের জন্য ছওয়াব লেখা হয়।

ব্যখ্যা:—মোজাহেদ ব্যক্তির উঠা-বসা, চল-ফেরা, আহার-নিদ্রা—প্রতিটি কার্য্য ও মুহূর্ত ছওয়াবে পরিণত হইয়া থাকে, তাই সর্বদার জন্য যে ব্যক্তি নামায রোযায় ব্রত হইতে পারে একমাত্র সে-ই মোজাহেদের সমকক্ষ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা সহজ সাধ্য নহে। কারণ, নামাযে আত্মনিয়োগকারী আহার-নিদ্রা মল মুত্র ত্যাগ ইত্যাদি নানা প্রকার অপরিহার্য্য লিপ্ততার দ্বারা নামায হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং সেই মুহূর্তগুলিতে সে ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। পক্ষান্তরে মোজাহেদ ব্যক্তির ঐ সব লিপ্ততা থাকে, কিন্তু সে নিজেকে জেহাদে উৎসর্গ করার পর হইতে তাহার সমস্ত কার্য্য এবং প্রতিটি মুহূর্ত ছওয়াবে পরিণত হইয়া যায়।

সর্বস্ব লইয়া জেহাদে আত্মনিয়োগকারী সর্বোত্তম

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ......

অর্থ—হে মোমেনগণ! আমি তোমাদিগকে একটি ব্যবসার সন্ধান দিব—যে ব্যবসা তোমাদিগকে (পরকালের) ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব হইতে পরিত্রাণ দান করিবে। (সেই ব্যবসা এই—) তোমরা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি ঈমানে দৃঢ় থাকিবে এবং আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জেহাদ—আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয় উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলময় ও কল্যাণজনক। (এই কার্য্যের অছিলায়) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং বেহেশতে প্রবেশাধিকার দান করিবেন যাহার মধ্যে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা স্বরূপ বাগ-বাগিচার মধ্যে ও অট্টালিকার সম্মুখে নদী-নালা প্রবাহিত থাকিবে এবং অনন্তকাল থাকিবার বেহেশতে মনোরম আবাস গৃহাদিতে স্থান দান করিবেন—ইহা অতি বড় সাফল্য। (২৮ পাঃ ১০ রুঃ)

১২৭৯। হাদীছঃ— عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه
قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ
فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ -

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, (সর্বোত্তম) ঐ মোমেন ব্যক্তি যে স্বীয় জান-মাল লইয়া আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে জেহাদে আত্মনিয়োগ করে। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কোন্ ব্যক্তি উত্তম? হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ মোমেন ব্যক্তি যে (ধর্মদ্রোহী পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাহাড়ী এলাকার (ন্যায় কোন নির্জন) স্থানে বসবাস অবলম্বন করে এবং তথায় খোদা-ভীরুতা ও খোদা-ভক্তির জিন্দেগী অতিবাহিত করিতে থাকে। সর্বসাধারণের (উপকারের সম্পর্ক বজায় রাখিতে না পারিলেও তাহাদের) অপকার পরিহার করিয়া চলে।

১২৮০। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ
وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ
لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهٖ بِاَنْ يَّتَوَفَّاهُ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ
اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহে তথা আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর মর্তবা এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি সদা-সর্বদা রোযা অবস্থায় থাকে এবং নামাযরত থাকে। অবশ্য কোন্ ব্যক্তির জেহাদ (খাঁটী ভাবে) আল্লার দ্বীনের জন্য হয় তাহা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপেই জানেন। আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ তায়ালা জামিন হইয়া আছেন—শহীদ হওয়া অবস্থায় তাহাকে (বিনা হিসাবে ও বিনা কষ্টে) বেহেশতের অধিকারী করিবেন, অথবা পূর্ণ ছওয়াব বা ধন-সম্পদ (ও ছওয়াব উভয়টি) প্রদান করতঃ ছালামতির সহিত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করিবেন।

জেহাদের সুযোগ ও শাহাদৎ লাভের দোয়া করা

ওমর (রাঃ) এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَالْمَوْتَ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

"হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র মদীনায় শহীদী মৃত্যুর সুযোগ দান কর।"

১২৮১। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওবাদা ইবনে ছামেৎ (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী আসিয়া থাকিতেন, তাঁহার স্ত্রী উম্মে-হারাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পানাহার দ্বারা সমাদর করিতেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন; উম্মে-হারাম (রাঃ) তাঁহাকে খাদ্যে আপ্যায়িত করিলেন এবং তাঁহার আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; তথায় তাঁহার নিদ্রা আসিয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) হাসিমুখে নিদ্রা হইতে উঠিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার উম্মতের একটি দল আল্লার রাস্তায় জেহাদের পথে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সন্তুষ্ট চিত্তে অতিক্রম করিয়া যাইবে উহার দৃশ্য আমাকে (স্বপ্নে) দেখান হইয়াছে। (জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহে তথা আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদে আমার উম্মতের উৎসাহের দৃশ্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি)।

এতচ্ছ্রবণে উম্মে হারাম (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঐ দলভুক্ত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনঃ নিদ্রা গেলেন। পুনরায় হাসিমুখে নিদ্রা হইতে উঠিলেন; এইবারও তিনি ঐরূপ আর একটি দলের দৃশ্য দেখার কথা প্রকাশ করিলেন। এইবারও উম্মে-হারাম (রাঃ) ঐ দলভুক্ত হওয়ার দোয়া চাহিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে হইবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। মোয়াবিয়া (রাঃ) শাসনকর্তার ব্যবস্থাপনায় একটি সৈন্যদল জেহাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম সমুদ্র পথে যাত্রা করে। উম্মে-হারাম (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওবাদাহ (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে সেই দলে ছিলেন এবং জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন পথে সমুদ্র অতিক্রম করার পর যানবাহন হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর মর্তবা

১২৮২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْجَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهٗ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ .... وَفَوْقَهٗ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছে, নামায পূর্ণ-রূপে আদায় করিয়াছে এবং রমযানের রোযা রাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। চাই সে জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকুক বা (জেহাদে অংশ গ্রহণ করার কোন সুযোগ না পাওয়ার দরুণ জেহাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া) স্বীয় জন্মভূমিতেই অবস্থান করিয়া থাকুক।

শ্রোতাগণ আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! লোকদিকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বেহেশতের মধ্যে (সাধারণ শ্রেণীর উর্দ্ধে) একশত শ্রেণী আল্লাহ তায়ালা জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের জন্য তৈরী রাখিয়াছেন। যাহার পারস্পরিক ব্যবধান আসমান-জমিনের ব্যবধান সমতুল্য।

তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট বেহেশত লাভের দোয়া কর তখন ফেরদৌস বেহেশতের দোয়া করিও, উহা বেহেশতের শ্রেণী সমুহের অন্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। উহার উর্দ্ধে একমাত্র মহান আরশ। ফেরদৌস বেহেশতই অন্যান্য বেহেশতসমুহে প্রবাহমান নহরগুলির উৎস।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য জেহাদের অনাবশ্যকতা প্রকাশ করা নহে, বরং নিজ ত্রুটি ব্যতিরেকে শুধু সুযোগ প্রাপ্তির অভাবে যে ব্যক্তি জেহাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া

যায় সেইরূপ ব্যক্তির নৈরাশ্যতা ও মনোবেদনা লাঘবের উদ্দেশ্যে এই হাদীছ ব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং সেই পরিস্থিতিতে যদিও সে বেহেশত হইতে বঞ্চিত না হয়, কিন্তু জেহাদের প্রতিদানে বেহেশতের যে উচ্চ শ্রেণী লাভ হয় উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে—এই বিষয়টিও এই হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

অল্প সময়ের জেহাদেও অনেক ছওয়াব

১২৮৩। হাদীছ:— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

অর্থ—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন অংশে বা শেষার্দ্ধের কোন অংশে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

ব্যাখ্যা:—উল্লেখিত হাদীছের দুই প্রকার তাৎপর্য্য হইতে পারে (১) আমাদের নিকট সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমস্ত ধন-সম্পদের মূল্য যে পরিমাণ, আল্লার নিকট ঐ অল্প সময়ের জন্য বাহির হওয়ার মূল্য তদপেক্ষা অধিক। (২) দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করিলে যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ হয়, অল্প সময়ের জন্য বাহির হওয়ায় তদপেক্ষা অধিক ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

১২৮৪। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের এক ধনু পরিমাণ (তথা সামান্য) অংশ সমগ্র বিশ্বের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। নবী (দ:) আরও বলিয়াছেন, দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন সময়ে বা শেষার্দ্ধের কোন সময়ে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমগ্র বিশ্বের ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

১২৮৫। হাদীছ:— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনের শেষার্দ্ধের কোন সময় এবং (তদ্রূপ) দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন সময় আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১২৮৬। হাদীছঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلَّا الشَّهِيْدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ يَسُرُّهُ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرَى... لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْغَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ يَعْنِىْ سَوْطَهٗ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নেয়ামত সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ সে মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে—যদিও তাহাকে সমগ্র জগৎ ও উহার সমস্ত ধন-সম্পদ দেওয়া হইবে বলা হয়। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি ইহার বিপরীত—তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল প্রকার নেয়ামত সামগ্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে। কারণ, শহীদ হওয়ার মর্তবা ও ফজিলত দেখিতে পাইয়া সে ভালবাসিবে যে, পুনঃরায় দুনিয়াতে আসিয়া শহীদ হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

শুধু মাত্র দিনের শেষার্দ্ধে বা প্রথমার্দ্ধে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া দুনিয়া ও উহার ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। বেহেশতের এক ধনুক বা এক চাবুক পরিমাণ তথা সামান্যতম অংশ সমগ্র দুনিয়ার ও দুনিয়ার সামগ্রী অপেক্ষা উত্তম।

বেহেশতের কোন একজন রমণী যদি জগদ্বাসীদের প্রতি শুধু উকি দেয়, তবে আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী সমস্ত বিশ্বকে সুবাসে পরিপূর্ণ করিয়া দিবে এবং তাঁহার মাথার ওড়না সমস্ত জগৎ ও জগতের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা রাখা :

১২৮৭। হাদীছ :— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَا اَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যেই জেহাদে বাহির হইব প্রত্যেক মোমেনই সেই জেহাদে অংশ গ্রহণে উদগ্রিব হইয়া পড়িবে—আমার পিছনে বাড়ী থাকিতে কেহই তুষ্ট হইবে না, অথচ আমি প্রত্যেককে জেহাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করায় সক্ষম নহি; (এমতাবস্থায় অনেকেই মর্মাহত হইবে—শুধু) এই ভয়ে আমি কোন কোন সময় জেহাদে যাওয়া হইতে ক্ষান্ত থাকি, নতুবা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, জেহাদে যাত্রী প্রত্যেক দলের সঙ্গেই আমি যাত্রা করিতাম।

আমি ঐ মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে আমার প্রাণ—আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, আমি আল্লার রাস্তায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং পুনরায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং পুনরায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং শহীদ হই।

আল্লার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে

আল্লার পথে অর্থাৎ কোন নেক ও দ্বীনের কাজ সম্পাদনে বাহির হইয়াছে—যেমন, জেহাদের নিয়্যতে বাহির হইয়াছে অতঃপর সেই কাজে নয়, বরং কোন দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে মৃত্যুবরণকারী গণ্য হইবে।

১২৮১নং হাদীছের ঘটনায় আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খালা—উম্মে-হারাম (রাঃ) স্বামীর সহিত এক জেহাদে গিয়াছিলেন। সেই জেহাদের ঘটনায় নয়, বরং যানবাহন হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি উক্ত জেহাদে মৃত শহীদ গণ্য হইয়াছেন।

এমনকি সেই কার্য্য সম্পাদনের পূর্বে বরং সেই কার্য্যের স্থান ও ক্ষেত্রে পৌঁছিবার পূর্বেও যদি কোন দুর্ঘটনায় বা কোন রোগে তাহার মৃত্যু হয় তবুও সে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিবে। কোরআন শরীফে আছে —

وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ

যখন মক্কা নগরীতে ইসলাম ছিল না, নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, মক্কায় থাকিয়া ইসলাম প্রকাশ করা এবং দ্বীন ইসলামের কোন কাজ করা সহজসাধ্য ছিল না; তখন মক্কাস্থিত কোন মানুষ মোসলমান হইতে চাহিলে তাহার উপর ফরজ ছিল মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসা। হিজরত করায় সামর্থবান ব্যক্তির হিজরত না করার ভয়াবহ পরিণতি ও উহার জন্য জাহান্নামের আজাবের বয়ান কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। বর্তমানেও কোন পরিবেশে তৎকালীন মক্কার ন্যায় অবস্থা হইলে তথা হইতে মোসলমানের হিজরত করা ফরজ। উল্লিখিত বিষয় বর্ণনা উপলক্ষে পবিত্র কোরআনে আলোচ্য আয়াতটি রহিয়াছে। যাহার অর্থ—"যে ব্যক্তি নিজ বাড়ী হইতে বাহির হয় আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে; অতঃপর (পথি মধ্যে) আসিয়া পড়ে তাহার উপর মৃত্যু; তাহার হিজরতের ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লার নিকট নিশ্চয় সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে"।

আল্লার রাস্তায় কোন আঘাত লাগিলে?

১২৮৮। হাদীছ:— জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন জেহাদ অভিযানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আঙ্গুল আঘাত প্রাপ্তে রক্তাক্ত হইয়া গেল। হযরত (দঃ) আঙ্গুলটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ত একটি আঙ্গুলই মাত্র, রক্তাক্ত হইয়াছ। (আল্লার রাস্তায় আমার সর্বস্বইত উৎসর্গ;) তোমার যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা আল্লার রাস্তায়ই লাগিয়াছে (ইহা নিষ্ফল যাইবে না)।

১২৮৯। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি—যে কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হইবে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এমতাবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার আঘাত হইতে রক্ত প্রবাহিত

হইতে থাকিবে। সেই রক্ত শুধু বর্ণে রক্ত হইবে, কিন্তু (দুর্গন্ধের পরিবর্তে) মেশকের সুগন্ধিময় হইবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা খুব ভালরূপেই জানেন যে, কোন্ ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে আল্লার রাস্তায় আঘাত পাইয়াছে। (বহু লোক নানা প্রসঙ্গে বা স্বীয় কোন স্বার্থ হাসিল প্রসঙ্গে জেহাদে যায় এবং আঘাত পাইয়া থাকে উহার এই ফজিলত নহে।)

জেহাদে আত্মনিয়োগকারী মোসলমানের উভয় অবস্থাই উত্তম

অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জীবন অবলম্বনকারী মোসলমানের কোন অবস্থাই তাহার পক্ষে ক্ষতি ও মন্দ হয় না। এই সংগ্রামে যদি সে প্রাণ হারায় তবে সে হয় শহীদ—যাহার বদৌলতে সে লাভ করিবে জীবনের চরম ও চির সাফল্য। আর যত দিন সে সেই সংগ্রামী জীবনে বাঁচিয়া থাকিবে—থাকিবে সে গাজী হইয়া। যাহার বদৌলতে তাহার প্রতিটি মূহূর্ত নেক কাজে ব্যয়িত গণ্য হইবে, এমনকি তাহার নিদ্রাবস্থার মুহূর্ত-গুলিও। এই তথ্যটির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

অর্থাৎ—কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনের প্রতিউত্তরে তোমরা বল যে, তোমরা আমাদের দুইটি উত্তম অবস্থারই একটির আশায় রহিয়াছ।" (১০ পাঃ ১৩ রুঃ)

আল্লার পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পণ করিলে?

কেহ যদি পণ করে, আল্লার পথে প্রাণ দিবে—যদি কোন ক্ষেত্রে তাহার শহীদ হওয়া ভাগ্যে জুটিয়া যায় তবে তাহার পণ সিদ্ধ হইলই। যদি সেরূপ না-ও হয়, কিন্তু সে নিজকে সর্বদা আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে; যেন সে তাহার পণকে বাস্তবায়িত করায় প্রতীক্ষমান ও উপস্থিত রহিয়াছে সেও স্বীয় পণে সিদ্ধি লাভকারী গণ্য হইবে, এমনকি যদিও সে ঐ অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুতেই পতিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ - وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণ হইতে যে সব ছাহাবী বাদ পড়িয়াছিলেন তাঁহারা পণ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সম্মুখে জেহাদের সুযোগ আসিলে আমাদের জীবন উৎসর্গ করার দৃশ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দেখিতে পাইবেন। অনধিককালের মধ্যেই তাঁহাদের সম্মুখে ওহোদের জেহাদ উপস্থিত হইল। তখন ঐ পণকারীদের কেহ কেহ শত্রুদের প্রতি

অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিতে এমন ভয়াবহ অবস্থায়ও দৃঢ়পদ রহিলেন যে ক্ষেত্রে অগ্রগামী না হইয়া আশ্রয়গামী হওয়ার অনুমতি শরীয়ত অনুযায়ীও রহিয়াছে। যেমন পাঁচশত শত্রুর মোকাবেলায় একা একজনের অগ্রাভিযান। কোন কোন ছাহাবী ঐরূপ অবস্থায়ও দ্বিধা না করিয়া সম্মুখে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং শহীদ হইলেন। কেহ কেহ ঐরূপ অস্বাভাবিক কার্য্য অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ শহীদ হইয়া যাওয়াকে এড়াইয়া গিয়া স্বাভাবিক গতিবিধি অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ঐ রণাঙ্গণে এবং পরবর্তী জীবনেও সর্বদা নিজেদের পণকে সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া চলিয়াছেন; কখনও উহা হইতে বিচ্যুত বা অবহেলাকারী হন নাই। উভয় শ্রেণীকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের নিজ পণে সত্যবাদী আখ্যায় প্রসংশা করতঃ উক্ত আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যাহার অর্থ—"খাঁটী মোমেনদের অনেক লোক—তাহারা সত্য প্রমাণিত করিয়া দেখাইল নিজেদের পণকে—যেই পণে তাহারা আল্লার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের এক শ্রেণী ত নিজ পণের বাস্তবায়নে প্রাণকেই বিসর্জন দিয়া দিয়াছে; অপর শ্রেণী তাহারাও নিজ পণের বাস্তবায়নকে চুড়ান্তে পৌঁছাইবার প্রতীক্ষায় উপস্থিত রহিয়াছে—স্বীয় পণে বিন্দুমাত্রও রদ-বদল করে নাই, শিথিল হয় নাই।"

জেহাদের পূর্বে নেক আমল করা

প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবুদ-দরদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নেক আমল সমুহের বদৌলতে যুদ্ধে (বিজয় ও পদ-স্থিতি লাভে) সক্ষম হইতে পারিবে।

১২৯০। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি জেহাদে যাত্রা করিব, না—প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর অতঃপর জেহাদে অংশ গ্রহণ কর। ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিল তৎপর জেহাদে শরীক হইল এবং শহীদ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার সম্পর্কে বলিলেন, অল্প (সময়) আমল করিয়াছে, কিন্তু অনেক ছওয়াব লাভ করিয়াছে।

কাফের পক্ষের আকস্মিক আঘাতে নিহত হইলে

১২৯১। হাদীছঃ—হারেছা ইবনে সুরাকাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র হারেছা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; হারেছা (রাঃ) কম বয়স্ক যুবক; দর্শকরূপে জেহাদের ময়দানে দাঁড়ান ছিলেন, শত্রুপক্ষীয় একটি আকস্মিক-তীর বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। (যেহেতু তিনি যুদ্ধে নিহত হন নাই, তাই) তাঁহার মাতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! হারেছার প্রতি আমার কিরূপ মায়া-মমতা তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি আমার নিকট তাহার অবস্থা বর্ণনা করুন, যদি

(আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে,) সে বেহেশত লাভ করিয়াছে তবেত আমি (তাহার অসীম সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ধৈর্য্য ধারণ করিব, নতুবা (ধৈর্য্যহারা হইয়া) আমার ক্রন্দনের সীমা থাকিবে না। হযরত (দঃ) তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে ? বেহেশতের বিভিন্ন শ্রেণী আছে, তোমার ছেলে হারেছা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী—:ফেরদাউস-:বেহেশত লাভ করিয়াছে।

প্রকৃত জেহাদ

১২৯২। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله عنه جاء رجل الى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِى سَبِيْلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللهِ -

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোন ব্যক্তি গণীমতের ধন লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, কোন ব্যক্তি সুনাম অর্জন ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি স্বীয় বীরত্ব দেখাইবার জন্য যুদ্ধ করে (ইত্যাদি ইত্যাদি)। কোন্ ব্যক্তির জেহাদকে ফি-ছাবি-লিল্লাহ বলিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে আল্লার কলেমাকে উচু করার ও উচু রাখার উদ্দেশ্যে একমাত্র তাহার যুদ্ধই জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা :—"আল্লার কলেমা"-এর উদ্দেশ্য তৌহিদ একত্ববাদ তথা দ্বীন-ইসলাম। উচু রাখার অর্থ উহার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, সারা বিশ্বে উহার প্রসার লাভের বাধা-বিপত্তি ও অন্তরায় অপসারিত করা ইত্যাদি।

আল্লার রাস্তায় যাহার পা ধুলা মাখিবে

কোরআন শরীফে আছে—

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ........

অর্থ—মদীনা ও তৎসংলগ্নস্থ এলাকার কোন (মোসলমান) ব্যক্তির জন্য এইরূপ করা সঙ্গত ও সমীচীন নহে যে, আল্লার রসুল জেহাদের জন্য যাত্রা করার পর সে তাঁহার

সঙ্গে না যাইয়া বাড়ী বসিয়া থাকে এবং ইহাও বিধান সম্মত নহে যে, আল্লার রসুলের জান অপেক্ষা নিজের জানের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখে। আল্লার রসুলের সঙ্গে জেহাদে যাত্রা করার আদেশ এই জন্য যে, (ইহা তাহাদের জন্যও মঙ্গলজনক। কারণ,) আল্লার (দ্বীনের জন্য জেহাদের) রাস্তায় যে কোন রকম পিপাসা-যাতনা হইলে এবং ক্লান্তি আসিলে এবং ক্ষুধার যাতনা হইলে এবং কাফেরদিগকে অসন্তুষ্টকারক অভিযানে অগ্রসর হইলে এবং কাফেরদের যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিলে তাহাদের জন্য এক একটি নেক আমল লেখা হইবে। আল্লাহ তায়ালা নেককারগণকে প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না। এবং জেহাদের পথে তাহারা অধিক বা অল্প যে কোন প্রকার ব্যয় করিলে এবং (ধুলা-বালুর বা পাথর-কাঁকরের উপর দিয়া) পায়ে হাটিয়া রাস্তা অতিক্রম করিলে তাহাদের জন্য ইহা লিখিয়া রাখা হইবে—আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাহাদের এইসব নেক আমলের প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যে। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

১২৯৩। হাদীছঃ— عن عبد الرحمن بن جبر رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ-

অর্থ—আবদুর রহমান ইবনে জবর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন বন্দার পদদ্বয় আল্লার রাস্তায় ধুলা মাখিবে অতঃপর ঐ বন্দাকে দোযখ স্পর্শ করিবে এরূপ কখনও হইবে না।

শহীদের ফজিলত ও মর্তবা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন (৪ পাঃ ৮ রুঃ)—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا......

অর্থ— আল্লার রাস্তায় যাঁহারা প্রাণ দিয়াছে তাঁহাদিগকে মৃত ধারণা করিও না; (তাঁহারা মৃত নয়,) বরং তাঁহারা জীবিত; স্বীয় প্রভুর নিকট তাঁহারা খাদ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে যে মর্তবা দান করিয়াছেন উহাতে তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল এবং তাঁহাদের যে সব বন্ধু-বান্ধব এখনও (ইহজগৎ ত্যাগ করতঃ) তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা এই ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন যে, (তাহারাও আমাদের ন্যায় শহীদ হইলে) তাহাদের জন্য কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকিবে না এবং তাহারা কোন প্রকার ভাবনা-চিন্তায় পতিত হইবে না।

শহীদগণ আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করিয়া এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেনগণের প্রতিদান নষ্ট করেন না—ইহা বাস্তবে রূপায়িত দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

১২৯৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিরে-মাউনার ঘটনায়ক শহীদগণের সম্পর্কে কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত নাজেল হইয়াছিল—

بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমাদের বংশধরকে ওজাফিকে দাও, আমরা প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; আমরাও তাঁহার দানে আনন্দিত হইয়াছি।" অতঃপর উক্ত আয়াতটির তেলাওয়াত মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে।

শহীদের উপর ফেরেশতাগণ কর্তৃক ছায়া প্রদান

১২৯৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবহুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন, কাফেররা তাঁহার মৃত দেহের নাক কান কাটিয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাঁহার মৃতদেহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। আমি বার বার তাঁহার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করিয়া দেখিতেছিলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে বাধা প্রদান করিতেছিল।

ঐ সময় নবী (দঃ) ক্রন্দনরতা একটি নারীর শব্দ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কাঁদিতেছে? আমরের মেয়ে বা আমরের ভগ্নি বলিয়া উক্তি করা হইল। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, কাঁদ কেন? (সে ত অতি বড় মর্তবা লাভ করিয়াছে;) মৃত্যুস্থল হইতে উঠাইয়া না আনা পর্য্যন্ত ফেরেশতাগণ ডানা দ্বারা তাহাকে ছায়া প্রদান করিতেছিলেন।

শহীদ ব্যক্তি তুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে অভিলাষী

১২৯৬। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, বেহেশতে প্রবেশের পর তুনিয়ার প্রতি ফিরিয়া আসার অভিলাষী হয় যদিও তাহাকে তুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়া দেওয়া হইবে বলা হয়। একমাত্র শহীদ ব্যক্তিই এইরূপ যে, সে (পুনঃ পুনঃ এমনকি) দশ বার তুনিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া শহীদ

ক "বিরে-মাউনা" একটি বস্তির নাম। তথায় সত্তর জন ছাহাবী কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতায় শহীদ হইয়াছিলেন। উহার ইতিহাস বিস্তারিতরূপে জেহাদসমূহের বিবরণে বর্ণিত হইবে।

হওয়ার আকাঙ্খা করিয়া থাকে, ঐ মর্তবা পুনঃ পুনঃ হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাহা সে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতেছে ও অনুভব করিতেছে।

তরবারীর ছায়াতলে বেহেশত

● মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) কোন ঘটনায় বলিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে শাহাদৎ বরণকারী অবশ্যই বেহেশত লাভ করিবে।

● ওমর (রাঃ) এক ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শীথিল হইব কেন ? কাফেরদের সঙ্গে সংগ্রামে) আমাদের মৃতগণ বেহেশতে এবং তাহাদের মৃতরা নরকে যাইবে না কি ? নবী (দঃ) দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, নিশ্চয় এইরূপই হইবে।

১২৯৭। হাদীছ :— كتب عبد الله بن ابى اوفى رضى الله عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় বেহেশত তরবারীর ছায়াতলে। অর্থাৎ আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদ করিলে বেহেশত লাভ অনিবার্য্য।

অসাহসীকতা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা

১২৯৮। হাদীছ :— প্রসিদ্ধ ছাহাবী সায়াদ (রাঃ) স্বীয় ছেলে-মেয়েদিগকে নিম্নের দোয়াটি বিশেষ যত্নের সহিত শিখাইয়া থাকিতেন ; যেরূপ শিক্ষক ছাত্রগণকে লেখা-পড়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তিনি বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযান্তে এই দোয়াটি পড়িয়া থাকিতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, সাহসহারা দুর্বলচেতা হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি—জ্ঞান, চেতনা ও বোধশক্তি বিহীন বয়সে পতিত হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, দুনিয়ার ফেৎনা (তথা দুনিয়ার লোভ-লালসা, প্রেম-আসক্তি ও মোহে লিপ্ত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া) হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, কবরের আজাব হইতে।

১২৯৯। হাদীছঃ— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নিষ্কর্মন্যতা হইতে, অলসতা দুর্বলতা সাহসহীনতা হইতে এবং শক্তি, সামর্থ্য, সচ্ছলতা ও চেতনা বোধহীন বয়স হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি জাগতিক জীবনে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং মৃত্যুকালে (কলেমা নছীব না হওয়া ইত্যাদির ন্যায়) বা মৃত্যুর পর (কবরে মোনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে) সঠিক পথ বিচ্যুত হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে।

জেহাদে অংশগ্রহণ ঘটনা বর্ণনা করা

অর্থাৎ—জেহাদ ইত্যাদি কোন নেক আমলে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ হইয়াছে; সেই বিষয় লোকদের নিকট আলোচনা করা—ইহাতে যদি খ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হয় তবেত তাহা নাজায়েয। আর যদি ঐরূপ খারাপ উদ্দেশ্য না থাকে, কিন্তু কোন উপকারী উদ্দেশ্যও নাই, তবে ঐ আলোচনা নাজায়েয নয়, কিন্তু ভাল নহে। আর যদি ঐ আলোচনার উদ্দেশ্য এই হয় যে, আলোচনা শুনিয়া শ্রোতা ঐ নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তবে তাহা উত্তম গণ্য হইবে। অবশ্য অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐরূপ আলোচনা পরিহার করিয়াই চলেন, যেন খ্যাতি অর্জনের কোনরূপ ধারণা অন্তরে স্থান করিয়া ছওয়াব বিনষ্ট না করে।

১৩০০। হাদীছঃ—সায়েব ইবনে এযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তালহা (রাঃ), সা'দ (রাঃ) আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীগণের প্রত্যেকের সাহচর্যেই থাকিয়াছি। (তাঁহারা সকলেই ওহোদ জেহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, কিন্তু) একমাত্র তালহা (রাঃ)কেই শুনিয়াছি—তিনি ওহোদ জেহাদের ঘটনার বর্ণনা দিতেন।

জেহাদে অংশ গ্রহণ বা উহার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ......

অর্থ—আল্লার দ্বীনের পথে বাহির হইয়া পড়; ছামান অল্প থাকুক বা বেশী থাকুক। জেহাদ কর আল্লার পথে মাল এবং জান দ্বারা—একমাত্র ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল রহিয়াছে; যদি তোমরা জ্ঞানী হও তবে ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিবে (১০ পাঃ ১২ রুঃ)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! বড়ই পরিতাপের বিষয়—তোমাদিগকে আল্লার পথে বাহির হইবার আদেশ করা হইলে তোমরা স্ফুর্তির সহিত ধাবিত হও না—উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাও না। তোমরা কি পর-জীবনের তুলনায় জাগতিক জীবনকে বেশী ভালবাস? স্মরণ রাখিও, জাগতিক জীবন পর-জীবনের তুলনায় তুচ্ছ।

১৩০১। হাদীছ:— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এই ঘোষণা করিলেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা নগরী দারুল-ইসলাম হইয়াছে, মক্কা হইতে) আর হিজরত করিতে হইবে না, কিন্তু (এখন যদিও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবুও জেহাদের সমাপ্তি হয় নাই, এখনও) জেহাদ এবং সুযোগ সাপেক্ষ জেহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ এবং যখনই আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়ার প্রতি আহ্বান আসিবে তখনই ধাবিত হইতে হইবে।

কাফের ব্যক্তি কোন মোসলমানকে শহীদ করিয়াছে অতঃপর সে মোসলমান হইয়া শহীদ হইয়াছে:

১৩০২। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট যাহাদের একজন মোসলমান অপর জন কাফের; মোসলমান ব্যক্তি আল্লার দ্বীনের জন্য কাফের ব্যক্তির সঙ্গে জেহাদে শাহাদৎ বরণ করেন। অতঃপর কাফের ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের তৌফিক দান করেন অতঃপর সেও আল্লার রাস্তায় জেহাদে শহীদ হয়।

১৩০৩। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "খয়বর" এলাকা জয় করতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় থাকাবস্থায় আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, আমাকে গণিমতের মালের কিছু অংশ প্রদান করুন। আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তাহাকে কিছু দিবেন না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার প্রতি কটাক্ষ করতঃ বলিলেন, এই ব্যক্তিই ইবনে কাওকাল (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিল। (আবান ইবনে সায়ীদ ওহোদের জেহাদকালে কাফেরদের দলে ছিলেন এবং তখন ইবনে কাওকাল (রাঃ) তাঁহারই হাতে শহীদ হইয়াছিলেন; আবু হোরায়রা (রাঃ) সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই আবান ইবনে সায়ীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি কটাক্ষ করিলেন।)

আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ) এই কটাক্ষের প্রতিউত্তরে আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি তিরস্কার দিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আবু হোরায়রার ন্যায় ব্যক্তি আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছে এক মোসলমান ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে—যাহাকে আল্লাহ তায়ালা আমার কার্য্যের অছিলায় অতি বড় মর্তবা দিয়াছেন; (তিনি আমার হাতে নিহত হওয়ায় শাহাদৎ লাভ করিয়াছেন) এবং আমাকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করতঃ চির লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইয়াছেন। (কারণ, তখন আমি কাফের ছিলাম; যদি আমি তখন নিহত হইতাম তবে চিরতরে নরকবাসী হইতাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমি জীবিত থাকায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছি।)

জেহাদের জন্য নফল রোযা ত্যাগ করা

১৩০৪। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তালহা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সর্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকার দরুন নফল রোযা রখিতেন না। হযরত (দঃ) যখন ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন তখন আবু তালহা (রাঃ)কে রোযাহীন অবস্থায় কখনও আমি দেখি নাই, শুধু রমজানের ঈদ ও কোরবানীর ঈদের (এবং উহার সংশ্লিষ্ট) দিন ব্যতীত।

জেহাদ ব্যতিরেকেও শাহাদতের ছওয়াব

১৩০৫। হাদীছ:— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم
قَالَ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্লেগ রোগে মৃত্যু প্রত্যেক মোসলমানদের জন্য শহীদের মৃত্যু গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রথম খণ্ডের ৩৯৭নং হাদীছও এখানে উল্লেখ হইয়াছে। সেই হাদীছে পাঁচ প্রকারের শহীদ বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফৎহুল বারী" কিতাবে বিভিন্ন হাদীছের প্রমাণে আরও অনেক প্রকারের শহীদ বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে এই শ্রেণীর শহীদের সমষ্টির বিবরণ দান করা হইল।

(১) প্লেগাক্রান্তে মৃত্যু, (২) কলেরা উদরাময়ে মৃত্যু, (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু, (৪) চাপা পড়িয়া মৃত্যু, (৫) অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যু, (৬) নিমুনিয়া আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু, (৭) সন্তান প্রসব সংক্রান্তে স্ত্রীলোকের মৃত্যু, (৮) স্বীয় ধন-সম্পদ রক্ষা সম্পর্কীয় সংগ্রামে মৃত্যু, (৯) স্বীয় প্রাণ রক্ষার সংগ্রামে মৃত্যু, (১০) স্বীয় পরিবারবর্গকে রক্ষা করার সংগ্রামে মৃত্যু, (১২) অত্যাচার হইতে রক্ষা প্রাপ্তির সংগ্রামে মৃত্যু, (১৩) জেহাদের জন্য যাত্রাপথে যে কোন প্রকারের মৃত্যু, (১৪) বিদেশে মৃত্যু, (১৫) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদান অবস্থায় মৃত্যু, (১৬) সর্প দংশনে মৃত্যু, (১৭) দমবন্ধ হইয়া মৃত্যু (১৮) হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু, (১৯) যানবাহন হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু, (২০) সমুদ্রপথে সমুদ্র-তরঙ্গে দোলায়মান হওয়ার দরুন মাথায় চক্র, উদগিরণ ইত্যাদি উপসর্গে মৃত্যু, (২১) যে ব্যক্তি বাস্তব ও খাঁটীরূপে আল্লার রাস্তায় জেহাদে শাহাদৎ লাভের সন্ধানী হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার প্রার্থনা করিতে থাকিবে এবং এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জেহাদ ব্যতিরেকেই শহীদের মর্তবা দান করিবেন।

জেহাদের সামর্থহারা হইলে

১৩০৬। হাদীছ:—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই আয়াতটি নাযেল হইল—
لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, যায়েদকে ডাকিয়া দাও; সে যেন (লিখিবার জন্য) দোয়াত এবং কাষ্ঠপত্র সঙ্গে আনে। তিনি আসিলে পর নবী (দঃ) বলিলেন, লিখ—......لا يستوى القاعدون "মোমেনগণের মধ্য হইতে যাহারা বসিয়া থাকে আর যাহারা আল্লার পথে জেহাদ করে—উভয়ে সমপর্য্যায়ের হইতে পারিবে না।" ঐ সময়ে অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লামের পিছনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি? আমি অন্ধ মানুষ। তখন উক্ত আয়াতটির স্থলে (অতিরিক্ত একটি বাক্যের সহিত) এইরূপে আয়াত নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ

ব্যাখ্যা:—এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম (রা:) অন্ধ ছাহাবীর উল্লিখিত প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আয়াতের মধ্যে যেহেতু গম্ভীরভাবে জেহাদ হইতে বসিয়া থাকার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, সুতরাং আমি অন্ধের প্রতিও যদি আপনার আদেশ হয় তবে আমি সাধ্য মোতাবেক জেহাদে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত আছি। এইরূপ প্রস্তুতিই মোমেন ও মোসলমানের পরিচয়। আয়াতটির তরজমা সম্মুখে রহিয়াছে।

১৩০৭। হাদীছ:—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা:) ছাহাবী যিনি কোরআনের আয়াত নাযেল হইলে উহা লিখিয়া রাখার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে সদ্য অবতারিত এই আয়াতটি লিখিতে বলিলেন,

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

যায়েদ (রা:) একটি অস্থি বা হাড়ের উপর আয়াতটি লিখিয়া লইলেন। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মকতুম (রা:) অন্ধ ছাহাবী হযরতের সম্মুখে আসিলেন এবং দৃষ্টিহীনতার ওজর পেশ করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি যদি (অন্ধ না হইতাম এবং) জেহাদ করিতে সক্ষম হইতাম তবে আমি নিশ্চয় জেহাদে যাইতাম। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জেহাদে আত্মনিয়োগকারী নয় এইরূপ লোককে নিম্নস্তরের বলিয়াছেন, অথচ আমি ত অক্ষম।) তৎক্ষণাৎ উক্ত আয়াতের মধ্যস্থলে অতিরিক্ত একটি শব্দ— غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ "অক্ষম ব্যতিরেকে" (সংযোজিত করিয়া পুন: আয়াতটি) নাযেল হইল।

(যায়েদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন,) যখন অতিরিক্ত শব্দটির সহিত আয়াত নাযেল হইতেছিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুর কিয়দাংশ আমার উরুর উপর ছিল, যদ্দরুন আমার উপর এত অধিক ওজনের চাপ পড়িল যে, মনে হইতেছিল যেন আমার উরু বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আলোচ্য আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এই—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ...

অর্থ—মোমেনগণের মধ্যে যাহারা বাড়ী বসিয়া থাকে কোন প্রকার অক্ষমতা ব্যতিরেকে এবং যাহারা জান মাল দ্বারা আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগ করে উভয়ে সমপর্য্যায়ের গণ্য হইবে না। স্বীয় জান-মাল ব্যয় করত: জেহাদে আত্মনিয়োগকারীগণকে বাড়ীতে

অবস্থানকারীদের উপর অধিক মর্য্যাদা ও মর্তবা দান আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য (মোমেন হওয়ার দরুন) উভয়ের জন্যই আল্লাহ তায়ালা উত্তম অবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, জেহাদে আত্মনিয়োগকারীগণকে বাড়ীতে অবস্থানকারীদের তুলনায় অতি বড় প্রতিদান লাভের প্রযোগ্যতা দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা উচ্চ শ্রেণী এবং বিশেষ ক্ষমার সুযোগ এবং স্বীয় বিশেষ কৃপা দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী দয়ালু। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

জেহাদে ধৈর্য্য ধারণ করা

১৩০৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা যখন কাফেরদের মোকাবেলায় সংগ্রামে অবতরণ কর তখন বিশেষরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিও।

জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী! মোমেনগণকে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন।"

১৩০৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ খন্দকের জেহাদে শত্রুর আক্রমণ পথে পরিখা খনন কার্য্য চলিতেছিল।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিখা খনন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ হীমবান প্রভাতে, অনাহারী অবস্থায় খনন কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের কোন চাকর-নকর এমন ছিল না যাহারা সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। ছাহাবীগণের কষ্ট-ক্লেশ ও ক্ষুধার যাতনা দেখিতে পাইয়া হযরত (দঃ) তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে একটি ছন্দ পাঠ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ ـ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ আখেরাতের সুখ-শান্তিই বাস্তব সুখ শান্তি; আনছার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা ক্ষমা করতঃ তাহাদের আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দাও।" ছাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্তির স্বরে অপর একটি ছন্দের দ্বারা উহার প্রতিউত্তর দান করিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ـ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা সেই বীরগণ যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি—জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সর্বদা দ্বীনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাইব।

চেষ্টা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতার দরুণ জেহাদে যাইতে না পারিলে

১৩১০। হাদীছ:— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ভীষণ কষ্ট, ক্লেশ ও দুর পাল্লার জেহাদ—) তবুকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বলিলেন, একদল লোক যাহারা মদীনাতেই রহিয়া গিয়াছে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই; আমরা যে কোন পথ বা ময়দান অতিক্রম করিয়াছি প্রত্যেক স্থানেই তাহারা (ছওয়াবের দিক দিয়া) আমাদের সঙ্গী পরিগণিত হইরাছে। তাহারা ঐ ব্যক্তিগণ যাহাদের অতি প্রবল আগ্রহ, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতা তাঁহাদেরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

জেহাদ-পথে রোযার ফজিলত

১৩১১। হাদীছ:— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফি-ছাবি লিল্লাহ একদিন (নফল) রোযা রাখিবে; সেই একটি মাত্র রোযার ফজিলত এত অধিক যে, উহার বদৌলতে দোযখ হইতে দীর্ঘ সত্তর বছরের দূরত্ব লাভ হইবে।

ব্যাখ্যা:— ফি-ছাবি-লিল্লাহ রোযা রাখার অর্থ কোন কোন আলেম এই বলিয়াছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, জেহাদ অবস্থায় রোযা রাখা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে উক্ত হাদীছে বর্ণিত ফজিলত শুধু ঐ অবস্থায় হাসিল হইবে যখন রোযার দরুণ জেহাদের মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা, ত্রুটি ইত্যাদি আসিবার আশঙ্কা না থাকে। নতুবা জেহাদ অবস্থায় রোযা রাখার অনুমতি নাই।

গাজীকে পথের ছামান দেওয়া বা তাঁহার বাড়ী-ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ফজিলত

১৩১২ হাদীছ:— حدث زيد بن خالد رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ـ

অর্থ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদে অংশ গ্রহণকারী—গাজীকে যে ব্যক্তি আসবাবপত্র সরবরাহ করিবে সেই ব্যক্তি জেহাদ করার ফজিলত লাভ করিবে এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদে অংশ গ্রহণকারী—গাজীর অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা যে ব্যক্তি করিবে সে জেহাদ করার ফজিলত লাভ করিবে।

১৩১৩। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় বিবিগণের আবাসগৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে অধিক যাতায়াত করিতেন না, কিন্তু উম্মে-সোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে অধিক আসা-যাওয়া করিতেন এবং বলিতেন, তাহার প্রতি আমার বড়ই দয়া হয়, যেহেতু তাহার ভ্রাতা আমার সঙ্গে জেহাদে যাইয়া শহীদ হইয়াছে।

জেহাদে উপস্থিতি লগ্নে হানুত ব্যবহার করা

"হানুত" এক প্রকার বিশেষ সুগন্ধি যাহা সাধারণতঃ শুধু মাত্র মৃতকে তাহার কাফন-দাফন কালে লাগাইয়া দেওয়া হয়। জেহাদের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিতি কালে উহা ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, জেহাদে যাইতে মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

১৩১৪। হাদীছ :—(আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ আমলে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার মোসায়লেমা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে মোসলমানদের এক ভয়বাহ ঐতিহাসিক যুদ্ধ 'ইয়ামামাহ' নামক এলাকায় হইয়াছিল।) মুছার পুত্র আনাছ (রা:) সেই যুদ্ধের আলোচনা উপলক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন. (ঐ দিন) আনাছ (রা:) ছাবেৎ ইবনে কায়স (রা:) ছাহাবীর নিকট আসিলেন ; ছাবেৎ (রা:) ঐ সময় "হানুত" শরীরে লাগাইতে ছিলেন। আনাছ (রা:) তাঁহাকে বলিলেন, কি বাধার কারনে আপনি এখনও রণাঙ্গণে আসিতেছেন না। তিনি বলিলেন, হে বৎস! এখনই আসিতেছি। তখন তিনি "হানুত" লাগাইবার কাজ সম্পন্ন করিতে ছিলেন। অতঃপর রণাঙ্গনে আসিয়া বসিলেন। ঐ সময় মোসলমানদের মধ্যে পশ্চাদপদ হওয়ার দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের ইশারার সহিত বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে হটিয়া যাও ; (আমাকে পথ দাও—) আমি শত্রু-দলের উপর আক্রমণ চালাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদ করাকালে আমরা এইরূপ করি নাই (যেরূপ করিতে তোমাদিগকে দেখিতেছি—) তোমরা শত্রু পক্ষকে সুযোগ দিয়া যে ভাবে তাহাদের সাহসী হওয়ার অভ্যস্ত করিয়াছ—ইহা নিতান্তই খারাপ। (অতঃপর তিনি শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধ চালাইয়া শহীদ হইলেন।)

উন্নতি সর্বদার জন্য ঘোড়ার সঙ্গে বিজড়িত

এস্থলে ঘোড়া বলিতে যুদ্ধ সরঞ্জাম উদ্দেশ্য। মোসলমান জাতির উন্নতির একমাত্র পথ—আল্লার দ্বীনকে বলন্দ রাখিবার জন্য আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রত থাকা এবং এই পন্থা কোন কাল বা যুগের জন্য নির্দিষ্ট নহে, বরং প্রত্যেক কালে ও প্রত্যেক যুগে মোসলমান জাতির উন্নতির জন্য এই পন্থাই প্রচলিত রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইহাই প্রচলিত থাকিবে। মোসলমান জাতির সোনালী যুগে মোসলমান জাতি এই পথেই

উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অতীতের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এস্থলে যুক্তি তর্কের বাড়াবাড়ি নিছক অবান্তর। অধিকন্তু আল্লার রসুল খবর দিতেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত মোসলমান জাতির উন্নতি এই পন্থায়ই হাসিল হইতে পারিবে ; এই পন্থা পরিত্যাগ করিলে জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটিবে এবং উন্নতি ব্যাহত হইবে।

আল্লার রসুলের এই সংবাদের বাস্তবতার উজ্জ্বল সাক্ষী ইতিহাস, জাতির অধঃপতনের প্রাথমিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্তের বাস্তব অবস্থাই উহাকে প্রমাণিত করিয়া দেয়। এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য ও ইন্দ্রিয়ভূত বাস্তব বিষয় সম্পর্কে যুক্তি তর্কের হাতড়ানি মস্তিষ্কের অসুস্থতা বই কি ?

১৩১৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছেই রহিয়াছে উন্নতি ও সাফল্য চিরকালের জন্য।

১৩১৬। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দ্বীন-দুনিয়ার বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গল ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছে রহিয়াছে।

জেহাদ জারী থাকিবে; শাসনকর্তা ভাল হউক বা মন্দ

১৩১৭। হাদীছ :— عن عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ٥

অর্থ—ওরওয়া ইবনুল জায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়ার কেশগুচ্ছের সঙ্গেই বাঁধা রহিয়াছে (অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া জেহাদ করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে মোসলমান জাতির) সাফল্য ও উন্নতি (—আখেরাতে ছওয়াব এবং দুনিয়াতে গণীমতের ধন-দৌলত) কেয়ামত-দিবস উপস্থিত হওয়া তথা দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত।

ইমাম বোখারী (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আনাছ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয় হইতেও এই বিষয়বস্তুর দুইটি হাদীছ এখানে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন শাসনকর্তা মোসলমানদিগকে জেহাদের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করিলে তাহার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য হইবে যদিও শাসনকর্তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষা

১৩১৮। হাদীছ :— يقول ابو هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ

شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِى مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় (জেহাদের জন্য) ঘোড়া পুষিয়া রাখিবে, আল্লার প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন পূর্বক; তাহার সেই ঘোড়ার ভক্ষিত ও পানীয় বস্তু সমুহের এবং ঐ ঘোড়ার মল-মুত্রের পরিমাণ ওজন কেয়ামতের দিন তাহার নেকীর পাল্লায় প্রদান করা হইবে।

ঘোড়া ও গাধার বিশেষ নাম রাখা

১৩১৯। হাদীছঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের বাগানে নবী ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘোড়া চরিত; উহার নাম ছিল "লোহায়ফ"।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত ঘোড়াটির লেজ অধিক লম্বা হওয়ার কারণে আরবী ভাষায় উহার এই নাম রাখা হইয়াছিল।

হযরতের একটি গাধা ছিল—কাজলা রঙ্গের; উহার নাম ছিল "ওফায়র"।

হযরতের বাহন একটি উটের নাম ছিল, "কাছ্‌ওয়া" যাহার অর্থ কান কাটা। বস্তুতঃ উটটির কান কাটা ছিল না—ছোট ছিল, তাই ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

আর একটি উটের নাম ছিল "আজ্‌বা" যাহার অর্থ চেরা ও বিদীর্ণ কানওয়ালা; কোন বিষয়ে চিহ্নিত করার জন্য ঐরূপ করা হয়। বস্তুতঃ ঐ উটটি ঐরূপ ছিল না: কিন্তু উহা এতই উত্তম ছিল যে, উত্তম হওয়ার চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য ছিল, তাই উহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

হযরতের একটি খচ্চর ছিল, যাহার নাম ছিল "দুলদুল"।

আবু কাতাদাহ (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘোড়া ছিল—উহার নাম ছিল "জারাদ"।

আবু তালহা (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘোড়া ছিল যাহার উপর নবী (দঃ) একবার ছওয়ার হইয়াছিলেন; উহার নাম ছিল "মানদুব"।

ঘোড়া সম্পর্কে অশুভ হওয়ার ধারণা

১৩২০। হাদীছ ঃ— عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِىْ ثَلٰثَةٍ

فِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ○

১৩২১। হাদীছ ঃ— عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ ○

উভয় হাদীছের অর্থ—হযরত রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বস্তুর মধ্যে অশুভ, অমঙ্গলতা বিদ্যমান থাকার বাস্তবতা ও অস্তিত্ব যদি থাকিত, তবে একমাত্র ঘোড়া, স্ত্রী এবং বাসস্থান ও বাড়ীর মধ্যে থাকে বলিয়া গণ্য করা হইত।

অর্থাৎ—এই তিনটি বস্তু এমন যে, সাধারণতঃ উহাদের মধ্যে অশুভ অমঙ্গলতা থাকার ধারণা হইতে পারে, কিন্তু উহাদের সম্পর্কেও এই ধারণা ভিত্তিহীন।

ব্যাখ্যা ঃ—ভাল-মন্দের সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার হস্তে ন্যাস্ত। ভাল করা বা মন্দ করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভিন্ন আর কাহারও নাই। ইহা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা ও অপরিহার্য্য মতবাদ; এই সম্পর্কে কোন প্রকার অন্যমনস্ক ভাব পোষণ করিলে ঈমানের মূলে মারাত্মক আঘাত লাগিবে। এই মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস্য বিষয়টি স্পষ্টরূপে কোরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে। অতএব কোন বস্তুকে অশুভ অমঙ্গলকারক মনে করা ইসলামের মূল আকিদার পরিপন্থী গণ্য হইবে; জাহেলিয়ত ও অন্ধকার যুগে এইরূপ ভাবধারার প্রচলন ছিল। সেই যুগে কোন কোন বস্তু, অবস্থা বা সময়, দিন ও মাসকে অশুভ ও অমঙ্গল মনে করা হইত। ইসলাম সেই ধারণা ও বিশ্বাসকে বর্জন করার জরুরী আদেশ করিয়াছে।

কোন কোন বস্তু এমন আছে যাহার সঙ্গে মানুষের আচার-ব্যবহার, মেলা-মেশা ও সংশ্রব অত্যধিক; ঐ বস্তুর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি থাকায় উহা তাহার জন্য নানা-প্রকার দুঃখ-যাতনা, কষ্ট-ক্লেশ ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়। এমতাবস্থায় মানুষ সাধারণ ও বাহ্যিক দৃষ্টি সূত্রে ঐ বস্তুকে অশুভ ও অমঙ্গল ধারণা করিতে পারে। তাই বিশেষভাবে সেইরূপ কতিপয় বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়া হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) ঐ ধারণাকে ভিত্তিহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছে তিনটি বস্তু বিশেষের নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য্য ইহাই। অবশ্য এই হাদীছ দ্বারা এই শিক্ষাও লাভ করিবে যে, এরূপ জীবন-সাথী ও প্রতি মুহূর্তের সংশ্রবময় বস্তুকে অবলম্বন করা কালে বিশেষ বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনেক সময় এইরূপ বস্তুসমূহের গুপ্ত ও সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেরূপ—বাসস্থান ও গৃহ; আবহাওয়া সংক্রান্ত দোষ-ত্রুটি, বিশেষতঃ অসৎ, অভদ্র ও দুশ্চরিত্র প্রতিবেশী মানুষের জন্য বহু দুঃখ-যাতনা ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এই জন্যই বলা হয়, الجار قبل الدار "গৃহ অবলম্বন করার পূর্বে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য কর। তদ্রূপ—স্ত্রী, যেহেতু সে জীবনের চিরসঙ্গিনী তাই তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, আখলাক-ব্যবহার, বিশেষতঃ দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কীয় দোষ-ত্রুটি মানুষের জন্য শুধু দুঃখ-যাতনা, অশান্তি ও ক্ষয়-ক্ষতিরই কারণ হয় না, বরং মানুষের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; অনেক সময় অপরিণামদর্শী মানুষ বাহ্যিক চাকচিক্যের ফেরে পড়িয়া অগ্নিময় অশান্তি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এই জন্যই রছুলুল্লাহ (দঃ)

স্বীয় উম্মতকে সতর্ককরণ ও পরামর্শ দান পূর্বক বলিয়াছেন, মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যের দ্বারা স্ত্রী নির্বাচন করিয়া থাকে; তুমি দ্বীন ও ধর্ম দ্বারা স্বীয় স্ত্রী নির্বাচন কর।

তদ্রূপ—ঘোড়া, বিশেষতঃ আরব দেশীয়দের পক্ষে—যাহাদের জীবন-মরণ বাহ্যিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ঘোড়ার উপর নির্ভর করিত, এমতাবস্থায় ঘোড়া ভাল না হইলে জীবন বাঁচাইবার অছিলা পঙ্গু হইয়া বহু ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণরূপেও যদি ঘোড়া জেহাদের উপযোগী না হয় তবে উহা দুনিয়ার দিক দিয়াও ব্যয়ভারের কারণ হইয়া ক্ষতি সাধন করে এবং আখেরাতের দিক দিয়াও ক্ষতির কারণ এই হয় যে, আখেরাতে উহা নিষ্ফল।

● পাঠকবৃন্দ। এস্থলে একটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝিয়া রাখিতে হইবে—কোন বস্তুবিশেষকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা ভিন্ন কথা; আর কোন বস্তু কোন বিশেষ অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া ক্ষেত্রে তাজরেবা ও অভিজ্ঞতা সূত্রে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় ঐ বস্তুকে উক্ত অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া কালীন দোষী মনে করা এবং উহাকে বর্জন করা ভিন্ন কথা। প্রথম প্রকারের ধারণা নিষিদ্ধ, যেরূপ—কোন ঘোড়াকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা। দ্বিতীয় প্রকারের ধারণা নিষিদ্ধ নহে। যেরূপ—কোন বিশেষ এলাকার ঘোড়া বা বিশেষ প্রকারের ঘোড়া বা বিশেষ রঙ্গের ঘোড়া অভিজ্ঞতার দ্বারা ভাল প্রতিপন্ন হওয়ায় উহাকে গ্রহণ করা বা মন্দ প্রতিপন্ন হওয়ায় উহাকে বর্জন করা—এইরূপ তারতম্যের বাছ-বিচার নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবরূপে আস্থাবান তাজরেবা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, নতুবা উহা বাহুল্য ওছ্‌ওছাহ্‌ পরিগণিত হইবে। কোন কোন হাদীছে ঘোড়ার বিভিন্ন রঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে যে তারতম্যের উল্লেখ আছে উহা এই পর্য্যায়ের; কোন রঙ্গকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা পর্য্যায়ের নহে—পার্থক্যটি গভীর চিন্তার সহিত বুঝিতে হইবে।

জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষার ফজিলত

১৩২২। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য ছওয়াব লাভের অছিলা। দ্বিতীয় শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য শুধু জাগতিক আবশ্যকাদি পূরণে তাঁহার মান-ইজ্জত রক্ষাকারী (আখেরাতে কোন ছওয়াব লাভের অছিলা নহে, গোনাহের কারণও নহে)। তৃতীয় শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য গোনাহের কারণ।

(১) মালিকের জন্য ছওয়াবের অছিলা ঐ ঘোড়া, যেই ঘোড়াকে মালিক আল্লার রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে। (এইরূপ ঘোড়ার অছিলায় ছওয়াব লাভের সুযোগ অগণিত—) মালিক সেই ঘোড়াকে মাঠে বা বাগানে লম্বা দড়িতে বাঁধিয়া

আসিলে, ঐ অবস্থায় ঘোড়া যত ঘাস-পাতা খাইবে সবই মালিকের জন্য নেক আমল গণ্য হইতে থাকিবে, (অর্থাৎ মালিক স্বয়ং ঘাস-পাতা সংগ্রহ করিয়া দেয় নাই, বরং বাগানে বা মাঠে বাঁধিয়া আসিয়াছে ইহাতেই মালিক এইরূপ ছওয়াব লাভ করিবে। এমনকি) যদি ঐ ঘোড়া দড়ি ছিন্ন করিয়া নিজ খুশীমনে বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ায় এমতাবস্থায় (উহার সমুদয় পানাহার, এমনকি) উহার মল-মুত্র এবং এই ভ্রমণের সমুদয় পদক্ষেপ পরিমাণ ছওয়াব মালিককে প্রদান করা হইবে। ঐ ঘোড়া পথিমধ্যে যাতায়াতে কোথাও পানি পান করিল যদিও মালিক ইচ্ছাকৃত পানি পান করায় নাই তবুও এই পানি পানকে মালিকের জন্য নেক আমল গণ্য করা হইবে।

(২) মালিকের জন্য (ছওয়াব ও গোনাহ বিহীন রূপে শুধু) মান-ইজ্জত রক্ষাকারী ঐ ঘোড়া, যেই ঘোড়াকে স্বীয় প্রয়োজন পূরণে অন্যের মুখোপেক্ষিতা হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে এবং উহা সম্পর্কে শরীয়তের যে সব নির্দেশ রহিয়াছে (যেমন—শর্ত অনুযায়ী যাকাৎ এবং কোন মোসলমান ভাই-এর কার্য্যোদ্ধারে সাহায্য প্রদান) সেই সব হইতে অমনোযোগী থাকে নাই।

(৩) মালিকের পক্ষে গোনাহের কারণ ঐ ঘোড়া যেই ঘোড়াকে মালিক স্বীয় গৌরব, আত্মগর্ব, বড়াই ও বাহ্যাড়ম্বরতার উদ্দেশ্যে এবং মোসলমানদেরই বিরুদ্ধে ঝগড়া বিবাদের কার্যে লাগাইবার উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে।

কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে গাধার (শ্রেণী বিভক্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, গাধা সম্পর্কে আমার নিকট কোন বিশেষ অহী নাযেল হয় নাই, অবশ্য কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত আছে, (গাধা ইত্যাদি সবই উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে) আয়াতটি এই—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক করিবে সে উহার প্রতিদান পাইবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ গোনাহ করিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে।"

অর্থাৎ গাধা ইত্যাদির শ্রেণী বিভক্তি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি উহাকে সামান্যতম নেক আমলের উদ্দেশ্যে পোষিবে সে উহার প্রতিদান লাভ করিবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহাকে সামান্যতম গোনাহের কাজের উদ্দেশ্যে পোষিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে।

পাঠকবর্গ। উল্লেখিত হাদীছ ও আয়াতটি অতি ব্যাপক, যত রকমের মোবাহ কার্য্য আছে সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং মানব জীবনের হাজার হাজার মোবাহ কার্য্য সমুহের ছওয়াব ও গোনাহ রূপে শ্রেণী-বিভক্তি এই হাদীছ ও আয়াত দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় এবং ঐ হাজার হাজার মোবাহ কার্য্য সমুহকে ছওয়াব ও নেক আমলে পরিণত করার পথ আবিষ্কৃত হয়।

বস্তুতঃ এই হাদীছ ও আয়াতটি বোখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীছ—নিয়্যতের হাদীছেরই অনুশীলন। এই বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ তথায় বর্ণিত হইয়াছে।

গণিমতের মাল হইতে ঘোড়ার অংশ

১৩২৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার জন্য (গনীমতের মাল হইতে) দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ— রণক্ষেত্রে হস্তগত ধন-সম্পদ গণিমতের মাল গণ্য করা হয়। গণিমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট চার অংশ ঐ জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়; গণিমতের মাল সম্পর্কে শরীয়তের এই বিধান।

যোদ্ধগণের মধ্যে গণিমতের মালের চার অংশকে বণ্টন করা কালে প্রতিটি ঘোড়াকে দু'জন সৈনিকের বরাবর গণ্য করিয়া প্রাপকদের সংখ্যার সমপরিমাণ অংশে ঐ মালকে বণ্টন করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক সৈনিককে এক এক অংশ প্রদান করা হয়; সেমতে প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ এবং অশ্বারোহীকে তিন অংশ (—ঘোড়ার দুই অংশ মালিকের এক অংশ) দেওয়া হইত। উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই এবং অধিকাংশ ইমামগণের মত, এই হাদীছের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন হাদীছে অশ্বারোহীর দুই অংশ তথা ঘোড়ার এক অংশ ও মালিকের এক অংশ উল্লেখ আছে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহের মজহাব সেই হাদীছের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ঘোড়-দৌড় অনুষ্ঠিত করা

জেহাদের উদ্দেশ্যে অশ্বচালনার উন্নতি বিধানকল্পে ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠিত করা মহৎ কাজ এবং এই সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষের তরফ হইতে কোন পুরস্কার ঘোষণা করাও জায়েজ। কিন্তু পরস্পর কোন বাজি ধরিয়া বা কোন প্রকার জুয়া ইত্যাদির সংশ্রবে ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠিত করা হারাম।

১৩২৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে গঠিত পোক্তাদেহী অশ্ব সমুহের দৌড় ছয় সাত মাইল ব্যবধানের দুইটি স্থানের মধ্যে এবং সাধারণ দেহী অশ্ব সমুহের দৌড় এক মাইল ব্যবধানের দুইটি স্থানের মধ্যে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন,) আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী ছিলাম।

নারীদের জেহাদ

১৩২৫। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমি জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের জেহাদ হইল হজ্জ করা।

১৩২৬। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার নিকট জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, (নারীদের জন্য) উত্তম জেহাদ হইল হজ্জ।

১৩২৭। হাদীছ:— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদের দিন মোসলমানগণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, (যদ্দরুন তাঁহাদের অনেক লোক হতাহত হয়,) সেই বিপদের দিন দেখিয়াছি, উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) ও (আমার মাতা) উম্মে-সোলায়েম বিশেষ তৎপরতার সহিত স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করতঃ মশক ভরিয়া পানি আনিতেন এবং আহতদের মুখে পানি ঢালিয়া দিতেন; পুনঃ পুনঃ তাঁহারা এই কাজ করিতেছিলেন এবং এত অধিক তৎপতার সহিত এই কার্য্য করিতেছিলেন যে, তখন তাঁহাদের পায়ের গোছা আমার নজরে পরিয়াছে।

১৩২৮। হাদীছ:—একদা আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) কিছু সংখ্যক চাদর মদীনার মহিলাদের মধ্যে বন্টন করিলেন। একটি উত্তম চাদর অবশিষ্ট রহিল। এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৌহিত্রী— আপনার স্ত্রী উম্মে কুলছুমকে এই চাদরটি দিন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, মদীনাসিনী উম্মে সালীৎ ইহা পাইবার অগ্রাধিকারিনী; তিনি জঙ্গ-ওহোদের দিন আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিতেন।

১৩২৯। হাদীছ:—মোআওয়েজের দুহিতা রোবাইয়্যে (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করিতাম। লোকদিগকে পানি পান করাইতাম, তাহাদের আবশ্যকাদির ব্যবস্থা করিতাম, আহতগণের ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিতাম এবং নিহতদের লাশ ও আহতগণকে মদীনায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতাম।

ব্যাখ্যা:—বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ্ ফতহুল বারী কিতাবে লিখিত আছে যে— মা, খালা, ফুফু, ভগ্নি ইত্যাদি এমন মেয়েলোক যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ রূপেই এই সব আচার ব্যবহার জায়েয বটে, কিন্তু ঐ শ্রেণীর মহিলাগণ ভিন্ন পরপুরুষের শরীর স্পর্শকে পরিহার করিয়া চলা আবশ্যক।

জেহাদের মধ্যে প্রহরীর কাজ করা

১৩৩০। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোন এক জেহাদ হইতে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলেন; তিনি বিনিদ্র ছিলেন, তাই এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, আমার ছাহাবীগণের মধ্য হইতে যদি কোন উত্তম ব্যক্তি এখন উপস্থিত হইয়া আমাকে পাহারা দিত। (আমি নিরাপদে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতাম।) হঠাৎ অস্ত্র সাজে সজ্জিত ব্যক্তির আগমন শব্দ শ্রুত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আগন্তুক বলিলেন, আমি সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ, আপনাকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর হযরত (দঃ) শুইয়া পড়িলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— মদীনায় ইহুদীদের আধিক্য ছিল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল, তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিদ্রামগ্নতা ইত্যাদি অবস্থায় স্বীয় প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। সেই সম্পর্কে কোরআান শরীফে এই আয়াত নাযেল হইল— والله يعصمك من الناس "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শত্রুদের হইতে সুরক্ষিত রাখিবেন" এই আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন, তোমরা চলিয়া যাও, পাহারার আবশ্যক নাই ; আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৩৩১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهٗ مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ وَاِنِ اسْتَاْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা— নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহারা টাকা পয়সা সোনা-চান্দি, কাপড়-চোপড়, পোষাক পরিচ্ছদের গোলাম তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। (তাহাদের মনোবৃত্তি কত নিম্নস্তরের—) তাহাদিগকে তাহাদের (মনোবাঞ্ছা) ধন-সম্পদ প্রদান করা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট, নতুবা অসন্তুষ্ট ; (ধন-সম্পদই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।) তাহারা ধ্বংস হউক তাহাদের অধঃপতন ঘটুক, তাহাদের আপদ-বিপদ দুরীভূত না হউক।

পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তির জন্য মহাসুসংবাদ যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় জেহাদের অপেক্ষায় স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া (তথা সর্বদা প্রস্তুত হইয়া) থাকে ; (কোন পদ বা সুযোগের মোহ তাহার অন্তরে মোটেই নাই,) আল্লার রাস্তায় তাহাকে চৌকিদারির কার্য্য প্রদান করা হইলে সেই কার্য্যেই সে আত্মনিয়োগ করে এবং সকলের পেছনে তাহাকে রাখা হইলে সে পেছনে থাকিয়াই দায়িত্ব পালনে ব্রত থাকে। (এমন নিঃস্বার্থ কর্মির জন্য মহা সুসংবাদ, যদিও বাহ্যিক পরিপাটি মান-মর্য্যাদা তাহার না থাকে—) তাহার মাথার চুল এলোমেলো, পায়ে ধুলা-বালু মাখানো, কাহারও নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে অনুমতি পায় না, সে কোন সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশ রক্ষা করা হয় না। (এইরূপে সে বাহ্যিক মান-মর্য্যাদাহীন হইলেও তাহার জন্য আল্লার রসুলের মারফৎ এই সুসংবাদ যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার মান-মর্য্যাদা অনেক বড়।)

স্বীয় সঙ্গী-সাথির খেদমত ও সেবার ফজিলত

১৩৩২। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কোন এক ছফরে বিশিষ্ট ছাহাবী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত ও সেবা করিয়া থাকিতেন; অথচ তিনি আনাছ (রাঃ) হইতে বয়সে বড় ছিলেন। জরীর (রাঃ) বলিতেন, মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে একটি মহান কাজ করিতে দেখিয়াছি (—তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতিশয় খেদমত ও সেবা করিয়াছেন,) তাই তাঁহাদের যে কোন ব্যক্তিকে আমি পাইব আমি তাঁহার যথাসাধ্য খেদমত ও সেবা করিব।

প্রিয় পাঠক। মদীনাবাসিগণের খেদমত ও সেবা সম্পর্কে জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, তাঁহাদের খেদমত ও সেবা বস্তুত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ ও অনুরাগের পরিচয়।

১৩৩৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (এক জেহাদের ছফরে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (আমাদের মধ্যে কেহ কেহ রোযাদার ছিল, কেহ কেহ রোযাহীন।) রোযাদারগণ (ভীষণ উত্তাপের মধ্যে রোযার কঠোরতার দরুন) কোন কাজকর্মে সক্ষম হইল না। রোযাহীনগণ যানবাহন সমূহের পানাহারের ব্যবস্থা, সঙ্গি-সাথী সকলের প্রয়োজন পুরণ ও খেদমত-সেবা ইত্যাদি সকল প্রকার পরিশ্রম করিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আজকার দিনের সমুদয় ছওয়াব রোযাহীনগণই হাসিল করিয়া নিয়াছে।

আল্লার দ্বীন রক্ষায় আক্রমণ প্রতিরোধে পাহারা দেওয়ার ফজিলত

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ....

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! (দ্বীন ইসলাম রক্ষা কল্পে সকল প্রকার আপদ-বিপদে, কষ্ট-ক্লেশে) ধৈর্য্য ধারণ কর, শত্রুর মোকাবিলায় সংগ্রামে দৃঢ় থাক এবং শত্রুর প্রতিরোধে পাহারাদানে রত থাক। আর সর্বাবস্থায় আল্লার ভয়-ভক্তি উপস্থিত রাখ; ইহাতে তোমাদের সাফল্য লাভ হইবে।

১৩৩৪। হাদীছ :— عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِالْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

অর্থ— সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার (দ্বীন রক্ষার) পথে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিরোধে একদিন পাহারা দেওয়া (তথা এই আমলের বদৌলতে আখেরাতে যে সম্পদ লাভ হইবে উহা) সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ হইতে উত্তম। বেহেশতের এক চাবুক পরিমিত (তথা সামান্যতম) অংশ সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক মুল্যবান। একবার সকালে বা বিকালে (তথা অল্প সময়ের জন্য) আল্লার রাস্তায় জেহাদে বাহির হওয়া সমগ্র জগত ও উহার সব সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

কম বয়স্ক ছেলেকে জেহাদের পথে খেদমতের জন্য দেওয়া

১৩৩৫। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার মাতার স্বামী) আবু তাল্‌হা (রাঃ)কে বলিলেন, খয়বরের জেহাদ-পথে আমার খেদমতের জন্য একটি বালক তালাশ করিয়া আন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) আমাকে উপস্থিত করিলেন, তখন আমি বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়া থাকিতাম। আমি তাঁহাকে অনেক সময় এই দোয়া করিতে শুনিতাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ

وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

"হে আল্লাহ! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি—পেরেশানী, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা হইতে এবং নিষ্কর্মণ্যতা হইতে, অলসতা হইতে, কৃপণতা হইতে, দুর্বলতা ও সাহসহীনতা এবং ঋণের বোঝা হইতে ও শত্রুর প্রাবল্য হইতে।"

অতঃপর হযরত (দঃ) খয়বরে পৌঁছিয়া কিল্লা জয় করিলেন, তাঁহার নিকট তথাকার সর্বপ্রধান সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের দুহিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল যে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ঘরের অতীব সুন্দরী যুবতী, সবে মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার স্বামী এই আক্রমনে নিহত হইয়াছে। (এইরূপ উচ্চ মর্য্যাদাশীলা নারীকে কোন সাধারণ লোকের হস্তে দেওয়া হইলে তাহার মর্য্যাদারও হানী হইবে এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও আছে। লোকদের এই কথায়) হযরত (দঃ) তাঁহাকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনিলেন (এবং এত উচ্চ মর্য্যাদা দান করিলেন যে, তাঁহাকে দাসী না রাখিয়া সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন।)

খয়বর হইতে ফিরিবার পথে "ছাহ্‌বা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) নব-দাম্পত্যের ওলিমার ব্যবস্থা স্বরূপ কিছু খাওয়া-খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, আশেপাশের সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম; ওলিমার সমাপ্তি হইল।

অতঃপর তথা হইতে মদীনা যাত্রা করা হইল। হযরত (দঃ) (স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতি কিরূপ সদয় ছিলেন। তিনি) নব-দম্পতির জন্য নিজ বাহনের উপর পেছনে পর্দা করিয়া আসনের ব্যবস্থা করিলেন এবং আরোহণের জন্য স্বীয় উরু পাতিয়া দিলেন; নব দম্পতি উহাতে নিজ "আবা" দ্বারা পা রাখিয়া যানবাহনে আরোহণ করিলেন। অতঃপর আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিলাম এবং ওহোদ পাহাড় দৃষ্ট হইল, তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, এই পাহাড়টি আমাদিগকে মহব্বত করিয়া থাকে, আমারাও উহাকে মহব্বত করিয়া থাকি। অতঃপর হযরত (দঃ) মদীনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি মদীনা নগরীর উভয় পার্শ্বস্থ এলাকাকে বিশেষ সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা নগরী সম্পর্কে করিয়াছিলেন। হে আল্লাহ। তুমি মদীনাবাসীগণের ফল-ফলাদি, শস্য-ফসলের মধ্যে বরকত ও উন্নতি দান কর।

দুর্বল ও নেককার লোকদের নামে আল্লার নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করা

১৩৩৬। **হাদীছঃ**—মোছয়া'ব ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা সায়াদ (রাঃ) (প্রসিদ্ধ বীর ধনুর্ধর ছিলেন এবং তীর চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি) নিজকে ধন্য মনে করিতেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার সেই ধারণায় বাধা প্রদান পূর্বক বলিলেন—

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَاءِكُمْ -

"তোমরা দুর্বলদের অছিলায়ই আল্লার সাহায্য ও দান লাভ করিয়া থাক।"

পাঠকবর্গ! সাংসারিক ও দলীয় ইত্যাদি সমবায় ব্যবস্থাপনার মধ্যে উল্লেখিত সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; অধুনা আমাদের মধ্যে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৩৩৭। **হাদীছঃ**—আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে যে, এক দল লোক জেহাদের জন্য যাইবে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান চালান হইবে যে, কোন ছাহাবী তাহাদের সঙ্গে আছেন কি? অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে যে, হাঁ—ছাহাবী আছেন; তখন তাঁহার বদৌলতে তাহাদের জয়লাভ হইবে। অতঃপর এমন এক সময় আসিবে যে, এক দল লোক জেহাদের জন্য যাত্রা করিবে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে যে, রসুলুল্লার ছাহাবীর ছাহাবী তথা কোন তাবেয়ী আছেন কি? অনুসন্ধানে জানা যাইবে, হাঁ—আছেন; তখন তাঁহার বরকতে জয় লাভ হইবে। আবার এক সময় আসিবে যে, ঐরূপ একদল লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইবে, রসুলুল্লার ছাহাবীদের ছাহাবীর ছাহাবী তথা কোন তাবে-তাবেয়ী আছেন কি? আনুসন্ধান করিয়া জানা যাইবে, হাঁ—আছেন। তখন তাঁহার বদৌলতে তাহাদের জয়লাভ হইবে।

কাহারও সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত নির্দিষ্ট ভাবে এইরূপ বলার অধিকার নাই যে, সে শহীদের মর্তবা পাইয়াছে

ইহা একটি ধ্রুব সত্য এবং সুস্পষ্ট বাস্তব বিষয় যে, শহীদের মর্তবা লাভ করা অনেকগুলি সূক্ষ্ম, আন্তরিক, অপ্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সে সব বিষয়বস্তুর বাস্তবতার খবর একমাত্র অন্তর্যামী সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং তাঁহার তরফ হইতে অহী মারফত জানা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে শুধু বাহ্যিক ও স্থূল দৃষ্টিতে উহা জানিবার উপায় নাই। অতএব এইরূপ অজ্ঞাত বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল বস্তু সম্পর্কে নির্দিষ্টরূপে দৃঢ়তার সহিত কোন উক্তি করা অনধিকার চর্চা বই কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করুন—প্রথমত: নিয়্যতের দিক দিয়া, খালেছ অবিমিশ্ররূপে ফী-ছাবি-লিল্লাহ—আল্লার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হইলে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই শহীদের মর্তবার প্রশ্ন আসিতে পারে, নতুবা নহে। নিয়্যত অদৃশ্য বস্তু, এমনকি উহার উৎপত্তি স্থলও অদৃশ্য; উহার খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। বিভিন্ন হাদীছের মধ্যেও এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ১২৮০ নং হাদীছে জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ফজিলত বর্ণনা করিতে যাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

والله اعلم بمن يجاهد فى سبيله "আল্লাহই ভালরূপে জানেন, কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আল্লার উদ্দেশ্যে জেহাদ করিয়া থাকে।"

তদ্রূপ ১২৮৯নং হাদীছে বলা হইয়াছে—والله اعلم بمن يكلم فى سبيله "আল্লাহ তায়ালাই ভালরূপে জানেন, কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আল্লার উদ্দেশ্যে আঘাত খাইয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।"

অতঃপর যত বড় নেক ও মর্তবার আমলই হউক না কেন উহার ফলাফল লাভ জীবনের শেষ মুহূর্তের ভাল-মন্দের উপর নির্ভর করে, যাহা অনেক সময় সাধারণ দৃষ্টিভূত হয় না; নিম্নের হাদীছে ইহারই একটী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৩৩৮। হাদীছ:—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও মোশরেক কাফেরদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হইল। মোসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যাধিক বীরত্ব ও তৎপরতার সহিত কাজ করিয়াছে—সে যে কোন কাফেরকে একটু সুযোগে পাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিয়াছে। যখন যুদ্ধের একটু বিরাম ঘটিল এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দলীয় লোকদের সঙ্গে একত্রিত হইলেন; আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম, অমুক ব্যক্তি আজ এত অধিক কাজ করিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে অন্য আর কেহই ঐ পরিমাণ কাজ করিতে পারে নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নাম লইয়া বলিলেন সে দোযখী হইবে। হযরতের এই উক্তিতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক ব্যক্তি মনে মনে এই পণ করিল যে, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার অনুসন্ধান করিব। সে যেখানেই যেই কাজ করে ঐ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ঐ ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল, সে এক ভীষণ আঘাত পাইয়াছে এবং আঘাতের যন্ত্রণায় ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া স্বীয় তরবারিকে সোজাবস্থায় রাখিয়া উহার উপর নিজকে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল। অনুসন্ধানী ব্যক্তি এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং ভাবাবেগে বলিয়া উঠিল, আমি পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লার রসুল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? সে বলিল, যেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি পূর্বাহ্নে বলিয়াছেন যে, দোযখী হইবে এবং আপনার উক্তি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল; তখন আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার অনুসন্ধান চালাইব। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে পাইলাম, সে স্বীয় তরবারী সোজা করিয়া রাখিয়া উহার উপর নিজেকে পতিত করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! (আত্মহত্যা মহাপাপ, যাহার অনুষ্ঠানকারী দোযখের শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে; অতএব শেষ ফলে দেখা যায়, তাহার সম্পর্কে নবীজীর উক্তিই ঠিক হইল)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন কোন সময় এইরূপ হয় যে, একজন মানুষ প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেহেশত লাভের উপযোগী আমল করিতে থাকে বটে, কিন্তু (শেষ পর্য্যন্ত তাহার আসল রূপ প্রকাশ পায় এবং দোযখ উপযোগী আমল করিয়া) সে দোযখী সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ কোন সময় এইরূপও হয় যে, একজন মানুষ প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দোযখ উপযোগী আমল করিতে থাকে বটে, কিন্তু (শেষ পর্য্যন্ত তাহার আভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ গুণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং বেহেশত উপযোগী আমল করিয়া) সে বেহেশতী সাব্যস্ত হয়।

তীর চালনা শিক্ষা করা

পবিত্র কোরআনে নির্দেশ রহিয়াছে—

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

অর্থাৎ—ইসলামদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি ও সমরাস্ত্র সঞ্চয় কর এবং প্রস্তুত রাখ—এই পরিমাণ যে, তোমাদের ও আল্লার (দ্বীনের) শত্রুরা যেন উহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত ও ভয়ে কম্পিত থাকে।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে শক্তি সঞ্চয়ের অর্থ তীর চালনা শিক্ষা করা।

পাঠকবর্গ! যুগের পরিবর্তনে শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের রূপে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আদি যুগে অশ্ব ও তীরই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র। অধুনা যে সব বৈজ্ঞানিক অস্ত্র

আবিষ্কার হইয়াছে ইসলামদ্রোহীদের মোকাবিলায় সেই সব অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং উহার পরিচালনা শিক্ষা আলোচ্য আয়াতের আদেশভুক্ত।

১৩৩৯। হাদীছ :— সালামা-তুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রীয় কতিপয় লোকদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তাহারা (শিক্ষা উদ্দেশ্যে দুই দল হইয়া) তীর চালনা করিতেছিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণ! তোমরা তীর চালনায় অবশ্যই অভিজ্ঞতা লাভ কর; তোমাদের পিতামহ (ইসমাঈল (আঃ) তীর চালনা করিয়া থাকিতেন।) অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি দলের সঙ্গে অবতরণ করতঃ বলিলেন, আমি এই পক্ষে। তখন অপর পক্ষ তীর ছোড়া বন্ধ করিয়া দিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তীর চালাওনা কেন? তাহারা বলিল, আপনি ঐ পক্ষে থাকাবস্থায় তাহাদের প্রতি কিরূপে তীর নিক্ষেপ করিব? তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গেই আছি; তোমরা তীর চালনা কর।

খঞ্জর চালনার খেলা করা

১৩৪০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় হাবশী লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে মসজিদের মধ্যে খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল, এমন সময় ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং (ঐ খেলা বন্ধ করার জন্য) তাহাদের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে ওমর! তাহাদিগকে এই খেলা করিতে দাও। এই বিষয়ে ৫৩০ নং হাদীছখানাও এস্থানে উল্লেখ আছে।

তরবারীর সাজ বা অলঙ্কার

১৩৪১। হাদীছ :—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণ অসংখ্য বিজয় লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তরবারির সাজ স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল না। তাঁহাদের তরবারির সাজ হইত সীসা, লোহা।

অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন সাজ-সজ্জায়, বেশ-ভূষায় অপব্যয় করা যদিও উত্তম কাজ সম্পর্কে হয় উচিৎ নহে। যেমন, জেহাদের তরবারি যাহার সম্পর্কে হাদীছ শরীফে আছে, তরবারির ছায়াতলে বেহেশত। এই তরবারির সাজ-সজ্জায় স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার সোনালী যুগের মোসলমান ছাহাবী-তাবেয়ীগণ করিতেন না। মসজিদ, জায়নামায, তছবীহ, কোরআন শরীফ ইত্যাদি বস্তু সম্পর্কেও এই একই কথা।

বর্শা নিক্ষেপ শিক্ষা করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বর্শার ছায়াতলে আমার (উম্মতের) রিজিক রাখা হইয়াছে; আর আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণে রহিয়াছে মান-মর্যাদার হানি ও অধঃপতন।

ব্যাখ্যা:—মোসলমানের জন্য বেশী পরিমাণের এবং সম্মানজনক ও উত্তম রোজগারের সূত্র হইল জেহাদ। বর্শার ছায়াতলের উদ্দেশ্য জেহাদই বটে।

জেহাদ সম্পর্কে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী

১৩৪২। হাদীছ:— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্বে) তোমরা মোসলমানগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক জেহাদ করিবে। (সেই জেহাদে ইহুদীরা পরাজিত হইবে এবং দুনিয়ার কোন বস্তু তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে না। এমনকি) কোন ইহুদী কোন পাথরের (বা গাছের) আড়ালে লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মোসলমান ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিবে, হে আল্লার বন্দা! এই দেখ, একজন ইহুদী আমার পেছনে লুকাইয়া আছে তাহাকে হত্যা কর।

১৩৪৩। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্বে নিশ্চয় এই ঘটনা ঘটিবে যে, তোমরা মোসলমান ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে। (কোন বস্তু ইহুদীদেরকে আশ্রয় দিবে না) এমনকি কোন পাথরের পেছনে কোন ইহুদী লুকাইয়া থাকিলে ঐ পাথর মোসলমানকে ডাকিয়া বলিবে, দেখ—আমার পেছনে এক ইহুদী লুকাইয়া আছে ইহাকে হত্যা কর।

১৩৪৪। হাদীছ:—আম্র ইবনে তাগলেব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত এই যে, এমন এক জাতির সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ বাঁধিবে যাহারা স্বভাবত: ও সাধারণত: পশমযুক্ত চামড়ার জুতা ব্যবহারকারী হইবে। আরও এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবে যাহাদের মুখ-মণ্ডল পুরু ঢালের ন্যায় (মোটা—দবীজ ও গোলাকারের) হইবে।

কাফেরদের প্রতি বদ-দোয়া করা

১৩৪৫। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ সময়ে নবী (দ:) মোশরেকেদের প্রতি বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ. اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ.

اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

"হে আল্লাহ! তুমিই কেতাব (কোরআন) নাযেল করিয়াছ (তুমি উহার হেফাজতের ব্যবস্থা কর;) তুমি মুহূর্তের মধ্যে (ভাল-মন্দের) হিসাব লইতে সক্ষম। হে আল্লাহ শত্রুর দলসমূহকে পরাজিত কর, হে আল্লাহ তাহাদিগকে পরাজিত কর, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দাও।"

এই বিষয়ে ৫৪৭ নং হাদীছখানাও উল্লেখ হইয়াছে।

কাফেরদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করা

১৩৪৬। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দৌস গোত্রীয় তোফায়েল ইবনে আম্র (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গি মোসলমানগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! দৌস্ গোত্রের লোকগণ (আমার কথায় কর্ণপাত করে না) ইসলামের বিরোধিতা করিতেছে এবং ইসলামকে অস্বীকার করে; তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করুন। উপস্থিত কেহ বলিল, আজ দৌস গোত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য; (সে মনে করিল, নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করিবেন। কিন্তু) নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া না করিয়া দোয়া করিলেন—اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ

"আয় আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর এবং তাহাদেরে আমাদের দলভুক্ত করিয়া দাও।"

বিরোধী দলকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা

১৩৪৭। **হাদীছ :**—সাহল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খয়বর অভিযান কালে আলী (রাঃ) চক্ষুর যাতনায় ভুগিতেছিলেন, তাই তিনি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি ভাবিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে আমি বাড়ী বসিয়া থাকিব? ইহা ভাল হইবে না। এই ভাবিয়া তিনিও রওয়ানা হইলেন এবং পথিমধ্যে হযরতের সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইলেন। খয়বর চুড়ান্ত বিজয়ের পুর্বের দিন বৈকালে*) হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, আগামীকল্য যুদ্ধ-পতাকা এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিব যাহাকে আল্লাহ ও আল্লার রসুল মহব্বত করিয়া থাকেন এবং তিনিও আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে মহব্বত করেন, তাহার হস্তে আল্লাহ তায়ালা খয়বরের চুড়ান্ত বিজয় দান করিবেন। সারারাত্র প্রত্যেকটি মানুষই পতাকা লাভের অপেক্ষায় ছিল, (কারণ ইহা মস্ত বড় সুসংবাদের প্রতীক ছিল) এই আকাঙ্ক্ষা নিয়া সকলেই ভোর বেলায় উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আলী কোথায়? বলা হইল, তিনি চক্ষু-যাতনায় ভুগিতেছেন। (কেহই ভাবিতেছিল না যে, আলী (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।) তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল, রসুল (দঃ) তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে থুথু দিলেন এবং দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, যেন তাঁহার কোন যাতনাই ছিল না। রসুল (দঃ) তাঁহার হস্তে পতাকা অর্পণ করিলেন। তখন আলী (রাঃ) (স্বীয় দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদানার্থে) বলিলেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব, যাবত তাহারা আমাদের ন্যায় মোসলমান হইয়া না যায়। নবী (দঃ) বাধা প্রদান করতঃ বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের কর্তব্য জ্ঞাত করিবে। (তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বর্ণনা সমূহ মূল বোখারীর ৪১৮ নং পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

স্বীকার করতঃ রাষ্ট্রিয় ট্যাক্স আদায়ের প্রস্তাব করিবে, তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইবে।) স্মরণ রাখিবে—তোমার অছিলায় একটি মাত্র ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত প্রদান করিলে উহা তোমার জন্য সর্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা

১৩৪৮। হাদীছ :— কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের জেহাদের জন্য বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা ভালবাসিতেন।

ইমামের ও অধিনায়কের আনুগত্য

১৩৪৯। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন বাধ্যতা ও আনুগত্য (সর্বাবস্থায়) অত্যাবশ্যক যাবৎ শরীয়ত বিরোধী আদেশ প্রয়োগ করা না হয়। শরীয়ত বিরোধী আদেশ প্রয়োগ করা হইলে সে স্থলে বাধ্যতা ও আনুগত্য চলিবে না।

১৩৫০। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি এবং আমার উম্মত আমরা দুনিয়াতে সকল নবীর পরে আসিয়াছি, কিন্তু আখেরাতে আমরা সর্বাগ্রে থাকিব।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুগত ও অনুসারী হইবে সে আল্লাহ তায়ালার অনুগত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য-নাফরমান হইবে সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য-নাফরমান গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি অধিনায়কের বাধ্যগত ও অনুগত হইবে সে আমার বাধ্যগত-অনুগত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি অধিনায়কের অবাধ্য নাফরমান হইবে সে আমার অবাধ্য নাফরমান গণ্য হইবে।

ইমাম ও শাসনকর্তা সকলের জন্য ঢাল স্বরূপ হওয়া চাই; তাহার পেছনে থাকিয়া (তথা তাহার সাহায্য সহায়তা লইয়া) যুদ্ধ জেহাদ পরিচালনা করা হইবে এবং রক্ষা-ব্যবস্থা লাভ করা হইবে। শাসনকর্তা যদি খোদা-ভক্তি ও ইনসাফের আদেশাবলী প্রবর্তন করেন তবে তিনি ছওয়াব লাভ করিবেন। আর যদি বিপরীত করেন তবে গোনাহের বোঝা বহন করিবেন।

জেহাদ ও প্রাণ উৎসর্গ করায় দীক্ষা নেওয়া

১৩৫১। হাদীছ :— ছালামাতু-বন্নুল-আক্‌ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোদায়বিয়ার জেহাদের ঘটনায়) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া দীক্ষা

গ্রহণ ও অঙ্গিকার করিলাম, অতঃপর বৃক্ষ ছায়াতলে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। যখন লোকের ভীড় কম হইল তখন হযরত (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি বায়য়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করিবে না? আরজ করিলাম, আমি তাহা করিয়াছি ইয়া রাসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, পুনরায়; সেমতে আমি দ্বিতীয় বার দীক্ষা ও অঙ্গিকার গ্রহণ করিলাম।

তাঁহার শাগের্দ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা তখন কি বিষয়ের অঙ্গিকার করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, (ইসলামের জন্য) জীবন উৎসর্গের অঙ্গিকার।

১৩৫২। হাদীছ:—মোজাশে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার এক ভাতিজাকে সঙ্গে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, হিজরত করার উপর আমাদের দীক্ষা ও অঙ্গিকার গ্রহণ করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা হইতে) হিজরতের আবশ্যকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, তবে কি বিষয়ের উপর আমাদের দীক্ষা বা অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন? নবী (দঃ) বলিলেন, দ্বীন ইসলামে দৃঢ় থাকার উপর এবং জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর।

অধিনায়কের কর্তব্য অধিনস্থদেরকে কোন আদেশ করিতে তাহাদের সামর্থ্যের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে

১৩৫৩। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিল এবং একটি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল; উহার উত্তর আমি তাহাকে কি দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতে ছিলাম না। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বতঃস্ফুর্ত আমীর বা অধিনায়কের অধীনে জেহাদ করিতে বাহির হইয়াছে। সেই আমীর আমাদিগকে এমন এমন অকাট্য আদেশ করেন যাহা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। (ঐরূপ ক্ষেত্রে কি করা যাইবে?) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাকে আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না। তবে একটি কথা এই যে, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিতাম; নবী (দঃ) আমাদেরকে কোন বিষয়ে শুধু কেবল একবার আদেশ করিলেই আমরা তাহা সম্পন্ন করিতাম।

আর একটি কথা—তোমাদের প্রত্যেকেই মঙ্গলের অধিকারী থাকিবে যাবৎ সে আল্লার ভয়-ভক্তি নিজের মধ্যে বিরাজমান রাখে এবং কোন বিষয় মনে খট্‌কা জন্মিলে তাহা এমন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে তাহাকে খট্‌কা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। অবশ্য অচিরেই ঐ শ্রেণীর লোক দুর্লভ হইয়া আসিবে।

যেই খোদা ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার স্মরণ মতে—জগতের যে যুগ চলিয়া গিয়াছে উহা এবং অবশিষ্ট যুগের তুলনা এরূপ—যেমন, একটি পুকুর যাহার উপরের পরিষ্কার পানি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, বাকি আছে শুধু উহার কর্দমময় ঘোলা পানি।

ব্যাখ্যা ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিগতভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমীরের আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে এই নীতিচ্যুত হওয়া অপরিহার্য্য বোধ হইলে শুধু নিজের বিবেক দ্বারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত কোন ভাল লোকের দ্বারা কার্য্যানির্বাহের পথ বাহির করিতে সচেষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়াছেন যে, ঐ শ্রেণীর লোক অচিরেই দুর্লভ হইয়া আসিবে, অতএব তাহা পাইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ও যত্নবান হইতে হইবে।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) মানুষের জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার একটি সুন্দর ও সহজ সন্ধান দিয়াছেন—ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিগুলি মানিয়া চলিবে। কোন ক্ষেত্রে কোন নীতি এড়াইয়া যাওয়া অপরিহার্য্য বোধ করিলে সে সম্পর্কে শুধু নিজের বিবেক দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। কারণ, নিজের বেলায় নিজের বিবেক অনেক সময় ফাঁকি দিয়া ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ দেখাইয়া থাকে। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শরীয়তের বিজ্ঞ লোক দ্বারা যাচাই করিবে যে, এই ক্ষেত্রে নীতিচ্যুতি বাস্তবিকই অপরিহার্য্য কি না—এই ফয়সালাটা শুধু নিজ বিবেকে সাব্যস্ত করিবে না।

একত্রে কাজ করিতে নেতার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাইবে না

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ...... لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ

অর্থ—খাটি ঈমানদার তাঁহারা যাঁহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং যখন রসুলের সাথে সম্মিলিত কোন কাজে থাকে তখন তাহারা রসুলের অনুমতি না লইয়া কোথাও যায় না।

হযরতের পতাকা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত একটি বড় পতাকা ছিল; যাহার নাম ছিল "ওকাব" উহা কাল রঙ্গের ছিল। জেহাদকালে উহা উড্ডিন হইত। সাধারণতঃ উহার বাহকরূপে কায়স ইবনে সায়াদ (রাঃ) নির্দিষ্ট ছিলেন।

১৩৫৪। হাদীছ ঃ— ছা'লাবাহ (রঃ) কায়স্ ইবনে সায়াদ ছাহাবীর আমল বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হজ্জের সময় (এহরামের পূর্বক্ষণে) চুল আঁচড়াইতেন।

ছা'লাবাহ (রঃ) স্বীয় বর্ণনায় উক্ত ছাহাবীর পরিচায়দানে বলিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পতাকাবাহী ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছোট ছোট ঝাণ্ডাও ছিল ঐ সব সাদা রঙ্গের ছিল। (আছাহ-হুস্ সিয়ার ৫২৭)

রসুলুল্লার প্রতি আল্লার বিশেষ দান

১৩৫৫। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অল্প কথায় বহু তথ্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য আমাকে দান করা হইয়াছে। এক মাসের পথের সুদুর প্রান্তে আমার প্রভাবে ভীতির সঞ্চারণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার সাহায্য করিয়াছেন। একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে বিশ্বের ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আমার হস্তে দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই শেষ বাক্যটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগৎ হইতে বিদায় নিয়াছেন (তাঁহার হস্তে ঐ স্বপ্নের উদ্দেশ্যের বিকাশন হয় নাই; পরবর্তীকালে) তোমরা (মোসলমানগণ) উহার বিকাশ সাধন করিবে।

ব্যাখ্যা : প্রথম বাক্যটি বাস্তব সত্য, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, অতি অল্প শব্দ ও সংক্ষিপ্ত কথায় বহু বহু তথ্য-জ্ঞান প্রকাশ করিতেন। যেমন—১নং হাদীছ "انما الاعمال بالنية" বর্ণিত হইয়াছে; ইহা শব্দের দিক দিয়া কত সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাখ্যা ও তথ্যের দিক দিয়া কত প্রশস্ত। হাদীছ শাস্ত্রে এই ধরনের বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয় বাক্যটির মর্ম প্রথম খণ্ডে ২২৮ নং হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয় বাক্যে যেই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব ধন-ভাণ্ডারের অধিপতি সম্রাটগণের সাম্রাজ্য করতলগত হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মোসলমানগণকে গঠন করতঃ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করিয়া বিদায় নিয়াছেন। হযরতের বিদায় গ্রহণের দ্বারা এই পথে যে সব প্রতিবন্ধক মাথা চারা দিয়া উঠিয়াছিল আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) সেই সবের দমন ও অপসারণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। অতঃপর ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফতকাল হইতে ঐ উদ্দেশ্য সাধন আরম্ভ হয়। বিশ্বের সেরা ও বড় সাম্রাজ্যদ্বয়—পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্য মোসলমানদের করতলগত হয়। এই বিষয়টির প্রতিই মূল হাদীছ বর্ণনাকার আবু হোরায়রা (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইবে না

১৩৫৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন—আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইতে।

জেহাদের সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দেওয়া

১৩৫৭। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর অভিযানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভোর বেলা সেই বস্তিতে প্রবেশ করিলেন, তথাকার অধিবাসীরা তখন সবেমাত্র বেলচা-কোদাল ইত্যাদি কাঁধে লইয়া কার্য্যে যাত্রা করিতেছিল। তাহারা মোসলমান সৈন্য দেখামাত্র দ্রুত কিল্লার ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইল। নবী (দঃ) তখন স্বীয় হস্তদ্বয়

উত্তোলন করিয়া—"আল্লাহু আকবার" ধ্বনি প্রদান পূর্বক বলিলেন, খয়বর (তথা উহার বর্তমান শক্তি) ধ্বংস হউক; আমরা যেই বস্তিতে প্রবেশ করি সেই বস্তির ভাগ্য-বিপর্য্যয় অনিবার্য্য।

অত্র জেহাদে আমরা গৃহপালিত গাধা হস্তগত করিয়া ছিলাম। পূর্ব রেওয়াজ অনুসারে আমরা খাওয়ার উদ্দেশ্যে উহা পাকাইতে ছিলাম, হঠাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোষণা জারীকারক এই ঘোষনা জারী করিল যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ডেক সমুহ উল্টাইয়া গোশ্ত ফেলিয়া দেওয়া হইল।

পথ চলার একটি বিশেষ আদব

১৩৫৮। হাদীছ:— জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ভ্রমণ অবস্থায় আমরা উচু জায়গায় আরোহণ করিলে "আল্লাহু আকবার" বলিতাম এবং নিচু জায়গায় অবতরনে সোব্হানাল্লাহ বলিতাম।

ব্যাখ্যা:—অবস্থাদ্বয়ের উভয় জিকর অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। উর্দ্ধে উঠিয়া আল্লাহু আকবার অর্থাৎ (আমরা যত উর্দ্ধেই গমন করি) আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব উর্দ্ধে। আর নিম্নে আসিলে ছোব্হানাল্লাহ—অর্থাৎ (উর্দ্ধের পর নিম্নে পতন আমাদের জন্য অবধারিত। কিন্তু) আল্লাহ পাক-পবিত্র তথা তাঁহার জন্য উর্দ্ধই আছে নিম্ন নাই।

ছফরের দরুণ কোন আমল ছুটিয়া গেলে?

১৩৫৯। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَ كُتِبَ لَهٗ

مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا -

অর্থ—আবু মুছা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িলে বা ছফরে বাহির হইলে (যদি তাহার এমন কোন আমল ছুটিয়া যায়) যেই আমলের সে অভ্যস্ত ছিল—সুস্থ অবস্থায় ও বাড়ী থাকাবস্থায়; তাহার জন্য রোগ ও ছফর অবস্থায় (উক্ত আমল না করা সত্ত্বেও) ঐ পরিমাণ ছওয়াব লেখা হইবে যেই পরিমাণ ছওয়াব সুস্থ ও বাড়ী থাকা অবস্থায় (উক্ত আমল করার দরুণ) লেখা হইয়া থাকিত।

ছফর হইতে যথা-সত্বর ফিরিয়া আসা

১৩৬০। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছফর অতি কষ্ট-ক্লেশের বস্তু; উহা নিদ্রার প্রতিবন্ধক

হয়, পানাহারের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব প্রত্যেকের উচিৎ—আবশ্যক পুরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গে ফিরিয়া আসা।

জেহাদের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করা

১৩৬১। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন কি ? সে বলিল হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহাদের খেদমত ও সেবার আত্মনিয়োগ কর।

কোন পশুর গলায় ঘণ্টা ইত্যাদি লটকাইয়া দেওয়া

১৩৬২। **হাদীছ :**—আবু বশীর আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ছফরে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। সকলেই রাত্রি যাপন-স্থানে অবস্থান রত ছিল। হযরত (দঃ) একজন লোকের মারফত এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিলেন যে, কোন উটের গলায় কোন বস্তু লটকানো রাখিবে না, থাকিলে উহা কাটিয়া ফেখিবে।

বন্দিগণকে কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া

১৩৬৩। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে বন্দিগণের সঙ্গে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ)কেও বন্দীরূপে উপস্থিত করা হইল। তাঁহার গায়ে কাপড় দিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অধিক পরিপুষ্ট ও দীর্ঘকায়া বিশিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহার পরিমাপের কোন জামা পাওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক-সর্দারের জামা তাঁহার পরিমাপের হইল ; সেই জামা-ই তাঁহাকে প্রদান করা হইল। এই ঘটনার প্রতিদান স্বরূপই হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাহার মৃত্যুর পর তাহার কাফনের জন্য স্বীয় জামা প্রদান করিয়াছিলেন, যেন হযরতের উপর তাহার কোন উপকারের বোঝা না থাকে।

মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ

১৩৬৪। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিস্মিত হন ঐ লোকদের অবস্থায় যাহাদিগকে শিকলে বাঁধিয়া বেহেশতে পৌছান হইয়াছে।

অর্থাৎ—মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিল ; অতঃপর মোসলমানদের সাহচর্য্যে ইসলামকে বুঝিতে সক্ষম হইয়া ইসলাম গ্রহণ পুর্বক বেহেশতের অধিকারী হইয়াছে।

শিশু ও নারী হত্যা করা

১৩৬৫। **হাদীছ :**—ছাব্বাব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "আবওয়া" অভিযান কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন। কোন

এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল যে, অন্ধকার রাত্রে যখন মোশরেকদের বস্তির উপর আক্রমণ চালান হয়, তখন অনিচ্ছাকৃত অনেক শিশু এবং নারীও নিহত হয়। নবী (দঃ) বলিলেন, (যদিও নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ) তাহারা মোশরেকদেরই দলভুক্ত, (তাই তাহারা অনিচ্ছাকৃত নিহত হইলে গোনাহ হইবে না।)

নবী (দঃ)কে ইহাও ঘোষণা দিতে শুনিয়াছি, (স্বীয় মালিকানাভুক্ত জায়গা জমি ভিন্ন পতিত এলাকার) কোন জমি কেহ নিজ আবশ্যকে নির্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিবে না, অবশ্য আল্লাহ এবং আল্লার রসুল (তথা খলীফাতুল-মোছলেমীন জাতীয় প্রয়োজনে) কোন পতিত এলাকাকে নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

১৩৬৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক জেহাদ উপলক্ষে একটি নারী নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতদদৃষ্টে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

অগ্নি-দগ্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া

১৩৬৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে একটি অভিযানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং আমাদিগকে আদেশ করিলেন—এই এই নামের ব্যক্তিদ্বয়কে পাইলে তাহাদিগকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবে। যাত্রার প্রক্কালে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম, দুই ব্যক্তিকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করার জন্য। কিন্তু অগ্নি দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই (আখেরাতে) শাস্তি প্রদান করিবেন। অন্য কাহারও উহা করা চাই না। সেমতে ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে পাইলে তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিবে।

১৩৬৮। হাদীছ ঃ— একরেমা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক দল লোক (আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এইরূপ ভক্ত সাজিল যে, তাঁহাকে খোদা বলিল। তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে এই কুফুরী আকিদা হইতে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে) আলী (রাঃ) তাহাদিগকে আগুন দ্বারা পোড়াইয়া দিলেন। প্রসিদ্ধ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, আমি হইলে তাহাদিগকে আগুন দ্বারা পোড়াইতাম না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার শাস্তি দ্বারা কাহাকেও শাস্তি দিও না। আমি হইলে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতাম, যেরূপ নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন-ইসলামকে পরিবর্তন করে (তথা ইসলাম-পরিপন্থী আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করে) তাহাকে প্রাণদণ্ড দেও।

১৩৬৯। হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী এক নবীর ঘটনা—তাঁহাকে একটি পিপীলিকা কামড় দিল, তিনি পিপীলিকার বাসাটি সম্পূর্ণ জ্বালাইতে আদেশ করিলেন এবং উহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া

হইল। সেই নবীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া অহী পাঠাইলেন—একটি মাত্র পিপীলিকা কামড় দেওয়ায় আপনি সৃষ্ট জীবের একটি দলকে জ্বালাইয়া দিলেন যাহারা আল্লার তছবীহ পাঠ করিত?

ঘর বাড়ী বা বাগ-বাগিচা অগ্নি দগ্ধ করা

১৩৭০। হাদীছ :— জারীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, "জুল-খালাছা" নামক মূর্তি-ঘর সম্পর্কে আমার মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিবে নয় কি? "জুল খালাছা" খাছআম গোত্রের একটি মূর্তি-ঘর ছিল যাহাকে তাহারা "ইয়ামানী কা'বা" বলিত।

আমি তৎক্ষণাৎ আহমাস্ গোত্রীয় দেড়শত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাত্রার প্রস্তুতি করিলাম, ঐ গোত্রীয় লোকগণ অশ্বচালনায় অভিজ্ঞ ছিল। আমি হযরতের খেদমতে অভিযোগ করিলাম, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকিতে পারি না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার বুকের উপর হাত রাখিলেন, এমনকি আমার বুকের উপর তাঁহার আঙ্গুল সমূহের রেখাপাত হইল। হযরত (দঃ) আমার জন্য দোয়াও করিলেন, হে আল্লাহ! তাহাকে স্থিরতা দান কর এবং সৎ পথের পথিক ও সৎপথ প্রদর্শনকারী বানাও; ফলে আমি আর কখনও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হই নাই।

অতঃপর জরীর (রাঃ) জুল-খালাছার প্রতি যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া উহা বিধ্বস্ত করতঃ অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন এবং উক্ত শুভ সংবাদ হযরত (দঃ)কে সত্তর পৌঁছাইবার জন্য সঙ্গিদের মধ্য হইতে একজনকে দ্রুত পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ মূর্তি-ঘরকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আহমাস্ গোত্রীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণকে বরকত—উন্নতি ও সাফল্য দান কর; এইরূপে পাঁচ বার দোয়া করিলেন।

১৩৭১। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনার ইহুদী গোত্র বনু-নজীর শান্তিচুক্তি ও মৈত্রি ভঙ্গ করতঃ বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতায় লিপ্ত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইলেন—তাহাদের বিল্লা ঘেরাও করিয়া তাহাদের বাগানের গাছপালা কাটিলেন এবং উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—

ما قطعتم من لينة........فباذن الله......

অর্থাৎ—আপনি যে, গাছপালা কাটিয়াছেন তাহা আল্লার আদেশেই করিয়াছেন এবং আল্লাহদ্রোহীদের দমন করার জন্য করিয়াছেন। (২৮ পাঃ ৪ রুঃ)

যুদ্ধ কামনা করা চাই না

১৩৭২। হাদীছ:— ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহ যখন খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা:) তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে এই বিষয়টিও লেখা ছিল—কোন এক জেহাদের ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুপক্ষ কাফেরদের অপেক্ষারত ছিলেন। দিনের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষোমান অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর হযরত (দ:) দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে বলিলেন—

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ

فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

"হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করিও না, আল্লাহ তায়ালার নিকট নিরাপত্তা ও শান্তির প্রার্থনা করিতে থাক। অবশ্য শত্রুর মোকাবিলা আরম্ভ হইলে তখন ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (তরবারীকে ভয় করিও না;) জানিয়া রাখিও—তরবারীর ছায়াতলে বেহেশত।" অত:পর হযরত (দ:) এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ

اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ٥

"হে আল্লাহ! তুমিই কোরআন নাযেল করিয়াছ, (যেই কোরআনে এই শুভ সংবাদ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মোকাবিলায় মোসলমামানগণকে সাহায্য দান করিবেন এবং মোসলমানদের হস্তে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন।) তুমিই (এত বড় শক্তিমান যে, পর্বত সমতুল্য) মেঘমালাকে (মুহূর্তের মধ্যে) স্থানান্তরিত করিয়া থাক; শত্রুদল সমূহকে পরাজিত করা তোমারই কাজ। তুমি আমাদের শত্রুকে পরাজিত কর এবং তাহাদের মোকাবিলায় আমাদিগকে সাহায্য কর।

জেহাদে কৌশল অবলম্বন করা

১৩৭৩। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لَا يَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهٗ

وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهٗ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই পারস্য সম্রাট ধ্বংস হইবে; অতঃপর আর কেহ পারস্য সম্রাট হইবে না। এবং রোম সম্রাটও অবশ্যই ধ্বংস হইবে; অতঃপর আর কেহ রোম সম্রাট হইবে না। (উভয় সাম্রাজ্য মোসলমানদের করতলগত হইয়া) তাহাদের ধন ভাণ্ডার আল্লার রাস্তায় ব্যয় হইয়া যাইবে। এই বক্তব্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, কৌশলই যুদ্ধের প্রাণ-বস্তু।

জেহাদের তারানা পড়া

১৩৭৪। হাদীছঃ— বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি পরিখা খননের মাটি অপসারণ করিতেছিলেন। হযরতের শরীরে (বুকের উপর) অধিক লোম ছিল, তাঁহার বুকের লোম মাটিতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। তিনি কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ۝ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ তোমার কৃপা না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না; দান-খয়রাত ও নামায-রোযা ইত্যাদি কিছুই করিতে পারিতাম না।

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ۝ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

তুমি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং শত্রুর মোকাবিলা হইলে আমাদিগকে দৃঢ়তা ও পদস্থিতি দান কর।

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ۝ اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

শত্রুগণ আমাদের উপর জুলুম করিয়াছে। তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, আমরা কখনও তাহাদের সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইতে দিব না, দিব না— এই বলিয়া তিনি স্বর উচ্চ করিতেন।

জেহাদের সময় আত্মগর্বের উক্তি করা

১৩৭৫। হাদীছঃ—বরা ইবনে আজেব (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনাইনের জেহাদে পশ্চাদপদ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পশ্চাদপদ হন নাই। বরং তিনি অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ (রাঃ) হযরতের যানবাহনের লাগামধারী ছিলেন। যখন মোশরেকগণ তাঁহার প্রতি চতুর্দিক হইতে আক্রমণ

চালাইল তখন তিনি (তরবারি লইয়া প্রত্যক্ষ লড়াই করার জন্য) যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং এই বলিতে লাগিলেন—

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ۝ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি সত্য নবী, আমি আরবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনা

১৩৭৬। **হাদীছ** :—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বন্দীকে মুক্ত করিয়া আন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং পীড়িতের খোঁজ-খবর লও।

গুপ্তচরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া

১৩৭৭। **হাদীছ** :—ছালামাতু-ব্‌নুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছফরে ছিলেন। মোশরেকদের একজন গুপ্তচর হযরতের নিকট আসিল এবং ছাহাবীগণের সঙ্গে বসিয়া কিছু সময় সে কথাবার্তা বলিল, অতঃপর সে চলিয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে গুপ্তচর জানিয়া তালাশ করিবার এবং তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে হত্যা করিলাম। তাহার সঙ্গে যে মাল-ছামান পাওয়া গেল হযরত (দঃ) উহা আমাকে প্রদান করিলেন।

অনুগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধ করা

১৩৭৮। **হাদীছ** :—খলীফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে আহত অবস্থায় তাঁহার পরবর্তী খলীফার প্রতি যে সব নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন উহার মধ্যে এই বিষয়টিও ছিল—আমার পরবর্তী খলীফাকে আমি বিশেষ তাগিদের সহিত আদেশ করিয়া যাইতেছি, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিধানমতে যে সব সংখ্যালঘু ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিবে—নাগরিকত্বের বিধানগত সমুদয় সুযোগ-সুবিধা যেন তাহাদেরকে পূর্ণরূপে দেওয়া হয়; তাহাদের জান-মাল ইজ্জত রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যেন যুদ্ধও করা হয়; রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স ধার্য্য করিতে যেন তাহাদের সামর্থকে অতিক্রম করা না হয়।

ইসলামী বিধানে গরীব-পোষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব

১৩৭৯। **হাদীছ** :—আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) বাইতুল মালের পশুপালের জন্য সরকারী রিজার্ভ গোচারণ ভুমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য "হুনায়্য" নামীয় এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে নিম্নরূপ নির্দেশ দান করিয়াছিলেন—

দেখ! সর্বসাধারণ মোসলমানদের প্রতি সর্বদা সদয়, বিনয়ী, নম্র ও সদাচারী থাকিবে। কাহারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার করিয়া তাহার বদদোয়ার ভাগী হইবে না; মজলুমের বদদোয়া আল্লার দরবারে অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে।

আর গরীব দুঃখীদের পশুপাল ও ছাগলপালকে সংরক্ষিত ভূমিতে প্রবেশে বাধা দিবে না। হাঁ—আবহুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) শ্রেণীর ধনী লোকদের পশুপালকে অবশ্যই বাধা দিবে। এই শ্রেণীর লোকদের পশুপাল যদি ঘাসের অভাবে মরিয়াও যায় তবুও তাহাদের বাগান ও জায়গা-জমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। কিন্তু গরীবদের ছোট-খাট পশুপাল ও ছাগলপাল যদি ঘাস অভাবে মরিয়া যায় তবে তাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাষ্ট্রের দ্বারে আসিবে এবং হে আমীরুল-মোমেনীন, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমাদেরকে সাহায্য করুন—চীৎকার করিবে। তুমি কপাল-পোড়া না হইলে নিশ্চয় উপলব্ধি করিবে, আমি কি তাহাদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়—ঐ অবস্থায় রাষ্ট্রের স্বর্ণ-চান্দি ব্যয় করিয়া তাহাদেরকে আমার সাহায্য করিতেই হইবে। অতএব সংরক্ষিত ভূমির ঘাস-পানি তাহাদের জন্য ব্যয় করা স্বর্ণ-চান্দি ব্যয় অপেক্ষা সহজ।

অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) গোচারণ ভূমি সংরক্ষণের প্রতি লোকদের অভিযোগের উত্তরে বলিলেন, জেহাদের জন্য সদা প্রস্তুত পশুপালগুলির প্রয়োজনে বাধ্য না হইলে আমি এক আঙ্গুল ভূমিও সংরক্ষণ করিতাম না।

সরকার কর্তৃক আদমশুমারী করা

১৩৮০। হাদীছ :—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় লোককে বলিলেন, তোমরা আমার জন্য সমস্ত মোসলমানের বিবরণ লিখিয়া আনিয়া দাও। সে মতে আমরা পনর শত লোকের বিবরণ লিখিয়া হযরত (দঃ)কে দিলাম। তখন আমাদের মনে বিরাট সাহস জন্মিল যে, আমরা পনর শত; এখন কি আর কোন শক্তিকে আমরা ভয় করি?

(এক সময় মোসলমানদের মনোবল এরূপ ছিল যে, সংখ্যায় পনর শত হইয়াই তাহারা নির্ভিক হইতে পারিয়াছিল।) ধীরে ধীরে মোসলমানদের সেই মনোবল শিথিল হইয়া আসিয়াছে, এমনকি কোন শাসক নামায বিলম্বে পড়ে উহার প্রতিবাদ করিতে ভয় করিয়া অনেকে একাকী উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায় করিয়া নেয়।

ব্যাখ্যা :—এযিদ হইতে আরম্ভ করিয়া উমাইয়া বংশের অনেক শাসক ইমামতী করিত এবং নামায বিলম্বে পড়াইত। সেই সময় তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনেকেই ভয় পাইত এবং সঠিক সময়ে একা একা গৃহে নামায আদায় করিত।

ইসলামের সেবা-সাহায্য ফাছেক-ফাজের দ্বারাও হয়

অর্থাৎ আল্লার নৈকট্য লাভ ও পরকালীন উন্নতির মুল ও প্রাথমিক অছিলা হইল স্বীয় আত্মশুদ্ধি এবং শরীয়তের পাবন্দির মাধ্যমে জীবন ও চরিত্র গঠন করা। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন-ইসলামের খেদমত ও সেবা করিলে তাহা "সোনায় সোহাগা" গণ্য হইবে। ফাছেক-ফাজের—শরীয়তের পাবন্দ নয় এমন ব্যক্তির দ্বারা দ্বীনের খেদমত হইলে সে এই নেক আমলের ছওয়াব পাইবে বটে—যদি তাহার ঈমান ছহীহ ও শুদ্ধ হয়, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী জীবন-যাপনের দরুণ সে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে যে, সেই ক্ষতির সম্মুখে ঐ একটি নেক আমলের ফলাফল দৃষ্টি গোচরে না-ও আসিতে পারে, তাই আমল এবং আত্মশুদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক।

১৩৮১। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক জেহাদে ছিলাম। মোসলেম দলভুক্ত এক ব্যক্তি সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সে দোযখী হইবে। জেহাদ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি অতিশয় তৎপরতার সহিত জেহাদ করিল। সেই জেহাদে সে ভীষণ আহত হইল। (এমনকি অনেকে ধারণা করিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের ধারণা মতে ঐ ব্যক্তি জেহাদে মরিয়াছে, তাই) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এইরূপ উক্তি করা হইল যে, অমুক ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে আপনি উক্তি করিয়াছিলেন, সে দোযখী হইবে— ঐ ব্যক্তি আজ অতিশয় তৎপরতার সহিত জেহাদ করিয়াছিল এবং জেহাদেই সে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। নবী (দঃ) এই সংবাদের উপরও ঐ উক্তিই করিলেন—সে দোযখী।

কোন কোন মানুষের মনে এই বিষয়টি বিশেষ সংশয়ের সৃষ্টি করিল। হঠাৎ এই সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, ভীষণ আহত হইয়া আছে। রাত্রিবেলা সে আঘাতের যন্ত্রণায় ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া আত্মহত্যা করিল। (তখন হযরতের উক্তির বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়া গেল, কারণ আত্মহত্যা মহাপাপ যদ্দরুণ সে দোযখে যাইবে।) নবী (দঃ)কে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করা হইল। হযরত স্বীয় উক্তির বাস্তবতার সংবাদ পাইয়া "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করতঃ বলিলেন, এই ঘটনার দ্বারাও বাস্তবরূপে প্রমাণিত হইল যে, আমি আল্লার বন্দা ও রসুল; অতঃপর বেলাল (রাঃ)কে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ করিলেন—

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ۰

"একটি বিশেষ ঘোষণা—ইসলামের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশই করিবে না, একমাত্র ইসলামের অনুসারীই বেহেশতে যাইবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা বদকার মানুষ দ্বারাও দ্বীন-ইসলামের সাহায্য করাইয়া থাকেন।"

ব্যাখ্যা ঃ—একমাত্র ইসলামের অনুসরণের উপরই বেহেশত লাভের ভিত্তি; যে পূর্ণ অনুসারী হইবে সে পূর্ণ মাত্রায় তথা প্রথম হইতেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যে ইসলামের গণ্ডির ভিতর হইবে, কিন্তু উহার অনুসরণে ত্রুটিযুক্ত হইবে তাহার বেহেশতে প্রবেশও বিলম্বে হইতে পারে—যদি সেই ত্রুটি ও গোনাহ মাফ না হয়, তবে ঐ গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইসলাম ব্যতিরেকে কস্মিনকালেও বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ লাভ হইবে না—ইহাই হইল উক্ত ঘোষণার মূল।

মোসলমানের কোন সম্পদ কাফেরদের কবলিত হওয়ার পর মোসলমানগণ পুনঃ ঐ বস্তু হস্তগত করিলে পূর্ববর্তী মোসলমান মালিক উহার অধিকারী হইবে

১৩৮২। হাদীছ ঃ—নাফে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ক্রীতদাস পলাইয়া রোম দেশে চলিয়া গেল। অতঃপর খালেদ ইবনে অলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচালনায় রোম দেশ মোসলমানদের জয় হইল। খালেদ (রাঃ) সেই ক্রীতদাসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যার্পণ করিলেন। আরও একটি ঘটনা—

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়া রোম দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ ঘোড়াটি মোসলমানগণের অধিকারে আসিল। তখন ঐ ঘোড়াটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে প্রত্যার্পণ করা হইল।

গণিমতের মালে খেয়ানত করা

শরীয়তের বিধান মতে জেহাদে বিজিত ধন-সম্পদকে গণিমতের মাল বলা হয়। এই মালের ভাগ-বন্টন সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত রহিয়াছে। সেই বিধান ছাড়া উক্ত মাল ভোগ করা বা কুক্ষিগত করাকেই এস্থলে খেয়ানত বলা হইয়াছে—যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সতর্কবাণী রহিয়াছে—

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"যে ব্যক্তি গণিমতের মালে খেয়ানত করিবে কেয়ামতের দিন সে ঐ মাল বহন করিয়া হাশরের মাঠে আসিবে।"

১৩৮৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণদানে আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। নবী (দঃ) গণিমতের মালে খেয়ানত করার উল্লেখ করিয়া উহার পরিণতি ও শাস্তি ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হইবে বলিলেন।

নবী (দঃ) বলিলেন, কেয়ামতের দিন যেন কেহ আমার সম্মুখে এই অবস্থায় না আসে যে, তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী ছাগল থাকে বা ঘোড়া থাকে ; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল ! আমার সাহায্য করুন। আমি তখন বলিব, তোমার সাহায্য কিছুই আমি করিতে পারিব না ; আমি ত শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে চিৎকারকারী উট থাকে ; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল ! আমার সাহায্য করুন। আমি বলিব, তোমার কোন সাহায্য করিতে পারিব না ; আমি শরীয়তের বিধান পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে ধনের বোঝা থাকে ; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল ! আমার সাহায্য করুন। আমি বলিব, তোমার কোন সাহায্য আমি করিতে পারিব না ; আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। কিম্বা তাহার ঘাড়ে উড্ডিয়মান কাপড় থাকে ; আর সে বলিতে থাকে, হে আল্লার রসুল। আমার সাহায্য করুন ; আমি বলিব তোমার সাহায্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। আমি ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম।

গণিমতের মালে অল্প খেয়ানতেরও পরিণাম ভয়াবহ

১৩৮৪। হাদীছ:— আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছফর অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাল-ছামান, আসবাব-পত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন লোক নির্দ্ধারিত ছিল ; তাহার নাম ছিল "কার্‌কারাহ"। তাহার মৃত্যু হইল : রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সে দোযখে যাইবে। লোকেরা খোঁজ করিয়া জানিতে পারিল, সে গণিমতের মাল হইতে একটি জুব্বা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

কোন দেশ ইসলামী শাসনে আসিয়া গেলে তথা হইতে হিজরত করার ফজিলত নাই

১৩৮৫। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) মক্কা জয় করিলে পর তথা হইতে হিজরত করার প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল।

মোজাহেদগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা

১৩৮৬। হাদীছ:— আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, আমি এবং আপনি ও ইবনে আব্বাস—আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (এক জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে) অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলাম ? আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন, তাহা স্মরণ আছে এবং ইহাও স্মরণ আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন আমাকে ও ইবনে আব্বাসকে স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া আনিলেন, আপনাকে আরোহণ করান নাই।

১৩৮৭। হাদীছ :— ছায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তবুকের জেহাদ হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যাবর্তনে আমরা হযরতের অভ্যর্থনায় মদীনা শহরের বাহিরে "ছানিয়াতুল-ওয়াদা" স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম।

ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনে এই দোয়া পড়িবে

১৩৮৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আবু তাল্‌হা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক জেহাদ হইতে প্রত্যার্তন করিলাছিলাম। হযরতের সঙ্গে একই যানবাহনের উপর উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ যানবাহন হোঁচট খাওয়ায় রসুল (দঃ) এবং উম্মুল-মোমেনীন যানবাহন হইতে পতিত হইয়া গেলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) দৌড়িয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ। আপনি কোন আঘাত পাইয়াছেন কি? নবী (দঃ) বলিলেন, না। অবশ্য মহিলাটির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর। তৎক্ষণাৎ আবু তাল্‌হা (রাঃ) একটি চাদর স্বীয় চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া উম্মুল-মোমেনীনের প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং ঐ চাদরটিই উম্মুল-মোমেনীনের উপর ফেলিয়া দিলেন; তিনি ঐ চাদরে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নবী (দঃ) ও উম্মুল-মোমেনীন উভয়ের জন্য পুনরায় যানবাহনের উপর আসন তৈরী করা হইল এবং তাঁহারা আরোহণ করিলেন। অতঃপর সকলেই যাত্রা করিল, মদীনার নিকটবর্তী হইলে পর নবী (দঃ) এই দোয়া পড়া আরম্ভ করিলেন—

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"আমরা (বাহ্যিক) প্রত্যাবর্তন করিলাম, (আধ্যাত্মিক তথা সমস্ত গোনাহ হইতেও) তওবা (তথা আল্লার প্রতি প্রত্যাবর্তন) করিলাম, আল্লার গোলামী অবলম্বন করিলাম, স্বীয় পালনকর্তার শোকর ও প্রশংসা মুখর হইলাম।

ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নামায পড়া

১৩৮৯। হাদীছ :—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ছফরে ছিলাম। ছফর হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত (নফল) নামায পড়।

১৩৯০। হাদীছ :—কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় স্বাভাবিক রীতি অনুসারে) দিনের প্রথম ভাগে ছফর হইতে মদীনায় পৌঁছিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িলেন।

বিদেশ হইতে নিজ বাড়ী প্রত্যাবর্তনে সাক্ষাৎকারীদের আদর-আপ্যায়ন করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বাড়ী থাকিলে বেশী পরিমাণে রোযা রাখিতেন, কিন্তু বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনে সাক্ষাৎকারীদের সৌজন্যে খাওয়া-দাওয়ায় নিজেও শরীক হওয়ার জন্য কতেক দিন রোযা বিহিন থাকিতেন।

১৩৯১। হাদীছঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর হইতে বাড়ী আসিয়া একটি উট বা গরু জবেহ করিয়াছিলেন।

জেহাদে হস্তগত ধন সম্পদ

জেহাদে যে সব অস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহাকে গণিমতের মাল বলা হয়। গণিমতের মাল পাঁচ ভাগের চার ভাগ জেহাদে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হয়। বাকি পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল—জাতীয় ধন ভাণ্ডার মারফৎ এতীম, মিছকীন ও অসহায় পথিকদিগকে দান করিতে হয়। কোরআন শরীফে এই সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে—

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ........

"তোমরা জানিয়া রাখ, যাহা কিছু ধন-সম্পদ তোমরা গণিমতরূপে হাসিল করিবে উহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লার রসুল, রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধরগণের জন্য এবং এতীম, মিছকীন ও অসহায় পথিকগণের জন্য। (এই সম্পর্কে তোমরা কোন অন্যমনস্ক ভাব পোষণ করিও না) যদি তোমরা (বাস্তবিকরূপে) আল্লার উপর ঈমান আনিয়া থাক।"

ব্যাখ্যাঃ— উল্লিখিত আয়াতের বিশ্লেষণে ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত দান করিয়াছেন যে, এস্থলে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উল্লেখ শুধু এই সূত্রে যে, এই পঞ্চমাংশের ভাগ-বন্টন আল্লাহ তথা আল্লার রসুলের ইচ্ছাধীন থাকিবে, জেহাদে অংশগ্রহণকারী বা অন্য কাহারও অধিকার এইক্ষেত্রে থাকিবে না।

এতদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণী তথা "রসুলুল্লার বংশধর" সে সম্পর্কে আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, ঐ বংশধরগণ যদি দরিদ্র হন তবেই পাইবেন, এই সূত্রে বংশধরগণ কোন ভিন্ন শ্রেণী থাকিলেন না—এতীম মিছকীনের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন। ঐ বংশধরগণের উল্লেখ শুধু এই সূত্রে হইয়াছে যে, এই রকমে ধন বন্টনে রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীনকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করা হইবে এবং এই অগ্রাধিকারের কারণ এই যে, রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীনগণ যাকাৎ ফেৎরা ইত্যাদি শ্রেণীর মাল গ্রহণ করিতে পারেন না, তাই তাঁহাদিগকে আলোচ্য শ্রেণীর মধ্যে অগ্রাধিকার দান করা হইয়াছে।

এতদ্দৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, গণিমতের পঞ্চমাংশ বাইতুল-মাল মারফৎ তিন প্রকার লোকের মধ্যে বন্টিত হইবে, (১) এতীম (যাহারা সাধারণত অসহায়ই হইয়া থাকে) (২) মিছকীন (৩) অসহায় পথিক। অবশ্য রসুলুল্লার বংশধর এতীম-মিছকীন অগ্রগণ্য হইবেন।

১৩৯২। হাদীছ :-- عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلَا اَمْنَعُكُمْ

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিবাছেন, তোমাদের কাহাকেও দেওয়া, কাহাকেও না দেওয়া বস্তুতঃ আমার ইচ্ছাধীনে হয় না; আমি শুধুমাত্র বণ্টনকারী—যেই যেই স্থানে আমি দেওয়ার আদিষ্ট হই একমাত্র সেই সেই স্থানেই দিয়া থাকি।

১৩৯৩। হাদীছ :— عن خولة رضى الله تعالى عنها قالت

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ

مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ٥

অর্থ—খাওলা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লার মাল তথা জাতীয় ধন-ভাণ্ডার যাহা একমাত্র আল্লার আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে বণ্টিত হইবে, সেই মালের মধ্যে স্বৈরাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করে তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিন নরক বা জাহান্নাম অবধারিত।

১৩৯৪। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—পূর্ববর্তী কোন একজন নবী জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে যাইতে পরিবে না—(১) যে ব্যক্তি নুতন বিবাহ করিয়াছে, এখনও স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হয় নাই, (২) যে ব্যক্তি নুতন ঘর তৈরী করিয়াছে, এখনও উহার ছাদের কাজ শেষ হয় নাই, (৩) যে ব্যক্তি বকরি, উট, গাভী ইত্যাদি কোন গাভীন পশু ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই উহার প্রসবের আশা করিতেছে, এখনও প্রসব হয় নাই।

সেই নবী জেহাদে যাত্রা করিলেন, যখন উদ্দেশ্যস্থল বস্তির নিকটবর্তী হইলেন, তখন আছরের নামাযের সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। (সেই যমানার শরীয়তে সূর্য্যাস্তের পর

জেহাদ-যুদ্ধ পরিচালনা না-জায়েয ছিল, তাই তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন; (সময় অল্প তদুপরি ফরজ নামাযও উপস্থিত।) অতএব তিনি সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমিও (নিজ দায়িত্ব পালনে আল্লার) আদিষ্ট এবং আমিও (নিজ উদ্দেশ্য সাধনে আল্লার) আদিষ্ট; এই বলিয়া তিনি আল্লার দরবারে দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ আমাদের জন্য সূর্য্যের গতি থামাইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যের গতি থামিয়া গেল, ইত্যবসরে তিনি ঐ বস্তি জয় করিয়া নিলেন।

অনেক অনেক গণীমতের মাল একত্রিত করা হইল, (সেই যমানায় গণীমতের মাল ভোগ করা নিষিদ্ধ ছিল। সম্পূর্ণ গণীমতের মাল একত্রিত করা হইত অতঃপর আকাশের দিক হইতে অগ্নি আসিত, যেই জেহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইত সেই জেহাদের গণীমতের মালকে ঐ অগ্নি ভস্মীভূত করিয়া দিত; উক্ত রেওয়াজ অনুযায়ী ঐ নবী সেই জেহাদের সমুদয় গণীমতের মাল একত্রিত করিলেন।) আকাশের দিক হইতে অগ্নি আসিল বটে, কিন্তু ঐ মাল সম্পদসমূহকে স্পর্শ করিল না। তখন আল্লার নবী বলিলেন, নিশ্চয় গণীমতের মালের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাৎ করা হইয়াছে (যদ্দরুন অগ্নি ইহাকে স্পর্শ করিতেছে না। অতঃপর তিনি আত্মসাৎকারীর খোঁজ পাওয়ার তদবীর করিলেন—) তিনি সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের এক একজন লোক আমার হাতে দীক্ষা গ্রহণ কর। সেইরূপ করা হইলে একটি লোকের হাত নবীর হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। নবী বলিলেন, তোমার গোত্রের মধ্যেই কোন লোক গণীমতের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে; সেই গোত্রের সকলকে ঐরূপে হাতে হাত দেওয়ার আদেশ করা হইল। তাহাদের দুই তিন জন লোকের হাত নবীর হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। এইরূপে তাহারা ধরা পড়িল এবং গাভীর মাথার ন্যায় একটি স্বর্ণ-খণ্ড যাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। যখন উহাকে স্তূপীকৃত গণীমতের মালের সঙ্গে রাখা হইল, তখন অগ্নি আসিয়া ঐ মাল ভস্ম করিল।

(রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) অতঃপর আমাদের শরীয়তে আমাদের বৈশিষ্ট্য রূপে গণীমতের মাল ভোগ করা জায়েয করা হইয়াছে। (অবশ্য শরীয়তের বিধানের বরখেলাফ উহাকে আত্মসাৎ করা হারাম।)

জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ধন-দৌলতে উন্নতি

১৩৯৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা যোবায়ের (রাঃ) জামালের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াকালে আমাকে ডাকিলেন; আমি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস! অদ্যকার যুদ্ধের নিহতগণ জালেম বা মজলুম হইবে।

(অর্থাৎ যদিও উভয় দল মোসলমান এবং প্রত্যেক দলই ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে নয়, বরং হককে প্রাবল্যদানের ভিত্তিতে মতবিরোধে লিপ্ত হইয়া সংঘর্ষে অবতরণ করিয়াছে।

সেই সূত্রে উভয়ের নিয়্যত শুদ্ধ হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এক দলের বুঝ ভুল হওয়ায় সেই দল অন্যায় পথে এবং অপর পক্ষ ন্যায়ের পথে হইবে। অবশ্য উভয় পক্ষের যোগ্য নেতৃবৃন্দ ছাহাবীগণ প্রত্যেকেই নিজকে হকের উপর গণ্য করিয়াছেন ; আর বিরোধীয় বিষয়টি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণে পূর্ণ সাব্যস্ত নহে ; উভয় পক্ষেরই দলীল প্রমাণ আছে। তাই যেই পক্ষ বাস্তব ন্যায়ের বিপক্ষে তাঁহারাও ক্ষমার্হ পরিগণিত।) আমার ধারণা অদ্য আমি মজলুম অবস্থায় নিহত হইব।

আমার সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হইতেছে আমার ঋণ। তোমার কি ধারণা হয়, আমার ঋণ আমার সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট রাখিবে ? হে বৎস ! তুমি আমার ঋণ পরিশোধে আমার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দিও। যদি ঋণ পরিশোধান্তে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অবশিষ্টের তৃতীয়াংশের অছিয়ত করিতেছি এবং সেই তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য অছিয়ত করিতেছি। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের কোন কোন পুত্র যোবায়েরের কোন কোন পুত্রের সমবয়স্ক ছিল। (অর্থাৎ পৌত্রগণ সাংসারিক জীবনের পর্য্যায়ে ছিল ; তাই সাহায্য স্বরূপ পৌত্রগণের পক্ষে তিনি অছিয়ত করিলেন। যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তখন নয় পুত্র নয় কন্যা ছিল।)

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা বার বার আমাকে তাঁহার ঋণ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছিলেন এবং তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, হে বৎস। যদি তুমি অসাধ্য বোধ কর তবে আমার মাওলা—সাহায্যকারীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও। তিনি সাহায্যকারীর কথা বলিতেছিলেন ; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান ! "সাহায্যকারী" বলিয়া আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিতেছেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা আমার পিতা যোবায়েরের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহার ঋণ সম্পর্কে কোন জটিলতার সম্মুখীন হইলেই আমি দোয়া করিয়াছি, হে যোবায়েরের মাওলা ! যোবায়েরের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দাও ; এই দোয়া করিলেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইয়া যাইত।

এই সমস্ত কথা-বার্তার পর যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ধারণাই বাস্তবায়িত হইল ; তিনি ঐ দিনই শহীদ হইলেন। তিনি কোন নগদ টাকা পয়সা রাখিয়া যান নাই, তিনি কতিপয় স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন—মদীনার নিকটবর্তী "গাবা" নামক এলাকা, মদীনা শহরে এগারখানা বাড়ী, বসরা শহরে দুইটি বাড়ী, কুফা শহরে একটি বাড়ী এবং মিশর শহরে একটি বাড়ী।

তাঁহার ঋণ এই ধরণের ছিল যে, মানুষ তাঁহার নিকট টাকা-পয়সা আমানত রাখিবার জন্য উপস্থিত করিত ; আমানতরূপে রাখিলে উহা নগদরূপেই থাকিয়া যাইবে যাহা নষ্ট

হওয়ার আশঙ্কা অধিক ; অতএব তিনি ঐরূপ লোকদেরকে বলিতেন, করজ ও ঋণস্বরূপ রাখিতে পার (আমি উহাকে এমন কোন স্থানে লাগাইয়া দিব যাহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম।)

আমার পিতা কোন সময় শাসনক্ষমতা লাভ বা তহশীলদারী ইত্যাদি কোন চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন না। অবশ্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং খলীফা আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিতেন।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, পিতার বিয়োগান্তে আমি তাঁহার ঋণ সমূহের হিসাব করিলাম। সর্বমোট ঋণ ছিল ২২,০০০০০ দেরহাম—(রৌপ্যমুদ্রা)।

হাকিম ইবনে হেযাম (রাঃ) ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই যোবায়েরের উপর ঋণ কি পরিমাণ আছে? আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন সত্য গোপন করিয়া বলিলেন, এক লক্ষ। ঐ ছাহাবী বলিলেন, আমার মনে হয় না, তোমাদের সম্পত্তি এত ঋণ পরিশোধ করার পরিমাণ হইবে। তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) মূল সত্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঋণ যদি বাইশ লক্ষ হয় তবে কি হইবে? ঐ ছাহাবী বলিলেন, তোমরা এই ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয় না; যদি অপারগ হইয়া পড় তবে আমার সহায়তা গ্রহণ করিও।

যোবায়ের (রাঃ) "গাবা" এলাকাটি এক লক্ষ সত্তর হাজারে ক্রয় করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে ষোল খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রতি খণ্ড বাজার দর হিসাবে এক লক্ষ নির্দ্ধারিত করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন—যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট কাহারও প্রাপ্য থাকিলে সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) উপস্থিত হইলেন, তাঁহার প্রাপ্য চার লক্ষ ছিল; তিনি যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্রকে বলিলেন, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে আমার সমুদয় প্রাপ্য আমি ছাড়িয়া দিতে পারি। যোবায়ের—পুত্র তাহা অস্বীকার বলিলেন; তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমার টাকার পরিবর্তে আমাকে এই "গাবা" এলাকার কিছু জমি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁহাকে এক টুকরা জমি দিলেন। এইরূপে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পত্তি বিক্রয়ে তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল; কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে চার ও অর্দ্ধখণ্ড "গাবা" এলাকার জমি—উহাও এক লক্ষ হারে বিক্রি হইল।

এইরূপে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বীয় পিতার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং সম্পত্তি আরও অবশিষ্ট রহিল, তখন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টনের দাবী জানাইল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, এই মুহূর্তে আমি উহা বণ্টন করিব না, যাবৎ আমি চার বৎসর পর্য্যন্ত হজ্জের মৌসুমে সকলের সম্মুখে এই ঘোষণা জারী না করি যে, যোবায়েরের নিকট কাহারও কোন প্রাপ্য থাকিলে আমার নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লউন। তাহাই করা হইল—প্রতি বৎসর ঐরূপ ঘোষণা

দেওয়া হইত, এইরূপে চার বৎসর ঘোষণা দেওয়া হইল। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করা হইল। যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অছিয়্যতানুসারে অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ ভিন্ন রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টন করা হইল। তাঁহার চার স্ত্রী ছিল, প্রত্যেকে (দুই পয়সা অংশে) বার লক্ষ পাইলেন।

(যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পত্তির মুল্যমান ছিল ৫০২ লক্ষ তথা ৫,০২০০০০০। তাঁহার মৃত্যুর পর বাজার দর হিসাবে উহার মুল্য দাঁড়াইল ৫৯৮ লক্ষ তথা ৫,৯৮০০০০০। তন্মধ্যে ২২ লক্ষ ঋণ পরিশোধ হইয়া ৫৭৬ লক্ষ অবশিষ্ট থাকে, উহার এক তৃতীয়াংশ ১৯২ লক্ষ অছিয়্যতে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৩৮৪ লক্ষ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন হইয়া স্ত্রীর দুই আনা অংশ চার স্ত্রীর মধ্যে ভাগ হয়; প্রত্যেক স্ত্রী দুই পয়সা অংশে ১২ লক্ষ পায়।)

ব্যাখ্যা ঃ—জেহাদের অছিলায় জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরও জাগতিক ধন-সম্পদের মধ্যেও যে বরকত ও উন্নতি হয় আলোচ্য ঘটনার দ্বারা তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় রিক্ত হস্তেই মদীনায় আসিয়াছিলেন, জীবনে কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। শুধু জেহাদের অছিলায় যে সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন উহার মুল্যামান ছিল ৫০২ লক্ষ; তাঁহার মৃত্যুর পর উহার মুল্য আরও ৯৬ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। উল্লেখিত হিসাব দেরহাম তথা সিকি পরিমিত রৌপ্য মুদ্রায় ছিল।

গণিমতের পঞ্চমাংশ হইতে কোন মোজাহেদকে অতিরিক্ত প্রদান করা বা কোন অতিরিক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা

১৩৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "নজদ" এলাকার প্রতি একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলেন, যাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। সেই বাহিনী জয়লাভ করতঃ বহু উট গণিমতরূপে লাভ করিল। তাহাদের মধ্যে গণিমতের মাল বণ্টনে প্রত্যেকের অংশে বারটি উট আসিল। নবী (দঃ) বাইতুল-মালের অংশ হইতে প্রত্যেককে আরও এক একটি উট অতিরিক্ত দিলেন।

১৩৯৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথাও সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত করা কালীন অনেক সময় পথিমধ্যে হইতে কোন ছোট-খাট এলাকার প্রতি মুল বাহিনীর এক অংশকে প্রেরণ করিয়া থাকিতেন। (তাহাদের হাসিলকৃত গণিমতের মালসমুহে মুল বাহিনীর সকলের সমান অধিকার থাকাই শরীয়তের বিধান। অবশ্য) তাহাদিগকে নবী (দঃ) কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত দিয়া থাকিতেন।

১৩৯৮। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ইয়ামনে থাকিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মক্কা পরিত্যাগ পূর্বক মদীনায় পৌঁছিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। তখন আমরাও স্বীয় দেশ ইয়ামন ত্যাগ করতঃ হযরতের প্রতি যাত্রা করিলাম; আমরা তিনজন ছিলাম—আমি এবং আমার বড় দুই ভ্রাতা, একজনের নাম আবু বোরদাহ্ (রাঃ) অপর জনের নাম আবু রোহ্‌ম্ (রাঃ)। আমাদের সঙ্গে আমাদের গোত্রীয় তিপ্পান্ন জন লোক ছিলেন। আমরা সকলেই একটি সামুদ্রিক নৌকাযোগে যাত্রা করিলাম। (ঝঞ্ঝাবাত্যার বেগে) নৌকা আমাদিগকে আবিসিনিয়ায় লইয়া গেল। তথায় জা'ফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। (তাঁহারা সকলেই মক্কাবাসীদের অসহনীয় অত্যাচারের দরুণ পূর্বেই তথায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন।) জা'ফর (রাঃ) আমাদেরে বলিলেন, রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে এই দেশে পাঠাইয়াছেন এবং এই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। আপনারাও এখানেই অবস্থান করুন। আমরা তথায় অবস্থান করিলাম। অতঃপর আমরা সকলে (সুযোগ প্রাপ্তে) তথা হইতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন নবী (দঃ) সবেমাত্র খয়বরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। নবী (দঃ) ঐ যুদ্ধের গণিমতের মাল হইতে আমাদিগকেও কিছু অংশ প্রদান করিলেন। জাফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এবং আমাদের নৌকারোহী লোকগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও খয়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ব্যতিরেকে ঐ গণিমতের অংশ প্রদান করেন নাই।

আমরা নৌকারোহী দল সম্পর্কে কোন কোন লোক এইরূপ উক্তি করিত যে, হিজরত করার সৌভাগ্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। একদা আমাদের দলীয় আসমা-বিনতে-উমাইস নাম্নি রমণী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবি—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা—হাফছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনিও আবিসিনিয়ার হিজরতকারীগণের একজন ছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার পিতা ওমর (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন। "আসমা" সম্পর্কে ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রমণীটি কে? তিনি বলিলেন, আসমা বিন্‌তে উমাইস। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে সমুদ্র পথে সদ্যাগত দলীয় রমণী আসমা তুমি? আসমা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। ওমর (রাঃ) (কৌতুক করিয়া) বলিলেন, হিজরতের সৌভাগ্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী; আমরা মদীনায় তোমাদের পূর্বে পৌঁছিয়াছি। তাই আমরা তোমাদের অপেক্ষা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক (নৈকট্য লাভের) অধিকারী।

এই উক্তিতে আসমা (রাঃ) রাগান্বিত হইলেন এবং প্রতিবাদে বলিলেন, কখনও নহে—আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি। আপনারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুশীতল ছায়াতলে রহিয়াছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তকে খাদ্য যোগাইয়াছেন, অজ্ঞকে

শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা ছিলাম দূরদেশে শত্রুর দেশে, অশান্তির দেশে—আবিসিনিয়ায়; আমাদিগকে কত কষ্ট দেওয়া হইত! কত ভয় দেখান হইত! এই সব দুঃখ-যাতনা কষ্ট-ক্লেশ সহিয়া যাওয়া একমাত্র আল্লাহ ও আল্লার রসুলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। আমি শপথ করিতেছি, কোন পানাহার গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনার এই উক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিয়া এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করি। অবশ্য আমি শপথ করিতেছি, আপনার উক্তিকে অতিরঞ্জিত করিব না।

অতঃপর যখন নবী (দঃ) তশরীফ আনিলেন তখন আসমা (রাঃ) হযরতের নিকট ওমরের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উত্তর করিয়াছ? আসমা স্বীয় উত্তরও ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী নয়; তাহাদের ত শুধু একটি হিজরত হইয়াছে (—স্বীয় দেশ মক্কা হইতে মদীনায়।) কিন্তু তোমরা নৌকারোহী দল—তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (—স্বদেশ ইয়ামন হইতে আবিসিনিয়ায় এবং তথা হইতে মদীনায়।)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নৌকারোহী দলের আবু মুছা (রাঃ) এবং অন্যান্য লোকগণ দলে দলে আমার নিকট আসিয়া (তাহাদের জন্য সুসংবাদের) এই হাদীছ শুনিত। দুনিয়ার কোন বস্তুই তাহাদের নিকট এই হাদীছ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও সন্তুষ্টি-বাহক ছিল না। আসমা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট হইতে আবু মুছা (রাঃ) এই হাদীছ পুনঃ পুনঃ শুনিতেন।

আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের দলীয় লোকদের প্রশংসায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন, আমি আশ্‌য়ার গোত্রীয় দলের লোকদের কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করিতে পারি—যখন তাহারা গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং তাহাদের বাসস্থান না দেখিয়াও তাহাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা উহার পরিচয় লাভ করিয়া থাকি।

জেহাদে নিহত শত্রুর ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহ হত্যাকারী পাইবে—ঘোষণা দেওয়া হইলে?

১৩৯৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হোনাইনের জেহাদে যাত্রা করিলাম। যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন প্রথম দিকে মোসলমান দলের পক্ষে পশ্চাদপসারণের ন্যায় দৃশ্য দেখা গেল। ঐ সময় আমি দেখিতে পাইলাম, একজন মোসলমান ব্যক্তিকে একজন মোশরেক কাবু করিয়া ফেলিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ মোশরেকের পেছন দিক হইতে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত করিলাম। তখন সে ঐ মোসলমান ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং এমন ভীষণভাবে চাপ দিল যে, আমি মৃত্যুভাব অনুভব করিলাম, কিন্তু তাহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল এবং সে আমাকে ছাড়িয়া দিল।

সেই জেহাদে প্রথম অবস্থায় মোসলমান পক্ষে যে, পরাজয়ের দৃশ্য দেখা গেল সে সম্পর্কে আমি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোক সকল এইরূপ করিল কেন? তিনি বলিলেন, আল্লার তরফ হইতে অদৃষ্টে ইহাই ছিল। অতঃপর পশ্চাদপসরণকারী মোসলমানগণই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রবলবেগে আক্রমণ চালাইল (এবং মোসলমানদের জয় হইল। জেহাদ সমাপ্তে রসুলুল্লাহ (দঃ) এক স্থানে বসিয়া ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করিয়াছে এবং সে সম্পর্কে প্রমাণ দিতে সক্ষম হইবে তাহাকে সেই নিহত ব্যক্তির ব্যবহার্য্য উপস্থিত সমুদয় সম্পদ দান করা হইবে। তখন আমি যে, ঐ কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলাম সেই সম্পর্কে দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমার কার্য্যের উপর কেহ সাক্ষী আছেন কি? এই বলিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম এবং এইরূপে আমি তিনবার দাঁড়াইলাম। তৃতীয়বার নবী (দঃ) আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলাম, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তাঁহার দাবী সত্য, ঐ কাফেরকে তিনি হত্যা করিয়াছেন, এবং নিহত কাফেরের সম্পদসমূহ আমার নিকট আছে। নবী (দঃ)কে অনুরোধ জ্ঞাপন পূর্বক বলিল, আপনি তাঁহাকে সম্মত করাইয়া দেন যেন উহা আমারই থাকে।

আবু বকর (রাঃ) বিরোধিতা করিয়া বলিলেন, হত্যাকারীকে প্রদান করাই কর্তব্য, নতুবা বীর পুরুষগণের উৎসাহ বর্দ্ধন উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকরের উক্তি সমর্থন করিয়া ঐ সম্পদ আমাকেই প্রদান করিলেন। উহা এত মূল্যবান ছিল যে, একমাত্র লৌহ-বর্মটি বিক্রি করিয়া আমি একটি বাগান ক্রয় করিয়াছি এবং মোসলমান হওয়ার পর উহাই আমার সর্বপ্রথম সম্পত্তি।

১৪০০। **হাদীছঃ**— আম্‌র ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (জেহাদে অধিকৃত কিছু) ধন-সম্পদ উপস্থিত করা হইল, তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে উহা বণ্টন করিয়া দিলেন। যাহাদিগকে দেওয়া হইল না তাহারা মনক্ষুণ্ণ হইল। তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি কোন কোন সময় এক দল লোককে দান করিয়া থাকি তাহাদের পদস্খলনের আশঙ্কা করিয়া এবং কোন এক দল লোককে দান করি না—আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত তাহাদের অন্তরে দৃঢ় ঈমান ও নিষ্কামনতার উপর নির্ভর করিয়া। এইরূপ লোকদের মধ্যে আম্‌র ইবনে তাগলেব অন্যতম। আম্‌র ইবনে তাগলেব (রাঃ) ইহা শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি বলিতেন— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তির বিনিময়ে যে কোন মূল্যের সম্পদ আমার হাসিল হইলে আমি তাহাতে এইরূপ সন্তুষ্ট হইতাম না।

১৪০১। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি (জেহাদে অধিকৃত ধন-সম্পদের বাইতুল-মালের অংশ হইতে অন্যান্যদের তুলনায়) কোরায়েশগণকে অধিক দিয়া থাকি। তখন

আমার উদ্দেশ্য হয় তাহাদের মন রক্ষা করা, কারণ তাহারা সবেমাত্র অন্ধকার যুগ হইতে ইসলামের আলোতে আসিয়াছে। (এখনও তাহারা ইসলামের পূর্ণ অনুভূতি হাসিল করিতে পারে নাই।)

১৪০২। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের জেহাদে বহু ধন-সম্পদ মোসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, উহা হইতে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের অংশ যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিলেন তখন তিনি কোরায়েশ বংশীয় কোন কোন লোককে এক একশত উট দান করিলেন। এতদসম্পর্কে (ইসলামে নবাগত সরল প্রকৃতির) কোন কোন মদীনাবাসী লোক এইরূপ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরায়েশগণকে যেই পরিমাণ দান করিয়াছেন আমাদিগকে সেই পরিমাণ দান করিতেছেন না, অথচ আমরা ইসলামের জন্য অধিক জেহাদ করিয়াছি, এমনকি এখনও ইসলাম-দ্রোহীদের তাজা রক্ত আমাদের তরবারী হইতে ঝরিতেছে; আল্লাহ তাঁহাকে মার্জনা করুন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরে এইসব কথা-বার্তার সংবাদ দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে ডাকাইয়া একটি তাবুতে একত্রিত করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না। তাঁহারা একত্রিত হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এইসব কি কথা-বার্তা যাহা তোমাদের সম্পর্কে আমি শুনিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে সুবুদ্ধি রাখেন এইরূপ ব্যক্তিগণ আরজ করিলেন, আমাদের মধ্যে যাহারা বুঝমান তাঁহারা কিছুই বলেন নাই; অবশ্য আমাদের মধ্যে কতিপয় ছেলে বয়সের লোক এই এই কথা বলিয়াছে। তখন রসুল (দঃ) তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি এমন লোকদিগকে বিশেষরূপে দান করি যাহারা সবেমাত্র কুফুরী ত্যাগ করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছে (অর্থাৎ এখনও তাহাদের ইসলাম পূর্ণ মজবুত হয় নাই)।

তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, (কোরায়েশদের এই) সমস্ত লোকগণ ধন লইয়া বাড়ী ফিরিবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? আল্লার কসম—তোমাদের বস্তু তাহাদের বস্তু অপেক্ষা অতি মহান, অতি মহান। উপস্থিত সকলেই বলিল, নিশ্চয় আমরা উহাতে সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যের প্রাধান্য দেখিতে পাইবে তখন তোমরা ধৈর্য্য ধরিও—আল্লার সঙ্গে এবং হাওজে-কাওছারের নিকট আল্লার রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ (তথা মৃত্যু) পর্য্যন্ত।

আনাছ (রাঃ) বলেন, আমরা পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্য্য ধারণ করি নাই। (যে সব বিরোধ পরবর্তী সময় সৃষ্টি হইয়াছিল উহার প্রতি আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

● মক্কা-বিজয়ের পরক্ষণেই হোনায়নের বিজয় ছিল, ঐ সময় মক্কাবাসীদের প্রতি নবীজীর বিশেষ অনুরাগ দেখায় সরলমনা মদিনার যুবকদের মনে আশঙ্কা জন্মিল, নবী (দঃ)·

মক্কায় থাকিয়া যাইবেন। সেই মনোবেদনাই অসংযত মুখে প্রশ্নের ভাষা জন্মাইয়াছে। বস্তুতঃ উহা ছিল, নবীজীর প্রতি তাঁহাদের অতি ভালবাসার বিকাশ। প্রবাদ আছে—"অতি ভালাবাসা নানা প্রশ্ন জন্মায়"। সেমতেই নবী (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প প্রকাশে তাঁহাদেরে সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কোন প্রশ্ন থাকে নাই।

১৪০৩। **হাদীছ ঃ**—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি এবং অন্যান্য লোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হোনায়নের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গ্রাম্য লোকগণ সাহায্যের জন্য রসুল (দঃ)কে ঘিরিয়া ধরিল, এমনকি তাহারা তাঁহাকে বাবুল কাঁটার ঝোপের প্রতি কোণ-ঠাসা অবস্থায় পতিত করিল এবং হযরতের গায়ের চাদর বাবুল কাঁটায় লটকিয়া গেল। হযরত (দঃ) দাঁড়াইয়া চাদরখানা দিবার জন্য বলিলেন এবং শপথ করিয়া বলিলেন, এই বাবুল বনের কাঁটা সংখ্যা পরিমাণ পশুপাল (ইত্যাদি ধন-সম্পদ) হস্তগত হইলেও সবই আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব; তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও সাহসহীন পাইবে না।

১৪০৪। **হাদীছ ঃ**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। হযরতের গায়ে একটি মোটা পাড়বিশিষ্ট চাদর ছিল; এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী (দঃ)কে চাদর ধরিয়া শক্তভাবে টানিল; হযরতের গর্দানে চাদরের পাড় বিদ্ধ হওয়ার রেখা অঙ্কিত হইয়া গেল। এইরূপ করিয়া সে বলিল, আল্লাহ আপনার হস্তে যে ধন-সম্পদ দিয়াছেন উহা হইতে আমার জন্য কিয়দাংশ বরাদ্দ করুন। নবী (দঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া হাস্যমুখে তাহাকে অর্থ দানের আদেশ করিলেন।

১৪০৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের জেহাদ সমাপ্তে (গণিমতের পঞ্চমাংস বন্টনকালে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় লোককে অধিক দান করিলেন। আক্‌রা' ইবনে হাবেস নামক এক ব্যক্তিকে একশত উট দিলেন, ওয়ায়না ইবনে হেছন নামক এক ব্যক্তিকেও ঐরূপ এবং আরও কতিপয় আরবের নেতৃস্থানীয় লোককে এইরূপ বেশী বেশী দিলেন। এক মোনাফেক ব্যক্তি মন্তব্য করিল, এই বন্টনের মধ্যে ইনসাফ করা হয় নাই বা একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে স্থির করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই কু-উক্তির সংবাদ নিশ্চয় পৌঁছাইব। অতঃপর আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া গোপনে তাঁহাকে ঐ সংবাদ বলিলাম। নবী (দঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল; এমনকি আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই সংবাদ না দিলেই ভাল ছিল। অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ইন্‌সাফ না করিলে কে ইন্‌সাফ করিবে? নবী (দঃ) ইহাও বলিলেন, মুছা নবীর প্রতি আল্লার রহমত হউক—তিনি ত এইরূপ উক্তি অপেক্ষা অনেক যাতনাদায়ক ঘটনাসমূহের সম্মুখীন হইয়াও ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন।

রণাঙ্গণে হস্তগত খাদ্যবস্তু প্রয়োজনে খাইতে পারে

১৪০৬। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের একটি দুর্গ আমরা ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় দুর্গের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি একটি চামড়ার থলিয়া নিক্ষেপ করিল ; উহাতে চর্বিজাতীয় খাদ্য বস্তু ছিল। আমি উহা ধরিবার জন্য ছুটিলাম। তাকাইয়া দেখি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপস্থিত ; তাঁহাকে দেখিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। (নবী (দঃ) মুস্কি হাসি দিয়া বলিলেন, ইহা তোমারই জন্য।)

১৪০৭। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, বিভিন্ন জেহাদে আমরা মধু, আঙ্গুর ফল (ইত্যাদি খাদ্যবস্তু) হস্তগত করিতাম এবং আমরা উহা খাইতাম, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে উহা জমা রাখিতাম না।

অমুসলিমদের উপর জিযিয়া প্রবর্তন করা

দেশ রক্ষা ও দেশ শাসন ইত্যাদি প্রয়োজনে সকল শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিই রাষ্ট্র কর্তৃক কর নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। সকল যুগে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই ইহার প্রচলন আছে। মোসলমান প্রজাদের প্রতি দেশ রক্ষার দায়িত্ব সরাসরি চাপাইয়া দিয়া জেহাদকে ফরজ করা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের প্রতি যাকাৎ, ওশর ইত্যাদি নির্দ্ধারিত ও অনির্দ্ধারিত নানাপ্রকার ব্যয় বাধ্যতামূলক প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে অমোসলেমদের উপরও কর ধার্য্য করা হইয়াছে, সেই করকেই আরবী ভাষায় "জিযিয়া" বলা হয়। প্রতি মাসে মাথা কিছু ধনীদের উপর চার দেরহাম (এক টাকা), মধ্যবিত্তদের উপর দুই দেরহাম এবং সাধারণ সক্ষমীদের উপর এক দেরহাম (চার আনা) হারে নির্দ্ধারিত ছিল, অসমর্থ অক্ষমকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া হইত। এই সামান্য করের বিনিময়ে তাহাদের জান, মাল ইত্যাদির রক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ছিল।

এই সামান্য কর অর্থে "জিযিয়া" শব্দকে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা কতই না জঘন্য! আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, (১০ পা: ১০ রুঃ)—

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ...... حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

অর্থ—যাহারা আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লার ও আল্লার রসুল কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত হারামকে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম (দ্বীন ইসলাম)কে গ্রহণ করে না (যদিও তাহারা) কিতাবধারী কাফেরদের মধ্য হইতে (হয়) ; তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাও, যাবৎ না তাহারা জিযিয়া— রাষ্ট্রিয় কর বাধ্যগতরূপে পূর্ণ আনুগত্যের সহিত রাষ্ট্রের প্রভুত্ব স্বীকার এবং উহার সম্মুখে নতী স্বীকার পূর্বক আদায় না করে।

১৪০৮। হাদীছ :—আম্‌র ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু ওবায়দা (রাঃ)কে বাহ্‌রাইন এলাকার জিযিয়া ওয়াসিল করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বাহ্‌রাইন বাসীদের পক্ষ হইতে কর দানের চুক্তিপত্র গ্রহণ করতঃ তাহাদের উপর আলা-ইবনে হজরমী (রাঃ) ছাহাবীকে শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া দিয়াছিলেন। আবু ওবায়দা (রাঃ) বাহ্‌রাইন হইতে কর আদায় করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। মদীনাবাসী আনছারগণ তাঁহার প্রত্যাবর্তন সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই ফজরের নামায রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে পড়িলেন। নামাযান্তে তাঁহারা হযরতের সম্মুখে আসিলেন। নবী (দঃ) হাসিমুখে বলিলেন, তোমরা আবু ওবায়দার প্রত্যাবর্তন সংবাদ অবগত হইয়াছ? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ। রসুল (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আশা রাখ।

অতঃপর রসুল (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষে দারিদ্রকে ভয় করি না, অবশ্য এই ভয় আছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় তোমাদিগকে ধন-দৌলতের প্রাচুর্য্য প্রদান করা হইবে এবং তোমরা সেই পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় ধন-দৌলতের মোহে নিমগ্ন হইবে, ফলে ঐ মোহ এবং প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে যেরূপে পূর্ববর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করিয়াছে।

১৪০৯। হাদীছ :—ওমর (রাঃ) স্বীয় শাসনকালে বড় বড় শহর ও এলাকা সমূহের প্রতি অমোসলেমদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালিত করিলেন। সেই উপলক্ষেই পারস্য রাজ্যাধীন এক এলাকার শাসনকর্তা "হুরমুজান" ইসলামে দীক্ষিত হয়। ওমর (রাঃ) তৎকালীন যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, বর্তমান প্রধান প্রধান শক্তি সমূহের শীর্ষ হইল পারস্য সম্রাট, অতএব মোসলমান সৈন্যগণকে তাহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার আদেশ করুন।

ওমর (রাঃ) সকলকে ডাকিলেন এবং নোমান ইবনে মোকাররেন রাজিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোসলেম সৈন্যগণ শত্রুদেশের নিকটবর্তী হইলে পারস্য সম্রাটের গভর্ণর চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইল। উভয়পক্ষ নিকটবর্তী হইলে শত্রুপক্ষের সর্বাধিনায়ক দুভাষী মারফৎ মোসলমান পক্ষের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ আলোচনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। মোসলমানদের পক্ষ হইতে মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইল। তিনি শত্রুদলীয় সর্বাধিনায়ককে বলিলেন, আপনার কি বলিবার ইচ্ছা—বলুন। সে বলিল, আপনাদের অবস্থা কি? (কোন্ সাহসে আপনারা এত বড় শক্তির সংঘর্ষে আসিয়াছেন?) মুগিরা (রাঃ) বলিলেন, আমরা আরববাসী, আমরা অভাব-অনটন ও কষ্ট ক্লেশের মধ্যে কালাতিপাত করিতাম। আমাদের জীবন মান এতই নিম্নস্তরের ছিল যে, আমরা চর্ম ও খেজুরের দানা চুষিয়া জীবন বাঁচাইতাম এবং মেষ ছাগল ইত্যাদি লোম বুনিত কাপড়ে জীবন কাটাইতাম। আমাদের

ধর্মীয় জীবন এত কুৎসিত ছিল যে, আমরা বট-বৃক্ষ ও পাথরের মূর্তিসমূহ পূজা করিতাম। এমতাবস্থায় সপ্ত জমিন সপ্ত আকাশের সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা আমাদেরই দেশীয় ও জাতীয় একজন নবী আমাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সেই নবীর মাতা-পিতা বংশধর সকলের পরিচয়ই জ্ঞাত আছি। সেই নবী বা আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি রসুল আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন তোমাদের মোকাবিলায় সংগ্রাম চালাইয়া যাই যাবৎ না তোমরা এক আল্লার এবাদৎ ও গোলামী অবলম্বন কর, কিম্বা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও। সেই নবী আমাদিগকে এই সংবাদও দিয়াছেন যে, সংগ্রামে আমাদের যে কেহ নিহত হইবে সে বেহেশত লাভ করিবে; তথায় এমন নেয়ামত সামগ্রি উপভোগ করিবে যাহার নমুনাও কেহ দেখে নাই। আর যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা জয়ী হইয়া তোমাদের মনিব হইবে।

আলাপ-আলোচনা সমাপনাস্তে মুগিরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ দুপুর বেলা হইতেই আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেওয়া। কিন্তু দলের সর্বাধিনায়ক নোমান (রাঃ) বিলম্ব করিতেছিলেন এবং তিনি মুগিয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এইরূপ অনেক জেহাদের সম্মুখীন করিয়াছেন; আপনি উহাতে অলসতা, অমনোযোগিতা ও পশ্চাদপদ হওয়া ইত্যাদি লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হন নাই। অবশ্য আমিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক জেহাদে গিয়াছি। হযরতের রীতি ছিল, তিনি দিনের প্রথম ভাগে (ভোর বেলার শীতলতার মধ্যে) আক্রমণ আরম্ভ না করিলে অতঃপর আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য আছরের নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ার তথা শীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করিতেন।

ইহুদীদেরে আরব ভূ-খণ্ড হইতে বহিষ্কারের আদেশ

১৪১০। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—একদা আমরা মসজিদে ছিলাম, নবী (দঃ) তথায় তশরীফ আনিয়া আমাদিগকে বলিলেন, ইহুদীদের মহল্লায় চল। আমরা রওয়ানা হইলাম এবং তাহাদের একটি শিক্ষাগারে উপস্থিত হইলাম। তথায় নবী (দঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি লাভ করিতে পারিবে। তোমরা বুঝিয়া লও, এই ভূ-খণ্ডের মালিক আল্লাহ তায়ালা তথা তাঁহার প্রতিনিধি—রসুল; (যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর তবে) আমি ইচ্ছা করিতেছি, তোমাদিগকে এই এলাকা হইতে বহিষ্কার করার। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া ফেলিবার সুযোগ পায় সে যেন উহা বিক্রি করিয়া ফেলে, নতুবা এই কথাই বাস্তবে পরিণত হইবে যে, এই ভূ-খণ্ডের মালিক আল্লাহ তায়ালা তথা তাঁহার প্রতিনিধি—রসুল।

বিভিন্ন বিষয়

● জেহাদের ব্যাপারে গোপনতা অবলম্বনের জন্য গন্তব্য স্থানের নাম উল্লেখ না করিয়া ঐ দিকের অন্য কোন একালার নাম উল্লেখ পূর্বক শুধু দিক নির্ণয় করা জায়েয— অর্থাৎ ইহা মিথ্যা পরিগণিত হইবে না। (যেমন, ঢাকা হইতে চিটাগাং যাওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে বলিল—ফেণীর দিকে যাইতেছি।) (৪১৬ পৃঃ) ● কোন দিকে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে সেই দিকে রাষ্ট্রপ্রধানকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া চাই (৪১৭ পৃঃ)। ● মোজাহেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন; আমি জেহাদে যাওয়ার মনস্থ করিয়াছি। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার কিছু মাল দ্বারা তোমার সাহায্য করিতে চাই। মোজাহেদ (রঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার সচ্ছলতা তোমার জন্য রহিয়াছে; আমার কামনা যে, জেহাদের পথে আমার মাল ব্যয় হউক। (ঐ) ● খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ধন-ভাণ্ডার তথা বাইতুল-মাল হইতে কোন কোন মানুষ জেহাদের নামে মাল গ্রহণ করে, কিন্তু পরে তাহারা জেহাদে যায় না; ঐরূপ ব্যক্তির নিজস্ব ধন হইতে আমি ঐ পরিমাণ মাল ফেরত উসুল না করিয়া ছাড়িব না। (ঐ) ● তাউস ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, জেহাদে যাওয়া উপলক্ষে তোমাকে হাদিয়া বা উপহার স্বরূপ কোন কিছু দেওয়া হইলে উহা তুমি যে কোন কাজে ব্যয় করিতে পার, এমনকি বাড়ী খরচের জন্যও রাখিয়া যাইতে পার (ঐ)। ● জেহাদের আমীর কোন বন্দীকে হত্যা করা ভাল বিবেচনা করিলে হত্যা করিতে পারেন (৪২৭)। ● শত্রুর নিকট বন্দী হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ করার অবকাশ আছে; তাহা না করাও জায়েয আছে (ঐ)। ● জেহাদে শত্রুদেরকে প্রাণদণ্ড দানে প্রাপ্ত বয়স্ক বাছাই করার প্রয়োজনে গুপ্তলোম দেখার ব্যবস্থা করা জায়েয আছে। এমনকি শরীয়ত সম্মত বিশেষ প্রয়োজনে কোন মোসলমান নারীকেও আবশ্যক হেতু কোন পুরুষ তাহার দেহের সর্বাঙ্গে তল্লাসী চালাইতে পারে (৪৪৩ পৃঃ)। ● পার্থিব কোন প্রাপ্যের আশায় জেহাদ করিলে সেক্ষেত্রে ছওয়াব হইবে না (৪৪০ পৃঃ)।

● মোসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য কোন প্রধানের সহিত কোন চুক্তি করিলে তাহা সকল মোসলমানের পক্ষে বলবৎ হইবে (৪৪৮ পৃঃ)। ● অমোসলেমদের পক্ষ হইতে কোন বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা যাইতে পারে (৪৪৯ পৃঃ)। ● অতি সাধারণ একজন মোসলমানও কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিলে সকল মোসলমানের পক্ষে তাহা বাধ্যতা-মূলক হইবে (৪৫০)। ● ইসলাম শব্দ ছাড়াও যে কোন শব্দে ইসলাম গ্রহণকারী নিরাপত্তার অধিকারী হইবে (ঐ)। ● অমোসলেমদের সহিত চুক্তি ও মিমাংসা করা জায়েয (ঐ)। ● বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ (ঐ)। ● অমোসলেম নিহতদের মৃতদেহ পুতিয়া দিবে। উহার বিনিময়ে ধন উপার্জন নিষিদ্ধ। (৪৫২ পৃঃ)।

হজরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম-পরিচালিত জেহাদসমুহের বর্ণনা

ভুমিকা—

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তের বৎসরকাল মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পুর্বে তিনি মক্কাবাসীদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন, অত্যন্ত প্রশংসণীয় ছিলেন—সকলেই তাঁহার মিত্র ছিল, তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিল না। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তিনি তৌহিদ—একত্ববাদ ও এক আল্লার বন্দেগী করার এবং মন পুজা, মানুষ পুজা, মত্ পুজা, মুর্তি পুজা ইত্যাদি পৌত্তলিকতা এবং যাবতীয় শেরেকী কার্য্য পরিহার করার প্রতি আহ্বান জানাইলেন তখন হইতেই সমস্ত মক্কা নগরী নয় শুধু, সমস্ত আরব দেশ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তাঁহার সমর্থনকারী এবং তাঁহার প্রচালিত সত্য পথ গ্রহণকারীগণ পর্য্যন্ত অত্যাচারিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের উপর মার-পিট, অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুমের সীমা রহিল না। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও এক এক সময় প্রহারের দরুণ অচেতন হইয়া পড়িতেন। বেলাল (রাঃ) খাব্বাব (রাঃ) আম্মার (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিগণ যাঁহারা কোন প্রকার প্রতিপত্তি ও প্রভাব রাখিতেন না তাঁহাদের প্রতি যে পৈশাচিক বর্বারোচিত জুলুম হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। স্বয়ং নবী (দঃ) পর্য্যন্ত মক্কা-বাসীদের হইতে রক্ষা পাইতেন না।

আল্লার কুদরতের নেশানা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ মোসলমানগণ মক্কার রাস্তায় রাস্তায় অলিতে-গলিতে কাফেরদের অত্যাচারের ষ্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হইতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আল্লার সাহায্য-সহায়তার কোন সক্রিয় ব্যবস্থা দেখা যাইতেছিল না। এমনকি অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া নগণ্য সংখ্যক মোসলমান জীবনদানার্থে সেই অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অনুমতি চাহিয়াও ব্যর্থ হইলেন। বার বার সংগ্রামের পিপাসা প্রকাশ করা সত্ত্বেও অনুমতি দেওয়া হইতেছিল না। বাধা হইয়া কিছু সংখ্যক মোসলমান দেশ ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও দীর্ঘ তের বৎসর দুঃখ-যাতনা ভোগ করার পর দেশ ত্যাগ পুর্বক মদীনায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এতদসত্ত্বেও কাফেরদের শত্রুতার উপশম হইল না; মোসলমান জাতিকে ভুপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার তৎপরতায় তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। স্বদেশ হইতে বিতাড়িত

মোসলমানগণ অন্য দেশে যাইয়া জীবন-যাপন করিবে তাহাও যেন সম্ভব না হয় সেই সব চেষ্টা-তদবীর চলিতে লাগিল। কাফেরদের আয়ত্তের ভিতরকার কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে তাহা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কাহারও সেইরূপ দুঃসাহস হইলে তাহাকে অসহনীয় দুঃখ-যাতনার মধ্যে শিকলে আবদ্ধ থাকিতে হইত বা জীবনে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইত।

এইসব হাল-অবস্থা কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নহে, বরং বর্ণনাতীত বাস্তব সত্য অবস্থার কিঞ্চিৎকর আভাষদান মাত্র, যাহার শত শত নজীর ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মদীনায় আসিবার পরও নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ শান্তি লাভের প্রয়াস পাইলেন না। মক্কাবাসীরা সর্বদাই মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করায় সচেষ্ট থাকিল।

এইসব বাস্তব ইতিহাস দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দেয় যে, সেই পরিস্থিতিতে দ্বীন-ইসলাম এইরূপ অন্তরায় ও বাধার সম্মুখীন ছিল যে, তখন জেহাদ ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিশ্ব মানবের জন্য মনোনীত ধর্ম দ্বীন ইসলামকে সারা বিশ্বে বাধামুক্ত ও অন্তরায়হীন করার জন্য সৃষ্টিকর্তার সৈনিকরূপে কাজ করিয়া যাওয়ার বিশেষ কর্তব্য মানব-স্কন্ধে ন্যাস্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ দ্বীন-ইসলামকে বিশ্ব-বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্বীয় বিশেষ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উপর উক্ত কর্তব্য কি পরিমাণে ন্যাস্ত হইতে পারে তাহা সুস্পষ্ট। এদিকে পরিস্থিতি ভয়াবহতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল; পদে পদে পাহাড়তুল্য শত শত বাধা ও অন্তরায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ নাই। এমন অবস্থায় মক্কাস্থ দীর্ঘ তের বৎসরের নীরবে নিস্তব্ধে ধৈর্য্যের সহিত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া যাওয়ার নীতি তথা নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের নীতি বহন করিয়া যাওয়ার রীতি পরিবর্তন করিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুধু বাধ্যই হইলেন না, বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ছিল ভূপৃষ্ঠে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্তব্য সম্পাদনে হযরত (দঃ) দীর্ঘ ১৩ বৎসর পূর্ণমাত্রায় শান্তভাবে অতুলনীয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সংযমশীল প্রচেষ্টা চালাইলেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উপর নজীরবিহীন অমানুষিক অত্যাচার ও সীমাহীন জুলুম-উৎপীড়নে সামান্য বিরতিও দিল না। হযরত (দঃ) সেই জুলুম-অত্যাচারের প্রতিউত্তর ধৈর্য্য, সহ্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা দিতে থাকিলেন; ভক্তবৃন্দকেও ঐ নীতিতে বাধ্য রাখিলেন। অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত দেহ, বিদীর্ণ মস্তক ও রক্তাক্ত শরীর নিয়া

ভক্তবৃন্দ হযরতের চোখের সামনে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু হযরত (দঃ) ধৈর্য্য ধারণ করিতেন এবং ধৈর্য্যরই ছবক দিতেন। এই অপরিসীম ধৈর্য্য, সহ্য সহিষ্ণুতা ও উদারতার প্রচেষ্টা দীর্ঘ ১৩ বৎসরে শুধু মক্কার বুকেও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ হইল না। বরং হযরত (দঃ) এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দ বাড়ী-ঘর ও ধন-সম্পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিঃস্ব অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হইলেন। ধৈর্য্য-সহ্যের এই ব্যর্থতা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিল যে, ঐ নীতির দ্বারা হযরত (দঃ) কস্মিনকালেও স্বীয় কর্তব্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

অপর দিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় পৌঁছিবার পর পরই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জেহাদের বিধান প্রবর্তনের আয়াত নাযেল হইল—

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ○

অর্থ—(মোসলেম জাতি) যাহারা (এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতির দরুন পথে-ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা হইল; যেহেতু তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাহায্যে সক্ষম; (যদিও তাহাদের বাহ্যিক শক্তি কম।) তাহাদিগকে অন্যায়রূপে তাহাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতি দান করিয়াছে। (নতুবা তাহারা কাহারও প্রতি আদৌ কোনরূপ অন্যায়-অত্যাচার করে নাই।) ১৭ পাঃ ১২ রুঃ

উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম এই যে—এই আয়াতের মূল সম্বোধিত ইসলামের সর্বপ্রথম যুগের মোসলমান—ছাহাবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুগণের বাস্তব অবস্থা ও করুণ কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিতার্থে يقاتلون "আক্রান্ত হওয়া" ظلموا "অত্যাচারিত হওয়া" اخرجوا من ديارهم بغير حق "অন্যায়রূপে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়া" ইত্যাদি কতিপয় বিষয় উল্লেখের ভূমিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে, ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামকে বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই জেহাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুলের অনুমতির প্রতীক্ষায় ছিলেন; ইতিপূর্বে অনুমতি চাহিয়াও অনুমতি পান নাই, তাই জেহাদের বিধান প্রবর্তন প্রসঙ্গটি প্রাথমিক পর্য্যায়রূপে আলোচ্য আয়াতে অনুমতি প্রদান আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত জেহাদ সমূহের বাস্তব তথ্যের বর্ণন দান করা হইলে পাঠকবর্গ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে মক্কাবাসিরা ও ইহুদীরা হযরত নবীজীকে সংগ্রামে অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারসাজি, আন্দোলন ও উৎপীড়ন-অত্যাচার মোসলমানগণকে এইরূপে চতুর্দিক

হইতে ঘিরিয়া ধরে যে, হযরত (দঃ) একের পর এক ধারাবাহিকরূপে ছোট বড় যথেষ্ট সংখ্যক যুদ্ধে জড়িত হইতে বাধ্য হন। ঐসব যুদ্ধ সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনাই আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় আসিয়া শক্তি সঞ্চয়ের পর ধারাবাহিকরূপে চতুর্দিকে যে সমস্ত জেহাদ পরিচালনা করিয়াছিলেন, বর্তমান যুগের ক্ষমতালোভী ভোগ-বিলাসে মত্ত ব্যক্তিরা সেই জেহাদগুলির ইতিহাস দেখিয়া ধারণা করিতে চায় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বোধহয় তাহাদেরই ন্যায় একজন ক্ষমতা-শিকারী ছিলেন। নাউজুবিল্লাহে মিন জালেকা—এইরূপ ওছওয়াছা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যাহারা রসুলকে চিনে না, রসুলের মর্য্যাদা জানে না, জেহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্যের খবর রাখে না—ইসলামের ইতিহাসকে যাহারা আপন কেন্দ্র হইতে শিক্ষা করে নাই, শত্রুর কেন্দ্র হইতে শিক্ষা করিয়াছে তাহারা এইরূপ কু-ধারণার বশীভূত হইলে আশ্চর্য্যের কিছুই নহে। কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে দস্যু ডাকাতের কার্য্যকলাপ ও অস্ত্রোপচারকারী ডাক্তারের কার্য্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য বোধ কঠিন নহে। যদি কেহ উভয়কে একই পর্য্যায়ের মনে করে তবে তাহা তাহার জন্য শুধু অজ্ঞতার পরিচয়ই হইবে না, বরং সে নির্বোধ জ্ঞানশূন্যও প্রতিপন্ন হইবে।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিগত ১৩ বৎসরের শুধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলেন; ভূপৃষ্ঠে আল্লার দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় ও বাধার অশুভ শক্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। মানবদেহে আল্লাহদ্রোহিতার ফোড়াকে দয়া, ক্ষমা, ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার প্রলেপ দ্বারা বিদূরিত করার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আজ বিশ্ব-মানবের দয়াল নবী—স্নেহ-মমতা, প্রেম ও ভালবাসার মূর্তপ্রতিক রহমতুল-লিল-আলামীন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐ ফোড়ার উপর অস্ত্রোপচারে উদ্যত হইলেন; ইহাতেই মানবের কল্যাণ ও মঙ্গল—এই ফোড়াকে অস্ত্রের সাহায্যে দমন করাই মানব-গোষ্ঠির প্রতি বড় দয়া।

এই পর্য্যায়ে হযরতের দৃষ্টি বিভিন্ন কারণে সর্বপ্রথম মক্কার শত্রুদেরকে দমন করার প্রতি নিপতিত হইল। কারণগুলি নিম্নরূপ—

(১) আল্লার দ্বীন-ইসলামের প্রাণবস্তু আল্লার ঘর নামে পরিচিত কা'বা শরীফ মক্কায়—উহার উদ্ধার করা ছাড়া ইসলাম ও মোসলমানদের গত্যন্তর নাই।

(২) ভূপৃষ্ঠে দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠায় বাধা ও অন্তরায়রূপে সর্বপ্রথম মক্কাবাসীরাই দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ভিতরই ইসলামদ্রোহিতার বিষ অধিক সঞ্চারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

(৩) সমগ্র আরব-বিশ্ব মক্কাবাসীদের প্রতি শুধু তাকাইয়াই ছিল না, বরং তাহারা প্রকাশ্যে বলাবলি করিতেছিল, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি ক্ষয় করার প্রয়োজন

নাই; তিনি যদি মক্কাবাসী কোরায়েশদের উপর জয়ী হইতে পারেন তবে আমরাও তাঁহার দলে যোগ দিব, আর যদি মক্কাবাসী কোরায়েশরা তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয় তবে আমরা এমনিতেই রেহায়ী পাইব। এই কারণেই মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবের মানুষ দলে দলে ইসলামের প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছিল। যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআন ছুরা-নছরে রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেও ইহাই বলা হইয়াছিল যে, অবিলম্বে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হউক। হিজরতের পর জেহাদের বিধান প্রবর্তন লগ্নে কোরআন শরীফের যে সব আয়াত নাযেল হয় অনেকের মতে (রুহুল মায়ানী, ১৭—১৪৭ দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে এই আয়াতটিও ছিল—

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا.........

"সংগ্রাম ও অস্ত্রধারণ কর আল্লার দ্বীনের জন্য ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম ও অস্ত্রধারণে লিপ্ত রহিয়াছে তোমাদের বিরুদ্ধে। সীমা লঙ্ঘন (তথা নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা) করিও না; আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। তাহাদেরকে যথায় পাও হত্যা কর এবং যে দেশ হইতে তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে তোমরাও তাহাদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত করে; আল্লার দ্বীনে বাধার সৃষ্টি করা ইহা নরহত্যা অপেক্ষা অনেক বেশী জঘন্য (২ পাঃ ৮ রুঃ) এই আয়াতে যে, সংগ্রামের বিপক্ষরূপে মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

ইসলাম ও মোসলমানদের দীর্ঘদিনের শত্রু—পরম শত্রু এবং ইসলাম ও মোসলমানদের উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্প ও সংগ্রামরত মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সুচনায় হযরত (দঃ) একজন বিশিষ্ট-সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ পরিকল্পকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। কোন দেশ ও জাতিকে পরাজিত করার এবং কাবু করার সর্বাপেক্ষা কার্যাকরী মারণাস্ত্রটি মক্কাবাসীদের উপর প্রয়োগের' পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিলেন। বর্তমান কূটযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক কল-কৌশলের যুগে ত ঐ অস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বিবেচিত; সেকালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ বাস্তবিকই চমকপ্রদ ছিল। নবী (দঃ) সর্বপ্রথম মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ও বাণিজ্য অবরোধ সৃষ্টির পদক্ষেপ নিলেন। এই অস্ত্র যে কোন দেশ বা জাতিকে ঘায়েল ও দুর্বল করিতে বিশেষ ক্রিয়াশীল। মক্কাবাসীদের পক্ষে ত ইহা মৃত্যু পরওয়ানা ছিল। কারণ, প্রাকৃতিক রূপেই মক্কা একটি উৎপাদনহীন মরুদেশ; সেই দেশবাসী লোকদের প্রতিটি লোকমার সংস্থানে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষ সংগ্রহে বহির্দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং মক্কাবাসীদের জন্য বাণিজ্য অবরোধ শুধু অর্থ-নৈতিক অবরোধই ছিল না, বস্তুত উহা তাহাদের পক্ষে খাদ্য অবরোধ ও জীবন অবরোধ ছিল। সেই যুগে মক্কার সর্বাধিক বাণিজ্য ছিল সিরিয়ার

সহিত; মক্কা ও সিরিয়ার যাতায়াত পথ ছিল মদীনাবাসীর বাগের আওতায়। মক্কার অর্থ-সামর্থ্য আহার্য্য-ব্যবহার্য্য সব কিছু বণিকদের মারফৎ এই পথে সিরিয়া হইতে আনিত।

হযরত (দঃ) এই পথকে মক্কার বণিকদের জন্য বিপদ সংকুল ও অবরুদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) এই উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে পর পর কয়েকটি আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব দান আরম্ভ করিলেন। যে সব অভিযানে হযরত (দঃ) নিজে অংশগ্রহন করেন নাই উহাকে পরিভাষায় "সারিয়্যা" বলা হয়। আর যে অভিযানে হযরত (দঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন উহাকে সাধারণতঃ "গয্ওয়া" বলা হয়।

সর্ব প্রথম জেহাদ

হাম্‌যাহ (রাঃ)-এর অভিযান:

উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হযরত (দঃ) সর্বপ্রথম হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিজরতের মাত্র ছয় মাস পরেই সপ্তম তথা রমজান মাসে ত্রিশ জন মোহাজের ছাহাবীর একটি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বাহিনীটিকে হযরত (দঃ) নিজ হাতে গাঁথা একটি বিশেষ পতাকাও দিয়া ছিলেন যাহা সাদা রঙ্গের ছিল। সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী মক্কাবাসীদের একটি বণিক দল যাহার মধ্যে মক্কার প্রধান সর্দার আবু জহল সহ তিনশত লোক ছিল—তাহাদের উপর আক্রমণের জন্য উক্ত বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দলে সাক্ষাৎ এবং লড়াই-এর উপক্রমও হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ের মিত্র একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় লড়াই ক্ষান্ত থাকে বাহিনীটি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। (আছাহ-হুস-সিয়ার— ৮০)

ওবায়দা (রাঃ)-এর অভিযান:

পরবর্তী শাওয়াল মাসেই এই দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয়, ৭০ ৮০ জন মোহাজের ছাহাবী এই বাহিনীতে ছিলেন। মক্কাবাসী একটি বণিক দল যাহাতে মক্কার প্রধান আবু জহল ও বিশিষ্ট সর্দার আবু সুফিয়ান সহ দুইশত লোক ছিল—এই দলটির উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে উক্ত বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। মোসলমানদের হইতে সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ) কাফেরদের প্রতি একটি তীরও নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যাহা ইসলামী জেহাদের সর্বপ্রথম তীর রূপে পরিগণিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত উভয় দলে কোন লড়াই হয় নাই। (ঐ)

সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ)-এর অভিযান:

পরবর্তী জীলকাদ মাসে বিশ জনের এই বাহিনীটি মক্কাবাসী কোরায়েশদেরই একটি বণিক দলের উপর আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মক্কাবাসী বণিক দলটি পূর্বাহ্নেই সরিয়া পড়ায় লড়াই হইতে পারে নাই। (ঐ ৮২)

গয্‌ওয়া আব্‌ওয়া বা ওয়াদ্দান :

স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ:) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ অভিযানের সর্বপ্রথম অভিযান এইটি। হিজরতের এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই; ১২তম মাসে—ছফর মাসে হযরত (দ:) অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং ১৫ দিনে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। মদীনা হইতে প্রায় বিশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত সন্নিকটবর্তী দুইটি বস্তি—একটির নাম "আব্‌ওয়া" অপরটির নাম "ওয়াদ্দান"। রসুলুল্লাহ (দ:) ষাট জন মোহাজের ছাহাবী সঙ্গে লইয়া মক্কাবাসী শত্রু কোরায়েশদের একটি বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবনে উক্ত এলাকা পর্য্যন্ত পৌছিয়া ছিলেন। বিপক্ষ দলের লাগ পাওয়া যায় নাই, তাই এই অভিযানে লড়াই হয় নাই।

গয্‌ওয়া বাওয়াত :

অতঃপর প্রায় এক মাস ব্যবধানে রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের নেতৃত্বাধীনের এই দ্বিতীয় জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। "বাওয়াত" একটি পর্বতের নাম, মদীনা হইতে চার দিনের পথ দুরে অবস্থিত। কোরায়েশদের ঐরূপ একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যেই রসুলুল্লাহ (দ:) দুইশত মোহাজের ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া ঐ পর্বত পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। এইবারও বিপক্ষ দল সরিয়া পড়িতে সক্ষম হওয়ায় এই অভিযানেও লড়াই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

গয্‌ওয়া ওসায়রা :

অতঃপর প্রায় দুই মাস ব্যবধানে তথা জোমাদাল-আখেরাহ মাসে এই জেহাদ পরিচালিত হয়। "ওসায়রা" মদীনা হইতে তিন দিনের পথ দুরে অবস্থিত—একটি স্থানের নাম। রসুলুল্লাহ (দ:) প্রায় দুইশত ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া এই অভিযান পরিচালিত করেন। মক্কার একটি বণিক দল বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করিয়াছিল; তাহাদের গতিরোধে হযরত (দ:) অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উক্ত স্থান পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। এই অভিযানেও বিপক্ষ দল সরিয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছিল; লড়াই হয় নাই।

১৪১১। **হাদীছ :—** যায়েদ ইবনে আরকাম (রা:)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, উনিশটি। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি তাঁহার সহিত কতটিতে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলিলেন, সতরটিতে। জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বপ্রথম কোন্‌টি ছিল? তিনি বলিলেন, "ওসায়রা" অভিযান।

ব্যাখ্যা :— হযরত নবী (দ:) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ অভিযানের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য রহিয়াছে। ২১, ২৪ এবং ২৭ সংখ্যার বর্ণনাও আছে। বর্ণনাকারীদের অবগতির পার্থক্যেই এই পার্থক্য।

সর্বপ্রথম অভিযান কোন্‌টি ছিল সে সম্পর্কেও উল্লিখিত বর্ণনার ব্যতিক্রমে বোখারী (র:) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সর্ব প্রথমটি "আবওয়া" অভিযান তারপর "বাওয়াত" অভিযান, তারপর "ওসায়রা"।

গয্‌ওয়া ছাফওয়ান :

উপরোক্ত অভিযানের অল্প দিন পরেই মদীনার সীমান্তে মোসলমানদের পশুপাল লুণ্ঠনের চেষ্টায় কাফেরদের একটি আক্রমণ হয়, সেই আক্রমণকারীদের পশ্চাদ্ধাবনেও রসুলুল্লাহ (দঃ) ছোট-খাট একটি অভিযান চালাইয়া ছিলেন এবং "ছাফওয়ান" নামক উপত্যকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের লাগ পাওয়া যায় নাই।

হিজরতের পর সপ্তম মাস তথা রমজান মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জোমাদাল আখেরাহ পর্যন্ত দশ মাসে পর পর ছয়টি অভিযান চলিল; উদ্দেশ্য—বাণিজ্য অবরোধ সৃষ্টি করিয়া মক্কাবাসী শত্রুকে দুর্বল ও ঘায়েল করা। প্রথম তিনটি বিভিন্ন ছাহাবীর নেতৃত্বে চলিয়া ছিল। অতঃপর উক্ত ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ নেতৃত্বে আরও তিনটি অভিযান চালাইলেন।

উক্ত অভিযানগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের লাগ পাওয়া যায় নাই বলিয়া লড়াই অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় মক্কাবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল নিশ্চয়। শুধু ব্যতিব্যস্তই নয়, তাহারা কিছুটা বেসামালও হইয়া পড়িল এবং প্রতিশোধে মোসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত করার পদক্ষেপও নিল। যেরূপ গয্‌ওয়া ছাফওয়ানের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের ঐ শ্রেণীর খোঁচাখুঁচিতে ভীত না হইয়া তিনি তাঁহার অবরোধ ব্যবস্থাকে আরও অধিক জোরদার, ক্রিয়াশীল এবং উন্নতমানের করার আর এক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলেন। মক্কা এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া তাহাদের গমনাগমন ও গতিবিধির খবরাখবর গোপনে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) বারজন লোকের একটি দল মক্কা একালার অভ্যন্তর দিকে প্রেরণ করিলেন। মনে হয়, উক্ত ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার নিকটও অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। উক্ত দলটির একটি ঘটনা সাধারণ বিধানে ত্রুটিজনক ছিল; যদ্দরুণ রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ সকলেই তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে ছিলেন, আর মক্কার কাফেররা ত উহার প্রতিবাদে ঢাক-ঢোল পিঠাইতে ছিল। সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত দলের পক্ষে সাফাই বর্ণনায় পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই—

আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ)-এর গোয়েন্দা দল :

মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি অভিযান আরম্ভের একাদশ মাস রজব মাসে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে বারজন লোকের একটি দল গোয়েন্দাগিরির জন্য হযরত (দঃ) প্রেরণ করিলেন। উক্ত দলটির গতিবিধিকে এতই গোপন রাখা হইল যে, তাহাদের কোথায় যাইতে হইবে সেই বিষয়টি যাত্রার সময় তাহাদের নিকটও হযরত (দঃ) গোপন রাখিয়া-ছিলেন। একটি আবদ্ধ লিপি দলপতির হাতে অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে নির্দিষ্ট পথে রওয়ানা

করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, দুই দিন ভ্রমণের পর লিপি পাঠ করিয়া উহার অনুসরণ করিবে। লিপি পাঠে দেখা গেল, লেখা রহিয়াছে—তোমরা 'নখলা' নামক স্থানে পৌঁছিবে যাহা মক্কা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগরী তায়েফ ও মক্কার মধ্যস্থলে অবস্থিত। তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হইবে, কোরায়েশের বণিক দলসমূহের গতিবিধি ও গমনাগমন লক্ষ্য করা এবং উহাদের সঠিক তথ্য আমাকে অবগত করা। শত্রু দলের অভ্যন্তরে তাহাদের পেটের ভিতরে প্রবেশ পূর্বক গোয়েন্দাগিরী করা অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল কাজ এবং জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিপদে অর্পণ করার কাজ, তাই হযরতের বিশেষ পরামর্শ মতে দলপতি সঙ্গীগণকে বলিলেন, লিপির মর্ম এই, কিন্তু কাহারও প্রতি জবরদস্তি নাই, স্বেচ্ছায় যে অগ্রসর হইতে না চাহিবে সে ফিরিয়া যাইতে পারে। দ্বীন-ইসলামের খেদমতে সকলেই বিপদকে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নির্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া কর্তব্য পালনে রত হইলেন। তখন রজব মাস।

জিলকদ, জিলহজ্জ, মহরম ও রজব এই চারিটি মাস হরমের মাস; এই সব মাসে কোন প্রকার লড়াই ও খুন-খারাবি আরববাসীদের নিকট অত্যন্ত জঘন্য কাজ পরিগণিত। ইসলামেও হিজরী নবম সন পর্য্যন্ত উহা হারাম পরিগণিত ছিল। আলোচ্য গোয়েন্দা দলটি তাহাদের কার্য্যকাল—রজব মাসের শেষ দিনটিতে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।

মক্কাবাসী চারজন লোকের একটি দল তায়েফ শহর হইতে উক্ত গোয়েন্দা দলের অবস্থান পথে মক্কা যাইতে ছিল; গোয়েন্দা দলটি তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িল। গোয়েন্দা দলের মোসলমানগণ চিন্তায় পড়িলেন—যদি উক্ত চারজন লোককে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় তবে এক দিনের মধ্যেই গোয়েন্দা দলের সংবাদ মক্কায় ফাঁস হইয়া যাইবে, আর তাহাদেরে আক্রমণ করা হইলে হরমের মাস—রজব মাসের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা হইবে। অবশেষে পরামর্শে সাব্যস্ত হইল যে, তাহাদের উপর আক্রমণ করা হউক; (প্রাণ বাঁচাইতে অবৈধ কাজে বাধ্য হইলে তাহা শরীয়ত অনুমিত।) সেমতে তাহাদের উপর আক্রমণ করা হইল। তাহাদের একজন নিহত হইল, দুইজন বন্দী হইল, আর একজন পলাইতে সক্ষম হইল। গোয়েন্দা মোসলমান দল (বিপদ আশঙ্কায়) বন্দীদ্বয় এবং তাহাদের মালামাল সহ তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন এবং মদীনায় চলিয়া আসিলেন।

অচিরেই ঘটনার সংবাদ মক্কাবাসীদের গোচরে আসিয়া গেল, তাহারা প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়িল যে, মোসলমানগণ হরমের মাসেরও পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াছে। মদীনার মোসলেম সমাজও গোয়েন্দা দলের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদী হইল, এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাহাদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইলেন। অমোসলেম-মোসলেম সকলের মুখেই প্রশ্ন—হরমের মাসে লড়াই করা কি জায়েয ও বৈধ? কিন্তু গোয়েন্দাদের কার্য্যে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ছিল না। তাহাদের কার্য্যের উপর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে ছিল উহা খণ্ডনে ঠেস ও কটাক্ষমূলক উত্তরের আয়াত আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ...... وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"হরমের মাসে লড়াই করা সম্পর্কে আপনার নিকট লোকেরা প্রশ্ন করে; আপনি বলিয়া দিন, হরমের মাসে লড়াই-যুদ্ধ বড় অন্যায়ই বটে। কিন্তু আল্লার পথে (তথা আল্লার দ্বীন-ইসলামে) বাধার সৃষ্টি করা, আল্লার সহিত কুফরী করা এবং মক্কার পবিত্র মসজিদ তথা কাবা শরীফে (এবাদতের কাজে বা লোকদের জন্য) বাধার সৃষ্টি করা এবং সেই পবিত্র মসজিদের প্রতিবেশীদেরকে তথা হইতে বিতাড়িত করা আল্লার নিকট উক্ত অন্যায় অপেক্ষা অনেক বেশী বড় অপরাধ। আর আল্লার দ্বীনে বাধার সৃষ্টি করা এবং উহার জন্য কাহাকেও দুঃখ-যাতনা দেওয়া মনুষ্য খুন করা অপেক্ষা জঘন্য ও মহাপাপ" (২ পাঃ ১১ রুঃ *।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক গোয়েন্দা দলের পক্ষাবলম্বন বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিকল্পনার প্রতি বিরাট সমর্থন দান ছিল। এই সমর্থন এবং ফলাফল দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও অধিক জোরদার করায় নূতন উৎসাহ পাইলেন।

ইতিমধ্যেই তথা উক্ত ঘটনার মাত্র এক মাস ব্যবধানে হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, মক্কাবাসীদের একটি বিশেষ বণিক দল সিরিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতেছে। দুই মাস পূর্বে এই দলটি মক্কা হইতে সিরিয়া গমন করিতে ছিল; তখনও রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাদেরই পিছু ধাওয়া করিয়া নিজ নেতৃত্বে পূর্বে বর্ণিত "গযওয়া ওসায়রা" নামক অভিযান পরিচালিত করিয়া ছিলেন।

এই দলটি বৃহৎ বাণিজ্য-দল ছিল, মক্কার প্রায় প্রতিটি লোকেরই টাকা ইহাতে ছিল। ধন-সম্পদ, মালামালও অনেক বেশী ছিল। মক্কাবাসীদের জীবন ধারণের রসদ এবং শক্তি সঞ্চয়ের অস্ত্র সস্ত্রও নিশ্চয় ইহাতে থাকিবে। এমতাবস্থায় এই দলটিকে কাবু করিতে পারিলে মক্কাবাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে এবং অবরোধ ব্যবস্থায় বিরাট সাফল্য অর্জিত হইবে। এই দলটির উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) নিজ নেতৃত্বে পূর্ববর্তী সকল অভিযান অপেক্ষা অধিক লোক লইয়া যাত্রা করিলেন। কুদরতের খেলা— বণিক দলটি নাগালে আসিল না; উহার পরিবর্তে হযরত (দঃ) নিজ দল অপেক্ষা বহুগুণ বেশী শক্তিশালী মক্কাবাসী এক দল সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন; উহাই ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ যাহার বিবরণ এই—

বদরের জেহাদ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিজ নেতৃত্বে পরিচালিত সাতাইশটি অভিযানের নয়টির মধ্যে লড়াই সংঘটিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বদরের জেহাদ।

* এই বিবরণ আছাহ্‌হুস সিয়ার ৮২ পৃঃ ও রুহুল-মায়ানী ২—১২ হইতে উদ্ধৃত।

বদর একটি এলাকার নাম, মদীনা হইতে প্রায় ১০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই জেহাদে ৩১৩ জন ছাহাবী যোগাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে ১০ জন রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিযানে মোসলমানগণের সাজ-সরঞ্জামের খুবই অভাব ছিল; তিন শতের অধিক লোকের মধ্যে যানবাহনরূপে শুধুমাত্র নগণ্য সংখ্যক ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। তিন তিন, চার চার জন লোক এক একটি উটকে পরস্পর ভাগাভাগিরূপে ব্যবহার করিতেন। রসুলুল্লাহ (দ:) পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবস্থায়ই দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন।

পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী; সৈন্য এক হাজার—তাহার মধ্যে মক্কার সর্দারগণ ও বড় বড় প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ, ঘোড়া এক শত ও উট সাত শত ছিল।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজান মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যভাগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত কোরেশদের একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন। সপ্তাহকাল ভ্রমণের পর বদর নামক এলাকার নিকটবর্তী বণিক দলের পরিবর্তে কাফের সৈন্য দলের সম্মুখীন হইলেন এবং সেই এলাকার ময়দানে যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে মোসলমানগণ জয়লাভ করেন এবং শত্রু পক্ষ কাফের সম্পুর্ণরূপে পরাজিত হয়। মোসলমাদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন, কাফেরদের পক্ষে মক্কার সর্বপ্রধান নেতা আবু জহল ও অন্যান্য কতিপয় নেতাসহ ৭০ জন নিহত হয় স্বয়ং হযরতের চাচা আব্বাস (রা:) ও জামাতা সহ ৭০ জন কাফের বন্দী হয়, অবশিষ্ট কাফেররা পলায়নের সুযোগ পায়।

বদর-জেহাদের সুচনা

১৪১২। হাদীছ:— ان عبد الله بن كعب رضى الله تعالى عنه

قال لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها الا فى غزوة تبوك غير انى تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ٥

অর্থ—ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজে যে সমস্ত জেহাদে যোগদান করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটিতেই আমি যোগদান করিয়াছি। কিন্তু তবুকের জেহাদে আমি যোগদান করি নাই (যদ্দরুন আমাকে বহু তিরস্কার ও শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে।) অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও যোগদান করিয়াছিলাম না, কিন্তু বদরের জেহাদে যোগদান না করার কারণে কাহাকেও কোন প্রকার তিরস্কার বা ভৎ'সনা করা হয় নাই। কারণ, বদর-জেহাদের ঘটনার সুচনায়

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল (সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত) মক্কাবাসী কোরায়েশদের একটি বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবন করা। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্বীয় আবাস স্থান (মদীনা) হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মোসলমানগণ এবং (ঐ বণিকদলের পরিবর্ত্তে) মক্কার রণপিপাসু কাফের সৈন্যদলের মধ্যে পূর্ব হইতে কোন প্রকার তারিখ নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—বিশিষ্ট ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বদর-জেহাদের প্রাথমিক সূচনারূপ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত মক্কাবাসী কোরায়েশদের একটি বণিকদলের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পরিবর্ত্তে মক্কার সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যাহার ঘটনা এই ছিল—উক্ত বণিকদলের নেতা আবু-সুফিয়ান পূর্বাহ্নেই মোসলমানদের গতিবিধির খোঁজ পাইয়া ছিল। সেমতে সে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে ছিল। এমনকি অবশেষে সে স্বীয় দলবল সহ সাধারণ পথ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্বক রক্ষা পাইতেও সক্ষম হইয়াছিল।

আবু সুফিয়ান মোসলমান বাহিনীর গতিবিধির খোঁজ পাওয়ার সূচনায়ই মক্কাবাসীদের নিকট এই খবর পাঠাইয়া দিয়াছিল যে, তোমরা স্বীয় বণিকদলের রক্ষার জন্য অগ্রসর হও, মোহাম্মদ ও তাহার সহচরগণ বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে।

সেই বণিকদলের নিকট মক্কাবাসী প্রত্যেকটি নর-নারীর ধন-সম্পদ অর্পিত ছিল এবং উহা প্রচুর ধন-দৌলত সম্বলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন মোসলমানদের প্রতি বিশেষরূপে মক্কাবাসীদের ক্রোধ অত্যধিক ছিল। তাই উক্ত খবরে মক্কাবাসীরা অগ্নিমূর্তিতে উতলিয়া উঠিল এবং এহেন কার্য্যক্রমের প্রতিকার, বরং মোসলমানদের এইরূপ দুঃসাহসিকতার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বণিকদের দলপতি আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী সিংহী নারী হিন্দা স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় উন্মাদিনী হইয়া পড়িল; সে তাহার পিতা ওৎবা, চাচা শায়বা এবং ভ্রাতা ওলীদ যাহারা প্রত্যেকেই মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বীর পুরুষ ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক রূপে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মাসেক পূর্বে মোসলমান গোয়েন্দাদের হাতে "নখলা" নামক স্থানে মক্কাবাসী একজন নিহত দুইজন বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনও প্রতিশোধ গ্রহণের পিপাসায় সদলবলে যুদ্ধের নাগে ছুটিয়া আসিল। মক্কার ঘরে ঘরে রণ-সজ্জার প্রস্তুতি চলিল; পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যদল গঠিত হইয়া মক্কার নেতাগণের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হইল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে "রওহা" নামক স্থানে পৌছিলেন এবং তথা হইতে "ছুফ্‌রা" স্থানে পৌছিয়া স্বীয় গুপ্তচর মারফৎ মক্কাবাসীদের সৈন্য চালনার খবর অবগত হইলেন। সেমতে হযরত (দ) ছাহাবীদের সহিত পরামর্শ

করিলেন। অধিকাংশ সঙ্গিগণের মনোভাব এইরূপ ছিল যে, আমাদের লোক সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতাদৃষ্টে বণিক দলের অনুসরণ করাই উত্তম, কারণ তাহারাও সংখ্যায় অল্প এবং রণ-সাজে সজ্জিত নহে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও উল্লেখ করেন।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ ....

অর্থ—হে মোসলমানগণ! স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (রসুলের মারফৎ) আশ্বাস দান করিতেছিলেন যে, (শত্রু-পক্ষের সৈন্যদল বা বণিকদল) উভয় দলের একটিকে আল্লাহ তোমাদের হস্তে পরাজিত করিবেন। তোমরা তখন নিরস্ত্র (বণিক) দলের আশা পোষণ করিতেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিতেছিলেন, এই উপলক্ষেই সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয় প্রকাশিত হউক এবং আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের মূল-উচ্ছেদন আরম্ভ হউক। (যাহার ব্যবস্থা এই ছিল যে, মোসলমানগণের সৈন্য এবং সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাহাদের হস্তে কাফেরদের অধিক সংখ্যক ও শক্তিশালী সৈন্যদল পরাজিত হউক। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাই শেষ ফলে সৈন্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষ ও যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হইল।) ৯ পাঃ ১৫ রুঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইসলামের কুৎসা রটনাকারী শত্রু ইসলামদ্রোহী কোন কোন অমোসলেম ঐতিহাসিক বদরের সূচনায় উল্লিখিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বণিকদলের পশ্চাদ্ধাবন করার ঘটনাটিকে ঘৃণ্যরূপ দানপূর্বক অভদ্রোচিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্মল ঐতিহ্যকে কালিমাময় করার অপচেষ্টা করিয়াছে। এমনকি উক্ত ঘটনাকে ডাকাত ও দস্যুদলের কার্যক্রমের নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন দুর্বলচেতা মোসলমান ঐতিহাসিকও শত্রুপক্ষের ঐ ঘৃণ্য কারসাজি হইতে ইসলামের আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করিয়াছে বটে, কিন্তু সঠিক পন্থার সন্ধান না পাইয়া ভীত অবস্থায় মূল ঘটনা অস্বীকার করার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে যে—ঐরূপ ঘটনা নিছক ভুল, উহার কোন বাস্তবতা নাই। তাহারা ইসলামের সুনাম রক্ষার্থে শত্রুপক্ষের কুৎসা রটানোর উত্তরদানে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্বলচেতা ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আত্মসমর্পন করিয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এমনকি ঘটনার সময় মদীনায় উপস্থিত বিশিষ্ট ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লিখিত বর্ণনা যাহা বোখারী শরীফের ন্যায় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রতি আস্থাও পরিত্যাগ করিয়াছে। উপরোল্লিখিত কোরআন শরীফের আয়াতে বদরের জেহাদের বর্ণনায় উল্লিখিত اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ "উভয় দলের কোন একটি" বাক্য দ্বারা বণিক দল ও সৈন্যদলের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অতঃপর ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে, "হে মোসলমানগণ!

তোমরা বণিক দলের আশাই পোষণ করিতেছিলে" কোরআন শরীফের এইসব স্পষ্ট ইঙ্গিতের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ইসলামদ্রোহী শত্রুদের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাহাদের প্রশ্নাবলীতে ভীত হইয়া কোরআন-হাদীছের প্রতি যেন মোসলমানগণের আস্থা শিথীল হইয়া উঠে। ইসলামের নাদান দোস্ত ঐতিহাসিকগণ মূল বিষয় উদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া বস্তুতঃ শত্রুগণের সেই সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যকেই সফল করিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে উল্লিখিত হাদীছে কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত ঘটনা বাস্তব সত্য এবং ইহা একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সম্পন্ন কার্য্যবিধি ছিল—যাহার মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। উহার দ্বারা সমগ্র আরব দেশকে সহজে কাবু করার সূচনা ছিল। যাহার বিবরণ এই—

মক্কাবাসী কোরেশগণ সমগ্র আরবের প্রধানরূপে গণ্য হইত; এবং তাহারাই ছিল ইসলাম ও মোসলমানদের প্রধানতম শত্রু; তাহাদিগকে পরাজিত করার অর্থ ছিল সমগ্র আরবকে বশে আনা। এতদ্ভিন্ন আরবের অন্যান্য অধিবাসীরা সাধারণরূপে ইহাই ভাবিয়া থাকিত যে, হযরত মোহাম্মদ যদি আরবের সেরা মক্কাবাসী কোরেশকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন তবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করা বৃথা হইবে। আর যদি তিনি তাহাদের দ্বারা নিঃশেষ ও খতম হইয়া যান তবে আমরা বিনা সংগ্রামেই রেহাই পাইয়া যাইব। এইরূপ মনোভাব লইয়া অধিকাংশ আরববাসী প্রথম অবস্থায় নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জেহাদের অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম মক্কাবাসীকে পরাজিত করার পরিকল্পনা তৈরী করিলেন।

পূর্বেও বলা হইয়াছে, কোন দেশ বা জাতিকে দুর্বল করার সহজ উপায়—তাহাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা এবং তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করিয়া দেওয়া। ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি জাতি ও দেশের মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দেয়। বিশেষতঃ মক্কাবাসীর পক্ষে এই ব্যবস্থা মৃত্যু পরওয়ানা ছিল। কারণ, মক্কা নগরীর এলাকাটি সৃষ্টিগতরূপেই কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী পর্বতমালা ও মরুভূমি—সেখানে একটি দানা জন্মাইবারও উপায় নাই। তথাকার বাসিন্দাদের প্রতিটি লোকমার সংস্থান বহির্দেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভরশীল। তাহাদের জীবনধারণ একমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যর সহিত জড়িত।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) চিন্তা করিলেন এবং তাঁহার এই চিন্তাধারা ধ্রুব সত্য ও একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহারা অতি সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে। তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-আমদানির সর্বপ্রধান কেন্দ্র সিরিয়া দেশের যাতায়াত পথে অবরোধ সৃষ্টি করা মদীনা হইতে সহজ সাধ্যও ছিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার তরফ হইতে জেহাদের অনুমতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই অবরোধ সৃষ্টির শুধু পরিকল্পনাই নয়, বরং প্রত্যেকটি সুযোগেই তিনি ঘন ঘন অভিযান চালাইতে ছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন ছাহাবীদের দ্বারা, অতঃপর তাঁহার নিজ

পরিচালিত সর্বপ্রথম অভিযান—আবওয়া বা ওয়াদ্দানের অভিযানও এই পরিকল্পনা দৃষ্টেই পরিচালিত হইয়াছিল এবং উহার মাত্র এক মাস ব্যবধানে দ্বিতীয় অভিযান—বাওয়াতের অভিযানও এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়াছিল। অতঃপর তৃতীয় অভিযান—ওসায়রার অভিযান ঐ পরিকল্পনা অনুসারেই পরিচালিত হইয়াছিল। এই অভিযানসমূহের বিস্তারিত ইতিহাস একটু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মক্কা হইতে সিরিয়াগামী যেই বণিক দলটির অনুসরণে উক্ত ওসায়রার অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং বণিক দল পূর্বাহ্নে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল; পুনরায় সেই বণিক দলটিরই উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে তাহাদের মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে বদরের জেহাদের সূচনার অভিযান চলে।

সুধী পাঠক। লক্ষ্য করুন—বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবন, তাহাদের অনুসরণ ও তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালানোর পেছনে কত বড় সুদূরপ্রসারী করিকল্পনা ছিল। বর্তমান মানবতাবোধের ও সভ্যতার দাবীর যুগে ছোট-বড় প্রতিটি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের রসদ সরবরাহ এবং জল ও স্থলপথে বাণিজ্যিক চলাচল বন্ধ করার জন্য সর্বাগ্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয় এবং সেই দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি রাখা হয়। এইরূপ যুগের লোকদের মুখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত পরিকল্পনাকে প্রশংসা না করিয়া উল্টা নিন্দা করা বুদ্ধি-বিবেক এবং ন্যায় বিচারের মাথা খাইয়া একান্ত ধৃষ্টতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ দুষ্ট মনোভাবের পরিচয় দেওয়া বৈ নহে। তাহারা এই উত্তম পরিকল্পনাটিকে কদর্য্য ও কলঙ্কের কার্য্যের নামে নাম-করণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসকে সুষ্ঠু ও ন্যায় এবং শত্রুতা বিবর্জিত দৃষ্টিতে অনুধাবনকারীগণের নিকট তাহাদের নির্লজ্জ মনোবৃত্তি গোপন থাকিবে না।

কোন একটি উত্তম বস্তুকে জঘন্য কার্য্যের নামে নাম করণ দ্বারা কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা যে ক্ষমাহীন অপরাধ তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। বড় পরিতাপের বিষয়, কোন কোন ইসলাম-দরদী লিখক ঐরূপ অপরাধীদের অপরাধকে অজ্ঞাত বশতঃ ধরিতে না পারিয়া বাস্তব ঘটনার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া ইসলামকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন; ইহাতে বোখারী শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থ যাহার দ্বারা আমরা ইসলামের সুশিক্ষা লাভ করিব উহার প্রতি আস্থার শিথীলতা নিশ্চয় আসিবে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের এই হীনমন্যতা পন্থার রক্ষাকবচ একেবারেই অচলও বটে। কারণ, বদরের পূর্বে ছয়টি অভিযান তন্মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত পর পর তিনটি অভিযানের প্রত্যেকটি অভিযানই মক্কাবাসী কোরায়েশ বণিক দলের পশ্চাদ্ধাবনে অনুষ্ঠিন হইয়াছিল—যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সবের প্রত্যেকটিকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

নব্য সৃষ্ট একদল ইসলাম-দরদী লিখক বোখারী শরীফে বর্ণিত বদরের জেহাদের সূচনার ঘটনাটিকে এই বলিয়াও অস্বীকার করে যে, ইহা আক্রমণাত্মক ঘটনা। তাহাদের মতে ইসলামে আক্রমণাত্মক জেহাদের অস্তিত্ব নাই, ইসলামে আছে শুধু আত্মরক্ষামূলক জেহাদ।

এই উক্তি নিছক অবাস্তর ও মনগড়া উক্তি। জেহাদ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের জেহাদ একটি সংস্কারমূলক পন্থা, সেখানে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার আদৌ কোন প্রশ্ন নাই। সংস্কারের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে কোন সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে আক্রমণের আকার দেখা গেলেও কেহই উহাকে নিন্দা করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিতে দেখিলেও এস্থলে দেখা যায় যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম এবং মোসলেম জাতিকে নিপাত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে রসদ আনিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হযরত (দঃ) বাগদাদের আব্বাসী খলীফাদের ন্যায় বা মোগল সম্রাটদের ন্যায় অদুরদর্শী ছিলেন না, তিনি শত্রুর গতিবিধি পূর্বাহ্নেই সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। শক্তি সঞ্চয়ের সময় শত্রুকে দুর্বল করিয়া না দিলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সারিলে কি আর তাহাকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়? অতএব রসুলুল্লার এই যুদ্ধ মানব-জাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক ভাবেই হইয়াছিল বলিলে তাহা বাস্তব অবস্থার অনুকুলই হইবে।

অধিকন্তু কোরায়েশরা মোসলমানগণকে বিনা অপরাধে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল। হযরত (দঃ) হিজরতের সময় দুর হইতে মক্কা পানে চাহিয়া বলিতে ছিলেন, "হে মক্কা নগরী! আমি তোমাকে অত্যধিক ভালবাসি, আমার গোষ্টির লোকেরা আমাকে বহিস্কৃত না করিলে আমি বাহির হইতাম না।" স্বীয় দেশ পুনঃরুদ্ধারের জন্য যচেষ্ট হওয়াকে কোন জ্ঞানী আক্রমণ বলিয়া নিন্দা করিতে পারে কি?

১৪১৩। **হাদীছ :**—ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ ইবনে মোয়াজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মক্কার সর্দার উমাইয়া ইবনে খলফের বন্ধুত্ব ছিল। সে কখনও মদীনায় আসিলে সায়াদ ইবনে মোয়াজের অতিথি হইত এবং সায়াদ (রাঃ) কোন সময় মক্কা পৌঁছিলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করিতেন। পূর্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব ছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিয়া আসিবার পর একদা সায়াদ (রাঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিলেন এবং উমাইয়া ইবনে খলফের অতিথি হইলেন। তিনি উমাইয়াকে বলিলেন, এমন একটি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যখন কা'বা-ঘরে লোকের সমাগম না থাকে, আমি এরূপ সময় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে ইচ্ছা রাখি। এক দিন দ্বিপ্রহরের সময় উমাইয়া ইবনে খলফ সায়াদ (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল। আবু জহল তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গী লোকটি কে? সে বলিল, তিনি সায়াদ (মদীনার সর্দার)। আবু জহল (মদীনাবাসীদের প্রতি এই কারণে ক্রোধান্বিত ছিল যে, তাহারা মোসলমানগণকে স্থান দিয়াছে, তাই সে) সায়াদ (রাঃ)কে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, অতি শান্ত পরিবেশে তোমাকে মক্কার মধ্যে তওয়াফ করিতে দেখিতেছি! অথচ তোমরা মক্কাবাসীদের শত্রু,

বাপ-দাদার ধর্মত্যাগী—মোসলমানগণকে স্থান দিয়াছ এবং তাহাদের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ যদি তুমি উমাইয়ার সঙ্গে না হইতে তবে নিরাপদে বাড়ী ফিরিতে সক্ষম হইতে না।

সায়াদ (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, খোদার কসম—শান্ত পরিবেশে তওয়াফ করায় আমাকে বাধা দিলে আমি তোমাদের এমন এক কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করিব যাহা তোমাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন হইবে—তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার যাতায়াত পথ মদীনা সংলগ্নে অবস্থিত, সেই পথে তোমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিব। এতদশ্রবণে উমাইয়া ইবনে খলফ বলিল, হে সায়াদ। মক্কা নগরীর প্রধান সর্দার আবুল হাকামের ❁ সম্মুখে এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবেন না। সায়াদ (রাঃ) ক্রোধভরে তাহাকে বলিলেন, তুমি চুপ কর (এবং নিজের চিন্তা কর;) আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি মোসলমানদের হস্তে নিহত হইবে। উমাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার এলাকায় নিহত হইব? সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, তাহা জানি না।

(কাফেররাও ভালরূপে জানিত যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, তাই) উমাইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া স্বীয় স্ত্রীর নিকট এই কথা ব্যক্ত করিল। অতঃপর সে শপথ করিল, সে কখনও মক্কা হইতে বাহিরে যাইবে না। (তাহার ধারণা ছিল যে, তাহার নিজের দেশ মক্কায় তাহাকে কেহ হত্যা করিতে পারিবে না।)

কিছু দিনের মধ্যেই বদরের জেহাদের সূচনা—বণিকদলের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটিল। সেই উপলক্ষে আবু জহল সমগ্র মক্কাবাসীকে এই মর্মে নির্দেশ দিল যে, সত্বর তোমরা সমবেত ভাবে স্বীয় বণিকদলকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। তখন উমাইয়া ইবনে খলফ (স্বীয় আতঙ্ক ও শপথ অনুসারে) মক্কার এলাকা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে সম্মত হইল না। সেমতে আবু জহল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, আপনি মক্কার প্রধান সর্দারগণের মধ্যে অন্যতম। আপনি যদি এই কার্যে অগ্রসর না হন, তবে সর্বসাধারণ লোক অগ্রসর হইবে না; এই বলিয়া আবু জহল তাহার সঙ্গে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, এমনকি উমাইয়া তাহাকে বলিল, আপনি যখন আমাকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন তখন আমি (এই কার্য্যে বিশেষ মনোযোগের সহিত তৎপর হইব—মক্কার সর্বোত্তম একটি উষ্ট্র ক্রয় করিব। অতঃপর স্বীয় স্ত্রীকে বলিল, আমার রণ-সজ্জার ব্যবস্থা কর। তখন তাহার

❁ "আবু-জহল" মক্কার সর্বপ্রধান নেতা ছিল, তথাকার সকল প্রকার বিচার-মীমাংসা ও কর্তৃত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল, এই অর্থে মক্কাবাসীগণ তাহাকে "আবুল হাকাম" নামে অভিহিত করিয়া থাকিত অর্থাৎ প্রধান বিচারক এবং প্রধান মীমাংসাকারী। কিন্তু সে জাগতিক কার্য্যাবলীতে যে পরিমাণ জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিল আখেরাত ও পরকাল সম্পর্কে ততোধিক অজ্ঞ ছিল, তাই তাহাকে মোসলমানগণ "আবু-জহল"—অজ্ঞতার পিতা ও অজ্ঞতার কেন্দ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্ত্রী বলিল, আপনার মদীনাবাসী বন্ধু যে কথা বলিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? সে বলিল, ভুলি নাই; আমি সকলের সঙ্গে যাত্রা করিব বটে, কিন্তু নিকটবর্তী স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিব, মক্কার এলাকা অতিক্রম করিব না। সকলের সঙ্গে যাত্রা করার পর উমাইয়া প্রতিটি বিশ্রাম স্থানেই এইরূপ ইচ্ছা করিত যে, সে ফিরিয়া যাইবে, এমনকি সেই উদ্দেশ্যে স্বীয় যানবাহনও প্রস্তুত রাখিত। কিন্তু তাহার ইচ্ছা মনেই থাকিয়া যাইত কার্য্যে পরিণত হইত না, শেষ পর্য্যন্ত সে বদরের রণক্ষেত্রে পৌছিল এবং যুদ্ধে নিহত হইল—এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইল।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন—বিশিষ্ট ছাহাবী সায়া'দ ইবনে মোয়াজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদীনার সর্দার যিনি স্বয়ং বদরের জেহাদে একজন অন্যতম প্রধান রূপে যোগদানকারী ছিলেন তাঁহার বর্ণনার মধ্যেও বণিকদলের ঘটনার ভূমিকা উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিরিয়ার সহিত মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ মদীনাবাসীগণ কর্তৃক অবরোধ করার হুমকিও উল্লেখ হইয়াছে।

মোসলেম বাহিনী মক্কার শসস্ত্র বাহিনীর মুখামুখী :

মোসলমানদের অন্তরের কামনা—নিরস্ত্র বণিক দলের লাগ পাওয়া, আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা—মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়া। আল্লার ইচ্ছাই প্রবল থাকিবে; তাহাই ঘটিল—

বদরের গিরি-পথই মক্কা ও সিরিয়ার সাধারণ পথ এবং বদর উপত্যকাই পথিক কাফেলাদের মঞ্জিল তথা বিশ্রাম-ষ্টেশন। অতএব মক্কা হইতে আগত সশস্ত্র বাহিনী বদর পানে ধাবমান; আর মোসলেম বাহিনীও বণিকদলের উদ্দেশ্যে বদর পানেই অগ্রসর। হযরত (দঃ) বদরে পৌছিবার অনেক পুর্বেই দুইজন গোয়েন্দা বদরে পাঠাইয়া দিলেন; বদর এলাকায় আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা পৌছিবার সম্ভাব্য দিনের খোঁজের জন্য।

কুদরতের লীলা—হযরতের এত সতর্কতামুলক ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সম্মুখে ফেল হইল। গোয়েন্দাদ্বয় বদরে আসিয়া একটি পানির কূপের নিকট বসিল এবং তথায় তাহাদের বাহন উট বাঁধিল। ইতিমধ্যে ঐ এলাকার দুইজন মহিলা কুপের পানি লইতে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, আগামী কাল বা তারপর দিনই সিরিয়া হইতে আগত আবু-সুফিয়ানের একটি বৃহৎ বাণিজ্য-কাফেলা এস্থানে পৌছিবে। আমরা তাহাদের কাজ করিয়া পয়সা উপার্জনের সুযোগ পাইব। হযরতের গোয়েন্দাদ্বয় ঐ মহিলাদ্বয়ের এই আলাপে নিজ উদ্দেশ্যের খোঁজ লাভ করিয়া দ্রুত তথা হইতে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার সময় তথায় "মুজদী" নামক একজন পুরুষও উপস্থিত ছিল।

গোয়েন্দাদ্বয় দ্রুত আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে খবর পৌঁছাইল যে, বণিকদল আগামী দুই দিনের মধ্যেই বদরে পৌঁছিতেছে। সেমতে মোসলেম বাহিনী বদরপানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বণিকদল পূর্বেই মোসলেম বাহিনীর সংবাদ অবগত ছিল; তাই তাহাদের দলপতি আবু-সুফিয়ান বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ চলিতেছিল। তাহার কাফেলা বদর এলাকায় পৌঁছিবার পূর্বে সে নিজে মোসলেম বাহিনীর গতিবিধি অবগতির জন্য গোপনে একা বদরে আসিল। হযরতের গোয়েন্দাদ্বয় বদর হইতে প্রস্থানের মুহূর্ত পরেই আবু-সুফিয়ান তথায় পৌঁছিল এবং ঠিক ঐ কূপের নিকটই পৌঁছিল। সেও তথায় আসিয়া ঐ "মুজদী" নামক ব্যক্তির নিকট গোয়েন্দাদ্বয়ের খোঁজ পাইল এবং তথায় উটের মল দেখিতে পাইল যাহাতে মদীনা এলাকার খেজুরের আঁটি ছিল যাহা আকারে ছোট হয়। আবু-সুফিয়ান বুঝিয়া ফেলিল মোসলেম বাহিনীর গোয়েন্দা এস্থানে পৌঁছিয়াছিল। তাহারা বদর পথেই বণিকদলের পিছু নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। এই ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান দ্রুত ছুটিয়া যাইয়া নিজ কাফেলাকে বদরের পথ হইতে ফিরাইয়া অন্য পথে পরিচালিত করিল। এই ঘটনা এবং বণিকদলের পথ পরিবর্তনের কোন খোঁজই হযরতের নিকট নাই; তিনি তাঁহার গোয়েন্দাদ্বয়ের সংবাদ অনুসারে স্বীয় বাহিনী লইয়া বণিকদলের আশায় বদরপানে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন, তথায় পৌঁছিয়া বণিকদলের উপস্থিতির অপেক্ষা করিবেন; অথচ বণিকদল অন্য পথে নির্বিঘ্নে মক্কাপানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবু-সুফিয়ান তাহার নিরাপত্তার এই ঘটনা এবং সংবাদও মক্কায় প্রেরণ করিয়াছে। সেই সংবাদ মক্কা হইতে আগত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবুজহলের নিকট পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের অভিযান অব্যাহত রাখা সম্পর্কে মতভেদও হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদের বাহিনী বদর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে এবং আবু-সুফিয়ানের নিরাপত্তা-চাতুর্য্যের জন্য তথায় আনন্দ-উৎসব করিবে—বদর উপত্যকায় উট জবেহ করিয়া এলাকাবাসীদেরে ভোজন করাইবে। ইহাতে সমস্ত এলাকায় কোরায়েশদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মক্কার সশস্ত্র বাহিনী বদর এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তেই মোসলেম বাহিনী বদরের উপকণ্ঠে উপনিত হইয়াছে। বিকাল বেলা হযরত (দঃ) কতিপয় ছাহাবীকে পাঠাইয়াছেন—বদর এলাকায় ঘোরা-ফেরা করিয়া খোঁজ-খবর সংগ্রহ করার জন্য। তাঁহারা একটি কূপের নিকট হইতে দুইটি ভৃত্যকে ধরিয়া নিয়া আসিয়াছেন খবর সংগ্রহ করার জন্য। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সময় নামায পড়িতে ছিলেন। ছাহাবীগণ সেই ভৃত্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাদের সঙ্গে আসিয়াছ? ভৃত্যদ্বয় বলিল, কোরায়েশদের সঙ্গে আসিয়াছি—তাহাদের পানি সংগ্রহে জন্য। মোসলেম বাহিনীর লক্ষ্যে এখনও আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার স্বপ্ন; তাঁহারা ভাবিলেন, ভৃত্যদ্বয় সত্য গোপন করিতেছে, তাই তাদেরকে তাঁহারা মারধর করিলেন। ভৃত্যদ্বয় এইবার বলিল, আবু-সুফিয়ানের কাফেলার সঙ্গে আসিয়াছি, এখন তাহারা নিস্তার পাইল।

হযরত (দঃ) মূল ঘটনার অবগতি পাইয়া ফেলিয়াছেন ; হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন ইঙ্গিত আসিয়াছে। নামায শেষে হযরত (দঃ) বলিলেন, ভৃত্যদ্বয় যখন সত্য কথা বলিয়াছে তখন তাহাদেরকে তোমরা মারিয়াছ, যখন মিথ্যা বলিয়াছে তখন রেহাযী দিয়াছ। অতঃপর স্বয়ং হযরত (দঃ) ভৃত্যদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর বিস্তারিত তথ্য অবগত হইলেন—তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করিয়াছে, এমনকি মক্কার কোন্ কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বাহিনীতে রহিয়াছে তাহাও অবগত হইলেন। ঐ লোকদের সকলের নাম শ্রবণান্তে হযরত (দঃ) ছাহাবীদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মক্কা তাহার কলিজার টুকরাসমুহের সবই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। (আছাহ-হুস্-সিয়ার)

মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত মুসলেমদের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লার ইচ্ছা ছিল :

আল্লাহ তায়ালা রহমানুর রহীম, তিনি অসীম সহিষ্ণু : তাঁহার ধৈর্য্য সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালার এই গুণাবলীর প্রতিবিম্বেই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাফেররা চরম গোড়ামী এবং উশৃঙ্খল বিদ্রোহের দ্বারা সেই ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার ব্যবস্থাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

সর্বশক্তিমত্তাও আল্লাহ তায়ালার একটি গুণ ; এখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই গুণের বিকাশে দ্বীন-ইসলামের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করিলেন। অবশ্য মুসলেমদের ত্যাগ, কোরবানী এবং বিপদের ঝুকি নিয়া অগ্রগামী হওয়ার ধারা-প্রবাহের উপরই আল্লার সর্বশক্তিমত্তা-গুণ বিকাশের বর্ষণ বর্ষিবে ; জগতের বুকে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম ইহাই। সেমতে আলোচ্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল—মক্কার দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সল্প সম্বলের নগণ্য সংখ্যক মুসলেম বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাউক ; এই অবস্থায় মুসলমানদের চরম ত্যাগ ও কোরবানী উপস্থিত করার উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা-গুণের বিকাশ সাধন করিবেন। আল্লার ইচ্ছার প্রতিফলন অবধারিত ; তদুপরি এক্ষেত্রে যুদ্ধ বানচাল না হইয়া যায় তাহার বাহ্যিক ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা করিলেন ; যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্বে হযরত (দঃ) আসন্ন যুদ্ধের একটা স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্নে শত্রু পক্ষ হযরতের দৃষ্টিতে কম ও স্বল্প বোধ হইল। যাহার ব্যাখ্যা এই ছিল যে, বস্তুতঃ শত্রু সৈন্য অধিক হইলেও তাহারা নগণ্য সংখ্যকের ন্যায়ই মোসলেম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হইবে। এই স্বপ্নের ফলে হযরতের মনে কিছুটা স্বস্তির ভাব আসিল এবং ছাহাবীদের নিকট হযরত (দঃ) ঐ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তাঁহাদের মনেও স্বস্তির ভাব আসিল ; ইহাতে মোসলেম বাহিনী যুদ্ধের প্রতি এক ধাপ অগ্রসর হইল। এই বিষয়টা পবিত্র কোরআনের ভাষায়—

وَاِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَّلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ.........

"একটি স্মরণীয় ঘটনা—আল্লাহ তায়ালা আপনাকে স্বপ্নে শত্রু পক্ষ কম দেখাইলেন। যদি তাহাদিগকে বেশী দেখাইতেন তবে অবশ্যই (স্বপ্ন শুনিয়া হে মোসলেম বাহিনী।) তোমরা সাহস-হারা হইয়া পড়িতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইসব গ্লানি হইতে বাঁচাইয়া নিয়াছেন"। (১০ পাঃ ১ রুঃ)। ইহা ত হইল যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বের ঘটনা এবং ইহা স্বপ্নের ঘটনা; মোসলেম বাহিনী যাহা শুনিয়া মনে সাহস বোধ করিল। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের আরও একটি লীলা প্রকাশ পাইল—উহার বিবরণও পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ

"হে মোসলেম বাহিনী! আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা—যখন তোমরা রণে অবতীর্ণ হইলে তখন আল্লাহ তায়ালা শত্রু পক্ষকে তোমাদের চাক্ষুস দৃষ্টিতে কম ও স্বল্প দেখাইলেন, আর তাহাদের দৃষ্টিতেও তোমাদিগকে কম দেখাইলেন, যেন উভয় পক্ষের মনে সাহসের সঞ্চার হয়; ফলে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিয়া পড়ে এবং ঐ কাজ আল্লাহ বাস্তবায়িত করেন যাহা পূর্বে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে"। (ঐ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন—মোসলমানদের হাতে মক্কার কাফের সর্দারদের বিনাশ সাধন করা এবং মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। এই কার্য্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন, তাই যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল। সেমতে যুদ্ধ বানচাল না হইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা স্বরূপ উভয় পক্ষের সাহস অটুট রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা এক কুদরতী কাজ করিলেন যে, কাফের পক্ষ ত মোসলেম বাহিনীকে স্বল্প দেখিল যাহা প্রকৃত অবস্থা ছিল—হাজারের মোকাবিলায় তিন শত। কিন্তু আল্লার কুদরতে তিন শতের মোসলেম বাহিনীও হাজার সংখ্যার শত্রু পক্ষকে চাক্ষসরূপেই স্বল্প দেখিল, ফলে তাহারাও নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইল এবং উভয় পক্ষে তীব্র যুদ্ধের পূর্ব-নির্দ্ধারিত কাজ সম্পন্ন হইয়া গেল।

ছাহাবীগণের চরম কোরবাণী :

এই অভিযানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়া আসেন নাই—সেইরূপ সৈন্য সংখ্যাও নয়, অস্ত্রশস্ত্রও নয়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মোসলমানগণ মুখামুখী হইয়া পড়িল এমন এক দুর্দ্ধর্ষ শত্রু বাহিনীর যাহাদের সৈন্য সংখ্যা মোসলমান বাহিনীর তিন গুণের অধিক, অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্য ত বলারই নাই। এমতাবস্থায় মোসলমানদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা চিন্তা করিলেই অনুমান করা যায়। অকস্মাৎ এমন পটপরিবর্ত্তন ঘটিবে, কে জানিত? তাঁহারা আসিয়াছিলেন

বণিক দলের নিরস্ত্র কাফেলাকে আক্রমণ করিতে আর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল দুর্ধর্ষ শত্রুদের এক সশস্ত্র বাহিনী; তাহাদের মোকাবেলা করিতে মোসলমানগণ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধ ছাড়া উপায় নাই; শত্রু ত অস্ত্রহাতে ঘাড়ের উপর দণ্ডায়মান।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ)ও খুব অস্থির; তিনি ছাহাবীদিগের সহিত পুনরায় পরামর্শে বসিলেন। উক্ত সমাবেশে ছাহাবীগণের দৃঢ় মনোবল এবং সর্বস্ব উৎসর্গ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতি দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

১৪১৪। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)কে এমন একটি সুযোগ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি যে, সেই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে আমি তাঁহার সাথী হইতে পারিলে দুনিয়ার যে কোন প্রকার ধন-সম্পদ লাভ করা অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

মেকদাদ (রাঃ) বদর-জেহাদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন; তিনি মোশরেক শত্রুদের প্রতি আল্লার দরবারে বদদোয়া করিতেছিলেন। মেকদাদ (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্যে আরজ করিলেন, আমরা মুছা আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের ন্যায় আপনাকে এইরূপ বলিব না যে, "আপনি স্বীয় প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে সঙ্গে নিয়া উভয়ে রণাঙ্গনে যান এবং যুদ্ধ করুন; আমরা ত যাইতে পারিব না, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।"

আমরা আপনাকে ঐরূপ বলিব না, বরং আমরা আপনার ডানে বাঁমে, সম্মুখে পেছনে— চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইব। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন,) তখন আমি দেখিলাম, তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক দীপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি উৎফুল্ল হইলেন।

(আল্লার রসুলকে এইরূপ সন্তুষ্ট করার সুযোগ লাভ অতি বড় সৌভাগ্য, তাই আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই সুযোগের সাথী হওয়ার অভিলাষী ছিলেন।)

ব্যাখ্যা :—বদরের রণাঙ্গণেই প্রথম শত্রুর সঙ্গে মোসলমানদের যুদ্ধ ও লড়াই অনুষ্ঠিত হয়, ইতিপূর্বে কোন অভিযানেই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই; তাই রণক্ষেত্রে মোসলমানগণের কার্য্যক্রম ও কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের মনোবল কিরূপ ও কতদুর দৃঢ় হইবে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার কোন সুযোগ এযাবৎ হইয়া ছিল না। বদরের জেহাদই উহার প্রথম সুযোগ এবং এই উপলক্ষে অবস্থার ভয়াবহতাও ছিল অত্যধিক। এতদ্দৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রাপ্তির আগ্রহ পোষণ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ বদরের জেহাদেই মদীনাবাসী মোসলমান—আনছারগণের যোগদানের সর্বপ্রথম জেহাদ ছিল এবং তথায় তাঁহাদের সংখ্যাই তিন চতুর্থাংশ ছিল; মাত্র এক চতুর্থাংশ ছিলেন মোহাজের ছাহাবীগণ। হযরত (দঃ) সর্বাধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন— মদীনাবাসী আনছারগণের পক্ষ হইতে আশ্বাস পাইবার প্রতি।

পরামর্শ সভায় সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) অতঃপর ওমর (রাঃ) বক্তৃতা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ত পূর্ব হইতেই সর্বোৎসর্গকারীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতঃপর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মেকদাদ (রাঃ) স্বীয় বক্তব্য পেশ করিলেন, যাহাতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু এখনও তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। কারণ, মদীনাবাসী আনছারগণ যাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণের বিশেষ প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন, এখনও তাঁহাদের পক্ষ হইতে কিছু বলা হইয়াছিল না। তাই হযরত (দঃ) পুনরায় ঐরূপ আহ্বান জনোইলেন; তখন সকলেই অনুভব করিতে পারিলেন, তিনি আনছারগণের বক্তব্য শুনিতে চাহেন।

এইবার মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইলেন, তিনি ঘোষণা করিলেন—
امض يا رسول الله لما امرت به فنحن معك "ইয়া রসুলাল্লাহ; আপনি আল্লার আদেশ পুরণে অগ্রসর হউন, নিশ্চয় নিশ্চয় আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আছি।" এমনকি বিশেষ আনুগত্যের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি দানার্থে তিনি ঘোষণা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (সুদুর ইয়ামান দেশ বা তৎনিকটস্থ—) বরকুল-গেমাদ নামক স্থান পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে আপনি আমাদিগকে আদেশ করিলে আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। আপনি আমাদিগকে সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতে আদেশ করিলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিব না। ইহা সত্য যে, আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়া মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আপনি স্বীয় স্বাধীন মতে অগ্রসর হউন, সর্বক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই অনুসারিত হইবে। আমাদের ধন সম্পদ হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি কাজে লাগাইতে পারেন। আপনার গৃহীত অংশকে আমরা আমাদের নিকট অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক মনে করিব।

অতঃপর সমস্ত সঙ্গী ছাহাবীগণই এক বাক্যে বলিলেন—

لا نقول كما قالت بنو اسرائيل ولكن انطلق انت وربك انا معكم

বনী-ইস্রাঈলরা মুছা (আঃ)কে যেমন বলিয়াছিল—"আপনি ও আপনার খোদা দুই জনে যাইয়া যুদ্ধ করুন, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।" আমরা আপনাকে ঐরূপ বলিব না। আমরা বলিব, আপনি স্বীয় প্রভুর সাহায্য লইয়া অগ্রসর হউন, আমরা সমবেতভাবে আপনাদের সঙ্গে আছি। (ফতহুলবারী)

উল্লিখিত বাক্যে এবং আলোচ্য হাদীছে বনী-ইস্রাঈলগণের যেই উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই উক্তির ঘটনা কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে—

হযরত মুছা (আঃ) ছয় লক্ষ বনী-ইস্রাঈলকে লইয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশে বায়তুল-মোকাদ্দাস শহর জয় করার উদ্দেশ্যে জেহাদের জন্য যাত্রা করিলেন। উক্ত শহরের অনতিদূরে যাইয়া বনী ইস্রাঈলরা সেই শহরবাসীদের শক্তি ও বীরত্বের কথা শুনিতে পাইলে মনোবল হারা হইয়া বসিয়া পড়িল, সম্মুখে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল। এমনকি অনেক রকম

বুঝ-প্রবোধ দেওয়া হইল তাহারা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকারকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ গোস্তাখী ও বে আদবী সূচক উক্তিও করিল যে, হে মুছা! আপনি স্বীয় প্রভুকে লইয়া অগ্রসর হউন এবং উভয়ে যাইয়া যুদ্ধ করুন; আমরা ত এই স্থানেই বসিয়া পড়িলাম। এইরূপ অশোভন উক্তির ফলে তাহাদের প্রতি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার গজব নাযেল হইয়াছিল। তাহারা যেই স্থানে পৌঁছিয়া এই কুকাণ্ড ও কু-উক্তি করিয়াছিল—দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জীবন কাটাইতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হয় নাই। এই ঘটনার নানারূপ বিবরণ কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

জেহাদের প্রারম্ভে আল্লার দরবারে রছুলুল্লার কাকুতি-মিনতির করুণ দৃশ্য

১৪১৫। **হাদীছ :—** عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ

وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ٥

অর্থ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-জেহাদের দিন (তাঁহার জন্য তৈরী শিবিরে বসিয়া) দোয়া করিতে ছিলেন—হে আল্লাহ! আমার সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কে অতীতে যে সব আশা ভরসা দিয়াছেন অদ্য উহা বাস্তবে পরিণত করুন। হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করিলে (আমি এবং আমার সঙ্গী মোসলেম দলকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে) আপনার বন্দেগীকারীর অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া যাইবে।

এমতাবস্থায় আবু বকর (রাঃ) আসিয়া হযরতের হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, আপনি ক্ষান্ত হউন; যথেষ্ট দোয়া করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) এই আয়াত উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন سيهزم الجمع ويولون الدبر "অচীরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে।"

ব্যাখ্যা :—বদরের রণাঙ্গন সম্মুখে, যাহা ইসলামের জীবনে প্রথম রণাঙ্গন; এত বড় শত্রু সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তিও মোসলমানদের নাই। মোসলমানগণ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে; উহার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে উহার সহিত তাহারা জড়াইয়া পড়িয়াছে।

রণাঙ্গণের এক প্রান্তে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য একটি শিবির তৈরী করা হইয়াছে, তথায় বসিয়া এই সব ভয়াবহ অবস্থার চিন্তায় তিনি মগ্ন। সঙ্গী দলটি একমাত্র তাঁহারই ইঙ্গিত-ইশারায় ও আদেশে ঘর-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সুদুর পথের মধ্যে এই বিপদাবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সত্য যে, তিনি আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল, তিনি আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় পাত্র, কিন্তু ইহাও বাস্তব যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বে-নিয়াজ, তাঁহার ইচ্ছাই ইচ্ছা, সেই মহান দরবারে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন নাই। তদুপতি ইহাও বাস্তব কথা যে, "قربياں را بيش بود حيرانى" নৈকট্য প্রাপ্তদের আতঙ্ক অধিক হইয়া থাকে। এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) বিচল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিচলতা তাঁহাকে তাঁহার প্রভু আল্লাহ তায়ালার দরবারেই উপস্থিত করিল, তিনি সাধারণ অবস্থার বিপরীত—দাঁড়াইয়া দোয়া করা আরম্ভ করিলেন এবং দোয়া করাকালীন হস্তদ্বয় এত অধিক উত্তোলন করিলেন যে, কাঁধ হইতে তাঁহার চাদর পিছলিয়া পড়িয়া গেল। তিনি নগ্ন বদনে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক দাঁড়াইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন اللهم - হে আল্লাহ। اللهم—হে আল্লাহ। বলিয়া দয়ার সমুদ্রে বাণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মোনাজাত করিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِىْ مَا وَعَدْتَّنِىْ

"হে আল্লাহ! আমাকে প্রদত্ত সমস্ত ওয়াদা আজ বাস্তবে পরিণত করুন।"

اللهم آت ما وعدتنى হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে সমস্ত ওয়াদা ও আশা দিয়াছেন আজ বাস্তব জগতে আমাকে তাহা দান করুন—ফলাফল আজ আমাকে প্রদান করুন।

اللهم لا تخذلنى হে আল্লাহ! আমাকে আশ্রয়চ্যুত করিবেন না।

এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) উপস্থিত সঙ্কট মুহূর্তের ভয়াবহ অবস্থার চিত্রকে তুলিয়া ধরিয়া চরম ব্যাকুলতার সহিত আল্লাহকে ডাকিলেন—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ اَتَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخْرِهَا تُجَادِلُ وَتُكَذِّبُ رَسُوْلَكَ

اَللّٰهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِىْ وَعَدْتَّنِىْ ٥

"হে আল্লাহ! কোরায়েশ শত্রু সেনাদল গর্ব, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ হইয়া তোমার সত্য ধর্মকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা তোমার প্রেরিত রসুলকে অস্বীকার করতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছে; হে আল্লাহ! তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রার্থনা করি।"

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি অতি কাতর স্বরে কাকুতি মিনতি করিয়া ইহাও বলিলেন—হে আল্লাহ! এই মুষ্টিমেয় মুসলিম জামাতকে যদি আজ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া না লও, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে তোমার এবাদৎ-বন্দেগীকারীদের নাম-নেশান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হে আল্লাহ! ভাগ্যের পরিহাসে এই নগণ্য দলটির বিলুপ্তি যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া পড়ে, তবে দুনিয়ার বুকে তোমার গোলামী বন্ধ হইয়া যাইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ অস্বাভাবিক অস্বস্তির অবস্থা দৃষ্টে আবু বকর (রাঃ) স্থির থাকিতে পারিলেন না; সান্ত্বনা ও প্রবোধ দানে তাঁহাকে বারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। এমনকি তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আপনি স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে যতদূর বলিয়াছেন অধিক বলিয়াছেন—ইহাই যথেষ্ট। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্কন্ধে যেই দায়িত্বের বোঝা অনুভব করিতেছিলেন আবু বকর ছিদ্দিকের কাঁধে সেই বোঝা ছিল না, তাই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইতেছিলেন।

অতঃপর হয়ত আল্লার পক্ষ হইতে সান্ত্বনার কোন ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (দঃ) পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি আয়াত উৎফুল্লকণ্ঠে তেলাওয়াত করিতে করিতে শিবির হইতে বাহির হইলেন—سيهزم الجمع ويولون الدبر "অচিরেই শত্রুদল পরাজিত হইবে এবং পশ্চাৎপদ হইয়া পলায়নে বাধ্য হইবে।" ✢

এইসব ব্যবস্থায় তাঁহার অস্বস্তির লাঘব ঘটিল বটে, কিন্তু অবস্থার ভয়াবহতা দৃষ্টে এখনও তিনি আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করা হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদের দিন যুদ্ধ চলাকালীন আমি যুদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবস্থান-স্থানে উপস্থিত হইলাম।

✢ জেহাদের বিধান প্রবর্তনের, বরং হিজরতের বহু পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালে মোসলমান-দিগকে সান্ত্বনা দান পূর্বক ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়াতের মর্ম ও সংবাদটি তখন মোসলমানদের নিকট খুবই আশ্চর্যজনক ছিল। এমনকি এই আয়াত শুনিয়া তখন ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। কোন লোকদের পরাজিত হওয়ার ও পশ্চাদপদে পলায়ন করার সংবাদ ইহা? তখন মোসলমানগণ ভাবিতেও পারে নাই যে, মক্কার দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডরা মোসলমানদের হাতে পরাজিত হইবে এবং পশ্চাদপদে পলায়ন করিবে—এইরূপ অলৌকিক ঘটনাও কোন সময় ঘটিবে।

বদরের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্নাকাটি করিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া আসার প্রাক্কালে উৎফুল্লকণ্ঠে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত পূর্বক হযরত (দঃ) পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী মোসলমানদের স্মরণে আনিয়া দিলেন। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, সেই আশাতীত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার দিন উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।

দেখিতে পাইলাম, তিনি সেজদায় পতিত আছেন— يا حى يا قيوم হে চির-জীবন্ত! হে সর্ববিষয়ের সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক। এইরূপে তিনি আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতেছিলেন। আমি পুনরায় উপস্থিত হইলাম এইবারও তাঁহাকে সেজদারতই দেখিতে পাইলাম।

বদর-জেহাদে আল্লার বিশেষ সাহায্য

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থ—নিশ্চয় তোমাদের স্মরণ আছে, বদর-জেহাদে তোমরা নিতান্ত দুর্বল, শক্তি-সামর্থহীন ছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভক্তি সঞ্চয় কর; তবেই তোমরা কৃতজ্ঞ গণ্য হইবে। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

সর্বপ্রথমে সাহায্য ছিল ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ। প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের সুসংবাদ জ্ঞাত করান হয়, অতঃপর তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রস্তাব দান করা হয়, অতঃপর একটি বিশেষ সংবাদ বাস্তবে পরিণত হওয়ার শর্তে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্যের ঘোষণা করা হয়।

ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ প্রসঙ্গটি আধুনিক পরিবেশে সমর্থিত হওয়া সহজ বা কঠিন, সেই বিতর্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে, যেহেতু এই প্রসঙ্গটি স্পষ্টরূপে বিস্তারিত ভাবে কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে।

(১)......فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

অর্থ—বদরের জেহাদ উপলক্ষে যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়া এই সুসংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব—এক সহস্র ফেরেশতা পাঠাইয়া, যাঁহারা সারিবদ্ধরূপে অবতরণ করিবেন। (৯ পাঃ ১৫ রুঃ)

(২)......اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

অর্থ—ঐ সময়টি চিরস্মরণীয়; যখন আপনি মোসলমানগণকে (সান্ত্বনা দানে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া) বলিতেছিলেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে তিন সহস্র ফেরেশতা প্রেরণে সাহায্য করিবেন—যাঁহারা এই কার্য্যের জন্যই অবতারিত হইবেন। (৪ পাঃ ৪ রুঃ)

(৩) ..... يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ -

অর্থ— তিন সহস্র ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট, তবুও যদি তোমরা আপদ-বিপদে দৃঢ় মনোবল লইয়া কাজ করিতে থাক আল্লাহ তায়ালার ভয় ও ভক্তির উপর স্থির থাক এবং শত্রু পক্ষের অধিক সাহায্য এই মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের পরওয়ার-দেগার তোমাদেরে সাহায্য করিবেন—পাঁচ হাজার পদকধারী ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা। (ঐ)

কুর্‌জ ইবনে জাবের নামক কাফের সর্দারের পরিচালনাধীনে একটি বাহিনী শত্রু পক্ষের সাহায্যার্থে আসিবার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। যদ্দরুণ মোসলমানগণের মধ্যে বিচলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা স্বাভাবিক ছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঐ অবস্থায় সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত শত্রু পক্ষের ঐ সাহায্য আসে নাই।

ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণের উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তাঁহারা সরাসরি যুদ্ধ করিয়া কাফেরদেরকে পরাজিত করিবেন। নতুবা তাঁহারা যেরূপ শক্তিমান, তাঁহাদের একজনই ঐ উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট। এক জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী বহু শক্তিশালী উম্মতকে ধ্বংস করিয়াছেন। যদি প্রত্যক্ষরূপে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারাই কাফেরদের ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হইত তবে আল্লাহ তায়ালা যে কোন মুহূর্তে সারা বিশ্বের কাফেরকে ধ্বংস করিতে পারেন।

বস্তুতঃ এখানেও প্রত্যক্ষরূপে মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমেই কাফেরদিগকে পরাজিত করা উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য জাগতিক অন্যান্য কার্য্যাবলীর ন্যায় এই উপলক্ষেও পরোক্ষভাবে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফেরেশতা অবতরণ সংবাদে মোসলমানদের মনোবল সুদৃঢ় হইয়া ছিল; বিপদকালে মনোবল সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থাও একটি অতি বড় সাহায্য।

সাধারণতঃ ফেরেশতাগণ যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই, বরং তাঁহাদের আগমন বার্তায় এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় মোসলমানদের মনোবল দৃঢ় রহিয়াছে। এই কারণেই সংখ্যায় আধিক্য অবলম্বিত হইয়াছিল, কারণ সংখ্যার আধিক্যের দ্বারা মনোবলের উপর প্রতিক্রিয়া হওয়া সাধারণ ও স্বভাবগত সত্য।

উল্লিখিত বিষয়টি একাধিক স্থানে কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। দুই একটি শব্দের সামান্য পরিবর্তনে দুই স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ -

অর্থ—ফেরেশতা প্রেরণ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা একমাত্র এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করিয়াছিলেন যেন তোমরা ইহাকে একটি সুসংবাদরূপে গ্রহণ কর এবং ইহা দ্বারা তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় হয়। (৪ পাঃ ৪ রুঃ এবং ৯ পাঃ ১১ রুঃ)

ফেরেশতাগণ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু স্থান বিশেষে কাফেরকে আঘাত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও ইহার আদেশ ছিল। কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে—

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ

فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ .....

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের প্রতি নির্দেশ পাঠাইতে ছিলেন যে, (মোমেনগণের সাহায্যে) আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা মোমেনগণের মনোবল দৃঢ় রাখিতে সচেষ্ট হও, আমি শত্রুপক্ষ কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছি। তোমরা প্রয়োজন ক্ষেত্রে কাফেরদের গর্দানের উপর এবং অঙ্গসমুহের প্রতিটি জোড়-স্থলে আঘাত করিও। কাফেরদের বিরুদ্ধে এইসব ব্যবস্থা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

মোছলেম শরীফে এই শ্রেণীর একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণিত আছে—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে মোসলমান এক ব্যক্তি কোন এক মোশরেক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ তিনি চাবুকাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং কোন একজন অশ্বারোহীর শব্দও শুনিতে পাইলেন-- اقدم حيزوم "চল হায়যুম!" বলিয়া ঘোড়া হাঁকাইতেছেন, ("হায়যুম" ঘোড়ার নাম)। সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন, মোশরেক ব্যক্তি ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দেখিতে পাইলেন কোড়াঘাতের ন্যায় তাহার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার চেহারার চামড়া বিদীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ স্থানটি বিষাক্ত রং ধারণ করিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে মোসলমান ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা সত্য ঘটনা; তৃতীয় আকাশ হইতে প্রেরিত একজন ফেরেশতার দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

১৪১৬। হাদীছ :— عن رفاعة بن رافع جاء جبرئيل الى

النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ قَالَ مِنْ

اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ .

অর্থ—রেফাআ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা বদরের জেহাদে যোগদানকারী মোসলমানগণকে কিরূপ গণ্য করেন? নবী (দঃ) বলিলেন, তাঁহারা সর্বোত্তম মোসলমান গণ্য হইয়া থাকেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, তদ্রূপ ফেরেশতাগণের মধ্যেও বদর-জেহাদে যোগদানকারী ফেরেশতা, ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম গণ্য হইয়া থাকেন।

১৪১৭। হাদীছঃ— عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ اٰخِذٌ بِرَاْسِ فَرَسِهٖ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ .

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-রণাঙ্গনে সুসংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ঐ দেখ, জিব্রাঈল (আঃ) (তোমাদের সঙ্গে রণ-সজ্জায়সজ্জিত হইয়া) ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছেন।

(২) বদরের জেহাদ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মোসলমানদের প্রতি আরও বিশেষ রহমত নাযেল হইয়াছিল। বদর এলাকার যে প্রান্ত মদীনার বিপরীত দিক ছিল, উহা ছিল উত্তম—উহার জমীন ছিল বসবাস ও চলাফেরার উপযোগী; প্রস্তরময়ও নহে বালুকাময়ও নহে এবং তাহার সংলগ্ন স্থানে কূপ আকারের একটি ঝরণা ছিল। পক্ষান্তরে মদিনার দিকের প্রান্ত ছিল বালুকাময় চলাফেরার অনুপযোগী, তথায় পানিরও ব্যবস্থা ছিল না।

শত্রু সেনাদল মদীনার বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ মক্কার দিক হইতে আগন্তুক এবং তাহারা পূর্বাহ্নেই সেই এলাকায় উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাহারা উত্তম প্রান্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। মোসলমানগণ সাধারণ ভাবেই দ্বিতীয় প্রান্তে অবস্থানরত হন। সেই প্রান্তে সকল রকমেরই অসুবিধা ও কষ্ট-ক্লেশ। তদুপরি অজুর জন্যও পানি পাওয়া যাইতেছিল না, কাহারও ফরজ গোসলের আবশ্যক হইলে গোসলের পানিও পাওয়া যাইতেছিল না। এইসব কারণে সকলের মনেই বিষণ্ণতার ভাব, তদুপরি শয়তান কোন কোন ব্যক্তির মনে এরূপ অছঅছার সৃষ্টি করিল যে, তোমরাই যদি সত্য পথের পথিক ও আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হইতে তবে আজ তোমাদের ভাগ্যে এই দুর্ভোগ কেন? অথচ তোমাদের শত্রুপক্ষ পানি ইত্যাদির কারণে সচ্ছলতার স্ফূর্তি ও আনন্দে রহিয়াছে। তাহারা অপেক্ষায় আছে যে, তোমরা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অতি সহজে এই কষ্ট লাঘবের সুব্যবস্থা করা হইল। রাত্রি বেলায় প্রবল বারিপাত হইল। যদ্দরুন মোসলমানগণের বালুকাময় অবস্থান-ভূমির বালুরাশি জমাট বাঁধিয়া আরামের সহিত চলাফেরার উপযোগী হইয়া গেল। পক্ষান্তরে শত্রু সেনার অবস্থান ভূমি যাহা সাধারণ মাটির এলাকা ছিল এবং নীচু ছিল তথায় প্রবল বারিপাতের পানি জমিয়া যাওয়ার দরুন ঐ এলাকা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিলে পরিণত হইয়া

চলাফেরার অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি শত্রুসেনার এই দুর্ভোগের সুযোগে মোসলমানগণ সেই এলাকার অভিজ্ঞ ছাহাবী হোবাব ইবনুল মোনজের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শে গভীর রাত্রে শত্রুসেনার নিকটস্থ পানির প্রধান কেন্দ্রকে নিজ দখলে আনিয়া অন্যান্য পানির কূপগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

এই ব্যবস্থায় শত্রুদের সকল সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইল এবং মোসলমানগণ সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া সুখ ভোগের অধিকারী হইলেন। এই প্রসঙ্গটি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ......

অর্থ—আল্লাহু তায়ালা তোমাদের প্রতি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিতেছিলেন তোমাদিগকে পবিত্র করার জন্য এবং শয়তানের কু-অছ্অছা তোমাদের হইতে দূরীভূত করার এবং তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য এবং (বালুর উপর চলাফেরায় সুবিধা ও রণাঙ্গনে) তোমাদের পদস্থিতির ব্যবস্থার জন্য। (৯ পারা ১৬ রুকূ)

বদর-যুদ্ধে ইবলিস শয়তানের ভূমিকা :

ইসলামের বৃহৎ ক্ষতি সাধন বেলায় অনেক ক্ষেত্রে ইবলিস-শয়তান মানুষ আকৃতিতে ইসলামদ্রোহীদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্ররোচিত করার এবং প্রত্যক্ষ পরামর্শ দানের বিভিন্ন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন—যেই ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই ঘটনায় ইবলিস-শয়তানের ঐরূপ ভূমিকার অনেক ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

ইসলামের অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাপারে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রুদ্ধদারে গোপন পরামর্শের জন্য তাহাদের জাতীয় মিলনায়তনে একত্রিত হইল। সেই মুহূর্তে ইবলিস-শয়তান আরবের প্রসিদ্ধ এলাকা 'নজদ" নিবাসী সর্দার মানুষের আকৃতিতে তথায় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ সম্মেলন-প্রতিনিধীরা তাহাকে বাধা দিল; সে বলিল, আপনারা কি বিষয়ে পরামর্শ করিবেন তাহা আমি অবগত আছি এবং সে সম্পর্কে আমি আপনাদের উত্তম সাহায্যকারী হইব। এতদশ্রবণে তাহারা তাহাকে "শায়খে নজ্‌দী" নজদনিবাসী মুরব্বি আখ্যাদানে স্বাদরে বরণ করিল এবং সে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিল। আলোচনায় প্রথম প্রস্তাব এই আসিল যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে কোন নির্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। শায়খে-নজদী এই প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিল, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাহার বংশ বনু-হাসেমরা তাহাকে ছিনাইয়া নিয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব আসিল যে, তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দেওয়া হউক। শায়খে-নজদী এই প্রস্তাবেও

বাধা দিয়া বলিল, অন্য দেশে যাইয়া সে এই কাজই করিবে এবং শক্তি সঞ্চয় করিয়া তোমাদেরে আক্রমণ করার ব্যবস্থা করিবে।

অতঃপর মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবূ-জহল প্রস্তাব করিল যে, তাঁহাকে হত্যা করা প্রয়োজন, কিন্তু যে কেহ একা তাঁহাকে হত্যা করিলে তাঁহার বংশধরেরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। সুতরাং মক্কা এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল গোত্র হইতে এক একজন লোক সকলে একত্রিক হইয়া এক সঙ্গে তাঁহার উপর আঘাত হানিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হউক। এমতাবস্থায় এতগুলি গোত্র হইতে প্রতিশোধ নেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না; ক্ষতিপুরণ দিতে হইলে সম্মিলিত রূপে তাহা আদায় করাও সহজ হইবে। এই প্রস্তাবে ইবলিস-শয়তান—শায়খে-নজদী সমর্থন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করিল, উহা কার্য্যকরী করিতে সকলকে প্ররোচিত করিল। পবিত্র কোরআনে এই পরামর্শের উল্লেখেই বলা হইয়াছে—

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْيَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ -

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

"একটি স্মরণীয় মুহূর্ত—যখন কাফেররা আপনার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতেছিল; আপনাকে অবরুদ্ধ করিবে বা হত্যা করিবে কিম্বা দেশান্তর করিবে। (অবশেষে হত্যা কার্য্যকরী করার) তদবির তাহারা করিতে লাগিল, আর আল্লাহ (তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার) তদবির করিলেন। আল্লাহ সর্বোত্তম তদবিরকারী।" (৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

বদর-যুদ্ধ উপলক্ষেও ইবলিস-শয়তান মানুষ আকৃতিতে কাফেরদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। কোরেশদের পড়শী কেনানা গোত্র; তাহারাও বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাহাদের বিশিষ্ট সর্দার "সোরাকা।" ইবলিস-শয়তান সেই সোরাকা সর্দারের আকৃতিতে কোরায়েশ বাহিনীর মধ্যে উপস্থিত হইল এবং আবু-জহল ও হারেছা নামীয় বিশিষ্ট দলপতিদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া হাত ধরাধরিরূপে তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। আর তাহাদেরে উত্তেজিত ও উৎসাহ দান করিয়া যাইতে লাগিল। এমনকি রণাঙ্গনেও সে দলপতিদের সহিত ঐরূপে ছুটাছুটি করিতে এবং সৈন্যবাহিনীর উৎসাহ যোগাইতেছিল। মোসলমানদের পক্ষে যখন ফেরেশতাদের অবতরণ হইল এবং ইবলিস-শয়তান তাহার নিজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ফেরেশতা দেখিতে পাইল তখন সে পলায়ন করিল। এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ

وَاِنِّىْ جَارٌلَّكُمْ - فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ

بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ

"একটি স্মরণীয় ঘটনা—শয়তান কোরেশ বাহিনীকে তাহাদের কার্য্যে প্রেরণা যোগাইতেছিল এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দানে বলিতেছিল যে, আজ মোসলেম বাহিনী কেন কোন বাহিনীই তোমাদের উপর জয়ী হইতে পারিবে না। (তোমাদের শক্তি অতুলনীয়।) আমি তোমাদের সাহায্য দানে উপস্থিত আছি। (কোরেশ দলপতিরা তাহাকে কেনানা গোত্রীয় সর্দার "সোরাকা" ভাবিতেছিল; তাই এই কথার মূল্য তাহাদের নিকট অনেক বেশী ছিল এবং ইহাতে তাহারা অত্যাধিক উৎসাহবোধ করিতেছিল।) যখন রণাঙ্গনে উভয় পক্ষ মুখামুখী হইল তখন ইবলিস-শয়তান পশ্চাদমুখী পলায়ন করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম। তোমরা যাহা দেখিতেছ না (তথা ফেরেশতা) আমি তাহা দেখিতেছি। (সে মিছামিছি আরও বলিল এবং তাহাদের সঙ্গ ত্যাগের জন্য ভান করিল যে,) আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লার আজাব অতি কঠিন।" (১০ পাঃ ২ রুঃ)

বদরের জেহাদে মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা

১৪১৮। হাদীছঃ—ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বদরের জেহাদে যোগদানের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে) উপস্থিত করা হইলে পর আমরা (জেহাদের অনুপযুক্ত) ছোট পরিগণিত হইলাম।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে যোগদানকারীদের মধ্যে ষাট জনের কিছু অধিক ছিলেন মোহাজের এবং বাকী দুইশত চল্লিশ জনের কিছু অধিক ছিলেন আনছার—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ।

১৪১৯। হাদীছঃ—ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদে মোসলমানদের সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ঐ পরিমাণই ছিল যে পরিমাণ "তালুৎ"-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল। ইহা সর্ববিদিত যে, তালুতের সঙ্গে শুধু খাঁটি মোমেনগণই যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু অধিক ছিল।

ব্যাখ্যাঃ— "তালুৎ"-এর ঘটনাটি কোরআন শরীফে দ্বিতীয় পারার সর্বশেষ দুইটি রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত মুছা আলাইহেচ্ছালামের যুগের পরের ঘটনা। তখন শিমবীল আলাইহেচ্ছালাম নবীর যুগ। তাঁহার উম্মতগণের উপর জেহাদ ফরজ হইল এবং জেহাদ পরিচালনার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে সৎ ও দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নত এবং এলম ও জ্ঞানে সুমহান "তালুৎ" নামক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে বাদশাহ নিয়োজিত হইলেন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর আল্লাহ তায়ালা দলীল প্রমাণে ঐ ব্যক্তির প্রাধান্য ও মহত্ত্ব প্রমাণিত করিয়া সমস্ত লোককে তাঁহার আনুগত্যে বাধ্য করিলেন।

অতঃপর তিনি তৎকালীন "জালুৎ" নামক কাফের বাদশার বিরুদ্ধে জেহাদে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সত্তর হাজার লোক ছিল। পথিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে একটি ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন। তখন অতিশয় গরমের মৌসুম ছিল এবং ভীষণ উত্তাপ ও প্রখর রৌদ্র ছিল; দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাদের বাদশা তালুৎ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অনতিদূরেই তোমাদের সম্মুখে একটি নদী উপস্থিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা উহাকে তোমাদের পরীক্ষার বস্তু সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহার পানিতে মুখ লাগাইবে না বা অতি সামান্য—মাত্র এক অঞ্জলি পান করিবে একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার সঙ্গে জেহাদে যাইবার উপযুক্ত ও খাঁটী মোমেন সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অধিক পানি পান করিবে সে জেহাদে যোগদানের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হইবে এবং আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না।

সত্য সত্যই ঐ ভীষণ অবস্থায় তাহাদের সম্মুখে একটি নদী উপস্থিত হইল। তখন পূর্ব সতর্ককরণ সত্ত্বেও সকলেই পেট পুরিয়া ঐ পানি পানে লিপ্ত হইল এবং সেখানেই ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিল; সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না।

শুধুমাত্র তিন শত দশের কিছু অধিক—তিনশত তের সংখ্যক লোক ঐরূপে পানি পান হইতে বিরত রহিলেন এবং একমাত্র তাঁহারাই স্বীয় বাদশাহ তালুতের সহিত ঐ নদী অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন। কোথায় ছিল সত্তর হাজার আর কোথায় হইল তিন শত তের জন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটি মোমেন প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও সাহায্য লাভ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অলৌকিকরূপে শত্রু পক্ষের স্বয়ং বাদশাহ জালুৎ রণাঙ্গনে নিহত হইল এবং মুষ্টিমেয় লোকের মোকাবেলায় বিরাট শত্রু সেনাদল পরাজিত হইল।

ছাহাবী বরা ইবনে আজেব (রাঃ) উল্লিখিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, বদরের জেহাদে যোগদানকারী মোসলমানদের সংখ্যা ঠিক ঐ পরিমাণই ছিল যেই পরিমাণ লোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাঁটি মোমেন সাব্যস্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারা সংখ্যায় তিনশত দশ জনের কিছু অধিক ছিলেন এবং খাঁটি মোমেন ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও সাহায্য লাভ করতঃ বিরাট শত্রু সেনাদলকে পরাজিত করিয়া জয় ও সাফল্য লাভ করিতে সমক্ষ হইয়াছিলেন। বদরের জেহাদে মোসলমানদের সংখ্যা এবং অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ ঃ

রমজান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার দিন, আজ বদরের ময়দানে মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। একটি উঁচু টিলার উপর একটি তাঁবু বা শিবির তৈয়ার করা হইয়াছে; তথা হইতে রণাঙ্গনের সমুদয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া সেই শিবিরে অবস্থানরত। মদীনার প্রধানতম সর্দার সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই শিবির পাহারা দিতেছেন।

এদিকে রণাঙ্গনের দুই প্রান্তে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ রূপে রণাঙ্গনে অবতরণে প্রস্তুত। সর্বপ্রথম কাফের শত্রু দলের মধ্যে হইতে রবিয়ার দুই পুত্র—(১) শায়বা ও (২) ওত্‌বা এবং ওত্‌বার পুত্র—(৩) অলীদ এই তিন ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে হুঙ্কার মারিয়া ময়দানের মধ্যস্থলে চলিয়া আসিল এবং মোসলমানদের প্রতি যুদ্ধে অবতরণের হাঁক দিল। তৎক্ষণাৎ মোসলমানদের পক্ষ হইতে আনছার—মদীনাবাসী তিন জন যুবক ছাহাবী তাহাদের প্রতিউত্তরে অগ্রসর হইলেন—আফ্‌রা (রাঃ) নাম্নী ছাহাবীয়ার দুই পুত্র—(১) আউফ (রাঃ), (২) মোয়াজ (রাঃ) এবং (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। কাফেররা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাঁহারা গর্বভরে স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, আমরা মদীনার আনছার দল। কাফেরা বলিল, আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আসি নাই। এই বলিয়া তাহাদের একজন চীৎকার করিল, হে মোহাম্মদ! আমাদের সমকক্ষ ও বংশধরগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করুন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় চাচা হাম্‌যা (রাঃ) ও চাচাত ভাই আলী (রাঃ) এবং ওবায়দা (রাঃ)কে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশক্রমে তাঁহারা রণে ঝাপাইয়া পড়িলেন। ওবায়দা (রাঃ) ওত্‌বা ইবনে রবিয়ার প্রতি, হাম্‌যা (রাঃ) শায়বা ইবনে রবিয়ার প্রতি এবং আলী (রাঃ) অলীদ ইবনে ওতবার প্রতি আক্রমণ চালাইলেন। আল্লাহ তায়ালার দ্বীন—ইসলামের জন্য জেহাদের সর্বপ্রথম দৃশ্য ইহা এবং (বোধ হয়) এই তিন জনের মধ্যে আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম আক্রমণকারী ছিলেন। আলী (রাঃ) সেই দৃশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন।

১৪২০। হাদীছ ঃ— আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিতেন, খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে নালিশ দায়ের করার সুযোগ হইবে তখন আমি (এই উম্মতের) সর্বপ্রথম নালিশ দায়েকারী হইব। (এই শ্রেণীর সংগ্রামের সর্বপ্রথম যোদ্ধা তিনি)।

১৪২১। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট ছাহাবী আবু জর গেফারী (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেন, هذان خصمان اختصموا فى ربهم "এই দুইটি সংগ্রামকারী দল তাহাদের বিরোধ

হইতেছে—তাহাদের স্বীয় সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে"। উক্ত আয়াতে যেই দুইটি দলের উল্লেখ হইয়াছে উহার একটি হইতেছে—(১) হাম্‌যা (রাঃ), (২) আলী (রাঃ), ও (৩) ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ) এবং অপরটি হইতেছে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী (১) ওত্‌বা, (২) শায়বা ও (৩) অলীদ ইবনে ওত্‌বা; যাহারা বদরের রণাঙ্গনে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল।

উল্লিখিত ছয় জনের সংগ্রামে মুহূর্তের মধ্যেই হাম্‌যা (রাঃ) স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শায়বা ইবনে রবিয়াকে এবং আলী (রাঃ) স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অলীদকে হত্যা করিতে সমর্থ হন। ওবায়দা (রাঃ) ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ওত্‌বা তাহাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলিতে থাকে এবং উভয়েই আহত হয়। হাম্‌যা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করিয়া ওবায়দা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন এবং ওতবাকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ওবায়দা (রাঃ)কে মারাত্মকরূপে আহত অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে নিয়া আসা হইল। তাঁহার পায়ের নলা কাটিয়া গিয়াছিল, হাড়ের ভিতরের মগজ বহিয়া পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—اشهيد انا يا رسول الله

ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি কি শহীদ গণ্য হইব? হযরত (দঃ) বলিলেন—হাঁ নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে ওবায়দা (রাঃ) একটি বয়েতও বলিয়াছিলেন—

انسلمه حتى نصرع حوله — ونذهل عن ابنائنا والحلائل

"আমরা নিজ নিজ পরিবার পরিজনকে, সন্তান-সন্ততিকে এবং সব কিছুর মায়াকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া নিজকে আল্লার রসুলের চরণে বিলাইয়া দিয়াও তাঁহার সমর্থন করিয়া যাইব—তাঁহাকে শত্রুর কবলে ফেলিয়া পশ্চাদপদ হইব না।" অতঃপর তিনি আরও দুইটি বয়েত রচনা করতঃ আবৃত্ত করিলেন—

فان يقطعوا رجلى فانى مسلم — ارجى به عيشا من الله عاليا

"শত্রুপক্ষ আমার পা কাটিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু (আমি তাহাতে মোটেই দুঃখিত নহি, কারণ) আমি মোসলমান (দ্বীন-ইসলামের পথে আমি এই আঘাত বরণ করিয়াছি,) আমি এই কার্য্যের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট বহু উন্নত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন জীবন লাভের আশা পোষণ করিতেছি।"

والبسنى الرحمن من فضل منه — لباسا من الاسلام غطى المساويا

"করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিজ করুণাবলে ইসলামের ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমার পূর্বকৃত সমুদয় পাপ মোচন হইয়া দিয়াছেন।"

পাঠকবর্গ! ওবায়দা (রাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে যেই উদ্দেশ্য ও মনোভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন উহার দ্বারাই জেহাদ-ফি-ছাবিলিল্লার তাৎপর্য্য অনুভূত হয় এবং জেহাদ ও জাগতিক স্বার্থের যুদ্ধ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য প্রমাণিত হয়।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়টি এই দৃশ্য ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের পরস্পর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। শত্রু পক্ষ প্রতিশোধের মনোভাবে উন্মাদ হইয়া উঠিল। মোসলমানগণও বিজয়ের সূচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রতিরোধ ও শত্রু নিপাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এইরূপে উভয় পক্ষ দলবদ্ধরূপে সম্মিলিতভাবে পরস্পর তীব্র আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালাইতে লাগিল। এক হাজার শত্রুসেনা মুষ্টিমেয় তিন শত মোসলেম বাহিনীর উপর এক সঙ্গে হিংস্র পশুর ন্যায় লাফাইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) শিবিরে বসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে-ছিলেন। সময়ে রণক্ষেত্রের আবশ্যকীয় আদেশাবলীও দিতে ছিলেন।

১৪২২। **হাদীছ:**—আবু উসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, শত্রুরা নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিলে (তথা তীরের পাল্লায় আসিলে পর) তীর নিক্ষেপ করিবে। (দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করতঃ) তীরের অপচয় করিবে না।

● যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক মুষ্ঠি ধুলিকঙ্কর উঠাইলেন এবং شاهت الوجوه —"চেহারা সমূহ ধ্বংস হউক" বলিয়া শত্রু-দলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের শান—এক সহস্র শত্রুর কোন একজনও রেহাই পাইল না যাহার চোখে পাথরের কঙ্কর প্রবেশ না করিল। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উক্ত ঘটনা সম্পর্কেই বলিয়াছেন- وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى "আপনি যখন (ধুলিকঙ্কর) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন বস্তুতঃ আপনি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

শত্রু সেনারা চোখ কচলানোর মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; ইত্যবসরে মোসলমানগণ তাহাদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন। মূল দলপতি আবু জহল এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ সত্তর জন নিহত হইয়া গেল, সত্তর জন বন্দী হইল; অবশিষ্টরা হতভম্ভ হইয়া পলায়নের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এইরূপে বিরাট শক্তিশালী শত্রুদলের পরাজয়ের উপর বদর-জেহাদের সমাপ্তি ঘটিল।

যুদ্ধের ফলাফল:

বদরের জেহাদ উপলক্ষে মোসলমানের পক্ষে চৌদ্দজন লোক শহীদ হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় লোক এরূপও ছিলেন যাঁহারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থায় শহীদ হইয়াছিলেন না, বরং অজ্ঞাত বা অপ্রস্তুতাবস্থায় শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের কবলে পতিত হইয়া শহীদ হইয়াছিলেন। আর কতক এরূপ ছিলেন যাঁহারা রণাঙ্গণে আহত হইয়াছিলেন অতঃপর সেই আঘাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন। যেমন ওবায়দা (রাঃ)—তিনি প্রথমে আহত হইয়া-ছিলেন। যুদ্ধ অবসানের তিন দিন পর রণ এলাকা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে

"ছাফরা" নামক স্থানে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। উক্ত চৌদ্দ জনের মধ্যে ছয় জন ছিলেন মোহাজের এবং আট জন আনছার মোসলমানগণের পক্ষে কেহ বন্দী হন নাই।

শত্রু দল—মোশরেকদের পক্ষে রণাঙ্গনের মধ্যেই সত্তর জন নিহত হয়। তন্মধ্যে মক্কার অন্যতম প্রধান, ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রু আবু জহল ও উমাইয়া সকলেই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং সকলেই নিহত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সত্তর জন বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস এবং জামাতা আবুল আছ্ও ছিলেন।

১৪২৩। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোরায়শ গোত্রীয় অতিশয় দুষ্কৃতিকারী—শায়বা, ওতবা, অলীদ এবং আবু জহলের প্রতি অভিশাপ করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি শপথ করা পূর্বক সাক্ষ্য দিতেছি—ঐ নামীয় ব্যক্তিদেরকে বদরের রণাঙ্গনে নিহত হইয়া বিকৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। বদরের জেহাদের দিনটি ভীষণ উত্তপ্ত দিন ছিল, তাই মৃতদেহগুলি অল্প সময়েই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

আবু জহল নিহত হওয়ার ঘটনা ঃ

১৪২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু জহলের অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ বলিলেন, আবু জহলের কি অবস্থা তাহা কেহ তদন্ত করিয়া আসিতে পার কি ? তখন ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উহার খোঁজে বাহির হইলেন এবং একস্থানে তাহাকে পতিত দেখিতে পাইলেন। মদীনাবাসী আফরা (রাঃ) নাম্নী ছাহাবীয়ার যুবক পুত্রদ্বয় ভীষণ আঘাতে আহত করিয়া তাহাকে মুমূর্ষ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নিকটে আসিলেন এবং তাহার দাড়ি ধরিয়া (তাহার চেতনা আনিলেন এবং গর্দানের উপর পা রাখিয়া) বলিলেন, তুই-ইত সে আবু জহল ? (হে আল্লার দুশমন! আজ আল্লাহ তায়ালা তোকে সঠিকরূপে অপদস্থ করিয়াছেন।) আবু জহল উত্তর করিল, (আমি কি অপদস্থ হইয়াছি) নিহতদের মধ্যে আমার তুল্য সর্দার কেহ আছে কি ? অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাহার মাথা কাটিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলেন।

১৪২৫। হাদীছ ঃ— আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের রণাঙ্গনে যখন সকলকে সারিবদ্ধাকারে প্রস্তুত করা হইল তখন আমি আমার ডানে বামে তাকাইলাম এবং উভয় পার্শ্বেই দুইটি যুবক—ছেলে বয়সের লোক দেখিতে পাইলাম। এতদ্দৃষ্টে আমি নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারিলাম না। (কারণ, রণাঙ্গনে শক্তিশালী

লোকদের মধ্যে থাকিতে পারিলে তাহা এক প্রকার নিরাপদ অবস্থা গণ্য হইয়া থাকে।) এমতাবস্থায় হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজন হইতে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে আমাকে কানে কানে বলিল, আবু জহল কোন্ লোকটি তাহা আমাকে দেখাইয়া দিবেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু জহলকে চিনিতে পারিলে তুমি কি করিবে? সে উত্তর করিল, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই অঙ্গিকার করিয়াছি যে, সে আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আমি তাহাকে হত্যা করিব, কিম্বা সেই চেষ্টায় নিজে মৃত্যু বরণ করিব। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে দ্বিতীয় যুবকটিও ঐরূপে নিজ সঙ্গী হইতে গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে আমার কানে কানে ঐরূপ উক্তিই করিল। এতচ্ছ্রবনে আমি তখন ঐ যুবকদ্বয়ের কারণে এত অধিক সন্তুষ্ট হইলাম যে, দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হইতাম না।

অতঃপর আমি আবু জহলকে দেখিতে পাইয়া ঐ যুবকদ্বয়কে তাহার প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইলাম। যুবকদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বাজের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত উড়িয়া ছুটিল। এবং মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে ভীষণ আঘাতে ধরাশায়ী করিল।

ঐ যুবকদ্বয় মদীনবাসী আফরা (রা:) নাম্নী মহিলার দুই পুত্র মোয়ায এবং মোয়াওয়ায। (তাঁহার আরও পাঁচটি ছেলে—মোট সাতটি ছেলে বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।) আবু জহল মদীনাবাসী লোকের হাতে মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, কৃষক ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে মৃত্যু ঘটিলে ভাল হইত (মদীনা কৃষি প্রধান দেশ—তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক ছিল।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আবু জহলের হত্যাকারীরূপে বিভিন্ন হাদীছে চার জনের নাম পাওয়া যায়।—(১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (২) মোয়াজ ইবনে আফ্রা (৩) মোয়াওয়ায ইবনে আফ্রা (৪) মোয়াজ ইবনে আম্র-ইবনুল জমুহ। শেষোক্ত নামটি বোখারী শরীফ ৪৪৪ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে। সেই হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে, ২ এবং ৪নং যুবকদ্বয় আবু জহলকে ধরাশায়ী করিয়া উভয়ে সানন্দে হযরতের নিকট সুসংবাদ নিয়া ছুটিয়া আসিল। হযরত (দ.) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে? তাহারা উভয়ে দাবী করিল, আমি হত্যা করিয়াছি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের তরবারি তাহার খুনের রক্ত হইতে পরিষ্কার করিয়াছ কি? তাহারা বলিল, না। হযরত (দঃ) উভয়ের তরবারি দেখিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই হত্যায় অংশ-গ্রহণকারী। অতঃপর আবু জহলের পরিধেয় মূল্যবান লৌহবর্ম লৌহ-শিরস্ত্রান ইত্যাদি ৪নং যুবককে পুরস্কার দিলেন। অতএব মনে হয় ৪নং যুবকই আবু জহলকে ভূলুণ্ঠিতকারী মূল আঘাত করিয়াছিল; ২ ও ৩ নং যুবকদ্বয়ও ছোটখাট আঘাত করায় অংশীদার ছিল, আর ১নং ছাহাবী আসিয়া ধরাশায়ী মুমূর্ষ আবু জহলের মাথা কাটিয়াছিলেন।

● নিহত আবু জহলের পরিধেয় চিজ-বস্তুগুলি হযরত (দঃ) হত্যাকারীকে পুরস্কার দিয়াছিলেন; আর তাহার উটটি বিশিষ্ট উট ছিল, উহার নাকে রৌপ্যের কড়া ছিল; সেই উটটি হযরত (দঃ) নিজে গ্রহণ করিয়া উহাকে পোষিয়া রাখিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধের চার বৎসর পর ষষ্ঠ হিজরী সনে হযরত (দঃ) যখন সর্বপ্রথম মদীনা হইতে মক্কায় ওম্‌রাব্রত সমাপনে যাইতেছিলেন তখন ঐ উটটিকে মক্কায় আল্লার নামে কোরবাণী করার জন্য নিয়াছিলেন।

আবু জহলের তরবারিটিও হযরত (দঃ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাই হযরতের প্রসিদ্ধ "জুল-ফাকার" নামীয় তরবারি। হযরত দুনিয়া ত্যাগের পূর্বে উক্ত তরবারি আলী (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তাঁহার পরে উহা হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যবহারে ছিল। ঐতিহাসিক কারবালার জেহাদে উহা তাঁহার হস্তে ছিল। তিনি শহীদ হইলে পর ঐ তরবারিখানা তাঁহার নাবালক পুত্র জয়নুল-আবেদীনের হস্তগত হইয়াছিল যাহার উল্লেখ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৪২৬। **হাদীছ**:— হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আলী—জয়নুল আবেদীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শহীদ হওয়ার পর এযীদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা তথা হইতে যখন মদীনায় উপনীত হইলেন তখন বিশিষ্ট ছাহাবী মেসওয়ার (রাঃ) তাঁহার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশে বলিলেন, আপনাদের কোন প্রয়োজন থাকিলে আমাকে আদেশ করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এখন কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তলোয়ারখানা আপনাদের নিকট রহিয়াছে, উহা আমার নিকট দিয়া দিন; আমার ভয় হয়, লোকেরা উহা আপনার হাত হইতে ছিনাইয়া নিবে। কসম খোদার উহা আমার নিকট থাকিলে যাবৎ আমার জান থাকিবে কেহ উহার নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস পাইবে না। (৪৩৮ পৃঃ)

উমাইয়া ইবনে খলফের মৃত্যু:

উমাইয়া-ইবনে খলফও মক্কার একজন সর্দার ছিল। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পূর্বে তাহারই ক্রীতদাস ছিলেন। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল সেই সব অত্যাচারের পরিচালক ছিল এই উমাইয়া-ইবনে-খলফ। তাহার মর্মান্তিক অত্যাচারে জর্জরিত ও হৃদয়বিদারক অবস্থায় পতিত বেলাল (রাঃ)কে অতঃপর আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আযাদ ও মুক্ত করিয়াছিলেন।

১৪২৭। **হাদীছ**:—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া ইবনে খলফের সঙ্গে আমি এইরূপ একটি চুক্তি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার মক্কাস্থিত

ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সে করিবে এবং মদীনাস্থিত তাহার ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমি করিব। যখন এই চুক্তিপত্র লিখিত হইতেছিল তখন আমার ইসলামী নাম আবদুর রহমান লিখিতে সে আপত্তি উত্থাপন করিল এবং বলিল, আমরা "রহমান" কে জানি না। আপনাকে পূর্বের নাম লিখিতে হইবে। আমি বাধ্য হইয়া আমার পূর্ব নাম "আবদু-আমর" লিখিলাম।

(তাহার সঙ্গে আমার একটি চুক্তি থাকায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল।) বদর রণাঙ্গনে শত্রু পক্ষের দলে সেও উপস্থিত ছিল। (রণাঙ্গনের ভ বহ অবস্থা দৃষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষার্থে) তাহাকে লুকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলা— যখন সকলে নিদ্রামগ্ন ছিল তখন আমি তাহাকে লইয়া পাহাড়ী এলাকার দিকে যাইতে লাগিলাম, বেলাল (রাঃ) তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ফেলিলেন এবং তিনি দ্রুত একদল মদীনাবাসী ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন যে, উমাইয়া ইবনে-খলফের দিকে ছুটিয়া চলুন; উমাইয়া ইবনে খলফের ন্যায় চুক্তিকারী আজিকার দিনে রক্ষা পাইলে আমার জীবন বৃথা। বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ডাকে একদল আনছার ছাহাবী সাড়া দিলেন এবং তাঁহারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

আমি যখন দেখিলাম—তাহারা আমাদের নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন আমি আমাদের তৃতীয় সঙ্গী উমাইয়া ইবনে-খলফের পুত্রকে পিছনে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম, তাঁহারা ইহাকে হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হইবে, কিন্তু তাঁহারা উহাকে হত্যা করিয়া পুনঃ আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। উমাইয়া অতিশয় মোটা ছিল; দ্রুতবেগে চলিতে পারিত না। অবশেষে তাঁহারা আমাদিগকে পাইয়া ফেলিলেন। আমি কোন গতিক না দেখিয়া উমাইয়াকে বলিলাম, তুমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়। অতঃপর আমি নিজ দেহ দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া লইলাম, যেন তাঁহারা তাহাকে আঘাত করার সুযোগ না পায়, কিন্তু তাঁহারা তলদেশে তরবারি ঢুকাইয়া তাহাকে আঘাত করতঃ মারিয়া ফেলিলেন।

নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে. ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে রাত্রিবেলা রণাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানকে নির্দিষ্ট করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, هذا مصرع فلان غدا انشاء الله ইনশা-আল্লাহ ইহা আগামীকল্য অমুকের নিহত হওয়ার স্থান هذا مصرع فلان ইহা অমুকের নিহত হওয়ার স্থান। এইরূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নামে এক একটি স্থান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দেখাইয়া দিলেন।

ওমর (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশিত স্থানসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রমও ঘটে নাই।

যুদ্ধের পর :

১৪২৮। হাদীছ :—আবু তাল্‌হা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, যুদ্ধ শেষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুদলের নিহতদের মধ্য হইতে সরদার শ্রেণীর চৌদ্দ জন লোকের লাশকে নিকটস্থিত গর্তাকারের একটি কদর্য কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। সেমতে উক্ত লাশসমুহ কুপে নিক্ষিপ্ত করা হইল। অতঃপর হযরত (দ:) বদর-ময়দানে তিন দিন অবস্থান করিলেন; সাধারণতঃ যুদ্ধ জয়ের পর রণক্ষেত্রে হযরত (দ:) তিন দিন অবস্থান করিতেন।

তৃতীয় দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় যানবাহনকে প্রস্তুত করার আদেশ করিলেন, এবং পদব্রজে অগ্রসর হইলেন; ছাহাবীগণ তাঁহার সঙ্গেই আছেন। সকলেরই ধারণা, তিনি কোন উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ঐ কুপের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলেন যেই কুপের মধ্যে কাফেরদের লাশ স্তুপকৃত ছিল। অতঃপর তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নাম ও তাহাদের পিতার নাম উল্লেখ পূর্বক এক একজন করিয়া এইরূপে ডাকিলেন—

"হে অমুকের পুত্র অমুক। এখনত নিশ্চয় অনুভব করিতেছ যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ফরমাবরদারী ও আনুগত্য তোমাদের জন্য চরম ও পরম সন্তুষ্টি লাভের বস্তু ছিল। আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতেছি, আমাদের সম্পর্কে প্রভু-পরওয়ারদেগারের সমুদয় প্রতিশ্রুতি আমরা বাস্তবায়িত পাইয়াছি। তোমাদের সম্পর্কে প্রভু-পরওয়ারদেগারের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তাহা কি তোমরা বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছ?" ওমর (রা:) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ!

مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا

"আত্মাহীন দেহসমুহকে আপনি কি অর্থে সম্বোধন করিতেছেন?"

রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন—

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ

لٰكِنْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يُجِيْبُوْنَ ۝

"যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার হস্তে আমি মোহাম্মদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বক্তব্যকে তোমাদের তুলনায় তাহারা কম শ্রবণ করিতেছে না। অবশ্য তাহারা উত্তর দানে অক্ষম।"

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত কাফের সরদারগণকে যে প্রশ্নবোধক উক্তি দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন উহা কোরআন শরীফ হইতে উদ্ধৃত। ছুরা আ'রাফের মধ্যে উহা বেহেশত ও দোযখবাসীদের প্রশ্নোত্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে—

وَنَادٰىٓ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا

حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ـ قَالُوْا نَعَمْ........

অর্থ—বেহেশতবাসীগণ দোযখীদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতিশ্রুতি সমূহকে বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছি, তোমরাও প্রভু-পরওয়ারদেগারের ভীতিজনক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে বাস্তবে রূপায়িত পাইয়াছ কি-না? তাহারা উত্তর করিবে, হাঁ—সব কিছুই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে এক চীৎকারকারী (ফেরেশতা) চীৎকার করিবেন, আল্লার অভিশাপ স্বৈরাচারীদের উপর যাহারা আল্লার দ্বীন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকিত এবং উহার মধ্যে দোষ-ত্রুটি আবিষ্কারের সন্ধানে থাকিত এবং তাহারা আখেরাতকে অস্বীকার করিত। (৮ পাঃ ১২ রুঃ)

● মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। আয়েশা (রাঃ) এবং বহু বিশিষ্ট তাবেঈগণের মত এই যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণশক্তি রাখে না, তাই সে শুনিতে পারে না। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশ্নের উত্তরে মৃত কাফেরগণের শ্রবণ করা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা বলিয়াছেন সেই সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) এই স্থানে দুইটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(১) বিশিষ্ট তাবেঈ কাতাদা (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় সম্বোধিত কাফেররা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি শ্রবণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা মৃতদের সাধারণ অবস্থা নহে, বরং ঐ নিহত কাফেরগণকে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও ভৎ'সিত করার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি শ্রবণের শক্তি তাহাদিগকে সাময়িকরূপে আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছিলেন। (২) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই স্থানে শ্রবণ করা অর্থ অনুভব ও উপলব্ধি করা।

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে :

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিজয়ীরূপে গণিমতের মাল তথা রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ও বন্দিগণ সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিলেন। বন্দীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি ইসলামের ও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এরূপ ঘোর শত্রু এবং প্রকাশ্যে কুৎসা রটনাকারী ছিল যে, তাহাদের সংশোধনের সম্ভাবনা মোটেই ছিল না; পথিমধ্যেই তাহাদের উভয়কে প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেই গণিমতের মালকে আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে রসুলুল্লাহ (দঃ) বন্টন করিলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিককে পদাতিকের দ্বিগুণ দেওয়া হইল এবং যাঁহারা

এরূপ ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশে কোন কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, যেমন—ওসমান (রাঃ), এইরূপ লোকদিগকেও গণিমতের অংশ দেওয়া হইল।

১৪২৯। **হাদীছঃ—** যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের জেহাদ উপলক্ষে মোহাজেরগণের পক্ষে গণিমতের মাল সর্ব-মোট একশত ভাগ ছিল।

ব্যাখ্যাঃ— গণিমতের মালসমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোহাজের যোদ্ধাগণের জন্য একশত ভাগ গণ্য করা হয়। গণিমতের মাল হইতে জাতীয় ধন-ভাণ্ডার—বায়তুল মালের জন্য এক পঞ্চমাংশ রাখার বিধানানুসারে ঐ একশত ভাগ হইতে কুড়ি ভাগ বায়তুল মালের জন্য থাকে। রণক্ষেত্রে শুধুমাত্র তিনটি ঘোড়া ছিল যাহা একমাত্র মোহাজেরগণেরই ছিল, সেই অশ্বারোহী সৈনিকগণকে ঘোড়া বাবদ অতিরিক্ত তিন অংশ দেওয়া হয়। রণক্ষেত্রে উপস্থিত মোহাজেগণের সংখ্যা ছিল ষাটের উর্দ্ধে এবং কতেকজন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশক্রমে অন্য কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, উভয় রকমের সর্ব-মোট সংখ্যা ছিল সাতাত্তর,* তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক অংশ দেওয়া হয়, এইরূপে মোহাজেরগণের পক্ষে একশত ভাগ পরিগণিত হয়। (৭৭+২০+৩=১০০)

১৪৩০। **হাদীছঃ—**আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদর-জেহাদের গণিমতের মাল হইতে আমার অংশে আমি একটি উট পাইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন (আমার অত্যন্ত জরুরত ছিল বলিয়া) সাধারণ জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের অংশ হইতে আমাকে অপর একটি উটও দেওয়া হয়। (বদর-জেহাদের পূর্বেই নবী-কন্যা ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় হইয়াছিল)। জেহাদ হইতে আসিয়া নবী-কন্যাকে আমার গৃহে আনিবার ইচ্ছা করিলাম। এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি এক ইহুদী কর্মকারের সঙ্গে এই চুক্তিতে শরীক হইলাম যে, আমরা উভয়ে জঙ্গল হইতে এজ্‌খের (এক প্রকার উদ্ভিদ যাহা কর্মকারগণ জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে) বহন করিয়া আনিব এবং উহা কর্মকারগণের নিকট বিক্রি হইবে। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ আয়ের দ্বারাই আমি বিবাহের অলিমার ব্যবস্থা করিব।

একদা ঐ কার্য্যে যাত্রা করিবার জন্য স্বীয় উটদ্বয়কে অন্য এক মদীনাবাসী ছাহাবীর গৃহের পার্শ্বে বাঁধিয়া আমি দড়ি, বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে ছিলাম। ঐ সবের ব্যবস্থা করিয়া উটদ্বয়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম, উটদ্বয় মৃত; কে বা কাহারা উহাদের পিঠের কুঁজ কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলিজা ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

---

* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক এই সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। (ফৎহুল-বারী)

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আমার চোখের পানি শামলাইতে পারিলাম না, দর দর করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। আমি নিকটস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কার্য্য কে করিয়াছে? সকলেই উত্তর করিল, হামযা (রাঃ) করিয়াছেন, তিনি ঐ নিকটবর্ত্তী ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ঐ ঘরের মধ্যে একদল মদীনাবাসী ছাহাবীর সঙ্গে তিনি মদ্য পান করিতেছিলেন ❁ তিনি জ্ঞানহীন অবস্থায় এক গায়িকার উস্কানিতে উত্তেজিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন।

আলী (রাঃ) বলেন, এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট তাঁহার পোষ্য যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) ছিলেন। আমার বাহ্যিক নিষণ্ণতা দৃষ্টে হযরত (দঃ) আমার আন্তরিক দুঃখের কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে? আমি উত্তরে বলিলাম, আজিকার ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনার সম্মুখীন আমি কখনও হই নাই; এই বলিয়া হামযার কার্য্যের বিবরণ দিলাম এবং বলিলাম, তিনি নিকটবর্ত্তী একটি গৃহেই আছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে একটি চাদর আনাইলেন এবং উহা গায়ে দিয়া হামযার (রাঃ) অবস্থানের দিকে চলিলেন; যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এবং আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। উক্ত গৃহের দ্বারে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি ভিতরে গেলেন এবং হামযা (রাঃ)কে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। হামযা (রাঃ) কিন্তু তখনও জ্ঞানশূন্য, তাই তিনি রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই ত আমার পিতার আমলের চাকর। হযরত (দঃ) অনুভব করিতে পারিলেন, হামযা এখনও জ্ঞানশূন্য; তাই তিনি চলিয়া আসিলেন, আমরাও চলিয়া আসিলাম।

বিজয়ের সংবাদ মদিনায় :

হযরত (দঃ) এবং মোসলেম বাহিনীর জন্য মদীনায় নিশ্চয় উৎকণ্ঠা ছিল; তাই হযরত (দঃ) বিজয় সংবাদ মদীনায় দ্রুত পৌঁছাইবার জন্য স্বীয় পোষা পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে হযরতের নিজস্ব বাহন "আল-কাছোয়া" দিয়া এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে সঙ্গে দিয়া বার্ত্তাবাহী অগ্রদূতরূপে পাঠাইয়া দিলেন। মদীনার সর্বত্র যথাসম্ভব সত্বর সুসংবাদ ছড়াইবার উদ্দেশ্যে দূতদ্বয় মদীনার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া দুইজন দুই প্রান্তের পথ ধরিলেন। আবদুল্লাহ মদীনার উপকণ্ঠ-পথ ধরিলেন; আর যায়েদ সোজা মদীনার প্রাণকেন্দ্রের পথে অগ্রসর হইলেন।

❁ ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের—তখনও মদ্যপান, গান-বাদ্য, বেপর্দা মেলামেশা হারাম হইয়াছিল না, তাই তখন মোসলমানগণও মদ্যপান করিতেন এবং গায়িকার গান শুনিতেন।

হযরতের ব্যক্তিগত যানবাহনের উপর যায়েদ উপবিষ্ট—হযরত নহেন; দূর হইতে ইহুদী ও মোনাফেকরা এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল যে, মোসলমানদের দফারফা—তাহাদের নবী নিহত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার যানবাহন তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য লোককে নিয়া আসিবে কেন? কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের মিথ্যা আনন্দ হাওয়ায় মিশিয়া গেল; যায়েদ (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, হে মদীনাবাসী মোসলমানগণ! সুসংবাদ শ্রবণ কর—কোরায়েশদিগকে আল্লাহু তায়ালা মোসলমানদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছেন।

যায়েদ-পুত্র উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময় আমি আমার আব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছেন। আর তিনি বয়ান দিতেছেন, ওত্‌বা শায়বা, ওলীদ, আবু জহল, উমাইয়া-ইবনে-খলফ তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। এই কথা আমি আমার মনকে বিশ্বাস করাইতে পারিতে ছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বা! ইহা কি বাস্তবিক? তিনি বলিলেন, বৎস! নিশ্চয় ইহা সত্য সংবাদ।

বন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন:

রণাঙ্গনে মোসলমানদের বিজয়ের সংবাদ পূর্বাহ্নেই হযরত (দঃ) যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ছাহাবীদ্বয় মারফৎ মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর মুজাহেদ ছাহাবীগণ বন্দীদেরকে লইয়া মদীনায় পৌছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও একদিন পর মদীনায় পৌছিলেন। তিনি মদীনায় পৌছিয়া বন্দীদের সাময়িক সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য এক একজন ছাহাবীর দায়িত্বে ২।৩ জন করিয়া বন্দী বণ্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর ছাহাবীগণের সঙ্গে বন্দীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পরামর্শ করিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, বন্দীরা আমাদেরই ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সৎপথের পথিক করিয়া আমাদের সহায়তাকারী বানাইয়া দিতে পারেন। এদিকে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ধনের প্রয়োজন; তাই আমি ভাল মনে করি, তাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। ওমর ফারুক (রাঃ) বলিলেন, যাহা আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন আমি কিন্তু উহা উত্তম মনে করি না। আমি উত্তম মনে করি এই যে, তাহাদের সকলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক: এইরূপে যে, আমি আমার আত্মীয় অমুককে নিজ হস্তে হত্যা করিব। আলী (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতা আকীলকে নিজ হস্তে কতল করিবেন। হামযা (রাঃ) স্বীয় ভ্রাতাকে কতল করিবেন। এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়কে নিজ হস্তে কতল করিয়া প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিবে যে, যাহারা আল্লাদ্রোহী আত্মীয় হইলেও তাহাদের প্রতি আমাদের অন্তরে মায়া-মমতা নাই (যোরকানী)। শেষ পর্য্যন্ত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিদ্ধান্ত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতের

অনুকূলে হইল এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক বন্দীর বিনিময় হার চারি হাজার দেরহাম (রৌপ মুদ্রা) নির্দ্ধারিত করা হইল। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশী-কমও করা হইল, এমনকি শিক্ষিত অক্ষমের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন যে, দশজন মোসলমানকে লেখা শিক্ষা দিবে অতঃপর সে মুক্ত হইতে পারিবে।

এইরূপে বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে অর্থ আদায় করতঃ উহা ভোগ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত ছিল যে, এই উম্মতের জন্য ইহা হালাল করা হইবে, কিন্তু তখনও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ আসিয়াছিল না। সেই জন্য অর্থের বিনিময়ে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া এবং সেই অর্থ ভোগ করার রীতি অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُوْنَ لَهٗٓ أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ........

অর্থ—প্রাথমিক পর্য্যায়ে রক্ত প্রবাহিত করতঃ শত্রুর মূল উচ্ছেদ এবং ইসলামের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে বন্দীদেরকে মুক্তিদানের পন্থা অবলম্বন করা নবীর জন্য সমীচীন হয় নাই। তোমরা দুনিয়ার আশু ফলের দিকে এবং ক্ষণস্থায়ী টাকা-পয়সার দিকে দৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি সব সময় স্থায়ী ফলের দিকে এবং পরিণাম ফলের দিকে অর্থাৎ আখেরাতের উন্নতির দিকে। আল্লাহ তায়ালা (স্বীয় কুদরতের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে) সব কিছুই করিয়া ফেলিতে পারেন, (কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তাহা করেন না, কারণ) তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী। (তাই তিনি কার্য্য-কারণযুক্ত জগতে আখেরাতের উন্নতিও কার্য্য-কারণের পথে মোসলমানদের মধ্যেমেই প্রতিষ্ঠা করিতে চান।)

তোমরা যেই নীতি অনুসারে (বন্দীদের নিকট হইতে) ধন হাসিল করিয়াছ এই উম্মতের জন্য উহা হালাল করা হইবে বলিয়া পূর্ব হইতেই আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত না থাকিলে এইরূপে অর্থ গ্রহণ করায় তোমাদের উপর ভীষণ আজাব নামিয়া আসিত। (এখন তোমাদের জন্য ঐ অর্থকে গণিমতের মাল গণ্য করতঃ উহা তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করা হইতেছে।) অতএব তোমরা গণিমতরূপে যাহা লাভ করিয়াছ উহা পবিত্র ও হালালরূপে ব্যবহার করিতে পার, এখন অনুমতি দেওয়া হইতেছে। (১০ পাঃ ৫ রুঃ)

উক্ত আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাঁদিতে লাগিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, আজাব নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আজাব নামিয়া আসিলে ওমর ভিন্ন আর কেহ আজাব হইতে রেহাই পাইত না।

উল্লেখিত আয়াতের মর্ম :—হে মোসলমানগণ। তোমাদের জেহাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার হীন স্বার্থ উদ্ধার করা নয়, বরং একমাত্র আল্লার দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা। আর তোমরা যাহাদিগকে কতল করিবে তাহাদের কতল দুনিয়ার কো-

প্রতিহিংসা গ্রহণের কারণে হইবে না, বরং যেহেতু তাহারা কতলের যোগ্য—মানবদেহের ফোঁড়াকে অপারেশন করিয়া কাটিয়া দেওয়ার মত; সেইজন্য তাহাদিগকে কতল করিবে। অতএব অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার বাহ্যিক আকার হইবে এইরূপ—যেমন, ডাক্তার যদি টাকার বিনিময়ে রুগীর ফোঁড়ার অপারেশন করা ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং যাবৎ পর্য্যন্ত না ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যাবৎ পর্য্যন্ত না ইসলাম-দ্রোহীদের রক্তপাত করিয়া তাহাদিগকে ভয়-বিহ্বল এবং দুর্বল করিয়া না দেওয়া হয় তাবৎ পর্য্যন্ত নবীর পক্ষে এইটা সমীচীন নয়—যে তাহার কয়েদী জীবিত থাকিয়া যায়। কারণ, তাহাতে প্রমাণ হইবে, যেন তোমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার হীন স্বার্থ—টাকা, কিন্তু আল্লার উদ্দেশ্য তাহা নয়, আল্লার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বারা তোমাদের চিরস্থায়ী স্বার্থ উদ্ধার করাণ। তোমরা ইহা চিন্তা করিও না যে, তোমাদের টাকার অভাব আছে; টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিলে অভাব পুরণ হইবে বা তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা কিম্বা তাহাদের সন্তান-সন্ততি হয়ত মোসলমান হইয়া ইসলামের সাহায্য করিতে পারে—এক্ষেত্রে এরূপ চিন্তা তোমরা করিও না। কারণ, আল্লাহ সর্বক্ষম এবং সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু পারেন। কয়েদীগণকে কতল করিয়া ফেলিলে এই মুহূর্তেই ইসলামের জয়ডঙ্কা সারা আরবদেশে বাজিয়া যাইত; কাফেররা চিরতরে দুর্বল ও ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িত।

রসুলুল্লার চাচা বন্দীরূপে:

বন্দীদের মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ)ও ছিলেন। হযরতের অন্তরে স্বীয় চাচার প্রতি মমতা ছিল না এমন নহে; রণক্ষেত্র হইতে বন্দীরূপে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়াকালীন পথিমধ্যে একদা রাত্রিবেলায় তিনি বন্ধনীর ব্যথায় আর্তনাদ করিতেছিলেন। হযরত (দঃ) চাচার আর্তনাদ শুনিয়া বিচলিত হইলেন; আব্বাসের বন্ধন শিথিল করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত হযরতের নিদ্রা আসিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও যখন বন্দীগণের উপর টাকা দেওয়ার হুকুম প্রবর্তিত হইল তখন আব্বাস (রাঃ)ও রেহাই পাইলেন না। তাঁহাকেও অর্থ প্রদাণ করিতে হইল, বরং তিনি ধনাঢ্য হওয়ায় তাঁহার উপর মুক্তি-পণ সাধারণ পরিমাণ চার হাজার দেরহামের অধিক প্রবর্তিত হইল। তদুপরি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় আকীল ও নওফল্ এবং তাঁহার বন্ধু ওতবা ইবনে আম্র এই তিনজনের পক্ষে তাঁহাকেই অর্থ প্রদান করিতে হইল।

এমনকি আব্বাস (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইহা রসুলুল্লাহ। আমি ত অন্তরে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করিতাম, মক্কাবাসীরা আমাকে জবরদস্তিমূলক রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছে, (তাই আমার উপর অর্থ-দণ্ড হইবে না।) আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি বাস্তব

সত্যও ছিল। এই জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) যুদ্ধ চলাকালীন সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, আব্বাস কাহারও সম্মুখে পড়িলে তাহাকে কতল করিবে না; তাঁহাকে জবরদস্তিমূলক রণে উপস্থিত করা হইয়াছে।

এতদসত্ত্বেও মুক্তি-পণ আদায়ের বেলায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বলিয়া তাঁহার ঐ উক্তি তখন খণ্ডন করিলেন যে, আপনার আন্তরিক অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপে জ্ঞাত আছেন, যদি আপনার উক্তি সত্য হয় তবে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। আমরা ইহাই দেখিব ও বলিব যে, আপনি আমাদের শত্রু পক্ষে ছিলেন।

এমনকি আব্বাস (রাঃ)কে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার প্রতি ছাহাবীগণের পক্ষ হইতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও হযরত (দঃ) উহা গ্রাহ্য করিলেন না। যেহেতু এইরূপ না করিলে হযরতের উপর স্বজন তোষণের দোষারোপ আসিতে পারিত যে, তিনি জনগণের অর্থের বেলায় নিজের চাচার খাতির করিয়াছেন।

১৪৩১। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী কতিপয় ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, আমরা আমাদের ভাগিনা আব্বাসকে অর্থ-দণ্ড হইতে রেহাই দিতে ইচ্ছা করি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাঁহার পক্ষের একটি দেরহামও ছাড়িতে পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ— আব্বাসের দাদী—আবদুল মোত্তালেবের মাতা মদীনা বংশীয়া ছিলেন। এই সূত্র আব্বাসকে মদীনাবাসীদের ভাগিনা বলা হইয়াছে। যেন হযরতের প্রতি এহসান প্রদর্শন প্রকাশ না পায়।

রসুলুল্লার জামাতা বন্দীরূপেঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় কন্যার বিবাহ মক্কাবাসী মোশরেকদের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অতঃপর ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন শুধু আকিদা—আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি সম্পর্কীয় কতিপয় মোটামুটি বিষয় ভিন্ন ইসলামের অন্যান্য বিধি-নিষেধ বলবৎ হইয়াছিল না, তখন মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ ছিল না। নবী-কন্যা যয়নব রাজিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ ইসলামের পূর্বে মাতা খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা আবুল আছের সঙ্গে হইয়াছিল, তিনি তাহার বিবাহেই ছিলেন। এমনকি হযরত (দঃ) হিজরত করিয়া মক্কা পরিত্যাগ করার পরও যয়নব (রাঃ) মক্কায়ই ছিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই জামাতা আবুল আছ বদরের রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও মোসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন।

যখন অর্থের বিনিময়ে বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া সাব্যস্ত হইল এবং প্রত্যেক বন্দীর আত্মীয়-স্বজনগণ মদীনায় অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিল তখন নবী-কন্যা যয়নব (রাঃ) স্বীয় স্বামীর মুক্তির সম্পূর্ণ অর্থ জোটাইতে না পারিয়া স্বীয় গলার হারটিও পাঠাইয়া দিলেন। এই হারটি ছিল সেই হার যেই হারটি তাঁহার মাতা উম্মুল-মোমেনীন খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে পরাইয়া স্বামীর বাড়ী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই এই হারটি একটি পুরাতন স্মৃতির নিদর্শন ছিল।

ঐ হারটি দেখিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, যয়নবের বন্দীকে মুক্তি প্রদান করতঃ তাঁহার এই হারটি ও অর্থ একটি শর্তের বিনিময়ে ফেরৎ দেওয়া হউক। ছাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাইলেন এবং আবুল-আছকে ঐ হার ও অর্থ সহ মুক্তি দান করা হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার প্রতি এই শর্ত আরোপ করিলেন যে, আমার কন্যাকে মক্কার সীমান্ত পার করিয়া মদীনায় আসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আবুল-আছ শর্ত স্বীকার করতঃ অঙ্গীকার করিলেন এবং মক্কায় যাইয়া স্বীয় অঙ্গীকার পুরণে সচেষ্ট রহিলেন। নির্দ্ধারিত তারিখ মতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইজন ছাহাবীকে মক্কা-মদীনার সীমান্তে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আবুল-আছও নবী-কন্যা যয়নব (রাঃ)কে স্বীয় ভ্রাতা মারফৎ ঐ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। এইরূপে যয়নব (রাঃ) মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুল-আছের অঙ্গীকার পুরণের তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আবুল-আছ তখনও মক্কায় অবস্থানরত অমোসলেম। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর আবুল-আছ ইসলাম গ্রহণ পুর্বক মদীনায় উপস্থিত হইলেন। তখনও যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিবাহ অন্য কোন স্থানে হইয়াছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুল-আছের সঙ্গে তাঁহার পুর্ব সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন।

বদর জেহাদের বৈশিষ্ট্য:

বদর-জেহাদের দিনকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে—يوم الفرقان "ইয়াওমুল-ফোরকান"—সত্য-অসত্যের মীমাংসা ও সত্যকে পৃথকরূপে উদ্ভাসিত করার এবং সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়-এর দিন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘ তের বৎসরের অধিককাল অত্যাচারে জর্জরিত এবং স্বদেশ হইতে বিতাড়িত মোসলেম জাতির একটি দল নিরস্ত্র ধরণের মুষ্টিমেয় সংখ্যক হইয়াও অত্যাচারী ও বিতাড়ণকারী পরাক্রমশালী শত্রুর সুসজ্জিত বিরাট সেনাবাহিনীকে শুধু পরাজিত নহে, বরং শীর্ষ স্থানীয় সর্দারগণকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়। এই সব কার্য্য এতই অস্বাভাবিকরূপে সমাধা হয় এবং এই উপলক্ষে মোসলমানদের

প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ধারাবাহিকরূপে সাহায্য-সহায়তার এত এত ঘটনা সংঘটিত হয় যে, ইহাকে শুধুমাত্র সাময়িক জয়-পরাজয় বলা যাইতে পারে না, বরং ইহা ইসলামের সত্যতার ও মোসলমানগণ আল্লার সৈনিক হওয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল।

বাস্তবিকই বদর-যুদ্ধের গুরুত্ব ও গৌরব অপরিসীম। ইসলামের ইতিহাসের এখান হইতেই মোড় ফিরিয়াছে। এতদিন সে ছিল নিরীহ; এখন হইতে সে হইল নির্ভীক। এত দিন তাহাকে গণ্য করা হইত দুর্বল; আজ সে প্রমাণ করিয়া দিল—সে দুর্বার দুর্জয়। দীর্ঘ দিন যাবৎ বিধর্মীরা ইসলামকে শৃঙ্খলিত রাখার কত শত চেষ্টাই না করিয়া আসিয়াছে; আজ ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করতঃ বিজয়ীর বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাই বদর-যুদ্ধের ঘটনা শুধু একটি সাধারণ ইতিহাস নহে, বরং "সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়,,-এর প্রকৃষ্ট ঘটনা।

বদর-যুদ্ধের বিজয়ে ইসলাম বাঁচিয়া থাকার অবকাশ পাইয়াছে; ইসলামকে বাধা দানের শক্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সূচনা হইয়াছে, তাই এই দিনটি ইসলামের পক্ষে আত্ম-বিকাশের দিন ছিল। সুতরাং বদরের দিনটি "يوم الفرقان—ইয়াওমুল-ফোরকান" তথা সত্য ও অসত্যকে চিনিবার দিন, সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়ের দিন, সত্যের বিকাশ ও অসত্যের বিলুপ্তির দিন।

বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারিগণের বিশেষ ফজিলত ও মর্তবা :

১৪৩২। **হাদীছ :**—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু মারছাদ, যোবায়ের ও আমাকে কোথাও পাঠাইবেন স্থির করিলেন। আমরা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, (মদীনা হইতে বার মাইল দূরে অবস্থিত) "রওজা-খাখ্" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অমোসলেম একটি পথিক নারী দেখিতে পাইবে। তাহার নিকট একটি লিপি আছে। হাতেব-ইবনে-আবী বালতায়া নামক ছাহাবী মক্কাস্থিত মোশরেকদের প্রতি ঐ লিপিখানা (গোপনে) লিখিয়াছে।

আলী (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই স্থানের কথা বলিয়াছেন, তথায় পৌঁছিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, বাস্তবিকই ঐরূপ একটি নারী সেখান দিয়া যাইতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, লিপিখানা আমাদিগকে অর্পণ কর। সে বলিল, আমার নিকট কোন লিপি নাই। আমরা তাহাকে থামাইলাম—অগ্রসর হইতে দিলাম না এবং তাহার তল্লাশী চালাইলাম, কিন্তু লিপির কোন খোঁজ পাইলাম না। তখন আমরা তাহাকে বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি অবাস্তব হইতে পারে না, (নিশ্চয় তোমার নিকট লিপি আছে, নতুবা তিনি ঐরূপ বলিতেন না।) তোমাকে লিপি বাহির করিতেই হইবে, অন্যথায় (তল্লাশী চালাইয়া) তোমাকে উলঙ্গ

করিয়া ফেলিব। সে যখন দেখিল যে, আমরা নাছোড়বান্দা তখন স্বীয় কমরের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়া (পরিধেয় ঘাগরার আড়াল হইতে) লিপি খানা বাহির করিল।

আমরা লিপিসহ তাহাকে লইয়া রসুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম। লিপি পড়িয়া দেখা গেল—বাস্তবিকই উহা হাতেব ইবনে আবু বালতায়ার পক্ষ হইতে মক্কাস্থিত মোশরেকদের প্রতি লিখিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা আক্রমনের যেসব গোপন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ঐ লিপিতে সেই বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে। হযরত (দঃ) হাতেব ইবনে আবু বালতায়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কাণ্ড? হাতেব (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার প্রতি দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবেন না, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি অপরাধী, কিন্তু আমি যাহা করিয়াছি উহার মূল কারণ এই যে, মক্কা হইতে আগত মোহাজেরগণের প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজন মক্কায় বিদ্যমান রহিয়াছে যাহারা তাহার স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার এমন কোন আত্মীয় মক্কাতে নাই যে আমার পক্ষে ঐ কার্য্য সমাধা করিবে, কারণ আমি মক্কার আসল বাসিন্দা ছিলাম না, বরং আমি অন্য দেশ হইতে মক্কায় আসিয়া বসতি অবলম্বন করিয়া ছিলাম। তাই আমি ভাবিলাম, মক্কাবাসীদের এই গোপন সঙ্কটের সময়ে তাহাদের কোন একটা উপকার মূলক কাজ করিয়া দিতে পারিলে তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহারা নিশ্চয়ই মক্কাস্থিত আমার ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। (এই অছিলায় আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, অথচ আল্লার রসুলের কোন ক্ষতি হইবে না; আল্লাহ ত স্বীয় রসুলকে জয়ী করিবেন ইহা স্থিরকৃত সত্য, এ বিশ্বাস আমার আছে।) আমি ইসলাম পরিত্যাগ করি নাই বা ইসলামের বিরোধিতার ইচ্ছায় ইহা করি নাই। ইসলামের প্রতি আমার মহব্বৎ ও অনুরাগ বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি ইমানে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসে নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে. তাহাকে তোমরা মন্দ বলিও না। ওমর (রাঃ) (বেশামাল হইয়া) বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। সে আল্লাহ, আল্লার রসুল ও মোসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; আমাকে অনুমতি দিন এই মোনাফেক বেটার গর্দান আমি উড়াইয়া দেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا

مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ٥

অর্থ—সে ত বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী (যাহারা আল্লাহ তায়ালার এতই প্রিয় যে,) তাহাদের সম্পর্কে আল্লার তরফ হইতে এইরূপ সীমাহীন, শর্তহীন, কৃপা ও করুণা প্রদর্শন বিচিত্র নহে যে, (বদরের জেহাদ উপলক্ষে তোমরা যে চরম উৎসর্গের পরিচয় দিয়াছ উহার

পর) তোমরা যাহাই কর না কেন আমি তোমাদের জন্য ক্ষমার দ্বার খোলা রাখিলাম (তোমাদের জন্য বেহেশত নির্দিষ্ট রহিয়াছে।)

এতদশ্রবণে ওমর (রাঃ) অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের তথ্য-জ্ঞান সর্বাধিক।

● পাঠকবর্গ। ইহা একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক এবং বাস্তব বিষয় যে, বাদশাহ স্বীয় খাদেম ও ভৃত্যের অতিশয় আনুগত্য ও চরম উৎসর্গ দেখিয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশার্থে বলিতে পারেন যে, তোমার জন্য "সাত খুন মাফ" তোমার কোন অপরাধ নাই ইত্যাদি। কিম্বা কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর বন্ধুত্বে একনিষ্ঠতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া বন্ধুকে বলিয়া থাকে, বন্ধুবর! আপনি আমার হাজার ক্ষতি করিলে বা আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আপনাকে কিছুই বলিব না। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য হয় সেই খাদেমের প্রতি বাদশাহের গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাহার চরম উৎসর্গের বদৌলতে যেই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ সে পাইয়াছে তথা বাদশার সন্তুষ্টিভাজন হওয়া উহা তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া যেন সে এই কার্য্যে উন্নতি লাভে আরও উৎসাহিত হয়।

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে নির্ভীক বানাইয়া দেওয়া যেন সে বিনাদ্বিধায় খুন-খারাবি এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ করিয়া যাইতে পারে বা বন্ধুর ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করিতে ও বন্ধুকে খুন করিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি—আলোচ্য উক্তি সমুহের এইরূপ উদ্দেশ্য বা ব্যাখ্যা কখনও হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যে খাদেম ও বন্ধু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র এইরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিবে যে, সে এই সব উক্তিকে এইরূপ অর্থ ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে ঐরূপ পাগল সম্পর্কে এইরূপ উক্তি কখনও করা হইবে না। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ অর্থ বুঝিতে চায় তবে সেও বোকা ও নির্বোধই গণ্য হইবে।

কোন কোন বিদ্যাবাগীশ বাঙ্গালী পণ্ডিত যাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি শুধু শব্দ ও বাক্যের সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্যের ভিতর যে রহস্য লুক্কায়িত থাকে তাহা তাহারা জানে না—এইরূপ ব্যক্তি আলোচ্য হাদীছের এই অংশটিকে শ্রদ্ধার নজরে দেখে না। এমনকি এইরূপ বিষয় অসম্ভব মনে করিয়া এই অংশটিকে হাদীছের শুদ্ধ অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। এইরূপ অবস্থা বস্তুতঃ অতি আশ্চর্য্যজনক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত বিদ্যাবাগীশগণের হাল-অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা কোন বিস্ময়ের বস্তু নহে। তাহাদের অবস্থা অবিকল ঐ বেকুফ কাবুলির ন্যায় যে ঘটনাক্রমে বাংলা দেশে আসিয়া নারিকেল খাইতে বসিয়াছে, কিন্তু নির্বোধ বোকা কাবুলি নারিকেলের ভিতরের শাশকে ফলের বিচি মনে করিয়া উহা ফেলিয়া দিয়া উহার ছোবড়া চিবাইতে থাকে এবং নারিকেল খাইবার বস্তু নয় বলিয়া মন্তব্য করে।

১৪৩৩। **হাদীছ :**—কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বায়তুল-মাল হইতে ভাতা প্রদানে বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারিগণকে (অন্যান্যদের তুলনায় অধিক—) পাঁচ পাঁচ হাজার দেহরাম (রৌপ্য মুদ্রা) দেওয়া হইত। আমীরুল মোমেনীন ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন যে, আমি অন্যান্যদের উপর তাঁহাদিগকে প্রাধান্য দান করিব।

১৪৩৪। **হাদীছ :**— ইবনে মা'কাল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী সাহ্‌ল ইবনে হোনায়ফ (রাঃ) ইন্তেকাল করিলে আলী (রাঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন। সেই নামাযে আলী (রাঃ) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে পাঁচ বা ছয় তকবীর বলিলেন। আলী (রাঃ) উহার কারণ উল্লেখ বলিলেন, এই ছাহাবী বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন।

ব্যাখ্যা :—বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণের মর্তবা ও ফজিলতের আধিক্য বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে, যেমন ১৪১৬ নং হাদীছে উহা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এমনকি ফেরেশতাদের মধ্যেও যাঁহারা বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন তাঁহারা অধিক মর্তবা ও ফজিলতের অধিকারী ছিলেন। বাহ্যিক ব্যবস্থাদিতেও তাঁহাদের ঐ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়া থাকিত। খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ এই বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখিতেন।

বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারিদের নাম :

পূর্বাপর আওলীয়া-আল্লাহ, বুজুর্গানেদীন, ছলফে-ছালেহীন ও নেককার লোকদের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী ছাহাবীগণের নামের বরকতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশেষরূপে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। তাই বড় বড় আলেমগণ ঐ সমস্ত নাম খুঁজিয়া বাহির করায় তৎপর হইয়াছেন। "আল-বেদায়া ওয়ান্‌-নেহায়া" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের কিতাবে বিশেষ তৎপরতার সহিত সম্পূর্ণ ৩১৩ জনের নাম সংরক্ষণ করিয়াছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত অজিফা "মোনাজাতে মক্‌বুলের" সঙ্গেও ঐসব নামের তালিকা সংযোজিত করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রাঃ) শুধু স্বীয় গ্রন্থের মর্যাদানুপাতিক ছনদ দ্বারা প্রমাণিত নাম একত্রিত করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) ছায়্যেদুল-মোরছালীন খাতেমুন্নাবীয়্যীন হযরত আহমদ মোজতাবা মোহাম্মদ মোস্তফা ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাশেমী আল-কোরায়শী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (২) এয়াস ইবনে বোকায়ের (রাঃ), (৩) বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ), (৪) হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব আল-হাশেমী (রাঃ), (৫) হাতেব ইবনে আবি বাল্‌তায়া (রাঃ), (৬) আবু হোযায়ফা (রাঃ), (৭) হারেছা ইবনুর-রবী আনছারী (রাঃ), (৮) খোবায়েব ইবনে আদী আনছারী (রাঃ), (৯) খোনায়েছ ইবনে হোজাফা (রাঃ), (১০) রেফায়াহ ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (১১) আবু লোবাবা আনছারী (রাঃ), (১২) যোবায়ের ইবনে আওওয়াম

আল-কোরায়শী (রাঃ), (১৩) আবু তালহা আনছারী (রাঃ), (১৪) আবু যায়েদ আনছারী (রাঃ), (১৫) সায়াদ ইবনে মালেক (রাঃ), (১৬) সায়াদ ইবনে খাওলাহ (রাঃ), (১৭) সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), (১৮) সাহল ইবনে হোনায়েফ আনছারী (রাঃ), (১৯) যোহায়ের ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (২০) যোযহের ইবনে রাফে আনছারী (রাঃ), (২১) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (২২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), (২৩) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), (২৪) ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ), (২৫) ওবাদা ইবনে ছামেৎ আনছারী (রাঃ), (২৬) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), (২৭) ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)। তিনি প্রত্যক্ষরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, বরং মদীনাতেই ছিলেন বটে, কিন্তু ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-ক্রমে ছিল—তিনি স্বীয় স্ত্রী নবী-কন্যার সেবা শুশ্রূষার কার্য্যে আবদ্ধ ছিলেন। অতএব তাঁহাকে বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী গণ্য করা হইয়াছে, এমনকি অন্যান্য প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁহাকেও গণিমতের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। (২৮) আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ), (২৯) আমর ইবনে আউফ (রাঃ), (৩০) ওকবা ইবনে আমর আনছারী (রাঃ), (৩১) আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ), (৩২) আছেম ইবনে সাবেত আনছারী (রাঃ), (৩৩) ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা আনছারী (রাঃ), (৩৪) এতবান ইবনু-মালেক আনছারী (রাঃ), (৩৫) কোদামা ইবনে মজউন (রাঃ), (৩৬) কাতাদা ইবনে-আফরা (রাঃ), (৩৭) মোয়াজ ইবনে আমর (রাঃ), (৩৮) মোয়াওয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ), (৩৯) মোয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ), (৪০) মালেক ইবনে রবিয়া আনছারী (রাঃ), (৪১) মোরারাহ ইবনে রবী আনছারী (রাঃ), (৪২) মাআন ইবনে আদী আনছারী (রাঃ), (৪৩) মেসতাহ ইবনে উছাছা (রাঃ), (৪৪) মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), (৪৫) হেলাল ইবনে উমাইয়া আনছারী (রাঃ)।

হে আল্লাহ! তোমার এইসব নেক বান্দাগণের নামের বরকতে আমাদের এই দোয়া কবুল কর—হে আল্লাহ। আমাদের, আমাদের মাতা-পিতার এবং সকল মোসলমান নর-নারীর গোনাহ মাফ করিয়া দাও। রাব্বানা আতেনা ফিদ-দুনিয়া হাছানাতাওঁ ওয়া ফিল-আখেরাতে হাছানাতাওঁ ওয়াকেনা আজাবান-নারে ওয়া আজাবাল-কবরে।

বদর-যুদ্ধের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া ঃ

বদরের যুদ্ধে আবু জহল সহ মক্কার অধিকাংশ সরদার নিহত হইয়া যাওয়ায় ইসলাম ও মোসলমানদের প্রধানতম শত্রু শিবিরে ফাটল ধরিয়া গেল, মক্কাবাসীরা কোমর-ভাঙ্গা হইয়া পড়িল এবং সমগ্র আরবের কোণায় কোণায় মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমনকি মদীনাবাসী আবদুল্লাহ-ইবনে উবাই-ইবনে-সলুল যাহাকে মদীনার সমগ্র এলাকায় প্রধান নেতারূপে নির্বাচিত করা হইতে ছিল অচিরেই তাহার অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা হইতে ছিল। এমতাবস্থায় মদীনাতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের শুভ আগমনে ঐ নির্বাচন শুধু স্থগিতই থাকে নাই, বরং রহিত হইয়া যায়। যেই কারণে আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই-ইবনে-সলুল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন সে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী কাফের থাকিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয়ে লিপ্ত রহিয়াছিল। বদরের যুদ্ধে মোসলমানদের অস্বাভাবিক বিজয়ের দরুন তাহার ন্যায় শত্রুও শিথিল হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে; সে স্বীয় দলবল সহ বাহ্যিক স্বীকারোক্তির দ্বারা মোসলেম দলভুক্ত হইয়া যায়। সে ইসলামের শত্রুতায় এতই বিভোর ছিল যে, সুবিধাবাদী হিসাবে প্রকাশ্যভাবে মোসলমান দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খাঁটি ঈমান তাহার নছিবে হয় নাই। তাহারই পুত্র "আবদুল্লাহ" তিনি খাঁটি মোসলমান হইয়া বিশিষ্ট ছাহাবীরূপে পরিগণিত হন, কিন্তু পিতা আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই চিরকাল মোনাফেক থাকে এবং মোনাফেক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়।
বদরের যুদ্ধের ফলাফলে মক্কার ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসে, মোসলমানদের শক্তি ও মনোবল প্রখর হয়, মক্কাবাসীদের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত লাগে, কিন্তু তাহারা কোমর-ভাঙ্গা সর্পের ন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণে মাতাল হইয়া উঠে।

আবু জহল নিহত হওয়ায় আবু সুফিয়ান মক্কার প্রধান নেতা নির্বাচিত হইল। সে শপথ করিল—যাবৎ মোসলমানদের হইতে বদর-যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিবে তাবৎ গোসল করিবে না, মাথার চুল কাটিবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং যেই বাণিজ্য দল উপলক্ষে বদরের যুদ্ধ হইয়াছিল সেই বাণিজ্যদলের লভ্যাংশ এই কার্য্যের জন্য রক্ষিত রহিল। এমনকি দুই মাস পরেই আবু সুফিয়ান দুইশত সৈন্য সহ মদীনার শহরতলীতে একটি চোরা আক্রমণ পরিচালিত করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এক বৎসর পর মহাসমারোহে আবু সুফিয়ান মোসলেম জাতীর মূলচ্ছেদার্থে মদীনা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধই ইতিহাসে ওহোদ-যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ওহোদ-যুদ্ধের বর্ণনা পরে আসিতেছে।

বদরের জেহাদের ফলাফল যেরূপ মক্কাবাসীদের শক্তি শিবিরে আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের অগ্নিময় উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং কাঁটা ঘায়ে নিমকের ক্রিয়া করে; তদ্রূপ অন্যান্য আরব অধিবাসীদের বিশেষতঃ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতা ও আক্রমণাত্মক ভাবধারার ঝড় সৃষ্টি করিয়া দেয়। আর মদীনার ধনাঢ্য ও সংখ্যাগুরু জাতি ইহুদী জাতিত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে।

ফলে ভীমরুলের বাসায় ঢিল মারিলে যে অবস্থা হয়—বদর বিজয়ের পর মোসলমানদের প্রতি মদীনার ভিতর বাহির হইতে শত্রুতায় তদ্রূপ অবস্থাই সৃষ্টি হইল। বদর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে যে ভাবে ঘন ঘন অভিযানে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় সেই ইতিহাসই উক্ত অবস্থা সৃষ্টির উজ্জল প্রমাণ।

বদর-যুদ্ধের এক বৎসর পরেই দ্বিতীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহদের যুদ্ধ; মধ্যবর্তী এক বৎসরের মধ্যেও ছয়টি অভিযানের প্রয়োজন হয়। চারটি মদিনার বাহিরে বিভিন্ন পৌত্তলিকদের মোকাবিলায়, দুইটি মদীনার ভিতরে ইহুদীদের মোকাবিলায়। ইহার প্রত্যেকটি অভিযানেই স্বয়ং রসুলুল্লাহকে (দঃ) নেতৃত্ব দিতে হয়। বদর হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাত দিনের মধ্যে হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, মদীনার অনতিদূরে বনু-সোলায়েম গোত্রীয়রা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছে। তাহাদের প্রতিরোধে (দঃ) ছাহাবীগণ সহ মদিনার অদূরে "মাউল-কাদের" নামক স্থানে তিনদিন অবস্থান করেন। আশঙ্কা কাটিয়া গেলে হযরত (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বনী-সোলায়েম" নামে প্রসিদ্ধ।

এই অভিযানের ১৫।২০ দিন পরেই মদীনার অভ্যন্তরে মদীনার নাগরিক ইহুদী গোত্র বনী-কাইনুকা বিদ্রোহ এবং উস্কানীমুলক কার্য্য আরম্ভ করিল।

মদীনার সংখ্যাগুরু অধিবাসী ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্র মদীনায় বসবাস করিত—(১) বনু-কাইনুকা, (২) বনু-নজীর (৩) বনু-হারেছা (৪) বনু-কোরয়জা। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব ইহুদীদের সহিত সহ-অবস্থানের মৈত্রীচুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহুদীরা সেই চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

ইহুদীরা জাতিগত ভাবেই বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী। বদর-জেহাদের বিজয়ে মোসলমানদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহুদীদের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মোসলমানদের সহিত মৈত্রীচুক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়া মোসলমানদের ক্ষতিসাধন ও মুল উচ্ছেদে তাহারা সক্রিয় হইয়া উঠিল।

ইহুদীদের মধ্যে বনু-কাইনুকা গোত্র অর্থে সামর্থে সর্বাধিক বলবান ছিল; তাহারাই সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বদর-যুদ্ধের মাত্র এক মাস পরেই তাহারা সহ অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়া উস্কানীমূলক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন; প্রতিউত্তরে তাহারা হযরতের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইলেন। তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। সুপারিশে হযরত (দঃ) তাহাদের প্রাণভিক্ষা দিলেন, কিন্তু সর্পকে ঘরে স্থান দেওয়া যায় না বিধায় তাহাদিগকে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন।

বনু-কাইনুকার বিদ্রোহ ও তাহাদের পতন ঃ

বনু-কাইনুকা গোত্রের উস্কানীমূলক উপদ্রব এবং বিদ্রোহ ঘোষণার উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা—

একদা একটি মোসলেম নারী তাহাদের এক দোকানদারের নিকট কোন কার্য্যে আসিল। কতেক জন গুণ্ডা প্রকৃতির ইহুদী তথায় একত্র হইল এবং বাহুল্য ছুতানাতার

অছিলায় নারীটির চেহারা উন্মুক্ত করিতে বলিল; কিন্তু সে কোন প্রকারেই সম্মত হইল না। নারীটি বসা অবস্থায় ছিল, দুষ্ট ইহুদী দোকানদার বেটা চুপে চুপে পিছন দিক দিয়া আসিয়া নারীটির পরিধেয় ঘাগড়ার নিম্ন কিনারা তাহার পৃষ্ঠের কাপড়ের সঙ্গে কাঁটা দ্বারা জড়াইয়া দিল। মহিলাটি যখন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সে উলঙ্গ হইয়া গেল। এইরূপে একটি মোসলেম নারীকে জঘন্যভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতঃ তামাশা করিয়া তাহারা খুব হাসি-ঠাট্টা উড়াইতে লাগিল। নারীটি নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একজন মোসলমান ব্যক্তি এইসব ঘটনা দৃষ্টে অধির হইয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করায় ঐ দুষ্ট দোকানদারের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল, শেষ পর্যন্ত ঐ দুষ্ট দোকানদার মোসলমান ব্যক্তির হস্তে নিহত হইলে পর উপস্থিত বনু-কাইনুকা গোত্রীয় ইহুদীগণ সেই মোসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর তথায় উভয় দলের লোকই সমবেত হইল এবং ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ঘটনার আসল সূত্রের অপরাধী ইহুদীগণকে সংযত হওয়ার জন্য তিনি নরমে-গরমে নানাপ্রকার উপদেশ দান করিলেন এবং সদ্য সংঘটিত বদরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, মোসলমানগণকে দুর্বল ভাবিয়া এইরূপ উৎপীড়নের ফলাফল ভয়াবহ হইতে পারে—তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় কর, তিনি বদরের ন্যায় ঘটনা আরও ঘটাইতে পারেন।

বনু-কাইনুকা গোত্রীয় ইহুদীরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া উত্তেজিত হইল এবং ভীতি-প্রদর্শন মুলক উত্তরে বলিল, আপনি বদরের যুদ্ধে জয়ের দ্বারা ভুল বুঝের বশীভুত হইবেন না। বদরের যুদ্ধে বিপক্ষ দল কোরায়েশ আপনাদেরই স্বজাতি লোক ছিল, যাহারা মোটেই যোদ্ধা ছিল না; তাই আপনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিলে বুঝিতে পারিবেন যুদ্ধের কি মজা।

বনু-কাইনুকা গোত্র পুর্বেই সহ-অবস্থান ও মৈত্রী চুক্তির অবসান ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, তদুপরি তাহাদের নানাপ্রকার উৎপীড়নমুলক আচার ব্যবহার এবং আলোচ্য ঘটনার দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, তাহারা ত ঘরের শত্রু পকেটের সর্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অচিরেই তাহাদের শক্তি চুর্ণ-বিচুর্ণ না করিলে মদীনায় অবস্থান মোসলমানদের জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাই তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন।

তাহারা কিল্লায় আশ্রয় নিল। মোসলমানগণ তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিলেন; পনর দিন তাহারা অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটাইল। তাহারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া

গিয়াছিল যে, কিল্লার বাহিরে আসিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের সাহসও তাহাদের ছিল না। অতএব তাহারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

বিশিষ্ট ছাহাবী ওবাদা ইবনে ছামেতের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব ছিল, তিনি তাহাদের প্রাণ রক্ষার সুপারিশ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সুপারিশ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বিতাড়িত হইয়া তাহারা সিরিয়াস্থ "আজরোয়াত" শহরে চলিয়া গেল।

এই অভিযানের মাত্র এক মাস পর তথা বদরের মাত্র দুই মাস পরেই মক্কার নবনির্বাচিত সর্দার আবু সুফিয়ান দুইশত লোক সহ মদীনার উপকণ্ঠে চোরা আক্রমণে একজন মোসলমানকে শহীদ করে এবং বাগানের গাছ-পালা বিনষ্ট করে। হযরত (দঃ) দ্রুত তাহাদের পিছু ধাওয়া করেন; তাহারা পালাইয়া যায়। এই অভিযান "গযওয়া সবীক" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার এক মাস পরেই নজ্‌দ এলাকার বনু-গাতাফান গোত্রের আক্রমণমূলক মনোভাবের সংবাদে হযরত (দঃ) নজ্‌দ পর্যন্ত ছুটিয়া যান এবং তথায় পূর্ণ ছফর মাস অবস্থান করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বনী গাতাফান" নামে প্রসিদ্ধ।

ইহার এক মাস পরেই আবার মক্কার কোরায়েশদের আক্রমণ আশঙ্কার খবর আসে এবং অগ্রগামী হইয়া প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) "বোহ্‌রান" এলাকায় পৌঁছেন। দীর্ঘ দিন তথায় অবস্থান করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযান "গযওয়া বোহরান" নামে প্রসিদ্ধ। যেই সব অভিযান বহির্শত্রুর মোকাবিলায় ছিল হযরত (দঃ) প্রতিপক্ষের সেই সব অভিযানে শুধু প্রতিরোধ উদ্দেশ্যের উপর ক্ষান্ত থাকেন। প্রভাব বিস্তার দ্বারা অগ্রসর হওয়া প্রতিহত হইলেই হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; ঐ সব অভিযানে রসুলুল্লাহ (দঃ) আগ্রাসনের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।

উল্লিখিত অভিযানগুলির সময়ের মধ্যেই শেষ দিকে কোন এক মাসে—বদর-বিজয়ের মাত্র ছয় মাস পরে মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ এবং মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ইহুদীদের অন্যতম গোত্র বনু-নজীর; তাহাদের সহিতও রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বদর-বিজয়ে মোসলমানদের প্রতি তাহাদের ভিতরে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং সেই আগুনেই সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তির সম্পাদিত সমুদয় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহারা শুধু মোসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত হয় নাই, মোসলমানদিগকে হত্যা করার, এমনকি স্বয়ং নবীজীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা চালাইতে থাকে। হযরত (দঃ) তাহাদের কুকীর্তি দমন করিতে উদ্যত হইলে তাহারা বিদ্রোহ ও চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দিয়া বসে। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান পরিচালিত করেন। তাহারা আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রাণ-ভিক্ষা দানে ক্ষমা করেন, কিন্তু তাহাদের ন্যায় হিংসুক বিশ্বাসঘাতককে

নবজাত মোসলেম রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনার অভ্যন্তরে রাখা সমীচীন নয় বলিয়া তাহাদিগকে মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন।

বনু-নজীর ইহুদীদের বিদ্রোহ এবং তাহাদের পতন ঃ

বনু-নজীর অন্যান্য ইহুদীদের ন্যায় সর্বদাই বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সম্পর্কে তাহাদের দুইটি বিশেষ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ঘটনা বর্ণিত আছে।

(১) এক মোসলমান ব্যক্তি দুই জন অমোসলেমকে পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অমোসলেম হইলেও তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হইতে জান-মাল রক্ষিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত ছিল, ঐ মোসলমান ব্যক্তি এই বিষয় অবগত ছিলেন না। শরীয়তের বিধানানুসারে ঐ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত অর্থাৎ শরীয়ত নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়।

ইহুদী বনু-নজীরগণের সঙ্গে মোসলমানদের সন্ধিচুক্তি অনুসারে সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের অংশীদার বনু-নজীরগণও ছিল। এইজন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করার জন্য আবু বকর, ওমর, আলী ইত্যাদি কতিপয় ছাহাবী সমভিব্যাহারে তাহাদের বস্তিতে গমন করিয়াছিলেন। ইহুদীগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান জানাইল এবং খাতির-তাওয়াজু ও বন্ধুত্বের পরিচয় দিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্যরূপ দুরভিসন্ধি করিল যে, তাঁহাদিগকে সাদরে একটি কুঠির দেয়ালের সংলগ্নে বসিবার স্থান করিয়া দিল এবং এইরূপ পরামর্শ করিল যে, কোন এক ব্যক্তি উপরে উঠিয়া গোপনে দেয়ালের উপর হইতে একটা বড় পাথর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে। তাহারা এইরূপে তাঁহার প্রাণ নাশ করার ষড়যন্ত্র করিল, এমনকি আমর ইবনে জাহ্হাশ নামক এক ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে দেয়ালের উপর চড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ওহী মারফৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত করাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হইতে উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গী ছাহাবীগণও চলিয়া আসিলেন।

(২) একদা বনু-নজীর গোত্রীয় ইহুদীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আপনি আমাদিগকে সর্বদাই ইসলামের আহ্বান জানাইয়া থাকেন। আমরা সমস্ত বিতর্ক অবসানের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছি যে, আপনি স্বীয় সঙ্গিগণ সহ—তিনজন আমাদের বস্তিতে আসুন, আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বিশেষ বিশেষ তিন জন আলেম উপস্থিত করিব। যদি আপনারা আমাদের আলেমগণকে আপনাদের দাবী মানাইতে পারেন তবে আমরা সকলে মোসলমান হইয়া যাইব। প্রকাশ্যে এইরূপে

রসুলুল্লাহ (দ:)কে আমন্ত্রণ জানাইয়া তাহাদের আলেম নামীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে গুপ্তভাবে ছোরা দিয়া দিল; এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল। তাহাদেরই এক ব্যক্তির মারফৎ রসুলুল্লাহ (দ:) সমস্ত ষড়যন্ত্র জ্ঞাত হইয়া গেলেন। (ফতহুল-বারী)

এইরূপ ঘটনায় যখন তাহারা হাতে নাতে ধরা পড়িয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হইয়া গেল তখন রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাদিগকে দেশ ত্যাগের আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে নির্দেশ পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল যে, দশ দিনের মধ্যে তোমাদের এই দেশ ত্যাগ করিতে হইবে। দশ দিন পর তোমাদের যে কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে হত্যা করা হইবে। বনু-নজীরগণ এই নির্দেশে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি আরম্ভ করিবে এমতাবস্থায় মোনাফেকদের গুরু—আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল খবর পাঠাইয়া তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিল যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করিও না, আমি দুই সহস্র লোক লইয়া প্রস্তুত আছি এবং তোমাদের সাহায্যে তৈয়ার আছি এবং অন্যান্য ইহুদী গোত্রগণও তোমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে। এতদ্ভিন্ন মক্কার কোরায়েশ কাফেররা ত বদর-যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে এই বনু নজীরগণকে আশা-ভরসা দিয়া উস্কাইতে ছিলই। সে মতে বনু-নজীরগণ তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিল এবং রসুলুল্লাহ (দ:)কে উত্তর পাঠাইল, আমরা দেশ ত্যাগ করিব না, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

এই উত্তর পাইয়া রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাদিগকে শায়েস্তা করার মনস্থ করিলেন এবং বনু-নজীরের বস্তির প্রতি অভিযান চালাইলেন। বনু-নজীরগণের আশ্রয়স্থল সুদৃঢ় কিল্লা ছিল, তাহারা কিল্লায় প্রবেশ করিয়া গেট বন্ধ করিয়া থাকিল।

তাহাদের সাহায্য-সহায়তার আশা-ভরসা সবই অবাস্তব প্রমাণিত হইল, মোনাফেক দল বা ইহুদীদের অন্য কোন গোত্র অথবা মক্কার কোরায়েশরা কেহই তাহাদের প্রতি তাকাইয়াও দেখিল না। রসুলুল্লাহ (দ:) ছহাবীগণ সহ দীর্ঘ পনর দিন তাহাদের কিল্লা ঘেরাও করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্য তাহাদের বাগ-বাগিচায় অগ্নি সংযোগ করিলেন এবং বাগ-বাগিচার বৃক্ষাদি কাটিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে শত্রু দলের ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ত্রাসের সঞ্চার করা যুদ্ধের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। রসুলুল্লাহ (দ:) সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিলেন। এমনকি শেষ পর্য্যন্ত বনু-নজীররা সুদৃঢ় কিল্লার ভিতর আবদ্ধ থাকাকেও নিরাপদ মনে করিল না; আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশ—দেশ ত্যাগ করাকে নতশিরে বরণ করিয়া লইতে সম্মত হইল। এইবার রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাদের প্রতি শর্ত আরোপ করিলেন যে, তোমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হইবে, তোমরা নিজ সঙ্গে যাহা কিছু ধন-সম্পদ লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে ততটুকুই তোমাদের হইবে, বাকি অস্থাবর এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত গণ্য হইবে।

(তাহারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে, এইসব শর্তেই তাহারা দেশ ত্যাগে প্রস্তুত হইল। তাহাদের সুরক্ষিত ইমারত ও সুসজ্জিত মহল সমূহের কড়ি-বরগা, দরওয়াজা-জানালা ইত্যাদি পর্য্যন্ত খুলিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ হস্তে ঐ সবকে ভাঙ্গা-চুরা আরম্ভ করিল। এমন কি এই ব্যাপারে বিরোধী পার্টি মোসলমানগণের সাহায্যের প্রত্যাশী হইল। এইরূপে তাহারা মদীনা ত্যাগ করতঃ ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত ইহুদী বস্তি খয়বরে চলিয়া গেল। এই ঘটনাকে মোসলমানদের প্রতি একটি বিশেষ কৃপা ও দানরূপে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন—

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ ...

অর্থ—(মোসলমানদের প্রতি আল্লার কি অসীম কৃপা যে,) তিনি কিতাবধারী কাফেরদের একটি (বৃহৎ শক্তিশালী) দলকে তাহাদের দেশ মদিনা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, প্রথমবার সমষ্টিগতভাবে—(এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে বিতাড়িত করিয়াছেন যে, হে মোসলমানগণ!) তোমরাও ভাবিতে পারিতেছিলে না যে, তাহারা দেশ-ত্যাগ বরণ করিবে এবং স্বয়ং তাহারাও এইরূপ দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছিল যে, তাহাদের সুদৃঢ় কিল্লাসমূহ তাহাদিগকে আল্লাহ (তথা তাঁহার আদিষ্ট মোসলমানদের আক্রমণ) হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যাহা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই—আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন, তাহারা নিজ হস্তে এবং মোসলমানদের সাহায্যে তাহাদের অট্টালিকাসমূহ ভাঙ্গিতে লাগিল। বুদ্ধিমান মাত্রেরই এইরূপ ঘটনার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা চাই। (২৮ পাঃ ৪ রুঃ)

১৪৩৫। **হাদীছ** :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী বনু-নজীর, বনু কোরায়জা ইত্যাদি ইহুদ গোত্র-সমূহের সহিত মৈত্রি ও সহ-অবস্থানের চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু) বনু-নজীর, বনু কোরায়জা প্রত্যেকেই চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু নজীরগণকে দেশ ত্যাগের আদেশ দেন; আর বনু-কোরায়জাকে তাহাদের আবাস ভুমিতেই অবস্থিত রাখেন এবং তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। অতঃপর এই বনু-কোরায়জাও এক অস্বাভাবিক ও অতিশয় জঘন্যরূপে বিশ্বাস ভঙ্গে লিপ্ত হয় এবং বিদ্রোহ করে। ফলে (যখন তাহারা পরাজিত হয় তখন তাহাদেরই প্রস্তাবিত সালিসের রায় অনুসারে) তাহাদের বয়স্ক (যোদ্ধা) ব্যক্তিগণকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয় এবং নারী, শিশু ও ধন-সম্পদকে মোসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হয় এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে।

(এইরূপে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ ও বিদ্রোহের অভিযোগে) মদীনাবাসী আরও কতিপয় ইহুদী গোত্রকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়। প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর বংশ—বনু কায়নুকা, এবং বনু-হারেছা ইত্যাদি বিদ্রোহী ইহুদীগণকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ— বনু-নজীরের ঘটনা বর্ণিত হইল বনু-কোরায়জার ঘটনা পঞ্চম হিজরী সনে ঘটিয়াছিল, উহা যথাস্থানে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। বনু-কাইনুকার ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৩৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জায়গা-জমি কিছুই ছিল না। ছাহাবীগণ এক একজন এক-দুইটি খেজুর গাছ তাঁহাকে প্রদান করিতেন, উহা দ্বারা তাঁহার পারিবারিক খরচ নির্বাহ হইত। বনু-নজীর ও বনু-কোরায়জা গোত্রদ্বয়ের পতনের পর তাহাদের জায়গা-জমি বাগ-বাগিচা সব মোসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়। হযরতের জন্যও একটি অংশ থাকে। তখন তিনি অন্যান্যদের খেজুর গাছসমুহ ফেরৎ দিয়া দেন।

কায়া'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

ইহুদীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। তাহারা প্রকাশ্যে ধরা পড়িত না; কিন্তু ইহুদীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামুলক কার্য্যকলাপের মুল উৎস তাহারাই ছিল। তাহাদেরই আথিক সমর্থনে এবং তাহাদেরই প্ররোচনায় সব ষড়যন্ত্রের পত্তন হইত এবং সব ঘটনা অনুষ্ঠিত হইত। অধিকন্তু তাহারা সমগ্র আরবদেশে মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইয়া বেড়াইত। তন্মধ্যে মদীনা এলাকায় বসবাসকারী কয়াব ইবনে আশরাফ এবং খায়বর এলাকার বাসিন্দা আবু রাফে অন্যতম ছিল। বদর-জেহাদের ফলাফলে ইহাদের শত্রুতা ও বিষ ছড়ান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এইসবের মুল উৎপাটনেও আগ্রহান্বিত হইলেন। ছাহাবীগণ তাঁহার মনোভব উপলব্ধি করিয়া ঐ ব্যক্তিদের এক এককে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন।

বদর-জেহাদের পর ছয় মাসের মধ্যে ইহুদীদের অন্যতম দুইটি গোত্র—বনু-কাইনুকা ও বনু-নজীর মদীনা হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। তৃতীয় অন্যতম গোত্র বনু-কোরায়জা তাহারা পুনঃ মোসলমানদের সহিত সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি করিয়া নিজেদের বস্তী মদীনা এলাকায়ই থাকিয়া গিয়াছিল। এই বনু-কোরায়জা গোত্রেরই এক ধনাঢ্য ও সুপণ্ডিত কবি ব্যক্তি ছিল কায়া'ব ইবনে আশরাফ। মোসলমানদের সহিত একাধিকবার তাহার গোত্রের সহ-অবস্থান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন সত্বেও সে মৈত্রীচুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্যাবলী সর্বদা করিতেছিল। তাহার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক চুক্তিভঙ্গকারী অপরাধীকে নিপাত করা ন্যায়সঙ্গত, বরং অপরিহার্য্য কর্তব্যই বটে। তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা মোসলমানদের পক্ষে মোটেই অসাধ্য ছিল না। মোসলেম শক্তি ত তখন মদীনায় স্বীয় প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত

করিয়া নিয়াছিল; অধিক সংখ্যক ইহুদী—বনু-কাইনুকা ও বনু-নজীরকে মদীনা হইতে মোসলমানগণ বহিস্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু কায়া'ব ইবনে আশরাফের ন্যায় এবং তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু রাফের ন্যায় অভিজাত ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ্যে হত্যা করিতে গেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সংঘর্ষ বাধিত এবং তথায় অতিরিক্ত রক্তপাত হইত। দুইটি মাত্র মানুষকে নিপাত করার ন্যায় মামুলী উদ্দেশ্য সাধনে রক্তস্রোত প্রবাহের পথ অবলম্বন করা মোটেই বিজ্ঞোচিত হইবে না, তাই উভয় ক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করা হয় যাহাতে বিনা রক্তপাতে দস্যুর ধ্বংস সাধিত হয়।

বদর-জেহাদের এক বৎসরকাল পর কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কায়াব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার অসংখ্য কারণ সমুহের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি কারণ এই ছিল:—(১) কায়াব ইবনে আশরাফ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল, সে স্বজাতীয় সকল পণ্ডিতগণকে বেতনভোগী করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারা সর্বসাধারণ ইহুদীদের মধ্যে মোসলমানদের কুৎসা ও ইসলামদ্রোহীতার বিষ ছড়াইয়া বেড়াইত। (২) বর্তমান যোগেও দেখা যায় যে, তেজস্বী বক্তৃতায় দেশময় আন্দোলন গড়িয়া উঠে; এইজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ নেতাকে অতিশয় আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের প্রথম নম্বরে গণ্য করা হইয়া থাকে। আরববাসীগণ কাব্যের অনুগত ও অভ্যস্ত ছিল, কবিতা তাহাদের মধ্যে তেজস্বী বক্তৃতা হইতেও বহুগুণ অধিক এই ক্রিয়া করিয়া থাকিত। কায়াব ইবনে আশরাফ আরবের বিখ্যাত কবি ছিল এবং তিলকে তাল বানাইতে বেশ পটু ছিল। সে তাহার খ্যাতি-সম্পন্ন কাব্য রচনা ও কাব্য আবৃত্তির শক্তি মোসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে ক্ষেপাইয়া তোলার মধ্যে ব্যয় করিয়া থাকিত। (৩) বদরের যুদ্ধে মক্কার সর্দারগণ নিহত হইযাছে, মক্কার ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। কায়াব ইবনে আশরাফ এই সুযোগকে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত মক্কায় পৌঁছিল এবং নিহতদের নামে শোকগাথা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল যাহার মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানীমুলক বাক্যসমুহ এবং মোসলমানদের প্রতি আরবগণকে লেলাইয়া দেওয়ার বিষয়বস্তু পরিপুর্ণ ছিল। বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি ও অনুষ্টানাদি করিয়া সে ঐসব শোকগাথা হৃদয়গ্রাহী সুরে গাহিয়া গাহিয়া লোকদিগকে মাতাইয়া তুলিত। (৪) বিখ্যাত কবি হিসাবে সাধারণ্যে তাহার কাব্যের বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিক্রিয়া ছিল, সে রসুলুল্লাহ (দ:)কে লোকদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে, তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে সর্বদা তাঁহার নিন্দায় কবিতা গাহিয়া এবং কাব্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইত। এমনকি মোসলমানদের শ্রদ্ধেয় মাতৃজাতির উপর মিথ্যা অপবাদ পর্য্যন্ত প্রচার করিত। এইরূপ শত্রু ও অপরাধীর প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে?

১৪৩৭। হাদীছ—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কায়াব ইবনে আশরাফ হইতে ইছলাম ও মুসলিম জাতিকে মুক্তি দিতে

কেহ প্রস্তুত হইতে পারে কি? সে ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রুতায় এবং আল্লার রসুলকে যাতনা প্রদানে চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে। মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) নামক মদীনাবাসী ছাহাবী প্রস্তুত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি সত্যই চান যে, এই দুরাচার পাপিষ্ঠকে আমি শেষ করিয়া ফেলি? হযরত (দঃ) বলিলেন— হাঁ। তখন ঐ ছাহাবী আরজ করিলেন, আপনার সম্বন্ধে কিছু কৃত্রিম অভিযোগ প্রকাশের অনুমতি আমাকে দান করুন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর ঐ ছাহাবী কায়াব ইবনে আরশাফের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে বন্ধু! ঐ লোকটা (রসুলুল্লাহ (দঃ)) সর্বদা আমাদেরে দান-খয়রাতের জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকে, আমাদিগকে মস্ত বড় চাপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, বাধ্য হইয়া আমি আপনার নিকট ধার নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।

কায়াব ইবনে আশরাফ বলিল, তোমাদিগকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এমনকি তোমরা বিতৃষ্ণ হইতে বাধ্য হইবে। ঐ ছাহাবী উত্তর করিলেন, একবার যেহেতু তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছি, এখন শেষ ফল না দেখিয়া উহাকে হঠাৎ ত্যাগ করাও ভাল মনে করি না। সাময়িকভাবে আপনি আমাকে কিছু ধার প্রদান করুন। (এই কথাগুলিই কৃত্রিম, যে কৃত্রিম কথার অনুমতি হযরত হইতে এই ছাহাবী নিয়াছিলেন।)

কায়াব ইবনে আশরাফ ঐ ছাহাবীর কথাবার্তায় তাঁহার মত্ পরিবর্তনের আশাবাদী হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ধার দিতে স্বীকৃত হইল। অবশ্য সে বলিল, ধার আমি দিব, কিন্তু কোন বস্তু বন্ধক রাখিতে হইবে। ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বস্তু রাখিব? সে বলিল, স্ত্রীকে রাখুন। ছাহাবী বলিলেন, আপনার ন্যায় সুন্দর পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক রাখা যায় কি? সে বলিল, তবে পুত্রগণকে রাখুন। ছাহাবী বলিলেন, তাহা করিলে আজীবন আমার বংশধরকে নিন্দা করা হইবে। তাই এই সবের পরিবর্তে আমি আপনার নিকট আমার অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখিব। শেষ পর্যন্ত ইহাই সাব্যস্ত হইল। (অন্ধকার যুগে স্ত্রী-পুত্র রেহের রাখান প্রথা ছিল; সেমতেই সে ঐরূপ বলিয়াছিল।)

অতঃপর ঐ ছাহাবী—মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) দ্বিতীয় একজন ছাহাবী আবু নায়েলা (রাঃ) যিনি কায়াব ইবনে আশরাফের দুধ ভাইও ছিলেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ রাত্রিবেলা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিলেন। কায়াব ইবনে আশরাফ একটি সুদৃঢ় কিল্লার ভিতর থাকিত। ঐ ছাহাবীদ্বয়কে কিল্লার ভিতর ডাকিয়া আনিল এবং সে উপর তলা হইতে নামিয়া আসার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিল, এই রাত্রিবেলা আপনি কোথায় যাইতেছেন? আগন্তুকের ডাকের মধ্যে আমি যেন রক্তের ফোটা অনুভব করিতেছি। সে বলিল, না, না—কোন ভয়ের কারণ নাই; আগন্তুক আমারই বন্ধু মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা এবং আমার দুধ-ভাই আবু নায়েলা। কাহারও ডাকে সাড়া না দেওয়া ভদ্রলোকের কার্য্য নহে, যদিও বিপদের আশঙ্কা থাকে।

মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) নিজ সঙ্গে আরও দুই ব্যক্তি সহ তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে তিনি পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কায়াব ইবনে আশরাফ আমার নিকট আসিলে কোন অজুহাতে আমি তাহার মাথার লম্বা চুল শক্তভাবে ধরিবার চেষ্টা করিব; আমি ভালরূপে তাহাকে কাবু করিয়াছি দেখিলে তোমরা তাহার গর্দান কাটিয়া ফেলিও।

কায়াব ইবনে আশরাফ নীচের তলায় নামিয়া আসিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে বলিলেন, আপনি যেরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছেন এইরূপ সুগন্ধি আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। সে বলিল, আমার রূপশী স্ত্রী সুগন্ধির অনুরাগিনী অধিক। ছাহাবী বলিলেন, আপনার মাথা হইতে একটু সুঘ্রাণ লাভ করিতে পারি কি ? সে বলিল—হাঁ। এই সুযোগে ঐ ছাহাবী তাহার মাথার চুল শক্তভাবে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইলেন এবং সঙ্গিদ্বয়কে এশারায় বলিলেন, তোমাদের কার্য্য তোমরা করিয়া ফেল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার গর্দান কাটিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহারা সোজা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চলিয়া আসিলেন।

আবু-রাফে ইহুদীর হত্যা

আবু-রাফে ইহুদীদের মধ্যে অতি বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল; আরবের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল; "তাজেরুল হেজাজ" হেজাজের প্রধানতম ব্যবসায়ী নামে আখ্যায়িত ছিল। ব্যবসার অছিলায় সমগ্র আরবে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইসলাম ও মোসলমানদের ধ্বংস চেষ্টায় সে কায়াব ইবনে আশরাফ হইতে কম ছিল না। আবু-রাফে কায়াব ইবনে আশরাফেরই নানা ছিল। কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যার পর আবু-রাফের হত্যার প্রতি মোসলমানগণ সচেষ্ট হইলেন। তাহার হত্যার সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে; একদল ঐতিহাসিকের মতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরী সনে তাহাকে হত্যা করা হয়। অন্য এক দলের মতে তৃতীয় সনে কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যার পরই এই হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বোখারীর দৃষ্টিতে এই মতের প্রাধান্য দেখা যায়। মদীনা হইতে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত খায়বর এলাকার শেষ সীমায়—হেজাজের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত তাহার বাড়ীতেই তাহাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণ এই—

১৪৩৮। **হাদীছঃ**—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতিপয় মদীনাবাসী ছাহাবীকে আবু-রাফে ইহুদীর হত্যার জন্য বিশেষ-ভাবে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক্ (রাঃ)কে আমীর করিয়া দিলেন। আবু রাফে সর্বদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরোধিতায় ও তাঁহার ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট থাকিত এবং তাঁহার প্রতি আক্রমণ পরিচালনার জন্য

লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। সে মদীনা হইতে বহু দুরে হেজাজ (সংলগ্ন) এলাকায় অবস্থিত এক সুরক্ষিত কিল্লার মধ্যে বসাবাস করিত। তাহার হত্যার জন্য প্রেরিত ছাহাবীগণ তাহার গৃহের নিকটবর্তী পৌঁছিলে পর যখন সূর্য্যাস্ত হইল এবং গরু-ঘোড়া ইত্যাদি পশুপালসমূহ গৃহে প্রবেশ করান হইতেছিল তখন ঐ ছাহাবী দলের আমীর আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা কিল্লার বাহিরেই অবস্থান কর, আমি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করিব। এই বলিয়া তিনি কিল্লার গেটের নিকটবর্তী হইলেন এবং নাক-মুখ কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া এইরূপে বসিয়া রহিলেন যেন তিনি মল-মূত্র ত্যাগে রত হইয়াছেন। তখন কিল্লার ভিতরে প্রবেশকারী সকলেই ভিতরে চলিয়া গিয়াছে এবং দারোয়ান গেট বন্ধ করার জন্য আসিয়াছে। দারোয়ান ঐ ছাহাবীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া মনে ভাবিল যে, এই ব্যক্তি এই বাড়ীরই কোন লোক, মল ত্যাগের জন্য বসিয়া আছে। এই ভাবিয়া দারোয়ান তাহাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লার বন্দা! ভিতরে আসিতে হইলে চলিয়া আসুন, এখনই গেট বন্ধ করিয়া দিব।

(ঐ ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন—) আমি তৎক্ষণাৎ কিল্লার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম এবং লুকাইয়া রহিলাম। অতঃপর সমস্ত লোক ভিতরে প্রবেশ করার পর দারোয়ান গেট বন্ধ করিয়া দিল, গেট বন্ধ করিয়া দারোয়ান গেটের চাবি একটি পেরেকের সহিত লটকাইয়া রাখিল। আবু রাফে উপর তলায় বাস করিত এবং সে গল্প-গুজারী করায় অভ্যস্ত ছিল। তাহার মোছাহেবগণ যখন চলিয়া গেল (এবং বাতি নিবাইয়া) সকলেই শুইয়া পড়িল তখন আমি আবু-রাফের অবস্থান কক্ষের প্রতি উঠিতে উদ্যত হইলাম। প্রথমেই আমি গেটের চাবি লইয়া আসিলাম এবং গেট খুলিয়া রাখিলাম, অতঃপর আমি এক একটি কক্ষের দরওয়াজা খুলিয়া অন্দর মহলের ভিতরে প্রবেশ করা আরম্ভ করিলাম। আমি প্রত্যেকটি দরওয়াজাই ভিতর দিকে বন্ধ করিয়া যাইতে লাগিলাম; এই উদ্দেশ্যে যে, আন্দর মহলের উপর তলায় যাইয়া যখন আবু-রাফের উপর আক্রমণ চালাইব তখন তাহার চীৎকার শুনিয়া যেন বাহির বাড়ী হইতে লোকজন তাহার সাহায্যার্থে আসিতে না পারে এবং সুষ্ঠুরূপে তাহার হত্যাকার্য্য সমাধা করা যায়।

এইরূপে আমি তাহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলাম। কক্ষটি অন্ধকারময় এবং আবু রাফে স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যস্থলে শুইয়া ছিল। আমি আবু-রাফেকে নির্দিষ্ট করিতে পারিতে-ছিলাম না; তাই আমি আকস্মিকভাবে আবু-রাফে নাম ধরিয়া ডাক দিলাম। সে বলিয়া উঠিল, কে আমাকে ডাকিল? আমি তাহার শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তরবারি দ্বারা আঘাত করিলাম। আমি সন্ত্রস্ত ছিলাম, তাই আঘাত তাহার উপর পূর্ণ কার্য্যকরী হইল না; সে চীৎকার করিল (, কিন্তু নিদ্রায় ভারাক্রান্ত)। আমি কিছুক্ষণের জন্য ঐ কক্ষ হইতে চলিয়া আসিলাম এবং অনতিবিলম্বেই পুনরায় কক্ষের ভিতর যাইয়া আমি স্বীয় কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন

করতঃ তাহার আপন লোকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু-রাফে। আপনি চীৎকার করিলেন কেন? সে বলিল, তোমাদের সর্বনাশ হউক—এই মাত্র কেহ আমাকে তরবারির আঘাত করিয়াছে। এইবার আমি তাহার শব্দের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া এমন ভীষণ আঘাত করিলাম যে, তাহার শব্দ করার শক্তি রহিল না। কিন্তু তাহার পূর্ণ মৃত্যুও ঘটিল না, তাই আমার তরবারির ধারাল দিকটি তাহার পেটের উপর রাখিয়া অতি জোরে চাপ দিলাম, এমনকি অনুভব করিলাম যে, আমার তরবারি তাহার মেরুদণ্ডের হাড়কে স্পর্শ করিয়াছে। তখন আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলাম, আমি তাহার হত্যাকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি।

অতঃপর আমি কক্ষসমূহের দরওয়াজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলাম। আমি একটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া নামিতে ছিলাম, পূর্ণিমার রাত্র ছিল; চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি ভাবিলাম, সম্পূর্ণ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মাটির নিকটবর্তী আসিয়াছি এবং সেই অনুপাতেই আমি পা রাখিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ ছিল না, মাটি এখনও আমার ধারণা হইতে অধিক নিম্নে ছিল, তাই আমি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম, এমনকি আমার পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াহুড়ার মধ্যে স্বীয় পাগড়ি দ্বারা ভাঙ্গা পা-টি বাঁধিয়া লইলাম এবং কিল্লার গেটের নিকট আসিয়া বসিয়া রহিলাম। ইচ্ছা করিলাম যে, আবু রাফের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহনীন না হইয়া কিল্লার বাহিরে যাইব না। রাত্রি প্রভাতে যখন মোরগের ডাক আরম্ভ হইল তখন আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইল। অতঃপর আমি কিল্লার বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং অপেক্ষমান সঙ্গিগণকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আবু রাফেকে ধ্বংস করিয়াছেন, এখন দ্রুত এই এলাকা পরিত্যাগ কর। আমরা দ্রুত তথা হইতে চলিয়া আসিলাম এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার পা-টি লম্বা করিয়া দাও, আমি তাহাই করিলাম। তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি এরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম যে, কখনও আমার এই পা ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ধারণাও করা যাইত না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যাকার্য্য, বিশেষতঃ কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা যেই কৌশলে সমাধা করা হইয়াছে, উহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সমর্থনীয় হওয়ার প্রধানতম করাণ এই ছিল যে, তিনি সর্বদা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়াইয়া চলার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই গোপন ব্যবস্থায় তাহাদের হত্যাকার্য্য সমাধা করা হয়; যেন সংঘর্ষ বাঁধিয়া অধিক রক্তপাত না ঘটে।

ওহোদের জেহাদ

ওহোদ একটি পর্বতের নাম, বর্তমানে উহা পবিত্র মদীনার শহরতলীতে পরিণত হইয়াছে। উহা শহরের কেন্দ্রস্থল হইতে ২×২॥ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ঐ পর্বতের

সম্মুখে বিরাট ময়দান রহিয়াছে, সে স্থানেই এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "ওহোদের জেহাদ" বলা হয়। এই জেহাদটি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত জেহাদ সমূহের বড় কয়েকটি জেহাদের অন্যতম। এই জেহাদে মোসলমান যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পরীক্ষিত হইয়াছিল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে অন্য কোন জেহাদেই এইরূপ হয় নাই, তাই ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেহাদ। কোরআন শরীফের বহু আয়াত এই জেহাদ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী (রঃ) কতিপয় আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনায় ঐ আয়াত সমূহ এবং উহার তরজমা উল্লেখ করা হইবে।

মুল ঘটনার প্রাথমিক বয়ান ঃ—

বদর-যুদ্ধে মক্কাবাসী কোরেশরা যে আঘাত পায়, তাহাদের পক্ষে উহা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহারা উহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণের সেই অগ্নিময় মনোবৃত্তিই ওহোদের যুদ্ধের মুল কারণ। বদর-যুদ্ধের পুর্ণ বারমাস পর— তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসের সাত তারিখ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পনর তারিখ শনিবার দিন এই জেহাদ হইয়াছিল মোসলমান পক্ষের সৈন্য ছিল মাত্র সাত শত ; সকলেই—পদাতিক, ঘোড়া কাহারও নিকট ছিল না।

কাফেররা পুর্ণ সাজসজ্জার সহিত মোসলেম জাতিকে ভু-পৃষ্ঠ হইতে নির্মুল করিয়া দেওয়ার দৃঢ় মনোভাব লইয়া মক্কা হইতে মদীনার প্রতি যাত্রা করিল। এমনকি তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ত্রীদেরে সঙ্গে নিয়া আসিল। আরব দেশের দস্তুর ছিল, চরম ক্ষিপ্রতার সহিত সংগ্রামে যাত্রা করিলে নারীগণকে সঙ্গে নেওয়া হইত। নারীগণ সঙ্গে থাকিলে রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বাধার সৃষ্টি হইবে কারণ পলায়নের ইচ্ছা হইলেই মনে এই কথা জাগিয়া উঠিবে যে, আমরা পলায়ন করিলে আমাদের নারীগণ শত্রুহস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। এতদ্ভিন্ন আরবের নারীরা সিংহী প্রকৃতির তেজস্বিনী হইত. রণাঙ্গনে আপন লোকদের মধ্যে দুর্বলতা দেখিলে তাহাদিগকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিতে থাকিত ; বীর ও বাহাদুর স্বভাবের আরব পুরুষগণ নারীদের ভৎর্সনা ও তিরস্কার মৃত্যুবরণ অপেক্ষা অধিক জঘন্য বোধ করিত। এতদ্ভিন্ন নারীরা নানা রকম উত্তেজনার গীত ও উস্কানীর কথা দ্বারা দলীয় লোকদেরকে ক্ষেপাইয়া তুলিত।

শত্রুপক্ষ কোরায়েশ কাফেররা মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘ পথ— ৩০০ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করতঃ মদীনা সংলগ্ন ওহোদ পাহাড়ের সম্মুখস্থ ময়দানে ক্যাম্প করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুর্ব হইতেই তাহাদের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ছিলেন। তাহারা শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার মদীনার নিকটে পৌছিল। হযরত (দঃ) বিভিন্ন লোক পাঠাইয়া শত্রুদলের সম্পুর্ণ খবর পুর্ণরূপে জ্ঞাত হইলেন, এবং শাওয়াল মাসের পঞ্চম দিন বৃহস্পতিবার

ছাহাবীগণকে একত্রিত করিয়া পরমর্শ করিলেন। কিছু সংখ্যক ছাহাবী, এমনকি প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্ত মোনাফেকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনু সলুল এইরূপ মত প্রকাশ করিল যে, আমরা মদীনা শহরের বাহিরে যাইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হইব না, বরং আমরা শহরের আভ্যন্তরিণ রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া শহরেই অবস্থান করিব। শত্রুদল শহরের উপর আক্রমণ করিলে তখন তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ সাধ্য হইবে। কারণ, ঐ অবস্থায় আমাদের পুরুষগণ মুখামুখী আক্রমণ চালাইবে এবং নারীগণ নিজ নিজ বাড়ীর ছাদ হইতে শত্রুদলের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিবে। শত্রুসেনা সংখ্যায় অধিক হইলেও এই পন্থায় সহজেই কাবু হইয়া পড়িবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থার বিরোধী হইলেন, তাঁহাদের বীরত্ব তাঁহাদিগকে ঐরূপে বাড়ী বসিয়া থাকিতে সম্মত হইতে দিল না। মদীনার প্রধান সরদার সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এবং শেরে-খোদা হামযা (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন, এমনকি হামযা (রাঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, অদ্যই মদীনা হইতে বাহির হইয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা না করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিব না। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত ছাহাবীগণ বদর-জেহাদে শরীক হইয়াছিলেন না এবং তাঁহারা বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের ফজিলত ও মর্তবার বয়ান শুনিতে পাইয়া জেহাদের সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিলেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমরা মনোবাঞ্ছা পুরণের সুযোগ পাইয়াছি ; আমরা এখন বসিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে মদীনার বাহিরে যাইয়া সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মতামতের প্রাবল্যতায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মতই গ্রহণ করিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। অতঃপর পরিকল্পিত সময়ে যুদ্ধের বিশেষ পোষাক লৌহ-বর্ম পরিধান করতঃ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইলেন। এদিকে যাহাদের পীড়াপীড়িতে হযরত (দঃ) সংগ্রোমের জন্য মদীনার বাহিরে যাইতে সম্মত হইয়াছেন তাঁহারা অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন যে, আমাদের কারণে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা হযরতের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন যে, আপনার মনোভাবকেই আমরা সকলে গ্রহণ করিতেছি—মদীনার শহরে থাকিয়াই আমরা আক্রমণের প্রতীক্ষা করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন, নবী যখন যুদ্ধের পোষাক পয়িধান করিয়া নেয় তখন শেষ ফল না দেখিয়া উহা পরিত্যাগ করেন না। এই বলিয়া তিনি বাহিরে অবস্থানরত শত্রুদলের উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে মদদীনা হইতে বাহিরে যাওয়ার উপরই দৃঢ় রহিলেন। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার জুমার নামাজের অনেক পর হযরত (দঃ) ওহোদ পানে যাত্রা করিলেন।

● আজ ইসলাম তথা শান্তির ধর্মের প্রবর্তক আল্লার রসুলের এক অপুর্ব রূপ—তাঁহার অঙ্গে একটির উপর আর একটি লৌহ-বর্ম, হস্তে ঢাল, কোমরে জোলফাকার তরবারি, মাথায় লৌহশিরস্ত্রান। রসুলুল্লাহ (দঃ) আজ বীরবেশে রণ ক্ষেত্রের সিপাহী।

বদর-জেহাদে হযরত (দঃ) রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; শিবিরে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। আজ তিনি প্রত্যক্ষভাবে রণে অবতীর্ণ হইবেন; সৈনিকদের মধ্যে থাকিয়া সেনাপতির দায়িত্ব পরিচালনা করিবেন। মোসলমান দ্বীনের খাতিরে সকল ক্ষেত্রেই ঝাপাইয়া পড়িতে সদা প্রস্তুত—হযরত (দঃ) আজ এই আদর্শ ও এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। ধর্ম ও কর্ম, দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হওয়াই ইসলামের শিক্ষা। ধর্মহীন কর্ম তাঁহার লক্ষ্য নয়, কর্মহীন ধর্মও তাঁহার আদর্শ নয়। ভোগের সুযোগে বসিয়া ত্যাগের সাধনা, উচ্চাসনের অধিকারী হইয়া কর্মীস্তরে নামিয়া আসার শিক্ষা সর্বদাই হযরত (দঃ) স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিতেন: আজ ভয়াহব বিপদসঙ্কুল অস্ত্র ঝঙ্কারের ময়দানেও হযরত (দঃ) সেই রূপেরই রূপী। পুরা দস্তুর যোদ্ধার সাজে সজ্জিত সেনাপতি রূপে হযরত (দঃ) চলিয়াছেন নিজ দল অপেক্ষা চার গুণের অধিক সংখ্যার শত্রুকে আক্রমণ করিতে। ইসলামের নামকে মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে শত্রু ঘাড়ের উপরে আসিয়া গিয়াছে; এইরূপ মুহূর্তে উচ্চ-নিচ প্রতিটি মোসলমানকেই এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে—নবীজী আজ হাতে-কলমে এই শিক্ষাই দিতে চলিয়াছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

সৈন্য দলের যাচাই ঃ

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি ছিল, তিনি নিজ শহর হইতে কিছু দুর পথ অতিক্রম করার পরই সৈন্য দলের যাচাই করিতেন। তৎকালীন মোসলমানগণের মধ্যে দীনের খেদমত ও আল্লার রাস্তায় জেহাদ করার অপূর্ব আকাঙ্খা স্পৃহা ছিল; অনেক অনেক রুগ্ন এবং কম বয়স্ক ছেলেগণও সৈন্যদলের সঙ্গে রণাঙ্গনে ছুটিয়া চলিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সৈন্য-দলের যাচাই-এর সময় অনুপযোগী লোকগণকে বুঝ-প্রবোধ দানে বাড়ী ফিরাইয়া দিতেন। বদর-জেহাদেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন; ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে কম বয়স্ক হওয়ার দরুন ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

ওহোদের জেহাদের সময়ও তিনি ঐরূপ করিলেন। শুক্রবার জুমার নামায ইত্যাদি কার্য্য হইতে অবসর হইয়া তিনি সৈন্যদল সহ মদীনা শহর হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে "শায়খাইন" নামক এক স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং তথায় সৈন্যদলের যাচাই করিলেন; এই সময় তিনি ১৫ জন কম বয়স্ক ছাহাবীকে ফিরাইয়া দিলেন। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ) যাঁহারা বদরের জেহাদে বাছাইয়ের মধ্যে বাদ পড়িয়াছিলেন এইবারও তাঁহারা ঐরূপ কম বয়স্ক হওয়ার দরুন বাদ পড়িলেন। এতদ্ভিন্ন আরও দুইজন—রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও ও ছামুরা (রাঃ) ছোট গণ্য হইয়া বাদ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) চাতুরী করিলেন—তিনি নিজকে বড় দেখাইবার জন্য পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীর ছুড়িতে বিশেষ পটু বলিরা সকলে তাঁহার প্রশংসা করিল। তাই

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার সঙ্গী ছামুরা (রাঃ) এই সংবাদ শুনিয়া স্বীয় মুরব্বির নিকট বলিলেন, রাফে ইবনে খাদীজ জেহাদে যাইবার অনুমতি পাইয়াছে, আমি কেন অনুমতি পাইব না? অথচ পাছাড় ধরিলে আমি তাহাকে পরাজিত করিতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদে (কৌতুক স্বরূপ) তাঁহাদের মধ্যে পাছাড় ধরাইলেন, সত্য সত্যই ছামুরা (রাঃ) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)কে পরাজিত করিয়া দিলেন।

এতদ্দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাঁহাকেও জেহাদে যাইবার অনুমতি দিলেন। ছোবহানাল্লাহ! সেই যমানায় জেহাদের প্রতি মোসলমানদের কিরূপ উৎসাহ ছিল!

মোনাফেকদলের যোগদান বর্জন :

মদীনা হইতে যাত্রাকালে হযরতের সঙ্গে এক সহস্র যোদ্ধা ছিল। তন্মধ্যে তিন শত ছিল মোনাফেক, তাহাদের সর্দার ছিল আবদুল্লাহ ইবনে-উবাই-ইবনে সলুল। মোনাফেকরা বস্তুতঃ মোসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মোসলমানদের সঙ্গে না থাকিলে তাহাদের মোনাফেকী প্রকাশ পাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা, তাই তাহারাও মোসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করিল। কিন্তু মদীনা হইতে কিছু দুর অগ্রসর হওয়ার পরই তাহারা স্বীয় আভ্যন্তরীণ ভাব প্রকাশ করিয়া দিল। তাহাদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের মতামত যেহেতু মদীনা হইতে বাহির না হওয়ার অনুকুলে ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহার বিপরীত মদীনার বাহিরে যাইয়া সংগ্রাম পরিচালনা করাই সাব্যস্ত হয়, তাই তাহারা ছুতা ধরিল যে, যখন আমাদের পরামর্শের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না তখন আমরা কেন প্রাণ বিসর্জন দিতে যাইব? এই বলিয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল স্বীয় তিন শত মোনাফেকের দল লইয়া মোসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ পুর্বক ফেরত চলিয়া আসিল। এমনকি তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইলে তাহারা এই উত্তর দিল—

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ - هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ......

"যদি আমরা এই ব্যবস্থাকে যুদ্ধ মনে করিতাম তবে তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম, (কিন্তু এইরূপ অধিক শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলায় রণাঙ্গনে যাওয়া নিছক আত্মহত্যায় উদ্যত হওয়ার সামিল, তাই আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—) এতদিন তাহারা বাহ্যিকরূপে ঈমানের যতটুকু নিকটবর্তী মনে হইতেছিল ঐ দিন তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রকাশ্যেও কুফুরীর নিকটবর্তী সেই তুলনায় অধিক দেখা গেল। তাহারা মুখে যতটুকু বলিয়াছে (যে, যুদ্ধ মনে করিলে তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম) উহাও তাহাদের অন্তরে নাই।" (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

১৪৩৯। হাদীছ :— যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ পানে যাত্রা করিলেন, তখন মধ্যপথ হইতে তাঁহার সঙ্গস্থ কিছু লোক (মোনাফেক) ফিরিয়া আসিল। তাহাদের সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিল। একদল বলিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা শত্রুর ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। অপর দল বলিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করা যাইবে না। (কারণ তাহারা ত মোসলেম দলভুক্ত।) এই মতবিরোধের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল—

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۝

"তোমরা মোনাফেকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়াছ কেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কার্য্য কলাপের দ্বারা পূর্বাবস্থা তথা প্রকাশ্য কুফুরীর প্রতি তাহাদের প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন।" (৪ পাঃ ৮ রুঃ)

এতদ্ভিন্ন তাহাদের সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মদীনার অপর নাম "তায়বাহ" (—পবিত্র কারক) সে দোষী ও অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, যেরূপ অগ্নি রৌপ্যের ময়লাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা :—মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করা—তখনকার জন্য সাময়িক সঠিক মতামতই ছিল। বস্তুতঃ ঐ মোনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বিত হইয়াও ছিল না, বরং তখন কোন মোনাফেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত না। এতদসত্ত্বেও ঐ মত পোষণকারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কটাক্ষপাত করার কারণ—ঐ মোনাফেকদের প্রতি অসহনীয় ক্রোধ প্রকাশ করা এবং মোসলমানদিগকে একটি বাস্তব তথ্যের ইঙ্গিত দেওয়া যে, মোনাফেকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বিত না হওয়া শুধু মাত্র সাময়িক কারণাধীন, বস্তুতঃ তাহারা কঠোর ব্যবস্থার উপযোগী। মোসলমান দলভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে তাহাদিগকে খাতিরের পাত্র গণ্য করা নিছক ভুল।

মোনাফেকদের কার্য্যের অশুভ প্রতিক্রিয়া :

মোনাফেকগণ প্রথম হইতেই যুদ্ধে যাত্রা না করিত তাহা ভাল ছিল, কিন্তু প্রথমে যাত্রা করিয়া মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন কোন মোসলমান উপদলের উপর একটু দুর্বলতার ভাব পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রহমতে সেই মুহূর্তেই তাঁহাদের মনোবল দৃঢ় হইয়া গেল এবং ঐ অশুভ প্রতিক্রিয়া দুরীভুত হইয়া গেল। সেই উপদলদ্বয় ছিল বনু-সালেমা গোত্র ও বনু-হারেছা গোত্র। কোরআন শরীফেও এই ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে।

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا......

"(মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার কি কি বিশেষ করুণা তাহা উপলব্ধি করার জন্য স্মরণ কর—) যখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইটি উপদল দুর্বলতার ভাবধারায় পতিত হওয়ার উপক্রম হইল (তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মনোবলকে দৃঢ় করিয়া দিলেন। এইরূপের অশুভ ভাবধারা তাহাদের ক্ষতিসাধন কিরূপে করিবে?) অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু। অতএব মোমেনগণকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপনকারী হওয়া আবশ্যক। (৪ পাঃ ৩ নুঃ)

জাবের (রাঃ) (বনু-সালেমা গোত্রের ছিলেন. তিনি) উক্ত আয়াতের উল্লেখ করিয়া বলেন, যদিও এই আয়াতের মধ্যে আমাদের একটু কলঙ্কের উল্লেখ রহিয়াছে তবুও আমরা এই আয়াতের অভিলাষী। কারণ, এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের গোত্রদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু; ইহা আমাদের জন্য চরম ও পরম সৌভাগ্য।

রণাঙ্গনের দৃশ্য:

২ বা ২.। মাইল উচ্চ মুল ওহোদ পর্বতের পাদদেশের বিস্তীর্ণ ময়দান-মধ্যে অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা কম উচ্চ ক্ষুদ্র আয়তনের "আইনাইন" নামক একটি ছোট পাহাড় ছিল। এই পাহাড়টির দৈর্ঘের এক দিক ওহোদ পর্বতের দিকে, কিন্তু উহা ওহোদের সঙ্গে মিলিত নহে—মধ্যভাগে বিরাট ফাঁকা। উহার অপর দিক মদীনা নগরীর দিকে; উহা ঘেঁষিয়া একটি অপ্রশস্ত পথ; ঐ পথের পার্শ্বেই (তৎকালে একটি) পার্বত্য প্রণালী বা খাল-বিশেষ ছিল। সেই প্রণালীটিই উক্ত এলাকাকে মদীনার মূল ভু-খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই আইনাইন পাহাড়টির উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দান। এক পার্শ্বের ময়দানে তিন হাজার কাফের বাহিনী দিন কয়েক পুর্ব হইতেই অবস্থান গাড়িয়া রহিয়াছিল। তাহাদের বামে ওহোদ পর্বত, ডানে পার্বত্য প্রণালী ও মদীনার দিক, পেছনে মক্কা দিকের পথের এলাকা, সম্মুখে আইনাইন পাহাড়। মোসলেম বাহিনী উক্ত পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থ ময়দানে উপস্থিত হইল; তাহাদের সম্মুখে ঐ পাহাড়, ডানে ওহোদ পর্বত, বামে পার্বত্য প্রণালী।

এই আইনাইন পাহাড়ের দৈর্ঘের পূর্ব মাথা এবং ওহোদ পর্বতের মধ্যবর্তী যে সুপ্রশস্ত ফাঁকা রহিয়াছে এই ফাঁকা পথেই মোসলেম বাহিনী অগ্রসর হইয়া আইনাইন পাহাড়ের অপর পার্শ্বে অবস্থানরত কাফের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইবে—এই পরিকল্পনা হযরত (দঃ) স্থির করিলেন। কারণ, পাহাড়টির অপরদিকে ত অপ্রশস্ত পথ এবং পথের সংলগ্নেই প্রণালী বা খালের খাদ। কাফের বাহিনীর সম্মুখেও এই একই পরিকল্পনা,

অতএব আইনাইন পাহাড়ের মাথা এবং ওহোদ পাহাড় উভয়ের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত ফাঁকা জায়গাটিই হইবে যুদ্ধের মুল ক্ষেত্র। প্রত্যেক পক্ষই ঐ পথে অগ্রসর হইয়া অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করিবে; সুতরাং উভয় পক্ষের অক্রমণ ও প্রতিরোধ ঐ জায়গায়ই হইবে।

আইনাইন পাহাড়ের অপর তথা মদিনার দিকের মাথায়ও উহার উভয় পার্শের যোগ-সূত্র পথ ছিল কিন্তু তাহা প্রণালীর গর্তের দরুন অপ্রশস্ত। এই পথটি কাফের বাহিনীর জন্য বিশেষ সুযোগের বস্তু; কারণ তাহাদের সংখ্যা অনেক; তাহারা মুল যুদ্ধক্ষেত্রে পুরাদমে যুদ্ধ চালাইয়াও বাহিনীর বিশেষ অংশকে এই পথে অগ্রসর করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শস্থ মোসলেম বাহিনীর উপর পেছন দিক হইতে আক্রমণের জন্য নিয়োগ করিতে পারে। মোসলমানদের জন্য এই পথের উক্ত সুযোগ বর্তমান, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প—তিন হাজারের সম্মুখে মাত্র সাত শত। তাহারা বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইবে না, কিন্তু এই দিকের আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। নতুবা মুহূর্তের মধ্যে তাহারা সম্মুখ ও পেছন উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং এই পথে কাফেরদের জন্য আক্রমণের সুযোগ, আর মোসলেম বাহিনীর জন্য আত্মরক্ষায় প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

কাফেররা তাহাদের সুযোগ হইতে বে-খবর ছিল না, তাই তাহারা বীরবর খালেদ ইবনে ওলীদের (তিনি তখন মোসলমান ছিলেন না) অধীনে দুইশত অশ্বারোহী বীর সেনানী ঐ পথে অগ্রসর হওয়া সুযোগ অপেক্ষায় মোতায়েন রাখিয়া মুল ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভের প্রস্তুতি নিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইতে অচেতন ছিলেন না, তাই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে পঞ্চাশ জনের একটি তীরান্দাজ—ধানুকী বাহিনী ঐ পাহাড়ের মাথায় এই পথে নিয়োগ করিলেন। ধানুকী বাহিনীকে আরবী ভাষায় "রোমাত" বলা হয়, এই সূত্রেই বর্তমানে আইনাইন পাহাড়কে "জাবালে রোমাত"—ধানুকীদের পাহাড় বলা হয়। ঐ পথটি মোসলেম বাহিনীর পক্ষে অতি ভয়াবহ বিপদের বাহনরূপে থাকিলেও পুর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, পথটি অপ্রশস্ত ছিল; অতএব ঐ পথে অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে অধিক সংখ্যককে প্রতিরোধ করা সহজ-সাধ্য ছিল। তাই দুইশত শত্রু সেনার প্রতিরোধে পঞ্চাশ জন যথেষ্ট ছিল। ঐ ধানুকী বাহিনীর প্রতি হযরতের এই কঠোর আদেশ রহিল যে, আমরা তথা মুল বাহিনী জয়ী হই বা পরাজিত হই—কোন অবস্থাতেই আমার ভিন্ন নির্দেশ ছাড়া তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না।

এইরূপে সামান্য সংখ্যক লোক দ্বারা পেছন দিকের পথটি বন্ধ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে নিশ্চিন্ত অবস্থায় সম্মুখ দিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই বিচক্ষণতাপুর্ণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যরূপে কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ......

"আপনি স্বীয় পরিবারবর্গ ছাড়িয়া প্রভাত বেলায় যখন মোসলেম সৈন্যদলের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করিতে লাগিলেন (তখনকার দৃশ্যটি একটি স্মরণীয় দৃশ্য।) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শোনেন এবং জানেন।" (৪ পারা ৩ রুকু)

উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা :

মোসলমানদের পক্ষে মদীনা হইতে এক সহস্র সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল, মধ্যপথ হইতে মোনাফেক তিন শত চলিয়া আসিয়াছিল, তাই মোসলমানদের সৈন্য ছিল সাত শত; তন্মধ্যে নগণ্য সংখ্যক ছাড়া কাহারও সঙ্গে ঘোড়া ছিল না। কাফেরদের সৈন্য ছিল তিন হাজার; তন্মধ্যে দুই শত অশ্বারোহী ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ ও মোসলমানদের বিজয় দৃশ্য :

সর্বপ্রথম কাফেরদের পক্ষে তাল্‌হা নামক পতাকাবাহী ব্যক্তি অগ্রগামী হইল এবং মোসলমানদের প্রতি উপহাস স্বরূপ এই বলিয়া কটাক্ষ করিল যে, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে (হত্যা করিয়া সত্বর আমাকে) নরকে পৌঁছাইয়া দেয় বা আমার হাতে (নিহত হইয়া) সত্বর স্বর্গে পৌঁছিয়া যায়। তাহার এই আহ্বানে আলী (রাঃ) ময়দানে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আছি। এই বলিয়া তিনি তরবারির এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর নিহত তালহার পুত্র ওসমান পতাকা হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। হামযা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী হইয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারির এরূপ আঘাত করিলেন যে, তরবারি তাহার কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল।

অতঃপর উভয় পক্ষ হইতে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইল, মোসলমানগণ বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতে ছিলেন। কাফেরেদের পক্ষে পর পর লাশ পড়িতেছিল, এমনকি তাহারা পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইল। যেই নারীগণ সৈন্য দলকে অগ্রগামী হওয়ায় উৎসাহিত করিতেছিল তাহারা পর্য্যন্ত পলায়নে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এইরূপে মোসলমানগণ স্বীয় অবস্থান ঘাটি হইতে অগ্রসর হইয়া শত্রু সেনার অবস্থান ঘাটিতে আসিয়া পড়িলেন; শত্রুপক্ষ সকলেই পলায়নে ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের অশ্বারোহী দল খালেদ ইবনে অলীদের অধীনে সুযোগের সন্ধানে ছিল—তাহারা মোসলমানদের পেছনের পথ বাধামুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল; জয়-পরাজয়ে পরিবর্তন ঘটিল।

মোসলমানদের পক্ষে পরাজয়ের দৃশ্য ও উহার কারণ :

পূর্বেই বলা হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে আক্রমণের সুযোগ পাওয়ার পথের উপর আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে পঞ্চাশ

জন তীরান্দাজ সৈন্য মোতায়েন করিয়া ছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহাদের প্রতি তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত—তোমরা কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করিবে না। এই ব্যবস্থার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইলেন। মোসলমানদের পক্ষে স্পষ্টরূপে জয় পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাঁহারা পেছন দিক হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং শত্রু সেনাদলকে তাড়া করিয়া যাইতে ছিলেন।

পেছন দিকে অবস্থিত তীরান্দাজ বাহিনী ভাবিলেন, যুদ্ধের অবসান প্রায়; শত্রুদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ তাহাদিগকে তাড়া করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ করার সুযোগ পাই নাই। এখন আমাদের সম্মুখে একটি কাজের সুযোগ দেখা যাইতেছে—উহা হইল গণিমতের মাল তথা শত্রুগণ কর্তৃক রণাঙ্গনে পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যাহা বাইতুল-মাল বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের সম্পদ হইবে, এই সবকে একত্রিত করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা; ইহাও একটি জাতীয় খেদমত, তাই আমরা বর্তমান সুযোগে এই কার্য্যটি সমাধা করি। এই ভাবিয়া তাঁহারা গণিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে চলিয়া আসিলেন।

পাঠকবর্গ; এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন যে, গণিমতের মাল কোন অবস্থাতেই কাহারও ব্যক্তিগত সম্পদ পরিগণিত হয় না। যে বা যাহারা উহা হস্তগত করিবে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে তাহার ব্যক্তিগত কোন প্রকার অধিকার উহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এমনকি ঐ ব্যক্তি অন্যান্য মোজাহেদগণের তুলনায় কোন প্রকার আধিক্যের ভাগী হইবে না। ইহা শরীয়তের একটি সুস্পষ্ট বিধান। এমতাবস্থায় ঐ ছাহাবীগণের উক্ত কার্য্যকে জাতীয় খেদমতে অংশগ্রহণ করা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই কার্য্যকে উক্ত ছাহাবীগণের পক্ষে লালসা বা ধন-সম্পদের স্পৃহা গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির স্থলেই লালসা ও স্পৃহার উৎপত্তি বলা যায়, অথচ এইস্থলে ব্যক্তিগত বিশেষ স্বার্থের কোন সম্পর্ক ও সুযোগ ছিলই না।

অবশ্য এইস্থলে তাঁহাদের অন্য একটি মারাত্মক ভুল হইতেছিল যে, তাঁহারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধারণার বশীভূত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়া-ছিলেন, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই আমার পুনঃ আদেশ ব্যতিরেকে তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাঁহারা নিজ বিবেকে যুদ্ধের অবসান ধারণা করিয়া হযরতের পুনঃ আদেশ ব্যতিরেকেই ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। এমনকি তাঁহাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতের বিরুদ্ধে তাঁহারা উহা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাহাদিগকে হযরতের সুস্পষ্ট নির্দেশ স্মরণও

করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ বিবেকের যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন, এই নির্দেশ প্রবর্তিত থাকার পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়াছে।

এইরূপে নিজস্ব ধারণার বশে রসুলের সুস্পষ্ট নির্দেশ বিরোধী কার্য্য করা মারাত্মক ভুল ছিল এবং এই ভুলের সূচনায় আল্লার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ মনোভাব বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি ছিল না, ছিল একমাত্র জাতীয় খেদমতে অংশ-গ্রহণ করার অভিলাস, অবশ্য এই অভিলাসটি গণিমতের মাল তথা জাগতিক বস্তু সম্পর্কীয় ছিল।

জাতীয় খেদমতে অংশগ্রহণ করার মনোবৃত্তি একটি উত্তম বস্তু, কিন্তু যেহেতু এস্থলে এই মনোবৃত্তি আল্লার রসুলের নির্দেশের পরিপন্থি কার্য্য টানিয়া আনে, তাই ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের একটি আয়াতে এই ভুল ও ত্রুটি সংঘটক ছাহাবীগণকে তাঁহাদের কার্য্যের বাহ্যিক দিক তথা জাগতিক বস্তু—গণিমতের মালের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করণ পূর্বক বলিয়াছেন,—"তোমাদের মধ্যে কাহারও ইচ্ছা ও ধাবন দুনিয়ার প্রতি হইল।" অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লালসায় না হইয়া জাতীয় স্বার্থে হইলেও তাহারা দুনিয়া তথা জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবমান হইল। এই কার্য্যটা তত বড় অপরাধমুলক না হইলেও ঐ ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্য একটা বড় অপরাধ করিয়া ছিলেন যে, রসুলের স্পষ্ট আদেশ বিদ্যমান থাকাবস্থায় নিজ বিবেক খাটাইয়া উহার বিপরীত কাজ তাঁহারা করিয়াছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে কোন ছাহাবীর দ্বারা এই শ্রেণীর অপরাধ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ তাহারা নিষ্পাপ ছিলেন না। তাঁহাদের এই অপরাধটি নিতান্তই গুরুতর ছিল যদ্দরুণ তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভয়ঙ্কর ক্রোধ সাময়িকরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে এই গুরুতর অপরাধটির বর্ণনা-সংলগ্নেই ঐ জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবমান হওয়ার বিষয়টাও উল্লেখ হইয়াছে। এই উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, অনেক ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রবাহে বর্ণিত বর্ণনায় গুরুতর অপরাধের সহিত লঘু অপরাধ, এমনকি বস্তুত: যাহা অপরাধ নয় শুধু বাহ্যিক দৃশ্যের মামুলী সূত্র ধরিয়া উহাকেও অপরাধ গণনার মধ্যে শামিল করিয়া দেওয়া হয়। বিশেষত: অপরাধকারী যদি এরূপ মর্য্যাদাবান হন যে, ক্রোধজনিত কাজ তাহার দ্বারা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল; সে যদি তাহা করে তবে সে ক্ষেত্রে রাগ ও ক্রোধের বিকাশে ক্ষুদ্র অপরাধও বড়রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পবিত্র কোরআনে এইরূপে বর্ণনার নজীর আরও বিদ্যমান আছে। যেমন -আদম আলাইহেচ্ছালামের গন্দম খাওয়ার ঘটনায় রাগ প্রকাশে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, وعصى ادم ربه فغوى যাহার শাব্দিক অর্থ হইল—"আদম আল্লার নাফরমানী করিয়াছেন ফলে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অথচ নবী নিঃষ্পাপ হইয়া থাকেন। তদ্রূপ ইউনুস আলাইহেচ্ছালাম সম্পর্কে আছে—

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

"মাছের ঘটনার নবী—যখন তিনি (তাঁহার জন্য নির্দ্ধারিত কর্মস্থল হইতে) রাগ হইয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার যেন ধারণা ছিল—আমি তাহাকে ধরিতে সক্ষম হইব না।" অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা নিঃপাপ নবীর দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু আল্লার অনুমতি ব্যতিরেকে লোকদের প্রতি রাগ বশতঃ কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত ভাষা ও বাক্য প্রয়োগ করিরাছেন।

পাত্র ও ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুদ্র অন্যায় বড় অন্যায়রূপে গণ্য হওয়া এবং সেই রাগে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হওয়া একটি সাধারণ নিয়ম। আদম আলাইহেচ্ছালামের ঘটনায় উপরোল্লিখিত আয়াতের কঠোর ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে মাওলানা রুমী এই তথ্যই একটি সুন্দর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন।

گرچه یک مو بود گناه کو جسته بود - لیک آن مو در دو دیده رسته بود

بود آدم دیدۂ نور قدیم — موئے در دیده بود کوه عظیم

অর্থ—যদিও আদম আলাইহেচ্ছালামের অন্যায়টা চুল পরিমাণ মাত্র ছিল* কিন্তু সেই চুল চোখে পতিত হইয়াছিল। আদম আলাইহেচ্ছালামের মর্য্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট চোখ তুল্য; চোখে চুলও বড় পাহাড় বোধ হইয়া থাকে।

ওহোদ-জেহাদের আলোচ্য ঘটনায় গণিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি কতিপয় ছাহাবীর ছুটিয়া যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে মন্তব্য ও কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাও উল্লিখিত দর্শন দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। দুনিয়ার মোহ এবং ধনের লালসা অধিক হওয়া—এই গ্লানি কোন একজন ছাহাবীর মধ্যেও বিন্দুমাত্র পাওয়া যাইত না। মোসলমানদের ঈমান ও বিশ্বাস ইহাই এবং ইহাই বাস্তব ও সত্য বটে।

সতর্কবাণীঃ— কোন কোন প্রসংশনীয় লেখক নবীজীর ইতিহাস রচনায় অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাঙ্গীন ইসলামী জ্ঞানের অভাবে অনেক আছাড়ও খাইয়াছেন। যেমন—ওহোদ-জেহাদের আলোচ্য ঘটনায় উক্ত ছাহাবীগণের প্রতি এমন একটা কদর্য্য উক্তি করিয়াছেন যাহার উদ্ধৃতিতেও কলম থামিয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনায় জড়িত ৩৭/৩৮ জন ছাহাবীর ঐ ক্ষেত্রে ত্রুটি অবশ্যই হইয়াছিল; যেই ত্রুটির মাশুল সকলকে ভুগিতে হইয়াছিল এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত তাঁহাদের ত্রুটির বর্ণনাও দিয়াছেন; অবশ্য তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশে বলিয়াও দিয়াছেন—ولقد عفا عنكم "শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।"

কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটি ঐ গ্লানি ছিল না যাহা উক্ত লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। লেখকের ভাষায়—"যুদ্ধ জয় অপেক্ষা লুণ্ঠনের লোভই ছিল অনেকের মধ্যে প্রবল। হযরতের

---

* কারণ, আল্লাহ তায়ালাই বলিয়াছেন, আদম ভুলিয়া গিয়াছিল; ইচ্ছাকৃত সে নাফরমানী করিয়াছিল না (ছুরা তা'হা দ্রষ্টব্য) আর ভুল চুক ত ক্ষমার্হ।

কড়া হুকুম সত্ত্বেও তীরন্দাজদিগের স্থান ত্যাগই তাহার প্রমাণ।" কিন্তু উল্লিখিত গ্লানি কোন ছাহাবীর চরিত্রেও ছিল না—ইহাই সত্য; সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।

একটি ভুল :—ইসলামী জেহাদে গণিমত অর্জন ও গণিমতের মাল সংগ্রহকে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ "লুণ্ঠন" শব্দে ব্যক্ত করেন; ইহা বিশ্রী ও কুৎসিত ভাষান্তর। "লুণ্ঠন" শব্দটির আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার পরিমাপের প্রয়োজন নাই; সাধারণ্যে এই শব্দটি যে কাজকে বুঝায় উহা যে, একটা মন্দ ও অবৈধ কাজ তাহা সুস্পষ্ট। অথচ গণিমত অর্জন ও সংগ্রহকরণ একটি বৈধ কাজ। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তেও ইহা বৈধ ছিল। অবশ্য তাঁহাদের শরীয়তে উহা ভোগ করার অনুমতি ছিল না; বিধান এই ছিল যে, গণিমতের সমস্ত মাল একত্রিত করিয়া রাখা হইবে; উক্ত জেহাদ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইলে আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐ মাল ভস্ম করিয়া যাইবে, কবুল না হইলে আগুন আসিবে না। তখন কর্মকর্তা খোঁজ করিবেন যে, জেহাদ কি দোষে কবুল হইল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—احلت لى الغنائم "আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য যে, গণিমতের মাল তাহাদিগকে ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" স্বয়ং হযরত (দঃ) গণিমতের অংশগ্রহণ করিয়া থাকিতেন। নবী (দঃ) কি লুটের মাল গ্রহণকারী ছিলেন? গণিমতের মালের ভাগ-বণ্টন এবং উহা ব্যয়ের পাত্র নির্দ্ধারণের বিধান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে: দশম পারার আরম্ভ এবং নবম পারার ছুরা আনফালের আরম্ভ দ্রষ্টব্য।

অবশ্য গণিমতের কোন প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নাই। কারণ, গণিমত হইল ইসলামের একটি বিশেষ বস্তু, আর ইসলামের ভাষা আরবী। এই ক্ষেত্রে গণিমত শব্দের ভাষান্তর না করিয়া উহার মর্ম বুঝাইয়া দিব যে, ইসলামী জেহাদে শরীয়তের অধীনে শত্রুপক্ষের যে ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহাকে গণিমত বলে—অর্থাৎ "যুদ্ধ-লব্ধ মাল-সম্পদ"। বর্তমান যুগেও যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ সমরক্ষেত্রে শত্রুর পরিত্যক্ত মাল সম্পদ হস্তগতকারী হইয়া থাকে—ইহাকে লুণ্ঠন করা কেহই বলে না।

তীরান্দাজ বাহিনীর সৈন্যগণ যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশিত স্থান ত্যাগ করায় উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) তাঁহাদিগকে রসুলুল্লার নির্দেশ স্মরণ করাইয়া বাধা দিলেন, কিন্তু তাহাদের অধিক সংখ্যক পূর্বালোচিত যুক্তি বলে সেই বাধা খণ্ডন পূর্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন। শুধুমাত্র অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী ১১।১২ জন ছাহাবী তথায় অবস্থিত রহিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! মুহূর্তের মধ্যে উহাই ঘটিয়া বসিল যাহার আশঙ্কায় হযরত (দঃ) এই স্থানে তীরান্দাজ বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন। শত্রুদলের অন্যতম বীর পুরুষ অশ্বারোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খালেদ ইবনে অলীদ মোসলমানদের পেছন দিকের ঐ রাস্তায় সুযোগ লাভের অপেক্ষায় ছিল, ঐ রাস্তায় মোসলমানদের শক্তির স্বল্পতা এবং

সৈন্য সংখ্যার নগণ্যতা লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য তৎসঙ্গে আরও এক শত সৈন্য লইয়া অতি দ্রুতবেগে ঐ দিকে ধাবিত হইল এবং হঠাৎ ভীষণ ভাবে আক্রমণ চালাইয়া দিল। তিন শত শত্রু সেনার মোকাবিলায় ১১।১২ জন সৈন্য কি করিতে পারে? তাঁহারা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পশ্চাদপদ হইলেন না, কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা তাঁরাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) সহ সকলেই শাহাদৎ বরণ করিলেন।

খালেদ-বাহিনীর সম্মুখের বাধার অবসান হইল, তাহারা সরাসরি মোসলমামদের মূলবাহিনীর উপর পেছন দিক হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মোসলমানগণ পেছন দিকের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে এমন বিশৃঙ্খলায় পতিত হইলেন যে, অস্থিরতার মধ্যে নিজেদের হাতে নিজেদের লোক শহীদ হওয়ার ঘটনা পর্য্যন্ত ঘটিল। হোজায়ফা (রাঃ) ছাহাবীর পিতা ইয়ামান (রাঃ) সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মোসলমানদের হাতেই শহীদ হইলেন। হোজায়ফা (রাঃ) "আমার পিতা, আমার পিতা" চীৎকার করিলেন, কিন্তু চীৎকার কার্য্যকর হওয়ার সুযোগ ছিল না।

মোসলমানদের পেছন দিকে খালেদ বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পলায়নরত শত্রুদলের মূলবাহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। এখন মোসলমানগণ শত্রুদের কবলে বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন। শত্রু পক্ষের লক্ষ্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তাহারা সাধারণ সৈন্য দলকে ভেদ করিয়া রসুলুল্লার দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট ছিল। উপস্থিত ছাহাবীগণ তাঁহার সম্মুখে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ সৃষ্টি করিলেন। আবু দুজানা (রাঃ) স্বীয় পৃষ্ঠকে, তালহা (রাঃ) স্বীয় বাহুকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য ঢালরূপে ব্যবহার করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) অতি অল্প সংখ্যক ছাহাবীগণের সঙ্গে ছিলেন। শত্রুদের প্রবল আক্রমণ একমাত্র তাঁহার প্রতি—

এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, من يرد هم عنى وهو رفيقى فى الجنة "আমার হইতে শত্রুগণকে প্রতিহত করিয়া বেহেশতের মধ্যে আমার সঙ্গ লাভের প্রয়াসী কে আছে? মদীনাবাসী সাত জন ছাহাবী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরতের নিরাপত্তার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতঃ শাহাদৎ বরণ করিলেন। (মোসলেম)

তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়াছিলেন যিয়াদ ইবনে ছাকান (রাঃ); তিনি ভীষণ আহত—এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) তাঁহাকে উঠাইয়া আনার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে হযরতের সম্মুখে ধরাশায়ী অবস্থায় রাখা হইলে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল রসুলুল্লার চরণে রাখিয়া দিলেন এবং চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধের এই স্তরে হাম্‌যা (রাঃ) এবং কতিপয় বড় বড় ছাহাবীসহ সত্তর জন ছাহাবী শাহাদৎ বরণ করিলেন। তন্মধ্যে দশ জন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য তাঁহার নিকটবর্তী শাহাদৎ বরণ করেন। এতদসত্ত্বেও হযরত (দঃ) ঐ সময়

ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন, এমনকি তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যদ্দরুণ তিনি দৃষ্টির আড়ালে হইয়া গেলেন। এদিকে হযরতের নিকটবর্তী যে দশ জন ছাহাবী শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পতাকাবাহী মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ছিলেন। আমর ইবনে কমিয়া নামক কাফের তাঁহাকে শহীদ করিয়াছিল। তাঁহার আকৃতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকৃতির সদৃশ ছিল; তাই ঐ কাফের মনে করিল, সে হযরত (দঃ)কে শহীদ করিয়াছে। লোকদের মধ্যেও সে এই ভুল কথাই প্রচার করিয়া বেড়াইল, এতদ্ভিন্ন ইবলিশ শয়তানও চিৎকার করিয়া এই মিথ্যা খবর প্রচার করিল যে, قتل محمد "মোহাম্মদ নিহত হইয়াছে।"

পরিস্থিতির ভয়াবহতা, তদুপরি এই দুঃসংবাদ মোসলমানগণকে হতাশ ও হুশহারা করিয়া ফেলিল। তাঁহারা দিশাহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় লৌহ মানব পর্য্যন্ত হাত পা ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কেহ কেহ পাহাড়ী এলাকার দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গর্তে পতিতাবস্থায় الی عباد الله "আল্লার বন্দাগণ। আমার নিকট আস" বলিয়া ডাকিতে ছিলেন, কিন্তু সন্ত্রস্ততার অবস্থায় মোসলমানদের কর্ণ পর্য্যন্ত এই শব্দ পৌছার সম্ভাবনা ছিল না। মোসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থা ইহার বিপরীতও ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) শহীদ হওয়ার গুজবে তাঁহারা শত্রুর মোকাবিলায় অধিক তৎপর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন এবং প্রকাশও করিলেন যে, রসুলুল্লার পরে আমাদের জীবিত থাকার আবশ্যক কি? তিনি যেই পথে প্রাণ দিয়াছেন আমরাও সেই পথেই চলিয়া যাই; আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি ওমর (রাঃ)কে পর্য্যন্ত তিরস্কার করতঃ ঐ কথা বলিয়া শত্রু সেনার ভিতরে প্রবেশ পূর্বক জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার শরীরে আশিটির অধিক আঘাত লাগিয়াছিল, এমনকি তাঁহার সেনাক্ত করা অসম্ভব ছিল। তাঁহার ভগ্নি তাঁহার অঙ্গুলির একটি নিদর্শন দেখিয়া সেনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই অবস্থার পর কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) নামক ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জীবিতাবস্থায় সর্বাগ্রে দেখিতে পান। দেখামাত্র তিনি "এইত রসুলুল্লাহ" বলিয়া চীৎকার করিলেন। তাঁহার এই চীৎকার ছাহাবীদের মধ্যে বিজলীর ন্যায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। হুশহারা বিক্ষিপ্ত মোসলমানগণ চতুর্দিক্ষ হইতে দৌড়িয়া আসিলেন—যেরূপ মাতৃহারা গোশাবক মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসে।

অতঃপর কাফেররা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালায় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাফের শত্রু সৈন্য অগ্রসর না হইয়া রণাঙ্গন হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিল। রণাঙ্গন পরিত্যাগের প্রাক্কালে তাহাদের দলপতি আবু সুফিয়ান শুধু এতটুকু বলিয়া গেল, আজিকার দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ।

অতঃপর রণাঙ্গনে শুধু মোসলমানগণই থাকিলেন, শত্রু সেনা কাফেররা রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহের বিভিন্ন বিষয়ের আয়াত ও হাদীছ যাহা বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন উহার অনুবাদ এই—

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰىٓ اِذَا فَشِلْتُمْ......

অর্থ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি (যে, তিনি মোসলমানদিগকে সাহায্য দান করিবেন উহা ওহোদের রণাঙ্গনেও) কার্য্যকরী ও বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন— যখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য-সহায়তায় শত্রু সেনা কাফেরদের বিলুপ্তি সাধন করিয়া যাইতেছিলে। অতঃপর যখন তোমাদের মধ্যে (রসুলুল্লার আদেশ সম্পর্কে) মত বিরোধের সৃষ্টি হইল এবং তোমরা (তথা তোমাদের একাংশ রসুলুল্লার) আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হইল (তখন আর ঐ অবস্থা স্থায়ী রহিল না, বরং অবস্থা বিপরীত রূপ ধারণ করিল।) অথচ এইমাত্র আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তোমাদের মনোবাঞ্ছা-পূরণ দৃশ্য দেখাইয়া ছিলেন। তোমাদের মধ্যে একদল লোকের ইচ্ছা ছিল জাগতিক বস্তু (সম্পর্কীয় কার্য্য; যদ্দরুন তাহারা মারাত্মক ভুলে পতিত হইয়াছিল)। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপও ছিলেন যাঁহারা শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আখেরাতের (উন্নতি তথা রসুলের আদেশের প্রতি লক্ষ্য ও দৃষ্টি নিবদ্ধকারী ছিলেন। (বস্তুতঃ সকলেরই ঐরূপ করা কর্তব্য ছিল; এই কর্তব্যের ত্রুটিই বিপদের মূল কারণ। তোমাদের উক্ত ত্রুটিজনিত কার্য্যের) পরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে শত্রু বাহিনীর দিক হইতে ফিরাইয়া দিলেন। (তোমরা শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করিয়া শত্রুদেরকে তাড়া করিয়া নিয়া যাইতেছিলে; শত্রুদল পরাজিতরূপে পলায়নরত ছিল। এখন উহার বিপরীত শত্রুদল তোমাদিগকে ধাওয়া করিয়া তাড়াইয়া আনার প্রয়াস পাইল, তোমরা পরাজিতরূপে দ্রুত ছুটিতে লাগিলে।) এই অবস্থা সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন—(কে পাকা মোমেন, আর কে কাঁচা।) অবশ্য (যাহা ঘটিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (সেই ত্রুটির গোনাহ) ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন; আল্লাহ তায়ালা মোমেনগণের প্রতি অতিশয় মেহেরবান। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মোসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং শত্রু সেনাকে রণাঙ্গন হইতে উচ্ছেদ করা, অতঃপর তীরান্দাজ বাহিনীর লোকদের ভুল ধারণার বশীভূত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়া তথা যুদ্ধের অবসান ধারণা করিয়া নির্দ্ধারিত ঘাটি ত্যাগ করা এবং তদ্দরুন অবস্থার অবনতি ঘটা ইত্যাদি বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

১৪৪০। **হাদীছ :—**বরা ইবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদের দিন আমরা কাফের শত্রু সেনার সম্মুখীন হইলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

তীরান্দাজ বাহিনীর একটি দলকে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের অধিনায়কত্বে একটি নির্দ্ধারিত স্থানে বসাইয়া দিলেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিল যে— আমাদিগকে বিজয়ী দেখিলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিও না এবং আমাদের উপর শত্রুর বিজয় দেখিতে পাইলেও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমাদের সাহায্যে আসিও না। এইরূপ ব্যবস্থাধীনে যখন আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম তখন শত্রুগণ রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। এমনকি (তাহারা যে বিশেষ দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য নারীগণকে সঙ্গে আনিয়াছিল সেই) নারীরাও দ্রুত দৌড়িবার জন্য পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিয়া ছুটাছুটি করিয়া পাহাড়ের আড়ালে যাইতেছিল।

এমতাবস্থায় তীরান্দাজ বাহিনীর লোকগণ বলিয়া উঠিলেন, শত্রুগণের ধন-সম্পদ তথা গনিমতের মালের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হউক। অধিনায়ক আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে এই নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। অধিকাংশ সঙ্গিগণ উপস্থিত পরিস্থিতিতেও সেই আদেশ বলবৎ আছে বলিয়া স্বীকার করিল না। সেই আদেশ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটিল, ফলে সত্তর জন ছাহাবী শহীদ হইলেন।

শত্রু সেনার দলপতি আবু সুফিয়ান মোসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) জীবিত আছেন কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কোন উত্তর দিও না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, ইবনে আবী কোহাফা (আবু বকর (রাঃ)) জীবিত আছেন কি? হযরত (দঃ) উত্তর দানে নিষেধ করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র (ওমর (রাঃ)) জীবিত আছেন কি? এইবারও হযরত উত্তর প্রদানে নিষেধ করিলেন। ইহার উপর আবু সুফিয়ান মন্তব্য করিল—তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে, তাহারা জীবিত থাকিলে নিশ্চয় উত্তর প্রদান করিত। তাহার এই মন্তব্য শ্রবণে ওমর (রাঃ) নিজকে বারণ রাখিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধ ভরে বলিয়া উঠিলেন, হে খোদার দুশমন! তুই মিথ্যা মন্তব্য করিতেছিস্; তোকে পদদলিতকারী তাঁহাদের সকলকেই আল্লাহ তায়ালা জীবিত রাখিয়াছেন।

অতঃপর আবু সুফিয়ান اعل هبل "হুবালের জয়" বলিয়া ধ্বনি দিল ("হুবাল" তাহাদের একটি দবতার নাম)। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে এই ধ্বনির প্রতিউত্তর দানের আদেশ করিলেন এবং সমবেত স্বরে এই ধ্বনি দিতে বলিলেন الله اعلى واجل "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমহান।"

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলিল, لنا العزى ولا عزى لكم "আমাদের ওজ্জা (দেবতা) আছে, তোমাদের উহা নাই"। হযরত (দঃ) ছাহাবীগণেকে ইহার প্রতিউত্তর দানের আদেশ করিলেন, এবং সমবেত স্বরে এই ধ্বনি দিতে বলিলেন— الله مولانا ولا مولا لكم "আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী আছেন, তোমাদের কেহ সাহায্যকারী নাই।" আবু সুফিয়ান

(তাহার গর্ব-ধ্বনির প্রত্যুত্তরে স্তব্ধ হইয়া) বলিল, আজিকার দিন বদরের দিনের বিনিময়ে ; হার-জিত পালাক্রমেই হইয়া থাকে। আবু সুফিয়ান আরও বলিল, নিহতদের নাক-কান কাটার ঘটনা ঘটিয়াছে বটে, উহা আমার আদেশে হয় নাই, অবশ্য আমি অসন্তুষ্টও নহি।

১৪৪১। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদকালীন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর অধীনে পদাতিক তীরন্দাজ বাহিনীকে এক নির্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই তীরন্দাজ বাহিনীর ত্রুটির দরুণ যখন মোসলমানগণ বেকায়দায় পতিত হইলেন এবং চতুর্দিক হইতে শত্রুর কবলে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন তখন মোসলমান সৈন্য দলের শৃঙ্খলা বাকি থাকিল না ; এক একজন এক একস্থানে আবদ্ধ রূপে লড়াই করিতে ছিলেন—কেহ বা শহীদ হইতে ছিলেন, কেহ বা শত্রু সেনা ভেদ করিয়া আসিতেছিলেন। এবং (কিছু সংখ্যক লোক) পরাজিত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে পেছন হইতে ডাকিতেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا......

অর্থ—তোমাদের উপর যখন বিপদের করালছায়া নামিয়া আসিল, অবশ্য তোমরা ইতিপুর্বে শত্রু পক্ষকে ইহার দ্বিগুণ বিপদে পতিত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলে (সেই অবস্থার রূপ ধারণে) তোমরা স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিলে, আমাদের উপর এই বিপদ কোথা হইতে আসিল ? আপনি তাহাদিগকে তদুত্তরে বলিয়া দিন, তোমাদের পক্ষ হইতেই তোমাদের উপর এই বিপদ আসিয়াছে। (অর্থাৎ তোমাদেরই ত্রুটির দরুণ তোমরা এই বিপদে পতিত হইয়াছ।) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করিতে সক্ষম। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

১৪৪২। হাদীছ :— সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় তীরদান হইতে সমুদয় তীর আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আমাকে (স্নেহভরে) বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি উৎসর্গ ; তুমি যথাসাধ্য তীর ছুড়িতে থাক।

১৪৪৩। হাদীছ :—আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একমাত্র সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ)-ই এইরূপ সৌভাগ্যশালী ছিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় মাতা-পিতা উৎসর্গ বলিয়া তাহার সম্পর্কে উক্তি করিয়াছিলেন—অন্য কাহারও সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ঐরূপ উক্তি করিতে আমি শুনি নাই।

ব্যাখ্যা :— বিশিষ্ট ছাহাবী ছায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) তীর ছুড়িতে খুবই পটু ছিলেন, তাঁহার প্রত্যেকটি তীর কার্য্যকরী হইয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ছাহাবীগণের

গুণাগুণের বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়া থাকিতেন। আলোচ্য ঘটনায় হযরতের সেই অমায়িক স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মাতা-পিতা উৎসর্গের উক্তি হযরত (দঃ) মোবায়ের (রাঃ) সম্পর্কেও করিয়াছেন—আলী (রাঃ) তাহা শুনেন নাই।

১৪৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে এমন সময়ও গিয়াছে যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে একমাত্র ছায়াদ (রাঃ) এবং তাল্‌হা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন লোক ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—ওহোদ রণাঙ্গনে মোসলমানগণ শত্রুদল কর্তৃক সম্মুখ ও পশ্চাদ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার পর যখন সৈন্য দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া গেল তখন মোসলমান সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে পরিবেষ্টিত আকারে লড়িতে লাগিলেন। সেই বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলাবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গিগণের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্কের ছিল।

১৪৪৫। **হাদীছ ঃ**—কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর হস্ত অবশ অবস্থায় দেখিয়াছি; ওহোদের রণাঙ্গনে তিনি শত্রুগণ কর্তৃক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর সমুহ স্বীয় বাহু দ্বারা প্রতিহত করিয়াছিলেন।

১৪৪৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে যখন মোসলমান সৈন্যগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ) হযরতের নিকটে ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে একটি ঢালের আড়ালে আবৃত করিয়া রাখিলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বিশিষ্ট তীরান্দাজ ছিলেন, ওহোদের রণাঙ্গনে তিনি ২/৩টি ধনু ভাঙ্গিয়া ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন ব্যক্তিকে তীর লইয়া যাইতে দেখিলেই বলিতেন, তীরসমুহ আবু তাল্‌হার সম্মুখে রাখিয়া যাও। হযরত (দঃ) ঐ ঢালের আড়াল হইতে সময় সময় মাথা উঁচু করিয়া শত্রু পক্ষের প্রতি তাকাইতেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) কাতর স্বরে নিবেদন করিতেন, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ—আপনি মাথা উঠাইবেন না, হঠাৎ শত্রু পক্ষের তীর আপনার শরীরে লাগিয়া যাইতে পারে।

আনাছ (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রাঃ) এবং উম্মে ছোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ন্যায় ব্যক্তিবর্গকে ঐ দিন দেখিয়াছি, বিশেষ তৎপরতার সহিত নিজ নিজ পৃষ্ঠে বহন করতঃ মশক ভরিয়া ভরিয়া পানি আনিতেন এবং আহত ব্যক্তিবর্গের মুখে ঢালিয়া দিতেন।

১৪৪৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গনে প্রথম অবস্থায় শত্রুপক্ষ মোশরেকগণ পরাজিত হইল। (অতঃপর যখন মোসলমান সৈন্যদের পশ্চাৎদিকের পথ বাধামুক্ত পাইয়া খালেদ বাহিনী ঐ পথে মোসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইল) তখন (মোসলমান সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে) ইবলিস শয়তান চীৎকার করিয়া বলিল, হে মোসলমানগণ! তোমাদের পেছনে দেখ।

তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে মোসলমান সৈন্যদেরই অগ্রভাগ ও পশ্চাদ ভাগের মধ্যে সংঘর্ষ হইল। সেই পরিস্থিতিতে হোজায়ফা (রাঃ) দেখিলেন, তাঁহার পিতা ইয়ামন (রাঃ) মোসলমান সৈন্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হইতেছেন, তখন হে আল্লার বন্দাগণ! আমার পিতা, আমার পিতা—বলিয়া হোজায়ফা (রাঃ) চীৎকার করিলেন। কিন্তু তখন তরবারি সংবরণ সম্ভব হইল না, ইয়ামন (রাঃ) নিহত হইলেন। এই ঘটনায় হোজায়ফা (রাঃ) মর্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে কাহারও প্রতি কোন দাবী দাওয়া রাখিলেন না, বরং অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা চাহিলেন। অবশ্য হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তরে এই ঘটনার অনুতাপ চিরজীবন বাকি রহিল।

১৪৪৮। **হাদীছ:**—ছা'লাবা ইবনে মালেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) (স্বীয় খেলাফত কালে একদা) কতকগুলি চাদর কতিপয় মদীনাবাসী নারীর মধ্যে বন্টন করিলেন; একটি উত্তম চাদর অবশিষ্ট থাকিল। সকলেই অভিপ্রায় জানাইল যে, আপনার সহ ধর্মিনী—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা উম্মে-কুলছুমকে এই চাদরটি প্রদান করুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, না; মদীনাবাসিনী উম্মে ছালীৎ (রাঃ) ইহা লাভের অগ্রাধিকারিণী; তিনি ওহোদ-রণাঙ্গনে আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিয়াছিলেন।

হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদত:

১৪৪৯। **হাদীছ:**—জাফর ইবনে আম্র (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী রহমতুল্লাহ আলাইহের সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম। আমরা যখন "হেম্‌ছ" নামক স্থানে পৌছিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, ওয়াহ্‌শী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ হয় কি? তিনি ওহোদ রণাঙ্গনে কাফের দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহার অতর্কিত আক্রমণেই হামযা (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হাঁ—তাহার নিকট উপস্থিত হইব। ওয়াহ্‌শী "হেম্‌ছ" শহরেই বসাবস করিতেন, আমরা লোকদের নিকট তাঁহার খোঁজ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগকে তাঁহার খোঁজ দেওয়া হইল। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম। আমার সঙ্গী ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রঃ) কাপড়-চোপড়ে এরূপ আবৃত হইলেন যে, তাঁহার পা ও চক্ষুদ্বয় ভিন্ন আর কোন অংশ যেন দৃষ্টিগোচর না হয়। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রঃ) এই অবস্থায় ওয়াহ্‌শী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে চিনেন কি?

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন এবং একটু রসিকতার সহিত বলিলেন, না—চিনি না, তবে কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আদী ইবনে খেয়ার (রাঃ) "উম্মে কেতাল" নাম্নী একটি নারী বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে একটি ছেলে জন্মিয়াছিল এবং সেই ছেলের জন্য দাই বা ধাত্রী আমিই খোঁজ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলাম; তোমার পা দুইটি দেখিয়া সেই ছেলের ন্যায় মনে হয়। ওবায়দুল্লাহ (রঃ) যখন দেখিলেন যে, ওয়াহ্‌শী (রাঃ)

তাঁহাকে পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছেন তখন স্বীয় চেহারা উন্মুক্ত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনি হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদতের ঘটনা আমাদিগকে শুনাইবেন কি? তিনি বলিলেন—হঁা।

বদরের রণাঙ্গনে হাম্‌যা (রাঃ) তোয়ায়মা ইবনে আদী ইবনে খেয়ারকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার ভাতিজা—আমার মনীব জোবায়ের ইবনে মোতয়েম সেই আক্রোশে আমাকে বলিল, যদি আমার চাচার প্রতিশোধে হাম্‌যাকে তুমি হত্যা করিতে পার তবে তোমাকে আমি (দাসত্ব হইতে) মুক্তি দান করিব।

ওহোদ সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের নিকটস্থ যেই যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধের জন্য যখন মক্কাবাসীরা যাত্রা করিল তখন আমিও তাহাদের সহযাত্রী হইলাম। রণক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াইল, তখন (কাফের সৈন্যদলের মধ্য হইতে) 'সেবা' নামক বাহাদুর ময়দানে অবতরণ করিয়া মোসলমানদের প্রতি প্রতিদ্বন্দিতার আহ্বান জানাইল। হাম্‌যা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি লাফাইয়া পড়িলেন এবং হে খত্‌নাকারিণীর পুত্র সেবা। তুই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতা বাঁধিয়াছিস্? এই বলিয়া তরবারির এমন আঘাত করিল যে, সেবার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গেল। (হাম্‌যা (রাঃ) যেই দিকেই ধাওয়া করিতেন সেই দিকেই বিপক্ষ সেনাদল শুষ্ক পাতার স্তুপ ছড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।)

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) বলেন, আমি হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উদ্দেশ্যে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। যখন তিনি আমার বরাবরে আসিলেন তখন আমি আমার (বিষাক্তরূপে প্রস্তুত) বর্শাটি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। বর্শাটি তাঁহার নাভির তলদেশে বিদ্ধ হইয়া পিছন দিকে বাহির হইয়া গেল। এই আঘাতেই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল।

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) বলেন, সেই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি মক্কায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। অতঃপর যখন মক্কা মোসলমানদের করতলগত হইয়া গেল তখন আমি 'তায়েফ' শহরে চলিয়া গেলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তায়েফবাসীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিল। আমি শুনিতে পাইলাম, হযরত (দঃ) প্রতিনিধি দলকে কোন প্রকারেই বিব্রত করেন না। তাই আমি এই সুযোগকে সযত্নে গ্রহণ করিলাম এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম (এবং ইসলামের কালেমা পাঠ করিলাম।) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই ওয়াহ্‌শী? আমি আরজ করিলাম, হঁা। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হাম্‌যা (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহা করিতে পার যে, তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে না আস?

অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগত ত্যাগের পর নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। আমি সেই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা করিলাম—আমি ভাবিলাম, যদি মিথ্যাবাদী মোসায়লামার ন্যায় ইসলামের শত্রুকে ধ্বংস করিতে পারি তবে হাম্‌যা (রাঃ)কে শহীদ করার কিছুটা বিনিময় সাধন সম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া আমি রণে যাত্রা করিলাম। রণক্ষেত্রে যাইয়া (আমি একটি দেয়ালের আড়ালে বর্শা হাতে লইয়া অপেক্ষমান রহিলাম)। দেওয়ালের একটি স্থান ভগ্ন ছিল সেই পথে আমি মোসায়লামাকে দেখিতে পাইলাম, সে উষ্ট্রের ন্যায় বিরাট দেহাকারের ছিল। যুদ্ধে লিপ্ততায় তাহার মাথার চুলগুলো এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখামাত্র আমি তাহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলাম এবং উহা বুকের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠের দিকে বাহির হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ একজন মদীনাবাসী ছাহাবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

ওয়াহ্‌শী (রাঃ) যে, সেই মিথ্যাবাদী মোসায়লামার হত্যাকারী ছিলেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ঘটনার মধ্যেও পাওয়া যায় যে, মোসায়লামার দলীয় একটি নারী তাহার শোক প্রকাশে বলিয়াছিল, আ···হ্‌! আমাদের আমীর, তিনি একটি অতি সাধারণ ব্যক্তি হাবশী গোলামের হাতে নিহত হইয়াছেন।

ওহোদের জেহাদে হযরতের আঘাতসমূহ ঃ

ওহোদ-জেহাদে রসুলুল্লাহ (দঃ) মূল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যখন বিপদের ছায়া নামিয়া আসিল, তখন মোসলমানগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, বড় বড় বাহাদুরগণ স্থানে স্থানে বেষ্টিতাকারে লড়িতেছিলেন, কিছু সংখ্যক ভীষণ আহত হইয়া রহিলেন, কিছু সংখ্যক হতাশ হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন; তখন হযরতের প্রতি শত্রুদের তীব্র আক্রমণ হয়। হযরত (দঃ) বহু সংখ্যক আঘাতে আহত হন। কতিপয় আঘাত ভয়ঙ্কর ছিল। (১) নীচের সারির ডান দিকস্থ চোখা দাঁতের বাম দিক সংলগ্ন দাঁতটির অংশবিশেষ প্রস্তরের আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়া ছিল। (২) নীচের ঠোঁটটি ভিতর দিকে যখমী হইয়া গিয়াছিল। (৩) লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া এইরূপে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, ওবায়দাতুবনুল জাররাহ্ (রাঃ) কর্তৃক উহা কামড় দিয়া বাহির করিতে তাঁহার দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

১৪৫০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ওহোদের যুদ্ধে আহত অবস্থায় অনুতপ্ত হইয়া) বলিতেছিলেন, ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালা ভীষণ ক্রুদ্ধ যাহারা স্বীয় পয়গাম্বরের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছে—এই বলিয়া তিনি স্বীয় ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যে ব্যক্তি জেহাদাবস্থায় আল্লার রসুলের হাতে নিহত হয় সে আল্লাহ তায়ালার ভীষণ ক্রোধের পাত্র।

ব্যাখ্যা—ওহোদের যুদ্ধেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আঘাতে উবাই ইবনে খলফ নামক কাফেরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সে দম্ভভরে হযরতের প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছিল। হযরত (দঃ) একটি ছোট বর্শা হাতে লইয়া তাহার গর্দানের উপর মারিলেন, সামান্য একটু যখম হইল, কিন্তু সে উহাতেই অস্থির হইয়া পড়িল, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত সে ঐ যখমেই মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

১৪৫১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অতি ক্রোধের পাত্র যাহার মৃত্যু আল্লার রসুলের হাতে ঘটিয়া থাকে।

ঐ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভীষণ ক্রোধ যাহারা আল্লার নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করিয়াছে।

১৪৫২। **হাদীছ ঃ**—ছাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জ্ঞাত আছি, কোন্ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষত ধৌত করিতেছিলেন এবং কোন্ ব্যক্তি পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন এবং কি বস্তু ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ফাতেমা (রাঃ) ধৌত করিতেছিলেন, আলী (রাঃ) পানি ঢালিতেছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখিলেন, পানি দ্বারা রক্ত বন্ধ হইতেছে না, তখন তিনি চাটাই ভাঙ্গা টুকরা আগুনে পুড়িয়া উহার ভস্ম দ্বারা যখমের মুখ ভরিয়া দিলেন রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

এতদ্ভিন্ন হযরতের একটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার চেহারার উপর বিভিন্ন যখম হইয়াছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ভাঙ্গিয়া মাথায় বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১৪৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ওহোদ-জেহাদের ঘটনার পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফজরের নামাযের মধ্যে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু হইতে দাঁড়াইয়া ছামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিয়া এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ۝

অর্থ—হে আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ কর ছাফ্‌ওয়ান ইবনে উমাইয়ার উপর, সোহায়েল ইবনে আম্‌রের উপর এবং হারেছ ইবনে হেসামের উপর। (৫৮২ পৃঃ)

হযরতের এই অভিশাপের প্রতিবাদে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হয়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

অর্থ—(আপনি কাফেরদের প্রতি আল্লার গজব তথা তাহাদের ধ্বংস কামনা করেন বা তাহাদের সৎপথ অবলম্বন করা হইতে নিরাশ হইয়া ব্যথিত হন, এইসব আপনার পক্ষে

সমীচীন বা ফলদায়ক নহে। কারণ, তাহাদের ধ্বংস হওয়া বা সৎপথের পথিক হওয়া সম্পর্কে) আপনার কোন অধিকার বা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ নাই। (এই সম্পর্কে সর্বাধিকারের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা; তিনি) হয়ত তাহাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি করিবেন (তথা সৎপথের পথিক বানাইবেন; ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত গণ্য হইবে।) কিম্বা তাহাদিগকে এইসব দুষ্কৃতির শাস্তি প্রদান করিবেন, কারণ তাহারা বাস্তবিকই দুষ্কৃতিকারী। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

● আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ওহোদের ঘটনায় (মক্কাবাসী কাফেরগণ কর্তৃক) ভীষণরূপে আঘাত পান। (তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়)। তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত মুছিতেছিলেন এবং (অনুতপ্ত হইয়া অভিশাপ উদ্দেশ্যে) বলিলেন, كيف يفلح قوم شجوا نبيهم "ঐ জাতির মুক্তি ও মঙ্গল কিরূপে সম্ভব হইবে যাহারা স্বীয় পয়গাম্বরকে এইরূপে যখমী করিয়াছে? (অথচ সেই পয়গাম্বর তাহাদিগকে তাহাদের স্রষ্টিকর্তার প্রতি আহ্বান জানাইতেছেন।)" হযরতের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাযেল হয়—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ

ব্যাখ্যাঃ— হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসী কাফেরদের আচরণে অনুতপ্ত হইলেন, এমনকি তাহাদের প্রতি বদ-দোয়ার বাক্যও হযরতের মুখে উচ্চারিত হইল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দয়ার দরিয়া ধৈর্য্যের পাহাড় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তায়েফের ঘটনায় কাফেররা হযরতের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষিত করিয়াছিল, তাঁহার মাথার রক্ত পায়ের জুতাকে আটকাইয়া দিয়াছিল, তিনি আঘাতের অসহ্য যাতনায় চৈতণ্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্লার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ প্রতিশোধের অনুমতি চাহিতে ছিলেন এই অবস্থায়ও হযরত দয়া ভুলেন নাই, ধৈর্য্য হারান নাই; কষ্ট যাতনা প্রদানকারীদের পক্ষে সৎপথ অবলম্বনের দোয়া করিয়াছেন, বরং সেই আশাও পোষণ করিয়াছেন। তদ্রূপ আলোচ্য ওহোদের ঘটনায়ও হযরত তাঁহার ধৈর্য্য ও দয়া ছাড়িতে পারেন নাই। 'যোরকানী' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, এই ঘটনায়ও হযরত আহত হইয়া রক্তের ফোটা মাটিতে পড়িতে দেন নাই; তাহার রক্তের ফোটা মাটিতে পড়িলে ভূপৃষ্ঠে আল্লার গজব আসিবে, তাই তিনি স্বীয় রক্ত নিজ হাতে মুছিতে ছিলেন এবং বলিতে ছিলেন— اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون "হে আল্লাহ আমারই গোত্রীয় লোকদের কার্য্য তুমি ক্ষমা কর; তাহারা নির্বোধ।"

এতদসত্ত্বেও ওহোদের ঘটনায় কাফেরদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা এইরূপ চরমে পৌছিয়াছিল যে, সেই অবস্থায় অনুতাপ ও বিরক্তি প্রতিরোধ করা মানুষ হিসাবে হযরতের জন্য সম্ভব হইয়াছিল না।

এখানেই আল্লাহ পাকের অসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিদ্রোহীগণ কর্তৃক স্বীয় প্রতিনিধি মাহবুবের এইরূপ অত্যাচারিত হওয়াকে ধৈর্য্য সহকারে শুধু নিবিড় নিরীক্ষণই করিতে ছিলেন না, বরং এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণে রক্তাক্তাবস্থায় পতিত স্বীয় মাহবুবের মুখে অনুতাপের বাক্যও বরদাশ্‌ত করিলেন না। আল্লাহ তায়ালা আপন বন্ধুগণ হইতে যাহা পাইতে চান তাহা এই যে—"আমার পথে কষ্ট-যাতনা সহ্যই করিয়া যাইবে উহুও করিতে পারিবে না।"

ওহোদের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত :

ওহোদের রণাঙ্গনে মোসলমানদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতিই হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই অবস্থায়ও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত মোসলমানদের পক্ষে থাকার কতিপয় নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা শর্বশক্তিমান। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সব কিছু ঘটাইতে পারেন, কিন্তু ইহজগৎ মানবের পরীক্ষাকেন্দ্র ও কর্মস্থল; সাধারণতঃ ও স্বাভাবিকরূপে ইহজগতে আল্লাহ তায়ালা মানবের কার্য্যের মাধ্যমেই ফলাফল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার উর্দ্ধে কোন ফল লাভ হইলে উহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত। সেই বিশেষ রহমত কদাচিত মানবের কার্য্যধারার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের বিপরীত বা বহু গুণ উর্দ্ধে হইয়া থাকে, সেইরূপ হইলে উহা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তাঁহার কুদরত অসীম; কিন্তু উহার নিদর্শন সর্বাবস্থায় প্রকাশিত হওয়ার বাধ্য-বাধকতা নাই। স্বাভাবিক ও সাধারণরূপে মানবের কার্য্যধারার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের ভিতর দিয়াই আল্লাহ তায়ালা কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত; এই ধরণের রহমতই ওহোদের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হইয়াছিল। মোসলমানদের স্বীয় কার্য্যধারার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর দিয়াই আল্লাহ তায়ালার কৃপার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা ওহোদ-রণাঙ্গনেও মোসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাইয়াছিলেন।

১৪৫৪। হাদীছ :— সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের রণাঙ্গণে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি তাঁহার সঙ্গে দুইজন লোক তাঁহার পক্ষ হইয়া লড়াই করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধানে সাদা পোষাক। ইতিপুর্বে তাঁহাদিগকে দেখি নাই, যুদ্ধের পরেও আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই। (৫৮০পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে যে, এই দুইজন ছিলেন মানুষ বেশে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা এই ভীষণ অবস্থায় ফেরেশতাগণের দ্বারা হযরতের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আঘাত হইতে রক্ষা করেন নাই; এই ধরণের ঘটনা সমুহ আল্লাহ তায়ালার বেনেয়াজির অজ্ঞেয় এবং অনাবিষ্কৃত ভেদ-রহস্য।

এতদ্ভিন্ন কোরআন শরীফে আরও একটি বিশেষ রহমতের উল্লেখ আছে—

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ ○

অর্থ—তোমরা কষ্ট ক্লিষ্ট চিন্তামগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চিন্তা দূরীভূত করিয়া প্রসন্নতা ও শান্তি আনয়নের জন্য তোমাদের উপর নিদ্রা-ভার চাপাইয়া দিলেন। সেই নিদ্রা তোমাদের একটি দল (তথা খাঁটী মোমেনগণকে) পরিবেষ্টিত করিয়া লইয়াছিল। (পক্ষান্তরে রণাঙ্গনের মধ্যেও যে কতকজন মোনাফেক ছিল তাহারা এই নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া নানা কুচিন্তায় মগ্ন হইল।) (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

১৪৫৫। **হাদীছ**:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ-জেহাদের দিন বলিয়াছেন, ঐ যে জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় ঘোড়ার লাগাম হাতে রণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে সমরাস্ত্র রহিয়াছে। (৫৭৮ পৃঃ)

১৪৫৬। **হাদীছ**:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা (রাঃ) নিজের অবস্থা বয়ান করিয়াছেন যে, আমিও ঐ দলে ছিলাম—ওহোদের রণাঙ্গনে যাহাদিগকে নিদ্রা পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। এমনকি নিদ্রা ভারে আমার হাত হইতে তরবারি বার বার পতিত হইতেছিল—বার বার আমি উহাকে উঠাইতাম।

ব্যাখ্যা:—ক্ষয়-ক্ষতি, যখম ইত্যাদি পীড়াদায়ক ও যাতনাদায়ক—ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সবের চিন্তায় মগ্ন ও জর্জরিত থাকা অধিক পীড়া ও যাতনাদায়ক। পক্ষান্তরে এইরূপ অবস্থায় চিন্তামগ্ন না থাকিয়া নিদ্রামগ্ন হওয়া শান্তি আনয়নে অধিক সহায়ক হয়। সেই হিসাবেই আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মধ্যে দ্রুত শান্তি আনয়নের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেরূপ কেহ আছাড় খাইয়া হাত-পা বিকল হইয়া পড়িলে ডাক্তার উহার উপর অস্ত্রপাচার করেন, কিন্তু উহা সত্বর শুষ্ক হওয়ার জন্য ব্যাণ্ডিজের ব্যবস্থাও করেন।

মোসলমান সৈনিকদের ত্রুটি মার্জনার ঘোষণা:

মোসলমানদের যে ত্রুটি হইয়াছিল, উহার বিষময় ফল ভোগ হইতে মোসলমানগণ নিস্তার পাইলেন না, বরং উহাতে সকলেরই অংশীদার হইতে হইল—

چوں از قومے یکے بیدانشی کرد × نہ کہ را منزلت باشد نہ مہ را

"দলের মধ্যে একজন মানুষের অসতর্কতার দরুনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, ছোট-বড় সকলকেই উহার খারাব পরিণাম ভোগ করিতে হয়।"

কিন্তু যেহেতু মোসলমানদের ঐ ত্রুটি ইচ্ছাকৃত তথা কোন প্রকার বিরোধী মনোভাবযুক্ত ছিল না, বরং একটি ভুল ধারনা প্রসূত ছিল মাত্র, তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বারংবার স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের ত্রুটি মার্জনা ও ক্ষমার ঘোষণা

দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং যেহেতু মোসলমানদের পক্ষে এই ধরণের অতর্কিত বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি ইহাই সর্বপ্রথম ছিল, তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে বিভিন্ন রকমে বুঝ-প্রবোধও দিয়াছেন। যথা—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ...

অর্থ—যাহারা (ওহোদের রণাঙ্গনে) শত্রু সেনাদলের সম্মুখীন হওয়ার দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিয়াছিল তাহাদের স্বীয়কৃত নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির* দরুণ শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইতে প্রয়াস পাইয়াছিল। আল্লাহ তাহাদের সব কিছু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন; (তাহাদের প্রতি কেহ কটাক্ষ করিবে না।) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী, অতিশয় ধৈর্য্যশীল। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

এই আয়াতেরই একটু পূর্বে অপর আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ولقد عفا عنكم "আল্লাহ তোমাদের কৃত ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন."

মোসলমাদেরে বুঝ-প্রবোধ দান এবং ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে সুফল দানের বয়ান :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○......

অর্থ—নিরুৎসাহ হইও না, চিন্তিত হইও না এবং বিশ্বাস রাখিও যে, তোমরাই প্রাবল্য ও প্রাধান্য লাভ করিবে যদি তোমরা খাঁটী মোমেন প্রতিপন্ন হও। (আজ) তোমরা ঘায়েল হইয়াছ বটে. (কিন্তু ইহা শত্রুপক্ষ কাফেরদের প্রাধান্যের প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ পূর্বে—বদরের রণাঙ্গনে) শত্রুপক্ষও এইরূপ ঘায়েল হইয়াছিল। জাগতিক জীবনে) বিভিন্ন দলের মধ্যে পালাক্রমে জয়-পরাজয়ের সুযোগদান করা আমার একটি সাধারণ রীতি। এতদ্ভিন্ন (এই জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা খাঁটি ঈমানেদারগণকে প্রকাশ্যে দেখিয়া নিতে চান, আর তোমাদের শাহাদৎ লাভের সুযোগ দিতে চান এবং খাঁটী মোমেনগণকে গোনাহ মাফ করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে এবং কাফেরদের মূল উচ্ছেদ করিতে চান।

---

* এই আয়াতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ রণাঙ্গণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দেশ-বিরোধী কার্য্য—নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করার ত্রুটিও তন্মধ্যে একটি।

ইহা একটি স্বাভাবিক বাস্তব তথ্য যে, এক গোনাহ অন্য গোনাহের প্রতি টানিয়া নেয়। সেমতেই তাহাদের ঐ গোনাহ তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটাছুটি করার গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে, যেরূপ এক ব্যাধি অন্য ব্যাধিকে, এক উপসর্গ অন্য উপসর্গকে টানিয়া আনিয়া থাকে। এমনকি একই দলের কতিপয় ব্যক্তির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে যখন অন্য ত্রুটির সৃষ্টি হয় তখন উহাতে ঐ দলীয় অন্য লোকও জড়াইয়া পড়ে।

তোমরা কি ভাবিয়াছ—তোমরা বেহেশত লাভের অধিকারী হইয়া বসিবে এইরূপ পরিস্থিতির পূর্বেই যদ্দারা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে দেখিয়া লইবেন, তোমাদের দলের মধ্যে কে কে (দীনের জন্য) সংগ্রামকারী ও ধৈর্য,শীল?

তোমরা ত পূর্বে (জেহাদের সুযোগ লাভে) মৃত্যু (বরণ পূর্বক শাহাদৎ) লাভের আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকিতে; এখন সেই আকাঙ্খার বস্তু দেখিতে পাইয়াছ। (৪ পারা ৫ রুকু)

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ...

অর্থ— (ওহোদের রণাঙ্গনে) শত্রু-সেনাদলের সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের উপর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়ই ঘটিয়াছিল; (যাহাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল এবং) এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, কে খাঁটী মোমেন ও কে মোনাফেক তাহা প্রকাশ পাইয়া যায়। (৪ পাঃ ৮ঃ)

ব্যাখ্যাঃ—ওহোদের জেহাদে মোসলমানগণ অনেক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মোসলমানগণকে এই ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে পতিত করার কতিপয় সুফলের বর্ণনা ও ইঙ্গিত উক্ত আয়াতদ্বয়ে করা হইয়াছে। যথা—

(১) আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমেই খাঁটী ভক্ত ও স্বার্থ শিকারীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলেও খাঁটী মোমেন ও মোনাফেকের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। যাঁহারা খাঁটী মোমেন ছিলেন তাঁহারা দল ত্যাগীও হন নাই বা বিপদ দেখিয়া কোন সংশয়ের সম্মুখীও হন নাই। পক্ষান্তরে যাহারা মোনাফেক ছিল তাহাদের অধিকাংশ পথিমধ্য হইতেই দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যাহারা স্বীয় মোনাফেকীকে গোপন রাখায় যত্নবান ছিল তাহারা ঐ সময় দল ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যায় নাই, বরং শেষ পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল, কিন্তু আপদ-বিপদের দরুন তাহারা নানাপ্রকার সংশয়ে পতিত হয় এবং দোষারোপের উক্তি করে। দল ত্যাগী মোনাফেকদের বর্ণনার আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকদের বর্ণনার আয়াত এই—

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ......

অর্থ—তোমাদের সঙ্গে অপর একটি দল আছে যাহাদের মনে স্বীয় জান বাঁচাইবার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। তাহারা আল্লাহ সম্পর্কেও ভিত্তিহীন নির্বুদ্ধিতামুলক ধারণা জন্মাইতেছে (যে, রসুল ও মোসলমানদের সব কিছুর এখানেই পরিসমাপ্তি; আল্লাহ তাহাদের সহায়ক হওয়ার আশা-ভরসার অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি) তাহারা এইরূপ উক্তিও করিয়া থাকে যে, আমাদের কথা কি কেহ শোনে? আমাদের কথা শোনা হইলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত না। (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

(২) "কতিপয় মোসলমানকে শাহাদৎ লাভের সুযোগ প্রদান করা।" শাহাদৎ যে কি অমূল্য বস্তু তাহার বর্ণনা সম্মুখে রহিয়াছে।

(৩) "আপদ-বিপদ, ক্ষয় ক্ষতির দ্বারা মোসলমানদের গোনাহ খাতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতঃ তাহাদিগকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা"। হাদীছ শরীফে আছে- মোসলমানের প্রতিটি কষ্ট-ক্লেশেই তাহার গোনাহ মাফ হয়, এমনকি তাহার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার যে কষ্ট হয় সেই কষ্টটুকু দ্বারাও তাহার গোনাহ মাফ হয়।

(৪) "কাফেরদের ধ্বংস সাধন করা।" আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা কাফেরদেরকে মোসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ধ্বংস করা। এমতাবস্থায় যদি প্রত্যেক ঘটনায়ই কাফেররা পরাজিত হইতে থাকে তবে ২/৪টি ঘটনার পর কাফেররা সম্মুখে আসিবে না, দুরে দুরে থাকিয়া মোসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকিবে। ইহাতে তাহাদের মূলউচ্ছেদ কঠিন হইবে। সময় সময় তাহারা স্বীয় বিজয়রূপ দেখিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে উৎসাহিত হইবে এবং ধীরে ধীরে তাহারা নিঃশেষ হইতে থাকিবে, যেরূপ মক্কাবাসী কাফের শত্রুদের অবস্থা ঘটিয়াছিল।

(৫) সংগ্রাম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দানে বেহেশত লাভের উপযোগী হওয়া; কারণ, কষ্ট বিনে মিষ্ট লাভ হয় না।

(৬) মোসলমানগণ পুর্বাহ্নে যেই জিনিসের আকাঙ্খা করিতে ছিলেন তথা শাহাদতের মৃত্যু, সেই বস্তু তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দেওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জেহাদে শহীদ হওয়ার ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - بَلْ اَحْيَاءٌ .....

অর্থ—যাঁহারা আল্লার রাস্তায় প্রাণ দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মৃত গণ্য করিও না, তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভকারী, তাঁহারা (বিশেষ রূপে নানারকম) নেয়ামত উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আল্লার প্রতিদানের উপর অতিব সন্তুষ্ট, এমনকি যে সমস্ত ভাই-বেরাদর (জাগতিক জীবনে রহিয়া গিয়াছেন—) তাঁহাদের সঙ্গে এখনও মিলিত হয় নাই তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, (আমাদের ন্যায় তাহারাও শাহাদৎ বরণ করিলে) তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকিবে না। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

(৭) রসুলের আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনে যে কি অমঙ্গল নামিয়া আসে তাহার প্রত্যক্ষ নমুনা দেখাইয়া এবং ফল ভোগাইয়া মোসলেম জাতিকে চিরকালের জন্য সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া। ওহোদ-রণাঙ্গনে বিজয় ত মোসলমানদের করতলে আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার ফলেই সেই বিজয় তাঁহাদের

হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালার কালামে এই বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۗ قُلْ هُوَ

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"যখন তোমাদের উপর আঘাত লাগিল যে আঘাতের দ্বিগুণ আঘাত তোমরা শত্রুকে লাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলে তখন উৎকণ্ঠিত স্বরে তোমরা বলিতে লাগিলে, এই বিপদ আমাদের উপর কোথা হইতে—কেন আসিল ? (আমরা ত মোসলমান ; বেদীনদের হাতে আমরা কেন আঘাত খাইলাম।) আপনি বলিয়া দিন, এই আঘাত তোমাদের উপর তোমাদের পক্ষ হইতেই—তোমাদের কারণেই লাগিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সব রকম শক্তিই রাখেন।" (৪ পারা ৮ রুকু)

ওহোদ-রণাঙ্গনে মক্কার কাফের বাহিনীর হাতে মোসলমান সত্তর জন শহীদ হইয়া ছিলেন; তাহাদের হাতে কেহ বন্দী হইয়া ছিলেন না। ইতিপূর্বে বদর রণাঙ্গনে মোসলমানদের হাতে ঐ কাফের বাহিনীর সত্তর জন নিহত হইয়াছিল এবং সত্তর জন বন্দী হইয়াছিল।

ক্ষয়-ক্ষতির উক্ত অনুপাত স্মরণ করাইয়া আল্লাহ তায়ালা বুঝাইতেছেন—বদর রণাঙ্গনেও তোমাদের রণসম্ভার ও সৈন্য সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় নগণ্যই ছিল, তবুও তোমরা শত্রুকে দ্বিগুণ আঘাত হানিতে এবং পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলে। আর সেই শত্রুর হাতেই তোমরা আজ তোমাদের বাড়ীর নিকটে ওহোদ-রণাঙ্গনে আঘাত খাইয়া গেলে! এখন নিজেরাই স্তম্ভিত হইতেছ, উৎকণ্ঠিত হইতেছ যে, আমাদের উপর আঘাত কেন লাগিল? শুনিয়া রাখ—তোমাদের উপর আঘাত তোমাদেরই ত্রুটির দরুন লাগিয়াছে। তোমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিপরিত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া এই আঘাতের সূচনা হইয়াছে।

এই সতর্ককরণ বিশ্ব-মোসলেমের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৮) মোসলমানদেরকে অতি প্রয়োজনীয় একটি ট্রেনিং ও শিক্ষা দেওয়া। সর্বদা বিজয়ই বিজয় কোন মানুষের বা কোন জাতির ভাগ্যেই জুটে না। জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ ও উত্থান-পতন উভয়ই জাগতিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী—ইহাই ইহ-জগতের স্বভাব; সুতরাং উভয়ের মধ্য দিয়াই মানুষ বা জাতির গঠন সম্পূর্ণ হয়।

দুঃখে-দুর্দিনে, পরাজয় ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দিনে হুঁশহারা হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, আত্মস্থ থাকিতে হইবে। বিপদে অধীর ও ব্যাকুল হইলে চলিবে না, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বিপদ কাটাইয়া উঠায় অগ্রসর হইতে হইবে। পতনের সম্মুখে উত্থানের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইবে—এই সব ট্রেনিং ও শিক্ষা মানুষ বা জাতি

গঠনের জন্য কত না প্রয়োজন। মোসলেম জাতির জন্য এই প্রয়োজনই ওহোদের রণাঙ্গনে নিষ্পন্ন করা হইয়া ছিল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ের ইঙ্গিত দানে বলিয়াছেন—

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ

(ওহোদ রণাঙ্গনে তোমরা ত্রুটি করিয়াছ;) যদ্দরুন আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিফল ভোগাইলেন—দুঃখের উপর দুঃখ, ভাবনার উপর ভাবনা; তোমরা যেন সম্মুখ জীবনে হুতাশ ও নিরাশ না হও—না লাভ ছুটিয়া যাওয়ায়, না বিপদ আসিয়া যাওয়ায়।" (৪পাঃ ৭রুঃ)

ওহোদ-রণাঙ্গনে মোসলমানগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ছিল, দুঃখ দুর্দশায় বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি বিজয় তাহাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া যাওয়ার পর তাহারা উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিপর্য্যয়ের বানে ডুবিয়া ছিল—এই দুর্ভাবনা এবং মনোব্যাথাও ছিল পাহাড় তুল্য। উল্লিখিত আয়াতে এই সব অবস্থাকেই "দুঃখের উপর দুঃখ, ভাবনার উপর ভাবনা" বলিয়া মোসলমানগণকে এই সবের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, দুঃখ-দুর্দশা, ভাবনা-চিন্তা ও শোক-বিয়োগে ভাজা করিয়া তোমাদিগকে পাকা-পোক্তা করা উদ্দেশ্য ছিল। একবার ভোগ করিয়া সম্মুখ জীবনে শত বার সহ্য করার সাহস ও বল তোমাদের অর্জিত হয়—এই উদ্দেশ্যেই তোমাদিগকে ঐ সব অবস্থার সম্মুখীন করা হইয়াছিল। গঠনোন্মুখ জাতির মধ্যে উক্ত সাহস ও বলের সঞ্চার বিশেষ প্রয়োজন; যেন বিপদ-সঙ্কুল পথে শত ভয়-ভীতিকে পদদলিত করিয়া অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকিতে পারে। এই শ্রেণীর শিক্ষা মোসলমানগণ সর্বপ্রথম ওহোদ-ক্ষেত্রেই লাভ করিয়া ছিলেন।

উক্ত শিক্ষার অতি সুন্দর নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন নবীজী (দঃ) এই ওহোদ-রণাঙ্গনে। সঙ্কট মুহূর্তে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়পদ থাকা, মৃত্যুর মুখামুখী দাঁড়াইয়াও কর্তব্যরত থাকা, মৃত্যুকে শুধু ইঞ্চি ব্যবধানে দেখিয়াও উদ্দেশ্যের লক্ষ্য ত্যাগ না করা—ইত্যাদি গুণাবলীর অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন নবীজী (দঃ) ঐ দিন। মৃত্যুর বাহন শত শত তীর বর্শা বেষ্টনকারীরূপে নবীজীর প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিল, দাঁত ভাঙ্গা মুখ হইতে এবং হাড় ভাঙ্গা মাথা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, আঘাত জনিত দেহের উপর আঘাত লাগিতেছিল, নবীজীর জীবন রক্ষায় ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইতেছিলেন—এই অবস্থায়ও মৃত্যুর পরওয়া না করিয়া রণাঙ্গন আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, মুহূর্তের জন্যও রণাঙ্গন হইতে পশ্চাদপদ হন নাই। মৃত্যুর বেষ্টনীতে থাকিয়াও হযরত (দঃ) বিক্ষিপ্ত মোসলেম সৈনিকদিগকে একত্রিত করার ডাক ছাড়িতে ছিলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এই দৃশ্যের বর্ণনা—

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

"ঐ ভয়াবহ মুহূর্তকে স্মরণ কর—যখন তোমরা ছিন্ন-ভিন্নরূপে ছুটাছুটি করিতে ছিলে, কেউ কাহারও প্রতি ফিরিয়া তাকাইতেও ছিলে না; আর রসুল (দঃ) পেছন হইতে তোমাদিগকে ডাকিতেছিলেন। (৪ পাঃ ৭ রুঃ)

আদর্শকে জয়যুক্ত করার চেষ্টায় মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াও কিরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয়, দ্বীন-ইসলামের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে কি পরিমাণ ত্যাগ তিতিক্ষার এবং আল্লার উপর ভরসা-বিশ্বাস ও ঈমানের প্রয়োজন হয় তাহারই চাক্ষুস দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন নবীজী (দঃ) ঐদিন মোসলেম জাতিকে।

(৯) ছাহাবীগণের ন্যায় অতুলনীয় ভক্তবৃন্দকে একটি বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে একদিন; সেই দিনে তাঁহাদের কর্তব্য কি হইবে সেই কর্তব্য পালন করিয়া দেখাইবার বা উহার শিক্ষা লওয়ার সুযোগ হইয়াছিল ওহোদ-রণাঙ্গনের ঘটনার অংশ বিশেষে।

নবীজী (দঃ) অমর হইয়া দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন না, ছাহাবীগণের ন্যায় ভক্তবৃন্দের উপর দ্বীন-ইসলামের বোঝা ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদের সামনেই তাঁহার তিরোধান হইবে একদিন—এই দিনটি অবশ্যই ছাহাবীগণের সম্মুখে আসিবে। এই দুর্বিসহ শোককে তাঁহারা কোন্ আলোকে গ্রহণ করিবেন—বিহ্বলরূপে হাত-পা ছাড়িয়া অসাড়-অচেতন হইয়া পড়িবেন বা উদভ্রান্ত হইয়া পথত্যাগী হইবেন, না—অক্ষুন্ন মনোবলের সহিত তাঁহারই পথে অগ্রাভিযান রাখিবেন? এই পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল ছাহাবীগণকে ওহোদ-প্রাঙ্গণে।

হঠাৎ গুজব—قُتِلَ مُحَمَّدٌ "মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) নিহত হইয়াছেন।" কিছু সংখ্যক ছাহাবী এই দুঃসংবাদেও কর্তব্যচ্যুত না হইয়া, বরং অধিক দুর্বার গতিতে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিলেন—যেমন, আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আর কিছু সংখ্যক, এমনকি লৌহ মানব ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন; তাঁহাদের শিক্ষা দানে কোরআনের সুদীর্ঘ কটাক্ষপাতের আয়াত নাযেল হইল—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ....

"মোহাম্মদ ত একজন রসুল; (খোদা নহেন, যে অমর হইবেন।) তাঁহার পূর্বে অনেক রসুলের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহারও যদি মৃত্যু ঘটিয়া যায় অথবা নিহতই হইয়া যান তোমরা কি তবে পশ্চাদ পথে ফিরিয়া যাইবে? পশ্চাদ পথে যে ফিরিয়া যাইবে সে (নিজেরই ক্ষতি করিবে;) আল্লার কোন ক্ষতি করিবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞদিগকে অচিরেই প্রতিদান দিবেন। কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না আল্লার হুকুম ছাড়া, আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া।" (৪ পাঃ ৬ রুঃ)

এই শিক্ষার কি স্বর্ণ ফল যে, ফলিয়াছিল তাহার নমুনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেদিন সত্যিই নবীজীর মৃত্যু ঘটিল ঐদিন ছাহাবীগণের উপর বিহ্বলতার যে কাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল উহা বর্ণনাতীত। সকলেই অসাড়-অচেতন। আবু বকর (রাঃ) নবজীর মসজিদে সকলকে একত্রিত করিয়া নবীজীর মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত আয়াত পাঠ করিলেন। উক্ত আয়াত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সকলের নব চেতনার উদয় হইল। এমনকি উক্ত আয়াত মুখে লইয়া সকলে মসজিদ হইতে বাহির হইলেন এবং মদীনার গলিতে গলিতে তাঁহারা ছড়াইয়া পড়িলেন; সারা মদীনা শহর উক্ত আয়াতের শব্দে গুঞ্জনিত হইয়া উঠিল। শোকাভিভূত বিহ্বল অচেতন মদীনার মোসলেম সমাজ উক্ত আয়াতের শিক্ষা ও আদর্শে নূতন প্রেরণা লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্মতৎপরতার নবরূপ উদ্যম উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল; ফলে আভ্যন্তরীণ মোনাফেক শত্রু এবং বিভিন্ন দিকের বহির্শত্রুরা হযরতের তিরোধানে যেই সুযোগের আশা করিতেছিল তাহাদের সেই আশার উপর ছাই পড়িয়া গেল। মোসলমানগণ আবু বকর (রাঃ) খলীফার নেতৃত্বে ভিতর-বাহিরের শত্রু দমনে পুরাদমে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অভিযান চালাইলেন। অচিরেই হযরতের তিরোধান লগ্নে সৃষ্ট সমুদয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিল। বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে পাঠ করিবেন।

ঐ স্বাভাবিক অবধারিত সঙ্কট সময়ে এই স্বর্ণফল ওহোদ-ঘটনায় প্রদত্ত শিক্ষা ও সেই উপলক্ষের আয়াত—কোরআনের বাণীর দ্বারাই লাভ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

জয়, না—পরাজয়?

মোসলমানগণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে পরাজয় বলা যায় না, বরং বে-কায়দায় পতিত হওয়ায় সত্তর জন সৈনিকের জীবন ক্ষয় হইয়াছিল মাত্র। কাফেরদের আটাশ জন বরং আরও অধিক নিহত হইয়াছিল।

বদরের যুদ্ধে মোসলমানদের চৌদ্দজনের মোকাবিলায় কাফেরদের সত্তরজন নিহত হইয়াছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধে শত্রু সেনা কাফেরগণের সত্তর জন বন্দিও হইয়াছিল। ওহোদের যুদ্ধে কোন মোসলমান কাফেরদের হস্তে বন্দী হন নাই। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছিয়া জয়ের দম্ভ করিলে পর তাহার জাতীয় লোক মধ্য হইতেই কেহ কেহ তাহার প্রতি এই তিরস্কার করিয়াছিল যে, তোমরা জয়ী হইয়া থাকিলে তোমাদের হস্তে কোন বন্দী নাই কেন?

সর্বোপরি জয়-পরাজয়ের মূল নিদর্শন—এক পক্ষের রণাঙ্গন পরিত্যাগ করা—ইহা বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে স্পষ্টতর বিদ্যমান ছিল। কারণ, তখন অবশিষ্ট কাফেররা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের পলায়নের পরও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় দলবল সহ বিজয় গৌরবের সহিত তথায় তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ওহোদের

যুদ্ধে মোসলমানগণ মুহূর্ত পূর্বেও প্রথমে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না, বরং মোসলমানদের দলপতি রসুলুল্লাহ (দঃ) রণাঙ্গনে স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। কতিপয় ছাহাবী বিহ্বল অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন তাঁহারাও হযরত জীবিত আছেন এই সুসংবাদ শুনা মাত্র বিজলী-গতিতে ছুটিয়া আসিয়া হযরতের নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। যে যেখানে ছিলেন সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—

يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"হে মোসলমানগণ। সুসংবাদ গ্রহণ কর—ঐ দেখ, রসুলুল্লাহ (দঃ)।" মোসলমানদের কানে এই শব্দ পৌঁছা মাত্র বিজলী-গতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা সমবেত হইলেন; যেরূপ গাভীর বাছুর মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসে।

এইরূপে মোসলমাগণ একত্রিত হইয়া সমবেতভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতঃ আক্রমণ প্রতিহত করাই নয় শুধু, বরং নব উদ্যমে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তখন মোসলমানদের কিরূপ দৃঢ় মনোবলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৪৪০ নং হাদীছে বর্ণিত কাফের দলপতি আবু সুফিয়ানের মন্তব্যের প্রতিউত্তরে ওমর (রাঃ) যে কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার মুখের উপর যে সব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন উহার দ্বারা পাওয়া যায়। পরাজিত দলের পক্ষে বিজয়ী দলের দলপতির প্রতি এইরূপ উক্তি প্রয়োগ সম্ভব হয় না এবং কোন বিজয়ী দল তাহা সহ্যও করিতে পারে না। সেই পরিস্থিতিতে আবু ফফিয়ান নানা প্রকার বিজয় ধ্বনি দিয়াছিল, কিন্তু মোসলমানগণ প্রতিউত্তরে স্বতঃস্ফূর্ত বিজয়-ধ্বনি দ্বারা তাহাদের ধ্বনিকে বিলীন করিয়া দেন। আবু সুফিয়ান মোসলমানদের মনোবল দেখিয়া স্বীয় বিজয়ের ভুল ধারণার অসাড়তা উপলব্ধি করিতে পারিল এবং উপস্থিত মুখ রক্ষার জন্য আগামী বৎসর বদরের ময়দানে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিল। মোসলমানগণ বীরত্বের সহিত তাহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন। আবু সুফিয়ান দলবল সহ রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এখনও স্বদলবলে রণাঙ্গনে বিদ্যমান। বরং বহু সময় তথায় অতিবাহিত করিলেন, সমস্ত শহীদানের দাফন-কাফন তথায়ই সমাধা করা হইল।

মোসলমানগণ যদি পরাজিতই হইবে তবে কোরেশরা মদীনা শহর আক্রমণ করিল না কেন? মদীনার শহরতলী ওহোদ প্রান্ত হইতে মক্কায় ফিরিয়া গেল কেন? সর্বপরি কথা এই যে, পর বৎসর বদর প্রান্তরে আবার যুদ্ধ হইবে—আবু সুফিয়ানের এই আস্ফালন তাহাদের পক্ষে কার্য্যে পরিণত হইল না কেন? অথচ মোসলমানগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

শহীদানের কাফন-দাফন :

১৪৫৭। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদের জেহাদের দিন দুই দুই ব্যক্তিকে এক একটি চাদরের নীচে রাখিয়া দাফন করিয়াছিলেন। তিনি দুই দুই জন একত্রে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণ কোরআন শরীফের শিক্ষা লাভ করিয়াছিল? যখন সেই অনুযায়ী একজন নির্দিষ্ট করা হইত, তখন তিনি তাহাকেই প্রথমে কবরে রাখিতেন। (এইরূপে নিজ তত্ত্বাবধানে সকলকে সেই ময়দানেই সমাহিত করিয়া) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য আমি কেয়ামতের দিন (আল্লার দরবারে) সাক্ষ্য প্রদান করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সকল শহীদানকে রক্তাক্তাবস্থায় দাফন করিলেন। তাঁহাদের উপর জানাযার নামায পড়িলেন না এবং তাঁহাদিগকে গোসলও দিলেন না।

ব্যাখ্যা :— শবদেহের আধিক্য; সত্তরটি শবদেহ ছিল। এতগুলি কবর খনন করা বিশেষতঃ যখন সকলেই আহত, শ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিলেন সহজ কার্য্য ছিল না। তাই এক একটি কবর অধিক প্রশস্ত করিয়া উহাতে একাধিক শবদেহ দাফন করা হয়।

কাফনের কাপড়ের সল্পতা ছিল, তাই নিয়মিত কাফন দান সম্ভব হয় নাই—এক একটি চাদরে একাধিক শবদেহ আবৃত করিয়া দেওয়া হয়।

সকল ইমামগণের ঐক্যমত্যপূর্ণ মাছআলা এই যে, আল্লার রাস্তায় জেহাদে শাহাদৎ বরণকারীকে তাঁহার রক্তাক্তদেহে ও রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করিতে হইবে তাঁহাকে গোসল প্রদান করা হইবে না। সেমতেই খুন-রঙ্গীন লেবাছে ওহোদের ময়দানে জেহাদকারী বীর শহীদানগণ শেষ শয়ন গ্রহণ করিলেন।

শহীদের প্রতি জানাযার নামায সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত এই যে, শহীদের প্রতি জানাযার নামায পড়িতে হইবে না। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। ইমাম আবু হানিফার মত এই যে, শহীদের প্রতি জানাযার নামায পড়া হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদানের উপর জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া কতিপয় হাদীছ অন্যান্য কেতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে দশ দশ জনের জানাযা একত্রে পড়িয়াছিলেন; প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পড়িয়াছিলেন না; সেই বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীছে জানাযার নামায পড়েন নাই বলা হইয়াছে।

১৪৫৮। হাদীছ :—খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করতঃ স্বীয় দেশ-খেশ সর্বস্ব পরিত্যাগ করি। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদের এই মহাত্যাগের ছওয়াব

স্থির ও সাব্যস্ত হয়। অতঃপর আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়া হইতে এইরূপ অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করেন যে, ইহজগতে ঐ মহাত্যাগের কোন প্রতিফলই ভোগ করেন নাই; মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে শাহদাৎ বরণ করিয়াছিলেন। একটি মাত্র সাধারণ কম্বল ব্যতীত আর কোন কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ স্বরূপ রাখিয়া যান নাই, এমনকি কাফনের জন্য আর কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঐ কম্বল দ্বারাই তাঁহার কাফন দেওয়া হয়। কম্বলটির দৈর্ঘ্য কম ছিল—উহার দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন বলিলেন, কম্বল দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও এবং এজখের (নামক ঘাস) দ্বারা পা আবৃত করিয়া দাও।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এমনও আছেন যাহারা (ইহজগতেই) স্বীয় আমলের বৃক্ষে ফল পাকিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং উহা ভোগ করিতেছেন।

ব্যাখ্যাঃ—ইসলাম শক্তিশালী ও উন্নত হওয়ার পর জেহাদের মাধ্যমে ছাহাবীগণ ইসলাম ও হিজরতের অছিলায় সচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই সুযোগকেই বৃক্ষের ফল পাকিবার সুযোগপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য এই সুযোগ দ্বারা ইসলামের ও হিজরতের ছওয়াব কম হইয়া যাইবে না, কিন্তু যাঁহারা এই সুযোগ পান নাই, বরং দুনিয়াকে অস্থায়ী মনে করতঃ নিছক অস্থায়ীরূপেই স্বেচ্ছায় কিম্বা সুযোগ না পাইয়া কষ্ট-ক্লেশের জেন্দেগী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহারা কষ্ট-ক্লেশের অতিরিক্ত প্রতিদান ও প্রতিফল নিশ্চয় লাভ করিবেন। উল্লিখিত হাদীছে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মোসলমানগণের অক্ষুন্ন মনোবল—

ওহোদের ঘটনায় মোসলমানগণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনোবল অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আসিয়া ছিল না এবং তাঁহাদের সাহসিকতারও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

১৪৫৯। **হাদীছঃ**—আয়েশা (রাঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ......

"যাহারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও আল্লাহ এবং রসুলের আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁহাদের স্থায় খাঁটি ও মোত্তাকীদের জন্য বড় প্রতিদান রহিয়াছে।" (৪ পাঃ ৯ রুঃ)

আয়েশা (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ স্বীয় ভাগিনা ওরওয়া (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার পিতা যোবায়ের (রাঃ) এবং নানা আবু বকর (রাঃ) উল্লিখিত লোকদের মধ্যে ছিলেন।

● রসুলুল্লাহ (দঃ) ওহোদের রণাঙ্গনে বহু ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হইলেন। শত্রুসেনা মোশরেকরা রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) (নানাপ্রকার সংবাদের দরুণ) আশঙ্কা করিলেন যে, শত্রুদল পুনঃ আক্রমণ চালাইতে পারে। শত্রুদলের সম্ভাব্য পুনঃ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ সত্তর জন ছাহাবী সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন, তন্মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)ও ছিলেন।

ব্যাখ্যা :—ইহা একটি ভিন্ন অভিযান ছিল; শনিবার দিন ওহোদের জেহাদ হইল, শেষ বেলা হযরত (দঃ) মদীনা শহরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রবিবার দিন ফজর নামাযের পূর্বেই হযরত (দঃ) সংবাদ পাইলেন, ওহোদ হইতে প্রস্থানকারী শত্রুদল পুনঃ মদীনার উপর আক্রমণের দ্বারা মোসলমান জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছে। হযরত (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)কে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করিলেন। তাঁহারা এই পরামর্শই দিলেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুদের প্রতিরোধ করা আবশ্যক। ফজর নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে আহ্বান জানাইলেন এবং ইহাও প্রচার করিয়া দিলেন যে, গতকল্য ওহোদের রণাঙ্গনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল একমাত্র তাহারাই এই অভিযানে যাইবে।

উপস্থিত ঐ মজলিসেই সত্তর জন প্রস্তুত হইলেন, এতদ্ভিন্ন ওহোদের জেহাদে অংশ-গ্রহণকারী অবশিষ্ট সকলেই প্রস্তুত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং তাঁহাদের নেতৃত্ব দানে যাত্রা করিলেন এবং মদীনা হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত "হামরাউল-আসাদ" নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিলেন। তথায় তিনি সোম, মঙ্গল, বুধ পূর্ণ তিন দিন অবস্থান করতঃ বৃহস্পতিবার তথা হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার মদীনায় পৌঁছিলেন। কাফের শত্রুদল পুনঃ আক্রমণের শুধু আলাপ-আলোচনাই করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে বিপরীত পরামর্শও দান করিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা মোসলমানদের অক্ষুন্ন মনোবল এবং উৎসাহ উদ্দীপনাময় অভিযানের সংবাদে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

ওহোদ-রণাঙ্গনের ক্ষয়-ক্ষতির শোকে সদ্য শোকাভিভূত এবং রক্তাক্ত ও আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় ছাহাবীগণ পুনঃ জেহাদের যে, উৎসাহ-উদ্দীপনার শুধু পরিচয়ই দিলেন না, বরং কার্য্যক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন সেই অপরূপ দৃশ্যের প্রেক্ষিতেই ছাহাবীগণের গুণগান ও সুসংবাদ দানে উপরোল্লিখিত আয়াত নাযেল হইয়াছিল।

ওহোদের জেহাদের ফলাফল সম্পর্কে রসুলুল্লার স্বপ্ন :

১৪৬০। হাদীছ :— আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আমার তরবারিটি নাড়া দিলাম, উহা মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া গেল; (এখন আমি বুঝিতে পারিলাম,) উহা ওহোদ

রণাঙ্গনে মোসলমানদের উপর আগত বিপদের প্রতিচ্ছবি ছিল। (আমি আরও দেখিয়াছিলাম যে,) অতঃপর আমি তরবারিটিকে পুনঃ নাড়া দিলাম, উহা অতি সুন্দর সুশ্রী হইয়া গেল; মোসলমানগণ যে পরমুহূর্তে একত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল এবং জয় তাহাদেরই রহিল তাহাই অর্থ ছিল স্বপ্নের এই অংশের।

আমি স্বপ্নের মধ্যে ইহাও দেখিয়াছিলাম যে, একটি গরু জবেহ করা হইল এবং স্বপ্নের মধ্যেই ইহাও জ্ঞাত হইলাম যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান অতি উত্তম। গরু জবেহ হওয়ার অর্থ ছিল—মোসলমানগণের শাহাদৎ বরণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান উত্তম হওয়ার অর্থ ছিল—পরবর্তীকালে মোসলমানদের খাঁটী ও নিষ্ঠাবানরূপে কার্য্য করার তৌফিক এবং সাহস ও মনোবল যে শুভ প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বদরের অভিযান উপলক্ষে।

ব্যাখ্যা :—দ্বিতীয় বদরের অভিযান ওহোদের পরবর্তী বৎসর চতুর্থ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহোদের ময়দান পরিত্যাগের পূর্বে কাফের দলপতি আবু সুফিয়ান গর্বভরে এই বলিয়া গিয়াছিল যে, বদরের ময়দানে আগামী বৎসর পুনরায় যুদ্ধের জন্য তোমাদিগকে তারিখ দিয়া যাইতেছি। তখন মোসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই তারিখ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম।

নির্দ্ধারিত সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিলে পর মক্কাবাসী কাফেরগণ মোসলমানদের মনোবল নষ্ট করার জন্য তদবীর করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। "নোয়ায়েম ইবনে মসউদ" নামক এক সওদাগর বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কায় আসিয়াছিল, আবু সুফিয়ান তাহাকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বলিল, তুমি মদীনায় যাইয়া মোসলমানদিগকে এই প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা আতঙ্কিত করিও যে, মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র একত্র করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছিয়া ঐরূপ প্রোপাগাণ্ডা ছড়াইল, কিন্তু কাফেরদের উদ্দেশ্যের বিপরীত মোসলমানগণ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দানে বলিলেন, حسبنا الله ونعم الوكيل "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং অতি উত্তম কার্যনির্বাহক।"

রসুলুল্লাহ (দঃ) পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া নির্দ্ধারিত স্থান—বদরের ময়দানাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া আট দিন মক্কাবাসীদের অপেক্ষায় রহিলেন। আবু সুফিয়ান পঁচিশ শত সৈন্য সহ মক্কা হইতে যাত্রা করিল, কিন্তু মোসলমানদের দৃঢ় মনোবলের সংবাদে ভীত হইয়া পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া গেল। যুদ্ধ হইল না; মোসলমানগণ বিনা রক্তপাতে ছওয়াবের ভাগী হইলেন, এতদ্ভিন্ন তথায় একটি বাণিজ্য মেলার উপলক্ষ ছিল, সেই মেলায় মোসলমানগণ ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাইলেন, এইরূপে মোসলমানগণ দ্বীন ও দুনিয়া উভয় রকমের দৌলত সঞ্চয় করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি নিম্ন আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا......فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ -

অর্থ—(আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের প্রশংসা করিয়া বলেন,) যখন তাহাদিগকে এই সংবাদ দেওয়া হইল যে, (মক্কায়) লোকগণ তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; তখন এই সংবাদ তাহাদের ঈমানকে অধিক দৃঢ় করিয়া দিল এবং তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্যনির্বাহক। ফলে তাঁহারা বিনা কষ্টে আল্লার নেয়ামত ও করুণা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৪ পা: ৯ রু:)

ওহোদের জেহাদে আনছারগণের বিশেষ ভূমিকা ঃ

১৪৬১। **হাদীছ ঃ**—কাতাদাহ (র:) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন শহীদরূপে আনছার—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ অপেক্ষা কোন সম্প্রদায় অধিক সম্মানী হইবে না।

কাতাদাহ (র:) বলেন, ছাহাবী আনাছ (রা:) বলিয়াছেন, ওহোদ জেহাদে সত্তর জন (শহীদের অধিকাংশ) তাঁহারাই ছিলেন, বীরে-মউনার ঘটনায় সত্তর জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন। ইয়ামামার জেহাদের সত্তর জন শহীদ তাঁহারাই ছিলেন; এই যুদ্ধ খলীফা আবু বকরের আমলে মিথ্যা নবী মোসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। (৫৮৪ পৃ:)

১৪৬২। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদ-জেহাদের দিন এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, সুনির্দিষ্টরূপে বলুনত—জেহাদে যদি আমি শহীদ হইয়া যাই তবে আমার স্থান কোথায় হইবে? নবী (দ:) বলিলেন, বেহেশতে। ঐ সময় ঐ ব্যক্তির হাতে খুরমা ছিল যাহা সে খাইতে ছিল। উত্তর শুনা মাত্র সে হাতের খুরমাগুলি ফেলিয় দিয়া জেহাদে অবতরণ করিল এবং শহীদ হইয়া গেল। (৫৭৯ পৃ:)

১৪৬৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ ইবনে মালেক (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা আনাছ ইবনে নজর (রা:) বদর-জেহাদে অনুপস্থিত ছিলেন; ইহাতে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, কাফের-মোশরেকদের সঙ্গে আপনার সর্বপ্রথম যে জেহাদ হইল আমি উহাতে অনুপস্থিত থাকিলাম! পুনরায় কাফের-মোশরেকদের সহিত জেহাদে যদি আল্লাহ তায়ালা উপস্থিতির সুযোগ দান করেন তবে আমি কি করি তাহা আল্লাহই দেখিবেন।

ওহোদের জেহাদে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মোসলমানদের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! মোসলমানগণ যে, ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে উহার জন্য

আমি অনুতাপ প্রকাশ করিতেছি, আর মোশরেকরা যে, সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে— উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। এই কথা বলিয়া তিনি তরবারি লইয়া একাই সম্মুখ অগ্রসর হইলেন। বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে সায়াদ! কোথায় যাইতেছেন? বেহেশতের দিকে চলুন না কেন? আমি ত ওহোদ পর্বতের অদুরে বেহেশতের সুবাস পাইতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি যেরূপ করিলেন, সেরূপ করা আমার জন্য সম্ভবই হইল না।

আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ অবস্থায় তিনি শহীদ হইলেন। তাঁহার শরীরে তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাত আশি সংখ্যার অধিক ছিল এবং মোশরেকরা তাঁহার নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গসমুহ কাটিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার দেহ এরূপ ক্ষতবিক্ষত ছিল যে, তাঁহাকে সনাক্ত করা যাইতেছিল না; তাঁহার ভগ্নি তাঁহার আঙ্গুলের একটি বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা ছাহাবীগণ তাঁহার এবং তাঁহার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই এই আয়াতের অবতরণ ধারণা করিয়া থাকিতাম—

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

"মোমেনদের মধ্যে এমন লোকগণ আছেন যাঁহারা আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা পুর্ণ করায় সত্যবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন।" (৫৭৯ পৃঃ)

এই হাদীছের সহিত আরও একখানা হাদীছ উল্লিখিত রহিয়াছে উহার অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে "ছাহাবীগণের ফজিলত" পরিচ্ছেদে আনাছ ইবনে নজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনায় আসিবে।

মৃত্যুকালে ওহোদের শহীদগণ হইতে রসুলুল্লার বিদায় গ্রহণ:

প্রথম খণ্ডের ৬৯৯ নং হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী (দঃ) মৃত্যু-শয্যার রোগ অবস্থায় একদা ওহোদের শহীদগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিয়া মসজিদে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং জীবিত মৃত সকল হইতে চিরবিদায় গ্রহণ স্বরূপ একটি ভাষণ দান করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে রহিয়াছে।

● ওহোদের জেহাদের পর দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—প্রথমটি "রাজী"-এর যুদ্ধ যাহাকে "আজল" ও "কারা" গোত্রের ঘটনা বলা হয়, দ্বিতীয়টি বীরে-মউনার যুদ্ধ যাহাকে "রেয়েল" ও "জাকওয়ান" গোত্রের ঘটনা বলা হয়।

রাজীর ঘটনা

তৃতীয় হিজরী সনের শেষ ভাগের ঘটনা—আজল ও কারা গোত্রদ্বয়ের কতিপয় ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমাদের এলাকায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে ইসলামের প্রতি আগ্রহান্বিত, তাই আপনার ছাহাবীগণের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক তথায় দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করুন। এদিকে পুর্ব হইতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসী কোরায়েশ শত্রুদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের গোপন খবর জ্ঞাত হওয়ার জন্য ঐ এলাকায় স্বীয় লোক প্রেরণের ইচ্ছাও করিতেছিলেন। এদতাবস্থায় ঐ এলাকার লোকদের পক্ষ হইতে উক্ত আগ্রহ প্রকাশ পাওয়া একটি শুভ সুযোগ ছিল, তাই হযরত (দঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী আছেম ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে ছয় জন ছাহাবীকে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গেই প্রেরণ করিলেন—(১) আছেম (রাঃ), (২) মারছাদ (রাঃ), (৩) খোবায়েব (রাঃ), (৪) যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ), (৫) আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ), (৬) খালেদ ইবনে বকর (রাঃ)। এতদ্ভিন্ন আরও চার জনকে তাঁহাদের সহচররূপে পাঠাইলেন, যাঁহাদের মধ্যে মোয়াত্তাব ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)ও ছিলেন। সর্বমোট দশ জন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

মক্কার নিকটস্থ "রাজী" নামক এলাকায় তাঁহারা পৌঁছিলে পর ঐ আহ্বানকারী প্রতিনিধি দলই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাহাবীগণের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করিল এবং ঐ এলাকাস্থিত "বনু-হোজায়েল" গোত্রের শাখা বনু-লেহ্ইয়ান গোত্রের লোকদিগকে লেলাইয়া দিল। তাহারা একশত তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যাহারে দুইশত লোক ছাহাবীগণের প্রতি ধাওয়া করিল। মুষ্টিমেয় দশ জন ছাহাবী ঐ দুইশত লোকের মোকাবিলায় সংগ্রাম চালাইলেন, কিন্তু তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। বিস্তারিত ঘটনা নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪৬৪। **হাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আছেম ইবনে ছাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে একটি গোপন খবর সরবরাহকারী দল এক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যখন মক্কা ও ওসফান নামক এলাকাদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে পৌঁছিলেন তখন উক্ত এলাকাস্থিত বনু-হোজায়েল গোত্রের শাখা বনু-লেহ্ইয়ান গোত্রের লোকদের নিকট তাঁহাদের সংবাদ প্রদান করা হইল। ঐ গোত্রীয় লোকগণ প্রায় শতাধিক তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যাহারে তাঁহাদের প্রতি ধাওয়া করিল। পথিমধ্যে যে স্থানে ছাহাবীগণ খেজুর খাইয়াছিলেন শত্রুদল তথায় পৌঁছিয়া পতিত খেজুরের দানাগুলিকে মদীনার খেজুরের দানারূপে লক্ষ্য করতঃ সন্ধান লাভ করিল যে, মোসলমানগণ এই পথেই গিয়াছে। তাহারা ঐ পথ ধরিয়া ছাহাবীগণের নিকটবর্তী আসিয়া পৌঁছিল। ছাহাবীগণ একটি টিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুদল ঐ টিলাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল এবং ছাহাবীগণকে বলিল, আমরা তোমাদিগকে ওয়াদা ও অঙ্গীকার

প্রদান করিতেছি, যদি তোমরা স্বেচ্ছায় নামিয়া আস তবে আমরা তোমাদের কাহাকেও হত্যা করিব না। দলপতি আছেম (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন কাফেরের অঙ্গিকারে নির্ভর করিয়া অবতরণ করিব না; এই বলিয়া তিনি দোয়া করিলেন, اللهم اخبر عنا رسولك "হে আল্লাহ! তোমার রসুলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ পৌঁছাইয়া দাও।" অতঃপর ছাহাবীগণ শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাইলেন। শত্রুদল তাঁহাদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করিল; দলপতি আছেম (রাঃ) সহ তাঁহাদের সাতজন শাহাদত বরণ করিলেন, অবশিষ্ট তিনজন জীবিত রহিলেন—খোবায়েব (রাঃ), যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ) এবং তৃতীয় একজন (আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ)। তাঁহারা পরীক্ষামূলক ভাবে) শত্রুদলের অঙ্গিকার গ্রহণ পুর্বক নীচে অবতরণ করিয়া আসিলেন। শত্রুগণ যখন তাঁহাদের উপর কাবু করিয়া লইল তখন তাহারা স্বীয় ধনুকের তার দ্বারা তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ) বলিলেন, তোমরা প্রথমেই অঙ্গিকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ; এই বলিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানা হেচরা করিল, কিন্তু সঙ্গে নিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলিল। তারপর খোবায়েব (রাঃ) ও যায়েদ (রাঃ)কে বন্দীরূপে সঙ্গে লইয়া গেল। শত্রুদল তাঁহাদেরকে মক্কাবাসীদের হস্তে বিক্রি করিল।

খোবায়েব (রাঃ) বদরের জেহাদে হারেছ ইবনে আমের নামক মক্কাবাসী এক কাফেরকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাফেরের পুত্রগণ তাহাদের পিতার হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ক্রয় করিয়া নিল। খোবায়েব (রাঃ) তাহাদের নিকট বন্দীরূপে রহিলেন, অতঃপর তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। তখন খোবায়েব (রাঃ) (স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ছফরের প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন—) তাহাদের নিকট হইতে একটি ক্ষৌর চাহিয়া লইলেন, সুন্নতরূপে পরিচ্ছন্নতা হাসিলের উদ্দেশ্যে। তাহাদেরই এক মহিলা বর্ণনা করিয়াছে যে, আমার একটি শিশু সন্তান আমার বে-খেয়ালিতে হাঁটিয়া খোবায়েবের নিকট চলিয়া গেল। খোবায়েব শিশুটিকে স্বীয় উরুর উপর বসাইয়া ক্ষৌর ধার দিতে ছিল; আমি (এই দৃশ্য দেখিয়া হতভম্ব হইয়া উঠিলাম—ভাবিলাম যে, খোবায়েব ভালরূপেই জানে, আমাদের হস্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে আমাদের ক্ষতি করার জন্য যদি শিশুটিকে ঐ ক্ষৌর দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলে! এই ভাবিয়া) আতঙ্কিত হইলাম, এমনকি আমার চেহারা দৃষ্টে খোবায়েব আমার আতঙ্ক অনুভব করিতে পারিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ভয় করিতেছ, আমি শিশুটিকে মারিয়া ফেলিব? ইনশাআল্লাহ আমি কখনও তাহা করিব না।

ঐ মহিলা আরও বর্ণনা করিয়াছে যে, খোবায়েবের ন্যায় এইরূপ সৌভাগ্যশালী বন্দী আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, তাজা আঙ্গুরের ছড়া হাতে লইয়া আঙ্গুর খাইতেছেন, অথচ তখন মক্কার এলাকায় কোন প্রকার ফলের মৌসুমই

নহে, তদুপরি তিনি শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ঐ আঙ্গুর একমাত্র আল্লার বিশেষ দান ছিল যাহা খোবায়েরকে তিনি দান করিয়াছিলেন।

অবশেষে একদিন শত্রুগণ খোবায়েব (রাঃ)কে শহীদ করার জন্য হরম শরীফের এলাকার বাহিরে লইয়া গেল। হত্যাস্থলে পৌঁছিবার পর খোবায়েব (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়িবার সময় দান কর। তিনি দুই রাকাত নফল নামায পড়িলেন এবং শত্রুদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ভাবিতে পার, আমি মৃত্যুর ভয়ে ঘাবরাইয়া গিয়াছি, নতুবা আরও দীর্ঘ সময় নামায পড়িতাম। খোবায়েব (রাঃ)ই সর্বপ্রথম এই সুন্দর সুন্নতটি জারি করিলেন যে, বন্দী অবস্থায় ধীর-স্থিরে মৃত্যু আসিলে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে। অতঃপর খোবায়েব (রাঃ) শত্রুদের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا

"হে আল্লাহ! ইসলামের এইসব শত্রুগণকে এক এক করিয়া গণনা করিয়া রাখ এবং প্রত্যেককে ধ্বংস কর, তাহাদের একজনকেও জীবিত রাখিও না।" অতঃপর তিনি একটি পদ্য পাঠ করিলেন! (বোখারী শরীফে ঐ পদ্যের দুইটি মাত্র পংক্তি উল্লেখ আছে পূর্ণ পদ্যটি এই—)

لَقَدْ جَمَّعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِىْ وَاَلَّبُوْا — قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْا كُلَّ مَجْمَعٍ

শত্রুদল তাহাদের বংশধরকে তামাশা দেখিবার জন্য আমার চতুষ্পার্শ্বে একত্র করিয়াছে এবং প্রতিটি দলকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

وَكُلُّهُمْ مُبْدِى الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ — عَلَىَّ لِاَنِّىْ فِىْ وَثَاقٍ مُضَيَّعٍ

তাহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশকারী, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। (তাহারা এতদূর সুযোগ পাইয়াছে শুধু) এই কারণে যে, আমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

وَقَدْ جَمَّعُوْا اَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ — وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُمَنَّعٍ

তাহারা তামাশা দেখিতে স্ত্রী পুত্রগণকে একত্র করিয়াছে এবং আমাকে শূলি দিবার জন্য সুরক্ষিত দীর্ঘ শূলি কাষ্ঠের নিকটবর্তী উপস্থিত করা হইয়াছে।

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْا غُرْبَتِىْ ثُمَّ كُرْبَتِىْ ـ وَمَا اَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِىْ عِنْدَ مَصْرَعِىْ

আমার সমুদয় অভিযোগ আল্লার দরবারে—স্বদেশ হইতে দূরে হওয়ার অভিযোগ, কষ্ট-ক্লেশ সমূহের অভিযোগ এবং শত্রুদল আমার হত্যাস্থলে যেসব ব্যবস্থা করিয়াছে সেই সবের অভিযোগ।

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلٰى مَا يُرَادُ بِي ـ فَقَدْ بَضَعُوْا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي

হে মহান আরশের মালিক! আমার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইযাছে সেই সব সহ্য করতঃ ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা আমাকে দান কর, শক্রগণ আমার মাংস টুকরা টুকরা করার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আমার জীবনের আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَأْ ـ يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমার এই আপদ-বিপদ একমাত্র আল্লার (সন্তুষ্টির) জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার ছিন্নভিন্ন দেহের অঙ্গসমূহে বরকত, মঙ্গল ও সৌভাগ্য দান করিতে পারেন।

وَقَدْ خَيَّرُوْنِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ ـ وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ

শক্রগণ মৃত্যুকে আমার সম্মুখে রাখিয়া কুফর—ইসলামদ্রোহিতা অবলম্বন করতঃ পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ আমাকে প্রদান করিয়াছিল, তখন দর দর করিয়া আমার চক্ষুদ্বয় (হইতে অশ্রু) বহিয়া পড়িল; মৃত্যু-চিন্তায় নহে।

وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ ـ وَلٰكِنْ حِذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ

মৃত্যুর দরুণ আমার কোন চিন্তা নাই, একদিন আমাকে মরিতে হইবেই; আমার একমাত্র চিন্তার কারণ—শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড—জাহান্নাম।

وَلَسْتُ اُبَالِي حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا ـ عَلٰى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَضْجَعِي

আমি যখন মোসলমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিতেছি তখন আমার কোনই ভয় নাই; আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হউক।

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا ـ وَلَا جَزَعًا اِنِّي اِلَى اللهِ مَرْجِعِي

আমি শক্রর নিকট কস্মিনকালেও নতি স্বীকার করিব না বা বিহ্বলতা প্রকাশ করিব না, কারণ আমি আল্লার নিকটই পৌঁছিতেছি।

(শক্ররা খোবায়েব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি পছন্দ কর, মোহাম্মদকে তোমার স্থলে দণ্ডায়মান করা হউক? তিনি বলিলেন, আমার প্রাণ বিসর্জনের পরিবর্তে তাঁহার পায়ে সামান্য কাঁটা বিদ্ধ হউক তাহাও আমি পছন্দ করি না।) অতঃপর বদরের জেহাদে নিহত হারেছের পুত্র ওক্‌বা তাঁহাকে শহীদ করিল।

ঐ ছাহাবীগণের দল-নেতা আছেম (রাঃ)ও বদরের জেহাদে মক্কাবাসী কাফেরদের কোন এক প্রধানকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আছেম রাজিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুর নিহত হওয়ার প্রমাণ চাক্ষুসরূপে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহার নিহত দেহের কোন একটি অংশ কাটিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার লাশকে কাফেরদের হস্ত হইতে পবিত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; মেঘ খণ্ডের ন্যায় মৌমাছির একটি বিরাট দল প্রেরণ করিলেন। মৌমাছিগুলি আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দেহকে ঘিরিয়া রাখিল, শত্রুগণ তাহার নিকটেও আসিতে পারিল না। তারপর পাহাড়ী ঢল নামিয়া আসিল এবং আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশকে নিখোঁজ করিয়া দিল।

ব্যাখ্যা ঃ— খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ইসলামী ইতিহাসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে—বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের (রাঃ) এবং মেক্‌দাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কাফেরগণ খোবায়েব (রাঃ)কে শহীদ করতঃ শূলীকাষ্ঠের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল।) রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ছাহাবীদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন, গোপনে নিহত খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ নিয়া আনিবার জন্য। তাঁহারা ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন—তখনও খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ তাজা ছিল; কোনরূপ বিকৃত হইয়াছিল না এবং তাঁহার শরীরের প্রবাহিত রক্ত বর্ণে রক্ত ছিল বটে, কিন্তু সুগন্ধে ছিল কস্তুরী। যোবায়ের (রাঃ) ঐ লাশ নামাইয়া আনিলেন এবং মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাফেররা এই ঘটনার খোঁজ পাইয়া সত্তরজন লোক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যোবায়ের (রাঃ) অগত্যা ঐ লাশ মাটির উপর রাখিয়া দিলেন। খোদার কুদরতের লীলা—তৎক্ষণাৎ জমিন খোবায়েবের লাশকে গিলিয়া ফেলিল; এই সূত্রেই খোবায়েব (রাঃ)কে "বালীউল-আর্‌য—জমিনের গলাধঃকৃত" বলা হইয়া থাকে।

খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গী যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ) তিনিও বদরের জেহাদে এক কাফের প্রধানকে হত্যা করিয়াছিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকেও ঐ নিহত কাফেরের আত্মীয়দের নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহাকেও খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঠকবর্গ! বর্তমান লাগামহীন তর্কের যুগে নব্য উৎপাদিত অনেক লোকের যুক্তি-তর্কে হয়ত এই তর্কের মীমাংসা কঠিন বোধ হইবে যে, এইসব ছাহাবীগণকে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের আক্রমণের সময় রক্ষা করতঃ জীবন বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা করিলেন না, অথচ এস্থলে দেখান হইয়াছে যে, আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত লাশকে শত্রুদের স্পর্শ হইতে মৌমাছি দল পাঠাইয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং খোবায়েব রাজিয়াল্লাহু আনহুর লাশকে জমিনে গলাধঃকরণ করাইয়া কাফের শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচিত্রময় অসীম কুদরতের লীলার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের জন্য এইসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ। আল্লাহ তায়ালা فعال لما يريد যখন যাহা ইচ্ছা হয় করিয়া থাকেন, তাঁহার কার্যাবলী তাঁহার হেকমত

ও নৈপুন্যতা সাপেক্ষ বটে, কিন্তু আমাদের যুক্তি তর্কের কোন ধারও ধারে না বা উহার উপর নির্ভরও করে না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি—শেখ সা'দী (রঃ) কোরআনে বর্ণিত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ হযরত ইয়াকুব ও তাঁহার পুত্র ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের ঘটনার এইরূপ অসামঞ্জস্যজনক একটি অংশকে উল্লেখ করিয়া উহা যে আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও অসীম কুদরতের বিচিত্র লীলা তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তিনি বলেন—

زمصرش بوئے پیرا هن شنیدی — چرا در چاه کنعانش نه دیدی

ইয়াকুব আলাইহেচ্ছালামের পুত্র ইউছুফ (আঃ)কে তদীয় ভ্রাতাগণ স্বীয় দেশ কেনানের এক কূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ভান করিয়াছিল। অতঃপর কোন এক পথিক বণিকদল সেই কুপের পানি আনিতে গেলে বালক ইউসুফ তাহাদের হস্তগত হইয়া মিশর দেশে পৌঁছিলেন এবং তথায় তাঁহার জীবনের উপর নানাপ্রকার পরিবর্তন আসিল; বহুকাল ক্রীতদাস রহিলেন, দশ বৎসর কারাগারে জীবন কাটাইলেন। অবশেষে তিনিই আবার মিশরের অধিপতি হইলেন। ইউসুফ আলাইহেচ্ছালাম স্বীয় পিতা ইয়াকুব আলাইহেচ্ছালামের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন; পিতা পুত্রকে হারাইয়া শোকে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

ইউছুফ (আঃ) মিশরাধিপতি হওয়ার পর দেশে দুর্ভিক্ষের দরুন তাঁহার শত্রু ভাইগণ পর-পর দুইবার তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন; এই সময়ও বহু ঘটনা ঘটে। অতঃপর ইউছুফ (আঃ) স্বীয় হাল-অবস্থার সুসংবাদবাহক এক ব্যক্তিকে সুদূর মিশর হইতে কেনান দেশে পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করিলেন এবং তাহার হস্তে স্বীয় জামা নিদর্শন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। খোদার কুদরতের বিচিত্র লীলা—জামা-বাহক লোকটি এখনও সুদূর মিশরেই রহিয়াছে তথা হইতে যাত্রাও করে নাই, এমতাবস্থায় শোক-বিহ্বল দৃষ্টি হারা পিতা ইয়াকুব (আঃ) কেনান দেশে থাকিয়া ঐ জামার মধ্য হইতে পুত্র ইউছুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতে পারিয়া সকলকে হযরত ইউছুফের সংবাদ প্রদান করিলেন।

শেখ সা'দী (রঃ) বলেন—ঘরের কোণে, স্বগ্রামের কূপে যখন ইউছুফ পতিত ছিলেন, পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন তাঁহার কোন খোঁজ পাইলেন না, আর এখন দীর্ঘকাল পর সুদূর মিশর হইতে জামার সুঘ্রাণ অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন। এ সবই হইল—আল্লাহ তায়ালার স্বাধীন ইচ্ছা ও অসীম কুদরতের বিচিত্র লীলা; এখানে কোন তর্ক ও প্রশ্নের মীমাংসা নাই; প্রশ্ন উত্থাপনও নিছক অবাস্তর।

বীরে-মউনার ঘটনা

চতুর্থ হিজরী সনের আরম্ভেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। "বীরে-মউনা" একটি স্থানের নাম; তথায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই উক্ত ঘটনা এই নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনার বিবরণ এই যে, মক্কার নিকটস্থ নজদ এলাকা হইতে বনু-আমের গোত্রীয় সর্দার আবুবরা

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন, সেই সম্পর্কে সে কোন হাঁ, না করিল না, বরং অনুরোধ জ্ঞাপন করিল যে, আমাদের এলাকায় লোকদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ আছে, আপনি কিছু সংখ্যক মোবাল্লেগ তথায় প্রেরণ করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নজদ এলাকায় লোক প্রেরণ করিতে আমার আশঙ্কা বোধ হয়। আবুবরা বলিল, আমি তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। (আরব দেশে এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত, বিশেষতঃ এলাকার সর্দারের পক্ষ হইতে, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তর জন বিশিষ্ট ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ ছাহাবীগণ অতি উচ্চ মর্তবার ছিলেন; তাঁহারা এরূপ খোদাভক্ত ছিলেন যে, দিনভর লাকড়ি সংগ্রহ করিয়া উপার্জিত অর্থ দান-খয়রাত করিতেন এবং রাতভর কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন ও নামাযরত থাকিতেন।

নজদ এলাকায় আরও একজন প্রধান ছিল, তাহার নাম ছিল আমের ইবনে তোফায়েল, সে আবু বরা সর্দারের ভাতিজা ছিল; সে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। পূর্বে একবার সে কতিপয় দাবী লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিল। সে এই দাবী জানাইয়াছিল যে, আপনার ও আমার মধ্যে, তিনটি বিষয়ের কোন একটি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে—(১) আপনি গ্রাম্য এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান থাকিব, কিম্বা (২) আমি আপনার পর আপনার স্থলাভিষিক্ত নির্দ্ধারিত হইব, নচেৎ (৩) আমি হাজার হাজার লোক লইয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইব। হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করতঃ দোয়া করিলেন— اللهم اكفنى عامرا "হে আল্লাহ! আমেরের মোকাবিলায় তুমি আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যাও।" এরূপ বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা কিছুদিন পূর্বে তাহার সঙ্গে হইয়াছিল। এখন যখন তাহার এলাকায় তাহারই চাচার দায়িত্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) লোক পাঠাইলেন তখন হযরত (দঃ) তাহার প্রতি একটি লিপি লিখিয়া স্বীয় প্রেরিত লোকদের হস্তে দিয়া দিলেন। তাহার বস্তির অদূরে "বীরে-মউনা" নামক স্থানে ছাহাবী দল পৌঁছিয়া স্বীয় দলের বিশিষ্ট ছাহাবী হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)কে পত্র বাহকরূপে আমেরের নিকট পাঠাইয়া অন্যান্য ছাহাবীগণ সেই স্থানে অপেক্ষমান রহিলেন। ঐ ছাহাবী পত্র লইয়া পৌঁছিলে আমের ঐ পত্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না, বরং তাহার ইঙ্গিতে অন্য এক ব্যক্তি ঐ ছাহাবীর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিল, তিনি তথায় শহীদ হইয়া গেলেন। অতঃপর আমের কতিপয় গোত্রের লোকগণকে একত্র করিয়া অবশিষ্ট ছাহাবীগণকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ছাহাবীগণ হঠাৎ আক্রমণের মোকাবিলায় অস্ত্রধারণ করিয়া সকলেই তথায় শাহাদৎ বরণ করিলেন, মাত্র একজন প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

রাজীর ঘটনা ও বিরে-মউনার ঘটনা—এই মর্মান্তিক ঘটনাদ্বয় নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়, এমনকি প্রায় এক সঙ্গেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনাদ্বয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘটনায় এতদূর মর্মাহত ও শোকাবিষ্ট হইলেন যে, এরূপ আর কখনও হন নাই, এমনকি ঐ সকল গোত্র সমূহের প্রতি দীর্ঘ এক মাসের অধিককাল ফজরের নামাযের মধ্যে বদ-দোয়া করতঃ "কুনূতে-নাযেলা" পড়িলেন। যোরকানী কিতাবে বর্ণিত আছে, জ্বরের মহামারীতে ঐ গোত্রগুলির সাতশত লোক মরিল। ঘটনার মূল আমের ইবনে তোফায়েলও প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৪৬৫। **হাদীছ**:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সত্তর জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন, যাঁহারা কোরআন-বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিরে-মউনা নামক স্থানে তাঁহারা "রেয়েল" ও "জাকওয়ান" গোত্রদ্বয় কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমাদিগকে কিছু বলিবার বা কিছু করিবার আসি নাই, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু অলাইহে অসাল্লামের নির্দেশিত একটি কার্য্যের উদ্দেশ্যে এই পথ অতিক্রম করিতেছি মাত্র। শত্রুরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিল। হযরত (দঃ) হত্যাকারী গোত্র সমুহের প্রতি প্রভিশাপ করতঃ দীর্ঘ এক মাস "কুনূতে-নাযেলা" পড়িলেন। ইতিপূর্বে আর কখনও আমরা "কুনূতে-নাযেলা" পড়ি নাই।

১৪৬৬। **হাদীছ**:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"রেয়েল", "জাকওয়ান" ও "ওছাইয়া" গোত্রত্রয় (হইতে তাহাদের প্রতিনিধি আবুবরা) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (ইসলামের প্রতি স্বীয় এলাকায় লোকদের আকৃষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়া ইসলামের শিক্ষা ও তবলীগের দ্বারা) বিরোধী পার্টির মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনাবাসীদের হইতে সত্তর জন ছাহাবীকে তাহাদের সাহায্যে পাঠাইলেন। ঐ ছাহাবীগণ কোরআন-বিশেষজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা (জীবিকা নির্বাহ ও দান-খয়রাতের জন্য) সমস্ত দিন লাকড়ি কুড়াইতেন এবং সারা রাত্র নফল নামাযে কাটাইতেন।

ছাহাবী দল যখন "বীরে-মউনা" নামক এলাকায় পৌঁছিলেন তখন (দুষ্ট আমের ইবনে তোফায়লের আহ্বানে) ঐ গোত্রত্রয়ের লোকগণই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ছাহাবীগণকে মারিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ সংবাদ পাইয়া "রেয়েল", "জাক্ওয়ান", "ওছাইয়া" ও "বনু-লেহ্ইয়ান" গোত্রসমূহের প্রতি বদ-দোয়া করিয়া দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত ফজরের নামাযের মধ্যে "কুনূতে-নাযেলা" পড়িলেন।

আনাছ (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, ঐ ঘটনায় শহীদানের পক্ষে কোরআন শরীফে একটি আয়াত নাযেল হইয়াছিল; পরে উহার তেলাওয়াত রহিত হইয়াছে।

بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا -

"আমাদের সম্প্রদায়ের সকলকে জানাইয়া দাও, আমরা প্রভু পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।"

১৪৬৭। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার মাতুল (হারাম-ইবনে-মেলহান (রাঃ)কে) সত্তর জন সহযাত্রীর সঙ্গে হযরত (দঃ) এক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথাকার অমোসলেমদের এক সরদার—আমের ইবনে তোফায়েল ইতিপূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনটি দাবীর কোন একটি গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল—সে বলিয়াছিল, আপনি পল্লী এলাকার প্রধান থাকিবেন, আমি শহর এলাকার প্রধান হইব, কিম্বা আমি আপনার স্থলাভিষিক্তরূপে নির্দ্ধারিত থাকিব, নচেৎ আমি স্বীয় গোত্রের হাজার হাজার সৈন্য লইয়া আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইব। কিছুকাল পরে সে একস্থানে প্লেগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তথা হইতে বাড়ী আসিবার জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করিলে অশ্ব পৃষ্ঠেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

আমের ইবনে তোফায়েল যতদিন জীবিত ছিল ইসলাম বিদ্বেষী ছিল; তাহার এলাকায় উপস্থিত হইতে ছাহাবী দল আশঙ্কা বোধ করিতেছিলেন, তাই দলের সকলে একত্রে তথায় উপস্থিত না হইয়া দলের দুই ব্যক্তি—হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) ও অপর আর একজন সেই এলাকার প্রতি যাত্রা করিলেন। অন্যান্য সকলকে পথিমধ্যে নিকটবর্তী একস্থানে অপেক্ষমান রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, আপনারা এই স্থানেই থাকুন—যাবৎ না আমরা দুইজন ফিরিয়া আসি। যদি ঐ এলাকাস্থ লোকগণ আমাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে আপনারা সকলেই মূল উদ্দেশ্যের উপর স্থির থাকিবেন এবং সকলে সমবেতভাবে নির্দ্ধারিত এলাকায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করিব, আর যদি তাহারা আমাদিগকে মারিয়া ফেলে তবে আপনারা এস্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ দেশের লোকদের সঙ্গে যাইয়া মিশিবেন।

হারাম-ইবনে-মেলহান (রাঃ) ঐ এলাকায় উপস্থিত হইয়া তথাকার লোকদিগকে বলিলেন, আল্লার রসুলের প্রেরিত বাণী প্রচারে তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিবে কি? তিনি তাহাদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলেন হঠাৎ তাহারা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিল, সে ঐ ছাহাবীকে পেছন হইতে বর্শাঘাত করিল। বর্শা তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া গেল। (দ্বীনের জন্য এই আঘাতকে তিনি ধন্য মনে করিলেন) এবং প্রবাহিত রক্ত কোশ ভরিয়া স্বীয় নাকে-মুখে মাখিলেন এবং বলিলেন, فزت ورب الكعبة "মহান কা'বার প্রভুর শপথ—আমি সফলকাম হইয়াছি।"

অতঃপর তাঁহার সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষমান সহযাত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা শত্রুগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সকলেই শাহাদৎ বরণ করিলেন. শুধুমাত্র একজন পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলেন তিনি রক্ষা পাইলেন।

১৪৬৮। হাদীছ :—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিরে-মউনার ঘটনায় ছাহাবীদল যখন শহীদ হইলেন এবং তাঁহাদের দলীয় আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন তখন শত্রু পক্ষের সরদার আমের ইবনে তোফায়েল আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে একটি শব দেহের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? আম্র ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলিলেন, ইনি আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল, আমি দেখিয়াছি, তিনি নিহত হওয়ার পর তাঁহাকে আসমানের প্রতি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অতঃপর জমিনে রাখা হইয়াছে, এমনকি তাঁহাকে আসমানে উঠাইবার দৃশ্য এখনও আমার নজরে ভাসিতেছে।

ছাহাবী দলের শহীদ হওয়ার সংবাদ হযরত নবী (দঃ) প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলকে তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করতঃ ইহাও বলিলেন, তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁহাদের অন্যান্য ভাই-বন্ধুগণকে জ্ঞাত করিয়া দেন যে, তাঁহারা প্রভুর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং প্রভুও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতকালে তিন দিন "ছওর" পর্বতের গুহায় লুকায়িত ছিলেন। আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ)ই রাত্রি বেলা গোপনে তাঁহাদের খাদ্য যোগাইতেন, ঐ সময় তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কোন এক আত্মীয়ের ক্রীতদাস ছিলেন।

১৪৬৯। হাদীছ :—আছেম-আহ্ওয়াল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে (বেতের) নামাযের মধ্যে দোয়া-কুনূত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হাঁ পড়া চাই। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দোয়া-কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে পড়া হইবে? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, রুকুর পূর্বে। আমি বলিলাম, এক ব্যক্তি আপনার তরফ হইতেই বর্ণনা করিয়াছে যে, উহা রুকুর পরে। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, সে ভুল বুঝিয়াছে। (ঐ নিয়ম কুনূতে-নাযেলা সম্পর্কে ছিল এবং সাময়িক ছিল;) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সত্তরজন কোরআন নিবশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ছাহাবীকে এক এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার কাফেররা তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই কাফেরগণের প্রতি অভিশাপ করিয়া দীর্ঘ এক মাস (ফজরের নামাযে) কুনূত পড়িয়াছিলেন, সেই কুনূত রুকুর পরে ছিল।

খন্দকের জেহাদ

"খন্দক" আরবী শব্দ উহার অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে শত্রু দল অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করতঃ মদীনা শহরকে পরিবেষ্টিতাকারে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা শহর রক্ষার্থে শহরের প্রবেশ পথের বিস্তৃত

এলাকায় পরিখা খনন করিয়াছিলেন, তাই এই জেহাদকে খন্দকের জেহাদ বলা হয়। এই জেহাদে শত্রুপক্ষ আরবের বিভিন্ন দলকে একত্র করিয়া বিরাট আকারে অভিযান চালাইয়াছিল বলিয়া ইহাকে আহ্‌যাবের জেহাদও বলা হয়। "আহ্‌যাব" শব্দের অর্থ বিভিন্ন দল।

এই জেহাদ সম্পর্কে একদল ঐতিহাসিকের মত এই যে, উহা পঞ্চম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বোখারী (রঃ) অন্য একদলের মত সমর্থন করতঃ বলেন যে, উহা চতুর্থ হিজরী সনের শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সূত্রে উহা ওহোদের জেহাদের পরবর্তী বৎসরই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুল ঘটনার বিবরণ এই যে, ইহুদীরা মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিষময় বিদ্বেষ পোষণ করিতে ছিল, বিশেষতঃ বনু-নজীর ইহুদী গোত্র। কারণ, তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, যাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মোসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্বেষ চরমে পৌঁছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে কিছু করিবার সাহস তাহাদের ছিল না।

ওহোদের যুদ্ধে মক্কার কোরেশরা মোসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধনের সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু মোসলমানদের বীরত্ব, তাঁহাদের আত্মত্যাগ এবং তাঁহাদের ধর্ম ও আদর্শের জন্য তাঁহারা যে কত বড় সুকঠিন—যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায় সেই অভিজ্ঞতা কোরেশরা বদরে ত ভালরূপেই লাভ করিয়াছিল ওহোদ প্রাঙ্গণেও সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের কম লাভ হইয়াছিল না। যদ্দরুন ওহোদের অঙ্গন ত্যাগকালে দলপতি আবু সুফিয়ানের আস্ফালন—পর বৎসর বদর ময়দানে আবার যুদ্ধ হইবে—উহা কার্য্যে পরিণত করা দুরের কথা অন্ততঃ মুখ রক্ষার্থে বদর প্রান্তের ধারে-কাছেও তাহারা আসে নাই। অথচ মোসলমানগণ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে নির্দ্ধারিত সময়ে বদর-প্রান্তরে পৌঁছিয়া আট দিন কোরেশদের অপেক্ষায় তথায় অবস্থান করিয়াছিল।

কোরেশ কাফেররা ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, যেমন-তেমন যুদ্ধে মোসলমানদেরে কাবু করা সম্ভব নহে। অতএব নূতন কোন প্রচেষ্টা নিতে হইলে পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও অধিক শক্তিশালী অভিযানের প্রয়োজন। এই ভাবিয়া কোরেশ অধিপতি আবু সুফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি এবং ব্যাপক আয়োজন চালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যাওয়া স্থির করিল।

এদিকে মদীনা হইতে নির্বাসিত ইহুদী গোত্র বনু-নজীর—ওহোদের যুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণ কর্তৃক মোসলমানগণ ঘায়েল হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণে তাহারা বিশেষ তৎপর হইল। তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিল—মক্কাবাসীদের সঙ্গে এক যোগে সংগ্রাম চালাইয়া মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার একটি সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা তাহারা গ্রহণ করিল। কোরায়েশরা এই সুযোগকে মুল্যবান গণ্য করিয়া স্বীয় জোটের সমুদয় গোত্রবর্গকে লইয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের উৎসাহ প্রদর্শন করিল। ইহুদীরা অতঃপর আরবের বিশিষ্ট গোত্র মোসলমানদের বিদ্বেষপুর্ণ "গাতাফান" গোত্রের নিকটও উপস্থিত

হইল। তাহারাও স্বতঃস্ফুর্ত হইয়া সাড়া দিল। এইরূপে ইহুদীদের প্ররোচনায় সমগ্র আরবের মধ্যে মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে কোরায়েশ, বেদুইন ও অন্যান্য পৌত্তলিক—বনু-আসাদ, বনু-মোর্‌রা, বনু-আশ্‌জা ও গাত্তাফান গোত্রসমুহের সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠিত হইল। আর ইহুদীরা ত তাহাদের সাহায্যে আছেই। প্রত্যেক গোত্রের এক একজন অধিনায়ক ছিল, মুল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান নির্বাচিত হইল। এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দশ হইতে পনর হাজারের মধ্যে ছিল, একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈন্য সংখ্যা চব্বিশ হাজারেরও অধিক উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিরাট বাহিনী মদীনার প্রতি অগ্রসর হইল, তখন মদীনায় মোসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

মদীনার প্রতি বিরাট শত্রু-সেনার অভিযান যাত্রার সংবাদ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্ঞাত হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। পারস্যবাসী অতি প্রবীণ ছাহাবী সালমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শক্রমে শত্রুর সম্ভাব্য প্রবেশ পথে পরিখা খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ সমস্ত ছাহাবী-গণের বিশ হইতে পঁচিশ দিন বা সুদীর্ঘ এক মাসের বিরামহীন ও আপ্রাণ চেষ্টায় পরিখা খনন কার্য্য সমাপ্ত হইল। ইহা ছিল যুদ্ধের এক নুতন পদ্ধতি যাহা আরবরা পূর্বে কখনও দেখে নাই।

শত্রুবাহিনী পৌছিবার পুর্বক্ষণেই খনন কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা মদীনায় প্রবেশ করিতে পরিখা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পরিখার অপর পারে অবস্থান করিল। মোসলমানগণের সর্বমোট সংখ্যা তিন হাজার ছিল, তাঁহারাও পরিখার অপর কিনারায় সারিবদ্ধরূপে উপস্থিত রহিলেন। শত্রুবাহিনী সর্বদাই পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টায় নিমগ্ন, মোসলমানগণ এক পলকের জন্যও ঐ দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইতে পারেন না। এমনকি কোন কোন দিন শুধু ফরজ নামায আদায় করিতেও সমর্থ হইতেন না; অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে নামায আদায় করা সম্পর্কে অনেক বিধি-বিধানকে শিথীল করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতির ভয়াবহতার দরুণ কোন উপায়েই নামায আদায় করা কোন কোন দিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই, বরং এক একদিন কতিপয় নামায কাজা হইয়া যাইত।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে ইহাই যথেষ্ট যে, ঐ সময়ের বিভীষিকাপুর্ণ অবস্থার বিবরণে কোরআন শরীফে নিম্নরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا - هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ

وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ـ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا……

অর্থ—হে মোসলমানগণ। তোমাদের প্রতি আল্লার বিশেষ একটি নেয়ামত স্মরণ কর—যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের চতুর্দিক ঘেরাও করিয়া আসিল, যখন ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের দরুণ তোমাদের চক্ষু অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল এবং তোমাদের কলিজা বাহির হইয়া আসার উপক্রম হইয়াছিল এবং তোমাদের ভিতরে আল্লার (রহমতের দৃঢ় বিশ্বাস শিথিল হইয়া তাঁহার) সম্পর্কে নানাপ্রকার বাজে ধারণার উৎপত্তি হইতেছিল। বাস্তবিকই এই সময় মোসলমানগণকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং গোটা মোসলেম জাতির উপর যেন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বহিতে ছিল। যখন মোনাফেক ও আত্মার রোগে রুগ্নরা বলিতেছিল, মোসলমানগণকে সাহায্য সহায়তা করার যে সব ওয়াদা অঙ্গীকার আল্লাহ ও আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল সবই অবাস্তব ও ধোকা ছিল মাত্র। এমনকি তাহাদের একটি দল মোসলমানগণকে প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল, তোমাদের এস্থানে টিকিয়া থাকিবার সাধ্য হইবে না; বাড়ী চলিয়া যাও। (২১ পাঃ ১৭ রুঃ)

মোসলমানগণ এইরূপ অবর্ণনীয় বিপদের সম্মুখীন এবং নিজেদের অপেক্ষা বহু বহু গুণ অধিক শত্রুবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত; এমতাবস্থায় মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত ইহুদী গোত্র বনু-কোরায়জা যাহারা মোসলমানদের সঙ্গে সহ-অবস্থান এবং মৈত্রি ও শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল; ঠিক এই বিপদ মুহূর্তে তাহারাও চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়া শত্রুপক্ষের সহিত হাত মিলাইয়া বসিল। এখন আর বিপদের সীমা রহিল না, এতদিন শত্রু ছিল বাহিরের, যাহাদিগকে পরিখার সাহায্যে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এখন মদীনার অভ্যন্তরও মোসলমানদের জন্য শত্রুর দেশ হইল। মোসলমান পুরুষগণ সকলেই পরিখার নিকট অবস্থানরত; তাই মদীনার অভ্যন্তরে মোসলমান নারী ও শিশুগণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইল।

পরিখার নিকটস্থ শত্রুসেনার মোকাবিলার জন্য মোসলমানদের সর্বশক্তিও নেহাৎ অপর্য্যাপ্ত ছিল, এমতাবস্থায় নারী ও শিশুগণকে বরং ঘর-বাড়ী রক্ষা করার কি ব্যবস্থা হইতে পারে? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নারী ও শিশুগণকে একটি কিল্লার ভিতর রক্ষিত করিয়া তথায় প্রহরী স্বরূপ দুই শত যোদ্ধাকে নিয়োগ করিয়া দিলেন। এইরূপ ভয়াবহ বিপদ ও বিভীষিকাপূর্ণ আতঙ্কের মধ্যে মোসলমানদের দিবা-রাত্রি কাটিতে লাগিল। প্রায় দীর্ঘ এক মাস কাল এই অবরোধ অবস্থা চলিল। অবশেষে মোসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য নামিয়া আসিল; শত্রু পক্ষের অবস্থান এলাকায় ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইল। শত্রু

বাহিনীর তাবু ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া সমুদয় আশ্রয়স্থল বাতাসে উড়িয়া গেল। আসবাব-পত্র, রসদ ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। শীতের প্রকোপে তাহারা কাবু হইয়া পড়িল। তাহাদের দুর্গতির সীমা রহিল না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া দিলেন যাঁহারা শত্রু-সেনাদের মনোবল নষ্ট করিতে সাহায্য করিলেন। এইরূপে শত্রুদল প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া তাহারা রাত্রির অন্ধকারে মক্কার পথ ধরিল। কোরআন শরীফে এই বিষয়টিরও উল্লেখ আছে।

يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ـ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালার ঐ বিশেষ নেয়ামতকে স্মরণ কর যাহা তোমাদের লাভ হইয়াছিল তখন, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া আসিয়াছিল; তখন আমি তাহাদের উপর হীমবায়ু প্রবাহিত করিলাম এবং এমন এক বাহিনী প্রেরণ করিলাম যাঁহারা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। (২১ পাঃ ১৭ রুঃ)

এই ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে পরিখা বিদ্যমান থাকায় কোন উল্লেখযোগ্য হাতা-হাতি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। উভয়পক্ষ হইতে শুধুমাত্র বিক্ষিপ্তাকারে তীর, বর্শা, ঢিল ইত্যাদি ছোড়াছুড়ি হইয়াছিল যাহাতে সর্বমোট মোসলমানদের পক্ষে ছয়জন শহীদ হইয়া-ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষে তিনজন নিহত হইয়াছিল।

মূল ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ উল্লেখ করা হইতেছে—

১৪৭০। **হাদীছ:**—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দক খননকালে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। কতক লোক খনন কার্য্য করিতেছিলেন এবং আমরা কাঁধে করিয়া মাটি বহন করিতেছিলাম। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য দোয়া করতঃ বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের জিন্দেগী ভিন্ন আর কোন জিন্দেগী নাই; মোহাজের ও আনছারগণকে ক্ষমা কর।" (যেন তাহারা সেই জিন্দেগীর সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে।)

১৪৭১। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিখা-খনন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ শীতের প্রকোপের মধ্যে ভোর বেলা খনন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন;

তাঁহাদের কোন চাকর-বাকর ছিল না যাহাদের দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণের অনাহার, উপবাস ও কষ্ট-ক্লেশ অনুধাবন করিতে পারিয়া দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ — فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের জিন্দেগীই একমাত্র জিন্দেগী; আনছার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও।"

ছাহাবীগণ তদুত্তরে নিজেদের পণ-প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ঘোষণা করিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا — عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি, জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর, সর্বদার জন্য—জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত।"

১৪৭২। **হাদীছ:**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাজের ও আনছারগণ মদীনার প্রবেশ পথে পরিখা খনন করিতে এবং নিজ নিজ পৃষ্ঠে মাটি বহন করিতে ছিলেন। তাঁহারা আনন্দ-কণ্ঠে গাহিতে ছিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا — عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের উৎসর্গতার প্রতিউত্তরে এই বলিতেন"—

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ — فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের সাফল্য ব্যতীত আর কোন সাফল্য নাই। আনছার ও মোহাজেরগণের কার্য্যে বরকত দান করুন।"

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, কার্য্যরত ছাহাবীগণের ক্ষুধার তাড়না ও দরিদ্রতার অবস্থা এই ছিল যে, কেহ এক আঁজল পরিমাণ সামান্য যবের আটা বাসি চর্বি মিশ্রিত করতঃ খাদ্য তৈরী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিত, ক্ষুধার্ত ছাহাবীগণ উহার উপরই তুষ্ট হইতেন, অথচ উহা বদমজা বিশ্রী ও গন্ধময় হইত।

১৪৭৩। **হাদীছ:**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দক খনন করা কালীন খননস্থলে একটি পাথর আমাদের সম্মুখে পড়িল যাহা বিধ্বস্ত হইতে ছিল না। তখন সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ দিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি তথায় উপস্থিত হইব, এই বলিয়া তিনি

দাঁড়াইলেন, তাঁহার পেটের সঙ্গে পাথর বাঁধা ছিল; আমরা তিন দিন হইতে অনাহারী ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া খননাস্ত্র হস্তে লইলেন এবং পাথরের উপর মারিলেন; তৎক্ষণাৎ উহা বালুকারাশিতে পরিণত হইয়া গেল।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনাহারী দেখিতে পাইয়া আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুণ। আমি গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যাহা আমি সহ্য করিতে পারি না; তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট কিছু যবের আটা ও একটি বকরির ছোট বাচ্চা আছে। ঐ আটা গোলাইবার ও বকরির বাচ্চাটি জবেহ করিয়া পাকাইবার ব্যবস্থা করিয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হইলাম। স্ত্রী আমাকে হুসিয়ার করিয়া দিল যে, আমাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গিদের নিকট লজ্জিত করিবেন না। (অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণের অধিক লোককে দাওয়াত করিবেন না।) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চুপি চুপি বলিলাম, আমরা একটি ছোট বকরি জবেহ করিয়াছি এবং সামান্য কিছু যবের আটা তৈরী করিয়াছি; আপনি এক বা দুইজন সঙ্গি সহ আমার গৃহে তশরিফ লইয়া চলুন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উহা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা প্রচুর ও উত্তম। অতঃপর নবী (দঃ) উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে খনন কার্য্যে উপস্থিতবর্গ! জাবের দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়াছে, তোমরা সকলে চল। রসুল (দঃ) আমাকে বলিলেন, গোশতের ডেগ চুলা হইতে নামাইবে না এবং আমি পৌঁছিবার পূর্বে রুটি তৈরী আরম্ভ করিবে না। আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রসুল (দঃ) এবং তাঁহার পেছনে বহু লোক আমার গৃহপানে রওয়ানা হইলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলাম, সে আমার উপর চটিয়া নানারকম উক্তি করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আমি ত তোমার কথা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলাম। সে বলিল, রসুল (দঃ) আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া (খাদ্যের পরিমাণ অবগত হইয়া) ছিলেন কি? আমি বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, আল্লাহ ও আল্লার রসুলই জানেন। আমরা ত আমাদের অবস্থা জ্ঞাত করিয়া দিয়াছি। স্ত্রীর এই উক্তিতে আমিও দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। নবী (দঃ) আমার গৃহে পৌঁছিলেন, আমি রুটি তৈরীর খামীর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তিনি উহার উপর ফুংকার করিলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর গোশতের ডেগেও ঐরূপ করিলেন এবং বলিলেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, তোমার সঙ্গে রুটি তৈরী আরম্ভ করুক এবং ডেগ হইতে পেয়ালা ভরিয়া তরকারী আনিতে থাক, ডেগ নামাইবে না।

আগন্তুক মেহমানের সংখ্যা এক হাজার ছিল; হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তাহাদিগকে দলে দলে ডাকিয়া আন। তাহারা যেন একত্রে ভীড় না করে। দলে দলে তাহাদের সম্মুখে রুটি ও তরকারী উপস্থিত করা যাইতে লাগিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সকলে পেট পুরিয়া খাইয়া তৃপ্তি লাভে চলিয়া গেলেন, অথচ আমাদের ডেগ টগবগ করতঃ পুর্বের ন্যায়ই শব্দ করিতেছিল এবং খামীর হইতে রুটি তৈরী হইতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, অবশিষ্টাংশ তোমরা খাও এবং অন্যান্যকে দান কর, অনেক লোকই অনাহারে আছে।

১৪৭৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) (খন্দকের ঘটনা সমাপ্তে) বলিয়াছেন, পুর্বদিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা আমার সাহায্য করা হইয়াছে। আমার পুর্ববর্তী 'আদ' গোত্র (হুদ (আঃ) নবীর উম্মত)কে পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

● খন্দকের জেহাদে যে হীমবায়ু শত্রুপক্ষকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল সেই বাতাস পুর্বদিক হইতে প্রবাহমান ছিল—আলোচ্য হাদীছে উহারই ইঙ্গিত।

১৪৭৫। **হাদীছ ঃ**—ছোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদকালে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হইয়া যাওয়ার পর নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, এখন হইতে তাহারা (মক্কার কাফেররা) আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না, বরং আমরাই তাহাদের প্রতি অভিযান চালাব।

১৪৭৬। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) খন্দকের ঘটনায় এক দিন কাফেরদের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন, আল্লাহ তাঁহাদের কবর আগুনে ভরিয়া দিন; তাহারা আমাদিগকে সুর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আছর নামাযের অবকাশ দেয় নাই।

১৪৭৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ (দঃ) খন্দকের ঘটনায় প্রাপ্ত আল্লার সাহায্যের স্মরণে শুকরিয়ারূপে অনেক সময় বলিতেন—

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ اَعَزَّ جُنْـدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ

الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَـلَا شَـيْءَ بَعْـدَهٗ

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি এক—অদ্বিতীয়, তিনি নিজের সৈনিকদেরকে জয়ী করিয়াছেন, তাঁহার বিশিষ্ট বন্দাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি একাই শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন; এরপর আর ভয়ের কারণ নাই।"

১৪৭৮। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (খন্দকের জেহাদে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হওয়ার পর) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য বলিলেন, শত্রুদের সঠিক খবর আনিয়া দিতে পারে কে? (ইহা বড়ই কঠিন

কাজ ছিল, কারণ শত্রুদের সঠিক খবর জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাহাদের পশ্চাতে যাইতে হইবে; কোন প্রকারে যদি তাহারা টের পাইয়া বসে তবে তৎক্ষণাৎ জীবনের অবসান। তাই কেহ সাহস করিতেছিল না, কিন্তু) যোবায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় ঐরূপ আহ্বান জানাইলেন, এইবারও যোবায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হইলেন। তৃতীয় বার হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন। এইবারও যোবায়ের (রাঃ) দাঁড়াইলেন। (দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গে এইরূপ সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার প্রশংসায়) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের জন্য কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ সাহায্যকারীরূপে থাকিতেন, আমার জন্য ঐরূপ বিশেষ সাহায্যকারী হইলেন যোবায়ের।

● মদীনার প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী—ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্র সমূহের প্রত্যেকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ-অবস্থান ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে "বনু কাইনুকা" গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করতঃ মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে হযরত (দঃ) তাহাদিগকে মদীনার এলাকা হইতে বহিষ্কৃত করেন। তদ্রূপ অন্যতম ইহুদী গোত্র বনু নজীরকে চুক্তি ভঙ্গ ও বিদ্রোহের অপরাধে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের ঘটনার বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

"বনু-কোরায়জা" ইহুদীদের বিশিষ্ট গোত্রসমূহের অন্যতম ধনে-জনে বলবান গোত্র ছিল। এযাবৎ তাহারা শান্তি চুক্তিতে কোন ব্যাঘাত ঘটাইয়া ছিল না, মোসলমানদের কাঁধে কাধ মিলাইয়া মদীনার এলাকায় বসবাস করিতেছিল। কিন্তু খন্দকের জেহাদের বিভীষিকাপূর্ণ বিপদ যখন মোসলমানদের মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক সেই মুহূর্তেই বনু-কোরায়জা গোত্র শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই নহে, বরং প্রকাশ্য বিদ্রোহের ঢোল বাজান আরম্ভ করিয়া দিল এবং খন্দকের ঘটনার মুল কারণ—বনু নজীর গোত্রের সর্দার হোয়ায় ইবনে আখতাব ইহুদীর প্ররোচনায় তাহারাও মোসলমানদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে একযোগে মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়িল; যাহার উল্লেখ শুধু ইতিহাসেই নহে; কোরআন শরীফেও আছে। এই সঙ্কট মুহূর্তে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ মোসলমানদের পক্ষে এত ভীষণ দুঃখ জনক ও ক্ষতিকারক হইল যে, মুল ঘটনার চব্বিশ হাজার শত্রুবাহিনী দ্বারাও তাহা হইয়াছিল না। কারণ, মুল শত্রু বাহিনী যতই অধিক ছিল না কেন তাহারা বাহিরে ছিল, পরিখার সাহায্যে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বনু-কোরায়জা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন তাহারা ঘরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বনু-কোরায়জা গোত্র এমন মুহূর্তে ও পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা করিল যে, তাহাদের এহেন কার্য্য দুনিয়ার কোন সভ্য জাতির নিকটই মার্জনীয় হইতে পারে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা মানবতার প্রতি চরম আঘাতই নহে শুধু, বরং মনুষ্যত্বের উপর আস্থা বিনষ্টকারী অপরাধ ছিল। তাহাদের এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি বিধানে কোন প্রকার বিলম্ব না করাই স্বয়ং বিধাতা আল্লাহ তায়ালার মর্জি ছিল। তাই খন্দকের

ঘটনার মুল শত্রু বাহিনী প্রতিহত হওয়ায় পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে পঙ্গেই ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ পোষাক পরিহিত উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি যুদ্ধ পোষাক খুলিয়া ফেলিয়াছেন? আমরা কিন্তু তাহা করি নাই। এই বলিয়া জিব্রিল ফেরেশতা বিশ্বাসঘাতক বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি ইশারা করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। খন্দকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী তিন হাজার মোজাহেদ বাহিনীকে অভিযান পরিচালনার আদেশ দেওয়া হইল। তখন আছরের নামাযের সময় নিকটবর্তী ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাবিলেন, মোজাহেদগণ মদীনায় আমার মসজিদে আছরের নামায পড়িয়া তৎপর রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষায় বিলম্ব করিতে পরে, তাই তিনি সকলকে বিশেষ তাকিদের সহিত আদেশ করিলেন, বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া কেহ যেন আছরের নামায না পড়ে। ছাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি যাত্রা করিলেন, এমনকি পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পথিমধ্যে নামায না পড়িয়া বনু কোরায়জার বস্তিতে পৌঁছিয়া আছরের নামায কাজা পড়িলেন।

বনু-কোরায়জার লোকগণ প্রথমে বিশেষরূপে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শানে নানাপ্রকার কুৎসিত গালীগালাজ করতঃ উত্তেজনার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পুর্ণরূপে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদের কিল্লার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল। রসুল (দঃ) স্বীয় মোজাহেদ বাহিনীকে কিল্লা ঘেরাও করিবার আদেশ দিলেন। প্রায় এক মাস এই অবরোধ অবস্থা চলিল। অবশেষে তাহারাই সালিসের প্রস্তাব পেশ করিল।

ইহজগতে স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তিভোগ তাহাদের প্রাপ্য ছিল, নতুবা তাহারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অতি সহজে সব কিছু মুছিয়া ফেলিতে পারিত। তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতঃ সেই সুযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তাহা না করিয়া স্বীয় বন্ধুভাবাপন্ন "আউস্" গোত্রের সরদার—ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)কে সালিসরূপে মনোনীত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এই মনোনয়নে সম্মতি দিলেন। সায়াদ (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে ঘটনাস্থলে লইয়া আসা হইল।

বনু কোরায়জার অপরাধ এই ধরণের ছিল ঃ

মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় বনু-কোরায়জা গোত্রের সঙ্গেও সহ-অবস্থান ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন বনু-নজীর গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে মদীনা হইতে বহিস্কৃত হইল, তখন এই বনু-কোরায়জা বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশ করতঃ পুনরায় নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল।

সেইরূপ দৃঢ় চুক্তি তাহারা ভঙ্গ করিয়া মোসলমানদের জীবনের সর্বাধিক সঙ্কটময় মুহূর্তে—পূর্ব বর্ণিত খন্দকের জেহাদকালে এইরূপে বিদ্রোহ করিল যে, তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট বিপদ মূল বিপদ হইতে অধিক আশঙ্কাময় হইয়া দাঁড়াইল।

এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য কতিপয় ছাহাবীকে তাহাদের বস্তিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে এমন বিদ্রোহীরূপে পাইলেন যেরূপ ধারণাও করা হইয়াছিল না। তাহারা ঐ ছাহাবীগণের সাক্ষাতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শানে বে-আদবী করিল। তাহারা পরিষ্কার ভাষায় বলিল, لا عهد بيننا و بين محمد 'মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোন সন্ধি নাই।' ঐ অনুসন্ধানকারী ছাহাবীগণ তাহাদেরে পূর্বে বর্ণিত "রাজী" ঘটনার বিশ্বাসঘাতকদের সমতুল্য বলিয়া রিপোর্ট দিলেন।

তাহাদের বিদ্রোহের সংবাদে হযরত (দঃ) মোসলমান নারী ও শিশুগণকে একটি কিল্লায় একত্র করিয়া দিয়াছিলেন, সেখানে হযরতের বিবিগণও ছিলেন। বিদ্রোহী বনু-কোরায়জা সেই কিল্লার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়াছিল।

সুধী পাঠক! বিচার করুণ, এই শ্রেণীর বিদ্রোহী শত্রুদলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য নয় কি? কোন জাতি কি এই শ্রেণীর বিদ্রোহীকে বরদাশ্‌ত করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন ইহুদীদের অনুসরণীয় আসমানী কিতাব তৌরিতেও এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত ছিল।

(১) যোদ্ধা তথা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষগণকে প্রাণদণ্ড দান।

(২) বালক ও নারীগণকে এবং স্থাবর সমুদয় সম্পত্তিকে গণিমতের মাল তথা অধিকৃত সম্পদে পরিণত করা। (সীরাতুন-নবী ১ম খণ্ড ৩১৯ পৃঃ)

সায়াদ (রাঃ) বনু-কোরায়জার অপরাধ দৃষ্টে যেরূপ শাস্তির রায়দানে বাধ্য ছিলেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ন্যায় ও হক-ইনসাফের উপর দৃঢ় থাকিয়া তিনি এই রায় দিলেন যে, বিদ্রোহী বনু-কোরায়জার যোদ্ধা পুরুষগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক। তাহাদের ধন-সম্পদকে গণিমত তথা বিজিত মাল গণ্য করা হউক। নারী ও নাবালকগণকে (তাহাদেরই মঙ্গল ও কল্যাণ তথা রক্ষণাবেক্ষণের সহজ ব্যবস্থার বিধানমতে) মোসলমান-গণের হস্তগত গণ্য করারও রায় দিলেন।

সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রায় ও সুপারিশসমূহ বনু-কোরায়জার দুষ্কৃতির সমুচিত ইনসাফ ছিল, যাহা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত বিধান মোতাবেক ছিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রায় শ্রবণে বলিলেন, তুমি আল্লার ফয়সালা মোতাবেক রায় দিয়াছ।

অদৃষ্টের পরিহাস—বনু-কোরায়জা স্বীয় দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করিবে ইহাই বিধাতার বিধান ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত ছিল। সায়াদ (রাঃ) যদিও বনু-কোরায়জার বন্ধু গোত্রীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন বিশেষ সম্মানিত সরদার স্বীয় গোত্রের প্রধান ছিলেন।

ইনসাফ ও ন্যায় বিরোধী রায় দানের কলঙ্ককে তিনি বরণ করিতে পারেন না, তাই বনু-কোরায়জা কর্তৃক সালিশ মনোনীত হইলেও কিন্তু তিনি ন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারের রায় দিলেন। তিনি বনু-কোরায়জারই মনোনীত সালিশ ছিলেন; তাই তাঁহার রায় অস্বীকার করার উপায় তাহাদের ছিল না। তাঁহার রায় ও ফয়সালা কার্য্যকরী করা হইল—ছয় শত বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল; এইরূপে বনু-কোরায়জার বিদ্রোহের ঘটনার সমাপ্তি ঘটিল।

১৪৭৯। **হাদীছঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খন্দকের জেহাদ সামাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অস্ত্র-শস্ত্র খুলিয়া গোসল করিলেন, এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি অস্ত্র-শস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা করি নাই। এখনই যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হউন। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন কোন দিকে যাত্রা করিব? জিব্রাইল (আঃ) বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি ইশারা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন তাহাদের প্রতি অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন।

১৪৮০। **হাদীছঃ**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি যাইতে ছিলেন তখন (জিব্রাইল আলাইহে-চ্ছালামের অধীন ফেরেশতা বাহিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে ছিলেন, এমনকি (পথিমধ্যে) বনী-গনম্ গোত্রীয় বস্তির গলিতে জিব্রাইল-বাহিনীর গমনে ধূলা উড়িবার দৃশ্য এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

১৪৮১। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ হইতে যেই দিন প্রত্যাবর্তন করা হইল সেই দিনই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে এই আদেশ করিলেন যে, বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া কেহ যেন আছরের নামায না পড়ে।

একদল লোক পথিমধ্যে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন যে, পথিমধ্যেই আছরের নামায পড়িতে হয় (নতুবা নামায কাজা হইয়া যায়, তখন) তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইল; কতিপয় লোক এই কথার উপর দৃঢ় রহিলেন যে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন; আমরা তথায় না পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িব না।

অন্য কতিপয় লোক বলিলেন, ঐ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য এই ছিল না (যে, নামায কাজা করিয়া দেওয়া হউক; উদ্দেশ্য ছিল, যথাসত্বর তথায় পৌঁছা; এই বলিয়া তাঁহারা পথেই নামায পড়িলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ তথায় নামায পড়িলেন না; নামায কাজা

হইল, বনু-কোরায়জার বস্তিতে পৌঁছিয়া তাঁহারা আছরের নামায কাজা পড়িলেন।) উভয় পক্ষের কার্য্যক্রম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করা হইল, তিনি কোন পক্ষকেই তিরস্কার করিলেন না।

ব্যাখ্যা :—যাঁহারা পথিমধ্যে নামায পড়িলেন না তাঁহাদের ধারণা ভিত্তিহীন ছিল না, জেহাদের কার্য্যে বিশেষ লিপ্ততায় নামায কাজা করা যায়—যাহার নজীর ইতিপূর্বে খন্দকের জেহাদে দেখা গিয়াছে; সেই দিক লক্ষ্যে তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক দিকের উপর দৃষ্টি করিলেন।

যাঁহারা নামায পড়িলেন, তাঁহাদের কার্য্যক্রমও শরীয়তের বিধান মোতাবেক ছিল, কারণ উপস্থিত নিষেধাজ্ঞাটি একটি সাময়িক বিষয় ছিল এবং তাঁহারা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার আদেশের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নামাযের ওয়াক্তের পাবন্দী সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছের যে সব স্পষ্ট নির্দেশ ও বিধান রহিয়াছে ঐ সবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। যদি কোরআন-হাদীছের ঐ সব স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান না থাকিত তবে তাঁহারা উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার উপরই আমল করিতেন। অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণের কোন অবকাশ থাকিত না এবং উহার আবশ্যকও হইত না।

পাঠকবর্গ। এই ঘটনায় একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কোন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন দলীল ও সূত্র দৃষ্টে কার্য্যাবলম্বনের বিভিন্নতা সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উভয় পক্ষেই হাদীছ-কোরআনের স্পষ্ট নজীর, নির্দেশ বা বিধান বিদ্যমান থাকিতে হইবে; যেরূপ এই স্থলে ছিল। এক পক্ষে উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে খন্দকের জেহাদ কালে জেহাদে লিপ্ততার দরুণ নামায সঠিক ওয়াক্ত হইতে বিলম্ব করার নজীরও বিদ্যমান ছিল, অপর পক্ষে কোরআনের স্পষ্ট বিধান—ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "নির্দ্ধারিত ওয়াক্তে নামায পড়া মোসলমানদের উপর ফরজ" এবং ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট উক্তি—من فاتته صلوة العصر فكانما وتر اهله وماله "কাহারও আছরের নামায ছুটিয়া গেলে তাহার এতদুর ক্ষতি হয় যেন তাহার ধন-জন সর্বস্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" এই সমস্ত স্পষ্ট বিধান ও নির্দেশাবলী দৃষ্টে উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণাদি ব্যতিরেকে শুধু যুক্তির ভাওতা ধরিয়া কোরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

১৪৮২। **হাদীছ :**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু কোরায়জার লোকগণ সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) ছাহাবীর সালিস ও ফয়সালা মানিয়া লইবে এই শর্তে কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়াদ (রাঃ)কে খবর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গাধায় আরোহণ করিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) ঐ এলাকায় নামাযের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ছিলেন; সায়াদ (রাঃ) তথায়

অবস্থান করিতেছিলেন। সায়াদ (রাঃ) স্বীয় গোত্রের সরদার ছিলেন, যখন তিনি সালিস-স্থলের নিকটবর্তী পৌঁছিলেন তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত মদীনাবাসী ছাহাবীগনকে বলিলেন, তোমাদের সরদারের প্রতি অগ্রসর হও (এবং তাহাকে নামাইয়া আন।)

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, বনু-কোরায়জাগণ আপনার সালিসী ও ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) রায় দান করিলেন—তাহাদের যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক এবং শিশু ও নারীগণকে বন্দী বা হস্তগত গণ্য করা হউক। তাঁহার এই রায় শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আপনি আল্লাহ তায়ালার মর্জি মোয়াফিক রায় দান করিয়াছেন।

১৪৮৩। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) স্বীয় হস্তের শিরা-নাড়ীতে তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হইলেন। কোরায়েশ গোত্রীয় হেব্বান নামক এক ব্যক্তি ঐ তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী নামায-স্থানে একটি তাঁবু টানাইয়া তথায় তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন।

খন্দকের জেহাদ হইতে অবসর হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হাতিয়ার-পত্র খুলিয়া গোসল করিলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) মাথার ধুলা-বালু ঝাড়িতে ঝাড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি হাতিয়ার খুলিয়া ফেলিয়াছেন, আমি এখনও হাতিয়ার খুলি নাই; চলুন ওদের প্রতি। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন দিকে যাত্রা করিব? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, বনু-কোরায়জাগণের বস্তির প্রতি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন। (বনু-কোরারজাগণ কিল্লার ভিতর আশ্রয় নিল। তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া আবদ্ধ রাখা হইল।) অতঃপর তাহারা প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিল।

সায়াদ (রাঃ) তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে এই রায় দিলেন যে, তাহাদের যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক এবং নারী ও শিশুগণকে হস্তগত করা হউক এবং ধন-সম্পত্তি গনিমতরূপে বন্টন করা হউক।

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ (রাঃ) বনু-কোরায়জার ঘটনার পর আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই দোয়া করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ! তুমি জান—যে লোকেরা তোমার রসুলকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহার দেশ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরায়েশ) তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ করাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। (খন্দকের ঘটনার পর মক্কাবাসী কোরায়েশদের যেহেতু আর কোন সময় আক্রমণ করার সাহস হইবে না বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)

ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাই) আমার মনে হয়, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। যদি এখনও কোরায়েশদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিয়া থাকে তবে আমাকে রোগমুক্ত করিয়া জেন্দেগী দান কর যেন আমি তোমার রাস্তায় তাহাদের মোকাবিলায় জেহাদ করিতে পারি। আর যদি বাস্তবিকই তাহাদের মোকাবিলায় জেহাদের অবসান হইয়া থাকে তবে (তাহাদের মোকাবিলায় সর্বশেষ জেহাদে প্রাপ্ত আমার) এই আঘাতে রক্ত প্রবাহিত করিয়া এই সুত্রে আমার মৃত্যু ঘটাও। (যেন জেহাদে প্রাণ দেওয়ার মর্তবা লাভ হয়।) এই দোয়া করার পর তাঁহার ঐ ক্ষত হঠাৎ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পড়িল এবং হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হওয়ায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন "রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।"

ব্যাখ্যা :—সায়াদ (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট কত পেয়ারা ছিলেন ! রসুলুল্লাহ (দঃ) খবর দিয়াছেন, তাঁহার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আল্লাহ তায়ালার মহান আরশ পর্য্যন্ত শোক বিহ্বল হইয়াছিল।

১৪৮৪। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু-কোরায়জার ঘটনার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কবি ছাহাবী হাচ্ছান (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, বিধর্মীদের নিন্দা করিয়া কবিতা রচনা কর ; জিব্রাঈল ফেরেশতা তোমার সাহায্যে থাকিবেন।

জাতুর-রেকার জেহাদ

এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হওয়ার সন ও তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। নজ্দ এলাকায় গাতাফান বংশীয় কতিপয় শাখা গোত্র ছিল। হযরত (দঃ) এই মর্মে এক সংবাদ পাইলেন যে, ঐ গোত্রসমুহ একতাবদ্ধ হইয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে সেনা বাহিনী গঠন করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পুর্বাহ্নেই তাহাদের শক্তি নষ্ট করার জন্য পাঁচ-সাত শত মোজাহেদ বাহিনী সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তাহাদের প্রতি অভিযান পরিচালিত করিলেন। মদীনা হইতে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থিত "নখ্ল" নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌছিলেন। শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ পাহাড় পর্বত এলাকায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। পনর দিন পর হযরত (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১৪৮৫। হাদীছ :—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক জেহাদ উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। (আমাদের যানবাহনের সংখ্যা-স্বল্পতার দরুণ কতিপয় ব্যক্তি এক একটি যানবাহন একের পর অন্যে আরোহণ করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল।) আমাদের প্রত্যেক ছয় জনের মধ্যে একটি মাত্র যানবাহন ছিল। পাহাড়ীয় রাস্তায় পায়ে হাটার দরুণ আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, এমনকি পাথরের সঙ্গে আঘাত খাইয়া খাইয়া আমাদের পায়ের নখ সমুহ

ঝরিয়া গিয়াছিল। যদ্দরুণ আমরা সকলেই পায়ে নেকড়া পোঁচাইয়া রাখিয়া ছিলাম। সেই সূত্রেই এই জেহাদকে "জাতুর-রেকা" নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ("রেকা" বহুবচন "রোক্‌আতুন"-এর; অর্থ নেকড়া; জাতুর-রেকা অর্থ নেকড়াওয়ালা।)

আবু মুছা (রা:) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া অনুতপ্ত হইলেন যে, স্বীয় নেক আমল লোক সম্মুখে প্রকাশ করিলেন যাহাতে রিয়া—লোকদের হইতে প্রশংসা লাভের স্পৃহা বুঝায়।

১৪৮৬। হাদীছ:— ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোন একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জাতুর-রেকার জেহাদের দিন রণাঙ্গনের জন্য বিশেষ কায়দারূপে নামায পড়িয়াছিলেন। সকলে হযরতের পেছনে নামায আদায় করার এই পন্থা অবলম্বন করিলেন যে, একদল মোজাহেদ শত্রুর আশঙ্কা দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন, আর একদল হযরতের সঙ্গে একতেদা করিয়া নামায আরম্ভ করিলেন; এক রাকাত নামায হইলে পর রসুলুল্লাহ (দ:) দ্বিতীয় রাকাতকে অতি দীর্ঘ করিলেন; তিনি এই দ্বিতীয় রাকাত পড়িতে ছিলেন—এই অবসরে মোক্তাদীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত সমাপ্ত করত: সালাম ফিরিয়া শত্রুর আশঙ্কা দিকে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রথমে যেই দল তথায় ছিলেন তাঁহারা আসিয়া হযরতের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হইলেন; হযরত এখনও দ্বিতীয় রাকাত পড়িতেছিলেন। অত:পর রুকু-সেজদা করিয়া রাকাত পুরা করিয়া রসুলুল্লাহ (দ:) আত্তাহিয়্যাত পড়ার জন্য বসিলেন এবং দীর্ঘ সময় বসিলেন; এই অবসরে মোক্তাদীগণ না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং দ্বিতীয় রাকাত পড়িয়া বসিলেন এবং আত্তাহিয়্যাত পড়িলেন, অত:পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লাম তাহাদের সহ সালাম ফিরাইলেন।

ব্যাখ্যা:- সাধারণ অবস্থায় ইমামের সঙ্গে নামায পড়িলে ঐরূপ কার্য্যকলাপ নামায বিনষ্টকারী গণ্য হয়, কিন্তু রণাঙ্গনে যখন সকলে একত্রে নামায আরম্ভ করিলে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তখন নামায এবং এক জামাত কায়েম রাখার জন্য শরীয়তে বিশেষ ব্যবস্থা স্বরূপ ঐরূপ পন্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এমনকি অবস্থা দৃষ্টে অন্যান্য কায়দা অবলম্বন করাও বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ আছে; তবুও যেন নামায এবং এক জামাত কায়েম থাকে।

১৪৮৭। হাদীছ:—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নজ্‌দ এলাকার প্রতি এক অভিযানে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে একদা সকলেই দুপুর বেলা কোন এক ময়দানে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই ময়দানে "এজাহ্‌" নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছের আধিক্য ছিল। সকলে বিভিন্ন স্থানে ঐ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন, হযরত (দ:) একা একটি বাবুল গাছের ছায়া গ্রহণ করিলেন। হযরত (দ:) স্বীয় তরবারী ঐ গাছের সঙ্গে লটকাইয়া রাখিয়া আরাম করিলেন।

জাবের (রা:) বলেন, আমরা সকলেই নিদ্রামগ্ন ছিলাম হঠাৎ আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ডাক শুনিলাম; আমরা সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম; আমরা তথায় এক বেদুইনকে বসা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সম্বোধন পূর্বক তাহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম; এই লোকটি আমার তরবারী হস্তগত করতঃ উহা উন্মুক্ত অবস্থায় আমার উপর ধরে, আমি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাই। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাকে ভয় করেন কি? আমি বলিলাম না। সে বলিল, এই অবস্থায় আমার হাত হইতে আপনাকে কে রক্ষা করিবে? সে একাধিকবার এইরূপ বলিল। আমি উত্তরে বলিলাম—আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ! (ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল, অতঃপর এইরূপও হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তরবারীখানা নিজ হস্তে উত্তোলন করতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? সে বলিয়াছে, কেহ নাই; আপনি স্বীয় উদারতা প্রকাশ করুন।) এই দেখ সে এখানে বসিয়া আছে। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তিকে ধমকাইলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না। (হযরত (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে নিজ বস্তিতে আসিয়া সকলকে বলিল, আমি এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করিল এবং বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করিল।

১৪৮৮। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আনমার জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে দেখিয়াছি। তখন নবী (দঃ) স্বীয় বাহনের উপর নফল নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহার বাহন পূর্বদিকে ছিল; তিনি সেই দিকেই নামায পড়িতেছিলেন।

ব্যাখ্যা :—ভ্রমণ অবস্থায় বাহনের উপর নফল নামায পড়ার জন্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে কেবলামুখী না হইলেও চলে; অবশ্য ফরজ বা ওয়াজেব নামায ঐরূপে শুদ্ধ হয় না।

হোদায়বিয়ার জেহাদ

মক্কা হইতে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি এলাকার নাম হোদায়বিয়া। ঐ স্থানে একটি কূপ ও বিরাট একটি ময়দান আছে। বর্তমানে ঐ এলাকাকে "শোমায়ছিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন প্রকার আক্রমণ বা লড়াই-জেহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ছিলেন না, বরং বিশেষরূপে এই সবকে পরিহার করিয়া শুধু মাত্র ওমরা (হজ্বের ন্যায় একটি বিশেষ এবাদত) আদায় করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া এলাকায় পৌঁছিয়া মোসলমানগণ মক্কার কাফেরগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে উভয় পক্ষে ছোলাহ বা সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে "ছোল্‌হে-হোদায়বিয়া—হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অবশ্য বাধাদানের প্রাথমিক অবস্থায় সংঘর্ষের পরিস্থিতি দেখিয়া মোসলমানগণ জেহাদের জন্য শুধু প্রস্তুতই হইয়াছিলেন না, বরং বিশেষ উত্তেজনার মধ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত প্রত্যেক মোসলমানের নিকট হইতে হাতে হাত দিয় এইরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, "হয় মক্কা জয়, না হয় জীবন ক্ষয়।" জেহাদের জন্য এইরূপ প্রস্তুতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই ঘটনাকে হোদায়বিয়ার জেহাদও বলা হয়। যদিও অবশেষে জেহাদ না হইয়া ছোলেহ বা সন্ধি হইয়াছিল।

চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে বা পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের চূড়ান্ত অভিযান এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর মোসলমানদের বিরুদ্ধশক্তি বিশেষতঃ কোরেশ ও ইহুদীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের উপর মোসলমানদের প্রভাব বসিয়া যায়। পক্ষান্তরে মোসলমানদের বুকে নব বলের সঞ্চার হয়, পূর্বাপেক্ষা তাঁহারা অধিক নির্ভীক হইয়া পড়েন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণীরূপে উক্ত অবস্থার সংবাদও মোসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করেন, যেমন ১৪৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই :

ষষ্ঠ হিজরী সনে একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি নির্বিঘ্নে ছাহাবীগণ সহ মক্কায় হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কেহ মাথার চুল কাটিয়াছেন কেহ মুণ্ডন করিয়াছেন। (যাহা হজ্জ ওমরা সমাধা করার একটি বিশেষ কার্য্য।)

হযরত (দঃ) তাঁহার এই স্বপ্ন ছাহাবীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন এবং জিলকদ মাসে ওমরা করার জন্য মক্কা রওয়ানা হইবেন স্থির করিলেন। নবীগণের স্বপ্ন অহী—উহাতে অবাস্তবের কোন অবকাশ নাই, কিন্তু ঐ স্বপ্নের মধ্যে মক্কায় নির্বিঘ্নে প্রবেশের দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল না। অবশ্য স্বপ্ন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ওমরায় গমনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ছাহাবীগণ এই ধারণা করিলেন যে, ঐ স্বপ্নের বাস্তবতা এই বৎসরই প্রকাশ পাইবে—মোসলমানগণ নির্বিঘ্নে মক্কায় যাইয়া ওমরা সমাধা করিতে পারিবে। এই পরিস্থিতিতে ছাহাবীগণের মধ্যে ওমরায় যোগদানের বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। প্রায় দেড় হাজার ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী হইলেন। জিলকদ মাসে রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরম শরীফে আল্লার নামে জবেহ করার জন্য যেই জানোয়ার সঙ্গে লওয়া হয় উহাকে 'হাদী' বলা হয়। এইরূপ সত্তরটি উট হযরতের সঙ্গে ছিল, যাহার মধ্যে ঐ উটটিও ছিল যেইটি বদরের জেহাদে নিহত মক্কার সরদার আবু জহলের ছিল।

মোসলমানগণ উহাকে হস্তগত করেন এবং গণীমতের মালামাল বণ্টনে উহা হযরতের মালিকানায় আসে।

মদীনা হইতে অনতিদূরে—জোলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও ছাহাবীগণ ওমরার এহরাম বাঁধিলেন এবং তথা হইতে গোপন খবর সরবরাহকারী একজন লোককে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন; মক্কাবাসীদের অবস্থা ও মনোভাবের সংবাদ সরবরাহ করার জন্য। এইসব ব্যবস্থার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "ওসফান" নামক বস্তির নিকটবর্তী পৌঁছিলে পর গুপ্তচর তথায় উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ দিল, মক্কাবাসী কোরায়েশ এবং তাহাদের কতিপয় বন্ধু গোত্র একত্রিত হইয়াছে এবং স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, তাহারা আপনাকে মক্কায় পৌঁছিতে দিবে না; আপনাকে নিশ্চয় বাধা দিবে এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শক্রমে ইহাই স্থির হইল যে, আমরা যেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি শান্তিপূর্ণভাবে সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইব। যদি কেহ বাধা দেয় তবে প্রয়োজন হইলে আক্রমণ প্রতিহত করিতে জেহাদ করিব। অথচ মোসলমানগণ এতদূর শান্তিপূর্ণ মনোভাব লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের নিয়মিত অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে আনেন নাই, শুধুমাত্র পথিকের সম্বল তরবারী সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মনোবল অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় ছিল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে আদেশ করিলেন আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হও। কতদূর অগ্রসর হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) জানিতে পারিলেন, মক্কা যাতায়াতের সাধারণ পথে খালেদ ইবনে অলীদ (তিনি তখনও মোসলমান হন নাই) একটি বিশেষ বাহিনী লইয়া প্রতীক্ষামান আছে, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন পাহাড়ীয় রাস্তার ঐ মোড়ে পৌঁছিলেন যেই মোড়ের সম্মুখেই মক্কার সন্নিকটস্থ এলাকা হোদায়বিয়ার ময়দান অবস্থিত, তখন তাঁহার যানবাহন হঠাৎ বসিয়া পড়িল। উহাকে দাঁড় করাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে দাঁড়াইল না। হযরত (দঃ) স্বীয় যানবাহনের এই অস্বাভাবিক ব্যাপারকে বিশেষ কোন ঘটনা সম্পর্কে আল্লার পক্ষ হইতে ইঙ্গিত দান বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর যানবাহনকে পুনঃ তাড়া করা হইলে সে দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু সম্মুখে না যাইয়া রাস্তার পার্শে নামিয়া গেল। রসুলুল্লাহ মক্কার পথে অগ্রসর না হইয়া সম্মুখস্থ হোদায়বিয়ার ময়দানে অবতরণ করিলেন এবং প্রতীক্ষায় রহিলেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মনোভাব অবলম্বনের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করিলেন।

এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ পক্ষ হইতে বিশিষ্ট দুত হিসাবে ওসমান (রাঃ)কে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিলেন—এই সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করিবার জন্য যে, আমরা শুধু ওমরা আদায় করার নিয়্যতে আসিয়াছি, আমরা ওমরার কার্য্যাবলী সমাপণ করিয়া চলিয়া যাইব।

মক্কাবাসীরা এতই বর্বরতার পরিচয় দিল যে, ঐরূপ শান্তিপূর্ণ মনোভাবের মোকাবিলায় তাহারা দূত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার উদারতাটুকুও দেখাইতে পারিল না। তিনি স্বীয় এক আত্মীয়—বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রিতরূপে মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিলেন বটে এবং সেই সূত্রে তিনি অক্ষতও রহিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীগণ হযরতের প্রেরিত কথার প্রতি কর্ণপাতও করিল না, বরং ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে তাহারা এমন ব্যবহার করিল যদ্দরুন এই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই খবর মোসলমানদের মধ্যে বিজলী গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদে ভীষণ মর্মাহত হইলেন, তৎক্ষণাৎ মোসলমানগণকে একত্রিত করিলেন এবং হাতে হাত দিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে এই দৃঢ় অঙ্গীকার লইলেন যে, "হয় মক্কা বিজয়, না হয় জীবন ক্ষয়।"

ছাহাবীগণ সকলেই তখন বিশেষ একনিষ্ঠতা ও পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন; ইহাকেই "বায়রা'তে রেজ্ওয়ান" বলা হয়; যাহার ফজিলত বর্ণনার্থে কোরআন শরীফের কতিপয় আয়াত নাযেল হয়। যথা—

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى.......

"যাহারা আপনার হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছে; তাহাদের হাতের উপর (বাহ্যিক রূপে আপনার হাত, কিন্তু বস্তুতঃ যেন—) আল্লার হাত। অতএব যে কেহ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে সে উহার কুফল নিশ্চয় ভোগ করিবে এবং যে ব্যক্তি আল্লার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অতি বড় প্রতিফল দান করিবেন। (২৬ পাঃ ৯ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা আরও সুসংবাদ দান করিলেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

"যে সকল মোমেনগণ বাবুল গাছের তলায় আপনার নিকট (ইসলামের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করার) অঙ্গীকার করিতেছিল, আল্লাহ তায়ালা (ঘোষণা দিতেছেন যে, তিনি) তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" (২৬ পাঃ ১০ রুঃ)

"বায়আ'তে রেজ্ওয়ান" নামের উৎসও ইহাই। "বায়আ'ত" অর্থ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং "রেজ্ওয়ান" অর্থ সন্তুষ্টি; এই অঙ্গীকারের উপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন, তাই ইহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করা হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওসমান (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন প্রকাশ হইয়া গেল যে, তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদ সঠিক ছিল না। কিন্তু মক্কাবাসী কোরায়েশদের উপর এই সুদৃঢ় প্রস্তুতির

ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হইল। তাহাদের গোড়ামির উপর কিঞ্চিৎ পানির ছিটা পড়িল। ইতিমধ্যে মক্কার নিকটস্থ অধিবাসী "খোযায়া" গোত্র মোসলমানদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ভাল ছিল, সেই গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল বোদায়েল ইবনে অরাক্কা নামক সর্দারের নেতৃত্বে হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরায়েশদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট স্বীয় শান্তিপূর্ণ মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং ইহাও বলিলেন, কোরায়েশরা ইচ্ছা করিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে। ইত্যবসরে যদি আমি আরবের অন্যান্য লোকদের দ্বারা নিঃশেষ হইয়া যাই তবে কোরায়েশরা বিনা কষ্টে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে। আর যদি আমি সকলের উপর প্রবল হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হই তবে কোরায়েশরা ধীর-স্থিরতার সহিত চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্ম-পন্থা নির্দ্ধারণের সুযোগ পাইবে। এই সব প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া যদি তাহারা যুদ্ধের হুঙ্কারই ছাড়িতে থাকে তবে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, দ্বীন ইসলামের জন্য সর্বশেষ রক্ত-বিন্দু দান করিতেও কুণ্ঠিত হইব না—তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইব।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রস্তাব ও দৃঢ় মনোভাব কোরায়েশগণকে অবগত করার অনুমতি লইয়া বোদায়েল ইবনে অরাক্কা অবিলম্বে মক্কাবাসীদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিল যে আমি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) এর নিকট হইতে কতকগুলি কথা শুনিয়া আসিয়াছি যাহা তোমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। তাহাদের মধ্যে যুবক দল ঐরূপ কোন কথা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু মুরব্বি শ্রেণীর লোকগণ উহাতে সম্মত হইল। যখন হযরতের প্রস্তাব সমূহ তাহাদের সম্মুখে রাখা হইল তখন তাহাদের প্রভাবশালী এক বিশিষ্ট ব্যক্তি—ওরওয়া ইবনে মসউদ দাঁড়াইয়া বলিল, এইসব প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত, আমার উপর যদি তোমাদের পূর্ণ আস্থা থাকিয়া থাকে, তবে মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলিবার সম্মতি আমাকে দিতে পার।

ওরওয়ার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। ওরওয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য তাঁহাকে বুঝ প্রবোধ দান করতঃ ছাহাবীগণ সম্পর্কে একটি জঘন্য মন্তব্য করিল। আবুবকর (রাঃ) তিক্ত ভাষায় প্রতিউত্তর করিলেন। এতদ্ভিন্ন হযরতের সঙ্গে অশোভনীয় ব্যবহারের দরুণও তাহাকে নাজেহাল হইতে হইল। এই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে এবং দীর্ঘ সময় ছাহাবীদের মধ্যে অবস্থানের সুযোগে সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবীগণের অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও চরম উৎসর্গতার দৃশ্য দেখিয়া অত্যধিক মুগ্ধ হইল। কোরায়েশদের নিকট প্রত্যাবর্তনে সে ঐ দৃশ্যের বর্ণনা দান পূর্বক তাহাদিগকে হযরতের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরামর্শ দিল।

অতঃপর কোরায়েশ বংশের বন্ধু "কেনানা" গোত্রের "হোলায়েস" নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এই ঘটনায় মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনুমতি চাই। কোরায়েশরা সম্মত হইল। হোলায়েস আসিতেছিল, ছাহাবীগণ কোরবানীর জানোয়ার সমুহকে লইয়া "লাব্বাইকা—" পড়িতে পড়িতে তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ছাহাবীগণের এই অকৃত্রিম দৃশ্য দেখিয়া মধ্য পথ হইতেই হোলায়েস প্রত্যাবর্তন করিল এবং মোসলমানদেরে মক্কা প্রবেশে বাধা দান হইতে বিরত থাকার জন্য কোরায়েশগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। তাহারা তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় সে তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল যে, আমরা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ সকলকে লইয়া ছিন্ন হইয়া যাইব। কোরায়েশরা বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এই সম্পর্কে অধিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রতি অগ্রসর হইল এবং মেকরায ইবনে হাফছ নামক এক ব্যক্তিকে মীমাংসার কথাবার্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল। সে ছিল দুষ্ট প্রকৃতির, সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া কথাবার্তা বলিতে-ছিল এমতাবস্থায় সোহায়েল ইবনে আমর নামক দ্বিতীয় এক ব্যক্তি কোরায়েশগণের পক্ষ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, মনে হয় কোরায়েশরা বাস্তবিকই মীমাংসার ইচ্ছা করিয়াছে। সোহায়েলের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, আমাদের একমাত্র দাবী এই যে, আল্লার ঘরে পৌছিতে আমাদিগকে বাধা প্রধান করা না হউক। সোহায়েল বলিল, এই পরিস্থিতিতে আপনাকে মক্কার পথ ছাড়িয়া দিলে সমগ্র আরববাসী এই বলিয়া আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিবে যে, আমরা মোসলমানদের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। এই বলিয়া কটাক্ষ করার কলঙ্ক আমরা বরণ করিতে পারি না। অতএব আপনাকে এই বৎসর ফেরৎ যাইতে হইবেই, অবশ্য কতিপয় শর্তে আপনার সঙ্গে আমাদের সন্ধি হইতে পারে এবং সেই সুত্রে আপনি আগামী বৎসর স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারিবেন।

শর্ত সমুহ নিম্নরূপ ছিল :

(১) এই বৎসর অবশ্যই ফেরৎ যাইতে হইবে।

(২) আগামী বৎসর মক্কায় তিন দিনের অধিক অবস্থান করা যাইবে না।

(৩) মক্কায় প্রবেশ করিতে উন্মুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র বহন করা যাইবে না।

(৪) মক্কার কোন ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত হইয়া যাইতে চাহিলে মোসলমানগণ তাহাকে সঙ্গে নিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে মোসলমান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ মক্কায় থাকিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ মদীনায় চলিয়া গেলে তাহাকে আমাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে লইবে। কিন্তু কোন মোসলমান ইসলাম ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া আসিলে তাহাকে প্রত্যার্পণ করা হইবে না।

(৬) উক্ত শর্ত সমূহের ভিত্তিতে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি করা হইবে, এই সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ একে অন্যের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং অন্য কোন আক্রমণকারীকে কোন প্রকার সাহায্য সমর্থনও দিতে পারিবে না। আরবের অন্য যে কোন গোত্র উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা করিতে পারিবে এবং উভয়পক্ষ অপর পক্ষের মিত্র সম্পর্কে বাধ্যতামূলক এরূপ অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিবে—ঐ মিত্রের উপর আক্রমণও করা যাইবে না এবং তাহাদের উপর আক্রমণকারীকে সাহায্য সমর্থনও দেওয়া যাইবে না।

সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল এমতাবস্থায় মোসলমানগণের সম্মুখে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা উপস্থিত হইল যদ্দারা তাঁহারা ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। সন্ধি-চুক্তির আলাপ আলোচনার বিপক্ষের মুখপাত্র—সোহায়েল-এর পুত্র আবু জন্দল (রাঃ) যিনি মোসলমান হইয়া যাওয়ায় দীর্ঘকাল হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে মারপিটের যাতনা ভোগ করিতে ছিলেন—তিনি এই সময় মোসলমানদের মধ্যে আসিয়া যাইতে সক্ষম হইলেন। তখন সন্ধির চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তানুযায়ী তাঁহাকে প্রত্যার্পণের দাবী করা হইল। মোসলমানগণ বিশেষতঃ ওমর (রাঃ) কিছুতেই ঐ দাবী সহ্য করিতে পারিতে ছিলেন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে প্রত্যার্পণ না করার সর্বপ্রকার চেষ্টায় ব্যর্থ হইরা দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন। তিনি আল্লার রসুল; প্রতিটি ঘটনার শেষ বাস্তব ফলাফল তিনি অবহিত হইতে ছিলেন যাহা অন্য কাহারও জন্য সম্ভব ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু জন্দলের অবস্থা আল্লার হাওয়ালা করতঃ তাঁহার অভিভাবকদের হস্তে তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তের উপর মোসলমানদের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, ওমর (রাঃ) ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে সাধারণ রীতির বিরুদ্ধে ঐ শর্তকে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ স্থলে মানিতে সম্মত হইলেন; শরীয়তের সাধারণ বিধানে কোন মোসলমানকে আশ্রয় দান না করা বা শত্রুর হস্তে সমর্পণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) অহীর মারফৎ অনেক কিছু জ্ঞাত হইতে পারিতেন যাহা অন্য কেহ পারিত না। অদূর ভবিষ্যতে এই শর্তের ফলাফল কি হইবে তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী মারফৎ জ্ঞাত হইলেন এবং ইহা যে—নিছক সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি শর্তের প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না; চুক্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববুকে মোসলেম জাতির শক্তি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমুদয় বিষয় স্থির হওয়ার পর চুক্তিনামা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হওয়ার ব্যবস্থা হইল। আলী (রাঃ) লিখক হইলেন, প্রথমে ইসলামী রীতিতে বিসমিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম লেখায় আপত্তি উঠিল অতঃপর হযরতের নামের সঙ্গে "রসুলুল্লাহ"

লেখার বিরোধীতায় প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ চুক্তি সম্পাদনকে এত অধিক গুরুত্ব দান করিলেন যে, উহার খাতিরে ঐ সব বিতর্কে আত্মপক্ষ বিসর্জন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। সন্ধি-নামা লিখিত ও উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত হইয়া, সমস্ত বিতর্কের সমাপ্তি ঘটিল। এইরূপে সেই অগ্নিময় পরীক্ষার ঘটনার সমাপ্তি হইল।

অতঃপর তথায় কোরবানীর জানোয়ার সমূহ আল্লার নামে জবেহ করিলেন এবং মাথা কামাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেলিয়া মদীনা পানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চুক্তি অনুসারে পরবর্তী বৎসর মক্কায় আসিয়া শান্ত পরিবেশে ওমরা করা হইল—এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইল।

আল্লার কুদরতের লীলা—রসুলুল্লাহ (দঃ) সন্ধি-নামার তিক্ত শর্তসমুহের শেষ ফল যাহা পুর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন, অচিরেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিল।

আবু বছীর (রাঃ) নামক একজন মোসলমান যিনি সন্ধি-চুক্তির পর ইসলাম গ্রহণ পুর্বক মদীনায় আসিলেন। অতঃপর শর্ত অনুসারে মক্কাবাসীদের দাবী পুরণে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে মক্কা হইতে আগত দুই ব্যক্তির হস্তে প্রত্যার্পণ করিলেন, কিন্তু আবু বছীর (রাঃ) মধ্যপথে তাহাদের একজনকে খুন করিয়া অপর জনকে ভাগাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন এবং মক্কাবাসীদের সিরিয়ার বাণিজ্য পথের কোন এক পর্বত গুহায় ঘাটি স্থাপন করতঃ ঐ পথে মক্কাবাসী বাণিজ্যদলীয় যাত্রীগণের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবু বছীরের কার্য্যকলাপের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, এখন মক্কার আবদ্ধ ইসলাম অনুরাগী সকলেই, এমনকি পুর্বোল্লিখিত আবু জন্দল (রাঃ)ও আবু বছীরের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদের একটি দল সৃষ্টি হইল, তাঁহাদের দ্বারা মক্কাবাসীদের বাণিজ্য পথ বন্ধ হইয়া গেল। মক্কাবাসীরা বাধ্য হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিল, আমরা ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রত্যার্পণের শর্ত ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি আবু বছীর বাহিনীকে মদীনায় ডাকিয়া লউন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন, এইরূপে ঐ সব শর্তের সমাপ্তি ঘটিল।

সন্ধি-চুক্তির বাকী শর্তসমূহ প্রতিপালিত হইতেছিল, সন্ধি চুক্তির মাত্র দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও আট বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে এমতাবস্থায় মক্কাবাসীরা গোপনে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বসিল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) চুক্তি ভঙ্গের খবর অবগত হইয়া গেলেন, তিনি দশ সহস্র ছাহাবী লইয়া মক্কা অধিকারে যাত্রা করিলেন। মক্কাবাসীরা মোসলমানদের অভিযান যাত্রার খবরে বিহ্বল হইয়া পড়িল, ছোট খাট দুই একটি সামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ব্যতীত বিশেষ রকমের যুদ্ধ ব্যতিরেকেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অধিকারে সক্ষম হইলেন। নগরীর প্রধান সরদার আবু সুফিয়ান স্বীয় পরিবারবর্গ সহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কাবাসীদের প্রতি ব্যাপক আকারে ক্ষমার ঘোষণা জারি করিলেন, সমগ্র নগরী ইসলামের কলেমা-ভূষিত

হইয়া গেল। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের সমন্বয়ে বিরাট বাহিনী লইয়া "তায়েফ" এবং "হোনায়েন" জয় করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সর্বমোট উনিশ দিন তথায় অবস্থান করিয়া সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতঃ মক্কায় স্বীয় শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। যাঁহারা এক কালে ইসলামের জন্য নিজ আবাসভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই মক্কায় অবস্থান অবলম্বন করিলেন না, সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহা হিজরী সনের অষ্টম বৎসর—হযরতের দুনিয়া ত্যাগের দুই বৎসর বাকী রহিয়াছে মাত্র।

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছসমুহ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

১৪৮৯। **হাদীছ ঃ**—মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে এক হাজারের অনেক অধিক ছাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মদীনার অনতিদূরে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি কোরবানীর জানোয়ারসমূহকে উহার নিদর্শন যুক্ত করিয়া ওমরার এহরাম বাঁধিলেন এবং "খোযায়া" গোত্রের একজন লোককে স্বীয় গুপ্তচর রূপে প্রেরণ পূর্বক মক্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন "গাদীরে-আশতাত" নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার গুপ্তচর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ ব্যক্ত করিল যে, কোরায়েশরা বহু সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিয়াছে এবং বন্ধু ও জোটের সমস্ত গোত্র-সমূহকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় এবং আপনাকে মক্কায় পৌঁছিতে বাধাদানে বদ্ধ পরিকর।

এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সঙ্গীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও—যে সমস্ত গোত্রের লোকগণ কোরায়েশদের সঙ্গে একত্রিত হইয়াছে আমি তাহাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণ করিয়া দেই; যদি তাহারা এই আক্রমণের সংবাদে ছুটিয়া চলিয়া আসে তবে মক্কাবাসীদের শক্তি হ্রাস পাইল, আর যদি তাহারা তথা হইতে না আসিল তবে তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে—এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে তোমরা সমীচীন মনে কর কি? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আপনি বাইতুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। কাহারও উপর আক্রমণ বা যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নাই। আপনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন, যে কেহ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধক হইবে তাহার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালাইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) (এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং) সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হইতে থাক। (৬০০ পৃঃ)

১৪৯০। **হাদীছ ঃ**—মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া পথ

অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি একস্থানে পৌঁছিয়া সকলকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলেন যে, (আমাদের অবলম্বিত পথের সম্মুখে) "গোমায়েম" নামক স্থানে খালেদ ইবনে ওলীদ (তিনি তখনও মোসলমান হন নাই) অশ্বারোহী একটি বাহিনী লইয়া কোরায়েশদের পক্ষে অগ্রবর্তী দলরূপে মোতায়েন রহিয়াছে; তাই তোমরা ডান-দিকের পথ অবলম্বন কর। এই ব্যবস্থা অবলম্বনে খালেদ বাহিনী মোসলমানদের গমনাগমন জ্ঞাত হইতে পারিল না, কিন্তু হঠাৎ তাহারা দূর হইতে ধুলা-বালু উড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, ঐ পথে মোসলমানগণ অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ খালেদ বাহিনী দ্রুত কোরায়েশদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিল।

নবী (দঃ) মক্কাপানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তিনি ঐ বাঁকে পৌঁছিলেন যেই বাঁক অতিক্রম করিলেই মক্কার এলাকা সম্মুখে থাকে হঠাৎ তাঁহার "কাছওয়া" নামক যানবাহন বসিয়া পড়িল। সকলে তাহাকে হাঁকাইল, কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। সকলেই বলিতে লাগিল, কাছওয়া হঠকারী হইয়া গিয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, কাছওয়া হঠকারী হয় নাই, হঠকারিতা তাহার অভ্যাসও নহে, ঐ মহান শক্তি তাহার গতিরোধ করিয়াছেন যিনি হাতীওয়ালা আবরাহা বাদশার গতিরোধ করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ আমাদের কোন মঙ্গলের জন্য সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতে ইহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছেন; নিশ্চয় কোন ঘটনা ঘটিবে এবং কি ঘটনা ঘটিবে তাহারও ইঙ্গিত হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে; তাই তিনি স্বীয় শান্তিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতঃ ঘোষণা করিলেন,) শপথ করিয়া বলিতেছি, মক্কাবাসীরা আল্লার সম্মানিত চিজবস্তু সমূহের সম্মানে ব্যাঘাত না ঘটায় এইরূপ যে কোন শর্ত আরোপ করিবে আমি উহা গ্রহণ করিব। অতঃপর কাছওয়া যানবাহনকে পুনঃ হাঁকান হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কার পথ ত্যাগ করিয়া হোদায়বিয়া নামক ময়দানের এক প্রান্তে অবতরণ করিলেন। তথায় একটি কুপের মধ্যে যৎসামান্য পানি ছিল যাহা এতবড় কাফেলার হাতে হাতেই শেষ হইয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পিপাসার অভিযোগ পেশ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় তীরদান হইতে একটি তীর ঐ কুপের মধ্যে নিক্ষেপের আদেশ করিলেন। যাহার ফলে কুপ উথলিয়া উঠিল এবং পূর্ণ কাফেলা উহার পানি পান করিয়া তৃষ্ণামুক্ত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বোদায়েল ইবনে অরাকা নামক খোযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল; খোযায়া গোত্রটি মোসলমানদের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ছিল। ঐ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, আমি দেখিয়া আসিয়াছি—কোরায়েশরা হোদায়বিয়া ময়দানের ঐ প্রান্তে অবস্থান অবলম্বন করিয়াছে যথায় প্রচুর পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাহাদের সঙ্গে দুগ্ধ দানকারী জানোয়ার সমূহও আছে। অর্থাৎ তাহাদের

সঙ্গে পানাহারের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, আপনাকে কা'বা শরীফে পৌছিতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আমরা ত কাহারও সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য আসি নাই, আমরা ত শুধু ওমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। কোরায়েশরা ত যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা যদি ইচ্ছা করে, তবে আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের সঙ্গে "যুদ্ধ নয়" চুক্তি সম্পাদন করিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহারা দেখিয়া লউক, অন্যান্য আরববাসীদের মোকাবিলায় আমার কি অবস্থা দাঁড়ায়; যদি আমি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারি (সকলকে আমার স্বমতে আনিতে সক্ষম হই) তবে ইচ্ছা করিলে তাহারাও আমার দলভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাইবে, আর যদি অন্য রকম অবস্থা দাঁড়ায় (তথা আমি পর্যুদস্ত হই) তবে তাহারা শান্তি লাভ করিবে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তেজদীপ্ত ভাষায় বলিলেন—

وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا

حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ ۝

"যদি তাহারা আমার সব কথাই উড়াইয়া দেয় তবে যেই মহান আল্লার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই দ্বীন-ইসলামের জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব—যাবৎ আমার গর্দান ছিন্ন হইয়া না যায়। এবং আমি আশা করি আল্লাহ নিশ্চয় নিশ্চয় স্বীয় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

বোদায়েল বলিল, আপনার এই উক্তি আমি কোরায়শগণের সম্মুখে ব্যক্ত করিব। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং কোরায়েশগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি (তোমাদের বিপক্ষ পার্টির) ঐ লোকটির নিকট হইতে আসিলাম। আমি তাহার মুখে একটি উত্তম উক্তি শুনিয়া আসিয়াছি, যদি তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর তবে আমি উহা ব্যক্ত করিতে পারি। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বল্প বুদ্ধিওয়ালা ছিল তাহারা বলিল, কোন কথা ব্যক্ত করার আবশ্যক আমাদের নাই, কিন্তু জ্ঞানীগণ বলিল, তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর। তখন বোদায়েল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ উক্তি কোরায়েশদের সম্মুখে ব্যক্ত করিল।

এতদ শ্রবণে ওরওয়া ইবনে মসউদ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমার বন্ধুগণ। আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নহি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। তোমরা কি আমার সন্তান-সন্ততি তুল্য নও? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। আমার প্রতি কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সকলেই উত্তর করিল, না। আমি আমার দেশ— "ওকাজ" নিবাসী সকলকে তোমাদের সাহায্যের প্রতি আহ্বান করিয়া ব্যর্থ হইলে পর

আমি পরিবারবর্গ পুত্র-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে লইয়া তোমাদের সাহায্যে উপস্থিত হইয়াছি নয় কি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। এইরূপে উপস্থিত সকলের মনকে আকৃষ্ট করতঃ সে বলিল, ঐ ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে অতি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছে, তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং আমাকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি দাও। উপস্থিত সকলেই এই কথায় সম্মত হইল।

ওরওয়া ইবনে মসউদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। প্রথমে নবী (দঃ)ই কথা আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি বোদায়েল ইবনে অরাকার সম্মুখে যাহা বলিয়াছিলেন এই ব্যক্তির সম্মুখেও তাহাই বলিলেন। ওরওয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনি যদি নিজ বংশকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন তবে বলুন ত, ইতিপুর্বে কোন আরববাসী সম্পর্কে শুনিয়াছেন কি যে, সে নিজ উৎসকে ধ্বংস করিয়াছে? এতদ্ভিন্ন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদল ধ্বংস না হইয়া বিপরীত অবস্থাও ত হইতে পারে এবং আমি উহার সম্ভাবনাই অধিক মনে করি—কেননা, আপনার সঙ্গে যে সব চেহারা দেখিতেছি এবং বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন গোত্রের মিসাল মানুষ দেখিতেছি হয়ত তাহারা আপনাকে একা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে দ্বিধা করিবে না।

তাহার এই অশোভনীয় উক্তি শুনিয়া আবু বকর (রাঃ) ক্রোধে বেশামাল হইয়া তাহার প্রতি ঘৃণা ভর্ৎসনা স্বরূপ বলিলেন, তুই তোর "লাত" দেবীর জননাঙ্গ চাটিতে থাক। (অর্থাৎ তুই তোর ধর্ম আঁকড়াইয়া থাক, আমাদের সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করার তোর কি অধিকার আছে? আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ছাড়িয়া পলায়ন করিব ইহার সম্ভাব্যতা তোর মনে জাগিল কিরূপে?) ওরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? সকলে উত্তর করিল, আবু বকর (রাঃ)। তখন ওরওয়া বলিল, আমি যদি তোমার একটি বিশেষ উপকারে ঋণী না থাকিতাম, তবে তোমার কথায় উত্তর প্রদান করিতাম।

আরও একটি ঘটনায় ওরওয়া অপদস্ত হইল—সে কথাবার্তা বলিবার সময় (সমকক্ষ সাধারণ লোকদের বেলায় প্রচলিত আরবের রীতি অনুসারে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাঁড়ি মোবারকে হাত লাগাইত, ঐ সময় নবী (দঃ)-এর সম্মুখে তাঁহার দেহরক্ষী রূপে মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) দণ্ডায়মান ছিলেন—তাঁহার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ও হাতে তরবারি ছিল। ওরওয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাঁড়ি মোবারকের প্রতি হাত বাড়াইলে প্রত্যেকবারই মুগিরা (রাঃ) তরবারির ফলা দ্বারা (তাচ্ছিল্যের সহিত) তাহার হাতে আঘাত করিতেন এবং বলিতেন, আল্লার রসুলের দাঁড়ি মোবারক হইতে তোমার হাত দুরে রাখ। ওরওয়া মুগিরা ইবনে শো'বা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোন্ ব্যক্তি? উপস্থিত সকলে উত্তর করিল, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ)। তখন সে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, হে নিমক-হারাম! আমি তোমার এক বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনায় কত চেষ্টা-তাবীরই না করিয়াছিলাম?

ঘটনা এই ছিল যে, মুগিরা (রাঃ) ইসলামের পূর্বে কোন এক সময় কোন এক পরিবারের সঙ্গে কিছু দিন বসবাস করিয়া হঠাৎ একদিন ঐ পরিবারের লোকজনকে খুন করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ লইয়া পলায়ন করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং মোসলমান হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এই ধন-সম্পদ সম্পর্কে তোমার সমর্থন করিতে পারি না। এই ঘটনায় নিহত পরিবারের গোত্র ও মুগিরার গোত্রের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল; সেই উত্তেজনা উপশমে ওরওয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রতিই সে এস্থলে ইঙ্গিত দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ওরওয়া এই বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের থুথু বা শ্লেষ্মা মাটিতে পতিত হইতে পারিত না, বরং উহাকে ছাহাবীগণ নিজ হস্তে লইয়া লইতেন এবং তাঁহারা উহাকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চেহারা ও শরীরে মলিয়া ফেলিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন আদেশ করা মাত্র ছাহাবীগণ সেই আদেশ পালনে দ্রুত ছুটিয়া যাইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন অজু করিতেন তখন ছাহাবীগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি হাসিল করার জন্য ভীষণ ভীর করিতেন, মনে হইত যেন তাঁহারা রণে লিপ্ত হইবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন কথা বলা আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ তথায় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিত, কেহ কোন প্রকার শব্দ করিতেন না। ছাহাবীগণের অন্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এত গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও মান্যতা ছিল যে, তাঁহার প্রতি তাহারা চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেন না।

ওরওয়া এই সব অবস্থা দৃষ্টে অতিশয় অভিভূত হইয়াছিল, সে কোরায়েশদের নিকট আসিয়া বলিল, বন্ধুগণ! আমি বড় বড় শাদশাদের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি, আমি রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট, আবিসিনিয়ার সম্রাটগণের দরবারে পৌছিয়াছি; কোন সম্রাটকে তাহার অনুচরগণ কর্তৃক এত শ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই যতদুর শ্রদ্ধা মোহাম্মদের অনুচরগণ মোহাম্মদকে করিয়া থাকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। সে ছাহাবীগণের উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া বলিল, এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট একটি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর।

অতঃপর বনু-কেনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি প্রদান কর। কোরায়েশরা তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল। ঐ ব্যক্তি তখনও পথিমধ্যেই ছিল; তাহার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তির বংশধরগণ বিশেষরূপে কোরবানীর জানোয়ারকে সম্মান করিয়া থাকে, তাই তোমরা তোমাদের কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধর। ছাহাবীগণ কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে সম্মুখে রাখিয়া "লাব্বাইকা" ধ্বনিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইল এবং বলিল, এমন ব্যক্তিবর্গকে

বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইতে বাধা দেওয়া কোন প্রকারেই সমিচীন হইতে পারে না। সে কোরায়েশগণের নিকট আসিয়াও ঐ দৃশ্য ব্যক্ত করিল এবং ঐ মন্তব্যই প্রকাশ করিল।

অতঃপর মেকরায ইবনে হাফ্‌ছ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। কোরায়েশগণ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল। সে যখন হযরতের নিকটবর্তী হইতেছিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, এই ব্যক্তির নাম মেকরায, সে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে আসিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন।

এই পর্য্যন্ত যত লোকই আসিয়াছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। এইবার স্বয়ং কোরায়েশরা নিজস্ব প্রতিনিধিরূপে সোহায়েল ইবনে আমরকে পাঠাইল এবং তাহাকে স্পষ্ট নির্দেশ দান করিল যে, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা কর। সোহায়েল উপস্থিত হইল। সোহায়েলের আগমনে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন সন্ধির পথ প্রশস্থ হইবে। সোহায়েল উপস্থিত হইয়া পরস্পর সন্ধির চুক্তিপত্র লিখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। রসুলুল্লাহ (দ.) লিখককে ডাকিলেন (লিখক ছিলেন আলী (রাঃ)।) রসুলুল্লাহ (দঃ) লিখককে "বিসমিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম" লিখিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সোহায়েল আপত্তি করিয়া বলিল, "রাহমান" শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত নহি, তাই ঐরূপ না লিখিয়া আমাদের পুর্ব রীতি অনুযায়ী "বিস্‌মেকাল্লাহুম্মা" লিখুন। মোসলমানগণ এক বাক্যে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল যে, বিস্‌মিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম" ব্যতীত অন্য কোন কিছু আমরা লিখিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) "বিস্‌মেকাল্লাহুম্মা" লিখিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) এইরূপ লিখিতে বলিলেন—'ইহা আল্লার রসুল মোহাম্মদের সঙ্গে চুক্তি-পত্র।" সোহায়েল এস্থলেও আপত্তি করিল যে, আমরা আপনাকে "আল্লার রসুল" বলিয়া স্বীকার করিলে আপনাকে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে বাধা প্রদান করিতাম না এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিতাম না। কারণেই "মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লিখুন।* রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লার রসুল যদিও তোমরা অস্বীকার কর; আচ্ছা—"মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লিখ। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এইসব গোঁড়ামী সহ্য করিয়া লইতে ছিলেন শুধু মাত্র ঐ কথার খাতিরে

---

* বর্ণিত আছে যে, চুক্তি পত্রের লিখক আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হযরত (দঃ) "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। আলী (রাঃ) আরজ করিলেন হে আল্লার নবী। আমি আমার হস্তে "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিতে পারিব না। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে রসুলুল্লাহ শব্দ মুছিয়া দিলেন এবং তদস্থলে ইবনে আবদুল্লাহ লিখিতে আদেশ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহও এবং আবদুল্লার পুত্রও।

যাহার ঘোষণা তিনি পুর্বে দিয়াছিলেন যে, আল্লার নির্দ্ধারিত সম্মানিত বস্তু সমুহের সম্মান বিনষ্ট না করিয়া যে কোন শর্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব—এই ঘোষণাই তিনি রক্ষা করিতেছিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চুক্তিপত্র এই শর্তে লেখা হইতেছে যে, আমাদিগকে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে ও তওয়াফ করিতে তোমরা বাধা প্রদান করিবে না। এই কথার উপর সোহায়েল বলিল, ইহা কখনও হইতে পারিবে না যে, আরববাসীদের মধ্যে এইরূপ চর্চ্চা হয় যে, এই ব্যাপারে বল-পূর্বক আমাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে; হাঁ— এতটুকু হইতে পারে যে, আপনারা আগামী বৎসর এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। চুক্তিপত্রে ইহাই লেখা হইল। সোহায়েল বলিল, এই শর্তও লিখিতে হইবে যে, আমাদের কোন ব্যক্তি আপনার নিকট চলিয়া আসিলে যদিও সে আপনার দ্বীন অবলম্বন করে তবুও তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই শর্তের প্রতিবাদে মোসলমানগণ উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে পর তাহাকে আমরা মোশরেকদের হাতে কিরূপে প্রত্যার্পণ করিতে পারি? যাই হউক এইরূপ বাক-বিতণ্ডার ভিতর দিয়া চুক্তি-পত্র লেখা হইতে ছিল, তখন সোহায়েলের পুত্র আবু জন্দল (রাঃ) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কোন প্রকারে মক্কা হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজকে মোসলমানদের জমাতে ফেলিয়া দিলেন। তখন সোহায়েল বলিয়া উঠিল, এই ঘটনাই আমাদের চুক্তি-পত্র প্রতিপালিত হওয়ার প্রথমস্থল, উহার শর্ত অনুসারে আবু জন্দলকে প্রত্যার্প.ণ আপনি বাধ্য। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখনও ত চুক্তি-পত্র সম্পূর্ণ হইয়া স্বাক্ষরিত হয় নাই। কিন্তু সোহায়েল শপথ করিয়া বসিল, আবু-জন্দলকে প্রত্যার্পণ না করিলে কোন অবস্থাতেই সন্ধি হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ অনুরোধের স্বরে বলিলেন, আমার খাতিরে তুমি আবু-জন্দলের পক্ষে ঐ শর্ত স্থগিত রাখ। সোহায়েল বলিল, আমি তাহা কখনও করিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে উহাও প্রত্যাখ্যান করিল। এমনকি হযরতের অনুরোধে মেকরাযের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকের দিলও নরম হইয়া গেল এবং সে বলিল, আচ্ছা আবু-জন্দলের ব্যাপারে আমরা আপনার কথা রক্ষা করিলাম, (কিন্তু সোহায়েল এই ব্যাপারে কঠিন হইয়া গেল।) আবু-জন্দল করুণ স্বরে মোসলমান-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে মোশরেকদের হস্তে সমর্পণ করা হইবে? অথচ আমি মোসলমান হইয়া আসিয়াছি। তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আমি আল্লার দ্বীনের জন্য কত কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া আসিতেছি?

এই দৃশ্য দেখিয়া ওমর (রাঃ) ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন; তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি কি আল্লার সত্য নবী নন? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। আমি বলিলাম, আমরা সত্যের উপর এবং অপর পক্ষ মিথ্যার উপর নয় কি? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন,

নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে এত অপদস্থতা স্বীকার করিব? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমি আল্লার রসুল, আমি তাঁহায় নাফরমান নহি, আল্লাহ আমার সাহায্যকারী। আমি আরজ করিলাম, আপনি বলিয়া ছিলেন, আমরা বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিব এবং তওয়াফ করিব। নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ— বলিয়াছি, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই উহা অনুষ্ঠিত হইবে? আমি বলিলাম, না। নবী (দঃ) বলিলেন নিশ্চয় তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিবে এবং তওয়াফ করিবে।

ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের রসুল কি আল্লার সত্য নবী নহেন? তিনি উত্তম করিলেন, নিশ্চয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি নির্দিষ্ট নহে যে, আমরা সত্যের উপর এবং অপর পক্ষ মিথ্যার উপর? তিনি উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। তখন আমি বলিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কেন আমরা হীনতা ও অপদস্থতা স্বীকার করিব? তিনি বলিলেন, দেখুন। তিনি আল্লার রসুল, তিনি সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করিবেন না। এইরূপে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিবার সংবাদ দান সম্পর্কেও পুর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর হইল।

ওমর (রাঃ) ঘটনার বর্ণনা দানকালে বলেন, ঐ সময় ত মনের আবেগে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর লইয়া ছুটাছুটি করিয়াছি, কিন্তু অতঃপর এই সব প্রশ্নের অবতারণার উপর আমি কত অনুতপ্তই না হইয়াছি! এমনকি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কত কত নেক আমল (—নফল নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি) করিয়াছি।

মুল ঘটনার বর্ণনা দানে ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর যখন সন্ধির চুক্তি-পত্র সমাপ্ত ও স্বাক্ষরিত হইল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নিজ নিজ কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিয়া দাও এবং মাথা মুণ্ডাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেল। ছাহাবীগণ (উদ্দেশ্য সফলের দ্বারে পৌঁছিয়া উদ্দেশ্য ভঙ্গের) এই ব্যবস্থায় সাড়া দিলেন না, (অন্য কোন ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রহিলেন। এমনকি হযরত (দঃ) তিনবার তাঁহাদিগকে আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট তশরীফ নিলেন এবং উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তখন উম্মুল-মোমেনীন (বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করিলেন—তিনি) বলিলেন, আপনি যদি চান যে, তাহারা এহরাম ভঙ্গ তৎান্বিত করুক তবে আপনি কাহাকেও মুখে কিছু না বলিয়া স্বীয় জানোয়ার কোরবানী করিয়া ফেলুন এবং ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া স্বীয় মাথা মুণ্ডাইয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন। যখন ছাহাবীগণ হযরত (দঃ)কে এহরাম ভাঙ্গিতে দেখিলেন তখন তাঁহাদের অপেক্ষার অবকাশ রহিল না, তাহারা সমবেতভাবে কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিলেন, পরস্পর মাথা মুণ্ডাইতে লাগিলেন, এমনকি এই কার্য্য সমাধা তরান্বিত করিতে হাঙ্গামা সৃষ্টির ন্যায় ভীড় হইল।

সন্ধি প্রতিষ্ঠার পর হোদায়বিয়ার ময়দানে তিন দিন অবস্থান করিয়া নবী (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কোরায়েশ গোত্রীয় আবু বছীর নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরতের খেদমতে মদীনায় উপস্থিত হইলেন। চুক্তি-পত্রের শর্ত অনুসারে মক্কাবাসীগণ দুই ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করিল এবং এই সংবাদ পাঠাইল যে, আমাদের শর্ত পূর্ণ করা হউক। রসুলুল্লাহ (দঃ) শর্ত অনুযায়ী আবু বছীর (রাঃ)কে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের হাওয়ালা করিয়া দিলেন। তাহারা আবু বছীর (রাঃ)কে লইয়া মদীনা ত্যাগ করতঃ জুলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া পানাহারের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিল। তখন আবু বছীর (রাঃ) সঙ্গীদ্বয়ের একজনকে (ভান করিয়া) বলিল, ওহে! আপনার তরবারীখানা অতি সুন্দর মনে হয় ত। ঐ ব্যক্তি তরবারীখানা উন্মুক্ত করিয়া বলিল, হাঁ—বাস্তবিকই ইহা সুন্দর; আমি অনেক অনেক স্থানে ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছি। আবু বছীর (রাঃ) বলিলেন, তরবারীখানা আমার হাতে দেন ত দেখি। ঐ ব্যক্তি তরবারী তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। আবু বছীর (রাঃ) তরবারীখানা ভালরূপে স্বহস্তে আনিতে সক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির উপর ভীষণ আঘাত করিলেন, সে নিহত হইল। অপর সঙ্গী দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া মদীনা পানে ধাবিত হইল, এমনকি হযরতের মসজিদে আসিয়া শ্বাস ফেলিল। হযরত (দঃ) তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন, সে নিশ্চয় কোন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার সঙ্গী নিহত হইয়াছে আমিও সেই অবস্থার সম্মুখীন!

ইতিমধ্যেই আবু বছীর (রাঃ) উপস্থিত হইলেন, তিনি আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! আপনি স্বীয় শর্ত পূর্ণ করিয়াছেন—আমাকে তাহাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া দিয়াছেন; অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। কেহ যদি আবু বছীরকে বুঝ প্রবোধ দান করিত। আবু বছীর (রাঃ) এইসব শ্রবণে বুঝিতে পারিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনঃ প্রত্যার্পণ করিবেন, তাই মদীনা হইতে চলিয়া আসিয়া সমুদ্রকুলবর্তী এক এলাকায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবু বছীর (রাঃ)-এর এই ঘটনার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, ফলে পুর্বোল্লিখিত বেদনাদায়ক ঘটনার বাহক আবু-জন্দল (রাঃ) কোন প্রকারে মক্কার নর-পিশাচদের কবল হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবু বছীরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। (মক্কার মধ্যে যত ইসলামানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা ভয়ে উহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই—এরূপ) অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবু বছীর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। (কোরায়েশ গোত্র ভিন্ন অন্যান্য গোত্রের ইসলামানুরাগী ব্যক্তিগণও মিলিত হইলেন,) এমনকি এস্থানে তাঁহাদের একটি শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিল। (কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত

বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহারা তথায় ঘাটি স্থাপন করিয়া কোরায়েশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। প্রথমেই তাহাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন, বরং শুধু অর্থনৈতিক অবরোধই নহে, সমস্ত মক্কাবাসীর খাদ্য সংগ্রহেও অবরোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন। অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সিরিয়ার বাণিজ্যই ছিল কোরায়েশদের প্রধান অবলম্বন। আবু বছীর-বাহিনীর ঘাটি সেই বাণিজ্য পথের এলাকায়ই অবস্থিত ছিল, তাই অতি সহজেই তাঁহারা ঐ অবরোধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন।) কোরায়েশদের যে কোন বাণিজ্য দলই ঐ পথ অতিক্রম করিত তাহাদের উপরই আবু বছীর বাহিনী আক্রমণ চলাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং মাল ছামান হস্তগত করিত। এইরূপে সল্পকালের মধ্যেই কোরায়েশরা রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় বেগতিক হইয়া পড়িল। তাহারা মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই দরখাস্ত করিয়া এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিল যে, আমরা আপনাকে আল্লার কসম দিয়া এবং আপনার সঙ্গে আমাদের যে বংশীয় সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক-সূত্রে প্রাপ্য সদ্ভাবের দোহাই দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আবু বছীর-বাহিনীকে মদীনায় ডাকিয়া লইবেন, আমরা চুক্তি-পত্রের শর্ত পরিত্যাগ করিলাম—যে কোন ব্যক্তি মোসলমান হইয়া আপনার নিকট যাইবে তাহার প্রতি আমাদের কোন দাবী থাকিবে না, তাহাকে প্রত্যার্পন করিতে হইবে না। ✝

● কাফেররা চুক্তিপত্র সম্পর্কে যে সব অন্যায় দাবী আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল এবং যে সব অন্যায় শর্ত আরোপ করিয়াছিল বাস্তবিকই উহা মানবতার সীমাহীন অবমাননার দৃষ্টান্তরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতে সেই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ
اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ......

অর্থ—চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ঐ সময়টি—যখন কাফেররা তাহাদের অন্তরকে অমানুষিক জেদ ও গোঁড়ামীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল; তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুল ও মোমেনগণকে ধৈর্যাবলম্বনের শক্তি দান করিয়া ছিলেন এবং খোদা-ভক্তির উপর সুদৃঢ়তা

✝ "যোরকানী" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসীদের অনুরোধে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু বছীরের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। অদৃষ্টের লীলা—হযরতের পত্র যখন আবু বছীরের নিকট পৌঁছিল তখন আবু বছীর (রাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। প্রিয় হাবীব রসুলুল্লার পত্রখানা আবু বছীরের হস্তে প্রদান করা হইল; সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তটি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। লিপিখানা মুঠের ভিতর করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আরজাহু)। আবু-জন্দল (রাঃ) সেই স্থানেই তাঁহাকে দাফন করিলেন, অতঃপর সঙ্গীগণ সহ মদীনায় পৌঁছিলেন।

বজায় রাখার তৌফিকও তাঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন; বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা উহার সুযোগ্য পাত্রও ছিলেন বটে। আল্লাহ তায়ালা পূর্ব হইতেই সব কিছু জ্ঞাত আছেন।

(২৬ পারা ১০ রুকু)

উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের অমানুষিক জেদ ও গোঁড়ামী বলিতে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

(১) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামের সঙ্গে "আল্লার রসুল" সংযোজিত করিতে না দেওয়া এবং তাঁহাকে আল্লার রসুল স্বীকার না করা।

(২) বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম লিখিতে সম্মত না হওয়া।

(৩) দীর্ঘ সাড়ে তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিকটবর্তী হওয়ার পর মোসলমানগণকে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌছিতে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি। ৩৭৭ পৃঃ

(৪) এতদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন পূর্বক মোসলমানদের নিকট পৌছিলে তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করার শর্ত।

বায়আতে-রেজওয়ান:

১৪৯১। হাদীছ:—এযীদ ইবনে আবু ওবাইদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সালামাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা হোদায়বিয়ার ঘটনায় কি বিষয়ের উপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, মৃত্যুর উপর; অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করিব তবুও মক্কা জয় না করিয়া ফিরিব না।

১৪৯২। হাদীছ:—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষে বলাবলী করিয়া থাকে যে, ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার পূর্বে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ঘটনা এই ছিল যে, হোদায়বিয়ার ময়দানে মোসলমানগণ ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নাকারে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে ছিলেন; হঠাৎ দেখা গেল অনেক লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এতদৃষ্টে ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কেন ঘিরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আস। এতদ্ভিন্ন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়া কোন একজন ছাহাবীর নিকট ছিল ঐ ঘোড়াটিও নিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) এখানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বাবুল গাছের ছায়ায় বসিয়া লোকদের নিকট হইতে (প্রাণ বিসর্জন দিয়া জেহাদ করার) বায়আ'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহা দেখিতে পাইয়া তখনই বায়আ'ত ও অঙ্গীকার করিলেন। ওমর (রাঃ) তখনও এই সংবাদ জ্ঞাত নহেন; অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) ঘোড়ার নিকট যাইয়া উহা লইয়া ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তখন জেহাদের প্রস্তুতি করিতে ছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ)

তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) গাছের ছায়ায় বসিয়া লোকগণের নিকট হইতে (প্রাণ বিসর্জন দিয়া জেহাদ করার) বায়আ'ত ও বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লার সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনিও বায়আ'ত ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন।

এই বায়আ'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনায় যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার অগ্রগামী ছিলেন উহা হইতেই সাধারণ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পিতা ওমরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪৯৩। হাদীছঃ—তারেক ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হজ্জ করিতে মক্কা শরীফ যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে একস্থানে লোকদিগকে বিশেষরূপে নামায পড়িতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নামাযের স্থানে পরিণত হইল কিরূপে? সকলে উত্তর করিল, এস্থানে ঐ বৃক্ষটি আছে যাহার তলে হযরত (দঃ) বায়আ'তে-রেজওয়ান গ্রহণ করিরাছিলেন। তারেক (রঃ) বলেন, এতদ শ্রবণে আমি সায়ীদ ইবনে মোছাইয়েব (রঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি হাসিলেন এবং স্বীয় পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ঐ বায়আ'তে উপস্থিত ছিলেন—তিনি বলিয়াছেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে দেখিয়াছিলাম যাহার তলায় বসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বায়আ'তে রেজওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসব পর যখন আমি তথায় পুনঃ উপস্থিত হইলাম তখন আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করিতে পারিলাম না, আমি উহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

(পরবর্তী সময়ে সাধারন লোকগণ কর্তৃক ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া) সায়ীদ (রঃ) বলেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ ঐ বৃক্ষটিকে পর বৎসর নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, তোমরা উহা পারিয়াছ, তবে কি তোমরা ঐ ছাহাবীগণ অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ হইয়াছ?

১৪৯৪। হাদীছঃ—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বৎসর পুনঃ ঐ ময়দানে আমরা উপস্থিত হইলাম; যেই বৃক্ষের তলায় বসিয়া বায়আ'ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ঐ বৃক্ষটি নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে আমাদের দুইজন লোকও একমত হইতে পারিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন—

বৃক্ষটি এইরূপে অনির্দিষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মস্ত বড় রহমত নিহিত ছিল। (নতুবা সাধারণ লোকগণ ঐ বৃক্ষটির প্রতি সম্মান দেখাইতে যাইয়া নানা প্রকার বেদা'ৎ কার্য্যে—কুসংস্কারে লিপ্ত হইত)। ৪১৫ পৃঃ

ব্যাখ্যাঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং মোছাইয়েব রাজিয়াল্লাহু আনহুমার ন্যায় ছাহাবী যাঁহারা স্বয়ং ঐ ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, ঐ বৃক্ষটি পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট করা যায় নাই; বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবনে

ওমরের বর্ণনা ত অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ, পরবর্তী বৎসর তথায় উপস্থিত হওয়া নিশ্চয় ওম্‌রাতুল-কাজা উপলক্ষে ছিল—যে উপলক্ষে প্রথম বৎসর অংশ গ্রহণকারী সমুদয় ছাহাবী-গণই অনিবার্য্যতঃ তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় কোন দুইজন লোকও ঐ বৃক্ষটি নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে একমত হইতে না পারা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং এমতাবস্থায় পরবর্তী লোকগণ কর্তৃক ঐ বৃক্ষের নামে কোন একটি বৃক্ষকে নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়া এবং উহার প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করা কুসংস্কার বই কি হইতে পারে? বস্তুতঃ এইরূপ হইয়াও ছিল—পরবর্তী লোকগণ একটি বৃক্ষকে ঐ নামে নির্দিষ্ট করিয়া উহার সম্মান ও উহার দ্বারা বরকত হাসিল করা আরম্ভ করিয়াছিল। যাহা দেখিয়া খলীফা ওমর (রাঃ) ঐ গর্হিত বৃক্ষটির মুলোচ্ছেদ করিয়া ছিলেন; অবশ্য যদি ঐ বৃক্ষটি বাস্তবিকই নির্দিষ্ট থাকিত তবে উহা সম্মানের উপযুক্ত ও বরকত হাসিলের বস্তু গণ্য হইত।

হোদায়বিয়ার ঘটনার বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা ঃ

১৪৯৫। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হোদায়-বিয়ার ঘটনাকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল; রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাযান্তে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে যে বৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত করিয়াছেন—উহা তোমরা জান কি? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, ঐ বৃষ্টি সম্পর্কে একদল লোক আমার প্রতি ঈমানের উক্তি ও পরিচয়-দানে প্রভাত করিয়াছে, আর একদল লোক উহা সম্পর্কে আমার প্রতি কুফরী—ঈমানহীনতার উক্তি ও পরিচয় দানে প্রভাত করিয়াছে। যাহারা বলিয়াছে—আল্লার রহমতে, আল্লার দানে ও আল্লার কৃপায় বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা আমার প্রতি ঈমানের উক্তি ও পরিচয় দিয়াছে, নক্ষত্র পুজারী-রূপ উক্তি করে নাই। পক্ষান্তরে যাহারা বলে যে, অমুক নক্ষত্রের দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বস্তুত নক্ষত্রের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী, আমার প্রতি কুফরী ও ঈমানহীনতার পরিচয় দানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—জগতের বুকে প্রবাহমান কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলী সাধারণতঃ কার্য্যকারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া সৃষ্টিকর্তারই বিধান। কিন্তু ইহা অবধারিত যে, ঐসব কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলীর মূল স্রষ্টা হইলেন বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এবং ঐ কার্য্যাকারণের স্রষ্টাও তিনিই। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আদরণীয় সৃষ্টি—মানবজাতির উপকারার্থে ঐসব কার্যকারণ ও কার্য্যাবলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় যদি মানব ঐসব কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কার্য্যাকারণের প্রতি

দৃষ্টি করে তবে নিশ্চয় উহা তাহার পক্ষে মস্তবড় নিমকহারামী, অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী গণ্য হইবে। কার্য্যকারণ যাহা শুধুমাত্র বাহ্যিক বাহক ও মাধ্যম উহার আবরণে অন্ধ না হইয়া স্বীয় দৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি নিবদ্ধ রাখাই মানবের কর্ত্তব্য এবং ইহাই ইসলামের শিক্ষা। ঐ কার্য্যকারণের মাধ্যম আল্লাহ তায়ালাই রাখিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এই তথ্যও প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্টিকর্তা আমি, তোমাদের দৃষ্টি আমার প্রতিই নিবদ্ধ রাখিও; কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না। এমতাবস্থায় যে হতভাগা সৃষ্টিকর্ত্তার সেই আদেশ লংঘন পূর্বক বাহ্যিক আবরণে অন্ধ হইয়া থাকিবে সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিবে।

পাঠকবর্গ। আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত দুই প্রকার উক্তি এবং অন্যান্য জাগতিক কার্য্যাবলী সম্পর্কে এই ধরণের দুই প্রকার উক্তির পার্থক্যকে শুধু কেবল বাক্য-গ্রন্থনি ও বাক্যের কায়দা-কানুনের পার্থক্য এবং ক্রিয়া পদের কর্ত্ত ও উপকর্ত্তা উল্লেখের পার্থক্য গণ্য করিবেন না।

অন্ধকারে নিমজ্জমান ব্যক্তিগণ ঐ বাহ্যিক কার্য্যকারণকে বাস্তব কার্য্যকারক ও মূল প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী গণ্য করিয়া থাকে, এই সুত্রেই তাহারা ঐ সব কার্য্যকারণের পুজক ও উপাসক হইয়া বসে। যদি শুধু বাক্যের মধ্যে উপকর্ত্তাপদ হিসাবে ঐসব কার্য্যকারণকে উল্লেখ করিত তবে কস্মিনকালেও উহার উপাসক হইত না। সুর্য-পুজক, চন্দ্র-পুজক, নক্ষত্র-পূজক, গাভী-পুজক, নদ-নদী-পুজক এবং মহামণীষীগণের মুর্তি-পুজক ইত্যাদি যত গায়রুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর পুজক আছে তাহাদের এই পুজা ও উপাসনায় এই তথ্যই নিহিত রহিয়াছে।

অশিক্ষিত ব্যক্তি ও জাতিকে ত শয়তান নমস্কার দান, সেজদা দান, ভোগ দান এবাদত উপাসনা ইত্যাদি পুরাতন ধরণের পুজায় পতিত করে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত জাতি ও ব্যক্তিগণ যাহারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার সেজদা এবাদৎ ও বন্দেগী করিতেও রাজি নহে তাহা-দিগকে শয়তান অন্য ধরণের পুজায় পতিত করিতেছে। তাহারা ঐ সব কার্য্যকারণের প্রতি স্বীয় দৃষ্টিকে এত গাঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছে যে, শুধু বাক্যের মধ্যে উহাকে কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং বাস্তবেও উহাকেই কার্য্যকর্ত্তা ভাবিয়াছে, তাই তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ধাবিত না হইয়া সর্বদা ঐ কার্যকারণ সমুহের প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে। এই সুত্রেই তাহারা (Godless theory) "খোদা নাই" মতের মতাবলম্বী হইয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র উপকর্তা হিসাবে ঐরূপ কার্য্যকারণকে বাক্যে উল্লেখ করে, উহাকে বাস্তব কার্যকারক ও মুল প্রতিক্রিয়াশীল গণ্য না করে এবং "খোদা নাই" মতাবলম্বী না হয়, সেইরূপ হওয়ার বাহ্যিক আশঙ্কাও না থাকে—এমতাবস্থায় ঐরূপ

উক্তি ও বাক্য প্রয়োগ ততটা দোষণীয় না হইলেও একেবারে দোষমুক্ত নহে এবং যথাসাধ্য ঐরূপ উক্তি পরিহার করিয়া চলা আবশ্যক। কারণ, উহা "খোদা নাই" মতবাদের উক্তির সামঞ্জস্য। ঐরূপ উক্তির আধিক্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক; কারণ, কোন এক প্রকারের মৌখিক উক্তি যখন বারংবার মুখে আসে তখন আভ্যন্তরীণ ভাবধারার উপর প্রতিক্রিয়া ও ছাপ বসাইতে শয়তান উত্তম সুযোগ পাইয়া বসে, এবং ঐরূপ উক্তি সর্বদা করিতে থাকিলে শয়তান সহজেই "খোদা নাই" মতের দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

এই সূত্রেই অন্য এক হাদীসে "لو—যদি" শব্দকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য অছিলা ও বাহ্যিক কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যবহার করা হইতে এই বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, "لو—যদি" শয়তানের প্রবেশ-দ্বার প্রশস্থ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সর্বদা বাহ্যিক অছিলা ও কার্য্যকারণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে যে, যদি ঐ ব্যবস্থা করিতাম তবে এই হইত, যদি অমুক ব্যবস্থা করিতাম তবে এই অবস্থা হইত না ইত্যাদি—এই রূপে মূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সর্বদা শুধু বাহ্যিক কার্যকারণ সমূহের জপনা জপিতে থাকিলে শয়তান উপরোল্লিখিত সুযোগ পাইয়া থাকে; ইহাকেই "শয়তানের দরওয়াজা প্রশস্ত হওয়া" বলা হইয়াছে।

১৪৯৬। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চারিটি ওম্‌রা করিয়াছিলেন। বিদায় হজ্জকালীনকৃত ওম্‌রাটি ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটিই জিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হোদায়বিয়ার (অসম্পূর্ণ) ওম্‌রাটি জিল্‌কদ মাসে এবং পরবর্তী বৎসর উহার কাজা ওম্‌রাটিও জিল্‌কদ মাসে এবং হোনায়েন-জেহাদে জয় লাভের পর মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত "জেয়েররাণা" নামক স্থান হইতে যেই ওম্‌রাটি করিয়াছিলেন উহাও জিল্‌কদ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৪৯৭। **হাদীছ :**—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহারা সংখ্যায় চৌদ্দশত বা আরও কিছু অধিক ছিলেন। এই অধিক সংখ্যক লোক যখন হোদায়বিয়া এলাকার কূপটির নিকট অবতরণ করিলেন তখন অল্প সময়ের মধ্যেই উহার পানি নিঃশেষ হইয়া গেল। সকলেই হযরত (দঃ)-এর নিকট পানির অভাবের অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) কূপটির নিকটবর্তী বসিলেন এবং উহা হইতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ পানি উপস্থিত করিতে বলিলেন। তাহা করা হইল; হযরত (দঃ) ঐ পানির মধ্যে স্বীয় থুথনী দিলেন এবং দোয়া করিয়া ঐ পানি কূপে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কিছুক্ষণের জন্য পানি উত্তোলন বন্ধ রাখ। অতঃপর কূপে এত অধিক পানি আসিতে লাগিল যে, উপস্থিত সকল মানুষ এবং তাহাদের যানবাহন পানি পানে তৃপ্ত হইল, এমনকি যত দিন তাঁহারা তথায় অবস্থানরত ছিলেন, ঐ পানি তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইল।

১৪৯৮। হাদীছ :—সালেম (রাঃ) জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে একদিন সকলেই পানির অভাবে পতিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল। হযরত (দঃ) উহা হইতে অজু করিলেন, এবং অতঃপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা অস্থির কেন? সকলেই আরজ করিলেন, আপনার সম্মুখের পাত্রে যে পানিটুকু আছে উহা ব্যতীত আমাদের পানীয় বা অজু করার আর কোন পানি নাই। তখন হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ হযরতের আঙ্গুলসমূহের মধ্য দিয়া ঝর্ণার ন্যায় পানি উতলাইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা সকলে ঐ পানি পানে তৃপ্ত হইলাম এবং অজু করিলাম।

আমি জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন আপনাদের সংখ্যা কি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের সংখ্যা প্রায় পনর শত ছিল; অবশ্য আমরা এক লক্ষ হইলেও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত।

১৪৯৯। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার এলাকায় হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফ কর্তৃক ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করার বৎসর বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিলেন, এই বৎসর মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখিলেই উত্তম হইত। (তথায় যুদ্ধ বিরাজমান, তাই) আশঙ্কা হয়, আপনি বাইতুল্লাহ শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই সক্ষম হইবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (মক্কা শরীফ) যাইতেছিলাম। কোরায়েশ গোত্রীয় কাফেররা হোদায়বিয়ার এলাকায় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তখন হযরত (দঃ) আল্লার নামে উৎসর্গকৃত জানোয়ারসমূহ জবেহ করিয়া দিলেন এবং ছাহাবীগণ মাথা মুণ্ডাইয়া বা চুল কাটিয়া এহ্রাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি ওমরা করার নিয়েতে যাত্রা করিলাম; যদি বাইতুল্লাহ শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরার কার্য্যাদি আদায় করিব, আর যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তবে আমিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় (এহ্রাম ভঙ্গ করিয়া অন্য বৎসর কাজা) করিব। কতদূর পথ অতিক্রম করার পর তিনি বলিলেন, প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইলে হজ্জ ও ওমরার মাছআলাহ সমপর্য্যায়ের, তাই আমি ওমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়েত করিতেছি। অতঃপর তিনি এক তওয়াফ ও এক ছায়ী দ্বারা হজ্জ ও ওমরা উভয় ব্রত সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন বাধার সৃষ্টি হইল না।

হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির বিশেষ গুরুত্ব :

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্ধি-চুক্তির শর্ত সমূহ মোসলমানদের পক্ষে পরাজয় বরণ ও নতি স্বীকারের শামিল ছিল, যেরূপ অধিকাংশ ছাহাবীগণ বিশেষতঃ ওমর (রাঃ) উপস্থিত

ক্ষেত্রে বুঝিতেছিলেন। কিন্তু উহার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া ছিল মোসলমানদের পক্ষে অতি মঙ্গলময় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ছিল বিরাট সাফল্য। নিম্নে কতিপয় বিষয়ের ইঙ্গিত দান করা হইতেছে।

[১] এই সন্ধি সম্পাদনের দ্বারাই মোসলমান জাতি স্বীয় প্রতিদ্বন্দী আরব দেশের সেরা মক্কাবাসী কোরায়েশগণ কর্তৃক রাষ্ট্রিয় মর্য্যাদার স্বীকৃতি লাভ করিয়া ছিল তথা বিশ্ব-শক্তির একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইহা একটি অতি মুল্যবান মর্য্যাদা। বর্তমান যুগেও দেখা যায় কোন নুতন রাষ্ট্র বিশ্ব-শক্তির স্বীকৃতি লাভের জন্য কত চেষ্টাই না করিয়া থাকে!

[২] হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু মদীনা বা মক্কার নবী ছিলেন না, তিনি বিশ্ব-নবী। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত মোসলমানগণ স্বীয় দেশ ও জাতি কর্তৃক শক্তি ও মর্য্যাদাবানরূপে স্বীকৃত হইয়া শান্তি, শৃঙ্খলা ও অবকাশ লাভের সুযোগ না পাওয়ায় বহির্জগতের সঙ্গে হযরত (দঃ) যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইতে ছিলেন না। সন্ধি সম্পাদন দ্বারা শান্তি ও অবকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্রুত ঐ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্ব-নবী যে সত্যের সওগাত, মঙ্গল ও কল্যাণের ধর্ম বহন করিয়া আনিলেন সর্বজনে উহা পরিবেশন করিতে পারিলেই হইবে উহার সার্থকতা। হযরত (দঃ) তৎকালীন বৃহৎ শক্তিদ্বয়—রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাট এবং অন্যান্য শাসন ক্ষমতাধিকারীগণ, এমনকি আরবের বিশিষ্ট গোত্রীয় সর্দারগণের নিকট লিপি প্রেরণ করিলেন এবং প্রত্যেককে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইলেন।

কতিপয় নাম যাহাদের নিকট রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন—

(১) রোম সম্রাট—হেরাক্লিয়াস; তাহার নিকট দেহইয়া কলবী (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে।

(২) পারস্য সম্রাট—খুসরুপরভেজ; তাহার নিকট আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন; সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) মিশর অধিপতি মোকাওয়াকাস; তাহার নিকট হাতেব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আদবের সহিত পত্রের উত্তর প্রদান করিয়াছিল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মানার্থে হাদিয়া পাঠাইয়াছিল।

(৪) আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশী; তাঁহার নিকট আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মারফৎ লিপি পাঠাইয়াছিলেম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও অবকাশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপে সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন।

[৩] হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে মোসলমান ও মক্কাবাসী কোরায়েশদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিগুমান থাকায় পরস্পর মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না, তাই মোসলমানদের মূল উদ্দেশ্য—দ্বীন ইসলামকে প্রসারিত করা এবং উহার বাস্তব পন্থা—দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ সমূহের খাঁটীত্ব ও বাস্তবতা এবং মনমুগ্ধকর গুণাবলী ও মোসলমানদের অমায়িকতার দ্বারা মানুষের মন জয় করা ; এই বাস্তব ও সহজ পন্থায় উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ হইতেছিল না। মক্কাবাসী কোরায়েশরা মোসলমানদিগকে যাচাই করার এবং ইসলাম সম্পর্কে নীরব চিন্তা করার অবকাশ পাইতেছিল না। হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হওয়ায় মক্কাবাসীরা মোসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার এবং ইসলামকে নীরব চিত্তে ভাবিয়া দেখার প্রয়াস পাইল, যাহার ফলে অনেকে ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিল, তাই হোদায়বিয়ার সন্ধি মোসলমানদের পক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাহাই হউক, কিন্তু মন ও অন্তর জয় করার পথে বিরাট সাফল্য ছিল।

কোরায়েশদের দক্ষিণ হস্ত ও গর্বের পাত্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর খালেদ ইবনে অলীদ এবং আরবের অদ্বিতীয় কুটনীতিবিদ আম্‌র ইবনুল আছ সন্ধিকালীন শান্ত পরিবেশে ইসলামের কোলে স্থান সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এমনকি এই সুযোগে সকল মক্কাবাসীই ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

সার কথা—এই সন্ধির সুযোগেই ইসলাম তাহার গুণবলে শত্রুতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া শত্রুর অন্তর্লোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল।

[৪] হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও অবকাশ সৃষ্টির সুযোগে মোসলমানগণ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে মোসলমানগণ এতদূর শক্তিশালী হইয়া ছিলেন যে যেই মক্কাবাসীরা মোসলমানগণকে কোন কিছু গণ্য করিত না, সন্ধির দুই বৎসর পর যখন মক্কাবাসীগণ কর্তৃক গোপনে চুক্তি ভঙ্গের দরুন মোসলমানগণ মক্কা আক্রমণ করিলেন তখন সেই মক্কাবাসীরা নিজ বাড়ীতে থাকিয়া আত্মরক্ষা মূলক সংগ্রামেও মোসলমানদের মোকাবিলায় পূর্ণ অবতরণে সাহসী হইল না। একপ্রকার বিনাবাধায় মোসলমানগণ মক্কা অধিকার করিতে প্রয়াস পাইলেন। অতএব মক্কা বিজয় যাহা মোসলমানদের পক্ষে বিজয় লাভের চরম সীমা ছিল, কারণ মক্কা বিজয়ের পরেই আরবের বিভিন্ন বস্তি ও গোত্রসমূহ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হইতে লাগিল—এই বিরাট সাফল্যের গোড়ায় নিহিত ছিল একমাত্র হোদায়বিয়ার সন্ধির বদৌলতে সঞ্চিত শক্তি।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি-চুক্তির উক্ত ফলাফলসমূহ দৃষ্টে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা পূর্বাহ্নেই এই সন্ধি-চুক্তিকে ইহার বাহ্যিক রূপের বিপরীত "فَتْحٌ مُّبِينٌ—সুস্পষ্ট বা মহা বিজয়" নামে আখ্যায়িত করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত রূপে নাযেল করেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا—"আমি আপনার জন্য মহা বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলাম"।

আল্লার রসুল (দঃ)ও উহাকে মহাবিজয়রূপেই বরণ করিলেন। উক্ত আয়াত নাযেল হইলে পর হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ওমর (রাঃ) চমকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, هذا هو الفتح المبين — ইহা কি মহাবিজয়? রসুলুল্লাহ (দঃ) গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, হাঁ—ইহা মহাবিজয়। পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সকলের নজরেই উজ্জলরূপে প্রতীয়মান করিয়া দিল যে, বাস্তবিকই ঐ সন্ধি দ্বারা সুস্পষ্ট বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫০০। **হাদীছ :**—বরা (রাঃ) একদা বলিলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কে অতি বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাক, অবশ্য ইহা সত্য যে মক্কা বিজয় অতি বড় জয়লাভ ছিল, কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে বায়আ'তে-রেজওয়ান (তথা উহার ফলাফল—মক্কাবাসীগণ কর্তৃক সন্ধি-চুক্তিতে সম্মত হওয়া)কে বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাকিতাম। আমরা চৌদ্দশত মোসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেই হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম।

হোদায়বিয়া বস্তুতঃ একটি কূপের নাম, আমরা এত লোক তথায় অবস্থানরত হইলে পর অল্প সময়ের মধ্যেই উহা শুষ্ক হইয়া যায়, উহার মধ্যে এক ফোটা পানিও থাকে না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ কূপের কিনারায় আসিয়া বসিলেন, অতঃপর পানির পাত্র আনাইলেন এবং অজু করিয়া কুলির পানি কূপে ফেলিলেন ও দোয়া করিলেন। আমরা অল্প সময় কূপের পানি উঠান হইতে বিরত থাকিলাম। অতঃপর আমাদের যানবাহনের জন্যও আমাদের ইচ্ছানুযায়ী পানি উহা হইতে বাহির করিলাম। (৫৯৮ পৃঃ)

১৫০১। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত—انا فتحنا لك فتحا مبينا "আমি আপনার জন্য মহাবিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি" এস্থলে হোদায়বিয়ার ঘটনাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। উক্ত আয়াত সংলগ্ন আরও আয়াত আছে—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ ....

অর্থ—(সেই জয়লাভের তথা হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির বদৌলতে) আল্লাহ তায়ালা আপনার আগে-পরের সমস্ত খাতা-কছুর মাফ করিবেন, আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নেয়ামত সম্পূর্ণ করিবেন, আপনাকে সরল সত্য পথের (তথা দীন-ইসলামের) উপর (বাধা মুক্তরূপে) অগ্রসর হইবার সুযোগ দিবেন এবং সম্মান ও মর্য্যাদাশীল প্রাধান্য দান করিবেন। (২৬ পাঃ ছুরা-ফাতাহ)

এই আয়াত নাযেল হইলে ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, অতি সুন্দর সুসংবাদ ইহা, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে সুসংবাদ কি? তখন এই আয়াত নাযেল হইল—

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ........

অর্থ :—(হোদায়বিয়ার ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা ও সুযোগ প্রদান করিয়াছেন), এই উদ্দেশ্যে যে, মোমেন পুরুষ ও নারীকে বেহেশতে পৌঁছাইবেন—যাহার মনোরম বাগ-বাগিচার মধ্যে সুশীতল নহর প্রবাহমান থাকিবে এবং তাহাদের গোনাহসমুহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন। এই সব ব্যবস্থাই আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় উন্নতি ও সাফল্য গণ্য করা হয়। (৬০০ পৃ:)

ব্যাখ্যা :— হোদায়বিয়ার ঘটনার বদৌলতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে চারিটি সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে—

(১) আগে-পরের সমস্ত খাত্তা-কছুর মাফ করা ; তাহা এইরূপে যে, উক্ত ঘটনার দ্বারা অধিক লোক মোসলমান হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল—

ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا

"আপনি দেখিতে পাইবেন, দলে দলে লোক আল্লার দীনে দীক্ষিত হইতেছে।" কাহারও অছিলায় কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত ও মর্য্যাদাশীল গণ্য হইয়া থাকে ; এই সূত্রে অধিক লোক মোসলমান হওয়ায় রসুলুল্লাহ (দ:) সেই মান-মর্য্যাদা অধিকের অধিক লাভ করিলেন।

(২) আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নেয়ামত সম্পুর্ণ করিবেন ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে ইসলামের পথ প্রশস্ত হওয়ায় অধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং উহার বদৌলতে হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) মান-মর্য্যাদা ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের চরম সীমায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

(৩) সরল পথ তথা দ্বীন-ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে শান্তি ও অবকাশ পাইয়া মোসলমানগণ প্রচুর শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হইবে যদ্দারা কাফেররা অতি সহজে পরাজিত হওয়ায় দ্বীন-ইসলামের পথ হইতে মস্তবড় বাধা দুরীভুত হইবে।

(৪) সম্মান ও মর্য্যাদশীল প্রাধান্য লাভ করা ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে সঞ্চিত শক্তির অছিলায় মক্কা জয় হইবে অত:পর সমস্ত আরব ভু-খণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পথ সুগম হইবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত প্রত্যেকটি সুসংবাদই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

ছাহাবীগণের জন্য সুসংবাদ দান করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বেহেশত লাভ করিবেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবেন; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনা উপলক্ষে ছাহাবীগণ বিপরীত দুইটি গুণের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। প্রথম—আল্লার রসুলের আহ্বানে জান-মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করতঃ জেহাদের জন্য বায়আ'ত ও অঙ্গীকার করিলেন। দ্বিতীয়—সকল প্রকার উস্কানীমূলক ও অসংগত দাবীর উপর ধৈর্য্যধারণ করতঃ আল্লার রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বীনের জন্য উৎসর্গতা এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য মোসলমানগণ পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বীনের জন্য উৎসর্গতা এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য, দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবী ও বেহেশত লাভ ইত্যাদির প্রধান অবলম্বন।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ফজিলত :

১৫০২। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। ঐ ঘটনায় আমরা চৌদ্দশত সংখ্যক ছিলাম। তথায় যেই স্থানে গাছের তলায় বসিয়া আমরা বায়আ'তে-রেজওয়ান করিয়াছিলাম, বর্তমানে আমার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান থাকিলে আমি হয়ত তোমাদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইতে সক্ষম হইতাম। (৫৯৮ পৃঃ)

১৫০৩। **হাদীছ :**— ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খাদেম আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলিফা ওমরের সঙ্গে যাইতে ছিলাম; একটি বয়স্কা রমণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমার স্বামী এন্তেকাল করিয়াছেন, কতিপয় শিশু সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের জন্য বকরীর পায়ের খুরা পাকাইয়া আহারের ব্যবস্থা করার সামর্থও আমার নাই, কোন শস্য ফসলের ব্যবস্থা বা গাভী ছাগলও নাই; অনাহারে তাহারা এইরূপ হইয়া গিয়াছে যে, আশঙ্কা হয়, মুর্দারখোর জন্তু—বিজ্জু তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। আমার পিতা খোফাফ্ ইবনে আইমা (রাঃ); তিনি হোদায়বিয়ার ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর না হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ রমণীটির অভিযোগ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর রমণীটিকে ধন্যবাদ দান করতঃ স্বীয় বাড়ী আসিয়া একটি মোটা-তাজা উটের পৃষ্ঠে দুই বস্তা খাদ্য বস্তু, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং কাপড়-চোপড় রাখিয়া উটের নাকা দড়িটি ঐ রমণীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি এইসব লইয়া যাও, ইহা শেষ হইতে হইতে আশাকরি আল্লাহ তায়ালা তোমার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল-মোমেনীন! রমণীটিকে অনেক বেশী দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাহাকে ভৎর্সনা পূর্বক বলিলেন, তাহার বাপ-ভাই যেই রাজত্ব জয় করিয়া গিয়াছেন সেই রাজত্বে তাঁহাদের অর্জিত সম্পদই আমরা ভোগ করিতেছি।

১৫০৪। হাদীছ:—আসলাম (রঃ) ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) (হোদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের) ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন কিছুর উত্তর করিলেন না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন এইবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেও উত্তর পাইলেন না। ওমর (রাঃ) নিজকে নিজে তিরস্কার করিলেন যে, তিনবার রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিলেন, কিন্তু একবারও রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর দিলেন না।

ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলাম যে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) কে বিরক্ত করার ফলে আমার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া) কোন আয়াত নাযেল হইয়া পড়ে না কি। এই ভয়ে আমি আমার উটকে হাকাইয়া সকলের অগ্রে চলিয়া গেলাম, (যেন আমি হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নজরে না পড়ি।) কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এক ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি মনে মনে বলিলাম, যাহা ভাবিয়া ছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাযেল হয় না কি? (তাহাই হইয়াছে বুঝি।) এই ভাবনা লইয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, অদ্য আমার প্রতি একখানা আয়াত নাযেল হইয়াছে, উহা আমার নিকট দুনিয়ার সব ধন-দৌলত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—إنا فتحنا لك فتحا مبينا
"আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।" (৬০০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা:—সম্পূর্ণ আয়াতটি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে এবং মোসলমানগণ সম্পর্কে কতিপয় সুসংবাদ সম্বলিত ছিল যাহার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হোদায়-বিয়ার সন্ধির বাহ্যিক নতি স্বীকারের আড়ালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিরাট বিজয় ও সাফল্যের যে ছবি দেখিতে ছিলেন, এই আয়াত উহারই ঘোষণা দিতে ছিল; তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াতটিকে বিশেষ প্রিয় বস্তুরূপে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সন্ধির বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে ওমর (রাঃ) সর্বাধিক মনক্ষুন্ন ছিলেন; তাই তাঁহাকে ডাকিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ আয়াতটি শুনাইয়া দিলেন।

১৫০৫। হাদীছ:—মোছাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বরা ইবনে আযেব (রাঃ) ছাহাবীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, আপনার জন্য ত বড় সুসংবাদ—আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে বায়আ'তে রেজওয়ানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি ত অবগত নও—রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগের পর আমরা কি কি বিপরীত কার্য্য করিয়াছি! (৫৯৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। কিন্তু স্বীয় গুনের প্রতি নজর না রাখা এবং আল্লার দরবারে নিজেকে অপরাধী গণ্য করাই মহতের পরিচয়।

ছোট একটি অভিযান

১৫০৬। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকূল" এবং "ওয়ায়না" গোত্রদ্বয়ের কতিপয় লোক মদিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলামের বাহ্যিক স্বীকৃতি প্রকাশ করিল। মদীনার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তাহারা শোথাক্রান্ত হইয়া গেল। তাহারা হযরতের নিকট আরজ করিল যে, আমরা খোলা মাঠে থাকিতে ও দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, বস্তির মধ্যে থাকা এবং শাক-শব্জি খাওয়ায় আমরা অভ্যস্ত নহি, (আমাদের জন্য উন্মুক্ত বাসস্থান ও দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিন।)

মদীনা শহর হইতে বাহিরে একস্থানে হযরতের (তথা বায়তুল-মালের) কতকগুলি উট রক্ষিত ছিল ; হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথায় চলিয়া যাইতে এবং (তাহাদের ব্যাধি দৃষ্টে) তাহাদিগকে তথায় উটের দুগ্ধ ও চনা ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। তাহারা তথায় যাইয়া যখন রোগমুক্ত হইল তখন তথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে রাখাল ছিল তাহাকে (পৈশাচিক রূপে) হত্যা করিয়া ফেলিল এবং উটসমূহ লইয়া পলায়ন করিল।

হযরত (দঃ) সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ঐ দিনই তাহাদিগকে বন্দী করিয়া উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ দান করিলেন যে, উত্তপ্ত শালকা দ্বারা তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করা হউক এবং এক হাত ও এক পা কাটিয়া রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ফেলিয়া রাখা হউক। তাহাই করা হইল এবং তাহাদিগকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইল ; তাহারা পানি চাহিল ; পানি দেওয়া হইল না, (পিপাসায় তাহারা মাটি চাটিতে ছিল ;) এইরূপে তাহাদের মৃত্যু হইল।

ব্যাখ্যা :—তাহাদের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে যত রকমের ব্যবস্থা উল্লেখ আছে অনুবাদের মধ্যে সবই একত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহাদের অপরাধ ও বর্বরতার ফিরিস্তি শুনুন।

(১) হযরত (দঃ) তাহাদের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে বাইতুল মালের উট সমূহের দুগ্ধ বিনা মুল্যে পান করার সুযোগ দান করতঃ রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কি পিশাচ তাহারা যে, রোগমুক্তির পর সেই উপকারের প্রতিদানে তাহারা হযরতের রাখালকে অমানুষিকতার সহিত অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়ভাবে

হত্যা করিয়া ফেলে। "যোরকানী" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, তাহারা তাঁহার চোখে এবং জিহ্বায় বড় বড় কাঁটা বিদ্ধ করিয়া দেয়, তাঁহার অঙ্গ সমূহ কাটিয়া ফেলে অতঃপর তাঁহাকে জবাই করে।

সেই রাখাল ছিলেন অতি নিরীহ অতি সাধু প্রকৃতির, হজরতের ক্রীতদাস, তাঁহার নাম ছিল "ইয়াসার" তিনি অত্যাধিক নামাজ পড়িতেন। হযরত (দঃ) তাঁহার নামাযে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আজাদ ও মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐসব উটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এমন মহৎ ব্যক্তিকে ঐ পিশাচগণ নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, বরং কোন কোন হাদীছের বর্ণনা মতে তথায় একাধিক রাখাল ছিল, ঐ নরপিশাচগণ তাহাদের সকলকেই নির্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিল।

(২) মদীনায় মোনাফেক অনেকই ছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বহীন ঐ নরপিশাচগণ মোনাফেকীর সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের জান-মাল বিপন্ন করার এক ভয়ঙ্কর পন্থার সুত্রপাত করিল যে, প্রকাশ্যে মোসলমানদের দলভুক্ত থাকিয়া সুযোগ প্রাপ্তে মোসলমানদের জান-মাল ক্ষতি করিয়া পলায়ণ করিল।

(৩) ইসলামের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার পর তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের বিদ্রোহী হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নরহত্যা, লুণ্ঠনের অপরাধ ত ছিলই।

অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন বস্তুতঃ শান্তিকামী জন-সাধারণের উপর অন্যায়-অত্যাচারের শামিল। রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি ঐরূপ করিলে তাহা তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ত্রুটিই হইবে না শুধু, বরং জন-সাধারণের জান-মাল বিপন্ন করার সহায়তা করনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ নরপিশাচগণ উক্ত অপরাধসমুহের সর্বপ্রথম উদ্ভোক্তা ছিল—ইতিপুর্বে মোসলমানদের দলভুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হয় নাই। অঙ্কুরে যদি আদর্শ শাস্তি প্রদান করিয়া এইরূপ পন্থাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা না হইত, তবে জনসাধারণের নিরাপত্তা ব্যহত হইত এবং প্রতিটি সুযোগেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকিত। এই অবস্থার অতি বড় কুফল এই ফলিত যে, নুতন মোসলমানদের পুনর্বাসন অসম্ভব হইয়া পড়িত।

উল্লিখিত অপরাধ ও বিষয়াবলী দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুণ্ঠনের অপরাধে কোরআনে বর্ণিত হাত-পা কাটিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। নরহত্যায় পৈশাচিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দৃষ্টে শাস্তিকে কঠোরতর করার জন্য গরম শলাকা দ্বারা চক্ষু ঘায়েল করার এবং পানি হইতে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে, মূল ঘটনার রাবী স্বয়ং আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাদের চোখে গরম শলাকা দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, তাহারা রাখালগণের চোখে গরম শলাকা দিয়াছিল।

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (ঐ ঘটনায় অপরাধীদের অপরাধ দৃষ্টে) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু) অতঃপর তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এক হাদীছে সাধারণ বিধি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, নরহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ড একমাত্র তরবারীর দ্বারাই সমাধা করিতে হইবে। সাধারণ নিয়ম ও মছআলাহ ইহাই।

জী-কারাদের অভিযান

"জী-কারাদ" মদীনা হইতে দুই দিনের পথে অবস্থিত একটি ঝরনার নাম। এই অভিযানে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ এলাকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন, তাই এই অভিযান ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহ আলাইহের মতে এই অভিযানটি ষষ্ঠ হিজরীর শেস বা সপ্তম হিজরীর প্রথমভাগে খয়বরের জেহাদের তিন দিন পুর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫০৭। হাদীছ :—সালামাতুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জী-কারাদের নিকটবর্তী ("গাবাহ্" নামক স্থানে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতকগুলি উট চরিয়া বেড়াইত এবং তথায় রক্ষিত ছিল। আমি (ঘটনার দিন) শেষ রাতে ফজরের নামাজের আজানের পুর্বে ঐদিকে যাইতেছিলাম। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল, হযরতের উটগুলি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম লুণ্ঠনকারী কে? সে বলিল, গাতাফান গোত্রীয় লোক।

সালামা (রাঃ) বলেন, তখন আমি যে স্থানে ছিলাম তথা হইতেই তিনবার চীৎকার করিয়া মদীনা শহরবাসী সকলকে সতর্ক করিতে এবং স্বীয় আওয়াজ পৌছাইতে সক্ষম হইলাম। অতঃপর আমি সম্মুখ পানে দ্রুত ছুটিলাম, এমনকি আমি লুণ্ঠনকারী দলকে পাইয়া ফেলিলাম; তাহারা একস্থানে পানি পান করিতেছিল। আমি তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য প্রতিটি তীর নিক্ষেপের সময় বলিতাম, "আমি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আক্ওয়ার বেটা; আজ কমীনা ও অসভ্য লোকদিগকে নিপাত করার দিন।" এইরূপে আমি তাহাদিগকে তীর বর্ষণের দ্বারা হাঁকাইতে থাকিলাম। তাহারা বেগতিক দেখিয়া আমার হাত হইতে রক্ষা পাইতে দ্রুত দৌড়িবার উদ্দেশ্যে হাল্কা-পাতলা হইবার জন্য লুণ্ঠিত উটগুলি এক এক করিয়া পেছনে ছাড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে লুণ্ঠিত সমুদয় উট তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিলাম, কিন্তু আমি ক্ষান্ত-হইলাম না। অতঃপর তাহারা স্বীয় কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পেছনে ফেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের হইতে ঐরূপে ত্রিশটি চাদর (এবং ত্রিশটি বর্শা) লাভ করিলাম; এই সবই তাহারা দ্রুত দৌড়িয়া পালাইবার জন্য পেছনে

ফেলিয়াছে। আমি উহার প্রত্যেকটিতে পাথর ইত্যাদি রাখিয়া নিদর্শনযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে ছিলাম।

(এদিকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার প্রথম অবস্থার চীৎকার শুনিয়া পাঁচশত মোজাহেদের এক বাহিনী লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন।) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং মোজাহেদ বাহিনী (সন্ধ্যাকালে) আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। আমি আরজ করিলাম যে, শত্রুদলকে আমি (সারাদিন তীর মারিয়া) পানি পান করা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত তাহারা পিপাসায় কাতর; আপনি এখনই সৈন্য বাহিনী তাহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করুন (সহজেই তাহারা ধরা পড়িবে)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ত তাহাদের হইতে সব কিছু উদ্ধার ও হস্তগত করিয়া নিয়াছ; এখন তাহাদিগকে মুক্তি দাও। অতঃপর আমরা মদীনা পানে প্রত্যাবর্তন করিলাম, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে স্বীয় যানবাহনে বসাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—সালামাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) কতিপয় গুণে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আওয়াজ অতি উচ্চ ছিল, তাই তিনি আলোচ্য ঘটনায় স্বীয় চীৎকার সমস্ত মদীনাবাসীকে শুনাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ তীরান্দাজ ছিলেন। সর্বাধিক বিশিষ্ট গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল দ্রুত দৌড়িবার অসীম শক্তি। আলোচ্য ঘটনায় তিনি ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এত দ্রুতবেগে দৌড়িয়াছিলেন যে, শত্রুদল যানবাহনের উপর থাকিয়াও তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইতেছিল না। এমনকি মোছলেম শরীফের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, এই অবস্থায় মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে কোন এক ছাহাবী তাঁহার সঙ্গে দৌড়িবার পাল্লা লাগাইল, এই দৌড়েও সালামা (রাঃ)ই অগ্রগামী হইলেন।

খয়বরের জেহাদ

মদীনা হইতে উত্তর দিকে এক শত মাইলেরও অধিক ব্যবধানে অবস্থিত একটি শহরের নাম "খয়বর"। তথায় ইহুদী জাতির বসবাস ছিল এবং ইহুদীদের সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক শক্তিশালী কেন্দ্র উহাই ছিল। মদীনা হইতে বহিস্কৃত বনু-নজীর, বনু-কাইনুকা ইহুদী গোত্রসমূহ তথায় বসতি স্থাপন করার পর সেখানে ইহুদীদের শক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল; মোসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র এবং উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। তথাকার ইহুদীদের প্ররোচনা উৎসাহ দান ও উত্তেজনা সৃষ্টির কারণে মোসলমানদের উপর বড় বড় আক্রমণের সুচনা হইয়া থাকিত। খন্দকের যুদ্ধ, বনু-কোরায়জার ঘটনা এবং জি-কারাদের ঘটনার ন্যায় বড় বড় ঘটনা ঐ ইহুদীদের কারসাজিরই প্রতিক্রিয়া ছিল। এই সূত্রে মক্কাবাসী কোরায়েশদের ন্যায় খয়বরবাসী ইহুদীরাও ইসলাম এবং মোসলমানগণের প্রধানতম শত্রু ছিল এবং নিকটতম শত্রু ছিল।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে মক্কাবাসী কোরায়েশদের সঙ্গে হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐদিক হইতে অবকাশ লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মাত্র বিশ-পঁচিশ দিন পরেই তথা ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রারম্ভে হযরত (দঃ) খয়বর অভিযানে যাত্রা করিলেন। এই অভিযানে ষোল শত মোহাজেরদের এক বাহিনী তাঁহার সঙ্গে ছিল তন্মধ্যে দুই শত ছিলেন অশ্বারোহী।

খয়বর শহর বিভিন্ন দুর্গে বিভক্ত ছিল, ভিন্ন ভিন্ন নামের নয়টি দুর্গ ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিবেলা খয়বরের নিকটবর্তী পৌঁছিলেন এবং ভোরে অতর্কিতে শহরে প্রবেশ করিলেন। শহরবাসী কৃষকরা সর্বপ্রথম মোসলমান সৈন্যগণকে দেখিয়া চিৎকার করিলে শহরবাসীরা বিভিন্ন দুর্গ ও কেল্লাসমূহে আশ্রয় নিল এবং দুর্গের ভিতরে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক একটি দুর্গের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিকে নায়ে'ম দুর্গ ও ছা'ব দুর্গ জয় করা হইল। এই দুর্গদ্বয়ে খয়বরবাসীরা রসদ জমা করিয়াছিল, তাই উহা জয় হওয়ার দরুন মোসলমানদের শক্তি সঞ্চয় হইল। এতদ্ভিন্ন "নাতাৎ" নামক দুর্গও জয় হইল; এই দুর্গে বিশেষ রূপের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী বিদ্যমান ছিল। এইরূপে দুর্গসমূহ এক একটি জয় হইতে লাগিল। "কামুছ" নামক একটি দুর্গ ছিল, তথায় সর্বাধিক সৈন্যের সমাবেশ ছিল এবং "মোরাহ্হাব" নামক আরব বিখ্যাত দুর্দম পাহালওয়ান ঐ দুর্গবাসী ছিল। এই দুর্গেই ভীষণ যুদ্ধ হয়, মোসলমানগণ দুর্গটি ঘেরাও করিয়া অবরুদ্ধ রাখে, দীর্ঘ বিশ দিন পর্য্যন্ত এই অবরোধ অবস্থায় ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। প্রথম আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু দুর্গ জয় হইল না। অতঃপর ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলিল, এইবারও দুর্গ জয় হইল না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান করিব যাহার হস্তে (এই দুর্গ তথা সমগ্র) খয়বর জয় হইবে। এস্থলেই পূর্বে বর্ণিত ১৩৪৭ নং হাদীছের বিষয়াবলী অনুষ্ঠিত হয় এবং হযরত (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে যুদ্ধ-পতাকা দান করিয়া তাঁহার উপর যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব অর্পন করেন। দুর্দ্ধর্ষ পাহালওয়ান মোরাহ্হাব দর্প ও গর্বের সহিত দুর্গ হইতে বাহিত হইয়া আসিল। আলী (রাঃ) প্রথম আঘাতেই তাহার দর্প চিরতরে খতম করিয়া দিলেন, সে নিহত হইল। এই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশেষ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পাইল, এমনকি তিনি দুর্গের গেটের একটি কপাট ভাঙ্গিয়া উহাকে ঢালরূপে ব্যবহার করিলেন—সেই ঘটনা সম্পর্কে নানাপ্রকার গুজব কথিত আছে; অনেক অনেক ঐতিহাসিক ঐসব গুজবকে বর্ণনা করিয়া সকলেই একবাক্যে ঐ সবকে ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যাহাই হউক শেষ

পর্য্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল—দীর্ঘ কুড়ি দিনের অজেয় দুর্গ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে জয় হইল। এই দুর্গের পতনে সমস্ত খয়বরের পতন ঘটিল, তাই আলী (রাঃ) খয়বর-বিজেতা রূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।

এই দুর্গের পতনের পরেও কতিপয় দুর্গ অবশিষ্ট ছিল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐগুলিও ঘেরাও করিয়া অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কোন সংঘর্ষ হয় নাই, বরং ইহুদীরা শুধু পরনের কাপড় লইয়া সর্বস্ব ছাড়িয়া খয়বর ত্যাগ করার শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ইহুদীদের অনুরোধে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে আধাভাগী হিসাবে বর্গাদাররূপে তথায় থাকিতে দেওয়ায় রাজি হইলেন; এইরূপে খয়বর অভিযানের সমাপ্তি ঘটিল।

১৫০৮। **হাদীছ**ঃ—সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে খয়বর অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন। (তিনি বলেন,) যখন আমরা ছাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছিলাম যেই স্থানটি খয়বরের নিকটবর্তী ছিল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের নামায পড়িলেন, অতঃপর সকলকে খাদ্যবস্তু উপস্থিত করার আদেশ করিলেন। ছাতু ভিন্ন আর কিছুই উপস্থিত করার ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহাই তৈরী করার আদেশ করিলেন; তিনি এবং আমরা সকলেই উহা খাইলাম, অতঃপর তিনি এবং আমরা সকলেই কুল্লি করতঃ নূতন অজু ব্যতিরেকেই মগরেবের নামায পড়িলাম।

১৫০৯। **হাদীছ**ঃ—সালমাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে খয়বর অভিযানে যাত্রা করিলাম। রাত্রিবেলায় আমরা পথ চলিতে ছিলাম, এক ব্যক্তি (আমার চাচা—) আ'মের ইবনুল আক্ওয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমাদিগকে আপনার তারানা পাঠ করিয়া শুনান। আ'মের (রাঃ) কবি মানুষ ছিলেন; তিনি স্বীয় যানবাহন হইতে অবতরণ করিয়া সকলের আগে আগে তারানা গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই তারানা গাহিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا — وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ। তোমার সাহায্য ও তৌফিক না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না; দান-খয়রাত, নামায ইত্যাদি নেক আমলের সুযোগ পাইতাম না।

فَاغْفِرْ فِدًى لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا — وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

আমাদের সর্বস্ব তোমার সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতঃ নিবেদন করিতেছি, আমাদের কৃত সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং ইসলামদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদিগকে পদস্থিতি ও দৃঢ়তা দান কর।

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا - اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا - وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণেই আমরা সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছি ; ইসলামদ্রোহীগণ আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

(আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুমধুর সুরে) রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তারানা গাহিয়া কাফেলা পরিচালনকারী কে ? সকলেই উত্তর করিল, আমের ইবনুল আক্ওয়া। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, يرحمه الله আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন। (এই সম্পর্কে সকলেরই অভিজ্ঞতা ছিল যে, যুদ্ধ উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাঁহার সম্পর্কে ইহা বলিতেন, তাঁহার আয়ু শেষ বলিয়া প্রমাণিত হইত, তাই) এক ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লার নবী। আপনার বাক্যের প্রতিক্রিয়া ত অনড় অটল। এই ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরও কিছু সুযোগ আমাদিগকে দান করিলেন না কেন ?

অতঃপর আমরা খয়বর পৌঁছিলাম, আমরা খয়বরবাসীকে ঘেরাও করিলাম। দীর্ঘ দিন ঘেরাও করিয়া রাখিতে গিয়া আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে (একটি দুর্গের) জয়লাভ দান করিলেন। জয়লাভের দিন সন্ধ্যাবেলা খানা তৈরীর জন্য আগুন প্রজ্বলিত করা হইল যাহা অনেক অধিক ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইসব অগ্নি দ্বারা কি পাকান হইতেছে ? সকলেই উত্তর করিল, গোশত। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের গোশত ? সকলে উত্তর করিল, গৃহপালিত গাধার গোশত। রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন, গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, গোশত ফেলিয়া দিয়া পাত্রকে ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাও করা যাইতে পারে।

যুদ্ধ চলাকালীন পূর্বোল্লিখিত আমের (রাঃ) রণে অবতরণ করিলেন, তাঁহার তরবারীখানা দৈর্ঘ্যে ছোট ছিল, তিনি উহা দ্বারা এক ইহুদীর পায়ে আঘাত করিতে চাহিলেন, কিন্তু উহা (ছোট হওয়ার দরুন) ঐ ইহুদীর পায়ে না লাগিয়া আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বীয় হাঁটুর উপর উহার আঘাত লাগিল ; সেই আঘাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

(ছালামা (রাঃ) বলেন,) যখন আমরা খয়বর হইতে প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিলাম তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে মনক্ষুণ্ণ দেখিতে পাইলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মনক্ষুণ্ণ কেন ? আমি আরজ করিলাম, আপনার চরণে আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ—সকলেই এইরূপ বলে যে, আমেরের নেক আমলসমূহ বরবাদ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে ; (যেহেতু আত্মহত্যার ন্যায় সে নিজ হস্তে মারা গিয়াছে।) এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঐরূপ কথা যে বলিয়াছে সে ভুল করিয়াছে ; সে (আমের) ত দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই অঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করিয়াও

দেখাইলেন এবং বলিলেন, সে ত দ্বীনের জন্য কঠোর পরিশ্রমকারী মোজাহেদ ছিল, এমনকি সমগ্র আরবে তাহার ন্যায় ব্যক্তি কমই দেখা যায়।

১৫১০। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রিকালে খয়বর শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, রাত্রিবেলা কোন বস্তির নিকট পৌঁছিয়া ভোর হইবার পুর্বে ঐ বস্তির উপর আক্রমণ শুরু করিতেন না, এইস্থলেও তাহাই করিলেন। যখন ভোর হইল এবং খয়বরবাসী ইহুদীরা ধাম', বেল্‌চা লইয়া বাগানের কার্য্যে বাহির হইল (ঠিক সেই সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শহরের উপর আক্রমণ করিলেন।) তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া সন্ত্রস্ততার সহিত এই বলিয়া চীৎকার করিল যে, কসম খোদার! মোহাম্মদ এবং তাহার সৈন্যবাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন; আমরা কোন বস্তির উপর আক্রমণ চালাইলে সেই বস্তিবাসীরা পর্যুদস্ত হইতে বাধ্য।

১৫১১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ দিল যে, গাধাসমূহ খাইয়া ফেলা হইতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) চুপ রহিলেন—কিছু বলিলেন না। সংবাদদাতা দ্বিতীয়বার ঐ সংবাদ দিল, হযরত (দঃ) এইবারও চুপ রহিলেন। সংবাদদাতা তৃতীয়বার আসিয়া বলিল যে, গাধা সব শেষ হইয়া গেল। এইবার রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘোষণা দিবার আদেশ করিলেন যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ চুলার উপর হইতে ডেগসমুহ উল্টাইয়া দেওয়া হইল, অথচ উহার মধ্যে গোশ্‌তের তরকারী টগবগ করিতেছিল। (ইহা খয়বর জেহাদের সময়ের ঘটনা)।

১৫১২। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্ধকার থাকিতে খয়বরের নিকট ফজরের নামায পড়িলেন। অতঃপর (শহরে প্রবেশ কালে) আল্লাহু আকবার, খয়বর ধ্বংস হউক ধ্বনি দিলেন।

অতঃপর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুপক্ষীয় বিদ্রোহী যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং নারী ও শিশুগণকে বন্দীরূপে (সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা) করিলেন। বন্দীদের মধ্যে "ছফিয়া" নাম্নী একটি রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে দেহ্‌ইয়া কলবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তগত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হইয়া গেলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁহার মুক্তি দানকেই মহরানা স্বরূপ গণ্য করিলেন।

১৫১৩। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের জেহাদে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণের মধ্যে ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন যে, এই ব্যক্তি দোযখীদের মধ্যে একজন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি ভীষণ যুদ্ধ করিল, তাহার দেহে অত্যধিক আঘাত লাগিল। (ইসলামের জন্য তাহার পরিশ্রম ও উৎসর্গতা দেখিয়া) কোন কোন মানুষের অন্তরে তাহার দোযখী হওয়া সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হইল।

ঐ ব্যক্তি স্বীয় আঘাতসমূহের যন্ত্রণায় তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া স্বহস্তে নিজ গলগণ্ডে বিদ্ধ করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ কতিপয় মোসলমান ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার উক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন—অমুক ব্যক্তি স্বহস্তে নিজকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে।

এতদ শ্রবনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন—

قُمْ يَا فُلَانُ فَاَذِّنْ اَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ اِنَّ اللّٰهَ

يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ٥

"যাও এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, খাঁটী ঈমানদার ব্যতীত কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ফাছেক-ফাজের মানুষ দ্বারাও দ্বীন-ইসলামের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাকেন।"

১৫১৪। হাদীছ:—আবু মুছা আশআরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সহযাত্রীগণ পথিমধ্যে কোন এক নিম্ন ভূমির নিকটবর্তী হইলে সকলে الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله বলিয়া ভীষণ জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এতদ্দৃষ্টে হযরত (দ:) বলিলেন, তোমরা নিজের উপর রহম কর। (এইরূপ চীৎকার করিয়া স্বীয় জানকে কষ্ট-ক্লেশে পতিত করার কি আবশ্যক?) তোমরা যাঁহার নাম জপ করিতেছ তিনি শ্রবণশক্তিহীন বা তোমাদের হইতে দূরে নহেন, তোমরা যাঁহার নাম জপিতেছ তিনি সব কিছু শোনেন এবং তিনি তোমাদের অতি নিকটবর্তী, এমনকি তিনি তোমাদের (সর্বাবস্থা জ্ঞাত থাকা সূত্রে) তোমাদের সঙ্গেই আছেন।

এই সময় আমি হযরতের যানবাহনের পেছনেই ছিলাম। রস্থলুল্লাহ (দ:) আমাকে এই বাক্যগুলি বলিতে শুনিলেন—لا حول ولا قوة الا بالله "আপদ বিপদ ও সব রকমের ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচিবার এবং সুখ-সুবিধা ও লাভজনক কার্য্য সমাধা করিবার শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় নিকট হইতেই লাভ হইতে পারে।"

অতঃপর হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ জী—হুজুর বলিয়া পূর্ণ একাগ্রতার সহিত মনযোগ দিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব কি যাহা বেহেশত লাভের জন্য পরম সম্পদ ও অমূল্য রত্ন তুল্য? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ। হযরত (দঃ) বলিলেন ঐ বাক্যটি এই—لا حول ولا قوة الا بالله "লা-হাওয়া ওয়ালা কৌওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

১৫১৫। হাদীছঃ—ইয়াযীদ ইবনে আবু ওবায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পায়ের তলায় আমি একটি তরবারীর আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আঘাতটি কি? তিনি বলিলেন, খয়বরের জেহাদের দিন এই আঘাতটি লাগিয়াছিল; তখন সকলেই অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল, ছালামা ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিলাম, তিনি আমার যখমে তিনবার থুথুনী দিলেন, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই স্থানে আমি কখনও ব্যথা অনুভব করি নাই।

১৫১৬। হাদীছঃ—ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর অভিযানে যাত্রাকালে আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে (মদীনায়ই) থাকিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার চোখে যাতনা ছিল। পরে তিনি ভাবিলেন, আমি নবী (দঃ) হইতে পেছনে থাকিব। (ইহা ভাল মনে করিতে না পারিয়া) তিনি দ্রুত যাইয়া খয়বর এলাকায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত মিলিত হইলেন। খয়বর-বিজয় সমাপ্তির দিনের পূর্ব রাত্রে নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, আগামীকল্য এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যাহাকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ভালবাসেন; সেও আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে ভালবাসে; খয়বরের চরম বিজয় তাহার দ্বারা হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে উক্ত পতাকা লাভে লালায়িত থাকিল; কিন্তু অবশেষে নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে খোজ করিলেন এবং তাঁহাকে পতাকা দিলেন; তাঁহার অধীনে খয়বরের চরম বিজয় সমাপ্ত হইল।

১৫১৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে একস্থানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন দিন অবস্থান করিলেন; ঐ সময়ে তিনি উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে তাঁহার শাদী মোবারক সম্পন্ন করিতেছিলেন। উপস্থিত সকল মোসলমানকে অলিমার দাওয়াত পৌঁছাইবার কার্য্যে আমিই নিযুক্ত ছিলাম। সেই দাওয়াতে রুটি-গোশতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে দস্তরখানা বিছাইবার আদেশ করিলেন; উহা বিছান হইল; উহার উপর খেজুর, পনির ও মাখন রাখা হইল। (ঐসব মিশ্রিত করিয়া "হাইস্" নামক এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈরী করা হইল,) উহাই ছিল সেই শাদীর অলিমা।

অতঃপর সর্বসাধারণ মোসলমানগণ সঠিকরূপে জ্ঞাত হইতে চাহিলেন যে, ছফিয়া (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সহধর্মিনী—উম্মুল মোমেনীনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, না—মালিকানা সত্বাধিকারভুক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই ভাবিলেন, যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্ত বিশেষরূপে পর্দার ব্যবস্থা করেন তবে উম্মুল-মোমেনীন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, নতুবা মালিকানা সত্বাধিকার ভুক্ত গণ্য হইবেন। তথা হইতে যাত্রাকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্ত স্বীয় বাহনের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন।

(উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ১৩৩৫ নং হাদীছে বিবরণ রহিয়াছে।)

১৫১৮। হাদীছ ঃ—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর অভিযানের সময় তুইটি বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মোতা-বিবাহ তথা নির্দিষ্ট কালের জন্য বিবাহ করা এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া।

১৫১৯। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর-জেহাদকালে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১৫২০। হাদীছ ঃ—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের জেহাদকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাধার গোশত নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দান করিলেন।

● হানাফী মজহাব মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া মকরুহ। আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে উহা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রহিয়াছে; সেমতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সতর্কতামূলক উহাকে মকরুহ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

১৫২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর-জেহাদকালে আমরা ক্ষুধাগ্রস্ত হইয়া গাধার গোশত রান্না করিতেছিলাম; আমাদের ডেগ টগবগ করিতেছিল এবং কাহারও রান্না সমাপ্ত হইয়াছিল—এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রচারক ঘোষণা জারি করিল—তোমরা গাধার গোশত মোটেই খাইবে না এবং ডেগ সমুহ উল্টাইয়া দাও।

১৫২২। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর-জেহাদকালে নবী (দঃ) আমাদিগকে আদেশ করিলেন, গাধার গোশত রান্না করা এবং কাঁচা—সবই ফেলিয়া দেওয়ার। পরেও আর কোন সময় উহা খাওয়ার অনুমতি দেন নাই।

১৫২৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে গণিমতের মাল বণ্টন কালে ঘোড়ার জন্ত তুই অংশ এবং পদাতিক মোজাহেদের জন্ত এক অংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

১৫২৪। **হাদীছ:**—আবু মুছা আশয়ারী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হাবসা—আবিসিনিয়া হইতে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম—যখন তিনি খয়বর জয় করিয়া অবসর হইয়াছেন। তিনি তথায় সংগৃহীত গণিমতের মাল হইতে আমাদিগকে অংশ দান করিলেন। আমাদিগকে ছাড়া জেহাদে উপস্থিত ছিল না এমন আর কাহাকেও উহার অংশ দেন নাই।

১৫২৫। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা খয়বর জয় করিলাম। তথায় গণিমতরূপে সোনা-চান্দি হাসিল হইল না, কেবল গরু, বকরি, উট, নানা প্রকার বস্তু ও বাগ-বাগিচা হাসিল হইল।

খয়বর জয় করার পর আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে "ওয়াদিল-কোরা" নামক এলাকার দিকে যাত্রা করিলাম। হযরতের সঙ্গে তাঁহার একজন ক্রীতদাস ছিল, তাহার নাম ছিল "মেদআম"। একদা সে হযরতের যানবাহনের জিন বা গদি ইত্যাদি খুলিতেছিল হঠাৎ একটি অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া বলিল, তাহার জন্য এই শাহাদাৎ লাভের সুযোগ বড় সৌভাগ্যময়।

এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, সে দোজখে কেন যাইবে না? আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার হস্তে আমার প্রাণ, নিশ্চয় ঐ চাদরটি যাহা সে খয়বর-জেহাদের গণিমত হইতে স্বীয় অংশে লাভ করে নাই (বরং উহা গোপনে আত্মসাৎ করিয়াছিল;) সেই চাদরটি শিখাযুক্ত অগ্নি হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি একটি বা দুইটি সেণ্ডেল-জুতার দোয়াল বা ফিতা উপস্থিত করিয়া বলিল, ইহা আমি রাখিয়া ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, তোমার জন্য ইহা আগুনের দোয়াল ছিল।

১৫২৬। **হাদীছ:**—ওমর (রা:) (স্বীয় খেলাফৎকালে) বলিয়াছেন, পরবর্তী মোসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিতে না হইলে আমি প্রতিটি বিজিত দেশকেই মোজাহেদ বাহিনীর মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম, যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরকে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। (কিন্তু আমি তাহা করিলাম না; পরবর্তী মোসলমানদের জন্য বিজিত দেশের জমি রক্ষিত রাখিলাম।)

১৫২৭। **হাদীছ:**—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় করার পর আমরা (মনে মনে) বলিয়াছি, এখন আমরা পেট পুরিয়া খেজুর খাইতে পারিব।

১৫২৮। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় করার পূর্বে পেট পুরিয়া খেজুর খাইবার সুযোগ আমাদের ছিল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা

১৫২৯। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় হইয়া যাওয়ার পর তথাকার কোন এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি রন্ধিত বকরি হাদিয়া দিল উহার মধ্যে বিষ ছিল।

ব্যাখ্যাঃ—খয়বরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উদারতা প্রকাশ করিতে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি মনে করিলেন না তখন ছাল্লাম ইবনে মেশকাম নামক ইহুদীর স্ত্রী জয়নব হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল। হযরত (দঃ) দাওয়াত কবুল করিলেন। হযরতের সম্মুখে একটি রন্ধিত বকরি পেশ করা হইল, হযরতের সঙ্গে কতিপয় ছাহাবীও ছিলেন। জয়নব ঐ বকরির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল, বিশেষতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্মুখস্থ রানের গোশত অধিক পছন্দ করেন জানিতে পারিয়া ঐ রানের মধ্যে অত্যধিক বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল। হযরত (দঃ) গোশত মুখে দিয়াই বিষ অনুভব করিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে উহা ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু বিশর ইবনে বরা (রাঃ) নামক ছাহাবী কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহুদীগণকে চাপ দিলে তাহারা স্বীকার করিল এবং বলিল, আমরা ভাবিয়াছি—যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আপনি জানিতে পারিবেন এবং বাঁচিয়া যাইবেন। অন্যথায় আপনার মৃত্যুতে সকলে মিথ্যা নবী হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সম্পর্কে উপস্থিত কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে হযরত (দঃ) এত বড় ঘটনাকেও ক্ষমা করিয়া গেলেন। অতঃপর এই বিষের প্রতিক্রিয়ায় বিশর ইবনে বরা (রাঃ) ছাহাবীর মৃত্যু ঘটিল। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত ছাহাবীর মৃত্যুতে হযরত (দঃ) খুনের অপরাধে ঐ ইহুদী নারীকে প্রাণদণ্ড দিলেন।

ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া হযরতের উপরও হইয়াছিল। হযরত (দঃ) উহা সময় সময় অনুভব করিতেন; মৃত্যু শয্যায় স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, এই বার আমি সেই বিষের প্রতিক্রিয়া ভীষণরূপে অনুভব করিতেছি—মনে হয় যেন উহাতে আমার হৃদ-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এই সূত্রেই বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে স্বীয় পছন্দনীয় কোন প্রকার মর্তবা ও বৈশিষ্ট্য হইতেই বঞ্চিত রাখেন নাই। শহীদের মর্তবা এবং ফজিলত লাভ করার সুযোগও তাঁহাকে দিয়াছেন; তিনি শেষ পর্য্যন্ত আল্লার দীনের উন্নতি বিধানে শত্রুর দেওয়া বিষের প্রতিক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

মুতার জেহাদ

"মুতা" সিরিয়ার অন্তর্গত একটি এলাকার নাম, তথায় এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।" ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই—

রোম সম্রাটের অধীনে "বোছরা" এলাকায় শারজীল ইবনে আমর নামক এক শাসনকর্তা ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজাদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান-লিপি প্রেরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই অনুসারে তাহার নিকটও একখানা লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত শাসনকর্তা শারজীল লিপি বাহক দুত ছাহাবী হারেছ ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলিল। ইতিপুর্বে কেহ কোনও দুতকে হত্যা করে নাই। শারজীলের এই কার্য্য আন্তর্জাতিক বিধান বিরোধী ছিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) ও মোসলমান জাতির প্রতি চরম অপমানজনক আঘাত ছিল, তাই হযরত (দঃ) ইহার শাস্তি প্রদানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিন হাজার মোজাহেদের এক বাহিনী জেহাদের জন্য রওয়ানা করিলেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অভিযানে শরীক ছিলেন না। হযরতের পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে অষ্টম হিজরীর জোমাদালউলা মাসে এই অভিযান পরিচালিত হইল।

শারজীল মোজাহেদ বাহিনীর যাত্রার খবর জ্ঞাত হইয়া এক লক্ষ লোকের এক সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখিল। এতদ্ভিন্ন রোম সম্রাট হেরাক্লও তাহার সাহায্যের জন্য এক লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখিল। মোসলমানগণ পথিমধ্যে এই খবর বিস্তারিতরূপে অবগত হইলেন। তাঁহারা দুই দিন পর্যন্ত পরামর্শ করিলেন যে, এত অধিক সৈন্যের মোকাবিলায় এই অল্প সংখ্যক সৈন্য অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কি? এইরূপ স্থির করা হইল যে, সম্পূর্ণ খবর লিখিয়া হযরতের নিকট প্রেরণ করা হউক; হযরত (দঃ) আরও সৈন্য প্রেরণ করিবেন কিম্বা অন্য কোন আদেশ দিবেন, সেই অনুপাতে কার্য্য করা হইবে। কিন্তু দলের অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ত শহীদী মর্তবা লাভের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছ! এখন উহাকে নাপছন্দ করার কারণ কি? আমরা ত শক্তি ও সংখ্যার বলে জেহাদ করি না; আমরা দ্বীনের জন্য জেহাদ করিব, তাই দুইটি মঙ্গলের কোন একটি আমাদের নিশ্চয় লাভ হইবে— বিজয় বা শাহাদৎ।

এই বক্তৃতায় মোসলমানদের মধ্যে উৎসাহ ও জেহাদের দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি হইল এবং এই কথায় সাড়া দিয়া তাঁহারা সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। "মুতা" নামক স্থানে পৌছিলে পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর পর তিনজন অধিনায়ক শহীদ হইলেন—যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। পরে খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) পতাকা উঠাইলে তাঁহার নেতৃত্বে জয়লাভ হইল।

(১৫৩২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অবশ্য এই যুদ্ধে দেশ অধিকার হয় নাই বলিয়া সাধারণ্যে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইল যে, তাঁহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাই কোন কোন ঐতিহাসিক পরাজয়ের মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে রণাঙ্গন ত্যাগে বাধ্য করিয়া স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে বাঁচাইয়া লইয়া আসাও বড় সাফল্য ছিল। এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র তিন হাযার মোসলেম মোজাহেদ সাত দিন যুদ্ধ চালাইয়া শত্রু পক্ষকে রণাঙ্গন ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে মোসলমানদের পক্ষে মাত্র তের জন শহীদ হইয়াছিলেন। শত্রু পক্ষের নিহতদের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব না হইলেও উহার আধিক্য ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এক খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)ই ঐ যুদ্ধে নয় খানা তরবারী ভাঙ্গিয়াছিলেন। অতএব যুদ্ধের বিজয় মোসলমানদের পক্ষে হওয়াই অবধারিত।

১৫৩০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মুতার জেহাদের দিন জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত দেহের নিকটে দাঁড়াইলেন। তিনি বলেন—আমি তাঁহার দেহে তরবারী ও বর্শার (বড় বড়) আঘাতগুলি গণনা করিলাম; উহা সংখ্যায় পঞ্চাশ ছিল এবং উহার সবগুলিই তাঁহার সম্মুখ দিকে ছিল, একটি আঘাতও পেছন দিকে ছিল না।

১৫৩১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মুতার জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় পোষ্য পুত্র—) যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)কে অধিনায়করূপে নিয়োগ করিলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর অধিনায়ক হইবে, সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অধিনায়ক হইবে।

ঘটনা বর্ণনাকারী—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সেই জেহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা জা'ফর (রাঃ)কে তালাশ করিলাম—তাঁহাকে শহীদানদের মধ্যে পাইলাম এবং তাঁহার শরীরে সর্বমোট নব্বইটির অধিক তীর ও বল্লমের আঘাত ছিল।

১৫৩২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যায়েদ (রাঃ) জা'ফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যু-সংবাদ (অহী মারফত জ্ঞাত হইয়া) তথা হইতে সংবাদ আসিবার পূর্বেই সকলকে জ্ঞাত করিলেন। তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দানে বলিলেন, সর্বপ্রথম যায়েদ ইবনে হারেছার হস্তে ঝাণ্ডা ছিল; সে শহীদ হইয়াছে। অতঃপর জা'ফর ঝাণ্ডা লইয়াছে সেও শহীদ হইয়াছে, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা লইয়াছে সেও শহীদ হইয়াছে। হযরত (দঃ) এই বর্ণনা দান করিতেছিলেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া পানি বহিতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, অতঃপর একজন "আল্লার তলওয়ার" (—খালেদ ইবনে অলীদ) ঝাণ্ডা হাতে লইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার হস্তে বিজয় দান করিয়াছেন।

১৫৩৩। **হাদীছ**:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন যায়েদ ইবনে হারেছা, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মৃত্যু সংবাদ আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চিন্তিত ও মলিন-মুখ অবস্থায় মসজিদে বসিয়া পড়িলেন। আমি দরওয়াজার ফাঁক দিয়া হযরতের প্রতি দেখিতেছিলাম; এক ব্যক্তি আসিয়া জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিবারবর্গের ক্রন্দন সম্পর্কে অভিযোগ জানাইল। হযরত (দঃ) তাহাদের ক্রন্দন বারণ করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া অভিযোগ করিল যে, তাহারা আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। হযরত (দঃ) এইবারও ঐ আদেশই করিলেন; সে পুনরায় আসিয়া ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করে না। এইবার হযরত (দঃ) (তাহার পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) বলিলেন, তবে (সামর্থ হইলে) তাহাদের মুখে মাটি ভরিয়া দাও।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বলিলাম—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অপদস্ত করুক; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ পুরণ করিতেও সক্ষম হইলে না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি হইতে রেহাইও দিলে না।

১৫৩৪। **হাদীছ**:— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্রকে দেখিলেই তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া সালাম করিতেন—
السلام عليك يا ابن ذى الجناحين "হে দুই ডানা-বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র আপনাকে সালাম।"

ব্যাখ্যা:—মোজাহেদ বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জা'ফর (রাঃ) অধিনায়ক হইলেন এবং ঝাণ্ডা হাতে লইলেন। তখন শত্রুদের ভীষণ আক্রমণ জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি হইল। ঝাণ্ডা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ছিল, শত্রুর আক্রমণে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া গেল, তখন তিনি বাম হস্তে ঝাণ্ডা ধরিলেন; ঐ হাতও কাটিয়া গেল, তখন ঝাণ্ডাকে কোলে লইয়া উহা দণ্ডায়মান রাখিলেন। অবশেষে শাহাদৎ বরণ করিলেন। বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, জা'ফরের হস্তদ্বয় আল্লার রাস্তায় কাটা গিয়াছে, তাই আল্লাহ তাঁহাকে ফেরেশতাদের সঙ্গে ফেরেশতাদের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি অবাধে বেহেশতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে থাকেন।

এই সূত্রেই জা'ফর (রাঃ)কে ذو الجناحين—দুই ডানা বিশিষ্ট এবং جعفر طيار —উড়ন্ত জা'ফর নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

১৪৩৫। **হাদীছ**:—কায়েস ইবনে আবু হাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, মুতার জেহাদের দিন আমার হস্তে নয়টি তরবারি ভাঙ্গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত একটি ইয়ামানী তরবারি বাকী রহিয়াছিল।

একটি ছোট অভিযান

১৫৩৬। হাদীছ:—উছামা ইবনে যায়েদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে (জোহায়না গোত্রের শাখা গোত্র) হোরাকার প্রতি প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রভাতে তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলাম এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলাম। আমি এবং মদীনাবাসী অন্য এক ব্যক্তি আমরা ঐ পক্ষের এক কাফের ব্যক্তিকে ঘেরাও করিলাম, তখন ঐ কাফের ব্যক্তি لا اله الا الله কালেমা-তৌহিদের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিল, তাই আমার সঙ্গী তাহার হত্যা কার্য্য হইতে বিরত রহিল, কিন্তু আমি তাহাকে বর্শাঘাত করিলাম, উহাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

আমরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ঘটনা জ্ঞাত হইলেন। হযরত (দ:) আমাকে (ভৎর্সনা স্বরে) বলিলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে কলেমা-তৌহীদের স্বীকারোক্তির পর হত্যা করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, সে ত প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উহা বলিয়াছিল। হযরত (দ:) (এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া) বার বার ঐ কথা বলিতে লাগিলেন; (যদ্দরুন আমি আমার ঐ কার্য্যকে অতি বড় পাপ গণ্য করিলাম, এমনকি আমি মনে মনে এইরূপ আকাঙ্খা করিতে লাগিলাম যে, যদি আমি অদ্য ইসলাম গ্রহণ করিতাম। (অর্থাৎ এইরূপ বড় গোনাহের কার্য্য যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হইত তবে ইসলামের বদৌলতে উহা ক্ষমা হওয়ার আশা ছিল।)

মক্কা-বিজয় অভিযান

হিজরী ৬ সালে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইল, উহাতে মোসলমান ও মক্কাবাসীদের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইল। উভয় পক্ষের মিত্রদের সম্পর্কেও এই শর্ত করা হইল যে, কোন পক্ষই অপর পক্ষের কোন মিত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা আক্রমণে সহায়তা দান করিতে পারিবে না। মক্কার নিকটবর্ত্তী দুইটি গোত্র ছিল "বনু বকর" ও "বনু খোযায়া"। এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহু পূর্বকাল হইতে দাঙ্গা-ফছাদ, রক্তারক্তি চলিয়া আসিতেছিল। হোদায়বিয়ার ঘটনায় মোসলমান ও কোরায়েশদের মধ্যে সন্ধি হইল এবং নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গোত্র সমূহকে যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইল। সেই সুযোগে বনু-বকর গোত্র কোরায়েশদের সঙ্গে এবং তাহাদের বিরুদ্ধ পক্ষ বনু-খোযায়া গোত্র মোসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা বাঁধিল।

কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব কলহ সুত্রে উক্ত গোত্রদ্বয়ের দাঙ্গা আরম্ভ হইল। যদিও বনু-বকর কোরায়েশদের মিত্র ছিল, কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুসারে মোসলমান-দের মিত্র বনু-খোযায়ার উপর আক্রমণ চালাইতে কোরায়েশগণ স্বীয় মিত্রের কোন প্রকার

সাহায্য সহায়তা করিতে পারে না। কিন্তু কোরায়েশরা সেই শর্ত ভঙ্গ করিয়া গোপনে স্বীয় মিত্রগণকে ঐ দাঙ্গায় অস্ত্র সরবরাহ করিল এবং প্রত্যক্ষরূপে দাঙ্গায় যোগদান করিল। বনু বকর কোরায়েশদের সাহায্য সমর্থন পাইয়া মোসলমানদের মিত্র বনু-খোযায়া গোত্রের উপর অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইল।

অত্যাচারিত বনু-খোযায়া গোত্রের পক্ষ হইতে আমর ইবনে সালেম নামক এক ব্যক্তি মদীনায় উপস্থিত হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল; এতদ্ভিন্ন তাহারা এক প্রতিনিধি দলও মদীনায় প্রেরণ করিল। প্রতিনিধি দল কোরায়েশ ও বনু বকরের সমস্ত অত্যাচারের করুণ কাহিনী ও হৃদয়বিদারক ঘটনা সমুহ বিস্তারিতরূপে হযরতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

কোরায়েশ সর্দার আবু সুফিয়ান নিজ দুষ্কৃতির পরিণামের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; সে সন্ধি-চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুর্বাহ্নেই ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। কোরায়েশ-দের অপরাধ শুধু একটা চুক্তি ভঙ্গই ছিল না, বরং এমন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল যাহার অন্তরালে তাহারা মোসলমানদের মিত্র গোত্র বনু-খোযায়ার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল। কোরায়েশরাই এই অত্যাচারে মুলতঃ দোষী ছিল; তাহাদের স্বক্রিয় সাহায্য না হইলে একা বনু-বকর গোত্র বনু-খোযায়াকে ঐরূপ অত্যাচার করিতে পারিত না। সুতরাং হযরত (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অত্যাচারীকে শায়েস্তা করা স্বীয় বিশেষ কর্তব্য গণ্য করিলেন। অতএব হযরত (দঃ) আবু সুফিয়ানের অনুরোধের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করিলেন না, কোন উত্তরই দিলেন না। আবু সুফিয়ান নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক মোসলমানদের নিকট সুপারিশের জন্য ধর্ণা দিল, কিন্তু কোন ফল হইল না, শেষ পর্য্যন্ত সে বিফল মনোরথ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন। হযরত (দঃ) যুদ্ধে সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে উহার সাধারণ নিয়ম—গোপনীয়তা রক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনা ঘটিল। মক্কাবাসীরা সঠিকরূপে মোসলমানদের প্রস্তুতি ও অভিযানের পুর্ণ তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিল না।

অষ্টম হিজরী সনের রমজান মাসের দশ তারিখ রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন; মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দশ হাজার ছিল। মদীনার অদুরে জোহ্ফা এলাকায় পৌঁছিলে পর হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পরিবারবর্গ সহ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় হিজরত করিয়া আসার পথে হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহারা অনেক পুর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কা হইতে হিজরত করার সুযোগ সন্ধানে উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। আব্বাস (রাঃ) তথা হইতে স্বীয়

পরিবারবর্গকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং হযরতের সঙ্গে মক্কা অভিযানে যোগদান করিলেন। ৭।৮ দিন পথ চলার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "মার্‌রুজ্জাহরান"* নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন যে, আবশ্যকীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নরূপে করিও। তাহাই করা হইল; এইরূপে ১০ হাজার লোকের ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি তথায় এক বিভিষিকাপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল।

এদিকে মক্কাবাসীরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিযান যাত্রার সঠিক তথ্য জ্ঞাত না থাকিলেও মোটামুটি কিছু আভাষ তাহারা জানিতে পারিয়াছিল। সেই সূত্রে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান দুই জন সঙ্গী সহ মোসলমানদের খোঁজে মক্কা হইতে বাহির হইল। তাহারা মার্‌রুজ্জাহরান এলাকার নিকট পৌঁছিয়া রাত্রিবেলা দুর হইতে তথায় প্রজ্বলিত অগ্নির দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা পরস্পর নানাপ্রকারের মন্তব্য করিতেছিল। আব্বাস (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন এবং আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করিতে পারিলেন; আবু সুফিয়ান আব্বাস (রাঃ)কে মূল ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই দৃশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের; এখন কোরায়েশদের আর রক্ষা নাই। আবু সুফিয়ান ভীত হইয়া কাকুতি-মিনতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, এখন উপায় কি? আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মোসলমানগণ তোমার খোঁজ পাইলে এখনই তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তুমি আমার যানবাহনে আরোহণ কর, আমি তোমার জন্য হযরতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিব। ঐ যানবাহ-টি বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যানবাহন ছিল। হযরতের যানবাহন এবং উহার উপর হযরতের চাচা আরোহিত, তাই কেহ উহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নাই এবং আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে ঠাহর করিতে পারিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন যে, আল্লার দ্বীনের প্রধান শত্রুকে সুযোগ মতে পাওয়া গিয়াছে; তিনি দ্রুত হযরতের প্রতি ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন, আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতির জন্য। কিন্তু আব্বাস (রাঃ) অধিক দ্রুত হযরতের নিকট পৌঁছিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়াছি; তাই ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কোন কথাই কাজে আসিল না।

হযরত (দঃ) আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, এখন ইহাকে (আবু সুফিয়ানকে) লইয়া যান; ভোরবেলা আসিবেন। ভোর হইতেই তাহাকে হযরতের নিকট উপস্থিত করা হইল, সে ইসলাম গ্রহণ করিল; এখন তিনি আবু সুফিয়ান (রাঃ)।

---

* আছহহুস্‌সিয়ার নামক কিতাবের টিকায় লিখা আছে যে, ইহা ঐ স্থানটি যাহাকে বর্তমানে ওয়াদি-ফাত্তেমা বলা হয়। উহা মক্কা হইতে প্রায় ১২।১৪ মাইল দুরে অবস্থিত। আমি তথায় উপস্থিত হওয়ার এবং এক মাত্র এক দিন অবস্থান করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) খালেদ বাহিনীকে মক্কায় নিম্ন প্রান্ত পথে প্রবেশের আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং উর্দ্ধ প্রান্তের পথে প্রবেশ করিলেন। কোথাও কোন সংঘর্ষ বাঁধিল না; শুধু খালেদ বাহিনীর দুই ব্যক্তি একা একা ভিন্ন রাস্তায় চলাকালীন কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক শহীদ হইয়াছিলেন; খালেদ (রাঃ) দুষ্কৃতিকারীদেরে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বার জনেক হত্যা করিয়াছিলেন।

২০ রমজান রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করিলেন; "হাজুন" নামক মহল্লায় তাঁহার ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হইল ✲ স্বাভাবিক ধারণার বিপরীত হযরত (দঃ) মক্কাবাসীদের প্রতি করুণা ও অনুকম্পার ঘোষণা দান করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি গৃহদ্বার বন্ধ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি হরম শরীফে প্রবেশ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা।

অতঃপর হযরত (দঃ) বিশিষ্ট সঙ্গিগণ সহ হরম শরীফে প্রবেশ করিলেন। বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের মূর্তিসমূহ অপসারণ করিলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে নামায পড়িলেন। অতঃপর বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া হযরত (দঃ) ভাষণদানে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বলিলেন—
لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই; তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় বন্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন, বিদ্রোহী পক্ষের দল-সমূহকে তিনি একাই পরাজিত করিয়াছেন।" হযরত (দঃ) স্বীয় ভাষণে অন্ধকার যুগের নানা কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদেরও ঘোষণা করিলেন। হযরতের ভাষণকালে মক্কার নাগরিকরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিঃস্তব্ধরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তাহাদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও জুলুমের পরিণাম ভোগের প্রহর গণিতেছিল। এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার পক্ষ হইতে কিরূপ ব্যবহারের আশা পোষণ কর? সকলে উত্তর করিল, আপনি স্বয়ং উদার এবং উদারতাশীল বংশের, তাই আমরা আপনার অনুগ্রহের আশাই পোষণ করি। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত ও দেশান্তরিত হইয়া নবুয়ত ও রাজত্বের অধিকারী হইবার পর যখন তাঁহার ভাইগণ কাতর স্বরে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করিয়াছিল তখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, আমিও আজ তোমাদের প্রতি উহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি— لا تثريب عليكم اليوم انتم الطلقاء

✲ বর্তমানে সেই স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে "মসজিদুর রায়াহ" বলা হয়, 'রায়াহ' অর্থ ঝাণ্ডা (আল্লাহ তায়ালা আমাকে তথায় নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন।)

"আজ তোমাদের প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি, তিরস্কার ভৎসনা প্রয়োগ করা হইবে না, কাহারও উপর কোন অভিযোগ নাই; তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করা হইল।"

হযরতের আদেশে বেলাল (রাঃ) কা'বা ঘর-সম্মুখে আজান দিলেন; অতঃপর হযরত (দঃ) স্বীয় চাচাত ভগ্নি উম্মে-হানী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে আসিয়া গোসল করিলেন এবং আট রাকাত নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

হযরত (দঃ) মক্কাবাসীদেরকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করিলেন। এমনকি তাহাদের সম্পর্কে এইরূপ কঠোর আদেশ ছিল যে, যে কোন স্থানে দেখা মাত্র তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু দয়ায় দরিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের মধ্য হইতেও অধিকাংশকে ক্ষমা করিলেন। (১) আবু জহল পুত্র একরেমা (২) উমাইয়ার পুত্র ছাফওয়ান (৩) হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যাকারী ওয়াহ্‌শী সহ সাত জন ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন এবং চার জনের প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী হইল। নারীদের মধ্যে হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কলিজা চর্বনকারিণী, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা সহ তিন জন ক্ষমাপ্রাপ্তা হইলেন এবং তিন জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।

অতঃপর হযরত (দঃ) মক্কার আশেপাশে অলিগলিস্থিত মূর্তি সমূহ ধ্বংস করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন, এমনকি ঘোষণা করিয়া দিলেন, কাহারও ঘরের ভিতরেও যেন কোন প্রকার মূর্তি না থাকে। এইরূপে হযরত (দঃ) রমজানের অবশিষ্ট দশ দিন এবং শাওয়ালেরও কিছুদিন মোট ১৫ বা ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) মক্কা হইতে হোনায়ন, আওতাস ও তায়েফ ইত্যাদি এলাকায় অভিযান চালাইলেন এবং দুই মাসের অধিককাল পর জিলকদ মাসের শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই মহাবিজয় কালে হযরত (দঃ) কর্তৃক সোনালী আদর্শ স্থাপন :

মক্কা বিজয় মোসলেম জাতির জন্য মহাবিজয় ছিল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের চরম বিজয় ছিল। এই মহাবিজয় লগ্নে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি বিষয়ে এমন দুইটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা মানব সমাজের মঙ্গল ও শান্তি আনয়নের দিশারীরূপে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

(১) এইরূপ মহাবিজয় ও চরম বিজয় লগ্নে সাধারণতঃ বিজয়ীর প্রতিটি কার্য্যে প্রতিটি আদেশ-নিষেধে এবং প্রতিটি আচরণে সীমাহীন ঔদ্ধত্য, লাগামহীন দর্প ও দম্ভ ভাসিয়া উঠিবে। তাহার অসুরীয় উম্মাদনা ও দানবীয় বিজয়মত্তা বিজীতদের উপর টানিয়া আনিবে শত শত দুঃখ-যাতনা। এই সব স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত আজ নবীজী (দঃ) সর্বাধিক বিনয়ী, সর্বাধিক বিনম্র। মক্কা হইতে মাত্র ১২।১৪ মাইল ব্যবধানে "মাররুজ্জাহ্‌রান" এলাকা; তথায় হযরত (দঃ) সমুদয় বাহিনীসহ রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যুষেই নবীজী (দঃ)

নগরে প্রবেশের আয়োজন করিলেন। দশ সহস্রীয় সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রত্যেক দলের দলপতির হাতে ভিন্ন ভিন্ন নিশান উড়াইয়া দিয়া নবীজী (দঃ) সকলকে মক্কা নগরীর প্রতি মার্চ্চ করার আদেশ দিলেন। একের পর এক কাতারে কাতারে সেনাদল চলিতে লাগিল। শেষের দিকে এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সর্বাধিক ছোট একটি দলে পরিবেষ্টিতরূপে নবীজী (দঃ) অগ্রসর হইলেন একটি উটের পিঠে চড়িয়া; তাহাও নিজ শিষ্য যায়েদ-পুত্র উসামাকে সম-আসনে সঙ্গে বসাইয়া নিরবে চলিতে লাগিলেন—কোন হাঁকাহাঁকি নাই, দর্প নাই, দম্ভ নাই। কি মনোহারী দৃশ্য! মহাবিজয়ের বিজয়ী সম্রাট চরমবিজয়ের বিজয়ী সেনাপতি এই সাধারণ বেশে অনাড়ম্বর পরিবেশে নগর-প্রবেশ-পর্ব সম্পন্ন করিতেছেন—বিজয় অপেক্ষা বড় বিনয়ী তিনি।

নবীজী (দঃ)-এর পক্ষে এই অবস্থা সহজ হওয়ার গোড়ায় ছিল একটি মহাআদর্শ, একটি পবিত্র অনুভূতি—তাহাই লক্ষ্যনীয় এবং সেই শিক্ষাই এস্থলে গ্রহণীয়। বিজয় ক্ষেত্রে এবং সাফল্যের ময়দানে এক মুহূর্তের জন্যও যেন নিজের বাহাদুরী ও নিজের কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি ও ধ্যান-ধারণা না যায়। সবই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দান তাঁহারই অনুগ্রহ বলিয়া শুধু বিবেচনা নয়, বরং অন্তরের অন্তস্থল হইতে এই স্বীকৃতি এই বিশ্বাস এই একীনই পোষণ করিবে; সেই বিশ্বাসকে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবে। মনে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে এই একই ভাব, একই ভঙ্গি। সেমতে সকল বিজয়ের মাঝখানে নবীজী (দঃ) একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার করুণাস্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন; তাঁহার মস্তক কৃতজ্ঞতায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতেছিল, এমনকি তাঁহার অবনত মস্তক বার বার তাঁহার উটের পিঠকে স্পর্শ করিতেছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। এই আদর্শ নবীজী (দঃ)-এর স্বভাবগতও ছিল আবার আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের ছুরা নছর—সেই ছুরায় মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। উক্ত ছুরায় স্পষ্ট বর্ণনা আছে—"যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসিবে তখন তোমার প্রভুর তছবীহ—মহিমা-জপ, হাম্‌দ—প্রশংসা-জপ করিবে এবং অলক্ষ্যে ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকিবে।" উক্ত আদেশত্রয়ের সঙ্গে রঞ্জিত থাকিলে যে কোন বিজয়ে ঔদ্ধত্ব, দর্প ও দম্ভ স্থান পায় কোথায়? এই মহাবিজয়ের দিন নবীজীর দৃশ্যই উহার প্রমাণ। এমনকি নবীজী (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে সারা জীবন উক্ত আদেশত্রয়ের মৌখিক জপ নামাযেও করিয়া থাকিতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার মহিমাই আমার জপনা এবং তোমার প্রসংশা আমার ভজনা; হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা কর।" রুকু অবস্থায় হযরত (দঃ) ইহা পড়িয়া থাকিতেন।

(২) মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত (দঃ) আরও একটি অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মক্কাবাসীরা হযরত (দঃ)কে এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে মক্কায় থাকাকালে কি অত্যাচারই না করিয়াছিল! দীর্ঘ তের বৎসর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া তাঁহাদেরকে দেশান্তরিত করিয়াছিল। বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া মদীনায় যাইয়াও হযরত (দঃ) শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই; এই দুরাচাররা তথা হইতেও মোসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কত আক্রমণ করিয়াছে। ওহোদ ও খন্দক যুদ্ধের ঘটনাবলী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই দীর্ঘ একুশ বৎসরের অত্যাচারী শত্রু আজ হযরতের পদানত। শত অত্যাচার ভোগ শেষে বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ পথ বহিয়া আজ হযরত (দঃ) ঐ শত্রুদের উপর সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন। আজ হযরত (দঃ) এই শত্রুদের প্রতি কি ব্যবহার করেন তাহাই লক্ষণীয়, তাহাই শিক্ষণীয়।

আজ মহাবিজয়, কিন্তু হযরতের উদারতা আজ মহাসমুদ্র অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত—কি করুণা তাঁহার! কি মহিমা তাঁহার! অতীতের কোন আঘাত বা বেদনার কথা তাঁহার মনে নাই; তাঁহার অন্তর-সমুদ্রে আজ শুধু ক্ষমার ঢেউ খেলিতেছে। ক্ষমা ও দয়ার কি অপূর্ব দৃশ্য আজ মহাবিজয়ী হযরতের ভাব-ভঙ্গিতে। আজ নবীজীর কথায় ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি আদেশ-নিষেধে ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি ঘোষণায় ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি ভাষণে ক্ষমা ও শান্তি।

মক্কা প্রবেশের পূর্বে রাত্রিবেলায়ই মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের রণাঙ্গনের—ওহোদ ও খন্দকের সেনানায়ক, দীর্ঘ সাত বৎসরের সকল আক্রমণ ও শত্রুতার নেতা আবু সুফিয়ান নবীজী (দঃ) সমীপে উপস্থিত; এহেন শত্রুকে হাতে পাইয়া তিনি কি করিলেন? হযরত (দঃ) তাহার সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। কোন জোর নাই, জবরদস্তি নাই, ধমক নাই, ভীতি প্রদর্শন নাই। করুণা ও মধুর স্বরে তাহাকে আল্লার একত্ব ও রসুলের স্বীকৃতি মানিয়া লওয়ার প্রতি তাহার বিবেককে আকৃষ্ট করিলেন। অনতিবিলম্বে সে ইসলামের কলেমা পাঠ করিল। নবীজী (দঃ) আবু সুফিয়ানের পদমর্য্যাদার মূল্য দানেও কুণ্ঠিত হইলেন না। হযরত (দঃ) তাঁহার গৃহকে নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াদিলেন।

প্রত্যুষে যখন নবীজী (দঃ) দশ সহস্র বীর সেনানীকে মক্কা নগরীর প্রতি মার্চ করার আদেশ করিলেন তখন কি মধুর বাণী সকলকে শুনাইলেন। যুদ্ধমত্ত সৈনিকদেরকে বলিয়া দিলেন, আক্রান্ত না হইয়া কাহারও প্রতি আক্রমণ করিবে না। ফলে বিনা রক্তপাতে মোসলেম বাহিনীর হস্তে শত্রুদুর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের চিরপতন ঘটিল।

মোসলেম বাহিনী বিভিন্ন পথে নগরে প্রবেশ করিল। মক্কার সকল নর-নারী আজ ভীত সন্ত্রস্ত; দীর্ঘদিন নিঃসহায় মুসলিমদের উপর তাহারা যে অত্যাচার অবিচার করিয়াছিল সে সবের প্রতিশোধ ভোগের প্রহরই তাহারা গণিতেছিল! কিন্তু নবীজীর উদারতা

নবীজীর সীমাহীন দয়া তাহাদেরকে সেই মুহূর্তেই রক্ষাকবজ প্রদান করিল। নবীজী (দঃ) তাহাদের সমুদয় আঘাত ভুলিয়া গিয়া উদার কণ্ঠে তাহাদের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তার ঘোষণা দানে বলিলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি গৃহ-দ্বার বন্ধ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি হরম শরীফে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। সারকথা—প্রতিটি নর-নারী যাহাতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় পায় সেই ব্যবস্থা নবীজী (দঃ) করিয়া দিলেন। দীর্ঘ একুশ বৎসরের শত্রুদের প্রতি নবীজীর কি অপূর্ব উদারতা।

নবীজীর উদারতা ও দয়ার সীমা রহিল না যখন বিজয়ের দিনেই আল্লার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাপূর্বক বলিলেন, তোমাদের কাহারও প্রতি আজ কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত, ক্ষমাপ্রাপ্ত।

এত বড় করুণা, এত মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে? এত বড় ক্ষমা কে কোথায় দেখিয়াছে? প্রতিশোধ নেওয়ার কোন কথা নাই, বিগত অপরাধের কোন অভিযোগ নাই। কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস-বিভীষিকা নাই; আছে কেবল দয়া, ক্ষমা ও উদারতা। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু বিজয় কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে, বহু বীর সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ রক্তপাতবিহীন মহাবিজয় কোথাও দেখা গিয়াছে কি?

মক্কা বিজয়ের এই দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব ও অমর হইয়া থাকিবে। এইরূপ করুণা, ক্ষমা, দয়া উদারতা এবং উগ্রতার স্থলে নম্রতা বিনয়ীর বেশে বিজয়ী—ইহাই শান্তির ধর্ম ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সোনালী আদর্শ ও শিক্ষারই দ্বারোদঘাটন করিয়াছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন।

এই আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন নবীজীর ছাহাবীগণ। নবীজীর সঙ্গে মক্কা বিজয়ে দশ সহস্র সৈনিক ছিলেন; যাঁহারা সকলেই মক্কাবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মোহাজেরগণ তাঁহারা ত দেশ-খেস, ধন-সম্পদ সব কিছুই হারাইয়াছিলেন এই মক্কাবাসীদের অত্যাচারে। তাঁহাদের মধ্যে বেলাল (রাঃ) খাব্বাস (রাঃ)-এর ন্যায় কত শত জনই ছিলেন যাঁহাদের উপর মক্কাবাসীদের পৈশাচিক অত্যাচারের ইতিহাস অতি প্রসিদ্ধ। এই সৈনিকগণ যদি নবীজীর উক্ত আদর্শ ও শিক্ষার আলো না পাইতেন তবে এই বিজয়ী সৈনিকদের দ্বারা মক্কার বুকে কত অঘটনই না ঘটিত। বর্তমান বিভীষিকা পূর্ণ জগৎ যদি নবীজীর উক্ত আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে তবে বিশ্ববাসীর জন্য কত মঙ্গল ও কল্যানই না নামিয়া আসে! মঙ্গল ও কল্যাণ বুলি আওড়াইলে বা সংঘ গঠনে আসে না; সত্যিকার মঙ্গল ও কল্যাণ আসিতে

পারে আদর্শের মাধ্যমে। মক্কা বিজয় লগ্নে সেই আদর্শই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরতের ভাষণ :

এই মহা বিজয় উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (দ:) দুই দিন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম ভাষণটি ছিল নবীজীর মক্কা প্রবেশের প্রথম দিন। এইদিন কা'বা শরীফের ভিতরে হযরত (দ:) নামায পড়িয়াছেন।

মক্কার নাগরিকদের অন্তর আজ বিহ্বল। মক্কার বুকে তাহারা হযরতের উপর এবং তাঁহার আছহাবের উপর কিরূপ এবং কি কি অত্যাচার ও জুলুম করিয়াছিল—অক্ষরে অক্ষরে আজ তাহা তাহাদের স্মরণে আসিতেছে, তাই তাহারা নিজে নিজেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাহাদের মুখে শব্দ নাই, চোখে আলো নাই; এমতাবস্থায় তাহারা কা'বা-সম্মুখে ভীড় জমাইয়াছে। সকলেই দণ্ডায়মান, আর হযরত কা'বা-ভিতরে নামায রত। নামায সমাপ্তে নবীজী (দ:) কা'বার দ্বারে দাঁড়াইলেন। মক্কার নাগরিকরা অপরাধীর দৃষ্টিতে মহাবিজয়ী নবীজীর মুখপানে তাকাইয়া আছে—কি আদেশ, কি ফরমান তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়?

নবীজী (দ:) কা'বা দ্বারে দাঁড়াইয়া সমবেত নাগরিকদেরকে সম্বোধন পূর্বক ভাষণ দিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করিল—

● সর্বাগ্রে হযরত (দ:) আল্লার একত্ববাদ ঘোষণায় কলেমা—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতঃ এই মহা বিজয়ের উপর প্রভুর দরবারে শুকরিয়া নিবেদন করিলেন।

● আভিজাত্যের গর্ব সমগ্র আরবে এক অভিশাপ ছড়াইয়া রাখিয়াছিল। দুর্বলদের প্রতি অন্যায় অবিচার এই গর্বের ভিত্তিতে স্বাভাবিক ও নির্দ্ধারিত নিয়ম ও নীতিরূপে প্রচলিত ছিল। এই আভিজাত্যে হযরতের নিজ বংশ কোরেশ গোত্র সর্বাগ্রে ছিল। বিচার ও মানবাধিকার ক্ষেত্রে সাম্যের বিধান প্রবর্ত্তনে হযরত (দ:) সর্বাগ্রে নিজ বংশের উপর আঘাত হানিলেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণে হযরত (দ:) মানবাধিকার ও বিচার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে সমান ঘোষণা করিলেন। আভিজাত্যের গর্বে দুর্বলদেরকে ন্যায় বিচার ও প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার নীতি চিরতরে পদদলিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

● নরহত্যার বিচার বা ক্ষতিপূরণে অভিজাত ও অনভিজাতের পার্থক্যের নীতি প্রচলিত ছিল; উহার পরিবর্তে সকলের জন্য সমান ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করিলেন।

● মক্কার নাগরিকদের জন্য তাহাদের কল্পনা ও আশার উর্দ্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন, এমনকি কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ আনা হইবে না বলিয়াও তাহাদিগকে নিশ্চয়তা ও অভয় প্রদান করিলেন।

নবীজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ন্যায় ও উদারতার ঘোষণায় পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত ভাষণের নিম্নোক্ত মূল বক্তব্য ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে—

● لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

● আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই; তিনি এক, অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার কথা (যে, মোসলমানদের সাহায্য করিবেন) বাস্তবায়িত করিয়াছেন। তাঁহার বান্দাকে তথা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সমবেত শত্রুদলকে তিনি একা পরাজিত করিয়াছেন।

● اَلَا كُلُّ مَاْثُرَةٍ اَوْدَمٍ اَوْمَالٍ يُدْعٰى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ اِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ

● তোমরা শুনিয়া রাখ। পূর্ববর্তী সমুদয় প্রথা এবং খুনের বা মালের অন্যায় দাবী সবকে আমি পদদলিত করিলাম; অবশ্য কা'বা ঘরের খেদমত এবং হাজীদিগকে জমজমের পানি পান করাইবার যে প্রথা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা বলবৎ থাকিবে।

● اَلَا وَقَتِيْلُ الْخَطَاِ مِثْلُ الْعَمَدِ اَلسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيْهِمَا الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا

● জানিয়া রাখ। নরহত্যা যদি অনিচ্ছাকৃতও হয়, কিম্বা হত্যার সাধারণ ও স্বাভাবিক অস্ত্র ভিন্ন—যেমন, লাঠি বা বেত্র-কোড়া দ্বারাও হয়; এইরূপ ক্ষেত্রেও শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত কঠোর ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। নিহতদের উত্তরাধিকারীকে বিভিন্ন বয়সের একশত উট দিতে হইবে যাহার মধ্যে চল্লিশটি হইতে হইবে গাভিন।

● يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْاٰبَاءِ اَلنَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ تَلَا

● হে কোরায়েশ গোত্র! অন্ধকার যুগে প্রচলিত তোমাদের অহঙ্কার গর্ব এবং বাপ-দাদার নামের উপর আভিজাত্য ও অভিমানকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। (মানবাধিকার এবং বিচারের বেলায় ঐ গর্ব ও আভিজাত্যের দরুণ কোন পার্থক্য করা হইবে না; সকল মানুষের সঙ্গে তোমরা সমপর্য্যায়ের পরিগণিত হইবে।) সকল মানুষ এক আদমের সন্তান; আর আদম মাটির দ্বারা তৈরী;

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْٓا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

(অতএব কাহারও গর্বের কিছু নাই।) অতঃপর বংশের গর্ব এবং আভিজাত্যের কুপ্রথার অবসান ঘোষণাকল্পে রসুলুল্লাহ (দঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—"হে বিশ্ব মানব। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা তথা আদম ও হাওয়া হইতে তোমাদের সকলকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি; গোত্রে ও বংশে যে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি তাহা শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্মানী সে-ই হইবে যাহার মধ্যে আল্লার ভয়-ভক্তি অধিক থাকিবে।"

(২৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

● يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَيَا اَهْلَ مَكَّةَ مَا تَرَوْنَ اَنِّىْ فَاعِلٌ بِكُمْ قَالُوْا خَيْرًا اَخٌ كَرِيْمٌ اِبْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ ثُمَّ قَالَ اِذْهَبُوْا لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

● হে কোরায়েশগণ! হে মক্কার নাগরিকগণ! আমি তোমাদের সহিত কি করিব বলিয়া তোমরা ধারণা কর? তাহারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমরা আপনার হইতে ভাল আশাই পোষণ করি; আপনি আমাদের ভাই এবং অতি ভদ্র ভাই, আপনার বংশও আমাদের সহোদর এবং ভদ্র। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাও—তোমরা মুক্ত, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত; তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নাই।

(তারীখ তবরী ২৩৩৭)

পরবর্তী দিন হযরত (দঃ) দ্বিতীয় ভাষণ দিলেন ছাফা পাহাড়ে দাঁড়াইয়া। এই ভাষণের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র মক্কা নগরীর সুনির্দিষ্ট এলাকা—হরম শরীফের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিধানাবলীর ঘোষণা। উক্ত ভাষণে উপস্থিত ছাহাবী আবু শোরায়হ (রাঃ) কর্তৃক ভাষণের বর্ণনা দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭ নং হাদীছে রহিয়াছে।

এই দ্বিতীয় ভাষণে রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও একটি গুরুতর অন্যায়ের উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—একজনের অপরাধের প্রতিশোধ তাহার আত্মীয়, গোত্রীয় বা দেশীয় অন্য ব্যক্তি হইতে গ্রহণ করা যাইবে না। মোসলমানদের মিত্র গোত্র "খোযায়া" যাহাদের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মক্কা বিজয়ের অভিযান চলিয়াছিল—সেই খোযায়া গোত্রীয়রা মক্কা বিজয়ের সুযোগে ঐরূপ একটি প্রতিশোধ-মূলক হত্যা করিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তে হযরত

নবী (দঃ) তৎক্ষণাৎ নিজ পক্ষ হইতে উক্ত হত্যার ক্ষতিপূরণ দান পুর্বক উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া ঘটনার সমাপ্তি সাধন করিলেন। এবং স্বীয় ভাষণের মধ্যে সর্ব সমক্ষে ঐরূপ প্রতিশোধের উচ্ছেদ ঘোষণা পুর্বক সকলকে সতর্ক করিয়াদিলেন যে, ঐরূপ অন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণের নামে হত্যাকারীর উপর মানুষ-হত্যার পুর্ণ শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও ছোট-খাট ভাষণ হইয়াছে কোন কোন কোন বিশেষ ঘোটনা উপলক্ষে। যেমন—১৫৪৯ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইবে।

১৫৩৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান মাসে মক্কা বিজয় অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) পথিমধ্যে রোযা রাখিয়াছিলেন। (তিনি প্রায় চতুর্থাংশের অধিক পথ অতিক্রম করার পর) যখন তিনি "কাদীদ" নামক স্থানে পৌছিলেন তখন রোযা ভঙ্গ করিলেন এবং (যেহেতু মুসাফির ছিলেন, তাই) মাসের শেষ পর্য্যন্ত রোযা রাখেন নাই।

১৫৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র মোজাহেদ ছিল। এই ঘটনা হযরতের হিজরত করিয়া মদীনায় আসার অষ্টম বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ মক্কার দিকে পথ অতিক্রম করিতে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌছিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রোযা ভঙ্গ করিলেন, ছাহাবীগণও রোযা ভঙ্গ করিলেন।

১৫৩৯। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন, কোরায়েশরা অভিযানের খবর জ্ঞাত হইল; আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হেযাম ও বোদায়েল ইবনে অরাকা—এই তিন জন সঠিক তথ্যের খোঁজে বাহির হইল। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে মাররুজ-জাহরানের নিকটবর্ত্তী পৌছিয়া বহু সংখ্যক অগ্নি প্রজ্জলিত দেখিতে পাইল, যেরূপ আরাফার ময়দানে দেখা যায়। অবু সুফিয়ান সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, এইসব অগ্নি কিসের হইতে পারে? আরফার ময়দানের ন্যায় বহু সংখ্যক অগ্নি দেখা যাইতেছে। সঙ্গীদ্বয় বলিল, বনী-আমর গোত্রের অগ্নি মনে হয়। আবু সুফিয়ান বলিল, ঐ গোত্র ত এত সংখ্যার নহে।

এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নিযুক্ত প্রহরীগণ ঐ ব্যক্তিত্রয়কে দেখিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত করিলেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন তথা হইতে মক্কা শহরপানে

যাত্রা করিলেন তখন আব্বাস (রাঃ) কে বলিলেন, (যাত্রা পথে যে স্থানটি সরু পথ) যথায় যাত্রীগণের ভীড় হয় তথায় আবু সুফিয়ানকে দাঁড় করিয়া রাখুন, মোসলমান মোজাহেদ বাহিনীর সঠিক সংখ্যা যেন সে দেখিতে পারে। আব্বাস (রাঃ) তাহাই করিলেন। বিভিন্ন গোত্রসমূহ আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়া এক একটি বাহিনী আকারে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি বাহিনী পথ অতিক্রম করা কালে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইহা কোন্ গোত্র? তিনি উত্তর করিলেন, বনু-গেফার গোত্র। আবু সুফিয়ান বলিলেন, ইহাদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। অতঃপর জোহায়না গোত্র ছোলায়েম গোত্র, পথ অতিক্রম করাকালীনও ঐরূপ বলিলেন। অতঃপর একটি বড় বাহিনী যাইতে লাগিল, অন্য কোন বাহিনী এত বড় ছিল না। আবু সুফিয়ান ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা মদীনাবাসী আনছারগণের দল, তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ); তাঁহার হস্তে ঝাণ্ডা ছিল। সায়াদ (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, অদ্য (যুদ্ধের দরুন) কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। আবু সুফিয়ান (বুঝিতে পারিল যে, অদ্য আবশ্যক হইলে কা'বা শরীফের নিকটবর্তী স্থানেও যুদ্ধ চলিবে, তাই তিনি ভীত হইয়া) বলিলেন, হে আব্বাস! অদ্যকার দিন আত্মীয়তার হক আদায়ে উপযুক্ত দিন।

অতঃপর একটি ছোট বাহিনী অগ্রসর হইল; উহাতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার বিশিষ্ট সঙ্গীগণ ছিলেন। হযরতের দলের পতাকা যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়াল আনহুর হস্তে ছিল। হযরত (দঃ) যখন আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন আবু সুফিয়ান হযরতকে অভিযোগ জানাইলেন যে, মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে ওবাদা কি বলিয়াছেন তাহা শুনিয়াছেন কি?

রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিয়াছে? আবু সুফিয়ান বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন, অদ্য কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। হযরত (দঃ) বলিলেন, সায়াদ ভুল বলিয়াছে। আজ আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফের সম্মান বর্ধিত করিবেন; (আজ তথা হইতে গর্হিত মাবুদ সমূহের মূর্তি অপসারিত হইবে তাহাদের উপাসনা রহিত হইবে, তথায় এক আল্লার এবাদৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে।) এবং আজ নুতনভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফ পরিধান করান হইবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করিয়া স্বীয়ঝাণ্ডা "হাজুন" নামক মহল্লায় উড্ডীয়মান করার আদেশ করিলেন। মক্কায় প্রবেশ করা কালে রসুলুল্লাহ (দঃ) খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) কে মক্কার উর্ধ (বরং নিম্ন) প্রান্ত পথে প্রবেশের আদেশ করিলেন। খালেদ বাহিনীর দুই ব্যক্তি—হোবায়েশ ইবনে আশয়ার এবং কুরয ইবনে জাবের (রাঃ) ঐ ঘটনায় শহীদ হইলেন।

১৫৪০। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় যানবাহনের উপর আরোহিত অবস্থায় সুন্দর সুরের সহিত ছুরা ফাত্‌হ পাঠ করিতেছেন। আমি তোমাদিগকে ঐরূপ সুরে পাঠ করিয়া সুনাইতাম যদি আশঙ্কা না হইত যে, লোকজন ভিড় করিবে।

ব্যাখ্যা :—হোদায়বিয়ার ঘটনায় যে বিজয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং আল্লাহ তায়ালা ঐ সময় যে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়াছিলেন انا فتحنا لك فتحا مبينا—আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট ও মহাবিজয় প্রতিষ্ঠা করিলাম। অদ্য সেই বিজয়ের বাস্তব রূপ প্রকাশিত হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আনন্দ স্বরে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিতেছিলেন।

১৫৪১। **হাদীছ :**—উছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামী কল্য কোথায় অবস্থান করিবেন? (অর্থাৎ স্বীয় পূর্ব পুরুষগণের গৃহে অবস্থান করিবেন কি?) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আকীল সেই সব ঘর-বাড়ীর কোন অংশ অবশিষ্ট রাখিয়াছে কি? অতঃপর বলিলেন, কোন মোসলমান কোন কাফেরের এবং কোন কাফের কোন মোসলমানের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী ইমাম যুহ্‌রীকে জিজ্ঞাসা করা হইল (হযরতের লালন-পালনকারী দাদা আবদুল মোত্তালেবের সম্পত্তির দখলকার এবং হযরতের মুরব্বি—) আবু তালেবের উত্তরাধিকারী কে ছিল? তিনি বলিলেন, আকিল ও তালেব।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাস গৃহ বলিতে মক্কা শরীফে যেই গৃহটি ছিল উহার সঠিক তথ্য সম্পর্কে অধিকাংশ লেখকগণের মত এই যে, ঐ গৃহটি বস্তুতঃ আবু তালেবের মালিকানাভুক্ত ছিল। কারণ, হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের বড় ছেলে ছিলেন আবু তালেব, হযরতের পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন ছোট, তাই সেই যুগের রীতি অনুসারে আবদুল মোত্তালেবের সমুদয় সম্পত্তির মালিক তাহার বড় ছেলে আবু তালেবই হইয়া ছিলেন, আবদুল্লাহ কোন অংশই লাভ করিতে পারেন নাই, এতদ্‌ভিন্ন আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু আবদুল মোত্তালেব জীবিত থাকিতেই হইয়া যায়; আবদুল্লাহ আবদুল মোত্তালেবের উত্তরাধিকারী গণ্য হইতে পারেন নাই।

অতএব আবদুল মোত্তালেবের সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র আবু তালেব ছিলেন, অবশ্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু তালেবেরই রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, তাই তিনি ঐ গৃহে বসবাস করিতেন। আবু তালেবের চার পুত্র ছিল—তালেব, আকীল, জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। তন্মধ্যে জা'ফর ও আলী প্রথমেই মোসলমান হইয়া যাওয়ায় এবং হিজরত করিয়া চলিয়া আসায় পৈত্রিক সম্পত্তির উপর তাঁহাদের

অধিকার থাকে নাই। অতঃপর তালেব নিখোঁজ হইয়া যায়, তাই আবদুল মোত্তালেবের উত্তরাধিকারী— আবু তালেবের সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক আকীলই সাব্যস্ত হয়; উক্ত সম্পত্তির অংশ বিশেষই ছিল মক্কাস্থিত হযরতের আবাস গৃহটি; আকীল ঐ সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হইয়া উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

যোরকানী নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আবদুল মোত্তালেবের সম্পত্তির এক অংশের মালিক আবদুল্লাহও হইয়াছিলেন, কারণ আবদুল মোত্তালেব অন্ধ হইয়া গেলে পর তিনি পুত্রগণের মধ্যে স্বীয় সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আবদুল্লাহ স্বীয় পৈত্রিক আবাস গৃহের বাস্তব মালিক ছিলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ঐ গৃহের মালিক হইয়াছিলেন। এই সূত্রে হযরত (দঃ) মক্কাস্থিত স্বীয় আবাস গৃহের বাস্তব মালিক ছিলেন, কিন্তু হযরত (দঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসিলে পর সর্ব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আকীল ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। আকীল পরে মোসলমান হইয়াছিলেন।

১৫৪২। **হাদীছ ঃ—** আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে ফরমাইয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে বিজয় দান করিলে আমরা ইন্‌শা-আল্লাহ আগামী কল্য বনী-কেনানার ("মোহাচ্ছাব") ময়দানে অবতরণ করিব—যে স্থানে কোরায়েশের বিভিন্ন শাখা-গোত্র একত্রিতরূপে আল্লাহদ্রোহিতার উপর শপথ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ— বিদায় হজ্জ কালীনও রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯০১নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

১৫৪৩। **হাদীছ ঃ—** আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রান পরিধেয় অবস্থায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (শান্তি প্রতিষ্ঠার পর) তিনি লৌহ-শিরস্ত্রাণ মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সংবাদ দিল, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ইবনে-খাতাল কা'বা শরীফের গেলাফ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। হযরত (দঃ) তাহার উপর প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী করার আদেশ করিলেন।

হাদীছ বর্ণনাকারী ইমাম মালেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের ধারণা ঐ দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ— এহ্‌রামের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানের বাহির হইতে মক্কা নগরীতে প্রবেশকারীকে এহ্‌রাম অবস্থায় প্রবেশ করিতে হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধানরত ছিলেন, এই সূত্রে বলিতে হয় যে, তিনি এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না, নতুবা মাথা আবৃত করিতেন না।

এই সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) অন্য এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন যে, মক্কা নগরী সম্পর্কে যসব বিশেষ বাধ-নিষেধ বলবৎ আছে, এমনকি তথায় কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করা ইত্যাদি—আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা শিথিল করা হইয়াছিল, তাহাও শুধুমাত্র একদিন ভোরবেলা হইতে আসরের সময় পর্য্যন্ত। অতঃপর মক্কা নগরী সম্পর্কে সমস্ত বাধা-নিষেধ পুর্বের ন্যায় বহাল হইয়া গিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা বহাল থাকিবে। আমার কার্য্য দেখাইয়া কেহই উহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

ইবনে-খতল ঐ লোকদের একজন যাহাদের প্রাণদণ্ড সম্পর্কে হযদত (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইবনে-খতল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক ছিল, সে পুর্বে মোসলমান হইয়াছিল, পরে সে ইসলামদ্রোহী হইয়া পালাইয়া আসে এবং সর্বদা হযরতের কুৎসা গাহিত এবং ইহার জন্য গায়িকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

১৫৪৪। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ (করিয়া হরম শরীফে প্রবেশ) করিলেন, তখন কা'বা শরীফের (ভিতরে এবং উহার) চতুষ্পার্শ্বে তিনশত ষাটটী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; হযরতের হস্তে একটি খড়ি ছিল, তিনি উহার দ্বারা প্রত্যেকটি মূর্তিকে এই বলিয়া খোঁচা দিতেছিলেন—

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

"সত্য সমাগত, বাতেল বা অসত্য অপসারিত। নিশ্চয় বাতেল ও অসত্যের ক্ষয় ও ধ্বংস অনিবার্য্য।" সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলি উপুড় হইয়া পড়িতেছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐগুলি স্পর্শ করিতেন না।

১৫৪৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অধিকার করার পর তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিলেন না, যাবৎ না তথা হইতে মূর্তিসমুহ অপসারিত করা হইল। বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর প্রতিমূর্তি দুইটি বাহির করা হইল; ঐ মূর্তিদ্বয়ের হস্তে জুয়া খেলার তীর ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা দৃষ্টে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই কাফেরদিগকে ধ্বংস করুন—(ইহাদের কার্য্যকলাপ সব মিথ্যার বেশাতি।) ইহারা ভালরূপেই জানে যে, এই নবীদ্বয় কখনও জুয়ার তীর ব্যবহার করেন নাই, (তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের হস্তে এই তীর রাখিয়া দিয়া লোকদিগকে ধোকা দিয়াছে যে, এই কার্য্যের সঙ্গে যেন তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল।)

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দ.) বাইতুল্লাহ শরীফে দাখেল হইলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ সমুহে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দ্বারা মহান আল্লার মহত্বের গুণগান করিলেন।

অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে বাহিরে আসিলেন। (এই হাদীছ বর্ণনাকারী নিজের ভুল অবগতি অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন, যে) রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে নামায পড়েন নাই। (বস্তুতঃ হযরত (দঃ) তথায় নামায পড়িয়াছিলেন।)

১৫৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা অধিকারের দিন মক্কার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে আসিতে লাগিলেন, একই যানবাহনে তাঁহার সঙ্গে উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) আরোহিত ছিলেন। বেলাল (রাঃ) এবং বাইতুল্লাহ শরীফের চাবীবাহক ওসমান ইবনে তাল্‌হা (রাঃ)ও হযরতের সঙ্গে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) হরম শরীফের মসজিদে আসিয়া স্বীয় যানবাহন বসাইয়া দিলেন এবং চাবীবাহককে চাবী আনিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফে দাখেল হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উছামা (রাঃ), বেলাল (রাঃ) এবং ওসমান ইবনে তল্‌হা (রাঃ) ছিলেন। হযরত (দঃ) তথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে বাহির হইলেন। সকলেই হযরতের প্রতি ধাবিত হইলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সর্বাগ্রে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)কে দরওয়াজা হইতে ভিতর দিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত (দঃ) কোন্‌ স্থানে নামায পড়িয়াছেন? বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে ঐ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

১৫৪৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আমার গৃহে তশরীফ আনিয়া গোসল করিয়াছিলেন এবং আট রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি আর কখনও ঐরূপে হাল্‌কা (ছোট কেরাতে) নামায পড়িতে দেখি নাই, অবশ্য তিনি রুকু-সেজদা সুন্দররূপে পূর্ণতার সহিত আদায় করিয়াছিলেন।

১৫৪৮। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায কছর পড়িয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলেমগণ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) নির্দিষ্টরূপে অবস্থানের দিন পনর বা ততোধিক স্থির করিয়াছিলেন না, তাই কছর পড়িতেন।

মক্কা বিজয় দিনে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

১৫৪৯। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক মক্কা বিজয়ের ঘটনাকালে চুরি করিল। তাহার বংশধররা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত

হইয়া পড়িল; (এই ভাবনায় যে, এখন তাহার হাত কাটা যাইবে এবং চিরকালের জন্য বংশের কলঙ্ক-চিহ্ন থাকিয়া যাইবে।) তাহারা (হযরতের প্রিয়পাত্র) উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে এই সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য জড়াইয়া ধরিল। উছামা (রাঃ) এই সম্পর্কে যখন কথা উত্থাপন করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। হযরত (দঃ) রাগতঃ স্বরে বলিলেন, আল্লার নির্দ্ধারিত শাস্তির বিধান প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে তুমি সুপারিশ করিতেছ? উছামা (রাঃ) সকাতরে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করুন।

অতঃপর বৈকালবেলা রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণদানে দাঁড়াইলেন, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফৎ বয়ান করিলেন এবং বলিলেন—

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

"তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক জাতি এই দরুণ ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে বড় বংশের লোক চুরি করিলে (তাহার শাস্তি বিধান না করিয়া) তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং কোন দুর্বল লোক চুরি করিলে তাহার শাস্তি বিধান করিত।" অতঃপর হযরত (দঃ) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

ঐ মহান আল্লার শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ—যদি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) কন্যা ফাতেমার দ্বারাও চুরি সংঘটিত হয় তবে নিশ্চয় আমি মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারও হাত কর্ত্তন করিব।"

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে হাত কর্ত্তনের আদেশ করিলেন। তাহার হাত কর্ত্তন করা হইল। অতঃপর সে খাঁটি তওবা করিল। তাহার বিবাহও হইয়াছিল।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পরবর্তীকালেও ঐ রমণীটি বিভিন্ন আবশ্যকাদির জন্য আমার নিকট আসিয়া থাকিত, আমি তাহার অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া থাকিতাম।

১৫৫০। হাদীছ:—মোজাশে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভ্রাতাকে লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার ভ্রাতাকে লইয়া আসিয়াছি, তাহার নিকট হইতে (হিজরত করার) অঙ্গীকার ও বায়য়াত গ্রহণ করিবেন এই উদ্দেশ্যে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ذهب أهل الهجرة بما فيها —হিজরতের মর্তবা ও ফজিলত পূর্বে হিজরতকারীগণ হাসিল করিয়া নিয়াছে। (অর্থাৎ মক্কা মোসলমানদের অধিকারে আসিবার পর উহা দারুল-ইসলাম হইয়া গিয়াছে, এখন মক্কা হইতে হিজরত করার প্রয়োজন নাই।)

হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম, তবে এখন কি বিষয়ের উপর বায়য়া'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার এবং জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর।

১৫৫১। হাদীছ:—মোজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আমি সিরিয়ায় হিজরত করার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি বলিলেন, এখন তথায় হিজরত হইবে না; (যেহেতু এখন তোমার বাসস্থান মোসলমানদের দেশ।) অবশ্য তোমার জন্য জেহাদের সুযোগ রহিয়াছে; তুমি সিরিয়ায় যাও—জেহাদের জন্য নিজকে পেশ কর। যদি জেহাদের সুযোগ পাও তবে জেহাদ করিও; নতুবা প্রত্যাবর্তন করিও।

১৫৫২। হাদীছ:—আ'তা-ইবনে-আবু রাবাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওবায়েদ ইবনে-ওমায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, বর্তমানে (মক্কা হইতে) হিজরতের আবশ্যক নাই; পূর্বে ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন-ঈমান লইয়া আল্লাহ ও রসুলের প্রতি পলায়ন করিত এই ভয়ে যে, (মক্কায় থাকিয়া) সে স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষায় সক্ষম হইবে না। বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন; এখন প্রত্যেকে যথা ইচ্ছা তথা থাকিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ও পালনকর্তার এবাদত-বন্দেগী করিয়া যাইতে সক্ষম, (তাই মক্কা হইতে হিজরতের আবশ্যক বাকি নাই)। অবশ্য এখনও ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও জেহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প সর্বদা বজায় রাখিতে হইবে।

মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া:

১৫৫৩। হাদীছ:—আমর ইবনে সালেমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিবাস সাধারণ চলাচলের পথের পার্শে ছিল। আমাদের নিকটবর্তী পথে বিভিন্ন কাফেলার গমনাগমন হইত। আমরা তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতাম লোকদের কি অবস্থা এবং নবুয়তের দাবীদার লোকটির কি অবস্থা? তাহারা বলিত, ঐ লোকটি বলিয়া থাকে আল্লাহ তাঁহাকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি এই এই বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন।

বিভিন্ন কাফেলার সহিত এই শ্রেণীর আলাপে কোরআনের বহু আয়াত শুনিবার সুযোগ আমার হইত এবং ঐসব আয়াত আমার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যাইত। (এইরূপে 'কোরআনের অনেক আয়াত আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।)

এদিকে আরবের সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা বলাবলি করিত, নবুয়তের দাবীদার লোকটিকে তাঁহার স্বজাতি মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; তিনি যদি তাহাদেরে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন তবে তিনি সত্য নবী। সেমতে যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দ্রুত পৌঁছাইতে লাগিল। আমার পিতাও আমাদের গোত্রের ইসলামের সংবাদ পৌঁছাইতে গেলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন, আমি সত্য নবীর নিকট হইতে আসিলাম; তিনি অমুক নামায অমুক সময়ে, অমুক নামায অমুক সময়ে পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। আরও আদেশ করিয়াছেন, নামাযের সময় উপস্থিত হইলে আগে আজান দিবে এবং এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে যাহার বেশী পরিমাণ কোরআন কণ্ঠস্থ আছে। এইরূপ লোক তালাশ করা হইলে আমার অপেক্ষা অধিক কোরআন কণ্ঠস্থওয়ালা কেহ পাওয়া গেল না; যেহেতু আমি গমনাগমনকারী কাফেলাদের নিকট হইতে কোরআনের আয়াত লাভ করিয়া থাকিতাম। তাই সকলে আমাকেই তাহাদের ইমামরূপে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। তখন আমার বয়স মাত্র ৬/৭ বৎসর। আমার পড়নে একটি খাট কাপড় ছিল। সেজদার সময় আমার পেছন দিক উলঙ্গ হইয়া যাইত। এক মহিলা আমাদের লোকদেরকে বলিল, তোমাদের ইমামের পাছা ঢাকিবার ব্যবস্থা কর। লোকগণ আমার পোশাক বানাইয়া দিল; সেই পোশাক পাইয়া আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিলাম অন্য কোন জিনিষে আমি কখনও ঐরূপ আনন্দ লাভ করি নাই। ৬১৫ পৃঃ

ব্যাখ্যা:— শরীয়তের বর্তমান মছআলাহ মতে নাবালেগ ব্যক্তির ইমামতিতে নামায হয় না; শুধু খতমে-তারাবীহ সম্পর্কে অবকাশের কথা বলা হয়। উল্লিখিত হাদীছের ঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যেরূপ বর্তমান মছআলাহ মতে পাছা উন্মুক্ত অবস্থায় নামায শুদ্ধ হইতে পারে না।

মক্কা এবং উহার সমগ্র এলাকা হইতে মূর্তি ভাঙ্গার অভিযান:

মক্কা নগরীতে বিজয়ীরূপে প্রবেশের দিনই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা নগরীর সমুদয় মূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন। কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শে ৬০টি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। নবী (দঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশলগ্নে স্বয়ং ঐগুলির উচ্ছেদ করেন। হযরতের হাতে তাঁহার ধনু ছিল উহার দ্বারা ইশারা করিলেই এক একটি মূর্তি পতিত হইয়া চুরমার হইয়া যাইত (১৫৪৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

ছাফা পর্বতের উপর পুরুষ মূর্তি "এসাফ" এবং মারওয়া পর্বতের উপর নারী মূর্তি "নায়েলা" নামক অতি প্রাচীন দুইটি মূর্তি ছিল। কথিত ছিল যে, এককালে ইহারা কা'বা শরীফের ভিতরে জেনা—ব্যভিচার করিয়াছিল; আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ উভয়কে পাথর বানাইয়া দিয়াছিলেন। লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্যে দুইটিকে ঐ দুই পর্বতের

উপর রাখিয়া দিয়াছিল। এই ইতিহাস জানা সত্ত্বেও মোশরেকরা উহাদের পুজা ও উপাসনা করিত। মক্কা বিজয়ের প্রথম দিনই রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত মূর্তিদ্বয়কেও ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মক্কায় আরও একটি প্রধান মূর্তি ছিল "হুবল"; এই দেবের উপর কোরায়েশদের গর্ব ছিল। ওহোদ রণাঙ্গনে মোশরেক দলপতি ইহারই জয়ধ্বনি দিয়াছিল—উহাকেও ভাঙ্গা হয়। কা'বা শরীফের দেওয়ালে অনেক উচ্চে আর একটি মূর্তি গ্রথিত ছিল; হযরত (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বারা উহা ভাঙ্গাইলেন। এইভাবে বিজয়ের প্রথম দিনই মক্কা নগরীর অভ্যন্তরস্থিত সকল মূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সর্বত্র ঘোষণা দেওয়া হইল, কাহারও ঘরের ভিতরেও কোন মূর্তি থাকিতে পারিবে না।

মক্কায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাপনান্তে রসুলুল্লাহ দঃ) মক্কা নগরীর বাহিরস্থ মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইলেন। "লাত্" এবং "মানাত" নামক প্রসিদ্ধ দেবী-মূর্তি যাহার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে ঐ মূর্তিদ্বয় ভাঙ্গিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নখ্‌লা নামক বস্তীতে "ওজ্জা" নামক এক প্রধান দেবী-মূর্তি ছিল; উহাকে ভাঙ্গিবার জন্য খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ত্রিশজনের এক বাহিনী সহ পাঠাইয়া দিলেন। "সূয়া" নামক মূর্তিকে ভাঙ্গিবার জন্য হযরত (দঃ) আমর ইবনুল আছ (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি উহার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া উহার সেবককে বলিলেন, আমরা ইহা ভাঙ্গিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। সে বলিল, ইহাকে ভাঙ্গিতে আসিলে সে নিজেই তাহাতে বাধা দিবে। আমর (রাঃ) বলিলেন, এখনও তুমি এই অবাস্তব ধারণা পোষণ কর। এই বলিয়া তিনি উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন এবং সেবককে বলিলেন, দেখিলে ত। সেবক তৎক্ষণাৎ কলেমা পাঠে মোসলমান হইয়া গেল। (আছাহ্‌-হুস-সিয়ার)

মোসলমানদের জেহাদ ও রাজ্য বিস্তার রাজত্বের জন্য নহে, দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে ইসলামের অন্যতম মূলবস্তু তৌহীদ—একত্ববাদকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযান চালাইলেন। দিল্লী বিজয়ী সোলতান কুতুবুদ্দিন এবং শোমনাথ বিজয়ী সোলতান মাহমুদ উক্ত আদর্শের অনুসরনে দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্য অর্জন করিয়া ছিলেন। উক্ত আদর্শের উপেক্ষাকারী বিজয়ীদের আমল হইতেই মোসলেম জাতি তাহাদের গৌরব ও প্রভাবকে হারাইয়াছে।

হোনায়নের জেহাদ

তায়েফের পথে মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম "হোনায়ন"। তথায় "হাওয়াযেন" নামক গোত্রের সঙ্গে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। মোসলমানগণ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া আরববাসীদের উপর এই হইয়াছিল যে, বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন বস্তির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদল মারফৎ দলে দলে ইসলাম গ্রহণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—যাহার

উল্লেখ পবিত্র কোরআনে ছুরা নছরের মধ্যেও হইয়াছে। কিন্তু মক্কার অনতিদুরে অবস্থানরত হাওয়াযেন গোত্র যাহারা যুদ্ধে বিশেষ পটু ও দক্ষতা সম্পন্ন ছিল, তাহারা স্বীয় যুদ্ধাভিজ্ঞতার উপর অতি গর্বিত ছিল, তাই তাহাদের উপর মক্কা বিজয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইল। তাহারা মোসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া রমজান মাসের শেষ ভাগে বা শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে মক্কা হইতে হাওয়াযেন গোত্রের প্রতি অভিযান চালাইলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মূল মক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণকারী দশ সহস্র মোজাহেদের বাহিনীটি ছিল, এতদ্ভিন্ন মক্কা বিজয় উপলক্ষে ইসলামে নবদীক্ষিত এমনকি ক্ষমাপ্রাপ্ত অমোসলেমগণের কিছু সংখ্যক সহ দুই হাজার লোক ছিল। সর্বমোট বার হাজার লোক লইয়া হযরত (দঃ) যাত্রা করিলেন।

শত্রু পক্ষ পূর্বাহ্ণেই হোনায়েন এলাকার বিভিন্ন গোপন ঘাটি সমূহে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল। মোসলমানগণ একটি সরু পথ অতিক্রম করা কালে হঠাৎ শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অতর্কিত আক্রমণের দরুণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—যাহা সাধারণতঃ পরাজিত দলের দৃশ্য হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা শুধু সাময়িক অবস্থা ছিল, বস্তুতঃ পরাজয় ছিল না, কারণ দলপতি হযরত (দঃ) কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীসহ রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত বিদ্যমান ছিলেন। মোসলমানগণ পুনঃ একত্রিত হইয়া আক্রমণ চালাইলে পর শত্রু পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। শত্রু পক্ষের বিভিন্ন দলসমূহ পলায়ন করিল, মাত্র একটি দল রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিতেছিল তাহাদের দলপতি সহ সত্তর জন নিহত হইলে পর তাহারাও দ্রুত পলায়নে বাধ্য হইল। মোসলমানদের পক্ষে মাত্র পাঁচ জন শহীদ হইয়াছিল, তাহাও শুধু হোনায়নের রণাঙ্গনে নহে, বরং নিকটবর্তী আওতাসের রণাঙ্গনসহ—যেখানে পলায়নকারী শত্রুগণ দলবদ্ধাকার ধারণ করিলে তথায় খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

হোনায়নের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ স্ত্রী-পুত্র, সমুদয় ধন-সম্পদ লইয়া রণাঙ্গণে আসিয়াছিল, এই উদ্দেশ্যে যে, ঐ সবের মায়া-মমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যেন দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালনায় বাধ্য হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে বাধ্য হইল এবং সমুদয় ধন-সম্পদ গণিমতরূপে মোসলমানদের হস্তগত হইল এবং সমস্ত নারী ও শিশু বন্দী হইল। এত অধিক পরিমাণ গণিমত এবং এত অধিক সংখ্যক বন্দী ইতিপূর্বে আর কোন জেহাদ হস্তগত হইয়াছিল না। শিশু ও নারী বন্দী ছিল ৬০০০, উট ছিল ২৪০০০, ভেড়ী-বকরী ছিল ৪০,০০০ এর অধিক এবং রৌপ্য ছিল প্রায় ৪০,০০০ তোলা।

পলায়নকারী শত্রুদল অধিকাংশ তায়েফে পৌঁছিয়া তথায় দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাই উল্লিখিত গণিমতের ধন-সম্পদ সমূহকে মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত "জেয়েররানা"

নামক স্থানে রাখিয়া স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তায়েফের প্রতি অভিযান পরিচালিত করিলেন।

● হোনায়নের জেহাদে প্রাথমিক অবস্থায় মোসলমানদের পক্ষের যে পরাজয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ঐতিহাসিকগণ উহার কতিপয় কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) মোসলমান মোজাহেদ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল মক্কা বিজয় উপলক্ষে সদ্য ইসলামে দীক্ষিত নব-মোসলেমগণ, বরং কিছু সংখ্যক ক্ষমাপ্রাপ্ত অমোসলেমও ছিল। যাত্রাকালে তাহারা ফুর্তির সহিত অগ্রগামী হইয়া চলিল, কিন্তু অন্তরে এখনও ইসলামের মহব্বত দৃঢ় হয় নাই, তাই বিপদের সম্মুখে অটল থাকার অভাবও তাহাদের মধ্যে ছিল এবং তাহারা সংখ্যায় ২,০০০ ছিল। এত অধিক সংখ্যার লোকগণ শৃঙ্খলাহীনরূপে অগ্রভাগ হইতে বিশেষতঃ অপ্রশস্ত পথে পশ্চাদপদ হইতে লাগিলে দলের সকলেই উহার দরুণ শৃঙ্খলাহীন হইতে বাধ্য হয়।

(২) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, জাবের (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিশ্চিন্ত মনে পথ অতিক্রম করিতেছিলাম, একস্থানে পথটি অপ্রশস্ত ও সরু ছিল। কাফেররা তথায় গর্তে, গুহায় পূর্বাহ্নেই আত্মগোপন করিয়াছিল। যখন আমরা ঐ সরু পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম তখন অতর্কিতে শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে আমাদের উপর তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল, ফলে মোসলমান বাহিনী শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

কিন্তু ঐসব ছিল বাহ্যিক কারণ মাত্র; প্রকৃত প্রস্তাবে মূল কারণ ছিল মোসলমানদের একটি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি, যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উহারই কারণে মোসলমানগণ পরাজয় বরণ-দৃশ্যে এবং বিপদে পতিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোরআন শরীফে সেই বিষয়টির উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا........

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ বিশেষ সাহায্য সহায়তা স্মরণার্থে হোনায়েনের ঘটনাকে স্মরণ কর—যেদিন তোমাদের আধিক্য দৃষ্টে তোমরা গর্ব ও অহমিকায় লিপ্ত হইয়াছিলে। কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে কোন সাহায্যই করিতে পারিল না এবং প্রশস্ত জমিন তোমাদের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, ফলে তোমরা পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইলে। (১০ পারা ৩ রুকু)

১৫৫৪। হাদীছঃ—আবু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনায়েনের ঘটনায় পশ্চাদপসারণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, আমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতেছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মুহূর্তের জন্যও রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছিলেন না। অবশ্য রণে যাত্রাকালে

তাড়াহুড়াকারী যুবকদল অগ্রভাগে ছিল; শত্রুপক্ষ হাওয়াযেন গোত্র তাহাদের প্রতি তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করিল। (বাধ্য হইয়া তাহারা পশ্চাৎপদ হইল, কিন্তু হযরত (দঃ) দৃঢ়তার সহিত রণাঙ্গণে শুধু বিদ্যমানই রহিলেন না, বরং তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একা একা হযরত (দঃ) শত্রুদলের বেষ্টনীতে চলিয়া যান না, কি এই ভয়ে) আবু সুফিয়ান্-ইবনুল-হারেছ (রাঃ) হযরতের যানবাহনের মাথা তথা মুখের লাগাম টানিয়া ধরিয়া রাখিলেন। হযরত (দঃ) যানবাহন হইতে অবতরণ পূর্বক পূর্ণ উদ্দমের সহিত বলিতে লাগিলেন—

انا النبی لاکذب — انا ابن عبد المطلب۔

"আমি খাঁটি ও সত্য নবী, মিথ্যার লেশমাত্র আমার মধ্যে নাই, আমি আরব-প্রসিদ্ধ আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

১৫৫৫। **হাদীছ:**—বরা (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনায়নের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? বরা (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছিলেন না।

মূল ব্যাপার এই ছিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকগণ তীর ছুড়িতে বিশেষ পটু ছিল। আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইলাম তখন প্রথম অবস্থায় তাহারা পলায়ন করিল; এদিকে আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করায় লিপ্ত হইলাম, হঠাৎ আমরা তাহাদের পক্ষ হইতে তীর-বৃষ্টির সম্মুখীন হইলাম। সেই ভীষণ অবস্থায়ও আমি হযরত (দঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি স্বীয় যানবাহন—শ্বেত বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। (তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সতর্কতা স্বরূপ) আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ (রাঃ) তাঁহার এ যানবাহনের লাগাম ধরিয়া (টানিয়া) রাখিতেছিলেন। হযরত (দঃ) পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত—انا النبی لاکذب — انا ابن عبد المطلب বলিতে বলিতে যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

১৫৫৬। **হাদীছ:**—মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়ন-জেহাদে পরাজিত হাওয়াযেন গোত্র (ইসলাম গ্রহণ পূর্বক) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল এবং তাহাদের বন্দী পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ তাহাদিগকে প্রত্যার্পনের দরখাস্ত পেশ করিল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গে যে, আরও বহু লোক আছে তাহা তোমরাও দেখিতেছ; (উভয় পক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলাই ন্যায় সঙ্গত এবং) যাহা বাস্তব মুখে তাহা বলাই আমার নিকট পছন্দনীয়। তোমরা দুই শ্রেণীর বস্তু হইতে এক শ্রেণী অবলম্বন করিতে পার—বন্দী পরিবার পরিজন বা ধন-সম্পদ। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ) তায়েফের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও দশ দিনের অধিককাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন—উক্ত গনিমতের মাল

মোজাহেদগণের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন না। (কিন্তু তখনও পরাজিত পক্ষ ইসলাম গ্রহণ করতঃ অনুগত হইয়া না আসায় রসুলুল্লাহ (দঃ) গণিমত বণ্টন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ বস্তু সমুহের সঙ্গে বহু লোকের সত্ব জড়িত হইয়া গেল।) প্রতিনিধিদল যখন উপলব্ধি করিতে পারিল—হযরত (দঃ) উভয় শ্রেণীর বস্তু প্রত্যাপর্ণ করিবেন না তখন তাহারা বলিল, আমরা স্বীয় পরিবার-পরিজন ফেরৎ পাওয়াকেই অবলম্বন করিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) মোসলমানদের সমাবেশে ভাষণ দান করিলেন। প্রথম আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদেরই ভাই (হাওয়াযেন গোত্র) তওবা করতঃ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাদের পরিবার-পরিজন তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমার এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত তাহারা তাহা করিয়া ফেল। আর যে ব্যক্তি এইরূপ ইচ্ছা করে যে, অতঃপর সর্বপ্রথম গণিমতের মাল হইতে তাহাকে বিনিময় প্রদান না করা হইলে সে নিজ অংশকে ছাড়িবে না তাহাও করিতে পারে। এতদ শ্রবণে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে উহা করিতে প্রস্তুত আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের এত অধিক লোকের মধ্যে কে স্বীকারোক্তি করিল, কে না করিল তাহা পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই, তাই তোমরা এই সম্পর্কে নিজ নিজ দলীয় সরদারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কর, সরদারগণ প্রকৃত তথ্য আমাকে জ্ঞাত করিবে। তাহাই করা হইল এবং ঐরূপে সরদারগণ এই সংবাদই প্রদান করিলেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্টচিত্তে আপনার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত আছে।

১৫৫৭। হাদীছ :—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) হোনায়নের জেহাদে হাসিলকৃত বন্দীগণ হইতে দুইটি ক্রীতদাসী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উহাদেরকে মক্কা নগরীর কোন এক গৃহে রাখিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোনায়েন জেহাদের বন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন, তাহারা মুক্তি লাভ করিয়া আমোদ-উল্লাসে মক্কার রাস্তাসমুহে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, দেখ ত ইহাদের ছুটাছুটি করার কারণ কি? তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পুর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি অমুক গৃহে যাও এবং আমাদের ক্রীতদাসীদ্বয়কে মুক্তি দিয়া আস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইসলামী জেহাদে অধিকৃত বন্দী নর-নারী ও বালক-বালিকা সম্পর্কে শরীয়তে একটি সুনির্দ্ধারিত পদ্ধতি রহিয়াছে। সেই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মুল সুত্র এবং সুফল বুঝিবার জন্য কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যথা—

ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য দেশ জয় ও রাজ্য বিস্তার করা নহে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল—আল্লার সৃষ্ট জগতের প্রতি প্রান্তকে আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম

বিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ও বাধামুক্ত করা।* সুতরাং এই জেহাদে যাহারা বন্দী হইবে তাহাদের মধ্যেও ইসলাম ধর্ম বিস্তারই হইবে একমাত্র লক্ষ্য।※ এই জন্যই এই বন্দীদেরকে কোন মতেই ইসলামী আধিপত্যের বাহিরে ইসলামী শত্রু কাফেরদের আওতায় দেওয়ার কোন অবকাশ শরীয়তে নাই। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, কাফেরদের হইতে মুক্তিপণ লইয়া বা মোসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করিয়াও এই বন্দীদেরকে ইসলামী আধিপত্যের বহির্ভূত করা জায়েয নহে।† আর বন্দীশালায় তাহাদেরকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের মানবাধিকার ক্ষুন্ন করাকেও শরীয়ত অনুমোদন করে না। বলপূর্বক তাহাদেরকে মোসলমান করিয়া নেওয়ার বিধান ত ইসলামে মোটেই নাই। অবশ্য ইসলাম এই বন্দীদের ক্ষেত্রে অবকাশ রাখিয়াছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারেন যে, এই বন্দীদেরকে মুক্ত রাখিলে মোসলমান ও ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্রে তাহাদের লিপ্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে মুক্তি দানের আদেশ জারী করিতে পারেন❀। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত বন্দীদের প্রতি ঐরূপ আস্থাবান ও আশঙ্কামুক্ত হইতে না পারিলে যেহেতু মানবতা ক্ষুন্নকারী দীর্ঘ কারারুদ্ধ রাখা ইসলামের নীতি নহে, তাই এখানে কতিপয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যথা— (১) বন্দীদের স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা। (২) তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা। (৩) তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা। (৪) ইসলামের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পরিবেশ তাহাদের জন্য

---

* এই জন্যই কাফেরদের কোন এলাকা বা দুর্গ ঘেরাও বা অবরুদ্ধ করা অবস্থায়ও তাহাদিগকে আক্রমণের পূর্বে ইসলামের আহ্বান জানাইবে। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বা ইসলামের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহাদের উপর আক্রমণ করা যাইবে না। যেই এলাকায় ইসলামের ডাক পৌঁছে নাই সেই এলাকায় লোকদেরকে ইসলামের আহ্বান না জানাইয়া তাহাদের প্রতি জেহাদ পরিচালনা জায়েয নহে (হেদায়াহ)।

※ এই জন্যই বন্দী হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে দাসে পরিণত করার কোন অবকাশ ইসলামে নাই (হেদায়াহ)।

† কারণ, মোসলমান বন্দীগণ কাফেরদের হাতে বন্দী থাকিলে তাঁহাদের জানের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের ঈমানের ও ইসলামের আশঙ্কা নাই; পাকা-পোক্তা ইসলাম কোন ভয়-ভীতিতে নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অমোসলেম বন্দীদেরকে ইসলামের আওতার বাহিরে দেওয়া হইলে তাহাদের ইসলামের সুযোগ নষ্ট হইবে। এই বন্দীদের ইসলামের মূল্য মোসলমান বন্দীদের জানের মূল্য অপেক্ষাও বেশী; তাই মোসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করিয়াও এই বন্দীদেরকে ইসলামের আওতার বাহিরে দেওয়া হইবে না; ইহা ইমাম আবু হানিফার সুচিন্তিত অভিমত (হেদায়াহ)।

❀ উল্লিখিত হাদীছের ঘটনায় হাওয়াযেন গোত্রীয় বন্দীদেরকে হযরত (দঃ) এই সূত্রেই মুক্তি দান পূর্বক তাহাদের আত্মীয়দের নিকট প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন। কারণ, সমুদয় গোত্র মোসলমান হইয়া গিয়াছিল।

সহজ সুলভ করা; যেন তাহারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ধর্মের ছায়াতলে স্বতঃস্ফূর্ত আসিতে পারে যাহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইয়াছিল। (৫) তাহাদের সব সুযোগ-সুবিধার সহিত তাহাদের প্রতিটি লোকের প্রতি কড়া দৃষ্টিও রাখিয়া যাইতে হইবে যে, তাহারা মোসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার প্রয়াস না পায়। ব্যয়, যত্ন ও দায়িত্ব সাপেক্ষ এই পঞ্চ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য ইসলাম এই শ্রেণীর বন্দীদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর পন্থা রাখিয়াছে যে, ঐ বন্দীদিগকে মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মোসলমান তাহার প্রাপ্ত বন্দীর ব্যাপারে উক্ত পাঁচটি দায়িত্ব সযত্নে পালন করিয়া যাইবে; ইহা শরীয়তের বিশেষ বিধান এবং এই সব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ও ব্যয়ভার বহনে জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য ঐ প্রাপ্ত বন্দীদের সম্পর্কে ব্যয়ভার বহনকারীকে শরীয়ত কতকগুলি সুযোগ প্রদান করিয়াছে যাহা সাধারণভাবে পরস্পর প্রতিষ্ঠিত হয় না। উহা দৃষ্টেই অত্র অবস্থায় বন্দীদেরকে দাস-দাসী আখ্যা দেওয়া হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে—বন্দীদেরকে মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার উদ্দেশ্য শুধু বন্দীদের উপর মোসলমানদের ঐ সব সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা কস্মিনকালেও নহে। বরং এই বিতরণের মূল উদ্দেশ্য হইল ঐ পাঁচটি মঙ্গলময় ও কল্যাণকর ব্যবস্থাকে সযত্নে ও সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত করা। এই জন্যই দাস-দাসী তথা ঐ বিতরিত বন্দীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে মোসলমানদিগকে সীমাহীনরূপে সতর্ক ও কঠোরভাবে আদিষ্ট করা হইয়াছে যথা—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তিনি উম্মত হইতে ইহজগতের চিরবিদায় নিতেছিলেন তখন উম্মতকে দুইটি বিষয়ের তাকিদ দিয়া গিয়াছেন; একটি "নামায" অপরটি দাস-দাসীদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন"। উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) তাঁহার মৃত্যুশয্যায় বারবার এই কথা বলিতেছিলেন الصلوة وما ملكت ايمانكم "নামায এবং তোমাদের দাস-দাসী" (মেশকাত ২৯১)। অর্থাৎ এই দুইটি সম্পর্কে সর্বদা বিশেষ সচেতন থাকিও।

লক্ষ্য করুন। দাস-দাসীর ব্যাপারে দায়িত্ব পালনকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের সমদৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই দাস-দাসীদের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তাহারা তোমাদেরই ভাই; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। আল্লাহ যাহার করতলগত তাহার ভাইকে করিয়াছেন, তাহার কর্তব্য হইবে সেই ভাইকে উহাই খাওয়ানো যাহা সে নিজে খায়, উহাই পরানো যাহা সে নিজে পরে এবং তাহাকে তাহার সাধ্যের উর্দ্ধে না খাটায় (মেশকাত শরীফ ২৯০)।

মোসলমানগণ বহু ক্ষেত্রেই শরীয়তের বিধান পালনে ধীরে ধীরে শিথিল হইয়াছে; সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও শিথিল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মোসলমানদের সোনালী যুগে

এই দাস-পদ্ধতির যে সোনালী ফল ফলিত তাহা অসংখ্য, অগণিত ও বাস্তব ইতিহাস। উহার এক-দুইটি নজীর লক্ষ্য করুন—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের দাস ছিলেন নাফে' (রঃ); আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার এই দাসকে এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি তৎকালীন সমস্ত আলেম ও ইমামগণের ওস্তাদ ও শিক্ষক হইয়াছিলেন; সেই পদে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছাহাবীর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মদীনার সুবিখ্যাত ইমাম মালেক (রঃ) যিনি চার মজহাবের এক ইমাম—তিনি ঐ নাফে' (রঃ) দাসেরই শাগের্দ ছিলেন।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হইতে নাফে'—নাফে' হইতে মালেক এই সনদ বা সূত্রে বহু হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বের বর্তমান হাদীছ গ্রন্থাবলীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ ইমাম মালেকের "মোয়াত্তা" উক্ত সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ সমূহের উপরই স্থাপিত। এমনকি বিশুদ্ধতার দিক দিয়া এই সনদ বা সূত্রকে হাদীছ প্রাপ্তির سلسلة الذهب বা স্বর্ণধারা (Gold Chain) বলা হয়। আজও মদীনার কবরস্থান "জান্নাতুল-বাকী"—বাকীর-বেহেশতখানায় ইমাম মালেক এবং তাঁহার ওস্তাদ নাফে' (রঃ) পাশাপাশি সমাহিত আছেন; বিশ্ব-মোসলেম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহাদের জেয়ারত করে। লক্ষ্য করুন! আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর দাসত্ব নাফে' (রঃ)কে কত উচ্চে সমাসীন করিয়াছিল।

তদ্রূপ "একরেমা (রঃ)" ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দাস ছিলেন। একরেমা (রঃ)কে স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রাঃ) পায়ে শিকল দিয়া লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেন। একরেমা (রঃ) অসংখ্য মোহাদ্দেছের ওস্তাদ ছিলেন; তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এলেমের সিন্দুক বলা হইত। বন্দীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের উল্লিখিত সুব্যবস্থাসমূহের উদ্দেশ্যেই ইসলামের দাস-পদ্ধতি। দাস-দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করার প্রতিও ইসলাম বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে; যেমন—প্রথম খণ্ডে ৮০নং হাদীছ এবং এই খণ্ডে ১২০৭ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

আওতাসের জেহাদ

১৫৫৮। হাদীছঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোনায়নের রণাঙ্গন হইতে পলায়নকারী শত্রুদলের এক অংশ তথা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত "আওতাস" নামক স্থানে পৌছিল; তাই) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোনায়নের জেহাদ হইতে অবসর হইয়া আবু আ'মের (রাঃ) নামক ছাহাবীর নেতৃত্বে কয়েক হাজার মোহাজেরগণকে আওতাস এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথায় দোরায়দ-ইবনে-ছেম্মা নামক কাফের ও তাহার দলবলের সঙ্গে জেহাদ আরম্ভ হইল। দোরায়দ নিহত হইল এবং তাহার দল পরাজিত হইল।

আবু মুছা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল (দঃ) আমাকে আবু আমরের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। আবু আমরের হাঁটুর মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, জুশামী নামক ব্যক্তি তাঁহাকে তীর মারিয়াছিল। তীরটি অতি শক্তভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমি তাঁহার নিকট পৌছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম- চাচাজান! আপনাকে তীর কে মারিয়াছে? তিনি ইশারায় দেখাইলেন, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মারিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইলাম। সে যখন আমাকে দেখিতে পাইল তখন সে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। আমি তাহার পেছনে ধাওয়া করিলাম এবং বলিতে লাগিলাম, পালাও কেন, লজ্জা হয় না, দাঁড়াও না কেন? এইরূপ কটাক্ষপাতে সে দাঁড়াইয়া গেল। কিছু সময় উভয়ের তরবারী চলিল, কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর আমি আবু আ'মের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলাম এবং সুসংবাদ জানাইলাম যে, আপনার আঘাতকারীকে আল্লাহ তায়ালা হত্যা (করিবার সুযোগ দান) করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, বিদ্ধ তীরটি বাহির করিয়া ফেল, আমি তাহাই করিলাম; যখম হইতে পানির ন্যায় পদার্থ বহিয়া পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আমার সালাম পেশ করিও এবং আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন, অতঃপর তিনি স্বীয় নেতৃত্ব পদে আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

(রণাঙ্গনে জয়লাভ করিয়া) আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) স্বীয় অবস্থান স্থলে একটি দড়ির বুনন খাটিয়ার উপর শোয়া অবস্থায় ছিলেন, উহার উপর কোন বিছানা ছিল না, তাঁহার পিঠ ও বাহুর উপর খাটিয়ার বুননের রেখাগুলি দেখা যাইতেছিল। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত করিলাম এবং আবু আ'মের রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঐ কথাও জানাইলাম যে, হযরতের খেদমতে আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ অজুর পানি চাহিলেন এবং অজু করিলেন, অতঃপর উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া মোনাজাত করতঃ এই দোয়া করিলেন—

اللهم اغفر لعبيد ابى عامر

"হে আল্লাহ। আবু আ'মেরকে ক্ষমা করুন।" মোনাজাতকালে অধিক কাকুতি-মিনতি প্রদর্শনে হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় এত অধিক উত্তোলন করিলেন যে, তাঁহার নূরানী বগল পরিদৃষ্ট হইল। অতঃপর আরও বলিলেন—

اللهم اجعله يوم القيمة فوق كثير من خلقك

"হে আল্লাহ! আবু আ'মেরকে কেয়ামতের দিন তোমার সৃষ্টির মধ্যে বহু সংখ্যকের উর্দ্ধের মর্তবা ও আসন দান করিও।"

আবু মুছা (রাঃ) বলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, আমার জন্যও মাগফেরাতের দোয়া করুন, তখন হযরত (দঃ) এই দোয়া করিলেন—

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما

"হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (আবু মুছা)কে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিন, কেয়ামতের দিন তাহাকে শান্তি ও মর্য্যাদার স্থান দান করুন।"

তায়েফের জেহাদ

হোনায়ন হইতে পলায়নকারীদের অধিকাংশ তায়েফে চলিয়া গিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন "আওতাস্" হইতে পলায়নকারীরাও তথায় যাইয়া একত্রিত হইল এবং একটি কেল্লার মধ্যে এক বৎসরের রসদ জমা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল।

এই সংবাদে রসুলুল্লাহ (দঃ) হোনায়নের জেহাদে হস্তগত গণিমতের মালসমূহ মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত "জেয়েররানা" স্থানে রাখিয়া মোজাহেদ বাহিনী সহ স্বয়ং তায়েফ যাত্রা করিলেন—তখন অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাস।

শত্রুপক্ষ কেল্লার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল; রসুলুল্লাহ (দঃ) কেল্লা ঘেরাও করিলেন। প্রায় কুড়ি দিন কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখা হইল এবং জেহাদ পরিচালনা করা হইল; সর্বমোট ১২ জন ছাহাবী শহীদ হইলেন, কিন্তু কেল্লা জয় হইল না। কেল্লা জয় হইল না বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ খুব হেস্তনেস্ত হইল, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আর অধিক সময় নষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, তিনি তথা হইতে জেয়েররানায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই হোনায়ন, আওতাস ও তায়েফের জেহাদের মূল শত্রুপক্ষ হাওয়াযেন গোত্র ইসলাম গ্রহণ পূর্বক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিল।

১৫৫৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তায়েফ (নগরীর কেল্লা) ঘেরাও করিলেন, কিন্তু পূর্ণ বিজয় ছাড়াই হযরত (দঃ) বলিলেন, আমরা আগামীকল্য চলিয়া যাইব। হযরতের এই সিদ্ধান্ত ছাহাবীগণের মনঃপুত হইল না, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—জয়লাভ না করিয়া চলিয়া যাইব?

হযরত (দঃ) ছাহাবীগণের মনোভাব দৃষ্টে পুনঃ আদেশ করিলেন, আগামীকল্য রণে অবতরণ করিব। সকলেই পর দিন রণে অবতীর্ণ হইলেন, এই দিন মোসলমানগণ ভীষণরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই দিন হযরত (দঃ) পুনরায় সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা ইন্শা-আল্লাহ তায়ালা আগামীকল্য চলিয়া যাইব। অদ্য ছাহাবীগণ এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহাদের এই সন্তুষ্টি দৃষ্টে হযরত (দঃ) হাসিলেন। (এই কারণে যে, পুর্ব দিন ছাহাবীগণ যেই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই আজ তাঁহারা আঘাত খাইয়া সেই সিদ্ধান্তেই কত সন্তুষ্ট হইলেন।)

১৫৬০। **হাদীছ:**—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে ছিলাম, হযরত (দঃ) জেয়েররানাতে অবস্থানরত ছিলেন। হযরতের সঙ্গে বেলাল (রাঃ)ও ছিলেন; এক ব্যক্তি হযরতের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে যাহা দিবার অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন তাহা এখন দিবেন কি? হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আশা পুরণের সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ ব্যক্তি বলিল, এইরূপ সুসংবাদ বহু দিয়াছেন। তখন হযরত (দঃ) আবু মুছা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাগতঃস্বরে বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সুসংবাদ গ্রহণ করিল না; তোমরা গ্রহণ কর। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা গ্রহণ করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) একটি পানির পাত্র চাহিলেন; উভয় হস্ত ও মুখমণ্ডলী ধৌত করিয়া উহার মধ্যে পানি ফেলিলেন, কুল্লিও উহার মধ্যেই ফেলিলেন এবং বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পানি পান কর, বুকের ও চেহারার উপর ঢাল এবং (দোন-জাহানের সাফল্যের) সুসংবাদ গ্রহণ কর। ছাহাবীদ্বয় তাহা করিতে উদ্যত হইলেন। পর্দার আড়াল হইতে উম্মে-সালামা (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মাতার (আমার) জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখিও। তাঁহারা কিছু অংশ রাখিয়া দিলেন।

১৫৬১। **হাদীছ:**—আবদুল্লাহ ইবনে আছেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন হোনায়নের জেহাদে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে অধিক পরিমাণে গণীমতের মাল দান করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ মাল (হইতে বাইতুল মালের অংশ) লোকদের মধ্যে বণ্টন করিলেন এবং বিশেষরূপে নব মোসলমানগণকে তাহাদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ দান করিলেন। মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে কিছুই দিলেন না। তাই তাঁহাদের (মধ্যে এক শ্রেণীর) মনোভাব যেন এইরূপ দেখা যাইতেছিল যে, অন্যান্য লোকদের ন্যায় অংশ লাভ না হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অতএব হযরত (দঃ) বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণদান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আনছারগণ। আমি কি তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছিলাম না, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন? তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদের দারিদ্র দুর করিয়াছেন।

হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কয়টি কথা বলিলেন, উহার প্রত্যেকটির উত্তরেই আনছার ছাহাবীগণ বলিতেছিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের এহসান ও

উপকার তদপেক্ষা অধিক। হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার সম্বন্ধে নানা বিষয় উল্লেখ করিতে পার (যে, আমি বিদেশী ছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছ। আমাকে রসুলরূপে স্বীকার করা হইত না, তোমরা স্বীকার করিয়াছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ উট, বকরি লইয়া বাড়ী যাইবে এবং তোমরা নবীকে লইয়া বাড়ী যাইবে? আমি বাস্তবে হিজরত করিয়াছি, নতুবা আমি নিজকে আনছারদের দলভুক্ত গণ্য করিতাম। (এই অবস্থায়ও তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ আছে—) আনছারগণ যদি অন্যান্য লোকগণ হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন করে, তবে আমি আনছারদের সঙ্গে তাহাদের পথ ও ময়দানকেই অবলম্বন করিব। আমার ঘনিষ্ঠতা দৃষ্টে আনছারগণ আমার শরীর স্পর্শনকারী জামার ন্যায়, পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকগণ উপরে পরিধেয় চাদর ইত্যাদির ন্যায়। আমার ইহজগৎ ত্যাগের পরে তোমরা অন্যান্য লোকদের প্রাবল্যতা দেখিতে পাইবে তখন তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিও এবং আমার সাক্ষাৎ লাভ (তথা কেয়ামত বা শেষ জীবন) পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের উপরই দৃঢ় থাকিও।

১৫৬২। **হাদীছ** :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আনছারগণের কতিপয় লোক একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কোরায়েশগণ (দীর্ঘকাল হইতে মোসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ধন-জন হারাইবার) আপদ-বিপদ এবং (কুফরের) অন্ধকার হইতে এইমাত্র বাহির হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চাহিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য সকলে জাগতিক সামগ্রী লইয়া বাড়ী ফিরিবে; তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? উত্তরে সকলেই বলিলেন, নিশ্চয় আমরা সন্তুষ্ট আছি।

১৫৬৩। **হাদীছ** :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের ঘটনা উপলক্ষে হাওয়াযেন ও গাতাফান গোত্রদ্বয় এবং তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীগণ তাহাদের স্বীয় পরিবার-পরিজন ও পশুপালসমূহকে লইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। (উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই সবের মমতায় যেন রণাঙ্গনে দৃঢ় থাকিতে বাধ্য হয়।) হযরতের সঙ্গে মূল বাহিনী দশ হাজার ভিন্ন কিছু সংখ্যক (প্রায় দুই হাজার) নব মোসলেমও ছিলেন (এবং তাঁহারাই অগ্রভাগে ছিলেন।)

শত্রুর প্রবল আক্রমণে ঐ নব মোসলেমগণ পশ্চাৎপদ হইলেন (সরু পথ বিশিষ্ট পার্বত্য এলাকায় দলের অগ্রভাগ পশ্চাদপদ হইলে পর তাহাদের ভীড়ের দরুণ সম্পূর্ণ দলই শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িল।) এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (নগণ্য সংখ্যক লোকসহ) রণাঙ্গণে একা রহিয়া গেলেন। এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ)

ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুইবার আহ্বান করিলেন—ডান দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনছার দল! তাঁহারা এই বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন যে, আমরা উপস্থিত আছি, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। অতঃপর বামদিকেও ঐরূপ আহ্বান করিলেন, এইবারও আনছারগণ এইরূপেই আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় যানবাহন সাদা রঙ্গের একটি খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন; ঐ পরিস্থিতিতে তিনি যানবাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আল্লার বান্দা ও আল্লার সত্য রসুল।

এইবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শত্রু দলের প্রতি প্রবল আক্রমণ করা হইল। শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। এই অভিযানে অধিক পরিমাণ গণিমতের মাল হস্তগত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐসব মাল (হইতে বাইতুল মালের অংশকে) বিশেষরূপে মোহাজেরগণ এবং নব মোসলমানগণের মধ্যে বন্টন করিলেন, আনছারগণকে দিলেন না। তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি মন্তব্য করিলেন যে, কষ্টের বেলায় আমাদিগকে ডাকা হয়, কিন্তু গণিমতের ধন অন্যদেরকে দেওয়া হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মন্তব্য জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাদের সকলকে তাঁবুর মধ্যে একত্রিত করিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সব কি কথা যাহা আমি শুনিতে পাইয়াছি? (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ওজর করিলেন যে, আমাদের যুবক বুদ্ধিহীন কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছে; গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কিছু বলেন নাই। অন্যান্য) সকলেই অনুতপ্ত হইয়া লজ্জায় চুপ রহিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) আনছারগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও আকর্ষণ উল্লেখ পূর্বক বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকগণ উট-বকরি লইয়া বাড়ী ফিরিবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? তোমাদের প্রতি আমার আকর্ষণ এত অধিক যে, আনছারগণ যদি অন্য লোকদের হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন করে তবে আমি আনছারগণের পথ ও ময়দানই অবলম্বন করিব।

বিভিন্ন এলাকায় মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ

১৫৬৪। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজদ এলাকার প্রতি একটি মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করিলেন; আমিও সেই দলভুক্ত ছিলাম। তথায় আমরা জয়লাভ করিলাম এবং শত্রুপক্ষ হইতে গণীমতের মাল হস্তগত করিলাম। উহা বন্টন করা হইল—আমাদের প্রত্যেকের অংশে বারটি উট আসিল; এতদ্ভিন্ন (বাইতুল মালের প্রাপ্য পঞ্চমাংশ হইতে) অতিরিক্ত এক একটি উট আমাদিগকে প্রদান করা হইল। আমরা প্রত্যেকে তেরটি করিয়া উট লাভ করতঃ বাড়ী ফিরিলাম।

১৫৬৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে বনু-জযীমা গোত্রের প্রতি প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। তাহারা (তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে) ভালভাবে "أسلمنا—আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম।" বাক্যটির উক্তি করিতে না পারিয়া "صبأنا صبأنا—আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলাম নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলাম" বলিল।

(তাহারা স্পষ্টরূপে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি না করায়) খালেদ (রাঃ) তাহাদেরে কাফের গণ্য করা পূর্বক হত্যা ও বন্দী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বন্দীগণকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। একদিন তিনি আদেশ করিলেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তখন আমি বলিলাম, আমি স্বীয় বন্দীকে হত্যা করিব না এবং আমার সঙ্গীগণের মধ্যেও কেহ কোন বন্দীকে হত্যা করিবে না।

আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরতের নিকট পৌঁছিলাম তখন আমরা সম্পূর্ণ ঘটনা হযরতের গোচরীভূত করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনা শ্রবণে স্বীয় হস্ত উত্তোলন করতঃ বলিলেন, اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد "হে আল্লাহ! খালেদ যাহা করিয়াছে উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই" এইরূপে দুইবার বলিলেন।

১৫৬৬। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানের প্রতি জেহাদে প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদ (রাঃ)কে (অধিনায়করূপে) পাঠাইলেন; আমাদিগকে তাঁহার অধীনে পাঠাইলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে (অধিনায়ক করিয়া) পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, খালেদের সঙ্গীগণকে বলিও—যাহার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে জেহাদে যাইতে পারে এবং যাহার ইচ্ছা প্রত্যাবর্তনও করিতে পারে। বরা (রাঃ) বলেন, আমি জেহাদে গমনকারীদের দলে থাকিলাম এবং বিজয় লাভে গণীমতের অনেক ধন লাভ করিলাম।

১৫৬৭। হাদীছঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন আনছারী (আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) ছাহাবীকে) তাহাদের অধিনায়ক মনোনীত করিলেন এবং সকলকে ঐ ব্যক্তির কথা মানিয়া চলার আদেশ করিলেন।

(সৈনিকগণ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অত্যাধিক ব্যাকুলতা দেখাইতে ছিল। (আছাহহুস্সিয়ার ৩৫৬ পৃঃ) তাই একদা ঐ অধিনায়ক ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে কি নবী (দঃ) আমার কথা মানিয়া চলার আদেশ করেন নাই? সকলেই বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমার আদেশ এই যে, কতকগুলি জ্বালানী কাঠ একত্রিত কর। তাহাই করা হইল। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, ইহাতে আগুন জ্বালাইয়া দাও।

তাহাই করা করা হইল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তোমরা এই আগুনে প্রবেশ কর। কেহ কেহ ঐ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কেহ কেহ বিরত রহিলেন এবং বলিলেন, অগ্নি হইতে বাঁচিবার জন্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আশ্রয় লইয়াছি। তাহারা এই মতবিরোধের মধ্যেই রহিলেন; ইত্যবসরে আগুন নিভিয়া গেল, ঐ ব্যক্তির রাগও থামিয়া গেল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তাহারা যদি আগুনে প্রবেশ করিত তবে আজীবন আগুনের শাস্তিই ভোগ করিত; কাহারও কথা মানিয়া চলা বা অনুসরণ করা শরীয়ত সম্মত বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

● এতদভিন্ন আরও কতিপয় অভিযানের উল্লেখ ইমাম বোখারী (রঃ) করিয়াছেন। ইয়ামান এলাকায় "জুল-খালাছা" নামক একটি মন্দির ছিল; উহাকে ইয়ামানের কা'বা-ঘর বলা হইত। উহার বিলুপ্তি সাধনের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে দেড় শত অশ্বারোহী বাহিনী সহ পাঠাইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১৩৭০ নং হাদীছে আছে।

গজওয়া-জাতুস্‌সালাসেল:—এই অভিযানে প্রথমতঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে তিন শত মোজাহেদ বাহিনীর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি শত্রু এলাকার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া শত্রু সংখ্যার আধিক্য অবগত হইলেন. তাই সাহায্যের জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। হযরত নবী (দঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ)কে দুই শত মোজাহেদ বাহিনী সহ সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

এই অভিযান সম্পর্কে কথিত আছে যে, শত্রু বাহিনী তাহাদের বিভিন্ন লোক-জনকে রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বিরত রাখার জন্য শিকলে আবদ্ধ করিয়া দিয় ছিল। "জাতুস-সালাসেল" অর্থ শিকলওয়ালা বাহিনী; উক্ত তথ্য সূত্রেই অভিযানের এই নাম হইয়াছিল। শত্রু দল এইভাবে দৃঢ় পদ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা পরাজিত হইয়াছিল।

গজওয়া-সীফুল বাহার:—এই অভিযানকে "খাবাত-অভিযান"ও বলা হয়; "খাবাত" অর্থ গাছের পাতা। এই অভিযানে মোসলেম বাহিনী খাদ্য অভাবে পতিত হইয়া গাছের পাতা খাইয়া ছিলেন বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে; অগ্রগণ্য মত এই যে, কোরায়েশগণ কর্তৃক সন্ধি ভঙ্গের পর মক্কা বিজয় অভিযানের কিছু দিন পূর্বে কোরায়েশদের একটি বণিক দলের উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে এই অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযানে তিন শত লোকের বাহিনী ছিল; আমীর ছিলেন আবু ওবায়দা (রাঃ)।

এই অভিযানে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা হইয়াছিল; ১২০১ নং হাদীছে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

তবুকের জেহাদ

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেহাদসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম জেহাদ; এই জেহাদের একটি বিশেষত্ব ইহাও ছিল যে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা দৃষ্টে এই জেহাদ উপলক্ষে "নফীর আম" তথা ইসলামের দলভুক্ত প্রত্যেক মোজাহেদকে উহাতে অংশ গ্রহণের আদেশ করা হইয়াছিল, ঐ আদেশ লাঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত জেহাদসমূহের সর্বশেষ জেহাদ ইহাই ছিল।

দামেস্কের পথে সিরিয়ার অন্তর্গত মদীনা হইতে প্রায় তিনশত মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম "তবুক"। এই অভিযান ঐ স্থান পর্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল, কারণ শত্রুপক্ষ ঐ স্থানে একত্রিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়া ছিল। শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া পশ্চাদেই থাকিয়া যায়, অগ্রসর হওয়ায় সাহসী হয় নাই, তাই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় মোজাহেদ বাহিনীসহ ঐ "তবুক" স্থানে অবস্থান করতঃ শত্রুর উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি দিন অবস্থান করার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। এই অভিযানে রসুলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরীর রজব মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং রমজান মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দশ হাজার ঘোড়া সম্বলিত ত্রিশ হাজার সৈনিকের বিরাট বাহিনী ছিল (আসহ-হুস-সিয়ার ৩৮৪)। হযরতের সমর-জীবনের ইতিহাসে এত বড় অভিযান আর কখনও দেখা যায় নাই।

এই অভিযানের মুল কারণ:

রোম সম্রাট হেরাক্ল—যাহার সুদীর্ঘ ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে; সে ঐ ঘটনায় ভাবাবেগের প্রভাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে ভাল ভাল মন্তব্য ও হযরতের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাজত্বের মোহে উদীয়মান ভাবকে বিসর্জন দিয়া ইসলামদ্রোহিভায়ই রহিয়া গিয়াছিল। সে মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিল, এদিকে আরবের নাছরানীগণ নবম হিজরী সনে তাহাকে এই মিথ্যা সংবাদ দিল যে, নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং বর্তমানে মদীনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ, এই সুযোগে মদীনা অধিকার করা অতি সহজ হইবে।

রোম সম্রাটের সাহায্য-সহায়তা ও অনুগ্রহে গাচ্ছান বংশধররা সিরিয়ায় রাজত্ব করিতেছিল; হেরাক্ল তাহাদিগকেই মদীনা আক্রমণে উৎসাহিত করিল এবং সিরিয়ায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিল। এমনকি হেরাক্ল মদীনা আক্রমণের জন্য উৎসাহদানে স্বীয় সৈন্যগণকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দিল এবং বহু সৈন্য উপস্থিত রাখিয়া 40 হাজারের একটি বাহিনীকে মদীনা আক্রমণে প্রস্তুত করিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি মদীনার সমস্ত মোসলমান মোজাহেদগণকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ করিলেন এবং সকলকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানের আবেদন জানাইলেন।

আবু বকর (রাঃ) স্বীয় সমুদয় সম্পদ, ওমর (রাঃ) স্বীয় সম্পদের অর্দ্ধাংশ এবং ওসমান (রাঃ) তিন শত উট ও উহার বোঝা পরিমাণ মাল-আছবাব এবং এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ছাহাবীগণ মজুরী করিয়া উপার্জন করতঃ এই অভিযানে সাহায্য করিলেন; নারীগণ সাহায্য করার জন্য স্বীয় অলঙ্কার বিক্রি করিলেন। এই-রূপে মোসলমানগণের অপরিসীম ত্যাগের ফলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরী সনের রজব মাসে দশ সহস্র ঘোড়া সহ ত্রিশ সহস্র মোজাহেদ লইয়া স্বয়ং এই অভিযানে যাত্রা করিলেন।

এই জেহাদটি বড়ই কঠিন ছিল, কারণ প্রথমতঃ বহু দূরের ছফর অথচ লোকের সংখ্যানুপাতে যানবাহন অনেক কম ছিল, এমনকি কতেক জনের মধ্যে এক একটি মাত্র যানবাহন ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়টি ভীষণ গরম ও উত্তাপের সময় ছিল। তৃতীয়তঃ মদীনায় দুর্ভিক্ষের দরুন অত্যধিক চেষ্টা সত্ত্বেও পথের সম্বল যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা লোক-সংখ্যানুপাতে নেহাৎ অপর্য্যাপ্ত ছিল। চতুর্থতঃ ঐ সময়টি খেজুর ইত্যাদি ফলফলাদি পাকিবার সময় ছিল যদ্দরুন মদীনাবাসীদের ন্যায় বাগ-বাগিচার উপর জীবিকা নির্বাহকারীদের জন্য বিদেশ যাত্রা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। এইসব অবস্থাসমূহ দৃষ্টেই এই অভিযানকে "গযওয়াতুল-ওসরাহ" কঠিন অভিযান নামে আখ্যায়িত করা হয়। কোরআন শরীফেও উহাকে কঠিন পরিস্থিতির অভিযান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কঠিনত্বের কারণেই নফীর-আম তথা মোসলমান দলভুক্ত প্রত্যেক মোজাহেদের প্রতি উহাতে যোগদানের আদেশ থাকা সত্ত্বেও মোনাফেকরা ত যোগদানের ইচ্ছাই করিল না, বরং উল্টা তাহারা গোপনে নানাপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা করতঃ মোসলমানদের মনোবল নষ্ট করিতেও চেষ্টা করিল। এতদ্ভিন্ন খাঁটি মোসলমান-মোমেনগণের মধ্য হইতেও তিনজন যোগদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অলসতা ও বিভিন্ন অজুহাতের দরুন অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত রহিলেন।

অভিযান হইতে হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিলে পর মোনাফেকরা এই স্থলেও তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মিথ্যা কসম করিয়া নানাপ্রকার অবাস্তব ওজর পেশ করতঃ অব্যাহতি লাভ করিল, কিন্তু খাঁটি মোমেনগণ সত্য ঘটনা প্রকাশে অন্যায় স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগকে বহু বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইতে হইল; অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের তওবা কবুল করিলেন।

এই অভিযানে শত্রুপক্ষের অনুপস্থিতির দরুন যুদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু চতুষ্পার্শের অমোসলেমদের উপর এই অভিযানের ভীষণ প্রভাব পড়িয়াছিল। এমনকি "আইলা", "জারবা", "আজরুহ" এবং "দওমাতুল-জান্দাল" নামক বিভিন্ন এলাকাসমূহ মোসলমানদের

অধীনস্থ হইয়াছিল। এই সময়ই আইলার শাসনকর্তা নানাপ্রকার উপঢৌকনের মধ্যে শ্বেতবর্ণের একটি খচ্চরও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমিপে পেশ করিয়াছিল উহারই নাম ছিল "তুলতুল"।

১৫৬৮। হাদীছ :—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক অভিমানে যাত্রাকালে আলী (রাঃ)কে (মদিনার) তত্ত্বাবধায়করূপে রাখিয়া গেলেন। তদ্দরুন আলী (রাঃ) (জেহাদে যাইতে না পারিয়া মর্মাহত স্বরে) বলিলেন, আপনি আমাকে (জেহাদে যাইতে অক্ষম) নারী ও শিশুদের সঙ্গে রাখিয়া যাইতেছেন। হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে (সান্ত্বনা দান পুর্বক) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে মুছা আলাইহেচ্ছালামের স্থলে তত্ত্বাবধায়ক হারুন আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় আমার স্থলে তুমি তত্ত্বাবধায়করূপে থাকিবে? অবশ্য আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইবে সেই সম্ভাবনা নাই; (তাই তুমি হারুন আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় নবী হইতে পারিবে না।)

ব্যাখ্যা :—মুছা (আ.) তৌরাত কেতাব প্রাপ্তির জন্য আল্লার আদেশে ত্রিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে চলিয়া যাইবেন; যাত্রাকালে মুছা (আঃ) স্বীয় ভ্রাতা ও নবী হারুন (আঃ)কে তত্ত্বাবধায়করূপে রাখিয়া গেলেন, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীছে ঐ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তবুকের জেহাদে না যাওয়ায় শাস্তিমুলক ব্যবস্থা

খাটী মোমেনদের মধ্যে তিনজন তবুক জেহাদে যোগ দিয়া ছিলেন না। তাঁহাদের একজন কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ); তাঁহারই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) যিনি স্বীয় পিতা কায়া'ব (রাঃ) দৃষ্টিহারা হওয়ার পর তাঁহার চালক ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—

১৫৬৯। হাদীছ :— তবুকের জেহাদে যাত্রা না করার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দান করিতে যাইয়া কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত কোন জেহাদেই আমি অনুপস্থিত থাকি নাই—একমাত্র তবুকের জেহাদ ভিন্ন অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম না, কিন্তু বদরের জেহাদে অনুপস্থিতির দরুন কাহাকেও ভৎর্সনা করা হইয়াছিল না। কারণ, সেই উপলক্ষে হযরত (দঃ) (পুর্ব হইতে যুদ্ধের জন্য তৈরী হইয়া সকলকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আদেশ করিয়াছিলেন না, বরং তিনি কিছু সংখ্যক সহযাত্রী লইয়া) শুধু একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ শত্রুপক্ষের মোকাবিলা হইতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমি আকাবার * ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম যাহার পরিবর্তে বদরের উপস্থিতিকে আমি অধিক মর্য্যাদাবান মনে করি না, যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ।

* রছুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত করার পুর্বে মদীনা হইতে হজ্জ সমাপনায় আগন্তুক কতিপয় মদীনাবাসী লোকের সঙ্গে মিনা এলাকার এক পর্বত বেষ্টিত স্থানে গোপনভাবে আলাপ আলোচনা

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তবুকের অভিযান যাত্রা না করা সম্পর্কে আমার ঘটনার বিবরণ এই যে, ঐ অভিযান পরিচালিত হওয়াকালীন আমি অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক সামর্থশালী ছিলাম। ইতি-পূর্বে কখনও আমার নিকট দুইটি যানবাহন সঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু ঐ সময় আমার নিকট দুইটি যানবাহন ছিল।

ইতিপূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন অভিযানের ইচ্ছা করিলে পূর্বাহ্নে উহার স্থান নির্দিষ্টরূপে প্রকাশ করিতেন না, বরং গোপনীয়তা রক্ষার্থে অন্য কোন স্থানের (এলাকা বা দিকরূপে) নাম উল্লেখ করিতেন, কিন্তু তবুকের অভিযানে যেহেতু ভীষণ উত্তাপ, অধিক দূরের ছফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রু-সেনার সম্মুখীন ছিলেন, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অভিযানে গন্তব্য স্থান ইত্যাদি সবকিছু সুস্পষ্টরূপে পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেন সকলেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হয়।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বহু সংখ্যক লোক ছিল এবং তাঁহাদের নামসমূহ কোন রেজিষ্টার ইত্যাদিতে লিখিত ছিল না। অতএব যে কোন ব্যক্তি অভিযান যাত্রা হইতে বারণ থাকিতে চাহিলে অতি সহজেই সে তাহা করিতে পারিত এবং অহী মারফৎ খবর জ্ঞাত না করা হইলে তাহার কার্য্য গোপন থাকিবে বলিয়াই ধারণা হইত।

ঐ অভিযান যাত্রার সময়টি এমন সময় ছিল যখন বাগ-বাগিচার ফল পাকিয়াছিল এবং গাছপালা ইত্যাদির ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণসহ সকলেই অভিযান যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিলেন, আমি প্রতিদিন স্থির করি, যাত্রার ব্যবস্থা করিব, কিন্তু তাহা করি না; এই ভাবি যে, যখন ইচ্ছা তখনই ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিব। এইরূপে আমার সময় কাটিতে লাগিল; অন্যান্য লোকগণ কার্য্য সমাধা করিয়া লইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং সকল মোসলমানগণ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করিয়া লইয়াছেন অথচ আমি কিছুই করি নাই। তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম, এক দুই দিনে ব্যবস্থা করিয়া পরে দ্রুতবেগে যাইয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইব। এইরূপে সকলে মদীনা ত্যাগ করতঃ যাত্রা করিয়া গেল, কিন্তু আমি এখনও সেই ভাব নিয়াই আছি— প্রতিদিন বাড়ী হইতে এই ইচ্ছা করিয়া বাহির হই যে, অন্য সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিব, কিন্তু কিছুই করি না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, এমনকি অভিযাত্রী দল অনেক

করিয়াছিলেন। ঐ লোকগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদীনায় ইসলামের প্রভাব ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাই আকাবার ঘটনা। যেহেতু এই ঘটনা ইসলামের সমুদয় উন্নতির মূল ভিত্তিস্বরূপে ছিল, তাই উহার ফজিলত অনেক বেশী। ঐ ঘটনা-স্থলটি "আকাবা" নামে প্রসিদ্ধ, বর্ত্তমানে তথায় একটি মসজিদ আছে। আমি নরাধমকে একাধিকবার তথায় উপস্থিত হইবার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন।

দূর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখনও আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমি দ্রুত চলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইব। যদি সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করিতাম তবে মঙ্গলই ছিল, কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে জোটে নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমার আর যাত্রা করা হইল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এই বিষয়টি আমার মনে বড় অস্বস্তি সৃষ্টি করিত যে, সারা মদীনা ঘুরিয়া একমাত্র ঐ ব্যক্তিদেরকেই দেখিতে পাই যাহারা মোনাফেক পরিচিত ছিল বা অক্ষম—মাজুর ছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। কিন্তু তবুকে পৌঁছিয়া একদা তিনি অন্যান্য লোকদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন; ঐ দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কায়া'ব ইবনে মালেক কি করিল? বনু-ছালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। তাঁহার ধন-দৌলত এবং আত্ম গর্ব তাহাকে আসিতে দেয় নাই। তদুত্তরে মোয়া'জ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, তুমি ভাল কথা বল নাই। ইয়া রসুলাল্লাহ। খোদার কসম—আমরা তাঁহাকে উত্তম ও খাঁটীই জানি। এই মন্তব্যের উপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ রহিলেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিয়াছেন তখন অন্তরে ভাবনা-চিন্তার ভিড় জমিতে লাগিল এবং আমি নানাপ্রকার মিথ্যা সাজাইতে লাগিলাম। মনে মনে ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে, কি বলিয়া আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব? এই সম্পর্কে আমি আমার পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হইতে পরামর্শও গ্রহণ করিতে লাগিলাম। যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন সব মিথ্যা আমার হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল এবং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, এমন কোন ব্যবস্থার দ্বারা আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব না যাহার মধ্যে মিথ্যার লেশ থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি দৃঢ় পণ করিলাম যে, হযরতের সম্মুখে আমি সত্যই প্রকাশ করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ভোর বেলা মদীনায় উপনিত হইলেন। তিনি ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বপ্রথম মসজিদে যাইতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন; অতঃপর লোকদের প্রতি ফিরিয়া বসিতেন। এই ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ করিলেন তখন এমন ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হইতে লাগিল যাহারা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল না। ঐ শ্রেণীভুক্ত মোনাফেক ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মিছামিছি ওজর আপত্তি পেশ করতঃ মিথ্যা কসম খাইতে লাগিল। ঐরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যা আশির উর্দ্ধে ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের ওজর গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং পুনঃ বাহিক

বায়আ'ত তথা আনুগত্যের দীক্ষা তাহাদের হইতে গ্রহণ করিলেন, তাহাদের মাগফেরাতের দোয়াও করিলেন, কিন্তু ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ তায়ালার হাওয়ালা।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিলাম। হযরত (দঃ) অন্তরে রাগ পোষণকারী ব্যক্তির ন্যায় (কড়া দৃষ্টির সহিত) সামান্য মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন এবং অধিক নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ করিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া হযরতের সম্মুখে বসিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে এই জেহাদে অংশ নেও নাই—তুমি কি যানবাহন ক্রয় করিয়াছিলে না? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—করিয়াছিলাম। কসম খোদার—আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি আপনি ভিন্ন কোন দুনিয়াদার মানুষের সম্মুখে বসিতাম তবে আমি আশা করিতে পারিতাম যে, মিথ্যা ওজর দেখাইয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব, আমি তর্কে বিশেষ পটু। কিন্তু ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অদ্য যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া আপনাকে সন্তুষ্টও করি, তবুও আল্লাহ তায়ালা অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারেন। আর অদ্য যদি আমি সত্য বলি যদ্দরুন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তবুও আমি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ক্ষমার আশা করি।

অতএব আমি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করিতেছি; বস্তুতঃ আমার কোন ওজর বা বাধা-বিঘ্ন ছিল না। এই অভিযানে আমি সর্বাধিক শক্তি ও সামর্থশালী ছিলাম।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব কিছু শ্রবণান্তে বলিলেন, সে সব কিছু সত্য বলিয়াছে। অতঃপর আমাকে বলিলেন, তুমি এখন চলিয়া যাও; যাবৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমার এই অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু ফয়ছালা না করেন (তাবৎ তোমাকে অপরাধী গণ্য করা হইবে)। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। বনু-সালেমা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমার প্রতি ছুটিয়া আসিল এবং আমাকে বুঝ দিতে লাগিল যে, আমরা যতটুকু জানি ইতিপূর্বে তুমি আর কোন গোনাহ কর নাই। তুমি কি অন্যান্যদের ন্যায় কোন একটি ওজর পেশ করিয়া দিতে পারিলে না? ইহাতে যদি তোমার গোনাহ হইত তবে হযরতের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা উহা মাফ হইয়া যাইত। এইরূপে তাহারা আমাকে বুঝ-প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিল এবং তিরস্কার করিতে লাগিল, এমনকি আমি পূর্বেকার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কল্পনা করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার ন্যায় আরও কেহ এইরূপ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, হাঁ—আরও দুই জন তোমার ন্যায়ই বলিয়াছেন এবং তাহাদের সম্পর্কেও রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপই বলিয়াছেন যাহা তোমার জন্য বলিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তাহারা বলিল, একজন মুরারাতুবনুর-রবী, অপর জন হেলাল ইবনে উমাইয়া। তাহারা এমন দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিল যাঁহারা অতি মহৎ ও বিশিষ্ট ছিলেন এবং

বদর জেহাদের মোজাহেদ ছিলেন; এমন ব্যক্তিদ্বয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাই ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম উল্লেখ করার পর আমি স্বীয় পূর্ব মতের উপরই দৃঢ় হইয়া গেলাম।

রসুলুল্লাহ (দঃ) সকল মোসলমানকে আমাদের তিন জনের সঙ্গে সর্বপ্রকার কথাবার্তা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। আমরা ভিন্ন অন্য (যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল না, কিন্তু তাহারা মোনাফেক; মিথ্যা শপথ করিয়া ওজর পেশ করিয়াছিল তাহাদের) কাহারও প্রতি এইরূপ কোন ব্যবস্থা হযরতের পক্ষ হইতে গৃহিত হইয়াছিল না—যেরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমাদের জন্য হইল।

হযরতের আদেশ অনুসারে সমস্ত মোসলমানগণ আমাদের সঙ্গে সকল প্রকার আচার-অনুষ্ঠান কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল। সমস্ত লোকের সম্পর্কই আমাদের সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া গেল, এমনকি আমাদের দেশ যেন বিদেশে পরিণত হইয়া গেল—এই দেশ যেন আমাদের পরিচিত দেশই নহে। এই অবস্থায়ই আমাদের তিন জনের দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

আমার সঙ্গীদ্বয় ত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, গৃহে আবদ্ধ জীবন কাটাইতে লাগিলেন এবং দিবা-রাত্রি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি যেহেতু আধাবয়সী শক্তিবান ও সাহসী পুরুষ ছিলাম, তাই আমি বাহিরে আসিতাম, সকল মোসলমানের সঙ্গে জামাতে নামায পড়িতাম, বাজারে চলাফেরা করিতাম, কিন্তু আমার সঙ্গে কেহই কথাবার্তা বলিতেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতেও উপস্থিত হইতাম এবং সালাম করিতাম—যখন তিনি নামাযান্তে সকলকে লইয়া মজলিস করিতেন। আমি সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিতাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার সালামের উত্তর দানে ঠোঁট নাড়িয়াছেন কি? আমি হযরতের নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়িতে দাঁড়াইতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতাম। আমি তাঁহাকে দেখিতাম যে, আমি যখন নামাযের প্রতি ধ্যান মগ্ন থাকি তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যখন আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি তখন তিনি স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন।

লোকদের এইরূপ কঠোর ব্যবহার আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল চলিতে লাগিল। একদা আমি আবু কাতাদা (রাঃ) নামক ব্যক্তির বাগানের দেয়াল টপকিয়া প্রবেশ করিলাম; ঐ ব্যক্তি আমার চাচাত ভাই ছিলেন এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি বলিলাম, হে আবু কাতাদা! আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কি জ্ঞাত নহেন যে, আমি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে খাঁটী ভাবে ভালবাসি ও ভক্তি করি; আমি খাঁটী মোসলমান? তিনি এই কথারও উত্তর দিলেন না; চুপ রহিলেন। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলাম এবং আল্লার কসম দিলাম। এইবার তিনি এতটুকু বলিলেন, আল্লাহ

এবং আল্লার রসুল সর্বজ্ঞ। এতদৃষ্টে আমার চক্ষুদ্বয় দর দর করিয়া বহিতে লাগিল; আমি পুনঃ দেয়াল টপকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে চলাফেরা করিতে ছিলাম হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, সিরিয়া হইতে আগন্তুক এক কৃষক বনিক যে মদীনার বাজারে স্বীয় পণ্য বিক্রি করিতে আসিয়াছিল সে বলিতেছে, আমাকে কায়া'ব ইবনে মালেকের পরিচয় করাইয়া দিবার কেহ আছেন কি? সকলেই তাহাকে আমার প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিতেছিলেন। সে আমার নিকট আসিয়া একখানা লিপি আমাকে দিল; লিপিখানা তবুক অভিযানের বিপক্ষ পার্টি গাচ্ছান-গোত্রীয় রাজার লিখিত ছিল। ঐ রাজা লিখিয়াছিলেন—

اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك
الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك

"শ্রদ্ধা নিবেদনের পর—আমি জানিতে পারিলাম, আপনার দলীয় প্রধান আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। আপনি মর্য্যাদাহীন আশ্রয়হীন মানুষ নহেন, আপনি আমাদের দেশে আসুন; আমরা আপনার সাহায্য সহায়তা করিব।"

লিপিখানা পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, আমার পক্ষে ইহাও আর একটি পরীক্ষা। আমি লিপিখানাকে চুলার মধ্যে দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিলাম। তখন আমাদের সর্বমোট পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে সংবাদবাহক এক ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, আপনার স্ত্রীও আপনার হইতে পৃথক থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তালাক দিয়া দিব কি—না অন্য কিছু করিব? তিনি বলিলেন, তালাক দিতে হইবে না, তবে আপনাকে পৃথক থাকিতে হইবে—আপনি তাহার নিকটবর্তী হইতে পারিবেন না। আমার অপর সঙ্গিদয়ের প্রতিও এই আদেশ পৌছান হইল। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও; যাবৎ আল্লাহ তায়ালা আমার কোন ফয়সালা না করেন তথায়ই থাকিও।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গী হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী এই আদেশ পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, যে কোন সময় সে আকস্মিক কোন বিপদে পতিত হইতে পারে, তাহার কোন চাকর-নওকর নাই, আমি তাহার খেদমত করিয়া দিব ইহাও কি নিষিদ্ধ? হযরত (দঃ) বলিলেন, এতটুকু করিতে পার, কিন্তু সে তোমার বিছানায় আসিতে পারিবে না। স্ত্রী বলিলেন, এই সম্পর্কে তাঁহার কোন আকর্ষণ ও অনুভূতিই নাই, তিনি ত ঘটনার প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত দিবা-রাত্র কাঁদিয়াই কাটাইতেছেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমাকে কেহ কেহ এই পরামর্শ দিলেন যে, আপনিও যদি স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অনুমতি চাহিতেন যেরূপ হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী অনুমতি লইয়াছে। আমি বলিলাম, আমি কখনও ঐরূপ অনুমতি চাহিব না, আমি বৃদ্ধ নহি; আমার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন তাহা কে বলিতে পারে? এই অবস্থায় আরও দশদিন অতিবাহিত হইয়া পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সর্বদা আমার সর্বাধিক চিন্তা এই ছিল যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তবে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার জানাযার নামায পড়িবেন না, কিম্বা আমি এই অবস্থায় থাকাকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) যদি ইহ জগৎ ত্যাগ করিয়া যান তবে চিরদিনের জন্য আমি এই অবস্থায় থাকিয়া যাইব—কেহই আমার সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং আমার জানাযার নামায পড়িবেন না।

পঞ্চাশতম দিনের রাত্রি শেষে ফজরের নামাযান্তে আমি আমার গৃহের ছাদের উপর বসিয়া ছিলাম, আমার অবস্থাও ঐ ছিল যাহা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার নিজের জান-প্রাণ যেন আমার জন্য জঞ্জাল হইয়া পড়িয়া ছিল এবং সমগ্র জগৎ যেন আমার জন্য সংকীর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, এক চীৎকার-কারী সালা' পাহাড়ের উপর চড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, হে কায়া'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই শব্দ আমার কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম; আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুদিন আসিয়াছে।

ঘটনা এই ছিল যে, ঐ রাত্রিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে ছিলেন। রাত্রি যখন এক তৃতীয়াংশ বাকী রহিয়াছে এমন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উম্মে-সালামা! কায়া'ব ইবনে মালেকের তওবা কবুল হইয়াছে; তাহার অপরাধ ক্ষমা করা সম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। উম্মে-সালামা (রাঃ) বলিলেন, এখনই তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলে লোকের ভীষণ ভিড় হইবে (এবং সকলেরই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে।) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন ফজরের নামায হইতে অবসর হইলেন তখন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তখন আমার প্রতি এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি বহু লোক সুসংবাদ দানের জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত ছুটিল, আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া চীৎকার করিল, তাহার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুত পৌঁছিল। চীৎকারকারী যখন সুসংবাদ দানের জন্য আমার নিকটে পৌঁছিলেন তখন আমি (অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে কাপড় ধার করতঃ) আমার নিজের পরিধেয় কাপড় তাহাকে সুসংবাদ দানের প্রতিদান স্বরূপ

প্রদান করিলাম। ঐ সময় ঐ দুইটি কাপড় ভিন্ন আর কোন কাপড় আমার প্রস্তুত ছিল না; তাই আমি ধার করিয়া কাপড় পরিলাম।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইলাম; মানুষ দলে দলে আমাকে মোবারকবাদ জানাইবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বলিতেছিল—لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ তোমার জন্য মোবারক ও মঙ্গল হউক যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করিয়াছেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি লোকদের এইরূপ মোবারকবাদ ধ্বনির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং মসজিদে প্রবেশ করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক জমা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) দ্রুত আমার প্রতি ছুটিয়া আসিলেন এবং মোবারকবাদ দান করতঃ মোছাফাহা করিলেন, তিনি ব্যতীত মোহাজেরগণ হইতে অন্য আর কেহই আমার প্রতি এইরূপে আসেন নাই; আমি তাঁহার এই ভালবাসা-পূর্ণ ব্যবহার কখনও ভুলিতে পরিব না।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম তখন তাঁহার চেহারা মোবারক আনন্দে ঝকঝক করিতেছিল, তিনি আমাকে বলিলেন—

أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

"তোমার জন্মদিন হইতে এই পর্য্যন্ত সর্বাধিক উত্তম দিন অদ্যকার দিনটির সুসংবাদ তুমি গ্রহণ কর।" আমি আরজ করিলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার নিজ পক্ষ হইতে না—আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার নিজ পক্ষ হইতে নহে, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন ঘটনায় সন্তুষ্ট হইতেন তখন তাঁহার চেহারা মোবারক পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝকঝক করিত—যাহা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকিতাম।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে বসিয়া আরজ করিলাম, আমার তওবার সম্পূর্ণতা স্বরূপ ইহাও ইচ্ছা করিতেছি যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আমার সমুদয় ধন-সম্পদ ছদকা করিয়া দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিছু পরিমান ধন তুমি নিজের জন্যও রাখ; ইহাই উত্তম। আমি আরজ করিলাম, খয়বর এলাকায় যে সম্পত্তির অংশ আমার আছে উহা আমার নিজের জন্য রাখিলাম, অন্য সব সম্পত্তি ছদকাহ করিয়া দিলাম।

আমি আরও আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সত্যের বদৌলতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই আমার দৃঢ় অঙ্গিকার এই যে, চিরজীবন

সত্যের উপরই থাকিব। আল্লাহ তায়ালা সত্যের প্রতিদানে যে নেয়ামত আমাকে দান করিয়াছেন এইরূপ আর কাহাকেও দান করেন নাই।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, যেই দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এই অঙ্গিকারের উল্লেখ করিয়াছি সেই দিন হইতে অদ্য (বর্ণনার সময়) পর্য্যন্ত সত্যের বিপরীত শব্দ মুখেও আমি আনি নাই; আশা করি বাকী জীবনেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে মিথ্যা হইতে এইরূপ হেফাজতই করিবেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্পর্কে যেই আয়াত নাযেল করিয়াছিলেন তাহা এই—

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ

الْعُسْرَةِ......ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ......

অর্থ—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ-দৃষ্টি ছিল নবীজীর উপর এবং মোহাজের ও আনছারগণের উপর যাহারা ভীষণ কষ্টের মুহূর্তেও অনুগত রহিয়াছে, অথচ একদল লোকের মনোভাব ভিন্ন ধরণের হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ দৃষ্টি তাহাদের প্রতিও হইয়াছিল; আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি স্নেহশীল দয়ালু। এতদ্ভিন্ন ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি হইয়াছে (তথা তাহাদের তওবা কবুল হইয়াছে এবং অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে) যাহাদের সম্পর্কে ফয়ছালাহ্ মুলতবী রাখা হইয়াছিল; এমনকি জগৎ তাহাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাদের নিজের জান নিজের উপর জঞ্জাল মনে হইতে লাগিল এবং তাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়া নিল যে, আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করিলেন; যেন তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হইতে পারে; আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহশীল দয়ালু। হে ঈমানদারগণ! নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তি সৃষ্টি কর এবং (উহা লাভের জন্য) সত্য ও খাঁটী লোকদের সঙ্গী হইয়া থাক। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইসলাম গ্রহণের পর ইহার তুল্য কোন নেয়ামত আমার উপর হয় নাই—আমি যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সত্য বলিতে পারিয়াছি, আমি যে, তাঁহার নিকট মিথ্যা বলি নাই—যদ্দরুন আমিও ঐরূপ ধ্বংস হইতাম যেরূপ অন্যান্য মিথ্যা ওজর প্রকাশকারীগণ ধ্বংস হইয়াছে। সেই মিথ্যাবাদীগণ সম্পর্কে যখন অহী নাযেল হইয়াছে তখন তাহাদিগকে অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্যের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ - فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ - إِنَّهُمْ رِجْسٌ - وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ........

অর্থ—(মোনাফেকরা নানা প্রকার অজুহাত ও মিথ্যা ওজর দেখাইয়া তবুকের অভিযানে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছে;) যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে তখন তাহারা পুনঃ মিথ্যা কসম করিয়া নানাপ্রকার উক্তি করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না কর। আচ্ছা—তাহাদের ব্যাপারে তাহাই কর। ইহারা অপবিত্র, ইহাদের অবস্থান-স্থল হইবে জাহান্নাম—ইহা তাহাদের কর্মের ফল। তাহারা মিথ্যা কসমের আশ্রয় লইবে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। যদিও তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এইসব নাফরমান দলের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবেন না। (১১ পাঃ ১ রুঃ)

তবুক অভিযানের পথে পুর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তি

১৫৭০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন "হেজর" বস্তির নিকটবর্তী পৌছিলেন তখন তিনি সঙ্গীগণকে বলিলেন, যাহারা আল্লাহদ্রোহিতা করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করতঃ ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের বস্তিতে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমাদের মধ্যে (আল্লার ভয়ে) ক্রন্দনের সৃষ্টি হয়। (যদি ক্রন্দনের বা ক্রন্দনাবস্থার সৃষ্টি না হয় তবে তথায় প্রবেশ করিও না;) নতুবা ভয় হয়, তোমাদের উপরও ঐরূপ আজাব আসিয়া পড়ে নাকি যেইরূপ এই বস্তিবাসীদের উপর আসিয়াছিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় চাদরে আবৃত হইয়া দ্রুতবেগে ঐ এলাকা অতিক্রম করিলেন।

১৫৭১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তবুকের পথে) যখন "হেজর" এলাকায় পৌছিলেন তখন সকলকে এই নির্দেশ দিলেন যে, কেহ যেন এই এলাকার কূপসমূহ হইতে পানি পান না করে এবং পান করার জন্য পানি সংগ্রহ না করে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আমরা ত এই পানি দ্বারা আটা তৈরী করিয়াছি এবং পানের জন্য পানি সংগ্রহ করিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ঐ আটা ফেলিয়া দাও এবং পানিও ফেলিয়া দাও। ৪৭৮ পৃঃ

১৫৭২। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (তবুকের পথে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী লোকগণ যখন ছামুদ জাতির বস্তি "হেজর" এলাকায় পৌছিলেন তখন তাঁহারা তথাকার কূপসমূহ হইতে পানীয় পানি

সংগ্রহ করিলেন এবং ঐ পানি দ্বারা আটা তৈরী করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, সংগৃহীত পানি ফেলিয়া দাও এবং ঐ পানি দ্বারা তৈরী আটা উটকে খাওয়াইয়া ফেল।

ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের মো'জেযার উটটি যেই কূপ হইতে পানি পান করিত সকলকে সেই কূপ হইতে পানি পান করার আদেশ করিলেন। ৪৭৮ পৃঃ

ব্যাখ্যাঃ—পয়গাম্বর হযরত ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের বংশধর ছিল ছামুদ জাতি, তাহাদের বাসস্থান ছিল "হেজর" নামক এলাকায়। তাহারা স্বীয় পয়গাম্বরকে অস্বীকার করিল। অবশেষে তাহারা একটি বড় পাথর বা সম্মুখস্ত পাহাড় দেখাইয়া ছালেহ্ (আঃ) কে বলিল, আপনি যদি এই পাথর বা পাহাড় হইতে একটি উট বাহির করিয়া দিতে পারেন তবে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিব। ছালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে এইরূপে আল্লার রসুলকে চ্যালেঞ্জ করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা সেই দিকে কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের কথার উপর দৃঢ় রহিল। ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন; তৎক্ষণাৎ সকলের চাক্ষুস দৃষ্টিতে পাথরটি প্রসবিনীর ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে উহা ফাটিয়া একটি বয়স্কা মাদি উট বাহির হইয়া আসিল। এতদৃষ্টেও ঐ সমস্ত লোকেরা ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের প্রতি ঈমান আনিল না।

সেই উটটি ছিল বিরাট দেহবিশিষ্ট, উহার পানাহার ছিল সাধারণ নিয়ম হইতে অধিক। সেই দেশে পানির সঙ্কতা ছিল, তথায় একটি বিশেষ কূপ ছিল—উহা হইতে সাধারণতঃ বস্তিবাসিরা পানি সংগ্রহ করিয়া থাকিত। ঐ উট সেই কূপের সমুদয় পানি একাই পান করিয়া ফেলিত; ইহাতে বস্তিবাসীরা ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, এক দিনের পানি বস্তিবাসীগণ নিবে আর এক দিনের পানি ঐ উট পান করিবে। বস্তিবাসীরা নিজেরাই ঐ উট চাহিয়া লইয়াছিল, তাই তাহাদিগকে উহার ব্যয় বহনে বিরক্ত হওয়া উচিৎ ছিল না, কিন্তু তাহারা ঐ উটকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। ছালেহ্ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন এবং ঐরূপ কার্য্যের ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার আজাব নামিয়া আসিবে বলিয়া সংবাদ দিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না। সকলে মিলিয়া একজন লোককে উহার হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য সাব্যস্ত করিল এবং সকলে তাহার সাহায্য সমর্থন করিল। একদা সে ঐ উটকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার আজাব নামিয়া আসিল—এক বিকট শব্দের গর্জনে সমুদয় বস্তীবাসী মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

মদীনা হইতে তবুকের পথে ঐ বস্তি অবস্থিত; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের অভিযানে ঐ বস্তি অতিক্রম করা কালে পূর্বোল্লিখিত হাদীছ সমূহের নির্দেশাবলী প্রদান করিয়াছিলেন।

আল্লার গজবের স্থানে উপস্থিত হইয়াও অন্তরে আল্লার ভয় সঞ্চারিত না হওয়া মস্তবড় কুলক্ষণ। এইরূপ নির্ভীকতার পরিণামে আল্লাহ তায়ালার গজব নামিয়া আসা বিচিত্র নহে, তাই নবী (দঃ) ছামুদ জাতির বস্তিতে পৌঁছিয়া নিজেও ভয়াক্রান্ত হইয়া আল্লার হুজুরে কাতরতা অবলম্বন করিলেন এবং সঙ্গীগণকে ঐ অবস্থা সঞ্চারের আদেশ করিলেন। এমনকি এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী (দঃ) সকলকে ক্রন্দন সৃষ্টির আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, ক্রন্দন না আসিলে ক্রন্দনের ভাব ও অবস্থা নিশ্চয়ই অবলম্বন করিবে।

ঐ এলাকার কূপসমুহের পানি ব্যবহার করিতেও নিষেধ করিলেন, কারণ উহা আল্লাহদ্রোহী আল্লার গজবাক্রান্ত লোকদের ব্যবহৃত ছিল। অবশ্য ছালেহ্ আলাইহেচ্ছালামের মোজেযার উটটি আল্লাহ প্রদত্ত বিশিষ্ট বস্তু ও বরকতের জিনিষ ছিল, তাই উহার ব্যবহৃত কূপ হইতে পানি পানের আদেশ দিয়াছিলেন।

১৫৭৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনে মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া বলিলেন, মদীনাতে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপ রহিয়াছে যাহারা তোমাদের প্রত্যেক পদে পদে তোমাদের সঙ্গীরূপে গণ্য ছিল; অথচ তাহারা মদীনায়ই অবস্থানরত। ছাহাবীগণ আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা মদীনাতেই অবস্থান করিতেছিল? উত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—তাহারা মদীনাতেই অবস্থানরত। অবশ্য জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য তাহাদের অন্তর ভরা আকাঙ্খা ও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাস্তব ওজর ও অক্ষমতার দরুণ তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

বহির্বিশ্বের প্রতিনিধিদল সমুহের আগমন

অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে নবীজী (দঃ) মহাবিজয় তথা মক্কা ও উহার নিকটবর্তী সমুদয় এলাকার জয় লাভ করিলেন। সমগ্র আরবে মোসলমানদের বিজয় সূচিত হইল। ইহার মাত্র ৮/৯ মাস পরেই বহিঃ আরবে তৎকালীন বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তি রোমানরা বিরাট শক্তি লইয়া মদীনা আক্রমনের প্রস্তুতি করিতেছিল। নবীজী (দঃ) সংবাদ পাইয়া তাঁহার জীবনের সর্ববৃহৎ অভিযানে মদীনা হইতে দীর্ঘ এক মাসের পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদের সীমান্তে পৌঁছিলেন এবং বিশ দিন তথায় তাহাদের অপেক্ষা করিলেন। অচিরেই তাহাদের মদীনা আক্রমনের সাধ মিটিয়া গেল। এইবার তৎকালীন বিশ্বের সর্বত্রই মোসলমানদের

প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলে সমগ্র প্রতিবেশী এলাকা হইতে ইসলাম ও আনুগত্যের সওগাত লইয়া নবীজীর নিকট দলের পর দল প্রতিনিধিবৃন্দ আসিতে লাগিল; পবিত্র কোরআন যাহার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল—

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ

"অর্থাৎ—অচিরেই আপনার প্রতি আল্লার সাহায্য ও বিজয় সূচিত হইবে এবং দেখিতে পাইবেন—লোক-সমাজ দলে দলে আল্লার দ্বীনে আসিতেছে।" মহাবিজয়ের পর নবম হিজরীতে বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নবীজীর নিকট বহু সংখ্যক প্রতিনিধিদলের আগমন হইয়াছিল। তাই ইতিহাসে নবম হিজরী সনকে "আ'মুল-ওফুদ—প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর" বলা হয়। সত্তরের অধিক প্রতিনিধিদল নবীজীর নিকট আসিয়াছিল।

তায়েফের প্রতিনিধিদল:

তবুক অভিযান হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই প্রথমে তায়েফবাসীদের প্রতিনিধি-দল মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিল।

তায়েফ অভিযানের বর্ণনায় বলা হইয়াছিল, তায়েফবাসী ছকীফ গোত্র তাহাদের সুদৃঢ় কেল্লায় আশ্রয় লইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ (দঃ) দীর্ঘ দিন কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় সমাপ্ত হইয়া ছিল না। হযরত (দঃ) তথায় অধিক রক্তপাত করা বা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন এবং অভিযান মুলতবী রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কা'বা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণ স্বরূপ হযরত (দঃ) ওমরাব্রত পালন পূর্বক মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। হযরত (দঃ) এখনও মদীনায় পৌঁছেন নাই—পথিমধ্যেই তায়েফবাসীদের বিশিষ্ট সর্দার ওরওয়া-ইবনে মসউদ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াই হযরতের নিকট অনুমতি চাহিলেন, নিজ এলাকায় ইসলাম প্রচারের। হযরত (দঃ) আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমাদের এলাকাবাসী তোমাকে হত্যা না করিয়া ফেলে! ওরওয়া (রাঃ) বলিলেন, আমার প্রতি দেশের লোকগণ অত্যধিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রাখে; কেহ আমার বিরোধীতা করিবে না। সেমতে ওরওয়া (রাঃ) তায়েফে আসিয়া নিজ গৃহ ছাদে উঠিলেন এবং লোকদেরকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন; নিজের ইসলামও তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। তায়েফবাসীরা তাঁহার মান-মর্য্যাদার কোনই মূল্য দিল না— তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

ওরওয়া (রাঃ)কে শহীদ করার পর তায়েফবাসীদের মনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তাহাদের সমবেত পরামর্শে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রতিনিধিদল

প্রেরণ সাব্যস্ত হইল। তাহাদের মধ্যে আব্দ-ইয়ালীল নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল; তাহাকেই অপর পাঁচ ব্যক্তিসহ মদীনায় প্রেরণ করা হইল। হযরত (দঃ) তবুক অভিযান হইতে মদীনায় পৌঁছিয়াছেন সেই সময়েই উক্ত প্রতিনিধিদল মদীনায় উপস্থিত হইল। ইসলাম গ্রহণে তাহারা বিভিন্ন শর্ত আরোপ করিতে চাহিল—তাহারা নামায পড়া হইতে অব্যাহতি চাহিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, নামাযহীন ধর্ম প্রাণহীন, অতএব নামায মাফ হইতে পারে না। তাহারা জেনা—ব্যভিচারের অনুমতি চাহিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা জেনা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন; উহার অনুমতি দেওয়া যায় না। তাহারা সুদের অনুমতিও চাহিয়াছিল; হযরত (দ.) বলিলেন, সুদকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়াছেন উহারও অনুমতি দেওয়া যায় না। এই সব আলোচনার পর তাহারা হযরতের অসাক্ষাতে পরামর্শে বসিল; পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, সব কিছু স্বীকার করিয়া নেওয়াই কর্তব্য, নতুবা আমাদের পরিণাম মক্কাবাসীদের ন্যায়ই হইবে।

পুনঃ আলোচনা আরম্ভ করিয়া তাহারা এইবার শুধু একটি শর্ত চাহিল যে, আমাদের দেবীমূর্তি ভাঙ্গা হইবে না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। অতঃপর তাহারা উহা ভাঙ্গিতে এক মাসের অবকাশ চাহিল; হযরত (দঃ) তাহাতেও সম্মত হইলেন না। সর্বশেষ অনুরোধ তাহাদের এই হইল যে, আমাদের নিজ হাতে আমরা উহা ভাঙ্গিব না। হযরত (দঃ) তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষার স্বীকৃতি দিলেন। কারণ, নিজ হাতে উহা ভাঙ্গার মধ্যে অশিক্ষিত জনসাধারণের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই উহা এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। অবশেষে তাহারা সমবেতভাবে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। (আছাহ্‌-হুছ-সিয়ার, ৪৫০)

বনু-তামীম প্রতিনিধি দল :

বনু-তামীম প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইল; তাহারা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাকল্পে সঙ্গে একজন বিশিষ্ট বাগ্মি বক্তা আর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত কবি নিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের বক্তা তাহাদের গোত্রীয় গর্ব বর্ণনায় বক্তৃতা দিল। হযরত (দঃ) উহার উত্তরে মদীনাবাসী ছাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) বিশিষ্ট বক্তাকে দাঁড়া করিলেন। তিনি নবীজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কর্মধারার বিবরণ দান করিলেন। অতঃপর তাহাদের কবি দাঁড়াইল এবং গোত্রীয় গর্ব বর্ণনায় কবিতা পাঠ করিল। হযরত (দঃ) উহার উত্তরে ছাহাবীগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি হাচ্ছান (রাঃ)কে দাঁড়া করিলেন; তিনি নবীজীর প্রশংসায় চমৎকার এক কবিতা পাঠ করিলেন।

ছাহাবীগণের মধ্যে কোন জিনিষের অভাব ছিল না; বনু-তামীমরা স্বীকার করিল, আমাদের বক্তা অপেক্ষা মোসলমানদের বক্তা উত্তম, আমাদের কবি অপেক্ষা মোসলমানদের কবি উত্তম। অতঃপর তাহারা সমবেত ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিল। (আছাহ-হুছ-সিয়ার ৩৪১)

১৫৭৪। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু-তামীম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিনটি কথা শুনিবার পর হইতে তাহাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছে। রসুল (দঃ) বলিয়াছেন, (১) বনু তামীমগণ আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জালের মোকাবিলায় সর্বাধিক কঠোর হইবে। (২) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট ঐ গোত্রীয় একটি দাসী ছিল; হযরত (দঃ) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, সে ইসমাঈল (আঃ) পয়গাম্বরের বংশধর। (৩) উক্ত গোত্রের যাকাত-ফেৎরার মালামাল হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) স্বাদরে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা আমার বংশধরের যাকাত-ফেৎরা। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের বংশধর।)

বনু-হানিফার প্রতিনিধি দল :

বনু-হানিফা গোত্র ইয়ামামা এলাকার অধিবাসী ছিল, তাহাদের বংশীয়ই ছিল ইতিহাস প্রতিদ্ধ মিথ্যা নবী মোসায়লামাহ।

১৫৭৫। হাদীছ :— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে মিথ্যাবাদী মোসায়লামাহ তাহার গোত্রীয় অনেক লোকের প্রতিনিধিদল সহ মদীনায় আসিয়াছিল। সে বলিতেছিল, মোহাম্মদ (দঃ) যদি আমাকে তাঁহার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত নির্দ্ধারিত করেন তবে আমি তাঁহার দলে যোগ দিব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা উদ্দেশ্যে তাহাদের অবস্থান গৃহে তশরিফ আনিলেন; তাঁহার সঙ্গে ছাবেত ইবনে কায়স (রাঃ) ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে একটি খেজুর-ডালি ছিল; হযরত (দঃ) উক্ত ডালির প্রতি ইশারা করিয়া মোসায়লামাহকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট এই ডালিটির দাবী করিলে তাহাও আমি তোমাকে দেওয়ার স্বীকৃতি দিব না। আল্লার ফয়ছালা হইতে তুমি এক চুলও বাহিরে যাইতে পারিবে না; তুমি যদি আমার আনুগত্য হইতে বিরত থাক তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করিবেন; আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি তোমার পরিণতি তাহাই ঘটিবে। ইহাই আমার শেষ কথা; অধিক আলোচনার ইচ্ছা হইলে আমার পক্ষে এই ছাবেত ইবনে কায়স কথা বলিবে—এই বলিয়া হযরত (দঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত স্বপ্নের বিবরণ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হস্তদ্বয়ে দুইটি স্বর্ণ-কঙ্কন; আমি উহাতে বিব্রত হইলাম। অতঃপর স্বপ্নেই আমাকে ওহী দ্বারা আদেশ করা হইল, কঙ্কনদ্বয়কে ফুৎকার মারিয়া দিন। আমি উহাদের প্রতি ফুৎকার মারিলে উভয়টি হাওয়ায় বিলীন হইয়া গেল।

হযরত (দঃ) বলিলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি এই বুঝিয়াছি, আমার নবুয়ত প্রাপ্তির পরে দুই জন মিথ্যাবাদী নবী--একজন আসওয়াদে আনসী অপর জন মোসায়লা তাহাদের পরিণতি এইরূপ বিলুপ্তিই হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—মিথ্যা নবীদের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে আসিবে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বনু-হানিফা গোত্রীয় প্রতিনিধিদল তখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, এমনকি মোসায়লামাহও। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে মোসায়লামাহ ইসলাম ত্যাগ করতঃ নবী হওয়ার দাবী করে; তাহার গোত্রীয় অনেক লোকও তাহার দলে যোগ দেয়। (আছাহ-হুস-সিয়ার ৪৭৯) ঘটনার বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ইয়ামনবাসীদের প্রতিনিধিদলঃ

১৫৭৬। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইয়ামানের দিকে ইশারা করতঃ বলিয়াছেন, ঈমান ঐ দেশে আছে; আর নিষ্ঠুরতা ও পাষাণ হৃদয় ঐ লোকদের মধ্যে হয় যাহারা উট-গরু চরায়—রবিয়া ও মোজার গোত্র যাহাদের বাসস্থান (মদীনা হইতে) পূর্ব দিকে।

১৫৭৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইয়ামনের লোকগণ তোমাদের নিকট আসিয়াছে—তাহাদের অন্তর সর্বাধিক কোমল, হৃদয় সর্বাধিক মোলায়েম। (ঈমানের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ অধিক—) ঈমান যেন ইয়ামানের বস্তু এবং পরিপক্ক জ্ঞানও ইয়ামান দেশের বস্তু। উট-গরুর মালিকদের মধ্যে গর্ব ও অহংকার হইয়া থাকে এবং বকরী-ছাগলের মালিকগণ শান্ত ও ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকে।

১৫৭৮। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা আসিয়াছে; অন্তর তাহাদের অত্যন্ত কোমল, হৃদয় তাহাদের অত্যন্ত নরম। দ্বীন-ইসলামের বুঝ-জ্ঞান যেন ইয়ামন দেশীয় বস্তু এবং পরিপক্ক বিবেক-বুদ্ধিও যেন ইয়ামন দেশীয় বস্তু।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— বিশ্বের অন্যতম খ্রীষ্টানদের চার্চ বা গির্জা ইয়ামনস্থিত "নাজরান" এলাকায় ছিল। উক্ত গির্জার পাদ্রিদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদেরও একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিল; উক্ত ঐতিহাসিক নাজরান-প্রতিনিধিদলের উল্লেখও ইমাম বোখারী (রাঃ) এস্থানে করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ড হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের বয়ানে উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদল হইল—

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল ঃ

ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাঈ-এর গোত্র; তখন হাতেম তাঈ জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্র আ'দী-ইবনে হাতেম ঐ সময় উক্ত গোত্রের প্রধান ছিলেন; তিনি নবীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট ছাহাবীর মর্য্যাদা লাভে ভাগ্যবান হন।

উক্ত গোত্রেয় মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ কে দেড় শত অশ্বারোহী মোজাহেদ সহ পাঠাইয়া ছিলেন। মোসলেম বাহিনীর অভিযান যাত্রার সংবাদ পাইয়া আ'দী-ইবনে হাতেম স্বীয় পরিবারবর্গ সহ সিরিয়ায় পলায়ন করিল। সে নিজে খৃষ্টান ছিল, তাই সিরিয়ার খৃষ্টানদের আশ্রয়ে চলিয়া গেল।

তখন হাতেম তাঈ-এর এক বৃদ্ধা মেয়েও ছিল; স্বীয় ভ্রাতা আ'দী-ইবনে হাতেমের আশ্রিতা ছিল। কিন্তু আ'দী পালাইবার সময় এই ভগ্নিকে সঙ্গে নেয় নাই। মোসলেম বাহিনীর আক্রমণে সে বন্দিনীরূপে মদীনায় উপনীত হয়। নবীজীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা হইলে সে নিবেদন জানাইল, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমার পিতা ইহজগতে নাই; আমার আশ্রয়দাতা আমাকে ফেলিয়া পালাইয়া গিয়াছে; আমি দুর্বল আমার প্রতি দয়া করুন। হযরত (দঃ) তাহাকে তাহার আশ্রয়দাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল, হাতেমের পুত্র আ'দী। হযরত (দঃ) তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং ভ্রাতার নিকট পৌঁছিবার জন্য একটি উট দিলেন। সে ভ্রাতার নিকট পৌঁছিয়া নবীজীর অত্যধিক প্রশংসা করিল। ভ্রাতা আ'দী ইবনে হাতেম এক প্রতিনিধি দলে মদিনায় উপস্থিত হইল; তখন নবীজী (দঃ) মসজিদে উপবিষ্ট। লোকদের মধ্যে বলাবলি হইতে লাগিল, হাতেমের পুত্র আ'দী আসিয়াছে। ইতিপূর্বে হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন, অচিরেই আ'দী পুত্র-হাতেমের হাত আমার হাতে আসিবে। হযরত (দঃ) আ'দীকে নিজ গৃহে নিয়া আসিলেন; একটি বিছানা বিছাইয়া উভয়ে উহার উপর বসিলেন। হযরত (দঃ) স্নেহভরে বলিলেন, হে আ'দী। তুমি কেন পলায়ন করিয়াছ? তুমি কি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ - আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই" ইহার স্বীকৃতি হইতে পালাইয়াছ? তুমি কি মনে কর, আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ আছে? আ'দী বলিল, না। হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, তুমি কি "আল্লাহু আকবর—আল্লাহ—সর্বশ্রেষ্ঠ" ইহা হইতে পালাইয়াছ? তুমি কি মনে কর, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ আছে? আ'দী বলিল, না। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, ইহুদীদের উপর আল্লার গজব রহিয়াছে এবং নাছারা—খৃষ্টানরা পথ ভ্রষ্ট। তৎক্ষণাৎ আ'দী ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। (আছাহ-হুছ সিয়ার ৪৬১)

১৫৭৯। হাদীছ ঃ—আ'দী-ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে খলীফা ওমরের নিকট আসিলাম। তিনি আমাদের এক একজনকে

নাম ডাকিয়া সাক্ষাৎ দান করিতে লাগিলেন; (আমাকে সর্বশেষে ডাকিলেন, তাই) আমার সাক্ষাৎকালে আমি বলিলাম, আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি হে আমিরুল-মোমেনীন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়—তুমি ঐ ব্যক্তি যে (তোমার গোত্রীয়) লোকেরা যখন কাফের ছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলাম হইতে দূরে ছিল তখন তুমি ইসলামের প্রতি অগ্রসর হইয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলামের প্রতি শত্রুতা দেখাইয়াছে তখন তুমি উহাকে পূর্ণ ভালবাসা দিয়াছিলে, লোকেরা যখন ইসলামকে চিনে নাই তখন তুমি ইসলামকে চিনিয়া ছিলে।

আ'দী (রাঃ) বলিলেন, আপনি যখন আমার এতদূর স্বীকৃতি দিয়াছেন তখন আর আমার কোন অভিযোগ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবম হিজরী সনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিচালনায় ঐ বৎসরের হজ্জ সম্পাদন।

হজ্জ পূর্বেই ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু মক্কা নগরী শত্রু কবলিত থাকায় পূর্বে হজ্জ সম্পাদন সম্ভব হয় নাই। অষ্টম হিজরী সনে মক্কা জয় হইল। নবম হিজরীতে বিভিন্ন কারণে নবী (দঃ) হজ্জ সম্পাদনে গেলেন না। হযরত (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে আমীরুল-হজ্জ বানাইয়া ঐ বৎসরের হজ্জ সম্পাদন করাইলেন।

ঘটনার সামান্য বিবরণ প্রথম খণ্ডে ২৪৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উসামা বাহিনী প্রেরণ

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বশেষ অভিযান ছিল তবুকের অভিযান এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ বাহিনী ছিল উসামা বাহিনী। অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় ইহজগৎ ত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হযরত (দঃ) এই বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমনকি ঐ বাহিনীটি মদীনার অনতিদূরে থাকাবস্থায়ই হযরতের ইহ-জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া সকলেই যাত্রা ভঙ্গ করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১১ হিজরী সনের ছফর মাসের মাত্র দুই চারদিন বাকী রহিয়াছে, এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম রোম দেশের প্রতি অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দান করিলেন। হযরতের পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) যাঁহার নেতৃত্বে অষ্টম হিজরীর জোমাদাল-উলা মাসে রোমানদের বিরুদ্ধে পূর্বে বর্ণিত মূতার অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল এবং তিনি তথায় শহীদ হইয়াছিলেন, সেই যায়েদ

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র উসামা (রাঃ)কে হযরত (দঃ) এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উসামা (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, "উব্‌না" নামক স্থান—যথায় তোমার পিতা শহীদ হইয়াছিলেন তুমি সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া রোমানদের উপর আক্রমণ চালাইবে এবং গুপ্তচর ইত্যাদি সহ দ্রুতবেগে তথায় পৌঁছিতে চেষ্টাবান হইবে।

এই সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্বর ও মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন; ইহাই ছিল হযরতের অন্তিম রোগ। এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই হযরত (দঃ) নিজ হস্ত মোবারকে ঐ অভিযানের জন্য যুদ্ধ-ঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিলেন এবং উহা উসামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে অর্পন করিয়া বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া যাত্রা কর, আল্লার রাস্তায় জেহাদ কর, আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও।

আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আবু ওবায়দাহ (রাঃ), সায়াদ (রাঃ) ইত্যাদি মোহাজের ও আনছারগণের বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বহু লোক এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সম্পর্কে কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করিল যে, যেই বাহিনীতে আবুবকর ও ওমরের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছেন, আঠার-বিশ বৎসরের যুবক এবং আরবের নীতি অনুসারে ক্রীতদাসের পুত্র উসামার ন্যায় ব্যক্তি সেই বাহিনীর নেতৃত্ব পদে নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আপত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন এবং দুঃখিত হইলেন। তিনি ব্যাথার যন্ত্রনায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ নিলেন এবং মিম্বারের উপর বসিয়া এই সম্পর্কে উত্তর প্রদান করিলেন। এই দিনটি রবিউল আউয়াল চাঁদের দশ তারিখ শনিবার ছিল।

ইহার পরদিন রবিবার, এইদিন হযরতের পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল, এই অবস্থাতেও হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেছিলেন, উসামা বাহিনীর যাত্রা করিতে হইবে। উসামা (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) বাকশক্তি পরিচালনায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উসামা (রাঃ)কে দেখিয়া হস্তদ্বয় উপরের দিকে উত্তোলন করিলেন অতঃপর উসামার উপর রাখিলেন। উসামা (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেছেন। তিনি মোজাহেদ-ক্যাম্পে চলিয়া আসিলেন। সোমবার দিন পুনঃ হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এই দিন হযরত (দঃ) কথা বলিতে সক্ষম ছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে দোয়া করতঃ বিদায় দান করিলেন এবং যাত্রা করার আদেশ করিলেন।

উসামা (রাঃ) ক্যাম্পে চলিয়া আসিলেন এবং অভিযানে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে সকলকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দান করিলেন। যাত্রার ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হইতেছিল, এমন

সময় উসামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা দ্রুত লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দান করিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র যাত্রা স্থগিত রাখিয়া উসামা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ দ্রুত হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। ঐ দিনই দিনের শেষার্দ্ধে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম চির বিদায় গ্রহণ করিলেন; "ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে আবারাকা অসাল্লাম।"

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণে সব কিছুই মুলতবী হইয়া গেল, অতঃপর আবুবকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সর্বপ্রথম কাজ হইল উসামা বাহিনীকে প্রেরণের পুনঃ ব্যবস্থা করা। এই সম্পর্কে অধিকাংশ ছাহাবী ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হযরতের এন্তেকালে চতুর্দিকে বিদ্রোহের এবং নানা রকম ভুল ধারণা সৃষ্টির হিড়িক উঠিতেছিল। এমতাবস্থায় তিন হাজার মোজাহেদ বাহিনীকে মদীনা হইতে বাহিরে প্রেরণ করাকে ঐ ছাহাবীগণ মদীনার জন্য আশঙ্কার কারণ মনে করিতে ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, বর্তমান অবস্থায় উসামা বাহিনী প্রেরণ বন্ধ রাখা হউক। ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত উসামা বাহিনী প্রেরণে খলীফা আবুবকরের বিরোধিতা করেলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) ক্রোধ ভরে ওমর (রাঃ)কে তিরস্কা'র স্বরে বলিলেন, جبار في الجاهلية خوار في الاسلام "কাফের থাকাকালে ছিলে সিংহ; আর মোসলান-কালে হইয়াছ বিড়াল?"

তিনি আরও বলিলেন, নবীজীর হাতে গাঁথা ঝাণ্ডা আবু বকর খুলিতে পারে না; যদি অন্য কেহ যাইতে প্রস্তুত না-ও হয় তবুও উসামা বাহিনী প্রেরিত হইবে—উসামা অধিনায়ক হইবে এবং আবু বকব সাধারণ সৈনিক হইবে।

শেষ ফলে উসামা বাহিনী প্রেরিত হইল; উহার প্রতিক্রিয়া মোসলমানদের জন্য অত্যন্ত সুফলদায়ক হইল; মোসলমানদের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ সহায়ক হইল। এমনকি উসামা বাহিনী পূর্ণ উদ্যমের সহিত হযরতের নির্দেশিত এলাকায় পৌছিয়া আক্রমণ চালাইল, শত্রুপক্ষকে ভীষণভাবে হেস্তনেস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিল। যেহেতু তখন ঐ দেশ দখল করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং শত্রুগণকে ঘায়েল করা এবং দুর্বল করাই উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বিজয়-গৌরবের সহিত উসামা (রাঃ) তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাস

—·—০—·—

নিখিল সৃষ্টির আদি কথা

নিখিল সৃষ্টির আদি ও গোড়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের অনেক কথা রহিয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সব কোন তথ্য নহে, উহা কিংবদন্তী বৈ নহে। এই তথ্যের উদঘাটন বৈজ্ঞানিকের সামর্থেরও উর্দ্ধে; কারণ, বৈজ্ঞানিক ত নিজেই অনেক পরবর্তী সৃষ্টির একজন। অতএব এই তথ্য উদ্ঘাটনে তাহার প্রচেষ্টা অন্ধের হাতড়ানী তুল্যই হইবে। এ সম্পর্কে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার ওহীপ্রাপ্ত প্রতিনিধি রসুলের কথাই হইবে সঠিক তথ্য—তাহাই হইবে গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি-জগতকে প্রথমবারে (কোন প্রকার উপাদান ব্যতিরেকে) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই উহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন, যাহা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ।"

উপাদান ব্যতিরেকে বস্তু তৈরী করা অপেক্ষা বিকৃত বস্তুর পুনর্গঠন স্বাভাবিক জ্ঞানেই সহজ গণ্য হইয়া থাকে; অবশ্য আল্লাহ তায়ালার কার্য্যে উভয়ই সমান সহজ।

১৫৮০। হাদীছঃ—এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার গৃহের নিকটে আমার উটটি বাঁধিয়া রাখিলাম। তখন তাঁহার খেদমতে বনুতমীম গোত্রের কয়েক ব্যক্তি (সাহায্যের জন্য) উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, আরও অনেকবার সুসংবাদ দান করিয়াছেন, এইবার সাহায্য প্রদান করুন। অতঃপর হযরতের নিকট ইয়ামন দেশের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, ইয়ামনবাসীগণ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর; বনু-তমীমগণ ত উহা গ্রহণ করিল না। ইয়ামনবাসীগণ বলিল, আমরা আপনার সুসংবাদ সাদরে গ্রহণ করিলাম। তাহারা ইহাও বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা সৃষ্টির গোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ـ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ

"আদি হইতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন অন্য আর কিছুই ছিল না। (প্রথমে তিনি পানি সৃষ্টি করিলেন অতঃপর আরশ সৃষ্টি করিলেন;) তখন মহান আরশ পানির উপর ছিল এবং লাওহে-মাহফুজের মধ্যে তিনি (সৃষ্টি জগতের) সব কিছু লিখিয়া দিলেন। অতঃপর (সেই লেখা অনুপাতে প্রথমে) আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করিলেন। তারপর বিভিন্ন সৃষ্টিনিচয় সেই লেখা অনুপাতে সৃষ্টি করিতে থাকিলেন।)

এমরান (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতটুকু বর্ণনা দান করিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে এমরান! তোমার উট ছুটিয়া গিয়াছে, তাই আমি উটের তালাশে চলিয়া গেলাম, উটটি বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। যদি আমি উটের পরওয়া না করিয়া হযরতের বিবরণ শুনিতাম তবে ভাল ছিল।

অন্য এক হাদীছ ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষ ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং সৃষ্টির আদি ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া বেহেশত লাভকারীগণের বেহেশতে প্রবেশ করা পর্য্যন্তের এবং দোযখবাসীদের দোযখে প্রবেশ করা পর্য্যন্তের সমুদয় তথ্য ও বিবরণ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে যে যতটুকু স্মরণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে ততটুকুই স্মরণ রাখিয়াছে।

১৫৮১। হাদীছ :— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَتَمَنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّشْتُمَنِىْ وَيُكَذِّبُنِىْ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اِنَّ لِىْ وَلَدًا وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ لَنْ يُّعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন—রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আদম-তনয় আমার গ্লানি করিতে লিপ্ত হইয়াছে, অথচ আমার গ্লানি করা তাহার পক্ষে অতীব দোষণীয় এবং আমার সত্যতা স্বীকার করে না, অথচ ইহাও তাহার জন্য অতীব দোষণীয়।

আমার গ্লানি এই যে, সে বলে—আমার পুত্র কন্যা আছে। আমার সত্যতা অস্বীকার এই যে, সে বলে—আল্লাহ আমাকে প্রথম বারের ন্যায় পুনঃ জীবিত করিতে পারিবেন না বা করিবেন না।

● মানব সহ সকল সৃষ্টির আদি কথা উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছদ্বয়ে এই প্রমাণিত হয় যে, নিখিল সৃষ্টি, এমনকি মানবকেও প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা উঁহাদের নিজ নিজ স্বত্বায় সৃষ্টি করিয়াছেন ও করেন। অন্য কোন বস্তু বা জীব রূপান্তরিত হইয়া এই সব হয় নাই ও হয় না।

১৫৮২। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى غلبت غضبى -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার পর এই বিষয়টি লিখিত আকারে মহান আরশের উপর লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রহমত আমার গজবের তুলনায় অধিক ও প্রবল আছে এবং থাকিবে।

● এই হাদীছের মর্ম সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টি জগত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি করায় অস্তিত্ববান হইয়াছে—স্বভাবতঃ (NATURALLY) নহে।

ব্যাখ্যা :—আল্লাহ তায়ালার রহমতের আধিক্য ও প্রাবল্যতার প্রতিক্রিয়া এই যে, অনেক ক্ষেত্রে বান্দা স্বীয় কার্য্য ও আমল দ্বারা রহমতের অধিকারী না হইলেও আল্লার রহমত তাহার নিকটে পৌঁছিতে থাকে, পক্ষান্তরে বান্দা স্বীয় কার্য্যকলাপে অপরাধী সাবাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে আল্লার গজবে পতিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অতি সাধারণ নেকীর অছিলায় বহু পরিমাণে আল্লার রহমত লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু গজবের বেলায় সাধারণতঃ ঐরূপ হয় না। এতদ্ভিন্ন ইহাও উহার প্রতিক্রিয়া যে, এক একটি নেক আমলের ছওয়াব দশ গুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয়, কিন্তু গোনাহের কাজে ঐরূপ হয় না। নেক আমলের শুধু নিয়েত করিলেই ছওয়াব লাভ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ গোনাহের কাজ করিলে পর গোনাহ লেখা হয়—ইহাও উহারই প্রতিক্রিয়া।

অবশ্য আইনের ধারা অনুসারে অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদত্ত হইবে—ইহা উহার পরিপন্থি নহে; অপরাধের শাস্তি বস্তুতঃ আইনের ধারা অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং অপরাধ ও শাস্তি উভয়ের সময় ও কালের সমতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; চুরি, ডাকাতি, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি অপরাধ অল্প সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকে কিন্তু উহার শাস্তি তিন বৎসর ছয় বৎসর দশ বৎসর, এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হইয়া থাকে। অপরাধের ধারা অনুসারেই শাস্তি প্রদত্ত হয়। সময়ের সমতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না।

কুফ্‌রী ও আল্লাদ্রোহীতার শাস্তি--অনন্তকাল দোযখের আজাব ভোগ করা এই শাস্তিও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত আইনের ধারা অনুসারেই হইবে। বিদ্রোহীদের শাস্তি-ধারায় শিথিলতা প্রদর্শন করা অনুগতদের প্রতি অবিচার করার শামিল।

আকাশ এবং ভূমণ্ডল উভয়ের সংখ্যা সাত :

الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن

পবিত্র কোরআনের কথা—"আল্লাহ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জমিনও ঐ সংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন।" (২৮ পাঃ ১৮ রুঃ)

১৫৮৩। হাদীছঃ—আবু সালামাহ (রঃ) তাবেয়ীর বিরোধ ছিল কতিপয় লোকের সহিত জমির সীমানা লইয়া। তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট যাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে আবু সালামাহ। জমির ব্যাপারে সতর্ক থাকিও; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যের উপর জুলুম করিয়া হাসিল করিবে কেয়ামতের দিন সাত জমিনের প্রতিটি হইতে ঐ পরিমাণ জমি তাহার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

১১৮৪ এবং ১১৮৫নং হাদীছেও জমিনের সংখ্যা সাত হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত আছে।

উর্দ্ধ জগতের সব কিছু আল্লার সৃষ্টিঃ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ (ভূ-খণ্ডের) নিকটতম আসমানকে আমি অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত করিয়াছি।

১৫৮৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্রকে কেয়ামতের দিন আলোহীন করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫৮৫। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়িতেন; অন্দরে বাহিরে ছুটাছুটি করিতেন এবং তাঁহার চেহারা মোবারক মলিন হইয়া যাইত। অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষিত তখন তিনি শান্ত হইতেন এবং তাঁহার অস্থিরতা দূর হইত। আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, মেঘখণ্ড সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কি বলিবার সাধ্য আছে? পূর্ববর্তী এক উম্মতের লোকগণ তাহাদের বস্তির দিকে মেঘমালা আসিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ইহা তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভীষণ আজাবের বাহক ছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটিতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ— আলোচ্য হাদীছে যেই উম্মতের ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তাহারা হইল হুদ আলাইহেচ্ছালামের উম্মত—আ'দ জাতি। তাহাদের ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে ১৬ পারা, ছুরা আহকাফ, তৃতীয় রুকুতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তাহারা ইয়ামান

দেশের কোন এক মরু অঞ্চলে বসবাস করিত; তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিগকে এক আল্লার এবাদতের প্রতি আহ্বান করিলেন এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা করা হইতে সতর্ক করিতে যাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উপর ভীষণ আজাবের আশঙ্কা করিতেছি। তাহারা স্বীয় শেরেকীর উপর দৃঢ়তা প্রকাশ করতঃ উপহাস স্বরূপ সেই আজাবের দ্রুততা চাহিতে লাগিল। উহার উত্তরে হুদ (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আজাব আসিবার নির্দিষ্ট তারিখ ত আমি অবগত নহি; উহা একমাত্র আল্লাহ জানেন; কিন্তু তোমরা বাস্তবিকই জ্ঞানশূন্য বোকা; নতুবা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা কামনা করিতে না।

অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইল, একটি বিরাট মেঘখণ্ড তাহাদের বস্তি-এলাকার দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা আনন্দোৎফুল্লিত হইয়া বলিতে লাগিল, (হুদ নবী আমাদিগকে আজাবের ভয় দেখাইয়াছিল, অথচ আমরা ত সৌভাগ্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি—) এই ত মেঘমালা আসিতেছে, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।

(আল্লাহ তায়ালা বলেন,) উহা বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা নহে, বরং উহা ঐ আজাব যাহার দ্রুততা তোমরা কামনা করিতেছিলে। ইহা একটি ভীষণ তুফান—তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর আজাব বহন করিয়া আসিতেছে। এই তুফানী বাতাস স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে তোমাদিগকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবে। বাস্তবে তাহাই হইল, সেই বাতাস প্রবল বেগে একাধারে সাত রাত্র আট দিন প্রবাহিত হইল, মানুষ ও পশুপাল ইত্যাদিকে উপরে উঠাইয়া জোরে নিক্ষেপ করতঃ ধ্বংস করিতে লাগিল; একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিল না। তাহাদের এলাকাটি নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়া গেল। আল্লাহ বলেন, আমি অপরাধীদিগকে এইরূপের শাস্তিই দিয়া থাকি। (হে মক্কাবাসী!) আমি ঐ বস্তিবাসীগণকে তোমাদের তুলনায় অধিক বল-শক্তি দান করিয়াছিলাম এবং শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধি ও বিবেকশক্তিও তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম কিন্তু এই শক্তিসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিল না যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমুহকে এনকার করার দরুন তাহাদের উপহাস্য আজাব তাহাদেরে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল।

● মেঘমালার আকৃতিতে ধ্বংসকারী আজাব আগমনের ঘটনা স্মরণ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মেঘমালা দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং যাবৎ উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া উহা আল্লার আজাব নয়, বরং আল্লার রহমত তাহা প্রতিপন্ন না হইত তাবৎ তিনি শান্ত হইতেন না।

যখন বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া ঐরূপ আজাবের আশঙ্কা দুরীভূত হইত তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার দরবারে এইরূপ আবেদন নিবেদন আরম্ভ করিতেন—

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل

"হে আল্লাহ! তৃষ্ণা নিবারক, তৃপ্তিদায়ক, শান্তি আনয়নকারী, উৎপন্ন-শক্তি বাহক, কল্যাণকর, ক্ষয়-ক্ষতিবিহীন বৃষ্টি অবিলম্বে দ্রুত আগমনকারীরূপে আমাদের উপর বর্ষণ কর।"

اللهم صيبا نافعا ۔ اللهم سقيا نافعا

"হে আল্লাহ! কল্যাণ ও মঙ্গলজনক বৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষণ কর।"

● আয়াতে স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঝড়-তুফান বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্নচাপ ইত্যাদি হইতে উৎপত্তি হইলেও বস্তুতঃ উহার "রব" তথা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করায়ই জন্ম নিয়া থাকে। এমনকি উহার প্রলয়ঙ্করী গতি এবং ধ্বংসলীলাও সৃষ্টিকর্তার আদেশেই হইয়া থাকে।

ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণনা

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও তাঁহাদের সত্যবাদীতা, পবিত্রতা ইত্যাদি গুণাগুণে বিশ্বাস রাখা ইসলামের বিশেষ অঙ্গ; এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণ হইবে না, আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। কারণ, ফেরেশতা অস্বীকারের আড়ালে কোরআন ও রসুলের অস্বীকার আসিবে।

কোন কোন ঈমানহীন দল বা ব্যক্তি ফেরেশতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য কোরআন শরীফে বহু আয়াত বিদ্যমান আছে, যে সব আয়াতের মধ্যে ফেরেশতার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রসুল বা প্রতিনিধির অনেক অনেক হাদীছেও ফেরেশতার উল্লেখ আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে এরূপ ৩৫টি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ পূর্বে অনুবাদ হইয়াছে এবং কতিপয় হাদীছ সম্মুখে বিশেষ বিশেষ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে অনূদিত হইবে। অবশিষ্ট কতিপয় হাদীছের অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হইতেছে।

১৫৮৬। হাদীছ:— قال عبد الله رضى الله تعالى عنه

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهٗ اُكْتُبْ عَمَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَاَجَلَهٗ وَشَقِىٌّ اَوْسَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهٗ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি-পদার্থ তথা মাতা-পিতার বীর্য্য চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে বীর্য্যাকারে থাকে (অবশ্য ধীরে ধীরে উহার পরিবর্তন সধিত হইতে থাকে।) অতঃপর রক্তপিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাও ঐরূপ (চল্লিশ দিন থাকে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে)। অতঃপর মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাও ঐরূপ (চল্লিশ দিন থাকে)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতাকে বিশেষরূপে পাঠান এবং ঐ ফেরেশতাকে চারিটি বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন। আল্লার তরফ হইতে ঐ ফেরেশতাকে বলা হয়, এই ব্যক্তির (সমস্ত জীবনের) ক্রিয়াকলাপ (যাহা সে সম্পাদন করিবে, আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তাহা জানেন, ফেরেশতাকে জানাই দেন—উহা) এবং তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রিজিক লিখিয়া দাও, নির্দ্ধারিত জীবনকাল লিখিয়া দাও এবং ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা তাহা লিখিয়া দাও।

(তখনকার নির্দ্ধারণ ও লিখন এতই সুদৃঢ় হয় যে, উহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে না।) ঐ নির্দ্ধারণে ভাগ্যবান কোন ব্যক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) দোযখের উপযোগী আমল করিতে থাকে, এমনকি মনে হয় তাহার ও দোযখের মধ্যে শুধু মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহার জন্য পূর্বে লিখিত ও নির্দ্ধারিত সৌভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ হইয়া পড়ে—সে বেহেশতের উপযোগী আমল করে এবং বেহেশতে প্রবেশ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) বেহেশতোপযোগী আমল করিতে থাকে, এমনকি মনে হয় তাহার ও বেহেশতের মধ্যে শুধু মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে এমতাবস্থায় তাহার জন্য পূর্বে লিখিত ও নির্দ্ধারিত দুর্ভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ পায়—সে দোযখোপযোগী আমল করে এবং দোযখে যাইতে বাধ্য হয়।

১৫৮৭। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ ○

অর্থ—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক গর্ভাশয়ের পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রাখেন।

(সেই ফেরেশতা গর্ভজাত সন্তান সম্পর্কে স্বীয় কর্তব্যের নির্দেশ লওয়ার জন্য প্রত্যেক স্তরের সংবাদ সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা সমীপে উল্লেখ করিয়া যাইতে থাকেন। প্রথম চল্লিশ দিন— যখন উহা বীর্য্যাকারে থাকে তখন) ঐ ফেরেশতা বলিয়া থাকেন, হে পরওয়ারদেগার! এখনও বীর্য্যাকার রহিয়াছে। অতঃপর (যখন রক্তপিণ্ড হয় তখন ফেরেশতা বলিয়া থাকেন,) হে পরওয়ারদেগার! এখন রক্তপিণ্ড হইয়াছে। অতঃপর (মাংসপিণ্ড হইলে) বলেন, হে পরওয়ারদেগার! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর যদি ঐ মাংসপিণ্ডকে আল্লাহ তায়ালা মানুষরূপে পরিণত করার ইচ্ছা করেন (এবং ফেরেশতা সেই সম্পর্কে আদিষ্ট হন) তবে ফেরেশতা আরজ করেন, হে পরওয়ারদেগার! পুরুষ হইবে না স্ত্রী? বদবখত হইবে না নেকবখত? এবং জিজ্ঞাসা করেন, তাহার জন্য কি (পরিমাণ ও প্রকার) রিজিক নির্দ্ধারিত হইবে? তাহার বয়স কত নির্দ্ধারিত হইবে? এইরূপে মানুষ মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায়ই (তাহার প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসারে) লিখিত হইয়া যায়। ৯৭৬ পৃঃ

১৫৮৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرَئِيْلَ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ فَيُنَادِيْ جِبْرَئِيْلُ فِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقُبُوْلُ فِى الْاَرْضِ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র সন্তুষ্টিভাজন হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলেন,—আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তুমিও তাহাকে ভালবাস। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাহাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তোমরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিবে। তখন আসমানবাসী সকলেই তাহাকে ভালবাসেন; অতঃপর জগতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির সুনাম ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

(وَاِذَا اَبْغَضَ اللّٰهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوْهُ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ)

অর্থ—(পক্ষান্তরে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিরাগভাজন হইয়া যায় তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলেন, অমুক ব্যক্তির প্রতি আমি অসন্তুষ্ট ; তুমি তাহাকে ঘৃণা কর। তখন সে জিব্রাঈল ফেরেশতার নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়া যায় এবং জিব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক ব্যক্তি আল্লার ঘৃণার পাত্র ; তোমরা সকলে তাহাকে ঘৃণিত গণ্য করিও। তখন তাঁহারা সকলে তাহাকে ঘৃণিত গণ্য করেন, অতঃপর জগদ্বাসীদের অন্তরেও তাহার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। (মোসলেম)

ব্যাখ্যা :— কোন মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তুষ্টিভাজন ও প্রিয়পাত্র কিম্বা বিরাগভাজন ও ঘৃণিত হওয়া সম্পর্কে ইহা একটি সাধারণ নিদর্শন ও পরিচয় যে, জগদ্বাসীদের অন্তরে তাহার প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণার উদয় হইবে। তবে এ ক্ষেত্রে জগদ্বাসী বলিতে একমাত্র আল্লাহ-ভক্ত মোমেন-মোসলমানগণই উদ্দেশ্য, তাঁহারাই নির্ভরযোগ্য। কারণ, একমাত্র তাঁহারাই জগতের বুকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জানোয়ার তুল্য, বরং তদপেক্ষা অধম—এ ক্ষেত্রে তাহাদের কোন মূল্য বা স্থান নাই, তাহারা আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী হইতে পারে না।

که عیسی نتوان گشت بتصدیق خرچند

"কতিপয় গর্দভের সাক্ষ্যে তুমি ঈসা গন্য হইতে পারিবে না"।

১৫৮৯। হাদীছ :— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন যে, ফেরেশতাগণ (কোন কোন সময়) মেঘমালার আড়ালে ঐ সমস্ত (জাগতিক) বিষয়সমূহের আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন সে সব সম্পর্কে আসমানের উপর (ফেরেশতাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার) নির্দেশ পৌঁছিয়াছে।

ঐ আলাপ আলোচনা চলাকালীন দুষ্ট জ্বিনগণ গোপনে চোরাভাবে ঐ সমস্ত শুনিবার চেষ্টায় রত হইয়া থাকে এবং কিছু আলোচনা শুনিতে সক্ষম হয়। অতঃপর যে দুই একটি বিষয় শুনিয়াছে উহা গণক-ঠাকুর বা জ্যোতিষগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় ; তাহারা ঐ এক দুইটির সঙ্গে একশত মনগড়া মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া লোকদের নিকট প্রকাশ করে।

● পাঠকবর্গ। উল্লিখিত হাদীছের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও একটি হাদীছ আছে যাহা বোখারী শরীফেরই ৬৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। হাদীছটি এই—

১৫৯০। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা (জাগতিক) কোন বিষয় সম্পর্কে আসমানে ফেরেশতাদের নিকট কোন নির্দেশ প্রেরণ করেন তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশের সম্মুখে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে ফেরেশতাগণ স্বীয় ডানা আন্দোলিত করিয়া থাকেন, যদ্দরুণ লৌহ শৃঙ্খলকে বড় পাথর খণ্ডের উপর নাড়াচাড়া করার স্থায় শব্দ সৃষ্টি হয়। মহামান্বিত আল্লাহ তায়ালার আদেশের সম্মুখে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া তাঁহারা হুস-চেতনাহারা হইয়া পড়েন এবং সমস্ত ফেরেশতাগণের উপরই এই অবস্থাটি পতিত হয়। অতঃপর ফেরেশতাদের চেতনা ফিরিয়া আসে যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে এইরূপ আছে—

فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ......

"যখন তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসে তখন তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন যে, মহান পরওয়ারদেগার কি আদেশ করিয়াছেন? তাঁহারা একে অন্যকে ঐ আদেশের প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা দানকারী অনুগতরূপে প্রথমে এতটুকু বলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা যে আদেশ করিয়াছেন তাহা বাস্তব ও শিরোধার্য্য; আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ মহান।" (অতঃপর তথায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ আদেশকৃত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়) তখন লুকায়িত দুষ্ট জিনগুলি গোপনে ঐ আলোচনা শুনিবার চেষ্টা করে এবং তাহারা নীচ হইতে উপরের দিকে আসমানের নিকটবর্তী স্থান পর্য্যন্ত একের উপর অন্য—এইরূপে সারি বাঁধিয়া থাকে। (এবং তাহারা এই চেষ্টা করে যে সর্বউর্ধে আসমানের নিকটবর্তী যে আছে সে তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে দুই একটা শব্দ বা বাক্য যাহা শুনিতে পারিবে তাহা সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় নিম্নস্থের প্রতি এবং সে তাহার নিম্নস্থের প্রতি—এইরূপে একের পর অন্যকে বলিয়া দিতে থাকিবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ যখন ঐ দুষ্টদের সম্পর্কে অনুভব করিয়া ফেলেন তখনই তাহাদিগকে নক্ষত্র বা নক্ষত্রের আলো অগ্নিশিখার ন্যায় ছুড়িয়া মারেন।) কোন সময় ঐ নক্ষত্রটি শ্রবণকারী জিনের দেহে বিদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সে ভষ্মীভূত হইয়া যায়—তাহার নিম্নস্থ জিনের প্রতি ঐ শ্রুত বাক্যটি পৌঁছাইবার পূর্বেই, (এমতাবস্থায় ঐ বাক্যটি নিম্নদিকে আর আসিতে পারে না।) এবং কোন কোন সময় এইরূপও হয় যে, নক্ষত্রটি দেহে বিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই সে স্বীয় নিম্নস্থের প্রতি বাক্যটি পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হয়; এমতাবস্থায় একের পর অন্য এইরূপে ঐ বাক্যটি ভূ-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। এবং সেই দুষ্ট জিনগণ কর্তৃক উহা জ্যোতিষী—গণক-ঠাকুরগণের নিকট

পৌঁছে। সেই জ্যোতিষী ঐ বাক্যটির সঙ্গে একশত (তথা অনেক) মিথ্যা জড়িত করিয়া অন্যের নিকট বলে। তাহার ঐ সব মিথ্যার সঙ্গে ঐ একটি সত্যও যেহেতু জড়িত আছে এবং ঐ সত্যটি বাস্তবে পরিণত হইতে দেখা যায়, তাই ঐ একটি মাত্র সত্যের প্রভাবে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেকেই ঐ একটি কথার উল্লেখ করিয়া বলে যে, অমুক দিন সে আমাদিগকে এইরূপ কথা বলিয়াছিল তাহা ত সত্য হইয়াছে। আসমান হইতে আমদানীকৃত ঐ একটি মাত্র বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেকেই ঐরূপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করে। (কিন্তু এই জ্যোতিষীর যে, অপর একশত কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে না।) ৬৮২ পৃঃ

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছের কতিপয় বিষয়ের বিবরণ। (১) মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ শ্রবণের প্রতিক্রিয়ায় ফেরেশতাগণের অবস্থা বর্ণনার যে আয়াতখানা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা পবিত্র কোরআনে ২২ পারা ছুরা ছাবা ৩ রুকুতে আছে। ফেরেশতাদের ঐ অবস্থার বিবরণ দানের উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত উপাসনা করে এবং ঐ সব গর্হিত মাবুদকে মহান আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বা ভাল-মন্দের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান মনে করে তাহাদের এই বিশ্বাস ও ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য বলা হইতেছে যে—আল্লাহ তায়ালা কত মহান কত মহান যে, সৃষ্ট জগতের সর্বাধিক পবিত্রাত্মা ফেরেশতা পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও তাঁহার মহত্ত্বের সম্মুখে ঐরূপে বিলীন ও বিগলিত হইয়া যান। এমতাবস্থায় ঐ সবকে বা তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালার ন্যায় উপাস্য বা কর্মকর্তা সাব্যস্ত করা কতই না বোকামী কতই না অন্যায়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতি পবিত্রাত্মা ফেরেশতাদের ঐরূপ আনুগত্য ও মর্য্যাদা প্রদান দৃষ্টে মানবকে তাহার কর্তব্যে সচেতন করা উদ্দেশ্যেও উহার বর্ণনা দান করা হইয়াছ।

(২) দুষ্ট জিনগণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উহারও উল্লেখ আছে—১৪ পারা, ৩ রুকুতে আছে—

جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ - وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ -

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ -

"আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি এবং প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ঐগুলাকে আকাশের জন্য শোভা ও সজ্জা বানাইয়াছি, ঐগুলার দ্বারা আকাশের রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্য সমাধা করিয়াছি প্রত্যেক প্রতারিত শয়তান (দুষ্ট জিন) হইতে। অবশ্য কোন কোন শয়তান লুকায়িতভাবে গোপনে কিছু শ্রবণের চেষ্টা করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য অগ্নিশিখার ন্যায় একটি বস্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ও ধাবিত হয়।"

২৩ পারা ছুরা ছাফফাত এর আরম্ভে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ نِ الْكَوَاكِبِ ـ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ـ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ـ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

"আমি ভূ-খণ্ডের নিকটস্থ তথা সর্বনিম্ন আকাশকে নক্ষত্রমালার শোভায় শোভিত করিয়াছি এবং উহা দ্বারা আকাশকে প্রত্যেক দুষ্ট শয়তান হইতে হেফাজত করার ব্যবস্থা করিয়াছি; যদ্দরুণ দুষ্ট শয়তানরা ঊর্দ্ধস্থানীয় ফেরেশতাগণের সমাবেশে আলোচিত কোন বিষয় শ্রবণ করিতে সক্ষম হয় না। এবং ঐরূপ চেষ্টা করিতে দেখা গেলে তাহাদিগকে প্রত্যেক দিক হইতে ঢিল স্বরূপ নক্ষত্র নিক্ষেপ করিয়া সাময়িকরূপে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়; অধিকন্তু তাহাদের জন্য চিরশাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (ফেরেশতাগণের আলোচনা শ্রবণ করা হইতে এইরূপে শয়তানদেরকে হাঁকাইয়া রাখা হয়) অবশ্য যদি কোন শয়তান দৈবাৎ কোন বাক্য শুনিতে সক্ষম হইয়া বসে তবে তৎক্ষনাৎ জলন্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় একটি বস্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ও ধাবিত হয়।"

এতদ্ভিন্ন এক দল জ্বিন "বত্‌নে-নখ্‌লা" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফজরের নামাযে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিয়া ঈমান গ্রহণ পূর্বক স্বজাতীদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ঐ ঘটনাটি রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং জ্ঞাত ছিলেন না, আল্লাহ তায়ালা অহী মারফৎ তাঁহাকে ঐ ঘটনা বিস্তারিত রূপে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি এবং ঐ জ্বিনগণ স্বজাতীদের সম্মুখে যে বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন উহার বর্ণনা দান পূর্বক একটি বিশেষ ছুরা নাযেল হয় যাহাকে ছুরা জ্বিন বলা হয়। ২৯ পারায় ঐ ছুরার মধ্যে ঐ জ্বিনদের বক্তব্য রূপে ইহাও উল্লেখ আছে।

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ـ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ـ

অর্থ—ইতিমধ্যে আমরা আকাশের নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম উহা ভীষণ কড়া পাহারায় পরিপূর্ণ এবং নক্ষত্রসমূহ (আমাদিগকে নিক্ষেপ করার জন্য) সর্বত্র মোতায়েন। পূর্বে আমরা (আকাশে ফেরেশতাগণের আলাপ-আলোচনা) শুনিবার উদ্দেশ্যে আকাশের নিকটবর্তী বিভিন্নস্থানে বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু এখন যে-ই শ্রবণের চেষ্টা করে সে-ই উপস্থিত অগ্নিশিখারূপ আঘাতকারী নক্ষত্রের সম্মুখীন হয়।

অর্থাৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে দুষ্ট জিনরা আকাশের নিকটবর্তী যাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিত তখন নক্ষত্র নিক্ষেপে এত কড়াকড়ি ছিল না। যখনই হযরতের আবির্ভাব হইল তখন হইতে নক্ষত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা কঠোরতর করতঃ কড়া পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। এই পরিবর্তনের দ্বারা জিনরা উপলব্ধি করিতে পারিল যে, জগতে কোন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইবে এবং তাহারা ঐ সম্ভাব্য আলোড়নের খোঁজে চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়িল। আরব এলাকার প্রতি যে দলটি আসিয়াছিল তাহারাই "বত্‌নে-নখলা" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ফজরের নামায পড়া অবস্থায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতে পাইয়া তথায় দাঁড়াইল এবং তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইল যে, আকাশের হেফাজত ও পাহারার পরিবর্তন সাধন এই বস্তুর খাতিরেই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঈমান লাভ করিয়া দ্রুত স্বজাতীগণের প্রতি ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে ঈমান গ্রহণের প্রতি আহ্বানে বিশেষ জোরালোভাবে ভাষণ দান করিলেন। তাঁহাদের সেই ভাষণ আল্লাহ তায়ালা সুরা-জিনের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) জ্যোতিষী পণ্ডিতদের কার্য্যাবলীর মূল তথ্য উদ্‌ঘাটন পূর্বক তাহাদের প্রতি সাধারণ লোকদের আকৃষ্টতার মুল কারণও এই হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের কার্য্যাবলীর সূত্র অনেক প্রকারের হয়। আলোচ্য হাদীছে একটি সুত্র উল্লেখ পূর্বক উহার অসারতা এবং একটি মাত্র অসম্পূর্ণ মুল বিষয়ের সঙ্গে একশতটি মিথ্যা জড়িত হওয়া সম্পর্কে আল্লার রসুল বর্ণনা দান করিয়াছেন, ঐ কার্য্যের অন্যান্য সূত্রগুলিও তদ্রূপই। সুতরাং তাহাদের গণনার প্রতি আস্থা স্থাপন করা নাজায়েয এবং এই কার্য্যের জন্য তাহাদের নিকট যাওয়া হারাম এবং তাহারা গায়েবের কথা বলিতে পারে এইরূপ বিশ্বাস রাখা শেরেকী গোনাহ।

১৫৯১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে আয়েশা! ঐ দেখ - জিব্রিল (আঃ) তোমাকে সালাম বলিতেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—وعليه السلام ورحمة الله وبركاته (ইয়া রসুলুল্লাহ!) আপনিত এমন জিনিষও দেখিয়া থাকেন যাহা আমরা দেখি না।

১৫৯২। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা জিব্রিল (আঃ) কে বলিলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসিয়া থাকেন আরও অধিকবার কেন আসেন না? জিব্রিলের পক্ষ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ . لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ

অর্থ—আমরা আপনার পরওয়ারদেগারের আদেশ ব্যতিরেকে কোথাও আসিতে পারি না; আমাদের পূর্ববর্তী, পরবর্তী এবং মধ্যস্থলের সবই মহান আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ।
(১৬ পারা ছুরা মরিয়ম ৪ রুকু)

১৫৯৩। **হাদীছ:**—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একটি গদি বা আসন ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিলেন, উহাতে ছবি ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের দরওয়াযায় পৌছিলেই তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পতিত হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন না, দরওয়াযায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। আয়েশা (রা:) বলেন—আমি আরজ করিলাম, স্বীয় গুনাহ হইতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করিতেছি, আমার কসুর কি হইয়াছে? হযরত (দ:) বলিলেন, এই গদিটি কেন? আমি আরজ করিলাম, আপনি উহার উপর বসিবেন এবং বিছানা রূপে ব্যবহার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন—

أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ
يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ٥

"তুমি কি জাননা যে, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে ছবি থাকে। এবং যে ব্যক্তি ছবি বানাইবে (আকিয়া বা যে কোন উপায়ে) তাহাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে এবং (তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ) বলা হইবে, যেই আকৃতি তুমি বানাইয়াছ উহার মধ্যে জীবন দিতে হইবে।"

১৫৯৪। **হাদীছ:**—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহোদের যুদ্ধ-ময়দানে আপনি যেরূপ আঘাত ও ব্যাথা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ততোধিক ব্যাথাও কি কোন ঘটনায় পাইয়াছেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোরায়েশ বংশীয়দের পক্ষ হইতে অনেক অনেক ব্যথাই আমি পাইয়াছি; সর্বাধিক ব্যথা পাইয়াছি যখন আমি (কোরায়েশগণ কর্তৃক অত্যাচারিত ও বাধ্য হইয়া) "তায়েফ" নগরীতে উপস্থিত হই এবং তথায় আমি তথাকার সরদারের আশ্রয় চাহিলাম, কিন্তু সে তাহা করিল না, (বরং আমি তথাকার লোকগণ কর্তৃক প্রস্তর বৃষ্টিতে ভীষণভাবে প্রহারিত হইলাম। এমন কি আমি রক্তাক্ত হইয়া চৈতন্যহারা অবস্থায় দিশাহারার ন্যায় সম্মুখ দিকে চলিতে লাগিলাম।) এই অবস্থায় আমি "করনে-ছায়ালেব" নামক স্থানে পৌছিলে আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন আমি উপর দিকে তাকাইলাম এবং দেখিলাম, একটি মেঘখণ্ড আমাকে ছায়া দান করিতেছে; উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া উহাতে জিব্রিল আলাইহেচ্ছালামকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার বংশধর কোরায়েশরা দ্বীন-ইসলামের

প্রতি আপনার আহ্বানের কি উত্তর দিয়াছে এবং তাহারা আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করিয়াছে (যদ্দরুন আপনি এই নগরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এইরূপে প্রহারিত হইয়াছেন ;) সব কিছু আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত আছেন এবং তিনি আপনার প্রতি পাহাড়-পর্বতের ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে আদেশ করিতে পারেন।

তৎক্ষণাৎ ঐ ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম করিলেন এবং হে মোহাম্মদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বলিয়া ঐ কথাই বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইচ্ছা করেন? যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, এই লোকদিগকে ধ্বংস করার জন্য নগরীর দুই দিকের দুইটি পাহাড়কে একত্র করিয়া ফেলি তবে তাহাই করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, বরং আমি এই আশা পোষণ করি যে, (তাহারা জীবিত থাকুক এবং) তাহাদের ঔরসে এরূপ লোকের জন্ম হউক যাহারা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করিবে—আল্লার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবে না।

১৫৯৫। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) এইরূপ মত প্রকাশ করিতেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে) স্বীয় পরওয়ারদেগার (আল্লাহ তায়ালা)কে দেখিয়াছেন তবে সে মস্ত বড় ভুল করিবে। এতদশ্রবণে মছরুক (রঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআনের আয়াত—

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

"অতঃপর নিকটবর্তী হইলেন এবং আরও অধিক নিকটবর্তী হইলেন, এমনকি উভয়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যবধানই বাকি থাকিল।" এই আয়াতের তাৎপর্য কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য জিব্রিল ফেরেশতা।

জিব্রিল (আঃ) (প্রকাশ্যে হযরতের সাক্ষাতে আসিলে) সাধারণতঃ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেন। উক্ত আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে সেই ঘটনায় জিব্রিল ফেরেশতা তাঁহার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ এত বড় ছিল যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহ জীবনকালে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন কি না—সে সম্পর্কে ছাহাবাদের মধ্যে মতভেদ ছিল ; কোন কোন ছাহাবীর অভিমত এই ছিল যে, মে'রাজ উপলক্ষে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এবং আরও কোন কোন

ছাহাবীর অভিমত এই ছিল যে, ইহজীবনে কেহ আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে সক্ষম হইতে পারে না, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহজীবনে আল্লাহ তায়ালাকে দেখেন নাই। ছাহাবীগণের এই মতভেদ পরবর্তীকালের ইমামগণের মধ্যেও এই সম্পর্কে মতভেদের কারণ হইয়াছে, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয়টি অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে।

১৫৯৬। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ

فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার প্রতি ডাকে এবং স্ত্রী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে যদ্দরুন স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছে, তবে সেই স্ত্রীর রাত্রি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, ফেরেশতাগণ ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র তাহার প্রতি লানৎ অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকেন।

১৫৯৭। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি মুছা আলাইহেচ্ছালামকে দেখিয়াছি—তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট, মাথার চুল কুঞ্চিত, "শানুয়া" গোত্রীয় লোকের ন্যায়। এবং ঈসা আলাইহেচ্ছালামকে দেখিয়াছি—তিনি মধ্যম রকমের কায়াবিশিষ্ট, সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মধ্যমাকারের শরীরের রং সুন্দর, মাথার চুল সোজা। এবং দোযখের তত্ত্বাবধায়ক "মালেক" নামক ফেরেশতাকেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি; তদুপরি আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের আরও বহু নিদর্শন দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা:—মে'রাজ উপলক্ষে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম কুদরতের নানা প্রকার নিদর্শন পরিদর্শন করাইয়া ছিলেন সেই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মে'রাজের প্রাথমিক বিবরণ প্রদান পূর্বক বলেন—لنريه من اٰيٰتنا "তাঁহাকে এই পরিভ্রমণে আনিবার উদ্দেশ্যে এই ছিল যে, আমি তাঁহাকে স্বীয় কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন দেখাইব।" এই নিদর্শন সমুহের মধ্যে দোযখের ব্যবস্থাপকদের প্রধান "মালেক" নামক ফেরেশতাও ছিলেন।

ইনশা-আল্লাহ তায়ালা মে'রাজের বয়ানে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইবে।

বেহেশতের বিবরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। একটি হইল বেহেশতের নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে ঈমান রাখা, দ্বিতীয়টি হইল এই যে, বেহেশত সৃষ্টরূপে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে—এই সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখাও ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেহেশতের ইমারতসমূহ এবং বাগ-বাগিচা ও বৃক্ষাদি ইত্যাদিও আল্লাহ তায়ালার ফজল ও রহমতের বিকাশে তৈরী হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বেহেশত এলাকার এক অংশ খালিও রহিয়াছে; মানুষের আমলের প্রতিদানে আরও ইমারত এবং বাগ বাগিচা ও ফলের গাছে উহা পরিপূর্ণ হইবে।

উভয় বিষয় সম্পর্কেই ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৯৮। **হাদীছঃ—** আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে (এক একজন বেহেশতবাসীর জন্য এক) একটি বিশেষ গৃহ হইবে; বিরাট একটি মোতি খুঁড়িয়া ও খনন করিয়া ঐ গৃহটি তৈয়ী হইয়াছে। উহা উচুর দিকে ত্রিশ মাইল হইবে (এবং দৈর্ঘে ও প্রস্থে ষাট মাইল করিয়া হইবে।) উহার প্রতি কোণে মোমেন ব্যক্তির জন্য এক একজন হুর থাকিবেন। গৃহটি এত বড় বিরাট যে, উহার এক কোণ হইতে অপর কোণ দেখা যাইবে না।

১৫৯৯। **হাদীছঃ—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ.........

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বন্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত সমূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান শোনে নাই, কোন মানুষের অন্তরে উহার কল্পনাও আসিতে পারে না। তোমরা পবিত্র কোরআনের নিম্ন আয়াতখানা পাঠ করিলেই ঐ সম্পর্কে প্রমাণ পাইতে পার।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

"কোন প্রাণী ধারণাও করিতে পারে না ঐ সব শান্তিদায়ক নেয়ামত সম্পর্কে যাহা বেহেশতবাসীগণের জন্য দৃষ্টির অগোচরে বিদ্যমান রাখা হইয়াছে।"

১৬০০। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ وَاَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ. قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশকারী প্রথম দলটির লোকগণের চেহারা পুর্ণিমার চাঁদের স্থায় দীপ্ত হইবে, (তাঁহাদের পরবর্তী দলটি সর্বাধিক উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় হইবে। বেহেশতবাসীগণের মধ্যে এইরূপ শ্রেণী বিভক্তি হইবে। ঘৃণিত বস্তু হইতে তাঁহাদের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার বর্ণনায় হযরত (দঃ) বলেন,) তাঁহাদের মুখে থুথুর উৎপত্তি হইবে না, নাকে শ্লেষ্মা থাকিবে না, মল-মুত্রের উদ্রেক হইবে না, কোন প্রকার রোগের আক্রমণ হইবে না। তাঁহাদের ব্যবহারিক আসবাবপত্র, বর্তন-পেয়ালা স্বর্ণ নির্মিত হইবে। মাথা আঁচড়াইবার চিরণীখানা পর্য্যন্ত স্বর্ণ-রৌপ্যেরই তৈয়ী হইবে। স্থগন্ধির জন্য বিশেষ আগরের ধুনির ব্যবস্থা থাকিবে। তাঁহাদের ঘাম কস্তুরীর স্থায় স্থগন্ধিময় হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকের দুই দুই জন বিশেষ পরিণীতা হইবেন যাঁহাদের সৌন্দর্য্য এই পরিমাণের হইবে যে, তাঁহাদের পায়ের গোছাসমূহের হাড্ডির মগজ বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে।

বেহেশতবাসীগণের পরস্পর কোন রকম বিবাদ বিসম্বাদ হইবে না; যেন তাঁহারা সকলে এক মন, এক প্রাণ। তাঁহারা সকাল-বিকাল আল্লাহ তায়ালার তছবীহ—পবিত্রতা প্রকাশ (করিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ) করিবেন।

৪৬৮ পৃষ্ঠার হাদীছে অতিরিক্ত বাক্য রহিয়াছে— ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم ستون ذراعا فى السماء

"বেহেশতবাসীদের পরিণীতা হইবেন মৃগ-নয়না হুরগণ। তাঁহারা সকলেই (৩০/৩৩ বৎসরের ভরা-যৌবন প্রাপ্ত) সম বয়স্ক হইবেন—সকলেই আদি পিতা আদমের দেহাকৃতি—উচ্চতায় ষাট হাত লম্বা হইবেন।"

ব্যাখ্যা:—বেহেশতী পরিণীতাগণের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই বলা হইয়াছে। দুনিয়াতেও সুন্দর মানুষের শরীরের রক্ত বাহির হইতে চামড়ার উপরে গোলাবী রং রূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং উহা অধিক সৌন্দর্যের কারণ গণ্য হয়। বেহেশতের হুরগণের সৌন্দর্য্য আরও অধিক হইবে, এমনকি তাঁহাদের শরীর যেন কাঁচের ন্যায় হইবে, তাই রক্ত মাংস এবং হাড্ডির মগজ পর্য্যন্ত বাহির দিক হইতে গোচরীভূত হইবে, যাহার সৌন্দর্য্য একমাত্র চাক্ষুষ দেখার উপরই নির্ভর করে। না দেখিয়া বিরূপ ভাব পোষণ করিবে না। ভিতরে ফুল যুক্ত কাঁচের পেপার-ওয়েট উহার ক্ষুদ্র নমুনা।

১৬০১। হাদীছ:— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْسَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত হইতে সত্তর হাজার বা (হযরত বলিয়াছেন,) সাত লক্ষ লোকের একটি দল বেহেশত লাভ করিবে—তাঁহারা একত্রে বেহেশতের গেট অতিক্রম করিবে, তাঁহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে।

১৬০২। হাদীছ:— حدثنا انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ٥

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়াতলে বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

১৬০৩। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে—অশ্বারোহী ব্যক্তি শত বৎসর উহার ছায়াতলে চলিতে পারিবে। এই তথ্যের প্রমাণে পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত কর—وظل ممدود "বেহেশতে অতি দীর্ঘ ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে।"

নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, বেহেশতের শুধু এক ধনু পরিমাণ অংশ সমগ্র জগত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

১৬০৪। হাদীছ :— عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُو الْمُرْسَلِيْنَ ٥

অর্থ—আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসী নিম্নস্তরের লোকগণ উর্দ্ধস্তরের লোকগণকে এইরূপে দেখিবে যেরূপে তোমরা (ভূপৃষ্ঠে হইতে) আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম কিনারায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাক। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ঐরূপ উর্দ্ধ শ্রেণীর বেহেশতসমূহ নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট হইবে অন্য কেহ উহা লাভ করিতে পারিবে না? হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এমন ব্যক্তিবর্গ যাহারা আল্লাহ তায়ালার উপর নিয়মিতরূপে ঈমান আনিবে এবং রসুলগণের রসুল হওয়ার প্রতি আস্থা স্থাপন করিবে (এমন ব্যক্তিবর্গের অনেকে স্বীয় আমল অনুপাতে ঐ উর্দ্ধ শ্রেণীর বেহেশত লাভ করিবে।)

ব্যাখ্যা :—বেহেশতের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তি হইবে বটে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বাসীন্দাদের মনে উর্দ্ধ শ্রেণীর স্পৃহা এবং নিজ শ্রেণীর প্রতি বিরাগভাব থাকিবে না। যেরূপ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কোন মানুষ একতালা দালানে থাকিতেই ভালবাসে; অন্যের দোতালা দেখিয়া তাহার মনে কোন স্পৃহার উদয় হয় না।

দোযখের বয়ান

বেহেশত সম্পর্কে যে দুইটি বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য তদ্রূপ দোযখ সম্পর্কেও ঐ বিষয়দ্বয়ের ঈমান রাখা অবশ্য ফরজ।

১৬০৫। হাদীছ :— আবু জমরাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট থাকিতাম। আমার জ্বর হইল; ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমার জ্বর যমযম কুপের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট; অতএব উহাকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করিবে।

১৬০৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের তথা জাগতিক অগ্নি দোযখের অগ্নির তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ, জাগতিক অগ্নিই ত যথেষ্ট ছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, (এতদসত্ত্বেও) দোযখের অগ্নিতে জাগতিক অগ্নির বর্তমান তাপ সহ আরও উনসত্তর গুণ অধিক তাপ থাকিবে।

১৬০৭। হাদীছ :— قال اسامة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهٗ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ مَا شَانُكَ اَلَسْتَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهٰكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ٥

অর্থ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে (আল্লার দরবারে) উপস্থিত করা হইবে, অতঃপর (হিসাব-নিকাশের পর) তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। দোযখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি গুলি বাহির হইয়া পড়িবে এবং সে ঐগুলির সঙ্গে জড়িত ও আবদ্ধ থাকিয়া চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকিবে যেরূপে গাধা (ঘানির তক্তা বা) গম পিসাইয়ের পাথরে যুক্ত থাকিয়া ঘুরিতে থাকে।

ঐ ব্যক্তির নিকট দোযখবাসীরা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক। তুমি না আমাদিগকে (উপদেশ মুলক) আদেশ-নিষেধ করিয়া থাকিতে? সে বলিবে, আমি তোমাদিগকে ভাল কাজের পথ বাতাইয়া দিয়া থাকিতাম, স্বয়ং আমি ঐ কাজ করিতাম না। এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাকিতাম, কিন্তু অতঃপর আমি নিজে ঐ কাজ অবলম্বন করিয়া থাকিতাম।

অর্থাৎ ইবলিসের অস্তিত্ব বাস্তব এবং তাহার কার্য্যকলাপও বাস্তব। এই সব কাল্পনিক বা রূপক অর্থের নহে।

১৬০৮। হাদীছঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ ০

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মানুষের নিকট শয়তান উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তরে এইরূপ প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, অমুক বস্তুটাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে এইরূপ প্রশ্নে অগ্রসর হইতে থাকে, এমনকি অবশেষে এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, তোমার পরওয়ারদেগারকে সৃষ্টি করিয়াছে কে? যখনই এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় (তখনই এই সম্পর্কে চিন্তা শক্তিকে মুহূর্তের জন্যও অগ্রসর না করিয়া) তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্নকে ত্যাগ করিবে (এবং "আউজুবিল্লাহে মিনাশ্‌শায়তানির রাজিম" বলিয়া শয়তানকে তাড়াইবে) এবং শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।

ব্যাখ্যাঃ—মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন মানুষও পরস্পর এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকে; সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য হযরত (দঃ) শিক্ষা দিয়াছেন, امنت بالله "আমি খাঁটিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখি" বলিয়া ঐ প্রশ্নের এবং আলোচনার অবসান করিবে।

অর্থাৎ অন্তরে ঐরূপ প্রশ্নের স্থান দেওয়া আল্লাহ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমানের পরিপন্থি। কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমানের তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহ "খালেক্" অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্তা; অথচ যে বস্তু সৃষ্ট হইবে তাহা হইবে "মাখলুক্"। "খালেক্" কখনও "মাখলুক্" হইতে পারে না।

১৬০৯। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রির আগমন তথা সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয় তখন বিশেষরূপে ছেলে মেয়েগণকে গৃহে আবদ্ধ রাখ। কারণ, তখন শয়তান তথা দুষ্ট জিনগণ চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িতে থাকে। রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইলে পর ছেলে-মেয়েগণকে বাহিরে যাইতে দিতে পার। আর (শয়নকালে) ঘরের দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিও এবং বন্ধ করা কালীন "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং বাতি নিভাইয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং

পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও এবং অন্যান্য পাত্র সমূহ ঢাকিয়া দিও, তখনও "বিছমিল্লাহ" বলিও। পাত্র সমূহকে পুর্ণ আবৃত করার উপযুক্ত কোন বস্তু উপস্থিত না থাকিলে শুধু মাত্র যে কোন ধরণের একটি বস্তু বিছমিল্লাহ বলিয়া উহার মুখের উপর রাখিয়া দিবে।

১৬১০। হাদীছ :— সোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, ঐ সময় দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যধিক ক্রোধের দরুণ তাহার চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গলার রগগুলি মোটা হইয়া গিয়াছিল। এতদৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা ঐ ক্রোধবান ব্যক্তি বলিলে তাহার ক্রোধ উপশম হইয়া যাইবে। "আউজুবিল্লাহে মিনাশ শায়তান— শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি" বলিলে এখনই তাহার ক্রোধাবস্থার অবসান হইবে। কোন একজন লোক ঐ ব্যক্তিকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলে সে এইরূপ উক্তি করিল যে, আমাকে জ্বিনে আছর করিয়াছে কি?

ব্যাখ্যা :— ঐ ব্যক্তি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ছিল, ইসলাম সম্পর্কে এখনও তাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া ছিল না, আল্লার রসুলের মর্য্যাদা এখনও সে উপলব্ধি করে নাই, তাই সে একটি অবাস্তব ধারণায় বলিল যে, শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় কাহারও উপর জ্বিন-ভুতের আছর হইলে।

১৬১১। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আদম জাতের প্রত্যেক সন্তানকেই ভূমিষ্ঠের সময় শয়তান তাহার পার্শ্বদেশে আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা দেয়; সেই খোঁচার কারণে শিশু চিৎকার করিয়া উঠে, মরয়ম ও তাঁহার পুত্র (ঈসা (আ:) ভিন্ন।

ذهب يطعن فطعن فى الحجاب —হযরত ঈসার ক্ষেত্রেও সে খোঁচা দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার খোঁচা হযরত ঈসার শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং (যেই মিহিন পর্দায় আবৃত হইয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয় সেই) পর্দায় খোঁচা লাগিয়াছিল।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রা:) পবিত্র কোরআনের নিম্ন আয়াত তেলাওয়াত করিলেন...وانى اعيذها... "আমি আমার প্রসূত কন্যাকে এবং তাহার সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তান হইতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করিতেছি।"

ব্যাখ্যা :— উক্ত আয়াতে যেই দোয়ার উল্লেখ হইয়াছে উহা মরয়ম-জননী—হান্নার দোয়া। এই দোয়ার মধ্যে মরয়মের সঙ্গে তাঁহার সন্তানকেও অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লার আশ্রয়-তলে সমর্পন করা হইয়াছে।

আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইঙ্গিত দানের তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয় যে, মরয়ম-সন্তান হযরত ঈসা (আ:) যে বিশেষরূপে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত ছিলেন—এই বিশেষত্বের সূত্র ছিল হান্নার দোয়া।

পাঠকবর্গ। এস্থলে ভূমিকারূপে কতিপয় বিষয় লক্ষ্য করিবেন—

(১) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি ও বর্ণনা তথা—মুল হাদীছের বক্তব্য শুধু এতটুকুই যে, প্রত্যেক শিশুকেই ভূমিষ্ঠ হওয়া কালীন শয়তান খোঁচা দিয়া থাকে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার জননী মরয়মকে শয়তান খোঁচা দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(২) মুল হাদীছ বর্ণনা করার পর আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজ পক্ষ হইতে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বুঝাইলেন যে, মুল হাদীছে ঈসা আলাইহে-চ্ছালাম সম্পর্কে যে বিশেষত্বটি বর্ণিত হইল কি সূত্রে ঐ বিশেষত্ব তাঁহার লাভ হইয়াছিল—এই আয়াতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৩) ঈসা (আঃ) ও তাঁহার জননী মরয়ম উভয় সম্পর্কে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কথা অবশ্য মুল হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিয়া তাঁহাদের একজনের বিশেষত্বের সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই কথা কখনও বলেন নাই যে, উক্ত আয়াতের দ্বারা যে সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল তাহা ঈসা (আঃ) ও মরয়ম উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য—আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ মন্তব্য করেন নাই। বরং ইহার বিপরীত তিনি শুধু ঈসা আলাইহেচ্ছাল্লামের নাম উল্লেখ পূর্বক ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন; আবু হোরায়রা (রাঃ) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিশেষত্বের গুরুত্বই বেশী দিয়া থাকিতেন। এমনকি কোন কোন সময় আবু হোরায়রা (রাঃ) মুল হাদীছে শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় অংশটুকুই উল্লেখ করিয়াছেন—মরয়ম (আঃ) সম্পর্কীয় অংশটুকু উল্লেখও করেন নাই। বোখারী শরীফ ৪৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীছটি তাহারই প্রমাণ। অবশ্য আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, হয়ত পরবর্তী কোন কোন ব্যাখ্যাকার লিখক ইহাও লিখিয়া থাকিতে পারেন যে, ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ) উভয়ের ঐ বিশেষত্বের সূত্র সম্পর্কে আবু হোরায়রা (আঃ) আয়াতখানা উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা শুধু পরবর্তী কোন কোন লিখকের মন্তব্য, ইহা ছাহাবী আবু হোরায়রার মন্তব্য নহে।

সারকথা এই যে, আয়াতখানা মুল হাদীছের অংশ নহে, বরং মুল হাদীছ বর্ণনার পর আবু হোরায়রা (রাঃ) উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তদুপরি আয়াতখানা ঈসা (আঃ) ও মরয়ম (আঃ) উভয় সম্পর্কে হওয়া—ইহা আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর মন্তব্য নহে, বরং হয়ত পরবর্তী কেহ ঐরূপ ধারণা করিয়াছেন।

কোরআন-হাদীছ ও শরীয়ত সম্পর্কে লাগামহীন অশ্ব হাঁকানেওয়ালাদের দলীয় এক বাংলা ভাষার পণ্ডিত স্বীয় পাণ্ডিত্যের গর্বে তথাকথিত তফছীরুল কোরআন লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি উল্লিখিত হাদীছখানার প্রতি যে গুরুতর বেয়াদবী ও ঈমানহীনতার কুউক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, এস্থলে উহার সমালোচনা না করিলে কর্তব্য পালনে অমার্জনীয় অবহেলার দোষে দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। ভূমিকা স্বরূপ হাদীছখানার অংশসমূহের

বিশ্লেষণ পাঠকবর্গের সম্মুখে রাখা হইবে। এখন পণ্ডিত সাহেবের মূল বক্তব্য পেশ করিতেছি, তিনি লিখিয়াছেন—

"হাদীছ ও তফছীরের কেতাবসমূহে একটা রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে, রেওয়ায়েতটির সারমর্ম এই যে, আদম বংশের কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আসিয়া তাহার গায়ে খোঁচা মারে······বোখারী-মোসলেমেও এই রেওয়ায়েতটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি এই রেওয়ায়েতের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রসুলে করীমের উক্তি বলিয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। না হওয়ার কারণগুলি নিম্নে আরম্ভ করিতেছি।"

এই বলিয়া পণ্ডিত সাহেব পাঁচটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুতাপের বিষয়, পণ্ডিত সাহেব যে কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন ঐগুলা ইসলামদ্রোহী মো'তাযেলী ইত্যাদি গোম্‌রাহ ফের্কা কর্তৃক বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত ছিল। পূর্ববর্তী বিশিষ্ট আলেমগণ ঐসব প্রশ্নাবলীর উত্তর দানে বহু পূর্বেই সেই সবের সমাধি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেব সেই সব উত্তর জ্ঞাত হওয়ার চেষ্ট না করিয়া ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রশ্নাবলীর মুর্দা লাশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন এবং আরম্ভ করা সুরে ঐসব গাহিয়া সর্বসাধারণকেও নিজের ন্যায় গোমরাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেব প্রথম নম্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "মরয়মের জন্ম হইয়াছে মরয়ম-জননীর দোয়া করার পূর্বে। সুতরাং ঐ দোয়ার বরকতে বিবি মরয়ম শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন—এরূপ কথা আদৌ যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব এই আয়াতের বাহক মোহাম্মদ মোস্তফার পক্ষে উপরোক্ত অসঙ্গত বক্তব্য করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

পাঠকবর্গ! প্রশ্নটি গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল। মোহাক্কেক আলেমগণ উহার বিভিন্ন উত্তরদানে উহাকে চাপা মাটি দিয়াছিলেন।

(১) বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ্ "কাস্‌তালানী" কেতাবের সপ্তম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠায় (২) বাগদাদ শরীফের মুফতী ও মোফাচ্ছের শায়েখ মাহমুদ আলুছীর প্রসিদ্ধ তফছীর "রূহুল মায়ানী" তৃতীয় খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠায় (৩) আমার ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ রহমতুল্লাহে আলাইহের উরদু ভাষায় লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ঐ সব উত্তর লিপিবদ্ধ আছে। প্রবীন পণ্ডিত সাহেব চেষ্টা চালাইলে আরও উত্তরের খোঁজ পাইতেন। কিন্তু ঐসব তথ্য পণ্ডিত সাহেবের নজরে পড়িল না; তাহার নজরে পড়িল গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কার প্রশ্ন এবং তিনি তাহা বিনা দ্বিধায় আমদানী করিলেন বাংলার সরল প্রাণ মোসলমান ভাইদের জন্য, তফছীরকার সাজিয়া। এই কার্য্যের দ্বারা পণ্ডিত সাহেব কোন ফের্কার উকিল প্রমাণিত হইলেন তাহা পাঠকের বিচার্য্য।

পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ যে, তিনটি বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে উহার দ্বারাই মূল প্রশ্নের উত্তর হয়। প্রশ্ন ত এই যে, মরয়ম-জননীর দোয়া মরয়মের জন্মের পরে হইয়াছে সুতরাং মরয়মের জন্ম হওয়াকালীন অবস্থার সম্পর্ক ঐ দোয়ার সঙ্গে থাকিতে পারে না; অথচ সেই দোয়া-বর্ণিত আয়াতের উল্লেখ এই হাদীছে রহিয়াছে।

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকগণ যেই আয়াতের উল্লেখ বেখাপ্প। ধারণা করিয়া হাদীছ এনকার করিয়াছে সেই আয়াতখানা মুল হাদীছের অংশই নহে, বরং উহা একটি উপকথা স্বরূপ আবু হোরায়রা (রাঃ) তেলাওয়াত করিয়াছেন (যাহার উদ্দেশ্য পরে ব্যক্ত করা হইবে।) এবং উহা যে আবু হোরায়রা উদ্ধৃতি তাহা "ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ—অতঃপর আবু হোরায়রা বলিলেন" বাক্যের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আবু হোরায়রার উদ্ধৃতিটাকে, বরং ঐ উদ্ধৃতি সম্পর্কে অন্যান্য লোকের মতামতটাকেও মুল হাদীছের সঙ্গে জড়াইয়া দিয়া মতলব সিদ্ধি করিতে চাহে তবে তাহা নিজ মতলব সিদ্ধির অবৈধ পন্থা বই আর কি হইবে?

অতঃপর আবু হোরায়রা (রাঃ) যে, হাদীছ বর্ণনার পর ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই যে, মরয়ম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) উভয়ের পক্ষে শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কারণ ও সূত্র এই আয়াতে বর্ণিত মরয়ম-জননীর দোয়া—আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ কখনও বলেন নাই। অতএব আয়াতের উদ্ধৃতিকে যদি শুধু ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা যায় তবে আয়াতের সম্পর্ক বেখাপ্পা ও অযৌক্তিক হওয়ার কোন কারণই থাকে না। এত সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া বোখারী-মোসলেমে বর্ণিত একটি ছহীহ হাদীছকে এনকার করার বাতুলতা পাঠকেরই বিচার্য্য! যদি বলা হয়, এই ব্যাখ্যানুযায়ী মরয়ম (আঃ) শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষিত থাকার কারণ অবর্ণিত থাকে। তবে বলা হইবে, ইহাতে ত্রুটি কি হইবে? মুল হাদীছে ত মরয়ম, ঈসা কাহারও সম্পর্কে কারণ উল্লেখ নাই, আবু হোরায়রা (রাঃ) যদি একজন সম্পর্কে কারণ বর্ণনা না করিয়া দ্বিতীয় জন সম্পর্কে কারণের ইঙ্গিত দিয়া থাকেন তাহাতে দোষের কি আছে?

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় উক্ত তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। মুল প্রশ্নের আরও উত্তর তিনি এবং পূর্ববর্তী আলেমগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত বরাত অনুযায়ী খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য হাদীছ এনকার করার দ্বিতীয় কারণ যাহা আরজ করিয়াছেন উহার সারকথা এই যে, "প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে—ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা; অনেক সময় অনেক শিশু ভূমিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে এমনকি তাহার কিছু পর পর্য্যন্তও কাঁদে না।"

পাঠকবর্গ! পণ্ডিত সাহেবের আরজ বা প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যাইতে পারে তাহা আপনারাই স্থির করুন। বোখারী শরীফের হাদীছে আছে যে, প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে, পণ্ডিত সাহেব বিনা দলীলে দাবী করিতেছেন যে, অনেক অনেক শিশু চীৎকার করে না। পণ্ডিত সাহেবের দাবীর সমর্থক না হওয়ায় হাদীছ গ্রহণীয় নহে, তদপেক্ষা সহজ ইহাই যে, বোখারী শরীফের বর্ণিত হাদীছের বরখেলাফ দাবী করায় পণ্ডিত সাহেবই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত।

এমনকি বৃদ্ধ পণ্ডিত সাহেব যদি ধাত্রীকার্য্য ও প্রসূতি সেবায়ই বৃদ্ধ হইয়া থাকেন তবুও আমরা তাহার ঐ দাবী স্বীকার করিতে রাজি নহি। কারণ আলোচ্য হাদীছের বক্তব্য ছাড়িয়া দিয়া গার্হস্থ বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি করিলেও পণ্ডিত সাহেবের দাবীর অসাড়তা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে বিখ্যাত অভিজ্ঞ "ডঃ সলমন" রচিত পুস্তকের বাংলা সংস্করণ "গার্হস্থ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান" নামক পুস্তকের সাক্ষ্যও ইহাই যে, প্রত্যেক শিশুই ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া থাকে।

অবশ্য বাহ্যিক বিজ্ঞানের বাহক অমোসলেম ডঃ সলমন শয়তানের খোঁচার কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠে; তিনি ইহার একটি বৈজ্ঞানিক কারণও বর্ণনা করিয়াছেন যে, শিশু এতদিন পর্য্যন্ত এক গরম ও আবদ্ধ স্থানে বসবাস করিতেছিল, হঠাৎ যখন সে উন্মুক্ত আবহাওয়ায় উপনীত হইল তখন উন্মুক্ত জগতের হাওয়া-বাতাস তাহার শরীরে নেহাত অপরিচিত বস্তুর ন্যায় স্পর্শ করে বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে। ডঃ সলমনের যুক্তিকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ একটি কার্য্যের কতিপয় কার্য্য-কারণ থাকা অসম্ভব নহে; একটি শিশুর চীৎকারের স্বাভাবিকরূপেও একাধিক কারণ থাকে। ছহীহ হাদীছ দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, ভূমিকম্প ইত্যাদির যে সব তথ্য প্রকাশিত হয় উহা দৃষ্টে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য সম্পর্কে—বিভিন্ন কারণ বা বাহ্যিক কার্য্য কারণ ইত্যাদি বলিয়াই সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয়। শিশুর চীৎকার সম্পর্কেও হাদীছে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ঐরূপেই খাপ খাওয়াইতে হইবে।

পণ্ডিত সাহেব তৃতীয় কারনরূপে যাহা আরজ করিয়াছেন উহার সারকথা এই যে, "মরয়ম ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন মানব শিশু শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পায় না, ইহা ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকিদার বিপরীত কথা। ইহাতে অন্য নবী ও রসুলগণের মর্য্যাদাহানি করা হইতেছে।"

যেই পণ্ডিত সাহেব তথাকথিত তফছীরের মধ্যে ইসলামের এত এত বুনিয়াদী আকিদার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং ইসলামের মৌলিক বস্তু—ছহীহ হাদীছ এনকার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই তাহার মুখে ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার হামদর্দি শুনিয়া কাকের মুখে কোকিলের বুলির কথা মনে পড়ে।

এই কারণ ও প্রশ্নটিও গোমরাহ মো'তাযেলী ফের্কা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া ছিল। পূর্ববর্তী আলেমগণ উহারও উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই এইরূপ প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। হযরত (দঃ) সম্পর্কে কোন কোন আলেমের মত এই যে, তাঁহার ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান নিকটবর্তী আসিতেও সক্ষম হয় নাই। ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) কড়া পাহারা দিতেছিলেন; হযরতের বিষয়টি স্বতন্ত্র। কারণ, সাধারণতঃ বক্তা স্বীয় কথার উর্দ্ধে থাকেন। এতদ্ভিন্ন নবী-রসুলগণের পরস্পর কোন কোন বিশেষত্বের মধ্যে পার্থক্য হওয়া পবিত্র

কোরআনেরই বিঘোষিত বিষয়—تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "রসুলগণকে পরস্পর এক জনকে অন্য জনের উপর কোন কোন বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছি।"

কেয়ামতের দিন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁকের দ্বারা চেতনা আসার ঘটনায় হযরত রসুলে করীমের উপর মুছা আলাইহেচ্ছালামের ফজিলত এবং তখন কাপড় পরিধানের ব্যাপারে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ফজিলত অনেক অনেক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। এমনকি নবী নন এমন ব্যক্তিও কোন ব্যাপারে বিশেষত্বের অধিকারী হইতে পারেন; সম্মুখে বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, স্বয়ং হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন, "হে ওমর! শয়তান আপনাকে কোন পথে আসিতে দেখিলে সে ঐ পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে"। অথচ বোখারী শরীফের হাদীছেই প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, একদা হযরত (দঃ) নামায পড়িতে ছিলেন, একটি শয়তান দ্রুত তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল আক্রমণ করার জন্য; সে এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, হযরত (দঃ) তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেন। সারকথা এই যে, এক-দুই বিষয়ে কাহারও বিশেষত্বের দরুণ অন্যের মর্য্যাদাহানী ঘটে না।

পণ্ডিত সাহেব চতুর্থ কারণ বলিয়াছেন, "মরয়ম-জননীর দোয়ার বরকতে যদি মরয়মের সন্তান ঈসা (আঃ) শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন তবে মরয়মের অন্যান্য সন্তান তথা ঈসা আলাইহেচ্ছালামের ভ্রাতা-ভগ্নিগণও রেহায়ী পাওয়ার অধিকারী; এমতাবস্থায় হযরত ঈসার বিশেষত্ব থাকে না।"

পাঠকবর্গ! পণ্ডিত সাহেবের এই উক্তিটি নির্ভর করিতেছে হযরত ঈসার ভ্রাতা-ভগ্নি থাকার উপর, অথচ তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ দিতেছি—বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফতহুলবারী" এবং অন্য আর একখানা শরাহ "কাসতালানী" উভয় কেতাবে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভিন্ন হযরত মরয়মের অন্য কোন সন্তানই হইয়াছিল না, কিরূপে হইতে পারে? হযরত মরয়মের ত বিবাহই হইয়াছিল না। ঈসা (আঃ) ত তাঁহার গর্ভে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে জন্ম নিয়াছিলেন।

পণ্ডিত সাহেব সর্বশেষ কারণ এই বর্ণনা করিয়াছেন—"সব চাইতে গুরুতর এই যে, এই রেওয়ায়েতটা আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।" অর্থাৎ আলোচ্য হাদীছ খানা যেহেতু আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাই ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। (معاذ الله— এইরূপ বেয়াদবীর উক্তি ও উক্তি কারক হইতে আমরা সকলে আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করি।)

পাঠকবর্গ! আবু হোরায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী যিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন দীর্ঘ চারি বৎসর; দিবারাত্র রসুলুল্লার দরবারে কাটাইয়া থাকিতেন—খাদ্য জোটাইতেও কোথা যাইতেন না। ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে তিনি বাহ্‌রাইন এলাকার শাসনকর্তা বা গভর্ণর ছিলেন অতঃপর এক সময় তিনি পবিত্র মদীনার শাসনকর্তাও নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। সেই ছাহাবী

আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ পণ্ডিতের নজরে পছন্দনীয় হইলেন না, এমনকি এই হাদীছখানা উক্ত ছাহাবীর মুখে বর্ণিত হওয়ায় পণ্ডিত মিঞা হাদীছটিকে এনকার করার যোগ্য ঠাওরাইলেন।

এই সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেবকে কি বলা যাইতে পারে? ছাবাহীগণের মর্য্যাদা এবং তাঁহাদের সম্পর্কে মোসলমানদের কর্তব্য বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা বর্ণিত হইবে। মোসলমান ভাইদের ঈমান রক্ষার্থে এস্থানে একখানা হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ

"আল্লাহকে ভয় করিও, আল্লাহকে ভয় করিও—আমার ছাহাবীগণ সম্পর্কে; আমার পর তাঁহাদের প্রতি কেহ কোন কুউক্তি করিও না।"

তৃতীয় শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ইমাম আবু যোরয়া (রঃ) পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন—

اذا رأيت رجلا ينتقص صحابيا فاعلم انه زنديق

"যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে কোন ছাহাবীর মর্যাদাহানীকর কথা বলে তবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিও যে, সে যিন্দীক্—ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী।" (এছাবা ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ)

পাঠকবর্গ! যে সব ভিত্তিহীন ছুতানাতার ভান করিয়া পণ্ডিত মিঞা আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার দৌরাত্ম দেখাইয়াছেন সেই সবের অসারতা আপনারা বিস্তারিতরূপে অনুধাবন করিয়াছেন। এইরূপ অসার, অযৌক্তিক ও অবাস্তব প্রলাপোক্তিকে কারণ সাব্যস্ত করিয়া এমন একটি ছহীহ হাদীছকে এনকার করা যাহা সমস্ত ইমামগণের নিকট ছহীহরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় কেতাবের তিন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কিরূপ লোকের কার্য্য হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

পণ্ডিত মিঞার আস্ফালনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করি, তিনি স্বীয় ঈমানের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কি উক্তি করিয়াছেন; "বোখারী-মোছলেম শরীফেও এই রেওয়ায়েতটা স্থান লাভ কয়িয়াছে। আমি এই রেওয়ায়েতের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রসুলে করীমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।"

১৬১২। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ

اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হাই আসা (যাহা আলস্যজনিত অবস্থার নিদর্শন) শয়তানের কারসাজিতে হইয়া থাকে, তাই কাহারও হাই আসিতে চাহিলে যথাসাধ্য উহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিবে। (মুখকে বিকট মূর্তিতে উন্মুক্ত করিয়া) "হাঁ......" শব্দজনক হাই দিলে শয়তান (স্বীয় চেষ্টা ও উদ্দেশ্য—অলসতা সৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়া সন্তুষ্ট হয়—আনন্দে) হাসিয়া উঠে।

১৬১৩। হাদীছঃ— عن ابى قتادة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

অর্থ—আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সুস্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (সুসংবাদ স্বরূপ ফেরেশতাগণ মারফৎ) প্রকাশ হইয়া থাকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের কারসাজিতে প্রকাশ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ভয়-ভীতিজনক স্বপ্ন দেখিলে বাম দিকে থুথু দিয়া ঐ স্বপ্নের কুফল হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে; এই ব্যবস্থাবলম্বন করিলে ঐ কুস্বপ্নের কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইবে না।

১৬১৪। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

এই দোয়াটি যে ব্যক্তি একশত বার পড়িবে সে দশটি ক্রীতদাস আজাদ করার ছওয়াব পাইবে, একশতটি নেক আমলের ছওয়াব তাহার জন্য লেখা হইবে, তাহার একশতটি গোনাহ আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে এবং (সকালে উহা পড়িলে) সমস্ত দিনের জন্য তাহার পক্ষে শয়তান হইতে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ স্বরূপ হইবে এবং তাহার অপেক্ষা অধিক মর্তবা লাভকারী কেহ হইবে না, অবশ্য যদি কেহ উল্লিখিত দোয়ার গণনা পূর্ণ করিয়া আরও অধিক নেক আমল করে।

১৬১৫। **হাদীছ**:— সায়াদ ইবনে আবু অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্দর গৃহে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন উম্মুল-মোমেনীনগণ হযরতের নিকট বসিয়া খোরাকীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার দাবীতে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় যখন ওমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাহিলেন তখন উম্মুল-মোমেনীনগণ তথা হইতে দৌড়িয়া আড়ালে চলিয়া গেলেন।

হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে অন্দরে আসিবার অনুমতি দিলেন; হযরত (দঃ) তখন হাঁসিতে ছিলেন। ওমর (রাঃ) হযরত (দঃ)কে হাঁসিতে দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে হাসি-মুখ রাখুন, ইয়া রসুলুল্লাহ। (অর্থাৎ এখন হাঁসিবার কারণ কি?)

হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম, এই নারীগণের প্রতি—তাহারা আমার নিকট (দাবী-দাওয়া পেশ করিতে) ছিল, কিন্তু আপনার আওয়াজ শুনিয়া দৌড়িয়া আড়ালে পালাইয়াছে।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার প্রতি অধিক ভয় রাখা তাহাদের পক্ষে বড় কর্তব্য। অতঃপর ওমর (রাঃ) উম্মুল্‌-মোমেনীনগণকে সম্বোধন করিলেন—হে আপন জানের-শক্র নারীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ভয় কর না?

উম্মুল মোমেনীনগণ আড়াল হইতে উত্তর করিলেন, হাঁ—নিশ্চয় আপনাকে অধিক ভয় করি; আপনি রসুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা অধিক কড়া ও কঠোর মেযাজের।

হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, শয়তান যখনই আপনাকে কোন পথে চলিতে দেখে তখনই শয়তান ঐ পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

● অর্থাৎ আপনার মধ্যে খোদা-প্রদত্ত প্রভাব এইরূপ রহিয়াছে যে, শয়তান ও শয়তানের প্ররোচনার কার্য্যে লিপ্ত মানুষ আপনাকে দেখিলে ভীত সন্ত্রস্ত না হইয়া পারে না।

১৬১৬। **হাদীছ**:— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিলে অজু করাকালে তাহার জন্য বিশেষ কর্তব্য হইবে—তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়া। কারণ, নিদ্রাবস্থায় শয়তান মানুষের নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে (চক্ষুদ্বয়, নাসিকা ও মস্তিষ্কের মিলনস্থলে) অবস্থান করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা:—প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন শয়তান সর্বদার জন্য নিয়োজিত থাকে বলিয়া হাদীছে উল্লেখ আছে। মানুষের নিদ্রার সময় তাহার শয়তান উল্লিখিত স্থানে অবস্থান করে; যেন ঐ মানুষটির মূল শক্তিসমূহের উপর শয়তান প্রভাব রাখিতে পারে। অজুর পানির বরকতে শয়তানের সেই আছর বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সহজে দুরীভূত হইবে।

জ্বিন সম্প্রদায় এবং তাহাদের বেহেশত লাভ

মানুষ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন "জ্বিন" নামে একটি সম্প্রদায় এই জগতে বসবাসকারী আছে। সেই জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে সপ্রমাণিত করার উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) বিশেষরূপে এই পরিচ্ছেদটির উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মোসলমানদের জন্য অকাট্য বিষয়।

বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ শরাহ্ "কাস্তালানী নামক কেতাবে আছে—"কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট উক্তিসমূহ এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগ হইতে সমস্ত ওলামাদের-ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে অকাট্য বিশ্বস্ত সূত্রে পরম্পরা যাহা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে—ঐ সবের দ্বারা জ্বিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত আছে, সুতরাং যুক্তির ধ্বজাধারীরা উহার অস্তিত্ব স্বীকার করায় কোন প্রকার দ্বিধার সৃষ্টি করিতে পারে না।" (৫ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)

বোখারী শরীফের আর একখানা শরাহ "আইনী" নামক কেতাবে আছে—

لم يخالف احد من طوائف المسلمين فى وجود الجن
وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجن

"মোসলেম সম্প্রদায়ভুক্ত যতগুলি উপদল আছে তাহাদের কোন একটি দলও জ্বিনের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানে দ্বিমত প্রকাশ করে নাই, এমনকি অমোসলেমগণের অধিকাংশ দলগুলিও উহাকেই সমর্থন করিয়া থাকে।" (৭ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ)

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে কতিপয় আয়াত ও হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা মোসলমান নামধারী কোন কোন মানুষ জ্বিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল মোসলমানদের আকিদাকে উপেক্ষা করিতেছে। এমনকি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে তফছীরকার সাজিয়া এ সম্পর্কীয় স্পষ্ট আয়াত সমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করার অসাধু চেষ্টা করিয়াছে, তাই নিম্নে জ্বিনের অস্তিত্ব প্রমাণকারী সমুদয় আয়াত ও হাদীছের পূর্ণ বিবরণ দান করা হইতেছে।

(১) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

"এবং এইরূপে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানাইয়াছি। মানব ও জ্বিন সমাজের শয়তানদিগকে।" (৮ পারা ১ রুঃ—)

(২) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

কেয়ামতের হিসাব-দিবসে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তিরস্কার স্বরূপ বলা হইবে—"হে জ্বিন এবং মানব সমাজ। তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হইতে (আমার মনোনীত) রসুলগণ পৌঁছিয়াছিলেন না? যাঁহারা তোমাদেরে আমার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইতেন এবং এই (হিসাবের) দিবস সম্পর্কে সতর্ক করিতেন।" (৮ পাঃ ২ রুঃ)

(৩) قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ ...... مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ

"আল্লাহ বলিবেন, তোমাদের (জাগতিক জীবনের) পূর্ববর্তী জ্বিন ও ইনছানের যে দলগুলি দোযখে গিয়াছে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া তোমরাও আগুণে প্রবেশ কর।" (৮ পাঃ ১১ রুঃ)

(৪) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ

بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا

"এবং জ্বীন ও ইনছানদিগের মধ্য হইতে দোযখের জন্য পয়দা করিয়াছি এমন অনেককে, যাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা (হক ও সত্য) বুঝিবার চেষ্টা করে না। চক্ষু আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা (হক পথ) দেখিতে চায় না। কান আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা (হক কথা) শ্রবণের চেষ্টা করে না—ইহারা চতুষ্পদ পশু তুল্য, বরং অধিকতর অজ্ঞ; ইহারাই ত হইয়েছে গাফেল ও উদাসীন সমাজ।" (৯ পারা ১২ রুকু)

(৫) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করিব জ্বিন ও মানুষ দ্বারা।" (১২ পারা ১০ রুকু)

(৬) لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ

"আপনি ঘোষণা করিয়া দিন যে, এই কোরআনের অনুরূপ পেশ করার জন্য মানুষ ও জ্বিন সকলের শক্তি যদি একত্রে সমবেত হয় তাহা হইলেও ইহার অনুরূপ তাহারা পেশ করিতে পারিবে না।" (১৫ পাঃ ১০ রুঃ)

(৭) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

"যখন ফেরেশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, অবনমিত হও আদমের প্রতি। সেমতে সকলে অবনমিত হইল, কিন্তু হইল না ইবলীস—সে ছিল জিনদিগের একজন, কিন্তু সে নিজ প্রভুর আদেশকে অমান্য করিল।" (১৫ পাঃ ১৯ রুঃ)

(৮) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

"আর ছোলায়মান (আঃ)-এর জন্য সমবেত করা হইল তাঁহার ফৌজগুলিকে—জিনদিগের মধ্য হইতে, মানুষদিগের মধ্য হইতে ও পক্ষীদিগের মধ্য হইতে; সেমতে সুবিন্যস্ত করা হইল তাহাদিগকে।" (১৯ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৯) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ

"এক দুর্দান্ত জিন সোলায়মান (আঃ)কে বলিল, আপনি নিজের মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি বিলকিসের সিংহাসনকে আপনার নিকট নিয়া আসিতেছি।" (১৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

(১০)...حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ......

"ইচ্ছা করিলে প্রত্যেককে আমি (বাধ্যতামূলক—জবরদস্তি) সৎ পথে পরিচালিত করিতে পারিতাম, কিন্তু (ঐরূপ ব্যবস্থা ইহজগতের মূল উদ্দেশ্য—পরীক্ষার পরিপন্থি, তাই ঐ ব্যবস্থাবলম্বন না করিয়া সকলকে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান করতঃ এক শ্রেণীর করিয়া দিয়াছি, সেই সূত্রে) পাপিষ্ঠগণ সম্পর্কে আমার তরফ হইতে এই বাক্য সুসাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে, নিশ্চয় জাহান্নামকে আমি পূর্ণ করিব ঐ শ্রেণীর জিন ও মানুষ দ্বারা।" (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

(১১) فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا......

"(হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক কার্য্যে নিয়োজিত জিনগণ কার্য্য চালাইয়া যাইতেছিল) অবশেষে যখন তিনি পতিত হইয়া গেলেন (এবং সকলে তাঁহার মৃত্যু উপলব্ধি করিতে পারিল) তখন জিনগুলি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি গায়েবের খবর জানিতে পারিত তাহা হইলে তাহারা হেয়তাজনক কষ্টদায়ক কার্য্য বহন করিয়া চলিত না।" (২২ পাঃ ৮ রুঃ)

(১২) وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ـ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ......

"(মক্কার কাফেররা) আল্লাহ এবং জিনদের মধ্যে (পরিণয় সূত্রের) সম্পর্ক স্থাপনের উক্তি করিয়া থাকে; অথচ জিনগণও জ্ঞাত আছে যে, তাহাদেরও কর্মফল ভোগের সম্মুখীন হইতে হইবে।" (২৩ পাঃ ছুরা ছাফ্‌ফাত শেষ রুকু)

ইমাম বোখারী (রঃ) এই আয়াতের তফছীর সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মক্কার কাফের কোরায়েশগণ বলিয়া থাকিত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার কন্যা এবং সেই কন্যাগণের মাতা হইল জিন সর্দারদের মেয়েগণ।

(১৩) وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

"উপরোল্লিখিত কাফেরদের উপর দোযখে যাওয়ার হুকুম বলবৎ হইয়া যাইবে—ঐ সব জিন ও মানুষদের সহিত মিলিত হইয়া যাহারা (জাগতিক জীবনে) তাহাদের পূর্বযুগে ছিল। (২৪ পা: ১৭ রু:)

(১৪) أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا

"কাফেরগণ (কেয়ামতের দিন) বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! মানুষ ও জিনের মধ্য হইতে যে দুই দলে আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দাও, তাহাদেরে আমরা পদদলিত করিব।" (২৪ পা: ১৮ রু:)

(৫) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

"সেই সময়টি স্মরণীয় যখন জিনদের একটি দলকে আপনার (রসুলুল্লার) প্রতি ফিরাইয়া দিলাম, যাহারা কোরআন শ্রবন করিতেছিল।" (২৬ পা: ৪ রু:)

(১৬) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

"জিন এবং মানুষকে আমি পয়দা করিয়াছি কেবল মাত্র এই জন্য যে, তাহারা আমার গোলামী করিবে।" (২৭ পা: ছুরা জারিয়াত)

● জিন সম্প্রদায়কে ব্যক্ত করার জন্য কোরআন মজিদে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; জিন, জিন্নাত ও জান। আরবী অভিধানেও "জান" শব্দকে জিন জাতি ও সম্প্রদায় অর্থে লিখিয়াছে—"কামুস" নামক প্রসিদ্ধ আরবী অভিধানে আছে, الجان اسم جمع للجن "জান" শব্দটি জিনের জাতি ও সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। "জিন্নাত" শব্দটি সম্পর্কেও ঐ অভিধানে লিখিয়াছে—الجنة طائفة من الجان "জিন্নাত" শব্দটি জিন সম্প্রদায়ের দল অর্থে ব্যহৃত হয়।

(১৭) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ - وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ -

"আমি মানুষকে পয়দা করিয়াছি পচা দুর্গন্ধময় কর্দম হইতে এবং জিনকে পয়দা করিয়াছি উহার পুর্বে লু-হাওয়ার (ন্যায় সুক্ষ্ম ও নির্মল) অগ্নিত হইতে।" (১৪ পা: ৪ রু:)

(১৮) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ - وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ......

"আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করিয়াছেন পচা কর্দম হইতে—যাহা (অতি শুষ্ক হইয়া আগুনে পোড়ার ন্যায় শক্ত খনখন) শব্দকারী তুল্য ছিল। আর জিনকে পয়দা করিয়াছেন নির্মল অগ্নি হইতে।" (২৭ পারা ১১ রুকু)

(১৯) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ......

"হে জিন ও ইনছানের জমায়াত (আল্লাহকে এড়াইবার জন্য) যদি আছমান-জমিনের এলাকা হইতে বাহির হইয়া যাইতে সমর্থ হও তাহা হইলে বাহির হইয়া যাও; কিন্তু বাহির হওয়ার জন্যও ত সামর্থ্যের প্রয়োজন। (২৭ পারা ছুরা আর-রহমান)

(২০) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ۔

"কোন মানুষকে বা জিনকে সে দিন তাহার অপরাধ (প্রমাণ করা) সম্পর্কে (বিশেষ কিছু) জিজ্ঞাসা করা (আবশ্যক) হইবে না।" (২৭ পারা ছুরা আর-রহমান)

(২১) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ۔

"(বেহেশতের হুরগণ—) তাহাদিগকে পুর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নাই।"

এতদ্ব্যতীত ছুরা আর-রহমানের আয়াত—فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ "তোমরা দুই জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন্ নেয়ামতটা ঝুটলাইতে পার?" এই আয়াতটি উক্ত ছুরায় ১৩ বার আসিয়াছে; এখানে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, এই আয়াতটির মধ্যে "كُمَا—কুমা" ও "تُكَذِّبَانِ—তুকাজ্জেবান" শব্দদ্বয় আরবী ব্যাকরণ মতে দ্বিবচণ; যাহার অর্থ বিশ্ববাসী দুইটি সম্প্রদায় ও দুইটি জাতি; এবং সমস্ত তফছীরকার-গণই এস্থলে মানুষ ও জিন জাতীদ্বয়কে উক্ত দ্বিবচণের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পবিত্র কোরআনের ২৯ পারার বিশেষ ছুরা "ছুরা-জিন"। ঐ ছুরাটি সম্পুর্ণরূপে জিনদের একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা; ঐ ছুরার মধ্যে জিন সম্প্রদায় সম্পর্কে বহু তথ্য বর্ণিত আছে। কোন খাঁটী আলেমের নিকট ঐ ছুরাটির শুধু তর্জমা জ্ঞাত হইতে পারিলেও একটি সাধারণ মানুষ বলিতে বাধ্য হইবে যে, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমানধারী ব্যক্তি কখনও জিন সম্প্রদায় নামে এই জগতে বসবাসকারী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে পারে না।

পাঠকবর্গ। পুর্বে যে পণ্ডিত সাহেবের সমালোচনা করা হইয়াছে সেই পণ্ডিত সাহেব তফছীরকার সাজিয়া পবিত্র কোরআনের যে সব অপব্যাখ্যা করিয়াছেন তন্মধ্যে তাহার আবিস্কৃত একটি তথ্য ইহাও তিনি সরবরাহ করিয়াছেন যে, জিন নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায় নাই। তিনি পরিস্কার লিখিয়াছেন—"কোরআনের বর্ণনামতে জিন বলিতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝাইতেছে।" ৫—৬২২

এমনকি মানুষ জাতীর কোন্ শ্রেণীটিকে জিন বলিয়া স্থির করিবেন সে সম্পর্কেও পণ্ডিত সাহেব কম চেষ্টা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"আরবের 'বদ্দু' ইউরোপের

'বেদুইন' ও আমাদের দেশের বাদিয়া (বেদে) ইহা হইতে উৎপন্ন। ফলতঃ কোরআনের বর্ণিত জিনদিগের বাস ছিল নাগরিক জীবনের সংশ্রব হইতে দূরে, পাহাড়-পর্বতে ও বনজঙ্গলে। দুনিয়ার সব দেশের আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হযরত রসুলে করীম এই বন্য ও পাহাড়ীয়া মানুষ (জিন) দিগকে নাগরিক ও সামাজিক মানুষদিগের সমান পর্য্যায়ে উপনীত করিয়া দিতেছেন।" ৫—৬২৯

পণ্ডিত সাহেবের মতবাদের সারমর্ম এই যে, (১) বাস্তবে "জিন" বলিতে মানুষ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। (২) পবিত্র কোরআনে বিশেষ রূপে ছুরা জিনের মধ্যে নানাপ্রকার বিষয় সম্পর্কে যে, জিনের উল্লেখ আছে তাহার উদ্দেশ্য মানুষেরই একটি শ্রেণী। (৩) "জিন" বলিয়া যেই শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে তাহারা হইল প্রত্যেক দেশের আদিম অধিবাসীগণ যাহারা অনুন্নতরূপে পাহাড়ে-জঙ্গলে বসবাসের জীবন-যাপন করিয়া থাকে সেই শ্রেণীর মানুষ। এবং তাহারা ধীরে ধীরে আদর্শবাদী রূপে রূপান্তরিত হইয়া নাগরিক ও সামাজিক জীবন লাভ করিতে পারে এবং অনেকে তাহা করিয়া নিয়াছে।

পাঠকবর্গ! জিন সম্প্রদায়রূপে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করার জন্য আমরা পবিত্র কোরআন হইতে ২৩টি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছি। সে সবের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় জিন এই জগতে বিদ্যমান আছে—যাহারা অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে ভিন্ন—মানুষের ন্যায় আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম আদেশ ও নিষেধাবলীর মোকাল্লাফ বা আওতাভুক্ত; উহা লঙ্ঘনে তাহারাও দোজখের শাস্তি ভোগ করিবে এবং পালনে দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, সুফল লাভ করিবে।

পণ্ডিত সাহেবের মতবাদ উক্ত আয়াতসমূহ ও সমুদয় দলীল প্রমানাদির সম্পূর্ণ বিরোধী। বিশেষতঃ ১৭ ও ১৮ নম্বরের আয়াতদ্বয়—যেখানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বোল আলামীন মানুষ ও জিন উভয়ের সৃষ্টি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—মানুষের সৃষ্টি পদার্থের মূল হইল মাটি এবং জিনের সৃষ্টি পদার্থের মূল হইল অগ্নি। এমতাবস্থায় জিনকে মানুষেরই একটি শ্রেণী বলিয়া দাবী করা কোন্ পর্য্যায়ের দাবী তাহা পাঠকের বিচার্য্য। এমনকি পণ্ডিত সাহেবও স্বীয় তথাকথিত "তফছীরুল কোরআনে" আলোচ্য আয়াত সমূহ সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ অনুসারে কোন কিছু সরবরাহ করিতে সক্ষম হন নাই হইবেনও না।

এতদ্ভিন্ন ছুরা জিন যাহার তফছীরেই পণ্ডিত সাহেব স্বীয় আভ্যন্তরীন পলীদ মতবাদের উদগার করিয়াছেন সেই ছুরারই একটি আয়াত পেশ করিতেছি যেখানে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং জিনগণের একটি উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন—

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا - وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ

مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا......

"আর আমরা আকাশের নিকটবর্তী হইয়াছিলাম; দেখিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইয়া আছে ম'বুত রক্ষকগণের ও নক্ষত্রগুলির দ্বারা। আর পূর্বে আমরা উহার (আকাশের) বিশেষ স্থানসমূহে বসিতাম (তথাকার আলোচনা) শ্রবণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এখন যদি কেহ শুনিবার চেষ্টা করে সে প্রস্তুত অগ্নি-শিখার সম্মুখীন হয়। (আকাশের এই পরিবর্তেন দ্বারা) বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিবাসীগণের অমঙ্গলের ইচ্ছা করা হইয়াছে কিংবা তাহাদের পরওয়ারদেগার তাহাদের জন্য কোনও মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিয়াছেন—তাহা আমরা অবগত নহি।"

পাটকবর্গ। ছুরা জিনের মধ্যে যেই জিনদের উল্লেখ হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তাহাদেরই উক্তিরূপে পবিত্র কোরআন উক্ত আয়াতে যে বর্ণনা দান করিল উহার মর্ম উপলব্ধি করার পর পণ্ডিত সাহেবের বক্তব্য স্মরণ করুন যে, "এই ছুরায় বর্ণিত ঘটনায় জিন বলিতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝান হইয়াছে এবং তাহারা অনুন্নত পাহাড়ী মানুষ।" উক্ত আয়াত দৃষ্টে এইরূপ উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়? কোথায় পাহাড়ী মানুষ আর কোথায় আকাশে যাইয়া ফেরেশতাগণ কর্তৃক নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হওয়া? এই সবের সঙ্গে পাহাড়ী মানুষের কি সম্পর্ক?

এতদ্ভিন্ন উক্ত আয়াতের মর্ম ও ছুরা জিনের ঘটনা সম্পর্কে বোখারী শরীফের ৭২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একখানা হাদীছ উল্লেখ করিতেছি। ঐ হাদীছের তথ্য সমূহের সঙ্গে পণ্ডিত সাহেবের আবিষ্কৃত পাহাড়ী মানুষের কি সম্পর্ক তাহাই লক্ষণীয়।

১৬১৭। হাদীছ :— ইবনে আব্বাস (রাঃ) (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শুনিয়া) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় স্বীয় কতিপয় ছাহাবী সহ (মক্কা নগরী হইতে বহু দূরে তায়েফ নগরীর নিকটবর্তিস্থিত) "ওকায" নামক প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটের দিকে যাইতেছিলেন।

ইতিপূর্বে দুষ্ট জিনগণ যে, আকাশের নিকটবর্তী যাইয়া (ফেরেশতাগণের আলাপ আলোচনা হইতে) কোন কোন তথ্য জ্ঞাত হইয়া থাকিত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐরূপ জিনদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে তথা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনকারী জিনগণকে অন্যান্য জিনগণ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি অবস্থা? তাহারা উত্তর করিল, উর্দ্ধ জগতে আমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই বলিল, নিশ্চয় কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টির দরুণই এই প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চল সকলে জগতের চতুর্দিকে তালাশ করিয়া বেড়াই যে, ঐ বস্তুটি কি? অতঃপর তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

জিনদের যেই দলটি মক্কা এলাকার প্রতি আসিয়াছিল তাহারা (মক্কা হইতে এক দিনের পথ দূরে অবস্থিত) "বতনে-নখ্‌লা" নামক স্থানের দিকে আসিল। তখন ঐ স্থানে

রসুলুল্লাহ (দঃ) ওকাযের হাটের দিকে (ইসলামের তবলীগ উদ্দেশ্যে) যাওয়ার পথে স্বীয় সঙ্গীগণ সহ বিশ্রাম নিতে ছিলেন এবং (উচ্চৈঃস্বরে কেরাতের সহিত) ভোর বেলার নামায আদায় করিতেছিলেন। ঐ জিনগণ কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া উহার প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করতঃ তথায় দাঁড়াইল এবং দৃঢ় বিশ্বাস করিল যে, ইহাই ঐ বস্তু যাহার কারণে আকাশের নিকটবর্তী আমাদের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা তথা হইতে স্বজাতীদের প্রতি ফিরিয়া আসিল এবং সকলের সম্মুখে ঘটনা বর্ণনা করিল, (যাহার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআন "ছুরা-জিনে" রহিয়াছে—)

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا

"আমরা এক আশ্চর্য্যজনক বস্তুর তেলাওয়াত শুনিতে পাইয়াছি, উহা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছি এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিব না।"

এই সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযেল করিলেন—(ছুরা-জীনের আরম্ভ)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ -

"আপনি সকলকে জানাইয়া দিন, আমাকে অহী দ্বারা জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, জিনদের একটি দল বিশেষ মনযোগের সহিত কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়াছে।"

১৬১৮। **হাদীছঃ**— আবদুর রহমান (রঃ) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মছরুক (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি (-তথা ভোর) বেলা জিনগণ যে, কোরআনের তেলাওয়াত শুনিয়াছিল সেই ঘটনা নবী (দঃ)কে (অহী ব্যতীত অন্য) কেহ জ্ঞাত করিয়াছিল কি ? তিনি বলিলেন, আপনার পিতা--আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ তাঁহাকে ঐ জিনদের সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছিল। (৫৪৪ পৃঃ)

১৬১৯। **হাদীছঃ** আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য অজুর পানির পাত্র এবং এস্তেঞ্জার জন্য পানির লোটা আনিয়া থাকিতেন। একদা তিনি লোটা নিয়া আসিতে ছিলেন, হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আমার জন্য কয়েকটি পাথর খণ্ড নিয়া আস, আমি (উহা কুলুখরূপে ব্যবহার করিয়া) পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিব ; হাড্ডি বা (উট, গরু, ঘোড়ার) লেদা—মল যেন না হয়।

আমি কতিপয় পাথর খণ্ড স্বীয় কাপড়ে করিয়া নিয়া আসিলাম এবং হযরতের নিকটে রাখিয়া আমি তথা হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। হযরত (দঃ) অবসর হওয়ার পর আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হাড্ডি ও লেদা সম্পর্কে

নিষেধ করার কারণ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ বস্তুদ্বয় জিনদের (ও তাহাদের যানবাহনের) খাদ্যবস্তু।

"নছীবীন" নামক স্থানে বসবাসকারী একদল জিন আমার নিকট তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে আবেদন জানাইলে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছি যে, তাহারা হাড্ডি ও লেদার নিকটবর্তী হইলে যেন উহাতে তাহাদের (ও তাহাদের যানবাহনের) খাদ্যবস্তু জন্মিয়া যায়। (৫৪৪ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ—এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফের একখানা হাদীছ আছে—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম; হঠাৎ তিনি আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। পাহাড়ী এলাকায় অনেক তালাশ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার কোন খোঁজ পাইলাম না। আমরা আশঙ্কা করিতে লাগিলাম যে, তাঁহাকে কোন জিনে উড়াইয়া লইয়া গেল বা গোপনে তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া ফেলা হইল। এই ভাবনা-চিন্তায় ঐ রাত্রিটি আমাদের জন্য সর্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক রাত্ররূপে অতিবাহিত হইল।

প্রভাতে হঠাৎ আমরা দেখিলাম, হযরত (দঃ) হেরা পর্বতের দিক হইতে আসিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট আমাদের রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, জিনদের প্রতিনিধি দল আসিয়া আমাকে দাওয়াত করিয়াছিল; আমি তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম. তাহাদিগকে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছি।

অতঃপর হযরত (দঃ) স্বয়ং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জিনদের সম্মেলন স্থানটি দেখাইলেন; তথায় তাহাদের প্রজ্জলিত অগ্নির নিদর্শন দেখিতে পাইলাম।

তাহারা স্বীয় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার নামে জবেহকৃত জানোয়ারের হাড্ডি তোমাদের হস্তে আসিলে উহা গোশতপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং পশুর লেদাসমুহ তোমাদের যানবাহনের খাদ্য হইবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা উক্ত বস্তুদ্বয় দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করিও না। কারণ, উহা তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক। ঐ জিন দলটি (সিরিয়া ও এরাকের মধ্যে অবস্থিত) "আল জাযীরা" এলাকার ছিল।

পাঠকবর্গ। পণ্ডিত সাহেব মাকড়সার জাল অপেক্ষা দুর্বল—বাজে কথা শ্রেণীর দুই-চারিটি কথা দলীলরূপে পেশ করিয়াছেন ঐগুলি ছিন্ন করা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর হইবে।

প্রথমতঃ তিনি একটি হাস্যষ্পদ ধরণের দোষারূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জিনদের প্রকৃত স্বরূপ যে কি সে সম্বন্ধে ঘোর মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে।"

কোন একটা বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণকে মত বিরোধ করিতে দেখিয়া উহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হয় কি? মানুষের

আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের অনেক অনেক মতাবরোধ আছে। তাহা দেখিয়া পণ্ডিত সাহেব আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ তিনি জিনদের সম্পর্কে কোরআনে ব্যবহৃত "نفر নফর" এবং "معشر-মা'শার" শব্দদ্বয় সম্পর্কে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত শব্দদ্বয় একমাত্র মানব জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই জিন মানব শ্রেণীর বস্তুই হইবে।

পণ্ডিত মির্জার এই সব দাবীর অসাড়তা প্রমাণে উক্ত শব্দদ্বয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তরূপে দুইটি প্রমাণ—একটি হাদীছ, আর একটি আরবী অভিধানের উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি—

اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكة

(১) نفر—নফর শব্দ সম্পর্কে বোখারী শরীফের ও মোসলেম শরীফের একটি হাদীছের অংশবিশেষ ইহা। ঐ হাদীছে হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আদেশ করিলেন—

"আপনি ঐ দলটির প্রতি যান এবং তাহাদিগকে সালাম করুন—ঐ দলটি ছিল ফেরেশতাগণের একটি দল।"

পাঠকবর্গ। লক্ষ্য করুন এস্থলে ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া "نفر নফর" শব্দটি অত্র হাদীছে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিত সাহেব কি ফেরেশতাকেও এক শ্রেণীর মানুষ গণ্য করিবেন? নতুবা ত তাহার এই দাবী সত্য হইবে না যে, "نفر-নফর" শব্দ মাত্র মানব জাতির জন্যই ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ نفر নফর ও معشر-মা'শার উভয় শব্দই জামাত ও দল অর্থে সকলের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) معشر -মা'শার শব্দটি সম্পর্কে আরবী অভিধানের বিশেষ গ্রন্থ "কামুস"-এ পরিষ্কার লিখিত আছে—معشر— جماعة الجن والانس

অর্থাৎ "মা'শার" শব্দ দল ও জমাত অর্থে জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পণ্ডিত সাহেব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহের নামেও কল্পনা হাঁকাইয়াছেন। এই নামে জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অতি বিস্ময়কর, কারণ মাওলানা থানভী (রঃ) 'আল-এন্তেবাহাত' নামক স্বীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন।

اور نصوص میں انکا وجود وارد ہے اسلئے ایسے جوا ہرکا
قائل ہونا لابد واجب ہوگا -

অর্থাৎ—কোরআন-হাদীছে স্পষ্টরূপে ইহাদের (জিনদের) অস্তিত্ব উল্লেখ আছে, তাই উহার স্বীকৃতি অবশ্য কর্তব্য। তিনি আরও সতর্ক করিয়াছেন—

آیات میں ایسی بعید تاویلیں کیجاتی ہیں کہ بالکل
وہ حد تحریف میں داخل ہیں -

অর্থাৎ—"যেহেতু অকাট্য কোরআনের অনেক আয়াতে জিনদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি রহিয়াছে। তাই অস্বীকারকারীরা ঐ আয়াত সমূহের এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকে যাহা পবিত্র কোরআনকে বিকৃত করণ বৈ নহে।"

পূর্বাপর ইমাম ও আলেমগণের মতে জিন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি। একমাত্র ইসলাম বহির্ভূত জিন্দীক এবং ফাছেক পরিগণিত মো'তাযেলা ইত্যাদি দলই এই মতকে অস্বীকার করে। এই সম্পর্কে বোখারী শরীফের শরাহ্ ফতহুল বারীর একটি উদ্ধৃতির অনুবাদ লক্ষ্য করুন—

"ফালছফী ও জিন্দিক এবং মো'তাযেলীগণ জিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকে। যাহারা কোরআন-হাদীছকে মানে না তাহাদের পক্ষে জিনের অস্তিত্বের অস্বীকারোক্তি বিস্ময়কর নহে, অবশ্য যাহারা কোরআন-হাদীছ মান্য করার দাবীদার তাহাদের পক্ষে উহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেহেতু কোরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং অকাট্য হাদীছ এই সম্পর্কে ভূরিভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে। জিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও কোন ঠেস লাগে না। অনেকে উহা অস্বীকার করার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া থাকে যে, যদি জিন নামে বিশেষ কিছু থাকিত তবে উহা দেখা যাইত। এইরূপ যুক্তির অবতারণা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আল্লাহ্ তায়ালার বিচিত্রময় অসীম কুদরতকে অবহেলা করে।"

লক্ষ্য করুন। ফেরেশতা দেখা যায় না, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি অসংখ্য সত্য বস্তু দেখা যায় না, সেই জন্য কি ঐ সবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইবে?

পাঠকবর্গ! জিন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, অথচ ইসলামদ্রোহীরা উহা অস্বীকার করে, তাই বোখারী (রঃ) জিন সম্পর্কে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এবং ৫৪৪ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরাও উক্ত ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিলাম।

হে আল্লাহ্! আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করিও এবং উহাকে মোসলমান ভাইদের ঈমান হেফাজতের সহায়ক বানাইয়া আমাদের জন্য মাগফেরাত ও তোমার সন্তুষ্টি লাভের অছিলা বানাইয়া দিও—আমীন! আমীন!!

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

সমাপ্ত

بسم الرحمن الرحيم

(রহমানুর রাহীম আল্লাহর নামে)

সপ্তদশ অধ্যায়

নবীদের ইতিহাস

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে বহু সংখ্যক নবী পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক নবী আলাইহিমুস সালামের কোন কোন ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। যেসব নবীর উল্লেখ পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের ভিন্ন আরও নবী যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎসম্পর্কেও পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ـ

"(হে মুহাম্মদ (সঃ)!) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম যাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের বিভিন্ন ঘটনা আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি এবং এমনও অনেক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জ্ঞাত করি নাই।" (পারা– ২৪; রুকু– ১৩)

নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অবশ্য একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রসূল ও নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার; কিন্তু উপরোল্লিখিত আয়াতের দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, রসূলগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক এইরূপও ছিলেন, যাঁহাদের বয়ান হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জ্ঞাত করান হইয়াছিল না। তাই উক্ত হাদীছখানা নবীগণের সংখ্যা নির্ধারণ ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারক অথচ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বরহক ও সত্য হওয়া সম্পর্কে ঈমান রাখা ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং পয়গাম্বরগণের সংখ্যা নির্ধারণ না করিয়া এইরূপ ঈমান রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলা যত পয়গাম্বর জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত খাঁটি ও সত্য ধর্মবাহক, আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষ। তাঁহারা গোনাহ হইতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নবীগণের উল্লেখ রহিয়াছে, ইমান বোখারী (রঃ) এই অধ্যায়ে সেই নবীগণ সম্পর্কেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

হযরত আদম (আঃ)

নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী, বরং মানব জাতির আদি পিতা এবং আল্লাহর কুদরতের সৃষ্ট সর্বপ্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আল্লাহ তাআলা মাটি দ্বারা স্বীয় বিশেষ কুরতবলে সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতপর তাঁহারই শরীরের এক অংশ দ্বারা তাঁহার জোড়া মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পিতা আদম ও মা হাওয়া হইতেই বিশ্বজোড়া মানব জাতির সৃষ্টি।

হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাবলী ও আদি ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; সেই সব ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা

আসমান-যমীন ইত্যাদি তথা বিশ্বজগতকে আল্লাহ তাআলা পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে রহিয়াছে। অতপর যখন আল্লাহ তাআলা আদমকে এই ভূমণ্ডলে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি তাঁহার এই ইচ্ছা ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন।

ফেরেশতা হইলেন নূর বা আলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও বিশেষ পাক-পবিত্র জীব। পাপ বা নাফরমানীর প্রবৃত্তির লেশ মাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই, তাঁহারা সর্বদা সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ তাআলার ফর্মাবরদারী, আজ্ঞা বহন এবং তাঁহার এবাদত-বন্দেগী প্রশংসা ও মহিমা জপ করিয়া থাকেন– ইহা তাঁহাদের সৃষ্টিগত স্বভাব। তাঁহারা যখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা জানিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাআলা অন্য এক জীব সৃষ্টি করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিশেষ আসক্ত ভক্ত অনুরক্ত ভৃত্য দাসের ন্যায় নিজেদের ফেদাইয়ত বা প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আত্ম-বিলীনের ঘোষণাদানপূর্বক প্রভুর দরবারে আরজ করিলেন– ওহে প্রভু! অন্য জীব সৃষ্টি হইলে তাহারা হয়ত তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে; সদা-সর্বদা তোমার মহিমা জপের জন্য আমরাই ত প্রস্তুত রহিয়াছি।

এখানে আল্লাহ তাআলার মূল ইচ্ছা এবং ফেরেশতাদের ধারণার মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। আল্লাহ বলিয়াছেন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিবেন, আর ফেরেশতাগণ বলিতেছিলেন, মহিমা জপের কাজ সমাধা করিবেন। এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ফেরেশতাদের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা নাই– আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের মধ্যে সেই কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি করেন নাই, সেই দিকে ফেরেশতাগণের লক্ষ্য ছিল না; অথচ আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ঐ বিষয়টিই ছিল প্রধান এবং সেই জন্য খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য জীব সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে তাহাদের অজ্ঞতার কথা বলিয়া দিয়া স্বীয় বিজ্ঞপ্তির আলোচনা সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা এইরূপ–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ـ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ـ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

তোমরা স্মরণ কর তখনকার ঘটনা যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি দুনিয়াতে একজন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। তখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, আপনি কি দুনিয়াতে এমন জাতি সৃষ্টি করিতে চাহেন, যাহারা তথায় ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে? অথচ আমরাই ত আপনার মহিমা জপ ও পবিত্রতা বয়ান করিয়া থাকি। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি যেসব গোপন বিষয় অবগত আছি তোমরা তাহা অবগত নও। (পারা–১; রুকু– ৪)

আদম সৃষ্টির স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা মুলতবী করিয়া দিয়া অতপর তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আদম সৃষ্টি করার স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন যে, আমি আদম সৃষ্টি করিবই। এমনকি আদম সৃষ্টি করার পর ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ফেরেশতাগণ যে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে

আদিষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদিগকে তাহা পালন করিতে হইবে; আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে সে সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের সম্মুখে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করিব একটি মানব দেহ বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার খন্ খন্ শব্দাকারক শুষ্ক মাটি হইতে। যখন আমি উহা সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি আত্মা বা রূহ প্রদান করিব, তখন (ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আমার আদেশ আসিলে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে। (সূরা হেজ্‌র পারা– ১৪; রুকু– ৩)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ـ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ـ

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করিয়া তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন, নিশ্চয় আমি একটি মানুষ কর্দম দ্বারা তৈয়ার করিব। আমি যখন উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আত্মা বা রূহ্ প্রদান করিব তখন (ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আমার আদেশে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে। (সূরা সোয়াদঃ পারা–২৩; রুকু-১৪)

হযরত আদমের সৃষ্টি

মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর দেহকে আল্লাহ তাআলা মাটির দ্বারা তৈয়ার করিবেন, তাহা পূর্ব বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ঘোষণায়ই জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা আদমকে যেই মাটিটুকু দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন, সেই মাটিটুকু ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল (যাহার মধ্যে লাল, সাদা, কাল এবং নরম, শক্ত, মন্দ ও ভাল বিভিন্ন রকমের মাটি ছিল) যার ফলে আদম সন্তানগণ লাল, সাদা, কাল, নরম এবং শক্ত ও ভাল-মন্দে বিভক্ত হইয়াছে।–

(মেশকাত শরীফ)

ঐ মাটি সম্পর্কে আরও তথ্য এই জানা যায় যে, প্রথমে ঐ মাটিকে পচা কর্দমে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়। যখন উহা (কুমারের মাটির ন্যায়) চটচটে আঠাল রূপধারণ করে, তখন উহা শুকানো হয়। ঐ মাটি যখন পূর্ণ শুষ্ক হয়, এমনকি আগুনে পোড়া মাটির তৈয়ার পাত্রের ন্যায় করাঘাতে খন্ খন্ করিয়া বাজিবার উপযোগী হয় তখন আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরত বলে সেই শুষ্ক ও শক্ত মাটি দ্বারাই আদমের আকৃতি বা দেহ-কাঠামো তৈয়ার করা হয়। (বয়ানুল কোরআন)

এইসব তথ্যের ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে– خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ

আল্লাহ তাআলা আদমকে মাটি হইতে তৈয়ার করিয়াছেন; অতপর "কুন হইয়া যাও" আদেশ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে (মাটির তৈয়ার পুতুলটি) জীবন্ত হইয়া গেল। (পারা–৩; রুকু–১৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ـ

একটি বাস্তব তথ্য এই যে, (মানব জাতির আদি) মানুষটিকে আমি পয়দা করিয়াছিলাম খন্ খন্ বাজে এইরূপ মাটি হইতে, যাহা বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার ছিল। এর পূর্বে আমি জ্বিন জাতিকে পয়দা করিয়াছিলাম। গরম বাতাসের ন্যায় ধুঁয়া-শূন্য স্বচ্ছ নির্মল আগুন হইতে। (পারা–১৪, রুকু–৩)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ـ

(মানব জাতির আদি) মানুষটিকে পয়দা করিয়াছিলেন খন্ খন্ শব্দকারক মাটি হইতে এবং জ্বিনকে পয়দা করিয়াছিলেন নির্মল অগ্নি হইতে। (পারা–২৭; রুকু–১১)

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

আমি মানুষকে (তথা তাহাদের উৎপত্তির আসল গোড়াকে) সৃষ্টি করিয়াছি চটচটে আঠাল মাটি হইতে। (পা–২৩; রুকু–৫)

اَلَّذِیْ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ـ

এ সম্পর্কে আরো একটি সুস্পষ্ট আয়াত– তিনি (আল্লাহ তাআলা) স্বীয় সৃষ্ট বস্তুগুলিতে অতি সুন্দর রূপ দান করিয়াছেন এবং মানব জাতির সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন কর্দম হইতে (তথা প্রথম মানুষটিকে কর্দম দ্বারা তৈরী করিয়াছেন)। অতপর উহার নছল বা পরবর্তী বংশধরকে এক নিষ্কাশিত বস্তু তথা নিকৃষ্ট জলীয় পদার্থ (অর্থাৎ বীর্য) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।(পারা–২১; পারা–১৪)

১৬২০। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْاٰنَ ـ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে তাঁহার নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপর সৃষ্টি করিয়াছিলেন– জন্মের প্রথম হইতেই) তাঁহার দৈর্ঘ বা দেহের উচ্চতা ছিল (বর্তমান সাধারণ মাপের) ষাট হাত। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তাআলা তথায় একত্রিত এক দল ফেরেশতার নিকটবর্তী যাইতে বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে সালাম করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, তাঁহারা সালামের উত্তর কিরূপ প্রদান করেন তাহা আপনি লক্ষ্য করিবেন; ঐ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর, সন্তান-সন্ততির জন্য পারস্পরিক সালামের নিয়ম হইবে।

আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের সন্নিকটে যাইয়া "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে "ওয়াআলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" বলিলেন। সালাম তথা শান্তির দোয়ার উত্তরে ফেরেশতাগণ সালাম তথা শান্তির দোয়া ভিন্ন বিশেষ রহমতের দোয়াও বর্ধিত করিলেন।

(হযরত সঃ বলেন,) আদম দেহের উচ্চতার আসল পরিমাপ ছিল ষাট হাত, (আদম সন্তানদের) যাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাও তখন সেই আদি পরিমাপ ষাট হাত উচ্চতায়ই হইবেন। মধ্যবর্তী জাগতিক জীবনে আদম সন্তানদের দেহের দৈর্ঘ ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ আদম (আঃ) সম্পর্কে আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে তাঁহার দৈহিক গঠন, পরিমাপ ও আকারের উপর সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ সৃষ্ট জীবসমূহের জন্ম পদ্ধতি হইল– অতিশয় ছোট ও ক্ষুদ্রাকারে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু আদম (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ছিল ভিন্ন রূপ। তিনি ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত প্রস্থ দৈহিক আকার লইয়া জন্ম লাভ করিয়াছিলেন; এই পার্থক্যের হেকমতও অতি সুস্পষ্ট। কারণ, সকল জীবই সঙ্কীর্ণ মাতৃগর্ভে বা ডিমের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ছিল এইরূপে– خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালামের দেহ)কে মৃত্তিকা দ্বারা তৈয়ার করিয়া "কুন" (হইয়া যাও)" নির্দেশ দান করার সঙ্গে তিনি জীবন্ত রূপধারণ করিয়াছিলেন। (পারা– ৩; রুক– ১৪)

ষাট হাত দৈর্ঘ ছিল আদম জাতির আসল আকার, কিন্তু বৃক্ষের ফল-মূল যেরূপ প্রাথমিক আকারের তুলনায় ক্রমশই ক্ষুদ্র হইতে থাকে তদ্রূপ আদম সন্তানরাও ক্রমশই ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য আদম সন্তানগণ যখন স্বীয় আসল বাসস্থান বেহেশতে যাইবে, তখন তাহাদের দেহ আদি আকার ষাট হাত দৈর্ঘেরই হইবে।

যেসব আদম সন্তান দোযখী হইবে তাহাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, দোযখের আযাব অত্যধিক পরিমাণে ভোগ করাইবার জন্য দোযখীদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরাট আকারের ন্যায় করিয়া দেওয়া হইবে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, তাহাদের এক একটি বিরাট দাঁত (আড়াই মাইল উঁচু মদীনার) ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকারের হইবে। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব কয়েক মাইলের ব্যবধান হওয়া সম্পর্কেও হাদীছে উল্লেখ আছে।

সালাম সম্পর্কে শরীয়তের যে বিধান ও মুসলমানদের মধ্যে যে রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে, উহার মূল উৎস এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তরে "ওয়া আলাইকাস সালাম" বলিয়াছিলেন। عليك আলাইকা এবং عليكم আলাইকুম-এর পার্থক্য বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ নহে। আরবী ব্যাকরণে ك কা" এবং كم কুম" একবচন ও বহুবচন; কিন্তু আরবী ব্যাকরণে ইহাও আছে যে, বহুবচনবোধক শব্দ كم কুম সম্মানার্থে একজনের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদম (আঃ) একজন ছিলেন, সেই সূত্রেই ফেরেশতাগণ একবচনের মূল শব্দ ك কা ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইরূপ সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা অশুদ্ধ নহে। অবশ্য প্রত্যেক মুসলমান সম্মানের পাত্র, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে সর্বদাই কয়েকজন ফেরেশতা থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত থাকায় একজন মুসসলমানকে বহুবচন বোধক كم কুম" শব্দ দ্বারা সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা শুদ্ধই বটে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ছাহাবাগণের মধ্যে উহার প্রচলনের আধিক্যও বিভিন্ন হাদীছে পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রেই كم কুম শব্দের দ্বারা সালামের উত্তরের সাধারণ রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তর وَرَحْمَةُ اللّٰه "ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বাক্য অতিরিক্ত বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে কোরআন-হাদীছেও কিছু বিবরণ বিদ্যমান আছে। কোরআন শরীফে আছে–

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا ـ

অর্থঃ "তোমাকে কেহ সালাম করিলে যে পরিমাণ ও যে দোয়ার দ্বারা তোমাকে সে সালাম করিয়াছে, তুমি তাহাকে তদপেক্ষা অধিক উত্তম দোয়ার দ্বারা বা অন্ততঃ এইরূপ দোয়ার দ্বারাই উত্তর দাও।" (পারা– ৫; রুকু– ৮)

এই আয়াতে অধিক দোয়ার দ্বারা উত্তর দেওয়াকেই উত্তম বলা হইয়াছে; ইহাতে সওয়াবও অধিক হইবে। এক হাদীছে আছে– একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে আসিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং আগন্তুক হযরতের মজলিসে বসিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, সে দশ নেকী লাভ করিয়াছে। অতপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, এই ব্যক্তি বিশ নেকী লাভ করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি ত্রিশ নেকী লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি আসিয়া "অস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফেরাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি চল্লিশ নেকী লাভ করিয়াছে। হযরত (সঃ) ইহাও বলিলেন, বেশী-কম নেকী লাভের তারতম্য এইরূপে হইয়া থাকে।

–(আবু দাউদ শরীফ)

নেকী লাভ করার জন্য উপরোল্লিখিত শব্দসমূহকে সালাম দানেও এবং সালামের উত্তর দানেও ব্যবহার করা যায়।

আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের প্রতিযোগিতা

ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনার সময় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে এই বলিয়া আলোচনা ক্ষান্ত করিয়াছিলেন যে, "গোপন তথ্য যাহা আমি জানি তাহা তোমরা জান না।" সেই গোপন তথ্য এস্থলে এই যে, খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তোমাদের নাই– তোমাদিগকে উহা দেওয়া হয় নাই; আদমের মধ্যে সেই যোগ্যতা প্রদান করা হইবে। অতএব, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আদমের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, তোমাদের দ্বারা হইবে না।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইল আদম ও ফেরেশতা উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেই গোপন তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া; আল্লাহ তাআলা সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক হয়– (১) ওফাদারী ও ফর্মাবরদারী– অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত পূর্ণানুগত্য ও আজ্ঞা বহন। (২) দায়িত্ব পালন এবং কার্য সমাধানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা।

প্রথম গুণ তথা ওফাদারী ও ফর্মাবরদারী– আনুগত্য ও আজ্ঞা বহন– ইহার উৎস হইল আ'বদিয়ত বা আল্লাহর দাসত্ব; আ'বদিয়ত বা আল্লাহর দাসত্ব ফেরেশতাদের মধ্যে অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় গুণটির উৎস হইল এলম তথা জ্ঞান বা বিদ্যা। এস্থলে যেহেতু রাব্বুল আ'লামীন– বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আহকামুল হাকেমীন, সর্বাধিপতি বিধানকর্তা আল্লাহ তাআলার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব এবং এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য এমন জাতি নির্বাচিত হইতে পারিবে, যে জাতি ব্যাপক এলম লাভ করিতে সক্ষম, যে জাতি বিশ্বব্যাপী সব কিছুর এলম বা জ্ঞান লাভের সামর্থ রাখে। এইরূপ জাতিই সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিসের উপর আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে।

এইরূপ ব্যাপক এলম বা জ্ঞান লাভ করার শক্তি বা সামর্থ্য সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে দেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের এলম বা জ্ঞান সীমাবদ্ধ রহিয়াছে শুধু ঐ বস্তু ও কার্য সম্পর্কে, যাঁহার উপর যে বস্তু ও কার্যের ভার ন্যাস্ত করা হইয়াছে। যিনি পাহাড়ের ব্যবস্থাপক তাঁহার এলম ও জ্ঞান পাহাড় সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি সৃষ্টির ব্যবস্থাপক বা তাঁহার জ্ঞান সৃষ্টি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি জীবের

মৃত্যু ঘটানো কার্যে নিয়োজিত তাঁহার এলম বা জ্ঞান সেই বিষয়েই সীমাবদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সীমাবদ্ধতায় তাঁহারা বাধ্য রহিয়াছেন ইচ্ছা করিলেও এই সীমা অতিক্রম করতঃ অন্য বিষয়ে এলম বা জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহারা সক্ষম নহেন। এমনকি ঐ ধরনের এলম বা জ্ঞান তাঁহাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দেওয়া হইলেও তাহা আয়ত্তে আনিতে তাঁহারা সক্ষমই হইবেন না। এই ক্ষমতা সামর্থ্য তাঁহাদের সৃষ্টিতেই রাখা হয় নাই। (لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا)

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিতেই ব্যাপক এলম বা জ্ঞান লাভ করার এক সুপ্রশস্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য ও গুণ রাখিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহারা আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত, এমনকি সুগভীর সমুদ্রের তলার মাটির নীচে কি আছে তাহার জ্ঞানও তাহারা লাভ করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়া গিয়াছে, تحت البحر نار "সমুদ্রের তলদেশের নিম্নস্তরে অগ্নি রহিয়াছে।" তাঁহার পরবর্তী যুগের লোকগণ সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরি এবং আটলান্টিক মহাসগরের তলদেশে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের খনির সন্ধান লাভ করিয়াছে। সপ্ত আকাশের উর্দ্ধ দেশে কি আছে তাহার এলমও তাহারা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে হযরত (সঃ) আরশ, কুরসী, সেদরাতুল মোনতাহার খবর বাতলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উম্মতগণ কাশ্‌ফ ও এলহামের দ্বারা কত কিছুর খোঁজ লাভ করিয়াছেন! বিজ্ঞানের সাহায্যে উর্দ্ধ দেশীয় নিত্যনূতন স্তর ও গ্রহ-উপগ্রহ জয় করা হইতেছে।

মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের শুধু এলম বা জ্ঞান লাভেই নহে, বরং প্রত্যেকটি বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ দানেও সক্ষম ইয়াছে। ফেরেশেতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জ্বিন জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।* জল ও স্থলের, উর্দ্ধ ও নিম্নের হাতী হইতে বড় এবং পিপীলিকা হইতে ক্ষুদ্র প্রত্যেকটি জীবের শুধু পরিচয় ও বিবরণদানই নহে, বরং উহার গোশ্‌ত-পোশ্‌ত, অস্থি-মজ্জা এমনকি উহার রগ-রেশার প্রতিটি কণার বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করিয়াছে।* বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এমনকি সমুদ্র বক্ষের প্রতিটি উদ্ভিদের খাল-বাকল, মূল-শিকড়, ফল-ফুল ইত্যাদির রং-রূপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছে *। শুধু তাহাই নহে, বরং ঐ সবের দ্বারা সমস্ত জগতকে উপকৃত করত هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا "আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব বস্তুকে তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" এর তাৎপর্যের বিকাশ সাধন করিয়াছে। আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা কার্যে পরিণত করার ময়দানে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে ও করিতেছে।*

---

* "আ-কা-মুল মারজান" নামক একখানা আরবী পুস্তক এই বিষয়ে পাওয়া যায়।

* "হায়াতুল হায়ওয়ান" নামক কিতাবখানাকে এই বিষয়ে বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। "আজায়েবুল মাখলুকাত" নামক আর একখানা কিতাবও এই সম্পর্কে পাওয়া যায়।

* হেকিমী কবিরাজী কিতাব ও বই-পুস্তক এই বিষয়ে অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে।

* আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের দুইটি বিভাগ– এক হইল জীবিকানির্বাহ ও জাগতিক আবশ্যক পূরণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনার ব্যাপার। দ্বিতীয় হইল শরীয়ত তথা আল্লাহর নির্দেশাবলী বা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন সারা বিশ্বে জারি করার ব্যাপার।

বলাবাহুল্য– খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের বাপারে দ্বিতীয় বিভাগটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের মধ্যেও এই শ্রেণীর বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। কোন প্রতিনিধি মূল ক্ষমতাধিকারীর আদেশে অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করিলে অথবা আদেশ বহন না করিলে বা স্বীয় মন মোতাবেক স্বেচ্ছাচারীরূপে কাজ করিলে বা অন্য কাহারও ইঙ্গিত-ইশারার পায়রবী করিলে সেই প্রতিনিধি বিদ্রোহী গণ্য হইবে এবং তাহার ভাগ্য গোরেফতারী ও জেল-হাজতে জড়াইয়া পড়িবে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানব জাতির সম্পর্কে ঠিক তদ্রূপই। অতএব, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালন ও তাঁহার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তাঁহার আসল খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব। অন্যথায় বিদ্রোহী প্রতিনিধি গণ্য হইয়া জেল-হাজত তথা জাহান্নামী হইতে হইবে। এই জন্যই আল্লাহর রসূল ও নায়েবেরসূলগণ এই বিভাগকেই অধিক গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছেন।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যে শক্তি সামর্থ্য রক্ষিত আছে, উল্লিখিত ব্যাপক এলম বা জ্ঞান উহারই পরিচয় ও প্রতিক্রিয়া। ফেরেশতাদের মধ্যে এই শক্তি সামর্থেরই অভাব। আল্লাহ তাআলা উভয়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই ব্যবধানকে উদ্ভাসিত করারই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা এইরূপ করিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট জগতের সমস্ত বস্তুনিচয়ের বিস্তারিত তথ্য-জ্ঞান আদম ও ফেরেশতা উভয়ের সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন। আদমের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই ধরনের এলম বা জ্ঞান আয়ত্তে আনিবার যে শক্তি সামর্থ্য ছিল, উহার সাহায্যে তিনি ঐ এলম বা জ্ঞানকে আহরণ ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ সৃষ্টিগতভাবে ঐ শক্তি সামর্থ্য ক্যাপাসিটির অভাবে তাহা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণ ও আদমকে সমবেতভাবে উপস্থিত করিয়া ফেরেশতাগণের সম্মুখে ঐ বস্তুগুলি সব বা আংশিক রাখিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে তাহাদিগকে ঐ সবের বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে নিজের অজ্ঞতা অক্ষমতাই তুলিয়া ধরিলেন এবং ঐ সবের কোন তথ্যই বাত্লাইতে পারিলেন না। অতপর আল্লাহ তাআলা ঐ আদেশই আদমের প্রতি করিলেন। আদম (আঃ) ব্যাপক এলম এবং জ্ঞান-গুণে আহরিত ও সঞ্চিত সমুদয় তথ্য সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেন। তখন সর্বসমক্ষে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলা স্বীয় পূর্ব উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আসমান-যমীনের তথা সর্বপ্রকার গোপন যাহা তোমরা জান না, আমি সব অবগত আছি। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

আর আল্লাহ তাআলা আদমকে সমস্ত বস্তুনিচয়ের এলম ও তথ্য-জ্ঞান (আয়ত্ত করার সামর্থ) দান করিলেন। অতপর তিনি ঐ বস্তুনিচয়কে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, তোমরা এই সবের তথ্য বর্ণনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা সঠিক মনে কর।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

ফেরেশতাগণ বিনীত স্বরে আরজ করিলেন, হে প্রভু! তুমি পাক-পবিত্র (তোমার কার্য্যে দোষ-ত্রুটি থাকে না)" আমাদের মধ্যে যতটুকু এলম বা জ্ঞানের শক্তি-সামর্থ্য রাখিয়াছ তাহার অধিক জ্ঞান আমাদের নাই। তুমি সর্বজ্ঞ সুকৌশলী (প্রত্যেককে উহার উপযোগী শক্তি-সামর্থ দিয়া তৈয়ার করিয়াছ)।

আল্লাহ তাআলা আদমকে ঐ সবের তথ্য বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। (আদম সব কিছুর তথ্যের বর্ণনা দিলেন।) যখন আদম বস্তুনিচয়ের তথ্য বাতলাইয়া দিলেন, তখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না যে, আমি আসমান-যমীনের তথা সর্বপ্রকার গোপন তথ্য অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ সবই আমি জানি। (সূরা বাকারাহঃ পারা– ১ রুকু– ৪)

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ -

প্রতিযোগিতার ফলাফলে ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আদেশ ঃ

প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে আদমের যোগ্যতা প্রমাণিত ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনিই আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন এবং এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদনে

ফেরেশতাগণ হইবেন আদমের সহযোগী। অতএব, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি বিশেষ কায়দায় সালাম বা শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের আদেশ করিলেন। যাহাকে Guard of Honour-এর সমতুল্য বলা যাইতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, জ্বিন জাতীয় ইবলীস তখন ফেরেশতাদের সঙ্গে একত্রেই বসবাস করিয়া থাকিত; ফেরেশতাদের প্রতি যে আদেশ হইল, স্বাভাবিকরূপে বা বিশেষ নির্দেশবলে ইবলীসও সেই আদেশের আওতাভুক্ত হইল। এই সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পারা-৮; রুকু-৯-এর مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ আয়াতে রহিয়াছে, অনুবাদ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন আদমকে কেবলা সাব্যস্তপূর্বক তাঁহার দিকে সেজদা করার। ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ সকলেই আল্লাহ তাআলার আদেশকৃত সেজদা আদায় করিয়া দিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা করিল না। ফলে সে আল্লাহ তাআলার অভিশপ্ত হইল। পবিত্র কোরআনে এই বিবরণের আলোচনা নিম্নরূপ–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

আর একটি ঘটনা– আমি যখন আদেশ করিয়াছিলাম ফেরেশতাগণকে, আদমের দিকে সেজদা কর। তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস (আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) অহঙ্কারে মাতিয়া সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে বিদ্রোহী কাফেরে পরিণত হইয়াছিল। (সূরা বাকারা ঃ পারা– ১; রুকু– ৪)

ইবলীসের পরিচয়

ইবলীস বা শয়তান সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়ছে, সে মূলতঃ জ্বিন জাতি হইতে ছিল। ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে সে ফেরেশতাদের সংস্রব লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল* এবং সে একজন বিশিষ্ট আবেদ–ইবাদতকারী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসবাস করিতেছিল। অবশেষে সে আদমের দিকে সেজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করিয়া চিরতরে ধিকৃত কাফের বিদ্রোহী ও অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চিরকাল এইরূপ থাকিবে বলিয়া আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ـ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلاً ـ

যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের দিকে সেজদা কর, তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস সেজদা করে নাই; সে ছিল জ্বিন জাতীয় (সে আগুনের তৈয়ারী হওয়ায় নিজেকে বড় মনে করিয়াছিল;) যদ্দরুন সে স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল (এবং কাফের মরদুদ হইয়াছে।) হে মানব! তোমরা কি ঐরূপ মরদুদকে এবং উহার চেলাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে আমার বিনিময়ে– আমাকে ছাড়িয়া? অথচ তাহারা তোমাদের পরম শত্রু! স্বৈরাচারী জালেমদের এই বিনিময় কতই না জঘন্য। (পারা– ১৫; রুকু– ১৯)

---

*মানব জাতির পূর্বে এই ভূমন্ডলে জ্বিন জাতির সাধারণ বসবাস ছিল। নাফরমানীর আধিক্যের দরুন আল্লাহর গজবস্বরূপ ফেরেশতাদের দ্বারা তাহারা ধ্বংস এবং ভাল আবাসস্থল হইতে বন-জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। ঐ সময় ইবলীস শিশু বয়সের ছিল; ফেরেশতাগণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এইভাবে ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

ইবলীসের দৌরাত্ম্য ও পরওয়ারদেগারের সঙ্গে বিতর্ক

ইবলীস আদমের দিকে সেজদা করার আদেশ লঙ্ঘন করিলে অসীম ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু দয়াময় আল্লাহ তাআলা কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও সেজদা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তোর পক্ষে কি কারণ থাকিতে পারে? তদুত্তরে ইবলীস কারণস্বরূপ এই ব্যাখ্যা দিল যে, আমি আদমকে ঐরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন কেন করিব? আমি ত আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিক মর্যাদাবান। আদম আমার তুলনায় নিকৃষ্ট। কারণ, আপনি আমাকে আগুন হইতে এবং আদমকে মাটি বা কর্দম হইতে তৈয়ার করিয়াছেন। আগুনের গতি ঊর্ধ্বে, মাটির গতি নিম্নে। আমার প্রতি আদমকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা আদেশ অযৌক্তিক।

বলাবাহুল্য, শয়তানের এই যুক্তি ছিল অসার। কারণ মাটির উপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নাই। গতির ব্যবধান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। স্বর্ণ-রৌপ্য, হিরা-জওয়াহেরাতের ন্যায় ভারী মূল্যবান বস্তুর গতি নিম্ন দিকে হইয়া থাকে এবং হালকা তুলার ন্যায় বস্তুর গতি ঊর্ধমুখী হইয়া থাকে।

ইবলীসের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা এস্থলে ইবলীসের নিজ উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তাহার উক্তিতেই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তাহার সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহ তাআলা। অতএব, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের মোকাবিলায় কোন যুক্তির অবতারণাই অযৌক্তিক। আল্লাহর তরফ হইতে কৈফিয়ত তলবে **اذ امرتك** "আমার আদেশ সত্ত্বেও" বলিয়া এই বিষয়টিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল। ইবলীস ভুল যুক্তির পিছনে পড়িয়া স্বীয় প্রভু আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করিল। আল্লাহ তাআলা তাহাকে স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টিভাজনদের স্থান বেহেশত হইতে তাড়াইয়া দিলেন, সে চিরতরে ধিকৃত অভিশপ্ত হইয়া গেল।

আদমের প্রতি ইবলীসের অন্তরে ভয়ানক ক্রোধ সৃষ্টি হইল। সে প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মাদ হইয়া গেল। কিন্তু সেও জানিত, হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে; তিনি যদি আমাকে এই মুহূর্তে মারিয়া ফেলেন তবে প্রতিশোধ গ্রহণের বাড়াবাড়ি অবান্তর হইবে। অতএব, সে প্রথমে আল্লাহ তাআলার নিকট স্বীয় জীবন সম্পর্কে একটা গ্যারান্টি বা অবকাশ প্রার্থনা করিল, আমি যেন জগতের আয়ুর সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থাকি। সর্বাধিপতি আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে বলিয়া দিলেন, "যা– তোকে দীর্ঘ আয়ুর অবকাশ দেওয়া হইল।"

ইবলীস মৃত্যুর দিক হইতে নিশ্চিত হইয়া স্বীয় ক্রোধ প্রকাশে বলিল, যেহেতু আমি আদমের দরুন সর্বহারা হইলাম, তাই আমিও শুধু আদমকে নহে, তাহার সমুদয় নছলকে ক্ষতি ও ধ্বংসে ফেলিব, তাহাদের জন্য সঠিক পথ রুদ্ধ করিব এবং কু-পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিব।

সর্বাধিপতি পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত ধিক্কার দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, তুই এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম ভর্তি করিব। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ - لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ - قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ - قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ - خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

একটি বিশেষ তথ্য– আমি তোমাদের (আদি পিতা আদম)-কে তৈয়ার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে গঠন দান করিয়াছিলাম, তারপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের দিকে সেজদা কর ফেরেশতাগণ সকলে

সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস সেজদা করে নাই। আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও কেন তুই সেজদা হইতে বিরত থাকিলি? সে বলিল, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ - قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ - قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ -

আল্লাহ তাআলা তাহাকে ধিক্কারের সহিত আদেশ করিলেন, এখান হইতে তুই বাহির হইয়া যা, এখানে থাকিয়া অহঙ্কার দেখান তোর জন্য ভাল হইবে না, তুই বাহির হইয়া যা, তুই চিরতরে ধিকৃত ও অপদস্থ। ইবলীস বলিল, আমাকে অবকাশ দান করুন কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তোকে সেই অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ - ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَاتَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ -

ইবলীস বলিল, আদমের দরুন আমার উপর আপনার অভিশাপ বর্তিল এবং আমি ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইয়া গেলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার সঠিক পথ আদম ও আদম সন্তানদের জন্য রুদ্ধ করার চেষ্টা করিব। আমি তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম দিক হইতে ঘেরাও করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করার চেষ্টা করিব এবং আপনি তাহাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাইবেন।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَدْحُوْرًا - لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ -

আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে আদেশ করিলেন, এখান হইতে তুই ধিকৃত ও অভিশপ্ত অবস্থায় বাহির হইয়া যা। ইহা আমার সুনিশ্চিত ঘোষণা যে, (যাহার ইচ্ছা সে তোর অনুসারী হউক;) নিশ্চয় আমি তোদের সকলকে দিয়া দোযখ ভর্তি করিব। (সূরা আ'রাফ পারা- ৮; রুকু- ৯)

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلاَّ اِبْلِيْسَ - اَبٰى اَنْ يَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ - قَالَ يَا اِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلاَّ تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ -

আল্লাহর আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিল, ইবলীস তাহা করিল না; সে সেজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবলীস! তুই কেন সেজদাকারীদের সঙ্গে সেজদা করিলি না?

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ - قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ - وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

ইবলীস বলিল, আপনি পচা দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার শুষ্ক ঠন ঠন শব্দকারক মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন- তাহার দিকে সেজদা (করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন) করিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নহি। (তাহার এই উক্তির উপর) আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তবে তুই এখান হইতে বাহির হইয়া যা, তোর প্রতি চিরতরে ধিক্কার এবং তোর উপর কেয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ রহিল।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ - قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ - اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ -

ইবলীস বলিল হে, পরওয়ারদেগার! তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার অবকাশ দিন। আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয় তোকে এক নির্ধারিত (তথা মহাপ্রলয়ের) দিনের তারিখ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ـ

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার। যেহেতু আদমের দরুনই আমাকে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত করিলেন, অতএব আমি আদম জাতির (ক্ষতি সাধনে লাগিলাম–) তাহাদের দৃষ্টিতে কুকর্ম ও নাফরমানীর কার্যকে চাকচিক্যময় মনোরম করিয়া দেখাইব এবং তাহাদের ভ্রষ্ট করিব। অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে আপনার খাঁটি বান্দাগণ বাঁচিতে পারিবেন।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ـ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ـ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ـ

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমার খাঁটি বান্দা হওয়াই একমাত্র সোজা পথ, যে পথ পথিককে আমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; আমার এইরূপ বান্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব চলিবে না। অবশ্য যেসব ভ্রষ্ট তোর অনুসারী হইবে তাহাদেরই তুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবি। নিশ্চয় তোর অনুসারী দলের সকলের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রহিয়াছে, যাহার সাতটি তব্‌কা; সাত তব্‌কার জন্য সাতটি গেট রহিয়াছে। তোর দলের লোকগুলি সাতটি গেটের জন্য সাত ভাগে বিভক্ত হইবে; প্রত্যেক গেটের জন্য এক ভাগ নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহারা ঐ গেটেই প্রবেশ করিবে। (পারা– ১৪; রুকু– ৩)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ ـ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ـ قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সেজদা কর; সেমতে তাহারা করিল, ইবলীস সেজদা করিল না। সে বলিল, আপনি যাহাকে কর্দম হইতে পয়দা করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমি সেজদা করিব? (আল্লাহর আদেশ অমান্যে ইবলীস অভিশপ্ত হইল।) সে বলিল, দেখুন ত সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন (তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কি আছে? আচ্ছা, যাক–) যদি আপনি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু দান করেন, তবে আমি এই আদমের সন্তানদের অল্প সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশকে আয়ত্তে আনিয়া নিব।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا ـ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ـ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلاَّ غُرُوْرًا ـ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ـ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً ـ

আল্লাহ বলিলেন, তুই বাহির হইয়া যা। আদম সন্তানদের যে কেহ তোর অনুসারী হইবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোর এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল আর তোর দলীয় চেলা-বেলা, লোক-লস্কর দ্বারা এবং রাগ-রাগিনী, গান ও বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি সুরের আকর্ষণ দ্বারা তোর শক্তি পরিমাণ আদম জাতিকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালাইয়া যা। আর তাহাদের ধন-সম্পদ, আওলাদ-ফরজন্দকেও এই কাজে তোর সহায়ক বানাইয়া নে এবং তাহাদিগকে (আদম জাতিকে) নানা প্রলোভন দেখা (সব সুযোগাই আমি তোকে দিয়া দিলাম)। শয়তানের সব প্রলোভনই ধোঁকা ও ফাঁকি। যাহারা খাঁটিভাবে আমার বান্দা হইবে তাহাদের উপর তোর কোন শক্তিই থাকিবে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে কার্য সমাধানকারীরূপে যথেষ্ট হইবেন। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ পারা-১৫, রুকু-৭)

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ - اِلَّآ اِبْلِيْسَ - اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

(আল্লাহ তাআলার) আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিলেন, ইবলীস সেজদা করিল না। সে অহঙ্কার করিল এবং কাফেরে পরিণত হইল।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىْ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ

আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, হে ইবলীস! তোকে কিসে বাধা দিল ঐ জিনিসের দিকে সেজদা করিতে যাহাকে আমার হাতে (বিশেষ গুণ-গরিমায়) গড়িয়াছি? ইহা তোর অহঙ্কার মাত্র, না-(তোর ধারণাই এই যে,) তুই বড়?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ - خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

ইবলীস উত্তর করিল, বস্তুতঃ আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে আপনি অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাহাকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ - وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

আল্লাহ তাআলা তাহাকে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং চির ধিকৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন, কেয়ামত পর্যন্ত তথা চিরকাল তোর উপর আমার অভিশাপ থাকিবে।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ - قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ - اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ -

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তাআলা বলিলেন আচ্ছা- তোকে বাঁচিয়া থাকার অবকাশ দেওয়া হইল নির্দিষ্ট দিনের তারিখ (তথা দুনিয়ার শেষ দিন) পর্যন্ত।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ - اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ - قَالَ فَالْحَقُّ - وَالْحَقَّ اَقُوْلُ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিতেছি, এই আদম জাতির সকলকে আমি পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িব, অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা খাঁটি হইবে তাহারা ব্যতীত। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঘোষণা এবং বাস্তবই আমি বলি; নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ

করিয়া দিব তোকে এবং তোর অনুসারী সকলকে দিয়া। (সূরা সোয়াদঃ পারা-২৩; রুক-১৪)

হযরত হাওয়ার সৃষ্টি

শয়তান বিতাড়িত হইল, হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে বসবাস করিবেন, কিন্তু তথায় তাঁহার কোন নিজ জাতীয় সঙ্গী নাই; আল্লাহ তাআলা তাহার এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা করিলেন। একদা হযরত আদম নিদ্রামগ্ন, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতবলে আদমের পাঁজরের একখানা হাড় হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আদমের চির সঙ্গিনী বানাইলেন, যেন আদম তাঁহার সঙ্গ লাভে শান্তি ও সুখভোগী হইতে পারেন। অন্তরের ছাউনি পাঁজরের হাড়, তাই হাওয়াকে পাঁজরের হাড় হইতে বানাইলেন যেন উভয়ের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা জন্মে। এই সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً -

হে মানব! তোমরা সেই মহান প্রভু পরওয়ারদেগারের ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একটি ব্যক্তি হইতে পয়দা করিয়াছেন। প্রথমে ঐ ব্যক্তি হইতেই তাহার জোড়া পয়দা করিয়াছেন, অতপর উভয় হইতে নরনারী ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়াছেন। (সূরা নেসাঃ পারা-৪; রুকু-১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -

আল্লাহ তাআলা এত বড় শক্তিমান যে, তিনি তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন; যেন সে স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভে সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে পারে। (পারা ৯ রুকু ১৪)

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا -

আল্লাহ তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (তাহাকে সরাসরি কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন) পরে তাহার হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (অতপর তাহাদের হইতে তাহাদের বংশধর সৃষ্টি করিয়াছেন।) (সূরা যুমার ঃ পারা-২৩; রুকু-১৫)

মা হাওয়া (আঃ) পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি– এই মর্মে বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, পাঁজরের সর্ব উর্ধ্বের হাড়টি– যাহা অধিক বাঁকা হয়, উহা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তফসীরকারগণ বাম পাশের হাড়ের কথা বলিয়াছেন। পুরুষের উদরে সন্তান জন্মের অবকাশ সৃষ্টিগতভাবেই নাই, তাই আদমের হাড় হইতে উপাদান গ্রহণপূর্বক হাওয়াকে উহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। পুরুষের বাম পাশে পাঁজরের একটি হাড় কম–এই কিংবদন্তী অবাস্তব; হাড় ব্যয় করা হয় নাই, তাহা হইতে উপাদান গ্রহণ করা হইয়াছে।

আদম ও হাওয়া উভয়ের বেহেশতে বসবাস

হযরত হাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের অবশিষ্ট অভাব পূরণপূর্বক উভয়কে বলিয়া দিলেন, তোমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বেহেশতে বসবাস কর এবং বেহশতের ফল-ফলারি অবাধে ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিয়া যাও।

ইহা একটি সাধারণ কথা। বাগানে ও বাড়ীতে বিভিন্ন উদ্দেশে বিভিন্ন বৃক্ষ রাখা হয়– কোনটা ফল খাইবার জন্য, কোনটা ফুলের জন্য, কোনটা শুধু শোভার জন্য ইত্যাদি। এমনকি মাদার গাছ, জিকা গাছ, ঝাউ গাছ, নিম গাছ ইত্যাদিও বাড়ীতে, বাগানে রাখা হয়। যে গাছের ফল-ফুল শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুই নাই বা যে গাছের শোভা আছে কিন্তু ফুলও ভাল নহে, ফলও ভাল নহে বা যে গাছের ফল আছে ফুল নাই বা যে গাছের ফুল আছে ফল নাই অথবা আছে, কিন্তু ভীষণ তিক্ত, দুর্গন্ধময়, এই ধরনের নানারূপ গাছপালাও বাড়ীতে বা বাগানে রাখা হয় বিভিন্ন উদ্দেশে।

আল্লাহ্ তাআলা আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে থাকিতে দিয়া এক বিশেষ উদ্দেশে (যাহার বিবরণ পরে আসিবে) তথায় তখন এমন একটি গাছও রাখিয়া দিলেন, যাহার ফল ভক্ষণের তাছির বেহেশতী জিন্দেগীর পক্ষে ক্ষতিকারক, বরং বিপরীত। ঐ ফল খাইলে বেহেশতের পোশাক শরীরে থাকিবে না, ঘৃণাময় হাজতের উদ্বেগ হইবে, যাহা দূর করার ব্যবস্থা বেহেশতে নাই– যেমন পায়খানা পেশাবখানা। ঐ ফল ভক্ষণে বেহেশতী জীবন এইভাবে পর্য্যুদস্ত হইবে।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়াকে বলিয়া দিলেন, তোমরা বেহেশতে অবাধে যে কোন গাছের যে কোন পরিমাণ ফল-ফলারি খাইতে পারিবে, কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারে যাইবে না, উহার ফল খাইলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর স্মরণ রাখিবে, শয়তান তোমাদের পরম শত্রু, সে তোমাদের ক্ষতির চেষ্টায় লাগিয়া আছে। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিবরণী লক্ষ্য করুন–

وَقُلْنَا يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا ـ وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

আমি বলিয়া দিয়াছিলাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সহধর্মিনী উভয়ে বেহেশতের মধ্যে বসবাস করিতে থাক* এবং তোমরা বেহেশতের মধ্যে অবাধে খাইতে পার নিজেদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারেও যাইও না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারী–নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

(সূরা বাকারাঃ পারা-১; রুকু-৪)

---

* হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা "জান্নাতে" অবস্থান করাইয়াছিলেন। "জান্নাত" বলিতে সাধারণতঃ বেহেশত বুঝায়, অবশ্য "জান্নাত" শব্দটির আভিধানিক অর্থ দৃষ্টে যেকোন উদ্যান, বাগ-বাগিচা ও কাননকেই বলা যাইতে পারে।

একদল লোক "জান্নাত" শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য ঘটনার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হযরত আদম ও হাওয়াকে যে জান্নাতে রাখা হইয়াছিল উহা সর্বজনবিদিত বেহেশত নহে, বরং ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন এক বিশেষ কানন ও সুরম্য বাগিচা ছিল। এই মতামতের উপর কোনই প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এই মতটি ভ্রষ্ট মো'তাযেলা ফের্কার মতামত (রুহুল মাআনী ১, ২৩৩ দ্রঃ)।

এতদ্ভিন্ন এই মতামতের আসল হইল খৃষ্ঠানদের সংকলিত ও বিকৃত বাইবেল। উহাতে আছে– "৮, আর সদাভক্ত ঈশ্বর পূর্ব দিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন।"

–(বাইবেল– আদি পুস্তক পৃষ্ঠা ৩)

বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতামত ইহাই যে, এস্থলে "জান্নাত" বলিয়া সর্বজনবিদিত বেহেশতকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে একটি বিশেষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে যে, "জান্নাত" শব্দটি "আ-ল" অব্যয়ের বাহক হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, এস্থানে স্বেচ্ছাধীনভাবে উহার অর্থ গ্রহণ করা অবৈধ। এস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে জান্নাতের সর্বজবিদিত বা পূর্ব বর্ণিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। জান্নাতের সর্ববিদিত অর্থ বেহেশত এবং আয়াতের পূর্বে সেই সর্বজনবিদিত বেহেশতেরই উল্লেখ এবং আলোচনা হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন কানন বা বাগিচার উল্লেখ পূর্বে কোথাও হয় নাই।

এদদ্ভিন্ন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত দুইটি সহীহ্ হাদীছ এ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ। প্রথমটি হইল– বরযখী জগতে হযরত মূসা ও আদমের মধ্যে যে প্রীতি ও সৌজন্যমূলক একটা বিতর্কালাপ হইয়াছিল; সেই হাদীছে ঐ বিতর্কেরই বিবরণ রহিয়াছে। সেই হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মূসার যে উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম সর্বজনবিদিত বেহেশতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের বিপরীত কার্যের দরুন তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

এই ধরনের বিবরণ সূরা আ'রাফ-৮ পারা, ১ রুকুর মধ্যেও আছে।

فَقُلْنَا يَآدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى -

আমি আদমকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, ইবলীস তোমার এবং তোমার জীবনসঙ্গিনীর পক্ষে পরম শত্রু। সর্বদা সতর্ক থাকিও, সে যেন চক্রান্ত করিয়া তোমাদেরকে এই বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিতে না পারে, অন্যথায় তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

اِنَّ لَكَ اَنْ لاَ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرٰى - وَاَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحٰى -

বেহেশতে সব রকম সুব্যবস্থাই রহিয়াছে- এখানে তোমাদের ক্ষুধা পাইতে হইবে না, বস্ত্রহীন থাকিতে হইবে না* এখানে তোমরা পিপাসাতুর হইবে না, রৌদ্রের কষ্ট ভোগ করিবে না। (পারা-১৬; রুকু-১৬)

ইবলিস কর্তৃক ও হাওয়াকে প্রতারিত করার ঘটনা

হযরত আদম ও হাওয়া বেহেশতের মধ্যে পরম সুখ-শান্তির জীবন যাপন করিতে ছিলেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ বিরোধী কাজ করার আদৌ কোন কল্পনা তাঁহাদের দেলের কোন নিভৃত কোনেও ছিল না। ইবলীস তাঁহাদের শত্রুতায় পূর্ব হইতেই লাগিয়াছিল। সে ইহাই ভবিল ও স্থির করিল যে, তাঁহাদেরকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কাজ করাইতে পারিলেই তাঁহারা এই সুখ-শান্তিময় বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইবেন। ইবলীস তদবীরে লাগিয়া গেল-কিরূপে আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত করান যায়।

বেহেশতের মধ্যে আদম ও হাওয়ার প্রতি এই একটি আদেশ ছিল যে, তোমরা ঐ বিশেষ বৃক্ষের ফল খাইও না- উহার কাছেও যাইও না। শয়তান এই পথেই স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইল। শয়তান বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, সে তথায় বসবাস করিতে পারিত না, কিন্তু সাধারণ

দ্বিতীয় হাদীছটি তদ্রূপই বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত শাফাআ'তের হাদীছ- হাশরের ময়দানে সমস্ত লোক যখন বিচলিত অবস্থায় শাফাআ'ত বা সুপারিশের জন্য হযরত আদমের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আদম (আঃ) তাহদের সম্মুখে যে উক্তি করিবেন তাহার বিবরণ সেই হাদীছে আছে, উহা দ্বারাও ঐ কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

বলিতে দুঃখ হয় যে, একজন সুপণ্ডিত তথাকথিত তফসীরুল কোরআনে আলোচ্য বিষয়বস্তুটির সমালোচনা করিতে যাইয়া, প্রথম হাদীছটি সম্পর্কে ত কিছু বলিতে সাহস করেন নাই বা উহা তিনি অবগত নহেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছটিকে তিনি ভিত্তিহীন ঠাওরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বয়ংকৃত উহার ভুল অনুবাদের পেঁচে ফেলিয়া অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা আঁটিয়াছেন। "মালাহেম" শব্দটি কঠিন একটি আরবী শব্দ। তিনি "মালাহেম" শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত"। এই অনুবাদ সূত্রে তিনি আলোচ্য হাদীছকে মালাহেমের আওতাভুক্ত করিয়া "মালাহেম" সম্পর্কীয় হাদীছ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ প্রমুখের একটি উক্তিকে আলোচ্য হাদীছটির উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কি জঘন্য কারসাজি!

পাঠকবর্গ যেকোন উপায়ে ইচ্ছা আপনারা তলাইয়া দেখিতে পারেন, "মালাহেম" শব্দের যে অর্থ পণ্ডিত সাহেব করিয়াছেন তাহা কোন ক্রমেই সত্য নহে, উহা একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা ও ধোঁকা মাত্র ملاحم মালাহেম" শব্দের অর্থ মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ। মারামারি-কাটাকাটি যুদ্ধ-বিগ্রহের ভাবী ঘটনাসমূহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কোন কোন অতিরঞ্জিত কাহিনী হাদীছ নামে প্রচলিত ছিল, সেইগুলিই হইল ইমাম আহমদ প্রমুখের উক্তির উদ্দেশ্য। শাফাআ'ত সংক্রান্ত হাদীছের সঙ্গে ঐ উক্তির কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। বোখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত শাফাআ'ত সংক্রান্ত একটি সর্বসম্মত সহীহ হাদীছকে প্রবঞ্চনামূলকভাবে মালাহেম তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত হাদীছ নামে আখ্যায়িত করিয়া উহার উপর কটাক্ষ করা দুঃখজনক বৈ নহে।

আদমের ঘটনায় "জান্নাত"কে সর্বজনবিদিত বেহেশত অর্থে লওয়া সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেব কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার জানা উচিত যে, মানুষ যখন কর্মফলস্বরূপ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখনকার কথা ভিন্ন হইবে। আদম-হাওয়া আলোচ্য ঘটনা তথায় কর্মফল ভোগ স্বরূপ ছিলেন না; বরং মেহমানস্বরূপ ছিলেন।

* খৃষ্টানদের বাইবেলে যে গর্হিত কথাবার্তা আছে, উহার একটা নমুনা বাইবেল আদি পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে, জান্নাতে "আদম ও তাঁহার স্ত্রী উলঙ্গ থাকিতেন, তাঁহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" কিরূপ যুক্তিহীন কথা। যেখানে আদম-হাওয়ার এত সুখ-শান্তি, আদর-যত্ন এবং মান-মর্যাদা, সেখানে তাঁহারা উলঙ্গ থাকিবেন, ইহা কি সম্ভব? কখনও নহে, ইহা মিথ্যা মন্তব্য।

এ সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও সত্য বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে ولا تعرى "হে আদম! বেহেশতের মধ্যে আপনি বস্ত্রহীন থাকিবেন না, সকল প্রকার মনোরম মান-মর্যাদার লেবাস-পোশাক আপনার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন সূরা অ'রাফ পারা-৮; রুক-১০-এর একটি আয়াতের দ্বারাও সম্যক প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে তাঁহাদের উভয়ই লেবাস-পোশাক সুসজ্জিত থাকিতেন।

যাতায়াতে হয়ত খুব কড়াকড়ি ছিল না, যেরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত কোন অপরাধীর অবস্থা হইয়া থাকে। কিম্বা বেহেশতের বাহিরে থাকিয়াই আদম ও হাওয়ার সঙ্গে কথোপকথনের বা তাঁহাদের মনের মধ্যে অছঅছা সৃষ্টির সুযোগ ছিল, যেরূপ এখনও আছে। এই ধরনের কোন সুযোগে ইবলীস, আদম ও হাওয়াকে নিম্নরূপ প্রতারণামূলক বুঝ দিল!

ইবলীস হযরত আদম ও হাওয়াকে ধোঁকা ও প্রতারণাস্বরূপ বলিল, ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষটির তাছির বা প্রতিক্রিয়া এই যে, উহার ফল খাইলে অমর জিন্দেগী লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ফেরেশতাদের ন্যায় আশঙ্কাহীন ও অবিচ্ছেদ্যরূপে লাভ হয়। আপনাদের সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ তাছির ও প্রতিক্রিয়া বরদাশত করিয়া নেওয়ার মত শক্তি না থাকায় আল্লাহ তাআলা আপনাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন আপনারা বেহেশতের মধ্যে কিছুকাল বসবাস করার দরুন আপনাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে। অতএব, এখন ঐ বৃক্ষের ফল আপনারা খাইলে সহজেই উহার উপরোক্ত দুইটি প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল লাভ করিতে পারিবেন।

ইবলীস সর্বাধিক ধোঁকা ইহাও দিল যে, তাহার উল্লিখিত প্রবঞ্চনাময় উক্তির সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর নামের কসম ব্যবহার করিল এবং নিজে আদম ও হাওয়ার মহা উপকারী বন্ধু হওয়ার দাবীও করিল।

অমরভাবে আল্লাহ তায়ালার অবিচ্ছেদ্য নৈকট্য লাভের লালসা স্পৃহা হযরত আদম ও হাওয়ার কি পরিমাণ থাকিতে পারে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। এদিকে হযরত আদম ও হাওয়া ইতিপূর্বে কখনও আর "মিথ্যা" শুনেন নাই, মিথ্যা কি জিনিস তাহা তাঁহারা জানেন না, তদুপরি আল্লাহর নামের কসম মিশ্রিত উক্তি অবাস্তব হইতে পারে এরূপ ধারণাও তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইল না। ফলে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ধারে না যাইবার যে এক অনড় অটল মনোভাব তাঁহাদের ছিল তাহা শিথিল হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। এই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপে রহিয়াছে—

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوُرِيَ عَنْهُمَا سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ـ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ـ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ـ

অতপর শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল; তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, (নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া তাঁহাদেরকে বেহেশত হইতে বাহির করিবে এবং উপস্থিত) একজনকে অপর জনের সম্মুখে উলঙ্গ (করিয়া অপমানিত) করিবে। সে আদম ও হাওয়াকে বুঝাইল, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে ঐ বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য বারণ করিয়াছিলেন যে, তোমরা (উহা খাইয়া) অমর ফেরেশতা ও হওয়ার) প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত)) না হইয়া পড়; (যাহা সহ্য করার শক্তি তখন তোমাদের ছিল না, সুতরাং ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক ছিল।) আর ইবলীস আদম-হাওয়াকে কসম খাইয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। ইবলীস এই প্রবঞ্চনাময় বুঝ-প্রবোধে আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করিয়া তাঁহাদের শিথিল করিয়া দিল এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিল। (পারা- ৮; রুকু- ৯)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ـ

অতঃপর শয়তান আদমকে অছঅছা- কুমন্ত্রণা দিল এই বলিয়া যে, হে আদম তোমাকে অমর হইবার এবং অবিচ্ছেদ্য বাদশাহী লাভের বৃক্ষের খোঁজ দিব কি? (সূরা তা-হা ঃ পারা-১৬; রুকু-১৬)

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরিণাম

ইবলীসের প্রবঞ্চনা প্রতারণায় আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। ফলে তাঁহাদের বেহেশতী লেবাস-পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত কোন উপায় না পাইয়া বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের সতর ঢাকার চেষ্টা করিলেন। এদিকে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি কৈফিয়ত তলবের ডাক পড়িল। পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ (পারা- ৮; রুকু- ৯)

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

ঐ বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (বেহেশতী লেবাস পোশাক বিচ্ছিন্ন হইয়া) তাঁহাদের একের সম্মুখে অপরের গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তাঁহারা উভয়ের বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা আবরণ সৃষ্টি করায় সচেষ্ট হইলেন। আর প্রভু পরওয়ারদেগার তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম না এবং বলিয়াছিলাম না যে, জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু (তোমরা তাহার হইতে সতর্ক থাকিও)!

فَاَكَلَا مِنْهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى -

আদম ও হাওয়া উভয়ে (শয়তানের প্রবঞ্চনায়) ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে তাঁহাদের পরস্পর গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহারা উভয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের উপর আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। আদম তাঁহার প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া ভুল করিয়া বসিলেন। (সূরা ত্বাহাঃ পারা- ১৬; রুকু- ১৬)

বেহেশতী পোশাক বিছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গ

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا বলা হইয়াছে।

بَدَتْ বাদাত" অর্থ প্রকাশ হইয়া যাওয়া-গুপ্ত না থাকা।

سَوْاٰةُ ছাওআত" শব্দের দুই অর্থ- (১) গুপ্তাঙ্গ (২) খারাপ খাসলত।

অধুনা হাল-ফ্যাশনের তফসীরকারদেরকে সাধারণত দেখা যায় তাহারা "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় বস্তুতই হযরত আদম ও হাওয়ার বেহেশতী পোশাক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল- এই প্রসঙ্গটি সরাসরিরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে। তাহারা উল্লিখিত শব্দগুলির নানারূপ উপঅর্থের দিকে ছুটাছুটি করিয়া থাকে, অথচ এই প্রসঙ্গটি অন্য এক আয়াতে (পারা- ৮; রুকু- ১০) অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে-

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما -

"শয়তান আদম ও হাওয়াকে এমন কাজে লিপ্ত করিল, যদ্দারা সে তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদের হইতে খসাইয়া ফেলিল। ফলে উভয়ের গুপ্ত শরীরাংশ পরস্পরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল- এইরূপে তাঁহাদিগকে অপমান করিল।"

বেহেশত হইতে বাহির হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে অভিযুক্ত করিয়া বেহেশত ত্যাগেরও নির্দেশ দিলেন। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় ও সূরা আ'রাফে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করিলেন- اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ "তোমরা (বেহেশত হইতে) নামিয়া যাও; তোমাদের মধ্যে শত্রুতা চলিবে।" অর্থাৎ বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার শাস্তি ত আছেই, এতদ্ভিন্ন পরস্পর স্নায়ু-দ্বন্দ্বের মানসিক দুর্ভোগও তোমাদের ভুগিতে হইবে।

এস্থলে তফসীর বিশেষজ্ঞদের মতামত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ তফসীরকারের মত এই যে, উক্ত আদেশ অনতিবিলম্বে আদম ও হাওয়ার উপর কার্যকরী হইল। তাঁহারা ইহজগতে নিপতিত হইলেন, দুনিয়াতে নিপতিত হওয়া তাঁহাদের জন্য অপরাধের পরিণামস্বরূপ ছিল। অভিযুক্ত হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দিন পর্যন্ত কান্নাকাটার পর আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হইয়া নিজেই ক্ষমা প্রার্থনার কতিপয় বাক্য তাঁহাদিগকে দান করিলেন। তাহার বদৌলতে তাঁহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন না শুধু, বরং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলার খলীফা হওয়ার মর্যাদাও লাভ করিলেন। যেমন, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া হাজত ভোগস্বরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বরাতের জোরে সে তথায় জেলারের চাকুরী পাইয়া বসিল।

কোন কোন তফসীরকারের মত এই যে, অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুনিয়াতে নিপতিত হওয়ার আদেশ হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই আদেশ কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই দারুণ কান্নাকাটা ও স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর মাধ্যমে তওবা-এস্তেগফারের দরুন সেই আদেশ মুলতবী হইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং বেহশতে থাকাবস্থায় খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া দুনিয়াতে পদার্পণ করিলেন।

অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা

হযরত আদম-হাওয়ার দ্বারা যখন অপরাধ সংঘটিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিলেন; তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমার জন্য প্রভুর দরবারে নিজেদেরকে বিলীন করিয়া দিলেন। প্রভুর দরবারে করজোড়ে এমন কান্নাকাটা করিলেন যে, স্বয়ং প্রভুই তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার মোনাজাত শিখাইয়া দিলেন। অবশেষে সেই মোনাজাতের বদৌলতে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

এখানেই একটি বিশেষ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহা হইল, ইবলীস এবং আদম-হাওয়ার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ইবলীস আল্লাহর আদেশ লংঘন করিয়া অভিযুক্ত হইলে পর সে আল্লার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, বাদানুবাদ ও কথা কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছিল, পরওয়ারদেগারে দরবারের গোড়ামি দেখাইয়াছিল- ইহাই ছিল তাহার ধ্বংসের কারণ। আর আদম ও হাওয়া আদেশ বিরোধী কাজে অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটির সহিত ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া নিজেদেরকে প্রভুর দরবারে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন- ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম উন্নতির সোপান।

এই তথ্যের দ্বারা দুইটি বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। প্রথম প্রশ্নটি হইল, এই কেলেঙ্কারির মূল ঐ বৃক্ষটি বেহেশতে রাখা হইয়াছিল কেন? এক কথায় প্রশ্নের উত্তর হইল- পরীক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় হযরত আদম পাস করিয়াছিলেন কি ফেল করিয়াছিলেন? যদি বলা হয় ফেল করিয়াছিলেন তবে ভুল হইবে কারণ, মূলতঃ পরীক্ষার আসল বিষয়বস্তু শুধু এই ছিল না যে, ঐ বৃক্ষ

হইতে বিরত থাকিয়া আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর স্থির থাকিতে পারেন কিনা? বরং পরীক্ষার মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি অধিক দৃষ্টি ছিল যে, ভুলের কারণে যদি আল্লাহর আদেশ লংঘিত হইয়া যায় তখন আদম কি করেন ইহা প্রকাশ্যরূপে দেখিয়া নেওয়া এবং সকলকে দেখাইয়া দেওয়াই ছিল এই পরীক্ষার মূল বিষয়বস্তু। কারণ, ইবলীস এখানেই পদস্খলিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে আদম (আঃ) এই পরীক্ষায় অতি উচ্চ মানে পাস করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্র্যশ্নটি এই যে, হযরত আদমকে আল্লাহ তাআলা যমীনে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধি বানাইবেন সেই জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টির করার পর তাঁহাকে বেহেশতে কেন রাখিলেন, এই বৃক্ষের কেলেঙ্কারিতে কেন ফেলিলেন?

শুই প্রশ্নের মীমাংসাও উক্ত তথ্য দ্বারা সহজেই বুঝে আসে যে, খস্বীফা বা প্রতিনিধিরূপে নিযুক্তির পূর্বে হযরত আদমের এই বিশেষ গুণটি সর্বসমক্ষে বিশেষতঃ আদম সৃষ্টির প্রতিবাদী গ্রুপ ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করাইবার ইচ্ছায়ই আল্লাহ তাআলা বেহেশতের মধ্যে তথা ফেরেশতাদের মধ্যে আদমকে রাখিয়া এই ব্যবস্থা করিয়ছছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক। একটি হইল- যোগ্যতা, বা উপযুক্ততা, যাহা এল্‌ম তথা জ্ঞান বিদ্যার দ্বারা সম্পন্ন হইতে {ারে; সে সম্পর্কে প্রথমে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে হযরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। আর এক একটি গুণ হইল- ওয়াফাদারী ও ফর্মাবরদারী বা আনুগত্য ও আজ্ঞা বহন, যাহা আব্‌দিয়ত বা আল্লার গোলামীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। হযরত আদম যে এই আবদিয়তের গুণেও উচ্চ মানের অধিকারী ছিলেন, তাহা এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণের "আবদিয়ত" কামেল বা পূর্ণমাত্রায় ছিল; কিন্তু উহার মান এই হিসাবে নিম্ন ছিল যে, ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাফর্মানী করার মূল ধাতু সৃষ্টিগতভাবেই ছিল না। অতএব, ফেরেশতাগণ ত আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী বা আনুগত্যে বাধ্য। পক্ষান্তরে জ্বিন এবং মধ্যে এই ইনসানের মধ্যে আল্লাহ তাআলাসৃষ্টিগতভাবে নাফরমানীর ধাতু রাখিয়াছেন যাহার প্রতিক্রিয়া ও নমুনা ইবলীসের দ্বারা সেজদার ঘটনায় এবং আদমের দ্বারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। যেকোন কারণে নাফরমানী সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার ও কান্নাকাটা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন ও প্রভুর দরবারে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়ার জয্‌বা স্পৃহা এবং এরূপ মনোবলও আল্লাহ তাআলা জ্বিন-ইনসানের মধ্যে রাখিয়াছেন। ইবলীস এই মনোবল ও সৎসাহস কাজে না লাগইবার দরুন বিতাড়িত ও চির অভিশপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই মনোবলের সদ্ব্যবহার করিয়াই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই কান্নাকাটি, তওবা-এস্তেগফার ও প্রভুপানে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে যে আব্‌দিয়ত, আত্ম নিবেদন, আনুগত্য ও দাসত্বের বিকাশ হইয়াছে, উহার মান অতি উচ্চ।* আদমের এই উচ্চ মানসম্পন্ন আব্‌দিয়তই এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতীয়মান করা হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম ও হাওয়ার এই আবদিয়তকে প্রতিপন্ন করিয়া দেখানটা বড়ই অবস্থা উপযোগী হইয়াছে। কারণ জ্বিনদের উপর কেয়াস করিয়া বা যেকোন কারণে ফেরেশতাগণ আদম সৃষ্টির গোড়াপত্তনের আগেই আদম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, " يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ফেতনা-ফাসাদ, মারা মারি ইত্যাদি নাফরমানীতে লিপ্ত হইবেন।"

এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে দেখাইয়া দিলেন- যে দোষটির প্রতি অঙ্গুলি

* ফেরেশতা ও আদম উভয়ের আব্‌দিয়তের পার্থক্যটা অতি সহজেই নজরে পড়ে; একটা সরল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন যে, এক হইল পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জেনা বা ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকা। আর এক হইল সব রকম শক্তি-সামর্থ্য এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেনা ব্যাভিচার হইতে সংযমী থাকা।

নির্দেশ করা হইয়াছে উহার মস্ত বড় প্রতিষেধকও যে আদমের মধ্যে হইবে তাহা তোমাদের জানা নাই أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ "তোমরা যাহা জান না তাহা আমি জানি।" সেই প্রতিষেধক হইল, নাফরমানীর সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেফার– প্রভুপানে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে আত্ম-নিবেদন ও নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া। এই প্রতিষেধকের মাধ্যমে আদম চরম উন্নতি লাভ করিবে; বস্তুতঃ তিনি তাহা লাভ করিয়াছেনও–

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى - ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى -

"আদম স্বীয় প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া কসুর করিয়াছিল বটে, (কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিষেধক তওবা-এস্তেগফার ও পুনঃ প্রত্যাবর্তনের দরুন) পরে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অধিক নৈকট্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।" (সূরা ত্বা-হাঃ পারা– ১৬; রুকু– ১৬)

এই সব নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন দৃষ্টে বেহেশতে ফেরেশতাদের মধ্যে আদমের অবস্থান কতই না সমীচীন ছিল, কতই না তথ্যপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ ছিল! এবং আল্লাহ তাআলা যে সূচনায়ই বলিয়াছেন, اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ "নিশ্চয় আমি ঐ সব তথ্য ও রহস্য জানি যাহা তোমরা জান না" ধাপে ধাপে এই ঘোষণারই বিকাশ হইয়াছিল। হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা-এস্তেগফার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা এই–

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

আদম হাওয়া (কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর দরবারে করজোড়ে) বলিলেন, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা অপরাধী; নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করিয়াছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইব।

(সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ - اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

(কান্না ও দোয়ার ফলে) আদম স্বীয় প্রভু হইতে কতিপয় বাক্য প্রাপ্ত হইলেন (সেই বাক্যাবলীর বদৌলতে) আল্লাহ আদমের তওবা কবুল করিলেন; আল্লাহ তাওবা কবুলকারী দয়ালূ। (সূরা বাকারাঃ পারা-১, রুকু-৪)

এস্থলে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। একটি এই যে, হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল হইয়াছিল কোন্ সময়? অপরটি এই যে, সেই মোনাজাত বা বাক্যগুলি কি ছিল, যাহা হযরত আদম আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? উভয় বিষয় সম্পর্কে তফসীরকারগণের মতভেদ আছে।

সাধারণতঃ তফছীরকারগণের মতামত ইহাই দেখা যায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া অভিযুক্ত হওয়ার পর কান্নাকাটা করিতে লাগিলেন, ইহজগতে নিপতিত হইয়াও কান্নাকটায় নিমগ্ন ইহলেন। ইহজগতে নিপতিত হওয়ার বহু দিন পর আল্লাহ তায়ালারই তরফ হইতে কতকগুলি বিশেষ বাক্য প্রাপ্ত হইলেন, যাহার দ্বারা মোনাজাত করার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোন কোন তফসীরকারের মত এই যে, বেহেশতে থাকাকালেই তওবা-এস্তেগফার ও আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর বদৌলতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূরা বাকারাহ আয়াতে فَتَلَقّٰى এবং فَتَابَ শব্দদ্বয়ের ف 'ফা" অব্যয়টি দৃষ্টে এই মতামতকে অগ্রগণ্য বলিতে হয়। কারণ ف ফা" অব্যয় এই কথাই বাঝাইয়া থাকে যে, উহার পরবর্তী বিষয়টি উহার পূর্ববর্তী বিষয়ের পরে অনতিবিলম্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতের মর্ম হইবে এই– আদম ও হাওয়ার অপরাধ সংঘটিত হইল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করতঃ শাস্তিমূলকভাবে বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার আদেশ করিলেন। অতপর অনতিবিলম্বে

আদম (এবং হাওয়া) কান্নাকাটির বদৌলতে আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী প্রাপ্ত হইয়া উহা দ্বারা তওবা করিলেন; অনতিবিলম্বে তাঁহাদের তওবা আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করিলেন, শাস্তিও রহিত হইয়া গেল। তারপর আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে দুনিয়াতে খলীফা বা প্রতিনিধিস্বরূপ পদার্পণের আদেশ করিলেন। এই মতাবলম্বী তফসীরকারগণের তফসীরই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথমোক্ত আদেশ তথা অভিযুক্ত থাকাকালীন আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে শাস্তিমূলক যে আদেশ দিয়াছিলেন, اهْبِطُوْا "বেহেশত হইতে নীচে নামিয়া যাও" -ঐ আদেশ কার্যকরী হইয়াছিল না।

প্রথম মতটিকে এই দৃষ্টে অগ্রগণ্য মনে করা হয় যে, এ সম্পর্কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আদম ও হাওয়া উভয়ে নিজেদের ভুলের জন্য দীর্ঘ দুইশ বৎসরকাল আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়াছিলেন। (রুহুল মাআনী, (সূরা আ'রাফ ঃ পারা- ৮; রুকু- ৯)

এই মতাবলম্বী তফসীরকারগণই বলিয়া থাকেন (সূরা আ'রাফঃ পারা-৮; রুকু-৯) যে সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হইয়াছে যে, অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা কবুল হয় নাই, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে নামাইয়া ইহজগতে নিপতিত করিয়াছিলেন এবং বহিষ্কৃত হওয়ার আদেশ কার্যকরী করিয়াছিলেন।

সে মতে এস্থলে মস্ত বড় প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, সূরা বাকারার বিবরণের মধ্যে দেখা যায়, হযরত আদম ভুল করার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি اهْبِطُوْا নীচে নামিয়া যাও" বলিয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং আলোচ্য তফসীরকারকগণের মতে এই আদেশ কার্যকরীও হইল। অতপর আল্লাহ তাআলা আদমের তওবা কবুল করিলেন। তওবা কবুল হওয়ার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে তথায় উল্লেখ আছে যে, তারপর পুনঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا এস্থলেও সেই اهْبِطُوْا নীচে নামিয়া যাও" শব্দটি ব্যবহৃত হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, তওবা কবুল হওয়ার পূর্বেও যেই আদেশ ছিল اهْبِطُوْا "নীচে নামিয়া যাও" পরেও সেই আদেশ দেখা যায় اهْبِطُوْا। সুতরাং তওবা কবুল হওয়ার ফলাফল কি হইল এবং প্রথম বারের আদেশ "নীচে নামিয়া যাও" কার্যকরী হইয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বারের "নীচে নামিয়া যাও" আদেশের কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র কোথায়?

এই প্রশ্নটির উত্তর এই যে, উভয় আদেশের শব্দ এক হইলেও অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। প্রথম اهبطوا -এর অর্থ হইল "নীচে নামিয়া যাও" আর দ্বিতীয় اهبطوا -এর অর্থ হইল "নীচে থাক" এবং প্রথম আদেশটি ছিল শাস্তিমূলক, দ্বিতীয় আদেশটি খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগমূলক। অর্থাৎ আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় ফেলিলেন শাস্তিমূলকভাবে; পরে তাঁহাদের তওবা কবুল হইলে তাঁহাদিগকে দুনিয়াতে বসবাস করিতে বলিলেন- কিন্তু মনোনীত খলীফা ও প্রতিনিধিরূপে উভয় নির্দেশের ব্যবধানটা অতি সুস্পষ্ট।* এই ধাপেই আল্লাহ তাআলার হেকমতপূর্ণ সুদীর্ঘ লীলার মাধ্যমে মূল ঘটনার প্রথম কথা- আদমের খলীফা হওয়া বাস্তবে রূপায়িত হইল।

দ্বিতীয় বিষয় তথা আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী বা মোনাজাত কি ছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মোফাস্সের মোজাহেদ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে-

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ

* একটি নজির লক্ষ্য করুন। একজন সুশিক্ষিত লোককে তাহার কোন অপরাধের দরুন জেলে দেওয়া হইল এবং তথায় তাঁহাকে কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হইল। কারাভোগ শেষ করিয়া মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তথাকার জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টরূপে মনোনীত করিয়া তাহার নিয়োগ-পত্রের ঘোষণা দিয়া দেওয়া হইল এবং জেলকর্তারূপে জেলখানারই অফিসের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হইল; উভয়ের পার্থক্য কত সুস্পষ্ট।

خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম (তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (এখন কোন উপায় নাই); সুতরাং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর, তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বূদ, তুমি পাক-পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আর কোন উপায় নাই); অতএব তুমি আমার প্রতি দয়া কর, তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি; (আমার কোন উপায় নাই); অতএব, তুমি আমার তওবা কবুল কর, তুমিই সকলের তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়ালু।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

অর্থ ঃ পাক-পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, অতি মহান তোমার নাম এবং অতি উচ্চ তোমার মহত্ত্ব; তুমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদ নাই– তুমি একমাত্র মা'বুদ। আমি (তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আমার আর কোন উপায় নাই।) অতএব, তুমি আমায় ক্ষমা কর, ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত যে, তুমি ভিন্ন আর কেহ মাফ করিতে পারে না–গোনাহ মাফ করার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই।

তফসীরে রুহুল মা'আনী কিতাবে এই দোয়াটি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কোরআনে সূরা আ'রাফে হযরত আদম ও হাওয়ার বিনীত আরাধনারূপে যাহা উল্লেখ আছে উহাই সেই আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী, যাহা এই–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! (আমরা তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, তুমি যদি আমাদের প্রতি রহম না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারাদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

হযরত আদম ও হাওয়া এই মোনাজাতই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই মোনাজাত দ্বারাই কান্নাকাটি করিয়াছিলেন এবং ইহার বদৌলতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া সম্পর্কে মা হাওয়ার ভূমিকা

পবিত্র কোরআনে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া, উহার জন্য অভিযুক্ত হওয়া, তদ্দরুন বেহেশত হইতে বহিষ্কারাদেশ এবং আল্লাহর দরবারে তওবা-এস্তেগফার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই দ্বিবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদ্দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে হযরত আদম ও হাওয়া

উভয়ই সমভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি, শয়তান যে অছ্অছা কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিয়াছিল এবং যত রকম তয়-তদবীর ও প্রবঞ্চনামূলক বুঝ-প্রবোধ দান করিয়াছিল, ঐ সবের বিবরণ দানেও পবিত্র কোরআন আদম ও হাওয়া উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দ্বিবচনবাচক শব্দই ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মূলতঃ উভয়েই শয়তানের প্রবঞ্চনায় ভুলে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব, উভয়েই সমানভাবে অভিযোগের পাত্র হইয়াছিলেন। হাঁ এতটুকু সত্য যে, উভয়ে শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া যাওয়ার পর মা হাওয়া প্রথমে ঐ ফল খাইয়াছিলেন এবং শয়তানের প্রবঞ্চনায় হযরত আদম যে ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন মা হাওয়া উহার প্রতি অধিক আকর্ষণ যোগাইয়াছিলেন; এতটুকু বিষয়ের প্রতিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। ইহাতে অপরাধ বা অভিযোগের মাত্রায় কমবেশ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাইবেলের মধ্যে ঘটনার সমস্ত দোষ মা হাওয়ার উপর চাপান হইয়াছে, যদ্দরুন খৃস্টানদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে মাতৃজাতি– নারীগণকে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে– ইহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ بَنُوْا اِسْرَائِيْل لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمَ وَلَوْلاَ حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا -

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– গোশত (ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বেশী সময় থাকিলে) পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যায়, ইহার সূচনা বনী ইসরাঈলদের ঘটনা হইতে এবং স্ত্রী (অনেক সময়) নিজ স্বামীকে ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হওয়ায় প্রভাবান্বিত করে, ইহার সূচনা মা হাওয়ার ঘটনা হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ বনী ইসরাঈলগণ তাহাদের নিজ কৃত এক অন্যায় ও গোনাহের ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সীনা উপত্যকাস্থিত বসতিবিহীন বিশাল মরুভূমিতে দিগভ্রান্ত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই দানা-পানিবিহীন মরুভূমিতে থাকাকালেও রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলা তাহাদের পানাহারের ব্যবস্থা অস্বাভাবিকরূপে করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য আল্লাহ তাআলা তথায় দুই প্রকার বস্তু প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একটি 'বটের' নামক এক প্রকার পাখী। এই পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় নামিয়া আসিত এবং বনী ইসরাঈলদের জন্য ইহা শিকার করা অতীব সহজসাধ্য হইত। এইসব বর্ণনা কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

এই সময় বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল যে, তোমরা প্রতিদিন নিজ নিজ প্রয়োজন পরিমাণ "বটের" পাখি ধরিয়া জবাই করিয়া খাইতে পারিবে; কিন্তু সঞ্চয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের বেশী জবাই করিতে পারিবে না। তাহারা সেই আদেশ অমান্য করিল এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশে অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখি জবাই করিয়া গোশত জমা করিতে আরম্ভ করিল। আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই কার্যের শাস্তিস্বরূপ সঞ্চিত গোশত পচাইয়া দুর্গন্ধময় করিয়া দিবার উপকরণ বাতাসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তখন হইতেই গোশত ইত্যাদি কাচা দ্রব্য পচন ও দুর্গন্ধময় হওয়ার সূচনা হয়। এই বিষয়টির প্রতিই আলোচ্য হাদীছের প্রথমাংশে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া সতর্কতামূলক একটি বিশেষ উপদেশ আমাদিগকে দিয়াছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের আদেশ অমান্য করিলে মানুষের শুধু আখেরাতের ক্ষতিই সাধিত হয় না, বরং এই পার্থিব জীবনেও নানা প্রকারের কষ্ট বিড়ম্বনার সীমা-পরিসীমা থাকে না। আলো-বাতাস, বৃষ্টি-বাদল, আগুন, পানি ইত্যাদি তথা বিশ্বের আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বতের প্রতিটি বস্তু যাহা আমাদের সর্বপ্রকারের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে– এইগুলিই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। ঝড়-তুফান, কীট-পতঙ্গ, ভূকম্পন বন্যা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দেশে ধ্বংসকরী যে

প্রলয়কাণ্ড ও দুর্ভিক্ষ-মহামারী সংঘটিত হয়; অনেক সময় আল্লাহর আদেশ বিরোধী কার্যাবলীই এই সবের মূল কারণরূপে বর্তমান থাকে। এমনকি আল্লাহর আদেশের বিরোধিতার বিষময় ফল অনেক সময় স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত তথ্য প্রকাশের দ্বারা উম্মতকে এই ভয়াবহ বিষয়টি সম্পর্কেই সতর্ক করিয়াছেন। এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ....

অর্থঃ (অনেক সময়) জলে স্থলে নানারকমের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মানুষের কৃত অসৎ কার্যের কুফল ভোগ করাইবার উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়া থাকে- যেন তাহারা এই দুর্যোগ ভোগের পর (স্বীয় কু কর্ম হইতে) ফিরিয়া আসে। (পারা- ২১; রুকু- ৮)

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীছ এবং উল্লিখিত আয়াতের সতর্কবাণী দ্বারা আমাদের একটি বড় উপদেশ এই গ্রহণ করিতে হইবে যে, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য বাহ্যিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করার সঙ্গে, বরং তদপেক্ষাও অধিক তৎপরতার সহিত আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আদেশ-নিষেধাবলী পালন এবং নিজেদের কৃত ত্রুটি ও গোনাহ হইতে তওবা-এস্তেগফার করায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

সুফীকুল শিরোমণি দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এই মর্মে বলিয়াছেন–

غم چون ايد زود استغفار كن # غم بامر خالق امد كار كن

"দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ তওবা এস্তেগফার কর। কারণ দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টিকর্তার আদেশ ব্যতীত আসিতে পারে না। তাই সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করার কার্যে তৎপর হও।"

দুনিয়া দারুল আসবাব, অর্থাৎ সাধারণতঃ কার্যকারণের মাধ্যমে কার্যসমূহ সমাধা হইয়া থাকে, তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা যে কারণেই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা সাধারণতঃ বান-তুফান, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমেই ঘটাইয়া থাকেন। আমরা এমন বোকা যে, এইসব দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য উপকরণসমূহের পিছনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি। সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করার প্রতি তৎপরতা দেখাই না। ইহাই হইল আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা একটা জানোয়ার হইতেও বোকা। লক্ষ্য করুন! একটা কুকুরকে দূর হইতে একটি পাথর মারিয়া আঘাত করা হইলে যদিও বাহ্যতঃ কুকুরের শরীরে পাথরই আঘাত হানিয়াছে; কিন্তু কুকুর ঐ পাথরের প্রতি ধাবিত হইবে না; ইহা একটি বাস্তব ব্যাপার। আমরা বুদ্ধিমান জীব (Rational animal) হইয়া একটা সামান্য কুকুরের চেয়েও হীন বুদ্ধি হওয়ার পরিচয় দিয়া থাকি যে, আমরা পাথর নিক্ষেপকারীর প্রতি ধাবিত না হইয়া বরং শুধু পাথরটির প্রতি ধাবিত হইয়া থাকি।

আল্লাহ তাআলার আদেশ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হওয়ায় গোশত পচিতে আরম্ভ করিল, গোনাহের কারণে দুর্যোগ আসে ইত্যাদি তথ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করা আপাততঃ কঠিন বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু গভীর অন্তরদৃষ্টি লইয়া সংস্কারমুক্ত মনে চিন্তা করিলেই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া পড়ে।

এ স্থলে একটি বাস্তবের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জাগতিক বস্তুনিচয়ের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধের আওতায় পরিচালিত। যেমন আগুন আগুনের ক্রিয়া হইল জ্বালাইয়া দেওয়া, কিন্তু আগুনের এই ক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহার এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাঁহার আদেশ নিষেধের আওতায় পরিচালিত। তাই কোন কোন ঘটনায় দেখা যায় সত্যিকার আগুন আছে; কিন্তু একটি চুলের উপরও উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় নাই। পবিত্র কোরআনে

বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এক অত্যাচারী কাফের রাজার কাহিনীতে একটি শিশু জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষত থাকার ঘটনা উক্ত দাবীরই প্রকৃষ্ট নমুনা।

মো'মিন ও নেচারবাদী (Naturalist)-এর মধ্যে পার্থক্য ইহাই। মুমিনের এই ঈমান বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য কর্তব্য যে, প্রত্যেকটি জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাধীন রহিয়াছে।

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীছের উপরোল্লিখিত বিষয়টি অনুধাবন করা অতি সহজ। কারণ, বাহ্যতঃ আবহাওয়া, বায়ু-বাতাসের প্রতিক্রিয়ায় পচনের সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু-বাতাসের এই ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাধীন। ইহার নমুনা পবিত্র কোরআনে তৃতীয় পারা দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত হযরত 'ইউশা (আঃ) নবীর ঘটনা। সেই ঘটনায় সাধারণ পানাহারীয় পচনশীল বস্তু কোনরূপ বাহ্যিক (preservation বা Refregeration) রক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর কুদরতে দীর্ঘ একশ'ত বৎসরেও পচে নাই বলিয়া পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ -

"বরং তুমি একশ'ত বৎসর মৃত অবস্থায় রহিয়াছ; কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুগুলি দেখ, ঐগুলি বিকৃত হয় নাই– পচে নাই, দুর্গন্ধী হয় নাই।"

সুতরাং ইহা বিশ্বাস করা অতি সহজ যে, বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার আদেশেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই তেজস্ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত ঘটনার ফলেই হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বাক্যটি হযরত আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

এই ঘটনায় আদম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় ক্ষতিকর কার্যে পতিত হওয়ার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী হাওয়ার প্রভাবও অনেকটা অগ্রসরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্তান-সন্ততি মাতা-পিতার দোষ-গুণের ধারক হওয়া স্বাভাবিক। সেই সূত্রেই মেয়েরা আদি মাতা হাওয়ার ঐ দোষটুকু এখনও বহন করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময় নিজ নিজ স্বামীকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে তাহারই ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য ইহাই। এই তথ্য প্রকাশ করিয়া রসূল (সঃ) দুইটি উপদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথম এই যে, স্ত্রী যতই জ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, স্বামীকে অবশ্যই সতর্ক থাকিতে হইবে; কোন কাজেই নিজের সতর্কতার মধ্যে শিথিল হইয়া স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না, বরং প্রথম হইতেই সতর্ক থাকিবে। কেননা, স্বামীকে, প্রভাবান্বিত করার কলা-কৌশল, ছলনা, চাতুরী ও দক্ষতা নারীদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় এই যে, কোন স্ত্রীর দ্বারা এরূপ কিছু সংঘটিত হইয়া গেলে তখন যথাসম্ভব এই ভাবিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে যে, এই স্বভাব ত আদি মাতার মীরাস।

হযরত আদমের ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভ

ভূমিকায় বলা হইয়াছে, পবিত্র কোরআনে অনেক অনেক ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু উহা কিস্সা-কাহিনী বা শুধু ইতিহাস পর্যায়ে নহে, বরং উপদেশ প্রদান ও উপদেশ গ্রহণ পর্যায়ে। বাস্তবিকই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে বহু মূল্যবান উপদেশ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইতিহাস একটি বিশেষ উপদেশমূলক ইতিহাস। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপদেশের বিষয়বস্তু রহিয়াছে। এস্থলে নমুনাস্বরূপ দুইটি উপদেশের

বিবরণ দান করা হইতেছে।

প্রথম উপদেশ ঃ ইবলীস শয়তানের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সে যে আমাদের কত বড় শত্রু তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করা। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় ঘোষণা রহিয়াছে– শয়তান মানব জাতির পরম শত্রু। চিরজীবন তাহাকে পরম শত্রু গণ্য করিয়াই চলিবে। পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা মানবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাই বলিয়াছেন, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا "নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুনিয়া মনে গাথিয়া লইও – শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাকে চিরকাল শত্রুই গণ্য করিও।"

(পারা-২২; রুকু ১৩)

শয়তানকে মিত্রের পর্যায়ে রাখা, তাহার মন্ত্রণা ও পরামর্শ গ্রহণ করা তথা আল্লাহ ও আল্লার রসূলের আদেশ বিরোধী কাজ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আল্লাহ তাআলা বান্দাহদিগকে ১৫-পারা; ১৯ রুকুতে তাহাই বুঝাইয়াছেন–

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ....

"হে মানব! তোমরা কি শয়তানকে এবং তাহার দলবল, চেলা-চামুণ্ডাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছ আমাকে ছাড়িয়া? অথচ শয়তান ও তাহার চেলারা তোমাদের ঘোর শত্রু। (দয়াল প্রভুর পরিবর্তে পরম শত্রু শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী) জালেম স্বৈরাচারীদের এই বিনিময় গ্রহণ কতই না জঘন্য! কতই না দুর্ভাগ্যজনক!"

শয়তান আমাদের নূতন শত্রু নহে। সে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে বেহেশত হইতে বাহির করার কারণ হইয়াছিল, আমাদিগকেও সেই বেহেশত হইতে চিরবঞ্চিত করায় সচেষ্ট; সদা-সর্বদা তাহার হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। আল্লাহ তাআলা সেই বিষয়েই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন–

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ـ

হে আদম সন্তান! সতর্ক থাকিও, শয়তান যেন তোমাদিগকে কুপথে ফেলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত (তথা বেহেশত হইতে বঞ্চিত) করিতে না পারে; যেরূপ সে প্রবঞ্চনা দিয়া তোমাদের আদি মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদের পরিধেয় পোশাক অপসারিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখে তাহাদের গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ـ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ـ

জানিয়া রাখিও, শয়তান এবং তাহার দলবল তোমাদিগকে এমন কায়দায় দেখিতে পায় (এবং প্রবঞ্চনার সুযোগ পায়) যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। আমি (পরীক্ষার্থ) ঈমান উপেক্ষাকারীদের জন্য শয়তানকে বন্ধু বানাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছি। আর (তাহাদের পরিচয় এই যে, যখন তাহারা ফাহেশা-নির্লজ্জ কার্যে লিপ্ত হয় তখন (সদুপদেশদাতাকে) বলিয়া থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের হইতে এই রীতিই চলিয়া আসিয়াছে। এমনকি তাহারা মিথ্যারূপে এই দাবীও করে যে, আল্লাহই আমাদেরকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ

بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ -

(হে মুসলমানগণ!) তোমরা বলিয়া দাও, নিশ্চয় (তোমাদের দাবী মিথ্যা), ফাহেশা নির্লজ্জ কার্যাবলী আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত হয় না। বড়ই দঃখজনক কথা যে, তোমরা আল্লাহর উপর এমন দাবী করিতেছ যাহার কোন প্রমাণ দিতে তোমরা সক্ষম হইবে না। বলিয়া দাও, আমাদের প্রভু ন্যায়ের আদেশ করিয়াছেন এবং জীবনের প্রতি স্তরে একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যে, একমাত্র তাঁহারই প্রতি মাথা নত করিবে, আর প্রভুর দায়িত্ব একনিষ্ঠতার সহিত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিবে– এই আদেশ করিয়াছেন। (এবং সকলকে সতর্কবাণীও শুনাইয়া দিয়াছেন যে, হিসাব-নিকাশের জন্য আমার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। উহার জন্য) যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ (তাঁহারই কুদরতে পুনঃ) জীবিত হইয়া তাঁহার নিকট পৌছিবে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ - اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ -

দুনিয়াতে এক শ্রেণীর লোক যাহারা (আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে), তাহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আর একদল লোক, তাহাদের উপর গোমরাহীর ছাপ লাগিয়াছে– ইহারা হইল ঐ লোক যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে; তবুও তাহাদের ধারণা, তাহারা সঠিক পথেই আছে।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাগণকে তাহাদের চির শত্রু চিনাইয়া দিবার জন্য এবং তাহাদেরকে সেই শত্রু হইতে সতর্ক করিবার জন্য স্বীয় কালামে সেই শত্রু ইবলীসের বৃত্তান্ত জড়িত হযরত আদমের ঘটনা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় উপদেশ যাহা প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে চির জীবনের জন্য গলার মালারূপে গাঁথিয়া রাখার বস্তু– তাহা হইল এই যে, জ্বিন ও মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেই ধাতে তৈয়ার করিয়াছেন উহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। নবীগণের দ্বারা গোনাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাঁহারা হইলেন মা'সুম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সমুদয় গোনাহ হইতে সুরক্ষিত; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এরূপ কাজ হইতে পারে যাহা গোনাহ ত নহে; হাঁ তাঁহারা যে নৈকট্যের অধিকারী উহা দৃষ্টে ত্রুটি বিচ্যুতি বলা যাইতে পারে; অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের সংশোধনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা লইয়া রাখিয়াছেন।

কারও দ্বারা ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ সংঘটিত হইলে তখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং কোন পথ ধরিতে হইবে ইহা একটি কঠিন সমস্যা। এই ক্ষেত্রে ইবলীসের পথ ছিল তওবা এস্তেগফার না করিয়া অপরাধের উপর হটকারিতা করা। ইহাই তাহার জন্য চির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে এবং যে কেহ এই পথে অনুসরণ করিবে সেও চির ধ্বংসে পতিত হইবে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই সমস্যার মুখে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জন্য ধ্বংস হইতে শুধু রক্ষাকবচই ছিল না, বরং চির উন্নতির সোপানও ছিল বটে।

সেই পথ হইল انابة الى الله আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত হওয়া। গোনাহ-খাতা, ভুল-ত্রুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপানে পুন-প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া; খালেস তওবা-এস্তেগফার করা। প্রত্যেক মানুষকে আদি পিতা আদমের অনুসারী হইতে হইবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

বিশ্ব-মানব সকলেই আদমের বংশধর

মানব জাতির মূল বা উৎপত্তিস্থল কি? সে সম্পর্কে ইসলাম তথা কোরআন হাদীছ অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁহার প্রতিনিধি রসূলের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সব উপেক্ষা করা বা ডারউইনের ন্যায় কোন মানুষের উক্তিকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ও তাঁহার প্রতিনিধির উক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া ভ্রান্তি ও মূর্খতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আদম সম্পর্কে যে কয়টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাদীছটিতে على صورة ابيهم ادم বাক্যে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদমই মানব জাতির আদি পিতা। দ্বিতীয় তৃতীয় হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাওয়া মানব জাতির আদি মাতা। এতদ্ভিন্ন নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি হযরত আদম বিশ্ব মানবের আদি পিতা হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৬২২। হাদীছ ঃ عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُه اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَئٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَاَلْتُكَ مَاهُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَّا تُشْرِكُ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ ـ

অর্থঃ আনাছ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা দোযখবাসীদের মধ্য হইতে সর্বাধিক সহজ ও কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি তোমার হাসিল হইয়া যায় তবে তুমি এই আযাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ঐ সব ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইবে কি? সে উত্তর করিবে, হাঁ- নিশ্চয়। তখন আল্লাহ তাআলাবলিবেন, আমি এতদপেক্ষা অতি সহজ একটি বিষয়ের অঙ্গীকার তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ছিলাম, তখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে। অঙ্গীকারটি এই যে, তুমি একমাত্র আমাকেই মাবূদরূপে গ্রহণ করিবে; আমার কোন শরীক সাব্যস্ত করিবে না; কিন্তু (পরবর্তী জীবনে) তুমি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ- আমার শরীক সাব্যস্ত করিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীছে যে অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, উহা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতও রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ـ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ شَهِدْنَا ـ

"ঐ ঘটনা স্মরণ কর যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা যখন আদম সন্তানকে পরম্পরা তাহাদের পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- "আমি কি তোমাদের মাবূদ নহি? সকলেই বলিয় ছিল, হাঁ নিশ্চয়ই- আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি (যে, আপনিই আমাদের মাবুদ)। (পারা-৯; রুকু-১২)

নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছ দৃষ্টে পূর্বাপর আলেমগণ এই আয়াতের তফসীর ইহাই করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে তাঁহার ঔরসে সন্তানগণকে এবং সেই সন্তানগণ হইতে তাহাদের নিজ নিজ ঔরসের সন্তানগণকে- এইরূপে বংশ পরম্পরায় সকল মানবকে আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষুদ্র আকারে বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তরের পর নিজ নিজ স্থানে পুনঃ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

ঔরসের সন্তানদের বেলায় সরাসরি এবং পরবর্তীদের বেলায় পরম্পরের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত

মানব জাতির মূল হইল হযরত আদম (আঃ)। এই সূত্রেই আলোচ্য হাদীছে উক্ত দোযখী ব্যক্তিকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করার কথা বলা হইয়াছে।

মানব জাতির আদি পিতা যে হযরত আদম (আঃ) পবিত্র কোরআনের আরও বিভিন্ন আয়াত দ্বারা এই তথ্যটি প্রমাণিত রহিয়াছে। যথা–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ ....

অর্থঃ হে বিশ্ব মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের পরওয়ারদেগারকে, তিনি তোমাদের সকলকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ প্রাণী হইতে উহার জোড়া ও পরিণীতা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উভয় হইতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দুনিয়াতে আবাদ করিয়াছেন। (পারা– ৪; সূরা নিসা আরম্ভ)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ

অর্থঃ আল্লাহ তাআলাএমন নিপুণ কৌশলী ও শক্তিমান যে, তিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রাণীটি হইতে উহার জোড়া– পরিণীতাকে বানাইয়াছেন, যাহাতে এই প্রাণীটি স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে। (পারা–৯;রুকু–১৪)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى ....

অর্থঃ হে বিশ্ব মানব! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী হইতে এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করিয়া দিয়াছি পরস্পর পরিচয়ের জন্য। (পারা– ২৬; রুকু– ১৬)

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে نفس নফস" শব্দের অর্থ প্রাণী এবং উহার উদ্দেশ্য হযরত আদম (আঃ) زوجها যাওজাহা" শব্দের অর্থ ঐ প্রাণীর জোড়া বা স্ত্রী এবং উহার উদ্দেশ্য হাওয়া (আঃ) ইহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত তফসীরকারগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহও এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় আয়াতে যে বলা হইয়াছে لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ঐ নফস স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিবে" এই তথ্য দ্বারা نفس নফস শব্দের অর্থ যে প্রাণী এবং উহা যে কোন উপাদান, সত্তা-মূল ইত্যাদি জড় পদার্থ নহে, তাহা স্পষ্টতই প্রমাণিত হইয়া যায়। তৃতীয় আয়াতে ذكر যাকারুন একজন পুরুষ انثى উনসা" একজন স্ত্রী শব্দদ্বয়, نفس নফ্‌স শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া সমুদয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে। কারণ, পুরুষ ও স্ত্রী একমাত্র প্রাণীই হয়,উপাদান ও পদার্থ তাহা হয় না।

পারা– ৮; রুকু– ১০ সূরা আ'রাফের আয়াত–

يٰبَنِىْ اٰدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ ......

এই আয়াতখানা সম্পূর্ণরূপে অনুবাদসহ ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়–প্রথম এই যে, সমুদয় মানব সমাজকে "আদম-সন্তান" বলিয়া সম্বোধনপূর্বক আদি মাতা-পিতার ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করায় আদম (আঃ) যে বিশ্ব মানবের আদি পিতা তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় এই যে, এই আয়াতে كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ 'যেভাবে শয়তান তোমাদের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে" বলা হইয়াছে ইহা সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত যেই ঘটনার বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আছে (পারা– ৮; রুকু - ৯)। উহাতে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে–

(১) শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কে অছঅছা প্রদান করিয়াছিল।

(২) শয়তান তাঁহাদের উভয়ের নিকট কসম খাইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

(৩) শয়তান তাঁহাদের উভয়কে প্রবঞ্চনা দিয়া তাঁহাদের দৃঢ়তার মধ্যে শিথিলতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।

(৪) আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উভয়ের বেহেশতী পোশাক খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজ নিজ গুপ্ত অঙ্গে আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৫) পরওয়ারদেগার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়কে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরওয়ারদেগারের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন পারা- ১৬; রুকু- ১৬ সূরা ত্বা-হার মধ্যেও এই ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে, মূল আয়াত অনুবাদসহ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। সেই আয়াতে বিবৃতির আরম্ভ এইরূপ- আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের প্রতি সেজদা করার জন্য, তাঁহারা সকলেই সেজদা করিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা অস্বীকার করিল। অতঃপর আমি বলিয়া দিলাম, হে আদম! এই ইবলীস তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সে যেন তোমাদিগকে বেহেশত হইতে বাহির করিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

পাঠকবৃন্দ! এইসব তথ্য পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এইসব তথ্যদৃষ্টে বক্ষ্যমান আয়াতে উল্লিখিত كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ 'যেরূপ তোমাদের সকলের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিয়াছে।" এ স্থলে اَبَوَيْكُمْ তোমাদের মাতা-পিতা" বলার একমাত্র উদ্দেশ্য যে হযরত আদম ও হাওয়া, এ সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ থাকিতে পারে কি?*

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত চারিটি আয়াত ও আলোচ্য পরিচ্ছেদের তিনটি হাদীছ ব্যতীত হযরত আদম যে মানব জাতির আদি পিতা সে সম্পর্কে অতি স্পষ্ট আরও দুইখানা হাদীছ রহিয়াছে, যাহা বোখারী শরীফেরই অন্যত্র বর্ণিত আছে এবং হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীসটির অংশবিশেষ এই যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত আদমের সঙ্গে প্রথম আসমানে হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রত্যেক আসমানেই

বিভিন্ন নবীগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁহার ঐ সফরে সম্বর্ধনা জানাইবার উদ্দেশে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্বর্ধনাসূচক সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন প্রথম আসমানে পৌছিলেন, তখন তথায় হযরত আদম (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) প্রথমে হযরত আদমের সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় করাইতে যাইয়া যে বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বহু হাদীছে উল্লেখ আছে এবং বিশেষ লক্ষণীয় বাক্যটি এই هَذَا اَبُوكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ "ইনি আপনার আদি পিতা আদম, তাঁহাকে সালাম করুন।"

হযরত আদম (আঃ) সালামের উত্তর দান করতঃ স্বাগত জানাইয়া বলিলেন, مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ "মহান পুত্র মহান নবীর প্রতি মারহাবা।" (বোখারী শরীফ)

দ্বিতীয় হাদীছটির অংশবিশেষ এই যে, হাশরের ময়দানে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ যখন ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইবে তখন আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করাইবার জন্য তাহারা সমবেতভাবে সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্সালামের নিকট যাওয়া সাব্যস্ত করিবে এবং পরস্পর বলিবে-

اَلَا تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاتُوْنَهُ

---

* ইসলামের দাবী করিয়া যাহারা পরোক্ষভাবে ডারউইনের ন্যায় অমুসলিমের মতবাদের প্রতি অধিক আগ্রহশীল, কিন্তু সর্বসাধারন সাধারণ মুসলিম সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোরআন-হাদীছ উপেক্ষা করার সাহস পায় না; এই শ্রেণীর লোকগণের মুখপাত্র একজন পণ্ডিত তফসীরকার "হযরত আদম মানব জাতির আদি পিতা।" এ প্রসঙ্গটির বিরোধিতা করিবার গোপন ইচ্ছা লইয়া আলোচ্য আয়াতের যেসব বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, উল্লিখিত তথ্যসমূহ দৃষ্টে উহার অসারতা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

فَيَقُوْلُوْنَ يَاٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْكَ الْبَشَرِ -

"কেয়ামতের মাঠে যখন সুপারিশকারী তালাশ করা হইবে, তখন বলা হইবে, সকলের আদি পিতা আদম (আঃ) এই কার্যের উপযোগী। অতপর তাহারা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, আপনি মানব জাতির আদি পিতা। আপনাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এইরূপে আপনার মধ্যে আত্মা দান করিয়াছিলেন এবং ফেরেশতাদিগকে আপনার প্রতি সেজদার আদেশ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করুন।

কিন্তু আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্বীয় ক্রটির উল্লেখ করিয়া নিজের সম্পর্কে আতঙ্ক ও ভীতি ও প্রকাশ করতঃ নূহ আলাইহিস্ সালামের নিকট যাইবার জন্য সকলকে পরামর্শ দিবেন। (বোখারী শরীফ)

এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আদি-অন্তের বিশ্ব মানব সকলেই হাশরের দিন হযরত আদমকে "মানব জাতির আদি পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিবে এবং সম্বোধনকালে তাঁহাকে "বিশ্ব মানবের আদি পিতা" আখ্যায়িত করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার কুদরতে সৃষ্ট আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা– এই সত্যের একটি বহিঃপ্রকাশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠে মানবের বসতি স্থাপন এবং তথায় আদম (আঃ)-কে অবতীর্ণ করার পূর্বে ভূপৃষ্ঠের ভাবী বাসিন্দা মানবগণ হইতে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ পর্বের এক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি হাদীছ এবং মূল ঘটনার বিবরণীর একটি আয়াত তথায় উল্লেখ হইয়াছে।

মেশকাত শরীফ ২৪ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে সেই অনুষ্ঠানের বিবরণীতে বলা হইয়াছে, হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে (পুরুষ-পরম্পরারূপে) ভাবী সৃষ্ট সকল মানুষকে বাহির করা হইয়াছিল। فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا মানুষগুলিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকা পরিমাণ দেহাকৃতিতে রূপায়িত করিয়া তাহাদের সমাবেশে মুখামুখিভাবে কথা বার্তার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহাদের হইতে স্বীয় প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আদম পৃষ্ঠ হইতে শুধু মানবের ভাবী দেহ ক্ষুদ্র আকৃতিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। মানবের রূহ বা আত্মা সৃষ্টি সম্পর্কে একটি বিশেষ তথ্য নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে.

১৬২৩। হাদীছ ঃ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ -

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আত্মা (বহু পূর্ব হইতেই সৃষ্ট হইয়া এক বিশেষ এলাকায়) সমাবেশিত ছিল। তথায় যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হইয়াছিল ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ জন্মে এবং পরস্পর সদ্ভাব ও মিল সৃষ্টি হয়। আর তথায় যেসব আত্মার মধ্যে পরস্পর গরমিল ছিল, ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের মধ্যে গরমিলই হয়।

(ইহজগত ভিন্ন অন্য এক বিশেষ এলাকায় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আত্মাসমূহ সমাবেশিত আছে; তথা হইতেই জন্ম লাভকারী প্রত্যেক মানবের দেহে তাহার আত্মা আসে। উক্ত এলাকাকে আলমে আরওয়াহ বা আত্মা জগত বলা হয়।)

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত আদমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শীছ্ (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। শীছ্ আলাইহিস সালামের উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আসে নাই, হাদীছে এবং ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত শীছ্ (আঃ)-এর পরে কোন নবী ছিলেন সে সম্পর্কে একটু মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হযরত শীছ (আঃ)-এর প্রপৌত্রের পৌত্র বলিয়াছেন এবং তাঁহারা নূহ (আঃ) কে ইদ্রীস (আঃ)-এর প্রপৌত্রের পুত্র বলিয়াছেন। আর কেহ কেহ নূহ (আঃ)-কে ইদ্রীছ (আঃ)-এর পৌত্র বলিয়াছেন।

অপর একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, হযরত শীছ্ (আঃ)-এর পরবর্তী নবী হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হয় তিনি এই মতামতকেই অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন।

ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত একটি বর্ণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহের জাহাজ প্লাবনের পর "জুদী" পর্বতের উপর থামিয়া ছিল।

জুদী পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের বর্ণনায় যথেষ্ট মতদ্বৈধতা দেখা যায়। কেহ কেহ তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে ইহাকে "আরারাত" পর্বতমালার একটা পর্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোন কোন ভূগোলবিদ উহাকে "কুর্দিস্তানে" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ "ইবনে ওমর দ্বীপ" নামক দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ)-ও লিখিয়াছেন যে, "জুদী" পর্বত একটি বিশেষ দ্বীপে অবস্থিত। কাস্তালানী নামক (বোখারী শরীফের শরাহ্) কিতাবে ঐ দ্বীপকে "ইবনে ওমর দ্বীপ" বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কোন কোন ভূগোল বিশারদ এই পর্বতটিকে ইরাকের "মোসেল" অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন নাম দৃষ্টে এই সব উক্তিকে বিভিন্ন মতামত বলা যায় বটে, কিন্তু মানচিত্রে দেখা যায়, উল্লিখিত স্থানগুলি সবই প্রায় কাছাকাছি এবং "মোসেল" অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের উত্তরাংশে উহারই প্রদেশ "মোসেল" (বাংলা মানচিত্রে "মোসেল"–বর্তমানে তৈল সমৃদ্ধ) এলাকা। এই এলাকাটি পশ্চিমে সিরিয়া, পূর্বে ইরান, উত্তরে তুরস্ক দ্বারা বেষ্টিত। এই 'মোসেল' এলাকার উত্তর সীমান্তে "দিজ্‌লা" (তাইগ্রীস) ও "ফোরাত" (ইউফ্রেটিস) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রান্তে অর্থাৎ "দিজ্‌লা" নদীর কূলে "ইবনে ওমর দ্বীপ" অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে "মোসেল" এলাকার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে "আরারাত" পর্বতমালা এবং উহার সীমানা সংলগ্নেই "কুর্দিস্তান" (যাহার তুরস্কস্থ "আর্মেনিয়া" এলাকার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় "মোসেল" এলাকা সংলগ্ন) পার্বত্য এলাকা– এই নিকটবর্তী ও লাগালাগি বিভিন্ন নামীয় স্থানসমূহের এলাকায়ই "জুদী" পর্বত অবস্থিত।

মোট কথা, এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকস্থিত 'মোসেল' এলাকার উত্তর সীমান্তে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তুফানের পর জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। সমষ্টিগতভাবে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নূহ (আঃ)-এর জাতি ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক, নসর এবং আরও বিভিন্ন রকমের দেব-দবীর পূজা করিত। নূহ (আঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভে স্বীয় জাতিকে এই সব শেরকী কার্য হইতে বিরত রাখার এবং এক আল্লাহর বন্দেগী করার প্রতি আহ্বান জানাইতে লাগিলেন এবং এই কার্যে তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা দীর্ঘ নয়শ'ত পঞ্চাশ বছরকাল চলিল; এই দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলাফলস্বরূপ সর্বোচ্চ সংখ্যার মতামত হিসাবেও শুধু মাত্র ৮০ জন পুরুষ ৮০ জন নারী– সর্বমোট ১৬০ জন লোক ঈমান আনিল; আর কেহ ঈমান আনিল না। এমনকি অন্য কাহারও ঈমান গ্রহণের আশা বা সম্ভাবনাও রহিল না।

যখন নূহ (আঃ) অকাট্যরূপে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অহী দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, অতপর আর একজনও ঈমান আনিবে না, তখন তিনি সেই কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিলেন। আল্লাহর নিকট তাহাদের ধ্বংস কামনা করিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন বলিয়া হযরত নূহকে জানাইয়া দিলেন; তাহারা পানিতে ডুবিয়া মরিবে, ইহাও নির্দিষ্টরূপে জানাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে একটি জলযান জাহাজ বা বড় নৌকা তৈয়ার করার আদেশ করিলেন।

হযরত নূহ (আঃ) স্বয়ং বা নিজস্ব কোন লোকের সাহায্যে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশাবলী মতে সেই জাহাজ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। দেশীয় লোক জাহাজ বানাইতে দেখিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। হযরত নূহ তাহাদিগকে শুধু এই বলিতেন যে, এখন তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ, কিন্তু এমন একটি সময় আসন্ন যখন আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রূপ করার সুযোগ পাইব।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহকে পূর্বে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, যখন কাফের বিদ্রোহীদের উপর আল্লাহর গজবের তান্ডবলীলা বহিতে থাকিবে, তখন তাহাদেরকে ক্ষমা করা সম্পর্কে আপনি কোন কথাই আমার নিকট বলিবেন না।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহকে আসন্ন ঘটনা উপস্থিতির নিদর্শনও জানাইয়া দিলেন। যখন মাটি ফাটিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে দেখিবেন তখনই মনে করিবেন ভয়াবহ ঘটনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তৎক্ষণাৎ ঈমানদার সঙ্গীগণকে এবং পশু-পক্ষীর এক এক জোড়াকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিবেন।

কিছু দিনের মধ্যে একদিন হঠাৎ মাটি ফাটিয়া পানি উথলিয়া উঠিল। নির্দেশ মোতাবেক পশু-পক্ষীর জোড়াগুলি জাহাজে উঠাইলেন এবং ঈমানদার সঙ্গীগণকে আল্লাহর নাম লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিভীষিকাময় আকারে তুফান জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। হযরত নূহের জাহাজ পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গমালার মধ্যে ভাসিতে লাগিল।

হযরত নূহের চারি পুত্র ছিল– হাম, সাম, ইয়াফেছ ও কেনান। প্রথম তিন জন ঈমানদার ছিলেন। তাঁহারা পিতার সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ছেলে কেনান কাফের ছিল, সে জাহাজে আরোহণ না করিয়া উঁচু পর্বতের দিকে ছুটিল। হযরত নূহ পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মহব্বতে অভিভূত হইয়া পুত্রকে শেষবারের মত চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করার চেষ্টাস্বরূপ জাহাজে আরোহণের জন্য ডাকিলেন; কিন্তু পূর্বকৃত কর্মের ফলাফল আজ তাহাকে ভুগিতে হইবে, তাই সে পিতার আহ্বান এই বলিয়া উপেক্ষা করিল যে, কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিব।

পিতা নূহ (আঃ) ঘটনার আগাগোড়া পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতের স্থান আমার জাহাজ ব্যতীত কোন স্থান এই প্লাবন হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এই কথোপকথনের মধ্যে পাহাড় তুল্য বিরাট ঢেউ আসিয়া কেনানকে গ্রাস করিয়া নিল। নূহ (আঃ) পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারেও অনেক কিছু বলিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়া হযরত নূহকে ধমকের সুরে তাঁহার আবেদন প্রত্যাহার করার আদেশ এবং এই পুত্রকে স্বীকৃতিদানেও নিষেধ করিয়াছেন। ঈমান দৌলত না থাকিলে কোন প্রকার সম্বন্ধ ও গৌরবই কাজে আসে না– উক্ত ঘটনা ইহার প্রকৃষ্ট নজির। হযরত নূহের এক স্ত্রী কেনানের মাতাও কাফের ছিল; সেও ধ্বংস হইয়াছিল। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ২৮ পারা শেষ রুকুতে বিশেষ নজিরস্বরূপ তাহার উল্লেখও করিয়াছেন।

তওরাতের বর্ণনা দৃষ্টে সর্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই তুফান অব্যাহত রহিল। হযরত নূহের জাহাজ ভিন্ন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছু ডুবিয়া গেল, কাফের বিদ্রোহীরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চল্লিশ দিন পরে তুফান থামিল। আল্লাহ তাআলা আকাশকে পানি বর্ষণে বিরত থাকার আদেশ করিলেন এবং যমীনকে উহার নিসৃত

পানি পুনঃ শোষণ করিয়া লওয়ার আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বেই প্লাবনের পানি হ্রাস পাইল।

হযরত নূহের জাহাজ "জুদী" পর্বতের উপর থামিল এবং আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত নূহ (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য পশু-পক্ষী গাছপালা বিহীন ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে তাঁহাদের দেলে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে বিধায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে সব রকমের বরকত, উন্নতি, মঙ্গল, কল্যাণ ও সুখ-শান্তির সুসংবাদের দ্বারা উৎসাহ বর্ধন করিলেন।

নূতনভাবে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আদম জাতের গোড়া পত্তন হইল। হযরত নূহের সঙ্গে জাহাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক অন্যান্য লোকও ছিলেন বটে এবং তাঁহারাও এই গোড়াপত্তনের সময় দুনিয়াতে ছিলেন; কিন্তু তাহাদের বংশের ছেলছেলা চলিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। বরং ইতিহাসের সাক্ষ্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয়বার পৃথিবীর আবাদীর মধ্যে একমাত্র হযরত নূহের তিন পুত্র হাম, সাম ও ইয়াফেসের বংশধরগণই রহিয়াছে।

অন্যান্য মুমিন সঙ্গীগণের বংশের বিলুপ্তি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় ইহাই প্রমাণিত হয় وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ "আমি শুধু নূহের বংশধরকেই বাকী রাখিয়াছিলাম!" (পারা-২৩; রুকু-৭)

এই সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে একখানা হাদীছও বর্ণিত আছে, যাহাতে বর্তমান বিশ্ব-আবাদীর সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীগণকেই একমাত্র হযরত নূহের বংশে কেন্দ্রীভূতরূপে দেখান হইয়াছে। এই সূত্রেই হযরত নূহ (আঃ)-কে "আদমে ছানী" বা দ্বিতীয়। আদম বলা হয়; কেননা, বর্তমান বিশ্বের সমস্ত লোকই হযরত নূহের বংশধর।

হযরত নূহের বিবরণে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

ইহা ঠিক ঘটনা যে,আমি রসূলরূপে পাঠাইয়া ছিলাম নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি; তিনি তাহাদের মধ্যে (রসূলরূপে) পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসরকাল থাকিলেন।* (এত দিনের প্রচেষ্টায়ও তাহারা ঈমান আনিল না)। ফলে সর্বগ্রাসী তুফান তাহাদের ডুবাইয়া দিল; বস্তুতঃ তাহারা ছিল স্বৈরাচারী।

হযরত নূহের আবেদন ও জাতির বিরূপ উত্তর

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

নিশ্চয় আমি নূহকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহার জাতির প্রতি। সেমতে তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ভিন্ন কেহ তোমাদের মা'বুদ হইতে পারেন না।

* হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তাবলীগী কার্যকাল কোরআনের অকাট্য ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হইল ৯৫০ বৎসর। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জাহাজ হইতে অবতরণের পর ৬০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে (রূহুল মা'আনী) এবং তওরাতের বর্ণিত সর্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে তুফান ৪০ দিন স্থায়ী হয়িয়াছিল। এই সূত্রে হযরত নূহের সর্বমোট বয়স ৪০+৬০+৯৫০=১০৫০ বৎসর ১ মাস ২০ দিন।

বাইবেলের মধ্যে যাহা লিখা আছে যে, "সবসুদ্ধ নূহের নয়শ'ত পঞ্চাশ বৎসর হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল", (বাইবেল; আদি পুস্তক পৃষ্ঠা-২১) ইহা ভুল।

(ব্যাতিক্রম করিলে) নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرٰكَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

তাঁহার জাতির প্রধানরা বলিল, (তুমি যে আমাদিগকে এক আল্লাহর এবাদত করিতে বল এবং অন্যথায় আযাবের ভয় দেখাও, এ সম্বন্ধে) আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তুমি স্পষ্টতর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছ। قَالَ

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্রও নাই– অবশ্যই আমি বিশ্ব স্রষ্টার রসূল বা প্রতিনিধি (তিনি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ করেন আমি তাহাই বলি)।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ـ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

পরওয়ারদেগারের বাণী ও আদেশ–নিষেধসমূহই আমি তোমাদের পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি আল্লাহর তরফ হইতে এমন তথ্য জ্ঞাত হই, যাহা তোমরা জ্ঞাত নও।

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত যে, তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মারফত তোমাদের পরওয়ারদেগার হইতে উপদেশ বাণী আসিল তোমাদেরে সতর্ক করার জন্য, যেন তোমরা সংযত হও এবং তোমরা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হও? (অর্থাৎ ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।)

فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ـ

এত বুঝ-প্রবোধদানেও তাহারা নূহকে অমান্য করিল, তাহাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাইল। ফলে (তাহাদের উপর তুফানরূপে আযাব আসিল।) আমি নূহকে এবং তাহার সঙ্গীগণকে জাহাজে রাখিয়া বাঁচাইলাম। আর যাহারা আমার আয়াতসূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল, অমান্য করিয়াছিল, তাহাদের পানিতে ডুবাইয়া মারিলাম; নিশ্চয় তাহারা ছিল একেবারে অন্ধের দল। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ১৫)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত– গোলামী কর, আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই, তোমরা সংযত হও না কেন?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلٰئِكَةً ـ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ ـ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ـ

তাঁহার জাতির কাফের প্রধানরা সর্বসাধারণকে বলিয়া বেড়াইল যে, এই লোকটি তোমাদেরই মত একজন মানুষ; (সে রসূল-নবী কিছুই নহে; কিন্তু রসূল হওয়ার দাবী দ্বারা) সে তোমাদের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আল্লাহ তাআলা যদি রসূল বা প্রতিনিধি পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় কোন একজন ফেরেশতা পাঠাইতেন। (মানুষ আল্লাহর রসূল হইয়া আসিবে) এইরূপ উদ্ভট কথা ত বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও আমরা শুনি নাই। এই লোকটা পাগল ভিন্ন কিছুই নহে। তোরা কিছু দিন অপেক্ষা কর– (এর মধ্যেই তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে)।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنَ - فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا - اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ -

নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য করুন, তাহারা ত আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে। (আল্লাহ পাক বলেন,) তখন আমি তাহার নিকট অহী মারফত সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশ মতে আপনি একটি জাহাজ নির্মাণ করুন (বিদ্রোহীদের ধ্বংসের জন্য তুফানরূপে আযাব আসিবে)। যখন আমার আযাব আরম্ভের সময় হইবে এবং (উহার নিদর্শন এই যে,) যমীন বিদীর্ণ হইয়া পানি উৎক্ষিপ্তরূপে উঠিতে আরম্ভ করিবে; তখন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক এক জোড়া এবং আপনার পরিজনকে জাহাজে উঠাইয়া লইবেন, অবশ্য তাহাদের মধ্যে (যে আমার বিদ্রোহী) যাহার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আমার আদেশ হইয়া গিয়াছে, সে উঠিতে পারিবে না। আর একটি কথা– যাহারা অন্যায়কারী বিদ্রোহী তাহাদের সম্পর্কে আপনি আমার নিকট কোন অনুরোধ করিবেন না, তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই ডুবাইয়া মারা হইবে।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

যখন আপনি সঙ্গীগণসহ জাহাজে শান্তিতে বসিয়া যাইবেন, তখন বলিবেন, সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে জালেমদের কবল হইতে মুক্তি দান করিলেন।

(সূরা মোমেনুনঃ পারা–১৮; রুকু–২)

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উপর অন্যায়কারীদের একটি অভিযোগ ইহাও ছিল যে, আপনি গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্থান দিয়া থাকেন। তাহারা সেই গরীব লোকদের অপসারণ দাবী জানাইল। নূহ (আঃ) তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে তাহারা বিরোধিতায় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতঃ নূহ (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করিল। নূহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। এই সম্পর্কে কোরআনের বিবৃতি এই–

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحُ اَلاَ تَتَّقُوْنَ - اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ - وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ -

নূহ পয়গম্বরের কওম (নূহের আদর্শকে মিথ্যা বলিয়া শুধু নূহকেই মিথ্যুক বলে নাই,) সমস্ত রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল! যখন তাহাদেরই বংশধর নূহ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি সংযত

হইবে না? আমি তোমাদের কল্যাণার্থ বিশ্বস্ত রসূলরূপে আসিয়াছি। অতএব, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি পোষণ কর ও সংযত হও এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থী হইব না। সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি, একমাত্র তাঁহারই নিকট আমার প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তি ও সংযম অবলম্বন কর এবং আমার কথা মানিয়া চল।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ - قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلاَّ عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ - وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ - اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ -

তাহারা বলিল, আমরা কি আপনার তাবেদারী করিতে পারি এই অবস্থায় যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলি আপনার অনুগামী হইয়া বসিয়া আছে? নূহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা যাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিতেছ, তাহারা কি কাজ করে না করে (যদ্দারা নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণীর বিচার হয়) তাহা আমি খবর রাখিতে যাইব কেন? তাহাদের হিসাব ত আমার পরওয়ারদেগারের নিকট হইবে। তোমরা এই বাস্তবকে বুঝিলে এইরূপ বলিতে না। যাহারা ঈমান আনিয়াছে (নিম্ন হউক বা উচ্চ) তাহাদিগকে আমি তাড়াইয়া দিতে পারি না। আমি সতর্ককারী বই নহি (উঁচু নীচুর পার্থক্য কেন করিব।)

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ -

তাহারা ভীতি প্রদর্শনে বলিল, হে নূহ! তুমি যদি (তোমার কার্যাবলী হইতে) নিবৃত্তি না হও, তবে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতের শিকার হইবে।

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنَ - فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি ত আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাহাদের মধ্যে একটা শেষ ফয়সালা করিয়া দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনগণকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তি দিন।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ - ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

সেমতে আমি তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীগণকে জাহাজে উঠাইয়া উদ্ধার করিলাম। অবশিষ্ট সকলকেই ডুবাইয়া মারিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য কুদরতের নির্দশন ও উপদেশ রহিয়াছে।

(পারা-১২; রুকু-১০)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنَ -

বিশ্ববাসীকে নূহের ঘটনা পাঠ করিয়া শুনান; যখন তিনি স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতগুলি দ্বারা উপদেশদান যদি তোমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করিয়া আছি। তোমরা নিজেদের গর্হিত মাবুদ সহ তোমাদের সমুদয় চেষ্টা একত্রিত কর, অতপর সমবেতভাবে নিশ্চিন্ত চিত্তে সেইসব চেষ্টা আমার বিরুদ্ধে চালাইয়া দাও, আমাকে একটুও অবকাশ দিও না। (পারা- ১১; রুকু- ১৩)

পয়গম্বরের মনোবল, সাহস ও আল্লাহ তাআলার উপর তাঁহার ভরসা হয় অতি প্রবল ও মজবুত। হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদের ভয়-ভীতির প্রতি উত্তরে তাহাই প্রকাশ করিলেন। পবিত্র কোরআনে তাহারও বিবরণ রহিয়াছে–

নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনার আরও বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ـ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারাও গোলামী অবলম্বন করিও না, অন্যথায় আমি তোমাদের উপর ভীষণ দুঃখ-যাতনাময় দিনের আযাব আসিবার আশঙ্কা করিতেছি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ـ

তাহাদের সর্দার শ্রেণীর কাফেররা বলিল, হে নূহ! আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখি; (তুমি আল্লাহর রসূল কিরূপে হইতে পার?) এবং তোমার তাবেদার এমন ব্যক্তিগণকেই দেখিতেছি, যাহারা নগণ্য নিম্ন শ্রেণীর; (তাহাদের জ্ঞানও) ভাসা ভাসা রকমের, অধিকন্তু তোমাদের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি না। (তুমি রসূল নও,) বরং তোমাদিগকে আমরা মিথ্যাবাদীই মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি, যদি আমি স্বীয় পরওয়ারদেগার প্রদত্ত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তিনি আমাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের (নবুয়তের) ভাগী করিয়াছেন, কিন্তু; (ঐসব দলীল এবং আমার নব্যুয়ত হইতে) তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় আমি কি জবরদস্তি উহা তোমাদের গলায় ঠাসিয়া দিতে পারি কি? অথচ তোমরা উহা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ـ

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট আমার কার্যের বিনিময়ে টাকা-পয়সা চাই না, আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট জমা থাকিবে। (নূহ (আঃ) আরও বলিলেন– তোমাদের অবাঞ্ছিত দাবী পূরণার্থ) আমি এই সকল লোককে তাড়াইতে পারিব না, যাহারা ঈমান আনিয়াছে। (যদিও তোমরা তাহাদিগকে হেয় মনে কর); কিন্তু তাহারা (ঈমানের বদৌলতে সম্মানে ও আদর-যত্নে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে পৌঁছিবে। (বস্তুতঃ তাহারা হেয় নহে,) কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা জ্ঞানান্ধের দল (তাই তোমরা ঐরূপ মনে করিয়া থাক)।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ

হে আমার জাতি! আমি যদি এই লোকদিগকে তাড়াইয়া দেই তবে আল্লাহর ক্রোধানল হইতে আমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা কি বুঝ না?

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(তোমরা আমার প্রতি যে বিস্ময় প্রকাশ কর তাহা বোকামি; আমি ত বিস্ময়কর কোন দাবী করি না); আমি ত দাবী করি না যে, (আমি খোদায়ী শক্তির মালিক–) আমার হস্তে আল্লাহর সর্বস্ব। আমি এই দাবীও করি না যে, (আল্লাহর ন্যায়) সমস্ত ভূত-ভবিষ্যতের আমি খবর রাখি। আমি এই দাবীও করি নাই যে, আমি ফেরেশতা। আর তোমরা যেসব মুমিনকে হেয় মনে করিয়া থাক, তোমাদের ন্যায় আমিও তাহাদের সম্পর্কে বলিব যে, আল্লাহ তাহাদিগকে কল্যাণ দান করিবেন না– আমি এইরূপ বলিতে পারিব না। তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ জ্ঞাত আছেন, তদনুপাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবেন। এমতাবস্থায় আমি যদি ঐরূপ কথা বলি, তবে আমিও তোমাদের ন্যায় অন্যায়কারীদের একজন হইয়া যাইব।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

(কাফেররা বলিল,) হে নূহ! তুমি তর্কে লিপ্ত হইয়াছ এবং অধিক তর্ক করিতেছ। সত্যবাদী হইলে তর্ক ছাড়িয়া যে আযাবের ভয় দেখাইতেছ উহা আমাদের উপর নিয়া আস।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ـ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, আযাব নিয়া আসিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা যদি তাঁহার মর্জি হয় এবং উহাকে ঠেকাইবার শক্তি তোমাদের নাই। (নূহ (আঃ) তাহাদের প্রতি আক্ষেপ-অনুতাপ প্রকাশে) আরও বলিলেন, তোমাদের জন্য আমি যতই কল্যাণ কামনা করি, আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না, যদি আল্লাহ তোমাদিগকে গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে দেন। (অর্থাৎ তোমরা স্বেচ্ছায় গোমরাহীর উপর থাকিতে বদ্ধপরিকর হও– সে অবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলা বল প্রয়োগ করিবেন না।) তিনি তোমাদের পরওয়ারদেগার, মালিক। তাঁহারই নিকট তোমরা (হিসাব দেওয়ার জন্য) ফিরিয়া যাইবে (তিনি হিসাব নিকাশ লইবেন।)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ـ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِىْ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ـ

(হে মুহাম্মদ (সঃ)! নূহের কওমের ন্যায় মক্কার কোরায়শরাও মিথ্যায় লিপ্ত।) কি আশ্চর্য যে, তাহারা বলিতেছে, মুহাম্মদ কোরআন নিজেই গড়িয়াছে। আপনি বলিয়া দিন, যদি আমি গড়িয়া থাকি তবে আমার অপরাধের শাস্তি আমাকে ভুগিতে হইবে। আর (তোমরা যে মিথ্যা বল সেই পাপ তোমরা ভুগিবে,) আমি তোমাদের পাপের দায়ী হইব না।

وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

(নূহের কওম সীমা অতিক্রম করিলে আযাব ঘনাইয়া আসিল।) এবং নূহকে অহী মারফত জ্ঞাত করান হইল যে, এ পর্যন্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত আপনার কওমের আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদের কার্য কলাপে আপনি দুঃখিত হইবেন না। (আশার বিপরীত অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়; আশা না থাকিলে দুঃখ হইবে না।)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ـ

আপনি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশানুসারে একটি জাহাজ নির্মাণ করুন। জালেমদের সম্পর্কে আমার নিকট মুখও খুলিবেন না; তাহারা অবশ্যই ডুবিয়া মরিবে।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌَ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার আরম্ভ করিলেন, তাঁহার কওমের সর্দার লোকেরা যখনই জাহাজের নিকট দিয়া গমন করিত, উহা সম্পর্কে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। নূহ (আঃ) বলিতেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (ভালবাস তবে) কর; একদিন আমরাও তোমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিব, যেরূপ তোমরা করিতেছ।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ـ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ ـ

অচিরেই উপলব্ধি করিবে, কাহার উপর আসে অপদস্থকারী আযাব এবং কাহার উপর পতিত হয় স্থায়ী আযাব। অবশেষে যখন আমার (আযাবের) আদেশ হইল এবং মাটি ফাটিয়া পানি উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন আমি নূহ (আঃ)-কে বলিলাম, প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় জাহাজে উঠাইয়া লউন এবং এমন ব্যক্তি, যাহার সম্পর্কে (কুফরীর দরুন) পূর্বাহ্নেই (ধ্বংসের) আদেশ রহিয়াছে, সে ব্যতীত আপনার পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য ঈমানদারগণকে উঠাইয়া লউন। নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে অল্প সংখ্যকই ঈমানদার ছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

নূহ (আঃ) সঙ্গীদেরকে বলিলেন, জাহাজে আরোহণ কর (আশঙ্কা নাই), আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। (তিনি হেফাযত করিবেন। গোনাহের দরুন আশঙ্কা হয়, কিন্তু নিশ্চয়) আমার পরওয়ারদেগার দয়াবান ও ক্ষমাকারী।

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ـ وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

জাহাজ তাঁহাদেরকে লইয়া চলিতে লাগিল পাহাড় সমতুল্য ঢেউয়ের মধ্যে। নূহের এক পুত্র জাহাজ হইতে দূরে ছিল। নূহ (আঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে আস; কাফেরদের সঙ্গে থাকিও না।

قَالَ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ـ

পুত্র উত্তর করিল, এখনই আমি পাহাড়ে আশ্রয় লইতেছি, পাহাড় আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। নূহ (আঃ) বলিলেন, আজ আল্লাহর আযাব হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ রক্ষা করিবেন। ইতিমধ্যেই একটি বিরাট তরঙ্গ আসিয়া উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হইল, পুত্র ডুবিয়া গেল।

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاۤءَكِ وَيٰسَمَاۤءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاۤءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(কাফেররা ডুবিয়া মরিল) এবং (আল্লাহর তরফ হইতে) আদেশ হইল, হে যমীন! শোষণ করিয়া লও তোমার উদগত পানি এবং হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ কর। পানি কমিল এবং দুর্যোগের অবসান হইল; জাহাজ "জুদী" পর্বতের উপর থামিল। আল্লাহর আদেশ ছিল, স্বৈরাচারীর দল চিরতরে ধ্বংস হউক (তাহাই ঘটিয়া গেল)।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) (পুত্রের ধ্বংস নিকটবর্তী দেখাকালে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে প্রভু! আমার ছেলে ত আমার পরিবারেরই একজন এবং আপনার ওয়াদা একান্ত সত্য; আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বোপরি এখতিয়ারের মালিক (আমার ছেলেকে রক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারেন)।

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ـ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ

আল্লাহ বলিলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত– অসৎ কর্মপরায়ণ (সে ধ্বংস হইবেই)। অতএব, যে বিষয় তুমি অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করিও না। আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কার্য করিও না।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আর যেন আপনার নিকট দরখাস্ত না জানাই যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ এবং (অতীতের ত্রুটি) যদি আপনি আমাকে মার্জনা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন তবে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের একজন হইয়া যাইব।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

(অবশেষে) অনুমতি আসিল– হে নূহ! অবতরণ করুন শান্তি হউক এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক– আপনার উপর এবং আপনার সঙ্গীদলের উপর। পক্ষান্তরে (পরবর্তীদের মধ্যে) একটি এমন দলও হইবে যাহাদিগকে আমি উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করিব, অতপর তাহাদের উপর আমার তরফ হইতে পৌঁছিবে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব। (পারা– ১২; রুকু– ৩-৪)

নূহ আলাইহিস সালামের কওম– যাহারা আল্লাহদ্রোহী কাফের ছিল, তাহারা সকলেই প্লাবনে হালাক হইল। একমাত্র হযরত নূহ (আঃ) ও এক স্ত্রী, এক পুত্র ব্যতীত তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার নগণ্য সংখ্যক সঙ্গী মোমেনগণই জাহাজের মধ্যে থাকিয়া আল্লাহর রহমতে নাজাত পাইলেন। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন– وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ـ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ

নূহ আমার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন; আমি উত্তম সাড়া দিয়াছিলাম। (বিদ্রোহীদের হালাক করিয়া)

তাঁহাকে এবং তাঁহার (মো'মিন) পরিবারবর্গকে (আযাবের) ভয়াবহতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِىْ الْاٰخِرِيْنَ - سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ - وَاِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ -

এরপর একমাত্র তাঁহার বংশধরকেই ধরাপৃষ্ঠে বাকী রাখিয়াছি এবং তাঁহার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রাখিয়া দিলাম–"সালাম নূহের প্রতি বিশ্ব মানবের মধ্যে।" আমি নেক বান্দাদেরকে এইরূপেই পুরস্কৃত করি। (পারা– ২৩; রুকু– ৭)

নূহ আলাইহিস সালামের তুফান সমগ্র বিশ্বে হইয়াছিল না শুধুমাত্র তাঁহাদের এলাকায় হইয়াছিল; এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অবশ্য ইহাও সুস্পষ্ট যে, তখন দুনিয়ার প্রাথমিক জীবন; নূহ আলাইহিস সালামের অঞ্চল ব্যতীত কোথাও জন-মানবের বসবাস ছিল না বলিয়াই বিশ্বাস। অতএব, তৎকালীন ভূ পৃষ্ঠের সমস্ত কাফেরই যে সেই তুফানে হালাক হইয়াছিল ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। হযরত নূহের যে বদ দোয়ার ফলে এই তুফান আসিয়াছিল, পবিত্র কোরআনে সেই বদ দোয়া সকল কাফের সম্পর্কে ব্যাপক আকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে– وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিলেন– হে পরওয়ারদেগার! ভূপৃষ্ঠে কাফেরদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দিবেন না। (সূরা নূহ ঃ পারা– ২৯)

নূহ (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে "সূরা নূহ" নামে একটি বিশেষ সূরা রহিয়াছে। উহার শুধু অনুবাদ পেশ করা হইল

তর্জমা সূরা নূহ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। (তাঁহাকে আমি আদেশ করিয়াছিলাম,) আপনি আপনার জাতিকে (কর্মফলের দরুন) তাহাদের উপর ভয়াবহ আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিন। সে মতে নূহ (আঃ) জাতিকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করিয়া বলিতেছি, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর (দেব-দেবীর পূজা ছাড়িয়া দাও) এবং আল্লাহর ভয়-ভক্তি সর্বদা দেলে জাগরূক রাখ আর আমার কথা মানিয়া চল; আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় তথা আয়ুষ্কাল পর্যন্ত (শান্তিতে) দিন কাটাইতে দিবেন। নিশ্চয় জানিয়া রাখ, মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে (মৃত্যু আসিতে) একটুও বিলম্ব হইবে না। এই সব বিষয় যদি তোমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া লও তবে তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

(দীর্ঘ দিন এইরূপ আহ্বানের পর) নূহ (আঃ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে দিবারাত্র সৎপথের দিকে আহ্বান জানাইলাম, কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদের পক্ষে অধিক দূরে সরিয়া পড়ার কারণই হইয়াছে। এমনকি যখনই আমি তাহাদিগকে তাহাদের গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা তথা ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছি তখন তাহারা নিজেদের কুর্ণ কুহরে আঙ্গুল ঠাসিয়া রাখিয়াছে (আমার কথা শোনে নাই) এবং কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে (আমি যেন তাহাদের নজরেও না পড়ি) এবং নিজেদের রীতি-নীতির উপর অধিক বদ্ধপরিকর হইয়াছে অহঙ্কার গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদসত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি প্রকাশ্যভাবে, পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি গোপনে গোপনে। আমি তাহাদিগকে এতদূর বুঝাইয়াছি যে, তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি অতি বড় ক্ষমাশীল। (তোমরা গোনাহ হইতে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পরওয়াবদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিবেন এবং তোমাদের

অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া দিবেন। সব দিক দিয়া তোমাদের উন্নতি দান করিবেন–) তোমাদের দেশে তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ভক্তি ও মহত্ত্ব মহিমার উপর দৃঢ় আস্থা অন্তরে গাঁথিয়া লও না? অথচ তিনিই (হইতেছেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা হিসাব গ্রহীতা; তিনি) তোমাদিগকে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (খাদ্য-দ্রব্যের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য, বীর্য হইতে রক্তপিণ্ড, রক্তপিণ্ড হইতে মাংসপিণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া মানুষরূপে তাঁহার কুদরতে তোমরা জন্ম নিয়াছ। তিনি অতি মহান সর্বশক্তিমান;) তোমরা কি দেখ না যে, কি আশ্চর্যজনকরূপে আল্লাহ তাআলা সাত তবক আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার উহার মধ্যে চন্দ্রকে আলো স্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপস্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন! আরও দেখ, আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে মাটি হইতে (তথা উহার উদ্ভূত খাদ্য দ্রব্য হইতে) এক বিশেষ উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই মাটির মধ্যে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন, তারপর সেই মাটি হইতেই পুনঃজীবিত করিয়া উঠাইবেন (এবং তোমাদের হইতে পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে হিসাব নিকাশ লইবেন।)

আল্লাহ (কত মেহেরবান! তিনি) তোমাদের সুবিধার্থ ভূপৃষ্ঠকে সমতল রূপ দিয়াছেন যেন তোমরা উহার সুপ্রশস্ত রাস্তা ঘাটসমূহে চলাফেরা করিতে পার।

(এত বুঝান সত্ত্বেও যখন তাহারা সত্য গ্রহণ করিল না তখন) নূহ (আঃ) প্রভুর দরবারে আরজি পেশ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি আমার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং তাহারা এমন লোকদের কথায় সাড়া দিতেছে যাহাদের ধনবল জনবলের অহঙ্কার খোদাভীরুতা হইতে দূরে সরাইয়া তাহাদিগকে শুধু ধ্বংসের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। তাহারা (তাহাদের আল্লাহদ্রোহী নীতি জারি রাখার জন্য) বড় বড় ব্যবস্থা ও তদবীর অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা দেশবাসীকে এই বুঝাইয়াছে যে, তোমরা কিছুইতেই তোমাদের দেব-দেবী ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নসরকে ছাড়িও না। আরও অনেক প্রকারে তাহারা দেশবাসীকে বিপথগামী করিয়াছে। (তাহারা সৎপথে আসার সব রকম সম্ভাবনাই শেষ করিয়া দিয়াছে; অতএব) তাহাদের গোমরাহী তুমি (ক্ষমার ব্যবস্থা না করিয়া) বাড়াইয়া দাও। পরিণামে যেন তাহারা গজবে ধ্বংস হয় এবং সৎ লোকদের পথের কাঁটা দূরীভূত হইয়া যায়।)

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) তাহাদের এইসব গোনাহের কারণে (ইহজগতে) তাহাদিগকে ভয়াবহ প্লাবনে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরজীবনের জন্য দোযখের আগুনে পতিত হওয়া সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। (তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া দেব-দেবীর পূজা-করিয়াছিল, কিন্তু যখন গজব আসিয়াছে তখন) আল্লাহ তাআলা ভিন্ন তাহাদের দেব-দেবীদের কোন সাহায্যই তাহারা পায় নাই।

(তাহাদের হেদায়াত ও সৎপথ অবলম্বনে নিরাশ হইয়া) নূহ (আঃ) দরখাস্ত করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! এই সব কাফেরদের আর যমীনের উপর থাকিবার সুযোগ দিবেন না; তাহাদিগকে দুনিয়াতে থাকিতে দিলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে বিপথেই পরিচালিত করিবে। (তাহাদের সমবেত আল্লাহদ্রোহিতা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়–) তাহাদের বংশের মধ্যেও বদকার কাফের ভিন্ন ভাল লোক সৃষ্টি হওয়ার কোন আশা নাই।

হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন, আমার মাতা-পিতাকে, আমার পরিবারে যাহারা ঈমানদার আছে তাহাদেরকে এবং সমস্ত মো'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর স্বৈরাচারী জালেমদের জন্য ধ্বংসই বর্ধিত করুন। (যেন তাহারা দেশবাসীকে বিপথগামী করার সুযোগ আর না পায়।)

হযরত নূহের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়

নূহ আলাইহিস সালামের ইতিহাসে দুইটি উপদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম এই যে, আল্লাদ্রোহিতা, আল্লাহর নাফরমানী অনেক সময় দুর্যোগ-দুর্গতি, ঝড়-তুফান ইত্যাদি দেশ বিধ্বংসী বিপর্যয় ঘটিবার মূল কারণ হইয়া থাকে। অতএব, এই ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে সর্বাগ্রে

দেশব্যাপী তওবা-এস্তেগফার, সমস্ত রকম শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ এবং আল্লাহ ও রসূলের তাবেদারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শুধু বাহ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা রক্ষা ব্যবস্থার পরিণাম অনেক সময় হযরত নূহের পুত্র কেনানের মতই হইয়া থাকে। কেনান বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থা তথা প্লাবন হইতে বাঁচিবার জন্য উঁচু পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট মনে হয়, কিন্তু যেহেতু সে বিপর্যয়ের মূল কারণ তথা আল্লাহদ্রোহিতায় নিমগ্ন ছিল, তাই তাহার অবলম্বিত রক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ফল হইয়াছে। পক্ষান্তরে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার দলবলের রক্ষা ব্যবস্থা তথা জাহাজে আরোহণ ফলদায়ক হইয়াছিল। কারণ, তাঁহারা বিপর্যয়ের মূল কারণের ব্যবস্থাকারী ছিলেন। অবশ্য মূল কারণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হইবে, যেরূপ নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ঘটনার সময় মোমিনগণ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহাও আল্লাহ তাআলারই নির্দেশ ছিল। সাধারণত ইহজগতের সব কিছুই কার্যকারণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়– ইহাই আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম-নীতি।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, মানুষ স্বয়ং নিজে ঈমানদার সৎকর্মী না হইলে যত বড় সম্বন্ধই তাহার হাসিল থাকুক না কেন, উহা তাহার জন্য নাজাতদানকারী হইতে পারে না। হযরত নূহের পুত্র কেনানের পরিণাম উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। তদ্রূপ কেনানের মাতা নিজেই ঈমানদার ছিল না, ফলে নূহ (আঃ)-এর ন্যায় একজন পয়গাম্বরের স্ত্রী হইয়াও সে নাজাত পাইল না– দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। পবিত্র কোরআনে এই কেনান-মাতা হযরত নূহের স্ত্রীর প্রসঙ্গ সারা বিশ্বের কাফেরদের জন্য একটি বিশেষ নজির স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَامْرَاَتَ لُوْطٍ ـ

"আল্লাহ তাআলা কাফেরদের জন্য উপদেশমূলক ঘটনারূপে হযরত নূহের স্ত্রী এবং হযরত লুতের স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেন। উভয় নারী আমার অতি বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্য হইতে দুই জন বান্দাহর স্ত্রী ছিল; কিন্তু উক্ত নারীদ্বয় তাহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কার্যে লিপ্ত ছিল, ফলে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ঐ নারীদ্বয়ের পক্ষে আল্লাহর আযাবের মোকাবিলায় কোনই সাহায্য করিল না এবং (দুনিয়ায় ধ্বংস হওয়ার পর) তাহাদের সম্পর্কে এই আদেশই জারি করা হইবে যে, দোযখীদের দলভুক্ত হইয়া তোমরাও দোযখে প্রবেশকারী।" (পারা– ২৮; রুকু– ২০)

কেয়ামতের দিন হযরত নূহের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য

১৬২৪। হাদীছ ঃ আবু সায়ী'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) নূহ (আঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি (আপনার উম্মতকে) খাঁটি ধর্মের ডাক পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তিনি উত্তর করিবেন, হ্যাঁ– ইয়া পরওয়ারদেগার! অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদিগকে নূহ খাঁটি ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না না– আমাদের নিকট কখনও কোন নবী আসেনই নাই। আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? নূহ (আঃ) বলিবেন— মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন– তখন আমরা সাক্ষ্য দিব যে, হাঁ– নূহ তবলীগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ঘটনাই পবিত্র কোরআনের আয়াতের তাৎপর্য–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ـ

('হে উম্মতে মুহাম্মদী! পূর্ববর্ণিত নেয়ামতসমূহ ও সম্মান যেরূপে তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে,) তদ্রূপ

তোমাদিগকে এই বিশেষ সম্মানও প্রদান করা হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে সর্বোত্তম উম্মতরূপে গঠিত করিয়াছি, যেন তোমরা অন্য সকল উম্মতগণের উপর (উপযুক্ত) সাক্ষী হইতে পার। (পারা-২; রুকু-১)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যদানের বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আছে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন— কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে, কোন নবীর উম্মত শুধু একজন, কোন নবীর উম্মত দুই জন, আবার কোন নবীর উম্মত অনেক বেশী। প্রত্যেক নবীর সময়কার লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তোমাদিগকে সত্য ও খাঁটি ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না। আমাদিগকে সত্য ধর্ম পৌঁছান নাই। তখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? নবী বলিবেন হাঁ- আমি সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনার পক্ষে সাক্ষী কে আছে? নবী বলিবেন, আমার পক্ষে সাক্ষী মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত। তখন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার উম্মতকে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তাঁহার সময়কার লোকদেরকে সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? মুহাম্মদী উম্মতগণ বলিবেন, হাঁ- সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। বিপক্ষ লোকেরা প্রশ্ন উথাপন করিবে যে, মুহাম্মদী উম্মত! আমাদের পরে জন্ম লাভ করিয়া আমাদের ঘটনা সম্পর্কে কিরূপে সাক্ষ্য দিতে পারে? তখন মুহাম্মদী উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা তাহাদের ঘটনা কি সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছ? তাহারা বলিবে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র কিতাব কোরআনের মাধ্যমে আমাদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, নবীগণ প্রত্যেকেই সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। তখন মুহাম্মদ (সঃ)-কে এই সম্পর্কে বিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য দান করিবেন।

কেয়ামতের দিনের আরেকটি ঘটনা

হাশরের ময়দানে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া সুপারিশের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরামর্শে লোকগণ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইবে। নূহ (আঃ) সুপারিশে অক্ষমতা জানাইয়া নিজের ব্যাপারে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় দুইটি কার্যের উল্লেখ করিবেন।

প্রথম- আল্লাহর আযাব তুফান ও জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া তাঁহার পুত্র "কেনান" মরিবার সময় তিনি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র আমারই পরিবারের; আর (আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা সম্পর্কে) আপনার ওয়াদা (যাহার আশ্বাস আপনি দিয়াছিলেন, তাহা ত) অখণ্ডনীয়- আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" উত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন-

"হে নূহ! এই পুত্র তোমার পরিবারভুক্ত নহে, সে তোমার আদর্শের বিপরীত কাজে লিপ্ত ছিল, যে বিষয় তুমি পূর্ণ অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট পীড়াপীড়ি করিও না- আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞদের দলভুক্ত হইও না।"

দ্বিতীয়- নূহ (আঃ) অমান্যকারীদের ধ্বংসের বদ দোয়া করিয়াছিলেন-

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ـ

"হে পরওয়ারদেগার! ভূ পৃষ্ঠে কাফের গোষ্ঠীর একটি প্রাণীকেও বাকী থাকিতে দিবেন না যে, চলাফেরা করিতে পারে।"

নূহ (আঃ) হাশরের দিন এই বিষয়দ্বয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশঙ্কা প্রকাশপূর্বক বলিবেন, তোমরা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও। -(বোখারী শরীফ)

হযরত ইলয়াস (আঃ)

হযরত ইল্‌য়াস (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াতে বর্ণনা রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার সম্পর্কে কোন বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ নাই। শুধু এটুকু আছে যে, তাঁহার এলাকাবাসী بَعْل "বা'ল্" নামক দেবতা বা দেবীর পূজা করিয়া থাকিত। ইল্‌য়াস (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করতঃ এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিতেন। তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তাকে ছাড়িয়া তোমরা বা'লের পূজা করিতেছ! ইহা কত বড় অন্যায় অপরাধ! কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই; আল্লাহ তাআলা তাহাদের সম্প্রর্কে বলিয়াছেন, فَاِنَّهُمْ مُحْضَرُوْنَ ـ তাহারা সকলেই আমার নিকট হিসাবদানে উপস্থিত হইবে।

ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের পরিচয় সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন– তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর পৌত্রের পুত্র বা পৌত্রের পৌত্র ছিলেন। তিনি বনী ইস্রাঈলদের নবী ছিলেন।* তাঁহার আবির্ভাবস্থল ছিল তৎকালীন সিরিয়ার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর "বা'লা-বাক্কা"। আরবী মানচিত্রে এই শহরকে "বা'লা-বাক্কা" নামে লেখা হয় যাহা বর্তমান লেবানন প্রজাতন্ত্রের একটি মহকুমাস্বরূপ। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বৈরুত ও তারাব্লাসের মধ্যস্থল বরাবর প্রায় একশ'ত মাইল পূর্বে অবস্থিত।

এই শহর এলাকার আদি অধিবাসীদের দেবতা "বা'ল" এবং এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ "বাক্কা"– এই উভয় নামের সংমিশ্রণে শহরটির নাম "বা'লা-বাক্কা" হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে হযরত ইল্‌য়াসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই–

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ـ اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ـ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ ـ

নিশ্চয় ইল্‌য়াস রসূল ছিলেন। স্মরণ কর, যখন তিনি স্বীয় দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি (সর্বশক্তিমান আল্লাহকে) ভয় কর না? তোমরা "বা'ল" দেবতার পূজা কর আর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা মাবুদ বরহক আল্লাহ যিনি তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া উপেক্ষা করিতেছ? (ইল্‌য়াস আঃ) এইরূপে বুঝাইলেন;) তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল। (আল্লাহ বলেন,) এইসব লোককে আমার নিকট অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হইবে। অবশ্য আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ (সসম্মানে আমার নিকট আসিবেন।) ইল্‌য়াসের পক্ষে চিরকালের জন্য আমার ঘোষণা, ইল্‌য়াসের প্রতি সালাম।" (পারা– ২৩; রুকু– ৮)

হযরত ইল্‌য়াসের দীর্ঘায়ু লাভ এবং ইহজগতে থাকিয়া অদৃশ্য থাকা সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে; ঐ সব কাহিনী নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নহে।

---

* এই হিসাবে হযরত ইল্‌য়াসের আবির্ভাব হযরত মূসার অনেক পরে ছিল, কিন্তু এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইদ্রীসের অপর নাম ইল্‌য়াস। হয়ত এই জন্যই বোখারী (রঃ) হযরত ইল্‌য়াসের বর্ণনা হযরত ইদ্রীসের সংলগ্নে করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম মতামতই অগ্রগণ্য।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)

ইদ্রীস (আঃ) নবী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা রহিয়াছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ـ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ

"পবিত্র কিতাবে ইদ্রীস সম্পর্কে জ্ঞাত হও, তিনি খাঁটি ও সত্য নবী ছিলেন।"

মে'রাজ শরীফের ভ্রমণে চতুর্থ আসমানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর হযরত (সঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি সালামের জবাবদনপূর্বক এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন–

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ـ

"উপযুক্ত ও সম্মানিত ভ্রাতা এবং উপযুক্ত ও সম্মানিত নবীকে মোবারকবাদ।"

হযরত হুদ (আঃ)

"আ'দ" নামক এক জাতির প্রতি হুদ (আঃ) নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর এক পৌত্রের পুত্র তাহার নাম ছিল "আ'দ"; তাহার হইতে যে নছল বা বংশধারার উৎপত্তি তাহারাই "আ'দ জাতি" নামে পরিচিত।

নূহ আলাইহিস সালামের তুফানে সব কাফের-মোশরেক ধ্বংস হইয়া নূতনভাবে দুনিয়া আবাদ হওয়ার পর এই আ'দ জাতিই প্রথম পুনঃ কুফ্‌রী ও শিরেকীতে পতিত হয়। তাহারা মূর্তি পূজা ও দেব-দেবীর উপাসনা করিত। হুদ (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা তাহাদের হেদায়াতের জন্য নবীরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

আ'দ জাতির পিতা "আ'দ" হযরত নূহের পৌত্রের পুত্র ছিল এবং এই আ'দের পৌত্রের পৌত্র ছিলেন হযরত হুদ (আঃ)। আ'দ জাতির দেশ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে একটু খোঁজ পাওয়া যায়– وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ

"বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিন আ'দ জাতির নবীর ঘটনা, তিনি সতর্ক করিয়াছিলেন স্বীয় জাতিকে যাহারা "আহ্'কাফে" বসবাস করিত।"

"আহ্'কফ" শব্দটি বহুবচন, ইহার একবচন হইল 'হে'কফ" যাহার অর্থ মরু অঞ্চলের বালুকাস্তূপ। ঐ অঞ্চলে বালুকাস্তূপের আধিক্য ছিল; এই সূত্রে সেই অঞ্চলকে "আহ্'কাফ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্ত এইরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, উক্ত সূত্রে এই অঞ্চলটি "আহ্''কাফ" নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমানেও আরবী মানচিত্রে এই এলাকা "আহ্'কাফ" নামেই উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে এই এলাকা বস্তুতঃ বালুকাময় মরুভূমি ছিল না। আল্লাহর গজবে দেশবাসী ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এই দেশও ধ্বংস হইয়া ঘন ঘন বালুকাস্তূপবিশিষ্ট মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থাদৃষ্টেই উহাকে আহ্কাফ বলা হইয়াছে।

আরব সাগরের উত্তর পারে অবস্থিত উপকূল এলাকা "হাজরামাওত" এবং আরব সাগর হইতে লোহিত সাগরের উৎপত্তিস্থলে ত্রিভুজ আকৃতির ভূখণ্ডের কোণে– লোহিত সাগরের পূর্ব পারে অবস্থিত "ইয়ামান" এবং সউদী আরব রাষ্ট্রের "নজ্‌দ" প্রদেশ এবং ওমান উপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী (ছোট ছোট রাজ্যের একটি রাজ্য) "ওমান–" এই এলাকাসমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিরাট মরু এলাকা আছে, যাহাকে বর্তমানে আরবী মানচিত্রে الربع الخالى (রবউলখালী) "জন শূন্য ভূখণ্ড" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যাহার উত্তরে "নজ্‌দ" দক্ষিণে "হাজরামাওত", পশ্চিমে "ইয়ামান" পূর্বে ওমান রাজ্য।

বর্তমান এই মরু ভূখণ্ডের মধ্যেই আ'দ জাতির বসবাস ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে, এই অঞ্চলটি পূর্ব হইতেই মরু অঞ্চল হইলেও পূর্বকালে উহার কোন কোন অংশ বিশেষতঃ "হাজরামাওত" ও "ইয়ামান" এলাকা সংলগ্ন অংশসমূহ যথেষ্ট উর্বর ছিল। আ'দ জাতির আবাদী সেখানেই ছিল। কতিপয় বিশিষ্ট তফসীরকার ইহাও লিখিয়াছেন যে, উক্ত সম্পূর্ণ মরু অঞ্চলটি আদি আমলে সবুজ বাগানরূপী উর্বর শস্য-শ্যামল ছিল, উহার কোন অংশই মরুভূমি ছিল না। আদ জাতির উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাজিল হওয়ার পর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেশও ধ্বংস হইয়া মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজও উহা জনহীন মরু প্রান্তররূপেই বিদ্যমান আছে, এমনকি মানচিত্রেও সেই এলাকা "আহ্কাফ বা রবউল-খালী"– জনশূন্য মরু প্রান্তর নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিপকে আল্লাহ তাআলার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহারা নাফরমানী করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ তাআলার আযাবে তাহারা ধ্বংস হইয়াছিল। এই সবের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি এক আল্লাহর এবাদত কর, তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য অন্য কেহ হইতে পারে না। তোমাদের অন্তরে কি ভয় আসে না?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ

কাফের নেতারা হুদকে বলিল, আমরা তোমার মধ্যে বুদ্ধিহীনতা দেখিতেছি– (একা সকলের বিরুদ্ধে চলিতেছ।) তদুপরি আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (তুমি যে, তোমার এই সব উক্তিকে ধর্মের নাম দিতেছ, আযাবের ভয় দেখাইতেছ– ইহা মিথ্যা।)

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ـ

হুদ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নহি। আমি সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার প্রেরিত রসূল (বার্তাবহ দূত)। আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের কথা বহন করিয়া তোমাদেরকে পৌছাই এবং আমি নিতান্ত খাঁটিভাবেই তোমাদের কল্যাণ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ـ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

তোমাদেরই স্বজাতীয় একজন মানুষ মারফত তোমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশ-নিষেধসমূহ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তোমাদের সতর্ক করিতে– ইহাতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইতেছ (এবং অমান্য করিতেছ)। স্বরণ কর, নূহ পয়গাম্বরের উম্মতকে– আল্লাহ কিরূপে তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া তোমাদেকে তাহাদের পরে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক আকৃতিতে বর্ধিত ও বল-বীর্যে উন্নত করিয়াছেন। আল্লাহর এইসব নেয়ামত স্মরণে তাহার হক আদায় কর; ইহাতেই তোমাদের সাফল্য নিহিত।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে আসিয়াছ, যেন আমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের মা'বুদগণকে ছাড়িয়া দেই? (আমরা তাহা করিব না।) তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাও ঐ আযাব নিয়া আস যদি সত্যবাদী হও।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ـ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَائُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ـ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ـ

হুদ বলিলেন, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে ক্রোধানল ও আযাব আসন্ন। তোমরা আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ এরূপ উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে– যাহাদের (আদৌ বাস্তবতা নাই;) আছে কেবল নাম; যেই নামগুলি তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা গড়িয়া লইয়াছ। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহর তরফ হইতে কোন প্রমাণ আসে নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর; আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের উপর আযাব আসার অপেক্ষায় রহিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ

আল্লাহ বলেন, অতঃপর হুদ ও তাঁহার সঙ্গীদের নাজাত দিলাম আমার করুণায়। আর যাহারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং ঈমান আনে নাই, তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

(পারা–৮ রুকু–১৬)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ مُفْتَرُوْنَ ـ

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদের বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি এই আহ্বান জানাইলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। ইহার বিপরীত তোমরা যাহা বল সবই মিথ্যা।

يٰقَوْمِ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

হে আমার জাতি। এই আহ্বানকার্যে আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রতিদান পাইব। তোমরা আমার বক্তব্য অনুধাবন কর না কেন?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহর প্রতি রুজু হও; দেশে অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া তিনি তোমাদের দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিবেন এবং তোমাদেরকে অধিখ উন্নতি ও শক্তি দান করিবেন। আমার কথা অমান্য অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইও না।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

সেই লোকেরা বলিল, হে হুদ! তুমি আমাদের সম্মুখে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতে পার নাই। শুধু তোমার কথায় আমরা নিজেদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করিব না; আমরা তোমার কথা মানিব না।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرٰكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ـ

তোমার সম্পর্কে আমাদের ধারণা– আমাদের কোন দেবতা তোমাকে অভিশাপ দিয়াছে (ফলে তুমি মাথাখারাপ হইয়া আবোল-তাবোল বলিতেছ)।

قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنَ ـ

হুদ (আঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকিও, তোমরা যেসব জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানাইতেছ, সেইসব হইতে আমি সম্পর্কহীন। (এই দেবতারা কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে সেই ধারণা আমার নাই।) আল্লাহ ছাড়া তোমরা একত্রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ـ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা; দুনিয়ার সমস্ত জীবন তাঁহারই করতলগত। সত্য ও সোজা পথেই আমার পরওয়ারদেগারকে পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ ـ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ

তোমরা যদি আমাকে অমান্য কর তবে তোমরাই অপরাধী হইবে; আমি কর্তব্য পালন করিয়াছি– তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছি যাহা পৌঁছাইবার জন্য আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত। (সংশোধন না হইলে তোমরা ধ্বংস হইবে) এবং আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিবেন। তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমার প্রভু সব কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন। (আল্লাহ বলেন–)

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ـ

যখন আমার গজবের আদেশ তাহাদের উপর আসিল, তখন হুদ ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার রহমতের দ্বারা রক্ষা করিলাম এবং আমি তাঁহাদিগকে আখেরাতের ভীষণ আযাব হইতেও বাঁচাইলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ـ

এই আদ জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহ অমান্য করিয়াছিল, তাঁহার প্রেরিত রসূলগণের নাফরমানী করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবজ্ঞাকারী বিদ্রোহীদের কথায় সাড়া দিয়াছিল।

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلاَ اِنَّ عَاداً كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ـ

তার ফলে তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিল লানত অভিশাপ এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে। বাস্তবিকই আ'দ জাতি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার বিরোধিতা করিয়াছিল, ফলে হুদ আলাইহিস সালামের বংশ- সেই আ'দ জাতি ধ্বংস কবলিত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। (সূরা হুদ ঃ পারা- ১২ রুকু- ৫)

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আ'দ জাতি রসূলগণ কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল। যখন তাহাদের স্বজাতীয় নবী হুদ তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি খোদাকে ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত খাঁটি ও শুভাকাঙ্ক্ষী রসূল; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। একমাত্র আমার পরওয়ারদেগারের নিকটই আমার প্রতিদান গচ্ছিত রহিয়াছে।

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ـ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ـ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ـ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ـ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

(খোদাভীরুতা তোমাদের নাই; আছে শুধু ভোগ-বিলাস, বৃথা দম্ভ ও ক্ষমতার উন্মত্ততা, তাই) অপব্যয় করতঃ সুউচ্চ স্থানে ইমারত বানাইয়া থাক (নামের জন্য- প্রয়োজন ছাড়া। এবং এরূপ দালান-কোঠা তৈয়ার কর যে,) মনে হয় তোমরা দুনিয়ায় চিরস্থায়ী। আর কাহারও প্রতি ক্ষমতা দেখাইতে ভয়ঙ্কর কঠোরতা অবলম্বন কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। ভয়-ভক্তি কর সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরকে বহু উন্নতি দিয়াছেন। যাহা তোমরা অবগত আছ (-ধনে-জনে, মানে সম্ভ্রমে)। আরও উন্নতি দিয়াছেন তোমাদিগকে পশুপালের ও প্রবাহমান ঝরণাসমূহের দ্বারা; আমি আশঙ্কা করি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিনের আযাবের।

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَوْ عَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ ـ اِنْ هٰذَا اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ـ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তোমার ওয়াজ-নসীহত করা না করা উভয় আমাদের কাছে সমান। (আমরা তোমার কথায় প্রভাবিত হইব না। তুমি যে নবী হওয়ার দাবী কর এবং ওয়াজ শুনাও,) পুরাতন লোকদের ইহা চিরাচরিত স্বভাব। বস্তুতঃ আমাদের উপর কোন আযাব আসিবে না। ফলকথা, তাহারা হুদকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরিণামে তাহাদেরকে ধ্বংস করিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বড় শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও (মক্কাবাসীদের) অধিকাংশই ঈমান আনিতেছে না। (সূরা শোআরা- পারা-১৯; রুকু- ১১)

আ'দ জাতির ধ্বংস

হুদ (আঃ) আ'দ জাতিকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবার জন্য দীর্ঘকাল আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বিরোধিতাই করিল, যাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লিখিত আয়াতসমূহে রহিয়াছে। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব ও গজব আসিল, যাহাতে সমগ্র আ'দ জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং তাহাদের সমগ্র দেশ জনশূন্য বালুকাময় মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আজও

তাহা সেই অবস্থায়ই পতিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির উপর যে আযাব আসিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রথমতঃ দীর্ঘকাল তাহারা অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষের কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে ঘন কাল মেঘপুঞ্জ উড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এই ত আমাদের দেশের প্রতি মেঘমালা উড়িয়া আসিতেছে; এখনই আমাদের বস্তিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা পানিবাহক মেঘমালা ছিল না, বরং ছিল তাহাদের জন্য সর্ববিধ্বংসী ভয়াবহ ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবাত্যার পূর্বাভাস। তথায় সাত রাত আট দিন পর্যন্ত ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা চলিল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা আ'দ জাতির প্রতিটি প্রাণীকে পাহাড়-পর্বতের গায়ে আছড়াইয়া এবং উর্ধ্ব হইতে নিম্নে ভীষণভাবে নিক্ষিপ্ত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আ'দ জাতির মানুষ ও পশুগুলি ঘূর্ণিবাত্যার সহিত ভূমি হইতে উর্ধ্বে খড় কুটার ন্যায় বাতাসের সহিত উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। ফলে সেই মানুষ ও পশুগুলির একটি প্রাণীও বাঁচিল না। একমাত্র হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমিনগণ (যাহাদের সর্বশেষ সংখ্যা চারি হাজার ছিল;) আল্লাহ তাআলার রহতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা সকলে এক স্থানে একত্রিত হইয়া নির্বিঘ্নে রহিলেন। ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা সেখানে পৌঁছিল না। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই আযাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে—

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرْ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ـ

আ'দ জাতি নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর কিরূপ হইয়াছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণের ফল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়াছিলাম প্রবল বেগের ঝঞ্ঝা বায়ু, ঘূর্ণবাত্যা এক অশুভ অবস্থার দিনে— যাহার প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর চিরস্থায়ী হইয়া গেল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা মানুষগুলিকে উপরে উঠাইয়া ভীষণ জোরে নিক্ষেপ করিল; (ফলে আ'দ জাতির লোকদের দীর্ঘদেহী লাশগুলি বিক্ষিপ্তাকারে পড়িয়া রহিল) যেন তাহারা সমূলে উৎপাটিত খের্জুর বৃক্ষের কাণ্ডগুলি। (সূরা কামার ঃ পারা— ২৭; রুকু— ৮)

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ـ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ـ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ـ

আর আ'দ জাতির বিনাশ ঘটিয়াছিল সীমা অতিক্রমকারী প্রবল বেগের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা দ্বারা। সেই ঘূর্ণিবাত্যাকে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন সাত রাত আট দিন অবিচ্ছিন্নভাবে। ফলে সেই বংশধরদের অবস্থা এমন হইয়া গেল যে, তাহারা যেন বিধ্বস্ত খেজুর গাছের কাণ্ড। তাহাদের কেহ অবশিষ্ট থাকিল কি? (পারা— ২৯; রুকু— ৫)

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ـ مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ـ

তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আ'দ জাতির ঘটনার মধ্যে— আমি পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের উপর এক (বিধ্বস্তকারী) মঙ্গলবিহীন ঝঞ্ঝা; উহা যেকোন বস্তুর উপর বহিল উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। (সূরা আহকাফঃ পারা— ২৬; রুকু— ২)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ـ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

আ'দ বংশের নবীর ঘটনা লক্ষ্য কর– যখন তিনি স্বীয় জাতিকে সতর্ক করিয়াছিলেন যাহারা আহ্কাফ অঞ্চলে বাস করিত। পূর্বাপর আরও অনেক সতর্ককরীর আবির্ভাব হইয়াছিল সেই গোত্রে। (তাহাদের প্রতি সকলের এই কথাই ছিল,) যে, তোমরা এক আল্লাহরই বন্দেগী কর (অন্যথায়) তোমাদের উপর আমি ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি কি আসিয়াছ আমাদিগকে আমাদের পূজনীয় মাবূদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে? (তোমার কথা মানি না;) তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস; যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ـ

নবী বলিলেন, (আযাব আসিবে নিশ্চয়; তাহার সময়) একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি ত তোমাদেরকে ঐ বিষয়ই পৌঁছাই যাহার বাহকরূপে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা অজ্ঞতারই পরিচয় দিতেছ।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অতঃপর যখন তাহারা দেখিল, একখণ্ড মেঘ তাহাদের বস্তির প্রতি অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা বলিল, এই ত মেঘমালা আসিতেছে, আমাদিগকে বৃষ্টি দিবে। (আল্লাহ বলেন, না, না-) বরং ইহা হইতেছে সেই আযাব যাহার দ্রুত আগমন তোমরা কামনা করিতে, ইহা হইতেছে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবাত্যা, যাহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাবে পরিপূর্ণ।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

সেই ঘূর্ণিবাত্যা সব কিছু বিধ্বস্ত করিবে প্রভুর আদেশে। ফলে আ'দ জাতি এরূপ ধ্বংস হইল যে, তাহাদের পাকা-পোক্তা ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত কোন (প্রাণীর) চিহ্নও বাকী রহিল না। এই ধরনের অপরাধীগণকে আমি এমন শাস্তিই দিয়া থাকি। (পারা– ২৬ ; রুকু– ৩)

আ'দ জাতির ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ

৩নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে "আ'দ জাতির" ঘটনার মধ্যে । ৪ নম্বরে বর্ণিত আয়াতসমূহের পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা সংক্ষেপে সেই শিক্ষণীয় বিষয়ের ইঙ্গিতে বলেন-

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً فَمَا اَغْنٰى

عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُوْنَ -

"আদ জাতিকে (ধনবল, জনবল, বাহুবল, দৈহিক বিক্রম ও বিশালতাপূর্ণ) যেরূপ সমর্থ আমি দিয়াছিলাম, তোমাদিগকে সেরূপ দেই নাই এবং তাহাদিগকে কান, চোখ, বিবেক-বুদ্ধি সবই দিয়াছিলাম। যেহেতু তাহারা আল্লাহর কথায় কর্ণপাত করিত না, তাই তাহদের কান, চোখ ও বিবেক বুদ্ধি কোনটারই কিছুমাত্র সাহায্য তাহারা পাইল না এবং যেই আযাবের সংবাদে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া থাকিত, সেই আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। (শ্রবণ-শক্তির দ্বারা সরাসরি বা যন্ত্রের সাহায্যে সংঙ্কেত শুনিয়া অথবা দর্শন-শক্তির দ্বারা সরাসরি বা যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বাভাস দেখিয়া কিম্বা বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায় ও কৌশল অবলম্বনে আযাব ঠেকাইবার কোন ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিল না।)

(আ'দ জাতির এলাকাকে ধ্বংস করার ন্যায়) তোমাদের পার্শ্ববর্তী আরও অনেক এলাকা আমি ধ্বংস করিয়াছি; তাহাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে পুনঃ পুনঃ আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম যেন তাহারা (আল্লাহ বিরোধী গতি হইতে) ফিরিয়া আসে।

হযরত সালেহ (আঃ)

"সামুদ" জাতির বংশে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তিনি সেই জাতির প্রতিই পয়গম্বর নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

সামুদ জাতির বাসস্থান সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা ফাজরে উল্লেখ আছে, " وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ " এবং (কি ভয়ঙ্কররূপে ধ্বংস করিয়াছেন আল্লাহ তাআলা) সামুদ জাতিকে, যাহারা নিজ বসবাসের জন্য "ওয়াদিল কুরা" নামক এলাকায় (পাহাড়-পর্বতের ভিতরে ও গায়ে) পাথর কাটিয়া (সুরম্য অট্টালিকাদি তৈয়ার করিয়া) ছিল।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সামুদ জাতির আবাসস্থল "ওয়াদি" ছিল। তফসীরকারগণ ইহাকে "ওয়াদিল কুরা" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আকাবা উপসাগরের পূর্ব উপকূল হইতে পূর্ব-দক্ষিণে হেজায এবং সিরিয়ার মধ্যস্থলে উক্ত এলাকা অবস্থিত।

এই এলাকারই একটি প্রধান শহর তথা রাজধানীর নাম ছিল حجر "হে'জর"। এই সূত্রেই পবিত্র কোরআনে সামুদ জাতিকে اصحاب الحجر আসহাবুল হেজ্‌র– হেজ্‌রবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমানে আরবী মানচিত্রে এই এলাকাকে مداين صالح 'মাদায়েনে সালেহ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার অর্থ "সালেহ-এর বস্তিসমূহ" প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই নামটির সঙ্গতি সুস্পষ্ট।

এই এলাকাটি হেজায ও সিরিয়ার মধ্যে মদীনা মোনাওয়ারা হইতে উত্তর দিকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার তথা ১৮০ ইংরেজী মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হেজায্ হইতে সিরিয়ার দিকে সাধারণ পথ এই এলাকা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

সিরিয়ার পথে আগন্তুক আক্রমণকারী এক শত্রু দলকে বাধা প্রদানের উদ্দেশে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সিরিয়াস্থিত "তবুক" নামক স্থান পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন; সেই অভিযান ইতিহাসে "তবুক অভিযান" নামে অভিহিত এবং সেই তবুক "মদীনা" হইতে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার ইংরেজী ৪৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই অভিযান পথে এই সামুদ জাতির এলাকা হেজর অঞ্চল দিয়াই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ এলাকা অতিক্রম করার কালে হযরত (সঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দান

করিয়াছিলেন, এই এলাকার একটি কুপ ব্যতীত অন্য কূপের পানি কেহ ব্যবহার করিবে না, ঐরূপ পানি দ্বারা ভিজান রুটি তৈয়ারীর আটা ফেলিয়া দিবে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্রুতবেগে এই এলাকা অতিক্রম করিয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে তবুকের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।

"সামুদ" জাতির উৎপত্তি "সামুদ" নামক এক ব্যক্তি হইতে। এই লোকটির বংশ তালিকায় ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিক বলেন, সামুদ পিতা– আবের পিতা– এরাম পিতা– সাম পিতা নূহ (আঃ)। অপর দল বলেন, সামুদ পিতা– আ'দ, পিতা– আছ, পিতা– এরাম, পিতা- সাম, পিতা– নূহ (আঃ)।

প্রথম মতে আ'দ এবং সামুদ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জাতি, অবশ্য উভয় জাতির সংযোগস্থল হযরত নূহের পৌত্র "এরাম"। এরামের এক পুত্র ছিল "আছ", তাহার পুত্র আ'দ, সে-ই হইল আ'দ জাতির আদি পিতা। এরামের আর এক পুত্র ছিল "আবের", তাহার পুত্র "সামুদ", সেই হইল সামুদ জাতির পিতা।

(তফসীরে বয়ানুল কোরআন– সূরা ওয়াল ফাজ্র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় মত হিসাবে সামুদ জাতি আ'দ জাতিরই শাখা এমনকি, এই মতের পক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আ'দ জাতি যখন আল্লাহ তাআলার গজবে ধ্বংস হইয়াছিল তখন তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীয় মোমেনগণ পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আ'দ জাতির রক্ষাপ্রাপ্ত সেই মুষ্টিমেয় অবশিষ্টাংশই কালে সামুদ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

কালের পরিবর্তনে যখন সামুদ জাতি পৌত্তলিকতায় এবং এক খোদার বন্দেগী তথা তৌহীদ ত্যাগ করতঃ মূর্তি পূজায় লিপ্ত হইল, তখন হযরত সালেহ্ (আঃ) তাহাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর মনোনীত হইলেন। জাতি তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব আসিল। ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, ভীষণ ভূকম্পন ও বিকট গর্জনে সমস্ত জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। রক্ষা পাইলেন শুধু হযরত সালেহ্ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেন দল।

সামুদ জতির ধ্বংসের কাহিনী

সামুদ বংশীয় লোকগণ যখন স্বীয় পয়গম্বর হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালামের প্রতি অবজ্ঞা ও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকিল; তাহাদের সংশোধনের আশা রহিল না, তখন তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব আসন্ন হইয়া উঠিল।

তাহারা একদিন হযরত সালেহ (আঃ)-কে বলিল, আপনি যদি এই পাড়াড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। হযরত সালেহ (আঃ) তাহাদের ঈমানের প্রতি অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন: তিনি তাহাদের এই স্বীকারোক্তিকে বিশেষ সুযোগ মনে করিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী পাহাড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইবার দোয়া করিলেন। দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইল। তৎক্ষণাত জনসমক্ষে পাহাড়ের একটি পাথরে কম্পন দৃষ্ট হইল এবং উহা ফাটিয়া একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল, অনতিবিলম্বেই উহার একটি বাচ্চা প্রসব হইল।

কিন্তু দুষ্ট কাফেররা নিজেদের স্বীকারোক্তি হইতে ফিরিয়া গেল, বস্তুতঃ ঐ স্বীকারোক্তি শুধু তাহাদের মৌখিক মুনাফেকী ছিল, অন্তরে তাহার কোন স্থান ছিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, দাবী পূরণও করিতে পারিবে না, আমাদের ঈমানও আনিতে হইবে না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ধৈর্য তাহাদিগকে বাঁচাইয়া নিতে লাগিল। এখনও গযব নাযিল হইল না, কিন্তু সেই উটটি ছিল অসাধারণ দেহবিশিষ্ট এবং

উহার পানাহারও ছিল অসাধারণ। মাঠের সমস্ত ঘাস, কূপের সমস্ত পানি সে একাই গ্রাস করিয়া ফেলিত। দেশের পশুপাল ইহাকে দেখিলেই ছুটিয়া পালাইত। এইসব কারণে দেশবাসী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল এবং নানারূপ অসদুপায় অবলম্বনের পরামর্শ করিতে লাগিল। এখনও আল্লাহ তাআলার ধৈর্য তাহাদের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করিতেছিল। হযরত সালেহ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই উটটি তোমাদের বাঁচন-মরণ পরীক্ষার বস্তু। খবরদার! তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিও না, অন্যথায় আল্লাহ তাআলার গযব নামিয়া আসিবে। হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে তাহাদিগকে একটি সুপন্থা বাতলাইয়া দিলেন যে, পালাক্রমে একদিন আল্লাহ তাআলার উটটিকে আবদ্ধ রাখা হইবে। ঐ দিন তোমাদের পশুপাল অবাধে চলিয়া পানাহার করিবে। আর একদিন তোমরা তোমাদের পশুপালের ব্যবস্থা নিজ নিজ গৃহে করিয়া নিবে। ঐ দিন এই উটটি একা পানাহার করিয়া বেড়াইবে এইরূপে উভয় পক্ষের কার্য সমাধা করা হউক।

তাহারা নিজেরাই যে জিনিস চাহিয়া লইয়াছিল, কষ্ট-ক্লেশ হইলেও উহার বোঝা বহন করা তাহাদের কর্তব্য ছিল; কিন্তু যাহারা স্বীয় প্রভু আল্লাহ ও তাঁহার প্রতিনিধি রসূলেরই কোন ধার ধারে না, তাহারা ন্যায়-অন্যায়ের ও বুদ্ধি-বিবেকের ধার কি ধারিবে? তাহারা ঐ ব্যবস্থায়ও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা নিজেদের গোমরাহ দিকভ্রষ্ট বিবেকের দ্বারাই পরিচালিত হইল। সকলের পরামর্শে তাহারা উটটিকে উহার বাচ্চাসহ জবাই করিয়া খাইয়া ফেলিল।

তাহাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিল না বরং তাহারা সালেহ (আঃ)-কে সপরিবারে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবকাশ দিলেন না; তৎপূর্বেই ভীষণ ভূকম্পন এবং জিব্রাঈল ফেরেশতার এক কলিজা বিদীর্ণকারী প্রচণ্ড গর্জন দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন। মুহূর্তে সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল। সালেহ (আঃ) মোমেনগণসহ রক্ষা পাইলেন। তিনি দেশবাসীর পরিণতিতে অনুতপ্ত হইলেন এবং ঐ দেশ ত্যাগ করত: সিরিয়ায় বা মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিলেন। পবিত্র কোরআনে সামুদ জাতির ইতিহাস নিম্নরূপ–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদেরই স্বজাতি সালেহকে। তিনি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ তোমাদের নাই। আমি তাঁহার পয়গম্বর; আমার সত্যতা প্রমাণে তোমাদের সেই প্রভুর তরফ হইতে উজ্জ্বল নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে– এই নাও (তোমাদেরই ফরমায়েশ অনুযায়ী) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত উষ্ট্রী; আমার সত্যতার নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর যমীনে মুক্তভাবে চরিয়া বেড়াইতে দিও, কোন অনিষ্টের উদ্দেশে ইহাকে ছুঁইবাও না, অন্যথায় ভীষণ আযাব তোমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ـ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

সালেহ (আঃ) আরও বলিলেন, তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ আ'দ জাতিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরে তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তেমরা নরম যমীনের উপর সুরম্য অট্টালিকাদি তৈয়ারী করিতেছ

এবং পাহাড় চাঁছিয়া-ছিলিয়া গৃহও নির্মাণ করিতেছ। আল্লাহর এত নেয়ামত স্মরণ রাখিয়া হক আদায় করিয়া) চল এবং দেশে বিপর্যয় ঘটাইয়া বেড়াইও না।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۔ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۔

তাহাদের মধ্যকার অহঙ্কার ও গর্বে গর্বিত সর্দার দল উৎপীড়িত (ধনে-জনে) দুর্বল মোমেনদিগকে বলিল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ তাঁহার প্রভুর তরফ হইতে রসূল হইয়া আসিয়াছে? মোমেনগণ বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে যেসব আদর্শ দেওয়া হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়া নিয়াছি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔

সেই অহঙ্কারী সর্দারগণ বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস করিয়াছ উহা আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। অতঃপর তাহারা ঐ উটটিকে মারিয়া ফেলিল এবং ঔদ্ধত্য দেখাইয়া বলিল, হে সালেহ! আমাদের যেই আযাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস যাদি বস্তুতই তুমি রসূল হইয়া থাক।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۔

ফলে ভীষণ ভূকম্পন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহারা নিজ নিজ গৃহে অধঃমুখে মরা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۔

(সালেহ আঃ) এবং মোমেনগণ রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ দেশ ত্যাগ করিলেন।) দেশ ত্যাগকালে সালেহ (আঃ) আক্ষেপপূর্বক বলিলেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের আমার প্রভুর প্রেরিত সব কিছু পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা মঙ্গলকামী দলকে পছন্দই কর নাই। (সূরা আ'রাফঃ পারা– ৮;রুকু–১৭)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۔ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۔ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۔

সামুদ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশীয় সালেহকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত কেহই তোমাদের মাবুদ হইতে পারে না। তিনিই তোমাদেরকে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন এবং তাহাতে আবাদ করিয়াছেন; (তাঁহাকে ছাড়িয়া মহাপাপ করিয়াছ;) অতএব তাঁহার দরবারে ক্ষমা চাও এবং তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আস। নিশ্চয় আমার প্রভু দূরে নহেন, তিনি প্রার্থনা কবুল করিবেন।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا ۔ اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۔

তাহারা বলিল, হে সালেহ! তোমার দ্বারা ত আমরা দেশের উন্নতি আশা করিতেছিলাম; তুমি দেখি আমাদিগকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদগণের পূজা করিতে নিষেধ কর (এবং নূতন ধর্মের আহবান জানাইতেছ)! তুমি যেই মতবাদের প্রতি ডাকিতেছ উহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস মোটেই নাই। (তুমি আমাদের মতবাদে চলিয়া আস।)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ـ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ـ

সালেহ বলিলেন, হে আমার জাতি! বল দেখি, আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে স্বীয় রহমত ভাজন করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায় যদি আমি পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি তবে আমাকে আল্লাহর আযাব হইতে কে রক্ষা করিতে পারিবে? সুতরাং তোমাদের পরামর্শ আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ـ

হে আমার জাতি! আল্লাহ প্রদত্ত উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য আমার সত্যতার প্রমাণ। অতএব ইহাকে আল্লাহর যমীনে (গোচারণ ভূমিতে) অবাধে চরিতে দাও। খবরদার! অনিষ্টের ইচ্ছায় উহাকে স্পর্শও করিও না, অন্যথায় আশু আযাবে তোমরা আক্রান্ত হইবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ـ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ـ

তাহারা (এই কথায় কর্ণপাত করিল না-) উষ্ট্রীকে মারিয়া ফেলিল। সালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা মাত্র তিন দিন নিজ নিজ গৃহে ভোগ-বিলাস করিয়া নাও (চতুর্থ দিনই তোমাদের উপর আযাব আসিবে) এই নির্ধারণের ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمَئِذٍ ـ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ـ

অতপর যখন উপস্থিত হইল আমার আযাবের নির্দেশ, তখন সালেহ এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে বাঁচাইয়া নিলাম নিজ রহমতের দ্বারা এবং সেই দিনের জিল্লতী হইতে রক্ষা করিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই একমাত্র সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ

আর প্রচণ্ড গর্জন আক্রমণ করিল স্বৈরাচারীদেরকে, ফলে তাহারা অধঃমুখে পতিত হইয়া মরিয়া রহিল। মুহূর্তে সারা দেশ নীরব-নিস্তব্ধ হইয়া গেল; যেন ঐ দেশে তাহাদের বসবাস ছিলই না।

اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ـ

হে বিশ্বাসী। জানিয়া রাখ- সামুদ জাতি তাহাদের পরওয়ারদেগারের কুফরী (তথা আদেশ অমান্য) করিয়াছিল। জানিয়া রাখ -(ইহারই ফলে) তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। (পারা- ১২; রুকু- ৬)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

সামুদ জাতি রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদেরই বংশীয় সালেহ (আঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইবে না? আমি তোমাদের প্রতি সত্য রসূলরূপে আসিয়াছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রচারের আজুরা চাই না, আমার আজুরা একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট।

اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ـ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ـ

তোমাদেরকে কি চিরস্থায়ীরূপে ভোগ-বিলাসে ছাড়িয়া রাখা হইবে এই বাগ-বাগিচায় এবং প্রবাহমান ঝরণাসমূহে, মনোরম শস্য-শ্যামল পরিবেশে এবং ঘন গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে, আর পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া তোমরা বানাইতে থাকিবে প্রাসাদ-অট্টালিকা অহংকার ও গর্বে মাতিয়া? (এই আরাম-আয়েশ, গর্ব-অহঙ্কার অচিরেই শেষ হইয়া যাইবে।)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ وَلاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ ـ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমার কথা মান। আর যেসব সীমালজ্ঘনকারী লোক দুনিয়ায় বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে অভ্যস্ত যাহাদের দ্বারা কোন সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ হয় না, তাহাদের কথায় সাড়া দিও না।

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ـ مَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ـ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, আর কিছু নহে তোমার উপর কেহ জাদু চালাইয়াছে ; (সেই আছরে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাই তুমি রসূল হইবার দাবী কর; নতুবা) তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ। আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ পেশ কর।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

সালেহ (আঃ) বলিলেন, এই নাও তোমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক উট– ইহার জন্য কূপের পানি একদিন থাকিবে, আর তোমাদের পশুর জন্য নির্ধারিত একদিন থাকিবে। খবরদার! অনিষ্ট সাধনে ইহাকে স্পর্শও করিও না, নতুবা কঠিন দিনের আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করিবে।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ـ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ

অতঃপর তাহারা ঐ উটকে মারিয়া ফেলিল। পরে ভয়ে অনুতপ্তও হইল, কিন্তু আযাব তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিল। নিশ্চয় এই ঘটনায়। উপদেশের বড় নিদর্শন রহিয়াছে। (পারা– ১৯; রুকু– ১২)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَاهُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে এই নির্দেশ দিয়া যে, তোমরা এক

আল্লাহর এবাদত কর। তাহারা এই আহবানে সাড়া দিল না দুই দলে বিভক্ত হইয়া, (অমান্যকারীরা মান্যকারীদের বিরুদ্ধে) ঝগড়া বাঁধাইয়া দিল। (অমান্যকারীরা এইরূপও বলিল যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বিপক্ষদের উপর আযাব আন)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ـ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

সালেহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! কল্যাণ চাহিবার আগেই অকল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছ কেন? (ইহাতে আশ্চর্যের বিষয়) তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও না কেন যাহাতে রহমত লাভ করিবে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ـ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ـ

তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীগণকে অশুভ গণ্য করি (তোমাদের দরুন দেশে অনৈক্য আসিয়াছে)। সালেহ (আঃ) বলিলেন, অশুভের কারণ (কাহারা তাহা) আল্লাহ তাআলার জানা আছে। (তোমাদের কার্যের ফল শুধু অনৈক্য অশুভেরই নহে,) বরং এর দরুন তোমরা আযাবে আক্রান্ত হইবে।

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ـ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ـ

ঐ দেশে নয় জন লোক ছিল যাহারা কেবল ফেত্না-ফাছাদ ঘটাইত কোন ভাল কাজ করিত না। তাহারা সালেহ (আঃ)-কে তাঁহার পরিবারবর্গসহ হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়া পরস্পর স্থির করিল যে, আস আমরা সকলে আল্লাহর নামে কসম খাই যে, রাত্রিবেলা আমরা সালেহ এবং তাহার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিব। তারপর তাহার দাবীদারকে বলিয়া দিব, আমরা তোমার লোকের হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না। আমরা সত্যই বলিতেছি।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ـ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) সালেহ ও তাঁহার দলকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র তাহারা করিল; আমিও ঐ ষড়যন্ত্র বানচালের গোপন কৌশল করিলাম, তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতেছিল না। চোখ খুলিয়া দেখ, তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হইয়াছিল! নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের জাতিকে এক সঙ্গে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ

বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচরে রহিয়াছে সেই সামুদ জাতির ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ যেসব তাহাদের স্বৈরাচারিতার দরুন ধ্বংস হইয়াছিল। নিশ্চয় এই ঘটনায় উপদেশের নিদর্শন আছে বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য। আর এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম ঐ দলকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল ও আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইয়া চলিত। (পারা-১৯; রুকু-১৯)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ

আর "সামুদ" জাতি, যাহারা ছিল এক প্রগতিশীল ও উন্নয়নশীল জাতি, তাহাদিগকে আমি সংপথ দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সৎপথে চলার পরিবর্তে ইহা হইতে চক্ষু বন্ধ রাখার এবং অসৎ পথে চলার রীতি অবলম্বন করিল। ফলে জিল্লতীর আযাবের ভীষণ গর্জন তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিল তাহাদেরই কর্মদোষে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহর ভয়-ভক্তি ও ঈমান অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম। (পারা– ২৪; রুকু– ১৬)

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ـ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ـ

হে বিশ্ববাসী! সামুদ জাতির ইতিহাসে তোমাদের জন্য বড় উপদেশ রহিয়াছে। যখন তাহাদিগকে (ভীতি প্রদর্শনে) বলা হইল, মাত্র কয়েকটি দিন ভোগ-বিলাস করিয়া নাও, (তোমাদের দুষ্কর্মে তোমাদের ধ্বংস আসন্ন)। তাহারা সংযত হইল না স্বীয় প্রভুর নির্দেশাবলী হইতে ঘাড় মুড়িয়া নিল, উহার ধ্বংসলীলা তাহারা দেখিতেছিল, কিন্তু পালাইবার সামর্থ তাহাদের হইল না এবং কাহারও সাহায্যও তাহারা পাইল না। (পারা– ২৭; রুকু–১)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ـ فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ـ ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ـ

সামুদ জাতি সব সতর্ককারীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, এমনকি তাহাদের নবী সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমাদের মধ্যকারই একজন মানুষ, আমরা তাহার তাবেদারী করিব? তাহা হইলে ত আমরা বিভ্রান্ত ও মস্তিষ্ক বিকৃত সাব্যস্ত হইব। আমাদের সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র ঐ লোকটার প্রতিই অহী আসিল? (বস্তুতঃ অহী আসে নাই,) বরং সে মহা মিথ্যুক, নিজকে বড় বানাইতে চায়।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ـ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ـ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ـ

(আল্লাহ বলেন,) অচিরেই তাহারা উপলব্ধি করিবে কে মিথ্যাবাদী আত্মম্ভরী। আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠাইলাম। হে সালেহ! আপনি ধৈর্য ধরুন, তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে থাকুন এবং তাহাদের বলিয়া দিন, কূপের পানি তাহাদের পশুপাল ও এই উষ্ট্রীর মধ্যে পালাক্রমে বণ্টিত হইবে। প্রত্যেক পক্ষ নিজ পালার দিন পানি পানে উপস্থিত হইবে।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ـ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ـ

কিন্তু তাহারা (ঐ বণ্টনে সন্তুষ্ট হইল না এবং সব নির্দেশ ও সতর্কবাণীর বিরুদ্ধে "কোদার" নামক) নিজেদের লোকটিকে ডাকিল। সে উষ্ট্রীটির উপর হাত চালাইল এবং উহাকে মারিয়া ফেলিল। ফলে আমার আযাব ও সতর্কবাণীর বাস্তবতা তাহাদের পক্ষে কী ভীষণ হইল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়া দিলাম এক

প্রচণ্ড নিনাদ; যাহার ফলে মুহূর্তে তাহারা শুষ্ক ডালার চূর্ণ-বিচূর্ণ পত্রাবশেষের মত ধ্বংস হইল।

(পারা-২৭; রুকু- ৯)

اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ ـ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَاد بِالْقَارِعَةِ ـ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ـ

অবশ্যম্ভাবী বস্তু, কি ভীষণ হইবে সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু! সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু (তথা মহাপ্রলয় কেয়ামতের বিভীষিকা) তোমারা উপলব্ধি করিতে পার না। (কিন্তু খবরদার! উহা অবিশ্বাস করিও না; উহা অবিশ্বাস করার পরিণাম ভয়াবহ।) সামুদ জাতি এবং আ'দ জাতি কর্ণ বিদীর্ণকারী কেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ফলে সামুদকে ধ্বংস করা হইয়াছে সহন-সীমা অতিক্রমকারী প্রচণ্ড নিনাদের দ্বারা।

(পারা- ২৯; রুকু- ৯)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ـ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا ـ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ـ

সামুদ জাতি ঔদ্ধত্যবশে নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল– বিশেষতঃ যখন তাহাদের সর্বাধিক দুর্ভাগা হতভাগা লোকটি (মোজেযার উষ্ট্রীটি মারিবার জন্য) প্রস্তুত হইল; এবং আল্লাহর রসূল তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহর প্রেরিত বিশেষ উষ্ট্রী; উহা সম্পর্কে ও উহার পানি পান সম্পর্কে সতর্ক থাকিও, উহার অনিষ্ট করিও না। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং উষ্ট্রীটিকে মারিয়া ফেলিল। তাহাদের পাপের ফলে পরওয়ারদেগার তাহাদের উপর সর্বগ্রাসী আযাব নাযিল করিলেন। তাঁহার ত পরিণামের কোন ভয় করিতে হয় না। (সূরাা শামছ পারা–৩০)

যুল-ক্বারনাইন্

"যুল-কার্নাইন" একটি উপাধি; দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত– 'যুল' অর্থ অধিকারী এবং 'কারনাইন' ইহা কারনুন-এর দ্বিবচন, যাহার অর্থ দিক। বিশ্বের স্থল ভাগের দুই দিক– পূর্ব ও পশ্চিম, এই উভয় দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত এই লোকটি ভ্রমণ করায় তিনি এই উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই লোকটি কে ছিলেন? তাঁহার নাম কি ছিল? কোন্ যুগে ছিলেন? এই সব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈততা অনেক বেশী। পূর্ব হইতে বিশিষ্ট তথ্যবিদগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যে, তাঁহার নাম ছিল 'এস্কান্দার'। দুনিয়াতে বহু লোকই এস্কান্দার নামে আসিয়াছেন; এমনকি আমাদের হযরত রসূলুল্লাহর যুগের প্রায় নয়শ'ত বৎসর পূর্বে এক প্রতাপশালী বাদশাহ ছিল– তাহার নামও ছিল এস্কান্দার এবং তাহার উপাধিও ছিল যুল-কারনাইন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই বাদশাহকেই পবিত্র কোরআনের যুল-কারনাইন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তহা ভুল। কারণ, ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বাদশাহ কাফের এবং ভীষণ অত্যাচারী ছিল– অথচ পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত যুল-কারনাইন সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন খোদাভক্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিরেন। এমনকি তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ বাণীও আসিয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। এই বাণী অহী মারফত ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ কোন কোন তথ্যবিদ তাঁহাকে নবী বলিয়াও গণ্য করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) সেই সূত্রেই যুল-কারনাইনের বর্ণনা নবীগণের বর্ণনার শামিল করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বিশিষ্ট আলেমগণের মত ইহাই যে, আল্লাহ তাআলার বাণী তাঁহার প্রতি এল্হামস্বরূপ আসিয়াছিল এবং তিনি একজন অতি মহান ও আল্লাহ তাআলার পেয়ারা, খোদা-ভক্ত, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন– নবী ছিলেন না।

এতদ্দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, সেই কাফের অত্যাচারী বাদশাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত যুল-কারনাইন নামীয় ব্যক্তি নহে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় এস্কান্দার নামে এক বাদশাহ ছিলেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত গুণাবলী তাঁহার ছিল, তাই তঁহাকেই আলোচ্য যুল-কারনাইনরূপে স্থির করা হয়। বোখারী (রঃ) যুল-কারনাইনের বর্ণনা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বর্ণনা সংলগ্নে উল্লেখ করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের পারা– ১৬; রুকু– ২-তে জুল-কারনাইনের বর্ণনা রহিয়াছে। কাফেররা পরীক্ষাস্বরূপ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যুল-কারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরেই পবিত্র কোরআনের এই সুদীর্ঘ বয়ান নাযিল হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ـ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ـ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىٍٔ سَبَبًا ـ

কাফেররা যুল-কারনাইন সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দিন, তাঁহার সম্পর্কে কিছু বিবরণ তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে) তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছি– আল্লাহ বলেন, আমি যুল-কারনাইনকে জগতে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, তাহাকে বহু উপায় উপকরণের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলাম।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ـ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ ـ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ـ

সেমতে সে (এক ভ্রমণ অভিযানে) একটা পথ ধরিয়া চলিল। সে যখন পশ্চিম দিকের বসতি এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিতে পাইল– সূর্য (যেন) কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যাইতেছে এবং তথায় একটি বিশেষ জাতির সাক্ষাত পাইল। (সে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল।) আমি তাহাকে বলিলাম, (তুমি ত তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছ; এখন) তাহাদের উপর হয়ত নির্যাতন চালাইবে কিম্বা তাহাদের প্রতি সুব্যবহার ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। (অবশ্য তুমি যে নীতি অবলম্বন করিবে ফলও তেমনই পাইবে।)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ـ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءَ نِ الْحُسْنٰى وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ـ

যুল-কারনাইন বলিল, (আমার নীতি হইবে–) যে অন্যায়কারী তথা কাফের থাকিবে আমরা তাহাকে (ইহজগতের) শাস্তি দিব। অতঃপর স্বীয় প্রভুর নিকট তাহার উপস্থিতি হইবে; তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। পক্ষান্তরে যে ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে (পরকালে) উত্তম প্রতিদান এবং আমরাও তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক ব্যাপারে মোলায়েম কথাই বলিব এবং উত্তম ব্যবহারই করিব।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ـ

অতঃপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। যখন পূর্ব দিকের আবাদীর শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিল, সূর্য তথায় এমন মানবগোষ্ঠীর উপর উদিত হয় যাহাদের জন্য সূর্যের নীচে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আমি (শিক্ষা) দেই নাই। (তাহারা উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠে বাস করে।)

كَذٰلِكَ - وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا -

এই ঘটনা এইরূপই ছিল; (আমার বর্ণনা ও বাস্তব ঘটনা একই।) যুল-ক্বার্নাইনের সব সংবাদই আমার নিকট সম্যকরূপে বিদ্যমান আছে।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا - حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا -

অতপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। এই অভিযানে যখন সে দুইটি পর্বত-প্রাচীরের মধ্যস্থ এক স্থানে পৌঁছিল তখন সেই পর্বতদ্বয়ের পাদদেশে এক মানব সমাজ পাইল, যাহারা তাহার ভাষা মোটেই বুঝে না।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا -

(দোভাষী মারফত কথাবার্তায়) তাহারা বলিল, হে যুল-কার্নাইন্। (এই পর্বতমালার প্রাচীরদ্বয়ের মধ্য দিয়ে সময় সময়) "ইয়াজুজ-মাজুজ" আমাদের অঞ্চলে আসিয়া ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। আমরা কি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব; যেন আপনি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরি করিয়া দেন?

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا -

জুল-কারনাইন্ বলিল, আমার পরওয়াদেগার আমাকে ধন-দৌলতের যে সামর্থ্য দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট; তোমরা শুধু শ্রমশক্তি দ্বারা আমাকে সাহায্য কর; তোমাদের ও উহাদের মধ্যে মজবুত প্রাচীর তৈয়ার করিয়া দেই।

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ - حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا - حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا -

তোমরা বড় বড় লৌহ চাদরগুলি আমার নিকট পৌঁছাও। পর্বতদ্বয়ের মধ্যকার গিরিপথটি যখন (লৌহ-পাতে) ভরাট করিয়া পর্বত সমান করিল তখন সে ঐ লৌহগুলিকে (তপ্ত করার উদ্দেশে) আগুন জ্বালাইতে আদেশ করিল। যখন উহা অগ্নিতুল্য তপ্ত করিয়া দিল তখন আদেশ করিল, গলিত তাম্র আমার নিকট উপস্থিত কর; এই তপ্ত লৌহগুলির উপর ঢালিয়া দিব।

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا - قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّاءَ - وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا -

(লৌহ-তাম্রে জমাট বাঁধা পর্বত সমান প্রাচীর তৈরী হইল, উহা অতি উঁচু, মসৃণ, কঠিন ও সুদৃঢ় ছিল।) অতএব ইয়াজুজ-মাজুজদের পক্ষে উপরে চড়িয়া উহা অতিক্রম করাও সম্ভব হইবে না; ভাঙ্গিয়া পথ সৃষ্টি করাও সম্ভব হইবে না। যুল-কারনাইন্ ইহাও বলি এই প্রাচীর আমার পরওয়াদেগারের বিশেষ দান– একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। যখন তাঁহারই নির্ধারিত সময় (কেয়ামত নিকটবর্তী) আসিবে, তখন তিনি ইহা ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন। আমার পারওয়ারদেগারের নির্ধারণ বাস্তব ও অবশ্যম্ভাবী।

যুল-কারনাইন সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই ঘটনার ইতিহাস স্বভাবতই অন্য দুইটি বস্তুর তথ্য অবগত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। একটি হইল ইয়াজুজ-মাজুজ, দ্বিতীয়টি

হইল উল্লিখিত বিশেষ প্রাচীর। তাই ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করতঃ পবিত্র কোরআনের আয়াত ও কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিতেছেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ

ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আবাসস্থল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধতা অনেক বেশী। যে মতকে সাধারণতঃ প্রামাণিক মনে করা হয় তাহা এই যে– ইহারা আদম সন্তানেরই একটি বিশেষ সম্প্রদায়। সাধারণ মানব জাতির ন্যায় ইহারাও নূহ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ) উভয়ের ঔরসজাত বংশধর। ইহারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। ঈমানদার ইহাদের মধ্যে কেহই নাই– সকলেই দোযখী; ইহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। তাহারা দুই গোত্রে বিভক্ত; একটির নাম "ইয়াজুজ" অপরটির নাম "মাজুজ, তাই তাহাদের সমষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজ নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণ মানুষের আবাদী হইতে ভিন্ন স্থানে তাহাদের নিবাস। যুল-কারনাইন কর্তৃক প্রাচীর তৈয়ার হওয়ার পর সাধারণ মানুষের বসবাস স্থলে আসিবার পথ তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে কেয়ামতের নিকটবর্তিতার নিদর্শনস্বরূপ এই প্রাচীরে আল্লাহর কুদরতে এক ইঞ্চি পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র হইয়াছে। কেয়ামত যখন অতি ঘনাইয়া আসিবে তখন এই প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের দল প্রবল স্রোতের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। অতপর তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ গজবে ধ্বংস হইবে। তাহাদের এইসব ঘটনা কেয়ামতের অতি নিকটবর্তিতার একটি বিশেষ আলামত। এই সূত্রেই ইমাম বোখারী (রঃ)ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণের ন্যায় ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনা কেয়ামতের আলামত অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এ স্থলে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি আয়াত এই–

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ـ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ ـ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ـ كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ ـ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ـ وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ ـ

সমস্ত নবীগণের ধর্মের মূল একই যে, একমাত্র আমিই তোমাদের প্রভু– তোমরা আমারই এবাদত করিবে। মানব সমাজ (শয়তানের ধোকায়) দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া আছে; (হিসাব-নিকাশের জন্য) তাহারা সকলেই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যাহারা ঈমান গ্রহণ ও নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিবে তাহাদের চেষ্টা বিফল যাইবে না। আমি তাহাদের ঈমান ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ـ

(সেই হিসাব-নিকাশ এই জগতে অনুষ্ঠিত হইবে না; কারণ) যেকোন বস্তির অধিবাসীকে আমি মৃত্যুর কবলে পতিত করি, তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে– তাহারা পুনঃ এই জগতে ফিরিয়া আসিবে না। (হিসাব-নিকাশের জন্য নির্ধারিত সময় রহিয়াছে।)

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ـ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

যখন (সেই নির্ধারিত সময়ের বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইবে যে,) ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং (তাহারা প্রবল স্রোতের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িবে, এমনকি) প্রত্যেক পাহাড়-পর্বত, টিলা-ভিটা হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। (এই নিদর্শন প্রকাশেই) নিকটবর্তী হইয়া

আসিবে সেই নির্ধারিত সময় যাহা বাস্তব ও নিশ্চিত। উক্ত সময়ের উপস্থিতিতে অবিশ্বাসীদের চোখে অকস্মাৎ চমক লাগিয়া যাইবে। (তখন তাহারা আক্ষেপে জর্জরিত হইয়া নিজকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিবে,) আমাদের চরম দুর্ভাগ্য ছিল যে, আমরা এই নির্ধারিত সময় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা অন্যায়কারী ৮৮ছিলাম। (পারা- ১৭ ; রুকু-৭)

ইয়াজুজ-মাজুজের ছড়াইয়া পড়া কেয়ামতের নিকটবর্তিতার নিদর্শন- সে সম্পর্কে অনেক হাদীছও আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে কেয়ামতের পূর্বক্ষণে বিশেষ দশটি নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজও রহিয়াছে।

মুস্‌লিম শরীফে আরও একখানা হাদীছ রহিয়াছে। সেই হাদীছটির মধ্যে কেয়ামতের নিকটবর্তী বহু ঘটনার ফিরিস্তি বর্ণিত আছে। সেই হাদীছে দজ্জালের বিবরণ ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান হইতে অবতরণ এবং ঈসা (আঃ) কর্তৃক দজ্জাল বধ করার ঘটনা বর্ণনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে-

اذ اوحى الله على عيسى انى قد اخرجت عبادا لى لايدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهون الى جبل الجمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الارض هلم فلنقتل من فى السماء -

অর্থঃ ঈসা (আঃ) কর্তৃক দজ্জাল নিহত হওয়ার পর তৎকালীন অবশিষ্ট ঈমানদার দল ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে আদর-যত্ন করতঃ বেহেশতে তাহারা যে উচ্চাসন লাভ করিবেন তাহা শুনাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদা আল্লাহ তাআলা অহী মারফত ঈসা (আঃ)-কে সংবাদ জানাইবেন যে, আমি আমার এক শ্রেণীর সৃষ্ট মানুষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। অর্থাৎ আমারই আদেশক্রমে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা এতই দুর্ধর্ষ যে, তাহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কাহারও নাই। আপনি আমার মোমেন বান্দাহগণসহ পাহাড়ের উপর যাইয়া লুকাইয়া থাকুন। অতপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিকে তাদের আবদ্ধ এলাকার বাহিরে আসিবার পথ খুলিয়া দিবেন। তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়ায় চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। তাহাদের প্রথম দলটি পথিমধ্যে (ইরাকের ওয়াসেত অঞ্চলে) তবরিয়া এলাকাস্থিত একটি (দশ মাইল প্রশস্ত) হ্রদের পানি পান করিতে যাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। এমনকি তাহাদের আর একটি দল তথায় উপস্থিত হইয়া একটুও পানি পাইবে না, শুধু এতটুকু ধারণা করিতে পারিবে যে, এ স্থানে পূর্বে পানি ছিল। অতপর তাহারা জেরুজালেমস্থিত একটি পর্বতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলাবলি করিবে যে, ভূপৃষ্ঠে ত কাহাকেও বাকী রাখি নাই, সবাকেই শেষ করিয়াছি এখন উপরওয়ালাকে হত্যা করিব- এই বলিয়া তাহারা উপরের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে। (তাহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধির পরীক্ষাস্বরূপ) আল্লাহ তাআলার কুদরতে তাহাদের তীরগুলি রক্ত রঞ্জিতরূপ রঙ্গিন অবস্থায় তাহাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে।

ঈসা (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ- যাহারা দীর্ঘ দিন পাহাড়ে আবদ্ধ জীবন কাটাইতেছিলেন, তাঁহারা আল্লাহ তাআলার নিকট বিপদ দূরীভূত হওয়ার দোয়া করিবেন। আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের উপর গজব নাযিল করিবেন যে, তাহাদের গর্দানের উপর (ঘা হইয়া উহাতে) এক প্রকার পোকা হইবে; তাহাতে তাহারা সব ধ্বংস হইবে। অতপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ পাহাড় হইতে অবতরণ করিবেন। তাঁহারা সেই এলাকায় সমস্ত যমীনই ইয়াজুজ-মাজুজের গলিত লাশে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবেন। তখন তাঁহারা আল্লাহ তাআলার

নিকট এই বিষয়ে দোয়া করিবেন। আল্লাহ তাআলা উটের ন্যায় লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখী পাঠাইবেন। উহারা সব মৃতদেহ আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিবে। তারপর প্রবল বৃষ্টিপাতে ভূপৃষ্ঠ ধৌত হইয়া যাইবে। ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বোখারী শরীফের হাদীছে–

১৬২৫। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِى سَعِيد رضى اللّٰه تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاادَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُولُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهٗ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ - قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَاْجُوْجُ وَمَاجُوْجُ اَلْفٌ - ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا - فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا - فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا - فَقَالَ مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ -

অর্থ ঃ আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে ডাকিবেন। আদম (আঃ) ভক্তি ও আনুগত্যের সহিত নিজের উপস্থিতি আরজ করিবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে নির্দেশ দিবেন, আদম সন্তান হইতে চির দোযখী দলকে ভিন্ন করিয়া দাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, চির দোযখী দলের সংখ্যা কিরূপ? আল্লাহ তাআলা ফরমাইবেন, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন।

(হযরত (সঃ) বলেন,) এই ঘোষণার সময়েই মানুষ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এই ভীতি সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, এই ধরনের ভয়ে বালক বৃদ্ধ হইয়া যায়, গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যায়। আল্লাহ তাআলার এই আদেশ শ্রবণে সমস্ত মানুষ অচৈতন্য দেখা যাইবে। বস্তুতঃ তাহারা অচৈতন্য হইবে না, কিন্তু (দোযখে) আল্লাহর আযাব ভীষণ ও ভয়ঙ্কর, যাহার ভয়ে ঐ ঘোষণা শুনিয়া সমস্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

এই বর্ণনায় ছাহাবীগণ (কাঁদিতে লাগিলেন এবং নৈরাশ্যজনক সুরে) আরজ করিলেন, (হাজারের মধ্যে বেহেশতবাসী মাত্র একজন! হায়–) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হইবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও। (একমাত্র মুসলমানই বেহেশত লাভ করিবে; ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত সকলেই দোযখী। আর মুসলমান ও মুসলিম এই দুই দলের সংখ্যার অনুপাত এইরূপ–) তোমরা (তথা পূর্বাপর বিশ্ব মোসলেম সারা বিশ্বের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতি হাজারে) একজন এবং হাজারের বাকী সংখ্যা (৯৯৯ জন সকলেই) ইয়াজুজ-মাজুজ (ও তাহাদের ন্যায় অন্যান্য কাফের অমুসলিমগণ) হইবে।* (পাপী মুসলমান অনকেই

---

* অর্থাৎ হাজারের মধ্যে একজন বেহেশতী ইহার অর্থ এই নয় যে, খাঁটী মুসলমানদের প্রতি হাজারে একজন বেহেশ্তী যাইবে, বরং সারা বিশ্ব মানব তথা ইয়াজুজ-মাজুজসহ সকলের সমষ্টির প্রতি হাজারে একজন বেহেশ্তী , ৯৯৯ জন দোযখী হইবে।
বস্তুতঃ খাঁটী মুসলমানের সংখ্যাই অতি নগণ্য । অঁখাটী তথা শুধু ইসলামের দাবীদার ঈমানহীন মুনাফেক, প্রকাশ্য অমুসলিম এবং ইয়াজুজ-মাজুজ যাহারা সকলই অমুসলিম– এই সবের সমষ্টির সঙ্গে খাঁটী মুসলমানদেরকে হিসাব করা হইলে তাঁহাদের মূল সংখ্যা হাজারের মধ্যে একজনই দাঁড়াইবে এবং প্রত্যেক খাঁটী মুসলমান প্রথম বারেই অথবা শেষ পর্যন্ত বেহেশ্তে যাবে। খাঁটী মুসলমান একজনও চিরজাহান্নামী হইবে না! সুতরাং হাজারের মধ্যে একজনমাত্র বেহেশত লাভ করিবে" এই ঘোষণা খাঁটী মুসলমান কাহারও পক্ষে ভয়ের কারণ নহে।
এস্থলে একটি লক্ষ্ণীয় বিষয় এই যে, এখানে ইয়াজুজ-মাজুজ বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কাফের মোনাফেক মানুষ ও জ্বিনসহ সকল প্রকার অমুসলমানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ অমুসলমান দলে ইয়াজুজ-মাজুজেরই আধিক্য।

দোযখে যাইবে। কিন্তু তাহারা চির-জাহান্নামী হইবে না, সাময়িক জাহান্নামী হইবে- তাহাদের উল্লিখিত সংখ্যায় শামিল করা হয় নাই। নতুবা জাহান্নামীর সংখ্যা আরও অধিক বলা হইত। অতঃপর হযরত (সঃ) শপথ করিয়া ঘোষণা করিলেন, আমি আশা করি তোমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) সমস্ত বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। এই সুসংবাদ শ্রবণে ছাহাবীগণ তকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

অতপর হযরত বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে, ছাহাবীগণ, পুনঃ তকবীর-ধ্বনি দিলেন। অতপর হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি অর্ধাংশই তোমরা হইবে, এইবারও ছাহাবীগণ তকবীর ধ্বনি দিলেন।*

হযরত (সঃ) আরও বলিলেন, (জগতে) অমুসলিমদের তুলনায় তোমরা (মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা) এইরূপ, যেরূপ সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কাল লোম বা কাল বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম। (এই অধিক সংখ্যার অমুসলিম সকলেই দোযখী, অতএব, দোযখীদের আধিক্য শুনিয়া নিরাশ হইবে না। অবশ্য ইসলাম রত্নের মূল্যবোধে খাঁটী মুসলমান হওয়ায় সচেষ্ট হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্যের কারণও হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদিকে তাহাদের যৌন স্পৃহা ও শক্তি অত্যধিক। অপর দিকে তাহারা বয়সও অনেক বেশী পায়। এমনকি সাধারণতঃ তাহাদের এক জনের এক এক হাজার সন্তান-সন্ততি হওয়ার পূর্বে মৃত্যু ঘটে না। (ফতহুল বারী)

যুল-কারনাইন- এস্কান্দর বা সেকান্দরের প্রাচীর

এই প্রাচীরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষতঃ ইহার স্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের অনেক গবেষণাই চলিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে ৩৪টি প্রাচীন প্রাচীরের খোঁজ পাওয়া যায়; উহার প্রত্যেকটিই অতি প্রাচীন ও আশ্চর্য ধরনের, এমনকি "চীনের প্রাচীর" ত বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে একটি। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সমুদ্রোপকূলে এক প্রাচীন প্রাচীর আছে- এক হাজার মাইলের অধিক লম্বা, বার মাইল চওড়া, এক হাজার ফুট উঁচু; উহার উপর বহু রকম জীবের অবস্থান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও উহার তথ্যানুসন্ধান চালাইতেছেন।

আমাদের আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের দ্বারা কতিপয় গুণাগুণ প্রমাণিত হয়-(১) এই প্রাচীরের নির্মাতা যুল-কারনাইন নামক খোদাভক্ত বাদশাহ ছিলেন। (২) এই প্রাচীর সাধারণ ধরনের ইট-পাথরের তৈয়ার নহে, লৌহ ও তাম্রে নির্মিত। (৩) উহা দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উহার উভয় দিক পাহাড়ের সঙ্গে গাঁথা। (৪) এই প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর অবস্থিত, যাহাদের অবস্থা সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন। (৫) তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ এবং আরও অনেক কিতাবে উল্লিখিত একটি হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ দল প্রতিদিন এই প্রাচীর খনন করে। সারা দিন খননে যখন ইহা ভেদ করার নিকটবর্তী হইয়া আসে তখন দলপতির আদেশে কার্য স্থগিত রাখিয়া তাহারা এই বলিয়া চলিয়া যায় যে, আগামীকল্য আসিয়া ইহা ভেদ করিয়া ফেলিব; কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে খননকৃত স্থান অধিক শক্তরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রতিদিন তাহাদের কার্য এইরূপই চলিয়া আসিয়াছে, এমনকি যখন কেয়ামত আসন্ন হইবে এবং কোরআন- হাদীছের ঘোষণা- ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব বাস্তবায়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইবে তখন একদিন খনন কার্য হইতে বিরতিকালে তাহাদের দলপতি এইরূপ বলিবে, "ইনশা আল্লাহ- আগামীকাল ইহা ভেদ করিয়া

* তিরমিযী শরীফের এক হাদীছের হিসাব মতে বেহেশতীগণের দুই তৃতীয়াংশ এই উম্মত হইবে। উক্ত হাদীছে বর্ণনা আছে যে, বেহেশতীগণের ১২০ কাতার হইবে। তন্মধ্যে ৮০ কাতার হইবে এই উম্মত এবং অন্য সব উম্মতের সমষ্টি হইবে ৪০ কাতার। (২-২৭ পৃঃ)

নবী (সঃ) সুসংবাদটি ধাপে ধাপে জ্ঞাত করিয়াছেন; হয়ত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে নবী (সঃ) কেও এইরূপেই জ্ঞাত করা হইয়াছে।

ফেলিব।" (ইনশা- আল্লাহর বদৌলতে) এইবার খননকৃত স্থান পূর্ণ হইবে না; পর দিন তাহারা অতি সহজেই অবশিষ্ট খনন কার্য সমাধা করিয়া উহা ভেদ করতঃ প্রবল স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে এবং সম্পূর্ণ প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হইবে فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগারের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন তিনি এই প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উল্লিখিত অবস্থা ও গুণাবলী দৃষ্টে বলিতে হয় যে, ভূগোলবিদগণ কতৃক আবিষ্কৃত প্রাচীর সমূহের কোনটিই কোরআনের আলোচ্য প্রাচীর নহে এবং অদ্যাবধি এই প্রাচীর অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতির প্রভাবে এই মতবাদকে নাক সিটকানোর দৃষ্টিতে দেখা বোকামির পরিচায়ক হইবে। কারণ পাঁচশত বৎসর পূর্বে আমেরিকার ন্যায় মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের খোঁজের বাহিরে ছিল। ইতিপূর্বেও বিশাল "আণ্টার্কটিকা" মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে ছিল, আজও সেই মহাদেশের সমুদয় এলাকা ও অবস্থাই বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে। এই ধরনের আরও কত জিনিসের জ্ঞান হইতে বৈজ্ঞানিকগণ বঞ্চিত। অতএব এই প্রাচীরের তথ্যও যে তাহাদের অজ্ঞাত ইহাতে বৈচিত্র্যের কি আছে? ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থলও তো সকলের অজ্ঞাত রহিয়াছে।

আল্লাহ তাআলার কুদরত বৈচিত্র্যপূর্ণ, একদিকে বর্তমান যুগের বিরাট সফলতাপূর্ণ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে তিনি এই প্রাচীর পর্যন্ত পৌছিতে দিলেন না, অপর দিকে স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ একজন সাধারণ লোককে এই পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন–

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَأَيْتَهُ ـ

অর্থঃ একদা এক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি (ইয়াজুজ-মাজুজের) প্রাচীর দেখিয়াছি। (বিবরণদানে) ঐ ব্যক্তি ইহাও বলিলেন যে, তাহা ডোরাবিশিষ্ট চাদরের ন্যায় দেখিয়াছি। হযরত (সঃ) তাহার উক্তি সমর্থনপূর্বক বলিলেন, বাস্তবিকই তুমি তাহা দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা– সাধারণ দৃষ্টি এই প্রাচীর আবিষ্কার করিতে অক্ষম থাকা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় একজন লোকের দৃষ্টি উহাকে জয় করা বৈচিত্র্যপূর্ণ বটে, কিন্তু অসম্ভব ও অস্বীকারযোগ্য নহে। এই ধরনের ঘটনার নজির আরও প্রমাণিত আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে "দজ্জাল" সম্পর্কে এই ধরনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামত নিকটবর্তী হইলে দজ্জালের আবির্ভাব হইবে; দজ্জালের জন্ম বহু পূর্বেই হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে সাধারণ দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তামীমে দারী (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী তাহাকে দেখিয়াছিলেন যাহার আশ্চর্যজনক ঘটনা ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে। তামীমে দারী (রাঃ) কর্তৃক পূর্ণ ঘটনা হযরতের খেদমতে বর্ণিত হইলে হযরত (সঃ) এই বিবরণকে শুধু সমর্থনই করিলেন না, বরং স্বীয় মসজিদে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে বিশেষরূপে আহ্বান করিয়া সকলকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করিলেন এবং নামাযান্তে প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিবার আদেশ করিলেন। অতপর হযরত (সঃ) ভাষণদানে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে কোন সুসংবাদ বা আতঙ্কের সংবাদ শুনাইবার জন্য একত্র করি নাই, বরং এই জন্য একত্র করিয়াছি যে, তামীমে দারী নামক একজন মুসলমান নিজ চক্ষে দজ্জালকে দেখিয়া আসিয়াছে– যে দজ্জাল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ আমি তোমাদিগকে শুনাইয়া থাকিতাম। তাহারই বর্ণিত বিস্তারিত ঘটনা শুনাইবার জন্য আমি তোমাদিগকে একত্র করিয়াছি। এই বলিয়া হযরত (সঃ) পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন*

* এইরূপে শাদ্দাদ কর্তৃক নির্মিত বেহেশত যাহা আল্লাহ তাআলার কুদরতে সাধারণ দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আমার উম্মতের একজন লোক স্বীয় উট হারাইয়া তালাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ শাদ্দাদের বেহেশত দেখিতে পাইবে। মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইয়াছিল। (তফসীরে আজীজী, ছুরা ফাজর)। অপর পৃঃ দ্রঃ–

১৬২৬। হাদীছ ঃ عن زينب ان النبى صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِاقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامَ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ـ

অর্থ ঃ উম্মুল মোমেনীন যয়নব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন বিচলিত অবস্থায় এবং ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু! আরবের লোকদের আসন্ন আপদ-বিপদ দৃষ্টে মস্ত বড় ভয় ও আশঙ্কা। অদ্য ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হইয়া গিয়াছে– ইহা বলিবার সময় হযরত (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলিক বৃদ্ধাঙ্গুলির সঙ্গে মিলাইয়া গোলাকৃতি (circle) করতঃ ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

উম্মুল-মোমেনীন যয়নব (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে নেককার ব্যক্তিদের বর্তমানেও আমরা ধ্বংস হইব কি? হযরত (সঃ) বলিলেন হাঁ যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও গোনাহের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ "আরব" মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়– যখন মুসলমানদের জন্য অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও আপদ-বিপদ দেখা দেওয়ার সময় তখন সমস্ত জগত কুফ্‌রী–ফাসেকীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে; মুসলমান শুধু আরবেই থাকিবে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের আপদ-বিপদের স্রোতের মোকাবিলায় আরবগণই দাঁড়াইবেন এবং বিপদের সম্মুখীন হইবেন, তাই এ স্থলে আরবগণকে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হওয়া তাহাদের বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ার নিকটবর্তিতার নিদর্শন এবং তাহাদের বাহির হওয়াই হইল আসন্ন কেয়ামতের আলামত। আর কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মুসলমানগণ আপদ-বিপদের সম্মুখীন হইবে, তাই সেই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ার দরুন নবী (সঃ) স্বীয় উম্মতের উপর আসন্ন আপদ-বিপদের স্মরণে বিচলিত হইয়াছিলেন।

অনেক সময় নেক লোকদের বদৌলতে আল্লাহ তাআলার আযাব এবং আপদ-বিপদ দূরে সরিয়া যায়। তাই উম্মুল মোমেনীন যয়নব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যে সঙ্কটময় সময়ের কথা স্মরণ করিয়া আপনি বিচলিত হইতেছেন, তখন কি মুসলমানদের মধ্যে অনেক লোক থাকিবেই না, না নেক লোক থাকা সত্ত্বেও জাতির ধ্বংস আসিবে?

হযরত (সঃ) ফরমাইলেন, 'মুসলমানদের মধ্যে তখনও নেক লোক থাকিবে সত্য, কিন্তু অতি নগণ্য সংখ্যায়। কুফরী–ফাসেকী, অন্যায়-অত্যাচার ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে, ফলে আল্লাহর আযাব ও ধ্বংস নামিয়া আসিবে।" অর্থাৎ নগণ্য সংখ্যক নেক লোকদের খাতিরে আযাব এবং গজবের গতি রোধ করা হইবে না, বরং স্বাভাবিকরূপে এই নেক লোকদেরও সেই আযাব ও ধ্বংসের স্রোতে মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাঁহারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়রূপেই উঠিবেন এবং আপদ-বিপদ দুঃখ-যাতনার বিনিময়ে বিশেষ সওয়াবের অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে কাফের-ফাসেকরা দুনিয়াতে ধ্বংস হইয়া আখেরাতেও চিরকালের জন্য সকল কষ্টের কেন্দ্র দোযখবাসী হইবে।

উল্লিখিত প্রাচীর দেখার এবং শাদ্দাদের বেহেশত দেখার ঘটনার– উভয় ঘটনা ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য হয়ত রহস্যময় কুদরতে জ্বিনদের দ্বারা অকস্মাৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্বিনদের দ্বারা কোন মানুষের এইরূপ অনাবিষ্কৃত এলাকার ভ্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে।

কোন দেশ বা জাতির মধ্যে যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও আল্লাহদ্রোহিতা দেখা দেয় তখন সেই দেশ ও জাতির নেক লোকগণ যদি সেই সব নাফরমানীর যথাসাধ্য মোকাবিলা না করে– সাধ্যানুযায়ী বাধা প্রদান না করে, তবে নেককার বদকার উভয় দলই আল্লাহ তাআলার নিজট অপরাধী গণ্য হয়। যখন আল্লাহর গজব আসে তখন সকলেই গজবের আওতাভুক্ত হয়; এমনকি যাহাদিগকে নেককার বলা হইত তাহারাও গজবে পতিত হইবে, যেহেতু তাহারা আল্লাহদ্রোহিতায় বাধা প্রদান না করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

আর যদি নেককার ভাল লোকগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদানের কর্তব্য পালন করিয়া য"যাইতে থাকেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও অপরাধ ও আল্লাহদ্রোহিতা বাড়িয়া যাইতে থাকে, এমনকি অপরাধী বিদ্রোহীদেরই প্রাবল্য ও প্রাধান্য হইয়া যায়, তবে নেককার লোকগণ আল্লাহ তাআলার প্রিয় থাকেন বটে, কিন্তু আ'দতুল্লাহ– আল্লাহ তাআলার সাধারণ রীতি অনুযায়ী তখন এই নগণ্য সংখ্যক প্রিয় লোকদের খাতিরে গজব এবং আযাবের গতি রোধ করা হয় না। আল্লাহর গজব আসে এবং উহার ধ্বংসলীলার স্রোতে সাধারণতঃ নেককার লোকগণও মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সেই গজব অপরাধীদের পক্ষে গজব হয়, আর নেক লোকদের পক্ষে আল্লাহর রহমতের কারণ হয়; তাঁহারা শাহাদতের মর্তবা লাভ করিয়া থাকেন।

১৬২৭। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ -

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন– ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে উহার মধ্যে যে ছিদ্র হইয়াছে উহা এই পরিমাণ– এই বলিয়া হযরত (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলির মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় লাগাইয়া ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য–আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে –

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا

"ইয়াজুজ-মাজুজরা এই প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য উহার উপর চড়িতেও সক্ষম হইবে না এবং উহার মধ্যে ছিদ্রও সৃষ্টি করিতে পারিবে না (যতদিন পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়)। অবশ্য যখন নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহ তাআলা প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উক্ত আয়াত দ্বারা আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়– (১) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীর ডিঙ্গাইতে সক্ষম হইবে না। (২) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে কোন প্রকার ছিদ্র সৃষ্টি করিতে পারিবে না। (৩) নির্ধারিত সময় উপস্থিত তথা কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হইলে আল্লাহ তাআলা এই প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।

পাঠকবর্গ! দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে এই কথা ভালভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক ঐ প্রাচীরে কোন ছিদ্র সৃষ্টি সম্ভব হইবে না, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, প্রাচীরে অন্য কোন কারণে ছিদ্র সৃষ্টি হইতে পারিবে না বা ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক উহাতে ছিদ্র ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলিতে পারিবে না।

অতএব উপরোল্লিখিত উম্মুল মোমেনীন যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাদীছ এবং আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদীছ যেই হাদীছদ্বয়ের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় এই প্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে– এই হাদীছদ্বয় উক্ত আয়াতের বিরোধী কখনও নহে। এই হাদীছদ্বয়কে উক্ত আয়াতের বিরোধী মনে করা বোকামি বৈ নহে। কারণ আয়াতের মর্ম শুধু এই যে, এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক ছিদ্র হইতে পারিবে না, আর হাদীছদ্বয়ের মর্ম এই যে, হযরতের যমানায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে। হাদীছদ্বয়ের মধ্যে

কোথাও এইরূপ শব্দ নাই যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, এই ছিদ্র ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, বরং আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে– فتح الله من ردم ياجوج وماجوج "ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ তাআলা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত যয়নব (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বণিত হাদীছদ্বয় ঐকমত্যপূর্ণ সহীহ্। কেহই এই হাদীছদ্বয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

ইবনে মাজা শরীফ ও তিরমিযী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানা হাদীছ– পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে, যাহার বিষয়বস্তু এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন এই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং ভেদ করার নিকটবর্তী হইয়া পর দিনের জন্য মুলতবী রাখে, ইত্যবসরে উহা পূর্ণ হইয়া যায়– তাহারা এইরূপই করিয়া চলিয়াছে। যখন কেয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং তাহাদের বাহির হইয়া পড়ার সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা "ইনশা আল্লাহ" এর বদৌলতে পরদিন উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য হইবে, এমনকি উহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই হাদীছখানা সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রঃ) একটু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সঃ) হইতে শ্রুত, না পরবর্তী কোন লোক ভুলবশতঃ এই ঘটনা আবু হোরায়রার মাধ্যমে নবী (সঃ)-হইতে বর্ণিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন? ইবনে কাসীর (রঃ) সন্দেহটা অতি হালকাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বক্তব্যের প্রথমে বলিয়াছেন لعل হয়ত এইরূপও হইতে পারে" এবং বক্তব্যের শেষে বলিয়াছেন, والله اعلم অর্থাৎ উক্ত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সঃ) হইতে শ্রুত কি না সেই সন্দেহ সম্পর্কে আমি সঠিক কিছু বলিতে পারি না; প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন।

পাঠকবর্গ! হাফেয ইবনে কাছীর (রঃ) কর্তৃক উক্ত হাদীছে এই মামুলী সন্দেহটুকুও পোষণ করার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনাকে তিনি وما استطاعوا له نقبا ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে (নির্ধারিত সময়ের পূর্বে) ছিদ্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না"– কোরআনের এই আয়াত বিরোধী মনে করিয়াছেন। হাদীছটির সনদে কোন দোষ নাই। (তফসীর ইবনে কাসীর দ্রষ্টব্য)।

হাফেজ ইবনে কাসীর সাহেবের এই ধারণা যে, শুধুমাত্র মানবীয় দুর্বলতা তাহা সুস্পষ্ট। কারণ উল্লিখিত আয়াতের মর্ম শুধু এতটুকু যে, ইয়াজুজ-মাজুজ উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিতে পারিবে না; ছিদ্র করার চেষ্টাও করিতে পারিবে না– আয়াতে এই কথার ইঙ্গিত-ইশারাও নাই, বরং আয়াতের মর্মের স্বাভাবিক তাৎপর্য ইহাই বলিতে হয় যে, তাহারা ছিদ্র করার চেষ্টা করিবে। তাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, ছিদ্র করিতে সক্ষম হইবে না। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছে ইহাই বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা প্রতিদিনই প্রাচীরে ছিদ্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রাচীর ভেদ করতঃ ছিদ্র সৃষ্টি সম্পন্ন করার পূর্বেই পরবর্তী দিনের জন্য কার্য মুলতবী রাখিয়া চলিয়া যায়, পর দিন আসিয়া দেখে যে, প্রাচীর পূর্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া রহিয়াছে (ইহা আল্লাহ তাআলার কুদরত)। হাদীছের বর্ণনা যে কত সুস্পষ্ট তাহা লক্ষ্য করুন–

يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عليه ارجعوا فستخرقونه

غدا قال فيعيده الله كامثل ماكان حتى اذا بلغ

"ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন আসিয়া প্রাচীর খনন করিতে থাকে, যখন ভেদ করার নিকটবর্তী হয় (অর্থাৎ এখনও ভেদ হয় নাই), তখন তাহাদের দলপতি আদেশ দেয়, তোমরা এখন বাড়ী চল; আগামী কাল আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব, কিন্তু (তাহাদের যাওয়ার পর) আল্লাহ তাআলা উহাকে পূর্বাপেক্ষা মজবুতরূপে সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিয়া দেন। এই অবস্থাই চলিতে থাকিবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত– যেই সময় আল্লাহ তাআলা তাহাদের বাহির করিবার ইচ্ছা করিবেন।" এই হাদীছের বিষয়বস্তু এবং উক্ত আয়াতে কোন প্রকার বিরোধ বা গরমিল মোটেই নাই।

হাদীছখানার এই অংশ যে, حتى اذا بلغ مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس অর্থাৎ যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হওয়ার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইবে তাহাদের সাধারণ মানুষের অঞ্চলে বাহির করিয়া দিবার, তখন তাহাদের দলপতি আল্লাহর উপর নির্ভরপূর্বক বলিবে, ইনশা আল্লাহ– আল্লাহ চাহে ত আগামীকাল ইহা ভেদ করিয়া ফেলিব। এই দিন আল্লাহ তাআলা উহা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিবেন না, ফলে তাহাদের হস্তেই উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে। এই বিবরণ ত কোরআনেরই স্পষ্ট উক্তি–فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগার কর্তৃক নির্ধারিত সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।" প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা ইয়াজুজ-মাজুজের খনন চেষ্টা ব্যাহত করিতেছেন এবং ভাঙ্গন সৃষ্টি প্রতিরোধ করিতেছেন। নির্ধারিত দিন উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যবস্থা করিবেন না, ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে– যাহা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়ই হইবে এমনকি আল্লাহর নামের উপর নির্ভরের বদৌলতেই তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে। অতএব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে হইলেও মূলতঃ ইহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতেই।

পাঠকবর্গ! হাফেয ইবনে কাসীর সাহেব ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে বোখারী শরীফের পূর্বোল্লিখিত হাদীছদ্বয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি স্বীয় তফসীরে যয়নব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই হাদীছ এমন ছহীহ যে, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই ইহাকে সহীহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বোখারী শরীফে উল্লিখিত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানাও তদ্রূপই; ইহাকেও ইমাম বোখারী ও মুসলিম উভয়েই সহীহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই হাদীছ দুইটি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণের অবকাশ নাই।

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্য আর একটি হাদীছ; যে হাদীছটি বোখারী-মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয় নাই; ইবনে মাজা ও তিরমিযী শরীফে বর্নিত হইয়াছে সেই হাদীছটি সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর সাহেব একটু দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু যেই ধারণার ভিত্তিতে তাহা করিয়াছেন সেই ধারণা নিছক অবাস্তব। হাফেয ইবনে কাসীর সাহেবও সেই দ্বিধার অবকাশ সম্পর্কে নিজেই সঙ্কোচিত, যদ্দরুন তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষে والله اعلم প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন" বলিয়া দ্বিধাবোধের দায়িত্ব এড়াইয়াছেন।*

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূব ২১০০ বা ২২০০ সন। (আরজুল কোরআন ২–৩)। তওরাতে বর্ণিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র "সাম"-এর বংশে "সাম"-এর আট পুরুষ পর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের

* হালের জনৈক বাংলাভাষার পণ্ডিত, শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে লেখনীর বলে তফসীরকার সাজিয়া তফসীরুল কোরআন নামে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কোরআন -হাদীছ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের স্বল্পতা পূর্বেও কয়েক স্থানে দেখান হইয়াছে। তিনি স্বীয় তফসীরে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ কয়টি সম্বন্ধে যেসব বেআদবী করিয়াছেন তাহা মুসলমানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। বোখারী-মুসলিম নহে, অন্য কিতাবের একটি মাত্র হাদীছ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর সাহেবের সামান্য সন্দেহের সঙ্কোচপূর্ণ উক্তিকে খুব ফলাও করিয়া উদ্ধৃত করতঃ তিলকে তাল বানাইয়া উহার আড়ালে এই বিষয় সম্পর্কিত সমুদয় হাদীছ তিনি এন্‌কার করিয়াছেন। তাঁহার বাচালতা এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, উম্মুল মোমেনীন যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণিত রসূলুল্লাহ(সঃ)-এর একটি সতর্কবাণী সম্বলিত হাদীছকে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এই সব রেওয়ায়েত কতকগুলি স্ত্রীলোকের খোশগল্প।" এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমসহ বিশ্ব জগতের সমস্ত মোহাদ্দেসগণের ঐকমত্য পূর্ণ ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই রেওয়ায়াতগুলির উপর কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না" তাহার এই সকল প্রলাপের সমর্থনে হাফেয ইবনে কাসীরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছেন।, তাই মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

জন্ম ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম তওরাতে উল্লেখ আছে "তারেখ", কিন্তু কোরআন মজীদে "আযর্" উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নানারূপ মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, "তারেখ" আসল নাম এবং "আযর্" ডাক নাম; উভয় নামের ব্যক্তি একজনই।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বাবেল" (বেবিলন) নামক অঞ্চলে "ফাদ্দানে আরাম" এলাকায় "ওর" নামক বস্তিতে ইব্রাহীম (আঃ) জন্ম লাভ করেন।

হযরত ইব্রাহীমের দেশবাসী বিভিন্ন দেব-দেবীর এবং চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রের পূজা করিত। এতদ্ভিন্ন তাহারা তাহাদের রাজাকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করিত। ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমতঃ স্বীয় পিতাকেই মূর্তি পূজা বর্জন ও এক আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর সমস্ত দেশবাসীকেও এই দিকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে সত্য বুঝাইবার বিভিন্ন কৌশলও করিয়া ছিলেন। তৎকালীন অতি প্রতাপশালী বাবেল সিংহাসনের অধিপতি, দেশবাসীর উপাস্য ও মাবুদ পরিগণিত রাজা নমরূদকেও তিনি তবলীগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের খোদায়ী দাবীর বিরুদ্ধে এবং মাবুদে বরহকের পরিচয় দিতে নমরূদের মোকাবিলায় বিতর্ক-বাহাসও করিয়াছিলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও দেশবাসী হযরত ইব্রাহীমের আহ্বানে সাড়া দিল না, অবশেষে সকলের সাথে একমত হইয়া রাজা নমরূদ তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল, আল্লাহ তাআলার কুদরতে তিনি অক্ষত রহিলেন।

দেশবাসীর আচরণে নিরাশ হইয়া ইব্রাহীম (আঃ) দেশত্যাগে হিজরত করিলেন এবং ফিলিস্তীনে কিছুকাল থাকিলেন। অতঃপর সত্য ধর্মের তবলীগ করিতে করিতে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মিসরে পৌঁছিলেন। পুনরায় মিসর হইতে ফিলিস্তীন আসিয়া তথায় স্থায়ী নিবাস করিয়াছিলেন, এমনকি এই দেশেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তথায় তিনি সমাহিত আছেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বহু ঘটনা কোরআন-হাদীছে বর্ণিত আছে। মে'রাজের রাত্রে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে। নবী (সঃ) তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছিলেন– مرحبا بك من ابنى ونبى বিশিষ্ট পয়গম্বর এবং আমার (বংশধর) পুত্র! আপনাকে জানাই মোবারকবাদ।

হাশরের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ কষ্ট-যাতনায় অধীর হইবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করার প্রার্থনা লইয়া বড় বড় নবীগণের দ্বারে উপস্থিত হইবে তখন আদম (আঃ) সকলকে নূহ (আঃ)-এর নিকট যাইবার পরামর্শ দিবেন। নূহ (আঃ) পরামর্শ দিবেন যে, ايتوا خليل الرحمن তোমরা আল্লাহ তাআলার খলীল বা প্রিয় পাত্র হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাও।

১৬২৮। হাদীছ ঃ عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَا " كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ." وَاَوَّلُ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِىْ يُوْخَذُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اُصَيْحَابِىْ اُصَيْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْ مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ ...... اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জীবিত করা হইবে এই অবস্থায় যে, তাহারা নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর এবং খাত্‌নাবিহীন হইবে। নবী (সঃ) স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোরআনের

আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ـ

"আমি তোমাদিগকে প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভূমিষ্ট করিয়াছিলাম সেই অবস্থায়ই পুনর্জীবিত করিব– ইহা আমার অটল সিদ্ধান্ত, ইহা আমি করিবই।' (পারা– ১৭; রুকু– ৭)

(হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন–) কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁহাকে কাপড় পরান হইবে, তিনি হইবেন (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)।

(হযরত (সঃ) আরও ফরমাইলেন,) একদল লোক– যাহারা আমার দলীয় মনে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে বাম দিকের তথা দোযখের পথে লইয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি বলিতে থাকিব, "উসায়হাবী, উসায়হাবী– তাহারা ত আমার দলের, তাহারা ত আমার দলের।" তখন উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিবেন, ইহারা (প্রকাশ্যে আপনার দলীয় তথা মুসলমান হওয়ার দাবীদার ছিল, কিন্তু বস্তুত ইহারা) আপনার পরে সদা আপনার বিরোধী পথের যাত্রী ছিল। এতদশ্রবণে আমি খোদার প্রিয় বান্দা ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যায় এই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব–

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ ....

অর্থঃ যাবত আমি এই লোকদের মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম তাবত তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। অতঃপর যখন আপনি (হে আল্লাহ!) আমাকে তাহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে (পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ আমার থাকে নাই); একমাত্র আপনিই তাহাদের সব কিছুর পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন; আপনি ত সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ রাখেন। ইহাদিগকে যদি আপনি শাস্তি দেন তবে (বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই); তাহারা আপনারই সৃষ্ট দাস। আর যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তবে (কৈফিয়ত চাওয়ার কেহ নাই;) আপনি সর্বাধিপতি, হেকমতওয়ালা। (পারা– ৭ ; রুকু– ৫)

ব্যাখ্যাঃ কেয়ামতের দিন সকল মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হওয়া সম্পর্কে উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, الرجال والنساء নারী-পুরুষ সকলে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হইবে? তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের অবস্থা এতই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর হইবে যে, এই দিকে কোন খেয়াল করার বা পরস্পর লক্ষ্য করার সুযোগ ও চেতনা কাহারও মোটেই থাকিবে না।

কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) সর্বাগ্রে পরিধেয় পাইবেন। আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি খোদাদ্রোহীগণ কর্তৃক উলঙ্গ অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; হয়ত উহার প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এই সম্মান দান করিবেন।

যাহারা শুধু বাহ্যিকরূপে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত তথা মুসলমান দলভুক্ত; কার্যত তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী জীবন যাপন করিতে থাকে, এই হাদীছ শ্রবণে তাহদের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে হিসাব-নিকাশের দিন তাহারা দোযখের পথে যাইতে বাধ্য হইবে এবং হযরতের শাফাআ'ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা– এই অবস্থা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

১৬২৯। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা "আযর"-কে এই অবস্থায় দেখিতে পাইবেন যে, (ভীষণ কষ্ট-যাতনা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দরুন) তাহার মুখ বিবর্ণ কাল হইয়া রহিয়াছে চেহারা যেন

ছাই-মাটিতে মাখা। তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে বলিবেন, আমি (দুনিয়ায়) তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না! (কিন্তু তুমি তখন ঈমান হইতে ফিরিয়া রহিয়াছিলে, তাই আজ তোমার এই অবস্থা।) তখন "আযর" বলিবে, আজ হইতে আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। (কিন্তু তখনকার এই কথায় কোন ফল হইবে না।)

অতপর ইব্রাহীম (আঃ) পিতার অবস্থায় মর্মাহত হইয়া আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ করিবেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে আশা দিয়াছিলেন, পুনরুত্থানের তথা কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করিবেন না। আমার পিতা, আপনার রহমত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক অপমান আর কি হইতে পারে? আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রবোধদানে বলিবেন, انى حرمت الجنة على الكافرين "আমি কাফেরদের জন্য চিরতরে বেহেশত হারাম করিয়া রাখিয়াছি।" (ঈমানহীন ব্যক্তি বেহেশত পাইবে না, চিরকাল সে দোযখের আযাব ভোগ করিবে। হযরত ইব্রাহীমের পিতা যেহেতু ঈমানহীন কাফের, তাই সেও চিরকাল আযাব ভোগ করিবে, নাজাত পাইবে না। অবশ্য ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইবে যে,) অতঃপর বলা হইবে, হে ইব্রাহীম! নীচের দিকে দৃষ্টি করুন ত! ইব্রাহীম (আঃ) নীচের দিকে দৃষ্টি করিবেন এবং (পিতার স্থলে) সর্বশরীরে গলীজ মাখা একটি মুর্দারখোর জানোয়ার "হায়েনা" দেখিতে পাইবেন; উহার চার পা বাঁধিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

সারকথা, ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা এই করিবেন যে, তাঁহার পিতা "আযর"-কে দোযখে নিক্ষেপ করার সময় একটি জানোয়ারের আকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে; কেহ যেন তাহাকে হযরত ইব্রাহীমের পিতা বলিয়া পরিচয় পাইতে না পারে।

বিশেষ শিক্ষা ঃ ঈমান না থাকিলে কোন সম্বন্ধই মানুষের কাজে আসিবে না, উল্লিখিত ঘটনা উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায় বিশিষ্ট নবী– যাঁহাকে আল্লাহ তাআলা "খলীলুল্লাহ– আল্লাহর দোস্ত" আখ্যা দিয়াছেন; "আযর" এইরূপ নবীর পিতা হইয়াও ঈমান না থাকায় নাজাত পাইল না। ইব্রাহীম (আঃ) পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিয়া এবং স্বীয় মান-ইজ্জতের দোহাই দিয়াও তাহাকে দোযখ হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু "আযর'-কে দোযখ হইতে রেহাই দিলেন না; ইহা ঈমান না থাকার পরিণতি।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আরও দুই জনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ আছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَةَ نُوْحٍ وَّامْرَاَةَ لُوْطٍ ـ

অর্থ ঃ কাফের ও ঈমানহীন থাকার পরিণতি যে কিরূপ তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীর ঘটনা লোকদিগকে শুনাইয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমার বিশিষ্ট দুই জন বান্দার (নবীর) স্ত্রী ছিল, কিন্তু তাহারা সেই বান্দাদের খেয়ানত করিয়াছে– তাঁহাদের আদেশ মতে চলে নাই, ফলে তাহাদের স্বামী বিশিষ্ট নবী হইয়াও তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার আযাব হইতে বিন্দুমাত্র বাঁচাইতে পারেন নাই; তাহাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশই প্রবর্তিত রহিয়াছে যে, অন্যান্য ঈমানহীনদের সঙ্গে তোমরাও দোযখে প্রবেশ কর।

পক্ষান্তরে (নিজে ভাল হইতে চাহিলে কোন শক্তিই যে তাহাকে রুখিতে পারে না উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন– (কি করুণ দৃশ্য ছিল) যখন তিনি (ফেরআউনের ন্যায় খোদায়ী দাবীদার স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হইতেছিলেন, কিন্তু স্বীয় ঈমান দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং) ফরিয়াদ করিতেছিলেন, হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আপনার নৈকট্য লাভের স্থান বেহেশতের মধ্যে আমার জন্য একটি ঘর তৈয়ার করিয়া রাখুন। (সেই ঘরে যাইয়া আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে আমি যেন চির শান্তি উপভোগ করিতে পারি।) হে পরওয়ারদেগার। আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন

ফেরআউন হইতে (সে যেন আমার ঈমান নষ্ট করিতে না পারে) ও তাহার কার্য কলাপ হইতে (উহার দ্বারা যেন আমি প্রভাবান্বিত হইয়া ঈমান হইতে বঞ্চিত না হই) এবং (ফেরআউনের ন্যায়) সমস্ত স্বৈরাচারীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (পারা-২৮ শেষ)

ফেরআউন স্বীয় স্ত্রী আছিয়ার ঈমানের সংবাদে ভীষণ ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহার উপর কঠোর শাস্তির আদেশ দিল। তাঁহাকে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত যমীনে ঊর্ধ্বমুখী শোয়াইয়া হাতে-পায়ে লোহার খিল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইল। বিবি আছিয়া (রাঃ) সেই পৈশাচিক অত্যাচারে থাকিয়াও ঈমান রত্ন আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং সেই দুর্যোগের মধ্যেই এই দোয়া করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোয়া কবুল হওয়ার কিছু নমুনা খোলা চোখে দেখাইয়াছিলেন- বিবি আছিয়া সেই অবস্থায়ই বেহেশতের মধ্যে তাঁহার জন্য নির্মিত বালাখানা স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। (বয়ানুল কোরআন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ "আযর" সম্পর্কে যাহা উল্লেখ হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহার চেহারা ছাই-মাটিতে মাখান অবস্থায় দেখা যাইবে- আল্লাহ তাআলার নাফরমানদের এই অবস্থাই হইবে। তাহারা হাশর ময়দানের ভীষণ অবস্থা ও সম্মুখস্থ দোযখের ভীষণ তর্জন-গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত হওয়ার জিল্লতী ও অপমানে তাহাদের চেহারা এইরূপ হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার ফর্মাবরদার মোমেন বান্দাগণ আনন্দোৎফুল্লিত হইবেন, তাঁহাদের চেহারায় আনন্দ-উল্লাসের আভা দেখা যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ের বর্ণনা দান করিয়াছেন। যথা-

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ -

অর্থ ঃ সেই দিন (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, হাশরের ময়দান ও কেয়ামতের দিন- যেদিন মানুষ স্বীয় ভাই-বন্ধু, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র হইতে দুরে সরিয়া থাকিবে এবং নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে- সেই দিন) অনেকের চেহারা উজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হইবে। পক্ষান্তরে অনেকের চেহারা উহার বিপরীত বিশ্রী বিবর্ণ ও কুৎসিৎ ছাই-মাটি মাখা হইবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল ভাবনা-চিন্তায় ও আতঙ্কে ভারাক্রান্ত হইবে। এই লোকগুলি ঐ সব মানুষ যাহারা আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহর নবীর আদর্শ বিরোধী ছিল।

(পারা- ৩০; সূরা আ'বাছা)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ...... وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ -

"সেই (কেয়ামতের) দিন অনেকের চেহারা বিমর্ষ ভীষণ ক্লান্তিপূর্ণ দুঃখ-যাতনায় জর্জরিত হইবে; পরিশেষে ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আর অনেকের চেহারা ঐ দিন উল্লাসভরা, আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় কৃত-কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, অতি উচ্চ মর্তবায় বেহেশতে স্থান লাভ করিবে।" (৩০ পাঃ ছুরা গাশিয়া)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ....

অর্থঃ রসূল ও কিতাব মারফত আল্লাহর দ্বীন পৌঁছিবার পরও যাহারা সেই দ্বীন গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে ভীষণ আযাব ভোগ করিতে হইবে সেই দিন- যেদিন অনেকের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং অনেকের চেহারা কাল বিবর্ণ হইবে। বিবর্ণ কাল চেহারাওয়ালাদের দলকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলা হইবে, তোমরাই না ঈমান লাভের সুযোগপ্রাপ্তির পরও কুফরী করিয়াছ? এখন সেই কুফরীর দরুন আযাব ভোগ কর। পক্ষান্তরে যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতে (তথা বেহেশতে স্থান লাভ করিবেন এবং তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবেন। (পারা- ৫; রুকু- ২)

ইব্রাহীম (আঃ) পিতার দুরবস্থাদৃষ্টে মর্মাহত হইয়া তাহাকেই তাহার অবস্থার জন্য দায়ী করিবেন এবং বলিবেন, "আমি কি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচারণ করিবে না।" ইব্রাহীম (আঃ) পিতাকে এবং জাতিকে যেভাবে সত্য পথের দিকে ডাকিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ـ اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

(একটি স্মরণীয় ঘটনা)– যখন ইব্রাহীম স্বীয় পিতা "আযর"কে বলিয়াছিলেন, তুমি কি কতকগুলি প্রতিমাকে মাবুদ বানাইয়াছ? আমি ত দেখিতেছি, তুমি এবং তোমার জাতি স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় পতিত।

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ـ

(এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেবদেবী পূজার জঘন্যতা ও কদর্যতার উপলব্ধি দিয়াছিলাম, যদ্দ্বারা তিনি স্বীয় জাতির সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।) আর এইরূপে নিম্ন জগতের ও সৌর জগতের (সর্বত্র যে একমাত্র আমারই সার্বভৌম আধিপত্য রহিয়াছে তাহার নিদর্শনরূপে উভয় জগতের) সৃষ্ট বস্তুনিচয়কে জ্ঞান ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি ইব্রাহীমকে আমি দান করিয়াছিলাম– আমার মা'রেফত বা পরিচয় যেন তাহার দৃষ্টিতে অতি উজ্বলরূপে প্রকাশিত হয়) এবং যেন চোখে দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারেন এই উদ্দেশে।

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা বাস্তব মাবুদের সন্ধান লাভ এবং গর্হিত মা'বুদ হইতে পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে মারেফতের দৃষ্টির মাধ্যমে। মা'রেফত অর্থ মহান আল্লাহর গুণাবলীর সম্যক জ্ঞান– সেই মা'রেফত হাসিল করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) নিজেও মহান আল্লাহর সম্পর্কে অধিক দৃঢ়তা লাভ করিবেন এবং নক্ষত্রপূজক জাতিকেও দক্ষতার সহিত বুঝাইতে পারিবেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰكَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ـ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَااُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ـ

সেমতে একদা রাত্রির গভীর অন্ধকারে তিনি একটি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং (সৃষ্ট বস্তু হইতে খোদার মা'রেফত লাভের সবক দানে নক্ষত্রপূজক জাতিকে) বলিলেন, (তোমাদের বিশ্বাসে) এই নক্ষত্রটি আমার এক মা'বুদ। অতঃপর যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি (তাহাদেরকে) বলিলেন, যে বস্তু অস্তমিত হইয়া যায় (উহা মা'বুদ হইতে পারে না,) আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি না।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۤلِّيْنَ ـ

অতঃপর যখন চন্দ্রকে দেখিলেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে তখন তিনি (ঐরূপে) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে। যখন চন্দ্র অস্তমিত হইয়া গেল তিনি বলিলেন, (এই অস্তগামী বস্তুও আমার মা'বুদ হইতে পারে না। এই বাস্তব জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ দান)। আমার প্রভু যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ ـ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ

অতপর সূর্যকে দেখিলেন দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি (ঐরূপেই) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে– ইহা ত পূর্বের সবগুলি হইতে বড়। কিন্তু যখন সূর্য অস্তমিত হইল তখন তিনি স্বীয় জাতিকে বিশেষরূপে বলিলেন, তোমাদের গর্হিত মা'বুদগুলির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

আমি ত সব কিছু ত্যাগপূবক আমার লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি একমাত্র সেই মাবুদের প্রতি, যিনি আকাশ-পাতাল সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা; কাহাকেও আমি তাঁহার শরীক গণ্য করি না।

وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ـ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْهَدٰنِ وَلاَ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىٍ عِلْمًا ـ اَفَلاَ تَتَذَكَّرُوْنَ ـ

(চোখে দেখা অবস্থায় ভুল ধরাইবার পরও) তাঁহার জাতি তাঁহার সঙ্গে হঠকারিতাপূর্ণ তর্কে লিপ্ত হইল। (তাহাদের মাবুদগণ ইব্রাহীমের ক্ষতি করিবে ভয় দেখাইলে) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে আমার সঙ্গে তর্ক কর? অথচ আল্লাহ্ আমাকে সঠিক পথ দেখার তওফিক দিয়াছেন। তোমরা তোমাদের গর্হিত মাবুদদের ভয় দেখাও; আমি এই সব ভয় করি না। অবশ্য যাহার মাবুদ হওয়া আমি প্রচার করি, তিনি ইচ্ছা করিলে সব কিছু করিতে পারেন। আমার মাবুদ সব কিছু জ্ঞাত আছেন। তোমরা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করিতেছ না কেন? (পারা– ৭; রুকু– ১৫)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ

এই কিতাবের মাধ্যমে আপনি (জগদ্বাসীর নিকট) ইব্রাহীমের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন খাঁটি ও সত্যের প্রতীকবিশিষ্ট নবী।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَيُبْصِرُ وَلاَيُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ـ

একটি ঘটনা– যখন তিনি বলিয়াছিলেন নিজ পিতাকে, হে আমার পিতা! কেন এমন সব জড় বস্তুর পূজা করিতেছ যাহারা না পারে শুনিতে, না পারে দেখিতে, না পারে তোমার কোন উপকার করিতে?

يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ـ

হে আমার পিতা! এমন জ্ঞান আমি লাভ করিয়াছি যাহা তোমার লাভ হয় নাই, অতএব তুমি আমার অনুসরণে চল, আমি তোমাকে সরল সত্য পথ দেখাইব।

يٰاَبَتِ لاَتَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ـ

হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের গোলামী করিও না, নিশ্চয় শয়তান দয়াময় আল্লার নাফরমান।

يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ـ

হে আমার পিতা! আমার আশঙ্কা হইতেছে, দয়াময় আল্লাহর তরফ হইতে আযাব তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে, ফলে তুমি (আযাব ভোগেও) শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرَاهِيْمُ ـ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ـ

পিতা বলিল, ইব্রাহীম। তুমি কি আমার পূজ্য মাবুদগুলি হইতে মুখ ফিরাইতেছ? এই কার্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিব; দূর হও তুমি আমার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমায় আমি সালাম করি; (আর কিছু বলিব না। অবশ্য তোমার জন্য চেষ্টা করিব–) আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তোমার ক্ষমা মাগফেরাতের (ব্যবস্থা তথা ঈমানের) জন্য দরখাস্ত করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহরবান। (পারা– ১৬; রুকু–৬)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ

হে রসূল! বিশ্ববাসীকে ইব্রাহীমের ঐ সময়ের ঘটনা শুনান– যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কিসের পূজা করিয়া থাক?

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করিয়া থাকি এবং উহাদের তপস্যায় আমরা বসিয়া থাকি।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিল, যখন তোমরা এইগুলিকে ডাক তখন কি তাহারা তোমাদের ডাক শুনে অথবা তোমাদের কি কোন লাভ-লোকসান পৌঁছাইতে পারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল (এইরূপ কোন শক্তি তাহাদের নাই), বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এইরূপ করিতে (তথা উহাদের পূজা করায় লিপ্ত) পাইয়াছি।

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ـ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ـ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিতেছ কি? যাহাদের পূজা করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষরা; নিশ্চয় ইহারা আমার (তোমাদের প্রত্যেকের) শত্রু (ইহাদের উপাসনা সকলকে জাহান্নামে পৌঁছাইবে)। অবশ্য সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি (তাঁহার এবাদত-উপাসনা স্বর্গের অধিকারী করে এবং তিনি সর্বোপকারী।)

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ـ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ـ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ـ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ـ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়া থাকেন– যিনি সদা আমার পানাহার যোগাইয়া থাকেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে নিরাময় করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন এবং যাহার প্রতি আমি এই আশা পোষণ করিয়া থাকি যে, প্রতিফলের দিন তিনি আমার দোষ-ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন।

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ـ

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে হেকমত (মা'রেফতের গভীর জ্ঞান) দান করুন এবং আপনার বিশিষ্ট

বান্দাদের দলভুক্ত রাখুন এবং আমাকে এইরূপ কার্যের তওফীক দিন যদ্দ্বারা পরবর্তীদের মধ্যে আমার নেক্‌নামী থাকে এবং আমাকে নেয়ামতময় বেহেশতের অধিকারী করুন।

وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ ـ وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ـ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

পরওয়ারদেগার! (ঈমানের তওফীকদানে আমার পিতার মাগফেরাত (ক্ষমার ব্যবস্থা) করিয়া দিন; সে ত গোমরাহদের দলভুক্ত রহিয়াছে। আর আমাকে পুনরুত্থানের দিন অপমানিত করিবেন না; যেদিন ধন-সম্পদ, আল-আওলাদ কাহারও (নাজাতের) কাজে আসিবে না; অবশ্য যে (কুফরী শেরেকী হইতে) পবিত্র অন্তর লইয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছিবে তাহার জন্যই নাজাত। (পারা- ১৯; রুকু- ৯)

এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের একটি দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি পিতার অবস্থায় নিরাশ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার আযাব ও শাস্তির আশঙ্কা করিলেন এবং পিতার দুরবস্থা পুত্রের পক্ষে অপমানের কারণ হয়, তাই দোয়া করিলেন হে খোদা! তুমি কেয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করিও না।

ইব্রাহীম (আঃ) বিশিষ্ট নবী, আল্লাহর খলীল বা দোস্ত; অতএব তাঁহাদের দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়া সুনিশ্চিত। সেইরূপ দৃঢ় আশার সূত্রেই পূর্বে বর্ণিত হাদীছে হযরত ইব্রাহীমের ফরিয়াদে তাঁহার এই উক্তির উল্লেখ রহিয়াছেন যে, "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে আশা দিয়াছিলেন পুনরুত্থানের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত ও অপমানিত করিবেন না।"

১৬৩০। **হাদীছ ঃ** عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে নিজের খতনা করিয়াছিলেন আশি বৎসর বয়সকালে কুঠারের সাহায্যে।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পূর্বে খতনা করার নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি ইহার জন্য আদিষ্ট হন। যখন আল্লাহ তাআলার এই আদেশ তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বৎসর। তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে কতদূর ফর্মাবরদার ও উদগ্রীব ছিলেন তাহা উপলব্ধি করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, আশি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে খতনা করার ন্যায় কঠিন কাজ আল্লাহ তাআলার আদেশে অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিলেন। এমনকি আদেশ প্রাপ্তির সময় তাঁহার নিকট কাষ্ঠ কাটার কুঠার ছিল, আর কোন অস্ত্র ছিল না; আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে বিলম্ব হয় এই আশঙ্কায় আদেশ পৌঁছার সাথে সাথে কুঠারের সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে নিজের খতনা কার্য সম্পন্ন করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হাবীবুল্লাহ- আল্লার প্রিয় বন্ধু উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি ভিন্ন একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ- আল্লাহর দোস্ত" এই উপাধি পাইয়াছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভীষণ কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; তিনি সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর মহব্বত ও পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দানে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি "খলীলুল্লাহ" উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কঠিন কঠিন পরীক্ষার

সম্মুখীন হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পবিত্র কোরআনেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (পারা-১; রুকু-১৫)

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ ....

যখন ইব্রাহীমের পরওয়ারদেগার তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন কতিপয় বিষয়ের দ্বারা এবং তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিলেন; তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি আপনাকে লোকদের ইমাম বানাইব এবং আদর্শ হওয়ার মর্যাদা দান করিব।"

আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে যেসব কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত খাতনার ঘটনা একটি। তদপেক্ষা কঠিন ঘটনারও সম্মুখীন তিনি হইয়াছিলেন। যথা- অতি আদরের দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইসমাঈলকে তাঁহার মাতাসহ জনশূন্য এলাকায় আল্লাহর হুকুমে ছাড়িয়া যাওয়া- যাহা বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং পুত্রকে আল্লাহর নামে কোরবানী করার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে আছে। আরও একটি ঘটনা- স্ত্রী ছারা (রাঃ)-কে নিয়া জালেম রাজার বিপদে পড়া।

অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিবরণ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ

আমি ইব্রাহীমকে প্রথম হইতে সুবুদ্ধি দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার প্রতিভা যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ـ قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা- যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, যেসব প্রতিমা মূর্তিগুলির উপাসনায় তোমরা জমায়েত হও সেইগুলি কি? (এইগুলি কি উপাসনার যোগ্য) তাহারা বলিল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই সবের পূজা করিতে পাইয়াছি।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমাদের বাপ-দাদা স্পষ্টতর গোমরাহীর মধ্যেই ছিল এবং তোমরাও তাহাতে আছ। তাহারা বলিল, ইব্রাহীম! তোমার এই উক্তি কি তোমার ধারণা বিশ্বাস, না হাসিঠাট্টা করিতেছ?

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, (বাস্তবিকই এই সব উপাস্য বা মাবুদ নহে;) বরং উপাস্য, মাবুদ তোমাদের আমাদের সকলের প্রভু-পরওয়ারদেগার তিনিই, যিনি সমস্ত আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। এই উক্তি আমি সর্ব সমক্ষে ঘোষণারূপে প্রকাশ করিতেছি।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ـ

খোদার কসম– তোমরা এখান হইতে যাওয়ার পর তোমাদের এই প্রতিমা মূর্তিগুলির একটা ব্যবস্থা করিবই। সেমতে তিনি একদা সেইগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, শুধু বড় একটা মূর্তি বাকী রাখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য– লোকগণ এই ঘটনা দেখিলেই সকলে তাঁহার নিকট আসিবে (এবং তাহাদের তিনি এইগুলির অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন)।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ ـ

তাহারা (পূজাশালার অবস্থাদৃষ্টে) খোঁজ করিতে লাগিল, আমাদের উপাস্য দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার কে করিল? যে করিয়াছে সে নিশ্চয় বড় অন্যায়কারী অপরাধী। কিছু লোক বলিল, একটা যুবককে শুনিয়াছি– সে এই সব উপাস্য দেবতাদের সমালোচনা করিয়া থাকে– তাহার নাম "ইব্রাহীম।"

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ـ قَالُوْا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرَاهِيْمُ ـ

সকলে বলিল, সেই যুবককে সর্বসমক্ষে উপস্থিত কর, সকলে তাহাকে দেখুক। (উপস্থিতির পর) জিজ্ঞাসিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছ?

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, বরং (আমি বলি,) এই বড় প্রতিমাটি এই কাজ করিয়াছে;* (এখন) ইহাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর না– যদি ইহাদের কথা বলিবার শক্তি থাকে।

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاۤءِ يَنْطِقُوْنَ ـ

(ইব্রাহীম (আঃ) ইঙ্গিত করিলেন, ঘটনার বিবরণ উপাস্যদেরকেই জিজ্ঞাসা কর! এরা যদি এমনই নিষ্ক্রিয় হয় যে, কিছু বলার সামর্থ্য তাহাদের নাই, তবে ইহারা উপাস্য হইতে পারে কিরূপে? এই তথ্যের ইঙ্গিতে তিনি উপস্থিত লোকগণকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিলেন; শেষ পর্যন্ত তাহাদের উত্তেজনা হ্রাস পাইল।) এমনকি তাহারা নিজ নিজ অন্তরে চিন্তা করিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, বাস্তবিকই তোমরা না-হক অন্যায়ের পথে আছ। অতঃপর তাহারা মাথা হেঁট করিয়া বলিল, ইব্রাহীম! তুমি ত বুঝই যে, এই সব প্রতিমাগুলি কথা বলিতে পারে না।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

(এই স্বীকারোক্তির সুযোগে) ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন (নিষ্ক্রিয় অক্ষম জড়) বস্তুর এবাদত উপাসনা কর, যাহারা তোমাদের কোন হিত অহিত করিবার ক্ষমতা রাখে না। (তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা বা তৎসম্পর্কে কিছু বলিবার পর্যন্ত শক্তি রাখে না।) ধিক তোমাদের উপর এবং তোমাদের মন গড়া মাবুদগুলির উপর। তোমরা কি অবুঝ এতটুকুও বুঝ না?

* হযরত ইব্রাহীমের এই কথার তাৎপর্য পরবর্তী ১৬৩৪ হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ

(তাহারা নিরুত্তর হইল, কিন্তু গোঁয়ার্তুমির নীতিতে) সকলে বলিয়া উঠিল, ইব্রাহীমকে আগুনে পোড়াও এবং স্বীয় মাবুদগণের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ কর, যদি তোমাদের কিছু করিতে ইচ্ছা হয়।

قُلْنَا يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ

আমি (সেই আগুনকে) আদেশ করিলাম, হে আগুন! ইব্রাহীমের পক্ষে শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও। তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল; আমি তাহাদিগকেই অকৃতকার্য ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ـ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ـ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

(ইব্রাহীমের একটি স্মরণীয় ঘটনা–) যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি সব বস্তুর উপাসনা কর? আল্লাহকে ছাড়িয়া এই সব গর্হিত মাবুদকে চাহিতেছ? তাহা হইলে সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ـ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ـ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ـ فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ـ مَالَكُمْ لَاتَنْطِقُوْنَ ـ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ـ

(এক দিনের ঘটনা– দেশবাসী মেলায় যাইবে; ইব্রাহীম (আঃ)-কেও যাইতে বলিল)। ইব্রাহীম (আঃ) নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইলেন ও বলিলেন, আমি অসুস্থ। সেমতে তাহারা তাঁহাকে বাড়ীতেই ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি তাহাদের মূর্তিগুলির নিকটে গেলেন এবং (উহাদের সম্মুখে মিঠাই-মণ্ডার ভেট দেখিয়া উপহাস ব্যঙ্গ করতঃ) বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? তোমরা নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? এই বলিয়া সেইগুলিকে জোরে আঘাত করিলেন (ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।)

فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ـ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ـ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ قَالُوْا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ـ

অতঃপর সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজ হাতে চাঁছিয়া -ছিলিয়া যেসকল প্রতিমা মূর্তি বানাও সেইগুলিকেই মাবুদরূপে গ্রহণ কর তোমরা? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমাদের কৃত সমুদয় আমলকে সৃষ্টি করেন আল্লাহ (ইহা কত বড় অন্যায়! তখন তাহারা (দলীল প্রমানে অক্ষম গোঁয়ারের ন্যায়) সিদ্ধান্ত করিল যে, ইব্রাহীমের (শাস্তির) জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার কর, অতঃপর তাহাকে উহাতে নিক্ষেপ কর। فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ

সেমতে তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপাত করিলাম।

১৬৩১। হাদীছঃ عَنْ اُمِّ شريك رضى الله تعالى عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفَخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

অর্থ উম্মে শরীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গিরগিট মারিবার আদেশ করিয়াছেন এবং হযরত (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) যখন কাফেরগণ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিলেন তখন এই গিরগিটি অগি অধিক প্রজ্বলিত করার জন্য ফুঁক দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ ইহাকে বলে "বোগ্‌জ ফিল্লাহ্– আল্লাহর মহব্বতে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা। ইহার বিপরীত হইল, হোব্ব ফিল্লাহ– আল্লাহর মহব্বতে মহব্বত রাখা। উভয়টি খাঁটি ঈমানের আলামত এবং উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর প্রতি এত অনুরাগী থাকা যে, স্বভাবত আল্লাহ এবং আল্লাহর দোস্তদারদের বিরুদ্ধাচরণকারী ও শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মহব্বত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলার প্রতি কত অধিক ও গভীর অনুরাগের ফলে এই স্বভাবের উদয় হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করিতে পারেন; এই জন্য এই ভাবকে ঈমানের বিশেষ আলামত ও শাখা বলা হইয়াছে।

কাফেররা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে পোড়াইয়া মারার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ তাআলার কুদরতে রক্ষা পাইলেন। এই ঘটনার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসী হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশ ত্যাগপূর্বক হিজরতের সঙ্কল্প করিলেন–وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين "ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িব, তিনি আমাকে কোন (ভাল) স্থানে পৌছাইবেন।"

এই বলিয়া তিনি ইরাক হইতে হিজরত পূর্বক সিরিয়ায় পৌছিলেন। কিছু দিন পর তথা হইতে মিশরে পৌছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট পুত্র লাভের এই দো'য়া করিলেন, رب هب لى من الصلحين "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে নেক ফরজন্দ দান করুন।" তাঁহার দোয়া কবুল হইল فبشرنه بغلم حليم "তাঁহাকে বিশেষ ধৈর্যশীল একটি পুত্রের সুসংবাদ দান করিলাম।"

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র লাভ করিলেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, কিন্তু সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুত্র সম্পর্কেও তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

সেই পুত্র যখন পিতা ইব্রাহীমের সঙ্গে চলাফেরা করিতে পারে– (যে বয়সে পুত্রের স্নেহ-মমতা পূর্ণরূপে পিতাকে দখল করে; এই অবস্থাতে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সেই পুত্রকে কোরবানী করার আদেশ অর্থে স্বপ্ন দেখিয়া)। বলিলেন, হে বৎস! স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি তোমাকে জবাই করিতেছি। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার মতামত কি?

قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

পুত্র উত্তর করিল, হে পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা সম্পন্ন করুন; ইনাশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। (নবীর স্বপ্ন অহী, তাই তাহা আল্লাহর আদেশ অর্থে অকাট্য; উহার বাস্তবায়ন আবশ্যক।)

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرَاهِيْمُ ـ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ـ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অতঃপর যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে পূর্ণ অনুগত হইলেন এবং পিতা পুত্রকে

(কোরবানী করিতে) অধঃমুখী শায়িত করিলেন এবং আমি পিতাকে এই বলিয়া ডাকিলাম– হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছ (তখনকার সেই দৃশ্য! বড়ই আশ্চর্যজনক ছিল।) এইরূপ (সৎসাহস ও উদার) প্রতিদান আমি নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করিয়া থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُ الْمُبِيْنُ ـ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ـ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ

নিশ্চয় তাহা একটি বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল; (পিতা-পুত্র উভয়ই ইহাতে উত্তীর্ণ হইলেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রতিফল দান করিলাম) এবং (আল্লাহর নামে কোরবানী করার উপস্থিত মনস্পৃহা পূরণার্থ) কোরবানীর যোগ্য একটি পশু (দুম্বা) পুত্রের বদলে দান করিলাম। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিলাম যে, সকলেই বলিবে– "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।"

(সূরা সাফ্‌ফাত– পারা– ২৩;রুকু–৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী লোকদের মধ্যে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণে বলিয়াছেন– সকলেই বলিবে, "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।" এই সালামের বাস্তবায়ন সাধারণত এইভাবে ত হয়ই– যে, তাঁহার নামের সঙ্গে "আলাইহিস সালাম– তাঁহার প্রতি সালাম" সচরাচরই বলা হয়; যাহা প্রত্যেক নবীর নামের সঙ্গেই হয়। তদুপরি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই বৈশিষ্ট্যও আছে যে, নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে নির্ধারিত দরূদ পড়ার বিধান আছে; সেই দরূদে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরূদ বিজড়িত রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছে তাহাই লক্ষ্য করুন। দরূদ ও সালাম উভয়টিই পাশাপাশি সম্মানসূচক দোয়া।

১৬৩২। হাদীছ ঃ আবু হোমায়দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি দরূদ কিরূপ হইবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আইলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

১৬৩৩। হাদীছ (৯৪০ পৃঃ) ঃ আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা আরজ করিলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের রূপ ত আমরা (আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে) শিখিয়াছি; আপনার প্রতি দরূদের রূপ কি হইবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ـ

ব্যাখ্যা ঃ সকলের সুবিধার্থ সংক্ষেপ ও দীর্ঘতার ব্যবধানে হযরত (সঃ) ছাহাবীগণকে বিভিন্ন দরূদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোখারী শরীফে সেইরূপ তিনটি হাদীছে তিনটি দরূদ বর্ণিত আছে। দুইটি উপরোল্লিখিত এবং আর একটি যাহা এই দুইটি অপেক্ষা দীর্ঘ; ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাজহাবে তাহাই অগ্রগণ্য– প্রথম খণ্ডে "নামাযের বিভিন্ন মাসআলা" পরিচ্ছেদে পূর্ণ তরজমা ও ব্যাখ্যার সহিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি দরূদেই "সালাত" তথা রহমত ও "বরকত" মঙ্গল ও কল্যাণের দোয়ায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নামের সহিত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নামও বিজড়িত আছে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে এক একজন মুসলমানের মুখে প্রতিদিন ১০, ২০ বার উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তেও ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জন্য এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকা বিচিত্র নহে।

কাফের রাজা ও বিবি ছারার ঘটনা ঃ

১৩৩৪। হাদীছঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال (قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمَ الاَّ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هٰذَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهٖ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ فَاَخَذَ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهٖ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَاْتُوْنِىْ بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِىْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَوْمَا بِيَدِهٖ مَهْيَمْ قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِىْ نَحْرِهٖ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ - قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ -

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) (সুদীর্ঘ জীবনের শত শত সঙ্কটপূর্ণ আপদ-বিপদেও সত্য নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি) কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই। হাঁ– তিনটি ঘটনায় (মহৎ উদ্দেশ্য লাভের খাতিরে নিজ ভাবার্থে বাস্তব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে) অবাস্তব উক্তি তিনি করিয়াছেন। (ঐরূপ কৌশল অবলম্বনে একটি ঘটনায় ভাসা নজরে তাঁহার নিজের উপকার লাভের কিছুটা সম্পর্ক দেখা যায়, কিন্তু) উহার দুইটি ঘটনাই (এমন ছিল যে, উহাতে নিজ স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না), নিছক আল্লাহর (দ্বীন প্রচার ও বুঝাইবার) জন্য ছিল।

এই দুইটির একটি হইল– (স্বীয় পৌত্তলিক জাতিকে পৌত্তলিকতার অসারতা বুঝাইবার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশে তিনি দেব-দেবীর মুর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। একদা যখন দেশবাসী মেলায় যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিল, তখন এই সুযোগে তাহাদের পেছনে থাকিয়া যাইবার জন্য) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি রুগ্ন"।

আর একটি হইল– (এই ঘটনায়ই যখন তাহারা আসিয়া দেব-দেবীগুলি ভাঙ্গা দেখিল এবং ইব্রাহীম (আঃ)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিল তখন এই দেব-দেবীগুলির অসারতা ও অক্ষমতার চাক্ষষ দৃশ্য তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার ভূমিকারূপে একটি সাময়িক দাবীস্বরূপ) তিনি বলিয়াছিলেন; "বরং (আমি বলি,) ইহাদের মধ্যকার এই বড় মূর্তিটা এই কাজ করিয়াছে।"

(প্রথম ঘটনা–) রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) যখন স্বীয় স্ত্রী "ছারাহ্" (আঃ) কে সঙ্গে লইয়া হিজরতের সফর করিলেন তখন (মিসরের অন্তর্গত) এক এলাকায় পৌঁছিলেন। তথাকার শাসনকর্তা ছিল এক পরাক্রমশালী জালেম রাজা। সেই রাজাকে (ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার সহধর্মিনী সম্পর্কে) খবর দেওয়া হইল যে, এই এলাকায় এক বিদেশী লোক আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে এক পরমা সুন্দরী রমণী আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট পেয়াদা পাঠাইয়া দিল এবং তাঁহার সঙ্গে

রমণী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, উভয়ের সম্পর্ক কি? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন,আমার ভগ্নী* এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছারাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট আসিয়া "ভগ্নী" বলিবার তাৎপর্য এবং সত্য ব্যাখ্যা বুঝাইয়া বলিলেন যে– হে ছারাহ্! বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে একমাত্র মোমেন তুমি ও আমি; (আর মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী; সেই সূত্রে)। আমি এই জালেম রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছি, তুমি আমার ভগ্নী (উক্ত সূত্রে এই উক্তি সত্য) অতএব তুমি আমার উক্তি অসত্য বলিও না। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।

এদিকে ঐ রাজা ছারাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিল। (ছারাহ্ (রাঃ) রাজ মহলে পৌঁছিয়া অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।) যখন রাজা আসিয়া তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল তখনই সে আল্লাহর গজবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িল। (এমনকি ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া গেল এবং ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।) তখন সে (ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া) বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন; আমি আপনাকে কোনরূপ কষ্ট দিব না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, (সে ভাল হইল কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করিল) এবং পুনঃ তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল। তৎক্ষণাৎ পূর্বরূপ, বরং আরও কঠিন অবস্থায় পতিত হইল; এইবারও সে দোয়ার দরখাস্ত করিল এবং ওয়াদা করিল, তাঁহাকে কষ্ট দিবে না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, সে রেহাই পাইল এবং একজন দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা যাহাকে আনিয়াছিলে (তাহাকে পৌঁছাইয়া আস); সে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় জ্বিন-পরী হইবে। (কিন্তু ছারাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে তাহার অন্তরে যে ভয়-ভক্তি জন্মিয়াছিল সেমতে) তাঁহার খেদমতের জন্য "হাজেরা" নাম্নী একজন রমণী উপঢৌকন পেশ করিল।

ছারাহ্ (রাঃ) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট পৌঁছিলেন, তখনও তিনি নামাযে ছিলেন, হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে। ছারাহ্ (রাঃ) বলিলেন, কাফের রাজার সমস্ত কূটকৌশলকে আল্লাহ তাআলা তাহারই বিপদ বানাইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা "হাজেরা"কে আমার খেদমতের জন্য দিয়াছে।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আরববাসীগণ! এই "হাজেরা (রাঃ)-ই তোমাদের গোষ্ঠীর মাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনাছ (রাঃ) ,হাম্মাম ইবনে মোনাব্বেহ্ (রাঃ), আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ), আবু হোরায়রা (রাঃ)– এই বিশিষ্ট চারি জন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছসমূহে (ফতহুল বারী একাদশ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠায়) এই তথ্য উল্লেখ আছে যে, কঠিন হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ ভীষণ উত্তাপের মধ্যে কষ্ট যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া শাফাআতের জন্য হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের নিকট হাজির হইতে থাকিবে। তখন নবীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ এক একটি ক্রুটির ঘটনা উল্লেখপূর্বক আতঙ্কিত অবস্থায় স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকিবেন। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ ইনশাআল্লাহু তাআলা সপ্তম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উক্ত হাদীছে আছে যে, লোকগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও বলিবেন, لست هناكم "এই কাজের (অর্থাৎ আজ আল্লার দরবারে শাফাআত করিবার) সাহস আমার নাই" ويذكر خطيته এবং তিনি স্বীয় ক্রুটি উল্লেখ করিবেন" انى كذبت ثلث كذبات "আমি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।" স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিথ্যা বলার উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, قريبان رابيش بود حيرانى "আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে যে যতদূর অগ্রাধিকারী হয় সে ততদূর অধিক ভয়-ভক্তির প্রভাবে পতিত থাকে।" কারণ, নৈকট্যের দরুন অধিক মা'রেফত লাভ হইতে থাকে এবং যত মা'রেফত তত ভয়-ভক্তি।

ঐ রাজার প্রসিদ্ধ রীতি ছিল যে, তাহার অভিলাস্য রমণীর সঙ্গে স্বামী থাকিলে প্রথমে স্বামী হত্যা করিত। সুতরাং ইব্রাহীম (আঃ) নিজেকে স্বামী বলিয়া প্রকাশ করিলেন না।

হাশরের দিন– যেদিন আল্লাহ তাআলার জ্বালাল কাহ্‌হারিয়াত তথা পরাক্রমশীলতা সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিবে; সেই হাশরের দিন নবীগণ উল্লিখিত ভয় ভক্তির প্রভাবে লাচার হইয়া পড়িবেন। এমনকি যাহার যে ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বারংবার ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন, তিনিও সেই ত্রুটি স্মরণ করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইবেন। যেমন– আদম (আঃ) বেহেশতে বাসকালে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ত্রুটি সম্পর্কে বহু তওবা ও কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তওবা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণাও দিয়াছেন, এতদসত্ত্বেও তিনি সেই ত্রুটির ভয়েই জড়সড় হইয়া বলিবেন, انه نهانى عن الشجرة فعصيته نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى "আমি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলাম; নফ্‌সী নফ্‌সী নফ্‌সী–নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত, নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত, নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত; তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও।"

তদ্রূপ যেসব বিষয় অন্যের পক্ষে মোটেই ত্রুটি নহে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নবীগণও তাহা ত্রুটি মনে করিয়াছিলেন না, কিন্তু সেই দিন ভয়-ভীতির দরুন সেই বিষয়টিও বড় ত্রুটি মনে করিবেন, এমনকি ত্রুটিরূপে প্রকাশও করিবেন এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িবেন। ইহা একটি মানবীয় স্বভাব প্রবৃত্তি।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উল্লিখিত উক্তিটি এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায়ই সৃষ্ট। তাঁহার যে তিনটি উক্তিকে তিনি "মিথ্যা" বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, বস্তুত তাঁহার মনোগত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যদৃষ্টে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল, মিথ্যা মোটেই ছিল না। অবশ্য উক্তিগুলি এরূপ ছিল যাহা উদ্দিষ্ট অর্থ ছাড়া সাধারণ অর্থে অবাস্তব মনে হয়। সাধারণ শ্রোতা সেই অর্থ বুঝিবে; যদ্দরুন এই উক্তিগুলিকে অবাস্তব তথা মিথ্যার আওতাভুক্ত বলা যায় (অর্থদ্বয়ের বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে)। এই সূত্রেই ইব্রাহীম (আঃ) সেই উক্তিগুলিকে "মিথ্যা" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ত্রুটি গণ্য করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার উদ্দিষ্ট অর্থ সূত্রে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। এইরূপ বিভিন্নমুখী অর্থজনক উক্তি আত্মরক্ষার জন্য বা অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য শুধু জায়েয ও সমর্থনীয় নহে, বরং উত্তম।

যেভাবেই হউক ইব্রাহীম (আঃ) স্বয়ং বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম।" এই উক্তির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া লোকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, নবী ত মা'সূম নিষ্পাপ হন। হযরত ইব্রাহীমের ন্যায় সত্যের প্রতীক বিশিষ্ট নবী মিথ্যার ন্যায় জঘন্য পাপ কিরূপে করিতে পারেন? অথচ ইহা ত তাঁহার নিজের উক্তি।

এইরূপ সংশয় ও অছ্‌অছা দূরীভূত করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) আলোচ্য হাদীছখানা বিস্তারিত বিবরণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রথমেই বলিয়াছেন, لن يكذب ابراهيم "ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।"*

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) যে বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" এই উক্তি উক্ত ঘোষণার বিপরীত। এই প্রশ্নের অবসানেই রসূল (সঃ) الا فى ثلث অবশ্য তিনটি ঘটনায়" বলিয়া হযরত ইব্রাহীমের ইঙ্গিত প্রদত্ত তিনটি ঘটনার বিষয়গুলি ব্যক্ত করিয়াছেন, যেগুলির তথ্য সংগ্রহের দ্বারা এই প্রশ্নের অবসান হয়। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে একটি বাক্যের দ্বারা হযরত (সঃ) এইগুলির তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, ما حل بها عن دين الله ইব্রাহীম (আঃ) এই সব ঘটনার উক্তিসমূহ আল্লাহর দ্বীনের জন্য সূক্ষ্ম কৌশলরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটি ঘটনার উক্তি সম্পর্কে সেই সূক্ষ্ম কৌশলের বিবরণত স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) হইতে রসূল (সঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্ত্রীকে স্বীয় ভগ্নী বলার ব্যাখ্যায় ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মোমেন এবং মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী

* আরবী ভাষার ব্যাকরণ তথা এলমে-নাহু সম্বন্ধে যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে তাহারা জানেন যে, جملہ استثنائية -এর মধ্যে مستثنى منه ই আসল উদ্দেশ্য হয়; প্রসঙ্গক্রমে কোন প্রশ্নোদয়ের পরিস্থিতির অবসানের জন্য استثناء কে আনা হয়। অতএব আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য হইল হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা না বলার ঘোষণা।

অতএব স্ত্রীকে দ্বীনী ভগ্নী ও স্বামীকে দ্বীনী ভ্রাতা বলিলে তাহা মিথ্যা নহে। ইব্রাহীম (আঃ) নিজের স্ত্রী ছারার নিকট ভগ্নী বলার এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম কৌশল দ্বারা আত্মরক্ষাপূর্বক ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন প্রচারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রীকে স্বীয়ভগ্নী বলিয়া দ্বীনী-ভগ্নী উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, সেমতে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ছিল, তাহাতে মিথ্যার লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু শ্রোতা ভগ্নী শব্দ এই অর্থে বুঝে না; যেহেতু "ভগ্নী" বলিলে সাধারণতঃ অন্য অর্থ বুঝা যায়, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিনের ভয়-ভীতির সময়ে এই উক্তিকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন। অপর দুইটি ঘটনা সম্পর্কীয় কথাও এই ধরনেরই একাধিক অর্থবোধক এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ও মনোগত তাৎপর্য অনুসারে তাহা মোটেই অসত্য নহে। বিস্তারিত বিবরণ এই–

আলোচ্য উক্তিদ্বয়ের একটি হইল انى سقيم ইন্নী সাক্বীম– আমি পীড়িত। এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও আছে; এ সম্পর্কীয় আয়াতের তরজমা ১৬৩১ নং হাদীছের পূর্বে রহিয়াছে। মূল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীকে তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির বাস্তব জ্ঞান দান সম্পর্কে একটি

সূক্ষ্ম পরিকল্পনা স্থির করিলেন। সেই পরিকল্পনার মধ্যে সেই প্রতিমাগুলি প্রথমে ভাঙ্গিয়া চুরমার করার প্রয়োজন ছিল। এই কার্য সমাধার জন্য তিনি প্রতিমা ঘরে ঢুকার জন্য নির্জনতার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। দেশীয় রীতি অনুযায়ী এক উৎসবে তাহাদের একটি মেলা জমিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই সে মেলায় গেলে সম্পূর্ণ বস্তি কিছু সময়ের জন্য জনশূন্য হইবে; ইব্রাহীম (আঃ) এই সুযোগকেই স্বীয় প্রয়োজনের জন্য নির্বাচিত করিলেন, কিন্তু দেশবাসী মেলায় যাওয়াকালে তাঁহাকেও মেলায় যোগদান করিতে বলিল। ইব্রাহীম (আঃ) সংকটে পড়িলেন, তাহাদের সঙ্গে গেলে সুযোগ নষ্ট হয়, না যাইয়া বা নিস্তার কিরূপে? তিনি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া একটু চিন্তা করিলেন যে, এখন তাহাদের হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য কি উত্তর দেওয়া যায়। মানুষ কোন বিষয় চিন্তা করাকালে সম্মুখস্থ যেকোন বস্তুর প্রতি তাকাইয়া একাগ্রতা লাভের জন্য দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করে। এই ক্ষেত্রে নক্ষত্ররাজির প্রতি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি করাও সেই ধরনের ছিল। অথবা তিনি ভান করারূপে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাকাইয়াছিলেন। তাঁহার জাতি রাশিচক্রে তথা ভাল-মন্দের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং তাহার গণনায় অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যতের শুভাশুভ ইত্যাদি নক্ষত্ররাজির আবর্তন দ্বারা নিরূপণ করায় বিশ্বাসী ছিল। সেমতে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক কোন কথা বলিলে তাহারা সহজেই উহা গ্রহণ করিয়া নিবে– পীড়াপীড়ি করিবে না, তাহাদের হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। তাই তিনি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "ইন্নী সাক্বীম– আমি পীড়িত"। এই বাক্যটির দুই অর্থ হইতে পারে– শারীরিক ও দৈহিক পীড়িত বা মানসিক ও আত্মিক পীড়িত; যেরূপ বলা হয় যে, আমার তবিয়ত ভাল না বা মন-মেজাজ ভাল না। ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য করিতেছিলেন এবং এই অর্থ অনুসারে এই উক্তিটি খাঁটি বাস্তব ও সম্পূর্ণ সত্য ছিল। কারণ, স্বীয় জাতি ও দেশবাসী বিশেষতঃ নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব এমনকি স্বীয় পিতা পর্যন্ত সব জড় পদার্থ প্রতিমা মর্তিগুলির প্রতি যে সব আকিদা ও বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিল এবং উহার প্রেক্ষিতে যেসব কার্যকলাপ করিয়া থাকিত, তাহা দৃষ্টে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায় ব্যক্তির মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে এবং তাঁহার অস্থিরতা যে কতদূর চরমে পৌঁছিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দিষ্ট অর্থ অনুসারে তাঁহার এই উক্তি সত্য ছিল কিন্তু শ্রোতা তাঁহার উক্তিকে প্রথম অর্থে বুঝিয়াছিল; যেই কারণে তাহারা উচ্চবাচ্য না করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ছাড়িয়া গিয়াছে। এই অর্থ অনুসারে ইহা সত্য নহে, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন।

মূল আলোচনার দ্বিতীয় উক্তিটি হইল– بل فعله كبيرهم هذا বরং তাহাদের প্রধানটাই এই কাজ করিয়াছে।" এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনার আয়াতে ইহার তরজমা রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, পূর্বোল্লিখিত মেলা উপলক্ষ্যে দেশবাসী সকলেই চলিয়া গেল। এই

সুযোগে ইব্রাহীম (আঃ) পূজা ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, প্রতিমাগুলির সম্মুখে দুধ, কলা, মিঠাই-মণ্ডা ইত্যাদি ভেঁটস্বরূপ রাখা আছে। ইব্রাহীম (আঃ) এই সকল কার্যে এবং এই কার্য বিশ্বাসীদের ব্যঙ্গপূর্বক প্রতিমাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? ইহা বলিতে বলিতে তিনি সেইগুলিকে কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং দেশবাসীকে মূল বিষয় বুঝাইবার পরিকল্পিত যুক্তি-তর্কের ভূমিকা দাঁড় করার জন্য শুধু বড় প্রতিমাটিকে বাকী রাখিয়া কুঠারখানা উহার কাঁধেই ঝুলাইয়া রাখিলেন।

দেশবাসী মেলা হইতে আসিয়া এই অবস্থা দেখিতে পাইল; অবশেষে তাহারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে ডাকিয়া আনিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্রাহীম! আমাদের মাবুদগুলির সঙ্গে এই ব্যবহার তুমি করিয়াছ কি? তদুত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন بل فعله كبيرهم هذا "বরং (আমি বলি,) উহাদের এই বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে।" এই উক্তিটির তাৎপর্য দুই রকম হইতে পারে। একটি এই যে, নিজে নির্দোষ-নিরপরাধ হওয়ার জন্য অভিযোগ খণ্ডন করিতে যাইয়া অবাস্তবরূপে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দেওয়া। আর একটি এই যে, অভিযোগ খণ্ডন উদ্দেশ্য নহে, বরং উদ্দেশ্য হইল একটি বিশেষ বাস্তব সত্য শ্রোতৃবৃন্দকে সহজে উপলব্ধি করাইবার ও গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত ভূমিকা ও কৌশলস্বরূপ একটি সাময়িক দাবী শুধুমাত্র সম্ভাব্য পরিকল্পিত আকারে কথার কথারূপে দাঁড় করানো– যাহাতে উহার উপর অন্য একটি বিষয় উপস্থাপনপূর্বক তাহা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সত্যটাকে সহজে প্রমাণিত করা যায়।

এই স্থলে দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই হযরত ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য। তিনি দেশবাসীর গর্হিত মাবুদ– প্রতিমাগুলির জড়তা ও অক্ষমতা তাহাদের চোখে দেখাইয়া দিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর অক্ষম জড় বস্তুগুলি মাবুদ ও উপাস্য হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গকে সহজে স্বীকার করায় বাধ্য করিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) কৌশলরূপে সাময়িকভাবে এই দাবী দাঁড় করিলেন। এই সূত্রে আলোচ্য উক্তির মর্ম এই যে, যখন দেশবাসী ইব্রাহীম (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এই কাণ্ড করিয়াছ হে ইব্রাহীম!" তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আসল উদ্দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভূমিকাস্বরূপ সাময়িকভাবে সম্ভাব্য একটি পরিকল্পিত দাবী তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন যে, মনে কর– আমি এরূপ দাবী করিতেছি যে, "আমি করি নাই বরং এই বড়টাই করিয়াছে।"

এই সাময়িক দাবীর উপর তিনি আর একটি বিষয় উপস্থাপনপূর্বক বলিলেন, فسئلوهم ان كانوا ينطقون এখন তোমরা তোমাদের এই মাবুদগণকে জিজ্ঞাসা কর (আমার এই দাবী মিথ্যা হইলে তাহারাই আমাকে দোষী প্রমাণ করিবে); যদি তাহাদের (অন্তত) কথা বলিবার শক্তি থাকে।

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা যায়, বড় মাছে ছোট মাছ খায়, বড় রাজা ছোট রাজাকে ধ্বংস করে। তদ্রূপ এখানেও সম্ভবত বড় মাবুদটাই ছোট মাবুদগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। মনে কর– আমি এই সম্ভব দাবীটাই তোমাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি; এখন যদি আমার দাবী মিথ্যা হয় তবে তাহারাই মূল ঘটনা ব্যক্ত করুক যদি তাহাদের কথা বলার শক্তি থাকে। আর যদি তাহাদের কথা বলিবার শক্তিও নাই, এমনকি তাহাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা হইলেও নিজেদের নির্দোষ হওয়া প্রমাণ করিবার পর্যন্ত ক্ষমতাটুকু তাহাদের নাই, তবে তাহারা মাবুদ– উপাস্য তথা খোদা কিরূপে হইতে পারে?

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই যুক্তি তাহাদের বিবেকের উপর এত গভীর রেখাপাত করিল যে, উহার প্রতিক্রিয়ায় তাহাদের অন্তরে সত্যের প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল, যাহাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাতে মগ্ন হইয়া নিজেদের দোষের স্বীকৃতি দিতে লাগিল। কোরআনের বর্ণনায় রহিয়াছে-

فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظلمون ـ ثم نكسوا ....

"ফলে তাহারা নিজেরাই মনে মনে চিন্তা করিল এবং পরস্পর বলাবলি করিল, বস্তুতঃ তোমরাই অন্যায়কারী। (ইব্রাহীম ঠিকই বলিতেছে; অক্ষম জড় পদার্থগুলি মাবুদ হয় কিরূপে?) অতঃপর লজ্জায় তাহাদের মাথা হেট হইয়া গেল এবং নিজেরাই ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলিল, তুমি ত জানই, ইহারা কথা বলিতে পারে না।" (পারা- ১৭; রুকু- ৫)

ইব্রাহীম (আঃ) যখন দেখিলেন, তাঁহার যুক্তি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন তিনি মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় পরম প্রতাপের সহিত তাহাদের ভর্ৎসনা করিলেন-

قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولايضركم -

"ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এই সবগুলির জড়তা ও অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখিবার পরও তোমরা পূজা উপাসনা করিতেছ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত এমন কতগুলি জড় বস্তুর, যেগুলি তোমাদের কোন প্রকার উপকার বা অপকার করিতে পারে না। (অর্থাৎ একেবারেই অক্ষম অচেতন।) ধিক্ তোমাদের উপর এবং ঐ সব মনগড়া মাবুদগুলির উপর, যেগুলিকে উপাস্য বানাইয়া রাখিয়াছ আল্লাহর স্থলে। তোমরা কি জ্ঞানহারা বোধ-বুদ্ধিহীন গর্দভ?"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ইব্রাহীম (আঃ) بل فعله كبيرهم هذا "তাহাদের বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে"- এই সাময়িক দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া মূল সত্যকে কি সুন্দর ও সহজরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেন এবং শ্রোতাদের ভ্রান্তি ধরাইয়া দিতে প্রয়াস পাইলেন।* ইহাকে মিথ্যা বলা হয় না; ইহাকে বলা হয় فرض المحال لتبكيت الخصم বিপক্ষকে সহজে নিরুত্তর ও কাবু করিবার উদ্দেশে সাময়িক পরিকল্পিত দাবী।" ইহা তর্কশাস্ত্রের একটি বিশেষ কৌশল।

অবশ্য ইহার বাহ্যিক অর্থ যেহেতু অবাস্তব, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া আতঙ্কিত হইবেন।

বিবি হাজেরার বনবাস ও মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আলোচ্য হাদীছের অর্থ ও উদ্দেশ্য ইহা প্রতিপন্ন করা নহে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তিনটি ঘটনায় মিথ্যা বলিয়াছেন। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা", বরং এই হাদীছের তাৎপর্য হইল- ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিন এই বলিয়া শংকা প্রকাশ করিবেন যে, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" সেই তিনটি বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যে, এই বিষয় তিনটিও বস্তুতঃ মিথ্যা ছিল না, অতএব এই ঘোষণা দেওয়া নিতান্তই সত্য ও বাস্তব যে, ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।

---

* পূর্ব বর্ণিত জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত হাদীছখানার তাৎপর্য বিপরীত বুঝিয়া তথাকথিত "তফসীরুল কোরআনে" এই হাদীছখানার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজের স্বল্প জ্ঞানহেতু ভুলে পতিত হইয়া নানারূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন- হাদীছকে এনকার করিয়াছেন, হাদীছ বর্ণনাকারীদের প্রতি ক্ষেপিয়াছেন। এমনকি চরম ধৃষ্টতায় বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি বেআদবী করতঃ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এইটা আবু হোরায়রার গর্হিত বয়ান এবং বোখারী-মুসলিম শরীফে উল্লেখ হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত মিয়া ইহাকে হাদীছ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল প্রলাপোক্তির একমাত্র কারণ হইল, হাদীছখানার মূল তাৎপর্য পৌঁছিবার অসামর্থতা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, ইহাতে হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা বলা প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ ইহা এই হাদীছের বাস্তব তাৎপর্য নহে, বরং ইহা পণ্ডিত মিঞার অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রসূত বক্র ও ভুল ধারণা হইতে সৃষ্ট। হাদীছখানার সঠিক তাৎপর্য পাঠক উপলব্ধি করুন।

পণ্ডিত সাহেব আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু আনাছ (রাঃ), হাম্মাম (রাঃ) ও আবু ছায়ীদ (রাঃ) সাহাবীগণের হাদীছসমূহেও আছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই হাশরের দিন বলিবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম; এই সব হাদীছ সম্পর্কে তিনি কি বলিবেন এবং উক্ত ছাহাবীগণ সম্পর্কে কি মন্তব্য করিবেন?

১৬৩৫। হাদীছ ঃ আব্দুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে*) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিলেন (মাতৃ জাতির মানবীয় স্বভাবের প্রবণতায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী ছারাহ্ (রাঃ) ও বিবি হাজেরার মধ্যে গরমিলের সৃষ্টি হইল। (হাজেরা (রাঃ) তাহা দূর করায় সচেষ্ট হইলেন।) বিবি হাজেরাই প্রথম নারী যিনি পরিচারিকা নারীদের কোমরে পরিকর বা কোমরবন্ধ বাঁধার রীতি অবলম্বন করেন। তিনি সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় কোমর বাঁধিয়া বিবি ছারার মনের আবিলতা দূর করার উদ্দেশে সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। (কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল, এমনকি বিবিদ্বয়ের মধ্যেকার মনের আবিলতায়) যখন ইব্রাহীম (আঃ) এবং বিবি ছারার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইল তখন (আল্লাহ তাআলার আদেশ ক্রমে) ইব্রাহীম (আঃ) শিশু পুত্র ইসমাঈল ও বিবি হাজেরা (রাঃ)-কে (দেশান্তরিত করার জন্য) লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি মোশকে পানি ছিল– তাঁহারা পথিমধ্যে তাহা পান করিতেন এবং ইসমাঈল মাতার দুগ্ধ পান করিত। এইভাবে তাঁহারা মক্কা নগরীর বর্তমান অবস্থাস স্থলে পৌঁছিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) বিবি হাজেরা ও শিশুকে বড় একটি বৃক্ষের নীচে রাখিলেন। তখন এই এলাকায় কোন মানুষ ছিল না, পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিলা না। তিনি তাঁহাদের নিকট শুধুমাত্র একটি থলিয়ার মধ্যে কিছু খুরমা এবং মোশকের মধ্যে অল্প পরিমাণ পানি দিয়া আসিলেন। এই অবস্থায় শিশু ও তাঁহার মাতাকে তথায় রাখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার (ফিলিস্তীনস্থ) গৃহজনের দিকে রওয়ানা হইলেন।

যখন ইব্রাহীম (আঃ) শিশু ও শিশুর মাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন হাজেরা (রাঃ) তাঁহার পিছনে ছুটিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন–

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا فِىْ هٰذَا الْوَادِىْ الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ اَنِيْسٌ وَلاَ شَىْءٌ -

"হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলিয়া যাইতেছেন? অথচ আমাদিগকে এমন স্থানে ফেলিয়া যাইতেছেন যেখানে কোন মানুষ নাই, পানাহারের কোন ব্যবস্থা নাই।" বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেদিকে মোটেই তাকাইতে ছিলেন না– তাঁহার দৃষ্টি ও গতি সম্মুখ দিকেই।

অবশেষে হাজেরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন الله امرك بهذا আপনি কি আল্লাহর আদেশে এই ব্যবস্থা করিলেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, نعم হাঁ। জবাব শুনিয়া হাজেরা (রাঃ) সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, اذن لايضيعنا "তাহা হইলে আমাদের কোন ভয় নাই– আল্লাহ আমাদিগকে হালাক করিবেন না।" হাজেরা (রাঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, الى من تتركنا আপনি আমাদিগকে এই জনশূন্য এলাকায় কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, الى الله আল্লাহর আশ্রয়ে ইহা শ্রবণে বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, رضيت আল্লাহর আশ্রয়ে আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট" –এই বলিয়া তিনি হযরত ইব্রাহীমের পেছন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ও তাঁহার মাতাকে ত্যাগ করিয়া পেছন দিকে না তাকাইয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন গিরিপথের বাঁকে পৌঁছিলেন যেখান হইতে স্ত্রী-পুত্র চোখের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তখন কা'বা গৃহের (স্থানের) প্রতি মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন–

رَبَّنَا اِنِّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرَ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ -

---

* এই হাদীছ বর্ণনার প্রারম্ভে স্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, এই বিবরণ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে শুনিয়াছেন; কিন্তু ইহা অবধারিত যে; তিনি এই বিবরণ হযরত (সঃ) হইতে শুনিয়াছেন। কারণ, প্রারম্ভে উহার উল্লেখ না থাকিলেও হাদীছখানার বিবরণের মধ্যে একাধিক স্থানে সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

"হে পরওয়ারদেগার! আমি জনশূন্য মরুর বুকে আমার পরিজনের বসতি স্থাপন করিয়া যাইতেছি তোমার সম্মানিত ঘরের নিকটে, এই উদ্দেশে যে, তাহারা নামায তোমার এবাদত-বন্দেগী) ভাল ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবে। প্রভু হে! তুমি আরও লোকের মন এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দাও যেন উহার জনশূন্যতা দূর হইয়া যায়। আর ফলফলারি খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া পানাহারের সুব্যবস্থা করিয়া দাও; যাহাতে তোমার নেয়ামত উপভোগ করিয়া মানুষ তোমার শোকরগুজারী করিবে। (পারা– ১৩; রুকু– ১৮)

বিবি হাজেরা (রাঃ) হযরত ইব্রাহীমের পিছন হইতে নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন : মোশকের পানি নিজে পান করিতেন এবং শিশুকে বুকের দুধ পান করাইতেন। কিছু দিনের মধ্যেই পানি ফুরাইয়া গেল। তখন নিজেও ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হইলেন এবং শুষ্কতার দরুন বুকের দুধ না থাকায় শিশুও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। এমনকি চক্ষের সামনে শিশু পুত্র পিপাসায় ছটফট করিতে লাগিল। তখন চোখের সামনে শিশু-পুত্রের এই করুণ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া হাজেরা (রাঃ) তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং নিকটতম "সাফা" পর্বতের উপর উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন যে, কাহারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা; কিছুর খোঁজই নাই। সুতরাং তিনি দ্রুত সাফা পর্বত হইতে নামিয়া সম্মুখস্থ "মারওয়া" পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। (এর মধ্যে তিনি শিশু ইসমাঈলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন।) সাফা পাহাড় হইতে নামিয়া একটু সম্মুখের স্থানটি তখন যথেষ্ট নীচু, (তথা হইতে শিশু-পুত্র দৃষ্টির আড়াল হইত, তাই) উহা অতিক্রম করিতে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্তের ন্যায়ই দৌড়িয়া চলিলেন। অতঃপর "মারওয়া" পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কোন কিছুর খোঁজ পাইলেন না। এইরূপে বিচলিত হইয়া তিনি (আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে এবং আল্লাহকে ডাকিতে ডাকিতে) উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন, এমনকি বারংবার একটি হইতে অপরটিতে যাওয়ার সংখ্যা সাতের সংখ্যায় পৌঁছিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) উক্ত ঘটনার প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা কর্তৃক উক্ত পাহাড়দ্বয়ে আসা-যাওয়া করার স্মরণেই আজও হজ্জ সমাপনকারীগণ হজ্জের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দোয়া ও যিকির করতঃ) সাতবার সা'য়ী বা আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন। (এমনকি উল্লিখিত নীচু স্থানটি যদিও বর্তমানে সমতল,* তবুও শরীয়তের নির্দেশানুসারে তাহাকে বিবি হাজেরার ন্যায় দৌড়িয়া অতিক্রম করিতে হয়।)

বিবি হাজেরা (রাঃ) সপ্তম বার "মারওয়া" পাহাড়ে উঠিবার পর শিশু পুত্রের অবস্থা দেখার জন্য শিশুর নিকট চলিয়া আসার ইচ্ছা করিলে হঠাৎ একটি শব্দ শুনিলেন। তিনি পূর্ণ মনোযোগের সহিত ঐ শব্দের প্রতি ধ্যান দিলেন এবং পুনরায় শব্দ শুনিলেন।

এইবার তিনি বলিলেন, তোমার আওয়াজ ত শুনাইয়াছ; সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার নিকট থাকিলে সাহায্য কর। তখন তিনি (বর্তমান) যমযম কূপের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখিলেন, তিনি

* বিগত ১৯৫০ সনে আমি নরাধমের আল্লাহর ঘরের মহান দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তখন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় এবং তাহার মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণরূপে হেরেম শরীফের মসজিদ হইতে বাহিরে ছিল। তখন পাহাড়দ্বয়ের পার্শ্ববর্তী দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী, দ্বারা শহরের পরিবর্তন হইয়াছিল বটে কিন্তু পাহাড়দ্বয় এবং তাহার মধ্যবর্তী ভূচিত্র পুরাতনকালেরই অনেকটা দৃশ্য বহন করিতেছিল, এমনকি দৌড়িয়া অতিক্রম করার নীচু স্থানটি তখনও প্রাচীন কালের ন্যায় নীচুই ছিল। যাতায়াতের পথ প্রাকৃতিক পাহাড়ী এলাকার পাথরিয়া ভূমিই ছিল, সুরম্য অট্টালিকার আবরণে আবদ্ধ ছিল না, শুধু উপরে নব নির্মিত সাধারণ ছায়ার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫৫ ইং সালের পর বাদশাহ সউদ হেরেম শরীফের মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়ায় উক্ত পাহাড়দ্বয় ও তাহাদের মধ্যবর্তী স্থান সহসমুদয় এলাকা মসজিদের সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকার ভিতরে আসিয়া যাওয়াতে সব কিছু দৃশ্য এবং হাল-অবস্থা পরিবর্তিত হয়া গিয়াছে। বিশেষত পাহাড়দ্বয়কে ভাঙ্গিয়া তাহাদের অস্তিত্বই প্রায় বিলোপ করিয়া ফেলা হইয়াছে, না থাকার মত একটু নিদর্শন অবশিষ্ট রাখা হইয়াছে; যাহা দেখিয়া কেহ তাহা পাহাড় বলিয়া ভাবিতে পারিবে না এবং সমুদয় এলাকা কংক্রিটের ঢালাই হইয়া সমতল আকার ধারণ করিয়াছে। সম্পূর্ণ এলাকা মরমর পাথরের সুরম্য ফরাশে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য দৌড়িয়া অতিক্রম করার স্থানটির সীমা চিহ্নিত রাখা হইয়াছে।

জিব্রাঈল (আঃ)। ঐ ফেরেশতা স্বীয় পায়ের গোড়ালির আঘাতে তথায় গর্ত করিলেন, তাহা হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা (রাঃ) আচম্বিত হইলেন এবং মাটি দ্বারা চতুর্দিকে বাঁধ সৃষ্টি করতঃ হাউজের ন্যায় বানাইলেন; অতঃপর অঞ্জলি ভরিয়া মোশকে পানি ভরিতে লাগিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, ইসমাঈলের মাতাকে আল্লাহ রহম করুন–তিনি পানির চতুর্দিকে বাঁধ না দিলে যমযমের ঐ পানি কূপ না হইয়া প্রবাহমান ঝরণায় পরিণত হইত।

বিবি হাজেরা (রাঃ) এই পানি পানে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাঁহার বুকেও দুধের সঞ্চার হইল; শিশুকে পর্যাপ্ত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহাকে এই সান্ত্বনাও দিয়াছিলেন যে, এই পানি নিঃশেষ হইয়া আপনি আবার বিপদের সম্মুখীন হইবেন। এই আশঙ্কা করিবেন না যে, জানিয়া রাখুন– এখানেই আল্লাহর ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং এই শিশু স্বীয় পিতার সঙ্গে সেই ঘর পুনঃনির্মাণ করিবেন। এই ঘরের নির্মাতাগণকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করিবেন তাহা হইতে পারে না। ঐ সময় তথায় (তুফানে নূহের পর ভগ্নাবশেষ) আল্লাহর ঘরের নিদর্শন শুধুমাত্র উহার ভিটা যমীনের উপর উঁচু টিলার ন্যায় ছিল, তাহাও পাহাড়ী ঢলের স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বিবি হাজেরা (রাঃ) একাকী এই এলাকায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে (ইয়ামান দেশীয়) "জুরহুম" গোত্রের একটি কাফেলা এই এলাকা অতিক্রম করাকালে নিকটবর্তী স্থানে বিশ্রাম নিল। তাহারা হঠাৎ দেখিতে পাইল, কতকগুলি পাখী কোন কিছুকে কেন্দ্র করিয়া উড়িতেছে। এতদ্দৃষ্টে তাহারা অনুমান করিতে পারিল যে, এই পিপাসার্ত জীবগুলি নিশ্চয় পানিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে এবং তাহারা আশ্চর্য হইল যে, আমরা তো এই এলাকায় বহুবার গমনাগমন করিয়াছি; এখানে পানি দেখি নাই। তৎক্ষণাৎ তাহারা এক দুইজন লোক তথায় পাঠাইল; ঐ স্থান হইতে পানির কূপের সংবাদ আসিলে তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া বিবি হাজেরাকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপনার এই স্থানে বসতি স্থাপন করিতে চাই, অনুমতি দিবেন কি? বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিলেন, অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু এই কূপের উপর তোমাদের স্বত্ব স্থাপিত হইবে না। তাহারা সম্মত হইয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা লোকদের সাহচর্যের আশা করিতেছিল, তিনি সেই সুযোগও পাইলেন। এই পর্যটক দলটি তথায় বসতি স্থাপন করিল, তাহারা নিজেদের আরও লোক সংবাদ দিয়া তথায় আবাদ করিল; এমনিভাবে সেখানে কয়েকটি পরিবারের বস্তি হইয়া গেল। এদিকে ইসমাঈল (আঃ)-এরও বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি "জুরহুম" গোত্র হইতে তাহাদের ভাষা "আরবী" শিক্ষা করিলেন। ফলে তিনি ঐ জুরহুম গোত্রের লোকদের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইসমাঈল (আঃ) বয়স্ক হইলে তাহারা নিজেদের একটি মেয়েকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা হাজেরা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন।

ইসমাঈলের বিবাহের (ও মাতার মৃত্যুর) পর একদা ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পরিজন পরিদর্শনে মক্কায় তশরীফ আনিলেন। ইসমাঈল (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রীর নিকট ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল, তিনি শিকার করিয়া আহার্যের ব্যবস্থায় কোথাও গিয়াছেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূকে তাহাদের জীবন যাপনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রবধূ বলিলেন, আমরা অতিশয় দুরবস্থা, দারিদ্র্য ও কষ্টে আছি। (পুত্রবধূ শ্বশুর ইব্রাহীম (আঃ)-কে চিনে নাই।) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও এবং বলিও, সে যেন তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া নেয়। এই বলিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চলিয়া গেলেন।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী উপস্থিত হইলে পর তিনি স্বীয় পিতার আগমনের আভাস অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কোন মেহমান আসিয়াছিল কি? স্ত্রী বলিল হাঁ (এবং আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া বলিল),

এমন আকৃতির এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সে সম্পর্কে উত্তর দিয়াছি এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিল, হাঁ– আপনাকে সালাম জানাইবার এবং আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

এতদশ্রবণে ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, সেই বৃদ্ধ আমার পিতা; তিনি এই কথার দ্বারা আমাকে তোমায় পৃথক করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া গিয়াছেন, অতএব তুমি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। এই বলিয়া ইসমাঈল (আঃ) স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন এবং ঐ গোত্রের অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

কিছু দিন কাটিবার পর ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় আসিলেন। সেই দিনও ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রীকে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; স্ত্রী জানাইলেন, তিনি আহার্যের সন্ধানে বাহিরে গিয়াছেন। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রবধূ বলিলেন, আমরা ভাল ও সচ্ছলতায় আছি; এই বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। পুত্র বধূ তাঁহাকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্যবস্তু কি? পুত্রবধু বলিলেন, গোশত। পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, পানি। ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন اللهم بارك لهم فى اللحم والماء আয় আল্লাহ! তাহাদের জন্য গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত (আধিক্য ও অধিক জীবনী শক্তি) দান করুন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালাম বলিয়াছেন, ঐ সময় তথায় শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা তাহা সম্পর্কেও ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিতেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার ফলেই শুধু গোশত ও পানির দ্বারা মক্কা অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে, অন্য কোন স্থানে শুধু এই দুই বস্তুর দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য টিকিতে পারে না। ইব্রাহীম (আঃ) তখন এই দোয়াও করিয়াছিলেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ -

"হে আল্লাহ! তাহাদের খাদ্য ও পানীয়ে বরকত (অধিক মঙ্গল) দান কর।" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মক্কা শরীফে খাদ্য পানীয়ের বরকত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার বদৌলতেই।

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূর সঙ্গে আলাপের পর বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও বরং সে নিজ ঘরের চৌকাঠ যেন বহাল রাখে।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কেহ আসিয়াছিলেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– এক নূরানী চেহারার বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন– তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমি যথাযথ উত্তর দিয়াছি। সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছি– আমরা সুখে-শান্তিতেই আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– আপনার নিকট সালাম বলিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, আপনি যেন নিজ ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা; তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখিবার আদেশ করিয়াছেন।

কিছু দিন পর ইব্রাহীম (আঃ) আবার আসিলেন। এইবার ইসমাঈল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যমযম কূপের নিকটে বৃক্ষের নীচে বসিয়া তীর বানাইতেছিলেন। ইসমাঈল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখামাত্র দাঁড়াইয়া গেলেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ব্যবহারের আদান-প্রদান হয় পরস্পর তাহাই করিলেন। অতপর ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি আদেশ করিয়াছেন। ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, স্বীয় প্রভুর আদেশ বাস্তবায়িত করুন। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহর আদেশ

বাস্তবায়নে তুমি আমার সাহায্য করিবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, আমি নিশ্চয় আপনার সাহায্য করিব। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই উঁচু ভিটাটিকে ঘেরাও করিয়া একটি ঘর তৈয়ারি করি। ঐ সময়েই উভয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের ঘর প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) গাঁথুনি করিতেন। যখন দেওয়াল উঁচু হইয়া গেল তখন ইসমাঈল (আঃ) একটি বড় পাথর আনিলেন, ইব্রাহীম (আঃ) উহার উপর দাঁড়াইয়া নির্মাণ কার্য করিতে লাগিলেন * এবং ইসমাঈল (আঃ) তাঁহাকে গাঁথুনীর পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন এবং এই দোয়া করিতেছিলেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই আমলটুকু কবুল করিয়া লউন; আপনি সব কিছু শুনেন এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন।*

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন তবলীগ করিতে করিতে মিসর পৌঁছিয়াছিলেন। মিসর এলাকায় তবলীগ করার পর সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তীনে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। মক্কার মরুভূমিতে ফেলিয়া আসা স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) ফিলিস্তিনস্থ আবাসগৃহ হইতে আগমন করিতেন। ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতাকে যখন মক্কার মরুভূমিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর বয়স ছিল দুই বৎসর।(ফতহুল বারী, ৬–৩০৮) তারপর ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় পরিদর্শনে আসিতেন। (ফতহুল, বারী ৬–৩১১) যখন ইসমাঈল (আঃ) সাত বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন তখন স্বপ্নের নির্দেশানুযায়ী ক্বোরবানীর ঘটনা সংঘটিত হইল। হযরত ইসমাঈলের বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার মৃত্যু হয়। (আহওয়ালে আম্বিয়া–৯) তারপরও ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় আসিতেন। তিনবার

আসার উল্লেখ উপরের হাদীছেই আছে। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ১০০ বৎসর এবং হযরত ইসমাঈলের বয়স ৩০ বৎসর, তখনই কা'বা ঘর নির্মাণ কার্য সমাধা করেন। (ফতহুল বারী ৬–৩১৩)

ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণকালে যে দোয়ার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপে আছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ ـ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا .....

অর্থঃ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা– যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা গৃহের দেওয়াল উঠাইতে ছিলেন (এবং আল্লাহর দরবারে মিনতি করিয়া দোয়া করিতেছিলেন–) হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হইতে এই সামান্য প্রচেষ্টা ও আমল কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন। (আমাদের দোয়া শুনিতেছেন এবং আমাদের অকপটতা ও আন্তরিকতা জ্ঞাত আছেন।) হে আমাদের প্রভু! আরও আমাদের দরখাস্ত যে, আপনি আমাদের উভয়কে আপনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী, আপনার সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব বিলীনকারী বানাইয়া রাখুন এবং আমাদের উভয়ের বংশধরের মধ্য হইতে এইরূপ একটি

* যেই পাথরটির উপর ইব্রাহীম (আঃ) দাঁড়াইয়া নির্মাণ কার্য করিতেছিলেন ঐ পাথর কা'বা শরীফের সন্নিকটে সুরক্ষিত আছে; তাহার উপর হযরত ইব্রাহীমের পদ-চিহ্নের রেখাপাতও রহিয়াছে। ঐ পাথরকেই মাকামে ইব্রাহীমে বলা হয়– যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।

* হাদীছটি ৪৭৪ ও ৪৭৬ পৃঃ দুই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; উভয়ের সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

দল সৃষ্টি করুন যাহারা ঐরূপ আত্মসমর্পণকারী ও সর্বস্ব বিলীনকারী হয় এবং আমাদিগকে (এই কা'বা গৃহের) হজ্জের সমুদয় নিয়মাবলী শিক্ষা দিন এবং আমাদের প্রতি নেক দৃষ্টি রাখুন; একমাত্র আপনিই নেক দৃষ্টিবান দয়ালু! হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়ের বংশধর হইতে যে বিশেষ দলটি দাড় করিবেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রসূলরূপে মনোনীত করিবেন যিনি তাহাদিগকে আপনার কালাম পড়িয়া শুনাইবেন এবং আপনার কিতাব (কালাম) ও হেকমত (আপনার প্রদত্ত শরীয়ত) শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে বাহ্যিক ও আত্মিক কদর্যতা হইতে পাক-পবিত্র করিবেন; নিশ্চয় আপনি সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সুকৌশলী।

(পারা- ১; রুকু- ১৫)

১৬৩৬। হাদীছ ঃ আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কোন মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে? হযরত (সঃ) বলিলেন, হেরেম শরীফের মসজিদ (কা'বা শরীফ ও উহাকে কেন্দ্র করিয়া যে মসজিদ আছে)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্ মসজিদ? হযরত (সঃ) বলিলেন; মসজিদে আক্সা (বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত মসজিদদ্বয় নির্মিত হওয়ার মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? হযরত (সঃ) বলিলেন, চল্লিশ বৎসর।* (পূর্বের উম্মতে নামাযের জন্য মসজিদ শর্ত ছিল; ঐ সম্পর্কে-)

হযরত (সঃ) ইহাও বলিলেন, তোমাদের জন্য বিধান এই যে, যে স্থানেই নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় সেই স্থানেই নামায আদায় করিবে, মসজিদ বা অন্য যে কোন স্থানে নামায আদায় করিলে নামাযের সওয়াব লাভ হইবে।

ইহা শুধু নামায শুদ্ধ হওয়ার মাসআলা। নতুবা মসজিদে জামাতে নামায পড়ার বেশি সওয়াব এবং গুরুত্ব ও চাপ আমাদের শরীয়তেও রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ৭০ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ছোট বিবি হাজেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভে জন্ম লাভ করেন। (ফতহুল বারী ৬-৩১৩) অতপর হযরত ইব্রাহীম ১২০ বৎসর বয়সে বড় বিবি ছারাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পক্ষে সন্তান লাভের সুসংবাদ লাভ করেন, তখন বিবি ছারার বয়স ছিল ৯০ বা ৯৯ (তফসীর মাওয়াহেবে রহমান ১২-৫৯)। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। যথা-

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ـ فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ـ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ـ قَالُوْا لاَتَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ـ

একদা আমার প্রেরিত কতিপয় ফেরেশতা ইব্রাহীমের নিকট একটি সুসংবাদ লইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ইব্রাহীমকে সালাম করিলেন। ইব্রাহীমও উত্তরে সালাম করিলেন এবং (তাঁহাদিগকে সাধারণ মেহমান ভাবিয়া) অবিলম্বে কাবাব করা গো-শাবক উপস্থিত করিলেন। কিন্তু যখন ইব্রাহীম দেখিলেন, তাঁহাদের হাত খাদ্যের প্রতি অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় ধারণা বহির্ভূত ভাবিলেন এবং তাহাদের দরুন ভয় অনুভব করিলেন। আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না; আমরা (ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক)

* ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাস্থ হেরেম শরীফের মসজিদ তথা উহার মূল কেন্দ্র কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর সোলায়মান (আঃ) মসজিদে আকসার পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উভয়ের ব্যবধান হাজার বৎসরের অধিক ছিল। কিন্তু উক্ত মসজিদদ্বয়ের মূল নির্মাতা হযরত আদম (আঃ)- তাঁহার নির্মাণে উভয়ের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল।

প্রেরিত হইয়াছি লুতের বস্তিবাসীদের প্রতি (তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য। পথিমধ্যে আপনাকে পুত্রের সুসংবাদ দানে আসিয়াছে।)

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ـ

ইব্রাহীমের স্ত্রী "ছারাহ্" নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, (পুত্র হওয়ার খবরে) হাসিয়া উঠিলেন। তখন (ঐ ফেরেশতাদের মাধ্যমেই) আমি বিবি ছারাহ্কে ইসহাক এবং ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ـ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ـ

বিবি ছারাহ্ বলিলেন, কি বিপদ– আমার সন্তান হইবে! অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই ত আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আল্লাহর কাজে আপনি তাজ্জব বোধ করিতেছেন? হে নবীর পরিবার! আপনাদের প্রতি ত আল্লাহর বিশেষ রহমত ও বরকত পূর্ব হইতেই আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রশংসাভাজন মহিমান্বিত। (সূরা হুদঃ পারা– ১২;রুকু– ৭)

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ـ

হে মুহম্মদ (সঃ)! আপনি তাহাদিগকে ইব্রাহীমের অতিথিগণের ঘটনা জ্ঞাত করুন। যখন অতিথিগণ ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইল এবং সালাম করিল। ইব্রাহীম (আগন্তুকদের খাদ্য স্পর্শ না করায়) বলিলেন, আমরা তোমাদের দরুন ভয় অনুভব করিতেছি।

قَالُوْا لَاتَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ـ

আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না, আমরা আপনাকে এক বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিতেছি।

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইতেছ আমার বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও– তোমরা আমাকে কি রকম সুসংবাদ দিতেছ?

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ ـ قَالَ وَمَنْ يَّقْنُطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ـ

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদই আপনাকে দিয়াছি; আপনি নিরাশ হইবেন না। ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন, উদভ্রান্ত লোক ব্যতীত নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হইতে কি কেহ নিরাশ হইতে পারে? (সূরা হেজ্রঃ পারা– ১৪; রুকু– ৪)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ سَلٰمٌ ـ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ـ

ইব্রাহীমের সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের ঘটনার বিবরণ জ্ঞাত আছেন কি? যখন তাঁহারা ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন ও সালাম করিলেন; তখন তিনিও সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনাদেরকে চিনিতে পারিলাম না।

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِه فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ـ فَقَرَّبَه اِلَيْهِمْ قَالَ اَلاَ تَاكُلُوْنَ ـ

অতঃপর ইব্রাহীম নিজ পরিজনের নিকট গেলেন এবং অবিলম্বে একটি মোটা তাজা গোবৎস কাবাব আনিয়া অতিথিদের সম্মুখে রাখিলেন। (তাঁহারা হাত অগ্রসর করেন না দেখিয়া) তিনি বলিলেন, আপনারা খাইতেছেন না কেন?

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ـ قَالُوْا لاَتَخَفْ ـ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাদের এই অবস্থা দৃষ্টে ভীত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ভয় পাইবেন না। তাঁহারা তাঁহাকে সুবিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।

فَاَقْبَلَتْ امْرَاَتُه فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ـ قَالُوْا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ اِنَّه هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ـ

তাঁহার স্ত্রী উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে আসিলেন এবং কপাল চাপড়াইয়া বলিলেন, (আমি ত) বাঁঝা বৃদ্ধা (সন্তান হইবে কিরূপে)? তাঁহারা বলিলেন (এই অবস্থায়ই সন্তান হইবে;) এইরূপই তোমার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি সুকৌশলী সর্বজ্ঞ। (পারা-২৬; শেষ রুকু)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আরও কতিপয় বিশেষ ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। যথা-

পুনর্জীবিত করার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন

এ সম্পর্কে কোরআনের বিবরণ এই-

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ......

অর্থঃ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা- ইব্রাহীম (আঃ) আবদার করিলেন, প্রভু! আমাকে স্বচক্ষে দেখাইয়া দিন, কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন।* আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করিলেন, এ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস নাই কি?

* হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য সুস্পষ্ট- তাঁহার জিজ্ঞাসা ছিল পুনর্জীবিত করার আকার নিরূপণ সম্পর্কে- যেন চোখের সামনে তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

পুনর্জীবিত করার নির্দিষ্ট আকার মনে উপস্থিত করিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নহে। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করিবেন- শুধু এই বিশ্বাসই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; কি আকারে জীবিত করিবেন তাহা অতিরিক্ত বিষয়; তাহা জানিবার জন্য আল্লাহ তাআলা মানবকে আদেশ করেন নাই। হযরত ইব্রাহীমের মনে উক্ত রূপ আকারের দৃশ্য অবলোকনের কৌতুক জন্মিয়াছিল নমরূদের সঙ্গে বিতর্কের ঘটনা হইতে- যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মৃতকে পুনর্জীবিত করার মূল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল না; তাহার প্রতি অটুট বিশ্বাস মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, যাহা প্রত্যেক মোমেনের মধ্যে অকাট্যরূপে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। ইব্রাহীম (আঃ) পয়গম্বর ছিলেন; তাঁহার ত ঐ বিশ্বাস পূর্ব হইতে অসাধারণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসা ঈমান পর্যায়ের বিষয় সম্পর্কে ছিল না এবং তাহা হইতে পারে না। অতএব হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার উপর তাঁহাকে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিকই গণ্য হইবে। তবুও আল্লাহ তাআলা এ স্থলে ইব্রাহীম (আঃ)-কে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন এই উদ্দেশে যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেন প্রকৃত বিষয় সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া যায়, যাহাতে সাধারণ শ্রোতাদের ভুল বুঝে পতিত হওয়ার এবং হযরত ইব্রাহীমের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অছওয়াছা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ না থাকে।

ইব্রাহীম বলিলেন, বিশ্বাস ত অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় আছে, তবে তাহার বাস্তবায়ন কি আকারে হইবে তাহা চাক্ষুষ দেখিয়া ঐ আকার সম্পর্কে (মানবসুলভ নানাবিধ কল্পনার অবসানপূর্বক) মন স্থির করিয়া লইতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আচ্ছা– তবে আপনি চারটি পাখি সংগ্রহ করুন এবং পালিয়া-পুষিয়া ইহাদের সহিত ভালরূপে পরিচিত হউন। অতপর (এই পাখীগুলিকে জবাই করতঃ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া) এক একটার এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আসুন। তারপর (পোষা পাখীকে ডাকার ন্যায়) ঐ পাখীগুলিকে ডাকুন; দেখিবেন, আপনার চোখের সামনে প্রত্যেকটি (পাখীর বিভিন্ন অংশ একত্রিত হইয়া পুনর্জীবনলাভে) আপনার নিকট দৌড়িয়া আসিবে। (দেখার পূর্বে ভাবিতে না পারিলেও) বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান সুকৌশলী। (পারা– ৩; রুকু– ৩)

পাঠকবর্গ! উল্লিখিত আয়াতের যে তফসীর করা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী বিখ্যাত সমস্ত তফসীরের কিতাবেই উল্লেখ আছে। এ স্থানে প্রসিদ্ধ "তফসীর ইবনে কাসীর" হইতে বিবরণ পেশ করা হইতেছে–

فذكروا انه عمد الى اربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ـ ثم جزاهن اجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل اربعة اجبل وقيل سبعة ـ قال ابن عباس واخذ رؤسهن بيده ثم امره الله عزوجل ـ ان يدعوهن فدعاهن كما امره الله عزوجل فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم والاجزاء من كل طائر يتصل بعضها الى بعض حتى قام كل طائر على حدته واتينه يمشين سعيا ليكون ابلغ له فى الروية التى سالها وجعل كل طائر يجئ لياخذ راسه الذى فى يد ابراهيم عليه السلام ـ فاذا قدم له غير راسه ياباه فاذا قدم اليه راسه تركب مع بقية جسده ......

অর্থঃ (ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন–) উল্লিখিত ঘটনার বিবরণে পূর্ববর্তী তফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চারিটি পাখী গ্রহণ করিলেন, ঐগুলিকে জবাই করিলেন, তারপর টুকরা টুকরা করিলেন এবং পালকও উপড়াইয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া একত্র মিলাইয়া ফেলিলেন, অতঃপর কয়েক ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং এক এক ভাগ এক পাহাড়ে রাখিয়া আসিলেন। কাহারও মতে চারি ভাগ করিয়া কাহারও মতে সাত (বা দশ) ভাগ করিয়া প্রতি ভাগ এক এক পাহাড়ে রাখিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পাখীগুলির মাথা ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ তাঁহাকে ঐ পাখীগুলিকে ডাকিতে বলিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) ঐগুলিকে ডাকিলেন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যে, প্রতিটি পাখীর পালক উড়িয়া আসিয়া একটা অপরটার সহিত মিলিত হইতেছে, রক্তের কণাগুলিও একটা অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে, গোশতের এক একটা অংশ অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে– এইরূপে প্রত্যেকটি পাখীর অংশ পরস্পর মিলিত হইল, এমনকি প্রত্যেকটি পাখী ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দিকে আসিতে লাগিল– আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যবস্থা এই জন্য করিলেন যেন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় কাঙ্খিত দৃশ্য ভালরূপে দেখিতে পারেন।

অতপর প্রত্যেকটি পাখী হযরত ইব্রাহীমের হস্তে রক্ষিত মাথার সঙ্গে মিলনের জন্য আগাইয়া আসিল। ইব্রাহীম (আঃ) একটার সম্মুখে অপরটার মাথা পেশ করিলে মিলিত হইল না; উহার নিজ মাথা সম্মুখে ধরিলে বিনা দ্বিধায় মিলিত হইয়া গেল। এই সব ব্যাপার আল্লাহর মহাশক্তি ও মহাকুদরতে হইয়াছিল। তাই আল্লাহ বলিলেন, واعلم ان الله عزيز حكيم জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষমতার

অধিকারী সুকৌশলী। অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান, কোন বিষয়ই তাঁহার ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না এবং তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ই অসম্ভব থাকে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন বিনা বাধায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেননা, তিনি সকলের উপর ক্ষমতার অধিকারী, তিনি হেকমতওয়ালা, বিজ্ঞ, তাঁহার হেকমত ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার বাণীসমূহে, তাঁহার কার্যাবলীতে, তাঁহার প্রবর্তিত শরীয়তে এবং তাঁহার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায়। (ইবনে কাসীর– ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩১৫)।*

সুধী পাঠক! আল্লাহর জন্য সর্বস্ব কোরবানকারী, বহু পরীক্ষায় পরীক্ষিত এবং আল্লাহর তরফ হইতে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদপ্রাপ্ত আল্লাহর খলীল বা বিশেষ প্রিয় পাত্র।

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তাঁহার অসীম কুদরতের প্রতি যে কিরূপ অগাধ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা অনাবশ্যক। অবশ্য বৈচিত্র্যময় ব্যাপারে দৃশ্য অবলোকন করার কৌতুক ও স্পৃহা জন্মা– বিশেষতঃ কোন রকম প্রয়োজনের সূত্র বিদ্যমান থাকাবস্থায় অতি স্বাভাবিক সাধারণ ব্যাপার। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে সেই শ্রেণীর কৌতুক ও স্পৃহা নিবারণের আবদারই করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহার মাধ্যমেই স্বীয় কুদরতের লীলা প্রকাশ্যরূপে দেখাইয়া আবদার পূরণ করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনা আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করিয়া আমাদেরও বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আখেরাত তথা পরজীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত– যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ও ইসলামের বিশেষ অঙ্গ, যাহাকে اليوم الاخر। আখেরাতের কাল বা জীবন" বলা হয়; সেই পরজীবনের উপর ঈমানের মূলই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহাকেই البعث بعد الموت মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া" নামে ব্যক্ত করা হয়– যাহার প্রতি বিশ্বাসও ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া অনেক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ–

এই পুনর্জীবন লাভের গোটা বিষয়টার প্রতিই অনেকে সন্দেহ বরং অস্বীকারের ভাব পোষণ করে এই অজুহাতে যে, একটা মানুষ পচিয়া-গলিয়া কিম্বা ভস্ম হইয়া বা বিভিন্ন পশু-পক্ষীর ভক্ষিত হইয়া ইত্যাদি আকারে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার পর এবং অংশসমূহ ধূলা কণারূপে বাতাসে উড়িয়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর উহাকে জীবিত করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত আক্রম খাঁ মরহুম স্বীয় তথাকথিত তফসীরুল-কোরআনে এই ঘটনাটিকেও বিকৃত রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সার হইল এই যে, চারিটি পাখীকে ইব্রাহীম (আঃ) পালিয়া নিজের আয়ত্তে করার পর ঐগুলিকে জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অতঃপর ডাক দিলে ঐগুলি উড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত সাহেব এই প্রলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলিয়া পবিত্র কোরআন শরীফের বিবৃতি হইতে একটি বিশেষ শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন– ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا। এই বাক্যে আল্লাহ তাআলা جزءا। জুয্আন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার অর্থ টুকরা বা অংশ। অতএব এই শব্দটি আমাদের পক্ষে বিরোধমান বক্তব্যের স্পষ্ট প্রমাণ; পণ্ডিত সাহেব এই শব্দটি তরজমায় বাদ রাখিয়াছেন– অনুবাদই করেন নাই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, পূর্বাপর তফসীরকারগণ ঘটনার বিবরণে উল্লিখিত যে বিবরণ দান করিয়াছেন, পণ্ডিত সাহেব সেই বিবরণকে বাজে ও কল্পিত কাহিনী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহার সমর্থনে "ইবনে কাসীর" নামক প্রসিদ্ধ তফসীরের নাম ভাঙ্গাইয়াছেন। পণ্ডিত সাহেবের এই রেফারেন্স কতদূর সত্য তাহা খোদা তাআলা জানেন। তফসীরে ইবনে-কাসীরে আমরা ঘটনার বিবরণ যাহা পাইয়াছি তাহা পূর্বাপর তফসীরকারগণের বিবৃতিরই অবিকল রূপ। তফসীরে ইবনে কাসীরে এই বিবরণ সমর্থনীয়রূপেই উল্লেখ আছে, অন্য কোন রূপে নহে। আমরা যে ইবনে-কাসীরে উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছি; তাহার পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি, যে কেহ অনুসন্ধান করিতে পারেন। পণ্ডিত সাহেব কোন ইবনে-কাসীর দেখিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, তাই অনুসন্ধান সম্ভব হইল না।

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকদের একটি বাতিক রোগ আছে যে, কোরআন হাদীছে বর্ণিত কোন অলৌকিক ঘটনাকে তাহারা অলৌকিক ও অসাধারণ রূপে গ্রহণ করিতে চান না, এই নীতি অনুসারেই পন্ডিত সাহেব পবিত্র কোরআনে নবীগণের "মোজেযা" স্বরূপ যত ঘটনার উল্লেখ আছে সবগুলিকেই বিকৃত রূপ দান করিয়া পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঘটনায় ত দেখা যায়, পণ্ডিত সাহেব আল্লাহর কুদরত সম্পর্কেও তদ্রূপ ঈমানই পোষণ করেন– সেখানেও তিনি কোন অলৌকিক অসাধারণ বিষয়কে স্থান দিতে রাজি নহেন। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা– এইরূপ ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাই।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের চাক্ষুষ দৃষ্ট ঘটনা ঐ ধরনের সমুদয় প্রশ্নকে অহেতুক প্রতিপন্ন করিয়াছে। আল্লাহর কালাম কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখে এই বিষয়টিও অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের এই শ্রেণীর নমুনারূপে এই ঘটনা সংলগ্ন ওযায়ের আলাইহিস সালামেরও একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে আছে। এতদ্ভিন্ন এক ব্যক্তির শবদেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই-ভস্মকে পিষিয়া ধূলিবৎ করতঃ পানিতে ও বাতাসে বিলীন করিয়া দেওয়ার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনর্জীবিত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে (৭ম খণ্ড; ২৪৫০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইসব ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আখেরাত ও পুনর্জীবনের ঈমানকে দৃঢ় করা চাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইব্রাহীম (আঃ) পুনর্জীবিত করার দৃশ্য নিজ চোখে দেখিবার আবদার কেন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তফসীরকারগণ লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে বাবেল সিংহাসনের অধিপতি খোদায়ী দাবীদার নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বিতর্ক বাহাছ হইয়াছিল। সেখানে মৃতকে পুনঃজীবিত করা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল– যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।

নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বাহাছ ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ - اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ - قَالَ اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ -

ঐ লোকটির অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে ইব্রাহীমের সহিত হুজ্জতি করিয়াছিল তাঁহার পরওয়ারদেগার সম্পর্কে– এই শক্তিতে মত্ত হইয়া যে, পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিলেন, আমার প্রভু পরওয়ারদেগার (এত বড় শক্তিমান যে,) তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন। তদুত্তরে সে বলিল, আমিও জীবিত করিয়া থাকি ও মারিয়া থাকি।

ঐ উক্তির পর নমরুদ তাহার কারাগার হইতে দুই জন কয়েদীকে আনিয়া একজনকে হত্যা করিল অপর জনকে ছাড়িয়া দিল– জীবিত করার এবং মারিয়া ফেলার এই নমুনা সে দেখাইল। কিরূপ বুদ্ধিহীনতা! احياء অর্থ জীবন দান করা; পক্ষান্তরে তাহার কাজটা হইল জীবিত মানুষটাকে বন্ধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া; ঐ নাদান উভয়কে এক পর্যায়ের গণ্য করিল। তদ্রূপ اماتة অর্থ মৃত্যু ঘটানো; আর তাহার কার্যটা হইল শুধু আঘাত করা– ইহাকে মৃত্যু ঘটানো বলা হইলে শৃগাল-কুকুরকেও সেই মর্যাদা দিতে হইবে। কারণ, উহাদের আঘাতেও মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাহার মগজ পচা বুদ্ধি দেখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) অন্য একটি প্রমাণ পেশ করিলেন–

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرْ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ যিনি তিনি ত সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদিত করেন; তুমি (যদি আল্লাহ হইয়া থাক তবে) সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর। ঐ কাফের এইবার হতভম্ব হইয়া রহিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা স্বৈরাচারীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (পারা–৩; রুকু–৩)

এই ঘটনায় احياء এহ্ইয়া– পুনঃজীবনদান যাহা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ সিফত গুণ বা পরিচয়। উক্ত সিফত সম্পর্কে ইব্রাহীম (আঃ) বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, احياء এহ্ইয়া– পুনঃজীবন দানের বাস্তব অর্থ ও তাৎপর্য, যে অর্থে তাহা আল্লাহ তাআলার বিশেষ সিফত সে অথ তাৎপর্যের বাস্তবরূপ কি তাহা তিনি নিজ চক্ষে প্রকাশ্য

দিবালোকে দেখিয়া সে সম্পর্কে পূর্ণ ও বিস্তারিত অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; যেন আগামীতে এইরূপ বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্যের সম্মুখীন হইলে তখন তিনি চাক্ষুষ দৃষ্ট তাৎপর্যের বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে বিশেষভাবে সমর্থ হন; شنیده کئے بود مانند دیده শ্রুত তাৎপর্য কি দৃষ্ট তাৎপর্যের সমান হইতে পারে?

মূল আলোচ্য ঘটনা তথা পুনঃ জীবন দানের দৃশ্য দেখাইবার প্রশ্নের দরুন ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, ইব্রাহীম (আঃ) কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন না? হযরত ইব্রাহীমের পক্ষে এরূপ ধারণার কোন অবকাশই যে ছিল না তাহা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা সেই করিলেন اولم تؤمن আপনি কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল নহেন? হযরত ইব্রাহীমের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর কি তাহাও আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত; তবুও প্রশ্ন করিলেন এই উদ্দেশে যে, তিনি যে উত্তর দিবেন সে উত্তর দ্বারা যেন চিরতরে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে ঐ ভুল ধারণার অবসান হইয়া যায়।

এতদুদ্দেশে তথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও একটি সাধারণ যুক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই

১৬৩৭। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লাম বলিয়াছেন– ইব্রাহীম (আঃ)-এর দরখাস্ত হে পরওয়ারদেগার! আমাকে প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিন, "কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন। এই জিজ্ঞাসা দৃষ্টে যদি কেহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলে যে, তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনঃজীবন দান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী ছিলেন তবে (তাহা ভিত্তিহীন প্রমাণিত করার জন্য) আমি বলিব, এইরূপ সন্দেহ পোষণ "ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমাদের জন্য অধিক উপযুক্ত ও অধিক নিকটবর্তী।

অতপর হযরত (সঃ) লূত পয়গাম্বরের (ঘটনা ও তাঁহার অসহায়তার করুণ কাহিনী স্মরণপূর্বক তাঁহার) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ রহম করুন (হযরত) লূতের প্রতি; তিনি (বাহ্যিক দিক দিয়া কিরূপ অসহায়তার মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুদের মোকাবিলায় স্বীয় গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা যে সাধারণ সহায়তাটুকু লাভ হইতে পারে, তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি নিজের দেশ হইতে দূর এলাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাই এক সময়) আক্ষেপে বলিয়াছেন, অন্ততঃ আমার গোষ্ঠীর লোকজনের মজবুত দল থাকিলে হয়ত তাহাদের বাহ্যিক সহায়তা লাভ হইত।

অতপর হযরত (সঃ) ইউসুফ পয়গম্বরের ঘটনা স্মরণ করতঃ তাঁহার দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যের প্রশংসায় বলিলেন, (বোধহয়) আমি যদি এত দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার তরফ হইতে মুক্তির আহ্বান পাইতাম তবে তৎক্ষণাৎ আহ্বানকারীর কথায় সাড়া দিয়া বসিতাম। (ইউসুফ (আঃ) কত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, দশ বৎসর কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার আহ্বান সত্ত্বেও তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন না। পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, আমার উপর যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইয়া ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করিব না)।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত কথা। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতীক; তিনি আল্লাহর জন্য সর্বস্ব কোরবান করার ব্যাপারে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া প্রত্যেকটিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যদ্দরুন তাঁহাকে আল্লাহ তাআলা সকলের উপর নেতৃত্বদান করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সকল পয়গম্বরকে তাঁহারই আদর্শবাদী হওয়ার আদেশ ছিল, এমনকি নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ও ঐরূপ আদিষ্ট ছিলেন–اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا "আমি অহী মারফত আপনার প্রতি আদেশ পাঠাইয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শে আদর্শবান হউন– যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজকে সোপর্দ করিয়াছিলেন। (পারা– ১৪; রুকু– ২২) তদুপরিত হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের উপর থাকিবার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীকেও আদেশ করা হইয়াছে–

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرى تَهْتَدُوْا ـ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ

"হে মুহাম্মদের উম্মত! ইহুদী-নাসারারা বলে, তোমরা ইহুদী-নাসারা হও, তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত– সত্য-পথের পথিক সাব্যস্ত হইবে। (আল্লাহ বলেন,) তোমরা তাহাদেরকে বলিয়া দাও, আমরা ইব্রাহীমের আদর্শ অবলম্বন করিব; যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।"

(১ম পারা শেষ রুকু)

ইব্রাহীম (আঃ) যাঁহার আদর্শ এই শ্রেণীর– সেই ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে যদি ধারণা করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনঃ জীবনদান সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, তবে আমাদের (তথা তাঁহার আদর্শে আদর্শবাদী হওয়ার আদিষ্ট হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং উম্মতে মুহাম্মদী) সকলের সম্পর্কে এরূপ ধারণা তাঁহার তুলনায় অধিক উপযুক্ত ও সহজ হইবে না কি? অথচ মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত সম্পর্কে এই ধারণা হইলে জগতে আর বাকী থাকিতে পারে কে, যাহার সম্পর্কে ঐ ধারণা না করা যায়? আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-সহ সকলের সম্পর্কে এই সন্দেহ পোষণের ধারণা অতি জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা জঘন্য ধৃষ্টতাই বটে।

লূত (আঃ) সম্পর্কে হযরত (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা। তাঁহার ঘটনার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হযরত (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁহার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করা। আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য ইহাই; এস্থলে শব্দার্থের সূক্ষ্মার্থ বাহির করিতে যাইয়া মাথা ঘামান ঠিক হইবে না।

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বহু মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ধরনের কতিপয় আয়াতের উদ্বৃতি দেওয়া হইল–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمُ .... قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ

" একটি স্বরণীয় ঘোষণা– ইব্রহীম (আঃ)-কে তাঁহার প্রভু কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য ইমাম (অনুসরণীয়) বানাইব– আপনার আদর্শকে সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ করিব।" (পারা– ১ম পারা; রুকু– ১৫)

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ـ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ـ وَاِنَّهُ فِىْ الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"ইব্রাহীমের দ্বীন ও আদর্শ হইতে একমাত্র সে-ই বিচ্যুত হইবে যে প্রকৃতই জ্ঞানশূন্য আহ্মক। আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে দুনিয়াতে বিশিষ্টরূপে নির্বাচিত করিয়াছি এবং আখেরাতে ত তিনি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে একজন। (তিনি স্বীয় প্রভুর এতই অনুরক্ত ছিলেন যে,) যেকোন পরিস্থিতিতে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যেকোন বিষয়ে আনুগত্যের আহ্বান জানাইলে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, (দেলে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে) আমি সারা জাহানের প্রভুর আনুগত্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিয়াছি।" (পারা– ১ম; রকু– শেষ)।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ـ

"ঐ ব্যক্তির ন্যায় উত্তম দ্বীন আর কাহারও হইতে পারে কি? যে নিজের লক্ষ্যকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া নিয়াছে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সহিত এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শের অনুসারী হইয়াছে– যে আদর্শে বক্রতার নামও নাই; (যে আদর্শের বদৌলতে) আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বীয় "খলীল" বিশেষ বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" (পারা–৫; রুকু–১৫)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۔

"আমি প্রথম হইতেই ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার (ব্যক্তিত্ব) সম্পর্কে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলাম"। (পারা–১৭,রুকু–৫)

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ...... وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۔

"স্মরণ কর আমার বিশিষ্ট বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে। তাঁহারা ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও কার্য দক্ষতায় শীর্ষস্থানীয়; (যাহার মূল কারণ ছিল আমি তাঁহাদিগকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা সর্বদা পরকালের জীবনকে স্মরণে রাখিতেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার বাছাই করা, মনোনীত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম।" (পারা– ২৩; রুকু– ১৩)

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ..... وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔

"নিশ্চয় ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অতি বড় আদর্শবান অনুসরণীয় মানুষ, আল্লার প্রতি পূর্ণ অনুগত, একনিষ্ঠ– তওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকরগুজার। আল্লাহ তাঁহাকে বাছাই করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সরল সঠিক পথের পথিক বানাইয়াছিলেন। (আল্লাহ আরও বলেন) আমি দুনিয়াতে তাঁহাকে দিয়াছিলাম সকল প্রকার কল্যাণ; আর আখেরাতে ত তিনি নিশ্চিতরূপে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হইবেন। তদুপরি অহী মারফৎ আপনাকে নির্দেশ দিয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শের উপর চলিবেন, যাঁহার মধ্যে চরম একনিষ্ঠতা ছিল এবং পূর্ণ তওহীদ একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না।"

(পারা– ১৪; রুকু– শেষ)

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে মোশরেকদের কুসংস্কার

মক্কার মোশরেকরা দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলিয়া দাবী করিত। তাহাদের সেই দাবী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দাবী। মোশরেকদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ দ্বারা পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায়ই উক্ত দাবী অসামঞ্জস্য হওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে সেই সামঞ্জস্যহীনতা প্রমাণ করিয়াছেন–

১৬৩৮। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) ও মরিয়ম (আঃ)-এর চিত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিরস্কারের স্বরে হযরত (সঃ) বলিলেন, মক্কার লোকেরা ত এই কথা নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবে যে, (রহমতের) ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যেই ঘরে চিত্র থাকে।

চিত্রে হযরত ইব্রাহীমের হাতে তীর দেখান ছিল; সেই সম্পর্কে হযরত (সঃ) বলিলেন, তীর দ্বারা এসতেকসামের রীতির সঙ্গে ইব্রাহীমের কি সম্পর্ক ছিল?

ব্যাখ্যাঃ তীর দ্বারা দুইটি হারাম কাজ করার রীতি মোশরেকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একটি ছিল জুয়ারূপে তীর দ্বারা ভাগ বন্টন–৭ বা ১০টি তীর হইত; উহার কোনটায় ৫ সের, কোনটায় ৮ সের, কোনটায় ১৫ সের ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণের সংকেত চিহ্ন থাকিত এবং কোনটায় ফাঁকা বা শূন্যের চিহ্ন থাকিত। কতিপয় লোক সমান অংশে টাকা দিয়া একত্রে একটি উট ক্রয় করিয়া উহার গোশত ঐ তীর দ্বারা বন্টন করিত এইরূপে যে, আবৃত স্থান হইতে অংশীদার প্রত্যেকে এক একটি তীর বাহির করিবে; যাহার তীরে শূন্যের চিহ্ন থাকিবে সে ফাঁকা যাইবে, অথচ ঐ উটের মূল্যে প্রত্যেকেই সমপরিমাণ টাকা দিয়াছে।

দ্বিতীয়টি ছিল, কোন কার্যের শুভ-অশুভ নির্ণয়। পুরোহিতের নিকট কতিপয় তীর থাকিত; উহার কোনটিতে ভাল, কোনটিতে মন্দ এবং কোনটিতে ফাঁকার চিহ্ন থাকিত। কেহ কোন কাজ করিতে বা কোথাও যাত্রা করিতে পুরোহিতের দ্বারা ঐ তীর বাহির করিত; ফাঁকা চিহ্ন বাহির হইলে পুনরায় বাহির করিত, আর ভাল-মন্দের চিহ্নের দ্বারা উক্ত কার্য বা যাত্রার মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারিত করিত এবং তাহা অবধারিত অখণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এই উভয় কার্যকেই "এসতেক্সাম বিল-আয্লাম" বলা হয় এবং ইহা হারাম বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (সূরা মায়েদা ১ম রুকু দ্রষ্টব্য)

মোশরেকরা চিত্রে ইব্রাহীমের হাতে এইরূপ একটি তীর দেখাইয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তাহাদের প্রচলিত ঐ রীতি হযরত ইব্রাহীমের নীতি ও আদর্শ। হযরত (সঃ) এই ইঙ্গিতকেই ভিত্তিহীন মিথ্যা গর্হিত বলিয়াছেন। মোশরেকরা হযরত ইব্রাহীমের নামে এইরূপ বহু কুসংস্কার গড়িয়াছিল। উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ আরও একখানা হাদীছ দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৩৭ নম্বরে অনূদিত হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের একটি বিশেষ ঝাড়-ফুঁকের দোয়া ঃ

১৬৩৯। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পৌত্র হাসান এবং হোসাইনকে নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি দ্বারা আল্লাহ তাআলার হেফাযতে সমর্পণ করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের বংশের আদি পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এই দোয়াটি দ্বারা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাককে আল্লাহর হেফাযতে সমর্পণ করিতেন–

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ـ

"আল্লাহ তাআলার মঙ্গল, কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিলাম তোমাদের উভয়কে– সমস্ত শয়তান, ভূত-প্রেত হইতে এবং সাপ-বিচ্ছু, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ হইতে এবং সকল প্রকার বদ নজর হইতে।"

হযরত লূত (আঃ) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামেরই ভাইয়ের ছেলে– ভাতিজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম "হারান্"। তিনি বাল্যকাল হইতে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সাহচর্যে চিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সত্য ধর্ম প্রচারে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হিজরত করতঃ মাতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করিয়া মিসরে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। এমনকি তিনিও হযরত ইব্রাহীমের যুগেই নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

* মেশকাত শরীফে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের নামে আলোচ্য দোয়াটির মধ্যে এই শব্দই বিদ্যমান আছে। অর্থের দিক দিয়া এই শব্দটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। كما শব্দটি দ্বিবাচক। হাসান ও হোসাইন এবং ইসমাঈল ও ইসহাক – দুই দুই জন একত্রে উদ্দেশ্য হওয়ায় হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিবাচক শব্দ كما ই ব্যবহার করিয়াছিলেন। শুধু একটি বালকের উদ্দেশে দোয়া পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে নিয়ম মতে اعيذك (কাফ জবর) এবং একটি বালিকার উদ্দেশে হইল- اعيذك (কাফ জের) পড়িলে উদ্দেশের সহিত শব্দের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

তাঁহারা উভয়েই মিসরে এক সঙ্গে কাজ করার পর মিসর হইতে দুইজন দুই এলাকায় চলিয়া যান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিসর হইতে সিরিয়ার ফিলিস্তিনে চলিয়া আসেন, এমনকি সিরিয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অবশ্য তিনি সিরিয়া হইতে স্বীয় দেশ (বেবিলন–) বাবেলেও তবলীগ কার্যে আসিয়া থাকিতেন।

হযরত লূত (আঃ) মিসর হইতে ঐ এলাকায় আসিয়াছিলেন যাহাকে বর্তমানে জর্দান রাজ্য বা "ট্রান্সজর্দান" বলা হইয়া থাকে। এই এলাকায় "সাদ্দুম" সামক একটি বস্তি ছিল, এই বস্তিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। নিকটবর্তী আরও কতিপয় বস্তি ছিল, এইসব বস্তিতেই তিনি সত্য ধর্মের তবলীগ করিয়া থাকিতেন। ঐ এলাকার লোকদের মধ্যে কুফর, শেরক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে জুলুম, অত্যাচার, পথিক, আগন্তুক, মুসাফির, বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ীগণকে লুণ্ঠন ইত্যাদি সাধারণ অপরাধও অগণিত রকমের ছিল। তাহাদের উল্লেখযোগ্য অপরাধ যাহা মানবতার চরম অবমাননা এবং মান-বৈশিষ্ট্য লজ্জা-শরমের চরম বিপর্যয়কারী কুৎসিত ও ঘৃণিত ছিল– তাহা ছিল এই যে, তাহারা ছেলেদের সঙ্গে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। এই কার্যে তাহারা এতই মত্ত ছিল যে, তাহার মোকাবিলায় নারী-সহবাসও তাহাদের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল এবং তাহারা হাটে-মাঠে, রাস্তা-ঘাটে, মহফিল-মজলিসেও বিনা দ্বিধায় এই কুকর্মে লিপ্ত হইত এবং ভূপৃষ্ঠে তাহারাই ছিল এই কুকর্মের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা। মানবতার এই চরম অবমাননা, লজ্জা-শরমের এই চরম বিপর্যয়ে হযরত লূত (আঃ) তাহাদিগকে অন্যায় অপরাধ বিশেষতঃ এই কুকর্ম হইতে বারণ করিবার শত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব নামিয়া আসিল– ভীষণ তর্জন-গর্জন, ভূকম্প ও উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণের মধ্য দিয়া সমগ্র অঞ্চলের ভূখণ্ডকে উপরের দিকে উঠাইয়া উল্টাইয়া দিয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল; ফলে সব কিছু ধ্বংস হইয়া সম্পূর্ণ এলাকা সাগরে পরিণত হইয়া গেল। আজও মানচিত্রে উহা জর্দানের মধ্যে আরবী ভাষায় بحرميت বাহরে মাইয়্যেত্" বাংলা ভাষায় "মরু সাগর" ইংরেজীতে "Dead sea" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার পরিমাপ এই– দৈর্ঘ্য ৭৭ কিলোমিটার তথা প্রায় ৫০ ইং মাইল, প্রস্থ ১২ কিলোমিটারের কিছু ঊর্ধ্বে প্রায় ৯ ইং মাইল, গভীরতা ৪০০ মিটার প্রায় পোয়া মাইল। পুরাতন ইতিহাসে উহাকে بحر لوط লূত সাগর নামে" আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

চতুর্দিকে স্থলভাগ বেষ্টিত, কোন সাগর মহাসাগরের যোগাযোগ হইতে বহু দূরে অবস্থিত– এই ভৌগোলিক দৃশ্যটি বাস্তবিকই পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করাইয়া থাকে। ১০৩৯–৪০ ইং সনের সমসাময়িক ভূতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক উক্ত সাগরকূল এলাকায় যে খনন কার্য চালান হইয়াছিল এবং তাহাতে যেসব পুরাতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাও উল্লিখিত ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে– সেই ইতিহাস চৌদ্দ শ'ত বৎসর পূর্বে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়াছিল। (কাসাসুল কোরআন খণ্ড– ১ম; পৃষ্ঠা– ২৩১)

পবিত্র কোরআনে লূত আলাইহিস সালামের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ اِنَّكُمْ لَتَاتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ـ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ـ

আর আমি লূতকে এক বিশেষ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি লিপ্ত থাকিবে এই কদর্য ও নির্লজ্জ কাজে, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের আর কেহই করে নাই? কি কুকাণ্ড! তোমরা নারীদেরকে ছাড়িয়া পুরুষের সঙ্গে যৌন কামনা চরিতার্থ কর! অধিকন্তু তোমরা অনাচারী জাতিতে পরিণত হইয়াছ।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ـ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ـ

ঐ লোকগুলির পক্ষ হইতে উত্তর শুধু ইহাই ছিল যে, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, লূত ও তাহার

দলকে বস্তি হইতে দেশান্তরিত কর। তাহারা পবিত্রতাধারী দল সাজিয়াছে।

فَانْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ـ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

অতপর আমি রক্ষা করিয়াছিলাম লূতকে এবং তাঁহার পরিজনকে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পায় নাই; সে আযাবে পতিতদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের উপর ভয়াবহ (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। খোঁজ লও, অপরাধীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা- ৮; রুকু-১৭)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ

লূত (আঃ) যাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা নবীগণের আদর্শকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল। যখন তাহাদের মঙ্গলকামী লূত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সংযত হইবে না কি? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আমি তোমাদের নিকট সত্য পথ বাতলাইবার উপর কোন আজুরা চাই না। আমার আজুরা সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর নিকট পাইব।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ـ

সারা বিশ্বের নজিরবিহীন কাজ- যৌন কামনা চরিতার্থের জন্য তোমাদের প্রভু কর্তৃক সৃষ্ট তোমাদের স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে কুকর্মে তোমরা লিপ্ত থাকিবে কি? শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা ত সীমালঙ্ঘনকারী জাতি হইয়াছ।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ـ

তাহারা হুমকি দিল, হে লূত! তুমি যদি তোমার এই ধরনের প্রচার কার্য হইতে বিরত না থাক তবে নিশ্চয় তুমি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ـ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ

লূত (আঃ) বলিলেন, তোমাদের কার্যের প্রতি আমি চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করি। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এবং আমার পরিজনকে তাহাদের কার্যাবলীর অভিশাপ হইতে রক্ষা করিও।

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ـ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ـ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ـ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاۤءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

সে মতে আমি লুততকে এবং তাঁহার সমস্ত পরিজনকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু লুতের স্ত্রী- বৃদ্ধা রক্ষা পাইল না, সে আযাবে পতিতদের শামিলই থাকিল। তারপর লূত ও তাঁহার পরিজন ভিন্ন অন্য সকলকে

বিধ্বস্ত করিলাম এবং তাহাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; সতর্ককৃত ঐ বস্তিবাসীর উপর বর্ষিত বৃষ্টি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۔ وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۔

নিশ্চয় এই ইতিহাসে উপদেশমূলক নিদর্শন আছে। এতদসত্ত্বেও অনেকেই ঈমান আনে না। (আল্লাহ তাহাদিগকে সময় দিতেছেন;) নিশ্চয় আপনার প্রভু ভীষণ পরাক্রমশালী এবং দয়ালুও।

(সূরা শোআ'রাঃ পারা– ১৯; রুকু– ১৩)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۔ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۔ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۔

এবং লূতকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। স্মরণীয় ইতিহাস– যখন তিনি তাঁহার এলাকার বাসিন্দাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজেই লিপ্ত থাকিবে? অথচ তোমরা ত অজ্ঞান নও। তোমরা স্ত্রীকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে যৌনতা চরিতার্থ কর– কত বড় জঘন্য কাজ! শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা সব কার্যে একেবারেই নাদান।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۔

তাঁহার এলাকার বাসিন্দারা উত্তরে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, লূত পরিবারকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; তাহারা পবিত্রতাশীল দল সাজিয়াছে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۔ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۔

অতপর লূতকে এবং তাঁহার পরিজনকে বাঁচাইয়া নিলাম, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইল না; তাহার আমল অনুযায়ী তাহাকে আযাবে পতিত দলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছিলাম। সেই লোকদের উপর বিশেষ ধরনের (পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সতর্ককৃত লোকগুলির উপর বর্ষিত বৃষ্টি ভয়ঙ্কর ছিল। (পারা– ১৯; রুকু– ১৯)

লূত আলাইহিস সালামের দেশবাসীর উপর আযাবের ঘটনা বৈচিত্র্যময় ছিল। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বয়ানে বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে– কতিপয় ফেরেশতা মেহমানরূপে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন যাঁহাদের সম্মুখে তিনি গো-শাবকের কাবাব পেশ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করায় ইব্রাহীম (আঃ) ভীত হইয়াছিলেন। তাহার পর ফেরেশতাগণ নিজ পরিচয় দানপূর্বক ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ছারাহ (আঃ)-কে পুত্র লাভের সুসংবাদ দিয়াছিলেন, সেই ফেরেশতাগণই ছিলেন হযরত লূতের বস্তিবাসীদের উপর আযাবের বাহক। তাঁহারা যে ঐ বস্তির উপর আযাব বর্ষণে যাইতেছেন তাহা হযরত ইব্রাহীমের নিকটও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) সে সম্পর্কে কথা কাটাকাটি এবং ঐ বস্তিতে হযরত লূতের পরিবারবর্গ সম্পর্কেও প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন।

ঐ ফেরেশতাগণ সুশ্রী বালকবেশে মেহমানরূপে হযরত লূতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লূত (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না; কোথাও গিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া এই সব সুশ্রী যৌবনের কুরি বালকশ্রেণীর বিদেশী মেহমানগণকে দেখিয়া দেশবাসীর চরিত্র ও অভ্যাস স্মরণে চিন্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এদিকে নিজ ঘরেই ইঁদুর– তাঁহার স্ত্রী ছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ অসহযোগী; সে যাইয়া এইসব মেহমান সম্পর্কে দেশবাসীকে খবর দিয়া আসিল। দেশবাসী মাতালের ন্যায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লূত (আঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন; কাহারও

কোন সাহায্য-সহায়তা পাইবার আশা নাই। গুণ্ডারা উপস্থিত হইল। তিনি মেহমানগণকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করিলেন– আপন কন্যাগণকে ঐ গুণ্ডা দলের সর্দারদের বিবাহে দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহারা সব কিছু অগ্রাহ্য করিল এবং একই কথা বলিল যে, আপনি ত জানেন আমরা কি চাই।

হযরত লূতের অবস্থা চরমে পৌঁছিল। তখন ফেরেশতাগণ গোপনে তাঁহার নিকট নিজেদের পরিচয় দান করিলেন এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, আপনি স্বীয় পরিজন ও সঙ্গীগণকে লইয়া রাত্রে রাত্রেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন। ভোর হইতে না হইতেই এই দেশের উপর আল্লাহর আযাব আসিবে; অবশ্য আপনার স্ত্রী যাইবে না; তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিবেন না।

যেসব বদমায়েশ হযরত লূতের বাড়ী চড়াও করিয়াছিল আল্লাহ তাআলা ঐ সময়েই তাহাদের অন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাত্রি অতিবাহিত হইতেই স্থায়ী আযাব সমগ্র এলাকাকে গ্রাস করিল। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা– (পারা– ২৭; রুকু– ৯)

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ....

"বদমায়েশের দল লুত (আঃ)-কে চাপ দিতেছিল তাঁহার মেহমানগণকে হস্তগত করার জন্য; বস্– আমি তাহাদের চক্ষুগুলি নির্বাপিত করিয়া দিলাম; আমার আযাব ও সতর্ককরণের মজা ভোগ কর। আর প্রভাত আরম্ভেই সমগ্র এলাকায় স্থায়ী আযাব আসিয়া গেল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ -

"লূত (আঃ) তাহাদিগকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সতর্ককরণকে সন্দেহ ও দ্বিধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। (পারা–২৭ ; রুকু– ৯)

ফেরেশতাদের পরামর্শ মতে লুত (আঃ) স্বজনগণকে লইয়া সিরিয়া দেশের উদ্দেশে রাত্রেই এই বস্তি ছাড়িয়া গেলেন। প্রভাতে এই এলাকায় ভয়ঙ্কর ভূকম্প-ভূচালের তর্জন-গর্জন আরম্ভ হইল, উপর হইতেও প্রস্তর বর্ষিতে লাগিল, সমগ্র দেশকে উপরে তুলিয়া উল্টাইয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল। প্রভাতেই সমগ্র দেশ ধ্বংস হইয়া দেশবাসী পাপিষ্ঠরা ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল– রহিল শুধু তাহাদের কুৎসিত কলঙ্কের কালিমা রেখা। এই সব কেসসা-কাহিনী বা গল্পের ছড়া নহে, ইহা বাস্তব ইতিহাস। পবিত্র কোরআনে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ - اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ - وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ - فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ - قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ -

লূতকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজে লিপ্ত যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের কেহই করে নাই। পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে কুকর্ম, ডাকাতি এবং প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্মে কি তোমরা ডুবিয়া থাকিবে? দেশবাসীর উত্তর ইহাই ছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তবে আমাদের উপর আল্লাহর গজব নিয়া আস। লূত (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এই দুষ্টদের মোকাবিলায় মদদ করুন। এদিকে যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ (পথিকবেশে) ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন (পুত্রের) সুসংবাদ লইয়া; তখন তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, আমরা হযরত লূতের ঐ বস্তিবাসীদের ধ্বংসের প্রোগ্রাম নিয়া যাইতেছি; ঐ বস্তিবাসীরা স্বৈরাচারী দলে পরিণত হইয়াছে।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظَالِمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, ঐ বস্তিতে ত লূত পয়গম্বরও বাস করেন। তাঁহারা বলিলেন, সেখানে কে কে আছে তাহা আমরা ভালরূপেই অবগত আছি। আমরা তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনের রক্ষার ব্যবস্থা করিব; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী– সে আযাবগ্রস্তদের মধ্যেই থাকিবে।

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوطًا ـ قَالُوْآ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوْا لاَتَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ ـ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلاَّ امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

আমার প্রেরিত ঐ ফেরেশতাগণ যখন লূতের গৃহে উপস্থিত হইলেনম, তখন (যেহেতু তাঁহারা সুশ্রী বালক বেশে ছিলেন এবং লুত (আঃ) তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, তাই) লূত (আঃ) ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফেরেশতাগণ বলিলেন, আপনি শঙ্কিত হইবেন না। আমরা আপনার এবং আপনার পরিজনের রক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয় করিব। অবশ্য আপনার স্ত্রী আযাবে পতিতদের দলভুক্ত রহিয়াছে। নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন এই বস্তিবাসীদের উপর আমরা আসমানী আযাব ফেলিব তাহাদেরই বদকারীর দরুন। নিশ্চয় আমি ঐ বস্তির এমন নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছ যাহা বুদ্ধিমান লোকদে পক্ষে সুস্পষ্ট উপদেশমূলক। (পারা-২০; রুকু-১৬)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ـ قَالُوْآ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ اِلاَّ اٰلَ لُوطٍ ـ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক ফেরেশতা দলের মনোভাব অনুভব করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সম্মুখে আর কি প্রোগ্রাম আছে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা (লূত নবীর বস্তিবাসী) এক অপরাধ-পরায়ণ জাতির প্রতি (তাহাদের ধ্বংস করার জন্য) প্রেরিত হইয়াছি; অবশ্য লূত পরিবারকে বাঁচার সুব্যবস্থা নিশ্চয় করিব, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইবে না। তাহার জন্য আমরা (আল্লাহর আদেশ) সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি, সে আযাবে পতিত দলেই থাকিবে।

فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوطٍ اِلْمُرْسَلُوْنَ ـ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ـ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ـ

প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের গৃহে পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা তোমাদের চিনিতে পারি নাই। তাঁহারা বলিলেন, আমরা অন্য কিছু নহি. বরং আপনার নিকট সেই ব্যাপার নিয়াই আসিয়াছি যেইটা সম্বন্ধে এই দেশবাসী সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে অর্থাৎ আসমানী আযাব। আমরা আপনার নিকট অবশ্যম্ভাবী প্রোগ্রাম লইয়া আসিয়াছি। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ـ

অতএব আপনি স্বীয় পরিজনসহ রাত্রের অংশেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন; আপনি সকলের পিছনে থাকিবেন। আপনার দলের কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়; যথাসত্বর আপনারা আদিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌঁছিবেন। وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ـ

আমি লূতকে এই সিদ্ধান্তও জানাইয়াছিলাম যে, ভোর হইতে না হইতেই এই দেশবাসী সমূলে ধ্বংস হইবে। وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ـ

(ঘটনার প্রথম অংশের বিবরণ–) ঐ দেশবাসীরা (আগন্তুক ছদ্মবেশী যৌবনের কুরি ছেলেদের উদ্দেশ্যে) উল্লাস-স্ফূর্তির সহিত ধাবিত হইল। قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنَ ـ

লূত (আঃ) তাহাদের বলিলেন দেখ! ইহারা আমার মেহমান; তাঁহাদের প্রতি দুব্যবহার করিয়া আমাকে অপমান করিও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আমাকে অপদস্থ করিও না।

قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

তাহারা (লূতের উপর দোষ চাপাইল–) আমরা ত পূর্বেই আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, দুনিয়াভর মানুষের যাহাকে তাকে স্থান দিবেন না। (তাহাদিগকে স্থান না দিলে অপদস্থ হইতেন না)।

قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ

লূত (আঃ) তাহাদের বড়দেরকে ইহাও বলিলেন, আমার কন্যাগণ আছে; তোমারা যদি চাও বিবাহ করিয়া নিয়া যাও; আমাকে অপদস্থ করিও না। لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ

আল্লাহ শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাহারা ত তখন মাতলামির জোশে পাগল হইয়া গিয়াছিল, (এই সব কথা তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবে কিরূপে)? فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ـ

ফলে প্রভাত হইতেই প্রচণ্ড শব্দের গর্জন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِم حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তিকে উল্টাইয়া উপর দিক নীচে, নীচের দিক উপরে করিয়া দিলাম এবং তাহাদের উপর শক্ত কাঁকরে পাথর বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়া ছিলাম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ـ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ـ

এই ঘটনায় তথ্যানুসন্ধানীদের জন্য অনেক কিছু নির্দশন রহিয়াছে এবং ঐ এলাকাটি মক্কাবাসীর সিরিয়া যাতায়াতের রাস্তার উপর অবস্থিত। (পারা– ১৪; রুকু– ৪)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ

ইব্রাহীম যখন (আগন্তুকদের পরিচয় লাভে) নির্ভয় হইলেন এবং পুত্র লাভের সুসংবাদে সন্তুষ্টি লাভ করিলেন, তখন ইব্রাহীম লূতের দেশবাসী সম্পর্কে আমার নিকট পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিলেন ধৈর্যশীল, অতিশয় কোমল হৃদয়, নম্র স্বভাবের।

يَاِبْرَاهِيْمَ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ـ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ـ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ـ

(তখন বলা হইল,) হে ইব্রাহীম! আপনি এই বিষয়ে নিবৃত্ত থাকুন। নিশ্চয় এ সম্পর্কে আপনার প্রভুর অকাট্য ফরমান আসিয়া গিয়াছে এবং লুতের দেশবাসীর উপর অপ্রতিরোধ্য আযাব আসিবেই।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ـ

অতঃপর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন (সুশ্রী বালকবেশে) উপস্থিত হইল লূতের গৃহে তখন তাহাদেরকে নিয়া তিনি বিব্রত হইলেন, দুর্বল ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং হায়-হুতাশ করিয়া বলিলেন, আজিকার দিনটি (আমার পক্ষে) ভয়ানক কঠিন দিন।

وَجَاءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ـ قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ـ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ـ

এদিকে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার গৃহের প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তাহারা পূর্ব হইতেই কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত (আঃ) তাহাদের সর্দারদেরকে বলিলেন, আমার কন্যাগণকে তোমরা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিয়া নিতে পার– তাহারা তোমাদের জন্য বৈধ হইবে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করা হইতে বারণ থাক। তোমাদের মধ্যে একজনও কি সুবোধ মানুষ নাই?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ـ

দেশবাসীরা বলিল, আমাদের প্রয়োজন নাই আপনার কন্যাদের। আমরা কি চাই তাহা আপনি ভাল রূপেই জানেন।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ـ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ ـ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ـ

লূত (আঃ) অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, হায়– যদি তোমাদিগকে শায়েস্তা করার শক্তি আমার থাকিত বা আমি কোন মজবুত পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা পাইতাম! আগন্তুক ফেরেশতাগণ তখন নিজেদের পরিচয় দানে লূত (আঃ)-কে বলিলেন, আমরা আপনার মহান প্রভুর প্রেরিত। এই বদমাশরা আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আপনি নিজ পরিজনকে লইয়া রাত্র থাকিতে এই দেশ হইতে চলিয়া যান এবং আপনাদের কেহ পিছন দিকে ফিরিয়া যেন না দেখে। অবশ্য আপনার স্ত্রী– তাহার উপর পড়িবে সেই আযাব যাহা দেশবাসীর উপর আসিবে।* তাহাদের জন্য নির্ধারিত সময় হইল প্রভাত। প্রভাত কি অতি নিকটবর্তী নহে?

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ـ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ـ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) অতঃপর যখন উপস্থিত হইল আমার ফরমান তখন ঐ দেশটাকে উল্টাইয়া উপরকে নীচ নীচকে উপর করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন ঐ বস্তিবাসীদের উপর পাথর বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলাম;

* হযরত লুৎ আলাইহিস সালামের স্ত্রী আযাব হইতে রক্ষা পাইল না– যেরূপ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের স্ত্রীও আযাব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল না। নিজে কাফির হইলে কাহারও কোন সম্পর্ক যে নাজাতের জন্য ফলপ্রদ হয় না তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুই নারীর ঘটনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিশেষরূপে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার বিবরণ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

পাথর খণ্ডগুলি বৃষ্টির ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল; ঐ পাথর আপনার প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য নিদর্শনযুক্ত ছিল। ঘটনাস্থল ঐ বস্তি মক্কার স্বৈরাচারীদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে (তাহা দেখিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে)। (সূরা হুদঃ পারা-১২ রুকু-৭)

হযরত ইসমাঈল (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। তাঁহার বংশধর হইতে একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। বায়তুল্লাহ শরীফ তৈয়ার করিতে ইসমাঈল (আঃ) স্বীয় পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে একত্রে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিয়াছিলেন- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ .

"হে আমার প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজন রসূল পাঠাইও-যিনি তাহাদিগকে তোমার কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন,

ঐ কিতাবের বিস্তারিত শিক্ষা এবং কর্ম জ্ঞান দান করিবেন। শরীয়ত তথা আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদের ভিতর, বাহির, বাহ্যিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্ন তথা চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান সুকৌশলী- তুমি সব কিছু করিতে পার।"

ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) উভয়ের মিলিত এই দোয়ায় প্রার্থনীয় রসূলই হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। এই বিষয়টি এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে- "আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের দোয়ারই বাস্তবরূপ।" এই হাদীছে আলোচ্য আয়াতের দোয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের পর দুনিয়াতে বহু সংখ্যক রসূলের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ সাব্যস্ত করা হইল। অন্য কোন রসূলকে সাব্যস্ত করার মধ্যে অসুবিধা এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে মিলিতভাবে বলিয়াছিলেন- "আমাদের বংশধর হইতে"। অতএব এই দোয়ার রূপে রূপায়িত ঐ রসূলই হইতে পারেন যিনি বংশীয় সূত্রে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের পূর্ববর্তী নবীগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশ হইতে ছিলেন; ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে কোন নবী আসেন নাই; একমাত্র সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বংশের ছিলেন। অতএব হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল উভয়ের মিলিত বংশের রসূল একমাত্র সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ই ছিলেন, তাই তিনিই উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ হিসাবে নির্ধারিত।

হযরত ইসহাক (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র- যিনি তাঁহার বিবি ছারাহ্ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহার তরফে ছিলেন, তিনিই ইসহাক (আঃ)। তাঁহার জন্মের পূর্বেই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাঁহার শুভাগমন সম্পর্কে তাঁহার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ও মাতা ছারাহ্ (রাঃ)-কে সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি যে পূর্ণ বয়সপ্রাপ্তির সুযোগ পাইবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ এই সুসংবাদও দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম হইবে "ইয়াকুব"। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা হযরত ইব্রাহীমের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)

হযরত ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আঃ), তাঁহার সময়কাল খৃষ্ট সনের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে। তাঁহার আর এক নাম ছিল 'ইসরাঈল"। ইহা ইবরানী ভাষা- "ইছরা" শব্দ আরবী "আব্দ" শব্দের অর্থে এবং "ঈল্" "আল্লাহ" অর্থে। এই সূত্রে 'ইসরাঈল" অর্থ "আবদুল্লাহ"-আল্লাহর বান্দা বা দাস।

এই নামের সূত্রে তাঁহার বংশধরকে "বনী ইসরাঈল" ইসরাইলের তথা ইয়াকুবের বংশধর বলা হয়। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে বিশ্বের বিশেষতঃ আরবের দুইটি বিশেষ সম্প্রদায়– ইহুদী ও নাসারা উক্ত বনী ইসরাঈল নছলেরই ছিল এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনাবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ নবী মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) তাহাদের মধ্য হইতে ছিলেন। তাই অনেক অনেক ঘটনার সংশ্লিষ্টে পবিত্র কোরআনের অগণিত স্থানে বনী ইসরাঈলের উল্লেখ ও সম্বোধন রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের জন্মদেশ ইরাক ছিল বটে, কিন্তু তথা হইতে হিজরত করতঃ তিনি অবশেষে সিরিয়ার ফিলিস্তিনে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইসহাক (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁহার বংশধর বনী ইসরাইলও সিরিয়ার বাসিন্দাই ছিলেন। এই সূত্রে বনী ইসরাঈলগণ মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসী ছিল। হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ (আঃ) ভাগ্যচক্রে মিসরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঘটনার বিবর্তনে তিনি মিসরের অধিপতি হইয়া স্বীয় মাতা-পিতা ও ভাই বোনদেরকে মিসরে নিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে এশিয়ার অন্তর্গত সিরিয়া হইতে বনী ইসরাঈলদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার অন্তর্গত মিসরে চলিয়া আসিলেন, তথায় তাঁহাদের আবাদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বহু যুগ অতিক্রমের পর সেই মিসরে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হইল। তিনি তৎকালীন মিসর অধিপতি ফেরাউনের কবল হইতে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার জন্য তাহাদিগকে লইয়া মিসর হইতে সিরিয়া আসিয়াছিলেন; যেই ঘটনা সংশ্লিষ্টেই ফেরআউন ধ্বংস হইয়াছিল। এইভাবে বনী ইসরাঈলরা সিরিয়ায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল এবং তাহারা মিসরেরও মালিক হইয়াছিল। এই সব ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে; হযরত মূসা (আঃ)-এর বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ তাআলা উদ্ধৃত হইবে।

হযরত ইসুফ (আঃ)

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হযরত ইউসুফের ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সর্বাধিক সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত ঘটনা। এই ঘটনার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, পবিত্র কোরআনে অন্যান্য নবীগণের ঘটনা টুকরা টুকরা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; পূর্ণ ঘটনা একত্রে উল্লেখ হয় নাই। হযরত ইউসুফের ঘটনা সুদীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ঘটনা একত্রে ধারাবাহিকরূপে উল্লেখ হইয়াছে। পবিত্র কোরআন এই ঘটনাকে احسن القصص অতি উত্তম কাহিনী বা ইতিহাস নামে আখ্যায়িত করিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাস এমনই এক বিচিত্রময় ইতিহাস যে, তাহার মধ্যে উপদেশমূলক বহু উপাদান এবং আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁহার ভাইদের ঘটনায় (উপদেশ লাভের, আল্লাহর কুদরতের এবং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সত্যবাদিতার) বহু নিদর্শন রহিয়াছে– বিশেষতঃ জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য।"

ইহুদীরা মক্কাবাসীদের পরামর্শ দিয়াছিল যে, নবুয়ত ও অহী প্রাপ্তির দাবীদার মুহাম্মদকে ইউসুফ নবীর ইতিহাস জিজ্ঞাসা কর যাহা এমন ইতিহাস যে, আসমানী এলম ছাড়া তাহা কঠিন। অতএব এই প্রশ্নের দ্বারাই মুহাম্মদের সত্য-মিথ্যার প্রমাণ হইয়া যাইবে। সেমতে তাহাই করা হইল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই হযরত ইউসুফের পূর্ণ ইতিহাস সম্বলিত এই সুদীর্ঘ সূরা নাযিল হইয়াছিল। অতএব এই বিবরণ প্রশ্নকারীদের পক্ষে বিশেষরূপে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। আর এই ঘটনা

বিশেষরূপে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, "আল্লাহ যাকে চান বাঁচাইতে কে পারে তাকে মারিতে? এবং আল্লাহ যাহাকে চান উঠাইতে কে পারে তাহাকে নামাইতে?

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের যেসব নিদর্শন রহিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। হযরত ইউসুফের ভাইগণ তাঁহাকে প্রাণে বধ করার জন্য অন্ধ কূপে ফেলিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্রীতদাসরূপে মিসরের বাজারে বিক্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মিসর অধিপতি বানাইয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্রময় কুদরতের লীলার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাসের জন্য অন্য কোন বই-পুস্তক বা গ্রন্থের আবশ্যক নাই, পবিত্র কোরআনের বিবরণই যথেষ্ট। অতএব এ স্থানে পবিত্র কোরআনের বিবরণের অনুবাদই করা হইবে, অবশ্য সংক্ষিপ্ততার জন্য আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হইবে না। ১২-১৩ পারা- সূরা ইউসুফের মধ্যে সমস্ত আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বিভিন্ন স্ত্রীর পক্ষ হইতে বার জন ছেলে ছিল; তন্মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনইয়ামীন এই দুই জন এক মাতার ঔরসের ছিলেন, অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিভিন্ন মাতার পক্ষের ছিলেন। ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ এবং তাঁহার সূত্রে তাঁহার ভ্রাতা বিনইয়ামীনকে সর্বাধিক ভালবাসিতেন। ইউসুফের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অতিমাত্রায় ছিল এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ইউসুফের উপর নূরে নবুয়তের যে উজ্জ্বল আভা ছিল তাহা হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলেন- যাহা অন্য আর কোন পুত্রের উপর ছিল না। এতদ্ভিন্ন বাল্যকালেই তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এত অধিক ভালবাসিতেন। তদুপরি ইউসুফের একটি স্বপ্ন, যাহা তাঁহার প্রাধান্যতার পূর্বাভাস এবং স্পষ্ট প্রমাণ ছিল, তাহার দরুন সেই ভালবাসা আরও অধিক হইয়া গেল।

ইউসুফের প্রতি পিতার এই ভালবাসা অন্যান্য বড় ভাইদের পক্ষে বিষতুল্য পরিগণিত হইল। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সুদীর্ঘ ঘটনার সূচনা ইহা হইতেই।

সূরা ইউসুফের অনুবাদ

ভূমিকা ঃ আলিফ লা-ম্-রা- (এ স্থানে তোমাদের সম্মুখে যাহা পেশ করা হইবে-) এই সব এমন এক কিতাবের আয়াতসমূহ যে কিতাবের সত্যতা অকাট্যতা ও বিবরণ অতি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট। আমি তাহাকে আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাযিল করিয়াছি যেন (তাহার প্রথম সম্বোধক) তোমরা (আরববাসী) সহজে ও ভালরূপে বুঝিতে পার (তোমাদের মাধ্যমে সারা বিশ্ব তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে)। এই কোরআনের অহী মারফত আমি আপনাকে এক উত্তম কাহিনী বয়ান করিয়া শুনাইব, অবশ্য আপনিও ইতিপূর্বে উহার খবর রাখিতেন না।

ঘটনার প্রকাশ্য সূচনা

একদা ইউসুফ স্বীয় পিতাকে বলিলেন, আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যকে আমার সম্মুখে নত হইতে দেখিয়াছি। এতদশ্রবণে পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন প্রকাশ করিও না, নতুবা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তোমাকে আল্লাহ তাআলা যেরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, বাস্তবেও) তদ্রূপ তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার (শ্রেষ্ঠত্ব দান করতঃ) বিশেষত্ব প্রদান করিবেন এবং বিশেষরূপে তোমাকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার গভীর জ্ঞানদান করিবেন এবং আরও নেয়ামত (তথা নবুয়ত) দানপূর্বক তোমার উপর এবং ইয়াকুবের বংশধরের উপরে নেয়ামতদান কার্য সম্পন্ন করিবেন; যেরূপ তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর করিয়াছিলেন। তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা- সুকৌশলী।

ঘটনার আরম্ভ

বাস্তবিকই ইউসুফ ও তাঁহার ভাইদের ঘটনায় বহু নিদর্শন ছিল জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য। একদা ভ্রাতাগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া বলিল, ইউসুফ ও তাঁহার ভ্রাতা "বিনইয়ামীন"ই আমাদের পিতার অধিক ভালবাসার পাত্র, অথচ (আমরা শক্তিশালী এবং সংখ্যায় বেশী) আমরা হইতেছি একটি দল! (আমাদের দ্বারা পিতার স্বার্থ অধিক উদ্ধার হইতে পারে, তবুও পিতা তাহাদেরকে অধিক ভালবাসেন,) নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলে আছেন।

অতএব সকলের প্রচেষ্টায় ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেলা হউক কিম্বা কোন দূরদেশে ফেলিয়া আসা হউক; ইহাতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হইবে এবং এই ব্যবস্থাবলম্বনে তোমাদের সব কিছু শোধরাইয়া যাইবে।

তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ইউসুফকে প্রাণে বধ না করিয়া কোন একটি অন্ধকূপে ফেলিয়া দেওয়া হউক; (পার্বত্য অঞ্চলের কূপের পানি কম হয়, তাই সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে এবং) কোন পথিক তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবে। যদি তোমরা কিছু করিতে ইচ্ছা কর তবে এই ব্যবস্থাবলম্বন কর। (এই কথার উপর সকলে একমত হইয়া তাহা বাস্তবায়নের তদবীরে লাগিয়া গেল)।

ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে ফেলিবার ঘটনা

একদা ভ্রাতাগণ সকলে মিলিতভাবে পিতার নিকট বলিতে লাগিল, আপনি ইউসুফ সম্বন্ধে আমাদের উপর আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করেন না কেন? অথচ নিঃসন্দেহে আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব তাহাকে আগামীকল্য আমাদের সঙ্গে যাইতে দিবেন; সে আমাদের সঙ্গে (জঙ্গলে যাইয়া) ফল-ফলারি খাইবে এবং খেলাধুলা করিবে; আমরা তাহার হেফাজত করিব নিশ্চয়।

পিতা বলিলেন, এই ভাবিয়া আমি নিশ্চয় চিন্তিত হই যে, তোমরা ইউসুফকে আমার চোখের আড়ালে লইয়া যাইবে এবং আশঙ্কাও করি যে, তোমাদের উদাসীনতার সুযোগে (জঙ্গলে) তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলে নাকি!

তাহারা বলিল, আমাদের একদল মানুষ থাকা সত্ত্বেও যদি তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিতে পারে তবে ত আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না।

যখন তাহারা ইউসুফকে (নিজেদের নির্ধারিত স্থানে) নিয়া গেল এবং তাঁহাকে অন্ধকূপের তলদেশে ফেলিবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিল, তখন আমি ইউসুফকে গোপন সূত্রে জ্ঞাত করিলাম, (তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহাদের এই সব তদবীর সত্ত্বেও তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, এমনকি এইরূপ দিনও আসিবে যে, তাহাদের উপর তোমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং) তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই অপকর্মের বিবরণ জানাইয়া তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবে। এখন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না (অতঃপর তাহারা ইউসুফকে অন্ধকূপে নামাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল)।

পিতার নিকট ভাইদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা

ভ্রাতাগণ সন্ধ্যার পর কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, বাবাজান! আমরা সকলে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মাল-সামানার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম; ইত্যবসরে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে– আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হইয়া থাকি। আর তাহারা ইউসুফের জামার উপর মিথ্যা রক্ত (তথা অন্য কিছুর রক্ত) মাখাইয়া নিয়া আসিল। (খোদার লীলা– তাহার জামাটিকে বাঘে খাওয়া মানুষের জামার ন্যায় ছিড়িয়া ফাঁড়িয়া লয়

নাই, তাহা ছিল সম্পূর্ণ আস্ত– ইহা লক্ষ্য করিয়া) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন (তাহাকে বাঘে খায় নাই), বরং তোমরাই নিজে নিজে একটা কথা গড়িয়া লইয়াছ; অতএব পূর্ণ ধৈর্যধারণ ছাড়া আর আমার গতি কি? আর তোমরা যাহা বলিতেছ সেই ব্যাপারে আল্লাহই হইতেছেন সাহায্য প্রার্থনার স্থল।

কূপ হইতে ইউসুফের বাঁচিয়া আসার ঘটনা

এদিকে একদল সওদাগর পথিক কূপটির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের পানিবাহক ভিশ্‌তীকে পানি আনিবার জন্য ঐ কূপে পাঠাইল; সে ঐ কূপে ডোল ফেলিল। (বালক ইউসুফ ঐ ডোল ধরিয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল যে, এ দেখি একটি বালক। দলের লোকগণ ইউসুফকে লাভজনক বস্তুরূপে গোপন রাখিল যেন কেহ খোঁজ পাইয়া দাবী না করে)। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের সর্ব কার্যকলাপ জ্ঞাত হইতেছিলেন। (সওদাগর দল ইউসুফকে লইয়া মিসর পৌঁছিল) এবং তাঁহাকে কম মূল্যে– মাত্র কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিল। তাহারা (ইউসুফকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই তাহারা) তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল না।

মিসরে ইউসুফের প্রাথমিক অবস্থা

মিসরে যে ব্যক্তি ইউসুফকে ক্রয় করিল (সে ছিল মিসরের উজিরে আযম তথা প্রধান শাসনকর্তা এবং সে নাকি নিঃসন্তান ছিল); সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, বিশেষ সুনজরের সহিত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; হয়ত আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা তাহাকে ছেলে বানাইয়া নিব। এইরূপে মিসরে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত (করার সূচনা) করিলাম। এইসব করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, (তাঁহাকে নবুয়ত দেওয়া হইবে মোজেযা স্বরূপ) আমি তাঁহাকে স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান দান করিব। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা নিজ কার্যে ও ইচ্ছা প্রয়োগে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক সে সম্পর্কে অজ্ঞ। (আল্লাহ তাআলার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন– তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ইউসুফের ঘটনা। ইউসুফ নিরুপায় নিঃসহায়রূপে কূপে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বাজারে বিক্রীত হইল। আল্লাহ তাআলার কুদরতের লীলা– সেই ইউসুফকে শুধু ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতই করিলেন না, বরং আল্লাহ বলেন,) অতপর যখন ইউসুফ পূর্ণ বয়সে পৌঁছিলেন তখন আমি তাঁহাকে এল্‌ম এবং হেকমত দান করিলাম। (তথা শরীয়তের জ্ঞান এবং নবুয়ত দান করিলাম)। সৎ ও খাঁটী কর্মশীল ব্যক্তিবর্গকে আমি এইরূপে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (যেই ইউসুফ মিসর রাজ্যের ক্ষমতাসীন, শরীয়তের জ্ঞানী এবং নবুয়তের আসনে আসীন হইয়াছেন, সেই ইউসুফের প্রথম জীবনের কাহিনী কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার সেই জীবনের দুঃখ-যাতনা ভোগের বৈচিত্র্যময় ধারাবাহিক বিবরণ আরও শুন–)

ক্রেতার গৃহে ইউসুফের দারুন পরীক্ষা

(মিসরের উজিরে আযম যিনি ইউসুফকে খরিদ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট রাখিয়াছিলেন। ইউসুফ যখন যৌবনে পড়িলেন তখন) ঐ মহিলা যাহার গৃহে ইউসুফ বসবাস করিতেন অর্থাৎ উজিরে আযমের স্ত্রী), সে-ই ইউসুফকে নিজের প্রতি ফুসলাইতে লাগিল, এমনকি একদিন ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, হে ইউসুফ! আমি তোমাকে বলি– তুমি আমার প্রতি আস। (আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে কোন পরিস্থিতিই মানুষকে বিপথগামী করিতে পারে না, তাহার এক বিরাট নমুনা স্থাপন করিয়াছিলেন ইউসুফ (আঃ)। ইউসুফ (এইরূপ পরিস্থিতিতেও পরিষ্কার) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে কত উত্তম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! এমন উপকারী জন প্রভুর আদেশ বিরোধী ও অসন্তুষ্টির কাজ করার ন্যায় অন্যায় অপরাধ আর কি হইতে পারে?) ইহা সুনিশ্চিত যে, অন্যায়কারীর ভালাই কখনও হয় না।

(কি সাংঘাতিক পরিস্থিতি ও অগ্নিপরীক্ষা! একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি লক্ষ্য রাখাই এই পরিস্থিতিতে ইউসুফকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে)। স্ত্রীলোকটির অন্তরে ত ইউসুফের প্রতি অভিলাষ পূর্ণ মাত্রায় গাঁথিয়া গিয়াছিলই; যদি ইউসুফ স্বীয় প্রভুর অভিজ্ঞান (তথা ইহা যে, গোনাহর কাজ, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজ তাহা) প্রত্যক্ষ না করিতেন তবে তাঁহার অন্তরেও খেয়াল সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র ছিল না।* আমি ইউসুফকে এই ধরনের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য ছিল– তাঁহাকে মন্দ, নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজ– ছোট বড় সমস্ত গোনাহ হইতে অস্পৃশ্য রাখা। তিনি আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

(আবদ্ধ দরজার ভিতরে যে উদ্দেশের প্রতি ইউসুফকে ডাকা হইতেছিল,) ইউসুফ তাহা হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) দরজার প্রতি দৌড়িয়া ছুটিলেন, স্ত্রীলোকটিও তাঁহার পেছনে ছুটিল, পিছন হইতে জামা টানিয়া ধরিলে তাহা ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ে দৌড়িয়া দরজার বাহিরে গৃহস্বামীকে উপস্থিত পাইল।

ইউসুফের প্রতি চরম আঘাত কিন্তু সত্যের জয়

(গৃহস্বামীকে উপস্থিত দেখা মাত্র) স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে জেল ভোগ বা কঠিন শাস্তি ভোগ ছাড়া তাহার সাজা কি হইতে পারে? (অর্থাৎ ইউসুফ আমার সঙ্গে কুকর্ম করিতে চাহিয়াছিল; তাহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক)। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, (আমি অপরাধী নহি, বরং) সে-ই নিজে আমার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য আমাকে ফুসলাইতেছিল। এই সম্পর্কে ঐ স্ত্রীলোকটির আপন জনের মধ্য হইতে একজন (অভিনব ধরনের) সাক্ষ্যদাতা (দুগ্ধপোষ্য শিশু ইউসুফের সত্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিল, যদি ইউসুফের জামা সম্মুখ দিকে ছিড়া হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তাঁহার জামা পিছন দিকে ছিড়া হয় তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী এবং ইউসুফ সত্যবাদী সাব্যস্ত হইবেন।

যখন গৃহস্বামী দেখিতে পাইল যে, ইউসুফের জামা পিছনের দিক হইতে ছিঁড়া তখন স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, ইহা তোমাদের নারী জাতির ধূর্ততা। তোমাদের ধূর্ততা বাস্তবিকই অতি সাংঘাতিক। (ইউসুফ (আঃ) কে বলিলেন,) হে ইউসুফ! যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য মনে কিছু করিও না। (স্ত্রীকে ইহাও বলিলেন যে,) তুমি নিজের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; বস্তুত তুমিই অপরাধিনী।

* বস্তুত যেকোন রকম পরিস্থিতিতে যত অভিলাষপূর্ণ গোনাহই হউক না কেন আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে ঐ গোনাহের প্রতি আকর্ষণ মোটেই জন্মিতে পারে না। মানুষ তাহার অন্তরে ঈমান তথা আল্লাহর বিশ্বাস ও ভয় থাকাবস্থায় যেনা–ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান ইত্যাদি কোন গোনাহতেই লিপ্ত হইতে পারে না। অতএব মানুষের অন্তরে আল্লাহর বিশ্বাস ও ভয় সৃষ্টি করাই হইল অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করার একমাত্র উপায়, অন্য কোন উপায়ে যে তাহা সম্ভব নহে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান জগতের অবস্থা, যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ইউসুফ (আঃ) এই পরিস্থিতিতে একটি অতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, তিনি দরজা বন্ধ দেখিয়া হাতা-পা ছাড়িয়া নিষ্কর্মারূপে বসিয়া থাকেন নাই, বরং যেস্থানে তিনি ছিলেন ঐ স্থান হইতে যেহেতু দরজা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিতে সামর্থ্যবান ছিলেন। কোন বাধা ছিল না, তাই তিনি সামর্থজনক কর্তব্যটুকু পালন করিতে ইতস্তত না করিয়া সম্মুখপানে দৌড়িলেন; অমনিই আল্লাহর রহমতে বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। এই দৃষ্টান্তটিকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এক সুন্দর উপদেশমূলক কথা বলিয়াছেন–گرچه رخنه نیست عالم راپدید # خیر یوسف وارمیباید دوید

"নিজকে রক্ষা করার জন্য যদি জগতের সমস্ত পথও বন্ধ দেখ– কোন দিকে ছিদ্র না দেখ ,তবুও কিন্তু খবরদার! তুমি হতাশ হইয়া হাত-পা গুটাইয়া নিজকে কলুষে ফেলিও না, বরং ইউসুফের ন্যায় খারাপ কাজ– আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাঁচিবার উদ্বেগ লইয়া সম্মুখপানে ছুটিতে থাক।"

এই ব্যবস্থাবলম্বনে আল্লাহ তাআলার রহমতের সাহায্যে সহজে অধিক সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। এক হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি এক হাত অগ্রসর হইব, সে এক হাত অগ্রসর হইলে আমি তাহার প্রতি এক বাও অগ্রসর হইব। যে আমার প্রতি হাঁটিয়া অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইব যে, দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইব।

(এদিকে ঘটনা গোপন রহিল না– জানাজানি হইয়া গেল, এমনকি) শহরের কতিপয় নারী (দোষারোপ করতঃ) বলিল, আজীজের (তথা উজিরের আজমের) স্ত্রী তাহার পরিচারককে ফুসলাইয়া থাকে তাহার হইতে মতলব সিদ্ধির জন্য; পরিচারকের প্রতি আসক্তি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে ঘর করিয়া নিয়াছে; আমরা তাহাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত মনে করি। আজীজের স্ত্রী তাহাদের ঐ দোষারোপ শুনিতে পাইয়া তাহাদের নিকট নিমন্ত্রণ পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য ছুরি-চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার মত খাদ্য সামগ্রী ফলের ব্যবস্থা রাখিল। তাহারা উপস্থিত হইলে পর তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানা ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, তুমি একটু তাহাদের সম্মুখে আসিয়া যাও। (বস্তুতঃ ছিলেন এত সুশ্রী সুন্দর ছিলেন যে,) তাহারা যখন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহাদের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল, এদিকে তাহাদের হাত কাটিয়া গেল এবং তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, সোবহানাল্লাহ্– এ ত মানুষ জাতীয় নহে– এ ত উচ্চ মর্যাদাবান ফেরেশতা ভিন্ন আর কিছু নহে। তখন আজীজের স্ত্রী নিজের ওজর প্রকাশ করতঃ বলিল, এ-ই সেই ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলে। শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাকে ফুসলাইতেছি সত্য, কিন্তু সে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র রহিয়াছে। আগামীতেও যদি সে আমার আদেশ পুরা না করে, নিশ্চয় তাহার কারাবরণ করিতে হইবে এবং অপদস্থ হইতে হইবে। (নিমন্ত্রিত নারীরাও হযরত ইউসুফকে পরামর্শ দিল যে, তুমি তোমার গৃহকর্ত্রীর কথা রক্ষা কর)।

ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এক বিরাট আদর্শ স্থাপন

এই পরিস্থিতি এবং এই হুমকি-ধমকি! এর মোকাবিলায় ইউসুফ (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে এবং সারা বিশ্বের জন্য এক যুগান্তকারী উপদেশরূপে পরিগণিত হইবে। তাঁহার তৎকালীন বলিষ্ঠ উক্তি পবিত্র কোরআনের ভাষায় শুনুন। তিনি বলিলেন–

"হে আমার প্রভূ-পরওয়ারদেগার! জেলখানা ও কারাগার আমার নিকট শ্রেয় ঐ কার্য অপেক্ষা যে কার্যের প্রতি এই নারীগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে। প্রভু! তুমি আমাকে তাহাদের ফন্দি-ফেরেব হইতে বাঁচাইয়া রাখ; যদি তুমি আমাকে বাঁচাইয়া না রাখ তবে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে পারি এবং অজ্ঞানদের দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারি।

(ইউসুফের আন্তরিকতা ও কাকুতি-মিনতির) ফলে তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগার তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন এবং নারীদের ফন্দি-ফেরেব তাঁহার উপর ক্রিয়াশীল হইতে দিলেন না; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী এবং জ্ঞাত।

ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ

(ইউসুফ আলাইহিস সালামের সততা ও সত্যতা অকাট্যরূপেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত ছিল, কিন্তু আজীজ তথা উজিরে আযমের পরিবার সম্পর্কে একটা খারাপ চর্চা হইতে লাগিল, সুতরাং) অতপর ইউসুফের সততা ও সত্যতার বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও (ঐ চর্চা বন্ধ করার জন্য) সকলে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, ইউসুফকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে দেওয়া হউক।

জেলখানার মধ্যে তওহীদের তবলীগ

ইউসুফ (আঃ) যখন কারাগারে গেলেন তখন (রাজ্যপতির) দুই জন পরিচারক (রাজার পানাহারে বিষ মিশ্রণ করার অভিযোগে) কারাগারে পতিত হইল। (পরিচারকদ্বয় একদা একটি স্বপ্ন দেখিল। তাহারা হযরত

ইউসুফের জ্ঞান-গুণ এবং নূরানী চেহারায় তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট ছিল, তাই তাঁহার নিকট স্বপ্ন ব্যক্ত করতঃ) তাহাদের একজন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন আঙ্গুর হইতে চাপিয়া রস বাহির করিতেছি। (বস্তুতঃ ছিলও সে রাজার পানীয় সংগ্রহকারক)। অপরজন বলিল, আমি দেখিয়াছি, আমি যেন মাথায় রুটির বোঝা উঠাইয়া রাখিয়াছি, আর কতকগুলি পাখী তাহা খাইতেছে। স্বপ্ন বর্ণনান্তে তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিন। আমরা আপনাকে সৎ-সাধু লোক গণ্য করি। (এই সুযোগে) ইউসুফ (আঃ) তাহাদিগকে (তওহীদের দাওয়াত দিবেন, তাই তাহাদিগকে অধিক আকৃষ্ট করার জন্য) বলিলেন, (আমি স্বপ্নের অর্থ ভালরূপেই বলিতে পারিব; আমাকে ত আল্লাহ তা'আলা এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যে,) তোমাদের খাদ্য যাহা তোমাদিগকে আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা তোমাদের নিকট পৌঁছিবার (এবং তাহা দৃষ্টিগোচর হইবার) পূর্বেই আমি তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে পারি; এই অসাধারণ বিদ্যা ও অভিজ্ঞান আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত।

আমি তোমাদিগকে একটি বিশেষ কথা শুনাইতেছি– আমি এইরূপ লোকদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, পরকালকেও অস্বীকার করে। পরন্তু আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মতবাদের অনুসারী। আমাদের জন্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করি। (এই সত্যের সন্ধান লাভ) ইহা হইতেছে আমাদের ও বিশ্বমানবের উপর আল্লাহর একটি অনুগ্রহ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক লোক এই নিয়ামতের কদর বা মূল্য দান (তথা তাহাকে গ্রহণ) করে না।

হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! বল দেখি– বিভিন্ন প্রভু গ্রহণ করা ভাল, না এক অদ্বিতীয় পরম পরাক্রমশালী আল্লাহকে মাবুদরূপে এককভাবে গ্রহণ করা ভাল?

তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যত কিছুর উপাসনা কর (সে সবই অবাস্তব–) সেগুলির আছে শুধু নাম, যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা নির্ধারিত করিয়াছ, আল্লাহ এগুলি সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেন নাই।

জানিয়া রাখ, হুকুমের মালিক আর কেহ নাই এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না– ইহাই হইতেছে সঠিক ও সুদৃঢ় ধর্ম, কিন্তু অনেক লোক তাহা বুঝে না।

অতপর তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলিলেন– হে আমার সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন– (যে প্রথম দেখিয়াছে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে এবং তাহার চাকুরী বহাল থাকিবে; ফলে) সে রাজাকে (পূর্বেরমত) সুরা পান করাইবার কাজ করিবে। দ্বিতীয় জন– (যে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখিয়াছে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়া) তাহার শূলদণ্ড হইবে এবং (শূলীকাষ্ঠে) পক্ষীদল তাহার মাথার মগজ খাইবে। তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহার ফয়সালা ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে।

ইউসুফের কারাগার হইতে বাহির হওয়ার সূচনা

(আসামীদ্বয়ের মধ্যে) যাহার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, (নির্দোষী সাব্যস্ত হইয়া) খালাস পাইবে তাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়া দিলেন, তোমার মনিব– রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও। (অতঃপর তাহাই হইল যে, ঐ ব্যক্তি খালাস পাইয়া চাকুরীতে পুনঃ বহাল হইল, কিন্তু) তাহার মনিব তথা রাজার নিকট যে, ইউসুফের উল্লেখ করিবে তাহা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিল, ফলে ইউসুফ আরও কতক বৎসর কারাগারে রহিলেন।

তারপর একদা রাজা বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরু– এগুলিকে অন্য সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গরু খাইয়া ফেলিতেছে। আরও দেখিলাম, সাতটি তাজা সবুজ রঙ্গের শস্য ছড়া আর সাতটি শুষ্ক। শুষ্ক

সাতটি সবুজ সাতটি ছড়ায়ে জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে (রাজা তাহার এই স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া বলিলেন,) হে আমার দরবারস্থ লোকগণ! তোমরা আমার এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দাও যদি তোমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভ্যস্ত হও।

উপস্থিত সকলে বলিল, এইগুলি হইতেছে বিবিধ জল্পনা-কল্পনার সমষ্টিগত (বাস্তবহীন) স্বপ্ন। অধিকন্তু আমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ নহি। (পূর্বোল্লিখিত আসামীদ্বয়ের যেব্যক্তি খালাস পাইয়াছিল (–যাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তোমার মনিব রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল) এবং অনেক দিন পর (রাজার এই স্বপ্নের ঘটনা উপলক্ষে স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ ইউসুফের কথা) স্মরণ হইল, সে বলিল, আপনাদিগকে আমি এই স্বপ্নের অর্থ জানাইতে পারিব, আমাকে (কারাগারে একজন লোকের নিকট) পাঠাইয়া দিন (তাহাই করা হইল)।

(সে কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,) হে ইউসুফ! হে সত্যের প্রতীক! আমাদিগকে তাবীর দান করুন এই স্বপ্ন সম্পর্কে– সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরুকে জীর্ণ-শীর্ণ সাতটি গরু খাইয়া ফেলিতেছে এবং সাতটি তাজা সবুজ শস্য ছড়াকে অপর সাতটি শুষ্ক ছড়া জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। এই স্বপ্নের অর্থ কি তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন, আমি লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদেরকে বলিব– তাহারাও জানিয়া যাইবে।

(ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া) হযরত ইউসুফ বলিলেন, এই দেশে তোমরা অনবরত সাত বৎসর ফসল বপন করিতে থাক (এই সাত বৎসর ফসল ভাল জন্মিবে)। এবং শস্য কাটিয়া আনিবার পর তাহা ছড়া ও গুচ্ছের মধ্যেই থাকিতে দিবে, অল্প কিছু মাড়াইয়া লইবে, যে পরিমাণ আহারের আবশ্যক মনে কর। (অবশিষ্ট ফসলগুচ্ছ ছড়াসহ গুদামজাত করিয়া রাখিবে। কারণ,) এর পরই সাতটি বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষের আসিবে; প্রথম সাত বৎসরের রক্ষিত সমুদয় ফসল এই সাত বৎসরে খাইয়া নিঃশেষ করিবে; শুধু কেবল অল্প পরিমাণ যাহা (অতি কষ্টে) সামলাইয়া রাখিবে (জমিতে বপনের জন্য)। দ্বিতীয় সাত বৎসর পর আবার সুদিন আসিবে যাহাতে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির সাহায্য পাইবে এবং ফল-ফলারির রস চিপিয়া জমা করার সুযোগও পাইবে।

(রাজ্যপতির স্বপ্নের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা– যাহার উপর লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা নির্ভর করে– ইহা শুনিতে পাইয়া রাজা হযরত ইউসুফের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন) এবং রাজা আদেশ করিলেন, (এই ব্যাখ্যাদানকারী) ব্যক্তিকে আমার নিকট এখনই নিয়া আস।

হযরত ইউসুফের আত্ম মর্যাদাবোধের পরিচয়

ঘটনার বিবরণ দানকারীদের মতে; এই সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসে কাটিয়াছে। অতঃপর স্বয়ং রাজ্যপতির দূত প্রেরণ এবং সসম্মানে রাজদরবারের নৈকট্য লাভের আহ্বান মানুষের পক্ষে কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু হযরত ইউসুফের নজরে আত্মমর্যাদার মূল্য এতই অধিক ছিল যে, বর্তমান মান-মর্যাদা লাভের উদীয়মান সুযোগ তাঁহাকে উল্লাস ও উৎফুল্লতায় মাতাইতে পারিল না। দশ বৎসর পূর্বের কাহিনী তাঁহার মনে গাঁথিয়াছিল যে, তাঁহার উপর অপবাদ চাপান হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ঐ ঘটনার ফয়সালা করিয়া স্বীয় মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা প্রমাণ করিতে হইবে।

বাস্তবিকই এই অদম্য আত্ম মর্যাদাবোধের ধারণাও করা যায় না, যাহার মোকাবিলায় দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসের পর খালাস পাওয়াকেও উপেক্ষা করা হইয়াছে। হযরত ইউসুফের এই বিরাট মনোবল ও মহতী গুণের প্রশংসায়ই রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যাহা ১৬৩৭ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে–

وَلَوْ لَبِثْتُ طُوْلَ مَالَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ

"ইউসুফ (আঃ) যে দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটাইয়াছেন এত দীর্ঘকাল যদি আমি কারাবাসে কাটাইতাম এবং পরে রাজার পক্ষ হইতে দূত আসিয়া আমাকে ডাকিত, তবে নিশ্চয় আমি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া বসিতাম।"

হযরত ইউসুফের ধৈর্য ও মনোবল পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন– যখন (কারাগারে) হযরত ইউসুফের নিকট রাজদূত উপস্থিত হইল (এবং রাজার আহ্বান জানাইল), তখন তিনি বলিলেন, তুমি তোমার মনিব রাজার নিকট ফিরিয়া যাও এবং জিজ্ঞাসা কর– যেসকল নারী (দাওয়াত খাওয়াকালে আমাকে দেখিয়া) নিজ নিজ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের কোন খোঁজ আছে কিনা? (তাহাদের নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার সততা ও সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কারণ, তাহাদের সম্মুখে ঘটনার মূল– আজীজের স্ত্রী নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছিল যে, সে নিজেই আমাকে ফুসলাইয়াছিল, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ পবিত্র রহিয়াছি। অধিকন্তু ঐ নারীদের দ্বারা আমার কারাবাসের আসল কারণও জানা যাইবে; তাহাদের সম্মুখেই আজীজের স্ত্রী আমাকে হুমকি দিয়াছিল, আমি তাহার কথামত কাজ না করিলে আমাকে কারাবাস ভোগ করিতে হইবে সুতরাং সেই নারীগণকে খোঁজ করিতে হইবে এবং আমার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করিতে হইবে, তারপর আমি রাজ দরবারে যাইতে পারি– এর পূর্বে নহে)। আমার পরওয়ারদেগার নারী জাতির ফন্দি-ফেরেব সব জানেন। (সুতরাং তাঁহার নিকট ত আমার পবিত্রতা প্রমাণিত আছেই, এখন তদন্তের দ্বারা মানুষ চোখেও তাহা দেখাইতে হইবে)।

হযরত ইউসুফের সততার সাক্ষ্য

(ঐ স্ত্রীলোকগণকে খোঁজ করিয়া আনা হইল)। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘটনা কি ছিল যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলাইয়াছিলে? তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, আল্লাহর পানাহ– আমরা তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটির সূত্র পাই নাই। আজীজের স্ত্রীও তখন স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল, এখন ত বাস্তব সত্য স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া গিয়াছে (এখন সত্য গোপনের চেষ্টা বৃথা, অতএব আমিও স্বীকার করিতেছি,) আমিই তাহার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম, সে সম্পূর্ণ খাঁটি ও সত্যবাদী।

সাক্ষ্যপ্রমাণের পর হযরত ইউসুফের উক্তি

অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমি এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের তৎপরতা এই জন্য দেখাইয়াছি যে, গৃহকর্তা "আজীজ" যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আমি তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সাথে খেয়ানত বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং ইহাও যেন স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যায় যে, (নিজের মধ্যে ত্রুটি না থাকিলে) খেয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতকদের ফন্দি-ফেরেব আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত চলিতে দেন না।

(যাঁহারা আল্লাহওয়ালা হন তাঁহারা সংযত ও সতর্ক রাখার উদ্দেশে নিজেকে সর্বদা কিরূপ গণ্য করিয়া থাকেন, হযরত ইউসুফের পরবর্তী উক্তি দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইউসুফ (আঃ) ইহাও বলিলেন,) আমি আমার প্রবৃত্তি সম্পর্কে বলিতে চাই না যে, তাহা দোষমুক্ত (–দোষের সম্ভাবনাই তাহার মধ্যে নাই)। নিশ্চয় মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি তাহাকে মন্দের দিকে পরিচালিত করিতে চায়; অবশ্য যাহার প্রতি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার দয়া করেন (তাহার অবস্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে)। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ক্ষমাশীল দয়ালু।

মিসর রাজ্যে হযরত ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

(সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের পর) রাজা বলিলেন, তাঁহাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়া আস, আমি তাঁহাকে আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে মনোনীত করিব। ইউসুফ (আঃ) আসিলেন এবং রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয় আপনি আজ হইতে বিশ্বাসভাজন, অতি মর্যাদাশালীরূপে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমাকে রাজ্যের সম্পদ-ভাণ্ডারের কর্তৃ পদে নিয়োগ করুন (সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিতেছে, এখন হইতে সতর্কতাবলম্বন আবশ্যক;) আমি (সমস্ত সম্পদ) ভালরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; ঐ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে।

(আল্লাহ বলেন,) ঐরূপে মিসরে আমি ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলাম। (একদিন তিনি এই দেশেই কারাগারের কয়েদী ছিলেন। আজ তিনি এই দেশে বিশিষ্ট কর্তা–) তিনি যথায় ইচ্ছা তথায় বিশেষ মর্যাদার সহিত থাকিতে পারেন। (এ ঘটনায় প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আমি আমার বিশেষ রহমত যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারি এবং ইহাও প্রমাণিত হয়, সদাচারী লোকদের কর্মফল আমি (দুনিয়াতেও) নষ্ট হইতে দেই না, আর আখিরাতের কর্মফল ত কতই না উত্তম হইবে তাহাদের পক্ষে যাহারা ঈমান এবং তাক্বওয়া অবলম্বনকারী।

হযরত ইউসুফ সমীপে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের উপস্থিতি

(ইউসুফ (আঃ) মিসরে ধন-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল আগত মহাদুর্ভিক্ষের মোকাবিলা এবং সেই সময়ে জনসাধারণের খেদমত করা। তিনি স্বীয় পরিকল্পনানুসারে কাজ চালাইতে লাগিলেন। সাত বৎসর পর সমগ্র দেশ ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইল, এমনকি মিসরের নিকটস্থ সিরিয়ায়ও দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল। "কানআন" (কেনান) অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষ পড়িল। দুর্ভিক্ষের সময় লোকদিগকে মিসরের সরকারী ভাণ্ডার হইতে খাদ্য ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইল। সাত বৎসর পূর্ব হইতে এই উদ্দেশেই সরকারী ভাণ্ডারকে পুষ্ট করা হইতেছিল। এইসব কাজ পরিচালনার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ইউসুফ (আঃ)।

আল্লাহ তাআলার মহিমার বিচিত্র লীলা আরম্ভ হইল। দেশ-বিদেশে এই দুর্ভিক্ষের সময় মিশর রাজ্যের খাদ্য বিক্রয়ের খবর ছড়াইয়া পড়িল এবং দূর দূরন্ত হইতে লোকদের আগমন আরম্ভ হইল। (এরই মধ্যে হযরত) ইউসুফের ঐ ভ্রাতাগণও আসিল (যাহারা তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য লোকদের ন্যায় খাদ্যবস্তু ক্রয়ে হযরত ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনে নাই।

(দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রয়ে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রর্বতন স্বাভাবিক এবং তদবস্থায় খাদ্য গ্রহণকারী প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যার বিবরণ দান আবশ্যক; এই ধরনের কোন ব্যাপারে তাহারা বাড়ীতে অবস্থানকারী বৈমাত্রেয় ভাই "বিনইয়ামীন"-এর নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবে, যে ছিল ইউসুফের সহোদর ভাই)।

হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে মাল-সামান ঠিক করিয়া দিয়া বলিলেন, আবার আসিতে বৈমাত্রেয় ভাইকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। তোমরা ত দেখিতেছ, আমি প্রত্যেক আগন্তুকের জন্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ পুরাপুরিভাবে দিয়া থাকি এবং আমি উত্তমরূপে আতিথেয়তা করি। যদি তাহাকে আনিতে না পার তবে আমার নিকট রেশন পাইবে না, বরং তোমরা আমার নিকটেও আসিও না। তাহারা ভাবিল, পিতাকে বুঝ-প্রবোধদানে আমরা এই কাজ সমাধা করিতে পারিব।

হযরত ইউসুফ (ভাইদের সম্পর্কে এই কাজও করিলেন যে,) স্বীয় কার্যনির্বাহকগণকে বলিয়া দিলেন, তাহারা মূল্যরূপে যাহা প্রদান করিয়াছে তাহা (গোপনে) তাহাদের মাল-সামানের মধ্যে রাখিয়া দাও; আশা করা যায়– তাহারা বাড়ী যাইয়া যখন এইসব দেখিবেন তখন আমাদের সহৃদয়তা অনুভব করিয়া পুনরায় আমাদের নিকট আসিতে বিশেষরূপে আগ্রহশীল হইবে।

ভ্রাতাগণের মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন

তাহারা যখন পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন পিতাকে বলিল, আগামীর জন্য আমাদের রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে –(যদি বিন্‌ইয়ামীনকে সঙ্গে লইয়া না যাই)। অতএব ছোট ভাইকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে পাঠাইবেন; তবেই আমরা রেশন আনিতে পারিব। আমরা বিশেষরূপে তাহার হেফাযত করিব।

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, বিন্‌ইয়ামীন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি ঐরূপ বিশ্বাসই করিব যেরূপ তাহার ভ্রাতা (ইউসুফ) সম্বন্ধে পূর্বে করিয়াছি। (অর্থাৎ মনে ত বিশ্বাস জন্মে না, তোমাদের কথা শুনিলাম মাত্র;) সুতরাং আসল বিশ্বাস ইহাই যে, আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম হেফাযতকারী এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

অতঃপর যখন তাহারা মাল-সামান খুলিল তখন দেখিতে পাইল, খাদ্য বস্তুর মূল্য তাহারা যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিল, হে পিতা! আর কি চাই! এই দেখুন– আমাদের প্রদত্ত মূল্য আমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। (আমরা ছোট ভাইকে নিয়া পুনরায় তথায় যাইব;) বাড়ীর সকলের রেশন আনিব, ভাইকে হেফাযতে রাখিব এবং (ভাইকে নেওয়ায়) এক উটের বোঝা অতিরিক্ত রেশন লাভ করিব। এইবার আমরা যাহা আনিয়াছি তাহা ত অল্প দিনের জন্য মাত্র।

দ্বিতীয়বার ভ্রাতাগণের মিসর যাত্রা

(এইবার যাত্রাকালে পূর্ব বর্ণিত শর্তানুসারে ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করিলে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, তাহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারি না যাবত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহর কসম করিয়া অঙ্গীকার দাও যে, নিশ্চয় তাহাকে আমার নিকট প্রত্যার্পণ করিবে, অবশ্য যদি বিপদ-আপদে অপারগ হও তবে তাহা ভিন্ন কথা (তাহারা তাহাই করিল)। যখন তাহারা মজবুত ওয়াদা-অঙ্গীকার করিল তখন ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, আমাদের সমুদয় আলোচনা আল্লাহর হাওলা রহিল।

ইয়াকুব (আঃ) পুত্রগণকে এই উপদেশও দিলেন, হে পুত্রগণ! মিসর শহরে প্রবেশ করিতে সকলে একত্রে একই দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া বিভিন্ন দ্বারে প্রবেশ করিও। (ইহা একটি বাহ্যিক তদবীর বা ব্যবস্থা অবলম্বন মাত্র– কোন অঘটন ঘটিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য; যেমন বদ নজর লাগার আশঙ্কা বা বিদেশীদের ভিড় দেখিয়া দেশীয় লোকদের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা। নতুবা) আল্লাহ তাআলার হুকুম (তকদীর) হটাইবার ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লাহর হুকুমই চলিবে, অতএব তাঁহার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা এবং যাহারা ভরসা করিতে চায়– আল্লাহর উপরই ভরসা করা চাই।

আর যখন তাহারা স্বীয় পিতার উপদেশ মতে (বিভিন্ন দ্বার ও পথে) মিসরে প্রবেশ করিল (তখন পিতার উপদেশ বাস্তবায়িত হইল); অবশ্য এই ব্যবস্থা আল্লাহর কোন হুকুমকে ঠেকাইতে পারে না, কিন্তু ইয়াকুবের মনে ছেলেদের পক্ষে বাহ্যিক তদবীর স্বরূপ একটা আবেগ আসিয়াছিল, তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। (তিনি এই তদবীর খোদার হুকুম রদকারীরূপে গ্রহণ করেন নাই;) তিনি ছিলেন বিশেষ এল্‌মসম্পন্ন, যেহেতু আমি তাঁহাকে বিশেষ এল্‌ম দান করিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক লোকই মূল তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। (ফলে বাহ্যিক তদবীরকে বাস্তব কর্তা পদের মর্যাদা দেয়)।

হযরত ইউসুফ সমীপে বিন্‌ইয়ামীনের উপস্থিতি

হযরত ইউসুফের নিকট (তাঁহার সহোদর ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে লইয়া) যখন (বৈমাত্রেয়) ভাইগণ উপস্থিত হইল তখন তিনি (গোপনে) স্বীয় ভাইকে (আদর যত্নে) নিজের নিকটে স্থান দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার সহোদর ভ্রাতা (ইউসুফ)। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন যে, দীর্ঘদিন পর আমাদের মিলনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অতএব (বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বারা যত দুঃখ-যাতনা পৌঁছিয়াছে সব ভুলিয়া যাও), তাহারা যত কিছু করিয়া আসিতেছিল সে সম্পর্কে মনে দুঃখ রাখিও না।

বিন্‌ইয়ামীনকে রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা

অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের মাল-সামান ঠিক করিয়া দিলেন তখন ভাই (বিন্‌ইয়ামীন)-এর মাল-সামানের মধ্যে (আমলাদের দ্বারা গোপনে রৌপ্য নির্মিত) একটি পানি পানের পেয়ালা রাখিয়া দিলেন। তরপর (ভাইদের কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল, তখন) এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, হে কাফেলার লোকগণ! তোমরা চুরি করিয়াছ তাহারা পেছন দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কি জিনিষ হারাইয়াছে? তাহারা বলিল, রাজার একটি পেয়ালা (যদ্দ্বারা পানিও পান করা হয়), খাদ্য শস্যও মাপিয়া দেওয়া হয় তাহা হারাইয়াছে; যে ব্যক্তি তাহা বাহির করিতে পারিবে তাহাকে এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য শস্য পুরষ্কার দেওয়া হইবে, এ সম্পর্কে আমি (সরকারের পক্ষে) দায়িত্ব লইতেছি।

তাহারা বলিল, খোদার কসম- আপনারাও জানেন যে, আমরা এই দেশে কোন দুষ্কর্মের উদ্দেশে আসি নাই এবং চুরির অভ্যাসও আমাদের নাই।

রাজকীয় লোকগণ বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও (অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ পেয়ালা বাহির হয়) তবে তাহার পরিণাম কি হওয়া চাই? তাহারা বলিল, যেব্যক্তির মাল-সামানের মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে সেব্যক্তি নিজেই ঐ কার্যের পরিণামরূপে গোলাম হইয়া থাকিবে; আমরা এরূপ অন্যায়কারীকে এই শাস্তিই দিয়া থাকি- আমাদের দেশের আইন ইহাই।

এই কথার উপর (কাফেলাওয়ালাদের তল্লাশি লওয়া হইবে-) প্রথমে অন্যদের মাল-সামানের তল্লাশী লওয়া হইল। অতপর ঐ ছোট ভাইয়ের মাল-সামানের মধ্য হইতে পেয়ালা বাহির করা হইল।

(আল্লাহ তাআলা বলেন, ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখা সক্ষম হউক এই উদ্দেশ্যে) আমি ইউসুফের জন্য ঐরূপ গোপন কৌশল (তাঁহার পরিকল্পনায় আনয়ন) করিয়াছিলাম। মিসরের রাজার আইন মতে (চুরি সূত্রেও) ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখিতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইয়াছে ইউসুফের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, তাই স্বয়ং কাফেলাওয়ালাদের হাতে বিচার অর্পিত হইল; তাহারা নিজেদের আইনে রায় দিল যাহা হযরত ইউসুফের আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হইল। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,) আমি যাহাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া থাকি। সকল বিজ্ঞের উপর আছেন বিজ্ঞতম একজন- আল্লাহ তাআলা।

বৈমাত্রেয় ভাইগণ (বিরক্তি ভাবাপন্নরূপে) বলিল, সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সম্ভাবনাও আছে; তাহারই এক সহোদর বড় ভাই ছিল, সে পূর্বে একবার চুরি করিয়াছিল।* (ভ্রাতাগণ যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিল ইউসুফ (আঃ) তাহা বুঝিতেছিলেন) ইউসুফ (আঃ) একটি কথা মনে মনে বলিলেন-

---

* এই উক্তিতে তাহারা হযরত ইউসুফকেই ইঙ্গিত করিতেছিল। যাহার ঘটনা এই যে, শিশুকালে ইউসুফের ফুফু তাঁহার অনুগামিনী হইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিবার ফন্দি করিয়াছিল- রূপার একটি চেইন গোপনে ইউসুফের কোমরে গুঁজিয়া প্রচার করিল, চেইন চুরি হইয়াছে। অতঃপর তাহা ইউসুফের কোমর হইতে বাহির হওয়ায় ঐ দেশের নিয়মানুসারে ফুফুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে তাহার নিকট থাকিতে হইয়াছিল। ভ্রাতাগণ সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এক মায়ের পেটের দুই ভাই; বড় ভাই এক সময় চুরি করিয়াছিল; এখন ছোট ভাইও হয়ত চুরি করিয়াছে।

তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন না। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, তোমরা ত অধিক অপরাধী, তোমরা ত আমাদেরকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিয়াছিলে)। তোমরা (আমাদের দুই ভাইয়ের চুরি সম্পর্কে) যাহা বলিতেছ (উভয় ঘটনাই যে বস্তুতঃ চুরি ছিল না) তাহা আল্লাহ তাআলা ভালরূপে জানেন।

বিন্‌ইয়ামীনকে ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা

অতপর তাহারা বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিল, হে আজীজ! * এই ছেলেটির বৃদ্ধ পিতা আছে (সে তাহার জন্য পাগল)। অতএব তাহার স্থলে আমাদের একজনকে রাখিয়া দিন; আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল স্বভাবের দেখিতেছি। হযরত ইউসুফ বলিলেন, আমরা আল্লাহর পানাহ্‌ চাই, আমাদের বস্তু যাহার নিকট পাইয়াছি সে ভিন্ন অপর একজনকে দোষী করিব না। কারণ, এমতাবস্থায় আমরা অন্যায়কারী সাব্যস্ত হইব।

তাহারা যখন বিন্‌ইয়ামীনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল তখন তাহারা তথা হইতে চলিয়া আসিল এবং পরস্পর পরামর্শ করিল। তাহাদের মধ্যে সকলের বড় যে ছিল সে বলিল, তোমাদের স্মরণ নাই কি যে, তোমাদের পিতা আল্লাহর কসম দিয়া তোমাদের হইতে ওয়াদা-অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং তোমরা পূর্বে একবার ইউসুফ সম্পর্কে কি কেলেঙ্কারি করিয়াছিলে? অতএব আমি এখানেই থাকিয়া যাইব; দেশে যাইব না– স্বয়ং পিতাই আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য কোন ফয়সালার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। তোমরা পিতার নিকট যাও এবং পিতাকে বুঝাইয়া বল যে, আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করিয়াছে, আমরা যাহা জানি তাহাই বলিলাম। (চুরির অপরাধে সে আটক রহিয়াছে, সে যে চুরি করিবে তাহা পূর্বে জানি না) এবং গায়েবের কথা আমরা জানিতে পারি না।

(আপনার যদি কোন রকম সন্দেহ হয় তবে) ঐ এলাকাবাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহাদের সঙ্গে আমরা আসিতেছিলাম। আমরা নিশ্চয় সত্য বলিতেছি। পিতা পূর্বের অভিজ্ঞতানুসারে বলিলেন, এইসব কিছুই নহে, বরং তোমরা একটা ঘটনা গড়িয়া লইয়াছ। সুতরাং পূর্ণরূপে ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা ইউসুফ, বিন্‌ইয়ামীন– তাহাদের সকলকে এক সঙ্গেই আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন, তিনি হইতেছেন সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা। (ইয়াকুব (আঃ) নবী, তাঁহার সম্মুখে আগাম ঘটনার আভাস ভাসিয়া উঠিল; তাহারই বিবৃতি মুখেও ফুটিল,

ইউসুফের বিচ্ছেদের পুরাতন আঘাতও তাজা হইয়া উঠিল। তিনি সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু সাদা (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত) হইয়া গিয়াছিল এবং চিন্তায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সকলে তাঁহাকে (বিরক্তিভরে) বলিল, খোদার কসম– আপনি ত এক ইউসুফের চিন্তা করিতে করিতে রসাতলে যাইবেন জীবন হারাইয়া বসিবেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার সব কিছু দুঃখ-যাতনা, আবেদন-নিবেদন একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুজুরে পেশ করিতেছি– তোমাদেরকে ত কিছু বলিতেছি না। আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জান না।

ইউসুফ ও বিনইয়ামীনের খোঁজে গমন এবং ইউসুফের পরিচয় দান

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা বাহির হও; ইউসুফ ও তাহার ভাইকে লাভ করা যায় সেই ব্যবস্থার খোঁজে লাগিয়া যাও; নিরাশ হইও না। নিশ্চয় কাফের জাত ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয় না।

(ভ্রাতাগণ বিন্‌ইয়ামীনকে মিসরে ছাড়িয়াই ছিল, তাই তথায় উপস্থিত হইল এবং রেশনের বাহানায়

* মিসরের তৎকালীন সাধরণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত, যেরূপ বর্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজির" বলা হইয়া থাকে।

মিসরের সরকারী কর্মকর্তা আজীজের নিকট পৌঁছিল; তিনি ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তাহারা তথায় পৌঁছিয়া (প্রধান কর্মকর্তার সাথে যোগসূত্র সৃষ্টির কৌশলরূপে রেশনের আবদার উত্থাপনে) বলিল, হে আজীজ (মন্ত্রী মহোদয়)! আমরা পরিবারবর্গ লইয়া (দুর্ভিক্ষের দরুন) বিপদে পড়িয়াছি, আমরা অল্প পরিমাণ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে পুরাপুরি (অল্প মূল্যেই) রেশন দিয়া দেন এবং অবশিষ্ট মূল্য আমাদিগকে দান করেন তথা মাফ করিয়া দিন। দানকারীদিগকে আল্লাহ অবশ্যই প্রতিফল দিবেন।

ইউসুফ (আঃ) এইবার ভ্রাতাগণকে বলিলেন, স্মরণ আছে কি? তোমাদের অজ্ঞতার অবস্থায় ইউসুফ ও তাহার সহোদর ভ্রাতার প্রতি কি ব্যবহার করিয়াছিলে? তাহারা হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিই কি ইউসুফ? তিনি বলিলেন, হাঁ- আমি ইউসুফ এবং এই বিন্‌ইয়ামীন আমার ভাই; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। বাস্তবিক- যাহারা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করে, সেই মহতী লোকদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নষ্ট হইতে দেন না।

ভ্রাতাগণ স্বীকারোক্তি করিল- খোদার কসম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধ করিয়াছি।

ভ্রাতাগণের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা এবং পিতার নিকট নিদর্শন প্রেরণ

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণায় বলিলেন, তোমাদের উপর আজ কোন ভর্ৎসনা নাই, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন; তিনি সর্বাধিক মেহেরবান। (ইউসুফ (আঃ) আরও বলিলেন,) আমার এই জামাটি পিতার নিকট লইয়া যাও, ইহা পিতার চোখের উপর রাখিলেই তাঁহার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়া আস।

পিতা কর্তৃক ইউসুফের সুঘ্রাণ প্রাপ্তি

(যখন হযরত ইউসুফের জামা লইয়া ভ্রাতাদের) কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল মাত্র, তখনই (সুদূর "কান্‌আ'ন দেশে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) (গৃহবাসীদের নিকট) বলিলেন, যদি তোমরা আমার কথাকে বার্ধক্যের বিভ্রম গণ্য না কর তবে শুন নিশ্চয় আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতেছি। উপস্থিত সকলে বলিল, খোদার কসম- আপনি ত পুরাতন বিভ্রান্তির মধ্যেই আছেন।

অতঃপর যখন (ইউসুফের) সুসংবাদ বাহক আসিয়া পৌঁছিল এবং ইউসুফের জামা পিতার চোখের উপর রাখিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন বলিলেন, আমি পূর্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, আমি আল্লাহর তরফ হইতে এমন সব বিষয় অবগত হই যাহা তোমরা জান না।

যখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া গেল তখন ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ পিতা হযরত ইয়াকুবের নিকট বিনয় করিয়া বলিল, হে আমাদের স্নেহশীল পিতা! আল্লাহর দরবারে আমাদের গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আমরাই ছিলাম অপরাধী। পিতা বলিলেন, এখনই আমি তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করিব; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল (অতঃপর মাতা-পিতা পরিবারবর্গ কেনান হইতে মিসর যাত্রা করিলেন)।

মাতা-পিতা সকলের ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট উপস্থিতি

(পিতা-মাতার আগমন সংবাদে ইউসুফ (আঃ) তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া রহিলেন)। যখন সকলে ইউসুফের নিকট পৌঁছিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতাপিতাকে নিজের সঙ্গে রাখিলেন

এবং বলিলেন, সকলে মিসর শহরে চলুন, তথায় ইনশাআল্লাহ আরাম ও শান্তিতে থাকিবেন। গৃহে পৌঁছিয়া ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে রাজকীয় উচ্চাসনে স্থান দিলেন। (সকলের অন্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার ঢেউ খেলিতেছিল, এমনকি শ্রদ্ধা নিবেদনের তৎকালীন জায়েয ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী) সকলে হযরত ইউসুফের সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেলেন।

এই দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, হে পিতা! আমার অতীত স্বপ্ন চন্দ্র-সূর্য, এগার নক্ষত্র আমার সম্মুখে সেজদা করার তাৎপর্য এই ঘটনাই। চন্দ্র-সূর্য অর্থ মাতা-পিতা, এগার নক্ষত্র অর্থ এগার ভ্রাতা। আমার পরওয়ারদেগার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিলেন।

আমার পরওয়ারদেগার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন– আমাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়াছেন এবং শয়তান কর্তৃক আমার ও ভ্রাতাগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির পরও আপনাদের সকলকে দূরদেশ হইতে নিয়া আসিয়া মিলিত করিয়াছেন। আমার প্রভু যাহা করিতে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্ম তদবীরের দ্বারা তাহা বিনা বাধায় করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা।

হযরত ইউসুফের দোয়া

...... فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ۔

(হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনি আমার প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন–) "হে আসমান-যমীনের তথা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমার অভিভাবক ইহকালে ও পরকালে। চিরকাল আমাকে খাঁটি মুসলিম তথা আপনার তাবেদাররূপে রাখিবেন, এই অবস্থায়ই মৃত্যু দান করিবেন এবং নেক লোকদের শামীল রাখিবেন।* (আমীন!)

হযরত আইউব (আঃ)

হযরত আইউবের বংশ ও সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারীর মতামতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আইউব আলাইহিস সালামের সময়কাল মূসা আলাইহিস সালামের এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের সময়কালের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল, তথা হযরত মূসার পূর্বে এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের পরে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন।

---

* মিসরের তৎকালীন সাধরণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত, যেরূপ বর্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজির" বলা হইয়া থাকে।

* হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনীর বিরাট অংশের উল্লেখযোগ্য মহিলাটি সর্বসাধারণ্যে "জোলেখা" নামে পরিচিতা। সেই জোলেখার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ উপকথা বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই জোলেখার স্বামী উজিরে আজমের ইন্তেকাল হইয়া যায়। সে যেহেতু নপুংসক ছিল, তাই জোলেখা তখনও কুমারী ছিলেন। স্বয়ং রাজার মাধ্যমে হযরত ইউসুফের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ইউসুফ (আঃ) কৌতুক করিয়া একদিন বলিলেন, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে বর্তমান ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা কত উত্তম ইয়াছে! জোলেখা লজ্জিত স্বরে ওজর বর্ণনা করিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, একদা জোলেখা অভাবে পড়িয়া হযরত ইউসুফের দরবারে আসিলেন এবং তাঁহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ঐ মহান আল্লাহর যিনি তাঁহার তাবেদারীর বদৌলতে গোলামকে বাদশাহ বানান এবং তাঁহার নাফরমানীর পরিণামে বাদশাহকে গোলাম বানান। ইউসুফ (আঃ) তাঁহার প্রয়োজন পুরা করিয়া দিলেন এবং পরে তাঁহার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হইলেন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে তাঁহার কৌমার্য ও সৌন্দর্য পুনঃ দান করিলেন।

এক বর্ণনায় আছে– বিবাহের পর জোলেখার প্রতি হযরত ইউসুফের মহব্বত অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। আর জোলেখার মহব্বত কম হইয়া গিয়াছিল। ইউসুফ (আঃ) এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আপনার উসিলায় আল্লাহর মহব্বত এই পরিমাণ লাভ হইয়াছে যে, তাহার সম্মুখে অন্য সব মহব্বত ম্লান হইয়া গিয়াছে।

হযরত আইউবের বংশ তালিকা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতামতও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল। তাহাদের মত এই যে, আইউব (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের বংশধর। হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী ছারাহ (আঃ)-এর পক্ষের পুত্র হযরত ইসহাকের এক পুত্র ছিল ইয়াকুব যাঁহার অন্যনাম ইসরাঈল; তাঁহার হইতে বনী-ইসরাঈলের বংশ। হযরত ইসহাকের আর এক পুত্র ছিল "ঈসু" তাহার অন্য নাম "আদুম", আইউব (আঃ) তাঁহার বংশের একজন। আইউব (আঃ) দুই বা তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে আদুমের সঙ্গে মিলিত হন।

হযরত আইউবের বংশ পরিচয় লাভের পর তাঁহার আবাস ভূমির খোঁজ সহজেই লাভ হয়। কারণ তিনি "আদুম" বংশের লোক। আদুমী জাতির অবস্থান যে অঞ্চলে ছিল সেই অঞ্চলটি এশিয়ার অন্তর্গত (বর্তমানে জর্দান রাজ্যের আওতাভুক্ত) মরু সাগর- "Dead sea" ও আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উত্তরে মরু সাগর ও ফিলিস্তীন, দক্ষিণে আকাবা উপসাগর ও মাদইয়ান, পশ্চিমে সাইনা উপত্যকা, পূর্বে আরবের উত্তর সীমান্ত ও "মাওয়াব" অঞ্চল।

অবশ্য আদুমী জাতির আবাস অঞ্চল পরবর্তীকালে আরও বিস্তার লাভ করিয়া মরু সাগর হইতেও উত্তরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; যাহার কতিপয় শহরের নাম "তওরাত" কিতাবেও উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে "বোসরা" (ইরাকস্থিত "বসরা" নহে) শহরের নামও আছে। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফিলিস্তীনের নিকটবর্তী মরু সাগর হইতে প্রায় এক শত মাইল উত্তরে মরু সাগর ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত; এখনও বোসরা নামেই প্রসিদ্ধ। হযরত রসূলে করীমের যুগেও " বোসরা" গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। আইউব (আঃ) এই "বোসরা" শহরেরই অধিবাসী। (আরজুল-কোরআন ২য় খণ্ডঃ ১, ২৮, ৩৮ পৃঃ)।

কোরআন শরীফে হযরত আইউব আলাইহিস সালামের বিশেষ কোন ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। শুধু কেবল তাঁহার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন- কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ধনে-জনে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষায় তিনি অসীম সবরের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কষ্ট-যাতনা ধৈর্যের সীমা অতিক্রমকারী ছিল, কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সবর ভঙ্গ করেন নাই। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিজের সম্পক বহাল রাখিয়াই নয় শুধু বরং বিপদের কঠোরতা ও আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক ধাবিত হইলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাঁহাকে সবরের সুফল প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববাসীকে সবর শিক্ষাদান এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা তাঁহার সেই পরীক্ষা ও সবরের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন- وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আইউবের ঘটনা স্মরণ কর; যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! আমার উপর কষ্ট-যাতনা পড়িয়াছে; আপনি সকল দয়ালের শ্রেষ্ঠ দয়াল; আমাকে কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ـ

আমি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলাম, সেমতে তাঁহার কষ্ট-যতনা সমূলে দূর করিয়া দিলাম; তাঁহার হারান পরিজনবর্গ পুনঃ দান করিলাম এবং ঐ পরিমাণ তৎসঙ্গে আরও দান করিলাম- ইহা আমার রহমত ছিল। এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা রহিয়াছে এবং আল্লাহর গোলামীকারীদের জন্য ধৈর্যের সুফল লাভের চিরস্মরণীয় নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আম্বিয়া- পারা -১৭; রুকু- ৬)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ ـ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ـ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ـ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ـ وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

আমার বিশিষ্ট বান্দা আইউবের ঘটনা স্মরণ কর। যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে। (আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ বলেন, তাঁহাকে বলিলাম,) নিজ পা দ্বারা যমীনে আঘাত করুন। (তাহাতে তৎক্ষণাৎ এক পানির ঝরণা বাহির হইল; আল্লাহ তাআলা বলিলেন,) ইহা আপনার গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানির স্থান এবং পান করিবার জন্য। (আইউব (আঃ) ঐ পানিতে গোসল এবং তাহা পান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। এইরূপে) আমি তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্তি দিয়াছি। আর তাঁহার পরিজনবর্গ এবং আরও অধিক পরিমাণ দান করিয়াছি। (ইহা ছিল তাঁহার প্রতি) আমার বিশেষ রহমত এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশস্বরূপ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَاتَحْنَثْ - اِنَّا وَجَدْنَاه صَابِرًا - نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

আরও (এক অনুগ্রহ যে, আইউবকে সুযোগ দিয়াছিলাম,) এক মুষ্টি তৃণগুচ্ছ হাতে লইয়া তাহা দ্বারা স্ত্রীকে মারুন এবং কসম ভঙ্গ করিবেন না। নিশ্চয় আইউবকে আমি ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম; নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। (সূরা সেয়াদঃ পারা– ২৩, রুকু–১৪)

আইউব (আঃ) আল্লাহর আদেশ মতে ঐ পানিতে গোসল করিলেন এবং পানি পান করিলেন; সেই অছিলায় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন।*

এইরূপে হযরত আইউবের শারীরিক বিপদ দূরীভূত হইল; তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ধন-জনের ক্ষতি পূরণও হইল। কাহারও মতে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত তাঁহার সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার কুদরতে জীবিত ইয়া উঠিল তদুপরি আরও সন্তান জন্ম লাভ করিল। অধিকাংশের মতে মৃতগণ জীবিত হয় নাই, কিন্তু নূতনভাবে যে সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিল তাহারা গুণে-জ্ঞানে এবং সংখ্যায় পূর্ব সন্তানগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল।

ধন-দৌলতের দিক দিয়াও তাঁহার পূর্বাপেক্ষা বহু আধিক্য লাভ হইল, এমনকি আল্লাহ তাআলার কুদরতে ঘাটে-মাঠে তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া পড়িত– যেমন প্রথম খণ্ডে ২০৩ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আইউবের স্ত্রী অতিশয় নেককার এবং স্বামীভক্তা ছিলেন। হযরত আইউব কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সকল বন্ধু-বান্ধবই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন নাই, ঐ অবস্থায় তিনি জানে-প্রাণে তাঁহার খেদমতে লাগিয়া থাকিতেন। একদা তাঁহার দ্বারা কোন একটু ত্রুটি হইয়া গেল। রুগ্ন আইউব (আঃ) তাহাতে ভীষণ চটিয়া গেলেন, এমনকি কসম করিয়া বসিলেন যে, সুস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিবেন। রাগের সময় কসম খাইয়া বসিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু স্ত্রীর অপরাধও সামান্য ছিল, তাই পরবর্তীকালে আইউব (আঃ) নিজেও এই কসমে অনুতপ্ত ছিলেন নিশ্চয়; এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্বামীভক্তা নেককার স্ত্রী সামান্য ত্রুটিতে বেত্রাঘাত খাইবেন তাহাও অসহনীয়। এদিকে কসম ভঙ্গ করাও সাধারণ ব্যাপার নহে।

এইসব ব্যাপারেও হযরত আইউবের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ হইল। আল্লাহ তাআলা কসম পূরণের বিধানে শুধু তাঁহার পক্ষে এক বিশেষ সংশোধনী দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আদেশ করিলেন,

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত তাঁহার অভ্যাসের দাসত্বে رکض। শব্দের অর্থ অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া এই তফসীর করিয়াছেন যে, আল্লাহ আইউবকে আদেশ করিলেন–"তুমি দ্রুত পদে পলায়ন কর; এই দেখ গোসল করার ও পান করার পানি এখানে মওজুদ আছে।"

পণ্ডিত সাহেবের এই উদ্ভট অপব্যাখ্যা সম্পর্কে এতটুকুই জিজ্ঞাস্য যে, দীর্ঘ তেরশত বৎসরে শত শত তফসীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের কেহ আপনার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে কোন তফসীরে তাহা লিপিবদ্ধ আছে?

আমরা যে তফসীর বর্ণনা করিয়াছি তাহা ইবনে জরীর, রুহুল মাআনী, দুররে মনসুর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তফসীরের কিবাতসমূহে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও উক্ত তফসীর বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মনসুর)

একশত তৃণের গুচ্ছ হাতে লইয়া তাহার দ্বারা স্ত্রীকে একবার প্রহার করুন; তাহাতেই একশ'ত বেত্রাঘাত করার কসম পূর্ণ গণ্য হইবে। অন্য কাহারও পক্ষে এই নিয়মে কসম পুরা হইবে না– ইহা শুধু হযরত আইউবের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।*

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে চারিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে–(১) হযরত আইউবের কষ্ট-যাতনা, (২) ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা, (৩) পূর্বের পরিজনবর্গ এবং আরও তৎপরিমান অধিক প্রদত্ত হওয়া, (৪) একমুষ্টি তৃণগুচ্ছ দ্বারা প্রহার করতঃ কসম ভঙ্গ করা হইতে নিষ্কৃতি লাভ। এই চারিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ আবশ্যক। নিম্নে এই সব বিষয়ের সমষ্টিগত একটি বিবরণ দান করা হইতেছে।

আইউব (আঃ) ধনে-জনে, স্বাস্থ্যে-সম্পদে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার শোকরগুজারী করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মর্তবা আরও বাড়াইবার জন্য এবং বিশ্ববাসীকে ধৈর্যের স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। তাঁহার শস্য-ফসল সব নষ্ট হইয়া গেল, পশুপাল মরিয়া গেল, আওলাদ-ফরজন্দ নিখোঁজ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মরিয়া গেল, নিজে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন– এমতাবস্থায় বন্ধু-বান্ধব সব পৃথক হইয়া গেল; শুধু স্ত্রী তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত হইয়া রহিলেন।

হযরত আইউবের রোগ সম্পর্কে অনেক বিবরণ দেখা যায়, কোনটা অতিরঞ্জিতও মনে হয়। কোরআন-হাদীছে নির্দিষ্ট রোগের উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট– (১) রোগ অতি কঠিন ছিল (২) এই শ্রেণীর রোগ নিশ্চয় ছিল না যাহা সর্ব সাধারণের ঘৃণার কারণ হয়; আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরকে এইরূপ অবস্থায় ফেলেন না যাহাতে তাঁহার প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে, নতুবা নবুয়তের উদ্দেশ্য– সর্বসাধারণের হেদায়াত কার্যে ব্যাঘাত ঘটিবে।

শয়তান কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে এই উক্তির ব্যাখ্যা

কষ্ট-যাতনা ও রোগ-শোকের বাহ্যিক ও নিকটবর্তী কার্যকারণ কোন কিছু থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময় সব কিছুর গোড়ায় অন্য একটি মূল কার্যকারণ এই থাকে যে, কোন গোনাহ ও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজ করা হইয়াছে তদ্দরুন বিপদ আসিয়াছে শাস্তির জন্য বা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার জন্য। এই মূল

---

* পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিত সাহেব এস্থলেও অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন এবং স্বভাবগত অভ্যাসের দাস হইয়া لا تحنث শব্দের আভিধানিক পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাইয়া একটি মনগড়া সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, حنث শব্দের আসল অর্থ "পাপ, গোনাহ"। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন; "স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "কসম ভঙ্গ করা" অর্থ ঐ শব্দের আসল তাৎপর্য নহে। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই একটা নিজের মনগড়া আজগুবি গোঁজামিলকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যারূপে প্রাধান্য দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বাংলাভাষায় পাণ্ডিত্যের জোরে অন্যান্য ভাষাকেও ঠেলিয়া নিয়া যাইতে চেষ্টা করেন এবং লাগামহীনভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তিনি যদি আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানও রাখিতেন তবে ঐরূপ বাস্তবের বিপরীত স্বপ্ন দেখিতেন না।

আরবী ভাষায় কোন শব্দের আসল অর্থ এবং তাহার উপঅর্থ জানিতে হইলে কোন পণ্ডিতের গবেষণার আবশ্যক হয় না, তাহার জন্য বিশেষ অভিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্রেণীর সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান "আসাসুল বালাগাহ" হইতে আলোচ্য حنث শব্দ সম্পর্কে একটু উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি–

حنث فى يمينه حنثا ـ وقع فى الحنث ومن المجاز بلغ الغلام الحنث (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) وهو الذنب استعير من حنث الحانث الذى هو نقيض البر ـ

অর্থাৎ حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" পক্ষান্তরে তাহার একটি উপঅর্থ হয় গোনাহ ও পাপের অর্থ; وكانوا يصرون على الحنث العظيم এই আয়াতে ঐ উপঅর্থই উদ্দেশ করা হইয়াছে। গোনাহ বা পাপের উপঅর্থ حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" হইতে হাওলাত স্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, পণ্ডিত সাহেব তাহার গোঁজামিলপূর্ণ ব্যাখ্যায় শুধু যে তফসীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের বরখেলাফ করিয়াছেন তাহাই নহে, বরং আভিধানিক বিষয়াবলীতেও ভুল সিদ্ধান্তের ও অবাস্তব তথ্যের আশ্রয় লইয়াছেন। এই ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কোরআনের তফসীরকার সাজা কি সমীচীন হইয়াছে!

কার্যকারণ তথা "গোনাহ"-র মূল সূত্র হইল শয়তান; মানুষ শয়তানের প্ররোচনায়ই গোনাহ করিয়া বসে। এইরূপে সূত্রের সূত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোক, কষ্ট-যাতনার মূল সূত্র দাঁড়ায় শয়তান।

হযরত আইউবের রোগ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে বস্তুতঃ তাঁহার মর্তবা বাড়াইবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন গোনাহের কারণে ছিল না। কিন্তু আইউব (আঃ) নম্রতাবশে ভাবিলেন, শয়তানের কারসাজিতে আমার দ্বারা কোন ত্রুটি হইয়াছে, যার ফলে বিপদ আসিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন مسنى الشيطان بنصب وعذاب "শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনা পৌঁছাইয়াছে।"

আইউব (আঃ) নবী হইয়াও কষ্ট-যাতনায় নিজেকে অপরাধী গণ্য করিয়াছিলেন, শয়তানকে শত্রুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সর্ব-সাধারণের পক্ষে এই আদর্শ অবলম্বন করা অতি কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক। কারণ, এই উপলব্ধির ফলে বিপদ-আপদের ন্যায় কঠিন সময়েও মানুষের জন্য এনাবত-ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি রুজু ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ সহজ হইয়া যায় এবং বিপদের কারণে (মাআযাল্লাহ) আল্লাহর প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি না হইয়া শয়তানের প্রতি শত্রুতার ভাব বাড়িয়া যায়, যাহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন- انَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

"নিশ্চয় জানিও, শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু, তোমরা সর্বদা তাহাকে শত্রুই গণ্য করিও।"

আইউব (আঃ) যে সব বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বিঘোষিত পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ـ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ ـ

অর্থঃ আর জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব (কম বা বেশী) কিছু পরিমাণ ভয়-ভীতি দ্বারা (তথা শত্রুর বা বিপদের আক্রমণ দ্বারা) এবং অনাহারীর (তথা খাদ্য-খাবারের অভাব-অনটন দ্বারা) এবং ধন-সম্পদ, জন-ফরজন্দ ও ফল-মূলের বিনষ্টির দ্বারা। সুসংবাদ শুনাইয়া দিন ঐ সব ধৈর্যাবলম্বনকারীকে যাঁহারা বিপদের সময় মনে-মুখে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিয়া থাকেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"-আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার (তথা আমরা আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকার ক্ষমতার আওতাভুক্ত; অতএব তিনি আমাদিগকে যেকোন অবস্থায় রাখিতে পারেন; তহাতে আমাদের কিছু ভাবিবার নাই)। এবং নিশ্চয় আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার প্রতি ফিরিয়া যাইব, (অতএব আমাদের ইহকালীন দুঃখ-কষ্ট বিফল যাইবে না, তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে সবরের মেওয়া দান করিবেন)।

এইরূপ ধৈর্যশীলদের প্রতি তাঁহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে শত ধন্যবাদ এবং রহমত; আর তাঁহারাই সঠিক পথের পথিক। (পারা- ২, রুকু- ৩)

আইউব (আঃ) সীমাহীন বিপদে পড়িলেন, কিন্তু বিপদের স্রোতে ভাসিয়া প্রভুহারা হইলেন না; বরং সেই স্রোত তাঁহাকে অধিক দ্রুত ধাবিত করিল তাঁহার প্রভুর প্রতি। বিপদাবস্থায় তাঁহার এনাবত ইলাল্লাহ- আল্লাহর প্রতি আনুরাগ অধিক বৃদ্ধি পাইল, তিনি পূর্ণ সবরের পরিচয় দিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলার বিঘোষিত নীতির বিকাশ আরম্ভ হইল- সবরে মেওয়া ফলনের রীতি বাস্তবায়িত হইল।

প্রথমে আল্লাহ তাআলা গায়েবী মদদে হযরত আইউবের আরোগ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত আইউবকে বলিলেন, "আপনি মাটির উপর পদাঘাত করুন।" আইউব (আঃ) তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরতে তথায় ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা আবিষ্কার হইল। যেরূপ হযরত ইসমাঈলের শৈশবে তাঁহার জন্য যমযম কূপের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা আজও বিদ্যমান আছে।

আইউব (আঃ) আল্লাহ তাআলার এই সব নেয়ামত লাভ করিলেন– ইহা তাঁহার সবরের জাগতিক ফল ছিল। তাহাই আল্লাহ তাআলা সকল নেয়ামত উল্লেখান্তে বলিলেন–انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب "নিশ্চয় আইউব আমার নিকট বড়ই ধৈর্যশীল প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেনও অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি রুজুকারী ও অনুরাগী।"

হযরত মূসা (আঃ)

বনী ইস্রাঈল বংশের প্রসিদ্ধ রসূল মূসা (আঃ) এবং তাঁহারই বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা হারুন (আঃ) তাঁহাদের পিতার নাম ছিল এমরান। ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুবের সঙ্গে মাত্র তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত মূসার বংশ মিলিত হয়। হযরত মূসার পিতামহের পিতামহ ছিলেন ইয়াকুব (আঃ)।

হযরত মূসার পয়গাম্বরীর যমানায় তাঁহার সাধারণ সম্পর্ক সুয়েজ ও সুয়েজ উপ সাগরের পূর্বপারে সাইনা বা সীনা উপত্যকা, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইত্যাদির সঙ্গে ছিল; কিন্তু তাঁহার জন্ম ছিল সুয়েজের পশ্চিম পারস্থিত মিসরে।

বনী ইস্রায়ীলের আসল আবাস ভূমি ছিল ফিলিস্তিনের "কান্‌আন" শহর এলাকায়, কিন্তু হযরত ইয়াকুবের শেষ আমলে হযরত ইউসুফের ঘটনায় তাঁহারা তথা হইতে মিসরে আসিয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইউসুফের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মূসার জন্ম

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইউসুফ (আঃ) খৃষ্ট সনের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে মিসরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কতেক বৎসর পর হইতেই বনী ইসরাঈল মিসরে আবাদ হইল। এর প্রায় ৩০০/৩৫০ বৎসর পর হযরত মূসার জন্মের যুগ। ঐ যুগে মিসরে রাজাগণের প্রত্যেকেরই উপাধি হইত " "ফেরআউন"। খৃষ্টপূর্ব ১২৯২ হইতে ১৩১৫ পর্যন্ত যে ফেরআউনের রাজত্ব ছিল, তাহারই আমলে মিসরে হযরত মূসার জন্ম হয়। উক্ত হিসাব মতে হযরত মূসার জন্ম খৃষ্টপূর্ব (১২০০) দ্বাদশ শতাব্দীর যুগে। (কাসাসুল কোরআন)

কাহারও মতে তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব (১৬০০) ষষ্ঠদশ বা (১৭০০) সপ্তদশ যুগে এবং তাহাদের মতে মিসরে হযরত ইউসুফের প্রবেশ খৃষ্টপূর্ব (২০০০) বিংশ শতাব্দী যুগ ছিল। (আরজুল কোরআন) হযরত মূসার জন্মের সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত; ঐ সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

হযরত মূসার জন্ম এমন কঠিন সময়ে হইয়াছিল যখন, মিসরস্থ দুর্ধর্ষ রাজা ফেরআউনের আদেশবলে বনী ইসরাঈল বংশের নবজাত প্রত্যেকটি ছেলে সন্তানকে মারিয়া ফেলা হইত। কারণ, জ্যোতিষগণ তাহাকে খবর দিয়াছিল যে, এই বনী-ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন পুরুষের হাতে তাহার ধ্বংস ঘটিবে, তাই সে তাহার মোকাবিলায় ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের লীলা– ঐ সময়ে হযরত মূসা (আঃ) উক্ত ফেরআউনেরই শাসন এলাকায় তাহার রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শুধু বাঁচিয়াই রহিলেন না, বরং সেই ফেরআউনের গৃহেই দীর্ঘ ৩০ বৎসর আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنْ نَبَاٍ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

আপনাকে মূসা ও ফেরআউনের ঘটনা ঠিক ঠিক শুনাইব মোমেনদের জন্য।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ -

অর্থ ঃ নিশ্চয় ফেরআউন অতিশয় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ছিল দেশের উপর এবং দেশের অধিবাসীগণকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার একটি দল (তথা বনী ইসরাঈল)-কে হীন ও দুর্বল করিয়া রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। সে তাহাদের মেয়েগকে জীবন্ত রাখিত (দাসী বানাইয়া) আর ছেলে সন্তানগুলিকে জবাই করিত; নিশ্চয় সে ছিল মস্ত বড় ফাসাদকারী।

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ -

অর্থ ঃ (আল্লাহ বলেন,) এদিকে আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি বিশেষ অনুগ্রহ করি ঐ দলের উপর যাহাদিগকে হীনবল করিয়া রাখা হইতেছিল এবং তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করি ও তাহাদিগকে দেশের উত্তরাধিকারী করি এবং তাহাদিগকে দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি; আর ফেরআউন ও তাহার উজির হামান এবং তাহাদের লোক-লস্করদের দেখাইয়া দেই ঐ পরিস্থিতি যাহার আশঙ্কা তাহারা করিতেছিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -

অর্থ ঃ (মূসা জন্মগ্রহণ করিলেন,) আমি মূসার জননীর অন্তরে এই নির্দেশ মর্ম ঢালিয়া দিয়াছিলাম যে, মূসাকে দুগ্ধপান করাইয়া লালন-পালন করিতে থাক। যখন মূসার উপর (ফেরআউনী লোকদের) আশঙ্কা বোধ করিবে তখন তাহাকে (সিন্দুকে রাখিয়া) নদীতে ভাসাইয়া দিও; কোন ভয় ও চিন্তা করিও না। নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমাদের নিকট ফিরাইয়া দিব এবং তাহাকে রসূল বানাইব।

فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا - اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ -

অর্থ ঃ (ঘটনার) শেষে এই ঘটিল যে, ফেরআউনেরই স্ত্রী মূসাকে উঠাইয়া নিল (ছেলে বানাইয়া উপকার লাভের পাত্ররূপে তাঁহাকে পাইবে এই আশায়, কিন্তু) শেষকালে তিনি তাহাদের পক্ষে শত্রু ও চিন্তার কারণ হইলেন। নিশ্চয় ফেরআউন হামান ও তাহাদের লোকজন ঠকার কাজ করিয়াছিল।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ - لَاتَقْتُلُوْهُ - عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ -

অর্থ ঃ ফেরআউনের স্ত্রী (নদীর তীরস্থ বাগানের ঘাটে ভাসমান সিন্দুক হইতে শিশু মূসাকে উঠাইয়া ফেরআউনকে) বলিলেন, আমার তোমার নয়ন জুড়ান আদরের বস্তু হইবে এই শিশুটি– ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদের উপকারে আসিবে বা তাহাকে আমরা ছেলে বানাইব। তাহারা (মূসাকে লালন-পালনের শেষফল) অবহিত ছিল না।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فَارِغًا - اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ (ঘটনার প্রারম্ভে মূসা জননী আল্লাহর এলহাম মতে ফেরআউনের আশঙ্কায় মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দেওয়াকালে) মূসা-জননীর মন ধৈর্যহারা হইয়া পড়িল; হয়ত সে ঘটনাটা প্রকাশই করিয়া বসিত যদি আমি (আল্লাহ) তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় না রাখিতাম এই উদ্দেশে যে, সে যেন আমার উপর অবিচল বিশ্বাসী হয়।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ মূসা জননী মূসার ভগ্নীকে বলিল, মূসার (সিন্দুকের) অনুসরণ কর। সেমতে ভগ্নী তাঁহাকে দূরে দূরে থাকিয়া দেখিল; তাহার পরিচয় সম্পর্কে ফেরআউনী লোকদের অনুভূতি ছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ (আল্লাহ বলেন, মূসাকে মাতার নিকট ফিরাইতে) আমি পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মূসা কোন ধাত্রীর দুগ্ধ পান করিবে না। (সেমতে ফেরআউনী লোকগণ সঙ্কটে পড়িলে) ঐ ভগ্নী বলিল, আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যাহারা এই শিশুকে যত্নে লালন-পালন করিবে।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ এই সূত্রে আমি মূসাকে তাঁহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন সে সান্ত্বনা লাভ করে এবং তাহার চিন্তা দূর হয় এবং সে দেখিয়া লয় যে, আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকার নিশ্চয় বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই জ্ঞান রাখে না।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা পূর্ণ বয়স্ক, পাকা-পোক্ত হইলেন তখন তাঁহাকে পরিপক্ক জ্ঞান ও এলম দান করিলাম; সৎকর্মশীলগণকে আমি এইরূপেই পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (পারা- ২০ রুকু- ৫)

উক্ত ঘটনাকে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র হযরত মূসার উপর বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহসমূহের ফিরিস্তিদানের প্রথম নম্বরে উল্লেখ করিয়াছেন। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসাকে নবুয়ত প্রদান করিয়া ফেরআউনকে তবলীগ করিতে যাইতে বলিলেন, আর হযরত মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে নবুয়ত দানের দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার সেই দরখাস্তে মঞ্জুরী দান করতঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ـ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ـ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি পূর্বে তোমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করিয়াছি– যখন আমি (তোমাকে ফেরআউন হইতে বাঁচাইবার জন্য) তোমার মাতার অন্তরে বিশেষ এলহাম করিয়াছিলাম যে, শিশু মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া তাহাকে দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও; দরিয়া তাহাকে কূলে ঠেকাইবে। তথা হইতে তাহাকে এমন এক ব্যক্তি উঠাইয়া নিবে যে আমারও শত্রু মূসারও শত্রু। আমি তোমার উপর স্নেহ মমতার আভা ঢালিয়া

দিয়াছিলাম; তোমাকে (বাঁচাইয়া রাখার জন্য) এবং আমার তত্ত্বাবধানে গড়িয়া তোলার উদ্দেশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

اِذْ تَمْشِىْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَكْفُلُهٗ ـ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ ـ

অর্থ ঃ আর একটি স্মরণীয় ঘটনা– তোমার ভগ্নী (সিন্দুকের অনুসরণে) চলিতেছিল, অতপর সে ফেরআউনী লেকগণকে বলিল, আমি এমন লোকদের সন্ধান দিব যে এই শিশুকে সযত্নে পালন করিবে। এইরূপে আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তোমাকে পাইয়া তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়।

১৬৪০। হাদীছ ঃ আব মূসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, পুরুষের মধ্যে ত অনেকেই কামেল সিদ্ধ ও সুখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে সিদ্ধ ও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্না হইয়াছেন একমাত্র ফেরাউনের স্ত্রী "বিবি আছিয়া" এবং এমরানের কন্যা "বিবি মরইয়াম"। আর আয়েশার মর্যাদা ত সর্বোপরি– সমস্ত নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদা এরূপ বড় যে রূপ সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদের" মর্যাদা।

ব্যাখ্যা ঃ গোশত ও উহার সুরুয়ার মধ্যে রুটির ছোট ছোট টুকরা ভিজাইয়া এক প্রক প্রকার খাদ্য বস্তু তৈয়ার করা হয় উহাকেই "সারীদ" বলা হয়। আরব দেশে উহা অতি জনপ্রিয় ও উচ্চাঙ্গের খাদ্য। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অতি উচ্চ মর্যাদা বুঝাইবার জন্য হযরত (সঃ) এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত মূসার মিসর ত্যাগ

হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের লালন-পালনে রাজকীয় সুখ শান্তির মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশে পৌঁছিল। তাহার নিজের সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তিনি একজন বনী ইসরাঈল বংশীয় এবং মিসরীয় কিবতীগণ বনী ইসরাঈলদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া যাইতেছিল – তাহাদিগকে শুধু পরাধীনই নহে বরং দাস-দাসীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন এইসব অনুভূতির প্রতিক্রিয়া যে, হযরত মূসাকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সূত্রের একটি ঘটনার ফলেই হযরত মূসা আকস্মিকভাবে মিসর ত্যাগ করিয়া মাদইয়ানের দিকে চলিয়া যান। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ـ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ـ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ـ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ـ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ ـ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ একদা মূসা (আঃ) নিরবচ্ছিন্নতার মুহূর্তে শহর এলাকায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছে– একজন মূসার সমাজের অপরজন শত্রু পক্ষীয় তথা মিসরীয় কিবতী। নিজ পক্ষীয় লোকটি শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে মূসার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মিসরীয়রা বনী ইসরাঈলকে অত্যাচার করে তাহা মূসা (আঃ) জানিতেন এবং মনের আগুন মনেই রাখিতেন; এই ঘটনায় চাক্ষুষরূপে ইসরাঈলী

ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিরপরাধতা এবং মিসরীয় ব্যক্তির নির্মম ব্যবহার দেখিয়া মূসা ধৈর্যচ্যুত হইলেন। তিনি মিসরীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারিলেন যাহাতে তাহার দফা রফা হইয়া গেল। (তাহাকে শায়েস্তা করার ইচ্ছা ছিল হত্যার ইচ্ছা ছিল না। তাই মূসা অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, এইরূপ ধৈর্যচ্যুত করা) ইহা শয়তানের কাজ; নিশ্চয় সে স্পষ্ট শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকটও ক্ষমা প্রার্থনায় বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি আমায় ক্ষমা কর। তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। মূসা আরও বলিলেন, হে প্রভু! আমার উপর তোমার অসংখ্য অনুগ্রহ, অতএব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামীতে কখনও (ঝগড়া-বিবাদী) অপরাধ পরায়ণদের সাহায্য করিব না।

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ـ قَالَ لَهُ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ـ فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (কেহ না দেখায় হত্যাকারীর পরিচয় গোপন থাকিল। মূসা শহরেই রহিলেন, সন্ত্রস্ততার মধ্যে রাত্রি কাটাইলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি, যে পূর্বের দিন সাহায্যপ্রার্থী ছিল (এবং তাহাতে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল) সে ই আজ আবার (এক মিসরীয়ের সঙ্গে বিবাদে) মূসাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মূসা তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন– নিশ্চয় তুমি স্পষ্টতঃই দুষ্টলোক! (প্রতিদিন তোমার ঝগড়া বাধে।) অতপর যখন মূসা (বারণ করণার্থে ধরিতে চাহিলেন ঐ ব্যক্তিকে, যে মূসা ও ইসরাঈলী উভয়ের শত্রু (তথা মিসরীয়; তখন সাহায্যপ্রার্থী ইসরাঈলী ব্যক্তি ভাবিল, মূসা আমাকে রাগ করিয়াছে; আমাকেই মারিবে– এই ভয়ে) সে বলিয়া উঠিল, হে মূসা! গতকল্য তুমি এক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছ, আজ ঐরূপে আমাকে খুন করিতে চাও! তুমি ত দেশে শুধু নিজের জোরবাজি করিয়া চলিতে চাও, সংশোধনীর কাজ করার ইচ্ছা তোমার মোটেও নাই।

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ـ قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ـ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ ـ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (এই ঘটনায় পূর্ব দিনের হত্যাকারীরূপে মূসার নাম ফাস হইয়া সংবাদ ফেরআউনের দরবারে পৌঁছিল। রাজ্যসভায় মূসার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হইল।) এক ব্যক্তি (ফেরআউনেরই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু অন্তরে মূসার ভালবাসা; সে গোপনে) শহরের দূর প্রান্তের পথে,দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে মূসা! রাজসভায় তোমার সম্পর্কে পরামর্শ হইতেছে, তোমাকে তাহারা হত্যা করিবে; তুমি এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। আমি তোমার মঙ্গলকামী; তোমাকে সব বলিয়া দিলাম।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ـ

অর্থ ঃ মূসা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া ভয়-ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে বিপদের আশঙ্কারত অবস্থায় দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! জালেমদের হইতে আমাকে নাজাত দিন।

আর যখন মূসা "মাদইয়ান" এলাকার প্রতি পথ ধরিলেন তখন বলিলেন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন।

"মাদইয়ান" এলাকার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য শোআয়ব আলাইহিস সালামের বিবরণে বর্ণিত

হইবে। এস্থানে শুধু এতটুকু বলা আবশ্যক যে, মিসর এলাকা, বিশেষতঃ যে এলাকায় তাহার রাজধানী তাহা সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম কূল হইতেও বেশ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত। সুয়েজ উপসাগরের অপর পারে সাইনা উপত্যকা, তাহার পর আকাবা উপসাগর, তাহা পার হইয়া পূর্ব কূলে তাহার দক্ষিণ মাথা তথা লোহিত সাগর হইতে তাহার আরম্ভস্থল সংলগ্নে লোহিত সাগরের উপকূলীয় দক্ষিণ পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকাটিই "মাদইয়ান"।

সেকালে সুয়েজ খাল ছিল না, অতএব মিসর এলাকা হইতে পূর্ব দিকে ফিলিস্তীন, সিরিয়া, আরব ইত্যাদি এশিয়ার অঞ্চলে সরাসরি স্থল পথে আসা যাইত। মিসর হইতে পূর্ব দিকে সাইনা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ফেলিস্তীন এলাকায়, অতপর দক্ষিণ দিকে আকাবা উপসাগরের কূল বাহিয়া "মাদ্য়ানে" পৌঁছার জন্য স্থলপথের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু এই সমস্ত এলাকা পর্বতময় মরু অঞ্চল; উক্ত পথ অতিক্রম করিতে অন্ততঃ প্রায় হাজার মাইল চলিতে হইত।

মূসা (আঃ) ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মাদইয়ানে পৌঁছিলেন। তখন তথায় শোআয়ব (আঃ) নবী ছিলেন। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত একটি বিশেষ ঘটনা সূত্রে মূসা (আঃ) হযরত শোআয়বের নিকট পৌঁছিলেন এবং তথায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। হযরত শোআয়বের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও হইল এবং দীর্ঘ দশ বৎসর তথায় রহিলেন। উক্ত ঘটনা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ–

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ - وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ - قَالَ مَا خَطْبُكُمَا - قَالَتَا لَانَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ - وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ -

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) মাদইয়ানে একটি কূপের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, একদল লোক কূপের পানি পশুপালকে পান করাইতেছে; আর দুইটি রমণী নিজের পশু থামাইয়া রাখিতেছে। মূসা রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি? তাহারা বলিল, আমরা পানি পান করাইতে (কূপে) যাই না যাবত রাখালরা চলিয়া না যায়। আর (আমাদের কূপে আসার হেতু) আমাদের পিতা বৃদ্ধ।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ -

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) (ইহা শুনিয়া) নিজে তাহাদের পশু পালকে পানি পান করাইলেন অতঃপর গাছের ছায়ায় আসিয়া আল্লাহর হুজুরে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যাহা দান কর– আমার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া দাও আমি তাহার প্রত্যাশী।

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ - قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا - فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ - اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -

অর্থ ঃ ইতিমধ্যেই উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জা-শরমে ভারাক্রান্ত অবস্থায় মূসার নিকট আসিয়া বলিল, আপনাকে আমার পিতা ডাকিতেছেন; আপনি আমাদের পশুপালকে পানি পান করাইয়াছেন তাহার প্রতিদান দেওয়ার জন্য। সে মতে যখন মূসা রমণীর পিতার নিকট আসিলেন এবং (মিসর ও তথা হইতে পলায়নের) ঘটনা ব্যক্ত করিলেন তখন তিনি বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত হও; ঐ জালেম দল হইতে নাজাত পাইয়াছ। (এখানে তাহাদের শাসন নাই। এই বৃদ্ধ ছিলেন হযরত শোআয়ব (আঃ)।

উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, হে পিতা! এই লোককে চাকুরীতে রাখুন; শক্তিমান বিশ্বাসী লোকই চাকুরীতে শ্রেয় (এই লোকটির উভয় গুণই আছে।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ - فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ - وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ - سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

অর্থ ঃ শোআয়ব (আঃ) নবী; তিনি মূসাকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া) তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা– আমার কন্যাদ্বয়ের একটিকে তোমার বিবাহে প্রদান করা এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার চাকুরী করিবে (তাহার আজুরা মহরানা গণ্য হইবে।) আর যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে তোমার উদারতা হইবে; তাহার জন্য আমি তোমার উপর চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা রাখি না! ইনশাআল্লাহ আমাকে ন্যায়-নিষ্ঠা পাইবে।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ -

অর্থ ঃ মূসা বলিলেন, আচ্ছা– আমার ও আপনার মধ্যে এই কথাই সাব্যস্ত রহিল; নির্ধারিত দুইটা পরিমাণের যে কোনটাই আমি পূর্ণ করি আমার উপর তাহার অধিকের জন্য কোন চাপ দেওয়া হইবে না। আমার কথার উপর আল্লাহ সাক্ষী রহিলেন। (পারা– ২০)

হযরত মূসার মাদইয়ান ত্যাগ ও পথিমধ্যে নবুয়তপ্রাপ্তি

মূসা (আঃ) চাকুরীর মেয়াদ (দশ বৎসর) শেষ করিয়া শর্ত পুরা করিলেন; অতঃপর শ্বশুর শোআয়ব আলাইহিস সালামের অনুমতিপ্রাপ্তে স্ত্রীকে লইয়া নিজের আদি ভূমি সিরিয়া বা তৎকালীন বনী ইসরাঈল দেশ মিসর পানে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে যখন তিনি সুয়েজ খাল এলাকা ও আকাবা উপসাগরের মধ্যস্থ সাইনা উপত্যকা অঞ্চলে "তুর" পর্বতমালার এলাকাস্থ "তুয়া" নামক স্থানে মরূদ্যানে পৌঁছিলেন তখন এই ঘটনা ঘটিল যে, অত্যধিক শীতের কারণে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, এদিকে রাত্রের অন্ধকারে রাস্তাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এমতাবস্থায় হঠাৎ কিছু দূরে আগুনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত একটি বস্তু দেখিতে পাইয়া তাহাকে আগুন বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এ স্থানে অপেক্ষা কর; আমি ঐ অগ্নির স্থানে যাইয়া পথের খোঁজ নিয়া আসিব এবং কিছু অগ্নিও নিয়া আসি, যেন তোমরা তাহার তাপ লইয়া শীতের কষ্ট লাঘব করিতে পার। পরবর্তী বহুবচন শব্দ দ্বারা স্ত্রী ব্যতীত আরও সঙ্গী প্রমাণিত হয়।

যখন মূসা (আঃ) ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন তখন তথায় একটি বৃক্ষ হইতে এক মহান আহ্বান শুনিতে পাইলেন এবং স্নেহময় সম্ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মনোনীত হওয়ার সনদ পাইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরআউনের হেদায়াতের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ারও আদিষ্ট হইলেন। মূসা (আঃ) নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুনের জন্যও নবুয়তের দরখাস্ত করিলেন। আল্লাহ তাআলা দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং হযরত হারুনকে সঙ্গে লইয়া ফেরআউনের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনের তিন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে–

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ -

অর্থ ঃ অতপর যখন মূসা চাকুরীর মেয়াদ সমাপ্ত করিলেন এবং নিজ পরিবারবর্গ লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন পথিমধ্যে তুর পর্বতের দিকে একটা আগুন দেখিলেন। নিজ পরিবারবর্গকে বলিলেন, তোমরা এ স্থানে অপেক্ষা কর। আমি একটু দূরে আগুন দেখিয়াছি; আমি তথায় যাইয়া তোমাদের জন্য হয়ত রাস্তার খবর আনিব অথবা এক খণ্ড অগ্নি-অঙ্গার; তোমরা তাহার তাপ লইতে পারিবে।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۔

অর্থ ঃ যখন মূসা (আঃ) ঐ অগ্নির স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন মরূদ্যানের ডান দিকে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডস্থিত একটি বৃক্ষ হইতে ঘোষণা শুনিতে পাইলেন–"হে মূসা! নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি কর, আমি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ।"

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۔ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدْبِرًا وَّلَمْ یُعَقِّبْ ۔ یٰمُوْسٰی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ ۔

অর্থ ঃ আর তোমাকে একটি মোজেযা দিতেছি; তোমার হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দাও ত! (মাটিতে পড়িয়া তাহা ৮০ গজ লম্বা অজগর হইয়া দ্রুত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।) যখন মূসা দেখিলেন, তাহা এত বড় হইয়াও সরু সর্পের ন্যায় দ্রুত ছুটাছুটি করে, তখন (মানবীয় স্বভাবে সর্পের ভয়ে) তিনি দৌড়িয়া সরিয়া পড়িলেন– পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না। (আহ্বান আসিল–) হে মূসা! সম্মুখে আসিয়া যাও, কোন ভয় করিও না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। (আরও বলিলেন–)

اُسْلُكْ یَدَكَ فِیْ جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِ سُوْٓءٍ ۔ وَّاضْمُمْ اِلَیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ۔

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার হাত জামার ভিতরে বগলতলে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আন; দেখিবে তাহা অতি উজ্জ্বল– (শ্বেত) রোগের কারণে নহে। হাতের পরিবর্তনে ভয় হইলে তাহার জন্য পুনঃ তুমি হাতকে বগলের সঙ্গে মিলাইও; দেখিবে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। এই দুইটি মোজেযা তোমার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ দান করতঃ তোমাকে ফেরআউন ও তাহার পরিষদের প্রতি প্রেরণ করিতেছি; তাহারা নাফরমান জাতি হইয়াছে।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ۔ وَاَخِیْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّیْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُّصَدِّقُنِیْٓ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّكَذِّبُوْنَ ۔

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, প্রভু! আমিফেরআউন গোষ্ঠীর একজন লোক হত্যা করিয়াছিলাম; আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে (পাইলে) মারিয়া ফেলিবে। আমার ভ্রাতা "হারুন" আমার তুলনায় অধিক বাক-শক্তিমান, তাঁহাকে আমার সঙ্গে রসূলরূপে প্রেরণ করুন; তিনি আমার সমর্থন করিবে; ফলে আমার কথা জোরদার হইবে। আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِیْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا یَصِلُوْنَ اِلَیْكُمَا ۔ بِاٰیٰتِنَآ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ বলিলেন, এখনই তোমার ভ্রাতার (নবুয়ত) দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি করিব এবং তোমাদেরকে বিশেষ প্রভাব দান করিব; ফলে তাহারা (ক্ষতি করিতে) তোমাদের কাছেও ভিড়িতে পারিবে না। আমার প্রদত্ত (সত্যবাদিতার) নিদর্শন লইয়া তাহার নিকট যাও। তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই বিজয় হইবে। (পারা–২০ রুকু– ৭)

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ـ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় ঘটনা– মূসা স্বীয় স্ত্রী ও সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমি কিছু দূরে আগুন দেখিয়াছি (তোমরা স্থানে থাক), আমি তথা হইতে পথের খোঁজ নিয়া আসিব বা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়া আসিব; তোমরা তাহার তাপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইয়া বলা হইল, বরকতপূর্ণ হউক যাহারা এই অগ্নির (ন্যায় উজজ্বল নূরের ব্যবস্থারূপে তাহার) মধ্যে আছে (ফেরেশতা) এবং যে তাহার পাশ্ববর্তী আছে (তথা মূসা)। অধিকন্ত (বলা হইল,) সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ হইতেছেন পবিত্রতাময় মহামহিমান্বিত। (আর যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সবই স্থুল বস্তু; এই সব মহান আল্লাহ নহেন, বরং তাঁহার কুদরতের লীলা মাত্র!)

يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

হে মূসা! নিশ্চয় জানিও, আমি হইতেছি মহান আল্লাহ তাআলা প্রবল পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ـ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ـ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ আর তোমার লাঠি মাটিতে ফেল ত। অতঃপর যখন তাহাকে (বড় অজগররূপে) সরু সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিলেন তখন তিনি ভয়ে সরিয়া পড়িলেন, পিছনে তাকাইলেনও না। আহ্বান আসিল, হে মূসা! ভয় পাইও না; আমার নিকট রসূলগণের ভয় পাওয়ার কারণ নাই। অবশ্য যে অন্যায় করে (সে ভীত হইতে পারে, কিন্তু) তৎপর খারাপের পরিবর্তে ভাল করিলে গোনাহের পরে তওবা করিলে তাহারও গোনাহ মাফ হইবে, ভয়-ভীতির কারণ থাকিবে না;) নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়ালু।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর তুমি নিজ হাতকে জামার ভিতর বক্ষে প্রবেশ করাও, তাহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। এই দুইটিসহ নয়টি মোজেযা লইয়া ফেরআউন ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি যাও। তাহারা নাফরমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। (পারা–১০ রুকু– ১৬)

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ـ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ـ

অর্থ ঃ মূসার ঘটনা কি আপনি জানেন? যখন তিনি পথিমধ্যে দূর হইতে একটি আগুন রূপ বস্তু দেখিয়া নিজ পরিজনকে বলিলেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; আমি দূরে একটা আগুন দেখিয়াছি; আশা করি তাহা হইতে কিছুটা অংশ তোমাদের জন্য নিয়া আসিব; অথবা তথায় আগুনের সন্ধান পাইব।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى - اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى -

অর্থ ঃ মূসা ঐ আগুনের নিকটবর্তী আসিলে ঘোষণা শুনিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার; তুমি পায়ের জুতাদ্বয় খুলিয়া ফেল; তুমি ত এক পবিত্র প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছ। আর শুন, আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, (রসূলরূপে), অতএব প্রেরিত অহী মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى - فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى -

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি হইতেছি আল্লাহ, আমি ব্যতীত মা'বুদ আর কেহই নাই, অতএব বন্দেগী একমাত্র আমারই করিবে এবং আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য নিয়া "নামায" উত্তমরূপে আদায় করিবে। "কেয়ামত" নিশ্চয় আসিবে, আমি তাহার আগমন তারিখ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করি। (নির্ধারিত সময় তাহা সংঘটিত হইবেই;) যেন প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম অনুসারে ফল লাভ করিতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করে না এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন হইতে কোন মতেই বিরত রাখিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলিলেন–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى - قَالَ هِىَ عَصَاىَ - اَتَوَكَّؤُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى -

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার ডান হস্তের ঐ জিনিসটা কি? মূসা বলিলেন, তাহা আমার লাঠি; তাহার উপর আমি ভর করিয়া থাকি এবং তাহা দ্বারা আমার পালের জন্য বৃক্ষের পাতা পাড়িয়া থাকি; তাহা আরও অনেক কাজে আসে।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى - فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى - قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ - سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى -

অর্থ ঃ আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! লাঠিটা মাটিতে ফেল ত; মূসা তাহা মাটিতে ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা (৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, ইহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় পাইও না। এখনই তাহাকে প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া দিব।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى - لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى - اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى -

অর্থ ঃ আল্লাহ আরও বলিলেন, নিজ হস্তকে বগলের সঙ্গে মিলিত কর; তাহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বলরূপে

বাহির হইবে। ইহা আমার শক্তির ও তোমার সত্যতার দ্বিতীয় নিদর্শন। (সম্মুখ ঘটনাপ্রবাহে) আমার বৃহত্তম নিদর্শনের আরও কতকগুলি তোমাকে দেখাইবার ইচ্ছা রাখি। তুমি ফেরআউনের নিকট যাও; নিশ্চয় সে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْلِىٓ اَمْرِىْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِى ـ وَاجْعَلْ لِّى وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰرُوْنَ اَخِىْ ـ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ ـ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ ـ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ـ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ـ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ـ ... .

অর্থ ঃ মূসা দোয়া করিলেন, হে প্রভু! আমার সিনা খুলিয়া দাও (তোমার বাণী ভালরূপে বুঝিতে পারি, প্রচারে মনোবল পাই, ভয়-ভীতি না আসে)। আমার সব কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও; আমার মুখের জড়তা দূর করিয়া দাও যেন সকলে আমার কথা ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর আমার আপন লোকদের হইতে আমার একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর– আমার ভ্রাতা হারুনকে মনোনীত কর; তাহার দ্বারা আমার বাহুবল বাড়াইয়া দাও– তাহাকেও আমার সঙ্গে আমার কর্তব্যে নিয়োগ কর; যেন আমরা উভয়ে তোমার পবিত্রতা প্রচার বেশী পরিমাণে করিতে পারি, তোমার যিকির বেশী করিতে পারি; তুমি আমাদের সব অবস্থা দেখিতেছ। আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! তোমার দরখাস্ত পুরা করিলাম।...

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ـ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلاَ تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ـ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ـ فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ـ

অর্থ ঃ আর আমি তোমাকে গঠন করিয়াছি আমার নিজের (কাজের) জন্য; তুমি ও তোমার ভ্রাতা (তোমাদের সত্যতা প্রমাণে) আমার প্রদত্ত নিদর্শন মোজেযাগুলি লইয়া রওয়ানা হও; আমাকে স্মরণে রাখিতে অবহেলা করিও না। তোমরা যাও ফেরআউনের নিকট। নিশ্চয় সে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তোমরা তাহাকে নম্রভাবে বুঝাও; হয় ত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা পরিণামের ভয় করিবে।

قَالاَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

অর্থ ঃ উভয়ে আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের আশঙ্কা হয় সে আমাদের আক্রমণ করিয়া বসে বা কোন অসঙ্গত কার্য করিয়া বসে। قَالَ لاَ تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি– সব (কথাবার্তা) শুনিতে থাকিব, (সব অবস্থা) দেখিতে থাকিব।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ـ

অর্থ ঃ তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে এই বল যে, আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা প্রভুর তরফ হইতে রসূলরূপে আসিয়াছি। বনী ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও, তাহাদিগকে আর যাতনা দিও না। আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রভুর তরফ হইতে

আমাদের সত্যতার প্রমাণ লইয়া স্মরণ রাখিও– যাহারা সত্যের অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্যই শান্তি। আমাদিগকে অহী মারফত জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি সত্যকে মিথ্যা বলিবে এবং অস্বীকার করিবে নিশ্চয়, তাহাকে আযাব ভোগ করিতে হইবে।(সূরা ত্বোয়াহাঃ পারা– ১৬ রুকু– ১০, ১১)

ফেরআউনের নিকট হযরত মূসা ও হারুনের উপস্থিতি

আল্লাহ তাআলার আদেশনানুসারে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) উভয়ে ফেরআউনের নিকট আল্লাহর আদেশ পৌঁছাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ফেরআউন ত হযরত মূসার মুখে নবুয়তের দাবী শুনিয়াই অবাক হইয়া গেল যে, কিছু দিন পূর্বে তুমি আমাদের লালন পালনে ছিলে; খুনের অপরাধী হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলে। এখন বলিতেছ– তুমি নবী হইয়াছ! এইরূপে ফেরআউন প্রতিবাদ করতঃ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আর মূসা (আঃ) যে তাহাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের আহ্বান জানাইতে ছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং হযরত মূসাকে তাঁহার সত্যতার প্রমাণ দেখাইতে বলিল। মূসা (আঃ) তাঁহার লাঠী এবং হাতের মোজেযা দেখাইলেন। ফেরআউন ও তাহার পরিষদমণ্ডলী ঐ সব মোজেযাকে "যাদু" সাব্যস্ত করিল এবং দেশের বড় বড় জাদুকরদের দ্বারা হযরত মূসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হইল। পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে; কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ . اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ .

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) যখন আমার প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ লইয়াফেরআউন গোষ্ঠীর নিকট পৌঁছিলেন তখন তাহারা বলিল, এই সব ত জালিয়াতি যাদু ভিন্ন কিছু নহে। (আল্লাহ আছেন, তিনি নবী পাঠান, মোজেযা প্রদান করেন–) এইসব কথা ত আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও শুনি নাই। মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার পরওয়ারদেগার ভালরূপে জানেন কে তাঁহার নিকট হইতে সত্য দ্বীন নিয়া আসিয়াছে এবং কে পরিণামে সাফল্য লাভ করিবে! ইহা ধ্রুব সত্য যে, পরিণামে স্বৈরাচারীরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ فَاَوْقِدْلِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ . فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

অর্থ ঃ ফেরআউন তাহার পরিষদকে বলিল, আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে ইহা আমি ধারণাও করি না। অতপর সে লোকদিগকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশে বিদ্রূপ করিয়া উজীর) হামানকে বলিল, আগুনে পুড়িয়া পাকা–পোক্ত ইট তৈয়ার কর তদ্দ্বারা উঁচু বালাখানা (মানমন্দির) তৈয়ার কর; তাহার উপর উঠিয়া আমি দেখিব, মূসার খোদার খোঁজ পাই নাকি। আমার ত বিশ্বাস, মূসা মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ .

অর্থ ঃ ফেরআউন এবং তাহার লোক-লস্কররা দুনিয়ার মধ্যে মিছামিছি আত্মগর্বে ফুলিয়াছিল; তাহাদের ধারণা বিশ্বাস এই ছিল যে, তাহাদের আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ . فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ . وَجَعَلْنٰهُمْ

اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَايُنْصَرُوْنَ ـ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ـ

পরিণামে আমি ফেরআউন ও তাহার লোক-লস্করকে পাকড়াও করিলাম এবং দরিয়ায় ডুবাইয়া দিলাম। চিন্তা কর স্বৈরাচারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল। আর আমি তাহাদিগকে সরদার বানাইয়াছিলাম; তাহারা লোকদিগকে দোযখের দিকে পরিচালিত করিত, তাই কেয়ামতের দিন তাহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না। শুধু তাই নহে– এই দুনিয়াতেই আমি তাহাদের পিঠে লা'নতের ছাপ লাগাইয়া দিয়াছি, আর কেয়ামতের দিন তাহাদের যে দুরবস্থা হইবে তাহা ত আছেই। (পারা– ২০ রুকু–৭)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

(পূর্বোল্লিখিত রসূলগণের) পরে আমি মূসা ও হারুনকে পাঠাইলাম আমার পক্ষ হইতে তাঁহাদের সত্যতার কতিপয় নিদর্শন দিয়া (বিশেষরূপে) ফেরআউন ও তাহার পরিষদবর্গের প্রতি। কিন্তু তাহারা গোঁড়ামি করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিলই অপরাধ পরায়ণ দল। যখন আমার পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হইল তখনও তাহারা বলিল, ইহা ত স্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, সত্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তোমরা তাহা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কর? যাদু কি এরূপ হয়? কোন যাদুকর (নবুয়তের দাবী করিয়া কোন যাদুর মধ্যে) কৃতকার্য হইতে পারে না।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ـ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ আমাদিগকে ঐ ধর্ম হইতে হটাইবার জন্য, যে ধর্ম মতের উপর আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে পাইয়াছি; আর এই জন্য যে, দেশের মধ্যে তোমাদের দুই জনের সরদারী কায়েম হউক? আমরা তোমাদিগকে কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিব না।

(সূরা ইউনুছঃ পারা–১১ রুকু–১৩)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

তারপর আমি পাঠাইলাম মূসাকে আমার প্রদত্ত প্রমাণাদি দিয়া ফেরআউন ও তাহার সরদারদের প্রতি। তাহারা ঐসব প্রমাণের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিল (তাহা উপেক্ষা করিল)। ফলে সেই ফাসাদকারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, হে ফেরআউন! আমি সারা জাহানের প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল নিয়োজিত হইয়াছি। আমার কর্তব্য– আমি আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে সত্য বৈ আর কিছু বলিব না। আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আমার সত্যতা প্রমাণের নিদর্শন নিয়া আসিয়াছি। অতএব বনী ইসরাঈলগণকে আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

ফেরআউন বলিল, তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তাহা প্রকাশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ـ

সেমতে মূসা স্বীয় লাঠি ফেলিয়া দিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা স্পষ্টতঃ (৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন মূসা নিজ হস্ত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে তাহা সমস্ত দর্শকদের সমক্ষে উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ـ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ـ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ ـ

ফেরআউন গোষ্ঠীল সাহেব-সরদাররা তাহাদের সর্বসাধারণকে বুঝাইল যে, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বড় বিজ্ঞ যাদুকর; সে তোমাদিগকে দেশান্তর করিতে চায়, সুতরাং তোমাদের পরামর্শ কি?

قَالُوْآ اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ـ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ـ

তাহারা সকলে মিলিয়া ফেরআউনকে পরামর্শ দিল যে, মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে এখনকার মত অবকাশ দেওয়া হউক, আর নগরে নগরে লোক সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; তাহারা সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকরগণকে নিয়া আসিবে। (পারা– ৯; রুকু– ৩)

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ـ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ـ

ফেরাউন বলিল, হে মূসা! তোমরা যে প্রভুর কথা বল সেই প্রভু কে? মূসা বলিলেন, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে উহার আকার-আকৃতিতে রূপায়িত করিয়াছেন, অতঃপর প্রত্যেককে তাহার উপযোগী খাদ্য-খাদক, কাজ-কর্ম, চাল্-চলন ইত্যাদির প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে পরিচালিত করিয়াছেন যিনি, তিনিই আমাদের প্রভু।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ـ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ـ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى ـ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ـ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ـ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ـ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ

ফেরআউন (প্রভু হওয়ার দাবীদার; মূসার মুখে সে বাস্তব প্রভুর পরিচয় ও গুণাগুণ শুনিয়া ভয় পাইল যে, এই পরিচয়ে ত আমার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, তাই ঐ আলোচনা এড়াইবার উদ্দেশে অন্য প্রশ্ন তুলিয়া) বলিল, পূর্ব যুগের লোকদের অবস্থা কি হইবে? (অনেকে ত "প্রভু" অস্বীকার করিত। মূসা (আঃ) এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপ করতঃ বাস্তব প্রভুর আরও গুণাবলী উল্লেখ করিলেন যেন ফেরআউনের দাবীর অসারতা

অসারতা সুস্পষ্ট হয়। মূসা (আঃ) বলিলেন, পূর্ব যুগীয় লোকদের সংবাদ আমার প্রভুর নিকট লিখিত রহিয়াছে; আমার প্রভু তাহা হইতে অজ্ঞ নহেন, তিনি তাহা ভুলিবেনও না। (প্রভুর আরও গুণাবলী শুন,) তিনি তোমাদের বসবাসের জন্য যমীনকে বিছানার ন্যায় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চলাফেরার জন্য বিভিন্ন পথ বানাইয়া দিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। (আল্লাহ বলেন সেই পানি দ্বারা আমি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু রকম উদ্ভিদ মাটি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি; তোমরা তাহা খাও, তোমাদের পশু পালকেও তাহাতে চরাও। নিশ্চয় এই সমস্তের মধ্যে (প্রভুর পরিচয়ের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য। (আল্লাহ আরও বলেন,) আমি এই যমীন হইতে তোমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছি (যমীনের উদ্ভিদ হইতে খাদ্য, তাহা খাইয়া রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য, বীর্য দ্বারা মানব দেহ সৃষ্ট) এবং এই যমীনের মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব এবং ইহা হইতে পুনঃ তোমাদিগকে বাহির করিব। (যেমন বীজ যমীনই জন্মে, আবার যমীনেই ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ জন্মে।)

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ـ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ـ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ـ

আমি (মূসার মাধ্যমে আমার পরিচয়ের) সব রকম নিদর্শনই ফেরআউনকে দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে অমান্য করিল। সে বলিল, হে মূসা! তুমি যাদুর দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইতে আসিয়াছ? আমরাও তোমার বিরুদ্ধে অনুরূপ যাদুর ব্যবস্থা করিতেছি। অতএব উভয়ের মধ্যে সময় নির্ধারিত কর; আমরা বা তুমি– কেহই তাহার ব্যতিক্রম করিবে না, ঐ সময়ে উভয় পক্ষ মাঝামাঝি এক স্থানে সমবেত হইবে।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমাদের উৎসব দিবস নির্ধারিত রহিল, বেলা এক প্রহরে সমস্ত লোক সমবেত হইবে। فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى

ফেরাউন চলিয়া গেল এবং নিজের ফন্দিফিকির সম্পন্ন করিয়া নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ـ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ـ

মূসা (আঃ) উপস্থিত সকলকে উপদেশ দানে বলিলেন, তোমাদের ভয়াবহ অবস্থা হইবে; তোমরা (আল্লাহ প্রদত্ত মোজেযাকে 'যাদু' বলিয়া) আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করিও না; অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিবেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ـ

উপদেশের ফলে লোকদের মধ্যে (মূসা সম্পর্কে) মতভেদ সৃষ্টি হইল এবং গোপনে সলা-পরামর্শ চলিল।

قَالُوْا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدَانِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ـ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ـ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ـ

তাহারা বলিল, মূসা ও হারুন- তাহারা দুইজন যাদুকর তোমাদিগকে যাদুর জোরে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তোমাদের সুশৃঙ্খল ধর্মমত নষ্ট করিয়া দিতে চায়, অতএব তোমরা সমবেতভাবে সকল প্রকার তয়-তদবীর লইয়া প্রতিরোধের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া একতাবদ্ধতার সহিত উপস্থিত হইবে।

(সূরা ত্বোয়া-হা ঃ পারা- ২৬ রুকু-১২)

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلاَ يَتَّقُوْنَ ـ

আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা-যখন তোমার পরওয়ারদেগার মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি একটি স্বরাচারী জাতি তথা ফেরআউন জাতির নিকট যাও; তাহারা কি সংযত হইবে না?

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ ـ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ـ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার ভয় হয়, (আমি একা হইলে) তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার মধ্যে ত সঙ্কোচবোধ আছেই, তদুপরি আমার মুখও চালু নহে– মুখে তোতলামি আছে, অতএব (আমার ভ্রাতা) হারুনকেও নবুয়ত দান করুন। তদুপরি আমার উপর তাহাদের একটি (খুনের) অপরাধের দাবী আছে। আমার ভয় হয়, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

قَالَ كَلاَّ ـ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْنَ ـ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ـ

আল্লাহ বলেন, না না – কিছুই করিতে পারিবে না, তোমরা আমার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, আদেশাবলী লইয়া যাত্রা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; সব শুনিতে থাকিব। তোমরা ফেরআউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা সারা জাহানের প্রভুর রসূল; প্রভুর আদেশ– তুমি বনী ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ـ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

(মূসা (আঃ) ফেরআউনকে নবুয়তের দাবী জানাইলেন,) ফেরআউন বলিল, আমরা ত তোমাকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন করিয়াছি এবং আমাদের মধ্যে তুমি নিজ বয়সের অনেক বৎসর কাটাইয়াছ, তারপর তুমি একটা জঘন্য কাজ করিয়াছিলে (এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে), তুমি ত বড়ই অকৃতজ্ঞ।

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ ـ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, ঐ কাজ করিয়াছি– তখন তাহা আমার অসর্কতায় সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর তোমাদের ভয়ে তোমাদের হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। পরে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূলরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ـ

আর (লালন-পালন করার) যে উপকার আমার প্রতি দেখাইতেছ– তাহা তোমারই কারণে ছিল যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানাইয়া রাখিয়াছিলে। (তাহাদের ছেলে সন্তান তুমি মারিয়া ফেলিতে, তাহারই দরুন দীর্ঘ ঘটনার জেরে তোমার গৃহে আমি পৌছিয়াছিলাম।)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ـ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ـ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ـ

ফেরাউন বলিল, (তোমাদে উল্লেখ্য) সারা জাহানের পরওয়ারদেগারের পরিচয় কি? মূসা বলিলেন, সমস্ত আসমান, যমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা যিনি, তিনিই সারা জাহানের পরওয়ারদেগার; যদি বিশ্বাস কর (তবে এই পরিচয়ই যথেষ্ট)। ফেরআউন দরবাস্থিত সকলকে বলিল, তোমরা শুনিতেছ কি? (আমি ভিন্ন অন্য প্রভু আঁছে!) মূসা আরও বলিলেন, তোমাদের সকলের এবং তোমাদের বাপ-দাদার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা (–তিনিই সারা জাহানের প্রভু)। ফেরআউন বলিল, তোমাদের এই (দাবীদার) রসূল যে (স্বীয় দাবী মতে) তোমাদের প্রতি প্রেরিত, নিশ্চয় পাগল। (নতুবা আমাদের বাপ-দাদা তুলিয়া কথা বলিতে ভয় পাইত।)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, (যিনি আমার প্রভু) তিনি চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, উদয়-অস্তের কাল ও স্থান এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রভু।* বিবেক-বুদ্ধি থাকিলে ইহাতে প্রভুকে চিনিতে পারিবে।

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

(প্রভুর গুণ ও পরিচয় শ্রবণে প্রভুত্বের দাবীদারফেরআউন নিরুত্তর দিশাহারার ন্যায় হুমকিদানে বলিল,) যদি তুমি আমি ভিন্ন অন্য মা'বুদ গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় তোমাকে কারারুদ্ধ করিবে।

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ـ قَالَ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমি যদি (সত্যতার) স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারি তবুও (কারাভোগ)? ফেরআউন বলেল, সত্যবাদী হইলে প্রমাণ কর।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিলেন, তাহা স্পষ্ট অজগর হইয়া গেল। আর তিনি নিজ হস্ত বগলের তলদেশ হইতে বাহির করিলে তাহা দর্শকদের সম্মুখে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ـ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ ـ

ফেরাউন তাহার পরিষদকে বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বিজ্ঞ যাদুকর; তাহার ইচ্ছা– যাদুর জোরে

* অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগত যাহা লক্ষ লক্ষ বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত– এই সব বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পর্যায়ে রহিয়াছে; বিভিন্ন গতিতে চলিতেছে। সেই সবের গতিবিধি এবং তাহার বর্তমান শৃঙ্খলা ইত্যাদি সব কিছু তাঁহার প্রভুত্বের অধীন। আছে কি আর কেহ যে, এই সবের মধ্যে বিন্দুমাত্র অধিকার খাটায়? ইহা অতি উজ্জ্বল ও অকাট্য পরিচয় বাস্তব প্রভুর। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকিলে এই সূত্রে প্রভুকে সহজে চিনিতে পারিবে।

তোমাদেরকে দেশান্তরিত করিবে; তোমরা (তাহার সম্পর্কে) কি পরামর্শ দাও?

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ - يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ -

পরিষদ বলিল, তাঁহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে এখন অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠাইয়া দিন, তাহারা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে আপনার নিকট উপস্থিত করিবে।

(সূরা শোয়ারাঃ পারা– ১৯; রুকু– ৬/৭)

হযরত মূসা ও যাদুকরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফেরআউনের লোক-লস্কর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বড় বড় বিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহ করিল। সেই যুগও ছিল যাদুবিদ্যার উন্নতির সেরা যুগ। সমবেত প্রচেষ্টায় একদল সেরা যাদুকর ফেরআউনের দরবারে সংগৃহীত হইল। যাদুকরগণ জয়ী হইতে পারিলেফেরআউন তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিবে– সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলিয়া সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে যাদুকরগণ উপস্থিত হইল। তাহারা হযরত মূসাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার লাঠি প্রথমে ফেলিবেন, না আমাদেরটা প্রথমে ফেলিবে? মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম ফেল। তাহারা নিজেদের কতিপয় লাঠি ও দড়ি মাটিতে ফেলিল এবং যাদুর দ্বারা লোকদের নজরবন্দি করিয়া দিল; ফলে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোকদের চক্ষে এইরূপ দেখাইতেছিল যেন ঐ লাঠি ও রশিগুলি সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। এইরূপে তাহারা এক মস্ত বড় যাদুর অবতারণা করিল।

মূসা (আঃ) সব কিছুই উপলব্ধি করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ভয় করিলেন যে, যাদুকররা দর্শকদের নজরবন্দি করিয়া যাহা দেখাইল আমার মোজেযাও ত সেই শ্রেণীরই, এমতাবস্থায় দর্শকদের নজরে হক ও না হক মোজেযা এবং যাদুর পার্থক্য উদ্ভাসিত হইবে কিনা? আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার নিকট অহী পাঠাইলেন, আপনি কোন প্রকার আশঙ্কা না করিয়া আপনার লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিন। মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহা এক অজগর হইয়া যাদুকরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সব কিছুকে গিলিয়া ফেলিল।

অবস্থাদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকররা সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হইল। তাহারা যাদুর বাস্তব অবস্থা ও তাহার শক্তি-সীমা ইত্যাদি ভালরূপে জানিত। সুতরাং তাহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, মূসা (আঃ) যাহা দেখাইলেন তাহা যাদু নহে, অলৌকিক শক্তি, নতুবা তাহা বাস্তব অজগরে পরিণত হইয়া আমাদের যাদুর বস্তুসমূহ খাইয়া ফেলিতে পারিত না। অধিক এই হইত যে, তাঁহার লাঠিও আমাদের লাঠিগুলির ন্যায় বা তাহা অপেক্ষা বড় আকারের সাপের মত দেখাইত; বাস্তব সাপে পরিণত হইত না, যদ্দরুন তাহা আমাদের যাদুকে ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাদুর দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র দর্শকের নজরে একটি বস্তুর উপর অপর বস্তুর আকার ও রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা নজরবন্দির কারণে তাহা হইয়া– প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দৃষ্ট রূপের বস্তুতে পরিণত হয় না। যেমন আলোচ্য ঘটনায় যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলি আগে পরে সব সময় প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জীব লাঠি ও দড়িই রহিয়াছে, অবশ্য নজরবন্দীর দরুন কিছু সময়ের জন্য দর্শকদের চোখে ঐগুলির উপর সাপের আকৃতি ও রূপ ও দৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র, ঐগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সাপ হইয়াছিল না। পক্ষান্তরে হযরত মূসার নির্জীব লাঠি বিশেষ সময়ের জন্য হইলেও জীবন্ত অজগরে পরিণত হইয়াছিল। সেমতে তাহার পক্ষে যাদুকরদের বস্তুসমূহ গলাধঃ করা সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহা যে, নজরবন্দী বা ভোজবাজি ছিল না, তাহা যাদুকরগণ নিজেদের বিজ্ঞতার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতেছিল ফলে তৎক্ষণাৎ সর্বসমক্ষে ঐ প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকরগণ খাঁটি ঈমান গ্রহণের ঘোসনা পূর্বক প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে নিজেকে নিবেদিত করিয়া দিবার নিদর্শনস্বরূপ সেজদায় পড়িয়া গেল। উক্ত ঘটনার বিবরণ নিম্নের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى -

যাদুকররা বলিল, হে মূসা! প্রথমে আপনি লাঠি ফেলিবেন, না– আমরা প্রথমে ফেলিব?

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا - فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى -

মূসা (আঃ) বলিলেন, বরং তোমরাই ফেল। তখন তাহাদের নিক্ষিপ্ত দড়ি এবং লাঠিগুলি যাদুর বলে

(দর্শকদের, এমনকি) মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টিতেও দেখাইতেছিল যেন ঐগুলি (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করিতেছে।

فَاَوْجَسَ فِى نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوسٰى ـ قُلْنَا لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ـ وَاَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ـ وَلاَ يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ـ

মূসা (আঃ) মনে আশঙ্কা বোধ করিলেন; (ইহা ভেলকিবাজী, কিন্তু দেখিতে আমার মোজেযার অনুরূপই; দর্শকরা পার্থক্য করিতে পারিবে কি? আল্লাহ বলেন,) আমি মূসাকে বলিলাম, ভয় পাইবেন না; নিশ্চয় আপনিই হইবেন জয়ী। আপনার ডান হস্তের বস্তুটা মাটিতে ফেলুন; তাহা যাদুকরদের গর্হিত সব কিছু গিলিয়া ফেলিবে। তাহারা যাহা বানাইয়াছে তাহা শুধু যাদুকরের ভেলকিবাজি। যাদুকর (মোজেযার সম্মুখে) আসিয়া কখনও জয়ী হয় না। (সূরা ত্বোয়া-হাঃ পারা- ১৬; রুকু- ১২)

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُوْنَ ـ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ـ

যাদুকর দলকে নির্দিষ্ট দিনটিতে একত্র করা হইল এবং লোকদের মধ্যে ঢোল-শোহত করা হইল যে, তোমরা সকলে অবশ্য অবশ্য একত্রিত হইবে। যদি যাদুকর দল জয়ী হয় তবে আমরা সকলে তাহাদের তরীকা তথা ফেরআউনের প্রভুত্ব স্বীকারের উপরই থাকিব।

فَلَمَّا جَاۤءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ـ

যাদুকর দল যখন ফেরআউনের নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরআউনকে বলিল, আমরা কি বড় পুরস্কার লাভ করিব, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি?

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

ফেরাউন বলিল নিশ্চয়, অধিকন্তু তোমরা রাজদরবারে নৈকট্য লাভকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ـ

(মূসা (আঃ) ও যাদুকর উভয় পক্ষ ময়দানে আসিলে) মূসা (আঃ) যাদুকর দলকে বলিলেন, ফেল যাহা কিছু তোমাদের ফেলিবার আছে।

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ـ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ

যাদুকর দল তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মাটিতে ফেলিল এবং ফেরআউনের জয়ধ্বনি করিয়া বলিল নিশ্চয় আমরাই জয়ী হইব। অতঃপর মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ আচম্বিত তাহা (বড় অজগর হইয়া) যাদুকরদের বানোয়াট বস্তুগুলি গিলিয়া ফেলিল। (পারা- ১৯; রুকু- ৭)

وَجَاۤءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ـ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

যাদুকর দল ফেরআউনের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি তবে আমরা নিশ্চয় বড় পুরস্কার লাভ করিব ত?ফেরআউন বলিল- হ্যাঁ, তদুপরি তোমরা রাজদরবারে বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী হইবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ـ قَالَ اَلْقُوْا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاۤءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ـ

যাদুকরগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মূসা। আপনি ফেলিবেন, না আমরা ফেলিব? মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই ফেল। যাদুকররা যখন (লাঠি ও দড়ি) ফেলিল তখন তাহারা (যাদুর দ্বারা) দর্শকদের চোখে ভেলকি লাগইয়া দিল এবং যাদুর চাপে তাহাদের ভীত করিয়া দিল, (ফলে লাঠি ও দড়ি দর্শকদের চোখে সাপের ন্যায় দেখাইল*) যাদুকররা একটা বড় রকমের যাদু উপস্থিত করিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ـ

আর আমি মূসার নিকট ওহী পাঠাইলাম, আপনি স্বীয় লাঠি ফেলুন; তৎক্ষণাৎ তাহা বড় অজগর হইয়া যাদুকরদের বানোয়াট বস্তুসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং তাহাদের বানাওটির অবসান ঘটিল। পরিণামে ফেরআউনগোষ্ঠী উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরাজিত হইল এবং অপমানিত হইল। (সূরা আ'রাফঃ পারা-৯; রুকু-৪)

যাদুকরগণের ঈমান ও ফেরআউনের ভীতির উত্তর

যাদুকররা হযরত মূসার মোজেযা দেখিয়া সহজেই তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিল; তৎক্ষণৎ সর্ব সমক্ষে খাঁটি ঈমানের ঘোষণাদানপূর্বক সেজদায় পড়িয়া গেল।ফেরআউন তাহাদের প্রতি ভীষণ চটিয়া গেল। সে বলিল, মনে হয় তোমরাও মূসার দলেরই; মূসা ওস্তাদ, তোমরা শার্গেদ। সকলে মিলিয়া এই ফন্দি করিয়াছ যে, প্রথমে একজন আসিয়াছ, অতঃপর অবশিষ্টরা আসিয়া সর্ব সমক্ষে পরাজয় বরণে নিজেদের দলেরই বিজয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইয়াছ। আমি তোমাদিগকে এই কার্যের সমুচিত শাস্তি দিতেছি- আমি তোমাদেরকে শূলদণ্ড দিব, বুঝিতে পারিবে কিরূপ মজা লাগে!

ফেরআউনের ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে যাদুকরগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় শোনাই উত্তম। নিম্নের আয়াতসমূহের যুগান্তকারী উত্তর লক্ষ্য করুন-

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ـ

তৎক্ষণাৎ যাদুকর দল সেজদায় পড়িল এবং ঘোষণা করিল, আমরা মূসা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু পরওয়ারদেগারের উপর ঈমান আনিলাম।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ـ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ـ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ـ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ـ

ফেরআউন (ভীষণ চটিয়া গিয়া) বলিল, তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিলে- আমার অনুমতির পূর্বেই? (মনে হয়-) নিশ্চয় মূসা তোমাদেরই প্রধান, সে-ই তোমাদের যাদুবিদ্যার ওস্তাদ (তোমরা একই দল) সুতরাং আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া শাস্তি দিব এবং তোমাদিগকে শূলে

* যাদুর শক্তি এতটুকুই- ভেলকিবাজি, নজরবন্দী এবং মানসিক চাপ প্রয়োগের দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ন্যায় দেখাইতে পারে মাত্র। ইহা কোন বড় কথা নহে- মানুষ সাধারণতঃ বায়রোগ, মস্তিস্কের শুষ্কতা ইত্যাদির চাপেও নানা রকম বস্তু বা রং চোখে দেখিতে পায়, যাহা বাস্তবে মোটেই নাই।

চড়াইয়া হত্যা করিব। (তোমাদের প্রভুর আর আমার মধ্যে) কে অধিক কঠোর ও স্থায়ী শাস্তি দিতে পারে তাহা জানিতে পারিবে!

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ـ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ

তাঁহারা ফেরআউনকে উত্তর দিলেন, আমাদের নিকট (মূসার সত্যতার) যেসব সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে ঐ সবের উপর এবং আমাদিগকে যিনি পয়দা করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে প্রাধান্য দিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নহি; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা করিয়া ফেলিতে পার তুমি ত শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনের উপর হুকুম চালাইবে।

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ـ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার উপর, আমাদের আশা– তিনি আমাদের সব অপরাধ মাফ করিবেন, তোমার চাপে পড়িয়া যাদুর ব্যাপারে যাহা করিয়াছি তাহাও মাফ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হইলেন মঙ্গলময় অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ وَذٰلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكّٰى ـ

ইহা অবধারিত যে, যেব্যক্তি তাহার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইবে অপরাধীরূপে, তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রহিয়াছে, তথায় (কঠোর আযাব ভোগ করিতে থাকিবে।) তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যুও ঘটিবে না, আবার (কষ্ট-যাতনা লক্ষ্য করিলে) তাহাকে জিন্দেগীও বলা চলে না। পক্ষান্তরে যে উপস্থিত হইবে ঈমানদার সৎকর্মশীলরূপে, এই শ্রেণীর লোকদের জন্য অতি উচ্চ মর্যাদা তথা চিরস্থায়ী বেহেশত রহিয়াছে যাহার নিম্নদেশে নহর বহিয়া চলিবে; তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আত্মশুদ্ধি লাভকারীদের প্রতিদান এইরূপই হইবে। (পারা– ১৬ রুকু– ১২)

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ـ

যাদুকর দল সেখানেই সেজদায় পড়িল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা তথা হযরত মূসা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিলাম।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ

ফেরআউন (চটিয়া গিয়া) বলিল, আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিয়াছ? (তোমরা সব এক দলের;) নিশ্চয় এই ঘটনা তোমাদের একটা বড় ষড়যন্ত্র। এই দেশবাসীকে দেশান্তর করার উদ্দেশে এই অভিসন্ধি আঁটিয়াছ। আচ্ছা– ইহার পরিণাম শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব, অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ - وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاۤءَتْنَا -

তাঁহারা বলিলেন, (ভয় নাই; মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছাইব। তোমার নিকট আমাদের অপরাধ একমাত্র এই ত যে, আমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আমাদের নিকট পৌঁছিলে আমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ -

অতঃপর তাঁহারা মোনাজাত করিলেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ধৈর্যধারণের শক্তিবলে আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের মৃত্যু যেন তোমার অনুগত দাস অবস্থায়ই আসে। (পারা-৯; রুকু- ৪)

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ - قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ -

যাদুকর দল সেজদায় পড়িলেন। তাঁহারা ঘোষণাও করিলেন যে, আমরা সারা জাহানের প্রভু তথা মূসা ও হারুনের বর্ণিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ - اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ -

ফেরাউন ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমরা আমার অনুমতি লইবার পূর্বে তাহার উপর ঈমান আনিয়া ফেলিলে? নিশ্চয় মূসা তোমাদের প্রধান- যে তোমাদিগকে যাদু শিখাইয়াছে। (তোমরা সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছ) অচিরেই পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ -

তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব এবং নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

قَالُوْا لَاضَيْرَ - اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ - اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

তাঁহারা বলিলেন, মৃত্যুতে কোনই ক্ষতি নাই; (মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছিব-(প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়া প্রভুর দরবারে পৌঁছিলে ত খুশীর সীমা নাই)। আমরা আশা রাখি, আমাদের প্রভু আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন; ইহার বদৌলতে যে, আমরা উপস্থিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম মোমেন হইয়াছি। (সূরা শোয়ারাঃ পারা-১৯;রুকু-৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ঈমানের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত যাদুকরদের সর্বশেষ অবস্থা কি? কাহারাও মত এই যে,ফেরআউন তাহাদের হুমকি কার্যে পরিণত করিয়াছিল এবং তাঁহারা দৃঢ় চিত্তে তাহা বরণ করিয়াছিলেন, ঈমান ছাড়েন নাই।

তফসীর “রুহুল-মাআ’নী” এই মতামতকে দুর্বল সাব্যস্ত করিয়া বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিয়াছে যে,ফেরআউন শাস্তি প্রয়োগে সাহসী হয় নাই।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঈমানের বিস্তার

মূসা আলাইহিস সালামের বিজয়ে যাদুকর দল ত ঈমান আনিলই বনী ইসরাঈলদেরও একদল লোক ঈমান আনিল; অবশ্য তাহারা ফেরআউনের ভয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে সাহস করে নাই। মূসা (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপনের উপদেশ দিলেন; তাহারা আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন

নিবেদন করিতে লাগিলেন। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ এই-

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ـ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ـ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

মূসার বংশধর হইতে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনিল- তাহাও ফেরআউনে এবং তাহার পরিষদের ভয়ে ভীত অবস্থা যে, তাহারা (জানিতে পারিলে) তাহাদিগকে কষ্ট-যাতনা দিবে। বস্তুতঃফেরআউন ছিলও দেশের মধ্যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ও সীমা অতিক্রমকারী।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে আমার জাতি! যদি তোমরা বাস্তবিকইআল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার উপরই ভরসা কর (সেই ঈমানের মোকাবিলায় সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও), যদি তোমরা বাস্তবিকই মুসলমান তথা আল্লাহর অনুগত হইয়া থাক।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ـ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

তাহারা হযরত মূসার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিল, আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন করিলাম। হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে জালেমদের দ্বারা অত্যাচারিত হইতে দিও না এবং নিজ রহমতে আমাদিগকে কাফেরদের হইতে রক্ষা কর। (পারা- ১১; রুকু-১৪)

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা করার নির্দেশ

হযরত মূসার জয়লাভ এবং কিছু লোকের ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, এখন বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসরেই অবস্থান করুন এবং তাহাদের মধ্যে নামাযের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে নামাযী বানাইতে চেষ্টা করুন। নিম্নের আয়াতে এই বিবরণই রহিয়াছে-

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

আর আমি মূসা ও হারুনের প্রতি অহী পাঠাইলাম যে, তোমরা (এখন) নিজ জাতির ঘড়-বাড়ী বাসস্থান মিসরেই রাখ এবং ঐ সব ঘর-বাড়ীর মধ্যেই নামাযের জায়গার ব্যবস্থা কর এবং সকলে নামাযের পাবন্দী কর। আর খাঁটি মোমেনগণকে সুসংবাদ দান কর। (পারা- ১১; রুকু- ১৪)

মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলদের প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন

ফেরআউন ও তাহার দলবল হযরত মূসার সাফল্যে অগ্নি যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। সকলে ফেরআউনকে মূসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য চাপ দিল। ফেরআউন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিল যে, মূসার জাতি বনী ইসরাঈলকে শাস্তিদান এবং দুর্বল করার উদ্দেশে পূর্বের ন্যায় তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা হউক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখিয়া দাসীরূপে ব্যবহার করা হউক। বনী ইসরাঈলগণ এ সম্পর্কে হযরত মূসার নিকট ফরিয়াদ জানাইলে তিনি তাহাদের সবরের উপদেশ দিলেন এবং অচিরেই আল্লাহ তাআ-লা কর্তৃক ব্যবস্থাবলম্বনের আশ্বাস দিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই-

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ـ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ـ

ফেরাউনগোষ্ঠীর একদল লোক ফেরআউনকে বলিল, আপনি কি মূসা এবং তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিবেন– তাহারা দেশের ঐক্য নষ্ট করিবে, আপনা এবং আপনার মনোনীত মা'বুদদের উপাসনা পরিত্যাগ করিবে? ফেরআউন বলিল, (হুকুম জারি করিতেছি,) তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলিব এবং মেয়ে সন্তান জীবিত রাখিয়া দাসী বানাইব। আর (ইহা সহজই হইবে;) আমরা ত তাহাদের উপর প্রবল।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ـ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) নিজ জাতিকে বলিলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। সমগ্র ভূমণ্ডলের মালিক আল্লাহ, তিনি নিজ বান্দাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ক্ষমতা দান করেন। (তাঁহার ইচ্ছা বিভিন্ন কারণে বিভিন্নরূপে পরিচালিত হয়; জাগতিক উন্নতির দ্বারা আল্লাহর প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার বিচার হয় না। অবশ্য) শুভ পরিণাম একমাত্র খোদাভীরুদের জন্য নির্দিষ্ট।

قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ تَاْتِيْنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ـ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ تَعْمَلُوْنَ ـ

বনী ইসরাঈলগণ বলিল, আপনার আবির্ভাবের পূর্বেও আমরা কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়াছি, আপনার আবির্ভাবের পরেও সেই দুঃখ-কষ্টই ভোগ করিব! মূসা (আঃ) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আশা করি তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাসীন করিবেন; অতঃপর তিনি দৃষ্টি রাখিবেন, সুযোগপ্রাপ্তে তোমরা (দায়িত্ব পালনে) কিরূপ কাজ কর।

(পারা–৯; রুকু–৫)

ফেরআউনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহর গজব

হযরত মূসার সত্যতা এবং তাঁহার নবুয়তের দাবী স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল, এমনকি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকরদল তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। ফেরআউন ও তাহার দলবলের অন্তরেও হযরত মূসার সত্যতার ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফেরাউনের স্বৈরাচারী স্বভাব, গোঁড়ামী এবং স্বার্থান্ধতা তাহাকে যাদুকর দলের ন্যায় সত্যতার সামনে নত করিতে দিল না এবং তাহার দলবলও তাহারই পথ অবলম্বন করিল। এ সম্পর্কে কোরআনে বর্ণনা এই–

فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ وَجَحَدُوْا بِهَا ....

অর্থ ঃ যখন ফেরাউন গোষ্ঠীর নিকট আমার বিভিন্ন নিদর্শন দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল, তখনও তাহারা এই বলিল যে, এইসব স্পষ্ট যাদু। তাহারা (মূসার সত্যতার) নিদর্শনসমূহকে (ঐরূপ) অমান্য অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) একীন বিশ্বাসের রেখাপাত হইয়াছিল; (অবশ্য তাহারা অন্তরে সেই উদিত একীন গ্রহণ করে নাই) তাহাদের স্বৈরাচারী স্বভাব এবং গোঁড়ামীর কারণে। ফলে সেই স্বৈরাচারীদের পরিণতি কি হইয়াছিল তাহাই দেখিবার জিনিস।

(সূরা নমলঃ পারা–১৯; রুকু–১৬)

ফেরআউন নিজকে ও দলবলকে আখেরাতের আযাবে ত ঠেলিয়া দিলই, দুনিয়াতেও অভিশাপে পতিত হইল। পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে–

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ـ

"মূসাকে আমি (তাঁহার সত্যতার উপর) আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউন ও তাহার দলবলের প্রতি পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু (ফেরাউন ঐ নিদর্শন ও প্রমাণসহ মূসাকে অমান্য করিল এবং) ফেরআউনের দলের লোকেরা ফেরআউনের পরামর্শেই চলিল; অথচ ফেরআউনের পরামর্শ ভাল ছিল না– তাহাদের জন্য ধ্বংসকারী ছিল। ফেরআউন (দুনিয়াতে যেমন দলের নেতৃত্ব দিতেছিল, তদ্রূপ) কেয়ামতের দিন তাহার দলবলের আগে থাকিয়া (নিজেও জাহান্নামে পতিত হইবে,) তাহাদিগকেও জাহান্নামে পতিত করিবে; জাহান্নাম কতই না খারাপ জায়গা! ফেরআউন ও তাহার দলবলের উপর দুনিয়াতেও অভিশাপের ছাপ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেয়ামতের দিনও তাহাই ভোগ করিবে। কতই না খারাপ পরিণতি তাহাদের। (সূরা হুদঃ পারা–১২; রুকু–৯)

ফেরআউন ও তাহার দলবল অন্যায় ও স্বৈরাচারিতার দরুন দুনিয়াতেই নানা প্রকার গযবে পতিত হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ এই–

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

আমি ফেরআউনগোষ্ঠীকে পাকড়াও করিয়াছিলাম দুর্ভিক্ষ এবং শস্য-ফসল, ফল-ফলারির ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা এই উদ্দেশে যে, তাহাদের সুবুদ্ধি আসিবে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ـ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ

কিন্তু (তাহাদের অবস্থা কি জঘন্য!) যখনই (পরীক্ষা স্বরূপ) তাহাদের একটু ভাল অবস্থা দেখা দিত তখন বলিত, আমরা ত এই অবস্থারই উপযুক্ত; আর যদি (স্বরাচারিতার ফলে) খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হইত, তবে তাহাকে মূসা ও তাঁহার সঙ্গীগণের অশুভতার পরিণতি বলিয়া থাকিত।

اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

স্মরণ রাখিও, তাহাদের অশুভতা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই জানেন (যে, তাহাদেরই কৃত-কর্মের ফল)। যদিও অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা (হযরত মূসাকে) আরও বলিল, আমাদের উপর যাদু চালাইবার জন্য যেকোন রকম আশ্চর্য বস্তুই পেশ কর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইব না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ـ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ

ফলে তাহাদের উপর বন্যা শস্য-ফসল, ফল-মূল ধ্বংসকারী পঙ্গপালের আক্রমণ, গুদামজাত খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টকারী কীট পোকা, শরীর ও মাথার উকুনের প্রাদুর্ভাব, অত্যধিক ব্যাঙের উপদ্রব, পানীয় বস্তু রক্তে পরিণত হওয়া– নানা রকমের গজব প্রকাশ্য মোজেযা ও কুদরতের নিদর্শনরূপে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা গোঁড়ামি করিয়াছে এবং তাহারা ছিলই অপরাধ-পরায়ণ জাতি। (পারা– ৯; রুকু–৬)

এই আয়াতে দেখা যায়, ফেরআউন জাতি হযরত মূসার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার সাত প্রকার গযব আসিয়াছিল–

(১) দুর্ভিক্ষ ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, (১) শস্য ফল, ফল-মূল উৎপন্নের ক্ষতি ও ধ্বংস, (৩) ভীষণ বন্যা ও প্রলয়ঙ্কর তুফান, (৪) দেশে পঙ্গপালের অসাধারণ আক্রমণ, (৫) কীট-পোকার এত উপদ্রব যে, সাধারণ জীবনযাত্রা কষ্ট-যাতনাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গুদামজাত দ্রব্য নষ্ট হইতেছিল, (৬) ব্যাঙের উপদ্রবেরও এত আধিক্য যে, ঘর-বাড়ী, হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, ঘটি-বাটি, বিছানাপত্র সর্বদা ব্যাঙে পরিপূর্ণ থাকিত; যদ্দরুন সাধারণ জীবন যাপন সঙ্কটময় হইয়া গিয়াছিল (৭) যেকোন স্থান হইতে পানি পান ও ব্যবহার করিবার জন্য সম্মুখে আনিলেই পানি রক্তে পরিণত হইয়া যাইত।

এই সাতটি ঘটনা তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজবস্বরূপ ছিল এবং হযরত মূসার পক্ষে তাঁহার মোজেযা ছিল। এই সাতটি ভিন্ন তাহাদের সম্মুখে হযরত মূসার আরও দুটি প্রধান মোজেযা ছিল– (১) হযরত মূসার হাতের লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া, (২) তাঁহার হাত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে তাহা উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করা। এই নয়টি বিশেষ বিশেষ মোজেযা আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে দান করিয়াছিলেন ফেরআউন জাতির সম্মুখে তাঁহার সত্যতা প্রমাণের জন্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ـ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ....

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি মূসাকে স্পষ্ট নয়টি মোজেযা ও প্রমাণ দিয়াছিলাম; যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবীরূপে আসিয়াছিলেন– সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বনী ইসরাঈলদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার।

তখন ফেরআউন মূসাকে বলিয়াছিল, হে মূসা! তোমার প্রতি আমার ধারণা যে, যাদুর দরুন তোমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাই তুমি নবুয়তের দাবী করিয়াছ)। মূসা (আঃ) বলিলেন, নিশ্চয় তুমি জান, এই ঘটনাবলী তিনিই ঘটাইয়াছেন যিনি সমস্ত আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি এই সব ঘটাইয়াছেন তোমাদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের উদ্দেশে, কিন্তু হে ফেরআউন! (তোমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে বলিয়া দেখা যায় না, তাই) আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তুমি ধ্বংসে পতিত হইবে। (পারা–১৫, রুকু–১২)

উল্লিখিত বিপদাপদ ও ঘটনাসমূহের দরুন ফেরআউনগোষ্ঠী হযরত মূসার প্রতি আকৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু শুভ বুদ্ধি লইয়া নহে, বরং মোনাফেকী এবং শুধু জান বাঁচাইবার উদ্দেশ্য লইয়া। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ ـ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ ـ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ـ ......

"যখন তাহাদের উপর আযাব আসিল, তখন তাহারা বলিল, হে মূসা! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের উদ্দেশে দোয়া করুন ঐ অবস্থার জন্য যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন (যে, আপনি দোয়া করিলে আযাব হটাইয়া দিবেন)। আপনি আমাদের হইতে আযাব হটাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চয় আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সঙ্গে ছাড়িয়া দিব। (আল্লাহ বলেন– মূসার দোয়ায়) যখন আমি তাহাদের উপর হইতে আযাব দূর করিলাম, নির্ধারিত সময়ের জন্য–(যে পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া দেখিবার ছিল); তখন তাহারা পূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। ফলে আমি তাহাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম– এই যে, তাহাদিগকে ডুবাইয়া

মারিলাম এই উদ্দেশে যে, তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং ঐ সবকে উপেক্ষা করিয়াছিল। (সূরা আরাফঃ পারা- ৯; রুকু- ৬)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আমি মূসাকে বিভিন্ন নিদর্শনসহ ফেরআউন ও তাহার দলবলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রেরিত রসূল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا اِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ ـ

মূসা যখন আমার নিদর্শনসমূহ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলেন তখন তাহারা আশ্চর্যজনকভাবে ঐ সব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلاَّ هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ـ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

পূর্বেরটার চেয়ে পরেরটা বড়– এইরূপে নিদর্শনসমূহ দেখাইয়াছি ও তাহাদিগকে আযাবে ফেলিয়াছি এই উদ্দেশে যে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ـ

আযাবে পতিত হইলেই মূসা (আঃ)-কে বলিত হে যাদুকর! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের জন্য ভাল অবস্থার দোয়া করুন যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন; আমরা (বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে) সৎপথে আসিয়া যাইব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ـ

(আল্লাহ বলেন, পক্ষান্তরে) যখনই আমি তাহাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছি তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত। (সূরা যুখ্‌রোফঃ পারা–২৫)

ফেরআউনের প্রতি এক ব্যক্তির বিশেষ নসীহত

ফেরাউন এবং তাহার দলবল ও পরিষদবর্গ হযরত মূসার ব্যাপার লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিল। একদা পরামর্শ সভায় ফেরআউন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল যে, মূসার দলকে দুর্বল রাখার উদ্দেশে ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলার এবং মেয়ে সন্তানকে দাসী বানাইয়া রাখার পূর্ববর্তী আইন বহাল রাখা হইবে এবং স্বয়ং মূসাকে হত্যা করা হইবে। এই কথা শ্রবণে ফেরআউন পরিবারেরই একজন লোক যে গোপনে মূসার প্রতি ঈমান রাখিত, সে ফেরআউনকে লক্ষ্য করিয়া এক বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ـ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ـ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ ـ

আমি মূসাকে আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠাইয়াছিলাম– ফেআউন, হামান ও কারুন প্রমুখের প্রতি। তাহারা তাঁহাকে যাদুকর মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। মূসা যখন আমার পক্ষ হইতে সত্যের আহ্বান লইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছিলেন, তখন তাহারা সাব্যস্ত করিল যে, মূসার প্রতি যাহারা ঈমান রাখে

তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা এবং মেয়ে সন্তান জীবিত (দাসীরূপে) রাখা বহাল থাকুক। (এই অভিসন্ধি তাহারা করিল, কিন্তু রসূলের বিরুদ্ধে) কাফেরদের অভিসন্ধি নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ -

আর ফেরআউন বলিয়াছিল, তোমরা কেহ আমাকে এই সিদ্ধান্তে বাধা দিও না– আমি মূসাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব, সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করুক। আমার আশংকা হয়– সে তোমাদের প্রচলিত ধর্ম বিগড়াইয়া দিবে। অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে।

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

এই হুমকির খবরে মূসা বলিয়াছিলেন, যিনি আমারও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি প্রত্যেক স্বৈরাচার হইতে– যে হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ - وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ - وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ -

ফেআউন পরিবারের একটি লোক যে গোপনে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল, সে ফেরাউনের পরিষদমণ্ডলীকে বলিল, তোমরা কি একটি লোককে মারিতে চাও এই অপরাধে যে, সে বলে আমার প্রভু আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের নিকট পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে বহু দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছে। আরও একটা কথা– যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে মিথ্যার পরিণাম তাহাকে ভুগিতে হইবে, আর যদি সে সত্য হয় তবে আযাবের যেসব সতর্কবাণী সে শুনাইতেছে তাহার কিছুটা তোমাদের উপর আসিবেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে (উদ্দেশ্য সাধনের শেষ প্রান্তে) পৌঁছিতে দেন না।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ - فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا -

ঐ ব্যক্তি আরও বলিলেন, হে আমার জাতি! আজ তোমাদের হাতে রাজকীয় ক্ষমতা আছে, তোমরা দুনিয়াতে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, কিন্তু আল্লাহর গজব যদি আসিয়া পড়ে তবে আমাদের সাহায্যকারী কে আছে? (তোমাদের ক্ষমতা ত আল্লাহর মোকাবিলায় কিছুই না)।

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ -

ফেরাউন বলিল, আমি যাহা ভাল বুঝি তাহাই বলি এবং আমি তোমাদিগকে সঠিক পথেই চালাই।

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ - مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ - وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ -

মো'মিন ব্যক্তি সমগ্র জাতির প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিল– হে আমার জাতি! আমার ভয় হয়, তোমরাও ঐরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়া পড় না-কি যেরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়াছিল বহু জাতি– নূহের জাতি, আ'দের জাতি, সামুদের জাতি, তাহাদের পরে আরও অনেকে। (প্রত্যেকেই নিজে ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছিল নতুবা) আল্লাহর ইচ্ছাও হয় না বান্দাকে অত্যাচার করার।

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ـ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ـ مَالَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ـ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ـ

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি–(পুনর্জীবিত হইয়া উঠা, হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী দৃষ্টে) ডাকাডাকি (হা-হুতাশ, চীৎকার, হৈ-হল্লা) হওয়ার দিনকে– যে দিন তোমরা বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা পাইবার কোন আশ্রয় তোমাদের থাকিবে না। (সেই আযাব এড়াইয়া হেদায়াতের পথ ধর না কেন? বাস্তবিকই) যাহাকে আল্লাহ গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে দেন (তাহা হইতে বাঁচাইয়া না লন) তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারে না)।
(সূরা মোমেনঃ পারা– ২৪; রুকু– ৯)

ফেরআউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّه كَاذِبًا ـ

(এই যুক্তিপূর্ণ আহ্বান এড়াইতে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করিয়া) ফেরআউন তাহার প্রধান উজীরকে বলিল, হে হামান! আমার জন্য উঁচু মঠ তৈয়ার কর ত দেখি, তাহার সাহায্যে আসমানে পৌঁছাইতে পারি কি না এবং মূসার খোদার খোঁজ আনিতে পারি কি-না; আমি মূসাকে মিথ্যুকই মনে করি।

وكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ـ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاَّ فِىْ تَبَابٍ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ফেআউনের (ধৃষ্টতা) অসৎ কার্যাবলী (নফস-শয়তানের প্ররোচনায়) এইরূপেই তাহার চোখে সুন্দর দেখাইত এবং সে সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ফেআউনের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।
(পারা– ২৪; রুকু– ৯)

ফেআউনের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উল্লেখ পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও আছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ـ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ

ফেরাউন ঘোষণা দিল, হে আমার পরিষদমণ্ডলী! আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য মা'বুদ আছে– ইহার খোঁজ আমার নাই। অতএব হে হামান! আমার জন্য পোক্তা ইট দ্বারা উঁচু ইমারত তৈয়ার কর, তাহাতে চড়িয়া মূসার খোদার খোঁজ আনিতে পারি না-কি? আমি ত মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে করিতেছি।
(সূরা কাছাছঃ পারা– ২০; রুকু– ৭)

মোমেন ব্যক্তির উদাত্ত আহ্বান

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ـ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ـ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ـ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا ـ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

(ঐ মোমেন ব্যক্তি ফেরাউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথায় দমিল না, সে পুনরায় আহ্বান করিল,) হে আমার জাতি! তোমরা আমার কথায় সাড়া দাও, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথই দেখাইব।

হে আমার জাতি! ইহকালের অস্থায়ী জিন্দেগী অল্প দিনের মাত্র। নিশ্চয় আখেরাত বা পরকালই স্থায়ী চিরকালের বাসস্থান। যে কেহ পাপ করিয়াছে তাহাকে তাহার পাপের ধারা অনুসারে (আখেরাতে) শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর যেকোন পুরুষ বা মহিলা ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে মোমেনও ছিল, তবে সে বেহেশতে স্থান লাভ করিবে, তথায় সে বে-হিসাব নেয়ামত ভোগ করিবে।

وَيٰقَوْمِ مَالِىٓ اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَى النَّارِ ـ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَالَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ـ وَاَنَا اَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ـ

হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য ও অনুতাপের কথা! আমি ত তোমাদের মুক্তির পথের আহ্বান জানাইতেছি; আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাক (কি আশ্চর্যের কথা)! তোমরা আমাকে ডাকিতেছ আল্লাহদ্রোহিতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি এবং মিছামিছি বস্তুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার প্রতি– অথচ আমি তোমাদিগকে ডাকি মহান আল্লাহর প্রতি. যিনি সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ক্ষমতাশালী।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ ـ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ـ

সুনিশ্চিত কথা যে, যাহাদের পূজার প্রতি তোমরা আমাকে ডাক তাহারা দুনিয়া বা আখেরাত কোন দিক দিয়াই পূজা জপনার উপযুক্ত নহে। ইহাও সুনিশ্চিত যে, আমাদের সকলেই আল্লাহর দরবারে যাইতে হইবে। ইহাও সুশ্চিত যে, তখন স্বৈরাচারীরা দোযখবাসী হইবে। (আজ লক্ষ্য করিলে না!) ভাবী জীবনে তোমরা অবশ্যই আমার কথা স্মরণ করিবে, (কিন্তু সেই স্মরণে ফল হইবে না। সত্যের আহ্বানের দরুণ তোমরা আমার শত্রু হইবে; আমি ভীত নহি)। আমি আমার সব কিছু আল্লাহর হাওলা করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাগণের হাল-অবস্থা নিরীক্ষণকারী।

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ـ

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টার কুফল হইতে বঁচাইয়া রাখিলেন। ফেরআউন গোষ্ঠীকে কঠিন আযাব ঘিরিয়া ধরিল, (তখনও আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেন)। (২৪ পারা– ৯,১০)

ফেরআউনের আস্ফালন

হযরত মূসার অপরাজেয় মোজেযা তদুপরি মোমেন ব্যক্তির যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ইত্যাদি মিসরবাসীদের অন্তরে নিশ্চয় রেখাপাত করেছিল। ফেরাউনের অন্তরকেও যে, দুর্বল না করিয়াছিল এমন নহে, যার ফলে সে হযরত মূসার সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট বিকাশে বেসামাল হইয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করার শুধু হুমকিই দিল; সেই জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস করিতেছিল না।

কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থান্ধতা মারাত্মক ব্যাধি। যে মানুষ তাহা জয় করিতে না পারে তাহার সম্মুখে যুক্তি-তর্ক, দলীল-প্রমাণ, এমনকি নিজের বিবেক-বুদ্ধিও ব্যর্থ হয়। ফেরাউনের অবস্থা তাহাই ছিল; সে ক্ষমতা ও প্রাধান্য বজায় রাখিতে নিজের খোদায়ী দাবী এবং হযরত মূসাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জোর প্রচার

চালাইল। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টিকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে– فَحَشَر فَنَادى فقال انا ربكم الاعلى ফেরআউন জনসমাবেশের ব্যবস্থা করিল এবং এই ঘোষণা দিল যে, আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।

ধন-দৌলতের পূজারী, বল–ক্ষমতার মদে মত্ত দুরাচার স্বৈরাচারী ও ইহজীবনকেই সর্বশেষ লক্ষ্যস্থলরূপে গ্রহণকারীগণ সাধারণত যেই মাপকাঠিতে হক্ব ও বাতিল সত্য ও মিথ্যার বিচার করিয়া থাকে, ফেরআউনও মিসরবাসীদের সম্মুখে সেই মাপকাঠিই তুলিয়া ধরিল। সে বলিল, যেহেতু সব রকমের বল-ক্ষমতা ও ধন-দৌলত আমার আছে, তাই আমিই হইব হিরো, আমি হইব পূজারী আমার ব্যক্তিগত জীবন যতই কদর্য-কলুষময় জুলুম-অত্যাচার, অন্যায় অবিচার ও ব্যভিচারপূর্ণ সর্বোপরি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতে যতই দূরবর্তী হউক না কেন, তাঁহার যতই নাফরমানীময় হউক না কেন। পক্ষান্তরে মূসার নিকট যেহেতু ঐ দুই জিনিস তথা ধন-দৌলত ও বল-ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কিছুই নহেন, তাঁহার মধ্যে অন্য গুণ-গরিমা যতই থাকুক না কেন।

ফেআউনের সেই বিভ্রান্তিকর বিবৃতির নকলই নিম্নের আয়াতে দেওয়া হইয়াছে।

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ـ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ـ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ـ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ـ فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ـ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

ফেরাউন স্বজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা কি দেখ না এবং চিন্তা কর না যে, সমগ্র মিসর রাজ্য আমারই এবং এইসব নদী-নহর আমারই অধিকারে প্রবাহমান? (মূসা কি আমার সমকক্ষ?) বরং আমি অতি উচ্চ এই বেটা হইতে; সে ত একজন নিকৃষ্ট লোক (তোত্‌লা) কথাবার্তাও বুঝাইয়া বলিতে সক্ষম নহে। (সে খোদার প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে) তাহার হাতে স্বর্ণ-কঙ্কণ পরান হয় নাই কেন? (সেকালে শাহী প্রতিনিধি ব্যক্তিবর্গকে পদকরূপে স্বর্ণ-কঙ্কণ হস্তে পরান হইত)। কিম্বা (শাহী জুলুসের মত) তাহারা সঙ্গে ফেরেশতাগণের দল আসে নাই কেন? (ঐ সব উক্তি দ্বারা) ফেরআউন তাহার জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল; তাহারা তাহারই অনুসারী হইল। বস্তুতঃ তাহার পূর্ব হইতেই ফাসেক জাতি ছিল। (পারা–২৫; রুকু–১১)

ফেরআউনের প্রতি হযরত মূসার বদ দোয়া

মূসা (আঃ) যখন দেখিলেন এবং একীন করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফেরআউন ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহার কারণে তাহার পরিষদমণ্ডলী এবং মিসরবাসী সর্ব সাধারণও ঈমানের পথে আসিবে না। এমনকি ফেরাউনের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বনী ইসরাঈলগণও ঈমানের পথে আসিতে পারিবে না। তখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আঃ) এই দুর্ধর্ষ, পথের কাঁটা ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়ার হাত উঠাইলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও করিলেন যে, দোয়া কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ ব্যতিব্যস্ততা, চাঞ্চল্য না দেখাইয়া নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ়রূপে নিয়োজিত থাকিবেন। এই বিষয়ের বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে–

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ـ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

মূসা আল্লাহর হুজুরে বলিলেন- হে পরওয়ারদেগার! ফেরআউন ও তাহার দলবলের ঐ ধন-দৌলত ও শান-শওকতের সাজ সরঞ্জাম আপনিই তাহাদিগকে জাগতিক জীবনে দিয়াছেন (ছিনাইয়া নেওয়ার ক্ষমতাও আপনার আছে)। হে পরওয়ারদেগার! (এই সব নেয়ামতের) ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা লোকদেরকে আপনার পথ হইতে দূরে সরাইতেছে (এইরূপে নেয়ামতের ফল উল্টা ফলিতেছে)। সুতরাং হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করিয়া দিন। আর (মুখে মুখে) ঈমানের অঙ্গীকার করিয়া আযাবকে থামাইবার সুযোগ তাহারা পাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থাস্বরূপ তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দিন; যেন ভীষণ আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বে তাহারা (মিছামিছি) ঈমানের কথা মুখেও না আনে।

قَالَ قَدْ أُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ

(মূসা (আঃ) দোয়া করিতেছিলেন; হারুন (আঃ) "আমীন" বলিতেছিলেন; তাই) আল্লাহ তাআলা উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর করা হইল। তোমরা নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ় থাক। (দোয়ার ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য দেখাইয়া) অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হইও না।

(সূরা ইউনুসঃ পারা- ১১; রুকু- ১৪)

আলেমগণ বলিয়াছেন, এই দোয়া এবং তাহা গৃহীত হওয়ার সংবাদের পর দীর্ঘ ৪০ বৎসর মূসা ও হারুন (আঃ) তবলীগ কার্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ পার্টির উপর আল্লাহর গজব আসে নাই। দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর এই দোয়ার ফল প্রকাশ পায়; ফেরআউন ও তাহার দলবল সমুদ্রে ডুবিয়া ধ্বংস হয়।

ফেরআউনের ধ্বংস কাহিনী

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের (তফসীর রুহুল মাআ'নী- সূরা তোয়া-হার এক বর্ণনানুসারে ২০ বৎসরের) অধিক কাল মূসা ও হারুন (আঃ) ফেরআউন ও তাহার দলবলকে সত্যের ডাক শুনাইলেন। তাহারা সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এইরূপ সদিচ্ছা উদয়ের আভাসও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল না। সর্বদা সত্য উপেক্ষাই নহে শুধু, পরাজিত করার ষড়যন্ত্রেই তাহারা সর্বশক্তি ব্যয় করিতেছিল। তাই প্রয়োজন হইল মানব জাতির দেহ বা অন্ততঃ মিসরবাসী ও বনী ইসরাঈল জাতির সমষ্টিগত দেহবিশেষকে সুস্থ করা ও সুস্থ রাখার খাতিরে ফেরআউন গোষ্ঠীর অংশবিশেষকে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্নকরণ ও চিরতরে তাহার বিলুপ্তি ঘটান।

সেমতে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সেই অস্ত্রোপচার তথা গজব আসিল; ফেরআউন দলবলসহ ধ্বংস হইল, বিশ্বের বুক হইতে তাহাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে-

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ـ

(ফেরআউন ও তাহার দলবল সত্যের বিরোধিতা ছাড়িল না-) তাই তাহাদের কর্মের সমুচিত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলাম; তাহাদের সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিলাম এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন ও আদেশাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং ঐসবকে উপেক্ষা করিতেছিল। (পারা- ৯; রুকু- ৬)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لاَيُرْجَعُوْنَ ـ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(আল্লাহ বলেন,) ফেরআউন ও তাহার দলবল দেশের মধ্যে অনধিকার শ্রেষ্ঠত্ব চালাইয়াছিল এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে, আমার নিকট তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ফলে আমি ফেরআউনকে এবং

তাহার লোক-লস্করগুলিকে পাকড়াও করিলাম এবং সমুদ্র বক্ষে ডুবাইয়া মারিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ, কি ঘটিয়া গেল স্বৈরাচারীদের পরিণাম। (পারা- ২০; রুকু- ৭)

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ - فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلاً لِّلْاٰخِرِيْنَ -

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) ফেরআউন গোষ্ঠী যখন আমার ক্রোধানলে পতিত হওয়ার কার্য করিল তখন আমি তাহাদের কার্যের সমুচিত দণ্ড দিলাম। তাহাদের সকলকে একত্রে ডুবাইয়া মারিলাম এবং তাহাদিগকে করিয়া রাখিলাম পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী- যাহাদেরকে দেখিয়া শিক্ষা হয়।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى - فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى - فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى -

অতঃপর ফেরআউন (সত্যের ডাক হইতে) ফিরিয়া গিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সকলকে একত্র করিয়া ঘোষণা দিল, "আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।" ফলে আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিলেন ইহ-পরকালের আদর্শ শাস্তিদানে। বাস্তবিকই তাহার ঘটনায় উপদেশ রহিয়াছে ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা নাজেয়াতঃ পারা-৩০)

ইহকালে চূড়ান্ত আযাবের সঙ্গে পরকালের অভিশাপ

ফেরআউন ও তাহার দলবল ইহকালের চূড়ান্ত শাস্তি তথা ধ্বংসের সঙ্গে পরকালের দিক দিয়াও সাধারণ পাপীদের হইতে বিভিন্নরূপে চিরতরে অভিশাপ ও আযাবের সম্মুখীন হইয়া রহিল। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ-

وَاتْبَعْنَاهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ -

সারা দুনিয়ার মানুষের মুখে তাহাদের প্রতি লা'নত চলিতে থাকিবে এবং কেয়ামতের দিন ত তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হইবেই। (পারা-২; রুকু-৭)

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءَ الْعَذَابِ - اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا - وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -

আর ফেরআউন গোষ্ঠীকে ঘেরাও করিয়া নিল কঠিন আযাব। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে (দোযখের) আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর যেদিন হাশর-ময়দান কায়েম হইবে সেদিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন- ফেরআউন গোষ্ঠীকে সর্বাধিক কঠিন আযাবে ঠেলিয়া দাও। (পারা- ২৪; রুকু- ১০)

ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস

ফেরআউন ও তাহার দলকে একত্রে ধ্বংস করিবার এক বৈচিত্র্যময় ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিলেন। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, সুযোগমতে এক রাত্রে বনী ইসরাঈলকে লইয়া মিসর হইতে চলিয়া যাইবেন।

মূসা (আঃ) একদা রাত্রি বেলা বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসর হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়নের প্রারম্ভে হযরত মূসার পরিকল্পনায় কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহা কোন্ স্থান ছিল, কোরআনে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলকে নিয়া মিসর হইতে পলায়ন করিয়া "তুর" নামক পার্বত্য এলাকায় পৌঁছিয়াছিলেন। পলায়ন পথে বনী ইসরাঈলদের সম্মুখে একটি সমুদ্র উপস্থিত হইল। তাহারা সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত, এমতাবস্থায় পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, ফেরআউন সৈন্য সামন্তসহ তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা (মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, আপনি স্বীয়-"আছা"-লাঠি দ্বারা সমুদ্রবক্ষে আঘাত করুন। মূসা (আঃ) তাহাই করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিকরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; এক এক খণ্ডের উভয় পার্শ্বে পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল- বহিয়া পড়িল না; এইভাবে সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে পথ আবিষ্কৃত হইল। মূসা (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া ঐ সব পথে সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন। অতঃপর দোয়া করিলেন, এই পথ পুনঃ পানিভর্তি হইয়া যাউক; যেন ফেরআউন তাহাদের ন্যায় এই পারে আসিতে না পারে। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে এই দোয়ায় বাধাদানে বলিলেন, সমুদ্রকে বর্তমান অবস্থার উপর থাকিতে দিবেন।

অতঃপর ফেরআউন তথায় পৌঁছিয়া নবআবিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইয়া তাহা অতিক্রম করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে পৌঁছিবা মাত্রই সমুদ্রের পানি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, ফেরআউনগোষ্ঠী ডুবিয়া মরিল। হযরত মূসার সঙ্গী বনী ইসরাঈলগণ কূলে দাঁড়াইয়া ফেরআউনগোষ্ঠীর এই দশা চাক্ষুষ দেখিতেছিল।

আলোচ্য ঘটনার সমুদ্রটির নাম কোরআন-হাদীছে উল্লেখ নাই, কিন্তু মিসর এলাকা- যথা হইতে মূসা (আঃ) যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তুর পর্বত এলাকা- যথায় তিনি প্রথমে পৌঁছিয়াছিলেন, এই দুই এলাকার মধ্যে লোহিত সাগর তথা তাহার সুয়েজ উপসাগর শাখাটি বিদ্যমান, যে শাখা হইতে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছে। লোহিত সাগরের এই অংশ প্রায় ৩০ মাইল প্রস্থ। এই উপসাগর ভিন্ন আর কোন সমুদ্র তথায় নাই, তাই সমস্ত তফসীরকারগণ লোহিত সাগরকেই উক্ত ঘটনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই স্থলে লোহিত সাগর বলিতে তাহার ঐ অংশ উদ্দেশ্য যাহা সুয়েজ উপসাগর নামে পরিচিত।

আলোচ্য ঘটনাস্থলের মানচিত্র

স্কেল ১ ইঞ্চি = ১৮১ মাইল

দক্ষিণ ← → উত্তর
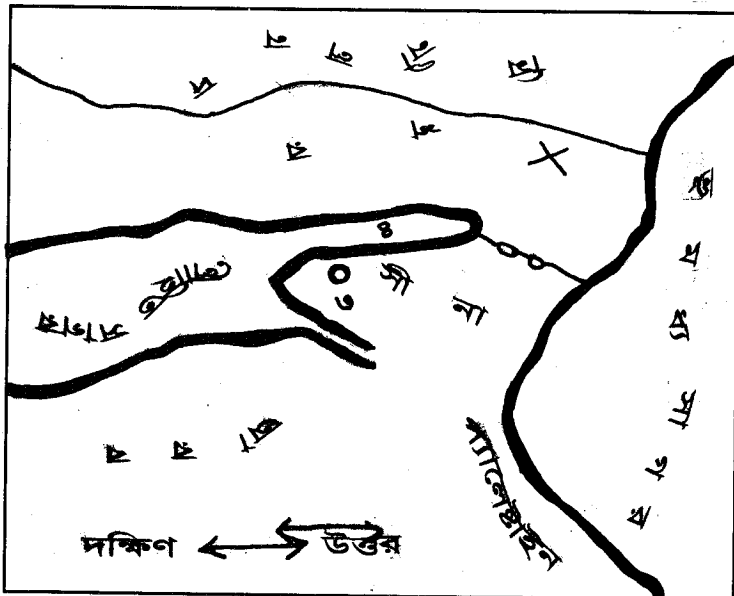
(১) তিমসাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ (৩) তুর পর্বত (৪) সুয়েজ উপসাগর । × চিহ্নিত স্থানটি বনী ইসরাঈলগণের আবাসভূমি–"জশন" বা "গোশেন" অঞ্চল।

মানচিত্রের বিবরণ

ভূগোল প্রসিদ্ধ লোহিত সাগরকে আরবীতে বাহ্‌রে আহ্‌মার (লাল সমুদ্র) এবং বাহ্‌রে কোলজুম বলা হয়। ইহা আরব সাগর হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, বরং ১৩১০ মাইল, দৈর্ঘ্যে প্রবাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সরু দুইটি উপসাগরে বিভিক্ত হইয়াছে; একটি উত্তর-পূর্ব দিকে কম-বেশ ১২৫ মাইল দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ প্রায় ১৫ মাইল প্রস্থে; তাহাকে আকাবা উপসাগর বলা হয়। অপরটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ মাইল দৈর্ঘে এবং সাধারণতঃ ৩০ মাইল প্রস্থে, তাহাকে সুয়েজ উপসাগর বলা হয়। সুয়েজ উপসাগরের শেষ প্রান্ত হইতে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত ১০০০ মাইল স্থল পথ ছিল, অবশ্য এই ১০ মাইলের মধ্যে দুইটি হ্রদ ছিল– (১) তিমসাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ, কিন্তু এই হ্রদগুলির মধ্যেও স্থলভাগের বিরাট ব্যবধান ছিল– সুয়েজ উপসাগরের তীর ও প্রথমটির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং দ্বিতীয়টি হইতে ভূমধ্য সাগরের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল স্থল ভাগ ছিল। এই তিন খণ্ড ভূভাগের উপর খাল খননে হ্রদদ্বয়কে একত্রিত করিয়া ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত সুয়েজ খাল তৈয়ার করা হইয়াছে। এই খালটিই ঐতিহাসিক "সুয়েজ খাল"। এই খাল দ্বারাই ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যে নৌপথের যোগাযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যবর্তী ত্রিভুজ আকারের যে স্থলভাগটি দেখা যায় তাহাই পার্বত্য মরু অঞ্চল বিশিষ্ট সাইনা বা সিনাই উপত্যকা।

সিনাই উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তি উভয়ের সংযোগ স্থলের নিকটবর্তী সুয়েজ উপসাগরের তীরে "তূর" পর্বত অবস্থিত।

বনী ইসরাঈল ও হযরত মূসার অনেক ঘটনাবিশিষ্ট এই পর্বতটি পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় "তুর" নামে ব্যক্ত হইয়াছে, আরবী মানচিত্রেও ইহাকে তুর নামে উল্লেখ করা হয়। বাংলা মানচিত্রে ইহাকে সাইনা পর্বত বলা হয়। ইহাও ভুল নয়, কারণ পবিত্র কোরআনেই ইহাকে তুরে সীনীন ও তুরে সাইনা নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। তুর শব্দের আভিধানিক অর্থ পবর্ত, তাই তুরে সাইনা অর্থ সাইনা পর্বত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মানচিত্র দৃষ্টে অবশ্য দেখা যায় যে, বনী ইসরাঈলদের মিসরস্থিত আবাসভূমি হইতে পূর্বদিকে "ফিলিস্তীন" ও "কেনান" এলাকার দিকে বিরাট স্থলভাগ ছিল। অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করিলে হযরত মূসা ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্মুখে সমুদ্র আসিতই না বলিয়া একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। এমনকি এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়াই কোন কোন অজ্ঞ লোক হযরত মূসার লাঠির দ্বারা সমুদ্র খণ্ডিত করার এই ঐতিহাসিক বিরাট মোজেযা অস্বীকার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু উক্ত মোজেযার বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই এই শ্রেণীর অজ্ঞ লোকগুলি পবিত্র কোরআনের প্রতি অটুট ঈমানধারী মুসলিম সমাজের ভয়ে এই সম্পর্কীয় আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা ও অবাস্তব গোজামিল দিয়া সর্বসাধারণকে ধোকা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছে। তদুপরি আলোচ্য ঘটনা লোহিত সাগরের কোন অংশে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা না জানিয়া একটা মিথ্যা কল্পিত মানচিত্র সাজাইয়া ঘটনার ক্ষেত্র লোহিত সাগর হওয়া প্রসঙ্গটির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে। সুতরাং নিম্নে কতিপয় মোটা মোটা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সত্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যদ্দ্বারা অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়াবলীর অবসান হইবে।

(১) মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলগণ মিসর হইতে পলায়ন করিয়া ফিলিস্তীন ও কেনান এলাকার দিকে গিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীছ বা ইতিহাস ভাণ্ডারের কোথাও কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে না। অতএব ঐরূপ কথার উপর ভিত্তি করিয়া পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করা এবং পূর্বাপর সমস্ত তফসীর বিশেষজ্ঞগণকে ভুল পথের পথিক সাব্যস্ত করা বোকামি বৈ আর কি হইতে পারে?

অধিকন্তু ফিলিস্তীন এলাকায় তখন বনী ইসরাঈলের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বসবাস ছিল না। তথায় "আমালেকা" নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির দখল ছিল। এই তথ্য পবিত্র কোরআনে (সূরা মায়েদা ঃ পারা– ৬;রুকু– ৮) স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার উল্লেখ সম্মুখে পাইবেন। এই তথ্য দৃষ্টে বনী ইসরাঈলদের মিসর ত্যাগকালে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলিয়া তাহাদের লক্ষ্যস্থল ফিলিস্তীন এলাকা সাব্যস্ত করা নিছক ধোকা।

সমুদ্রবক্ষে নব আবিষ্কৃত পথে বনী ইসরাঈলদের পার হইয়া যাওয়া এবং ঐ পথেই ফেরআউনগোষ্ঠীর ডুবিয়া মরা উভয়ের ইতিহাস কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত আছে। যথা–

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ

হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর, আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলাম, সেমতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিয়াছিলাম আর ফেরআউনগোষ্ঠীকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম– যাহা তোমরা চাক্ষুস দেখিতেছিলে।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ـ حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

আর আমি বনী ইসরাঈলগণকে সমুদ্র পার করাইয়া নিলাম; তাহাদের পিছে পিছে ধাওয়া করিল ফেরআউন ও তাহার লোক-লস্কর জুলুম-অত্যাচার করার উদ্দেশে। অবশেষে সে যখন ডুবিয়া যাইতেছিল তখন সে বলিল, আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যাহার প্রতি বনী ইসরাঈলগণ ঈমান আনিয়াছে তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। আর আমি মুসলমানদের দলভুক্ত হইতেছি।

اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,) এতক্ষণে! (ঈমানের কথা!) অথচ এতদিন পর্যন্ত নাফরমানীতেই কাটাইলে আর ফাসাদকারীদের দলভুক্ত থাকিলে! (আযাবে আক্রান্ত অবস্থায় ঈমান গৃহীত নহে)। অবশ্য তোমার লাশ উদ্ধার করিয়া নিব; (তাহা রক্ষিত থাকিবে) এই উদ্দেশে তুমি যেন তোমার পরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনরূপে বিদ্যমান থাক; বস্তুতঃ মানব সমাজের অনেকেই

(২) মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিশর ত্যাগ করার পর তাহাদের প্রথম উপস্থিতির স্থান সীনা পর্বত তথা কোহেতুর বা তুর-পর্বত এলাকা– ইহা সর্বস্বীকৃত ও সর্বসম্মত ঐতিহাসিক সত্য। এতদ্ভিন্ন এই সত্যের সমর্থনে পবিত্র কোরআনে কতিপয় তথ্যও পাওয়া যায়– (ক) মিসর ত্যাগ করতঃ ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার পর বনী ইসরাঈলদের জন্য শরীয়তরূপে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে মূসা (আঃ) যে আসমানী কিতাব (তওরাত" পাইয়াছিলেন তাহা তুর পর্বতে যাইয়া লাভ করিয়াছিলেন। (খ) "তওরাত" প্রাপ্তির পর যখন বনী ইসরাঈলগণ তাহা গ্রহণ করিয়া নিতে গড়িমশি করিয়াছিল তখন "তুর পর্বত"কেই তাহাদের মাথার উপর উঠাইয়া ধরা হইয়াছিল এবং তাহার ভয় দেখাইয়া বলা হইয়াছিল যে, তওরাত গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করার স্বীকৃতি দান কর। এই তথ্যদ্বয়ের প্রমাণ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত রহিয়াছে।

(৩) "তুর পর্বত" সুয়েজ উপসাগরের পূর্বকূলে অবস্থিত এবং তাহার অবস্থান সুয়েজ উপসাগরের গোড়ার দিকে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী। অর্থাৎ তূর পর্বত এলাকা বরাবর সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিমকূলস্থ মিসরের এলাকা বনী ইসরাঈলদের আবাসভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত। মানচিত্রের এই বিষয়গুলি ভালরূপে অনুধাবন করুন।

উল্লিখিত তথ্যসমূহ দৃষ্টে সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসর ত্যাগ করতঃ ফিলিস্তীন বা কেনান এলাকায় উপস্থিত হন নাই, বরং বোধহয় তখন ঐ এলাকা উদ্দেশ্যেও করেন নাই। অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করার কথা একেবারেই অবাস্তব। তিনি মিসর ত্যাগ করতঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন তুর পর্বত এলাকায়। তাঁহার এই উপস্থিতি ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে। কারণ, এই এলাকাটি শুধু তাঁহার পূর্ব পরিচিতই ছিল না; বরং তাঁহার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শান্তিনিকেতনও ছিল– যেহেতু এই এলাকায়ই তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এ স্থান হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়া তিনি মিসর গমন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বরং তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাকালে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে এই এলাকাটি بقعة مباركة বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল। وادى المقدس পাক-পবিত্র মহান প্রান্তর" নামে আখ্যায়িত হইয়াছিল, (হযরত মূসার নবুয়ত প্রাপ্তির আলোচনায় পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতিসমূহ দেখুন)। এই এলাকার এইসব বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যাওয়া হযরত মূসার পক্ষে কি সম্ভব ছিল? অতএব স্বাভাবিকরূপেই তিনি এই এলাকার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং ফেরআউনের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নাজাত হাসিল করিয়া ফেরআউনের ক্ষমতা বহির্ভূত এই মঙ্গলময় পবিত্র এলাকায় আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন– এরূপ বলা হইলে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হইবে না।

আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ হইতে গাফেল থাকে।* (সূরা ইউনুসঃ পারা- ১১ রুকু- ১৪)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ـ

আমি মূসার নিকট অহী পাঠাইয়াছিলাম, রাত্রি বেলা আমার বান্দা (বনী ইসরাঈলগণকে) লইয়া (মিসর হইতে) চলিয়া যাও; তারপর (পথিমধ্যে সমুদ্র আসিবে, তাহাতে লাঠি মারিয়া) তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ করিয়া লইও ধরা পরিবার ভয়ও করিবে না, ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কাও করিবে না। (সেমতে মূসা (আঃ) রাত্রের অন্ধকারে যাত্রা করিলেন)।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ـ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ـ

অতপর ফেরআউন তাহার লোক-লস্কর লইয়া তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিল এবং শেষ ফলে ভয়ঙ্কর সমুদ্র তাহাদিগকে ঘিরিয়া নিল। আর ফেরআউন তাহার জাতিকে পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংসের পথে নিয়াছিল- তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করে নাই। (পারা- ১৬; রুকু-১৩)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْنَ ـ

মূসার নিকট আমি অহী পাঠাইয়াছিলাম, আমার বান্দাহ বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া রাত্রে মিসর হইতে চলিয়া যাও। স্মরণ রাখিও, অবশ্যই তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হইবে। (মূসা (আঃ) রাত্রের অন্ধকারে যাত্রা করিয়া গেলেন। ফেরআউন সংবাদ পাইল)।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ـ اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ـ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ـ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ـ

* ফেরাউনের লাশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং ঢেউয়ের দ্বারা কূলে আসিবার পর তাহা রক্ষিত রহিয়াছিল। আজও তাহা মিসরের মিউজিয়ামে আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, পানিতে ডুবিয়া মরার নিদর্শন এখনও তাহার লাশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হযরত মূসার কোন নির্দিষ্ট ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহার তাড়াহুড়ার মধ্যে শুধু আল্লাহ নির্ধারিত গোপন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার বাধ্যবাধকতায় তিনি এই এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আর একটি তথ্য ঃ তুর পর্বত এলাকার প্রতি আসিতে মিসরস্থিত বনী ইসরাঈলের আবাসভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে পূর্ব দিকে কম-বেশ শতেক মাইল অগ্রসর হইয়া তারপর দক্ষিণ দিকে তুর পর্বত এলাকায় পৌঁছিলে এই পথে সমুদ্র আসিবে না অবশ্য, কিন্তু এই রাস্তায় যে পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহা মানচিত্রের সরল রেখারূপেই প্রায় ৩০০ মাইল। তদুপরি পর্বতমালার আবরণ বেষ্টনের দরুন যে তাহা আরও কতদূর দীর্ঘ হইতে পারে তাহা আল্লাহই জানেন। সর্বাধিক বড় কথা এই যে, ছয় লক্ষ নর-নারীকে লইয়া সেই জনশূন্য পানাহারের ব্যবস্থাবিহীন মরু পার্বত্য অঞ্চলটি সাধারণভাবে মানুষের জন্য অতিক্রমোপযোগী ছিল কিনা তাহাই কে জানে? পক্ষান্তরে গোশেন অঞ্চল হইতে তুর পর্বত এলাকায় পৌঁছিবার দ্বিতীয় পথ-গোশেন অঞ্চল হইতে সুয়েজ উপসাগরকে বামে রাখিয়া দক্ষিণ দিকে মিসর অঞ্চলের উপর দিয়া অগ্রসর হওয়ার পর সুযোগ সুবিধা মতে কোন স্থানে সুয়েজ উপসাগর পার হইয়া তুর পর্বত এলাকায় পৌঁছিয়া যাওয়া- এই পথটি প্রথম পথ অপেক্ষা দূরত্বের দিক দিয়াও কম এবং অতিক্রম করার দিক দিয়াও সহজসাধ্য; অবশ্য এই পথে শুধু অনধিক ৩০ মাইল প্রশস্ত সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর পার হইতে হইবে। সে যামানায়ও যেহেতু এই উপসাগরের পশ্চিম কূলের ন্যায় তাহার পূর্ব কূলেও আবাদি ছিল যেমন পবিত্র কোরআনের পারা- ৯;রুকু- ৬ -এর একটি বিবরণীতে আভাস পাওয়া যায়, অতএব তাহা পার হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক।

সুতরাং যদি মূসা (আঃ) নিজস্ব পরিকল্পনারূপে তুর পর্বত এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া থাকেন; তবে তিনি সুয়েজ উপসাগর পার হওয়ার ব্যবস্থা পাইবেন আশায় এই দ্বিতীয় পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর যদি বলা হয় যে, হযরত মূসার গতিবিধি সবই একমাত্র আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত গোপন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিতেছিল, তবে ত আর কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ত এই ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই ফেরআউন ও তাহার দলবলকে ডুবাইয়া মারার পরিকল্পনা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেমতে মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া রাত্রিবেলা পলায়নকালে তাড়াহুড়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুপাতিক সমুদ্র সম্মুখে আসিবার পথই অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

অবিলম্বে ফেরআউন (লোক-লস্কর সংগ্রহের জন্য) শহরে-বন্দরে পেয়াদা পাঠাইল এই বলিয়া যে, মূসার দল আমাদের তুলনায় কম সংখ্যক, তাহারা আমাদের ক্রোধান্বিত করিয়াছে, অথচ আমরা অস্ত্রধারী বিরাট। (তাহাদেরকে পাকড়াও করা সহজ। অতঃপর লোক-লস্কর লইয়া ফেরআউন মূসার পেছনে ছুটিল)।

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - وَكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ - كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ - فَاتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ - فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ - قَالَ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -

আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে বলেন, দেখ! ফেরআউন ও তাহাদের হোমরা-চোমরাগণকে পানির ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত বাগ-বাগিচা, অগাধ ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা হইতে এইরূপে বাহির করিয়া আনিলাম (এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া) ঐ সবের স্বত্বাধিকারী বানাইয়া দিলাম বনী-ইসরাঈলগণকে। (ফেরাউনগোষ্ঠীর ধ্বংসের বিবরণ এই যে, মূসা (আঃ) রাত্রিবেলা বনী ইসরাঈলদেরসহ পলায়ন করিলেন;) ফেরআউন লোক লস্করসহ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ধাওয়া করিল। (এবং দ্রুতগতির বাহনে তাহাদের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া গেল। যখন উভয় দল পরস্পর দেখা যাইতে লাগিল, (এদিকে মূসার সম্মুখে সমুদ্র); তখন মূসার সঙ্গীগণ বলিল, আমরা ত ধরা পড়িয়া গেলাম। মূসা বলিলেন, কস্মিনকালেও নয়; আমার সঙ্গে আমার পরওয়ারদেগারের সাহায্য রহিয়াছে– তিনি আমাকে (প্রয়োজন মুহূর্তে) সুব্যবস্থার নির্দেশ দিবেন।

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ - فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ -

তৎক্ষণাৎ মূসার প্রতি অহী পাঠাইলাম (পূর্ব বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থা এখনই প্রয়োগ কর) তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত কর। (তিনি তাহা করিলেন) তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি খণ্ড খণ্ড হইয়া এক একটা খণ্ড বড় বড় পর্বতের ন্যায় খাড়া রহিয়া গেল (মাঝে মাঝে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হইল; মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ ঐ সব পথে পার হইলেন)।

পবিত্র কোরআন সূরা ত্বা-হা পারা–১৬; রুকু–১৩-এর যে আয়াত সম্মুখে উদ্ধৃত ও অনূদিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট মর্ম-দৃষ্টে বলিতে হয় যে– সমুদ্র সম্মুখে আসিবে সেই পথ অবলম্বন করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে পূর্বাহ্নেই অবগত করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তাহার মধ্যে পথ সৃষ্টি করাও অবগত করিয়াছিলেন। অতএব সব কিছু আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য নির্দেশ মোতাবেক অবগতির সহিতই হইয়াছিল; সুতরাং ফিলিস্তিন ও কেনান এলাকার পথ অবলম্বন করার কথা নিতান্তই অবান্তর।

সুপ্রসিদ্ধ তফসীর রূহুল মাআ'নীতে বলা হইয়াছে, সমুদ্রে শুষ্ক পথ করিয়া নেওয়া সম্পর্কে অহী পূর্বাহ্নে–রাত্রিবেলা রওয়ানা হইয়া যাওয়ার আদেশসম্বলিত অহীর সঙ্গেই হইয়াছিল, ইহাই অধিকাংশ তফছীরকারগণের অভিমত (খন্ড–১৬; পৃষ্ঠা–১৩৭)। তফসীরে বয়ানুল-কোরআন ছূরা শোয়া'রার মধ্যেও এই আয়াতের বরাত দানে বলা হইয়াছে যে, রাত্রিবেলা রওয়ানা হওয়ার আদেশ আসিবার সঙ্গেই সমুদ্রে পথ করিয়া নেওয়ার আদেশও ছিল।

ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল যে, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণসহ সুয়েজ উপসাগর কূলে আসিয়া ঠেকিলেন; উপস্থিত পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা পাইতেছিলেন না; এমতাবস্থায় দেখা গেল; ফেরআউন লোক-লস্করসহ দ্রুত আসিয়া পৌঁছিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর উপস্থিত আদেশে লাঠির আঘাতে সমুদ্র খণ্ডিত হওয়ার মোজেযা সংঘটিত হইল। সমুদ্র বক্ষে নব আবিষ্কৃত পথ বহিয়া মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ পার হইয়া আসিলেন। পিছে পিছে ফেরআউন দলবলসহ তথায় পৌঁছিল এবং হযরত মুছার অনুসরণে সেই নব আবিষ্কৃত পথেই অগ্রসর হইল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ,ঐ সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর কম-বেশ ৩০ মাইল প্রস্থ। যখন ফেরআউন ও তাহার দলবল সকলে পূর্ণরূপে সমুদ্রের মাঝে আসিয়া পড়িল তখনই আল্লাহর আদেশে সমুদ্র স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, তাহারা সকলে ডুবিয়া ধ্বংস হইল।

ঘটনার এই বিবরণ শুধু যে, তফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, বরং ঐতিহাসিকগণও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন–(১) الكامل فى التاريخ আল-কামেল ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। ইহা ৭৫০ বৎসর পূর্বের স্বনামধন্য সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে আছীরের সঙ্কলিত ৪হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ।

(২) البداية والنهاية আল-বেদায়তু ওয়ান-নেহায়াহ্ ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা। ইহা ৬০৬ বৎসর পূর্বের সুপ্রসিদ্ধ মোফাচ্ছের; মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিক আল্লামাহ এমাদুদ্দীন (রঃ) কর্তৃক সঙ্কলিত।

পূর্বে স্মরণ করানো হইয়াছে যে, "সুয়েজ উপসাগর" একটি ভৌগোলিক উপনাম মাত্র, বস্তুতঃ তাহা লোহিত সাগরেরই অংশবিশেষ। অতএব পূর্বাপর সমস্ত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এবং সমস্ত তফসীরকারগণ ঐকমত্যরূপে যাহা বলিয়া আসিতেছেন যে, ফেরআউন ও তাহার দলবল লোহিত সাগরে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তাহাই বাস্তব ও অখণ্ডনীয়।

وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ - وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ - ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

(আল্লাহ বলেন,) অপর দল– ফেরআউন গোষ্ঠীকেও তথায় পৌঁছাইলাম। মূসা ও তাঁহার সব সঙ্গীদের বাঁচাইয়া নিলাম; তারপর (সে পথেই) অপর দলকে ডুবাইয়া মারিলাম।

এই ঘটনার মধ্যে (উপদেশ লাভের) নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু অনেক লোক এইরূপ ঘটনায় বিশ্বাসী নহে। জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার সর্বশক্তিমান ক্ষমতাশালী অতিশয় দয়ালু।

(পারা– ১৯; রুকু– ৮)

فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ -

আমার বান্দাগণকে লাইয়া রাত্রে রওয়ানা হও; শত্রু তোমাদের ধাওয়া করিবেই। (সমুদ্রে সৃষ্ট পথে পার হইয়া মূসা (আঃ) সেই পথ বিলুপ্তির দোয়া করিলে আল্লাহ বলিলেন)।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا - اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ -

সমুদ্রকে (উহাতে সৃষ্ট পথ এবং খন্ডিত পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া) শান্ত অবস্থায় থাকিতে দাও। নিশ্চয় ফেরআউনের সম্পূর্ণ দলটি (এই পথেই) ডুবিয়া মরিবে।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ - وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ - كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ -

(আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে উপদেশ গ্রহণের-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করার জন্য বলেন,) ঐ ফেরআউনগোষ্ঠী ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত কত বাগ-বাগিচা, খেত-খামার, জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা এবং আরও কত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী, যাহাতে তাহারা মত্ত ছিল– সেই সব তাহারা ছাড়িয়া ত ডুবিয়া মরিল;) আর কালক্রমে ঐ সবের মালিক বানাইয়া দিলাম অপর পক্ষ (বনী ইসরাঈলগণকে)।

(সূরা দোখান ঃ পারা– ২৫; রুকু–১৪)

মুক্তিলাভের পর বনী ইসরাঈল

পরাধীনতা এবং বিজাতীয় প্রভাব ও পরিবেশ মানুষের মন-মগজ, ভাবধারা ও চিন্তাধারা কিরূপে বিকৃত করিয়া ফেলে তাহার একটি প্রকৃত স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের মরু জীবনের প্রাথমিক একটি ইতিহাসে দেখা যায়।

বনী ইসরাঈল নবীগণের বংশ ছিল, শেরক ও মূর্তি পূজা তাহাদের জাতীয় চরিত্রের বিপরীত ছিল। তাহাদের জাতীয় চরিত্র ছিল খাঁটি তওহীদ; কিন্তু দীর্ঘকাল ফেরআউনের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া এবং ফেরআউনের পূজারী মিসরীয়দের প্রভাবে ও পরিবেশে পরাধীন দুর্বলরূপে থাকিয়া তাহারা আপন-ভোলা, স্বজাতীয়তা বিবর্জিত, বিজাতীয় ভাবধারায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কোন জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া যখন তাহার মন-মগজ ভাবধারা, চিন্তাধারা, বিকৃত হইয়া যায় তখন তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরাধীনতার মানসিক ছাপ সাধারণ দৈহিক ছাপ হইতে বহুগুণে বেশী শক্ত ও কঠিন হইয়া যায়। তাই দেখা যায়, কালক্রমে ঐ জাতি বাহ্যিক ও দৈহিক মুক্তি ও লাভের পরও তাহাদের ভাবধারা চিন্তাধারা, বিজাতীয় কলুষে কলুষিত থাকিয়া যায়। যেমন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শরীরে পড়িলে তাহা দূরীভূত হইয়া গেলেও ছাপ তথা ঠোসা থাকিয়া যায়; ঠোসা দূর হইলেও আগুনে পোড়ার দাগ শরীরে বহু দিন থাকে।

সুতরাং কোন জাতি দুর্ভাগ্যবশত পরাধীনতার অভিশাপে পতিত হইলে তাহার কর্ণধারগণের উপর বিশেষ দায়িত্ব আসে জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতির মন-মগজ, ভাবধারা চিন্তাধারাকে বিজাতীয় ছাপ মুক্ত করিতে অধিক যত্নবান হওয়া।

ফেরআউন নিজকে انا ربكم الاعلى আমি তোমাদের প্রধান প্রভু বলিত। অধিকন্তু মফস্বলের প্রত্যেক এলাকায় নিজের এক একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল; মফঃস্বল এলাকার লোকগণ সেই প্রতিমূর্তির পূজা করিয়া থাকিত। বনী ইসরাঈলগণ ঐরূপ পরিবেশে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় তাহাদের ভাবধারা চিন্তাধারা মূর্তিপূজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যখন তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিলাভ করিল, ফেরআউনগোষ্ঠী তাহাদের চোখের সামনে ডুবিয়া মরিল- এমতাবস্থায়ও তাহাদের মন-মগজ হইতে সেই বিজাতীয় প্রভাবপূর্ণ মূর্তি পূজার কথাই নির্গত হইল, নবীর সম্মুখে সেই দাবী পেশ করিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই-

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ـ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ـ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়া নিলাম। অতপর এমন একদল লোকের নিকট তাহাদের উপস্থিতি হইল যাহারা কতকগুলি মূর্তির পূজায় জড় ছিল। বনী ইসরাঈলরা বলিল, হে মূসা! আমাদের জন্যও এই ধরনের মা'বুদ বানাইয়া দিন তাহাদের যেরূপ মা'বূদ রহিয়াছে। মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা বড়ই নাদান, জ্ঞানশূন্য লোক।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

(মূসা (আ) আরও বলিলেন,) এই লোকগুলি যেসব কাজ করিতেছে তাহার মধ্যে এই কার্য ত নিতান্তই অবান্তর। তিনি আরও বলিলেন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য আনিতে পারি? অথচ এক আল্লাহ তোমাদিগকে সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (সূরা আরাফঃ পারা- ৯; রুকু- ৬)

তওরাতের জন্য হযরত মূসার তুর পর্বতে গমন

বনী ইস্রাঈলদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইল তাহারা হযরত মূসার নিকট আবদার জানইল, এখন ত আমরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি। এখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে কোন হেদায়াত নামা- কিতাব পাইলে আমরা তদনুযায়ী আমল করিতে সক্ষম হইব। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ-

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

আমি মূসাকে আশ্বাস দিলাম (কিতাব পাইতে তুর পর্বতে আসুন) ৩০ রাত্রের জন্য এবং আরও ১০ রাত্র বর্ধিত করিলাম; সেমতে তাঁহার প্রভুর নির্ধারিত সময় পূর্ণ ৪০ রাত্র হইল। যাত্রাকালে মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে বলিয়া গেলেন, আমার স্থলে আপনি জাতির মধ্যে থাকিয়া সকল কার্য সমাধা করিবেন, তাহাদের সংশোধন করিবেন, স্বৈরাচারীদের অনুসরণে চলিবেন না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ـ

মূসা যখন আমার নির্ধারিত দিনগুলির জন্য তুর পর্বতে আসিলেন এবং তাঁহার প্রভু তাঁহার সঙ্গে কালাম করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, প্রভু! আমাকে দর্শন দান করুন- আমি স্বচক্ষে আপনাকে দেখার আকাঙ্খা রাখি।

قَالَ لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ - فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا -

আল্লাহ বলিলেন, (ইহজগতে) কস্মিনকালেও আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। আচ্ছা- সম্মুখস্থ পাহাড়টির প্রতি নজর কর; যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকিয়া যায় তবে ত আমাকে দেখিবে। যখন তাঁহার প্রভুর নূরের তাজাল্লি মাত্র ঐ পাহাড়ে পতিত হইল; শুধু তাহাতেই পাহাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং মূসা চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মূসার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে আরজ করিলেন, প্রভু! (ইহজগতে দৃষ্ট হওয়ার আকার-আকৃতি হইতে) আপনি পাক পবিত্র। (সেই দরখাস্ত করায়) আমি আপনার দারবারে ক্ষমাপ্রার্থী (ইহজগতে আপনার দিদার-দর্শন সম্ভব নহে)।

قَالَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ -

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে মূসা আমি তোমাকে আমার পয়গাম্বরী দান করিয়া এবং কালামের পাত্র বানাইয়া লোকদের উপর বিশেষত্ব দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাকে যাহা দান করিতেছি তাহা সযত্নে গ্রহণ কর এবং আমার কৃতজ্ঞ হইয়া থাক।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ - فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ -

আর আমি ত তাঁহার জন্য কতিপয় ফলকে লিখিয়া দিলাম সব রকমের নসীহত উপদেশ এবং (জীবন যাপনের) বিস্তারিত বিবরণ। অতএব (হে মূসা!) নিজেও তুমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই সবগুলি গ্রহণ কর এবং নিজ জাতিকেও আদেশ কর, তাহারা যেন এইসব উত্তম বিষয়াবলীকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। নাফরমান- ফেরাউনগোষ্ঠীর দেশ সত্বরই তোমাদের দেখার সুযোগ দিব। (দেখিবে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে কিরূপে বিতাড়িত হইয়াছে!)।

হযরত মূসার যাওয়ার পর বাছুর পূজার কেলেঙ্করী

মূসা (আঃ) যখন তুর পর্বতে উপস্থিত হইবার আহ্বান পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী বনী ইসরাঈলদের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সঙ্গে নেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি অধীরচিত্তে ছুটিয়া পড়িলেন। ভ্রাতা হযরত হারুনকে জাতির কর্ণধাররূপে নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া "তুর" পানে রওয়ানা হইয়া গেলন। বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিবর্গ পিছনে সঙ্গেই আছে ধারণা করিয়া মূসা (আঃ) এক মনে এক ধ্যানে তুর পর্বত পানে দৃষ্টি নিবদ্ধভাবে এদিক-ওদিক কোন লক্ষ্যই না করিয়া একরোখা সম্মুখপানে ধাবিত হইতেছিলন। বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিবর্গ কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যায় নাই।

বরং তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বনী ইসরাঈল জাতি এক জঘন্য কেলেঙ্কারিতে জড়াইয়া পড়িল।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে "সামেরী" নামে এক মোনাফেক ঐ কেলেঙ্কারির উদ্যোক্তা ছিল। বনী ইসরাঈলদের নিকট কতকগুলি স্বর্ণের অলঙ্কার ছিল। সেইগুলি মিসরীয়দের নিকট হইতে তাহারা সাময়িক ধার আনিয়াছিল; মিসরে তাহাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পদের বিনিময়রূপে বা যেকোন কারণে ঐ গুলি তাহারা নিয়া আসিয়াছিল; পবিত্র কোরআনে এই তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এক দিকে হযরত মূসা তুর পর্বতের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন অপর দিকে সামেরী সেই অলঙ্কারগুলি একত্রিত করার ব্যবস্থা করিল এবং সেগুলিকে আগুনে গলাইয়া উহা দ্বারা একটি 'গোশাবক' মূর্তি তৈয়ার করিয়া নিল।

সামেরীর নিকট আর একটি বস্তু ছিল- মূসা (আঃ) যখন মিসর হইতে আসিতেছিলেন তখন ফেরেশতা জিব্রীল (আঃ)-ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; ইহা নবীগণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয়। নবীগণের সাহায্য-সহায়তা ও বিপদ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা- ইহা আল্লাহর তরফ হইতে জিব্রাঈল ফেরেশতার উপর ন্যস্ত এবং তাঁহার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। হযরত ঈসার রক্ষক ও সহায়করূপে ফেরেশতা জিব্রীলের নিয়োজিত থাকা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত আছে। বদর, ওহুদ, আহযাব, বনু কোরায়যা ইত্যাদি জেহাদসমূহে জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহায়তায় আসিয়াছিলেন, ইহা বোখারী শরীফ ইত্যাদি কিতাবের অনেক হাদীছে প্রমাণিত রহিয়াছে।

হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত জিব্রাঈলের ঘোড়া আছে; তিনি নবীগণের সাহায্য প্রয়োজনে ঘোড়া লইয়া অনেক ক্ষেত্রে আসিতেন। বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, বদরের জেহাদে ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র লইয়া হযরত জিব্রীলের উপস্থিতি রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যক্ষ করা পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়ার নাম حيزوم "হাইযুম" বলা হইয়া থাকে। বদরের জেহাদে হাইযুম হাঁকাইবার শব্দ ছাহাবীগণ শুনিয়াছেন বলিয়া মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফেরই জন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, "বনু কোরায়যা" গোত্রের উপর আক্রমণে যাত্রাকালে ছাহাবীগণ মদীনার "বনী গনম" সড়কে ধুলা উড়িতে দেখিয়াছেন যাহা অশ্বারোহী জিব্রাঈল বাহিনী অতিক্রমের দরুন ছিল।

মোট কথা-আপদ-বিপদে পয়গাম্বরগণের সাথে হযরত জব্রাঈলের সঙ্গ অবলম্বন এবং তাঁহার ঘোড়ায় আরোহণ এই সব তথ্য হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত।

মোফাস্‌সেরগণ লিখিয়াছেন, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে লইয়া মিসর ত্যাগের সঙ্কটময় ঘটনায় জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ঘোড়া আরোহিত ছিলেন। ঐ ঘোড়ার একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছিল- হযরত জব্রাঈলের ঘোড়ার পা যে স্থানে পতিত হইত সে স্থানে মরুভূমির মধ্যেও ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠিত। হযরত জিব্রীল ও তাঁহার ঘোড়া সাধারণরূপে দৃষ্ট না হইলেও স্থানে স্থানে ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠা দৃষ্ট ছিল এবং সামেরী তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে এরূপ স্থান হইতে কিছু মাটি সঙ্গে রাখিয়াও দিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, মৃত তথা ঘাস-পাতাবিহীন যমীন হঠাৎ সজীব ঘাস-পাতা বাহক হইয়া যাইতেছে! এই স্থানের মাটির আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় থাকিবে। এইরূপে একটা স্বাভাবিক মনোভাব লইয়া সে ঐ মাটি নিজের নিকট রাখিয়াছিল।

পূর্ববর্ণিত স্বর্ণের তৈয়ারী গোশাবক মূর্তিটি তৈয়ার করার পর সামেরীর মনে খেয়াল আসিল যে, আমার নিকট ত ঐ মাটি আছে যাহার ঘটনা ছিল- জীবনবিহীন বস্তুতে সজীবতার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া; ঐ মাটি এই জীবনবিহীন বাছুর মূর্তিটার মধ্যে দিয়া দেখি কি হয়! মনের খামখেয়ালীর দ্বারাই সে উদ্বুদ্ধ হইল এবং সেই বাছুর মূর্তিটার মুখে ঐ মাটি রাখিয়া দিল।

আল্লাহর কুরতের লীলা– ঐ মাটি রাখিলে পর বাছুর মূর্তিটির মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া গেল যে, ঐ মূর্তিটি প্রকৃত গোশাবকের ন্যায় হাম্বা হাম্বা করিতে আরম্ভ করিল। মোনাফেক সামেরী উহাকে কেন্দ্র করিয়া বনী ইসরাঈলদের দ্বীন ঈমান নষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করিল। সে তাহাদিগকে বলিল, এই গোশাবকটিই বস্তুতঃ তোমাদের এবং তোমাদের নবী মূসারও প্রভু-পরওয়ারদেগার– মাবুদ উপাস্য। মূসা ভুল করিয়া উপাস্য মাবদের তালাশে তুর পর্বতে গিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বনী ইসরাঈলগণ দীর্ঘ পরাধীনতার জীবনে শেরক ও মূর্তিপূজকদের ভাবধারা ও রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি মূর্তি পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাহারা স্বয়ং হযরত মূসা সমীপে দাবীও পেশ করিয়াছিল, যাহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

আপন ভোলা, বিজাতীয় ভাবধারায় নিমজ্জমান বনী ইসরাঈলগণ সহজেই সামেরীর খপ্পরে পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে ঐ গোশাবকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল, এমনকি হারুন (আঃ) তাহাদিগকে শত বুঝাইয়াও নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেন না। তাহারা পূর্ণ উদ্দ্যমে ঐ কেলেঙ্কারিতে মশগুল হইয়া গেল। তুর পর্বতে উপস্থিত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা তাঁহার জাতির অবস্থা জ্ঞাত করিলেন। জাতির জন্য আসমানী কিতাব লাভ করিলেন– সেই মুহূর্তে এই কেলেঙ্কারির সংবাদে হযরত মূসার আক্ষেপ অনুতাপের সীমা রহিল না। তিনি তথাকার কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া আল্লাহ তাআলার কিতাব তওরাত শরীফ লাভ করতঃ স্বীয় জাতির প্রতি ক্রোধ ও অনুতাপ লইয়া তুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিরেন।

প্রথমেই স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারুনকে অভিযুক্ত করিলেন। কারণ, তাঁহাকেই নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাই ভাবিলেন যে, তাঁহার দুর্বলতায়ই হয় ত এই অঘটন ঘটিয়াছে। হারুন (আঃ) বলিলেন, আমি যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমার বাধা মানে নাই, বরং আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। অবশেষে আমি এ সম্পর্কে কিছু করিতে না পারিয়া জাতির সংহতি রক্ষা করতঃ আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।

অতপর হযরত মূসা (আঃ) জানিতে পারিলেন যে, এই কেলেঙ্কারির মূল হইল সামেরী, অতএব তিনি সামেরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে হযরত মূসার প্রভাব ও ভয়ে-আতঙ্কে কিছুই গোপন রাখিতে সক্ষম হইল না, সব কিছু খুলিয়া বলিয়া দিল। হযরত মূসা সকলকে এরূপ অযৌক্তিক হীনকার্যের উপর ভর্ৎসনা করিলেন। মোনাফেক সামেরী ত সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষামূলক শাস্তি ভোগে গজবে পতিত হইল; আর সর্বসাধারণ বনী ইসরাঈলদিগকে বিশেষরূপে তওবা করার আদেশ করা হইল এবং বাছুর-মূর্তিটাকে আগুনে পোড়াইয়া ছাই ভস্ম করিয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

স্মরণীয় ঘটনা– আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম মূসাকে চল্লিশ রাত্রের – (তুর পর্বতে ৪০ রাত্র ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও; কিতাব প্রদান করিব)। তারপর তোমরা একটা বাছুর মূর্তিকে মা'বুদরূপে অবলম্বন করিয়াছিলে; (কিতাবের জন্য) মূসার যাওয়ার পর। তোমরা গুরুতর অন্যায়কারী ছিলে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ـ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَايُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلاً ـ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ـ

মূসার জাতি তাহার যাওয়ার পর তাহাদের স্বর্ণালঙ্কারগুলি দ্বারা একটা গোশাবকের মূর্তি বানাইল– এটা শুধু আকৃতিই ছিল (আত্মা উহাতে ছিল না; কেবল) গোশাবকের ন্যায় শব্দ উহাতে ছিল। তাহারা কি চিন্তা করিল না যে, ঐ বাছুর মূর্তিটা (মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট; মানুষ ত কথা বলিতে পারে, বাছুর মূর্তিটা ত)

কথাও বলিতে পারে না, তাহাদিগকে কোন পথ প্রদর্শনও করিতে পারে না। এমন অক্ষমকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা! বাস্তবিকই তাহারা বড় অন্যায়কারী ছিল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ـ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ ـ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ـ

আর যখন মূসা অনুতাপ ও ক্রোধভরে স্বীয় জাতির নিকট ফিরিলেন তখন বলিলেন, তোমরা আমার যাওয়ার পর অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত হইয়াছ! আল্লাহর তরফ হইতে হুকুম-আহকাম আনিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও করিলে না? এই বলিয়া তিনি তওরাত শরীফের খণ্ডগুলি ক্ষিপ্ততার সহিত রাখিয়া দিয়া স্বীয় ভ্রাতা হারুনের মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন।

قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ـ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

হারুন (আঃ) বলিলেন, ভাই! জাতি আমাকে হাল্কা মনে করিয়াছে– আমার কথার মূল্য দেয় নাই, আমাকে ত তাহারা খুন করিতে প্রস্তুত ছিল (তুমিও কঠোরতা দেখাইলে শত্রুরা হাসিবে) অতএব শত্রু দলকে তুমি আমার প্রতি হাসাইও না এবং আমাকে অপরাধীদের দলভুক্ত গণ্য করিও না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ـ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকেও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার রহমতের আওতায় শামিল করুন, আপনি ত সর্বোপরি দয়ালু মেহেরবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ـ

যাহারা বাছুর মূর্তিকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদের অচিরেই পাকড়াও করিবে তাহাদের পরওয়ারদেগারের গজব এবং ইহকালেই তাহারা অপদস্থ হইবে। (আল্লাহ বলেন,) এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারীদেরকে।

اَلَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

আর যাহারা গোনাহের কাজ করার পর তওবা করে নেক আমল করে এবং ঈমানকে শুদ্ধ করিয়া নেয়, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার ঐরূপ তওবা করিলে পর ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং রহম দান করিবেন। (পারা–৯; রুকু–৮)

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ـ

মূসা তুর পর্বতে পৌঁছাইলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, (যাহাদেরকে সঙ্গে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই) লোকদেরকে ছাড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন কেন? মূসা (নিজের ধারণাবসে) বলিলেন, তাহারা আমার পিছনেই আছে। প্রভু হে! আমি যথাসত্বর আপনার আদিষ্ট স্থানে হাজির হইয়াছি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ـ

আল্লাহ বলিলেন, আপনি চলিয়া আসার পর (তাহারা আসে নাই, বরং) তাহাদের আমি পরীক্ষায় ফেলিয়াছি– সামেরী তাহাদের গোমরাহ করিয়া দিয়াছে।

فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ـ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ـ

(বিস্তারিত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া) মূসা স্বীয় জাতির প্রতি অনুতাপ ও ক্রোধ ভরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের পরওয়ারদেগার কি তোমাদের নিকট একটি উত্তম ওয়াদা করিয়াছিলেন না (যে, "কিতাব" দান করিবেন)। তোমাদের সেই ওয়াদা পূরণের সময় কি ফুরাইয়া গিয়াছিল? না তোমরা ইচ্ছাই করিয়াছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের গজব পতিত হউক, সে মতে তোমরা আমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার (তওহীদে দৃঢ় থাকিবে) ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছ?

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ـ

বনী ইসরাঈলরা বলিল, আপনার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার আমরা সহজসাধ্যে ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু ঘটনা এই যে, আমাদের উপর (মিসরবাসীদের) স্বর্ণালঙ্কারের বোঝার চাপ ছিল; অতএব (সামেরীর পরামর্শে) আমরা সেগুলিকে (আগুনে) ফেলিয়াছিলাম, তারপর সামেরীও ঐরূপে ফেলিয়াছে।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ـ فَقَالُوْا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ ـ

(সেইগুলি আগুনে গলাইয়া) সামেরী তাহাদের জন্য একটা বাছুরমূর্তি বানাইয়াছিল– এটা শুধু আকৃতিই, ছিল যাহাতে (আত্মা ছিল না) ছিল কেবল গোশাবকের ন্যায় শব্দ। সেই বাছুর মূর্তি সম্পর্কে (সামেরীর ধোকায়) তাহারা পরস্পর বলিল, ইহাই তোমাদের মা'বুদ এবং মূসা ও মা'বুদ। মূসা ভুল করিয়াছে। (মা'বুদের জন্য তুর পর্বতে গিয়াছে)।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ـ

(আল্লাহ বলেন,) তাহারা কি চিন্তা করিল না। এটা তাহাদের কথার উত্তর দিতেও অক্ষম, লাভ-লোকসানের মালিক হওয়ার কথাই নাই।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ ـ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ ـ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ ـ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ـ

হারুন (আঃ) তাহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! বাছুর মূর্তির দ্বারা তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ (এইটা প্রভু বা মা'বূদ হইতে পারে না)। তোমাদের প্রভু হইলেন একমাত্র তিনি, যিনি "রাহমান," অসীম দয়ালু-দাতা, করুণাময়। সুতরাং তোমরা আমার কথা মান এবং আমার আদেশের অনুসরণ কর। তাহারা হারুনকে বলিয়াছিল, আমরা কিছুতেই এই বাছুর মূর্তিকে ছাড়িব না– ইহার পূজায় লিপ্ত থাকিব যাবত না মূসা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ـ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ـ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ـ

মূসা (আঃ) ভ্রাতা হারুনকে (ক্রোধভরে মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং থুতিতে হাত

লাগাইয়া মুখামুখি বসাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারুন! জাতি যখন গোমরাহ হইতেছিল তখন আমার (নিকট পৌঁছার) পথ ধরিতে তোমার জন্য বাধা কি ছিল? তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে?

قَالَ يَابْنَؤُمَّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَاسِي . اِنِّي خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي .

হারুন (আঃ) বিনয়ভাবে বলিলেন, হে আমার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা! আমার চুল-দাড়ি ছাড়িয়া দাও (এবং কথা শোন–) আমি আশঙ্কা করিয়াছি (তোমার নিকট গেলে কিছু লোক আমার সঙ্গে যাইবে, ফলে তাহাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইবে); তুমি হয়ত বলিবে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির কাজ করিয়াছ, আমার আদেশ রক্ষা কর নাই– (আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে সুষ্ঠুতা বজায় রাখিবে)।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيْ . قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ .

মূসা (আঃ) (কেলেঙ্কারির মূল গুরুকে?) বলিলেন হে সামেরী! তোর ঘটনা কি? সে বলিল, অতীতে আমি একটি বস্তু লক্ষ্য করিয়াছিল যাহা সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল না– (অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা জিব্রীলের ঘোড়ার পদস্থানের অলৌকিক অবস্থা)। সেমতে আমি সেই প্রেরিত দূতের পদস্থান হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়াছিলাম; সেই মাটি-মুষ্টি আমি (বাছুর-মূর্তিটিতে) ফেলিয়াছিলাম, এইটা আমার মনের একটা পরিকল্পনা ছিল; (তাহা হইতেই মূল ঘটনার সৃষ্টি)।

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لاَ مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ . وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا . لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا .

মূসা বলিলেন, দূর হইয়া যা– এই জিন্দেগীতে তোর এই দুর্ভোগ হইবে যে, ছুঁইও না, ছুঁইও না বলিতে হইবে, তদুপরি তোর জন্য শাস্তির আরও একটা নির্ধারিত সময় আছে পরকাল; যাহা এড়াইবার উপায় নাই। যেই মা'বুদকে কেন্দ্র করিয়া তুই ও তোর দল পূজা-পাট করিয়াছিল– এখনই দেখিবে, উহাকে জ্বালাইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া দিব।

اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا .

তোমাদের সকলের মা'বুদ একমাত্র তিনি যিনি ভিন্ন মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আর কেহ নাই, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞানী। (পারা– ১৬; রুকু– ১৩, ১৪)

সামেরীর ইহকালীন দুর্ভোগের বিবরণ সম্পর্কে মোফাসসেরগণ লিখিয়াছেন যে, তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে স্পর্শকারী এবং সামেরী উভয়ের ভীষণ জ্বর আসিয়া যাইত, সুতরাং সে পাগলের ন্যায় মানুষ-জন হইতে দূরে ঝাড়-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মানুষ-জন দেখিলেই এইরূপ বলিতে থাকিত, ছুঁইও না– ছুঁইও না।

বাছুর পূজারীদের তওবা

সামেরী ইহকালীন গজবে পতিত হইল এবং বাছুর-মূর্তিটাকে পোড়াইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া সমুদ্রে ফেলা হইল। অতপর মূসা (আঃ) বনী ইস্রাঈলের লোকগণকে তাহাদের এই মহাপাপ শেরেকের জঘন্যতা বুঝাইলেন এবং উহা হইতে তওবা করার উপদেশ দিলেন; তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিল। আল্লাহ তাআলা

তাহাদের এই মহাপাপের তওবা এইরূপ নির্ধারিত করিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে। যেমন, বর্তমানে আমাদের শরীয়াতেও ব্যভিচার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ আছে, নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করা।

ছাহাবী মা'য়েজ (রাঃ) এবং "গামেদিয়াহ" (রাঃ) নাম্নী ছাহাবী এইরূপ ঘটনায় স্বীয় জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য طهرني يا رسول الله ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে পাক-পবিত্র করুন বলিয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে নিজেকে পেশ করিয়াছিলেন। সেমতে হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে শরীয়তের নির্দেশ মতে প্রকাশ্যে জনসাধারণের প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করিয়াছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাদের এই তওবার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

তওবার ব্যবস্থাটি কঠিন ছিল বটে, কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ তাহার জন্য শুধু প্রস্তুতই হইল না, বরং বাস্তবে পরিণত করিল। তাহাদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক ঐ পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই তাহাদের জীবন বিসর্জন দিয়াছিল; ফলে আল্লাহ তাআলা ঐরূপ তওবাকারীদের সেই মহাপাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ ـ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় ঘটনা– মূসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা বাছুর পূজা অবলম্বনে নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছ। তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধাবিতও হও খাঁটি তওবা কর এবং সেমতে তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও। এই ব্যবস্থা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তোমাদের পক্ষে সুফলদায়ক হইবে– তিনি তোমাদের তওবা কবুল করিবেন; নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

(পারা–১ ;রুকু–৬)

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন–

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ـ

"বনী ইসরাঈলদের অপর একটি ঘটনা যে, তাহাদের নিকট সত্য দ্বীনের দলীল প্রমাণ আসিবার পরেও তাহারা বাছুর পূজা অবলম্বন করিয়াছিল। সেইরূপ মহাপাপকেও (তাহাদের তওবার বদৌলতে) আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলাম।" (পারা– ৬;রুকু– ২)

তওরাত সম্পর্কে গড়িমসি, তাই ব্যবস্থা অবলম্বন

বাছুর পূজার কেলেঙ্কারির সমাপ্তি ঘটিল, সেই পাপে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত ব্যক্তিরা তওবারূপে জীবন বিসর্জন দিল অতপর শান্ত পরিবেশে মূসা (আঃ) তওরাত শরীফ বনী ইসরাঈল জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তাহাদের বেআদব প্রকৃতির কিছু লোক একটা গোঁড়ামিমূলক প্রশ্ন তুলিল যে, আল্লাহ তাআলা সরাসরি আমাদিগকে বলিয়া দিলে আমরা এই কিতাবে বর্ণিত আদেশ গ্রহণ করিতে পারি; নতুবা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, ইহা বাস্তবিকই আল্লাহর কিতাব?

অনেক সময় আল্লাহ মানুষকে ঢিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেমতে মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতক্রমে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট আল্লাহ তাআলা কিছু বলিবেন এটা ত দুরূহ কথা, তবে এইরূপ ব্যবস্থা কর যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষকে নির্বাচিত করিয়া দাও; তাহারা আমার সঙ্গে তুর পর্বতে উপস্থিত হইবে; আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন। তাহাই করা হইল–

তাহারা সত্তর জন লোক নির্বাচিত করিল। মূসা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া তুর পর্বতে উপস্থিত হইলেন– তাহারা তথায় নিজ কানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ শুনিতে পাইল– আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

انی انا الله لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر فاعبدونی ولا تعبدوا غیری -

"একমাত্র আমিই তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য, আমি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। আমি পরম প্রতাপশালী, তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া শত্রুমুক্ত করিয়াছি, অতএব তোমরা আমারই গোলামী কর– আমি ভিন্ন অন্য কাহারও গোলামী করিও না।"। (তফসীর আজিজী)

এই স্পষ্ট নির্দেশ শুনিবার পর তাহারা বলিতে লাগিল; যে নির্দেশ আমরা শুনিলাম তাহা যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যাবৎ প্রকাশ্যে আমরা আল্লাহ তাআলাকে না দেখি?

এত গোঁড়ামি? এত গোস্তাখী! আর কত ঢিল দেওয়া যাইতে পারে! এইবার তাহারা আল্লাহর গযবে পতিত হইল– ভীষণ গর্জন এবং বিদ্যুৎ তাহাদিগকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দিল, সত্তর জন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন মূসা (আঃ) চিন্তায় পড়িলেন যে, দুষ্টগণ ত নিজ দোষে ধ্বংস হইল; কিন্তু জাতিকে আমি এই ঘটনা বুঝাইতে পারিব না, তাহারা সমস্ত দোষ আমার উপর চাপাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বিনয়ের সহিত আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার দোয়ার বরকতে পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দিলেন।

তুর পর্বত হইতে মূসা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলেন। তাহারা জাতির সম্মুখে কিছুটা সাক্ষ্য দিল। এখন বনী ইসরাঈলরা বলিতে লাগিল, আমরা এত কঠিন কঠিন বিধানের কিতাব গ্রহণ করিতে পারিব না।

যেসব ব্যক্তি সম্যক বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল তাহারা ত তওবাস্বরূপ জীবনদানে ইহজগত হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু জাতির মধ্যে বহু লোক এমনও ছিল যাহারা সরাসরি পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল না, তাই তাহারা সেই জীবন বিসর্জনের তওবার আওতায় পড়ে নাই; কিন্তু তাহাদের অন্তরে বাছুর পূজার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই মহাপাপের যে প্রভাব ও আকর্ষণ তাহাদের অন্তরে ছিল, তাহার অভিশাপে তাহাদের এই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আল্লাহ তাআলার আদেশাবলীকে শিরোধার্য করিয়া নিতে গড়িমসি করিল। আল্লাহ তাআলা এক পর্বত খন্ডকে উপড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন এবং নবীর মারফত বলিলেন, আমার প্রদত্ত কিতাব গ্রহণ কর, নতুবা রক্ষা নাই, এই পাহাড় তোমাদের উপর পতিত হইবে। তখন তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ততার প্রভাবে বলিল, আমরা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহাদের পরবর্তী অবস্থা ও কার্যকলাপ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা খাঁটি অন্তরে গ্রহণ করে নাই।

অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ধ্বংস করেন নাই। প্রত্যেককে তাহার জীবন সময়ের অবকাশ দিয়াছেন; ইচ্ছা করিলে সংশোধন হইতে পারিবে। আল্লাহ তাআলা কতই না দয়ালু যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠাইয়া তাহাদের সেই সংশোধনের সুযোগ আরও প্রশস্ত করিয়াছেন। এই সবের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত রহিয়াছে–

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ -

(বাছুর পূজার কারণে সৃষ্ট) মূসার রাগ যখন থামিল, তখন তিনি তওরাত লিখিত খন্ডগুলি বনী ইসরাঈলকে বুঝাইতে হাতে নিলেন। তাহার বিষয়বস্তু ছিল হেদায়াত– সৎপথ প্রদর্শন এবং রহমত–কল্যাণময় তাহাদের জন্য যাহারা স্বীয় প্রভুর ভয়-ভক্তি রাখে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ - اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا -

(আর তওরাত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী শুনিবার জন্য) মূসা স্বীয় জাতি হইতে সত্তর জন লোক মনোনীত করিলেন নির্দিষ্ট স্থান তুর পর্বতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। (তথায় আল্লাহর বাণী শুনিবার পর আল্লাহকে দেখিবার প্রস্তাব করায়) যখন ভীষণ ভূকম্পনাকারে আল্লাহর গজব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং তাহারা ধ্বংস হইল তখন মূসা আল্লার দরবারে আরজ করিরেন, পরওয়ারদেগার! (ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহাদের ঔদ্ধত্যতায়ই তাহাদের ধ্বংস করিয়াছেন নতুবা) আপনি সব সময়ই সর্বশক্তিমান– ইচ্ছা করিলে পূর্বে আমাকে এবং তাহাদিগকে– সকলকেই ধ্বংস করিতে পারিতেন। প্রভু! আপনি কি আমাকে সহ হালাক করিবেন আমাদের এই কতিপয় জ্ঞানশূন্য লোকের আচরণের দরুন? (এই অপরাধে তাহাদের সহিত আমারও ধ্বংস আসন্ন; কারণ, এই লোকদের মৃত্যুতে বনী ইসরাঈলরা আমাকে আসামী সাব্যস্ত করিবে এবং মারিয়া ফেলিবে)। (পারা– ৯; রুকু– ৯)

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ - ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন তোমরা বলিয়াছিলেন, হে মূসা! কিছুতেই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না (এই শ্রুত বাণী আল্লাহ তাআলার) যাবত না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়া নেই। তখন ভীষণ বজ্র ও বিদ্যুৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করিয়াছিল। তোমরা নিজ চোখে গজবের আগমন দেখিতেছিলে। তারপর (মূসার দোয়ার ফলে) আমি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম তোমাদের সেই মৃত্যুর পর, তোমরা যেন আমার শোকরগুজারী কর। (সূরা বাকারাঃ পারা– ১; রুকু– ৬)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ - خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

স্মরণ কর– আমি তোমাদের হইতে ওয়াদা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং সেই ব্যাপারে পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম* আর আদেশ করিয়াছিলাম– আমি তোমাদেরকে, যে কিতাব দিয়াছি তাহা মজবুতরূপে গ্রহণ কর, তাহার নির্দেশাবলী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং তাহা মোতাবেক চল; তবে তোমরা হইতে পারিবে মোত্তাকী–পরহেজগার। (পারা– ১; রুকু– ৮)

---

* বহু সমালোচিত বাঙ্গালী পন্ডিত তফসীরকার এখানেও অপব্যাখ্যর উদগার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার চিরাচরিত ফন্দি-ফেরেব এখানেও আঁটিয়াছেন, কতিপয় শব্দের বিচ্ছিন্ন উপঅর্থ হাতড়াইয়া সমাবেশ করতঃ গোঁজামিল দিয়াছেন।

তাহার বক্তব্য এই যে, পাহাড় উঠাইয়া আনিয়া তাহাদের মাথার উপর ধরা হইয়াছিল ইহা সত্য নহে, গল্প-গুজব মাত্র। তাহার মতে, আয়াতের মর্ম ও ঘটনার সত্য বিবরণ এই যে, পাহাড়টাকে নিজ স্থানে রাখিয়াই বনী ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশমান করা হইয়াছিল মাত্র। পাঠকবর্গ! পণ্ডিতের তফসীর কিরূপ সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরা পড়িবে। এখানে তিনটি বাক্য আছে– (১) স্মরণ কর ঐ সময়টা যখন তোমাদের হইতে আমি অঙ্গীকার লইয়াছিলাম (২) আর তোমাদের উপর পাহাড় উঠাইয়াছিলাম (৩) আদেশ করিয়াছিলাম, যাহা আমি দিয়াছি তাহা শক্তভাবে ধর এবং স্মরণ রাখ।

এখন বিচার করুন ২ নং বাক্যটির মর্ম যদ্দি এই হয় যে, "পাহাড়টাকে তোমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশমান করিয়াছিলাম" তবে এই বাক্যটির পূর্বাপর তথা ১ নং ও ৩ নং বাক্যদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গতি কি হইবে এবং এই বাক্যত্রয়ের ধারাবাহিকতার তাৎপর্য কি হইবে?

অতপর পণ্ডিত সাহেব رفعنا রাফা'না ও فوقكم ফাওকাকুম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে হাতড়ানি দেখাইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন যে, তিনি যেসব অর্থ দেখাইয়াছেন তাহা শব্দের মূল অর্থ নহে, বরং ব্যবহারিক অর্থ। আর ব্যবহারিক অর্থেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, رفعنا রাফানা ও فوقكم ফাওকাকুম শব্দদ্বয় বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে ব্যবহারে যে অর্থ হইতে

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ - خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا - قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا - وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ -

আরও স্মরণ কর, তোমাদের হইতে ওয়াদা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং (তাহার জন্য) তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। আদেশ করিয়াছিলাম, যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং মনোযোগের সহিত শুন। তাহারা বলিয়াছিল– শুনিলাম, কিন্তু আমল করিতে পারিব না। বস্তুতঃ তাহাদের অন্তরকে দখল করিয়া রাখিয়াছিল বাছুর পূজার (ন্যায় শেরেকী গোনাহের) আকর্ষণ তাহাদের কুফরী মনোভাবের দরুন। (পারা– ১; রুকু – ১১)।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

একটি স্মরণীয় ঘটনা– আমি পাহাড় উঠাইয়া ধরিলাম তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায়। তাহারা ভাবিয়াছিল, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে– এমতাবস্থায় তাহাদের আদেশ করা হইল, যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং তাহার আদেশবালী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং সেই মোতাবিক চল; তোমরা মোত্তাকী হইতে পারিবে। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৯; রুকু– ১১)

অর্থাৎ পরাধীনতার যুগে বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের মধ্যে কুফরী ও মূর্তি পূজার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুখে এবং কার্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক, লোক যাহারা আত্মবিসর্জনদানে বিশেষ তওবার আদেশ বরণ করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন অবশিষ্ট লোকগণ উক্ত কুফুরী ও শেরেকী মানসিকতা হইতে সাধারণ নিয়মেও খাঁটি এবং পরিপক্ক তওবা করে নাই। ফলে সেই অশুভ মানসিকতার জুলমত ও অন্ধকারময় প্রক্রিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে গাঁথিয়া থাকে এবং তাহাই প্রতিক্রিয়ায় পদে পদে নাফরমানী ও গোঁড়ামি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যাহার একটি নমুনা তৌরাতে গ্রহণ করিয়া লওয়া সম্পর্কীয় আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে কেলেঙ্কারীর উল্লেখিত ঘটনা। তদুপরি ময়দানে তীহ বা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় পরবর্তী ঘটনাবলীও সেই নাফরমানী ও গোঁড়ামি মনোবৃত্তিরই আত্মপ্রকা, যেসবের বিবরণ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

পারে উভয়ের মিলিত আকারের ব্যবহারেও ঐ অর্থ লইতে চাহিলে ভাষার মধ্যে তাহার নজির দেখাইতে হইবে। কারণ, ব্যবহারিক অর্থ ব্যবহারের আকার ও তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য করুন! "ধরা" শব্দটি "পায়ে ধরা" বাক্যে যে অর্থে ব্যবহার হয়, 'মাথা ধরা" বাক্যে সেই অর্থ ভুল হইবে।

অতএব পণ্ডিত সাহেব যে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন– সেই প্রচেষ্টা সম্পন্ন হইবে না যাবত না তিনি رفعنا ও فوق শব্দদ্বয়ের মিলিত এবং فوق শব্দ كم কুম শব্দের সঙ্গে আবদ্ধ আকারে ব্যবহারে তাহার উদ্দেশ্য উপঅর্থের নজির আরবী ভাষায় দেখাইতে পারেন। পণ্ডিত সাহেবের জীবন ত খরচ হইয়াই গিয়াছে, তাঁহার দোস্ত-মদদগারদের জীবনও সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া আরবী ভাষায় ঐরূপ নজির বাহির করিতে সক্ষম হইবেন না।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য বিষয়ের পরবর্তী সূরা আ'রাফের আয়াত খানার মধ্যে نتقنا নাতাক্না" শব্দের অর্থ সম্পর্কে কতকগুলি অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া ময়দান জয় করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা নিছক ব্যর্থ। কারণ, কোরআনের তফসীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভর স্থল হইল হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বা তাঁহার ছাহাবীগণের বক্তব্য; অবশ্য কোন আয়াত সম্পর্কে যদি আমাদের খোঁজে ঐ সম্পদ না থাকে তবে দ্বিতীয় নম্বরে আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে।

ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা তফসীর কার্যে প্রথম নম্বরের প্রমাণ; অভিধান ইত্যাদি দ্বিতীয় নম্বরের প্রমাণ। কারণ, অভিধান দ্বারা আমরা আরবী শব্দের অর্থ নির্ধারিত করিব; আর ছাহাবীগণ স্বয়ং আরবী-ভাষাভাষী এবং তাঁহাদের সম্মুখেই পবিত্র কোরআন নাযিল হইয়াছে– কোরআন রসূলের উপর নাযিল হইয়াছিল, ছাহাবীগণ তাঁহারই শার্গেদ।

তীহ প্রান্তরের ঘটনার সূচনা

ফেরআউন ধ্বংস হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরের স্বত্বাধিকারী হইয়া থাকিলেও তাহারা তথায় পুনর্বাসিত হয় নাই। আপন দেশ সিরিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছায় বা আদেশে তাহারা অস্থায়ীভাবে 'সীনা' উপত্যকায় তুর পর্বতের এলাকায় বাস করিতেছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বনী ইসরাঈলদের আসল বাসস্থান ছিল শাম তথা সিরিয়ায়। বনী ইসরাঈলদের মূল ইসরাঈল তথা ইয়াকুব (আঃ) শাম দেশেরই "কেনান" অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক হইতে হিজরত করিয়া শাম দেশেই আসিয়াছিলেন।

বনী ইসরাঈলগণ মুক্ত হইয়া তুর অঞ্চলে বসবাসকালে তওরাত কিতাব তথা পূর্ণ শরীয়ত প্রাপ্ত হইল এবং তথায় দীর্ঘকাল কাটাইল। অতপর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহাদের প্রতি আদেশ আসিল, স্বীয় পৈত্রিক আবাসভূমি শাম দেশে যাওয়ার। সেই সময় শাম দেশ "আমালেকা" নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির দখলে ছিল; তাহাদের সঙ্গে জেহাদ করিয়া ঐ দেশ উদ্ধার করার আদেশ হইল।

মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া জেহাদ উদ্দেশে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বনী ইসরাঈলগণকে আশ্বাস দিলেন জেহাদ চালাইলে তোমরা সিরিয়া দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে বলিয়া আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। বনী ইসরাঈলগণ বলিল, ঐ দেশ এক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক অধিকৃত; আমরা তাহাদের সঙ্গে জেহাদে পারিয়া উঠিব না, সুতরাং তাহারা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমরা তথায় যাইব না।

পথিমধ্যে এই বিভ্রাট ঘটায় মূসা (আঃ) তাহাদের মনোবল বৃদ্ধি করার একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। বনী ইসরাঈলগণ বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন সর্দার ছিল, তাহাদিগকে "নকীব" বলা হইত। আলোচ্য ঘটনায় বস্তুতঃ বনী ইসরাঈলগণ আমালেকা জাতি সম্পর্কে নানারূপ গুজব ও অতিরঞ্জিত খবরে প্রভাবান্বিত ছিল, তাই মূসা (আঃ) বার গোত্রের বার সর্দারকে একত্র করতঃ তাহাদিগকে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা গোপনে আমালেকা জাতির সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিয়া সর্বসাধারণ বনী ইসরাঈলকে জানাইবে, যেন তাহারা গুজবের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়– এই আদেশ তাহাদের প্রতি ছিল।

বার সর্দারের দলটি সব কিছু হাল-অবস্থা ওয়াকেফ হইয়া স্থির করিল যে, স্বীয় জাতিকে তাহাদের মনোবল বৃদ্ধিকারক খবরই শুনান হইবে যে, তাহারা সাহস করিয়া জেহাদের জন্য অগ্রসর হইলে তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার জনের মাত্র দুই জন নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল এবং দশজনই তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত বর্জনপূর্বক বিপরীত সংবাদ পৌঁছাইল। ফলে বনী ইস্রাঈলগণ একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দিল, এমনকি হযরত মূসার সঙ্গে বেআদবীপূর্ণ কথা বলিয়া পথিমধ্যে তাহারা বসিয়া পড়িল; সেই

দুঃখের বিষয়– পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য আয়াতের তফসীর করিতে অভিধানের পাতা উল্টাইয়াছেন, কিন্তু ইহা দেখেন নাই যে, স্বয়ং হযরত রসুলুল্লার চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে প্রধানতম মোফাসসের তাঁহার হইতে আলোচ্য আয়াতের তফসীর স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই তফসীর বড় বড় তফছীরের কিতাকে উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ তফসীর ইবনে কাছীর- ২য় খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় আছে–

عن ابن عباس .... وابو ان يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كانه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤسهم -

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলগণ তওরাত শরীফ স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল না, ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর পাহাড়কে "নাতক করিলেন তাহা তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায় লট্‌কিয়া রহিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতাগণ পাহাড়কে তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এইরূপ স্পষ্ট তফসীর বর্ণিত হওয়ার পর "নাতক" শব্দের অর্থ অভিধান হইতে খয়রাত করা শুধু নিষ্প্রয়োজনই নহে, বরং ভুল পন্থাও বটে। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবী আরবী ভাষাভাষী ছিলেন বিশেষত পণ্ডিত সাহেবের স্বীকারোক্ত অনুসারেই যখন "নাতক" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া ধরা" অভিধানেও বিদ্যমান আছে তখন ত ঐ অর্থ বাদ দেওয়ার অর্থ হয় ছাহাবী ইবনে আব্বাসের তফসীর পণ্ডিত সাহেবের মনঃপূত নয়, তাই ঐ তফসীর গ্রহণ করিতে গড়িমসি; ইহা ত বনী ইসরাঈল-মার্কা স্বভাব।

কেলেঙ্কীরর এলাকাটিই ছিল “তীহ প্রান্তর”।

হযরত মূসা (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হইলেন, এমনকি আল্লাহর দরবারে নিজেকে এবং ভ্রাতা হযরত হারুনকে পেশ করত স্বীয় জাতির বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইলেন। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলগণকে ইহকালীন আযাবে পতিত করিলেন, তাহারা ঐ মরু প্রান্তর অঞ্চলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দিশাহারা দিগভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান থাকিবে– এই অঞ্চল হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

ঐ মরু অঞ্চলটি এই অর্থেই “তীহ প্রান্তর” নামকরণ হইয়াছে। “তীহ” অর্থ দিকভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান হওয়া। ঐ প্রান্তরটি পূর্বালোচিত সীনা উপত্যকার প্রশস্ত দিক তথা উত্তরাংশ– খাদ্য পানীয়, ঘাস-পাতা, তৃণ-লতাবিহীন বিশাল মরুভূমি।

এই বিবরণীর আলোচনায় পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -

স্মরণ কর, মূসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর– আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কত কত নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (ফেরআউন হইতে মুক্ত করিয়া কত কত শহরের স্বত্বাধিকারদানে) তোমাদিগকে রাজ্যের মালিক বানাইলেন, আরও কত নেয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়ানে! বর্তমান জগদ্বাসীদের আর কাহাকেও ঐরূপ দান করেন নাই।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ -

হে আমার জাতি! তোমরা পূণ্যময় ভূখণ্ডে প্রবেশ কর (তথা সিরিয়া বা শাম দেশে–) যাহাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন (জেহাদ করিলেই তোমরা তাহা পাইয়া যাইবে)। খবরদার! জেহাদ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না, অন্যথায় তোমাদের সর্বনাশ হইবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ - وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ -

তাহারা বলিল, হে মূসা! সে অঞ্চলে ত এক দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী জাতি বাস করে; আমরা কোন মতেই তথায় প্রবেশ করিব না যাবত না তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। হাঁ, যদি তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায় তবে পরে আমরা প্রবেশ করিব।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ - فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ - وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

দুই জন লোক যাহারা আল্লাহকে ভয় করিত– যাহাদেরকে আল্লাহ শুভবুদ্ধির নেয়ামত দিয়াছিলেন তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তোমরা তাহাদের সম্মুখে তাহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হও; তবেই তোমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইবে (ভয় কর কেন)? তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হইয়া থাক তবে তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন কর।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ -

এইবার তাহারা আরও দৃঢ়ভাবে বলিল, হে মূসা! যাবত ঐ জাতি সেই অঞ্চলে থাকিবে তাবত আমরা কিছুতেই কস্মিনকালেও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি যাও আর তোমার খোদা যাউক– তোমরা সেখানে যুদ্ধ কর ,আমরা ত এখানেই বসিয়া পড়িলাম।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ـ

মূসা (আঃ) আল্লাহর হুজুরে বলিলেন, পরওয়ারদেগার! কাহারও উপর আমার কর্তৃত্ব নাই একমাত্র আমার জান ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত; এখন তুমিই আমাদের এবং এই নাফরমান জাতির মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً یَتِیْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ ـ فَلاَ تَاسَ عَلَی الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তাহাদের কর্মফল ইহকালে এই ভোগ করিবে যে, ঐ পুণ্য ভূমি–পৈতৃক দেশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল চল্লিশ বৎসরের জন্য; এই দীর্ঘকাল তাহারা এই মরু অঞ্চলেই দিগভ্রান্তরূপে ঘুরিতে থাকিবে। তুমি কিন্তু হে মূসা! এই নাফরমান জাতির দুরবস্থায় আক্ষেপ অনুতাপ করিও না। (পারা– ৬; রুকু– ৯)

তীহ প্রান্তরে দয়াল মা'বুদের অসীম দয়া

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলগণ তীহ প্রান্তরে শাস্তি ভোগস্বরূপ আবদ্ধ ছিল। আর মূসা (আঃ)ও তথায় তাহাদের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের রক্ষক ও পরিচালকরূপে। সেই মরুভূমিতে পানাহারের ব্যবস্থা ছিল না, বরং সূর্যের উত্তাপ হইতে মাথা ঢাকিবারও কোনরূপ ব্যবস্থার নাম-নিশানা পর্যন্ত তথায় ছিল না। সুতরাং তাহারা তথায় তিনটি জিনিসের অভাবে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পড়িল (১) পানীয়, (২) খাদ্য, (৩) ছায়া।

মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে ঐ সব অভাব সম্পর্কে দোআ করিলে রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলার করুণা দৃষ্টি সেই শাস্তি ভোগরত জাতির প্রতিও উন্মুক্ত হইল; তাহাদের প্রত্যেকটি অভাবেরই সুব্যবস্থা হইল। পানির জন্য আল্লাহ তাআলা বারটি ঝর্ণা সৃষ্টি করিলেন, খাদ্যের জন্য মান্ন-সালওয়ার ব্যবস্থা করিলেন আর ছায়ার জন্য তাহাদের উপর মেঘমালা সৃষ্টি করিলেন।* ঐ সব ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ

পানির ব্যবস্থা

وَاِذِ اسْتَسْقٰی مُوْسٰی لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ـ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِن رِّزْقِ اللّٰهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এইসব ঘটনা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় নহে, বহু পূর্বের ঘটনা– যখন বনী ইসরাঈলগণ সাগর পার হওয়ার পর তুর পর্বতের অনাবাদ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল।

পূর্বালোচিত পণ্ডিত সাহেব স্বীয় তফসীরুল কোরআনে এস্থানেও কতকগুলি অপদার্থ অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন। সরলপ্রাণ মুসলমান! শুধু এইতটুকু স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা যে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছি তাহা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরকার ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সমস্ত তফসীরের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (তফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড– ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

مُفْسِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– মূসা পানীয় ব্যবস্থার দো'য়া করিলেন স্বীয় জাতির জন্য। আমি আদেশ করিলাম, তোমার লাঠিখানা পাথরটির উপর মার, ফলে সেই পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। তাহাদের বার গোত্রের প্রত্যেকে নিজ নিজ পানীয় স্থান নির্ধারিত করিয়া নিল। (আল্লাহ তাআলা সতর্ক করিয়া দিলেন), তোমরা আল্লার নেয়ামত– খাদ্য-পানীয় ভোগ কর, দুনিয়াতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।

(পারা– ১; রুকু– ৭)

খাদ্য ও ছায়ার ব্যবস্থা

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

আর আমি মেঘমালাকে তোমাদের উপর ছায়াদানে নিয়োজিত করিলাম এবং (খাওয়ার জন্য) মান্ন ও বটের পাখি আমদানী করিলাম। (বলিয়াছিলাম,) তোমরা আমার নেয়ামত খাও (নাফরমানী করিও না; কিন্তু সেই অবস্থায়ও তাহারা নাফরমানী করিয়াছিল; নাফরমানী করায়) আমার কোন ক্ষতি করে নাই, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে। (পারা– ১; রুকু– ৬)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ـ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ـ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ـ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ـ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– আমি বনী ইসরাঈলকে ১২টি গোত্রে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। (যদদ্বারা তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় ছিল)। যখন তাহারা মূসার নিকট পানীয়ের ব্যবস্থা চাহিল তখন আমি মূসার নিকট এই মর্মে অহী পাঠাইলাম যে, তুমি তোমার লাঠিকে ঐ পাথরটির উপর মার, ফলে ঐ পাথর হইতে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজ নিজ ঘাট নির্ধারিত করিয়া জানিয়া নিল। আরও আমি মেঘমালা দ্বারা তাহাদের ছায়া দিয়াছিলাম এবং খাদ্যের জন্য তাহাদের নিকট মান ও বটের পাখীর বিপুল সমাবেশ করিয়াছিলাম* আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা আমার প্রদত্ত এই উত্তম রেজেক খাও (এবং শোকরগুজারী কর, নাফরমানী করিও না, কিন্তু তাহারা নাফরমানী করিল), তাহারা আমার ক্ষতি করে নাই, নিজেদের ক্ষতি করিয়াছিল।

(সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৯;রুকু– ১০)

---

*"মান্ন" এক প্রকার বৃক্ষ হইতে নির্গত মিষ্ট খাদ্য বস্তু। ঐ অঞ্চলে উক্ত বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল এবং লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈলদের জন্য আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তখন ঐ বৃক্ষসমূহ হইতে অসাধারণ পরিমাণে তাহা নির্গত হইতে লাগিল। কিম্বা ঐ জিনিস বৃক্ষ ব্যতিরেকে রাত্রি বেলা আল্লাহর কুদরতে আকাশ হইতে শিশিরের ন্যায় বর্ষিত হইয়া যমীনের উপর জমাট বাঁধিয়া থাকিত।

"সালওয়া" বটের পাখী ইহাও আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় উড়িয়া আসিয়া সহজ সুলভরূপে বনী ইসরাঈলদের হস্তগত হইত।

আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি উপেক্ষা ও বেআদবী

আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ছিল যে, বনী ইসরাঈলদিগকে তাহাদের আযাব ভোগ অবস্থায় মান্না সালওয়ার ন্যায় নেয়ামত তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা উপেক্ষা করিল। তাহারা হযরত মূসার নিকট দাবী জানাইল, আমরা সব সময় হালুয়া জাতীয় মিঠাখানা ও গোশ্‌ত খাইতে খাইতে খানার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের জন্য শাক-সব্জি, তরী-তরকারী খাদ্যের ব্যবস্থা করুন। তাহাদের এই দাবীতে মূসা (আঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক তাহাদিগকে কোন শহরে প্রবেশ করার পরামর্শ দিলেন। তীহ প্রান্তর এলাকায় দূর প্রান্তে কোন উপশহর ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাদিগকে তাহা প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই তথ্যসমূহের বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَصْبِرْ عَلٰى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ـ

হে বনী ইস্রাঈল! একটি স্মরণীয় ঘটনা– তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা কিছুতেই এক রকম খাদ্যের উপর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আপনি অপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীনের উদ্ভিদজাত শাক-শব্জী, খিরা-কাঁকড়, গম-যব, ডাল-মটর, পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ـ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা কি উত্তম বস্তু পরিবর্তন করিয়া নিকৃষ্ট বস্তু চাহিতেছ? তবে তোমরা কোন শহরে অবতরণ কর, তথায় তোমাদের প্রস্তাবিত বস্তু পাইতে পারিবে। (সূরা বাকারাহঃ পারা–১; রুকু–৭)

তীহ-প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন সমাপ্তির পর

বনী ইস্রাঈলগণ তীহ্-প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল চল্লিশ বৎসরের জন্য এবং পুণ্য ভূমি তথা তাহাদের পৈতৃক দেশ শাম বা সিরিয়ায় তাহদের প্রবেশ ঐ চল্লিশ বৎসরের জন্য মুলতবী হইয়া গিয়াছি। যখন সেই চল্লিশ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইল তখন পুনরায় তাহাদিগকে সেই পৈত্রিক দেশ দখল করার আদেশ করা হইল। ইতিপূর্বে তীহ প্রান্তরে অবস্থানকালেই হযরত মূসা ও হযরত হারুণের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত "ইউশা" নবী হইয়াছিলেন। এইবার বনী ইসরাঈলগণ হযরত ইউশার সঙ্গে থাকিয়া আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করিল। ঐ দেশ জয় হইল; কিন্তু ঐ দেশের রাজধানী বাইতুল মোকাদ্দাস শহরে প্রবেশ করা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে কয়েকটি বিশেষ আদেশ দান করিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা যে, বনী ইস্রাঈলগণ তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাসের বশে সেই আদেশের বরখেলাফ করিল, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহর গজব আসিল। এই সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–)

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ـ وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْلَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

স্মরণ কর, আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা এই (শহর) এলাকায় প্রবেশ কর; অবাধে এই এলাকাকে তোমরা নিজেদের খাদ্যখাদক যোগাইতে ব্যবহার করিতে পারিবে। আর তোমাদের প্রতি নির্দেশ– শহরের প্রবেশদ্বার অতিক্রমকালে (আল্লাহর শোকরগুজারী ও তাঁহার প্রতি অগাধ আনুগত্য আত্মনিবেদনের স্বাক্ষরস্বরূপ) শির নত করিয়া উহা অতিক্রম করিবে, আর বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন। (এই কাজ করিলে) আমি তোমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিব এবং খাঁটি লোকদের অতিরিক্ত আরও দিব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

ঐ স্বৈরাচারীরা আদেশকৃত কথার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। ফলে আমি যালেমদের উপর আসমান হইতে আযাব পাঠাইলাম; যেহেতু তাহারা আমার আদেশ লংঘন করিতেছিল।

(সূরা বাকারাহ ঃ পারা– ১, রুকু–৫)

১৬৪১। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইসরাঈলগণকে আদেশ করা হইয়াছিল, (প্রস্তাবিত) শহরে প্রবেশ করাকালীন (নম্রতা ও আনুগত্যের নিদর্শনে) নতশিরে মাথা ঝুঁকাইয়া প্রবেশ করিবে এবং (নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহের ভয়ে ভীত হইয়া) মুখে বলিবে "হেত্তাতুন" হে খোদা! আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দাও। "কিন্তু তাহারা (এতই গোঁড়া ছিল যে, হয়ত ঐ সব আদেশ ও বিধি-বিধানকে মোল্লাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণামাত্রায় উহার বিরোধিতা করিল। এমনকি স্বেচ্ছায় শির নত করা ত দূরের কথা, শহরের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ ও নীচ হওয়ায় শির নত হওয়ার বাধ্যতা এড়াইতে নিতম্বের উপর ভর করিয়া চলিল, তবুও শির নত হইতে দিল না। এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, "হেত্তাতুন অর্থাৎ ক্ষমা চাই" বলিতে; তাহারা উহার পরিবর্তে "হাব্বাতুন ফি-শা'রাতিন" (বা "হেন্তাতুন" অর্থাৎ খাওয়ার জন্য) "যবের দানা (বা গম ইত্যাদি তথা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা) চাই" বলিল।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ তা'আলার আদেশাবলীর এরূপ চরম বিরোধিতা করায় তাহাদের উপর প্লেগের মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাঠক! বনী ইসরাঈলরা গোঁড়া প্রকৃতির অবাধ্য স্বভাবের ত ছিলই, তদুপরি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের অন্তঃকরণ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল– আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অগাধ

* আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীত এইরূপ চুলে-চুলে ও অক্ষরে-অক্ষরে নাফরমানী করা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু জাতির মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করার প্রবণতা ব্যাপক হইয়া পড়ে তখন চুলে-চুলে, অক্ষরে-অক্ষরে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের বিপরীত চলা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বর্তমান মুসলিম জাতির অবস্থা দেখিলে ঐরূপ নাফরমানীর অনেক নমুনাই নজরে পড়িবে। যথা– শরীয়তের আদেশ দাড়ি বেশী করিয়া রাখ এবং মোছ ফেলিয়া দাও, জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে– দাড়ি ফেলিয়া দাও, মোছ রাখ। মোছ সম্পর্কে হুকুম এই যে, উভয় পার্শ্ব রাখিলেও নাক বরাবর অব্যশই ফেলিবে; জাতি ইহার বিপরীত চলিয়াছে– উভয় পার্শ্ব ফেলিয়া নাক বরাবর রাখিয়া দিবে। তদ্রূপ শরীয়তের বিশেষ অলজ্ঘনীয় আদেশ, পরিধেয় বস্ত্র এত লম্বা পরিবে না যে, পায়ের গিঁটের নীচে চলিয়া যায় এবং এত খাট পরিবে না যে, হাঁটুর উপরে উঠে। জাতির ফ্যাশন হইল– লম্বা পরিলে এত লম্বা যে, পায়ের গিঁটের নীচে অবশ্যই যাওয়া চাই এবং খাট পরিলে হাঁটুর উপরে হাফপ্যান্ট পরিবে। হাঁটু হইতে পায়ের গিঁট পর্যন্ত এক হাত পরিমাণ জায়গা রহিয়াছে; ইহার মধ্যে ফ্যাশনের স্থান হয় নাই; ফ্যাশন রহিয়াছে উহার চার আঙ্গুল নীচে তথা গিঁটের নীচে, অথবা চার আঙ্গুল উপর তথা হাঁটুর উপরে। আমাদের এই অবস্থা কি বনী ইসরাঈলদের গোঁড়ামির তুলনায় কম?

আনুগত্য, পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নম্রতা তাহাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল– যাহার ফলে তাহাদের দুর্ভোগও অনেকই ভুগিতে হইয়াছিল। পূর্বালোচিত ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে তাহাদের ঐ স্বভাবের অনেক নজির পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ স্বভাবের পরিচায়ক আরও দুইটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে।

গরু জবাই করার ঘটনা

কোন এক সময়ের ঘটনা– বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি গুপ্ত খুন হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিল, তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল এবং তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল এক ভাতিজা। যথাসত্বর উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য ঐ ভাতিজা তাহাকে গোপনে খুন করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্য এক গ্রামে লাশ রাখিয়া আসিয়াছিল এবং ঐ গ্রামবাসীদের উপরই খুনের দোষ চাপাইল। ফলে তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল যাহার মীমাংসার কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। তাহারা এই ঘটনা হযরত মূসার দরবারে পেশ করিল। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাহাদিগকে বলিলেন, একটা গরু জবাই করিয়া উহার কোন একটি অংশ কাটিয়া নিহত ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করিলেই নিহত ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে।

বনী ইসরাঈলগণ গরু জবাই করা সম্পর্কে কেলেঙ্কারির পথ অবলম্বন করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা করা হইল এবং হযরত মূসার আদেশানুসারে কার্য করার ফলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করিয়া দিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য এই ঘটনাকে একটি বিশেষ নজিররূপে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছেন, "এই ঘটনাটি মৃতকে পুনর্জীবিত করার একটি নজির– এইরূপেই আদি-অন্তের সমস্ত মৃতগণকে আল্লাহ তাআলা জীবিত করিয়া তুলিবেন। তিনি ইহজগতে স্বীয় কুদরতের দুই এটা নজির-নমুনা দেখাইয়া থাকেন, যেন তোমরা ইহার দ্বারা পরকালে পুনঃ জীবিত হওয়াকে বুঝিতে পার।"

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

স্মরণীয় ঘটনা– তোমরা একটি মানুষকে গোপনে হত্যা করিয়া পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছিলে; এদিকে আল্লাহর ইচ্ছা হইল তোমাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়া। সুতরাং আমি (আল্লাহ) আদেশ করিলাম, একটি (জবাই করা) গরুর কোন অংশের দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ কর (সে জীবিত হইয়া ঘটনা বলিয়া দিবে)। এইরূপেই আল্লাহ মৃতগণকে জীবিত করিবেন। আর আল্লাহ তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন স্বীয় কুদরতের নিদর্শনসমূহ, যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ـ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ـ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ

স্মরণ কর, মূসা (আঃ) বলিয়াছিলেন, স্বীয় জাতিকে (ঐ হত্যাকান্ডের তথ্য জানিবার জন্য) আল্লাহ তা'আলার আদেশ এই যে, তোমরা একটি গরু জবাই কর। তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন ? মূসা বলিলেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি অজ্ঞের ন্যায় কাজ করা (তথা আল্লাহর নামে কথা বলিয়া বিদ্রূপ করা) হইতে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ ـ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ـ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ـ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

তাহারা বলিল, হে মূসা! আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন ঐ গরুটা কি বয়সের হইবে। মূসা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা বুড়া বা কম বয়সের জওয়ান হইলে চলিবে না– মধ্যবর্তী বয়সের হইতে হইবে। (অধিক প্রশ্ন না করিয়া) আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া নাও। (কিন্তু গড়িমসির ভাব ধরিয়া) তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন যেন আমাদিগকে বলিয়া দেন, গরুটা কি রঙ্গের হওয়া চাই। মূসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা হলুদ হইবে– খুব গাঢ় হলুদ, দেখিতে সুন্দর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَةَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ـ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ـ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ـ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ـ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল, আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের বলিয়া দেন গরুটা কি ধরনের হইবে? গরুটা ত আমাদের পক্ষে অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এইবারে আমরা ইন্‌শা আল্লাহ উহাকে চিনিয়া লইতে পারিব। মূসা বলিলেন, আল্লাহ বলিতেছেন, গরুটা এইরূপ হইবে যে, জমি চাষ করে নাই এবং জমিনে পানিও দেয় নাই, তদুপরি সব রকম দোষমুক্ত হইতে হইবে এবং উহার সর্বশরীর এক রঙ্গের হইতে হইবে। তাহারা বলিল, এইবার আপনি পূর্ণ বিবরণ আনিয়াছেন। অতপর তাহারা ঐরূপ গরু জবাই করিল। (তাহাদের প্রশ্নোত্তরে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল যে,) মনে হইতেছিল না তাহারা উহা সামাধা করিতে পারিবে। (পার– ১, রুকু– ৮)

* উল্লিখিত বিভিন্ন প্রশ্ন বস্তুতঃ বনী-ইসরাঈলদের গোঁড়ামীর প্রতিফলন ছিল; নতুবা হযরত মূসার উক্তি সুস্পষ্ট ছিল। যেকোন বয়সের ও রঙ্গের যে কোন একটি গরু জবাই করিলেই আদেশ পালন হইয়া যাইত। কিন্তু নবীর আদেশ পালনে টালবাহানা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল; খাট বিষয়কে দীর্ঘায়িত করিয়া গা বাঁচাইবার বাহানা তাহারা খুঁজিতেছিল।

আল্লাহ তাআলাও তাহাদের শায়েস্তা করার জন্য প্রত্যেক প্রশ্নের উপর এক এক শর্ত আরোপে গরুটিকে এমন পর্যায়ে পৌঁছাইলেন যে, উহা পাওয়াই কঠিন হইয়া পড়িল। অবশেষে বহু পরিশ্রম ও অগাধ ধন ব্যয়ে উহা লাভ করা গেল। প্রশ্ন উত্থাপন না করিলে একটি সাধারণ গরু দ্বারাই উদ্দেশ্য সফল হইত। হযরত মূসার প্রথম উক্তির মর্ম তাহাই ছিল।

হযরত মূসার প্রতি অপবাদ

বনী-ইসরাঈলরা বড় গোঁড়া ছিল; তাহারা অতি সামান্য ব্যাপার লইয়াও পয়গম্বরের প্রতি পর্যন্ত অপবাদ রটাইতে কুণ্ঠিত হইত না। কোন এক সময়ের ঘটনা– বনী-ইসরাঈলদের একটি বর্বরতা এই ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত। মূসা (আঃ) ঐরূপ করিতেন না, তিনি পূর্ণ পর্দার মধ্যে গোসল করিতেন। হযরত মূসার এই আবশ্যকীয় কার্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অপবাদ রটাইল যে, মূসার শরীরের গোপন অংশে কোন ঘৃণিত রোগ আছে; সেই জন্যই সে অন্যের সম্মুখে উহা খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই পন্থায় তাহারা হযরত মূসাকে লোক সমক্ষে হেয় করার চেষ্টা করিল এবং তাঁহার প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া জনগণকে তাঁহার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার ফন্দি করিল।

মূসার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে হেদায়াত প্রচারের ব্যাপারে উক্ত ঘটনা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। ঐ অপবাদটি এক প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আকার ধারণ করিয়া বসিল। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ তাআলা সাধারণ বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের হেদায়াতপ্রাপ্তির পথ হইতে ঐ কন্টক দূরীভূত করারও ব্যবস্থা

করিলেন; হেদায়াত লাভ করিতে পয়গম্বরের শরণাপন্ন না হওয়ার পক্ষে যেন কাহারও জন্য কোন অজুহাতের অবকাশ বাকী না থাকে।

একদা মূসা (আঃ) নির্জনে গোপন স্থানে একটি পাথরের উপর স্বীয় কাপড় রাখিয়া গোসল করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ পাথরটি তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। মূসা (আঃ) তাড়াহুড়া ও ব্যতি-ব্যস্ততার মধ্যে পাথরের এই ঘটনায় স্তম্ভিত অবস্থায় কাপড় উদ্ধারের জন্য উহার পিছনে দৌড়াইলেন। আল্লাহর এমনই কুদরত যে, নিজের বস্ত্রহীন অবস্থার প্রতি হযরত মূসার লক্ষ্য রহিল না। পাথরটি সোজাসুজি একদল অপবাদকারী বনী-ইসরাঈলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। মূসাও উহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং পাথর হইতে স্বীয় কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন। আল্লাহর কুদরতের লীলায় আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে অপবাদকারীদের মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া গেল।

বাস্তবিকই রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলা কত দয়ালু দয়াময় যে, স্বীয় বান্দাদের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য কত ছোট ছোট প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রতিও কিরূপে বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। এই ঘটনা তাহারই একটি নজির। পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা মূসাকে মর্মাহত করিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁহাকে তাহাদের অপবাদ হইতে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি বড় উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন ছিলেন।

১৬৪২। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত মূসা (আঃ) অতিশয় হায়াদার-লজ্জাশীল ছিলেন; স্বীয় শরীর সর্বদা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতেন– তাঁহার শরীর খোলা অবস্থায় কেহ দেখিতে পারিত না; তহাতে তিনি লজ্জাবোধ করিতেন।

এই ব্যাপারটিকে ভিত্তি করিয়া বনী-ইসরাঈলদের একদল লোক হযরত মূসাকে কষ্ট দিল– তাহারা এই অপবাদ রটাইল যে, মূসার শরীরে নিশ্চয় কোন আয়েব বা গোপন দোষ আছে, তাই তিনি স্বীয় শরীরকে ঢাকিয়া রাখায় বিশেষ তৎপর। (তাহারা হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে অপবাদ রটাইয়াছিল যে, তাঁহার গুপ্ত শরীরাংশে শ্বেত রোগ কিংবা একশিরা বা কোড়লের রোগ অথবা অন্য কোন ঘৃণিত রোগ আছে)।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইল স্বীয় রসূল মূসা সম্পর্কে এই অপবাদ মুছিয়া দিবেন। হযরত মূসা একদিন একাকী নির্জন স্থানে স্বীয় কাপড়-চোপড় একটি পাথরের উপর রাখিলেন এবং গোসল করা আরম্ভ করিলেন। গোসল শেষ করিয়া যখন ঐ কাপড় লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন ঐ পাথর তাঁহার কাপড় লইয়া ছুটিয়া চলিল। হযরত মূসা (আঃ) সত্বর স্বীয় লাঠি হাতে লইয়া পাথরকে ধাওয়া করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে পাথর আমার কাপড়! হে পাথর আমার কাপড়! এমনকি (আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি ও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য একমাত্র পাথর ও কাপড়ের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া গেল; বস্ত্রহীন হওয়ার খেয়াল রহিল না।) ঐ পাথর দৌড়িয়া বন-ইসরাঈলদের একটি মজলিসে আসিয়া থামিল; মূসা (আঃ) ও তথায় পৌঁছিলেন এবং তাড়াতাড়ি কাপড় লইলেন। মুহূর্তের জন্য উপস্থিত লোকগণ তাঁহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া ফেলিল এবং তাহাদের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, হযরত মূসার শরীর আল্লাহপ্রদত্ত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং সব রকম দোষমুক্ত।

হযরত মূসা যথাসত্বর কাপড় পরিয়া স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, ফলে পাথরের গায়ে আঘাতের ৪/৫ টা রেখা পড়িয়া গেল। এই ঘটনাই হইল এই আয়াতের উদ্দেশ্য– (আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

১৬৪৩। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক উপলক্ষে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু চিজ-বস্তু কতিপয় লোকের মধ্যে বন্টন করিলেন। সেই বন্টন উপলক্ষ করিয়া এক (মোনাফেক) ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই বন্টন কার্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই (নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে)।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ব্যক্তির এইরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়া তাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলাম। হযরত (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি তাঁহার চেহারার উপর অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। অতপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ মূসাকে বিশেষ বিশেষ রহমত দান করুন; তাঁহাকে ত আরও অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ উক্তিটি আলোচ্য ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

কারুনের ঘটনা

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনপতি এবং সর্বপ্রসিদ্ধ কৃপণ "কারুন" বনী-ইসরাঈল বংশধর এবং হযরত মূসারই চাচাত ভাই ছিল। ফেরাউনের আমলে বনী-ইসরাঈলদেরকে শোষণ করার জন্য ফেরআউন তাহাদের স্বজাতীয় কারুনকে তাহাদের উপর শোষণের ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়াছিল। হযরত মূসার আবির্ভাবে ফেরআউন ধ্বংস হইল, বনী-ইসরাঈলগণ হযরত মূসার আশ্রয় পাইল। ফলে কারুনের আয়-আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি স্তিমিত হইয়া আসিল। এই আক্রোশে হযরত মূসার প্রতি তাহার অন্তরে শত্রুতা জন্মিল, কিন্তু মোনাফেকীর সহিত ঈমান প্রকাশ করিয়া সে ভক্ত সাজিয়া থাকিল। হযরত মূসার সম্মান ও প্রাধান্য বৃদ্ধিতে কারুনের অন্তর-অগ্নিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সময় সময় সে ধন-দৌলতের গরিমা দেখাইয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে জাঁকজমকের প্রদর্শনী করিয়াও ব্যর্থ হইত। মূসা (আঃ) তাহাকে শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রতি আহবান করায়, বিশেষতঃ যাকাতের হুকুম এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন ব্যয় করার আদেশে হযরত মূসার প্রতি তাহার চরম শত্রুতার সৃষ্টি হইল। সে হযরত মূসাকে কলঙ্কিত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিল। এক নারীকে ধন-দৌলতের লালসা দেখাইয়া সম্মত করিল যে, সে কোন জনসভার মধ্যে সর্বসমক্ষে হযরত মূসার প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা তোহ্মত লাগাইবে। সেমতে একদিন মূসা (আঃ) এক জনসভায় ওয়াজ-নসিহত ফরমাইতেছিলেন, কারুন ঐ নারীটিকে তথায় উপস্থিত করিয়া তাহার দুশ্চক্রান্ত সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করিল। ঐ নারী হযরত মূসার প্রতি অপবাদ লাগাইল। মূসা (আঃ) ঐ নারীকে আল্লাহর গজবের ভয় দেখাইয়া কসম খাইতে বলিলেন, ঐ নারীটি ভয় পাইয়া তাহার দাবী যে মিথ্যা তাহা স্বীকার করিল এবং কারুনের চক্রান্ত ফাঁস করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া দিল।

ঘটনা শ্রবণে ভীষণ জালালী তবিয়তের আজিমুশশান জলীলুল কদর পয়গাম্বর হযরত মূসা (আঃ) ভাবিলেন, এইরূপ ঘটনার দ্বারা তাঁহার প্রতি সর্বসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে উহা তাহাদের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক এবং তাহাদের হেদায়াতের পথ রুদ্ধকারী হইবে। সুতরাং তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। এমনকি হযরত মূসা ঐরূপ কুচক্রী কারুনের প্রতি বদ দোয়া করিলেন। ফলে আল্লাহ তাহাকে তাহার ধন-দৌলত ও বাড়ী-ঘরসহ যমিনে ধসাইয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনেও কারুনের এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ـ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ
لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ـ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ـ وَابْتَغِ

فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

নিশ্চয় কারুন মূসার জাতির একজন ছিল; সে অহঙ্কার ও গর্বে তাহাদের উপর গরিমা ও প্রাবল্য দেখাইত। আর আমি তাহাকে এত অধিক ধন-ভাণ্ডার দান করিয়াছিলাম যে, যাহার চাবিসমূহ শক্তিশালী লোকের একটা দল অতি কষ্টে উঠাইতে পারিত। ঐ ঘটনাটি স্মরণীয়, যখন কারুনের জাতি কারুনকে বলিল, তুমি অহঙ্কার করিও না। আল্লাহ প্রদত্ত ধন-দৌলত দ্বারা আখেরাতের জগতে শান্তি লাভের ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত হইতে আখেরাতের জন্য স্বীয় অংশ লইয়া যাওয়ার কথাও ভুলিও না। আর আল্লাহ ধন-দৌলত দ্বারা তোমার উপকার করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও আল্লাহর বান্দাদের উপকার কর, দেশে বিপর্যয় ও অশান্তি ঘটাইও না; নিশ্চয় জানিও– আল্লাহ তাআলা ফাছাদকারীদের পছন্দ করেন না।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ـ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ـ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

কারুন বলিল, (আমার প্রতি আল্লাহর কি উপকার!) ধন-দৌলত ত আমার নিজস্ব জ্ঞান-গুণের দ্বারা লাভ হইয়াছে! (আল্লাহ বলেন, সে এত বড় দম্ভের কথা বলিল! তাহার ভয় হইল না?) সে কি জানে না, আল্লাহ তাহার পূর্বে অনেককে ধ্বংস করিয়াছেন যাহারা তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, অধিক ধন-জনের অধকারী ছিল? আর (আখেরাতে ত আযাব আছেই। আল্লাহ তাহাদের সব অপরাধ জ্ঞাত আছেন;) অপরাধীদের অপরাধ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইবে না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ـ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ـ

(এক দিনের ঘটনা–) কারুন বিশেষ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকের সহিত তাহার জাতির দৃষ্টি আকর্ষণে বাহির হইল। যাহারা দুনিয়াভিলাষী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল, হায়! যদি কারুনের ন্যায় ধন-দৌলত আমাদেরও হইত! বাস্তবিকই কারুন বড় ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে তাহারা ঐ লোকগুলিকে বুঝাইয়া বলিল যাহারা ছিল প্রকৃত জ্ঞানী– তোমরা কি সর্বনাশের কথা বলিতেছ! জানিয়া রাখিও, যে ব্যক্তির ঈমান ও নেক আমল আছে তাহার পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিফল (কারূনের ধন–সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে) উত্তম হইবে অবশ্য ঐ প্রতিফল একমাত্র তাহারাই লাভ করিবে যাহারা (স্বীয় মাবুদের সন্তুষ্টির-পথে স্থির, দৃঢ়পদ ও) ধৈর্যধারণকারী হইবে।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ـ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ـ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অতপর আমি আল্লাহ কারুনকে তাহার মহলসহ যমিনে ধসাইয়া দিলাম। কোন দল খাড়া হইল না যাহারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাহার সাহায্য করিতে পারে। আর সে নিজেও জান বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে

পারিল না। ইতিপূর্বে যাহারা কারুনের ন্যায় হওয়ার আরজ-আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, আজ তাহারা বলিতে লাগিল, বাস্তবিকই (ধন-দৌলতের আধিক্য ভাগ্যবান হওয়ার প্রমাণ নহে, ধন-দৌলতের ব্যাপারটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত,) আল্লাহ (তাঁহার হেকমতে) স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করেন, যাহার পক্ষে ইচ্ছা করেন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। (তাহারা আরও বলিল,) যদি আল্লাহর করুণা আমাদের প্রতি না হইত, তবে নিশ্চয় আমাদিগকেও (কারূনের সঙ্গে) ধসাইয়া দিতেন; (আমরা কারুনকে ভাগ্যবান মনে করায় অপরাধী ছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম,) বাস্তবিকই শেষ পরিণামে কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না। (সূরা কাসাস-পারা ২০, রুকু ১১)

হযরত মূসা ও হযরত খিজিরের ঘটনা

এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ প্রথম খন্ডে ৯৭নং হাদীছরূপে অনূদিত হইয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনেও ১৫-১৬ পারায় উল্লেখ আছে। যাহার তফসীর উল্লিখিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

১৬৪৪। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "খাজের"কে খাজের নামে আখ্যায়িত করার সূত্র এই ছিল যে, তিনি একদিন ঘাস-পাতাবিহীন এক স্থানে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ লক-লকে ঘাসে আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় খাজরা শব্দের অর্থ "সবুজ"। এই ধাতু হইতেই "খাজের" শব্দ গৃহীত। আরবী ব্যাকরণ সূত্রে শব্দটি "খাজের" হওয়াই অবধারিত; অবশ্য সাধারণ প্রচলন সূত্রে "খিজির" বলাকেও শুদ্ধ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

হযরত খিজিরের আসল নাম "বাল্ইয়া।" তিনি কোন্ সময় হইতে দুনিয়াতে আছেন সে সম্পর্কে কাহারও মত এই যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় হইতে তাঁহার আবির্ভাব। দুনিয়াতে কতদিন ছিলেন বা এখনও আছেন কিনা এ সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। তিনি নবী বা রসূল কিনা– সে সম্পর্কেও মতানৈক্য রহিয়াছে। অবশ্য কোরআন-হাদীছদৃষ্টে এতটুকু অবধারিত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সৃষ্ট জগতের গুপ্ত রহস্যের বহু তথ্য-জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দান করিয়াছেন।

হযরত রসূলুল্লাহর সঙ্গে মূসার মোলাকাত

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মে'রাজে গিয়াছিলেন তখন বিশিষ্ট রসূলগণের মধ্যে হযরত মূসা এবং হযরত হারুনের সঙ্গেও তাঁহার মোলাকাত হইয়াছিল।

হযরত হারুনের সঙ্গে পঞ্চম আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত মূসার সঙ্গে ষষ্ঠ আসমানে মোলাকাত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাও উল্লেখ আছে যে, প্রত্যাবর্তনকালে পুনঃ হযরত মূসার সঙ্গে মোলাকাত হইয়াছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয নামাযের হুকুম লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, কিন্তু হযরত মূসার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নয় বার আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হইয়া পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম করিতে করিতে সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত মোকাররার করিয়া দেন। কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দানের ঘোষণা দ্বারা পঞ্চাশের তাৎপর্য বজায় রাখেন। বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ পঞ্চম খন্ডে মে'রাজ শরীফের বয়ানে উল্লেখ হইবে।

১৬৬৫। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আকৃতি অনুমান করিতে তোমরা তোমাদের পয়গম্বরের (তথা আমার) প্রতি দৃষ্টি কর। আর মূসা (আঃ) ছিলেন বাদামী বর্ণের, তাঁহার দেহের মাংস জমাট বাঁধা, খুব মজবুত ছিল। একটি লাল উট যাহার নাকের দড়ি খেজুর গাছের ছোবড়ার তৈয়ারী, উহার উপর আরোহণ করিয়া তিনি হজ্জের সফর করিয়াছিলেন। তখন পর্বত পথ অতিক্রমে নিচের দিকে অবতরণকালে তিনি যে, হজ্জের তলবিয়া ও তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া যাইতেছিলেন সেই দৃশ্য আমি যেন এখনও দেখিতেছি। (পৃষ্ঠা-৪৭৩)

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীদের কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস, মুসলমানদের কেবলা কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফ শ্রেষ্ঠ, হজ্জ চিরকাল কা'বা শরীফেই হইয়াছে; সমস্ত নবীগণ কা'বা শরীফেই হজ্জ করিয়াছেন। ইহুদীরা মুসলমানদের কেবলার এই বৈশিষ্ট্য খন্ডনে মিথ্যা দাবী করিত যে, তাহাদের নবী মূসা (আঃ) হজ্জ করেন নাই। তাহাদের এই দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করিতে হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক হজ্জের তলবিয়া পড়িতে কা'বা শরীফের দিকে আসিবার অতীত দৃশ্য আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিশেষ কুদরতে অবলোকন করাইয়াছেন। আলোচ্য হাদীছে হযরত (সঃ) তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যেরূপ ৬৯৭ নং হাদীছে হযরত (সঃ) মূসা আলাইসিস সালামের সমাধির বর্ণনাও এইভাবে দিয়াছেন।

হাশরের মাঠে হযরত মূসা

হাশরের মাঠে হিসাব আরম্ভ হইবার পূর্বে হাশর মাঠের বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থায় যখন মানুষ অস্থির হইয়া পড়িবে এবং বিভিন্ন পয়গম্বরগণের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সুপারিশ কামনা করিবে, তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে হযরত মূসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। সকলে হযরত মূসার নিকট উপস্থি হইয়া বলিবে, হে আল্লাহর রসূল মূসা! আপনাকে আল্লাহ তাআলা রসূল বানাইয়া অতঃপর আপনার সঙ্গে কালাম করিয়া আপনাকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিয়াছিলেন; আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের জন্য সুপরিশ করুন। তখন তিনি মিসরে অবস্থানকালে এক কিব্তীকে মারিয়া ফেলার অপরাধ উল্লেখ করিয়া স্বীয় ভয়-ভীতি প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে হযরত ঈসার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিবেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ ইনশা আল্লাহ তা'আলা হাশরের বিবরণে উল্লেখ হইবে।

হযরত শোআ'য়ব (আঃ)

শোআ'য়ব আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং মোফাসেসর ও মোহাদ্দেছগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একজন লেখকের বয়ান মতে দেখা যায়, হযরত শোআ'য়বের আবির্ভাব হযরত মূসার আবির্ভাবকালের অনেক পরে, প্রায় ৭০০ বৎসরের ব্যবধানে।

(কাছাছুল কোরআন ১-৩৩৫)।

আবার অনেকের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহারা বলেন, হযরত শোআ'য়েবের আবির্ভাব হযরত মূসার অনেক পূর্বে ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের নিকটবর্তীকালে কাছাছুল কোরআন ১-৩৩৫)।

এই মতামতদ্বয় সূত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, মূসা (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মিসর দেশে একটি হত্যাকান্ডের আসামী হইয়া মিসর ত্যাগ করত "মাদইয়ান" অঞ্চলে উপস্থিত হইবার পর যে বৃদ্ধের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সেই বৃদ্ধ হযরত মূসার শ্বশুর হইয়াছিলেন– সেই বৃদ্ধ হযরত শোআ'য়ব নহেন; অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মূসার বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআনে সেই লোকটির নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয় নাই। হাদীছ ভান্ডারেও কোন বিবরণ আসে নাই। পবিত্র কোরআনে তাঁহাকে শুধু شَيْخٌ كَبِيْرٌ "শায়খুন-কবীর" তথা অধিক বয়সের বৃদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট তফসীরকার ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর এই ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্টরূপে কিছু বলা হইতে বিরত থাকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি হ্যরত শোআ'য়ব (আঃ) ছিলেন। হাসান বসরী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ আলেমগণের মত এবং সাধারণ্যে প্রচলিত মত ইহাই যে, হযরত মূসার শ্বশুর ঐ বৃদ্ধ হযরত শোআয়েবই ছিলেন। এই সূত্রে ইহা অবধারিত যে, উভয়ের সময়কাল লাগালাগিই ছিল এবং হযরত শোআ'য়ব "মাদ্ইয়ান" ও "আইকাহ্"-বাসীদের নবী ছিলেন, আর হযরত মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হযরত শোআ'য়ব ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরই ছিলেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের তিন স্ত্রী ছিলেন। (১) ছারাহ্ (আঃ) যাঁহার গর্ভের ইসহাক (আঃ) ছিলেন এবং তাঁহারই পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আঃ), যাঁহার নাম "ইসরাঈল" ছিল। তাঁহার হইতে বনী ইসরাঈলের বংশধর। (২) হাজেরাহ (আঃ) যাঁহার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁহার বংশের মধ্যে একমাত্র নবী আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইয়াছেন, যাঁহার উপর নবুয়তের সেলসেলাহ শেষ হইয়াছে। (৩) "কতুরা" (আঃ) তাঁহার গর্ভে হযরত ইব্রাহীমের ছয় ছেলে ছিল। একজনের নাম ছিল "মাদ্ইয়ান"। তাঁহার বংশধর যে অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল উহার নাম তাঁহারই নামানুসারে "মাদ্ইয়ান" ছিল। সেই মাদ্ইয়ানের বংশেই হযরত শোআ'য়বের জন্ম। প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ মতামত অনুসারে হযরত শোআ'য়বের প্রপিতামহ ছিলেন "মাদইয়ান"। এই সূত্রে হযরত শোআ'য়বের নসব তিন জনের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে মিলিত হয়। (তফসীর হক্কানী, ৪-১৪৪ দ্রঃ)

ভৌগলিক বিবরণ

কম-বেশ ১২৫ মাইল দীর্ঘ আকাবা উপসাগরের পূর্বকূল এবং তৎসংলগ্ন লোহিত সাগরের উপকূলীয় অংশবিশেষসহ ফিলিস্তিন ও আরবের মধ্যবর্তী উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকাই "মাদইয়ান" অঞ্চল। উহার কেন্দ্রীয় শহরকে মাইদয়ান বলা হয়, যাহা লোহিত সাগর হইতে আকাবা উপসাগরের উপৎপত্তিস্থলের সন্নিকটস্থ এলাকায়ই অবস্থিত ছিল। হযরত শোআ'য়ব (আঃ) নিশ্চয়ই এই কেন্দ্রীয় শহর মাদইয়ানেরই বাসিন্দা ছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلاً ... .

"আপনার প্রভু কোন বস্তিকে ধ্বংস করেন নাই যাবত না উহার কেন্দ্রীয় শহরে রসূল পাঠাইয়াছেন, যিনি এলাকাবাসীকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন (এবং তাহারা উহা উপক্ষো করিয়াছে)।

(পারা ২০ রুকু ৯)

কাহারও মতে, মাদইয়ান এলাকার বিস্তার আরও উত্তরে জর্দানস্থিত মাআ'ন পর্যন্ত ছিল। সেমতে হযরত লূতের উম্মতের ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তি অঞ্চল- "মরু সাগর" এলাকার কাছাকাছি পর্যন্ত মাদইয়ানের বিস্তার ছিল।

পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে, وما قوم لوط منكم ببعيد হযরত শোআ'য়ব (আঃ) স্বীয় জাতিকে আল্লাহর আযাব ও গযব হইতে সতর্ককরণার্থে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "লূতের উম্মতগণ তোমাদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে"– তোমরা উহার অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ কর। অবশ্য হযরত শোআ'য়বের যুগও হযরত লূতের যুগের নিকটবর্তীই ছিল।

এই মাদ্ইয়ানবাসীদের প্রতি শোআ'য়ব (আঃ) রসূলরূপে প্রেরিত ছিলেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। কোন কোন আয়াতে হযরত শোআ'য়বকে "আইকাহ্'বাসীদের রসূলও বলা হইয়াছে। এ স্থলে ঐতিহাসিক ও তফসীরকারগণের মতভেদ হইয়াছে। এক মত এই যে, "মাদ্ইয়ান" ও "আইকাহ্" ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল; শোআ'য়ব (আঃ) উভয় অঞ্চলবাসীর প্রতি রসূল ছিলেন। অপর মত এই যে, মাদ্ইয়ান অঞ্চলকেই

"আইকাহ্" বলা হইত। "আইকাহ্" অর্থ বন বা জঙ্গল– যে স্থানে গাছ-পালা ও বৃক্ষাদির আধিক্য হয়। মাদ্ইয়ান অঞ্চলটি উপকূলবর্তী এলাকা হওয়ায় তথাকার মাটি আর্দ্রতাপূর্ণ ছিল এবং তথায় ঘন বন-জঙ্গল ছিল, এই সূত্রে ঐ মাদইয়ানকেই "আইকাহ্" বলা হইত।

মাদ্ইয়ানবাসীর অবস্থা

শেরেক ও মূর্তি পূজা তাহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শেরেক ও মূর্তি পূজার পর এই জঘন্যতম দুষ্কৃতিও তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল যে, লেন-দেনের মধ্যে মাপিয়া লইতে হেরফের করিয়া বেশী লইত এবং দিতে কম দিত। ইহা এক জঘন্যতম অপরাধ, এই অপরাধের পরিণাম অতি ভয়াবহ; যাহার সম্পর্কে আমাদের পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা রহিয়াছে–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ـ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ

"ভীষণ শাস্তি ও দুরবস্থার সম্মুখীন ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে আদায় করার সময় পুরাপুরা আদায় করে, অথচ লোকদিগকে পাত্র বা পাল্লা-বাটখারা দ্বারা মাপিয়া দিবার সময় তাহাদের প্রাপ্য হইতে কম দেয়।" এই অপরাধ মাদ্ইয়ানবাসী সমগ্র জাতির দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল; তদুপরি তাহারা রাহাজানি ও ডাকাতির অভ্যাসেও অভ্যস্ত ছিল। হযরত শোআ'য়ব (আঃ) তাহাদিগকে বহু রকমে বুঝাইলেন এবং সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা উল্টা হযরত শোআ'য়াবকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে তাহাদের পথের পথিক হইতে বলিল। অন্যথায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার হুমকি দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রোপাগান্ডাও আরম্ভ করিয়া দিল, ফলে তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করিলেন, তাহাদের উপর আল্লাহর গযব নামিয়া আসিল, অতপর সব ধ্বংস হইয়া গেল।

মাদ্ইয়ানবাসীর উপর আল্লাহর গযব

পবিত্র কোরআনে ঐ জাতির ধ্বংস সম্পর্কে বিভিন্ন আযাবের উল্লেখ আছে– (১) ভয়াবহ ভূচাল ভূ-কম্পন এবং (২) ভয়ানক গর্জন ও বিকট আওয়াজ। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আযাবের উল্লেখ রহিয়াছে– فاخذهم عذاب يوم الظلة "হযরত শোআ'য়বের বিদ্রোহীগণকে মেঘ-খন্ডের আযাব পাকড়াও করিল।" মেঘ-খন্ডের আযাবের বিবরণে বর্ণিত আছে– ঐ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে অস্বাভাবিক গরম ও উত্তাপ আবর্তিত হইল। সেই গরম ও উত্তাপে তাহারা ছুটাছুটি করিতেছিল, হঠাৎ প্রত্যেক এলাকায় এক একটি মেঘ-খন্ডের আবির্ভাব হয় এবং উহা হইতে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সমস্ত লোক ঐ মেঘ খন্ডের নীচে জমায়েত হয়। তৎক্ষণাৎ উহা হইতে প্রবল বেগে অগ্নি বর্ষিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে কাফেরগোষ্ঠী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই-ভস্ম হইয়া গেল।

পবিত্র কোরআনে যে স্থানে উপরোক্ত আযাবের উল্লেখ আছে তথায় হযরত শোআ'য়বের বিদ্রোহীগণকে اصحاب الايكة বন-জঙ্গলবাসী" বলা হইয়াছে। اصحاب مدين মাদইয়ানবাসী আর اصحاب ايكة আইকাহ্ বা বনবাসী দুইটি জাতির নাম, না এক জাতির নাম এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ বর্ণিত হইয়াছে। দুই জাতি হইলে মাদ্য়নবাসীদের উপর প্রথমোক্ত দুই প্রকারের আযাব আসিয়াছিল, আর তৃতীয় আযাব আসিয়াছিল আইকা্বাসীদের উপর। উভয় নামে একই জাতি হইলে তিন প্রকারের আযাব তাহাদের উপরে এইরূপে আসিয়াছিল যে, প্রথমে ভয়ানক ভূকম্পন ও ভীষণ তর্জন-গর্জন দ্বারা তাহাদের মধ্যে

ত্রাসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ভীষণ উত্তাপের দরুন বাড়ী-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় মেঘখন্ড আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবর্ষণ করে এবং নিজেদের দেশ-খেশের মধ্যে থাকাবস্থায়ই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

তলদেশ হইতে ভূকম্পন আর উর্ধ্বদেশ হইতে বিকট আওয়াজ ও গর্জন ও এবং অগ্নিবর্ষণ- এই সবের মধ্যে কাফের ও আল্লাহ-রসূলের বিদ্রোহীগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পর দিন মনে হইতেছিল– এই দেশে যেন কোন বসবাসকারীর অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত লোকদের পরিণাম এইরূপই হয়। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় ঐ জাতির ইতিহাস–

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ـ وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

অর্থ ঃ মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাহাদের বংশধর এক ভাই– শোআ'য়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে আহবান জানাইয়াছিলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই; এই দাবীর উপর উজ্জ্বল প্রমাণ আমার মারফত তোমাদের নিকট পৌছিয়াছে, সে মতে তোমরা (আল্লাহর আদেশ পালন পূর্বক) দেয়ার সময় মাপে ও ওজনে পুরাপুরি দিও; আর লোকদের তাহাদের প্রাপ্য কম দিও না এবং দেশে শান্তির পর (আল্লাহদ্রোহিতা এবং ঠকাঠকি ও চুরি-ডাকাতির দ্বারা) অশান্তি সৃষ্টি করিও না। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর রাস্তা-ঘাটে বসিয়া ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীতি প্রদর্শন করিও না এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করিও না, উহার মধ্যে বক্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিও না। আর এই বিশেষ নেয়ামত স্মরণ কর যে, তোমরা সংখ্যায় নগণ্য ছিলে, তিনি তোমাদিগকে সংখ্যাগুরু করিয়াছেন। আর তোমরা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় চোখ দিয়া দেখ, নাফরমান ফাসাদকারীদের পরিণাম কি হইয়াছে !

وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ـ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ـ

এত বুঝান সত্বেও যদি তোমাদের শুধু একদল ঈমান আনিয়াছে অপর দল ঈমান আনে নাই, তবে (তাহাদের আল্লাহই যাহা করেন করিবেন;) তোমরা ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা কর– যাবত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে তথা ঈমান গ্রহণকারী ও বর্জনকারীদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন, তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ـ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ ـ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ـ وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ـ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ـ

সর্দার শ্রেণীর লোকগণ হুমকি দিল যে, হে শোআ'য়ব! তোমার সমস্ত দলবলসহ যদি আমাদের পথের পথিক না হইয়া যাও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সকলকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, তোমাদের পথ আমাদের নজরে অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য, তবুও কি তোমরা আশা কর আমরা তাহা গ্রহণ করিব? আল্লাহ আমাদিগকে তোমাদের পথ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এর পরও যদি আমরা সেই পথের পথিক হই, তবে আমরাও (তোমাদের ন্যায়) আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা মতবাদ পোষণকারী সাব্যস্ত হইব। আমাদের সম্পর্কে এই সম্ভাবনা মোটেই নাই যে, আমরা তোমাদের পথের পথিক হইব। অবশ্য যদি আমাদের মালিক আল্লাহ তাহা চাহেন, (কিন্তু আল্লাহ ঐরূপ চাহেন না। কারণ) আমাদের প্রভু আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে অবহিত। আমরা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করিলাম। প্রভু হে! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে শেষ ফয়সালা করিয়া দাও, তুমিই উত্তম ফয়সালাকারী।

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ـ

কাফের সর্দাররা ইহাও প্রচার করিল যে, হে দেশবাসী! যদি তোমরা শোআ'য়বের অনুসরণ কর তবে তোমরা ভয়ানক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ـ

পরিণামে প্রচন্ড ভূ-কম্পন তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে (বা নিজ দেশেই) উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল; সারাদেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল– যেন তথায় ঐ দেশবাসীর বসবাসই ছিল না। যাহারা শোআ'য়বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল তাহারা ভীষণ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ـ

অতপর হযরত শোআ'য়ব ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলেন, তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না এবং অনুতাপ আক্ষেপে বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদিগকে পরওয়ারদেগারের সমুদয় বিষয়াবলী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই; এখন তোমাদের ন্যায় কাফেরদের ব্যাপারে আক্ষেপ অনুতাপ কিরূপে আসিতে পারে?

(৮ পারার শেষের ৯ পারা আরম্ভ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মাদ্ইয়ান ও আইকাহ্বাসী কাফেরদের উপর আল্লাহর গযব আসিয়াছিল, কিন্তু মোমেনগণ অক্ষত রহিয়াছিল। কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার পর হযরত শোআ'য়ব (আঃ) ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে হযরত শোআ'য়ব অবশিষ্ট মোমেনগণকে লইয়া "আদন" হইতে পূর্বে অবস্থিত আরব সাগরের উত্তর উপকূলে "হায্রামাউত" অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এমনকি বর্তমানেও তদঞ্চলে শোআ'য়বের কবর নামে একটি কবর বিদ্যমান আছে। (কাছাছুল কোরআন)

"রুহুল মাআনী" তফসীরে আছে– হযরত শোআ'য়ব মোমেনগণকে লইয়া মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবরও তথায়ই অবিস্থত।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ـ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ . بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ .

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই এক ভ্রাতা শোআয়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব কর: তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। আর মাজে ওজনে কম দিওনা; তোমরা স্বচ্ছলতার মধ্যে আছ, তোমাদিগকে ভাল অবস্থায়ই দেখিতেছি: (অন্যকে ঠকাইবার প্রয়োজন হয় না। ঐ অভ্যাস ত্যাগ না করিলে) আমি তোমাদের উপর সর্বগ্রাসী আযাবের আশঙ্কা করিতেছি। হে আমার জাতি! লোকদিগকে মাপে-ওজনে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দিও; (চুরি ডাকাতি, ঠগবাজি ইত্যাদি দ্বারা) দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। এই সব অবৈধ উপায় ত্যাগ করতঃ হক হালালীরূপে আল্লাহর দান যাহা কিছু থাকে তাহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম; তোমরা যদি বিশ্বাস কর তবে আমার কথা গ্রহণ কর (সত্য পথ দেখাইলাম- ইহাই আমার দায়িত্ব)। আমি তোমাদের উপর চৌকিদার নহি।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِى اَمْوَالِنَا مَانَشَؤُ . اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ .

তদুত্তরে তাহারা বলিল, হে শোআ'য়ব! মনে হয় তোমার নামায-রোজা তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পূজনীয় দেব-দেবীকে ছাড়িয়া দেই এবং আমরা নিজেদের ধন-সম্পত্তির মধ্যে নিজেদের ইচ্ছানুসারে তছরুপ না করি। তুমি যেন একটা জ্ঞান বুদ্ধির বক্তা।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا . وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ . اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللهِ . عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ .

শেআ'য়ব্ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি- আমি (আমার দাবীতে) যদি আমার প্রভু হইতে প্রাপ্ত দলিল প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তাঁহার হইতে এক বিশেষ সম্পদ (তথা নবুয়ত) প্রাপ্ত হইয়া থাকি (এমতাবস্থায় আমি উহার প্রচার না করিয়া পারি কি? উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম তোমাদের কি হইবে)? আর আমি তোমাদের যাহা নিষেধ করি নিজেও আমি উহার বিপরীত করি না। আমি যথাসাধ্য সংশোধন ও শান্তি আনয়নেরই চেষ্টা করি এবং সব কিছুর সামর্থ আল্লাহর তরফ হইতেই পাই। তাঁহারই উপর আমার ভরসা ও তাঁহার প্রতিই আমি রুজু হই।

وَيٰقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ . وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ . وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ . اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ .

হে আমার জাতি! আমার প্রতি শত্রুতায় তোমরা এমন কোন অপরাধ করিও না, যাহার ফলে তোমাদের উপর ঐ প্রকারের আযাব আসিয়া পড়ে যেরূপ আযাব নূহের জাতি, হুদের জাতি এবং সালেহ্-এর জাতির উপর পড়িয়াছিল; আর লূত-জাতির দেশ বা কাল ত তোমাদের হইতে অধিক দূরে নহে (তাহাদের অবস্থা তোমাদের চোখের সম্মুখেই রহিয়াছে)। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে (পূর্বকৃত অপরাধ সমূহের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর (আগামীতে) একমাত্র সেই প্রভুর প্রতিই ধাবিত হও; নিশ্চয় আমার (ও তোমাদের সেই) প্রভু অতি দয়ালু ও স্নেহবান।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ـ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ـ

তাহারা বলিল, হে শোআ'য়ব তোমার অনেক কথাই যুক্তিহীন– আমাদের বুঝে আসে না। আর তুমি ত আমাদের মধ্যে দুর্বল হিসেবেই বিবেচিত, তোমার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি (আমাদেরই দলভুক্ত); তাহাদের খাতিরদারীর খেয়াল না হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিতাম; আর আমাদের উপর তো তোমার কোনই প্রভাব নাই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ ـ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ـ اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ـ

শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমার গোষ্ঠী-জ্ঞাতি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের? (তোমরা গোষ্ঠী-জ্ঞাতির সম্ভ্রম কর,) অথচ মহান আল্লাহকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ! নিশ্চয়ই আমার প্রভু তোমাদের সমস্ত কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ـ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইতে থাক, আমি আমার অবস্থার উপর কাজ করিয়া যাইব। সত্বরই জানিতে পারিবে অপদস্থকারী আযাব কাহার উপর পতিত হয় এবং কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর আমিও অপেক্ষায় আছি।

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ـ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ـ

যখন (ঐ বিদ্রোহীদের ধ্বংস সম্পর্কে আমার আদেশ উপস্থিত হইল তখন আমি শোআ'য়ব ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার বিশেষ রহমতে বাঁচাইয়া নিলাম। আর স্বৈরাচারীদের পাকড়াও করিল এক বিকট গর্জন; ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল এবং দেশ-খেশের মধ্যেই নিজ নিজ বাড়ীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল (কেউ কাহারও সাহায্য করিতে পারিল না। তাহারা ধ্বংস হইয়া সারাদেশ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল); যেন এই দেশে তাহাদের বসবাসই ছিল না। হে বিশ্ববাসী! দেখ– মাদ্‌ইয়ানবাসীও তদ্রূপ ধ্বংস হইয়া গেল যেরূপভাবে ছামুদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল। (সূরা হুদ পারা ১২ রুকু ৮)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

আর আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদেরই জ্ঞাতি শোআ'য়বকে রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং পরকালের ভয় রাখিয়া চল, দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ

মাদ্‌ইয়ানবাসী শোআ'য়বকে অমান্য করিল; ফলে ভয়াবহ ভূ-কম্পন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, পরিণামে তাহারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে উপুড় হইয়া মরিয়া রহিল। (পারা ২০ রুকু ১৬)

كَذَّبَ اَصْحَابُ الْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ - اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ - وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ - وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ - وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ - وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ - قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ - وَمَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ - فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

"আইকাহ্" (অরণ্য) বাসী সমস্ত রসূলগণের আদর্শ অমান্য করিয়াছিল; যখন শোআ'য়ব (আঃ) তাহাদের বলিয়াছিলেন, তোমরা ভয় ও সতর্কতা অবলম্বন কর না কেন? আমি তোমাদের জন্য সত্যবাদী রসূল রূপে আসিয়াছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল এবং আমার অনুসরণ কর। আর এই তবলীগ কার্যের কোন প্রকার প্রতিদান আমি তোমাদের নিকট চাহি না, আমার প্রতিদান তো একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট রহিয়াছে।

তোমরা মাপে-ওজনে পুরাপুরি দিও কম দিও না; শুদ্ধ ও সঠিক মাপযন্ত্রের দ্বারা মাপিও, লোকদিগকে কম দিও না তাহাদের প্রাপ্য হক। আর দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। আর অন্তরে ভয় রাখিয়া চল ঐ প্রভু-পরওয়ারদেগারের, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদেরকে। তাহারা বলিল, নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্ত (হইয়া এই সব বলিতেছ)। তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ (রসূল হওয়ার দাবী সম্পর্কে) আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। আমাদের এইসব ধারণা যদি অবাস্তব হয় এবং বস্তুতঃ তুমিই সত্যবাদী হও, তবে আকাশ ভাঙ্গিয়া উহার বড় বড় খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।

قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

শোআ'য়ব (আঃ) বলিলেন, (আযাবের ক্ষমতাবান) আমার প্রভু-পরওয়াদেগার ভালরূপ জ্ঞাত আছেন যাহা কিছু তোমরা করিতেছ (তাঁহার নির্ধারণ অনুযায়ী আযাব আসিবেই)। তাহারা শোআ'য়বকে অমান্য করিল; ফলে মেঘখন্ডের ঘটনার আযাব তাহাদেরকে পাকড়াও করিল, নিশ্চয় উহা ছিল এক ভীষণ ও ভয়াবহ দিনের আযাব।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

নিশ্চয়ই এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ রহিয়াছে। (তাহাদের উপর এই জন্যই আযাব আসিয়াছিল যে,) তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য ছিল। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু সর্ব ক্ষমতার অধিকারী; (তাঁহার কার্যে বাধার সৃষ্টি করা যায় না) এবং অত্যন্ত দয়ালু (তাই কোন সময় আযাব বিলম্বে আসে বা ইহজগতে আযাব আসেও না)।

হযরত ইউনুস (আঃ)

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের বংশ পরিচয়ের কোন তথ্য ইতিহাস ভান্ডারে নাই। এ সম্পর্কে শুধু দুইটি কথাই পাওয়া যায়– (১) বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত ইউনুসের পিতার নাম "মাত্তা" ছিল। (২) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) বনী ইসরাঈল বংশীয় নবী ছিলেন।

হযরত ইউনুসের সময় কাল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী দৃষ্টে মনে হয়– হযরত ইউনুসের আবির্ভাবকাল খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ছিল। (কাছাছুল কোরআন ২০২)

কোন কোন ইতিহাস বিশারদ তফসীরকার বিভিন্ন তথ্য-দৃষ্টে মন্তব্য করিয়াছেন– হযরত ইউনুসের আবির্ভাব খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ছিল।

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল "মাওসেল" (বর্তমান তৈল সমৃদ্ধ "মুসল" নামীয় এলাকা) এই অঞ্চলে "দিজলা" (তাইগ্রীস) নদের তীরবর্তী তৎকালীন রাজধানী, সুপ্রসিদ্ধ শহর "নিনওয়া" অঞ্চলের নবী ছিলেন হযরত ইউনুস (আঃ)।

হযরত ইউনুসের একটি বিশেষ ঘটনা পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। উহার বিবরণ এই যে, এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের আবাদী অঞ্চল "নিনওয়া" এলাকার নবী হইয়া হযরত ইউনুস (আঃ) তথাকার অধিবাসীগণকে তাহাদের চিরাচরিত শেরেক– মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা ত্যাগ করার এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানাইলেন। দীর্ঘ সাত বৎসরকাল তাহাদিগকে তবলীগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আহবানে দেশবাসী মোটেই কর্ণপাত করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর গযব ও আযাবের সতর্কবাণী শুনাইলেন, কারণ আল্লাহর দ্বীনের ও আল্লাহর নবীর সঙ্গে বিদ্রোহ করিলে পরিণামে আল্লাহর আযাব আসিয়া থাকে। ইউনুস (আঃ) নিনওয়াবাসীকে শত রকমে বুঝাইলেন, ভয় দেখাইলেন, সতর্ক করিলেন, কিন্তু আযাব আসিতে বিলম্ব হইল, তাই তাহারা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া "নিনওয়া" ত্যাগ কল্পে তথা হইতে অন্যত্র যাত্রা করিলেন।

এ স্থলেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর একটু ভুল হইয়া গেল একজন নবীর পক্ষে এক দেশ ত্যাগ করতঃ অন্য দেশে চলিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ যেই দেশে তবলীগ করার সেই জন্য নবী আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে আদিষ্ট হন, সেই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া নবীর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সঙ্গত হয় না, যাবত না আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে স্পষ্ট অনুমতি লাভ করিয়া নেন। ইহা একটি বাস্তব নিয়ম এবং সব নবীগণই এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন।

আমাদের হযরত রসূলে করীম (সঃ) দীর্ঘ তের বৎসরকাল মক্কা নগরীতে অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত অবস্থায় দিন কাটাইলেন। এমনকি ছাহাবীগণকে হিজরত তথা মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন, পরে মুসলমানদের হিজরত স্থলরূপে খেজুর গাছের দেশ স্বপ্নে দেখিয়া তাহাদিগকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতিও দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে মক্কা হইতে হিজরত করেন নাই। এমনকি এ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, আমি পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে এখনও মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি পাই নাই, তবে (অবস্থাদৃষ্টে) আশা করি অনুমতি আসিয়া যাইবে। এই প্রতীক্ষায় তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে হিজরত হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আবু বকর এই উদ্দেশে বিশেষ দুইটি উট যত্নের সহিত পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন আকস্মিকরূপে উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে হযরত

(সঃ) আবু বকরের গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে প্রকাশ করিলেন যে, মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় চলিয়া যাওয়া সম্পর্কে পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে আমার জন্য অনুমতি আসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা ত্যাগপূর্বক মদীনাপানে হিজরত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য নবীগণের ইতিহাসেও এই রীতিই পরিলক্ষিত হয়। হযরত লূত (আঃ) তাঁহার দেশবাসীর দ্বারা কতই না নির্যাতিত হইতেছিলেন! কিন্তু আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট আদেশ না আসা পর্যন্ত ঐ দেশ ত্যাগ করেন নাই।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এখানেই ভুল হইল যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া ঐ দেশ ত্যাগ করিবার উদ্দেশে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হযরত ইউনুসের কার্যের সপক্ষে যুক্তির অভাব ছিল না। কারণ, দীর্ঘ সাত বৎসরের তবলীগেও তাহাদের মধ্যে কোনই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই এবং তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞপ্তি অনুসারেও তাহাদের উপর আযাব অত্যাসন্ন হইয়াছিল। এমনকি আযাব আসিয়া পড়ার অবকাশস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই যে, তিন দিন নির্ধারিত করা হইয়াছিল সেই তিন দিনের পূর্ণ দুই দিন গত হইয়া তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্র আসিয়া গিয়াছিল, তবুও দেশবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তনই আসে নাই। এমতাবস্থায় ঐ অঞ্চলে অবস্থান করার কোন সুফল বা কার্যকারিতা দেখা যাইতেছিল না। এইসব ভাবিয়াই হয়ত হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ দেশ ত্যাগে অন্যত্র রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং ইহা যুক্তিযুক্তই মনে হয়। কিন্তু নবীগণের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন পর্যায়ের থাকে, যাহা সাধারণ সম্পর্কের অনেক ঊর্ধ্বে নবীগণের উপর অতি সূক্ষ্ম বিষয়কেও যাচাই-বাছাই করা কর্তব্য হয়, তাঁহাদিগকে চুলচেরা পদ্ধতিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

بود ادم دیدہ نور قدیم # موئے در دیدہ بود کوہ عظیم ۔

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে নবীগণের মর্যাদা মানব দেহের চোখ তুল্য; চোখের মধ্যে অতি সামান্য একটি লোম বা বালুকণাও পাহাড় সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। তদ্রূপ নবীগণের মামুলী ত্রুটিও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় বিবেচিত হয়– যে, এত বড় মর্যাদার অধিকারী হইয়া এতটুকু ত্রুটিই বা কেন করা হইল?

এই দৃষ্টিতেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আঃ)-কে তাঁহার উক্ত ত্রুটির জন্য গেরেফত করিলেন– তাঁহাকে ভুলের মাসুলদানে পতিত করিলেন।

রাত্রিকালে ইউনুস (আঃ) "নিনওয়া" হইতে বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। নিনওয়ার অনতিদূরেই দিজলা– তাইগ্রীস নদী (মানচিত্রের বিবরণে পূর্বেই বলা হইয়াছে, "নিনওয়া" দিজলা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত)। ইউনুস (আঃ) নদী পার হওয়ার জন্য অন্যান্য লোকের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিলেন।*

নৌকাটি তীর হইতে দূরে আসার পরই উহা ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। নৌকাটি যেরূপে আকস্মিক বিপদে পতিত হইল, তাহাতে ঐ দেশীয় লোকদের সাধারণ রেওয়াজ অনুসারে নৌকার মাঝি বলিল, আরোহীদের মধ্যে কোন একজন পলাতক গোলাম আছে; যে স্বীয় মনিবের অনুমতি ছাড়া পালাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সেই গোলামকে নৌকা হইতে ফেলিয়া না দিলে নৌকা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; অচিরেই নৌকা ডুবিয়া সকল আরোহীই ধ্বংস হইবে।

---

* ইউনুস আলাইহিস সালামের উল্লিখিত বিবৃত নৌকার ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে তওরাতে ভূমধ্যসাগরের নাম উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআনে বা হাদীছে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই। অবশ্য তফসীরকারগণের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ তফসীর রুহুল মাআ'নী ২৩-১৪৫ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঘটনাস্থল দিজলা– তাইগ্রীস নদী ছিল। ১২৭০ হিঃ সনে মৃত তথা মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্বের এই তফসীরকার শেখ মুহাম্মদ আলুসী বাগদাদী তথায় ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমি নিজে দিজলা নদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিরাট আকারের মাছ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" বর্তমানের দিজলা নদ তখন অনেক বড় ছিল। ইউনুস (আঃ)-এর যুগে কত বড় ছিল এবং তাহাতে কত বড় বড় মাছ ছিল তাহা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

এই মতামতটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ ভূগোল ও মানচিত্র দৃষ্টে দেখা যায়, নিনওয়া শহর দিজলা নদের তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল, উহা ভূমধ্য সাগরের ধারে-কাছেও নহে।

একজন বিশিষ্ট আলেমের লিখিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ফোরাত নদীর নাম দেখা গেল এবং তিনি উল্লিখিত তফসীর রুহুল মাআ'নীরই বরাত দিয়াছেন। আমরা তফসীর রুহুল মাআ'নীকে বিশেষরূপে বার বার দেখিলাম, কিন্তু তথায় "ফোরাত" শব্দই নাই, বরং একাধিকবার দিজলা নদেরই নাম রহিয়াছে; মনে হয় উহা ছাপার ভুল।

অধুনা এই শ্রেণীর বিষয়াবলীর বিশেষ গবেষক একজন প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারও দিজলা নদের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইউনুস (আঃ) ঘটনার সূচনা ও মর্ম বুঝিয়া ফেলিলেন। ঘটনার বিবরণ দানকারী কোন কোন বর্ণনাকারের মতে মাল্লাদের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং হযরত ইউনুসই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সেই পলাতক গোলাম আমিই, অতএব আমাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দাও। উপস্থিত লোকগণ মূল ঘটনা অবগত ছিল না; তাহারা হযরত ইউনুসের ন্যায় এমন একজন সুধী মানুষকে নদীতে ফেলিবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। যাই হউক–

অবশেষে ব্যালট প্রথায় অপরাধীর নাম বাহির করার ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে হযরত ইউনুসের নামই প্রকাশ পাইল। এমনকি তিন বার ঐ ব্যবস্থা করা হইল; প্রত্যেক বারই হযরত ইউনুসের নামই আসিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া সকলে তাঁহাকেই দরিয়ায় ফেলিয়া দিল। উপস্থিত একটি বিরাট মাছ তাঁহাকে আস্ত গিলিয়া ফেলিল।

আল্লাহ তাআলার কুদরত অসীম শিশু সন্তান মায়ের পেটে জরায়ুর ভিতর ঝিল্লি বা পর্দার আবরণের মধ্যে জীবিত থাকে– শুধু এক দুই দিন নহে, কয়েক মাস জীবিত থাকে; তদ্রূপ ইউনুস (আঃ) ঐ মাছের পেটে জীবিত ও অক্ষত রহিলেন।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটের ভিতর নিজেকে জীবিত পাইয়াই আরম্ভ করিলেন আল্লাহ তয়ালার দরবারে কান্না-কাটি, আবেদন-নিবেদন, তওবা-এস্তেগফার, স্বীয় ত্রুটির উপর অনুতাপ-অনুশোচনা। তাঁহার বিশেষ জপনা ছিল– لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে খোদা! একমাত্র আপনিই আমার প্রভু, আপনিই আমার মা'বুদ ও মকসুদ-মতলুব; আপনি ছাড়া কেহ মা'বুদ ও মকসুদ-মতলুব হইতে পারে না। আপনি পাক-পবিত্র (আপনার কোন কার্যে দোষ-ত্রুটির লেশমাত্র থাকিতে পারে না;) বস্তুতঃ আমিই অপরাধী (আপনি আমাকে ক্ষমা করুন)।"

তফসীরকারগণের কাহারও মতে তিন দিন কাহারও মতে দীর্ঘ চল্লিশ দিন মাছের পেটের ভিতর তওবা-এস্তেগফারের মধ্যে অতিবাহিত হইল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুসের ত্রুটি মার্জনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপদ মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহর আদেশে ঐ মাছটি কোন এক চরের মধ্যে বমি করিয়া হযরত ইউনুসকে ফেলিয়া গেল। আলো-বাতাসবিহীন আবদ্ধ স্থানে থাকিয়া তাঁহার শরীর নবজাত শিশুর শরীরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি এক বালুচরে পতিত হইলেন– যেখানে পানাহারের কোন বস্তু ছিল না, এমনকি সূর্যের উত্তাপ হইতে ছায়া লাভেরও কোন উপায়-উপকরণ তথায় মোটেই ছিল না।

আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে তথায় কদু-কুমড়া গাছের ন্যায় বড় বড় পাতার একটি উচু বৃক্ষ জন্মিল। ইউনুস (আঃ) ঐ গাছের বড় বড় পাতার ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন এবং উহার ফল দ্বারা তাঁহার পানাহারের আবশ্যক পূরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার শরীর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

নিনওয়াবাসীদের অবস্থা

হযরত ইউনুস (আঃ) রাত্রিকালে নিনওয়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন; পর দিন ভোরবেলা হইতেই আল্লাহ তা'আলার গযব ও আযাবের ঘনঘটা ও নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী হযরত ইউনুসের সতর্কবাণী স্মরণ করিল, এবং তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার তালাশে ছুটাছুটি করিল, কিন্তু তাঁহাকে পায় কোথায়? তিনি ত শহর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইউনুসকে না পাইয়া দেশবাসী অধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল এবং সকলে সমবেতভাবে বাড়ী-ঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগপূর্বক ময়দানে একত্রিত হইয়া পরওয়ারদেগারের দরবারে চীৎকার করিয়া কান্না-কাটি করিতে লাগিল। এমনকি পশুপালগুলিকে ঘাস-পানিবিহীন রাখিয়া এবং শিশু সন্তানগুলিকে মায়ের বুক হইতে পৃথক করিয়া রাখিল। একদিকে সেই সব নিষ্পাপদের চীৎকার, অপর দিকে অপরাধীদের

তওবা-এস্তেগফারের চীৎকার; ফলে তৎক্ষণাত করুণাময় আল্লাহ তাআলার রহমত তাহাদের প্রতি নাযিল হইল এবং অত্যাসন্ন গযব ও আযাব তাহাদের উপর হইতে হটিয়া গেল। আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা হইতে তওবা-এস্তেগফারের উপর খাঁটি এবং পরিপক্করূপে পদস্থিতি হাসিল করায় তাহারা আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট করুণার পাত্র হইয়া গেল।

একদিকে নিনওয়াবাসী সৎপথাবলম্বী হইয়া আল্লাহ তা'আলার করুণার পাত্র হইল, অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) ত্রুটি মার্জিত অবস্থায় বালুচরের মধ্যে বল-শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনঃ ফিরিয়া পাইলেন। আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে নিনওয়া শহরে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করিলেন। তিনি তথায় ফিরিয়া আসিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অভ্যর্থনা করিল এবং পূর্ণ আনুগত্যের সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। হযরত ইউনুস (আঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ শহরবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিয়া তথায়ই ইহকাল ত্যাগ করিলেন। বাগদাদ শহর এলাকায়ই এখনও তাঁহার সমাধিস্থল বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা যিয়ারতের সৌভাগ্য নরাধমের হইয়াছে। মূল ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ـ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ـ فَلَوْلاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ـ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ـ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ـ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ـ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ـ

নিশ্চয় ইউনুস রসূলরূপে প্রেরিতগণের দলভুক্ত ছিলেন। তখনকার ঘটনা একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন ইউনুস (তাঁহার নিযুক্তি স্থান বিনানুমতিতে ত্যাগ করতঃ পথ অতিক্রম করাকালে) একটি বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছিলেন, অতপর লটারি ব্যবস্থায় শরীক হইলেন; ফলে তিনি-ই অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন এবং একটি মাছ তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন তিনি অনুতপ্ত ছিলেন। যদি তিনি সেই অবস্থায় তসবীহ– আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা জপনে লিপ্ত না হইতেন, তবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁহাকে মাছের পেটেই থাকিতে হইত। তারপর আমি তাঁহাকে (মাছের পেট হইতে) একটা চিজ বস্তুহীন উন্মুক্ত বালুচরে ফেলিয়া দিলাম, তিনি তখন স্বাস্থ্যহীনতায় রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। আর আমি (তাঁহার ছায়া ও পানাহারের উদ্দেশে) গুল্মজাতীয় একটি গাছ সৃষ্টি করিয়া দিলাম এবং তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করিলাম এক লক্ষ, বরং তারও অধিক লোকের (আবাদী স্থান নিনওয়া শহরের) প্রতি। সেই দেশীয় লোকগণ পূর্ণ ঈমান আনিল, ফলে আমি তখনকার আযাবে তাহাদিকে ধ্বংস না করিয়া একটি সময়কাল (জীবনের দিনগুলি) পর্যন্ত ইহকালের সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম। (পারা–২৩, রুকু–৯)

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ـ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

মাছের ঘটনায় পতিত নবীর কথা স্মরণ কর– যখন তিনি (তাঁহার নিয়োগস্থলের লোকদের প্রতি) রাগ করিয়া (আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তথা হইতে) চলিয়া গেলেন তাঁহার ধারণা ছিল যে (এতটুকু ত্রুটির জন্য) আমি তাঁহার উপর কড়াকড়ি করিব না– (তাঁহাকে অভিযুক্ত করিব না, কিন্তু ঘটনা তাঁহার ধারণার বিপরীত হইল– আমি তাঁহাকে ঐ ত্রুটির জন্য অভিযুক্ত করিলাম। তিনি মাছের ঘটনায় পতিত হইলেন)। অতপর তিনি (রাত্রের অন্ধকার, নদীগর্ভের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার– এই তিন) অন্ধকারে থাকিয়া জপনা করিলেন, হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ, মাকসুদ ও মাতলুব নাই; তুমি পাক-পবিত্র (বিনা অপরাধে তুমি শাস্তি দিও না)। বস্তুতঃ আমি অপরাধীদের দলভুক্ত হইয়াছিলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

এই জপনার ফলে আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাহাকে যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে মুক্তি দিলাম। আমি আমার খাঁটি অনুগতগণকে এইরূপেই বিপদমুক্ত করিয়া থাকি।

(সূরা আম্বিয়া রুকু–৬ পারা– ১৭)

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا الاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ ـ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ـ

যত দেশ আল্লাহর গযবে পতিত হইয়াছে কোন দেশই এমন পরিস্থিতিতে ঈমান আনিয়াছিল না যে, তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকার করিতে পারে; হাঁ– ইউনুসের জাতির ঘটনা এই ছিল যে, (আযাব আসিয়া যাওয়ার পূর্বক্ষণে আযাবের লক্ষণ দেখিয়াই) যখন তাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়া নিল তখন অপদস্থকারী আযাব তাহাদের হইতে আমি হটাইয়া দিলাম; এবং তাহাদিগকে ইহজীবনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগের সুযোগ দিলাম (আখেরাতে তাহাদের পরবর্তী অবস্থার হিসাব অনুসারে ব্যবস্থা করা হইবে)।

(রুকু– ১১, পারা– ১৫)

اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ـ لَوْلاَ اَنْ تَدٰرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ـ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

ইউনুস ভীষণ চিন্তামগ্ন অবস্থায় প্রভুকে ডাকিলেন। যদি তাঁহার প্রভুর বিশেষ করুণা তাঁহার সাহায্য না করিত তবে তিনি বালু চরেই দুরবস্থায় পতিত হইয়া থাকিতেন। (কিন্তু তওবা এস্তেগফারের ফলে) তাঁহার প্রভূ তাঁহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিলেন এবং তাঁহাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণদের শ্রেণীভুক্তরূপেই বহাল রাখিলেন।

(পারা– ২৯ রুকু– ৪)

হযরত ইউনুসের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়

এই ইতিহাসে দুইটি উত্তম শিক্ষা আছে। প্রথম এই যে, তওবা-এস্তেগফার তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন দ্বারা দুর্যোগ-দুর্ভোগ, আপদ-বিপদ ও আল্লাহর গযব সহজে দূর হয়; যেরূপ নিনওয়াবাসীদের হইয়াছিল।

দ্বিতীয় এই যে, যত মর্যাদাবান মানুষই হউক না কেন তাহাকে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণানুগত্যের সহিত চলিতেই হইবে। এই ব্যাপারে ত্রুটি বিপদ টানিয়া আনিবে; ইহাতে কাহারও ব্যক্তিত্ব বা কোন সম্বন্ধ ব্যতিক্রমের ছিদ্র পথ সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং যে যত বেশী নৈকট্যলাভকারী হইবে তাহার পক্ষে তত বেশী আশঙ্কার কারণ থাকিবে। হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর– নিষ্পাপ ছিলেন, তবুও তাঁহার সামান্য ত্রুটি– যাহা গোনাহ পর্যায়ের ছিল না– শুধু ত্রুটি পর্যায়ের ছিল, উহার উপর কত বড় ঘটনা ঘটিয়া গেল!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। পয়গম্বরের মর্তবা অনেক বড়, তাই তাঁহার সামান্যতম ত্রুটি আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনেক বড় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনে হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ঐ ধরনেরই কোন কোন বাক্য ও শব্দ আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন– ২৯ পারার ৪র্থ রুকুর আয়াতে আছে– ولا تكن كصاحب الحوت "আপনি মাছের ঘটনায় পতিত নবীর মত করিবেন না।" রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সতর্ক করতঃ ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতিই আল্লাহ তাআলা এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং কোন স্বল্প

জ্ঞান ও স্বল্প বুদ্ধির মানুষই ইউনুস আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদার বিপরীত কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে। অথচ ঐরূপ ধারণা ঈমান ধ্বংসকারী,* তাই রসূল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তুলনামূলকভাবে হযরত ইউনুসের উচ্চ মর্যাদাহানিকররূপে আমাকে উচ্চ শ্রেণীর এবং হযরত ইউনুসকে নিম্ন শ্রেণীর বলা হইলে বা ঐরূপ ধারণা করা হইলে তাহাও মস্ত বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধরনের তুলনামূলক তারতম্য কখনও করা যাইবে না। নিম্নের হাদীছে এই বিষয়টিকেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন–

১৬৬৪। হাদীছ ঃ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اِنِّىْ خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার! তোমাদের কেহ যেন আমাকে উল্লেখ করিয়াও এইরূপ না বলে, আমি উচ্চ শ্রেণীর আর মাত্তার পুত্র ইউনুস নিম্ন শ্রেণীর।

ব্যাখ্যা ঃ তুলনামূলকভাবে এইরূপ উক্তি ইউনুস আলাইহিস সালামের মর্যাদাহানিকর হইবে, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন; নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে নবী ও রসূলগণের মর্তবায় তারতম্য আছে; আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

"আমি রসূলগণের মধ্যে পরস্পর ফযিলত মর্তবার তারতম্য রাখিয়াছি।"

তাই বলিয়া কোন নবীর মর্যাদাহানিকর তুলনা ও উক্তি কখনও জায়েয হইবে না।

হযরত দাঊদ (আঃ)

হযরত দাউদের সময়কাল ও স্থান

বনী ইসরাঈলগণ সীনাই উপত্যকাস্থিত তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর আবদ্ধ থাকাকালেই হযরত মূসা ও হযরত হারুনের ইন্তেকাল হইয়া যায়। তারপর হযরত মূসার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হযরত ইউশা নবী হন এবং তাঁহার পরিচালনায় বনী-ইসরাঈলগণ তাহাদের পৈতৃক ভূমি আরদ্ মোকাদ্দাস তথা ফিলিস্তিন জয় করিতে সমর্থ হয় এবং তাহারা ফিলিস্তিনের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া লয়। তথায় হযরত ইউশার পর হযরত কালব, তাঁহার পর হযরত হি'যকীল, তাঁহার পর হযরত ইল্ইয়াস তাঁহার পর হযরত ইয়াসা' প্রমুখ নবী বনী ইসরাঈলদিগকে পরিচালিত করেন। (রুহুল মাআনী – ২- ১৬৫) এইভাবে হযরত মূসার পর তিন বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়া যায়।

হযরত মূসার পর চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফিলিস্তিন ও মিসরের মধ্য ভাগে ভূমধ্য সাগরের উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ "আমালেকা" জাতির এক পরাক্রমশালী অত্যাচারী রাজা "জালুতের" পুনঃ আক্রমণ চলে ফিলিস্তিনের উপর। এই আক্রমণে বনী ইসরাঈলগণ অত্যাচারী জালুত রাজার হাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি তাহাদের বিশেষ পাক-পবিত্র বস্তু "তাবুতে-সকীনা– শান্তির সিন্দুক" যাহার মধ্যে তওরাতের মূল পাণ্ডুলিপি, হযরত মূসার আ'ছা বা অলৌকিক লাঠি এবং হযরত মূসা ও হারুনের জামা ইত্যাদি বিভিন্ন বরকতের বস্তু রক্ষিত ছিল, সেই সিন্দুক পর্যন্ত শত্রুগণ লুট করিয়া নিয়া গিয়াছিল। বনী

* বাদশার ছেলে শাহজাদা কোন ত্রুটি করিলে মুরুব্বি স্বয়ং বাদশাহ শাহজাদাকে তাম্বীহ করিতে পারেন, শাহজাদাকে তাঁহার মর্যাদানুরূপ সংশোধন করিবার উদ্দেশে নিজে শাস্তিও দিতে পারেন, রাগও করিতে পারেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া কোন চাপরাশি বা প্রজা যদি শাহজাদার প্রতি মানহানিকর ব্যবহার করে তবে তাহা কি কখনও বরদাশত করা যাইবে?

ইসরাঈলদের এই দুর্দিনে শিমবীল (আঃ) তাহাদের নবী হইলেন। তিনি খৃস্টপূর্ব ১১ শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীরও অংশবিশেষ পর্যন্ত ছিলেন। হযরত শিমবীলের সময়েও বনী-ইসরাঈলদের উপর জালুত রাজার অত্যাচার অব্যাহত ছিল।

এই জালুত রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যই বনী ইসরাঈল সরদারগণ তাহাদের নবী শিমবীল আলাইহিস সালামের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ বা নেতা মনোনীত করিয়া দেন, যাহার পরিচালনায় আমরা সমবেতভাবে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধরূপে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করিব। অতপর শিমবীল (আঃ) বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য "তালুত" নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়নে তাহারা আপত্তি করিল, কিন্তু তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। তালুতের প্রতি যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ করুণার দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার নিদর্শনস্বরূপ বনী ইসরাঈলদের হারান ধন "তাবুতে সকিনাহ্" শান্তির সিন্দুক" আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে ফেরেশতাগণ কর্তৃক শত্রু কবল হইতে বনী ইসরাঈলদের নিকট প্রত্যর্পিত হইল। অবশেষে তালুতের পরিচালনাধীনে সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হইল জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পথিমধ্যে বনী ইসরাঈল বাহিনী এক পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। মাত্র ৩১৩ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। রণক্ষেত্রে শত্রু সেনার মুখোমখি হইয়া সকলে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী রাজা তালুত স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, সে ছিল নিতান্ত দুর্ধর্ষ বাহাদুর যোদ্ধা; তার সম্মুখে যাইতে কেহ সাহস করিতে ছিল না।

তালুতের সেই সৈন্যদলের মধ্যে দাউদ (আঃ)-ও শামিল ছিলেন। দাউদ তখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই, বরং তখন তাঁহার কোন বিশেষ প্রসিদ্ধিও ছিল না।

রণক্ষেত্রে রাজা জালুত হুঙ্কার মারিতেছিল, কেহই তাহার দিকে অগ্রসর হইতে ছিল না; দাউদ তাহার মোকাবিলায় অগ্রসর হইলেন এবং পাথর নিক্ষেপ করিলেন। পাথরের আঘাতে রাজা জালুত নিহত হইল, শত্রুদল পরাজিত হইল।

মুষ্টিমেয় তালুত বাহিনীর এই বিরাট সাফল্যের বাহ্যিক অসিলা ছিল দাউদের অসীম সাহসিকতা এবং তাঁহার বীরত্ব। এই ঘটনায়ই দাউদের প্রসিদ্ধি লাভ হইল। আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় ত তিনি ছিলেনই, এখন তিনি জনপ্রিয়ও হইলেন।

আল্লাহ্ তাঁহাকে হযরত শিমবীল আলাইহিস সালামের পরে নবুয়ত দান করিলেন এবং তালুতের স্থলে তিনিই বনী ইসরাঈলদের বাদশাহও মনোনীত হইলেন। হযরত দাউদ (আঃ) একাধারে বনী ইসরাঈলদের নবীও হইলেন এবং বাদশাহও হইলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে তালুতের সময়কাল খৃস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ছিল। তখন বনী ইসরাঈলগণ ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ছিল। এই তথ্যের দ্বারা দাউদের সময়কাল এবং আবির্ভাবস্থল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা সহজ। ঘটনার বিবরণ কোরআনে নিম্নরূপ–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ـ قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا ـ

জান কি? বনী ইসরাঈলদের ঘটনা যাহা মূসার পরে ঘটিয়াছিল? যখন তাহারা তৎকালীন নবী (শিমবীল আঃ)-কে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্– নেতা মনোনীত করিয়া দিন যাহার পরিচালনাধীনে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিব। নবী বলিলেন, এরূপ আশঙ্কা ত নাই যে, তোমাদের নেতা মনোনীত করিয়া তোমাদের উপর জেহাদ ফরয হইলে তোমরা জেহাদে অগ্রসর না হও? তাহারা বলিল,

আমাদের জন্য জেহাদ না করার কি কারণ থাকিতে পারে? শত্রুগণ কর্তৃক আমরা সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ী হারাইয়াছি। فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

অতপর যখন (নেতা মনোনীত করিয়া) তাহাদের উপর জেহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলে জেহাদ হইতে ফিরিয়া রহিল। (যাহার বিবরণ সম্মুখে আছে) এই ধরনের জালেম-অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সব অবগত রহিয়াছেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ـ قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ـ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন তালুতকে বাদশাহ ও নেতারূপে। তাহারা বলিল, তালুত আমাদের নেতা কিরূপে হইতে পারে? আমরা তাহার তুলনায় নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত। তালুতের ত টাকা-পয়সার সচ্ছলতাও নাই। নবী বলিলেন, তাহাকে ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়া মনোনীত করিয়াছেন, আর তাহাকে দৈহিক গঠনে, শক্তিতে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আধিক্য দিয়াছেন। অধিকন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব দান করিয়া থাকেন, আল্লাহ সর্বাধিকারী, সর্বজ্ঞ। (নিজ বিজ্ঞতায় নেতা বানাইবেন)। নবী তাহাদিগকে আরও বলিলেন, তালুতের বাদশাহ ও নেতা মনোনীত হওয়ার বাহ্যিক নিদর্শন এই যে, তোমাদের প্রভুর বিশেষ কুদরতে তোমাদের নিকট আসিয়া যাইবে "তাবুতে সকিনা"– শান্তির সিন্দুক যাহাতে রহিয়াছে মূসা ও হারুনের পরিত্যক্ত বস্তু। ঐ সিন্দুককে তোমাদের নিকট নিয়া আসিবেন * ফেরেশতাগণ। এই ঘটনায় (তালুত আল্লাহর মনোনীত হওয়ার) বড় নিদর্শন রহিয়াছে। যদি তোমরা সত্য সত্যই মোমেন হও (তবে ইহা স্বীকার করিবে)।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتَ بِالْجُنُوْدِ ـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ـ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ

অতপর যখন তালুত সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন তখন সঙ্গীগণকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন– (শত পিপাসা হইলেও উহার পানি পেট পুরিয়া পান করা নিষিদ্ধ), অতএব যে কেহ উহার পানি পান করিবে সে আমার সঙ্গী হইবে না, আর যে পানি মুখেও লইবে না সে আমার সঙ্গী হইবে, অবশ্য যে শুধু এক অঞ্জলি পান করিবে (সেও সঙ্গী হইবে)।

فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ـ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

* অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে উহা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। কথিত আছে– আল্লাহর কুদরতে এরূপ হইল যে, শত্রুগণ ঐ সিন্দুক যথায়ই রাখে তথায়ই মহামারী রোগ দেখা দেয়, ফলে কোথাও রাখিতে বা কেহ উহার নিকট যাইতে রাজি হয় না। অবশেষে তাহারা ঐ সিন্দুককে গাড়ী ইত্যাদির কৌশলে দুইটি গরুর ঘাড়ে উঠাইয়া চালক ছাড়া গরুদ্বয়কে মরু অঞ্চলের দিকে তাড়াইয়া দিল, তখন ফেরেশতাগণ গরুদ্বয়কে হাঁকাইয়া বনী ইসরাঈলদের নিকট লইয়া আসিলেন।

(মরু অঞ্চলের প্রখর উত্তাপে পিপাসাতুর অবস্থায় ঐ নদীর নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল।) তাহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পেট পুরিয়া পানি পান করিল। (এই অকৃতকার্য দল তথায়ই হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল, নদী পার হইল না)। অতপর যখন তালুত কৃতকার্য মোমেনগণকে সঙ্গে লইয়া নদী পার হইলেন তখন দুর্বল ঈমানের লোকগণ (-যাহারা এক অঞ্জলী পানি পান করিয়াছিল) বলিল, আমাদের (সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায়) আজ জালুৎ রাজা ও তাহার সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি আমাদের হইবে না। পক্ষান্তরে পক্ক মোমেনগণ যাহারা অন্তরে জাগরুক রাখে যে আল্লাহর সন্নিধ্যে অবশ্যই হাজির হইতে হইবে (-যাহারা পানি মুখে না লাগাইয়া পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিল) তাহারা বলিল, কতবার দেখা গিয়াছে, ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়ী হইয়াছে। আল্লাহর সাহায্য ত একমাত্র ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকে।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

যখন তাহারা জালুত ও তাহারা জালুৎ ও তাহার সৈন্যদলের মোকাবিলায় রণাঙ্গণে খাড়া হইল তখন তাহারা এইরূপ দোয়া করিল, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে পূর্ণ ছবর ও ধৈর্যের তওফিক দান করুন, আমাদের কদম মজবুত করুন এবং কাফের জাতির উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ - وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ -

আল্লাহর হুকুমে তালুতের মুষ্ঠিমেয় দল জালুতের বৃহৎ দলকে পরাজিত করিল এবং (হযরত) দাউদ রাজা জালুতকে মারিয়া ফেলিল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান-বিদ্যা (তথা নবুয়ত) দান করিলেন, অধিকন্তু আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা মতে তাঁহাকে বিভিন্ন শিক্ষা দান করিলেন, (যেমন বিশেষ হস্তশিল্প ইত্যাদি)।

হযরত দাউদের বংশ

হযরত দাউদ (আঃ) বনী-ইসরাঈল বংশের ছিলেন। ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুবের "ইয়াহুদা" নামক পুত্রের সঙ্গে নয়জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত দাউদ মিলিত হন। (কাছাছোল কোরআন ১-৫৫)

হযরত দাউদের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তা'আলা বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকেন যাহা তাঁহার মো'জেজা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। কারণ, উহা সাধারণতঃ অলৌকিক হয়। দাউদ (আঃ)-কেও আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন, পূর্বোল্লিখিত আয়াতে وعلمه مما يشاء অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছামতে বিভিন্ন বিষয় দাউদকে শিক্ষা দিয়াছেন" বলিয়া এই তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে হযরত দাউদের দুইটি বৈশিষ্টের উল্লেখ আছে। প্রথমটি এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদকে আসমানী কেতাব "যবুর" তেলাওয়াত করিতে এবং আল্লাহ তা'আলার "তছবীহ" পড়িতে এইরূপ খোশ লেহান- মধুর সুর এবং এই রূপ আকর্ষণীয় তাছীর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যবুর তেলাওয়াত করিলে বা তছবীহ পড়িলে ঝাড়-জঙ্গল, গাছ-পালা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া তাঁহার নিকটে জমায়েত হইত এবং হযরত দাউদের যবুর তেলাওয়াত বা তছবীহ পড়া শ্রবণে অভিভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে পাখী সমূহও মধুর স্বরে তছবীহ পড়িত। এমনকি, হযরত দাউদের পড়ার আওয়াজে পাহাড়ও

ঠিক থাকিতে পারিত না, তাঁহার সঙ্গে তছবীহ পড়ার ধ্বনি করিয়া উঠিত।

দ্বিতীয়টি এই যে, রাসায়নিক দ্রব্য বা কোন উপায়-উপকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু হযরত দাউদের হাতের স্পর্শে লৌহ নরম হইয়া যাইত; তিনি ঐসব উপকরণ ছাড়াই বিভিন্ন লৌহ-দ্রব্য হাতে তৈরী করিতেন। এইসব বিষয়াবলীর বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ـ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ـ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ـ

পর্বতমালাকে এবং পাখী দলকে দাউদের অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম– ঐ গুলি দাউদের সঙ্গে তছবীহ– (আমার) মহিমা-জপ করিত। (এই বিষয়টা অসম্ভব নহে;) ইহার কর্মকর্তা ছিলাম আমি। আরও দাউদকে শিক্ষা দিয়াছিলাম নিপুণতার সহিত লৌহ-বর্ম তৈরী করা– যুদ্ধে তোমাদের শোকর করা আবশ্যক নয় কি? (সূরা আম্বিয়া, পারা– ১৭ রুকু– ৬)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ـ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ـ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

আমার তরফ হইতে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছিলাম– পবর্তমালা এবং পাখী দলকে আদেশ করিয়াছিলাম, দাউদের সঙ্গে মিলিয়া আমার তছবীহ– মহিমা-জপ কর। আর আমি তাঁহার হস্তে লৌহ নরম হওয়ার মো'জেযা দিয়াছিলাম। তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, লৌহ-বর্ম পূর্ণাঙ্গরূপে তৈরী করিতে এবং উহার খুচরা অংশ তৈরী করিতে বিশেষ পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে। অতএব এই নেয়ামত স্মরণে পরিবার পরিজনসহ আমার শোকরগুজারী স্বরূপ নেক আমল করিও। আমি তোমাদের সমুদয় কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। (পারা– ২২ রুকু– ৮)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ ـ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ـ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِشْرَاقِ ـ

আমার বিশিষ্ট বান্দা অলৌকিক ক্ষমতাধারী দাউদকে স্মরণ কর। তিনি ছিলেন আমার বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত। পর্বতমালাকে তাঁহার অনুসরণকারী সাথী বানাইয়া দিয়াছিলাম; ঐগুলি তাঁহার সঙ্গীরূপে সকালে-বিকালে আমার তছবীহ-মহিমা-জপ করিত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ـ كُلٌّ لَهٗ اَوَّابٌ ـ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ـ

এবং পাখীর দলও তাঁহার নিকট সমবেত হইতে; ঐগুলিও তাঁহার সঙ্গে যিকিরে আত্মনিয়োগ করিত। আর আমি দাউদের রাজত্বকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞান-বিদ্যা, সুস্পষ্ট বাকশক্তি বা ন্যায় বিচারের দক্ষতা দান করিয়াছিলাম। (সূরা ছাদ, পারা– ২৩ রুকু– ১১)

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের আরও একটি মো'জেযা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উপর অবতারিত (আমাদের কোরআন শরীফের ন্যায়) আসমানী কেতাব "যবুর" যাহা সাধারণতঃ দীর্ঘ সময়ে খতম করা সম্ভব, সেই যবুর কেতাবের তেলাওয়াত তিনি অতি অল্প সময়ে খতম করিতে পারিতেন।

১৬৪৭। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে হযরত) দাউদের পক্ষে আসমানী কেতাব যবুরের তেলাওয়াত অতি সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি তিনি (চাকরকে) স্বীয় যানবাহনের উপর জিন বা গদি ও

আসন বাঁধিবার আদেশ করিয়া যবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেন; (চাকরের) জিন্ বাঁধা সমাপ্তের পূর্বেই দাউদ (আঃ) যবুর তেলাওয়াত সমাপ্ত করিতেন। আর হযরত দাউদ শুধু নিজ হস্ত-কার্যের উপার্জন দ্বারা স্বীয় ব্যয় বহন করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার কুদরত অসীম, আর মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতি সবই অকিঞ্চিৎকর, নেহায়েত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তাই অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কুদরতের লীলা মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও অনুভুতির সীমারেখার অনেক ঊর্দ্ধে হইয়া থাকে; সেইরূপ ক্ষেত্রেই মোমেন ও ঈমানহীনের পরিচয় হয়। মোমেন ব্যক্তি অতি সহজেই ঐ শ্রেণীর বিষয়কে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া লইতে সক্ষম হয়, পক্ষান্তরে ঈমানহীন ব্যক্তি অস্বীকার বা সংশয়ের মধ্যেই থাকিয়া যায়। সে কূপে পতিত ব্যঙের ন্যায় তাহার অকিঞ্চিৎকর সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিবেক ও অনুভূতিকেই বাস্তবতার মাপমাঠি ধারণা করিয়া এই সীমার বাহিরে সব কিছুকেই অবাস্তব মনে করে। বলা বাহুল্য, ঐ ব্যঙের ধারণার কারণে যেরূপ সারা বিশ্বের বাস্তবতা উপেক্ষা করা বোকামি বৈ নহে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসাধারণ ও অস্বাভাবিক লীলাকে উপেক্ষা করাও বোকামিই বটে।

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য লীলার একটি বিশেষ হইল "তাইয়্যে-আরদ" অথ্যাৎ বহু দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বাস্তবেই কম করিয়া দেয়া। এইরূপ করা মানুষের শক্তির বাইরে বটে, কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য সামান্য সঙ্গতি সম্পন্ন একটি নজির আমাদের সম্মুখে আছে–

দুরবীণের সাহায্যে আমরা দূরে দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বকে অতি কম দেখিতে পাইয়া থাককি দূরের জিনিষকে নিকটে দেখিয়া থাকি। এ স্থলে একটি যন্ত্রের সাহায্যে যে অবস্থা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টি হয় সেই অবস্থাটাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতে বাস্তবে পরিণত হওয়ার নামই হইল "তাইয়্যে-আরদ্"। যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহারে বিশিষ্ট বান্দাদের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে সংঘটিত করিয়া থাকেন, ফলে কোন প্রকার দ্রুতগতি ব্যতিরেকেই উভয় স্থানের দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে।

ইহা হয় স্থান ও জায়গার ক্ষেত্রে; এই ধরনেরই আর একটি ব্যবস্থা হয় সময় ও কাল ব্যাপারে– উহাকে বলা হয় "তাইয়্যে-যমান"। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও সর্বসাধারণের পরিমাপ এবং হিসাবে যাহা দীর্ঘ পরিমাণের সময়, সেই দীর্ঘ সময়কালই ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে অল্প ও সামান্য পরিমাণের হইয়া যাওয়া। যেমন, স্বাভাবিক ও সর্বসাধারণের হিসাবে ১ মাস ব্যক্তি বিশেষের জন্য ১ দিন হইয়া যাওয়া, দিবারাত্র ১ দিন ব্যক্তি বিশেষের জন্য মাত্র ১০ মিনিট হইয়া যাওয়া!

ইহা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র এই যে– একটি কাজ যাহার সম্পাদন স্বাভাবিক স্তরে সুদীর্ঘ সময়ের; সেই কাজটি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এমনভাবে সম্পন্ন হওয়া যে, উহা সম্পাদনার সময়টাই সর্বসাধারণের হিসাবে অল্প পরিমাণের হয়।

অতি সামান্য সঙ্গতির একটি নজির লক্ষ্য করুন! একজন লোক স্বপ্নে এমন কার্যাবলী করে বা এমন ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে যাহা ২/৪/১০ দিন বা মাস ও বৎসরের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ; এই দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কার্য বা ঘটনাটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কোন দ্রুততা অবলম্বন ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয় এইরূপে যে, সেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী কার্যাবলী ও ঘটনাটির সময় ও কাল জাগ্রত সর্বসাধারণের পক্ষে সামান্য পরিমাণের হয়– শুধু অর্থ ঘন্টা বা এক ঘন্টা মাত্র।

স্বপ্নে আমাদের জন্য যেইরূপে দীর্ঘ সময়ের ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়, ঐরূপে আল্লাহর কুদরতে ব্যক্তি বিশেষের জন্য দীর্ঘ সময়ের কার্য বা ঘটনা অল্প সময়ে বাস্তবে এবং প্রকৃত প্রস্তাবেও সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থাকেই "তাইয়্যে-যমান" বলা হয়।

নবীগণ ও ওলিগণ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই দীর্ঘসময়ের কার্য ও ঘটনা অল্প সময়ে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সঙ্কীর্ণ যুক্তিবাদী লোকগণ উহাকে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া হয়ত অস্বীকার করিয়া বসে, না হয় "স্বপ্ন" বলিয়া আখ্যায়িত করে। কারণ স্বপ্নের মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থা তাহাদের বিবেকে বোধগম্য হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরতে যে এই ব্যবস্থাটি বাস্তবেও সম্পন্ন হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করে না।

এই "তাইয়্যে-যমান" ব্যবস্থার মাধ্যমেই হযরত দাউদ (আঃ) দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ "যবুর" কেতাবের খতম অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন, অথচ তাঁহাকে কোন প্রকার বিশেষ দ্রুততাও অবলম্বন করিতে হইত না।*

হযরত দাউদ (আঃ) এবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই অধিক সময় মশগুল থাকিতেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধিক এবাদৎ করার জন্য হযরত দাউদের আদর্শ বিশেষ অনুসরণীয় ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন সময়ে হযরত দাউদের আদর্শ ছাহাবীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীরই

১৬৪৮। হাদীছ ঃ قال عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامَ اِلٰى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلٰى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ وكَانَ يَنَامُ نِصْفَ الَّليْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهٗ وَيَنَامُ سُدُسَهٗ ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, যেই রীতিতে দাউদ (আঃ) নফল রোযা রাখিতেন সেই রীতি আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) সর্বদা একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীন কাটাইতেন।

আর যেই নিয়মে দাউদ (আঃ) তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন সেই নিয়ম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। দাউদ (আঃ) রাত্রের প্রথমার্ধে নিদ্রা যাইতেন, তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়িতেন অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ পুনঃ নিদ্রা যাইতেন।

হযরত দাউদের বিশেষ ঘটনা

সর্বদার জন্য স্মরণীয় একটি উপদেশ– এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন বান্দা নেক কাজ করিয়া যদি বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমি এই নেক কাজ করিয়াছি– আমি ছদ্‌কা করিয়াছি, আমি নামায পড়িয়াছি, আমি গরীব মিছকিন খাওয়াইয়াছি। তবে আল্লাহ তা'আলা (তাহার এই আমিত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, আমি তোমার সাহায্য করিয়াছি, আমি তোমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ দান করিয়াছি। (অর্থাৎ এইসব দানের ফলে তুমি এই সব কাজ সমাধা করিতে পারিয়াছ, এখন তুমি আমার নাম উল্লেখ কর না, শুধু নিজের কথাই বলিতেছ)।

---

* হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও অনেক অনেক ওলীর দ্বারা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হিজরী একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম শেখ নুরুদ্দিন আলী ইবনে সুলতান– মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'মেরক্বাত' ৫-৩৪৪ পৃষ্ঠায় মোল্লা জামীর এক কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান কিরয়াছেন যে, একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকালে হজরে আছওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থান, যাহা মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করতে পারে– এই সামান্য স্থান অতিক্রম করিতে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহাদ্দেস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ)-এর বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা "ফয়যুল বারী ৪-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, সুফীকুলশিরমণি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) একদিন এক রাত্রে ষাট বার কোরআন শরীফ খতম করিতেন এবং দিল্লীর শাহ ইসমাঈল (রঃ) আছর হইতে মাগরেব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীর স্থিরতার সহিত কোরআন শরীফ খতম করিতেন।

কোরআন হাদীছের অসংখ্য প্রমাণাদিতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রসিদ্ধ মে'রাজ শরীফের ঘটনা উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হইয়াছিল– বাস্তব ছিল, স্বপ্ন ছিল না।

পক্ষান্তরে যদি বান্দা নেক কাজ করিয়া বলে, হে পরওয়ারদেগার! (নেক কাজ সমাধায়) তুমি আমার সাহায্য করিয়াছ, তুমি আমাকে তৌফিক এবং শক্তি ও সামর্থ দান করিয়াছে, এই ব্যাপারে তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ; তবে আল্লাহ তা'আলা (তাহার উক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, তুমি এই নেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছ; তুমি ইহা সমাধা করার ইচ্ছা করিয়াছ, তুমি নেকী কামাই করিয়াছ। (মাদারেজুছ ছালেকীন ১-১৯)

এই হাদীছের মর্মে বুঝা যায়, বান্দা যত নেক কাজই করুক উহার সম্বন্ধ নিজের প্রতি করাকে আল্লাহ তাআলা আদৌ পছন্দ করেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা দাউদ (আঃ) বলিলেন, " হে পরওয়ারদেগার! রাত্র দিনের এক সেকেন্ডও দাউদের ঘর তোমার এবাদত হইতে খালি থাকে না।"

হযরত দাউদ নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে একের পর এক এবাদতের জন্য এইরূপে দিন-রাতের সময় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঘরে যেন দিবারাত্র সর্বদাই আল্লাহ তাআলার এবাদত হইতে থাকে, এক মুহূর্তও যেন এবাদত হইতে তাঁহার ঘর খালি না থাকে।

এতদ্ভিন্ন হযরত দাউদ স্বীয় কার্যের রুটিন এইরূপে তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একদিন নির্জনে একমাত্র এবাদতে মশগুল থাকিয়া কাটাইতেন ঐদিন তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাত করার অনুমতি থাকিত না। বাড়ীর গেইটে পাহারাদার রাখিয়া দিতেন, যেন কেহ আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে। আর একদিন মামলা-মকদ্দমার রায় ও ফয়ছালা দানের জন্য, আর একদিন নিজের সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের জন্য, আর একদিন সর্বসাধারণকে ওয়াজ-নছীহত, তবলীগ-তলকীন করার জন্য রাখিয়াছিলেন। এইরূপে চার দিনের প্রোগ্রামের উপর স্বীয়কার্যের রুটিন তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার উপর তিনি চলিতেন। (কাছাছুল কোরআন)

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ গৃহে আল্লাহ তাআলার এবাদতের যে সুশৃংখল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার উপর তিনি আত্মতুস্টি বাবাপন্ন হইয়া বলিলেন, " হে পরওয়ারদেগার! দিন-রাত্রের প্রতি মুহূর্তে দাউদ-পরিবারের কোন একজন অবশ্যই তোমার এবাদতে মশগুল থাকে।"

হযরত দাউদের এই আত্মতুষ্টি আল্লাহ তাআলার না-পছন্দ হইল, (যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে।)* আল্লাহ তাআলা বলিলেন, এসবই একমাত্র আমার সাহায্য-সহায়তায় এবং তৌফিক দানের বদৌলতে হয়। আমার সাহায্য না পাইলে তুমি কোন কিছুর উপর সক্ষম হইতে পার না। আমার মহানত্বের

---

* এই ধরনের আত্মতুষ্টি- আমিত্ব অতি সাধারণ মনে হইলেও নবীগণের পক্ষে আল্লাহ তা'আলা উহাকে ব্যর্থ না করিয়া ছাড়েন না। নবীগণের মর্তবা অনেক বড়; বড় মর্তবার লোকের ছোট ক্রটিও বড় অপরাধের ন্যায় গণ্য হয় এবং উহাকে ব্যর্থ ও খন্ডনকারী ঘটনার সম্মুখিন করা হয়। যেন মূসা (আঃ) কোন এক উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, "সর্বাধিক বিজ্ঞ আমি" নবীর পক্ষে এই দাবী অবাস্তব ছিল না, কিন্তু এই আমিত্ব আল্লাহ তা'আলার না-পছন্দ হইয়াছিল, যদ্দরুন হযরত মূসা এক বিরাট ঘটনার সম্মুখিন হইয়াছিলেন- যাহার বিবরণ প্রথম খন্ডে খিজির (আঃ) সম্পর্কীয় হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) একদা জেহাদের প্রস্তুতি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি আমার একশত স্ত্রীর প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গম করিব, প্রত্যেকে একটি সন্তান জন্ম দিবে যাহারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হইবে। কথাটা ভালই ছিল, কিন্তু নিজের উপর আস্থা রাখিয়া বলা হইয়াছিল, আল্লাহ তা'আলার উপর তোয়াক্কা করিয়া বলা হয় নাই। ফলে আল্লাহ তাআলা হযরত ছোলায়মানকে বিফল মনোরথ করিলেন, শুধুমাত্র একজন ব্যতীত কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না এবং গর্ভধারিণী স্ত্রীও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিল; যাহার একহাত এক পা ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই ঘটনা উপলক্ষে শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যদি হযরত ছোলায়মান স্বীয় উক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর তোয়াক্কা রাখিয়া বলিতেন, তবে নিশ্চয়ই প্রত্যেক স্ত্রী এক একজন মুজাহিদ জন্ম দান করিতেন। বিস্তারিত বিবরণ হযরত ছোলায়মানের বর্ণনায় আসিবে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও একটি ঘটনার প্রতি পবিত্র কোরআনেই ইঙ্গিত রহিয়অছে- একদা কাফেরগণ তাঁহাকে পরীক্ষামূলকভাবে "আছহাবে-কাহাফের" ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আগামীকল্য বলিব। হযরতের মনে এই ছিল যে, অহীর দ্বারা জ্ঞাত হইয়া পরদিন তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন, কিন্তু কথাটি তিনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা না রাখিয়া শুধু নিজের উপর ভরসা রাখিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার নিকট না পছন্দ হইল, ফলে ১৫ দিন পর্যন্ত অহী বন্ধ রহিল। হযরত (সঃ) অত্যন্ত চিলিত হইলেন। অতপর অহী নাযিল হইল এবং তাঁহাকে সর্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, কখনও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখা ব্যতীত কোন কাজ করার বা কোন কিছু বলার ঘোষণা দিয়া বসিবেন না। (পবিত্র কোরআন সূরা কাহাফ দ্রষ্টব্য)

শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে একদিন তোমার নিজের উপর ছাড়িয়া দিব। (আমার সাহায্য হটাইয়া লইব, তখন দেখা যাইবে, তুমি তোমার শৃংখলা ও সুব্যবস্থা কতদূর ঠিক রাখিতে পার!)

হযরত দাউদের যেই দিনটি এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একদা সেই দিন তিনি বিশেষ পাহারা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে নির্জনে স্বীয় এবাদতে মশগুল হইলেন। বাড়ীর গেটের উপর কড়া পাহারা রহিয়াছে, কেহ যেন আসিয়া হযরত দাউদের এবাদতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে।

আজ আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদকে তাঁহার নিজের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, স্বীয় সাহায্য-সহায়তা হটাইয়া লইয়াছেন, ফলে হযরত দাউদের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাবলীও কোন কাজে আসিল না। হঠাৎ দুই দল লোক বাড়ীর গেট দিয়া না আসিয়া অন্য দিক দিয়া দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং হযরত দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ তাহাদের আকস্মিক আগমনে হযরত দাউদ (আঃ) শঙ্কিত হইলেন, এমনিক এবাদতের একাগ্রতা হইতে বিচ্যুৎ হইয়া পড়িলেন। অতপর তাহারা তাঁহার নিকট একটি ঝগড়ার মীমাংসা চাহিয়া একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিল এবং তাহারা হযরত দাউদের সঙ্গে যে কথোপকথন করিল তাহাতেও রুষ্টতা অবলম্বন করিল। তাহাদের ঝগড়াও অতি সামান্য ছিল, যাহার জন্য এত কড়া বিশৃঙ্খলাজনক কার্য বাস্তবিকই বিরক্তিজনক ও দুঃখজনক হয়। এইসব ঘটনা প্রবাহের হযরত দাউদের এবাদত পরিচালনার রুটিন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া গেল, তাঁহার ঘরে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর এবাদত করার যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বাতিল হইয়া গেল।

এখন হযরত দাউদের চক্ষু খুলিল; তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার উপর দিয়া আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা প্রবাহিত হইয়া গেল। আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষায় তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে শত শত ব্যবস্থাও নিষ্ফল হয়। এই অনুভূতির সাথে সাথে হযরত দাউদ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে সেজদায় নত হইলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদের ত্রুটি ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে সান্তনা দানে তাঁহার মর্তবা বাড়াইয়া দিলেন। ঘটনাটির বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ-

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَاتَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ـ

তুমি কি বিরোধমান দলদ্বয়ের ঘটনা জ্ঞাত আছ? যখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া এবাদত খানায় প্রবেশ করিল- যখন তাহারা দাউদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের আকস্মিক আগমনে দাউদ সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা বলিল, ভয় পাইবেন না, (আমরা দেও-ভূত বা শত্রু নহি)। আমরা দুইটি বিবাদমান দল; একে অপরের প্রতি অন্যায় করিয়াছি। আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায় ফয়ছালা করিয়া দিন, অন্যায় করিবেন না এবং আমাদিগকে মীমাংসার সহজ পথ বাতলাইয়া দিন।

اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ـ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ـ

একজন অপরজনের প্রতি অভিযোগ করিল, আমার এই ভাই- নিরানব্বইটি দুম্বা তাহার আছে, আমার আছে শুধু একটি দুম্বা; এতদসত্ত্বেও সে আমাকে বলেন, তোমার দুম্বাটা আমাকে দিয়া দাও এবং তর্কে সে আমার উপর জিতিয়া যায়; আমি কথায় তাহার সঙ্গে পারি না।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ـ

দাউদ (আঃ) উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে এই রায় দান করিলেন যে, এই ব্যক্তির এতগুলি দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমার দুম্বাটা চাওয়া তাহার জন্য তোমার প্রতি অবিচার। একত্রে বসবাসকারী লোকগণ অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর এইরূপ অন্যায়-অবিচার করিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা খাঁটি মোমেন ও নেককার হন তাঁহারা সতর্ক হইয়া চলেন, অবিচার অন্যায় করেন না; অবশ্য এইরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

وَظَنَّ دَاوُدَ اَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ـ فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ ـ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ـ

দাউদ বুঝিয়া ফেলিলেন, তিনি আমার পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন, এবং সেজদায় পড়িয়া আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হইলেন, ফলে আমি তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। তাঁহার জন্য আমার নৈকট্য এবং শুভ পরিমাণ রহিয়াছে। (পারা-২৩, রুকু-১১)*

হযরত দাউদ আলাহিস্ সালামের উম্মতের বিশেষ উপদেশমূলক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরত দাউদের শরীয়তে শনিবার দিনটি আমাদের শুক্রবার দিনের ন্যায় এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ দিন ছিল। বরং আমাদের শরীয়তে যেরূপ জুমআর আযানের পর দুনিয়ার কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়া যায় হযরত দাউদের শরীয়তে তদপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি ছিল যে, শনিবার পূর্ণ দিন দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও উহার লিপ্সা হারাম ছিল। এক সময়ে দাউদ আলাইহিস সালামের উম্মতের একটি সম্প্রদায় যাহারা সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দা ছিল- তাহারা ঐ শনিবার সম্পর্কে একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। অনেকে সেই পরীক্ষায় নিজেদের সামলাইতে না পারিয়া আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বসিল, ফলে তাহারা আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হইল। তাহাদের পরীক্ষার ও আযাবের বিবরণ এই-

তাহারা ছিল জেলে সম্প্রদায়। সমুদ্রে মাছ শিকার করাই ছিল তাহাদের কাজ ও ব্যবসা। তাহাদের শরীয়ত অনুযায়ী শনিবার দিন তাহাদের জন্য মাছ শিকার বন্ধ রাখা ফরয ছিল। সুতরাং মাছ শিকার করা ছিল হারাম। এদিকে আল্লাহর কুদরত- শনিবার দিন সমুদ্রের অসংখ্য মাছ পানির উপর ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত; অন্য কোন দিন এই সমস্ত মাছ দেখাও যাইত না। জেলে সম্প্রদায়ের ঐ লোকেরা শনিবার দিন মাছের এই অবস্থা দৃষ্টে লোভ সামলাইতে পালি না; তাহারা এই দিনে অবৈধরূপে মাছ শিকারের নিমিত্ত ফন্দি আঁটিল-

তাহারা সমুদ্রকূলে পুকুর কাটিল এবং সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া ঐ পুকুর সমূহে সংযোগ করিয়া দিল। শনিবার দিন মাছগুলি সমুদ্র কিনারায় খেলা করিতে করিতে ঐ খাল পথে পুকুরে আসিয়া জমা হইত। ঐ লোকেরা যখন দেখিত, পুকুরগুলি মাছে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন খাল্লের মুখ বন্ধ করিয়া দিত, ফলে মাছগুলি পুকুরে আবদ্ধ হইয়া যাইত। পরদিন রবিবার তাহারা ঐসব মাছ পুকুরসমূহ হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিত তাহারা ভাবিত, মাছ শিকার করা শনিবারে হইল না, রবিবারে হইল, অথচ ঐ মাছ শিকারের মূল কাজটা

* পাঠকবর্গ। পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত বিবরণ সম্পর্কীয় ঘটনা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দান করা হইল শাইখুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ কোরআনের ব্যাখ্যায় ইহাই লিখিয়াছেন। বাইবেল সঙ্কলনকারী খৃষ্টানদের একটি সাধারণ স্বভাব যে, তাহারা ঈসা আলাইহিস্ সালামকে এত উর্ধ্বে উঠায় যে, তাঁহাকে প্রভুত্বের স্থান দেয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক অনেক নবীগণের সম্পর্কে এমন এমন ভিত্তিহীন ঘটনা রচনা করে যদ্দারা তাঁহাদের মান মর্যাদা নষ্ট হয় এবং তাঁহারা হেয় প্রতিপন্ন হন। আলোচ্য বিবরণ সম্পর্কে এই খৃষ্টানগণই কোন একটি লোকের সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে হযরত দাউদের এমন একটি জঘন্য ঘটনা গড়িয়াইয়াছে যাহা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও অতীব কলঙ্কময় বলিয়া গণ্য হইবে।

দুখের বিষয় কোন কোন তফসীরকার যাহাদের নীতি হইল- কোন ঘটনা সম্পর্কে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সব রকম বর্ণনা সমাবেশ করা; তাঁহারা সত্য-মিথ্যার বিচার করেন না। কিম্বা তাঁহারা হয় ত সত্য-মিথ্যার বিচারের সঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইসলাম দুশমনগণ তাঁহাদের সেই সত্য-মিথ্যার বিচার বাদ দিয়া শুধু ঘটনাকে ঐ তফসীরকারদের নামে উদ্ধৃত করিয়াছে- এইরূপে খৃষ্টানদের সেই গর্হিত বিবরণ মুসলমান তফসীরকারদের নামেও প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ধরনের বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

শনিবারই সম্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব উহা তাহাদের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াই ছিল– বরং জঘন্যরূপে তথা ফন্দি-ফেরেব আকারে। এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি হইল– (১) এক শ্রেণী যাহারা ঐ ফন্দি-ফেরেবে মাছ শিকারে লিপ্ত ছিল। (২) আর এক শ্রেণী যাহারা ওয়াজ-নছিহত করিয়া ঐ হারাম কাজে বাধা দিতে ছিল। (৩) আর এক দল ঐ কাজে লিপ্ত হয় নাই, কিন্তু লিপ্তদিগকে বাধাদানেও তৎপর হয় নাই, এমনকি ঐ তৎপরতাকে নিরর্থক ভাবিত।

প্রথম শ্রেণীর লোকগুলি তাহাদের অসৎ কার্য হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব আসিল; তাহারা বানর হইয়া গেল এবং তিনদিন বানর থাকিয়া সবাই মরিয়া গেল। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ আযাবে তৃতীয় শ্রেণীও ধ্বংস হইয়াছে। কারণ, অসৎ কাজে বাধাদানের ফরয তাহারা আদায় করে নাই। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণী আযাব হইতে রেহাই পাইয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এইরূপ–

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ. اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَاتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

২২০ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ বস্তিবাসীদের ঘটনা যাহারা সমুদ্রোপকূলবাসী ছিল। যখন তাহারা শনিবার সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞার সীমা লংঘন করিতে ছিল। শনিবার দিন তাহাদের নিকট সমুদ্রের মৎস্যসমূহ পানির উপরে ভাসিয়া কিনারায় আসিয়া যাইত। শনিবার ছাড়া অন্য দিন ঐরূপে আসিত না; ইহা তাহাদের জন্য আমার পরীক্ষা ছিল। কারণ তাহারা সীমালংঘনে অভ্যস্ত ছিল।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا - قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ - فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ -

আরও একটি স্মরণীয় কথা– (কিছু সংখ্যক লোক তাহাদের ঐ অসৎ কার্যে বাধা দিলে) তাহাদেরই এক শ্রেণীর লোক (বাধাদানকারীদিগকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, ঐ লোকদেরকে কেন ওয়ায-নছিহত কর যাহাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করিবেন বা কঠিন আযাব দিবেন? বাধাদানকারী দল বলিলেন, আমরা পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমার্হ গণ্য হইতে চাই এবং আশা রাখি, হয়ত এই অসৎ লোকেরা অসৎ কাজ হইতে ফিরিয়া যাইবে। অতপর অসৎ লোকের দল সব ওয়ায-নছিহতকে উপেক্ষা করিল তখন আমি বাধাদানকারী দলকে রক্ষা করিলাম।

وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ - فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ -

আর অন্যায়কারী সকলকে কঠিন আযাবে পাকড়াও করিলাম তাহাদেরই সীমা লংঘনের কারণে। (যাহার বিবরণ এই যে–) যে কাজ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহারা যখন গোড়ামী করিয়া সেই কাজে লিপ্ত হইল তখন তাহাদের উপর আমার আদেশ বলবৎ হইল যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।

তাহারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে চালাকী-বজ্জাতী করার ফন্দি আঁটিয়াছিল, তাই তাহাদের সেই স্বভাবের জীবেই পরিণত করিয়া লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করা হইয়ছে। বানর হইয়া তাহারা তিন দিন জীবিত ছিল; তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি অনুভূতি সবই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কথা বলার শক্তি ছিল না। সবকিছু স্মরণ করিয়া একে অপরকে দেখিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। তিন দিন এই লাঞ্ছনা ভোগের পর সবাই মৃত্যুমুখে

পতিত হইয়াছিল। এই ঘটনা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার এবং উপদেশ দান করার এক বিশেষ শিক্ষা বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে উল্লেখ করিয়াছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ـ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই তোমরা অবগত আছ ঐ লোকদের পরিণতি যাহারা সীমা লংঘন করিয়াছিল শনিবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার। ফলে আমি তাহাদের প্রতি আদেশ প্রয়োগ করিয়াছিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও। উক্ত ঘটনার শাস্তিকে আমি বানাইয়া রাখিলাম তৎকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য সতর্ককারী ও আদর্শমূলক শিক্ষা এবং খোদাভক্ত ও খোদাভীরুগণের জন্য উপদেশ ও নছীহত। (পারা–১, রুকু–৮)

হযরত ছোলায়মান (আঃ)

যহরত ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের পুত্র ছিলেন। খৃস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর বাদশা তালুতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হযরত দাউদ। তাঁহার সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দী। সুতরাং হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হযরত ছোলায়মানের সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী। তাঁহাদের সকলেরই কেন্দ্রীয় স্থান ছিল ফিলিস্তিন। ছোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদের সুযোগ্য পুত্রই ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) অতি সুদক্ষ ও সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিশেষরূপে উহার দক্ষতা দান করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের সূরা ছাদে এ সম্পর্কেই ঘোষণা আছে– واتينه الحكمة وفصل الخطاب "আমি দাউদকে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের বিশেষ দক্ষতা দান করিয়াছিলাম।" এই গুণে ছোলায়মান (আঃ)-ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। বাল্য বয়সেই এক ঘটনায় তাঁহার রায় ও বিচার পিতা হযরত দাউদের রায় অপেক্ষা অধিক সুষ্ঠু হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তির পশুপাল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ক্ষেত্রের মালিক হযরত দাউদের নিকট নালিশ করিল। হযরত দাউদ তদন্তে জানিতে পারিলেন, পশুপালের মালিকের ত্রুটিতেই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ পশুপালের মূল্যের সমান। সুতরাং হযরত দাউদ (আঃ) সেই ঘটনায় রায় দিলেন যে, শস্যহানির বিনিময়ে ক্ষেতের মালিককে পশুপালগুলি দিয়া দেওয়া হইবে– ইহা আইনগত রায় ছিল এবং নির্ভুল রায়ই ছিল।

হযরত ছোলায়মান তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘটনা শুনিতেছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর। তিনি পিতাকে বলিলেন, আইনের ধারা অবলম্বন না করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার দ্বারা ঘটনার মীমাংসা অন্য পন্থায়ও হইতে পারে এবং উহা বাদী-বিবাদী উভয়ের পক্ষে উত্তম হইবে। তাহা এই– এখন পশুগুলি সাময়িকভাবে বাদীকে দেওয়া হউক, সে উহার দুগ্ধ ও পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইতে থাকুক এবং বিবাদী-বাদীর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতের চাষ-বাস করিতে থাকুক। যখন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত পূর্ববর্তী ভাল অবস্থার উপর আসিয়া যাইবে, তখন বিবাদী স্বীয় পশুপাল বাদীর নিকট হইতে ফেরত লইয়া লইবে। ফলে বাদীর ক্ষতিপূরণও হইয়া যাইবে এবং বিবাদীও তাহার পশুপাল হইতে বঞ্চিত হইবে না। এই রায় দাউদ (আঃ) পছন্দ করিলেন। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনার বিবরণ–

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ـ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ـ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ـ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ

দাউদ ও ছোলায়মানের একটি ঘটনা শুনুন। যখন উভয়ের উপস্থিতিতে একটি (আঙ্গুর) ক্ষেতের বিষয়ে বিচার হইতেছিল– ঐ ক্ষেত্রে অপর লোকের ছাগল-পাল আসিয়া পড়িয়াছিল (এবং গাছের ক্ষতি করিয়াছিল) আমি তাহাদের রায়কে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। সে মতে ঘটনার উত্তম মীমাংসার বুঝ ছোলায় মানকে দান করিলাম, আমি তাঁহাদের উভয়কেই সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। (সূরা আম্বিয়া, পারা–১৭, রুকু–৬)

হযরত ছোলায়মান বিচারকার্যে অতি নিপুণ, সুদক্ষ এবং সুকৌশলীও ছিলেন, যাহার একটি নজির নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৬৪৯। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হযরত দাউদ ও ছোলায়মানের কালের ঘটনা– একস্থানে) দুইজন মহিলা তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দুইটি শিশু ছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া একটি শিশু লইয়া গেল। অবশিষ্ট শিশুটি সম্পর্কে মহিলাদ্বয়ের প্রত্যেকের দাবী, এই শিশু আমার; বাঘে নিয়াছে তোমার শিশুকে। (অতি ছোট শিশুর সনাক্ত আকৃতির দ্বারা হয় না।)

অতপর তাহারা উভয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হইল। (স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে যে অধিক বয়স্কা ছিল শিশুটি তাহার হস্তে ছিল এবং তাহার বিরোধিনী কম বয়স্কার নিকট স্বীয় দাবীর কোন সাক্ষ্য ছিল না, তাই শরীয়তের এবং আদালতের বিধান মতে) হযরত দাউদ (আঃ) বয়স্কা স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন।

মহিলাদ্বয় তথা হইতে যাওয়ার সময় হযরত ছোলায়মানের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাঁহাকে ঘটনার বিবরণ শুনাইলেন। হযরত ছোলায়মান ভান করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, একটি ছুরি নিয়া আস, আমি শিশুটিকে দ্বিখন্ডিত করিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিব। এতদশ্রবণে কম বয়স্কা মহিলাটি চীৎকার করিয়া বলিল, এইরূপ করিবেন না– এইরূপ করিবেন না; আমি মানিয়া লইতেছি, শিশুটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। (স্নেহ-মমতা কৃত্রিম উপায়ে আসিতে পারে না, তাই বয়স্কা মহিলাটির অবস্থা তদ্রূপ হইল না, ফলে সর্বসমক্ষে ইহা প্রকাশ পাইয়া গেল যে, বস্তুতঃ কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুর জননী। এই অকৃত্রিম সাক্ষ্যে বিপক্ষিণী বাস্তবকে স্বীকার না করিয়া কোথায় যাইবে?) অবশেষে পুনর্বিচার হইয়া কম বয়স্কা মহিলাটিই শিশুটিকে লাভ করিল।

হযরত ছোলায়মান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর হযরত দাউদের ইন্তেকাল হইল। হযরত ছোলায়মান নবুয়ত ও রাজত্ব উভয় ক্ষেত্রে স্বীয় পিতা হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করিলেন যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল–

জিন, পাখী ও বায়ু-বাতাসের উপর ক্ষমতা *

আল্লাহ তা'আলা হযরত ছোলায়মানকে একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব শুধু মানুষ জাতির উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দুর্ধর্ষ জিন জাতি এবং পাখী জাতিও তাঁহার করায়ত্তে ও শাসনাধীনে ছিল, বায়ু-বাতাসও তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল– ঐসব তাঁহার আদেশ পালনে সাধারণ মজুর ও সৈনিকের ন্যায় কাজ করিয়া যাইত। পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে বর্ণনা–

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ـ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ـ

আমি ছোলায়মানের জন্য বতাসকে বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম; বকরতপূর্ণ (দেশ– সিরিয়া হইতে কোথাও যাইতে এবং তথা হইতে ঐ) দেশের দিকে (প্রত্যাবর্তনে) বাতাস তাঁহাকে তাঁহার আদেশ মতে বহন করিয়া প্রবলবেগে চলিত। আমি ত সর্বজ্ঞ আছি; (আমার পক্ষে সবই সহজ)

* জিন, পাখি ও বাতাস এইসব হযরত ছোলায়মানের বশীভূত ছিল। উহারা তাঁহার আজ্ঞাবহ মজুর ও সৈনিকের কাজ করিয়া থাকিত। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় শুধুমাত্র এই তিনটি জাতিই উল্লেখ আছে; এই সূত্রেই একদল তফছীরকারের মত এই যে, পশু জাতির উপর হযরত ছোলায়মানের সাধারণ আধিপত্য ছিল না, নতুবা উহারও উল্লেখ কোরআনে থাকিত। তফছীরকারদের অপর দলের মত এই যে, কোরআনের উল্লিখিত তিনটি জাতিকে বশীভূত রাখার ক্ষমতা দ্বারা পশু জাতিকেও বশীভূত রাখা অধিক সহজ সাধ্য। তাঁহাদের মতে পশু-পক্ষী, জিন-পরী, বায়ু-বাতাস, মানব-দানব সকলের উপরই হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য ছিল।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۔

আর দেও-জ্বিনদের মধ্য হইতে অনেকগুলি তাঁহার জন্য (মণি-মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র গর্ভে) ডুবুরির কাজ করিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা আরও অনেক কাজ করিত। (পারা-১৭, রুকু- ৬)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۔ وَاَرْسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۔ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۔

আমি ছোলায়মানের জন্য বাতাসকে বশীভূত করিয়াছিলাম যাহার গতি এরূপ ছিল যে, শুধু এক ভোর বেলায় এক মাসের পথ এবং শুধু এক বিকাল বেলায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।* আরও আমি প্রবাহিত করিয়াছিলাম তাঁহার জন্য বিগলিত তাম্রের খনি। আর জ্বিনদিগকেও তাঁহার অধীনস্থ করিয়াছিলাম; অনেকে তাঁহার জন্য পরওয়ারদেগারের আদেশে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত থাকিত। যে কেহ আমি আল্লাহর আদেশ লংঘন করিলে তাহাকে দোযখের শাস্তি ভোগাইব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۔

জ্বিনগণ ছোলায়মানের ইচ্ছা মোতাবেক বিভিন্ন জিনিস তৈরী করিত- বড় বড় দালান কোঠা তৈরী করিত, বিভিন্ন শিল্পকাজ করিত এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিরাট বিরাট পাত্র তৈরী করিয়া বসাইয়া রাখিত।

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۔ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۔

(দাউদ-পুত্র ছোলায়মানকে এইসব নেয়ামত দানের) আদেশ দিয়াছিলাম, হে দাউদ-পরিবার! (রাজত্বের মোহে আমাকে ভুলিও না;) আমার শুকর-গুজারি কার্যে মনোনিবেশ করিবে। সতর্ক থাকিও- আমার বান্দা হইয়াও আমার শোকর গুজারী কম লোকেই করে। (সূরা সাবা, পারা-২২ রুকু- ৮)

পাখীর ভাষা ও বুলি বুঝি বার শক্তি *

হযরত ছোলায়মানকে আল্লাহ তা'আলা আরও একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন যে, একটি মানুষ অপর মানুষের ভাষা যেইরূপে বুঝিয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত ছোলায়মান (আঃ) সমস্ত রকম পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন, উহাদের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইত। পবিত্র কোরআনে হইারও উল্লেখ রহিয়াছে-

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۔

ছোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইলেন; তিনি ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল! আমাকে পাখীর

* হযরত ছোলায়মান (আঃ) এবং প্রয়োজনে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত কোন বাহনের উপর আরোহণ করিতেন এবং বাতাস উহাকে বহন করিয়া চলিত এবং আদিষ্ট স্থানে নামাইয়া দিত।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে যেভাবে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহা দ্বারা বহন করার কাজ লওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক উন্নতরূপে আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত ছোলায়মান (আঃ) বাতাসের দ্বারা প্রয়োজনীয় বহন করার কাজ সমাধা করিতেন।

* পবিত্র কোরআনে শুধু পাখীর বুলি ও ভাষা বুঝিবার বিষয় উল্লেখ আছে, যেসব তফছীরকারদের মতে হযরত ছোলায়মানের আধিপত্য পশু জাতির উপরও ছিল তাহাদের মতে তিনি পাখী জাতির ন্যায় পশু জাতিরও ভাষা বুঝিয়া থাকিতেন। নিম্নে বর্ণিত পিপীলিকার ঘটনা ইহার প্রমাণ।

বুলি ও ভাষা বুঝিবার শক্তি দান করা হইয়াছে, আমার রাজত্বের প্রয়োজনীয় সব কিছু আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা আমার প্রতি আল্লাহর একটি সুস্পষ্ট কৃপা ও দান। (পারা-১৯, রুকু- ১৭)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হযরত ছোলায়মানের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারাও তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণিত হয়। নিম্নে ঐসব ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

পিপীলিকার ঘটনা

একবার হযরত ছোলায়মান কোন ভ্রমণ বা অভিযানের প্রস্তুতি করিলেন। সেমতে মানুষ, জ্বিন ও পাখী জাতির সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা হইল। জ্বিনদের দ্বারা ভারী কার্য সমাধা করা হইত এবং পাখীর দ্বারা সাধারণতঃ ছায়াদানের কাজ লওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন পাখীর দ্বারা আরও বিশেষ কাজ লওয়া হইত- যেমন, কোন পার্বত্য বা মরু অঞ্চলে পানির আবশ্যক হইল, "হুদ্ হুদ্- কাঠ-ঠোকরা" নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, ভূগর্ভে কোথায় কোন স্তরে পানির অস্তিত্ব আছে, তাহা ঐ শ্রেণীর পক্ষী নিজ অভিজ্ঞতায় অতি সহজেই সন্ধান লাভ করিতে পারে। অতএব ছোলায়মান (আঃ) ঐ পাখির দ্বারা পানির সন্ধান লইয়া জ্বিনদের দ্বারা ততায় মাটি খুঁড়িয়া পানি বাহির করিতেন।

সারকথা এই যে, বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রের সাহায্যে ব্যয়-বহুল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যে সব কার্য সামাধা করা হয় হযরত ছোলায়মান জ্বিন, পাখী ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজে সেইরূপ আবশ্যকাদি পূরণ করিতেন।

হযরত ছোলায়মানের বিরাট বাহিনী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহারা যেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল সেই পথেই সম্মুখভাগে একস্থানে একদল পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ছোলায়মান বাহিনী এই পথে এ স্থলে পৌছিবে এবং তাহাদের পদতলে পিপীলিকাগুলি নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, তাই দলপতি পিপীলিকাটি ঘোষণা দিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা সত্বর গুহায় প্রবেশ করিয়া যাও; ছোলায়মান বাহিনী দ্বারা যেন তোমরা পিষ্ট না হইয়া পড়।

হযরত ছোলায়মান নিকটেই পৌছিয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা বাতাস তাঁহার বশীভূত থাকায় তিনি ছোট আওয়াজ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাইতেন। পিপীলিকার সেই সতর্কবাণী সবকিছু তিনি শুনিলেন এবং উহা বুঝিতেও পারিলেন। সামান্য পিপীলিকার এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া হাসিয়া পড়িলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এত প্রশস্ত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার কথাবার্তা বুঝিতে সক্ষম হইলেন! এবং আল্লাহ তা'আলা যে, তাঁহাকে এত বড় বিশাল রাজত্ব দান করিয়াছেন- উহার উপর আল্লাহ তা'আলার শোকরগুজারী করার তওফিক এবং অধিক নেক কাজ করার তৌফিক চাহিয়া এই উপলক্ষে ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দরবারে আবেদন-নিবেদন করিলেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ-

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ - حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ -

একদা ছোলায়মানের (অভিযান প্রস্তুতি) উদ্দেশ্যে মানব, দানব ও পাখী জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইল। এত বড় বাহিনী ছিল যে, উহার অগ্র ও পশ্চাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। এই বিরাট বাহিনী একটি ময়দানের নিকটে পৌছিল; এই ময়দানে পিপীলিকার দল বাস করিত। ছোলায়মান বাহিনীর আগমন লক্ষ্য করিয়া একটি পিপীলিকা তাহার সঙ্গীদেরকে বলিল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ

গুহায় চলিয়া যাও, ছোলায়মান এবং তাঁহার বাহিনী তোমাদিগকে অজ্ঞাতে যেন পিষ্ট করিয়া না ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصَّٰلِحِينَ -

ছোলায়মান সেই পিপীলিকার কথায় হাসিয়া পড়িলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে বিশেষ মোনাজাত করিলেন– হে পরওয়ার দেগার! আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে যেসব বিশেষ নেয়ামত দান করিয়াছ উহার শোকর-গুজারী করার তৌফিক আমাকে দান কর এবং তোমার সন্তুষ্টি ভাজন নেক কাজ যেন করিতে পারি সেই তৌফিক দান কর এবং আমাকে নিজ করুণাবলে নেককার দলভুক্ত করিয়া রাখ।

(পারা–১৯, রুকু– ১৭)

শিক্ষণীয় বিষয়

শক্তি ও ক্ষমতার আধিক্য মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়, প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাআলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, মানুষকে অহঙ্কারী অত্যাচারী বানায়। ফেরাউন, শাদ্দাদ, কারূণ ও নমরূদ প্রমুখ লোকদের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট নজীর। এইসব মহা রোগের প্রতিষেধক এই যে, প্রথম হইতেই সকল শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতাকে আল্লাহ তা'আলার দান উপলব্ধি করতঃ আল্লাহর দিকে ঝুকিয়া থাকিবে। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের তরীকা সর্বদা ইহাই রহিয়াছে।

বিলকীস রাণীর ঘটনা

একদা হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহার কার্যরত বিভিন্ন জাতির সৈন্য-সামন্তদের, বিশেষতঃ পাখীদের তল্লাশি লইলেন। "হুদ্‌হুদ্– কাঠ ঠোকরা" পাখী– যাহা দ্বারা পানিহীন অঞ্চলে ভূগর্ভে পানির খোঁজ নেওয়া হইত উহাকে অনুপস্থিত দেখিলেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি ঐ পাখির প্রতি রাগান্বিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে হুদ্‌হুদ পাখী হাজির হইল এবং নতুন খবর হযরত ছোলায়মানকে জ্ঞাত করিল যে, আপনার অজ্ঞাতে এক স্থানে "সাবা" নামক এক গোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের শাসনকর্তা হইল এক রাণী, যাহার একটি বিরাট ও অতি মূল্যবান সিংহাসন আছে এবং তাহার আরও সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে। সেই রাণী এবং তাহার জাতি তাহারা সকলেই আল্লাহ তাআলার বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়া সূর্য পূজায় লিপ্ত। তাহারা সূর্যের সম্মুকেই মাথা নত করিয়া থাকে। শয়তান তাহাদিগকে আরও অনেক রকম গোমরাহীতে লিপ্ত রাখিয়াছে।

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, তোমার খবরের পরীক্ষা এখনই করিতেছি– দেখিব, তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া তিনি সেই রাণীর প্রতি একটি পত্র লিখিয়া উহা হুদহুদের হাওয়ালা করিলেন। তাহাকে আদেশ করিলেন, পত্রটি সেই রাণীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া তুমি দূরে সরিয়া অপেক্ষা করিবা এবং ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করিবা। হুদ্‌হুদ তাহাই করিল।

রাণীর নিকট যখন পত্র পৌছিল এবং তিনি উহা পাঠ করিলেন, তখন তিনি স্বীয় পরিষদ আহবান করিয়া পরিষদবর্গের নিকট বলিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে একটি পত্র আসিয়াছে যাহার মর্ম এই–

"বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" আমার মোকাবেলায় বাহাদুরী দেখাইও না, আমার পূর্ণ অনুগত হইয়া যাও" রাণী পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। পরিষবর্গ নিজেদের শক্তি-সামর্থের উল্লেখ করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীর উপর ন্যস্ত করিল।

রাণী বলিলেন, যুদ্ধের পরিণামে এক দেশে অপরদেশের বাদশাহ্ প্রবেশ করিলে সেই দেশের ধ্বংস অনিবার্য, সেই দেশের বড় বড় লোকগণ নিষ্পেষিত হয়– এই ধরনের বহু অঘটন ঘটিয়া থাকে, অতএব সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাইব। প্রথমতঃ আমি বিশ্ব-সম্রাট ছোলায়মানের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনস্বরূপ কিছু উপঢৌকন পাঠাইব; দেখি– উহার প্রতিউত্তর কি আসে।

হযরত ছোলায়মানের দরবারে যখন ঐ উপঢৌকন বহনকারীগণ পৌছিল, তিনি তাহাদের উপঢৌকনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার হুমকি দিলেন। তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে সমুদয় পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলিল। বুদ্ধিমতি রাণী পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে পারিয়া হযরত ছোলায়মানের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য স্বীকার করতঃ তাঁহার দরবারে হাজির হইবার জন্য সদলবলে রওয়ানা হইলেন। হযরত ছোলায়মান সব সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি রাণীকে প্রভাবান্বিত করার জন্য তাঁহার পৌছিবার পূর্বে দুইটি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। একটি এই যে, রাণীর যে বিশেষ সিংহাসনটি ছিল উহাকে হযরত ছোলায়মান কোন জ্বিনের দ্বারা বা স্বীয় বিশেষ বিদ্যা দ্বারা এক পলকের মধ্যে তাঁহার দেশ হইতে নিয়া আসিলেন এবং নিজের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা এই করিলেন যে, রাণীর থাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের শীশমহল তৈরী করিলেন। উহার মধ্যে একটি ঘর সুসজ্জিত করিলেন। অতপর সেই ঘরের সম্মুখে বড় একটি পানির হাউজ তৈরী করিলেন। পানি ও মাছ ভর্তি করিয়া হাউজটির মুখ মজবুত কাঁচ বা আয়নার দ্বারা আবৃত করিয়া দিলেন। পানির উপর কাঁচের আবরণ! আবরণ বলিয়া মনে হয় না এবং আবরণরূপে দেখাও যায় না। ইহাতে মনে হয়, ঐ সুসজ্জিত ঘরে যাইতে পানি অতিক্রম করিতে হইবে, বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং পানির উপর মজবুত কাঁচ রহিয়াছে যাহার উপরে শুষ্ক পথ।

রাণী হযরত ছোলায়মানের দরবারে পৌছিলেন। ছোলায়মান (আঃ) তথায় অবস্থিত সিংহাসনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সিংহাসনটি কি এই ধরনের? রাণী বলিলেন, আমার ত ধারণা হয় ইহা সেইটিই। আমরা পূর্বেই জানি, আপনি এই ধরনের অলৌকিক শক্তি রাখেন। অতপর রাণীকে তাঁহার জন্য প্রস্তুত শীশমহলে লইয়া যাওয়া হইল এবং সুসজ্জিত ঘরে যাইবার জন্য বলা হইল। সম্মুখে বিশেষরূপে তৈরী হাউজ রহিয়াছে। রাণী সাধারণ দৃষ্টিতে ভাবিলেন, বোধ হয় আরাম উপভোগের জন্য অল্প পানির উপর দিয়া যাওয়ার পথ করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি পায়ের গোছার উপরে কাপড় টানিয়া ধরিলেন। তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, পানির উপর কাঁচের আবরণ রহিয়াছে, পায়ে পানি লাগিবে না।

রাণী সব অবস্থা অনুধাবন করার পর স্বীকার করিলেন যে, আমি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেই নিজের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলাম। এখন আমি হযরত ছোলায়মানের হস্তে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলাম।* উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِىَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ۔

একদা ছোলায়মান হুদ্‌হুদ (কাট– ঠোকরা সদৃশ) পাখীকে অনুপস্থিত দেখিলেন। বলিলেন, হুদ্‌হুদকে দেখিতেছি না, সে কি উপস্থিত হয় নাই? তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব কিম্বা উহাকে জবাই করিয়া ফেলিব যদি না সে সুস্পষ্ট কারণ দর্শাইতে পারে। অল্প সময়েই হুদ্‌হুদ উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি এমন

* সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই যে, ঐ কুমারী রাণীর অনুরোধে হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহাকে পরিণীতারূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলাম।

বিষয়ের খোঁজ নিয়া আসিয়াছি যাহার খোঁজ আপনি রাখেন না– আমি "সাবা" গোত্রের দেশ হইতে একটি বাস্তব খবর লইয়া আসিয়াছি।

اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

আমি সেই দেশে দেখিয়াছি, এক রাণী সেই দেশের শাসনকর্ত্রী; তাহার সকল রকমের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে এবং অতি বড় বিশেষ একটি সিংহাসনও তাহার আছে।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَايَهْتَدُوْنَ ـ

সেই রাণী এবং তাহার জাতি সকলকেই দেখিয়াছি, আল্লাহকে ছাড়িয়া সূর্যের পূজা করে এবং শয়তান তাহাদের এই কার্যকেই উত্তম বুঝাইয়াছে; ফলে শয়তান তাহাদিগকে সৎপথ হইতে হটাইতে সক্ষম হইয়াছে; ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ـ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

তাহারা ঐ মহান আল্লাহর বন্দেগী ছাড়িয়া দিয়াছে যিনি (সকলের প্রতিপালনের জন্য) আসমানের গুপ্ত জিনিস (বৃষ্টির পানি) প্রকাশ (–বর্ষণ) করেন এবং যমীনেরও গুপ্ত জিনিস (উহার উদ্ভিদ) প্রকাশ করেন (জন্মাইয়া থাকেন।) তদ্রূপ তিনি সকলের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন; (কেয়ামতের তথা হিসাবের দিন সব প্রকাশ করিয়া দিবেন) এই আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ ও উপাস্য-পূজনীয়; তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য-পূজনীয় নাই, তিনি মহান আরশের মালিক।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ـ

হযরত ছোলায়মান বলিলেন, এখনই আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব, তুমি সত্য খবর বলিতেছ, না– মিথ্যা বলিতেছ। সেই রাণীর নিকট আমার এই পত্র লইয়া যাও এবং পত্রখানা তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া লক্ষ্য কর যে, তাহারা কি কথাবার্তা বলে।

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ـ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ

রাণী স্বীয় পরিষদবর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার নিকট একখানা বিশেষ মর্যাদাবান লিপি আসিয়াছে। লিপিখানা বিশ্ব-সম্রাট ছোলায়মানের তরফ হইতে আসিয়াছে। উহার মর্ম এই "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বিশেষ খবর এই যে, আমার মোকাবিলায় মাথা উঁচু করিও না, আমার অনুগত হও।

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْ اَمْرِىْ ـ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ـ

রাণী পরিষদবর্গকে বলিলেন, এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর, আমি ত তোমাদের উপস্থিতিতে পরামর্শ করা ছাড়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করি না।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ـ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ـ

পরিষদবর্গ বলিল, আমাদের জনবল ও অস্ত্রবল পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, অনুমতি প্রদান আপনার হাতে, সুতরাং কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা আপনিই ভাবিয়া ঠিক করুন।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

রাণী বলিলেন, (যুদ্ধ বিগ্রহের পরিণাম ভাল নহে, কারণ) রাজ-রাজাগণ কোন দেশ দখল করিলে পর তাহারা সেই দেশের পতন ঘটাইয়া দেয়; সেই দেশের বড় বড় লোকগণকে অপদস্ত করে– এই ধরনের আরও অনেক কিছু করে। পত্রলেখকগণের প্রতি প্রথমতঃ আমি কিছু উপঢৌকন পাঠাইতেছি; দেখি, আমার লোকজনেরা ইহার উত্তরে কি খবর নিয়া আসে।

فَلَمَّا جَاۤءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ ـ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ـ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ

উপঢৌকন বহনকারী দল যখন ছোলায়মানের দরবারে পৌঁছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ধন-দৌলতের দ্বারা আমার সহায়তা করিতে আসিয়াছ? আমাকে ত আল্লাহ তোমাদের অপেক্ষা অনেক দিয়াছেন। মনে হয়, তোমরা এই উপঢৌকনের দ্বারা নিজেদের গৌরব দেখাইতে আসিয়াছ! তোমরা যাও; তোমাদের লোকদেরকে খবর দাও, আমরা এত বড় বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণে আসিতেছি যেই বাহিনীর মোকাবিলার ক্ষমতা তাহাদের নাই; আমরা তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিব।

وَقَالَ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ـ

(অবশেষে রাণী আত্মসমর্পণরূপে ছোলায়মানের প্রতি যাত্রা করিলেন) ছোলায়মান (সংবাদ অবগত হইয়া) তাঁহার সকল জ্বিন জাতীয় অধীনস্থকে ডাকিয়া বলিলেন, রাণী আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে তাঁহার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছাইতে পারে কে? একটি শক্তিশালী জ্বিন বলিল, আপনি দরবার হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহাকে নিয়া আসিব– ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই; এই কার্য সমাধায় আমি সক্ষম ও বিশ্বস্ত।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ـ لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ـ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ـ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ـ

যাঁহার নিকট আল্লার কেতাবের বিশেষ এল্‌ম ছিল তিনি বলিলেন, আমি (তোর চেয়ে অধিক দ্রুত–) তোর চক্ষুর পলক মারার পূর্বে উহাকে নিয়া আসিতে সক্ষম হইব। (বাস্তবে তাহাই করা হইল;) ছোলায়মান যখন সেই সিংহাসনটি পলকের মধ্যে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন তখন বলিলেন, এই অসাধারণ কার্য একমাত্র আমার প্রভুর অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছে; ইহার পরিণাম হইল আমার পরীক্ষা যে, আমি প্রভুর কৃতজ্ঞ

থাকি, না অকৃতজ্ঞ হই? যে প্রভু-পরওয়ারদেগারের কৃতজ্ঞ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে সে নিজেই লাভবান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে অকৃতজ্ঞ (সে নিজেরই ক্ষতি করে।) নিশ্চয় আমার প্রভু অপ্রত্যাশী, সর্ব গুণাকর। ছোলায়মান (আঃ) ঐ সিংহাসনটির আংশিক রূপ পরিবর্তনের আদেশ দিলেন। বলিলেন, রাণী ইহাকে চিনিতে পারে কি-না, তাহা পরীক্ষা করিব (এবং জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিব)।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ - وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ -

রাণী ছোলায়মানের রাজ-প্রাসাদে পৌঁছিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসনটি কি এইরূপ? রাণী বলিলেন, মনে হয় যেন এইটা সেইটাই। (রাণী আরও বলিলেন,) এই আশ্চর্যজনক ঘটনার পূর্বেই আপনার নবুয়ত আমরা অবগত আছি; তখন হইতেই আমাদের আন্তরিক আনুগত্য রহিয়াছে।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ -

(আল্লাহ্ বলেন, পূর্ণ ঈমানের পথে) ঐ রাণীর জন্য এই বাধা ছিল যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করিত; সে কাফের দলভুক্ত ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ - فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا - قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ - قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অতপর রাণীকে বলা হইল, আরাম কক্ষে চলুন। কক্ষের বিশেষ পথকে দেখিয়া তিনি উহাকে পানিপূর্ণ ভাবিয়া (পানি হইতে কাপড় বাঁচাইবার জন্য) পায়ের গোছা হইতে কাপড় টানিলেন, তখন ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, ইহা ত কাঁচের তৈরী শীশমহলের আঙ্গিনা।

অবশেষে রাণী বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার হইতে দূরে থাকিয়া নিজেরই ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ছোলায়মানের দলভুক্তির ঘোষণা দিতেছি এবং আমি ঈমান আনিলাম সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি। (সূরা নমল, পারা-২০, রুকু- ৪৪)

রাণীর পরিচয় ও তাঁহার জাতির শিক্ষামূলক ইতিহাস

আলোচ্য ঘটনার রাণীর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত ইহাই যে, তাঁহার নাম ছিল "বিল্‌কীছ"। পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি "ছাবা" গোত্রীয় রাজ্যাধিকারিণী ছিলেন। ছাবা গোত্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহারা ইয়ামান দেশের অধিবাসী ছিল। ইয়ামানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী صنعا "সানা" হইতে প্রায় ৬০ মাইল পূর্বে অবস্থিত "মারিব্" অঞ্চল তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল।

হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তিনে। ভূগোল প্রসিদ্ধ ১৩১০ মাইল দৈর্ঘ্য লোহিত সাগরের শেষ প্রান্তের পরে ফিলিস্তিন অঞ্চল। আর আরব সাগর হইতে লোহিত সাগর প্রবাহিত হওয়ার তথা উভয়ের সংযোগ স্থলের পর্বূ উপকূলে ইয়ামান অঞ্চল। সুতরাং হযরত ছোলায়মানের কেন্দ্রীয় স্থল হইতে বিলকীছ রাণীর দেশ কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে ছিল।

ইয়ামান দেশে রাণীর গোত্র ছাবা জাতি দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ আরাম-আয়েশে ছিল। তাহাদের দেশের উন্নতির অছিলা ও বাহ্যিক সূত্র ছিল তাহাদের বিশেষ সেচ পরিকল্পন। (Water control & Irriagation development)

দেশের পার্বত্য অঞ্চলে সময়-অসময় বৃষ্টিপাত হইয়া বৃষ্টির পানি বিভিন্ন গিরিপথ বহিয়া একত্রিত অবস্থায় "মারেব" অঞ্চলের বিরাট উচু দুইটি পর্বতের মধ্যস্থল দিয়া আসিত। এইরূপে একত্রে অধিক পানি আসিবার কারণে দেশে প্লাবন হইত, আবার ঐ পানি কিছু অংশ মরুভূমিতে ছড়াইয়া এবং কিছু সমুদ্রে যাইয়া নিঃশেষ হইত, ফলে দ্বিতীয়বার প্লাবন না আসা পর্যন্ত পানিবিহীন অবস্থায় সারা দেশ মরুভূমি রূপ ধারণ করিয়া থাকিত। এইরূপে প্লাবন ও পানি শূন্যতার মধ্যে সারা বৎসর দেশের জায়গা-জমি উৎপাদন বিহীন থাকিত।

খৃস্টপূর্ব প্রায় ৮ম শতাব্দীতে "মারেব" অঞ্চলের উচু পাহাড়দ্বয়ের মধ্য ১৭০ ফুট দৈর্ঘ্যে, ৫০ ফুট প্রস্থ একটি বাঁধ নির্মিত হয় এবং বাঁধের মধ্যে ছোট ছোট দরওয়াজা রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন বাঁধের অভ্যন্তরে ডান ও বাম দিকে ছোট-বড়, নদী-নালা কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ সব দরওয়াজা ও নদী-নালার সাহায্যে সমগ্র দেশে সারা বছর আবশ্যকানুরূপ সেচ কার্য করা হইতে থাকিত।

এই সময়ে ঐ দেশে খাঁটি দ্বীন-ধর্ম এবং ঈমানেরও প্রসার হইয়াছিল। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিলকীছ রাণীর রাজত্বকাল ঐ সময়েই সাব্যস্ত হয়। যেহেতু রাণী ছিলেন, ছোলায়মান আলাইহিস্ সালামের সমসাময়িক; আর ছোলায়মান (আঃ) ছিলেন, খৃস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর এবং ছাবা গোত্রের উন্নতির উৎস বাঁধটিও খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে তৈরী হইয়াছিল।

রাণী বিলকীস হযরত ছোলায়মানের সাক্ষাতে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ স্বভাবতঃই রাজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ঐ দেশে খাঁটী দ্বীন-ধর্ম ও ঈমানের প্রভাব বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক।

অল্প দিনের মধ্যেই সারা দেশ বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ হইল এবং শস্য-শ্যামল হইয়া গেল। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে পর দেশবাসী বৈদেশিক বাণিজ্যের পথও প্রশস্ত করিতে থাকে। ইয়ামানের উত্তর-পশ্চিম দিক কম-বেশ ১৫০০ মাইল দূরে বিশেষ উন্নত দেশ সিরিয়া অবস্থিত এবং পূর্ব-উত্তর দিকে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে (বর্তমান ওমান রাজ্যের) "মছকট" প্রভৃতি উন্নত অঞ্চলসমূহ ছিল। সেই সব দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে "ছাবা" গোত্রীয় লোকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিল এবং ঐ সব দেশে যাতায়াতের জন্য বড় বড় মনোরম সড়ক তৈরী করিয়া নিল। সড়কের উভয় পার্শ্বে ফল-ফুলের বাগ-বাগিচা লাগাইয়া দিল এবং মাঝে মাঝে আরাম-আয়েশপূর্ণ হোটেল-রেস্তোঁরা এবং ছোট ছোট বস্তি-মহল্লা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। দেশবাসী এইরূপ আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া নিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের এই আরাম-আয়েশ ও উন্নতি ঊর্ধ্বগতিতে চলিতে লাগিল এবং তাহারা বেহেশতরূপ বাগ-বাগিচাময় দেশের সুখ-শান্তি ভোগ করিয়া যাইতে লাগিল।

ভোগ-বিলাসের পরিণতি স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে দীর্ঘকাল পরে তাহাদের বেলায়ও তাহাই ঘটিল; তাহারা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা মাবুদ বরহক্ আল্লাহ তাআলাকে ভুলিয়া তাঁহার নাফরমান হইয়া গেল, নবীগণের আদর্শের পরিপন্থী জীবন ধারায় পরিচালিত হইল। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব নামিয়া আসিল।

"মারেব" স্থিত যেই বাঁধের উপর তাহাদের সমুদয় ভোগ-বিলাস ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল, সম্ভবতঃ ৫৪২ খৃস্টাব্দে বড় বড় পাহাড়িয়া ইঁদুর ১৩০০ বছরের সেই প্রাচীন বাঁধে ছিদ্র করিয়া দিল। পানির প্রবল চাপে মুহূর্তের মধ্যে ছোট ছেট ছিদ্র বিরাট ফাটলে পরিণত হইল এবং বাঁধ ধ্বংস হইয়া গেল। ১৩০০ বছরের জমা পানি হঠাৎ দেশের উপর চড়াও হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিল– কোথায় সেই সুরম্য

অট্টালিকাসমূহ আর কোথায় সেই বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচা সমূহ? দীর্ঘ ১৩০০ বৎসর পার্বত্য অঞ্চলের আবদ্ধ পানির মধ্যে স্বভাবতঃ বা উপস্থিত আল্লাহ তা'আলার গযবের লীলাস্বরূপ সেই পানির মধ্যে এক প্রকার তেজস্ক্রিয়াও ছিল, যদ্দরুন অতি সহজেই প্লাবিত সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। দেশবাসীর মধ্যে যাহারা দৌড়াইয়া বা কোন আশ্রয়ে জান বাঁচাইল তাহারাও চিরতরে তাহাদের ভোগ-বিলাস হইতে বঞ্চিত হইল এবং বিভিন্ন দেশে পথের ভিখারীরূপে শরণার্থী হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

অতপর পানি কমিয়া গেল, কিন্তু সেই "মারেব" অঞ্চলে বেহেশতরূপী বাগ-বাগিচার চিহ্নও আর কেহ দেখিতে পাইল না। পরিপূর্ণ চরা মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গেল। কুল-কাঁটার ঝোপ, বাবলা কাঁটার গাছ ও বিশ্রী বিস্বাদ তিক্ত ফলধারী নানা প্রকার জংলী গাছপালা ব্যতীত অন্য সব কিছুর নাম-নিশানী তথা হইতে মুছিয়া গেল।

দীর্ঘ ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে বাহ্যিক কার্য-কারণ যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, মূলতঃ উহার ধ্বংস যে আল্লাহ তাআলার গযবস্বরূপ হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কোরআন রহিয়াছে।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ - كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ -

"ছাবা" জাতির জন্য তাহাদের আবাস ভূমিতে (আল্লাহর শোকর-গুজারীর কর্তব্য বহনের) নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তাহাদের সড়কসমূহের উভয়পার্শ্ব ফল-ফুলের বাগ-বাগিচাপূর্ণ ছিল। (এত এত নেয়ামতের সমাবেশ তাহাদিগকে বুঝাইতে ছিল,) স্বীয় প্রভু প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ কর আর তাঁহার শোকর গুজারী কর। একদিকে সুখ-শান্তির দেশ (অভাব-অনটনমুক্ত,) অপর দিকে প্রভু অতি ক্ষমাশালী; (কর্তব্য আদায়ে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিবেন)।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ - وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ -

তাহারা কর্তব্য পালন করিল না, ফলে আমি তাহাদের উপর বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন আনিয়া দিলাম এবং দেশের উভয় পার্শ্বের বাগ-বাগিচা ধ্বংস করিয়া ইহার স্থলে উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন বিশ্রী, বিস্বাদ জংলী ফল, বাবলা কাঁটা ও সামান্য কুল গাছের জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া দিলাম।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجٰزِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ -

এই প্রতিফল তাহাদেরই নাফরমানীর দরুন তাহাদের দিয়াছিলাম। এক মাত্র নাফরমান জাতিকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ - سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ - فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ -

(তাহাদের সুখের আরও ব্যবস্থা ছিল-) তাহাদের দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ উন্নত দেশ (তাহাদের বাণিজ্য স্থল "সিরিয়া" বা "মছকট") পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানে বস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়অ দিয়াছিলাম এবং পথিকদের সুযোগ-সুবিধার পরিমাপ লক্ষ্য রাখিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, যেন তাহারা দিবারাত্র নির্ভয়ে শান্তির সহিত ভ্রমণ করিতে পারে। (অবস্থা দৃষ্টে মনে হইত, যেন) তাহারা বলিতেছে, প্রভু হে! আমাদের ভ্রমণকে দূরপাল্লার করিয়া দিন। (অর্থাৎ তাহারা যেন এইসব সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তিকে

কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবর্তন করিয়া লইতে চায়। নতুবা এত এত নেয়ামত দানকারী প্রভুর নাফরমান তাহারা কিরূপে হইল? তাহারা আমার নাফরমান সাজিয়া) নিজেদের ক্ষতিসাধন করিল। ফলে আমি তাহাদেরকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং সেই দেশকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বহু উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য। (পারা- ২২, রুকু-৮)

হযরত ছোলায়মানের দুইটি বিশেষ ঘটনা

প্রথম ঘটনা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন প্রচার এবং দ্বীনের জন্য জেহাদের উদ্দেশ্যে ছোলায়মান (আঃ) বহু সংখ্যক ঘোড়া পুষিতেন। একদা বৈকাল বেলা তিনি ঐ ঘোড়াগুলি পরিদর্শনে গেলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে ঐ সময়টি কোন এক ফরয এবাদতের সময় ছিল, (যেরূপ আমাদের জন্য ঐ সময়টি আছর নামাযের সময়)। ছোলায়মান (আঃ) ঘোড়া পরিদর্শনে এত অধিক মগ্ন রহিলেন যে, ঐ এবাদত আদায়ের কথা ভুলিয়া গেলেন; তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন- এইরূপ কেহ সাহস করিল না; এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গেল।

অতপর হঠাৎ হযরত ছোলায়মানের চৈতন্য আসিল, কিন্তু তখন সেই এবাদত আদায়ের সময় নাই। ইহাতে ছোলায়মান (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘোড়াগুলি আল্লাহর নামে জবেহ করিয়া ফকির মিছকিনদের দান করিয়া দিলেন। তাঁহার শরীয়তে ঘোড়ার গোশত হালাল ছিল। আমাদের মধ্যেও হানাফী মাযহাব ভিন্ন অন্য ইমামদের মতে ঘোড়ার গোশত হালাল।

আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি পেয়ারা বান্দাদের একটি সাধারণ রীতি এই যে, দুনিয়ার যে কোন বস্তু স্বীয় মা'বুদকে ভুলাইয়া দেয় সেই বস্তুকেই মা'বুদের নামে খরচ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সংযত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ বাতাস, জ্বিন ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত ছোলায়মানের অধীনস্থ করার পূর্বে একদা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলার দরুন সোলায়মান (আঃ) স্বীয় সৈন্য-সামন্তের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদের ব্যাপারে অবহেলাকে বরদাশত করিতে না পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশপূর্বক নিজস্ব লোকজন দ্বারা সৈন্য বাহিনী গঠনে সচেষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা কল্পে তিনি বলিলেন, আমি আজ আমার সত্তরজন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করিব; যেন তাহাদের গর্ভে সত্তর জন মোজাহেদ সৈনিক জন্ম লাভ করে।

এ স্থলে হযরত ছোলায়মানের একটু ত্রুটি হইল যে, তাঁহার সঙ্গমে সত্তরটি ছেলে সন্তান লাভ করিবে কথাটি তিনি নির্ধারিতরূপে বলিলেন; অথচ ইহা নিছক আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। সুতরাং কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করিয়া বলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন, এমনকি তাঁহার সঙ্গী নেক-পরামর্শদাতা ফেরেশতা তাঁহাকে এ সম্পর্কে চৈতন্য করিলেন, কিন্তু ক্ষোভ ও ক্রোধের সময় উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল না। হযরত ছোলায়মানকে এই ত্রুটির ফল ভোগ করিতে হইল। সত্তর জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম হইল, কিন্তু তন্মধ্যে শুধুমাত্র একজন গর্ভবতী হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার গর্ভে একটি অপূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম নিল। ধাত্রী ঐ সন্তানটিকে হযরত ছোলায়মানের তখতের উপর তাঁহার সম্মুখে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভঙ্গিমায় রাখিয়া দিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত ছোলায়মান পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে কথা বলার পরিণামে আমার ভাগ্যে এই ঘটিয়াছে; তৎক্ষণাৎ হযরত ছোলায়মান (আঃ) আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিতে অপ্রতিহত শক্তি স্বরূপ এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দরখাস্ত আল্লাহর দরবারে পেশ করিলেন যাহা সর্বোপরি ও সর্বোচ্চ হয়; কোন শক্তি যেন তাঁহার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে না পারে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দরখাস্ত আশাতীতরূপে মঞ্জুর করিলেন এবং বাতাস, জিন ইত্যাদি শক্তিসমূকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন।

নবীগণ মনুষ জাতির অন্তর্গতই হইয়া থাকেন, সুতরাং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ভুল-চুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহাদের দ্বারাও সংঘটিত হইয়া থাকে। নবী ও নবীর পথ অবলম্বনকারী নেককারগণ ভুল-ত্রুটিতে পতিত হন বটে, কিন্তু অতি সামান্য তাম্বিহ্ ও ইঙ্গিতের দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সতর্ক হইয়া যান, তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তাঁহারা নিজের সংশোধন করিয়া নেন এবং নূতনভাবে পূর্ণরূপে প্রভুপানে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেন। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের দলের সাথী তাহাদের অবস্থা হয় উহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা বিনা দ্বিধায় গোনাহের ও আল্লাহদ্রোহিতার পথ বাহিয়া যাইতে থাকে, তাহারা অপর পথের দিকে তাকায়ও না। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটি বিবরণ বিশেষ আকর্ষণীয়।

اِنَّ اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ - وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ খোদাভীরু লোকদের স্বাভাব এই যে, শয়তানের কারসাজির দরুন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব তাঁহাদের উপর প্রবর্তিত হইল তাঁহারা হুশিয়ার হইয়া যান– সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে চেতনাবোধ আসিয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহারা শয়তানের পথের পথিক, শয়তান তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিতে থাকে এবং তাহারাও বিনা দ্বিধায় সেই পথ বাহিয়াই চলিতে থাকে, ঐ পথ ত্যাগ করিতে মোটেও সচেষ্ট হয় না। (পারা-৯, রুকু- ১৪)

সারকথা এই যে, ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বিষয়। ভাল-মন্দ উভয় দলের পক্ষেই উহা সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভাল মন্দের পার্থক্য হয় দ্বিতীয় ধাপে। নেককার লোকগণ সর্বদা সতর্ক থাকার দরুন প্রথমতঃ ভুলটা সহজেই ধরা পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার সংশোধনের জন্য তাঁহারা পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আর বদকার লোকগণ গাফলত ও অসতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে, সুতরাং ভুলটা তাহাদের চোখে ধরা পড়ে না; ধরা পড়িলেও অনেক বিলম্বে, তদুপরি ভুল ধরা পড়ার পরেও তাহারা দেখিয়া না দেখার ভানে অচৈতন্যরূপে ঐ ভুলের উপরই চলিয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় অবস্থা মানুষের জন্য ধ্বংসকারী। বোখারী শরীফেরই হাদীছে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করিলে (সে অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়–) সে যেন একটি পাহাড়ের নীচে আছে এবং পাহাড়টি যে কোন মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়ার আশঙ্কা করিতেছে পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গোনাহ্ করিয়া গোনাহ্কে অতি হালকা মনে করে, উহা যেন একটি মাছি– নাকের সম্মুখে উড়িতেছে, উহাকে সে হাতের ইশারা দিয়া খেদাইয়া দিতে সক্ষম।

গোনাহ্ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া তথা তওবা-এস্তেগফারের সহিত প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রভুকে রাজি করিতে সচেষ্ট হওয়া– ইহাই হইল খাঁটি মোমেনের কাজ এবং ইহার দ্বারা অধিক নৈকট্য লাভ হয়। হাদীছ– كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ -

"মানুষ মাত্রই খাতা-কছুর, ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া থাকে, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন করে তাহারাই হইল উত্তম।" (তিরমিযী শরীফ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) উল্লিখিত উভয় ঘটনার মধ্যেই এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ঘটনা দুইটির বিবরণ এই–

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ - اِنَّهٗ اَوَّابٌ - اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ - فَقَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - رُدُّوْهَا عَلَىَّ

ـ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّايَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ـ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ـ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ـ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ـ

অনুবাদ ঃ আমি দাউদের জন্য দান করিয়াছিলাম ছোলায়মানকে। তিনি আমার উত্তম বান্দা ছিলেন, প্রভুপানে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। (তাঁহার প্রভুভক্তির নমুনা-) একদা বৈকালে তাঁহার পরিদর্শনে একদল উত্তম ঘোড়া উপস্থিত করা হইয়াছিল; (উহা পরিদর্শনে তখনকার এবাদতের কথা ভুলিয়া গেলেন।) অতপর (সচেতন হইয়া) অনুতাপ করিয়া বলিলেন, আমার প্রভুর স্মরণ হইতে সরিয়া সম্পদের মায়া-মহব্বতে মগ্ন হইলাম, এমনকি (নির্ধারিত এবাদতের সময় শেষ হইয়া) সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে! এখনই ঐ ঘোড়াগুলি আমার নিকট পুনঃ উপস্থিত কর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (আল্লাহর নামে কোরবানী রূপে) ঘোড়াগুলির গলা ও পায়ের রগ কাটিতে লাগিলেন।

অপর এক ঘটনায় আমি ছোলাময়ানকে কর্মফল ভোগের সন্মুখীন করিয়াছিলাম যে, তাঁহার সিংহাসনের উপর (তাঁহার সম্মুখে) একটি অকর্মা অর্দ্ধাঙ্গ দেহ (ধাত্রীর মার্ফত) রাখিয়া দিয়াছলাম (যদ্বারা তাঁহার একটি কথা ব্যর্থ ইয়াছিল।) তারপর তিনি স্বীয় প্রভু ভক্তির কর্তব্য আদায়ে বলিয়াছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং (আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) আমাকে অপ্রতিহত রাজকীয় শক্তি দান করুন, যাহা আমি ভিন্ন কাহারও লাভ না হয়; আপনি একমাত্র দাতা। ফলে আমি বাতাসকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলাম; বাতাস তাঁহার আদেশে তাঁহাকে বহন করিয়া) আরামদায়করূপে চলিত। তাঁহার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত। আরও- জিন জাতিকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম যাহারা সব রকম কঠিন নির্মাণ কার্য এবং (মণিমুক্তা আহরণে) ডুবুরীর কাজ করিত। কার্যে অবহেলাকারী শাস্তি ভোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত। আমি (আল্লাহ) ছোলায়মানকে বলিয়াছিলাম, আমার এইসব নেয়ামত তোমার জন্য; তুমি অন্যকেও দান কর বা একা নিজেই বে-হিসাব ভোগ কর। হে বিশ্বাসী! নিশ্চয় ছোলায়মানের জন্য আমার বিশেষ নৈকট্য এবং অতি উত্তম পরিণাম নির্ধারিত রহিয়াছে। (২৩-১২)

১৬৫০। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত দাউদের পুত্র ছোলায়মান একদা ঘোষণা করিলেন, (আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ উদ্দেশ্যে নিজস্ব বাহিনী গঠন প্রচেষ্টায়) আমি আজ একই রাত্রে স্বীয় নব্বইজন* স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিব; যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে যেন এক একজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিবে- যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে। সঙ্গী ফেরেশতা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, (আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর ও ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য) "ইনশাআল্লাহ" বলুন। কিন্তু তখন সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল না। পরিণাম এই হইল যে, তিনি স্ত্রীগণের সহিত সঙ্গম করিলেন, কিন্তু কোন স্ত্রীই গর্ভধারণ করিল না, শুধুমাত্র একজন স্ত্রী অপূর্ণাঙ্গ একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করিল।

অতপর নবী (সঃ) বলিলেন, ছোলায়মান (আঃ) যদি তখন "ইনশাআল্লাহ" বলিতেন, তবে অবশ্যই নব্বইজন স্ত্রীর গর্ভে নব্বইজন বীর মোজাহেদ জন্ম লাভ করিত এবং তাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে সক্ষম হইত।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা বায়ু-বাতাস, দেও-জ্বিন ইত্যাদি মহাশক্তি সমূহকে তখনও হযরত ছোলায়মানের করতলগত করেন নাই- একদা তিনি আল্লাহর দ্বীনের জিহাদে সৈন্যদের মধ্যে শিথিলতা

দেখিয়া দুঃখিত ও ক্ষিপ্ত হইলেন।

প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হইল– তাহার পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার দ্বীনকে জারি করা ও জারি রাখার জন্য সর্বপ্রথম নিজের যথাসর্বস্ব এবং সর্বাত্মক চেষ্টা তদবীর ব্যয় করা। এই হিসাবে ছোলায়মান (আঃ) সৈন্য বাহিনীর শৈথিল্য দৃষ্টে নিজ কর্তব্য পালনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজস্ব বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করার ব্যাপারে শৈথিল্য দৃষ্টে দুঃখে ও ক্ষোভে জর্জরিত হযরত ছোলায়মান স্বীয় ঘোষণার মধ্যে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য "ইনশাআল্লাহ" বলিতে ভুলিয়া গেলেন। ব্যাপারটা সামান্য ও স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল; তাঁহার চুল পরিমাণ ত্রুটি আল্লাহর দরবারে পাহাড় তুল্য গণ্য হইল এবং আগামীর জন্য সতর্ককরণে আল্লাহ তাঁহাকে ভুলের মাসুল ভোগের সম্মুখীন করিলেন– তাঁহার ঘোষণাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

ছোলায়মান (আঃ) স্বীয় ঘোষণার ব্যর্থতা দৃষ্টে নিজ-ত্রুটি স্মরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়িলেন এবং আল্লাহর তায়ালার নিকট অপ্রতিহত রাজশক্তি লাভের দরখাস্ত করিলেন, যেন আল্লাহর দ্বীন জারী করিতে কোন বাধা থাকিতে না পারে। অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীন জারী করার জন্য হযরত ছোলায়মানের সাধনা, এখলাছ দৃঢ় নিয়্যত এবং সর্বসাধ্যে প্রচেষ্টা দৃষ্টে তাঁহাকে সেইরূপ শক্তি দান করিলেন– দেও, জ্বীন, বাতাস প্রভৃতি মহাশক্তিসমূকে তাঁহার করতলগত করিয়া দিলেন।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর এক আশ্চর্য ঘটনা

ছোলায়মান (আঃ) বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করিতেছিলেন, এখনও নির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই এমতাবস্থায় হযরত ছোলায়মানের জন্য নির্ধারিত মৃত্যু-সময় নিকটবর্তী হইল এবং তিনি তাহা অবগত হইলেন। মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল একদল জ্বিন, যাহারা সাধারণতঃ দুষ্ট ও দুর্ধর্ষ হয়; কোন রকম জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়া কাহারও আয়ত্বে থাকিয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসহনীয়। এস্থলে হযরত ছোলায়মানের খোদা-প্রদত্ত শক্তির প্রভাব তাহাদিগকে পদানত ও কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল।

মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বেই যখন হযরত ছোলায়মান তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি আশঙ্কা করিলেন, এই অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ধর্ষ জিনগণ কার্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, মসজিদ নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। এদিকে মৃত্যুর নির্ধারিত সময় অনড় ও অটল, এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হইতে পারে না।

ছোলায়মান আলাইহিচ্ছলামের নীতি ছিল, তিনি নির্জন কক্ষে একাধারে দীর্ঘ দিন আল্লাহর এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, লোকদের মেলামেশা ত্যাগ করিয়া থাকিতেন, কিন্তু সকলের উপর তাঁহার যে, ভয়ানক প্রভাব ছিল উহার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত কাজ-কর্ম সঠিকরূপে চলিত, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হইত না।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেলে তিনি তাঁহার পূর্ব প্রচলিত প্রথার দ্বারা কাজ নেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার রীতি অনুযায়ী একটি নির্জন কক্ষে এবাদত ও আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হইলেন। এইবার যেহেতু মৃত্যুর সম্মুখীন, তাই তিনি একটি লাঠির উপ এরূপ ভর করিয়া রহিলেন যেন মৃত্যু ঘটার পরও তাঁহার দেহ মাটিতে না পড়িয়া স্থির থাকে। নিজে এই ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্বক আল্লাহ তাআলার দরবারেও দোয়া করিলেন যে, বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদের নির্মাণকার্য যেন পূর্ণরূপে সমাধা হয়।

নির্ধারিত সময়ে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়া গেল, কিন্তু তিনি নির্জন কক্ষে এবাদতে মশগুল আছেন বলিয়াই সকলের ধারণা, তাই কেহ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিল না এবং সকলেই নিজ নিজ কার্যে নিয়োজিত থাকিল।

* পূর্বে ৭০ সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু নব্বই সংখ্যার মতামতই অগ্রগণ্য।

সমস্ত নবীগণেরই বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মৃত দেহের উপর কোন প্রকার বার্তন আবর্তন ঘটে না। তাই হযরত ছোলায়মানের দেহ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থির রহিয়া গেল। সকলেই তাঁহাকে পূর্ব প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জীবিত এবং এবাদত ও ধ্যানে মশগুল ভাবিয়া কাজ-কর্ম চালাইয়া যাইতে লাগিল। দুর্ধর্ষ জ্বিন যাহারা মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল তাহারাও দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাইতেছিল। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, এদিকে হযরত ছোলায়মানের লাঠি যাহার প্রতিরোধে তাঁহার মৃত দেহ স্থিতাবস্থায় ছিল সেই লাঠিতে ঘুণ-পোকা লাগিয়া উহা খাইতে আরম্ভ করিল।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতে এক দিকে মসজিদের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইল, অপর দিকে ঘুণ-পোকার দরুন লাঠির প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল; লাঠি ভাঙ্গিয়া হযরত ছোলায়মানের মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়াছে এবং লাঠির উপর ঘুণ-পোকার ক্রিয়া-কার্যের অবস্থা দৃষ্টে সকলেই অনুভব করিল যে, অদ্য হইতে বহুদিন পূর্বেই হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু আলেমুল-গায়েব আল্লাহ ভিন্ন কেহ তাঁহার মৃত্যু জ্ঞাত হইতে পারে নাই।

আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক একটা লীলার দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সমাধা হইয়া যায়। এখানেও এই লীলার মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়াও একটি জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইল। জ্বিনদের সম্পর্কে সাধারণ লোকদের এবং জ্বিনদের নিজেদেরও ধারণা ছিল– তাহারা গায়েবী খবরাখবর অবগত থাকে। আলোচ্য ঘটনায় এই অমূলক ধারণার অসাড়তা প্রমাণিত হইল। জিনগণ যদি গায়েবী খবর অবগতই থাকিত, তবে তাহাদের চোখের সম্মুখে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর ঘটনা অজ্ঞাত থাকিতে পারিত না এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হযরত ছোলায়মানের দরুন তাহারা যে সব কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিল সেই সব পরিশ্রমে তাহারা নিয়োজিত থাকিত না। উল্লিখিত বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ـ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ـ

অনুবাদ ঃ আমি নির্ধারিত সময়ে ছোলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম, (এমন সুকৌশলে যে, তাঁহার মৃত্যু কাহারও অনুভূতই হইল না) একমাত্র ঘুন-পোকাই তাঁহার লাঠি খাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার মৃত্যু অগত করিল। (ঘুণ-পোকার লাঠি খাওয়ায়) যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন (কার্যে নিয়োজিত) জ্বিনগণ (তাঁহার সম্পর্কে অবগত হইল যে, তিনি ত বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন এবং) বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহারা গায়েবের খবর জানিত তবে এতদিন এই কষ্টদায়ক পরিশ্রমে তাহাদের আবদ্ধ থাকিতে হইত না।

(পারা– ২২, রুকু– ৮)

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ মৃত্যু যে নির্ধারিত সময় হইতে একটুও টলে না উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে উহারই একটি বিশেষ নজীর দেখান হইয়াছে। ছোলায়মান আলাইহিস্ সালামের ন্যায় ব্যক্তি যিনি একদিকে ছিলেন বিশিষ্ট নবী, অন্য দিকে বিশ্ব-অধিপতি যাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি ছিল অসাধারণ। সেই ছোলায়মান (আঃ) শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকে উহার নির্দিষ্ট সময় হইতে হটাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অটল অনড় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন।

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ....

"প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই সময় উপস্থিত হইলে একটুও আগ-পাছ করার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না।।" (পারা–১১, রুকু– ১০)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত ছোলায়মান আলাইহিচ্ছলামের যে অতুলনীয় ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজত্ব

হাসিল ছিল তাহার একমাত্র সূত্র ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁআলার বিশেষ দান। যহার বিবরণ পূর্বালোচিত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমুহের অনেক স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহুদিদের মধ্যে এই সম্পর্কে একটা মিথ্যা ভিত্তিহীন ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, হযরত ছোলায়মান (আঃ) যাদু-বিদ্যার সাহায্যে এই অসাধারণ শক্তি, সামর্থ ও রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণা ও বিশ্বাস ইহুদিদের মধ্যে অতি পরিপক্ক ও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছিল, এমনকি ইহারই ফলে তাহারা নিজেদের ধর্মীয় কেতাব আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত আসমানী কেতাবকে পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যাদু বিদ্যা শিক্ষায় লিপ্ত হইয়াছিল।

পবিত্র কোরআনের ১ম পারা- ১২ রুকুর সুদীর্ঘ বিবরণে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উক্ত ধারণার অসাড়তা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাদু- যাহা কুফুরী কাজ উহার সঙ্গে হযরত ছোলায়মানের কোনই সংশ্রব ছিল না।

দুনিয়া পরীক্ষার স্থল- ভাল এবং মন্দ, হালাল এবং হারাম, ঈমানের জিনিস, কুফরের জিনিস উভয়কেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই পরীক্ষার স্থানে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ভাল তাহারা ভালকে অবলম্বন করিয়া কতৃকার্য হয়, পক্ষান্তরে যাহারা মন্দ তাহারা মন্দকে অবলম্বন করিয়া জাহান্নামের খোরাক হয়।

হক্ক ও সত্যকে বাছিয়া লইয়া উহাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করার পরীক্ষাকল্পে আল্লাহ তা'আলা যাদু-বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। শয়তানরা মানব জাতিকে হক্ক ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে মানবকে ঐ যাদু শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে।

হযরত ছোলায়মানের আমলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ লাভের জন্য শয়তান শ্রেণীর জিনগণ ঐ যাদু-বিদ্যার বিশেষ প্রচার ও চর্চা করিতে থাকে; এমনকি শয়তানের দলবলরা বই পুস্তক আকারে যাদু-বিদ্যা প্রচার করিতে থাকে। হযরত ছোলায়মান যথারীতি এই শয়তানী কার্যেরও প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হযরত ছোলায়মান যাদু-বিদ্যার সমস্ত বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া যথাসাধ্য ঐসবকে সংগ্রহ করতঃ সমস্ত বই পুস্তকগুলিকে স্বীয় কক্ষে সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কেহ উহাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে সাহসীই না হয়। কিন্তু হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর পর জ্বিন-শয়তানের দলেরা ব্যাপক প্রচার চালাইল যে, হযরত ছোলায়মানের অসাধারণ রাজত্ব একমাত্র যাদু-বিদ্যার সাহায্যেই ছিল। এমনকি লুক্কায়িত বই-পুস্তকগুলির অবশিষ্টাংশও বাহির করিয়া লোকদের মধ্যে মিথ্যা প্রচারণা চালাইল যে, এই দেখ ছোলায়মানের সিংহাসনের নীচে তিলিসমতি যাদুর বই-পুস্তক রহিয়াছে, যাহার বলে তিনি জ্বিন-পরী, দেও-ভুত, পশু-পক্ষী ও বাতাস ইত্যাদি করতলগত করিয়াছিলেন।

জ্বিন ও শয়তানের এই মিথ্যা প্রচারণা এবং হারাম ও কুফরী যাদু-বিদ্যা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে বিশেষ ব্যবস্থাও প্রেরিত হইয়াছিল, যাহা হারুত ও মারুতের ঘটনারূপে পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়া পরীক্ষার স্থল- এক শ্রেণীর লোক সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া জিন ও শয়তানের প্রচারণার উপরই বিশ্বাসী রহিল এবং যাদু-বিদ্যার পিছনে পড়িয়া রহিল। ইহাই ইহল মূল সূত্র ইহুদিদের এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার যে, ছোলায়মান (আঃ) যাদু জানিতেন, যাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার সবকিছু হাসিল করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এই মিথ্যা ও গর্হিত ধারণার বিরুদ্ধেই পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত বিবৃতির মধ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছেন-

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۔

"কুফরী কাজ (যাদু-বিদ্যাকে) ছোলায়মান কখনও (অবলম্বন) করেন নাই, বস্তুতঃ শয়তানরাই ঐ কুফরী (যাদু-বিদ্যার) কাজ করিয়াছিল; তাহারাই লোকদিগকে যাদুবিদ্যা শিখাইতেছিল।

হযরত লোকমান

পবিত্র কোরআনে "সূরা লোকমান" নামে একটি সূরা আছে এবং সেই ছুরার মধ্যে "লোকমান" নামীয় এক ব্যক্তির স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত কতিপয় মহৎ সদুপদেশ বিশ্ব-মানবের জন্য বিশেষ নজির স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুজ্ঞানী সুপন্ডিত হিসাবে "লোকমান হাকীম" নাম সচরাচর সাধারণেও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি যে, একজন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাও সর্ববিদিত। এমনকি তাঁহার সদুপদেশাবলী সম্বলিত صد پند لقمان ছদপান্দ লোকমান" অর্থাৎ লোকমানের এক শত উপদেশ পুস্তিকাটি সাধারণের প্রচলিত আছে।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নাম হিসাবে এই নামের তাহ্‌কীক এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কাহারও মত এই যে, হযরত লোকমান স্বয়ং যুগের নবী বা পয়গাম্বর ছিলেন, কিন্তু এই মতামত অতি দুর্বল; ইহার উপর কোন প্রমাণ নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও আলেমের মত এই যে, "লোকমান" নবী ও পয়গাম্বর ছিলেন না; তিনি একজন খোদাভক্ত পরহেজগার বড় বুজুর্গ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।

লোকমান নামের অনেক লোকই ভূপৃষ্ঠে আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতে একাধিক ব্যক্তি এমনও হইয়াছিলেন, যাহারা পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ স্থল আরবে এবং বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইজন। একজন ছিলেন খৃষ্টপূর্ব এয়োদশ শতাব্দীতে হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম পয়গাম্বরের বংশধর আ'দ জাতির মধ্যে; তিনি ছিলেন একজন অতি মহৎ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দ্বিতীয় জনও অতি মহৎ সুজ্ঞানী, সুপন্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব ১০ম শতাব্দীর পয়গাম্বর হযরত দাউদের যুগে কাজী তথা প্রধান বিচাপতির পদে মনোনীত ছিলেন। (কাছাছোল কোরআন ২-৩৮)

আমাদের আলোচ্য এবং পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত "লোকমান" কে ছিলেন সে সম্পর্কে উল্লিখিত দুইজন সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে দ্বিতীয় জন, কিন্তু অগ্রগণ্য মত ইহাই যে, প্রথমোক্ত লোকমানই পবিত্র কোরআনে আলোচিত লোকমান এবং তিনিই "লোকমান হাকীম" নামে সর্বপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত লোকমান হাকীমের আলোচনা নিম্নরূপ–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ - وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ -

নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে সৎ, সূক্ষ্ম ও পরিপক্ক জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। তাহাকে আদেশ করিলাম, (আমার এই বৃহৎ দানের কৃতজ্ঞতায় তুমি আল্লাহর শোকর আদায় কর। (ইহা বাস্তব কথা) যে কেহ আল্লাহ তা'আলার শোকর-গুজারী করিবে সে বস্তুতঃ নিজের উপকারার্থেই শোকর-গুজারী করিবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কুফুরী করে (তবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অপ্রত্যাশী, স্বয়ং প্রশংসিত।

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَىَّ الْمَصِيْرُ - وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا - وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

(লোকমানের পরিপক্ক জ্ঞানের পরিচয় হয়) যখন লোকমান তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন (১) হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেকী কাজ বড় অন্যায়, মহাপাপ। (আল্লাহ বলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হক্কের ন্যায়) আমি মানুষকে তাহার (জন্মদাতা) মাতাপিতার হক্ক আদায় করিতেও বিশেষ তাকীদ করিয়াছি। তাহার মাতা তাহার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছে! মাতা তাহাকে পেটে রাখিয়া তাহার বোঝা বহন করিয়াছে– দিন দিন দুর্বলতার উপর দুর্বলতার মধ্যে। তারপর কোলে-কাঁধে রাখিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছে; দুগ্ধ ছাড়াইতেও দুই বৎসর কাটিয়াছে। সুতরাং আমি মানুষকে আদেশ করিয়াছি, আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার শোকর আদায় কর; (আদেশ লংঘন করিও না) আমার নিকট ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অবশ্য যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে বাধ্য করে আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করার, যাহা প্রমাণহীন ও জ্ঞানহীনতার কথা, তবে তাহাদের কথা মানিবে না। হাঁ দুনিয়াতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বজায় রাখিবে। (আখেরাতের ব্যাপারে) আমার প্রতি ধাবমান লোকেরই অনুসরণ করিবে। (দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী) অতপর তোমাদিগকে আমার প্রতি ফিরিয়া আসিতেই হইবে; তখন আমি তোমাদের কার্যকলাপের হিসাব দেখাইব এবং কর্মফল প্রদান করিব।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

(২) হে বৎস! মানুষের সমুদয় কার্যাবলীই আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত থাকেন, এমনকি মানুষের কোন খাছলাত যদি সরিষা পরিমাণ সূক্ষ্মও হয় এবং উহা কোন পাথরের (তথা কোন Strong Room-এর) ভিতর প্রকাশ পায়, কিম্বা সপ্ত আকাশের কোন নিভৃত কোণে বা ভূগর্ভের অন্ধকারে প্রকাশ পায় (আল্লাহর নিকট উহারও হিসাব থাকিবে, কেয়ামতের দিন হিসাবের সময়) তিনি উহা উপস্থিত করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্ম জ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

(৩) হে বৎস! নামাযকে পূর্ণাঙ্গ অতি উত্তমরূপে আদায় ও প্রতিষ্ঠিত করিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করিবে এবং (এই পথে) যত রকমের বিপদাপদ তোমার উপর আসে উহার উপর ধৈর্যধারণ করিবে; নিশ্চয় ইহা হইতেছে প্রকৃত সাহসিকতার কাজ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

(৪-৫) গর্ব ও অহঙ্কারে মাতিয়া লোকদের হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে না এবং যমিনের উপর দাপট ও দর্পের সহিত চলিবে না; (এইসব অহঙ্কারের নিশান)। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন অহঙ্কারী গর্বকারীকেই পছন্দ করেন না– আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ـ

(৬-৭) আর পথ চলাকালে (বাচালতার পরিচায়ক ছুটাছুটি বা গর্ব ও অহঙ্কারের পরিচায়ক ক্ষীণ গতির) মধ্যবর্তী চলন অবলম্বন করিবে এবং কথা বলাকালে কোমল স্বরে কথা বলিবে; (চেঁচাইবে না) নিশ্চয়ই গাধার আওয়াজ সর্বাধিক ঘৃণিত আওয়াজ। (যেহেতু গাধা চেঁচাইয়া আওয়াজ করে।)

(সূরা লোকমান ঃ পারা–২১. রুকু– ১১)

উক্ত আয়াতে জানা গেল, মহাজ্ঞানী লেকমান হাকীমের সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শরীক করা অতি বড় মহাপাপ ও অন্যায়। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এক উক্তিতে লোকমান হাকীমের সেই অভিমতের প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হাদীছটি এই-

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال لما نزلت "اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيُّنَا لَايَظْلِمُ نَفْسَهٗ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ يَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يَابُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআনের আয়াত এই মর্মে নাজিল হইল যে, "যাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে এইরূপে যে, ঈমানকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, একমাত্র তাহারাই (দোযখ হইতে) মুক্তি পাইবে।"

তখন ছাহাবীগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন; (এই ভাবিয়া যে, উক্ত আয়াতের মর্মে কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর যে কোন অন্যায় তথা গোনাহ করিলে সে দোযখ হইতে মুক্তি পাইবে না। কারণ, তাহা আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অন্যায়ের সংমিশ্রণ পরিহারকারীদের মধ্যে মুক্তি সীমাবদ্ধ। এই ভীতির দরুন) তাঁহারা হযরতের দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, অন্যায় করিয়া নিজের ক্ষতি না করে? (সম্পূর্ণরূপে অন্যায় হইতে আমাদের কেহই বাঁচিয়া থাকে না, সুতরাং উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী আমাদের কেহই মুক্তি পাইবে না)।

হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অন্যায়ের অর্থ যাহা তোমরা বুঝিয়াছ (যে, সব রকমের অন্যায় ত্রুটি- গোনাহ্ তাহা নহে। উক্ত আয়াতে "অন্যায়" অর্থ একমাত্র শেরক। (অতএব উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়া শেরেকী কার্য করতঃ ঈমানের সঙ্গে শেরেককে মিশ্রিত করে সে মুক্তি পাইবে না)।

তোমরা কি লোকমানের উক্তি (পবিত্র কোরআন মারফত) শুন নাই। তিনি স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান পূর্বক বলিয়াছিলেন, "হে বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেক হইতেছে মহা অন্যায়।"

ব্যাখা ঃ শেরেকী গোনাহ আল্লাহ মাফ করিবেন না বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। শেরেক ভিন্ন অন্য গোনাহ নেক কাজের অছিলায় বা তওবার দ্বারা মাফ হইবে; এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত এই-

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ

'নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তাঁহার সঙ্গে শরীক করার গোনাহ মাফ করিবেন না, উহা ছাড়া অন্য গোনাহ যাহার জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।"

আলোচ্য হাদীছখানার অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ডে ২৮ নম্বরে হইয়াছে

হযরত যাকারিয়া (আঃ)

যাকারিয়া (আঃ) ঈসা আলাইহিস সালামের সংলগ্ন যমানারই ছিলেন; হযরত ঈসার মাতা "মারইয়াম"কে যাকারিয়া (আঃ)-ই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি মারইয়ামের খালু হইতেন, বাইতুল-মোকাদ্দাছের ধর্মীয় প্রধানও তিনিই ছিলেন।

হযরত যাকারিয়ার পিতার নাম সম্পর্কে এত মতভেদ রহিয়াছে যে, কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা

কঠিন। অবশ্যই ইহা সর্বস্বীকৃত যে, তিনি বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিচ্ছালামের বংশধর ছিলেন। যাকারিয়া (আঃ) ছুতার বা মিস্ত্রি কার্য করিয়া নিজ হস্তোপার্জিত আয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

প্রথম জীবনে হযরত যাকারিয়া নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি এবং স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তান হয় নাই। সন্তান লাভের আকাঙ্খায় তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মারইয়ামকে লালন-পালন করিতেন, তিনি তাঁহাকে এক বিশেষ এবাদৎ ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত যাকারিয়া যখনই মারইয়ামের নিকট আসিতেন তখনই তাঁহার নিকট তাজা তাজা ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। যেই মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায় না সেই মৌসুমে সেই ফলই তাজা, টাটকা ও সদ্য আহরিত তাঁহার নিকট দেখিতে পাইতেন।

হযরত যাকারিয়া নিজে এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ নিয়ম দৃষ্টে সন্তান লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মারইয়ামের নিকট অমৌসুমী ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিয়া হযরত যাকারিয়ার অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, মারইয়ামের জন্য আল্লাহ তা'আলা মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদির সমাবেশ করিয়া যেরূপ সর্বশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন তদ্রূপ আমাকেও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করিতে পারেন। নূতন আশায় মাতিয়া হযরত যাকারিয়া নব উদ্যমে সন্তান লাভের দোয়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

একদা তিনি স্বীয় বিশেষ এবাদত-ঘরে নামাযে মশগুল ছিলেন, হঠাৎ একদল ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দান করিলেন। সুসংবাদ শ্রবণে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রী আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অবশেষে হযরত যাকারিয়া আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ নেয়ামত সন্তান হওয়ার আলামত ও নিদর্শন দৃষ্টে তিন দিনের জন্য দুনিয়ার সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এবাদতে ব্রতী হইলেন।

কাহারও প্রতি কোন সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কোন নেয়ামত আসিলে সে ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করা এবং তাঁহার এবাদত-বন্দেগীতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করাই হইল আসল কর্তব্য। হযরত যাকারিয়া (আঃ) সেই আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ - إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

স্মরণ কর, যাকারিয়া নবীর ঘটনা– যখন তিনি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট নিবেদন করিলেন, হে প্রভু! আমাকে উত্তরাধিকারবিহীন নিঃসন্তান রাখিও না, অবশ্য তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (কিন্তু বাহ্যিক উত্তরাধিকারী সন্তানের অভিপ্রায়ও স্বাভাবিক।) আমি তাঁহার আবেদন পূর্ণ করিলাম এবং দান করিলাম তাঁহাকে "ইয়াহ্ইয়া" নামক পুত্র সন্তান তাঁহার আকাঙ্খা পূরণে তাঁহার (বৃদ্ধা) স্ত্রীকে সন্তানোপযোগী করিয়া দিলাম। তাঁহারা সকলেই নেক কার্যে দ্রুতগামী ছিলেন এবং ভয় ও আশার মধ্যে আমার এবাদত-গুজারী করিতেন এবং আমার সম্মুখে সর্বদা নত থাকিতেন। (সূরা আম্বিয়া, পারা–১৭, রুকু–৬)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا - قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ - إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

মারইয়ামকে প্রতিপালনকালে যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের নিকট তাহার কক্ষে যাইতেন তখনই তাহার নিকট (অমৌসুমী) ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মারইয়াম! এইসব

তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মারইয়াম বলিলেন, এইসব আল্লাহর তরফ হইতে। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিযিক দান করেন। هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

এই ক্ষেত্রে যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট আবেদনে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! (বাহ্যিক দৃষ্টিতে আশা নাই) আপনি নিজ রহমত ভান্ডার হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। আপনিত দোয়া শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অতপর তিনি এবাদত-ঘরে নামাজে দাঁড়াইলে একদল ফেরেশতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ পাঠাইয়াছেন ইয়াহ্ইয়া নামক পুত্রের; যিনি আল্লাহর বিশেষ আদেশবলে জন্মলাভকারী অন্য এক নবীর (তথা ঈসা নবীর) সত্যতার সাক্ষ্য বহন করিবেন, নেতৃত্ব লাভ করিবেন, বিশেষ সংযমী হইবেন এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া নবুওয়ত প্রাপ্ত হইবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ـ

তখন যাকারিয়া বলিলেন, হে প্রভু! আমার পুত্র কিরূপে হইবে অথচ আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ـ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً ـ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ـ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ـ

আল্লাহ বলিলেন, তোমরা যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই তোমরা পুত্র লাভ করিবে; আল্লাহ তা'আলা করিতে পারেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন। যাকারিয়া (আঃ) বলিলেন, পরওয়ারদেগার! ঐ নেয়ামত লাভ নিকটবর্তী হওয়ার কোন নিদর্শন আমাকে জানাইয়া দেন; (যেন বেশী শুকর-গুজারী করার সুযোগ পাই)। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই হইবে যে, লোকদের সঙ্গে তোমার কথা বলার শক্তি তিন দিন বন্ধ থাকিবে, শুধু কেবল ইশারা দ্বারা বুঝাইতে পারিবে। এই সময় তুমি তোমার প্রভুর যিকেরে মশগুল হইবে এবং সকাল-বিকাল সর্বদা তাঁহার তছবীহ– পবিত্রতার গুণ জপায় মশগুল থাকিবে। (পারা–৩, রুকু–১২)

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ـ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا ـ وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ

পরওয়ারদেগার তাঁহার বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়াকে বিশেষ করুণা ও রহমত দান করিয়াছিলেন– সেই আলোচনা। যখন যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে চুপে চুপে আবেদন জানাইলেন, প্রভু হে! (বার্ধক্যে) আমার অস্থি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মাথায় সাদার আবরণ আসিয়া গিয়াছে। আর আমি কোন সময় তোমার নিকট দোয়া করিয়া অকৃতকার্য থাকি নাই।

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَاءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ـ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ـ

আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিজন সম্পর্কে আশঙ্কা হয়, (তাহারা দ্বীন হেফাযতে কোরবানী দিবে না।

অবশ্য আশা করি আমার ঔরসের সন্তান সেইরূপ হইবে না।) কিন্তু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা (স্বাভাবিক স্তরে তাহার সন্তান হইবে না;) অতএব আপনার নিকট হইতে (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত) একজন উত্তরাধিকারী আমাকে দান করুন– যে আমার এবং ইয়াকুব-বংশের জ্ঞান-বিদ্যা ও বিশেষত্বের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। এবং প্রভূ হে! আপনি তাহাকে নিজ সন্তুষ্টি ভাজনরূপে গড়িবেন।

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ـ

(আল্লাহ বলিলেন,) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দান করিতেছি একটি বিশেষ পুত্র সন্তানের, যাহার নাম "ইয়াহ্ইয়া" হইবে; (বিশেষ বিশেষ গুণে) যাহার তুলনা আর হয় নাই।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ـ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ـ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ـ

যাকারিয়া আরজ করিলেন, প্রভু হে! কিরূপে আমার ছেলে হইবে, আমার স্ত্রী ত বন্ধ্যা এবং আমিও বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উভয়ে এইরূপ থাকাবস্থায়ই সন্তান হইবে। পরওয়ারদেগার আরও বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজ; (লক্ষ্য কর না যে,) আমি ইতিপূর্বে তোমাকে পয়দা করিয়াছি, অথচ তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। যাকারিয়া বলিলেন, প্রভু হে! (এত বড় নেয়ামতটি আগমনের একটা নিদর্শন) আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে সক্ষম হইবে না, অথচ তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ـ

সে মতে একদা তিনি স্বীয় এবাদত ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং (তখন তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়া আসন্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে মতে) সকলকে ইশারা দ্বারা বলিলেন, তোমরা সকলে (শুকরগুজারি স্বরূপ) সকাল-বিকাল তছবীহ পড়। সূরা মারইয়াম ঃ পারা–১৬, রুকু–৪)

হযরত ইয়াহ্য়্যা (আঃ)

৯৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা বন্ধ্যা মাতা এবং ১২০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পিতার ঔরসে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতে হযরত ইয়াহ্য়্যা জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ইয়াহ্য়্যা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) উভয়ে একই যমানায় ছিলেন। এমনকি কাহারও মতে ত উভয়ের মাতৃগর্ভে স্থান লাভের সময়ও একই ছিল এবং কাহারও মতে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধান ছিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবাধানও ঐ ছয় মাসই ছিল, সর্বোচ্চ সংখ্যার অভিমতেও বয়সের ব্যবধান মাত্র তিন বছরের ছিল।

মেরাজ শরীফে রসুলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় আসমানে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও হযরত ঈসার সাক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইবার পর হযরত (সঃ) তাঁহাদের উভয়কে ছালাম করিলে তাঁহারা সাদর সম্ভাষণে উত্তর দিলেন مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح "মারহাবা– ধন্যবাদ উচ্চ মর্যাদাবান ভ্রাতা ও উচ্চ মর্যাদাবান নবীর প্রতি।"

উল্লিখিত মেরাজের হাদীছে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা হইয়াছে যে, هما ابنا خالة তাঁহারা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। ইহার দুই রকম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে– কেউ কেউ বলিয়াছেন, হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ্"র দুই কন্যা ছিল– "মরয়্যাম" ও "য়্যাশা"। য়্যাশার গর্ভে হযরত ইয়াহ্য়্যা এবং মারয়্যামের গর্ভে হযরত ঈসা জন্ম লাভ করেন, সুতরাং ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সাধারণরূপেই পরস্পর খালাত ভাই

হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এবং ঐতিহাসিকের মতে হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ" সারা জীবন নিঃসন্তান থাকার পর বহু দোয়া-কালামের অছিলায় তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে একমাত্র কন্যা "মারইয়াম" দান করিয়াছিলেন, তাঁহার অপর কোন সন্তানই ছিল না। অবশ্য হযরত ইয়াহ্‌য়্যার মাতা "য়্যাশা" হযরত ঈসার নানী হান্নাহ্‌র ভগ্নি ছিলেন শুধু এই সূত্রেই উভয়কে খালাত ভাইরূপে ব্যক্ত করা করা হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্‌য়্যার গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ একটি হইল– مصدقا بكلمة من الله অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কলেমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা হইবেন। এস্থলে "আল্লাহর কলেমা।" দ্বারা কেউ তৌরাত কেতাব উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন– অর্থাৎ তিনি তৌরাত কেতাব অবলম্বী নবী হইবেন; তাঁহার নিকট কোন বিশেষ কেতাব আসিবে না।

কিন্তু সাধারণতঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায় كلمة الله কালেমাতুল্লাহ– আল্লাহর কলেমা বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) কে উদ্দেশ্য করা হয়। এই সূত্রে অধিকাংশ তফছীরকারগণ ঐকমত্য এই যে, এস্থলেও হযরত ঈসা-ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত ঈসার সত্যবাদিতা প্রচার করা হযরত ইয়াহ্‌য়্যার একটি বিশেষ কার্য হইবে। হযরত ইয়াহ্‌য়্যা এই দায়িত্বকে সারা জীবন সূচারুরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। এমনকি পিতৃস্পর্শ ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে যখন হযরত ঈসা স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন এবং সকলেই মারইয়্যামের প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিল, তখন হযরত যাকারিয়া ছয় মাসের বা তিন বৎসরের বালক হযরত ইয়াহ্‌য়্যাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনও শিশু ইয়াহ্‌য়্যা আল্লাহর কুদরতে প্রদত্ত বাকশক্তি বলে হযরত ঈসার নবুয়তের এবং সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পর ইহুদিরা তাঁহার প্রাণঘাতী শত্রু হইল। তাঁহার এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদ রটাইয়া তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করাই নয় শুধু, বরং সর্বপ্রকারের বিরোধিতা করিতে লাগিল।

ইহুদিগণের এই বিরোধিতার বন্যার সম্মুখে হযরত ইয়াহ্‌য়্যা (আঃ) সর্বদা হযরত ঈসার সত্যবাদিতাই প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, এমনকি অবশেষে, হযরত ঈসার ভ-পৃষ্ঠে অবস্থানকালেই হযরত ইয়াহ্‌য়্যা স্বীয় দায়িত্ব পালনে জীবন বিসর্জন দিয়া ইহুদিদের হস্তে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহ্‌য়্যার আরও গুণাবলী উল্লেখ করতঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন–

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ـ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ـ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ـ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ـ

আর আমি ইয়াহ্‌য়াকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান এবং আমার তরফ হইতে বিশেষরূপে হৃদয়ের কোমলতা ও নম্রতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা দান করিয়াছিলাম। তিনি অতি পরহেজগার এবং পিতা মাতার ভক্ত ও ফরমাবরদার ছিলেন, আত্মম্ভরী গোঁড়া নাফরমান প্রকৃতির ছিলেন না।

তাঁহার প্রতি সালাম তথা শান্তির সুসংবাদ জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এবং যে দিন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবেন সেই দিনের জন্যও রহিল। (ছুরা মারইয়্যাম ঃ পারা– ১৩, রুকু–৪)

উল্লিখিত আয়াতে হযরত ইয়াহ্‌য়্যাকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান প্রদত্ত হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের তাৎপর্যে কোন কোন মোফাস্‌সির বলিয়াছেন, বাল্যকালেই হযরত ইয়াহ্‌য়্যাকে আনুষ্ঠানিকরূপে নবুয়ত দান করা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ মোফাসসির ও আলেমগণের মত ইহাই যে, নবুয়ত পাইয়াছিলেন পূর্ণ বয়সের সময়ই, অবশ্যই তিনি বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিভা অলৌকিকরূপে বাল্যকার হইতেই পাইয়াছিলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়্যা সম্পর্কে তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার আত্মার পবিত্রতা ও পরহেজগারীর উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে যে প্রশংসা করা হইয়াছে হযরত ইয়াহ্য়্যার জীবন-ইতিহাসও উহার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে আছাকের নামক ইতিহাসবিশারদ ওয়াহ্হাব ইবনে মোনাব্বেহ্-এর মাধ্যমে কতিপয় বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহ্ইয়্যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভক্তির এত অধিক প্রভাব ছিল যে, আল্লাহর হুজুরে কাঁদিতে কাঁদিতে তঁহার চেহারার উপর অশ্রু বর্ষণের রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ বেহাল-বেক্করার অবস্থায় বন-জঙ্গলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং রোদন-ক্রন্দনের মধ্যেই সময় কাটাইতেন। একদা তাঁহার পিতা যাকারিয়া (আঃ) তাঁহাকে নিবিড় জঙ্গলে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং ঐরূপ রোদন ক্রন্দন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ''আমরা তোমার তালাশে ব্যতিব্যস্ত আর তুমি এই নীরব জঙ্গলে বসিয়া কাঁদিতেছ?'' হযরত ইয়াহ্ইয়্যা বলিলেন, আব্বাজান! আপনি ত বলিয়াছেন, জাহান্নামকে এড়াইয়া বেহেশতে পৌঁছিতে একটি বিশাল ময়দান অতিক্রম করিতে হয়, সেই ময়দান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তির অশ্রু বর্ষণেই পার হওয়া সম্ভব হইবে; অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিস্থল বেহেশতে পৌঁছা যাইবে না। এতদশ্রবণে পিতা হযরত যাকারিয়াও কাঁদিয়া উঠিলেন। (কাছাছোল কোরআন-১-২৯৬)

হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পূর্ববর্তী নবীগণের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মাত্র ছয় শতাব্দীর ব্যবধান ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ) ঘর-সংসার জুড়েন নাই, তাঁহার কোন নির্দিষ্ট বাড়ী-ঘর ছিল না তিনি বনী-ইস্রাঈলদের আবাসভূমি ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার বস্তি-বস্তি, শহর-শহর ঘুরিয়া আল্লাহর দ্বীন প্রচার করিয়া থাকিতেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈল বংশীয় ছিলেন; তিনি আল্লাহর কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে স্বীয় মাতা মারইয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে)। সুতরাং তাঁহার বংশ তাঁহার মাতা সূত্রেই হইবে।

হযরত মারইয়্যামের পিতার নাম ''এমরান'', মাতার নাম ''হান্নাহ''। তাঁহারা ইভয়েই বনী-ইস্রাঈল বংশীয় নেককার পরহেজগার ছিলেন। ''এমরান''-এর পূর্বপুরুষদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, ''এমরান'' বনী-ইস্রাঈল জাতীয় হযরত ছোলায়মান পয়গাম্বরের বংশধর ছিলেন, আর তাঁহার স্ত্রী ''হান্নাহ'' দাউদ আলাইহিচ্ছালামের অন্য পুত্রের বংশধর ছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পূর্বে বনী-ইস্রায়ীলগণ ''ইয়্যাহুদ'' (এক বচন ''ইয়্যাহুদী'') নামে পরিচিত হইত। এই নামের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি মতামত দেখা যায়। কাহারও মতে বনী-ইস্রায়ীলদের মূল ও আদি পিতা হযরত ইয়াকুবের বড় ছেলের নাম ছিল ''ইহুদা'' সেই নাম হইতেই ''ইয়্যাহুদ'' বা ''ইয়্যাহুদী'' আখ্যার উৎপত্তি। কাহারও মতে উক্ত আখ্যাটি د و ه হা, ওয়া, দাল এই তিন অক্ষর যুক্ত আরবী শব্দ হইতে গৃহীত, যাহার ধাতুগত অর্থ তওবা ও পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা। এই ধাতু হইতে বিশেষ্য পদ হইল ''হায়েদ''- هائد যাহার বহুবচন হইল هود কোরআন শরীফেও কোন কোন স্থানে ইহুদিগণকে ''হুদ هود শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, যেমন- وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ''ইহুদিগণ বলে, একমাত্র ইহুদিগণ ব্যতীত আর কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'' আরও আছে- وقالوا كونوا هودا ''ইহুদিগণ মুসলমানগণকে বলে, তোমরা ইয়্যাহুদী হইয়া যাও, তবেই সঠিক পথের পথিক হইবে।'' এই ধাতু হইতেই ইয়্যাহুদ বা ইয়্যাহুদী শব্দও গৃহীত। যাহার তাৎপর্য এই যে, হযরত মূসার আমলে বনী-ইস্রায়ীলগণ গো-শাবক

বা বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতপর হযরত মুছার চেষ্টায় তাহারা তওবা করতঃ হক্ক ও সত্যের প্রতি পুনঃ প্রত্যাবর্তন পূর্বক আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরাধনা করিয়াছিল। পবিত্র কোরআনেও উহার উল্লেখ আছে- انا هدينا اليك " হে মা'বুদ! আমরা তোমার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়াছি (তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া লও)।" ইহা হইতেই "হুদ; ইয়্যাহুদী" আখ্যার উৎপত্তি। সে মতে ইহুদী আখ্যা মূসার আমল হইতে আরম্ভ বলিতে হইবে; সাধারণতঃ তাহাই প্রচলিত।

হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের আবির্ভাবের পর যাহারা তাঁহার পায়রবী করিল তাহারা নাছারা (একবচনে নাছরানী) নামে আখ্যায়িত হইল; যাহার তাৎপর্য সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত আছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, ঈসা (আঃ) বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের শত্রুতায় অতীষ্ঠ হইয়া আহবান জানাইয়াছিলেন- যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে এইরূপ আছে من انصاری الی الله "কে আছে যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হয়?" তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া বলিয়াছিল, نحن انصار الله "আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হইয়া নিজদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" نصر -নাছর ধাতুর অর্থ সাহায্য করা, এই ধাতু হইতেই ঈসার অনুগামীগণ নাছারা বা নাছরানী নামের আখ্যা লাভ করে।

সারকথা, হযরত ঈসার আমলে বনী-ইস্রাঈলগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, এক দল হযরত ঈসার বিরুদ্ধবাদী শত্রু; তাহারা ইয়্যাহুদ নামেই রহিল, আর এক দল ঈসা আলাইহিচ্ছালামের অনুগামী ও সাহায্যকারী তাহারা "নাছারা" নামে পরিচিত হইল।

ইহুদিগণ ত প্রথম হইতেই হযরত ঈসার ঘোর বিরোধী ও শত্রু ছিল, এমনকি হযরত ঈসার সমর্থনের কারণেই তাহারা হযরত ইয়াহ্য়্যাকে শহীদ করিয়াছিল এবং হযরত ঈসাকেও প্রাণে বধ করার পরিকল্পনা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা হযরত ঈসার নবুয়তকেই শুধু অস্বীকার করিয়াছিল না, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসিত অপবাদও রটাইয়াছিল। তিনি যে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ছাড়া মারইয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন- ইহার সুযোগে (নাউজুবিল্লাহ) তাঁহার প্রতি জারজ হওয়ার অপবাদ প্রচার করিয়াছিল।

অপরদিকে নাছারাগণ হযরত ঈসার বর্তমানকাল পর্যন্ত ত সঠিক পথেই থাকে, তাঁহার তিরোধানের পর তাহারা নানারকমে পথভ্রষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কতিপয় মো'জেযাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাকে খোদার বেটা বলে। কেহ কেহ তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলে।

এতদ্দৃষ্টে পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত মর্যাদা সঠিকরূপে স্থির করতঃ বিভিন্ন যুক্তি তর্কে ও দলিল প্রমাণের মাধ্যমে ইহুদ-নাছারা উভয় দলের অপবাদ ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছে। এমনকি হযরত ঈসার মাতা মারইয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁহার বিশিষ্ট মো'জেযা সমূহের বিবরণ, ইহুদিদের অপবাদের উত্তর দান এবং নাছারাদের অতিরঞ্জনের খন্ডনে কোরআন বহু বিবৃতি দিয়াছে। নিম্নে পবিত্র কোরআনের ঐসব বিবৃতিরই ধারাবাহিক উদ্ধৃতি প্রদান করা হইবে।

মারইয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত

মারইয়্যামের পিতার নাম ছিল "এমরান" এই "এমরান" হযরত মূসার পিতা "এমরান" নহে; হযরত মূসার পিতা এমরানের যুগ এই এমরানের যুগের বহু পূর্বে। তদ্রূপ পবিত্র কোরআনে ১৬ পারায় ছুরা মারয়্যামের এক আয়াতে মারয়্যামকে ياخت هارون হে হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে; এই "হারুন" হযরত মুছার ভ্রাতা পয়গাম্বর হযরত হারুন নহেন, বরং হযরত হারুনের বহু পরের হারুন নামীয় অন্য এক ব্যক্তিকে উক্ত আয়াতে মরয়্যামের ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

প্রায় সমস্ত তফছীরকারগণের বিবরণেরই দেখা যায় যে, মারইয়্যামের মাতা "হান্নাহ্" বন্ধ্যা ছিলেন। এক মাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তাঁহার গর্ভে মারইয়্যাম জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, আর কোন

সন্তানই তাঁহার জন্মে নাই। অধিকাংশ তফসীরকারগণের মত এই যে, এমরানের অন্য স্ত্রীর পক্ষে এক ছেলে ছিল; তাহারই নাম ছিল "হারুন"। সে ছিল অতি মহৎ ও সৎ; মারইয়্যাম তাঁহার বৈপিতৃক ভগ্নি ছিলেন, সেই সুত্রেই মারইয়্যামকে "হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে।

এমরান বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছিলেন, "হান্নাহ" বাঁঝা নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে সন্তানের লালসা অত্যধিক ছিল। কথিত আছে– একদা "হান্নাহ্ নিজ ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের উপর একটি পাখী তাহার বাচ্চাকে আদর ভরা মুখে আহার দিতেছিল এবং বাচ্চার প্রতি অন্তর ভরা স্নেহ-মমতা দেখাইতেছিল। সন্তান লালায়িত হান্নাহ্ ঐ দৃশ্য দেখিয়া আবেগপূর্ণ অন্তরে আল্লাহর দরবারে সন্তানের দোয়া করিলেন। তাঁহার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। স্বামীও বৃদ্ধ নিজেও বৃদ্ধা এবং বাঁঝা; এমতাবস্থায় স্বীয় গর্ভে সন্তান জন্মিবার আভাস অনুভব করিয়া হান্নার অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

সেই যুগে রীতি ছিল, দ্বীনদার লোকেরা নিজেদের দুই-এক সন্তান আল্লাহর ঘর বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য অন্য সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিয়া দিত এবং এই কাজের জন্য ছেলে সন্তানই উপযুক্ত বলিয়া মেয়ে সন্তান এইরূপে মুক্ত করার প্রথা ছিল না। হান্নাহ স্বীয় অন্তরে পুত্র সন্তান লাভের আশা পোষণপূর্বক আল্লাহর দরবারে মান্নত করিলেন, " যে সন্তান লাভের আশা পোষণপূর্বক " হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিবে সে তোমার জন্য মুক্ত হইবে– তোমার ঘরের খেদমতের জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিব বলিয়া আমি মান্নত– অঙ্গীকার করিতেছি।"

অতপর সন্তান জন্মের পূর্বেই এমরানের মৃত্যু হইয়া গেল। তারপর বিধবা হান্নাহ যখন সন্তান প্রসব করিল তখন উহাকে মেয়ে সন্তান দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্খার উপর পানি পড়িয়া গেল। কারণ, মেয়ে সন্তান বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমত কি করিতে পারিবে? এই জন্যই সাধারণতঃ ঐ কাজে ছেলে সন্তানকেই মনোনীত করা হইত এবং গ্রহণ করা হইত। এইসব ভাবনায় হান্নার ভাঙ্গা বুক হইতে আক্ষেপের শব্দ বাহির হইল– তিনি প্রভুর দরবারে করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রভু হে! আমি ত মেয়ে সন্তান প্রসব করিয়াছি।"

আদি-অন্তের সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত ছিলেন যে, এই মেয়ে সন্তানটি কত বড় মর্যাদাশালিনী হইবে এবং তাহার মাধ্যমে এক বিশেষ কুদরত বিকশিত হইবে। তাহার ঔরষে হযরত ঈসার ন্যায় পয়গম্বর জন্ম লাভ করিবেন– এই সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত ছিলেন। এইসব দৃষ্টে ইহা বাস্তব কথা যে, বহু পুত্র সন্তান এই মেয়ের মর্যাদার কাছেও ভিড়িতে পারে না।

বিধবা হান্নাহ নিজেই মেয়েটির নাম রাখিলেন "মারইয়্যাম", যাহার অর্থ "আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগকারিণী।" অতপর অল্প দিনের মধ্যেই মারইয়্যাম একটু জ্ঞান বুদ্ধির বয়সে পৌঁছিলে পর হান্নাহ স্বীয় মান্নত পূর্ণ করার জন্য মেয়েকে বাইতুল-মোকাদ্দাছের খাদেম বা পুরোহিতগণের হাওয়ালা করার উদ্দেশ্যে লইয়া গেলেন। মেয়ে সন্তানকে এই কার্যে গ্রহণ করা সাধারণ রীতি ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে এবং তাঁহাদের দলীয় বিশেষ পুরোহিত ও সুপ্রসিদ্ধ বুজর্গ বিশেষতঃ তাঁহাদের ইমাম এমরানের মেয়ে হিসাবে তাঁহারা মারইয়্যাকে শুধু গ্রহণই করিলেন না, বরং তাঁহার লালন-পালন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মস্ত বড় প্রতিযোগিতা হইল। এমনকি এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরোহিত প্রধান সেই যমানার পয়গাম্বর হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারয়্যামের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, তিনি মারয়্যামের খালুও হইতেন।

হযরত যাকারিয়া তাঁহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে মারয়্যামের লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং তথায় শৈশবকাল হইতেই মারয়্যামের অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ আরম্ভ হইল। মারয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

إِذْ قَالَتِ امْرَاةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– এমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে পরওয়ারদেগার! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম লাভ করিবে আমি তাহাকে তোমার জন্য মুক্ত করিয়া দিব। তুমি আমার এই মান্নত কবুল কর; তুমি ত সব কিছুই শুন এবং জান।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ـ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ـ

অতপর যখন সে সন্তান প্রসব করিল, (এবং উহা মেয়ে হইল) তখন সে অপেক্ষা করিয়া বলিল, পরওয়ারদেগার! আমি ত মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়াছি। (সে ঐ মেয়ের মর্যাদা অজ্ঞাত; তাই তাঁহার আক্ষেপ;) আল্লাহ ভালরূপেই জ্ঞাত ছিলেন সে কি প্রসব করিয়াছে। এবং বস্তুতঃ (সাধারণ) পুত্র সন্তান ঐ মেয়ের তুলনায় কিছুই নহে।

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ـ

(এমরানের স্ত্রী বলিল,) আমি এই মেয়ের নাম ''মারয়্যাম'' রাখিলাম। আর হে প্রভু! আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তান-সন্ততিকে শয়তান মরদুদ হইতে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে প্রদান করিলাম।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ـ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

পরওয়ারদেগার ঐ মেয়েকেই (বাইতুল মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য) সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং সুন্দররূপে তাহাকে গড়িয়া তুলিলেন। তাহাকে (তৎকালীণ পয়গাম্বর) যাকারিয়া ললন-পালনে রাখিলেন। যাকারিয়া যখনই মারয়্যামের কক্ষে যাইতেন তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত পাইতেন। যাকারিয়া বলিলেন, হে মারইয়্যাম! এই খাদ্য সামগ্রী তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মারয়্যাম বলিল, ইহা আল্লাহর গায়বী-খাজানা হইতে আসে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিযিক দান করিয়া থাকেন। (পারা–৩, রুকু–১২)

হযরত যাকারিয়া তত্ত্বাবধানে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে মারয়্যামের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানে রাখা সম্পর্কে বাইতুল মোকাদ্দাছের পুরোহিতগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইল– তাঁহারা প্রত্যেকেই মারয়্যামকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্থির করা হইল যে, পুরোহিতগণ সকলেই নিজ নিজ কলম (যাহা দ্বারা তাঁহারা তৌরাত শরীফ লিখিয়া থাকিতেন) প্রবাহমান পানিতে ফেলিবেন। যাহার কলম স্রোতের বিপরীত চলিবে তিনিই মারয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। তাহাই করা হইল এবং সকলের মধ্যে একমাত্র যাকারিয়ার কলমই আল্লাহর বিশেষ কুদরতে স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল; ফলে তিনিই মারয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

হইলেন।* পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে–

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ -

(আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি যে, মারয়্যামের বৃত্তান্ত সঠিকরূপে লোকদিগকে শুনসাইলেন ইহা আপনার অহী-বাহক নবী হওয়ার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ,) যখন মারইয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পুরোহিতগণ নিজ নিজ কলম (পানিতে) ফেলিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না, ঐ ব্যাপারে যখন তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল তখনও আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। (পারা–৩, রুকু–১৩)

মারইয়্যামের উচ্চ মর্যাদা

হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারয়্যামের জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদ সংলগ্নে বিশেষ কক্ষ তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় মারইয়্যাম আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিত এবং নির্ধারিত সময়ে বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদের খেদমত করিত।

এবাদত বন্দেগী, পারছায়ী-সতিত্ব ইত্যাদি সৌভাগ্যের চরিত্রে মারইয়্যাম অপরিসীম যশ লাভ করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালাও প্রকাশ্যে তাহার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার জন্য গায়েব হইতে মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদি ও খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকিত। সময় সময় ফেরেশতা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ্যে বিভিন্ন সুসংবাদ শুনাইয়া থাকিতেন, যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে–

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعَالَمِيْنَ -
يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ ....

"এই ঘটনা স্মরণ কর, যখ ফেরেশতাদের একটি দল মারয়্যামকে এই বলিয়া সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন যে, হে মারয়্যাম! নিশ্চিতরূপে জানিইয়া লও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট মকবুল বান্দা বানাইয়াছেন এবং তোমাকে (অসন্তুষ্টিকর কার্যাবলী হইতে) পাক-পবিত্র থাকার ছাঁচে গঠিত করিয়াছেন। আর তোমার বৈশিষ্ট্য এই যুগের বিশ্ববাপী নারী সমাজের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে মারয়্যাম! তুমি (এই মান-মর্যাদার শুকরিয়া স্বরূপ) চিরজীবন সর্বদা স্বীয় পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ও দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাক এবং (সেই আনুগত্যের ও দাসত্বাবলম্বনের প্রকাশ্য নিদর্শন স্বরূপ) অন্যান্য নামাযীদের ন্যায় রুকু-সেজদার আদর্শগত নামাযের পাবন্দ থাক। (পারা–৩, রুকু–১৩)

১৬৫১। হাদীছ ঃ قَالَ عَلِىٌّ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

অর্থ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমরানের কন্যা মারয়্যাম তাঁহার যুগের সর্বোত্তম নারী ছিলেন এবং এই যুগের সর্বোত্তম নারী ছিলেন খাদীজা।

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষের নিজ আমল যদি তাহাকে অগ্রাধিকারী করে তবে অন্য কোন কিছুই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে না; ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা ছিলেন মারইয়্যাম। লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে কত অপবাদ রটাইয়াছিল, বাহ্যিক অবস্থায় মারইয়্যামের নিকটও অপবাদের কোন উত্তর ছিল না, কিন্তু তাঁহার সতিত্ব, পবিত্রতা ও খোদা-ভক্ততা তাঁহাকে এরূপ উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র

* এই ঘটনা কাহারও মতে মারয়্যামের প্রাথমিক শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া একটু বুঝদার হওয়ার পর ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, শৈশবের প্রারম্ভেই মারয়্যাম হযরত যাকারিয়া হস্তে গিয়াছিল।

কোরআনে সারা বিশ্বের মোমেনদের জন্য তাঁহাকে নমুনা স্বরূপ পেশ করিয়াছেন এবং উল্লিখিত হাদীছেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য রহিয়াছে।

মারয়্যামের গর্ভবতী হওয়ার বৃত্তান্ত

মারইয়্যাম যখন ১৩ বা ১৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন (তফছীর রুহুল মায়ানী ১৬-৭৯) তখন একদা তিনি স্বীয় আবাসিক কক্ষ হইতে বাহিরে পূর্ব দিকে নিজ সংশ্রবীয়লোকদেরও নজরের আড়ালে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করিয়া একাকী নির্জনে গোসল করিতেছিলেন। হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাঈল একজন সুষ্ঠু সুশ্রী মানুষের বেশ-ভুষায় মারইয়্যামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মারইয়্যাম তাঁহাকে একজন বেগানা পুরুষ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া আল্লাহ তা'আলার ভয়ের দোহাই দিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানে বলিলেন যে, আমি তোমারই পরওয়ারদেগারের প্রেরিত দূত। উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশেষ আদেশ বলে সৃষ্ট এক মহান সন্তান তোমাকে দান করিবেন– যিনি বনী ইস্রাঈলদের জন্য রসূল হইবেন এবং বহু রকমের মোযেজা দ্বারা তাঁহার প্রকাশিত হইবে। সেই মহান সন্তানেরই সুসংবাদ আল্লাহর তরফ হইতে তোমার নিকট নিয়া আসিয়াছি এবং তোমাকে সেই সন্তান অর্পণ করিতে আসিয়াছি।

মারইয়্যাম স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, বৈধ-অবৈধ কোন প্রকারেই (সন্তান জন্মানোর সাধারণ ব্যবস্থা–) পুরুষের স্পর্শ আমার উপর হয় নাই। এমতাবস্থায় আমার ছেলে হইবে কিরূপে? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই; ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

জিব্রাঈলের উক্তি বাস্তবের অনুকূলই ছিল, কারণ মূল সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি ত সাধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বা সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সব রকমেরই সৃষ্টি করিতে সক্ষম, নতুবা তিনি সৃষ্টিকর্তাই নহেন। যে শুধু গঠনকারী হয় সে অবশ্য উপাদানের প্রত্যাশী হয়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুর প্রত্যাশী নহেন, সৃষ্টিকর্তা ত কোন মূল, সত্ত্বা ও উপাদান ব্যতিরেকেই অস্তিত্ব দান করিতে পারেন, সৃষ্টির অর্থই ইহা।

এইসব কথোপকথনের পর জিব্রায়ীল ফেরেশতা মারইয়্যামের বক্ষ বরাবর ফুঁৎকার মারিলেন।* বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, সঙ্গে সঙ্গে মারয়্যাম গর্ভধারণ অনুভব করিলেন। অতপর কাহারও মতে অনতিবিলম্বেই প্রসবাবস্থারও সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু অধিকাংশের মত ইহাই যে, সাধারণ রীতি অনুসারে দীর্ঘ দিন তথা ৯ বা ৮ মাস গর্ভকাল অতিবাহিত হওয়ার পরই প্রসব হইয়াছিল।

(তফসীর রুহুল মায়া'নী ১৬-৭৯)

---

*যেই ফুৎকার দ্বারা হযরত ঈসার রুহ বা আত্মা মারয়্যামের গর্ভে পৌছিয়াছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ফুৎকার আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের বিকাশ ছিল মাত্র। ঐ স্থলে জিব্রায়ীল ফেরেশতা শুধু কেবল সেই কুদরতের বাহক এবং সেই কুদরত বিকাশের মাধ্যম ছিলেন। জিব্রাঈল ফেরেশতার আর কোন কৃতিত্ব তথায় ছিল না, সব কিছুর কর্মকর্তা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন।

পবিত্র কোরআন পারা–২৮, সূরা তাহরীমের সমাপ্তিতে স্পষ্টরূপে এই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে হযরত ঈসার রুহ বা আত্মাকে মরয়্যামের গর্ভে পৌছাইবার ক্রিয়াপদের কর্মকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا .

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জন্য এমরানের কন্যা মারয়্যামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন– মারইয়্যাম তাহার পাক পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল, আমি তাহার বক্ষে আমার সৃষ্ট রুহ ফুকিয়া দিয়াছিলাম।"

এইরূপ বিবরণের আরও একটি দৃষ্টান্ত কোরআন শরীফেই বর্ণিত আছে, কোন কোন জেহাদে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে; হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ধুলা-বালূর মুষ্ঠি শত্রু সেনাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সেই একমুষ্ঠি ধুলা-বালুর অংশ শত শত শত্রু-সেনার প্রত্যেকের চোখেই পতিত হইয়াছে– সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন।

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"আপনি যখন ধুলা মুষ্ঠি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন নিক্ষেপকারী আপনি ছিলেন না– প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপকারী ছিলেন।"

মারইয়্যাম স্বীয় বৃত্তান্ত হযরত যাকারিয়ার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই তিনি মুরুব্বির পক্ষ হইতে কোন বিপদের সম্মুখীন হইলেন না। কারণ, তাঁহারা ত পূর্ব হইতে মারইয়্যামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাই বিনা দ্বিধায় তাঁহারা এই ঘটনাকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সাধাণ্যে যখন তাঁহার গর্ভাবস্থা প্রকাশ পাইল তখন লোকদের সন্দেহ ও আনাগোনার সূত্রপাত হইল। স্থান বিশেষে মারইয়্যাম যুক্তি তর্কের কাটা-কাটিও করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ তফছীর ইবনে কাছীর তৃতীয় খন্ড ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে– বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদেরই আ একজন খাদেম ছিলেন তাহার নাম ছিল "ইউসুফ নাজ্জার" তিনি মারইয়্যামের আত্মীয়ও ছিলেন। মারয়্যামের যখন গর্ভ প্রকাশ পাইয়া উঠিল, তখন ইউসুফের মনে ভয়ানক সংশয়ের সৃষ্টি হইল। কারণ, একদিকে অবিবাহিতা নারীর গর্ভধারণ; অপরদিকে মারইয়্যামের পাক-পবিত্রতা, দ্বীনদারী, এবাদতগুজারী ইত্যাদি যাহা বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদের প্রত্যেক খাদেমই ভালরূপ অবগত ছিলেন। ভয়ানক সংশয় ও সমস্যার মধ্যে একদা ইউসুফ মারয়্যামকে বলিলেন, হে মারয়্যাম আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; উহার উত্তর দানে তাড়াহুড়া না করিয়া বিশেষ চিন্তা-বুদ্ধির দ্বারা উত্তর দিবেন। মারইয়্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কথাটি কি? ইউসুফ নাজ্জার বলিলেন,

هل يكون قط شجر من غير حب وهل يكون زرع من غير بذر وهل يكون ولد من غير اب -

"দানা ব্যতিরেকে, বৃক্ষ, বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি?" মারইয়্যাম তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর দানে বলিলেন,

اما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فان الله قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غير حب ولابذر - وهل يكون ولد من غير اب فان الله تعالى قدخلق ادم من غير اب ولا ام -

"আপনার প্রশ্ন– দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ এবং বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? আমি বলি, আল্লাহর কুদরতে তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে; আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বৃক্ষ ও ফসলের গাছ দানা ও বীজ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার প্রশ্ন, পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি? ইহাও নিশ্চয়ই হইতে পারেই; আল্লাহ আদমকে পিতা-মাতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" فصدقها وسلم لها حالها

"ইউসুফ নাজ্জার মারয়্যামের উত্তরে পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আস্থাবান হইলেন এবং তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন।"

মারইয়ামের উক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ -

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, ঈসার জন্ম লাভের (সাধারণ নীতিবিহীন) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানায় তদ্রূপই ছিল যেরূপ আদমের জন্ম লাভের ব্যাপার। আদমকে (সাধারণ নীতি ব্যতিরেকেই) আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়াছিলেন; অতপর "কুন্" হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে (জীবন্ত মানুষ) হইয়া গিয়াছিল। ইহা একটি বাস্তব সত্য যাহা তোমার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারিত; এই সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয় আনিও না। (পারা-৩, রুকু-১৪)

এইরূপে স্থান বিশেষে ত মারইয়্যাম সংশয় দূর করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সর্বসাধারণের মুখ বন্ধ করা ত সহজ নহে, সুতরাং এই সংবাদ যতই ছড়াইতে লাগিল ততই লোকদের অপবাদ মারয়্যামের প্রতি বাড়িতে লাগিল। মারয়্যাম লোকদের অপবাদে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এদিকে প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইল, তাই তিনি লোকদের হইতে দূরে সরিয়া নির্জনে যাওয়ার মানসে পার্বত্য এলাকায় চলিয়া গেলেন। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ হইতে ৮ মাইল দূরে বাইতুল-লাহ্‌ম (বেথেলহাম) নামক স্থানে পৌঁছিলে প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিনি একটি খেজুর গাছের নিকটে উহাতে হেলান দিয়া বসিলেন এবং সব একিন-বিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করা সত্বেও মানুষের অপবাদ স্মরণ পূর্বক এবং এইরূপ কঠিন সময়ে নিঃসম্বল নিঃসহায়তা দৃষ্টে অনুতপ্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমনকি, তিনি আল্লাহর দরবারে কামনা করিলেন যে, এই অবস্থার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া আমি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে আমার জন্য ভাল হইত।

এই সময় দূরে ও আড়ালে থাকিয়া ফেরেশতা জিব্রিল মারয়্যামকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তথায় তাঁহার পানাহারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে উহার খোঁজ বাতাইয়া দিলেন যে, তোমার অদূরেই তোমার প্রভু নির্মল ঠাণ্ডা পানির নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আর তোমার হেলান দেওয়ার খেজুর গাছটিতে এখনই খেজুর পয়দা করিয়া দিয়াছেন, উহাকে একটু নাড়া দিলেই পাকা পাকা খেজুর তোমার সম্মুখে পড়িবে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাজা তাজা সুস্বাদু খেজুর খাইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকদের দ্বারা বিব্রত ও বিরক্ত না হইয়া পারা যায়– তাহার পরামর্শও মারয়্যামকে দিলেন। সেকালে রোযার নিয়ম এই ছিল যে, রোযাদার ব্যক্তি কথা বলিতে পারিবে না, তাই মারয়্যামকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, এই ঘটনা সম্পর্কে লোকদের পক্ষ হইতে তোমার উপর যতই প্রশ্ন আসুক না কেন তুমি সকলকে ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি রোযা থাকার নিয়ত ও মান্নত করিয়াছ।

অতপর মারইয়্যাম শিশুকে কোলে লইয়া প্রকাশ্যে নিজের লোকদের মধ্যে আসিয়া গেলেন। অপবাদ, তান-তিসনা ও তিরস্কারের ঝড় বহিতে লাগিল। মারইয়্যাম রোযার দরুন কথা বলা হইতে বিরত থাকিলেন এবং শিশুর প্রতি ইশারা করিয়া তাহার নিকট হাল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, লোকগণ ইহাতে আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু সদ্য প্রসূত শিশু হযরত ঈসা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি দান করিলেন এবং তিনি যে নবী হইবেন, আল্লাহ তায়ালার কেতাব প্রাপ্ত হইবেন সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন; যদ্বারা মারইয়্যামের প্রতি সকল অপবাদের অবসান হইয়া গেল। এই বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনের বিবৃতিতে লক্ষ্য করুন–

اذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন ফেরেশতাগণ মারইয়্যামকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন তাঁহার তরফ হইতে প্রদত্ত কলেমার (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানের) যাহার নাম হইবে "মছীহ-মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা"। সে হইবে অতি মর্যাদাশালী দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। এবং সে হইবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের একজন। আর সে নবজাত শিশু অবস্থায় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় (সমভাবে পূর্ণ) কথা বলিবে এবং সে বিশিষ্ট লোকদের একজন হইবে।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ـ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

মারইয়্যাম (বুঝিতে পারিলেন, এইসব পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতেই, অতএব তাঁহার প্রতিই রুজু হইলেন–) আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার সন্তান কিরূপে হইবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? (ফেরেশতা) বলিলেন, এইরূপেই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা করেন, (আল্লাহ নিজ কুদরত বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন।) যখন তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন উহা সম্পর্কে হওয়ার আদেশ করেন; তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়। (পারা–৩, রুকু–১৩)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمْ ـ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ـ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ـ

কোরআনের মাধ্যমে মারইয়্যামের ঘটনা উল্লেখ করুন যখন মারইয়্যাম (গোসলের জন্য) স্বীয় পরিজন হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব এলাকার এক স্থানে আসিল এবং পর্দা করিয়া তাহাদের দৃষ্টি ও নজরের আড়াল হইয়া গেল।

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ـ قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ـ

এমতাবস্থায় আমি তাহার নিকট আমার দূত জিব্রাঈলকে পাঠাইলাম। সে তাহার সম্মুখে পূর্ণ মানুষের বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মারইয়্যাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি তোমা হইতে; তোমার যদি খোদার ভয় থাকে তবে ইহার মর্যাদা রক্ষা কর।

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ـ

জিব্রাঈল বলিলেন, আমি আপনার প্রভুর দূত; একটি পবিত্র ছেলে আপনাকে অর্পণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ـ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ـ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ـ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ـ فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ـ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ـ فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ـ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ـ

মারইয়্যাম বলিল, আমার ছেলে হইবে কিরূপে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে নাই, আর আমি বদকার মোটেও নই? জিব্রায়ীল বলিলেন, এই অবস্থায়ই (পুত্র হইবে;) আপনার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, এই অবস্থাতেই সন্তান দেওয়া আমার জন্য সহজ। (এই পুত্রকে এইভাবে সৃষ্টি করায় অন্যান্য অনেক রহস্য ত আছেই) এবং এই উদ্দেশ্যও রহিয়াছে যে, আমি তাহাকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে আমার বিশেষ কুদরতের নিদর্শন বানাইতে চাই এবং (তাহাকে নবুয়ত দানে লোকদের জন্য) আমার তরফ হইতে রহমত বানাইতে চাই। আর এইরূপে তাহার জন্ম নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেমতে মারইয়্যাম গর্ভে ছেলে ধারণ করিল। তারপর গর্ভ লইয়া সে এক দূরের এলাকায় চলিয়া গেল। অতপর প্রসব-বেদনা তাহাকে একটি খেজুর গাছের নিকট নিয়া আসিল। মারইয়্যাম অনুতাপ করিয়া বলিল, এই ঘটনার পূর্বে মরিয়া যাওয়া এবং নাম-নেশানা মুছিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে উত্তম ছিল। তখন মারইয়্যামের অবস্থান স্থলের পাদদেশ হইতে জিব্রাঈল ডাকিয়া বলিলেন, আপনি ঘাবরাইবেন না। আপনার প্রভু (আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন–) আপনার সন্নিকটে একটি নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আর খেজুর আপনার উপর ঝরিয়া পড়িবে।

فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ـ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِى اِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ـ

অতএব আপনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করুন এবং (মহান পুত্র দর্শনে) চোখ ঠান্ডা করুন। অতপর যদি আপনি কোন মানুষকে দেখেন, (এ সম্পর্কে কিছু বলিতে চায়) তবে (ইশারায়) বলিয়া দিবেন, আমি দয়াময় আল্লাহর নামে রোযার মান্নত ও নিয়্যত করিয়াছি, আজ কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলিবই না।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ـ يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ـ

অতপর মারইয়্যাম ছেলেকে কোলে উঠাইয়া স্বীয় লোকজনের মধ্যে আসিয়া গেল। সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, হে মারইয়্যাম! তুমি বড় জঘন্য কাজ করিয়াছ! হে হারুনের ভগ্নী! তোমার পিতা কোন খারাপ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও বদকার ছিলেন না, (তুমি এরূপ হইলে কিরূপে?)

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ـ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ـ

মারয়্যাম (প্রতি উত্তর না কিরিয়া) ছেলের দিকে ইশারা করিল; (তোমাদের যাহা বলিতে হয় ছেলের সঙ্গে বল।) লোকজন বলিল, কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কথা বলিব কিরূপে?

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ـ وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ـ

ঐ শিশু বলিয়া উঠিলেন, আমি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। তিনি আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন এবং তিনি আমাকে লোকদের কল্যাণ ও মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন, আমি যেখানেই থাকি লোকদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। আর আমাকে নামায ও যাকাতের কঠোর আদেশ করিয়াছেন– যাবত আমি (শরীয়তের স্থান ইহজগতে) জীবিত থাকি।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ـ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ـ

এতদ্ভিন্ন আমার মাতার ফরমাবরদারী করারও আদেশ করিয়াছেন, আর আল্লাহ আমাকে রূঢ়, বদমেজাজী, বদনছীবরূপে সৃষ্টি করেন নাই। আর আমার প্রতি সালাম– (শান্তির প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে সর্বদার জন্য, বিশেষতঃ) জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং পুনরুত্থানের দিন। (সূরা মারইয়্যাম– পারা–১৬, রুকু–৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আসমানী কেতাবে অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলীর সঙ্গে নবীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকে। বিশ্ব-মানবের পক্ষে শিক্ষণীয় ঘটনাবলী এবং কোন নবীর প্রতি ভ্রষ্ট লোকদের কোন অপবাদ থাকিলে খন্ডন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সাধারণতঃ নবীগণের ইতিহাস বর্ণনায় গ্রহণ করা হয়। পবিত্র কোরআনেও সাধারণ নবীগণের এই ধরনের আলোচনাই রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) সাধারণ রীতি বিহীন– কোন পুরুষের মাধ্যম ব্যতিরেকে স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত ছিল, কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা এবং তাঁহার মাতা পাক-পবিত্র মারইয়্যামের প্রতি অপবাদ ও কুৎসার ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল।

ভ্রষ্ট ইহুদিদের অপবাদের প্রতিবাদেই পবিত্র কোরআন হযরত ঈসার উচ্চ মর্যাদার বিবরণে এবং তাঁহার মাতার পবিত্রতা ও উচ্চ মর্তবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানে অনেক বিবৃতি দিয়াছে। যদ্বারা অবোধ নাছারা খৃস্টানরা সরল প্রাণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, মুসলমানদের কোরআনেই হযরত ঈসার এত অধিক প্রশংসা বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে ঐরূপ বর্ণনা নাই, অধিকন্তু হযরত ঈসার মাতা মারইয়্যামেরও বহু বহু প্রশংসা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

অবোধরা এতটুকু উপলব্ধি করিল না যে, হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতা মারইয়্যামের এইরূপ প্রশংসা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতার উপর জঘন্য অপবাদের কালিমা লেপন করিয়াছিল; উহারই সাফাই প্রদানে পবিত্র কোরআন এত অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহা বিশ্ব-হেদায়েত নামা পবিত্র কোরআনের বড় দায়িত্ব ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে ঐরূপ সাফাই প্রদানের কোন রূপ প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা মারইয়্যাম সম্পর্কে দুই দল দুই পথে গোমরাহ হইয়াছে। ইহুদিরা গোমরা হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি অপবাদ ও জঘন্য তোহমত লাগাইয়া, আর নাছারারা পরবর্তীকালে গোমরাহ হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন করিয়া। হযরত ঈসা (আঃ) নবী ও রসূল ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহর বান্দী মারইয়্যমের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ। তদ্রূপ মারইয়্যাম পাক-পবিত্র, আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্ট বান্দা। নাছারাগণ পরবর্তীকালে এক ইহুদি মোনাফেকের ধোকায় পড়িয়া মরয়্যামকেও খোদা এবং হযরত ঈসাকেও খোদা বা খোদার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও দাবী করে। যাহার ইতিহাস এই–

হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বানাইবার রহস্য

হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম ও সেই ধর্মাবলম্বী নাছারাগণের সঙ্গে ইহুদিদের ঘোর শত্রুতা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল। ইহুদিগণ প্রতমতঃ স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রাণে বধ করার চেষ্টা করে, তাঁহার ভূপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করার পর তাঁহার প্রচারিত সত্য দ্বীনকে নষ্ট করিবার তদবীরে তাহারা লাগিয়া যায়। প্রকাশ্য শক্তি ও বল প্রয়োগে তাঁহার দ্বীনকে বিকৃত করিতে না পারিয়া মোনাফেকীর সহিত মিত্রবেশে সেই সত্য দ্বীনকে বিকৃত করতঃ উহাকে মিথ্যারূপে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পায়। যাহার ঘটনা এই যে, জনৈক ইহুদি মোনাফেকীভাবে স্বীয় ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশীরূপে ঈসায়ী বা নাছরানী হয়– খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং সে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে ভন্ড তপস্যা, তপ-জপ, সাধনা–ভজনা করিতে থাকে। অতপর সে হঠাৎ লোকালয়ে ফিরিয়া আসে এবং এই প্রচারণা চালায় যে, আমি স্বয়ং যীশু–খৃস্টের দর্শন লাভ করিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছেন– "তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও, লোকেরা যেন আমাকে জারজ সন্তান মনে না করে, আমাকে যেন স্বয়ং খোদার পুত্র গণ্য করে এবং আমি যে, শূলি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়াছি উহাকে যেন অপমৃত্যু মনে না করে। আমি জগতে সমস্ত মানুষের– যাহারা আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে তাহাদের সকলের পাপ মোচনের জন্য শূলি কাষ্ঠের মৃত্যু বরণ করিয়াছি। আমি স্বয়ং খোদার বেটা হইয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়া জগতের সকল মানুষের পাপ পিতার নিকট হইতে মোচন করাইয়া লইয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

এই প্রবঞ্চক ছদ্মবেশী ইহুদিকেই পরবর্তীকালে প্রবঞ্চিত খৃস্টানগণ " সেন্টপল" নামে অভিহিত করিয়াছে এবং তাহাকে ও তাহার পবঞ্চনাময় মিথ্যা উক্তিকে শুধু গ্রহণই করে নাই, বরং উহাকেই কেন্দ্র করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করিয়াছে, আজও খৃস্টানগণ উহারই প্রচার করিয়া থাকে।

ইহুদিরা জানিয়া বুঝিয়া প্রবঞ্চনা করতঃ হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের সত্য দ্বীনকে বিকৃত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন ইহুদিগণকে مغضوب عليهم "মগযুব আলাইহিম" "আল্লাহ তায়ালার ক্রোধানলে পতিত ও অভিশপ্ত" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আর খৃস্টানগণ প্রবঞ্চনা ও ধোকায় পতিত হইয়া হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের দ্বীনের নামে মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং সেই মিথ্যাকে চালু রাখিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন তাহাদিগকে ضالين জাল্লীন "পথভ্রষ্ট" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

ইসলাম বাস্তববাদী ধর্ম ইহার প্রতিটি আক্বিদা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপবাদ ও অতিরঞ্জনের ঠাঁই ইসলামে নাই। এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই ইসলাম হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় ইহুদী ও নাছারা উভয় দলের ভ্রষ্টতার খন্ডন করিয়াছে।

পবিত্র কোরআন একদিকে ইহুদিদের অপবাদ ও তোহ্মতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসা ও মারয়্যামের প্রসংশায় বিশেষ প্রচারণা চালাইয়াছে। অপরদিকে হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম সম্পর্কে তওহীদের পরিপন্থী ও তওহীদ ধ্বংসকারী নাছারাদের যেসব অবাস্তব, অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন রহিয়াছে পবিত্র কোরআন সে সবের প্রতিবাদেও বিরাট প্রচারণা চালাইয়াছে এবং অনেক অনেক দলিল প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সে সবের খন্ডন করিয়া নাছারাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এইরূপে ইহুদী নাছারা উভয় দলের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ধুম্রজালকে ছিন্ন করিয়া পবিত্র কোরআন ছেরাতে-মোস্তাক্বীমের বিকাশ সাধন করিয়াছে যে–

(১) হযরত ঈসা আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বান্দা ছিলেন, মারইয়্যামের পুত্র ছিলেন।

(২) মারইয়্যাম পাক-পবিত্র, খোদাভক্তা নারী ছিলেন, আল্লাহর সৃষ্ট বান্দী ছিলেন।

(৩) যেরূপ সারা বিশ্বের মা'বুদ ও প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা; তদ্রূপ হযরত ঈসা ও মারয়্যামেরও মা'বুদ প্রভু-পরওয়ারদেগার ও আল্লাহ তায়ালা।

(৪) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরিক সাব্যস্ত করা যাইবে না, উহা অতিশয় মহাপাপ– যাহার অবধারিত ফল হইবে চিরকালের জন্য জাহান্নাম।

নাছারাবাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদে, উল্লিখিত বাস্তব সত্যসমূহের বিকাশনে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন–

হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম উভয়ই আল্লাহর বান্দা ছিলেন

يَاهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ - اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ -

হে কেতাবধারী নাছারাগণ! ধর্মীয় ব্যাপারে অতুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলিও না (যে ,তাঁহার ছেলে আছে বা তাঁহার শরিক আছে।) ঈসা মসীহ যিনি মারইয়্যাম পুত্র তিনি আল্লাহর রসূল ছিলেন মাত্র এবং আল্লাহর বিশেষ আদেশে সৃষ্ট ছিলেন, যেই আদেশ আল্লাহ তায়ালা মারইয়্যামের প্রতি পৌঁছাইয়াছিলেন এবং তিনি আল্লাহরই সৃষ্ট একটি আত্মা (তথা আত্মাবিশিষ্ট জীব; তিনি আল্লাহর পুত্র বা আল্লাহর শরীক কস্মিনকালেও নহেন– হইতে পারেন না।)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ - اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا -

অতএব সঠিকরূপে আল্লাহর উপর ঈমান আন (যে, তেনি একমাত্র মা'বুদ) এবং আল্লাহর রসূলদের উপর ঈমান আন (যে, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা ও প্রতিনিধি।) এইরূপ কথা মুখেও আনিও না যে, খোদা তিনজন; এই ধরনের কথা চিরতরে পরিহার কর; তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। বস্তুতঃ খোদা বা মাবুদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক, তাহার শরিক নাই। তাঁহার সন্তান আছে এইরূপ কথা (নিছক গর্হিত; ইহা) হইতে তিনি পাক-পবিত্র। আসমান সমূহে এবং যমিনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার মালিকানাভুক্ত; (একটিও তাঁহার সন্তান, সমকক্ষ বা শরীক নহে।) সব কিছু সমাধানে মহান আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ; (অন্যের প্রত্যাশী নহেন।)

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ

(তোমরা মছীহকে খোদা বা খোদার পুত্র বল, অথচ) স্বয়ং মছীহ কস্মিনকালেও আল্লাহর বান্দা হওয়ায় নাক সিটকাইবেন না। উচ্চস্তরের ফেরেশতাগণও নাজ সিটকান না যে, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা।

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ـ

যে কেউ আল্লাহর বন্দেগী ও গোলামী অবলম্বনে নাক সিটকাইবে এবং অহঙ্কার করিবে সে যেন স্মরণ রাখে, আল্লাহ সকলকে তাঁহার নিকট (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করিবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ـ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ـ

অতপর যাঁহারা প্রমাণিত হইবেন ঈমানদার নেক আমলকারী তাঁহাদিগকে আল্লাহ তাঁহাদের প্রাপ্য প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করিবেন এবং স্বীয় করুণাবলে আরও অধিক দিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ্য ও অহঙ্কারী প্রমাণিত হইবে, তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু ও সহায়ক পাইবে না। (পারা-৬, রুকু-৩)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলে, মারইয়্যাম-পুত্র মছীহ আল্লাহ্ই। (অর্থাৎ আল্লাহ মছীহ-এর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।* (হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি এই কথার অসারতা বুঝাইতে তাহাদের বলুন, আচ্ছা বলত মছীহকে এবং তাঁহার মাতা মরয়্যামকে এবং দুনিয়ার সকল মানুষকে আল্লাহ যদি মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা রোধ করার শক্তি কাহারও আছে কি? (সেই শক্তি কাহারও নাই, মছীহ-এরও ছিল না।) অথচ আল্লাহ যিনি হইবেন তাঁহার ক্ষমতায় ও আয়ত্তে হইবে সকল আসমান, যমিন এবং যাহা কিছু এই দুই-এর মধ্যে আছে।

তিনি সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহা ইচ্ছা এবং আল্লাহ হন সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (মসীহ-ঈসার মধ্যে কি এই শ্রেণীর কোন গুণ আছে?) (সূরা মায়েদাঃ পারা- ৬, রুকু- ৭)

* নাসারাদের মধ্যে বহু দল আছে- এক দলের দাবী এই যে, হযরত মছীহ খোদার পুত্র। আর এক দলের দাবী এই যে, তিন খোদার মধ্যে মসীহ ও তাঁহার মাতা মারইয়্যাম হইলেন দুইজন। আর এক দলের দাবী এই যে, মছীহ-ঈসা খোদা অর্থাৎ খোদা মসীহ-এর রূপে ও আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন- ইত্যাদি ইত্যাদি।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ـ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ـ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলিয়া থাকে যে, মারইয়্যাম পুত্র মসীহ আল্লাহই। অথচ মসীহ বলিয়াছেন, হে বনী ইস্রাঈলগণ! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু পরওয়ারদেগার। (তিনি আরও বলিয়াছেন) তোমরা স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতকে চিরদিনের তরে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার চিরকালীন বাসস্থান হইবে দোযখ এবং অনাচারীদের সহায়ক কেহই হইবে না। (পারা–৬, রুকু– ১৪)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ـ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

তাহারা কাফের যাহারা বলে, আল্লাহ তিন জনের একজন, (অর্থাৎ ঈসা, মারইয়্যাম এবং আল্লাহ এই তিন জন খোদা,) অথচ মাবুদ এক জনই আছেন (তিনি হইলেন, আল্লাহ তায়ালা।) তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (খোদা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের) ভ্রষ্ট লোকগণ যদি ঐসব হইতে চিরতরে বিরত না হয় তবে অবশ্যই (আখেরাতের) কষ্টদায়ক আযাব ঐসব কাফেরকে পাকড়াও করিবে।

اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

(সেই আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুফরী ত্যাগ করতঃ) তাহারা আল্লাহ পানে প্রত্যাবর্তন করে না কেন এবং (পুর্বাবস্থার জন্য) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় না কেন? অথচ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। (পারা– ৬,রুকু– ১৪)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ ـ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ

মারইয়্যাম-পুত্র মসীহ আল্লাহ রসূল– তিনি আর কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্বে অনেক রসূলই অতীত হইয়াছেন। (কেহই খোদা বা খোদার বেটা হন নাই।

وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ ـ كَانَا يَاْكُلاَنِ الطَّعَامَ ـ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

মছীহ-এর মাতা মারইয়্যাম ছিলেন (আল্লাহর প্রভুত্বে) পূর্ণ বিশ্বাসী, সত্যের প্রতীক। (তাঁহাদের কেহ খোদা হইতেই পারেন না। কেননা) তাঁহারা উভয়ে খাদ্য খাইতেন; (তাঁহাদের প্রত্যেকেই জীবন ধারনে আহারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।হে বিশ্বাসী! দেখ– মছীহকে যাহারা খোদারূপে বিশ্বাস করে তাহাদের (সেই ভুল নিরসনের) জন্য কিরূপ স্পষ্ট দলিল ও যুক্তি বর্ণনা করিতেছি; এতদসত্বেও তাহারা কিভাবে উল্টা পথে যাইতেছে তাহাও লক্ষ্য কর।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا ـ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(হে মুহাম্মাদ!) আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা কি (বোকা? যে,) এমন বস্তুর এবাদত কর যাহার মোটেই ক্ষমতা নাই তোমাদের লাভ-লোকসান করার? জানিয়া রাখিও, আল্লাহ (তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ) সব কিছু শুনেন ও জানেন।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ـ

আপনি তাহাদিগকে বলুন হে কেতাবধারী নাছারাগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অবাস্তব অতিরঞ্জনের পথ অবলম্বন করিও না এবং তোমরা তোমাদের ঐসব পূর্ব পুরুষদের অনুসারী হইও না যাহারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং সঠিক পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।
(পারা– ৬, রুকু– ১৪)

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ـ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتَ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ـ

হযরত ঈসা (ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার মাতার প্রতি অপবাদ খণ্ডনে) বলিলেন, আমি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন বলিয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাকে লোকদের মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন আর আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়াছেন যাবত আমি (ভূপৃষ্ঠে) জীবিত থাকি। (ছুরা মারইয়্যামঃ পারা– ১৬, রুকু– ৫)

ذٰلِكَ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ ـ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

(হযরত ঈসার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলেন,) মারইয়্যাম-পুত্র ঈসার পরিচয় এই। ইহাই সত্য বিবরণ যাহার মধ্যে ভ্রষ্ট ইহুদি-নাছারাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে। আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ কথা নিছক অবান্তর যে তিনি সন্তান রাখেন; অথচ তিনি মহান, পাক-পবিত্র। (আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার সৃষ্টি ক্ষমতা এইরূপ যে,) যখন তিনি কোন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছা করেন, তখন উহা সম্পর্কে শুধু তাঁহার আদেশ হয়– "কুন্" হইয়া যাও; ফলে তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অস্তিত্ববান হইয়া যায়। (ঈসার জন্ম এই ক্ষমতার দ্বারাই। (পারা–১৬, রুকু– ৫)

আলোচ্য বিষয়ে স্বয়ং ঈসা (আঃ) কর্তৃক চূড়ান্ত বিবৃতি

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সর্ব সমক্ষে বিশেষতঃ ভ্রষ্ট নাছারাদের শুনাইবার জন্য ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি লোকদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন আপনাকে এবং আপনার মাতাকে উপাস্য ও মা'বুদ বানায়?

তখন হযরত ঈসা (আঃ) বিশেষ দৃঢ়তা ও যুক্তি-প্রমাণের সহিত উহা অস্বীকার করিবেন। ভ্রষ্ট নাসারাদের অতিরঞ্জিত কথাবার্তা খণ্ডন করতঃ স্পষ্ট দাবী করিবেন যে, আমি তাহাদিগকে একমাত্র এই শিক্ষাই দিয়াছি যে– ان اعبدوا الله ربى وربكم –

হে বিশ্ববাসী! তোমরা সকলে এক আল্লাহকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর– এক আল্লাহর বন্দেগী, গোলামী ও এবাদত কর; যিনি আমার ও প্রভু-পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও প্রভু-পরওয়ারদেগার।

তিনি ইহাও বলিবেন যে, যাবত আমি ভূপৃষ্ঠে ছিলাম তাবৎ লোকদের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পর্কে আমি পূর্ণ তদারক এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছি; যে গলদ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে আমার পরে আসিয়াছে। আমি তাহাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতি অসন্তুষ্ট– উহার সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।

উক্ত প্রশ্নোত্তরের ঘটনা কেয়ামতের দিন ঘটিবে। আল্লাহ তায়ালা নাছারাবাদের কল্পিত ও গর্হিত অত্যুক্তি খন্ডনের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্য পবিত্র কোরআনে সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। যাহার উদ্ধৃতি এই-

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ - اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ - تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ - اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِىْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ - وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ - اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ - وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

স্মরণ কর (কেয়ামতের দিনের ঘটনা-) যখন আল্লাহ জিজ্ঞাস করিবেন, হে মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা! আপনি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন আমাকে এবং আমার মাতাকেও মাবুদরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলিবেন, আপনি মহান, পাক-পবিত্র- যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই সেই কথা বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না; আমি উহা বলি নাই। যদি আমি ঐরূপ বলিয়া থাকিতাম তবে আপনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন, আমি আপনার সব বিষয় জানিতে পারি না, কিন্তু আপনি ত আমার অন্তরের অন্তস্থলেরও সব কিছু জ্ঞাত আছেন; আপনি অপ্রকাশ্য সব কিছুও জ্ঞাত থাকেন। আমি তাহাদিগকে এক মাত্র ঐ কথাই বলিয়াছি যাহা আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন- তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মাবুদরূপে গ্রহণ কর, যিনি আমারও পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও পরওয়ারদেগার। আর আমি তাহাদের হাল-অবস্থার পর্যবেক্ষক ছিলাম যাবৎ আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলাম। অতপর যখন আপনি আমাকে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে একমাত্র আপনিই তাহাদের হাল অবস্থা প্রত্যক্ষকারী ছিলেন; আপনি ত সর্ব বিষয়েরই অবগতি রাখেন। (তাহাদের সব গোমরাহী আপনি জ্ঞাত আছেন- এখন) যদি আপনি তাহাদের শাস্তি দেন তবে সেই ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিয়াছে। কারণ তাহারা হইল আপনার বান্দা; (আপনি তাহাদের প্রভু।) আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা করেন তবেও (কিছু বলার অধিকার কাহারও নাই কারণ;) আপনি সর্বশক্তিমান সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানী হেকমতওয়ালা। (পারা-৭, রুকু- ৬)

১৬৫২। হাদীছ ঃ ওবাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই- মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ; তিনি এক, অদ্বিতীয়; তাঁহার কোন শরীক-সাথী নাই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁহার সৃষ্ট বান্দা, তাঁহার প্রেরিত রসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা, তাঁহার প্রেরিত রসূল; (সৃষ্টির রীতি পুরুষের স্পর্শে নারী গর্ভে সন্তানের জন্ম- এই রীতি ব্যতিরেকে পুরুষের স্পর্শ বিহীন শুধু) আল্লাহ তাআলার আদেশ বার্তা "কুন- হইয়া যাও" দ্বারা সৃষ্ট, এই আদেশের প্রতিক্রিয়া আল্লাহ তায়ালা মারইয়ামের প্রতি পৌছাইয়াছিলেন এবং (সাধারণ রীতি তথা কোন পুরুষ-স্পর্শনের মাধ্যম ব্যতিরেকে) আল্লাহ তায়ালা সরাসরি একটি রুহ বা আত্মারূপে হযরত ঈসাকে (মাতৃগর্ভে) পৌছাইয়া দিয়াছিলেন, (তিনি আল্লাহর সন্তান বা সমকক্ষ ছিলেন না।)

আরও ঘোষণা দিবে যে, (আল্লাহ-ভক্তদের জন্য) বেহেশত বরহক্ক ও বাস্তব এবং আল্লাহদ্রোহীদের জন্য) দোযখ বরহক্ক ও বাস্তব (-এই সব গল্প-গুজব নহে।)

এইরূপ আক্বিদাহ ও বিশ্বাসের ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিগণ বেহেশত লাভ করিতে পারিবে নিজ নিজ আমলের ভিত্তিতে। (এমন কি যদি ঐরূপ ঘোষণা দানকারীর আমল ভাল না হয় এবং স্বীয় বদ আমল আল্লাহর দরবার হইতে ক্ষমা না করাইয়া থাকে তবে শাস্তি ভোগ করার পর উক্ত বিশ্বাস তথা ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই চিরস্থায়ী রূপে বেহেশত লাভ করিতে পারিবে।)

নাছারাবাদের তথাকথিত যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু

ভূমিকা ঃ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি (EMBASADOR) নিযুক্ত হইয়া আসিলে তিনি স্বীয় নিযুক্তিস্থলে পদার্পণ করিয়া পরিচয়পত্র পেশ করেন। তদ্রূপ রসূলগণ আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি; যত রসূল দুনিয়াতে পদার্পণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সম্মুখে স্বীয় পরিচয়পত্র স্বরূপ বিভিন্ন মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখাইয়াছেন যদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্কে রহিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এত বড় ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

মো'জেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার মূল কর্মকর্তা এবং মূল উৎস হইলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। নবী বা রসূলের সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং যে কোন প্রকার মো'যেজার দরুন যদি নবী বা রসুলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পর্যায়ে রাখা হয় তবে তাহা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা হইবে এবং কোন নবী কখনও নিজে ঐরূপে দাবী করিতে পারেন না। শয়তানই লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে পতিত করে।

নবীকে বহু রকমের বহু মো'জেযাই প্রদান করা হয়, অবশ্য সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, যেই যুগে যেই বিষয়ে লোকদের উন্নতি অধিক ছিল সেই বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা সেই যুগের নবীকে তাঁহার প্রধান মোজেযা দান করিয়াছেন। কারণ, সেই বিষয়ে যুগের লোকদের চরম উন্নতি লাভ থাকা সত্ত্বেও যখন নবী অন্য লোকদের ক্ষমতার ঊর্ধের ঘটনা দেখাইতে সক্ষম হন তখন ন্যায়পরায়ণ লোকগণ নবীর মর্যাদাটা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যেমন মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে যাদুবিদ্যার অত্যধিক প্রসার ছিল, তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে "আ'ছা" বা লাঠিকে সাপ বানাইবার মোজেযা দিয়াছিলেন। যদ্দুরূন শুভবুদ্ধির উদয়নে যাদু-করগণ তৎক্ষণাৎ হযরত মূসার মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এবং তাঁহার জন্মদেশে আরবী সাহিত্যের অত্যধিক উন্নতি ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে মানব ক্ষমতার উর্ধ্বের সাহিত্যিক গুণাবলী বিশিষ্ট কেতাব কোরআন মজিদ প্রধান মো'জেযারূপে দান করিয়াছিলেন।* যদ্দরুন ন্যায়পরায়ণ আরবগণ অতিসহজেই তাঁহার মর্যাদা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী কবি "লবীদ" এবং আরও অনেক কবির ঘটনা ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যুগে যুগে নবীগণের মো'জেযা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই নিয়মই চলিয়া আসিয়াছে যে, যেই যুগে যে বিষয়ের অধিক উন্নতি ও প্রভাব ছিল সেই যুগের নবীকে সেই বিষয়ে প্রধান মোজেযা দেওয়া হইয়াছে- ইহা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য।

যেই যুগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব সেই যুগে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মো'জেযা দিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এমন ব্যধি বা রোগকে ভাল করিতে পারিতেন যাহা সকল চিকিৎসকের নিকট দুরারোগ্য। যেমন-

(১) মৃত্যু- ইহার কোন চিকিৎসা চিকিৎসকের নিকট নাই; মরা মানুষকে কেউ জীবিত করিতে পারে না। হযরত ঈসাকে আল্লাহ তায়ালা মো'যেজা দিয়াছিলেন- তিনি কোন মৃতকে লক্ষ্য করিয়া قم باذن الله কুম বে ইজ্ নিল্লাহ "আল্লাহর আদেশে তুমি জীবিত হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃতদেহ জীবিত হইয়া উঠিত।

---

* পূর্ববর্তী নবীগণকে যে সব আসমানী কেতাব প্রদান করা হইয়াছিল উহার এবারত (reading) কোরআন মজিদের ন্যায় সাহিত্যিক গুণাবলীতে মানবশক্তির উর্ধ্বে ছিল না; যাহার ফলে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কর্তন ও সংমিশ্রণের দ্বারা ঐ সবের বিকৃতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ শত্রুর সক্রিয় চেষ্টা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর কোরআন মজিদের একটি অক্ষরের বেশ-কম করাও সম্ভব হয় নাই, হইবেও না।

(২) মাটির তৈরী পাখির আকৃতি– কোন চিকিৎসাবিদ এইরূপ জড় জিনিসকে আত্মা দান করিয়া জীবন্ত বানাইবে তাহা সম্ভব নহে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মোজেযা দিয়াছিলেন– তিনি ঐরূপ মাটির তৈরী পাখীর দেহে ফুৎকার মারিলে আল্লাহ তায়ালার আদেশে উহা বাস্তবেই পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত।

(৩) জন্মান্ধকে কোন চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা তাহার দৃষ্টি শক্তি আনয়ন করিতে পারে না, তদ্রূপ কুষ্ঠ রোগের কোন চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মো'জেযা দিয়াছিলেন– তাঁহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিতেন এবং কুষ্ঠ রোগ দূর হইয়া যাইত।

(৪) এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার এই মো'জেযা এও ছিল যে, বাড়ীতে যে যাহা খাইয়াছে এবং যাহা সঞ্চিত রাখিয়াছে, ঈসা (আঃ) নিজে নিজেই সেই সবের বিবরণ বলিয়া দিতে পারিতেন।

এইসব বিষয়াবলী অলৌকিক ও অসাধারণ ছিল বটে, কিন্তু পয়গাম্বরগণের পক্ষে তাহাদের মো'জেযা স্বরূপ এই ধরনের ঘটনাবলী যুগে যুগেই চলিয়া আসিয়াছে। পবিত্র কোরআনে হযরত মূসার ঘটনা উল্লেখ আছে– এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার জন্য নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও একটি ঘটনা উল্লেখ আছে– হযরত মূসা সত্তর জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল লইয়া তূর পর্বতে গিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য হঠকারিত করিলে সকলেই আল্লাহর গজবে ধ্বংস হইয়াছিল। অতপর হযরত মূসাার দোয়ার বদৌলতে সত্তর জনের সকলেই জীবিত হইয়াছিল। তদ্রূপ একটি নির্জীব কাষ্ঠখন্ড বা লাঠি হযরত মূসার পক্ষে বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া যাইত, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে।

আমাদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও এই ধরনের বহু বহু মো'জেযা হাদীছের কেতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

(১) একটি নারী তাহার ছেলেসহ ইসলাম গ্রহণ করতঃ হিজরত করিয়া মদিনায় উপস্থিত হইলে পর অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ছেলেটি মারা যায়। নিঃসহায় নারীটি ছেলের মৃত্যুর সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল; তাহার ছেলের লাশ হযরতের সম্মুখে রক্ষিত ছিল। নারীটি হযরতের পায়ের নিকট বসিয়া অতি কাতর স্বরে দো'আ করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত ছেলেটি হাত-পা নাড়া দিয়া আবরণের চাদরটি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল এবং জীবিত হইয়া উঠিল, এমনকি তাহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পরও অনেক দিন সে বাঁচিয়া ছিল। আরও একটি ঘটনা– আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবির পুত্র জাবের (রাঃ) ছাহাবীর ঘরে একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) দাওয়াত খাইতে আসিলেন। তথায় তাঁহার জন্য একটি ছাগল জবেহ করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং একমাত্র পুত্র জাবের (রাঃ)-কে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় বিরাট সংসারের ব্যয় বহন ও ঋণের চাপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে বলিয়া দিলেন সকলেই গোশত খাইবে, কিন্তু হাড্ডি চিবাইবে না। অতপর হযরত (সঃ) ছাগলের গোশতের হাড়গুলি একত্রিত করিলেন এবং ঐগুলির উপর হাত রাখিয়া কিছু দোয়া পড়িলেন, হঠাৎ ছাগলটি পূর্ণ শরীরে জীবিত হইয়া শরীর ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এই শ্রেণীর আরও অনেক ঘটনার বিবরণ হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এই ধরনের মো'জেযা আরও অনেক বর্ণিত আছে– একটি নির্জীব শুষ্ক কাষ্ঠ, খেজুর বৃক্ষের কান্ড– মসজিদের খুঁটি জীবন্ত মনুষের ন্যায় হযরতের বিচ্ছেদে কাঁদিতেছিল। অতপর হযরত (সঃ) উহাকে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলে শান্ত হইয়াছিল– এই ঘটনা "উসতুয়ানায়ে-হান্নানাহ্"-এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। বদরের যুদ্ধে ওকাশা ইবনে মেহছান (রাঃ) এবং ছালামাহ ইবনে আছলাম (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের তরবারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদিগকে এক এক খানা গাছের ডালা দিয়াছিলেন যাহা লৌহ তরবারীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

(৩) এই শ্রেণীরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একটি নারী তাহার ছেলেকে লইয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। ছেলেটি যৌবন বয়সে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সে ছিল জন্ম-বোবা, কথা বলিতে পারিত না। হযরত (সঃ) ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত আমি কে? তৎক্ষণাৎ ছেলেটি বাক শক্তি লাভ করিয়া বলিল, انت رسول الله আপনি আল্লাহর রসূল। আরও একটি ঘটনা– এক লোকের পা সাপের ডিমের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে লইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (সঃ) ঘটনা শুনিয়া তাহার চোখে থু থু দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তি বহাল হইয়া গেল, সে ৮০ বৎসর বয়সেও সূঁচের ছিদ্রে সুতা দিতে সক্ষম ছিল। এতদ্ভিন্ন বদরের যুদ্ধে ক্বাতাদাহ ইবনে নোমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু ভীষণ আঘাতে খসিয়া পড়িয়াছিল, হযরত (সঃ) হাতে ধরিয়া চক্ষু বসাইয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ চক্ষু ভাল হইয়া গেল যেন উহার মধ্যে কখনও কোন যাতনা অনুভবই করেন নাই। খায়বরের যুদ্ধকালে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চক্ষুদ্বয়ের ভীষণ যাতনা ছিল, হযরতের থুথুতে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হইয়াছিল।

(৪) অজ্ঞাত বিষয়ের খবর বলিয়া দেওয়ার ঘটনা ত ইতিহাসে অসংখ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের আক্রমণে ভীষণরূপে পরাজিত হইয়াছিল এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন, অচিরেই রোমীয়গণ পার্সী গণের উপর জয়লাভ করিবে। এই সম্পর্কে কাফেরদের সঙ্গে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বাজিও রাখিয়াছিলেন। অবশেষে রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তিই সত্য হইয়াছে। রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের উপর বিরাট জয়লাভ করিয়াছে। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে ২১ পারায় সূরা রোমের আরম্ভেই উল্লেখ আছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) রাত্রে চোর ধরিয়া গোপনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ভোরে হযরত (সঃ) তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিন দিন এইরূপ ঘটনা হইয়াছে।

মক্কা অভিযানের গোপন খবরের এক পত্র লইয়া এক নারী মদীনা হইতে মক্কা যাইতেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ) এবং অপর একজনকে পাঠাইয়া দিলেন সেই পত্র হস্তগত করার জন্য এবং নির্দিষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, তোমরা তাহাকে "রওজা-কাখ" নামক স্থানে পাইবে; বাস্তবে তাহাই হইল।

এই ধরনের হাজার হাজার মো'জেযা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রহিয়াছে, যাহার সাক্ষ্য প্রমাণ-যুক্ত বিবরণ "আল-খাছায়েছুল কোবরা" "দালায়েলুন-নবুওয়াহ্ লে-আবিন্ নুয়াঈম" এবং "দালায়েলুন্ নবুওয়াহ লেল-বায়হাক্বী" ইত্যাদি কিতাবে বিদ্যমান আছে। এত মোজেযা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত মুসলমানগণ বা তাহাদের কোন দল হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) কে খোদা বা খোদার শরীক বলিয়া উক্তি করে নাই বরং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে তাহার ঈমানকে প্রমাণিত করার জন্য এই ঘোষণা দান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যে–

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله -

"আমি আমার আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ– আর কোন মা'বুদ নাই; তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি এই ঘোষণাও দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল।"

এমনকি কোন সময়ও যেন মুসলমানদের মধ্যে এই আকীদা ও বিশ্বাস বিস্মৃতির ধুম্রজালে ঢাকিয়া যাইতে না পারে সেই জন্য মুসলমানদের প্রতিটি ভাষণ ও অনুষ্ঠানাদির উদ্বোধনের প্রারম্ভে সর্বসমক্ষে এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদানের রীতিও ইসলামে আবহমান কাল হইতে প্রবর্তিত রহিয়াছে।

স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও স্বীয় উম্মতের প্রতি এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

১৬৫৩। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর (রাঃ)-কে সর্বসমক্ষে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি– তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি– তিনি স্বীয় উম্মতকে সতর্ককরণ পূর্বক বলিয়াছেন, খবরদার! আমার প্রশংসা করিতে এবং মর্যাদা বাড়াইতে অতিরঞ্জিত উক্তি করিবে না– যেরূপ নাছারাগণ মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে করিয়াছে।

আমি আল্লাহ সৃষ্ট বান্দা বৈ নহি; (আমাকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্যকারী কোন উক্তি দ্বারা আখ্যায়িত করিও না) হাঁ– আমার সম্পর্কে বল, "আল্লহর বান্দা ও রসূল"।

অর্থাৎ তোমরা আমার সম্পর্কে নাছারাদের ভূমিকা গ্রহণ করিও না– নাছারা বা খৃস্টানগণ ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মো'জেযা সমূহকে কেন্দ্র করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদল বলে, ঈসা-মসীহ খোদার বেটা বা ছেলে। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ ও তাহার মাতা তিন খোদার দুই খোদা। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ-ই খোদা।

এমনকি ঐতিহাসিক "অফদে-নাজরান"– নাজরানের গির্জা হইতে আগত নাছারাবাদের বড় বড় পাদ্রীগণের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল মদিনায় স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে ঐসব অলৌকিক ঘটনার দলীল প্রমাণ লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রতি উত্তরে পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়; বিস্তারিত বিবরণ এই–

অফদে নাজরান পাদ্রীদের বিশেষ প্রতিনিধি দল

ইয়ামানের অন্তর্গত "নাজরান" একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল, ঐ শহরেই রোমের অধীনে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ চার্চ বা গির্জা ছিল তৎকালীন খৃস্টান ধর্মীয়দের।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম হিজরী সনে দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও ধর্মপ্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত-নামা বা আহবান-পত্র বিশেষ বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খৃস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কেন্দ্র এই নাজরানেও দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। এই নাজরান গির্জার অধীনে সত্তরের অধিক নগর বা গ্রাম ছিল এবং লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবক যুবক নাগরিক সিপাই ছিল। এতদসত্ত্বেও নাজরানের পাদ্রিগণ ইহুদিদের ভয়ে ভীত ছিল। ইহুদিরা খৃস্টানদিগকে এক কথায় লা-জওয়াব করিয়া দিত যে, "তোমরা যাহাকে তোমাদের ধর্মের প্রধান বল তাহার ত বাপের ঠিক নাই– সে ত জারজ সন্তান, তাহার মৃত্যুই হইয়াছে অপমৃত্যু তথা শূলিতে; শূলিতে মৃত্যু ঘটে অভিশপ্তদের।"

ইহুদীদের এই আক্রমণের প্রতিরোধেই খৃস্টানগণ তাহাদের ছদ্মবেশী গুরু বৈপিতা সেন্টপলের প্রবঞ্চনাময় মন্ত্র গাহিয়া বেড়াইত যে, আমাদের ধর্মপ্রধানের বাপ হইলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং শূলিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলেও সেই মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না, বরং তিনি স্বয়ং শূলিবিদ্ধ হইয়া পিতার নিকট হইতে সকলের পাপ মোচন করাইয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবী নিছক মিথ্যা ভিত্তিহীন, এই সবের মূলে কোন যুক্তি প্রমাণ মোটেই নাই।

পূর্বেও বলা হয়েছে, ইসলাম হইল বাস্তব ও সত্যের প্রতীক ধর্ম। ইসলাম মিথ্যার আশ্রয় মোটেই লয় না এবং সত্যের প্রচার এবং প্রকাশ্যেও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখায় না, তাই ইসলামের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং ইসলামের কেতাব পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের গুণগান ও প্রশংসা করিল। তাঁহার ও তাঁহার মাতার মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া অনেক অনেক বিবৃতি দান করিল এবং ঈসার জন্ম-বৃত্তান্তের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া এবং সে সম্পর্কে বাস্তব ও সত্য ঘটনার উদঘাটন করিয়া ইহুদিদের মিথ্যা ও ভ্রষ্ট অপবাদের দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর প্রদান করিল। পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিল যে,

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক-পবিত্র বিশিষ্ট নবী ছিলেন; তাঁহার সম্পর্কে অপবাদকারীগণ আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত।

এইসব বিবৃতি ও ঘোষণায় ইসলামের তরফ হইতে ইহুদিদের মোকাবিলায় নাছারাদের পক্ষ সমর্থন ছিল; কাজেই নাছারাগণ খুব সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। নবম হিজরী সনের প্রারম্ভে তাহাদের প্রধানতম কেন্দ্র নাজরানের পাদ্রিগণ বিশেষ শান-শওকতের সহিত– চৌদ্দ গোত্রের প্রধান প্রধান পাদ্রীগণ, তৎসঙ্গে তিনজন সর্বোচ্চ নেতাসহ মোট ষাটজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় আসিল এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

তাহাদের সর্বপ্রধান নেতা ছিল "আব্দুল মসীহ ওরফে আকেব" প্রধান ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ লাটপাদ্রী ছিল "আবু হারেছা" এবং তাহাদের রাহবর বা পথ-পরিচালক নেতা ছিল "আইহাম ওরফে ছাইয়্যেদ"।

প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই প্রধান– আবদুল মছীহ এবং আইহামকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করিল। নেতাদ্বয় হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (সঃ) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। তাহারা বলিল, আমরা ত পূর্ব হইতেই মুসলমান (তথা আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করিয়া থাকি)। হযরত (সঃ) বলিলেন, আপনাদের ইসলামের দাবী মিথ্যা দাবী; আপনারা ত ইসলামের পরিপন্থী আকীদা ও কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। আপনারা (হযরত ঈসাকে) আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেন, ক্রুশকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শূকর খাইয়া থাকেন (যাহা কোন নবীর ধর্মেই হালাল নয়)।

নেতাদ্বয় তদুত্তরে বলিল, হযরত ঈসা যদি আল্লাহর পুত্র না হন তবে পিতা কে? এই যুক্তির উপরই তাহারা অধিক জোর দিল যে, কোন মানুষ হযরত ঈসার পিতা ছিল না, সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার পিতা, নতুবা তাঁহাকে জারজ বলিতে হয়, অথচ কোরআন ও ইসলাম এই কথা ঘোর প্রতিবাদকারী।

এতদ্ভিন্ন নাছারাগণ হযরত ঈসা খোদা হওয়ার এই দলিলও বয়ান করিত যে, তিনি মৃতকে জীবিত করিতে পারেন, অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন, মানুষ নিজ ঘরে কি খাইয়াছে কি করিয়াছে এইরূপ গায়েবের খবর বলিতে পারেন।

এই নাজরান প্রতিনিধি দলের বিতর্ক উপলক্ষ্যেই নাছারাদের বক্তব্যাদি খন্ডন পূর্বক সূরা আলে এমরানের প্রথম ৮৪টি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে নাছারাগণকে লক্ষ্য করিয়া চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

প্রথমত ঃ অতি সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার দুই তিনটি এমন গুণ বা ছেফতের উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্দারা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, অন্য কেহই তাঁহার শরীক, সাথী বা সমকক্ষ মা'বুদ; উপাস্য করা যাইতে পারে না। সূরাটির প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হইয়াছে, আল্লাহ যিনি তিনি হইলেন الحى "চিরজীবন্ত, অনাদি অন্তত" এবং القيوم "সারা বিশ্বের ধারকও রক্ষক;" সারা বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই উহার ধারণকারী ও অস্তিত্ব রক্ষাকারী। সেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার যোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর আরও একটি গুণ বিশেষরূপে উল্লেখ হইয়াছে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ـ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ এমন যে, তাঁহার সম্মুখে আসমান-জমিনের কোথাও একবিন্দু বস্তুও গোপন অজ্ঞাত অজানা থাকিতে পারে না।"

পক্ষান্তরে যে কোন নবী মো'জেজা স্বরূপ গায়েবের কোন বিষয় বলিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হয় নেহাত সীমাবদ্ধ। যেমন, ঈসা (আঃ) এই সম্পর্কে গোপন খবর বলিতে পারিতেন যে, একজন লোক সে আজ কি খাইয়াছে এবং বাড়ীতে কি কি বস্তু সঞ্চিত রাখিয়াছে। এই সীমার বাহিরে অন্য কোন গায়েবের

খবর তিনি বলিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মাতার জন্ম-বৃত্তান্ত এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যদ্দারা অতি সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁহারা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার মখলুক বা সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। অবশ্য হযরত ঈসার সৃষ্টি ও তাঁহার জন্মলাভ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে হইয়াছিল। সেই কুদরত কি ধরনের ছিল তাহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ـ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

"নিশ্চয় ঈসার (বিনা-বাপে জন্মের) আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষে (মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। তাঁহার জন্মের ব্যবস্থাটা) আদমের (জন্ম) বৃত্তান্তের ন্যায়ই। আদমকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, "কুন্‌– হইয়া যাও" সঙ্গে সঙ্গে আদম (জীবন্ত) হইয়া গিয়াছিলেন।"

হযরত আদম যেরূপ মাতা-পিতা ব্যতিরেকে আল্লাহর কুদরত শুধু আল্লাহর আদেশ দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছেন, হযরত ঈসাও তদ্রূপ কোন পিতার স্পর্শন ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে শুধু আল্লাহর অদশ দ্বারা মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা এই তথ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন–

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ

"এই সত্যটি তোমার মহা প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতেই প্রচারিত; এই সম্পর্কে কোন সংশয়ে পড়িও না।" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণও উল্লেখ হইয়াছে যে,

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۤءُ ـ

"মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে তৈরী ও গঠন করিতে পারেন।" যেমন– মাতৃ বীর্যের সঙ্গে পিতৃবীর্যের সংযোজনেও গঠন করিতে পারেন, যেরূপ সাধারণতঃ হয়; বিনা সংযোজনেও গঠন করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ কেতাবধারী বিশেষতঃ নাছারাগণকে খাঁটী তৌহিদ ও একত্ববাদের প্রতি আহবান জানানো হইয়াছে, যদ্দারা নাছারাগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে একত্ববাদী নহে, বরং মোশরেক।

নাছারাগণ হযরত ঈসাকে খোদার বেটা বলা সত্বেও, অধিকন্তু হযরত ঈসা এবং তাহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলা সত্বেও, মুয়াহ্‌হেদ বা একত্ববাদী হওয়ার দাবী করিয়া থাকে। এস্থলে তাহাদের সেই দাবীকে অসার ও অবাস্তব সাব্যস্ত করতঃ আহবান জানান হইয়াছে যে, তোমরা মুখে মুখে যে একত্ববাদের দাবী কর কার্যস্থলে উহা প্রতীয়মান করার সৎ সাহস লইয়া অগ্রসর হও।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"হে কেতাবধারীগণ! যে বিষয়টি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ঐক্যমতপূর্ণ যে, আমরা এক আল্লাহ বিভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত-উপাসনা করিব না, কোন জিনিসকে তাঁহার শরীক-সাথী সাব্যস্ত করিব না এবং মানুষ মানুষকে "রব" প্রভু বা রক্ষাকর্তা ত্রাণকর্তা, বিধানকর্তারূপে গ্রহণ করিব না (অর্থাৎ তৌহীদ ও একত্ববাদ, যে সম্পর্কে আমাদের ত স্থির সিদ্ধান্ত আছেই এবং তোমরাও উহার দাবী করিয়া থাক)– কার্যস্থলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রতীয়মান করিতে অগ্রসর হও।"

চতুর্থঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর দাবী করিয়াও বিপরীতুমখী ইহুদি-নাছারাগণ নানারূপ মিথ্যা ও আজগুবী উক্তি করিয়া থাকে, সেই সম্পর্কেও এই সূরায় মূল ঘটনার বর্ণনা আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিবে।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ নাযিল হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ঐসব দলীল-প্রমাণ ও বিষয়বস্তু ব্যক্ত করিলেন। তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরূত্তর হইল, তবুও ইসলাম গ্রহণে অগ্রসর হইল না। তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ মোতাবেক সর্বশেষ পন্থা অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে "মোবাহালাহ"-এর প্রতি আহবান জানাইলেন। "মোবাহালাহ" অর্থ কোন বিতর্কে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ এই রূপে দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী সেই পক্ষের উপর তোমার অভিশাপ ও গজব পতিত হউক, সে পক্ষ তোমার গজবে ধ্বংস হইয়া যাউক।

উভয় পক্ষের মনোবল ও দৃঢ়তা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে অধিক জোরদার করার জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও এই বদ-দোয়ায় শামিল করা যাইতে পারে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নাজরান প্রতিনিধি দলকে এইরূপ চূড়ান্ত মুবাহালার প্রতিই আহবান করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশেই ঐরূপ করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآئَنَا وَاَبْنَآئَكُمْ وَنِسَآئَنَا وَنِسَآئَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

অর্থঃ (মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইল– তাঁহার সম্পর্কে) ইহাই হইল বাস্তব তথ্য– প্রভু-পরওয়ারদেগারের বর্ণিত; অতএব এই সম্পর্কে দ্বিধাবোধের অবকাশ রাখিবেন না। অতপর ঈসা সম্পর্কে (এই সত্যের বিপরীত) যে কেহ আপনার সঙ্গে হঠকারিতা ও বৃথা তর্ক করে তাহাকে "বলুন, আস! আমরা (উভয়ে) আমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গকে নিজ নিজ সঙ্গে লইয়া একত্রিত হই এবং আল্লার দরবারে কায়মনোবাক্যে এই রূপ দোয়া করি যে, আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ ও গজব হউক হকের বিরোধী মির্থ্যাবাদী পক্ষের উপর।"

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় কলিজার টুকরা কন্যা ফাতেমাকে এবং তাঁহার স্বামী ও জামাতা আলী (রাঃ)-কে এবং পৌত্র হাছান ও হোছাইনকে (সহজ সুলভরূপে) ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহারা আমার পরিজন। (অর্থাৎ মোবাহালাহ করার জন্য আমি ইহাদিগকে সঙ্গে রাখিব।)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) ফাতেমা, আলী এবং হাছান ও হোছাইনকে সঙ্গে লইয়া মোবাহালাহ করার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি দোয়া করা আরম্ভ করিলে তোমরা আমীন বলিতে থাকিও। (রুহুল মায়ানী ২–১৮৮)

এইরূপে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অগ্রগামী হইয়া মোবাহালার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা পূর্বক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রতিনিধি দলের প্রধানগণকে মোবাহালার জন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা সত্য। আল্লাহ বলিয়াছেন–

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَ هُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ ....

"কিতাবধারী আলেমগণ মুহাম্মাদ (সঃ) কে আল্লাহর রসূলরূপে সন্দেহাতীতরূপে চিনিয়া থাকে– যেরূপ তাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে নিজ সন্তানরূপে চিনে, তবুও তাহাদের এক শ্রেণীর লোক জানিয়া শুনিয়া স ত্য গোপনে লিপ্ত আছে।" (পারা– ২, রুকু– ১)

নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রধানগণও এই শ্রেণীরই ছিল, সুতরাং তাহারা আল্লাহর রসূলের বদ দোয়ার তলে আসিতে সাহসী হইল না। তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে আবেদন

করিল যে, আমরা এই সম্পর্কে চিন্তা ও পরামর্শ করিব এবং তিন দিনের অবকাশ চাহিয়া নিল। তাহাদের পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, মোবাহালায় অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য, সুতরাং যে কোন বিনিময়েই হউক সন্ধি করিতেই হইবে।

অতপর তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই আবেদন করিল যে, আমরা মোবাহালায় অবতীর্ণ হইব না। আমরা আমাদের সমগ্র দেশসহ আপনার বাধ্যগত অধীনস্থ করদাতা রূপে থাকিব। হযরত (সঃ) তাহাদের আবেদন গ্রহণ করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে বাৎসরিক ২০০০০ জোড়া কাপড়, ৩৩টি লৌহ বর্ম, ৩৩টি উট এবং ৩৪টি ঘোড়া তাহাদের উপর ধার্য করিয়া দিলেন (তফছীর রুহুল মায়ানী ২-৮৮)। এতদ্ভিন্ন ২০০০ "উকিয়া" তথা ৮০০০০ দেরহাম (প্রায় ২০০০০ টাকা) নগদও ধার্য করিয়াছিলেন (ফতহুল বারী ৮-৭৭)। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে একটি নিরাপত্তা দান-পত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহার নকল সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস ভান্ডার "তবকাতে-ইবনে ছা'য়াদ" নামক কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। (১-২৮৭।)

তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদনও করিল যে, একজন বিশ্বস্ত লোক আমাদের উপর নিযোগ করিয়া দেন; যিনি আমাদের হইতে কর আনিবেন। হযরত (সঃ) আবু ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ)-কে মনোনীত করিলেন। বোখারী শরীফে নাজরান প্রতিনিধি দলের বিবরণ সম্পর্কে ২৬৯ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ আছে তথায় এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি আছে–

১৬৫৪। হাদীছ ঃ হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আবদুল মছীহ ওরফে) আ'কেব এবং (আইহাম ওরফে) ছাইয়্যেদ নাজরানের এই প্রধানদ্বয় (সঙ্গীগণসহ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল।

(ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তাহারা মোবাহালার সম্মুখীন হইয়া প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাব দেখাইল যেন) তাহারা হযরতের সঙ্গে মোবাহালাহ করিতে প্রস্তুত আছে। অতপর তাহাদের একজন অপরজনকে বলিল, খবরদার! এই ব্যক্তির সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হইও না। তিনি যদি সত্যই হইয়া থাকেন (যেরূপ আমাদের ধারণা) এবং আমরা তাহার সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হই তবে (নিশ্চয় আমাদের উপর তাঁহার অভিশাপ পতিত হইবে, ফলে) আমরা রেহাই পাইব না, এমনকি আমাদের বংশধরগণ পর্যন্ত রেহাই পাইবে না।

অবশেষে (মোবাহালায় অবতীর্ণ না হওয়া সাব্যস্ত করিয়া) তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদন জানাইল যে, (আমরা মোবাহালাহ করিব না, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম। সেমতে রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে) আপনি আমাদের উপর যাহা ধার্য করিবেন আমরা তাহাই পরিশোধ করিব। আর আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে একজন বিশ্বস্ত লোক মনোনীত করিয়া দিন– বিশ্বস্ত নয় এমন লোক পাঠাইবেন না। হযরত ফরমাইলেন, নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোকই পাঠাইব– পূর্ণ বিশ্বস্ত। (আল্লাহর রসূলের নিকট পূর্ণ বিশ্বস্তরূপে পরিচয় লাভের) এই সুযোগের প্রতি ছাহাবীগণ প্রত্যেকে তাকাইয়া রহিলেন। অতপর হযরত (সঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ) কে এই পদে মনোনীত করিলেন। তিনি যখন যাত্রা করিবেন তখন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

নাজরান প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ খবর এই যে, তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল এবং ধার্যকৃত রাষ্ট্রীয় কর বরণ করতঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিনিধি ও তাঁহার নিরাপত্তাদানপত্র লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পরেই প্রতিনিধি প্রধান– আবদুল মছীহ ওরফে আ'কেব এবং আইহাম ওরফে সাইয়েদ তাঁহারা পুনরায় হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ফতহুল বারী ৮-৭৭)

মো'জেযা পয়গাম্বরের জন্য আল্লারই দান

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, মো'জেযা কখনও নবীর নিজ ক্ষমতা বলে প্রদর্শিত হয় না, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই নবীকে মো'জেযা দান করা হইয়া থাকে। নবীর নবুয়তকে সর্বসমক্ষে প্রমাণিত করার জন্য। সুতরাং মোজেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার দ্বারা খোদার সমকক্ষ হওয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এই সত্যটি যেন লোকদের খেয়াল হইতে মুহূর্তের জন্যও লুকায়িত না থাকে এবং এই ব্যাপারে যেন শয়তান লোকদিগকে প্রবঞ্চনায় ফেলিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) বিভিন্ন মো'জেযা প্রদর্শনের প্রতিমুহূর্তে এবং দমে দমে প্রত্যেকটি মো'জেযার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নুতনভাবে এই ঘোষণা দিতে রহিয়াছেন যে, এই অলৌকিক কার্যটি আমার হস্তে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আদেশে এবং তাহার কুদরত বলেই সমাধা হইতেছে। হযরত ঈসা (আঃ) বার বার এটা ঘোষণার মারফত ঐ সত্যকেই উপলীব্ধ করাইয়াছেন যে, এই মো'জেযার মধ্যে আমার এমন কোন কৃতিত্ব নাই যদ্দারা আমার পক্ষে খোদার ন্যায় শক্তিমত্তা ও তাঁহার সমকক্ষতা প্রমাণিত হইতে পারি।

দুঃখের বিষয় নাছারা বা খৃস্টানগণ সেন্টপলের ন্যায় ইহুদী-জাত ছদ্মবেশী মোনাফেকের প্রবঞ্চনায় পতিত হইয়াছে, অথচ স্বয়ং ঈসা আলাইহিচ্ছালামের প্রচার ও ঘোষণাদি অতি সুস্পষ্ট ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের ঐসব প্রচার ও ঘোষণা সমূহ আজও অকাট্য কোরআন মজিদের মারফৎ সারা বিশ্বের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন মোজেযা সম্পর্কে হযরত ঈসার ঘোষণা কতই না সুস্পষ্ট ছিল।

اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِى الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে (রসূল হওয়ার) দলিল প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি– (১) আমি তোমাদের সম্মুখে কর্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি বানাইয়া অতপর উহার মধ্যে ফুঁৎকার মারিব, ফলে উহা আল্লাহর আদেশে বাস্তবেই পাখী হইয়া যাইবে। (২) আর আমি জন্ম-অন্ধকে ভাল করিতে পারি। (৩) (দুরারোগ্য) কুষ্ঠরোগ ভাল করিতে পারি। (৪) এবং মৃতকে জীবিত করিতে পারি। এইসব আল্লাহর আদেশেই হইবে। (৫) আরও আমি বলিয়া দিতে পারি তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে যাহা খাইয়াছ এবং যাহা কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছ। নিশ্চয়ই এই সবের মধ্যে (আমার রসূল হওয়ার) স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য রহিয়াছে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণে ইচ্ছুক হও।* (পারা– ৩, রুকু– ১৩)

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও এই ভ্রষ্ট নছারাহগণকেই শুনাইবার জন্য কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ডাকিয়া যখন স্বীয় প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি লোকদের মধ্যে

---

* হযরত ঈসার উল্লিখিত মো'জেযাসমূহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হওয়ায় প্রবৃত্তির ধ্বজাধারী, নবীদের মো'জেযা অস্বীকারকারী পূর্ব সমালোচিত পন্ডিত সাহেব তথাকথিত তফছীরুল কোরআনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে ভাঙ্গা-গড়া ও নানারূপে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমাবেশপূর্বক গোজামিল দানের যে অভিনয় করিয়াছেন তাহা হইতে রক্ষা পাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি হইল কোরআন-হাদীছের প্রগাঢ় জ্ঞান, আর একটি অকাট্য ঈমান।

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কেও উক্ত পন্ডিত স্বভাব ও প্রকৃতির লেজ ধরিয়া রহিয়াছেন এবং মারইয়্যামের সঙ্গে নাজ্জার নামক এক ব্যক্তির বিবাহ পড়াইয়া দিয়া তদ্দারা স্বাভাবিক রীতির মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্ম কাহিনী গাথিয়াছেন। এক কথায় তিনি আল্লাহ তায়ালাকেও স্বাভাবিক নিয়মের বাহিরে যাইতে দিতে রাজী নহেন।

এই ব্যাপারে তিনি খৃস্টানী বাইবেলের কিছু তথ্য গ্রহণ করিয়া পরে বাইবেলকেও মাত করিয়া দিয়াছেন। বাইবেলে যোশেফের (ইউসুফ) সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ কাহিনী আছে, কিন্তু মরয়্যাম গর্ভে হযরত ঈসার জন্ম যোশেফ বা কোন পুরুষের স্পর্শনে হইয়াছে– এইরূপ ধারণাকে বাইবেলও খন্ডন করিয়াছে। (মথি ২য় পৃষ্ঠা–প্রভু যিশুর জন্ম বিবরণ দ্রষ্টব্য)

পন্ডিত সাহেবের ঈমান ও ইসলাম বিরোধী মতামতের বিতর্কে সময় অপচয়ে উৎসাহ হয় না; অতি ছোট একটি উজ্জল যুক্তির উপরই এই আলোচনা ক্ষান্ত করিতে চাই। (অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খোদায়ী দাবীর প্রচার করিয়াছিলেন কি? (এই প্রশ্নোত্তরের পূর্ব বিবরণ পারা– ৭, রুকু– ৬ -এর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) তখনও আল্লাহ তায়ালা প্রথমে স্বয়ং ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধনপূর্বক বলিবেন যে, আপনি এই, এই মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন– এইসব একমাত্র আমারই আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এইসব মো'জেযার দ্বারা আপনার খোদায়ী কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য কেয়ামতের দিনের সেই বিবরণীর বর্ণনাও পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত হইয়াছে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ - اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ - تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً - وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ - وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا -

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা রসূলগণকে তাহাদের উম্মতের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই দিনের একটি স্মরণীয় ঘটনা– আল্লাহ বলিবেন, হে মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা! স্মরণ কর, আমি যেসব নেয়ামত দান করিয়াছিলাম তোমাকে এবং তোমার মাতাকে– যখন তোমার সাহায্য করিয়াছিলাম জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা। তুমি (আমার কুদরতে) নবজাত শিশু এবং বয়স্ক উভয় অবস্থায় একই ধরনের কথা বলিতে সক্ষম ছিলে এবং আমি তোমাকে আসমানী কেতাবের ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর বিশেষতঃ তৌরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তুমি কর্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করিতে আমার আদেশে; তারপর ঐ মাটির (তৈরী আকৃতিতে শুধু) ফুৎকার মারিতে,

فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ - وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ - وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ -

ফলে উহা হইয়া যাইত বাস্তব পাখী আমার আদেশে। এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে সক্ষম হইতে আমার হুকুমে এবং মৃতকে (জীবিত করিয়া কবর হইতে) তুমি বাহির করিতে আমারই হুকুমে। (পারা– ৭, রুকু– ৫)

আসমান হইতে খাদ্য লাভের মো'জেযা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ মো'জেযা– একদা তাঁহার বিশেষ অনুগত "হাওয়ারী" নামে আখ্যায়িত একদল লোক তাঁহার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য প্রকাশ্য মো'জেযা স্বরূপ যদি আসমান হইতে আমাদের জন্য তৈরী খানা পাঠাইয়া দিতেন।

মো'জেযার জন্য নবীকে ফরমাইশ করার পরিণাম ভাল হয় না বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন। তাহারা আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, ঐরূপ খানা খাইয়া আমরা বরকত হাসিল করিব এবং এইরূপ প্রত্যক্ষ মো'জেযা দৃষ্টে আমাদের ঈমানের মজবুতী বাড়িয়া যাইবে এবং আমরা লোকদিগকে বলিতে পারিব যে, এইরূপ স্পষ্ট মো'জেযা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বস্তুতঃই যদি ইউসফের সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া যথারীতি তাহার স্পর্শনে হযরত ঈসার জন্ম হইয়া থাকিত তবে ইহুদীদের অপবাদ ও নাছারাদের অতিরঞ্জনের খন্ডনে পবিত্র কোরআন যেসব দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার এবং আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমত্তা স্মরণ করাইবার এবং আদমের সৃষ্টি বৃত্তান্তের তুলনা উল্লেখের যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সেই ভূমিকা গ্রহণ শুধু নিরর্থকই নয় বরং অহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সব কিছুর প্রতিবাদে শুধু এতটুকু প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, বৈধ সম্পর্কীয় পিতা-মাতা ইউসুফ ও মরয়্যামের ওরসে ঈসা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম সম্পর্কে এত এত দীর্ঘ বিবৃতি কোরআনে ব্যক্ত হইল; কিন্তু বিশ্বজোড়া বিতর্কের মূলোচ্ছেদকারী ইউসুফের সঙ্গে মারইয়্যামের শুভ-পরিণয়ের খবরটা কোথাও করা হইল না! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোরআনের প্রায় শত শত স্থানে عيسى بن مريم মায়্যাম-পুত্র ঈসা, মারয়্যাম-পুত্র ঈসা বলা হইল; কোন এক স্থানেও ইউসুফ-পুত্র ঈসা বলা হইল না।

তদুপুরি ঐতিহাসিক নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রশ্ন, যে হযরত ঈসা খোদার বেটা না হইয়া থাকিলে তাঁহার পিতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নানারূপে দীর্ঘ বিষয়াবলী, এমনকি সর্বশেষ চূড়ান্ত পন্থারূপে মোবাহালার পথ অবলম্বন করিলেন, (বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে) একবারও উক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তরটা মুখেও আনিলেন না যে, তাঁহার পিতা ছিলেন ইউসুফ নাজ্জার। এইসব তথ্য দৃষ্টে হযরত ঈসা ইউসুফের পুত্র হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুধি পাঠকবর্গের উপরই ন্যস্ত রহিল।

হযরত ঈসা (আঃ) যখন তাহাদের উদ্দেশ্য খারাপ নয় দেখিলেন; তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা দোা কবুল করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্কবাণীও শুনাইলেন যে, অতপর যদি তোমাদের কেহ এই মো'জেযার পূর্ণ হক আদায় না করিয়া বিপথগামী হয় তবে আমি তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিব।

মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন, আল্লাহর কুদরতে ফেরেশতাগণ মারফত আসমান হইতে তৈরী রুটি ও গোশত ভর্তি খাঞ্চা তাহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইল।

তিরমিযী শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, আসমান হইতে তাহাদের জন্য তৈরী খানা– রুটি গোশত অবতীর্ণ হইল এবং তাহাদের প্রতি এই নির্দেশও আসিল যে, ইহা হইতে তৃপ্তিপূর্ণ পরিমাণ খাইতে পারিবে, কিন্তু আগামী দিনের জন্য রাখিয়া দিবে না। তাহাদের অনেকে এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আল্লাহর গযবে পতিত হইল; আকৃতি মছ্খ্ হইয়া তাহারা বাঁদর ও শূকরের আকৃতিতে পরিণত হইয়া গেল। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ـ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন হাওয়ারিগণ বলিয়াছিল, হে মারইয়্যাম পুত্র ঈসা পয়গম্বর! ইহা কি সম্ভব যে, প্রভু পরওয়ারদেগার আপনার অছিলায় আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানা পাঠাইয়া দেন? ঈসা (আঃ) বলিলেন, (মোজেযার ফরমাইশ করিও না) আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা খাঁটি মোমেন হইয়া থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

হাওয়ারিগণ আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, (বরকতের জন্য) আমরা ঐরূপ খানা খাইব এবং আপনার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি উহা আরও দৃঢ় হইবে এবং প্রকাশ্য ঘটনায় দেখিয়া নিব, আপনি (নবী হওয়ার দাবীতে) সম্পূর্ণ সত্য এবং (অন্যদের জন্য) আমরা আপনার সত্যতার প্রমাণ স্বচক্ষে অবলোকনকারী সাক্ষী হইব।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

ঈসা (আঃ) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানার খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন যাহা আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী সকলের জন্যই বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে এবং আপনার পক্ষ হইতে আমার সত্যতার বিশেষ নিদর্শন হইবে। এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য বিশেষ রিজিক স্বরূপও উহা দান করুন; আপনি ত সর্বোত্তম দাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি উহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিব, কিন্তু অতপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিআমার আনুগত্যহীনতার পরিচয় দিবে তাহাকে আমি এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করিব, যাহা (সাধারণতঃ) জগতের কাহাকেও প্রদান করি না। (পারা–৫, রুকু–৭)

হযরত ঈসা কর্তৃক মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সুসংবাদ প্রচার

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার পরবর্তী সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে শুধু সুসংবাদই দান করিয়াছিলেন না, বরং তিনি তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ বহনকে স্বীয় নবুয়তের একটি বিশেষ দায়িত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরত ঈসার ঘোষণা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ اسْمُهٗ اَحْمَدُ .

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী-ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসূল ও আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সমর্থনকারী এবং আমার পরে "আহমাদ" নামীয় এক রসূল আসিবেন তাঁহার সুসংবাদ বহনকারী হইয়া আসিয়াছি। (সূর ছফ, পারা-২৮ পাঃ)

১৬৪৬। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– তিনি বলিয়াছেন, আমি (নবীগণের মধ্যে) সর্বাধিক নিকটবর্তী হইলাম মারয়্যাম-পুত্র ঈসার– দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও; আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্য নবীর আবির্ভাব হয় নাই। নবীগণের পরস্পর সম্পর্ক ঐ ভ্রাতৃবৃন্দের সম্পর্কের ন্যায় যাহাদের পিতা একজন এবং মাতা ভিন্ন ভিন্ন। (সকল নবীগণের প্রচারিত দ্বীন ও ধর্মের মূল একই; বিভিন্নতা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে।)

ব্যখ্যা ঃ আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ইহকালে হযরত ঈসার সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কধারীও ছিলেন। নিকটবর্তীতা তো সুস্পষ্ট, কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন নবী আসেন নাই। বিশেষ সম্পর্ক এই সূত্রে যে, ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছিলেন সেই নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-ই ছিলেন। পরকালেও তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে। বিশ্ববাসী সকলে যখন কেয়ামতের মাঠে ভীষণ কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাফায়াতের উদ্দেশ্যে আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নবীগণের শরণাপন্ন হইবে এবং এক এক নবী নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পূর্বক অন্য নবীর নাম পেশ করিবেন তখন সর্বশেষে ঈসা (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নাম প্রস্তাব করিবেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কোন ওজর আপত্তি না করিয়া শাফায়া'তের জন্য অগ্রসর হইবেন।

হযরত ঈসার জাগতিক জীবনের শেষ বৃত্তান্ত

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ ইহুদীরা অপবাদের ঝড় তুলিয়াছিল এবং নাছারারা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছিল, তদ্রূপ হযরত ঈসার ইহজগত ত্যাগের বিষয়টি লইয়াও ইহুদীরা নানারূপ অপবাদ গাড়িয়াছে যে, তাহারা হযরত ঈসাকে বন্দী করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ভীষণ লাঞ্ছিত ও অপমানিতরূপে শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল। নাছারারা মূল বিষয় হইতে অজ্ঞ ও দুর্বলচেতারূপে ইহুদীদের সমস্ত অপবাদ নতশিরে বরণ করতঃ এই বলিয়া মুখ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে যে, হযরত ঈসা ঐ দুঃখ-যাতনায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে লোকদের পাপ ক্ষমা করাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না।

এস্থলেও ইসলাম ইহুদ-নাছারাদের মিথ্যা প্রচারণাকে পণ্ড করিয়াছে এবং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ পূর্বক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাস্তব ঘটনা এই যে, কস্মিনকালেও হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন নাই।

ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধরূপে নিহত না হইয়া তাঁহার সর্বশেষ অবস্থা কি হইয়াছিল, সে সম্পর্কে সরাসরি পবিত্র কোরআনের ঘোষণা লক্ষ্য করুন।

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ـ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ ـ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ـ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ـ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

(ইহুদীরা যেসব কারণে অভিশপ্ত ও গজবে পতিত হইয়াছিল ঐ সবের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ইহাও ছিল যে,) তাহারা মিথ্যা দাবী করিত– আমরা মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি; যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তাহারা তাঁহাকে (কোন প্রকারে) হত্যা করিতেও পারে নাই এবং শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ তাহারা এই ব্যাপার গোলক-ধাঁধায় পতিত ছিল। নিশ্চয় যাহারা এই ব্যাপারে ভিন্ন মত (তথা হত্যা বা শূলিবিদ্ধ করার মত) পোষণকারী হইয়াছে তাহারা এই ব্যাপারে শুধু একটা সন্দেহের মধ্যে আছে– শুধুমাত্র ধারণা ও অনুমানের উপর চলিয়াছে; এই ব্যাপারে তাহাদের নিকট সত্য এবং বাস্তবের কোন জ্ঞান মোটেই নাই। অকাট্য ও নির্ভুল খবর ইহাই যে, তাহারা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি* উঠাইয়া নিয়াছিলেন। আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান অতিশয় হেকমতওয়ালা সুকৌশলী।
(পারা– ৬, রুকু– ২)

উল্লিখিত বিবৃতির বিবরণে একদল ঐতিহাসিক তফছীরকারের মত এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে তৌরাতকে লংঘন করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগ আনয়ন করিল। এইরূপে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদন্ডের আদেশ রাজশক্তির তরফ হইতে জারি করাইল এবং তথাকার তৎকালীন রীতি অনুযায়ী শূলিবিদ্ধ করিয়া প্রাণদন্ড দানের জন্য ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রেফতার ও বন্দী করিয়া শূলে চড়াইবার মনস্ত করিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাঁহাকে বাঁচাইয়া নিলেন, শত্রুরা অপর একটি লোককে ঈসা মনে করিয়া তাহাকে শূলিবিদ্ধ করিয়া মারিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের মতে ঘটনা এই যে, ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে স্বীয় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িলেন– তখন তিনি তাঁহার বিশেষ ছাহাবী বা শিষ্য– হাওয়ারীগণকে আবদ্ধ ঘরে একত্রিত করিয়া তাঁহার পরেও আল্লাহর দ্বীনকে জারি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতে বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করিলেন, যাহার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।–

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ .... ـ

ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের তরফ হইতে পূর্ণ বিদোহীতা অনুভব করিলেসন, এমনকি স্বীয় জীবন হইতেও নিরাশ হইয়া পড়িলেন) তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী কে আছে?

---

* আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন; "আল্লাহর প্রতি" বলিতে "উর্ধ্ব জগত বা আসমান" উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ভাষায়ই এই ধরনের ব্যবহার আছে। মক্কা শহরে কা'বা ঘরে আল্লাহ তায়ালা অবস্থান করেন না, কিন্তু মক্কা নগরীকে بلد الله আল্লাহর শহর; কা'বাকে بيت الله আল্লার ঘর" বলা হয়। যেহেতু ঐ ঘরটি এবং উহার মাধ্যমে ঐ শহরটির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে।

তদ্রূপ উর্ধ্ব জগতেই আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টি এবং বিশাল কুদরতের করখানা সমূহের সমাবেশ। সেখানেই মহান আরশ, কুরছী, লাওহে-মাহফুজ, ছেদরাতুল-মোন্‌তাহা বিদ্যমান। সেখানেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জগতের পরিচালক বাহিনী ফেরেশতা জাতির অবস্থান; তথা হইতেই বিশ্ব জগতের পরিচালন কার্যবিধি সরবরাহ করা হয়– এই সূত্রেই কা'বাকে আল্লাহর ঘর বলার ন্যায় উর্ধ্ব জগতের দিকে আল্লাহর দিক বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হাওয়ারীগণ উত্তর করিল, "আমরা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীরূপে প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।"

ঈসা (আঃ) আবদ্ধ ঘরে শিষ্যগণকে লইয়া কথোপকথনে রত ছিলেন এই সুযোগে তাঁহার প্রাণঘাতীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল এবং ঘরটিকে ঘেরাও করিয়া তাহাদের একজন প্রথম ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে তথা হইতে সরাইয়া নিলেন এবং ঐ ঘরে প্রবেশকারী লোকটির উপর বা অন্য কোন একজনের উপর হযরত ঈসার আকৃতির ছায়া পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তির উপর হযরত ঈসার রূপ পড়িয়াছিল শত্রুরা তাহাকেই ঈসা মনে করিয়া শূলদন্ড দিল।

ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রেফতার ও বন্দী করিতে পারিয়াছিল এই মতবাদ পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ـ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

শত্রুদল ঈসাকে মারিয়া ফেলার গোপন ব্যবস্থা আঁটিল, আল্লাহ তাঁহাকে রক্ষা করার গোপন ব্যবস্থা করিলেন এবং আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ (ঈসা (আঃ) কে শত্রুদের হইতে অভয় দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (অর্থাৎ তোমার আত্মা ও দেহের সমষ্টি ভূপৃষ্ঠ হইতে) লইয়া যাইব * এবং আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং তোমাকে পাক-পবিত্র রাখিব তোমার অমান্যকারীদের হাত হইতে। (পারা–৩, রুকু– ১৪)

উক্ত বিবরণের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শত্রুদলের নাপাক হাত হযরত ঈসাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার এবং তাঁহার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার স্বার্থকতা ও এই দাবী করে যে, ইহুদী শত্রুদলের স্পর্শন হইতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ছিলেন।

ইতিহাস ভান্ডারে নজর করিলে অনেক অনেক ঘটনাই এইরূপ পাওয়া যায় যাহার বিস্তারিত তফছীল বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত থাকে। সেই মতভেদ দেখিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা বোকামী বৈ কি হইতে পারে?

আলোচ্য বিষয়টিও তদ্রূপ; উহার বিস্তারিত তফছীল রূপায়নের ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের বিভিন্ন মত আছে; সেই বিভিন্নতার ছুতা ধরিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না যাহা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "ইহুদীরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই, বস্তুতঃ তাহারা গোলক-ধাঁধাঁয় পড়িয়াছিল।"

---

* متوفيك শব্দের তফছীর কেহ কেহ এইরূপও করিয়াছেন যে, আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব, অর্থাৎ শত্রুদল তোমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহারা তা করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ, নির্ধারিত সময়ে স্বাভাবিকরূপে তোমার মৃত্যু ঘটাইব আমি; শত্রুদল সেই সময়ের পূর্বেই তোমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেই প্রয়াস তাহারা পাইবে না। হযরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর নির্ধারিত সময় হইল কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূপৃষ্ঠে তাঁহার অবতরণের দীর্ঘকাল পর– যাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক অনেক হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা متوفيك শব্দের যে তফছীর করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও দলিল প্রমাণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় দেখিতে পাইবেন।

ইসলাম হযরত ঈসার মর্যাদাকে কত নির্মলরূপে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছে! পক্ষান্তরে খৃষ্টান জাতি হযরত ঈসাকে একদিকে খোদা বা খোদার বেটা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে, অপরদিকে এতদূর নিম্নস্তরে ফেলিয়াছে যে, তাহারা বলে, ইহুদীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাঁহার গায়ে থু থু দিয়াছিল, তাঁহাকে মারপিট করিয়াছিল, তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়াছিল,তাঁহার মাথায় কাঁটার টোপ পরাইয়া তাঁহাকে শূলে চড়াইয়াছিল এবং তিনি চিৎকার করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রষ্ট খৃষ্টানদের এই সব আকীদা সম্পর্কে তাহাদের গর্হিত বাইবেলের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন– "আর যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল" (বাইবেল– লুক ১৫১)। "যীশুকে ক্রুশে দিবার পর সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল।" (বাইবেল– যোহন ১৯৯) "এবং কাটার মুকুট গাথিয়া তাঁহার মাথায় দিল, আর তাঁহার মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল, তাঁহার গায়ে থু থু দিল" (বাইবেল-মার্ক ৯২) "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চঃস্বরে চীকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী লামা শবক্তানী" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" (বাইবেল– মথি ৫৬)।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসাকে ইহুদীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কি ব্যবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে এবং হযরত ঈসার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের সোনালী যুগ ইহতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী প্রত্যেক যুগের কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত ও আকীদা এই যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে সশরীরে, জীবতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠ হইতে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় অবস্থান রত আছেন। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীয়তের অওতাভুক্তরূপে আসমান হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘ কাল ভূপৃষ্ঠে অবস্থানের পর তাঁহার সাধারণ ও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে এবং তিনি সাধারণ রীতি অনুসারে পবিত্র মদিনার ভূমিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন। এই মতবাদ ও আকীদার প্রতিটি অংশের দলিল প্রমাণ লক্ষ্য করুন–

হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া প্রসঙ্গ

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভকারী ছাহাবীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক যুগের ইমাম-মোজতাহেদ, কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের আকীদা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কে সশরীরে জীবতাবস্থায় আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন।* এই বিষয়ে সকলের একমত হওয়াকেই তফছীরকারগণ হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার দলিল স্বরূপ "ছলফে-ছালেহীনের এজ্‌মা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "ছলফে-ছালেহীন" অর্থ পূর্ববর্তী সৎ সাধু নির্ভরযোগ্য ওলামা-মাশায়েখ ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ, আর "এজ্‌মা" অর্থ ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ের আর একটি দলিল হইল পূর্বালোচিত পারা– ৬, রুকু– ১ সূরা নেছার আয়াত। ঐ আয়াতের একটি বাক্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়–وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "ইহা একটি বাস্তব, অকাট্য ও নির্ভুল তথ্য যে, ইহুদীগণ হযরত ঈসাকে হত্যা করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং আল্লাহ ঈসাকে নিজের

---

* বহু সমালোচিত পন্ডিত তফছীরকার যিনি কোন নবীর পক্ষে মো'জেযা তথা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না, এস্থলে দেখা যায় তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষেও কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিয়া নিতে রাজি নহেন।

এস্থলে পন্ডিত মিয়া হযরত ঈসাকে জীবন্ত আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, হযরত ঈসার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এ সম্পর্কে পাঠকবর্গের সম্মুখে একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসার যুগ হইল ইতিহাসের যুগ, এখন হইতে মাত্র দুই হাজার বৎসরেরও কম অতীতের যুগ। যেখানে দেড় হাজার বৎসর পূর্বের নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সমাধিস্থল এবং উহার শহর পবিত্র মদীনা এত জাকজমকপূর্ণরূপে বিদ্যমান সেখানে দুই হাজার বৎসর পূর্বের নবী হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের সমাধিস্থলের কোন খোঁজ ইতিহাসে পাওয়া না যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি? বিশেষতঃ হযরত ঈসার উম্মত হওয়ার দাবীদার বর্তমান বৃহৎ ও উন্নত জাতি খৃষ্টানগণের সকল রকম সুযোগ ও সামর্থ থাকা সত্বেও তাহাদের নবীর সমাধি স্থলের কোন নাম-নিশানা বাস্তবে বা ইতিহাসে বিদ্যমান না থাকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি?

চতুর পন্ডিত সাহেব যিনি নিজকে ইতিহাস ও ভূগোলের বড় একজন অভিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন তিনি মাত্র দুই হাজার বৎসর পূর্বের একজন মহা মানবের এত বড় একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিলেন, অথচ ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পেশ করিলেন না– ইহা তাহার পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হওয়া সত্বেও সেই দিকে তিনি অগ্রসর হন নাই। কারণ, ভূগোল ও ইতিহাস ক্ষেত্রে কোন মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হইলে তাহা সহজেই লোক চোখে ধরা পড়িয়া যাইবে, তাই এ ধরনের বিষয়ের সহজ ও সরল প্রমাণ ইতিহাস ও ভূগোলকে বাদ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, পাঠকগণকে অতি সংক্ষেপে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট আলেম ও ইমামের সমর্থন আমার পক্ষে আছে।" অতপর পন্ডিত সাহেব চার জনের মতামতের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। তন্মোধ্যে তিন জনের বক্তব্যই পন্ডিত সাহেবের মূল দাবীর সহিত সঙ্গতিবিহীন। সেই তিন জন হইলেন (১) ইবনে হাজম, (২) ছাহাবী ইবনে আব্বাছ, (৩) শাহ অলিউল্লাহ। স্বয়ং পন্ডিত সাহেব এই তিন জনের বক্তব্যের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতেই দেখা যায় যে; তাঁহারা আলোচ্য বিষয় তথা হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, বরং পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসার ঘটনায় এক স্থানে انى متوفيك এবং আর এক স্থানে কেয়ামতের দিনে হযরত ঈসার একটি উক্তির বিবরণ দানে توفيتنى শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে তফছীরকারদের বিভিন্ন মত আছে; একদল তফছীরকার

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতি উঠাইয়া নিয়াছিলেন" হযরত ঈসাকে হত্যা করার দাবীর প্রতিকূলে আল্লাহ কর্তৃক উঠাইয়া নেওয়ার ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সম্পর্কে তৃতীয় দলিল হইল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ। সে সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, সম্মুখে উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। এ স্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ভূপৃষ্ঠে হযরত ঈসার অবতরণ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে এবং হাদীছের মধ্যেই يـنـزل শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা نزول শব্দ হইতে গৃহীত এবং উহার একমাত্র অর্থ অবতরণ করা, সুতরাং যদি বলা হয় যে, হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে ইহজগতে পুনঃ জীবিত করিয়া উঠান হইবে; ইহাও উক্ত হাদীছ সমূহের পরিপন্থী হইবে। কারণ, মৃতকে জীবিত করিয়া উঠান হইলে সে ক্ষেত্রে "অবতরণ করিবেন" বলা যায় না।

এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার আসমান হইতে অবতরণের যে বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে উহা যাহা সম্মুখে আসিতেছে– দৃষ্টে পুনর্জীবিত হইয়া আসার সম্ভাব্যতার কোন অবকাশ নাই।

এই বিষয়ের চতুর্থ দলীল একটি সুস্পষ্ট হাদীছ। (১) তফসীর ইবনে কাছীর। (২) তফছীর রুহুল মায়ানী (৩) তফছীর ইবনে জরীর কেতাবে উহা উল্লেখ আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْيَهُوْدِ اِنَّ عِيْسٰى لَمْ يَمُتْ وَاِنَّهُ رَاجِعٌ اِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় জানিও, ঈসার মৃত্যু হয় নাই এবং তিনি কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তোমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিবেন।

যাঁহাদের মধ্যে উল্লেখিত তিনজনও আছেন তাঁহাদের মত এই যে, প্রথম শব্দটির মর্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে খবর দিয়াছিলেন যে, "আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি" এবং দ্বিতীয় শব্দটির মর্ম এই যে, হযরত ঈসা তাঁহার কেয়ামতের দিনের বক্তব্যে বলিবেন, "হে পরওয়ারদেগার আপনি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছিলেন।"

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক পরিগণিত তফছীরের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় আসিবে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তফছীরকার দলের মত অনুসারেও হযরত ঈসার আবির্ভাব কালেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে এই সিদ্ধান্ত উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য্য কিছুতেই নহে– ইহা অবধারিত।

কিয়ামত নিকটবর্তীকালে হযরত ঈসা আসমান হইতে প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘকাল ভূপৃষ্ঠে ঘর-সংসারির সহিত অতিবাহিত করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিবেন, যাহা পূর্বাপর সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যমতপূর্ণ আকীদা ও বিশ্বাস। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের তফছীরে যাহাদের মতে মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হইয়া থাকে উহা হযরত ঈসার এই কেয়ামত নিকটবর্তীকালীন স্বাভাবিক মৃত্যুই, অন্যকোন মৃত্যু নহে। এই দাবীর সমর্থনে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য পেশ করিতেছি–

متوفيك ورافعك يعنى رافعك ثم متوفيك فى اخر الزمان -

"ইবনে আব্বাসের মতে متوفيك ورافعك আয়াতের অর্থ এই যে, আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি। এখন আপনাকে উঠাইয়া নিব এবং পরে পৃথিবীর সর্বশেষ যুগে আমি আপনার মৃত্যু ঘটাইব।" (তফছীর দোর্‌রে মনছুরঃ ২–৩৬)। এতদ্ভিন্ন ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া সম্পর্কে স্বীয় আকীদা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে–

ليقتلوه فادخله جبرئيل عليه السلام بيتا ورفعه الى السماء ولم يشعروا بذلك

"ইহুদীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ঈসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, সেমতে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার পরিকল্পনা লইয়া রওয়ানা হইল। জিব্রাইল (আঃ) হযরত ঈসাকে একটি ঘরে প্রবেশ করাইলেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নিলেন, ইহুদীরা এই সম্পর্কে টেরও পাইল না (রুহুল মায়ানী ৬–১০) অন্য এক স্থানে আরও আছে–

رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو الرواية الصحيحة عن ابن عباس -

"আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মৃত্যু বা নিদ্রা ব্যতিরেকে উঠাইয়া নিয়াছিলেন– ইহাই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে ছহীহ রেওয়ায়াতে প্রমাণিত রহিয়াছে" (রহুল মায়ামী ৩–১৭৯)।

শাহ অলীউল্লাহর متوفيك শব্দের তফসীরে ইবনে আব্বাসের মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

পন্ডিত সাহেব তাহার একজন সমর্থক বানাইয়াছেন ইমাম ইবনে হজমকে। আমরা ঐ ইমাম ইবনে হাজম হইতে তাঁহার ঐ কেতাব হইতেই যে কিতাবের নাম পন্ডিত সহেব উল্লেখ করিয়াছেন, একটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি। ইবনে হাজম নবীগণ সম্পর্কে মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান ও আকীদার বিবরণ দিতে যাইয়া বলেন–

ان عيسى سينزل ... برهان ذلك ما حدثنا عبد الله .... قال جابر سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اميرهم -

সাধারণ প্রশ্ন ও উহার উত্তর

বিজ্ঞান মতে মহাশূন্য বা ঊর্ধ্ব জগতের যে অবস্থা ও স্তরসমূহ আবিষ্কার হইয়াছে উহা দৃষ্টে রক্ত-মাংসে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীবের ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভবই নহে।

বিজ্ঞানই এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞান কলা কৌশলের মাধ্যমে ঊর্ধ্ব জগতের দিকে– যেমন, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে মানুষ প্রেরণে সক্ষম হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আদি হইতেই বিশেষ কলা-কৌশলের মাধ্যমে বা উহা ব্যতিরেকেও উক্ত কার্য সমাধা করিতে সক্ষম– ইহাতে দ্বিধাবোধের কারণ কি থাকিতে পারে?

আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানব-দেহবিশিষ্ট হযরত ঈসা যদি আসমানে সাধারণ জীবনে জীবিত থাকেন তবে তথায় তাঁহার পানাহার ইত্যাদির অনেক অনেক আবশ্যকাদি পূরণের সমস্যারই বা সমাধান কি?

এই প্রশ্নের উত্তরও সহজ। প্রাণী যে স্থানে অবস্থান করে তথাকার উপযোগী অবস্থাই তাহার সম্মুখে আসে এবং মহান প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা তথায়ই তাহার সকল সমস্যার সমাধান যোগাইয়া থাকেন। ভূ-পৃষ্ঠের সমস্যাদি ভিন্ন। ভূগর্ভের সমস্যাদি ভিন্ন, সমুদ্র তলের সমস্যাদি ভিন্ন, চন্দ্রলোকে জীবের অস্তিত্ব থাকিলে উহার সমস্যাদি ভিন্ন, ইসলামী আকীদা মতে আকাশ জগতে ফেরেশতাদের অবস্থান রহিয়াছে। ঈসা (আঃ) তথায় পৌঁছিয়া ফেরেশতাদের অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়া থাকিলে তাহাতে বৈচিত্রের কি আছে!

"নিশ্চয় মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) অচিরেই অবতরণ করিবেন; ইহার প্রমাণ ঐ হাদীছ যে, হাদীছখানা ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি– নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত প্রাবল্যের সহিত হক্ক ও সত্যের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। নবী (সঃ) বলেন, অতপর মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করিবেন, তখন মুসলমানদের উপস্থিত নেতা হযরত ঈসাকে (নামাযের) ইমামতি করিতে বলিবেন। হযরত ঈসা অসম্মতি জ্ঞাপনে বলিবেন, এই উম্মত তথা উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ সম্মান এই যে, আপনারা নিজেই নিজেদের ইমামতী করিবেন।" (মোহাল্লা ১-৯)

পাঠকবর্গ! উক্ত উদ্ধৃতি দৃষ্টে ইহা কি বলা সম্ভব যে, ইমাম ইবনে হাজমের মতে হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে? তা' হইলে ينزل অবতরণ করিবেন" এবং তাঁহাকে ইমামতির জন্য আহবান করা হইবে– এই সবের তাৎপর্য ও সঙ্গতি কি হইবে?

ইমাম মালেকও সকলের সঙ্গে একমত যে, হযরত ঈসা কেয়ামতের নিকটবর্তী কালে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মোসলেম শরীফের শরাহ– একমালু-একমালেল মোলেম নামক কেতাবে উল্লেখ আছে

قال مالك بينا الناس قيام يستمعون لاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نزل .

"ইমাম মালেক বলিয়াছেন, লোকগণ নামাযের একামত শ্রবণে দাঁড়ানো থাকা মুহূর্তে তাহাদের উপর এক খন্ড মেঘমালা আসিবে এবং তাহারা দেখিবে, ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়াছেন" (১–২২৬)।

পণ্ডিত মিয়া ইমাম মালেক হইতে হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পক্ষে একটি উদ্বৃতি দিয়াছেন যে, ইমাম মালেক হযরত ঈসা সম্পর্কীয় একটি আয়াতের তফছীরে مات শব্দ বলিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ ইহা জানিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, পণ্ডিত সাহেব যেই কিতাব হইতে ইমাম মালেকের অভিমতটি আমদানী করিয়াছেন সেই কিতাবেই উক্ত অভিমতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বাক্য রহিয়াছে, যাহা পন্ডিত সাহেব দেখিয়াও দেখেন নাই। স্বয়ং পন্ডিত সাহেব উক্ত অভিমতটি যাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন– 'হাদীছের বিখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মুহাম্মদ তাহের'' তিনিই উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার সাথে উল্লিখিত তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে

ولعله اراد رفعه الى السماء .... لتواتر خبر النزول .

অর্থ ঃ হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ বিষয়টি যেহেতু অকাট্যরূপে অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, তাই মনে হয় ইমাম মালেক مات শব্দ বলিয়া হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। (মাজমাউল বেহার ১–২৮৬)

ইমাম মালেকের অভিমতের এই ব্যাখ্যাই সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, কারণ ইহজগৎ ত্যাগ করাকে مات বলা হয়; হযরত ঈসা যখন আসমানে চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। পন্ডিত সাহেবের উদ্ধৃতি মারফৎই ইমাম মালেকের উক্তির বিবরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তিনি স্বীয় উক্তিতে ঘটনার সময় হযরত ঈসার বয়সের পরিমাণটা নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যটাই বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, তখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর ছিল। মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। ইমাম মালেকের অভিমতের সঙ্গতি রাক্ষার্থে এই ব্যাক্যারও উল্লেখ হইয়াছে যে, তাঁহার মতে হয়ত ঈসা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পুনর্জীবিত হইবেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইহা ينزل ইয়ানযিল'' শব্দের পরিপন্থী; ينزل অর্থ অবতরণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অবতরণ সম্পর্কে ইমাম মালেক স্বয়ং যে বিবৃতি দান করিয়াছেন উহারও পরিপন্থী।

বিজ্ঞান ও যুক্তি ইত্যাদির হাতছানিতে যত প্রশ্নেই উদয় হউক, পবিত্র কোরআন ঘটনা বর্ণনার সমাপ্তিতে এমন একটি বাক্য উল্লেখ করিয়াছে যদ্দ্বারা সকল প্রশ্নেরই অবসান হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন–

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

"আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠাইয়া নিয়াছেন; আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা সুকৌশলী আছেনই।"

এস্থলে ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ক্রিয়াপদের কর্তাপদ আল্লাহ তায়ালা নিজকে ব্যক্ত করিয়া عزيز (আজীজ) "সর্বশক্তিমান", حكيم (হাকীম) "হেকমত ওয়ালা সুকৌশলী" –আল্লাহতায়ালার এই দুইটি ছেফত বা গুণকে সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিয়া দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

* হযরত ইসার মৃত্যু হয় নাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আসমানে জীবন্ত উঠাইয়া নিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে কুচক্রিরা পবিত্র কোরআনের দুইটি শব্দের দ্বারা প্রবঞ্চনার প্রয়াস পায়। একটি متوفيك যাহার পূর্ণ আয়াতটি হইল–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۔ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۔

متوفى শব্দটি توفى হইতে গৃহীত। যাহা মৃত্যু দান করা অর্থে স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সূত্রেই বিভ্রান্তকারীগণ বলে যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, توفى "তাওয়াফ্ফি" শব্দটি শুধুমাত্র উপ-অর্থ হিসাবে স্থান বিশেষে মৃত্যু দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু এই শব্দটির আসল অর্থ হইল, "কোন বস্তুকে পুরাপুরি নিয়া নেওয়া।" যেমন এই ধাতু হইতেই গৃহীত ايفاء শব্দের অর্থ "পুরাপুরি দিয়ে দেওয়া"।

আরবী শব্দের আসল অর্থ ও উপ-অর্থের পৃথককারী অভিধান اساس البلاغة "আছাছুল বালাগাহ্" হইতে একটি উদ্ধৃতি পাঠক সমক্ষে পেশ করিতেছি––

استوفاه وتوفاه ۔ استكمله .... ومن المجاز توفاه الله ۔

অর্থাৎ "তাওফ্ফা" অর্থ কোন বস্তুকে পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া, আর উপ-অর্থ হিসাবে "আল্লাহ মৃত্যু দান করিয়াছেন" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (৫০৫ পৃঃ)

উল্লিখিত আয়াতে "তাওফ্ফা" হইতে গৃহীত "মৃতাওয়াফ্ফী" শব্দের আসল অর্থ ছাড়িয়া উপ-অর্থ লওয়ার প্রয়োজন মোটেই নাই। সুতরাং আসল অর্থই লইতে হইবে এবং এই সূত্রে আয়াতটি মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদারই প্রতিধ্বনি। আয়াতের অর্থ এই–

ইহুদিরা (হযরত ঈসাকে হত্যা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল; পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা (তাঁহাকে রক্ষা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ হইলেন সর্বাধিক উত্তম ব্যবস্থাকারী। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (ঈসাকে সান্ত্বনা দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (তোমার দেহ ও আত্মার সমষ্টি) নিয়া নিব– তোমাকে আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং (ইহুদীদের নাপাক হাত হইতে) তোমাকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র রাখিব।"

আলাচ্য আয়াতের উক্ত তফছীরের যথার্থতা প্রমাণে কতিপয় তথ্য–

(১) এই তফসীর উক্ত আয়াতের পূর্বাপর বিবরণী ও বিন্যস্ততায় শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, উহার রক্ষা-কবচও বটে। কারণ বিষয়বস্তুর বিবরণীর আরম্ভে বলা হইয়াছে "ইহুদীরা ঈসাকে মারিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং আল্লাহও তঁহাকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক"– এই ভূমিকার পরেই বলা হইয়াছে, আল্লাহ ঈসাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, انى متوفيك ورافعك الى এখন এই বাক্যের মর্ম যদি এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেনঃ

"রহস্যজনকরূপে অস্বাভাবিকভাবে আমি আপনাকে পুরাপুরি তথা আপনার দেহ ও আত্মার সমষ্টি জগৎবাসীর নিকট হইতে লইয়া যাইব এবং আমার প্রতি উঠাইয়া লইব," তবেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার একটা ভাল নজীর রূপায়িত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার যে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক উহারও একটা উপযুক্ত নিদর্শন স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত বাক্যের মর্ম এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে মৃত্যু দিব এবং আপনার মর্যাদা বাড়াইব, তবে মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার কোন যথার্থতা দেখা যায় না এবং "আল্লাহ সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক" বাক্যটি প্রহসনে পরিণত হয়, কারণ ইহুদীরা হযরত ঈসাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল এবং উহার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তখন যদি হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার কৌশল ও গোপান ব্যবস্থার সাফল্য কি হইবে? এবং আল্লাহ তায়ালা সুকৌশলী তথা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার যথার্থতা কি হইবে? সুতরাং এখানে 'মৃত্যু দান" অর্থ মোটেই হইতে পারে না।

(২) এই তফছীরে متوفيك এবং رافعك উভয় শব্দের আসল অর্থ "পুরাপুরি নিয়া নেওয়া এবং উঠাইয়া নেওয়া" ধরা হইয়াছে। মৃত্যুদন্ড ও মর্যাদা বাড়ান অর্থ হইলে উপঅর্থের ছড়াছড়ি হইবে যাহা সুসাহিত্যিকতার পরিপন্থী।

(৩) আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসার সর্বশেষ খবর সম্পর্কে যে চুড়ান্ত ও সুস্পষ্ট ঘোষণা (সূরা নেছা,পারা-৬, রুকু-২ তে) প্রদান করিয়াছেন- وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "নির্ভূল বাস্তব একিনী খবর এই যে, ইহুদীরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন।" আমাদের তফছীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের মর্ম উক্ত ঘোষণার পূর্ণ মোতাবেক হয়। পক্ষান্তরে متوفيك অর্থ "মৃত্যুদান" ধরা হইলে আয়াতের মর্ম উক্ত ঘোষণাটির পরিপন্থী হইয়া পড়ে।

উক্ত আয়াতে رفع "রাফাআ" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া নেওয়া" লইয়া "মর্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া" ধরা হইলে শব্দের আসল অর্থ গ্রহণের সরল পথ পরিত্যাগ ও উপ অর্থের বিড়ম্বনা ছাড়া بل বরং" প্রতিকূল বোধক শব্দটির তাৎপর্য পঙ্গু হইয়া যাইবে। 'হত্য করিতে পার নাই, বরং উঠাইয়া নিয়াছেন' এই 'বরং' শব্দের তাৎপর্যে হেরফের করিলে তাহা অহেতুক হইবে।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ তফছীরকার আবু জাফর ইবনে জরির তাবারী (রঃ) স্বীয় তফছীরে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে বলেন-

واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك انى قابضك الى -

"বিভিন্ন তফছীরের মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক তফসীর আমাদের মতে এই- আমি আপনাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে লইয়া যাইব এবং উঠাইয়া নিব" (তফসীর ইবনে জারীর ৩-১৮৪)

মূল বিষয়ে বিতর্কমূলক দ্বিতীয় শব্দটি توفيتنى এই শব্দটি সম্পর্কে বক্তব্য উহাই যাহা প্রথম শব্দটি সম্পর্কে ছিল, উভয় শব্দ একই ধাতু হইতে গৃহীত। পূর্ণ আয়াতটি হইল এই

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ -

আয়াতের সিদ্ধ ও সঠিক অর্থ "(হযরত ঈসা হাশরের ময়দানে বলিবেন, হে আল্লাহ!) যখন আপনি আমাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে পুরাপুরি (আত্মা ও দেহের সমষ্টি) লইয়া আসিয়াছিলেন তখন হইতে আপনিই লোকদের অবস্থার পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন। আয়াতটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আসমান হইতে হযরত ঈসার অবতরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়বস্তুটিকে মূল পরিচ্ছেদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বিশেষ গুরুত্বের সহিত এই পরিচ্ছেদে উহাই প্রমাণিত করিতেছেন যাহা পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত আকীদাহ্ যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আঃ) প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মূল বিষয়টির প্রমাণে التصريح بما تواتر فى نزول المسيح নামক পুস্তিকায় ৭৩টি হাদীছের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই

কারণে উক্ত আকীদা ও বিশ্বাসকে ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং এই আকীদার পরিপন্থী মতকে ইসলাম বিরোধী, এমনকি কুফরী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন হাদীছে হযরত ঈসার অবতরণ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় বিবরণের উদ্বৃতি প্রদান করা হইল–

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاطَا رَاْسَهٗ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهٗ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ ....

দজ্জাল-আন্দোলনের ঘোরতর অবস্থা বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইতেছেন– দজ্জাল চতুর্দিকে ভীষণ উৎপাত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে, "এমতাবস্থায় অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালা মারয়্যাম-পুত্র মছীহ (আঃ)-কে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি অবতরণ করিবেন দামেশক শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত (মসজিদের) "মিনারা-বায়জা"– শ্বেত বর্ণের মিনারার উপর। তাঁহার পরণে এক জোড়া রঙ্গিন চাদর থাকিবে। অবতরণকালে তাঁহার হস্তদ্বয় দুইজন ফেরেশতার উপর ভর করিয়া থাকিবে। ক্লান্তির দরুন তাঁহার ঘাম বাহির হইতে থাকিবে– মাথাকে নিচু করিলে ঘামের ফোঁটা টপকিয়ে পড়িবে, আর মাথা সোজা করিলে ঘামের ফোটা মতির দানার ন্যায় বহিয়া পড়িবে।" (মুসলিম শরীফ ২–৪০১)

فَبَيْنَمَا اِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِىْ الْقَهْقَرٰى لِيُقَدِّمَ عِيْسٰى يُصَلِّىْ فَيَضَعُ عِيْسٰى يَدَهٗ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ تَقَدَّمْ ....

"মোসলমানের তৎকালীন নেতা একদা ফজরের নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, এমতাবস্থায় অকস্মাৎ মারয়্যাম-পুত্র ঈসা ঐ ফজরের সময় অবতরণ করিবেন।* তখন ঐ নেতা যিনি নামায পড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি পেছনের দিকে চলিয়া আসিবেন; যেন হযরত ঈসা আগে বাড়িয়া নামায পড়ান। কিন্তু হযরত ঈসা ঐ নেতার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিবেন, নামায আপনি পড়াইবেন; এই নামায আপনার ইমামতীতেই দাঁড়াইয়াছে। সেমতে ঐ নেতাই নামায পড়াইবেন।" (ইবনে মাজা শরীফ)

এইরূপে হযরত ঈসা ভূপৃষ্ঠে অতরণ করিয়া বহু প্রতিক্ষিত দজ্জালকে বধ করিবেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিবেন। তখন তিনি বিবাহও করিবেন, অতপর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করিবেন এবং পবিত্র মদিনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন– এই সম্পর্কেও হাদীছ বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) تاريخ ইতিহাস বিষয়ে একখানা কেতাব লিখিয়াছেন, সেই কেতাবে উল্লেখ আছে–

عن عبد الله بن سلام قال يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا ـ

"ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ছালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঈসা (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন, ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর ও ওমরের তিনটি কবরের সঙ্গে চতুর্থ কবর হযরত ঈসার হইবে।"

(তাছরীহ বে-মা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মসীহ ৩৮)

---

* ঈসা (আঃ) আছরের নামাযের সময়ে অবতরণ করিবেন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অনেকে লিখিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীছ দৃষ্টে ফজরের নামায সাব্যস্ত হয়। বোখারী শরীফের শরাহ ফয়জুল বারী চুতর্থ খন্ড ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে– আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীছ মজবুত।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় এক রাজত্বে অন্য রাজার পরিভ্রমণে আসার ন্যায় বিশিষ্ট মেহমানের মর্যাদায় আসিবেন বটে, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন অবস্থানকালে নানা রকমের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক রকমের সংস্কার সাধনও করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার উম্মৎ হওয়ার দাবিদার খৃষ্টানরা শূকর খাওয়ার ও ক্রুশ ধারণ করার যে অবৈধ রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছে ঐ সবের সংস্কারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। নিম্নের হাদীছে উহারই উল্লেখ রহিয়াছে–

১৬৫৭। হাদীছঃ عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَيَقْبَلُهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُ وْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শপথ করিয়া বলিয়াছেন, একদিন মারইয়্যামের পুত্র তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী রূপে। সেমতে তিনি (খৃষ্টানদের কুসংস্কার মুছিবার জন্য) ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন এবং (খৃষ্টানগণ শূকরকে খাদ্য ও গৃহপালিত পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি ঐ কুসংস্কার উচ্ছেদে) শূকর নিধন অভিযান চালাইবেন। যুদ্ধ-লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন। ঐ সময় ধন-দৌলতের আধিক্য হইবে, এমনকি উহা গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না, ফলে (সামান্য এবাদত– যথা) একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ-সামগ্রী হইতে উত্তম গণ্য হইবে।

হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতখানা পাঠ করিতে পার–

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ـ

ব্যাখ্যা ঃ حكما عدلا নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী" অর্থাৎ হযরত ঈসার তৎকালীন আগমন ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরিয়তের বাহকরূপে হইবে না, বরং তিনি ব্যক্তিগতবাবে নবী থাকিবেন বটে, কিন্তু তখন তিনি হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালাকারী এবং সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার দূর করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীরূপে আগমন করিবেন।

এ সম্পর্কে হাদীছও বর্ণিত আছে যে ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته "মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ধর্ম সমর্থনকারী, তাহারই শরীয়তের পাবন্দরূপে।" (ফতহুল বারী ৬–৩৮৩)

"فيكسر الصليب" ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন।" অর্থাৎ খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা গড়িয়া নিয়া সেই অবাস্তব ঘটনা সূত্রে ক্রুশ ধারণের রীতি অবলম্বন করিয়াছে, ক্রুশের ভক্তি প্রণাম অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। হযরত ঈসা স্বয়ং এই শেরেকী কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করিবেন, ক্রুশের প্রভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিবেন। এমনকি বাহ্যিক রূপেও ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে উহাকে মুছিয়া ফেলার অভিযান চালাইবেন।

"ويقتل الخنزير" শূকর নিধনের অভিযান চালাইবেন"। কোন নবীর শরীয়তেই শূকর হালাল ছিল না। হযরত ঈসার শরীয়তেও মুকর হারাম ছিল, কিন্তু খৃষ্টানরা তাহাদের শরীয়ত বিকৃত করিয়া মুকর খাওয়া অবলম্বন করিয়াছে, এমনকি গরু-ছাগলের ন্যায় শূকরের লালন-পালন, কেনা-বেচা অবলম্বন করিয়াছে। ঈসা

(আঃ) শূকর নিধনের মাধ্যমে উক্ত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবেন।

"ويضع الحرب" যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন''। ইহা এইরূপে হইবে যে, সেই সময় হযরত ঈসার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় ভূপৃষ্ঠে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে–

ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام -

''হযরত ঈসার অবতরণ সময়ে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ভিন্ন সব ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিবেন'' (আবু দাউদ শরীফ)

وتملا الارض من المسلم كما يملا الانا ء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله تعالى -

''ভূপৃষ্ঠের আবাসিক অংশ মুসলিম জাতিতে পূর্ণ থাকিবে (উহাতে অন্য কাহারও স্থানই থাকিবে না) যেরূপ কানায় কানায় পানি ভরা পাত্রের অবস্থা হয়।'' তখন সারা বিশ্ববাসীর একই কলেমা হইবে, ভূপৃষ্ঠে এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর এবাদত হইবে না। (ঐ)

মোসলেম শরীফে আছে, ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ''হযরত ঈসার অবতরণ কালে আল্লাহর কুদরতের একটি লীলা এই প্রকাশ পাইবে যে, সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়া সকল প্রকার বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা মুছিয়া যাইবে।'' ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান স্বাভাবিকরূপেই হইয়া যাইবে।

"ويفيض المال" মালের আধিক্য হইবে'' মালের আধিক্যের একটা সাধারণ সূত্র এই হইবে যে, জুলুম-অন্যায়, অত্যাচার দূরীভূত হইয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন সকল প্রকার বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হইবে, এতদ্ভিন্ন ভূ-গর্ভস্থ খনিজ পদার্থ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠে চালিয়া আসিবে। (ফতহুল বারী ৬–৩৮৩)

"حتى لا يقبل احد" মাল গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না' ইহার এক কারণ ত সাধারণ্যে মালের আধিক্য; এতদ্ভিন্ন সব রকম নিদর্শন দৃষ্টে সকলের অন্তরেই কিয়ামতের ভাবনা জন্মিবে, ফলে ধন-লিপ্সা থাকিবে না। (ফতহুল বারী ৬-৩৮৩)

"حتي تكون السجدة الواحد خير ...." তখন এক একটি সেজদা সারা দুনিয়া ও উহার সম্পদ হইতে উত্তম গণ্য হইবে। কেয়ামতের নিকটবর্তীতা বোধে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি হইয়া আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে; ফলে মানুষ এবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে। কিন্তু ধন-দৌলত গ্রহণকারীর অভাবে দান-খয়রাতের দ্বারা আখেরাতের লাভ হাসিল করার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই শারীরিক এবাদতের প্রতিটি সুযোগ মানুষের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান পরিগণিত হইবে। (ঐ)

ثم يقول ابو هريرة واقرءوا ان شئتم ....

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিলেন–

وَاِنَّ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ - ....

(হযরত ঈসার অবতরণের পর স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে যে, ইহুদীগণ যে সব অপবাদ রটাইয়াছিল, নাছারাগণ যে– তাঁহাকে খোদার বেটা বানাইয়াছিল এবং তাহারা উভয়ে তাঁহার শূলীবিদ্ধ হওয়ার যে কল্পিত কাহিনী গড়াইয়াছিল– সবই ছিল মিথ্যা। ঐ সময় স্বয়ং হযরত ঈসার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের সমুদয় গর্হিত মতবাদের অসারতা এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের সমুদয় বিবৃতির প্রামাণিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া সমবেতভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া যাইবে। এইভাবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসার (ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পর, তাঁহার স্বাভাবিক) মৃত্যুর পূর্বেই (তাঁহার সম্পর্কীয় সকল প্রকার মিথ্যা কল্পনার অবসান

ঘটিয়া, কল্পনা প্রণয়নকারী) ইহুদী-নাসারা দলের (তৎকালীন) প্রতিটি লোকই তাঁহার সম্পর্কে খাঁটি তথ্য-জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভের সুযোগ পাইবে।

আর কেয়ামতের দিন ত স্বয়ং হযরত ঈসা আল্লাহর দরবারে ঐ কেতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ দিবেনই। (ইহুদীগণ যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ত স্বাভাবিকই; সকল নবীই কেয়ামতের দিন অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসা তাঁহার দলভুক্ত হওয়ার দাবীদার নাছারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিবেন; যাহা পূর্বে ছুরা মায়েদার আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে।)

আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করিয়া মূল হাদীছের বিষয়বস্তুর প্রামাণিকতাই দেখাইয়াছেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি পুনঃ অবতরণ করিবেন এবং তখন তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সম্পর্কে প্রধান কুসংস্কার ক্রুশের কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিবেন; তখন সকলে ঐ সব মিথ্যা ত্যাগ করতঃ খাঁটিভাবে মুসলমান হইয়া তাঁহার সম্পর্কে সত্যের প্রমাণ স্থাপন করিবেন। সকলে খাঁটি ঈমানদার হইলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আখেরাতের জন্য এবাদতের প্রতি অধিক আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে।

১৬৫৮। হাদীছ ঃ ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কতই না সুন্দর হইবে তোমাদের অবস্থা তখন, যখন তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন মরয়্যামের পুত্র ঈসা (আঃ) এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন।

ব্যখ্যা ঃ হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের অবতরণের পর বিশ্বের অবস্থা সব দিক দিয়াই ভাল হইয়া যাইবে– দ্বীনের দিক দিয়া, একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সব রকম বে-দ্বীনী মুছিয়া যাইবে। শান্তির দিক দিয়া, সারা বিশ্ব এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইয়া যাইবে; বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ মুছিয়া যাইবে। ধন-সম্পদের দিক দিয়া সকলেই ধনী হইয়া যাইবে, এমনকি দান-খয়রাত গ্রহণকারী লোক পাওয়া যাইবে না। খাদ্য দ্রব্যের দিক দিয়া, জমিন তাহার উৎপাদনশক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশ করায় সব রকম খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দিবে।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় দুনিয়াতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন। প্রাথমিক অবস্থায় দাজ্জাল-আন্দোলনের এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন। অল্প দিনেই ঐসব ধ্বংস হইয়া সঙ্কট কাটিয়া উঠিবে, অতপর অনতিবিলম্বেই ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হইবে; তখন অল্প দিনের জন্য সংকটপূর্ণ বনবাসের জীবন কাটাইতে হইবে; তার পরেই আসিবে পূর্বোল্লিখিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রাচুর্যতার যুগ।

"وامامكم منكم" এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত আছে। অগ্রগণ্য মত এই যে, এই বাক্যটি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় বর্ণনা যে, তিনি অবতরণ করিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন এবং নামাযের ইমামতিও তিনি করিবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতবাবে নবী থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন জীবন শরীয়তে-মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

কোন কোন হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখা যায় যে, তিনি ইমাম হইতে অস্বীকার করতঃ ঐ সময় তাঁহার পূর্বে মুসলমানদের নেতা যিনি থাকিবেন তাঁহাকেই নামাযের ইমামতীর জন্য আগে বাড়াইয়া দিবেন। অত্র হাদীছের সামঞ্জস্য উপরোল্লিখিত বর্ণনার সহিত এইরূপে করা হয় যে, এই হাদীছটির মর্ম শুধু এতটুকু যে, উপস্থিত যেই নামাযের জামাত দাঁড়ানকালে হযরত ঈসার অবতরণ হইবে সেই জামাতের ইমামতী তিনি করিবেন না, বরং উপস্থিত নেতার ইমামতীতে ঐ নামায আদায় করা হইবে।

ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়া তাঁহার সর্বপ্রথম বিশেষ কাজ হইবে দাজ্জালকে ধ্বংস করতঃ তাহার বিপর্যয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করা। এইসব তথ্য এবং দজ্জালের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খন্ডে বর্ণিত হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ ـ

—সমাপ্ত—

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهِ

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهِ

বালাগাল উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ

হাসুনাত জামীউ খেছালিহী
ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ

بَلْ هُوَ يَاقُوْتَةٌ وَالنَّاسُ كَالْحَجَرِ

মুহাম্মাদুন বাশারুন লা কালবাশার্
বাল হুওয়া ইয়াকুতাতুন ওয়ান্নাসু কাল্ হাজার্

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

লা- ইউমকিনুস সানাউ কাম্মা কানা হাক্কুহু
বা'দায খোদা বুযুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মোখতাসার
সর্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজ মহিমায়
কাটিল তিমির রাশি তাঁর রূপের আভায়
চরিত্র মাধুরী তাঁহার অতি মনোরম
তাঁহার 'পরে ও বংশ' পরে দরূদ ও সালাম
মুহাম্মদ মানুষ তবে যেমন মানুষ নন
পাথর মাঝে পরশমণি গণ্য তিনি হন
গরিমা তাঁহার বর্ণিবে কেউ এমন সাধ্য নাই
খোদার পরেই শ্রেষ্ঠ তিনি তুলনা তাঁহার নাই

সর্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

অনাদিরূপে এক আল্লাহ তাআলাই ছিলেন– অন্য কিছু বলিতে আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই– এই শূন্যতার সমাপ্তি ঘটাইতে ইচ্ছা করিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

যেমন– ওলীকুল শিরোমণি শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী শায়খে আকবর (রঃ) কর্তৃক এলহামে প্রাপ্ত এবং পূর্বাপর ওলী ও সূফী তথা আধ্যাত্মিকতায় ধৈন্য মহানগণ কর্তৃক গৃহীত আল্লাহ তাআলার একটি বাণীতে উল্লেখ আছে–

كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيًا فَارَدْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ـ

"আমার সত্তা (জানিবার কেহ না থাকায়) অজানা ছিল; আমার ইচ্ছা হইল (আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ করা)– আমাকে জানান। সেমতে আমি সৃষ্টি করি জগত।" (তফসীর রুহুল মাআনী পৃঃ ১৪–২১)

এই বাণীর মর্ম কোরআনের একটি আয়াত দ্বারাও সমর্থিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

مَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ـ

"জিন এবং মানুষ এই দুইটি জাতিকে আমি একমাত্র আমার এবাদত বা গোলামী করার উদ্দেশে সৃষ্টি করিয়াছি।".

আল্লাহকে জানা ব্যতিরেকে আল্লাহর গোলামী হইতে পারে না। আর আল্লাহকে জানা এবং আল্লাহর মা'রেফত তথা আল্লাহর গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করা– ইহার সাথে আল্লাহর এবাদত-গোলামী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব প্রথম বাণীটির এবং এই আয়াতের মর্ম নিতান্তই অভিন্ন।

নিজকে জানান, নিজের গোলামী করান– আল্লাহ তাআলার এই ইচ্ছার বাস্তবায়নে জগত সৃষ্টির শুভ প্রারম্ভেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সৃষ্টি-মূল নূরকে। এই নূরকেই পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া"। (যোরকানী, ১–২৭)

এই নূর বা হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বলিতে কাহারও মতে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র রূহ বা আত্মা উদ্দেশ্য। আর কাহারও মতে অন্য কোন বাস্তব বস্তুবিশেষ উদ্দেশ্য (যোরকানী ১–৩৭)। অথবা ঐ পবিত্র রূহ বা আত্মারই বাহন, কিন্তু পদার্থীয় দেহ নহে, বরং হয়ত এক বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব– যাহার প্রতিবিম্বের বিকাশ ছিল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জাগতিক নশ্বর দেহ।*

এই হাকীকতে মুহাম্মদিয়াই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। লৌহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বা নূরে মুহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই তথ্য সুস্পষ্টরূপে বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ

* প্রথম খণ্ড "কবরের আযাব" পরিচ্ছেদে জেসমে মেসালী বা জ্যোতির্দেহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই ঐ দেহ আছে; ঐ শ্রেণীর কোন বাহন হওয়া বিচিত্র নহে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরাত সঙ্কলন 'নশ্‌রুত্তীব' কিতাবে নিজ সংযোজিত টীকায় নূরে মুহাম্মদীকে রূহে মুহাম্মদী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَاجَنَّةٌ وَلَانَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَاجِنِّىٌّ وَلَا اِنْسِىٌّ (رواه عبد الرزاق)

অর্থ ঃ "জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক; সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কোন্ জিনিসটি সৃষ্টি করিয়াছেন? রসূল (সঃ) বলিলেন, হে জাবের! আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা) আল্লাহর (বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট) নূর হইতে। অতঃপর সেই নূর আল্লাহর কুদরতে আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলমান ছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান- যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব-দানব এবং ফেরেশতা কিছুই ছিল না।"

(যোরকানী, ১-৪৬)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন যোগ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সকলের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন

উপরোল্লিখিত আল্লাহ প্রদত্ত এলহামী বাণী ও তাহার সমর্থনে আয়াতের মর্ম ইহাই ছিল যে, "আল্লাহকে জানিবে, আল্লাহর গোলামী করিবে এই উদ্দেশেই সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি।" সুতরাং সাধারণ নিয়ম মতেই আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রথম সৃষ্টি হযরত মুহামদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের যোগ্যতায় সকলের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন-

اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا -

"আল্লাহকে ভয় করায় এবং আল্লাহকে জানায় আমি তোমাদের তথা নিখিল সৃষ্টির সকলের ঊর্ধ্বে।" আল্লাহকে যে যত বেশী ভয় করিবে, সে তাঁহার তত বেশী গোলামী করিবে।

আল্লাহকে জানা তথা আল্লাহর মা'রেফতের আধার এবং আল্লাহর গোলামীর প্রকৃষ্ট নমুনারূপে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তথা তাঁহার মূল সত্তা সকল সৃষ্টির আগে সৃষ্টি করিয়া মূলতঃ ইহাই প্রতীয়মান করিয়াছেন যে, আল্লাহর মা'রেফতের ধারা এই আধার হইতেই প্রবাহিত হইবে। নিখিল সৃষ্টি সেই প্রবাহের ধারা হইতেই আল্লাহর মা'রেফত লাভ করিবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর মা'রেফতের দ্বারা লাভে ধৈন্য হওয়া একমাত্র সেই আধারের সংযোগেই সম্ভব। সেই আধারের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন সৃষ্টিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আল্লাহকে সঠিকরূপে জানায় ধন্য হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সঠিকরূপে জানা হইতে যাহারা বঞ্চিত, তাহারা বস্তুত সৃষ্টির উদ্দেশ্য বানচালকারী। তাহারা পরকালে জাগতিক জীবনের কর্মভোগ স্থলে সৃষ্টিকর্তার করুণাভাজন হইয়া তাঁহার পুরস্কার লাভে ধন্য হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না, তাহাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ-কেন্দ্র নরক অবধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সংযোগ ছাড়া পরকালের মুক্তি লাভ হইবে না।

তদ্রূপ আল্লাহর গোলামীর রূপরেখা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইতেই প্রকাশিত হইবে। কারণ, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আল্লাহর গোলামীর নির্ধারিত নমুনা।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে (আল্লাহর গোলামী বাস্তবায়নের) সুন্দর নমুনা রাখা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেকের জন্য, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির আশা রাখে।" (পারা- ২১; রুকু- ১৯)

অতএব তাঁহার আদর্শে ও তাঁহার শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর গোলামী না করা হইলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখেরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্ব-বুকে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পরে ত তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণপূর্বক তাঁহার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে, অবশ্য তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে অন্যান্য নবীগণের উম্মত হইয়া সেই নবীর মাধ্যমে উক্ত সংযোগ স্থাপিত হইত। সম্মুখের একটি শিরোনামে প্রতীয়মান হইবে যে, নবীগণের সকলের নবুয়তের উৎসই নবী মুহাম্মদ (সঃ)।

সৃষ্ট জগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্নরূপে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সৃষ্টির সূচনা করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সর্বাধিক প্রিয় এবং ভালবাসার ও আদরের পাত্র বানাইয়াছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র

কোন শিল্পী নিজ দক্ষতায় সুন্দর গঠনের একটি জিনিস তৈয়ার করে; তাহা এতই সুন্দর হয় যে, স্বয়ং গঠনকারী শিল্পী তাহারই হাতে গঠিত জিনিসটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, সে তাহাকে আদর করে, ভালবাসে।

তদ্রূপ মহান আল্লাহ হাকীকতে মুহাম্মদিয়াকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন, তাহাকে ভালবাসেন, সর্বাধিক আদরের পাত্র বানাইয়া নেন।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنِّىْ قَائِل قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى صَفِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আমি একটি কথা বলিতেছি; ফখর বা গর্ব করা উদ্দেশ্য নহে। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন), মূসা সফিউল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহ কর্তৃক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত), আর আমি হাবীবুল্লাহ (অর্থাৎ আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার দোস্ত বানাইয়াছেন– ভালবাসিয়াছেন)। –(মেশকাত শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবুব, সর্বাধিক প্রিয়– এই সত্যের প্রকাশ ভঙ্গিমায় পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত লক্ষণীয়–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ "আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাকে ভালবাস– ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাও তবে আমার অনুসরণ তোমাদের করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে (শুধু ইহাই প্রতিপন্ন হইবে না যে, তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, বরং) আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তোমাদেরকে ভালবাসিবেন।" (পারা–৩, রুকু–১২)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে দোস্ত বানাইয়াছেন; আল্লাহ তাঁহাকে ভালবাসেন– তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা এতই প্রগাঢ় যে, তাঁহার অনুসারীকেও আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়া থাকেন– স্বীয় হাবীব গণ্য করেন।

অন্য আয়াতে আছে مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যেব্যক্তি আল্লাহর রসূলের তাবেদারী করিবে সে আল্লাহর তাবেদার সাব্যস্ত হইবে।"(পারা-৫, রুকু-৮)

নিখিল সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিকাশ সাধন

শিল্পীর নিজ হাতে গড়া বস্তু তাহার দক্ষতায় এতই সুন্দর ও মনোরম হয় যে, স্বয়ং শিল্পী তাহার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়। এমনকি শিল্পী প্রদর্শনী করিয়া তাহার গুণ-গরিমার প্রচার-প্রসার করে। আল্লাহ তাআলাও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছেন।

আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর গোলামী করা- ইহার যোগ্যতা ও গুণ, বৈশিষ্ট্য দানে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে (তাঁহার মূল সত্তা হাকীকতে মুহাম্মদিয়া) সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে চরম ভালবাসা ও আদরের উচ্চ মর্যাদায় ধন্য করিয়া তাঁহার প্রদর্শনীর ইচ্ছা করিলেন। প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-গুণের প্রচার ও প্রসার হইবে এবং সৃষ্ট-জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হইবে।

আল্লাহকে চেনা তথা তাঁহার অসীম গুণাবলীর মারফতে তথা অনুধাবনে ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্বে পৌঁছা এবং আল্লাহর গোলামী বা এবাদতের অসংখ্য স্তর ধীরে ধীরে আয়ত্ত করা- ইহার একমাত্র পাত্র মানুষ ও জিন জাতিদ্বয়। এই জাতিদ্বয়ের জীবন যাপনের জন্য ইহজগতের সমুদয় সৃষ্টির প্রয়োজন। এই জাতিদ্বয় তাহাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর গোলামী করা- এই দায়িত্ব পালন করিলে পুরস্কার লাভের জন্য বেহেশত এবং পালন না করিলে শাস্তির জন্য দোযখ তথা পরজগতের সব কিছু সৃষ্টির প্রয়োজন।

সৃষ্ট জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশের কেন্দ্ররূপে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মূল সত্তা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তাআলা তাহার প্রদর্শনীর জন্য উল্লিখিত ধারা পরম্পরায় ইহজগত ও পরজগতসহ কুল-মখলুকাত তথা অসংখ্য অগণিত চিজ-বস্তু সৃষ্টি করিলেন। এই তথ্যের ইঙ্গিতই নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে উল্লেখ হইয়াছে।

হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে-

اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسٰى اٰمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمُرْ اُمَّتَكَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِهٖ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ ـ (رواه الحاكم)

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী মারফত আদেশ পাঠাইয়াছিলেন, মুহাম্মদের প্রতি আপনি ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় উম্মতকে আদেশ করিবেন- তাহারা যেন (বর্তমানে আপনার মুখে শুনিয়া এবং পরবর্তীতে তাঁহার আবির্ভাব হইলে) তাঁহার প্রতি ঈমান আনে। মুহাম্মদ (-এর বিকাশ সাধন ইচ্ছা) না হইলে আদমকেই সৃষ্টি করিতাম না, বেহেশতও সৃষ্টি করিতাম না, দোযখও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১-৪৪)

হাদীছ ঃ সালমান ফারেসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اِنْ كُنْتَ اتَّخَذْتُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا ـ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ

الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لِاُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِيْ وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا ۔ (رواه عساكر)

অর্থ ঃ "একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক সংবাদ পাঠাইয়াছেন– ইহা সত্য যে, ইব্রাহীম আমাকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে স্বয়ং আমি দোস্ত বানাইয়াছি। আমার নিকট আপনার চেয়ে সম্মানী কোন কিছু আমি সৃষ্টি করি নাই। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি– বিশ্ব এবং উহার সব কিছু আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশে যে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব আপনার গৌরব এবং আমার নিকট আপনার যে কত মর্যাদা। আপনার বিকাশ সাধনের ইচ্ছা না হইলে আমি বিশ্ব সৃষ্টি করিতাম না।"

(ইবনে আসাকের, ১–৬৩)

বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে উর্ধ্ব জগতে হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি

কাহাকেও কোন পদে নিযুক্তির তিনটি পর্যায় আছে– যেমন চাকুরীর জন্য– (১) বাছাই করা। (২) চাকুরী প্রদান করা। (৩) কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা। কোন সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় এক সঙ্গেই হয়, আর কোন সময় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে।

সকল নবীরই নবুয়তের জন্য নির্বাচন ও বাছাই করা আদিকালে আল্লাহ তাআলার নিকট সম্পন্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শুধু প্রথম পর্যায়ের ছিল। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া অন্য সকল নবীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় একই সঙ্গে তাঁহাদের আবির্ভাবকালে সম্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং উহা তাঁহার জন্য এক অসাধারণ গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বেলায় তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান তাঁহার আবির্ভাবকালে হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বহু বহু পূর্বে, এমনকি সারা বিশ্ব ও বিশ্বের আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালামেরও সৃষ্টির পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল।* হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর এই বিশ্ব-ভুবন এবং হযরত আদমেরও সৃষ্টির পূর্বে উর্ধ্ব জগতে নবীরূপে বিঘোষিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই একক বৈশিষ্ট্য নিম্ন হাদীছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ (رواه الترمذى فى سننه) ۔

অর্থ ঃ "ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ সময়ে নিশ্চিতরূপে আপনার নবুয়ত লাভ হইয়াছিল? রসূল (সঃ) বলিলেন, যে সময়ে আদম তাঁহার আত্মা ও দেহের সম্মিলনে পয়দাও হইয়াছিলেন না।" অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে। এই তথ্যটি আরও কতিপয় হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– এরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এবং মায়সারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে।

এই তথ্য "যোরকানী" ১–৩৮ এবং "নশরুত্তীব" ৬ পৃষ্ঠার টীকা হইতে গৃহীত। উক্ত টীকায় এই তথ্যটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত টীকাটি মূল কিতাবের সঙ্কলক মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিজস্ব হওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে।

(যোরকানী, ১-৩১, ৩২)

আরশ কুরসীতে "মুহাম্মদ (সঃ)"-এর নাম এবং তাঁহার নবুওতের প্রচার

আদম সৃষ্টিরও পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার নাম এবং তিনি যে আল্লাহ তাআলার রসূল তাহা ঊর্ধ্ব জগতের সর্বত্র বিঘোষিত হইতেছিল এবং মহান আরশের গায়ে তাঁহার নাম-পরিচয় এবং "রসূলুল্লাহ" খেতাব লিখিত ছিল। এই তথ্য একাধিক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন-

হাদীছ ঃ ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন)-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَارَبِّ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلاَّ مَا غَفَرْتَ لِى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاٰدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ اَخْلُقْهُ قَالَ يَا رَبِّ لاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِىْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِىَّ مِنْ رُّوْحِكَ رَفَعْتُ رَاْسِىْ فَرَاَيْتُ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَمْ تَضِفْ اِلٰى اسْمِكَ اِلاَّ اَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقْتَ يَاٰدَمُ اِنَّهُ لاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَىَّ وَاِذَا سَاَلْتَنِىْ بِحَقِّهٖ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ (رواه البيهقى)

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম (আঃ) আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যে ভুল করার পর একদা তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এইরূপে দোয়া করিলেন- হে পরওয়ারদেগার! মুহাম্মদের উসিলা ধরিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিরূপে চিনিতে পারিয়াছ, অথচ এখনও আমি তাঁহার (প্রকাশ্য) দেহ তৈয়ার করি নাই? আদম (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! যখন আমাকে আপনার বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও আপনার সৃষ্ট আত্মা আমার ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন তখন আমি মাথা উঠাইবা মাত্র আরশের পায়াসমূহে লেখা দেখিয়াছি- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূল্লাহ"। আমি তখন ভাবিয়াছি, আপনার সর্বাধিক ভালবাসার সৃষ্টি না হইলে আপনার নামের সহিত (এই নাম) জড়িত করিতেন না। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে আদম! তুমি সত্য বিষয়ই ভাবিয়াছ। নিশ্চয় মুহাম্মদ আমার সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। তুমি তাঁহার উসিলা ধরিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। মুহাম্মদের বিকাশ সাধন করার ইচ্ছা না হইলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১-৬২)

বিশ্ব-ধরাকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবযোগ্য করার ব্যবস্থায় তাঁহার নূরের আভা নিয়া পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবযোগ্য বিশ্ব গঠনে জরুরী পর্যায়ে কতিপয় বিশেষ গুণ প্রতিভা প্রয়োজন- (১) সত্য গ্রহণে নির্ভীক অদম্য সাহসী হওয়া; যেন সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় সৎসাহসের মদদে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করায় নির্দ্ধিধায় অগ্রসর হইতে পারে। (২) সত্যের উপর দৃঢ় থাকায় পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল-অনড়

হওয়া, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকায় জুলুম-অত্যাচার, ঝড়-তুফান চুল পরিমাণও বিচ্যুত করিতে না পারে। (৩) সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বীরত্বের সহিত ত্যাগ তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গে অগ্রসর হইতে থাকা, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার-প্রতিষ্ঠিত করায় বিরোধী শক্তির বাধায় প্রতিহত হইতে না হয়। (৪) সত্যকে স্থায়ী করার চেষ্টা ও পরিকল্পনায় সচেতন, বিজ্ঞ সুকৌশলী হওয়া, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্ব বুকে কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখায় বিরামহীন প্রচেষ্টা ও মেহনতে ব্রতী হইতে পারে।

এই শ্রেণীর গুণাবলী ও যোগ্যতার পরিবেশেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সার্থক হইতে পারে। মানব সমাজে ঐ শ্রেণীর গুণ ও যোগ্যতা আনয়ন উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার বা আরও বেশী নবী-রসূল এই ধরায় পাঠাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত শ্রেণীর অসংখ্য গুণাবলী ও যোগ্যতার মূল আধার-আকর বানাইয়াছিলেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে এবং তাঁহার মূল সত্তা– নূর বা হাকীকতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে ঐ সমস্ত গুণের উৎস প্রোথিত ছিল। যেরূপে আল্লাহর কুদরতে ডিমের কুসুমে মোরগ-মুরগীর দেহের হাড়, গোশত চোখ, কান, ঠোঁট, নখ সবই প্রোথিত থাকে।

পূর্ববর্তী সকল নবী পরম্পরা বিশ্ব-বুকে আসিয়াছেন এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা ও মেহনত চালাইয়া মানব সমাজে ঐ গুণাবলী ও যোগ্যতা আনয়ন করায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদেরও মূল সম্বল উক্ত নূরেরই আভা ছিল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসা ও অসাধারণ মান-মর্যাদা রচনায় ৮৫০-এর অধিক বৎসর পূর্বের একটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য পুস্তিকা প্রচলিত আছে– "কাসীদাহ বোরদাহ"। উক্ত কবিতায় দুইটি পংক্তি এই আলোচনায় লক্ষণীয়–

وَكُلُّ اٰىٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا ـ فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ بِهِمْ ـ

"সম্মানিত রসূলগণ যত বৈশিষ্ট্যের পাত্র ছিলেন– বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নূর হইতেই আসিয়াছিল।"

পরবর্তী পংক্তিতে উল্লিখিত সত্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত দানে বলা হইয়াছে–

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا ـ يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِىْ ظُلَمٍ ـ

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইলেন সকল গুণের আধার– সূর্য, আর সকল নবী ঐ সূর্যকেন্দ্রিক নক্ষত্রসমূহ। ঘোর অন্ধকারে লোকদের জন্য নক্ষত্রসমূহ সূর্যেরই আলো প্রকাশ করে। (অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলো নক্ষত্র হইতে দেখা গেলেও বস্তুতঃ ঐ আলো সূর্য হইতে।)"

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রচেষ্টায় মানব সমাজে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় ঐ গুণাবলী ও যোগ্যতা এবং উহার সর্বোত্তম যুগ দেখা দিলে সেই যুগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়। এই মর্মে বোখারী শরীফেরই একটি হাদীছ "সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব" শিরোনামে অনূদিত হইবে।

পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে নির্দেশ

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশেই আল্লাহ তাআলা এই বিশ্ব-ভুবন সৃষ্টি করিলেন। সেমতে এই

বসুন্ধরাকে হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে উপযোগী করার উদ্দেশে ধাপে ধাপে উহাকে মার্জিত করার জন্য এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এই বিশ্বে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়াই সকল নবীর আগমন।

জাগতিক কার্য ব্যবস্থায় দেখা যায়— একটি দেশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ও মন্ত্রী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ঐ দেশ ও উহার শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হয়। তদ্রূপ যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত নবী এই ধরায় আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মনোনয়ন বা নিয়োগ তথা আবির্ভাবলগ্নে তাঁহাদের প্রত্যেক হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহা পবিত্র কোরআন বর্ণিত সত্য—

وَاِذَا اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ

لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ .... قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

“**স্মরণীয় ঘটনা** ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আপনাদেরকে কিতাব এবং শরীয়ত যাহাই দান করি তারপর আসিবে আপনাদের নিকট এক রসূল— যিনি আপনাদের নিকটস্থ কিতাবের বাস্তবতা প্রমাণকারী হইবেন; (যেহেতু তাঁহার আগমনের অগ্রিম সংবাদ আপনাদের কিতাবে থাকিবে, অতএব তাঁহার আগমন দ্বারা আপনাদের কিতাবের বাস্তবতা প্রমাণিত হইবে। তিনি আপনাদের বর্তমানে আসিয়া গেলে) আপনারা তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সাহায্য-সহায়তা করিবেন। (অঙ্গীকারের এই বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক) আল্লাহ তাআলা নবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আপনারা অঙ্গীকার করিলেন ত এবং উক্ত বিষয়-বস্তুর উপর আমার কঠোর আদেশ গ্রহণ করিলেন ত? নবীগণ সকলে বলিলেন, আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আপনারা (নিজেরাই নিজেদের উপর) সাক্ষী থাকুন; আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে থাকিলাম। (এই অঙ্গীকারে উম্মতগণও শামিল হইবে) এই অঙ্গীকারের পর যে ফিরিয়া যাইবে সে অন্যায়কারী গণ্য হইবে।”

(পারা– ৩; রুকু– ৬)

- উল্লিখিত আয়াতে সমস্ত রসূলগণ হইতে ঈমান ও সাহায্যের উক্ত কঠোর অঙ্গীকার যেই রসূল সম্পর্কে লওয়া হইয়াছিল তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তফসীরে জালালাইন ও বিভিন্ন তফসীরে ইহা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।
- উল্লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল আলমে আরওয়াহ বা আত্মার জগতে। যেখানে ইহজগতের ভাবী মানবগুষ্ঠি সকল হইতে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণের অনুষ্ঠান হইয়াছিল— যাহার সুস্পষ্ট আলোচনা সূরা আ'রাফ ১৭ নং আয়াতে রহিয়াছে।

অথবা প্রত্যেক নবী হইতে তাঁহার আবির্ভাবকালে ওহী মারফত ঐ অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল।

(বয়ানুল কোরআন)

নবীগণের এই অঙ্গীকার তাঁহাদের নিজ নিজ উম্মতের উপর অবশ্যই কঠোরভাবে বর্তিবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মত হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেনও বটে।

পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণের বিষয়টি আলী (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই—

لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِّنْ اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهٗ اِلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِىْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ وَلَيَنْصُرَنَّهٗ وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذٰلِكَ عَلٰى قَوْمِهٖ

(رواه ابن كثير فى تفسيره وابن عساكر)

অর্থ ঃ "আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী যত নবীকে ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি ধরাপৃষ্ঠে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তবে তিনি স্বয়ং অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবেন এবং তাহার সমর্থন সহায়তা করিয়া চলিবেন। আর প্রত্যেক নবীও স্বীয় উম্মত হইতে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ঐরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতেন।

(যোরকানী, ১-৪০)

এই জন্যই ত রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন–

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهٗ اِلاَّ اِتِّبَاعِىْ -

অর্থ ঃ "এই যুগে মূসা পয়গম্বর জীবিত থাকিলে তাঁহার জন্য আমার আনুগত্য-অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না।" (মেশকাত শরীফ)।

"মাওয়াহেবে লুদুনিয়্যাহ্" কিতাবে উক্ত তথ্য বর্ণনার পর উল্লেখ আছে , এই তথ্যের অনিবার্য অর্থ ইহাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু তাঁহার উম্মতের নবীই ছিলেন না, তিনি সমস্ত নবীগণেরও নবী ছিলেন। ইহারই প্রতিফলন এবং বিকাশ সাধন হইবে কেয়ামতের দিন। আদম (আঃ) এবং তৎপরবর্তী সকল নবীই ঐদিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পতাকাতলে সমবেত থাকিবেন। নিম্নবর্ণিত তিরমিযী শরীফের হাদীছে তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে–

مَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِىْ -

অর্থ ঃ "কেয়ামতের দিন আদম (আঃ) এবং তিনি ছাড়া আরও যত নবী আছেন সকলেই আমার পতাকাতলে থাকিবেন।"

পূর্বাপর সকল মানুষ, জিন ও ফেরেশতাগণের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

উল্লিখিত আয়াতের মর্ম এবং আলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্ব ভুবন সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষেরই নবী। কারণ, উক্ত তথ্য অনুযায়ী আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী প্রত্যেক নবীই স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দরবারে অথবা ওহীর মাধ্যমে নিজ নিজ অঙ্গীকার ঘোষণা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিজ নিজ উম্মত হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাহারা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ পাইলে তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে এবং তাঁহার সমর্থন করিবে। আমরা হযরত (সঃ)-এর যুগপ্রাপ্ত লোকগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ আনুগত্য প্রকাশে ঈমান গ্রহণ করিয়া তাঁহার উম্মত হইয়াছি, আর তিনি আমাদের নবী হইয়াছেন; তদ্রূপ পূর্ববর্তী লোকগণও সেই প্রকার ঈমানের অঙ্গীকার গ্রহণ করায় তিনি তাহাদেরও নবী হইয়াছেন, যেরূপ তাহাদের নবীগণেরও তিনি নবী ছিলেন। কারণ, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই সূত্রে হযরতের বাক্য– بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً "আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত তথা আমি সমগ্র মানব জাতির নবী।"

এই বাক্যে সমগ্র মানব জাতি বলিতে শুধু হযরতের যুগের মানুষ উদ্দেশ করার কোনই প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃ এই সীমাবদ্ধতা উল্লিখিত বাক্যের শব্দাবলীর অর্থের ব্যাপকতার বিপরীত। পূর্বালোচিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রকৃতই পূর্বাপর সমগ্র মানব জাতির নবী।

শুধু তাহাই নহে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সমগ্র জিন জাতিরও নবী, পবিত্র কোরআনে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এই বিষয়টি বর্ণিত রহিয়াছে। (মেশকাত, পৃষ্ঠা-৫১৫) এতদ্ভিন্ন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ফেরেশতাদেরও নবী।

এই তথ্য মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছের বাক্য وارسلت الى الخلق كافة "আমি সমগ্র সৃষ্টির নবী"। সৃষ্টি শব্দের ব্যাপকতা উক্ত সত্যের ইঙ্গিত দানে যথার্থই বটে।

নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

এই পর্যন্ত যে সকল তথ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, সমস্ত সৃষ্টির সেরা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ); এমনকি সকল নবীগণেরও সেরা ও প্রধান ছিলেন তিনি। হযরত (সঃ) নিজ উম্মতকে তাহাদের নবীর মর্তবা-মর্যাদা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশে স্বীয় পরিচয় দানে এই শ্রেণীর অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা-

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ وَاَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ ـ

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার; ইহার সুস্পষ্ট বিকাশ হইবে কেয়ামতের দিন। আমি সর্বপ্রথম কবর হইতে পুনরুজ্জীবিত হইব, আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হইব এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে।" (মুসলিম শরীফ)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ـ

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দ্বারে আসিয়া তাহা খুলিতে বলিব। তখন প্রহরী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আমি বলিব, মুহাম্মদ। প্রহরী বলিবে, আপনার সম্পর্কে আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্বে কাহারও জন্য আমি যেন বেহেশতের দরজা না খুলি।" (মুসলিম)

হাদীছ ঃ জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ ـ

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সমস্ত রসূলগণের সর্দার; আমি গর্ব করি না। আমি সমস্ত নবীগণের সর্বশেষ নবী; আমি গর্ব করি না। আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী;

আমারই সুপারিশ সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে; আমি গর্ব করি না।" (মেশকাত শরীফ- ৬১৩)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّيْ -

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল মানুষের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম পুরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব, আমিই সকল মানুষের প্রধান ও পরিচালক হইব- যখন সকলে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লাহর মহান দরবারে যখন সকলেই নির্বাক থকিবে তখনও আমি সকলের পক্ষ হইতে কথা বলিব। সকলে যখন হাশরের ময়দানে অস্বস্তিকর অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে তখন তাহাদের পক্ষে আমারই সুপারিশ গৃহীত হইবে। সকলে যখন নিরাশ অবস্থায় থাকিবে তখন আমিই সকলকে আশার বাণী শুনাইব। ঐ দিন সকল সম্মান আমারই হইবে, বরং সব কিছুর চাবি আমারই হাতে হইবে। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত হইব।"

(মেশকাত শরীফ, ৫১৪)

হাদীছ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ -

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই সত্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে যে, আমি সকল নবীগণের ইমাম বা প্রধান এবং তাঁহাদের মুখপাত্র, তাঁহাদের পক্ষ হইতে সুপারিশকারী; ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই।" (তিরমিযী শরীফ)

মে'রাজ শরীফের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে যখন বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের সমাবেশ হইয়াছিল এবং নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐ বিশিষ্ট নবীগণের নামাযের ইমাম হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ছিল এবং কেয়ামতের দিন অসংখ্য ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ঘটিবে।

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ لَايَنَالُهَا اِلاَّ رَجُلٌ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ -

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'ওয়াসিলা' লাভের দোয়া করিও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, 'ওয়াসিলা' কি জিনিস? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, বেশেতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত মহল; যাহা শুধু এক ব্যক্তির জন্যই তৈয়ার হইয়াছে; আশা করি একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি।"

(তিরমিযী শরীফ)

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে হযরতের বয়ান

আমাদের আসমানী কিতাব কোরআন শরীফেও পূর্ববর্তী অনেক নবীর উল্লেখ এবং বয়ান রহিয়াছে। কিন্তু সেই বয়ান হইল সাধারণ ও স্বাভাবিক; অর্থাৎ অতীতকালের ইতিহাস স্বরূপ দৃষ্টান্তমূলকভাবে, বিভিন্ন নবীর আগমন হইয়াছে তাহার প্রমাণ ও সংবাদদানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা ভিন্নরূপ।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধরাধামে আবির্ভাবের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার ভবিষ্যত আবির্ভাব আগমনের সংবাদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রদান করা হইতেছিল। নিখিল বিশ্বকে বিশ্বপতির তরফ হইতে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি তখন হইতে আকৃষ্ট করা হইতেছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া যেন কৌতূহল, অপেক্ষা ও আবেগ জাগিয়া থাকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি; যেন নিখিলের ধ্যানের ছবি হইয়া থাকেন তিনি। তাই তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল কেতাবে তাঁহার গুণগান ও শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইতেছিল। এইসব কিতাবে তাঁহার বর্ণনা এতই বিস্তারিত ও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল যে, এই সব কিতাবধারীরা তাহাদের ধ্যানের ছবিকে ঠাহর করিতে মোটেই কোন বেগ পায় নাই। পবিত্র কোরআন দুই জায়গায় বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহাদিগকে আমি আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবীরূপে স্পষ্টভাবে চিনিয়া থাকে– যেমন পিতা তাহার সন্তানকে চিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আলেম শ্রেণী সত্যকে গোপন করিয়া রাখে জানিয়া বুঝিয়া।" (পারা–২, রুকু–১)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহাদিগকে আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবীরূপে সুস্পষ্টভাবে চিনে; যেরূপে নিজ সন্তানকে চিনিয়া থাকে। যাহারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে তাহারাই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।" (পারা–৭, রুকু– ৮)

ইহুদীদের বিশিষ্ট আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং নাসারাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)– এই শ্রেণীর কতিপয় কিতাবধারী লোক হযরত (সঃ) সম্পর্কে তাঁহাদের কিতাবে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করিয়াই হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহুদী মতের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম কা'বুল আহ্‌বার– তিনি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তওরাত কিতাবের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না বিধায় হযরতের সময়ে ইসলাম হইতে দূরে ছিলেন; পরে তওরাতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেমতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ مَكْتُوبٌ فِى التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ "তিনি বলিয়াছেন, তওরাত কিতাবে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গুণাগুণ এবং বিবরণ লিখিত ছিল।" (মেশকাত শরীফ-৫১৫)

কা'বুল আহ্বার (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

يَحْكِى عَنِ التَّوْرٰةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَبْدِى الْمُخْتَارُ لَافَظٌّ وَلَا غَلِيْظٌ .... مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ هِجْرَتُهٗ بِطَيْبَةَ -

অর্থ ঃ "কা'বুল আহবার (রঃ) তওরাত কিতাব হইতে বর্ণনা দানপূর্বক বলিয়াছেন, আমরা সেই কিতাবে লিখিত পাইয়াছি– মুহাম্মদ, যিনি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা (তিনি কোমল স্বভাবের হইবেন)– পাষাণ হইবেন না কঠোর হইবেন না (অতিশয় শালীন ও ভদ্র হইবেন), হাট-বাজারেও চীৎকার করিয়া কথা বলিবেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করিবেন না, ক্ষমা করায় অভ্যস্ত হইবেন। তাঁহার জন্ম হইবে মক্কায়, দেশ-ত্যাগ করতঃ "তায়বা" তথা মদীনায় বসবাসকারী হইবেন। (মেশকাত– ৫১৪)

পরবর্তীকালে ইহুদী-নাসারাগণ তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবের বহু সত্য গোপন করিয়া ফেলিয়াছে এবং নানাভাবে বিকৃত করিয়া মৌলিকত্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এমনকি প্রকৃত তওরাত-ইঞ্জীল কিতাব বিশ্বে কোথাও নাই: আসল কিতাব এইরূপে উধাও করিয়া তাহার বিকৃতরূপের নামমাত্র অনুবাদকে খৃষ্টানরা "বাইবেল" নামে খাড়া করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহা যে তওরাত ইঞ্জীলের অনুবাদ তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহা যাচাইয়েরও কোন উপায় নাই। আসল কিতাব একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বাইবেলেরও পুরাতন প্রকাশ ও নতুন প্রকাশের মধ্যে গরমিলের ইয়ত্তা নাই।

প্রতীক্ষিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রদর্শনীর জন্যই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে বিশ্ব প্রকৃতিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ করিয়া রাখার জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার শুভাগমন অবিদিত না থাকে, সারা বিশ্ব তাকাইয়া থাকে তাঁহার আবির্ভাব পানে; ফলে পুলকিত হইয়া উঠিবে সারা বিশ্ব তাঁহাকে পাইয়া আপন বুকে, প্রাণ ভরিয়া উঠিবে মহাতৃপ্তিতে নিখিল সৃষ্টির এবং আনন্দ ধ্বনিতে খোশ আমদেদ জানাইবে কুল্ মখলুকাত তাঁহার শুভাগমনকে।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন–

اَنَا دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى -

অর্থ ঃ "আমি আমার বংশ-পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যত সুসংবাদের বিকাশ।"

উভয় বিষয়ই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরতর ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া নিম্নরূপ–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (রাঃ) উভয়েই পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ সমাপ্ত করার শুভলগ্নে সুদীর্ঘ দোয়া করিয়াছিলেন। উক্ত দোয়ায় উল্লেখ ছিল– "হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার ফর্মাবরদার অনুগত দাস বানাইয়া রাখিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত দাসের অন্ততঃ একটি দল সর্বদা কায়েম রাখিও। প্রভু হে! আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই তাহাদের হেদায়াত উদ্দেশে একজন রসূল পাঠাইও, যিনি তাহাদেরকে তোমার কিতাব পড়িয়া শুনাইবেন, কিতাবের শিক্ষাদান ও পরিপক্ব জ্ঞান তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদিগকে সর্ববিষয়ে পবিত্র ও পরিমার্জিত করিবেন।" (পারা–১, রুকু–১৫)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্মিলিতভাবে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে এই দোয়া করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাদীছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দোয়ার শেষ অংশটিই উদ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত দোয়ায় যে রসূল আগমনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করা হইয়াছিল সেই রসূলই আমি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বিশ্ব মুরব্বী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন; যেন তাঁহার প্রতি নিখিলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এস্থলে একটি প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, উক্ত দোয়াকারী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পর হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবীর আগমন হইয়াছে, এমতাবস্থায় অন্য কোন নবী উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন না, অথচ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল পরে আবির্ভূত একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) ঐ দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন– ইহার সূত্র কি? উত্তর এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র (১) ইসহাক (আঃ) (২) ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইতে তাঁহার পরবর্তী নবীগণের আগমন হইয়াছে। ইসহাক (আঃ) হইতে বংশ পরম্পরায় বহু সংখ্যক নবীর আগমন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বনী-ইসরাঈলের নবী ছিলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশ হইতে দীর্ঘ তিন সহস্রাধিক বৎসর পরে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন হইয়াছিল। উল্লিখিত দোয়ার মধ্যে আমাদের বংশধর হইতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বলিতে উদ্দেশ করা হইয়াছে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ)। কেননা তাঁহারা উভয়েই কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণে শরীক ছিলেন। পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ -

পবিত্র কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল, তাঁহারা উভয়েই সমবেতভাবে ঐ দোয়া করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ দোয়ায় উল্লিখিত রসূলের উদ্দেশ্য একমাত্র সেই রসূলই হইতে পারেন যিনি হযরত ইব্রাহীমের বংশ হইতে হযরত ইসমাঈলের সূত্রে। এইরূপ রসূল একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহীমের বংশের অন্য সব নবী ছিলেন হযরত ইসহাকের সূত্রে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বিষয়– আমি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যত সুসংবাদের বিকাশ– এই সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে–

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ -

অর্থ ঃ "একটি স্মরণীয় কথা– মারইয়াম পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূলরূপে আসিয়াছি– আমার পূর্ববর্তী কিতাব তওরাতের সমর্থনকারী হইয়া এবং এই সুসংবাদ

লইয়া যে, আমার পরে এক মহান রসূল আসিবেন যাঁহার নাম হইবে 'আহমদ'। (পারা-২৮, রুকু-৯)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে – স্বয়ং নবী (সঃ) নিজের নাম 'মুহাম্মদ' এবং দ্বিতীয় নাম 'আহমদ' বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক এই সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল।

নিখিল সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

পূর্বালোচিত যাবতীয় তথ্যসমূহ এই সত্য সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কুল মাখলুকাত তথা সমগ্র সৃষ্টির সেরা ছিলেন। সৃষ্টিজগতের সেরা সৃষ্টি হইল মানব জাতি; তাহাদের মধ্যে সেরা মানুষ হইলেন নবী-রসূলগণ। নবী রসূলগণের সকলের সেরা ও প্রধান হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। এই বিষয়ে অনেক হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি সুদীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলার নিকট পূর্বাপর সকল সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আমি; ইহা বাস্তব সত্য-গর্ব নহে।" (তিরমিযী শরীফ)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, বনী ইসরাঈলগকে জানাইয়া দিবেন, যেকোন ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, সে আহমদকে স্বীকার করিয়াছিল না, তাহাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করিব সে যে-ই হউক না কেন। মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, আহমদ কে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে মূসা ! আমার মহত্ত্বের বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি– আমার এমন কোন সৃষ্টি নাই যে আমার নিকট তাঁহার অপেক্ষা মহান ও সম্মানিত হইতে পারে। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টিরও (যাহার পরিমাণ বর্তমান হিসাব অনুসারে) বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আমার নামের সহিত মিশ্রিতরূপে তাঁহার নাম আরশের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছি। আবার আমার মহত্ত্বের বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্য সকলের জন্য বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। (নশ্‌রুত তীব-১৯২)

পূর্বে এক শিরোনামে পারা-৩, রুকু-১৬-এর আয়াত বর্ণিত হইয়াছে, পূর্বকালের প্রত্যেক নবী হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবকাল পাইলে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁহার সাহায্য করিবে এবং তাঁহার অনুগত-অনুসারী হওয়ার জন্য নিজ নিজ উম্মতকে আদেশ করিবে। উক্ত পারা-৩, রুকু-১৬-এর আয়াতে বর্ণিত নবীগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল– যেরূপ সূরা আ'রাফ ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত মানব জাতি হইতে গৃহীত অঙ্গীকারের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে অথবা ওহীর মাধ্যমে সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে উল্লিখিত সতর্কবাণীর আলোচনা হইয়াছে।

মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৃষ্টি নহেন; মহান সৃষ্টি– অতি মহান। স্রষ্টার ছিলেন তিনি মাহবুব– প্রিয়পাত্র, একান্ত ভালবাসার বস্তু। পূর্বালোচিত

তথ্যাবলীতে এবং অনেক হাদীছে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।

হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; একদা কিছু সংখ্যক ছাহাবী (হযরতের মসজিদে দ্বীনের কথাবার্তায়) বসিয়া ছিলেন। হযরত (সঃ) গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। ঐ সময় তাঁহারা বিভিন্ন নবীর আলোচনা করিতেছিলেন– একজন বলিলেন, আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাকে স্বীয় দোস্ত বানাইয়াছেন। অপরজন বলিলেন, মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলিয়াছেন। আর একজন বলিলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার শুধু আদেশ বাক্যে সৃষ্ট এবং তাঁহার সরাসরি প্রেরিত আত্মা। অন্য একজন বলিলেন, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা স্বীয় মনোনীত আখ্যায়িত করিয়াছেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদের প্রত্যেকের উক্তি সমর্থনপূর্বক নিজের সম্পর্কে বলিলেন, "সকলে শুনিয়া রাখ– আমি হাবীবুল্লাহ– আল্লাহ আমাকে আপন দোস্ত, প্রিয়পাত্র ও ভালবাসার পাত্র বানাইয়াছেন।" (মেশকাত শরীফ)

আমরা এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিব; সেইটি হইল, আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত ও মর্তবা। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, তিনি আল্লাহ তাআলার কিরূপ ভালবাসার পাত্র যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি দরূদের এত অধিক মূল্য দিয়া থাকেন।

হযরতের প্রতি দরূদের ফযীলত

পবিত্র কোরআনের আয়াত–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা সম্প্রদায় প্রিয়নবীকে দরূদের সওগাত প্রদান করিয়া থাকেন; হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর।" (পারা– ২২, রুকু– ৪)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করিবেন, তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিবেন এবং দশটি মর্তবা বাড়াইবেন। (নাসায়ী শরীফ)

হাদীছ ঃ আবু তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রীল (আঃ) বিশেষভাবে এই কথাটি বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আমি তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করিব। যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার সালাম (শান্তি) পাঠাইব। (নাসায়ী শরীফ)

একবার দরূদ পাঠে দশটি রহমত লাভ হওয়া ন্যূনতম প্রতিদান; ইহা অপেক্ষা বেশী রহমত লাভের সুসংবাদও রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে সত্তরটি রহমত দান করিবেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার জন্য সত্তরবার মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। (মেশকাত শরীফ; পৃঃ–৭৮৭

হাদীছ ঃ উবাই (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দোয়া-কালাম পড়ার নির্ধারিত সময়ের কি পরিমাণ অংশে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তুমিই নিজ ইচ্ছায় নির্ধারিত কর। আমি আরজ করিলাম, চতুর্থাংশ? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও

বেশী করিলে তোমারই অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, অর্ধেক? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দুই তৃতীয়াংশ? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দোয়া-কালামের সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরূদ পাঠেই কাটাইব? হযরত (সঃ) বলিলেন, তাহা করিলে (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তোমার সকল রকম চিন্তা-ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করা হইবে এবং গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা আল্লাহ তাআলা এই কাজে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদা বিশ্বব্যাপী ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম পাঠ করিলে তাঁহারা ঐ সালাম আমার নিকট তৎক্ষণাত পৌঁছাইয়া থাকেন। (নাসায়ী)

হাদীছ ঃ ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুলহওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে না, যে যাবত দোয়ার সহিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া না হয় (তিরমিযী শরীফ)

এতদ্ভিন্ন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার এরূপ আরও অসংখ্য ব্যবহার প্রমাণিত আছে– যাহা তাঁহার মাহবুবে খোদা হওয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

হাদীছ ঃ মালাকুল মউত তথা জান কবজের ফেরেশতা যখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন প্রথমে তিনি হযরত (সঃ)-কে বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার জান কবজ করিতে পারি; নতুবা কবজ করিব না। ঐ সময় তথায় জিব্রাঈল (আঃ)ও উপস্থিত ছিলেন, হযরত (সঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ তাআলা আপনার সাক্ষাতের আগ্রহী। (জড় দেহের বেষ্টনী মুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বরযখী জগতে চলিয়া গেলে আল্লাহর সহিত উহার সম্পর্ক অধিক নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় হয়– উহাকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত বলা হইয়াছে।) জিব্রাঈলের কথা শুনিয়া হযরত (সঃ) মালাকুল মউতকে রূহ কবজের অনুমতি দিলেন। (নশরুত তীব ১৭৪)

হাদীছ ঃ আদম (আঃ)-এর বেহেশতে অবস্থানকালে বিবি হাওয়া (আঃ) যখন তাঁহার পরিণীতা সাব্যস্ত হইলেন এবং উভয়ের শুভ মিলনলগ্ন উপস্থিত হইল, তখন বিবি হাওয়া মহর তলব করিলেন। আদম (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে নিবেদন করিলেন, কিসের দ্বারা আমি মহর আদায় করিব? হুকুম আসিল, আমার ভালবাসার পাত্র– হাবীব মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিশবার দরূদ পাঠ করুন। (নশরুত তীব ১০)

ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী
ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে রাজকীয় সম্মান মর্যাদা প্রদান

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার পরম প্রিয় সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে মান-মর্যাদা ও রাজকীয় সম্মান দান করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা ছিল অপরিসীম, ভাষায় প্রকাশে সাধ্যের উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার পাক কালামে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে যেসব ফরমান জারি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সেই অপরিসীম মান-মর্যাদার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে মোমেনগণ! নবীজীর সম্মুখে তাঁহার আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিও না এবং তোমরা পরস্পর যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথা বল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত ঐরূপে কথা বলিও না; নতুবা আশঙ্কা আছে– সারা জীবনের কৃত নেক আমলসমূহ বেমালুম বরবাদ হইয়া যাইবে।"

(পারা—২৬, রুকু—১৩)

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল দৃষ্টে বিষয়টির আরও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। একদা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মজলিসে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) উভয়ের কোন বিতর্কে তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইয়া গিয়াছিল। তাহা কেন্দ্র করিয়াই এই মহাসতর্কবাণীর আয়াত নাযিল হইয়াছিল। ছাহাবীগণ বলিলেন, كاد الخيران ان يهلكا "আমাদের দুই প্রধান ধ্বংসের মুখ হইতে অল্পে বাঁচিয়া গিয়াছেন।"

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থ ঃ "নবীজীকে কোন প্রয়োজনে ডাকিতে হইলে তাঁহাকে ঐরূপে ডাকিবে না যেরূপ তোমরা পরস্পর একে অন্যকে ডাকিয়া থাক।" (পারা–১৮, রুকু–১৫)

অর্থাৎ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ডাকিতে হইলে তাঁহার মান-মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মানের সম্বোধনে ডাকিবে। প্রথমোক্ত আয়াতের সংলগ্নেই আছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِن وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

অর্থঃ "যাহারা আপনাকে আপনার কক্ষের বাহির হইতে ডাকে, নিঃসন্দেহে ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই নির্বোধ-আহমক। তাহারা যদি (আপনাকে না ডাকিয়া) কক্ষদ্বারে আপনার বহিরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিত তবে তাহাদের মঙ্গল হইত।"

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

"নিশ্চয় যাহারা রসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠস্বর অনুচ্চ রাখে তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ তাআলা খোদা ভীতির যোগ্য পাত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন; তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (ঐ)

হযরতের আবির্ভাব

নিখিল সৃষ্টির সর্বাগ্রে যে আল্লাহ তাআলা "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া"কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন– যাহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে; সেই হাকীকতে মুহাম্মদিয়া ছিল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র আত্মা বা তাহার জ্যোতির্বাহনসহ। এবং তাহা আলমে আরওয়াহ বা আল্লাহর কুদরতী ঊর্ধ্বজগতে চলমান ছিল আদম সৃষ্টির পূর্ব হইতে। সেই ঊর্ধ্বজগত হইতে এই জড়জগত ও বস্তুজগতে অবতীর্ণ হইবেন সেই "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া" এবং তাহা জড় দেহের পোশাকে লৌকিক জগতে বিকশিত হইবেন– ইহাই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের অর্থ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখাইবার জন্য এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি; সেই মহানেরই প্রদর্শনী রূপে এই বিশ্বজগতের ওজুদ বা অস্তিত্ব। অতএব সেই মহানের মর্যাদানুপাতিক যোগ্য প্রদর্শনীরূপে এই বসুন্ধরার সুগঠনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সমাপ্ত হইবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাঁহারই নীতি রহিয়াছে প্রত্যেক জিনিসকে ধাপে ধাপে উন্নত মানে উন্নীত করা; এই ক্ষেত্রেও সেই নীতি

চলিয়াছে। বিশ ভুবনকে বিধাতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য যোগ্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র (Exhibition ground) রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে। সেই গঠন কার্য সম্পাদনের জন্যই ছিল বিশ্ব বুকে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের আগমন। বিশ্ব ভুবনে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ আগমনের ইহাই ছিল রহস্য। কোন মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান বস্তুর প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে; প্রথমে উক্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রকে সেই মহামূল্যবান বস্ত প্রদর্শনীর যোগ্য করার প্রচেষ্টায় শত শত শিল্পীর আগমন হয়; বিভিন্ন শিল্পী প্রদর্শনী ক্ষেত্রকে গড়িয়া তোলেন মূল দর্শনীয় বস্তুর মর্যাদা অনুপাতে। সেই গড়ার কার্য সমাপ্ত হইলে উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিতি হয় সেই প্রদর্শনীয় মহানের এবং প্রদর্শন শেষ হইয়া গেলে উক্ত প্রদর্শনীর বিলুপ্তির পালা আসে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন–

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ـ

অর্থ ঃ "বিশ ভুবনে আমার আগমন পর্ব শেষ হওয়ার পর কেয়ামত তথা এই বসুন্ধরার প্রলয় এতই নিকটবর্তী, যেরূপ নিকটবর্তী মধ্যাঙ্গুলি এবং তাহার সংলগ্ন আঙ্গুল।"

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব তথা বিশ্ব বুকে তাঁহার পদার্পণের জন্য মহান বিধাতা বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম কাল বা যুগের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম স্থান বা দেশের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম বংশ ও ঘরের।

সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব

যেকোন মহামানুষের মহত্ত্বের বিকাশ ও তাঁহার মান-মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ হয় তাঁহার উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ গুণাবলীর প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁহার মিশনের কৃতিত্ব দ্বারা, তাঁহার সংস্কারের সাফল্যের দ্বারা। আর যে যত বড় মহান ও উত্তম সংস্কারকই হউন না কেন, তাঁহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে তাঁহার সহকারী ও সহচর উত্তম হওয়ার উপর। সহকারী-সহচর উত্তম ও সুযোগ্য না হইলে কোন মহানের মহত্ত্বের বিকাশ এবং কোন সংস্কারকের মিশনের সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। অতএব আল্লাহ তাআলা বিশ্ব ভুবনে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং তাঁহার মিশনের সাফল্য সংস্কারের কৃতকার্যতার দ্বারা তাঁহার পূর্ণ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার জন্য যোগ্যতম সহকারী ও সহচরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানব জাতি মানবীয় গুণাবলীতে বিশেষতঃ উত্তম সহচর এবং যোগ্য সহকর্মী হওয়ার উপাদানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যেই যুগে– ঠিক সেই যুগেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার বিকাশ ক্ষেত্র মানব সমাজে। ফলে সহজ সুলভ হইয়াছিল তাঁহার জন্য সুযোগ্য সহকারী ও সহচরবৃন্দ; শুধু কেবল তাঁহার সহকারী সহচরগণই সুযোগ্য ছিলেন না, বরং পরম্পরা দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে তাঁহার মিশনের সুযোগ্য কর্মীদের বহর। তাঁহার সঙ্গে থাকাকালে তাঁহার ভক্ত-অনুরক্ত সহকারী সহচরগণ তাঁহার জন্য এবং তাঁহার মিশনের জন্য যেভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও জান-মাল কোরবান করিয়াছেন, পূর্ববর্তী কোন যুগের কোন নবীর সহকারী সহচরগণের ইতিহাসে তাহার কোন নমুনা-নজির মোটেও দেখা যায় না। এই সত্যের দৃষ্টান্ত বদর জেহাদের ইতিহাসে দেখা যায় এবং হোদায়বিয়ার ঘটনা"র বিবরণে শত্রু পক্ষের সাক্ষ্যেও পাওয়া যায় (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। আর বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি রণাঙ্গনে তাঁহারা কার্যতঃ যে চরম উৎসর্গ ব্যাপক আকারে দেখাইয়াছিলেন, তাহার নমুনাও ইতিহাসে নাই।

তাঁহার পরে তাঁহার সহচর খলীফাগণ তাঁহার মিশনকে জীবন্তই নহে শুধু, বরং যেভাবে উন্নতির পথে আগাইয়া নিয়াছেন, তাহার নমুনাও পূর্ব যুগের কোন নবীর খলীফাদের ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজনীতির পথে ইসলামের শাসন বিস্তারের দ্বারাই নহে শুধু, বরং নবীজীর মিশন তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য নবীজীর সহচর ছাহাবীগণ যেসব গঠনমূলক কার্যাবলী সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ভিত্তি স্থাপন

পূর্বক সম্মুখের জন্য সেলসেলা জারি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এক অতুলনীয় সোনালী ইতিহাস। যেমন–

(১) নবীর প্রধান অবলম্বন ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাবের সংরক্ষণ। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে এইরূপ রক্ষণের গুণ ছিল না যে, তাহারা নিজেদের আসমানী কিতাবকে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি এই মানের ছিল না যে, তাহারা তাহাদের আসমানী কিতাবকে কণ্ঠস্থ করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাদের কিতাব শুধু কেবল পত্র-পৃষ্ঠে ছিল; ফলে তাহা শত্রু, স্বার্থান্বেষী ও ধর্মীয় মোনাফেকদের দ্বারা বৎসরে বৎসরে সংস্করণে সংস্করণে অতি সহজেই পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মূল কিতাব মূল ভাষায় বিশ্ব বুকে কোথাও বিদ্যমান নাই; আছে শুধু বিভিন্ন ভাষায় মনগড়া অনুবাদ। মূল কিতাব বিলুপ্ত হওয়ার পর অনুবাদের নির্ভরতা কি থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। আর কোন ধর্মের মূল ভিত্তি আসমানী কিতাব বিলুপ্ত হইয়া গেলে সেই ধর্মের টিকিয়া থাকার অবস্থা কি হইবে তাহাও সহজে অনুমেয়।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ তথা তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে (কেয়ামত পর্যন্ত) লোকগণ স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার গুণে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছিল। ফলে পবিত্র কোরআনের ন্যায় সর্বাধিক দীর্ঘ আসমানী কিতাব এই উম্মত অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ কোনকালে ছিল বলিয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যায় পরম্পরা প্রত্যেক যুগে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেড় হাজার বৎসর পর বর্তমান যুগেও আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে; যার ফলে পবিত্র কোরআনের মুদ্রিত গ্রন্থ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। বিশ্ব বুকে কোরআন শরীফের সমুদয় ছাপা কপি বিলুপ্ত করিয়া দিলেও পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও বিলুপ্ত বা বিকৃত হইতে পারিবে না; কোটি কোটি হৃদয়পট হইতে পবিত্র কোরআন মূল আকারে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এত উচ্চ মানে পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার যুগের মানুষের জন্য এত বড় সংরক্ষণ কার্য সম্ভব হইয়াছে। পূর্ববর্তী কোন যুগের নবীর উম্মতদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই; নতুবা তাহার খোঁজ ইতিহাসে থাকিত। বরং যুগ পরম্পরা এখনও তওরাত-ইঞ্জীল কিতাবের হাফেজ পাওয়া সম্ভব হইত। কারণ এই যুগেও উক্ত কিতাবদ্বয়ের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুসারী হওয়ার দাবীদার ভক্ত বিদ্যমান আছে এবং কোটি কোটি টাকা তাহারা ধর্ম প্রচারে ব্যয় করিতেছে। অথচ তাহাদের কিতাবের কোন একজন হাফেজ কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ ইহাই যে, পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণ এই মানের ছিলই না যে, তাহারা এই কার্য সমাধা করিতে পারে। অতএব প্রথম হইতে যাহা হয় নাই পরেও তাহার সেলসেলা রহে নাই। এমনকি শেষ পর্যায়ে ত তাহার মূল কিতাবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন আর তাহা কণ্ঠস্থকরণ সম্ভবই থাকে নাই। আর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে তাহা যেরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল; যুগপরম্পরা তাহার সেলসেলা চলিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

(২) তদ্রূপ পবিত্র কোরআনের অগণিত আয়াতের স্বয়ং নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসমূহ তফসীর আকারে ছাহাবীগণ পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অতি বড় একটি গঠনমূলক কাজ ছিল। কারণ, দ্বীন-ইসলামের মূল বস্তু হইল কোরআন শরীফ যাহা মহান আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালামের প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যাখ্যা আল্লাহর প্রতিনিধি রসূলের দ্বারা হইলেই পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মূল ভিত্তি হইবে ঐ ব্যাখ্যা' সুতরাং ঐ ব্যাখ্যাবলীর সংরক্ষণ দ্বীন-ইসলামের জন্য এক অপরিহার্য বস্তু ছিল। ছাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ঐ ব্যাখ্যা সংরক্ষণের প্রতি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারণ, স্বয়ং ব্যাখ্যাকার রসূল তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান ছিলেন। পরবর্তী যুগ পরম্পরা তথা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের সম্মুখে রসূল (সঃ) থাকিবেন না, কিন্তু ইসলাম এবং কোরআন

থাকিবে; কাজেই লোকদের জন্য উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। সেই যুগ-যুগান্তরের জন্য ছাহাবীগণ পবিত্র কোরআনের উক্ত ব্যাখ্যাসমূহের সুসংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন– যাহা একমাত্র তাঁহাদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ছিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যাখ্যাসমূহ সযত্নে সুরক্ষিত করিয়া না গেলে চিরতরে ইসলাম-জগত ঐ ব্যাখ্যার ন্যায় অপরিহার্য বস্তু হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া যাইত। যেমন যবুর, তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহের কোন ব্যাখ্যাই উক্ত কিতাবসমূহের বাহক নবী হইতে আজ ভূ পৃষ্ঠে বিদ্যমান নাই। অথচ তওরাতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদী জাতি এবং ইঞ্জীলের অনুসারী হইবার দাবীদার খৃষ্টান জাতি দুনিয়াতে কত জাঁকজমকের সহিত বিরাজমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত নবীগণের সহকারী ও সহচরদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করার দূরদর্শিতা ছিল না, তাহাদের মধ্যে সেই গুণেরও অভাব ছিল ফলে তাহাদের দ্বারা উক্ত সংরক্ষণ কাজ হয় নাই; পরিণামে সেই নবীগণের পরবর্তী উম্মতগণ তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং বিশ্ব বুক হইতে তাহার চিহ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহকারী সহচরগণের মধ্যে ঐরূপ গঠনমূলক এবং সংরক্ষণ কার্যের বিশেষ গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা নবীজী হইতে প্রাপ্ত আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যার ফলে আজ সেই সব ব্যাখ্যা বিদ্যমান। হাদীছ ভাণ্ডারের অধিকাংশ কিতাবে 'তফসীর অধ্যায়' নামে ঐ তফসীরসমূহ বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন ঐ শ্রেণীর তফসীরের ভিত্তিতে রচিত বিশেষ বিশেষ বড় বড় বহু তফসীর গ্রন্থও বিদ্যমান আছে। যথা– তফসীর ইবনে আব্বাস, তফসীর ইবনে জরীর, তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীর দোররে মনসুর ইত্যাদি।

(৩) পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের তুলনায় হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের লোকদের গঠনমূলক কাজের গুণ ও যোগ্যতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বীয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ইত্যাদি সমুদয় বিষয় সংরক্ষণ করা। এই জিনিসটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীনের উপর চলিতে হইলে সেই পথের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দিশারী হইবে ঐসব জিনিস। তাহা বাতিরেকে নবীর দ্বীন তাঁহার পরে সুষ্ঠুরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে উক্ত গঠনমূলক অপরিহার্য কার্যের গুণ ও যোগ্যতা ছিল না বিধায় পূর্ববর্তী কোন নবীর হাদীছ ভাণ্ডার কোথাও বিদ্যমান নাই। 'হাদীছ' বলা হয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ও তাঁহার মৌন সমর্থন ইত্যাদিকে। পূর্ববর্তী কোন নবীরই এই সমস্ত জিনিস সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নাই। যদি হইয়া থাকিত তবে পূর্ববর্তী যে সমস্ত নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার আজও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রহিয়াছে। অন্ততঃ তাহারা তাহাদের নবীর হাদীছকে প্রমাণরূপে পেশ করিতে সক্ষম হইত– যেরূপ দেড় হাজার বৎসর পরেও সক্ষম আছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতগণ এবং ইন্‌শা আল্লাহু তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত সক্ষম থাকিবে।

এই গুণ ও যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে লোকদের এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা নিজ নবীর আদর্শ, নীতি, কাজ, কথা, সমর্থন এবং প্রতিটি গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুসংরক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা আজ দেড় হাজার বৎসর পরেও হাজার হাজার হাদীছরূপে সাক্ষ্যসূত্র তথা সনদের সহিত শত শত কিতাব আকারে সারা বিশ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাকে হাদীছ-শাস্ত্র বা হাদীছ ভাণ্ডার বলা হয়। এই সুসংরক্ষিত হাদীছ ভাণ্ডার যাহা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতগণ সংরক্ষ করিতে সক্ষম হইয়াছে– পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত ঐরূপ করিতে পারে নাই; তৎকালীন মানুষের মধ্যে এই প্রতিভা ছিলই না; মানবীয় গুণাবলীর উন্নতির ধাপে ধাপে মানুষ এই শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াছে।

(৪) দুনিয়া পরিবর্তনশীল, নিত্যনূতন হইবার ঘটনাবলী ও প্রয়োজনাদি। ইসলামের নিয়ন্ত্রণ মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ও প্রতি কার্যের উপর। পবিত্র কোরআন শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারের বস্তু;

হাদীছ তদপেক্ষা বিস্তারিত বটে, কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের ঘটনা প্রবাহের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের ফয়সালা হাদীছ সরাসরি পাওয়ার সম্ভাবনাও অস্বাভাবিক। হাঁ, উক্ত প্রয়োজন মিটাইবার এবং তাহার সমাধানের একটি পথ আছে যে, নিত্যনৈমিত্তি খুচরা ঘটনাবলী সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কোরআন ও হাদীছের আলোকে সাব্যস্ত করা; ইহাকে 'ইজ্‌তেহাদ' বলা হয়। এই ইজ্‌তীহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতেই দেখা গিয়াছে, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতে ঐরূপ প্রতিভা ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতে এমন এমন দূরদর্শী প্রতিভাধারী ইমাম– অসাধারণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা শুধু নিজ নিজ সম্মুখস্থই নহে, বরং ভবিষ্যতের যত রকম ঘটনার জন্ম হইতে পারে, এইরূপ লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য খুচরা ঘটনাবলী গবেষণার মাধ্যমে অগ্রিম আবিষ্কার করিয়া ঐসব সম্পর্কীয় আদেশ-নিষেধ কোরআন হাদীছের আলোকে সাব্যস্ত করতঃ বিরাট গ্রন্থমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার সংখ্যা কয়েক হাজারেরও অধিক হইবে; ইহাকেই ফেকাহ শাস্ত্র বলা হয়। এইরূপ অগ্রিম আবিষ্কারের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কারণ, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ– বিভিন্ন গুণাবলীর যুগ বটে, কিন্তু ইহজগত লয়শীল; মহাপ্রলয়ের দ্বারা তাহার সমাপ্তি ঘটিবে। মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে সৎ গুণাবলী ক্ষীণ হইয়া আসিবে; সেমতে ইজ্‌তিহাদের ক্ষমতাও লোপ পাইবে। ইজতীহাদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকালে দ্বীনের প্রয়োজন মিটিতে পারে সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ ইজ্‌তেহাদ শক্তি দান করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্রিম আবিষ্কাররূপে ইজ্‌তিহাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মাসআলা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা দেখা যায় নাই যাহার ফতওয়া তাঁহাদের কিতাবের আলোকে পাওয়া যায় নাই; আশা করা যায় ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে না।

(৫) নবী না হইয়া নবীর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার প্রতিভা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের লোকের মধ্যে ছিল। হযরতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবময় ভূমিকা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শান্তি শৃঙ্খলার শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের উন্নতি দ্রুততর করার ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন, বরং তাঁহাদের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত খলীফাগণ কৃতিত্বের যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুসলমানদের সোনালী ইতিহাসরূপে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

খোলাফায়ে রাশেদীন হযরতের দায়িত্ব পালনে এবং তাঁহার আদর্শ বহনে যে সাফল্য অর্জন করিবেন, তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (সঃ) দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে আমার উম্মত! তোমরা সুদৃঢ় থাকিবে আমার আদর্শের উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর, যাঁহারা সত্যের প্রতীক হইবেন।"

পূর্বকালের নবীগণের উম্মতের মধ্যে এই প্রতিভা ছিল না, এমনকি স্বয়ং তাঁহাদের সহকারী আছহাবদের মধ্যেও ছিল না; তাই সে যুগে এক নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীন বাকী রাখার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে অনতিবিলম্বে অপর নবী প্রেরণের। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে খলীফাগণ ইসলামের সর্বাত্মক উন্নতি শুধু অব্যাহত রাখাই নহে, বরং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ও শিক্ষার বদৌলতে ইহাকে অধিক দ্রুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাদীছে এই তথ্যের বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ ـ

অর্থ ঃ "বনী ইস্‌রাঈলকে পরিচালনা করিতেন নবীগণ– যখনই এক নবীর তিরোধান হইত, তাঁহার স্থলে অপর নবী আসিতেন। আমার পরে আর কোন নবীর আগমন হইবে না; আমার পরে খলীফাগণ হইবেন।"
(মেশকাত শরীফ– ৩২০)

এতদ্ভিন্ন মানবীয় সাধারণ গুণাবলী– যেমন সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ব, পরোপকার, দানশীলতা, দয়া, সাহসিকতা, একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা; এমনকি প্রভু ভক্ত ইত্যাদি অসংখ্য গুণাবলী, যদ্দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে– সেইসব গুণাবলীর অধিকারীরূপে হযরতের যুগটি ছিল শীর্ষস্থানীয় যুগ। তাঁহাদের উপর কুফর বা অন্ধকারের আবরণ পড়িয়া থাকায় কোন কোন গুণের সুষ্ঠু বিকাশ হইতেছিল না বা গুণগুলি অপাত্রে অক্ষেত্রে ব্যয়িত হইতেছিল; হযরতের উসিলায় যাঁহাদের হইত সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা এমন বিশ্ব-সেরারূপে বিকশিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তুলনা পূর্ব ইতিহাসেও নাই, পরবর্তী ইতিহাসেও নাই এবং দুনিয়ার শেষ যুগ পর্যন্ত পাওয়াও যাইবে না। হযরতের ছাহাবীগণের ইতিহাস, যাহা অমুসলিমদের নিকটও স্বীকৃত, সেই ইতিহাসই উল্লিখিত দাবীর উজ্জ্বল প্রমাণ।

তাঁহাদের এইরূপ অতুনীয় উচ্চাসনে আসীন হওয়ার পক্ষে হযরতের সাহচর্যের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব গুণাবলীর প্রভাবও কম ছিল না। বীজ এবং বীজ বপনকারী যতই উত্তম হউক না কেন, জমি যদি উত্তম না হয় তবে ফল ভাল হইতে পারে না। ছাহাবীদের ন্যায় সুপাত্র ও সুক্ষেত্র দ্বারা হযরত (সঃ) এমন একটি সোনালী যুগ ও সোনালী জমাত এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, যাহা বিশ্ব-জীবনের সর্বোত্তম যুগ, সর্বোত্তম জমাত ও পরিবেশ ছিল এবং সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত ছিল। তাই স্বয়ং হযরত (সঃ) ছাহাবীদের যুগের প্রসংশায় বলিয়াছেন– خير القرون قرنى "আমার সাহচর্যে গঠিত যুগটি হইল বিশ্ব জীবনের সর্বোত্তম যুগ।" তাঁহারা এতই উত্তম ছিলেন যে, হযরতের সোনালী আদর্শে প্রস্ফুটিত মহিমাকে তাঁহারা তিন যুগ পর্যন্ত চলমান রাখার ব্যবস্থায় সফল হইয়াছিলেন।

সুতরাং পরবর্তীকালে ইসলামের আদর্শ ও জীবনধারা খুঁজিতে হযরতের যুগ তথা ছাহাবীগণের ইতিহাস উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামি হইবে। হযরতের আদর্শের সঠিক খোঁজ পাইতে হইলে ছাহাবীগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিতেই হইবে। কারণ ছাহাবীগণ হযরতের শিক্ষা ও আদর্শ যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার নমুনা কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ। অর্থাৎ এই যুগের মানুষ বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বেকার যুগসমূহের মানুষ অপেক্ষা উন্নত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে কতিপয় গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণাবলী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতের মধ্যে ছিল। কারণ, ইসলামের দীর্ঘায়ু লাভ এবং উন্নতির পথে উক্ত গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই মুসলমানগণ ঐসব গুণে অধিক যত্নবান ও অধিক তৎপর ছিলেন।*

বলাবাহুল্য, হযরতের যুগ সর্বোত্তম হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং সেই যুগের সর্বময় মানবগুষ্ঠি প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। যাহাদের ভাগ্যে ইসলাম জুটে নাই, তাহারা তাহাদের প্রতিভা ও

গুণ-বৈশিষ্ট্য জাগতিক উন্নতির পথে ব্যয় করায় নিয়োজিত হইয়াছে, ফলে ধাপে ধাপে তাহারা জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, পূর্ব যুগে ঐ সবের কল্পনারও অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত বিজ্ঞান

* ইহজগত ধাপে ধাপে প্রলয়ের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকিবে; তাহার জন্য ধাপে ধাপে মুসলমানদের ইসলামী গুণাবলীর শিথিলতা অবধারিত। কারণ, ইসলাম বিলুপ্ত হইলেই জগতের বিলুপ্তি আসিতে পারিবে। তাই উল্লিখিত ইসলামী গুণাবলী উচ্চমান হইতে ধাপে ধাপে শিথিল হইয়া নিম্নমানের দিকে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে মানব জাতির বিশেষ প্রতিভা ও গুণাবলীর জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার বিভাগ– যাহার আলোচনা সম্মুখে আসিতেছে– তাহার মধ্যে শিথিলতা আসে নাই, বরং দিন দিন তাহার উন্নতি বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্বে জগত তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া তারপর লয়ের পালায় আসিবে।

ও আবিষ্কার ঐ প্রতিভা গুণাবলীরই অবদান যাহার বদৌলতে হযরতের যুগ তথা তাঁহার যুগের মানুষকে উত্তম বলা হইয়াছে। এই বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য সকলেরই বিদিত, সকলেই ইহার উপর গর্ব করে।

সারকথা– সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে ধাপে ধাপে উন্নত করিয়াছেন। মানব জাতি যখন উপরোল্লিখিত শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণের পর্যায়ে পৌছিয়াছে– যাহা মানব জাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্তকৃত চরম উন্নতির পর্যায় ছিল, তখন বিধাতা তাঁহার হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিশ্ব ভুবনে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের জন্য সৃষ্টিকর্তা যুগের পর যুগ বিলম্ব করিতেছিলেন এই যুগটির জন্যই– যাহা মানব জাতির প্রতিভা ও গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগটি আসিলে পরই আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। এই তথ্যই নিম্নের হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

১৬৫৮। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِى اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ مِنْهُ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন– মানব সমাজ যে যুগে যুগে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে (মানবীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে) উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই উন্নতির সর্বাধিক উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে; অতপর যখন আমার আবির্ভাবের (উপযুক্ত) যুগ আসিয়াছে তখনই আমার আবির্ভাব হইয়াছে।

হযরতের জন্য দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহজগতে আবির্ভূত হইবেন; সৃষ্টিকর্তা তাঁহার জন্মের জন্য বিশ্ব বুকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কা নগরীকে নির্বাচিত করিলেন।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তাঁহার পবিত্র কালামে মক্কা নগরীকে যেসব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট।

(১) আল্লাহ তাআলা তাহাকে ام القرى উম্মুল কোরা আখ্যা দিয়াছেন। "উম্মুল কোরা অর্থ সমস্ত নগর-নগরীর জননী। বিশ্ব বুকে যত নাগরী আছে সবের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই নগরী তথা ইহার কা'বা শরীফকে যেরূপ আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্ব মানবের জন্য কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ সৃষ্টির বেলায়ও মক্কা নগরী সারা ভূমণ্ডলের কেন্দ্র ছিল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ভূমণ্ডল সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীর খণ্ডকেই সৃষ্টি করেন এবং পরে উহা কেন্দ্র করিয়াই ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হয়। এই সূত্রেও তাহাকে "উম্মুল কোরা" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সকল নগর-নগরীর কেন্দ্রস্থল।

(২) আল্লাহ তাআলা তাহাকে البلد الامين আল-বালাদুল আমীন বলিয়াছেন, যাহার অর্থ শান্তির নগরী। মক্কা নগরীর এই বৈশিষ্ট্য সর্বকালে সর্বযুগেই উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই বৈশিষ্ট্যকে এত দূর সম্প্রসারিত করিয়াছেন যে, বন্য পশু-পক্ষী এবং গাছ-পালার জন্যও তাহাকে শান্তি এবং নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াছেন। ঐ এলাকার কোন উদ্ভিদ বা তৃণ-লতার পাতাও ছিন্ন করা নিষিদ্ধ, ঐ এলাকার কোন বন্য পশু-পক্ষীকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ।

মক্কা এলাকার এই শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্ধকার যুগের বর্বররাও শ্রদ্ধা করিত, এমনকি তাহাদের কেহ নিজ পিতার হত্যাকারীকেও এই সীমার ভিতর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিত না।

শান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য এই শান্তির নগরী যথোপযুক্তই ছিল। এই মক্কা নগরী আল্লাহ তাআলার নিকটও এত অধিক সম্মানী ও মর্যাদাশীল যে, ইহার হরম শরীফের মসজিদে এক রাকাত নামাযে সাধারণ মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ রাকআতের সওয়াব হইয়া থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় নবীর জন্য এই প্রিয় নগরীকেই নির্বাচন করিয়াছেন।

ভৌগোলিক দিক দিয়াও মক্কা নগরীর বৈশিষ্ট্য বিচিত্রময় মক্কা নগরী ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, মক্কা নগরী যে ভূখণ্ডের বক্ষে অর্থাৎ আরব দেশে অবস্থিত, তথা হইতে যত সহজে ও অল্প সময়ে নৌ ও স্থল পথে পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগণ করা যায়, অন্য কোন দেশ হইতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব জগতের মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য ভূমণ্ডলের এই এলাকাই সর্বাধিক সমীচীন ছিল।

হযরতের জন্য সর্বোত্তম বংশ নির্বাচন

এই সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বর্ণনা দান করিয়াছেন–

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ইসমাঈল (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; হযরত ইসমাঈলের বংশধর কেনানা' গোত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; কেনানা গোত্রে কোরায়শ শাখাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। কোরায়শ শাখার মধ্যে হাশেমের বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে আমাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মেশকাত শরীফ)

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা নিখিল সৃষ্টির মধ্যে আদম জাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; আদম জাতের মধ্যে আরবীদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাশেম বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং আমাকে সেই বংশভুক্ত করিয়াছেন। (যোরকানী, ১– ৬৯)

হযরতের সময়কাল

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁহাদের মধ্যবর্তীকালে কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়কালের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ৫৬০ বৎসর, কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর।ঃ

(ফতহুল বারী ৭–২২২)

এই সংখ্যাকে প্রচলিত কথাবার্তায় ৬০০ বৎসর বলা নিতান্তই স্বাভাবিক। অধিক শতকের সংখ্যায় অসম্পূর্ণ শতককে শতকে পরিণত করা সাধারণ ক্ষেত্রে মোটেই দূষণীয় নহে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে (৫৪০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছেন–

عَنْ سُلْمَانَ قَالَ فَتْرَةُ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمَائَةِ سَنَةٍ ـ

অর্থঃ "ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যবর্তী সময়কাল– যে সময়ে কোন নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল না, ছয় শত বৎসর ছিল।"

ব্যাখ্যা ঃ সালমান ফারেসী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ঈসার ধর্মাবলম্বী– নাসরানী হইয়াছিলেন। তিনি সেই ধর্মের একজন বিশেষ সাধক ছিলেন এবং সেই ধর্মের অনেক বিশেষজ্ঞের শিষ্যত্ব ও সাহচর্য তাঁহার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স-মাত্রা ছিল অসাধারণ। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লারে মদীনায় আসার পর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ৩৬ হিজরী সনে ওফাত

পাইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ২৫০ বা ৩৫০ বৎসর। কাহারও মতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক শিষ্যের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। (হাশিয়া বোখারী- ৫৬২)

হযরতের পবিত্র নসব বা বংশ পরিচয় (পৃঃ ৫৪৩)

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (১) পিতা আবদুল্লাহ, (২) পিতা আবদুল মোত্তালেব (৩) পিতা হাশেম, (৪) পিতা আব্দে মনাফ, (৫) পিতা কুসাই, (৬) পিতা কেলাব, (৭) পিতা মোর্রাহ, (৮) পিতা কা'ব (৯) পিতা লুআই, (১০) পিতা গালেব, (১১) পিতা ফেহ্র, (১২) পিতা মালেক, (১৩) পিতা নজর, (১৪) পিতা কেনানা, (১৫) পিতা খোযায়মা (১৬) পিতা মোদ্রেকাহ্, (১৭) পিতা ইল্য়াস (১৮) পিতা মোজার, (১৯) পিতা নেযার, (২০) পিতা মাআদ্দ, (২১) পিতা আ'দ্নান।

বোখারী (রঃ) এই ২১ পোশ্তই উল্লেখ করিয়াছেন। এই ২১টি পোশ্ত এবং তাহাদের নামগুলি সম্পর্কে মতভেদ নাই। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) স্বীয় বংশ বর্ণনায় উক্ত ২১ পোশ্তই উল্লেখ করিতেন। (ফতহুল বারী ৭-১৩২)

উল্লিখিত "ফেহ্র" নামীয় ব্যক্তির উপনাম ছিল "কোরায়শ" এবং তিনি কোরায়েশ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হইতেই তাঁহার বংশধরগণ কোরায়েশ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অভিধান মতে "কোরায়শ" এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর নাম; সেই প্রাণীটি অতিশয় শক্তিশালী, সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর রাজা। ঐ শ্রেণীর প্রশংসনীয় গুণের সূত্রেই ফেহ্রের এই উপনাম অবলম্বিত হইয়াছিল।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ তালিকার তিনটি অংশ-

(১) মাথার অংশ মুহাম্মদ (সঃ) হইতে "আদ্নান" পর্যন্ত। (২০) গোড়ার অংশ ইসমাঈল (আঃ) হইতে আদম (আঃ) পর্যন্ত। (৩) মধ্যভাগের অংশ "আদ্নান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত। প্রথম অংশটি একুশ পোশ্তের- সর্বসম্মত ও অকাট্যরূপে কোন প্রকার বিভিন্নতা ব্যতিরেকে প্রমাণিত রহিয়াছে, যাহা ইমাম বোখারীর (রঃ) বর্ণনায় উপরে উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটি একুশ পোশ্তের; তাহাও প্রায় সর্বসম্মত, অবশ্য আদিকালের নামগুলি ভাষান্তরে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করিয়াছে। হিব্রু ভাষা হইতে যখন আরবীতে আসিয়াছে তখন নিশ্চয় কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে। যেমন, বাংলার 'দ' অক্ষর সম্বলিত নাম ইংরাজীতে লেখা হইলে তাহা 'ড' হইয়া যাইবে। আরবী হইতে বাংলায় আসিলেও নিশ্চয় বিভিন্নতা সৃষ্টি হইবে। কারণ, আরবী ভাষার জের, জবর, পেশ দ্বারা শব্দের আকৃতি গঠিত হয়, বাংলাভাষায় তাহা া, ি, ু দ্বারা হইয়া থাকে; কিন্তু আরবী জের, জবর, পেশ ছাড়াই সাধারণত লেখা হইয়া থাকে। পাঠকের নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাংলা শব্দ া, ি, ু ছাড়া লেখা যায় না, এতদ্ভিন্ন আরবীতে "জবর" স্থান বিশেষে "অ" এবং স্থান বিশেষে "আ" এবং "জের" "ি" ও "ে" লেখা হয়- ইত্যাদি। এইসব কারণে আদিকালের ঐ নামগুলির আবৃত্তি এবং ভাষান্তরে নানা আকারে বিভিন্নতা আসিয়াছে। নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল-

(১) ইসমাঈল (আঃ), (২) ইব্রাহীম (আঃ) (৩) তারেখ- অনেকে "তারেহ্" লিখিয়াছেন এবং অনেকের মতে তাঁহারই আর এক নাম "আযর" (৪) নাহ্র (৫) সরুগ- এই নামের উচ্চারণে বিভিন্ন মত রহিয়াছে; সারূ, শারূগ, আশরাগ, শারুখ, সরূহ (৬) রাউ (৭) ফালখ- কাহারও মতে ফালজ বা ফালগ। (৮) আইবার- কাহারও মতে আবর বা গাবর (৯) শালাখ- কাহারও মতে শালাহ (১০) আরফাখশাজ- কাহারও মতে আরফাখশাদ (১১) সাম- পুত্র নূহ (আঃ) (১২) নূহ (আঃ) (১৩) লমক- কাহারও মতে লামক (১৪) মাত্তুশালাখ (১৫) আখ্নুখ- তিনিই নবী ইদ্রিস (আঃ) (১৬) ইয়ার্দ (১৭) মাহলায়েল (১৮) কাইনাল- কাহারও মতে কায়েন। (১৯) ইয়ানেশ- কাহারও মতে আনূশ (২০) শীছ (আঃ) (২১) আদম (আঃ)।

মধ্য অংশ তথা ইসমাঈল (আঃ) ও "আদ্নান"-এর মধ্যবর্তী অংশে বিরাট মতভেদ এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় বিভিন্ন অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। নামের বিভিন্নতা ত আছেই, সংখ্যার মতভেদও আশ্চর্যজনক। অনেকের মতে এই অংশের সংখ্যা মাত্র ৭ বা ৮ জনের; আর কাহারও মতে সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সীরত রচনায় ইতিহাস মন্থনকারী বিশিষ্ট লেখক মরহুম শিবলী নোমানী তাঁহার "সীরতুন নবী" গ্রন্থে সর্বোচ্চ ৪০ সংখ্যার খোঁজ দিয়াছেন। আমরাও বিশেষ ইতিহাস গ্রন্থ "তারীখে তাবারী" এর মধ্যে ৪০ সংখ্যার মতের উদ্ধৃতি দেখিয়াছি। ৪০ সংখ্যার অধিক সম্পর্কে কোন মতামত আছে বলিয়াও আমরা খোঁজ পাই নাই। বাংলাভাষায় বিশ্বনবীর জীবনী রচয়িতাগণের একজন লেখক এই অংশে ৪০ সংখ্যাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; তিনি ৪৭ সংখ্যক নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যেই বরাত দিয়াছেন তাহা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই, তবে এই উদ্ধৃতির কোন স্থানে নিশ্চয় গরমিল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

এত দীর্ঘ মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ সীরাত লেখক বংশ তালিকার বর্ণনায় "আদ্নান" পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়াছেন; সতর্কতায় ইহাই উত্তম।

নবীজীর জীবনী রচনায় বিশেষ গ্রন্থ "সীরাতে ইবনে হেশাম"- ইহার মূল গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে আট সংখ্যক নামই উল্লেখ হইয়াছে। "সীরাতুন নবী" লেখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের নিকট এই সংখ্যাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন ইতিহাসবিদের সিদ্ধান্তে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় আগমন হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পর্যন্ত সর্বমোট সময়কাল ছয় হাজার বৎসরের উর্ধে। এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত সময়ের মাঝামাঝিকালে বর্তমান ছিলেন। কারণ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত তিন হাজার বৎসরের সামান্য উপরে, আর আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় অবতরণ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৩ হাজার বৎসরের উপরে।

দ্বিতীয় তিন হাজার বৎসরের তথা আদম (আঃ) হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ-সূত্রের মাধ্যম হইলেন বিশ জন।

প্রথম তিন হাজার বৎসরে "আদ্নান" পর্যন্ত ত মধ্যের সংখ্যা ২১ জন আছেনই; তদুপরি আদ্নান হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত ৪০ বা ৪৭ জন হইলে এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১ বা ৬৮; এই সংখ্যার অসামঞ্জস্য ২০ সংখ্যার সহিত অনেক বেশী। পক্ষান্তরে "আদ্নান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত মাধ্যম সংখ্যা আট হইলে প্রথম তিন হাজার বৎসরে সর্বমোট মাধ্যম সংখ্যা ২৯, যাহা ২০ সংখ্যার নিকটবর্তী। দুনিয়ার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে মানুষের বয়সের যে বেশকম আছে সে অনুপাতে এইরূপ নিকটবর্তী ব্যবধানই যথেষ্ট মনে হয়; ৬১+৬৮ = এর সংখ্যার সহিত ২০ সংখ্যার যে অধিক ব্যবধান তাহা অসঙ্গত মনে হয়।

হযরতের রক্তধারায় আব্দিয়ত

মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি; সৃষ্টির সর্বোপরি মহত্ত্ব হইল সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে আত্মনিবেদন- নিজেকে উৎসর্গীকরণ। মানুষ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি; তাহাকে সৃষ্টিকর্তা পরীক্ষার পাত্র বানাইয়াছেন, তাই তাহাকে স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতার অংশও দিয়াছেন; দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বা স্বেচ্ছাচারী- উভয় পথই তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত। মানুষ জ্ঞান-বিবেক খাটাইয়া স্বেচ্ছাচারিতা পরিহারপূর্বক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার দাসত্বে আবদ্ধ জীবন যাপন করুক; মানুবের প্রতি আল্লাহর আদেশ ও দাবী ইহাই। পবিত্র কোরআনে আছে-

"মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একমাত্র আমার দাসত্বের জন্য- তাহাদের হইতে আমার একমাত্র দাবী ইহাই।" এই দাসত্বের চরম পর্যায়কে "আব্দিয়ত" বলা হয়! অতএব, আব্দিয়তের অর্থ হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার দাসত্বে আত্মনিবেদন ও নিজকে চরম উৎসর্গীকরণ। সুতরাং এই আব্দিয়তই হইল মানুষের

মূল উন্নতির সোপান। আব্‌দিয়তহীন মানুষের জীবন ব্যর্থ; সে সৃষ্টিকর্তার দাবী আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে এই আব্‌দিয়তের পরিণামেই আল্লাহ তাআলার নিকট মানুষের মর্তবা এবং নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে এই আব্‌দিয়তের চরম পর্যায় বিদ্যমান ছিল। হযরতের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই আব্‌দিয়ত; হযরত (সঃ) তাঁহার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আব্‌দিয়তকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রতিটি কার্যে আব্‌দিয়ত তথা সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে নিবেদিতপ্রাণ থাকিতে ভালবাসিতেন।

হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! আমি ইচ্ছা করিলে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার জন্য লাভ করিতে পরিতাম। আমার নিকট এক (বিরাটকায়) ফেরেশতা আসিয়াছিলেন, যাঁহার কোমর কা'বা শরীফের গৃহের ছাদ সমান। তিনি আসিয়া বলিলেন, আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগার আপনার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং আপনাকে এই স্বাধীনতা দিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে আপনি পূর্ণ আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে রাজ্যাধিপতি নবীও হইতে পারেন। ঐ সময় জিব্রাঈল (আঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (সৃষ্টিগতভাবেই এই পরিমাণ আব্‌দিয়তধারী ছিলেন যে, উক্ত বিষয়ের নির্বাচনও নিজ ইচ্ছায় করিলেন না– তাহার জন্যও তিনি প্রভুর স্থায়ী দূত) জিব্রাঈলের প্রতি পরামর্শ চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) ইশারায় পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বিনয়– আত্মবিলীনতা অবলম্বন করুন। সেমতে হযরত নবীজী (সঃ) ঐ ফেরেশতার কথার উত্তরে বলিলেন, আমি আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবীই থাকিব।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হইতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হেলান দেওয়া বা নিতম্বে ভর করা অবস্থায় বসিয়া খানা খাইতেন না। শুধু পদদ্বয়ের ভরে বসিয়া খানা খাইতেন এবং) বলিতেন, আমি ঐরূপেই খাইতে বসিব যেরূপে গোলাম খাইতে বসে। সাধারণ বসায়ও ঐরূপ (বিনয়ী আকারে) বসিব যেরূপ গোলাম বসিয়া থাকে। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আব্‌দিয়তের এই চরম উৎকর্ষ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ত ছিলই; তাহার আরও অধিক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে হযরতের পূর্বপুরুষদের বিশেষ রক্তধারা। আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হওয়ার যে চরম ও পরমতর পর্যায় আছে– আল্লাহর জন্য নিজেকে বলিদান বা কোরবানী করা– তাহা বিশ্ব ইতিহাসে দুই জন লোকের জীবনীতেই দেখা যায়। সেই উভয় জন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঊর্ধ্বতন পুরুষ। হযরত (সঃ) নিজেই বয়ান করিয়াছেন, انا ابن الذبيحين "আল্লাহর জন্য নিজেকে বলিদান বা কোরবানীকারী ব্যক্তিদ্বয়ের পুত্র আমি।"

উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন ছিলেন হযরতের ঊর্ধ্বতন পিতা ইসমাঈল (আঃ)*। তাঁহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ; পবিত্র কোরআনেও সেই ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে (চতুর্থ খণ্ড হযরত ইব্রাহীমের (আঃ)-এর বয়ান দ্রষ্টব্য) অপরজন হইলেন হযরতের পিতা আবদুল্লাহ।

---

* হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার আদেশ মতে যেই পুত্রকে কোরবানী করিতে গিয়াছিলেন সেই পুত্র ইসমাঈল (আঃ) বটে; ইসহাক (আঃ) নহেন। এই বিষয়ের একটি সহজ প্রমাণ এই যে; ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী যখন একদল ফেরেশতা মারফত আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পৌছাইয়াছিলেন তখন ইহাও বলা হইয়াছিল যে; "ইসহাক হইতে সুদীর্ঘ বংশ চলিবে।" তওরাতেও আছে– "খোদা ইব্রাহীমকে বলিলেন; তোমার বিবি ছারা একটি ছেলে জন্ম দিবে; তুমি তাহার নাম ইসহাক রাখিবে; আমি তাহার হইতে সুদীর্ঘ বংশ চালাইব।" (সীরাতুন নবী ১, ১০২) পবিত্র কোরআনেও এই শ্রেণীর বর্ণনা রহিয়াছে। যথা– "ফেরেশতাগণ ইব্রাহীম (আঃ)-কে সুসংবাদ দিলেন ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম লাভ করার এবং ইসহাকের উত্তরাধিকার হইবেন ইয়া'কুব (আঃ), সেই সংবাদও ফেরেশতাগণ দিলেন!" সুতরাং যখন ইসহাকের জন্মের পূর্ব হইতে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ছিল যে, ইসহাকের বংশ ও উত্তরাধিকারী চলিবে– ইহার অর্থ এই ছিল যে, ইসহাক জীবিত থাকিবেন। তখন সেই আল্লাহর তরফ হইতে ইসহাকের কোরবানী করার আদেশ হইতে পারে না।

তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব ত ইহাদের বাহক নবীগণের পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছে; ইহুদী-নাসারাগণ ঐ কিতাবদ্বয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহুদীরা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশকে আল্লাহর নামে কোরবান হওয়ার বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত করার জন্য তওরাত কিতাবে এই প্রসঙ্গটি বিকৃত করিয়া লিখিয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার যেই পুত্রকে কোরবানী করিতে গিয়াছিলেন তিনি ইসহাক (আঃ)। ইহা তাহাদের জঘন্য মিথ্যাসমূহের একটি অন্যতম মিথ্যা।

হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী হওয়া

হযরতের দাদা– আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মোত্তালেব একটি সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বিশেষ স্মৃতি বরকত ও মঙ্গল-ভাণ্ডার যমযম-কূপ বহু দিন হইতে মাটির নীচে লুপ্ত হইয়া রহিয়াছিল; আবদুল মোত্তালেবের হাতে তাহার বিকাশ হইয়াছিল। গায়েবী সাহায্যে তিনি তাহার আবিষ্কারক হওয়ার গৌরবে ধন্য হইলেন।

যমযম কূপ বিলুপ্ত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে, মক্কা নগরীর আদি অধিবাসী ছিল "জুরহুম গোত্র"– যাহারা হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার সময়েই মক্কা এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যেই ইসমাঈল (আঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। মক্কা নগরীর কর্তৃত্ব এই গোত্রের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাহাদের আমল-আখলাক বিনষ্ট হইলে আল্লাহ তাআলার শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়নকারী এক পরাক্রমশালী শত্রুর আক্রমণ তাহাদের উপর আসিল। তখন তাহাদের মধ্যে "আম্র ইবনুল হারস ইবনুল মেজমাম" নামক ব্যক্তি তাহাদের সর্দার ছিল। শত্রুর আক্রমণে তাহারা পলায়নে বাধ্য হইলেন তাহাদের সর্দার আমর ইবনুল হারস তাহার বিশেষ বিশেষ ধন-রত্ন এবং অস্ত্র শস্ত্র যমযম কূপের মধ্যে ফেলিয়া কূপ ভরাট করতঃ এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিল, যেন তাহার কোন নিদর্শনও দেখা না যায়– এইভাবে ঐ কূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। (যোরকানী, ১– ৯২)

পুরাতন ইতিহাসরূপে যমযম কূপের চর্চা ছিল, কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন ছিল না। খাজা আবদুল মোত্তালেব যমযম কূপ আবিষ্কার করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু সঠিক কোন নিদর্শন তাঁহার জানা ছিল না, তাই আদেশ কার্যকরী করিতে পারিতেছিলেন না; স্বপ্নও পুনঃ পুনঃ দেখিতেছিলেন। শেষবার স্বপ্নে নিদর্শনও পাইলেন যে, প্রভাতে এক স্থানে পিপীলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে, কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে। আবদুল মোত্তালেবের তখন একটি মাত্র পুত্র ছিল– হারেস। ভোরবেলা আবদুল মোত্তালেব হারেসকে সঙ্গে লইয়া কা'বা ঘর এলাকায় আসিয়া ঐ নিদর্শন– পিপীলিকার বাসা এবং কাকের মাটি খোঁড়া দেখিতে পাইলেন; ঐ জায়গাটিতে মক্কাবাসীরা সেই আমলে তাহাদের দেব-দেবীর নামে জীব বলিদান করিত। আবদুল মোত্তালেব হারেসকে লইয়া ঐ স্থান খনন আরম্ভ করিলেন। কোরায়শের লোকেরা তাঁহাকে বাধা দিল; শেষ পর্যন্ত হারেসকে বাধার মোকাবিলায় দাঁড় করাইয়া মাটি খনন আরম্ভ করিলেন। অল্প কিছু খননের পরই কূপের বেড় বাহির হইল; আব্দুল মোত্তালেব আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। পূর্ণরূপে আবিষ্কারের পরে তাহাতে তৈয়ারী দুইটি স্বর্ণ হরিণ এবং কতিপয় তরবারি ও লৌহবর্ম পাওয়া গেল। উক্ত এলাকার আদি নিবাসী জুরহুম গোত্র ঐসব জিনিস তথায় রাখিয়াছিল। এই সব মালামালের ব্যাপারেও কোরায়েশের লোকজনের সহিত আব্দুল মোত্তালেবের কলহ বাধিল। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী আবদুল মোত্তালেব ঐসব মালামাল সম্পর্কে তাঁহার নিজের ও কোরায়শের লোকজনের এবং কা'বা গৃহের নামের ভিন্ন ভিন্ন লটারি করার প্রস্তাব দিলেন। সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া লটারী করিল। তখন আবদুল মোত্তালেব আল্লাহর নিকট আরাধনা করিতেছিলেন। লটারিতে স্বর্ণ হরিণদ্বয় কা'বা গৃহের নামে উঠিল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালেবের নামে আসিল; কোরায়েশগণ ফাঁকা গেল। দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩০ নং হাদীছে যে কা'বা শরীফের পোতায় প্রোথিত স্বর্ণ-রৌপ্যের উল্লেখ আছে, সেই ধন-রত্নের মধ্যে উক্ত স্বর্ণ-হরিণদ্বয়ও রহিয়াছে। তারপর যমযম কূপের স্বত্বাধিকার নিয়াও আব্দুল মোত্তালেবের সহিত কোরায়শদের বিরোধ দেখা দিল। তাহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ এক গণক-ঠাকুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পানির অভাবে পিপাসায় তাহাদের সকলের মৃত্যু আসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা মৃত্যু প্রহরের অপেক্ষায় এক স্থানে জড় হইয়া পতিত ছিল। আবদুল মোত্তালেব সকলকে বলিলেন, হাত-পা গুটাইয়া মৃত্যুবরণ করা কাপুরুষের লক্ষণ; শক্তি থাকা পর্যন্ত পানির তালাশে বাহির হওয়া কর্তব্য; আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে কোথাও পানির খোঁজ দিতে

পারেন। সেমতে সকলেই তথা হইতে পানির তালাশে যাত্রা করায় তৎপর হইল। আবদুল মোত্তালেবও স্বীয় বাহনের উপর আরোহণ করিলেন; বাহন উটটি তাঁহাকে লইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের নীচ হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পানি পান করিল এবং সকলে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় কোরায়শের লোকজন আবদুল মোত্তালেবের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িল এবং সকলে একবাক্যে বলিল, হে আব্দুল মোত্তালেব! আপনার সহিত আমাদের আর কোন বিরোধ নাই, যেই মহান আপনাকে এই মরুভূমিতে পানি দান করিয়াছেন, তিনিই আপনাকে যমযম কূপও দান করিয়াছেন; তাহার উপর একমাত্র আপনারই অধিকার থাকিবে। সেমতে হাজীদিগকে যমযম কূপের পানি পান করাইবার সেবা সৌভাগ্য বংশ পরম্পরা আবদুল মোত্তালেবের বংশেরই নির্ধারিত থাকিল (দ্বিতীয় খণ্ড ৮৫৩ হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এই সব ঘটনা ঘটিবার সময় আব্দুল মোত্তালেব একটি মাত্র পুত্রের পিতা ছিলেন। তিনি যমযম কূপের ব্যাপারে কোরায়শদের বিগত বিরোধে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন তাহা ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল অধিক পুত্র লাভের; যাহাতে তিনি কোরায়শদের বিরোধ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হইতে পারেন। সেমতে তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার দশটি পুত্র লাভ হইলে এবং তাহারা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে একটি পুত্র আমি আল্লাহর নামে কোরবানী করিব।

আল্লাহ তাআলার কুদরত– আবদুল মোত্তালেব একে একে দশটি পুত্র লাভ করিলেন; সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হইলেন আবদুল্লাহ– যিনি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাবী পিতা। আবদুল মোত্তালেবের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক আদর-সোহাগের পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ; তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির উপরই আবদুল মোত্তালেবের মান্নত বা প্রতিজ্ঞা পূরণ করা জরুরী হইয়া পড়িল। সেমতে একদিন আবদুল মোত্তালেব পুত্রদেরকে ডাকিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মান্নতের মর্ম জ্ঞাত করিলেন এবং কোরবানীর জন্য একজনকে নির্ধারিত করার উদ্দেশে লটারি করিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস– লটারিতে কোরবানীর জন্য আবদুল্লাহর নাম উঠিল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণে প্রস্তুত হইলেন এবং আবদুল মোত্তালেব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে লইয়া কোরবানীর স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের মধ্যে কোরায়শদের লোকজন বিশেষতঃ আবদুল্লাহর মাতুল আবদুল মোত্তালেবকে বাধা দিয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে সর্বশেষ প্রচেষ্টায় বাধ্য না হইয়া এই কার্য আমরা সম্পন্ন করিতে দিব না।

সেকালে মাদীনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরানী ছিল; সাব্যস্ত করা হইল সেই ঠাকুরানীর নিকট হইতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। আবদুল মোত্তালেব কতিপয় লোকসহ সেই ঠাকুরানীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ঠাকুরানী ঘটনা শ্রবণান্তে বলিয়া দিল, অদ্য তোমরা চলিয়া যাও; পরে পুনরায় সাক্ষাত করিও। আবদুল মোত্তালেব ঠাকুরানীর নিকট হইতে আসিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পরদিন পুনরায় ঠাকুনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালের প্রথানুযায়ী একজন মানুষের জীবন বিনিময় দশটি উট ছিল; অতএব অদ্য ঠাকুরানী তাহাদের কাম্য বিষয়ের ফয়সালা এই শুনাইল যে, দশটি উট এবং আব্দুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি করিবে; যদি উট দলের দিকে কোরবানী করা সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহর বদলে দশটি উট কোরবানী করিবে, আর যদি এই লটারিতেও কোরবানীর জন্য আবদুল্লাহর নাম উঠে, তবে ঐ দশটি উটের সহিত আরও দশটি উট যোগ করিয়া বিশটি উট ও আব্দুল্লার মধ্যে পুনঃ লটারি করিবে। এইরূপে যাবৎ কোরবানীর জন্য লটারিতে উটের নাম না আসিবে প্রতিবার দশটি করিয়া উট যোগ করতঃ লটারি করিতে থাকিবে– যত সংখ্যার উপর যাইয়া লটারিতে উট কোরবানীর নাম আসিবে সেই সংখ্যক উট কোরবানী করিয়া দিলে আবদুল্লাহ কোরবানী হইতে রেহাই পাইয়া যাইবে।

আবদুল মোত্তালেব এই ফয়সালা লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ঐরূপে লটারির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। নয় বার পর্যন্ত লটারিতে আবদুল্লাহর নামই আসিতে লাগিল; পুনরায় দশ দশ উট বর্ধিত করিলে উটের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল এবং দশমবার লটারি দেওয়া হইল; এইবার উটের নামে লটারি আসিল।

কোরায়শের লোকজন সকলেই আনন্দিত হইল এবং বলিল, হে আবদুল মোত্তালেব, ধন্য হও! পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা তোমার পক্ষে সফল হইয়াছে। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমি আশ্বস্ত হইব না যাবত একশত উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে তিনবার লটারি করিয়া না দেখি। এই বলিয়া আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহর দরবারে আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং লোকেরা দ্বিতীয়বার লটারি করিল; এইবারও কোরবানীর জন্য লটারিতে উটের নামই আসিল। তৃতীয়বার আবার ঐরূপে আবদুল মোত্তালেব আরাধনায় লিপ্ত হইলেন এবং এইবারও লটারিতে উটের নামই আসিল। আব্দুল মোত্তালেব সন্তুষ্ট চিত্তে একশত উট কোরবানী করিয়া সম্পূর্ণ গোশ্‌ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।*

(সীরতে ইবনে হেশাম, ১৪৩-১১৫৫)

এইভাবে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাবী পিতা খাজা আবদুল্লাহ কোরবানী হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)- পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তাআলার নামে কোরবানী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় আল্লাহর বিশেষ কুদরতে কোরবানী হওয়া হইতে রেহাই পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হওয়ার পূর্ণ মর্যাদার ভাগী হইয়াছিলেন. যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। তদ্রূপ আব্দুল মোত্তালেব ও আবদুল্লাহ উভয় পিতা-পুত্র আল্লাহর নামে কোরবানীর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় কোরবানী হইতে রেহাই পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গের বিকাশ সাধনে পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। সেই আব্‌দিয়তের রক্তধারাই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে আসিয়াছিল- যাহার ইঙ্গিত দানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন-انا ابن الذبيحين -অর্থাৎ আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই জন এরূপ ছিলেন যাঁহারা আল্লাহর জন্য কোরবানী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের রক্তধারা আমার মধ্যে প্রবাহমান।

হযরতের বংশের সম্পর্ক মদীনার সহিত

আল্লাহ তাআলার শান- হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কাল কাটিবে মদীনায়, এমনকি শেষ শয়নও মদীনায়ই হইবে। সুতরাং পূর্ব হইতেই মদীনার সহিত তাঁহার সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন অতি বাঞ্ছনীয়। সেমতে কুদরতে এলাহী তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের পিতা হাশেম- যিনি হযরতের গোত্রশাখা বনু হাশেমের মূল, তিনি মদীনার এক সম্ভ্রান্ত গোত্র বন নাজ্জার বংশের "সালমা" নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হযরতের পিতামহ হাশেম কোন প্রয়োজনে মদীনায় আসিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ করিয়া অনেক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব এই সালমার গর্ভেই জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্মের পর হাশেম মক্কায় চলিয়া আসেন, কিন্তু শিশু আবদুল মোত্তালেব মদীনায়ই মাতার নিকট থাকিয়া যান। আব্দুল মোত্তালেব মদীনায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইতিমধ্যে হাশেম মারা গেলেন। তাঁহার ভ্রাতা মোত্তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবার জন্য মদীনায় আসিলেন; সালমা পুত্রকে দিতে রাজি হইতেছিল না, পুত্রও তাহার অনুমতি ছাড়া যাইতে রাজি নহে। মোত্তালেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকে না লইয়া বাড়ী ফিরিব না। অবশেষে মোত্তালেব তাঁহার চেষ্টায় সফল হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মক্কার লোকেরা হাশেমের এই পুত্রকে কেহ কোন সময় দেখে নাই, তাই প্রথমে তাহারা ছেলেটিকে মোত্তালেবের সহিত দেখিয়া ভাবিল, ছেলেটি মোত্তালেবের দাস- সেই মর্মে ছেলেটিকে "আবদুল মোত্তালেব- মোত্তালেবের দাস" আখ্যায়িত

০ উক্ত ঘটনার পর হইতে মানুষের জীবন বিনিময় একশত উট প্রদানের প্রচলন হইয়া পড়ে। এমনকি ইসলামী শরীয়তের বিধানেও যে ক্ষেত্রে "কেসাস" তথা খুনের বদলা খুন হয় না- যেমন, অনিচ্ছাকৃত খুন কিম্বা খুনের বিনিময়ে বাদী পক্ষ যদি জীবন বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে একশত উট দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। ফেকাহ শাস্ত্রে ইহাকেই "দিয়াত" বলা হয়।

করিল। মোত্তালেব লোকদিগকে প্রকৃত খবর জানাইয়া বলিলেন, ছেলেটি আমার ভ্রাতা হাশেমের পুত্র– তাহার নাম "শায়বাতুল হাম্‌দ" কিন্তু, "আবদুল মোত্তালেব" আখ্যা আর মুছিল না। আজও হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব নামেই পরিচিত।

হাশেমের এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই মদীনাবাসীগণ মক্কার কোরায়শ বংশীয় বনু হাশেমকে ভাগিনার গুষ্টি গণ্য করিয়া থাকিত। (তৃতীয় খণ্ড– ১৪৩১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হযরতের শাখা গোত্র বনু হাশেমের বৈশিষ্ট্য

কোরায়েশ বংশ সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। কা'বা শরীফের উপর তাঁহাদেরই কর্তৃত্ব ছিল, হাজীদের সর্বপ্রকার সেবা বিশেষতঃ তাঁহাদের পানির যোগাড় তাঁহারাই করিতেন। আবদে মনাফের পরে এইসব বৈশিষ্ট্য হাশেমের উপর ন্যস্ত হয়। হাশেম দানশীল ছিলেন; তিনি হাজীদিগকে রুটিও খাওয়াইয়া থাকিতেন। এমনকি এক বৎসর কোরায়শদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; কাহারও সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না; হাশেম তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিয়া হাজীদের সেবার ব্যবস্থা একাই করিলেন। হাশেমের মৃত্যুর পর হাজীদের সেবার কাজ মোত্তালেব গ্রহণ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব হাজীদের পানি এবং সমুদয় সেবার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, কোরায়শদের উপর সর্বপ্রকারের কতত্ব-নেতৃত্বও তিনি লাভ করেন। তাঁহার জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই জন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় আত্মমর্যাদা প্রকাশ ক্ষেত্রে আবদুল মোত্তালেবের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়াছেন। (তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হযরতের মাতুল

হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কীয় ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। খাজা আবদুল্লাহ কোরবানী হইতে রেহাই পাইলে পর তাঁহার বিবাহের জন্য আবদুল মোত্তালেব প্রস্তুত হইলেন। আব্দুল মোত্তালেব কোরায়শদের প্রধান, সুখ্যাতির আধার; খাজা আবদুল্লাও কোরবানীর ঘটনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাকে কন্যা দেওয়ার জন্য কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকলেই প্রতিযোগী হইলেন।

কোরায়শদের শাখা গোত্র বনু যোহরা ঐ সময় তাহার সরদার ছিলেন ওয়াহ্‌ব; তাহার এক সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ছিল "আমেনা"। আবদুল মোত্তালেব স্বয়ং ওয়াহ্‌বের নিকট যাইয়া আবদুল্লাহর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমেনার সৌভাগ্যের চন্দ্রোদয় হইল; খাজা আবদুল্লাহর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবি আমেনার পিতা ওয়াহ্‌বের বংশ তালিকা এই– ওয়াহ্‌ব, পিতা আবদে মনাফ, পিতা যোহরা, পিতা কেলাব। (সীরাতে ইবনে হেশাম, ১৫৬)

হযরতের বংশ তালিকায় তাঁহার ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পিতা ছিলেন "কেলাব"। অতএব হযরতের পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারাই কোরায়শ বংশের "কেলাব" নামীয় পিতায় মিলিত ছিল।

° ওয়াহ্‌বের পিতা আব্‌দে মনাফ এবং হযরতের চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পিতা আব্‌দে মনাফ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মাতার বংশের আব্‌দে মনাফ হইলেন যোহরা পুত্র আব্‌দে মনাফ আর পিতার বংশের আব্‌দেমনাফ ছিলেন উক্ত আব্‌দে মনাফের পিতা যোহরা ভ্রাতা কুসাইর পুত্র। অর্থাৎ হযরতের ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পিতা "কেলাব"– তাঁহার দুই পুত্র ছিল (১) কুসাই (২) যোহরা। "কুসাইর এক পুত্রের নাম ছিল আব্‌দে মনাফ; তাহার বংশধরই হযরতের পিতা আবদুল্লাহ। তদ্রূপ যোহরার এক পুত্রের নামও আব্‌দে মনাফ ছিল; তাহার বংশধরই হযরতের নানা ওয়াহ্‌ব। (সীরাতে ইবনে হেশাম–১০৪)

হযরতের পিতৃবিয়োগ

মতভেদ থাকিলে সাধারণত ঐতিহাসিকগণের সাব্যস্ত ইহাই যে, নবীজী (সঃ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার পিতা খাজা আবদুল্লাহর মৃত্যু হইয়াছিল। এই সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়– (১) আবদুল্লাহ সিরিয়ার বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মধ্যপথে অসুস্থ হইয়া স্বীয় পিতার মাতুল দেশ মদীনায় গিয়াছিলেন। সেই অসুস্থতাতেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তথায়ই তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন। (২) মক্কায় খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ায় আবদুল মোত্তালেব স্বীয় মাতুল দেশ খেজুরের এলাকা মদীনায় খাজা আবদুল্লাহকে পাঠাইয়াছিলেন খেজুরের জন্য । তথায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই রোগেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তারীখে তাবারী, ২–৮)

খাজা আবদুল্লাহর মৃত্যু ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়াছিল এবং নবী (সঃ) দুই মাস কালের মাতৃগর্ভে ছিলেন; কাহারও মতে পিতার মৃত্যুকালে নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুই মাস বাকী ছিল।

(যোরকানী, ১– ১০৯)

সত্যের প্রাধান্য দ্বারা হযরতের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা

ধরাপৃষ্ঠে হযরতের আগমন উপলক্ষে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছিল– যাহা দৃষ্টে মনে হয় যেন খোদায়ী কুদরতের পক্ষ হইতে সত্যের বিকাশ এবং তাহার প্রাধান্য মহাসত্যের বাহক তথা হযরতের শুভাগমনকে অভ্যর্থনা জানাইতেছিল।

তন্মধ্যে আস্‌হাবে ফীল বা হাতীওয়ালা রাজা আব্‌রাহার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সূরা "ফীল" বা আলাম তারার মধ্যে এই ঘটনার দিকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ইয়ামানের শাসনকর্তা খৃস্টান ধর্মীয় আব্‌রাহা কা'বা শরীফের দিক হইতে লোকদের আকর্ষণ ফিরাইবার জন্য ইয়ামানের রাজধানী "সানা" শহরে অতি জাঁকজমকপূর্ণ একটি গির্জা তৈয়ার করিয়াছিল। আরববাসী একজন লোকের দ্বারা তাহা কদর্য বা ভস্মীভূত হইলে আব্‌রাহা আরবীয় কা'বা শরীফের উপর ক্ষেপিয়া উঠে এবং তাহা ধ্বংস করার জন্য হস্তী সম্বলিত বাহিনী লইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে দুই স্থানে কা'বা শরীফের ভক্তগণ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার বিরাট শক্তির মোকাবিলায় সকলেই পরাজিত হয়। আব্‌রাহা তায়েফের পথে মক্কার অনতিদূরে ''মোগাম্মেস' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় অবস্থান করিল। আব্‌রাহা তথা হইতে তাহার একজন জেনারেলকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কায় পাঠাইল; সেই জেনারেল মক্কায় আসিয়া ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গেল। মক্কার সর্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের দুই শত বা ততোধিক উটও লুণ্ঠিত হইল। মক্কার লোকেরা বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই পরিমাণ শক্তি মোটেই ছিল না।

অতঃপর আব্‌রাহা দ্বিতীয় একজন লোক পাঠাইল এই কথা বলিয়া যে, তুমি মক্কায় যাইয়া তথাকার সর্দারকে খোঁজ করিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে আমার এই পয়গাম পৌঁছাইবে যে, আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই; আমি আসিয়াছি শুধু কা'বা গৃহ ভাঙ্গিবার জন্য। তাহারা যদি আমাকে এই কাজে বাধা না দেয় তবে রক্তারক্তির প্রয়োজন নাই এবং তাহারা যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চায় তবে সেই সর্দার যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে।

আব্‌রাহার দূত মক্কায় আসিয়া তৎকালীন তথাকার সর্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে আব্‌রাহার পয়গাম পৌঁছাইল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমরা

আব্রাহার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। আর কা'বা গৃহ আল্লাহর ঘর; আল্লাহ যদি তাঁহার ঘর রক্ষা করেন করিবেন। আর যদি তিনি আব্রাহাকে সুযোগ দেন তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। আব্রাহার দূত বলিল, তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন; তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বলিয়াছেন।

আব্রাহার সহিত আবদুল মোত্তালেবের সাক্ষাত ঘটিল। দোভাষীর মাধ্যমে আব্রাহা আবদুল মোত্তালেবকে তাঁহার কোন আব্দার থাকিলে প্রকাশ করিতে বলিল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আপনার লোক আমার পশুপাল নিয়া আসিয়াছে তাহা প্রত্যার্পণ করা হউক। আব্রাহা বলিল, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার মন আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। আপনি সামান্য মালের জন্য আমার নিকট আব্দার করিলেন, আর আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ঘর কা'বার জন্য কোন আব্দার করিলেন না। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, দেখুন! আমি পশুপালের মালিক, তাই আমি পশুপালের কথা বলিলাম। আর কা'বা গৃহের মালিক (আমি নহি, অন্য) একজন আছেন; তিনি হয়ত তাহা ভাঙ্গায় বাধা দিবেন। আব্রাহা দর্পের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কাহারও বাধা মানিব না। আবদুল মোত্তালে বলিলেন, তাহা আপনি জানেন আর তিনি জানেন। অতঃপর আব্রাহা আবদুল মোত্তালেবের পশুপাল ফিরাইয়া দিল।

আব্দুল মোত্তালেব মক্কায় আসিয়া লোকদিগকে একত্র করিল এবং সমবেতভাবে কা'বার দ্বারে যাইয়া পরওয়ারদেগারের নিকট আরাধনা করিল; আব্রাহা বাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। আবদুল মোত্তালেব কা'বা দ্বারের কড়া ধরিয়া আবেগপূর্ণভাবে বলিলেন, "হে আল্লাহ! একজন মানুষ তাহার মাল-সামান রক্ষা করিয়া থাকে; আপনি আপনার ঘর ও ইহার সম্মান রক্ষা করুন। আগামীকল্য শত্রু এবং তাহার শক্তি যেন আপনার শক্তির উপর জয়ী হইতে না পারে। অতঃপর আবদুল মোত্তালেব লোকদেরকে লইয়া পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিলেন এবং কা'বার সহিত আবরাহা কি করে তাহা দেখিবার অপেক্ষায় থাকিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবরাহা দম্ভের সহিত সৈন্যবাহিনী লইয়া মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রধান হাতীটির নাম "মাহমুদ"– সেই হাতীটি সর্বাগ্রে চলিবে, কিন্তু হাতীটি মক্কার পথে কিছুতেই অগ্রসর হয় না, বসিয়া পড়ে। অন্য যেকোন দিকে চালাইলে সে চলে, কিন্তু মক্কার দিকে চলে না। এই বিভ্রাটের মধ্যেই হঠাৎ সমুদ্রের দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে এক শ্রেণীর পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল; প্রতিটি পাখীর মুখে ও দুই পায়ে মোট তিনটি কাঁকর। পাখীগুলি আবরাহা বাহিনীর উপর সেই কাঁকরসমূহ ফেলিতে লাগিল। আল্লাহ তাআলার কুদরত– যেকোন সৈন্য বা হাতীর উপর কাঁকর পতিত হইলেই সে ধ্বংস হইয়া যাইত। এইভাবে সেই বাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস হইল এবং অবশিষ্ট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা পবিত্র কোরআনে সূরা আলাম-তারায় নিম্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে–

"হে প্রিয়নবী! আপনি কি খবর রাখেন না কি অবস্থা করিয়াছিলেন আপনার পরওয়ারদেগার হাতীওয়ালা বাহিনীর? তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টা কি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন না? তাহাদের উপর তিনি পাঠাইয়াছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। সেই পাখী তাহাদের উপর ফেলিতেছিল শক্ত কাঁকর। ফলে তিনি তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।"

ঘটনার সত্যতা প্রমাণে একটি বিষয়ই যথেষ্ট যে, উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিবার মাত্র ৪০ হইতে ৫২ বৎসরের মধ্যে পবিত্র কোরআনের সূরা "আলামতারা" নাযিল হইয়াছিল; তখন উক্ত ঘটনার সময়কালের অনেক লোকই আবরাহার দেশ ইয়ামান এবং ঘটনার শহর মক্কায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ছিল। তাহাদের বর্তমানে পবিত্র কোরআনের উক্ত সূরা প্রচারিত হইয়াছে; তাহারা সকলেই কোরআনের বিরোধী দলভুক্ত ছিল। যদি কোরআনের বর্ণনায় বিন্দুমাত্রও অবাস্তবতা থাকিত, তবে নিশ্চয় তাহারা প্রতিবাদ করিত এবং সেইরূপ কোন প্রতিবাদ হইয়া থাকিলে তাহা মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না; প্রতি যুগেই কোরআনের শত্রুর আধিক্য ছিল।

আবরাহা বাহিনীর বহু সংখ্যক ধ্বংস এবং অবশিষ্ট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বরং আবরাহার গায়েও কাঁকর পড়িয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হালাক হয় নাই। তাহার* শরীরে পচন লাগিয়া গিয়াছিল। আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের অংশ টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই ঘা হইতে সর্বদা পুঁজ প্রবাহিত হইত; এইরূপ ঘৃণিত ও কদর্য অবস্থায় দীর্ঘ দিন ভোগার পর অবশেষে বক্ষ ফাটিয়া কলিজা বাহির হইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই ঘটনায় সমগ্র আরবে কোরায়শ বংশের প্রভাব অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বরকত ছিল; হযরত (সঃ) তখন দুনিয়াতে পদার্পণের প্রথম ধাপে তথা মাতৃগর্ভে ছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার ৫০ বা ৫৫ দিন পর হযরত (সঃ) ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের জন্ম।

বেলাদত বা শুভ জন্ম

এই সুসজ্জিত বিশ্ব বসুন্ধরা যেই মহানের প্রদর্শনী (Exhibition), নিখিল সৃষ্টি যেই মহান সৃষ্টের বিকাশ উদ্দেশে উন্মুখ, ছয় হাজার বৎসরের অধিককাল হইতে এই ধরণী যেই মহামানবের প্রতীক্ষায়, ভুবন-কাননে যেই ফুলের আকাঙ্ক্ষায় তাকাইয়াছিল সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি; আজ সেই মহানের শুভ পদার্পণ হইবে এই ধরণীতে, সেই মহাফুলের কুঁড়ি জন্ম নিবে এই উদ্যানে।

হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম শুভ সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে মহানবী, অগণিত নবীগণের পরিক্রমা শেষ করিয়া সকল জোগাড় আয়োজন সমাপ্তে বিশ্ব সভার মহাসমাবেশকে অলঙ্কৃত করিবেন যে মহিমান্বিত মহাপুরুষ– আজ সেই মহামহিমের শুভাগমন হইবে বিশ্ব ভুবনে।

চন্দ্রে মাস রবিউল আউয়াল ১২, ১০, ৯, ৮ বা ২ তারিখ সোমবার দিন নহে, রাত্রও নহে; আলো-আঁধারে সোবহে সদেকের শান্ত-শুভ্র আলোক-রেখা গগণ-প্রান্তকে মনোরম করিয়াছে, স্নিগ্ধ বায়ুর শীত প্রবাহ ধরাপৃষ্ঠকে প্রফুল্ল আমোদিত ও পুলকিত করিয়াছে, এই অপরূপ মুহূর্তে বিবি আমেনা প্রসব অবস্থা অনুভব করিলেন; অভিনন্দন অভ্যর্থনার আয়োজন চলিল গগনে ভুবনে। আল্লাহ তাআলা আদেশ করিলেন ফেরেশতাগণকে, আজ খুলিয়া দাও আসমানসমূহের সকল দরজা; খুলিয়া দাও সমস্ত বেহেশতের সকল দরজা (যোরকানী, ১–১১১)

বিবি আমেনা দেখিলেন, তাঁহার কুটির অপূর্ব নূরে উজালা হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, এক অপরূপ দৃশ্য– নিজ গোত্রীয় আব্‌দে মনাফ বংশের নারী আকৃতির দীর্ঘ কায়া-বিশিষ্ট কতিপয় স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী মহিলা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত; তাঁহারা বিবি আমেনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিবি আমেনা অবাক! কাহাকেও কোন খবর দেই নাই, এই মুহূর্তে ইহারা কিরূপে খোঁজ পাইলেন? কোথা হইতে আসিলেন? কাহারা ইহারা? সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দানে তাঁহার বলিয়া উঠিলেন, আমরা হইতেছি বিবি আছিয়া, বিবি মারইয়াম* এবং কতিপয় বেহেশতী হুর। এতদ্ভিন্ন বিবি আমেনা ঐ শুভ মুহূর্তে আরও অলৌকিক বহু কিছু দেখিতেছিলেন। (যোরকানী–১১১২)।

বিবি আমেনার বর্ণনা– প্রসব ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ধরণীর বুকে দেখিতে পাইলাম; ভূমি স্পর্শকালে তিনি উভয় হাতের উপর ভর করিয়া সেজদারত ছিলেন। (যোরকানী ১–১১২)। তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল; তাঁহার দেহ মোবারক হইতে মেশকের সুবাস ছড়াইতেছিল! (ঐ ১১৫)

* কাঁকরের ক্রিয়ায় মূল রোগ হাহার হইয়াছিল "বসন্ত" এবং বিশ্বে বসন্ত রোগের আরম্ভ ঐ সময় হইতেই হইয়াছিল; বসন্তের দানা তাহার শরীরে পচন লাগিয়াছিল। (যোরকানী– ৮৮)

* বিবি আছিয়া এবং বিবি মারইয়ামের আগমন অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিবি আছিয়ার স্বামী "ফেরআউন" চিরজাহান্নামী এবং তিনি হইবেন উচ্চস্তরের বেহেশ্‌তী। আর বিবি মারইয়ামের কোন স্বামী ছিল না। তাঁহারা উভয় বেহেশ্‌তে নবীজীর চিরসঙ্গিনী হইবেন।

ঐ সময় এক অপূর্ব শুভ্র মেঘ সদৃশ আলোমালা আসিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ধ্বনিত হইল– "জলে-স্থলে সারা জাহানে তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া নিয়া আঁস"; কিছু সময় তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরালে রহিলেন। (ঐ ১–১১২) তিনি যখন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন তাঁহার সঙ্গে এক অসাধারণ নূর বা আলো নির্গত হইল, যদ্দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র জগত যেন আলোকিত হইয়া গিয়াছিল, সেই আলোতে সুদূর সিরিয়ার ইমারতসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছিল।* হযরত (সঃ) মাতৃগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাক-পবিত্র অবস্থায় আগমন করিয়াছিলেন। (ঐ ১১৭)

নবীজীর নূরে সারা বিশ্ব আলোকিত হইবে, তাই তাঁহার শুভাগমন লগ্নে এই নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী (সঃ) নিজেই সেই নূরের সত্তা ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ -

অর্থ ঃ "আসিয়া গিয়াছে আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের নিকট এক মহান নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব; এই নূর ও কিতাব দ্বারা আল্লাহ তাআলা শান্তির পথে অগ্রগামী করিবেন ঐ লোকদেরকে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং তাহাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া নিবেন আলোর দিকে নিজ দয়ায়।" (পারা–৬, রুকু–৭)

আলোচ্য আয়াতে যে নূরের উল্লেখ আছে সে নূর হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। সুতরাং তাঁহার শুভাগমনের সঙ্গে নূর বা আলোর বিকাশ চমৎকার সামঞ্জস্যময় বটে। উক্ত আলোতে সিরিয়া উদ্ভাসিত হওয়াও সুন্দর অর্থই রাখে। বহির্বিশ্বে এই আলোর বিকাশ সর্বপ্রথম সিরিয়ায়ই হইয়াছিল। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম সিরিয়া দেশই জয় করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রসূল মোস্তফা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে। যাঁহার খাতিরে আরশ-কুরসী, লৌহ-কলম, আসমান-যমীন, মানুষ-ফেরেতা সৃষ্টি; আজ তিনি আসিয়াছেন শত ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্ব হইতে এই ধূলির ধরণীতে। তাই হর্ষে আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাঁহাকে

* সমালোচনা ঃ মোস্তফা চরিতে বিবি আমেনার এই নূর বা জ্যোতি দর্শনকে স্বপ্নের দেখা বলা হইয়াছে– ইহা নিছক ভুল। বলা হইয়াছে– "বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সকলে সমস্বরে স্বীকার করিতেছেন।" এই উক্তি ডাহা মিথ্যা; পূর্বাপর কেহই এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলেন নাই। সীরাত শাস্ত্রে পাঁচশত বৎসরের অধিক পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী কর্তৃক সঙ্কলিত "মাওআহেবে লুদুনিয়্যাহ" কিতাবে (পৃষ্ঠা–২২) একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এই জ্যোতির বিকাশ বাস্তব বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা–১১৬) ঐ জ্যোতি দর্শন স্বপ্ন নহে, বরং বাস্তব বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাহার "নশরুত্ তীবে" (পৃষ্ঠা–১৬) এবং মুফতী শফী সাহেব তাঁহার "সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়ায়" (পৃষ্ঠা–২৫) ঐ জ্যোতি দর্শনকে বাস্তব বলিয়াছেন। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাদীছ শাস্ত্রের হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বাস্তবরূপে উক্ত জ্যোতি দর্শনের বর্ণনাকে সহীহ-শুদ্ধ-সঠিক বলিয়াছেন এবং ইহার সমর্থনে মোহাদ্দেসগণের অনেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (যোরকানী, পৃষ্ঠা–১১৬)।

এমতাবস্থায় মোস্তফা চরিতের উল্লিখিত উক্তি অলীক ও অমূলক হওয়ায় সন্দেহ থাকে কি? পরিতাপের বিষয়, এই অলীক ও অমূলক মতটাকে প্রমাণিত করার জন্য দুইটি আরবি বাক্যের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে– উভয়টিই নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। একটি বাক্যে বিবি আমেনার স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে। এই স্বপ্ন ত বিবি আমেনার গর্ভধারণ সময়ের ছিল বলিয়া সীরাতে ইবনে হেশামে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসবের সময়ও ঐরূপ নূর দেখা সম্পর্কে। অপর বাক্যটি একটি হাদীছ; তাহাতে --- "রুয়া" শব্দ আছে, তাহার অনুবাদ "স্বপ্ন দর্শন" প্রবঞ্চনা ও সত্যের অপলাপ বৈ নহে। এই শব্দটি চাক্ষুষ এবং প্রত্যক্ষরূপে দেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী, পৃষ্ঠা–৬৮৬)

পাঠক! একটি আশ্চর্যজনক উক্তির কৌতুক উপভোগ করুন। মরহুম খাঁ সাহেব বিবি আমেনার উক্ত জ্যোতি দর্শন স্বপ্নযোগের ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে উল্লিখিত "রুয়া" শব্দের অর্থ স্বপ্নে দর্শন সূত্রে নবীজীর উক্তিরূপে হাদীছটির অনুবাদ করিয়াছেন– "এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন..."। সন্তান প্রসবের কঠিন অবস্থায় প্রসূতির এরূপ গভীর ও মধুর নিদ্রা আসিবে যে, সে তাহাতে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিবে– এই শ্রেণীর হাস্যকর কথা বলা মরহুম খাঁ সাহেবের ন্যায় হাতুড়ে লোকের পক্ষেই সম্ভব। "মিথ্যার বেসাতিধারীদের স্মরণশক্তি হয় না।"

নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে তাঁহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা	আল্লাহর নবী তুমি; তোমাকে সালাম!
ইয়া রসূল সালামু আলাইকা	আল্লাহর রসূল তুমি; তোমাকে সালাম!!
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা	আল্লাহর হাবীব তুমি; তোমাকে সালাম!
ছালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা	তোমার স্মরণে সদা সালাম সালাম!!!

হযরতের শুভ জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী

হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়া উপলক্ষে অনেক অলৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা এই–

পারস্যের অগ্নিপূজকগণ তাহাদের একটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডলী এক হাজার বৎসর হইতে প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাত্রে হঠাৎ সেই হাজার বৎসরের অগ্নিকুণ্ডলী নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর বহু মূর্তি ঐ রাত্রে অধঃমুখে পতিত হইয়াছিল, কা'বা গৃহের দেবমূর্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গিত ছিল যে, এক আল্লাহর এবাদত-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এবং অন্যান্য বস্তুনিচয়ের পূজার অবসান অত্যাসন্ন। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহত রাজশক্তি পারস্য সম্রাটের শাহী মহলে ঐ রাত্রে ভূমিকম্প হয় এবং তাহাতে রাজ প্রাসাদের চৌদ্দটি স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, কাফেরী শক্তির উপর ভূকম্পন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার পতন আসন্ন। আরও অলৌকিক ঘটনা এইরূপ ঘটে যে, পারস্যের এক বৃহৎ হ্রদ ঐ রাত্রে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়। তাহাতে আর পানি আসে নাই। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সিরিয়া এলাকার ঐরূপ একটি জলাশয়েও হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিরাট পরিবর্তন আসে, তাহার পানি অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। ইঙ্গিত ছিল যে, পারস্য ও রোমর তৎকালীন বৃহৎ কাফেরী শক্তিসমূহের শৌর্য-বীর্যে ভাঁটা আসিয়া গেল; ঐসব আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।* (যোরকানী, পৃষ্ঠা–১২১)

গগন-ভুবনের স্বাগত ধ্বনি, নিখিলের অভিনন্দন-অভ্যর্থনা এবং অলৌকিকের মহাসমারোহ-শোভাযাত্রার মাঝে শুভাগমন হইল মহান অতিথির– যাঁহার আগমনপানে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল সারা প্রকৃতি, অধীর আগ্রহে প্রহর গুনিতেছিল সারা সৃষ্টি। ধরণীপৃষ্ঠে শুভজন্ম তথা রূহানী দুনিয়া হইতে বস্তু জগতে পদার্পণ এবং নূরানী আত্মার নূরানী দেহসহ জড় দেহের আবরণে আবির্ভাব হইল পেয়ারা

সমালোচনা ঃ মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মোস্তফা চরিতের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের মস্ত বড় বাতিক তিনি নবীগণের মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। এই বাতিকেই তিনি কোরআন-হাদীছে হাতুড়ে হইয়াও বহু ঐতিহাসিক সত্যকে এবং সহীহ হাদীছকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ ব্যাধিবশে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভ জন্মোপলক্ষের উল্লিখিত ঘটনাবলী নগ্ন ও অভদ্র ভাষায় অবাস্তব সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার রুগ্ন রুচি এইসব ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ভালবাসে না বিধায় এইসব ঘটনার উল্লেখ এমন বিকৃত ও অতিরঞ্জিত আকারে করিয়াছেন যে, পাঠক ঐসব সত্য যেন আপনা হইতেই বিশ্রী, ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ গণ্য করিয়া নেয়। সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কত জঘন্য অপকৌশল ইহা!

আরও অতি দুঃখের বিষয়– তিনি এইসব ঘটনা উল্লেখের সহিত নিজ হইতে দুই-একটা আজগবী অলীক কথা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন – "সমস্ত রাজসিংহাসন উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতেছিল" ইত্যাদি (পৃষ্ঠা–১৮৮)।

এতদ্ভিন্ন ১৮৭ পৃষ্ঠায় "বলিতে লজ্জা হয়" বলিয়া এমন একটা বিশ্রী অশালীন অশ্লীল কুরুচিময় বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা একমাত্র তাঁহারই গড়ানো কথা হইবে। আমরা সীরাতের কোন গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিবরণ দেখি নাই।

চতুর খাঁ সাহেব এইসব অলীক ও লজ্জাকর গর্হিত কথাগুলিকে সত্য ইতিহাসের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন অতি এক জঘন্য কুমতলবে। যেন সাধারণ পাঠক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্য ইতিহাসগুলিকেও বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করে। আমরা যেসব অলৌকিক ঘটন আলোচনা করিয়াছি তাহা পূর্ববর্তী নোটে উল্লিখিত সমুদয় নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রসূল মহানবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের!!
মারহাবা ইয়া হাবীবাল্লাহ!
মারহাবা ইয়া রসূলাল্লাহ!!
মারহাবা, ইয়া মারহাবা, ইয়া মারহাবা।
"ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সারা বিশ্বে অতি বড় এক বিরাট ঘটনা ছিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও ছিল বিশ্বজোড়া। প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিস্তারিত ঘটনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, এই প্রতিক্রিয়া নক্ষত্ররাজির উপরও পড়িয়াছিল।* তৃতীয় খণ্ডে জিন সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, ঊর্ধ্ব জগতের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল; যদ্দরুন সমগ্র জিন জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। জিনদের মধ্যে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৫৭। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৪৫) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পুত্র ছাহাবী আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) অতিশয় সঠিক অনুমান ও শুদ্ধ ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; যেকোন বিষয়ে তিনি কোন ধারণা অনুমান করিলে আমরা কখনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই।

একদা ওমর (রাঃ) বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট দিয়া একজন সুশ্রী মানুষ পথ অতিক্রম করিল। ওমর (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, আমার ধারণা অবাস্তব না হইলে এই ব্যক্তি অমুসলিম হইবে; আর যদি সে এখন মুসলমান হইয়া থাকে তবে সে পূর্বে নিশ্চয় গণক-ঠাকুর (জিন-ভূতের দ্বারা গোপন খবর সংগ্রহকারী) ছিল। এই মন্তব্য করত তিনি লোকটিকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, ওমর (রাঃ) তাহার সম্মুখেও ঐ মন্তব্য করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, একজন মুসলমানকে এইরূপে অমুসলিম সন্দেহ করা সঙ্গত কি? অর্থাৎ আমি ত মুসলমান। তখন ওমর (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত তুমি পূর্বে কি ছিলে? সে বলিল, আমি পূর্বে গণক-ঠাকুর ছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাকে বিজ্ঞাসা করিলেন, যেই জিনটির সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ছিল সে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় তোমাকে কি জানাইয়াছিল?

ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি বাজারে ছিলাম, অকস্মাৎ সেই জিনটি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, তুমি জান কি? জিনগণ এক ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। (তাহারা দীর্ঘকাল মানুষ জাতিকে নানা প্রকার গর্হিত কার্যে লিপ্ত রাখিয়া স্বৈরাচারিতা চালাইয়া যাইতেছিল, সেই অবস্থা আর তাহারা বিরাজমান রাখিতে পারিবে না বলিয়া) তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুর্দিনের সূচনা হইয়াছে, ফলে তাহারা নিজেদের সব কিছু গুটাইয়া (সাধারণ লোকালয় হইতে অনাবাদ এলাকার দিকে) দ্রুত পালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে।

ওমর (রাঃ) ঘটনা শ্রবণান্তে বলিলেন, তোমার জিনটি তোমাকে যে নূতন পরিস্থিতির খবর দিয়াছিল তাহা সত্যই ছিল। আমারও (ইসলাম পূর্বের) তদ্রূপ একটি ঘটনা আছে। একদা আমি মূর্তি ঘরে শুইয়া ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া মূর্তিগুলির সম্মুখে একটি গোশাবক বলিদান করিল, তখন বিকট আওয়াজে একটি

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবে ঊর্ধ্ব জগতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে জিন সম্পর্কীয় আলোচনায় দ্রষ্টব্য। নক্ষত্ররাজির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে ৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য। এই ক্ষেত্রে গণক-ঠাকুরের কার্যকলাপ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম টানিয়া আনা- যাহা খাঁ সাহেব করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা বোখারী শরীফের সহীহ হাদীছকে এনকার করা হইয়াছে- ইহা শুধুমাত্র প্রবঞ্চনার উদ্দেশেই হইতে পারে- যাহা খাঁ সাহেব করিয়াছেন।

ঘোষণা শুনিতে পাইলাম– তদপেক্ষা বিকট আওয়াজ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। সেই ঘোষণাটি ছিল এই– হে জালীহ্ (কাহারও নাম)! একটি সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে– যাঁহার ঘোষণা হইবে, لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্– "আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।" উক্ত আওয়াজে উপস্থিত লোকজন সকলেই ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। (ওমর (রাঃ) বলেন,) তখন আমি মনে মনে এই পণ করিলাম, এই ঘোষণাটির তথ্য সঠিকরূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত আমি ইহার পিছনে লাগিয়া থাকিব। কিছু সময় আমি তথায়ই অপেক্ষা করিলাম এবং পুনরায় ঐরূপ বিকট আওয়াজের সেই ঘোষণাই শুনিলাম– "হে জালীহ! সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার ঘোষণা হইবে–لااله الا الله অতপর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] নবীর আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেক বর্ণিত আছে। "সীরাতে হালাবিয়াহ" নামক কিতাবে অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে–

সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও এইরূপই। তিনি পূর্বে গণক-ঠাকুর ছিলেন, একটি জিন তাঁহার সংস্রবে ছিল। একদা তিনি রাত্রিবেলা তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন, তখন ঐ জিনটি আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিল এবং কয়েকটি আরবি বয়াত পড়িল, যাহার মধ্যে বনী হাশেম গোত্রে এক মহামানবের আবির্ভাবের উল্লেখও ছিল।

প্রথম দিন তিনি ঘটনার কোন গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু পর পর তিন দিন একই রূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং মক্কায় উপস্থিত হইয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কতিপয় লোকের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওয়াদ ইবনে কারেবকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং বলিলেন, তোমার আগমনের মূল ঘটনা আমি জানি। অতপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণায় কয়েকটি আরবি বয়াত পড়িলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন।

আব্বাস ইবনে মের্দাস (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণে এই ধরনের ঘটনাই বর্ণিত আছে। মাযেন (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

খাতামে নবুয়ত– নবুয়তের মোহর বা ছাপ (পৃষ্ঠা-৫০১)

মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য যেরূপ তাহার Visible sign বা Distinctive marks তথা বিশেষ চিহ্ন থাকে এবং আবশ্যক স্থলে তাহার দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তের পরিচয়ের একটি Visible sign বা Distinctive marks তথা বিশেষ চিহ্ন ছিল, তাহাকে খাতামে নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর বলা হয়। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেখানে হযরতের পরিচয়ের উল্লেখ ছিল, তথায় এই মোহরে নবুয়তের উল্লেখ বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের আলেমগণ তাহা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। ("প্রথম বহির্দেশ গমন" আলোচনায় বোহায়রা পাদ্রীর ঘটনা এবং "সিরিয়া সফরে হযরত" আলোচনায় নাস্তুরা পাদ্রীর ঘটনা দ্রষ্টব্য।) ঐ শ্রেণীর অনেককে ইসলাম গ্রহণের পূর্বক্ষণেও এই মোহরে নবুয়তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে দেখা যাইত।

ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্মীয় ব্যক্তি সাল্‌মান ফারেসী (রাঃ)– যাঁহার উল্লেখ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, তিনি শেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ঐতিহাসিক সাধনা করিয়া শেষ পর্যন্ত মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের উদ্দেশে হযরতের পিছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হযরত (সঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, সালমান তাঁহার মোহরে নবুয়ত দেখিতে চাহিতেছে, তাই হযরত (সঃ) গায়ের চাদর কাঁধের উপর হইতে একটু ছাড়িয়া দিয়া মোহরে নবুয়তের স্থান উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সালমান তাহা দেখামাত্র চুম্বন করত বলিয়া উঠিলেন اشهد انك رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (যোরকানী, ১-১৫৪)

মোহরে নবুয়তের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ণরূপে বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। তাহা হযরতের পৃষ্ঠে কাঁধদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল, ঠিক মধস্থলে নহে, বরং একটু বাম দিকে, বাম কাঁধের চৌড়া হাড়ের মাথা বরাবর স্থানে ছিল। চামড়ার নীচে ঊর্ধ্বমুখী একটি গুটলির ন্যায় ছিল, পরিমাণে কবুতরের ডিমের ন্যায় কতিপয় লোমে বেষ্টিত ছিল। তাহা হইতে মেশকের সুগন্ধি অনুভূত হইত। তাহার উপর নূর পরিদৃষ্ট হইত।

প্রথম খণ্ডে ১৪২ নং হাদীছ- সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার খালা আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই ভাগিনাটি রুগ্ন। তৎক্ষণাৎ হযরত (সঃ) আমার মাথার উপর হাত বুলাইলেন আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করিলেন এবং অযূ করিলেন; আমি তাঁহার অযূর অবশিষ্ট বা অঙ্গ-ধৌত পানি পান করিলাম। অতপর আমি হযরতের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমি তাঁহার মোহরে নবুয়ত দেখিয়াছি; তাহা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যভাগে ছিল। পরিমাণে নববধূর জন্য নির্মিত সুসজ্জিত তাঁবুরূপী সামিয়ানার ঘুন্টির ন্যায়।

মোহরে নবুয়তের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য আলোচ্য হাদীছে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আরব দেশে সচরাচর ব্যবহৃত বস্তু ছিল। আমাদের পক্ষে সহজ দৃষ্টান্ত মুসলিম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে- "কবুতরের ডিমের ন্যায়"।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মোহরে নবুয়ত হযরতের জন্মগত ছিল না পরে সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। পরে সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্তেও কাহারও মতে দুধমাতার নিকট থাকাকালে বক্ষ বিদীর্ণ করার সময়, কাহারও মতে নবুয়তের বিকাশকালে, কাহারও মতে মে'রাজ উপলক্ষে। (যোরকানী, -১৬০)

হযরতের নাম (পৃষ্ঠা-৫০০)

নবীজীর নামকরণ সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা বিবি আমেনা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার গর্ভকাল ছয় মাস অতিক্রম হইলে একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক আগন্তুক আমাকে বলিতেছে, বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ। ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখিবে "মুহাম্মদ"। * আর তুমি এই স্বপ্ন গোপন রাখিও। (যোরকানী, ১-১১১)

দ্বিতীয় বর্ণনা- নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিন তাঁহার দাদা খাজা আবদুল মোত্তালেব মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিলেন। সেই উৎসবের দিন আব্দুল মোত্তালেব নবীজীর খাত্‌নার সামাজিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার নাম রাখিলেন "মুহাম্মদ"। অনেকের মতে হযরত (সঃ) জন্মগতভাবেই খত্‌নাকৃত ছিলেন। (যাদুল মাআদ)

নামকরণ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। "মুহাম্মদ" নামকরণের আসল উৎস বিবি আমেনার স্বপ্ন। নবীজী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই বিবি আমেনা খাজা আবদুল মোত্তালেবকে সংবাদ পাঠাইলেন, আপনার বংশের চেরাগ একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; আপনি আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। আবদুল

---

* **সমালোচনা ঃ** "মোস্তফা চরিত" এবং "বিশ্বনবী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের পণ্ডিত লেখকগণ আলোচ্য স্বপ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম "আহমদ" লিখিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির কোন সূত্র আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা সীরাত শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ দেখিয়াছি; বিশেষতঃ মোস্তফা চরিতের ফুট নোটে যে, "কামেল" কিতাবের নাম উল্লেখ আছে, তাহারও মূল কিতাব দেখিয়াছি। সর্বত্রই বিবি আমেনার স্বপ্নের আলোচনায় "মুহাম্মদ" নাম উল্লেখ রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য চলিতে পারে না।

মোত্তালেব ছুটিয়া আসিলেন এবং আদর-সোহাগের সহিত নবজাতক শিশুকে দেখিলেন। তখন বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং নাম সম্পর্কে যে আদেশ পাইয়াছিলেন সব কিছু খুলিয়া বলিলেন। আবদুল মোত্তালেব নবাগত শিশুকে কোলে লইয়া আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে গেলেন এবং দাঁড়াইয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিলেন, শোকরগুজারী করিলেন। (সীরাতে ইবনে হেশাম-১৬০)

সুতরাং আবদুল মোত্তালেব ঐ স্বপ্নের আদেশ নিশ্চয়ই মনে রাখিয়াছেন এবং চিরাচরিত নিয়মানুসারে সপ্তম দিন আনন্দ উৎসরেব মাঝে সে স্বপ্নাদিষ্ট "মুহাম্মদ" নাম আনুষ্ঠানিকরূপেই নির্ধারিত করিয়াছেন। "ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

১৬০। হাদীছ ঃ عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِى الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ ঃ জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার বিশিষ্ট নাম পাঁচটি; যথা- আমার নাম "মুহাম্মদ", আমার নাম "আহমদ" এবং আমার নাম "মাহী" তথা মূলোচ্ছেদকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফরীর মূলোচ্ছেদ করিবেন এবং আমার নাম "হাশের"- সর্বপ্রথম ময়দানে হাশরের দিকে অগ্রগামী; ময়দানে হাশরের দিকে অগ্রসর হওয়া কালীন সমস্ত লোক আমার পদাঙ্কে অগ্রসর হইবে এবং আমার নাম "আকেব"-সর্বশেষে আগমনকারী, (আমার পর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ "মুহাম্মদ" অর্থ অধিক প্রশংসিত; সৃষ্টিকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিনিচয় পর্যন্ত সকলের প্রসংসার পাত্র তিনি; তাই তাঁহার জন্য এই নাম পূর্ব হইতেই বিধাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিল।" "আহমদ" অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী, আল্লাহ তাআলার প্রসংশাকারীদের মধ্যে হযরত (সঃ) অন্যতম একজন হইবেন, তাই তাঁহাকে পূর্ব হইতেই এই নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এবং নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি উক্ত দুই নামে বিশেষত "আহমদ" নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য নাম সমূহের তাৎপর্য মূল হাদীছেই ব্যক্ত হইয়াছে।

১৬৬১। হাদীছ ঃ

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি! আমার শত্রু কাফের কোরায়শরা আমার প্রতি যেসব গালি ও ভৎর্সনা প্রয়োগ করিয়া থাকে ঐ সবকে আল্লাহ তাআলা কিরূপে আমা হইতে সরাইয়া রাখিতেছেন!

তাহারা "মোজাম্মাম" নাম বলিয়া গালি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে, অথচ আমি ত "মুহাম্মদ" নামের।

ব্যাখ্যা ঃ "মুহাম্মদ" শব্দের অর্থ অত্যধিক প্রশংসিত। কাফের শত্রুরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গ্লানি করাকালে তাঁহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করিত না যেই নামের মূলে প্রশংসিত হওয়ার অর্থ রহিয়াছে, "মুহাম্মদ" নামের পরিবর্তে "মোজাম্মাম" শব্দ ব্যবহার করিত, যাহার অর্থ "জঘন্য কলুষিত"।

হযরত (সঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবীদের সম্মুখে করুণাময় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন যে, কি আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে শত্রুর গ্লানি হইতে বাঁচাইয়াছেন। শত্রুর মুখের বাক্য আমার জন্য রক্ষাকবচ হইয়াছে। তাহারা "মোজাম্মাম" নামের ব্যক্তিকে গালি দেয়, আমার ত ঐ নাম নহে, আমার নাম "মুহাম্মদ"।

হযরতের "মুহাম্মদ" নাম আরশের গায়েও লেখা ছিল এবং হযরত মূসার উপর যে তওরাত কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল- সেই তওরাত কিতাবেও যেখানে হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং পরিচয় ও গুণাগুণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানেও "মুহাম্মদ" নাম উল্লেখ হইয়াছে।

কা'বে আহ্‌বার ও যিনি তওরাত কিতাবের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং তিনি তওরাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবেই ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কা'ব আহ্‌বার হইতে "মোসনাদে দারেমী" কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনটি রেওয়ায়াত উল্লেখ হইয়াছে- কা'বে আহ্‌বার বলিয়াছেন, তওরাত কিতাবে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল হইবেন, তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় এই এই হইবে।"

বিশেষতঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'বে আহ্‌বারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-

كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة -

অর্থ ঃ "তওরাত কিতাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় ও গুণাবলীর বিবরণ কিরূপ পাইয়াছেন?" কা'বে আহ্‌বার তদুত্তরে বলিয়াছেন-

نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر الى طيبة -

অর্থ ঃ "আমরা তওরাতে তাঁহার সম্পর্কে এই পাইয়াছি যে, তাঁহার নাম হইবে "মুহাম্মদ," আবদুল্লাহর পুত্র, মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তায়বা তথা মদীনায় হিজরত করিবেন।"

"মুহাম্মদ" অর্থ চরম প্রশংসিত। সারা বিশ্ব এবং বিশ্বাধিপতি রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রশংসামুখর এবং তিনি সর্বজনীন প্রশংসিত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইবেন, তাই সৃষ্টিকর্তা তাঁহার জন্য আদিকাল হইতেই এই মহান নাম নির্বাচিন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজীর প্রশংসা পবিত্র কোরআনে অনেক রহিয়াছে। যথা-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থ ঃ "হে বিশ্ববাসী! তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে বিশেষ নূর-আলো বা সত্যের দিশারী তথা রসূল মুহাম্মদ (সঃ) আসিয়াছেন এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব আসিয়াছে। সেই দিশারী এবং কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ তাঁহার সন্তুষ্টির আসক্ত ব্যক্তিকে শান্তির পথে পরিচালিত করিবেন এবং সকল প্রকার অন্ধকার মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আলোর দিকে নিয়া আসিবেন নিজ কৃপায় এবং তাহাদিগকে সত্য-সরল পথের দিকে পারিচালিত করিবেন।" (পারা-৬, রুকু-৭)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ ঃ "তোমাদের নিকট আসিয়াছেন এই রসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত। তোমাদের ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের লালায়িত, ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান দয়ালু, (পারা-১১, রুকু-৪)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ۔

অর্থ ঃ "যাহারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী ও তাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাদের জন্য রসূলুল্লাহ উত্তম আদর্শ।"(পারা-২১; রুকু- ১৯)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "সারা জাহানের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের বাহকরূপে এবং আমার আশীর্বাদরূপে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। -(পারা-১৭, রুকু-৭)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে পাঠাইয়াছি সত্যের মাপকাঠিরূপে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আল্লাহরই আদেশ মতে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোরূপে।" (পারা-২২, রুকু-৩)।

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ ۔

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সত্যের বাহক বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি।"(পারা-২২, রুকু-১৫)

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আপনি আমার রসূলগণের একজন এবং আপনি সত্য-সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।" (পারা-২২, রুকু-১৮)

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ۔

অর্থ ঃ "শপথ করিয়া বলি, তোমাদের নবী সঠিক-সত্য পথ হইতে চুল মাত্রও বিচ্যুৎ নহেন, ভ্রান্তির লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে নাই! তিনি প্রবৃত্তির বশে কোন কথা বলেন না; একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত কথাই বলেন" (পারা-২৭, রুকু-৫)

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

অর্থ ঃ "নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী।" (পারা-২৯, রুকু-৩)

এতদ্ভিন্ন পূর্বের আসমানী কিতাবেও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজীর অনেক প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে। যথা- প্রতিশ্রুত নবীর জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যে ঘোষণা হইবে তাহার উদ্ধৃতি তওরাতে নিম্নরূপ ছিল-

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّحِرْزًا لِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا ۔

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের মীমাংসাকারীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে শিক্ষা-দীক্ষাহীন লোকদের জন্য মুক্তির দিশারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত রসূল। আপনার একটি বিশেষ গুণ আমার প্রতি ভরসা স্থাপন; তাহার প্রতীকস্বরূপ আপনার এক নাম 'মোতাওয়াক্কেল' রাখিলাম ('মোতাওয়াক্কেল' অর্থ আল্লাহর উপর ভরসাকারী)।

আমার এই নবী কোমল হৃদয়, বিনীত, ভদ্র-সভ্য ও সৎ সাধু হইবেন– রুষ্ট প্রকৃতির হইবেন না। বাজারে যাইয়াও শালীনতার সহিত কথা বলিবেন– চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। খারাপ ব্যবহারের উত্তর খারাপ ব্যবহার দ্বারা দিবেন না– ক্ষমা করিবেন।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়া হইতে তাঁহার বিদায় মঞ্জুর করিবেন না যাবত না তাঁহার দ্বারা বক্র সম্প্রদায়কে সোজা করেন যে, তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তি করে এবং যাবত না এই কালেমার দ্বারা অন্ধ চোখে জ্যোতি সৃষ্টি করেন, বন্ধ কানকে খুলিয়া দেন, আবদ্ধ অন্তকরণ উন্মুক্ত করেন।

(মেশকাত শরীফ, ৫১৬)

১৬৬২। হাদীছ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী আলেম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট কয়েকটি দীনার স্বর্ণমুদ্রা পাইত; সে তাহার তাগাদায় আসিল। নবী (সঃ) বলিলেন, এখন আমার নিকট তোমার ঋণ পরিশোধের কিছু নাই। ইহুদী বলিল, আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে বসিব; সেমতে হযরত (সঃ) ঐ ইহুদীর সঙ্গেই বসিয়া থাকিলেন, এমনকি জোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায ঐ অবস্থায় পড়িলেন। ছাহাবীগণ চুপি চুপি ঐ ইহুদীকে ভয় দেখাইতেছিলেন এবং ধমকাইতে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহা অনুভব করিতে পারিলেন; ছাহাবীগণ (ভাবিলেন, হযরত তাঁহাদের প্রতি রাগ হইবেন, তাই তাঁহারা) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এক ইহুদী আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, অমুসলিম প্রজার প্রতিও অন্যায় করিতে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

পর দিন এই অবস্থায় অনেক বেলা হইলে ইহুদী ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং বলিল, আমার অর্ধেক ধন-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করিলাম। সে আরও বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলা আপনার যে প্রশংসা তওরাত কিতাবে করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করা যে– "তিনি মুহাম্মদ– পিতা আবদুল্লাহ, তাঁহার জন্মস্থান মক্কায়, হিজরতের দেশ "তায়বা" তাঁহার রাজ্য অচিরেই সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছিবে, তিনি কঠোর প্রকৃতির রুক্ষ মেজাজের হইবেন না। (ভদ্র ও সভ্য-শালীন হইবেন যে,) বাজারেও চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। অশ্লীল আচার-ব্যবহার ও অশ্লীল কথা হইতে পাক-পবিত্র হইবেন।" এই বলিয়া সে পুনরায় স্বীকৃতি ঘোষণা করিল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। ঐ ইহুদী বড় ধনাঢ্য ছিল; তাহার সমুদয় মাল হযরতের অধীনে দিয়া দিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসার চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেন যখন তিনি স্বয়ং তাঁহারই সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ)-কে স্বীয় "হাবীব" বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পী যখন কোন একটি বিশেষ বস্তুকে তাঁহার পছন্দনীয় সমুদয় গুণ-গরিমা মাধুরী-সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে গড়েন এবং তাহা তাঁহার মনমত ও মনপূত হয় তখনই তিনি তাঁহার হাতে গড়া বস্তুটিকে ভালবাসেন, তাহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আসক্তি জন্মে। সুতরাং কোন শিল্প বস্তুর প্রতি স্বয়ং শিল্পীর ভালবাসা আকর্ষণ শিল্পী কর্তৃক উক্ত বস্তুর চরম প্রশংসা এবং সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের মহা সনদই বটে।

বিশ্ব শিল্পী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে এমন এবং এতই ভালবাসিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "হাবীবুল্লাহ"– আল্লাহ তাআলার বন্ধু বা দোস্ত আখ্যা দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ ...... وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আমি একটি তথ্য প্রকাশ করিতেছি- গর্ব করার উদ্দেশে নহে, ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে দোস্তী করিয়াছেন, আর আমি "হাবীবুল্লাহ" অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ আমার সঙ্গে দোস্তী করিয়াছেন- আমাকে দোস্ত বানাইয়াছেন।"

মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়াছেন- চরম ভালবাসা দিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার আকার-আকৃতি তথা অনুসরণ-অনুকরণ অবলম্বন করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকেও ভালবাসিবেন। এই তথ্য স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়াছেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ "হে আমার প্রিয়নবী! আপনি বিশ্ববাসীকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ-অনুকরণ কর, তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। (পারা-৩, রুকু-১২) এই আয়াতের মর্ম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলার চরম ভালবাসার পাত্র হওয়ার এক উজ্জ্বল প্রমাপ; আর ইহাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ার মহা সনদ।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ অবলম্বনে যে কেহ ধন্য হইতে পারিবে সে-ই আল্লাহ তাআলার ভালবাসার পাত্র হইবে, অতএব স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) যে আল্লাহ তাআলার কিরূপ ভালবাসার পাত্র তাহা পরিমাণ করা যাইতে পারিবে কি? আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক এইরূপ ভালবাসা দান তাঁহার চরম প্রশংসা।

আল্লাহ তাআলা আদর-সাহাগ করিয়া নিজের 'মাহমুদ' নামের ধাতু হইতে 'মোহাম্মদ' নাম বাহির করিয়াছেন। এস্থলে আদর-সোহাগের কি বিচিত্র এবং সীমাহীন বিকাশ যে, 'মাহমুদ' অর্থ প্রশংসিত এবং 'মুহাম্মদ' অর্থ চরম প্রশংসিত।

এই তথ্যটি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবী- বিশিষ্ট কবি হাস্‌সান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন-

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ ـ فَذُوْ الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ ـ

অর্থঃ আল্লাহ (আদর-সোহাগ করিয়া) নিজের নাম হইতে তাঁহার নাম বাহির করিয়াছেন, অধিকন্তু মহান আরশের অধিপতি (আল্লাহ) হইয়াছেন 'মাহমুদ' নামের (যাহার অর্থ প্রশংসিত) এবং হযরতের নাম হইল 'মুহাম্মদ' (যাহার অর্থ চরম প্রশংসিত)।*

হযরতের দ্বিতীয় অন্যতম নাম 'আহমদ'। ইঞ্জীল কিতাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মুখে তিনি এই নামেই অধিক ব্যক্ত হইয়াছেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ঘোষণা দিয়া থাকিতেন, "আমার পরে এক নবী আসিতেছেন, তাঁহার নাম হইবে আহমদ।"

'আহমদ' অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী তিনি হইবেন, তাই আদি হইতেই তাঁহাকে 'আহমদ' নামে ভূষিত করা হইয়াছিল।

এই দুইটি প্রসিদ্ধ নাম ছাড়া হযরতের আরও গুণবাচক অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে তিনটি নামের উল্লেখ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাৎপর্যও বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের আরও অনেক নাম প্রচলিত আছে, যথা- 'মোতাওয়াক্কেল', অর্থ আল্লাহর প্রতি ভরসা স্থাপনকারী। আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা স্থাপনের গুণটি নবীজী (সঃ)-এর

---

* আদর-সোহাগভরা 'মুহাম্মদ' নামের বিশ্লেষণে কবি হাস্‌সান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উল্লিখিত উক্তিও আল্লাহ তাআলার নিকট অতি মকবুল ও পছন্দনীয় হইয়াছে। এমনকি এক বিশিষ্ট বুযুর্গ বলিয়াছেন, উল্লিখিত বয়াতটির নিম্নের আঙ্গিক নক্‌শা একটি কাগজ খণ্ডে লিখিয়া সন্তান প্রসবকালীন বিপদগ্রস্ত প্রসূতির গলায় লটকাইয়া দিলে তাহার উপর আল্লাহর রহমত নামিয়া আসিবে এবং সহজ-সরলভাবে সন্তান প্রসব করিবে।

নক্শাটি এই –
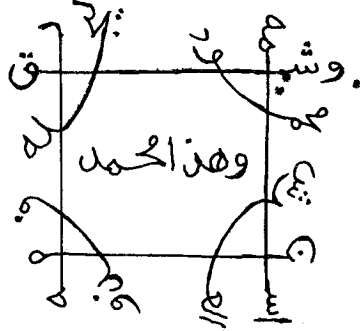
মধ্যে যে পরিমাণ ছিল তাহার পরিমাপও অন্যের জন্য সম্ভব নহে। একটি ঘটনাদৃষ্টে সামান্য অনুমান করা যায় মাত্র। মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের সফরে নবীজী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-সহ 'সওর' পর্বত গুহায় লুক্কায়িত আছেন; মক্কার রক্ত-পিপাসু শত্রু দল তাঁহাদেরকে খোঁজ করিতে করিতে ঠিক সেই গুহার কিনারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনকি গুহার ভিতরস্থ আবু বকরের দৃষ্টিতে ঐ শত্রু দলের পা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবু বকর (রাঃ) বিচলিত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শত্রুরা নিজ পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। সেই মুহূর্তেও নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, لا تحزن ان الله معنا- ""বিচলিত হইও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (কোরআন শরীফ)

নবীজী (সঃ)-এর এই নামটি (অর্থাৎ মোতাওয়াক্কেল) পূর্বের আসমানী কিতাব তওরাতেও উল্লেখ ছিল।

"আমীন" অর্থ শান্তিকামী, বিশ্বস্ত। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট সকলের নিকটই তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন। 'বশীর' অর্থ মুমিনদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দানকারী, 'নাজীর' আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ককারী। 'আবদুল্লাহ'– আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা, পবিত্র কোরআনে সূরা জিন-এর মধ্যে এই নামটি স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। আব্দিয়ত তথা আল্লাহর দরবারে আত্মনিবেদিত হওয়া নবীজীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সাইয়্যেদ' অর্থ সর্দার বা প্রধান, নবীজী নিখিল সৃষ্টির প্রধান, নবী ও রসূলগণের প্রধান। 'মোকাফ্‌ফা' অর্থ সর্বশেষে প্রেরিত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর ছিলেন। 'নবীউত্ তওবা' অর্থ তওবার নবী; নবীজী (সঃ) গোনাহমুক্ত হইয়াও তওবা করা অতি ভালবাসিতেন। হযরত (সঃ) বলিতেন, হে লোকসকল! তোমরা প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে তওবা করিও; আমিও প্রতিদিন একশত বার তওবা করিয়া থাকি। নবীজী (সঃ)-এর সম্মানে তাঁহার উম্মতের তওবা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় অধিক শীঘ্র ও সহজে কবুল হইয়া থাকে। 'নবীউল মাল্হামাহ' অর্থ জেহাদী নবী। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মতের ন্যায় এত অধিক জেহাদ আর কোন নবী এবং তাঁহার উম্মতের দ্বারা হয় নাই। 'সিরাজুম মুনীর' অর্থ দীপ্ত সূর্য; কুফরী, শেরেকী ও গোমরাহীর অন্ধকার দূরীকরণে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দীপ্ত সূর্য অপেক্ষা অধিক ভাস্কর ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আল্লাহর গুণবাচক নাম হইতে কোন কোন নাম নবীজীর জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে। যথা--- 'রউফ' অর্থ অতিশয় স্নেহশীল, 'রহীম' অর্থ অতিশয় দয়ালু।

হযরতের উপনাম (পৃষ্ঠা-৫১০)

১৬৬৩। হাদীছ ঃ عَنْ اَنَس رضى الله تعالى عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِىْ السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْه النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ (لَمْ اَعْنِكَ) اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ ـ

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বাজারে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসেম'! বলিয়া (কোন ব্যক্তিকে) ডাকিল। হযরত নবী (সঃ) (যেহেতু আবুল কাসেম নামে পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি) পেছন দিকে তাকাইলেন। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ত (আবুল কাসেম বলিয়া) আপনাকে উদ্দেশ করি নাই; আমি ঐ (অপর) ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি! তখন হযরত নবী (সঃ) বলিলেন, তোমরা আমার আসল নামের অনুকরণে নাম রাখিতে পারিবে, কিন্তু আমার যে উপনাম আছে অন্য কেহ সেই উপনাম অবলম্বন করিতে পারিবে না।

১৬৬৪। হাদীছ ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ -

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আসল নামের অনুকরণে তোমরা নাম রাখিতে পার, কিন্তু আমার উপনামের অনুকরণে উপনাম অবলম্বন করিও না। কারণ, (আমার উপনাম 'আবুল কাসেম'– যাহার অর্থ অতি বেশী বণ্টনকারী– আল্লাহ তাআলার কল্যাণ ও মঙ্গল ভাণ্ডার) আমি তোমাদের মধ্যে সদা বণ্টন করিয়া থাকি। (পৃষ্ঠা–৯১৫)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ উপনাম ছিল 'আবুল কাসেম' যাহার শব্দার্থ– বণ্টনকারীর পিতা। এই উপনামের একটি সাধারণ সূত্র এই ছিল যে, হযরতের বড় ছেলের নাম 'কাসেম' ছিল, অতএব তিনি আবুল কাসেম– কাসেমের পিতা ছিলেন। এই সূত্রেই ইহুদী-নাসারারা হযরত (সঃ) কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিত।

কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার এই উপনাম শুধু শাব্দিক অর্থ– কাসেমের পিতা হওয়া সূত্রেই ছিল না বরং এই উপনামের মধ্যে হযরতের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুণের প্রকাশও ছিল। 'আবুল কাসেম' অর্থ সদা বিতরণকারী; দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের যে ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করিয়াছিলেন তাহা তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সদা বণ্টন করিয়া থাকিতেন, যদ্দারা তিনি رحمة للعلمين রাহ্‌মাতুল-লিল আ'লামীন তথা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত বা কল্যাণ মঙ্গলের উৎস ছিলেন। এমনকি এই গুণ তাঁহার একটি বিশেষ নামরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই রাহ্‌মাতুল-লিল আলামীন গুণ বা নামের একটি বিশেষ অধ্যায় 'আবুল কাসেম' উপনামে ব্যক্ত হইয়াছে।

হযরত (সঃ) তাঁহার নামের অনুকরণে নাম রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপনাম অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে, যাহার আসল কারণ এই যে, অনেকে বিশেষতঃ ইহুদী-নাসারাগণ এবং তাহাদের দেখাদেখি নবাগত লোকগণ সাধারণতঃ হযরত (সঃ)-কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিত। এমতাবস্থায় যদি অন্য কাহারও এই নাম থাকে, তবে যখন তাহাকে সম্বোধন করা হইবে তখন স্থানবিশেষে অযথা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে এবং তিনি বিব্রত হইবেন; তাই উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল, কিন্তু মদীনায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হযরতকে সাধারণতঃ তাঁহার আসল নামে কেহ সম্বোধন করিত না, তাই ঐ নামে সম্বোধনের বেলায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং ঐ নামের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই। এই সূত্রেই অধিকাংশ আলেমের মতে 'আবুল কাসেম' নাম অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা হযরতের জীবৎকাল পর্যন্ত বলবত ছিল, তাঁহার পরে সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া গিয়াছে।

হযরতের দুগ্ধপান

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হযরত (সঃ) সাত বা নয় দিন স্বীয় মাতা বিবি আমেনার দুগ্ধপান করিয়াছেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী 'সুওয়াইবা' মাত্র কতিপয় দিন দুগ্ধপান করাইয়াছিলেন; স্থায়ী ধাত্রীর অপেক্ষায় ইহা

অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল মাত্র। ইতিমধ্যে আরবের প্রথানুযায়ী সা'দ গোত্রীয় ধাত্রী রমণীদের একটি দল মক্কায় পৌঁছিল; তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবতী হালিমাও ছিলেন। বিবি হালিমার নিজ বর্ণনা–

আমি আমার সা'দ গোত্রীয় ধাত্রী মহিলাদের সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কাপানে যাত্রা করিলাম। এই বৎসর আমাদের অঞ্চলে অভাব ছিল; অনাহারে আমার দুগ্ধ খুবই কম হইয়া গিয়াছিল। আমার নিজের যে একটি পুত্র সন্তান ছিল তাহার জন্যই আমার দুধ যথেষ্ট হইত না; ক্ষুধায় সে কাঁদিত; তাহার কান্নায় আমাদের নিদ্রাও পূর্ণ হইত না। আমাদের একটি উট ছিল, ঘাসের অভাবে তাহার দুধ ছিল না। এতদসত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় আমাকে ধাত্রী ব্যবসায় নামিতে হইল। আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়াছিলাম, গাধাটিও ক্ষীণ ও দুর্বল ছিল; সঙ্গীদের সহিত চলিতে পারিত না; বহু কষ্টে মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইলাম।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এতীম শুনিয়াধাত্রী মহিলারা কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। এদিকে বিবি হালিমার দুধ কম দেখিয়া কেহই তাঁহাকে শিশু দিল না। হালিমার দুগ্ধ কম হওয়াই তাঁহার সৌভাগ্য নক্ষত্র উদিত হওয়ার কারণ হইল।

হালিমার বর্ণনা– আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, খালি হাতে বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা ঐ এতীম শিশুটিকে নিয়া যাওয়া উত্তম। স্বামীর মতামতও তাহাই হইল; সেমতে আমি এতীম মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে আমার অবস্থানে নিয়া আসিলাম। তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিয়া বরকত-মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখিতে পাইলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার আসিয়া গেল। তিনি এবং আমার ছেলে উভয়েই পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া দুধ পান করিল। আমাদের সঙ্গে যে শুষ্ক দুর্বল উটটি ছিল উহাকেও দেখিলাম, উহার কুচ দুধে ভরিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী দুধ দোহাইয়া আনিলেন; আমরা সকলে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আজ আমরা দীর্ঘ দিন পর রাত্রে শান্তির নিদ্রা উপভোগ করিলাম। এখন আমার স্বামীও বলিতে লাগিলেন, শিশুটি ত অত্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় দেখা যাইতেছে!

আমরা শিশুকে লইয়া মক্কা হইতে যাত্রা করিলাম; এইবার আমার বাহন গাধাটি এত দ্রুতগামী হইয়া গেল যে, সঙ্গীদের কাহারও বাহন তাহার সঙ্গে চলিতে সক্ষম নহে। এমনকি এই অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহা কি তোমার পূর্বের বাহনটি?

আমরা ঐ শিশুকে লইয়া গৃহে পৌঁছিলাম; দেশে তখন ভয়াবহ অনাবৃষ্টি এবং অভাব ছিল; পশুর দুগ্ধ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু আমি বাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বকরীগুলি দুধে পূর্ণ হইয়া গেল; প্রতিদিন আমার বকরী দল মাঠ হইতে দুধে পরিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে; অন্যদের বকরীতে মোটেই দুধ হয় না। দেশীয় লোকগণ তাহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিত, হালিমার বকরী দল যথায় চরে, আমাদের পশুপালও তথায়ই চরাইও। কিন্তু একই স্থানে চরা সত্ত্বেও অবস্থা এইরূপই হইত। দুগ্ধ পানের দু'টি বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমরা এইরূপ বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণ সর্বদাই উপভোগ করিয়াছি। (সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া– ২৭)

দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ নিয়মানুসারে বালক মুহাম্মদ (সঃ)-কে লইয়া আমি তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শিশুর বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণদৃষ্টে আমার মন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি ছিল না। ঘটনাক্রমে ঐ সময় মক্কায় প্লেগের মহামারী ছিল; আমার একটু সুযোগ হইল; আমি বিবি আমেনাকে বুঝাইলাম, এখন শিশুকে মক্কায় রাখা ভাল হইবে না; তিনি শিশুকে আমার নিকট রাখিতে সম্মত হইলে পুনরায় তাঁহাকে লইয়া আমার দেশে পৌঁছিলাম।

একদা বালক মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার দুধ ভাইয়ের সঙ্গে গৃহের নিকটেই পশুপালের রাখালীতে ছিলেন; হঠাৎ দুধভ্রাতা দৌড়িয়া আসিল এবং আমার ও তাহার পিতার নিকট বলিল, আমার কোরায়শী ভাইকে সাদা পোশাকে পরিহিত দুই ব্যক্তি ধরাশায়ী করিয়া তাহার পেট ফাঁড়িয়া ফেলিয়াছে; আমি তাহাকে এই অবস্থায়ই রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

এই সংবাদে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দৌড়াইয়া ছুটিলাম; আমরা যাইয়া দেখি বালক মুহাম্মদ (সঃ) ভীত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি ঘটনা? তিনি বলিলেন, সাদা পোশাকের দুই ব্যক্তি আমাকে শায়িত করিয়া আমার বক্ষ চিরিয়াছে এবং কি যেন তালাশ করিয়া বাহির করিয়াছে– আমি তাহা পূর্ণ জ্ঞাত নহি। আমরা তাঁহাকে বাড়ী নিয়া আসিলাম। স্বামী আমাকে বলিলেন, হালিমা! মনে হয় বালকটির উপর জিনের আছর হইয়াছে; খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আস। সেমতে আমি বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মাতার নিকট পৌঁছিলাম।

বিবি আমেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত অনুরোধ করিয়া পুনঃ নেওয়ার পর নিজেই ফিরাইয়া আনিলে কেন? আমি বলিলাম, এখন বুঝ-জ্ঞানের হইয়াছে, আমারও যাহা করার করিয়াছি, তাই এখন নিয়া আসিয়াছি। বিবি আমেনা বলিলেন, ব্যাপার ইহা নহে; সত্য বল। তখন আমি সব ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। বিবি আমেনা বলিলেন, তোমার আশঙ্কা– তাঁহার উপর ভূতের আছর হইয়াছে! খোদার কসম– এই ছেলের উপর কস্মিনকালেও তাহা হইতে পারে না। আমার ছেলের অনেক অবস্থাই অসাধারণ, এই বলিয়া বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়াকালের অনেক ঘটনা শুনাইলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ছিল "শাক্কে সদর" বা বক্ষ বিদারণ; যাহার বিস্তারিত বিবরণ এক বিশেষ শিরোনামায় বর্ণিত হইবে। ইহা হযরতের এক বিশেষ মোজেযা। এইবারের বক্ষ বিদারণই হযরতের সর্বপ্রথম 'শাক্কে সদর' ছিল; এই সময় হযরতের বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইহা ঘটিয়াছিল কাহারও মতে তৃতীয় বৎসরে, কাহারও মতে চতুর্থ বৎসরে, কাহারও মতে পঞ্চম বৎসরে। তবে ইহা সর্বসম্মত যে, এই ঘটনা বিবি হালিমার নিকট থাকাবস্থায় ঘটিয়াছিল এবং এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই বিবি হালিমা হযরত (সঃ)-কে তাঁহার মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন– (যোরকানী, ১–১৫০)।

এই সম্পর্কে হাদীছও আছে ঃ

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বাল্যাবস্থায় বালকদের সহিত খেলায় ছিলেন; এমতাবস্থায় জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিলেন। অতপর হৃৎপিণ্ড (কাটিয়া তাহা) হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আপনার দেহের মধ্যে যে শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) ঐ হৃৎপিণ্ডকে স্বর্ণের তশতরিতে রাখিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তারপর কাটা হৃৎপিণ্ডটি জোড়া লাগাইয়া দিলেন এবং যথাস্থানে তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়া দিলেন।

এই সময় বালকগণ দৌড়াইয়া নবীজীর দুধ মাতার নিকট আসিয়া বলিল মুহাম্মদকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহারা সকলে বালক নবীজীর নিকট পৌঁছিল; তখন নবীজীর চেহারা বিবর্ণ ছিল। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর বক্ষে আমি সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকিতাম। (মুসলিম শরীফ, মেরাজ বর্ণার সংলগ্নে)

উক্ত ঘটনা যে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে নবীজীর বাল্যাবস্থা ছিল, দ্বিতীয় প্যারায় তাহা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।*

---

* **সমালোচনা ঃ** সীরাত সঙ্কলনে কলম ধরিলেই অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আলোচনা আসে। কারণ, নবীগণের ব্যক্তিত্ব ছিল অতি অসাধারণ; নবীগণের নবী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথা ত আরও একধাপ উর্ধ্বে। আর আল্লাহ তাআলার কুদরত ত অসীম। কিন্তু কোন অস্বাভাবিক ঘটনার আলোচনা আসিলেই নিশেষ বাতিক-ব্যাধিগ্রস্ত মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের কথা মনে আসে যে, মোস্তফা চরিতে এই সম্পর্কে নিশ্চয় গোলমাল করা হইয়া থাকিবে।

ইসলামের দুই ভিত্তি কোরআন ও সুন্নাহ; সুন্নাহ তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই কিতাব– বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর 'শাক্কে সদর' বা বক্ষ বিদারণ মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ত বোখারী শরীফেও রহিয়াছে, আর আলোচ্য ঘটনার বর্ণনা মুসলিম শরীফে রহিয়াছে– যাহার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সম্মুখে রাখা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরতের প্রথম দুধমাতা সুওয়াইবা হযরতের চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। হযরত (সঃ) ভূমিষ্ঠ হইলে সুওয়াইবা দৌড়িয়া যাইয়া আবু লাহাবকে ভাতিজা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন। আবু লাহাব আনন্দিত হইয়া এই সুসংবাদ দানের পুরস্কার স্বরূপ তৎক্ষণাত সুওয়াইবাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবু লাহাব তখন হযরতের বাস্তব পরিচয়ের কোন খোঁজ রাখিত না এবং সে ছিল কাফের, তবুও হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আনন্দিত হইয়া যে শ্রদ্ধা দেখাইল তাহার অতি বড় সুফলের অধিকারী সে চিরকালের জন্য হইয়া রহিয়াছে।

বর্ণিত আছে, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বৎসর পর হযরতের অপর চাচা আব্বাস তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু লাহাব বলিল, দোযখের শাস্তি ভোগ করিতেছি, অবশ্য প্রতি সোমবার রাত্রে আমার দুইটি আঙ্গুলের মধ্য হইতে একটু পানীয় পাইয়া থাকি যাহাতে আমার কষ্টের অনেক লাঘব ঘটে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের সুসংবাদ দানের উপর সুওয়াইবাকে এই আঙ্গুলদ্বয়ের ইশারায় মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম; তাহারই সুফল ও প্রতিদানে আমি ইহা লাভ করিয়া থাকি (যোরকানী, ১-১৩৮)। মূল ঘটনাটির বর্ণনা বোখারী শরীফ ৭৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

মোস্তফা চরিতে এই বিবরণটার উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলা হইয়াছে-"যাহা হউক, বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশতাগণ হযরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে কথকগণ যে গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই।" (পৃষ্ঠ-২০৩)

পাঠক! মুসলিম শরীফের উল্লিখিত হাদীছটির মূল বর্ণনাকারী হইলেন "ছাহাবী আনাছ (রাঃ)।" যিনি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল দিবা-রাত্র, ভ্রমণে-অবস্থানে সর্বদা নবীজী মোস্তফার সেকবরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছেন। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "সাবেত বুনানী (রাঃ)", যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহচর্যে থাকিয়াছেন। বসরা এলাকার সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস ও নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাত্র ২৭ বৎসর পর তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী 'হাম্মাদ ইবনে সালামা (রঃ)" তিনি বসরা এলাকার বিশিষ্ট আলেম দেশ-বরেণ্য মোহাদ্দেস ছিলেন, অত্যধিক এবাদত-বন্দেগী ও সুন্নতের তাবেদারীতে তিনি অদ্বিতীয়রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, নবীজীর শতাব্দীতেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলে ইমাম বোখারী (রঃ) ইমাম মুসলিম (রঃ) ইত্যাদি বড় বড় মোহাদ্দেছগণের ওস্তাদ 'শায়বান (রঃ)'; আর তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,ইমাম মুসলিম (রঃ)।

দেখা গেল- আলোচ্য হাদীছখানা প্রসিদ্ধ সহীহ মুসলিম শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে চারি জন অতি মহান লোকের সাক্ষ্য সূত্রে এবং পঞ্চম জনই হইলেন ইমাম মুসলিম (রঃ)। আনাছ (রাঃ) সাবেত বুনানী (রঃ), হাম্মাদ (রঃ) শায়বান (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ)- এই পবিত্রাত্মা মহান লোকগণকে "আমাদের কথকগণ" বলিয়া কটাক্ষ ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাহাদের বর্ণিত হাদীছকে "তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই" বলা, সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীছকে 'গল্প' বলা, "তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই" বলা- এইসব ধৃষ্ঠতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে "মোস্তফা-চরিত" বিপরীত নামীয় সঙ্কলনের প্রতি ক্ষুব্ধ হইলে এবং এই শ্রেণীর কটূক্তিকারকের মুখে থুথু দিলে তাহা অসঙ্গত হইবে কি?

আলোচ্য ঐতিহাসিক সত্যটি অস্বীকার করার জন্য মোস্তফা চরিত গ্রন্থে যেসব প্রলাপ করা হইয়াছে এবং যেসব মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তাহা আরও আশ্চর্যজনক এবং জঘন্য। যথা- বোখারী শরীফসহ সমস্ত হাদীছের কিতাবে বর্ণিত মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে নবীজীর ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ ঘটনার বর্ণনা এবং বিবি হালিমার গৃহে ৪ বৎসর বয়সের ঐরূপ ঘটনার বর্ণনা এত অধিক ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ঘটনাকে আকার-আকৃতির সামঞ্জস্যের কারণে এক ঘটনা গণ্য করিয়া শুধু বর্ণনার গরমিল ঠাওরানো- যেরূপ মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে মে'রাজ সংক্রান্ত বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।" (পৃষ্ঠা-২০৩)- এই উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়!

অপর দিকে গরমিলের কাহিনী ত আরও হাস্যকর। তিনটি ঘটনা- (১) বিবি হালিমার গৃহে বাল্যকালে ৪ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ, (২) নবুয়তপ্রাপ্তির পর মে'রাজ উপলক্ষে ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ (উভয় ঘটনা জাগ্রত অবস্থায়), আর (৩) অনুমান ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বাস্তব ও মূল মে'রাজ ঘটনার অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ মে'রাজ আলোচনায় আসিবে । এই ঘটনাটি স্বপ্নযোগের এবং মূল মে'রাজের ঘটনার অবিকল প্রদর্শনী ছিল, সুতরাং মূল মেরাজ উপলক্ষে বাস্তব বক্ষ বিদারণের আকৃতিতে স্বপ্নে তাহার প্রদর্শনী ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ঘটনা বিভিন্ন ছাহাবীর সহিত আনাছ (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই জন্য তিনটি ঘটনা একসঙ্গে গোঁজামিল দিয়া একটির বর্ণনা দ্বারা অপরটির বর্ণনা মিথা বলা- যেমন মোস্তফা চরিতে দ্বিতীয় বর্ণনা দেখাইয়া প্রথম বিবরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে- "আবু জর গেফারীর বর্ণনা অনুসারে আনাছের এই বিবরণ অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।" (পৃষ্ঠা-২০১) তদ্রূপ বর্ণনাটি সম্পর্কে বলা হইয়াছে- "তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে

হযরত (সঃ) পরবর্তীকালে মাত্র অল্প দিনের এই দুধমাতা সুওয়াইবার প্রতিও অতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করার পরও হযরত (সঃ) স্বয়ং সুওয়াইবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। মদীনায় হযরত (সঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসার পরও তিনি সুওয়াইবার জন্য মদীনা হইতে নানা প্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া থাকিতেন। মক্কা জয় করিয়া হযরত (সঃ) তথাকার সর্বেসর্বা হইয়া 'সুওয়াইবা' এবং তাঁহার পুত্র 'মসরূহ্' সম্পর্কে খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা বাঁচিয়া নাই। তখন হযরত (সঃ) সুওয়াইবার অন্য আত্মীয়বর্গের খোঁজ করিলেন তাহাদের প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইবার জন্য, কিন্তু তাহাদেরও কেহ বাঁচিয়া ছিল না।

কোন কোন আলেমের মত এই যে, সুওয়াইবা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(সীরাতে মোস্তফা, ১-৫৩)

হযরতের স্থায়ী দাই মাতা ছিলেন বিবি হালিমা; তিনি ছিলেন 'বনু সা'দ' গোত্রের। বনু সা'দ গোত্র সমগ্র আরবের মধ্যে আরবী ভাষার লালিত্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল সুললিত এবং মার্জিত ছিল। আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে নবীজীর শৈশব সেই বনু-সা'দ গোত্রেই কাটিল; হযরতের ভাষা উন্নত মানের

অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় বক্ষ বিদারণ ব্যাপারটি.... একেবারে মাঠে মারা যাইবে।" (পৃষ্ঠ-১৯৮) এইসব প্রলাপোক্তিকারীকে কি বলা যায়?

আর একটি অজ্ঞতার কথা এই বলা হইয়াছে যে, "আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই।" (পৃষ্ঠা-২০১) এই কথাটা সত্য হইলেও হাদীছ শাস্ত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। মূল্য হইত যদি আনাছ (রাঃ) ছাহাবী না হইতেন। কোন ছাহাবী এই শ্রেণীর কোন কথা বর্ণনা করিলে তাহা সর্বসম্মতরূপে গৃহীত। কারণ, ছাহাবী নিশ্চয় স্বয়ং হযরতের বর্ণনা বা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন মানিতে হইবে। অন্যথায় ছাহাবীকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। ইহা হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ বিধান, কিন্তু অজ্ঞতার কোন ঔষধ নাই।

আলোচ্য হাদীছের মধ্যে একটি বিষয় এই আছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) নবীজীর হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহা হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আপনার দেহে যে শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা।" এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তিরূপে কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে যাহা শুধু প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনা।

একটি মানবীয় দেহে সকল প্রকার অংশই থাকিবে। ইহাতে নখ থাকিবে; চুল থাকিবে, এমনকি অবাঞ্ছিত লোমও থাকিবে ,যাহা কটিয়া ফেলিতে হয়; মল-মূত্রের উদ্রেককারী নাড়ি-ভুঁড়িও থাকিবে। তদ্রূপ মানব যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার সম্মুখীন জীব এবং পরীক্ষা হইবে শয়তান দ্বারা। ইচ্ছা করিলে শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিতে পারে, এই ক্ষমতার উৎসও মানবীয় দেহে থাকিবে, নতুবা পরীক্ষা হইতে পারে না; ফেরেশতা পরীক্ষার সম্মুখীন জীব নহে, তাই তাহার দেহে এই উৎস নাই।

নবীজীর এই নশ্বর দেহ মানবীয় দেহই বটে। সুতরাং মানবীয় দেহের নিয়মিত সমুদয় অংশই ইহাতে থাকিবে; যাহা অপসারণের তাহা অপসারিত হইবে। যেমন, মল-মূত্র, নখ, অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি। এইসব অবশ্যই অপসারণের বস্তু, তাই বলিয়া এইসব মানবীয় দেহে থাকিবে না– আল্লাহর সৃষ্টির বিধান এরূপ নহে। তদ্রূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উৎস, যাহাকে এই হাদীছে "শয়তানের অংশ" বলা হইয়াছে, তাহাও অন্যান্য মানব দেহের ন্যায় নিয়মিতরূপে নবীজীর এই নশ্বর দেহেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অবশ্য নবীজীর বৈশেষ্ট্য এই যে, তাঁহাকে মা'সুম বে-গোনাহ রাখার জন্য অবাঞ্ছিত বস্তুর ন্যায় ঐ অংশকে তাঁহার দেহ হইতে বাল্যকালেই অপসারণ করার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য দ্বারা নবীজীর মান-মর্যাদা বাড়ে বৈ কমে না বা ক্ষুণ্ন হয় না।

সুতরাং "উক্ত তথ্য মতে স্বীকার করিতে হইবে যে, শয়তানের অংশ তাঁহার (নবীজীর দেহের) মধ্যে বলবত ছিল"– এই ভয় দেখাইয়া তারপর নবীজীর (সঃ) প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার দোহাই দিয়া আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার ফাঁদ তৈয়ার করা প্রবঞ্চনা বৈ নহে।

চারি বৎসর বয়সে– বাল্য অবস্থায় নবীজীর (সঃ) নশ্বর দেহের মধ্যে অবাঞ্ছিত অংশের ন্যায় শয়তানের অংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্বীকার করিলে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব দেখা দিবে– এই মায়াকান্না আর একটা অজ্ঞতা। এক হাদীছে আছে, একদা রসূল (সঃ) বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন ফেরেশতা সাথী এবং এক জন জীন জাতিয় (শয়তান) সাথী থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্যও আছে? হযরত (সঃ) বলিলেন, আমার জন্যও আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে ঐ জিন জাতীয় সাথী শয়তানের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; ফলে সে আমার বাধ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার অনিষ্ট হইতে আমি বাঁচিয়া আছি, সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে না। (মেশকাত শরীফ ১৮)। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হওয়ার মধ্যে বাহ্যিক কারণ ইহাও একটি ছিল। স্বয়ং হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমি আরবী ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদক্ষ ও লালিত্যের অধিকারী; এর (বাহ্যিক) কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরায়েশ বংশে এবং প্রতিপালন হইয়াছে বনু সা'দ গোত্রে। (সীরাত ইবনে হেশাম-১৬৭)

বিবি হালিমার স্বামী, হযরতের দুধ-পিতার নাম ছিল "হারেস"। বিবি হালিমার এক পুত্র ছিল, যে হযরতের সঙ্গে দুগ্ধপান করিয়াছে; নাম ছিল আবদুল্লাহ। দুই মেয়ে ছিল– এক মেয়ের নাম "ওনায়সা" অপর মেয়ের আসল নাম হোযায়ফা (উচ্চারণে মতভেদ আছে); তাঁহারই ডাকনাম ছিল "শায়মা" এবং এই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। তিনি সকলের বড় ছিলেন। (আসাহ্‌হুস সিয়ার- ৫১) নবীজীর লালন-পালনে তাঁহার বহু দান ছিল; তিনি হযরতের অনেক সেবা করিতেন এবং হযরতকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। শায়মা শিশু নবীজীকে দোলা দিত এবং কোলে নিয়া নাচনা ও গীত গাহিত–

هٰذَا اَخٌ لَمْ تَلِدْهُ اُمِّىْ ـ وَلَيْسَ مِنْ نَسْلِ اَبِىْ وَعَمِّىْ
فَدَيْتُهٗ مِنْ مَخْوَلٍ مُعْمِىْ ـ فَانْمِهِ اللّٰهُمَّ فِيْمَا تُنْمِىْ ـ

"এইটি আমার ভাই– আমার মাতার নয়
আমি তাকে ভালবাসি– আমার পিতার নয়
কোরবান করি মামা-চাচা সবই তাঁহার শানে
খোদা! তাঁহায় বাড়াও তুমি সর্ব গুণে-মানে।"

নাচনার তালে শায়মা আরও বলিত–

يَارَبَّنَا اَبْقِ اَخِىْ مُحَمَّدًا ـ حَتّٰى اَرَادَ يَافِعًا وَّاَمْرَدًا
ثُمَّ اَرَاهُ سَيِّدًا مُّسَوَّدًا ـ وَاكْبِتْ اَعَادِيْهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا
وَاَعْطِهٖ عِزًّا يَّدُوْمُ اَبَدًا

এই হাদীছের তথ্য অনুযায়ী বক্ষ বিদারণ হাদীছের তথ্যকে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার বিরোধী বলা প্রবঞ্চনা ছাড়া কি বলা যায়? আরও অধিক প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, বক্ষ বিদারণ হাদীছকে সত্য বলিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, "হযরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'সূম ছিলেন না। (পৃষ্ঠা-১৯৯) কত বড় অজ্ঞতা! "মা'সুম" অর্থ গোনাহ হইতে সুরক্ষিত, অর্থাৎ নবীজীর দ্বারা গোনাহের অনুষ্ঠান হইবে না। ইহার জন্য গোনাহের উৎস সৃষ্টিগতভাবে, তাহাও অতি বাল্যকালে শুধু দেহে বিদ্যমান থাকা ক্ষতিকর নহে, বরং বাল্যকালেই ঐ উৎসের অপসারণের দ্বারা মা'সুম হওয়ার গুণ সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং ঐ তথ্য হযরতের মা'সুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং ইহা প্রমাণকারী। যেরূপ শয়তান সঙ্গী হওয়ার হাদীছ মা'সুম হওয়ার পরিন্থী নহে, বরং আল্লাহ তাআলার সাহায্যে ঐ শয়তান বাধ্যগত হইয়া গিয়াছে বলায় ঐ হাদীছ মা'সুম হওয়ার প্রমাণ গণ্য হইবে।

একাধিকবার বক্ষ বিদারণ, বিশেষতঃ বোখারী শরীফসহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রমাণিত মে'রাজ উপলক্ষে বক্ষ বিদারণের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে যে, "হযরত নবুয়ত পাওয়ার পরেও তাঁহার শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মে'রাজের রাত্রিতেও তাঁহার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল। (পৃষ্ঠা-১৯৯) নাউযুবিল্লাহ! কিরূপ শয়তানী কথা! এই শ্রেণীর অপদার্থ মার্কা বেআদবের বে-ঈমানী উক্তির আলোচনা করিতেও ভয় হয়। কি আশ্চর্য প্রবঞ্চনা করায় বেঈমানীর উক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

বিভিন্ন হাদীছে হযরতের একাধিকবার বক্ষ বিদারণের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু শয়তানের অংশ অপসারণ করার তথ্য শুধুমাত্র বাল্যকালের বক্ষ বিদারণের বেলায় উল্লেখ রহিয়াছে; অন্য কোন উপলক্ষের বক্ষ বিদারণে তাহার উল্লেখ নাই। পূর্বাপর সকল ইমামও এক এক বারের বক্ষ বিদারণের হেকমত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। যথা– বাল্যকালের বক্ষবিদারণে নশ্বর দেহ হইতে শয়তানের অংশ অপসারণ করা হইয়াছে, আর হেরা গুহাও নবুয়তপ্রাপ্তি উপলক্ষে বক্ষ বিদারণ ওহীর গুরুভার সামলাইবার সামর্থ্যের জন্য ছিল (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) এবং মে'রাজ উপলক্ষে বক্ষ বিদারণ ঊর্ধ্বজগতের ভ্রমণে সামর্থ্যবান হওয়ার জন্য ছিল। (মেরাজের বয়ান দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজে অজ্ঞ হইয়া বিজ্ঞগণের ধার না ধারিলে গোমরাহ– ভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

আর একটা প্রবঞ্চনায় বলা হইয়াছে, "নবুয়তের পরও হযরতের হৃদয় ঈমান শূন্য ছিল।" (পৃষ্ঠা-১৯৯) এই প্রবঞ্চনার উৎস বাক্যটি মে'রাজের হাদীছে রহিয়াছে, অতএব তাহার আলোচনা তথায় হইবে।

"আমার ভ্রাতা মোহাম্মদকে বাঁচাও প্রভু তুমি
কিশোর-তরুণ দীর্ঘজীবী দেখব তাঁকে আমি
দেখব তাঁকে সাহেব-সর্দার সবার চেয়ে বড়
তাঁহার শত্রু তাঁহার হিংসুক সবকে ধ্বংস কর
চির গৌরব, চির সম্মান, সদা দৃষ্টি তোমার
তাঁহার জন্য অটুট রাখ এই কামনা আমার।"

(যোরকানী-১-১৪৬)

হালিমা পরিবারের সকলেই মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে, শুধু ওনায়সা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিবি হালিমার স্বামী হারেসের ইসলাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর একদা হারেস মক্কায় আসিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার নিকট বলিল, তোমার দুগ্ধপোষ্য ছেলে কি বলে তাহা জান কি? হারেস জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে? তাহারা বলিল, সে বলিয়া থাকে, আল্লাহ মানুষকে পুনর্জীবিত করিবেন এবং আল্লাহর দুই রকম ঘর আছে; নাফরমানদেরকে এক প্রকার ঘরে শাস্তি দিবেন এবং ফরমাবরদারদিগকে অপর এক প্রকার ঘরে শান্তি ও পুরস্কার দিবেন- এই শ্রেণীর আরও বহু রকম কথার দ্বারা সে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

হারেস নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, লোকেরা অভিযোগ করে আপনি নাকি বলেন, মানুষ মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইবে এবং বেহেশত বা দোযখে যাইবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, সত্যই আমি ইহা বলিয়া থাকি; ঐদিন আসিলে আমি আপনাকে হাতে ধরিয়া আজিকার এই আলোচনার সত্যাসত্য দেখাইয়া দিব। হারেস তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। তিনি বলিতেন, আমার এই ছেলে কেয়ামতের দিন যদি আমার হাত ধরে তবে আমাকে বেহেশতে না পৌঁছাইয়া কি আমার হাত ছাড়িবে? (হাশিয়া সীরাতে ইবনে হেশাম- ১৬১)

নবীজী (সঃ) আপন পিতা-মাতার সেবা করিবার সুযোগ পান নাই; জন্মের পূর্বে পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে হারাইয়াছিলেন। পিতা-মাতার সেবা সম্পর্কে নবীজীর অতুলনীয় শিক্ষা রহিয়াছে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন-

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার ভক্ত সুসন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি মায়া-মমতার দৃষ্টি করিলে প্রতি দৃষ্টিতে আল্লাহর দরবারে এক একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লাভ করিয়া থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক দিনে একশতবার দৃষ্টি করিলেও (ঐরূপ একশত হজ্জের সওযাব পাইবে?)। হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ- আল্লাহ তাআলা অতি মহান অতি পবিত্র (দানে তিনি কুণ্ঠিত নহেন)।

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার সেবা শ্রদ্ধায় যেব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হইবে, তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দরজা খোলা থাকিবে; তাঁহাদের একজনের ব্যাপারে ঐরূপ হইলে বেহেশতের একটি দরজা খোলা থাকিবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়। হযরত (সঃ) তিন বার বলিলেন, যদিও তাহার প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়।

হাদীছ ঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি পরিমাণ? হযরত (সঃ) বলিলেন, পিতা-মাতাই তোমার বেহেশত-দোযখ।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্তুষ্টি; পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের অসন্তুষ্টি।

হাদীছ ঃ এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যাওযার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমার মা আছেন? ঐ ব্যক্তি বলিল, হাঁ আছেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, মাতার সেবায় লাগিয়া থাক; বেহেশত জননীর চরণতলে। (সমুদয় হাদীছ মেশকাত শরীফ হইতে সংগৃহীত।)

এতদ্ভিন্ন হাদীছে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা তিন গুণ বেশী। পিতা-মাতাহারা নবীজীকে পিতা-মাতার সেবায় পুত্ররূপে দেখিবার সুযোগ থাকে নাই, কিন্তু শুধু স্তন্যদায়িনী মাতা হালিমার প্রতি হযরত (সঃ) যে ব্যবহার এবং ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, নবীজীর আপন পিতা-মাতার সেবার সুযোগ পাইলে তিনি কি আদর্শ স্থাপন করিতেন।

হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রতি হযরত (সঃ) অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়নের যুদ্ধ বন্দীগণকে যে হযরত (সঃ) মুক্তি দান করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে উল্লেখ হইয়াছে, সেই ঐতিহাসিক উদারতা প্রদর্শনের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ ইহাও ছিল যে, যুদ্ধ-বন্দীগণের মধ্যে হযরতের দুধ-মা হালিমার বংশীয় নারীগণও ছিল এবং মুক্তির আরজি পেশকারীগণ হযরতের সম্মুখে সেই বিষয়টিকে বিশেষরূপে তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাহাদের বিশিষ্ট সুবক্তা যোহায়র বলিয়াছেন–

يارسول الله انما فى الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك

অর্থ ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! বন্দিশালায় বন্দীদের মধ্যে আপনার খালা রহিয়াছেন এবং ঐ রমণীগণ রহিয়াছেন যাহারা শিশুকালে আপনার লালন-পালন করিয়াছেন।"

যোহায়র এই সম্পর্কে একটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিল–

أُمْنُنْ عَلٰى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ـ اِذْ فُوكَ تَمْلَؤُهُ مِنْ مَخْضِهَا الدُّرَرُ

اِذْ كُنْتَ طِفْلاً صَغِيْراً كُنْتَ تَرْضَعُهَا ـ وَاِذْ يُرَبِّيْكَ مَا تَاْتِىْ وَمَا تَذَرُ

অর্থ ঃ "দয়া করুন ঐসব রমণীর প্রতি যাহাদের (আপন জনের) স্তনের দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছেন– যাহাদের দুগ্ধের মুক্তাগুলি (ফোঁটাসমূহ) আপনার মুখকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকিত।

আপনি যখন ছোট শিশু ছিলেন তখন আপনি তাহাদের দুগ্ধপান করিয়া থাকিতেন–

যখন আপনি কোন কাজ করিতে বা কিছু হইতে উদ্ধার পাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন– একমাত্র কাঁদা ব্যতীত আপনার কোন উপায় থাকিত না।" (আল্-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া ৪–৩৫২)

এইসব উক্তি হযরতের দুধ মা হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জ্ঞাতিবর্গের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিল। অবশেষে হযরত (সঃ) ঐসব যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দানের ঘোষণা প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং মুসলমানগণকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে ঐ ব্যাপারে রাজি করিলেন।

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ আছে, আবুত্ তোফায়েল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোনায়েন এলাকায় জেহাদকালে) হযরত নবী (সঃ) (মক্কা হইতে ১২/১৩ মাইল দূরে) জেয়ে'ররানা নামক স্থানে একদা গোশত বণ্টন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য রমণী হযরতের প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহার জন্য নিজের চাদরখানা বিছাইয়া দিলেন। রমণী আসিয়া সেই চাদরের উপর বসিলেন। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রমণী কে? তখন উপস্থিত সকলে উত্তর করিলেন, তিনি হইলেন হযরতের দুধ মা। (এসাবা ৪–২৬৬)

ইহার পূর্বে আরও একবার বিবি হালিমা হযরতের নিকট আসিয়াছিলেন, তখনও হযরত (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত হযরতের বিবাহের পরের ঘটনা– একবার হালিমার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; বিবি হালিমা মক্কায় হযরতের নিকট আসিয়া সাহায্য

কামনা করিলেন। হযরত (সঃ) খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট বিবি হালিমাকে সাহায্য করার বিষয় আলাপ করিলেন; খাদিজা (রাঃ) বিবি হালিমাকে বিশটি মেষ এবং কতিপয় উট দিয়া দিলেন। (যোরকানী, ১-১৫০)

হযরত (সঃ) তাঁহার সেবাকারিণী দুধভগ্নী শায়মার প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়ন যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য হযরতের নিকট যে প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল, সেই উপলক্ষে হযরতের সেই ভগ্নী শায়মাও হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহার জন্যও স্বীয় চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ছিলেন। -(যাদুল-মাআদ)

হযরতের শৈশব

নবীজী (সঃ) শিশু অবস্থায়ই সব সময় ডান স্তনের দুধ পান করিতেন; উভয় স্তন একা পান করিতেন না, দুধ ভ্রাতার জন্য এক স্তন অবশ্যই ছাড়িয়া রাখিতেন; শিশুকালেই তিনি এতদূর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। (নশরুত তীব-২৩)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক উঠতি সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অসাধারণ ছিল; দুই বৎসর বয়সেই তিনি বেশ বড় দেখাইতেন। (সীরাতে খাতম-২৮)

দুধ ছাড়াইবার পর সর্বপ্রথম তাঁহার মুখে এই কথা ফুটিয়াছিল

الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا -

"আল্লাহ মহান- সর্ব মহান। আল্লাহ তাআলার অংসখ্য প্রশংসা। সকাল-বিকাল সর্বদা আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করি।" (ঐ- ২১)

নবীজী (সঃ) এই বয়সে বাহিরে যাইতেন, কিন্তু তিনি খেলা-ধুলায় লিপ্ত হইতেন না; অন্য ছেলেদেরকে খেলিতে দেখিয়াও খেলায় অংশগ্রহণ করিতেন না। (ঐ)

বিবি হালিমা হযরত (সঃ)-কে কোথাও দূরে যাইতে দিতেন না। একদা বিবি হালিমার অজ্ঞাতে হযরত তাঁহার দুধভগ্নী শায়মার সাথে দ্বিপ্রহরের সময় পশুপালের চারণ ক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। বিবি হালিমা হযরতের খোঁজে বাহির হইলেন এবং শায়মার সহিত তাঁহাকে পাইলেন। বিবি হালিমা শায়মার উপর রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি এই প্রখর রোদ্রে এবং উত্তাপের সময়ে কেন তাঁহাকে বাহিরে নিয়া আসিয়াছ? শায়মা বলিল, আমার ভাই উত্তাপ ভোগ করে নাই; আমি দেখিয়াছি, একটি মেঘখণ্ড সর্বদা তাঁহাকে ছায়া দিয়া চলিয়াছে। ভাই যখন চলিত তখন মেঘখণ্ডও চলিত, ভাই যখন থামিয়া থাকিত তখন মেঘখণ্ডও থামিয়া থাকিত। (নশরুত তীব-২১)

শৈশবে নবীজীর উসিলায় আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল; বিবি হালিমার বর্ণনায় সেইরূপ অনেক বিবরণ রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীর ঘটনা মক্কায়ও ঘটিয়াছে।

মক্কায় ভয়াবহ অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কোরায়েশ সর্দারগণ খাজা আবু তালেবের নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালেব! সমগ্র মক্কা উপত্যকায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ; বৃষ্টির জন্য প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুন। আবু তালেব বালক নবীজীকে সঙ্গে করিয়া ক'বা শরীফের নিকট আসিলেন। নবীজী (সঃ) তখন নিতান্তই বালক; তিনি স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল আকাশপানে উত্তোলনপূর্বক নিবেদনকারীর ন্যায় অবস্থা অবলম্বন করিলেন। তৎক্ষণাত মেঘবিহীন পরিষ্কার আকাশে অসাধারণ মেঘমালার সঞ্চার হইল এবং প্রবল বারিপাত হইল।

এক সময় মক্কাবাসীরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শত্রুতায় মাতিয়া উঠিল। নবীজীর

প্রশংসায় খাজা আবু তালেব স্বীয় কবিতায় এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং তাহা বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে। (পৃষ্ঠা-১৩৭)

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ - ثِمَالُ الْيَتٰمٰى عِصْمَةٌ لِّلْاَرَامِلِ

মেঘের বৃষ্টি আসে তাঁহার নূরানী চেহারায়!
এতীমগণের পালক তিনি, বিধবার আশ্রয়!!

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনায় একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অনাবৃষ্টির দরুন এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে যে, দুধের অভাবে শিশুদের শব্দ করার পর্যন্ত শক্তি নাই। তৎক্ষণাত রসূল (সঃ) মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায়ই হাত উত্তোলনপূর্বক দোয়া আরম্ভ করিলেন। দোয়ার হাত নামাইবার পূর্বে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল; লোকগণ পানিতে ভিজিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নবীজী (সঃ) হাসিমুখে বলিলেন, আজ আবু তালেব জীবিত থাকিলে এই ঘটনা দৃষ্টে তিনি আনন্দিত হইতেন; তাঁহার কাব্যের বাস্তবায়ন এই ঘটনায়ও রহিয়াছে। এই বলিয়া নবীজী (সঃ) বলিলেন, কেহ আছে কি যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়? আলী (রাঃ) উল্লিখিত পংক্তিটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। (যোরকানী, ১-১৯১)

হযরতের মাতৃবিয়োগ

নবীজীর জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার জন্ম, শৈশব ও বাল্যকাল শোক-ব্যথা এবং দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাবীবের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে বিশ্বনবীর জন্য তাহারই প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের সংখ্যাগুরু মানুষ দুঃখী-দরদী, তাহাদের দুঃখে-দরদে বিশ্বনবীকে অংশীদার হইতে হইবে; সুতরাং বাল্যকালের এ অবস্থার মধ্য দিয়াই তিনি দুঃখ-দরদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইবেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থায় অভিজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

এই তথ্য আল্লাহ তাআলাও কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন- الم يجدك يتيما فاوى "আপনি এতীম ছিলেন; পরে আল্লাহ আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ইতিহাসের বিভিন্ন মতামত দৃষ্টে বলিতে হয়, নবীজীর বয়স চারি হইতে নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

দুগ্ধপানের বয়স এবং তাহারও পর কিছুকাল নবীজী (সঃ) দুধ মায়ের প্রতিপালনে থাকিয়া দীর্ঘ দিন পর আপন মা বিবি আমেনার স্নেহ ছায়ায় ফিরিয়া আসিলেন; বিবি আমেনার অন্তরে কতই না আনন্দ। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, প্রাণের দুলাল শিশু নবীজী (সঃ)-কে লইয়া মদীনায় যাইবেন। নবীজীর পিতামহের মাতুলকুল মদীনায়, নবীজীর পিতার কবর মদীনায়। স্বামীহারা আমেনার সাধ জাগিল শ্বশুরের মাতৃকুলের সকলকে দেখাইবে- মৃত আবদুল্লাহর ঘরে আল্লাহ কি সোনার চাঁদ দান করিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে শত আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়া যেয়ারত করিবেন স্বামী আবদুল্লাহর কবর। বিবি আমেনা গর্ভ অবস্থা হইতে এই সময় পর্যন্ত নবীজী (সঃ) সম্পর্কে বহু কিছুই দেখিয়াছিলেন, উপলব্ধি করিয়াছিলেন- কী রত্ন তিনি প্রসব করিয়াছেন তাহা

বুঝিবার তাঁহার বাকী ছিল না। অথচ এহেন পুত্ররত্ন লাভের আনন্দ হইতে স্বামী তাঁহার চির বঞ্চিত; এই চাঁদের মুখ দেখিবার পূর্বেই তিনি মদীনায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিবি আমেনা সোনার পুত্র লাভের যে আনন্দ পাইয়াছেন সেই আনন্দের পার্শ্বে তাঁহার মনোবেদনা সমধিকই ছিল নিশ্চয়। তাই অন্ততঃ স্বামীর মাজারে পুত্রধনকে লইয়া না গিয়া তিনি শান্ত হইতে পারেন কি?

আনন্দ ও আবেগভরা অন্তর লইয়া বিবি আমেনা প্রাণের দুলাল বালক নবীজী (সঃ)-সহ মদীনাপানে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিয়াছে পরিচারিকা উম্মে আয়মান। শিশু পুত্র আর দাসী- শুধু এই দুই সঙ্গী লইয়া বিবি আমেনা একাই প্রায় তিন শত মাইলের দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌঁছিবেন; কী দুঃসাহসিক কার্য! ভাঙ্গা বুকের আবেগ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সাহসে বুক বাঁধিতে, প্রেরণা যোগাইয়াছে সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর জয় করিতে। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় উপস্থিত হইতে কৃতকার্য হইলেন।

বিবি আমেনা বালক নবীজী (সঃ) সহ মদীনায় এক মাস অবস্থান করিলেন; তৎকালীন মদীনার কোন কোন স্মৃতি নবীজীর স্মরণও রহিয়াছে। হিজরত করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আসিয়াছেন তখন তিনি ছাহাবীগণের সঙ্গে আলোচনায় বলিয়াছেন, এই গৃহে আমি আমার আম্মার সহিত অবস্থান করিয়াছিলাম। এমনকি ঐ সময় নবীজী (সঃ) তথায় এক বাড়ীর একটি জলাশয়ে ভালরূপে সাঁতার কাটাও শিখিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (যোরকানী, ১-১৬৪)

পরিচারিকা উম্মে আয়মানের বর্ণনা- ইহুদীদের কিছু লোক বালক নবীজীকে উদ্দেশ করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় দৃষ্টি করিতে লাগিল। একদা আমি তাহাদের একজনের উক্তি শুনিতে পাইলাম, সে সঙ্গীগণকে বলিতেছে, এই বালক এই যুগের নবী হইবেন এবং এই মদীনা তাঁহার হিজরত স্থান হইবে। তাঁহার উক্তিগুলি আমি সুরক্ষিত রাখিলাম।

নবীজীর মাতা বিবি আমেনাও ঐ শ্রেণীর উক্তির সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং বালক নবীজী (সঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের তরফ হইতে আশঙ্কা বোধ করিলেন। সেমতে কালবিলম্ব না করিয়া বিবি আমেনা বালক নবীজী (সঃ) ও পরিচারিকা উম্মে আয়মানসহ মদীনা হইতে মক্কা ফিরিয়া আসার জন্য যাত্রা করিলেন। মক্কা-মদীনার মধ্যে অর্ধ পথ পূর্বে 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছিয়া বিবি আমেনা অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কী করুণ দৃশ্য! মরুভূমির বুকে উন্মুক্ত আকাশতলে পাহাড়-পর্বতের মাঝে পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ কাছে নাই, এক দাসীর সহিত একা এই বালক! ইহা অপেক্ষ ভীষণ আর কি হইতে পারে? এই অবস্থায় দাসী উম্মে আয়মান বিবি আমেনাকে কবর দিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে লইয়া মক্কায় পৌঁছিলেন।

নবীজীর দুঃখ-বেদনার কি সীমা থাকিল! পিতার ত মুখই দেখেন নাই; দুনিয়ায় আসিবার পূর্বেই পিতাকে হারাইয়াছেন, এখন আবার শিশু বয়সেই এক হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য মাঝে মাতাকে হারাইলেন। মক্কা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন মায়ের সাথে; মাত্র একমাস পরেই আজ মক্কায় ফিরিলেন একা- মাকে পথিমধ্যে দূর প্রান্তরে রাখিয়া আসিলেন কবরে।

এত ব্যথা! কিন্তু এখনও নবীজীর দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয় নাই; পিতাহারা নবীজী মাকে হারাইয়া যাঁহার আশ্রয়ে আসিলেন, মাত্র দুই বৎসরেই আবার তাঁহাকে হারাইবার শোকে আক্রান্ত হইলেন। মাকে চির বিদায় দিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কায় পৌঁছিলেন; দাদা আবদুল মোত্তালেব তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। দাসী উম্মে আয়মানও সেই দায়িত্বে অংশীদার।

উম্মে আয়মান

নবীজীর পিতার মুক্ত দাসী ছিলেন উম্মে আয়মান। (যোরকানী-১৬৩) তিনি হাবশী তথা আবিসিনিয়ার ছিলেন; নবীজীর বাল্য বয়সের বিশিষ্ট সেবাকারিণী ছিলেন তিনি। নবীজী (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী

ছিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বলিয়া থাকিতেন, আমার (গর্ভধারিণী) জননীর পরে আপনিই আমার জননী। (যোরকানী, ১-১৮৮) তিনি বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। নবীজী (সঃ)-এর নিজের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল। মদীনার কোন কোন ছাহাবী নবীজীকে কতিপয় খেজুর গাছ প্রদান করিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই খেজুর গাছ হইতে উম্মে আয়মান (রাঃ)-কে কয়েকটি দান করিয়াছিলেন। নবীজীর বিশেষ ভালবাসার পাত্র পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত নিজ প্রচেষ্টায় উম্মে আয়মানকে বিবাহ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের পুত্র ওসামা (রাঃ)-কে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যধিক ভালবাসিতেন। এমনকি ছাহাবীদের মধ্যে তিনি "হেব্বু রসূলিল্লাহ"- রসূলুল্লাহর প্রিয়পাত্র আখ্যায় ভূষিত ছিলেন।

উম্মে আয়মান (রাঃ) নবীজীর সেবা করিয়া ইহ-পরকালে পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। লোকমুখে তিনি "বরকত" নামে পরিচিতা ছিলেন। বর্ণিত আছে- একদা "রওহা" নামক মরু প্রান্তরে তিনি পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন। কোথাও পানির ব্যবস্থা নাই। ঐ সময় রেশমী দড়িতে ঝুলানো পানিভরা ডোল আকাশ হইতে তাঁহার সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল; তিনি সেই পানি পান করিয়া এরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন যে, পরবর্তী জীবনে কখনও পিপাসার যাতনা ভোগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ঘটনার পর উত্তপ্ত দিনের রোযায় দ্বিপ্রহরকালেও আমি পিপাসা অনুভব করি না। (যোরকানী, ১-১৮৮)

নবীজীর ইন্তেকালে তিনি অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার ক্রন্দনে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুনিয়া ত্যাগের ৫/৬ মাস পরই তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দাদাকেও হারাইলেন নবীজী (সঃ)

পিতা-মাতাহারা নবীজী (সঃ) দাদা আবদুল মোত্তালেবের আশ্রয়ে থাকিতেন। আবদুল মোত্তালেব নবীজী (সঃ)-কে সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ-মমতা করিতেন। আবদুল মোত্তালেব মক্কার সর্বপ্রধান সর্দার ছিলেন। তাঁহার জন্য প্রত্যহ কা'বা গৃহের সন্নিকটে বিশেষ বিছানা করা হইত; অন্য কেহ এমনকি আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানরাও ঐ বিছানার উপর যাইতে পারিত না। বালক নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিনা বাধায় ঐ বিছানার উপর বিচরণ করিতেন; স্নেহ-মমতায় আবেগপূর্ণ আবদুল মোত্তালেব আদর ও ভালবাসার দৃষ্টিতে স্বীয় পৌত্র নবীজীর এই আচরণ উপভোগ করিতেন। চাচাগণ নবীজীকে বিছানা হইতে হটাইতে চাহিলে আবদুল মোত্তালেব বাধা দিয়া বলিতেন, বাছাধনকে বিরক্ত করিও না। আমার এই বাছাধনের ভবিষ্যত অতি উজ্জ্বল। (যোরকানী, ১-১৮৯)

আপদ-বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝায় মানুষের ধৈর্য, সাহস এবং উদ্যম বলিষ্ঠ হয়, তাই যেন বিধাতা নবীজীকে আঘাতের পর আঘাত, দুঃখের পর দুঃখ, ব্যথার পর ব্যথায় ফেলিয়া তাঁহার জীবন বুনিয়াদ মজবুতরূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পিতা-মাতাকে হারাইবার পর দাদা আবদুল মোত্তালেবের ছায়া নবীজীর জন্য সুদীর্ঘ হইল না। নবীজীর মাতৃবিয়োগের মাত্র দুই বৎসর পরেই দাদা আবদুল মোত্তালেব বালক নবীজীকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। আবদুল মোত্তালেব মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র আবু তালেবকে অসিয়ত করিয়া গেলেন নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তিনি নবীজীর পিতা খাজা আবদুল্লাহর এক মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা ছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দীর্ঘ দিন আবু তালেবের ছায়ায় ছিলেন; হযরত (সঃ) নবী হওয়ারও সাত বৎসর পর আবু তালেবের মৃত্যু হইয়াছিল। আবু তালেব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য-সহায়তায় সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিয়া যাইতেছিলেন।

নবীজীর মাতা-পিতা সম্পর্কে

নবীজী (সঃ) পিতাকে দেখেন নাই, মাতাকে বাল্যাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি সারা জীবনই মৃত পিতা-মাতার প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। মক্কা বিজয় বা ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনার সফরে

মক্কা হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে "আবওয়া" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) স্বীয় মাতার কবর যেয়ারত করিয়াছিলেন। নবীজীর অন্তরে যে কি আবেগ ছিল! মায়ের কবর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নবীজী (সঃ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে, আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন নিজ মাতার কবর যেয়ারত করিয়াছেন; তখন তিনি এইরূপ কাঁদিয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণকে পর্যন্ত কাঁদাইয়া ফেলিয়াছেন। মায়ের মমতাই মাতৃহারা নবীজীকে এইরূপ অভিভূত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি আজ নবী, কিন্তু মা তাঁহাকে নবীরূপে পান নাই- সেই ব্যথাও কম নহে। এত দুঃখ- এত ব্যথা! এই অবস্থায় নবীজী (সঃ) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে- নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, "পরওয়ারদেগারের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়াছিলাম; অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কবর যেয়ারতের অনুমতি চাহিয়াছি; সেই অনুমতি পাইয়াছি।" ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না পাইয়া নবীজীর মনের আবেগ ও ব্যথা কি চরম আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান- ঈমান ব্যতিরেকে ক্ষমা হইবে না; আল্লাহ তাআলার এই বিধান সকলের জন্য। অবশ্য আল্লাহ তাআলা কি স্বীয় হাবীবের এই ব্যথার লাঘব করিবেন না? এই আবেগের মূল্য দিবেন না? ইহা ত আল্লাহর হুজুরে বড় কথা যে, তাঁহার হাবীবের অন্তরে ব্যথা ও অশান্তি। নবীজী (সঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা-অঙ্গীকার বিঘোষিত রহিয়াছে- ولسوف يعطيك ربك فترضى "নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্বক আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিবেন।"

এই প্রভু-পরওয়ারদেগার কি স্বীয় হাবীবের অন্তরকে সারা জীবন কাঁদাইবেন? তাঁহার পিতা-মাতার মুক্তি সম্পর্কে কি তাঁহার মনোবেদনা দূর করার ব্যবস্থা করিবেন না?

পূর্বাপর বহু ইমাম ও আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নবীজী (সঃ)-এর পিতা-মাতা পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের মুক্তির সূত্র সম্পর্কে অধিকাংশের মত এই যে, নবীজীর সন্তুষ্টি ও সম্মান উদ্দেশে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে আল্লাহ তাআলা বিশেষ ব্যবস্থা এই করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতাকে মুহূর্তের জন্য জীবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহারা জীবিত হইয়া ঈমান গ্রহণ করতঃ পুনঃ মৃত হইয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। (যোরকানী, ১- ১৬৬-১৮৮ দ্রষ্টব্য) এমনকি বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবন হাজার (রঃ)ও তাঁহার এক কিতাবে এই বিষয়টির পূর্ণ সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল মোলহেম, ১-৩৭৩ দ্রষ্টব্য)।

বাল্যকালে নবীজীর বিদেশ সফর

এক-দুই জন ব্যতীত সকল পয়গম্বরই চল্লিশ বৎসর বয়সে পয়গম্বরী লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের এই সুদীর্ঘ সময়টা ব্যর্থ হইত না; পয়গম্বরীর গুরুদায়িত্ব বহনে তাঁহাদেরকে যোগ্য করা হইত। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ত হইবেন বিশ্বনবী; তাঁহার দায়িত্ব হইবে বিশ্বজোড়া, তাই তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে বিশেষরূপে; তাঁহার পয়গম্বরী জীবনের বুনিয়াদ মজবুত করিতে হইবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া। এই বিশেষ প্রস্তুতি এবং বিশেষরূপে গড়াইবার যোগাড়-আয়োজনেই অতিবাহিত হইয়াছে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চল্লিশ বৎসরের সুদীর্ঘ সময়।

নবীজী (সঃ) শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম-বেশী বার বৎসর। বিধাতা তাঁহাকে দেশের বাহিরে পাঠাইবেন। বহির্দেশের বিশাল জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক রচনা এবং পরিচয় ঘটান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সমাধার সুন্দর মুহূর্ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরেও আবেগের ঢেউ খেলিয়া উঠিল।

নবীজী (সঃ)-এর মুরব্বী চাচা আবু তালেব সিরিয়ায় বাণিজ্যে যাইবেন; তিনি সফরের যোগাড়-আয়োজন করিতেছেন, যাত্রার সময় আসিল, তিনি যাত্রা করিবেন। সেই মুহূর্তে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাচা আবু তালেবকে ধরিয়া বসিলেন, তিনিও তাহার সঙ্গে যাইবেন। আবু তালেবের স্নেহ-মমতা তাহাকে নবীজী (সঃ)-এর আবদার রক্ষা করায় বাধ্য করিল; তিনি নবীজী (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়াই সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

নবীজীর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আজ সূচিত হইল– ভাবী বিশ্বনবী বহির্বিশ্বের ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, বহিঃপ্রকৃতি তাই আজ উল্লসিত আনন্দিত। রাজপুত্রের ভ্রমণে পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ নবীজীর চলার পথের দুই ধারেও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহার গমনপথের নিকস্থ পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজি সকলেই নিজ নিজ কায়দায় নবীজী (সঃ)-কে অভিবাদন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। নীল আকাশও নবীজীর সেবায় ব্রতী হইল– ঘন মেঘখণ্ড নবীজী (সঃ)-কে ছায়া দিয়া চলিল। প্রকৃতিরাজির এই সব লীলা সকলে লক্ষ্য না করিলেও যাহারা দেখিয়াছে তাহারা ভাবী বিশ্বনবীকে চিনিতে পারিয়াছে– যাহার সাক্ষ্য সম্মুখে আসিতেছে।

আবু তালেবের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র "বস্‌রা" নগরে পৌঁছিল। তথায় "জিরজীস্" ওরফে "বহিরা" নামীয় এক খাঁটি অভিজ্ঞ পাদ্রী ছিলেন। তিনি তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব মারফত শেষ যমানার নবীর নিদর্শন ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন যীশুখৃষ্ট তথা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতিশ্রুত রসূল। ঈসা (আঃ) নবী মোস্তফা (সঃ) সম্পর্কে অনেক প্রচার ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টান পাদ্রী বহিরা নবীজীর বহু কিছু লক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই নবীজী (সঃ)-কে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আবু তালেবের সওদাগরী কাফেলা ঐ পাদ্রীর ঘরের নিকট অবতরণ করিল। পাদ্রী কাফেলার মধ্যে বালক রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা দেখামাত্রই চিনিয়া ফেলিলেন যে, এই বালকই প্রতিশ্রুত শেষ যমানার নবী। সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার মধ্যে আসিয়া হযরতের হাত ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, এই ত সকল পয়গম্বরগণের শিরোমণি, এই ত নিখিলের শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বিশ্বজগতের জন্য আশীর্বাদ ও মঙ্গলরূপে দাঁড় করাইবেন। কাফের লোকগণ সেই পাদ্রীকে প্রশ্ন করিল, আপনি কিরূপে এই বিষয় জ্ঞাত হইলেন? পাদ্রী বলিলেন, আপনারা রাস্তার মোড় ফিরিয়া এই অঞ্চলে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমুদয় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি আমি তাঁহার পৃষ্ঠে মোহরে নবুয়ত দেখিতে পাইতেছি; তাহার দ্বারাও তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। অতপর সেই পাদ্রী বস্তুতঃ হযরতের খাতিরে সম্পূর্ণ কাফেলাকে দাওয়াত করিলেন। সকলে খাওয়ার জন্য উপস্থিত হইল, কিন্তু হযরত (সঃ) তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পাদ্রী তাহাদের নিকট হযরতের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সকলে বলিল, তিনি উট চরাইতে গিয়াছেন। পাদ্রী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হযরতকে সংবাদ দিয়া আনিলেন। যখন হযরত ময়দান হইতে আসিতেছিলেন তখন পাদ্রী লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর একটি মেঘখণ্ড ছায়া প্রদান করিয়া আসিতেছে। যখন হযরত খাওয়ার স্থলে পৌঁছিলেন– যাহা একটি বৃক্ষের ছায়াতলে ছিল; তিনি বৃক্ষের ছায়ায় স্থান না পাইয়া ছায়াহীন জায়গায় বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ডালাগুলি হযরতের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছায়া দান করিল। পাদ্রী উপস্থিত কাফেলার লোকদিগকে বৃক্ষের এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, তোমরা এই বালককে লইয়া তোমাদের গন্তব্যস্থল সিরিয়ায় যাইবে না। তথাকার ইহুদীরা এই বালকের নিদর্শন দেখিয়া চিনিয়া ফেলিবে এবং তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যে পাদ্রী দেখিতে পাইলেন, সাত জন রোমীয় লোক ঐ স্থানের দিকে আসিতেছে। পাদ্রী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খোঁজ করিতেছ? তাহারা বলিল, তওরাত-ইঞ্জীলের বর্ণনা

মারফত আমরা জানি, শেষ যামানার নবী জন্মলাভ করিয়াছে, এই মাসে তিনি এই পথে সফর করিবেন; আমরা তাঁহার তালাশে আসিয়াছি। পাদ্রী তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, খোদার ইচ্ছা কি কেহ ঠেকাইতে পারে? তাহারা পাদ্রীর এই কথায় তাহাদের চেষ্টা ত্যাগ করিল। অতপর পাদ্রী হযরতের চাচা আবু তালেবকে কসম দিয়া বলিলেন, আপনি অবশ্যই এই বালককে সতর্কতার সহিত যথাসত্বর দেশে পৌঁছাইতে যত্নবান হইবেন। সেমতে আবু তালেব (সযত্নে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও) সিরিয়ার বাণিজ্য সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

(সীরাতে ইবনে হেশাম)

এই পাদ্রীর সহিত হযরতের সামান্য কথাবার্তাও হইয়াছিল- তাহার বিবরণও বর্ণিত রহিয়াছে। পাদ্রী বলিলেন, আপনাকে লাত ও ওজ্জা দেবীদ্বয়ের কসম দিতেছি- আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনি অবশ্যই দিবেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, আমাকে লাত-ওজ্জার কসম দিবেন না, তাহাদেরকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি। তখন পাদ্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম....। এইবার হযরত (সঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পাদ্রী তাঁহাকে অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করিলেন- হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিদ্রা, বিভিন্ন হাল-অবস্থা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্বশেষ পয়গম্বরের গুণাগুণ সম্পর্কে ঐ পাদ্রীর যাহা কিছু জানা ছিল তাহার পরীক্ষার জন্যই তিনি হযরত (সঃ)-কে এইসব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে লাত ও ওজ্জা দেবীর কসমও এই উদ্দেশেই করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবী সর্বশেষ নবী হইয়া থাকিলে কখনও তিনি এই কসম গ্রহণ করিবেন না, বস্তুতঃ হইলও তাহাই। (যোরকানী, ২- ৯৬)*

সামাজিক ও জনকল্যাণ কাজে হযরতের প্রথম যোগদান

তখনকার আরব দেশ অন্ধকার দেশ, তাহার পরিবেশ অন্ধকার এবং তখনকার যুগ অন্ধকার যুগ- মারামারি, রক্তারক্তি প্রায় সর্বদা লাগিয়াই আছে। অন্যায়-অবিচার, জুলুম-অত্যাচারই সেই দেশ ও সেই যুগের ইতিহাস।

*** সমালোচনাঃ** এক শ্রেণীর খৃষ্টান লেখক মাকড়সার জালের উপর ঘর তৈয়ার করার ন্যায় বহিরা পাদ্রীর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক আজগবী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নাকি এই বহিরা পাদ্রীর সাক্ষাত হইতে জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন। কি আজগবী আবিষ্কার! কি আজগবী কথা!

অচিরেই যাঁহার জ্ঞান-দর্শনে সারা জগত স্তম্ভিত মুগ্ধ হইল; যাঁহার আদর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ ও পরিবেশকে এবং কুসংস্কার জর্জরিত জাতিকে আদর্শের রাজমুকুট পরাইল, যাঁহার শিক্ষা ও দান বিশ্ব বুকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সোনালী আদর্শের বন্যা বহাইয়া দিল, তিনি তাঁহার এই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র ও অমৃতাদর্শের মহাসাগর লাভ করিলেন এক বিন্দুবৎ হইতে। ১২ বৎসর বয়সে মূহূর্তের সাক্ষাত ও দুই-চারি কথার আলাপে। এইরূপ পচা গল্পবাজির উত্তর না দেওয়াই ভাল উত্তর।

আশ্চর্যের বিষয়, "মোস্তফা-চরিত" খৃষ্টানদের ঐ পচা গল্পবাজিতে মস্তক হেঁট করিয়া লজ্জা ঢাকিবার জন্য পেরেশান হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে কোন পথ না দেখিয়া বহিরা পাদ্রীর ঘটনার ইতিহাসকেই অস্বীকার করতঃ হাঁপ ছাড়িতে চাহিয়াছে। মোস্তফা চরিতের ভাষায়- "এই গল্পটিই একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা।" (পৃষ্ঠা-২২০) মোস্তফা চরিত সঙ্কলকের স্বভাবগত কুঅভ্যাসই ইহা যে, যাহা তাহার মনঃপূত না হইবে তাহাকে "গল্প" বলিয়া আখ্যা দিবে, যদিও তাহা জগতভরা ইতিহাসের পাতায়, এমনকি হাদীছ গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকে।

বহিরা পাদ্রীর উল্লিখিত ঘটনার বয়ান সীরাতশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থেই বর্ণিত আছে, এমনকি সেহাহ সেত্তা হাদীছ গ্রন্থসমূহের তিরমিযী শরীফেও উল্লেখ আছে। মরহুম খাঁ সাহেব তাঁহার মোস্তফা চরিতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতি বিষোদাগারে প্রবঞ্চনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন রেফারেন্স বা বরাতের মারপ্যাঁচে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেনঃ

প্রথমতঃ তিনি ঘটনা বর্ণনার সনদ সম্পর্কে নানারূপ গোঁজামিলের দ্বারা তাহার দুর্বলতা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভূমিকায় বর্ণিত এই বিষয়টি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট যে, এই ঘটনার বর্ণনা হইল ইতিহাস। ইতিহাস ভিন্ন জিনিস এবং হাদীছ তদপেক্ষা বহু উর্ধ্বের ভিন্ন জিনিস। হাদীছ বলা হয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথা, কাজ এবং সমর্থনকে। আলোচ্য

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বয়স তখন ১৫-১৬। (আসাহিহুস সিয়ার) কায়স গোত্রীয় লোকেরা কেরায়শদের সঙ্গে অন্যায়রূপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; সেই যুদ্ধই ইতিহাসে "ফেজার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। আত্মরক্ষা, অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণে কোরায়শগণও যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কোরায়শদের শাখা গোত্রসমূহ নিজ নিজ সর্দারের নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীরূপে সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। বনী হাশেম গোত্রের নেতৃত্ব তাহাদের সর্দার হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের উপর ছিল। হযরতের জীবনের সর্বপ্রথম তিনি সেই যুদ্ধে দাদার সাহায্যকারীরূপে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।

ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহের কারণে মক্কায় এতীম-বিধবা, অনাথ-দুর্বলদের সংখ্যা অনেক ছিল। এই দুর্বলদের উপর দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য চলিত নির্বিবাদে।

মক্কার সুমতিসম্পন্ন কতিপয় সর্দার একটি কল্যাণমূলক সমাজ-সেবা সমিতি গঠনে সচেষ্ট হইলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমাজ সেবা সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশগ্রহণপূর্বক বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ-

(১) অসহায় দুর্গতদিগের সাহায্য সেবা করা।

(২) এতীম-বিধবা ও দুবর্লদেরকে সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা।

(৩) কোন বিদেশী বা পথিকের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করা হইলে তাহার আশু প্রতিকার করা।

(৪) সর্বপ্রকার অত্যাচার প্রতিরোধে অত্যাচারীকে দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া এবং অত্যাচারিতকে সাহায্য করা।

(৫) দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(৬) সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও রক্ষার চেষ্টা করা।

সমিতির সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন- ইহারই ঐতিহাসিক নাম 'হেলফুল ফজুল'। অন্ধকার যুগে ইহাই ছিল কিঞ্চিৎ আলোর সর্বপ্রথম উদ্ভাসন। বিশ্ব ভূমণ্ডলের এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সকলের জন্য এক নবী- এই ব্যতিক্রম রূপের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁহার দ্বারা প্রকৃত শান্তি এবং কল্যাণ মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সূচনায় যুগ-যুগান্তের অন্ধকার কাটিয়া

বিবরণটি ত নবীজীর পয়গম্বরী জীবনের বহু পূর্বেকার ঘটনা, যাহা ইতিহাসরূপে অন্য লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ গৃহীত হওয়ার জন্য তাহার সনদে যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাহা ইতিহাসের বেলায় প্রয়োগ করিলে ইতিহাস ভান্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে; গ্রহণযোগ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সুধী সমাজ! ইতিহাস ভাণ্ডার তলাইয়া দেখুন, শতকরা ৫০ ভাগ সনদহীন বর্ণনাই তাহাতে পাইবেন, তাহাও ইতিহাসের আরবী গ্রন্থাবলীতে। অন্যান্য ভাষার ইতিহাস বই-পুস্তকে ত সনদের কোন বালাই-ই নাই। পূর্বাপর যেসব ইতিহাস গ্রন্থ গৃহীতরূপে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ গন্থে এবং সীরাত গ্রন্থাবলীতে আলোচ্য বহীরা পাদ্রীর ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। সুতরাং সনদের দুর্বলতার দোহাই দিয়া তাহা উপেক্ষা করা প্রতারণার শামিল হইবে। অধিকন্তু মোস্তফা চরিত পুস্তকে দুই-এক জন আলেমের ভিন্ন মত পোষণের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। এইরূপ সামান্য দ্বিমতের দরুন ইতিহাসের বর্ণনা উপেক্ষা করিলে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য মিলিবে না।

অসংখ্য ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত হওয়া এবং হাদীছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ছয় ইমামের এক ইমাম তিরমিযী (রঃ) কর্তৃক গ্রহণীয় সাব্যস্ত হওয়া এই ঘটনার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সীরাত সঙ্কলনে কলিযুগের লিখক মরহুম মাওলানা শিবলী নোমানী এবং মরহুম মাওলানা আকরম খাঁর লেখায়ই এই ঘটনার প্রতি অস্বীকৃতি দেখা যায়, নতুবা পূর্বাপর সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টান লেখকদের অযৌক্তিক পচা গল্পবাজির ভয়ে ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা চরম দুর্বলতার পরিচয়ই বটে।

মোস্তফা-চরিতে এই বর্ণনার আর একটি দুর্বল দিক দেখান হইয়াছে যে, ঘটনাটির বর্ণনায় আছে, বহিরা পাদ্রীর উপদেশ মতে হযরতের মক্কায় প্রত্যাবর্তনে আবু বকর (রাঃ) বেলালকে সঙ্গে দিলেন। এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে; ঐ সময় আবু বকরের বয়স ১০ বৎসর ছিল। কারণ আবু বকর (রাঃ) হযরতের দুই বৎসরের ছোট ছিলেন, আর ঐ সময় হযরতের বয়স ১২ বৎসর ছিল।

উত্তর এই যে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, আবু বকর ঐ সফরে ছিলেন না। তাঁহার থাকা অসম্ভব নহে। নবী (সঃ) যদি ১২

ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব শান্তির দীপ্ত সূর্যের উদয়াভাসে এই শ্রেণীর রশ্মির বিকাশ অতি স্বাভাবিকই ছিল।

দেশের বরেণ্যরূপে হযরতের খেতাব লাভ

ইতিমধ্যেই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিভার খ্যাতি সমগ্র মক্কায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের দৃষ্টিতেই তিনি অতুলনীয়রূপে দেখা যাইতে লাগিলেন। মানব-সেবা, মানব-প্রেম, নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনা, সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং সততা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর মাধুর্যে সমগ্র দেশ ও জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি দিনে দিনে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলে কাহারও প্রস্তাব-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে সকলের মুখে তাঁহার জন্য এমন একটি খেতাব বা উপাধি আবিষ্কৃত হইল যাহা মহৎ গুণাবলীর চরম উৎকর্ষের প্রতীক। সারা দেশ তাঁহাকে 'আল-আমীন' আখ্যায় ভূষিত করিল। আরবী ভাষায় এই শব্দটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মানবীয় মহত্ত্বের অসংখ্য উপাদান এই অক্ষর কয়টির মধ্যে পরিবেষ্টিত। শান্তিপ্রিয়, সম্প্রীতির আধার, চরম সত্যবাদী ও পরম বিশ্বস্ত– এইসব মাহাত্ম্যের আকরকে আরবী ভাষায় বলা হয়, 'আমীন' এবং তাহারই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যধারীকে বলা হয় 'আল-আমীন'। গুণ-মাধুর্যের কত উচ্চ মূল্য জাতির পক্ষ হইতে নবী (সঃ) পাইলেন? 'আল-আমীন' উপাধি তাঁহার পরিচয়ের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল; নামের পরিবর্তে সকলে তাঁহাকে 'আল-আমীন' বলিয়া ডাকিত। অন্ধকার যুগ, অন্ধকার দেশ, অন্ধকার পরিবেশ– এই দুর্ধর্ষ জাতির চিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখকার দিনে সহজসাধ্য ছিল কি? কিরূপ চারিত্রিক মাধুর্য এবং সততা গুণের সুষমা ও মানব সেবার অকৃত্রিম প্রেরণা থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার জন্য আল্লাহর দেওয়া সাধারণ গুণের প্রভাবেই এত বড় গৌরব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হযরতকে শিক্ষা ও ট্রেনিং দান

শৈশবকালই মানুষের শিক্ষার সময়, কিন্তু নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর দেশ যুগ অন্ধকার দেশ ও যুগ; সেই পরিবেশে পিতা-মাতাহীন নবীজীর শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই জন্য কি তিনি শিক্ষাহীন ছিলেন, তাঁহার শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই? 'উম্মী নবী'-র কি অর্থ ইহাই যে, তিনি নিরক্ষর

বৎসর বয়সে ঐ সফরে থাকিতে পারেন তবে ১০ বৎসর বয়সের আবু বকরও থাকিতে পারেন। আর ইতিহাসে ইহাও প্রমাণিত যে, আবু বকর হযরতের বাল্যবন্ধু ছিলেন। আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে, বেলাল ঐ সময় তথায় থাকিতেই পারেন না। কিন্তু এই সম্পর্কেও দুইটি বক্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে– (১) কাহারও মতে বেলাল আবু বকরের সমবয়স্ক ছিলেন– (যোরকানী, ১–১৯৬)। সুতরাং আবু বকরের শুধু সঙ্গী হিসাবে বেলালের তথায় থাকা অসম্ভব নহে। (২) এই বেলাল প্রসিদ্ধ বেলাল হাবশী (রাঃ) না বেলাল নামের অন্য কোন ব্যক্তি তাহা নির্ধারণেরও কোন প্রমাণ নাই। (কাওকাবুদ্দুরি ২–৩১২) বেলাল হাবশী (রাঃ) ভিন্ন অন্য কেহ হইলে কোন প্রশ্নই থাকে না।

সারকথা, এইসব ছুতানাতা দুর্বল অজুহাত খণ্ডন করা সহজ, অতএব তাহার দরুন ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইহাছাড়া আরও কয়েকটি ছুতা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা শুধু বাহুল্যই বটে। যেমন– বর্ণনায় উল্লেখ আছে, বহিরা পাদ্রী নবীজীর পরিচয় লাভ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আগমনে এতদঞ্চলের সমুদয় পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সেজদারত হইয়াছিল। মরহুম খাঁ সাহেব এই বিবরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "ঐ অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা উল্টিয়া পড়িল– আবু তালেব বা দুনিয়ার আর একটি প্রাণীও তাহা দেখিল না; তাহা দেখিলেন বহু দূরে অবস্থিত বহিরা পাদ্রী তাঁহার মাঠের কোণে বসিয়া– ইহা অপেক্ষা আজগবী কথা আর কি হইতে পারে।" (পৃষ্ঠা–২৪৪)

প্রশ্নটির মূল হেতু খাঁ সাহেবের গর্ভেই জন্ম নিয়াছে। মূল ঘটনায় ত রহিয়াছে সেজদারত হইয়াছে; আর খাঁ সাহেব বুঝিয়াছেন, "হযরতকে সেজদা করার জন্য পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালাগুলি ভূপাতিত হইয়াছে।" মানুষের সেজদা এবং পাহাড় ইত্যাদির সেজদাকে খাঁ সাহেব এক আকারে বুঝিয়াছেন– এই বোকামির ফলেই ঐ প্রশ্ন জন্মিয়াছে। কোরআনে উল্লিখিত স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– وان من شئ الا يسبح بحمده .

"দুনিয়ায় যত জিনিসই আছে তাহার প্রত্যেকটিই আল্লাহর প্রশংসায় তাঁহার তসবীহ পাঠ করিয়া থাকে।"

খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকেরা বলিবেন, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বতের মুখ নাই, প্রশংসা ও তসবীহ কিরূপে করে?

অশিক্ষিত ছিলেন? কখনও নহে– ইহা 'উম্মী নবী' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। 'উম্ম' অর্থ মা; তাহার সহিত সম্পৃক্ত 'ইয়া–ী' সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়ের সম্পৃক্তি ও সান্নিধ্যে প্রকৃতির শিক্ষা যেভাবে মানুষ লাভ করে, যদিও তাহা সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত। কিন্তু তাহাও এক সুদীর্ঘ শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষা কোন গুরু বা শিক্ষক, কিতাব বা বই-পুস্তক, শিক্ষাগার বা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয় না। তদ্রূপ নবীজী মোস্তফার অপরিসীম শিক্ষা ও পরিধিহীন জ্ঞানার্জন ঐসব মাধ্যম ব্যতিরেকে সকল জ্ঞানের আকর সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুপ্রশস্ত, সুগভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য সারা বিশ্ব বহন করে– এই অসাধারণ জ্ঞান তিনি জাগতিক গুরু ও শিক্ষক ব্যতিরেকে মায়ের নিকটে থাকাবস্থায় উপার্জিত প্রাকৃতিক জ্ঞানের ন্যায় জাগতিক ও বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতিরেকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবী উম্মী' বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই হযরত (সঃ)-কে হাতে-কলমে শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়া বিশেষ গুণে গুণান্বিত এবং বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিধাতা অতি যত্নের সহিত নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর পয়গম্বরী জীবনের গঠন কার্য চালাইয়াছেন। সূরা ওয়াযযোহার মধ্যে এই শ্রেণীর কতিপয় বিষয়ের উল্লেখও রহিয়াছে। যথা– (১) আল্লাহ তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রথম হইতে পিতা-মাতাহীন এতীম বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি প্রত্যক্ষরূপে এতীম নিরাশ্রয়ের দুঃখ-দরদ বুঝিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের মন রক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

"আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এতীম বানাইয়া পরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَاتَقْهَرْ" সুতরাং আপনি এতীমকে ধমক দিয়া কথা বলিবেন না– তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিবেন না।

(২) আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত (সঃ)-কে কপর্দকশূন্য, রিক্তহস্ত ও দরিদ্র বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি দরিদ্রের দুঃখ-দরদ প্রত্যক্ষরূপে অনুধাবন করিতে সক্ষম হন এবং সেই দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি উদারতার ব্যবহার করিতে ত্রুটি না করেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى আল্লাহ আপনাকে প্রথমে রিক্তহস্ত দরিদ্র বানাইয়া পরে সচ্ছলতার ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ সুতরাং আপনি দারিদ্র্যের আঘাতে যাঞ্চায় লিপ্ত মানুষকে ধিক্কার দিবেন না।"

আরও শুনুন– ولله يسجد ما فى السموت وما فى الارض

"আল্লাহর জন্য সেজদা করিয়া থাকে যাহা কিছু আসমানসমূহে এবং ভূপৃষ্ঠে আছে।" (পারা–১৪ রুকু–১২)

হে খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকগণ! পারা–১৭, রুকু–৯ -এ আরও একটি আয়াত শুনুন–

الم تر ان الله يسجد له من فى السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب .

"তুমি কি দেখ না! আল্লাহর জন্য সেজদা করে যাহারা আসমানসমূহে আছে এবং যাহারা ভূপৃষ্ঠে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন প্রাণী।"

চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি, পবর্তমালা, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীসমূহকে ত সেজদার জন্য ভূপাতিত হইতে দেখা যায় না, সেই জন্য কি কোরআনও অস্বীকার করিতে হইবে?

পাঠক! সেজদা করা একটি ক্রিয়াপদ, তাহার আকার-আকৃতি সাব্যস্ত হইবে তাহার কর্তা পদের সামঞ্জস্যে; ঘোড়াকে গাধার সহিত জুড়িলে ত খচ্চর পয়দা হইবেই।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালার সেজদারত হওয়ার বর্ণনা যেখানে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে ছিল, সেখানে ঐ সেজদার কোন আকার নিদর্শন নিশ্চয় বর্ণিত ছিল। সেই কিতাবের অভিজ্ঞ আলেম তৎকালীন খাঁটি দ্বীনদার বহিরা পাদ্রী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবু তালেব এবং অন্যান্যরা ত সেই কিতাবের আলেম-বিদ্বান ছিলেন না, তাঁহারা তাহা কিরূপে দেখিবেন?

(৩) আল্লাহ তাআলা হযরতকে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় নিঃসম্বল বানাইয়া পরে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিপক্ক জ্ঞানভাণ্ডার দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানের আকর বানাইয়াছিলেন যেমন পবিত্র কোরআনে অনত্র আছে–

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلاَالْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا ـ

"কোরআন কি জিনিস, ঈমান কি জিনিস তাহা পূর্বে আপনি কিছুই জানিতেন না; হাঁ, পরে আমি আপনাকে কোরআন দান করিয়াছি এবং আমি তাহাকে নূর বা আলোর রূপ দিয়াছি।" (আপনাকে সকল জ্ঞানের আকর ও আলো কোরআন দান করিয়া পরিপ জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছি)

আল্লাহ তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিঃসম্বল বানাইয়াছিলেন যেন তিনি শিক্ষা-দীক্ষাহীন পথহারা মানবের অভাবটা প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং সেই অনুপাতে তাহাদের অভাব মোচনে সচেষ্ট হন।

সূরা ওয়াযযোহার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাহাই বলিতেছেন–

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এইরূপে বানাইয়াছিলেন যে, আপনি কিছু জানিতেন না, পরে আপনাকে (পরিপক্ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ- সুতরাং (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) যেসব অমূল্য নেয়ামতসমূহ আপনাকে আপনার প্রভু দান করিয়াছেন তাহা অযাচিতভাবে সকলের মধ্যে ব্যক্ত করতঃ বিতরণ করুন।

এই ট্রেনিং দান প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীছের মর্ম এবং সেই সূত্রেই হযরত নবীজী (সঃ) বিশেষরূপে এই হাদীছের বিষয়বস্তু সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন। (হাদীছ- ১৬৬৫)

اخبرنى جابربن عبد الله رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ فَقَالَ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهٗ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ رَعَاهَا ـ

অর্থ ঃ বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা "মাররুজ্জাহ্‌রান" নামক স্থানে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তথায় আমরা "পীলু" নামক (এক প্রকার জংলী) গাছের গোটা চয়ন করিতেছিলাম। হযরত (সঃ) আমাদিগকে বলিলেন, যেগুলি (পাকিয়া) কাল হইয়া গিয়াছে ঐগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও; ঐগুলি অধিক সুস্বাদু।

তখন এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ছাগলের রাখালী করিয়াছেন? হযরত (সঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ- কোন নবী এই রকম হন নাই যিনি ছাগলের রাখালী না করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ "পীলু" গাছ শহরে-বন্দরে হয় না, তাহা সাধারণত বস্তিবিহীন এলাকায় আগাছার ন্যায় জন্মিয়া থাকে। তাহার গোটা বা ফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একমাত্র রাখাল শ্রেণীর লোকদেরই হইতে পারে, যাহারা ঐ ধরনের এলাকায় পশুপাল লইয়া ঘুরাফিরা করিয়া থাকে। হযরত (সঃ) শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু পীলু গাছের ফল সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দৃষ্টেই প্রশ্নকারী হযরত (সঃ)-কে ছাগলের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। কারণ, আরব দেশে উট এবং ছাগল বা মেষ শ্রেণীর পশুপালই অধিক, কিন্তু উট অতিশয় শক্তিশালী বড় জানোয়ার হওয়ায় তাহার জন্য রাখালের আবশ্যক হয় না এবং সাধারণত তাহার রাখাল সব সময় রাখাও হয় না।

প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত (সঃ) নিজের সম্পর্কে ত 'হাঁ' বলিলেন; তদুপরি ইহাও বলিলেন যে, প্রত্যেক

নবীর দ্বারাই ছাগলের রাখালী করান হইয়াছে। হযরত মূসা (আঃ) দীর্ঘ দশ বৎসরকাল এই রাখালী করিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রাখালীর কাজ কিছুদিন ত কচি বয়সে করিয়াছেন; যখন তিনি দুধ-মা বিবি হালিমার গৃহে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মক্কায় থাকিয়াও কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগলের রাখালী করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একটু বয়স্ক অবস্থায় হইয়াছিল, কারণ ইহা তিনি আজুরার বিনিময়ে করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৬৬। হাদীছঃ عـن ابـى هـريـرة رضـى اللـه تـعـالـى عـنـه عـنِ الـنّبـىّ صَلّى اللّـه عَـلَـيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَاعِىَ غَنَمٍ فَقَالَ اَصْحَابُهٗ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা যত নবীই পাঠাইয়াছেন প্রত্যেক নবীকেই ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছিল। এতদ শ্রবণে ছাহাবীগণ হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি রাখালী করিয়াছেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ– আমি কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগল চরাইয়া থাকিতাম কয়েক 'কীরাত' (অতি কম মূল্যমানের মুদ্রা)-এর বিনিময়ে।

ব্যাখ্যাঃ রাখালী জীবনের সহিত পয়গম্বরী জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্বচ্ছ ধ্যান, গভীর চিন্তা ও নির্মল তপস্যার নীরব সুযোগ লাভ হয় এই জীবনে। অন্তর– সমুদ্রে ভাবের ঢেউ সৃষ্টির জন্য এই জীবনের এই পরিবেশের মুক্ত বাতাস এক বিশেষ অবলম্বন। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, নীচে শ্যামল ভূপৃষ্ঠ বা মরূদ্যান, চতুষ্পার্শ্বে পর্বতমালা বা সবুজ গাছ, সঙ্গী আছে সর্বপ্রকার সৃষ্টি-রহস্যের বাহক পশুপাল। কি দৃশ্য! কি মনোহর! ভাবুকের জন্য ভাব সৃষ্টির সব উপাদানই একত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার চোখের সামনে। এই পরিবেশের সুযোগের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে–

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ـ

অর্থঃ "লক্ষ্য কর না কেন উটগুলির সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি, ঊর্ধ্ব আকাশের ধারণ কৌশলের প্রতি, পর্বতমালার গ্রথন বিধির প্রতি, ভূপৃষ্ঠের সুসমতল বিন্যাসের প্রতি?" প্রকৃতির এই নিবিড় নীরব প্রশান্তি ভাবুকের জন্য কতই না উপভোগ্য।

রাখাল এই মানচিত্রে মনোনিবেশ করিলে সে সৃষ্টিকর্তার মারেফাতের বিরাট ভূমিকায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে। এই রাখালী জীবনে যদি পদার্পণ করেন কোন নবী, তবে তিনি যে এই বিশাল প্রান্তর হইতে কত হীরা-মাণিক্য আহরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাখালী জীবনের সহিত পয়গম্বরী জীবনের আরও গভীর সম্বন্ধ এই যে, একজন রাখালের কর্তব্য এই বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা– পশুপাল বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, কোনটা হারাইয়া না যায়, কোনটাকে বাঘে না ধরিতে পারে; অথচ প্রতিটি পশু উপযুক্ত আহার পাইয়া সন্ধ্যায় প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসে। এই কর্তব্যের সহিত পয়গম্বরী জীবনের কত নিকটতম সম্বন্ধ! পয়গম্বর গোটা একটা জাতির পরিচালক। রাখাল পশুচালক, আর পয়গম্বর মানুষ চালক; আল্লাহর বান্দাদেরকে সুপথে চালনা করা এবং কুপ্রবৃত্তি, কুপরিবেশ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে হেফাযত করতঃ ইহ-পরকালের খোরাক জোগাইয়া সকলকে প্রভুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়াই পয়গম্বরের কর্তব্য। এই কর্তব্যের দায়িত্ব বহন বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার এবং তাহার কর্মগত অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশেই পয়গম্বরগণের জন্য রাখালীর অনুশীলন।

রাখালীর অনুশীলনের মধ্যে ছাগল চরানোর অধ্যায় পয়গাম্বরী জীবনের প্রয়োজন পূরণের পক্ষে নিকটতম সহায়ক। কারণ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ অপরিসীমভাবে নবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন খেয়াল, বিভিন্ন মেযাজ, বিভিন্ন অভ্যাস ও বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সম্মুখীন হইতে হয় নবীকে, তাই তাঁহাকে বিনয়ী, বিনম্র, কোমল এবং সহিষ্ণু হইতে হইবে, ক্রোধের বান ডাকার ঘটনায়ও তাঁহাকে পর্বত সমতুল্য হইয়া ধীরস্থির থাকিতে হইবে।

ছাগলের রাখালী করার মধ্যে এই গুণগুলি বাস্তবরূপে হাসিল হইয়া থাকে। ছাগলের স্বভাব– হাঁটাইলে হাঁটিবে না, ধাক্কাইলে আগে বাড়িবে না, হেঁচড়াইলে শুইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় রাখালের ক্রোধের আগুন লেলিহান হইয়া উঠে, কিন্তু পিটাইলে চেঁচায় এবং লোকদের গালি শুনিতে হয়। অবশেষে তাহাকে রাখাল আপন কাঁধে চড়াইতে বাধ্য হয়। এই পর্যায়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার যে অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহার নজির কোথাও পাওয়া যাইবে কি? সুধীগণ বলিয়াছেন, কচি-কাঁচার শিক্ষকতা করিতে হইলে পূর্বে ছাগলের রাখালী করার ট্রেনিং দেওয়া অতিশয় লাভজনক হইয়া থাকে।

এই ট্রেনিংয়ের উদ্দেশেই প্রত্যেক নবীকে ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছে, এমনকি বিশ্বনবী সাইয়্যেদুল-মোরসালীন তাঁহার শান মর্যাদার সম্পূর্ণ অযোগ্য– অতি কম মূল্যমানের মাত্র কতিপয় মুদ্রার বিনিময়ে রাখালীর মজদুরীও করিয়াছেন। ট্রেনিং দানে যাইয়া মানুষ কত কিছু করিতে বাধ্য হয়!

সিরিয়া সফরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মক্কার এক ধনাঢ্য মহিলা "খাদীজা" তিনি লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে লোকদের দ্বারা ব্যবসা চালাইয়া থাকিতেন। হযরতের বয়স তখন ২৪ বৎসর শেষ প্রায়। তখন একদা হযরতের চাচা আবু তালেব তাঁহাকে বলিলেন, এই বৎসর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপূর্ণ; সিরিয়ার বাণিজ্যের মৌসুম উপস্থিত হইয়াছে; বহু লোকই বিবি খাদীজার নিকট হইতে পুঁজি লইয়া সিরিয়ায় ব্যবসা করিতে যাইবে; তুমিও যদি সেই পন্থা অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত; তোমাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা যদিও আমার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের দরুন অর্থনৈতিক চাপে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাচাকে উত্তর দিলেন, হযরত খাদীজা নিজেই আমার নিকট এই ব্যাপারে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তাই আমি স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া অপেক্ষা করি। আবু তালেব বলিলেন, ভয় হয় যে, অন্য সকলকে দেওয়া হইয়া গেলে হয়ত তোমাকে দেওয়ার মত কিছু থাকিবে না।

অতপর হযরতের উল্লিখিত ধারণাই বাস্তবায়িত হইল। খাদীজা স্বয়ং হযরতের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আপনার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং চরিত্র মহিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে; আমি আপনাকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পুঁজি এবং অধিক লভ্যাংশ প্রদান করিয়া ব্যবসায় নিয়োগ করিতে চাই। হযরত (সঃ) চাচাকে এই সংবাদ অবগত করিলেন। চাচা বলিলেন, এই অর্থনৈতিক সুযোগ আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন।

অতপর হযরত (সঃ) সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিলেন। বিবি খাদীজার বিশিষ্ট ক্রীতদাস মায়সারাও হযরতের সঙ্গে গেল। হযরত (সঃ) প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র বোসরায় পৌছিলেন। বোসরা শহরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বসিলেন। নিকটবর্তী স্থানেই "নাসতুরা" নামক বিশিষ্ট পাদ্রীর অবস্থান ছিল। তিনি হযরতকে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় দেখিয়া তৎক্ষণাত হযরতের সঙ্গী মায়সারাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, এই লোকটি পয়গম্বর হইবেন। অতপর পাদ্রী স্বয়ং হযরতের নিকট আসিয়া তাঁহার কদমবুসী করিলেন, হযরতের মোহ্‌রে নবুয়তের প্রতি লক্ষ্য করত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লাহর রসূল হইবেন, যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ঐ পাদ্রী মায়সারার নিকট এই আক্ষেপও প্রকাশ করিলেন যে, কতই না সৌভাগ্য হইবে, যদি আমি তাঁহার আবির্ভাবকাল পাই।

ঐ বোসরা শহরেই আর একটি লোক– যাহার সঙ্গে হযরতের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই লোকটিও মায়সারাকে জ্ঞাত করিয়াছিল যে, ইনি পয়গম্বর হইবেন, যাঁহার সম্পর্কে আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে এবং পাদ্রিগণও তাহা অবগত আছেন।

এতদ্ভিন্ন মায়সারা এই সফরের মধ্যে সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রৌদ্রের মধ্যে চলাকালে দুই জন ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া থাকিত।* এমনকি হযরত (সঃ) যখন এই সুদীর্ঘ সফর হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন দুপুর বেলা মক্কা নগরীতে পৌঁছিলেন। ঐ সময় বিবি খাদীজা স্বীয় বাসভবনের দ্বিতলের বারান্দা হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তখনও ঐ দুই ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া ছিলেন এবং বিবি খাদীজা তাহা অবলোকন করিয়াছিলেন। যখন মায়সারা বিবি খাদীজার নিকট

উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহাকে উক্ত ঘটনা বলিলেন। মায়সারা তাঁহাকে বলিলেন, আমি ত আগাগোড়া সম্পূর্ণ সফরেই এই অবস্থা বিরাজমান দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন মায়সারা বোসরা শহরের পাদ্রীর এবং অপর লোকটির উপরোল্লিখিত ঘটনাও বিবি খাদীজার নিকট ব্যক্ত করিলেন।*

বিবি খাদীজার সহিত হযরতের শাদী মোবারক (পৃষ্ঠা– ৫৩৮)

কোরায়শ বংশেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে 'খাদীজা' অতি সুপ্রসিদ্ধ রমণী ছিলেন। তিনি সারা মক্কায় সতীত্বে ও পাক-পবিত্রতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই মহিয়সী মহিলা পবিত্র জীবন যাপনে অতুলনীয় ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অন্তরের শুচিতা শুভ্রতায় এবং চরিত্রের পবিত্রতায় তিনি এতই সুনাম অর্জন করিয়া ছিলেন যে, লোকেরা তাঁহাকে খাদীজা না

---

* প্রাক ইসলাম যুগেও ফেরেশতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা-বিশ্বাস ছিল। এমনকি মোশরেক পৌত্তলিক মক্কাবাসীদেরও ঐ বিশ্বাস ছিল। তাহারাও ফেরেশতাকে দেবদূত পবিত্রাত্মা ধারণা করিত। নবীজীর উপর ছায়াদানকারী বস্তু ত মেঘখণ্ডের আকৃতির ছিল, কিন্তু সৎ-সাধু ব্যক্তি নবীজীর উপর বোধমান প্রাণীর ন্যায় ছায়া দিয়া আসিতেছে দেখিয়া দর্শক মায়সারা উহাকে পবিত্রাত্মা ফেরেশতা গণ্য করিয়াছে এবং তাহা ব্যক্তও করিয়াছে।

*** সমালোচনা ঃ** মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য– যখনই নবীগণ সম্পর্কে কোন অসাধারণ অস্বাভাবিক (অসম্ভব নয়) ঘটনার উল্লেখ আসিয়াছে তখনই তাঁহার পেটে ব্যথা সৃষ্টি হইয়াছে এবং উদরাময়গ্রস্তের ন্যায় বেসামালরূপে নানা পচা-গলা, মল-ময়লার উদ্‌গিরণ আরম্ভ করিয়াছেন। কতিপয় নমুনা পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে– যেমন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ১২ বৎসর বয়সে প্রথম বহির্দেশে গমন আলোচনায় এই বোসরা শহরেই পাদ্রীর ঘটনা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য নাস্তুরা পাদ্রীর ঘটনায় এবং মায়সারার বর্ণনার ব্যাপারে ত খাঁ সাহেবের লেখনী পুরাদস্তুর কুৎসিত নর্দমার ন্যায় পূতি-গন্ধের উদগার করিয়াছে।

তিনি ক্ষেপিয়াছেন এই বলিয়া যে, "এই গল্পগুলির দ্বারা প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক গুণ-গরিমার জন্য বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের অনুরাগিনী হন নাই। নাস্তুরার উক্তি, ইহুদীর উপদেশ বা ফেরেশতার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না।" (পৃষ্ঠা–২৩৯) মনে হয় মস্তিষ্কের শুষ্কতার দরুন খাঁ সাহেবের কর্ণকুহরে এরূপ একটা প্রলাপ ধ্বনিত হইয়াছে যে, একমাত্র এইসব ঘটনায়ই বিবি খাদীজা হযরতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রলাপ ধ্বনি যে, তাঁহারই শুষ্ক মস্তিষ্কের জন্ম দেওয়া তাহা তিনি ঠাহর করিতে না পারিয়া পূর্বাপর সীরাত সঙ্কলকগণের প্রতি অযথা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাবলী আরবী-উর্দু ভাষায় লিখিত সমস্ত সীরাত সঙ্কলনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ সকলেই এইসব বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ এইরূপ দাবী ত দূরের কথা ঘুর্ণক্ষরেও এইরূপ লেখেন নাই যে, হযরতের প্রতি বিবি খাদীজার অনুরক্তির কারণ একমাত্র এই ঘটনাবলী ছিল।

আমাদের ন্যায় সকলেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রকৃতিগত মহিমা এবং উদীয়মান গুণ-গরিমাকে হযরতের প্রতি বিবি খাদীজার অনুরাগিণী হওয়ার মূল কারণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য মায়সারা কর্তৃক আলোচ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা বিবি খাদীজাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। নবীজীর প্রকৃতিগত মহিমা ও গুণ-গরিমা খাদীজার হৃদয়ে রেখা না কাটিলে হযরত খাদীজাও আকরম খাঁ মরহুমের ন্যায় মায়সারার বর্ণনাগুলিকে বাহুল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

বিবি খাদীজা সারা মক্কায় বড় বড় লোকদের শত শত বিবাহ প্রস্তাব ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরণে যে অগাধ ধন-দৌলতসহ এইরূপে লুটাইয়া পড়িলেন– ইহা নিশ্চয় এক বিরাট বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার পিছনে নিশ্চয় অন্য অস্বাভাবিক ঘটনাবলীও শক্তি যোগাইয়াছে।

ডাকিয়া 'তাহেরা' (সতী-সাধ্বী পবিত্রা) বলিয়া ডাকিত। (যোরকানী, ১)

প্রথমে একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি সেই স্বামীর ঔরসে দুই পুত্র জন্ম দান করেন। সেই প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য আর একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাহার ঔরসেও এক কন্যা জন্মদান করেন। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু ঘটে; অতপর তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। তাঁহার পবিত্রতা ও ধনাঢ্যতার দরুন অনেকেই তাঁহার পরিণয় লাভের অভিলাষী ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অবশ্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যদিও তখন নবী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি চরিত্রগুণের প্রসিদ্ধি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অন্তরে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই আকর্ষণেই খাদীজা (রাঃ) নিজে প্রস্তাব দিয়া হযরত (সঃ)-কে টাকা প্রদানে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরতের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদুপরি হযরতের প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে বিবি খাদীজার স্বচক্ষে অবলোকিত অলৌকিক ঘটনাদৃষ্টে তিনি আরও অভিভূত ছিলেন; তৎসঙ্গে তাঁহারই গোলাম মায়সারার সাক্ষ্য ও বিবৃতি বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল।

খাদীজা (রাঃ) দীপ্ত সূর্যের প্রভাতী আলোর ইঙ্গিতে হযরতের ভবিষ্যত অনুধাবন করিতে পারিলেন। এতদ্ব্যতীত খাদীজা (রাঃ)-এর এক দূর সম্পর্কীয় মুরুব্বী চাচা ছিলেন "ওয়ারাকা ইবনে নওফল"। তিনি খাঁটি খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ও আসমানী কিতাব তওরাত ইঞ্জীলের পারদর্শী ছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন; নাসতুরা পাদ্রীর উক্তি এবং মায়সারার দেখা ও শুনা ঘটনাবলী এবং নিজের দেখা ঘটনা সবই বর্ণনা করিলেন। সকল বিবরণ শ্রবণান্তে ওয়ারাকা বলিলেন, হে খাদীজা! যদি এইসব ঘটিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) এই যুগের নবী হইবেন; আমি আসমানী কিতাবের আলোকে এই নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছি; তাঁহার আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী, আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি। (সীরাতে মোস্তফা, ১-৮৩)

বিবি খাদীজার বয়স তখন চল্লিশের ঊর্ধ্বে। একে একে দুই বিবাহের পর তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল। এই অবেলায় তাঁহার অন্তর-তলে এক নূতন স্বপ্ন উঁকি দিল, এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল। যে ভাবের প্রতি তিনি দীর্ঘ দিন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, অনুরক্ত ছিলেন, ভুলেও এতদিন অন্তর তৎ প্রতি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই- সেই স্বপ্ন সেই সাধ আজ তাঁহার অন্তরকে নূতন করিয়া দোলা দিল- কেন? নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর গুণ-গরিমা এবং তাঁহার অসাধারণ দীপ্ত ভবিষ্যতের কিরণমালায় সৃষ্ট আকর্ষণের দরুনই খাদীজা (রাঃ) এই অবেলায় তাঁহার জীবনতরী এক ভিন্ন স্রোতে ভাসাইতে উদ্যতই নহেন শুধু, বরং উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন।

এই নূতন প্রেরণা খাদীজা (রাঃ)-কে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, তাঁহার অন্তরকে যেন টানিয়া বাহিরে লইয়া ছুটিল। তিনি নিজকে নিজের মধ্যে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না, উদিত ভাবকে নিজ অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরণতলে আশ্রয় লাভের সন্ধানে পাগলপারা হইয়া পড়িলেন। এই ব্যতিব্যস্ততা ব্যাকুলতা তাঁহার চরম বুদ্ধিমত্তার এবং পরম সৌভাগ্যের পরিচায়কই ছিল- যাহা লাভে তিনি চির ধন্যও হইতে পারিয়াছিলেন।

নবীজী মোস্তফার (সঃ) সহিত বিবি খাদীজার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল; নবীজীর পঞ্চম উর্ধ্বতন পিতার মধ্যে বিবি খাদীজার বংশ মিলিত। অতএব তাঁহার আবেগ প্রকাশে তিনি কিছুটা সাহস বোধ করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার এক বিশেষ সহচরী, 'নাফিসা'কে নিয়োগ করিলেন নবীজীর মনোভাব আঁচ করার জন্য।* প্রতিকূলতার আশঙ্কা না দেখিয়া দ্বিগুণ সাহসে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বুক ভরিয়া উঠিল। এইবার তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বিবাহের সুস্পষ্ট প্রস্তাব পাঠাইতে সাহস করিলেন।

* বিশ্বনবীর জীবনী লেখক একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নাফিসার ভূমিকাকে নাটকের ললিত ভাষায় নাটকীয় রসিকতার ভাব-ভঙ্গিতে যে সাজ গোজ দিয়াছেন আমরা উহা নবীজীর জীবনী আলোচনার কোন ইতিহাসে পাই নাই। ঐরূপ না লেখাই বাঞ্ছনীয়; লালিত্য ও রসিকতার মাধুর্য সুন্দর বটে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর জীবনী বর্ণনায় অতিশয় সতর্কতা আবশ্যক।

খাদীজা (রাঃ) শুধু প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারিণীই ছিলেন না; ধন অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য ছিল অনেক বেশী। তিনি পরিণত বয়স্কা বিধবা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শান্ত শ্রী, স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং আত্ম-সৌন্দর্যের গুণাবলী যাহা ছিল তাহা ত অন্ধকার যুগের সমাজ চোখেও লুক্কায়িত ছিল না; যদ্দরুন স্বতঃস্ফূর্তরূপে সমাজ তাঁহাকে 'তাহেরা' পবিত্রা বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার সেই গুণাবলী এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য মাধুরী কি নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর চোখে ধরা পড়ে নাই? নিশ্চয় ধরা পড়িয়া থাকিবে। কারণ নবীজী (সঃ) নিজে পবিত্র; তিনি পবিত্রতার মূল্য না দিয়া পারেন কি?

قدر گل بلبل بداند یا بداند شاہ پری

قدر گوہر شاہ بداند یا بداند جوہری

ফুলের সৌরভ ভালবাসে বুলবুলি আর রাজপরী

মণি-মুক্তার কদর করে রাজ-রাজড়া আর জওহরী

আল্লাহ তাআলাও বলিয়াছেন- اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ

"পবিত্র পুরুষদের জন্য পবিত্রা নারীগণ, পবিত্রা নারীদের জন্য পবিত্র পুরুষগণ (ইহাই স্বভাব, প্রকৃতি)।" (পারা-১৮ রুকু-৯) অতএব স্বভাব প্রকৃতির ধর্ম মতেই নবীজী (সঃ) খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আবেগের প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিধাতার নির্ধারণেও নবী মোস্তফা (সঃ)-এর জন্য খাদীজা তাহেরার ন্যায় একজন পবিত্রা, পারদর্শী, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণ শান্ত স্বভাব শান্তবুদ্ধিসম্পন্না জীবন সঙ্গীনীর প্রয়োজন ছিল; যিনি তাঁহার ঘরে -বাহিরে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করিবেন। নবীজী (সঃ)-এর সম্মুখ জীবনে নানা প্রয়োজন দেখা দিবে; বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সমাধান প্রদানের জন্য আবশ্যক বিরাট প্রতিভার। সে প্রতিভা খাদীজা (রাঃ)-এর মধ্যে কি পরিমাণের ছিল তাহা নবীজীর সহিত তাঁহার দাম্পত্য জীবনের পরম ও চরম সাফল্যই প্রমাণ করিবে। افتاب امد دلیل افتاب "সূর্য নিজেই নিজের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ।"

কুদরতের খেলা- দেশে ও সমাজে সর্বত্র নবীজীর সদগুণরাজি এমনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে, সারা মক্কায় 'আল-আমীন' (সৎ-সাধু বিশ্বস্ত) নাম হযরতের জন্য অন্য সব নামকে ঢাকিয়া ফেলে। অপর দিকে খাদীজা (রাঃ)ও তাঁহার অপরিসীম মহত্ত্বের প্রভাবে 'তাহেরা' (সতী-সাধ্বী) নামেই পরিচিতা হইয়া পড়েন। এই দুইটি নামের পরিবর্তন-রহস্য বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব ব্যাপাররূপে স্বর্গের মঙ্গলধারা প্রবাহের ইঙ্গিত বহন করিতেছিল। কুদরত যেন নিজ হস্তে জগত জননী সতী-সাধ্বী তাহেরা (রাঃ)-কে বিশ্বনবী আল-আমীনের জন্য সহধর্মিনীর যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম খণ্ড ৩ নং হাদীছের ঘটনায় জিব্রাঈল ফেরেশতার প্রথম সাক্ষাত এবং সর্বপ্রথম ওহীর অবতরণ চাপে নবীজী (সঃ) হেরা গুহা হইতে কাতর হইয়া গৃহে ফিরিলেন। ঐ সময় খাদীজা (রাঃ) সান্ত্বনা ও বুঝ প্রবোধ দানে তাঁহার কাতরতা লাঘবে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চির বিদ্যমান থাকিবে। খাদীজা (রাঃ)-এর অসাধারণ প্রতিভার সুফল নবীজী (সঃ) খাদীজার সহিত দাম্পত্য জীবনে সর্বদাই উপভোগ করিয়াছেন। এই সুখ, এই শান্তি, এই মাধুরী খাদীজা (রাঃ)-এর সান্নিধ্যে নবীজী (সঃ) সর্বদাই লাভ করিতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে খাদীজা (রাঃ) নবীজীর (সঃ) সুখ-শান্তি যোগাইয়া চির ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার এই বিরাট সাফল্যের দ্বারাই নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তরে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়ের পরম তৃপ্তি এবং চরম সন্তুষ্টির মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রীতির সহিত খাদীজা (রাঃ) নিজকে নবীজীর চরণে বিলাইয়া দিয়া তাহার মনকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, খাদীজা (রাঃ) দুনিয়া হইতে বিদায়

নিয়াও নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তর হইতে বিদায় নিতে পারেন নাই। খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে হযরত (সঃ) গভীর মর্ম বেদনায় শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি বিবি খাদীজার মৃত্যু বৎসরকে নবী (সঃ) 'আমুল হোযন'– শোকের বৎসর আখ্যা দিয়াছেন। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী (সঃ) দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরও সকল স্ত্রীর ঊর্ধ্বে ছিল তাঁহার আসন; তাঁহার আসন কেহই দখল করিতে পারেন নাই।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরবর্তী জীবনের তরুণ বয়স্কা সর্বাধিক ভালবাসার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে ইঙ্গিতবহ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৬৭। হাদীছ ঃ বিবি খাদীজার প্রতি আমি যেরূপ গায়রত (নিজকে তাঁহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করিতাম' নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোন স্ত্রীর প্রতি সেইরূপ অনুভব করিতাম না, অথচ আমি (খাদীজার সময় পাই নাই–) তাঁহাকে দেখিও নাই। কিন্তু নবী (সঃ) তাঁহার স্মরণ, তাঁহার আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন (আমার মন তাঁহার প্রতি ঐরূপ ছিল)।

নবী (সঃ) অনেক সময় বকরী জবাই করিতেন এবং সম্পূর্ণ গোশ্‌ত বণ্টন করিয়া খাদীজার বান্ধবীদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় আমি কটাক্ষ করিয়া বলিতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ভিন্ন আর কোন মহিলা জন্মে নাই! উত্তরে নবী (সঃ) আবার খাদীজার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিতেন– খাদীজা এরূপ ছিল, ঐরূপ ছিল; তাঁহার হইতে আমার সন্তান-সন্ততি ছিল। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

খাদীজা (রাঃ) নবীজীর সেবা কিরূপ অন্তরে করিতেন তাহা অন্তর্যামী আল্লাহই জানেন। তাই আল্লাহ তাআলা খাদীজা (রাঃ)-কে নবীজী (সঃ)-এর সেবা এক বিশেষ ভূমিকায় এমন এক সৌভাগ্য উপহার দিয়াছেন যাহা পয়গম্বর ভিন্ন কাহারও লাভ হয় নাই।

১৬৬৮। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) (নবী (সঃ) হইতে শ্রবণপূর্বক ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা হঠাৎ জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখনই বিবি খাদীজা আপনার খাদ্য সামগ্রী পাত্রে করিয়া নিয়া আসিতেছেন। তিনি আসিয়া পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম বলিবেন এবং আমারও সালাম বলিবেন; আর তাঁহাকে বেহেশতের একটি বিশেষ (শান্তি-নিকেতন) মতি-মহলের সুসংবাদ দিবেন যেখানে শান্তি ভঙ্গকারী কোন শব্দও হইবে না, কোন বিষন্নতাও থাকিবে না। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

খাদীজা (রাঃ) গুণ-গরিমা ও মহত্ত্বের এত উচ্চ শিখার জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহার নিকটবর্তী হওয়াও জগতের অন্য কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৬৬৯। হাদীছ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন মারইয়াম। আর আসমান-যমীনের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা খাদীজা। (৫৩৮– পৃষ্ঠা)

মহীয়সী মহিলা বিবি খাদীজার মহত্ত্ব নবীজীর চরণ ছায়ায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মূলের অধিকারিণী তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই ছিলেন এবং উহার উন্নতির যোগ্য পাত্রীও তিনি ছিলেন। অন্ধকার যুগে তাঁহার ন্যায় পবিত্রা মহীয়সীকে ধুলার ধরণীতে বেহেশতী সওগাত বলিলে অত্যুক্তি হইত না। মক্কার গণ্যমান্য বড় বড় সর্দার কত জনেরই না আকাঙ্ক্ষা ছিল বিবি খাদীজার প্রতি, অথচ তিনি আবার বিবাহ হইতে এতই নির্লিপ্ত ছিলেন যে, সেইরূপ প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্ত সৌভাগ্য তাঁহাকে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট করিল এবং তাঁহার মহত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি নবীজী (সঃ)-কে আহ্বান করিল। যেরূপ–

"জওহরী জওহর চিনে, ভোমরায় চিনে মধু
ভোমরা কি বসে কভু রং দেখিয়া শুধু?"

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নত হইবে সংসারী জীবন। ইসলাম স্বভাব ধর্ম। সুষ্ঠু ও পবিত্র স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহাও আছে। নর-মাদী মিশ্রিত জীবন যাপনই জীবনের স্বভাব। "মানুষ" আরবী "মানুস" শব্দের ভাষান্তর, যাহার ধাতুগত অর্থ প্রেম ও ভালবাসার মিলন শান্তির প্রত্যাশী। অতএব নর-নারীর মিলিত জীবনই মানুষের স্বভাব। এই মিলনের পবিত্রতা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে। তাই নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى -

অর্থ ঃ "বিবাহ আমার আদর্শ, যেব্যক্তি আমার আদর্শ হইতে বিরাগী হইবে সে আমার জামাতভুক্ত পরিগণিত নহে।"

নবী (সঃ) আরও বলিয়াছেন لاسياحة فى الاسلام "সন্যাস জীবন ইসলামের আদর্শ ও নীতি নহে।" বিশ্ববাসীর জন্য যে আদর্শ ভাবী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবেন নবীজী (সঃ), আজ তিনি স্বীয় জীবনে তাহা বাস্তবায়নে অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (সঃ)-এর সহিত খাদীজা (রাঃ)-এর সহচরী নাফিসার আলোচনা আশাব্যঞ্জক পাওয়া মাত্র খাদীজা (রাঃ) স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব দিয়া নবীজীর (সঃ) খেদমতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। খাদীজা (রাঃ)-এর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাইয়া নবীজী (সঃ) স্বীয় মুরুব্বী চাচাগণের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন এবং বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হইয়া গেল। নির্ধারিত তারিখে হযরতের চাচা আবু তালেব এবং হামযাসহ আরও কোরায়শ বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বর যাত্রায় যোগদান করিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর পক্ষে তাঁহার পিতা; কাহারও মতে পিতা তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁহার অভিভাবক চাচা আমর ইবনে আসাদ এবং দূর সম্পর্কীয় চাচা বিশিষ্ট সৎ সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল বিবাহ সম্পাদনে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ মজলিসে খাজা আবু তালেব হযরতের পক্ষে অভিভাষণ বা খোতবা পাঠে বলিলেন, প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে ইব্রাহীমের কুলে ইসমাঈলের বংশে জন্ম দিয়াছেন। আমাদের তাঁহার ঘরের সেবক এবং জনসাধারণের নেতা– নায়করূপে মনোনীত করিয়াছেন। অতপর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মদ সমগ্র কোরায়শ গোত্রে জ্ঞানে গুণে অতুলনীয়; সকলেই মুহাম্মদের নিকট হার মানিতে বাধ্য; যদিও ধন তাহার কম। কিন্তু ধন ক্ষণস্থায়ী ছায়া এবং হাত-বদলের সাময়িক বস্তু মাত্র। মুহাম্মদের আত্মীয়-স্বজনের গৌরব সর্ববিদিত। মুহাম্মদ খোওয়ায়লেদ তনয়া খাদীজার বিবাহ পয়গাম বরণ করিয়াছেন। নগদ ও দেন-মহরানার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।" (যোরকানী, ১-২০২) "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

বিবি খাদীজার পক্ষে তাঁহার আত্মীয় বিশিষ্ট আলেম সৎ-সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসার পর কোরায়শ গোত্রের গৌরব এবং আবু তালেব বংশের (বনী হাশেম) প্রাধান্যের স্বীকৃতি উল্লেখপূর্বক বলিলেন, আমরা আপনাদের সহিত মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি এবং তাহাতে আনন্দ বোধ করি। সকলে সাক্ষী থাকুন– খোওয়ায়লেদ তনয়া খাদীজাকে আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মদের বিবাহে প্রদান করিলাম। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, রাযিয়াল্লাহু আনহা।

মহরানা চারি শত দেরহাম পরিমাণ স্বর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। নবীজী (সঃ)-এর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর ছিল; আরও বিভিন্ন মতামত আছে। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ; এ সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। ইহা নবীজী (সঃ)-এর প্রথম বিবাহ এবং খাদীজা (রাঃ)-এর তৃতীয় বিবাহ ছিল। বিবি খাদীজার প্রথম বিবাহ আবু হালাহ নামক ব্যক্তির সহিত হইয়াছিল, সেই পক্ষে তাঁহার দুই ছেলে ছিল– "হিন্দ" এবং "হালাহ", তাঁহারা উভয়ই ইসলাম গ্রহণপূর্বক ছাহাবী হইয়াছিলেন। একবার "হালাহ" নবী

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিলেন, নবী (সঃ) তখন নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "হালাহকে" বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। খাদীজা (রাঃ)-এর প্রথম স্বামী আবু হালার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছিল "আতীক" নামক ব্যক্তির সহিত। এই পক্ষে তাঁহার এক কন্যা ছিল, নাম "হিন্দ", তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (যোরকানী- ১-২০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং খাদীজা (রাঃ)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। কি অপূর্ব শাদী ছিল ইহা! যাঁহার গুণ-গরিমার তুলনা নাই, সুখ্যাতি সুনাম এবং গৌরব যশের অভাব নাই- ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন কুমারী তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের স্বভাব ধর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই তরুণ যুবক বিবাহ করিলেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা, বহু দিনের যৌবনহারা দুই বারের বিধবা এক মহিলাকে। কারণ, দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্ন বিলাস, কামরিপু চরিতার্থের জন্য তদ্রূপ কোন লালসা বা মোহবশেও এই বিবাহ ছিল না। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ হইল- মোস্তফা (সঃ) ও তাহেরার (রাঃ) সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিচ্ছন্ন মধুর জীবন যাপন। এক দিনের জন্য নহে, এক মাস বা এক বৎসরের জন্য নহে- দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকার এই জীবনসঙ্গিনীর সহিত হাসিমুখে অনাবিল অন্তরের প্রীতি ভালবাসায় কাল কাটাইয়াছেন নবীজী মোস্তফা (সঃ)। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী (সঃ) অন্য বিবাহের চিন্তাও কোন দিন করেন নাই। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ তথা যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত গোটা জীবনই নবীজী (সঃ) অতিবাহিত করিয়াছেন এই স্ত্রীর সহিত।* এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের তরেও বিরাগী হন নাই, বিরক্ত হন নাই। নবীজী (সঃ) খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি কোন অভাব অপূরণের অভিযোগ আনেন নাই, অনুযোগ করেন নাই কোন দিন। এই পরম তৃপ্তি ও চরম সন্তুষ্টির দাম্পত্য জীবন কি সম্ভব হইত যদি স্বার্থসিদ্ধির মানসে বা হীন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে এই বিবাহ হইত? গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধনে সমভাবে আবদ্ধরূপে কাটিয়াছে উভয়ের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। বরং খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে দৈহিক বিচ্ছিন্নতার পরেও ছিন্ন হয় নাই নবীজী (সঃ)-এর হৃদয়ের বন্ধন। খাদীজার স্মরণে নবীজী (সঃ) কত সৌহার্দ্য দেখাইয়াছেন খাদীজার বান্ধবীদের প্রতি! খাদীজার ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাদীজার কণ্ঠস্বর স্মরণে।

২৬৭০। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যুর বহু দিনের পরের ঘটনা-) একদা বিবি খাদীজার ভগ্নী হালাহ বিনতে

খোয়াওয়ায়লেদ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে হযরত (সঃ) বিবি খাদীজার কণ্ঠস্বর স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ! ইহা যেন হালাহর কণ্ঠস্বর হয় (যাহা আমি ভাবিয়াছি)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই অবস্থাদৃষ্টে আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হইল! আমি বলিলাম, আপনি এক দাঁত-পড়া বুড়ীকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? কোন্ যমানায় মরিয়া গিয়াছে! অথচ তাহার অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করিয়াছেন। হযরত (সঃ) আমার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলন; যাহাতে আমি এ বলিতে বাধ্য হইলাম যে খোদা আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আর কোন সময় আমি বিবি খাদীজার সমালোচনা করিব না। (পৃষ্ঠা-৫৩৯)

বিবি খাদীজার কত উচ্চ আসন ছিল নবীজীর অন্তরে, কিরূপ আবিষ্ট ছিল নবীজীর অন্তর তাঁহার প্রতি! ক্ষণস্থায়ী লালসায় হৃদয়ের এরূপ চির বন্ধন কি সৃষ্টি হইতে পারে?

---

* পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর নবীজী (সঃ) অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই বহু বিবাহকে মূলধন বানাইয়া নবীজীর গ্লানি ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা গরম করিতে প্রয়াস পায়। এই শ্রেণীর পিশাচমনা লোকদের লক্ষ্য করা উচিত, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যৌবন-জীবনের প্রতি। বহু বিবাহের যে তাৎপর্য তাহারা দেখাইতে চায় তাহা কি মানুষের বার্ধক্যকালে দেখা দেয় না যৌবনকালে। নবীজী (সঃ) সারা যৌবনকাল যেরূপ স্ত্রীর দাম্পত্যে যেভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলে কোন সুধী সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বিভ্রান্ত হইতে পারে কি?

নবীজীর (সঃ) বিবাহ ছিল এই উদ্দেশে যে, তিনি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সাধনে মিশিয়া যাইবেন মাটির মানুষের সহিত। স্বাভাবিক অধিবাসী হইবেন মাটির জগতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহার সুন্নতী জীবনের আদর্শ ও নীতি। পাত্রী নির্বাচনে মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও স্থূল লাবণ্যের পিয়াসী হয়, কিন্তু নবীজী (সঃ) ছিলেন গুণের সৌন্দর্য ও দেহের অন্তরালে লুক্কায়িত সুষমা পিয়াসী। এই সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিলেন খাদীজা তাহেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তাই তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্বাচন লাভে চির ধন্য চির সৌভাগ্যবতী হইতে পারিয়াছিলেন।

খাদীজা (রাঃ) তাহার সমুদয় ধন-সম্পদ হযরতের অধিকারে দিয়া দিলেন। হযরতের জন্য এই সচ্ছলতার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ দান ও রহমত ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই হযরতকে সম্বোধন করিয়াছেন, وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنٰى "আপনি ছিলেন নিঃস্ব রিক্তহস্ত, অতপর আপনার প্রভুই আপনাকে সচ্ছল ধনাঢ্য করিয়াছেন।"

শাদী মোবারকের পর

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর ভাবী সুন্নত হইবে মানবীয় আবেষ্টনে থাকিয়াও সর্বদা আল্লাহর পানে নিয়োজিত থাকা। সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন গড়িলেও ভোগ-বিলাসে পড়িবে না, কোন আকর্ষণেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। এই মনোবল ও আত্মসংযম লইয়া সব রকম বেড়াজাল এবং কোলাহলে থাকিয়াও মাওলার সঙ্গে মুক্ত নিরালা থাকিবে। কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে সংসার ত্যাগী হইয়া সন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাসনা-কামনার উপাদানের মধ্যে সংযম-সাধনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়া জীবন প্রান্তর অতিক্রম করিবেন– ইহাই হইবে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত।

এখন হইতে সেই সুন্নতের জীবন আরম্ভ হইল নবীজী মোস্তফার (সঃ)। বিবাহের পর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত পনরটি বৎসর নবীজী মোস্তফার জীবন আদর্শমূলকই ছিল। নবীজী (সঃ) পূর্ব হইতেই ব্যবসায় অভিজ্ঞ ছিলেন; বিবি খাদীজারই ধন নিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত ব্যবসায় করিয়াছেন; এখন ত বিবি খাদীজার সমুদয় ধন-দৌলত তাঁহার চরণে নিবেদিত। একদিন বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁহার বিরাট ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করিতেন; এখন ত তিনি গৃহবধূ– নবীজী মোস্তফাই তাঁহার হর্তাকর্তা।

ব্যবসা বা তেজারত নবীজীর একটি বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজী (সঃ)-এর হাদীছ–

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء .

অর্থ ঃ "সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামত দিবসে নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সহিত একত্রে থাকিবে।" (মেশকাত শরীফ) ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, নানা দেশের নানা বৈচিত্রের মধ্যে তাহার গমনাগমন ঘটে, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার গুণ লাভ হয়– নানা মনের নানা স্বভাবের মানুষের সহিত সর্বদা পালা পড়িতে থাকে। এতদ্ভিন্ন মানুষের কঠিন পরীক্ষাও হইতে হয়; একদিকে ধনের সমাগম, অপর দিকে সততা, সাধুতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন; অতএব বাণিজ্যের ভিতর দিয়া মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং ক্রমোন্নতি লাভ হইতে থাকে।

সুযোগপ্রাপ্তিতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) বাণিজ্যানুরাগী ছিলেন; বিভিন্ন দেশে তাঁহার বাণিজ্য সফরের আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায়। বোসরা ও সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্যের বর্ণনা ত আছেই, এতদ্ভিন্ন ইয়ামান বাহরাইনের বাণিজ্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (সীরাতুন নবী দ্রষ্টব্য)

এই পনর বৎসরে নবীজী মোস্তফার পাঁচ সন্তান জন্মলাভ করেন– এক পুত্র "কাসেম", যিনি সকলের বড় ছিলেন, বাল্য অবস্থায়ই ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। চার কন্যা– (১) যয়নব (রাঃ), বিবি খাদীজার ভাগিনা আবুল আছের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমান হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন; বিবি

যয়নব তাঁহার বিবাহেই ছিলেন (২) রোকাইয়া (রাঃ) (৩) উম্মে-কুলসুম (রাঃ); প্রথমে তাঁহাদের বিবাহ হযরতের চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্রের সহিত হইয়াছিল। নবীজী (সঃ) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলে আবু লাহাব দম্পতি তাঁহার সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করে; ফলে তাহার এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফে সূরা "লাহাব" অবতীর্ণ হইল; সেই আক্রোশে আবু লাহাবের পুত্রদ্বয় ক্ষুব্ধ হইয়া নবীজী (সঃ)-এর কন্যাদেরকে ত্যাগ করে।

রোকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত হয়; হিজরী দ্বিতীয় সনে বিবি রোকাইয়্যার ইন্তেকাল হইলে উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ তাঁহারই সহিত হয়। হযরতের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হইলেন খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ)। হিজরী দ্বিতীয় সনে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত তাঁহার শাদী হইয়াছিল।

নবীজীর কন্যাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যার কোন সন্তান জীবিত ছিল না। যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শুধু এক কন্যা– উমামা (রাঃ) জীবিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্তান ছিল না। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দুই পুত্র জীবিত ছিলেন; ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ ধারা এই দুইজন হইতেই চলিয়া আসিতেছে; প্রকৃত সৈয়দগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিবি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এক কন্যাও ছিলেন– উম্মে কুলসুম; তাঁহার বংশ চলে নাই।

নবী হওয়ার পর বিবি খাদীজার পক্ষে হযরতের আরও তিন বা দুই পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন; আবদুল্লাহ, তৈয়্যব ও তাহের। কাহারও মতে একই ছেলে– নাম আবদুল্লাহ, ডাক নাম তৈয়্যব ও তাহের ছিল; তিনি বা তাঁহারা কেহই বাঁচিয়া থাকেন নাই। হিজরতের পরেও হযরতের এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল– নাম "ইব্রাহীম" তিনি মারিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভজাত ছিলেন; শৈশবেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

হযরতের পোষ্যপুত্র

নবী হওয়ার পরবর্তীকালের একটি বিশেষ গুণ হযরতের এই বর্ণিত আছে–

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি প্রথম দৃষ্টি তাঁহার রাজসিক প্রভাব দর্শকের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিত; আর অকপটতার সহিত তাঁহার সাথে মেলামেশা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় করিয়া তুলিত।"

প্রথম বাক্যের মর্ম ত আল্লাহর দান নবুয়তের প্রভাব ছিল, আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম হযরতের স্বাভাবিক চরিত্র মাধুর্যের ফসল এবং এই বৈশিষ্ট্য প্রথম জীবন হইতেই ছিল। হযরতের দাস ও পোষ্যপুত্র যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস এই সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণীয়।

হারেসা পুত্র যায়েদ হযরতের দাস ছিল, তাহার দাসত্বের কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী। আট বৎসর বয়সের শিশু যায়েদকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতা মামা বাড়ী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের উপর লুটেরাদের আক্রমণ হয়, শিশু যায়েদকে তাহার মায়ের কোল হইতে লুটেরা দল ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাহারা যায়েদকে দাস বানাইয়া লয়। এভাবেই যায়েদ পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসে পরিণত হয় এবং এক সময়ে সিরিয়ার কোন বাজারে বিক্রীত হয়।

বিবি খাদীজার ভ্রাতুষ্পত্র হাকীম ইবনে হেযাম সিরিয়া হইতে কতিপয় দাস ক্রয় করিয়া আনেন; তন্মধ্যে যায়েদও ছিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) ঐ দাসগুলি দেখিতে গেলে হাকীম বলিলেন, ফুফু আম্মা! আপনি একটি দাস পছন্দ করিয়া নিন। খাদীজা (রাঃ) যায়েদকে নিয়া আসিলেন; হযরত (সঃ) বিবি খাদীজার নিকট যায়েদকে হেবা চাহিলেন। খাদীজা (রাঃ) হযরতের হস্তে যায়েদকে হেবা করিয়া দিলেন। যায়েদ হযরতের গৃহে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে যায়েদের পিতা-মাতা পুত্রকে হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়া গিয়াছে। তাহার বিচ্ছেদে পিতা-মাতার মনোবেদনার সীমা থাকে নাই। এই বিচ্ছেদ যাতনায় যায়েদের পিতা একটি হৃদয়বিদারক কবিতা রচনা করে। কবিতাটি এতই হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, অচিরেই তাহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; এমনকি ঐ কবিতা মক্কায় পৌঁছিল এবং যায়েদের গোচরেও আসিল। এইভাবে যায়েদের পিতা-মাতার নিকট যায়েদের খোঁজ পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইল। খোঁজ পাইয়া যায়েদের পিতা যায়েদের চাচাকে সঙ্গে নিয়া মক্কায় পৌঁছিল এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিল। তাহারা হযরতের বংশের সুখ্যাতি, বদান্যতা ও দেশজোড়া প্রশংসার উল্লেখপূর্বক মুক্তিপণের বিনিময়ে যায়েদের মুক্তি প্রার্থনা করিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, যায়েদ যদি আপনাদের সহিত চলিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে কোন প্রকার পণ ব্যতিরেকেই আমি তাহাকে মুক্তি দানে আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব। আর যদি সে আমার নিকটই থাকিতে চায় তবে যেব্যক্তি আমাকে ছাড়িতে রাজি না হইবে আমিও তাহাকে কোন বিনিময়েই ছাড়িতে রাজি হইব না। তাহারা বলিল, আপনি ত ন্যায়ের ঊর্ধ্বে উদারতার প্রস্তাব করিলেন। হযরত (সঃ) যায়েদকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যায়েদ ঠিকরূপেই পরিচয় বলিল– তিনি আমার পিতা হারেসা, আর তিনি আমার চাচা কা'ব।

হযরত (সঃ) এইবার বলিলেন, যায়েদ! আমি তোমাকে পূর্ণ সুযোগ দিলাম– তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার পিতা ও চাচার সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা করিলে আমার নিকটও থাকিতে পার। যায়েদ তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীনরূপে বলিয়া দিল, আমি আপনার নিকটই থাকিব। তখন যায়েদের পিতা তাহাকে বলিল, হে যায়েদ! তুমি তোমার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশ-খেশ ছাড়িয়া গোলামী অবলম্বন করিতেছ? যায়েদ উত্তর করিল, আমি এই মহানের যে ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী দেখিয়াছি, আমি তাঁহাকে কখনও ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ হযরত (সঃ) যায়েদের হাত ধরিয়া কোরায়শদের সমাবেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যায়েদের মুক্তি নহে শুধু, বরং তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিও– এই যায়েদ আমার পুত্র । এই ঘোষণায় যায়েদের পিতা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইল– আরবের শ্রেষ্ঠ কোরায়শ বংশের বনী হাশেম গোত্রের আবদুল মোত্তালেবের গৃহে আল-আমীনের পুত্র হইয়াছে যায়েদ– এই সৌভাগ্যের আনন্দ যায়েদের পিতাকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা একমাত্র তাহার অন্তরই অনুভবই করিতে পারিয়াছে। তখন হইতে "মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ" পরিচয়ই প্রবল হইয়া গেল। (ইবনে হেশাম, ১–২৪৭)। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

এই যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। লক্ষাধিক ছাহাবীর মধ্যে একমাত্র যায়েদেরই এই সৌভাগ্য যে, তাঁহার নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহার পূর্বে শুধুমাত্র খাদীজা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরও পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম জীবনে হযরতের গৃহভৃত্য ছিলেন। মানুষের সর্বময় অবস্থার অভিজ্ঞতা গৃহসঙ্গিনীর পরে গৃহভৃত্যের সর্বাধিক বেশী থাকে। মানুষ কৃত্রিমরূপে বাহিরে সব কিছুই সাজিতে পারে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তাহার কোন কৃত্রিমতা টিকিয়া থাকিতে পারে না। গৃহসঙ্গিনী বা গৃহভৃত্যের নিকট তাহার কৃত্রিমতা অবশ্যই ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব হযরতের প্রতি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সর্বাগ্রে ঈমান গ্রহণ যেরূপ হযরতের সত্য ও খাঁটি নবী হওয়ার বিশেষ প্রমাণ ছিল, তদ্রূপ গৃহভৃত্য যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমান গ্রহণও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই হইল নবীজীর সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিত বর্ণনা। আলোচ্য ১৫ বৎসর সময়ে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর আর একটি বিশেষ তৎপরতা এবং মহতী প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

শেরেক বর্জন ও তওহীদ অন্বেষণে নবীজী (সঃ)

তওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত শেরেকী কাজ হইতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যেরূপ ঘৃণা হওয়া এবং পবিত্র থাকার প্রয়োজন ছিল, নবী হওয়ার পূর্ব হইতেই তিনি বাস্তবে তাহাই ছিলেন। ছোট বড় কোন শেরেকী কাজের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও হইত না। অধিকন্তু তিনি মক্কা এলাকায় একত্ববাদী লোকদের অন্বেষণে থাকিতেন। ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে শেরেকীর যে অভিশাপ প্রচলিত আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা আরম্ভের সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই তৎপরতায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা এলাকার প্রসিদ্ধ একত্ববাদী যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়লের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথাবার্তাও বলেন। এই যায়েদ ইবনে আমর মূর্তিপূজার প্রতি অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করিতেন। সত্য ধর্মের তালাশে তিনি সিরিয়া এবং ইরাক পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের চাচাত ভাই ছিলেন; ওমরের পিতা তাঁহাকে তাঁহার মতবাদের জন্য ভীষণ উৎপীড়ন করিত; তাঁহাকে মক্কায় আসিতে দিত না। কিন্তু তিনি একত্ববাদে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তিনি নবীজীর পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া কাঁদিয়াছে এবং বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি সত্য ধর্ম না পাইয়া একত্ববাদের উপরই মৃত্যুবরণ করিতেছি। তাঁহার ছেলে সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ইসলামের যমানা পাইয়াছিলেন এবং মুসলমান হইয়া অতি বড় মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। আশারা মোবাশ্শারাহ অর্থৎ দশ জন ছাহাবী আনুষ্ঠানিকরূপে রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বেহেশতী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন; সায়ীদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে একজন।

হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা– একদা আমি নবীজীর (সঃ) সহিত মক্কার পার্বত্য এলাকায় পৌঁছিলাম; তথায় যায়েদ ইবনে আমরের সহিত নবীজীর (সঃ) সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়ে অতি সৌজন্যের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনার জাতি যেসব অপকর্মে লিপ্ত রহিয়াছে আপনি তাহা অবগত আছেন; তাহার প্রতিকারের কোন চিন্তা করেন কি? যায়েদ ইবনে আমর বলিলেন, সত্য ধর্মের খোঁজে আমি সিরিয়া ও ইরাক গিয়াছিলাম। তথায় তওরাত-ইঞ্জীলেরএকজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট জ্ঞাত হইলাম, সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী অচিরেই মক্কাতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাঁহার আবির্ভাবের শুভ নক্ষত্র উদিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়াই আমি মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষায় আছি।

অদৃষ্টের পরিহাস– নবীজীর (সঃ) সঙ্গেই নবীজী সম্পর্কে তাঁহার কথাবার্তা হইল, কিন্তু নবীজীর আবির্ভাবকাল তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে খাঁটি তওহীদই মুক্তির ভিত্তি ছিল; অতএব তিনি মুক্তির পাত্র। নবীজী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে উপস্থিত হইবেন। (আসাহ্হুস সিয়ার–৫৮)

এই যায়েদ ইবনে আমরের আলোচনায় ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৬৭১। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কার নিকটস্থ) 'বালদাহ' এলাকার শেষ প্রান্তে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়লের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় কোরায়শ বংশীয় কাহারও পক্ষ হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে দওয়াতের খানা পরিবেশন করা হইল (তাহাতে গোশ্ত ছিল)। নবী (সঃ) তাহা খাইতে অস্বীকার করত যায়েদ ইবনে আমরের সম্মুখে দিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হে কোরায়শগণ; তোমারা দেব-দেবীর নামে পশু জবাই করিয়া থাক– আমি তাহা খাই না। আল্লাহর নামে জবাইকৃত হইলে খাইয়া

থাকি। যায়েদ ইবনে আমর সর্বদা কোরায়শদের জবাই করার রীতির প্রতি ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভেড়া-বকরী সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার যমীন হইতে উৎপাদনের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ; আর সেই ভেড়া-বকরী তোমরা জবাই কর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের উপর। এই রীতির প্রতি তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে অতি বড় অন্যায় বলিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যাযেদ ইবনে আমর সিরিয়ায় গিয়াছিলেন সত্য ধর্মের খোঁজ করিতে। তথায় এক ইহুদী আলেমের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম অবলম্বন করিব। ঐ আলেম বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর গজব নিজের উপর টানিয়া নিও না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর গজব হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর গজব লইব না। আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিবেন কি? তিনি বলিলেন, আমার জানা মতে আপনি একমাত্র হানীফ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যায়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হানীফ ধর্ম কি? তিনি বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্ম- তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাসরানীও ছিলেন না। (তাঁহার ধর্মের অনুশাসন ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু এতটুকুর খোঁজ আছে,) তিনি একত্ববাদী ছিলেন- এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা তিনি করিতেন না।

অতপর যায়েদ এক খৃস্টান আলেমের সহিত সাক্ষাত করিলেন; তাঁহার নিকটও ঐরূপ বলিলেন যেরূপ ইহুদী আলেমের নিকট বলিয়াছিলেন। খৃস্টান আলেম তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর অভিশাপ কখনও নিজের উপর টানিয়া লইবেন না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর অভিশাপের কিঞ্চিতও লইব না, আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের অনুসন্ধান দিবেন কি? তিনিও হানীফ ধর্ম তথা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মমত সম্পর্কে বলিলেন।

যায়েদ যখন সকলের কথায়ই ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম- একত্ববাদের খোঁজ পাইলেন তখন সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমি ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আবু বকর (রাঃ) তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি যায়েদ ইবনে আমরকে দেখিয়াছি, তিনি কা'বা ঘরের সহিত হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, হে কোরায়শগণ! আমি ভিন্ন তোমাদের কেহই ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর নহে (অর্থাৎ তোমরা হযরত ইব্রাহীমের ধর্মের মিথ্যা দাবীদার। কারণ, তোমরা মোশরেক, আর ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নিরেট একত্ববাদী)।

যায়েদ ইবনে আমর অন্ধকার যুগের সব অপকর্ম হইতে পবিত্র ছিলেন। মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইতে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কোন পিতা স্বীয় কন্যাকে ঐরূপে হত্যা করিতে চাহিলে যায়েদ তাহাকে বলিতেন, (তাহার খোরপোষের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে চাও!) আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব, ব্যয়ভার আমি বহন করিব; তাহাকে হত্যা করিও না। এই বলিয়া তিনি ঐ হতভাগীকে নিজ আশ্রয়ে নিয়া যাইতেন এবং প্রতিপালন করিতেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিতেন, ইচ্ছা করিলে এখন তোমার কন্যাকে তুমি নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া চলিব। (পৃষ্ঠা-৫৪০)

মক্কাতে এই শ্রেণীর আরও কয়েকজন একত্ববাদী ছিলেন, যথা-ওযারাকা ইবনে নওফল, যাঁহার উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, ওসমান ইবনুল হোয়াইরেস এবং কোস্ ইবনে সায়দা।

শেষোক্ত ব্যক্তি ত সুপ্রসিদ্ধও ছিলেন; তাঁহার নামে আদর্শমূলক অনেক ভাষণও বর্ণিত আছে। এমনকি এরূপ বর্ণনাও রহিয়াছে যে, আরবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ "ওকাজ" মেলায় তিনি এক ভাষণে নবীজী মোস্তফা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের আলোচনাও করিয়াছিলেন যে- একজন পয়গম্বরের আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। ধন্য হইবে তাহারা যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তিনি তাহাদের জন্য সত্যের দিশারী হইবেন। যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের জন্য ধ্বংস! এই ভাষণে নবীজী (সঃ)ও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এতদ্ভিন্ন এই সময়ে নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীর সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমনকি তাহাদের বড় বড় বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিসীতে নবীজী (সঃ)-কে পাইলে তাহারা সকলেই আনন্দ বোধ করিত, সালিসীতে তাঁহার ভূমিকাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বরণ করা হইত।

সামাজিক সালিসীতে হযরত (সঃ)

আমরা যেই সময়ের আলোচনা করিতেছি তখনকার একটি ঘটনা- ঐ সময় কোরায়শরা কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ আরম্ভ করিল। কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বহির্দেশে মানুষের বক্ষ পরিমাণ উপরে "হাজরে আসওয়াদ" নামীয় অতি মর্তবা ও মর্যাদাশীল বিশেষ পাথর খণ্ড স্থাপিত আছে। (বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় টুকরা আকারে আছে- যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড হজ্জের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন লেখক যাঁহারা তাহা দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত; এই ক্ষেত্রে তাঁহারা এমন বিবরণ লিখিয়াছেন যাহা বাস্তব অবস্থার হিসাবে হাস্যাস্পদ।)

কা'বা গৃহের উক্ত পুনঃ নির্মাণে উহার দেওয়াল যখন এই পরিমাণ উঁচু হইল, যেখানে উক্ত বিশেষ পাথর মোবারক বসাইতে হইবে, তখন বিভিন্ন গোত্রীয় সর্দারদের পরস্পর বিরোধ বাধিয়া গেল- কে এই মহা বরকতের পাথর খণ্ড যথাস্থানে স্থাপিত করার সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে। প্রত্যেকে সেই সৌভাগ্য লাভের প্রয়াসী, এমনকি এই কোন্দলে একটা বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম।

হযরতের বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি একজন যুবক; কিন্তু সমগ্র দেশে তাঁহার গুণ মাধুর্যের এতই প্রভাব ছিল যে, যে ক্ষেত্রে বড় বড় সর্দারদের কাহারও উপর ঐকমত্য স্থাপন সম্ভব হইতেছিল না, সে ক্ষেত্রে হযরত (সঃ) সালিস নিয়োজিত হওয়ার উপর সকল গোত্র, সকল দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সহিত ঐকমত্য স্থাপন করিয়া নিল। হযরত (সঃ)ও এমন মীমাংসা করিলেন যাহা বিরোধমান সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিল। বিধাতাই যেন নবীজী (সঃ)-কে এই বিরোধে সালিসী করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মক্কাবাসীদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তাহাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা রক্তপাতে লিপ্ত হইও না; আগামী প্রভাতে সর্বাগ্রে যেব্যক্তি হরম শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিবে তাহাকে সালিস নিযুক্ত করিয়া এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবে। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। পর দিন অনেকেই এই সৌভাগ্যের প্রয়াসী হইয়া হরম শরীফে আসিল, কিন্তু দেখা দেল, সর্বাগ্রে একমাত্র মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন। নবী মোস্তফা (সঃ)-কে পাইয়া সকলে উল্লাস-ধ্বনি দিয় উঠিল- هذا محمد الامين رضينا هذا محمدا "এই যে মুহাম্মদ আল-আমীন; আমরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম (সীরাতে-মোস্তফা, ১-৬৮)

হযরত (সঃ) মীমাংসা করিলেন যে, সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি পাথর খণ্ড একটি বড় চাদরের উপর রাখিবেন; প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সর্দার সেই চাদর বহনে অংশগ্রহণ করিবে। এইরূপে সেই বরকতের পাথর বহনে সকলেই সমভাবে অংশীদার হইবে। অতপর হযরত (সঃ) সকলের প্রতিনিধিরূপে চাদর হইতে পাথরখানা যথাস্থানে স্থাপন করিবেন। হযরতের এই বিচক্ষণতাপূর্ণ মীমাংসায় সকলে মুগ্ধ-সন্তুষ্ট হইল এবং সেই অনুযায়ী কার্য সমাধা করা হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অন্ধকার যুগে কা'বা গৃহে ছাদ ছিল না; শুধু কেবল চারি দিকের দেওয়াল ছিল। উপরোল্লিখিত নির্মাণে কোরায়শগণ ছাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিদ্দা বন্দরে দুর্ঘটনায় একটি নৌযান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোরায়শগণ উহার কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া কা'বা গৃহের ছাদ নির্মাণ করিয়াছিল। তখন কা'বা শরীফ পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপ হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকের জায়গা, যাহা হরম শরীফের মসজিদ, তাহা উন্মুক্তই ছিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগেও হরম শরীফ উন্মুক্তই ছিল, এমনকি উহার চতুর্দিকের দেওয়ালও ছিল না; বাড়ী-ঘরের আবেষ্টনেই আবদ্ধ ছিল।

১৬৭২। হাদীছ ঃ হাম্মাদ (রঃ) এবং ওবায়দুল্লাহ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আমলে বাতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে (মসজিদে হরমের) কোন দেওয়াল ছিল না। (শুধু বাড়ী-ঘরে আবেষ্টিত ছিল এবং) ঐ চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গায়ই নামায পড়া হইত। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর আমলে (মসজিদে হরমের) চতুর্দিকে দেওয়াল তৈয়ার হয়, কিন্তু তাহা অনুচ্চ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) (মসজিদে হরমকে) অধিক প্রশস্ত পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপে তৈয়ার করিয়াছিলেন। (পৃষ্ঠা–৫৪০)

সময় নিকটবর্তী ঃ মাটির জগতে মাটির মানুষের নিকট পয়গম্বরী দায়িত্ব পৌঁছাইবেন নবীজী (সঃ)– সেই উদ্দেশেই তাঁহার আবির্ভাব এই জগতে। সেই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে, সমুদয় প্রস্তুতি ও যোগাড়-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। সেই নির্ধারিত সময়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে নবীজীর জীবন, আর মাত্র দুই বৎসর বাকী– নবীজী মোস্তফার (সঃ) বয়স এখন আটত্রিশ বৎসর।

মাটির দেহে আবেষ্টিত নবীজীর উপর পয়গম্বরী সূর্যের উদয়ন-পূর্ব আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ হঠাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে স্বর্গীয় আলোর কিরণমালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে– তিনি অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পয়গম্বরীর সাক্ষ্য-সম্মান পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার প্রাকৃতিক কণ্ঠ হইতে শ্রবণ করিয়া থাকিতেন। এক এক সময় স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, السلام عليك يارسول الله "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ– আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর রসূল।" এই সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি কৌতূহল ও বিস্ময়ে চতুর্দিকে তাকাইতেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোঁজ করিতেন– ইহা কাহার কণ্ঠ, কাহার সাক্ষ্য, ইহা কাহার সালাম? কিন্তু পর্বতমালার পাথর ও বৃক্ষরাজি ছাড়া তথায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। (যোরকানী–১–২১৯)

পয়গম্বরী প্রাপ্তির পরেও তাঁহার এই অবস্থা চলমান ছিল। পয়গম্বরী প্রাপ্তির সূচনায় প্রথমবার তিনি 'ওহী' লাভ করিয়াছিলেন, তারপর দীর্ঘ দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিল (যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিবে)। তারপরেও হয়ত কিছু দিন ওহীর আগমন অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল– এই সময়েও তিনি ঐ আলোকরশ্মির প্রতিভাত হওয়ার বিষয় অবলোকন করিয়া থাকিতেন এবং অদৃশ্য স্বর তাঁহার শ্রবণে আসিত। পয়গম্বরী প্রাপ্তির দুই বৎসর পূর্ব হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত নবীজীর এই অবস্থা চলিয়াছিল। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولايرى شيئا "অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর তিনি শুনিতেন, কিন্তু কিছু দেখিতেন না এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ তিনি অবলোকন করিতেন– এই অবস্থা দীর্ঘ সাত বৎসর বিরাজমান ছিল।

মুসলিম শরীফের আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে–

انى لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل ان ابعث انى لاعرفه الان ـ

অর্থ ঃ "মক্কার একটি পাথর আমি চিনি– ঐ পাথরটি আমাকে সালাম করিয়া থাকিত আমার পয়গম্বরী প্রাপ্তির পূর্বে; এখনও ঐ পাথরটি আমার স্মরণে রহিয়াছে।"

তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে আছে– আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কায় থাকাকালে একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এক দিকে যাইতেছিলাম। যত পাহাড় বৃক্ষ নবীজীর (সঃ) সম্মুখে পড়িতেছিল প্রত্যেকটি তাঁহাকে السلام عليك يارسول الله "আপনার প্রতি সালাম হে রসূলুল্লাহ!" এই বলিয়া সম্ভাষণ জানাইতেছিল।

আর মাত্র ছয় মাস বাকী– নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া নবুয়তপ্রাপ্তির দ্বারে পৌঁছিতেছে, এই সময় ঊর্ধ্বজগতের আর এক আলিঙ্গন নবীজী (সঃ)-কে অভিভূত করিল। নবীজী (সঃ) যাহা কিছু স্বপ্নে দেখেন প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলোর ন্যায় তাহার বাস্তবতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিকভাবে নবীজী মোস্তফা (সঃ) অতিশয় চিন্তাশীল ভাবগম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। হাদীছ শরীফে আছে– كان النبى صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة متواصل الاحزان

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সদা চিন্তামগ্ন ও ভাবগাম্ভীর্যে নিমজ্জমান থাকিতেন।"

উল্লিখিত অসাধারণ অবস্থাসমূহ এবং অতিন্দ্রিয় লোকের হাতছানি তাঁহার ঐ স্বভাবকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ভাবের আবেশ তাঁহার ভিতরে-বাহিরে আরও সুগভীর হইয়া উঠিল। এখন তিনি নির্জন নিরিবিলি স্তব্ধ পরিবেশে থাকার প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জনহীন শব্দহীন লুক্কায়িত স্থানে সর্বেন্দ্রিয় আবদ্ধ অবস্থায় একাগ্র চিত্তে মন ও ধ্যানকে এক প্রভু এক পরওয়ারদেগার এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি রুজু রাখিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। লোকালয়ের এবং সংসারের কর্মকোলাহল তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনা দুর্বল করিয়া দেয় না কি? সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতা তাঁহার প্রতি ধাবমান নূর জ্যোতির স্রোতকে বাধাগ্রস্ত করে না কি?– তিনি যেন এই শঙ্কা, এই ভীতি, এই ভাবনায় অস্বস্তি উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে জনবসতি হইতে দূরে সরিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, এমনকি রাত্রেও বাড়ী ফিরিতেন না, কোন পর্বত গুহায় থাকিয়া যাইতেন। অনেক সময় এরূপ হইত যে, বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া রুটি-পানি পৌঁছাইয়া আসিতেন। (আসাহ্হুস সিয়ার–৫৮)

ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান-চিন্তায় শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলেও নিরালা-নির্জন বাসের স্পৃহা তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখন তিনি মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতে দেড় মাইল উচ্চ শৃঙ্গের নিভৃত গুহায় একাধারে কতক দিবারাত্র কাটাইবার নিয়ম বাঁধিয়া নিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) প্রকৃত সহধর্মিনীর ন্যায় স্বামীর এই কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই চারি দিনের মত খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, নবীজী (সঃ) তাহা লইয়া সেই নিভৃত সাধনা গুহায় পৌঁছিতেন। সেই খোরাকী ফুরাইয়া গেলে গৃহে আসিয়া পুনরায় খাদ্য-পানীয় লইয়া তথায় ফিরিয়া যাইতেন। এইভাবে নবীজী (সঃ) এক বিরাট পরিবর্তনের দিকে আগাইয়া চলিলেন এবং সেই পরিবর্তনটা যেন ক্রমশই সাফল্যময় পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর বলিয়া তাঁহার মনে হইত। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে চিরবাঞ্ছিতকে পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, নবীজীর উপর যেন সেই ভাব পরিলক্ষিত! তিনি শান্ত শিষ্ট চিত্তে দিবানিশি আল্লাহ তাআলার যিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকেন; এইভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে; এই সময়ে তাঁহার ভিতরে-বাহিরে কেবল নূর– কেবল জ্যোতি।

সত্যের প্রথম প্রকাশ– নবুয়তের প্রারম্ভ (পৃষ্ঠা-৫৪৩)

রমযান মাস,* অমাবস্যা-পূর্ব অন্ধকার, রজনী গভীর, লোকালয় হইতে বহু দূরে হেরা পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে নিভৃত প্রকোষ্ঠে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ধ্যানমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ মহাসত্যের আগমন হইল– ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) ঐ প্রকোষ্ঠে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিলেন। ফেরেশতা নূরের তৈয়ারী; বহন করিয়া আনিয়াছেন আল্লাহ তাআলার কালাম– তাহাও নূর; এইসব নূরের আকর্ষণে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জড় দেহের আবেষ্টনে লুক্কায়িত মহানূরও প্রতিভাত হইয়াছে অসাধারণভাবে। অতএব হেরা গুহায় এখন নূর! নূর!! সবই নূর। নবীজী মোস্তফার (সঃ) ভিতর বাহির নূরের জৌলুসে নূরই নূর হইয়া গিয়াছে। এই মহা মুহূর্তে তাঁহার দেহ-মনের অবস্থা একমাত্র তাঁহারই অনুভব করিবার কথা– ব্যক্ত বা বর্ণনা করার আয়ত্ত বহির্ভূত। নিভৃত গিরিগহ্বরের এই অভূতপূর্ব মুহূর্তটি মোস্তফা হৃদয়ে কি রেখাপাত করিয়াছিল তাহা কি কোন মানুষ নির্ণয় করিতে পারে? "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ।"

সব কিছুই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এইসব অবস্থার মাঝে নবীজী মোস্তফার (সঃ) জ্ঞান, উপলব্ধি চেতনা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও প্রখর ছিল, তাহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এই পরিস্থিতি অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞান-উপলব্ধির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এমনকি চর্মচোখ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ঝলসায় নাই বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে নবীজীর প্রশংসা করিয়াছেন। মে'রাজ ভ্রমণে নবীজী (সঃ) মহান আরশ-কুরসী, সেদরাতুল মোন্তাহা ইত্যাদিসহ যাহা কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى মোস্তফা (সঃ) তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগারের অপেক্ষাকৃত অনেক বড় বড় কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই অস্বাভাবিক অবস্থার ভিড়ের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "ঐসব পরিদর্শনে নবীজীর চোখ মোটেই ঝলসায় নাই এবং কোন প্রকার ব্যতিক্রমেও পতিত হয় নাই।"

হেরা প্রকোষ্ঠে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার মাঝে নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় জ্ঞান, উপলব্ধি ও সুষ্ঠু চেতনার মাধ্যমে ফেরেশতা জিব্রাঈলকে সম্যকরূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন– ইহাও আল্লাহ তাআলার এক কুদরতই ছিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ পরিচয় ও গুণের উল্লেখ রহিয়াছে এই– اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "আল্লাহ তাআলা সেই মহান যিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উহার আকৃতি প্রকৃতি দান করিয়াছেন; অতপর তিনিই তাহাকে স্বাভাবিক ধর্মের প্রতি স্বয়ংক্রিয়রূপে পরিচালিত করিয়াছেন। (১৬-১১) আরও আছে– اَلَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى "আল্লাহ তাআলাই (প্রত্যেক সৃষ্টির স্বভাব ও প্রয়োজন) নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাহাকে সেই স্বভাব প্রয়োজনের প্রতি পরিচালিত করিয়াছেন।" যথা– কাহার খাদ্য কি? প্রত্যেক সৃষ্টি শিক্ষা ও পরিচয় করানো ছাড়াই তাহার সহিত পরিচিত হয় এবং নিজ নিজ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সদ্য প্রসূত শিশু কাহারও শিক্ষা দান ছাড়াই মাতার বক্ষ হইতে দুগ্ধ আহরণের কৌশল-প্রণালী

---

* নবুয়ত ও কোরআন অবতরণ আরম্ভের সময়কাল সম্পর্কে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ সীরাত সঙ্কলকগণের সিদ্ধান্ত এবং বিশিষ্ট ইমামগণের মত ইহাই যে, তাহা রমযান মাসে ছিল। পবিত্র কোরআনের আয়াতও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সুস্পষ্ট– যদি তাহাতে কোন প্রকার হেরফের করা না হয়। (যোরকানী ১-২০৭) এই হিসাবে নবুয়তপ্রাপ্তি চল্লিশ বৎসর ছয় মাসেরও বেশ কিছু দিন উর্ধ্বের বয়সে ছিল।

বুঝিয়া উঠে; এমনকি পরিচয় প্রদান এবং কাহারও হইতে পরিচয় গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাহার অন্তর তাহার সহিত এত গভীরভাবে পরিচিত হয় যে, সেই পরিচয়ের কোন তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর হাজার পরিচয় ও উপলব্ধি কোথা হইতে আসে? এই সবের প্রবাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতেই পৌঁছিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার এই মহাদানই উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শিশুর জন্য মায়ের পরিচয় যে প্রয়োজন তাহা মিটাইয়া থাকেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা; নবীর জন্য জিব্রাঈলের পরিচয় তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এবং হেরা গুহার সেই প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়াছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই। যোরকানী, ১-২১৮)

ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) প্রকাশের পর রসূল হওয়ার সুসংবাদ দানে নবীজীকে অভিনন্দিত করিলেন। সুস্পষ্ট সুসংবাদপ্রাপ্তিতে নবীজী (সঃ) সংশয়মুক্তরূপে রসূল হওয়ার একীন লাভ করিলেন। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) নবীজী (সঃ)-কে বলিলেন, পড়ুন; নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি পড়ায় সামর্থ্যবান নহি।

কাহারও মতে ঐ সময় জিব্রাঈল (রাঃ) রেশমীপত্রে নূরানী মণি-মুক্তা খচিত একখানা লিপি নবীজীর হস্তে অর্পণ করিয়া তাই পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তি লিপি পাঠে সক্ষম হয় না- তাহাই নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি পড়ায় সামর্থ্যবান নহি। অনেকের মতে জিব্রাঈল (আঃ) মৌখিক পড়ার কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু পঠনীয় কোন বস্তু শুধু শুনিয়া আবৃত্তি করাও লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হয়, এতদ্ভিন্ন পূর্বালোচিত ভয়াল দৃশ্যাবলীর চাপে ঐ সময় নবীজীর উপর সৃষ্ট শিহরণ ও কম্পন কোন কিছু পাঠ বা আবৃত্তি করিতে প্রতিবন্ধক হইতেছিল- তাই নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি পড়ায় সমর্থ নহি। (সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা-১-১০০)

যাহাই হউক, জিব্রাঈল (আঃ) নবীজীর সাহস ভাঙ্গা দেখিয়া তাঁহার মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশে স্বীয় দৈবশক্তি প্রয়োগে নবীজীর আধ্যাত্মিক শক্তিকে উচ্ছলিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বীয় বক্ষে নিবেশনপূর্বক আলিঙ্গনের মাধ্যমে সজোরে চাপ দিলেন; এমনকি চাপের দরুন নবীজী (সঃ) ক্লেশ অনুভব করিলেন। প্রথমবার আলিঙ্গনে নবীজীর সাহস সতেজ হইল না, তাই পর পর তিনবার আলিঙ্গন করিলেন; তৃতীয় বার আলিঙ্গনের পর জিব্রাঈলের পঠিত পাঁচটি আয়াত নবীজী (সঃ) অনায়াসে পড়িতে পারিলেন।

হেরা গুহার ঘটনায় সব কিছু চেনা, বুঝা ও উপলব্ধি করার মধ্যে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু এই দুনিয়াতে তিনি মানবীয় মাটির দেহে আবির্ভূত; আত্মা তাঁহার বহু ঊর্ধ্বের, কিন্তু তাঁহার দেহ ও দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি মাটির জগতের। অতএব তাঁহার দেহের উপর কোন বিশেষ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না- এই দৃষ্টিতে হেরা গুহার ঘটনার কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করুন ঃ

(১) নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ!
(২) অন্ধকারময় গভীর রজনী!
(৩) লোকালয় হইতে বহু দূরে!
(৪) পর্বত শৃঙ্গের নিভৃত গুহায়!
(৫) পরে পরিচয় হইলেও আগন্তুকের অকস্মাৎ আগমন!

এতগুলি ভীতির কারণ সমাবেশে মানবীয় দেহের উপর সাময়িক শিহরণ কম্পন সৃষ্টি হওয়া কতই না স্বাভাবিক।

সর্বোপরি কথা- নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘটনার মর্ম সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পারিবেন না কেন? তিনি ত পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার সাক্ষ্য শুনিয়া আসিতেছিলেন, انك لرسول الله "নিশ্চয় আপনি মহাপুরুষ, আল্লাহর রসূল"। লুক্কায়িত সাক্ষ্যের আজ চূড়ান্ত বিকাশ, তাই গুরুদায়িত্বের চেতনাও আজ পূর্ণমাত্রায় উপনীত। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল, যে কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে

প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা সহজ কাজ নহে। তাঁহাকে মুক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল বিশ্বের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। কর্ম ও সাধনা যুগপৎভাবে উভয় লইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে এই বিশাল ধরাপৃষ্ঠে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি ভীষণ চাপের বস্তু ছিল "ওহী"। ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) নিজ অবস্থায় থাকিয়া ওহী পৌঁছাইলেন। সেই ওহীর গুরুচাপ সম্পর্কে হাদীছেই উল্লেখ আছে যে, অত্যধিক শীতের সময়ও নবীজী (সঃ) ঘর্মাক্ত হইয়া যাইতেন; ঘর্মের ধারা তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে বহিয়া পড়িত, গলগণ্ড হইতে গোঙ্গানির শব্দ নির্গত হইত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ) ওহীর আভ্যন্তরীণ গুরুচাপ সম্পর্কে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনা রহিয়াছে– একদা মাত্র একটি শব্দের ওহী অবতীর্ণ হইল; ঐ সময় আমি নবীজীর পাশে বসা ছিলাম; তাঁহার ঊরু আমার ঊরুর উপরে ছিল। ওহীর ভীষণ চাপে আমার ঊরু চূর্ণ হইয়া যাইবে মনে হইতেছিল। হেরা গুহার ঘটনায় বাহ্যিক চাপ ততটা না হইলেও আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক চাপ ত অবশ্যই ছিল। তদুপরি এক দুই বার নহে, তিন বার জিব্রাঈল ফেরেশতার আলিঙ্গন চাপও ছিল। বিদ্যুৎ স্পর্শের চাপ বাহ্যিকরূপে দৃশ্য না হইলেও আভ্যন্তরীণ চাপ কতই না বিরাট হইয়া থাকে এবং সেই চাপে বিদ্যুৎ শলাকায় কম্পনও সৃষ্টি হইতে পারে। এস্থলে নির্মল জ্যোতির ফেরেশতা জিব্রাঈল চির জ্যোতির্ময় বস্তু "ওহী" নিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শে নবীজীর প্রাণে শিহরণ জাগিয়া উঠা মোটেই বিচিত্র ছিল না, বরং এই ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হাদীছে ও ইতিহাসে যদি শিহরণের উল্লেখ না থাকিত তবে তাহা অস্বাভাবিক পরিগণিত হইত।

ভয়াল দৃশ্য, ওহীর চাপ ও ফেরেশতা জিব্রাঈলের আলিঙ্গন ক্রিয়ার সৃষ্ট শিহরণ এবং বিশাল দায়িত্বের গুরুভার বোধে সৃষ্ট শঙ্কা ও ভীতিসহ হেরা গুহায় সর্বপ্রথম অবতারিত اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ পবিত্র কোরআনের পাঁচটি আয়াত লইয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহের লোকজনসহ খাদীজা (রাঃ)-কে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমাকে আবৃত কর– আমাকে আবৃত কর। গৃহের সকলে নবীজী (সঃ)-কে কম্বল আবৃত করিয়া নিলেন; ক্ষণিকের মধ্যে তাঁহার শিহরণ কম্পন দূরীভূত হইল। তিনি স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া

বলিলেন, হে খাদীজা! অসাধারণ আশ্চর্যজনক অবস্থা আমার উপর অর্পিত হইয়াছে– এই বলিয়া সকল বৃত্তান্ত তিনি খুলিয়া বলিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে আরও বলিলেন, আমার কিন্তু প্রাণের ভয় হয়।

নবীজী (সঃ) স্বীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা-চেতনা হেরাগুহা হইতেই নিয়া আসিয়া ছিলেন; এখন থাকিয়া থাকিয়া এই কর্তব্যের কঠোরতা বিশেষতঃ কর্মস্থলের ভয়াবহতা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিশ্বজোড়া আল্লাহ ভোলা মানব শেরেক ও মূর্তিপূজায় পরিবেষ্টিত, আর সেই কাজে সকলের গুরু হইল মক্কাবাসী– সেই মক্কায়ই নবীজীকে প্রথম দাঁড়াইতে হইবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ধ্বনি লইয়া, আঘাত হানিতে হইবে শেরেক ও মূর্তিপূজার প্রতি। এই পরিস্থিতিতে দেশজোড়া, বিশ্বজোড়া শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইবার শঙ্কা ও ভীতি কি অমূলক? কত নবীই ত এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। নবীজীর নিকটতম নবী ঈসা (আঃ), ইহুদীদের দ্বারা তাঁহার কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে নবীজী (সঃ) তাহার কোন খোঁজই কি পান নাই?

বিবি খাদীজা (রাঃ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন। তিনি নবীজীর জনসেবামূলক উন্নত চরিত্রের মহিমা ও গুণাবলী উল্লেখপূর্বক দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, কস্মিনকালেও আল্লাহ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন না। তিনি নিজেই আপনাকে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করিয়াছেন; তাহা যথাযথ পালন করিয়া যাওয়ার সুযোগ শক্তি প্রদান না করার অর্থ আপনাকে অপমান করা; আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপদস্থ-অপমান নিশ্চয়ই করিবেন না। এই সময়ে বিবি খাদীজা নবীজীর যে কয়টি চারিত্রিক গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন– আপনি

স্বজনবর্গের চির শুভাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলকামী বন্ধু, আপনি পরের দুঃখ বহনকারী মহাজন, আপনি গরীব কাঙ্গাল দুঃখীজনের সেবক, যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, আপনি তাহার আপনজন এবং সব কিছু। নবুয়তের পূর্ব হইতেই এই প্রেম ও সেবাবৃত্তি হযরতের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। এইসব ছিল হযরতের আজন্ম প্রতিপালিত সুন্নত। এরূপ পুণ্যবান মহামতি মহাত্মাকে কি আল্লাহ তাআলা বিপর্যস্ত ও অপদস্থ-অপমান করিবেন? কস্মিনকালেও নহে। এই পরিস্থিতিতে বিবি খাদীজা (রাঃ) উপযুক্ত সহধর্মিনীর দায়িত্বই পালন করিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই কঠিন মুহূর্তে যেভাবে তিনি তাঁহার জন্য সান্ত্বনা যোগাইয়াছিলেন– তাহা তাঁহার চির সৌভাগ্যের প্রতীক এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ হইয়া থাকিবে; খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই মহৎ চরিত্রের তুলনা নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ) কিন্তু ধীরস্থির, শান্ত অচঞ্চল; এইরূপ হইবেন না কেন? তিনি ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদীয়মান সূর্যের প্রভাতী আলো পূর্ব হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং সদা তাকাইয়া ছিলেন সেই সূর্য দৃষ্ট হওয়ার শুভলগ্নের প্রতি। সেই চির আকাঙ্ক্ষিত সূর্য আজ উঁকি দিয়াছে; মনে কি আনন্দের ঠাঁই হয়? প্রাণে কি উল্লাসের সঙ্কুলান হয় বিবি খাদীজার? "রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।"

বিবি খাদীজার চাচা সম্পর্কীয় মুরব্বী জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস সৎ-সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল– যাঁহার সহিত খাদীজা (রাঃ) পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) সম্পর্কে যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন, দাম্পত্য প্রণয়নে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ সময় তাঁহার নিকট মায়সারার বর্ণিত ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করিলে এই ওয়ারাকাই নবীজীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং নবী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই অসময়ে বিবাহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজ যখন সেই আশার সূর্যোদয়ের সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর খোঁজ পাইলেন এবং সেই ঘটনাবলীর নিদর্শন চোখে দেখিলেন তখন কি আর খাদীজা (রাঃ) এই মুহূর্তেই ওয়ারাকার নিকট না যাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? স্বাভাবিকভাবেই বিবি খাদীজা (রাঃ) এই নূতন ঘটনাবলীর বর্ণনা ওয়ারাকাকে শুনাইয়া তাঁহার পূর্ব ধারণার বাস্তবতা জ্ঞাত করিতে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য ও গৌরবের উদয় খবর প্রদানে ব্যাগ্র হইয়া পড়িলেন। অন্যের মুখে ও সাক্ষ্যে নহে, বরং স্বয়ং যাঁহার ঘটনা তাঁহার মুখেই ওয়ারাকাকে বিস্তারিত শুনাইবার আগ্রহে বিবি খাদীজা (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাহকেও সঙ্গে লইলেন। বিবি খাদীজার ন্যায় সর্বোৎসর্গকারিণী জীবনসঙ্গিনীর আগ্রহ -আকাঙ্ক্ষা নবীজী (সঃ) কি উপেক্ষা করিবেন? তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নবীজী (সঃ) সঙ্গে গেলেন। নবীজী (সঃ) নিজের ঘটনা সম্পর্কে ওরাকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সংশয় দূর করার জন্য নিজ আগ্রহে ওয়ারাকার নিকট গিয়াছিলেন– এইরূপ বিবৃতি কোন ইতিহাসেও নাই, হাদীছেও নাই; শত্রুরা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডারূপে এই শ্রেণীর কথা গড়িয়া থাকে।

আসমানী কিতাবের অভিজ্ঞ সৎ-সাধু ওয়ারাকা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই মুহূর্তেই সত্য ধরিয়া ফেলিলেন এবং অকাতরে তাহার স্বীকৃতিদানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, এই ত সেই চির মঙ্গলময় বার্তাবাহক দূত ফেরেশতা যিনি মূসা ও ঈসা পয়গম্বরদ্বয়ের নিকট আল্লাহর বাণী ওহী বহন করিয়া আনিতেন। নবীজী (সঃ)-এর পয়গম্বরী প্রসার লাভের সময় পর্যন্ত জীবিত থকার আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রকাশ করিলেন। আসমানী কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি দেশময় নবীজীর (সঃ) শত্রুতা সৃষ্টির সংবাদ দানে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আপনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করিবে; নবীজী (সঃ) স্তম্ভিত স্বরে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে! ওয়ারাকা বলিলেন, হাঁ– আপনার শ্রেণীর প্রত্যেকের সহিতই এইরূপ শত্রুতা করা হইয়াছে। ওয়ারাকা ইহাও বলিলেন, ঐ সময় যদি জীবিত থাকি তবে আমার শক্তি সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে আপনার সাহায্য-সহায়তা করিয়া যাইব। সেই মুহূর্তে ওরাকার ন্যায় ব্যক্তির এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বীকৃতি পাইয়া বিবি খাদীজা (রাঃ) নিজ বিশ্বাস ও সৌভাগ্যের গৌরবে কিরূপ পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা অনুভব উপব্ধি করার বস্তু; ব্যক্ত করার নহে।

ওয়ারাকা বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট চির স্মরণীয় হইয়া থাকিলেন। তিনি কি

তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? নবীজীর (সঃ) চরণতলে ছায়ালাভে তিনিই প্রথম উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের উদয় মুহূর্তেও তিনি সত্যের সঠিক স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মূল্যদানে বিবি খাদীজার অন্তরকে গৌরবে আনন্দে ভরিয়া দিলেন। ওয়ারাকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না; অল্প দিনের মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করিয়া গেলেন– নবীজীর পয়গম্বরীর প্রসারকাল তিনি পাইলেন না। একদা খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলিলেন, ওয়ারাকা ত আপনার পয়গম্বরীতে পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি ওয়ারাকাকে স্বপ্নে সাদা পোশাকে দেখিয়াছি; সে নরকী হইলে (আমার স্বপ্নে) তাহার এই পোশাক হইত না। আরও বর্ণিত আছে– নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ওয়ারাকাকে মন্দ বলিও না; আমি বেহেশতে তাহার জন্য তৈয়ারি বাগান দেখিয়াছি। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১০৭)।

সর্বপ্রথম ওহী

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

অর্থ ঃ "তোমার প্রভু পরওয়ারদেগারের নামের সাহায্য লইয়া পড়– যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন রক্তপিণ্ড হইতে। পড়; তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার মহামহিম। তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন কলমের দ্বারা। তিনি মানুষকে অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

যেই মহাসত্যের প্রতীক্ষায় ছিল সারা জাহান; যুগ-যুগান্তর হইতে ধরণীপৃষ্ঠে কত নবী-রসূল আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত শুনাইয়া গিয়াছেন সেই মহাবাণী সম্পর্কে। সেই মহাসত্য বাণীই হইল আল্লাহর পাক কালাম; আজ তাহার প্রথম অবতরণ। তাহার প্রথম প্রকাশ কত সুন্দর! মানুষের ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে কত সুগভীর ক্রিয়াশীল!

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী ও প্রত্যাশী, অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল অক্ষম। আল্লাহ ভোলা মানুষ তাহার মুখাপেক্ষিতা অক্ষমতা দূরীকরণে সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়িয়া শত দুয়ারে ছুটাছুটি করে– ইহা হইতেই আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজার সূচনা হইয়াছে; যাহার উচ্ছেদের জন্য ইসলামের আবির্ভাব, কোরআনের অবতরণ। তাই কোরআনের সর্বপ্রথম শিক্ষা– যেকোন প্রত্যাশা পূরণে এবং শক্তি সামর্থ্যের কামনায় প্রত্যেকে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হইবে। প্রথম আয়াতের মর্ম ও মূল তাৎপর্য ইহাই; নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সম্বোধন করা এবং পড়ার উল্লেখ করা আয়াতটির অবতরণ ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে উদাহরণ মাত্র। উদ্দেশ এই যে, প্রত্যেকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক কার্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করিবে। তাহা করিলে শক্তি-সাহসের অভাব থাকিলেও সাফল্য লাভ হইবে। আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান– ইহজগতে বান্দা আল্লাহর সাহায্য চাহিবার জন্য আল্লাহকে পাইবে কোথায়? এই জটিলতার সহজ সমাধানেই বলা হইয়াছে, আল্লাহর নামে সাহায্য সম্বল করিয়া কার্যে অবতীর্ণ হইয়া পড়; এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।

বিশ্বজোড়া ভুল ধ্যান-ধারণা, আল্লাহর দুয়ার ছাড়িয়া অন্যের দুয়ারে যাওয়া, ইহার আমূল পরিবর্তন পূর্বক সাহায্য-সহায়তার প্রত্যাশী একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট প্রত্যাশী হওয়ার আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই প্রথম আয়াতের মূল তাৎপর্য। এই আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়াই তওহীদের বিপরীত শেরকের সূত্র; তাই সর্বপ্রথম ওহী এই আদর্শ ও নীতি প্রবর্তনের অতি সুন্দর প্রারম্ভই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতির যৌক্তিকতায় আল্লাহ তাআলা স্বীয় পরিচয় দানে বলিতেছেন, তিনিই বিশ্ব-নিখিলের "রব" তথা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা– সকল সৃষ্টিকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি সম্পর্কে কত না গর্হিত মতবাদ ছিল– সেসব মতবাদ মানুষকে আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শেরকে লিপ্ত

করিয়াছে। পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই সৃষ্টি সম্পর্কে সমস্ত গর্হিত মতবাদ ও ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে– একমাত্র আল্লাহ তাআলাই খালেক স্রষ্টা। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অনাচার অবিচার ও গর্হিত মতবাদের ছড়াছড়ি হইয়াছে সবের মূলেই একটি মহাদোষ দৃষ্ট হয় যে, মানব সৃষ্টিকর্তার যথাযথ মর্যাদাদানে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে তঁহার আসন হইতে নামাইয়া সৃষ্টিকে সেই আসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অধুনা খোদা নাই মতবাদের ধ্বজাধারীরাও ন্যাচার বা স্বভাবকে সেই আসনেই আসীন করিতেছে। অথচ ন্যাচার বা স্বভাব প্রকৃতিও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আসনে টানিয়া আনার এই মূল রোগের বিনাশ সাধনে কোরআন তাহার প্রথম কথায় বলিয়া দিতেছে– বিশ্ব চরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্ত একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টি।

এস্থলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণবাচক নাম হইতে "রব" নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। সৃষ্টির বিবর্তনের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ অতি চমৎকার। "রব" শব্দের অর্থ বস্তুকে তাহার নগণ্য ও ছোট পর্যায় হইতে উন্নত ও বড় হওয়ার জন্য ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতায় উপনীতকারী। বিশ্ব চরাচরে সৃষ্টিসমূহের যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন তাহা ন্যাচার বা স্বভাবের ক্রিয়া নহে; তাহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাঁহারই নিয়ম পদ্ধতি। "রব" শব্দের দ্বারা তাহা বুঝানই উদ্দেশ্য এবং তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। সৃষ্টির সেরা মানব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে– "যিনি মানবকে "আলাক"– রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বিচিত্র ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন মানব সৃষ্টির মধ্যে। পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ـ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ـ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার মূল হইল– মাটি হইতে নিষ্কাশিত বস্তু (খাদ্য, যাহা মাটির রসে উৎপন্ন)। অতপর সেই বস্তুকে বীর্য বানাইয়াছি (খাদ্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য)– যাহাকে জরায়ু প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিয়াছি। অতপর বীর্যকে রক্তপিণ্ড বানাইয়াছি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসখণ্ড বানাইয়াছি। তারপর ঐ মাংস খণ্ডের কিছু অংশকে হাড় বানাইয়া তাহাকে মাংস আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছি। তারপর (আত্মার সংযোজনে) তাহাকে ঐ বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক (বহুমুখী গুণাধার, অসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক এবং বিচিত্র রূপ-লাবণ্য ও সুন্দর নকশা-আকৃতির) সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়াছি। কত বড় মহান সেই আল্লাহ তাআলা যিনি সুন্দর রূপদানে অতুলনীয়। তারপর হে মানব! তোমাকে মরিতে হইবে, অতঃপর কেয়ামত দিবসে তোমাকে পুনর্জীবিত হইতে হইবে (–সেই জীবনের আর শেষ নাই)। (পারা–১৮;রুকু–১)

ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিবর্তনের কি সুন্দর বিবরণ! প্রত্যেক ক্রম ও ধাপের বর্ণনার সহিত আল্লাহ তাআলা "খালাকনা" উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, এক ধাপ হইতে অপর ধাপে যাওয়া একমাত্র আমার সৃষ্টি কার্যেই হইয়াছে; স্বয়ংকৃত স্বয়ম্ভূরূপে বা অন্য কোন কর্তার ক্রিয়ায় নহে। মানবের আদি হইতে অন্ত এবং অনন্ত পর্যন্তের সর্বময় ক্রমবিকাশের কি সুন্দর বর্ণনা ইহা। সর্বপ্রথম ওহীর মধ্যে এই দৃষ্টান্তেরই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দানপূর্বক আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কর্তৃত্ব ব্যাপক আকারে দেখাইয়া শিরকের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে।

আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, ইহার বিকাশ-পাত্রের নমুনারূপে মানব সৃষ্টির আদিকথা উল্লেখ করিয়াছেন– এখানেই আসিয়া গেল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? এক্ষেত্রেও কোরআন

যাবতীয় মতবাদকে বাতিল করিয়া দিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, মানুষকে আল্লাহ তাআলাই পয়দা করিয়াছেন অতি নিকৃষ্ট ঘৃণার বস্তু বীর্য এবং রক্তপিণ্ড হইতে।

মহান আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তার কি সুস্পষ্ট বিকাশ! একটা নিকৃষ্ট বস্তু রক্তপিণ্ডের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের অসাধারণ শক্তি সম্ভাবনা পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তপিণ্ডকে জ্ঞান বিবেকসম্পন্ন অসংখ্য অসাধারণ গুণাবলীর আকররূপে শক্তিশালী সুশ্রী মানুষে পরিণত করিয়াছেন।

মানুষের মহারত্ন জ্ঞান সম্পর্কেও কোরআন সুস্পষ্ট ধারণা ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছে যে, আল্লাহ তাআলাই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই ব্যাপারেও আল্লাহর মহাশক্তিমত্তার উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে– এই মহারত্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়াছেন নির্জীব লেখনীর মাধ্যমে। জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লেখনীর মাধ্যমেই জন্মলাভ করিয়া প্রসারিত হয় এবং মানুষ তাহা আহরণ করে। তারপর আরও বলা হইয়াছে, বহু অজানা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা মানবকে বিভিন্ন উপায়ে দান করিয়াছেন।

জ্ঞান দুই প্রকার ঃ (১) জাহেরী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যেমন জাগতিক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি। (২) বাতেনী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; যেমন "হাকায়েক" তথা তত্ত্বজ্ঞান এবং "মাআরেফ" তথা আধ্যাত্মজ্ঞান। জাহেরী জ্ঞান সাধারণতঃ লেখনীলব্ধ, আর বাতেনী জ্ঞান মূলতঃ প্রত্যক্ষ সত্য দর্শন বা সত্যের সাক্ষাতলব্ধ কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ বা বাহ্যিক চর্চার মাধ্যমে ইহার অধিক উন্মেষ হইতে পারে। এই উভয় প্রকার জ্ঞান মানুষের দুই পথে লাভ হইতে পারে– (১) লেখনী চর্চা, শিক্ষা ইত্যাদি কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যমে; ইহাকে "এল্‌মে কসবী" বলা হয়। (২) কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যম ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে; ইহাকে "ইল্‌মে লাদুন্নী" বলা হয়।

এখানে প্রথমে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দানের উল্লেখপূর্বক এল্‌মে কসবীর ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে, মানুষকে আল্লাহ তাআলা বহু অজানা জ্ঞান দান করিয়াছেন। অর্থাৎ উভয় পথের জ্ঞান তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন! ওহী ও পবিত্র কোরআনের আরম্ভ উদ্বোধন (Opening) এবং প্রথম প্রকাশ (Beginning) কত মধুর! কত গুরুত্বপূর্ণ। কত সুন্দর! সব রকম উৎকর্ষ সাধন প্রণালী শিক্ষা দানে তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে– প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর নামের সাহায্য সম্বল গ্রহণ করিবে; অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ" বলিয়া আরম্ভ করিবে; যাহার অর্থ হইবে– হে আল্লাহ! আমি তোমারই সাহায্য কামনা করি, তোমারই প্রত্যাশা রাখি; তুমি সর্বশক্তিমান ভিন্ন অন্য কোন শক্তির প্রতি আমার প্রত্যাশা নাই– তুমি ত ধরা-ছোঁয়া এমনকি বর্তমান চোখে দেখারও উর্ধ্বে, তাই তোমার নামের উসিলায় তোমার সাহায্য কামনা করি।

এই আদর্শের ইঙ্গিতের পর সম্পূর্ণ কোরআন এই আদর্শের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে– কোরআনের প্রতিটি সূরার প্রারম্ভেই "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রারম্ভের আদর্শ সর্বাগ্রে ব্যক্ত হইতে হইবে, অতএব সর্বাগ্রে এই আয়াত নাযিল হওয়াই অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে।*

এই আদর্শ অতি গুরুত্বপূর্ণ; ইহাতেই শেরকের ছিদ্রপথ বন্ধ হইবে, যাহা তওহীদ– একত্ববাদের প্রথম সোপান; যেই তওহীদের জন্যই ইসলাম, কোরআন ও রসূল। ইহারই সঙ্গে সঠিক ধারণা ও সত্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে সর্ব উর্ধ্বের দর্শন সম্পর্কে– (১) আল্লাহর পরিচয়, (২) নিখিল সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? (৩)

---

* "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" পবিত্র কোরআনের একটি বিচ্ছিন্ন আয়াত, সূরার অংশবিশেষ নহে। প্রত্যেক সূরার আরম্ভেই তাহা বার বার শুভ আরম্ভরূপে অবতীর্ণ হইত। সূরা "ইকরা"–র প্রারম্ভে ইহা অবতীর্ণ হয় নাই বটে, কারণ তাহার দ্বারা প্রারম্ভের আদর্শ ত এই সূরায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য পরে ঐ আদর্শের সামঞ্জস্যে এই সূরার শুভ প্রারম্ভেও "বিসমিল্লাহ" সংযোজিত হইয়াছে; ছাহাবীগণের যুগ হইতেই ইহা করা হইয়াছে। (যোরকানী, ১–২১২)

বিশেষতঃ মানুষের সৃষ্টি বৃত্তান্ত কি? (৪) মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য জ্ঞান– যাহার দ্বারা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরারূপে যাবতীয় জীব হইতে পৃথক উর্ধ্বের স্থান লাভ করিয়াছে; সেই জ্ঞানরত্ন কোথা হইতে লাভ হইয়াছে? এইসব তত্ত্বের রহস্য উদঘাটনই সকল দর্শনের সেরা দর্শন।

পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান ঘোষণা করিয়াছে যে– এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা আছেন; তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতেই ইহা পরিচালিত হইতেছে। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার সৃষ্টিকর্ম হইতেই আসিয়াছে; মানুষকে তিনিই পয়দা করিয়াছেন; মানুষের বৈশিষ্ট্য জ্ঞানরত্ন তিনিই তাহাকে দান করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এইসব প্রশ্নের উত্তর হাতড়াইয়া বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছে– তাহা সবই শুধু কল্পনা ও ধারণা তথা ধরিয়া নেওয়া; তাই ঐসব মতবাদে ভাঙ্গা গড়া হইয়াছে এবং হইবে। বিজ্ঞান আবিষ্কারের বহু পূর্বেই পবিত্র কোরআন এইসব প্রশ্নের সমাধানে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছে– তাহাই পবিত্র কোরআনের প্রারম্ভ।

১৬৭৩। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে (তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) যখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। নবুয়তপ্রাপ্তির পর তিনি তের বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছেল। অতপর আল্লাহর আদেশে মদীনায় হিজরত করিয়া আসেন এবং তথায় দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করার পর ইহজগত ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ সপ্তাহের যেদিনে হযরত নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ছিল সোমবার দিন। ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (একমাল ১–৩০)

এই সম্পর্কে মুসলিম শরীফে একখানা হাদীছও উল্লেখ আছে– হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সোমবারে নফল রোযা রাখিয়া থাকিতেন; সেই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل على فيه - অর্থাৎ এই সোমবার দিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি এবং এই সোমবার দিন আমি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছি বা আমার উপর ওহী অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

এই দিনটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনাকারীদের মতভেদ আছে। কাহারও মতে রবিউল আউয়াল মাসের ঐ তারিখে যেই তারিখে তাঁহার জন্ম ছিল। এই সূত্রে হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি সঠিকরূপে তাঁহার বয়সের চল্লিশ বৎসরের সময়েই ছিল; যেরূপ উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নবুয়তপ্রাপ্তি নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পার হইয়া যাওয়ার পর রমযান মাসে ছিল। অনেকের মতে রমযান মাসের শেষ দশকের কোন রাত্রে ছিল যেই রাত্র "লাইলাতুল কদর"। এই সূত্রে নবুয়ত প্রাপ্তিকালে হযরতের বয়স চল্লিশ বৎসর ছয় মাস আরও কিছু বেশী দিন ছিল। পবিত্র কোরআনে ইহার ইঙ্গিত ও সমর্থন পাওয়া যায়– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ "রমযান মাসে কোরআন অবতারিত হইয়াছে।" আর কোরআন অবতরণ হইতেই নবুয়তের আরম্ভ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের আরও মতামত বর্ণিত আছে।

প্রথম প্রকাশের পর

হেরা গুহায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) আল্লাহ তাআলার সদ্য অবতারিত কালাম প্রাপ্ত হইলেন; আল্লাহর প্রেরিত দূত নূরে পয়দা ফেরেশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামের সাক্ষাত লাভ করিলেন। তারপর আর ওহী আসে না; জিব্রাঈল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন হয় না। ওহী বন্ধের এই বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কিরূপ হইয়া দাঁড়াইল তাহা ব্যক্ত করা ত সম্ভব নহে, তবে লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগরূপে আংশিক

উপলব্ধি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লাভ হইতে পারে।

রাজত্বের মোহে মুহ্যমান ব্যক্তি ইহা রাজত্ব লাভ করার পর রাজ্যহারা হইলে বা ধনের মায়া ও আকর্ষণে নিমজ্জমান ধনী ধনহারা হইয়া পড়িলে, সন্তানের মায়া মহব্বতে ব্যাকুল একটি মাত্র সন্তানের মা সন্তানহারা হইলে– এইসব ক্ষেত্রে প্রিয়হারা ব্যক্তি তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রিয় বস্তু হারাইয়া যেরূপ মানসিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হয়, আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য ও উন্নতিকামীগণ আল্লাহর নৈকট্য, আল্লাহর মারেফাত, আল্লাহর দেওয়া ঐ জগতের যত সম্পদ, তাহাতে বিন্দুমাত্র লাঘব দেখিলে তাঁহারা ঐ ক্ষণস্থায়ী প্রিয়হারাদের অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণ অধিক পীড়া ও যাতনায় পতিত থাকেন। দার্শনিক রুমী (রঃ) বলেন–

گر زباغ دل خلالے کم بود - بر دل سالك هزاران غم بود

অর্থ ঃ "সালেকের অন্তর বাগানে একটি তৃণেরও যদি লাঘব ঘটে তবে তাঁহার অন্তরে হাজার হাজার ব্যাকুলতার ঢেউ খেলিতে থাকে।"

আধ্যাত্মিক জগতের ছোট্ট শিশু, যে সবেমাত্র ঐ পথে হাঁটা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে সূফীবাদের পরিভাষায় "সালেক" বলা হয়। আধ্যাত্মিক জগতে এই শিশু সালেকের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্রেণী ও স্থান কত ঊর্ধ্বে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং সেই পরিমাণেই ঐরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাকুলতার পরিমাপ হইবে।

তদুপরি আলোচ্য ক্ষেত্রে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আধ্যাত্মিক জগতের তৃণহারা হইয়াছিলেন না, বরং মহা রত্নহারা হইয়াছিলেন; চির বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়া তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করিতেছিলেন। ওহী তথা আল্লাহর বাণী প্রাপ্তির সময় আল্লাহর সঙ্গে যেই দৃঢ় নিকটবর্তী যোগ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য সান্নিধ্যের যে স্বাদ লাভ হয় তাহা অতুলনীয়। অতএব তাঁহার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ছিল বর্ণনাতীত। ওহীর বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কোন কোন সময় অসহনীয় হইয়া উঠিত; পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিজেকে ফেলিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করার ন্যায় উত্তেজনা পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি হইতে চাহিত।* এইরূপ মুহূর্তে জিব্রাঈল (আঃ) আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং আশার ইঙ্গিতদানে সান্ত্বনা বাণী শুনাইতেন–

يا محمد انك رسول الله حقا -

"হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তাআলার বরহক রসূল।" অর্থাৎ আপনি বিচলিত হইবেন না, আপনার হারানিধি আপনার নিকট আসিবেই। জিব্রাঈলকে দেখিলে এবং ঐ বাণী শুনিলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তর অগ্নিতে কিছুটা পানির ছিটা পড়িত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত আল্লাহ তাআলার বাণী পুনঃ না পাওয়ায় যে ব্যাকুলতা ছিল তাহা বিদুরিত হইত না।

এতদ্ভিন্ন রত্নহারা মানুষের অন্তরে কতই না সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কত ধারণারই না জন্ম হয়! সত্য প্রবাদ–

---

* **সমালোচনাঃ** ওহীর বিচ্ছেদে নবীজী (সঃ)-এর বিরহ যাতনায় সৃষ্ট এই শ্রেণীর ত্রাস ও উত্তেজনাকে "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে, অথচ তথায়ই এই বর্ণনার প্রমাণও উল্লেখ রহিয়াছে। সনদের মারপেঁচে ফেলিয়া প্রমাণটাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। জানি না এই বর্ণনায় খাঁ সাহেবের গাত্রদাহ কেন জন্মিল? তবে তাঁহার ত চিরাচরিত স্বভাব– পাণ্ডিত্য ত তাঁহার আছেই; তিনি কোন বর্ণনাকে এন্‌কার করার ইচ্ছা করিলে অতি বক্র ভাষায় ব্যক্ত করেন, যেন পাঠক নিজেই তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে; যেমন আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনায় তিনি বলেন– "তিনি (নবীজী) মধ্যে মধ্যে পর্বত শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন? (পৃষ্ঠ–২৬৫) বিবরণ, উদ্ধৃতির কি জঘন্য ভঙ্গি! খাঁ সাহেবের এই বিবরণ ভঙ্গিতে মনে হয় তিনি বলিতে চাহেন– আত্মহত্যা মহাপাপ, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসছল্লাম তাহার সংকল্প কিরূপে করিতে পারেন?

এই প্রশ্ন নিতান্তই দুর্বল। কারণ, ইহা ত আভ্যন্তরীণ মনোবেদনা ও বিরহ জ্বালায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা মাত্র; কার্যে বাস্তবায়িত করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া নেওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নহে। যেমন হাদীছে আছে– নবক্কজী (সঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা নামাযের জামাতে উপস্থিত হয় না, আমার ইচ্ছা হয় তাহাদেরকে গৃহে রাখিয়া আগুন লাগইয়া দেই।" অথচ এইরূপ করা কি মহাপাপ নহে? এরূপ ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের মাসআলার অবতারণা নিছক বোকামি। ক্রোধে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বলে– "মন চায়, তোকে কাঁচা মরিচের ন্যায় চিবাইয়া খাইয়া ফেলি।" এক্ষেত্রে কি প্রশ্ন হইবে যে, মানুষের গোশত হারাম, পেটে মল-মূত্র; কিরূপে চিবাইয়া খাইবেন?

عشق است هزار بد گمانی "ভালবাসা হাজার হাজার দ্বিধা সংশয়ের কারণ।" প্রাণপ্রিয় ওহী হারাইয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তরে কত শত সংশয় ও আতঙ্কেরই না সৃষ্টি হইতেছিল! এমনকি এইরূপ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টিও বিচিত্র ছিল না যে, প্রভু কি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন? আমার প্রতি তিনি কি বিরাগী হইয়া গেলেন?

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ফাওয়ায়েদে কোরআনে তফসীর ইবনে কাসীরের বরাত দানে লিখিয়াছেন– নবীজীর নবুয়ত প্রাপ্তির সংবাদ যাহারা শত্রুতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ শ্রেণীর শত্রুরা এই সুযোগে নবীজীর কাঁটা ঘায়ে লেবুর রস দেওয়ার ন্যায় কটাক্ষ করিয়া থাকিত, উপহাস করিত– "মুহাম্মদের প্রভু তাহার প্রতি রাগ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" মনো ব্যথার প্রতিক্রিয়ায় নবীজীর দেহেও অবসাদ ছিল, তাই রাত্রের এবাদতে তিনি কতেক দিন জাগ্রত হন নাই; ইহা লক্ষ্য করিয়া এক হতভাগিনী শত্রুও ঐরূপ কটাক্ষপাত ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উক্তি করিয়া বেড়াইত।

এরই মধ্যে আর কেটি ছোট্ট সূরা নাযিল হইয়া নবীজীর ব্যথিত হৃদয়ে মহাপ্রলেপের ক্রিয়া করিল এবং তাঁহার ভাঙ্গা বুককে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ـ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلٰى ـ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ـ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ـ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ـ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰى ـ

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর শপথ– আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই, আপনার প্রতি বিরাগীও হন নাই। আপনার ভবিষ্যত অতীত অপেক্ষা নিশ্চয় অনেক উজ্জ্বল। আপনার প্রভু আপনার প্রতি মহাদানে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। আপনি কি ছিলেন না এতীম; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়াছেন? মহাজ্ঞান ও সহাসত্যের অবগতি আপনার ছিল না– তাহার সন্ধানে আপনি ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তিনি আপনাকে মহাজ্ঞান মহাসত্যের পথ দান করিয়াছেন। আপনি ছিলেন নিঃস্ব তিনি আপনাকে ধনাঢ্য করিয়াছেন।

দীপ্ত প্রভাত গভীর রজনীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে কতই না সুসামঞ্জস্যপূর্ণ! আলোর পরে অন্ধকার, দিনের পরে রাত্রি, ইহা স্বভাব– সৃষ্টির ধারা ও নীতি; ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। রাত্রির অন্ধকার আসিলে কি বলা হইবে, প্রভু বিশ্ববাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? শান্তির অবলম্বন নিদ্রার জন্য কি রাত্রি ও অন্ধকার বড় নেয়ামত নহে? জোয়ারের পরে কি ভাঁটা আসে না? ভাটার পরে কি জোয়ার আসে না? আপনার এই ভাঁটা মহাজোয়ারের পূর্বাভাস। বর্তমানে সাময়িক অন্ধকারদৃষ্টে আপনি মোটেই মন ভাঙ্গিবেন না; অতীতে আপনার জীবনের কত অন্ধকারে প্রভু আপনাকে আলো দান করিয়াছেন! এতিমীর অন্ধকারে আশ্রয়ের আলো দিয়াছেন, উর্ধ্ব জ্ঞানর ও সত্যের পিপাসায় ব্যাকুলতার অন্ধকারে মহাসত্যের আলো দান করিয়াছেন, দারিদ্র্যের অন্ধকারে অভাব মুক্তির আলো দিয়াছেন। তদ্রূপই বর্তমানের প্রিয় হারার অতি সাময়িক অন্ধকারের পরেই দীপ্ত প্রভাতের আশা লইয়া অগ্রসর হউন– ভয় নাই, আশঙ্কা নাই; আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত।*

এরপর আর ভীতি কি? কুণ্ঠা কী? নবীজী মোস্তফা (সঃ) উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস পাইয়াছেন; আর কোন বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-উৎপীড়ন তাঁহাকে দমাইতে পারে কি? এই সূরার বিবরণধারাই পাঠককে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেয়।

সত্য প্রচারের আদেশ

দীর্ঘ চল্লিশ দিন বা ছয় মাস, কাহারও মতে আরও অধিক দিন অতিবাহিত হইল; নূতন কোন বাণী আসে

* সূরা ওয়াযযোহার অবতরণ যে "ফাত্‌রাত" তথা সাময়িক ওহী বন্ধের উপলক্ষে ও সংলগ্নে ছিল– ইহা মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ)-ও তাঁহার ফাওয়ায়েদে কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন।

না, জিব্রাঈল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন এবং সাক্ষাত হয় না। তাই নবীজী (সঃ) ব্যাকুলতার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। অবশেষে তিনি সেই হেরা গুহায় যাইয়া দিবা-নিশি অবস্থান করিতে লাগিলেন; হযরত ভাবিলেন, যেস্থানে একবার প্রাণপ্রিয় বিষয় লাভ হইয়াছিল, তথায়ই ধরণা পাতিয়া থাকি। সেমতে দীর্ঘ এক মাসের এতেকাফের নিয়তে তিনি তথায় থাকিলেন। এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। স্বয়ং নবীজীর বর্ণনা– হেরা পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পদস্থ নিম্নভূমি অতিক্রম কালে মধ্যবর্তী স্থানে আসিলে পর আমি একটা আহ্বান শুনিতে পাইলাম। ডানে-বামে, সম্মুখে-পিছনে তাকাইলাম, কোন কিছু দেখিলাম না। অতপর উপর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, পূর্ব পরিচিত সেই ফেরেশতা জিব্রাঈল, যিনি হেরা গুহায় প্রথম বার আল্লাহর বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন– তিনি আমার দৃষ্টিগোচরে উদ্ভাসিত। অবশ্য সেই আকৃতিতে নহেন; তাঁহার ব্যক্তিগত আসল আকৃতিতে বিরাট অপেক্ষা বিরাট তাঁহার আকৃতি, সবুজ রং ভেলবেট বা মখমলরূপে ছয় শত ডানাবিশিষ্ট– তিনি কুর্সির উপর আকাশ প্রান্তে এক আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার আকৃতি এত বিরাট যে, আসমান যমীনের মধবর্তী সমগ্র প্রান্তকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন।

হযরত নবী (সঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-কে এই আকৃতিতে সারা জীবনে দুই বার দেখিয়াছেন, দ্বিতীয় বার মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে সপ্তম আসমানের উপর সেদ্‌রাতুল মোন্তাহার নিকট– যাহার আলোচনা পবিত্র কোরআন সূরা নাজমে রহিয়াছে। ঐ সময় নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় শক্তি সামর্থ্যে পাকা-পোক্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে বক্ষ বিদীর্ণের দ্বারা বেহেশতী পরিপুষ্টিকর বস্তুতে তাঁহাকে অধিক শক্তিমান করিয়া তোলা হইয়াছিল। আলোচ্য ঘটনায় নবুয়তের প্রারম্ভ, দীর্ঘ দিন হইতে বিরহ যাতনার বিহ্বলতায় ভুগিতেছেন, দীর্ঘ এক মাস পর্বত গুহায় কাটাইয়া সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছেন; এমতাবস্থায় মানবীয় দেহের উপর চর্ম চোখের দৃষ্টিতে অতি অস্বাভাবিক বস্তু দর্শনের প্রতিক্রিয়া তিনি সামলাইতে পারিলেন না। নবীজী (সঃ) ঐ দৈব দেহীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা নহে; তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন, ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে হেরা গুহার সেই পূর্ব পরিচিত ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম। (প্রথম খণ্ড ৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) এতদসত্ত্বেও হযরত (সঃ) বলেন, আমি চমকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ঐ অবস্থায় জিব্রাঈল মানুষবেশে নিকটে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম, তখনও সেই চমকের শিহরণ আমার উপর ছিল, তাই গৃহবাসীদেরকে আমি বলিলাম– دثرونى دثرونى وصبوا على ماء باردا "আমাকে চাদর মুড়িয়া দাও, আমাকে চাদর মুড়িয়া দাও এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢাল।" তাহারা আমাকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করাইয়া দিল এবং চাদর মুড়িয়া দিল। সেই অবস্থাতেই জিব্রাঈল ফেরেশতা ওহী নিয়া আসিলেন–

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۔

অর্থ ঃ "হে চাদর মুড়ি দেওয়া! উঠ; (চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকার সময় নহে; এখন উঠ) এবং বিশ্ববাসীকে সতর্ক কর, নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কর, নিজের বাহির-ভিতরকে পবিত্র রাখ, ভিতর-বাহিরের সমস্ত দেবদেবীকে পরিহার করার উপর দৃঢ় থাক। উপকার করিয়া অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও আশা পোষণ করিও না। (নবীজীর দায়িত্বের পথে ইহা মহা উপদেশ। কোরআনের বয়ান– সকল নবীগণই বলিতেন, দায়িত্ববোধেই দায়িত্ব পালন; তোমাদের হইতে কিছু পাইতে চাই না। দায়িত্বের বোঝা উঠাইবার প্রারম্ভেই এই উপদেশ।) স্বীয় প্রভুর কৃতজ্ঞতায় (তাঁহার পথে) ধৈর্যাবলম্বন করিও।"

সমস্ত যোগাড়-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে; আজ হইতে মহাপুরুষের কর্ম সাধনা আরম্ভ হইবে। মৌন ভাবুক, ধ্যানগম্ভীর মহাত্মাকে কর্তব্য পালনে দৃঢ়তার সহিত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আদেশ আসিল। ইহা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় প্রকাশ– কত সুন্দর! কত আবেগময়ী! কিরূপ মধুর স্বরে বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ার আহ্বান!

প্রথমে জড়তা পরিহারে সংগ্রামী পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য কর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং মূল বিষয়বস্তু স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল– বিশ্ব বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই বড়, সর্বক্ষেত্রে ইহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে, ইহাই হইল ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতীয়তার একমাত্র স্মারক– "আল্লাহু আকবার" আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম মহত্তম বিরাটতম। প্রতিটি মুসলমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই আল্লাহু আকবারেই আবেষ্টিত। জন্মঘরে শিশুর কর্ণকুহরে সর্বপ্রথম এই ধ্বনিই প্রবেশ করে, প্রতিদিন দিবারাত্রে পাঁচবার মুসলিম জাতির সর্বত্রই এই ধ্বনি বারংবার গর্জিত হয় এবং ঈদে, আনন্দ-উৎসবে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সর্বশেষে প্রতিটি মুসলমানকে এই ধরণী হইতে চিরবিদায় দানকালে জানাযার নামাযে তাহার প্রতি আল্লাহু আকবারের চারিটি ধ্বনি দিয়া সমাহিত করা হয়। মুসলিম জীবনের সহিত আল্লাহু আকবার– আল্লাহর মহত্ত্ব বড়ত্বের ধ্বনি এমনিভাবে ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আলোচ্য আয়াতে সেই আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্বই প্রতিষ্ঠার আদেশ করা হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে বিশ্ব নেতৃত্বের পটভূমিতে দাঁড় করান হইতেছে, তাই নেতৃত্ব পদের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাহারও আদেশ এস্থলে করা হইয়াছে। নেতৃত্বের পদে যিনি ব্রতী হইবেন সর্বপ্রথমে সকল প্রকার কলুষ হইতে তাঁহাকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, দৈহিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার বিকার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং সাধনার পথে পর্বতের ন্যায় অটল, আকাশের ন্যায় বিশাল হৃদয় লইয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে এই ছোট ছোট আয়াত কয়টিতে। নবীজীর জন্য ইসলামের কর্ম ময়দানে যাত্রার প্রাক্কালে এই নির্দেশসমূহ কতই না সুন্দর! কতই না শ্রেয়!!

তারপর ঘন ঘন ওহীর আগমন হইতে থাকিল, কোরআন শরীফের আয়াতও নাযিল হইত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকামও নাযিল হইত। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বৎসর পর মে'রাজ শরীফে ফরয হইয়াছে। তাহার পূর্বে এই প্রথম অবস্থায় সকাল-বিকালের দুই ওয়াক্ত নামায ফরয হইয়াছিল।

সর্বপ্রথম ফরয– নামায

একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-কে এক পাহাড়ের আড়ালে নিয়া গেলেন এবং পায়ের গোড়ালি দ্বারা যমীনে আঘাত করিলেন, তাহাতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। জিব্রাঈল (আঃ) স্বয়ং অযূ করিয়া নবী (সঃ)-কে অযূ শিক্ষা দিলেন। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) ইমাম হইয়া দুই রাকআত নামায পড়াইলেন। নবী (সঃ) মোক্তাদী হইয়া নামাযে শরীক হইলেন এবং নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা করিলেন। তথা হইতে নবীজী (সঃ) বাড়ী আসিয়া বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে এবং যে কতিপয় লোক মুসলমান হইয়াছিলেন সকলকে অযূ এবং নামায শিক্ষা দিলেন। সকলেই পাহাড়-পর্বতের আড়ালে গোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায পড়িতেন। প্রথমে শুধু সকাল-বিকাল দুই ওয়াক্ত দুই দুই রাকাতের নামাযই ফরয ছিল, তারপর সূরা মোযযাম্মেল নাযিল হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযেরও আদেশ হয়– اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ "দিনের দুই দিকে এবং রাত্রের অংশে নামায আদায় করিবে।" (সীরাতে মোস্তফা, ১–১১৪)

একদা নবী (সঃ) আলী (রাঃ)-সহ গোপনে এক জায়গায় নামায পড়িতেছিলেন। হযরতের চাচা– আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আবু তালেব হঠাৎ তথায় পৌঁছিলেন। নামায শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিলে? নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার রসূল বানাইয়াছেন, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার এক বিশেষ এবাদত ফরয করিয়াছেন– ইহা সেই এবাদত চাচাজান! আপনিও এই ধর্ম গ্রহণ করুন। আবু তালেব বলিলেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করা ত সম্ভব নহে তবে তোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাও; সর্বদা আমার সাহায্য তোমাদের পক্ষে থাকিবে। আলী (রাঃ)-কেও অভয় দিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার–৭১)

পবিত্র কোরআনে এই বিশেষ ওহীতে যে আদেশ ছিল, قُمْ فَأَنْذِرْ "উঠুন! সতর্ক করুন।" এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী (সঃ) ইসলামের প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অতি গোপনে। নবীজী (সঃ) তাঁহার কর্তব্য লইয়া প্রথম দাঁড়াইলেন; যে পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে মানুষের প্রাণের দুয়ারে তাহা পৌঁছাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। এই শুভ যাত্রায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) আপন সহধর্মিণী বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পূর্ণ সমর্থন-সহায়তা লাভ করিলেন।

সর্বপ্রথম মুসলমান বিবি খাদীজা (রাঃ)

বিবি খাদীজা (রাঃ) ইসলামের সূর্যোদয়ের প্রথম প্রভাতেই নবীজীর প্রতি ঈমান আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। খাদীজা (রাঃ) অপেক্ষা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বেশী চিনিতে পারে কে? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন সুন্দরভাবে দেখিতে পারিয়াছে। তিনি ত তাঁহার জীবন সঙ্গিনী।

১। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রথম জীবনের সুনাম-সুখ্যাতিতে বিবি খাদীজা (রাঃ) পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

২। সিরিয়ার বাণিজ্য সফরে বিবি খাদীজার ক্রীতদাস মায়সারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল।

৩। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী থাকিয়া খাদীজা (রাঃ) তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

৪। হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা নবীজী (সঃ) বিবি খাদীজাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

৫। অবশেষে বিবি খাদীজার মুরব্বী সৎ-সাধু অভিজ্ঞ আলেম ওয়ারাকার স্পষ্ট সাক্ষ্য ও উক্তি বিবি খাদীজার সম্মুখেই ছিল।

এইসব কারণে অতি সহজেই বিবি খাদীজা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিলেন; ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই নবীজীর মনোবল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাই ইসলামের জয়যাত্রার পথে বিবি খাদীজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার মূল্য ছিল অনেক বেশী। চারিপার্শ্বে সংশয়, ভয়-ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার– কোথাও কোন বন্ধু নাই, সহায় নাই; এই সময় সত্যের অভিযানের প্রথম পদেক্ষেপেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ স্ত্রীকে আপন দোসররূপে পাইলেন– ইহা নবীজীর জন্য এক বিরাট সাফল্য ছিল।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) যে সত্য পয়গম্বর, তিনি যে তাঁহার বর্ণনা ও দাবীতে অকপট সত্যবাদী মিথ্যাবাদী নন, কৃত্রিম নন ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে বিবি খাদীজার ইসলাম গ্রহণে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভণ্ডামি থাকিলে স্বীয় গৃহিণীর কাছে তাহা গোপন থাকিতে পারে না; তাই কোন মানুষের সততার পক্ষে তাহার স্ত্রীর সাক্ষ্য সর্বপ্রকার সাক্ষ্যের ঊর্ধ্বে বিবেচিত হয়। ইসলামের কঠিন দিনে বিবি খাদীজার এই ভূমিকা নারী জাতির জন্য বিশেষ গৌরবই বটে।

দ্বিতীয় মুসলমান আলী (রাঃ)

নবীজীর চাচা ছিলেন আবু তালেব। আবু তালেবের আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী। তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী। নবীজী (সঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে শাদী করার পর দৈন্যমুক্ত হইয়াছিলেন, আবু তালেবের সাহায্যার্থে তাঁহার পুত্র আলীকে নবীজী (সঃ) নিজ প্রতিপালনে নিয়া আসিলেন, আলী (রাঃ) নবীজীর ব্যয় বহনে এবং তাঁহার গৃহেই থাকিতেন।

একদা নবীজী (সঃ) বিবি খাদীজা (রাঃ)-সহ নামায পড়িতেছেন, তখন আলীর বয়স দশ-বার বৎসর; আলী (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহর দ্বীনের কাজ; পয়গম্বরগণ সকলেই আল্লাহর দ্বীন লইয়া দুনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে এই

দ্বীন গ্রহণের আহ্বান জানাই; তুমি লাত ওজ্জা দেব-দেবীকে বর্জন কর। আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন কথা। আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারি না। এই কথায় নবীজী (সঃ) বিব্রত হইলেন যে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ফাস হইয়া যাইবে, তাই তিনি আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, হে আলী! তুমি যদি গ্রহণ নাও কর তবুও তুমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিও না। আলী (রাঃ) তখন চুপ থাকিলেন; রাত্র অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলীর অন্তরের পরিবর্তন ঘটিল; প্রভাত হইতেই আলী (রাঃ) নবীজীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিসের আহ্বান করিয়া থাকেন? নবীজী (সঃ) বলিলেন, এই স্বীকৃতি করিতে হইবে যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং লাত-ওজ্জা ইত্যাদি দেব-দেবীকে বর্জন করিতে হইবে, মূর্তিপূজাকে চিরতরে ঘৃণা ও পরিহার করিতে হইবে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার ইসলাম গোপন রাখিলেন।

তৃতীয় মুসলমান যায়েদ (রাঃ)

নবীজীর গৃহ খাদেম যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)– নবীজী (সঃ) তাঁহাকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদা নবীজীর নিকটেই থাকিতেন। আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার বিশেষ প্রমাণ ছিল। কারণ স্ত্রীর ন্যায় গৃহভৃত্যের নিকটও আসল রূপ লুক্কায়িত থাকে না।

চতুর্থ মুসলমান আবু বকর (রাঃ)

নবীজীর গৃহবাসী সকলে ঈমান গ্রহণ করিলে পর নবীজী (সঃ) নিজ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও ইসলামের প্রচার চালাইলেন, কিন্তু গোপনে গোপনে। এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ নবীজীর (সঃ) সাফল্যের এক বিরাট অধ্যায় ছিল। কারণ ইতিপূর্বে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন নবীজীরই করতলগত লোকগণ; তদুপরি তাঁহাদের ইসলামের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। একজন মহিলা, অপরজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, আর একজন ত ক্রীতদাস গৃহভৃত্য। এতদ্ভিন্ন মহিলা ও গৃহভৃত্যের ত বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক কম ছিল, আর আলী (রাঃ) ত তখনও ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

এইসব দিক দিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবু বকর (রাঃ) বেশী বয়সের ছিলেন, এমনকি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রায় সমবয়স্ক– মাত্র দুই বৎসরের ছোটছিলেন। ধন-জন মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন পরিগণিত ছিলেন এবং সৎ-সাধু সুচরিত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন।

বিবি খাদীজার ভাইপো হাকীম ইবনে হেযামের নিকট একদা আবু বকর বসিয়াছিলেন; ঐ সময় হাকীমের ক্রীতদাসী আসিয়া বলিল, আপনার ফুফু আম্মা খাদীজা বলেন, তাঁহার স্বামী মূসা (আঃ) পয়গম্বরের ন্যায় পয়গম্বরী লাভ করিয়াছেন। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী (সঃ) তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শুনিবামাত্র বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেওয়া ঐ সময় অতি বিরল ও বিচিত্র ছিল; তাই তিনি "সিদ্দীক" –অতিশয় বিশ্বাসী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি যেকোন ব্যক্তিকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়াছি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আবু বকর ইসলামের আহ্বান শুনামাত্রই বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নবী (সঃ) হইতে শত্রুদের অত্যাচারও যথাসাধ্য নিবারণ করার চেষ্টায় ব্রতী থাকিতেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাই তিনি সাধারণ্যে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে প্রসিদ্ধ; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাহারও ইসলাম সম্পর্কে কেহ কোন খোঁজ রাখিত না।

১৬৭৪। হাদীছ ঃ হাম্মাম (রঃ) বলিয়াছেন, আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে প্রথম এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাঁচ জন ক্রীতদাস, দুই জন মহিলা আর আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। (পৃষ্ঠা-৫১৬)

ব্যাখ্যা ঃ পাঁচ জন ক্রীতদাস হইলেন, যায়েদ, বেলাল, আমের ইবনে ফোহায়রা, আবু ফোকায়হা এবং আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। আর মহিলাদ্বয় হইলেন খাদীজা এবং আম্মারের মাতা- সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা।

যায়েদ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্রীতদাস ছিলেন; তাঁহাকে মুক্ত করিয়া নবী (সঃ) স্বীয় পোষ্যপুত্র বানাইয়া ছিলেন। বেলাল (রাঃ) মক্কার এক সর্দার উমাইয়া ইবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন; ইসলাম গ্রহণের কারণে বেলাল (রাঃ) ভীষণ অত্যাচারিত হইতে ছিলেন, তাই আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া ছিলেন। আমের (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্রীতদাস ছিলেন। উক্ত সাত জনের দুই জন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পূর্বে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলী (রাঃ)ও মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু গোপনে।

আবু বকর (রাঃ) মুসলমান হইয়া গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে ওসমান, যোবায়ের, আবদুর রহমান, ইবনে আওফ, তাল্‌হা এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন; সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এই পাঁচ জন সকলেই মক্কার বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১-১১৯)

এইরূপে ধীরে ধীরে অতি মন্থর গতিতে হইলেও ইসলামের কাজ সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবীজীর কার্যকলাপ নিতান্তই বিক্ষিপ্ত আকারে চলিতেছিল; যথায় তথায় সুযোগপ্রাপ্তে তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ের মধ্যেই অষ্টম বা দশম সংখ্যায় আরকাম (রাঃ) মুসলমান হইলেন; তাঁহার বাড়ী ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে। মুসলমানগণের পরামর্শে স্থির হইল যে, নবী (সঃ) আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে বসিবেন; মুসলমানগণ লুকাইয়া লুকাইয়া তথায় একত্রিত হইবেন; নবী (সঃ) হইতে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, আর সকলে পরামর্শ করিয়া পরিকল্পিতভাবে কাজ চালাইবেন। তখন হইতে নবী (সঃ) "দারে আরকাম" আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে* নিয়মিত বসিতেন এবং মুসলমানগণ গোপনে তথায় একত্রিত হইতেন; ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন।

নবুয়তের তৃতীয় বৎসর- প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

দীর্ঘ তিন বৎসরকাল ইসলামের কার্যকলাপ মক্কা নগরীর সীমার মধ্যে গোপনে গোপনে চলিল। নবুয়তের তৃতীয় বৎসরের শেষের দিকে পবিত্র কোরআনের দুই সূরার দুইটি আয়াত নাযিল হইল- যাহাতে আল্লাহ

---

* ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে এই গৃহ যেয়ারতের সৌভাগ্য হইয়াছি; এখন গৃহটির স্থান হরম শরীফের আওতায় আসিয়া গিয়াছে- গৃহের চিহ্নও নাই!

তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রকাশ্যে সুস্পষ্টরূপে ইসলামের আহ্বান ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ দান করিলেন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ -

অর্থ ঃ "বিশ্ববাসীকে যাহা পৌঁছাইবার জন্য আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে আপনি তাহা সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে প্রচার করুন; মোশরেকদের কোন পরোয়া করিবেন না। উপহাসকারীদের মোকাবিলায় আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট হইব।" (পারা-১৪; রুকু-৬)

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

"আপনি (ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ) আপনার নিকটতম জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে (আল্লাহর আযাব হইতে)। সতর্ক করুন।" (পারা-১৯, রুকু-১৫)

এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত স্বীয় আত্মীয় স্বজনসহ মক্কার সকল প্রধানগণকে তওহীদ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন।

এই উদ্দেশে নিকট আত্মীয়গণকে একত্র করার জন্য একদিন নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে দাওয়াতের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আলী (রাঃ)কে বলিলেন, এক ছা'- প্রায় চারি সের আটা, বকরীর একটি সম্মুখ রান এবং সাধারণ এক পেয়ালা দুধ যোগাড় কর। অতপর আত্মীয় স্বজনসহ কোরায়শদলপতিদিগকে দাওয়াত প্রদান করিলেন। আবু তালেব, হামযা, আব্বাস, আবু লাহাব- হযরতের চাচাগণসহ প্রায় চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত দাওয়াতে আসিলেন।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অলৌকিক বরকত ছিল যে, ১০/১২ জনের খাদ্য পরিমাণ ঐ খানা চল্লিশ জন তৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকিল। অতপর হযরত (সঃ) দুধের পেয়ালা উপস্থিত করিতে বলিলেন; ইহাও তদ্রূপই- সাধারণ এক পেয়ালা দুধ চল্লিশ জনে পরিতৃপ্তির সহিত পান করিলেন। পানাহার শেষে নবীজী (সঃ) নিজের কথা প্রকাশ করিলেন; তাহার পূর্বেই আবু লাহাব বলিয়া উঠিল, হে লোকসকল! মুহাম্মদ ত আজ তোমাদের খাদ্যেও জাদু চালাইয়াছে- এইরূপ জাদু আর দেখি নাই। ইহা বলিতেই সকলে ছুটাছুটি করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল; সেই দিন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন কথাই বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

এই দিনের অকৃতকার্যতা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে দমাইতে পারিল না, তিনি চেষ্টার পর চেষ্টা বারংবার চেষ্টার নীতি অবলম্বন করিলেন।

আর একদিন ঐরূপ দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে একত্র করিলেন। আজ পানাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তওহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ! আমি আপনাদের জন্য এমন কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি যাহা কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য আনয়ন করিতে পারে নাই। আমি আপনাদের জন্য ইহ পরকাল উভয়ের কল্যাণ মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি।

(সীরাতে মোস্তফা, ১-১২৮)

কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছাড়াই দাওয়াতী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়া গেল, সকলে নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। এইরূপে গৃহাভ্যন্তরে সত্যের ডাক শুনাইবার পর নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ সাধনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন- দেশ ও জাতিকে চরম আহ্বান জানাইবার আরও এক বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিলেন।

আরবের প্রথা ছিল, সমাগত কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশ ও জাতিকে সতর্ক করিতে হইলে পর্বত শিখরে উঠিয়া চিৎকার করিতে হইত। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মঙ্গলবাহক বিপদ নিবারক নবীজী মোস্তফা (সঃ) সেই কায়দায় দেশ ও জাতিকে চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী আযাব হইতে সতর্কীকরণপূর্বক তওহীদ ও

ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সেমতে একদিন নবীজী (সঃ) প্রভাতে কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন এবং সমগ্র কোরায়শকে বিশেষভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে বিপদ সঙ্কেতের ধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া সাফা পর্বত প্রান্তে সমবেত হইল; এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই সে নিজ প্রতিনিধি পাঠাইল। পর্বত শৃঙ্গ হইতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) সকলকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পিছন হইতে একদা শত্রু সৈন্য তোমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতেছে-- তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করিবে কি? সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় করিব; আমরা কখনই তোমাকে কোন মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। নবীজী (সঃ) তখন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে শুন! আমি তোমাদিগকে কঠিন আযাব হইতে সতর্ক করিতেছি! অর্থাৎ আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে ঐ আযাব তোমাদের উপর আসিবে।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে এই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে।

১৬৭৫। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৭০২) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَابَنِىْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٍ فَقَالَ اَرَئَيْتُكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَاِنِّى نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ـ

(فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, **وانذر عشيرتك الاقربين** "আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করুন"– তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা সাফা পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং (হে জনমণ্ডলী। সতর্ক হও, সতর্ক হও বলিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং *) হে বনী ফেহ্‌র গোত্রীয় লোকগণ! হে বনী আদী গোত্রীয় লোকগণ! এইরূপে কোরায়শ বংশীয় গোত্রসমূহকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এমনকি কোন কোন গোত্রের সর্দার উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায় তাহার পক্ষের পর্যবেক্ষককে ব্যাপারটা দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তথায় আবুলাহাবসহ কোরায়শ সর্দারগণ উপস্থিত হইল।

হযরত নবী (সঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বল ত! যদি আমি তোমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রদান করি যে, একদল শত্রুসেনা নিকটবর্তী উপত্যকা বা গিরিপথ বাহিয়া (আজই সকাল বেলা বা বিকাল বেলা *) তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশে (এই পাহাড়ের পিছন হইতে)* আসিয়া পড়িতেছে, তবে তোমরা আমাকে সত্য সংবাদদাতা মনে করিবে কি? সর্দারগণ সকলেই একবাক্যে বলিল, হাঁ– কারণ আমরা কখনও আপনার মধ্যে সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশমাত্র দেখি নাই। তখন হযরত (সঃ) বলিলেন, (তোমরা যে শেরেক ও বুৎপরস্তির মধ্যে আছ যদি ইহা ত্যাগ না কর তবে কেয়ামত বা পরজীবনে তোমাদের উপর ভীষণ আযাব আসিবে; সেই) ভীষণ আযাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি। (সেই আযাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা তোমাদিগকে বাতাইবার জন্য আমি আসিয়াছি।)

---

* চিহ্নিত তিনটি বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয় ৭৪৩ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

তখন আবু লাহাব (ক্রোধ স্বরে) বলিল, সর্বদার জন্য তোমার সর্বনাশ হউক– তুমি আমাদিগকে (তোমার ধর্মের) এই কথা শুনাইবার জন্য একত্র করিয়াছ?

আবু লাহাবের উক্তির প্রতিবাদেই এই সূরা নাযিল হয়–

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ـ

অর্থ ঃ "আবু লাহাবের সমুদয় চেষ্টা-তদবীর ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে । তাহার ধন-সম্পদ এবং স্বীয় অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসে নাই। (আল্লাহর আযাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই।)

১৬৭৬। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৭০২১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ لاَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তাআলা وانذر عشيرتك الاقربين আয়াত নাযিল করিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (উক্ত আয়াতের নির্দেশানুসারে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করার উদ্দেশে) দণ্ডায়মান হইলেন এবং আত্মীয়বর্গকে সমবেতভাবে আর কতেক জনকে বিশেষরূপে আহ্বান করিলেন– হে (আমার বংশধর) কোরায়েশ বংশীয় লোকগণ! তোমরা নিজদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হও; (আযাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা তোমরা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে (নিকটতম আত্মীয়বর্গ–) আব্‌দে মনাফ গোত্রীয় লোকগণ! (তোমরাও আযাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাই কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে আমার চাচা! আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাস! (আপনিও যদি আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে) আমি আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিব না।

হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সূফিয়্যা"! (আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আপনাকেও আমি কোন সাহায্য পৌঁছাইতে পারিব না।

হে মুহাম্মদের (সঃ) কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার ধন-সম্পদের যতটুকু ইচ্ছা দাবী করিতে পার, কিন্তু (আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা স্বয়ং গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাকেও আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। (অর্থাৎ নাজাত পরিত্রাণের মূল বস্তু ঈমান ও ইসলাম ব্যতিরেকে কাহারও কোন সম্পর্ক, এমনকি নবীর সম্পর্কও কোন কাজে আসিবে না।)

এই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা এবং আহ্বানও উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন ফলদায়ক হইল না। আবু লাহাব এই ক্ষেত্রেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্য বানচাল করার হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া দিল সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীজী মোস্তফার (সঃ) উৎসাহ-উদ্যমের সীমা নাই। ভন্ড ধোকাবাজ লোক আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলচেতা হয়; প্রাথমিক অকৃতকার্যতায় তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অনাবিল সত্য ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা কর্তব্যের কারণেই কর্তব্য পালনে অগ্রসর হন তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস আত্মবল পর্বত সমতুল্য এবং অকৃতকার্যতার উপর তাঁহারা সাফল্যের কল্যাণ সৌধ নির্মাণে সাধনা করেন। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড লোকেরা যেই পরিস্থিতিতে অকৃতকার্যতার প্রথম আঘাতেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে, সত্যের সেবকগণ সেই পরিস্থিতে অধিকতর উৎসাহ, অধিকতর সাহস এবং বজ্র কঠিন দৃঢ়তা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন। সত্যের মহাসেবক কর্তব্যের মহাসাধক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার পূর্ণতম বাস্তব আদর্শ। দেশ ও জাতির এই উপেক্ষা উদাসীনতায়, আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহারে তিনি একটুও বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাঁহার উদ্যম-উৎসাহ এবং সাধনার গতি আরও বাড়িয়া গেল। "হয় উদ্দেশের সাধন না হয় জীবনের পাতন" এই আদর্শের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ) এই কঠিন ময়দানে।

দাওয়াত-ব্যবস্থার করুণ আহ্বানে বিফল হইলেন, পর্বতশৃঙ্গের গাম্ভীর্যপূর্ণ সতর্ক বাণীতে অকৃতকার্য হইলেন, কিন্তু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনোবল অক্ষুণ্ন, মর্মস্পৃহা অদম্য। এখন তিনি তওহীদ ও ইসলামের বাণী– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার জন্য পথে-প্রান্তরে নামিয়া পড়িলেন।

عن ربيعة بن عباد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منازلهم يقول ان الله يامركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وابولهب ورائه يقول يايها الناس ان هذا يامركم ان تتركوا دين ابائكم ۔

অর্থ ঃ "রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের ঘরে ঘরে ছুটাছুটি করিতেছেন এবং বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন– তোমরা একমাত্র তাঁহার এবাদত-উপাসনা কর, অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী, শরীক, অংশীদার সাব্যস্ত করিও না। নবীজী (সঃ) এই আহ্বান লইয়া বেড়াইতেন আর আবু লাহাব তাঁহার পিছনে পিছনে বলিতে থাকিত– হে লোকসকল! এই লোকটা তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় তোমাদের ভাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিতে; তোমরা সতর্ক থাকিও।"

ইহার উপরও ক্ষান্ত নহে– আবু লাহাব, আবু জহল-গোষ্ঠী তাঁহাকে জাদুকর, গণক-ঠাকুর, মিথ্যাবাদী, পাগল বলিয়া লোকদের নিকট হেয় ও উপেক্ষণীয় সাব্যস্ত করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহাকে তিলমাত্র ক্ষুন্ন করিতে পারিত না। তিনি পথে-প্রান্তে, হাটে-মাঠে, মেলা-উৎসবে সর্বত্র ইসলাম প্রচারে আমদমনীয় হইয়া উঠিল।

মুনীব গামেদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লা গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে। ঐ সময় হতভাগাদের কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর ধুলা-বালু ছঁড়িতেছিল। এমন অবস্থায় একটি মেয়ে পানি নিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মেয়েটি নবীজী তনয়া যয়নব (রাঃ)। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মেয়েটিকে বলিলেন, হে বৎস! পিতার দুঃখে ও মানহানিতে ভীত হইও না।

(সীরাতে মোস্তফা, ১–১৪৭)

তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল মাজায" মেলায় আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিয়া যাইতে ছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লা গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে! এক হতভাগা তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার উপর পাথর মারিতে ছিল এবং বলিতে ছিল, এই মিথ্যাবাদীর কথা কেহ শুনিও না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেহ মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। (ঐ)

আর একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন– জুল মাজায মেলায় আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোকসকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইব। আবু জাহল তাঁহার প্রতি ধুলা-বালু ছুঁড়িতেছিল এবং লোকদিগকে বলিতেছিল, তোমরা তাহার ধোঁকায় পড়িও না; সে তোমাদিগকে তোমাদের দেবদেবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেছিলেন না। (ঐ)

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকাজ" এবং 'জুল-মাজায" মেলায় আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর একটা টেরা মানুষ তাঁহার পিছনে পিছনে বলিতেছিল, এই লোকটা বেদ্বীন-মিথ্যাবাদী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ঐ টেরা মানুষটা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা আবু লাহাব। (সীরাতে মোস্তফা, ১-১৩১)

নবুয়তের চতুর্থ বৎসর মোশরেকদের শত্রুতার ঝড়

দীর্ঘ তিন বৎসর ইসলাম প্রচার গোপনে চলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার আরম্ভ হইলে পর আবু লাহাব শ্রেণীর কেহ কেহ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরোধী হইল এবং মক্কার জনসাধারণ পথে-ঘাটে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ঠেস মারিতে লাগিল বটে, কিন্তু হযরতের আত্মঘাতী শত্রুতায় লিপ্ত হয় নাই।

চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে হযরত (সঃ) মোশরেকদের গর্হিত মাবুদ দেবদেবী ও ঠাকুর প্রতিমাগুলির নিষ্কর্মণ্যতা, অপদার্থতা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ঐ সবের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এই মর্মে অবতারিত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতও প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা–

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ـ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاۗءِ اٰلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا ـ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে মোশরেকগণ! নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের গর্তিত পূজ্য দেবদেবীসমূহ সবই জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হইবে; তোমরা পূজারী ও পূজ্য উভয়েই নরকে প্রবেশ করিবে। (এখন ভাবিয়া দেখ!) যদি এই গর্হিত পূজ্য দেবদেবীগুলি বাস্তবিকই মাবুদ হইত তবে এইগুলি কখনও জাহান্নামে দগ্ধ হইত না, অথচ ঐ পূজ্য দেবদেবীগুলিসহ তোমাদের সকলেরই জাহান্নামে চিরকাল পতিত থাকিতে হইবে। (পারা-১৭, রুকু-১৭)

এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআনে আরও রহিয়াছে। যথা–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ـ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! একটি কৌতূহলজনক কথা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর! আল্লাহ ভিন্ন অন্য যেসব দেবদেবী-মূর্তির পূজা-উপাসনা তোমরা করিয়া থাক তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া একযোগে চেষ্টা করিলেও কিছুতেই একটি মাত্র মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আরও শুন- মাছি যদি তাহাদের (ভোগ-ভেট) হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া নিয়া যায় তবে সেই বস্তুটি মাছি হইতে ছাড়াইয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের নাই। উপাসক (মানুষ) ত অক্ষম দুর্বল আছেই, উপাস্য মূর্তিগুলি ত আরও অধিক অক্ষম দুর্বল। এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুতঃ আল্লাহ তথা প্রকৃত উপাস্যের পূর্ণ মর্যাদা বুঝেও নাই, দেয়ও নাই। আল্লাহ ত নিশ্চয় সর্বশক্তিমান সর্বোপরি প্রাধান্যের অধিকারী আছেন। (পারা- ১৭, রুকু-১৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ـ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহারা আল্লাহ ভিন্ন পূজ্য সাহায্যকারী অবলম্বন করে তাহাদের অবস্থা মাকড়সার ন্যায়। মাকড়সা নিজের রক্ষার জন্য ঘর তৈয়ার করে, অথচ দুনিয়ার সমস্ত গৃহের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল মাকড়সার গৃহ। (তদ্রূপ যাহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া সাহায্যের আশায় দুর্বলদের পূজা করিয়া থাকে! কতই না অযৌক্তিক তাহাদের এই আশা।) যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত! (পারা-২০; রুকু-১৬)

মোশরেকদের ধর্ম এবং তাহাদের ধর্মীয় দেব-দেবীদের এইরূপ নিন্দা-মন্দ বেইজ্জতী অপমানের বহু আয়াত কোরআন শরীফে নাযিল হইতে লাগিল। নবীজী (সঃ) সেইসব আয়াত নির্ভীকভাবে যথারীতি প্রচার করিয়া চলিলেন।

এতদিন কাফেররা নবীজীর প্রতি বেশীর ভাগ বিদ্রূপ, উপহাস, উপেক্ষা, করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছিল। এখন যখন তিনি তাহাদের পূজ্য দেব-দেবীর নিন্দা-মন্দ ও পৌত্তিলিকতার অসারতা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের পূজ্য মহাপুরুষগণসহ তাহাদেরকে নরকী বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন তখন কোরায়েশ দলপতিগণ সমবেতভাবে নবীজীকে বাধাদানে ইসলাম প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এই পর্যায়ে তাহাদের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইল- নবীজীর আশ্রয়দাতা বনী হাশেমের সর্দার আবু তালেব দ্বারা এই কাজ সমাধা করা। তাহারা ভাবিল, আবু তালেবের আশ্রয়ে থাকিয়াই মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাহাদের আন্দোলন চাইতে সক্ষম হইতেছে; আবু তালেব আমাদের সর্দার আমাদেরই ধর্মমতের। সুতরাং তিনি তাহাকে বাধা দিলে সহজেই সে ঐসব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। কোরায়শ দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য লইয়া আবু তালেবের সহিত পর পর তিন বার বৈঠকে বসিল।

আবু তালেবের সহিত প্রথম বৈঠক

কোরায়েশ দলপতিগণ আবু তালেবের নিকট নবীজী (সঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের পূজ্য দেব-দেবীর নিন্দা-মন্দ প্রচার করে, আমাদের ধর্মমতকে ভ্রষ্টতা বলে, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে নাদান-আহমক পথভ্রষ্ট নরকী সাব্যস্ত করে। আপনি হয় তাহাকে এইসব কথা ও কাজ না করিতে বাধ্য করুন, না হয় তাহাকে আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিন; আমরাই তাহার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করিব- আপনি মধ্যে পড়িবেন না।

এই দিন আবু তালেব কোরায়শ দলপতিগণকে মোলায়েমভাবে পাঁচ রকম নরম কথায় ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। (বেদায়া ৩-৪৭)

আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক

প্রথম বৈঠকে আবু তালেব নরম কথায় কোরায়শ দলপতিগণকেই ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন, নবীজীকে কোন কিছু বলেন নাই। নবীজী (সঃ) যথারীতি তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় কোরায়শ দলপতিদের উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল; তাহারা পুনরায় আবু তালেবের সহিত বৈঠকে মিলিত হইল। তাহারা আবু তালেবকে বলিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগকে যাতনা দিয়া থাকে- আমাদের সভা-সমাবেশে আমাদের পূজালয়ে মন্দিরে। আপনি তাহাকে আমাদের যাতনা দেওয়া হইতে বারণ করুন। আবু তালেব তৎক্ষণাত তাহার পুত্র আকীলকে বলিলেন, যাও, মুহাম্মদকে ডাকিয়া নিয়া আস। আকীল যাইয়া তাঁহাকে কাহারও কুঁড়ে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিল। কোরায়শ দলপতিগণ আবু তালেবের সম্মুখে বসিয়া আছে, দ্বিপ্রহর বেলা, নবীজী (সঃ) ঐ সময়ই তথায় উপস্থিত হইলেন। আবু তালেব নবীজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার এইসব লোকেরা বলিতেছে, আপনি তাহাদের সভা-সমাবেশে, পূজালয়ে-মন্দিরে তাহাদের যাতনা দিয়া থাকেন; আপনি এইরূপ কাজ হইতে বিরত থাকুন। নবী (সঃ) আকাশপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সূর্য দেখেন কি? তাহারা বলিল, হাঁ। নবী (সঃ) বলিলেন, আপনারা এই সূর্য হইতে কিছু অংশ নিয়া আসিতে যে পরিমাণ সক্ষম, আমি আমার কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করিতে তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম অক্ষম নহি। আবু তালেব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এরূপ দৃঢ়তাদৃষ্টে তাহাদিগকে বলিলেন, আমার ভ্রাতুষ্পত্র কখনও মিথ্যা বলে না; বাস্তবিকই সে অক্ষম না হইলে কখনও এইরূপ বলিত না; অতএব আপনারা চলিয়া যান। (বেদায়া ১-৪২)

ইতিমধ্যে নবীজী (সঃ) তথা হইতে চলিয়া গেলেন; কোরায়শ দলপতিগণ আবু তালেবের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা আবু তালেবকে বলিল, বয়সে, বংশে ও মান-সম্মানে আপনি আমাদের অনেক ঊর্ধ্বে, আমরা চাহিয়াছিলাম। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পত্রকে বারণ করিবেন; আপনি তাহা করিলেন না- এই বলিয়া তাহারা কঠোর মনোভাব প্রকাশে বলিল, আমাদের পূজ্য দেব-দেবীদের নিন্দা-মন্দ, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বেইজ্জতী-অপমান আমরা কিছুতেই বরদাশত করিব না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, নতুবা তাহার এবং আপনার মোকাবিলায় রক্তারক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ নিপাত হইয়া ঝগড়ার অবসান হইবে। এই কথা বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কোরায়শ দলপতিদের ভীতি প্রদর্শনে আবু তালেব বিচলিত হইলেন; সমগ্র দেশ ও জাতির শত্রুতার প্রতিক্রিয়া তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিল। আবু তালেব নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, দেশের ও বংশের লোকজন আমার নিকট আসিয়াছিল, যাহা তুমিও দেখিয়াছ- তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তুমি নিজের উপরও রহম কর, আমার উপরও রহম কর; তুমি সংযত হও- আমার সাধ্যের অধিক বোঝা আমার উপর চাপাইও না।

আবু তালেবের এই আলাপে নবীজী (সঃ) ধারণা করিলেন, চাচা আবু তালেব বোধহয় আমার সাহায্য-সহায়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। তাই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার দৃঢ়তার আসল রূপ প্রকাশে স্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে বলিলেন- "হে চাচা! মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয় আর বলে যেন আমি আমার এই কর্তব্য কাজ ত্যাগ করি, আমি আমার কাজ- সত্যের সেবা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত করিব না। হয় আল্লাহ আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ) কাঁদিয়া দিলেন- তাঁহার অশ্রু বহিতে লাগিল এবং আবু তালেবের সম্মুখ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তখন আবু তালেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যাও,

তোমার যাহা ইচ্ছা কর এবং যাহা ইচ্ছা বল। আল্লাহর কসম আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিব না। এই প্রসঙ্গে আবু তালেব একটি পদ্যও রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

وَاللّٰهِ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ - حَتّٰى أُوَسَّدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا -

আল্লাহর শপথ, বিরুদ্ধবাদীরা সর্বশক্তি ব্যয় করিয়াও আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না; যাবৎ না আমি মাটির নীচে দাফন হইয়া যাই।

فَامْضِ لِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ - اَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوْنًا -

অতএব নির্ভীক চিত্তে আপনি আপনার কর্তব্যে অগ্রসর হইতে থাকুন; (আমার এই প্রতিশ্রুতির) সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং চক্ষু শীতল করুন– কোন বাধাই আপনাকে কিছু করিতে পারিবে না।

وَدَعَوْتَنِىْ وَعَلِمْتُ اَنَّكَ نَاصِحِىْ - فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ اَمِيْنًا -

আপনি আমাকেও আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমি জানি, আপনি আমার মঙ্গলকামী। নিশ্চয় আপনি সত্য এবং পূর্ব হইতেই আপনি "আমীন" –সত্যবাদী।

وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِاَنَّهٗ - مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا -

আপনি এক সুন্দর ধর্ম পরিবেশন করিয়াছেন; আমি উপলব্ধি করি, ঐ ধর্ম সকল জাতির ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম।

لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْحِذَارُ مَسَبَّةٍ - لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا -

লোকের লানতান ও গালাগালির ভয় যদি আমার না হইত, তবে নিশ্চয় আমাকে দেখিতেন, আমি সরল সুষ্ঠুরূপে এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়া নিতাম। (বেদায়া ৩–৪২)

আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক

মক্কায় আবু তালেবের অসাধারণ প্রভাব ছিল, তাই কোরায়শ দলপতিরা রাগের বশীভূত হইয়া হুমকি-ধমকির কথা বলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শুধু তাহাদের অধৈর্য প্রকাশের কথা ছিল, বাস্তবায়িত হওয়ার মত কথা ছিল না। গরমের পর এইবার তাহারা ঠাণ্ডাভাবে আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠকে মিলিত হইল।

এইবার তাহারা ওমারা ইবনে অলীদ নামক এক অতি সুশ্রী সুদর্শন যুবককে সঙ্গে আনিয়া আবু তালেবের নিকট উপস্থিত করতঃ বলিল, এই যুবকটি আপনাকে নিদাবীরূপে দিয়া দিতেছি; তাহার পরিবর্তে আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিন। সে ত আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মমত বিরোধী আপনার দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সকলকে বুদ্ধি-বিবেকহীন বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দেই; আপনার কোন ক্ষতি হইল না– একজনের পরিবর্তে একজনকে আপনি পাইয়া গেলেন।

আবু তালেব বিস্ময়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ বলিলেন, কি অযৌক্তিক বিনিময়! আমার পুত্র তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব হত্যার জন্য, আর তোমাদের পুত্রের ব্যয়ভার আমি বহন করিয়া যাইব! খোদার কসম! কস্মিনকালেও ইহা হইবে না। এইবারও কোরায়শ দলপতিগণ উত্তেজনার সহিত নৈরাশ্য নিয়া চলিয়া গেল। (বেদায়া ৩–৪৮)

নবীজীর (সঃ) সহিত কোরায়শদের সরাসরি কথাবার্তা ও প্রলোভন দান

বার বার আবু তালেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্যর্থ হওয়ার পর কোরায়শগণ স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করার উদ্যোগ নিল।

একদা কোরায়েশ দলপতিগণ সন্ধ্যার পর কা'বা শরীফের নিকটে একত্রিত হইয়া স্থির করিল, মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ডাকিয়া আন এবং সরাসরি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া যুক্তি-তর্কে তাহাকে নিরুত্তর কর, যেন ওজর-আপত্তির কোন অবকাশ তাহার জন্য না থাকে। সেমতে তাহারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দিল যে, আপনার বংশীয় মুরব্বীগণ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একত্রিত হইয়াছেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহাদের হেদায়াতের প্রতি অত্যধিক লালায়িত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, হয়ত তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই ভাবিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দ্রুত তাহাদের বৈঠকে আগমন করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সংবাদ দিয়াছি শেষ কথা শুনিবার জন্য– যাহাতে কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে। সমগ্র আরবে আপনার ন্যায় কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয় নাই। আপনি নিজের পূর্বপুরুষদের মন্দ বলেন, তাহাদের ধর্মমতের নিন্দা করেন, তাহাদেরকে বিবেক-বুদ্ধিহীন বলেন, তাহাদের পূজ্য দেবদেবীকে গালি দেন– এই করিয়া আপনি আমাদের একতায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, যত রকম অনাচার এবং বিবাদ-বিরোধ আছে, আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে সেই সবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আপনি যদি এইসব ধন লাভের আশায় করিয়া থাকেন তবে আপনাকে এই পরিমাণ ধন যোগাড় করিয়া দেই যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনবান হইয়া যান। আর যদি প্রাধান্যের আশায় এইসব করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দাররূপে বরণ করিয়া নেই। যদি রাজত্বের আশায় করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানাইয়া নেই। আর যদি জিন-ভুতের তাছিরে আপনার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা সর্বপ্রকার ব্যয় বহনে আপনার চিকিৎসা করি; চিকিৎসা বিফল হইলে আমরা আপনাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিব।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সম্পর্কে আপনাদের একটি কথাও সত্য নহে। ধনের বা প্রাধান্যের আশায় রাজত্বের আশায় আ মি কাজ করিতেছি না। আমাকে আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং কিতাব দান করিতেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি আপনাদের বেহেশতের পথ দেখাইয়া সুসংবাদ দেই এবং দোযখ হইতে সতর্ক করি। সেমতে প্রভুর দেওয়া দায়িত্ব আমি পৌঁছাইতেছি এবং আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। যদি আপনারা আমার কথা, আমার জিনিস গ্রহণ করেন তবে আপনাদের ইহ-পরকালের সৌভাগ্য লাভ হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ় ও ধৈর্যধারী হইয়া থাকিব– যাবত না আল্লাহই আপনাদের ও আমার মধ্যে শেষ ফয়সালা করিয়া দেন।

এরপর কোরায়শ দলপতিরা কতগুলি বাহুল্য প্রস্তাব অবতারণা করিল। তাহারা বলিল, আপনি জানেন, আমাদের এই শহরটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের জীবনমানও অতি নিম্নের; আমরা গরীব। যেই প্রভু আপনাকে রসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের দেশের পাহাড়গুলি হটাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে সুপ্রশস্ত করিয়া দেন এবং আমাদের দেশে নদ-নদী প্রবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন যেরূপ সিরিয়া ও ইরাকে রহিয়াছে। আর আমাদের বাপ-দাদা মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করিয়া দেন– তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিব, আপনার দাবী সত্য কি মিথ্যা।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তরে এতটুকুই বলিলেন, এইসব উদ্দেশে আমি প্রেরিত হই নাই। যে ধর্মমত প্রদানে আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহা নিয়াই আসিয়াছি; আপনারা তাহা গ্রহণ করিলে দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল হইবে, আর গ্রহণ না করিলে আমি আল্লাহর আদেশের উপর অটল ধৈর্যশীল হইয়া থাকিব– যাবত না আল্লাহ শেষ ফয়সালা করিয়া দেন।

অতপর তাহারা বলিল, যদি আমাদের জন্য ইহা না করেন তবে আপনি নিজের জন্য এই আবেদন করুন, আপনার প্রভু যেন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন যে আপনার সমর্থন করিবে। আর আপনার জন্য বাগ-বাগিচা, স্বর্ণ-রৌপ্যের অট্টালিকা এবং ধন-দৌলতের ভাণ্ডার দান করেন যেন আপনাকে আমাদের ন্যায় জীবিকা উপার্জনে যাইতে না হয়। আপনার এইসব বৈশিষ্ট্য দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট এই আবেদন করিতে পারিব না; প্রভু আমাকে এই জন্য পাঠান নাই। এই সঙ্গে নবীজী (সঃ) আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বিঘোষিত পূর্ব উক্তিরও পুনরাবৃত্তি করিলেন।

অতপর তাহারা বলিল, আমরা ত আপনার প্রতি ঈমান আনিব না; আপনি আমাদের উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করুন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, এইরূপ কাজ ত আল্লাহ তাআলার; তিনি যদি ইচ্ছা করেন করিতে পারেন।

এই ধরনের কথাবার্তার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার আশার বিপরীত পরিস্থিতিদৃষ্টে আত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন (বেদায়া ৩-৫০)।

এই শ্রেণীর কথোপকথনের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও আছে–

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا ـ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيرًا ـ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيلًا ـ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ـ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ـ

অর্থ ঃ "কাফেররা বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না, যাবত না আপনি আমাদের জন্য প্রবাহিত করেন আমাদের দেশে নদ-নদী। অথবা আপনার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হয়, যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহিত থাকে। কিম্বা আপনি আসমান ভাঙ্গিয়া আমাদের উপর ফেলিবার ব্যবস্থা করেন বা আল্লাহ এবং ফেরেশতা আপনার জামিনরূপে নিয়া আসেন, অথবা সোনা-চান্দির ঘর-বাড়ী আপনার হয়, কিম্বা আপনি আসমানে চড়িতে পারেন। অবশ্য আমরা আপনার আসমানে আরোহণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না যাবত না আপনি তথা হইতে কোন লিপি নিয়া আসেন; যাহা আমরা পড়িতে পারি। আপনি বলুন, সোবহানাল্লাহ; কি সব আশ্চর্যের কথা! আমি ত মানুষ শ্রেণীর রসূল বৈ নহি!" (পারা-১৫, রুকু-১০)

আর এই শ্রেণীর ফরমায়েশ পূরণ না করা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার বক্তব্য পবিত্র কোরআনে নিম্নের আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে–

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ ـ وَاٰتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ـ

অর্থ ঃ "ফরমায়েশী মোজেযা প্রদানে একমাত্র বাধা ইহাই যে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এইরূপ ফরমায়েশ করিয়াছিল এবং তাহা পূরণ করার পরও তাহারা সত্য অস্বীকার করিয়াছিল। (ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। যেমন–) সামুদ জাতিকে তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, সত্যকে তাহাদের চোখে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাহার সঙ্গেও অন্যায় করিয়াছিল (এবং ধ্বংস হইয়াছিল)। মোজেযা ত আমি শুধু সতর্ক করার উদ্দেশে প্রকাশ করি। (সত্য বুঝিয়া নেওয়া এবং গ্রহণ করা ত জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা হইবে।) (পারা– ১৫, রুকু– ৬)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম এই যে, তাঁহার রসূলকে যদি কোন নির্ধারিত মোজেযা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ বা ফরমায়েশ করা হয় এবং আল্লাহ তাআলা রসূলকে সেই মোযেজা প্রদান করেন– এইরূপ ক্ষেত্রে মোজেযা প্রকাশের পরও সত্য অস্বীকার করা হইলে আল্লাহ তাআলার গজব সেই ক্ষেত্রে বিলম্ব করে না; অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। যেরূপ সামুদ জাতি তাহাদের নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল, এই পাহাড় বা বড় পাথরটি হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারিলে আমরা ঈমান গ্রহণ করিব। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিয়া সালেহ (আঃ) তাহা করিলেন; তাহাদের চোখের সম্মুখে ঐ পাহাড় বা পাথরটি কম্পমান হইয়া ফাটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাত তাহা ইহতে একটি বিরাটাকার উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। কাফেররা তাহা জাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল; সত্য গ্রহণ করিল না, ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা এবং এই শ্রেণীর আরও বহু ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেওয়া হইয়াছে যে, মক্কাবাসীদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হইলে তাহারা এই মুহূর্তে সত্য গ্রহণ করিবে না, সে ক্ষেত্রে তাহারা অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের সময়-সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাই তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয় নাই; রসূলুল্লাহ (সঃ)ও উদ্যোগ নেন নাই।

হাদীছ শরীফে আছে– মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিয়াছিলেন, আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করুন কিম্বা মক্কার পাহাড়গুলিকে হটাইয়া দিন। (যাহাতে আমরা ক্ষেত-খামার করিতে প্রয়াস পাই। তখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হইল, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথ অবলম্বন করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণও করিতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহারা সত্য অস্বীকার করিলে ধ্বংস হইবে; যেরূপ তাহাদের পূর্বে অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন– না, আমি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথই চাই। এই প্রসঙ্গেই আয়াত নাযিল হয় وما منعنا (নাসায়ী শরীফ, বেদায়া ৩–৫২)

সরাসরি নবী (সঃ)-কে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস

কোরায়শ দলপতিদের উল্লিখিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাহারা আর একটি উদ্যোগ নিল যে, নবীজীর (সঃ) বাড়ী যাইয়া সরাসরি প্রলোভনমূলক প্রস্তাব দানে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা হউক। সেমতে একদা তাহারা সকলে পরামর্শে বসিল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বাকপটু, চতুর, পন্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হউক, সে যাইয়া ঐ লোকটার সহিত কথা বলিবে যে, সে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছে আর আমাদের ধর্মকে মন্দ বলে! সেমতে রবিয়ার পুত্র ওতবাকে তাহারা এই কাজের

জন্য নির্বাচন করিল। ওতবা নবীজীর নিকট যাইয়া বলিল, আপনি একটি কথার উত্তর দিন– আপনি উত্তম, না আপনার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম ছিলেন? আপনি উত্তম, না আপনার দাদা আবদুল মোত্তালেব উত্তম ছিলেন? নবীজী (সঃ) এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। ওতবা বলিল, যদি তাঁহারা উত্তম ছিলেন তবে তাঁহারা ত এইসব দেব-দেবীরই সেবাইত ছিলেন, যাহাদের নিন্দা-মন্দ আপনি করিয়া থাকেন। আর যদি আপনি নিজেকে উত্তম মনে করেন তবে সেই কথা স্পষ্ট বলুন। আপনার ন্যায় এমন পুত্র দেখি নাই, যে নিজ বংশের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়; আপনি আমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের পূজনীয়দের নিন্দা-মন্দ করেন। আপনি সমগ্র আরবে আমাদেরকে লজ্জিত করিয়াছেন; সর্বত্র বলা হয়, কোরায়শদের মধ্যে একজন যাদুকর হইয়াছে, কেহ বলে পাগল হইয়াছে ইত্যাদি।

অতপর ওতবা তাহার আসল কথা প্রকাশ করিল– সে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে লোভ-লালসার ফাঁদে ফেলিবার অপচেষ্টা করিল। ধন, প্রাধান্য ও রাজত্ব– এই সর্বোচ্চ লোভের বস্তু যাহার প্রস্তাব কোরায়শ দলপতিগণ নবীজীর সম্মুখে প্রকাশ্য বৈঠকে দিয়া দিল– ওতবা সেই প্রস্তাবই (private pushing) সরাসরি পেশ করিল এবং তদুপরি একটি চতুর্থ বস্তুরও লোভ দেখাইল।

প্রবাদে বলা হয়, كل اناء يترشح بما فيه "প্রত্যেক পাত্র হইতে ঐ বস্তুরই ফোঁটা নির্গত হয় যাহা তাহার মধ্যে থাকে।" ওতবা তাহার নিজ শ্রেণীর লোকদের প্রলোভন দেখাইবার ন্যায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিল যে, আপনার যদি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাকিয়া থাকে তবে বলুন, কোরায়শদের মধ্যে যেকোন রূপসী আপনি পছন্দ করিবেন, দশ জন চাহিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া আপনার সাথে বিবাহ দিয়া দেওয়া হইবে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) গম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে? ওতবা বলিল, হাঁ। নবীজী (সঃ) জ্ঞাত ছিলেন, ওতবা আরবের একজন সুপণ্ডিত ও কবি ব্যক্তি; সে কোরআনের মাধুর্য লালিত্য অনুধাবন করিতে পারিবে। তাই নবী (সঃ) তাহার অশোভনীয় প্রলোভন প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ২৪ পারা সূরা হা-মীম-সাজদার প্রথম ১৩টি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। উক্ত আয়াতসমূহে পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহার প্রতি লোকদের বিরোধিতার বিবরণ দানে নবীজীর কর্তব্য-কর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে– বলিয়া দিন, আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ শ্রেণীর, কিন্তু আমার নিকট আল্লাহর ওহী আসে। তোমাদের উপাস্য ও পূজ্য শুধুমাত্র এক আল্লাহ; অতএব তোমরা সকলে একরোখাভাবে তাঁহারই প্রতি নিজ নিজ লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। ভীষণ দুর্ভাগ্য ও আযাব ঐ লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, যাহারা আত্মশুদ্ধি করে না এবং পরকাল অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ পূর্বক নেক আমল করিবে তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান ও সুফল রহিয়াছে। অতপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজি পয়দা করিয়াছেন– সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী-শেরেকী করার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতপর সতর্ক করণে বলা হইয়াছে– যদি তাহারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে বলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি ঐরূপ আসমানী আযাব হইতে, যে আযাব "আ'দ" ও "সামুদ" জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল।

নবীজীর ধারণা সত্য হইল– পবিত্র কোরআনের মাধুরী মাদকের ন্যায় ওতবাকে মত্ত করিয়া ফেলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, একমাত্র এই মহাতত্ত্বই আপনার উদ্দেশ্য, অন্য আর কোন উদ্দেশ্য নাই? নবীজী (সঃ) বলিলেন, না। তখন সে সোজা কোরায়শ দলপতিদের নিকট চলিয়া গেল। ওতবার উপর পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া এরূপ পড়িয়াছিল যে, তাহারা তাহাকে দেখামাত্র বলিয়া উঠিল হায়! ওতবা ত পূর্বের ওতবা নাই;

সে ত ধর্মত্যাগী (মুসলিম) হইয়া গিয়াছে! ওতবা তাহাদের নিকট বর্ণনা দিল, আমি তাঁহার সুমধুর কালাম শুনিয়াছি, খোদার কসম আমি ঐরূপ বস্তু আর শুনি নাই। তাহা কবিতাও নহে, জাদু নহে, মন্ত্রও নহে– তাহা এক অতুলনীয় জিনিস। হে আমার জাতি! তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর; তোমরা মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁহার অবস্থার উপর স্বাধীন ছাড়িয়া দাও। খোদার কসম তাঁহার মুখে যে কালাম বা বাণী শুনিয়াছি, অচিরেই তাহা বিশ্বব্যাপী মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী হইবে। তোমরা তাঁহাকে তাঁহার কাজে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়ার পর যদি আরবের অন্য লোকেরা তাঁহার দফা-রফা করিয়া দেয় তবে তোমরা নিস্তার পাইলে, আর যদি তিনি সমগ্র আরবের উপর জয়ী হন তবে তাঁহার সম্মান তোমার সম্মান, তাঁহাদের বিজয় তোমাদের বিজয়; কারণ, তিনি তোমাদের বংশীয়। কোরায়েশরা ওতবার এই উক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিল, হায় ওতবা! তোমার উপর ত মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জাদু ক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। ওতবা বলিল, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি; তোমাদের যাহা করার ইচ্ছা হয় করিতে পার।

(সীরাতে মোস্তফা, ১--১৩৭)।

ইহুদীদের সহিত কোরায়শদের যোগাযোগ

সব দিকে ব্যর্থতায় কোরায়শরা বিচলিত হইয়া পড়িল; এইবার তাহারা সত্য-অসত্যের খোঁজ লাগাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল। তাঁহাদের দুই ব্যক্তিকে ইহুদী আলেমদের নিকট মদীনায় পাঠাইয়া দিল; তাহাদের নিকট নবীগণের অনেক ইতিহাস রহিয়াছে। তাহারা ইহুদী আলেমদের নিকট নবীজীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বলিল, তাহার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি ঐসবের উত্তর দিতে সক্ষম হন তবে বাস্তবিকই তিনি রসূল। নতুবা মিথ্যা দাবীদার। চিন্তা করিয়া তোমরা তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে– (১) অতীত যুগের কতিপয় যুবক যাহারা তাহাদের দেশ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল (যাহাদের আসহাবে কাহফ বলা হয়), তাহাদের বাস্তব ও মূল্যবান ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (২) অতীতে এমন একজন বাদশাহ ছিলেন যিনি দুনিয়ার সমগ্র বসতি এলাকা পর্যটন করিয়াছিলেন, (যাহাকে জুলকারনাইন বলা হয়), তাহারও ইতিহাস আছে– সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে।

(৩) রূহ বা আত্মা কি জিনিস তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে প্রমাণ হইবে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর রসূল; তোমরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। আর উত্তর দানে সক্ষম না হইলে মিথ্যা দাবীদার প্রমাণিত হইবে; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহার সঙ্গে তাহাই করিবে।

ব্যক্তিদ্বয় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কোরায়শদের নিকট বলিল, সত্য-মিথ্যার বিচারের বিষয়বস্তু নিয়া আসিয়াছি– এই বলিয়া বিস্তারিত বিবরণ তাহাদের সম্মুখে প্রদান করিল। কোরায়শ দলপতিগণ ছুটাছুটি করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং উক্ত তিন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল।

নবীজী (সঃ) একটু বেখেয়ালীর সহিত বলিয়া ফেলিলেন, আগামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। এইরূপ ক্ষেত্রে "ইনশাআল্লাহ– যদি আল্লাহ তওফীক দেন" বলা প্রয়োজন, সেই ব্যাপারে নবীজীর ত্রুটি হইয়া গেল। আল্লাহ তাআলা তাহার পরিণতি হইতে নবীজী (সঃ)-কে রেহাই দিলেন না; ওহীর আগমন বন্ধ রহিল। নবীজীর আশা ছিল জিব্রীল (আঃ) আসিলেই কাফেরদের প্রশ্ন জ্ঞাত করিবেন বা এমনিতেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ওহী আসিয়া যাইবে এবং সব অবগত হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, আগামীকল্য তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিব। কিন্তু "ইনশাআল্লাহ" না বলার কারণে দীর্ঘ পনর বা আঠার দিন জিব্রীলের আগমন স্থগিত রহিল। আগামীকল্যের স্থলে যতই দিন কাটিতে লাগিল কাফেরদের জয়ঢাক পিটানো ততই বাড়িয়া চলিল যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম) বলিয়াছিলেন, আগামীকল্যই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন; অথচ দীর্ঘ দিন চলিল তিনি উত্তর দানে সক্ষম হইলেন না। নবীজীও অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইলেন; এক দিকে ওহীর আগমন বন্ধ হওয়া অপর দিকে কাফেরদের ঢাক-ঢোল পিটাইয়া দুর্নাম ছাড়ানো। পনর বা আঠার দিনের ভোর বেলা হইতে ঐ অবস্থা চরম আকার ধারণ করিল; ঠিক ঐ দিনই সূরা কাহফের সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের ঘটনাদ্বয়ের বিবরণে নাযিল হইল। তাহার মধ্যে নবীজী (সঃ)-কে সর্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল–

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ـ

অর্থ ঃ "কস্মিনকালেও কোন বিষয় সম্পর্কে এই কথা "ইনশাআল্লাহ" ব্যতীত বলিবেন না যে, আমি আগামীকল্য এই কাজ করিব; যদি ভুল হইয়া যায় তবে যথাসত্বর স্মরণ করিয়া নিবেন আপনার প্রভুকে।"

এই সূরার মধ্যে বর্ণিত আসহাবে কাহফের ঘটনা এবং বাদশাহ জুলকারনাইনের ঘটনা সুদীর্ঘরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ১৫ পারা ১০ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযিল হইল–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ـ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থ ঃ "তাহারা আপনাকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে * আপনি উত্তরে বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশে সৃষ্ট একটি বস্তু। অর্থাৎ material উপাদান ছাড়া শুধু আল্লাহ তাআলার "কুন হইয়া যাও" আদেশে সৃষ্টি। (যেহেতু রূহ উপাদান ছাড়া সৃষ্ট বস্তু, তাই উহা তোমাদের অথবা কোন মানুষের বোধগম্য হইবে না) তোমাদিগকে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ জ্ঞান দান করা হইয়াছে।" (ঐ শ্রেণীর বস্তুর বুঝ তাহার নাগালের বাহিরে।)

প্রশ্নত্রয়ের উত্তর পাইয়া সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ তাহাদের হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পলীদ– অপবিত্র অন্তর সেই পথে অগ্রসর হইল না; তাহারা বিকল্প পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিল।

আপোস প্রচেষ্টা

কোরায়শ দলপতিগণ এই পর্যায়ে একটা আপোস মিমাংসার প্রস্তাবও নবী (সঃ)-এর নিকট পেশ করিল। তাহাদের প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের উভয় পক্ষ একে অন্যের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। সেমতে আমরা এক বৎসর আপনার খোদার উপাসনা করিয়া নিব; বিনিময়ে আপনি আমাদের দেব-দেবীদের উপাসনা এক বৎসর করিবেন– এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিতে থাকিবে। এই প্রস্তাব বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোরআনের সূরা "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" নাযিল হয়; যাহার মর্ম এই –

আপনি বলিয়া দিন, হে কাফেরের দল! আমি উপাসনা করি না যাহাদের উপাসনা তোমরা কর; তোমরাও বন্দেগী কর না যাহার বন্দেগী আমি করি। (আমার ও তোমাদের মধ্যকার এই ব্যবধান চিরস্থায়ী; সংমিশ্রণের আপোস সুদূরপরাহতই নহে শুধু, অসম্ভবও বটে) তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা আমি করিব আমার উপাস্যের উপাসনা তোমরা করিবে– এই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবতার মুখ দেখিবে না। (হাঁ এখনকার মত আপোস এই হইতে পারে যে) তোমরা ত তোমাদের ধর্মে স্বাধীন আছ; আমিও আমার ধর্মে স্বাধীন থাকিব। (আমি তোমাদের বাধা দিব না, তোমরাও আমাকে বাধা দিবে না।)

নির্যাতনের তুফান আরম্ভ হইয়া গেল

মক্কাবাসীরা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে দমাইবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইল; এই ব্যর্থতা তাহাদের

* মদীনাতে স্বয়ং ইহুদীরাও নবী (সঃ)-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাদের উত্তর দানেও নবী (সঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। (বেদায়া ৩–৫৬)

বেসামাল করিয়া তুলিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গোত্রীয় প্রভাব এবং আবু তালেবের ন্যায় ব্যক্তির আশ্রয় বাহ্যিকরূপে এক সুকঠিন বাধা ছিল তাঁহার জীবন সংহার ব্যবস্থা গ্রহণে। তাই অগ্নিমূর্তি দস্যুদল লেলিহান হইয়া উঠিল নবীজীর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি; বিশেষতঃ যাহারা ছিলেন দুর্বল। দস্যুরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, মুসলমানদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না; পুরাদমে চলিল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতন– যাহাতে অনেকে জীবন হারাইলেন। কোরায়শরা মুসলেমদের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তে তাহা উপলব্ধি করা পাঠকের জন্য সহজ হইবে।

সাইয়্যেদুনা বেলাল রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

তিনি ছিলেন আফ্রিকার কালা মানুষ; মক্কার সর্দার এবং ইসলামের অন্যতম শত্রু উমাইয়ার ক্রীতদাস। সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) ইসলামের জন্য অমানুষিক অত্যাচার ভোগে এবং সর্বপ্রকার উৎপীড়নের মধ্যে দৃঢ় পদ থাকায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নজিরবিহীন। বেলালের মালিক নরাধম উমাইয়া যখন শুনিতে পাইল, তাহারই গৃহে তাহার দাস মুসলমান হইয়াছে তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বেলালকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিল এবং চাবুক লইয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে বেলাল রক্তাক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে 'আহাদ আহাদ– মাবুদ এক, মাবুদ এক' এই শব্দ ছাড়া আর কিছু নহে। বেলালের অনমনীয় ভাব দেখিয়া উমাইয়ার আরও ক্রোধ হইল– এত বড় স্পর্ধা! অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। দুপুর বেলা আরবের অগ্নিময় উত্তপ্ত প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথরের উপর উন্মুক্ত আকাশতলে বেলালকে চিতভাবে শোয়াইয়া দেওয়া হইত এবং বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়া দেওয়া হইত যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে না পারে।

কোন সময় তাপদগ্ধ মরু-বালুকার উপর ঐরূপ অবস্থা করা হইত। এই অবস্থায় বেলালকে বলা হইত, বাঁচিতে চাহিলে মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ধর্ম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলালের মুখে একই শব্দ আহাদ আহাদ।

কোন সময় গরুর কাঁচা চামড়ায় লেপটাইয়া, কোন সময় লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ রোদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত; সর্বাবস্থায় বেলালের একই জপনা– আহাদ, আহাদ। এই শ্রেণীর লোমহর্ষক অত্যাচারেও যখন বেলালের জপে পরিবর্তন আসিল না তখন পাষণ্ড উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করিল। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া বা নাকের ভিতর ছিদ্র করতঃ তাহাতে রজ্জু দিয়া তাঁহাকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে অর্পণ করিত। ঐ নিষ্ঠুরেরা বেলালের রজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে হৈ হৈ রবে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া হেঁচড়াইয়া মারিয়া পিটিয়া আধমরা অবস্থায় সন্ধ্যাবেলা বেলালকে উমাইয়ার বাড়ী দিয়া আসিত। রাত্রি বেলায় বেলাল যখন সারা দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবসন্ন, তখন তাঁহকে এক সঙ্কীর্ণ নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া চাবুক মারা হইত এবং বলা হইত, এখনও ইসলাম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলাল অনড় অটল।

কি দৃশ্য! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বাহির হইতে উদ্যত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত, রক্তঝরায় সর্বাঙ্গ সিক্ত কিন্তু নরাধম উমাইয়ার কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না; বেলাল তাঁহার ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পর্বত সদৃশ্য, তাঁহার মুখে একই ঘোষণা– আহাদ, আহাদ, আহাদ।

সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষায় চরম সাফল্য লাভ করিলেন; আল্লাহ তাআলার করুণা তাঁহার জন্য নামিয়া আসিল। একদা আবু বকর (রাঃ) চলার পথে বেলালের মর্মান্তিক দুদর্শা দেখিয়া দারুণ মর্মাহত হইলেন। তিনি পাষণ্ড উমাইয়াকে বলিলেন, এই গরীবকে আর কত অত্যাচার করিবে? তোর কি খোদার ভয়

হয় না? উমাইয়া বলিল, তোমরাই ত তাহাকে খারাপ করিয়াছ; এখন তোমরাই তাহাকে ছাড়াইয়া নাও। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ভাল কথা– আমার একটি ক্রীতদাস আছে তোমাদের ধর্মমতের এবং খুব শক্তিশালী; তাহার সঙ্গে বিনিময় করিয়া নাও। উমাইয়া সম্মত হইল, আবু বকর (রাঃ) এইরূপে সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ)-কে ছাড়াইয়া আনিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) মুসলমানদের নিকট এতই সম্মানিত ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবু বকর (রাঃ) আমাদের সর্দার ও মহান– তিনি আমাদের আর এক সর্দার ও মহানকে মুক্ত করিয়াছেন। (সীরাতে মোস্তফা ১–১৬০)

খাব্বার (রাঃ)

ইসলামের জন্য অগ্নি পরীক্ষার আর এক শিকার হযরত খাব্বাব (রাঃ)। উম্মে আনমার নামক এক দুরাত্মা নারীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। সেই হতভাগিনী তাঁহাকে সর্বদা অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট করিত। একদা জ্বলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া তাহার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল, আর এক পাষণ্ড তাঁহার বুকের উপর পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। খাব্বাবের গায়ের চর্বি বিগলিত হইয়া সেই অগ্নি অঙ্গার নির্বাপিত হইল। খাব্বাব (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাহের চিহ্ন বসিয়া ছিল।

অনেক সময় তাঁহাকে লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ উত্তাপে ফেলিয়া রাখা হইত। কোন সময় উলঙ্গ শরীরে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; চামড়ার নীচের চর্বি বিগলিত হইয়া চামড়া বিদীর্ণ হইত এবং বিগলিত চর্বি বাহিয়া পড়িত। তাঁহার কোমরে ঐরূপ জখমের বহু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) একদা তাঁহার অত্যাচারিত হওয়ার চিহ্ন দেখিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহাকে নিজ কোমরের ঐ চিহ্নসমূহ দেখাইয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার মালিক পাষণ্ডনীর অন্তরও হয়ত নরম হইতে বাধ্য হইল, সে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দিল।

আম্মার পরিবার

ইসলামের জন্য অকথ্য অত্যাচার ভোগের আর এক শিকার আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতা-পিতা। তাঁহার পিতার নাম "ইয়াসির", অন্য দেশের বাসিন্দা; ইয়াসির মক্কায় আসিয়া আবু হোযায়ফা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করেন এবং তথায় বসবাস করেন। আবু হোযায়ফার একটি দাসী ছিল "সুমাইয়া"। ঐ দাসীকে সে ইয়াসিরের নিকট বিবাহ দিয়া দেয়; তাঁহার গর্ভে আম্মার জন্ম লাভ করেন; এই সূত্রে আম্মার (রাঃ) আবু হোযায়ফার দাস পরিগণিত হন, কিন্তু সে তাহাকে মুক্তি দিয়া দেয়।

আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতা-পিতা সকলেই মক্কায় অতিশয় দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা তিন জনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকেই ভীষণভাবে অত্যাচারিত হন; এমনকি সেই অত্যাচারেই প্রথমতঃ ইয়াসির (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। অতপর একদা মাতা সুমাইয়্যা (রাঃ)-কে অগ্নিবৎ রৌদ্রে দাঁড় করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতেছিল, নর পিশাচ আবু জাহল ঐ পথে যাইতেছিল; সেই পাষণ্ড পিশাচ সুমাইয়্যা (রাঃ)-কে তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্ষাঘাত করে; তথায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। অনেকের মতে ইসলামের পথে সর্বপ্রথম যাঁহার রক্তে যমীন রঞ্জিত হয় তিনি ছিলেন সুমাইয়া (রাঃ)। ইসলামের পথে পিতা এবং মাতা উভয়েই দুনিয়া ত্যাগ করিলেন। আম্মার (রাঃ) বাঁচিয়া আছেন; তাঁহার উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার চলিল। তাঁহাকেও উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; কোন সময় জ্বলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া তাহার উপর শোয়ানো হইত। একদা এই অবস্থায় নবী (সঃ) তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় মোবারক হস্ত তাঁহার মাথায় বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন– "হে আগুন! আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও; যেরূপ ইব্রাহীমের জন্য হইয়াছিলে।" (আলাইহিস সালাম।)।

আম্মার (রাঃ)-কে তাঁহার পিতা-মাতাসহ একত্রে শাস্তি ভোগরত অবস্থায় কোন কোন সময় নবীজী (সঃ) নিচ চোখে দেখিতেন। নবীজী (সঃ) ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগকে বলিতেন, হে ইয়াসির পরিবার! সবর কর, ধৈর্য ধর। কোন সময় দোয়া করিতেন– হে আল্লাহ! ইয়াসির-পরিবারের মাগফেরাত করিয়া দাও। কোন সময় নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সৌভাগ্য চরমে পৌঁছাইয়া বলিতেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর; বেহেশত তোমাদের আকাঙ্ক্ষায় রহিয়াছে। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৬২)

আবু ফোকায়হাই ইয়াসার (রাঃ)

সাইয়্যেদুনা বেলালের অত্যাচারী মনিব পাষণ্ড উমাইয়ারই পুত্র সাফওয়ানের ক্রীতদাস ছিলেন আবু ফোকায়হা (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে পাষণ্ড উমাইয়া তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নির্যাতন করিত। কোন সময় পায়ে লোহার বেড়ী লাগাইয়া উত্তপ্ত বালুর উপর অধঃমুখী শোয়াইয়া রাখিত। একদিন দুরাত্মা উমাইয়া তাঁহাকে ঊর্ধ্বমুখী শোয়াইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; ঐ সময় পাপিষ্ঠ উমাইয়ার ভ্রাতা আর এক নরাধম উবাই আসিয়া বলিল, আরও শক্ত ও কঠিনভাবে তাহার গলা টিপিয়া ধর। পাপিষ্ঠ উমাইয়া তাহাই করিল। এমনকি সকলেই ভাবিল, আবু ফোকায়হার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া পাপিষ্ঠরা তথা হইতে চলিয়া গেল; তিনি সচেতন হইলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

আবু বকর (রাঃ) একদা তাঁহার চরম দুদর্শা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রয় করিয়া নিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৬৪)

যনীরাহ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহা

তিনি ক্রীতদাসী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁহার উপরও অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। অসহনীয় অত্যাচারের ফলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিনষ্ট হইয়া গেল; পাষণ্ডরা বলিতে লাগিলে, আমাদের দেবী "লাত" ও "ওজ্জা" তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, লাত ও ওজ্জা ত এরূপ অপদার্থ যে, তাহাদের পূজারী সম্পর্কেও তাহাদের কোন খবর নাই। আমার যাহা হইয়াছে আল্লাহর আদেশে হইয়াছে; আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে আমার চক্ষু ভালও হইয়া যাতে পারে। সত্য সত্যই ঐদিন ভোর বেলা নিদ্রা হইতে উঠিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ ভাল ছিল। তাঁহাকেও আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ১–১৬৫)

এতদ্ভিন্ন নাহ্‌দিয়াহ এবং তাঁহার কন্যা লবীনা, মুআম্মেলিয়াহ উম্মে আব্‌স– তাঁহারা সকলেই ক্রীতদাসী ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হইতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) একে একে প্রত্যেককেই ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করতঃ নির্যাতন হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরুষদের মধ্যে বেলাল, আবু ফোকায়হা এবং আমের ইবনে ফোহায়রা– তাঁহারাও ক্রীতদাস ছিলেন; মুসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তিদানে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা,–১৬৬)

দুনিয়ার কোন লাভ বা স্বার্থ ছাড়া শুধু নিপীড়িত মুসলমানকে উদ্ধারকরণে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ধন এইরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। নবী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার উপর জান-মালের সর্বাধিক উপকার যাঁহার রহিয়াছে, তিনি হইলেন আবু বকর।" (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

১৬৭৭। হাদীছ ঃ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْتُ اَلَا
تَدْعُوا اللّٰهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ
الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ عِظَامِهٖ مِنْ لَحْمٍ اَوْعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِيْنِهٖ وَيُوْضَعُ الْمِيْشَارُ عَلٰى
مَفْرَقِ رَاْسِهٖ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى
يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ ـ
(وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ)*

অর্থ ঃ খাব্বাব (রাঃ)* বর্ণনা করিয়াছেন, (যখন আমরা মুষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল লোক মোশরেকদের জুলুম-অত্যাচারের স্টীম-রোলারে নিষ্পেষিত হইতেছিলাম তখনকার ঘটনা-) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কা'বা গৃহের ছায়ার স্বীয় চাদরখানা মাথার নীচে দিয়া শোয়া অবস্থায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম (আমরা ত কাফেরদের অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছি), আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, সাহায্য তলব করুন। এতদশ্রবণে হযরত (সঃ) শোয়াবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং (রাগের দরুন) তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অতপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্বেও ঈমান ও ইসলামের জন্য মানুষকে বহু কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে- এক একজন মানুষকে দ্বীন ও ঈমান হইতে ফিরাইবার জন্য লোহার চিরুনি দ্বারা শরীরের মাংস ও হাড়ের উপরের মাংসপেশী পর্যন্ত আঁচড়াইয়া ফেলা হইত; এত কষ্ট-যাতনাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পারিত না এবং (যমীনের মধ্যে পা গাড়িয়া) করাত দ্বারা মাথা হইতে চিরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হইত, তাহাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পরিত না- সব কিছু সহ্য করত দ্বীন-ঈমান আঁকড়াইয়া থাকিত।

(তোমরা ধৈর্য ধর, দ্বীন-ইসলামের এই অবস্থা থাকিবে না,) নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দ্বীন-ইসলামকে অতিশয় শক্তিশালী করিবেন, সারা বিশ্বে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এমনকি একা একজন মুসলমান ইয়ামান দেশের সানা এলাকা হইতে সুদূর হাজ্‌রামাউত পর্যন্ত একা একা সফর করিতে পারিবে; এক আল্লাহ ভিন্ন বন-জঙ্গলের বাঘ-ভল্লুক ছাড়া কোন মানুষের ভয় তাহাকে করিতে হইবে না। (দ্বীন ইসলামের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি ও শান্তির দিন নিশ্চয় আসিবে, অবশ্য তাহা একটু সময়সাপেক্ষ।) কিন্তু তোমরা ঐ অবস্থা অতি তাড়াতাড়ি চাহিতেছ (যাহা বাঞ্ছনীয় নহে- তোমাদিগকে সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করিতে হইবে)

পরীক্ষার ফল

হেনা বা মেহেদি পাতা দুলালীর হাতকে কত সুন্দর রং দেয়; পিষিত না হইয়া কি সেই পাতা ঐ রং দিতে পারে? رنگ لاتی ہے حنا پس جانے کے بعد "পিষিত হওয়ার পরেই হেনার রং বিকশিত হয়।" ইসলামের অপূর্ব প্রাণশক্তিও ঠিক তদ্রূপই। ইসলামের জন্য নিষ্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে থাকে, ভিতর হইতে খাঁটি ইসলামের শক্তি ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। ইতিহাসে এইরূপ একটি নজিরও পেশ করিতে

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যটি ৫১০ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।
* খাব্বাব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন। তিনিও বেলাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় কাফেরদের অমানুষিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও দ্বীন-ইসলামকে আঁকড়াইয়া ছিলেন। পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পারিবে না যে, ঐ সকল অমানুষিক উৎপীড়ন-নির্যাতনে মুসলমান একটি প্রাণীও ইসলাম হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হইয়াছিল। দুরাচার বিধর্মীরা তাহাদের পাশবিকতা প্রকাশে শক্তির সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিত; আর ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ইসলামের গৌরব ও মহিমা অকাতরে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। كذالك الايمان اذا خالط بشاشته القلوب "ঈমান ও ইসলামের আভা যখন অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন তাহার স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অটলতা এইরূপ পর্বত সদৃশই হইয়া থাকে।" (৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

সম্ভ্রান্তগণের উপরও অত্যাচার

বলাবাহুল্য, শুধু নিঃস্ব দরিদ্র দুর্বল মুসলমানদের উপরই অত্যাচার-উৎপীড়ন সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশজোড়া যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ঝড় সৃষ্টি হইল এবং অত্যাচারীরা উগ্র হইয়া পড়িল, তখন উত্তেজনার মুখে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও কোন কোন ঘটনায় অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পতিত হইলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি ঘটনা– মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিতেছে– এই সময় আবু বকর (রাঃ) অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, ইসলামের আহ্বান প্রকাশ্যে চালাইবার। নবী (সঃ) প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আবু বকরের পীড়-পীড়িতে পরে তাহা মঞ্জুর করিলেন। এমনকি সকল মুসলমানসহ হরম শরীফের মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রকাশ্য ভাষণ দানে আবু বকর (রাঃ) দণ্ডয়মান হইলেন। একজন মুসলমানের পক্ষ হইতে ইসলামের সাধারণ বক্তৃতা সর্বপ্রথম উহাই। বক্তৃতা শুধু আরম্ভই হইয়া ছিল, তৎক্ষণাত কাফের-মোশরেক দল চতুর্দিক হইতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবু বকর (রাঃ) বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মুখে তিনিও রেহাই পাইলেন না– তাঁহার উপরও ভীষণ প্রহার পড়িল। বেদম প্রহারে তাঁহার মুখমণ্ডল পর্যন্ত এরূপ জখম ও রক্তাক্ত হইল যে, তাঁহাকে চেনা যাইত না, তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বংশের লোকেরা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। কাহারও আশা ছিল না যে, তিনি এত আঘাতে বাঁচিতে পারিবেন; তাই তাঁহার বংশের লোকেরা ঘোষণা দিল, যদি আবু বকরের মৃত্যু হইয়া যায় তবে প্রতিশোধে আমরা রবিয়া পুত্র ওতবাকে খুন করিব, কারণ আবু বকর (রাঃ)-কে প্রহারে সেই সর্বাগ্রে ছিল।

আবু বকর (রাঃ) সারা দিন অচেতন অবস্থায় রহিলেন, এমনকি শত ডাকিলেও উত্তর পাওয়া যাইত না। সন্ধ্যার দিকে ডাক দেওয়া হইলে তিনি কথা বলিলেন; চেতনা লাভের পর তাঁহার সর্বপ্রথম কথা ছিল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কি অবস্থা?

এই কথায় বংশের লোকেরা ভীষণ দুঃখিত ও বিরক্ত হইল যে, যাহার সঙ্গে থাকায় এত বিপদ, এই মুহূর্তে আবার তাহার নাম! বিরক্ত হইয়া সকলে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল; তাঁহার মাতাকে বলিয়া গেল যে, তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবার ব্যবস্থা করুন। তাঁহার মাতা কিছু খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিলে তিনি মাতাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা কি? বিরক্তির সহিত মাতা বলিল, আমি তাহা কি জানি?

উম্মে জমীল নাম্নী এক মুসলমান মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা সাধারণভাবে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ইসলাম জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি আশা করিলেন, ঐ মহিলা নবীজীর (সঃ) সংবাদ নিশ্চয় জ্ঞাত থাকিবেন। সেমতে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আপনি উম্মে জমীলের নিকট যাইয়া নবীজীর অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আসুন, তারপরে আমি খানা খাইব। মা তাহাই করিলেন, কিন্তু তিনি উম্মে জমীলের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নবীজীকে চিনেন বলিয়াও স্বীকার

করিলেন না। তবে তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রের সংবাদে মনে খুব ব্যথা লাগিয়াছে; চল আমি তাহাকে দেখিয়া আসিব। উম্মে জমীল (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে দেখিয়া কাঁদিয়া দিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে নবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গোপনে আবু বকরের মাতার ভয় প্রকাশ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কোন ভয় করিও না, তখন উম্মে জমীল বলিলেন, নবীজী (সঃ) অক্ষত ও সুস্থ আছেন। আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? উম্মে জমীল বলিলেন, তিনি এখন আরকামের গৃহে আছেন। তখন আবু বকর (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন– যাবত নবীজী (সঃ)-কে দুই নয়নে না দেখিব তাবত কোন পানাহার গ্রহণ করিব না।

এই অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) পানাহার গ্রহণ করিবেন না– ইহা কি মায়ের প্রাণ মানিয়া লইতে পারে? রজনী যখন গভীর হইয়া আসিল; লোকজনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তখন মা আবু বকর (রাঃ)কে গোপনে আরকামের গৃহে পৌঁছাইলেন। নবীজী (সঃ)-কে পাইয়া আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; নবীজী (সঃ)ও আবু বকর (রাঃ)-কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন। উপস্থিত মুসলমানগণও আবু বকর (রাঃ)-কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহার অবস্থা দেখাও অসহনীয় ছিল।

আবু বকর (রাঃ) ঐ সময় স্বীয় মাতার ইসলামের জন্য নবীজীর (সঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিলেন। নবীজী (সঃ) দোয়া করিলেন এবং তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন; তৎক্ষণাত তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। (হেকায়াতে ছাহাবা–৩০৩)

এতদ্ভিন্ন অভিজাত সম্ভ্রান্তদের কেহ মুসলমান হইলে তিনি দুর্বলদের ন্যায় যত্রতত্র সকলের যথেচ্ছ দুর্ব্যবহারের শিকার না হইলেও নিজ বংশীয় লোকদের এবং আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা অবশ্যই উৎপীড়িত হইতেন।

ওসমান (রাঃ) মক্কার একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশীয় লোকেরা তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিল; তাঁহার পিতৃব্য হস্তপদ বাঁধিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিত। তাহাদের অত্যাচারে তিনি বাধ্য হইয়া সস্ত্রীক দেশত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

নরাধম নরপিশাচরা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে এতই উগ্র ও উন্মাদ হইয়া পড়িল যে, স্বয়ং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনেও নানারূপ কষ্ট-যাতনার সৃষ্টি করিতে লাগিল। হযরতের ঘরে-দুয়ারে মরা-পচা, গান্ধা-গলিজ বস্তু ফেলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২০১)।

পথে-ঘাটে হযরতের মাথার উপর ধুলা-বালু ছুঁড়িয়া মারিত, তাঁহার উপর আঘাত করিত উৎপীড়ন-উত্ত্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

প্রথম খণ্ডের ১৭০ নং হাদীছে তাহাদের ঐরূপ একটি জঘন্য ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছটিও তাহার নমুনা

১৬৭৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫১৯) عن عروة بن الزبير قال سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص اَخْبَرْنِى بِاَشَدّ شَئ صَنَعَه الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ حِجْرِالْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ فَخَنَقَهٗ خَنْقًا شَدِيْدًا فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اَخَذَ بِمَنْكَبَيْهِ وَدَفَعَهٗ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ -

অর্থ ঃ ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে আমি বলিলাম, মক্কার মোশরেকরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যে অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে তাহা হইতে একটা জঘন্যতম ঘটনা শুনান ত।

তিনি বলিলেন, একদা নবী (সঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের হাতীমে নামায পড়িতে ছিলেন। হঠাৎ ওকবা ইবনে আবী মো'আইত তথায় আসিয়া তাহার কাপড় হযরতের গলায় জড়াইয়া ভীষণভাবে চিপা দিল।

আবু বকর (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং ওকবার কাঁধে ধাক্কা দিয়া নবী (সঃ) হইতে হটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা একটি লোককে এই জন্য মারিয়া ফেলিতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ; অথচ তিনি তাঁহার দাবীর পক্ষে তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে কত কত উজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন?

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছাহাবীদের উপর মোশকেরদের তরফ হইতে যেসব লোমহর্ষক জুলুম-অত্যাচার হইয়াছিল তাহা ইসলামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে ঐ সবের নমুনা উল্লেখ করিলেও তাহাতেই বড় বই হইয়া যাইবে। মোটকথা নবুয়তের চতুর্থ বৎসর হইতে ঐ সব জুলুম-অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিভীষিকাময় আকার ধারণ করিতে থাকে।

আবু তালেব কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে রক্ষা করার ভার গ্রহণ

মুসলমানদের ঐতিহাসিক দুর্দিনে কয়েকজন মুসলমান ছিলেন বেলাল (রাঃ) ও সোহায়েব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় ক্রীতদাস শ্রেণীর। তাঁহাদের উপর ত জুলুম-অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না, যাহারা মুক্ত কিন্তু কাফেরদের বৃহৎ শক্তির সম্মুখে দুর্বল তাঁহাদের উপরও অত্যাচার হইত, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি গোত্রীয় রক্ষাব্যূহ কিছুটা সহায়কের কাজ করিত। বিশেষতঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ঐরূপ সহায়তার উসিলা আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতই ছিল।

হযরতের পিতার স্থলে তাঁহার লালন-পালনের ভার বহনকারী দাদা আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যুও হযরতের শৈশবকালে হইয়া যায়। তৎপর হযরতের চাচা আবু তালেব তাঁহার লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়স হইতে হযরতের ন্যায় চরিত্রবান ছেলের লালন-পালনকারী আবু তালেবের অন্তর হযরতের মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং দীর্ঘ দিনের এই স্নেহ-মমতার চাপ তাঁহার অন্তরে এমনভাবে পাকা-পোক্তা হইয়া গিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি তাহাতে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই দুর্দিনে আবু তালেবের সেই অকৃত্রিম স্নেহ মমতাকে আল্লাহ তাআলা হযরতের জন্য বাহ্যিক রক্ষাব্যূহ বানাইয়া দিলেন। তখন আবু তালেব মক্কার মধ্যে একজন অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সর্দার পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার ইশারার উপর কোরায়শ বংশীয় বৃহত্তম দুইটি গোত্র বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবের প্রতিটি মানুষ জীবন দানে দাঁড়াইয়া যাইত। সেই আবু তালেব হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এই বিষয়টি মক্কার মোশরেকদের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা ব্যক্তিগতভাবে এবং একাধিকবার প্রতিনিধিত্বমূলকরূপে আবু তালেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মোশরেকরা হযরতের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র আঁটিল, আবু তালেব ততই হযরতের সাহায্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন; এমনকি শেষ পর্যন্ত আবু তালেব মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় স্বীয় শক্তি দৃঢ়তর করার জন্য বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সকলকে একত্রিত করিয়া হযরতের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল এবং সমবেতভাবে সর্বাবস্থায় হযরতকে সাহায্য করার ঘোষণা জারি করিয়া দিল।

নবুয়তের পঞ্চম বৎসর আবিসিনিয়া বা হাবশায় হিজরত (পৃষ্ঠা-৫৪৬)

মক্কার প্রভাবশালী দুইটি গ্রোত্র বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের শক্তি ও সমর্থনে পুষ্ট আবু তালেবের সাহায্য-সহায়তার দরুন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মোশরেকগণ ইচ্ছানুরূপ জুলুম-অত্যাচার করিতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হইয়া ছাহাবীগণের উপর তাহাদের সমুদয় ঝাল মিটাইবার উন্মাদনায় মত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের উপর এমনভাবে অত্যাচার বহাইয়া দিল যে, ইহা সহ্য করিয়া নেওয়া কোন প্রাণীর পক্ষেই সাধ্যকর ছিল না।

তদুপরি বড় কষ্ট মুসলমানদের এই ছিল যে, তাঁহারা সকলে এবাদত-বন্দেগী আদায় করার সুযোগ পাইতেন না, কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন না! দৈহিক নির্যাতন অপেক্ষা এই নির্যাতন মুসলমানদের পক্ষে অধিক বেদনাদায়ক ছিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাহাবীগণকে বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় জীবন বাঁচাইয়া স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাইতে পার। তথাকার শাসনকর্তা একজন সুপ্রকৃতির লোক, সে কাহারও উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করে না। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর রজব মাসে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই অনুমতি প্রদান করেন, সেমতে ছাহাবীগণের মধ্য হইতে ১২ জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তন্মধ্যে মাত্র ৪ জন নিজের সঙ্গে স্ত্রীকেও লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ৮ জন স্ত্রী-পুত্র সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ নিসঙ্গরূপেই হিজরত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মোট ১৬ জনের একটি দল মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হন। তাঁহারা হইলেন- (১) ওসমান গনী (রাঃ), (২) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরতের কন্যা রুকাইয়্যাহ্ (রাঃ), (৩) আবু হোযায়ফা (রাঃ), (৪) এবং তাঁহার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সোহায়ল (রাঃ), (৫) আবু সালামা (রাঃ), (৬) এবং তাঁহার স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ), (৭) আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ), (৮) এবং তাঁহার স্ত্রী লায়লা (রাঃ), (৯) সোহায়ল (রাঃ), (১) আবু সোবরা (রাঃ), হাতেব ইবনে আমর (রাঃ), (১২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), (১৩) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), (১৪) যোবায়ের (রাঃ), (১৫) মোসআ'ব ইবনে ওমায়ের (১৬) এবং দলপতি ওসমান ইবনে মযউ'ন (রাঃ)।

এই দলটিই ছিল এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য স্বীয় দেশ-খেশ সর্বস্ব ত্যাগকারী। দ্বীন ইসলামের জন্য তাঁহারা জন্মভূমি, ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বরণের মায়া ত্যাগে দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। নরপিশাচরা জানিতে পারিলে এই কাজেও বাধার সৃষ্টি করিবে, তাই তাঁহারা গোপনে মক্কা হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়েন এবং (লোহিত সাগরের কিনারায় পৌঁছিয়া) বাণিজ্যিক নৌকায় আরোহণ করেন। মক্কার কাফেররা সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য পিছনে ধাওয়া করে; কিন্তু তাহাদের পৌঁছিবার পূর্বেই নৌকা ছাড়িয়া যায়। (যোরকানী, ১-২৭১)

মক্কাবাসীদের মুসলমান হইয়া যাওয়ার গুজব

মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় পৌঁছিলেন, হযরতের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইল- তাঁহারা তথায় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে মক্কায় একটি ঘটনা ঘটিল- "একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম সূরা 'নজ্‌ম' তেলাওয়াত্ত করিলেন, তাহাতে সেজদার আয়াত আছে; তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানগণ সেজদা করিলেন, তথায় উপস্থিত মোশরেকরাও সেজদায় পড়িয়া গেল।" ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ড ৫৬৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলমানদের সঙ্গে মোশরেকরাও সেজদা করার এই সংবাদটি চতুর্দিকে এই আকারে ছড়াইয়া পড়িল যে, মক্কাবাসী মোশরেকগণ মুসলমান হইয়া গিয়াছে, এমনকি এই খবর আবিসিন্নিয়ায়ও পৌছিয়া গেল। মুসলমানগণ তথায় রজব মাসে পৌছিয়াছিলেন। রমযান মাসে সেজদার ঘটনা ঘটিয়াছিল। (তব্‌কাতে ইবনে সা'দ ১-২০৬) শওয়াল মাসেই কিছু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়া হইতে মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মক্কার নিকটে পৌছিলে পর তাঁহারা মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বর্তমানে মক্কায় জুলুম-অত্যাচারের ঝড় অধিক বেগে বহিতেছে। তখন কয়েকজন ত পুনঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া আসিলেন এবং কয়েকজন মক্কায় আসিয়া কাহারও আশ্রয়ে রহিলেন। (আসাহ্‌হুস্ সিয়ার-৮৮)

মক্কায় মুসলমানদের উপর বিশেষতঃ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের উপর ভয়াবহ জুলুম-অত্যাচার চলিতে লাগিল। অবস্থাদৃষ্টে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পুনরায় ছাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ দ্বিতীয় বার গোপনে গোপনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই বার দলবদ্ধভাবে না যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গেলেন। সর্বপ্রথম আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভ্রাতা জা'ফর (রাঃ) গিয়াছিলেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর- মুসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ

"কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট লাভ" ইহা নির্ধারিত সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে, দুঃখের সঙ্গে সুখ আছে, দুর্ভোগের সঙ্গে মঙ্গল আছে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে.......।

মুসলমানদের পক্ষেও এই নীতির উদয় হইল। মক্কার দুরাচাররা মুসলমানদের দমাইবার ও ধর্মান্তর করার জন্য অত্যাচারের শেষ সীমা ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু মুসলমানগণ বিন্দুমাত্র দমিলেন না। দ্বীন-ঈমানের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগে দেশান্তরিত হইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। ভীষণতম দুর্ভোগও তাঁহাদের সত্য সাধনার অগ্রাভিযানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্তে তাঁহারা নূতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া দ্বীন-ঈমানে পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল হইয়া রহিলেন। এই শঙ্কা, উদ্বেগ, অগ্নি পরীক্ষা ও কঠোর নির্যাতনের অন্ধকার মাঝে মঙ্গলের বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমাদের মঙ্গল ও শুভ লক্ষণের তিনটি নক্ষত্র উদিত হইল। প্রথমটি হইল এক নব ইতিহাসের সূচনা- মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করিতে গিয়া মক্কার কাফেরদের জঘন্যরূপে পরাজয় বরণ। ঘটনার বিবরণ এই- মুসলমানগণ পর পর মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় যাইতে লাগিলেন, কেহ একা আর কেহ পরিবারবর্গসহ। এইরূপে সর্বমোট ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা তথায় পৌছিলেন।

তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, তাঁহার নাম ছিল 'আসহামা'। তিনি ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্মের অনুসুরী ছিলেন; কিন্তু তিনি মুলমানদিগকে অতি আদর যত্নের সহিত তথায় বসবাসের সুযোগ প্রদান করিলেন।

মক্কার মোশরেকদের নিকট আবিসিনিয়ায়মুসলমানদের সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধার খবর পৌছিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মুসলমানদের তথাকার সুখ-শান্তি নষ্ট করার

চেষ্টা-তদবীরে লাগিয়া গেল। এমনকি, নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে আবিসিনিয়ার বাদশাকে প্রভাবান্বিত করা এবং তথা হইতে প্রবাসী মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া দিতে সম্মত করার জন্য তাহারা একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ কূটনীতিবিদ আম্‌র ইবনুল আছ * এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীয়া'কে বহু রকম উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া তথায় পাঠাইল। তাহারা দু জনই আবিসিনিয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ তথাকার সর্দারগণকে অনেক রকম উপঢৌকন পেশ করিয়া বুঝাইল যে, মক্কার কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়া দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল। মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদের দেশে আসিয়া স্থান লইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আপনারা এই দেশের সর্দার, আপনারা বাদশাহকে এই ব্যাপারে সম্মত করাইবার জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন। বাদশাহ যেন তাহাদিগকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া আমাদের হাতে সোপর্দ করেন। কারণ, আমরা তাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানি।

অতপর তাহারা সর্দারগণকে লইয়া বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইল এবং অনেক কিছু উপঢৌকন পেশ করতঃ মুসলমানদের সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্যই করিল এবং তাহাদিগকে দেশে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করিল। সর্দারগণও বাদশাহকে অনুরোধ করিল যে, তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে বাদশাহ রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারি না। অবশ্য তাহাদিগকে সম্মুখেই ডাকিয়া আনিতেছি। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সকলেরই বক্তব্য শুনা হইবে। যদি তোমাদের বক্তব্য সত্য হয় তবে তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে, নতুবা তাহাদিগকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

অতপর মুসলমানগণকে ডাকা হইল; তাঁহারা অবিলম্বে কর্তব্য স্থির করার জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা জা'ফর (রাঃ)-কে বক্তব্য পেশকারী মনোনীত করিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমরা ইসলাম ও ঈমানের খাঁটি বক্তব্যই পেশ করিব; নবীজী (সঃ) আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন সবই প্রকাশ করিয়া দিব, কিছুই গোপন করিব না; তাহাতে আমাদের পরিণাম যাহাই হয় হইবে।

মুসলমান দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহর দরবারে তাঁহার সকল পারিষদবর্গ তাহাদের ধর্মীয় পুস্তক লইয়া উপস্থিত আছে এবং মক্কা হইতে আগত প্রতিনিধিদ্বয় বাদশাহর দুই দিকে উপবিষ্ট হইয়াছে। তখনকার রীতি ছিল– বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে সেজদা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। মুসলমান দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুধু সালাম করিলেন, সেজদা মোটেই করিলেন না। উপস্থিত সকলেই আপত্তি জানাইল যে, তোমরা বাদশাহকে সেজদা কেন করিলে না? মুসলমানদের পক্ষে জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করি না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি তাঁহার রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, সেই রসূল আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও সেজদা না করি। (যোরকানী, ১–২৮৮)

অতপর স্বয়ং বাদশাহর তরফ হইতে মুসলমানগণকে প্রশ্ন করা হইল যে, তোমরা আমার ধর্মেও নও, বর্তমান যুগের কোন ধর্মেও নও– সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম তোমরা লইয়াছ তাহা কি ধর্ম? তদুত্তরে জা'ফর (রাঃ) সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন–

হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর জাতি ছিলাম, আমরা গর্হিত দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকিতাম। মরা খাইতে এবং ব্যভিচার করিতে দ্বিধাবোধ করিতাম না, আত্মীয়তা ছেদন করিতাম,

* তাঁহারা উভয়ে পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাড়া-প্রতিবেশীর উপর জুলুম-অত্যাচার করিতাম, আমাদের মধ্যে সবল দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত; আমাদের গোটা জাতির অবস্থাই এইরূপ ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আমাদের মধ্যকারই একজন লোক, আমরা তাঁহার বংশ পরিচয় পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং তাঁহার সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা সম্পর্কেও পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন আমরা যেন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি, আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা–এবাদত করি। আর আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারী মূর্তির পূজা করিয়া থাকিতাম আমরা যেন ঐসব ত্যগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং হারামকারী ও নরহত্যা হইতে বাঁচিয়া থাকার আদেশ করিয়াছেন। ব্যভিচার, মিথ্যা, এতীমের মাল হরণ এবং কাহারও প্রতি মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বিশেষ রূপে আদেশ করিয়াছেন, আমরা যেন আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক না করি। এতদ্ভিন্ন তিনি আমাদিগকে নামায, যাকাত ও রোযার আদেশ করিয়াছেন। জা'ফর (রাঃ) এইরূপে ইসলামের আহ্‌কামসমূহে বাদশাহর সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমরা সেই রসূলকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাদের জন্য যে জীবন বিধান আনিয়াছেন, আমরা তাহার অনুসারী হইয়াছি। ফলে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি, আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক বা সাথী সাব্যস্ত করি না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তাহা বৈধরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা বর্জন করিয়াছি।

আমাদের উক্ত কার্যধারার উপরই মক্কাবাসীরা আমাদের উপর অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে, ভয়াবহ কষ্ট-যাতনা দিয়াছে এবং আমাদিগকে আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেন আমরা আল্লাহর এবাদত ছাড়িয়া মূর্তিপূজায় লিপ্ত হই, অবৈধসমূহকে বৈধরূপে গ্রহণ করি। যখন তাহারা জুলুম-অত্যাচার করিয়া আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়াছে এবং আমাদের ধর্ম পালনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা বাধ্য হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছি। আপনার ন্যায়নিষ্ঠার সুখ্যাতি থাকায় অন্য কোন বাদশাহর প্রতি খেয়াল না করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি; আমরা আপনার আশ্রয়ের আশা করিয়াছিলাম। হে বাদশাহ! আমরা আশা রাখি, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হইব না।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের রসূল আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহার কোন অংশ কি এখন আপনার স্মরণে আছে?

অতি বিচক্ষণ আল্লাহ ভক্ত ছাহাবী জা'ফর (রাঃ) স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া পবিত্র কোরআনের সূরা মারইয়ামের প্রথম অংশ সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে মনোমুগ্ধকর, সুমধুর ও সুগভীর ভাষায় হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহারই একান্ত ঘনিষ্ঠ হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্মবৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণিত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সরল সুবোধগম্য যুক্তির মাধ্যমে ইহুদী ও খৃস্টান চরমপন্থীদের বিভিন্ন গর্হিত মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতিবাদ ছিল। উল্লিখিত বিষয়বস্তু এবং ইসলামের উদার সত্যপ্রিয়তা– এইসব এক সঙ্গে সভাস্থলে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। ঐ বাদশাহ ঈসায়ী বা খৃস্টান ছিলেন এবং অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন; হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত সত্যের আলো পাইয়া তিনি মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমনকি তিনি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

ঘটনার বর্ণনাকারী শপথ করিয়া বলেন, সমুদয় বৃত্তান্ত ও পবিত্র কোরআন শুনিয়া বাদশাহ কাঁদিতে কাঁদিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন এবং উপস্থিত তাঁহার পারিষদবর্গও কাঁদিয়া সম্মুখস্থ পুস্তক ভিজাইয়া ফেলিল। বাদশাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, ইহা এবং হযরত ঈসা (আঃ) যেই বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন (ইঞ্জীল কিতাব) উভয় এক জ্যোতিঃকেন্দ্র হইতে আবির্ভূত।

বাদশাহ মক্কা হইতে আগত ব্যক্তিদ্বয়কে দরবার হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, খোদার কসম! তোমাদের হস্তে এই লোকগণকে কখনও সোপর্দ করিব না এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বিব্রতও করা হইবে না, তাঁহারা আমার দেশে শান্তিতে বসবাস করিবেন।

মক্কা হইতে আগত লোকদ্বয় বাদশাহর দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াও চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। আমর ইবনুল আ'ছ স্বীয় সঙ্গীকে বলিল, আগামীকল্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ খাড়া করিব যদ্দ্বারা তাহারা অবশ্যই সুযোগ-সুবিধা হারাইবে। বাদশাহ নাসরানী– তাহাদের আকীদা এই যে, হযরত ঈসা খোদার বেটা। আমি আগামীকল্য বাদশাহকে বলিয়া দিব যে, মুসলমানগণ হযরত ঈসাকে খোদার বান্দা বলিয়া থাকে– খোদার বেটা স্বীকার করে না।

সত্য সত্যই পরদিন তাহারা বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে বাদশাহ! মুসলমানগণ হযরত ঈসা সম্পর্কে সাংঘাতিক কথা বলিয়া থাকে। তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা হযরত ঈসা সম্পর্কে কি বলে?

বাদশাহ মুসলমানগণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুসলমানগণ প্রথমে নিজেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, হযরত ঈসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দেওয়া হইবে। নাসরানী বাদশাহর সম্মুখে এই বিষয়টির আলোচনা মুসলমানদের পক্ষে সর্বাধিক বড় বিপদ ছিল; কিন্তু সকলে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, আমাদের পরিণাম যাহাই হউক, আমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাহাই বলিব, যাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। মুসলমানগণ বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, হযরত ঈসা সম্পর্কে আপনারা কি বলিয়া থাকেন? তাঁহার সম্পর্কে আপনাদের মতবাদ কি?

জা'ফর (রাঃ) উত্তর করিলেন, আমরা তাহাই বলি যাহা আমাদের নবী (সঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। । তিনি আমাদিগকে শিক্ষ দিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল ছিলেন; তাঁহার আত্মা আল্লাহর বিশেষ আদেশবলে পাক-পবিত্র কুমারী মারইয়ামের গর্ভে পৌঁছিয়াছিল।

এই বক্তব্য শুনিয়া বাদশাহ মাটি হইতে একটি খড় বা কুটা উঠাইয়া তাহার প্রতি ইশারা করতঃ মন্তব্য করিলেন, হযরত ঈসার মর্তবা উক্ত বর্ণনা হইতে এই খড় পরিমাণও অধিক নহে। বাদশাহর এই মন্তব্যে তাঁহার পারিষদবর্গ নাক সিট্‌কাইয়া উঠিল, তাই বাদশাহ ইহাও বলিলেন যে, যদিও তোমরা নাক সিট্‌কাও।

অতপর বাদশাহ মুসলমানগণকে বলিয়া দিলেন, আপনারা আমার দেশে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ভোগ করিবেন এবং তিন বার ইহাও বলিলেন, কেহ আপনাদিগকে মন্দ বলিবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাকে যদি স্বর্ণের পাহাড়ও দেওয়া হয় তবুও আমি আপনাদের কোন ব্যক্তিকে একটু মাত্র কষ্ট দিব না। বাদশাহ মক্কা হইতে আগত সমুদয় উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিলেন। ফলে মক্কা হইতে প্রেরিত লোকদ্বয় ব্যর্থ অপদস্থ হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হইল এবং মুসলমানগণ সুখ-শান্তির সহিত নিরাপদে বসবাস করার অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। (সীরাতে ইবনে হেশাম– ১)

বাদশাহ আবিসিনিয়াবাসী জনসাধারণ এবং তথাকার পাদ্রীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি, (মুসলমানগণ যাঁহার কথা বলিতেছেন) তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি ঐ রসূল যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইঞ্জীল কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। আমি যদি রাষ্ট্রীয় কার্যে আবদ্ধ না থাকিতাম তবে তাঁহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইতাম।

এই বাদশাহর অন্তরে তখন হইতে ইসলাম স্থান লাভ করে। অতপর চৌদ্দ বৎসর পর হিজরী সপ্তম সনে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা বিশ্বের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট যখন ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তখন সর্বপ্রথম এই বাদশাহর প্রতি বিশেষ দূত ছাহাবী আমর ইবনে

উমাইয়া জামরী (রাঃ) মারফত দুইটি পত্র লিখিয়াছিলেন। একটি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে এবং মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সকল মুসলমানকে মদীনায় প্রেরণ করার জন্য।

হযরতের লিপি তাঁহার দরবারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিপির সম্মানার্থ স্বীয় সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং লিপিখানা মাথার উপর বরণ করিয়া লইলেন। আর জা'ফর (রাঃ)-কে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে আনুষ্ঠানিকরূপে ইসলাম গ্রহণপূর্বক পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া হযরতের লিপির উত্তর প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয় পত্রের মর্মানুযায়ী দুইটি বড় বড় সামুদ্রিক নৌকায় তথাকার মক্কাবাসী মুসলমাগণকে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন।

অষ্টম বা নবম হিজরী সনে আবিসিনিয়ায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। (তবাকাতে ইবনে সা'দ ১- ২৫)। মদীনায় থাকিয়া নবী (সঃ) ওহী মারফত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদীনার ছাহাবীগণসহ তাঁহার গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন * এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক মন্তব্য করেন যাহা হাদীছে আছে–

১৬৭৯। হাদীছ ঃ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشى مات اليوم رجل صالح فقوموا على اخيكم اصحمة ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন নাজাশী– আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল, ঐদিনই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, অদ্য একজন নেককার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তোমরা সকলে চল, তোমাদেরই ভ্রাতা (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) আস্‌হামার জানাযার নামায আদায় কর।

(রসূলের মুখে "নেককার" আখ্যা কতই না সৌভাগ্যজনক।)

১৬৮০। হাদীছ ঃ عن جابر رضى الله تعالى عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى فصفنا وراءه فكنت فى الصف الثانى او الثالث ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদীনায় থাকিয়া) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশাহর জন্য জানাযার নামায পড়িয়াছেন। আমাদিগকে নিয়মিতভাবে তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন; আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে উপস্থিত ছিলাম।

১৬৮১। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشى صاحب الحبشة فى اليوم الذى مات فيه وقال استغفروا لاخيكم ـ صف بهم فى المصلى فصلى عليه وكبر عليه اربعا ـ

---

* সম্রাট আস্‌হামা শাহে আবিসিনিয়া, যিনি মুসলমানগণকে তাঁহার দেশে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সপ্তম হিজরী সনে তাঁহারই নিকট হযরতের লিপি প্রেরিত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কার্যে আবদ্ধতার দরুন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে বা নবম হিজরীর প্রারম্ভে আবিসিনিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইলে পর মদীনায় থাকিয়া হযরত নবী (সঃ) তাঁহার জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার পর আবিসিনিয়ায় সিংহাসনের অধিকারী যে ব্যক্তি হইয়াছিলেন হযরত নবী (সঃ) তাঁহার নিকট নবম হিজরী সনে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম এবং ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই, বরং অনেকে তাহাকে কাফের বলিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এই দ্বিতীয় বাদশাহ এবং তাহার প্রতি লিপি যাহা নবম হিজরীতে লেখা হইয়াছিল তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে। (ফাতহুল বারী ৮–১০৫)

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল ঐদিনই হযরত রসূলুল্লা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মদীনায়) ছাহাবীগণকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর এবং জানাযার নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলকে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন। অতপর তাঁহার প্রতি জানাযার নামায পড়িলেন এবং চারি তকবীরে নামায আদায় করিলেন।

আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি

দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ছাহাবী পর পর হাব্‌শা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও নিজ গোষ্ঠী-জ্ঞাতি মোশরেকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মন ভরিয়া নামায পড়ার, প্রাণ খুলিয়া পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার অভাব ও বাধা তাঁহাকে এতই ব্যথিত করিল যে, এই ব্যথা-বেদনা তিনি কোন মতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি চাহিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর (রাঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন; দুই দিনের পথ অতিক্রমের পর মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রসিদ্ধ "কারাহ্" গোত্রের সর্দার ইবনে দাগেনার সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি তাঁহাকে মক্কা ত্যাগে বাধা দিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিলেন। (বেদায়া ৩-৯৩)। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৮২। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা- ৫৫১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাতা-পিতাকে চিনিবার বয়স হইতেই আমি তাঁহাদের উভয়কে দ্বীন ইসলামের উপর দেখিতে পাইয়াছি এবং আমাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এত অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, একটি দিনও ফাঁক যাইত না যে দিন হযরত (সঃ) সকালে বা বিকালে আমাদের বাড়ীতে তশরীফ না আনিতেন।

সেই সময় মক্কার কাফেরদের তরফ হইতে মুসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতন চলিতেছিল (মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করত আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন)। তখন (আমার পিতা) আবু বকর (রাঃ) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতঃ মক্কা ত্যাগ করিলেন। (মক্কা হইতে দুই দিনের পথে) 'বরকুল গেমাদ' নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁহার সঙ্গে আরবের প্রসিদ্ধ 'কারাহ্' গোত্রের সর্দার ইবনে দাগেনার সাক্ষাত হইল। তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার বংশীয়গণ আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, সুতরাং স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের গোলামী বন্দেগী যাহাতে সুষ্ঠুরূপে করিয়া যাইতে পারি এই উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি (আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য গোপন রাখিলেন)।

ইবনে দাগেনা বলিলেন, হে আবু বকর! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে না এবং আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে দেশত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। (আপনি হইলেন মহৎ গুণাবলীর আকর, যথা-) বেকার রোজগারহীনের রুজির ব্যবস্থাকারী, আত্মীয়তার পূর্ণ হক্ আদায়কারী, নিরুপায়ের উপায়, অতিথি সেবায় আত্মনিয়োগকারী এবং সত্যের জন্য আগত আপদ-বিপদে সাহায্য দানকারী। আমি আপনার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি নিজ দেশে থাকিয়াই আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত-বন্দেগী করিতে থাকুন।

সেমতে আবু বকর (রাঃ) মক্কার দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইবনে দাগেনাও তাঁহার সঙ্গে মক্কায় আসিলেন। ইবনে দাগেনা কোরায়শ প্রধানদের সকলের নিকট ঐ দাবীই জানাইলেন যে, আবু বকরের ন্যায় মহান ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা যায় না এবং তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহার মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন। কোরায়শ প্রধানগণ আবু বকরের জন্য ইবনে দাগেনার নিরাপত্তাদান সমর্থন করিল, বিরোধিতা করিল না। অবশ্য তাহারা ইবনে দাগেনাক বলিল, আপনি আবু বকরকে বলিয়া দিন, তিনি যেন স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত-বন্দেগী নিজের ঘরের ভিতরে থাকিয়াই করেন। ঘরের ভিতরে থাকিয়াই যেন নামায আদায় করেন এবং তথায় যত ইচ্ছা কোরআন পাঠ করেন। তিনি যেন খোলাখুলি প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না করেন; তাঁহার কোরআন পাঠ শ্রবণে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়।

ইবনে দাগেনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাহাদের এই কথাগুলি পেশ করিলেন, সেমতে আবু বকর (রাঃ) কিছু দিন ঐভাবেই এবাদত-বন্দেগী করিয়া যাইতে লাগিলেন– প্রকাশ্যে নামাযও পড়িতেন না এবং ঘরের ভিতর ছাড়া কোরআন পাঠও করিতেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই বাধ্য-বাধ্যকতার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বাড়ীর বহির্ভাগে একখানা মসজিদ তৈয়ার করিলেন এবং তথায় নামায আদায় ও কোরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) অতিশয় কান্নাকাটির সহিত কোরআন পাঠ করিয়া থাকিতেন, কোরআন পাঠকালে তিনি নয়নযুগলের অশ্রুধারা সামলাইয়া রাখিতে পারিতেন না। কাফেরদের স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁহার কোরআন পাঠের দৃশ্য দেখিবার জন্য ভিড় জমাইয়া বসিত এবং তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত।

কোরায়শ প্রধানগণ এই অবস্থাদৃষ্টে ভীত হইয়া পড়িল; তাহারা ইবনে দাগেনাকে সংবাদ দিল। ইবনে দাগেনা আসিলে পর তাহারা বলিল, আমরা আবু বকরের জন্য আপনার নিরাপত্তা দান এই শর্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকাশ্যে নামায আদায় এবং কোরআন পাঠ হইতে বিরত থাকিবেন। এখন তিনি প্রকাশ্যেই নামায পড়েন এবং কোরআন পাঠ করিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণের ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। আবু বকরকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিন। তিনি যদি ঘরের ভিতরে থাকিয়া এবাদত-বন্দেগী করিতে রাজি হন তবে ভাল, অন্যথায় তাঁহাকে বলুন– তিনি যেন আপনার নিরাপত্তা দান ফেরত দিয়া দেন; আমরা আপনার নিরাপত্তাদান ভঙ্গ করা ভাল মনে করি না। অপর দিকে আবু বকর তাঁহার কার্যকলাপ প্রকাশ্যেই করিয়া যাইবেন, আমরা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিব না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাদের কথা মতে ইবনে দাগেনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আসিলেন এবং কোরায়শ প্রধানদের অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, আপনি জানেন আমি আপনাকে কি বলিয়াছিলাম। এখন আপনি হয়ত তাহাদের কথা রক্ষা করিয়া চলুন, না হয় আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ফিরাইয়া দিন। আমি ইহাতে বড়ই মর্মাহত হইব যে, আরবের লোকগণ শুনিতে পাইবে একটি লোকের পক্ষে আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হইয়াছে।

এতশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইবনে দাগেনাকে বলিয়া দিলেন, আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তা আপনাকে ফেরত দিয়া দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট রহিলাম। এই সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন (আবু বকর (রাঃ) ঐ অবস্থায় মক্কায় থাকিয়া গেলেন, পরে মদীনায় হিজরত করিলেন)।

আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মুসলমানদের দ্বারা ইসলামের প্রভাব

মৌখিক তবলীগ অপেক্ষা আদর্শ ও চরিত্রের তবলীগ অধিক শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মুসলিম নর-নারীগণ তথায় নিয়মিত ধর্ম প্রচারের তেমন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয় পান নাই। বাদশাহর উদারতায় তাঁহারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তির সুবিধা পাইয়া থাকিলেও পরদেশ, চতুর্দিক হইতে শত্রুতার পরিবেশ, যেখানে প্রাণ বাঁচানোই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছিল, সেক্ষেত্রে আবার ধর্ম প্রচারের

অবকাশ কোথায়? কিন্তু তাঁহাদের জীবন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই লোকের মনে তাঁহাদের ধর্ম ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিত; প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণই ইহা। সেমতে প্রবাসী মুসলমানদের দ্বারা আবিসিনিয়ায় মৌখিক ইসলাম প্রচার না চলিলেও আদর্শ ও চরিত্রে নির্বাক প্রচার অবশ্যই চলিত। এমনকি তথাকার খৃস্টানদের অনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইল– ইহারা যেই নবীর উম্মত সেই নবীকে দেখা দরকার। এই আকর্ষণের ফলে আবিসিনিয়ার কুড়ি জন খৃস্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীজী (সঃ) একা একা হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া ছিলেন। আর নিকটেই দারে-নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে আবু জাহল গোষ্ঠী বসিয়াছিল।

ঐ খৃস্টানগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাতে আসিয়া কতিপয় তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (সঃ) উত্তর দিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাক কালাম কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে তাঁহারা এতই অভিভূত হইলেন যে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইলেন। তাঁহাদের কাঁদা ও অশ্রু বর্ষণের দৃশ্য এবং তাঁহাদের হৃদয়পটে পবিত্র কোরআনের সুগভীর রেখাপাত এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সেই দৃশ্য উল্লেখপূর্বক তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শ্রেণীর ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিয়া পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ বর্ণনা অবতীর্ণ হইল। সেই বর্ণনায় তাঁহাদের অশ্রুপাত এবং পবিত্র কোরআন দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবাবিষ্টতা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে–

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ـ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ـ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "তাঁহারা যখন শুনিলেন ঐ মহাবাণী যাহা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তখন তুমি দেখিতেছ, তাঁহাদের নয়নযুগলে অশ্রু প্রবাহমান; সত্য অনুধাবন করার দরুন তাঁহারা বলিতেছিলেন, হে প্রভু! আমরা ঈমান গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ঈমান ঘোষণাকারীদের দলে আমাদের নাম লিখিয়া নিন। আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার তরফ হইতে যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করিয়া আমরা আশা রাখিব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৎ লোকদের দলভুক্ত করিয়া দিবেন– এইরূপ আশা রাখা আমাদের জন্য কি ফলদায়ক ও সঙ্গত হইবে? এই হৃদ্যতাপূর্ণ উক্তির ফলে আল্লাহ তাঁহাদের মহাপ্রতিদান বেহেশত দিবেন, যাহার বাগ-বাগিচায় প্রবাহমান রহিয়াছে নদী-নালা। তাঁহারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে থাকিবেন। সৎ-সুধীগণের প্রতিদান ইহাই।" (পারা–৭ আরম্ভ)

ঐ আগন্তুকগণ ইসলাম বরণ করিয়া নবীজী (সঃ) হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ দেশে যাত্রা করিলেন। সেই মুহূর্তেই আবু জাহল এবং তাহার দলীয় কতিপয় দুষ্কৃতকারী আসিয়া তাঁহাদেরকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিল, তোমাদের ন্যায় বেকুফের দল আর দেখি নাই! তোমরা এইরূপ হঠাৎ নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেলিলে? তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে কথা বলা হইতে সালাম– তোমাদের সঙ্গে কোন কিছু বলিতে চাই না, তোমাদের মতে তোমরা থাক; আমাদেরকে আমাদের মতে থাকিতে দাও। (আসাহহুস সিয়ার– ৯৮)

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের ফযীলত

১৬৮৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬০৭) আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় হিজরতের সংবাদ আমরা অবগত হইলাম– তখন আমরা (আমাদের দেশ) ইয়ামানেই (মুসলমান

হইয়া) অবস্থান করিতেছিলাম। নবীজীর হিজরত সংবাদে আমি এবং আমার বড় দুই সহোদরসহ তিপ্পান্ন জন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী লোকের সহিত মদীনায় হিজরত উদ্দেশে আমরা ইয়ামান হইতে যাত্রা করিলাম। আমরা একটি সমুদ্রযানে আরোহণ করিলাম; প্রতিকূল ঝড়ো বাতাস আমাদের যানটি নাজাশী বাদশাহর দেশ হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় পৌঁছাইয়া দিল।

তথায় জাফর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত আমাদের সাক্ষাত হইল। আমরা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলাম। (৭ম হিজরী সনে) যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খায়বর দেশ জয় করিয়াছেন তখন আমরা আবিসিনিয়া হইতে সকল প্রবাসী মুসলমান একটি সামুদ্রিক নৌকায় চড়িয়া মদীনায় পৌঁছিলাম। যাঁহারা আমাদের পূর্বে মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে (কৌতুক করিয়া) বলিতেন, আমরা আপনাদের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী। কারণ, আমরা আপনাদের পূর্বে হিজরত করিয়া নবীজীর নিকটে পৌঁছিয়াছি।

আমাদের নৌকায় আগতদের মধ্যে "আসমা" নাম্নী এক মহিলা ছিলেন। তিনি নবী গৃহিণী হাফসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি পূর্বে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় ছিল। আসমা (রাঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত। এমন সময় (হাফসার পিতা) ওমর (রাঃ) তথায় আসিলেন এবং আসমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাফসা (রাঃ) বলিলেন, তিনি ওমায়স তনয়া আসমা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে সমুদ্রযানে আগত? আসমা বলিলেন, হাঁ। তখন ওমর (রাঃ) সেই কথাটিই বলিলেন– আমরা মদীনায় তোমাদের পূর্বে হিজরত করিয়া আসিয়াছি; আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অধিক নৈকট্যলাভকারী। এতদশ্রবণে আসমা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, (আমাদের অপেক্ষা আপনারা অধিক নৈকট্যের অধিকারী) ইহা কখনও নহে; কসম খোদার! আপনারা (আরামে) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন; তিনি আপনাদের অনাহারীর আহার যোগাইয়াছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষা ও উপদেশ দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে দূরে, শত্রুর দেশে ছিলাম, (আমরা কত কষ্ট করিয়াছি! এবং আমাদের এইসব কষ্ট ভোগ একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশে ছিল)।

আমি শপথ করিলাম– আপনার এই কথার অভিযোগ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পেশ না করিয়া পানাহার করিব না। আমরা কত প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছি! কত রকম ভয়-ভীতির মধ্যে কালাতিপাত করিয়াছি; সব কিছু আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে ব্যক্ত করিব এবং (প্রতিফল সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিব। খোদার কসম! আমি একটুও মিথ্যা বা গর্হিত অতিরঞ্জিত কথা বলিব না।

ইতিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। তখন আসমা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! ওমর এইরূপ বলিয়াছেন। নবী (সঃ) আসমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছ? আসমা বলিলেন, উত্তরে আমি এই এই বলিয়াছি। নবী (সঃ) বলিলেন, ওমর শ্রেণীর লোকেরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক নৈকট্যের অধিকারী কখনও নহে। ওমর ও তাহার শ্রেণীর লোকদের একটি মাত্র হিজরত হইয়াছে (মক্কা হইতে মদীনায়)। আর নৌকাযোগে আগত তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (একটি নিজ দেশ হইতে আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি আবিসিনিয়া হইতে মদীনায়)।

আসমা (রাঃ) বলিলেন, আবু মূসা (রাঃ) এবং নৌকায় আগত ছাহাবীগণ দলে দলে আমার নিকট আসিতেন এবং এই হাদীছ শুনিয়া যাইতেন। দুনিয়ার কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক বড় ছিল না তাহা অপেক্ষা, যাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম তাঁহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। ছাহাবী আবু মূসা (রাঃ) ত এই হাদীছখানা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট খোঁজ করিয়া শুনিয়া থাকিতেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমানদের পক্ষে শুভ লক্ষণের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ঘটনা হইল শেরে খোদা

হাম্‌যা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।*

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোশরেকগণ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার সময়ই হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদা নবী (সঃ) সাফা পর্বতের নিবটবর্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ সময় আবু জাহলের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইল। দুরাচার আবু জাহল নবীজী (সঃ)-কে পথে পাইয়া অশ্লীল অশোভনীয় কথাবার্তা ও গালিগালাজ শুনাইল। সে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধেও জঘন্য কথা বলিল। নবীজী (সঃ) তাহার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না; অসভ্যের কথার উত্তরই চুপ থাকা– নবীজী (সঃ) তাহাই করিলেন। মক্কারই এক ব্যক্তির দাসী ঘটনা দেখিয়াছিল; ইতিমধ্যেই বীরবর হামযা শিকার করিয়া তীর-ধনুকসহ বাড়ী যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ দাসীর সাক্ষাত হইল; সে তাঁহাকে বলিল, আপনি যদি দেখিতেন! কিভাবে আবু জাহল আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালিগালাজ করিয়াছে! ইহা শুনামাত্র বীর হামযা অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাত আবু জহলের তালাশে ছুটিলেন। হরম শরীফে যাইয়া তাহাকে লোকদের সহিত বসা পাইলেন; ঐ অবস্থায় বীর হামযা স্বীয় ধনুক দ্বারা আবু জাহলের মাথায় আঘাত করিলেন; তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। হামযা (রাঃ) উত্তেজিতভাবে তাহাকে বলিলেন, তুমি না-কি মুহাম্মদ (সঃ)-কে গালাগালি করিয়াছ? শুনিয়া রাখ! আমি তাঁহার ধর্মে রহিয়াছি। উপস্থিত কেহ কেহ আবু জাহলের পক্ষে উত্তেজিত হইতেছিল; কিন্তু আবু জাহল তাহাদের বারণ করিয়া বলিল, হামযাকে কিছু বলিও না; সত্যই আমি আজ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শক্ত কথা বলিয়াছি। আমি অন্যায়ভাবে তাহাকে জলুম করিয়াছি। পাষণ্ড আবু জাহল সাংঘাতিকরূপে অপমানিত হইয়াও সাধু সাজিল! কারণটা সহজেই অনুমেয়, বীর হামযার অবস্থা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সর্বনাশ উপিস্থিত। এখন সদ্ব্যবহার ও সাধুতার দ্বারা হামযাকে শান্ত না করিলে আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দল ছাড়া হইয়া যাইবে এবং কোরায়শরা এই সর্বনাশের জন্য তাহাকে দায়ী করিবে। আবু জাহল কূটবুদ্ধি খাটাইল, কিন্তু বীর হামযাকে স্বর্গীয় মঙ্গলের আলিঙ্গন হইতে বারণ করিতে পারিল না।

উপস্থিত এক ব্যক্তি চমকিত হইয়া বীরবর হামযাকে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আপনি ধর্মমত পরিবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সত্য তাহা আমার হৃদয়পটে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমি ঘোষণা দিতেছি, তিনি আল্লাহর রসূল; তাঁহার সব কথা সত্য। তথা হইতে বাড়ী আসিলে পর শয়তান তাঁহার পিছনে লাগিল, কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এমনকি রাত্রেও তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি এই বলিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে আরাধনা করিলেন, আয় আল্লাহ! যদি ইহা (ইসলাম) সত্য হইয়া তাঁকে তবে আমার অন্তরকে তৎপ্রতি স্থির করিয়া দাও; আর যদি অসত্য হয় তবে ইহা হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা আমার জন্য করিয়া দাও। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, এই আরধনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের সকল দ্বিধা দূর হইয়া ইসলামের বিশ্বাসে অন্তর ভরিয়া গেল। ভোরবেলা নবীজী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং সব ঘটনা ব্যক্ত করিলাম; তিনি আমার দ্বীন-ইসলামের মজবুতীর জন্য দোয়া করিলেন। আমি আনুষ্ঠানিকরূপে ঘোষণা দিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি সত্য,আপনার সব কিছু সত্য এবং আপনি সত্যের দিশারী।

ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পরেই তদপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা– ইসলামের ষষ্ঠ বৎসরের তৃতীয় শুভ লক্ষণ ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ নবুয়তের দ্বিতীয় বৎসর ছিল।

ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি বহু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাওয়ার পরও মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিল এবং বীরবর হামযা (রাঃ) ইসলামের দলে আসিলেন। কোরায়শরা নিজেদের প্রমাদ গনিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শে বসিল এবং নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে প্রাণে বধ করা সাব্যস্ত করিল। অতপর তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল হত্যাকারী সাহসী বীর পুরুষের তালাশে। ওমর তাহার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তরবারি লইয়া নবীজীর খোঁজে বাহির হইল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিল, প্রথমে নিজের ঘর সামলাও; তোমার ভগ্নী ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি সায়ীদ মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে ওমর অগ্নিমূর্তি ধারণ করিল এবং সোজা ভগ্নীর বাড়ী রওয়ানা হইল। ঐ সময় ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়ই তাঁহাদের গৃহে ছিলেন। (পূর্বালোচিত) খাব্বাব (রাঃ) তাঁহাদিগকে পত্রে লিখিত পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেছিলেন; গৃহদ্বার বন্ধ ছিল।

ওমর আসিয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিলে খাব্বাব (রাঃ) লুকাইয়া গেলেন; ভগ্নি আসিয়া দরজা খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার শিরে আঘাত করিয়া রক্তস্রোত বহাইয়া দিলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন, তুই ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিস্? ঘরে আসিয়া ভগ্নীপতিকেও ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, যদি অন্য ধর্মটি সত্য হয়? এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার উপরও ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মাটিতে ফেলিয়া বেদম প্রহার করিলেন। ভগ্নী তাঁহাকে ছাড়াইতে আসিলে পুনরায় ভগ্নীকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার ভগী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মুসলমান হওয়ার করাণে আমাদের মারা হইতেছে! নিশ্চয় আমরা মুসলমান হইয়াছি; যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

মারপিট করিয়া ওমর ক্ষান্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঐ পত্রের প্রতি, যে পত্রে কোরআন শরীফের আয়াত লিখা ছিল। তিনি বলিলেন, তাহা কি? আমার হাতে দাও ত! ভগ্নী বলিলেন, আপনি অপবিত্র; অপবিত্র হাতে তাহা স্পর্শ করিতে পারেন না! ওমর বিনাবাক্য ব্যয়ে অযূগোসল করিয়া আসিলেন এবং ঐ পত্র পাঠ করিলেন; তাহাতে সূরা ত্বা-হার এই আয়াত লিখা ছিল–

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ
اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى - فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ
فَتَرْدٰى -

অর্থ ঃ "একমাত্র আমিই আল্লাহ– মাবুদ, আমি ভিন্ন আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, অতএব আমারই বন্দেগী কর এবং আমাকে স্মরণ করিতে নামায আদায় কর। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে; যেন প্রতিটি মানুষ কৃত কর্মের ফল পায়– অবশ্য তাহার তারিখ আমি গোপন রাখিয়াছি। যাহারা সেই কেয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং প্রবৃত্তির দাস হইয়া চলে তাহারা যেন তাহার প্রতি আস্থা স্থাপনে তোমাকে বিরত রাখিতে না পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই আয়াত কয়টির বিষয়বস্তু ওমরের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিল।

ইতিপূর্বে আরও একবার পবিত্র কোরআন লৌহমানব ওমরকে সত্যের প্রতি ধাক্কা দিয়াছিল। ঘটনা এই– একদা গভীর রাত্রে ওমর কা'বা ঘরের নিকট গেলেন; তখন নবীজী (সঃ) তথায় নামায পড়িতেছিলেন। ওমর বলেন, আমি লুকাইয়া তাঁহার পড়া শুনিবার ইচ্ছা করিলাম। সেমতে আমি কা'বার গেলাফের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইলাম। নবীজী (সঃ) সূরা "আল্-হাক্কাহ্ (পারা–২৯) পাঠ করিতেছিলেন। আমি তাহা শুনিতেছিলাম; আমার মনে তখন নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় আমার মনে হইতেছিল, কোরায়েশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক– ইনি একজন বিশিষ্ট কবি। সেই মুহূর্তে নবীজী (সঃ) উক্ত সূরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন–

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ - وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ - اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ ঃ "তোমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য সমুদয় বস্তুর শপথ- এই কোরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর (অদৃশ্য) বিশিষ্ট দূতের মারফত তাঁহার (দৃশ্য) রসূলের নিকট প্রেরিত। ইহা কোন কবির রচনা নহে। পরিতাপের বিষয় তোমরা তাহার প্রতি কমই বিশ্বাস স্থাপন কর।"

ওমর (রাঃ) বলেন- ইহা শ্রবণে আমি ভাবিলাম, এ ত আমারই মনের কথার উত্তর। অতএব নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) বড় গণৎকার। আমার মনে এই ভাবের উদয় হইতেছিল আর নবী (সঃ) উক্ত সূরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন-

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ "এবং তাহা কোন গণৎকারের উক্তিও নহে; তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণমূলক তাহা গভীর চিন্তার সহিত শুনিয়া থাক।"

ওমর বলেন, এই আয়াতসমূহ আমার অন্তরে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই আয়াতগুলি ওমরের অন্তরকে ধাক্কা দিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল কুফর ও শেরেক ত্যাগে নত করিতে পারিল না। অতপর পুনরায় উপরোল্লিখিত ঘটনায় সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহ দ্বারা যে ধাক্কা ওমরের অন্তরে লাগিল তাহা তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা মাত্র ওমরের অন্তরে পরিবর্তন আসিয়া গেল। উপস্থিত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট জানিতে পারিলেন, নবীজী (সঃ) আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আছেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চরণে নিজকে উৎসর্গ করিয়া ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশে সেই দিকে ছুটিলেন। এই বিরাট পরিবর্তনের সংবাদ কাহারও গোচরে আসে নাই, ধারণায়ও আসিতে পারে না।

আরকামের গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া ওমর দরজায় করাঘাত করিলেন; তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। ভিতরে অবস্থিত ছাহাবীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; হামযা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভাল উদ্দেশে আসিয়া থাকিলে ভাল হইবে, নতুবা তাহার তরবারি দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। দরজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে পা রাখিতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশে আসিয়াছ ওমর? অতি মোলায়েম সুরে উত্তর করিলেন, ঈমান লাভের উদ্দেশে।

এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে নবীজীর মুখে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি আসিয়া গেল। উপস্থিত ছাহাবীগণও সজোরে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; এলাকাস্থ পর্বতমালা গুঞ্জরিয়া উঠিল। এখন তিনি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু; তখন তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশের উর্ধ্বে। (সীরাতুন নবী)

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভগ্নীপতি সায়ীদ (রাঃ) আশারা মোবাশ্‌শারাহ তথা রসূল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বেহেশতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপ্রাপ্ত দশ জন ছাহাবীর একজন। তিনি ইসলাম পূর্ব একত্ববাদী যায়েদের পুত্র (যায়েদের একত্ববাদ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে), তিনি ওমরের চাচাত ভাইও ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন-

১৬৮৪। হাদীছ ঃ সায়ীদ (রাঃ) একদা কুফার মসজিদে বলিতেছিলেন, আমার এই অবস্থাও আমি দেখিয়াছি যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তখনও ওমর মুসলমান হন নাই। (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণে ইসলাম ও মুসলমানদের নবশক্তির সূচনা হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (সঃ) দোয়া করিয়াছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! ইসলামকে শক্তিশালী কর আবু জাহল বা ওমর দ্বারা।" পরবর্তী দিনের প্রথম দিকেই ওমর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে মুসলমানগণ হরম শরীফের মসজিদে প্রকাশ্যে নামায পড়িতে পারিলেন। (মেশকাত শরীফ– ৫৫৭)

নবী (সঃ) প্রথমে দুই জনের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে কোন একজনের ইসলাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; পরে বিশেষভাবে ওমরের নাম নির্দিষ্ট করিয়া পুনঃ দোয়া করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! খাত্তাব পুত্র ওমর দ্বারাই ইসলামের সাহায্য কর।" (সীরাতে মোস্তফা)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দোয়া বাস্তবায়িত হইল; ওমর (রাঃ) মুসলমান হইলেন এবং তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের নবযুগের সূচনা হইল!

১৬৮৫। হাদীছ ঃ (ষষ্ঠ নম্বরের মুসলমান) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর হইতে আমরা শক্তিলাভ করিয়াছিলাম। (পৃষ্ঠা– ৫৪৫)

ব্যাখ্যা ঃ কাফেরদের বাধাদানে মুসলমানগণ হরম শরীফের মসজিদে নামায পড়িতে পারিতেন না; পাহাড়-পর্বতের আড়ালে লুকাইয়া নামায পড়া হইত। ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কাফেরগণ গর্হিত মূর্তিপূজা প্রকাশ্যে করিবে আর আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এবাদত পলাইয়া পলাইয়া করিব? এরূপ হইতে পারে না। আল্লাহ তাআলার এবাদত প্রকাশ্যে আদায় হওয়া চাই। তখন হইতে হরম শরীফের মসজিদে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে নামায আদায় আরম্ভ করিয়া ছিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার– ৯২)

প্রথমে ওমর (রাঃ) এবং হামযা (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়া কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা দুইজন নবীজীর দেহরক্ষীরূপে অগ্রভাগে চলিলেন। কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং দুপুর বেলার নামায নির্বিঘ্নে আদায় করিয়া আসিলেন। (বেদায়া ৩/৩১)

তারপর ওমর (রাঃ) সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য কা'বা শরীফর সম্মুখে হরম শরীফে নামায পড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মক্কাস্থিত সমস্ত মুসলমান সমভিব্যাহারে তথায় নামায আদায় করিয়া যাইতে লাগিলেন। কাফেররা ইহাতে বাধা দিবে সেই সাহস আর তাহাদের হইল না। (বেদায়া ৩–৭৯)

এতদ্ভিন্ন এতদিন ত আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রুদ্ধগৃহে লুকাইয়া নবী (সঃ) এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইতেন; ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর যেকোন স্থানে ইচ্ছা করিলে নবী (সঃ) এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইতে পারিতেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১২৬)

ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে সে যথাসাধ্য ইসলাম লুকাইয়া রাখায় সচেষ্ট হইত, কিন্তু ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইলেন। এমনকি ইসলাম পূর্বে তিনি যথায় তথায় উঠা-বসা করিতেন, যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন ঐরূপ সকল স্থানে এবং সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করিলেন। (বেদায়া ৩–৩১)

ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিলাম, মক্কায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বাধিক কঠিন শত্রু কে আছে– তাহাকেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রথমে পৌছাইব। তখন আবু জাহলের নাম আমার মনে পড়িল। আমি ভোর বেলা তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলাম।

সে আমাকে অতিশয় সমাদর দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সময় তোমার আগমন কি উদ্দেশে? আমি বলিলাম, তোমাকে এই সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য যে, আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা শুনিতেই সে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

(ইবনে হেশাম)

মোশরেকদের তরফ হইতে প্রথম প্রথম আক্রোশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্মুখীন তিনি হইতেছিলেন বটে, কিন্তু আল্লাহর রহমতে সাহস এবং সংগ্রাম ও স্থিতিশীলতার দ্বারা সর্বত্র প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন।

১৬৮৬। হাদীছ ঃ ওমর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়াছেন এই সংবাদে মক্কায় বিশেষ চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মানুষ আসিয়া ওমরের বাড়ী ঘেরাও করিল; আমি আমাদের গৃহছাদে উঠিয়া সব ঘটনা দেখিতেছিলাম। ওমর (রাঃ) উত্তেজনার মুখে সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে বসিয়া ছিলেন; এমন সময় রেশমের জুব্বা পরিহিত একজন লোক ঘরের ভিতরে আসিয়া ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমার জাতির লোকেরা বলিতেছে, আমি মুসলমান হওয়ার অপরাধে আমাকে মারিয়া ফেলিবে। ঐ লোকটি বলিলেন, একটি মানুষও আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। ঐ লোকটি ছিলেন আমাদের মিত্র গোত্র বনু সাহমের সর্দার। তৎকালীন প্রথানুযায়ী এই শ্রেণীর সর্দারের এইরূপ কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইত; সুতরাং উপস্থিত উত্তেজনার মুখে তাঁহার এই কথায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

অতপর ঐ সর্দার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমগ্র প্রান্তর জুড়িয়া দলে দলে মানুষ ভিড় করিয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা বলিল, ওমরের বাড়ির দিকে যাইতেছি; সে নাকি ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্দার ব্যক্তি বলিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে। আমি তাঁহার আশ্রয়দাতা সহায়ক। তখন আমি গৃহ ছাদ হইতে দেখিলাম, সমস্ত লোক তথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)

নবুয়তের সপ্তম বৎসর- হযরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের বয়কট আন্দোলন (পৃষ্ঠা-৫৪৮)

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষাংশে পর পর তিনটি ঘটনার দ্বারা মুসলমানদের শুভ লক্ষণের সূচনা হইল, মুসলমানদের সুদিনের সূর্য যেন উদয়ের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল- (১) আবিসিনিয়া হইতে মোশরেকদের প্রতিনিধি দলের সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অপদস্থরূপে ফিরিয়া আসা এবং তথায় মুসলমানদের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তি লাভ। (২) শেরে খোদা হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ। (৩) সারা মক্কার সুপ্রসিদ্ধ লৌহ মানব ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ; যাঁহার প্রভাবে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, হরম শরীফে নামায পড়িতে সাহসী হইয়াছেন। এইসব কারণে সাধারণভাবে মুসলমানদের অন্তরে শক্তি-সাহসের সঞ্চার হইল এবং বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হইল।

এইসব দেখিয়া মক্কার মোশরেকদের গাত্রদাহ চরমে পৌঁছিয়া গেল, তাহাদের চোখে যেন বর্শাঘাত লাগিল। এই অবস্থা বরদাশত করিতে না পারিয়া এই বার তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রাণে বধ করিয়া সর্বদার জন্য নিশ্চিন্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিল।

আবু তালেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রীয় সকলকে একত্র করিয়া এই পরিস্থিতিতে হযরত (সঃ)-কে হেফাযত করার আহ্বান জানাইলেন। তাহারা সকলে আবু তালেবের

আহ্বানে সাড়া দিল; যদিও তাহারা কাফের ছিল; কিন্তু "স্বজনকে রক্ষা করার" আরবের রীতি অনুযায়ী এবং আবু তালেবের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন বিদ্যমান থাকায় তাহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সম্মতি প্রদান করিল। এমনকি তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে "শেবে আবু তালেব" নামক স্থানে (মক্কা নগরীর পর্বত বেষ্টিত একটি ভূখণ্ড, যে স্থানের মহল্লায় আবু তালেবের বসবাস এবং আধিপত্য ছিল, সেই মহল্লায়) নিয়া আসিল এবং বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেব অমুসলমান মুসলমান সকলেই তথায় একত্রিতভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিল। যেন সর্বদা হযরত (সঃ)-কে তাহারা চোখের উপর রাখিয়া হেফাযত করিতে পারে এবং সকলে একতাবদ্ধরূপে সম্ভাব্য সব রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতে পারে।

মক্কার মোশরেকগণ অবস্থা দৃষ্টে যখন বুঝিতে পারিল যে, হযরত (সঃ)-কে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের কারণে কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না, তখন হযরত (সঃ)-সহ বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বয়কট চালাইয়া যাওয়ার এবং একঘরে করিয়া রাখার উপর মক্কা নগরী ও তাহার আশে-পাশের কোরায়শ বংশীয় সমুদয় গোত্র এবং অন্যান্য যেসব গোত্র তাহাদের মিত্র ছিল সকলে শপথ বা হলফ করিল। তৎকালে মক্কা নগরীতে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব ছাড়া কোরায়শ বংশীয় অন্ততঃ নয়টি গোত্র ছিল- (১) বনী আবদে শাম্‌স বা বনী উমাইয়া (২) বনী নওফেল, (৩) বনী আবদিদ দার, (৪) বনী আসাদ, (৫) বনী তাইম, (৬) বনী আ'দী, (৭) বনী জুমাহ, (৯) বনী সাহম।

(আরজুল কোরআন, ২-৯৮)

এতদ্ভিন্ন কোরায়শ বংশ ছাড়া তাহাদের দুই পুরুষ পূর্বের "কেনানা" হইতেও কতিপয় গোত্র তথায় ছিল। কোরায়েশ ও কেনানা বংশের সকল গোত্রের লোকগণ "খায়ফে বনী কেনানা বা "মোহাস্‌সাব" নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে শপথ করিল যে, বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সঙ্গে লেন-দেন আদান-প্রদান, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কোন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান করা চলিবে না যাবত না তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। এই সম্পর্কে ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

এই শপথ লিপিবদ্ধ করতঃ তাহারা কা'বা ঘরে লটকাইয়া দিল। মনে হয় যেন কা'বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-দেবতাকে তাহারা এই শপথের সাক্ষী বানাইতেছিল এবং শপথনামা তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। অবস্থাদৃষ্টে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ তাহাদের সর্দার আবু তালেবের নিকট একত্রিত হইল সমবেতভাবে এই বিপদ মোকাবিলা এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুতরূপে সকলে শেবে আবু তালেবের গিরি প্রান্তরে একত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বজ্র কঠিন শপথ ইহাই ছিল যে, হযরত (সঃ)-কে কোন মূল্যেই শত্রুর হস্তে অর্পণ করিবে না। বরং হযরত (সঃ)-কে চোখের উপর রাখার উদ্দেশে তাঁহাকেও ঐ গিরি-প্রান্তরে নিয়া আসিল। নবুয়তের সপ্তম বৎসর মহররম মাসে এই ঘটনা ঘটিল।*

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পান নাই। যাহার নিকট যাহা কিছু ছিল তাহাই লইয়া তাঁহারা ঐ গিরি-প্রান্তরে প্রস্থান করিলেন। এই অবস্থায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব নিদারুণ খাদ্যাভাবসহ অনেক রকম সঙ্কটেরই সম্মুখীন হইলেন। গাছের পাতা ভক্ষণ এবং শুষ্ক চামড়া সিদ্ধ পানি পান করত এই নিদারুণ কষ্টের মোকাবিলা তাঁহারা করিতে লাগিলেন, তবুও কিন্তু তাঁহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শত্রুদের হস্তে অর্পণ করতঃ তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা করিতে রাজি হইলেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে তাঁহাদের অতিবাহিত হইতে লাগিল। মক্কাবাসীরা তাঁহাদের উপর হাট ঘাট এমনভাবে বন্ধ করিয়াছে যে, বাহির হইতে কোন কিছু সংগ্রহ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব

* তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১-২০৯ এবং যোরকানী ১-২৭৮।

ছিল। আবদ্ধ পরিবারবর্গের কচি-কাচা শিশু সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চিৎকার করিত। তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনিও মক্কাবাসীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিত না। এই সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামসহ সকল বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব দীর্ঘ তিন বৎসরকাল সেই গিরি প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন যাপন করিলেন।*

মুসলমানদের শুভ যুগের সূর্য উদিত হওয়ার পর মক্কা জয় করিয়া মক্কার আশ পাশ জয় করাকালে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতীতের ইতিহাস স্মরণ করতঃ অন্তরের অন্তস্থল হইতে সর্বশক্তিমান রহমানুর রাহীম প্রভু পরওয়ারদেগারের

শোকর আদায় করার উদ্দেশে দশ হাজার সাহাবীসহ ঐ খায়ফে বনী কেনানা বা মোহাস্‌সাব নামক স্থানে একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৬৮৭। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৪৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কা জয় করার পর মক্কা হইতে) যখন "হোনায়ন" এলাকা জয় করার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, আগামীকল্য আমাদের অবস্থান খায়ফে বনী কেনানা নামক স্থানে হইবে- যেস্থানে মোশরেকরা কুফরী তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বিদ্রোহীতার উপর সকলে শপথ করিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির চরম বিকাশকাল তথা বিদায় হজ্জকালে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লক্ষাধিক ছাহাবীসহ মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও ঐ খায়ফে বনী কেনানা বা মোহাস্‌সাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থান শুধু কোন সুযোগ-সুবিধাজনিতই ছিল না, বরং পূর্বাহ্নে মিনায় থাকাবস্থায়ই আলোচ্য হাদীছের বিবৃতির ন্যায় উক্ত অবস্থানের ঘোষণা জারি করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

নবুয়তের এই সপ্তম বৎসরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল "শাক্কুল কামার" বা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "মো'জেযার বয়ানে" দেওয়া হইবে।

নবুয়তের দশম বৎসর- বয়কট ভঙ্গের এবং হযরতের "শোকের বৎসর"

নবুয়তের সপ্তম, অষ্টম, নবম বৎসর হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সঙ্গে সঙ্কটপূর্ণ জীবন যাপন করিলেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামসহ সমস্ত বনী মোত্তালেব এবং বনী হাশেমের প্রতি মক্কাবাসীদের এই নির্মম ও অন্যায় ব্যবহারের পরিণতি চরমে পৌঁছিল। ঐ পাষণ্ডদের মধ্যে দুই-চারি জন সহৃদয় ব্যক্তিও ছিলেন; বিভীষিকার চরম অবস্থাদৃষ্টে তাঁহাদের মন বিগলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই বয়কট ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। সর্বপ্রথমে "হেশাম" নামক এক ব্যক্তি এই কার্যে অগ্রসর হইলেন; বনী হাশেমের সহিত তাঁহার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। বনী হাশেমের মূল ব্যক্তি হাশেমের পরিত্যক্তা স্ত্রী উক্ত হেশামের দাদী ছিল। হেশামের প্রচেষ্টা হইল, কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তিকে

* কাহারও মতে আবদ্ধ জীবন যাপনের কাল দুই বৎসর এবং তাহাদের মতে অসহযোগিতা আরম্ভ নবুয়তের অষ্টম বৎসর হইতে ছিল। (যোরকানী ১-২৭৮)

এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করা। সেমতে তিনি যোহায়র নামক এক ব্যক্তির নিকট গেলেন; তিনি আবদুল মোত্তালেবের দৌহিত্র– আবু তালেবের ভাগিনেয়। তিনি তাঁহার মাতুলকুল বনী মোত্তালেবগণের দুর্দশায় পূর্ব হইতেই ব্যথিত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু নিজেকে একা ভাবিয়া কিছু করার সাহস করিতে ছিলেন না। হেশাম যোহায়রের নিকট যাইয়া বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণের চরম দুর্দমা দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, খাইয়া পরিয়া বিবি বাচ্চার সহিত আনন্দ ভোগে আছেন আর আপনারই মাতুলগোষ্ঠী দুঃখে-কষ্টে মৃত্যুর মুহূর্ত গুণিতেছে? যোহায়ের ব্যথিত স্বরে উত্তর করিলেন– কথা ত সবই ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি? তখন হেশাম বলিলেন, এই লক্ষ্যে আপনি একা নন; আমি আপনার সঙ্গে আছি। অতপর তাঁহারা উভয়ে মোতয়েম ইবনে আদী নামক সর্দারের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, কোরায়শদের দুইটি বংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে আর আপনি তাহা দেখিয়া থাকিবেন? তিনি বলিলেন, আমি একা কি করিব? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর আবুল বোখতারী এবং যম্‌আ ইবনে আসওয়াদকেও ঐরূপে সম্মত করা হইল। এখন বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে পাঁচ জন একমত হইলেন। যোরকানী, ১–২১০)

তাহারা পাঁচ জন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দারে নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে যোহায়র এই আলোচনা প্রথমে উত্থাপন করিবেন এবং সুযোগ দেখিয়া অপর চারি জন পর পর সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। সেমতে পরদিন প্রাতে সেই মিলনায়তনের মজলিসে হেশাম এই ব্যাপারে বক্তৃতাদানে বলিলেন, "হে মক্কাবাসী! আমরা উদর পুরিয়া খাইব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব আর বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব ধ্বংস হইয়া যাইবে– ইহা কি সমীচীন? এই নৃশংসতার প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামা ছিন্নভিন্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।" তথায় আবু জাহল উপস্থিত ছিল, সেই পাষণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, তুমি মিথ্যা বুলির অবতারণা করিতেছ! আমাদের শপথনামা কখনও বিনষ্ট করা যাইবে না। আবু জাহলের দম্ভোক্তি শেষ হইতে না হাইতে যমআ বলিয়া উঠিলেন, আসল মিথ্যাবাদী তুমি। এই অন্যায় প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর আমরা পূর্বেও সম্মত ছিলাম না। যমআর সুরে সুর মিলাইয়া আবুল বোখতারী বলিলেন, যম'আ ঠিক বলিয়াছেন; এই প্রতিজ্ঞার বিষয়বস্তুতে আমরা পূর্বেও সম্মত ছিলাম না, এখনও তাহার প্রতি আমাদের সমর্থন মোটেই নাই। মোতয়েম এবং হেশামও একই মন্তব্য করিলেন। এই বিতর্ক চলাকালে তথায় আবু তালেবও উপস্থিত হইলেন; তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি বিষয় উত্থাপন করিলেন। মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটি অদৃশ্য ও সাধারণ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের শপথনামার লেখাগুলি পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে; তোমাদের অন্যায় অত্যাচার অবিচারের কথাগুলি আল্লাহর নামের সহিত বিজড়িত থাকে নাই। (শপথনামার দুইটি প্রতিলিপি ছিল; একটি সুরক্ষিত এবং অপরটি কা'বায় লটকানো ছিল। এক কপির মধ্যে পোকা অন্যায়-অত্যাচারের কথাগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল, শুধু আল্লাহর নামের শব্দগুলি অবশিষ্ট ছিল। অপর কপির মধ্যে ইহার বিপরীত শুধু অন্যায়-অত্যাচারের কথাগুলি অবশিষ্ট ছিল, আল্লাহর নামের শব্দগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সুস্পষ্ট। ইঙ্গিত এই বুঝা যায় যে, এইরূপ অন্যায়-অত্যাচারের কথার সহিত আল্লাহর নাম বিজড়িত থাকিবে না।) (যোরকানী, ১–২৯০)

কোন কিছু না দেখিয়া মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই সংবাদ দিয়াছেন। যদি এই সংবাদ সঠিক হয় তবে ইহা তাঁহার সত্যবাদিতার অলৌকিক প্রমাণ হইবে এবং প্রমাণ হইবে যে, এই প্রতিজ্ঞা শপথের বিষয়বস্তুর প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট; তোমাদের অন্যায় এবং আত্মীয়তা ছেদনের প্রতিজ্ঞা হইতে আল্লাহ তাআলা তাঁহার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দানে তোমাদের এই অন্যায়ের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেল। আমাদের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে আমরা কস্মিনকালেও মুহাম্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব না। আর যদি মুহাম্মদের এই সংবাদ বেঠিক হয়, তবে আমি নিশ্চয় তাঁহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব।

উপস্থিত সকলের উপর এই কথার একটা বিশেষ প্রভাব পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোতয়েম ইবনে আ'দী কা'বায় লটকানো প্রতিজ্ঞাপত্রটা নামাইয়া নিয়া আসিলেন। সত্য সত্যই দেখা গেল, সমস্ত লেখাই পোকায় খাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, শুধু কেবল আল্লাহর নামই অবশিষ্ট রহিয়াছে (অপর কপির অবস্থা তাহা বিপরীত ছিল)। এদিকে আর একটি অসাধারণ ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছিল, এই প্রতিজ্ঞাপত্রের লেখক মনসুর ইবনে একরেমার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল (আসাহ্হুস সিয়ার ৯৫)। অবশেষে প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং অন্যায় প্রতিজ্ঞার অবসান হইয়া গেল। এমনকি এই কাজে অগ্রগামী উল্লিখিত পাঁচ ব্যক্তি সকলে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গিরি-প্রান্তরে গেলেন এবং তথা হইতে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণকে নবীজী (সঃ)-সহ বাহির করিয়া নগরে নিয়া আসিলেন।

দীর্ঘ দুই বা তিন বৎসর নবীজীর উপর কি বিপদই না গেল। তদুপরি মানসিক যাতনাও তাঁহার জন্য কম কষ্টের কারণ ছিল না যে, একমাত্র তাঁহার দরুন বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সমস্ত লোক এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তবে আদর্শবান মহামানবগণ বিপদকেও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও বিশেষ দানে পরিণত করিয়া নেন, তাঁহারা বিপদকেও সুযোগরূপে গ্রহণ করেন, নিজ কর্তব্য কর্মের এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের বিশেষ অবলম্বন বানাইয়া নেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাহাই করিয়াছিলেন এই দুই তিন বৎসরের বিপদকালে। এই সময়ে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব এবং তাঁহাদের বন্ধুদের সঙ্গে নবীজী মোস্তফার অনাবিল মেলা-মেশার সুযোগ হইল। তাঁহারা শান্ত ধীরস্থির এবং দীর্ঘ দৃষ্টিতে নবীজী মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুরতা ও শিক্ষার সৌন্দর্য তাঁহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল। এতদ্ভিন্ন শত্রুদের মোকাবিলায়, আত্মক্রোধের উত্তেজনায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ নবীজী মোস্তফার রক্ষণাবেক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও একতাবদ্ধ হইলেন। এই সুযোগে নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার কর্তব্য কর্ম ইসলামের প্রচার এবং দাওয়াত দানে দুর্বার গতিতে কর্মচঞ্চল থাকিলেন, এই সোনালী সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। ইহার ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অনেক অভিজাত শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের সময় সুযোগে মুসলমান হইতে লাগিলেন। বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে যাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি হেশাম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যোহায়র উভয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন (যোরকানী, ১-২৯০) এতদ্ভিন্ন কোরায়শ বংশীয় বিশিষ্ট পালোয়ান রোকানাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ

কোরায়শদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন রোকানা। তিনি বনী হাশেম তথা নবীজী মোস্তফার বংশীয় ছিলেন। একদা গিরিপথে রোকানার সহিত নবীজী মোস্তফার সাক্ষাত হইল। নবী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, খোদার ভয় তোমার অন্তরে আসে নাকি? আমার আহ্বানে সাড়া দিবে না-কি? রোকানা বলিলেন, আপনার ধর্ম সত্য প্রমাণিত হইলে আমি আপনার অনুসরণ করিব। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে পরাজিত করিয়া দিতে পারি তবে (অস্বাভাবিক ক্ষমতাদৃষ্টে) আমাকে সত্যবাদী বিশ্বাস করিবে কি? রোকানা বলিলেন, নিশ্চয়। নবীজী বলিলেন তবে দাঁড়াও। তিনি দাঁড়াইয়া নবীজীকে কুস্তির কায়দায় কাবু করিতে চাহিলেন, নবীজী তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। রোকানা দ্বিতীয় বার লড়িবার অনুরোধ করিলে নবী (সঃ) পুনরায় তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। তৃতীয় বারও নবীজী (সঃ) তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। রোকানা বলিলেন, আপনি আমাকে কুস্তিতে পরাজিত করিলেন, ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় করার এবং আমার অনুসারী হওয়ার ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাইতে পারি। রোকানা বলিলেন, তাহা কি? নবীজী (সঃ) দূরবর্তী একটি বৃক্ষের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে ডাকিলে সে আমার নিকটে আসিয়া যাইবে।

সত্য সত্য তাহাই হইল, অতপর নবীজী (সঃ) ঐ বৃক্ষটিকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে বৃক্ষটি পূর্ব স্থানে চলিয়া গেল। রোকানা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার পূর্বে কোন ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠ মাটিতে ঠেকাইতে পারে নাই। ইতিপূর্বে আমার নিকট আপনি অপেক্ষা বিরাগভাজন আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আমি আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি لا اله الا الله وانك رسول الله "আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।* (বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া ৩-১০৩)

সত্যের গতি অপ্রতিহত

সত্য নিজেই আপন স্থান করিয়া লয়, আলো তাহার প্রবেশ পথ নিজেই বাহির করে। এই সব চিরন্তন প্রবাদ নবীজীর সাফল্যে ও ইসলামের আত্মপ্রকাশে প্রথম হইতে ধীরে ধীরে হইলেও দিনের পর দিন বাস্তবায়িত হইতে লাগিল।

আবু জাহল, আবু লাহাব, উমাইয়া গোষ্ঠী নবীজী এবং তাঁহার ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সবাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে বয়কট অভিযানেও পর্যদুস্ত হইল; এখন তাহারা হতভম্ব দিশাহারা। তাহারা কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না। একটা বাধা আসিয়া তাহাদের অনেক রকম আয়োজন পন্ড করিয়া দিয়াছে– ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিমর্ষ হইল নিশ্চয়। কিন্তু অভিমান, গোঁড়ামি ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা সত্য বরণ করিয়া লইতে পারিল না। বরং চরম ব্যর্থতার মুখেও তাহারা দুর্বলচেতা সংগ্রামের আশ্রয় নিল। তাহারা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে পাগল, জাদুকর, গণকঠাকুর, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদেরকে নবীজী (সঃ) হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহিরাগত লোককে কোরায়শরা ঘিরিয়া ধরিত, তাহার নিকট নবীজীর কুৎসা, নিন্দা ও গ্লানি করিত কিন্তু তাহাদের এই অপপ্রচার ও অপচেষ্টাই আগন্তুকদের মনে নবীজী (সঃ)-এর প্রতি আকর্ষণ জন্মাইত বিশেষ ক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন হইত।

তদ্রূপ কোরায়শ শত্রুরা নবীজী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক প্রচারণা চালাইল যে, তাহাদের প্রচারণা দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের সেই প্রচারই নবীজীর প্রসিদ্ধির জন্য মহা প্রচারের কাজ করিল। দূর দেশের লোক নিজ নিজ দেশে থাকিয়াই নবীজী (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইহা শুধু ভাবাবেগ বা কল্পনা নহে বাস্তব সত্য– ইতিহাসে যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোফায়েল দৌসীর ইসলাম গ্রহণ

আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র দৌসের প্রধান সর্দার ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর। অতিশয় প্রভাবশালী এবং বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি একবার মক্কায় আসিলেন; তখন নবীজী (সঃ) গিরিসঙ্কট হইতে মুক্ত। তোফায়েল মক্কায় আসিলে মক্কার সর্দারবৃন্দ সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করিল– তিনি যেন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট না যান, তাঁহার সহিত মোটেই সাক্ষাত না করেন, তাঁহার কোন কথাও যেন না শুনেন।

তোফায়েল নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা আমাকে এতই কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছে যে, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি– আমি তাঁহার কোন কথা শুনিব না। এমনকি হরম শরীফের মসজিদে যেহেতু নবীজী (সঃ) প্রায়শ ইসলামের আহ্বানে বক্তৃতা করিতেন, তাই আমি মসজিদে যাইতে কর্ণকুহরে তুলা ঠাসিয়া যাইতাম; যেন অনিচ্ছায়ও তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশ না করে।

* কোন কোন ঐতিহাসিক রোকার মুসলমান হওয়া অস্বীকার করিয়াছে।

একদা আমি সকাল বেলা মসজিদে গেলাম; দেখিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফের সম্মুখে নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলাম; আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার কিছু কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি একটু লক্ষ্য করিলাম, এই সব কথা কতই না সুন্দর! কতইনা মধুর!! অতপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং পণ্ডিত– কবি। ভাল-মন্দ পার্থক্য করা আমার জন্য কঠিন নহে; তবে কেন আমি এই লোকটির (নবীজীর) কথা শুনিব না? তাঁহার কথার ভালটি গ্রহণ এবং মন্দটি বর্জন করিব। সেমতে আমি তাঁহার কথাবার্তা শুনিলাম এবং তাঁহার সান্নিধ্যেই বসিয়া থাকিলাম। এমনকি তিনি মসজিদ হইতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া সাক্ষাত করিলাম এবং বলিলাম, আপনার জাতি আপনার সম্পর্কে আমার নিকট এই এই বলিয়াছে। এমনকি আপনার কথা না শুনিবার জন্য আমি আমার কর্ণে তুলা ঠাসিয়া রাখিতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আপনার কথা না শুনাইয়া ছাড়েন নাই এবং আপনার কথা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা অতি সুন্দর, অতি মধুর। আপনি আপনার ধর্ম আমার নিকট ভালরূপে ব্যক্ত করুন ত। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সম্মুখে ইসলাম ব্যক্ত করিলেন এবং পবিত্র কোরআনও তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। খোদার কসম– এত সুন্দর বাণী আর জীবনেও আমি শুনি নাই, এত সুন্দর উত্তম ধর্ম জীবনেও আমি পাই নাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলাম। সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়া দিলাম।

অতপর আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার গোত্রের প্রধান, সকলে আমাকে মান্য করিয়া চলে। আমি এখন তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব এবং তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিব। আমার বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন নিদর্শন আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করুন; সেই নিদর্শন যেন তাহাদের নিকট আমার প্রচারকার্যের জন্য সাহায্যকারী হয়। সেমতে নবী (সঃ) দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! তাকে কোন নিদর্শন দান করুন"। অতপর আমি আমার দেশের দিকে যাত্রা করিলাম; রাস্তার যেই মোড় অতিক্রম করিলে আমি দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর হইব– সেই মোড়ে পৌঁছিলে আমার ললাটে চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে একটি আলোকরশ্মি প্রদীপের ন্যায় বিকশিত হইল। আমি দোয়া করিলাম, ইয়া আল্লাহ! আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে আমার এই নিদর্শন দান কর। আমার ভয় হয়– লোকেরা ভাবিবে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃত হইয়াছে। তৎক্ষণাত ঐ আলোকরশ্মি আমার চাবুকের মাথায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকেরা ঐ আলো সুস্পষ্টরূপে প্রদীপের ন্যায় দেখিল।

আমি বাড়ী পৌঁছিলে আমার বৃদ্ধ পিতা আমার নিকট আসিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজ হইতে আপনি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন, আমি আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন; আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। পিতা বলিলেন কেন হে বৎস! আমি বলিলাম, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি; মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। পিতা বলিলেন, হে বৎস! তোমার ধর্মই আমারও ধর্ম। আমি বলিলাম, তবে গোসল করিয়া পাক-পবিত্র পোশাক লইয়া আসুন, তিনি তাহাই করিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম; তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিলে তাহার সহিতও ঐরূপ কথোপকথন হইল এবং সেও ইসলাম গ্রহণ করিল।

আমি আমার দৌস গোত্রেও ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা সাড়া দিল না। আমি পুন মক্কায় আসিয়া নবীজীর (সঃ) নিকট দৌস গোত্র সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম এবং তাহাদের প্রতি বদ দোয়ার জন্য বলিলাম। নবীজী (সঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলে– "হে আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর।" নবীজী (সঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রে ফিরিয়া যাও; তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের প্রতি উদার থাকিও। আমি তাহাই করিতে থাকিলাম, এমনকি নবীজী (সঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া গেলেন। হিজরতেরও ছয় বৎসর পর আমি আমার সঙ্গী মুসলমানগণ লইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলাম; আমরা সত্তর বা আশিটি পরিবার ছিলাম।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত আমলে মিথ্যা নবী মোসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার জেহাদে তোফায়েল (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। (বেদায়া ৩-৯৮)

গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ

মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত "আয্‌দ" গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন জেমাদ। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গুণী ছিলেন; খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদরূপে তাঁহার বিরাট খ্যাতি ছিল। একবার জেমাদ মক্কায় আসিলেন এবং মক্কার বেকুফদেরকে বলিতে শুনিলেন যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পাগল বা তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে । সেমতে ঐ গুণীন সাহেব হযরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমি ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র জানি; আল্লাহ অনেক মানুষকে আমার হাতে আরোগ্য দান করেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) সাধারণত কোন ভাষণ দান ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও সাহায্য কামনায় যাহা পাঠ করিতেন তাহা পাঠ করিলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, আমরা তাঁহার প্রশংসা করি এবং তাঁহারই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ যাহাকে সৎ পথ দান করিবেন; পারিবে না কেহ তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে এবং আল্লাহ যাহাকে থাকিতে দিবেন ভ্রষ্টতায়, পারিবে না কেহ তাহাকে সৎ পথে আনিতে। আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ, উপাস্য বা পূজনীয় নাই- তিনি এক, তাঁহার কোন সঙ্গী-সাথী অংশীদার নাই।"

জেমাদ এই ভূমিকা শুনিতেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তিন বার নবীজী (সঃ)-এর এই বাণী শ্রবণ করিলেন। অতপর বলিলেন, আমি মন্ত্রতন্ত্রবাদী অনেক গুণীনের কথা শুনিয়াছি, অনেক জাদুকরের জাদুমন্ত্র শুনিয়াছি, বড় বড় কবিদের রচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আপনার বাণীর ন্যায় এমনটি আর কখনও শুনি নাই। এই বাণী ত সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর, সুপ্রশস্ত, যাহার গভীরতায় অসংখ্য মণিমুক্তা লুক্কায়িত। আপনার হস্ত প্রদান করুন তাহা ধারণ করিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করি। সেমতে তিনি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচারের অঙ্গীকার করিলেন। (বেদায়া ৩-৩৬)

আবু যর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ

"গেফার" গোত্র মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে, আবু যর গেফারী তথায় বসবাস করেন। কোরায়শদের বিরূপ প্রচারণার ফলে নবীজী মোস্তফার (সঃ) চর্চা আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুদূর গেফার গোত্রেও এই চর্চা প্রসারিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আবু যর তাঁহার সহোদর ওনায়সকে নবীজীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়স মক্কায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান করত নবীজীর সন্ধানলাভে প্রত্যাগমন করিল এবং ভ্রাতা আবু যরকে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। এই বর্ণনায় আবু যরের তৃপ্তি হইল না; তাঁহার পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল; তিনি অবিলম্বে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু সাধনায় তিনি নবীজী (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আবু যর নবীজী (সঃ)-এর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন। তাঁহার ইসলাম

গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৪৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন–

১৬৮৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৪৯৯ ও ৫৪৪) আবু জমরাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আবু যরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তোমাদেরকে শুনাইব কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আবু যর (রাঃ) নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি গেফার গোত্রের লোক। আমাদের নিকট সংবাদ পৌছিল, মক্কায় একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে– তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন,। আমি আমার সহোদর (ওনায়স)-কে বলিলাম, তুমি মক্কায় ঐ লোকটির নিকটে যাও, যে দাবী করে– তাঁহার নিকট উর্ধ্বজগতের সংবাদ সরবরাহ হয়। তাঁহার কথাবার্তাও সরাসরি তাঁহার মুখে শুনিবে এবং সব তথ্য লইয়া আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

সেমতে ভ্রাতা যাত্রা করিল এবং মক্কায় আসিয়া নবীজীর সাক্ষাতে আসিল, তাঁহার কথাবার্তা শুনিল অতপর মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি সংবাদ? সে বলিল, আমি ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; তিনি সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন, অসৎ কর্ম হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আর তাঁহার বাণীও শুনিয়াছি, তাহা কবির রচনা মোটেই নহে (ওনায়স উত্তম কবি ছিলেন)। আমি ভ্রাতাকে বলিলাম, আমার যে পিপাসা রহিয়াছে তোমার বর্ণনায় তাহা মিটিল না। সেমতে অনতিবিলম্বে আমি পাথেয় এবং ছোট এক মশক পানি সঙ্গে লইয়া মক্কা পানে যাত্রা করিলাম। (ভ্রাতা আমাকে বলিয়া দিল, মক্কায় বিশেষ সতর্কতা অলম্বন করিবেন। তথাকার লোক ঐ মহানের বড় শত্রু এবং সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ। বেদায়া ৩–৩৫)

মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হরম শরীফের মসজিদে অবস্থান করিলাম; যমযমের পানি পান করিতাম এবং নিজে নিজে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খোঁজ করিতাম, কিন্তু তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। তাঁহার খোঁজ সম্পর্কে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিব তাহাও আমি সমীচীন মনে করিলাম না। এই অবস্থায় আমি সারা দিন মসজিদে পড়িয়া রহিলাম; এমনকি রাত্র আসিয়া গেল। এই অবস্থায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন; তিনি বলিলেন. বোধ হইতেছে লোকটি বিদেশী। আমি উত্তর করিলাম, হ্যাঁ– আমি বিদেশী। আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনি আমার অতিথি; আমার বাড়ী চলুন। সেমতে আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম; আমিও তাঁহাকে আমার মূল উদ্দেশ্যের কিছু বলি না, তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। আমি তাঁহার গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে আবার মসজিদে চলিয়া আসিলাম। আজও নবীজীর কোন খোঁজ লাভ করিতে পারিলাম না; কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিলাম না এবং এমন কোন মানুষ পাইলাম না যাহার কাছ হইতে খোঁজ লইতে পারি। দিনের শেষে আজও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় লোকটি এখনও উদ্দেশ্যস্থলের খোঁজ লাভে সক্ষম হই নাই। আমি বলিলাম, ঠিকই সক্ষম হয় নাই। আজও তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন। আজও পূর্ব দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে যাইয়া রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে মসজিদে চলিয়া আসিলাম। এইভাবেই তিন দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনার ব্যাপার কি? উদ্দেশ্য কি? কেনই বা আপনি এই শহরে আসিয়াছেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যদি আমার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন, কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, আর প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমার উদ্দেশ্যের সাফল্যে আপনি আমার সাহায্য করিবেন, আমাকে পথ দেখাইবেন, তবে আমি বলিতে পারি। আলী (রাঃ) আমার উভয় শর্তে সম্মতি দান করিলেন– বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমি করিব।

আমি বলিলাম, আমাদের নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, এই নগরে একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি দাবী করিয়া থাকেন তিনি নবী। তাহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পূর্বে আমার সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার তৃপ্তি যোগাইতে পারে নাই, তাই আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাত লাভের

আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আলী (রাঃ) বলিলেন, ঠিক জায়গায়ই আপনি আপনার কথা রাখিয়াছেন-- আপনার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে। যাঁহার বিষয় আপনি বলিতেছেন তিনি সত্য; তিনি আল্লাহর রসূলই বটেন। এই রাত্রে আপনি আমার গৃহেই অবস্থান করুন। প্রভাতে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিব।

ভোর হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, সেই মহানের পথ এই দিকে; আমি এই পথে যাইতে থাকিব, আপনি দূরে দূরে থাকিয়া আমার অনুসরণ করিবেন। আমি যদি আপনার জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা দেখি তবে প্রস্রাব করার ন্যায় ভান করিয়া থামিয়া যাইব বা জুতা ঠিকভাবে পায়ে দেওয়ার ন্যায় পথের কিনারায় দাঁড়াইব। আপনি অন্য দিকে পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবেন (যেন কেহ আপনার মূল উদ্দেশ্য আঁচ করিতে না পারে)। আর যদি আমি সরাসরি চলিয়া যাই তবে আপনিও আমার অনুসরণে চলিতে থাকিবেন এবং আমি যেই গৃহে প্রবেশ করি আপনিও সেই গৃহে ঢুকিয়া পড়িবেন।

সেমতে তিনি চলিতে লাগিলেন; আমি তাঁহার অনুসরণে চলিতে লাগিলাম। পথে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই তিনি সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে পৌঁছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছিলাম। আমি নবীজী (সঃ)-এর সমীপে আরজ করিলাম, আমাকে ইসলাম বুঝাইয়া দিন; তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দান করিলেন। তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমিয় বাণী শ্রবণে আমি মুহূর্তে সে স্থানেই ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্নেহভরে বলিলেন, আবুযর! এই এলাকায় তুমি তোমার অবস্থা গোপন রাখিও– প্রকাশ করিও না। এখন তুমি দেশে যাইয়া তোমার দেশের লোককে এই ধর্মের খোঁজ দিতে থাক। আমাদের পূর্ণ বিকাশ এবং জয়যুক্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইলে আমার কাছে চলিয়া আসিও।

আমি আরজ করিলাম, যেই মহাশক্তিমান প্রভু আপনাকে সত্য ধর্ম দানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ, আমি যে সত্য কালেমা পাইয়াছি তাহা মক্কার লোকদের কর্ণকুহরে না ঢুকাইয়া ক্ষান্ত হইব না।

ঠিকই, তৎক্ষণাত আবু যর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় কোরায়শর অনেক লোক সমবেত ছিল। আবু যর (রাঃ) তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে কোরায়শ গণ!

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"আমি অন্তর হইতে ঘোষণা দিতেছি, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ! আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। আরও ঘোষণা দিতেছি, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা এবং তাঁহার রসূল।"

এই ধ্বনি দিতেই কোরায়শ দুর্বৃত্তরা মারমার করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ধর্মত্যাগী বেদ্বীনকে ধর। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে আমার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। আমাকে প্রাণে শেষ করিয়া ফেলিবে সেইরূপ প্রহার তাহারা করিতে লাগিল। এই সময় (নবীজীর পিতৃব্য) আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তাঁহার দেহের আশ্রয়ে নিলেন এবং মারমুখী দুর্বৃত্তদের বলিলেন, তোমরা কি সর্বনাশ করিতেছ! এ যে গেফার গোত্রের লোক। সিরিয়ার বাণিজ্যযাত্রা এবং সাধারণভাবেও তোমাদের চলাচলের পথ গেফার গোত্রের পল্লী দিয়াই। আব্বাসের এই সতর্কবাণী শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইল এবং আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পর দিন ভোর হইতে না হইতেই আমার সেই অভিযান পুনঃ চলিল– আমি মসজিদে আসিলাম এবং পূর্ব দিনের ন্যায় আমার সেই ঘোষণার ধ্বনিই দিতে লাগিলাম। তাহাদেরও প্রহার অভিযান পূর্ব দিনের ন্যায় আমার উপর চলিল। আজও আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া নিজের দেহ দ্বারা আমাকে আশ্রয় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় দুর্বৃত্তদেরকে সতর্কবাণী শুনাইলেন; তাহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল।

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন, ঈমানের বল-বিক্রম কত অধিক। সাহস, শক্তি ও উদ্যম কত প্রখর! ক্ষণেক পূর্বে যেই আবু যর কোন ব্যক্তির নিকট নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী ছিলেন না, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন; ঈমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে আবু যর আর সেই আবু যর নাই। ভীত সন্ত্রস্ত আবু যর (রাঃ) এখন তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন বল-শক্তি, অসীমসাহস ও উৎসাহ-উদ্যমের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমনকি সেই বল-বিক্রম, সাহস-উদ্যমের বাণীক চাপিয়া রাখা তাঁহার জন্য সম্ভব হইল না। সকল প্রকার ভয়-ভীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রাণের মায়াঁর বাঁধন ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন কালেমা শাহাদাতের বিজয় ধ্বনি তুলিতে, তওহীদ এবং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বীকৃতি ঘোষণা মক্কার পাষণ্ডদের ঘাড়ে চাপিয়া ধরিতে। এই মহাশক্তি ও অদম্য সাহস একমাত্র ঈমানেরই ক্রিয়া ছিল। আবু যর (রাঃ) এখনও পেয়াজ বা গরুর গোশ্ত খাইয়াছিলেন না। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাত হইতে আবু যর (রাঃ) তওহীদ ও ঈমানের এমন মদিরাই পান করিয়াছিলেন যে, তাহার তেজস্ক্রিয়ায় নবীজীর স্নেহসুলভ পরামর্শও তখন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

বিগত তিন বৎসর কাল গিরিসঙ্কটে সঙ্কটপূর্ণ জীবন যাপনের পর নবুয়তের দশম বৎসরে বয়কট বা অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

দীর্ঘ তিন বৎসর কষ্ট-যাতনা হইতে খালাস পাওয়া হযরতের পক্ষে অবশ্যই একটি সুখের বিষয় ছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে সেই সুখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক পর পর দুইটি দুঃখজনক শোকের ছায়া হযরতের উপর নামিয়া আসিল।

আবু তালেবের মৃত্যু

অসহযোগিতা হইতে খালাস পাওয়ার মাত্র ছয় মাস বা আট মাস বিশ দিন পর ঐ বৎসরই হযরতের বাহ্যিক সাহায্য সহায়তার সর্বপ্রধান উসিলা চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হয়; যাহা হযরতের পক্ষে অপূরণীয় শূন্যতা ছিল। এত দিন সারা মক্কাবাসীর মোকাবিলায় হযরতের পক্ষে আবু তালেবই ছিলেন একমাত্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকারী। আজ সেই উসিলা চির দিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। বাহ্যিকরূপে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন।

আবু তালেবের সর্বশেষ অবস্থা (পৃষ্ঠা- ৫৪৮)

পূর্বে বলা হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লালন-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া নবুয়তের পরও সারা মক্কার শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য সহায়তার যে ভূমিকা আবু তালেব গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার নজীর ইতিহাসে নাই। নবীজী মোস্তফার পয়গম্বরী জীবনে সফলতার ব্যাপারে বাহ্যিক উসিলারূপে আবু তালেবের দান ছিল অপরিসীম। তিনি নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে তাঁহার অন্তরে যে স্থান দান করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্তও অতি বিরল। কিন্তু এত ভালবাসা সত্ত্বেও আবু তালেব হযরতের আনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের শেরেকী ধর্মের উপরই ছিলেন। হায়! সারা বিশ্ব যেই প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল, সেই প্রদীপের সর্বাধিক নিকটবর্তী আবু তালেব তাহার আলো হইতে বঞ্চিত। এ যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

এ বিষয়টি যে হযরতের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। যখন আবু তালেবের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল তখন হযরত (সঃ) সর্বশেষ চেষ্টার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মানুষবেশী শয়তান আবু জাহল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা পূর্ব হইতেই আবু তালেবের শয্যা পার্শ্বে ভিড় জমাইয়া রহিয়াছিল। হযরত (সঃ) আবু তালেবকে ইসলামের কালেমা পাঠ করিবার জন্য অত্যধিক অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি

করিতেছিলেন, এমনকি তিনি অন্তরের অন্তস্তল হইতে আদর ও সোহাগের ডাক দিয়া বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি একটি বাক্যের (ইসলামের কালেমা) স্বীকারোক্তি করিয়া আমার পক্ষে কেয়ামতের দিন আপনার জন্য শাফায়া'ত করার পথ সুগম করিয়া দিন;, আমি এই বাক্যটি নিয়াই আপনার পক্ষ সমর্থনে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। এইভাবে হযরত (সঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অপর দিকে আবু জাহল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁহাকে বলিতেছিল, হে আবু তালেব! জীবনের মেষ মুহূর্তে স্বীয় পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া আরবের নারীদেরকে তিরস্কারের সুযোগ দিও না যে, আবু তালেব কাপুরুষ ছিল– ভাতিজার কথায় আযাবের ভয়ে ভীত হইয়া বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে।

অবশেষে আবু তালেব এই দুর্ভাগ্যজনক উক্তির উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরই রহিলাম!

হযরত (সঃ) স্বীয় আশ্রয়স্থল চাচাকে হারাইয়া যতদূর শোক পাইয়াছিলেন তাহার হাজার গুণ অধিক শোক পাইলেন চাচার মৃত্যু বে-দ্বীনীর উপর হওয়ায়। হযরত (সঃ) এই শোকে দুঃখে বেহাল হইয়া ইসলাম না থাকা সত্ত্বেও চাচার মাগফেরাতের দোয়া করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়া তাঁহাকে তাহা হইতে বারণ করিল এবং আরও আয়াত নাযিল করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে আছে ।

১৬৮৯। হাদীছ ঃ عن ابن المسيب عن ابيه رضى الله تعالى عنه انَّ اَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَاهُ حَتّٰى قَالَ اٰخِرُ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْهُ ـ فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ) وَنَزَلَتْ (اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ)

অর্থ ঃ সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী' সায়ীদ ইবনে মোসাইয়াব (রাঃ) তাঁহার পিতা ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু তালেবের যখন মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হইল তখন নবী (সঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবু জাহল পূর্বাহ্নেই তথায় পৌঁছিয়াছিল।

হযরত (সঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি ইসলামের কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকারোক্তি করুন। ইহা লইয়াই আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। তখন আবু জাহল এবং তাহার আর এক সাথী বলিল, হে আবু তালেব! তুমি তোমার পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম ছাড়িয়া দিবে কি? এই ধরনের বহু রকমের কথা তাহারা দুই জনে আবু তালেবকে বলিতে লাগিল, এমনকি আবু তালেবের সর্বশেষ উক্তি এই হইল যে, আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরই...।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি আবু তালেবের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া যাইব যাবত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখনই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইল–

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ....

অর্থাৎ নবীর জন্য এবং মোমেনদের জন্য এই অনুমতি নাই যে, তাহারা কোন মোশরেকের পক্ষে

মাগফেরাতের দোয়া করে– ইহা প্রতীয়মান হইয়া যাওয়ার পর যে, ঐ মোশরেক শেরকের উপর মৃত্যুবরণ করিয়া জাহান্নামী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে; যদিও সেই মোশরেক কোন ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় হয়।

এতদ্ভিন্ন এই আয়াতও নাযিল হইল– اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

অর্থাৎ হেদায়েত দান করার ক্ষমতা আপনার হাতে ন্যস্ত নহে যে, আপনি আপনার প্রিয়পাত্রকে (জোর করিয়া) হেদায়েত দিয়া দিবেন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা (মানুষের ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখিয়া) যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত পাওয়ার তওফীক দান করিয়া থাকেন। হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ত কাহারা তাহা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই অবগত আছেন।

১৬৯০। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৪৮) عن العباس بن عبد المطلب انه قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَانَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَارٍ وَلَوْلَا اَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (কেয়ামতের দিন) আপনার চাচা আবু তালেবকে কি সাহায্য করিতে পারিবেন? তিনি ত আপনার অত্যধিক সাহায্য সহায়তা করিতেন এবং আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া থাকিতেন। নবী (সঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তিনি অল্প তথা পায়ের গিঁট পর্যন্ত দোযখের আগুনে থাকিবেন। (তাঁহার শাস্তির এই লাঘব আমারাই বদৌলতে হইবে।) যদি আমার সম্পর্কীয় ব্যাপার না থাকিত তবে তিনি দোযখের সর্বশেষ তবকার নিম্নস্তরে থাকিতেন।

১৬৯১। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৪৮) عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ ـ

অর্থ ঃ আবু সায়ী'দ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবু তালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি তাহার শাস্তি লাঘব করিতে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ সাহায্য করিবে। তাহাকে অল্প পরিমাণ দোযখের আগুনে রাখা হইবে; দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্যন্ত থাকিবে, কিন্তু তাহা দ্বারাই তাহার মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এস্থলে একটু চিন্তা করিলে ঈমান যে কি অমূল্য ধন এবং দোযখ হইতে নাজাত পাইবার জন্য ঈমান যে অপরিহার্য তাহা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর রসূলের সাহায্য সহায়তা করা সর্বশ্রেষ্ঠ নেক কাজ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ছাহাবীগণ এই নেকের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবু তালেবের মধ্যে সেই নেক কাজটি অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য সহায়তায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সব কোন কিছুই দোযখ হইতে তাহাকে নাজাত দিতে পারিবে না। তাহার একমাত্র কারণ হইল ঈমান রত্ন হইতে আবু তালেবের বঞ্চিত থাকা; এই জন্যই তাহার জীবনের শেষ মুহূর্তে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার ঈমানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এস্থলে পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়, তাহা এই যে, আল্লাহর রসূলকে মমতা করা, তাঁহাকে রসূল জানা, সত্যবাদী জানা– শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হইবে না। শুধু জানার পর্যায়ে আবু

তালেব কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। তাহার কাব্যের এক বিরাট অংশ এইসব বিষয়ে আজও ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাব্যে তাহার পরিষ্কার উক্তি ছিল–

ودعوتني وزعمت انك ناصحى ـ ولقد صدقت وكنت ثم امينا ـ

আপনি আমাকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া দাবী করিয়াছেন; বাস্তবিকই আপনি সত্যবাদী এবং পূর্ব হইতেই আপনি অকৃত্রিম।

وعرضت دينا لامحالة ـ انه ـ من خير اديان البرية دينا ـ

আর আপনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ধর্ম পেশ করিয়াছেন যাহা অবশ্যই সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম ধর্ম।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি আবু তালেবের কাব্যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই ধরনের উক্তিকে ঈমান গণ্য করা হয় নাই। কারণ, শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হয় না, বরং রসূলকে এবং ইসলামকে মানা ও গ্রহণ করার উপরই ঈমানের ভিত্তি। আবু তালেবের মধ্যে ইহার অভাব ছিল। ইহার অভাব আজ আমাদের সমাজে মুসলিম নামধারী অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

আবু তালেবের মৃত্যু শয্যায় আবু জাহলসহ কোরায়শ সর্দারগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আপনার অবিদিত নহে। আপনার শেষ সময় নিকটবর্তী, যাহা আপনিও বুঝিতেছেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমাদের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাও আপনি অবগত আছেন। আমাদের অনুরোধ– আপনি তাহাকে ডাকিয়া আনুন এবং তাহার হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, যেন আমাদের প্রতি অন্যায় না করে; আমাদের হইতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, আমরাও তাহার প্রতি কোন অন্যায় করিব না।

সেমতে আবু তালেব নবীজীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার বংশীয় সর্দারগণ সমবেত হইয়াছে। তাহারা তোমার সহিত আপস-মীমাংসার প্রস্তাব করিতেছে; তুমিও অঙ্গীকার করিবে, তাহারও অঙ্গীকার করিবে।

নবীজী (সঃ) বলিলেন, ভাল কথা! আপনারা আমাকে একটি মাত্র উক্তি প্রদান করিবেন; তাহা দ্বারা আপনারা সমগ্র আরবে প্রাধান্য লাভ করিবেন এবং ঐ উক্তির বদৌলতে সারা বহির্জগত আপনাদের পদানত হইবে!

আবু জাহল বলিল, এইরূপ একটি কেন! দশটি উক্তির অঙ্গীকার আপনি আমাদের হইতে আদায় করুন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আপনারা অঙ্গীকার করিবেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"– আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। আর আপনাদের বর্তমান পূজনীয় দেব-দেবী ঠাকুর-মূর্তিগুলিকে চিরতরে পরিত্যাগ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া কোরায়শ দলপতিগণ বলাবলি করিল, তোমরা যাহা চাও সেইরূপ একটি অক্ষরও এই ব্যক্তি হইতে আদায় করিতে পারিবে না, অতএব নিজেদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মমতের উপর অবিচল থাক; এই ব্যক্তির সহিত আল্লাহই যদি ফয়সালা করিয়া দেন। (ইবনে হেশাম)

সর্বশেষ পর্যায়ে আবু তালেব কোরায়শ দলপতিগণকে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন যাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি তাহাদের বলিলেন–

হে কোরায়শগণ! তোমরা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ এবং আরবীয়দের হৃৎপিণ্ড তুল্য। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে– সকলেই যাহাদের অনুগত। তোমাদের মধ্যে বাহাদুর এবং ধনে-জনে শক্তিশালী ব্যক্তিগণও রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে আরব জাতির সর্বময় মহিমা বিদ্যমান রহিয়াছে, যদ্দরুন তোমাদের

প্রাধান তোমরা কা'বা শরীফের যথাযথ সম্মান করিবে; ইহাতে তোমাদের প্রতি প্রভু-পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হইবেন, তোমাদের জীবিকার অবলম্বন হইবে এবং তোমাদের প্রাধান্য বজায় থাকিবে। আর তোমরা পরস্পর আত্মীয়তার হক আদায় করিও; তাহাতে নেকনামী বাকী থাকে, জীবনের মূল্য বাড়ে এবং বংশের উন্নতি হয়। জুলুম-অত্যাচার এবং পরস্পর শত্রুতা বর্জন করিও; এই দুই জিনিসের দ্বারা অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হইয়াছে। আর কেহ ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিও, সাহায্যপ্রার্থীকে দান করিও এবং সদা সত্য কথা বলিও, আমানত পূর্ণরূপে আদায় করিও।

আর আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছি- তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সহিত ভাল ব্যবহার বজায় রাখিও। তিনি সমগ্র কোরায়শ বংশের আমানতদার এবং সমগ্র আরবে সত্যবাদীরূপে প্রসিদ্ধ। আমি তোমাদের যতগুলি সৎ উপদেশ দান করিলাম মোহাম্মদের মধ্যে ঐসব গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি আমাদের নিকট যেই ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন অনেকেরই হৃদয় তাহা গ্রহণ করে যদিও মানুষের নিন্দার ভয়ে মুখে গ্রহণ করে না।

খোদার কসম! আমি যেন চোখে দেখিতেছি- আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আরব এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র দুর্বল লোকগণ মুহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়া, তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ফলে কোরায়শ দলপতিগণ অন্যের লেজুড় হইয়া যাইতেছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর উজাড় হইয়া যাইতেছে এবং ঐ গরীব-কাঙ্গালগণ তাহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

হে কোরায়শ বংশ! তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্যকারী এবং তাঁহার দলের সহায়তাকারী হইয়া যাও। যেব্যক্তি তাঁহার পথের পথিক এবং তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে সে নিশ্চয় ভাগ্যবান হইবে। আমার জীবনের আরও অংশ যদি বাকী থাকিত এবং আমার মৃত্যু যদি বিলম্ব করিত নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ (সঃ) হইতে সর্বপ্রকার আক্রমণ প্রহিত করিয়া চলিতাম এবং তাঁহার হইতে সকল রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতাম। (যোরকানী- ১-২৯৫)

অতপর সমবেত কোরায়শ দলপতিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে আবু তালেব নবীজী (সঃ)-কে পুনঃ ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোরায়শ দলপতিদের নিকট কোন অন্যায় দাবী কর নাই।

নবীজী (সঃ) আবু তালেবের এই আলাপে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া বলিলেন, হে চাচাজান! আপনি ঐ দাবীব কালেমাটা পড়িয়া নিন। যদ্দ্বারা কেয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য শাফাআত বা সুপারিশের সুযোগ লাভ করিব।

উত্তরে আবু তালেব বলিলেন, আমার যদি আশঙ্কা না হইত যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদেরকে কটাক্ষ করিয়া লোকেরা বলিবে, আবু তালেব ভীত হইয়া মৃত্যুর সময় কাপুরুষের ন্যায় এই কালেমা পড়িয়াছে, তবে নিশ্চয় আমি এই কালেমা পড়িয়া নিতাম। (ইবনে হেশাম)

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যু

বিপদ যেন অন্ধকার রজনীর ন্যায় ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে। আবু তালেবের মৃত্যু হইল, তাহার ঈমান সম্পর্কে হযরতের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই নিদারুণ শোক-তরঙ্গে ভাসিতে থাকা অবস্থায়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর আর এক শোকের পাহাড় ধসিয়া পড়িল।

এই দশম বৎসরেই রমযান মাসে আবু তালেবের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পর* হযরতের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজা (রাঃ) ৬৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের জন্য অর্থ-সামর্থ্য, ঘর-সংসার, শান্তি-শৃঙ্খলারই শুধু সংস্থাপক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন,

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবি খাদীজার মৃত্যু আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বিপরীত মতামতই প্রসিদ্ধ এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। (বেদায়া ৩-১২১)

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে হযরতকে সান্ত্বনাদানকারিণী, হযরতের অন্তরে বল-ভরসা আনয়নকারিণী। আজ হযরত (সঃ) এইরূপ জীবনসঙ্গিনীকেও হারাইয়া ফেলিলেন; ইহাতে তাঁহার শোকের সীমা থাকিতে পারে কি! এমনকি স্বয়ং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই বৎসরকে عام الحزن "শোকের বৎসর" বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন।

বিবি খাদীজাকে হারাইয়া হযরত (সঃ) অন্তরে কি ভীষণ আঘাতই না পাইলেন! দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যেন তিনি আজ হারাইলেন। বিবি খাদীজা হযরতের অন্তর ও জীবনের এত বড় বিরাট স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন যে, তাহা অন্য কাহারও দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী আদর্শ মহিলা জগতে অল্পই জন্ম নেয়। হযরতের জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, পারিবারিক ও সামাজিক ময়দানে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন সেই স্মৃতি রেখা হযরতের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না।

পয়গম্বরীর সূচানাকালে নবীজীর জীবনটা সম্পূর্ণ এলোমেলো শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার পানাহারের খোঁজ ছিল না, শোয়া-বসার খবর ছিল না। পথে-প্রান্তরে গিরিকন্দরে তিনি উদাসীনভাবে বেড়াইতেন, পড়িয়া থাকিতেন, তখন বিবি খাদীজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, খোঁজ করিয়া পানাহার পৌঁছাইতেন, শৃঙ্খলায় ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন। পয়গম্বরী জীবনের সর্বপ্রথম অধ্যায়ে যখন নবীজী (সঃ) আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়া ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেরা গুহা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আসিয়াছিলেন তখন বিবি খাদীজাই আদর্শ সহধর্মিণীরূপে নবীজী সান্ত্বনা, প্রেরণা ও বল-ভরসা যোগাইয়াছিলেন। জগতের সকলে যখন নবীজীর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন এই পুণ্যবতী মহীয়সীই সর্বপ্রথম তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জাতি ও দেশের সকলে যখন নবীজী (সঃ)-কে উপেক্ষা ও বর্জন করিয়াছিল তখন এই ভাগ্যবতী খাদীজাই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নবীজীর জন্য নিরাশার অন্ধকার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ঝড় তখন সেই ঘোর সঙ্কটকালে কর্মজীবনের সর্বপ্রথম সঙ্গিনী এবং ধর্ম জগতের সর্বপ্রথম মুরীদ বিবি খাদীজাই নবীজীর জন্য আলো বহনকারিণী এবং জানে-মালে সর্বপ্রকারে ঝড় ঝঞ্ঝা হইতে আশ্রয়দানকারিণী ছিলেন। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা ও দেশজোড়া শত্রুদের উৎপীড়নে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া দিনের শেষে নবীজী (সঃ) যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন বিবি খাদীজা প্রকৃত সহধর্মিণীর ধর্ম মতেই হৃদয়ের সর্বময় ভক্তি-শ্রদ্ধা, অন্তরের সবটুকু মায়া-মমতা তাঁহার চরণে নিবেদিত করিয়া তাঁহার দৈহিক ও আত্মিক অশান্তি দূর করণে এবং সুখ-সান্ত্বনা প্রদানে নিজেকে লুটাইয়া দিতেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) প্রতিদিন এইভাবে খাদীজার সেবায় সারা দিনের ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করিয়া নবোদ্যমের সহিত ধর্ম ক্ষেত্রে পুনঃ অবতীর্ণ হইতেন। সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে সর্বদা বিবি খাদীজা নবীজীর সহিত ছায়ার মত জড়াইয়া থাকিতেন; মুহূর্তের জন্যও বিবি খাদীজা নবীজী (সঃ)-এর সেবায় উদাসীন হইতেন না। বিবি খাদীজা ছিলেন নবীজীর আদর্শ সহধর্মিণী, সর্বক্ষেত্রের সহকর্মিণী এবং সর্বাবস্থার সহযোগিনী। অন্তরের ভক্তি আসক্তির সহিত বিবি খাদীজা নিজেকে এবং নিজের সর্বস্বকে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর চরণে যেভাবে লুটাইয়া দিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত জগতে মিলিবে না। নবীজী (সঃ)ও বিবি খাদীজার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ স্বীকৃতিদান করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিত বিবরণ "শাদী মোবারক" আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। বিবি খাদীজার প্রতি নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকর্ষণ ও স্বীকৃতি প্রমাণে এতটুকুই যথেষ্ট যে, বিবি খাদীজার বিরহ-ব্যথা চিরকাল নবীজীর হৃদয়ে দাগ কাটিয়াছে।

ইহকালের এহেন জীবন সঙ্গিনী চিরবিদায় নিলেন নবীজী (সঃ) হইতে, নবীজীর সেই বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাপ করা কি সহজ? এই শ্রেণীর ব্যথা-বেদনায় মানুষ ধৈর্যচ্যুত না হইয়া পারে না। বিশেষতঃ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী উপকারীজন পিতৃব্য আবু তালেবের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই

এই মহাশোকের আঘাত লাগিল নবীজীর অন্তরে। আঘাতের উপর আঘাত, শোকের উপর শোক; স্বয়ং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক এই বৎসরকে "আমুল হোয্ন"– শোকের বৎসর আখ্যা প্রদানই তাঁহার অন্তরের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ

নবুয়তের দশম বৎসর রমযান মাসে বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহার ইন্তেকাল হইল। হযরত (সঃ) শোকে জর্জরিত, তদুপরি তাঁহার ঘর-সংসার দেখিবার ও শৃঙ্খলা করিবার মত কেহ নাই, তাই হযরত (সঃ) পরবর্তী মাস শাওয়াল মাসেই পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং পর পর দুইটি বিবাহ হইল। একটি উম্মুল মোমেনীন সওদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গে। তিনি বিধবা ছিলেন তাঁহার স্বামীর নাম ছিল "সাকরান বিন আমর"। তিনি এবং তাঁহার স্বামী অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় থাকাকালীন বা মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তিনি বিধবা হইয়া থাকেন। পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে তিনি প্রথম দ্বিধা করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে দ্বিধাবোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন; আমার মহব্বত আপনার প্রতি সর্বাধিক, কিন্তু আমার পাঁচ-ছয়টি সন্তান রহিয়াছে; তাহারা সকাল-বিকাল আপনাকে বিরক্ত করিবে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমাকে এই কারণে বাধা দেয়। নবী (সঃ) বলিলেন, দ্বিধার আর কোন কারণ নাই ত? তিনি বলিলেন, খোদার কসম– আর কোন কারণ না (বেদায়া–১৩৩)

বিবি সওদার পিতা তখন জীবিত এবং অমুসলিম ছিলেন, কিন্তু তিনি হযরতের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হইয়া সওদা (রাঃ)-কে নবীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

অপর বিবাহ হইয়াছিল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গে। কিন্তু এই বিবাহ শুধু আনুষ্ঠানিক এবং কেবলমাত্র ইজাব-কবুলের বিবাহ ছিল; অন্য কোন রসূমতই হইয়াছিল না। বিবাহের সময় হযরতের বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর আর আয়েশার বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় একনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে হিসাবে আদর সোহাগের নিদর্শন স্বরূপ এই বিবাহের আক্দ্ বা ইজাব কবুল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই বিবাহ সম্পর্কে মালায়ে আ'লা তথা আল্লাহর দরবার হইতেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিয়াছিল, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে

১৬৯২। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৭৬০) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُكَ فِى الْمَنَام مَرَّتَيْن اذا رَجُل يَحْمِلُكَ فِىْ سَرَقَة حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذه امْرَاتُكَ فَاكْشفُهَا فَاذَا هِىَ اَنْت فَاَقُوْلُ اِنْ يَّكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْد اللّٰه يُمْضه ـ

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, স্বপ্নে আমায় দুই বার তোমাকে দেখান হইয়াছে– এক লোক রেশমী কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে, অতপর তিনি আমাকে বলিলেন, এইটি আপনার স্ত্রী। সেমতে আমি রেশমী কাপড়ের আবরণ উন্মোচন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম তুমি-ই।

নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি ভাবিলাম, ইহা যখন আল্লাহর তরফ হইতে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বাস্তবায়িত করিবেন।

১৬৯৩। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৫) ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (আয়েশা (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিয়া আসিবার পূর্বে তৃতীয় বৎসর বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু

তাআলা আনহার মৃত্যু হইয়াছিল। অতপর হযরত (সঃ) দুই বৎসর বা দুই বৎসরের নিকটবর্তী (অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক, কিন্তু তিন অপেক্ষা অনেক কম- দুই বৎসর চারি মাস) মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন। (এই সময়েই) আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহের ইজাব-কবুল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল। অতপর তাঁহাকে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন (মদীনায় পৌঁছিয়া; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর ছিল)।

১৬৯৪। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যদি কোথাও অবতরণ করেন এবং তথায় একটি বৃক্ষ দেখেন যাহা কাহারও পশু খাইয়াছে; আর একটি বৃক্ষ দেখেন যাহা কাহারও পশু খায় নাই, এমতাবস্থায় আপনি আপনার পশুকে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কোন্‌টি খাইতে দিবেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, যেই বৃক্ষটি খাওয়া হয় নাই।

আয়েশা (রাঃ) এই দৃষ্টান্তে বুঝাইতে চাহিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রাঃ)-ই কুমারী ছিলেন। (পৃষ্ঠা- ৭৬০)

ব্যাখ্যা ঃ হযরতের সহিত বিবি আয়েশার ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিমাসুলভ খোশ আলাপের একটি অধ্যায় ছিল এই প্রশ্নোত্তর। নবীজী (সঃ)-এর হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য সকলেই সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বিবি আয়েশার উল্লিখিত খোশ আলাপটা সেই উদ্দেশেই ছিল।

১৬৯৫। হাদীছ ঃ ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট বিবি আয়েশার বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি ত আমাকে ভ্রাতা বলিয়া থাকেন (সেই হিসাবে আয়েশা আপনার ভাতিজী)। নবী (সঃ) বলিলেন, আপনি আমার ধর্মীয় ভ্রাতা এবং কোরআনের উক্তিরূপে ভ্রাতা, সুতরাং আয়েশাকে বিবাহ করার বৈধতায় আমার জন্য কোন বাধা নাই। (পৃষ্ঠা- ৭০৬)

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে আছে انما المؤمنون اخوة "সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই"। এই আয়াতের প্রতিই নবী (সঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উর্ধ্বজগত হইতে ইঙ্গিত পাওয়ার পর নবীজী (সঃ) এই বিহের প্রস্তাবদানে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীর স্বপ্ন অকাট্য ওহী, সেমতে এই বিবাহ প্রস্তাব ওহী দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছিল। তাই পঞ্চাশ বৎসরের বর, ছয় বৎসরের কন্যা- বয়সের এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও এই প্রস্তাব প্রদান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নবীজীর প্রাণও হয়ত এই প্রস্তাবে স্বাগত জানাইয়াছিল। কারণ, নবীজীর সেবা ও শ্রদ্ধায় আবু বকরের (রাঃ) যে অপরিসীম দান ছিল তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (সঃ) এই ভাষায় দিয়া থাকিতেন-

اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبَا بَكْرٍ لَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهٗ ـ

"বিশ্বজোড়া মানুষের মধ্যে স্বীয় জান মাল দ্বারা আমার সর্বাধিক উপকার করিয়াছেন আবু বকর। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো আমার জন্য সম্ভব হইলে আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম। তবে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসা তাহার জন্য (আমার অন্তরে সর্বাধিক) রহিয়াছে।" এই আন্তরিক স্বীকৃতি কার্যত প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়া নবীজী হয়ত পুলকিত ও আনন্দিত ছিলেন। আবু বকরের (রাঃ) আনন্দের ত কোন সীমাই ছিল না। যাঁহার চরণে আবু বকরের সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত তাঁহারই চরণে তাঁহারই সেবায় স্বীয় স্নেহের দুলালীকে অর্পণ করিবেন- এই গৌরব এবং আনন্দ কি আবু বকরের অন্তর ধারণ করিতে পারে!

১৬৯৬। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৫১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন আমার বয়স ছয় বৎসর (পূর্ণ হইয়া সপ্তম বৎসর আরম্ভ) হইয়াছিল।

(আবু বকর (রাঃ) একাই হযরতের সঙ্গে হিজরত করিয়া মদীনায় পৌছিয়াছিলেন, মদীনায় আসিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করার পর তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পরিবারবর্গকে নিয়া আসিবার জন্য মক্কায় লোক পাঠাইয়াছিলেন।) অতপর আমরা মদীনায় পৌছিলাম এবং বনু হারেসের মহল্লায় অবস্থান করিলাম। আমি ভয়ানক জ্বরে পতিত হইলাম, এমনকি আমার মাথার চুল ঝরিয়া গেল। অতপর জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা-তদবীর করিয়া চুলগুলো একটু বড় করা হইল, তাহা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিল।

একদা আমি আমার কতিপয় বান্ধবীর সহিত দোলনায় বসিয়া ঝুলিয়া খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মাতা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন; আমি কিছুই বুঝিতেছিলাম না, কি উদ্দেশে আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন, তখনও আমার শ্বাস ফুলিতেছিল। আমার শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আমার মাথা ও মুখমণ্ডল পানি দ্বারা মুছিয়া দিলেন এবং ঘরের ভিতর নিয়া আসিলেন; তথায় মদীনাবাসিনী কতিপয় মহিলা বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি শুভ এবং মঙ্গল কল্যাণের আশীর্বাদ বাণীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আমার মাতা আমাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা আমার বেশ-ভূষা পরিপাটি করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভিতর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তশরীফ আনিলেন, তখন বেলা উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল। অতপর এই মহিলাগণ আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে সমর্পণ করিয়া দিলেন। আমার বয়স তখন নয় বৎসর।

তায়েফের সফর

খাজা আবু তালেব এবং বিবি খাদীজা (রাঃ) আর দুনিয়ায় নাই; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলও আর নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবীজীর গৃহাঙ্গনের, আর খাজা আবু তালেব ছিলের বাহিরের আশ্রয়; এখন নবীজীর উভয় দিক উজাড় হইয়া গিয়াছে। নবীজীর শান্তির নীড়ই শুধু ভাঙ্গে নাই, তাহার বৃক্ষেরও পতন হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই নবীজীর ভৌতিক দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা। তদুপরি মক্কার দূর্বত্ত শক্ররা নবীজীর উপর জুলুম অত্যাচারের স্বরাজ পাইয়াছে, তাহাদের জন্য অত্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কন্টক হইয়া গিয়াছে। এত দিন আবু তালেবের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিত না; এখন সেই বাধা দূর হইয়াছে। তাহাদের ধারণায় নবীজী (সঃ) এখন নিরাশ্রয়! তাঁহাকে লইয়া যাহা খুশী করা যায়– নবীজীর প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালাইতে কোরায়শরা দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। মনের ক্ষোভ মিটাইয়া তাহারা নবীজী (সঃ)-কে উৎপীড় করিতে আরম্ভ করিল।

নবীজীর গৃহভ্যন্তরে আহার্য রান্নার পাত্রে দুর্বত্তরা ময়লা গলিজ পচা গান্ধা আবর্জনা ফেলিয়া যাইত (বেদায়া ৩–১৩৪)। নবীজীর গৃহে মরা পচা ফেলিয়া যাইত; নবীজী তাহা লাঠির মাথায় উঠাইয়া অপসারিত করিতেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন, হে আবদে মনাফের বংশধর (কোরায়শ)। এই কি প্রতিবেশীর ধর্ম?

নবীজী আল্লাহর ঘরের নিকটে নামায পড়িতেন; সেজদাবস্থায় দুরাচাররা কখনও উটের, কখনও বা সদ্যপ্রসূতা ছাগীর ফুল ইত্যাদি আবর্জনা তাঁহার উপর ফেলিয়া দিত; নবীজীর অসহায় শোকাতুর মেয়েদের কেহ সংবাদ পাইয়া তাহা অপসারণ করিতেন। একদা নবীজী (সঃ) পথ বহিয়া চলিয়াছেন; এক নরাধম ছুটিয়া আসিয়া কতগুলি ধুলাবালি ও আবর্জনা নবীজীর মাথার উপর ফেলিয়া গেল। নবীজী সেই অবস্থায় গৃহে আসিলেন; এখন তাঁহার গৃহে কে আছে যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, তাঁহার সেবা করিবে! নবীজীর এক কন্যা আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মাথা পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। শোকাবিষ্টা মা হারা কন্যার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া নবীজী তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, মা! কাঁদিও না; আল্লাহ তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। নরাধমেরা এই শ্রেণীর অসভ্যপনা চালাইয়া যাইতে লাগিল; পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ত কথাই ছিল না। এতদ্ভিন্ন দৈহিক নির্যাতন চালাইতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। নবীজী (সঃ) কা'বা শরীফের নিকটে নামায পড়িতেছিলেন, এক দুরাচার পাপাত্মা আসিয়া তাঁহার গলায় চাদর দিয়া ফাঁস লাগাইয়া দিল, এমনকি নবীজীর শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আবু বকর (রাঃ) ছুটিয়া আসিলেন এবং নিজের উপর বিপদের ঝুঁকি লাইয়া দুর্বৃত্তকে সজোরে ধাক্কা দিলেন! সে দূরে সরিয়া পড়িল– এইরূপে নবীজী

রেহাই পাইলেন। এই শ্রেণীর আর একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৬৯৭। হাদীছ ঃ- (পৃষ্ঠা-৭৪০) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّداً يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَاَنَّ عَلٰى عُنُقِهٖ فَبَلَغَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهٗ لَاَخَذَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (পাষণ্ড খবিস) আবু জাহল তাহার সংকল্প প্রকাশ করিল, আমি যদি মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কা'বা ঘরের নিকট নামায পড়িতে দেখি তবে কসম করিয়া বলি, আমি তাহার ঘাড় পাড়াইয়া পিষ্ট করিয়া দিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার এই সংকল্পের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, সেইরূপ করিলে (আল্লাহ তাআলার) ফেরেশতা তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে "এক্‌রা" সূরায় এই বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে–

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْداً اِذَا صَلّٰى ـ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى ـ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ـ .... كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ـ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ـ

অর্থ ঃ দেখ ত! ঐ পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্য, আমার বিশিষ্ট বান্দা যখন নামায পড়েন তখন সে বাধার সৃষ্টি করিতে চায়। দেখ ত, তাহার পাপাচরণ! আমার ঐ বান্দা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমার ভয়-ভক্তি শিক্ষাদানকারী, আর এই পাপিষ্ঠ সত্যকে স্বীকার করে না, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহার এই দৌরাত্ম্য কিছুতেই চলিতে দেওয়া হইবে না। যদি সে বিরত না থাকে তবে পাপ ও মিথ্যা তথা অহঙ্কারের প্রতীক তাহার মাথার লম্বা চুলগুলি ধরিয়া তাঁহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিব। সে যেন তাহার দলবলকে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনে; আমি নরকের পেয়াদা ফেরেশতাকে ডাকিব। (ঐ ফেরেশতা তাহাকে হেঁচড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে।)

নাসায়ী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে– ঐ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ আবু জাহল একদা তাহার ঐ নারকীয় সংকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ভীত-সন্ত্রস্তরূপে ত্রাসের সহিত পিছনে হটিয়া আসিল। লোকেরা তাহাকে এইরূপ ভীতি ও ত্রাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি পা বাড়াইলেই লেলিহান অগ্নির খন্দক ও ভয়াল আকৃতি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

মক্কার দুরাচার নারকীয় আত্মার পাষণ্ডদের পক্ষ হইতে এইভাবে দিনের পর দিন লাঞ্ছনা নিগ্রহ চলিতে লাগিল। অথচ দুনিয়ায় আজ নবীজীর এমন কোন দরদী নাই যে, এই দুর্দিনে তাঁহার সান্ত্বনা যোগাইবে। বাহিরের জন্য তাঁহার কেহ মুরব্বী আশ্রয়ের সম্বল নাই, গৃহে তাঁহার স্ত্রী নাই। নবীজীর জন্য আছে শুধু চতুর্দিকে অন্ধকার। আবু তালেবের ন্যায় পিতৃব্যের বিয়োগ, পুণ্যবতী খাদীজার ন্যায় স্বর্গীয় সুসমাময়ী স্ত্রী সহধর্মিণীর বিচ্ছেদ, আর মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা ম্লান মুখ। আর আছে এই চরম হতাশাময় অবস্থায় নরাধম পাপিষ্ঠদের অকথ্য অত্যাচার।

একদিকে এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ, অপর দিকে নবুয়তের দায়িত্ব– ইসলাম প্রচার কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াও নবীজী মোস্তফার (সঃ) হৃদয় স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালনে এক বিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল না, তাঁহার লক্ষ্য বিচ্যুত হইল না, তাঁহার জ্ঞানে ধ্যানে মনে প্রাণে একই বিষয়– আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা। কিন্তু তাঁহার ইহা বুঝিতেও বাকী থাকিল না যে, মক্কায় ইসলাম প্রচার বর্তমানে অসম্ভব ও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই নবীজী মোস্তফা (সঃ) কর্তব্যে দৃঢ় ও কর্মের পিয়াসী হইয়া ধীরস্থির চিত্তে বিকল্প পন্থার চিন্তা করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তায়েফ গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় ৭০/৮০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ নগরী; ইহা এতই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যমলা যে, বেহেশত হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ড বলিয়া কথিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের সহিত তায়েফবাসীদের পরিচয়ও ছিল, পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদানও প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ কা'বা শরীফ তায়েফবাসীদেরও তীর্থস্থান ছিল; হজ্জ উপলক্ষে তায়েফবাসীদেরও মক্কায় আগমন হইত। কোরায়শ প্রধান অনেকেরই তায়েফে বাগ-বাগিচা ছিল। মক্কার পর এই তায়েফকেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ কর্মস্থল ও ইসলামের প্রচার কেন্দ্র বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন।

সেমতে পূর্বালোচিত উম্মুল মোমেনীন সওদা (রাঃ)-কে যিনি বেশী বয়সেরও ছিলেন এবং সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্নাও ছিলেন, পাঁচ ছয়টি সন্তানের মা হইয়াছিলেন– তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নবীজি (সঃ) নিজের ঘরের শৃঙ্খলা আনায়নের ব্যবস্থা করিলেন। ঘরে তাঁহার অবিবাহিত চারিটি কন্যা ছিল– এই মাতৃহারা কন্যাদের জন্য গৃহ সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া নবীজি মোস্তফা (সঃ) তায়েফ গমনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তায়েফের পথে যাত্রা করিলেন; তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইলেন তাঁহার প্রিয় ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ)। দুর্গম গিরি-কান্তার পার হইয়া নবীজী (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-সহ তায়েফ নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তায়েফ পর্যন্ত ৭০/৮০ মাইলের দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন (যোরকানী, ১–৩০৫)

তায়েফ অঞ্চলে যেসকল গোত্র বাস করিত "বনী সাকীফ" গোত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল। সেই সাকীফ গোত্রে আবদে ইয়ালীল, মসউদ, হাবীব এই ভ্রাতৃত্রয় বংশ প্রধান এবং তথাকার সর্দার সমাজপতি ছিল। তাহাদের একজনের নিকট কোরায়শ বংশীয় একটি কন্যাও বিবাহিতা ছিল। নবী (সঃ) সর্বপ্রথমে তাহাদের নিকট গমন করিলেন। এই প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবীজী (সঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর পানে আহ্বান করিলেন এবং সত্যের প্রচারে কোরায়শদের অন্যায়ভাবে বাধা দানের ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তায়েফবাসীরাও কোরায়শদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা শস্য-শ্যামল দেশে অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল– সেই অহঙ্কার এবং গর্বও ছিল তাহাদের ভিতরে বদ্ধমূল। সাকীফ দলপতিগণ নবীজীর আহ্বান অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করিল। তাহাদের এক জন ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আল্লাহ বুঝি খুঁজিয়া আর লোক পাইল না, তোমাকেই পয়গাম্বর করিল।"

নবীজী মোস্তফা (সঃ) উপস্থিত তাহাদের আশা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে নবীজী (সঃ) তাহাদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন নবীজী সম্পর্কে তাহাদের এই মনোভাব গোপন রাখে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা যদি এই বিষাক্ত মনোভাব প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে জনসাধারণের মধ্যে সত্যের প্রচার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। ফলে তায়েফের অবস্থাও মক্কার ন্যায় হইয়া উঠিবে, নবীজী (সঃ)-ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িবে। সাকীফ প্রধানগণ নবীজির এই অনুরোধও রক্ষা করিল না। তাহারা তায়েফের দুষ্ট দুরাত্মা দুরাচার লোকদেরকে লেলাইয়া দিল, দেশবাসীকে নবীজীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এমনকি তাহাদের চাকর ও দাসগুলিকে পর্যন্ত নবীজীর পিছনে লাগাইয়া দিল। এখন নবীজী (সঃ) কোথাও বাহির হইলেই ঐ সব লোকেরা হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে পিছনে পিছনে বিদ্রূপ গালাগালি বর্ষণ করিয়া চলে। শুধু তাহাই নহে, পাষণ্ডেরা তাঁহার প্রতি ইট-পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার দেহ মোবারক রক্তাক্ত করিয়া ফেলে। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোমল চরণদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইত, এমনকি পায়ের রক্ত শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া জুতা পায়ে আটকিয়া যায়।

অসহনীয় প্রস্তরাঘাতে সময় সময় নবীজী (সঃ) অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন। তখন পাষণ্ডরা তাঁহাকে দুই বাহু ধরিয়া তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ শুরু করিত। এই সময়

নরাধমদের বিকট হাস্য এবং হৈ হৈ ধ্বনির রোল পড়িয়া যাইত।

তায়েফ প্রবাসে নবীজীর উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তিনি যে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার অনুমান করার জন্য তৃতীয় খণ্ডের ১৫১৪ নং হাদীছখানা লক্ষ্য করা যথেষ্ট। তাহাতে স্বয়ং হযরতের মুখের বিবৃতি বর্ণিত রহিয়াছে– আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহুদ রণাঙ্গনের অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর অবস্থা আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি? উত্তরে হযরত (সঃ) তায়েফবাসীদের নির্যাতনে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখপূর্বক তাহাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী তুলিয়া ধরিলেন।

ওহুদের জেহাদে নবীজির দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, মাথা ফাটিয়াছিল, তদুপরি সারা দেহ মোবারকে শতের অধিক আঘাত লাগিয়াছিল। প্রিয় পিতৃব্য হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ এবং আবু সুফিয়ান স্ত্রী হেন্দা কর্তৃক তাঁহার বক্ষ ফাড়িয়া কলিজা চিবানোর দৃশ্যসহ সত্তর জন ছাহাবীর শাহাদাতের মানসিক আঘাতও কম ছিল না। নিকটবর্তী সময়ের সেই ওহুদের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের তায়েফের ঘটনার দুঃখ কষ্টকে অধিক বলা কতই না তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষতঃ এত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তায়েফের দুঃখ-কষ্টের বিষয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তরে দাগ কাটিয়া থাকা কি সহজ কথা!

নবীজীর সঙ্গী ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ) নিজের জান প্রাণ দিয়া নবীজী (সঃ)-কে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি একা এই পরিস্থিতিতে কি করিতে পারেন! তিনিও মাথায় ভীষণভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আল্লাহর পেয়ারা রসূল নবীজী মোস্তফা (সঃ) ক্রমশঃ অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাষণ্ডদের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। এমতাবস্থায় তিনি পথিপার্শ্বে একটি বাগানের নিকট পৌছিলেন। বাগানটি ছিল মক্কার দুই ভ্রাতা রবিয়া পুত্র ওতবা ও শায়বার। মালিকদ্বয় বাগানে উপস্থিত ছিল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ বাগানে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তাঁহার দেহ এবং পা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; এই সময় দূর্বত্তরা চলিয়া গিয়াছে; নবীজীর স্বস্তি চেতনাও কিঞ্চিত ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন যে, অবস্থার অনুভূতি করার মত' জ্ঞান বোধ তাঁহার ফিরিয়াছে। এই সময় তিনি শান্তি লাভের জন্য শান্তির মূল কেন্দ্র রহমানুর রাহীম রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকর্তা প্রভু পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। হাদীছে আছে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ছিল নিম্নরূপ–

عَنْ حُزَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ صَلّٰى

অর্থ ঃ "ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল– কোন বিষয়ে যখন তিনি বিব্রত হইতেন, চিন্তা ও অশান্তি অনুভব করিতেন, তখন তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন। (মেশকাত শরীফ– ১১৭)

সেমতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই চরম দুঃখ-বেদনা, দুরবস্থা ও দুর্দশার সময়ে শরণাপন্ন হইলেন পরম আপন আল্লাহ তাআলার এবং দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে তিনি ঐ মহানের দরবারে মোনাজাতের হাত তুলিলেন, যাঁহার পথে তিনি এই দুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হইয়াছেন। (যোরকানী, ১–৩০৫)।

নবীজী (সঃ) সেই মহানকেই একমাত্র আপনজনরূপে সম্বোধন করিয়া দোয়া প্রর্থনা করিলেন। দুরবস্থার চরম দৃশ্যের সম্মুখে নবীজীর ঐ প্রার্থনার প্রতিটি পদ ও বাক্যই ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহতে আত্ম নির্ভরশীলতায় পূর্ণতম এবং পূণ্যতম আদর্শ।

নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশাল অন্তরে যে অসীম প্রেরণার ভীষণ উচ্ছ্বাস ছিল, আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাসের যে অটুট বন্ধন ছিল, আল্লাহ অনুরক্তির যে অসাধারণ ভাবাবেগ ছিল– এই প্রার্থনা বা দোয়াটি তাহার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

দোয়াটির আবেগপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিমায় শত্রুও বলিতে বাধ্য হয়– বিশ্বের প্রতি নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামে আহ্বান যে স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক সেই বিশ্বাসের উপর তীব্র আলোকপাত করে তাঁহার এই প্রার্থনা বা দোয়া।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রচনার নামে নিকৃষ্টতম শত্রুতার অবতারণাকারীও আলোচ্য দোয়াটির ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া স্বীকার করিয়াছে।

It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling (life of mohamet, by mwir)। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهُوَ انِىْ عَلَى النَّاسِ ـ اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ ـ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَهَجَّمُنِىْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلاَ اُبَالِىْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ ـ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ اَلَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ يَّنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ

অর্থ ঃ "আয় আল্লাহ! তোমারই নিকট ব্যক্ত করিতেছি আমার দুর্বলতা ও এই লোকদের দৃষ্টিতে আমার হেয়তা। হে আল্লাহ হে পরম দয়াময়! তুমি সকল দুর্বলদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, তুমিই আমারও পালনকর্তা রক্ষাকর্তা। তুমি আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিতেছ? অপরের হস্তে– যে আমার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হইয়া আসে বা শত্রুর হস্তে– যাহার ক্ষমতায় দিয়াছ আমার সব কিছু? প্রভু হে! (আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ,) আমার প্রতি তোমার অসন্তোষ না থাকিলে আমি এই সব বিপদ-আপদের কোন পারওয়া করি না; তবে তোমার নিরাপত্তা ও শান্তির দান আমার জন্যও প্রশস্ত। (আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন?) প্রভু হে! তোমার যেই পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সর্ববিষয়ে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়– সেই পুণ্য জ্যোতির স্মরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অসন্তোষ যেন আমাকে ছুঁইতেও না পারে, তোমার কোপ বা অনল দৃষ্টি যেন আমার উপর পতিত না হয়। তোমার সন্তোষই আমার একমাত্র কাম্য! আমি যেন সর্বদা তোমার সন্তোষ লাভ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাক ইহাই আমার আরাধনা। আমার বল-ভরসা একমাত্র তুমিই, তুমি ভিন্ন আমার কোন সম্বল নাই; আমার শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু তোমার উপর নির্ভর করে। (বেদায়া ৩–১৩৬)

বাগানের মালিক ওতবা ও শায়বা কাফের, ইসলাম ও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরম শত্রু ছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাহারা কাফের থাকিয়া বদর রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাগানে উপস্থিত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রক্ত-ঝরা দেহের এমনই মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল যে, তাহা দেখিলে পরম শত্রু চরম নিষ্ঠুর না হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের করুণ অবস্থাদৃষ্টে ওতবা ও শায়বার ন্যায় পরম শত্রুর অন্তরেও দয়ার সৃষ্টি হইল। তাহাদের বাগানের মালী ছিল এক খৃষ্টান "আদ্দাস রুমী"; তাহারা মালীকে বলিল, গাছের এক ছড়া আঙ্গুর পাত্রে করিয়া ঐ লোকটিকে দিয়া আস; তাঁহাকে তাহা খাইতে বলিবা। আদ্দাস হযরতের সম্মুখে আঙ্গুরের ছড়া রাখিয়া দিল। হযরত (সঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করা আরম্ভ করিলেন।

আদ্দাস উক্ত বাক্য শ্রবণে হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইল এবং বলিল, এইরূপ বাক্য ত এই দেশের
লোকের মুখে কখনও শুনা যায় না। হযরত (সঃ) তাহার ধর্ম ও দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল,
আমি ঈসায়ী ধর্মের, আমার দেশ হইল (ইরাকস্থিত "মাসুল" এলাকায়) "নীনওয়া" অঞ্চলে। হযরত (সঃ)
বলিলেন, তাহা ত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর দেশ। হযরতের এই উক্তিতে আদ্দাস
আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহা জানেন কিরূপে? হযরত (সঃ) বলিলেন, তিনি আমার
সমশ্রেণীর ভ্রাতা– তিনি আমার মতই এক জন নবী ছিলেন। এত শ্রবণে আদ্দাস হযরতের হাত, পা, মাথা
চুম্বন করত ইসলাম গ্রহণ করিলেন।*

এইরূপ অসহনীয় কষ্ট যাতনার ভিতর দিয়া হযরত (সঃ) শুধু তায়েফ নগরীতে দশ দিন এবং আশে-পাশে
আরও কয়েক দিন ইসলাম প্রচারের কাজ চালাইলেন। এই সফরে তাঁহার সর্বমোট এক মাস ব্যয় হয়, কিন্তু
তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়া তায়েফে সফর করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য হাসিল হইল না– তায়েফবাসী বনু সাকীফ
গোত্র ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল না।

তায়েফবাসীরা হযরতের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে; অত্যাচারী জালেমদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ ও
বদ দোয়া এবং ধ্বংস কামনা করিবার তাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময় ছিল। কিন্তু হযরত (সঃ) তাহাদের প্রতি বদ
দোয়া করেন নাই; কি বলিষ্ঠ ছিল বিশ্ব নবীর বিশ্ব প্রেম! কি প্রাণঢালা মমতা ছিল মানুষের প্রতি! কত প্রশস্ত
ছিল তাঁহার হৃদয়! এমনকি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত
হইয়াছে; হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে অনুমতি দিলেই তাঁহারা সমস্ত তায়েফবাসীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া
দিবেন, কিন্তু দয়ার সাগর, ধৈর্যের পাহাড় রাহমাতুল্লিল আ'লামীন (সঃ) সেইরূপ অনুমতি মোটেই দেন নাই।
বরং তাঁহাকে চিনে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষমার্হ গণ্য করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করিয়াছেন
এবং তাহাদিগকে হেদায়েত দান করার জন্য দোয়া করিয়াছেন। তাঁহার আশা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এই
উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও বর্তমান তায়েফবাসী আমার প্রতি ঈমান আনিল না, আমাকে আঘাত
করিয়া তাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ঔরষের সন্তান-সন্ততি হয়ত ঈমান আনিবে।
এইসব বিষয় আল্লাহর দরবারে উল্লেখ করিয়া হযরত (সঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর গজব হইতে রক্ষার চেষ্টা
করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে ১৫৯৪ নং হাদীছে স্বয়ং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্তব্যে এইসব তথ্য
বর্ণিত আছে।

সাধনার ফলে ধারণা বহির্ভূত আল্লাহর রহমত আসে

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তায়েফ এলাকায় আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য কি সাধনাই না করিলেন!
তায়েফবাসীকে আল্লাহর দ্বীন বুঝাইবার চেষ্টায় কত অত্যাচার নির্যাতনই না ভোগ করিলেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত
তিনি তায়েফে তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা হইতে নিরাশ হইলেন এবং সফর সমাপ্তে ব্যর্থতার ব্যাখ্যা ও
নিরাশার বিষণ্ণতা লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তনে তায়েফ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই সাধনা, এই নির্যাতন
ভোগ কি একেবারে বিফল যাইবে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন– إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠাবান লোকদের প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না।"

* ১৯৬১ সনে পবিত্র হজ্জের সুযোগে আল্লাহ তাআলা এই নরাধমকে তায়েফ উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছিলেন।
এখনও তথাকার বড় একটি রাস্তা "শারেয়ে আদ্দাস আদ্দাস রোড" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে।
বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া উক্ত বাগান স্থানেও পৌঁছার তওফীক হইয়াছিল। এখনও তথায় আঙ্গুর শফরি, আঞ্জির ইত্যাদি বিভিন্ন
ফলফলাদীর সমাবেশে একটি উর্বর বাগান রহিয়াছে। বাগানের এক স্থানে ছোট একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহা "মসজিদে আদ্দাস"
নামে আখ্যায়িত। মনে হয় ঐ স্থানটিতেই হযরত (সঃ) বসিয়া ছিলেন এবং আদ্দাস আঙ্গুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়াছিলেন।
এই নরাধমকে আল্লাহ তাআলা ঐ মোবারক মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ অনুরাগী হইবে আল্লাহ তাহার উদ্ধার লাভের পথ করিয়া দিবেন এবং তাহার রিযিক (সাফল্য) যোগাইবেন এমন জায়গা হইতে যেখানে হইতে রিযিক লাভের ধারণাও তাহার ছিল না।"

তায়েফের সাধনার ফল চেষ্টার সাফল্য নবীজী (সঃ) তায়েফে লাভ করিতে পারিলেন না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র হইতে নবীজির ধারণা বহির্ভূত এক সাফল্য দান করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারের আশাতীত ব্যবস্থা করিলেন।

নবীজী (সঃ) তায়েফ হইতে যাত্রা করিয়াছেন; তায়েফের লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করাইতে পারিলেন না– মনে তাঁহার কত ব্যথা কত নিরাশা! ইহারই মাঝে আনন্দ লাভের এক বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন আল্লাহ তাআলা। নবীজী মোস্তফা (সঃ) শুধু মানুষের নবী নহেন, তিনি জিনদেরও নবী। জিনদেরকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করানোও তাঁহার দায়িত্ব।

তায়েফ হইতে ফেরার পথে মক্কা হইতে মাত্র এক দিনের পথ ব্যবধানে "নাখ্‌লা" নামক জায়গা; নবীজি (সঃ) তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। গভীর রাত্রে নবীজি (সঃ) নামাযে দাঁড়াইয়াছেন; অন্ধকার রজনীতে প্রাণ ঢালা আবেগ মিশাইয়া মধুর সুরে তিনি মাবুদের কালাম পবিত্র কোরআন সশব্দে তেলাওয়াত করিয়া যাইতেছেন। জ্বিনদের সাত বা নয় সংখ্যক একটি দল ঐ পথে যাইতেছিল। তাহারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাত ঈমান গ্রহণ করিল এবং নবীজীর সঙ্গে তাহাদের আলাপও হইল। নবীজী (সঃ) তাহাদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৯ নং হাদীছে এই জ্বিন দলেরই উল্লেখ রহিয়াছে। জ্বিনদের এই অপ্রত্যাশিত ঈমান গ্রহণের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে–

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوا اَنْصِتُوْا ـ
فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (আপনার প্রতি আমার বিশেষ রহমতের একটি ঘটনা–) যখন ধাবমান করিলাম আপনার দিকে জ্বিনদের একটি দল; তাহারা কোরআন শুনিল এবং নিকটে আসিয়া পরস্পর বলিল, চুপ করিয়া শোন। যখন (আপনার পড়া) শেষ হইল তখন তাহারা (ঈমান গ্রহণপূর্বক) নিজেদের জাতির প্রতি চলিয়া গেল; তাহাদের পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করিতে লাগিল। তাহারা দেশে যাইয়া বলিল, হে আমাদের জাতি! আমরা এক মহান কিতাবের পড়া শুনিয়া আসিয়াছি যাহা মূসা নবীর (আঃ) পর অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারীই বটে। ঐ মহান কিতাব সত্যের প্রতি এবং (আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার) সঠিক পথের উজ্জ্বল দিশারী। হে আমার জাতি! সাড়া দাও আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণ কর; পরওয়ারদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব হইতে তোমাদের বাঁচাইয়া রাখিবেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না আল্লাহর আযাব সে কোন মতে ঠেকাইতে পারিবে না এবং আল্লাহ ভিন্ন তাহার কোন সাহায্যকারীও হইবে না।, ঐ শ্রেণীর লোক সুস্পষ্ট ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (পারা–২৬, রুকু–৪)

আল্লাহ তাআলার কি রহমত! তায়েফ বাসীদের হেদায়েতের জন্য নবীজী (সঃ) কত কষ্ট না করিলেন। তাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিল না। আল্লাহ তাআলা নবীজীর সাধনা ও ধৈর্যের সুফল সাফল্য অন্যত্র হইতে দান করিলেন। সুদূর "নসীবীন" নামক এলাকার বাসিন্দা জ্বিনদের এই দলটিকে এই পথে নিয়া আসিলেন। কোন প্রকার চেষ্টা কষ্ট ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মুসলমান দলভুক্ত পাওয়া গেল। তাহারা অনায়াসে ঈমান গ্রহণ

করিল এবং নিজেদের বিরাট সম্প্রদায়ে দ্বীন ইসলামের বড় কর্মী ও প্রচারকের দায়িত্ব পালন করিল। সাধনা ও ধৈর্যের ফল এইভাবেই লাভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দীর্ঘ দিন পূর্বে নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে একদা নবীজী মোস্তফা (সঃ) দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্যে আরবের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক হাট "ওকায" মেলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ও নবীজী (সঃ) সঙ্গীগণসহ এই "নাখ্‌লা" এলাকায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন এবং জামাত করিয়া প্রভাতী নামায পড়িয়াছিলেন। তখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল একদল জ্বিন তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র কোরআন শ্রবণে মুসলমান হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও জ্বিন সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রচারের বিরাট কাজ সমাধা হইতেছিল। তাহাদের ঘটনা বর্ণনায়ও পবিত্র কোরআনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল- যাহা ২৯ পারায় "সূরা জ্বিন" নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৭ নং হাদীছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত আছে।

তায়েফ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ এক মাসের সফর শেষ করিয়া হযরত (সঃ) মক্কাপানে ফিরিলেন এবং মক্কা নগরীর হেরা পর্বত এলাকায় আসিয়া থামিলেন। মক্কা নগরীতে তখন হযরতের কোন বাহ্যিক সাহায্যকারী ছিল না, অথচ এখন ঐরূপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কারণ, মক্কার শত্রুদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হযরত (সঃ) তায়েফ গিয়াছিলেন। তথা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। এখন স্বাভাবিকরূপেই মক্কার শত্রুগণ আরও অধিক জুলুম অত্যাচারে মাতিয়া উঠিবে। এমতাবস্থায় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপনে নবীজী মোস্তফা (সঃ) অপেক্ষা অধিক দৃঢ় দুনিয়াতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। মদীনায় হিজরত উপলক্ষে সওর পর্বত গুহায় লুকাইয়া থাকাবস্থায় প্রাণঘাতী শত্রুরা খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক ঐ গুহার কিনারার নিকট পৌঁছিল। গুহার ভিতর হইতে সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শত্রুরা নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদের দেখিয়া ফেলিবে। এই ভয়াবহ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও নবীজি মোস্তফা (সঃ) পূর্ণ অবিচল পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল ছিলেন। তিনি ধীরস্থির, শান্ত ও গম্ভীর স্বরে আবু বকরকে সান্ত্বনা দানে বলিলেন- لا تحزن ان الله معنا "চিন্তা করিও না; আল্লাহ তাআলা আমাদের সঙ্গে আছেন।" এই শ্রেণীর ঘটনা ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

কিন্তু নবীজি মোস্তফা (সঃ) ছিলেন আদর্শ মানব, অনুসরণীয় নমুনা। বিশ্ব মানবের জন্য করণীয় পন্থা নির্ধারক। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান হইল- মানুষ তাহার সাধ্য সামর্থ্যানুযায়ী উসিলা বা অবলম্বন গ্রহণ করিবে; কার্যকারণ জগতে তাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দান লাভ হইবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লাহর নিকট তাঁহার দান চাওয়া হইলে তাহা বেআদবী গণ্য হয়।

আলোচ্য ঘটনায় মক্কায় প্রবেশ করিতে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনে নবীজীর (সঃ) বিন্দুমাত্র সংশয় বা দূর্বলতা ছিল না! কিন্তু তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের জন্য আদর্শ ও ইসলামের নীতি নির্ধারক ককর্মপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হেরা পর্বত এলাকায় থামিয়া আরবের রীতি অনুযায়ী কোন একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সমাজগত আশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট হযরত (সঃ) এই মর্মে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই পাশ কাটিয়া গেল। অবশেষে মক্কার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী- যিনি পূর্ব হইতেই হযরতের দরদী ছিলেন; হযরত (সঃ) এবং বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা খণ্ডন করার ব্যাপারে এই মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী একজন অন্যতম প্রচেষ্টাকারী ছিলেন। আজও সেই মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী হযরত (সঃ)-কে আশ্রয় দানের সৌজন্য বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিল। হযরত (সঃ) তাহার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

সকাল বেলা আনুষ্ঠানিকরূপে আশ্রয় প্রদানের ঘোষণা জারির করার জন্য মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী তাহার সাত পুত্রসহ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতকে লইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল এবং তাহাদের প্রহরার মধ্যে হযরতকে তওয়াফ করার অনুরোধ করিল। হযরত (সঃ) তওয়াফ করিতে লাগিলেন। মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী স্বীয় বাহনের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিলেন–

يا معشر قريش انى قد اجرت محمدا فلا يهجه احد منكم -

অর্থ ঃ "হে কোরায়শগণ! তোমরা জানিয়া লও যে, আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি; খবরদার! তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাঁহাকে কোন প্রকার বিব্রত না করে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২১২)

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপকারীজনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন। মোতয়ে'ম ইবনে আ'দীর এই উপকার হযরত (সঃ) সর্বদা স্মরণ রাখিয়াছেন, এমনকি বদরের যুদ্ধ-বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সকলের সুপারিশই হযরত (সঃ) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আজ মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত তবে তাহার সুপারিশে আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম।"

১৬৯৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫৭৩) عن جبير ابن مطعم رضى الله عنه انَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ اسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى فَتَرَكْتُهُمْ لَهٗ -

অর্থ ঃ মোতয়ে'ম ইবনে আ'দীর পুত্র ছাহাবী জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বদর জেহাদের যুদ্ধবন্দীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, যদি আজ মোতয়েম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত এবং সে এই (বন্দী) অপদার্থগুলি সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত, তবে আমি তাহার খাতিরে এইগুলিকে (মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই) ছাড়িয়া দিতাম।

বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচারে নবীজীর (সঃ) তৎপরতা

"মন্ত্রে সাধন কিম্বা শরীর পাতন"

دست ازطلب ندارم تا كام من برايد

يا تن رسد بجانان يا جان زتن برايد

"উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।
হয় উদ্দেশ্যে সফল হইব, না হয় জীবন বিলাইয়া দিব।"

এই সব প্রবাদ মানুষ মুখে বলে; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই প্রবাদকে কার্যে পরিণত করিয়াছেন। মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাইতে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করিতে বিরামহীন সংগ্রাম সাধনা করিয়া চলিয়াছেন তিনি। দীর্ঘ দশ বৎসর সর্বপ্রকার আপদ বিপদ ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়া ঐ সাধনা চালাইলেন স্বীয় জন্মভূমি মক্কায়। চরম অত্যাচার এবং চরম বাধাবিঘ্ন বিন্দুমাত্র দমাইতে পারিল না নবীজী (সঃ)-কে তাঁহার সংগ্রাম সাধনায়। কিন্তু আবু তালেব ও বিবি খাদীজার মৃত্যুর পর মক্কা এলাকায় আর ঐ কাজ চালাইবার কোন অবকাশই থাকিল না। তবুও নবীজী (সঃ) ক্ষান্ত হইলেন না নিজ দায়িত্ব কর্তব্য হইতে; ৭০/৮০ মাইল দুর্গম পথ পায়ে হাঁটিয়া কত কত গিরি-কান্তার পার হইয়া তিনি

তায়েফে পৌছিলেন। তথায় বিঘ্ন-বিপত্তির বিভীষিকা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, নিরাশার অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিল, সফলতার কোন আলোই দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দেশ্যের সংগ্রামে কোন সম্বল নাই, আশ্রয় নাই, কিন্তু আছে তাঁহার অদম্য সাহস-উদ্যম এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠ লক্ষ্য দায়িত্ব পালনের আকুল আগ্রহ ও সুদৃঢ় স্পৃহা। তাই তিনি শত দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য বলিয়া বেশ কিছু দিন চেষ্টা-সাধনার মধ্যে তায়েফে অতিবাহিত করিলেন। শেষ পর্যন্ত তায়েফ হইতেও নবীজী (সঃ)-কে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এখনও কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসে নাই; এখনও তিনি স্বীয় কর্তব্য পালনে ও দায়িত্ব বহনে পর্বত অপেক্ষা অধিক অনড় অটল।

মানুষকে তাহার কর্মস্পৃহাই বিভিন্ন পথের খোঁজ এবং বিভিন্ন কৌশলের সন্ধান বাহির করিয়া দেয়। নবজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা তাহাই ছিল। তিনি মক্কায় স্বীয় কৃতকার্যতার পথ রুদ্ধ দেখিয়া তায়েফে গেলেন; তায়েফ হইতে নিরাশরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বীন ইসলামের প্রচার অভিযানে আর এক সুযোগ উপস্থিত দেখিলেন এবং অবিলম্বে তাহার সদ্ব্যবহারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ইসলাম প্রচারে পূর্ব হইতেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ইহাও ছিল যে, বিভিন্ন এলাকা ও দেশ হইতে আগন্তুকদের সমাবেশস্থল বড় বড় বাৎসরিক হাট বা মেলায় বিশেষত হজ্জের মৌসুমে মিনায় যখন দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকদের বিপুল সমাবেশ হইত তখন এক এক গোত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আকর্ষণীয় উদাত্ত আহ্বানে তাহাদের চমকিত করিয়া তুলিতেন।

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি দেখিয়াছি "জুল-মাজায" মেলায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের সমাবেশে এই আহ্বান জানাইতেছিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُولُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

হজ্জ উপলক্ষে মিনায়ও নবী (সঃ) বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাইয়া আহ্বান করিতেন–

يَا بَنِىْ فُلاَنٍ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ اٰمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَنْ تَخْلَعُوْا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ هٰذِهِ الْاَنْدَادِ وَاَنْ تُؤْمِنُوْا بِىْ وَتُصَدِّقُوْا بِىْ وَتَمْنَعُوْنِىْ حَتّٰى اُبَيِّنَ عَنِ اللّٰهِ مَا بَعَثَنِىْ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ "হে অমুক গোত্রীয় লোকগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রসূল। আমি তোমাদের এই কথাই বলি যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না। আর তোমরা ত্যাগ কর আল্লাহ ভিন্ন ঐ সব দেব-দেবী ঠাকুর-মূর্তি যেসবের পূজা তোমরা করিয়া থাক। আর তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন, আমাকে বিশ্বাস কর এবং আমি আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম প্রচার করিতে পারি সেই জন্য তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা কর।" (বেদায়া, ৩–১৩৮)

কোন কোন সময় হযরতের অনুরোধ এইরূপ হইত–

لاَ اُكْرِهُ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَلٰى شَىْ بَلْ اُرِيْدُ اَنْ تَمْنَعُوْا مَنْ يُّؤْذِيْنِىْ حَتّٰى اُبَلِّغَ رِسَالاَتِ رَبِّىْ

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের কাহারও উপর কোন বিষয়ে জবরদস্তি করিব না, আমি তোমাদের নিকট শুধু এতটুকুই চাই যে, তোমরা কাহাকেও আমার উপর জুলুম-অত্যাচার করিতে দিও না; আমি যেন আমার প্রভু পরওয়ারদেগারের প্রেরিত বিষয়সমূহকে তাঁহার বান্দাদের সম্মুখে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।"

কোন কোন সময় হযরত (সঃ) এইরূপও বলিতেন–

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهٖ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّىْ -

অর্থ ঃ "আছে কেহ? যে আমাকে তাহার দেশে-খেশে লাইয়া যায়, আমি তাহার আশ্রয়ে পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে পারি; আমার জাতি কোরায়েশরা আমাকে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে দেয় না।" (যোরকানী, ১-৩০৯)

এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বান সকলেই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার বংশধরগণই ভালরূপে জানিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনার বংশধর কোরায়শ আপনাকে গ্রহণ করে নাই; আমরা গ্রহণ করিব কেন?

তায়েফ হইতে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং উৎপীড়িত অত্যাচারিত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর মুহূর্তেই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার উল্লিখিত প্রচেষ্টার একটি সোনালী সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত পাইলেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারেই নবীজী (সঃ) তাঁহার সাধনায় সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছিলেন, তাঁহার তের বৎসরের ও সবরে মেওয়া ফলার মৌসুম আসিল। ইসলামের উন্নতি, অগ্রগতি ও গৌরব লাভের কেন্দ্র সোনার মদীনায় ইসলামের ও নবীজীর (সঃ) আশ্রয় লাভের সুবর্ণ সুযোগের সূচনা হইল।

ইসলাম মদীনাপানে

মক্কায় ইসলামের আশ্রয় লাভ হইবে সেই আশা মোটেই থাকিল না, তাই নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তায়েফে গেলেন। তায়েফের ভাগ্যেও এই মঙ্গল জুটিল না। নবীজী (সঃ) তায়েফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নবুয়তের দশম বৎসর শওয়াল মাসের শেষ দিকে নিবীজী (সঃ) তায়েফপানে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এই সফরে এক মাস সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। সুতরাং নবীজী (সঃ) যিলকদ মাসের শেষ দিকে তায়েফ হইতে মক্কায় পৌঁছিয়াছিলেন। পরবর্তী মাসই হইল হজ্জের মাস– জিলহজ্জ মাস; এই মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখে হজ্জ উপলক্ষে মিনায় বহু লোকের সমাগম হইবে। দূর দূর এলাকা হইতে হজ্জের জন্য আগত অসংখ্য লোক জমায়েত হইবে এই মিনায়। নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্বব্যহারে প্রস্তুত হইলেন পূর্ণ উদ্যমে। মক্কার পিশাচরাও বসিয়া নাই। তাহারাও নবীজির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য, তাঁহার কুৎসা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিল এবং লোকদের নিকট তাঁহাকে ভণ্ড, পাগল, জাদুকর, গণৎকার ইত্যাদি সাব্যস্ত করার অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হজ্জ উপলক্ষে মিনায় জনসমাগম হইল; কোরায়শ দুষ্ট-দুরাচাররা লোকদের ঘাটিতে ঘাটিতে আড্ডায় আড্ডায় যাইয়া নবীজী (সঃ)-এর কুৎসা করিতে লাগিল। পিশাচ আবু লাহাব ত নবীজী (সঃ)-এর পিছনে সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করিয়াছেন– আমি আমার পিতার সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলাম। আমরা মিনায় অবস্থান করিতেছি এমন সময় হযরত (সঃ) সেখানে আগমন করিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন– "তোমরা শুন, আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা এক আল্লাহরই উপাসনা কর; তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিও না! দেব-দেবী ঠাকুর-প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া দাও।" তখন হযরতের পিছনে পিছনে একজন টেরা মানুষ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, সাবধান! হে লোকসকল! এই বেটা তোমাদেরকে নিজের নূতন ধর্ম এবং ভ্রষ্ট দলে ভিড়াইয়া লাত-ওজ্জা দেবীদের হইতে এবং তোমাদের মিত্র দল জ্বিনদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চায়। তোমরা তাহার কথা মানিও না, তাহার কথা শুনিও না। এই বেটা মিথ্যাবাদী, বিধর্মী।

ঘটনা বর্ণনাকারী বলিলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই পিছনে পিছনে ধাবমান লোকটি কে? তিনি বলিলেন, সে ঐ লোকটিরই পিতৃব্য আবু লাহাব। (বেদায়া– ১-১৩৮)

আবু জাহল আবু লাহাব গোষ্ঠী যাহারা হযরতের স্বজন বলিয়া পরিচিত, তাহাদের এহেন প্রচারে হযরতের পক্ষে ইসলামের প্রচারকার্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। এইভাবে অটল, সঙ্কল্প ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে পারেন সত্যের সাধনা তাঁহারই সার্থক হইয়া থাকে এবং এইরূপ সত্যের সেবক সাধক জনই আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্য পাত্র। এই ভূমিকায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ এই প্রতীয়মান হয় যে, কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ফলাফল মানুষের হাতে নহে, অতএব তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়া উচিত নহে। কর্তব্য পালন না করিলে আল্লাহর নিকট অপরাধী হইবে এই তাকিদে কর্তব্য করিয়া যাওয়াকেই বৃহত্তম সফলতা বিবেচনা করা চাই।

একদিকে কোরায়শ সর্দারগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, জাদুকর ইত্যাদি বলিয়া লোক সম্মুখে অপদস্ত করার চেষ্টা চালাইতেছে, তাঁহার উপর ধূলা-বালু নিক্ষেপ করিতেছে, প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্বশরীর জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। অপর দিকে নবীজি মোস্তফা (সঃ) মুখে ঘোষণা দিতেছেন- "জোর নাই, জবরদস্তি নাই- আমার কথাগুলি যাহার পছন্দ হইবে সে গ্রহণ করিবে। আমি কাহারও উপর জবরদস্তি করিতে চাই না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত যেন কেহ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে না পারে- যাহার ফলে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।*

মৌখিক এই শান্তির ঘোষণা অপেক্ষা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরিত্র মাহাত্ম্যের ঘোষণা আরও অধিক উন্নত ও অমিয় ছিল যে, বিতণ্ডা নাই, হানাহানি নাই, বিতর্ক নাই, গালির পরিবর্তে গালি নাই, এমনকি অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ পর্যন্ত নাই। আছে শুধু একনিষ্ঠতার সহিত দায়িত্ব পালন, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য পালন। আর আছে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া যাওয়া।

মানুষ প্রতি পদক্ষেপে সফলতা দেখিয়া জনকণ্ঠের প্রশংসাধ্বনিতে আনন্দ পাইয়া পুলকিত ও উৎসাহিত এবং অধিক উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রগামী হইয়া পারে। কিন্তু এই উদ্যম উৎসাহ প্রদর্শনে বিশেষ বাহাদুরী নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রশস্ত আয়তনে সফলতার নামমাত্র নাই, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদানের শব্দমাত্র নাই, আছে কেবল দূর দূর, ছিঃ ছিঃ, গালাগালি নিন্দা-মন্দ, মিথ্যারোপ ও দোষারোপ- এইরূপ ক্ষেত্রে কর্তব্য আঁকড়াইয়া থাকা, সত্যকে বলিষ্ঠ হস্তে ধরিয়া রাখা, সত্য প্রচারের অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকা, উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রখর ও অটুট রাখা মাত্র মহত্ত্বের মহাপালোয়ান এবং আদর্শের মহাপুরুষ জনেরই কাজ। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই মহত্ত্বের ও আদর্শের যেই পরিচয় তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় দিতেছিলেন তাহার তুলনা জগতে মিলিবে না।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই সাধনা, এই ধৈর্য কি সত্যই বিফল যাইতেছিল? কখনও নহে। নবীজী (সঃ) যে বিভিন্ন সম্মেলন-সমাবেশে এতদিন অবিশ্রান্তভাবে সত্য ধর্ম ও আল্লাহর বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইলেন, তাহাতে বিভিন্ন দেশের সমাগত হাজার হাজার মানুষ নবীজীর মুখ হইতে আল্লাহর মহিমা-গান শ্রবণ করিল, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ সম্বন্ধে অজানা তথ্যাবলী অবগত হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি নিজেদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে অশ্রুতপূর্ব উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইল। নিজেদের স্বহস্ত নির্মিত দেবতা প্রতিমাগুলির অপদার্থতা ও অক্ষমতার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মদ্যপান, যেনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি মহাপাপসমূহের অনিষ্ট অবগত হইতে পারিল। এইসব সত্যের ঝঙ্কার কোন দিন কাহারও কর্ণ হইতে মর্মে নামিয়া আসিবে- এইরূপ কি হইবে না? নিশ্চয় হইবে এবং ইহাই চরম সাফল্য। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় এই সুন্নত ও আদর্শ কার্যত শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্তী সকল জীবনে তিনি ইহাই মৌখিক শিক্ষাদানে বলিয়াছেন-

لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ -

অর্থ ঃ "তোমার চেষ্টা সাধনায় একটি মানুষেরও হেদায়েত লাভ হয়- ইহা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বস্তু।"

ইসলামের তবলীগ উদ্দেশে হযরত (সঃ) প্রতিটি লোক সমাবেশস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং সত্যের ডাক ইসলামের আহ্বান প্রতি কানে কানে ও ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতেন। এমনকি সেই যুগের "ওকায", "জুল-মাজায:, "মাজান্নাহ্" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বাৎসরিক হাট বা মেলায়ও হযরত (সঃ) উপস্থিত হইতেন এবং লোকদিগকে সত্যের প্রতি- ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেন। বিশেষত দীর্ঘ তিন বৎসরকাল অসহযোগিতা ও বয়কটের সঙ্কট হইতে বাহির হইয়া এই দশম বৎসর ত হযরত (সঃ) রজব মাস হইতেই বিভিন্ন গোত্রের বস্তিসমূহে উপস্থিত হইয়া ঘরে ঘরে ইসলামের ডাক পৌঁছাইবার এক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে হযরত (সঃ) ঐতিহাসিক তায়েফ সফর আশে-পাশের পনরটি গোত্রের বস্তিতে সফর করিয়াছিলেন!

(সীরাতুন নবী ১-১৯৩ এবং আসাহুস সীয়ার ১০৩)

সত্যের সাধনায় স্বর্গ ফলে, সবরে মেওয়া ফলে। অসংখ্য ঝিনুক কুড়ানো হয়- তাহার কোন একটার মধ্যে মতি মুক্তা হাতে পাওয়া যায়। নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক দশকের সাধনা এবং ধৈর্যও এই পর্যায়ে উপনীত হইল। নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে, চরম ব্যর্থতার দূরপ্রান্ত হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা একটা আশার আলো, সাফল্যের সূচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"মিনা" এলাকার সীমা সংলগ্নেই, একটি "আকাবা"* তথা গিরিপথ। হজ্জ মৌসুমে মিনা এলাকায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার ব্যতিব্যস্ততা ও ছুটাছুটিকালে ঐ আকাবার

নিকটবর্তী স্থানে ছয় বা আট জন লোককে দেখিতে পাইলেন। নবীজী (সঃ) তাহাদের নিকটে আসিলেন এবং পরিচয় জানিতে চাহিলেন; তাহারা মদীনাবাসী খায্‌রাজ গোত্রের বলিয়া পরিচয় দিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

---

* "আকাবা" সাধারণত কোন বিশেষ স্থানের নাম নহে; পর্বতমালার ফাঁকে- ফাঁকে বাকে যে দুর্গম পথ থাকে তাহাকেই বলে "আকাবা"। মিনার পশ্চিম প্রান্তে ঐরূপ একটি পথ ছিল এবং ঐ পথে পর্বত বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকিলেই মস্ত বড় ময়দান, যাহার চতুষ্পার্শ্ব উঁচু পাহাড় দ্বারা রূপে বেষ্টিত যে, ময়দানটি একটা মস্ত বড় গভীর পুকুরের ন্যায় দেখা যায়। উত্তর দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার যে পার্বত্য পথটি ছিল, যাহাকে "আকাবা" বলা হয়, উক্ত পথটুকু ছাড়া ঐ ময়দানের চতুর্দিকে উঁচু পাহাড় ভিন্ন কোনরূপ ছিদ্রও ছিল না, সুতরাং ঐ ময়দানে হাজার হাজার লোক বসিয়া কোন গোপন কাজ করিলে বাহির হইতে আভাস পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না।

মদীনায় ইসলামের প্রসার এবং তথায় বিশ্ব ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া এবং মদীনার আকাশে প্রিয় নবীর চন্দ্রোদয়ের ব্যাপারে উল্লিখিত আকাবার ময়দানটি ইতিহাসে আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কারণ, ঐ স্থানে নবুয়তের দশম বৎসর আলোচ্য ঘটনায় মদীনার ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া এই ইতিহাসের সূচনা করেন। পরবর্তী বৎসর ঐ স্থানেই বার জন মদীনাবাসী হজ্জ উপলক্ষে হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করার বায়আ'ত বা অঙ্গীকার করেন। তৃতীয় বৎসর এই সময়ে এই স্থানেই সত্তর জনের অধিক মদীনাবাসী হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাপকথন হইয়া বায়আ'ত অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত (সঃ) ব্যাপকভাবে মুসলমানগণকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হযরত (সঃ)ও হিজরত করেন। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

এই সব ঘটনা উল্লিখিত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যদ্দরুন মনে হয় পরবর্তীকালে মক্কায় তুরস্কের শাসন আমলে ঐ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মিত হয় যাহা "মসজিদে-আকাবা" নামে প্রসিদ্ধ।

১৯৫০ সনের হজ্জ উপলক্ষে আমি নরাধমের উক্ত মসজিদে হাযির হওয়ার এবং নামায পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত ময়দান ও এলাকটি সম্পূর্ণরূপে পুরাতন দৃশ্য বহন করিতেছিল যাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তীকালে উক্ত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া মিনা হইতে মক্কায় মোটর-বাস যাতায়াতের প্রশস্ত পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া দেওয়ায় মসজিদটি বড় রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়ান দেখা যায় এবং ঐতিহাসিক গুপ্ত ময়দানটির দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া ঐ এলাকাটির দৃশ্যই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। এমনকি ১৯৫৭ সনে আমি ঐ এলাকায় দাঁড়াইয়া সব কিছু যেন নূতন অনুভব করিতেছিলাম। বর্তমান দৃশ্যে ঐ এলাকার বিশেষ কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

আল্লাহর কুদরত মদীনায় ইহুদী জাতির আধিক্য এবং তাহারা আসমানী কিতাবের জ্ঞানবাহক। তাহারা জানিত এবং বলিয়া থাকিত যে, এক জন সর্বশেষ পয়গম্বরের আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্তী। এমনকি তাহার। ভেজাল তওরাত কিতাবের মর্মানুসারে অন্য জাতীয় লোকদিগকে তর্ক ও বিবাদস্থলে বলিয়া থাকিত যে, সেই নবীর আবির্ভাব হইলে পর তিনি আমাদের দলে যোগদান করিবেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিব। এই ধরনের কথা মদীনাবাসী লোকগণ ইহুদীদের মুখে অনেক সময়ই শুনিয়া থাকিত। (যোরকানী, ১-৩১০)

আজ মদীনার লোকগণ হযরতের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার কথাবার্তা ও কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া ইহুদীদের সেই কথা স্মরণে আসিল এবং পরস্পর বলিল, মনে হয় ইহুদীদের আলোচিত নবী ইনিই। অতএব আমরা এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িব না; ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হইয়া যায়। এই বলিয়া তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ছয় বা আট জন ছিলেন; সকলের নাম ও পরিচয় সীরাতের কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

এই ছয় বা আট জন লোক ইসলামকে তাহার আশ্রয়স্থল মদীনায় সর্বপ্রথম বহন করিয়া নিয়া আসেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিশেষ বরকত লাভ উদ্দেশে নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল। বস্তুত তাঁহারা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য বিশেষ উপকারী লোক ছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণের কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে ছয়টি নাম হইল-

১। আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ)- তিনি এই আকাবায় পর পর তিনটি সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত চিলেন। হিজরী প্রথম বৎসরই মদীনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

২। আওফ ইবনে হারেস (রাঃ)- তিনি বদর জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

৩। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ)- তিনি ওহুদ জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৪। কোতবা ইবনে আমের (রাঃ)- তিনিও আকাবার তিন সম্মেলনে এবং বদরসহ অনেক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা ওমর বা ওসমানের (রাঃ) আমলে মৃত্যু হয়।

৫। ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ)-তিনি বদরসহ সমস্ত জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) আমলে ইয়ামামার জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- তিনি বদর জেহাদ এবং আরও অনেক জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনার প্রসিদ্ধ ছাহাবী জাবের (রাঃ) নহেন; ঐ জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর বয়স এই সময় খুবই কম ছিল।

আরও ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হইল, যাঁহাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের কোন দুই জন হয়ত উপস্থিত ছিলেন।

---

* পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া তথা ইসলামের উন্নতির গোড়া পত্তনের ভিত্তিমূল ছিল এই আকাবার মধ্যে হযরতের সঙ্গে মদীনাবাসীদের গোপন সম্মেলন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই সম্মেলনকে "বায়আ'ত আকাবা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। "বায়আ'ত" অর্থ হাতে হাত দিয়া দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। এই সম্মেলন পর পর তিন বৎসরে তিন বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক তিন বৎসরের তিনটি সম্মেলনকে তিনটি "বায়আ'তে আকাবা" গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেস এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতে আলোচ্য দশম বৎসরের তথা প্রথম সম্মেলনটিকে বায়আ'ত নামে আখ্যায়িত করা ঠিক নহে। কারণ, এই উপলক্ষে শুধু মদীনাবাসী ছয় বা আট জন ইসলাম গ্রহণই করিয়াছিলেন। কোন প্রকার অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল না, যেরূপ পরবর্তী দুই বৎসর হইয়াছিল। এই সূত্রে "বায়আ'তে আকাবা" দুইটি গণ্য হইবে। (সীরাতে হলবিয়া ২-৮ ও আল বেদায় ওয়ান নেহায়া)

মদীনাবাসীদের সঙ্গে ঐ প্রথম মিলন এবং ছয় বা আট জনের ইসলাম গ্রহণ যে নবুয়তের দশম বৎসরে হইয়াছিল তাহা সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

(১) বরা ইবনে মারুর (রাঃ)। (২) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। (৩) মোআয ইবনে আফরা (রাঃ)। (৪) ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)। (৫) যাকওয়ান ইবনে কায়স (রাঃ)। (৬) আবুল হাইসম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ)।

নবীজী (সঃ) তাঁহাদের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, আমার মাবুদের পয়গাম পৌছাইবার জন্য (তোমাদের দেশে) তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে? তাঁহারা বলিলেন, বোআস যুদ্ধ* গত বৎসরও আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল– এমতাবস্থায় আপনি আমাদের দেশে পদার্পণ করিলে আমরা আপনার পশ্চাতে একমত হইয়া একত্রিত হইতে পারিব না; (ফলে শক্তি অর্জন করা সম্ভব হইবে না)। অতএব এখন আমাদেরকে দেশে যাইতে দিন। হয়ত অচিরেই আল্লাহ আমাদের পরস্পরে

সম্পর্ক ভাল করিয়া দিবেন এবং আমরা সকলকে ইসলাম ঐরূপে বুঝাইব যেমন আপনি আমাদের বুঝাইয়াছেন। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আপনার পশ্চাতে একত্র করিয়া দিবেন। যদি ঐরূপ হইয়া যায় এবং আমাদের সকলে একত্রিতভাবে একবাক্যে আপনার সঙ্গী অনুসারী হইয়া যায় তবে আপনার ন্যায় শক্তিশালী আর কেহ হইবে না। সুতরাং আগামী বৎসর পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা থাকিল। এই বলিয়া তাঁহারা মদীনায় চলিয়া গেলেন।

(যোরকানী– ১–৩১২)

তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করত হযরত (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি এখন বর্তমান অবস্থার উপর মক্কায়ই অবস্থান করুন। আমরা মদীনায় যাইয়া ইসলামের চর্চা করিব এবং তথাকার প্রধান গোত্রদ্বয়কে ইসলামের উপর একত্রিত করিবার চেষ্টা করিব, আগামী বৎসর এই সময়ে আপনার সঙ্গে পুনর্মিলনের ওয়াদা আমাদের রহিল। (সীরতে হলবিয়াহ, ১–৮)

এইরূপে সকলের অলক্ষ্যে ইসলামের জ্যোতি মদীনা নগরে প্রবেশ করিল। ইসলাম ও আল্লাহর বাণী মন ভরিয়া প্রচার করিবেন এইরূপ স্থানের তালাশেই নবীজীর দীর্ঘ সাধনা ও দীর্ঘ ত্যাগ; আজ সেই ত্যাগ ও সাধনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছে। নবীজী (সঃ) এখন ফলের প্রতীক্ষায় আশার সূত্রে দুলিতেছেন।

নবুয়তের একাদশ বৎসর– ঐতিহাসিক বায়আতে আকাবা * (পৃষ্ঠা ৫৫০)

উল্লিখিত ছয় বা আট জন যাঁহারা ইসলাম লাইয়া মদীনায় ফিরিলেন, বাস্তবিকই তাঁহাদের অন্তরে এক বিরাট জয্বা প্রেরণা ছিল মদীনার মধ্যে ইসলামকে ফুটাইয়া তোলার। তাঁহারা কার্যত প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণে মানুষের সাধনা শেষ হয় না; সাধনার সূত্রপাত হয় মাত্র। তাঁহারা সত্য সেবক ও খাঁটী প্রচারক হইয়া মদীনায় আসিলেন এবং মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা অনেকটা ফলপ্রসূ হইল; মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়া গেল। কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণও করিলেন, এমনকি এই বৎসর হজ্জ উপলক্ষে নূতন পূরাতন মিলাইয়া বার জনের একটি প্রতিনিধি দল সেই পূর্ববর্ণিত

---

* মদীনায় ইহুদী জাতি প্রবল ছিল, আর প্রবল ছিল পৌত্তলিক দুইটি গোত্র– "আওস" এবং "খায্রজ"। দীর্ঘকাল হইতে এই দুইটি গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল। যদ্দরুন তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভীষণ বিরোধ বিরাজমান ছিল; এক পক্ষ কোন কাজে অগ্রসর হইলেও অপর পক্ষ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত।

* আমরা নবুয়তের বৎসর নির্ধারণে চান্দ্র বৎসরের সাধারণ সীমা তথা "মহরম" হইতে "যিলহজ্জ" পর্যন্তকেই গণ্য করিয়াছি। কোন কোন লেখক "রবিউল আউয়াল" হইতে "সফর" পর্যন্ত তাহার সীমা ধরিয়াছেন যেহেতু হযরতের জন্ম রবিউল আউয়ালে ছিল; এই সূত্রে অনেক বৎসরের সংখ্যা নির্ধারণে এক বৎসরের বেশ কম হইবে।

আ'কাবায় হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন; তন্মধ্যে গত বৎসরের পাঁচ জন এবং অবশিষ্ট সাত জন এই বৎসরের নূতন ছিলেন। বারো জনের মোট দশ জন খায্‌রাজ গোত্রের আর দুই জন ছিলেন আওস গোত্রের। প্রথম বারের ছয় জন হইতে জাবের (রাঃ) ব্যতীত পাঁচ জন। অপর সাত জন এই–

(১) মোয়ায ইবনে আফরা (রাঃ)– তিনিসহ তাঁহার মা শরীক সাত ভাই বদর জেহাদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওহুদ জেহাদেও উপস্থিত ছিলেন।

(২) জাকওয়ান ইবনে কায়স (রাঃ)– তিনি ওহুদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৩) ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)– তিনি সব জেহাদে উপস্থিত ছিলেন।

(৪) আব্বাস ইবনে ওবাদা (রাঃ)– তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৫) এযীদ ইবনে সা'লাবা (রাঃ)–এই দশ জনই সকলই খায্‌রাজ গোত্রের ছিলেন। পরবর্তী দুই জন ছিলেন আওস গোত্রের।

(৬) আবুল হায়সাম ইবনে তায়েহান (রাঃ) তিনি বদর ও ওহুদসহ সব জেহাদেই অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

(৭) ওয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ)– তিনিও বদর, ওহুদসহ সব জেহাদেই অংশগ্রহণকারী ছিলেন। (যোরকানী, ১–৩১৩)

এই বার আকাবায় যেই সাক্ষাৎকার হইল, প্রথমবার অপেক্ষা ইহাতে একটি বিশেষ কাজ হইল যাহা প্রথম বারের সাক্ষাৎকারে হইয়াছিল না। প্রথম বারের উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ইসলাম গ্রহণপূর্বক শুধু আশ্বাস প্রদানেই মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, অঙ্গীকার গ্রহণপর্বের ব্যবস্থা হইয়াছিল না। এই বারের আগন্তুকবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের পর নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণপূর্বক বিশেষ বিশেষ প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন– যাহাকে বায়আ'ত বলা হয়।

বায়আ'তে আকাবা (৫০৫)

"বায়আ'ত" আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিতে " بيع বাইউন" শব্দের অনুরূপ যাহার অর্থ বিক্রয় করা। বিক্রয় ক্ষেত্রে এক পক্ষ হইতে বিক্রয় অপর পক্ষ হইতে ক্রয় হয়। উভয়ের কার্যকে আরবীতে "মোবায়াআত বলা হয়; যাহার ক্রিয়াপদ বায়াআ' য়ুবাএউ'। পরিভাষায় "বায়আ'ত" বলা হয় কোন মহানের হস্ত ধারণ করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রেও দুই পক্ষ হস্ত ধারণকারী প্রতিজ্ঞাকারী, অপর পক্ষ যাহার হস্ত ধারণ করা হয় যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হয়। এই ক্ষেত্রেও উভয়ের কার্যকে "মোবায়াআত" বলা হইবে, ক্রিয়াপদও ঐরূপই হইবে। ইসলামে যে বায়আত হয় সেই বায়আত কোন মহান মানুষের হস্তই ধারণ করা হয়। যেমন ছাহাবীগণ নবীজীর হস্ত ধারণ করিতেন এবং তদ্রূপ কোন পীর-বুজুর্গের হস্ত ধারণ করা হয়। কিন্তু ইসলামের বায়আতকে কঠোরতম সাব্যস্তকরণ উদ্দেশে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বায়আ'তে যদিও বাহ্যতঃ কোন মানুষের হস্ত ধারণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর হস্ত ধারণ গণ্য করিবে।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ـ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থঃ "নিশ্চয় যাহারা আপনার নিকট বায়আত করে বস্তুত তাহারা আল্লাহর নিকট বায়আত করে। তাহাদের হস্তের উপর বস্তুত আল্লাহর হস্ত রহিয়াছে। অতএব যে এই বায়আত ভঙ্গ করিবে সে নিজেরই সর্বনাশ করিবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার পূর্ণকরিবে, আল্লাহ তাহাকে

অচিরেই অতি বড় পুরস্কার দান করিবেন। (পারা-২৬; রুকু-৯)

বায়আতের মূল অর্থ যেহেতু বিক্রয় করা এবং উভয় পক্ষের ক্রিয়া হইল মোবায়াআত যাহার মূল অর্থ ক্রয়-বিক্রয় অথবা আদান-প্রদান। সুতরাং পরিভাষার ক্ষেত্রেও ঐ মূল অর্থের তথা ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে। সেমতে ইসলামের বায়আত ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের বস্তুদ্বয় কি তাহা নির্ণয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ “নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন মোমেনদের হইতে তাহাদের জান এবং মাল এই বিনিময়ে যে, তাহারা বেহেশত পাইবে। (বিক্রীত বস্তু তাহাদের জান ও মাল ক্রেতা আল্লাহ তাআলা সমীপে সমর্পণের ব্যবস্থা এই হইবে–) তাহারা (ঐ জান ও মাল ব্যয়ে) জেহাদ করিবে আল্লাহর পথে; পরিণামে সে আল্লাহর পথের শত্রুকে মারিবে (–নিজে বাঁচিয়া থাকিবে) বা শত্রুর হাতে মারিবে। (এই উভয় অবস্থায়ই তাহার পক্ষ হইতে বিক্রীত বস্তু জান ও মাল সমর্পণ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। এখন তাহারা প্রাপ্য হইল বিনিময় বা মূল্য– বেহেশত। সেই বেহেশত ইহজগতে দেয়ার নহে; পরজগতে দেওয়ার) অকাট্য ওয়াদা থাকিল। এই ওয়াদা-অঙ্গীকার তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন সমস্ত আসমানী কিতাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী আর কে আছে? (তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জান-মাল বিক্রয়ে চিরস্থায়ী বেহেশত ক্রয়– ইহা কতই না লাভজনক!)। অতএব তোমরা আনন্দিত হও এই ব্যবসায়ে। আর জানিয়া রাখ (মুসলিম জীবনের) চরম সফলতা ইহাই। (পারা-১১; রুকু-৯)

ইসলামের বায়আত ততা ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বদিক উক্ত আয়াতে এই নির্ধারিত হইল–

১। বিক্রীত বস্তু হইল মুসলমানের জান ও মাল।

২। মূল্য হইল বেহেশত।

৩। বিক্রীত বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের ব্যবস্থা হইল– মুসলমান কর্তক তাহার জান-মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা।

৪। ক্রেতা হইলেন আল্লাহ তাআলা যিনি মূল্য প্রদান করিবেন; তিনি মূল্য তথা বেহেশত প্রস্তুত করিয়া আসমানী কিতাবসমূহে তাহা প্রদানের ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া আছেন।

৫। বিক্রেতা হইল মোমেন ব্যক্তি। সে বিক্রীত বস্তু তাঁহার জান ও মাল উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা সমীপে সমর্পণ করিবে– এই প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণের নামই “বায়আত”।

ইসলামী বায়আতের মূল তাৎপর্য এবং তাহার মৌলিক বিষয় ইহাই। বায়আত ক্ষেত্রে উক্ত মৌলিক বিষয়টি মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে নির্ধারিত লক্ষ্যস্থিত ও উপস্থিত রাখিয়া সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কোন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ের অঙ্গীকারও গৃহীত হয়। আলোচ্য বায়আতে আকাবায় নবীজি মোস্তফা (সঃ) কর্তৃক মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানগণ হইতে গৃহীত ঐ শ্রেণীর অঙ্গীকারগুলিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। সেই গুলি ছিল নিম্নরূপ–

১। আমরা আল্লাহর সহিত তাঁহার উপাসনায়, তাহার গুণাবলীতে এবং তাঁহার আধিপত্য ও অধিকারে কোন অংশীদার বা শরীক সাব্যস্ত করিব না।

২। আমরা চুরি, ডাকাতি তথা কোন প্রকারে পরের স্বত্ব গ্রহণ করিব না।

৩। ব্যভিচার করিব না।

৪। সন্তান-নিধনের পন্থা অবলম্বন করিব না।

৫। (কাহারও প্রতি) মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপ করিব না।

৬। আমরা সৎকর্মে, ন্যায় কাজে আপনার অবাধ্য কখনও হইব না।

৭। শক্ত হউক বা নরম, কঠিন হউক বা সহজ, মনমত হউক বা মন বিরোধী– সর্ববিষয়ে এবং সর্বাবস্থায় আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব, আপনার আদেশে চলিব।

৮। নিজের স্বার্থ বিরোধী অন্যের স্বার্থমুখী আদেশ এবং পরিস্থিতিতেও আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব।

৯। ক্ষমতা ও পদের বেলায় যোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতায় অংশ নিব না।

১০। সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিব। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিন্দা-মন্দ, বদনাম-অখ্যাতির কোন ভয় কখনও করিব না।

এই সব অঙ্গীকার প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্তে নবী (সঃ) বলিলেন, এইসব প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলিলে তোমরা বেহেশতের অধিকারী হইবে, ত্রুটি করিলে (বেহেশত লাভের অধিকার থাকিবে না) আল্লাহ শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করিতে পারেন (যদি ক্ষমার ব্যবস্থা কর)। (যোরকানী, ১–৩১৪)

৬ নম্বর প্রতিজ্ঞা "নবীজীর অবাধ্য হইবে না" ইহাতে একটি শব্দ বলা হইয়াছে, فى معروف "সৎ কর্মে, ন্যায় কার্যে"। রসূল (সঃ) কি সৎ ও ন্যায়ের পরিপন্থী আদেশ করিবেন? তবুও ইহা বলা হইয়াছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাধিকারী হওয়ার প্রথম দিনেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার সুন্নত ও আদর্শের কাঠামো এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার আলো বিশ্বকে দেখাইলেন যে, শাসন এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লোকদেরকে বাধ্যগত অনুগত বানাইতে ক্ষমতার ব্যবহার, বল প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করিবে না। সততার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় অবলম্বন, সৎকর্ম ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে বশ্ করিতে এবং বাধ্য অনুগত বানাইতে চেষ্টা করিবে। ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার ছাড়া আমার আদেশ আমার কথা মানিতেই হইবে। হক-নাহক, সৎ-অসৎ যাচাই না করিয়া আমার অনুসরণ করিতেই হইবে– এইরূপ দম্ভ ঔদ্ধত্যের উক্তিও করিবে না, ভাবও দেখাইবে না, এই পন্থা অবলম্বন করিবে না।

বল প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে বশ করিলে, তাহাদের অধীনস্থ ও অনুগত বানাইলে সেই বশ্যতা এবং সেই আনুগত্য মোটেই টেকসই হয় না। পক্ষান্তরে সৎকর্ম, সততা বিস্তার এবং ন্যায় নিষ্ঠা দ্বারা অনুগত ও বশ করিতে পারিলে তাহা সুদীর্ঘ হয় এবং বস্তুত সেই ক্ষেত্রেই প্রকৃত আনুগত্য ও বশ্যতা হইয়া থাকে।

নবীজ মোস্তফা (সঃ)-এর ক্ষেত্রে অনুগত্য প্রকাশে "সৎকর্মে ও ন্যায় কার্যে" শর্ত আরোপের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সকলের জন্য সুন্নত আদর্শ স্থাপনকল্পে নবী (সঃ) নিজের বেলায়ও এই শর্ত আরোপ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন এই শর্ত আরোপে নবীজী মোস্তফার (সঃ) দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাসও পাওয়া যায় যে, ন্যায় ও সততার মাপকাঠিতে আমার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পরিমাপ করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিলে নিশ্চয় তোমরা আমার অনুগত হইতে বাধ্য হইবে। কতখানি সততা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকিলে এইরূপ চ্যালেঞ্জ দেওয়া যায়, স্বীয় আদর্শ ও ন্যায়-নীতির উপর অটুট আত্মবিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ নিষ্কলঙ্ক অভ্রান্ত মতবাদের দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে এই দাবী কখনও সহজ হইত না। নবীজী (সঃ) অতি সরল এবং দ্ব্যর্থ ও দ্বিধাহীনরূপে এই চ্যালেঞ্জ ও দাবীর সহিত লোকদের স্বীয় আনুগত্যের আহ্বান জানাইলেন। বস্তুত এই বাস্তব আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শক্তির এক বিশেষ উৎস ছিল। শক্তির এই উৎস হাসিলের শিক্ষাই বিশ্বকে প্রদান করিয়াছেন বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

এই শর্ত আরোপে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আরও একটি জরুরী বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন, ক্ষমতাধিকারী লোকদের কর্তব্য– ক্ষমতাকে বাস্তব ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের অধীনস্থ রাখা। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনস্থ করাই চাই না। বর্তমান যুগে শাসন ব্যবস্থায় বহু লেকেঙ্কারি এই একটি আদর্শের অভাবেই জন্ম নেয়। এই যুগের ক্ষমতাধারী শাসকগোষ্ঠী ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনে রাখে। অর্থাৎ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাহা ন্যায় ও ভাল বলিবেন তাহাই ন্যায় ও ভাল পরিগণিত হইবে; জনগণ তাহাকেই ন্যায় ও ভাল বলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার ফলে ভাল ও ন্যায়ের নামে শত শত অনাচার অবিচার চালু হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শ হইল ক্ষমতাকে ভাল ও ন্যায়ের অধীন রাখিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা ভাল ও ন্যায় সাব্যস্ত হইবে, ক্ষমতাধারীরা একমাত্র তাহারই অনুসরণ করিবেন এবং জনগণ একমাত্র তাহাতেই তাহাদের আনুগত্যে বাধ্য থাকিবে। নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

لاَ طَاعَةَ لِلْمَخْلُوْقِ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

অর্থ ঃ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে সৃষ্টির আনুগত্য চলিবে না।"

আকাবার এই সম্মেলনও গোপনীয়তার মধ্যে হইল, দীক্ষা গ্রহণও ঐরূপেই হইল। সব কিছুই মক্কার শত্রুদের অবগতির অন্তরালে সমাপ্ত হইল এবং মদীনার লোকগণ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। মদীনার এই সব লোক নবীজীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন– পবিত্র কোরআন পড়াইতে পারেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন লোক আমাদিগকে প্রদান করিবেন। সেমতে নবী (সঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোসআ'ব ইবনে ওমায়র (রাঃ)-কে মদীনায় প্রেরণ করিলেন।

মদীনায় প্রথম মোহাজের

মোসআ'ব (রাঃ) সর্বপ্রথম স্বদেশ মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ; দ্বীন ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। মোসআ'ব (রাঃ) ছিলেন মক্কার এক ভোগ-বিলাসপূর্ণ পরিবারের নয়নমণি। তাঁহার পিতার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। কত জাঁকজমকপূর্ণ হইত তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ! কত মূল্যবান হইত তাঁহার পরিধেয়! কত আরামপ্রিয়

ছিলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পিতার সব ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি দীন-দরিদ্র কাঙ্গাল; শত শত টাকা মূল্যের জোড়ার পরিবর্তে এখন তাঁহার অঙ্গ-আবরণ আছে কেবল এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল। তাহা পরিধানে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কোচিত হইতেন যে, সতর খুলিয়া যায় না কি। একদা নবী (সঃ) তাঁহাকে এই অসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার পূর্বেকার অবস্থা স্মরণে বর্তমান ত্যাগের দৃশ্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃশ্য লইয়াই তিনি ইহজীবন হইতে বিদায় নিয়াছিলেন। ওহুদের জেহাদে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; তাঁহার কাফনের সম্বল একমাত্র ঐ ছেঁড়া কম্বল টুকরাই ছিল। তাহা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানিয়া মাথা আবৃত করিলে পা বাহির হইয়া পড়িত, পা আবৃত করিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। এতদ্দৃষ্টে নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, মাথা কম্বলে আবৃত কর, আর "এয্‌খের" ঘাস দ্বারা পা আবৃত করিয়া মোসআ'বকে সমাধিস্থ কর। নবী (সঃ) ঐ দৃশ্য দৃষ্টে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলামের পাকা ফল লাভের তথা ইসলামের উসিলায় উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। মোসআ'ব ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিনিময় ও সুফল দুনিয়াতে বিন্দুমাত্রও ভোগ করিয়া যায় নাই; সবটুকুই আখেরাতের জন্য জমা রাখিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিল। (তৃতীয় খণ্ড, ১৪৫৮ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

মদীনায় ইসলামের প্রভাব

গত এক বৎসর হইতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণে দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন ভক্ত-অনুরক্তের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সারা মদীনাতে ইসলামের প্রচার প্রসার অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। অধিকন্তু মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগমনে ত ইসলামের জন্য কর্ম তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

বিশেষতঃ মহাত্যাগী মোসআ'ব (রাঃ) এবং দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন নিষ্ঠাবান ভক্তের চরিত্রের প্রভাব লোক চক্ষের অগোচরে ক্রমে ক্রমে মদীনাবাসীদের হৃদয়ে সুদৃঢ় স্থান করিয়া নিল এবং সমগ্র মদীনায় তাহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল।

চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্বাধিক ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং এই প্রভাব আপনা আপনিই বিস্তার লাভ করে; বিস্তারিত করিতে হয় না। যেমন সূর্য যখন তাহার জ্যোতি আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তখন আপনা আপনিই তাহার কিরণমালা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর উপর পতিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী মহামতিগণের চরিত্র আদর্শের প্রভাবও বিস্তারিত করার প্রয়োজন রাখে না; আপনা আপনিই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। মদীনায় মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তথাকার দ্বাদশ মহানের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইল।

মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় আসিয়া আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ)-যিনি আকাবার প্রথম বৎসরের সাক্ষাতকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় সম্মেলনেও অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় ইসলামের ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালাইলেন, এমনকি তিনি "মুক্‌রিল মদীনা" মদীনার শিক্ষক বা অধ্যাপক নামের খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি মদীনার মুসলমানগণের ইমামও ছিলেন, জামাতে নামায পড়াইয়া থাকিতেন। এই সময় মদীনায় মুসল্‌মানদের সাধারণ সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিয়াছে। (যোরকানী- ৩১৫)

তখনও জুমার নামায ফরয হয় নাই। আসআদ (রাঃ) সপ্তাহে একদিন সকল মুসলমানকে একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদত করার ব্যবস্থা করিলেন; তাহার জন্য তাঁহারা শুক্রবার দিন ধার্য করিয়া নিলেন। আসআদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইহা একটি বড় সৌভাগ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম শুক্রবার দিনে মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেগী করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই নবী (সঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ওহী মারফত শুক্রবার ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু মক্কায় তাহা সম্ভব নয়; নবীজী (সঃ) মদীনায় মোসআ'ব (রাঃ)কে পত্রযোগে এই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠাইলেন। বিশেষভাবে ইহাও লিখিলেন যে, দুপুর বেলায় সূর্য ঢলিবার পর সমবেতভাবে দুই রাকাত নামাযও পড়িবে। মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় মুসলমানদের ইমাম ছিলেন, তাই তিনিই সর্বপ্রথম জুমার নামাযের অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী। অতপর নবী (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলে আনুষ্ঠানিকরূপে জুমার নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ পবিত্র কোরআনের সূরা জুমার মধ্যে নাযিল হয়; তখন হইতে নবী (সঃ) ফরযরূপে জুমার নামাযের জমাত পরিচালনা করেন। (যোরকানী, ১-৩১৫)

গোটা একটি বংশের ইসলাম গ্রহণ

মদীনার দুইটি প্রসিদ্ধ বংশ বনু জফর ও বনু আবদিল আশহাল। একদা আসআদ (রাঃ) মোসআ'ব (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া ঐ বংশদ্বয়ের মহল্লায় ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করার জন্য রওয়ানা হইলেন এবং এই মহল্লার নিকট গিয়া তাঁহারা উভয়ে একটি বাগানে বসিলেন। ইসলামে দীক্ষিত আরও কতিপয় লোক আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

আবদুল আশহাল গোত্রের দুইজন সর্দার ছিলেন- একজন সা'দ ইবনে মোআয, অপরজন ওসায়দ ইবনে হোযায়ের। তন্মধ্যে সা'দ ছিলেন আসআ'দ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খালাত ভাই। এই সর্দারদ্বয় সংবাদ পাইলেন যে, আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ)-সহ মুসলমানগণ অমুক বাগানে একত্রিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মোআয ওসায়দকে বলিলেন, তাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়াছে; আমাদের কাঁচা ও দুর্বল লোকগুলিকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। তুমি যাইয়া তাহাদিগকে খুব করিয়া ধমকাইয়া আস। আমার জন্য

একটু অসুবিধা যে, তাহাদের মধ্যে আসআ'দ আমার খালাত ভাই; তাই ধমকাইবার জন্য তাহার সম্মুখে আমার যাইতে মন চলে না। নতুবা আমিই যাইতাম।

সেমতে ওসায়দ একটি বর্শা হাতে লইয়া ঐ বাগানের দিকে যাইতে লাগিল। আসআ'দ (রাঃ) দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া নিজ সঙ্গী মোসআ'ব (রাঃ)-কে বলিলেন, ঐ যে লোকটি আসিতেছে সে নিজ গোষ্ঠি আব্দুল আশহাল গোত্রের একজন সর্দার; আপনার নিকট আসিতেছে, তাহাকে আল্লাহ্র দ্বীনের কথা পরিষ্কার ভাষায় বলিবেন, সত্য প্রকাশ করিতে কোন কিছুর খাতির করিবেন না। মোসআ'ব (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকটে বসিলে আমি নিশ্চয় বলিব এবং বুঝাইব।

ইতিমধ্যে ওসায়দ তাঁহাদের নিকট পৌছার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক কঠোর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, তোমরা আমাদের সরল লোকগুলিকে বিভ্রান্ত করিতে কেন আসিয়াছ? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তবে দূর হইয়া যাও। বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে বুদ্ধিমান ডাক্তার রোগীর প্রতি রাগ না করিয়া দয়াপরবশই হইয়া থাকেন। সেমতে মোসআ'ব (রাঃ) ওসায়দকে মোলায়েমভাবে বলিলেন, শান্তভাবে একটু বসুন এবং আমার কিছু কথা শুনুন; পছন্দ হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে এড়াইয়া যাইবেন। গরমের উত্তরে এরূপ নরম। ওসায়দের অন্তরে তাহা রেখাপাত করিল। তিনি বলিলেন, আপনি ত ন্যায় কথা বলিয়াছেন; এই বলিয়া ওসায়দ তাঁহার বর্শাটা মাটিতে গাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। মোসআ'ব (রাঃ) খুব সুন্দরভাবে ইসলামের মাহাত্ম্য তাঁহাকে বুঝাইলেন এবং কোরআন শরীফের কিছু অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ওসায়দ বলিলেন, তাহা ত অতীব সুন্দর, অতীব চমৎকার! তিনি আরও বলিলেন, আপনারা কাহাকেও আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করাকালে কি করিয়া থাকেন? এখন আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ) উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, গোসল করিয়া পাক-পবিত্র হইয়া আসুন, পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রদানপূর্বক নামায আদায় করুন। ওসায়দ তৎক্ষণাত সব কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিলেন এবং সত্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। এখন তিনি ওসায়দ ইবনে হোযায়র রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। অতপর তিনি আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পিছনে আর একজন লোক আছেন "সা'দ", তিনিও যদি আপনাদের ধর্মে আসিয়া যান তবে আবদুল আশহাল গোত্রের ছোট বড় কেহই আপনাদের ধর্মমত হইতে বাহিরে থাকিবে না। আমি এখনই তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া ওসায়দ (রাঃ) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সা'দ ত ওসায়দকে পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষায় বসিয়াছিল; ওসায়দ (রাঃ) তাঁহার নিকটই আসিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখামাত্র সা'দ বলিয়া উঠিল, খোদার কসম ওসায়দ যেই অবস্থায় গিয়াছিল সেই অবস্থা হইতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিলে ওসায়দকে সা'দ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমাকে যেই কাজে পাঠাইয়াছিলাম তাহার কি করিয়াছ? ওসায়দ (রাঃ) বলিলেন, তাহাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছি; তাহাদের দ্বারা আমার কোন আশঙ্কা মনে হইল না, আমি তাহাদেরকে নিষেধও করিয়াছি এবং তাহারাও আমাকে বলিয়াছে– আপনি যাহা বলেন আমরা সেইরূপই করিব।

তবে একটি বিপদের সংবাদ এই পাইলাম যে, বনু হারেসা বংশের লোকজন বাহির হইয়া পড়িয়াছে আসআদকে হত্যা করিবার জন্য, যেহেতু তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তিনি আপনার খালত ভাই। তাই তাহারা মনস্থ করিয়াছে তাঁহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদস্থ করিবে।

সা'দ এই সংবাদে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাত ওসায়দের হাতের বর্শাটি লইয়া ছুটিয়া পড়িল যে, বনু হারেসা কোন অপকর্ম না করিয়া বসে। যাত্রাকালে ওসায়দকে তাহাও বলিল যে, মনে হয় তুমি কিছুই কর নাই। সা'দ ঐ বাগানে পৌছিল এবং দেখিল, আসআ'দ কোন প্রকারে শঙ্কিত ও ভীত মনে হয় না, তাই সা'দ ভাবিল যে, আসআদকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদটা সত্য নহে। এখন সা'দ মোসআ'ব (রাঃ) এবং আসআদ

(রাঃ)-কে কঠোর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। মোসআ'ব (রাঃ) পূর্বের ন্যায় অতি মোলায়েম ভাষায় সা'দকে ঐ কথাই বলিলেন যাহা ওসায়দকে বলিয়াছিলেন। ফলে ওসায়দের ন্যায় সা'দও নরম হইয়া পড়িলেন এবং মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনিলেন। অতপর পাক-পবিত্র হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সা'দ ইবনে মোআয (রাঃ)।

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওসায়দ (রাঃ)-সহ স্বীয় বংশ আশহাল গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আশহাল গোত্রীয় লোকদের সমাগম হইল। সা'দ (রাঃ) তাঁহার জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে কিরূপ গণ্য কর? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের সর্দার, অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ন্যায়নিষ্ঠ। তখন সা'দ (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়া রাখ– তোমাদের নারী-পুরুষ কাহারও সহিত আমি কথাও বলিব না যাবত না, তোমরা এক আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ কর। সা'দ (রাঃ) এবং ওসায়দ (রাঃ) তাঁহারা উভয়ই আশহাল বংশের প্রধান; তাঁহাদের এই ঘোষণায় সূর্যাস্তের পূর্বেই ঐ বংশের নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন, তাঁহাদের একটি প্রাণীও ইসলামের সুশীতল ছায়া বহির্ভূত থাকিল না।

"সত্যের গতি অপ্রতিহত", "সবরে মেওয়া ফলে", "আল্লাহর পথে যাঁহারা সাধনা করেন আল্লাহ তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি দান করেন"। তায়েফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসীম সবর এবং অসাধারণ সাধনা ও ত্যাগ ছিল; আজ মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা, নবীজী মোস্তফার (সঃ) সাফল্য। মদীনায় এইরূপ পরিবার কমই ছিল, যেই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল না।

মোসআ'ব (রাঃ) এবং আসআদ (রাঃ) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া গেল, কর্মশক্তি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। ইসলামের মহিমা চর্চায় সমগ্র মদীনা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর– আকাবায় বিশেষ সম্মেলন*

মদীনায় ইসলামের দ্বিতীয় বৎসর শেষ হইয়াছে, তৃতীয় বৎসর আগত। এই বৎসর মদীনায় ইসলামের বিস্তার পুরোদমে চলিয়াছে। মদীনার বিশিষ্ট দুইটি বংশ "আওস" ও "খাযরাজ" উভয় গোত্রেই ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে; মদীনার ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। এখন হইতেই মক্কার মজলুম অত্যাচারিত মুসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি মদীনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে অসহনীয় নির্যাতনে জর্জরিত হইয়া কোরায়শ বংশের বনু মাখযুম গোত্রীয় আবু সালামা (রাঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

আবু সালামা (রাঃ) প্রথমে স্ত্রীকে নিয়ে হাব্‌শা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে এই ভুল সংবাদে যাঁহারা আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, আবু সালামা (রাঃ) তাঁহাদেরই একজন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মক্কায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু দুরাচাররা তাঁহার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার-নির্যাতন চালাইল। ইতিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন, মদীনায় মুসলমান আছেন– তাঁহারা প্রবাসী মুসলমানকে সহোদররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদে তিনি আবিসিনিয়ায় পুনঃ না যাইয়া মদীনায় যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। সে মতে তিনি শিশু পুত্র "সালামা" এবং স্ত্রী উম্মে সালামাসহ উটে চড়িয়া মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যেই উম্মে সালামার গোষ্ঠীর লোক আসিয়া আবু

* নবীজী (সঃ)-এর মদীনায় প্রস্থানের শুভ সূচনা– আকাবার এই বিশেষ সম্মেলন নবুয়তের ১২শ সনের হজ্জ মৌসুমেই হইয়াছিল, ১৩শ সনে নহে। কারণ, নবীজী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরত নবুয়তের ১৩শ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ছিল বলিয়া নির্ধারিত। (বেদায়া ৩–১৭৭)

সুতরাং তাহার শুভ সূচনা এবং উক্ত সম্মেলন ১২ সনের হজ্জের মাস যিলহজ্জ মাসে হওয়া অবধারিত।

সালাম (রাঃ)-কে গালাগালি দিয়া বলিল, তোকে ত আমরা বারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমাদের মেয়েকে বিদেশে নিয়া যাইতে দিব কেন? এই বলিয়া তাহারা উটের লাগাম আবু সালামার হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া উম্মে সালামাকে বলপূর্বক লইয়া গেল। শিশু পুত্রটি উম্মে সালামার ক্রোড়ে ছিল, এমন সময় আবু সালামার গোষ্ঠীর লোকেরা আসিয়া দাবী করিল, আমাদের বংশের শিশু তোমাদেরকে নিয়া যাইতে দিব কেন? এই বলিয়া তাহারা শিশুটিকে মাতা উম্মে সালামার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া নিজেদের মধ্যে নিয়া গেল। এখন পিতা, পুত্র ও মাতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কী মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য! স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইল– তাহার আর্তনাদ, মায়ের বুক হইতে শিশু পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়াছে– তাহার ক্রন্দন। কিন্তু কোরায়শ নর পশুদের নিকট এই সবই তুচ্ছ; পাষণ্ডরা এই সমস্তের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহাদের কর্ম তাহারা করিয়া নিজেদের গৃহে চলিয়া গেল; নির্মম অভিনয়। আবু সালামা (রাঃ) মুহূর্তের মধ্যে নিঃসঙ্গ হইয়া গেলেন; নির্বাক হতভম্ভ কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি ত "মুসলিম," আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী, ইসলামে আত্মোৎসর্গকারী; এই বীভৎস কাণ্ডও তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিল না। মুসলিমের ইসলাম পরীক্ষার সম্মুখে উজ্জ্বল দৃঢ় ও দীপ্ত হইয়া উঠে; সেই মুহূর্তেই আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে সত্যের তেজ এবং ত্যাগের সঙ্কল্প উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার উটকে প্রিয় মদীনার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। সব কিছু পিছনে ফেলিয়া তিনি চলিলেন ইসলামের আশ্রয় পানে। ইসলাম ও ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করত; দ্বীনের আশ্রয়স্থলে চলিয়া যাইবে– মুমিন ও মুসলিমের পরিচয় তাহাই। আবু সালামা (রাঃ) এই অগ্নি পরীক্ষায় খাঁটি মুসলিম হওয়ার পরিচয় দানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন।

এদিকে উম্মে সালামার যে দশা হইল তাহার বর্ণনায়ও বুক ফাটিয়া যায়। স্বামী পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি ভীষণ কাতর, লোকালয় হইতে দূরে যেস্থানে ঐ মর্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রতিদিন সেই স্থানে যাইয়া তিনি উণ্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতেন, স্বামী-পুত্রের স্মরণে অশ্রু ধারায় শোকাতুর প্রাণ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করিতেন। উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই করুণ অবস্থার উপর প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

নিরাশার আঁধারে একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমতই আশার আলো। উম্মে সালামা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন– আমার এই মর্মস্পর্শী অবস্থায় আমার এক আত্মীয়ের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার অনুরোধে আমার স্বজনগণ আমাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে এবং আবু সালামার আত্মীয়গণ শিশু পুত্রটিকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল। সব কিছুই ঠিক হইল, কিন্তু আমি মদীনার পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল আমার নাই, আমার সঙ্গীও কেহ নাই। তবুও আমি শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া উটের পিঠে আরোহণ করিলাম এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া মদীনাপানে পাড়ি জমাইলাম। একটি শোকাতুর মহিলা, কোলে আছে শিশু পুত্র; সঙ্গে পাথেয় নাই, সঙ্গী নাই, পথের পরিচয় নাই, একাকী চলিয়াছে মরুভূমির পথে। দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মমতা বাধাদানে ব্যর্থ, পথের দুঃখ-কষ্ট এবং ভাবনাও তাঁহার নিকট তুচ্ছ। তাঁহার একমাত্র আবেগ– দ্বীন ঈমান রক্ষার জন্য স্বামী যেখানে গিয়াছেন তিনিও সেখানে পৌঁছিবেন।

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা– "আমার পথে যে সাধনা করিবে আমি তাহাকে আমা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথ অতিক্রম করাইয়া দিব।" (কোরআন)। আল্লাহ তাআলার মহিমার কি শেষ আছে! উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন– মক্কা হইতে মদীনার পথে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রমে "তানয়ীম" নামক জায়গায় পৌঁছিতেই মক্কার এক সহৃদয় ব্যক্তি ওসমান ইবনে তাল্‌হার সহিত সাক্ষাত হইল। তখনও তিনি মুসলমান হন নাই, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু উমাইয়া তনয়া! কোথায় চলিয়াছ? আমি বলিলাম, মদীনায় স্বামীর নিকট। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে কেহ নাই? আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সঙ্গে আছেন, আর আছে এই শিশু। তিনি বলিলেন, তোমাকে এই

অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না; এই বলিয়া তিনি আমার উটের লাগাম ধরিলেন এবং উট চালাইয়া মদীনার পথে চলিলেন। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি জীবনে আমি দেখি নাই। পথে বিশ্রাম মঞ্জিলে পৌঁছিলেন তিনি আমার উটটি বসাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন এবং আমি সুন্দরভাবে অবতরণ করিয়া সারিলে তিনি উটটি কোন বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, উহার পিঠের বোঝা নামাইতেন, তারপর নিকটবর্তী কোন বৃক্ষ ছায়ায় আরাম করিতেন এবং যাত্রা করার সময় হইলে গদি ইত্যাদি উটটি বাঁধিয়া আমার নিকটে রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন। আমি সুস্থিরভাবে আরোহণ করিয়া সুন্দররূপে বসিলে পর তিনি উটের দড়ি ধরিয়া চালিতে থাকিতেন। (মক্কা মদীনার তিন শত মাইলের অধিক) দীর্ঘ পথ তিনি এইরূপ পবিত্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত আমাকে পার করাইলেন। প্রাণপ্রিয় মদীনা দূর হইতে দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। মদীনার 'কোবা' পল্লীতে স্বামী আবু সালামা (রাঃ) বাস করিতেন; তাহার নিকট পৌঁছিয়া ওসমান আমাকে বলিলেন, আপনার স্বামী এ স্থানে বাস করেন, আপনি তাঁহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হউন- আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এইভাবে আমাকে স্বামীর আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া ওসমান মক্কার পথ ধরিলেন। -(বেদায়া ৩- ১৬৯)

পুণ্যবান ও পুণ্যবতী

আবু সালামা (রাঃ) এবং উম্মে সালামা (রাঃ)- স্বামী-স্ত্রীর সাধনার এই চিত্র কতই না সুন্দর! দ্বীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহনের এবং ত্যাগ স্বীকারের কি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহা। তাহার পরিণাম যে আরও কত সুন্দর হইবে সেই আভাস ইহজগতে উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবীজী (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার দুই-তিন বৎসর পর পুণ্যবান স্বামী আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় ইন্তেকাল করেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে সুসংবাদ দানে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে ডান হস্তে আমল নামা পাইবার সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন আবু সালামা (রাঃ)। (যোরকানী, ১-৩১৯)

সুন্দর সাধনার কী সুন্দর প্রতিদান! আল্লাহর পথে নির্যাতন ভোগে সর্বপ্রথম সপরিবার মোহাজের- দেশত্যাগী তিনি; তাই চির সাফল্যের প্রতীক ডান হস্তে আমল নামা লাভের চির সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন তিনি।

আবু সালামা ও উম্মে সালামার দুঃখী জীবনের চরম ভালবাসার যে চিত্র উপরোল্লিখিত বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কি তুলনা হয়। আবু সালামা (রাঃ) মৃত্যু মুহূর্তে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পরিবারের জন্য একটি অতি মূল্যবান সওগাত রাখিয়া গেলেন- আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে দোয়া মোনাজাত করিয়া গেলেন-

اَللّٰهُمَّ اَخْلُفْ فِىْ اَهْلِىْ خَيْرًا مِّنِّىْ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার স্থলে আমার পরিবারকে আমার অপেক্ষা উত্তমটি দান কর"।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছিলাম, যে মুসলমান তাঁহার কোন (ক্ষয়-ক্ষতির) বিপদে নিম্নে বর্ণিত দোয়া পড়িবে, আল্লাহ তাহাকে উত্তম ক্ষতিপূরণ দান করিবেন।

انَّا لِلّٰهِ وَانَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجُرْنِىْ فِيْهَا وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ

অর্থ ঃ "আমরা সকলেই আল্লাহর এবং তাঁহার নিকট আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদের সওয়াব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অতএব তুমি আমাকে বিপদের সওয়াব

দান কর এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দান কর।" (মেশকাত শরীফ, ১৪১ পৃষ্ঠা-)

উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী আবু সালামা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন তখন সেই বিপদে এই দোয়া পাঠ করিতে আমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি হইল। আবু সালামা অপেক্ষা কোন্ মুসলমান উত্তম হইবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (হিজরত স্থানের) দিকে সপরিবারে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন তিনি। অবশ্য এই দ্বিধা সত্ত্বেও আমি এই দোয়া পাঠ করিলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমায় বদলরূপে দান করিলেন। (রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করিলেন)

মদীনার প্রতিনিধি দল

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর শেষে হজ্জ মৌসুম নিকটবর্তী হইয়াছে; মদীনার মুসলমানগণ পরামর্শে বসিলেন; তাঁহারা আলোচনা করিলেন- রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল্লাহি অসাল্লামকে আর কত দিন এইভাবে ছাড়িয়া রাখা যায় যে, তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অবহেলিত অবস্থায় মক্কার পবর্তমালার আঁকেবাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইবেন?

সাব্যস্ত এই হইল যে, নবীজী (সঃ)-কে মক্কা হইতে মদীনায় নিয়া আসা বাঞ্ছনীয়। সেমতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মতৎপরতা আরম্ভ হইল। তাঁহারা এইবার নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে মদীনায় আগমনের অনুরোধ করিবেন। সুতরাং সব শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হজ্জযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমনকি মদীনায় ইসলামী শিক্ষার জন্য নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত অধ্যাপক মোসআ'ব (রাঃ)ও এই উপলক্ষে মক্কায় আসিলেন। (বেদায়া ৩-১৫৮)

মোশরেক কাফেররাও হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় যায়; মদীনা হইতে ঐ শ্রেণীর পাঁচ শত জনের তীর্থ যাত্রীর কাফেলা রওয়ানা হইল। মুসলমানদের দুই জন মহিলা হজ্জযাত্রীসহ মোট ৭৫ জনের দলও মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ১১ জন আওস এবং অবশিষ্ট সবই খাযরাজ গোত্রীয়। তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন যুবক শ্রেণীর, বাকীরা বয়স্ক মুরব্বী শ্রেণীর।

এই ৭৫ জন স্বর্গীয় মানুষের কত উল্লাস! কত উৎসাহ-উদ্দীপনা! তাঁহারা সুদূর মক্কা হইতে নিয়া আসিবেন আল্লাহর রসূলকে নিজেদের দেশে; সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন আল্লাহর নবীর; তাঁহার ছায়াতলে থাকিয়া ইসলামী পতাকা সমুন্নত করিবেন তাঁহারা। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের বরকতভরা নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

১। ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রাঃ) ২। সা'দ ইবনে খায়সামা (রাঃ) ৩। রেফাআ ইবনে আবদুল মোনজের (রাঃ) ৪। আবু হায়সম (রাঃ) ৫। যোহায়র ইবনে রাফে (রাঃ) ৬। সালামা ইবনে সুলামাহ (রাঃ) ৭। আবু বোরদাহ (রাঃ) ৮। নোহায়র ইবনে হায়সম (রাঃ) ৯। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ১০। মাআ'ন ইবনে আদী (রাঃ) ১১। ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা (রাঃ) (উক্ত ১১ জন আওস গোত্রীয়, অবশিষ্ট ৬২ জন পুরুষ খাযরাজ গোত্রীয়।) ১২। আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ) ১৩। সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) (১৪) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ১৫। রাফে ইবনে মালেক (র) ১৬। বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) ১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ১৮। ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) ১৯। সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) ২০। মোনযের ইবনে আম্‌র (রাঃ) ২১। আবু আইউব (রাঃ) ২২। মোআয ইবনে হারেস (রাঃ) ২৩। আওফ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৪। মোআওয়ায ইবনে আফরা (রাঃ) ২৫। ওমরা ইবনে হযম (রাঃ) ২৬। সাহ্‌ল ইবনে আতীক (রাঃ) ২৭। আওস ইবনে সাবেত (রাঃ) ২৮। আবু তাল্‌হা (রাঃ) ২৯। কায়স ইবনে আবু ছা'ছা' (রাঃ) ৩০। আম্‌র ইবনে গাযিয়া (রাঃ) ৩১। খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৩২। বোশায়র ইবনে সা'দ (রাঃ) ৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রাঃ) ৩৪। খাল্লাদ ইবনে সোয়ায়েদ (রাঃ) ৩৫। ওক্‌বা ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৩৬। যেয়াদ ইবনে

লবীদ (রাঃ) ৩৭। ফরওয়া ইবনে আম্র (রাঃ) ৩৮। খালেদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৩৯। যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স (রাঃ) ৪০। আব্বাদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৪১। হারেস ইবনে কায়স (রাঃ) ৪২। বিশ্র ইবনে বরা (রাঃ) ৪৩। সেনান ইবনে সায়ফী (রাঃ) ৪৪। তোফায়ল ইবনে নোমান (রাঃ) ৪৫। মা'কেল ইবনে মোনযের (রাঃ) ৪৬। এযীদ ইবনে মোনযের (রাঃ) ৪৭। মসউদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৪৮। যাহ্হাক ইবনে হারেসা (রাঃ) ৪৯। এযীদ ইবনে খেযাম (রাঃ) ৫০। যাব্বার ইবনে সখ্র (রাঃ) ৫১। তোফায়ল ইবনে মালেক (রাঃ) ৫২। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ৫৩। সোলায়মান ইবনে আমের (রাঃ) ৫৪। কোতবা ইবনে আমের (রাঃ) ৫৫। আবদুল মোনযের- এযীদ ইবনে আমের (রাঃ) ৫৬। আবুল ইউসর কা'ব ইবনে আমর (রাঃ) ৫৭। সায়ফী ইবনে সাওআদ (রাঃ) ৫৮। সা'লাবা ইবনে গানামা (রাঃ) ৫৯। আম্র ইবনে গানামা (রাঃ) ৬০। আব্স ইবনে আমের (রাঃ) ৬১। খালেদ ইবনে আম্র (রাঃ) ৬২। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওনায়স (রাঃ) ৬৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ৬৪। মোআয ইবনে আম্র (রাঃ) ৬৫। সাবেত ইবনে জাযা' (রাঃ) ৬৬। ওমায়র ইবনে হারেস (রাঃ) ৬৭। খাদীজ ইবনে সালামা (রাঃ) ৬৮। মোআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) ৬৯। আব্বাস ইবনে ওবাদা (রাঃ) ৭০। আবু আবদুর রহমান এযীদ ইবনে সা'লাবা (রাঃ) ৭১। আমর ইবনে হারেস (রাঃ) ৭২। রেফাআ' ইবনে আম্র (রাঃ) ৭৩। ওকবা ইবনে ওয়াহব (রাঃ)। (বেদায়া ৩-১৬৭)

যেই দুই জন মহীয়সী মহিলা হজ্জ পালনে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও এই মহতী সম্মেলনে শামিল হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম- ৭৪। আসমা বিন্‌তে আম্র (রাঃ) ৭৫। উম্মে ওমারা- নাসীবা (রাঃ)।

শেষোক্ত মহিলা নাসীবা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ একটি নাম। কাহারও মতে তিনি তাঁহার স্বামী যায়েদ ইবনে আসেম (রাঃ) এবং দুই পুত্র- হাবীব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রাঃ)-সহ এই হজ্জে আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনে শামিল হইয়াছিলেন। (যোরকানী, ১-৩১৬)।

তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রদ্বয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদেও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র হাবীব (রাঃ)-কে ভণ্ড নবী মোসায়লামা নিজ হাতে নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল। খলীফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে যখন ঐ ভণ্ড নবীকে নির্মূল করার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইয়ামামার যুদ্ধ হয় তখন এই বীর মহিলা নাসীবা যুদ্ধ ময়দানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে যাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তীর বর্শার বারটি আঘাত নিয়া তিনি তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-১৬৮)

কাফেলার একজন বিশিষ্ট সদস্য কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ); তিনি তাঁহাদের মনের আবেগ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাগ্র হইয়া পড়িলাম। এমনকি আমি এবং আমার আর একজন সাথী বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ) তিনি একজন সর্দার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন- আমরা দুই জন ভাবাবেগ সামলাইতে না পারিয়া নবীজীর (সঃ) সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি পিতৃব্য আব্বাসের সহিত কা'বা শরীফের নিকটে আছেন। আমরা দ্রুত তথায় উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। নবীজী (সঃ) পিতৃব্যকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, তাই তিনি বলিলেন, ইনি বরা ইবনে মা'রূর- মদীনার একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার। আর আমার নামও বলিলেন, মালেক পুত্র কা'ব। আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না- নবীজী (সঃ) যে, আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কা'ব- যিনি কবি! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস বলিয়াছিলেন, হাঁ।

কা'ব (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা মদীনাবাসী মুসলমানগণ নবীজীর (সঃ) সঙ্গে সম্মেলনের বিষয় সতর্কতার সহিত গোপন রাখিতেছিলাম। এমনকি আমাদের মদীনা হইতে যেসব অমুসলিম হজ্জে আসিয়াছিল তাহাদের হইতেও গোপন রাখিতেছিলাম। তবে আম্র ইবনে হারাম নামক একজন বিশিষ্ট

গোষ্ঠীপতি অমুসলিম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি একদা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আপনি আমাদের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা; আপনার বর্তমান ধর্মমত পরিবর্তন করুন, যদ্দরুন আপনি সম্মুখ জীবনে নরকী হইবেন– এই বলিয়া, তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলাম এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সম্মেলনের কথাও বলিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের সহিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিলেন। এমনকি ঐ সম্মেলনে নির্বাচিত বার জন প্রধানের একজন তিনি হইলেন। (বেদায়া ৩–১৫৮)

মদীনা হইতে আগত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে গোপন সূত্রে পূর্ববর্ণিত 'আকাবা' ১২ই যিলহজ্জ রাত্রে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন অনুষ্ঠান সাব্যস্ত করিলেন। সকলের এই লক্ষ্য যে, খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না, ডাকাডাকি করিবে না।

নির্ধারিত রাত্রের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর যখন সাধারণভাবে লোকজন শুইয়া পড়িল, তখন মদীনাবাসী মুসলমানগণ এক-দুই জন করিয়া নীরবে নিস্তব্ধ আকাবায় পৌঁছিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা সমবেত হইলেন, এখন অপেক্ষা শুধু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের। ইতিমধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় পৌঁছিলেন, তাঁহার চাচা আব্বাস (তখন মুসলমান হন নাই) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার প্রতি হযরতের পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি মদীনাবাসীদের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় কথাবার্তা ও ব্যবস্থাদি সরাসরি অবহিত হইয়া আশ্বস্ত হওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)– এই দুই জনকে দুইটি পথে দাঁড় করাইয়া রাখা হইল শত্রুদের গমনাগমন লক্ষ্য রাখার জন্য; এইভাবে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম হযরত (সঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করুন, কিন্তু সংক্ষেপ করিতে হইবে, কারণ মোশরেকদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির আশঙ্কা আছে। অতপর প্রথমে আব্বাস দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে খাযরাজ বংশীয় ভাইগণ। মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের মধ্যে যে মর্যাদার লোক তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমরা তাঁহাকে শত্রুদের হইতে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি স্বীয় (বনী হাশেম) বংশীয় লোকদের মধ্যে মর্যাদা ও হেফাযতের সহিতই রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের নিকট চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিতেছেন না।

এখন যদি আপনারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সমর্থন দান করেন তবে আপনারা এই গুরুভার বহনে অগ্রসর হউন। আর যদি একটুও আশঙ্কা থাকে যে, তিনি আপনাদের নিকট যাওয়ার পর আপনারা শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সাহায্য-সমর্থন ছাড়িয়া দিবেন, তবে আপনারা সে পথ এখনই অবলম্বন করুন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিন; তিনি নিজ দেশে আপনজনের মধ্যে মান-মর্যাদা ও হেফাযতের সহিতই থাকিবেন।

মদীনাবাসীগণ আব্বাসের ভাষণের উত্তরে বলিলেন, আপনার কথাগুলি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতপর তাঁহারা হযরত (সঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বলুন– প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে যত দূর ইচ্ছা আমাদের ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, তারপর আপনার ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন এবং বলুন সেই সব ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করিয়া চলিলে আমাদের কি পুরস্কার লাভ হইবে তাহাও?

হযরত (সঃ) বলিলেন, প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে আপনাদের কর্তব্য এই যে, একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিবেন এবং অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী-সাথী বা সমকক্ষ শরীকতুল্য মর্যাদা দিবেন না। আর আমার এবং আমার জামাতের জন্য আপনাদের উপর এই কর্তব্য হইবে যে, আমাদিগকে আশ্রয়ের স্থান দিবেন, সাহায্য-সমর্থন দান করিবেন এবং যেইভাবে নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত-হুরমতের হেফাযত করিয়া

থাকেন, আমাদের হেফাযতও তদ্রূপ করিয়া যাইবেন। আপনাদের স্বজনকে কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমার এবং আপনাদের দেশে গমনকারী মুসলমানদিগকেও কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা তাহা প্রতিরোধ করিবেন– সত্যের সহায়তা করিবেন। এইসব কর্তব্য পালন করিয়া চলিলে তাহার প্রতিদানে আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন। মদীনাবাসীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দ-উৎফুল্লতায় তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গেল।

ঐ মুহূর্তেই সর্বপ্রথম বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ), কাহারও মতে সর্বপ্রথম পূর্ববর্ণিত আসআদ (রাঃ) তাঁহার পর বরা (রাঃ) তাঁহার পর ওসায়দ (রাঃ) পর পর নবীজীর হস্ত ধারণপূর্বক বায়আত গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আপনাদের নিশ্চয় নিজ পরিবার-পরিজনের ন্যায় রক্ষা করার চেষ্টা করিব– যদিও আমাদের সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। (যোরকানী, ১–৩১৭)

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) মদীনাবাসী ছাহাবী, যিনি এই ঘটনায় উপস্থিতবর্গের অন্যতম ছিলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন–

انَّا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلٰى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلٰى اَنْ نَّقُوْلَ فِى اللّٰهِ لَا تَاْخُذُنَا فِيْهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَعَلٰى اَنْ نَنْصُرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ مِمَّا نَمْنَعُ بِهِ اَنْفُسَنَا وَاَزْوَاجَنَا وَاَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ ـ فَهٰذِهِ بَيْعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ بَايَعْنَاهُ عَلَيْهِ ـ

অর্থ ঃ "আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'তের ওয়াদা অঙ্গীকার করিয়াছি যে, মনপূত ও অমনপূত– প্রত্যেক অবস্থায় দ্বীন-ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাইব। সচ্ছল ও অসচ্ছল প্রত্যেক অবস্থায়ই দ্বীন ইসলামের জন্য ব্যয় বহন করিব। ইসলামী আদর্শের প্রচার এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিয়া যাইব। আল্লাহ অর্পিত দায়িত্ব পালনরূপে হক প্রকাশ ও প্রচার করিয়া যাইব– এই ব্যাপারে কাহারও কোন তিরস্কার ভর্ৎসনা বা বিরোধিতার পরোয়া করিব না। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের দেশ ইয়াসরেব– মদীনায় তশরীফ আনয়ন করিলে আমরা তাঁহার হেফাযত করিয়া যাইব, যেভাবে আমরা নিজেদের জীবনের ও বিবি-বাচ্চাদের হেফাযত করিয়া থাকি। এই সব কর্তব্য পালনের প্রতিদানে আমরা বেহেশত লাভ করিব। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আমাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার এইরূপ ছিল।"

মদীনাকে ইসলামের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পাইবার আগ্রহই হযরতের (সঃ) অন্তরে বিশেষরূপে জাগিতেছিল, তাই তিনি মুসলিম জামাতকে সাহায্য-সমর্থন করিয়া যাওয়ার উপরই মদীনাবাসীগণ হইতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন–

أُبَايِعُكُمْ عَلٰى اَنْ تَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ بِهِ نِسَائَكُمْ وَاَبْنَائَكُمْ ـ

অর্থ ঃ "আমি আপনাদিগকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিতেছি যে, আপনাদের নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকে আপনারা যেইভাবে হেফাযত করিয়া থাকেন, আমার (আমার জামাতের) হেফাযতও তদ্রূপ করিবেন।"

উপস্থিত মদীনাবাসীগণ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবুল হায়সম (রাঃ) নামক

একজন মদীনাবাসী দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এবং আমাদের দেশের বিশিষ্ট জাতি ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর একটা সহাবস্থান ও সদ্ভাব বিরাজমান রহিয়াছে। এখন আপনার জন্য আমাদের মধ্যকার সেই সদ্ভাবের অবসান ঘটিবে। আপনার উন্নতি সাধিত হইলে পর আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ দেশে চলিয়া আসিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে কি? হযরত (সঃ) মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, না না, আমি আপনাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিব না, বরং আপনাদের ও আমার মধ্যে এমন দৃঢ় বন্ধন হইবে যে, আমার জান-প্রাণ আপনাদের জান-প্রাণের জন্য এবং আপনাদের জান-প্রাণ আমার জান-প্রাণের জন্য নিবেদিত থাকিবে। আমাদের উভয়ের দায়িত্ব ও সংগ্রাম এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এক হইবে। আমি আপনাদের এবং আপনারা আমার অঙ্গরূপে পরিণত হইবেন।

উপস্থিত কাফেলার আর একজন সদস্য আব্বাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) মদীনাবাসীগণকে আর একটি জরুরী কথা বলিলেন। সম্মেলনে সদস্যবর্গের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বক্তার নিজ গোত্রও ছিল খাযরাজ, তাই তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

হে খাযরাজ বংশ! এই মহানের হস্ত ধারণপূর্বক যে প্রতিজ্ঞা তোমরা গ্রহণ করিতেছ তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছ কি? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়। তবুও তিনি বলিলেন, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার অর্থ হইতেছে সাদা কাল সকল শ্রেণীর লোকদের লড়াই ক্রয় করা। সুতরাং যদি তোমাদের ধারণায় এইরূপ আশঙ্কা থাকে যে, সেই লড়াইয়ে তোমাদের ধন-সম্পত্তি ক্ষয় হইলে এবং তোমাদের বড় বড় লোক প্রাণ হারাইলে তোমরা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে ছাড়িয়া দিবে, তবে এখনই তোমরা তাহা কর। অবশ্য তাহা করা দুনিয়া আখেরাতের ধ্বংস ও অপমান। আর যদি ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং বড় বড় লোকদের প্রাণ যাওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বর্তমান অঙ্গীকার পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়া যাইবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হও তবে নবীজী (সঃ)-কে দিলেজানে মজবুতরূপে ধর– তোমাদের ইহ-পরকালের সৌভাগ্য হইবেই।

এই উক্তির প্রতিউত্তরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিয়া উঠিলেন– নিশ্চয় আমরা আমাদের মালের ক্ষতি ইত্যাদি বিপদের ঝুঁকি লইয়াই নবীজী (সঃ)-কে গ্রহণ বরণ করিতেছি। তাঁহারা আরও বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বাস্তবায়িত করিলে আমাদের কি সুফল লাভ হইবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে এইসব কথাবার্তা হইয়াছে এবং তৎপরই বিপুল উৎসাহের সহিত মদীনাবাসীগণ দীক্ষা গ্রহণে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। (বেদায়া, ৩–১৬২)

আর একজন যুবক শ্রেণীর তেজস্বী সদস্য আসআদ (রাঃ); যিনি পূর্ববর্তী দুই বৎসরের আকাবা সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন এবং মদীনায় ইসলাম প্রচার প্রসারে তাঁহার অসীম দান ছিল। নবীজী (সঃ) প্রেরিত শিক্ষক মোসআ'ব (রাঃ)-কে তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া সমগ্র মদীনায় ইসলাম প্রচারের অভিযান চালাইতেন; সেই প্রচেষ্টায়ই গোটা আবদুল আশহাল বংশ এক দিনে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই আসআদ (রাঃ)ও দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে মদীনাবাসীগণকে ঐরূপ বিশেষভাবে সতর্ক করিলেন। তিনি নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ইয়াসরেব বাসীগণ! ধীরস্থিরভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করুন। আমরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আল্লাহর রসূল বিশ্বাস করিয়াই এত দূর হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা খুব ভালরূপে জানি যে, তাঁহাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া সমগ্র আরবের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার শামিল এবং আপনাদের বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্টের আশঙ্কা এবং চতুর্দিক হইতে তরবারির কোপ পড়িবার ভয়। হয় আপনারা ঐক্যবদ্ধরূপে ঐসব বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য প্রস্তুত হউন; তবে নবীজী (সঃ)-কে গ্রহণ বরণ করুন– দেশে লইয়া চলুন। আর যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ভয়-ভীতি অনুভব করেন তবে নবীজীকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিন এবং তাঁহার সমীপে নিজেদের অক্ষমতা

প্রকাশ করিয়া দিন; আল্লাহ তাআলাও আপনাদের অক্ষম ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন।

আসআদের এই বক্তব্য শ্রবণে মদীনাবাসীগণ বলিয়া উঠিলেন, ক্ষান্ত হও হে আসআদ! আজ আমরা যেই দীক্ষা লইয়া যাইব কখনও তাহা ভঙ্গ করিব না, তাহা হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হইব না। এই বলিয়া সকলেই উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া দীক্ষা গ্রহণে ধন্য হইলেন। (বেদায়া, ৩-১৫৯

বিগত বৎসর আকাবার দ্বিতীয় সাক্ষাতকারে ১২ জন প্রতিনিধি কর্তৃক যে দীক্ষা গ্রহণ ছিল তাহা ১০টি বিষয়ের উপর প্রতিজ্ঞা ছিল। এই বারের এই তৃতীয় সম্মেলনের দীক্ষা গ্রহণে মদীনাবাসী মুসলমানগণ বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদীনায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকিবেন, প্রবাসী মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে আপন সহোদরের ন্যায় গণ্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহতকরা-পূর্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

মদীনাবাসীগণের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনাকালে নবীজীর (সঃ) পার্শ্বে তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবীজী (সঃ) বলিলেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞা মঞ্জুর করিলাম, অনুমোদন ও স্বীকৃতি দান করিলাম। (বেদায়া, ২-২৬০)

এই সম্মেলন এবং এই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষাপর্ব জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তওহীদ ও শেরেক, ইসলাম ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্যের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান এবং ইসলাম ও সত্যের বিজয় সূচিত হইল এই দিনে। যদি এই দিন মদীনাবাসী মুসলমানগণ তাঁহাদের এই শৌর্য-বীর্য, সত্যের প্রতি তাঁহাদের এই অপরিসীম আগ্রহ, নবীজী (সঃ) এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য তাঁহারা এমন করিয়া যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়ার এই প্রস্তুতি না দেখাইতেন এবং প্রতিশ্রুতি না দিতেন, তবে ইসলামের বিজয় অভিযান কেমন করিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইত তাহা বুঝা কঠিন ছিল। মদীনাবাসীগণের এই অবদান শুধু মুসলমান জাতির জন্যই নহে, সমগ্র মানবকুলের জন্য এক মহা সৌভাগ্য। জগতের বুকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে সমগ্র ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ধন্য পুণ্যবান মদীনাবাসীগণের দৃঢ় সঙ্কল্প পৃথিবীকে ঐ চরম অভিশাপ হইতে রক্ষার সূচনা করিল! তাই সেই যুগের মদীনাবাসী মুসলমানগণ বাস্তবিকই "আনসার"- সাহায্যকারী অর্থাৎ ইসলাম তথা কল্যাণ ও মঙ্গলে,র সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যকারী আখ্যার যোগ্য পাত্র; পুণ্য ও মানবতার তাঁহারা সুযোগ্য মিত্র। তাঁহাদের ভূমিকাই তাঁহাদের এই নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মদীনাবাসী মুসলমানগণকে "আনসার" নামের আখ্যা দিয়াছেন।

১৬৯৯। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা- ৫৩৩) حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَرَأَيْتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ -

অর্থ ঃ গায়লান ইবনে জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত- "আনসার" নামটি আপনারা নিজেরাই পরস্পর প্রয়োগ করিতেন, না আল্লাহ আপনাদের এই নামের আখ্যা দিয়াছেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, বরং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহই আমাদিগকে এই নামের আখ্যা দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত দিলেন যে, মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে "আনসার" নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যথা-

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ -

অর্থ ঃ "মোহাজের ও আনসারগণের অগ্রগামীগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের অনুসারী হইয়াছেন পূর্ণ ও উত্তমরূপে, সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহাদের জন্য বেহেশত তৈয়ার রাখিয়াছেন; তাঁহারা তাহার চিরনিবাসী হইবেন। তাহা অতি বড় সাফল্য।" (পারা-১০ রুকু-১)

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ ....

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ মেহেরবানী করিয়াছেন নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনসারগণের প্রতি- যাঁহারা নবীর সঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন ভীষণ কঠিন সময়ে।" (পারা-১১, রুকু-৩)

সম্মেলন সমাপ্তে শেষে

সম্মেলনের সর্বদিক সমাপ্ত হইলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে বলিলেন, সতর্কতার সহিত সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান। একজন সদস্য আব্বাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল! শপথ করিয়া বলি, আপনার আদেশ হইলে আমরা আগামীকল্যই মিনায় উপস্থিত সমস্ত লোকদের উপর তরবারির অভিযান চালাইয়া দিতে পারি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে এরূপ আদেশ দেন নাই; আপনারা শান্তভাবে বাসস্থানে প্রস্থান করুন। সেমতে সকলে বাসস্থানে পৌছিয়া নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়েন। (বেদায়া, ৩-৬৪)

দীক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর হযরতের (সঃ) চাচা আব্বাস বলিলেন, তোমাদের এই দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং অঙ্গীকার প্রদান আল্লাহর সম্মুখে, এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র শহরে হইতেছে- তোমাদের হাত আল্লাহর হাতে দিয়া অঙ্গীকার করিতেছ যে, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্য সহায়তায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। মদীনাবাসীগণ সমবেত কণ্ঠে "হাঁ হাঁ" বলিয়া উঠিলেন। আব্বাস এই সব অঙ্গীকারের উপর মহান আল্লাহকে সাক্ষী বানাইলেন।

তারপর মদীনায় মুসলমানগণকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করার উদ্দেশে হযরত (সঃ) তাঁহাদের বারটি শাখা গোত্রের জন্য উপস্থিত লোকগণ হইতে বার জন নেতা নির্বাচনের আদেশ করিলেন। সেমতে আওস বংশ হইতে তিন জন (১, ২, ৩ নং) এবং খাযরাজ বংশ হইতে নয় জন (১২ হইতে ২০ পর্যন্ত) ব্যক্তিবর্গকে নেতা নির্বাচন করা হইল। হযরত নবীজী (সঃ) তাঁহাদের উপর মদীনাবাসীদের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া নবীজী (সঃ) বলিলেন, (আমি আপনাদের দেশে না যাওয়া পর্যন্ত) যেরূপ আমার উপর দায়িত্ব থাকিবে আমার দেশের লোকদের, তদ্রূপ আপনাদের দেশের লোকদের দায়িত্ব থাকিবে আপনাদের উপর। আপনারা আমার প্রতিনিধি; যেরূপ মারইয়াম তনয় ঈসা নবীর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যবর্গ। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ গভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হাঁ আমরা প্রস্তুত আছি। (বেদায়া- ৩-১৬২)

ভোর হইতেই কতিপয় কোরায়শ প্রধান মিনায় মদীনাবাসীদের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, হে খাযরাজ বংশ! এমন কিছু আভাস আমাদের গোচরে আসিয়াছে যে, আপনারা আমাদের (নবুয়তের দাবীদার) লোকটাকে আপনাদের দেশে নিয়া যাইতেছেন এবং আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ন্যায় ঘৃণার বিষয় আমাদের নিকট আর নাই। মদীনায় মুসলমানগণ তাহার উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মদীনা হইতে আগত অমুসলিম হজ্জযাত্রীরা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এইরূপ কোন কথা হয় নাই, কোন ঘটনাও ঘটে নাই। বস্তুতঃ তাহাদের শপথ সত্যই ছিল, কারণ ঐ অমুসলিমরা ত সম্মেলন এবং প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। এই কথাবার্তাকালে মদীনাবাসী মুসলমানগণ পরস্পরের প্রতি তাকাইতে ছিলেন; তাঁহারা কিছুই বলেন নাই।

মদীনার কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল। কোরায়শ দলপতিরা চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে খুব

খোঁজাখুঁজি করিল। অবশেষে তাহারা এই ধারণায় উপনীত হইল যে, ঐরূপ কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাই কোরায়শ মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে ধরিবার জন্য তাঁহাদের পিছনে ধাওয়া করিল। কাফেলা তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বার প্রধানের দুই প্রধান– সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এবং মোনযের ইবনে আমর (রাঃ) পিছনে ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের দুই জনকে নাগালে পাইল বটে, কিন্তু মোনযের (রাঃ)-কে কাবু করিয়া রাখিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা সা'দ (রাঃ)-কে বন্দী করিয়া নিয়া আসিল এবং তাঁহার উপর অত্যাচার চালাইল।

মক্কাতে দুই চারি জন মহামতি মানুষ ছিল; যেমন মোতয়েম ইবনে আদী– নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি যাহার অবদান ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আশ্রয়দানে। তদ্রূপ আবুল বোখতারী, তাহারও অবদান ছিল অসহযোগের বিরুদ্ধে। সা'দ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর মক্কার দুরাচারদের অত্যাচার দেখিয়া আবুল বোখতারীর মনে দয়া আসিল; সে সা'দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার কোন মানুষের সঙ্গে আপনার মৈত্রী নাই কি? সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আছে। তিনি মোতয়েম ইবনে আদী এবং হারেস ইবনে হরবের নাম উল্লেখ করিলেন। আবুল বোখতারী তৎক্ষণাত যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে সা'দের দুরবস্থার সংবাদ দিল। তাহারা বলিল, সত্যিই মদীনার খাযরাজ গোত্রের সা'দ আমাদের বিশিষ্ট মিত্র। বাণিজ্য সফরে মদীনা এলাকায় তিনি আমাদের আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাহারা সা'দের নিকট দৌড়িয়া পৌঁছিল এবং তাঁহাকে দুর্বৃত্তদের কবল হইতে ছুটাইয়া মদীনায় পৌঁছিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদীনার মুসলমানদের সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি মদীনায় যাইয়া পৌঁছিলেন।

এই সম্মেলন হইতে মদীনাবাসী মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞা লইয়া মদীনায় পৌঁছিলেন এবং নিজ নিজ কায়দা-কৌশলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও শ্রেণী ইসলাম প্রচারে ব্যাপক আকারের তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তরুণরাও বেশ কাজ করিতে লাগিলেন; তাহারা কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণসুলভ কূটকৌশলে বড় বড় সাফল্য লাভ করিতেন।

তরুণদের একটি মজার কাণ্ড

সম্মেলনের দীক্ষায় দীক্ষিত এক তরুণ মোআয ইবনে আমর (রাঃ)– তিনি বাড়ী আসিলেন; তাঁহার পিতা "আমর ইবনুল জমুহ" বৃদ্ধ, স্বীয় গোত্র প্রধান। ঐ সময় গোত্র প্রধানরা অনেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দেবমূর্তি রাখিত এবং তাহার গোত্রে উহার পূজা চলিত। মোআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আম্‌র এখন মোশরেক, তাহার একটি কাঠের তৈয়ারী "মানাত" নামের মূর্তি আছে। পুত্র মোআয ইবনে আম্‌র (রাঃ) এবং তাঁহার এক তরুণ বন্ধু মোআয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাত্রিবেলা গোপনে ঐ মূর্তিটাকে এক ময়লার খন্দকে ফেলিয়া আসিলেন। ভোর বেলা আম্‌র তাহার পূজনীয় মূর্তিটা না পাইয়া ভীষণ চটিয়া গেল। বহু খোঁজাখুঁজির পর ময়লার খন্দকে মূর্তিটা পাইয়া উঠাইয়া নিয়া আসিল এবং ধুইয়া-মুছিয়া আতর গোলাপ লাগাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; আর প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপকর্মকারীদের ধরিতে পারিলে ভীষণ শাস্তি দিব। পরবর্তী রাত্রেও ঐ ঘটনা; ভোর বেলা আম্‌র পুনরায় ঐ ময়লার খন্দক হইতে মূর্তিটা উদ্ধার করিয়া আনিল এবং ঐরূপে পুনঃস্থাপন করিল। কয়েক দিন এই ঘটনা ঘটিবার পর আম্‌র একদিন মূর্তিটাকে ময়লার খন্দক হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃস্থাপনকালে তাহার গলায় একটি তরবারি লটকাইয়া দিয়া বলিল, হে দেবতা! তোমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার কে করে তাহার খোঁজ বাহির করিতে আমি অক্ষম। তোমাকে অস্ত্র দিয়া দিলাম; তুমি দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিও। এইবার অধিক মজার কাণ্ড– তরবারিখানা নিয়া গিয়াছে, আর কোথাও হইতে একটা মরা কুকুর আমদানী করিয়া দেবতাকে তাহার সহিত বাঁধিয়া সেই ময়লার খন্দকে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আম্‌র আজও দেবতার খোঁজে বাহির হইয়া এবং সেই ময়লার খন্দকে অধিক দুরবস্থায় মরা কুকুরের সহিত জড়ানো অবস্থায় পাইয়াছে। এইবার আম্‌রের চৈতন্য হইল, এইবার আর দেবতাকে

উদ্ধার করিল না, বরং গোষ্ঠীর মুসলমানদের নিকট হইতে ইসলামের শিক্ষা জ্ঞাত হইয়া শেরক ও মূর্তিপূজার অসারতা বুঝিতে পারিল, তওহীদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিল এবং মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণপূর্বক খাঁটি মুসলমান হইয়া গেল। এখন তিনি আম্‌র ইবনুল জমুহ (রাঃ)। এই ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষা স্বয়ং আম্‌র (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার একটি পংক্তি এই–

وَاللهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ # اَنْتَ وَكَلْبُ وَسْطَ بِئْرٍ فِىْ قَرَنْ

'খোদার কসম! হইতে যদি তুমি আমার প্রভু

খন্দকেতে কুকুর সাথে না থাকিতে কভু"। – (বেদায়া ৩-১৬৫)

এই সম্মেলনের পরই হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাপকভাবে মুসলমাগণকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজেও হিজরতের প্রস্তুতি নিয়া আল্লাহর তরফ হইতে অনুমতির অপেক্ষায় রহিলেন। কারণ, নবীর পক্ষে আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট অনুমীত ব্যতিরেকে দেশত্যাগ করা অপরাধ গণ্য হয়, যাহার নমুনা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ৪র্থ খণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে।

মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপন তথা ইসলামের উন্নতির সূচনায় আকাবা সম্মেলনের গুরুত্ব যে কত দূর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই দ্বীন দরদী ছাহাবীগণের অন্তরে আকাবা সম্মেলনের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে

১৭০০। হাদীছ ঃ (৫৫০) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপস্থিতিতে যে আকাবাহ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আমরা (মদীনাবাসীগণ) ইসলামের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম, যদ্দরুন আমি নিজেকে ধৈন্য মনে করি এবং বদরের জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যের বস্তু আকাবা সম্মেলনকে মনে করিয়া থাকি। যদিও বদরের জেহাদ (অত্যধিক ফযীলতের বস্তু হিসাবে) লোকদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সর্বশেষ আকাবা সম্মেলনে উপস্থিত পঁচাত্তর জনের অন্যতম ছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে বিশেষ কর্মতৎপরতা বহন করিয়াছিলেন। (বেদায়া ওয়ান নেহায়া এবং যোরকানী দ্রষ্টব্য)।

মদীনায় ইসলামের কৃতকার্যতার কারণ

ইসলামের জীবন এক হইতে তের বৎসর মক্কায় কাটিল; এই দীর্ঘ তের বৎসর স্বয়ং নবী (সঃ) মক্কায় থাকিয়া কত সাধনা, চেষ্টা করিলেন! কিন্তু এই দীর্ঘ তের বৎসরে মক্কায় ইসলাম যতটুকু উন্নতি ও প্রসার লাভ করার স্বপ্নও দেখিতে পারে নাই, শুধু দুই বৎসরে মদীনায় তদপেক্ষাও অধিক সাফল্য, উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল– এই আকাশ পাতাল ব্যবধানের রহস্য কি?

দেশে ও সমাজে একটি অভিজাত সম্প্রদায় থাকে; যাহারা দেশ ও সমাজের সর্দার-মাতব্বর, প্রধান হয়। জনগণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি জমাইয়া রাখা তাহাদের মজ্জাগত স্বভাব। সাধারণ জনগণের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীনতা এবং চিন্তাশক্তিকে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ জনমণ্ডলীকে নিজেদের দাস করিয়া রাখিবার জন্য সদা তাহারা আগহান্বিত ও তৎপর থাকে। তাহারা স্বভাবতই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অতি অভিলাষী হইয়া থাকে। গর্ব, অহঙ্কার, অভিমান ও কৌলীন্য তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়।

দেশে বা সমাজে যাহারা ঐ সম্প্রদায়ের সদস্য পদ দখল করিয়া লইতে পারিয়াছে, সর্দার মাতব্বররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে– অন্য কেহ যেন ঐরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে না পারে, তাহাদের শ্রেণীর সদস্যপদে আসিতে না পারে। বিশেষতঃ অন্য কাহারও তাহাদের প্রতি

পক্ষরূপে সামান্য একটু ভবিষ্যত আত্মপ্রতিষ্ঠার আঁচ করিলেই ঐ সর্দার মাতব্বর সম্প্রদায়ের মন-মগজে অভিমান-অহঙ্কার, হিংসা ও ঘৃণার জঘন্য ভাব এমন করিয়া উত্থিত হয় যে, তাহা ভীষণ ক্ষোভ ও ক্রোধে পরিণত হয় এবং তাহাদেরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সেই ক্ষোভ ও ক্রোধ তাহাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বিবেককে কঠিন লৌহ মুষ্টিতে এমনভাবে চাপিয়া ধরে যে, সত্যাসত্য ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার শক্তিই তাহাদের লোপ পাইয়া যায় এবং বিপক্ষকে জব্দ করা, হেয় করা, পরাজিত করা, উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় তাহারা উন্মাদ হইয়া পড়ে। ফলে বিপক্ষের শত সত্য, শত ন্যায়কেও স্বীয় অন্তরে বা দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ স্থান দেওয়া তাহাদের নিকট আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য হয়।

বিপক্ষের ন্যায় ও সত্যকে নিজেদের দৃষ্টিতে স্থান দেওয়া দূরের কথা, ঐ সত্য যেন দেশে বা সমাজে এক বিন্দু শিকড় জমাইতে সুযোগ না পায় সেই উদ্দেশে তাহারা দেশ ও জাতিকে ক্ষেপাইয়া মাতাইয়া তোলে ঐ সত্য ও তাহার বাহকের বিরুদ্ধে। কারণ, জনশক্তিই হইল তাহাদের একমাত্র বল-ভরসা। অতএব জনশক্তিকে যেন কেহ তাহাদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিতে না পারে সর্বদা তাহাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। জনগণও ভেড়ীর পালরূপে সকলে একদিকে ছুটিতে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যখন জনসাধারণের বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ এই সর্দার, মাতব্বরদের দাসত্বে জীবন কাটাইয়াছে। ফলে দেশ জাতির সর্বশক্তি ঐ সত্য তাহার ও বাহকের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত মাতাল হইয়া উঠে, ঐ সত্য ও তাহার সেবকদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

শত শত দেশ ও সমাজের ঐ কুখ্যাত সর্দার-মাতব্বর সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া সত্য এবং সত্যের কত আহ্বায়ককে দেশ ও সমাজ হইতে চিরবিদায় দিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে। "তায়েফ" নগরে মহাসত্য ইসলামের বিপর্যয় এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যর্থতার মূলে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সৃষ্ট পরিস্থিতিই দায়ী ছিল। তায়েফে ত ঐ কুখ্যাতদের সংখ্যা মাত্র তিন ছিল।

পক্ষান্তরে মক্কা নগরে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল অনেক। ওতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, আছ আসওয়াদ, ওলীদ, উমাইয়া, উবাই, আবু জহল এবং আরও অনেকে। এই সব দুরাচারদের হাতে সর্দারী মাতব্বরী ত ছিলই, এতদ্ভিন্ন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফকে তীর্থ মন্দির বানাইয়া তাহার সেবক প্রধান হইয়াছিল তাহারাই। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যে যাজক পুরোহিতের গর্ব-অহঙ্কারও ছিল সমধিক।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাসে পাতায় পাতায় উল্লিখিত এই বাস্তব সত্যটিই নজরে পড়ে যে, ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় দুরাচার মাতব্বর শ্রেণীই ইসলাম এবং নবীজী (সঃ)-কে মক্কায় শিকড় জমাইতে দেয় নাই। আবহমানকাল হইতে দেশে দেশে সমাজে সমাজে যাহা ঘটিয়া আসিতেছিল এবং ঘটিয়া থাকে, ইসলাম এবং নবীজী (সঃ) সম্বন্ধে মক্কায় এবং কোরায়শ সমাজে তাহাই ঘটিয়াছিল। ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় নিজেরা ত মহাসত্য ইসলাম এবং তাহার বাহক মহানবী (সঃ)-কে গ্রহণ করেই নাই, অধিকন্তু তাহারাই সমাজ ও জনসাধারণকে এ সত্য ও তাহার বাহকের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছে, ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সত্যকে চাপিয়া মারিবার সর্বাত্মক চেষ্টা তাহারা করিয়াছে। ফলে মক্কায় ইসলামের দ্রুত সাফল্য লাভ সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

পক্ষান্তরে মদীনায় তখন একটা ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল। মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী পৌত্তলিক দুইটি বংশ "আওস" এবং "খাযরাজ"। দুই সহোদর হইতেই দুইটি গোত্রের উৎপত্তি; তাহাদের পরস্পর গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহ দীর্ঘদিন হইতে অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার সুদীর্ঘ ১২০ বৎসর স্থায়ী বোআস যুদ্ধের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, যাহাতে উভয় পক্ষের ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। ফলে সমাজ এবং জনসাধারণ মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ পায়, সর্দার-মাতব্বর দুরাচারদের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞান-বিবেকে সত্যাসত্যের ও

ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করার উত্তম সুযোগ পায়। মদীনাবাসী সমাজ ও জনগণের উপর সর্দারী মাতব্বরীর কঠোর লৌহ বাঁধ না থাকায় তাহারা ইসলামের সত্যাসত্য ধীরস্থিরভাবে শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখার সুযোগ পাইল। বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক না থাকিলে সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়– সেমতে মাত্র কতিপয় মুসলমানের পবিত্র কোরআন প্রচারের ফলে এবং ইসলামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সদগুণাবলীর মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট মদীনাবাসীগণ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিতেছিল। ইতিমধ্যেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনায় আসিয়া পড়িলে ত তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের ভিড় লাগিয়া গেল। এই সত্যটিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৭০১। হাদীছ (পৃষ্ঠা-৫৩৩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوْا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهٖ فِىْ دُخُوْلِهِمُ الْاِسْلَامَ -

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বোআস যুদ্ধের ঘটনাকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য আল্লাহ তাআলা অগ্রিম সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মদীনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণ এমন অবস্থায় হইয়াছিল যে, বোআস যুদ্ধের কারণে মদীনাবাসীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সর্দারগণ নিহত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা আঘাতে জর্জরিত ছিল। ইসলামের প্রতি মদীনাবাসীদের সহজে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে এইসব কারণ ছিল এবং এই কারণগুলি মদীনায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনের পূর্বে বোআস যুদ্ধের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরেই "মে'রাজ শরীফের" ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! তাহা অতি বড় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তাহার বিবরণও সুদীর্ঘ। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা আলোচনায় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

মদীনায় ইসলামের দুই বৎসর

নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ দিকে হজ্জের মৌসুমে আকাবায় প্রথম সাক্ষাতে ছয় বা আট জন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা মদীনায় ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। একাদশ বৎসর হজ্জ মৌসুমে আকাবায় নবীজীর সঙ্গে বার জন মদীনাবাসীর সম্মেলনে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার প্রতিজ্ঞাসহ কতিপয় বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা গ্রহণ হইয়াছিল। অধিকন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী মোসআ'ব (রাঃ) এবং তাঁহার পরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্যে নেতৃত্ব দানের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক মদীনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই মদীনা ইসলামের কেন্দ্রেররূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল; এমনকি তথায় প্রবাসী মুসলমানদের আশ্রয়েরও ব্যবস্থা হইল।

নবুয়তের একাদশ বৎসরে মদীনায় ইসলামের প্রসার ও প্রবাসী মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নহে, বরং শুধু ব্যক্তিগতভাবে আবু সালামা (রাঃ) এবং উম্মে সালামার (রাঃ)-এর ন্যায় কেহ কেহ মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। ইতিমধ্যেই দ্বাদশ বৎসরের শেষ দিকে যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তৃতীয় আকাবা সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত হয়। অপর দিকে নবী (সঃ) স্বপ্নযোগে মদীনায় মুসলমানদের হিজরত করার ইঙ্গিত লাভ করেন। নবীর স্বপ্ন ওহীই বটে এবং এই ব্যাপারে একাধিক স্বপ্ন ও ইঙ্গিত নবীজী (সঃ) প্রাপ্ত হন। প্রথম ইঙ্গিত যাহা আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) বলিলেন–

رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَّكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهْلِىْ اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرَ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ ـ

অর্থ ঃ "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি হিজরত করিয়াছি মক্কা হইতে খেজুর বৃক্ষের দেশে। সেমতে আমার ধারণা হইল, ঐ দেশ "ইয়ামামা" বা "হাজার" অঞ্চল হইবে, কিন্তু পরে দেখা গেল সেই দেশের উদ্দেশ্য "ইয়াসরেব" (মদীনা) নগরী ছিল।" এই হাদীছখানা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত সম্পর্কে নবী (সঃ) বলিয়াছেন−

اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَىَّ هٰؤُلَاءِ الْبِلَادِ الثَّلَاثِ نَزَلْتَ فَهِىَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِيْنَةُ اَوِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ قِنَّسْرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ আমাকে ওহী মারফত জ্ঞাত করিয়াছেন, তিনটি নগরীর যে কোনটিতে আপনি অবতরণ করিবেন তাহাই আপনার হিজরতের স্থান সাব্যস্ত হইবে− মদীনা, বাহরাইন কিম্বা কান্নাসিরীন।"

(তিরমিযী শরীফ)

তৃতীয় বার স্বপ্নযোগে এমন নিদর্শনও বর্ণনা করা হইল যাহাতে নবীজীর হিজরত স্থানরূপে মদীনা নির্ধারিত হইয়া গেল। "নবীজীর হিজরত" আলোচনায় একটি সুদীর্ঘ হাদীছ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইবে; তাহাতে আছে, নবীজী (সঃ) বলিলেন−

قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ اُرِيْتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের হিজরতের নগরী আমাকে দেখানো হইয়াছে− তাহা খেজুর বাগান পূর্ণ। তবে তাহাতে কোন জায়গা লোনাও রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান আছে।" এই তিনটি নিদর্শন একত্রে একমাত্র মদীনা নগরীতেই রহিয়াছে। খেজুর বাগানপূর্ণ নগরী অনেকই আছে, তৎসঙ্গে অপর নিদর্শনদ্বয় মদীনা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। উক্ত হাদীছে ইহা উল্লেখ আছে যে− "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কতৃক ঐ স্বপ্ন বর্ণিত হওয়ার পর মক্কার মুসলমানগণ নিজ নিজ সুযোগমতে অনবরত হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমনকি পূর্বে যাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছেন তাঁহারাও মদীনা পানে ধীরে ধীরে হিজরত করিতে লাগিলেন।"

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরের শেষ মাসে ঐতিহাসিক আকাবার তৃতীয় সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের সুদৃঢ় আশ্বাস লাভ হইয়াছে। মদীনাকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। মদীনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গমনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমতাবস্থায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও মুসলমানদিগকে ব্যাপকভাবে মদীনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নবীজী (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিলেন−

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ اِخْوَانًا وَدَارًا تَامَنُوْنَ بِهَا ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি দেশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যথায় তোমরা আশ্রয় পাইবে নিরাপদে থাকিবে এবং তিনি তোমাদের জন্য ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুবর্গের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।" (বেদায়াহ, ৩−১৬৯)।

অবশ্য নবীজী (সঃ) নিজে মক্কায়ই থাকিলেন; এই অবস্থায় তাঁহার মক্কায় অবস্থান সাধারণ দৃষ্টিতেও অতি বড় উদারতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আকাবায় সাফল্যজনক সম্মেলনের সংবাদ কোরায়েশরা পাইয়া বসিয়াছিল। এই কারণে তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা অধিক বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই দুঃসময়ে মহানুভব নবীজী (সঃ) নিজের চিন্তা একটুও করিলেন না। তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল মুসলমানগণকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সহচরবৃন্দকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া অবস্থান করিলেন শত্রুপুরীতে– এই আদর্শের দৃষ্টান্ত কতই না বিরল!

মুসলমানগণ যতই ব্যাপক হারে হিজরত করিতে লাগিলেন, কাফেররা ততই কঠোরভাবে বাধার সৃষ্টি করিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল। সতুরাং মুসলমানগণ হিজরতের ব্যবস্থা গোপনে গোপনে করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

ওমর (রাঃ) মদীনাপানে

ওমর (রাঃ) প্রকাশ্যেই হিজরত যাত্রার সময় সুসম্পন্ন করিয়া তরবারি বক্ষে ঝুলাইলেন, ধনুক তীর ছুঁড়িবার ভঙ্গিতে প্রস্তুত করিলেন। তীরদান হইতে তীর হস্তে ধারণপূর্বক কা'বা শরীফে আসিলেন। তথায় দুরাচার কাফেররা সলা-পরামর্শে এবং গল্প-গুজবে জটলা বাঁধিয়া বসিয়াছিল। ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের তওয়াফ করিলেন, মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন, অতপর কাফেরদের জটলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহ গর্জনে সম্বোধন করিলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হউক– যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার মাকে পুত্রশোকে পতিত করার, সন্তান-সন্ততিকে এতীম করার, স্ত্রীকে বিধবা করার, সে যেন হরম শরীফের সীমার বাহিরে আমার সম্মুখে আসে। এই ঘোষণায় কাফেরদের মুখ শুকাইয়া গেল; কাহারও সাহস হইল না ওমরের পিছু ধাওয়া করার। একমাত্র কতিপয় দুর্বল মুসলমান যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে হিজরত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন তাঁহারা পিছনে ছুটিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পথের খোঁজ অবগত করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। (যোরকানী, ১–৩২০)

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বড় ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং ভগ্নীপতি সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-সহ বিশ জনের কাফেলা মদীনাপানে রওয়ানা হইল। এই কাফেলায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আইয়্যাশ ইবনে রবীআ (রাঃ)। তিনি ছিলেন দুরাচার আবু জহলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাই তাঁহার হিজরত করায় আবু জাহলের ক্ষোভের সীমা থাকিল না, কিন্তু তিনি ওমরের সহযাত্রী, তাই বাধা দানের সাহস তাহার হইল না। তাঁহারা মদীনায় পৌঁছিবার পর আবু জাহল ভণ্ডামিপূর্ণ এক চক্রান্ত করিল।

আইয়্যাশ (রাঃ) বিপদে পড়িলেন

আইয়্যাশ (রাঃ) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছিয়া যাওয়ার পর আবু জাহল এবং তাহার আর এক দুধভ্রাতা "হারেস" মদীনায় পৌঁছিল এবং আইয়্যাশ (রাঃ)-কে নানারূপ ছল-চাতুরী দ্বারা বুঝাইল, তোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার বিচ্ছেদ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় যাইবেন না– রৌদ্রেই থাকিবেন। মাতার ক্লেশ ও দুর্গতির সংবাদে আইয়্যাশ (রাঃ) শেষ পর্যন্ত ঐ দুরাচারদ্বয়ের সঙ্গে মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তিনি হয়ত ভাবিলেন, অন্ততঃ একবার মাকে সান্ত্বনা দিয়া আশা আবশ্যক। পথিমধ্যে ছল করিয়া আবু জাহল ভ্রাতৃদ্বয় আইয়্যাশের বাহন থামাইয়া উভয়ে একসঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহাকে কাবু করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল এবং মক্কায় আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

উক্ত কারাগারে ইসলাম গ্রহণ অপরাধে "হেশাম" নামক একজন মুসলমান পূর্ব হইতেই ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতেছিলেন। তিনিও ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাফেলার সঙ্গী হইতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তিনি পাষণ্ডদের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়ই কারাগারে নির্যাতন ভোগে আবদ্ধ থাকিলেন; দীর্ঘ দিন এই অবস্থা তাঁহাদের উপর অতিবাহিত হইল। এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, তখনও তাঁহারা কারাগারেই আবদ্ধ। এই সময় ত তাঁহাদের শ্রেণীর আবদ্ধ বা দুর্বল মুসলমানদের উপর মক্কার দুরাচারদের নির্যাতন বহু গুণে বাড়িয়া গেল। কারণ, পাষণ্ডরা সকল ক্রোধ ঝাল তাঁহাদের উপরই মিটাইতে লাগিল। আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) দৈহিক নির্যাতনের সম্মুখীন ত ছিলেনই, আর একটি মানসিক যাতনাও ছিল তাঁহাদের অতি বড়।

আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা ত বিস্তারিত বর্ণিত হইলই যে, তাঁহাকে আবু জাহল ও তাহার ভ্রাতা ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করিল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়িয়া গেলেন। এই বিষয়টিকেই ইতিহাসে وَفَتَنَاهُ فَافْتَتَنَ "তাহারা উভয়ে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করিল, ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইলেন" বলা হইয়াছে। (বেদায়া ৩-১৭২)

হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও এইরূপ বিভ্রান্ত করারই কোন চক্রান্ত করা হইয়াছিল। ওমর (রাঃ) হিজরতে যাত্রার পূর্বে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়কে বলিয়াছিলেন, রজনীর অন্ধকারে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহ হইতে রওয়ানা হইয়া প্রভাতে "তানাজোব" নামক স্থানে পৌছিবে। ভোর বেলায় যে ঐ স্থানে পৌছিতে না পারিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ত ভোর বেলা ঐ স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু হেশাম (রাঃ) পৌছিলেন না। ফলে ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অপেক্ষা না করিয়া ঐ স্থান হইতে মূল কাফেলায় মিলিত হইয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, আর হেশাম (রাঃ) দুরাচারদের হাতে আটকা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা স্বয়ং ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বর্ণনায় রহিয়াছে- وَحُبِسَ هِشَامٌ وَفُتِنَ فَافْتَتَنَ "হেশামকে আটকাইয়া ফেলা হইল, তাঁহাকে বিভ্রান্তিতে ফেলিবার চেষ্টা করা হইল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়া গেলেন।" (বেদায়া, ৩-১৭২)।

এস্থলে আইয়্যাশের ঘটনার ন্যায় বিভ্রান্তির বিবরণ না থাকিলেও উল্লিখিত কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত দ্বারাই হেশাম (রাঃ)-কে আটকানো হইয়াছিল এবং তিনি সেই বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ায় হিজরত করিতে পারেন নাই!

আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনায় একটি প্রশ্ন সুস্পষ্ট যে, তিনি কাফেরদের কথা কেন বিশ্বাস করিলেন- যেই চক্রান্তে পতিত হইয়া তিনি তৎকালীন একটি বৃহত্তম ফরয হিজরত হইতে বিচ্যুত থাকিলেন? তদ্রূপ হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিও এই প্রশ্ন যে, হয়ত কাফেরদের চক্রান্তে বিশ্বাস করিয়াই তিনি আটকা পড়িয়া হিজরতের ফরয আদায় হইতে বঞ্চিত থাকিলেন। এই প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া লোকেরাও বলিত এবং তাঁহারাও ভীষণ চিন্হিত ছিলেন যে, হিজরত না করার তৎকালীন বৃহত্তর কবীরা। গোনাহ হইতে তাঁহাদের রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইবে না- কাফেরদের চক্রান্তে যেহেতু তাঁহারা নিজেই পতিত হইয়াছেন, তাই উক্ত গোনাহের জন্য শত তওবা করিলেও কবুল হইবে না।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মদীনায় পৌছিয়াছেন এবং সর্বত্রই ঐ জল্পনা কল্পনা। আল্লাহ তাআলার রহমত অসীম, তিনি সবই জ্ঞাত থাকেন; আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ)-এর ত্রুটি কি পরিমাণ ছিল তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া হইল। তিনি ঐ সকল জল্পনা কল্পনার অবসান করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করিলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "আপনি বলিয়া দিন হে বান্দাগণ! যাহারা নিজেদেরই ক্ষতিকর ক্রটি করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমতের আশা ত্যাগ করিও না, নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ এই শ্রেণীর সব গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী দয়ালু ....। এই আয়াত লিপিযোগে মদীনা হইতে মক্কায় আইয়্যাশ ও হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট পৌঁছাইয়া তাঁহাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থা করা হইল।

এদিকে নবীজী (সঃ) ঐ শ্রেণীর নির্যাতিত অসহায় মুসলমানগণের মুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা আরম্ভ করিলেন। এমনকি জামাতের সহিত ফরয নামাযের মধ্যেও সকলকে আমীন বলার সুযোগ দানে সশব্দে ঐ দোয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মক্কায় আবদ্ধ অত্যাচারিত দুর্বল মুসলমানদের মুক্তির দোয়ায় কতিপয় বিশেষ নামও উল্লেখ করিতেন; তন্মধ্যে আলোচ্য আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম সর্বাগ্রে ছিল। দোয়ার মধ্যে আরও একজনের নাম ছিল– সালামা ইবনে হেশাম। তিনি ছিলেন আবু জহলের সহোদর। তিনিও ইসলাম গ্রহণের অপরাধে একই কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁহার পা আইয়্যাশের পায়ের সহিত শিকলে বাঁধা ছিল। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ–৪) দোয়ার বিস্তারিত বয়ান প্রথম খণ্ড ৫৪৭ নং হাদীছে রহিয়াছে।

আইয়াশ (রাঃ)-এর মুক্তিলাভ

নবী (সঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কায় কাফেরদের হস্তে বন্দী রহিয়াছেন বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আটকা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম একই কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইতেছিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন–

مَنْ لِىْ بِعَيَاشِ ابْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٍ ـ

অর্থ ঃ "আইয়্যাশ এবং হেশামের মুক্তির জন্য আমি উদ্‌গ্রীব; আমার এই বাসনা পূরণে আত্মদান করিতে কে প্রস্তুত আছ? ওলীদ নামক ছাহাবী বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। ওলীদ (রাঃ) মক্কায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন; কারাগারে বন্দীদের আহার তাঁহাদের বংশীয় লোকদের পৌঁছাইবার অনুমতি ছিল; সেমতে এক মহিলা খাদ্য নিয়া যাইতেছিল। ওলীদ (রাঃ) ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলিয়া জানিতে পারিলেন সে ঐ বন্দীদের জন্যই খাদ্য নিয়া যাইতেছে। ওলীদ (রাঃ) তাহার পিছনে পিছনে গেলেন এবং কারাগারের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিলেন। কারাগারটি নগর প্রান্তে শুধু প্রাচীর বেষ্টিত ছিল– তাহার উপরে ছাদ ছিল না; বন্দীগণ সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারা দিন সেই ছাদবিহীন কারাগারে ছটফট করিতেন। ওলীদ (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সেই কারাগারের নিকটে যাইয়া বহু কষ্টে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া লাফাইয়া কারাগারের ভিতরে পড়িলেন। কিন্তু বন্দীদের পায়ে কঠিন লৌহ বেড়ির বাঁধন ছিল; এই অবস্থায় তাঁহারা চলিতে সক্ষম হইবেন না, কিরূপে পলায়ন করিবেন? ওলীদ (রাঃ) এক খণ্ড শক্ত পাথর খুঁজিয়া আনিলেন এবং লৌহ বেড়ির নীচে স্থাপনপূর্বক তরবারি দ্বারা ভীষণ জোরে লৌহ বেড়িতে আঘাত করিলেন; তাহা কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা মদীনার পানে ছুটিয়া চলিলেন। একটি মাত্র উট ছিল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর; তিনি মুক্ত বন্দীদ্বয়কে উটে চড়াইয়া নিজে এই দীর্ঘ প্রায় তিন শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন।* (সীরাতে ইবনে হেশাম)

* উল্লিখিত ঘটনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারীর নাম "ওলীদ" দেখিয়া মোস্তফা চরিত গ্রন্থে এই ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে এই কারণে যে, আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুক্তির জন্য যে নবী (সঃ) নামাযের মধ্যে দোয়া করিয়াছেন সেই দোয়ার মধ্যেই ওলীদ নামীয় ব্যক্তির মুক্তির জন্যও দোয়ার উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায়, ওলীদও তখন

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর ওসমান (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করিলেন। (যোরকানী, ১-৩২০)

এইভাবে মক্কা হইতে প্রায় সকল মুসলমানই হিজরত করিয়া গেলেন। মক্কায় রহিলেন শুধু কতিপয় মজলুম মুসলমান- যাঁহারা দুর্বল হওয়া কিম্বা নিজ গোষ্ঠি জ্ঞাতিদের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ বা কারারুদ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য ছিলেন। আর ছিলেন শাহেনশাহে দোজাহান সাইয়্যেদুল কাওনাইন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহারই আদেশে আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।

যথাসম্ভব মুসলমানগণকে আশ্রয় ও নিরাপদ স্থান মদীনায় পৌছাইয়া দিয়াও নবীজী (সঃ) মক্কায় অবস্থান করিলেন আল্লাহ তাআলার অনুমতির অপেক্ষায়।

আনসারগণের সৌজন্য

মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় আসিয়া অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। মদীনার আনসারগণ এই প্রবাসী ভ্রাতাদিগকে নিজ নিজ ঘরদুয়ার ও বিষয় সম্পত্তির অংশ প্রদানের প্রস্তাব দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। (১৭১৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে মোহাজের ভাইদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শনে আনসারগণ এক অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদীনার সর্বত্র ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল, মদীনাবাসী মুসলমানগণ ইসলামের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

নবীজীর (সঃ) হিজরত (পৃষ্ঠা- ৫৫১)

মক্কা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মভূমি; নবুয়তের পূর্বে জীবনের বড় অংশ সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর এই মক্কায়ই কাটিয়াছিল। নবুয়তী জীবনেরও বেশী অংশ মক্কায়ই কাটিয়াছে। মক্কায়ই সৃষ্টির মুকুটমণি আল্লাহ তাআলার ঘর- কা'বা শরীফ অবস্থিত। এই সব কারণে মক্কার প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী, ভালবাসা ছিল অপরিমেয়। কিন্তু আল্লাহর ও আল্লাহর দ্বীনের ভালবাসা হইল সর্বোচ্চ, সর্বাধিক ও সর্বাগ্রে। দীর্ঘ তের বৎসরের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষায়ও যখন মক্কা ভূমিতে দ্বীন ইসলামের জন্য নিরাপত্তা সৃষ্টি হইল না, নিরাপদে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারের সুযোগ তথায় হইয়া উঠিল না, তখন নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বাধ্য হইলেন স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণে। বিষাদ ও দুঃখভরা অন্তরে, ব্যথা বেদনা জড়িত হৃদয়ে স্থির করিলেন মক্কা পরিত্যাগ করিতে। এই সঙ্কল্প গ্রহণের পর মনোব্যথায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন-

مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَيَّ وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمِيْ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ -

অর্থ ঃ ঃ "মক্কা! কতই না ভাল তুমি!! কতই না ভালবাসি আমি তোমাকে!!! আমার জ্ঞাতিরা তোমার ক্রোড়ে আমাকে থাকিতে দিল না; নতুবা আমি তোমাকি ছাড়িয়া কোথাও বাস করিতাম না।"

(মেশকাত শরীফ ২৩৮)

মক্কায় বন্দী ছিলেন; সুতরাং উল্লিখিত ঘটনা নিশ্চয় অবাস্তব।

এই সংশয় জ্ঞান বিদ্যার অভাবপ্রসূত। কারণ, তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৪র্থ খণ্ডে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায়, সত্যই ওলীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কায় বন্দী ছিলেন এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ও সালামা (রাঃ)-এর সঙ্গে একই কারাগারে ছিলেন; সেই সময় মুক্তির দোয়ার মধ্যে আইয়্যাশ ও সালামার নামের সহিত ওলীদের নামও ছিল। পরে ওলীদ (রাঃ) কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। অপর বন্দীগণ কারাগারেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। নবী (সঃ) ওলীদের মুখেই আইয়্যাশ ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর নির্মম অত্যাচারের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের মুক্তির জন্য ওলীদ (রাঃ)-কে মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নবীজী (সঃ) যখন মক্কা ছাড়িয়া যাইবেন সেই বিচ্ছেদলগ্নে একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অশ্রুসজল নয়নে কা'বার প্রতি তাকাইলেন এবং গভীর মমতায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন–

وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَىَّ وَلَوْلَا اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ـ

অর্থ ঃ খোদার কসম মক্কা! অতি উত্তম দেশ তুমি!! আমার অতি প্রিয় তুমি!!! আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। তোমা হইতে আমাকে বিতাড়িত করা না হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিতাম না। (ঐ)

অধিকাংশ আলেমের মতে জগতের বুকে সর্বোত্তম দেশ প্রিয় মদীনা। কিন্তু মদীনা এই গৌরব লাভ করিয়াছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণের পর। যাবত না নবী (সঃ) মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাবত ঐ গৌরব মক্কার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

হিজরতের সূচনা

মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মুসলমানগণ মদীনায় আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পাইতেছেন, মদীনা এলাকায় ইসলামের প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। এই সব সংবাদ মক্কাবাসীদের অবিদিত থাকে নাই এবং তাহারা এই সংবাদে বিচলিত না হইয়া পারে না। কারণ, তাহাদের সুখ-শান্তি ও বল-শক্তিরই নহে শুধু, বরং তাহাদের বাঁচিবার প্রশ্ন নির্ভর করে সিরিয়ার বাণিজ্যের উপর এবং সেই বাণিজ্যের পথ মদীনাবাসীদের বাগের মধ্যে। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠা এবং তথায় মুসলমানদের শক্তি সৃষ্টি মক্কার কাফের গোষ্ঠীর জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। তাই কোরায়শদের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। মুসলমানগণ হাতছাড়া হইয়াছে, মদীনার আওস ও খাযরাজ প্রসিদ্ধ শক্তিশালী দুইটি গোত্রের সমর্থন সহযোগিতা লাভের সুযোগ তাঁহারা পাইয়া বসিয়াছেন। ইহার উপর আবার স্বয়ং মুহাম্মদও (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত; এইরূপ হইলে ত ইসলাম ও মুসলমানগণ বহু শক্তি অর্জনের সুযোগ পাইয়া বসিল এবং একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কেন্দ্র গড়িয়া তোলার সকল প্রকার সুবিধাই লাভ করিয়া ফেলিল।

মক্কার মোশরেকরা ভালভাবেই জানিত, ইসলামের প্রাণশক্তির উৎসমুখ হইলেন মুহাম্মদ (সঃ)। সুতরাং তাঁহার মদীনা যাওয়া পণ্ড করিতে পারিলে মদীনায় ইসলামী কেন্দ্র গড়িয়া উঠার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এমন কোন একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা করিতে লাগিল যদ্দ্বারা এইসব সুযোগেরও চির সমাপ্তি ঘটে এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) আন্দোলনই যেন চিরতরে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশে মক্কাবাসীরা এক শত মেম্বার সম্বলিত তাহাদের সর্বোচ্চ পরিষদ– "দারে নদওয়ার" এক পরামর্শ সভা আহবান করিল।

মক্কার কাফের শত্রুরা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যবস্থা স্থির করার জন্য বিশেষ গোপনীয়তার সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিল। এদিকে ইবলীসও এই সুযোগে ইসলামের মূল কর্তন করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। রসূলুল্লা (সঃ)-এর প্রাণ বিনাশে কোন সক্রিয় ব্যবস্থাবলম্বনে শত্রু দলকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে স্বয়ং ইবলীস شيخ نجدى আরব দেশীয় নজদ এলাকা নিবাসী প্রবীন মানুষের আকৃতি ও বেশে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। এমনকি এই সম্মেলনের মধ্যে সে-ই প্রস্তাব গ্রহণের ভূমিকায় প্রধান হওয়ার সুযোগ পাইয়া বসিল।*

---

* **সমালোচনা ঃ** আলোচ্য ঘটনায় নজদ নিবাসী বয়ঃবৃদ্ধের আকৃতিতে স্বয়ং ইবলীসের উপস্থিতিকে "মোস্তফা চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে। ছুতা ধরা হইয়াছে যে, "যাহারা ঐ কথা বলিয়াছেন তাঁহারা বৃদ্ধের মুখেও ঐ কথা শুনেন নাই, অথবা হযরতের মুখেও ঐ তথ্য অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধটি যে ছলধারী শয়তান ইহা তাহাদিগের অনুমান মাত্র।"

এইরূপ উক্তিতে হাসি না আসিয়া পারে না। সীরাত তথা চরিত শাস্ত্রের সমস্ত কিতাবেই আলোচ্য সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণ

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ হইতে লাগিল। একজন বলিল, মুহাম্মদ (সঃ)-কে বন্দী করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া হউক; হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করত যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কারাগারে ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে করিতে একদিন মরিয়া যাইবে। শেখ নজদী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব কার্যকর করিলে তাহার লোকজন ও আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় খোঁজ পাইবে এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয় চেষ্টা করিবে; তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাও ঘটিবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তাহারা উদ্ধার করিয়া নিয়াও যাইবে।

আর একজন বলিল, তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; সে তাহার দলবলসহ দেশান্তরিত হইলে আমাদের দেশ ঠান্ডা হইবে। শেখ নজদী এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সে যে দেশে যাইবে সেখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহার মিষ্ট কথায় এবং কোমল ব্যবহারে অনেক মানুষ তাহার দলে ভিড়িবে। পরে আমাদেরও বিপদের কারণ হইবে; হয়ত সে দল জুটাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিবে এবং আমাদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহার জন্য সহজ হইয়া যাইবে।

অবশেষে আবু জাহল একটি প্রস্তাব আনিল যে, তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলে চির দিনের জন্য আমরাও স্বস্তি লাভ করিব এবং তাহার ধর্ম ইসলামকেও হত্যা করা হইয়া যাইবে। তবে একা একজনে হত্যা করিলে তাহার গোষ্ঠী হাশেম ও মোত্তালেব বংশ প্রতিশোধ গ্রহণে ছুটিয়া আসিবে। অতএব আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মক্কা এবং তাহার পার্শ্বস্থ সমুদয় গোত্র হইতে এক-একজন শক্তিশালী যুবক বাছিয়া লইয়া একটি দল গঠন করা হউক, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তরবারি প্রদান করা হউক; তাহারা সকলে এক সঙ্গে মুহাম্মদের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করতঃ তাহাকে হত্যা করিবে। এই ব্যবস্থায় মূল উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া যাইবে এবং তাহার কোন পরিণামও বিশেষ ক্ষতিকর হইবে না। কারণ যেহেতু এই হত্যানুষ্ঠানে বহু গোত্রের লোক শামিল থাকিবে তাই বনু হাশেমগণ এতগুলি গোত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বনে সাহসী হইবে না। আর প্রাণ বিনিময়ের জরিমানা আদায় করিতে হইলে তাহাও সকল গোত্রের উপর বণ্টিত হইয়া সহজসাধ্য হইয়া যাইবে।

প্রবীণ মানুষবেশী ইবলীস এই প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিল এবং সকলেই ইহার প্রতি সমর্থন জানাইল। তাহাদের উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিতে রাত্রি বেলা রসূলুল্লাহর (সঃ) শয়ন গৃহ ঘেরাও করারও ব্যবস্থা হইল। শত্রুদের সম্মেলন শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ) মারফত হযরত (সঃ) সমুদয় খবর জ্ঞাত হইয়া গেলেন, তাঁহাকে স্বীয় বিছানায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল এবং মদীনার

উল্লেখ আছে এবং সুস্পষ্টরূপে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, উক্ত সমাবেশে স্বয়ং ইবলীস নজদ অধিবাসী বৃদ্ধের আকৃতিতে যোগদান করিয়াছিল। এখন যেই যুক্তিতে এই বিবরণ খণ্ডন করা হইয়াছে সেই যুক্তিতে ত মূল ঘটনা সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণেরও খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণও ত কেহ সভা অনুষ্ঠানকারীদের কিম্বা হযরতের মুখে শুনে নাই। বলাবাহুল্য সীরাত তথা চরিত শাস্ত্রের পূর্বাপর প্রচলিত গ্রন্থাবলীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই সীরাত বা চরিত গ্রন্থাবলী রচনা করা হইয়া থাকে, মোস্তফা চরিতও সেইরূপে রচিত। তাহার শত শত বর্ণনা প্রসিদ্ধ চরিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার লোকদের মুখে বা হযরতের মুখে শুনা হয় নাই, চরিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যেই যুক্তিতে ইবলীসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ অস্বীকারযোগ্য সাব্যস্ত হইবে, সেই যুক্তিতে মোস্তফা চরিতের এবং বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণ অস্বীকারযোগ্য হইবে। স্বয়ং ইতিহাস শাস্ত্রই পঙ্গু হইয়া যাইবে। ইতিহাস শাস্ত্রে কয়টি ঘটনা এইরূপ পাওয়া যাইবে যাহা মূল ঘটনার লোকদের মুখে শুনিয়া বা হযরতের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে? অতএব উল্লিখিত যুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তি নহে, বাতুলতা মাত্র।

এতদ্ভিন্ন উল্লিখিত অস্বীকারের কারণ এলমের অভাবও বটে। ইবলীসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ ঘটনার অতি নিকটবর্তী লোক– মহামান্য, নির্ভরশীল আস্থার পাত্র, বিশিষ্ট ছাহাবী নবীজীর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সনদযুক্তভাবে বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– সীরাত গ্রন্থ বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৩–১৭৫ যোরকানী, ১–৩২১। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর ইতিহাস গ্রন্থ ২–৯৮।

পানে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হইল।*

নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় প্রস্থানের পরিকল্পনা করিলেন এবং ইহাও স্থির করিলেন যে, আলী (রাঃ)-কে মক্কায় রাখিয়া যাইবেন। কারণ, মক্কার জনসাধারণ তাহাদের সমাজপতিদের প্ররোচনায় অজ্ঞতাবশতঃ নবীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও নবীজী (সঃ)-কে এত দূর মহাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিত

যে, মক্কায় যাহার যেকোন মূল্যবান বস্তু বা টাকা পয়সা আমানত রাখার আবশ্যক হইত সে তাহা নিঃসংশয়ে নবীজীর নিকট রাখিয়া যাইত। কারণ, সব রকম বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও তিনি "সাদেকে আমীন বিশ্বাস্য নির্ভরশীল" বলিয়া সুপরিচিত হইলেন। এমনকি নবীজী যখন মক্কা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন তখনও তাঁহার নিকট বহু মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল। নবীজী (সঃ) যদি হঠাৎ এক দিনে সমুদয় গচ্ছিত বস্তু ফেরত দিয়া দেন তবে তাঁহার হিজরতের গোপন তথ্য ফাঁস হইয়া যায়। আর লোকদেরকে তাহাদের আমানত পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না করিলে তাহাই বা কিরূপ হয়! তাই নবীজী (সঃ) আলী (রাঃ)-কে ঐসব আমানত সোপর্দ করিয়া মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের সুব্যবস্থা করিয়া গেলেন। নবীজীর চরিত্র মাহাত্ম্য এতই অনাবিল ছিল।

নবীজী (সঃ) হিজরতের সুস্পষ্ট অনুমতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত গরমের মধ্যেই আবু বকরের গৃহে আসিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার? নবীজী (সঃ) বিশেষ সর্তকতার সহিত আবু বকর (রাঃ)-কে অবগত করিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আবু বকর আরজ করিলেন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইব কি? নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। এই সৌভাগ্যের সুযোগ লাভের অসীম আনন্দে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারিণী আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, মানুষ যে আনন্দেও কাঁদে তাহার দৃষ্টান্ত আমি ঐ দিনই দেখিলাম। (বেদায়া ৩-১৭৮)

আবু বকর (রাঃ) চারি মাস পূর্বে হিজরতের জন্য দুইটি উত্তম উট ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিজরতের সমুদয় ব্যবস্থা কথাবার্তা নির্ধারিত করিয়া নিলেন। হিজরতের ব্যবস্থা বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাই নবীজী (সঃ) রাত্রি আরম্ভে স্বীয় গৃহেই থাকিলেন যেন কাহারও কোন সন্দেহ না হয় এবং যাত্রার পূর্বেই কোন কেলেঙ্কারি সৃষ্টি না হইয়া পড়ে। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে এক দিকে নবীজী (সঃ) গৃহ ত্যাগের প্রস্তুতি করিতেছেন, অপর দিকে আবু জাহলের প্রস্তাব অনুযায়ী সে নিজে এবং অন্যান্য গোত্র হইতে সংগৃহীত মোট একশত জন শত্রুর দল নবীজীর (সঃ) গৃহ ঘেরাও করিয়া নিল। দারে নদওয়া মক্কার মিলনায়তনের পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমবেত অস্ত্রের আঘাতে নবীজীকে হত্যা করার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার জন্য তাহারা এই রজনীকেই নির্ধারিত করিয়াছে। আর নবীজী (সঃ)ও হিজরত করিতে গৃহ ত্যাগে এই রজনীকেই সাব্যস্ত করিয়াছেন; আবু বকর (রাঃ) পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী নিজ গৃহে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

নবীজী (সঃ) পূর্বেই আলী (রাঃ)-কে আমানতসমূহ প্রত্যর্পণের ভার গ্রহণ করার এবং নবীজীর কক্ষে অবস্থান করার বিষয় অবগত ও সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেমতে নবীজী (সঃ) নিজে সবুজ রঙ্গের যে

---

* উল্লিখিত তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে–

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ـ

"একটি স্মরণীয় ঘটনা– কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; তাহাদের প্রস্তাব এই ছিল যে, আপনাকে বন্দী করিবে বা প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে বা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। এই উদ্দেশে তাহারা গোপন ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল। আল্লাহ তাআলাও তাহাদের ষড়যন্ত্র বান চাল করার গোপন ব্যবস্থা করিতেছিলেন। (ফলে তাহাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইল, কারণ) আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাকারী।" (পারা-৯, রুকু-১৮)

চাদরখানা মুড়িয়া ঘুমাইতেন সেই চাদরেই আলী (রাঃ)-কে আবৃত করিয়া নিজের শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। নবীজী (সঃ) এখন গৃহ হইতে বাহির হইবেন, কিন্তু একশত প্রাণঘাতী শত্রুর দ্বারা তাঁহার গৃহ অবরুদ্ধ। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) সূরা ইয়াছীনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করিয়া অদম্য সাহসের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ "আমি তাহাদের চতুর্দিকে বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদেরকে আবরণে ফেলিয়া দিয়াছি, ফলে তাহারা দেখিতে পাইবে না।"

পবিত্র কোরআনের ইহাও একটি অলৌকিক ক্রিয়া যে, আয়াতের মূল মর্ম ত পূর্বাপর বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যই উদ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন বাহ্যিক ক্রিয়াও আল্লাহ তাআলা তাহার বরকত ও উসিলায় সংঘটিত করেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা তাবিজ-গণ্ডা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি হাজার হাজার আমলের ঐরূপ ক্রিয়া আবহমানকালের অভিজ্ঞতায় সপ্রমাণিত রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাক-পবিত্র জবান মোবারকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করায় আল্লাহ তাআলা তাহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যময় ক্রিয়ার উপস্থিত ফল এই দান করিলেন যে, অবরোধকারী শত্রুদের দৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার কুদরতী আবরণ পড়িয়া গেল; নবীজী (সঃ) নির্বিঘ্নে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; শত্রুরা তাঁহাকে দেখিল না। এমনকি প্রস্থানকালে নবীজী (সঃ) শত্রুদের উদ্দেশ করিয়া কাঁকরময় মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাদের প্রত্যেকের মাথার উপর তাহার অংশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু মোটেই কোনরূপ টের পায় নাই। গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (সঃ) আবু বকরের গৃহে গেলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহের পিছন দিকের খিড়কি পথে বাহির হইয়া পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সওর পর্বত উদ্দেশে যাত্রা করিয়া গেলেন।

যাত্রাকালে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى هَوْلِ الدُّنْيَا وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاخْلُفْنِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَلَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَعَلٰى صَالِحِ خُلُقِىْ فَقَوِّمْنِىْ وَاِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَاِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِىْ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَنْ يَحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ وَيَنْزِلَ عَلَىَّ سَخَطُكَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ فَجَائَةِ نِقْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى عِنْدِىْ حَيْثُمَا اسْتَطَعْتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ -

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন দুনিয়ার আপদ-বিপদে, সর্বদার ভয়-ভীতিতে, দিবা-রাত্রির বালা-মসিবতে। আয় আল্লাহ! আপনি আমার সঙ্গী হইয়া থাকুন আমার ভ্রমণে এবং আমার পরিবারে আমার অনুপস্থিতির অভাব আপনি পূরণ করিয়া দিন। আমাকে যাহা দান করেন তাহাতে বরকত দান করুন। আমাকে আপনার অনুরক্ত বানাইয়া রাখুন, সৎ চরিত্রের উপর আমাকে দৃঢ় পদ রাখুন, আমাকে আপনার প্রেমিক বানাইয়া

রাখুন। আমাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করিবেন না। আপনি সকল দুর্বলের এবং আমি দুর্বলেরও প্রভু, আমি আপনার দেয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করি। আপনার নূরে সমস্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে, সকল প্রকার অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং পূর্বাপর সকলের সমস্ত কাজ-কারবার ঐ নূরের বদৌলতেই সুশৃঙ্খল হইয়াছে। আমাকে আশ্রয় দান করুন আমার উপর আপনার গজব পতিত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার নেয়ামত হারা হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে, অকস্মাৎ আপনার আযাবের আগমন হইতে, আপনার প্রদত্ত সুখ-শান্তির পরিবর্তন ঘটা হইতে। আপনার সকল প্রকার সন্তুষ্টি লাভই আমার একমাত্র কাম্য। আপনার সাহায্য ছাড়া বাঁচিবার স্থান ও শক্তি কোথাও কাহারও নাই।" (যোরকানী, ১-৩২৯)

এদিকে শত্রু দল নবীজীর (সঃ) গৃহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, নবীজীর শয্যার উপর তাঁহারই চাদরে আবৃত আলী (রাঃ)-কে তাহারা হয়ত দ্বারের ফাটল দিয়া বা কোন প্রকারে শায়িত দেখিয়া মনে করিতেছিল, হযরত শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতেছে অথচ তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুযোগ পায় নাই, তাই অবশেষে ভোর বেলায় অবরোধকারীরা গৃহ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তথায় আলী (রাঃ)-কে দেখিয়া তাহারা হতবাক হইয়া গেল। তাহারা আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কর্তা কোথায়, আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না। (বেদায়া, ৩-১৮)।

তৎক্ষণাত আবু জাহল কতিপয় লোকসহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীতে গেল; তাহারা গৃহদ্বারে দাঁড়াইলে আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) তথায় আসিলেন। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর পিতা কোথায়? আস্‌মা (রাঃ) বলিলেন, আমি জানি না আব্বা কোথায় গিয়াছেন। আবু জাহল খবিস বজ্জাত আস্‌মা (রাঃ)-কে সজোরে চপেটাঘাত করিল– যাহাতে তাঁহার কানের বালি ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

(বেদায়াহ, ৩-১৭৯)

নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সওর পর্বতে

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সওর পর্বত উদ্দেশে পথ চলিতে লাগিলেন। নগর হইতে মাত্র ৩/৫ মাইল ব্যবধানেই এই পর্বত অবস্থিত। সুতরাং সাধারণভাবে রাত্রির অন্ধকারে শহর হইতে যাত্রা করিয়া ভোর হইতেই তথায় পৌছার কথা। কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া পথ অতিক্রম করায় এবং হয়ত সাধারণ পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করায় সওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিবার পথেই দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বিশ্রামেও বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই সওর পর্বত গুহায় রাত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। (ঐ, ২-১৭৯)

বুধবার দিন যাইয়া যে রাত্রি আসিল তাহা বৃহস্পতিবার রাত্র; এই রাত্রে গৃহ ত্যাগ করতঃ বৃস্পতিবার পূর্ণ দিন অতিক্রান্তে সওর পর্বতে পৌছিয়াছিলেন। সেই রাত্র জুমার রাত্র এবং জুমার দিন, তারপর শনিবার রাত্র ও দিন, তার পরে রবিবার রাত্র ও দিন– এই তিন রাত্র তিন দিন গুহায় বাস করিয়া রবিবার দিনের পর রাত্র সোমবার গভীর রাত্রে সওর পর্বত গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

(যোরকানী, ১-৩২৫)

গিরিগুহায় আবু বকর (রাঃ) ও নবীজী (সঃ)

রাত্রির অন্ধকারে সওর গিরি গুহার দ্বারে পৌঁছিয়া আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন; আমি প্রথমে গুহার ভিতরে প্রবেশ করি; সর্প-বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক কোন কিছু থাকিলে তাহার দুঃখ আমার উপর দিয়াই যাইবে। এই বলিয়া প্রথমে আবু বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ

করিলেন; গুহার চতুর্দিকে ছিদ্র পথ ছিল যাহা হইতে কোন দংশনকারী জীব বাহির হইতে পারিত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট অতিরিক্ত কাপড় ছিল; তিনি তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া ছিদ্রসমূহ কাপড় খণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুইটি ছিদ্র বাকী থাকিতেই কাপড় শেষ হইয়া গেল। আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (সঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) উন্মুক্ত ছিদ্রের মুখ স্বীয় পা দ্বারা বন্ধ করিয়া উরু বিছাইয়া দিলেন; তাহার উপর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (সঃ) মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে ছিদ্রের ভিতর বিষাক্ত বিচ্ছু ছিল; আবু বকরের পায়ে বার বার দংশিতে লাগিল। নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কায় আবু বকর (রাঃ) বিচ্ছুর দংশন সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন, একটুও নড়িলেন না। কিন্তু বিষক্রিয়ায় তাঁহার চোখের অশ্রু নবীজীর চেহারার উপর পতিত হইল; নবীজী (সঃ) জাগিয়া গেলেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীত– আমার পায়ে বিচ্ছু দংশিয়াছে। নবীজী (সঃ) দংশন স্থানে থুথু দিয়া দিলেন; তৎক্ষণাত আবু বকর (রাঃ) আরোগ্য লাভ করিলেন। নবীজী (সঃ) ঐ মুহূর্তেই আবু বকরের জন্য দোয়া করিলেন–

رَحِمَكَ اللّٰهُ صَدَّقْتَنِىْ حِيْنَ كَذَّبَنِىْ النَّاسُ وَنَصَرْتَنِىْ حِيْنَ خَذَلَنِىْ النَّاسُ وَاٰمَنْتَ بِىْ حِيْنَ كَفَرَ بِى النَّاسُ وَاٰنَسْتَنِىْ فِىْ وَحْشَتِىْ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ যখন লোকেরা অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি আমাকে সাহায্য করিয়াছ যখন লোকেরা আমার সাহায্য ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছ যখন লোকেরা আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমার সান্ত্বনা যোগাইয়াছ উদ্বেগ অবস্থায়।" নবীজী (সঃ) আরও দোয়া করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَابَكْرٍ مَعِىْ فِىْ دَرْجَتِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! বেহশতে আমার শ্রেণীতে আমার সঙ্গে আবু বকরকে রাখিও।" (ঐ, ১-৩৩৫)

ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফত আমলে অবগত হইলেন যে, কোন কোন লোক তাঁহাকে আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বলিয়া থাকে। ওমর (রাঃ) তখন কসম করিয়া বলিলেন, আবু বকরের (রাঃ) শুধু এক রাত্রের বা শুধু এক দিনের আমল সমগ্র ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া সওর গুহার উদ্দেশে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিতেছিলেন। ঐ সময় আবু বকর (রাঃ) কতক্ষণ নবীজীর পিছনে চলেন, আবার কতক্ষণ সম্মুখে। নবীজী (সঃ) তাঁহার এইরূপ চলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, আবু বকর! তুমি এইরূপ চলিতেছ কেন? আকু বকর (রাঃ) বলিলেন, যখন পিছন হইতে ধাওয়াকারী শত্রুর আশঙ্কা করি তখন আপনার পিছনে চলি, আবার সম্মুখে অপেক্ষমাণ শত্রুর ভয় করি তখন আপনার সম্মুখে চলি। নবীজী (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কি এই কামনা কর যে, শত্রুর কোন আঘাত আসিলে তাহা আমাকে না লাগিয়া তোমাকে লাগে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীন প্রদানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলি– তাহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতপর ওমর (রাঃ) গুহার ভিতরে রাত্রি বেলায় তাহার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করার পূর্ববর্ণিত ঘটনাও বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিলেন এবং কসম করিয়া বলিলেন, ঐ এক রাত্রের আমল গোটা ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম। (বেদায়া, ৩-১৮০)

একদা ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্মুখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আলোচনা হইল। ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি– আমার সারা জীবনের আমল আবু বকরের (রাঃ) শুধু একটি রাত্র বা শুধু একটি দিনের আমলের সমপরিমাণ গণ্য হয়।

রাত্রটি হইল ঐ রাত্র যে রাত্রে তিনি এবং নবীজী (সঃ) এক সঙ্গে চলিয়া সওর গিরি গুহার দ্বারে পৌছিলেন। তথায় পৌছিয়া আবু বকর (রাঃ) নবীজীকে বলিলেন, আপনি গুহায় প্রবেশ করিবেন না, আপনার পূর্বে আমি প্রবেশ করিব; আঘাত পাওয়ার কোন কিছু তাহার ভিতরে থাকিলে আমিই পাইব, আপনার আঘাত লাগিবে না। সেমতে আবু বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন; তাহার ভিতরে চতুর্দিকে ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একখানা অতিরিক্ত লুঙ্গি ছিল, সেই লুঙ্গিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ করিলেন; দুইটি ছিদ্র উণ্মুক্ত থাকিল; কাপড় শেষ হইয়া গিয়াছে; ঐ ছিদ্র দুইটি দুই পায়ে বন্ধ করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রবেশ করিলেন এবং আবু বকরের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। ছিদ্র হইতে তাঁহার পায়ে বিচ্ছু দংশন করিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গার ভয়ে আবু বকর একটুও নড়িলেন না। তাঁহার অশ্রু ফোঁটা নবীজীর চেহারায় পতিত হইল; নবীজী জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে আবু বকর! তিনি বলিলেন, দংশন লাগিয়াছে– আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দংশন স্থানে থুথু দিলেন তৎক্ষণাত আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শেষ জীবনে সেই বিষের ক্রিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং মৃত্যুর কারণ হইল। (ফলে তিনি নবীজীর জন্য শহীদ হওয়ার মর্তবা লাভ করিলেন).... (মেশকাত শরীফ ৫৫৬)

উল্লিখিত তথ্য ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাবাবেগ নহে, বাস্তব সত্যই বটে; স্বয়ং নবী (সঃ) ঐরূপই বলিয়াছেন।

হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অতি উজ্জ্বল চাঁদনী রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ক্রোড়ে হেলান দেওয়া ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশের অগণিত নক্ষত্র সংখ্যার পরিমাণে কোন ব্যক্তির নেক বা সওয়াব আছে কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হাঁ– আছে, ওমর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে আবু বকরের নেকসমূহের পরিমাণ কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আবু বকরের একটি নেক ওমরের সারা জীবনের নেকসমূহের সমান। (মেশকাত শরীফ, ৫৬০)

গিরিগুহায় অসীম সাহসের পরিচয়

শত্রু দল নবীজীর গৃহে এবং আবু বকরের গৃহে তাঁহাদেরকে না পাইয়া ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বাকী থাকিল না এবং ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাহারা মোটেই বিলম্ব করিল না। অবিলম্বে তাহারা তাঁহাদের খোঁজে চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িল, বিশেষতঃ সেই যুগে একটি বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ ছিল, যাহাদিগকে কায়েফ বলা হইত। পদচিহ্নের পরিচয়, তাহার আবিষ্কার এবং অনুসরণ ঐ সম্প্রদায় অসাধারণে পটু হইত। ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদেরকে চতুর্দিকে নবীজী ও আবু বকরের গন্তব্যস্থানের খোঁজে লাগইয়া দেওয়া হইল। সওর পর্বতের দিকে যে দল চলিয়াছিল তাহারা তাঁহাদের পদচিহ্ন আবিষ্কার করিতে এবং তাহার অনুসরণ করতে সক্ষম হইল। তাহারা সেই সূত্র ধরিয়া চলিতে চলিতে সওর গিরি গুহার দ্বারে উপনীত হইল। (যোরকানী, ১–৩৩০)

সম্মুখে আর কোন পদ চিহ্নের নিদর্শন না দেখিয়া তাহারা ধারণা করিল, হয়ত এই গুহার ভিতরই আসামীরা লুকাইয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা তথায় থামিয়া গেল এবং আনাগোনা করিতে লাগিল; এমনকি গুহাভ্যন্তর হইতে আবু বকর (রাঃ) তাহাদেরকে দেখিতে ছিলেন। আবু বকর বিচলিত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখন উপায় কি? প্রাণঘাতী শত্রু দল নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই ত আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে– তখন যে, কি অবস্থা হইবে তাহা ত বলিতে হইবে না। ঐ সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভূমিকা অতি অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল।

অশিক্ষিত শত্রুরা নবীজীর (সঃ) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; শিক্ষিত শত্রু খৃষ্টানরা তদপেক্ষা অধিক

তীক্ষ্ণ অস্ত্র কলম ধারণ করিা নবীজীর সুনাম-সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের উপর কালিমা লেপনে তাহাদের সর্বময় শিক্ষা ও কৌশল ব্যয় করিয়াছে। ঐরূপ একজন স্বনামধন্য শত্রু 'মারগোলিয়থ'ও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলোচ্য ভূমিকার প্রশংসায় লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)– চরম বিপদের সময় যাঁহার মানসিক বল সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকশিত হইত, তিনি যে (এই মুহূর্তে) বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দে নাই।"

মারগোলিয়থ গোষ্ঠী সত্যের দ্বারে পৌঁছিয়া যাইতে সক্ষম হইত যদি তাহারা আর একটু গবেষণা করিত যে, এই অদম্য মানসিক বল, এই অসীম সাহস, এই অটল ধৈর্য এবং চরম বিপদের মুখে উক্ত গুণাবলীর পরম বিকাশ হইবার মূল কোথায়!

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহর সত্য নবী, তিনি সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ। তিনি আপন হৃদয়ে আল্লাহকে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতরে বাহিরে সত্যের তেজ, আল্লাহতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অনুভূতি এমনভাবে গাঁথিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার কোন বিভীষিকা, ভীষণ হইতে ভীষণতর কোন বিপদ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সুপ্রশস্ত মহান হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিত না, তাঁহার ধীরস্থিরতা সর্বদা অটুট থাকিত।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর যে ভূমিকা ছিল তাহাই উল্লিখিত দাবীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ বিভীষিকাপূর্ণ মহাসঙ্কটের মুহূর্তে যখন আবু বকরের (রাঃ) ন্যায় মানুষও বিহ্বল বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন– হায়! কি অবস্থা হইবে! শত্রু দল নিজেদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমাদেরকে দেখিয়া ফেলিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহারা শুধু মানুষ তাহারা কি ব্যাকুল না হইয়া পারে? নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ। পলায়নের কোন পথ নাই, মুক্তির আশা নাই, ঘাতক দল গুহার মুখে দাঁড়াইয়া আছে– মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও নবীজী মোস্তফা (সঃ) সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত ও গভীর, পর্বতের ন্যায় স্থির অটল। বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, হতাশা নাই; আছে শুধু আল্লাহর করুণার আশা, রহমতে বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর দৃঢ় নির্ভরতা। প্রশান্ত চিত্তে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" শুধু এতটুকুর উপর ক্ষান্ত না হইয়া আরও বলিলেন, "যেই দুই জনের তৃতীয় সঙ্গী থাকিবেন আল্লাহ, সেই দুই জনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি ধারণা কর?"

১৭০২। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رضى الله تعالى عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِى الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ـ

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আমরা (হিজরতের পথে সওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম, তখন আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম শত্রুগণ (আমাদের খোঁজে গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে) এখন তাহাদের কেহ যদি নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। এতদ শ্রবণে হযরত (সঃ) আমাকে বলিলেন, (এইরূপ কথা মুখেও আনিও না।) হে আবু বকর! ঐ দুই ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ মনে কর (যাহাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য-সহায়তা প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান রহিয়াছে যে,) আল্লাহ স্বয়ং এই দুই জনের তৃতীয় সাথী।

আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয়– এই ঘোরতর সঙ্কটময় সময়েও নবীজী মোস্তফা (সঃ) গুহার ভিতরে নামাযে মগ্ন ছিলেন। তায়েফের ঘটনায়ও বলা হইয়াছে, বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীজীর (সঃ)

সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন ছিল নামায। তাই গিরি গুহার সঙ্কটময় সময়- যখন ঘাতক দল গুহার মুখে আনাগোনা করিতেছিল, তখনও নবীজী মোস্তফা (সঃ) নামাযে মগ্ন ছিলেন।(যোরকানী, ১-৩৩৬)

গিরিগুহার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে নবীজী মোস্তফা (সঃ) মানুষের জন্য সান্ত্বনা লাভের এক চরম ভরসা রাখিয়া গিয়াছেন, এক কূলহীন প্রশস্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে কি? আল্লাহ তাআলার করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া চাই না- ইহার অমর দৃষ্টান্ত ও চির স্মরণীয় আদর্শ স্থাপন করিলেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গিরি গুহার সঙ্কট মুহূর্তে। আল্লাহ তাআলাও বলিয়াছেন-

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর করুণা হইতে নিরাশ হইও না।"

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর বুকভরা আশা ও বিশ্বাস ছিল সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলার করুণা লাভের; কার্যতঃ হইলও তাহাই। আল্লাহ তাআলা তথা হইতে ঘাতকদলের ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; অস্ত্রের বা ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইয়া নহে, ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্পের কাণ্ড ঘটাইয়া নহে; আল্লাহর কুদরতে নিজেদের ধারণা ত্যাগে বাধ্য হইয়া এবং তাহার বিপরীত বিশ্বাসে আসিয়া শত্রু দল ঐ স্থান ত্যাগ করিল, শুধু তাহাই নহে, বরং খোঁজাখুঁজির অভিযানই ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্যর্থতা বরণ করিয়া নিল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় রসূলকে প্রাণঘাতী পাষণ্ডদিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

গিরি গুহায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য

নবীজী মোস্তফা (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) রাত্রির শুরুর দিকেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় কাফেরদের পৌঁছিবার পূর্বে অনতিবিলম্বেই কুদরতে এলাহী কতিপয় অসাধারণ, কিন্তু সূক্ষ্ম কৌশলের ব্যবস্থা করিল। গুহার মুখে "রাআহ্" নামক এক প্রকার সাধারণ গাছ জন্মিল, তাহার শাখাগুলি গুহামুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। আর তথায় মাকড়সা জাল বুনিয়া দিল এবং এক জোড়া জংলী কবুতরও সেখানে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িল।

অনুসন্ধানী দল গুহামুখে পৌঁছিয়া তথায় কিছু সময় আনাগোনা করিল, এমনকি তাহাদের কেহ কেহ ঐ গুহার মধ্যে তাহাদের আসামী পলাইবার সম্ভাবনাও প্রকাশ করিল, কিন্তু তথায় মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা দৃষ্টে শেষ পর্যন্ত তাহারা ভাবিল, ঐ গুহায় নিশ্চয় কোন লোক প্রবেশ করে নাই, নতুবা মাকড়সার এইরূপ অক্ষত জাল থাকিত না এবং এইরূপভাবে কবুতরের বাসাও থাকিত না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা আর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না, খোঁজাখুঁজিও করিল না- তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল।

আল্লাহ তাআলার কী কুদরত! একবারে সাধারণ এবং নাজুক ও দুর্বল উপকরণ দ্বারা তিনি এমন দুর্ধর্ষ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টা বন্ধ করিয়া দিলেন, ভয়াবহ অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ঘটনা প্রবাহের আশ্চর্যজনক দৃশ্যপট আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে কি সুন্দর ভঙ্গিমায় বর্ণনা করিয়াছেন-

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ـ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর রসূলকে তোমরা যদি সাহায্য না কর, তবুও আল্লাহর সাহায্য তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। (তাহার দৃষ্টান্ত দেখ-) যখন কাফেরগোষ্ঠী তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিল তখন তিনি শুধু দুই জনের একজন ছিলেন (তৃতীয় কোন বাহ্যিক সঙ্গী তাঁহার ছিল না। কি করুণ দৃশ্য ছিল- !) যখন তাঁহারা দুইজন

গিরিগুহার আশ্রয় নিলেন। (আল্লাহর প্রতি কী দৃঢ় প্রত্যয় ছিল রসূলের!) যখন তিনি (এক বিভীষিকাপূর্ণ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে) নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাঁহার উপর শান্তি ও ধীরস্থিরতা বর্ষণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বিভিন্ন এমন বাহিনী নিয়োগ করিলেন যাহাদেরকে তোমরা দেখ নাই, যাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে নাই। আর কাফেরদের (সিদ্ধান্ত– নবীজীকে হত্যা করিবে, সেই) কথাকে আল্লাহ হেয়, নীচ তথা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আল্লাহর (সিদ্ধান্ত– নবীজী (সঃ) অক্ষত থাকিবেন সেই) কথাই উপরে তথা বলবত থাকিল। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাঁহার কৌশল অসীম। (পারা–১০, রুকু– ১২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– উল্লিখিত আয়াতের جنود জুনুদ শব্দটি বহুবচন; একবচন হইল جند জুন্দ যাহার অর্থ "বাহিনী"। বহুবচন দ্বারা নিশ্চয় বিভিন্ন বাহিনী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ফেরেশতা বাহিনীর সাহায্য ত তথায় ছিলই– যাহাদিগকে কেহ দেখে নাই; আর মাকড়সা ও কবুতর, যাহা সামান্য ও সাধারণ বস্তু হিসাবে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা সেই সাহায্য হইয়াছে যে, শত্রু দল তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে– এই সাহায্য ত সশস্ত্র মানুষ দ্বারাও কঠিন ছিল। সুতরাং মাকড়সা এবং কবুতরও ঐ স্থানে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্যকারী বাহিনীর মধ্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

গিরি গুহায় পানাহারের ব্যবস্থা

গৃহ ত্যাগের প্রাক্কালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরিবার বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা আস্‌মা (রাঃ) নবীজী ও আবু বকরের জন্য উপস্থিত সহজসাধ্য সামান্য কিছু পাথেয় তৈয়ার করিয়া একটি থলিয়া ছোট একটি মশকে পানি ভরিয়া দিয়াছিলেন। থলিয়া ও শামুকের মুখ বাঁধিবার দড়ি পাওয়া যাইতেছিল না; তাড়াহুড়ার মধ্যে আস্‌মা (রাঃ) স্বীয় কোমরবন্ধ চিরিয়া এক খণ্ড নিজের জন্য রাখিলেন অপর খণ্ড থলিয়া ও মশকের মুখে বাঁধিতে ব্যয় করিয়া দিলেন। (যোরকানী, ১–৩২৮)

এতদ্ভিন্ন গিরি গুহায় থাকাকালে খাদ্য লাভের জন্য একটি ব্যবস্থাও আবু বকর (রাঃ) করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একজন মুক্ত ও অতি ভক্ত ঈমানদার গোলাম ছিল আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ), তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে মদীনায় যাইবেন, কিন্তু এখনও তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহেই অবস্থান করেন তিনি আবু বকরের মেষপাল চরাইয়া থাকেন। পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মেষগুলো চরাইতে চরাইতে সন্ধ্যা বেলা ঐ গুহার নিকটে নিয়া যাইতেন এবং রজনীর অন্ধকারে দুগ্ধ দোহাইয়া দিয়া আসিতেন। নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ঐ দুগ্ধ পানে রাত্র ও দিন কাটাইতেন; গুহায় অবস্থানের তিন দিনের প্রতি দিনই তিনি ঐরূপ করিতেন।

কোরায়শদের খবরাখবর গুহায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা

গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা যাত্রা করিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং সতর্কতার জন্য মক্কাবাসীদের পকিল্পনা, সঙ্কল্প ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে অবগত থাকা আবশ্যক, নতুবা বাহির হইবার সুযোগ সুবিধা কিভাবে নিরূপণ করা হইবে?

আবু বকর (রাঃ) এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ছিলেন

* **সমালোচনা ঃ** মোস্তফা চরিত গ্রন্থে মাকড়সার ঘটনা অসত্য, বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মামুলীরূপে। বলা হইয়াছে– মাকড়সা দুনিয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এখানে পারিবে না কেন? আর কবুতরের ঘটনাকে অপ্রামাণিক প্রচলিত গল্প বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অবিশ্বাস্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ অস্বাভাবিক– নবীর মোজেযাকেও স্বীকার না করার ভূতের আছরেই এইসব প্রলাপ। নতুবা মোস্তফা চরিতসহ সর্বস্তরের সঙ্কলনেই যে সীরাত বা চরিত গ্রন্থাবলী হইতে শত শত বর্ণনা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, সেইরূপব গ্রন্থাবলীতেই মাকড়সা ও কবুতর উভয়ের ঘটনাই বর্ণিত আছে এবং অস্বাভাবিক ঘটনারূপেই উল্লেখ হইয়াছে।

আবদুল্লাহ (রাঃ), তিনি ছিলেন অত্যন্ত চালাক চতুর, গভীর জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম কুশলী যুবক। তিনি সারা দিন মক্কায় খোঁজ-খবর করিয়া বেড়াইতেন– নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে, কি সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা করা হইতেছে। সকল প্রকার সংবাদ তথ্য অবগত হইয়া তিনি রজনীর গভীর অন্ধকারে সওর গুহায় আসিতেন এবং সব সংবাদ নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সমীপে ব্যক্ত করিতেন। তিনি গুহার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিতেন, কিন্তু প্রভাতে আলো ছড়াইবার পূর্বেই অন্ধকারের মধ্যে মক্কা নগরে প্রত্যাবর্তন করিতেন; যেন নগরেই রাত্র কাটাইয়াছেন, কেহ যেন ভাবিতেও না পারে যে, রাত্রে তিনি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতিদিন তিনি সমুদয় তথ্য ও সংবাদ মক্কা নগরী হইতে গুহায় সরবরাহ করিয়া থাকিতেন।

বাহনের ব্যবস্থা

মক্কা নগরী হইতে সওর গুহা পর্যন্ত ত নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। গুহা হইতে মদীনা গমন ত বাহন ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না, তাই আবু বকর (রাঃ) তাহার সুব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নবীজী (সঃ) মুসলমানদিগকে মদীনায় হিজরত করার জন্য ব্যাপকভাবে উৎসুক করিয়া তুলিতেছেন, আবার আবু বকর (রাঃ)-কে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। এই সব ইঙ্গিতে আবু বকর (রাঃ) চারি মাস পূর্বেই উত্তম দুইটি উট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; উটদ্বয়কে ভালভাবে ঘাস-পাতা খাওয়াইয়া মোটা-তাজা শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিলেন।

পার্বত্য মরু অঞ্চলে দূর দেশের পথচলা কঠিন কাজ; দিক ও পথ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার; তাহার জন্য বিশেষজ্ঞ পারদর্শী লোক আছে! ঐরূপ অঞ্চলে কাফেলা চলার জন্য সেই লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বাড়ী হইতে যাত্রার অনেক পূর্বেই আবু বকর (রাঃ) সেইরূপ একজন অতি পারদর্শী লোককে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওরায়কীত; সে তখন ত কাফের ছিলই, পরেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খাঁটি ব্যবসায়ীর ধর্ম এবং যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবু বকর (রাঃ) এবং নবীজী (সঃ) তাহাকে নির্ভরশীল গণ্য করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সে পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার উত্তম পরিচয়ই দিয়াছে। আবু বকর (রাঃ) হিজরতের জন্য তৈয়ারী উটদ্বয় ঐ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের পরিকল্পনা মতে তাহাকে বলিয়া দিলেন, (যাত্রা করার বুধবার দিবাগত রাত্রির পরবর্তী) তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর উটদ্বয় লইয়া তুমি সওর পর্বত গুহার নিকটে যাইবে। সেমতে বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, রবিবার প্রভাতের দিকে সে উটদ্বয় লইয়া সওর পর্বত এলাকায় পৌঁছিল এবং রবিবার দিনটা অতিবাহিত হইয়া সোমবারের রাত্র আরম্ভে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিলে উটদ্বয়কে সওর গিরি গুহার দ্বারে উপস্থিত করিল।

গিরি গুহা হইতে মদীনাপানে

নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) বৃহস্পতিবার (দিনের পূর্বে) রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন; আজ রবিবার চতুর্থ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মক্কার কাফেররা তাহাদের সাধ্যমতে খোঁজাখুঁজি করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এখন তাহারা পথেঘাটে খোঁজ করা হইতে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত। নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) গিরি গুহায় তিনটি রাত্র দিন লুকাইয়া থাকার কষ্ট এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনারসঠিক ফল ফলিয়াছে, তাই আজ রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে অন্ধকার নামিয়া আসিলে তাঁহারা গিরি গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পানে যাত্রা করিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর

মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সময় মত উপস্থিত হইয়াছিলেন; খেদমত ও সেবার জন্য তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। নবীজী (সঃ), আবু বকর (রাঃ), আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ- এই চারি জনের ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনার পানে যাত্রা করিলেন। নবীজী (সঃ) একা একটি উটের উপর, আবু বকর (রাঃ) ও আমের (রাঃ) একত্রে অপর উটটির উপর, আর আবদুল্লাহ তাহার নিজস্ব ব্যবস্থায় পথচলা আরম্ভ করিল। মক্কা-মদীনার পথিকরা সাধারণতঃ যে পথ দিয়া যাতায়াত করে সে পথে চলা মোটেই নিরাপদ নহে, তাই পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ কাফেলা লইয়া লোহিত সাগরের উপকূলীয় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।*

হিজরত প্রসঙ্গে চির স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ

জগতে কোন মহৎ কার্য সমাধা করিবার আয়োজন পর্বে যাহার উপর সেই কার্যের ভার ন্যস্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য যোগ্য সহচর, সহকর্মী মনোনীত করিয়া থাকেন। ইসলামের গৌরব ও উন্নতি সাধনের প্রত্যেক অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবীগণের ভূমিকা এই সত্যের উজ্জ্বল নমুনা।

ইসলামের শুধু রক্ষাই নহে, বরং চরম উন্নতির সোপান ছিল মদীনায় হিজরত। এই মহান হিজরতের আয়োজনকে যাহারা ধৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা, আত্মত্যাগ ও জীবনের উপর ঝুঁকি লইয়া নীরবে সুকৌশলে সফল ও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে এবং মুসলিম জাতির হৃদয় প্রকোষ্ঠে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-

(১) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তিনি সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য নিজের জান-মাল সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় অনুরক্ত সুহৃদ ভক্ত জগতে দুর্লভ। হিজরত আয়োজনে এবং এই মহাযাত্রা সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার ত্যাগ ও দান ছিল অপরিসীম। প্রাণের দুলালী কিশোরী আয়েশা ও সন্তান সম্ভবা তরুণী কন্যা আসমাসহ স্বজনকে কারায়েশ শত্রুদের মধ্যে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভীষিকা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মক্কা হইতে মদীনায় পরিবহনের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই সম্পন্ন করিয়া রাখিলেন- চারি মাস পূর্বেই দুইটি উট ক্রয় করিয়া পোষণ করিলেন।

নবীজীর (সঃ) একটি মহান আদর্শ

আবু বকর (রাঃ) পরিবহন উদ্দেশে নিজের জন্য একটি এবং নবীজীর জন্য একটি উট চারি মাস পূর্বে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবীজী (সঃ) হিজরতের অনুমতি লাভ আবু বকরের গোচরে আনিলে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার

চরণে উৎসর্গীকৃত- এই বাহনদ্বয়ের একটি আপনি গ্রহণ করুন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, মূল্যদানে আমি এই উট গ্রহণ করিতে পারি, অন্যথায় নহে। নেতা, হাদী ও জাতির পরিচালক হওয়ার জন্য কত বড় মহান আদর্শ! নিজকে ভক্তগণের আর্থিক প্রভাব হইতে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবে, অপর দিকে নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর আর্থিক চাপ ফেলিবে না। কত মূল্যবান শিক্ষা ও মহান আদর্শ ছিল ইহা!

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের জন্য বিভিন্ন

* নবীজীর হিজরত পথের বিশ্রামাগার বা মঞ্জিলগুলি বর্তমানে অপরিচিত। তাহার মধ্যে "রাবেগ" নামক স্থানটি অবশ্য সেই মহাযাত্রার পথের আংশিক সন্ধান প্রদান করে। রাবেগ স্থানটি বর্তমান মক্কা-মদীনার পথেও একটি প্রসিদ্ধ মঞ্জিল। তথা হইতে লোহিত সাগরের আবছায়া পরিদৃষ্ট হয়। যেই যুগে মক্কা-মদীনার নগর-নগরীতে মৎস দেখা যাইত না, তখনও রাবেগ মঞ্জিলে সামুদ্রিক মৎস্য উপভোগ করা যাইত। যদ্দরুন বাংলাদেশী হাজীগণ মক্কা-মদীনার পথে রাবেগ মঞ্জিলের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকেন।

প্রয়োজনে চল্লিশ হাজার দেরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সব ব্যয় নবীজী মোস্তফা (সঃ) সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এহেন ভক্তের দান এইরূপ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নবীজী (সঃ) এড়াইয়া চলিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজী মোস্তফা (সঃ) এই আদর্শই দেখাইয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– "মৃত্যুর পূর্বে নবী (সঃ) পরিবারের আহার যোগাইতে নিজের লৌহবর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়া (দুই বা) তিন মণ খাদ্য তাহার নিকট হইতে বাকীতে ক্রয় করিয়াছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময় তাঁহার সেই লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক অবস্থায় ছিল। (বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা– ৬৪১)

আর্থিক অনটনে নবী (সঃ) ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণের নিকট হইতে ধার লইতে পারিতেন বা তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ খাদ্য ধারে ক্রয় করিতে পারিতেন; সে ক্ষেত্রে লৌহবর্ম বন্ধক রাখিতে হইত না। কিন্তু নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাহা করেন নাই, এমনকি ভক্তবৃন্দকে তাঁহার এইরূপ অনটন জ্ঞাতও হইতে দেন নাই; মৃত্যুশয্যায়ও এই আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। নবী (সঃ) ভাবিয়াছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার এই অনটন বুঝিতে পারিলে ব্যস্ত হইবে– তাহা পূরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না এবং কাহারও উপর তাহা অতিরিক্ত বোঝা হইতে পারে। এমনকি ধারে ক্রয় করিতেও এক ইহুদীর নিকট গিয়াছেন এবং বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন; কোন ভক্তের নিকট হইতে ধারে ক্রয় করেন নাই! কারণ, কোন ভক্ত এই ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ করিবে না, অথচ ইহা তাহার পক্ষে বোঝা হইতে পারে। কী অতুলনীয় আদর্শ ছিল নবীজীর! চির জীবন তিনি এই শ্রেণীর সোনালী আদর্শের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন স্বীয় কার্যের মাধ্যমে– শুধু বচনে নহে।

আলোচ্য উটটি চারি শত দেরহামে আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) সেই মূল্যেই উহা গ্রহণ করিলেন। এই উটটি নবীজীর অবশিষ্ট জীবনে "কাসওয়া" বা "জাদআ" নামের বাহন ছিল, অনেক অলৌকিক ঘটনা উহার সহিত বিজড়িত। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তিরোধানের পরও উহা জীবিত ছিল, অবশ্য কেহ উহা ব্যবহার করিত না, মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খলীফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে উহার মৃত্যু ঘটে। (যোরকানী, ১–৩১৮)

নবীজী মোস্তফা (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) রাত্রি বেলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজেই সওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, এমনকি পায়ে জুতাও ছিল না। নবীজী মোস্তফা (সঃ) প্রস্তরময় পার্বত্য পথে খালি পায়ে চলায় তাঁহার পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গুহায় পৌঁছিয়া চরণযুগলের রক্তধারা দৃষ্টে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম।

সওর পর্বত এক মাইলের অধিক উঁচু। হাঁটার করণে নবীজী (সঃ)-এর অত্যাধিক ক্লান্তি নিশ্চয় আসিয়াছে, তদুপরি চরণযুগলের ঐ অবস্থা, তাই পর্বতারোহণে নবীজী (সঃ) স্থানবিশেষে অপারগ হইয়া পড়িতেন। ঐ অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে স্বীয় কাঁধে বহন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে ঘোড়া, উট, খচ্চর এবং গাধাও বহন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রত্যেকটি বাহনই সেই বদৌলতে নিজ নিজ শ্রেণী ও জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ আবু বকর (রাঃ) ঐরূপ সঙ্কটাবস্থায় নবীজীর (সঃ) বাহন হইতে পারিয়া মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ধন্য হইয়াছেন। আবু বকরের (রাঃ) এই শ্রেণীর ত্যাগ ও সেবাকে স্বয়ং নবীজী (সঃ) যেই ভাষায় স্বীকৃতি দিয়াছেন তাহা চির দিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন–

مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ "আমার প্রতি যত মানুষের উপকারই রহিয়াছেন, প্রত্যেককেই আমি উহার প্রতিদান দিয়াছি একমাত্র আবু বকর ব্যতীত। আমার প্রতি তাঁহার এরূপ উপকার রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আল্লাহ তাআলাই কেয়ামত দিবসে পূর্ণ করিবেন।" (তিরমিযী শরীফ)

(২) আলী (রাঃ), হিজরতের আয়োজন সফল করার মধ্যে তাঁহার ত্যাগ এবং অবদান ছিল অনেক বেশী। যেই শয্যায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু কাফেররা একরূপ অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শয্যার উপর স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন আলী (রাঃ)। এমনকি নবীজীর চাদরখানাও মুড়ি দিয়া ভেল্কি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন অবরোধকারী ঘাতকদের চোখে! কত বড় আত্মত্যাগ ও অসীম সাহসের চরম দৃষ্টান্ত ছিল ইহা! যেকোন মুহূর্তে তাঁহার উপর অবরোধকারী ঘাতকদের তরবারি পতিত হইতে পারিত। কারণ, ঘাতক দল তাঁহাকেই নবীজী ভাবিয়া তাঁরে অবস্থিত গৃহকে কড়া দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

(৩, ৪) আস্‌মা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)– পিতা তাঁহাদেরকে ঘোর বিপদে শত্রুর মধ্যে ফেলিয়া পাড়ি দিলেন মৃত্যুর পথে। এই দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয়ে কী স্বাভাবিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তাঁহারা আদর্শ মুসলিম রমণীরূপে ধরাপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিলেন তাই একিবন্দুও অধীর হইলেন না। বরং সেই চরম দুর্ভাবনার মধ্যে নবীজী ও পিতার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের হাবভাবে কেহ ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝিতে পারিল না– কিসের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিত তবে সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইত– এই মহাযাত্রা হয়ত সম্ভব হইত না।

(৫) আবু বকর তনয় আবদুল্লাহ (রাঃ)– তিনি নিজ প্রাণের উপর ঝুঁকি লইয়া প্রত্যহ মক্কার সমুদয় সংবাদ পৌঁছাইয়াছেন নিভৃত সওর গুহায়। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিন দিন তিন রাত্র পরে বাহির হইয়াছিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) গুহা হইতে মদীনার পানে।

(৬) আবু বকরের মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) তিনি প্রত্যহ ঐ নিভৃত গুহায় আহার পৌঁছাইবার গোপন ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন।

ধন্য আবু বকর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আবু বকর পরিবার। তাঁহাদেরই আত্মত্যাগ, লক্ষ্য আদর্শের একমুখীতা, মনোবলরও কর্মকৌশল ইত্যাদি গুণাবলীর সমাবেশেই শত্রুদের বেষ্টন ভেদ করিয়া আল্লাহর আশ্রয়স্থলে যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।

হিজরত পর্বের এই পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াবলীর মৌলিক বর্ণনা সম্বলিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ নিম্নে তরজমা করা হইল। হাদীছখানা অতি দীর্ঘরূপে বোখারী (রঃ) ৫২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কতিপয় ঘটনা একত্রে সমাবেশিত আছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক ঘটনার অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তরজমা করিয়াছি। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর–আবিসিনিয়ায় হিজরত পরিচ্ছেদে "আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরত" আলোচনায় প্রথম অংশের তরজমা হইয়াছে। এস্থানে দ্বিতীয় অংশের তরজমা দেওয়া হইল।

১৭০৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫২৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ার স্থানটি আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে– তথায় খেজুর বাগানের আধিক্য রহিয়াছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান বিদ্যমান। মদীনার এলাকাটি উক্ত উভয় গুণেরই বাহক। সেমতে অনেক মুসলমানই মদীনায় হিজরত করিয়া গেলেন, এমনকি যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অধিকাংশই মদীনায় চলিয়া গেলেন। আবু বকর (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি করিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে একটু থামিয়া যাইতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আমি আশা করিতেছি, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হইবে। আবু বকর (রাঃ) হযরতের চরণে স্বীয় ত্যাগ কোরবানী পেশ করতঃ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি সত্যই ঐরূপ আশা পোষণ করিতেছেন। হযরত নবী (সঃ) বলিলেন, হাঁ। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার উদ্দেশে হিজরত মুলতবী রাখিলেন এবং হিজরত উদ্দেশে তাঁহার সংগৃহীত বিশেষ দুইটি উটকে ভালভাবে

বাবুল পাতা খাওয়াইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন– এ অবস্থায় চারি মাস কাটিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা দ্বিপ্রহরের সময় আমার পিতা আবু বকরের (রাঃ) গৃহে আমরা বসিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের একজন আবু বকর (রাঃ)-কে সংবাদ দিল, ঐ দেখুন! (আপনার গৃহাভিমুখে) রসূলুল্লাহ (সঃ), (দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের কারণে) তিনি সম্পূর্ণ মাথা কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এরূপ দ্বিপ্রহরে ইতিপূর্বে আমাদের গৃহে কখনও তিনি আসেন নাই। আবু বকর (রাঃ) খবরটা শুনামাত্র চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতা-মাতা সর্বস্ব তাঁহার চরণে উৎসর্গীকৃত–তিনি নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণে এই সময়ে আমার গৃহে তশরীফ আনিতেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিমধ্যে হযরত (সঃ) গৃহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তৎক্ষণাত সাদর সম্ভাষণ জানানো হইল। হযরত (সঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলেন, ঘর হইতে লোকজন বাহির করিয়া দেওয়া হউক। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, একমাত্র আপনার স্বজনগণই গৃহে আছেন, অন্য কেহ নাই। হযরত (সঃ) বলিলেন, বিশেষ খবর এই যে, আমাকে মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনার চরণে আমার পিতা-মাতা সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত– আপনি সঙ্গী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা রাখেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত– আপনি আমার উটদ্বয় হইতে একটি উট কবুল করুন। হযরত (সঃ) বলিলেন, কবুল করিলাম, কিন্তু মূল্যের বিনিময়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমরা তাঁহাদের জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু পাথেয়ের ব্যবস্থা করিলাম এবং কিছু খাদ্যবস্তু একটি থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া দিলাম। (আয়েশার ভগ্নী) আসমা (রাঃ) কোমরবন্ধের কাপড়খানা হইতে এক অংশ ফাড়িয়া উহা দ্বারা ঐ থলিয়ার মুখ বাঁধিয়া দিলেন। (তিনি যে, আল্লাহর রসূলের খদমতের জন্য স্বীয় কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে,) ঐ সূত্রেই তাঁহাকে "জাতুন নেতাকাইন"–"দুই কোমরবন্ধওয়ালী" বলা হইয়া থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রাত্রি বেলা) হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) গোপনে গৃহ ত্যাগ করত সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছিলেন এবং তথায় তিন রাত্র লুকাইয়া থাকিলেন। আবু বকরের এক ছেলে ছিল আবদুল্লাহ– সে ছিল যুবক এবং অতিশয় চালাক চতুর। সে সারা রাত্রি ঐ পর্বত গুহায় তাঁহাদের নিকট থাকিত, কিন্তু প্রভাতে অন্ধকার থাকিতেই মক্কা নগরীতে আসিয়া যাইত, যেন সে মক্কার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কাফেররা যত কিছু ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিত, সব কিছুর সংবাদ আবদুল্লাহ রাত্রি বেলা তাঁহাদিগকে অবগত করিয়া আসিতেন। আবু বকরের একজন ক্রীতদাস ছিল "আমের ইবনে ফোহায়রা", সে বকরীর দল চরাইয়া ঐ পাহাড়ের নিকট লইয়া যাইত এবং রাত্রির অন্ধকার আসিয়া গেলে তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পৌঁছাইত, তাঁহারা ঐ দুগ্ধের উপর রাত্রি যাপন করিতেন। আমের ইবনে ফোহায়রা রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই বকরীর দল লইয়া তথা হইতে মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিত– প্রত্যহই সে এইরূপ করিত। এতদ্ভিন্ন হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) একজন সুবিজ্ঞ পথপ্রদর্শকও পূর্ব হইতেই মজুরির উপর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উভয়ের বাহন তাহার হাওয়ালা করিয়া দিয়া তাহাকে তিন রাত্র পর সওর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি কাফেরই ছিল, কিন্তু তাহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল।

নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী তিন রাত্র অতিবাহিত হইয়া প্রভাতেই সেই ব্যক্তি উটদ্বয় লইয়া সেই এলাকায় উপস্থিত হইল। (অবশ্য দিন অতিবাহিত হইবার পর রাত্রি বেলা সুযোগমতে) হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পর্বতগুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাস আ'মের ইবনে ফোহায়রা এবং পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। পথপ্রদর্শক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে (সাধারণ চলাচলের পার্বত্য পথে অগ্রসর না করিয়া লোহিত সাগরের) উপকূলবর্তী পথে পরিচালিত করিল।

১৭০৪। হাদীছ ঃ (৫৫৫) আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য (হিজরতের সময়) রাস্তায় খাইবার কিছু খাদ্য তৈয়ার করিলাম এবং উহা একটি থলিয়ার মধ্যে রাখিলাম। থলিয়ার মুখ বাঁধিবার জন্য আমি আমার আব্বা আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলাম, বাঁধিবার কিছু পাইতেছি না, একমাত্র আমার কোমর বাঁধিবার কাপড়টা আছে। আব্বা বলিলেন, উহাই দুই খণ্ড করিয়া নাও। আমি তাহাই করিলাম (এবং এক খণ্ড আমার কোমরবন্ধের কাজে রাখিলাম, অপর খণ্ডের দ্বারা ঐ খাদ্যের থলিয়া এবং পানির মশকের মুখ বাঁধিয়া দিলাম।) সেই সূত্রেই আমাকে দুই কোমরবন্ধওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

আবু বকরের সদা সতর্কতা

আবু বকর (রাঃ) বহিরাঞ্চলে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোকজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হইত। সেমতে হিজরতের-পথে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাত হইত যাহারা আবু বকর (রাঃ)কে চিনিত, কিন্তু নবী (সঃ)-কে চিনিত না। ঐরূপ কোন কোন লোক আবু বকর (রাঃ)-কে নবী (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত– আপনার অগ্রবর্তী লোকটি কে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আব বকর (রাঃ) বলিতেন, هذا الرجل يهديني السبيل "এই ব্যক্তি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

প্রশ্নকারী ভাবিত, দুনিয়ার পথ প্রদর্শক, আর আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ করিতেন। এইভাবে নবীজীর (সঃ) পরিচয় গোপন থাকিয়া যাইত– ঐ সময় যাহার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল অথচ আবু বকর (রাঃ)-কে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত না। মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নবীজীর (সঃ) পরিচয় গোপন রাখার এক কৌশল ছিল। এই শ্রেণীর কৌশলকে শরীয়ত মতে "তৌরিয়া" বলা হয়। কাহারও কোন ক্ষতি না হয়– শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় ঐরূপ কৌশল অবলম্বন জায়েয ইহাকে ধোকা বলা যাইবে না। অবশ্য এইরূপ কৌশলে কাহারও ক্ষতি হইলে তাহা ধোকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নাজায়েয হইবে।

মদীনার পথে বিপদ

মক্কার মোশরেকেরা নবীজী (সঃ)-কে অনেক খুঁজিয়াও যখন পাইল না তখন তাহারা অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সর্বত্র ঘোষণা জারি করিয়া দিল– মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও আবু বকরকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিলে কোরায়শরা উভয়ের বিনিময়ে এক একশত উট পুরস্কার প্রদান করিবে। এই ঘোষণা তাহারা বিভিন্ন দলপতি এবং বিশিষ্ট লোকদের নিকটও বিশেষভাবে পৌঁছাইল।

কাফের-মোশরেকেরা ত নবীজীর (রাঃ) সর্বদার শত্রু আছেই, তদুপরি দুই শত উটের লালসা; অতএব নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-কে পাইবার প্রতি তৎকালীন আরবীয় দস্যু প্রকৃতির লোকদের কিরূপ আগ্রহ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আরবের "বনু মোদলাজ" গোত্র;কোরায়শরা তাহাদের নিকটও লোক পাঠাইয়া উক্ত ঘোষণার সংবাদ পৌঁছাইল! ঐ গোত্রেরই এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সোরাকা ইবনে মালেক; ঐ ঘোষণার সংবাদ সেও অবগত ছিল। একদিন তাহারই বংশীয় একজন লোক হঠাৎ বহু দূর হইতে নবীজীর (সঃ) কাফেলা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাত তাহাকে অবহিত করিল। সোরাকা দুই শত উটের পুরস্কার একা লাভ করিবার উদ্দেশে কৌশলের সহিত গোপনে অস্ত্র লইয়া কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিল।

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সোরাকা যখন আমাদের অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেল, তখন আমি অস্থির হইয়া বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের পিছনে ধাওয়াকারী আমাদেরকে পাইয়া ফেলিল! এই কথা

বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, আমার জীবনের জন্য কাঁদি না, আপনার চিন্তায় কাঁদিতেছি। নবী (সঃ) সম্পূর্ণ শান্ত অবিচল কিন্তু আমার হতাশাদৃষ্টে আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তাহার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ হইতে তুমিই যথেষ্ট হইয়া যাও। হে আল্লাহ! তাহাকে পাছাড়ে পতিত কর।" অমনি তাহার ঘোড়ার পা পেট পর্যন্ত পার্বত্য পাথর জমিতে গাড়িয়া গেল। সে ব্যাপারটা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল, তাই চীৎকার করিয়া বলিল, নিশ্চয় আপনাদের বদ দোয়ায় আমার এই বিপদ আসিয়াছে। আমার জন্য দোয়া করুন আমি মুক্তি পাইয়া যাই। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিব না, বরং আপনাদের হইতে শত্রু বিতাড়নে সাহায্য করিব। হযরত (সঃ) তাহার মুক্তির জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে কথা বলার সুযোগ দানে দাঁড়াইলেন।

সোরাকা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময়ই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) জয়ী হইবেন। আমি তাঁহাদের প্রতি লোকদের বিষাক্ত মনোভাব তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলাম এবং আমার বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী পাথেয় ইত্যাদি গ্রহণের অনুরোধ করিলাম; তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। এমনকি আমি বলিলাম, অমুক স্থানে আমার মেষপাল রহিয়াছে, আপনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহা হইতে নিয়া যাইবেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার প্রয়োজন হইবে না। তিনি আমাকে শুধু এই বলিলেন, আমাদের সংবাদ গোপন রাখিও! আমার অভিপ্রায় মতে তিনি একটা চামড়া খণ্ডে আমার জন্য নিরাপত্তা পত্রও লিখিয়া দিলেন। ঘটনার মূল ব্যক্তি সোরাকা ইবনে মালেকের ভ্রাতার মাধ্যমে ভ্রাতুষ্পুত্র আবুদুর রহমান হইতে বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন— যাহা মূল কিতাবে ১৭০৩ নং হাদীছের সঙ্গেই রহিয়াছে।

১৭০৫। হাদীছ ঃ সোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট কোরায়শ কাফেরদের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, কোরায়শরা রসূলুল্লাহ এবং আবু বকরকে হত্যা বা বন্দী করার উপর (প্রত্যেকের জন্য) একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে।

অতপর একদিন আমি আমার গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে বসিয়া খোশগল্প করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া আমায় খবর দিল যে, আমি উপকুলবর্তী পথে কতিপয় পথিকের গমন লক্ষ্য করিয়াছি; আমার মনে হয় মুহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণই হইবে। সোরাকা বলেন, আমি তখন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, সেই পথিকগণ তাঁহারাই হইবেন, কিন্তু ঐ খবরদাতা ব্যক্তিকে পুরস্কার লাভের সুযোগ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশে প্রবঞ্চনাস্বরূপ বলিলাম, ঐ পথিকগণ তাঁহারা নহেন, বরং ঐ পথিকগণ হইতেছে অমুক অমুক, কিছু সময়ের জন্য খবরটার প্রতি তৎপরতা না দেখাইয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিলাম। তারপর তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম এবং আমার এক দাসীকে বলিলাম, আমার ঘোড়াটা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া অমুক স্থানে আড়ালে নিয়া রাখ এবং আমি আমার বল্লমটা হাতে লইয়া বাড়ীর পিছন দিকের পথে বাহির হইলাম, এমনকি বল্লমটার ফলক নীচের দিকে রাখিয়া শোয়াইয়া নিয়া চলিলাম। (উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা; যেন অন্য কেহ সঙ্গী হইয়া পুরস্কারের অংশীদার না হইয়া বসে।)

এইরূপ গোপনভাবে আমি আমার ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উহার উপরে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে চালাইলাম, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ পথিকদের নিকটে পৌছিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খাইয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া আমি আমার তীরদান হইতে গণনকার্যের তীর বাহির করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম আমি উদ্দেশে সফলকাম হইব কিনা। গণনার ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধী বাহির হইল, কিন্তু আমি গণনার ফলাফলের পায়রবী না করিয়া পুনঃ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া উহাকে দ্রুত অগ্রসর করিলাম এবং এত নিকটবর্তী হইয়া গেলাম যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে

লাগিলাম। তিনি কিন্তু পিছনের দিকে মোটেও তাকান না, অবশ্য আবু বকর (রাঃ) বার বার (পিছনে আমার দিকে) তাকাইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে আমার ঘোড়ার সম্মুখের পা দুইটি হাঁটু পর্যন্ত (পাথরীর) যমীনের মধ্যে গাড়িয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। অতপর আমি উহাকে সজোরে হাঁকাইলাম, ঘোড়াটি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা দুইখানা উঠাইতে সক্ষম হইতেছিল না। অবশ্য অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, যে স্থানে তাঁহার পা গাড়িয়া গিয়াছিল তথা হইতে ধুলা-বালু ধুঁয়ার ন্যায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। তখন পুনরায় আমি গণনকার্যের তীর দ্বারা গণনা করিলাম, এইবারও ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধীই বাহির হইল। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনি উচ্চারণ করিলাম। সেমতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলাম। আমি যখন তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে বিপদগ্রস্ত হইতেছিলাম, তখন আমার অন্তরে এই কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আন্দোলনটা অচিরেই প্রাধান্য লাভ করিবে, তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন।

অতপর আমি তাঁহাকে জানাইলাম, আপনার দেশবাসী আপনার বিনিময়ে একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা জারি করিয়াছে। তাঁহাকে আমি লোকদের সমুদয় ইচ্ছা-এরাদার বিস্তারিত বৃত্তান্তও শুনাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদের খেদমতে খাদ্য এবং আবশ্যকীয় বস্তু পেশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোন কিছুই আমার ব্যয় করিতে হইল না। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন না শুধুমাত্র একটি কথা হযরত (সঃ) আমাকে বলিলেন– আমাদের সংবাদটা গোপন রাখিও। তখন আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম, আমার জন্য একটি নিরাপত্তা-দানপত্র লিখিয়া দিন। হযরত (সঃ) আ'মের ইবনে ফোহায়রাকে লিখিবার আদেশ করিলেন। তিনি একটি চর্ম খণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত (সঃ) চলিয়া গেলেন। (আমি ফিরিয়া আসিলাম)।

সোরাকা ইবনে মালেকের ইসলাম গ্রহণ

সোরাকা নবীজী (সঃ)-এর কাফেলাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন মানুষকে নবীজীর তালাশকারী পাইত তাহাকেই বলিত, আমি অনেক তালাশ করিয়াছি; তোমার তালাশের প্রয়োজন হইবে না। যখন এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, নবী (সঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া সারিয়াছেন তখন সোরাকা তাহার পূর্ণ কাহিনী লোকদের নিকট বর্ণনা করা আরম্ভ করিল। কিভাবে সে নবীজীর কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল ও অবিচল ভরসা কিরূপ দেখিল এবং তাঁহার ঘোড়ার সমুদয় ঘটনা কিরূপ ঘটিল– এই সব সে সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।

সোরাকার বর্ণিত ঘটনাবলী দেশময় ছড়াইয়া পড়িল;কোরায়শ দলপতিরা ইহাতে দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল যে, এইরূপ অলৌকিক ঘটনা শ্রবণে অনেক লোক মুসলমান হইয়া যাইবে। সোরাকা একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তিনি বনু মোদলাজ গোত্রের বিশিষ্ট বিত্তশালী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে ইসলাম প্রসারের আশঙ্কা করিয়া আবু জাহল কাব্যের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিল–

بَنِىْ مُدْلَجٍ اِنِّىْ اَخَافُ سَفِيْهَكُمْ - سُرَاقَةَ مُسْتَغْوٍ لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ
عَلَيْكُمْ بِهٖ اَلاَّ يُفَرِّقَ جَمْعَكُمْ - فَيُصْبِحُ شَتّٰى بَعْدَ عِزٍّ وَسُوْدَهٖ -

অর্থ ঃ "হে বনু মোদলাজ গোত্র। তোমাদের বাকা সোরাকা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়! সে লোকদের বিভ্রান্ত করিয়া মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্যের পথে আকৃষ্ট করিবে। তোমরা সতর্ক

থাকিও, সে যেন তোমাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের বংশ প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে।

সোরাকা এই সতর্কবাণীর উত্তরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কবিতা প্রচার করিল–

اَبَا حَكَمٍ وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا ـ لاَمْرِ جَوَادِى اِذْ تَسُوْخُ قَوَائِمُه

عَجِبْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِاَنَّ مُحَمَّدًا ـ رَسُوْلٌ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُه ـ

عَلَيْكَ فَكُفُّ الْقَوْمَ عَنْهُ فَاِنَّنِىْ ـ اَخَالُ لَنَا يَوْمًا سَتَبْدُوْ مَعَالِمُه ـ

অর্থ ঃ "হে আবুল হাকাম (আবু জাহল)! খোদার কসম, তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে আমার ঘোড়ার ঘটনার সম্মুখে * যখন উহার পাগুলি গাড়িয়া গিয়াছিল; তবে তুমিও আশ্চর্যান্বিত হইতে এবং তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এই বিষয়ে যে, মুহাম্মদ রসূল এবং সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ। এমন কে আছে যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে? তুমি যাও– লোকদিগকে তাঁহার হইতে বিরত রাখার চেষ্টা কর; আমার ত ধারণা– অচিরেই এমন দিন আমাদের সম্মুখে আগত যেদিন তাঁহার প্রাধান্যের ও বিজয়ের নিদর্শনসমূহ দিবালোকের ন্যায় প্রকটিত হইয়া উঠিবে।" (বেদায়া, ৩–১৮৯)

আরবের পৌত্তিলিকদের মধ্যে তৎকালে আত্মীগর্ব আত্মশ্লাঘা অত্যধিক ছিল। নিজেদের নীতি ও কৃষ্টি ত্যাগ করা তাহাদের জন্য কঠিন ছিল। নবীজীর (সঃ) পিতৃব্য খাজা আবু তালেব নবীজীর (সঃ) সত্যবাদিতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু নিজ পূর্বপুরুষদের নীতি ও কৃষ্টি রক্ষায় এতই দৃঢ় ছিলেন যে, শত বুঝিয়াও মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করিলেন না। সোরাকার অবস্থাও প্রায় সেইরূপই হইতে যাইতেছিল। সে নিজের ঘটনার অলৌকিকতার দ্বারা নবীজীর রসূল হওয়ার পক্ষে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, কিন্তু সব কিছু জানিয়াও ঈমান গ্রহণে অনেক বিলম্ব করিয়াছে।

হিজরতের ঘটনার সাত বৎসর পর অষ্টম বৎসরে মক্কা বিজয়ের সংলগ্নে হোনায়ন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মক্কা হইতে ১২/১৩ মাইল ব্যবধানে "জেয়ে'ররানা" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) অবস্থানরত ছিলেন। তখন নবীজীর চতুর্দিকে কত ভিড়! লোকে লোকারণ্য– এই সময় সোরাকা তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবীজী (সঃ) প্রদত্ত চর্ম খণ্ডে লিখিত নিরাপত্তানামা তখনও তাহার নিকট সুরক্ষিত ছিল। লোকেরা তাহাকে নবীজীর (সঃ) নিকট যাইতে বাধা দিতেছিল, তাই সে দূর হইতে নিরাপত্তানামাসহ হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চকণ্ঠে বলিল, ইয়া

*** সমালোচনা** "মোস্তফা চরিত" গ্রন্থের সঙ্কলক আকরম খাঁ মরহুমের কুঅভ্যাস নবীগণের মোজেযা বা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা। তাঁহার এই কুঅভ্যাসটা বাতিক রোগ অপেক্ষা অধিক নিরারোগ্য। ঐ শ্রেণীর সামান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার স্বভাব ভুলেন না।

সোরাকা ইবনে মালেকের আলোচ্য ঘটনায় তাহার ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় গাড়িয়া যাওয়ার চিত্রকে তিনি তাঁহার সঙ্কলনে যে ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রচেষ্টা একমাত্র ইহাই যে, ঘটনাটা নিছক স্বাভাবিক ছিল– ইহাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই ছিল না। তাঁহার বক্তব্য এই–" সোরাকা দিগ্বিদিক না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছিল, ঘোড়াটাও লম্ফন কুর্দনপূর্বক বাধাবিঘ্নগুলি উল্লম্ফন করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছিল– এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল।"

নবীর অস্বাভাবিক ঘটনা মোজেযাকে স্বাভাবিক বানাইবার অপচেষ্টা খাঁ মরহুমের উল্লম্ফন কুর্দন দেখিলে হাসি আসে। ঘটনা ত বাংলাদেশের বিল অঞ্চলে কাদা ও নরম মাটির মধ্যে নহে যে, লম্ফন উল্লম্ফনে স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার পা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যাইবে। ঘটনা ত আরব দেশের পার্বত্য পাথরী যমীনের; সেখানে লম্ফন উল্লম্ফনে ঘোড়ার পা, তাহাও পিছনের পদদ্বয় নহে– শুধু সম্মুখ পদদ্বয় প্রোথিত হইয়া যাওয়া এবং উহা স্বাভাবিকভাবে হওয়ার দাবী একমাত্র পাগলেই করিতে পারে। বিশেষত বোখারী শরীফের হাদীছেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, শক্ত পাথরী যমীনে ঘোড়ার পা গাড়িয়া গিয়াছিল।

সর্বোপরি ঘটনার মূল সোরাকা, যিনি এ ঘোড়ার পৃষ্ঠে ছিলেন, তিনি তাঁহার কাব্যে উক্ত ঘটনাকে অস্বাভাবিক সাব্যস্ত করিয়া নবীজীর (সঃ) রসূল ওয়ার প্রমাণরূপে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন– ইহার মোকাবিলায় খাঁ মরহুমের কুর্দন উল্লম্ফন কি কোন ফলদায়ক হইবে?

রসূলাল্লাহ! এই যে, আপনার দেওয়া লিখিত নিরাপত্তানামা আমার নিকট রহিয়াছে; আমি সোরাকা ইবনে মালেক। নবীজী (সঃ) বলিলেন, যাহাকে যে কথা দেওয়া হইয়াছে আজ তাহা পূরণ করিবার দিন; এই বলিয়া নবীজী (সঃ) সোরাকাকে তাঁহার নিকটে পৌছিবার সুযোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সোরাকা নবীজী মোস্তফার (সঃ) চরণে শরণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ)। (সীরাতে ইবনে হেশাম)

দস্যু দলের আক্রমণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)কে বাগে না পাইয়া কোরায়শরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব হইতে জানিত রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায়ই যাইবেন, তাই তাঁহাদের প্রত্যেককে হত্যা বা বন্দী করার জন্য একশত উট পুরস্কারের ঘোষণাটা মদীনা যাওয়ার পথের এলাকাসমূহে জোরালোভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

সেই বৃহৎ পুরস্করের আশায় আসলাম গোত্রের প্রধান "বোরায়দা" ৭০ জন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে লইয়া নবীজীর (সঃ) কাফেলার খোঁজে বাহির হইল। খোঁজ পাইয়াও বসিল। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষুদ্র কাফেলার সহিত তাহাদের সাক্ষাত হইল। কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! কি ভয়াবহ দৃশ্য!

একদিকে ৭০ জন দুর্ধর্ষ সশস্ত্র দস্যু বিদ্বেষ ও প্রলোভনে উত্তেজিত উৎসাহিত এবং যাঁহাদের মুণ্ডপাতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য ও দুই শত উট লাভের আশা, তাঁহাদেরকে বাগে পাইয়া বসিয়াছে। অপর দিকে নিরস্ত্র নিরীহ মাত্র চার জন লোক– তাহার মধ্যেও একজন বিধর্মী এবং তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্ত পলাতক পথিক– ঐ দুস্য দলের কবলে পতিত।

এই অবস্থায় মানুষের কল্পনায় নবীজীর রক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে কি? এহেন ঘোর বিপদ মুহূর্তেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধীরস্থিরতায় এবং স্বর্গীয় গাম্ভীর্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো অবস্থায় একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লাহর কার্যে নীরব-অবিচল আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ-নির্ভরতার এই প্রভাব যে– রক্ষা করার সকল ভার এবং সমস্ত ভাবনা একমাত্র আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কর্তব্যের এই সাধনা এবং বিশ্বাসের এই তেজ ও ঈমানের এই শক্তিই হইল ঐ অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার মূল উৎস।

কী প্রশান্ত চিত্ত, প্রশস্ত হৃদয়! দস্যু দলপতি বোরায়দা নবীজীর (সঃ) সম্মুখে আসিতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) ধীর কণ্ঠে শান্ত স্বরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, বোরায়দা। "বোরায়দা" শব্দ "বার্‌দ" ধাতু হইতে এবং বার্‌দ অর্থ শীতলতা, শান্তি; এই সূত্রে তাহার নাম হইতে নবী (সঃ) শুভলক্ষণ* গ্রহণপূর্বক আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের কার্যে শান্তি ও শীতলতা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে বলিল, "আসলাম" গোত্রের। "আসলাম" শব্দ "সেল্‌ম" ধাতু হইতে, যাহার অর্থ নিরাপত্তা নিষ্কণ্টকতা। ইহা হইতেও শুভলক্ষণ গ্রহণপূর্বক নবী (সঃ) বলিলেন, আমাদের কন্টক দূর হইবে, নিরাপত্তা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বংশ-শাখার, সে বলিল, "বনু সাহ্‌ম" হইতে। "সাহ্‌ম" অর্থ তীর। নবী (সঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! তোমার সৌভাগ্যের তীর আগত।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশান্তে দস্যু দলপতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল, তাহার সর্বাঙ্গে শিথিলতা ও শীতলতা আসিয়া গেল; দুস্যতার পরিবর্তে এখন তাহার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে কোমল স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিচয় কি? নবীজী (সঃ) আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠতাপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন– انا محمد بن عبد الله رسول الله "আমি আবদুল্লাহর

* যেকোন বস্তু হইতে শুভলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয আছে, কিন্তু কোন কিছু হইতেই কুলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নাই।

পুত্র মুহাম্মদ– আল্লাহর রসূল" (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। বোরায়দা নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না, প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বর্গীয় দৃষ্টির তীর তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া গেল। সে দমিত ও নমিত, কিন্তু আত্মবলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়া উঠিল–

আশ্‌হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।

দলপতি বোরায়দার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচররাও ইসলাম গ্রহণে নবীজীর (সঃ) চরণে লুটাইয়া পড়িল। কী অপূর্ব দৃশ্য! এক / দুই জন নহে–৭০ জন রক্ত-মাতাল হিংস্র শত্রু মুহূর্তের মধ্যে বশীভূত হইয়া মিত্রে পরিণত হইয়া গেল। সত্যের বল-শক্তি এইরূপই হয়–জাদুমন্ত্রের শক্তিও উহার সম্মুখে তুচ্ছ।

বোরায়দা (রাঃ) অবনত মস্তকে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করিলেন যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন; কোন প্রকার বাধ্য হইয়া নহে। নবীজী (সঃ) রাত্রির বিশ্রাম শেষে ভোর বেলা যাত্রা করিলেন। তখন বোরায়দা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাফেলা উড্ডীয়মান বিজয় পতাকার সহিত মদীনায় প্রবেশ করিবে। সেমতে বোরায়দা (রাঃ) নিজ আমামা–শিরস্ত্রাণ দ্বারা তাঁহার বর্শা ফলকে ইসলামের বিজয় নিশান তৈয়ারী করিয়া মহা উৎসাহে বীর দর্পে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। মদীনা বেশী দূরে নহে; কাফেলাওয়ালাদের মনে কতই না পুলক ও কৌতূহল! নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছেন সকলে; আর বোরায়দা (রাঃ) অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করিয়া। এই মনোহর দৃশ্য সমেতই কাফেলা পৌঁছিল মদীনার উপকণ্ঠে।

(যোরকানী, ১–৩৫০)

মদীনার পথে খাদ্যের ব্যবস্থা

আবু বকর (রাঃ) গৃহ ত্যাগকালে কিছু পাথেয় সঙ্গে লইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেও সুযোগমত আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐরূপ একটি ঘটনা এই–

১৭০৬। হাদীছ ঃ বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মদীনাপানে যাইতেছিলেন তখন সোরাকা ইবনে মালেক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে ধাওয়া করিল। হযরত নবী (সঃ) তাহার প্রতি বদ দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাত ঐ ব্যক্তির বাহন ঘোড়ার পা যমীনে গাড়িয়া গেল! সে ভয় পাইয়া হযরত (সঃ)-কে অনুরোধ করিতে লাগিল, আপনি আমার জন্য দোয়া (করিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার) করুন: আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সে মুক্তি পাইয়া গেল।

অতপর হযরত (সঃ) পিপাসা অনুভব করিলেন, এমতাবস্থায় এক রাখালের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন; সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমি একটি পাত্র লইয়া ঐ রাখালের নিকট হইতে কিছু দুগ্ধ দোহাইয়া আনিলাম। হযরতের নিকট সেই দুগ্ধ পেশ করিলে তিনি তাহা পান করিলেন, যাহাতে আমার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল।

১৭০৭। হাদীছ ঃ (৫১৫) আ'যেব (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শত্রু কাফেররা আপনাদের তালাশে পিছনে ধাওয়া করিল, তখন আপনারা কি করিয়াছিলেন? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মক্কা হইতে (মক্কার এলাকাস্থ সওর পর্বত গুহায় তিন দিন লুকাইয়া থাকার পর তথা হইতে রাত্রি বেলা) বাহির হইয়া আমরা সারা রাত্র পথ চলিলাম এবং পরের দিনও চলিলাম; যখন উত্তাপময় দ্বিপ্রহরের সময় উপস্থিত হইল তখন আমি বিশ্রামের উদ্দেশে ছায়ার জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং বড় একটি পাথরের ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তথাকার জায়গাটা একটু সমান করিয়া বিছানা বিছাইয়া দিলাম এবং হযরত

নবী (সঃ)-কে আরাম করার অনুরোধ জানাইলাম। নবী (সঃ) আরাম করিলেন এবং আমি চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এই উদ্দেশে যে, শত্রু দলের পক্ষ হইতে আমাদের তল্লাশকারী কাহাকেও দেখা যায় কি-না।

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক বকরীর রাখাল তাহার বকরী দল হাঁকাইয়া এই পাথরের দিকে নিয়া আসিতেছে; তাহারও উদ্দেশ উহাই যে উদ্দেশে আমরা পাথরটির নিকট আসিয়াছি। আমি তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মালিক কে? সে তদুত্তরে কোরায়শ বংশের এমন এক লোকের নাম উল্লেখ করিল যে আমার পরিচিত। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বকরী পালের মধ্যে দুগ্ধবতী বকরী আছে কি? সে বলিল, হা আছে। আামি বলিলাম, আমাদের জন্য দুগ্ধ দোহাইয়া দিবে কি? সে বলিল, হাঁ দিব এবং একটি বকরী সেই উদ্দেশে বাঁধিয়া রাখিল। বকরীর স্তন হইতে ধুলা-বালু ভালরূপে ঝাড়িয়া ফেলার অতপর তাহার হাতদ্বয় ভালরূপে ঝাড়িতে বলিলাম। সে তাহা করিয়া আমার জন্য দুগ্ধ দোহাইল। সেই দুগ্ধ আমি একটি পাত্রের মুখে কাপড় রাখিয়া ছাঁকিয়া এবং উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সুশীতল ঠাণ্ডা করিলাম, অতপর তাহা লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, হযরত (সঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! দুগ্ধ পান করুন। হযরত তৃপ্তির সহিত ঐ দুগ্ধ পান করিলেন। আমি তাহাতে খুবই আনন্দিত হইলাম। তারপর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূল্লাল্লাহ (সঃ)! এই সময় কি পুনঃ যাত্রা আরম্ভ করিবেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ। সেমতে আমরা যাত্রা করিলাম।

এদিকে মক্কাবাসীগণ আমাদের খোঁজে লাগিয়া আছে, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে বাগে পায় নাই। অবশ্য একমাত্র সোরাকা ইবনে মালেক নামক ব্যক্তি আমাদের খোঁজ পাইল এবং দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া আমাদের নিকটে চলিয়া আসিল। তখন আমি আতঙ্কিত অবস্থায় আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ। পিছনে ধাওয়াকারী আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। হযরত (সঃ) ধীর স্থিরতার সহিত বলিলেন, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা করিও না– আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

মদীনার পথে নবীজীর কাফেলা আরও কয়েক স্থানে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঐ সবের বিবরণ এই

উম্মে মা'বাদের কুটিরে নবীজীর (সঃ) কাফেলা

নবীজীর (সঃ) কাফেলা "কোদায়দ" নামক বস্তিতে পৌঁছিল। তথায় একটি কুটিরে উম্মে মা'বাদ পরিবার বাস করিত। উম্মে মা'বাদ এক পুণ্যাত্মা বৃদ্ধা, তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সে তাহার গৃহাঙ্গনে বসিয়া থাকিত, শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদের খাদ্য-পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করিত, তাহাদের সেবা করিত।

ঐ এলাকায় তখন খুব অভাব, অনাবৃষ্টির দরুন ঘাস-পাতারও খুব অভাব। তাই পশুপালের অবস্থাও অতিশয় সূচনীয়। উম্মে মা'বাদের স্বামী মেষপাল চরাইতে বহু দূরে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। এই সময় নবীজীর (সঃ) কাফেলা ঐ কুটীর পৌঁছিল এবং তাহারা দুগ্ধ, গোশত বা খেজুর যাহাই হউক ক্রয় করিতে চাহিলেন। উম্মে মা'বাদ বলিল, আমার নিকট পানাহারের কিছু থাকিলে আমি আপনাদের আতিথেয়তায় কার্পণ্য করিতাম না, আমি নিজেই আপনাদের সেবা করিতাম, আপনাদের মূল্য দিতে হইত না।

নবী (সঃ) লক্ষ্য করিলেন, কুটিরের এক প্রান্তে অতি কৃশ ও দুর্বল একটি ছাগী শুইয়া আছে। নবীজী (সঃ) উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছাগীটির কি অবস্থা? সে বলিল, উহা এতই দুর্বল যে, মেষপালের সঙ্গে চরিতে যাওয়ার বলও পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে দুগ্ধ আছে কি? সে বলিল, উহা দুগ্ধ দানের সম্ভাবনা হইতেও অনেক অধম। তারপরও নবীজী (সঃ) উম্মে মা'বাদকে বলিলেন, ঐ ছাগীটা দোহন করিতে অনুমতি আছে কি? সে বলিল, উহার স্তনে দুধ আছে মনে করিলে দোহন করিতে পারেন। নবী। (সঃ) উম্মে

মা'বাদের ছোট্ট ছেলে মা'বাদকে বলিলেন, হে বালক! ছাগীটা নিয়া আস ত। ছাগীটা নিয়া আসিলে নবী (সঃ) দোহনের জন্য উহাকে আবদ্ধ করিলেন এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া স্তনে ও পেটে হাত বুলাইলেন এবং দোয়াও করিলেন। পুনরায় উহার স্তনে হাত বুলাইলেন এবং বার বার আল্লাহর নাম জপিলেন।

অতপর বলিলেন, বড় একটি পাত্র আন– যাহার খাদ্যে এক দল লোকের পেট পুরিতে যথেষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই ছাগীটার স্তন দুগ্ধে ফাঁপিয়া উঠায় পিছনের পাদ্বয় ফাঁক করিয়া দিল এবং জাবর কাটিতে আরম্ভ করিল। নবী (সঃ) প্রবল বেগে দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিলেন। বড় পাত্রটি দুগ্ধপূর্ণ হইলে সর্বপ্রথম ঐ পাত্র উম্মে মা'বাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে কাফেলার লোকদের প্রদান করিলেন। প্রত্যেকে বার বার পান করিয়া অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইল। সকলে পরিতৃপ্ত হইলে সর্বশেষে নবীজী মোস্তফা (সঃ) পান করিলেন। এহেন মহান আদর্শ কার্যত শিক্ষাদানের পর মৌখিকও বলিয়া দিলেন–"সকলকে পান করাইবার ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে সে সকলের পরে পান করিবে।" অতপর দ্বিতীয় বার ঐ পাত্রে দোহন করিয়া পুনঃ পুনঃ সকলকে পান করাইলেন। নবীজীর দ্বারা এই অসাধারণ বরকত লাভে তাহারা তাঁহাকে "মোবারক"–বরকত ও মঙ্গলময় বলিয়া প্রশংসা করিল।

তারপর নবী (সঃ) তৃতীয়বার ঐ পাত্রে দুধ দোহন করিয়া উম্মে মা'বাদের গৃহে রাখিয়া গেলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী– মা'বাদের পিতা বাড়ী আসিলে তাহাকে পান করাইও। নবীজীর (সঃ) কাফেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া গেল; ইতিমধ্যেই স্বামী আবু মা'বাদ মেষপাল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। ঘাসের অভাবে মেষগুলি এতই দুর্বল ছিল যে, হাঁটিতে সক্ষম হইতেছিল না, এতই কৃশ ছিল যে, উহাদের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্ধ কোথা হইতে পাইলে? মেষপাল ত বাড়ীতে ছিল না, দুগ্ধের কোন ছাগীও গৃহে ছিল না। উম্মে মা'বাদ বলিল, তোমার কথা সত্যই, কিন্তু আমাদের গৃহে এক "মোবারক"–বরকতময় মহৎ ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে। অতপর উম্মে মা'বাদ দুগ্ধ দোহনের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। আবু মা'বাদ কৌতূহলে সেই মহান আগন্তুকের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। উম্মে মা'বাদ স্বামীর নিকট নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-গুণের বিবরণ যে ওজস্বিনী ভাষায় প্রদান করিয়াছিল, উহার যথাযথ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব নহে। সামান্য কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে। উম্মে মা'বাদ বলিল–

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি– অতি উজ্জ্বল বর্ণ সুপুরুষ তিনি, মুখশ্রী তাঁহার দীপ্ত ও আভাপূর্ণ, চরিত্র তাঁহার অতি মধুর, পেট তাঁহার স্ফীত নহে, দেহ তাঁহার কৃশ নহে– সুন্দর সুঠাম। খুব কাল তাঁহার চোখের তারা, ঘন ও সুদীর্ঘ তাঁহার নয়নের লোমরাজি। কর্কষ নহে– গম্ভীর তাঁহার স্বর, নয়নযুগলে অতি সাদার মধ্যে অতি কাল পুতুলি; প্রকৃতিই যেন সুরমা দিয়া দিয়াছে তাঁহার নয়নে, ভ্রূযুগল পরস্পর সংযোজিত, অতি কাল তাঁহার কেশদাম, গ্রীবা তাঁহার দীর্ঘ, দাড়ি তাঁহার ঘন। মৌন অবস্থায় তাঁহার উপর গুরুগম্ভীর ভাবের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, কথা বলিলে সকলের মনপ্রাণ মোহিত করিয়া দেয়। তাঁহার কথা মুক্তার দীর্ঘ মালার ন্যায় সুবিন্যস্ত– তাহা হইতে যেন এক একটি মুক্তা পর পর খসিয়া পড়িতেছে। মিষ্ট ও প্রাঞ্জল তাঁহার ভাষা, সুস্পষ্ট তাঁহার বর্ণনাধারা, ত্রুটি থাকে না আধিক্যও হয় না তাঁহার কথার মধ্যে। দূর হইতে দেখিলে তাঁহার রূপ-লাবণ্য মুগ্ধ করিয়া ফেলে, নিকটে আসিলে (তাঁহার ঐশিক প্রভাব দৃষ্টি ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু) তাঁহার প্রকৃতির মাধুরী মোহিত করিয়া ফেলে। দেহ তাঁহার মধ্যমাকার– দেখায় অপ্রিয় দীর্ঘও নহে, হেয় মানের খর্বও নহে, (পুষ্টি ও পুলকে সেই দেহ) রসাল বৃক্ষ ডালার ন্যায়– সেই ডালা কচিও নহে দীর্ঘ দিনেরও নহে। তিন জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সুদর্শন ও সুমহান। সঙ্গীরা তাঁহাকে সদা বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এবং কোন আদেশ করিলে অতি আগ্রহের সহিত পালন করে। সকলের সেবার পাত্র তিনি, সকলেই তাঁহার হুজুরে জটলা বাঁধিয়া থাকে। তিনি বিষণ্ণ আকৃতিতে থাকে না। তিরস্কার করা ধিক্কার দেওয়া তাঁহার স্বভাবে নাই।

আবু মা'বাদ স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শুনিবা মাত্র শপথ করত বলিয়া উঠিল, ইনিই ত কোরায়শদের সেই মহান। তাঁহার দর্শন পাইলে নিশ্চয় তাঁহার চরণে আমি শরণ লইতাম; তাহার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া যাইব। আমি তাঁহার সাহচর্যের কামনা করি, সুযোগ পাইলে সেই মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিব।

নবীজী (সঃ) চলিয়া যাওয়ার পরও ছাগীটি সকাল-বিকাল ঐরূপ অসাধারণভাবে দুগ্ধ দিয়া থাকিত এবং দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াও ছিল। (যোরকানী, ১-৩৪০)

আবু মা'বাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, সাধনা তাঁহার সফল হইল। স্বামী আবু মা'বাদ এবং স্ত্রী উম্মে মা'বাদ সপরিবারে মদীনায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উম্মে মা'বাদের ভ্রাতা "হোবায়শ"ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে উম্মে মা'বাদ হইতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের সকলে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ। (যোরকানী, ১-৩৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

উম্মে মা'বাদের ঘটনা জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল; তাহারা অদৃশ্য কণ্ঠে কাব্যের মাধ্যমে মক্কায় এই ঘটনা সুললিত সুরে গাহিয়া প্রচার করিল।

আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পিতা আবু বকর (রাঃ) ও নবীজী মোস্তফা (সঃ) গৃহ ত্যাগের ৪/৫ দিন পরে আমরা ত তাঁহাদের কোন সংবাদ অবগত নহি; ইতিমধ্যেই একটি অদৃশ্য কণ্ঠের এই কবিতা মক্কার লোকজন শুনিতে পাইল।

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ ـ رَفِيْقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتِى اُمِّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلاَ بِالْبِرِّ وَارْتَحَلاَ بِهِ ـ فَاَفْلَحَ مَنْ اَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ

سَلُوْا اُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَاِنَائِهَا ـ فَاِنَّكُمْ اِنْ تَسْاَلُوْا الشَّاةَ تَشْهَدِ

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ ـ لَهٗ بِصَرِيْحٍ صَرَّةَ الشَّاةِ مُزْبِدِ

فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ ـ يَدُرُّ لَهَا فِىْ مَصْدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ ـ

অর্থ ঃ "সকলের প্রভু আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন ভ্রমণ সঙ্গীদ্বয়কে, যাঁহারা উম্মে মা'বাদের কুটিরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপুণ্যবানরূপে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং ঐরূপেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বন্ধুত্ব যাহারই লাভ হইয়াছে, সাফল্য লাভে সে-ই ধন্য হইতে পারিয়াছে। তোমাদের ভগ্নী উম্মে মা'বাদকে তাহার ছাগী এবং বিরাট পাত্রের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর; ঐ ছাগীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মুহাম্মদ (সঃ) উম্মে মা'বাদকে ডাকিলেন তাহার এমন একটি ছাগীর জন্য, যাহা ছিল বন্ধ্যা (অতএব উহার স্তনে দুগ্ধের অস্তিত্বই ছিল না), কিন্তু ঐ ছাগীর স্তন খাঁটি দুগ্ধ এমন প্রবল বেগে প্রদান করিল যে, উহার ফেনার স্তূপ জমিয়া গেল। অবশেষে ঐ ছাগীটি উম্মে মা'বাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, প্রত্যেক দোহনকারী উম্মে মা'বাদের জন্য পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ দোহন করিতে থাকিবে। (বেদায়া ও যোরকানী,৩৪২)

উম্মে মা'বাদের নিবাস এলাকা "কোদায়দ" মক্কা-মদীনার পথে মদীনা অপেক্ষা মক্কার অধিক নিকটবর্তী ছিল। বদান্যতা গুণে সে মক্কা এলাকায় পরিচিত ছিল এবং তাহার কুটির পথিকদের বিশ্রামাগার ছিল,, দেশ-বিদেশের পথিকগণ তথায় সেবা ও সহানুভূতি পাইয়া থাকিত, তাই ঐ কুটিরও লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। সেমতে জ্বিনদের উক্ত কবিতা মক্কার মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল এবং যাঁহারা নবীজীর (সঃ) কাফেলার সংবাদ জ্ঞাত হইতে আগ্রহী ছিলেন তাঁহারাও আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

উম্মে মা'বাদের কুটিরে ছাগী দোহনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মোজেযা। এ মোজেযাটির বিভিন্ন দিক ছিল। যথা-

১। ঘাসের অভাবে ছাগীটি এতই কৃশ ও দুর্বল ছিল যে, চারণ ভূমিতে যাইতে অক্ষম ছিল। উম্মে মা'বাদ নিজেই এই কথা বলিয়াছিলেন। অতএব সাধারণভাবেই উহা দুগ্ধশূন্য ছিল। নবীজীর (সঃ) মোজেযায় তাহাতে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল।

২। ছাগীটির কোন বাচ্চা জন্মিয়াছিল না, যাহাতে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইতে পারে। জ্বিনদের কাব্যে যে ঐ ছাগীটির গুণবাচক حائل হাএল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার আভিধানিক অর্থই হইল كل انثى لا تحمل " ঐ মাদী জীব যে গর্ভধারণ করে না" অর্থাৎ বন্ধ্যা। সেমতে ঐ ছাগীটি গর্ভধারণের যোগ্যই ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারই হইতে পারে না। একমাত্র নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযায়ই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

৩। বড় পাত্র- যাহার মধ্যে একদল লোক পরিতৃপ্ত হওয়ার পরিমাণ পানীয় সামলাইতে পারে- স্বাভাবিকরূপে একটি অতি উত্তম ছাগী হইতেও ঐরূপ পাত্র বারংবার পরিপূর্ণ হওয়ার মত দুগ্ধ লাভ হইতে পারে না। এই ঘটনায় ঐরূপ হইয়াছিল এবং ৭/৮ জন মানুষ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; ইহাও মোজেযাই ছিল।

৪। আরও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয় এই ছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ঐ ছাগীটি এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ দিতেই ছিল।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তের পরশে উল্লিখিত অস্বাভাবিক ঘটনাই বাস্তবায়িত হইয়াছিল, যাহা দৃষ্টে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীগণ নবীজী (সঃ)-কে স্বতঃস্ফূর্ত "মোবারক" নামে আখ্যা দিয়াছিল এবং আবু মা'বাদ নিজ গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মুসলমান জ্বিন সম্প্রদায়ও এই ঘটনাকে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্য রসূল হওয়ার সাক্ষ্যরূপে প্রচার করিয়াছিল। এইসব তথ্য সীরাত তথা চরিত-শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ কিতাবসমূহের সবগুলিতেই বর্ণিত রহিয়াছে।*

মদীনার পথে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম কর্তৃক আহার যোগাইবার এরূপ আরও ঘটনা সীরাত গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঐরূপ আরও ঘটনা

মদীনার পথে নবীজী (সঃ)-এর কাফেলা এক রাখালের নিকট দিয়া যাইতেছিল, আহারের প্রয়োজন

সমালোচনা ঃ "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে ছাগীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় সমুদয় তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া শুধু গ্রন্থকারের নিজ অনুমানের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে স্বাভাবিক প্রমাণ করিবার অপচেষ্টায় বলা হইয়াছে- "সম্ভবত কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল তাহা পথিকগণের পক্ষে নিত্যান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সাথে পানি মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল।"

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন! ইতিহাসে বর্ণিত তথ্যগুলিকে কিরূপে মুছিয়া ফেলা হইল। বলা হইল- কয়েক দিনের দুগ্ধ স্তনে সঞ্চিত ছিল; অথচ ছাগীটি ছিল হায়েল অর্থাৎ বন্ধ্যা, যাহার গর্ভে বাচ্চা জন্মে না, স্তনে দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? বলা হইয়াছে, পথিকগণের পক্ষে; অথচ গৃহস্বামীরাও পান করিয়াছিল, এমনকি অনুপস্থিতের জন্যও এক পাত্র রাখা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে, নিতান্ত অপ্রচুর হইল না, অথচ প্রত্যেকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে মোস্তফা-চরিত গ্রন্থকার দুগ্ধে পানি মিশ্রিত করা সাব্যস্ত করিল, তবুও মোজেযা স্বীকার করিল না।

এইরূপ অপদার্থ মগজ হইতে নিঃসৃত বাতুলতার সমালোচনা করা যায়? প্রবীণ পণ্ডিত মরহুমের সমালোচনা হয়ত পাঠককেও মর্মাহত করে। কিন্তু নবীজীর মোজেযার প্রতি স্বীকৃতি দানে যাহারা এত সঙ্কীর্ণ, তাহাদের অধিকার ছিল না মোস্তফা-চরিত সঙ্কলন করিয়া মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার। মূল ঘটনা যেসব গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে আমাদের উদ্ধৃত তথ্যসমূহ ঐসব গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত তথ্যসমূহ বাদ দিয়া, বরং উপেক্ষা করিয়া ঘটনাকে মনগড়ারূপে 'সম্ভবত' 'জনিত' ইত্যাদি নিজ উক্তির আড়ালে বিকৃত করা শিক্ষা ও সভ্যতার বিপরীত নহে কি?

ছিল। তাঁহারা রাখালকে কোন একটি ছাগী হইতে দুগ্ধদানের অনুরোধ করিলেন। আরবে এই নীতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল যে, পথিকগণ যেকোন মেষপাল ইত্যাদি হইতে নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

রাখাল বলিল, আমার পেষপালে দুগ্ধ দেওয়ার যোগ্য কোন ছাগী নাই; একটি ছাগী আছে, উহার বয়সও কম। এই শীত মৌসুমের আরম্ভে বাচ্চা দিয়াছিল। সেই বাচ্চা ছিল অসম্পূর্ণ দেহবিশিষ্ট, বহু দিন পূর্বে ঐ ছাগীটির দুগ্ধ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। নবী (সঃ) বলিলেন, ঐ ছাগীটিই নিয়া আস। উপস্থিত করা হইলে নবীজী (সঃ) স্তনে হস্ত বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন। উহার স্তনে দুগ্ধ নামিয়া আসিল। আবু বকর (রাঃ) একটি পাত্র নিয়া আসিলেন। নবীজী (সঃ) দোহন করিলেন। প্রথমবার আবু বকর (রাঃ) পান করিলেন, দ্বিতীয় বার ঐ রাখাল পান করিল– এইভাবে সকলে পান করিলে সর্বশেষে নবীজী (সঃ) পান করিলেন।

ঘটনাদৃষ্টে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, খোদার কসম! আপনি কে? আপনার ন্যায় ব্যক্তি ত আমি আর দেখি নাই। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার পরিচয় জ্ঞাত করিলে সংবাদ গোপন রাখিবে ত? সে বলিল, হাঁ। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)– আল্লাহর রসূল। রাখাল বলিল, কোরায়েশরা যাহাকে ধর্মত্যাগী বলিয়া থাকে আপনিই তিনি। নবী (সঃ) বলিলেন, তাহারা এরূপই বলিয়া থাকে। রাখাল বলিল, আমার স্বীকৃতি ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় নবী এবং আপনার ধর্ম সত্য; আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইবে না, আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করি। নবী (সঃ) বলিলেন, তুমি এখন আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না। আমার বিজয় ও প্রাবল্যের সংবাদ অবগত হইলে পর তুমি আমার নিকটে চলিয়া আসিও।* (বেদায়া, ৩–১৯৪)

একটি ঘটনা

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা ত্যাগ করিবার পথে আমরা একটি গোত্রের বস্তিতে পৌঁছিয়া এক কুটিরে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঐ কুটিরে এক মহিলার অবস্থান। সন্ধ্যা বেলা তাহার পুত্র মেষপাল চরাইয়া উহা লইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে একটি ছুরি প্রদান করিয়া বলিলেন– এই ছুরি ও একটি মেষ লইয়া পথিক মুসাফিরদের নিকট যাও এবং বল, আপনারা এই মেষটি জবাই করিয়া নিজেরাও খওয়ার ব্যবস্থা করুন আর আমাদেরকেও দিন। মহিলার পুত্র ছুরি ও একটি ছাগী লইয়া পৌঁছিলেন। নবীজী (সঃ) ছুরি ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, দুগ্ধ দোহনের পাত্র নিয়া আস। বালক বলিল, ছাগীটিত কম বয়সের– এখনও পাঠার পালে আসে নাই * (ইহাতে দুগ্ধের সম্ভাবনা নাই)। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তুমি যাও; সে যাইয়া পাত্র নিয়া আসিল। নবী (সঃ) ছাগীটির স্তনে হাত বুলাইলেন, অতপর দুগ্ধ দোহাইলেন; পাত্রটি দুগ্ধে পূর্ণ হইলে উহা বালকের মাতার জন্য পাঠাইলেন। সে তৃপ্ত হইয়া পান করিলে পুনরায় দোহাইলেন। উহা সঙ্গীগণ পান করিলেন, সর্বশেষে নবীজী (সঃ) পান করিলেন। তথায় কাফেলা দুই রাত্র অবস্থান করিল। কুটির বাসীরা নবীজী (সঃ)-কে "মোবারক– বরকত ও মঙ্গলময়" নামে আখ্যায়িত করিল।

ঐ মহিলার মেষপালে বরকত হইল, উহা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল। মহিলা তাহার মেষপালসহ পুত্রকে লইয়া মদীনায় পৌঁছিল। পুত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল মা! ঐ যে মোবারকের সঙ্গী ব্যক্তি। তাঁহারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে "মোবারক" নামে আখ্যা দিয়াছিল।

মাতা তৎক্ষণাৎ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

---

* পাঠক! "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনাকে কি বলিয়া স্বাভাবিক বানাইবে? ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হওয়ার কারণেই ত ঘটনায় উপস্থিত রাখাল স্পষ্ট বলিয়াছে, আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ করিতে পারে না।

* "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনায় ছাগীটির দুগ্ধ দেওয়ার স্বাভাবিকতা কিরূপে নির্ণয় করিবেন? উল্লিখিত দুইটি ঘটনা ঐসব কিতাবেই বর্ণিত রহিয়াছে যেসব কিতাব হইতে উম্মে মা'বাদের ঘটনা মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহর বান্দা! আপনার সঙ্গী সেই মহাপুরুষ কে ছিলেন, আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আল্লাহর নবী। মহিলা বলিলেন, আমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে নবীজী (সঃ)-এর সমীপে পৌঁছাইয়া দিলেন; তাঁহারা নবীজী (সঃ)-কে কিছু পনির এবং গ্রাম্য সমগ্রী হাদিয়া পেশ করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলেন এবং পরিধেয় ইত্যাদি উপহার দিলেন। (যোরকানী, ১-৩৪৯, বেদায়া ৩-১৯২)

নূতন শুভ্র বসনে মদীনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা

১৭০৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৪) যোবায়র (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) মদীনা যাওয়ার পথে যোবায়র রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত সাক্ষাত হইল- তিনি কতিপয় মুসলমান বণিকের সঙ্গে বাণিজ্য কাফেলায় সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। যোবায়র (রাঃ) নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)-কে সাদা কাপড়ের নূতন পোশাক পরাইয়া দিলেন।

মদীনার শহরতলীতে নবীজীর (সঃ) উপস্থিতি

মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার দিন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতভেদ আছে। সিদ্ধ মত ইহাই যে, হযরত (সঃ) রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম তারিখ (বুধবার দিবাগত) বৃস্পতিবার রাত্রে মক্কা নগরী ত্যাগ করতঃ সওর পর্বত গুহায় পৌঁছিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাত্র হইতে রবিবার পর্যন্ত চারি দিন তিন রাত্র গুহার পথে এবং গুহায় উদ্‌যাপন করিয়া (রবিবার দিবাগত) সোমবার রাত্রে গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে মদীনায় পৌঁছিলেন। (ফতহুল বারী, ৭-১৮৮)

মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিতে মদীনার শহরতলী কোবা পল্লী দিয়াই প্রবেশ পথ। এই কোবা পল্লীতে বনী আম্‌র ইবনে আওফ গোত্রের বসবাস। তাঁহাদের মহানুভবতা ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মক্কা হইতে বিতাড়িত ও আগত মজলুম অত্যাচারিত সর্বহারা মুসলমানগণ এই পল্লীর উক্ত গোত্রে বেশী পরিমাণে শুধু আশ্রয়ই পাইতেন না, বরং সহোদররূপে সমাদরে গৃহীত ও সযত্নে আপ্যায়িত হইতেন। মজলুম মোহাজেরগণের প্রথম ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র সর্বস্ব হইতে বিচ্ছিন্ন আবু সালামা (রাঃ) এই পল্লীতেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখিনী স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) শিশু পুত্রসহ দীর্ঘ এক বৎসর পর এই পল্লীতেই স্বামীর সহিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন। আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর সস্ত্রীক হিজরতকারী আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) তাঁহার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী, ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী সকলেই হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতে মোবাশ্‌শের ইবনে আবদুল মোনযের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (বেদায়া৩- ১৭১)

ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, ভ্রাতা, ভগ্নীপতিসহ বিশ জন সকলেই কোবা পল্লীতে রেফাআ, ইবনে আবদুল মোনযের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। (বেদায়া ২-১৭৩)।

হামযা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), আবু মারসাদ (রাঃ), মারসাদ (রাঃ),আনাছাহ (রাঃ) এবং আবু কাব্‌শা (রাঃ) তাঁহারও কোবা পল্লীতে কুলসুম ইবনে হাদম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-১৭৪)

নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা হইতে আত্মগোপন করিয়া যাত্রা করিয়াছেন- মদীনাবাসী মুসলমানগণ যথাসময়ে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপরিসীম প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া

পড়িয়াছিল। সমগ্র শহর ও শহরতলীর মুসলমানদিগের আনন্দ-উৎসাহের সীমা ছিল না। কারণ তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মদীনায় পৌঁছিবেন। মদীনার মুসলমানগণ প্রত্যহ নগর এলাকার বাহিরে উন্মুক্ত কাঁকরময় ময়দানে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাকাইয়া থাকিতেন নবীজীর (সঃ) কাফেলার আগমন প্রতীক্ষায়। সূর্যের প্রখর উত্তাপই তাঁহাদিগকে সেই প্রতীক্ষা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিত সূর্য তাপ অসহনীয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা বাড়ী ফিরিতেন না।

১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিনও ঠিক ঐরূপেই মদীনাবাসী মুসলমানগণ সূর্য তাপে বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন মাত্র। ইতিমধ্যেই হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কোলাহল জাগিয়া উঠিল– উজ্জ্বল শুভ্র বসন পরিহিত ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনার ঊর্ধ্বপ্রান্ত পথে কোবা পল্লীর পানে আগত পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরময় আনন্দ-উৎসাহের হিল্লোল বহিয়া গেল। মুসলমানগণ দলে দলে ঘর হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে আজ পুলক অফুরন্ত উল্লাস; দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ পূরণ হইবে– আল্লাহর রসূলকে আজ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম"।

ধীরে ধীরে নবীজীর (সঃ) কাফেলা কোবা পল্লীতে উপনীত হইল। বার রাত্র বার দিনের কঠিন সফরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে লইয়া একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। নবীজী (সঃ) মৌনভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পাশেই আছেন আবু বকর (রাঃ)। নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক নাই, উপবেশনে কোন পার্থক্য ও আড়ম্বর নাই– যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে নবীজী (সঃ)-কে চিনিত পারিত। এমনকি যাঁহারা পূর্বে নবীজী (সঃ)-কে দেখেন নাই, আবু বকর (রাঃ)-কেও চিনিতেন না, তাঁহাদের অনেকে আবু বকর (রাঃ)-কে নবীজী মনে করিয়া তসলীম জানাইতেছিলেন। কারণ, আবু বকর (রাঃ) বয়সে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও তাহাকে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা অধিক বয়সের দেখাইত। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (সঃ) অভ্যর্থনাকারী ও সাক্ষাৎকারীগণের ভিড়ে যাতনা অনুভব করিবেন– অবলীলাক্রমে তিনি ঐভাবে তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন। হয়ত এই কারণেই আবু বকর (রাঃ) তসলীম গ্রহণে বাধার সৃষ্টি না করিয়া মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় ছায়া সরিয়া যাওয়ায় নবীজীর চেহারার উপর রৌদ্র লাগিতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) অবিলম্বে নিজ বস্ত্রের সাহায্যে নবীজীর জন্য ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়া করাও হইল এবং ভক্ত-অনুরক্ত খাদেম ও প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও হইয়া গেল।

বৃক্ষ ছায়াতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কুশলবাদ আলাপ-আলোচনার পর নবীজী (সঃ) কোবা পল্লীর কুলসুম ইবনে হদমের গৃহে আপ্যায়িত হইলেন। যে কয় দিন নবীজী (সঃ) কোবায় অবস্থান করিয়াছিলেন এই গৃহেই অবস্থান করিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত সাক্ষাত অনুষ্ঠানে তিনি সা'দ ইবনে খায়সামা (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে বসিতেন। কারণ, এই গৃহস্বামী ছিলেন পরিবার শূন্য; এই গৃহে নবীজীর নিকট লোকদের যাতায়াত ও সাক্ষাত সুবিধাজনক ছিল। (বেদায়া, ৩–১৯৭)

নবীজী (সঃ) মক্কা হইতে বাহির হইয়া আসায় কৃতকার্য হইলে পর আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষে সহজ হইয়া গেল নবীজীর নিকট মক্কাবাসীদের গচ্ছিত বস্তু তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া। সেমতে তিনি যথাসম্ভব দ্রুত মালিকদিগকে তাহাদের বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। মক্কা হইতে নবীজীর যাত্রা করার তিন দিন পরে আলী (রাঃ)ও মক্কা ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতেই নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের সহিত মিলিত হইলেন। (বেদায়া, ৩–১৯৭)

কোবা পল্লীতে নবী (সঃ) সোমবার পৌঁছিয়াছিলেন এবং শুক্রবার পর্যন্ত ঐ পল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা অবধারিত যে, কোবা হইতে নবীজীর প্রস্থান শুক্রবার ছিল; কাহারও মতে পরবর্তী শুক্রবার, কিন্তু অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় শুক্রবার। সেমতে কোবা পল্লীতে নবীজীর (সঃ) অবস্থান (অবতরণ ও প্রস্থানের দিনকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় গণনা করিয়া) বার দিন ছিল। (বেদায়া, ৩ –১৯৮)

ছাহাবী আনাছ (রাঃ)– যাঁহার বয়স এই সময় মাত্র দশ বৎসর ছিল; তিনি পরবর্তীকালে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা নিজ স্মরণ অনুযায়ী প্রদান করিয়াছেন যে, কোবা পল্লীতে নবী (সঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহার স্মরণ মতে নবীজীর কোবা পল্লীতে অবতরণ শুক্রবার দ্বিপ্রহরে ছিল এবং তথা হইতে মদীনা নগরে প্রস্থান তৃতীয় শুক্রবার দ্বিপ্রহরের পূর্বে ছিল। সেমতে অবতরণ ও প্রস্থানের অর্ধ অর্ধ দিনের সমষ্টিকে একদিন গণ্য করিয়া চৌদ্দ দিন বলা হইয়াছে। (আসাহহুস সিয়ার– ১০৯)

কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্মাণ

কোবা পল্লীতে ১২ দিন বা ১৪ দিন অবস্থান কালে নবীজী (সঃ) তাঁহার একটি বিশেষ আদর্শ ও সুন্নত বাস্তবায়ন করিলেন। নবীজীর (সঃ) বিশেষ মৌলিক আদর্শ ও সুন্নত এই যে, যেস্থানেই মুসলমানের বসবাস হইবে, তথায় সর্বদা জামাতের সহিত নামায আদায় করার সুব্যবস্থা করিবে। মুসলমানদের জন্য এই আদর্শ বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনেরও ইঙ্গিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ

অর্থ ঃ "মুসলমান এমন জাতি, তাহাদিগকে কোন ভূখণ্ডে শক্তি-সামর্থ্যের সুযোগ দান করিলে তাহারা তথায় নামায জারি করার সুব্যবস্থা করে... ।"

কোবা পল্লীতে মুসলমানগণের মুক্ত ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুযোগে মুসলমানদের কর্তব্য তথায় জামাতে নামাযের প্রচলন এবং ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ তৈয়ার করা। নবীজী (সঃ) তাঁহার ১২/১৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে সেই কর্তব্যের উদ্বোধন করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ ঐ কোবা পল্লীতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে তৈয়ার হয়। মুসলমান সর্ব সাধারণের জন্য এবং আনুষ্ঠানিক মসজিদরূপে পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত মসজিদ সর্বপ্রথম এই মসজিদে কোবা-ই ছিল। ইহার পূর্বে ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট নামাযের স্থানরূপে বা গোত্রীয় সমাজের নামাযের জন্য অতি সমান্য ঘেরাওয়ের রক্ষণায় নির্দিষ্ট নামাযের স্থান আরও তৈয়ার হইয়াছিল, কিন্ত আনুষ্ঠানিকরূপে পূর্ণাঙ্গ জামে মসজিদ এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম কোবা পল্লীর এই জামে মসজিদই। উক্ত মসজিদের গৌরব পবিত্র কোরআনেও নিম্নরূপ উল্লেখা আছে–

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ـ

অর্থ ঃ "যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেজগারী– আল্লাহ অনুরক্তির উপর প্রথম দিন হইতে উহার সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয়। ঐ মসজিদের পল্লীবাসীরা (উত্তম লোক। তাহারা) পাক-পবিত্রতা ভালবাসিয়া থাকে। (পারা–১১, রুকু–২)

অনেকের মতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোবায় পদার্পণের প্রথম দিনেই এই মসজিদের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। (বেদায়া– ৩–২০৯)

কোবা মসজিদের ফযীলত

কোরআন শরীফে এই মসজিদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করিয়াছেন– এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহর তাক্‌ওয়া তথা পরহেজগারী ও আল্লাহ অনুরক্তির উপর। এই পল্লী হইতে চলিয়া যাওয়ার

পরও নবী (সঃ) এই মসজিদে আসিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রথম খণ্ড ৬৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে– নবী (সঃ) প্রতি শনিবার এই কোবা পল্লীর মসজিদে সুযোগ হইলে বাহনে নতুবা পদব্রজে আসিতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়িতেন।

হাদীছে আছে– এই মসজিদে নামায পড়িলে ওমরা আদায় করার সওয়াব লাভ হয়। (যোরকানী, ১–৩৫১)

কোবা হইতে মদীনার শহর পানে প্রস্থান

বার বা চৌদ্দ দিন কোবা পল্লীতে অবস্থানের পর শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার দাদার মাতৃকুল নাজ্জার বংশের লোকদিগকে তাঁহার মদীনা নগরীতে যাত্রার সঙ্কল্পের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন।

দীর্ঘ দুই সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে! এখন নবীজীর (সঃ) আগমন সংবাদ পাইয়া নগরবাসীগণের আনন্দোল্লাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর সীমা থাকিল না। তৎকালীন আরবীয় বীর জাতির প্রথানুসারে তাঁহারা সকলে তরবারি ঝুলাইয়া ফৌজী কায়দায় নবীজী (সঃ)-কে রাজকীয় অভ্যর্থনার সহিত নিয়া আসিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। নগরের মুসলমানদের মধ্যে এই শুভ সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা সকলে আনন্দে উল্লাসে মাতিয়া উঠিল।

শুক্রবার দিনের দীর্ঘ অংশ অতিক্রমের পর নবীজী (সঃ) কোবা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বনী সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছিতেই জুমার নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। নবীজী (সঃ) তাঁহার একশত জন সঙ্গীসহ ঐ গোত্রের নির্দিষ্ট নামাযের স্থানে জুমার নামায আদায় করিলেন। নবীজীর (সঃ) জন্য ইহা সর্বপ্রথম জুমা ছিল।

নবীজী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম জুমার খোতবা

উক্ত জুমায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোতবার মর্ম নিম্নরূপ ছিল–

সমস্ত মহিমা-গরিমা একমাত্র আল্লাহর জন্য; আমি তাঁহার মহিমা গাহি ও প্রচার করি। আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং (কর্তব্য পালনে ত্রুটির জন্য) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সৎ পথ লাভ তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করি। তাঁহার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি। তাঁহাকে অমান্য করিব না। তাঁহাকে অমান্য করে এমন ব্যক্তিকে কখনও মিত্র বানাইব না। আমি এই সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তিনি এক, তাঁহার অংশীদার কেহ নাই এবং এই সাক্ষ্যও ঘোষণা করিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রসূল। যখন দীর্ঘকাল যাবত বিশ্ব রসূল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে– যখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে সত্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যখন মানব জাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে ডুবিয়া গিয়াছে, যখন বিশ্বের আয়ু শেষ প্রায় এবং কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সমাগত, কর্মফল ভোগের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী– এহেন সময় আল্লাহ তাঁহার রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে সত্যের জ্যোতি, জ্ঞানের আলো, সদুপদেশের আকর সঠিক ও বাস্তবমুখী ধর্ম দিয়া জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের অনুগত হইয়া চলিলেই মানব জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের অনুগত হইয়া না চলিলে পদস্খলন, অপরাধ প্রবণতা এবং সুদূরপ্রসারী ভ্রষ্টতা অবধারিত।

হে জনমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ– তামরা তাক্‌ওয়া পরহেজগারী– আল্লাহ অনুরক্তি ও আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর (অর্থাৎ বিবেকের ঐ চরম উৎকর্ষতা লাভ কর যে, কুভাব-কুচিন্তা ও অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তিই হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়– ঐসব কদর্যের প্রতি এমন ঘৃণা জন্মে যে, তাহা স্বতই বিষবৎ পরিত্যজ্য বোধ হয়)।

পরকালের চিন্তা ও আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বনের উপদেশ– এক মুসলিম অপর মুসলিমকে দিবার মত

উৎকৃষ্টতর উপদেশ ইহাই। যেসব দুষ্কর্মে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁহার আযাবের ভয় দেখাইয়াছেন- সাবধান! তাহার নিকটেও যাইও না; ইহা আপেক্ষা উত্তম সদুপদেশ আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা উত্তম সতর্কবাণী আর কিছু হইতে পারে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয় করিয়া আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা- যাহাকে "তাক্ওয়া" বলে; এই তাক্ওয়াই হইল মানুষের জন্য পরকালের সাফল্য লাভে প্রকৃত সাহায্যকারী।

আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক এবং যে কর্তব্য রহিয়াছে- যেব্যক্তি সেই সম্পর্ক ও কর্তব্যকে ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-গোপনে ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত করিতে সচেষ্ট থাকিবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে; ঐ ব্যক্তির এই প্রচেষ্টা তাহার জন্য ইহজীবনে অতি বড় সুনাম এবং পরজীবনে মহাসম্বল ও মহাসম্পদ হইবে- যখন মানুষের একমাত্র নির্ভরস্থল হইবে তাহার কৃত আমল। উল্লিখিত প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ দুনিয়ার বুকে যাহা কিছু করে, পরজীবনে সে শত আকাঙ্ক্ষা করিবে যেন হিসাব-নিকাশ হইতে অনেক অনেক দূরে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াময় ও কৃপাময়। আল্লাহর কথা সত্য, তাঁহার অঙ্গীকার সুরক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয়- সেই মহানই বলিয়াছেন, "আমার কথার রদবদল নাই, আমি বান্দাদের প্রতি আদৌ কোন অবিচার করিব না।"

ইহজীবন ও পরজীবন- উভয় জীবনের ব্যাপারে ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বতোভাবে আল্লাহর ভয়-ভক্তি সকলে অবলম্বন কর। যেব্যক্তি আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাসমূহ মুছিয়া ফেলিবেন এবং অতি বড় প্রতিদান তাহাকে দান করিবেন। যাহার ভিতরে আল্লাহর ভয়-ভক্তি থাকিবে সে চরম সাফল্য লাভ করিবে।

স্মরণ রাখিও, আল্লাহর ভয়-ভক্তি তাঁহার গজব হইতে রক্ষা করে, তাঁহার আযাব হইতে বাঁচায়, তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে হেফাযত করে। আরও আল্লাহর ভয়-ভক্তি চেহারা উজ্জ্বল করিবে, প্রভু-পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করিবে, মান-মর্যাদা ঊর্ধ্বে নিয়া যাইবে।

ইহজীবনের সুখ ভোগ কর, (কিন্তু ভোগের মোহে) আল্লাহর দাবী পূরণে শিথিল হইও না। আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার কিতাব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার (পর্যন্ত পৌঁছার) পথ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক আর কে মিথ্যাবাদী কপট, তাহাই আল্লাহ দেখিয়া নিবেন। সুতরাং আল্লাহ যেরূপ তোমাদের চরম উপকার করিয়াছেন তদ্রূপ তোমরাও নিজেদের উপকার কর- আল্লাহর শত্রুদের শত্রু গণ্য কর এবং তাঁহার (দ্বীনের) জন্য যথাযোগ্য জেহাদ কর। তিনি তোমাদিগকে (তাঁহার নিজের জন্য) নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তোমাদের নাম রাখিয়াছেন, মুসলিম- আত্মসমর্পনকারী।

(আল্লাহ তাআলা কিতাব ও পথের সন্ধান দানের সুব্যবস্থা এই উদ্দেশে করিয়াছেন-) যেন ধ্বংসের পথ অবলম্বনকারী সেই পথে ধ্বংস হয় সুস্পষ্টরূপে জানিয়া-বুঝিয়া লওয়ার পর। (ফলে তাহার কোন আপত্তির অবকাশ থাকিবে না।) এবং বাঁচিবার পথের সন্ধানী বাঁচিয়া যায় সুস্পষ্ট পথ পাইয়া। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন শক্তি নাই। অতএব সদা আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, আর পরজীবনের জন্য সম্বল করিয়া লও। আল্লাহর সহিত নিজ সম্পর্ক যে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লয়, মানুষের সঙ্গে তাহার সমুদয় সম্পর্কের জন্য আল্লাহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যান। কারণ, মানুষের উপর আল্লাহরই হুকুম চলে- আল্লাহর উপর মানুষের হুকুম চলে না। মানুষ আল্লাহর উপর প্রভুত্ব রাখে না- আল্লাহই মানুষের উপর প্রভুত্ব রাখেন। আল্লাহু আকবর- আল্লাহ সর্বমহান; সেই মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই।

-(ওয়াকেদী ২-১১৭, বেদায়া ৩)

জুমা শেষে নগরের দিকে যাত্রা

জুমার নামায শেষ করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবার নগর পানে যাত্রা করিলেন। নবী (সঃ) তাঁহারই বাহনের উপর পিছনে আবু বকর (রাঃ)-কে বসাইলেন এবং ধীরে ধীরে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর হইতে মক্কার নীরব আকাবা প্রান্তরে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তিন মাস পূর্বেও সেই আকাবার গভীর নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের আড়ালে গুপ্ত পরামর্শ করা হইয়াছিল যে, নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনায় আগমন করিবেন– আজ সেই পুণ্য প্রতিশ্রুতি সফল হইতে চলিয়াছে। মদীনার আনসার ও প্রবাসী মোহাজেরগণ বহু দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর নিজেদের আশাতীত সৌভাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন।

মুসলিম মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবীজীর প্রাঢালা অভ্যর্থনার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। বনু নাজ্জার বংশের সশস্ত্র লোকগণ নবীজীর কাসওয়া উষ্ট্রীর অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন রাজকীয় শান প্রদর্শনে। স্থানে স্থানে খঞ্জর ও বর্শা চালাইয়া যুদ্ধ মহড়া প্রদর্শনীর ধুম চলিয়াছে। সমগ্র নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গেল উৎসুক দর্শকদের ভিড়ে। এমনকি (তখন শরীয়তে পর্দার হুকুম ফরয হইয়াছিল না, তাই) অভিজাত মহিলারা পর্যন্ত নিজ নিজ গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অনন্ত আবেগে তাকাইয়া ছিল নবীজীর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায়। সকলের অন্তরে আন্দ হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল নবীজীর আগমন আশায়। কী আনন্দ! কী আগ্রহ সকলের মনে! নর-নারী, ছোট-বড় সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দের আভা। বালক-বালিকাদের বিরামহীন ছুটাছুটি চলিয়াছে সড়কে সড়কে, গলিতে গলিতে। তাহারা দফ্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে সর্বত্র আনন্দ ধ্বনি দিতে লাগিল আল্লাহু আকবার, জাআ-মুহাম্মদ । মুহাম্মদের শুভাগমন– ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। আল্লাহু আকবার, জাআ রসূলুল্লাহ! –আল্লাহর রসূলের শুভাগমন।

সকলের অন্তরে আজ নব কৌতূহল, চেহারায় তাঁহাদের আনন্দোচ্ছাস, সম্মুখে তাঁহাদের কত কত রঙ্গীন স্বপ্ন; এই অতুলনীয় আনন্দ-উৎসবের মাঝে মহামানব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বহন করিয়া তাঁহার কাসওয়া উষ্ট্রী ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মদীনার বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রায় পাঁচ শত গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ আগাইয়া আসিলেন নবীজী (সঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য। শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ـ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ـ مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا ـ جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

"মোদের পরে পূর্ণ চাঁদের হয়েছে উদয়
সানিয়াতুল-অদা* পথে দেখ্‌বি যদি আয়।
শোকর করব মোরা সদা সর্বজনে
ডাকবে যাবত ধরা পৃষ্ঠে কেহ আল্লাহ পানে*
মহান তুমি আস্‌ছ ধরায় মোদের শান্তি নিয়ে
বরণ করব তোমায় মোরা প্রাণ ঢেলে দিয়ে।
(যোরকানী, ১–৩৫৯, বেদায়া ৩–১৯৭)

* মদীনা নগরে প্রবেশ প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ পর্বতমালার একটি বিশেষ স্থান।

* অর্থাৎ যাবত আল্লাহর নাম তথা জগতের অস্তিত্ব থাকিবে।

মদীনা নগরে নবীজী (সঃ)

মদীনার রাজপথে নবীজীর বাহন চলিতেছে। কত মনের কত আকাঙ্ক্ষা! নবীজী (সঃ) আমাদের গৃহে অবতরণ করিবেন! প্রত্যেক গৃহ হইতে নবীজী (সঃ)-কে সাদর আহ্বান জানানো হইতেছিল। নবীজীর (সঃ) অন্তরে এই ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতামহের মাতুল বনু নাজ্জার গোত্রের কোন গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মান বর্ধিত করিবেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার মনোভাব মুখেও প্রকাশ করিয়াছেন–

اَنْزِلُ عَلٰى بَنِى النَّجَّارِ اَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُكْرِمُهُمْ بِذٰلِكَ ـ

অর্থ ঃ "পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করিব; এতদ্দারা আমি তাঁহাদের সম্মান বর্ধিত করিব।" (মুসলিম শরীফ) কিন্তু বনু নাজ্জার গোত্রের লোকও ত অনেক। প্রত্যেকেই নবীজী (সঃ)-কে প্রাণঢালা সাদর অভিবাদন জানাইতেছিলেন। নবীজী (সঃ) সকলের সহিত সমব্যবহার প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহার অবতরণের ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। নবীজী (সঃ) সকলকে একই উত্তর দিতেছিলেন– "আমার উষ্ট্রীকে তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও, সে আল্লাহর আদেশে চলিবে, আল্লাহর আদেশে বসিবে; আল্লাহ আমাকে যথায় অবতরণ করাইবেন আমি তথায়ই অবতরণ করিব। নবীজী (সঃ) সবাইকে এই উত্তর দিতে লাগিলেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম শিথিল করিয়া দিলেন। উষ্ট্রী ধীরে ধীরে চলিয়া নাজ্জার গোত্রীয় আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া বসিয়া পড়িল।

নবীজী (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজন (বনু নাজ্জার গোত্রের) কাহার গৃহ অধিক নিকটবর্তী? আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সর্বাধিক নিকটবতী আমার গৃহ এই আমার গৃহদ্বার। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গৃহে যাইয়া আমাদের জন্য আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া আস। তৎক্ষণাত আবু আইউব (রাঃ) গৃহে গেলেন এবং সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাদের আরামের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছি। আপনি ও আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর বরকত ও মঙ্গলময়, আপনারা উভয়ে তশরীফ নিয়া চলুন। তাঁহারা সেই গৃহে তশরীফ নিয়া গেলেন। (বেদায়া ৩–২০০)

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এবং তাঁহার সহিত নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যিনি পূর্বেই হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন– উভয়ে নবীজীর (সঃ) আসবাবপত্র উঠাইয়া গৃহে নিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১–৩৫৭)

বনু নাজ্জার বংশীয় কতিপয় বালিকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দফ্ বাজাইয়া আনন্দ গীত বা তারানা গাহিতে লাগিল–

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ ـ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارٍ ـ.

"বনু নাজ্জার দুলালী মোরা আনন্দ মোদের চরম।
মুহাম্মদ মোদের পড়শী হলেন ভাগ্য মোদের পরম।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)

নবীজী (সঃ) তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে ভালবাস? তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কসম খোদার নিশ্চয় ইয়া রসূল্লাল্লাহ! নবীজী (সঃ) তাহাদের একবার উক্তির উত্তরে তিন বার বলিলেন, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসিব– আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমার অন্তর তোমাদেরে ভালবাসে (বেদায়া ৩–৩০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ছিল–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ـ

অর্থঃ "আমার উম্মতে শামিল নহে ঐরূপ ব্যক্তি যে ছোটদেরকে স্নেহ-মমতা ও আদর না করে এবং বড়দিগকে সম্মান না করে। (মেশকাত শরীফ, ৪২৩)

আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) গৃহে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের পিছনে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই –

ঐতিহাসিকদের অগ্রগণ্য মত হিসাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বেকার ঘটনা– তখন ইয়ামানের বাদশাহদের পদবী ছিল "তুব্বা", যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সেই "তুব্বা" পদবীর এক বাদশাহ– যিনি অতিশয় নেক ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি কোন এক ভ্রমণে মদীনার এলাকায় পৌঁছিলেন; ঐ এলাকা তখন অনাবাদী। সঙ্গী আলেমগণ, যাঁহারা আসমানী কিতাবের খাঁটি এলম রাখিতেন, তাঁহাদের মারফত তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই এলাকায়ই সর্বশেষ পয়গম্বর "মুহাম্মদ" (সঃ) নামীয় রসূলের হিজরতের স্থান হইবে।

বাদশাহ এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাত হইতে পারিয়া ঐ অঞ্চলে আলেমদের একটি দলের বসতি স্থাপন করিয়া তাহা আবাদ করিলেন এবং অখেরী যমানার পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ)-কে লক্ষ্য কলিয়া একখানা লিপিও লিখিলেন, যাহার মধ্যে তিনি হযরতের প্রতি স্বীয় ঈমান বিশ্বাস প্রকাশ করতঃ আখেরাতে তাঁহার শাফাআ'ত কামনা করিয়াছেন। পত্রখানা তথায় বসবাসকারী একজন আলেমের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহা স্বয়ং বা তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের পরম্পরা আখেরী যমানার পয়গম্বরের নিকট পৌঁছাইবার অসিয়ত করিয়াছিলেন।

সেই "তুব্বা" বাদশাহ হযরতের উদ্দেশে তথায় একটি বাড়ীও তৈয়ার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী সেই "তুব্বা" বাদশাহ কর্তৃক তৈয়ারী বাড়ীর স্থানেই অবস্থিত। এমনকি সেই বাদশাহর উল্লিখিত লিপিখানাও হযরতের হস্তে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। এক হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা "তুব্বা-কে মন্দ বলিও না; সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (তফসীর রুহুল মাআ'নী, ২৫–১২৭)

কোবা পল্লী সম্পর্কীয় ঘটনাবলী বর্ণনায় একটি হাদীছ

১৭০৯। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে বাহির হইবার পরেই সারা মদীনায় খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনাপানে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। সেমতে মদীনার মুসলমানগণ প্রতিদিন ভোর হইতেই মদীনার বাহিরে আসিয়া হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিতেন, এমনকি রৌদ্রের উত্তাপে প্রস্থানে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করিতেন।

একদিন তাঁহারা ঐরূপ অপেক্ষা করতঃ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি উঁচু টিলার উপর কোন আবশ্যকবশতঃ দাঁড়াইলে সে দূর হইতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে সাদা পোশাকে দেখিতে পাইল! ইহুদী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখা মাত্র অধীর হইয়া উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল– হে আরব বংশধরগণ! তোমাদের অদৃষ্টের শুভ চন্দ্র উদিত হইয়াছে– যাহার অপেক্ষা তোমরা করিতেছিলে। এই সংবাদ শুনামাত্র মুসলমানগণ ফৌজী কায়দায় সুসজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চলিল এবং মদীনার শহর প্রান্তের কাঁকরময় ময়দানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করিল।

হযরত (সঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া (মূল মদীনা শহরে আসিলেন না, বরং) ডান দিকের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া বনী আম্‌র ইবনে আওফ গোত্রের বস্তিতে অবতরণ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার

ছিল। সাক্ষাতকারী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইলেন; রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মদীনাবাসী যাঁহারা পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেন নাই তাঁহারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতপর যখন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীরে রৌদ্র আসিবার দরুন আবু বকর (রাঃ) আগাইয়া আসিয়া স্বীয় চাদরের সাহায্যে হযরতের উপর ছায়া দানের ব্যবস্থা করিলেন তখন সকলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামকে চিনিতে পারিলেন।

ঐ বস্তিতে হযরত (সঃ) দশ দিনের অধিক অবস্থান করিলেন এবং তথায় একটি মসজিদ তৈয়ার করিলেন। * সেই মসজিদটির প্রশংসাই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে যে, "এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ ভয়-ভক্তির উপর।" হযরত (সঃ) তথায় সেই মসজিদেই নামায পড়িয়া থাকিতেন। তারপর হযরত (সঃ) মূল মদীনায় পৌঁছিবার জন্য স্বীয় বাহনে আরোহণ করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্যান্য লোকগণ হযরতের (সঃ) পিছনে চলিতে লাগিলেন। হযরতের বাহন ঠিক ঐ স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল যে স্থানে বর্তমানে রসূলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মসজিদ অবস্থিত। তথায় হযরতের পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায পড়িয়া থাকিতেন এবং ঐ স্থানটি বস্তুত মদীনাবাসী দুই এতীম ছেলের মালিকানায় ছিল, ঐ স্থানে খেজুর শুকান হইত। হযরত (সঃ) ঐ স্থানটি তাহার মালিক ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা বিক্রি করিব না, বরং ইহা আপনাকে বিনা মূল্যে হেবা করিয়া দিব (একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই ইহার বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখিব)। কিন্তু হযরত (সঃ) বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না, অবশেষে হযরত (সঃ) মালিকদ্বয়ের নিকট হইতে তাহা খরিদ করিয়া লইলেন, তারপর তথায় মসজিদ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলেন। মসজিদ তৈয়ারকালে ইট-পাথর বহন করিয়া আনার কার্যে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও শরীক হইয়াছেন এবং তিনি সেই ইটের বোঝা বহনকালে দুইটি বয়েত পড়িতেছিলেন–

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ ـ هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ

"এই বোঝা জাগতিক ধন-দৌলতের বোঝা নহে; হে পরওয়ারদেগার! আমি বিশ্বাস করি, এই বোঝা দুনিয়ার ধন-দৌলতের বোঝা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান, অনেক পবিত্র।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةْ ـ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ ـ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের প্রতিদান-পুরস্কারই আসল, অতএব আনসার ও মোহাজেরগণের প্রতি দয়া করুন– (তাহাদিগকে সেই পুরস্কার প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করুন)।"

১৭১০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনার দিকে আসিতেছিলেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে ছিলেন। তিনি (বয়সে ছোট বটে, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে হযরত (সঃ) অপেক্ষা অধিক) বৃদ্ধ দেখাইতেন এবং তিনি বাহিরাঞ্চলের লোকদের নিকট পরিচিত ছিলেন (যেহেতু তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরিতেন)। পক্ষান্তরে হযরত (সঃ) বয়সে বড় হইয়াও বাহ্যিক আকৃতিতে আবু বকর অপেক্ষা অধিক) বলিষ্ঠ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণত লোকেরা চিনিত না। পথিমধ্যে লোকদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট হযরতের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত তিনি কে? তখন আবু বকর (শত্রুর ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনে) বলিতেন, এই লোক আমাকে পথ দেখাইয়া থাকেন। জিজ্ঞাসাকারী ইহার অর্থ "সাধারণ জাগতিক পথ" গণ্য করিত; আর আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ করিতেন। এইভাবে আবু বকর (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে সত্যবাদী থাকিয়া মূল বিষয় গোপন রাখিতেন।

---

* সেই বস্তিটির নামই 'কোবা' তথায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক সময় আবু বকর (রাঃ) পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া তাঁহাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতেছে। তখন আবু বকর (রাঃ) আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ দেখুন এক অশ্বারোহী ঘাতক শত্রু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতেছে। তখন হযরত পিছনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم اصرعه ইয়া আল্লাহ! এই মানুষটাকে পাছড়াইয়া ফেলুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি (আবদ্ধরূপে) দাঁড়াইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐ লোকটি বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। (আমাকে রক্ষা করুন)। হযরত (সঃ) তাহাকে বলিলেন, সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইও না এবং আমাদের পিছনে যে কাহাকেও আসিতে দেখিবে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। (সে ব্যক্তি তাহাই করিল– কাহাকেও হযরতের তালাশে আসিতে দেখিলে সে বলিত, এই দিকে যাইতে হইবে না, আমি সব দেখিয়া আসিয়াছি।)

আবু বকর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কুদরত! যেব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শত্রু বা ভক্ষক ছিল, সে-ই দিনের শেষভাগে তাঁহার মিত্র ও রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল।

মদীনায় পৌঁছিয়া হযরত (সঃ) মূল শহরে আসিলেন না, বরং শহরের কিনারায় (কোবা নামক মহল্লায়) অবস্থান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করার পর হযরতের (সঃ) মদীনা শহরে অবস্থান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করার পর হযরত (সঃ) মদীনা শহরে অবস্থানকারী আনসারগণকে একদিন সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম আরজ করিয়া নিবেদন জানাইলেন আপনারা উভয়ে এখনই যানবাহনে আরোহণ করিয়া মদীনা শহরে চলুন; আমরা আপনাদের চির খাদেমরূপে আজ্ঞাবহ থাকিব। হযরত নবী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) বাহনে আরোহণ করিলেন। মদীনাবাসী আনসারগণ ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যস্থলে বেষ্টিতরূপে রাজকীয় শান-শওকতের সহিত মদীনায় নিয়া আসিলেন!

হযরত (সঃ) মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদীনা উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল– বাড়ী ঘরের ছাদ এবং উঁচু উঁচু টিলাসমূহের উপর হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভাগমন ধ্বনি গর্জিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপ স্বতস্ফূর্ত উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়া হযরত (সঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীর নিকটে আসিয়া অবতরণ করিলেন।

নবী (সঃ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজনের মধ্য হইতে কাহার বাড়ী নিকটবর্তী আছে? আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি উপস্থিত আছি; আমার বাড়ীই সর্বাধিক নিকটবর্তী– এই আমার ঘর এবং এই আমার বাড়ীর গেট। হযরত (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা– বাড়ী যাও এবং আমার জন্য আরাম করার ব্যবস্থা কর। আবু আইউব (রাঃ) (তাহা করিলেন এবং) বলিলেন, আপনারা উভয়ে [হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)] আমার বাড়ী তশরীফ নিয়া চলুন। আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করিবেন। সেমতে হযরত নবী (সঃ) আবু আইউবের গৃহে তশরীফ আনিলেন।

১৭১১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৯) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনা অঞ্চলে পৌঁছিলেন তখন প্রথম অবস্থায় তিনি মদীনার মূল শহরে আসেন না বরং তিনি মদীনার ঊর্ধ্ব প্রান্তে অবস্থিত বনু আম'র ইবনে আওফ গোত্রের (কোবা নামক) মহল্লায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় হযরত (সঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিলেন, অতপর (মদীনার সুপ্রসিদ্ধ গোত্র হযরতের দাদার মাতুল বংশ) বনু নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকগণকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা (হযরতের মনোবল দৃঢ় করার উদ্দেশে শান-শওকতের সহিত) ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সমভিব্যবহারে উটের উপর সওয়ার হইয়া মদীনা শহর পানে যাত্রা করিলেন। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকগণ হযরত (সঃ)-কে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া

রাখিয়াছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, সেই স্মৃতি এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

এইভাবে বিশেষ শান-শওকতের সহিত হযরত (সঃ) মদীনা শহরে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার বাহনটি আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (সঃ) (শহরে তথায় অবস্থান করিলেন এবং তিনি) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে যথায় থাকিতেন তথায় নামায আদায় করিয়া লইতেন। এমনকি বকরী রাখার ঘরেও তিনি আবশ্যকবোধে নামায পড়িয়া থাকিতেন (তখন মসজিদের কোন ব্যবস্থা ছিল না)। অতপর হযরত (সঃ) মসজিদ তৈয়ারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং (বর্তমান মসজিদে-নববীর স্থানটি ঐ সময় খেজুর বাগান ছিল, তাহা সম্পর্কে কথা-বার্তা চালাইবার উদ্দেশে) বনু নাজ্জার গোত্রের প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই বাগানটির মূল্য কি চাও তাহা আমাকে বল। তাহারা বলিল, খোদার কসম আমরা মূল্য চাহি না, ইহার মূল্য আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট হইতে চাহি।

সেই বাগানটিতে ছিল কতিপয় মুসলিমের পুরাতন কবর এবং পুরান ঘর-বাড়ীর ভগ্নস্তূপ ও খেজুর বৃক্ষ। হযরত (সঃ) কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন ভগ্নস্তূপগুলি সমান করিয়া ফেলিতে এবং খেজুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে মসজিদের কেবলার দিকে সারিবদ্ধাকারে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরজার উভয় চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইয়াছিল। সেই পাথর (এবং ইট ইত্যাদি) উঠাইয়া আনিবার সময় ছাহাবীগণ তারানা গাহিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের তারানা এই–

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلاَّ خَيْرَ الْاٰخِرَةْ ـ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ ـ

"হে আল্লাহ! পরকালের উন্নতিই একমাত্র উন্নতি, অতএব আনসার ও মোহাজের জামাতকে সেই পথে সাহায্য করুন।"

আবু আইউব (রাঃ)-এর গৃহে নবীজী (সঃ)

আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহ ছিল দ্বিতল। তিনি নবীজী (সঃ)-কে উপর তলায় অবস্থানের অনুরোধ করিলেন। আরজ করিলেন হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গীত; আপনার চরণ আমাদের মাথার উপর থাকিবে ইহাই অবধারিত। আমার পক্ষে সম্ভব নহে, আমি আপনার উপরে অবস্থান করিব। অতএব আমরা নীচের তলায় আসিয়া যাই, আপনি উপর তলায় তশরীফ নিয়া যাইবেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আবু আইউব! আমার এবং আমার সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য সুবিধাজনক ইহাই যে, আমি নীচের তলায় থাকি। অগত্যা তাহাই হইল। আবু আইউব পরিবার উপর তলায় এবং নবীজী মোস্তফা (সঃ) নীচের তলায় থাকিলেন।

রাত্রিবেলা উপর তলার একটি পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া পানি ছড়াইয়া পড়িল। আবু আইউব (রাঃ) ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নীচের তলায় পানি পড়িলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কষ্ট হইবে, তাই নিজেদের যে একমাত্র লেফ ছিল উহা সম্পূর্ণ ভিজাইয়া পানি মুছিয়া নিলেন।

এতদ্ভিন্ন আবু আইউব (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী এই ভাবিয়া ভীত থাকিলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপরে আছি, আমরা তাঁহার উপরে চলাফেরা করি! এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের এক কিনারায় সারা রাত্র বসিয়া থাকিলেন। ভোর বেলা নবীজী (সঃ)-কে সকল তথ্য অবগত করিয়া তাঁহাকে উপর তলায় যাইবার অনুরোধ করিলেন। নবী (সঃ) পূর্বের ন্যায় এইবারও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু আবু আইউব (রাঃ) উপরে থাকিতে কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নবী (সঃ) উপর তলায় তশরীফ নিলেন, আবু আইউব পরিবার নীচের তলায় অবস্থান করিল।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহার্য তৈয়ার করিয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত করিলাম। নবী (সঃ) তাহা হইতে গ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাইতেন। আমরা লক্ষ্য করিতাম পাত্রস্থ খাদ্যের কোন্ স্থানে নবীজীর আঙ্গুলের চিহ্ন দেখা যায়? আমি এবং আমার স্ত্রী ঐ বরকতপূর্ণ স্থান তালাশ করিয়া তথা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতাম। একদা আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হইলাম যে, পাত্রস্থ খাদ্যের কোন স্থানেই নবীজীর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায় না; মনে হয় নবীজী (সঃ) পাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি অতিশয় ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হইয়া খাদ্য গ্রহণ না করার হেতু জানিতে দরখাস্ত করিলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, এই খাদ্যে পেয়াজের গন্ধ ছিল। তাই আমি খাই নাই। কারণ আমাকে ফেরেশতার সঙ্গে আলাপ করিতে হয়; বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধেও ফেরেশতাগণের কষ্ট হয়। তোমরা ঐ খাদ্য খাইয়া নাও। অতপর নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাদ্যে আর কোন সময় পেয়াজ রসুন দেওয়া হইত না। (যোরকানী, ১-৩৫৮)

পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে মাসআলা ইহাই যে, যে সময় বা যেস্থানে ফেরেশতাগণের আনাগোনা থাকে বা লোকদের সহিত মেলামেশা হয়; ঐরূপ সময় ও ক্ষেত্রে পেয়াজ-রসুনের দুর্গন্ধ মুখে রাখিয়া উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। সেমতে পেয়াজ-রসুন খাইয়া মসজিদে বা নামাযে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি পেয়াজ-রসুন পূর্ণ পক্ব হয় যাহাতে দুর্গন্ধের লেশমাত্র নাই, তবে স্বতন্ত্র কথা।

আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে নবীজী (সঃ) অবস্থানকালে অন্যান্য ছাহাবীগণ নবীজীর জন্য খাদ্যসামগ্রী হাদিয়া দিয়া থাকিতেন। মদীনাবাসী যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ঐ সময় সর্বপ্রথম আমি হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটি পাত্রে দুধ ও মাখনে খণ্ড-বিখণ্ড রুটি ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাকে "ছরীদ" বলা হয়। আমি ঐ খাদ্যের পাত্র লইয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া আরজ করিয়াছিলাম, আমার মাতা এই খাদ্য হাদিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (সঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত মঙ্গল ও উন্নতি দান করুন।" অতপর উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া একত্রে ঐ খাদ্য খাইয়াছিলেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরে যাঁহার হাদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তিনি হইলেন সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)। তিনি গোশ্তের সুরুয়ায় ভিজানো রুটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতি দিনই বিভিন্ন ছাহাবীগণের খাদ্য হাদিয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উস্থিত হইয়া থাকিত। প্রত্যেক রাত্রেই দেখা যাইত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বারে তিন-চারি জন ছাহাবী খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। (বেদায়া, ৩-২০২)

নবীজীর (সঃ) পদার্পণে মদীনা

মদীনা নগরীর পূর্ব নাম ছিল "ইয়াসরেব"। নবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহার নাম "মদীনা" হইবে (দ্বিতীয় খণ্ড ৯৫৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। "মদীনা" অর্থ নগরী বা শহর। সেমতে নবীজীর আগমনের পরে সাধারণভাবে ইহাকে "মদীনাতুন নবী" বলা হইত; অর্থাৎ নবীর শহর। অতপর সংক্ষেপে শুধু "মদীনা" শব্দই থাকিয়া যায়। তাহার সহিত একটি গুণবাচক শব্দ মিলাইয়া বলা হয় "মদীনা মোনাওয়ারা" অর্থাৎ নূরে পরিপূর্ণ নগরী। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণে এই নগরীর প্রকৃত অবস্থার ইঙ্গিত তাহার আর একটি নামের দ্বারা পাওয়া যায়; সেই নামটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্থির করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে আছে- জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি ان الله سمى المدينة طابة নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম 'তাবাহ' রাখিয়াছেন।

'তাবাহ' অর্থেই বিভিন্ন হাদীছে ইহার নাম 'তায়বাহ'ও উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দের সহিত এই নগরীকে "মদীনা তায়্যেবা"ও বলা হয়।

"তাবা, তায়বা ও তাইয়্যেবা" শব্দত্রয়ের এক অর্থ 'উৎকৃষ্ট', ভূপৃষ্ঠে মদীনা সত্যই সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড। এমনকি অনেকের মতে নবীজীর আগমনে মদীনা মক্কা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত শব্দত্রয়ের আর এক অর্থ পাক-পবিত্র মদীনার ভূখণ্ডে মহা পবিত্রাত্মা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণে মদীনা এমন পবিত্র হইয়াছিল যে, ইহুদী মোনাফেকদের ন্যায় অপবিত্রদের তথায় সাময়িক অবস্থান সত্ত্বেও তাহা আল্লাহ তাআলার নিকট পবিত্র গণ্য হইতেছিল। এমনকি অপবিত্রদেরকে বাহির করিয়া দেওয়ার বৈশিষ্ট্য মদীনার ভূমিতে আল্লাহ তাআলা প্রদান করেন, যাহার বিকাশ সাধারণভাবে সময় সময় ক্ষেত্রবিশেষে ত হইয়াছেই; কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মদীনার এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে। এই তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৫ নং হাদীছে রহিয়াছে।

মদীনার সওগাত

আল্লাহ তাআলার রহমতে বিগত ১৯৬১ ইং সনে পবিত্র হজ্জের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং ইসলাম ও ঈমানের প্রাণকেন্দ্র, মাহবুবে খোদার পবিত্র শহর সোনার মদীনায় হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে পবিত্র মদীনাকে স্মরণ করিয়া এবং তাজদারে মদীনা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে দরূদ ও সালাম পেশ করিয়া একটি আরবী কাসীদাহ পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বোখারী শরীফ চতুর্থ খণ্ড অনুবাদ লেখা হইতেছিল। পাঠকদের উপভোগের জন্য উক্ত কাসীদা "মদীনার সওগাত" নামে পেশ করিলাম।

أُحِبُّ الْأَرْضَ تَسْكُنُهَا سُلَيْمٰى - وَيَاتِيْهَا فُؤَادِيْ يُسْتَطَارُ

প্রিয় পাত্রের দেশ আমার নিকট বড়ই আদরণীয়, আমার অন্তর সেখানে উপস্থিত হইতে উড়িয়া আসে।

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ - وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ حَوَتِ الدِّيَارُ

তথাকার দালান-কোঠা ইমারত ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু তথায় যিনি বসবাস করিতেন তাঁহার মহব্বতই আমাকে আকৃষ্ট করে।

نَعَمْ حُبُّ الدِّيَارِ أَرْضٍ - بِهَا الْمَحْبُوْبُ فِيْ قَلْبِيْ يَفُوْرُ

হাঁ হাঁ, যেই দেশ প্রাণাধিক প্রিয় পাত্রের দেশ, সেই দেশের প্রতিটি ঘর-দুয়ারের প্রতি মহব্বতও নিশ্চয় আমার অন্তরে উথলিয়া উঠে।

مَدِيْنَةُ طَيْبَةٍ نَفْسِيْ فِدَاهَا - بِهَا اٰثَارُ مَحْبُوْبٍ تُزَارُ

আমার জান-প্রাণ মদীনা তাইয়্যেবার উপর উৎসর্গ; সেখানে মাহবুবে খোদার বহু নিদর্শনের জেয়ারত লাভ হয়।

وَتُرْبَةُ طَيْبَةَ كُحْلٌ لِعَيْنِيْ - وَاَطْيَبُ لَايُضَاهِيْهَا الْعَبِيْرُ

মদীনা তাইয়্যেবার মাটি আমার চক্ষের সুরমা এবং আমার জন্য এরূপ সুগন্ধি যাহার মোকাবিলায় মেশ্‌ক-আম্বরও অতি তুচ্ছ।

وَتُرْبَتُهَا عَلٰى رَاْسِيْ وَعَيْنِيْ - وَلِيْ فِيْهَا السَّعَادَةُ وَالسُّرُوْرُ

উহার মাটি আমার মাথার উপর ও চোখের উপর রাখি, উহার স্পর্শে আমার সৌভাগ্য ও শান্তি নিহিত রহিয়াছে।

بِهَا دَارُ الْحَبِيْبِ حَبِيْبِ رَبِّىْ ـ وَاَنْوَارٌ لَهَا دَوْمًا ظُهُوْرُ

তথায় মাহবুবে খোদার আবাসিক ঘর-বাড়ী রহিয়াছে এবং সর্বদা তথায় নূরই নূর প্রকাশ পাইতেছে।

وَقُبَّةُ رَوْضَةٍ خَضْرَاءُ تَزْهُوْ ـ عَلٰى شَمْسٍ وَّبَدْرٍ يَّسْتَنِيْرُ

তথায় আরও আছে মাহবুবে খোদার রওজা পাকের "সবুজ গম্বুজ", যাহার নূরানী উৎকর্ষ চন্দ্র-সূর্য হইতেও অধিক।

وَرَوْضَةُ جَنَّةٍ فِىْ دَارِ دُنْيَا ـ تَعَالَوْا فَاقْبَلُوْا بُشْرٰى وَّزُوْرُوْا

তথায় আরও আছে ভূপৃষ্ঠে বেহেশতের বাগান। সকলে আসুন এবং তথায় প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ করত তাহা স্বচক্ষে জেয়ারত করুন।

تَعَالَوْا فَادْخُلُوْهَا بِالسَّلَامِ ـ سُرُوْرٌ وَابْتِهَاجٌ وَالْحُبُوْرُ

সকলে আসুন এবং সেই বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করুন। তথায় আনন্দই আনন্দ, শান্তিই শান্তি, সুখই সুখ।

تَعَالَوْا يَاعَصَاةُ يَاضِيَاعُ ـ فَبَابُ مُحَمَّدٍ مَلْجَى طَهُوْرٌ

হে পাপী গোনাহগারগণ! হে নরাধমগণ! আস–আস; হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বার ও দরবার তোমাদেরকে আশ্রয় দান এবং পরিচ্ছন্ন করিবে।

فَبَابُ مُحَمَّدٍ مَلْجَى لِجَانٍ ـ وَمَاْوٰى اِذْ تَرَاكَمَهُ الصَّغَارُ

তাঁহার দরজা গোনাহগারদের জন্য বিশেষ আশ্রয়স্থল এবং গোনাহগার যখন বিপদে বেষ্টিত হইয়া পড়ে তখন ঐ দরজা তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান।

وَبَابُ مُحَمَّدٍ مَاحِى الذُّنُوْبِ ـ وَلَوْ كَانَتْ تُعَادِلُهَا الْبُحُوْرُ

তাঁহার দরজায় উপস্থিত গোনাহসমূহ মুছিয়া দেয়, যদিও তাহা সমুদ্র পরিমাণ হয়।

وَمَنْ يَّاْتِىْ بِهٰذَا الْبَابِ يَوْمًا ـ سَيَغْفِرُ ذَنْبَهُ الرَّبُّ الْغَفُوْرُ

তাঁহার দরওয়াজায় যে ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, অচিরেই ক্ষমাশীল প্রভু আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

اَتَيْتُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِىْ ـ نَوَالَكَ مِنْ ذُنُوْبِىْ اَسْتَجِيْرُ

হে আল্লাহর রসূল! আপনার দরবারে আমি নরাধম হাযির হইয়াছি; আল্লাহর নিকট স্বীয় গোনাহের কুফল হইতে পানাহ চাহিতেছি, এ সম্পর্কে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি।

اَتَيْتُكَ تَائِبًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ـ رَجَاءً لِلشَّفَاعَةِ هَلْ تُجِيْرُ

খোদার দরবারে সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করতঃ শাফাআ'তের জন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি– আশা করি আপনি আশ্রয় দান করিবেন।

وَمَنْ لِىْ مِنْ هَلَاكِىْ يَوْمَ يَاْتِىْ ـ صَحَائِفُ سُوْءِ اَعْمَالِىْ تَطِيْرُ

কেয়ামতের দিন যখন আমার বদ-আমলের আমল নামা উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পৌঁছিবে তখন অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবার উসিলা আমার পক্ষে আর কে হইবে–

سِوَاكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ـ وَدُوْنَكَ يَاجَوَادُ يَابَشِيْرُ

আপনি ভিন্ন? আপনি সমস্ত গোনাহগারের পক্ষে শাফাআ'তকারী এবং দয়ার সাগর ও সুসংবাদ বহনকারী।

لَوَعْدُكَ بِالشَّفَاعَةِ حِرْزَ نَفْسِيْ ـ وَأَنَّكَ لَاتُخَيِّبُ مَن يَّزُوْرُ

আপনি স্বীয় উম্মতের শাফাআতের যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে রক্ষাকবচ। আপনারই ওয়াদা যে, আপনার (রওজা) জেয়ারতকারীকে কস্মিনকালেও বঞ্চিত করিবেন না।

عَلَيْكَ صَلٰوةُ رَبِّىْ وَالسَّلَامُ ـ دَوَامًا مَّايُقَلِّبُنَا الدُّهُوْرُ

যাবত এই বিশ্ব ভূমণ্ডলের যুগ চালু থাকিবে তাবত আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম চলিতে থাকিবে।

وَرَحْمَةُ رَبِّنَا الاَفُ اَلْفِ ـ عَلَيْكَ الدَّهْرَ يَابَدْرُ الْمُنِيْرُ

হে পূর্ণিমার চন্দ্র! বিশ্ব প্রভুর কোটি কোটি রহমত আপনার উপর চিরকাল বর্ষিত হইক–আমীন! আমীন!

নবীজী (সঃ)-এর আগমনে মদীনাবাসীদের উল্লাস

১৭১২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৮৮) মদীনাবাসী বিশিষ্ট ছাহাবী বরা-ইবনে আ'যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায়) আমাদের নিকট সর্বপ্রথম মোসআ'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার লোকদিগকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। অতপর বেলাল (রাঃ), সা'দ (রাঃ) এবং আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) আসিলেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ছাহাবীদের কুড়ি জনের একটি দল লইয়া পৌঁছিলেন। তারপর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পৌঁছিলেন।

ছাহাবী বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেন, আমি মদীনাবাসীগণকে কখনও কোন বস্তু দ্বারা ঐরূপ উল্লাসিত হইতে দেখি নাই যেরূপ উলসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনে। এমনকি কচি-কাঁচা মেয়েরাও উল্লাসের সহিত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভাগমন-ধ্বনি দিতেছিল।

হিজরতের গুরুত্ব

ইসলামে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, হিজরতের দ্বারাই ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্তি এবং শক্তির সূচনা হইয়াছে। হিজরতের পরেই মদীনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বভৌমত্ব বিশ্ব বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবই নহে শুধু, বরং বাস্তবায়িত হইয়াছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে এই হিজরতের গুরুত্ব অনেক বেশী; এমনকি এই মহান হিজরতকে মুসলমানদের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ইসলামী বৎসরের গণনা হিজরত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৎসর গণনার প্রয়োজন সাব্যস্ত করা হইলে হিজরী সনের আরম্ভ সম্পর্কে আলোচনা হইল। কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজী (সঃ)-এর জন্ম হইতে আরম্ভের, কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর (সঃ) মৃত্যু হইতে আরম্ভের। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে হিজরত হইতে আরম্ভ করাই সাব্যস্ত হয়। নবীজীর (সঃ) হিজরতের সূচনা ছিল আকাবা গিরি কান্তারে মদীনাবাসীদের

তৃতীয় বায়আ'ত বা দীক্ষা গ্রহণ– যাহা জিলহজ্জ মাসের মধ্য দিকে হইয়াছিল; ঐ ভাঙ্গা মাসের পরবর্তী মাসই ছিল "মহররম"। তাই মহররম মাস হইতে বৎসর আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। হিজরতকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামী বৎসর গণনার বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৭১৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৬০) عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوْا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ -

অর্থ ঃ ছাহাবী সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, সনের গণনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির সময় হইতে আরম্ভ করা হয় নাই এবং তাঁহার মৃত্যুকাল হইতেও আরম্ভ করা হয় নাই। মদীনায় তাঁহার হিজরত উপলক্ষ করিয়াই ঐ গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। অতপর আমরা ইনশা আল্লাহ তাআলা হিজরী সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা করিব।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইহুদী সম্প্রদায়ের ইসলামে প্রবেশ। মদীনায় ধন-দৌলত, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রথম নম্বরে ছিল ইহুদী সম্প্রদায়, পৌত্তলিকরা ছিল দ্বিতীয় নম্বরে। ইতিপূর্বে মদীনার আওস ও খাযরাজ পৌত্তলিক গোত্রদ্বয়ে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল, নবীজী (সঃ) মদীনায় পদার্পণ করিলে মন্থর গতিতে এবং নগণ্য সংখ্যায় হইলেও ইহুদী সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রবেশ করে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীদের বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ

১৭১৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৬) আনাছ (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় প্রবেশের ধারাবাহিক বিবরণ দানে বলিয়াছেন, নবীজী (সঃ) আবু আইউব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর) বাড়ীর নিকটে অবতরণ করিলেন।

এখানে হযরত নবী (সঃ) স্বীয় লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমতাবস্থায় (ইহুদীদের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাগানে ফল-ফলারি আহরণ করিতে থাকাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাত সেই আহরিত ফলের বোঝাসহ হযরতের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত হযরতের কথাবার্তা শ্রবণ করিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) পুনঃ হযরতের খেদমতে হাযির হইয়া ঘোষণা দিলেন, "আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল, আপনি সত্য দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরতের নিকট ইহাও আরজ করিলেন, ইহুদীগণ খুব ভালরূপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় একজন। আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম, আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।* আপনি ইহুদীদেরকে ডাকিয়া এই বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখুন। তাহাদিগকে আমার সম্পর্কে

* আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই বক্তব্য ও প্রচেষ্টা স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশার্থে ছিল না, বরং আসল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের মধ্যে তাঁহার যে বাস্তব মর্যাদা ও উচ্চ স্থান রহিয়াছে তাহা হযরত (সঃ)-কে জ্ঞাত করা; যেন হযরত (সঃ) তাঁহার ইসলামের দ্বারা ইহুদীগণকে প্রভাবান্বিত করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বিশেষ দৃষ্টির সৌভাগ্যও তিনি অধিক লাভ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করুন এর পূর্বে যে, তাহারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। কারণ, (ইহুদী জাতি মিথ্যা অপবাদে বড়ই পটু;) তাহারা যখন জানিতে পারিবে যে, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি তখন তাহারা আমার উপর দোষারোপ আরম্ভ করিবে।

সেমতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীগণকে সংবাদ দানের জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইহুদীগণ! তোমরা তোমাদের সর্বনাশা পরিণাম হইতে সতর্ক হও– তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, একমাত্র আল্লাই সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় তোমরা ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছ যে, আমি আল্লাহর খাঁটি ও সত্য রসূল এবং আমি সত্য ধর্ম নিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও। তাহারা উত্তরে বলিল, ইসলাম কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, বুঝি না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তিন বার তাহাদের এইরূপ কথা কাটাকাটি হইল। অতপর হযরত (সঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কিরূপ ব্যক্তি গণ্য হইয়া থাকেন? তাহারা বলিল, তিনি ত আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও সর্দার এবং সর্বাধিক বিজ্ঞ আলেম পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহার পিতাও তদ্রূপই ছিলেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণকারী হয় তবে? তাহারা বলিল, আল্লাহর পানাহ– তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন– ইহা সম্ভবই নহে। হযরতের সঙ্গে তাহাদের এই বিতর্ক তিন বার হইল। (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নিকটেই লুকাইয়া ছিলেন।) হযরত (সঃ) বলিলেন, হে ইবনে সালাম! তুমি বাহির হইয়া আস। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইহুদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ইহুদী জাতি! তোমরা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগাইয়া তোল। যেই আল্লাহ সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই; সেই আল্লাহর শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তোমরা নিশ্চয় একনিষ্ঠরূপে জান এবং বুঝ যে, তিনি [নবী (সঃ)] আল্লাহর রসূল, তিনি সত্য ধর্ম বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহুদীগণ বলিল, আপনার এই কথা সত্য নহে।* অতঃপর (ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কায়) হযরত (সঃ) ইহুদীদেরকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

১৭১৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৬১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আগমনের সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, যাহার সঠিক জ্ঞান একমাত্র নবীরই থাকিতে পারে–(১) কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত কি? (২) বেহেশত লাভকারীগণের আতিথেয়তা সর্বপ্রথম কি বস্তুর দ্বারা করা হইবে, (৩) সন্তান পিতার বা মাতার আকৃতি লাভ করার সূত্র কি?

হযরত (সঃ) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনই (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) জিব্রাঈল ফেরেশতা আমাকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলে, ইহুদীগণ ত জিব্রাঈলকে শত্রু মনে করিয়া থাকে। অতপর হযরত (সঃ) প্রশ্নগুলির উত্তর দান করতঃ বলিলেন, কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত হইল, একটি আগুন বাহির হইবে– সেই আগুনটি লোকদিগকে পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দিকে হাঁকাইয়া নিয়া চলিবে। আর বেহেশত লাভকারীগণের সর্বপ্রথম খাদ্যবস্তু হইবে একটি মৎস্যের কলিজার ছোট টুকরা। আর (গর্ভাশয়ের মধ্যে নর-নারীর উভয়ের বীর্য মিলিত হওয়ার সময়) পুরুষের বীর্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে এবং নারী বীর্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করে।

* এক হাদীছে আছে, প্রথমে ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন– তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। আর তাঁহার ইসলাম প্রকাশের পর তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সন্তান। তখন আবুদল্লাহ ইবনে সালাম (রঃ) বলিলেন; ইয়া রসূল্লাল্লাহ! ইহুদীদের এই মিথ্যা অপবাদের ভয়ই আমি করিতেছিলাম। অর্থাৎ তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই অপবাদের ভয়েই। তাহাদের অপবাদ তাহাদের মুখেই মিথ্যা প্রমাণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলেন اشـهـد ان لا الـه الا الـلـه وانـك رسـول الـلـه "আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত (সঃ)-এর নিকট ইহুদী আলেমগণের উপস্থিতি

মদীনায় হযরতের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে পর তথাকার সংখ্যাগুরু, আধিপত্য ও প্রতিপত্তিশালী জাতি ইহুদীদের আলেমগণ– যাহারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মারফত হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল, তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ ত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে গোপন ও হজম করিয়া ফেলিল। তাহারা হযরত (সঃ)-কে পূর্ণরূপে চিনিয়া নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া সত্ত্বেও স্বীয় জ্ঞান-বিবেক এবং অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করত তাঁহাকে অস্বীকার করিল। আর কিছু সংখ্যক ঐরূপও ছিল যাহারা উপরোক্ত দলের ন্যায় স্বীয় জ্ঞান-বিবেক ও অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে না পারিয়া আপন লোকদের নিকট সত্য প্রকাশ করিল, কিন্তু স্বীয় সঙ্গীদের সমর্থন না পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কবলে পতিত হইয়া নিজের সিদ্ধান্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। যেমন ইহুদীদের বিশিষ্ট গোত্র বনু নযীরের একজন সর্দার "আবু ইয়াসের ইবনে আখতাব" যে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিজ লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল– اطـيـعـونـى فـان هـذا الـنـبـى الـذى كـنـا نـنـتـظـر "তোমরা সকলে আমার কথা মান, নিশ্চয় তিনি সেই নবী যাঁহার আবির্ভাবের অপেক্ষা আমরা করিতেছিলাম।" কিন্তু তাহার ভ্রাতা "হুয়াই ইবনে আখতাব" সেও তাহাদের অন্যতম বিশিষ্ট সর্দার ছিল, সে ভ্রাতার উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিল এবং সর্বসাধারণও তাহার সঙ্গেই হইয়া গেল। (ফতহুল বারী, ৭-২২০)

ইহুদী আলেমগণ যদি সমবেতভাবে তাহাদের উপলব্ধিকৃত সত্য উপেক্ষা না করিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রসূলরূপে গ্রহণ করিয়া নিত তবে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিত। এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (সঃ) নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭১৬। হাদীছ ঃ عـن ابـى هـريـرة رضـى الـلـه تـعـالـى عـنـه عَـنِ الـنَّـبِـىِّ صَلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَلَّـمَ قَـالَ لَـوْ اٰمَـنَ بِـىْ عَـشَـرَةٌ مِـنَ الْـيَـهُـوْدِ لَاٰمَـنَ بِـىْ الْـيَـهُـوْدُ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদীদের মধ্যে (তাহাদের আলেম শ্রেণীর দশ জন লোক এমন রহিয়াছে, সেই) দশ জন লোক আমার প্রতি ঈমান আনিলে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় আমার প্রতি ঈমান আনিত।

ব্যাখ্যা ঃ আলেমদের পদস্খলনে গোটা জাতিরই পদস্খলন হইয়া থাকে; সেই সূত্রেই আলেমদের ঘাড়ে মস্ত বড় দায়িত্ব এবং গোনাহের বোঝাও বড় হইবে, সুতরাং আলেমকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনার মূল শহরে পৌঁছিবার পর নবী (সঃ) মসজিদ তৈয়ারীর পকিল্পনা নিলেন, মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার আবাসিক গৃহ তৈয়ার হইবে এই ইচ্ছাও হয়ত তিনি পোষণ করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মদীনা নগরীতে প্রবেশকালে নবীজী (সঃ) তাঁহার "কাসওয়া" উষ্ট্রীর উপর আরোহিত ছিলেন এবং নিজের অবতরণ সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছিলেন, উষ্ট্রী আল্লাহর হুকুমে চলিবে; যথায় ইচ্ছা বসিবে, তিনি তথায়ই

অবতরণ করিবেন। উষ্ট্রী আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী নহে, বরং বাড়ীর নিকটবর্তী একটি উন্মুক্ত স্থানে বসিল। তখন নবী (সঃ) বলিয়াছেন, هذا المنزل ان شاء الله "ইনশাআল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে।"

অতপর উট হইতে অবতরণ করিতে নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ -

অর্থ ঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে যে স্থানে অবতরণ করাইয়াছ উহাকে বরকতপূর্ণ করিয়া দাও; উত্তম স্থানে অবতরণ করানো তোমারই কাজ। (ওয়াফাউল ওয়াফ, ১–২৩০)

মসজিদ তৈরীর পকিল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত ভূখণ্ডকেই নবী (সঃ) মসজিদের জন্য নির্বাচন করিলেন। ঐ ভূখণ্ডের এক পার্শ্বে উট বাঁধা হইত, একদিকে খেজুর শুকানোর খলা ছিল, এক খণ্ডে প্রাচীন গোরস্থান ছিল, কিছু অংশে খেজুর বাগানও ছিল। ঐ ভূখণ্ডটির মালিক ছিল দুই জন এতীম বালক; তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদের অভিভাবক বিশিষ্ট ছাহাবী আস'আদ ইবনে যোরারা (রাঃ) সকলেই ঐ ভূখণ্ড মসজিদের জন্য বিনা মূল্যে দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু নবী (রাঃ) বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এমনকি ঐ ভূস্বামীদের গোত্র বনু নাজ্জার সকলেই উক্ত দান গ্রহণ করিতে নবীজী (সঃ)-কে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নবী (সঃ) শেষ পর্যন্ত সম্মত হইলেন না। ভূখণ্ডের মূল মালিক দুই এতীম বালক, তাই এতীমের মালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেই হয় ত নবীজী (সঃ) তাহা বিনা মূল্যে গ্রহণের সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে এই ভূখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হইল দশ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা এবং ঐ মূল্য আবু বকর (রাঃ) পরিশোধ করিয়াছিলেন। (ঐ ২৩১)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ কত সুন্দর ও কত সরল। মসজিদের ভূমি সংগ্রহ করিয়া মসজিদ নির্মাণ কার্য সম্পাদনে স্বয়ং নবীজী (সঃ) নিজে সামান্য দিনমজুরের মত ইট ও পাথরের মোট বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনসার ও মোহাজেরগণ কার্য সম্পাদনে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া আসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِىُّ يَعْمَلُ - ذَاكَ اِذاً لَلْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ -

আমরা যদি বসিয়া থাকি আর নবী (সঃ) পরিশ্রম করেন, তবে ইহা জঘন্য ধৃষ্টতার কাজ। (ঐ ১৩৫)

নবীজীর (সঃ) সঙ্গী হইয়া ভক্ত ছাহাবীগণ মসজিদ তৈয়ার করিতেছেন– তাঁহাদের উৎসাহের সীমা আছে কী? আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া এই মোহাজরগণ সমবেত কণ্ঠে তারানা গাহিয়া যাইতেছিলেন; নবীজী মোস্তফা (সঃ)ও তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া উৎসাহ যোগাইবার জন্য সেই তারানা গাহিতেছিলেন। ১৭০৯ নং হাদীছে সেই তারানার দুইটি ছড়া এবং ১৭১১ নং হাদীছে আর একটি ছড়ার উল্লেখ হইয়াছে।

নবীজী (সঃ) এবং ছাহাবীগণের সমবেত প্রচেষ্টায় মসজিদ নির্মিত হইল। এই প্রথম নির্মাণকালে মসজিদটির দৈর্ঘ্য সত্তর হাত, প্রস্থ ষাট হাত, উচ্চতা সাত হাত ছিল। পবরর্তীকালে নবীজীর (সঃ) আমলেই প্রয়োজনবোধে এ মসজিদের প্রথম সম্প্রসারণ হয়– দৈর্ঘ্যে একশত হাত, প্রস্থেও একশত হাত।

(ওয়াফাউল ওয়াফা– ১)

মূল মসজিদ তৈয়ারীর পর এক সময় নবীজী (সঃ) মসজিদ সংলগ্ন উহার একটি বারান্দাও তৈয়ার করেন। এক বর্ণনায় ঐ বারান্দা তৈয়ারীর সময়কালও নির্ণীত হয়। মসজিদ যখন তৈয়ার হয় তখন নামাযের কেবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে, যাহা মদীনা হইতে উত্তরে। হিজরতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়া নামাযের কেবলা কা'বা শরীফের দিকে নির্ধারিত হয়। যাহা মদীনা হইতে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে বিপরীত দিকে কেবলা পরিবর্তিত হইলে মসজিদেরও সম্মুখ-পশ্চাৎ পরিবর্তিত হয়। প্রথমে মসজিদের সম্মুখ তথা কেবলা দেওয়াল ছিল উত্তর দিকস্থ দেওয়াল। কেবলা পরিবর্তন হইলে মসজিদের

সম্মুখ হইয়া যায় দক্ষিণ দিকের দেওয়াল এবং স্বভাবতই মসজিদে প্রবেশ পথ উত্তর দিকের দেওয়ালে করিতে হয়। এই সময় উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে খেজুর পাতার একখানা চাল সংযোগ করিয়া সম্মুখ দিকে উন্মুক্ত একটি বারান্দা বা চাতাল তৈয়ার করা হয় (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১-৩২১)।

উল্লিখিত চাতাল বা বারান্দাকেই আরবি ভাষায় "সোফ্‌ফা" বলা হয়। নিঃসম্বল, নিঃস্ব, নিরাশ্রয় সর্বহারা মুসলমান– মদীনাতে যাহাদের কোন আপনজন বা আশ্রয়স্থল নাই, এই শ্রেণীর লোকদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নবীজী (সঃ) ঐ বারান্দা তৈয়ার করিয়াছিলেন। "সোফ্‌ফা" অর্থ বারান্দা, এই সূত্রেই তথায় আশ্রয় গ্রহণকারীগণকে "আসহাবে সোফ্‌ফা বা বারান্দার আশ্রিত" আখ্যায় স্মরণ করা হইত।

এই অস্থায়ী আশ্রয় জীবনে বিভিন্ন সূত্র সমন্বয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হইত। তাঁহারা নিজেরাও জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া কিছু জোটাইতেন এবং খেজুর বাগানের মালিক আনসারগণও নিজ নিজ সাধ্যমতে কিছু খেজুরের ছড়া মসজিদে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আর নবী (সঃ) নিজে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ নিজ নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে মেহমানরূপে নিয়া যাইতেন। নিঃস্ব নিঃসম্বল হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক দুর্বলতা ছিল চরম, তাই তাঁহাদের পরিধেয়ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইত। পারিবারিক জীবনের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সাংসারিক কোন ব্যস্ততা হইত না। তাঁহারা এই সুযোগ এক মহান কাজে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা সর্বদা নবীজী (সঃ)-এর সঙ্গে চাপিয়া থাকিয়া দ্বীনের শিক্ষা কোরআন-হাদীছের চর্চায় লিপ্ত থাকিতেন। মদীনার বাহিরে কোথাও শিক্ষকের চাহিদা হইলে নবী (সঃ) তাঁহাদের হইতেই শিক্ষক পাঠাইতেন।

স্মরণ রাখিবেন, মসজিদে নববীর এই বারান্দায় আশ্রয় লাভকারী আসহাবে সোফ্‌ফাগণ কোন স্থায়ী ও বিশেষ সম্প্রদায় ছিল না– যেরূপ হইয়া থাকে হিন্দুদের মধ্যে যোগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী বা ভিক্ষু সম্প্রদায়।

নবীজীর (সঃ) সুন্নত, ইসলামের আদর্শ পারিবারিক জীবন লাভের সংস্থান সাপেক্ষে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণরূপে তাঁহারা ঐ বারান্দায় আশ্রয় লইতেন। আদর্শগত সাধারণ জীবিকার সুযোগ যখনই যাঁহার লাভ হইত তখনই তিনি ঐ আশ্রয় হইতে কাটিয়া পড়িতেন। আসহাবে সোফ্‌ফাগণের স্বরূপ নির্ণয়ে মদীনার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ "ওয়াফাউল ওয়াফা" গ্রন্থে বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) হইতে উদ্ধৃতি বিদ্যমান আছে–

الصفة مكان فى مؤخر المسجد النبوى مظلل اعد لنزول الغرباء فيه ممن لاماوى له ولا اهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم او يموت او يسافر.

অর্থাৎ "সোফ্‌ফা" একটি বিশেষ স্থান, যাহা মসজিদে নববীর পিছনে (কেব্‌লার দিকের বিপরীত দিকের প্রান্তে)উপরে চাল বা ছাপ্পর দেওয়া ছিল। গরীব দুস্থ, যাঁহাদের ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন না থাকিত, ঐরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশে উহা তৈয়ার করা হইয়াছিল। তথায় আশ্রয়ীগণের সংখ্যা সময়ে বেশী, সময়ে কম হইত এইভাবে যে, তাঁহাদের কেহ বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনের সংস্থান করিয়া লইতেন, কাহারও মৃত্যু হইত, কেহ অন্যত্র চলিয়া যাইতেন।

সারকথা, সোফ্‌ফা বা এ বারান্দায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করা মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, সাময়িক আশ্রয় দানের ব্যবস্থা ছিল মাত্র। তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী সকলেই সুযোগ মতে সাধারণ জীবন যাপনে চলিয়া যাইতেন। আসহাবে-সোফ্‌ফাগণের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি পরবর্তী জীবনে এক প্রদেশের গভর্ণরও হইয়াছিলেন।

তৎকালীন মসজিদে নববী

ইসলাম বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে না, সর্বক্ষেত্রে সরলতাই ইসলামের আদর্শ। তদুপরি ঐ যুগে বিশেষতঃ মরু অঞ্চল মক্কা-মদীনায় লোকদের সাধারণ আবাস গৃহও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানেরই ছিল ।

সেমতে মসজিদে নববীর নির্মাণও ঐ শ্রেণীর ছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের আড়া ও খুঁটি এবং খেজুর পাতার ছাপ্পর, বৃষ্টি হইলে পানি ঝরিত। এই ছিল তৎকালীন মসজিদে নববীর আকৃতি (বাংলা বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ২৯১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে ছিল না কোন সমুচ্চ গুম্বজ, ছিল না সুদীর্ঘ মিনার।*

অনাড়ম্বররূপে তৈয়ারী ঐ মসজিদটি নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ জীবনের দশটি বৎসর এবং তাঁহার পরেও খলীফাগণের আমলে শুধু কেবল নামায বা এবাদতের স্থানই ছিল না; বরং এই মসজিদই ইসলামের সর্বপ্রকার জরুরী কার্যের প্রধানতম বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এমনকি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর ফরমান জারির কেন্দ্রও এই মসজিদই ছিল এবং এই খেজুর পাতার মসজিদেরই এত বড় প্রভাব ছিল যে, উহার সম্মুখে আসিলে পারস্য ও রোম মহাদেশের রাজদূতগণের কলিজাও কাঁপিয়া উঠিত।

নবীজী (সঃ)-এর আবাসিক গৃহ তৈয়ার

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নবীজীর উষ্ট্রী ঐ স্থানে বসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন– ইনশা-আল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে। তাই মসজিদ তৈয়ারর পরেই নবীজী (সঃ) তাঁহার সেই সঙ্কল্প বাস্তবায়ন করিলেন। ঐ সময় নবীজীর সহধর্মিনী ছিলেন দুই জন– সওদা (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)। অবশ্য আয়েশা (রাঃ)
তখনও নবীজীর গৃহিণী হইয়াছিলেন না। কিন্তু নবীজীর কন্যাগণ ত ছিলেন। তাই নবীজী (সঃ) মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদেরই সমান সামনে কাঁচা ইট এবং খেজুর গাছ ও পাতার দুইটি কক্ষ তৈয়ার করিলেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনমত আরও নয়টি কক্ষ তৈয়ার করিয়াছিলেন; কক্ষগুলি সবই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল, অবশ্য মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে কোনে কক্ষ ছিল না। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১–৩২৫)

নবীজীর কক্ষগুলি কাঁচা ইট, খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়া এবং খেজুর পাতার উপর মাটি ফেলিয়া ছাদ– এই আকৃতিতে তৈয়ার ছিল। দরজায় মেষের লোমে বুনা চট ঝুলানো ছিল। এই ছিল সরদারে দো-জাহান বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গৃহের আকৃতি– যথায় তিনি সারা জীবন পরিবার পরিজন নিয়া বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কত কত এলাকা তিনি জয় করিয়াছিলেন, তথাকার ধন-সম্পদ হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার গৃহ ঐ আকৃতিরই ছিল। প্রায় শতাব্দীকালের পর ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসন আমলে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইলে ঐ কক্ষসমূহ ভাঙ্গিয়া মসজিদ বর্ধিত করা হইয়াছে।

কক্ষসমূহ উচ্ছেদ উপলক্ষে ছাহাবী তনয় তাবেয়ীগণের অনেকে মসজিদে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন– "কক্ষগুলি বিদ্যমান রাখিতে পারিলে কত ভাল হইত। পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ লাভের সুযোগ হইত তাহারা বাড়ী-ঘরের মান নিম্নের রাখিত; তাহারা দেখিতে পাইত– আল্লাহ তাঁহার নবীর জন্য কিরূপ বাসস্থান পছন্দ করিয়াছিলেন। অথচ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ প্রদত্ত ছিল।" (ঐ ৩২৭)।

মক্কা হইতে নবীজী (সঃ)-এর পরিবারবর্গ আনয়ন

মসজিদ এবং উহার সঙ্গে আবাস গৃহের দুইটি কক্ষ তৈয়ার হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয়

* কবি গোলাম মোস্তফা সঙ্কলিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থের বিবরণ– "চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্তবিকই এক নূতন শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইত।"

উক্ত গ্রন্থের এই সব বর্ণনাদৃষ্টে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে; আয়াতটির মর্ম হইল– "তোমরা লক্ষ্য কর না কবিগণ হর রকম ময়দানেই (এমনকি শুধু কল্পনার ময়দানেও চক্কর খাইতে থাকে। (পারা– ১৯, রুকু– ১৫)।

পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং বিশিষ্ট খাদেম আবু রাফে'কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন উম্মুল মোমেনীন সওদা (রাঃ) এবং তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম ও কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা জোহরাকে নিয়া আসিবার জন্য। হযরতের দ্বিতীয় কন্যা রোকাইয়া (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ্য কন্যা তখনকার অমুসলিম স্বামী আবুল আ'ছের নিকট আবদ্ধ ছিলেন, আর উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পিতা আবু বকরের (রাঃ) পরিবারবর্গের সঙ্গেই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে মক্কায় পাঠাইলেন স্ত্রী উম্মে রুমান, পুত্র আবদুর রহমান এবং কন্যা আস্‌মা ও উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ)-কে নিয়া আসিবার জন্য।

হযরতের পরিবারবর্গ মদীনায় পৌঁছিলে হযরত (সঃ) আবু আইউব আনসারীর গৃহ ত্যাগ করতঃ মসজিদ সংলগ্ন তৈয়ারী স্বীয় বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

মদীনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব পালন ও প্রতিষ্ঠা উভয়টি ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দাসত্ব পালন হইল প্রথম নম্বরে, আর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা হইল দ্বিতীয় নম্বরে। তাই ইসলামের মক্কী জীবনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই, এমনকি জেহাদের অনুমতিও দেওয়া হয় নাই। অবশ্য মুসলমানকে আল্লাহর দাসত্ব পালনের সুযোগপ্রাপ্তির সাথে সাথে উহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতে হয়। মক্কায় আল্লাহর দাসত্ব পালনেরই সুযোগ ছিল না। মদীনায় আসার পর নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এমনকি আল্লাহর দাসত্ব পালনে এবাদত বন্দেগীর কেন্দ্র মসজিদও নবীজী (সঃ) তৈয়ার করিয়া সারিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার কর্ম পরিকল্পনা এত দ্রুত ধাবমান করিলেন যে, বিরতিহীনরূপে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আল্লাহর দাসত্ব পালনের সুযোগপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিয়া যাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াই নবীজী (সঃ) তাহার প্রতিষ্টার চেষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (সঃ) এই পকিল্পনায় সর্বপ্রথম মদীনা এলাকাকে গৃহযুদ্ধমুক্ত শান্তির এলাকায় পরিণত করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকিলে কোন কাজেরই অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয় না। এই পদক্ষেপে নবীজী (সঃ) মদীনার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।

মদীনার আদি অধিবাসীর পৌত্তলিক গোত্রগুলিতে ইসলামের প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে মুসলমানগণ প্রবল ছিলেন- যাঁহারা আনসার নামে আখ্যায়িত ছিলেন। আর এক শ্রেণী ছিলেন প্রবাসী মুসলমান, মদীনায় তাঁহাদেরও সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; তাঁহারা মোহাজের নামে আখ্যায়িত ছিলেন। মদীনার আদি অধিবাসী আর এক সম্প্রদায় ছিল ইহুদী; নবীজীর (সঃ) আগমনের পূর্বে মদীনায় তাহাদেরই প্রাবল্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

মুসলমানদের দুই শ্রেণী- আনসার ও মোহাজের এবং ইহুদী সম্প্রদায়, এই তিন শ্রেণীকে নবী (সঃ) সহাবস্থান ও মদীনার দেশরক্ষা চুক্তিতে এক করার ব্যবস্থা করিলেন।

আনসার মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে সহাবস্থান চুক্তির ঐতিহাসিক সনদ সম্পাদন

সনদটির শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ-

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা কোরায়শ বংশীয় (প্রবাসী বা মোহাজের) মুসলমান আর মদীনাবাসী মুসলমান এবং তাঁহাদের সহিত যাহারা দেশরক্ষা ও শান্তি অভিযানে অংশগ্রহণ করিবে- সকলের মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সম্পাদিত সনদ।

সনদটির সর্বপ্রথম অনুচ্ছেদ ছিল এই-

"স্বাক্ষরকারী সকল দল অন্য সকলের মোকাবিলায় এক গণ্য হইবে।" অর্থাৎ চুক্তি বা সনদের মর্ম ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উহার বিরোধীদের মোকাবিলায় স্বাক্ষরকারীগণ অভিন্নরূপে সংগ্রাম করিবে।

অতপর সনদের মধ্যে অনেক অনুচ্ছেদই ছিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতিপয় অনুচ্ছেদ এই-

১। ইহুদী সম্প্রদায়- যাহারা আমাদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরে যোগ দিয়াছে, তাহাদের জন্য সাহায্য এবং (নাগরিকত্বের) সমান সুযোগ থাকিবে। তাহাদের কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে তাহার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করা হইবে না।

২। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইহুদীদের সপক্ষে আরও একটি ধারা ছিল, তাহারা নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পাইবে।

৩। ইহুদীদের কেহ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারিবে না।

৪। সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কাহারও আক্রমণ হইলে অন্য স্বাক্ষরকারীগণ ঐ সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহায়তা করিবে। অবশ্য অন্যায়ের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫। স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীগণও ব্যয়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে- যাবত যুদ্ধ চলিতে থাকে।

৬। স্বাক্ষরকারী এক মিত্র অপর মিত্রকে তাহার অন্যায়ে সাহায্য করিবে না, সর্বক্ষেত্রে অত্যাচারিতের পক্ষে সাহায্য থাকিবে।

৭। স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমবেতভাবে ইয়াসরেব (মদীনা) এলাকাকে রক্ষা করিতে এবং অপরাধমুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

৮। স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় মক্কার কোরায়শদের বা তাদের কোন মিত্রকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না।

৯। সকল মোমেন মোত্তাকী ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত থাকিবে, যে অবাধ্য হয় কিম্বা অত্যাচার, অপরাধ, সীমা লঙ্ঘন বা মোমেনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ঘটানোর কাজে লিপ্ত হয়। মোমেনদের ঐক্যবদ্ধ হস্ত ঐ শ্রেণীর লোককে শায়েস্তা করায় সক্রিয় থাকিবে- যদিও ঐ লোক তাহাদের কাহারও নিজ সন্তান হয়।

১০। (কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপনে আনসার ও মোহাজের-) সকল মুসলমানের মৈত্রী এক হইবে। বিশেষতঃ জেহাদের বেলায় মুসলমানদের একজনকে ছাড়িয়া অন্যজন কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে এরূপ মৈত্রী স্থাপন করিবে যাহা সকলের স্বার্থ রক্ষায় সমান হয় এবং সকল মুসলমানের পক্ষে ন্যায় হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের কোন এক জামাত অন্যদেরকে ছাড়িয়া বা সকল মুসলমানদের স্বার্থ সমানভাবে না দেখিয়া শুধু এক দলের স্বার্থের জন্য কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না।

১১। এই সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান- যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদের কেহ কোন ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর সহায়তা করিতে পারিবে না, তাহাকে সমর্থন দিতে পারিবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কেহ সাহায্য সমর্থন দিলে তাহার উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব পড়িবে এবং তাহার ফরয নফল কোন প্রকার এবাদত কবুল হইবে না।

১২। সনদের কোন বিষয়ে কোন বিতর্কের সূত্রপাত হইলে উহার মীমাংসা একমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর ন্যস্ত হইবে।

১৩। স্বাক্ষরকারী মিত্রদের কোন সম্প্রদায়ে এমন কোন বিবাদের সৃষ্টি হইলে- যাহার প্রতিক্রিয়া ছড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাদের সমাপ্তি আল্লাহর এবং আল্লাহ রসূল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রাপ্ত যে মীমাংসা ও সালিস করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত ও সকলের গ্রহণীয় সাব্যস্ত হইবে।

সনদের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিল এই–

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সঃ) ঐ ব্যক্তির সাহায্য সমর্থনে থাকিবেন যে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং সৎ-সাধু হইয়া জীবন যাপন করিবে। (সীরতে ইবনে হেশাম এবং বেদায়া, ৩–২৪৪)

এই সনদ সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামের এমন একটি রূপের বিকাশ হইল যাহা সম্পর্কে এত দিন কোন ধারণা করা যায় নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায়, সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামী নীতির রূপরেখা কি হইবে তাহা এত দিন অপ্রকাশিত ছিল। কারণ ইসলাম এত দিন আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিল; নীতিমালার প্রকাশ সে কোথায় করিবে?

মদীনায় ইসলাম তাহার স্বাধীনতার উৎস লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়াছিল যে, ইসলাম তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা অন্য ধর্মের নাগরিকদের উপর ইসলাম বলপূর্বক চাপাইয়া দিবে না। সহাবস্থান বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলকে নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিবে। প্রথম দিন হইতেই ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত উদার নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে আজও ইসলামকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। আজও লোকদের ধারণা– ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী শাসনে অমুসলিমদের গলা কাটিয়া জবরদস্তি তাহাদের মুসলমান করা হয়।

উল্লিখিত চুক্তিটি শুধু দেশ রক্ষা শান্তি রক্ষা এবং মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য রাজনৈতিক চুক্তি ছিল।

মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় ধনে-জনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রবল ছিল এবং এই সম্প্রদায় ছিল মুসলমানদের ঘোর শত্রু। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শক্তিশালী হইতে হইলে নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মদীনায় মুসলমানদের দুইটি সম্প্রদায় ছিল– আনসার তথা মদীনার অধিবাসী মুসলমান আর মোহাজের তথা বহিরাগত মুসলমান। এই দুই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে পরস্পর তিল পরিমাণ বিভেদ সৃষ্টি হইলেই মদীনায় মুসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে চুরমার হইয়া যাইত, মদীনায় মুসলমানদের প্রভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না; বরং চিরকাল ইহুদীদের প্রভাবতলে থাকিতে হইত। আর ইহুদীদের ন্যায় শত্রুদের বেষ্টনে থাকায় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল প্রকট। তাই নবী (সঃ) মুসলমান শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টির জন্য উভয় শ্রেণীকে আনুষ্ঠানিকরূপে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থাকেই আরবী ভাষায় "মোআখাত" বলা হয়, যাহার অর্থ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

এই ভ্রাতৃত বন্ধন দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ত সৃষ্টি হইলই, এতদ্ভিন্ন ছিন্নমূল সর্বহারা বহিরাগত মুসলমানদের আশ্রয় লাভেরও বিশেষ সুব্যবস্থা হইল।

আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন (পৃঃ ৫৩৩–৫৬১)

মক্কায় সর্বস্ব ত্যাগ করত হিজরত করিয়া মদীনায় আগমনকারী নিঃস্ব মুসলমানদের জন্য এক একজন মদীনাবাসী মুসলমান তথা আনসারের সঙ্গে এক একজন মোহাজেরের "মোআখাত–ভাই-বন্ধী" বা বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা এক মজলিসে ৪৫ জন আনসারের সঙ্গে ৪৫ জন মোহাজেরের ভাই

বন্ধী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত হযরত (সঃ) এই মহান কার্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। (আসাহহুস সিয়ার, ১১০)। আনসার তথা মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই ভাই-বন্ধীর এমন মর্যাদা দান করিয়াছিলেন যাহার নজির কোন জাতির ইতিহাসে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৭ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের গৃহে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কাজ করিয়াছিলেন।।

আনসারগণের চরম সহানুভূতি

১৭১৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৩৪) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভাই-বন্ধী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর) আনসারগণ হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের এবং মোহাজের ভাইদের মধ্যে আমাদের সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিন। হযরত (সঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন। অতপর তাঁহারা বলিলেন, তবে মোহাজের ভাইগণ আমাদের জায়গা-জমিতে কাজ করিবেন, সে সূত্রে তাঁহারা উহার উৎপন্নে আমাদের শরীক হইবেন। ইহাতে সকলেই সম্মতি দান করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনসারগণ কর্তৃক মোহাজেরগণের প্রতি চরম সহানুভূতির অসংখ্য উপমা এবং ইতিহাস হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা- দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছে একটি ঘটনা রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজের এবং সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) আনসারী- এই দুই জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। সেমতে সা'দ (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব করিলেন, আমি একজন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, আপনি আমার ভ্রাতা; সেই হিসাবে আমার ধন-সম্পদের অর্ধভাগ আমি আপনাকে দিয়া দিলাম।

এমনকি প্রবাসী বিদেশী মানুষ হিসাবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজেরের নিকট কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না আশঙ্কায় সা'দ (রাঃ) এই প্রস্তাবও করিলেন যে, আমার দুই স্ত্রী আছে (তখন পর্দার মাসআলা না থাকায়) আপনি উভয়কে দেখিয়া যাহাকে পছন্দ করিবেন আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব; আপনি বিবাহ করিয়া নিবেন।

ঐরূপ দ্বিতীয় খণ্ড ১১৫৮ নং হাদীছেও বর্ণিত আছে, বাহরাইন এলাকা জয় হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের জন্য কর্মতৎপরতায় আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আনসারগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এই এলাকার পতিত জমিগুলি তোমাদের নামে লিখিয়া দেই। আনসারগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের মোহাজের ভাইগণকে ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন।

পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তাআলা আনসারগণের চরম উদারতার বর্ণনায় আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন-

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

অর্থ ঃ "অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আনসারগণ নিজেরা না খাইয়া অন্যকে অগ্রগণ্য করিয়া থাকে, অন্যের অভাব মিটাইয়া থাকে।"

এই আয়াত যেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছিল তাহা অত্যন্তই কৌতূহলজনক। একদা এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নবীজীর (সঃ) নিকট উপস্থিত হইল। নবী (সঃ) প্রথমে নিজ গৃহিনীদের নিকট খোঁজ নিলেন; সংবাদ আসিল, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক্ষুধার্তের মেহমানীর জন্য কে প্রস্তুত আছে। একজন আনসারী ছাহাবী নিবেদন করিলেন, আমি আছি। অতিথিকে নিয়া তিনি গৃহে গেলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অতিথির সেবা উত্তমরূপে করিও। স্ত্রী বলিলেন, শিশু সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য

ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গৃহের এই সামান্য খাদ্য নিজেরা কেহ না খাইয়া অতিথিকে সম্পূর্ণ খাওয়াইবার এক অভিনব কৌশল করিলেন । শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন। ঐ সময় পর্দার মাসআল্লা ছিল না আরবের প্রথানুসারে গৃহের সকলকে অতিথির সহিত বসিয়া একই পাত্রে খাইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানে স্ত্রী স্বামীর পরামর্শানুযায়ী ছল করিয়া গৃহের প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন। অতপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অতিথির সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। প্রকারান্তরে তাঁহারা এক লোকমাও খাইলেন না– সুকৌশলে সম্পূর্ণ খাদ্যটুকু অতিথিকে খাওয়াইয়া নিজেরা উপবাসে রাত্র কাটাইলেন। তাঁহাদের এই অতুলনীয় মহানুভবতা লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত আয়াত নাযিল হইল।

আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দৃঢ়তা

আনসারগণ এইভাবে অসাধারণ উদারতা মহানুভবতা দেখাইতেছিলেন কিন্তু মোহাজেরগণ ইহাকে সুযোগরূপে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আনসারগণের মহানুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিয়াও মোহাজেরগণ কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেন।

১৭১৭ নং হাদীছে দেখিতে পাইয়াছেন, আনসারগণ নিজেদের সম্পত্তি মোহাজেরগণকে ভ্রাতা হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মোহাজেরগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে বর্গা প্রথায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তদ্রূপ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছের ঘটনায়ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজের সা'দ (রাঃ) আনসারীর মহানুভবতার প্রস্তাব সম্পত্তি ও স্ত্রী বন্টন করিয়া নেওয়ার প্রস্তাবকে ধন্যবাদের সহিত এড়াইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন– ভাই! আমাকে বাজার দেখাইয়া দিন। তিনি বাজারে যাইয়া ব্যবসা দ্বারা প্রতিদিন সামান্য সামান্য উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিবাহ করিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাকে ওলীমা খাওয়াইবার পরামর্শ দিলেন; তাহা করিতেও তিনি সক্ষম হইলেন। এমনকি ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি কালে বহু ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন।

আয়েশা (রাঃ)-কে গৃহে আনয়ন

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত বিবাহের ইজাব-কবুল হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় বিবাহের শুধু ইজাব-কবুলই হইয়াছিল। আয়েশা (রাঃ)-কে নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে আনিয়াছিলেন না। তখন তাঁহার বয়সও অনেক কম ছিল– মাত্র ছয় বৎসর । মদীনায় হিজরত করিয়া আসার ৭ বা ৮ মাস পরে নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নিজ গৃহে আনিলেন; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ১৭৯৬ নং হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আযানের প্রবর্তন

মক্কার সুদীর্ঘ জীবনে নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ মনের সাধ মিটাইয়া নামায পড়িতে পারিতেন না। মসজিদে সমবেত হইয়া জামাতে নামায আদায় করার পূর্ণ সুযোগ ছিলই না। মদীনায় সেই সব বাধা-বিপত্তি নাই; মুসলমাগণ তাঁহাদের মা'বুদের সর্বপ্রথম এবাদত নামায মনের সাধ মিটাইয়া আদায় করার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। জামাতের সহিত নামায আদায় করার জন্য মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমার নামায মুসলমানগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে সমবেতভাবে জামাতের সহিত

আদায় করিতেছেন।

লোকেরা অনুমানে নামাযের সময় নিরূপণ করিয়া মসজিদে আগমন করিয়া থাকেন– ইহাতে নিশ্চিত অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মুসলমানদের সলা-পরামর্শ হইতেছিল। এমতাবস্থায় এক কৌতূহলজনক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আযান প্রবর্তিত হইল– যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আযান প্রথা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক নবযুগের সূচনা করিল। তওহীদের ঘোষণা, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল এই ঘোষণা– যাহা গৃহ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে বসিয়া শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ করিতেও মুসলমাগণ সন্ত্রস্ত থাকিত, নামায আদায় করিতে মুসলমানরা নিজেরাই শত বাধার সম্মুখীন হইত– অপরকে উহার প্রতি আহ্বান করার ত প্রশ্নই ছিল না।

আজ সেই তওহীদের ঘোষণা, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল হওয়ার ঘোষণা, নামাযের প্রতি আহ্বান গৃহভ্যন্তরে নহে, শুধু মুখের উচ্চারণে নহে, শুধু সুযোগ প্রাপ্তিতে নহে– বরং নীতিগতভাবে ও রীতিমত বলিষ্ঠ কণ্ঠে, সর্বোচ্চ স্বরে আকাশে-বাতাসে মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ বার ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের বজ্রনিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। আযানের এই অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তাহাদের মন-প্রাণ ঝংকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইসলামের গৌরব মুসলমানদের বিজয় ধ্বনির মহাস্বর সেই আযান, যাহা বিশ্বের মিনারে মিনারে আজও ধ্বনিত হইতেছে– হিজরতের প্রথম বৎসরই এই মহাধ্বনি ইসলামের বিধানরূপে প্রবর্তিত হয় এবং আবহমানকালের জন্যই ইসলামের গৌরব ও বিজয় স্মৃতিরূপে চিরায়ত বিধি আকারে সর্বত্র প্রচলিত হয়।

মদীনায় ইসলামের এক নবরূপের আবির্ভাব

মক্কায় সুদীর্ঘ তের বৎসর নবীজীর (সঃ) নীতি ছিল বিধর্মীদের জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া। এক গালে চড় খাওয়া সত্ত্বেও অপর গাল পাতিয়া দিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে হইবে– এই ছিল তাঁহার নীতি। মক্কার পাষণ্ডরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তগণের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না করিয়াছে! স্বয়ং নবীজী (সঃ)-কে গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, নানা প্রকারে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, সামাজিক বয়কট করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মুসলমানদের উপর ত অত্যাচারের সীমাই ছিল না। কিন্তু নবীজীর (সঃ) পক্ষ হইতে প্রতিরোধ বা প্রতিকার ছিল না; নীরবে সহ্য করিয়া চলাই ছিল তাঁহার নীতি। দীর্ঘ তের বৎসরেও এই নীতির সুফল ফলিল না। মক্কার পাষণ্ডরা এই নীতির পাত্র ছিল না। তাহাদের উপর এ সাধু নীতির বিরূপ ক্রিয়া হইল। এই নীতির সুযোগে পাষণ্ডরা জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ দিনের দিন বাড়াইল বৈ কমাইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, আত্মীয়-স্বজন বর্জন করতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন। মদীনায় আসিয়া নবীজী (সঃ) অন্য একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যে, নিষ্ক্রিয় সহ্য দুষ্কৃতির প্রশ্রয় দেয়। অতএব অত্যাচারী জালেমকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং যত দিন না তাহার উপর জয়লাভ করা যায় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলায় যাহারা বাধার সৃষ্টি করে, আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করা যাহারা অপরাধ গণ্য করিয়া উৎপীড়ন করে, জুলুম-অত্যাচার করে, তাহারা প্রকৃতই জালেম, সত্যের শত্রু। এই জালেমদেরকে দমন করিতে হইবে, এই শত্রুদেরকে বাধা দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে, অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

এই যুদ্ধ নিছক রাজ্য জয়ের জন্য নহে, ডাকাতের মত নিজ স্বার্থ লোভে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করার ন্যায় নহে। এই যুদ্ধ মঙ্গলের জন্য, সত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তথা ডাক্তারের মত দেহের শান্তি ও সুস্থতা রক্ষাকল্পে

উহার অবাঞ্ছিত ও দূষিত অংশ অস্ত্রোপচারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায়। এই যুদ্ধকেই জেহাদ বলা হয়।

জেহাদে অস্ত্র ধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ আছে বটে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অস্ত্র প্রয়োগ নিন্দনীয় নহে। সত্য ও আদর্শের জন্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র প্রয়োগ অতি মহৎই বটে।

বিশ্ব বুকে সত্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর সহ্য সহিষ্ণুতার সাধু নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন; পাত্রের অযোগ্যতা হেতু উদ্দেশ্যের সফলতায় প্রতিষ্ঠা তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মদীনায় আসিয়া নবীজী (সঃ) ঐ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় জেহাদের বলিষ্ঠ নীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

তাঁহার এই নীতি পরিবর্তনের সূচনায় আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিত এবং পরিপূর্ণ সমর্থনও ছিল অতি সুস্পষ্ট। মদীনায় হিজরত এবং প্রবাসীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা মোটামুটি শৃঙ্খলায় আসার পর পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ - اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ -

অর্থ ঃ (মুসলিম জাতি) যাহারা (এক আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি দানের অপরাধে পথে ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাদেরকে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা হইল। কারণ, তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জয়ী করিতে সক্ষম। তাহাদেরকে অন্যায়রূপে তাহাদের ঘড়-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রভু এক আল্লাহ। (পারা–১৭, রুকু–১২)

মুসলমানদের নীতি পরিবর্তনের আহ্বানে আরও আয়াত অবতীর্ণ হইল। যথা–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

অর্থ ঃ "আল্লাহর পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তবে (কোথাও চুক্তিবদ্ধ থাকিলে তথায় চুক্তির) সীমা লংঘন করিও না। সীমা লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" (পারা–২, রুকু– ৮)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

অর্থ ঃ "আর (যাহারা তোমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী) তাহাদের যথায় পাও হত্যা কর এবং যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে সেখান হইতে তোমরাও তাহাদেরকে বিতাড়িত কর। আর জানিয়া রাখ, (জুলুম-অত্যাচার, আল্লাহর ধর্মে বাধাদান ইত্যাদি) অপকর্ম হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা বেশী ভয়াবহ। (অতএব যাহারা ঐ শ্রেণীর অপকর্মে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীনই বটে।)" ঐ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -

অর্থ ঃ (আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় যাহারা বাধাদানকারী) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতে থাকিবে যাবত না আল্লাহর দ্বীনে অন্তরায় সৃষ্টি রহিত হইয়া যায় এবং আল্লাহ দ্বীনের প্রাবাল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (পারা– ২, রুকু– ৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "জেহাদ তোমাদের জন্য অবধারিত কর্তব্য করা হইল, যদিও তোমরা তাহা কঠিন মনে কর। তোমরা যাহা কঠিন গণ্য করিতেছ হয়ত তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত এবং যাহা তোমরা ভাল মনে

করিতেছ হয়ত তাহাতে তোমাদের অমঙ্গল রহিয়াছে। আল্লাহই সব জানেন তোমরা জান না।"
(পারা-২, রুকু-১০)

মুসলমানদের তৎকালীন প্রথম নম্বরের বিপক্ষ মক্কার কাফেরদের চরম উগ্রতাও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি পরিবর্তনকে অপরিহার্য করিয়া তুলিতেছিল এবং পরিবর্তিত নূতন নীতিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছিল।

মক্কার কাফেররা নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানদিগকে দীর্ঘ দিন যাবত জুলুম-অত্যাচারে কাবু করিয়া রাখিয়াছিল। হিজরতের পর তাহারা দেখিল, শিকার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ মদীনায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা তথায় শান্তি স্বস্তির সহিত ধর্মকর্ম পালনের পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। যে ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে কোরায়শরা এক যুগ ধরিয়া চেষ্টা-পরিশ্রম করিয়াছে, আজ সেই ধর্ম মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্রুত প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সব সংবাদে তাহাদের শয়তানী ক্রোধ শত গুণে বাড়িয়া গেল। তারপর এই সংবাদও তাহারা অবগত হইল যে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মদীনার মুসলমান, মক্কার প্রবাসী মুসলমান, এমনকি ধনে-জনে পুষ্ট মদীনার ইহুদীদিগকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। উক্ত সনদের একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে কোরায়শ এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি বৈরী হওয়ার উপর মদীনার সকল সম্প্রদায়কে সম্মত করাইয়াছেন। মদীনার সকল সম্প্রদায়কে এক বিশেষ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাইয়া আন্তর্জাতিক সন্ধি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যেকোন দেশ মদীনা আক্রমণ করিলে ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সকলে একযোগে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবে। এইভাবে মুসলমানগণ মদীনায় নিজেদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করিতে সফল হইয়াছে। এখন মদীনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হেস্তনেস্ত, বিধ্বস্ত করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এইসব শুনিয়া ও ভাবিয়া কোরায়েশরা ক্ষোভে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একদিকে মুসলমানদের শান্তি লাভের উপর ক্ষোভ ক্রোধ, অপর দিকে তাহাদের শক্তি সঞ্চয়ের উপর আতঙ্ক।

নরাধমরা নবীজী (সঃ) ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, এখন তাহা তাহাদের স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে আতঙ্ক উঁকি দিল যে, মুসলমানগণ এইভাবে আরও কিছু শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে।

তাহাদের আতঙ্কের আর একটি বিশেষ কারণ ত অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। মক্কা এলাকা উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম; বাণিজ্যই হইল ঐ এলাকার লোকদের একমাত্র জীবন সম্বল এবং সিরিয়ার বাণিজ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। আর মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথটি মদীনাবাসীদের বাগে রহিয়াছে। ঐ পথে চলাচলকারীদের বাণিজ্যসম্ভার লুণ্ঠন করা এবং মক্কাবাসীদের এই বাণিজ্য পথ বন্ধ করা মদীনাবাসীদের পক্ষে অতি সহজ। মক্কাবাসীরা মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের সহিত যে শত্রুতা স্থাপন করিয়াছিল, তাহাও তাহারা উত্তমরূপে অবগত ছিল। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভ মক্কার কাফেরদের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। এই সকল চিন্তা ও উদ্বেগ কোরায়শদের ক্ষোভ আতঙ্ক অগ্নির মাঝে কেরোসিনের কাজ করিল। শিকড় জমাইয়া অজেয় হইবার পূর্বেই কাল বিলম্ব না করিয়া মুসলমান জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা উন্মাদ হইয়া উঠিল। এমনকি মদীনা আক্রমণে মুসলমানদিগকে তথা হইতে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় নানা রকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং উস্কানিমূলক কার্যে উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। কোরায়শদের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কত মারাত্মক ছিল, একটি নমুনা লক্ষ্য করুন-

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলমানগণ মক্কায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়াছিলেন। এখানেও তাঁহারা যেন আশ্রয় না পান, মক্কার দুরাচাররা সেই ফিকিরে লাগিয়া গেল। ইহার সুযোগ লাভের অবকাশও মদীনায় ছিল। এই সময় মদীনায় খাযরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী

মোশরেক ছিল। সমগ্র মদীনায় তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্ব মূহূর্তে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আবদুল্লাহই মদীনার শাসক ও প্রধান নিযুক্ত হইবে। অচিরেই তাহার শিরে পরাইবার জন্য রাজমুকুটও তৈয়ার হইতেছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় পদার্পণে ঐসব পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে স্বাভাবতই তাহার ক্রোধ পড়িয়াছে নবীজীর (সঃ) উপরে। এই সংবাদ কোরায়শদের অবিদিত ছিল না এবং তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেও মোটেই বিলম্ব বা ক্রুটি করিল না। তাহারা আবদুল্লাহ এবং তাহার দলস্থ মোশরেক-পৌত্তলিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে উত্তেজিত করিয়া আবদুল্লাহর নিকট গোপন পত্র প্রেরণ করিল। যাহার মর্ম এই ছিল–

"তোমরা (আমাদের ধর্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের পরম শত্রু ব্যক্তিকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল, না হয় তোমাদের দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথায় আমরা নিশ্চয় আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব এবং তোমাদের যুবক দলকে হত্যা করিব, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ছিনাইয়া নিয়া আসিব।"

আবদুল্লাহর নিকট এই পত্র পৌঁছিলে সে অতি উৎসাহী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহে তৎপর হইল এবং নবীজীর (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং আবদুল্লাহ এবং তাহার দলের লোকদের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি কোরায়শদের চাল তোমাদের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছ। তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, কোরায়শরা আক্রমণ করিলে তাহারা তোমাদের যে ক্ষতি করিবে– তাহাদের উস্কানিতে তোমরা যাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তাহার ফলে তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ক্ষতি তদপেক্ষা তিল পরিমাণও কম হইবে না। মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। অতএব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তোমাদেরই সেই পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনরা মারা পড়িবে। নবীজীর (সঃ) এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির প্রভাবে আবদুল্লার দলের মধ্যে মত পরিবর্তনের হিড়িক পড়িয়া গেল, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আবদুল্লাহও নীরব থাকিতে বাধ্য হইল।

কোরায়শদের এই সব ষড়যন্ত্র এবং উস্কানির মুখে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় বসিয়া থাকা নবীজীর (সঃ) পক্ষে সমীচীন ছিল– কোন পাগলও ইহা ভাবিতে পারে না। কর্তব্যের খাতিরেই নবীজীকে সক্রিয় হইতে হইল। অত্যাচারী জালেম শক্তিকে শক্তি দ্বারা বাধা দানের বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে বাধা দানকারীদের বাধা অপসারণে তাহাদিগকে দমাইবার জন্য শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রয়োগের নীতিতে নবী (সঃ) অগ্রসর হইলেন– ইহাই বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের লক্ষণ বটে। সসম্মানে জাতিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই নীতি অপরিহার্য। যত দিন না ইহাতে জয়লাভ হয় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনার জীবনে সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ হইলেন।

চির শত্রু মক্কার দস্যুদের উস্কানির প্রতিরোধে প্রথম প্রথম ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয়, যাহার ফলে বড় বড় যুদ্ধের সূচনা হইয়া পড়ে। নবীজীর (সঃ) দশ বৎসর জেহাদী জীবনের বেশীর ভাগ জেহাদ এই অনুক্রমেই ছিল।

এতদ্ভিন্ন ইহুদী জাতি, যাহারা স্বভাবতই ক্রুর কুটিল, তাহারাও ইসলামের উন্নতিতে এবং মদীনায় তাহাদের দীর্ঘ দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হইতে থাকায় সহাবস্থান চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কতিপয় জেহাদের সূচনা হয়। এইভাবে মদীনায় নবীজীর (সঃ) দশ বৎসরের জীবনে তাঁহাকে কতগুলি যুদ্ধ-জেহাদে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী আলোচনায় সেই সব জেহাদের বিবরণ এক বিশেষ অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। বাস্তবিকই তাহা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। মুষ্টিমেয় সংখ্যার জামাত অতি

নগণ্য সম্বল লইয়া যেভাবে বিদ্যুৎ গতিতে জয়লাভ করিয়া যাইতে থাকে, তাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, জেহাদগুলি প্রকৃতই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা ও ইসলামের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল।

মূল বোখারী শরীফে ৫৬৩ হইতে ৬৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেই সব জেহাদের বিবরণ বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উহার অনুবাদ রহিয়াছে এবং অধ্যায়টির ভূমিকায় জেহাদ সম্পর্কে এবং জেহাদে অবতরণের সূচনায় নবীজীর (সঃ) প্রজ্ঞাময় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে ঐ সব জেহাদের বিবরণদান অবশ্যই অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু আমাদের তৃতীয় খণ্ডে সেসব বিষয় সম্বলিত হাদীছের অনুবাদ হইয়া যাওয়ায় বর্তমান খণ্ডে আমরা আলোচনা হইতে বিরত হইয়াছি। আমরা হিজরী সালগুলির ঘটনাবলী আলোচনায় ঐ জেহাদসমূহের শুধু নাম উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধার করার জন্য পাঠক সমীপে অনুরোধ রহিল।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই সালে নবী (সঃ) তিনটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। অভিযানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল এবং নবী (সঃ) সঙ্গে থাকেন নাই। সর্বপ্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে, দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ওবায়দা ইবনুল হারেস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে, তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয় সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসর

এই বৎসর সর্বপ্রথম নবী (সঃ) স্বয়ং জেহাদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বপ্রথম অভিযান ছিল– গযওয়া আবওয়া বা ওদ্দান। পর পর এইরূপ আরও তিনটি অভিযান স্বয়ং নবী (সঃ) কর্তৃক পরিচালিত হয়– গাযওয়া বাওয়াত, গাযওয়া ওসায়রা ও গাযওয়া সাফওয়ান।

এই বৎসরই নবীজী (সঃ) মক্কার দস্যুদের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক রণকৌশল জোরদার করার জন্য আর একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মক্কা এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া শত্রুদের গমনাগমন ও তাহাদের খবরাখবর গোপনে অবগত থাকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে গোয়েন্দা দল প্রেরিত হয়।

কেব্‌লা পরিবর্তন

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলিয়াছেন–

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরাপুরিভাবে ইসলামের আওতাভুক্ত হও।"

পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ ঈমান-ইসলাম আন্তরিক বিশ্বাস ও দৈহিক আমল ভিন্ন আর একটি সূক্ষ্ম জিনিসের দাবী করে। সেই জিনিসটি হইল মানসিক পরিবর্তন। ঈমানে মোফাস্‌সাল কালেমার বিষয়বস্তুগুলির প্রতি অটুট বিশ্বাস স্থাপন এবং পূর্ণ শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম অনুযায়ী সমুদয় আমল সম্পাদন। এর পরেও পরিপক্ক ঈমান ইসলামের আর একটি দাবী থাকে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের তথা ইসলামী

শরীয়তের মানসিক গোলামী। অর্থাৎ নিজের মন-মানস চিত্ত ও অভিলাষকে আল্লাহ ও রসূলের পূর্ণ অনুগত বানাইয়া নেওয়া যে, ভিন্ন ধর্মীয়, ভিন্ন রীতির বা ভিন্ন পরিবেশের কোন প্রকার প্রভাব বা আকর্ষণ তাহার মানস অভিলাষকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করিতে না পারে। এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে এই হাদীছে উল্লেখ আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

অর্থ ঃ "তোমাদের কেহ পরিপক্ক ঈমানদার সাব্যস্ত হইবে না যাবত না তাহাদের মানস অভিলাষ পূর্ণ অনুগত হইয়া যায় ঐ জীবনব্যবস্থার, যাহা আমি বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছি।"

ছাহাবায়ে কেরামগণকে আল্লাহ তাআলা সর্বদিক দিয়া পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া পূর্ণ পরিপক্ক মোমেন-মুসলিমরূপে গড়িয়াছিলেন। ভীষণ দুর্যোগ দুর্ভোগের প্রলয়ঙ্করী কম্পন তাঁহাদের উপর বহাইয়া তাঁহাদের ঈমান ও ইসলামকে পরীক্ষা করা হইয়াছে–

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا -

অর্থ ঃ "দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও বিভীষিকাপূর্ণ নির্যাতন তাঁহাদিগকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

(কোরআন শরীফ)

অর্থ ঃ ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক হিজরতের দ্বারাও তাঁহাদের পরীক্ষা করা ইয়াছিল। এইভাবে ঈমান ও ইসলামের পরীক্ষার সেলসেলায় অনেক বিষয়ের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ছাহাবীগণের মানসিক পরিবর্তনের পরীক্ষাও করিয়াছেন। সব রকম পরীক্ষায়ই ছাহাবীগণ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তবেই ত তাঁহারা ইসলামের এত দূর উন্নতি সাধনে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আল্লাহর রসূল কর্তৃক তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শ হওয়ার যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ -

অর্থ ঃ "আমার ছাহাবীগণ (ইসলামের ও ঈমানের পথে দিশারী হওয়ায়) উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ, তাঁহাদের প্রতিজনের অনুসরণই তোমাদিগকে সত্য পর্যন্ত পৌঁছাইবে।"

মানসিক পরিবর্তনের পরীক্ষায় আল্লাহ তাআলা ছাহাবীগণকে কেবলার বিষয় দ্বারা একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে আগত মোহাজের মুসলমানগণ ইসলাম পূর্বকালে নিজেদেরকে কা'বা ঘরের পুরোহিত সেবাইত গণ্য করিয়া নানা কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা– তাহারা যে বহিরাগতকে বস্ত্র না দিবে সে কা'বার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ কার্য উলঙ্গ হইয়া সম্পাদন করিবে, হজ্জ আদায় করিতে তাহারা আরাফার ময়দানে যাইবে না ইত্যাদি।

কা'বা শরীফের ভক্তি ভাল জিনিস, কিন্তু সেই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বহু অনাচারজনিত পৌরোহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। আর মক্কাবাসীরা এই পৌরোহিত্য জিয়াইয়া রাখার স্বার্থে কা'বা গৃহের ভক্তিতে গদগদ ছিল।

মক্কাবাসী মুসলমানগণ যখন হিজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন তখন আল্লাহ তাআলা কা'বা শরীফের বিপরীত দিক বায়তুল মোকাদ্দাসের দিককে কেবলা বানাইবার আদেশ করিলেন। আল্লাহ পরীক্ষা করিতে চাহিলেন আল্লাহর আদেশে কা'বা ছাড়িয়া, কা'বার পুরোহিতরা কেবলা হওয়ার সম্মান তাহা অপেক্ষা কম মর্যাদার বায়তুল মোকাদ্দাসকে দিতে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হয় কিনা। দীর্ঘকালের পৌরোহিত্য আল্লাহর আদেশে এইভাবে ক্ষুণ্ন করিয়া রসূলের মারফত দেওয়া আল্লাহর আদেশকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়ার মানসিকতা কাহার ভিতরে কতটুকু সৃষ্টি হইয়াছে– তাহাই আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া নিতে চাহিলেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দীর্ঘ ১৬–১৭ মাস পর এই পরীক্ষার সমাপ্তিলগ্নে এই তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ -

অর্থ ঃ "মদীনায় আসিয়া যেই কেব্লার উপর আপনি থাকিলেন তাহার আদেশ একমাত্র এই উদ্দেশে করিয়াছিলাম যে, দেখিয়া নিব- কে রসূলের কথা মানে, কে ফিরিয়া থাকে।" (পারা- ২, রুকু- ১)

পরীক্ষাকাল ১৬ বা ১৭ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই উম্মতের জন্য স্থায়ী কেবলারূপে কা'বা শরীফের দিক নির্ধারিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে। কেবলা পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৩৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইসলামের প্রথম মহাসমর বদরের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

বদর জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই নবী (সঃ)-কে ছোট একটি অভিযানে যাইতে হয়। স্বয়ং নবীজী (সঃ) এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন; অভিযানটি গাযওয়া বনী সোলায়ম নামে অভিহিত।

তারপর "গাযওয়া ছবীক" নামে আরও একটি অভিযান এই বৎসরই পরিচালিত হয়। ঘটনা এই ছিল যে, বদর যুদ্ধে মক্কার কফেরদের শোচনীয় পরাজয় হইল। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষা নিয়া বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। অথচ আবু সুফিয়ান তাহার কাফেলাসহ নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিল আর মক্কার সর্দাররা রণাঙ্গনে নিহত হইল। পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিল, সে স্ত্রী সঙ্গম করিবে না যাবত না মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হইতে প্রতিশোধ লয়।

সেমতে আবু সুফিয়ান দুই শত লোক লইয়া গোপনে মদীনার নিকট অবতরণ করিল এবং ইহুদীদের সাহায্যে দুই জন মদীনাবাসী মুসলমানকে হত্যা করিয়া লুকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেল এবং রসূলল্লাহ (সঃ) স্বয়ং তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য দ্রুত অভিযান চালাইলেন। আবু সুফিয়ান পূর্বেই পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইল। (বেদায়া, ৩-৩৪৪)

এই বৎসরই নবীজীর (সঃ) কন্যা রোকাইয়্যা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, যিনি ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিবাহে ছিলেন। নবীজীর (সঃ) জ্যেষ্ঠা কন্যা যয়নব (রাঃ)- যিনি এত দিন মক্কায়ই ছিলেন, এই বৎসরই তিনি মদীনায় পৌঁছেন। এই বৎসরই ফাতেমা (রাঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আসেন; বিবাহের আক্দ পূর্বের বৎসরই হইয়াছিল। (বেদায়া ৩-৩৪৬)

হিজরী তৃতীয় বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকে ছোট দুইটি অভিযান চালাইতে হয়- গাযওয়া নজদ বা জী আমর এবং গাযওয়া ফুরু।

ইতিমধ্যেই নবীজী (সঃ) এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন- এত দিন বহির্শত্রুর সহিত সংগ্রাম ছিল। এইবার মদীনার অভ্যন্তরে প্রকাশ্য শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া গেল। মদীনার প্রভাবশালী শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায় সহাবস্থান ও শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহ এবং নানা প্রকার উস্কানিমূলক উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ ধনবান গোত্র ছিল বনী কায়নুকা, তাহারা স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিল। সর্বপ্রথম এই গোত্রই বিদ্রোহ করে; নবী (সঃ) সাফল্যজনকভাবে তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন। তারপরেই ইহুদীদের আর এক প্রভাবশালী গোত্র বনু নজীর বিদ্রোহ করিল। তাহাদের বিরুদ্ধেও নবী (সঃ) সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে সফল হইলেন। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ হিজরী চতুর্থ বৎসরে হইয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিদ্রোহ দুইটির বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

এই আভ্যন্তরীণ বিপদের ভিতর দিয়াও নবী (সঃ) বহির্শক্রর প্রধান কোরায়শদেরকে শায়েস্তা করার এবং তাহাদিগকে দমাইয়া রাখার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা– তাহাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক অবরোধ অব্যাহত রাখেন। সেই সেলসেলায় নবীজীর (সঃ) পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে সাফল্য লাভ হয়।

এরই মধ্যে ইহুদীদের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমাইবার ব্যবস্থায় নবী (সঃ) অধিক সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের ধনকুবের কা'ব ইবনে আশরাফ নামীয় ব্যক্তি বিদ্রোহ উস্কাইয়া রাখিতে অত্যধিক তৎপর ছিল এবং মুসলিম জাতির ধ্বংসকল্পে তাহার সমুদয় ধনশক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়োজিত রাখিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে তাহাকে হত্যা করাইতে নবী (সঃ) সফল হইলেন।

এই শ্রেণীর আরও এক ইহুদী সওদাগর ছিল আবু রাফে। ধনশক্তি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত সওদাগরী সূত্রে তাহার বৈদেশিক খ্যাতি, পরিচয় ও মিত্রতা অনেক ছিল। সেও তাহার সমুদয় শক্তি-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল। রক্তপাতহীন ব্যবস্থায় তাহাকেও হত্যা করাইতে নবীজী (সঃ) সফল হইলেন।

ইতিমধ্যে ভীষণ বিপদের কালো মেঘ মদীনার মুসলমানদেরকে ঘিরিয়া ধরিল। মক্কার মোশরেকেরা সর্বশক্তি একত্র করিয়া বদর সমরের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশে তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়া মদীনার শহরতলীতে পৌছিল এবং ইসলামের দ্বিতীয় মহাসমর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহুদের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইল যাহার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই শেষ ভাগে (কাহারও মতে হিজরতের চতুর্থ বৎসর) মক্কার অনতিদূরে রাজী নামক এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

এই বৎসর ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত নবী (সঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল। এই বৎসরই হাসান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিজরী চতুর্থ বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকেই বনু আসাদ নামীয় একটি পৌত্তলিক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিল। তাহাদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে সেই সংবাদ পৌছাইল। নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু সালামা (রাঃ)-কে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই গোত্রের প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন; শত্রুরা পলায়ন করিল।

এই বৎসরের প্রথম ভাগে আর একটি দুঃখজনক ঘটনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত অনেক জন বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহা বীরে মাউনার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এই বৎসরই স্বয়ং নবী (সঃ) আর একটি অভিযানে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন; যাহা গাযওয়া জাতুর রেকা নামে প্রসিদ্ধ। (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

এই বৎসরই ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসরই নবী (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে বিবাহ কলিয়াছিলেন।

হিজরী পঞ্চম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা হইল ইসলামের বৃহত্তম মহাসমর খন্দকের জেহাদ। তৃতীয় খণ্ডে সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী তাহার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মহাসমর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মদীনার সর্বশেষ ইহুদী

গোত্র নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতক বনু কোরায়যাকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান পরিচালিত হয়। তাহার বিবরণও তৃতীয় খণ্ডে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকের মতে এই বৎসরই নবী (সঃ) মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবু সুফিয়ান তনয়া উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হন নাই, উম্মে হাবীবা (রাঃ) মুসলমান ছিলেন এবং নিজ স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিধবা হইয়া পড়েন। তিনি আবিসিনিয়ায় থাকাবস্থায়ই হযরত নবী (সঃ) তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং সেই দেশের বাদশার ব্যবস্থাপনায় বিবাহ সম্পন্ন হইল। এমনকি বাদশাহ নিজেই তাঁহার মহরানা চারি হাজার দেরহাম আদায় করিয়া দিলেন। বিবাহ সম্পাদনেও বাদশাহই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উকিল ছিলেন। বিবাহ সম্পাদনের পরে তাঁহাকে শোরাহ্‌বীল ইবনে হাসানা (রাঃ) ছাহাবীর তত্ত্বাবধানে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। (বেদায়া ৩-১৪৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত এই বিবাহের ইঙ্গিত বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছিল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ـ

"অচিরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভালবাসার একটি সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

মুসলমানদের সর্বপ্রধান ও সর্বেসর্বা ছিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ)। আর মুসলমানদের তৎকালীন প্রধান শত্রু পক্ষ মক্কার কোরায়শদের সর্দার ও সেনাপতি ছিলেন আবু সুফিয়ান। নবীজী (সঃ) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই বিবাহ সূত্রে শ্বশুর জামাতার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়া গেল। আবু সুফিয়ানের কন্যা মুসলমান জাতির মাতা হইয়া গেলেন। (বেদায়া, ১-১৪৩)

এই বৎসরই নবী (সঃ) যয়নব (রাঃ)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ শুধু আল্লাহর আদেশেই হয় নাই, বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতার মাধ্যমে এই বিবাহ সম্পাদনকারী ছিলেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের আয়াত-

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا ـ

অর্থ ঃ "যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়াই বিবাহ সম্পাদন ছিল।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যয়নব (রাঃ) (যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার পর তিনি) যখন ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিলেন, তখন নবী (সঃ) ঐ যায়েদ (রাঃ)-কেই বলিলেন, তুমি যাইয়া যয়নবকে আমার বিবাহের প্রস্তাব জানাও। সেমতে যায়েদ (রাঃ) যয়নবের নিকটে আসিলেন; তখন যয়নব (রাঃ) রুটি পাকাইবার জন্য আটা তৈয়ার করিতেছিলেন (ঐ সময় পর্দার মাসআলা ছিল না)।

(যয়নব (রাঃ) যায়েদেরই দীর্ঘ দিনের স্ত্রী ছিলেন; তবুও যায়েদ (রাঃ) বলেন-) আমার অন্তরে যয়নবের সম্মান ও শ্রদ্ধার এত বড় ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলাম না এই কারণে যে, নবী (সঃ) তাঁহাকে বিবাহে গ্রহণ করার আলোচনা করিয়াছেন। সেমতে আমি তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ দানে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বলিলাম, আপনি মহাসুসংবাদ গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়া পাঠাইয়াছেন।

যয়নব (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছু করিব না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নামায কক্ষে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল

হইয়া গিয়াছে যাহাতে আল্লাহ তাআল্লা বলিয়াছেন– "যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি যয়নবকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নবের কক্ষে অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই তশরীফ নিয়া গেলেন। অতপর বিবাহের ওলীমা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে দাওয়াত করিলেন। (মুসলিম শরীফ, বেদায়া ৩–১৪৬)

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে বর্ণিত আছে, যয়নব (রাঃ) নবীজীর (সঃ) স্ত্রীগণের উপর গর্ব করিয়া বলিতেন, আপনাদের বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন আপনাদের আত্মীয়গণ। পক্ষান্তরে আমার বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে।

এই বিবাহের ওলীমা লগ্নেই পর্দা ফরয হওয়ার আদেশ কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হিজরী ৬ষ্ঠ বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা জী-কারাদের অভিযান। এই অভিযানের সূচনায় অতি মজার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে রহিয়াছে। ১১৫০৭নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা গযওয়া বনী মোস্তালেক বা মোরায়সী অভিযান। এই জেহাদটির তারিখ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রাঃ) দুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন– হিজরী চতুর্থ বৎসরে হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে এবং ষষ্ঠ বৎসরের অভিমতই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন।

"খোযাআ" গোত্রের একটি শাখা বংশ বনী মোস্তালেক; "মোরায়সী" নামক একটি ঝর্ণার নিকট খোযাআ গোত্রের বস্তি ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই মর্মে সংবাদ পাইলেন যে, বনী মোস্তালেকদের সর্দার হারেস লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতেছে মদীনা আক্রমণ করার জন্য। নবী (সঃ) একজন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিয়া সংবাদটির বাস্তবতা তদন্ত করাইলেন। সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হইল; তাই নবী (সঃ) তাহার প্রতিকারে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই শত্রু দল পরাজিত হইল; অনেকে পলাইয়া গেল এবং বহু সংখ্যক বন্দী হইল।

বন্দীদের মধ্যে বংশপতি হারেসের দুহিতা "জোআয়রিয়া"ও ছিল। জোআয়রিয়া নবীজীর (সঃ) শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলেন এবং নিজের পরিচয়ও দিলেন যে, আমি বংশের সর্দার হারেসের কন্যা। তাঁহার অবস্থাদৃষ্টে নবীজীর (সঃ) মহানুভব অন্তর দয়ায় উথলিয়া উঠিল। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে চির গৌরবের আশ্রয় দানে চরম ভাগ্যবতী বানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে নিজ দাম্পত্যে স্থান দান করিয়া বিশ্ব মুসলিমের জননী বানাইয়া দিলেন।

এই জেহাদে মোস্তালেক বংশের অনেক নর-নারী বালক-বালিকা বন্দী হইয়া আসিয়াছিল। অবিলম্বে মদীনায় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, নবীজী (সঃ) এক মহা উদারতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, বিজিত বনী মোস্তালেক বংশের সর্দার হারেসের বন্দিনী দুহিতার পাণি গ্রহণে তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন। তখন মুসলমানগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বনী মোস্তালেক বংশের লোকগণ এখন হযরতের শ্বশুরকুল, সুতরাং ইহাদিগকে আর দাস-দাসীরূপে রাখা সঙ্গত হইতেছে না। নবীজীর (সঃ) সহধর্মিণী মাত্রই মুসলমানদের মাতা, অতএব জননী জোআয়রিয়ার বংশের সমস্ত লোকই এখন মুসলমানদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন। মদীনার মুসলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া বনী মোস্তালেকের সমস্ত বন্দী দাস-দাসীদেরকে মুক্তি দিয়া দিলেন।

এই অভিযান কতিপয় ঘটনার দরুন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হাদীছে তফসীরে এবং ইতিহাসে ঐসব ঘটনার আলোচনায় এই অভিযানের উল্লেখ আসিয়া থাকে।

প্রথম ঘটনা ঃ মদীনার অধিবাসীদের একটি শ্রেণী ছিল মোনাফেক– কপট মুসলমান। বস্তুতঃ তাহারা

ইসলাম ও মুসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু আতঙ্ক, স্বার্থ-লোভ কিম্বা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং মুসলমানদের দলে মিশিয়া থাকে।

আলোচ্য অভিযানে ঐ শ্রেণীর শয়তানদের বড় সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যোগদান করিয়াছিল। মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা, মোহাজের ও আনসারগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া ইত্যাদি শত্রুতামূলক কাজের সুযোগ সন্ধানে তাহারা সদা তৎপর থাকিত। এ অভিযানে একদা পানি সংগ্রহ করিতে ভিড় হয় এবং একজন মোহাজের ও একজন আনসারের মধ্যে বিবাদ হয়। সেই সুযোগে মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ উস্কানি এবং উত্তেজনামূলক কথাবার্তা ছড়াইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে তাহার দলের কতিপয় লোক সমবেত ছিল। তাহাদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান এক যুবক যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে মোনাফেক আবদুল্লাহ মোহাজেরগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর প্রাধান্য এবং প্রাবল্য দেখায়। তাহাদের ও আমাদের অবস্থা ঐ প্রবাদের ন্যায়– "কুকুরকে মোটা-তাজা বানাও যেন সে তোমাকে খায়।" এই বিদেশীদেরকে তোমরা এক দানা দ্বারাও সাহায্য করিও না; বাধ্য হইয়া তাহারা এদিক সেদিক চলিয়া যাইবে। এইবার মদীনায় যাইয়া দেশবাসী শক্তিশালীরা বিদেশী দুর্বলদের নিশ্চয় বাহির করিয়া দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কথাবার্তা বলিল এবং লোকদিগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিল।

তাহার এইসব কথাবার্তা খাঁটি মুসলমান যুবক যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) শুনিলেন এবং নবীজীর গোচরে আনিলেন। নবীজীর (সঃ) নিকটে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোনানেফ আবদুল্লাহকে হত্যা করার মত প্রকাশ করিলেন। নবী (সঃ) ওমরকে বরিলেন, তাহাকে হত্যা করিলে লোকেরা বলিবে, মুহাম্মদ তাঁহার দলের লোকদেরকেও হত্যা করেন (আবদুল্লাহ ত প্রকাশ্যে মুসলমান দলভুক্ত ছিল)।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এই সংবাদ অবগত হইল যে, তাহার কথাবার্তা নবীজীর গোচরে আসিয়াছে। তখন সে নবীজীর (সঃ) নিকট আসিয়া কসম করিয়া ঐসব কথা অস্বীকার করিল এবং বলিল, সে ঐরূপ কথা মুখেও আনে না। উপস্থিত কেহ কেহ নবীজী (সঃ)-কে প্রবোধ দিল যে, যায়েদ ইবনে আরকাম যুবক ছেলে; হয়ত সে বুঝিতে ভুল করিয়াছে। মোনাফেক আবদুল্লাহ অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিল।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহর এই জঘন্য ভূমিকা ও কথাবার্তার বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে ২৮ পারায় "মোনাফেকুন" নামের সূরাটি নাযিল হইল। ঐ সূরায় পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

"মোনাফেকেরা আপনার সম্মুখে আসিলে বলে, আমরা মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দেই– নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ ত জানেন, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন– মোনাফেকেরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী (তাহারা অন্তরে কখনও আপনাকে আল্লাহর রসূল মান্য করে না)। তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে নিজেদেরকে রক্ষা করিয়া লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন হইতে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। তাহাদের কার্যকলাপ নিতান্তই জঘন্য। তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করার পর সেই মুখেই আবার কুফরী কথা বলে; ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগিয়া গিয়াছে; তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি আপনাকেও আকৃষ্ট করে, তাহাদের মিষ্ট কথা আপনারও ভাল লাগে (কিন্তু তাহাদের এই আকৃতি ও কথার মূলে কোন শক্তি নাই) তাহদের অবস্থা ঐ থামগুলির ন্যায়, যেইগুলি মাটিতে প্রোথিত নহে– শুধু হেলান দিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। (ঐগুলি যতই মোটা-মজবুত হউক, কিন্তু প্রোথিত না হওয়ায় কোন শক্তি নাই; মোনাফেকদের ভাল আকৃতি ও মিষ্ট কথার অবস্থাও তদ্রূপই। যেহেতু তাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাই) তাহারা সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। তাহারা নিছক শত্রু; তাহাদের হইতে সদা সর্তক থাকিবেন। আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করুন; তাহারা কিভাবে উল্টা পথে চলে।"

এই ভূমিকা বর্ণনার পর আলোচ্য ঘটনায় আবদুল্লাহর বিষাক্ত উক্তিগুলিও আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায়

বর্ণনা করিয়াছেন– যাহা যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ কসম খাইয়া অস্বীকার করিয়াছিল।

উক্ত সূরা নাযিল হইলে পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছেন।

এখন আবদুল্লাহর ভূমিকা পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার এক ছেলে ছিলেন খাঁটি মুসলমান, তাঁহার নামও আবদুল্লাহ। তিনি নবীজীর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এইরূপ শুনা যায় যে, আপনি মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করার চিন্তা করিতেছেন; যদি তাহাই হয় তবে আমি তাহার মুণ্ডু কাটিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করি। অন্য কেহ হত্যা করিলে হয়ত মানবীয় স্বভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমি জাহান্নামী হইতে পারি। রসূলুল্লাহ (সঃ) পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, যত দিন সে আমাদের জামাতে মিশিয়া আছে, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই অভিযানে আর একটি ঘটনা এমন ঘটাইল যাহা তাহার জীবনের সমস্ত অপকর্ম ছাড়াইয়া গেল।

এই ভ্রমণে নবীজীর (সঃ) সহিত মুসলিম জননী আয়েশা (রাঃ)ও ছিলেন। খবিস মোনাফেক আবদুল্লাহ জঘন্য ষড়যন্ত্ররূপে জাতির জননী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নামে মিথ্যা অপবাদ গড়িয়া লোকদের মধ্যে তাহার চর্চা করিল। ইহাতে এক মহা বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। অবশেষে পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ বয়ান অবতীর্ণ হইয়া মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্রতা প্রমাণ করিল।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ বর্ণনা বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনশাআল্লাহু তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ফযিলত পরিচ্ছেদে উহার অনুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

আলোচ্য বৎসরের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল "হোদায়বিয়ার সন্ধি"। এই সন্ধির ফলেই মুসলিম জাতি সর্বপ্রথম নিজস্ব সত্তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে এবং ইসলামের জন্য অগ্রাভিযানের সুযোগ লাভ হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার জেহাদ" শিরোনামে ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

হিজরী সপ্তম বৎসর

নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্মতৎপরতা হিজরতের পরবর্তী বৎসরগুলিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে চলিতেছিল। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরের যিলহজ্জ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করিয়া নবীজী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সন্ধির দরুন মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ হইতে অবকাশ পাইয়াছেন। এই অবকাশে কালবিলম্ব না করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের আহ্বান ছড়াইয়া দেওয়ার এক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিশ্বের বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজন্যবর্গের প্রতি, বিভিন্ন গোত্রপতি, সমাজপতি এবং বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দূত মারফত ইসলামের আহ্বানে সীলমোহরকৃত লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

একদা নবী (সঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, আগামীকল্য সকাল বেলা তোমরা সব আমার সহিত একত্রিত হইবে। সেমতে পরবর্তী দিন ফজরের নামাযে সকলে বিশেষভাবে উপস্থিত হইলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি ফরয নামাযান্তে কিছু সময় তসবীহ পড়া ও দোয়া করায় মগ্ন থকিতেন। আজ সেই নিয়ম পালন পরে উপস্থিত ছাহাবীবর্গের প্রতি ফিরিয়া মিম্বর পরে দাঁড়াইলেন এবং ভাষণ দানে আল্লাহ তাআলার গুণগান ও প্রশংসা করিয়া সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, আমি তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে বহির্বিশ্বের রাজ-রাজড়াদের প্রতি প্রেরণ করার ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা আমার কথার ব্যতিক্রম করিবে না। আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কর্তব্য

পালন করিয়া যাইবে। জনগণের কোন দায়িত্ব কাহারও উপর ন্যস্ত করা হইলে যদি সে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা না করে, তবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন।

তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যে যাইবে এবং ঐরূপ করিবে না যেরূপ করিয়াছিল ঈসা আলাইহিস সালামের প্রেরিত দূত বনী ইসরাঈলগণ। তাহারা নবীর কথার ব্যতিক্রম করিয়াছিল; নিকটবর্তী স্থানে পৌছিয়াছিল, কিন্তু দূরবর্তী স্থানে যায় নাই।

ছাহাবীগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদিগকে যেকোন আদেশ করেন, যেকোন দেশে প্রেরণ করেন– আমরা আপনার কথার ব্যতিক্রম কখনও করিব না। তখন নবী (সঃ) এক একজনকে একজনের নিকট প্রেরণের জন্য নির্ধারিত করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্তব্য দেশের ভাষাও শিক্ষা করিয়া নিলেন। (তাবাকাত, ১–২৭৪, ৩–২৬৮)

সেমতে ঐ যিলহজ্জ মাসের পরবর্তী সপ্তম বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই নবীজী (সঃ) তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের ছয় জন সম্রাটের প্রতি লিপি লিখিলেন এবং ছয় জন দূত একই দিনে প্রেরণ করিয়া এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করিলেন।

১। সর্বপ্রথম দূত আম্‌র ইবনে উমাইয়া (রাঃ); তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে নবীজী (সঃ) দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন– একখানা পত্রে ইসলামের আহ্বান এবং পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত লিখিয়াছিলেন। বাদশাহ এই লিপিখানা হস্তে ধারণ পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত উভয় চোখে স্পর্শ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর কালেমা শাহাদত পাঠে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আক্ষেপের সহিত বলিলেন, সক্ষম হইলে অবশ্যই আমি নবীজী (সঃ) সমীপে উপস্থিত হইতাম।

অপর পত্রে লিখিয়াছিলেন, মক্কা হইতে যাঁহারা হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ার আশ্রয় নিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য। এই পত্রের আদেশও তিনি উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। দুইটি নৌকাযোগে তিনি তথাকার প্রবাসী ৮০ জন নারী-পুরুষ মুসলমানকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দলপতি জাফর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্তে নবীজী (সঃ) সমীপে লিপির উত্তরও পাঠাইয়াছিলেন– তাহাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিখিয়াছিলেন। (ঐ ২৫৯)

২। তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তি রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন দেহইয়া কল্‌বী (রাঃ) মারফত। এই লিপির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে রহিয়াছে।

৩। তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তির দ্বিতীয় পারস্য সম্রাটের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ) মারফত। লিপির মর্ম ছিল–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِسَ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا اَسْلِمْ تَسْلَمْ فَاِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ ۔

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের তরফ হইতে পারস্য প্রধান কেসরার নিকট– সালাম তাহাকে যে সত্যের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে বিশ্বাস করে। আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহর রসূল সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি– সকল জীবন্তদিগকে সতর্ক করার জন্য। ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তিতে থাকিবেন, যদি আপনি ইসলামকে অস্বীকার করেন তবে আপনার প্রজা সমস্ত অগ্নিপূজকরাই অস্বীকার করিবে, ফলে সকলের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন। (সীরাতুন নবী)

মহাপ্রতাপশালী পারস্য সম্রাট– যাহাকে তাহার প্রজা ও অধীনস্থগণ পূজনীয় প্রভু গণ্য করিত এবং সকলেই তাহার সম্মুখে অবনত মস্তকে সেজদা করিয়া থাকিত; তাহার নিকট কেহ কোন লিপি পেশ করিলে তাহাতে সর্বপ্রথম সকলের উপর তাহার নাম লেখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাহার নামের পূর্বে কোন কিছু লেখা মহা অপরাধ গণ্য করা হইত। সেমতে এই লিপিতে যখনই সে দেখিল, তাহার নামের উপরে প্রথম আল্লাহর নাম তার পর আবার মুহাম্মদ নাম। তখনই সে ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

দূত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সঃ)-কে তাঁহার লিপি ছিঁড়িয়া ফেলার সংবাদ পৌঁছাইতেই নবী (সঃ) আল্লাহর হুজুরে নিবেদন করিলে ان يمزقوا كل ممزق "আয় আল্লাহ! তাহারা যেন টুকরা টুকরা হইয়া যায় যেরূপ আমার লিপিকে টুকরা টুকরা করিয়াছে।" বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

ক্রোধে আত্মহারা সম্রাট ইতিমধ্যেই তাহার অধীনস্থ ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তা বাযানকে ফরমান পাঠাইল– অবিলম্বে আরবের নবুয়তের দাবীদার মুহাম্মদকে গ্রেফতার করিয়া আমার দরবারে হাযির কর। আদেশ পাওয়া মাত্র বাযান গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ দুই জন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মদীনায় পৌঁছিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বাযানের গ্রেফতারী পরোয়ানার লিপি অর্পণ করিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) লিপির মর্মে মুচকি হাসি হাসিলেন এবং আগন্তুকদ্বয়কে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (সঃ) যখন কথা বলিতেছিলেন তখন তাহাদের বুক থর থর কাঁপিতেছিল। নবীজী (সঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, আমার বক্তব্য আমি আগামীকল্য বলিব।

দ্বিতীয় দিন তাহারা নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের প্রেরক বাযানকে সংবাদ দাও যে, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহার প্রভু সম্রাটকে গত রাত্রির সাত ঘণ্টা অতিক্রান্তের পর মারিয়া ফেলিয়াছেন। সম্রাটের পুত্রকেই আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি লেলাইয়া দিয়াছেন। পুত্র তাহার পিতা সম্রাটকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা চলিত জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রের ঘটনা। তাহারা উভয়ে ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাযানকে ঐ সংবাদ পৌঁছাইলে বাযান এবং ইয়ামানে উপস্থিত তাঁহার পরিবারবর্গ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২৬৯)

৪। মিসরীয় কিবতী জাতির খৃস্টান শাসনকর্তা মোকাওকাসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন হাতেব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) মারফত। সে নবীজীর (সঃ) দূতকে সম্মান করিয়াছে, যথাসত্বর সাক্ষাত দান করিয়াছে, নবীজীর লিপিকে অতিশয় সম্মান করিয়াছে; একটি হস্তি দাঁতের কৌটায় হেফাযতের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছে। নবীজীর (সঃ) জন্য মূল্যবান হাদিয়া–উপঢৌকনও পাঠাইয়াছিল; এই উপঢৌকনের মধ্যে ছিল কতিপয় দুষ্প্রাপ্য শ্বেত বর্ণের অশ্বতরী দুলদুল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শনে মোকাওকাস কোন ত্রুটি করে নাই। সে শ্রদ্ধার সহিত নবীজীর লিপির উত্তরও দিয়াছে। উত্তরে সে প্রকাশ করিয়াছে– আমি জানিতাম, একজন নবীর আবির্ভাব বাকী রহিয়াছে; আমার ধারণা ছিল তাঁহার আবির্ভাব সিরিয়া হইতে হইবে।

মোকাওকাস ইসলাম গ্রহণ করে নাই। নবী (সঃ) নিজ উদারতা ও আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে তাহার উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসন্তুষ্টির সহিত বলিয়াছিলেন, রাজত্বের লালসা তাহাকে ইসলাম হইতে বঞ্চিত রাখিল, অথচ তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব নাই। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২৬০)

মোকাওকাস খৃস্টান ছিল, কিন্তু সে নবীজীর লিপিখানা সুরক্ষিতরূপে রাখিয়াছিল। দীর্ঘকাল তাহা

রাজভাণ্ডারে সযত্নে সুরক্ষিত ছিল। এমনকি এই যুগেও তাহা মুসলমানদে হস্তগত হইয়া কপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হইয়াছে। বরকতের জন্য আমরা উহার ফটো ব্লক ছাপাইয়া দিলাম।

১৮৪০ ইং মোতাবেক ১২৬০ হিজরীর দিকে তুরস্কের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ খান। তখন মক্কা-মদীনাসহ হেজায এলাকা তুরস্কের শাসনেই ছিল। নবীজীর রওজা পাকের সবুজ গুম্বজসহ বর্তমান মসজিদে নববীর সম্মুখ ভাগ সুলতান আবদুল মজিদ খানের নির্মিত। সেই সুলতান আবদুল মজিদ খানের আমলের ঘটনা-

ফ্রান্সের একজন পর্যটক মিসরস্থ কিবতিয়া শহরে পৌঁছিলেন। তথায় খৃস্টানদের বড় একটি গির্জা ছিল; উক্ত গির্জার প্রধান যাজক পাদ্রীর নিকট ঐ লিপি মোবারক সুরক্ষিত ছিল। পর্যটক খোঁজ পাইয়া পাদ্রী হইতে তাহা ক্রয় করিয়া আনেন এবং সুলতান আবদুল মজিদ খান সমীপে উপহাররূপে উপস্থিত করেন।

তুরস্কের রাজভাণ্ডারে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কতিপয় বরকতপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন সুরক্ষিত আছে। সুলতান আবদুল মজিদ খান (রঃ) এই মহামূল্যবান লিপি মোবারকও তাহাতে শামিল করিয়া রাখেন। কোন মহামতি ব্যক্তির সৌজন্যে সেই মহামোবারক লিপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হয়।

কালের আবর্তনে লিপির কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে মনে হয় এবং লিপির গায়ে দাগ ও রেখা সৃষ্টি হইয়াছে। চেষ্টা করিলে উক্ত দাগ ও রেখামুক্ত ফটো ব্লক তৈয়ার করা সম্ভব হইত, কেহ কেহ সেইরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মূল বস্তুর অবিকল ছাপ গণ্য হয় না। তাই আমরা সেই চেষ্টায় অগ্রসর হই নাই।

ঢাকা লালবাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গে তথা কিল্লার ভিতরে শাহী আমলের যে মসজিদ আছে সেই মসজিদ হইতে এই মহাসওগাত লাভ করা হইয়াছে।

লিপির ছবিখানা নিম্নরূপ
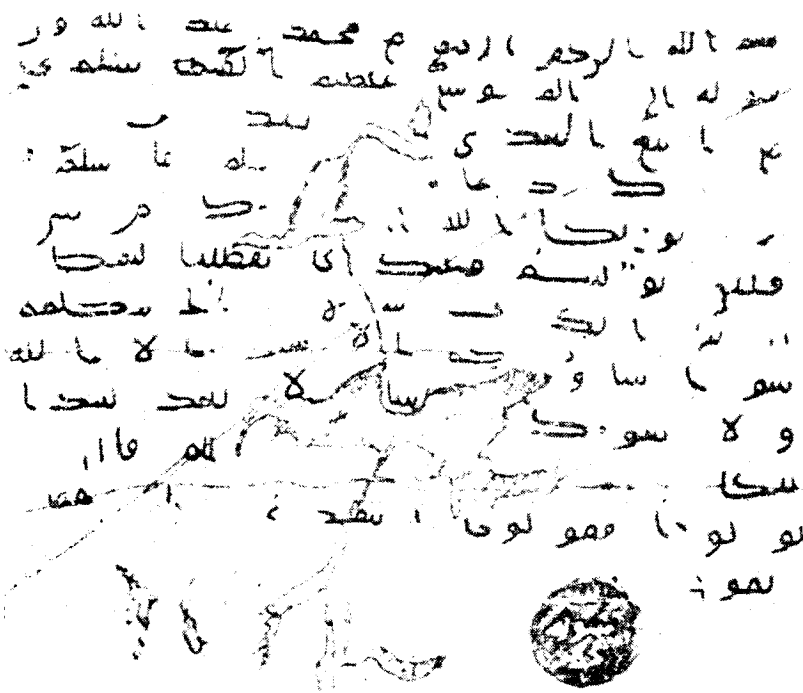
বর্তমান আরবিয় বর্ণমালায় লিপিখানার বিষ বস্তু এই –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الْمُقَوْقَسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبْطَ ـ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহীম–

আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে কিব্‌তী প্রধান মোকাওকাসের নিকট– সত্যের যে অনুসরণ করে তাহার প্রতি সালাম। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকিতে পারিবেন; আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ইসলাম হইতে আপনি ফিরিয়া থাকিলে কিব্‌তী জাতির উপর যে বিপদ আসিবে সেই জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঐকমত্যের কথাটি বাস্তবায়িত করার প্রতি আসিয়া যাও– তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভুর মর্যাদা দিব না। যদি তোমরা একত্ববাদ বাস্তবায়িত করা হইতে ফিরিয়া থাক তবে সাক্ষী থাকিও– আমরা এক আল্লাহর সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।

৫। রোমের আশ্রিত রাজ্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেসগাস সানীর নিকটও নবী (সঃ) লিপি শুজা ইবনে ওহ্‌ব (রাঃ) ছাহাবী মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বেদায়াহ, ৩–৬৮) প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সিরিয়াস্থ ইলিয়া শহরে আগমনের যে উল্লেখ রহিয়াছে– সেই আগমন উপলক্ষে রোম সম্রাটের আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনায় তখন মোনযের ইবনে হারেস অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত ছিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শাসনকর্তা হারেসের সাক্ষাতের জন্য পৌঁছিলাম এবং ২/৩ দিন অপেক্ষারত থাকিলাম। তাহার এক গৃহরক্ষী ছিল রোমান বংশীয়, তাহার নাম "মোরী"। সে আমাকে বলিল, অমুক অমুক বিশেষ দিন ছাড়া হারেসের সাক্ষাত হইবে না। আমি অপেক্ষায় থাকিলাম। মোরীর সহিত আমার বেশ সম্পর্ক হইয়া গেল। সে আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরে আমি নবীজীর (সঃ) গুণাবলী বর্ণনা করিতাম এবং তিনি যেই ধর্মের আহ্বান করিয়া থাকিতেন সেই ধর্ম ইসলামের বয়ানও তাহার নিকট করিতাম। মোরী আমার বক্তব্য শ্রবণে অত্যধিক মোহিত হইত, এমনকি কাঁদিয়া অস্থির হইয়া যাইত আর আমাকে বলিত, "আমি ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করিয়া থাকি! তাহাতে এই নবীর গুণাবলীর উল্লেখ ঠিক এইরূপই পাইয়া থাকি। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অবশ্য আমি ভয় করি, মোনযের ইবনে হারেস জানিতে পারিলে আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে।" মোরী আমাকে অত্যধিক সম্মান করিত এবং যত্নের সহিত আতিথেয়তা করিত।

একদা শাসনকর্তা হারেস রাজমুকুট পরিধানে দরবারে বসিল এবং আমাকে সাক্ষাত দানের সময় দিল। আমি উপস্থিত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপিখানা তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। লিপির বিষয়বস্তু ছিল এই–

سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِهٖ وَادْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ يَبْقٰى مُلْكَكَ۔

অর্থ ঃ "সালাম তাহার প্রতি যে সত্যের অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি আপনাকে আহ্বান জানাই, আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করুন যিনি এক– তাঁহার কোন শরীক নাই; আপনার রাজত্ব অটুট থাকিবে।" (বেদায়া, ৩–২৬৮)

সে লিপি পাঠ করিয়া ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, এমন কে আছে যে আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে পারে? আমি অভিযান চালাইব এবং সে সুদূর ইয়ামানে থাকিলেও তাহাকে পাকড়াও করিয়া আনিব। এখন হইতে লোক-লস্কর একত্রিত করা হইবে। ঐ দরবারে বসা অবস্থায়ই সে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিল এবং তথা হইতে উঠিয়া যুদ্ধের অশ্বসমূহের পায়ে নাল লাগাইয়া প্রস্তুত করার আদেশ জারি করিয়া দিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বলেন, সে যুদ্ধের এইসব তৎপরতা ও প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া আমাকে বলিল, তোমার গুরুকে এই সমাচার অবগত কর। শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেস রোম সম্রাটের নিকটও পত্রযোগে আমার বিষয় এবং যুদ্ধের জন্য তাহার প্রস্তুতির সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রোম সম্রাটের অবস্থা ত ৬নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, সে নবীজীর (সঃ) বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্বদানে ভাবাবেগে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব রোম সম্রাট তাহাকে পত্রের উত্তরে সতর্ক করিয়া দিল যে, ঐ নবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে না; তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপরতা বন্ধ কর, আর ইলিয়া শহরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর।

শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেসের নিকট যখন রোম সম্রাটের এই উত্তর পৌঁছিল তখন সে দমিয়া গেল। সে আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমার গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তনে কোন্ দিন যাত্রা করিবেন? আমি বলিলাম, আগামীকল্য। মোনযের তৎক্ষণাত আমাকে একশত তোলা স্বর্ণ এবং যাতায়াত ব্যয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার আদেশ করিল। আর মোরীকে আদেশ করিল, আমার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য।

মোরী আমার মারফত নবীজী (সঃ)-এর সমীপে সালাম আরজ করিলেন। আমি নবীজীর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোনযের ইবনে হারেসের সমুদয় সংবাদ অবগত করিলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, তাহার রাজত্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী। আর নবী সমীপে মোরীর পক্ষ হইতে সালাম নিবেদন করিলাম এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনাইলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, সে সত্যবাদী। মোনযেরের ভাগ্যে ঈমান জুটিল না।

(তাবাকাত, ১–২৬২)

৬। আরবের একটি প্রসিদ্ধ সুফলা এলাকা "ইয়ামামা"। তথাকার সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিল "হাওয়াযা ইবনে আলী।" এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ ব্যক্তি তথাকার সর্বাধিক প্রভাবশালী লোক। তাহার নিকটও নবী (সঃ) সালীত ইবনে আম্র (রাঃ) ছাহাবী মারফত লিপি পাঠাইলেন। লিপিতে তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান না করিলেও মোলায়েমভাবে প্রত্যাখ্যানই করিল। সে নবীজীর (সঃ) লিপির উত্তরে লিপি লিখিল, যাহার মর্ম এই ছিল– আপনি যেই বস্তুর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও উত্তমই বটে। তবে আমি আমার জাতির কবি ও বক্তা, সমগ্র আরব আমাকে ভয় করে। অতএব প্রাধান্যের কিছু অংশ আপনার সহিত আমাকে দিতে হইবে, তবেই আমি আপনার কথা গ্রহণ করিতে পারি।

সে লিপির এই উত্তর দান করিল আর নবীজী (সঃ)-এর দূতকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন উপঢৌকন

প্রদান করিল। দূত প্রত্যাবর্তন করিলে নবীজী (সঃ) তাহার লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন, (ইসলামের বিনিময়ে) যদি সে একটি খেজুর পরিমাণ জায়গার কর্তৃত্বও দাবী করে তাহাও দান করিতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহার ধন-সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঠক! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্মতৎপরতার দ্রুত গতির নমুনা এখানেই দেখা যায়। প্রায় ১৫০০ ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ৩০০ মাইল সফর করতঃ ওমরা করার নিয়্যতে মক্কার নিকটে পৌঁছিলেন। মক্কাবাসীরা মক্কায় যাইতে দিল না; বিরাট ঝামেলার পরে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আবার সেই প্রায় ৩০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অত বড় সফর এবং ঝামেলা অতিক্রম করতঃ মদীনায় পৌঁছিয়া এক মাসেরও অনেক কম সময় মদীনায় অবস্থান করিলেন। তাহার পরেই আরবে ইহুদী শক্তির সর্বপ্রধান কেন্দ্র খায়বর অভিযানে তাঁহাকে যাইতে হইল- যাহা এক ভয়াবহ অভিযান ছিল।

মধ্যবর্তী এই সামান্য সময়েও নবী (সঃ) তাঁহার দায়িত্ব পালনের তৎপরতায় বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিলেন না। এই ১০/২০ দিনের মধ্যেই নবী (সঃ) বহির্বিশ্বে ইসলামকে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া দেওয়ার বিপ্লবী ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। একই দিনে উল্লিখিত ছয় জন দূতকে ছয়টি দেশে প্রেরণ করিয়া এক সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামকে ছড়াইয়া দিলেন। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহাআহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হইল- সম্রাটের রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, বিশ্ব শক্তিসমূহও আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মরু নিবাসী ও খেজুর পাতার মসজিদে দরবার অনুষ্ঠানকারী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপিগুলির রাজকীয় মহত্ত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা, গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যাবলী, শক্তি সামর্থ্যের কণ্ঠধারী শব্দাবলী পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট এবং গর্ব-অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বীরগণকে কাঁপাইয়া তুলিল। শত শত যুগে যাহা সম্ভব হইত না শুধু লিপির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উল্লিখিত ছয়খানা লিপি ছাড়া আরও অনেক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা-

৭। আয্‌দ বংশীয় শাসনকর্তা জায়ফর এবং তাঁহার ভ্রাতা আব্‌দ- তাঁহাদের প্রতি নবী (সঃ) আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) ছাহাবীকে লিপি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা মোনযের ইবনে সাওয়ার নিকটও নবী (সঃ) আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) ছাহাবী মারফত লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণপূর্বক নবীজীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমার দেশে ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে: তাহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। নবী (সঃ) উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, আপনি যাবত সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, আপনার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে। আর ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় অনুগত নাগরিকরূপে রাষ্ট্রীয় কর আদায় করিলে তাহারা নিজ নিজ ধর্মে থাকিয়া দেশে বসবাস করিবার সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে ভোগ করিবে।

৯। গাসসানের শাসনকর্তা জাবালা ইবনে আইহামকেও নবী (সঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন। সে তখন মুসলমান হইয়াছিল। খলীফা ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রোধে ইসলাম ত্যাগ করত পলাইয়া গিয়াছিল।

১০। সামাওয়াহ্‌ এলাকার শাসক নুফাসা ইবনে ফরওয়াহ্‌কেও রসূল (সঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিও নবী (সঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা-

১১। ইয়ামানের হারেসা, ১২। শোরায়হ, ১৩। নোয়াএম, তাঁহারা তিন ভ্রাতা আবদে কুলালের পুত্র প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। নবী (সঃ) প্রত্যেকের নিকটই ভিন্ন ভিন্ন লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তদ্রূপ ইয়ামানে ১৪। নোমান, ১৫। মাআফের, ১৬। হামদান, ১৭। যোরআ- তাঁহাদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন লিপি

লিখিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ইয়ামনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি– ১৮। জীলকুলা এবং ১৯। জী আম্‌রকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি পবিত্র কোরআনে সূরা ফীলের ইতিহাসের নায়ক আব্‌রাহা রাজার কন্যা "জোরায়বা" জীল কুলার স্ত্রী ছিলেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ২০। আব্‌রাহার পুত্র মা'দীকারেবকেও লিপি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। নবী (সঃ) নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামা কাজ্জাবের নিকটও ইসলামের প্রতি আহ্বানে লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২২। রোমানদের প্রসিদ্ধ পাদ্রী জাগাতেরকেও লিপি লিখিয়ছিলেন।

নবী (সঃ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। যথা–

২৪। ইয়ামানস্থিত নাজরানের সুপ্রসিদ্ধ গির্জার পাদ্রীদের নিকট নবী (সঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২৫। আরব সাগরের উপকূলীয় হাজরামউত এলাকার কতিপয় সর্দার প্রধানের নিকটও লিপি লিখিয়াছিলেন।

লিপির মাধ্যমে বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের ডাক পৌছাইয়া দেওয়া– ইহাও নবীজীর নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায় ছিল, যাহার আশাতীত সুফল লাভ হইয়াছিল।

এই বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই ইহুদী শক্তি নিস্তব্ধকারী খয়বর জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই নবী (সঃ) চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার জন্য বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ওমরা আদায় করিয়াছিলেন। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে নবী (সঃ) ঐসব ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরা করার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় ওমরা আদায় করিতে পারেন নাই। অবশ্য পরস্পর সন্ধি হইয়াছিল– যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে এই বৎসর বিনা বাধায় মুসলমানগণ ওমরা আদায় করিয়াছিলেন।

হিজরী অষ্টম বৎসর

ইসলাম ও মুসলমানদের মহা বিজয়ের বৎসর

এই বৎসরের প্রথম জেহাদ মুতার জেহাদ। এই জেহাদে নবীজী (সঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন না। অত্যন্ত ভয়াবহ জেহাদ ছিল ইহা। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্ধারিত একের পর এক তিন জন আমীর বা কমাণ্ডার– নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ (রাঃ), চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রত্যেকেই শহীদ হইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

এই বৎসরই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তথা ইসলাম ও মুসলিম জাতির মহাবিজয়, চরম বিজয়, সুস্পষ্ট বিজয়– ফত্‌হে মুবীন তথা মক্কা বিজয় লাভ হয়। অধিকন্তু মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ– হোনায়ন, আওতাস, তায়েফ ইত্যাদিও জয় করা হয়; সর্বত্রই ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

নবীজী (সঃ)-এর উদারতা

আরবের বিখ্যাত কবি যোহায়র, তাহার পরিবারের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কবি। তাহার দুই পুত্র– বোজায়র এবং কা'বও প্রসিদ্ধ কবি। মক্কা বিজয়ের পর বোজায়র ইসলাম গ্রহণপূর্বক নবীজীর সহিত মদীনায় চলিয়া আসিলেন। মদীনা হইতে ভ্রাতা কা'বকে পত্র লিখিয়া নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন এবং

তাহাকেও লিখিলেন, যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পূর্বেকার অপরাধ ক্ষমা করেন। অতএব তোমার অন্তরে যদি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ হয় তবে যথাসত্বর চলিয়া আস, অন্যথায় প্রাণ বাঁচাইবার আশ্রয়স্থলের খোঁজ কর।

কা'ব উত্তরে কাব্যের মাধ্যমে নবীজী (সঃ)-কে কটাক্ষ করিয়া পত্র লিখিল। তাহার পত্রের কটাক্ষে নবীজী (সঃ) তাহার উপর রুষ্ট হইলেন এবং লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, তুমি প্রাণ হারাইবে। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্তিত হইল– সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদারতার প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিল। অতপর গোপনে মদীনায় আসিয়া এক পরিচিত ছাহাবীর আশ্রয় নিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে লইয়া নবীজী (সঃ)-এর মসজিদে ফজরের নামায পড়িলেন। ঐ ছাহাবী নামাযের পরে কা'বকে নবীজীর (সঃ) প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নবী (সঃ) কা'বকে চিনেন না। এই সুযোগে কা'ব নিজেই নবী (সঃ)-কে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! যোহায়র পুত্র কা'ব অনুতপ্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণপূর্বক আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছে। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন– যদি আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হাঁ– নিশ্চয়! তৎক্ষণাত কা'ব বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নিজেই কা'ব। এই বলিয়া কবি কা'ব (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশে রচিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "বানাত সোআ'দ" ঐ মজলিসেই পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উক্ত কবিতায় তিনি উল্লেখ করিলেন–

আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহর রসূলের দরবারে ক্ষমার আশা অতি উজ্জ্বল। আমার প্রতি সহিষ্ণু হউন; আল্লাহ আপনাকে মহান কোরআনে কত কত সুন্দর উপদেশমালা দান করিয়াছেন! মিথ্যা দোষ চর্চাকারীদের কথায় আমাকে মেহেরবানীপূর্বক অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন না। লোকেরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমি অপরাধী নহি।

নবীজী (সঃ) -এর প্রশংসায় তিনি একটি উক্তি অতি চমৎকার করিয়াছেন–

"রসূল আল্লাহর নূর, বিশ্ব হয় তাহাতে উজালা।
আল্লাহর উন্মুক্ত তলোয়ার তিনি, হিন্দী উহার শলা।"

নবী (সঃ) সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে তাঁহার গায়ের চাদর মোবারক পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন। চাদরখানা কা'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আজীবন ছিল। খলীফা মোআবিয়া (রাঃ) কবির নিকট হইতে দশ হাজার দেরহামে– রৌপ্য মুদ্রায় উহা ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি কা'ব (রাঃ) সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বরকতপূর্ণ বস্ত্র আমি কোন মূল্যে কাহাকেও দিব না। কবির ইন্তেকালের পর মোআবিয়া (রাঃ) বিশ হাজার দেরহামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। অতপর তাহা বনু উমাইয়া বংশীয় বাহশাহগণের নিকটই পরম্পর পবিত্র বস্ত্ররূপে সমাদর লাভ করিতে থাকে। তাঁহাদের রাজধানী বাগদাদের উপর যখন দস্যু তাতারীদিগের আক্রমণ হয় তখন সেই চাদর মোবারক নিখোঁজ হইয়া যায়। (যোরকানী, ৩– ৬০)

হিজরী নবম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা ছিল তবুকের জেহাদ। ইহাই ছিল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সক্রিয় সর্বশেষ জেহাদ। ইসলামের দশ বৎসর সামরিক জীবনে এই জেহাদের ন্যায় এত অধিক সৈন্য সমাবেশ আর কোন জেহাদে হয় নাই। এ যাবতকালের জেহাদসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ সৈন্য সংখ্যা বার হাজার ছিল হোনায়ন জেহাদে। মক্কা বিজয়েও দশ হাজার ছিল, কিন্তু তবুক জেহাদে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি ছিল, অধিক জনসমাবেশ দেখিলে তিনি তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ ব্যক্ত করায় তৎপর হইতেন এবং সুদীর্ঘ ভাষণ দিতেন। সেমতে তবুক এলাকায় পৌঁছিয়া শিবির স্থাপনের পরই নবীজী (সঃ) এই বিশাল জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া নৈতিকতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। সেই ভাষণের উপদেশমালা চির স্মরণীয়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাষণ ছিল–

حمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال ايها الناس اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد (صلى الله عليه وسلم) واشرف الحديث ذكر الله واحسن القصص هذا القران وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبياء واشرف الموت قتل الشهداء واعمى العمى الضللة بعد الهدى وخير الاعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب ـ

واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر والهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيمة ومن الناس من لا ياتى الجمعة الا دبرا ومن الناس من لايذكر الله الا هجرا ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورآس الحكمة مخافة الله عزوجل وخير ما وقر فى القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والشعر من مز امير ابليس والخمر جماع الاثم والنساء جبائل الشيطان ـ والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربو وشر الماكل اكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى فى بطن امه وانما يصير احدكم الى موضع اربعة اذرع والامر الى الاخرة وملاك العمل خواتمه وشر الروايا روايا الكذب وكل ما هو ات قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة ومن يستغفره يغفر له ومن يعف يعفه الله ومن يكظم ياجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى استغفر الله لى ولكم

প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন, তারপর বলিলেন– হে জনমণ্ডলী! আল্লাহর গুণগানের পর– স্মরণ রাখিও, সর্বাধিক সত্য বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক মজবুত ও শক্তিধারী মুক্তির কালেমা– কালেমা তওহীদ। ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ে সর্বোত্তম (হযরত) ইব্রাহীমের ধর্মের মূলসমূহ, সর্বোত্তম

আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। সর্বোচ্চ বাক্য আল্লাহর যিকির এবং সর্বাধিক সুন্দর ইতিহাস কোরআনের ইতিহাস।* শরীয়তের নির্দেশাবলীই সর্বোত্তম কাজ এবং গর্হিত কার্যাবলী সর্বাধিক মন্দ। সর্বাধিক সুন্দর জীবনব্যবস্থা নবীগণ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। সর্বাধিক সম্মানের মৃত্যু শহীদগণের আত্মদান। হেদায়েতের সুযোগ পাইয়াও ভ্রষ্টতার উপর থাকা সর্বাধিক বড় অন্ধতা। উৎকৃষ্ট আমল তাহা যাহার উপকার ভোগ করা যায়। উত্তম জীবন ব্যবস্থা উহা যাহার ব্যবস্থাপক নিজে অনুসরণ করিয়াছে। জ্ঞান বিবেকের অন্ধতা সর্বাধিক ঘৃণিত অন্ধতা।

দানকারী হস্ত গ্রহণকারী হস্ত অপেক্ষা উত্তম। প্রয়োজন পরিমাণ কম ধন-সম্পদ উত্তম সেই বেশী পরিমাণ হইতে যাহা উদাসীন বানাইয়া দেয়। মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়া ওজর আপত্তি করা ঘৃণ্য কাজ, কেয়ামত দিবসে লজ্জিত হইতে হইলে তদপেক্ষা অপমান আর কিছুই নাই। অনেক মানুষ জুমার নামাযে উপস্থিত হইতেও বিলম্ব করে, অনেকে আল্লাহর যিকির পূর্ণ মর্যাদার সহিত করে না (তাহা ভাল নহে)। জবানকে মিথ্যার অভ্যস্ত বানানো অতি বড় গোনাহ। অন্তরের তৃপ্তিই বড় ধনাঢ্যতা। মানুষের উত্তম সম্বল পরহেজগারী। বড় জ্ঞান-বিজ্ঞান হইল মহান আল্লাহর ভয়। অন্তরে বদ্ধমূল বিষয়ের উত্তমটি হইল আল্লাহর প্রতি আস্থা বিশ্বাস; তাহাতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ কুফরী গোনাহ। শোক বিলাপ অন্ধকার যুগের রীতি। অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ (দ্বারা প্রতিপালিত দেহ) জাহান্নামের জ্বালানি হইবে। সাধারণ কাব্য শয়তানের সুর। মদ নানাবিধ গোনাহ একত্রকারী। নারী শয়তানের ফাঁদ। (নারীর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে আল্লাহর বহু নাফরমানীতে লিপ্ত করিতে প্রয়াস পায়)। যৌবন উন্মাদনারই অংশবিশেষ। ঘৃণ্য উপার্জন সুদের উপার্জন। জঘন্য খাদ্য এতিমের মাল খাওয়া। অন্যকে দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করে সেই সৌভাগ্যশালী। হতভাগা শুধু সে যে মায়ের উদর হইতেই হতভাগা হইয়া জন্ম নিয়াছে।* প্রত্যেকেই পাইবে দুনিয়ার শেষ সীমা চারি হাত জায়গা (তথা

কবরের স্থানটুকু, সেই অনুপাতেই দুনিয়ার জন্য ব্যস্ততা অবলম্বন করিবে)। ভাল-মন্দের শেষ ফয়সালা চিরস্থায়ী আখেরাতে হইবে। সারা জীবনের আমলকে সংরক্ষণ করে শেষ জীবনের আমল। মিথ্যা বর্ণনার উদ্ধৃতকারীও জঘন্য। প্রত্যেক আগত সময় নিকটতম (অতএব পরকাল নিকটতমই বটে)। মোমেনকে গালি দেওয়া ফাসেকী গোনাহ, মোমেনের সঙ্গে লড়াই করা কুফরী গোনাহ, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা আল্লাহর নাফরমানী, তাহার ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা তাহার জানের নিরাপত্তার সমান। যেব্যক্তি আল্লাহর কার্যের উপর কসম খাইবে, আল্লাহ তাহাকে মিথ্যুক বানাইবে।* যে কেহ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যেব্যক্তি পাকপবিত্র থাকার সাধনা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাক পবিত্র থাকায় সাহায্য করিবেন। যেব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে আল্লাহ তাহাকে সওয়াব দান করিবেন। ক্ষয়-ক্ষতি বিপদে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষতিপূরণ দান করিবেন। যেব্যক্তি লোকদের নিকট সুখ্যাতি অর্জন করা ভালবাসে আল্লাহ তাআলা (কেয়ামত দিবসে) সর্বসমক্ষে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দণ্ড দিবেন। যে ব্যক্তি আপদে-বিপদে সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যধারণকারী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে অনেক গুণ বেশী সওয়াব দিনেব। নাফরমানী যে করিবে আল্লাহ তাহাকে দণ্ড দিবেন।

হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন (তিন বার বলিলেন)। আল্লাহর

---

* পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী বহু জাতি, বহু শক্তি এবং বহু দুর্ধর্ষ ব্যক্তির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উপদেশ গ্রহণে ঐসব ইতিহাসের তুলনা নাই।

* অর্থাৎ মায়ের পেট হইতে হতভাগা হইয়া জন্ম নেওয়ার তথ্য ত কাহারও জানা নাই; সুতরাং কেহ নিজেকে ভাগ্য বঞ্চিত, ভাগ্য বিতাড়িত, হতভাগা গণ্য করিয়া কার্য ময়দানে নিক্রীয় বসিয়া থাকিবে না। শত বার অকৃতকার্য হইলেও শত বারই কৃতকার্যতার জন্য চেষ্টা করিবে।

* যেমন কেহ অন্য একজন মুসলমানকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিল, কসম খোদার তোর গোনাহ মাফ হইবে না। এইরূপ অনধিকার কথা আল্লাহ না পছন্দ করেন।

নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য। (বেদায়া, ৪-১২)

মসজিদে যেরার

"যেরার" শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র। মদীনায় এক খৃষ্টান পাদ্রী ছিল আবু আমের। নবীজী (সঃ) তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া ইসলামকে মদীনা হইতে চির বিদায় দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বদর জেহাদের পরে মক্কায় যাইয়া মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা সৃষ্টি করিল, যাহার পরিণামে ওহুদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে তাহার মনের আশা পুরিল না; তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেই থাকিল, এমনকি সে রোম সম্রাটের সহিত যোগাযোগ করিল মদীনা আক্রমণের জন্য। রোম সম্রাটও খৃষ্টান, তাই তাহার সহিত যোগাযোগ খুব গাঢ়ভাবেই হইল। আবু আমের ঘন ঘন রোম যাইত এবং মদীনায় আসিয়া মদীনার মোনাফেকদের সহিত সলা-পরামর্শ করিত। আবু আমেরের তৎপরতা চালাইতে সুবিধা লাভের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থানের (অফিস গৃহের) প্রয়োজন। এই উদ্দেশে কোবা পল্লীতে নবীজীর (সঃ) তৈয়ারী সর্বপ্রথম মসজিদের নিকটবর্তীই মোনাফেকরা আর একটা মসজিদের আকৃতি তৈয়ার করিল। উহাতে তাহাদের এই উদ্দেশ্য ও থাকিল যে, কোবা মসজিদ হইতে কিছু মুসল্লী খসাইয়া এই মসজিদে আনিতে পারিলে ধীরে ধীরে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে দুইটা সমাজ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ হইবে। এইসব ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশে এই মসজিদ আকৃতির ঘরটা তৈয়ার করিল। মুসলমানদের নিকট উহাকে পুরাপুরি মসজিদ সাব্যস্ত করিবার জন্য নবীজীর দ্বারা এই মসজিদে নামায আরম্ভের পরিকল্পনা করিল। সেমতে মোনাফেক দল নবীজীর নিকট আসিয়া মিনতির সহিত আবেদন জানাইল যে, রুগ্ন ও দুর্বলদের জন্য সব সময় দূরের মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয়। তাই কোবা পল্লীতে আমরা দ্বিতীয় আর একটি মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি; আমাদের আরজু, আপনি ঐ মসজিদে নামায আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তখন তবুক জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, তাই তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তথায় নামায পড়াইয়া দিব। তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী (সঃ) "আওয়ান" নামক স্থানে পৌছিলেন। তাহা মদীনার অতি নিকটবর্তী, তথা হইতে মদীনা মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ঐ সময় উক্ত মসজিদ নামীয় মোনাফেকী ষড়যন্ত্রের আড্ডা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়া গেল এবং তথায় যাইতে নবীজী (সঃ)-কে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ـ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى ـ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ لاَ تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ـ

অর্থ ঃ "যাহারা মসজিদ তৈয়ার করিয়াছে ইসলামের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশে, কুফরী কাজের উদ্দেশে, মোমেনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং পূর্ব হইতে আল্লাহ ও রসূলের সহিত শত্রুতা বাধাইয়াছে- এমন এক ব্যক্তির কর্মস্থল বানাইবার উদ্দেশে অথচ আপনার নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম খাইয়া তাহারা বলে, আমরা ভাল উদ্দেশে এই মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। আপনি কস্মিনকালেও তাহাদের সেই মসজিদে দাঁড়াইবেন না। (পারা- ১১, রুকু-২)

আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সঙ্গে সঙ্গে "আওয়ান" এলাকা হইতে নবী (সঃ) দুই জন ছাহাবীকে সরাসরি এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, এখনই যাইয়া উক্ত মসজিদে আগুন লাগাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ছাহাবীদ্বয় তাহাই করিলেন। মোনাফেকদের দল তথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া পলাইয়া গেল। (বেদায়া, ৪-২১)

চতুর্দিক হইতে ইসলামের জয়জয়কার

ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়াছিল। ঐ সন্ধির শর্তগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই হেয়তাজনক ছিল, কিন্তু শান্তির অগ্রদূত, শান্তির মহাসাধক, মানুষের প্রেম-ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু নবীজী মোস্তফা (সঃ) ঐরূপ একটি সন্ধির প্রতি ব্যাকুল ছিলেন। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা নহে বরং সত্যের আহ্বান দ্বারা বিশ্ব জয় করাতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার নবী জীবনের সাফল্য মনে করিতেছিলেন। কোরায়েশদর যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিড়ে নবীজী (সঃ) সেই অবকাশ পাইতেছিলেন না। ইসলাম শান্তির সাধনা– শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোক সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই শান্তির সুযোগই নবীজী মোস্তফা (সঃ) খুঁজিতেছিলেন। তাই তিনি কোরায়শদের সমস্ত অন্যায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াও সন্ধিকে চূড়ান্তে পৌঁছাইয়াছিলেন এবং সেই সন্ধিকে নবীজী (সঃ) মহা বিজয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সন্ধি যে ইসলামের মহাবিজয় ছিল তাহার বিকাশ ধাপে ধাপে হইয়াছে। সন্ধির দ্বারা শান্তির অবকাশ পাইতে এক দিনেরও বিশ্রাম না লইয়া নবীজী (সঃ) সপ্তম বৎসরের আরম্ভ হইতেই চতুর্দিকে লিপি প্রেরণ করিয়া ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সর্বত্র ইসলামের ডাক পৌঁছাইয়া দিলেন। রাজদরবারে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এবং গোত্রে গোত্রে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়া গেল। এই অভিযানে বিরাট সাফল্য লাভ হইল। আবিসিনিয়ার সম্রাট, বাহরাইনের শাসনকর্তা, ওমানের শাসনকর্তা, গাস্সানের শাসনকর্তা এবং অনেক গোত্রপতিসহ বিভিন্ন শক্তি শিবিরে ইসলাম প্রবেশ করিল, বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন। উক্ত অভিযানে ইসলামের ডাক সর্বত্রই আলোড়নের সৃষ্টি করিল এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক বিরাট অংশ ইসলামের আহ্বান পাইয়াও আর এক বিষয়ের অপেক্ষায় থাকিয়া গেল।

মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এবং কোরায়শ বংশের লোক। মুসলমানদের খোদার ঘর মক্কায়। মুহাম্মদ (সঃ) এখনও মক্কা জয় করিতে পারেন নাই, কোরায়শরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, খোদার ঘর কা'বা এখনও ঠাকুর-দেবতা, মূর্তি-প্রতিমায় পরিপূর্ণ। সুতরাং কোরায়েশ ও মুসলমানদের চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য– সেই সংঘর্ষের ভবিষ্যত পরিণামের অপেক্ষায় বহু এলাকা, বহু গোত্র, বহু শক্তি ইসলাম হইতে দূরে থাকিয়া দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মনে করিতেছিল, এই চূড়ান্ত সংঘর্ষেই সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হইবে; সত্য বিজয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হইবে। একদিকে কোরায়শদের পূজিত শত শত দেব-দেবী– যাহাদের তাহারা বিজয়ের উৎস মনে করে, অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিতেছেন, এই ঠাকুর দেবতা এবং দেব-দেবী মূর্তিগুলি অক্ষম জড় পদার্থ, পক্ষান্তরে তাঁহার আল্লাহই এক ভাবে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা। এই দুই মতবাদে নিশ্চয় লড়াই হইতে থাকিবে। যদি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দল কোরায়শদের দ্বারা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবে আমরা লড়াই-বিগ্রহ ছাড়াই তাহাদের হইতে নিস্তার পাইয়া যাইব। আর যদি দেব-দেবীদের পূজারী ও পুরোহিত এবং জাতি হিসাবে দুর্ধর্ষ কোরায়শরাই ঐ দলের হস্তে পরাজিত হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদেরকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মুহাম্মদই সত্য; তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-লড়াই করিয়া জয়ী হইতে পারিব না।

আরবের বিভিন্ন গোত্র এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা এবং আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অপেক্ষমান দর্শকের ভূমিকায় তাকাইয়া রহিয়াছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিস্ময়কর সংবাদ তাহাদের গোচরে আসিয়া গেল যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কা অধিকার করিয়া লইইয়াছেন। মক্কার সর্বপ্রধান সর্দার আবু সুফিয়ান মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। দুর্ধর্ষ মক্কাবাসীরা ইসলামের দুয়ারে ভিড় জমাইয়া ইসলামের ছায়ায় স্থান সংগ্রহ করিতেছে। আবরাহার হাতী-ঘোড়া ও অসংখ্য সৈন্য যে কা'বা অধিকার করিতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; আজ অনায়াসে সেই কা'বা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অধিকারে আসিয়া গিয়াছে এবং কা'বা ঘরে স্থাপিত প্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের

ঠাকুর-দেবতাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। যেই মুহাম্মদ এবং তাঁহার দল নিঃস্ব নিঃসম্বলরূপে মক্কার পথেঘাটে অত্যাচারিত ছিল, আজ তিনি মক্কার সর্বেসর্বা। যেই সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার সমাজপতিদের ইসলামের ডাক দিয়াছিলেন আর তাহারা ঘৃণা, তিরস্কার ও ধমকের দ্বারা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল, আজ সেই সাফা পর্বতের পাদদেশেই ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গ করায় লালায়িত হইয়া মক্কার লোকেরা আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। মক্কা বিজয় দ্বারা এইভাবে বিস্ময়জনক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। তাই আরবের বহু গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে মদীনায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে লাগিল। তৃতীয় খণ্ড ১৫৫৩ নং হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, "মক্কা বিজয়ের পর আপনি দেখিতে পাইবেন দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করিতেছে।" (সূরা নাসর)

হিজরী অষ্টম বৎসরের শেষার্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাই নবম বৎসরে ঐরূপ প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়িয়া গেল। এমনকি ইতিহাসে হিজরী নবম বৎসরকে "আমুল উফুদ" ডেপুটেশন বা প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর বলা হয়।

হিজরী পঞ্চম বৎসর খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল সম্মিলিত আরব বাহিনী ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ইসলাম এবং মুসলমানদের সুদৃঢ় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতেই সময় সময় স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিতেছিল। সর্বপ্রথম পঞ্চম হিজরী সনে মোযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল। উক্ত প্রতিনিধি দলে চারি শত লোক আসিয়াছিল। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছায় একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমাদের নিজ দেশ হইতে হিজরত করিতে হইবে না। (কারণ, তাহাদের বস্তিতে মুসলমানগণ স্বাধীন শক্তিশালী হইবেন।) তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের স্থানে ফিরিয়া যাও। সেমতে তাঁহারা ইসলাম লইয়া নিজ বস্তিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (তাবাকাত, ১-২৯১)

এইভাবে পঞ্চম বৎসর হইতে প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কদাচিৎ । নবম বৎসরে ব্যাপক আকারে এবং বহু সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন হয়। ইতিহাসে ঐরূপ ৭২টি প্রতিনিধি দল আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় (তাবাকাত, প্রথম খণ্ড)। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল- তায়েফের প্রতিনিধি দল, তামীম প্রতিনিধি দল, বনু হানীফার প্রতিনিধি দল, ইয়ামান প্রতিনিধি দল এবং তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গোত্রীয় বা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি দল ছাড়াও মদীনায় নবীজী (সঃ) সমীপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনও অনেক হইয়াছে। যথা-

(১) ফারওয়া ইবনে মিস্‌সীক (রাঃ) তিনি কিন্দা বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন নিজ গোত্রের প্রধান ও শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কিন্দা বংশীয় রাজার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে নিজের গোত্র এবং পার্শ্ববর্তী আরও দুইটি গোত্রের শাসনকর্তা মনোনীত করিয়া তাঁহার দেশের যাকাত ইত্যাদির কালেক্টররূপে খালেদ ইবনে সায়ীদ (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) আম্‌র ইবনে মা'দীকারেব তিনি যোবায়দ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার এক বন্ধু কায়সকে বলিলেন, হে, কায়স! শুনিতে পাইলাম কোরায়শ বংশে মুহাম্মদ (সঃ) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন। আমাকে নিয়া তাঁহার নিকট চল, তাঁহার পূর্ণ তথ্য অবগত হইব; প্রকৃতই যদি তিনি নবী হইয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের চোখে লুক্কায়িত থাকিবে না- প্রকাশ পাইয়া যাইবে; আমরা তাঁহার দাবী মানিয়া লইব। আর যদি ঐ দাবীর বিপরীত কিছু হয় তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিব। বন্ধু কায়স তাঁহার কথায় সাড়া দিল না, তবুও তিনি একাই যাত্রা করিলেন এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(৩) জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, (রাঃ) -ইয়ামানের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি

নবীজীর (সঃ) তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তাঁহার আলোচনায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অবিলম্বেই এই দরজা দিয়া ইয়ামানের এক উত্তম ব্যক্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।

জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবীজীর মজলিসে পৌঁছিলে পর নবীজী (সঃ) আমার নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জরীর ! কি উদ্দেশে আসিয়াছেন? আমি উত্তর করিলাম, আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তখন নবীজী (সঃ) আমার জন্য একখানা কম্বল বিছাইয়া দিলেন এবং লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া (একটি সুন্দর আদর্শ শিক্ষাদানে) বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইবে। অতপর নবীজী (সঃ) আমাকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাইলেন–

(১) মনে-মুখে ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। (২) আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাল-মন্দের তকদীর সম্পর্কে ঈমান স্থাপন করা। (৩) নামায পড়া। (৪) যাকাত দান করা। আমি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহ্বানে প্রত্যেকটি বস্তু গ্রহণ করিলাম।

নবীজী (সঃ) আমার প্রতি এতই অমায়িক ও সদয় ছিলেন যে, তিনি যখনই আমাকে দেখিতেন আমার প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া মুচকি হাসি হাসিতেন।

(৪) ওয়ায়ল ইবনে হুজর (রাঃ)– তিনি ইয়ামানের রাজবংশীয় একজন ছিলেন। আরব সাগরের উপকূলবর্তী হায্‌রামাউত এলাকার একজন বিশিষ্ট জমিদার। তাঁহার আগমনের পূর্বেই নবী (সঃ) ছাহাবীগণকে তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইলেন। তিনি পৌঁছিলে নবী (সঃ) তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের অতি নিকটে বসাইয়াছিলেন এবং বসিবার জন্য চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার বংশধরের জন্য মঙ্গল কল্যাণের বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমগ্র হায্‌রামাউত এলাকার জমিদারদের প্রধান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মোআবিয়া (রাঃ) ছাহাবীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি চমকপ্রদ বিষয় ঃ ওয়ায়ল (রাঃ) রাজবংশীয় লোক, সবেমাত্র মুসলমান হইয়াছেন। সেই যুগের ও পরিবেশের বংশীয় উগ্রতা মন-মগজ হইতে মুছিতে কিছু বিলম্ব অবশ্যই হইবে। মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই আছেন। তিনি পায়ে হাঁটিয়া চলিতেছেন। রৌদ্রের উত্তাপে যখন মরুভূমির পথ উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে তখন মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট পথের উত্তাপের অভিযোগ করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার উটের ছায়ায় চলিতে থাকুন। মোআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে কষ্টের কি লাঘব হইবে? আপনি আমাকে আপনার বাহনের পিছনে বসাইয়া নিলে ভাল হয়। ওয়ায়ল (রাঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, চুপ থাকুন; রাজবংশীয় লোকদের সহিত এক বাহনে বসিবার মর্যাদা আপনার নাই।

যুগের পরিবর্তনে এই মোআবিয়া (রাঃ) পরবর্তীকালে আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মুসলেমীন হইলেন। তখনও ওয়ায়ল (রাঃ) জীবিত আছেন। তিনি একবার মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাতে আসিলেন। মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের নিকটেই বসাইলেন না শুধু, বরং তাঁহাকে নিজের আসনে নিজের সঙ্গে বসাইলেন এবং বহু মূল্যবান উপহার তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। ওয়ায়ল (রাঃ) বলেন, আমি তখন (লজ্জিত হইয়া) মনে মনে ভাবিতেছিলাম, ঐ দিন যদি আমি তাঁহাকে বাহনের অগ্রভাবে বসাইতাম।

৫। যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী– তিনি তাঁহার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতপর আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের প্রতি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। হুযুর! এখনই সৈন্যবাহিনী ফেরত আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমার গোত্রের ইসলাম ও আনুগত্য সম্পর্কে আমি জামিন থাকিলাম। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তুমি যাও এবং আমার পক্ষ হইতে সৈন্যবাহিনীকে ফিরাইয়া নিয়া আস। আমি আরজ করিলাম, আমার বাহনটি অতিশয় পরিশ্রান্ত; সেমতে নবী (সঃ) অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া সৈন্যবাহিনী ফেরত নিয়া আসিলেন।

অতপর আমি আমার গোত্রের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম; অবিলম্বে সমগ্র গোত্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ইসলাম ও আনুগত্যের সংবাদ লইয়া প্রতিনিধি দল নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল। এতদ্দৃষ্টে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার গোত্র ত তোমার খুবই অনুগত! আমি বলিলাম, আল্লাহ তাআলাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তোমাকেই তোমার গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ করিব; এই মর্মে নিয়োগপত্ররূপে একখানা লিপিও তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার ব্যয় বহনের জন্য তাহাদের সদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। সেই মর্মেও তিনি আমাকে একখানা লিপি লিখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে এক এলাকার লোক আসিয়া নবীজীর নিকট তাহাদের শাসনকর্তা সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি অতীতের আক্রোশে আমাদেরকে উৎপীড়ন করেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ঈমানদার লোকের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই। নবীজীর এই কথাটি আমার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যেই আর একটি ঘটনা ঘটিল। এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। নবীজী (সঃ) তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে, উহা তাহার মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়ার (ভীষণ যন্ত্রণার) কারণ হইবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে সদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু দান করুন। তদুত্তরে নবীজী (সঃ) বলিলেন, সদকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণীর লোক নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; তুমি যদি উহার কোন শ্রেণীভুক্ত হও তবে তোমাকে দিব। নবীজীর এই কথাটিও আমার অন্তরে বিদ্ধ হইল এবং আমি ভাবিলাম, আমি ত সচ্ছল, অথচ সদকার ভাণ্ডার হইতে অংশ গ্রহণের জন্য আমি নবীজী (সঃ) হইতে অনুমতি লিপি চাহিয়া লইয়াছি।

এই ভাবনা-চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফজর নামাযান্তে আমি নবীজীর (সঃ) লিপিদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই উভয় লিপির মর্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ তোমার অন্তরে কি উদিত হইয়াছে। আমি আরজ করিলাম, আপনার এই বাণী আমি শুনিয়াছি– "ঈমানদারের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই," আমি ত আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আপনার এই বাণীও শুনিয়াছি– "সচ্ছলতা সত্ত্বেও যেব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে, তাহা তাহার জন্য মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়ার কারণ হইবে; আমি সচ্ছল হইয়াও আপনার নিকট চাহিয়াছি।

নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা বাস্তব; অতএব তুমি সেমতে চিন্তা করিয়া হয় গ্রহণ কর না হয় ত্যাগ কর। আমি আরজ করিলাম, আমি ত্যাগ করিলাম। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিব তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমি প্রতিনিধি দলে আগন্তুকদের মধ্য হইতে একজনের নাম প্রস্তাব করিলাম; তিনি তাঁহাকেই গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অতপর আমি আরজ করিলাম, আমাদের গোত্রেসমূহ একটিমাত্র কূপ রহিয়াছে; বর্ষাকালে উহার পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট হয় না; পানির জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। এখন আমরা মুসলমান; চতুস্পার্শ্বস্থ গোত্রে অমুসলিম, তাহারা আমাদিগকে পানি দিবে না। নবী (সঃ) আমাকে বলিলেন, সাতটি কাঁকর নিয়া আস; তিনি সেই কাঁকরগুলি নিজ হস্তে মর্দন করতঃ উহাতে দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এই কাঁকরগুলি নিয়া যাও; এক একটি কাঁকর আল্লাহর নাম জপপূর্বক কূপে ফেলিয়া দিবে। আমরা তাহাই করিলাম; তখন হইতে সর্বদা আমাদের কূপে এত অধিক পরিমাণ পানি থাকিত যে, কোন সময়ই উহার তলা দেখা সম্ভব হইত না।

(৬) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ– তিনি নবীজী (সঃ)-কে নবুয়তের প্রথমজীবনে এক বার অতি করুণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন– আমি "জুল-মজায" নামক আরবের প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তথায় দেখিলাম, একজন লম্বা জুব্বাধারী লোক এই আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছেন–

"হে মানবগণ! সকলে বল, আল্লাহ এক– অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তাহা হইলে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, আর একটি লোক পিছনে পিছনে তাঁহার প্রতি পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং বলিতেছে, হে লোকসকল! সাবধান– কেহ ইহার কথা শুনিও না, সে মহা মিথ্যাবাদী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, আহ্বানকারী ব্যক্তি হইলেন হাশেম বংশের একজন সুপুরুষ, যিনি নিজকে আল্লাহর প্রেরিত রসূল বলিয়া থাকেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁহারই পিতৃব্য আবদুল ওয্যা– আবু লাহাব।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে– বহু লোক মুসলমান হইয়াছে এবং মক্কা হইতে মুসলমানগণ সকলেই হিজরত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সময় আমরা আমাদের বস্তি "রাবাজা" হইতে কতিপয় লোক খেজুর ক্রয়ের জন্য মদীনায় যাত্রা করিলাম। মদীনার বাগ-বাগিচার নিকটবর্তী হইয়া আমরা বিশ্রাম করিবার জন্য ময়লা কাপড় বদলাইতে অবতরণ করিলাম। এই সময় এক চাদর পরিধানে আর এক চাদর গায়ে একজন লোক আমাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেলাটি কোথা হইতে আসিয়াছে, আর কোথায় যাইবে? আমরা বলিলাম, রাবাজা হইতে আসিয়াছি , মদীনায় যাইব। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, খাদ্য ক্রয়ের জন্য যাইব।

কাফেলায় একজন মহিলাও ছিল, আর আমাদের সঙ্গে বিক্রির জন্য একটি লাল রংয়ের উট ছিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, উটটি বিক্রি হইবে কি? আমরা বলিলাম, হা– এ পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি হইবে। লোকটি মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ কাটাকাটি না করিয়া উটের নাশারজ্জু ধরিয়া উট লইয়া চলিয়া গেলেন। লোকটি উট লইয়া আমাদের দৃষ্টির আড়াল হইতেই চৈতন্য হইল– উট ক্রেতা আমাদের পরিচিত নহে ত, আর মূল্য না লইয়া তাঁহাকে উট দিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গী মহিলাটি বলিল, চিন্তার কারণ নাই, লোকটি নূরানী চেহারার– তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। এই লোক প্রতারক হইবে না; উটের মূল্যের জন্য আমি দায়ী থাকিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে নিজ পরিচয় দিলেন যে, আমি তোমাদের বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। অতপর বলিলেন, এই নাও খেজুর; ইহা হইতে তোমরা সকলে পেট পুরিয়া খাও, অতপর তোমাদের প্রাপ্য উটের বিনিময় পূর্ণ ওজন করিয়া নাও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা যথাসময় মদীনা নগরে গমন করিয়া মসজিদের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখি– সেই লোক মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলাম– "হে লোকসকল! অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালদের দান কর, ইহা তোমাদের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাত হইতে উত্তম। পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী ও অন্যান্য স্বজনবর্গের প্রতিপালন করিবে।"

ইতিমধ্যেই মদীনার একজন মুসলমান উপস্থিত হইয়া আমাদের উপর এক মস্ত বড় অভিযোগ চাপাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই কাফেলার লোকদের উপর পূর্ব আমলের একটি খুনের দাবী আমাদের রহিয়াছে। অন্ধকার যুগের রীতি ছিল, হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ লওয়া সহজ না হইলে তাহার গোত্র হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন, পিতা পুত্রের অপরাধে বা পুত্র পিতার অপরাধে প্রতিশোধ গ্রহণের পাত্র হইবে না (দূর সম্পর্কীয়দের ত কোন কথাই নাই)।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এইরূপ মহানুভবতা ও অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তারেক ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গীদের ন্যায় বহু লোক ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(উল্লিখিত সমুদয় ঘটনা বেদায়া, ৪৭০-৪৮৬ হইতে অনূদিত)

স্বাধীন মক্কায় মুসলমানদের প্রথম হজ্জ

আবু বকর (রাঃ)-এর নেতত্বে হজ্জ যাত্রা (পৃঃ ৬২৬)

অনেকের মতে নবম হিজরীর প্রথম দিকেই, কাহারও মতে আরও অনেক পূর্বেই হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্বে ত মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ্জ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না, আর নবম হিজরীতে নবীজীর (সঃ) জন্য হজ্জ সমাপনে কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল। অনেকের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান নবম হিজরীর একেবারে শেষ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে হজ্জ করার নিয়ম ত পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। সেমতে নবীজী (সঃ) শুধু সাধারণ নিয়মানুসারে মুসলমান হাজীদের একটি দল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে নবম হিজরী সনে হজ্জ সমাপনে যাত্রা করিয়াছিল। এই হজ্জে নবীজী (সঃ) অংশগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মক্কাস্থ মিনায় কোরবানী দেওয়ার জন্য বিশটি উট আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-৩৯)

আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ও নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত হাজী কাফেলা স্বাধীন মক্কায় সর্বপ্রথম ইহাই ছিল। অবশ্য অষ্টম হিজরীর হজ্জ মওসুমের পূর্বেই রমযান মাসে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরও মুসলমান মোশরেক সম্মিলিতভাবে হজ্জ আদায় করা হইয়াছিল। তখন মক্কার গভর্নররূপে আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ) নবীজী (সঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। পদাধিকারবলে তিনিই ঐ বৎসর মুসলমান হাজীগণের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। (যোরকানী, ৩-৯৪)।

কিন্তু ঐ বৎসর হজ্জ শুধু গতানুগতিক প্রথারূপে ছিল। তাহার কোন ব্যবস্থাই নবীজী (সঃ) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ছিল না- যেরূপ ছিল নবম হিজরীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে পরিচালিত হজ্জ।

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী সমুদয় এলাকার বিজয় দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাই এখন আল্লাহ তাআলার এর একটি বিশেষ আদেশ-

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও, যাবত না আল্লাহর দ্বীনে বাধাদানের শক্তি রহিত হইয়া যায় এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"

এই আদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কাজে বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেমতে অষ্টম হিজরীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই নবম হিজরী সনে উক্ত পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে চালানো হয়। নবম হিজরীর হজ্জ পর্যন্ত কাফেরদের জন্য সাধারণ সুযোগ ভোগের অবকাশ ছিল। যথা-

(১) কাফেররাও মুসলমানদের সহিত একত্রে হজ্জ করিত।

(২) হজ্জে কাফেররা তাহাদের গর্হিত নীতি- যেমন, উলঙ্গ হইয়া তওয়াফ করা পালন করিয়া যাইত।

(৩) অনেক অনেক গোত্রের সহিত রসূলুল্লাহ (সঃ) অনির্দিষ্টকাল বা নির্দিষ্টকালের জন্য "যুদ্ধ নহে চুক্তি" সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা ইসলামের সম্মুখে নতিস্বীকার ছাড়াই সর্বত্র পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া যাইত।

(৪) কাফেররা সমগ্র আরবে, এমনকি পবিত্র হরম শরীফেও নির্বিবাদে বসবাস এবং স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

৩ এবং ৪ নম্বরের সুযোগ ইসলামের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ক্ষতিকর ও আশঙ্কার বস্তু ছিল। কারণ, পবিত্র হরম শরীফ ইসলামদ্রোহীদের সর্বপ্রধান ঘাঁটি ছিল। অতএব তথা হইতে ইসলামদ্রোহীদের নাম-নিশানা চিরতরে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলা একান্ত কতব্য। আর সমগ্র আরবই ইসলামের কেন্দ্র ও রাজধানী রূপ; তথা হইতেও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ইসলামদ্রোহীদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বিরাট বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ ঘোষণা পবিত্র কোরআনের ত্রিশটি আয়াতরূপে অবতীর্ণ হয়। উক্ত আয়াতসমূহের তেজস্বী সুর ও কঠোর ভাষার প্রভাব-প্রতাপই কাফের মোশরেকদের ভীত সন্ত্রস্ত কম্পমান করিয়া তুলিতে এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু মোনাফেক ও বাহিরের লোলুপ শক্তিগুলিকে চিরতরে নিরাশ নিস্তব্ধ করিতে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ - وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ -

অর্থ ঃ "যে মোশরেকদের সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ হইতে সমুদয় চুক্তি বাতিলের সুস্পষ্ট ঘোষণা জারি করা হইল। (আর যাহাদের সঙ্গে কোন চুক্তি নাই তাহাদের প্রশ্ন ত আরও সুস্পষ্ট। উভয় শ্রেণীর কাফেরদের প্রতি চরম পত্র-) তোমরা এই দেশে আর শুধু চারি মাস অবাধে চলাফেরার সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে। (ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম; সুযোগ দিয়াছে। ইতিমধ্যে তোমরা হয় ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ কর, না হয় এই দেশ ত্যাগ কর।) জানিয়া রাখ- তোমরা (আল্লাহর রসূলকে তথা) আল্লাহকে হার মানাইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরে পদদলিত করিবেন।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ হইতে মহান হজ্জের দিনে সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে দৃঢ় কণ্ঠের ঘোষণা জারি করা হইতেছে যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল মোশরেকদের হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। অবশ্য যাহাদের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের চুক্তি রহিয়াছে এবং তাহারা কোন প্রকারে চুক্তি ক্ষুণ্ন করে নাই তাহাদের জন্য চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সুযোগ বহাল থকিবে। এই কথাটি মাত্র ঐ শ্রেণীর জন্য যাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া অচিরে আপনা আপনিই সুযোগ রহিত হইয়া যাইবে। অন্য সব কাফের-মোশরেকদের সম্পর্কে মুসলমানদিগকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হইল এই যে-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

অর্থ ঃ "কাফেরদের জন্য প্রদত্ত সুযোগের চারিটি মাস- যে সময় তাহাদের আক্রমণ করা নিষিদ্ধ; এই চারিটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরই মোশরেকদের পাকড়াও কর, তাহাদের ঘেরাও কর এবং তাহাদের ঘায়েল করার প্রতিটি সুযোগের অপেক্ষায় থাক। হাঁ, যদি তাহারা কুফরী-শেরেকী হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দান করে তবে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কর।

(পারা-১০ সূরা-তওবা)

অনেকের মতে আবু বকর (রাঃ) মক্কাভিমুখে যাত্রা করার পর এই তেজালো ঘোষণা ও চরম পত্রের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আর কাহারও মতে পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হয়ত মিনায় বৃহত্তম জনসমাবেশে তাহা ঘোষণার জন্য নবীজী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে বলিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু আবু বকর

(রাঃ) যাত্রার পর রাষ্ট্রীয় চুক্তি বাতিল ঘোষণার গুরুত্ব প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে নবীজী (সঃ)-এর নিজস্ব বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর সওয়ার করিয়া আলী (রাঃ)-কে ঐ ঘোষণা আবৃত্তির জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আল্লাহর ঘর– কা'বার নগরী মক্কাকে মূল কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আরবকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার বাস্তব পদক্ষেপে নবীজী (সঃ) অগ্রসর হইলেন এবং পরিকল্পনা করিলেন যে, (১) আল্লাহর সঙ্গে কাফের মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সম্পর্কের একমাত্র অধিকারী মোমেন-মুসলমানগণ– ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। (২) আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফকে অন্ধকার যুগের কুফরী রীতি-নীতি হইতে পূর্ণ পাক পবিত্র করা হইবে। (৩) মক্কার এলাকাকে এখন হইতেই চিরতরে কাফের-মোশরেক হইতে মুক্ত রাখার সুব্যবস্থা করা হইবে। (৪) সমগ্র আরবকে ঈমান ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্ররূপে রূপায়িত করার জন্য তথা হইতে উহার বিরোধী সকলকে ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করিতে হইবে; যেন ভিতরে থাকিয়া ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে সুযোগ না পায়। এই চারিটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রসূলুল্লাহ (সঃ) চারিটি নির্দেশ দিয়া তাহা ঘোষণার জন্য ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করিলেন। ঘোষণা চারিটি এই–

(১) মোমেন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে যাইতে পারিবে না। (২) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা শরীফের তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে না। (৩) এই বৎসরের পরে আর কোন কাফের-মোশরেক হজ্জ করিতে পারিবে না। (৪) বিশেষ ঘোষণা– পবিত্র কোরআনের ১৩ পারা সূরা তওবা বা বারাআতের প্রথম আয়াতসমূহ– যাহা মোশরেকদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা এবং চারি মাসের মধ্যে হরম শরীফ হইতে বরং সমগ্র আরব হইতে মোশরেক পৌত্তলিকদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ ছিল। আরবের মোশকেরদের সতর্কীকরণও ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় আরব দেশ ত্যাগ কর, অন্যথায় হত্যা, বন্দী বা ঘেরাওয়ের সম্মুখীন হওয়ার তথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (আসাহহুস সিয়ার– ৪৪৫)

৩ নং আদেশটিও বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের সূরা তওবারই সুস্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ـ

অর্থ ঃ"হে মোমেনগণ! নিশ্চয় মোশরেকরা হইতেছে অপবিত্রই অপবিত্র, সুতরাং তাহারা যেন এই বৎসর হজ্জের পরে আর হরম শরীফ মসজিদের নিকটেও আসিতে না পারে।"

এই চারিটি আদেশ লইয়া নবীজীর (সঃ) ব্যক্তিগত বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর আরোহণপূর্বক আলী (রাঃ) যাত্রা করিলেন। আবু বকর (রাঃ) মদীনা হইতে সত্তর মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া "আরজ" নামক জায়গায় পৌঁছিলে আলী (রাঃ) দ্রুত যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ফজরের নামায আরম্ভ করার জন্য দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় নবীজীর (সঃ) বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর আওয়াজ তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, হয়ত আমার যাত্রার পরে নবীজী (সঃ)-এর হজ্জে আগমনের ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি আসিয়াছেন। অতপর যখন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাত পাইলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, উপরস্থ হইয়া আসিয়াছেন, না অধীনস্থ? আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, আপনার অধীনস্থ হইয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে পাঠাইয়াছেন সন্ধি-চুক্তি বাতিলের ঘোষণা শুনাইবার জন্য।

সেমতে আবু বকর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) একত্রে চলিতে লাগিলেন। হজ্জ পরিচালনার সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আবু বকর (রাঃ)-ই প্রদান করিলেন; আলী (রাঃ) ১০ই যিলহজ্জ মিনায় জামরা আকাবার নিকট জনমণ্ডলীর বৃহত্তম সমাবেশে দাঁড়াইয়া নবী (সঃ) প্রদত্ত ঘোষণাসমূহ প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু

তাআলা আনহুর এই কার্যে তাঁহার সাহায্যার্থ অন্যদেরকে যেমন– আবু হোরায়রা (রাঃ)-কেও আবু বকর (রাঃ) নিয়োগ করিয়াছিলেন । (১ম খণ্ড ২৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হজ্জ সমাপনান্তে আবু বকর (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া নিজ অন্তরের একটি ভীতি দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার প্রতি কোন অভিযোগে আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল কি? নবী (সঃ) তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, না– তবে আমি ভাল মনে করিয়াছিলাম যে, আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি বাতিলের ঘোষণাটা আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব লোক মারফত হউক। (আসাহহুস সিয়ার– ৫৪৭)

অর্থাৎ শুধু উক্ত নিয়ম অনুসরণে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

হিজরী দশম বৎসর
মুসলমানদের পরম আনন্দ ও ইসলামের চরম গৌরবের বৎসর

ইসলামের প্রতি সম্ভাব্য হুমকিসমূহ দমাইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভিযান পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। বহির্বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানরা নবম হিজরীতে মদীনার প্রতি দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া অভিযানের শুধু পকিল্পনা করিয়াছিল; খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (সঃ) চল্লিশ হাজার আত্মোৎসর্গকারী ভক্তবৃন্দ লইয়া দীর্ঘ তিন মাইল পথ অতিক্রম করতঃ রোমানদের নাকের উপর তবুক নামক এলাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ক্যাম্প করিয়া বিশ দিন অবস্থান করিলেন। শত্রুদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সীমান্তে সমাবেশিত শত্রু সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া গেল। মদীনা আক্রমণ করার সাধ তাহাদের চিরতরে মিটিয়া গেল, অধিকন্তু তাহাদের উপর এবং এলাকার উপর মুসলিম বাহিনীর পূর্ণ প্রভাব জগদ্দল পাথররূপে চাপিয়া গেল। এমনকি রোম সীমান্তে আবরদের যেসব দেশীয় রাজ্য দীর্ঘ দিন হইতে রোম সম্রাটের আশ্রিত ও অনুগত ছিল এবং যেসব গোত্র রোম সম্রাটের পক্ষাবলম্বী ছিল, সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রের করতলে আসিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে রোম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত এলাকা মদীনার শাসনে আনয়নপূর্বক গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবুক অভিযানে যুদ্ধ না করিয়া চরম বিজয়লাভে নবীজী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নবীজী (সঃ)-এর এই রাজনৈতিক চরম বিজয়ে আরবের মুমূর্ষু কুফরী শক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগে বাধ্য হইল। মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলামের এই চরম বিজয় আরবে শেরেক ও কুফরী শক্তির কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; বহিঃশক্তির সাহায্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার যে দুরাশা আরবের কাফের-মোশরেকদের ছিল, তবুক অভিযানের ফলাফল উহা হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে নিরাশ করিয়া দিল। এখন ইসলাম সত্য সত্যই বলিষ্ঠ ও বিজয়ী; ইসলামের বিজয়ধ্বনিতে সমগ্র বহির্বিশ্ব প্রকম্পিত এবং ইসলামের জয়জয়কারে আরব উপদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত। দীর্ঘ দশ বৎসরের যুদ্ধের সকল সীমান্তই এখন নীরব। তেইশ বৎসরকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গিয়াছে। উহার ধূম্রজাল কাটিয়া গিয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপের আকাশে ইসলামের পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়াছে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়াছে চতুর্দিক। তাই বিদায় নিতে হইয়াছে কুফর ও শেরকের অন্ধকারকে। আকাশ হইতে আলো নামিয়া আসিলে ধরণীর জমাট বাঁধা অন্ধকারকে নীরবে বিদায় লইতেই হয়।

এদিকে কপট মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও জাহান্নামে চলিয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যুতে ইঁদুর মোনাফেক দলের অবস্থাও কাহিল– এইসব নবম হিজরীর অবস্থা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার পথ নবীজী (সঃ) সুগম করিয়াছেন, ইসলাম পালন করার বিধি-ব্যবস্থার অনুশীলন এবং শিক্ষাদান ও নবীজী (সঃ) পূর্ণ করিয়াছেন। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিব এবং

হালাল-হারামের শিক্ষাদানও কার্যে রূপায়ণ হাতে কলমে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। এখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শুধু একটি স্তম্ভ– একটি রোকন বা মহাফরয হজ্জ যাহা মুসলমানদের সারা জীবনে মাত্র একবার করিতে হয়, উহার অনুশীলন ও বাস্তব রূপায়ণ অবিশিষ্ট রহিয়াছে। দশম হিজরীতে নবী (সঃ) মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া হজ্জ পালনের ইচ্ছা করিলেন। নবীজী (সঃ)-কে দিবালোকে, স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে, খোলা ময়দানে, মুক্ত পরিবেশে মক্কায়, মিনায়, আরাফায় মোযদালেফায় এবং এইসব এলাকার পথে পথে ধীরস্থিররূপে লক্ষাধিক জনতাকে হজ্জের নিয়ম-কানুন কার্যতঃ দেখাইতে হইবে। জনতার ভিড়ে তাহাদের সঙ্গে সর্বদা নবীজীকে মিশিয়া থাকিতে হইবে। তাই নবীজী (সঃ)-এর নিরাপত্তার বাহ্যিক ব্যবস্থা জোরদার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন নবম হিজরীর বিশেষ ঘোষণাবলীতে পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে। সমগ্র হরম এলাকা হইতে কাফের-মোশরেকদের প্রতিটি প্রাণীর উৎখাত সাধিত হইয়াছে, হরম এলাকায় তাহাদের পা রাখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজ্জ উদযাপনে কাফের মোশরেক একটি প্রাণীও নাই; তাহাদের হজ্জে অংশগ্রহণ চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবীজীর (সঃ) নিরাপত্তার এই বাহ্যিক সুব্যবস্থা সম্পন্ন করার প্রয়োজন বহু কারণের একটি কারণ ছিল, নবীজীর (সঃ) হজ্জ উদ্‌যাপন দশম হিজরী পর্যন্ত পিছাইয়া যাওয়ার।

হজ্জের সময় উপস্থিতির বহু পূর্বেই সর্বত্র প্রচার করা হইল, এই বৎসর নবীজী মোস্তফা (সঃ) হজ্জ পালন করিতে যাইবেন। সর্বত্র এই প্রচারণায় অগণিত জনসমুদ্রের ঢেউ মদীনাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রায় দেড় লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে চলিতে লাগিল নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের "কাসওয়া" উষ্ট্রী; পথে পথে আরও অনেক লোকই শামিল হইলেন কাফেলায়। অত্যধিক ভিড় এবং পথে পথে সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে, এইরূপ অনেক কারণেই সংখ্যা নির্ধারণকারীদের বর্ণনায় বিভিন্নতা; যাহা এইরূপ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাভাবিক।

নয় দিন ভ্রমণ করিয়া নবী (সঃ) এই অগণিত মুসলমানসহ মক্কায় পৌঁছিলেন। আজ পবিত্র মক্কায় এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়াছে। শুভ্র শ্বেত বর্ণের একখানা চাদর গায়ে, পরনে একখানা চাদর– নবীজী (সঃ) এবং ধনী-দরিদ্র এমনকি ক্রীতদাস পর্যন্ত এই একই পরিচ্ছদে প্রায় দুই লক্ষ ভক্তের জামাত। সকলেই নগ্ন পদ, নগ্ন মস্তক এবং সকলের মুখেই লাব্বায়ক' ধ্বনি।

সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, এই মক্কা ভূমিতে যাহারা ছিলেন উপেক্ষিত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত তাঁহারাই প্রায় দুই লক্ষ সংখ্যায় আজ মক্কাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কা'বার তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার পরিক্রমণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আজ মক্কার সমগ্র এলাকায় একটি কাফের মোশরেককেও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। যেই দেশে নবীজীর (সঃ) কথা বলার অধিকার ছিল না, আজ সেই দেশের আকাশে-বাতাসে ঝংকৃত হইতেছে নবীজীর (সঃ) কত কত অভিভাষণ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করিয়াছেন নবীজী (সঃ) এবং তাহা পালন করারও সব নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। অবশিষ্ট ছিল শুধু এই মহান হজ্জ; ইহাও উদযাপিত হইয়া চলিয়াছে মহাসমারোহে। মুসলমানদের এই অভূতপূর্ব মহাসমাবেশের চরম গৌরব ও পরম আনন্দমুখর রাজকীয় পরিবেশে নবীজী (সঃ) কর্তৃক হজ্জ উদযাপনের সাথে সাথে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করিল। এই মুহূর্তেই মুসলিম জাতির জন্য চির গৌরব ও মহা সুসংবাদ বহন করিয়া পবিত্র কোরআনের এই মহান আয়াতটি অবতীর্ণ হইল–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ আমি পূর্ণতা দান করিলাম তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে এবং আমার নেয়ামত বা বিশেষ দান এই ইসলামকে পূর্ণ পরিণত করিলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকেই মনোনীত করিলাম।"

এই হজ্জ উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব মানবের প্রতি বিশ্ব নবীমোস্তফা (সঃ) ৯

যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে এবং ২০ যিলহজ্জ মিনার বিভিন্ন স্থানে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বিশ্ব শান্তি কল্যাণ ও বিশ্ব মানবের জন্য সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায় হজ্জ পরিচ্ছেদে আমরা ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই মহা অভিভাষণের মূল বিবরণ ও অনুবাদ করিয়াছি।

হজ্জের মৌলিক কার্যাবলী সমাপনান্তে ১০ যিলহজ্জ বিকাল বেলা শয়তানকে কাঁকর মারার মহাসমাবেশে মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষ করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জনতার দিকে মুখ করিলেন এবং "বিদায়! বিদায়"!! বলিয়া তাহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিদায়ের মূল তত্ত্ব ও মর্ম বুঝিতে বাকী থাকিল না কাহারও; তাই সকলেই নবীজীর (সঃ) এই সমারোহের হজ্জকে "বিদায় হজ্জ" নামে আখ্যায়িত করিল।

(দ্বিতীয় খণ্ড ৯১০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় উপস্থিত হইবা মাত্রই নবীজী (সঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। তাঁহার ভাষণটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। মিনায় শেষ ভাষণ সমাপ্তে জনতাকে নবীজী (সঃ) স্বীয় বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছেন; এখন আর এক ইঙ্গিতের বিশেষ প্রয়োজন যে, তাঁহার বিদায়ের পর উম্মতের কাণ্ডারী বা কর্ণধার কে হইবেন। সেই বিশেষ প্রয়োজন মিটাইয়াছেন নবীজী (সঃ) তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে। শুধু তাঁহার পরবর্তী কর্ণধারের ইঙ্গিতের উপরই ক্ষান্ত হন নাই তিনি, বরং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই প্রয়োজনের সুরাহাকল্পে পরম্পরা কতিপয় নামের ইঙ্গিতও দিয়াছেন এই ভাষণে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বীয় স্নেহাস্পদ উম্মতকে এক ভাষণে নিজ বিদায়ের ইঙ্গিত দানে বিচলিত করিয়া অপর ভাষণে কর্ণধার নির্ধারণে আশ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের কর্তব্যের নির্দেশও দিয়াছেন।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে মদীনায় পৌঁছিয়া সমবেত উম্মতের সম্মুখে মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শোক্‌র আদায় করিয়া বলিলেন–

"হে লোকসকল! আবু বকর কখনও আমার প্রতি কোন ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখিও।

হে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমার ছাহাবীগণের বেলায় আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করিও বিশেষতঃ যাঁহারা আমার শ্বশুর (যেমন– আবু বকর, ওমর) এবং যাঁহারা আমার দোস্তদার (যেমন, উল্লিখিত গণ্যমান্যগণ) তোমরা সতর্ক থকিও– আমার কোন একজন ছাহাবীর প্রতি অশোভনীয় আচরণের দায়ে। তোমাদের কাহারও যেন আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযুক্ত হইতে না হয়।

হে লোকসকল! মুসলমানদের গ্লানি প্রচার হইতে বিরত থাকিও এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহার প্রতি মন্তব্য করিতে ভাল মন্তব্য করিও। (বেদায়া, ৪– ২১৪)

হিজরী একাদশ বৎসর
নবীজী (সঃ)-এর মহাপ্রয়াণ উম্মতের মহাশোক

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব, পরিচয় এবং জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যেরূপ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত ছিল, তদ্রূপ তাঁহার তিরোধানের বিবরণও বর্ণিত ছিল। ঐসব কিতাবের জ্ঞানীগণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনায় উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৭১৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬২৫) জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানবাসী দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমি সাক্ষাত করিলাম– একজন যু-কালা, অপরজন যু-আম্‌র। তাঁহাদের সহিত আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাহা শ্রবণে যু-আম্‌র আমাকে বলিলেন, আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা যদি প্রকৃতই ঐরূপ হইয়া থাকে যাহা আপনি বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইতিমধ্যে তিন দিন পূর্বে তিনি পূর্বে ইহকাল ত্যাগ করিয়াছেন।

অতপর তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। আমরা তিন জন পথ চলিতে লাগিলাম। পথে একদল লোকের সহিত সাক্ষাত হইল– তাহারা মদীনা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট মদীনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা বলিল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার খলীফা মনোনীত হইয়াছেন, জনগণ সুশৃঙ্খল রহিয়াছে। এতদশ্রবণে তাঁহারা উভয় আমাকে বলিলেন, এখন আমরা মদীনায় যাইতেছি না। আপনি আমাদের সম্পর্কে আবু বকর (রাঃ)-কে বলিবেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, মদীনার পানে যাত্রা করিয়াছিলাম (আশা ছিল নবীজী (সঃ)-এর পদধূলি লাভ হইবে, কিন্তু ভাগ্যে তাহা জুটিবার নহে। হয়ত অচিরেই আমরা ইন্‌শাআল্লাহ তাআলা মদীনায় আসিতেছি। এই বলিয়া তাঁহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমি মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহাদের সমুদয় কথাবার্তা আবু বকর (রাঃ)-কে জ্ঞাত করিলাম, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিয়া আসিলেন না কেন?

অনেক দিন পর যু-আমরের সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার মস্ত বড় অনুগ্রহ রহিয়াছে (আপনার মাধ্যমেই আমি ইসলাম লাভ করিতে পারিয়াছি)। তাই আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাই– আপনাদের (আরব জাতির যাঁহারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন–) যে যাবত এই রীতি বহাল থাকিবে যে, শাসনকর্তা একজনের পর অপরজনের নিয়োগ পরামর্শের মাধ্যমে হইবে তাবত আপনাদের মধ্যে মঙ্গল অক্ষুণ্ন থাকিবে। যখন তরবারির সাহায্যে ক্ষমতা দখল করা হইবে, তখন শাসনকর্তাগণ একনায়ক হইবেন; তাহাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি একনায়কগণের ন্যায় নিজ মর্জির ভিত্তিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইয়ামানের আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় এলাকার সমাজপতি ছিলেন। ইয়ামানবাসী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবী মারফত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট নবীজী (সঃ) ইসলামের আহ্বান লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লিপিবাহকরূপেই জরীর (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার পানে যাত্রা করিলেন, পথে থাকাকালীনই নবীজী (সঃ) ইহকাল ত্যাগ করেন। তাই তাঁহারা ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আলোচ্য ঘটনায় যে, যু-আম্‌র নামীয় ব্যক্তি মদীনা হইতে বহু দূর ইয়ামানে থাকিয়া আলোচনার মাধ্যমে সর্বশষ পয়গম্বরকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ইহাও বলিতে পারিলেন যে, তিন দিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে– ইহা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছিল।

নবীজী (সঃ)-কে ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেতদান

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

নবীজী (সঃ)-এর প্রতি সূরা নসর অবতীর্ণ হইল, যাহা সুসংবাদ বহনকারী ছিল–

অর্থ ঃ আল্লাহর সাহায্য পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, মক্কা জয় হইয়া গিয়াছে এবং দলে দলে লোকদের আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া নিয়াছেন। অতএব (এখন) স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণার ও তাঁহার প্রশংসায় লিপ্ত থাকুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন; নিশ্চয় তিনি হইলেন অতিশয় ক্ষমাশীল, নেক দৃষ্টি দানকারী।

এতদ্ভিন্ন দশম হিজরী সনেই হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করেন এবং আরাফার ময়দানে সুসংবাদ বহনকারী এই আয়াত নাযিল হয়–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ (ইসলামের অবশিষ্ট রোকন– হজ্জকে স্বয়ং আপনার দ্বারা এবং আপনার সম্মুখে লক্ষাধিক সংখ্যক মুসলমান দ্বারা বিনা বাধায় পূর্ণ শান-শওকতের সহিত সম্পন্ন করাইয়া) আজিকার দিনে আমি তোমাদের (মুসলমান) জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম)-কে (আরকান আহকাম এবং শক্তি বিকাশের দিক দিয়া) সম্পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিলাম এবং (এইরূপে) আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীনরূপে পছন্দ করিয়া নিয়াছি। (পারা–৬, রুকু–৫)

সূরা নসর এবং উক্ত আয়াত বস্তুত হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ইহজগত ত্যাগ সম্পর্কে একটি সঙ্কেত ছিল। কারণ, ইহজগতে হযরতের আবির্ভাব দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্যই ছিল। তাহা যখন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নিতেছে, এমতাবস্থায় এই কষ্ট ক্লিষ্টের জগতে অবস্থানের আবশ্যক হযরতের জন্য থাকে নাই, তাই তাঁহাকে ইহজগত ত্যাগের প্রস্তুতি করা চাই। যেমন রাজদূত তাঁহার কার্য শেষে আপন দেশে যথাশীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হয়। নবীজী (সঃ)ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ যখন ফুরাইয়াছে তখন শীঘ্রই তাঁহাকে এই ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

সূরা নসরের এই তাৎপর্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুধাবন করিতে পারিয়াই এই সূরার শেষ অংশের আদেশগুলি পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। উঠা-বসা, চলাফেরা তাঁহার মুখে শুনা যাইত–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ এবং

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ এবং

বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ঐ তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩১৯১)

১৭১৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৭৪৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফাতুল মুসলেমীন) ওমর (রাঃ) তাঁহার দরবারে (বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে, এমনকি) বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারী বড় বড় ছাহাবীদের সঙ্গে আমাকে স্থান দিয়া থাকিতেন। ইহাতে কোন কোন লোক মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁহারা বলিলেন, এই অল্প বয়স্ক যুবককে কেন আমাদের সঙ্গে স্থান দিয়া থাকেন? তাহার বয়সের সন্তান-সন্ততি আমাদের রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, সে যে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা ত আপনারা ও জ্ঞাত আছেন।

অতপর একদা ওমর (রাঃ) বিশেষভাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দরবারে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে অন্যদের সঙ্গে বসাইলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলম যে, ওমর (রাঃ) (আমার দ্বারা) দরবারের লোকগণকে কোন একটা কিছু দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) দরবারের সকলকে বলিলেন, "ইয়া জাআ' নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু" সূরার তাৎপর্য সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুপ রহিলেন। আর কেহ কেহ বলিলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য এবং মক্কা বিজয় হওয়ায় (শুকরিয়াস্বরূপ) আমাদিগকে আল্লাহর প্রশংসা করিতে এবং তাঁহার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থীরূপে নম্র হইয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে আব্বাস ! তুমিও কি এইরূপই বুঝিয়া থাক? আমি বলিলাম, না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি কি বল? আমি বলিলাম, এই সূরায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইহজগত ত্যাগের কথা জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে আল্লাহর সাহায্যে মক্কা পর্যন্ত জয় হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকের লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা লাভ করিতেছে; ইহা আপনার ইহজগত ত্যাগ নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন। অতএব এখন বিশেষভাবে "তসবীহ্ তাহ্মীদ" প্রভুর পবিত্রতা প্রশংসা জপনায় এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও এই সূরার তাৎপর্য তাহাই বুঝি যাহা তুমি বলিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা "নসর" কাহারও মতে বিদায় হজ্জের মধ্যে এবং কাহারও মতে বিদায় হজ্জের পূর্বে নাযিল হইয়াছিল। হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের পূর্বেই ইহজগত ত্যাগ আসন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বের বৎসরগুলিতে রমযান মাসে জিব্রাঈল ফেরেশতা হযরতের সঙ্গে কোরআন শরীফ একবার খতম করিতেন, দশম হিজরীর রমযান মাসে দুই বার খতম করিলেন। হযরত (সঃ) ইহা দ্বারাও আঁচ করিতে পারিলেন যে, এই রমযান তাঁহার জীবনের শেষ রমযান। সম্মুখে ১৭৩৩ হাদীছে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বোধহয় সেই জন্যই তিনি এই রমযানে দশ দিনের স্থলে কুড়ি দিনের এ'তেকাফ করিয়াছিলেন

১৭২০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৭৪৮) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রাঈল ফেরেশতা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে প্রতি রমযানে একবার কোরআন শরীফ দাওর করিতেন। যেই বৎসর (রমযানের পরে) হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর (রমযানে) দুই বার দাওর করিয়াছিলেন এবং হযরত (সঃ) প্রতি বৎসর দশ দিনের এতেকাফ করিয়া থাকিতেন। যেই বৎসর তিনি ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর বিশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

মুসলিম শরীফে আছে- হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন, আমাকে দেখিয়া তোমরা হজ্জের নিয়মাবলী শিখিয়া রাখ; হয়ত তোমাদের সঙ্গে হজ্জ করার সুযোগ পুনরায় আর আমি পাইব না।

বিদায় সঙ্কেত প্রাপ্তিতে নবীজী (সঃ)-এর অবস্থা

স্বদেশে স্বজনগণের নিকটে ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত কাজকর্ম ও ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া, দায়িত্ব কর্তব্য শেষ করিয়া আনন্দ ঔৎসুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে, প্রবাসের প্রতি বিমনা হইয়া পড়ে; ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত প্রাপ্তিতে হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর নবীজী (সঃ) যেন তদ্রূপ পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল কার্যে সকল চিন্তায় ও ভাবধারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ওপার হইতে আগত ব্যক্তি যেমন বেলা শেষে নদীর কূলে দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে তাকায়; নবীজী মোস্তফা (সঃ)ও যেন পরপারের আকর্ষণে এই পার হইতে বিমনা হইয়া পরপারের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। এমনকি তিনি কোন ভাষণ দিলে শ্রোতাদের অনুভূতিতে ও দৃষ্টিতে তাঁহার ঐ ভাব দিবালোকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত। যেমন এক হাদীছে আছে –

এরবায (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া উপদেশমূলক বক্তব্য রাখিলেন, যাহা অত্যধিক মর্মস্পর্শী ছিল। সেই বক্তব্য শ্রবণে সকলের চোখই অশ্রু বহাইতে এবং অন্তর কাঁপিতে লাগিল। একজন ছাহাবী ঐ অবস্থায় আরজ করিলেন, ইয়া

রসূলাল্লাহ! আপনার এই ওয়াজ বিদায়কালীন ওয়াজের ন্যায় মনে হয়। অতএব আপনি আমাদেরে শেষ উপদেশ দিয়া যান। নবীজী (সঃ) ঐ ছাহাবীর কথা খণ্ডন না করিয়া উত্তরদানে বলিলেন; তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ–

"সর্বদা আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আর মুরব্বী ও উপরস্থের কথা মানিয়া চলিবে, যদিও সে নিম্নমানের হয়। আমার পরে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অনেক বিভেদ দেখিতে পাইবে। সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার সুন্নত এবং সত্যের ধারক-বাহক আমার খলীফাদের সুন্নতের উপর দৃঢ়পদ থাকিবে, উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, উহাকে শক্তভাবে দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া ধরিয়া রাখিবে। ঐ সুন্নত ছাড়া যত প্রকার গর্হিত তরীকা হইবে, সব হইতে সযত্নে দূরে সরিয়া থাকিবে। ঐরূপ গর্হিত তরিকাকেই "বেদআত" বলা হয় এবং সব রকম বেদআতই ভ্রষ্টতা। (মেশকাত শরীফ ৩০)

বিদায় হজ্জ সমাপনান্তে মদীনার নিকটবর্তী "গাদীরে খোম" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) অবস্থান করিয়া তথায়ও ভাষণ দিয়াছিলেন; সেই ভাষণে সুস্পষ্টরূপে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিদায়ের কথা বলিয়াই দিয়াছিলেন।

"গাদীরে খোম"-এর ভাষণ

মক্কা হইতে মদীনার পথে একটি স্থানের নাম হইল "গাদীরে খোম"। হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে মদীনাপানে যাত্রা করিয়া চারি দিন পথ চলার পর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ শনিবার যোহরের নামাযের সময় সকলকে একত্র করিয়া নবী (সঃ) এই স্থানে বিশেষ কারণে একটি ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

শিয়া সম্প্রদায় এই ভাষণকে কোরআন হাদীছ, ঈমান-ইসলামের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। তাহারা ইহাকে তাহাদের হৈ-হল্লা ও গোমরাহ মতবাদের মূল বেসাতি বানাইয়াছে।

ভাষণের মূল কারণ ঃ বিদায় হজ্জে মদীনা হইতে যাত্রার পূর্বেই নবী (সঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অধীনে ইয়ামান এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তথা হইতে আসিয়া হজ্জ সমাপনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে শামিল হইয়াছিলেন। হজ্জ সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে এই "গাদীরে খোম" নামক স্থানে বা ইহার পূর্বে ঐ বাহিনীর লোকগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আলী (রাঃ) সম্পর্কে কোন বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। বিশেষতঃ বোরায়দা (রাঃ) নামক ছাহাবী যিনি আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আচরণকে অশোভনীয় গণ্য করিয়াছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তাঁহার সম্পর্কে অভিযোগ করিলেন। তাহাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এস্থলে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য– একটি সর্বক্ষেত্রের জন্য নীতিগত বিষয়, আর একটি এই ক্ষেত্রের বিশেষ বিষয়।

নীতিগত বিষয়টি হইল, নবী (সঃ) আল্লাহ তাআলার এই পরিমাণ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, প্রভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলে বায়ত– পরিবার-পরিজন আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। যেরূপ মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ, যাহা সকল মুসলমানের সাহায্যার্থ বায়তুল মাল বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে জমা করা হইত, তাহার মধ্যে "জবিল কোরবা" তথা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের জন্য একভাগ বিধানগতরূপে নির্ধারিত থাকিত। ইসলামের এই বিধান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বজনপ্রীতি ছিল না। "নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা"। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি স্বজনপ্রীতির এক অণুকণার ধারণাও ঈমান ধ্বংসকারী। উল্লিখিত বিধান ত পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে (পারা–১০, রুকু– ১ দ্রষ্টব্য)। এই বিধান আল্লাহই করিয়া দিয়াছেন। তদ্রূপই

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার অতুলনীয় ভালবাসার প্রভাবে তাঁহার আহ্‌লে বায়ত আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রীতিভাজন সাব্যস্ত। এই প্রীতিভাজন হওয়ার স্বাভাবিক ফল ইহাই যে, তাঁহাদের প্রতি সকলেই বিশেষ ভালবাসা রাখিতে হইবে; তাঁহাদের সম্পর্কে প্রশস্ত অন্তর রাখিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত কাজ মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল হইবে। নবী (সঃ) উম্মতের জন্য নীতি নির্ধারক ও মঙ্গলকামী হিসাবে উল্লিখিত সত্য সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করা তাঁহার একটি কর্তব্য ছিল। গাদীরে খোমের ঘটনা ঐ সত্যটি আলোচনার একটি সুন্দর ও উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কারণ, ঐ ঘটনায় নবী (সঃ)-এর আহ্‌লে বায়তের অন্যতম সদস্য আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সঙ্কীর্ণমনা হওয়ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সামান্য ছোটখাট বিষয়ে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অভিযোগ করা হইয়াছিল।

আর ঐ ক্ষেত্রে অনুধাবনের বিশেষ বিষয় এই ছিল যে, ঐ অভিযোগের ব্যাপারে আলী (রাঃ) নির্দোষ ছিলেন। আলী (রাঃ) আহ্‌লে বায়তের সদস্য হিসাবে তিনি বিশেষ প্রীতিভাজন হওয়ার অধিকারী। এমতাবস্থায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি অভিযোগ তাঁহার অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি ভালবাসা রাখার বিশেষ নির্দেশ ও দাবী নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজনের তাকিদেই নবী (সঃ) "গাদীরে খোম" স্থানে এই বিষয়ে বিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৫-২০৮)

মুসলিম শরীফের হাদীছে উক্ত ভাষণের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনার পর নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন-

اَلاَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَن يَّاْتِيَنِىْ رَسُوْلُ رَبِّىْ فَاُجِيْبَ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ ـ

অথ ঃ হে লোকসকল! আমি মানুষই বটে; অচিরেই হয়ত আমার প্রভুর দূত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য উপস্থিত হইবেন; আমিও অবিলম্বে তাঁহার ডাকে সাড়া দিব। আমি অতি মহান দুইটি জিনিস তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি। প্রথমটি হইল, আল্লাহর কিতাব, যাহার মধ্যে হেদায়াত (সঠিক পথ প্রদর্শন) এবং নূর (ঐ পথের আলো) রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধরিয়া থাকিবে, উহা আঁকড়াইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়টি হইল আমার পরিবার-পরিজন (তাহাদের হইতে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে)। তাহাদের সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করাইয়া যাইতেছি। (আসাহ, ৫৩৯)

নাসায়ী শরীফ এবং অন্যান্য কিতাবে উক্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এইরূপ রহিয়াছে- "গাদীরে খোম" এলাকায় পৌঁছিয়া যোহর নামাযের সময় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য গাছতলায় স্থান ঠিক করা হইল এবং লোকদিগকে নামাযের জন্য একত্র করা হইল; যোহরের নামায একটু সত্বরই পড়া হইল। নামাযান্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে ডাকিয়া নিজের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন! তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার গুণ-গান পূর্বক বলিলেন-

اَيُّهَا النَّاسُ كَاَنِّىْ قَدْ دُعِيْتُ فَاَجَبْتُ اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلَ بَيْتِىْ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِّىْ فِيْهِمَا فَاِنَّهُمَا لَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ مَوْلاَئِىْ وَاَنَا وَلِىُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَاَحِبَّ مَنْ اَحَبَّهُ وَاَبْغِضْ مَنْ اَبْغَضَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ـ

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! আমার যেন (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পরপারের) ডাক আসিয়া গিয়াছে এবং আমি তাহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। আমি অতি মহান দুইটি বস্তু তোমাদের নিকট রাখিয়া যাইতেছি– আল্লাহর কিতাব এবং আমার পরিবার পরিজন, আমার আহলে বায়ত। আমার পরে এই দুই বস্তু সম্পর্কে নীতি অবলম্বনে তোমরা গভীর চিন্তা করিও। এই বস্তুদ্বয় এক সঙ্গেই হাউজে কাওসারের কিনারায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে (তাহাদের সহিত তোমাদের নীতি সম্পর্কে ঐ সময় তাহারা বক্তব্য রাখিবে)।

তার পর নবী (সঃ) বলিলেন– আল্লাহ আমার প্রিয়, আমি সকল মোমেনের প্রিয়; এই কথা বলার পর নবী (সঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, আমি যাহার প্রিয় হইব আলীও তাহার প্রিয় হইতে হইবে। আয় আল্লাহ! তুমি তোমার প্রিয় বানাও ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আলীকে প্রিয় বানায় এবং তুমি শত্রু গণ্য কর ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আলীকে শত্রু বানায় এবং তুমি ভালবাস ঐ ব্যক্তিকে যেব্যক্তি আলীকে ভালবাসে এবং অসন্তুষ্ট থাক ঐ ব্যক্তির প্রতি যেব্যক্তি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে এবং সাহায্য কর ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি আলীর সাহায্য করে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও "আহ্‌লে বায়ত" ছিলেন মুসলিম জননী নবী পত্নীগণ, আর ফাতেমা (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং হাসান ও হোসাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা (বয়ানুল কোরআন; পারা–২২, রুকু–১)

নবী পত্নীগণ আহলে বায়ত হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ইশারা রহিয়াছে; অন্যান্যগণ সম্পর্কে দুইটি হাদীছ আছে। একটি হাদীছে ত নিতান্তই সুস্পষ্ট। কোন এক বিশেষ উপলক্ষে নবী (সঃ) আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে ডাকিয়া একত্রীত করিলেন এবং বলিলেন–اللهم هؤلاء اهلى "হে আল্লাহ! ইহারা আমার আহ্‌ল পরিজন।" (মুসলিম শরীফ)–

অপর হাদীছে আছে– একদা নবী (সঃ) স্বীয় চাদরের ভিতরে হাসান, হোসাইন, ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-কে জড়াইয়া নিয়া ২২ পারা প্রথম রুকুর ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলেন যাহাতে "আহ্‌লে বায়ত" -এর উল্লেখ রহিয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

আলোচ্য ভাষণে আলী (রাঃ) সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তির প্রতিক্রিয়া ছাহাবা কেরামের উপর কি হইয়াছিল সে সম্পর্কে উক্ত ভাষণের পর ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উক্তি এই –

هنيئا يا ابن ابى طالب اصبحت وامسيت مولى لكل مؤمن ومؤمنة -

অর্থ ঃ হে আবু তালেব পুত্র! আপনাকে মোবারকবাদ– আপনি সর্বদার জন্য প্রত্যেক মোমেন নর-নারীর প্রিয়পাত্র হইয়া গেলন। (মেশকাত শরীফ, ৫৬৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্তবা ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছই বর্ণিত রহিয়াছে। আলোচ্য ভাষণটি ত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ভালবাসা রাখার আদেশ ও দাবী জ্ঞাত করার জন্যই ছিল। কিন্তু মান মর্যাদা, ফযীলত ও ভালবাসার জন্য তাহা অবধারিত নহে যে, আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত– প্রথম খলীফা হওয়ার নির্ধারিত অধিকারী ছিলেন। শিয়া সম্প্রদায় আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে সেই অধিকারেরই আকীদা ও একীন রাখিয়া থাকে। এমনকি তাহাদের মৌলিক মতবাদ এই যে, আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই অধিকার খর্ব করিয়া ছাহাবীগণ অন্যায় করিয়াছিলেন (নাউযু বিল্লাহে মিন যালিকা)। এইরূপ মতবাদ ও ধারণা পোষণ করা কবীরা গোনাহ।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত ও তাঁহার পরবর্তী খলীফা আবু বকর (রাঃ) হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনেক সুস্পষ্ট ইশারা বিদ্যমান ছিল। (১) অন্তিম শয্যায় নবী (সঃ) নামাযের জন্য যাইতে অপারগ হইলে পর আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাহার বিপরীতে

কতেক বার পীড়াপীড়ি করার উপর নবী (সঃ) কঠোর মন্তব্যপূর্বক জোরালো ভাষায় আদেশ করেন–
مروا ابابكر فليصل بالناس "লোকদের নামায পড়াইবার জন্য তোমরা আবু বকরকেই বল।" এই অবস্থায় নবী (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিশ ওয়াক্ত নামাযে আবু বকর (রাঃ)-ই ইমাম থাকেন; অথচ সেখানে আলী (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। (২) অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে নবী (সঃ) হজ্জে গমন করেন নাই; তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে তাঁহার স্থলে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আলী (রাঃ)-কে পরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। (৩) নবী (সঃ) কাহাকেও কোন কথা বা আশ্বাস দিলে তাহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকিবে– এইরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়া দিতেন। (৪) খেলাফত সম্পর্কে লোকদের বিভিন্ন দাবী ও আশার নিরসনে অন্তিম শয্যায় নবী (সঃ) লিপি লিখিয়া দেওয়ার জন্য আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অতপর তাঁহার সেই ইচ্ছা তিনি মুলতবী করিয়াছেন এই বলিয়া যে يابى الله والمؤمنون الا ابابكر "আল্লাহ এবং মুসলিম সমাজ আবু বকর ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বীকার করিবে না।" এই সম্পর্কে ৬ষ্ঠ খণ্ডে আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই শ্রেণীর অনেক তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া "গাদীরে খোম"-এর ভাষণকে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রথম খলীফা নির্ধারিত হওয়ার প্রমাণরূপে দাঁড় করা ভ্রষ্টতা বৈ নহে। উক্ত ভাষণে খলীফা নির্ধারণের কোন উক্তি নাই; আলী (রাঃ) সম্পর্কে "মাওলা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার অর্থ প্রিয়পাত্র; খলীফা হওয়ার অর্থের সঙ্গে ঐ শব্দের কোন সম্পর্ক নাই।

এইভাবে যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ততই পরপারের দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ইহজীবন হইতে বিদায়ী কার্যকলাপ ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ভয়াবহ যুদ্ধ ময়দানে যাঁহারা কঠোর পরীক্ষায় নবীজীর চরণ প্রান্তে দাঁড়াইয়া দ্বীন ইসলামের সেবায় আত্মদান করিয়াছেন– বিদায়ের বেলায় নবীজী (সঃ) তাঁহাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিলেন। এমনকি (অনেকের মতে) এই সময়ে একদা তিনি ওহুদ প্রান্তে যথায় শহীদাগণ চির নিদ্রায় শুইয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শহীদানের সমাধি কিনারায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জন্য প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। ঘটনার বর্ণনাকারী যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন– নবীজী (সঃ) যেন মৃত, জীবিত সকল হইতে বিদায় হইতেছিলেন। (পৃঃ ৫৭৮)

নবীজী (সঃ)-এর পীড়ার সূচনা

দশম হিজরীর শেষ যিলহজ্জ মাসে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করিয়া মাসের অল্প কয়েক দিন বাকী থাকিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন– তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। পরবর্তী মহররমের চাঁদ হইতে একাদশ হিজরী বৎসর আরম্ভ হইল। পূর্ণ মহররম মাসও হযরত (সঃ) সুস্থ ছিলেন।

একাদশ হিজরীর দ্বিতীয় মাস– সফর মাসের শেষ দিকে একদা রাত্রি বেলা হযরত নবী (সঃ) স্বীয় খাদেম আবু মোআইহাবাহ্‌কে নিদ্রা হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "বাকী (মদীনার) কবরস্থানে যাইয়া তথাকার সমাহিতদের জন্য দোয়ায়ে মাগফেরাত করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (সঃ) তথায় গেলেন এবং প্রত্যাবর্তন করার পর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন– তাঁহার মাথা ব্যথা ও জ্বর আরম্ভ হইল। এই রাত্রটি ২৯ সফর মঙ্গলবার দিবাগত ৩০ সফর বুধবার রাত্র ছিল।*

---

* অর্থাৎ সফর মাসের মাত্র এক রাত্র বাকী রহিয়াছে। এই সময় হযরত (সঃ) রোগাক্রান্ত হইলেন। এই রাত্রটি বুধবার গণ্য। কারণ ইসলামী হিসাবে রাত উহার পরবর্তী দিনের অংশ বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত "আখেরী চাহার শোম্বা" তথা সফর মাসের শেষ বুধবারের বৈশিষ্ট্যের সূত্র ইহাই যে, এই বুধবারেই হযরতের অন্তিম রোগ হইয়াছিল। রোগাক্রান্তির বরা ত বুধবার ছিল, কিন্তু তাহা কোন তারিখ ছিল সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সফর মাসের শেষ রাত্র হওয়া সম্পর্কেও একটি মত্

রোগের প্রথম প্রকাশ

"জান্নাতুল বাকী" গোরস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ) পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে আসিয়া নবীজী (সঃ) শুনিতে পাইলেন- আয়েশা (রাঃ) মাথার ব্যথায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন- উঃ! মাথা গেল! তখন নবীজী (সঃ) বিবি আয়েশার সহিত কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার ত্রাসের কি কারণ? আমার সম্মুখে তোমার মৃত্যু হইলে ত তোমার বড় সৌভাগ্য। আমার হাতে তোমার কাফন দাফন ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে এবং আমি তোমার জানাযা পড়াইয়া কবরে শোয়াইয়া দিব- এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! আয়েশা (রাঃ) তদুত্তরে রাগত স্বরে ঠেস মারিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার কামনা- আমি মরিয়া যাই আর আপনি একজন নতুন বিবি আনিয়া আমার ঘরে নতুন সংসার পাতেন! এই সময় নবী (সঃ) বিবি আয়েশার এই স্নিগ্ধ বিদ্রূপ স্মিত হাস্যে উপভোগ করিয়া নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশপূর্বক বলিলেন, তোমার মাথা কি গেল? বরং আমার মাথা গেল! (বেদায়া, ৪-২২)

নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের উল্লেখ আছে।

১৭২১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৪৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলাম, হায় মাথা! আমার হায়-হুতাশ শুনিয়া নবী (সঃ) বলিলেন, তোমার চিন্তা কি? আমি জীবিত থাকাবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হইয়াই যায় তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফেরাত কামনা ও দোয়া করিব।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হায়! আমার পোড়া কপাল মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন! তাহা হইলে ত সেই দিনের শেষ ভাগে (আমার গৃহে) অন্য স্ত্রীর সঙ্গে আপনি রাত্রি যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মৃদু হাসি হাসিলেন এবং) বলিলেন, (তোমার মাথায় কি ব্যথা? তাহাতে কিছুই নহে, বরং আমার মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা; আমি বলিতে পারি- হায় মাথা! (ইহা হইতেই হযরতের অন্তিম রোগ আরম্ভ।)*

নবীজী (সঃ)-এর অন্তিম রোগ

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম রোগের আরম্ভ ছিল মাথা ব্যথা; অচিরেই ইহার সহিত ভীষণ জ্বরও মিলিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম; তখন নবীজী ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি তাঁহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, আপনার জ্বর ত অতি মাত্রায়! নবীজী (সঃ) বলিলেন, হাঁ- তোমাদের সাধারণ লোকের দুই জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার আসে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই কারণে যে, আপনার সওয়াবও দ্বিগুণ? নবী (সঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি শপথ করিয়া আরও বলিলেন, যেকোন মুসলমানের পীড়া বা অন্য কোন কষ্ট হইলে তাহার গোনাহ এইরূপে ঝরিয়া যায় যেরূপ গাছের শুষ্ক পাতা ঝরিয়া যায়। (বেদায়া, ৪-৪৩৭)

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ঐ সময়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গায়ে কম্বল দেওয়া ছিল। জ্বর এরূপ ভীষণ ছিল যে, ঐ কম্বলের উপর হাত রাখিলে জ্বরের তাপ অনুভূত হইত। (যোরকানী, ৮-২০৯)

আছে, (মজমুয়া ফতওয়া মালানা আবদুল হাই, ২-২৩৯ দ্রষ্টব্য।) আমরা এই মতকে অগ্রগণ্য ধরিয়াছি। কারণ, এই বুধবার ৩০ তারিখ হইলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন সোমবার রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ হইতে পারে, যাহা অতি প্রসিদ্ধ। এই সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন আছে, তাহার মীমাংসা "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন" বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করা হইবে।

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়গুলি মেশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

নবীজী (সঃ)-এর শেষ অবস্থান

রোগ অবস্থায়ও নবীজী (সঃ) তাঁহার ন্যায় নীতি আদর্শের উপর দৃঢ় ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বিবিগণের জন্য নির্ধারিত তারিখে এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতেছিলেন। অবশেষে যখন পীড়ার যাতনা বাড়িয়া গেল এবং এই ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়ার ক্ষমতা ঘনাইয়া আসিল, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ জন্মিল। এই গৃহই সর্বাধিক ওহী অবতরণের ক্ষেত্র এবং বিধাতা কর্তৃক তাঁহার শেষ শয্যার স্থানরূপে নির্ধারিত ছিল। এই গৃহে আসিবার দিন ছিল সোমবার দিন; সোমবার দিনের পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) এই গৃহের প্রতি স্বীয় আকর্ষণ ও অপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ রহিয়াছে।

১৭২২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, আগামীকল্য আমি কোন্ স্ত্রীর গৃহে থাকিব? এই জিজ্ঞাসা দ্বারা তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের প্রতি অপেক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। অন্য বিবিগণ (ইহা বুঝিতে পাইয়া) সন্তুষ্ট চিত্তে নবী (সঃ)-কে যাহার গৃহে ইচ্ছা অবস্থান করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সেমতে হযরত (সঃ) আয়েশার গৃহে অবস্থান করিলেন, এমনকি এই গৃহেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ সোমবার দিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে অবস্থানের দিন; এই দিন হযরত (সঃ) আয়েশার গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় এই গৃহেই পরবর্তী সোমবারে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময় একদা হযরত (সঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আবু বকর ও তাহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া (আবু বকরকে আমার স্থলাভিষিক্তরূপে) মনোনীত করিয়া দেই, যেন অন্য কাহারও কিছু বলার বা আশা করার অবকাশ না থাকে, কিন্তু পরে ভাবিলাম, (আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মনোনয়ন) একমাত্র আবু বকর ছাড়া অন্য কাহারও জন্য আল্লাহ তাআলাও হইতে দিবেন না, মুসলমানগণ গ্রহণ করিবে না।

পরকালীন জেন্দেগীকে প্রাধান্য দান

নবীগণের কর্তব্য পূর্ণ হওয়ার পর তাঁহাদের সম্মানার্থ মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইত যে, ইচ্ছা করিলে দুনিয়ার দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে পারেন অথবা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রস্তুত নেয়ামতসমূহ উপভোগেও চলিয়া আসিতে পারেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকেও সেই অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। হযরত (সঃ) আখেরাতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় শায়িত হওয়ার কয়েক দিন পর স্বয়ং হযরত (সঃ) এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭২৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১৬) আবু সায়ী'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্ব সাধারণ সমক্ষে ভাষণ দান করিলেন তিনি বলিলেন। আল্লাহ তাআলা এক বান্দাকে দুনিয়ার জেন্দেগী উপভোগ কিম্বা তাঁহার নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগ– উভয়ের কোন একটা গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়াছেন; সে আল্লাহর নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগকেই অবলম্বন করিয়াছে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমাদের মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক! আমরা তাঁহার ক্রন্দনে আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক বান্দা সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করিলেন আর এই বৃদ্ধ কাঁদিতেছেন! প্রকৃত প্রস্তাবে সেই

বান্দা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ই ছিলেন (আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না, আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন)। আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

(আবু বকরের ক্রন্দন হযরত (সঃ)-কে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাই) হযরত (সঃ) তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে বারণ করিতেছিলেন এবং) বলিলেন, জান-মাল উভয় দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি হইল আবু বকর (রাঃ)। আমি যদি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কাহাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম তবে আবু বকর (রাঃ)-কে নিশ্চয়ই সেই স্থান দান করিতাম। অবশ্য তাহার জন্য ইসলামীভ্রাতৃত্ব সেই সূত্রের দোস্তি মহব্বত পূর্ণরূপে রহিয়াছে।

হযরত (সঃ) (আবু বকরের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ) এই নির্দেশও দান করিলেন যে, নিজ নিজ বাড়ী হইতে (আমার) মসজিদের দেয়ালে যতগুলি দরজা খোলা হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু আবু বকরের দরজা বাকী রাখিয়া অন্যান্য সমুদয় দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বুধবার এবং দীর্ঘ তের দিন* রোগ শয্যায় থাকিয়া সোমবার দিন ইহাজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন– সেই সোমবারের পূর্বের বৃহস্পতিবার দিন হইতে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় দিনের প্রথমার্ধে হযরত (সঃ) মুসলমানদের মঙ্গলার্থ একটি লিপি লিখিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া কাগজ-কলম চাহিলেন। কিন্তু হযরত (সঃ) রোগ যাতনার ভীষণ চাপে থাকিয়া আবার লিপি লেখাইবার কষ্ট করিবেন তাহা কোন কোন ছাহাবীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা কাগজ কলম আনিয়া দিয়া হযরতের কষ্ট-ক্লেশ বর্ধিত করিতে বাধা দান করিলেন। অবশেষে হযরত (সঃ)-ও স্বীয় ইচ্ছা হইতে বিরত রহিলেন এবং মতভেদ করিতে যাইয়া সাহাবীগণের মধ্যে কিছুটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হইলে হযরত (সঃ) সকলকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ঘটনার বিবরণ ১ম খণ্ডে ৯০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পর যোহরের নামাযের ওয়াক্তে হযরত (সঃ) বিশেষ কায়দায় গোসল করতঃ ব্যথার দরুন মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং নামাযান্তে একটি ভাষণ দান করিলেন– ইহাই ছিল তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। (সীরাতে মোস্তফা, ৭–১৯৭)

১৭২৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগ শয্যায় আমার গৃহে আসিবার পর তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে পর তিনি বলিলেন, সাত মশক পানি, যাহার মুখ বন্ধই রহিয়াছে, এখনও খোলা হয় নাই– আমার উপর ঢালিয়া (গোসল করাইয়া) দাও। লোকদিগকে একটি বিশেষ কথা জানাইতে চাহিতেছি– সেই কার্যে যেন আমি সক্ষম হই।

সেমতে আমরা হযরত (সঃ)-কে একটি বড় টবের মধ্যে বসাইলাম এবং তাঁহার গায়ে ঐরূপ মশকের পানি ঢালিতে লাগিলাম। হযরত (সঃ) যখন বলিলেন, তোমরা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ, তখনই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। অতপর হযরত (সঃ) আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ (ঘর হইতে) বাহির হইয়া (মজিদে) লোকদের সম্মুখে আসিলেন এবং নামায পড়াইয়া ভাষণ দিলেন। (এই ভাষণের উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৬৯১ নং হাদীছে আছে।)

এই ভাষেণেই হযরত (সঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করণার্থ ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহুদী-নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক; তাহারা তাহাদের নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদা করিয়া থাকিত।

১৭২৫। হাদছি ঃ (পৃঃ ৬৩৯) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَاَ ذَاكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

---

* এইসব নির্ধারণ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্তিম শয্যায়, যেই রোগ শয্যা হইতে আর সারিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই অবস্থায় বলিয়াছিলেন, (আল্লাহ ধ্বংস করুন *) আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক ইহুদী-নাসরাদের উপর; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল (নবীগণের কবরকে সেজদা করিত)।

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি এইরূপ গর্হিত কার্যের রীতি পূর্ব হইতে না থাকিত তবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কবর শরীফ উন্মুক্ত রাখা হইত কিন্তু এস্থলেও আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ইহাকেও সেজদার স্থান বানান হয় না কি! (তাই গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীছটি অতি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। হাদীছখানা ইমাম বোখারী (রঃ) মূল গ্রন্থে পাঁচ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কীকরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, এমনকি ইহা তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, বরং ইহার উপরও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে যখন স্বীয় পবিত্র আত্মাকে সৃষ্টিকর্তার হাওয়ালা করিয়াছিলেন তখনও পুনঃ পুনঃ এই সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ২৭৮ হাদীছ দ্রষ্টব্য।

বক্ষ্যমাণ হাদীছখানা মুসলিম শরীফে অতিরিক্ত একটি শব্দের সহিত বর্ণিত আছে, যাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত (সঃ) সর্বশেষ এই ভাষণে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন−

الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذالك ـ

অর্থ ঃ "তোমরা সতর্ক থাকিও! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের নবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়া থাকিত। খবরদার! তোমরা কখনও কোন কবরকে সেজদার স্থান বানাইও না। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ঐরূপ কার্য হইতে নিষেধ করিতেছি।"

উক্ত ভাষণে হযরত (সঃ) মদীনাবাসী ছাহাবী আনসারগণ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছদ্বয়ে রহিয়াছে।

১৭২৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৩৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম শয্যায়) একদা আবু বকর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) আনসারদের এক মজলিসের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আনসারগণ তথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।

আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আনসারগণ বলিলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারের কথা স্মরণে কাঁদিতেছি। আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ নবী (সঃ)-কে জানাইলেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, অতপর নবী (সঃ) (রুগ্ন অবস্থায় অসহনীয় ব্যথার দরুন) মাথায় কাপড় পট্টি বাঁধিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মিম্বরের উপর ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ আরোহণ। অতপর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। মিম্বরে বসিয়া পূর্ণাঙ্গী ভাষণ দানার্থ প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিলেন, অতপর আনসারদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন−

أُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَانَّهُمْ كَرْشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَقَدْ قَضَوُا الَّذِىْ عَلَيْهِمْ وَبَقِىَ الَّذِىْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُّحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ ـ

বোখারী শরীফ ৬২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই শব্দ রহিয়াছে।

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! আমি তোমাদিগকে আনসার– মদীনাবাসী ছাহাবীগণের পক্ষে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা আমার ভিতর-বাহিরের বন্ধু। তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য (যে সম্পর্কে আ'কাবা সম্মেলনে ওয়াদা করিয়াছিলেন) পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়াছেন। তাঁহাদের তোমাদের নিকট সেই প্রাপ্য বাকী রাহিয়াছে। অতএব তাঁহাদের সুব্যবহার বিশেষ আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করিও এবং অরুচির ব্যবহার দেখিলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া যাইও।

১৭২৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ২২৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (অন্তিম শয্যায়) একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিলেন। একখানা চাদর তাঁহার গায়ে উভয় স্কন্ধ সমেত জড়ান ছিল এবং মাথায় তৈলে তৈলাক্ত একখানা রুমাল, যাহা তিনি পাগড়ীর নীচে ব্যবহার করিয়া থাকিতেন, তাহা দ্বারা মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইহাই ছিল মিম্বরের উপর তাঁহার সর্বশেষ আরোহণ।

হযরত (সঃ) মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আমার নিকটে আসিয়া যাও। সেমতে সকলেই তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিলেন। অতপর হযরত (সঃ) বলিলেন–

فَانَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسَ فَمَنْ وَلِىَ شَيْئًا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ اَن يَّضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

অর্থ ঃ "আনসারগণের" বংশধর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া যাইবে, অন্যান্য লোকগণ সংখ্যাগুরু হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের যে কেহ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতে কোন ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং লোকদের লাভ-লোকসানে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে, তাহার কর্তব্য হইবে আনসারদের সুব্যবহার আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের কোন অরুচির ব্যবহার দেখিতে পাইলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলা।

এই ভাষণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও আদেশ করিয়াছেন–

১৭২৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪২৯) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মৃত্যুকালে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন।

(১) সমস্ত মোশরেক– পৌত্তলিকদেরকে আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিবে।

(২) বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে ঐরূপে উপহার দিবে যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম।

(৩) পবিত্র কোরআন বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাকারী ভুলিয়া গিয়াছেন।

রোগ শয্যায় শায়িত হইয়াও হযরত (সঃ) প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মসজিদে তশরীফ আনিতেন এবং ইমামতিও করিতেন। বৃহস্পতিবার রোগ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার পর এই দিনের মাগরিবের নামাযই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ইমামতির সর্বশেষ নামায। সূরা "ওয়াল-মোরসালাত" দ্বারা তিনি এই নামায পড়াইয়াছিলেন। ১ম খণ্ডে ৪৪৪ নং হাদীছে এই তথ্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দিনে মাগরিবের নামাযের পর হযরতের রোগ-যাতনা চরমে পৌঁছিয়া গেল। এমতাবস্থায় এশার নামাযের ওয়াক্ত হইল। হযরত (সঃ) বার বার ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেন নামাযের জন্য মসজিদে যাইবার, কিন্তু যত বারই তিনি শয্যা হইতে উঠিতে উদ্যত হইলেন প্রতিবারই মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩–১৯৯)

১৭২৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (বৃহস্পতিবার এশার সময়ে) তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন اصلى الناس "লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, لا يارسول الله وهم ينتظرونك না- হুজুর! তাহারা এখনও নামায পড়ে নাই; আপনার উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছে।" তখন হযরত (সঃ) বলিলেন- ضعوا لى ماء فى المخضب "আমার জন্য টবের মধ্যে পানি ঢাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাই করা হইল এবং হযরত (সঃ) ঐ পানিতে গোসল করিলেন। অতপর হযরত (সঃ) উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না- মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না-- হুযুর! তাহারা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষায় আছে। হযরত (সঃ) পুনরায় টবের মধ্যে পানি ঢালিতে আদেশ করিলেন এবং উহাতে গোসল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এইবারও হযরতের চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না- হুজুর! তাহারা আপনার অপেক্ষায় আছে। হযরত (সঃ) তৃতীয় বার টবের মধ্যে পানি ঢালিবার আদেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকজন তখনও এশার নামাযের জন্য হযরতের অপেক্ষায় মসজিদে সমবেত হইয়া আছে।*

অতপর হযরত (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট (বেলাল (রাঃ) মারফত) সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। সংবাদদানে প্রেরিত লোকটি আবু বকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

আবু বকর (রাঃ) অতিশয় নরম দিল মানুষ ছিলেন। (রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হওয়ার শোক বিহবল অবস্থায় তাঁহারই স্থানে দাঁড়াইয়া নামায পড়াইবেন ইহা আবু বকরের পক্ষে সম্ভব হইবে না বিধায়) তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, আপনি লোকদের নামায পড়াইয়া দিন। ওমর (রাঃ) অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আপনিই এই কার্যের জন্য অধিক যোগ্য। সেমতে আবু বকর (রাঃ) (ঐ নামায এবং আরও) কতিপয় দিনের নামায পড়াইলেন।

১৭৩০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে একদা বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের ওয়াক্তের উপস্থিতি জ্ঞাত করিলেন। সেই অবস্থায় হযরত (সঃ) বলিলেন- লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আবু বকরকে বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন আরজ করিলাম, আবু বকর (নরম দিলের মানুষ; তিনি) আপনার স্থানে যখন দাঁড়াইবেন তখন আর ক্রন্দনের দরুন নামাযের কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না, সুতরাং আপনি ওমরকে আদেশ করুন তিনি যেন লোকদিগকে নামায পড়াইয়া দেন। হযরত (সঃ) পুনরায় বলিলেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে।

---

* ইহা হযরতের মৃত্যুর সোমবার দিনের পূর্বে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রের এশার সময়ের ঘটনা। এই বৃহস্পতিবার দিন যোহরের নামাযের সময়ও হযরত (সঃ) টবের মধ্যে গোসল করিয়াছিলেন এবং উক্ত গোসলে কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ মসজিদে যাইয়া যোহরের নামাযে ইমামতি করিয়াছেন;এবং সর্বশেষ ভাষণ দান করিয়াছেন- যাহার বিবরণ ১৭২৪নং হাদীছে আছে। এই বৃহস্পতিবার দিনের পর রাত্রে এশার নামাযের পূর্বেও হযরত মসজিদে যাওয়ার সক্ষমতা লাভের আশায় পুনঃ পুন ঃ গোসল করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার গোসলের দ্বারা স্বস্তি আসে নাই এবং মসজিদে যাইতেও সক্ষম হন নাই।

আলোচ্য হাদীছে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। এই এশার ওয়াক্ত হইতেই আবুব বকর (রাঃ)-এর ইমামতি আরম্ভ হয় এবং পর দিন শুক্রবারের পাঁচ ওয়াক্ত তার পর দিন শনিবারের ফজর কিম্বা তার পর দিন রবি বারের ফজর পর্যন্ত আবু বকরের ইমামতি চলিতে থাকে। সেই শনি বা রবিবার দিন যোহরের নামাযের ওয়াক্তে নবী (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুই জনের কাঁধে ভর করিয়া মসজিদে যান এবং আবু বকর (রাঃ)-কে মোকাব্বের রাখিয়া জোহর নামাযের ইমামতি করেন- যাহার বয়ান ১৭৩১ নং হাদীছে রহিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি (ওমরের কন্যা উম্মুল মোমেনীন) হাফসাকে বলিলাম, আপনি যাইয়া হযরতের নিকট বলুন, আবু বকর আপনার স্থানে দাঁড়াইলে ক্রন্দনের দরুন লোকদিগকে কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না। অতএব আপনি ওমরকে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। হাফসা (রাঃ) হযরত (সঃ)-কে ঐরূপ বলিলেন! (এইরূপে তিন-চারি বার হযরতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হইলে অবশেষে বিরক্ত হইয়া) রসূলুল্লাহ (সঃ) (রাগতঃ স্বরে) বলিলেন, তোমাদের অবস্থা ঐ নারীদের ন্যায়, যাহারা ইউসুফ (রাঃ)-কে তাঁহার অভিরুচির বিপরীত, বিবি জোলায়খার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল। (তোমাদের অপচেষ্টা ত্যাগ কর) আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে বল।

হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, আপনার পরামর্শে কোন কাজ করিয়া কখনও আমি ভাল ফল লাভ করিতে পারি নাই।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের এক বা দুই দিন পূর্বে

রোগ যাতনা বৃদ্ধির দরুন উপরোল্লিখিত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামায হইতে আবু বকর (রাঃ) দ্বারা ইমামতির কার্য চালাইবার ব্যবস্থা স্বয়ং হযরত (সঃ) করিয়াছিলেন। সেমতে আবু বকর (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তে ইমামতি করিয়া যাইতে লাগিলেন, হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিতে পারিতেছিলেন না।

পরবর্তী শনিবার বা রবিবার দিন যোহরের নামাযের সময় আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; এমতাবস্থায় হযরত (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিলেন। তৎক্ষণাত আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের উভয়ের কাঁধে ভর করতঃ হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং ইমাম আবু বকরের বাম পার্শ্বে বসিয়া নামাযের ইমামতি করিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পক্ষে মোকাব্বেরের কার্য চালাইলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০১)

(নামায আরম্ভ হওয়ার পর এই ব্যবস্থা একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে জায়েয ছিল, অন্য কাহারও পক্ষ সিদ্ধ নহে।)

১৭৩১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৪) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগ যাতনা বৃদ্ধিকালে আবু বকরকে নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অতপর (একদা) হযরত (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিলেন* এবং স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া লোকদের নামায পড়াইতে ছিলেন। হযরতের প্রতি আবু বকরের দৃষ্টিকোণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) ইমামতির স্থান হইতে পিছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। অতপর হযরত (সঃ) আবু বকরের বরাবরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তখন (মূল ইমাম হযরত (সঃ) হইলেন) আবু বকর প্রত্যক্ষ্যরূপে হযরতের একতেদা করিতেছিলেন, আর অন্যান্য লোকগণ আবু বকরের অনুসরণ করিয়া যাইতেছিল।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে দিন রবিবার (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০২) এই ঘটনা ঘটিল যে, সকাল বেলা হযরতের রোগকে নিউমোনিয়া সাব্যস্ত করিয়া উহার জন্য কোন পানীয় ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। হযরত (সঃ) ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু

* মানুষের অন্তিম রোগ সাধারণতঃ প্রকট হইয়া উঠার পর কিছুটা স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তারপর হঠাৎ ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া চরম অবনতি দ্রুত আসিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হযরতের এই স্বস্তিবোধও এই শ্রেণীরই ছিল। বৃহস্পতিবার হইতে রোগ যাতনা প্রকট হওয়ার পর শনিবার বরং খুব সম্ভব রবিবার দুপুরে এই স্বস্তিবোধ পরিলক্ষিত হইল এবং রাত্রিও এই স্বস্তিবোধেই অতিবাহিত হইল। পরবর্তী দিন সোমবার ভোর বেলা ত ঐ স্বস্তিবোধ অধিক দৃষ্ট হইল, এমনকি আবু বকর (রাঃ)-সহ অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুত অবস্থার চরম অবনতি ঘটিল এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ভক্তগণ উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা মনে করিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল। হযরত (সঃ) তাহাদের এই কার্যের শাস্তি দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগ যাতনায় চৈতন্যহীনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন,) আমরা তাঁহার মুখে (নিউমোনিয়ার) ঔষধ ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলাম। তিনি ইশারা দ্বারা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। আমরা মনে করিলাম, ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণার দরুন এই নিষেধাজ্ঞা; তাই আমরা বারণ রহিলাম না। অতপর হযরতের পূর্ণ চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পর তিনি বলিলেন, মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম নহে কি? আমরা আরজ করিলাম, তাহা ত ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা। হযরত (সঃ) বলিলেন, গৃহে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দাও– আমার সম্মুখে ঐরূপ কর, আমি যেন তাহা দেখিতে পাই। অবশ্য আব্বাসকে রেহাই দিও, কারণ তিনি ঐ সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে ব্যথাদায়ক ও উত্ত্যক্তজনক কোন ব্যবহার করা হইলে সেখানে আল্লাহর তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা দেখা দেয়, এমনকি ঐরূপ ব্যবহার না বুঝিয়া ভুলবশতঃ করা হইলেও তাহার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য অনেক সময় আল্লাহর ওলীদের সাধারণ স্বভাব উদারতার বিপরীতে তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোকদের পক্ষে অতিশয় কল্যাণজনক ব্যবস্থা। কারণ ওলী যদি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ না করিতেন তবে হযত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহা গ্রহণ করা হইত; আর আল্লাহর তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ সামান্য পরিমাণের হইলেও বস্তুতঃ তাহা হইবে অতিশয় কঠোর ও কঠিন। তাই ওলীগণ এইরূপ স্থলে দয়াপরবশ হইয়া মানুষকে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশে দ্রুত নিজেরাই প্রতিশোধ লইয়া থাকেন।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এস্থলে ছাহাবীগণ ঐ ধরনের ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুল বুঝিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, যদ্দরুন হযরত রাগান্বিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। হযরতকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিশোধ আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লওয়া হইলে তাহা হইত ভয়ঙ্কর, তাই হযরত (সঃ) ছাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দ্রুত নিজেই প্রতিশোধ নিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ)-কে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল "উদে হিন্দী"– কুড়চি বা গিরিমল্লিকা গাছের কাষ্ঠ ও যাইতুন তৈল। এই বস্তুদ্বয় সাধারণভাবে কাহারও পক্ষে ক্ষতিকারক নহে, তাই প্রতিশোধ গ্রহণে ঐ বস্তুই সকলের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। উম্মুল মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ)ও ঐ লোকদের একজন ছিলেন, তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নফল রোযা ভঙ্গ করাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এই রবিবার দিনই হযরত (সঃ) ঐতিহাসিক ওসামা বাহিনীকে রোমের দিকে প্রেরণ করতঃ বিদায় দান করিয়াছিলেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হয়িয়াছে।

কন্যা ফাতেমার সহিত গোপন আলাপ

১৭৩৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১২) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের অন্তিমকালে তাঁহার বিবিগণ সকলেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমতাবস্থায়) ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট আসিলেন। ফাতেমার চাল-চলন হুবহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাল-চলনের ন্যায় ছিল।

ফাতেমা নিকট আসিলে পর নবী (সঃ) তাঁহাকে মারহাবা বলিলেন এবং শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া চুপি চুপি কিছু বলিলেন; ফাতেমা ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, ফাতেমা কাঁদে কেন? অতপর চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন; তাহাতে ফাতেমা হাসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, হাসি-কান্না উভয়ের এইরূপ সম্মিলন আর কোন দিন দেখি নাই। আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত (সঃ) কি বলিয়াছেন? ফাতেমা বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথা গোপনে বলিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না।

তারপর হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গেলে পর ফাতেমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফাতেমা বলিলেন, প্রথম বারে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর জিব্রাঈল (আঃ) আমার সঙ্গে একবার কোরআন শরীফ দওর করিয়া থাকিতেন, এই বৎসর দুই বার দওর করিয়াছেন; মনে হয় আমার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। (আমি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিব) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে (আমার পরে সর্বাগ্রে তোমারই মৃত্যু ইহবে)।

(ফাতেমা (রাঃ) বলেন, হযরতের মৃত্যু নিকটবর্তী) ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন হযরত (সঃ) আমাকে বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি বেহেশতবাসী মেয়েদের সর্দার হইবে? এই সুসংবাদ শুনিয়া হাসিয়াছি।

১৭৩৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম শয্যায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে চুপি চুপি কিছু বলিলেন, তাহাতে ফাতেমা কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনরায় চুপি চুপি কিছু বলিলেন, তাহাতে তিনি হাসিলেন।

আমরা ফাতেমাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রথম বারে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, তিনি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিবেন; তাই আমি তখন কাঁদিয়াছিলাম। আর দ্বিতীয় বারে বলিয়াছিলেন, (তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ বেশী দিনের নহে,) তুমি আমার পরিজনের মধ্য হইতে সর্বাগ্রেই আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে; এই সংবাদে আমি হাসিয়াছি।

শাহাদতের মর্তবা লাভ

মাথা ব্যথা ও জ্বরই ছিল হযরতের অন্তিম শয্যার সূচনা এবং মূল পীড়া। কিন্তু পরে উহার সঙ্গে আরও একটি পুরাতন উপসর্গ যোগ হইয়া গিয়াছিল। বহু দিন পূর্বে একবার ইহুদীগণ হযরত (সঃ)-কে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়াছিল; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ড খায়বর যুদ্ধের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলার কুদরতে এত দিন হযরতের উপর সেই বিষের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে উক্ত বিষের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। যেহেতু এই বিষ শত্রুগণ কর্তৃক প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাই হযরত (সঃ) শাহাদতের মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ উপায়ে হযরতের শাহাদত হইলে তাহা মুসলমানদের পক্ষে কলঙ্ক হইত, তাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবের পক্ষে শাহাদতের ন্যায় বড় মর্তবা লাভের জন্য উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৭৩৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৭) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় বলিয়া থাকিতেন, হে আয়েশা! খায়বর দেশে ইহুদীদের দাওয়াতে যে বিষ মিশ্রিত খাদ্য খাইয়াছিলাম এখন তাহার প্রতিক্রিয়া ও কষ্ট-যাতনা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি, এমনকি মনে হইতেছে তাহার চাপে আমার হৃদতন্ত্রী বা অন্তর-রগ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

জীবনের সর্বশেষ দিন

সোমবার দিন আজ। হযরত ইহজগত ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিন্তু আজ নবী (সঃ) অবিচলিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মসজিদে লোকগণ আবু বকরের (রাঃ) ইমামতিতে ফজরের নামায আদায়

করিতেছেন। হযরত (সঃ) স্বীয় কক্ষের দরজায় আসিলেন এবং পর্দা উঠাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে আবু বকরের পিছনে সকলের সমবেত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতঃ সন্তুষ্টিভরে মুচকি হাসি হাসিলেন। সেই বিবরণই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৩, ৯৪ ও ৬৪০) আনাছ (রাঃ)– যিনি দীর্ঘ দশ বৎসর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং হযরতের খেদমত করিয়াছেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি এশার নামায হইতে শুক্র, শনি, রবি) তিন দিন হযরত (সঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিতে পারিতেছেন না (আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াইতেছেন)। সোমবার ভোরে মুসলমানগণ মসজিদে ফজরের নামায আদায় করিতেছেন; আবু বকর (রাঃ) তাহাদের ইমামতি করিয়াছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাঁহার অবস্থানস্থল) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কক্ষের দরজার পর্দা উঠাইয়া (কক্ষ সংলগ্ন মসজিদে) লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। (হযরতের চেহারা মোবারক রক্তহীনতার দরুন কাগজের মত সাদা দেখাইতেছিল।) লোকগণ তখন কাতার বাঁধিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হযরত (সঃ) মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) হযরতের অগ্রসর হওয়া অনুভব করিতে পারিলেন এবং ইমামতির স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীদের কাতারে মিলিত হইবার জন্য পিছনের দিকে পিছপা চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিবেন। মোক্তাদীরা ত হযরতের মসজিদে আগমন অনুভবে অধিক খুশী হইয়া নামায ভঙ্গ করার উপক্রম করিয়া বসিল। হযরত (সঃ) হাতের ইশারায় আদেশ করিলেন, তোমরা নামায পুরা করিয়া লও; এই বলিয়া হযরত (সঃ) পর্দা ছাড়িয়া দিলেন এবং কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঐদিনই হযরতের ইন্তেকাল হইয়া গেল, হযরত (সঃ)-কে পুনঃ দেখার সুযোগ আর হইল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ জীবনের শেষ সময়ে মৃত্যুর মুখে আসিয়া অনেক সময় মানুষ কিছুটা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায়; রবিবার দুপুর হইতে সোমবার ভোর পর্যন্ত হযরত (সঃ)-এর সেই অবস্থা চরমে উপনীত হইয়াছে। সাধারণভাবে লোকগণ হযরতের এই স্বস্তির পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমনকি আবু বকর (রাঃ) এই দিনই হযরত (সঃ)-কে সুস্থ দেখিয়া ফজর নামাযান্তে হযরতের অনুমতি লইয়া মদীনা শহরের দূর প্রান্তে অবস্থিত এক স্ত্রীর আবাস গৃহে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা বৃহস্পতিবার হইতে হযরতের অবস্থার অবনতি দৃষ্টে হযরতের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, আজ তাঁহারাও অনেকে চলিয়া গেলেন।

অবশ্য হযরতের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক দেখিয়া পরিণতি কিছুটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৩৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট হইতে তাঁহার রোগ অবস্থায় চলিয়া আসিলেন। লোকগণ আলী (রাঃ)-কে হযরতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। আলী (রাঃ) বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ– হযরত (সঃ) একটু সুস্থতার মধ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। তখন আব্বাস (রাঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত ধরিয়া নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম! তুমি তিন দিন পরেই (অচিরেই) অন্যের লাঠি দ্বারা পরিচালিত হইবে। খোদার কসম আমার ধারণা এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণের মৃত্যু সময়কালীন চেহারার অবস্থা ভালরূপেই ঠাহর করিতে পারি। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট চল। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব কাহাকে বহন করিতে হইবে?

যদি সেই দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেন তবে তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া রাখিব, যাদি অন্যদের কথা বলেন তবে তাহাও জানিয়া রাখি এবং হযরত (সঃ) আমাদের সম্পর্কে একটা অসিয়তনামা লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

আলী (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি আমাদের সম্পর্কে "না" বলিয়া দেন তবে ত আর সেই অধিকার লাভের জন্য লোকদের নিকট দাঁড়াইবারও কোন সুযোগ আমাদের থাকিবে না। অতএব আমি ঐ বিষয়ে কোন কথা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিব না।

জীবনের শেষ মুহূর্ত

সোমবার দিন দুপুর হওয়ার পূর্বেই হযরতের অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটিল। উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) নিকটেই ছিলেন। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনার মধ্যে হযরতের শেষ মুহূর্তগুলি কাটিতেছিল।

১৭৩৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন রোগের ভীষণ চাপে অত্যধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) চীৎকার করিয়া উঠিলেন হায়! আমার পিতার কী কষ্ট! নবী (সঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে বলিলেন, আজিকার এই অল্প সময়ের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না।

নবীজী (সঃ)-এর শেষ মুহূর্ত ফুরাইয়া গেলে ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আ.. হ্! আমার পিতা প্রভুর ডাকে চলিয়া গিয়াছেন। আ...হ্! আমার পিতা ফেরদাউস বেহেশতের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আ...হ্! আমার পিতার শোক-সংবাদ জিব্রাঈলও অবগত হইয়াছেন। (আর ত তিনি ওহী নিয়া আসিবেন না!)

নবীজীর দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হইলে ফাতেমা (রাঃ) শোকাভিভূত স্বরে বলিলেন, হে আনাছ! তোমাদের প্রাণ কিভাবে সহ্য করিল যে, তোমরা আল্লাহর রসূলকে মাটির আড়াল করিয়া দিলে!

বিশিষ্ট তাবেয়ী সাবেত (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিতে এইরূপ কাঁদিতেন যে, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিত। (বোদায়া, ৪-২৭৩)

১৭৩৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আমারই বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়া ছিলেন, তাঁহার মাথা আমার সিনা ও থুতির মধ্যস্থলে ছিল। আমি তাঁহার মৃত্যু যাতনা দেখিবার পর কাহারও পক্ষে মৃত্যু যাতনা অশুভ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

১৭৪০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম স্বীয় পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর লাগাইয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁহার প্রতি কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও, আমার প্রতি রহমত কর এবং আমাকে উর্ধ্ব জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।

১৭৪১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট শুনিয়া থাকিতাম, কোন নবীকে দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জেন্দেগীর যেকোন একটা অবলম্বন করার পূর্ণ এখ্তিয়ার দেওয়ার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

হযরত (সঃ) যখন রোগ শয্যায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় উপনীত হইলেন তখন এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিতেছিলেন-

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থ ঃ যাঁহাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা রহিয়াছে– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং বিশেষ নেক বান্দাগণ তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে চাই; তাঁহারাই হইতেছেন অতি উত্তম সঙ্গী।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরতের মুখে এই আয়াত শ্রবণে আমি বুঝিতে পারিলাম, হযরত (সঃ)-কে সেই এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (তিনি আখেরাতের জেন্দেগীই গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন।)

১৭৪২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুস্থ থাকাবস্থায় বলিয়া থাকিতেন, কোন নবীর মৃত্যু হয় না যাবত তাঁহাকে বেহেশতের বাসস্থান দেখাইয়া (দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জেন্দেগীর) এখ্‌তিয়ার বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা না হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত (সঃ) যখন রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার মাথা আমার উরুর উপর ছিল এবং তিনি চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতপর যখন তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন ঊর্ধ্ব দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم فى الرفيق الاعلى "হে আল্লাহ! ঊর্ধ্ব জগতের বন্ধুগণের সঙ্গে শামিল হইতে চাই।"

এতদশ্রবণে আমি বুঝিয়া নিলাম, এখন আর হযরত (সঃ) আমাদের মধ্যে থাকিবেন না এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, হযরত (সঃ) সুস্থাবস্থায় যাহা বলিয়া থাকিতেন ইহা তাহারই তাৎপর্য।

১৭৪৩। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন সময় অসুস্থতা বোধ করিলে কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বি রাব্বিন নাস– এই সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ উভয় হস্তে ফুৎকার মারিয়া হস্তদ্বয় সর্বশরীরে বুলাইয়া দিতেন।

হযরত (সঃ) যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন তখন (নিজে ঐরূপ করিতেন না,) আমি উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ হযরতের হস্তদ্বয়ে ফুৎকার মারিতাম এবং তাঁহার শরীরে বুলাইয়া দিতাম।

নবীজীর (সঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তের আর একটি সতর্কবাণী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য– যাহা প্রথম খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে; ২৭৮ নং হাদীছ।

১৭৪৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার উপর আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নেয়ামত এই হইয়াছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন আমার গৃহে, আমার জন্য নির্ধারিত দিনে এবং আমার (বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায়) সিনা ও থুতির মধ্যস্থলে থাকিয়া। তদুপরি শেষ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা হযরতের এবং আমার থুথু একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন– যাহার ঘটনা এই–

আমার ভ্রাতা আবদুর রহমান হাতে তাজা একটি মেসওয়াকের ডালা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল; তখন আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আমার বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়াইয়া রাখিলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, হযরত (সঃ) আবদুর রহমানের প্রতি বিশেষভাবে তাকাইতেছেন; তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মেসওয়াকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ মেসওয়াক আপনার জন্য লইব কি? হযরত (সঃ) মাথার দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, হাঁ। আমি মেসওয়াক নিয়া হযরত (সঃ)-কে প্রদান করিলাম। তাহা চিবান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইা দাঁড়াইল; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা কলিাম, আমি ইহাকে চিবাইয়া নরম করিয়া দিব কি? হযরত (সঃ) মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া হাঁ বলিলেন। আমি মেসওয়াকটি লইয়া ভালভাবে চিবাইলাম (এবং ঝাড়িয়া সুন্দররূপে পরিষ্কার করতঃ হযরত (সঃ)-কে প্রদান করিলাম) অতপর হযরত (সঃ) এমন সুন্দরভাবে দাঁত মর্দন করিলেন যে,

ঐরূপ আর কখনও দেখি নাই। হযরত (সঃ) উহাদ্বারা মিসওয়াক করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল। হযরত (সঃ) বার বার স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ـ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

অতপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "উর্ধ্ব জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলন চাই।" এই বলিতে বলিতে হস্ত মোবারক শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ ـ

জীবন সায়াহ্নে কতিপয় বাণী

১। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলিতে শুনিয়াছি– আল্লাহর প্রতি তোমরা ভাল ধারণা রাখিও। তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা থাকে। (বোদায়া, ৪–২৩৮)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা তথা তাঁহার রহমত লাভের আশা পোষণ করা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমল ভাল হয়। সাধ্যানুসারে বা সাধারণ পর্যায়ে ভাল আমল করিয়াও অনেকের মতে আল্লাহর আযাবের আতঙ্ক ও ভীতির প্রাবল্য থাকে; তাঁহাদের প্রতি নবীজীর উপদেশ– মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা প্রবল রাখিবে।

২। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্তসমূহে পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া থাকিতেন–

নামায, নামায– সাবধান!
দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান!!

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন কোন একটি প্রশস্ত বস্তু আনিতে, যাহাতে তিনি এমন বিষয় লিখিয়া যাইবেন যাহা পাওয়ার পর উম্মত গোমরাহ হইবে না।

আলী (রাঃ) বলেন, আমার ভয় হইল যে, আমি দূরে গেলে হয়ত নবীজীর শেষ নিঃশ্বাসের সময়টুকু হারাইয়া বসিব। তাই আমি আরজ করিলাম, আমি স্মরণ রাখিব এবং সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া লইব। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে শেষ উপদেশ দিতেছি– নামায এবং যাকাত, আর দাস-দাসীদের প্রতি সদয় থাকিও।

উম্মুল মোমেনীন বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাসের বেলায়ও বলিতেছিলেন, নামায এবং দাস-দাসী। এমনকি তাঁহার জবান চলে না, তবুও তাঁহার কণ্ঠণালীর মধ্যে ঐ কথার গরগর শব্দ শ্রুত হইতেছিল। (নাসায়ী শরীফ,) বেদায়া, ৪–২৩৮।

৩। আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– (যাহা প্রথম খণ্ডে ২৭৭ নং হাদীছে অনূদিত হইয়াছে), নবীজী (সঃ) যখন মৃত্যু যাতনায় অস্থির ছিলেন, যদ্দরুন মুখমণ্ডল একবার চাদরে আবৃত করিতেছিলেন আর একবার উন্মুক্ত করিতেছিলেন, এইরূপ অস্থিরতার মধ্যে নবীজী (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কবরের সেবা ও শ্রদ্ধার নামে কবর পূজা হইতে সতর্ককরণার্থ বলিতেছিলেন, ইহুদী ও নাসারাদের উপর লা'নত, তাহারা তাহাদের নবীগণের এবং নেককার ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।

সাবধান! তোমরা ঐরূপ করিবে না– আমি কঠোরভাবে তাহা নিষেধ করিয়া যাইতেছি।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিমকালের এই অছিয়ত-উপদেশ এই যুগের উম্মতগণ যেইভাবে লঙ্ঘন করিতেছে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নবীজীর (সঃ) সর্বশেষ বচন (পৃঃ ৬৪১)

১৭৪৫। হাদীছ ঃ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قَالَتْ وَكَانَتْ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا ؛ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى -

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বচন ছিল– "আল্লাহুম্মার রফীকাল আ'লা" –হে আল্লাহ আমার পরম সুহৃদ! (তোমার মিলন চাই।)

কালোমা তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর যে মর্ম– তওহীদ বা একাত্ববাদ তাহা সম্পূর্ণরূপে এই বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। এই বাক্যের মর্ম হইল– একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই চাই; আমার লক্ষ্য একমাত্র তাঁহারই প্রতি । (যোরকানী, ৮– ২৮২)

কালেমা তাইয়্যেবার মর্ম– এক আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা, ইহার বিকাশ এই বাক্যে অতি উচ্চাঙ্গ পর্যায়ে রহিয়াছে। কারণ, ঐ মর্ম কালেমা তাইয়্যেবাতে আছে শুধু স্বীকৃতি পর্যায়ে, আর এই বাক্যে তাহা রহিয়াছে মহব্বত প্রেমের বন্ধন পর্যায়ে। "রফীকাল আ'লা"-এর অথ পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পরম প্রিয়, পরম প্রেমাস্পদ– আল্লাহ; একমাত্র তাঁহার মিলন কামনা করি।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) "হাবীবুল্লাহ" আল্লাহর প্রিয়পাত্র। তিনি সারা জীবন এই স্বীকৃতি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এখন জীবনের সর্বশেষ প্রান্তে সেই আল্লাহর সান্নিধানে পৌঁছিবার শুভ মুহূর্তে তাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ নামে ডাকিলেন এবং বরণ করিলেন; ইহা কতই না সামঞ্জস্য পূর্ণ।

নবীজী (সঃ) অন্তিম অবস্থায় বারংবার অচেতন হইয়া পাড়িতেছেন। প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাক্য বলিয়া উঠিতেন। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গেও পবিত্র জবান হইতে শেষ বাণী তাহাই উচ্চারিত হইত এবং সেই বাক্যের মর্মানুযায়ী তাঁহার পবিত্র আত্মা পরম সুহৃদ আল্লাহ তাআলার সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

বিবি আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর পবিত্র আত্মার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িল যাহা জীবনে কোন সময় লাভ হয় নাই।

বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, নবীজীর মহাপ্রস্থানের দিন আমি একবার তাঁহার পবিত্র বক্ষের উপর হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলাম; আমার হাতে এমন সুগন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অযু গোসলে ধোয়া-মোছা সত্ত্বেও আমার হস্তে কস্তুরীর সুগন্ধি পাওয়া যাইত। (বোদায়া, ৪- ২৪১)

অন্তিম শয্যায় নবীজীর বিভিন্ন ভাষণ

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন যোহর নামাযান্তে মসজিদের মিম্বরে আরোহণপূর্বক নবীজী (সঃ) যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাই ছিল তাঁহার বিদায়কালীন প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণ সমক্ষে শেষ ভাষণ। এই ভাষণে নবী (সঃ) অনেক বিষয়ই বয়ান করিয়াছিলেন এবং

তাহা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা– মিম্বরে আরোহণের পূর্বে সর্বপ্রথম নবীজী (সঃ) ওহুদ জেহাদের শহীদানদের জন্য বিদায়ী হৃদয়ের সমুদয় ভাবাবেগ ঢালিয়া দোয়া করিলেন। (১ম খণ্ড; ৬৯৯ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অতপর মিম্বরে আরোহণপূর্বক প্রথম তাঁহার ইহজগত ত্যাগ ও পরপারে যাত্রা করার কথা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া অনির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বিষয়রূপে প্রকাশ করিলেন। ফলে জন সাধারণ বুঝিতে পারিল না যে, নবীজী (সঃ) অচিরেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন; কিন্তু আবু বকর (রাঃ) বিষয়টি ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আবু বকরের ক্রন্দনে নবীজী (সঃ) অত্যন্ত অভিভূত হইলেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নবীজীর জন্য তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, দান ও সেবার স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহার প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। (১৭২৩ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অতপর সুস্পষ্ট ভাষায় সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রগামীরূপে আখেরাতের মঞ্জিলে চলিয়া যাইতেছি। আল্লাহর দরবারে আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হইব। হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতের ওয়াদা রহিল। হাউজে কাওসার (বাস্তব, সৃষ্ট) এখনও আমি দেখিতেছি। আমাকে সমগ্র ধন-ভাণ্ডারের চাবি দিয়া দেওয়া হইয়াছে; (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উপর মুসলমানদের আধিপত্য হইবে,) আমি এই ভয় আর করি না যে, আমার তিরোধানের পর তোমরা শেরক বা অংশীবাদে লিপ্ত হইবে। তবে আমার এই ভয় হয় যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-দৌলত, জাঁকজমক ও আরাম-আয়েশের প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িবে– প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাহাতে লিপ্ত ও মত্ত হইবে। ফলে দুনিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে।*

কবর পূজা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া নবী (সঃ) বলিলেন, খৃস্টান-ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে; তাহারা তাহাদের পীর পয়গম্বরগণের করবকে সেজদা করিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, খবরদার তোমরা ঐরূপ করিবে না, আমর কবরকেও তোমরা পূজা করিবে না। (১ম খণ্ড ২৭৮, ১৭২৫ হাদীছ দ্রঃ

ইসলামের জন্য মদীনাবাসী আনসারগণের জান-মাল সর্বস্ব ত্যাগের স্বীকৃতি দানে নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সম্পর্কে বলিলেন– আনসারগণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ব্যক্তিগত সর্বময় সম্পর্কের অধিকারী। তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের প্রাপ্য বাকী রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দিবে এবং ক্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে, ক্ষমা করিবে।

আমি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) উম্মতের যেকোন ব্যক্তি কাহারও ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে তাহার প্রতি আমার বিশেষ নির্দেশ– সে যেন আনসারগণের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁহাদের ক্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। (১৭২৬ নং ১৭২৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

নবম হিজরী সন হইতে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার জন্য তথা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদের উচ্ছেদ সাধনের যে অভিযান আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশে আরম্ভ করা হইয়াছিল– সেই অভিযান চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দানে নবীজী (সঃ) বলিলেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদেরকে বহিষ্কার করিয়া দিবে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য বজায় রাখিবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গকে উপহার দেওয়ার যে নীতি আমার ছিল, সেই নীতি তোমরাও অনুসরণ করিয়া চলিবে। (১৭২৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

নবীজী (সঃ) আরও বলিলেন, হে লোকসকল! আমি শুনিতে পাইয়াছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ভাবনায় আতঙ্কিত! বল ত! আমার পূর্বে কোন নবী তাঁহার উম্মতের মধ্যে চিরদিন রহিয়াছেন কি? তাহা

---

* প্রথম খণ্ডের ৬৯৯ নং হাদীছ যাহা মূল কিতাবে ১৭৯ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, কিছু অংশ মেশকাত শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠায় আছে।

হইলে আমিও চিরদিন থাকিতে পারিতাম। সত্যই– আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে চলিয়া যাইব। তোমরাও তাঁহার সন্নিধানে যাইবে।

আমি তোমাদের বিদায়ী উপদেশ দিতেছি– তোমরা ইসলামের জন্য সর্বস্বত্যাগী মোহাজেরদের মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকিও। মোহাজেরগণকেও আমি উপদেশ দেই, তাঁহারা যেন নিজ নিজ অবস্থার সংশোধন করিয়া সৎ-সাধু হয়। আল্লাহ তাআলা (সূরা আছরের মধ্যে) বলিয়াছেন, মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন; একমাত্র তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান বজায় রাখে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়া চলে, আর সৎ পথে এবং সত্যের উপড় দৃঢ়পদ থাকার প্রতি মনোযোগী ও আহ্বানকারী হয়। সব কাজই আল্লাহর আদেশে হইয়া থাকে। অতএব কোন কাজে বিলম্ব হইলে ব্যতিব্যস্ত হইও না। কাহারও ব্যতিব্যস্ততায় আল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। আল্লাহ সকলের উপর প্রবল, আল্লাহর উপর কেহ প্রবল হইতে পারে না। আল্লাহর প্রতি চালবাজি করিলে আল্লাহ তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

তোমরা যদি ইসলামের শিক্ষা হইতে বিরাগী হও তবে তোমাদের দুনিয়ারও বিপর্যয় ঘটিবে এবং পরস্পরের সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইবে। মদীনাবাসী আনসারদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেছি। তাহারা তোমাদের পূর্ব হইতেই মদীনার অধিবাসী এবং অতি যত্নের সহিত ঈমান গ্রহণ ও বরণকারী। তোমরা তাহাদের প্রতি সদয় থাকিও। তাহারা তাহাদের জায়গা জমির উৎপন্ন বণ্টন করিয়া তোমাদের সমান ভোগ দান করিয়াছে, বাড়ী-ঘরে স্থান দান করিয়াছে, নিজেরা অনাহারী থাকিয়াও তোমাদেরকে অগ্রগণ্য করিয়াছে। তাহাদিগকে তোমরা পিছনে ফেলিও না।

আমি তোমাদেরই অগ্রগামী ব্যবস্থাপকরূপে পরকালীন জগতের প্রতি চলিয়া যাইতেছি; পরে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। হাউজে কাওসারের কূলে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে স্বীয় মুখ এবং হাতকে অবাঞ্ছিত কার্যাবলী হইতে বিরত রাখিবে।

হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তাআলার নাফরমানী তাঁহার দেওয়া নেয়ামতসমূহ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। মনে রাখিও! জনসাধারণ সৎ, নেককার ও ভাল হইলে শাসনকর্তাগণও সৎ-সাধু, ভাল হইবে। আর জনসাধারণ ফাসেক-ফাজের হইলে তাহাদের শাসনকর্তা তাহাদের অশান্তি আনয়নকারী হইবে। (যোরকানী, ৮–২৬৮)

তুলনাহীন একটি আদর্শ ভাষণ

ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা ভীষণ জ্বর অবস্থায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া নিয়া চল! সেমতে আমি হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিয়া চলিলাম; তিনি মিম্বরের উপর যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! লোকদের নামাযে উপস্থিত হওয়ার ডাক দাও। আমি "নামাযের জন্য আস" বলিয়া ধ্বনি দিলাম; জনগণ মসজিদে উপস্থিত হইল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন– হে লোকসকল! তোমাদের মধ্য হইতে আমার বিদায় গ্রহণ নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে; অতপর তোমরা আমাকে এই স্থানে তোমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাদের নিকট জরুরী কথা বলিব; আমার পক্ষ হইতে অন্য কেহ ঐ কথাটি পৌছাইলে তাহা যথেষ্ট হইবে না ভাবিয়া আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন– কাহারও পৃষ্ঠে আমি কোন আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া নেয়। আমার মন্দ বলার দ্বারা কাহারও সম্মানের হানি হইয়া থাকিলে আমার সম্মান উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন প্রতিশোধ নিয়া নেয়।

কেহ যেন ভয় না করে যে, (ঐরূপ করিলে) তাহার প্রতি আল্লাহর রসূলের আক্রোশ থাকিয়া যাইবে।

স্মরণ রাখিও– কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার নিকট হইতে তাহার হক আদায় করিয়া নিবে, যদি আমার উপর তাহার কোন দাবী থাকে, কিম্বা দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি যেন মহান আল্লাহর সাক্ষাতে এমন পাক-সাফ অবস্থায় যাইতে পারি যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে।

ফজল (রাঃ) বলেন– (নবীজীর ভালবাসাপ্রাপ্তির) এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার নিকট আমার তিনটি দেরহাম প্রাপ্য আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি কাহারও দাবী অস্বীকার করিব না বা দাবীদারকে কসম খাইতেও বলিব না। তবে তোমার প্রাপ্য কি সূত্রে? ঐ ব্যক্তি বলিল, হুজুরের স্মরণ আছে কি? একদা এক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে (হুজুরের পক্ষ হইতে) তিনটি দেরহাম দেওয়ার জন্য আমাকে বলিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তখন বলিলেন, হে ফজল! তাহাকে তিনটি দেরহাম দিয়া দাও। নবী (সঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঐ বক্তব্য বলিলেন। অতপর বলিলেন–

হে লোকসকল! সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে কেহ কোন কিছু আত্মসাত করিয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই ফেরত দিয়া দিবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার উপর তিনটি দেরহাম রহিয়াছে; এক জেহাদে যুদ্ধলব্ধ ধন বায়তুল মালের হক হইতে আমি তাহা নিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তুমি কেন তাহা নিয়াছিলে? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া নিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হে ফজল! তিনটি দেরহাম তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লও। অতপর বলিলেন–

হে লোকসকল! কাহারও ঈমান ইসলামে আভ্যন্তরীণ কোন কপটতা অনুভব করিলে সে দাঁড়াও আমি তাহার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মোনাফেক, মিথ্যাবাদী, কপট, হতভাগা। ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, ধিক্ তোমার প্রতি– আল্লাহ তাআলা তোমার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন; তুমি কেন তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের বদনাম করিলে! রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হে খাত্তাব পুত্র (ওমর)! চুপ থাক। দুনিয়ার বদনাম-লজ্জা অতিক্ষীণ ও সহজ আখেরাতের বদনাম ও লজ্জা হইতে। অতপর নবীজী (সঃ) ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যখন নিজের শুদ্ধি চাহিয়াছে তখন তুমি তাহাকে শুদ্ধি দান কর, ঈমান দান কর, দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি দাও। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ওমর আমার সঙ্গী, আমি ওমরের সঙ্গী, সত্য সদা ওমরের সঙ্গে থাকিবে। (বোদায়া, ৪-২৩১)

কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকিলে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়াও উহার প্রতিশোধ দানে নতশিরে প্রস্তুত হওয়ার আদর্শ নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্থাপন করিয়া গেলেন। তাঁহার পরেও সুযোগ্য খলীফাগণ এই আদর্শের অনুসরণে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

আম্র ইবনে শোআয়েব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) সিরিয়ায় আগমন করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সিরিয়ার গভর্ণরের বিরুদ্ধে তাহাকে প্রহার করার অভিযোগ করিল এবং তাহার প্রতিশোধ চাহিল। ওমর (রাঃ) উক্ত গভর্নর হইতে প্রতিশোধ দানের ইচ্ছা করিলেন। (বিশিষ্ট ছাহাবী এবং মিসরের গভর্নর) আম্র ইবনুল আছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, সিরিয়ার গভর্ণর হইতে এক ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে? ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়। মিসরের গভর্নর বলিলেন, এরূপ হইলে ত আমরা আপনার চাকুরী করিব না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না কর; তাহাতে আমার কোন পরোয়া নাই– এই ভয়ে আমি প্রতিশোধ দানের নীতি ছাড়িতে পারি না; যেহেতু আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দানে আগাইয়া আসিয়াছেন। মিসরের গভর্নর বলিলেন, এই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলে চলিবে কি? ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা করিতে পার।

সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, নবী (সঃ) স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও স্বেচ্ছায় প্রতিশোধন দান করিয়াছেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১-৩৭৪)

করুণা বিজড়িত কণ্ঠের আর একটি ভাষণ

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মাসকাল পূর্বে আমরা নবীজীর ইহধাম ত্যাগের আভাস পাইয়াছিলাম। অন্তিম সময় যখন একেবারেই ঘনাইয়া আসিল এবং বিদায় মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার শেষ শয্যাকক্ষ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আমাদিগকে সমবেত করিলেন। অতপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

আল্লাহ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, তোমাদের ক্ষতিপূরণ দান এবং ব্যথা বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, তোমাদিগকে সাহায্য করুন, তোমাদিগকে উন্নতি দান করুন এবং তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে ধর্মভীরু হইবার অসিয়ত করিতেছি, তোমাদিগকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি। তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি– সাবধান! আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ করিও না। সদা স্মরণ রাখিবা, আল্লাহ আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য পরিষ্কার বলিয়াছেন– تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا ـ

অর্থ ঃ "এই যে পরকালের শান্তির নিবাস– ইহা আমি সেই লোকদিগের জন্যই নির্ধারিত করিয়া থাকি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য অহঙ্কার দেখাইতে এবং বিপর্যয় ঘটাইতে চাহে না, সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "অহঙ্কাকারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার শেষ মুহূর্ত কবে? তিনি বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লাহর সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে গোসল কে দিবে? হুজুর (সঃ) বলিলেন, আমার আপনজনদের মধ্যে নিকটতম ব্যক্তি। কাফন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার পরিধেয় কাপড়েই এবং ইচ্ছা করিলে তৎসঙ্গে মিসরীয় বা ইয়ামানী সাদা এক জোড়া কাপড়। জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,

গোসল দিয়া কাফন পরাইবার পর খাটের উপরে কবরের কিনারায় রাখিয়া কিছু সময় তোমরা অন্যত্র থাকিও। সর্বপ্রথম জানাযা পড়িবেন জিব্রাঈল, তারপর মীকাঈল, তারপর ইস্রাফীল, তারপর আযরাঈল– প্রত্যেকের সঙ্গেই ফেরেশতাগণের বিরাট দল থাকিবে। তারপর তোমরা জমাত জমাত আসিয়া দরূদ এবং সালাম পাঠ করিয়া যাইবে। আর একটি কথা–

তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "সালাম" পৌঁছাইয়া দিবে।

এতদ্ভিন্ন আজ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের প্রতিও আমার "সালাম"। (যোরকানী, ৪–২৬৯)

পাঠক-পাঠিকা! আসুন!! আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সালামে কৃতার্থ হইয়া সমবেত কণ্ঠে সেই মহান সালামের উত্তর দানে বলিতে থাকি–

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর রসূল।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর নবী।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর হাবীব।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

বোখারী শরীফ বাংলা তরজমা দ্বিতীয় খণ্ড লেখাকালীন ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৮ সনে হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে পঠিত–

الالتجاء والحنين مع الصلوة والسلام الى سيد المرسلين

রসূলগণের সরদার সমীপে করুণা ভিক্ষা, আবদার এবং প্রাণের আবেগপূর্ণ দরূদ ও সালাম

بِنَفْسِىْ وَاَوْلَادِىْ وَاُمِّىْ وَوَالِدِىْ ـ عَلٰى تُرْبَةٍ طَابَتْ بِطِيْبِ مُحَمَّدٍ

আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার মাতা-পিতা সর্বস্ব ঐ পাক ভূখণ্ডের উপর উৎস যেই ভূখণ্ড হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুগন্ধে সুগন্ধময় হইয়া আছে।

عَلٰى تُرْبَةٍ فَاقَتْ عَلَى الْعَرْشِ رُتْبَةً ـ وَحَازَتْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ الْمُتَابِّدِ

আমার সর্বস্ব উৎসর্গ ঐ ভূখণ্ডের উপর, যাহার মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক এবং যেই এলাকায় অনন্তময় বেহেশতের বাগিচা বিরাজমান–

وَوَارَتْ حَبِيْبًا رَبُّنَا قَدْ اَحَبَّهٗ ـ فَلَمْ يُبْقِ قِيْنًا بِالْبَقَاءِ الْمُخَلَّدِ ـ

যেই বিশেষ ভূখণ্ডটি আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম দোস্তকে ঢাকিয়া আছে। তিনি আল্লাহর অতি প্রিয়; তাই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল না রাখিয়া ডাকিয়া নিয়াছেন।

لَاَذْكُرُ اَيَّامَ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَهٖ ـ فَاَصْعَقُ مَغْشِيًّا عَدِيْمَ التَّجَلُّدِ ـ

প্রিয়পাত্র (হযরত নবী সঃ) যখন এই "তায়বা" মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন তখনকার মধুর দৃশ্যের কল্পনা, ধ্যান ও স্মরণ করতঃ আমি ধৈর্যহীন হুশহারা হইয়া পড়ি।

اَمُرُّ بِاٰثَارِ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ ـ فَكَادَ فُؤَادِىْ اَنْ يَّطِيْرَ بِمَوْجِدِ

আমি যখন তায়বাস্থিত প্রিয়তমের নিদর্শনসমূহের নিকট যাতায়াত করি তখন মনে হয়– ঐ সবের আকর্ষণে আমার প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে।

فَهٰذِىْ بِقَاعٌ وَّالْجِبَالُ وَمَعْهَدٌ ـ وَبِيْرٌ وَّبُسْتَانٌ وَّاٰثَارُ مَشْهَدِ

এই বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহ, পাহাড়সমূহ, রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন কূপ, বাগ-বাগিচার স্থান এবং তাঁহার উপস্থিতির স্থানের নিদর্শনসমূহ এবং

وَدُوْرٌ وَّاٰطَامٌ وَّمِمْبَرُ خُطْبَةٍ ـ اَسَاطِيْنُ اَعْلَامٌ وَمِحْرَابُ مَسْجِدٍ ـ

বিভিন্ন ঘর-বাড়ী, টিলা, খোতবা দানের মিম্বর এবং মসজিদস্থিত কতিপয় খুঁটি ও মেহরাব–

لَتَمْلأُمِنْ ذِكْرَى الْحَبِيْبِ قُلُوْبَنَا ـ وَتُوْرِثُ نَارًا فِىْ ظُلُوْعٍ وَاكْبُدِ

উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ আমার প্রাণকে প্রিয় পাত্রের স্মরণে পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং আমার হৃদয়পটে প্রজ্বলিত অগ্নির সঞ্চার করে।

كَانَّ فُوَادِيْ اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهِ ـ لَجَمْرَةُ نِيْرَانٍ شَدِيْدُ التَّوَقُّدِ ـ

আমি তাহার দ্বারে পৌঁছার মুহূর্তে আমার হৃদয় যেন একটি প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড।

وَلَمْ اَسْتَفِقْ حَتّٰى اَقُوْلَ مَقَالَةً ـ وَاُدْرِكَ اِدْرَاكًا بِقَلْبِىْ الْمُقَدَّدِ

তদবস্থায় আমার হুশ-জ্ঞান বিদ্যমান ছিল না যে, আমি কিছু বলিতে পারি এবং আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে কিছু অনুভব করিতে সক্ষম হই।

فَارْسَلَتْ دَمْعِىْ لِلْفُؤَادِ مُتَرْجِمًا ـ فَيَا عَيْنُ جُوْدِىْ وَاهْمِلِىْ لاَتَجْمُدِىْ

অগত্যা অন্তরের আবেগ প্রকাশে অশ্রু-বৃষ্টি বহাইলাম; হে নয়ন! খুব অশ্রু বহাও, থামিও না।

وَيَاعَيْنُ جُوْدِىْ وَاهْمِلِىْ مِنْ مَّدَامِعٍ ـ وَصُبِّىْ عُيُوْنًا مِّنْ دِمَاءٍ لِتَسْعَدِىْ

হে নয়ন! অবিরাম অশ্রুপাত কর; রক্তস্রোতের নদী বহাইয়া দাও, ইহাই তোমাদের সৌভাগ্য।

وَيَا عَيْنُ سُحِّىْ وَاسْكُبِىْ كُلَّ قَطْرَةٍ ـ نَجِيْعًا وَدَمْعًا كَىْ تَفُوْزَ بِمَقْصَدِ

হে নয়ন! অশ্রু ও রক্তের প্রতিটি বিন্দু বহাইয়া দাও, ইহাতে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য

وَيَا نَفْسُ ذُوْبِىْ ثُمَّ سِيْلِىْ مَدَامِعًا ـ عَلٰى رَسْمِهٖ رَسْمِ الدِّيَارِ وَمَلْحَدِ

হে প্রাণ! প্রিয়-পাত্রের ঘর-বাড়ী ও সমাধি-চরণে উৎসর্গ হওয়ার সুযোগ হারাইও না– বিগলিত হইয়া অশ্রু আকারে বহিয়া যাও।

لِاَىِّ مَرَامٍ تُرْصِدُ الْعَيْنُ مَائَهَا ـ وَاَىُّ مَرَامٍ يُرْصَدُ النَّفْسُ لِلْغَدِ

আর কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূরণের মানসে চক্ষু স্বীয় অশ্রু রক্ষিত রাখিবে? আর কোন্ আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে?

عَلَيْكَ سَلاَمٌ يَامُطَيِّبُ طَيْبَةٍ ـ لاَنْتَ مَلاَذِىْ اِذْ اَتٰى يَوْمُ مَوْعِدِ ـ

"তায়বা"কে মনোমুগ্ধকারী– হে মহান! আপনাকে সালাম। কেয়ামতের দিন আপনি আমার আশ্রয়স্থল।

وَاَنْتَ رَجَائِىْ فِىْ مَنَازِلِ مَحْشَرٍ ـ صِرَاطٍ وَّمِيْزَانٍ وَفِىْ كُلِّ مَوْرِدِ ـ

আপনি আমার আশার স্থল হাশরের ময়দানের প্রতিটি স্থানে– পোলসিরাত, নেকী-বদীর পাল্লার নিকট এবং অন্যান্য প্রতিটি ঘাঁটিতে।

مِنَ اللّٰهِ سَلْ تُعْطَهْ وَمِنْكَ شَفَاعَةٌ ـ فَهٰذَا رَجَائِىْ يَاغِيَاثِىْ وَمُسْنَدِىْ

আপনার পক্ষ হইতে শাফাআতের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার শাফাআত পূরণের ঘোষণা– ইহাই আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল।

بِذَنْبِيْ وَعِصْيَانِيْ لَغٰى كُلُّ حِيْلَتِيْ ـ بِجُوْدِكَ يَاخَيْرَ الْجَوَادِ تَغَمَّدِ

গোনাহ ও নাফরমানীর দরুন আমার সমস্ত চেষ্টা-তদবীরই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে; হে দয়াল! আপনি স্বীয় দান সমুদ্রে আমাকে নিমজ্জিত করুন।

غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ مَالِيْ عِصْمَةٌ ـ فَخُذْ بِيَدِيْ اَنْتَ الْكَرِيْمُ فَخُذْ يَدِيْ

গোনাহের সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত নিরুপায়, আপনি দয়ালু; আপনি আমার হাঁত ধরুন! আপনি আমার হাত ধরুন!

اَتَيْتُكَ مَسْلُوْبًا وَجِئْتُكَ هَارِبًا ـ اَغِثْنِيْ بِلُطْفٍ يَا مُغِيْثِيْ وَزَوِّدِ

আমি সর্বহারা হইয়া ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতঃ আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি দয়া দরিয়া আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার সম্বল করিয়া দিন।

اَتَيْتُكَ مَذْعُوْرًا مِنَ الذَّنْبِ خَائِفًا ـ اَتَيْتُكَ عَبْدًا مُسْتَجِيْرًا بِسَيِّدِ

আমি গোনাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া আপনার প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছি, যেরূপ বিপদগ্রস্ত গোলাম মনিবের সাহায্যের প্রতি ছুটিয়া আসে।

اَتَيْتُ كَئِيْبًا مِنْ دِيَارٍ بَعِيْدَةٍ ـ حَزِيْنًا بِاٰثَامٍ وَوَجْهٍ مُسَوَّدِ

গোনাহের চিন্তামগ্ন কাল মুখ লইয়া দূরদেশ হইতে ক্লান্তাবস্থায় আপনার দ্বারে পৌঁছিয়াছি।

اَتَيْتُ بِقَلْبٍ مُسْتَهَامٍ وَّمُغْرَمٍ ـ جَرِيْحٍ بِاَسَافِ الْفِرَاقِ الْمُبَعَّدِ

পাগল-প্রাণ হইয়া উপস্থিত হইয়াছি; বিচ্ছেদ যাতনায় সেই প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

اَتَيْتُ بِشَوْقٍ وَاشْتِيَاقٍ وَرَغْبَةٍ ـ رَجَائِيْ بِكُمْ اَعْلٰى وَغَيْرُ مُعَدَّدِ

বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবদার নিয়া আসিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য ও অতি বড়।

اَتَيْتُكَ مَوْلَائِيْ بِلُطْفِكَ رَاجِيًا ـ وَلَنْ يُحْرَمُ الرَّاجِيْ بِبَابِ مُحَمَّدِ

আপনার দয়ার ভিখারী হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দ্বার হইতে কোন ভিখারী কখনও বঞ্চিত হয় না।

لَاَغْضَبْتُ رَبِّيْ بِالْمَعَاصِيْ وَلَمْ اَجِدْ ـ وَسِيْلَةَ غُفْرَانِيْ سِوٰى بَابِ اَحْمَدِ

আমি আমার প্রভুর নাফরমানী করিয়া তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছি; এখন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বার ভিন্ন আমার গোনাহ মাফ হওয়ার কোন উসিলা নাই।

هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالسَّخَا ـ وَمَنْ يَّاْتِهٖ يَاْتِ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ

এই দ্বার দান ও দয়া সাখাওয়াতের দ্বার, যেব্যক্তি এই দ্বারে উপস্থিত হয় সে মনোবাঞ্ছা পূরণে এবং সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

فَكَمْ مِنْ غَرِيْقٍ هَالِكٍ لَجَّ بَابَهٗ ـ نَجٰى نَائِلاً نُوْرًا مِنَ اللّٰهِ يَهْتَدِيْ

বহু নিমজ্জমান ধ্বংসের সম্মুখীন ব্যক্তি এই দ্বার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আল্লাহ তাআলার হেদাআত ও নূর প্রাপ্তিতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

رَجَائِىْ اِلَيْكُمْ يَا شَفِيْعَ الْمُشَفَّعُ ـ وَمَنْ ذَا الَّذِىْ نَرْجُوْ اِلَيْهِ وَنَهْتَدِىْ

আপনি এমন সুপারিশকারী যে, আপনার সুপারিশ কবুল করিবেন বলিয়া আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়াছেন; তাই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি ব্যতীত আর কে আছে যাহার প্রতি আমরা আশা করিতে পারি এবং ধাবিত হইতে পারি?

رَثٰى لِىْ عَدُوِّىْ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَمَاثِمِىْ ـ فَمَا لِىْ لاَ اَرْجُوْ رَثَائِكَ سَيِّدِىْ

আমার গোনাহদৃষ্টে শত্রুর অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হয়। আপনি আমার মনিব, আপনার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী কেন হইব না।

وَمَالِىْ عِنْدَ اللّٰهِ دُوْنَكَ حِيْلَةٌ ـ نَجَاةٌ وَّغُفْرَانٌ فَكُنْ اَنْتَ رَائِدِىْ

আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি ভিন্ন আমার আর কোন সূত্র নাই, তাই আপনি আমার সংস্থাপক হইয়া যান।

تَرَحَّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُكَ رَاجِيًا ـ لاَنْتَ كَرِيْمٌ لِلْعَدُوِّ وَمُعْتَدِىْ

হে আল্লাহর রসূল! আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি করুন, আমি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি– আপনি ত শত্রুর প্রতিও দয়াশীল।

وَاَنْتَ جَوَادٌ مَالِجُوْدِكَ سَاحِلٌ ـ فَمَا لِىْ لاَ اَرْجُوْ بِاَنَّكَ مُسْعِدِىْ

আপনার দয়ার সাগরের কূল-কিনারা নাই; তবে কেন আমি আশাবাদী হইব না যে, আপনি আমাকে সৌভাগ্যশীল করিবেন।

تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ يَا مَنْ بِلُطْفِهِ ـ كَثِيْرٌ مِّنَ الْعَاصِىْ لِفِرْدَوْسِ يَهْتَدِىْ

আপনি নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন, আপনার উসিলায় বহু গোনাহগার ফেরদাউস বেহেশত লাভ করিয়া বসিবে।

فَرَبُّكَ يُعْطِىْ مَا تُرِيْدُ وَتَشْتَهِىْ ـ مُحِبُّ لِمَحْبُوْبٍ يُّطِيْعُ وَيَقْتَدِىْ

আপনি যাহাই ইচ্ছা ও পছন্দ করেন, আল্লাহ তাআলা তাহাই দান করিয়া থাকেন। দোস্ত দোস্তের মন রক্ষা করিয়া চলে।

عَلَيْكَ صَلٰوةٌ وَّالسَّلاَمُ وَرَحْمَةٌ ـ دَوَامًا مِّنَ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ مَيْعَدِ

আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।

عَلَيْكَ صَلٰوةٌ وَّالسَّلاَمُ وَرَحْمَةٌ ـ اُلُوْفٌ وَّاٰلاَفٌ وَّمَا زَادَ فَازْدَدِ

আপনার প্রতি হাজার হাজার দরূদ, সালাম ও রহমত এবং আরও যতদূর অধিক হইতে পারে।

مُنًى كُنَّ فِىْ قَلْبِىْ غَرَسْتُ بِطَيْبَةَ ـ فَاَسْقِىْ بِدَمْعٍ وَّالدِّمَاءِ لِتَجْتَدِىْ

আমার অন্তরের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা পবিত্র মদীনার ভূমিতে রোপণ করিলাম, এখন নয়নের অশ্রু ও রক্তের দ্বারা তাহাতে সেচন করিতে থাকিব। তবেই তাহাতে ফল ধরা সম্ভব হইবে।

فَمَا الْعَيْشُ بَعْدَ الْبُعْدِ مِنْ اَرْضِ طَيْبَةٍ ـ يَلَذُّ بِنَا وَالصَّبْرُ عَنْهَا بِمَبْعَدِ

মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনে আনন্দ থাকিতে পারে কি? মদীনাকে ভুলিয়া থাকা অসম্ভব।

وَهَلْ لَذَّةٌ لِّىْ فِىْ الدُّنٰى وَنَعِيْمَهَا ـ اِذَا اَنَا نَاءٍ مِّنْ مَّدِيْنَةِ سَيِّدِىْ

আমার মনিবের শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রীসমূহ আমার নিকট স্বাদকর হইতে পারে কি?

حَيَاتِىْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ مُرَّةٌ ـ وَقَلْبِىْ بِهٖ شَوْقٌ لِسَاحَةِ سَيِّدِىْ

মদীনা হইতে বিচ্ছেদে আমার জীবন বিষাক্ত এবং আমার মনিবের আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকাই আমার অন্তরের একমাত্র আনন্দ।

تَمَنَّيْتُ مِن رَّبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ ـ فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِىْ

মদীনায় অবস্থান আল্লাহ তাআলার নিকট আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা; হায়! মদীনার মধ্যে কবরের জন্য এক হাত ভূমি আমার অদৃষ্টে জুটিবে কি?

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَالْمَوْتُ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ ـ

হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং তোমার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শহরে আমার মৃত্যু নসীব কর। আমীন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ও তারিখ এবং হযরতের বয়স

ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাও প্রায় অবধারিত যে, সোমবার দিন দুপুর বেলার পূর্বেই হঠাৎ অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়া মৃত্যু যাতনা আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরকাল পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উক্ত সোমবার দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মত এই যে, তাহা ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল, * কাহারও মতে ২ তারিখ, কাহারও মতে ১ তারিখ ছিল। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০৫)

হযরত (সঃ) কত বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে এবং এই সম্পর্কে রেওয়ায়েত বা বর্ণনাও বিভিন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ৬৩ বৎসর সম্পর্কীয় বর্ণনাই বিশেষ অগ্রগণ্য।

১৭৪৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তেষট্টি বৎসর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (১) জন্ম। (২) নবুয়তপ্রাপ্তি (৩) মক্কা ত্যাগ

---

* ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি সোমবার হওয়ার জন্য ঐ মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে একটি জটিল প্রশ্ন প্রতিবন্ধক হয়- তাহা এই যে, এই মাসের দুই মাস পূর্বে যিলহজ্জ মাসে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ মাসের নয় তারিখ তথা আরাফার দিন শুক্রবার ছিল ইহা অকাট্যরূপে অবধারিত। সেমতে যিলহজ্জ, মহররম, সফর এই তিনটি মাসের সবগুলিকে ৩০ দিনের বা ২৯ দিনের কিম্বা কোনটা ৩০ কোনটা ২৯ যে প্রকারেই হিসাব করা হউক, যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার ধরিয়া কোন মতেই রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতি ও ১২ তারিখ সোমবার হইতে পারে না। এই জন্য হযরতের ওফাতের তারিখ সম্পর্কে ১২ই রবিউল আউয়াল, অনেকে অস্বীকার করিয়া বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হযরতের ওফাতের দিন সোমবার এবং ১২ই রবিউল আউয়াল এই মতবাদটা সর্বত্র এতই প্রসিদ্ধ যে, উহা উড়ান যায় না। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব মজমুয়া ফতওয়া ২-২৩৯ পৃ উক্ত প্রশ্নটির ভাল মীমাংসা দিয়াছেন যে-বোধ হয়, হযরতের বিদায় হজ্জের বৎসর যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ মক্কায় ও মদীনায় চাঁদ দেখার হিসাবে বিভিন্ন ছিল। পূর্ববর্তী

(৪) মৃত্যু– এই বিষয়গুলির সঠিক দিন-তারিখ নির্ধারণ যদিও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের রুচি দৃষ্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই যুগেও ঐসব বিষয় ঘটনার কোন সঠিক দিন-তারিখ নির্ধারণের গুরুত্ব মোটেই ছিল না। এতদ্ভিন্ন ইসলামেও উহার কোন গুরুত্ব মোটেই নাই। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের দিন-তারিখ সংরক্ষণ করা হয় নাই। পরবর্তীকালে কোন কোন ছাহাবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, ফলে তাঁহাদের মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে– যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই বিভিন্নতা সূত্রেই মোটামুটি হিসাবের বেলায়, (১) ঠিক কত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (২) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কত দিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন, (৩) মদীনায় কত দিন অতিবাহিত করিয়াছেন (৪) সর্বমোট কত বৎসর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন– এইসব বিষয় নির্ধারণে মতামতের বিভিন্ন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই ধরনের হিসাবাদির মধ্যে স্বাভাবিকরূপেই অনেক সময় বৎসরের ভাঙ্গা মাস, মাসের ভাঙ্গা দিনগুলির সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা হয় না; যেরূপ দিনের ভাঙ্গা ঘণ্টা, ঘণ্টার ভাঙ্গা মিনিট এবং মিনিটের ভাঙ্গা সেকেণ্ডগুলির সূক্ষ্ম হিসাবের প্রতি কেহই দৃষ্টি দান করে না; বরং কেহ বা ঐ ভাঙ্গাগুলি পূর্ণ ধরিয়া হিসাব করে, কেহবা ঐ ভাঙ্গাগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া হিসাব ধরে। দশকের মধ্যবর্তী ভাঙ্গা সংখ্যা সম্পর্কেও ঐরূপ করা হয়। এইভাবেও মোটামুটি সংখ্যা নির্ধারণে মতভেদ হইয়া থাকে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বয়স সম্পর্কে মতভেদটাও সেই শ্রেণীরই। এ স্থলে তিন প্রকার মতামত বর্ণিত রহিয়াছে। ৬০, ৬৩ এবং ৬৫। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরতের সঠিক বয়স ছিল ৬৩, কিন্তু কেহ কেহ দশক তথা ৬০-এর উপরে ভাঙ্গা ৩-এর সংখ্যা বাদ দিয়াছে,আবার কেহ জন্ম ও মৃত্যুর ভাঙ্গা বৎসর দুইটি পূর্ণ বৎসর হিসাব করিয়াছে, ফলে দুই বৎসর বর্ধিত হইয়া ৬৫-এর সংখ্যা হইয়াছে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যুর খবর ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদীনায় বিহ্বলতার অন্ধকার ছাইয়া গেল। ছাহাবীগণের মধ্যে সকলে এই কথা বিশ্বাস করিয়া নিতে পারিলেন না যে, হযরতের মৃত্যু হইয়াছে। হযরত (সঃ)-কে চির নিদ্রায় দেখা সত্ত্বেও তাঁহারা ভাবিলেন, ওহী নাযিল হওয়াকালে হযরতের উপর এইরূপ আচ্ছন্নতা পরিলক্ষিত হইত, এখনও সেই অবস্থায়ই হয়ত হযরত (সঃ)-কে দেখা যাইতেছে, কস্মিনকালেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

এইরূপ ধারণা পোষণকারীদের মধ্যে ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক অটল। এমনকি তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া বিহ্বলতার মধ্যে ঘোষণা দিতে লাগিলেন, যে কেহ বলিবে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। হযরতের মৃত্যু হয় নাই, তিনি অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন এবং মোনাফেকদের মূল উচ্ছেদ করিবেন। ওমর (রাঃ) তাঁহার উক্তির প্রচারে লোকদের মধ্যে বক্তৃতাও করিতেছিলেন। ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বিহ্বলতার মধ্যে কেহবা নির্বাক অচেতন অবস্থায় ছিলেন, কেহবা অশ্রু স্রোতে

যিলকদ মাসের প্রথম তারিখ– হযরতের হজ্জযাত্রার তারিখ বর্ণনাকারীদের হিসাব মতে বুধবার ছিল। এই মাসের ২৯ তারিখ বুধবার হযরত (সঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ মক্কার পথে থাকিয়া যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেন; মক্কাতেও তাহাই হয়। সেমতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হয় বৃহস্পতিবার এবং ৯ তারিখ হয় শুক্রবার। কিন্তু ঐদিন মদীনাতে যিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্ট হয় নাই এবং সেই যুগে মক্কা এলাকার খবর মদীনা শহরে সময়মত পৌছিতে পারে নাই। মদীনা শহরে যিলকদের চাঁদ ৩০ দিনের গণ্য হইয়া যিলহজ্জের প্রথম তারিখ শুক্রবার হইয়াছে এবং মদীনায় এই হিসাবই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; পরেও এই বিষয়ে কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় নাই। যিলহজ্জ মাসও ৩০ দিনের হইয়া প্রথম মহররম রবিবার হইয়াছে। মহররম মাসও ৩০ দিনের হইয়া প্রথম সফর মঙ্গলবার হইয়াছে। সফর মাসও ৩০ দিনে হইয়া প্রথম রবিউল-আউয়াল বৃহস্পতিবার হইয়াছে। এই হিসাব মক্কা এলাকার ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার এবং মদীনা এলাকার ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সঙ্গতিপূর্ণই বটে। ৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন শুক্রবার মক্কা এলাকার হিসাব অনুযায়ী হইয়াছে। আর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনা এলাকার হিসাবে হইয়াছে।

ভাসিতেছিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই দিন ভোর বেলা হযরত (সঃ)-কে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মদীনার দূর প্রান্তে চলিয়া গিয়াছিলেন; তথায় তাঁহাকে এই প্রলয়ঙ্করী সংবাদ পৌঁছান হইল। বিহ্বলতার চরমে পৌঁছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ধীরস্থিরতার তওফীক দান করিলেন। সমগ্র জাতি সর্বহারারূপে বিশৃঙ্খলাময় প্রলয়ঙ্করী বিপদের মুখে পতিত অবস্থায় জাতির কর্ণধারকে যেরূপ হইতে হয়, আল্লাহ তাআলা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে ঐ মুহূর্তে ঠিক সেই গুণে গুণান্বিত করিয়া সাজাইলেন। যাঁহার সাহচর্যে আবু বকর (রাঃ) সর্বস্ব বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনার অগ্নি আবু বকরের অন্তরকে পুড়িয়া ভস্ম করিতেছিল, কিন্তু তাহার বহিরাকৃতি পর্বততুল্য অটল-অবিচল ছিল। আবু বকর (রাঃ) সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়া স্বীয় কন্যা আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথায় সর্দারে দোজাহান চাদরে আবৃত রহিয়াছেন, "ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

১৭৪৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আবু সালামা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরতের মৃত্যু সংবাদে) আবু বকর (রাঃ) মদীনার দূর প্রান্তে "সুনহ্"স্থিত তাঁহার গৃহ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত আসিলেন এবং সোজা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন। অতপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি অগ্রসর হইলেন; হযরত (সঃ) একটি চাদরে আবৃত ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক হইতে চাদর হটাইয়া তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন। আবু বকরের (রাঃ) নীরবে অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল। অতপর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, (আল্লাহর সাধারণ নিয়মাধীন) আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল সেই মৃত্যু আপনার উপর আসিয়া গিয়াছে (এখন পুনঃ আগমন হইলে দ্বিতীয়বারও মৃত্যু অনিবার্য) আল্লাহ তাআলা আপনার উপর মৃত্যুকে দুই সুযোগ দান করিবেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অতপর আবু বকর (রাঃ) কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে স্বীয় বক্তব্য (হযরতের মৃত্যু হয় নাই) প্রচার করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ওমরকে বসিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন না (বিহ্বলতার মধ্যে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন)। ফলে লোকজন ওমরকে ছাড়িয়া আবু বকরের প্রতি ধাবিত হইল। আবু বকর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভাষায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى " وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ " ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি মুহাম্মদের পূজারী হইয়া থাক তবে সে জানিয়া লও যে, তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে (যদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, মুহাম্মদ যত বড়ই হন না কেন, কিন্তু তিনি মা'বুদ হইতে পারেন না।) আর যাহারা আল্লাহর বন্দেগীকারী তাহারা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ হইলেন আনাদি-অনন্ত, চীর জীবন্ত– তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না (সুতরাং আল্লাহর দ্বীন ও তাঁহার এবাদত চির বিদ্যমান থাকিবে।) সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করিলেন। যাহার অর্থ এই–

"মুহাম্মদ রসূল বটে (কিন্তু মানুষ তিনি খোদা নহেন) তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের কেহই দুনিয়াতে চিরজীবী হন নাই, সকলেরই মৃত্যুই হইয়াছে; (মুহাম্মদ (সঃ)ও সেই একই পথের পথিক)। সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ) মরিয়া গেলে বা শহীদ হইয়া গেলে তোমরা কি (দ্বীন-ইসলাম ছাড়িয়া) পিছনের অধঃপতনের অবস্থার দিকে ফিরিয়া যাইবে? যে কেহ পিছনের দিকে, অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে (সে নিজেরই ক্ষতি করিবে; আল্লাহর কোন ক্ষতিই সে করিবে না। আর জানিয়া রাখিও,) যাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের কদর করিয়া চলিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম! লোকগণ যেন ইতিপূর্বে জানিতই না যে, এই আয়াত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে; আবু বকর তেলাওয়াত করার পরেই যেন তাহারা জানিতে পারিল এবং সকলেই আবু বকরের মুখ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া নিল, এমনকি কোন একজন মানুষও আমি দেখি নাই, যে তখন এই আয়াত তলাওয়াত করিতেছিল না।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আবু বকরের মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন আমি উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত আবু বকরের মুখে শুনিলাম এবং উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্ছা খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

ভূপৃষ্ঠ হইতে হযরতের দেহ মোবারকের বিদায় গ্রহণ

সোমবার দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঐ দিনের অবশিষ্ট দীর্ঘ সময় ত শোক-বিহ্বলতার মধ্যে কাটিল; তাহা হইতে অবসর লাভের পূর্বেই সকলে অন্য আর একটি সমস্যায় জড়াইয়া পড়িলেন। সেইটি হইল শাসনযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের মনোনয়ন। বিষয়টি ছিল অত্যাবশ্যকীয়, বিশেষতঃ ঐ মুহূর্তে। কারণ চতুর্দিকে দ্বীন-ইসলামের শত্রুর অভাব ছিল না। মুসলিম জাতি বত্রিশ দাঁতের পরিবেষ্টনে এক জিহ্বার ন্যায় ছিল। তদুপরি মোনাফেকের দল আভ্যন্তরীণ শত্রুরূপে সর্বদাই সুযোগের সন্ধানে রহিয়াছে; এমতাবস্থায় উক্ত সমস্যার সমাধানের আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষতঃ যখন সকলের জানা ছিল যে, কাফন-দাফনে বিলম্ব হইলেও হযরতের দেহ মোবারকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। সাধারণ শহীদের দেহই যখন কোন প্রকার বিকৃত হয় না, যাহার প্রামাণিক বিবরণ প্রথম খণ্ডে ৭০০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থলে ত সাইয়্যেদুল মোরসালীনের দেহ বিকৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকায় সকলেই উক্ত সমস্যার সমাধানের প্রতি অধিক ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

সাধারণ আলোচনার মধ্যেই আবু বকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিন হযরতের গোসল দানের সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, আল্লাহর রসূলের দেহ পোশাক শূন্য করিও না, তিনি যেই পোশাকে রহিয়াছেন তাহাতে রাখিয়াই তাঁহাকে গোসল দান কর। তাহাই করা হইল এবং কাফন পরাইবার সময় উক্ত পেশাক খুলিয়া লওয়া হইল। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২১৯)

অতপর দাফন করার স্থান সম্পর্কে বিতর্ক হইলে আবু বকর (রাঃ) হাদীছ শুনাইলেন যে, পয়গম্বর (সঃ)-কে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থলে দাফন করা হইবে। ইহাই চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল এবং ঐ স্থানেই কবর শরীফ খনন করা হইল।

মঙ্গলবার দিন কাফন পরাইয়া হযরতের দেহ মোবারক কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। সাধারণ

নিয়মে জামাতের সহিত পূর্ণাঙ্গ কায়দায় জানাযার নামায পড়া হইল না, * যেরূপ (অনেক ইমামগণের মজহাব অনুসারে) শহীদের জন্য জানাযার নামাযের আবশ্যক হয় না। অবশ্য দলে দলে সকলেই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তকবীর এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ, অতপর প্রথম দলে আবু বকর, ওমর (রাঃ), তারপর নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকল ছাহাবী দলে দলে আসিলেন।

কাহারও মতে, দরূদ-সালামের সেলসিলা তিন দিন পর্যন্ত চলিয়াছে, অর্থাৎ সোম, মঙ্গল, বুধ– এই তিন দিন দেহ মোবারক মাটির উপরেই ছিল, সেমতে বুধবার দিন শেষে বৃহস্পতিবার রাত্রে সমাহিত হইয়াছেন। অধিকাংশ মোসাদ্দেসগণের মতে মঙ্গলবার দিন শেষে বুধবারের রাত্রে সমাহিত হইয়াছিলেন।

(বেদায়া, ৫–২৭১)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ ـ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ ـ

হযরতের পরিত্যক্ত সম্পদ

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় নিঃস্ব অবস্থায়ই মদীনায় আসিয়াছিলেন। প্রথম দিকে মুসলমানগণ নিজ নিজ বাগানের এক দুইটি করিয়া খেজুর গাছ হযরত (সঃ)-কে দিয়া রাখিয়াছিলেন– হযরতের জীবিকা নির্বাহের উসিলা তাহাই ছিল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৪৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৪১) আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী কোন কোন মুসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কতিপয় খেজুর বৃক্ষ দিয়া রাখিত, (তাহা দ্বারা হযরতের জীবিকা নির্বাহ হইত! মদীনার খেজুর বাগান-বিশিষ্ট শহরতলী এলাকা–) বনু কোরায়যা ও বনু নযীর ইহুদী গোত্রদ্বয়ের বস্তি মুসলমানদের করায়ত্ত হইলে পর তাহা হইতে প্রাপ্ত অংশবিশেষ দ্বারা হযরতের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা হইল এবং হযরত (সঃ) লোকদের প্রদত্ত খেজুর বৃক্ষ ফেরত দিতে লাগিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দুনিয়ার কোন আকর্ষণ যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্পর্শও করিতে পারিয়াছিল না তাহা নূতনভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। "যুদ" বা দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সম্পর্কীয় অধ্যায়ের অসংখ্য হাদীছ এই বিষয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহার কিছু বিবরণ ইনশা আল্লাহ তাআলা পরবর্তী খণ্ডে অনূদিত হইবে। ঐ সব হাদীছ এবং বিশেষরূপে ইতিহাসেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং বিশেষ কোন ধন-সম্পদ রসূলুল্লাহ (সঃ) পরিত্যক্তরূপে ছাড়িয়া যান নাই– ইহারই উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে আছে।

১৭৪৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আম্র ইবনুল হারেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বর্ণ-রৌপ্যের কোন মুদ্রা কিম্বা ক্রীত দাস-দাসী (ইত্যাদি কোন ধন-সম্পদ দুনিয়াতে) রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ব্যবহারের একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর রাখিয়া গিয়াছিলেন (পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের) কিছু পরিমাণ বাগান জমি; তাহারও মূল ভূমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭৫০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ১৯৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহজগত ত্যাগের পর তাঁহার স্ত্রীগণ নিজেদের মীরাস লাভ করার জন্য ওসমান (রাঃ)-কে খলীফাতুল মুসলেমীন আবু বকরের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনাদের কি স্মরণ নাই যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন– لا نورث ما تركنا صدقة আমাদের (নবীগণের সম্পত্তির) ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইতে পারে না; আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাইব সবই

* কারণ নবীগণের মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যু নহে, তাঁহাদের জীবন-সূর্য অস্তমিত হয় না, বরং শুধু আবরণে ঢাকিয়া যায় মাত্র। এই সূত্রেই তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও অন্যত্র তাঁহাদের স্ত্রীগণের আর বিবাহ হইতে পারে না। সাধারণ শহীদের বেলায় এই হুকুম নাই।

সদকা পরিগণিত হইবে।

১৭৫১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৯৬) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উত্তরাধিকারীগণ বন্টন করিয়া নেওয়ার কোন টাকা-পয়সা পাইবে না, যাহা কিছু আমার পরিত্যক্ত থাকিবে উহা হইতে আমার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ এবং কার্য পরিচালনাকারীগণের ব্যয় বহন করা হইবে; অতিরিক্ত যাহা থাকিবে তাহা দান বা সদকা পরিগণিত হইবে।

১৭৫২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫২৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিত্যক্ত মদীনাস্থ সম্পত্তি– যাহা দানস্বরূপ ছিল এবং ফদক এলাকা ও খায়বরের অংশ– এই সব সম্পত্তি হইতে স্বীয় উত্তরাধিকার স্বত্ব চাহিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না; তাহা সদকা পরিগণিত হইবে। অবশ্য মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিবারবর্গ ঐ সম্পত্তি হইতে, যাহা বস্তুতঃ আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছে– ভরণ-পোষণ লাভ করিবে, তদতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির মধ্যে সেই পরিবারবর্গেরও কোন হক বা অধিকার নাই।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (এই সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত তাঁহার) দানকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি এক তিল পরিমাণও ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং যেরূপে ঐ সবের পরিচালনা করিতেন আমিও ঠিক সেইরূপেই পরিচলনা করিব।

অতপর আলী (রাঃ) এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আবু বকরের মর্তবা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহাকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গ এবং তাঁহাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করার আবেদন জানাইলেন।

তদুত্তরে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ঐ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, যাঁহার ক্ষমতায় আমার জান-প্রাণ, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমি আমার নিজ আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি ও গুরুত্ব দান করিয়া থাকি। (অর্থাৎ হযরতের আত্মীয়বর্গ মাথার উপরে কিন্তু হযরতের আদেশ সর্বাগ্রে।)

ব্যাখ্যা ঃ আবু বকর (রাঃ) যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্পত্তির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব জিয়াইয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি শুধু বিবি ফাতেমা (রাঃ)-কেই উক্ত সম্পত্তি হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন না। যদি তাহা বণ্টিত হইত তবে তাঁহার কন্যা আয়েশা (রাঃ) এবং ওমরের কন্যা হাফ্সা (রাঃ)ও অংশীদার হইতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন অংশ দেন নাই। আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্পত্তি সম্পর্কে হযরতের নির্দেশ পালন করিয়া যাওয়া, যাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীছে রহিয়াছে।

অবশ্য ফাতেমা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এই ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। এমনকি এই ব্যাপারটি বোখারী শরীফের ৪৩৫ এবং ৬০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত বর্ণনা মতে ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু হযরতের স্পষ্ট নির্দেশের দরুন অপারগ ছিলেন।

ব্যাপারটা হয়ত এইরূপ ছিল যে, ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এ সম্পত্তিকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উত্তরাধিকারী আত্মীয়বর্গের মধ্যে বণ্টন করতঃ তাঁহাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর পক্ষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আশঙ্কা এই ছিল যে, হযরতের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে এইসব সম্পত্তি আল্লাহর নামে দানকৃত; ইহা একবার ভাগ-বণ্টনের আওতায়

আসিয়া গেলে পরবর্তীকালে ইহার বাস্তব রূপটা নষ্ট হইয়া যাইবে।

আবু বকরের নীতি যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হযরতের ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তাঁহাদের যে অধিকার ছিল, সেই অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। ব্যাপারটা অতি সাধারণ; সুমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই ধরনের মতবিরোধ বিশেষ কোন গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়, যাহারা আবু বকর (রাঃ) ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ঈমানহীনরূপে ক্ষেপিয়া আছে, তাহারা আলোচ্য বিষয়টিকে ভয়ানক ঘোলাটে করিয়া দেখাইয়া থাকে। অথচ ঘটনা অতি সাধারণ ছিল। আবু বকর (রাঃ) স্বয়ং ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজি করিয়া নিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২৬৬, ব-হাওয়ালা বেদায়া ওয়ান-নেহায়া)। স্বল্পকালের মধ্যে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর স্বয়ং আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে নিজ গৃহে সংবাদ দিয়া আনিয়াছিলেন এবং সম্মুখে পরস্পর সব কথাবার্তা মন খোলাভাবে বলিয়া দিয়া অতপর সর্বসমক্ষে আনুষ্ঠানিকরূপে উভয়ের মিল-মিশের ঘোষণা জানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৫৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬০৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যে সম্পত্তি মদীনায় এবং ফদক এলাকা ও খয়বরে ছিল– এই সবের মীরাস দাবী করিয়া হযরতের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইবে না; আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা পরিগণিত হইবে। অবশ্য মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিবারবর্গ এই সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভ করিবে।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সদকাহকে আমি এক তিলও পরিবর্তন করিতে পারি না; তাহা পূর্বাবস্থার উপরই বহাল থাকিবে– যে অবস্থায় হযরতের আমলে ছিল। আমি ঐরূপেই তাহা পরিচালনা করিব যেরূপ হযরত (সঃ) করিতেন। এই বলিয়া আবু বকর (রাঃ) ঐ সম্পত্তি ফাতেমা (রাঃ)-কে বণ্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (এই ব্যাপারে) আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করেন নাই, কথাও বলেন নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে ফাতেমা (রাঃ) মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

(আলী (রাঃ)-ও আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি মনক্ষুণ্ন ছিলেন, এমনকি) ফাতেমা (রাঃ)-এর ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) রাত্রি বেলায়ই তাঁহার কাফন-দাফন কার্য সমাধা করিয়া দিলেন, আবু বকর (রাঃ)-কে সংবাদ জানাইলেন না।

ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকাবস্থায় লোকদের মধ্যে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) অনুভব করিলেন যে, লোকদের সেই আকর্ষণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। এতদদৃষ্টে আলী (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আগ্রহশীল হইলেন এত দিন আলী (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সেইরূপে সমর্থন জ্ঞাপনের ঘোষণা দিয়াছিলেন না।

সেমতে আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে এই মর্মে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, আপনি আমার গৃহে তশরীফ আনিবেন, আপনার সঙ্গে অন্য কেহ যেন না আসেন– উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ওমর (রাঃ) যেন সঙ্গে না থাকেন। ওমর (রাঃ) ইহা অবগত হইয়া আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলেন, কসম খোদার! আপনি একা তাহাদের গৃহে যাইতে পারিবেন না। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে আশঙ্কার কি আছে? আমাকে কি করিবে? অতপর আবু বকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে আলী (রাঃ) ভাষণদানপূর্বক আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার মর্তবা এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রহিয়াছি এবং তাহা স্বীকারও করি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা মোটেও কোন হিংসা করি না, কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, আপনি ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন! অথচ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞাতি গুষ্ঠি ও নিকটতম আত্মীয় হওয়া সূত্রে এই ব্যাপারে আমাদেরও দাবী ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বক্তব্য শ্রবণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িল। অতপর তিনি এই বলিয়া বক্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, ঐ মহান খোদার কসম যাঁহার ক্ষমতাধীন আমার জান-প্রাণ, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়তার মর্যাদা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে হযরতের এই জায়গা-জমির ব্যাপারে যেই মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সম্পর্কে আমি উত্তম পথ অবলম্বনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করি নাই এবং এই পর্যন্ত আমি ঐ জমি সম্পর্কে এমন একটি কাজও ছাড়ি নাই যাহা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে করিতে দেখিয়াছি।

অতপর আলী (রাঃ) বলিলেন, আনুষ্ঠানিকরূপে আপনার প্রতি সমর্থন ঘোষণার জন্য আগামীকল্য দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়াদা রহিল। সেমতে পরবর্তী দিন আবু বকর (রাঃ) যোহরের নামাযান্তে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণদানপূর্বক আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার ওজর যাহা তিনি পেশ করিয়াছেন বর্ণনা করিলেন এবং নিজের সকল দোষ-ত্রুটির জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তারপর আলী (রাঃ) ভাষণ দানপূর্বক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যোগ্যতার প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার প্রতি সমর্থন ঘোষণা বিলম্ব করার কারণ তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ এবং তাঁহার খোদা-প্রদত্ত মর্যাদাকে উপেক্ষা করা নহে। হাঁ- আমাদের ধারণা এই যে, কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দানের অধিকার রহিয়াছে- সেই ক্ষেত্রে তিনি একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করায় আমরা মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলাম। (এই বলিয়া আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করিলেন। (মুসলিম)

এই মিল-মহব্বত প্রকাশে মুসলমানগণ অতিশয় খুশী হইলেন এবং আলী (রাঃ)-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই শুভকার্য সম্পাদিত হইলে পর মুসলমানগণ আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অধিক সৌজন্যশীল হইয়া উঠিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত জায়গা-জমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকাল পর্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইত। ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে পর দুই বৎসরকাল ঐ অবস্থায় চলিল। অতপর আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, অন্তত মদীনাস্থ জমির পরিচালনার ভার প্রদানে আমাদিগকে উহার মোতাওয়াল্লী বানানো হউক। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা এবং চাচাত ভাই- এইরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত থাকিবেন- ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল, যদ্দরুন তাঁহারা এই ব্যাপারে এত অধিক তৎপরতা দেখাইতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের এই অভিপ্রায় এতটুকু পূরণ করিলেন যে, মদীনাস্থ বনু নযীর মহল্লার জমি ভাগ-বন্টন ব্যতিরেকে আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে একত্রে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। কিছু দিন পর পরিচালন ব্যাপারে তাঁহাদের মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হইল। সেমতে তাঁহারা পুনরায় ওমর (রাঃ)-এর নিকট যাইয়া ঐ জমি বণ্টন করতঃ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইতে বলিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ জমি কোন প্রকার ভাগ-বন্টন করিতে কঠোরভাবে অস্বীকার করিলেন। বিস্তারিত

বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে–

১৭৫৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৩৪ ও ৫৭৫) মালেক ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলীফাতুল মুসলেমীন ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলাম। এমতাবস্থায় তাঁহার দারোওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে, ওসমান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) উপস্থিত হইয়াছেন– তাঁহারা আপনার সাক্ষাত চাহেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিয়া সালাম করতঃ বসিয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দারোয়ান আসিয়া পুনঃ সংবাদ ছিল, আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ)ও আসিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদিগকেও অনুমতি দিলেন, তাঁহারও উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ বসিলেন।

অতপর (হযরতের চাচা) আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার এবং ইহার (আলী (রাঃ)-এর) মধ্যে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিন। তাঁহারা উভয়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিত্যক্ত বনু নজীর বস্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য পরিচালনার ব্যাপারে মতবিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণও এই ব্যাপারে জোর দিলেন যে, হাঁ– তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে (ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়া) চূড়ান্ত ফয়সালা করতঃ পরস্পরের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

ওমর (রাঃ) সকলকে বলিলেন, একটু থামুন। আমি আসমান-যমীনের রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহর কসম দিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, কেহ আমাদের (তথা নবীগণের) ওয়ারিস হইতে পারিবে না, আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা পরিগণিত হইবে– এই কথার দ্বারা হযরত (সঃ) নিজের বিষয়ই উদ্দেশ করিয়াছিলেন। ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ একবাক্যে বলিলেন, হাঁ– হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহাই বলিয়াছিলেন। অতপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করতঃ আল্লাহর কসম দিয়া তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাও কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন? তাঁহারা উভয়ে স্বীকার করিলেন, হাঁ– হযরত (সঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন।

তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, আমি আপনাদিগকে মূল বৃত্তান্ত শুনাইতেছি। এই বলিয়া তিনি পবিত্র কোরআন সূরা হাশরের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, বিনা যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যে জায়গা-জমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত আয়াত নাযিল করিয়া সেই জমির পূর্ণ অধিকারও আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই দিয়াছিলেন। (এই শ্রেণীর অধিকার একমাত্র রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যই হইয়ছিল, অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ হইবে না)। কিন্তু খোদার কসম! হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ জায়গা-জমিসমূহ সকলকে বাদ দিয়া একাই সবগুলি কুক্ষিগত করিয়াছিলেন না, বরং সবই মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। শুধুমাত্র এই সামান্য (বনু নজীর মহল্লার) জমিটুকু (এবং "ফদক" এলাকাটুকু) নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা হযরত (সঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের পূর্ণ বৎসরের খোরপোষের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার আয়ের মধ্যেও যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা লিল্লাহরূপে দান-খয়রাত (বা সমরাস্ত্র সংগ্রহে*) ব্যয় করিয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় জীবনকালে এই পন্থায়ই উক্ত জমির কার্য চালাইয়া গিয়াছেন। ওমর (রাঃ) স্বীয় বক্তব্যের উপর উপস্থিত সকলকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই বিবরণ অবগত আছেন? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, অতপর যখন হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গেলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ জমির পরিচালনা নিজ হস্তে রাখিলেন এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। (ফতহুল বারী, ৬–১৫৫)

অসাল্লামের পন্থায়ই কাজ চালাইয়া গেলেন। এই সময় ওমর (রাঃ) আব্বাস ও আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তখন আপনারা আবু বকরের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন যে, আবু বকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, হক পথের পথিক ছিলেন। তারপর আবু বকর (রাঃ) ইহজগত ত্যাগ করিলেন এবং আমি তাঁহার স্থলে বসিয়া ঐ জমির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলাম এবং দুই বৎসরকাল রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকরের পন্থায় আমি উহার পরিচালনা করিলাম। আল্লাহ তাআলা সাক্ষী যে, আমি সত্য, ন্যায় ও হকভাবে তাহা পরিচালনা করিয়াছি।

অতপর আপনারা দুই জন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একই দাবী পেশ করিলেন। হে আব্বাস! আপনি ত চাচা হওয়ার সূত্রে ভাতিজার অংশ দাবী করিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পক্ষে তাঁহার পিতার অংশ দাবী করিলেন। তখন আমি আপনাদিগকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ কথাই শুনাইলাম যে, কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না, তাঁহার পরিত্যক্ত সব সাদকা পরিগণিত হইবে। তারপর আমার রায় হইল যে, মদীনাস্থ জমিটা আপনাদের হাওলা করি। সেমতে আমি আপনাদের উভয়কে ডাকিয়া বলিলাম যে, মোতাওয়াল্লীস্বরূপ এই জমির পরিচালনার ভার আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারি এই শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে ওয়াদা অঙ্গীকার করিবেন যে, ইহার সমুদয় কার্য রসূলুল্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) এবং আমি মোতাওয়াল্লী হইয়া এ যাবত যেই পন্থায় চালাইয়াছি, আপনারাও ঠিক সেই পন্থায়ই চালাইবেন। তখন আপনারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, এইভাবেই আমাদিগকে প্রদান করুন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়াছিলাম। এস্থলেও উপস্থিত সকলকে তিনি কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বক্তব্য ঠিক কি-না? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, হাঁ-ঠিকই।

অতপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ ব্যবস্থার পরে আপনারা আমার নিকট হইতে ভিন্ন কোন নূতন ব্যবস্থার আশা রাখেন? মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার আদেশে আসমান-যমীনের অস্তিত্ব কায়েম রহিয়াছে, আমার পূর্ব ব্যবস্থা ভিন্ন নূতন কোন ব্যবস্থারই অবকাশ আমি দিব না। আপনারা ঐ ব্যবস্থানুযায়ী কাজ চালাইতে অপারগ হইলে তাহা আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করুন, আমিই আপনাদের স্থলে কার্য পরিচালনা করিয়া যাইব।

অতপর ঐ জমি সদকারূপে আলী (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। আব্বাস (রাঃ)-এর কর্তৃত্ব অপসারিত হইয়া যায়। আলী (রাঃ)-এর পরে তাহা পুত্র হাসান (রাঃ)-এর থাকে, তারপর হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর, তারপর হোসাইনের পুত্র আলী– জয়নুল আবেদীন এবং হাসানের পুত্র হাসান– এই দুই জনের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাঁহারা উভয়ে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন– কিছুকাল একজন এবং কিছুকাল অপরজন; এইভাবে তাঁহারা উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের পর হাসানের পুত্র যায়েদের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই জমি হযরত (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সদকারূপেই পরিচালিত ছিল।

নবী (সঃ)-এর মীরাস সম্পর্কে বিশেষ বিধান তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাহা অবগত ছিলেন না। তাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে সাধারণ বিধান আছে, সেই মতেই ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট অংশীদারীর দাবী সম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, আপনি মরিয়া গেলে আপনার ওয়ারিস কে হইবে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার পরিজন ও সন্তানগণ। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তবে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়ারিস হইব না কেন? তখন আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীছ শুনাইলেন যে, নবীগণের সম্পত্তির কেহ ওয়ারিস হয় না, তাহা সদকা পরিগণিত হয়। সেমতে ফাতেমা (রাঃ) সদকারূপেই উহার পরিচালনার দাবী করিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ঐ জমি ওয়ারিসদের হস্তগত হইতে দেওয়া, অদূর ভবিষ্যতে তাহা মীরাসে পরিগণিত হওয়ার আশঙ্কায় উহাতে রাজি হইয়াছিলেন না; তাহাতে ফাতেমা (রাঃ) অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

এক নজরে

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের

তিরোধান

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দশম হিজরীর শেষার্ধে রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে তাঁহার পরকাল যাত্রার বিভিন্ন ইঙ্গিত লাভ করেন। যথা–

(১) প্রতি রমযান মাসে জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে পবিত্র কোরআন দাওর করিতেন– কোরআন শরীফ (যতটুকু অবতীর্ণ হইয়াছে) একে অপরকে শুনাইতেন। এই বৎসর জিব্রাঈল (আঃ) দুইবার দাওর করিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট দুইবার দাওর করার উল্লেখপূর্বক বলিলেন, মনে হয় আমার পরকালের যাত্রা নিকটবর্তী আসিয়া গিয়াছে।

(২) সূরা "ইযা জাআ নাছরুল্লাহি" অবতীর্ণ হইয়া নবী (সঃ)-কে জ্ঞাত করা হইল যে, দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্দেশে আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সেমতে এই সূরার ইঙ্গিত ইহাই ছিল যে, এখন আর আপনার দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজন নাই। ওমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণও এই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এক হাদীছে আছে– সূরা "ইযা জাআ নাছরুল্লাহি" নাযিল হইলে পর নবী (সঃ) জিব্রাঈল (রাঃ)-কে বলিলেন, এই সূরায় ত আমার মৃত্যুর ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনার জন্য দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত উত্তম। (তাবরানী– সীরাতে মোস্তফা, ২–৩৭৪)

এইসব ইঙ্গিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনে দাগ কাটিয়াছে; সেমতে তিনি আখেরাতের কাজের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি কোরআন শরীফের দাওর দুই বারের ব্যবস্থা দেখিয়াই দশম হিজরীর রমযান মাসে এতেকাফ সাধারণ নীতি দশ দিনের স্থলে বিশ দিন করিলেন।

এতদ্ভিন্ন দশম হিজরীর হজ্জের সময় আসিলে তিনি ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিপুল আয়োজনের সহিত সকল উম্মতকে সঙ্গে লইয়া অন্তিম সফরের পূর্বে শেষ বারের মত হজ্জ সমাধা করার প্রস্তুতি নিলেন। আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার লগ্নে দুনিয়াতে তাঁহার ঘরের হজ্জ করিয়া আসা নিতান্তই সঙ্গতি পূর্ণ। এই হজ্জের এক বিশেষ মুহূর্তে কোরআন পাকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নাযিল হইয়া নবী (সঃ)-কে তাঁহার মহা যাত্রার আর একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করিল।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম, আমার নেয়ামত (দ্বীনে-ইসলাম) পূর্ণ-পরিণত করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্মরূপে একমাত্র ইসলামকে আমার পছন্দনীয় সাব্যস্ত করিলাম।" এই আয়াতের ইঙ্গিতও নবী (সঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, যেই দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়াতে আমার আগমন হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব দুনিয়া হইতে আমার গমন অবধারিত। সেমতে হযরত নবী (সঃ) সর্বসাধারণ সমক্ষে তাঁহার ইহজগত ত্যাগের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের মহাসম্মেলনে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাহাই ছিল ইসলাম জগতের সর্বাধিক বড় সমাবেশ। কম-বেশী এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মুসলমানের সমাবেশ ছিল তাহা। সম্পূর্ণ অচল বা অক্ষম নিতান্ত বাধাগ্রস্ত ব্যতীত কোন মুসলমান বিদায় হজ্জে অনুপস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

উক্ত মহাসম্মেলনের ভাষণে নবীজী (সঃ) তাঁহার ইহধাম ত্যাগের ইঙ্গিত নানা রকমে দিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ) তাঁহার বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী করার উদ্দেশে ভাষণের প্রারম্ভে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন– "হে জনমণ্ডলী"! আগামী বৎসর হয়ত এই স্থানে তোমরা আমার সাক্ষাত আর পাইবে না।"

উক্ত ভাষণে নবী (সঃ) মুসলিম জাতির জন্য চির দিনের সুদৃঢ় ভিত্তির উল্লেখে ইহাও বলিয়াছিলেন– "আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর মহাগ্রন্থ রাখিয়া গেলাম; যদি তোমরা উহাকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ভাষণে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় ইহাও বলিলেন– হে মুসলিমগণ! একদা খোদার সম্মুখে তোমাদের হাযির হইতে হইবে; খবরদার! আমি চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িও না এবং একে অপরের গলা কাটিও না।

ঐ ভাষণের শেষ পর্যায়ে নবী (সঃ) তাঁহার উম্মতের জনসমুদ্র হইতে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য আহরণে সকলকে প্রশ্ন করা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন– (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তোমাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে; فما انتم قائلون "তখন তোমরা কি বলিবে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র জনতা সমস্বরে বলিয়াছিল–

نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ـ

অর্থ ঃ "আমরা সাক্ষ্য দিব, নিশ্চয় আপনি (আল্লাহর সব হুকুম আমাদেরকে) পৌছাইয়া দিয়াছেন, আপনি (আপনার দায়িত্ব) আদায় করিয়া গিয়াছেন, সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় ভাল-মন্দের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন।" এইভাবে উপস্থিত জনতার স্বীকারোক্তি লাভ করার পর নবীজী (সঃ) তাঁহার শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উথিত করিয়া আবার জনতার প্রতি নামাইলেন– এইরূপে মহান আল্লাহর দৃষ্টি জনতার স্বীকারোক্তির প্রতি আকৃষ্ট করাপূর্বক এই স্বীকারোক্তির উপর আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী বানাইতে যাইয়া তিন বার বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! (আমার কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে জনতার এই সাক্ষ্য) তুমি শ্রবণ কর! হে আল্লাহ! তুমি ইহা শুনিয়া রাখ!! হে আল্লাহ! তুমি (এই স্বীকারোক্তির উপর) সাক্ষী থাক!!!

ভাষণ সমাপ্তে নবী (সঃ) উপস্থিত জনমণ্ডলীকে এই আদেশও করিলেন যে, উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণকে (আমার শিক্ষা ও আদর্শ) অবশ্যই পৌছাইয়া দিও।

এতদ্ভিন্ন মিনায় ৩/৪ দিন হজ্জের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনকালে ক্ষণকাল পর পরই উম্মতের বিচ্ছেদ -ভাবনা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি প্রায়ই সঙ্গী-সাথী ছাহাবীগণকে বলিতেন, আমার নিকট হইতে শিখিয়া রাখ! আমার কাছ হইতে শিখিয়া রাখ!! হয়ত আমার সহিত তোমাদের হজ্জ করা আর হইবে না।

সর্বাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্য লক্ষাধিক উম্মতকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিল তখন, যখন প্রাণাধিক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ১০ই যিলহজ্জ এই হজ্জ সমাপনার দিনও কোরবানীর দিন তাঁহার সুদীর্ঘ এবং অন্তর নিংড়ানো ঐতিহাসিক ভাষণ সমাপনান্তে প্রাণপ্রিয় লক্ষাধিক উপস্থিত উম্মতের দিকে মুখ করিয়া বিদায়!! বিদায়!!! কণ্ঠে সকলকে ইহজগতের চিরবিদায় দান করিতেছিলেন; যদ্দরুন এই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

তার পর হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে ১৬ই যিলহজ্জ বুধবার মদীনা পানে যাত্রা করিয়া ৪ দিন পথ চলার পর ১৮ই যিলহজ্জ রবিবার পথিমধ্যে "গাদীরে খোম" নামক স্থানে নবী (সঃ) একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ

ভাষণ দিয়াছিলেন। সেই বিশেষ ভাষণের প্রারম্ভেও নবী (সঃ) হৃদয়বিদারক কণ্ঠে বলিয়া দিলেন – "হে লোকসকল! আমি মানুষ বৈ নহি; (আর প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যু অবধারিত, সেমতে) আমার নিকট আমার প্রভুর পেয়াদার আগমন অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে; আমিও তাঁহার ডাকে সাড়া দিব।"

দশম হিজরীর শেষ মাস যিলহজ্জ চাঁদের কয়েকটি দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের সফর শেষে মদীনায় পৌঁছিয়াই ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণের ভূমিকায় বিদায়ী কার্যকলাপ অতি ব্যবস্থার সহিত দ্রুত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রথমেই নবী (সঃ) স্বীয় মসজিদের মিম্বরে আরোহণপূর্বক তাঁহার পরবর্তীতে জাতির কর্ণধার হওয়ার যোগ্য কতিপয় ব্যক্তিত্বের আলোচনায় সর্বসমক্ষে ভাষণ দিলেন। পরে রোগ শয্যায় ত এই ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে নির্ধারিত করার কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্তই করিয়া দিয়াছিলেন (ষষ্ঠ খণ্ড, আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনায় মুসলিম শরীফের হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

ইসলামকে বাধামুক্ত এবং উহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখায় জাতির কর্ণধারকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে– এই মহা কর্তব্য শিক্ষা দানের বিশেষ ভূমিকাও তিনি সম্পাদন করিলেন।

তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানগণ মুসলিম জাতিকে সদা উৎপীড়ন করিত। এক বৎসর পূর্বে স্বয়ং হযরত (সঃ) বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী লইয়া সুদূর তাবুক পর্যন্ত ভয়াবহ কষ্ট-ক্লেশে অভিযান চালাইয়া তাহাদের অগ্রাভিযান পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধেই মুতার জেহাদে হযরতের প্রিয়পাত্র পোষ্যপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। সেই রোমানদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় অন্তিম রোগাক্রান্তির মাত্র দুই দিন পূর্বে ২৮ই সফর সোমবার যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর পুত্র ওসামা (রাঃ)-কে অধিনায়ক করিয়া সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। বুধবার রোগাক্রান্ত হইয়া রোগ শয্যায় বৃহস্পতিবার নিজ হস্তে ঐ বাহিনীর হাতে পতাকা দানের অনুষ্ঠান পরিচালনাপূর্বক যাত্রা করাইয়া দিলেন। অবশ্য সেই বাহিনী যাত্রা করার পরই হযরতের অবস্থার অবনতির সংবাদে যাত্রা মুলতবী রাখে।

রোগাক্রান্ত হইয়া অন্তিম শয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্বে ২/৩ দিন প্রিয়নবী (সঃ) বিদায়ী কার্যাবলীতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতেছিলেন। বিশেষতঃ নিজ সঙ্গী-সাথী জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবীগণের এবং স্বীয় উম্মতের স্মরণই যেন প্রিয় নবীজী (সঃ)-কে অহরহ বিচলিত করিতেছিল। তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব ব্যথিত হৃদয়ের সহিত তিনি দ্রুত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। জীবিত সঙ্গী-সাথীগণ হইতে ত বিদায় হজ্জের সমাবেশেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন জীবনের হারানো সঙ্গীগণ হইতে বিদায় গ্রহণের বেদনা নবীজী (সঃ)-কে প্রথমে ওহুদ পর্বতের নিকটে নিয়া আসিল। এই পর্বতের পাদদেশেই চিরনিদ্রায় শুইয়া আছেন নবীজীর চরণপ্রান্তে থাকিয়া ইসলামের সেবায় আত্ম-বলিদানকারী হযরতের চাচা শহীদ সর্দার হামযা (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ। ৭০ জন শহীদানের সমাধির কিনারায় দাঁড়াইলেন নবী (সঃ) এবং স্মরণ করিলেন দীর্ঘ আট বৎসর পূর্বের হৃদয়বিদারক স্মৃতি; ভাসিয়া উঠিল অশ্রুপূর্ণ চোখের সামনে ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শহীদ দেহসমূহ, কাঁদিয়া উঠিল বিদীর্ণ হৃদয়। সেই মুহূর্তে কী প্রাণঢালা আবেগই না বহিয়া পড়িল তাঁহার রোদন জড়ানো কণ্ঠ হইতে! তাঁহাদের জন্য তিনি প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। শহীদানের মৃত দেহ অবিকৃত থাকে; অনেকের মতে নবী (সঃ) ঐ আবেগপূর্ণ মুহূর্তে তাঁহাদের জন্য নিয়মিত জানাযার নামাযও পড়িলেন; ঐ শহীদানের প্রতি আবেগ যেন তাঁহার বিদীর্ণ অন্তর হইতে উথলিয়া উঠিতেছিল!

ওহুদ প্রান্ত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সোজা মসজিদে যাইয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং স্বীয় পরকালের যাত্রার সংবাদ সকলকে অবহিত করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের আগেই তোমাদের সুব্যবস্থার জন্য পরপারের দিকে রওয়ানা করিতেছি, আমি (দ্বীন-ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করা সম্বন্ধে প্রভুর দরবারে) তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিব। (চির বিদায়ের পর) হাউজে কাউসারের কিনারায় তোমাদের সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের অঙ্গীকার থাকিল। (হাউজে কাউসার প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কল্পনাপ্রসূত বস্তু নহে,)

এখানে বসিয়া আমি তাহা অবলোকন করিতেছি। (উম্মতকে সান্ত্বনাদানে বলিলেন, তোমাদের বর্তমান দারিদ্র্য থাকিবে না।) সমুদয় বিশ্ব সম্পদের চাবি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। (তোমরা তাহা হস্তগত করিতে সক্ষম হইবে। তখনকার অবস্থা মনে করিয়া তোমাদের জন্য আমি দুনিয়াকে অত্যধিক ভয় করিতেছি। এমনকি) আমি এই ভয় করি না যে, তোমরা (পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় স্বীয় নবীর তিরোধানের পর ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য দেব-দেবীর পূজায়) শেরকের মধ্যে লিপ্ত হইবে। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য দুনিয়াকে অত্যন্ত ভয় করি যে, তোমরা প্রতিযোগী হইয়া দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিবে এবং সেই আকর্ষণই তোমাদের ধ্বংস করিবে; যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে দুনিয়ার আকর্ষণ ও মোহ ধ্বংস করিয়াছে।

এইভাবে নবীজী (সঃ) জীবিত-মৃত সকল হইতে বিদায় গ্রহণ পর্ব সমাধা করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় শয়নের দিন আসিয়া গিয়াছে– এই শেষ মুহূর্তে মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে শায়িত সাথীগণ হইতে বিদায় গ্রহণের পালা আসিল। জান্নাতুল বাকী মদীনার সাধারণ গোরস্থান; এই গোরস্থানে জীবনের অনেক সঙ্গী শুইয়া আছেন– তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণের ইঙ্গিত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আসিল। ২৯ সফর মঙ্গলবার দিন শেষে ৩০ সফর বুধবার দিনের রাত্র আসিল; গভীর রজনীতে নবী (সঃ) স্বীয় খাদেমকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "বাকী" গোরস্থানে যাইয়া তথা সমাহিতদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (সঃ) খাদেমকে লইয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং নীরবে শায়িত বন্ধুগণকে সালামের সাথে ইহাও বলিলেন যে, শীঘ্রই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হইতেছি। অতপর ঐ গোরস্থানবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। বার বার তাঁহাদের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিলেন যে, তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ তাহা জীবিতদের অবস্থার তুলনায় অনেক উত্তম। (জীবিতদের সম্মুখে) অন্ধকার রজনীর ঘনীভূত অন্ধকারের ন্যায় ফেতনা (ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণসমূহ) ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রত্যেক পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা ভয়াবহ কঠিন। অতএব তোমাদের অবস্থা অভিনন্দনের যোগ্য।

অতপর খাদেমকে সম্বোধন করিলেন– হে আবু মোআইহবাহ্! আল্লাহ তাআলা আমাকে অধিকার দিয়াছেন দুনিয়ার ধন-সম্পদ, তারপর বেহেশত অথবা আল্লাহর সাক্ষাত ও বেহেশত উভয়টির কোন একটি গ্রহণের। খাদেম প্রথমটি গ্রহণের কথা বলিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর সাক্ষাত ও বেহেশত গ্রহণ করিয়াছি। (বেদায়া, ৫–২২৪)

এই রাত্রে নবী (সঃ) মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে গোরস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই নবী (সঃ) শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইলেন– এই তাঁহার রোগের সূচনা।

ইতিমধ্যে নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে শিরঃপীড়ায় অস্থির দেখিতে পাইয়া প্রথমে কৌতুক ও সোহাগের ভাষায় আলাপ করিলেন। অতপর স্বীয় অসুস্থতার কথা প্রকাশ করিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, তোমার কী মাথা ব্যথা! মাথা ব্যথা ত আমার!!

এর পরই ব্যথা ও জ্বরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিল। রোগের প্রথম দিকে নবী (সঃ) তাঁহার নীতি অনুযায়ী এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতেছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তিনি বিবিগণকে একত্র করিয়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহেই অবস্থানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সকলেই তাহাতে একমত হইলেন। তখন নবী (সঃ) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তাই মাথায় কাপড় বাঁধিয়া দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করতঃ আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে আসিলেন।

রোগ যাতনায় জর্জরিত ও দুর্বল এই অবস্থায় চাচা আব্বাসের ছেলে ফজলকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, আমাকে হাত ধরিয়া মসজিদে নিয়া চল। মসজিদে আসিয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং লোকদের নামাযের জন্য ডাকিতে বলিলেন। তারপর কষ্ট-যাতনার মধ্যেও দাঁড়াইয়া ভাষণ দিলেন– হে লোকসকল! তোমাদের হইতে আমার বিদায় অতি নিকটবর্তী, তোমাদের মধ্যে আমাকে আর দেখিতে পাইবে

না। তোমাদের নিকট আমি একটি জরুরী কথা বলিব; অন্য কাহারও দ্বারা তাহা বলা হইলে যথেষ্ট হইবে না বিধায় আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন– আমি কাহারও পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ তাহার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে–. সে যেন আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ নিয়া নেয়; কেহ যেন ভয় না করে, প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে আমার মনে আক্রোশ থাকিবে । স্মরণ রাখিও, কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার হইতে তাহার হক আদায় করিয়া নিবে অথবা দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি আল্লাহর সাক্ষাতে এমন পাক-সাফ হইয়া যাইতে চাই যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে। নবী (সঃ) পুনঃ পুনঃ এই বক্তব্য সকলের সম্মুখে রাখিয়া অন্তিম শয্যায় এক মহা আদর্শ শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, "হক্কুল এবাদ" হইতে কিরূপ সতর্ক হওয়া চাই।

রোগ অবস্থায়ও নবী (সঃ) মসজিদে নামাযের ইমামতি করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু দ্রুত বেগে দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে তাঁহার রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর চারি দিন পূর্বে বুধবার সূর্যাস্তের পর (বৃহস্পতিবার রাত্রে) মাগরিবের নামাযই তাঁহার ধারাবাহিক ইমামতির শেষ নামায ছিল। এই রাত্রে এশার নামাযে তিনি আসিতে সক্ষম হইলেন না। মাথায় চক্র আসার দরুন বার বার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন; নামাযের জন্য উঠিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া যাইতেন; অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিলেন।

রবিবার দিন দুপুর পর্যন্ত নবী (সঃ) সময় সময় চেতনা হারাইতেছিলেন। এই দিন তাঁহাকে নিউমোনিয়া রোগের ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু তিনি ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যেন আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়া ফেলিয়াছেন, তাই দাওয়া-দোয়া কোনটার প্রতিই আর তাঁহার আকর্ষণ নাই; তাঁহার মনে এই জপনাই আসিয়া গিয়াছে যে, ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর মিলন চাই। কিন্তু ভক্ত-অনুরক্তগণ এই অনিচ্ছাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা মনে করিয়া চেতনা লোপ পাওয়ার সুযোগে তাঁহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ সকলকে ঐ ঔষধ খাইতে বাধ্য করিলেন।

কয়েক দিন যাবত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাধারণ সাক্ষাত হইতে ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীগণ বঞ্চিত। এমনকি নামাযের জমাতেও আর সাক্ষাত হয় না, তাই তাঁহারা ব্যাকুল অবস্থায় জটলা বাঁধিয়া বসেন এবং কাঁদেন। আনসারগণের এইরূপ এক দৃশ্য দেখিয়া আব্বাস (রাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আনসারগণের অবস্থা জ্ঞাত করিলেন।

আজ তাঁহার জীবনের আর মাত্র একটি দিন বাকী রহিয়াছে। আজ রবিবার। এই রবিবার তিনি দুপুর বেলা সামান্য স্বস্তি অনুভব করিয়াছেন– দীর্ঘ জীবনের সঙ্গী-সাথীগণের সহিত চির বিদায়ের শেষ সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বিশেষ কায়দায় মাথায় ও গায়ে পানি ঢালিয়া দেহের স্থবিরতা দূর করিলেন এবং মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু তিনি মাথা ব্যথায় অস্থির এবং দুর্বল– অতি দুর্বল। আয়েশা (রাঃ) করুণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, নবী (সঃ) মাথায় কাপড় আঁটিয়া দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া চলিয়াছেন। এইভাবেও পদচালনায় তিনি সক্ষম নহেন। পদদ্বয় মাটির উপর রেখা টানিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে পৌঁছিলেন; তখন যোহরের নামায আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইমামতিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় হযরত নবী (সঃ) আবু বকরের বাম পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন এবং ঐ নামাযেরও ইমাম তিনি হইলেন। আবু বকর (রাঃ) পিছনে হটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কণ্ঠস্বর দুর্বলতার দরুন অতি ক্ষীণ এবং তিনি বসিয়া ইমামতি করিতেছেন– তাই আবু বকর (রাঃ)-কে স্বীয় পার্শ্বেই মোকাব্বেররূপে রাখিয়া নামায সমাপ্ত করিলেন।

নামাযের পর নবী (সঃ) চির বিদায়লগ্নে শেষ বারের মত তাঁহার দীর্ঘ দিনের মিম্বরে আরোহণ করিলেন।

একে ত অতিশয় দুর্বল, তদুপরি প্রাণপ্রিয় ছাহাবীগণ হইতে চির বিদায়ের মুহূর্ত; তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ, তাই উপস্থিত শোকাভিভূত ভক্তবৃন্দকে মিম্বরের নিকট ঘনাইয়া বসিবার আদেশ করিলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে বেদনা বিজড়িত স্বরে বিদায়ী ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি তাঁহার আখেরাতের সফরকে অগ্রাধিকার প্রদান করার ইঙ্গীত নিজের নাম গোপন রাখিয়া এই ভাষায় উল্লেখ করিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার জনৈক দাসকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এবং দীর্ঘায়ুর অধিকার দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহার পরিবর্তে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর আনসারগণের সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন; তাহাদিগকে স্বীয় ভিতর-বাহিরের বন্ধু আখ্যায়িত করিয়া ইসলামের জন্য তাঁহাদের কোরবানী দানের এবং দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দিলেন। তারপর সকল উম্মতকে অসিয়ত করিলেন, আনসারদের সেবার পূর্ণ স্বীকৃতি দানের এবং তাঁহাদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার। এই ভাষণে নবী (সঃ) বিশেষভাবে নবী-পয়গম্বরগণের কবর সেজদা করার উপর লানত অভিশাপের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, খবরদার! আমার কবরকে তোমরা দেবতা বানাইও না– এই কাজ হইতে আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদের নিষেধ করিতেছি। এই ভাষণে নবী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর আত্মত্যাগ ও ইসলামের সেবার অতুলনীয় স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহার বৈশিষ্ট্যের ঘোষণা করিলেন।

এই ভাষণের পর নবী (সঃ) আর লোকসমক্ষে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে উম্মতের হিত কামনা এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের বাসনা এতই বদ্ধমূল ছিল যে, অন্তিম রোগের ভীষণ যাতনাও তাঁহাকে তাহা মুহূর্তের জন্য ভুলাইতে পারিত না। অসহ্য যাতনা ও সীমাহীন দুর্বলতার মধ্যে তাঁহার শেষ শয্যাকক্ষ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে শয্যাপার্শ্বে ছাহাবীগণকে সমবেত করিলেন। সকলকে সম্বোধনপূর্বক করুণা বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন–

আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদের ব্যথা-বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, সাহায্য দান করুন, উন্নতি দান করুন, আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে অসিয়ত করিয়া যাইতেছি, তোমরা ধর্মভীরু হও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি, আল্লাহর পক্ষ হইতে সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি। সাবধান! আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ করিও না।

সদা স্মরণ রাখিও, আল্লাহ আমার এবং তোমাদের জন্য বলিয়া দিয়াছেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থ ঃ "পরকালের শান্তি নিবাস বেহশত আমি সেই সকল লোকদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার দেখায় না, বিপর্যয় ঘটায় না এবং সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থ ঃ "অহঙ্কারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার শেষ মুহূর্ত কবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লাহর সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

এতদ্ভিন্ন এই সাক্ষাতে ছাহাবীগণ নবী (সঃ)-কে শেষ নিঃশ্বাসের পর গোসল দান, কাফন পরানো এবং

জানাযার নামায সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে উম্মত হইতে শেষ বিদায় গ্রহণে নবী (সঃ) বলিলেন, তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীগণকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিও এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার অনুসারী হইবে তাহাদের সকলের প্রতি আমার সালাম থাকিল।

এতদ্ভিন্ন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম শয্যা ঘনাইয়া আসার সময় হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষণে উম্মতের জন্য বহু মূল্যবান নসীহত, উপদেশ ও তথ্যাবলী রাখিয়া গিয়াছেন। "অন্তিম শয্যায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিভিন্ন ভাষণ" শিরোনামে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ ঐ পৃষ্ঠাগুলি বারংবার পাঠ করিবেন।

ইতিমধ্যে এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এমন সময় সর্বাধিক স্নেহের তনয়া ফাতেমা (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন। নবী (সঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে ক্ষীণ কণ্ঠে স্নেহভরে বলিলেন, হে বৎস!" তোমাকে জানাই মারহাবা! এই বলিয়া স্নেহের কন্যাকে অতি নিকটে বসাইলেন এবং চুপি চুপি স্বীয় বিদায়ের কথা জ্ঞাত করিয়া বলিলেন– আল্লাহকে ভয় করিয়া ধৈর্যধারণ করিও। জানিয়া রাখিও, আমি তোমার উপকারের জন্য উত্তম অগ্রগামী হইয়া যাইতেছি। ফাতেমা (রাঃ) ইহা শুনামাত্র ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবী (সঃ) সান্ত্বনা দানে তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "তুমি সন্তুষ্ট হও যে, তুমি বেহেশতের মধ্যে নারীগণের সর্দার-মুকুটমণি গণ্য হইবে এবং তুমি শান্ত হও; আমার পরিজনের মধ্যে সর্বাগ্রে তুমিই (ইহজগত ত্যাগ করিয়া) আমার সহিত মিলিত হইবে।" এতদশ্রবণে ফাতেমা (রাঃ) আনন্দে হাসিলেন।

বিশ্ব মানবের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই নশ্বর পৃথিবী হইতে চির বিদায়ের আয়োজনে নিজকে পাথিব অর্থ-সম্পদ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব করিয়া নিয়াছিলেন। দুনিয়ার ধন-দৌলত গৃহে রাখিয়া খোদার সাক্ষাতে যাইবেন– ইহাতে যেন তিনি লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। এমনকি শেষ কয় দিনের জন্য পরিবারের আহার যোগাইতে এক ইহুদীর নিকট হইতে ধারে আটা ক্রয় করিয়া স্বীয় লৌহবর্ম বন্ধক রাখিয়া গিয়াছেন। কোন মুসলমানের নিকট হইতে ঐ ধার গ্রহণ করেন নাই এই আশঙ্কায় যে, হয়ত সে স্বীয় সাধ্যের অধিক চাপ সহ্য করিয়া ধার দেওয়ার পরিবর্তে হাদিয়া দানপূর্বক স্বীয় নবীকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করিবে। নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর এই সামান্য চাপের আশঙ্কাও নবী (সঃ) এড়াইয়া গিয়াছেন। এইভাবে মৃত্যুমুখেও নবী (সঃ) দুনিয়া হইতে নির্লিপ্ত থাকার সোনালী আদর্শ শিক্ষা দান করিয়া চলিয়াছেন।

১১ই রবিউল আউয়াল রবিবার– প্রিয় নবী (সঃ) আর মাত্র একটি দিনই পৃথিবীর অতিথি। দুপুর বেলা হইতে তিনি রোগ যাতনার অপেক্ষাকৃত মামুলী লাঘব বোধ করিলেন। স্ববংশীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুরব্বী শ্রেণী এই লাঘবকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক গণ্য করিলেন বটে, কিন্তু অন্যরা রোগ প্রকোপের এই লাঘবতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাঁহারা এতদিন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সন্নিকটে ভিড় জমাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এই সুযোগে নিজ নিজ বাড়ী দেখিয়া আসিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহজীবনের সর্বশেষ রাত্রিটি ঐ অবস্থায় কাটিয়াছে। এমনকি পর দিন সোমবার প্রভাতে নবীজীর মসজিদে আবু বকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে ফজর নামাযের জামাত আরম্ভ হইয়াছে। জাতির ইমাম তথা পরিচালক নির্ধারণের ইঙ্গিত অর্থে নবী (সঃ) চারি দিন পূর্ব হইতেই আবু বকর (রাঃ)-কে স্বীয় মসজিদের ইমাম বানাইয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার পিছনে নির্দ্বিধায় একতাবদ্ধরূপে মুসলমানদের সারিবদ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করিয়া চোখ জুড়াইবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হইল। তাই তিনি শত দুর্বলতা সত্ত্বেও শয্যা হইতে অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া কক্ষের দরজার নিকটে আসিলেন। দরজার কপাট ছিল না; চটই উহার আবরণ ছিল– উহা ফাঁক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখার জন্য মসজিদের প্রতি তাকাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ মুসল্লীগণের দৃষ্টি পড়িয়া গেল তাঁহার প্রতি, এমনকি ইমাম আবু বকর (রাঃ)-এর দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি আসিয়া গেল। সকলেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে নামায

পড়ার সুযোগ প্রাপ্তির আশায় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুসল্লীগণ নূতনভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে নিয়ত বাঁধিবার আশায় পূর্ব নিয়ত ছাড়িয়া দিতে এবং আবু বকর (রাঃ)ও মোক্তাদী হওয়ার আশায় ইমামতি ত্যাগ করিয়া পেছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। সকলের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল। নবী (সঃ)ও তাঁহার নির্ধারিত ইমামের পিছনে মুসলমানগণকে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দের অতিশয্যে তাঁহার চেহারা মোবারক হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ত দুর্বল হইতে দুর্বলতর, হাসির আলোমাখা সুন্দর চেহারাখানি রক্ত শূন্যতার কারণে ফেকাসে দেখাইতেছিল; তিনি ত কিছু সময় দাঁড়াইয়া থকিতেও অক্ষম। তাই ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণকে হাতের ইশারায় নিরাশ করিয়া দরজার আবরণ ছাড়িয়া দিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারক ছাহাবীগণের নজরে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আবার পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহাই ছিল ছাহাবীদের জন্য প্রাণ-প্রিয় নবী (সঃ)-কে জীবিত দেখার সর্বশেষ মুহূর্ত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা এতটুকু মন্দের ভাল মনে করিয়া নামায শেষে আবু বকর (রাঃ) আজ বাড়ী গেলেন। ইতিমধ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা নিমিষের মধ্যে গুরুতররূপে দ্রুত অবনতি হইতে অবনতির দিকে মোড় নিয়া নিল। পরিবার-পরিজনের মধ্যে হায়-হুতাশের রোল পড়িয়া গেল।

এক দিকে আকাশের সূর্য উদয়ের পথে আগমন করিতেছিল, অপর দিকে কুল মখলুকাতের সূর্য অস্তের দিকে গমন করিতেছিল। পত্নীগণ সকলেই উপস্থিত আছেন, স্নেহের তনয়া ফাতেমা (রাঃ)ও ছুটিয়া আসিয়াছেন। পয়গম্বরী আকাশের সূর্য অস্তের দিকে যাইতে যাইতে ম্লান হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চেহারার রং ঘন ঘন পরিবর্তন হইতেছে; চেতনা লোপ পাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে– এইরূপে মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই যাতনার দৃশ্য ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য অসহনীয় হইয়া উঠিল; তিনি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার আব্বার কী কষ্ট!! নবী (সঃ) ম্লান কণ্ঠে বলিলেন, এই সময়ের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকিবে না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিটি মুহূর্ত নিতান্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটিতেছিল, এমতাবস্থায়ও তিনি আদর্শ প্রচারে ক্ষান্ত ছিলেন না। শায়িত অবস্থায় গায়ে চাদর ছিল; অস্থিরতার দরুন মুখে মাথায় চাদর টানিয়া দিতে লাগিলেন, আবার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রমে তাহা অপসারিত করিতেছিলেন– এই অস্থিরতার মধ্যেও স্বীয় উম্মতের জন্য সতর্কবাণী রাখিয়া যাইতেছিলেন– "ইহুদ-নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত; তাহারা তাহাদের পীর-পয়গম্বরগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।

যাতনার দরুন অস্থিরতা চরমে পৌঁছিয়াছে; কী অবস্থায় শান্তি অনুভব করিবেন তাহাই যেন খুঁজিতে ছিলেন। মাথা একবার বালিশ হইতে সরাইয়া আয়েশার উরুর উপর রাখিলেন। আয়েশা (রাঃ) শেষ বারের মত একটি তদবীর করিতে চাহিলেন। তিনি শেফা তথা আরোগ্যের জন্য বিশেষ দোয়া পড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামর মুখ মণ্ডলে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নবী (সঃ) তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, বরং আমি ত সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলন চাই। রবিবার দিন তিনি ঔষধ সেবনে অনীহা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ তিনি বাঁচার পক্ষে দোয়ার তদবীরেও বাধা দিলেন। (বেদায়া, ৫–২৪০)। কারণ, এই সময় ত তিনি মহাযাত্রার আরম্ভে রহিয়াছেন। এই সঙ্কট মুহূর্তেও নবী (সঃ) উম্মতের হিত কামনা ভুলেন নাই। উম্মতকে সতর্ক করার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আলী (রাঃ)-কে ডাকিয়া আনিলেন এবং কিছু লিখিয়া দিয়া যাওয়ার কোন বস্তু নিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা এতই সঙ্কটের মধ্যে ছিল যে, আলী (রাঃ) আশঙ্কা করিলেন, ঐ বস্তুর জন্য উঠিয়া গেলে হয়ত ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ)-কে আর পাইবেন না। তাই আলী (রাঃ) বলিলেন, যাহা লিখাইতে চাহেন মুখে বলিয়া দিন; আমি তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিব। নবী (সঃ) বলিলেন,

(উম্মতের জন্য) আমি শেষ অসিয়ত করিয়া যাইতেছি– নামায, যাকাত এবং করতলগত অধীনস্থদের প্রতি বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য রাখার।

শেষ মুহূর্ত আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যু যাতনার প্রাবল্যে কোন অবস্থার উপর স্থিরতা সম্ভব হইতেছিল না। এই সময় প্রিয়তমা বিবি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বক্ষের সহিত হেলান দিয়া আছেন, কণ্ঠনালীতে গরগর শব্দ হইতেছে, শ্বাসনালী আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, মুখে জড়তা আসিয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র উম্মত এবং ব্যক্তিগত ধ্যানই হৃদয়পটে আছে। উম্মতের জন্য বার বার বিড়বিড় শব্দে বলিতেছিলেন– আস্‌সালাহ্‌, আস্‌সালাহ্‌... "সাবধান!! নামায, নামায এবং করতলগত অধীনস্থ।" আর নিজের জন্য শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ তাআলার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে নিম্নবর্ণিত বুলিসমূহই বার বার উচ্চারণ করিতেছিলেন।

(১) আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুদের সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও। (২) ঐ লোকদের সাথী বানাইয়া দাও যাঁহাদের উপর আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত বর্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ; তাঁহারাই হইতেছেন উত্তম সাথী। (৩) আয় আল্লাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলন চাই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা সুস্পষ্ট বুঝিয়া নিলাম, নবী (সঃ) আর আমাদের নিকট থাকিতেছেন না। তিনি মৃত্যু যাতনায় নিতান্তই অস্থির; আল্লাহর সান্নিধ্যে যাত্রা করিবেন– এই মুহূর্তে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মেসওয়াক করিয়া মুখ পরিষ্কার করার ইচ্ছা উদিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। ঐ সময়ই আয়েশা (রাঃ)-এর ভ্রাতা মেসওয়াকের একখানা ডালা হাতে তথায় উপস্থিত হইলেন। আয়েশা (রাঃ) উহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিয়া চিবাইয়া মোলায়েম করিয়া দিলেন। নবী (সঃ) তাহা দ্বারা সুন্দর মত মেসওয়াক করিলেন। নিকটবর্তী একটি পাত্রে পানি ছিল, তাহাতে তিনি উভয় হাত ভিজাইয়া মুখমন্ডল শীতল করিতে লাগিলেন এবং অসহনীয় যাতনার মধ্যে বলিতেছিলেন– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

এই অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোয়াও করিতেছিলেন–

اللهم اعنى على سكرات الموت -আয় আল্লাহ! মৃত্যুর যাতনা ও কষ্ট উপশমে আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী শরীফ)

অস্ত্রোপচারে পীর-পয়গম্বর সকলেরই ব্যথা-যন্ত্রণা হওয়া স্বাভাবিক; মৃত্যু ত বড় হইতে বড় অস্ত্রোপচার অপেক্ষা কঠিন।

অতপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন–

فى الرفيق الاعلى সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলনে চলিলাম -এই বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথেই উত্তোলিত হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং সাইয়্যেদুল মোরসালীন মাহবুবে রব্বুল আলামীন ইহজীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী অসাল্লাম।

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যুতে তাঁহার শোকাভিভূত পরিবার-পরিজনকে সর্বপ্রথম সান্ত্বনা দান করিয়াছেন হযরত খিজির (রাঃ)। তিনি অদৃশ্য থাকিয়া শুধু কণ্ঠস্বরে গৃহকোণ হইতে শুনাইয়াছেন– হে গৃহবাসী! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয় আল্লাহর (রহমতের) মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সব রকম দুঃখ-বিপদের সান্ত্বনা, সর্বপ্রকার হারানো বস্তুর বিনিময়, সকল রকম ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ। অতএব আপনারা সকলে আল্লাহকে ভয় করিবেন এবং একমাত্র তাঁহার হইতেই সব কিছুর আশা রাখিবেন। নিশ্চয় প্রকৃত বিপদগ্রস্ত একমাত্র ঐ ব্যক্তি যে (ধৈর্যহারা হইয়া বিপদের) সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকে। (কণ্ঠস্বর শুনিয়া) আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমরা জান তিনি কে? তিনি হইলেন খিজির (আঃ)। (মেশকাত শরীফ, ৫৫০)

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ওফাতে ছাহাবীগণের সকলের উপর শোকের তুফান বহিয়া যাইতেছিল, সকলেই বিহ্বল অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি লৌহ মানব ওমর ফারুক (রাঃ)সহ অনেক ছাহাবীর চেতনাই লোপ পাইয়া গেল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু স্বীকার করার মত বোধশক্তিও তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। একমাত্র আবু বকর (রাঃ)-ই ঐ মুহূর্তে বাহ্যিক ধীরস্থিরতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। গায়েবী নির্দেশ অনুসারে নবী (সঃ)-কে তাঁহার গায়ে জামা রাখিয়াই গোসল দেওয়ার পর তিনখানা সাদা সূতি কাপড়ে কাফন পরানো হইল, যেই জামায় গোসল দেওয়া হইয়াছিল উহা অপসারণ করা হইল। তারপর একমাত্র নবীগণের জন্য ব্যবস্থারূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার কক্ষেই বুগলী কবর তৈয়ার করিয়া শবদেহ কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। নিয়মিত জানাযা পড়া হইল না। কারণ, নবীগণের মৃত্যু বস্তুতঃ মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের পবিত্র আত্মা দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, শুধুমাত্র তাহার ক্রিয়াকলাপ ধুলার ধরণীর মধ্যে থাকে না। এই কারণেই নবীগণের স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না, তদ্রূপ জানাযারও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য শবদেহ সম্মুখে রাখিয়া দরূদ-সালাম পাঠ করা হইতেছিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়াছেন, তারপর মুসলমান পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর অপ্রাপ্ত বয়স্কগণ, তারপর দাস-দাসীগণ পর্যন্ত। এইভাবে সোমবার দ্বিপ্রহরের পর হইতে দুই বা তিন দিন পর্যন্ত দরূদ-সালাম পাঠ করা হয়। সেই যুগে দূর-দূরান্তে সহজ ও দ্রুত যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা মোটেই ছিল না, পার্বত্য এলাকার লোকসংখ্যা বেশী ছিল না। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার ত্রিশ হাজার মানুষ দলে দলে দরূদ-সালাম পাঠ করেন। তারপর মঙ্গলবার বা বুধবার দিনের পর রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেহ মোবারক কবরে আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। আলী (রাঃ), আব্বাস (রাঃ) এবং আব্বাসের পুত্রদ্বয় ফজল ও কুসাম (রাঃ)– এই চারি জন দেহ মোবারক কবরে অবতীর্ণ করেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আসুন– প্রিয়নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তিরোধান বিবরণ ঐ দরূদ-সালামের উপরই ক্ষান্ত করি, যে দরূদ-সালাম পাঠে তাঁহাদের ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীবৃন্দ তাঁহাকে ইহজগত হইতে চির বিদায় দিয়াছিলেন।

লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এবং সমাধিস্থ কক্ষে যে পরিমাণ সামাই হয় সেই সংখ্যক বিশিষ্ট মোহাজের ও আনসারগণ উপস্থিত হইলেন। ইমাম মোক্তাদীর জামাত নহে, কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলের অগ্রভাগে শবদেহের বরাবরে দাঁড়াইলেন, অন্যরা তাঁহাদের পিছনে কাতারবন্দীভাবে দাঁড়াইলেন। নিম্নে বর্ণিত সালামের বাক্যসমূহ প্রত্যেকেই উচ্চারণ করিলেন আর অপর বাক্যসমূহ আবু বকর ও ওমর (রাঃ) পাঠ করিলেন এবং অন্যরা "আমীন আমীন" বলিতে থাকিলেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ

হে মহান নবী ! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর সর্বপ্রকার রহমত ও মঙ্গল (বর্ষিত হউক।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهِ ـ

আয় আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, প্রিয়নবী (সঃ) নিশ্চয় পৌঁছাইয়াছিলেন জগদ্বাসীকে যাহা কিছু তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গলের সব কিছু বাতলাইয়া গিয়াছেন।

وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ ـ

আর তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন– যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁহার দ্বীনকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং তাঁহার বিধানাবলী পূর্ণ বাস্তবায়িত হইয়াছে।

وَاُوْمِنَ بِهٖ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ فَاجْعَلْنَا اِلٰهَنَا مِمَّنْ يَّتَّبِعُ

এবং শরীকবিহীনরূপে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব, হে আমাদের মাবুদ ।!

আমাদের ঐ লোকদের দলভুক্ত রাখুন যাহারা অনুসরণ করে–

الْقَوْلَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ ـ

ঐ বাণীর যাহা তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। আর আমাদের তাঁহার সহিত মিলিত করিবেন (কেয়ামত দিবসে) ;

حَتّٰى تُعَرِّفَهٗ بِنَا وَتُعَرِّفَنَا بِهٖ فَاِنَّهٗ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفًا رَّحِيْمًا ـ

এমনকি তাঁহার নিকট আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন এবং আমাদেরকেও তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিবেন। নিশ্চয় তিনি ঈমানদারদের প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু ছিলেন।

لَا تَبْتَغِىْ بِالْاِيْمَانِ بِهٖ بَدِيْلًا وَلَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ـ

এই মহান নবীর প্রতি ঈমানের বিনিময়ে কখনও আমরা কিছু গ্রাহ্য করিব না এবং তাঁহার (ভালবাসার) বিনিময়ে জগতের কোন মূল্যই গ্রহণ করিব না। (বেদায়া, ৫-২৬৫)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশেতাগণ নবীজীর প্রতি দরূদ পাঠাইয়া থাকেন। হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ صَلٰوةُ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

আয় আল্লাহ! আয় আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা উপস্থিত হইয়াছি, আমরা আপনার (দরূদ ও সালামের) আদেশ যথাযথ পালন করিব। সর্বাধিক মঙ্গলকামী দয়াল প্রভুর দরূদ (রহমত) এবং নৈকট্যধারী সমস্ত ফেরেশতাগণের দরূদ–

وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَئٍ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

এবং নবীগণের, সিদ্দীকগণের ও সমস্ত নেককারগণের দরূদ, আর যত বস্তু আপনার তসবীহ পাঠ করিয়া থাকে– সকলের দরূদ হে রব্বুল আলামীন! কবুল করিয়া নিন–

عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ ـ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ ـ

আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের জন্য, যিনি নবীগণের শেষ নবী, রসূলগণের সর্দার এবং মোত্তাকীগণের প্রধান।

وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِىْ بِاِذْنِكَ ـ

এবং তিনি সারা জাহানের প্রভুর রসূল, তিনি সত্যের মাপকাঠি, সুসংবাদদানকারী এবং আপনার আদেশে জগদ্বাসীকে আহ্বানকারী –

السِّرَاجُ الْمُنِيْرُ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ ـ

তিনি দীপ্ত প্রদীপ। আর তাঁহার উপর সকল প্রকার বরকত, কল্যাণ ও মঙ্গল বর্ষণ করুন এবং সালাম-শান্তি বর্ষণ করুন। (মাদারেজুন নবুয়ত)

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

হযরতের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ঃ (পৃঃ ৫০১)

১৭৫৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক গঠন মধ্যম শ্রেণীর ছিল– অতি লম্বাও নহে, একেবারে বেঁটে খর্বকায়ও নহে। শরীরের রং অতি উজ্জ্বল ছিল, ফেকাসে সাদাও ছিল না, ময়লা শ্রেণীর শ্যামবর্ণও ছিল না। মাথার চুল অধিক কুঞ্চিতও

ছিল না, সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না– মামুলী বাঁকযুক্ত সুশৃঙ্খল ছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয় এবং তাঁহার নবুয়ত প্রকাশ হয়, অতপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদীনায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহজগত ত্যাগকালে তাঁহার মাথা ও দাড়ির মধ্যে সর্বমোট কুড়িটি চুলও সাদা হইয়াছিল না।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত সময়ের হিসাব শুধু একটা মোটামুটি হিসাব, নতুবা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওহী নাযিলের আরম্ভকাল চল্লিশ বৎসর হইতে কয়েক মাস, কয়েক দিন ও কয়েক ঘণ্টার বেশ কম হইবে। কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখে ভোর বেলা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং রমযান মাসের শেষের দিকে কোন এক তারিখে লাইলাতুল কদরের রাত্রে সর্বপ্রথম ওহীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সূত্রে চল্লিশ বৎসর হইতে কিছু কম বেশী হওয়া অবধারিত।

মক্কায় অবস্থান সম্পর্কেও তদ্রূপই; অন্যান্য সূত্রে মক্কায় অবস্থানকাল তের বৎসর সাব্যস্ত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে দশকের উপর ভাঙ্গা সংখ্যা ধরা হয় নাই।

১৭৫৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্বাধিক সুশ্রী ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। তাঁহার দৈহিক গঠনও সুন্দর ছিল; অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অধিক বেঁটেও ছিলেন না।

১৭৫৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৭৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিল (যাহা জ্ঞানবান ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের আকৃতি) এবং তাঁহার পায়ের পাতা পুরু, বড় ও মজবুত ছিল। পূর্বে বা পরে তাঁহার তুল্য (অঙ্গ সৌষ্ঠববিশিষ্ট) কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। হযরতের হাতের তালু সুপ্রশস্ত ছিল।

১৭৫৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক আকৃতি মধ্যম শ্রেণীর এবং তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যস্থল সুপ্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ তাঁহার বক্ষ বা সিনা মোবারক অপেক্ষাকৃত চওড়া ছিল)। তাঁহার মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছিত (–ইহার অধিক লম্বা হইতে দিতেন না)।

আমি তাঁহাকে লাল রংয়ের পোশাকে দেখিয়াছি– তিনি এত সুন্দর দেখাইতেন যে, আমি কাহাকেও তাঁহার তুল্য সুন্দর দেখি নাই।

১৭৫৯। হাদীছ ঃ(পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারক কি তরবারির ন্যায় (জ্বলজ্বলা লম্বা সাইজের) ছিল? বরা (রাঃ) বলিলেন না–না, তাঁহার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও গোলাকৃতির) ছিল।

১৭৬০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোটা বা চিকন কোন প্রকার রেশমী কাপড়ও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত মোবারক অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই এবং সৃষ্টিগতভাবে হযরতের শরীরে যে সুগন্ধি ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক কোন সুগন্ধি আমি কোথাও পাই নাই।

১৭৬১। হাদীছ ঃ আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (হজ্জের সময়ে মিনা হইতে মক্কা পথে আব্‌তাহ নামক স্থানে) দ্বিপ্রহরে (যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্তে তাঁবু হইতে) বাহির হইলেন এবং যোহরের নামায পড়িলেন, অতপর (আছরের নামাযের আউয়াল ওয়াক্তে) আছরের নামায আদায় করিলেন।

তখনকার ঘটনা– লোকেরা সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াইল। নবী (সঃ) তাহাদের নিকট দিয়া গমনকালে প্রত্যেকেই (বরকতের জন্য) নবীজীর হস্তদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ চেহারা মুছিতে লাগিল। আবু জোহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমিও হযরতের হস্ত মোবারক আমার চেহারার উপর রাখিলাম; তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি,

হযরতের হস্ত মোবারক বরফতুল্য শীতল এবং মেশক্ বা কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সময় সময় তাঁহাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেন। তাঁহার মাতা) উম্মে সোলায়েম (দুপুর বেলা) হযরতের আরাম করার জন্য চামড়ার বিছানা বিছাইয়া দিতেন। হযরত (সঃ) ঐ বিছানার উপর দুপুর বেলা ঘুমাইতেন। স্বাভাবিকভাবে হযরতের শরীর হইতে অধিক পরিমাণে ঘাম নির্গত হইয়া থাকিত। হযরত যখন ঘুম হইতে উঠিয়া যাইতেন তখন উম্মে সোলায়েম চামড়ার বিছানার উপর হইতে হযরতের ঘাম এবং তাঁহার মাথা হইতে দুই চারিখানা চুল ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহা কুড়াইয়া কাঁচের শিশিতে জমা করিতেন এবং দেহ হইতে নির্গত ঘাম সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

একদা হযরত (সঃ) উম্মে সোলায়েমকে ঐসব কুড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? উম্মে সোলায়েম আরজ করিলেন, ইহা আপনার শরীরের ঘাম– আমি জমা করিয়া রাখি এবং সুগন্ধি বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকি। কারণ, তাহা সর্বাধিক সুগন্ধি; ইহার দ্বারা অন্য সুগন্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উম্মে সোলায়েম ইহাও বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বরকতের জন্য ইহা ছেলে-মেয়েদেরকেও ব্যবহার করাই। হযরত (সঃ) তদুত্তরে বলিয়াছেন, উত্তমই বটে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাগরেদ বলিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়াছিলেন, হযরতের ঘাম মিশ্রিত সুগন্ধি যেন আমার কাফনে দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই করা হইয়াছে।

১৭৬২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৫৭) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হযরত নবী (সঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, হযরতের বার্ধক্য এতদূর পৌঁছিয়াছিল না যে, খেজাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহার দাড়ি মোবারকের এত অল্প সংখ্যক চুল সাদা হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা গণনা করা যাইত।

১৭৬৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০১) আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তাঁহার (নিম্ন ওষ্ঠের নিচে) বাচ্চা দাড়ির কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র।

১৭৬৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) হারীজ ইবনে ওসমান আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, শুধু তাঁহার বাচ্চা দাড়ির কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি খেজাব ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিলেন, খেজাবের প্রয়োজনই ছিল না; শুধু কেবল তাঁহার মাথার উভয় পার্শ্বের কিছু পরিমাণ কেশ সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথমে স্বীয় মাথার বাবরি আঁচড়াইতে মাথার অগ্রভাগে সিঁথি না কাটিয়া অগ্রভাগের চুলগুলিকে গিঁট ল.গাইয়া কপালের উপর ছাড়িয়া দিতেন, তৎকালে কিতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের রীতিও ইহাই ছিল; মোশরেকগণ কিন্তু সিঁথি কাটিয়া থাকিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কার্যে বিশেষ কোন নিয়মের আদিষ্ট না হইতেন, সেই কার্যে তিনি কিতাবধারীদের রীতিই অগ্রগণ্য মনে করিতেন। (এস্থলে তিনি তাহাই করিতেন, কিন্তু) পরে তিনি সিঁথি কাটিবার রীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ)-এর চরিত্র গুণ

১৭৬৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ২৮৫) আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) (যিনি তওরাত কিতাবের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন,) তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তওরাত কিতাবে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের গুণাবলী কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা জানাইবেন কি? তিনি বলিলেন– হাঁ, কোরআন শরীফে বর্ণিত অনেক গুণাবলী তওরাতেও উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন পবিত্র কোরআনে আছে–

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি– আপনি বাস্তব সত্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন এবং সত্য-মিথ্যা, হেদায়াত ও গোমরাহীর সাক্ষ্যদাতা; তথা নমুনা ও মাপকাঠি হইবেন এবং সত্যাবলম্বনকারীদের পক্ষে সুসংবাদদানকারী আর সত্যের বিরোধীগণকে সতর্ককারী হইবেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, তওরাত শরীফেও হযরতের এই গুণগুলির উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় গুণেরও উল্লেখ আছে। যথা– "তিনি অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন বিশ্ব মানবকে রক্ষাকারী (ধর্মের বাহক) হইবেন, আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত প্রতিনিধি হইবেন, (আমার উপর পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরকারী হইবেন; যদ্দরুন) আমি তাঁহার নাম রাখিয়ছি "মোতাওয়াক্কেল" অর্থাৎ ভরসা স্থাপনকারী। তিনি কঠোর প্রকৃতির– কঠিন আত্মার লোক হইবেন না, (তাঁহার হৃদয় হইবে অতি কোমল। তিনি অতিশয় গাম্ভীর্যপূর্ণ হইবেন, এমনকি পথে-ঘাটে) হাটে-বাজারে হট্টগোল করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস তাঁহার মোটেই হইবে না। তিনি এতই সহিষ্ণু হইবেন যে, কাহারও দুর্ব্যবহারের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তিনি দুর্ব্যবহার করিবেন না বরং ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ইহজগত হইতে উঠাইয়া নিবেন না যাবত না তাঁহার মাধ্যমে বক্র পথের পথিক কাফের জাতিকে সোজা করিয়া দেন, তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দান করে এবং যাবত না তিনি এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চক্ষুসমূহকে সত্যের আলো দান করেন, বয়া বধির কর্ণসমূহে সত্য শ্রবণ ও গ্রহণের শক্তি সৃষ্টি করেন, আবদ্ধ অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি-বিবেককে সত্যের আলো দান করেন।

১৭৬৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) عن عبد الله به عمر رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلاَقًا ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লজ্জাহীন, অশ্লীল, বিশ্রী কথাবার্তায় অভ্যস্ত ছিলেনই না, ঐরূপ কথা কুত্রাপি মুখেও আনিতেন না। তিনি উপদেশ দিতেন, যাহার চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভাল সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

১৭৬৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে কোন্ কার্য সমাধা করার একাধিক পথ-পদ্ধতি থাকিলে তিনি সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি বাছিয়া লইতেন; অবশ্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন যে, ইহাতে কোন দিক দিয়া শরীয়তের বরখেলাপ গোনাহের কোন কিছু করিতে না হয়। যদি ঐ সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি গোনাহের কারণ তথা শরীয়তের বরখেলাপ হইত তবে অবশ্যই তিনি ঐ পথ-পদ্ধতি হইতে বহু দূরে থাকিতেন।

আর রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও নিজস্ব কোন ব্যাপারে কাহারও হইতে প্রতিশোধ লইতেন না (ক্ষমা করিতেন)। অবশ্য কেহ আল্লাহর শরীয়তের মর্যাদাহানিকর কোন কাজ করিলে সেস্থলে তিনি আল্লাহর দ্বীনে খাতিরে সুষ্ঠু প্রতিকার বিধান করিতেন।

১৭৭০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন– পর্দানশীল কুমারীও তত লজ্জাবতী হয় না। এমনকি রুচি বিরোধী কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাঁহার চেহারার উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাসিয়া উঠিত (কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না)।

১৭৭১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কখনও কোন খাদ্য-বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না; যদি মনের আকর্ষণ হইত তবে খাইতেন নতুবা খাইতেন না।

১৭৭২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কথা বলার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে কথা বলিতেন যে, তাঁহার শব্দাবলী কেহ গণনা করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিত।

১৭৭৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯৩) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অশ্লীল কথা কখনও মুখে আনিতেন না, লান্-তান্ অভিশাপ দিতেন না এবং গালি-গালাজ করিতেন না। কাহারও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে শুধু এতটুকু বলিতেন, সে এরূপ করে কেন, তাহার কপালে মাটি পড়ুক।

১৭৭৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে কখনও তাঁহাকে 'না' বলিতে শোনা যায় নাই।

১৭৭৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। কখনও তিনি আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কৈফিয়ত চাহেন নাই- এরূপ কেন করিয়াছ? এরূপ কেন কর নাই?

হযরত (সঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস

১৭৭৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাড়ীর ভিতরে কি কাজে থাকিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি গৃহ কর্মও করিয়া থাকিতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলেই নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

১৭৭৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯০০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পূর্ণ মুখে এইভাবে হাসিতে দেখি নাই যে, তাহার আল্‌জিভ নজরে পড়ে। তাঁহার হাসি একমাত্র মুচকি হাসিই ছিল।

হযরতের অনাড়ম্বর জিন্দেগী

১৭৭৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮০৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ পান নাই, তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিয়াছে।

১৭৭৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৩৭) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন তখন আমার ঘরে অল্প (মাত্র দুই সের পরিমাণ) যব ব্যতীত খাওয়ার উপযোগী কোন বস্তুই ছিল না (ঐ অল্প পরিমাণ যবের মধ্যে অনেক বরকত পাইতেছিলাম) তাহা আমি মাচাঙ্গের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম; তথা হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমাণ বাহির করিয়া খাইয়া থাকিতাম- এইরূপে দীর্ঘ দিন কাটিল। একদা আমি তাহার সমষ্টি মাপিয়া রাখিলাম, অতপর তাহা সাধারণভাবে নিঃশেষ হইয়া গেল।

১৭৮০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৪) আবু হয্‌ম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ময়দা (ময়দার রুটি) খাইয়া থাকিতেন কি? তিনি বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবনে (নিজের ঘরে) ময়দা চোখেও দেখেন নাই।

আবু হয্‌ম (রঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের যমানায় আপনারা (আটার

উৎকর্ষ সাধনে) চালনী ব্যবহার করিতেন কি? তিনি বলিলেন, রসূল (সঃ)ও সারা জীবন (নিজের ঘরে) চালনী চোখে দেখন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, চালনী ব্যতিরেকে যবের আটা কিরূপে খাইতেন? তিনি বলিলেন, যব পিষিবার পর ফুৎকারে যতদূর সম্ভব ভূষি উড়াইয়া অবশিষ্টের দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতাম।

১৭৮১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) একদা ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ লোকগণ আস্ত বকরী ভুনা করিয়া খাইতেছিল। তাহারা আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে খাওয়ায় শরীক হওয়ার জন্য বলিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ সৌখিন খাদ্যে শরীক হইতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ সব সময় পাইতেন না।

১৭৮২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চেয়ার-টেবিলে খানা খাইতেন না এবং পিরিচ তশ্‌তরী (ইত্যাদি বিলাসিতার পাত্র) ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার জন্য রুটিও পাত্‌লা তৈয়ার করা হইত না (সাধারণ মোটা রুটিই খাইতেন)।

হাদীছ বর্ণনাকরীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হযরত (সঃ) টেবিলে খাইতেন না– কিসের উপর খাইতেন? তিনি বলিলেন, হযরত (সঃ) দস্তরখানের উপর খাইতেন।

১৭৮৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আসার পর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন গমের রুটি খাইবার সুযোগ পান নাই। (অর্থাৎ এক-দুই দিন গমের রুটি খাওয়ার সুযোগ পাইলেও আবার দুই-চারি দিন যবের রুটি বা খুরমা-খেজুরের উপর অতিবাহিত করিতে হইত। একাধারে গমের রুটি খাইয়া যাইবেন এইরূপ সচ্ছলতা হযরত (সঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারর্গ সাধারণত প্রতিদিনের দুই ওয়াক্তের খানার মধ্যে এক ওয়াক্ত খুরমা-খেজুর খাইয়া থাকিতেন। (অর্থাৎ প্রতিদিন দুই ওয়াক্ত রুটি খাওয়ার মত সচ্ছলতা হযরত (সঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬ পৃঃ) কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার বাবুর্চি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, (সে তাঁহার জন্য খাদ্য পরিবেশন করিতেছিল; সে উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিল। তাহা দৃষ্টে) আনাছ (রাঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, এই খাদ্য তোমরা গ্রহণ কর। আমার অবগতি অনুসারে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা জীবন পতলা চাপাতি রুটি (খাইবার জন্য) চোখে দেখারও সুযোগ গ্রহণ করেন নাই এবং ভুনা করা আস্ত বকরী কাবাব (ইত্যাদির ন্যায় সৌখিন খাদ্য) চোখেও দেখেন নাই।

১৭৮৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারবর্গ) পূর্ণ দুই দুই মাস অতিবাহিত করিতাম এমন অবস্থায় যে, একদিনও আমাদের চুলায় আগুন জ্বলে নাই।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাগিনা ওরওয়া (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের জীবিকানির্বাহ হইত কিরূপে? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, পানি এবং খেজুর। অবশ্য কতিপয় পড়শী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য দুগ্ধ দিয়া থাকিত, তাহা হইতে তিনি আমাদিগকেও পান করাইয়া থাকিতেন।

১৭৮৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৭) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ ارزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবারবর্গকে খোর-পোষ শুধু আবশ্যক পরিমাণ দান কর।

অর্থাৎ, সাধারণভাবে জীবনধারণে যেন পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় এবং আবশ্যক পরিমাণ হইতে অধিকও যেন না হয়।

১৭৮৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিছানা ছিল চামড়ার, যাহার ভিতরে খেজুর গাছের (মাথার লাল রংয়ের ছাল (কুটিয়া নরম করা) ভরা ছিল।

মোজাদ্দেদে যমান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরাত সঙ্কলন 'নশরুত তীব' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থাবলী হইতে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর বিভিন্ন গুণাবলীর একটি প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ

নবীজী (সঃ) সৃষ্টিগতভাবেই অতি মহীয়ান গরীয়ান এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দেহ তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সুন্দর ছিল, চেহারা মোবারক পূর্ণ চন্দ্ররূপ গোলাকার, দীপ্ত ও কমনীয় ছিল; পূর্ণ গোল ছিল না। তাঁহার শির অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, কেশরাশি স্বভাবতই বিন্যস্ত আঁচড়ানোরূপী ছিল; অধিক লম্বা শুধু এতটুকু করিতেন যে, কানের নিম্নভাগ সামান্য অতিক্রম করিত। ললাট তাঁহার প্রশস্ত ছিল। তাঁহার ভ্রূ সরু, মিহি এবং ঘন ছিল, উভয়টি পৃথক ছিল, মধ্যভাগে একটি ধমনী বা শিরা ছিল, যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত। নাসিকা তাঁহার একটু উঁচু ছিল, যাহার উপর দীপ্ত আভা পরিদৃষ্ট হইত, যদ্দরুন নাসিকা অধিক উঁচু মনে হইত– বস্তুতঃ তত উঁচু ছিল না, মানানসই ছিল। দাড়ি তাঁহার মুখ ভরা এবং খুব ঘন ছিল। চোখের পুতুলী মিশমিশে কাল ছিল, চোখের পাতার লোম দীর্ঘ এবং কাল ছিল, সুরমা ব্যবহার ছাড়াই সুরমা দেওয়া দেখাইত। চোখের সাদা অংশে লাল বর্ণের সরু সরু রেখা চিল, চোখ ছিল দীর্ঘাকারে বড়। মুখ মানানসই বড় ছিল। গণ্ডদ্বয় সুসমতল ছিল; ফুলা-ফাঁপা ছিল না। দাঁতসমূহ অতিশয় সাদা সুবিন্যস্ত ছিল; কথা বলার সময় মনে হইত যেন দাঁতের ফাঁক হইতে নূর বা আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। হাসির সময় দাঁতসমূহ সাদা-শুভ্র শিলার ন্যায় দেখাইত। গ্রীবা তাঁহার এত সুন্দর ছিল যেন হাতে গড়ানো এবং উহার বর্ণ ছিল ঝকঝকে উজ্জ্বল। কাঁধ ও বক্ষ ছিল চৌড়া– প্রশস্ত। কাঁধে, বাহুতে ও বক্ষের ঊর্ধ্ব অংশে লোম ছিল এবং বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত লোমের সরু ধারা ছিল; ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট দেহ লোমহীন ছিল। পেট এবং বক্ষ সমতল ছিল, অবশ্য বক্ষ কিঞ্চিত স্ফীত ছিল। হাত লম্বা সাইজের ছিল, পাঞ্জা প্রশস্ত এবং পুরু ছিল। আঙ্গুলসমূহ দীর্ঘ ছিল। ধমনী বা শিরাসমূহ স্ফীতিহীন দেহের মিলে ছিল। বাহু এবং হস্তদ্বয় মোটা– গোশ্তপূর্ণ ছিল। পায়ের গোছাও ঐরূপ ছিল। পায়ের পাতা পুরু সমতল ও মসৃণ ছিল। তাহা হইতে পানি গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। পায়ের তলার মধ্যস্থ খোঁচ অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। পায়ের গোড়ালি শীর্ণ ও চাপা ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি মজবুত শক্তিশালী ছিল– জোড়ার হাড়ের অগ্রভাগ মোটা মোটা ছিল। সম্পূর্ণ দেহই পরিপূর্ণ জমাট বাঁধারূপ ছিল। সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অত্যন্ত মানানসই ছিল।

নবীজী (সঃ)-এর চালচলন

নবী (সঃ) হাঁটিবার সময় পা হেঁচড়াইয়া চলিতেন না– পা উঠাইয়া উঠাইয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অবনত দৃষ্টিতে চলিতেন; যেন উঁচু হইতে নীচুর দিকে চলিতেছেন। তিনি নম্র ও বিনয়ীর ন্যায় চলিতেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। তাঁহার পথ এত দ্রুত অতিক্রান্ত হইত যেন তাঁহার জন্য পথ ছোট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গতির চলাচলেও তাঁহার সঙ্গে চলিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার উঠা বসা

আল্লাহর যিক্‌রের উপর হইত। নবীজী (সঃ) কাহারও প্রতি তাকাইলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেন। অবনত দৃষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাব- তাঁহার দৃষ্টির গতি উর্ধ্বপানে অপেক্ষা নিম্নপানেই বেশী ছিল। তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিপাত বিনত চোখে হইত। সাধারণতঃ নবীজী (সঃ) পথ চলিতে ছাহাবীগণকে আগে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। যাহারই সঙ্গে দেখা হইত নবীজী প্রথমে সালাম করায় সচেষ্ট হইতেন।

নবীজী (সঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

নবী (সঃ) সদা ভাবগম্ভীর ও চিন্তামগ্ন থাকায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি আনন্দ-উল্লাস করিতেন না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না। যেই কথায় সওয়াব হওয়ার আশা ঐরূপ কথাই বলিতেন। দীর্ঘ সময় নীরব থকিতেন। কথা বলিলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতেন এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। অল্প কথায় অনেক উদ্দেশ্যবোধক উক্তি করিয়া থাকিতেন। তাঁহার কথা ধীরে ধীরে হইত। প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত কথা বলিতেন না, অম্পূর্ণ এবং কমও বলিতেন না। তাঁহার বচন মুক্তার মালার ন্যায় হইত। কোমলভাষী ছিলেন; কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না, কাহারও প্রতি ঘৃণা করিতেন না। আল্লাহর নেয়ামত অতি ছোট হইলেও সম্মান করিতেন; আল্লাহর কোন নেয়ামতের কুৎসা করিতেন না। কোন খাদ্যবস্তুর (লালসা বোধক) অতি প্রশংসাও করিতেন না, আবার কুৎসাও করিতেন না। সত্যের বিরোধিতা দেখিলে সত্যকে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তাহার অপ্রতিহত ক্রোধ প্রশমিত হইত না। নিজস্ব ব্যাপারে তাঁহার ক্রোধ আসিত না এবং প্রতিশোধও লইতেন না। কাহারও প্রতি রাগান্বিত হইলে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতেন; সন্তুষ্টির দৃষ্টি অবনত করিতেন। তাঁহার হাসি মুচকি হাসি হইত এবং দাঁতসমূহ শিলার ন্যায় ঝকঝকে দেখাইত।

নবী (সঃ) গৃহে অবস্থানকালীন সময়কে তিন ভাগ করিতেন- একভাগ আল্লাহ তাআলার (এবাদত-বন্দেগীর) জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের (অভাব-অভিযোগ কথাবার্তা ও প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য; আর একভাগ নিজের (ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য। নিজের জন্য সময়ের বেশী অংশ জনগণের (শিক্ষা ইত্যাদি) কাজে ব্যয় করিতেন; কিছু শিক্ষিতদের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করার ব্যবস্থা করিতেন, জনগণ হইতে কোন কিছু লুকাইয়া রাখিতেন না। জন সাধারণের জন্য নিজের সময় ব্যয় করিতেন, ধর্মীয় জ্ঞানে যোগ্য ব্যক্তিগণকে অগ্রগণ্য করিতেন এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময় দিতেন। কাহারও একটি প্রয়োজন, কাহারও দুইটি, কাহারও আরও অধিক; সেই অনুপাতেই তাহাদের সহিত ব্যাপৃত হইতেন। তাহাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী জ্ঞাত করিতেন, শিক্ষা দিতেন। আর লোকদিগকে অতিশয় তাকিদের সহিত বলিয়া দিতেন- উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে। আরও বলিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইতে সক্ষম না হইলে তোমরা তাহা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। যেব্যক্তি শাসনকর্তার নিকট অক্ষম লোকের প্রয়োজনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে পদস্থিতি দান করিবেন কেয়ামত দিবসে পুল-সেরাত চলার সময়। নবী (সঃ)-এর দরবারে একজনের মুখে অপর জনের ঐ শ্রেণীর বিষয়ই আলোচনা করা যাইত; কাহারও মুখে অপরের অন্য কোন আলোচনা হইত না।

লোকজন নবীজী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইত দ্বীনের অভাবী ও অন্বেষকরূপে, নবীজীর দরবারে তাহারা তৃপ্ত হইয়া বাহির হইত দ্বীনের অভিজ্ঞ ও দিশারীরূপে। মানুষের উপকারী কথা ছাড়া নবীজী স্বীয় জবান বন্ধ রাখিতেন। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেন, অনৈক্যের প্রতিরোধ করিতেন। গোত্রী প্রধানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিতেন। লোকদেরকে সদা সতর্ক রাখিতেন, নিজেও লোকদের হইতে সতর্ক থাকিতেন, অবশ্য সকলের সঙ্গে হাসি-মুখ ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখিতেন। সহচরগণের খোঁজ-খবর লওয়ায় তৎপর থাকিতেন। লোকদের হাল- অবস্থা অবগতির জন্য

সচেতন থাকিতেন। ভালকে ভাল বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতেন। মন্দকে মন্দ বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন। সর্ববিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন; তাঁহার কার্যে বা কথায় অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত না। ভাল লোক তাঁহার অধিক নৈকট্য লাভ করিত; যে বেশী পরোপকারী হইত সেই তাঁহার নিকট বেশী ভাল গণ্য হইত। অন্যের সাহায্য ও বিপদ উদ্ধারে যে যত উত্তম হইত সে নবীজী (সঃ)-এর নিকট তত মর্যাদাবান পরিগণিত হইত।

মজলিসের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; এমনকি মজলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবিত যে, তাহার অপেক্ষা অধিক আদরণীয় নবীজীর (সঃ) নিকট অন্য কেহ নহে। কেহ নবীজী (সঃ)-কে কোন কাজের জন্য বসাইলে বা দাঁড় করাইলে তিনি কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহার সাথে অপেক্ষা করিতেন, এমনকি ঐ ব্যক্তিকেই তাঁহার হইতে বিদায় নিতে হইত। কেহ তাঁহার নিকট কোন সাহায্য চাহিলে হয় তাহার আশা পূর্ণ করিতেন, না হয় অতি মোলায়েম কথায় বিদায় দিতেন। নবীজী (সঃ)-এর উদারতা ও সদ্ব্যবহার সকলের জন্য প্রসারিত ছিল। এমনকি সকলে তাঁহাকে স্নেহশীল পিতা গণ্য করিত। সকলেই সমানভাবে তাঁহার হইতে উপকৃত হইত, তাক্ওয়া-পরহেজগারী অনুপাতে তাহাদের তারতম্য হইত।

তাঁহার মজলিসে জ্ঞান, বিদ্যা, সংযমশীলতা, ধৈর্য ও আমানতদারীর অনুশীলন হইত। সেই মজলিসে কথাবার্তা উচ্চৈঃস্বরে হইত না, কাহারও মান-সম্মানে আঘাত করা হইত না। তাকওয়া-পরহেজগারীর দরুন পরস্পর নম্র বিনয়ী হইত; বড়কে সম্মান করা হইত, ছোটকে স্নেহ করা হইত, অভাবীকে সাহায্য করা হইত, বিদেশীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইত।

নবীজী (সঃ) তিনটি স্বভাব হইতে মুক্ত ছিলেন– লোক দেখান স্বভাব, অপব্যয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ততা। আর তিনটি বস্তু হইতে মানুষকে রেহাই দিয়া রাখিয়াছিলেন– কাহারও গ্লানি করিতেন না, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিতেন না এবং কাহারও দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেন না।

নবীজী (সঃ) স্বল্প খাওয়ায় ও শোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। নবীজী (সঃ) নিদ্রাকালে শয্যায় ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) প্রভাবময় মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। ওকবা ইবনে আম্র (রাঃ) নবীজীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কাঁপিতে লাগিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, শান্ত থাক, আমি কোন পরাক্রমশালী বাদশা নহি। মদীনার দশ বৎসরের জীবনে নবীজী (সঃ) কত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, কত এলাকা জয় করিয়াছিলেন, রাজা-বাদশাহদের পর্যন্ত কত কত উপহার-উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সবই জনসাধারণের জন্য ব্যয় করিয়া দিয়াছিলেন, এমনকি ইহজীবন ত্যাগকালে পরিবারের আহার জোটাইতে তাঁহার লৌহবর্ম বন্ধক রাখা ছিল। খাওয়ায়, পরায় ও বাসস্থানে নবীজী (সঃ) অত্যধিক সরল ও আড়ম্বরবিহীন ছিলেন।

তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইলে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিতেন, অন্তরের প্রশস্ততায় অপরিসীম ছিলেন। সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন। শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সঙ্গে একমাত্র বীরপুরুষ থাকিতে সক্ষম হইত। সীমাহীন দাতা ছিলেন। স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল। অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন; সময়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজের এবং গৃহের কাজ নিজেই করিতেন, অতি গরীব রোগীকেও দেখিতে যাইতেন, গরীবদের সহিতও উঠা বসা করিতেন, নিজ খাদেম পরিচারকের সহিতও একত্রে বসিয়া খাইতেন। নিজ হাতে কাপড় তালি লাগাইতেন, বাজার হইতে নিজের বোঝা নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। তিনি মানবকুলের জন্য সর্বাধিক উপকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক ছিলেন। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম"

নবুয়তের প্রমাণ তথা হযরতের মোজেযার বয়ান (পৃঃ ৫০৪)

নবী এবং রসূলগণ হইতেন আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা বান্দাগণকে তাঁহার পছন্দনীয়

পথে পরিচালিত করার জন্য বন্দাগণের নিকট স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করিতেন। সুতরাং নবী রসূলগণের নিকট তাঁহাদের মনোনয়ন ও পদাধিকারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক, যাহা তাঁহারা আল্লাহর বান্দাদের নিকট পরিচয়পত্ররূপে পেশ করিবেন এবং কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে উক্ত প্রমাণ দ্বারাই সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিবেন। এই জন্যই ইমাম বোখারী (রঃ) মো'জেযাসমূহের বর্ণনার পরিচ্ছেদটিকে "নবুয়তের প্রমাণসমূহের পরিচ্ছেদ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন- মো'জেযাকে নবুয়তের প্রমাণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, এই আখ্যা বড়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবীগণের সেই প্রমাণ বা পরিচয়পত্রই হইল তাঁহাদের মো'জেযা। মো'জেযার অর্থ অসম্ভব কার্য নহে, বরং তাহার অর্থ মানুষের অসাধ্য কার্য। নবীগণের মো'জেযা মানুষের শক্তিসাধ্য বহির্ভূত হয় বটে এবং সেই সূত্রেই তাহা নবীর নবুয়তের প্রমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনও আল্লাহ তাআলার শক্তি-ক্ষমতা বহির্ভূত হয় না; আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান, অতএব তাহা কোন মতেই অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতিনিধির পক্ষে স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন স্বরূপই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকিতেন। সুতরাং নবীদের মো'জেযাকে অসম্ভব সাব্যস্ত করতঃ তাহাকে অস্বীকার করা বস্তুত আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা। এতদ্ভিন্ন যেকোন দাবীর প্রমাণকে অস্বীকার করা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দাবীর সমর্থনে শিথিলতা প্রকাশেরই নামান্তর। অতএব মো'জেযা অস্বীকার করার অর্থ নবীর নবুয়তের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করা।

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ মো'জেযা প্রদান করিয়াছিলেন যাহা মানব জগতে তাঁহার নবুয়ত ও প্রতিনিধিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৮৯। হাদীছ ঃ عَن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيِّ الاَّ قَدْ أُعْطِى مِنَ الْاٰيَات مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ أُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحٰى اِلَىَّ فَارْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণের প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ মো'জেযা দিয়াছিলেন, যাহা মানব সমাজের জন্য সেই নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমাকে (সর্বপ্রধান মো'জেযারূপে) যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা ওহী পর্যায়ের; (কোরআন পাক- যাহা) আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন (এবং তাহা আমার দ্বীনের শাসনতন্ত্র বা আসমানী কিতাবরূপে এবং আমার মো'জেযারূপে আমার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হইবে) ফলে কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে যে, আমার অনুসারীদের জামাতই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে স্বভাবতঃ বা কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বা কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বহু মো'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাঁহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও তাঁহার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল। এইসব ঘটনার সমষ্টি প্রায় তিন হাজার।

কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া যেসব মো'জেযা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মো'জেযা পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ শুধু হযরতের যমানার কাফেরদের প্রতিই ছিল না, বরং কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত অমুসলিমদের প্রতিই এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন একাধিক জায়গায় স্বয়ং সেই চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করিয়াছে যে, এই কোরআন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মুহাম্মদের (সঃ) উপর অবতারিত হওয়া সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা দল সন্দেহ পোষণ করে এবং তাহারা মনে করে যে, ইহা মুহাম্মদের (সঃ) বা অন্য কোন মানুষের রচিত, তবে তাহারা এই কোরআনের বাক্যবিন্যাসের সমতুল্য তাহার

সর্বকনিষ্ঠ একটি সূরা পরিমাণ বাক্য তৈয়ার করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করুক; তবেই তাহাদের সন্দেহ বাস্তব বলা যাইতে পারিবে; অন্যথায় ঐরূপ সন্দেহ অসার সাব্যস্ত হইবে। কারণ, কোন মানুষ কর্তৃক রচিত এত বড় কলেবরের পুস্তকের শুধুমাত্র একটি লাইন পরিমাণ বাক্য তাহার সমতুল্য রচনা করা অন্য মানুষের সাধ্যে না হওয়া অস্বাভাবিক।

এই বিজ্ঞানের যুগের যেকোন আবিষ্কার সম্পর্কে কোন মানুষ এইরূপ দাবী টিকাইয়া রাখিতে পারে না যে, চিরকাল অন্য কোন মানুষ ইহার সমতুল্য আবিষ্কার করিতে পারিবে না। আজ পর্যন্ত বিশ্বে মানুয়ের আয়ত্তাধীন এমন কোন আবিষ্কৃত বস্তু দেখা যায় নাই, যাহা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পরও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কারে সারা বিশ্ব অপারগ রহিয়াছে এবং দীর্ঘকাল অপারগ থাকিবে। অথচ এই কোরআন প্রথমতঃ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে–

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ

অর্থ ঃ "আমি আমার বিশেষ বান্দা (মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর) উপর যে কিতাব নাযিল করিয়াছি (যাহা দ্বারা তিনি আমার রসূল ও প্রতিনিধি বলিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছেন)। তাহা (আমার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়া) সম্পর্কে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর তবে তোমরা তাহার সমতুল্য একটি ছোট সূরা পরিমাণ বাক্য রচনা করিয়া আন।" অতপর আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

অর্থ ঃ "যদি তোমরা তাহা করিতে না পার এবং কস্মিনকালেও পারিবে না, তবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হইবে (ঐ সত্য প্রমাণিত রসূলকে স্বীকার করিয়া) দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা। যাহার অগ্নি মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্বলিত হইবে।"

একাধিকবার এইরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদানের পর কোরআন ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছে–

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ ঃ "বিশ্বের সমস্ত মানব-দানব একত্রে পরস্পর সহায়ক হইয়াও যদি এই প্রচেষ্টা চালায় যে, কোরআনের সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া আনিবে, তবুও তাহারা কস্মিনকালেও সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে না।" (পারা–১৫, রুকু–১০)

পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে কোরআনের ঘোর শত্রু আরবের পৌত্তলিকগণ, ইহুদী এবং নাসারাগণ আরবি ভাষায় আরবি কাব্যে যে অতিশয় দক্ষ ও পারদর্শী ছিল তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও সেই শত্রুগণ রসূলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, কোরআনকে বানচাল করার জন্য শত শত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এই সহজ পন্থায় তাহারা আসে নাই যে, মাত্র এক লাইন পরিমাণ একটি ছোট সূরার সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া নিয়া আসে। বস্তুতঃ ইহা যে তাহাদের জন্য মোটেই সম্ভব নহে তাহা তাহারা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেছিল।

আজও মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষাভাষী খৃস্টান ইহুদী অমুসলিম কোরআনের শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ইউরোপ আমেরিকায় আরবী ভাষায় অনেক অনেক সুপণ্ডিত হইয়াছে এবং আছে, না থাকিলে হওয়ার জন্য আরবি ভাষার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া মুসলমানদের কোরআনকে বানচাল করতঃ তাহাদের জাতীয় বুনিয়াদ ধ্বংস করিতে এই পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু মহান কোরআনের এত বড় প্রভাব যে, তাহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দাঁড়াইবার সাহস কাহারও

নাই, কেয়ামত পর্যন্ত হইবেও না।

আজও আরবের অমুসলিম সাহিত্যিকগণ স্বীকার করিয়া থাকে– "কোরআনকে মানব রচিত গ্রন্থ বলা স্বীয় সাহিত্যিকতা ও পাণ্ডিত্যের উপর কালিমা লেপন স্বরূপ।"*

পূর্ববর্তী নবীগণকে যত মো'জেযাই প্রদান করা হইয়াছিল, প্রত্যেক নবীর দুনিয়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মো'জেযাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন নবীর মো'জেযা বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিবে না। একমাত্র মুসলমানদের কোরআন এবং তাঁহাদের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনা ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বর্তমান বিশ্বে মোটেই নাই।

কিন্তু মুসলিম জাতির পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়ত তদ্রূপ নহে। তাঁহার প্রধানতম মো'জেযা পবিত্র কোরআন অবিকলরূপে তাহার বিঘোষিত চ্যালেঞ্জ সহ আজও বিশ্ব বুকে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দুনিয়ার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত থাকিবে। যখন যাহার ইচ্ছা তাহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়া দেখিতে পারে যে, বাস্তবিকই ইহা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তের সঠিক প্রমাণই বটে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যেহেতু সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার দ্বীনই সর্বশেষ দ্বীন, তাই তাঁহার জন্য এইরূপ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট মো'জেযার আবশ্যকও ছিল। তাঁহার এই মো'জেযার প্রভাবে যুগে যুগে বহু লোক তাঁহার দ্বীনে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়টির প্রতিই উল্লিখিত হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মো'জেযা ছিল বিরুদ্ধবাদীগণকে চ্যালেঞ্জ

---

* পবিত্র কোরআন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার মো'জেযা বা প্রমাণ। কারণ এই কোরআন কোন মানুষের রচনা হওয়া অসম্ভব, ইহা নিশ্চয় আল্লাহর বাণী! আল্লাহর অকাট্য বাণীর বাহক যিনি তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী বা রসূল।

পবিত্র কোরআন যে মানুষের রচনা হইতে পারে না তাহার প্রমাণ পবিত্র কোরআনের নিজস্ব রূপ ও আকার-আকৃতি। এই সত্যকেই কোরআন তাহার চ্যালেঞ্জ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছে। এবং কোরআনের রূপে ও আকৃতিতে ঐ সত্য সদা স্বতঃ উদ্ভাসিত। যেমন, তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন একজন ফরাসী খৃস্টান বৈজ্ঞানিক মরিস বুকাইলী তাঁহার "দি বাইবেল, দি কোরআন এণ্ড সায়েন্স" পুস্তকে। উক্ত আলোচনার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর ২৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয়তে। নিম্নে তাঁহার ভাষায় উদ্ধৃতি দেওয়া হইল–

বিজ্ঞানী বুকাইলী বলেছেন– কোরআনকে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার করেছি। প্রথমে অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি, তারপর আমি আরবি শিখেছি এবং বিজ্ঞানের সত্য আর কোরআনে বর্ণিত বক্তব্য পাশাপাশি রেখে একটা তালিকা প্রস্তুত করেছি এবং সংগৃহীত যাবতীয় প্রমাণ-দলীলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই, যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসত্য বা ভ্রান্তিপূর্ণ।

মরিস বুকাইলী বলেছেন– আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, কোরআনের প্রতিটি বাক্য বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু যখনই কোরআন পড়া শুরু করলাম, দেখতে পেলাম– বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয় কী সঠিকভাবেই না কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে। একটা বিষয় আমার কাছে সবচাইতে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল ঃ আজকের যুগে যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা এত চিন্তা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে পাচ্ছি, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) যুগে বসে কি করে সেসব বিষয় একজন মানুষ জানতে পারল? সে যুগে এ বিষয়ে মানুষের তো কোন ধারণাই থাকার কথা নয়।

বিজ্ঞানী বুকাইলী তাঁর ঐ পুস্তকে আরও বলেছেন–

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য, পৃথিবী জীব-জন্তু, গাছ-পালা সৃষ্টির এবং মানুষের জন্মের নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোরআনে এত প্রচুর বক্তব্য রয়েছে যে, সন্ধানী পাঠক মাত্রই বিস্মিত না হয়ে পরে না। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এইসব বিষয় সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রায় সবগুলিই যেখানে মিথ্যা কিম্বা ভ্রান্তিপূর্ণ, সেখানে ১৪ শত বছর আগেকার কোরআনের এতদসংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য এতটা সঠিক হয় কিভাবে?

ফরাসী বিজ্ঞানী বুকাইলী সত্য প্রকাশে বাধ্য হয়ে বলেছেন–***I had to stop and ask myself :*** *If a man was the author of the Quran, how could he have written faets in the Seventh Century A.D. that today are shown to the in keeping with modern Scientific Knowledge?*

এই গ্রন্থ পাঠ করতে করতে আমি থমকে যাই এবং আমার নিজেকে প্রশ্ন করি, কোরআনের গ্রন্থকার যদি একজন মানুষই হতেন তবে তাঁর পক্ষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এমন বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের উপর আলোকপাত করা কিভাবে সম্ভব হল– যা

করিয়া। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মো'জেযা বিরুদ্ধবাদীগণের চ্যালেঞ্জের উত্তরেও প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন "শাক্কুল কামার"– চাঁদ দিখণ্ডিত করার মো'জেযা।

হযরত (সঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা (পৃঃ ৫১৩–৫৪৬)

অন্ধকার যুগেও কাফেরগণ মনগড়ারূপে হজ্জ পালন করিয়া থাকিত। হজ্জের কার্যাবলী পালনান্তে যিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকার নিয়ম রহিয়াছে। সেকালেও এই দিনগুলি মিনায় কাটাইবার নিয়ম ছিল। অবশ্য কাফেরগণ তথায় নিজেদের বাহাদুরী এবং নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের প্রাধান্যের আলোচনা সম্বলিত কবিতার ছড়াছড়ি করিয়া কাটাইত; এই সূত্রে উক্ত তারিখে মিনার মধ্যে একত্রে অনেক লোক পাইয়া যাওয়ার এক সুযোগ লাভ হইত।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশে হয়ত তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। আবু জাহলসহ কতিপয় কাফের সর্দার তখন হযরত (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবীর প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা কিম্বা নির্দিষ্টরূপে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইবার চ্যালেঞ্জ করিল।

হযরত (সঃ) সর্বদা মক্কার সর্দারগণকে কোন উপায়ে ইসলামের ছায়াতলে টানিয়া আনার সুযোগের সন্ধানে থাকিতেন। সুতরাং তিনি তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে বর্তমান যুগে দাবী করা হয়?

এই আলোচনাকে আরও সুস্পষ্ট করতে বুকাইলী বলেছেনঃ মুহাম্মদের (সঃ) উপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়র সময়টিতে ফ্রান্সে রাজত্ব করতেন রাজা জাগোবার্ড (৬২৯–৬৩৯)। কোন মানুষই যদি এই কোরআনের রচয়িতা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পক্ষে কিভাবে এত সব বিষয়ের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য তুলে ধরা সম্ভব হল যা আমরা আজ এত শত বছর পর জানতে পেরেছি?

অমুসলিম বিশ্বের এই ধারণা যে, কোরআনে এই সব বিস্ময়কর বিষয় পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে– খৃষ্টান মরিস বুকাইলী এই ধারণার খণ্ডনে বলেছেনঃ তিনি এর সত্যতা খুঁজতে গিয়ে নিজে (রাশিয়ার অন্তর্গত) তাশকন্দ সফর করেছেন এবং সেখানকার জাদুঘরে সংরক্ষিত হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলের কোরআনের সাথে বর্তমান আমলের কোরআনের প্রতিটি আয়াত ধরে ধরে মিলিয়ে নিয়েছেন। দেখেছেন, এই তের শত বছর পরেও কোরআনে কোন একটি শব্দও অনুপ্রবেশ করে নাই।

বিজ্ঞানী বুকাইলী ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জী তুলে ধরে বলেছেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) যিনি ছিলেন নিরক্ষর, সেই নিরক্ষর লোকটির দ্বারা এই সময়কার আরবে কোন একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম কিভাবে রচিত হতে পারে? শুধু কি তাই? সেই নিরক্ষর লোকটির পক্ষে কিভাবেই বা সম্ভব বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর এমন সব সত্য নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা, যা সে সময়ের যেকোন লোকের চিন্তারও অগোচরে থাকার কথা এবং সেই দুরূহ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য ও সত্যের বর্ণনায় কোথাও একবিন্দু ত্রুটি কিম্বা বিচ্যুতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

মরিস বুকাইলী তাঁর পুস্তকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটাই। আর তা হলো, সপ্তম শতাব্দীর কোন মানুষের পক্ষেই শত শত বৎসর পরে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের এত সব প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও সত্য এবং বিচিত্র জ্ঞান ও তথ্য বুঝতে পারা ও প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। কোরআন যে কোন মানুষের রচনা নয়, আমার কাছে এটাই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। (সমাপ্ত)

পাঠকবৃন্দ! ফরাসী খৃষ্টান বিজ্ঞানী বুকাইলী তাঁহার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে আসিয়াছিলেন কি-না তাহা জানা নাই। কিন্তু তিনি বর্তমান উন্নত দেশের একজন বিজ্ঞানী, পবিত্র কোরআনকে যাচাই-বাছাই করার জন্য তিনি নজিরবিহীন সুদীর্ঘ ও কঠিন সাধনা করিয়াছেন। তারপর সমালোচনার উদ্দেশ্যে তাহার চুল-চেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এমনকি তিনি তাঁহার ঐসবসাধনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তখনও তিনি অমুসলম। তিনি তাঁহার সেই গ্রন্থে সুচিন্তিত অভিমত ও স্থির সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "কোরআন মানুষের রচনা নহে।" কোন মুসলমানের এইরূপ উক্তি অপেক্ষা বিজ্ঞানী খৃষ্টান বুকাইলীর উক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জর্জ "বার্নার্ডশ"-এর একটি মূল্যবান দর্শন স্মরণ করাইয়া দেয়– "সত্য স্বতই প্রকাশমান। যিনি চক্ষুষ্মান তিনি সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সন্দেহে ভোগেন না। যে অন্ধ সে সত্য দেখার জন্য জেদ ধরে বটে, কিন্তু চোখ না থাকার কারণে দেদীপ্যমান সত্য দেখা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না।"

করিলেন। অতপর স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা * চাঁদের প্রতি ইশারা করিলেন, ফলে তৎক্ষণাত পূর্ণ চাঁদ দুই খণ্ড হইয়া গেল। এমনকি এক খণ্ড হইতে অপর খণ্ড অনেক দূর ব্যবধানে চলিয়া গেল। হযরত (সঃ) কাফেরদিগকে বলিলেন, اشهدوا اشهدوا তোমরা ভালরূপে প্রত্যক্ষ কর, ভালরূপে দেখিয়া নাও।

তালাবদ্ধ অন্তরবিশিষ্ট কাফেরগুষ্ঠি সবকিছু দেখা ও উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তাহাকে জাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিল যে, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের দৃষ্টির উপর জাদু করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকিবে। অতএব, দূর-দেশ হইতে আগন্তুক মুসাফিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হউক যে, তাহারা এস্থান হইতে দূরে থাকাবস্থায় চাঁদ দিখণ্ড হওয়া দেখিয়াছে কি-না? খোঁজ করিয়া তাহারা এইরূপ লোকও পাইল যাহারা দূর-দেশে থাকাবস্থায় এই তারিখে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া * দেখিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাহাকে সর্বগ্রাসী জাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিল এবং ঈমান আনিল না।

সীরাত শাস্ত্র তথা নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনা শাস্ত্রে ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারাও তাহা প্রমাণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা-

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ـ

অর্থ ঃ (বিশ্ববাসী! সতর্ক হও;) কেয়ামত ঘনাইয়া আসিয়াছে; (যাহার সংবাদদাতার সত্যতা প্রমাণে) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে * কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে,

তাহারা (রসূলুল্লাহর সত্যতার) কোন প্রমাণ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করে এবং বলে, ইহা বড় শক্তিশালী জাদু। (সূরা কামার- পারা-২৭)

এই সম্পর্কে হাদীছও অনেক আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) দুই স্থানে এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ৫১৩ পৃষ্ঠায় "মোশরেকগণ (সত্যতার) প্রমাণ দেখিতে চাহিলে নবী (সঃ) তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন।" ৫৪৬ পৃষ্ঠায় "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বয়ান" এই পরিচ্ছেদদ্বয়ে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৯০। হাদীছ ঃ عن انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কাবাসী কাফেররা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ফরামায়েশ করিল, তিনি যেন তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখান। তিনি তাহা দেখাইলেন, এমনকি চাঁদের খণ্ডদ্বয় পরস্পর এ রূপ ব্যবধানে চলিয়া গেল যে, তাহাদের মধ্যস্থলে দর্শকগণ হেরা পর্বত দেখিতে পাইল।

---

*তফসীর রহুল মাআনী- সূরা কমার।

* সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোহাদ্দেস "ইমাম বায়হাকী" তাঁহার "দালায়েলুন নবুয়াহ্- নবীর সত্যতার প্রমাণ" নামক কিতাবে ঘটনা প্রত্যক্ষকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে এই সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি বর্ণনা করিয়াছেন- যাহার উল্লেখ সম্মুখে আসিতেছে।

* انشق শব্দটি মাজি তথা অতীতকাল বোধক ক্রিয়াপদ; যাহার অর্থ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের অর্থ টানিয়া আনা যে, (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়কালে) খণ্ডিত হইবে- ইহা উক্ত শব্দের মূল অর্থের বিপরীত। এইরূপ ব্যবহার রূপক বা উপঅর্থে স্থান বিশেষে অনুমোদিত)।

কিন্তু এস্থলে প্রয়োজন না থাকায় তাহা অশুদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন এস্থলে ভবিষ্যত কালের অর্থ লওয়া হইলে সংলগ্ন পরবর্তী আয়াতের সঙ্গতি বিনষ্ট হইবে। পরবর্তী আয়াতের মর্মে বুঝা যায়, কাফেরগণ হযরতের সত্যতার এই প্রমাণ দেখিয়াছে এবং ইহা শক্তিশালী জাদু বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে। ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও উক্ত আয়াত আলোচ্য মো'জেযা সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। (১৭৯২ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

১৭৯১। হাদীছ ঃ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَقَالَ اشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ -

অর্থ ঃ ইবনে মসউ'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।* (হযরতের আঙ্গুলের ইশারায়) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। হযরত (সঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, (আমার রসূল হওয়ার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ কর। এক খণ্ড অপর খণ্ড হইতে দূরে হেরা পর্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

১৭৯২। হাদীছ ঃ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه اَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় (তাঁহারই সত্যতার প্রমাণস্বরূপ) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ "শাক্কে কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) তিন জন সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আনাছ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, ঐ ঘটনা সেকালের স্থানীয় লোকদের মধ্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের নিকটই তাহা বাস্তবরূপে স্বীকৃত ছিল। আনাছ (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন না, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘটনার সময় পয়দাও হন নাই, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের স্বীকৃতি সূত্রেই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন হোযায়ফা (রাঃ), জোবায়ের ইবনে মোতয়ে'ম (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও এই ঘটনা বর্ণিত হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"শাক্কুল কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার এবং রসূল হওয়ার একটি অতি উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। এই মো'জেযা হযরতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অন্য কোন নবীকে চাঁদের উপর এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাইবার মো'জেযা প্রদান করা হয় নাই।

(যোরকানী, ৫-১০৭)

"চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার" মো'জেযার প্রমাণ

পুরাতন যুগের ঘটনাবলীর সংবাদ সম্পর্কে ইতিহাস শাস্ত্র অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রের মান-মর্যাদা ও

---

* হযরত (সঃ) মিনায় থাকিয়াই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় মক্কার নাম উল্লেখ আছে, তাহা বাস্তবের বিপরীত নহে, কারণ মক্কাই হইল কেন্দ্রীয় নগরী।

মিনা তাহারই সংলগ্ন- শহরতলী স্বরূপ। তদুপরি মক্কার নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত (সঃ) মক্কায় থাকাকালীন এই মো'জেযা সংঘটিত হইয়াছিল।

চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে হেরা পর্বত দেখা যাওয়ার এবং মিনা এলাকায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার উল্লেখ বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ হেরা পর্বত মিনা এলাকায়ই অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনায় চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয়ে "আবু কোবায়েস পাহাড়" "সোআয়দা পাহাড়", "সাফা পাহাড়, "মারওয়া পাহাড়" ইত্যাদি নাম উল্লেখ হইয়াছে; এই পাহাড়সমূহ খাস মক্কা নগরীর মধ্যে অবস্থিত। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার সহিত সঙ্গতিবিহীনও নহে এবং পরস্পর বিরোধীও নহে, কারণ হেরা পর্বত এবং উল্লিখিত অন্যান্য পর্বতগুলি সবই ২/৩ মাইল সীমার মধ্যে অবস্থিত। চাঁদের ন্যায় এত উর্ধ্বের একটি বস্তু তথায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের সম্মুখে উল্লিখিত সবগুলি পাহাড়ের উপর দেখা যাওয়া এবং এক বর্ণনাকারীর এক একটি উল্লেখ করা বা একই বর্ণনাকারীর বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা মোটেই সঙ্গতিবিহীন নহে। অধিকন্তু হেরা পর্বতের নাম উল্লেখের বর্ণনায় পর্বতটি চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হওয়ার বয়ান রহিয়াছে, পক্ষান্তরে অন্যান্য পর্বতের নাম উল্লেখের বর্ণনায় চাঁদের এক-একটি যে যে পাহাড় বরাবর দেখা যাইতেছিল তাহার বয়ান রহিয়াছে।

নির্ভরযোগ্যতা অনেক অনেক বেশী, এমনকি উভয়ের কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাণবস্তু হইতেছে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর জন্য সনদ বা পরম্পরা সাক্ষ্য সূত্র উল্লেখ করা; তাহাও আবার মোহাদ্দেসগণের চুলচেরা বাছনিতে, যেন বিশ্বস্ততার প্রতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া যায়। বিশেষতঃ ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বাছনির মর্যাদা ত অনেক উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে ইতিহাস শাস্ত্রে অতীতের ঘটনাবলীর ছড়াছড়ি ত খুবই আছে, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের ন্যায় সাক্ষী পেশ করার রীতি সেখানে নাই, বাছনি করার কোন বাধ্যবাধকতা বা বিধান ত মোটেই নাই; অথচ হাদীছের সনদ বা সাক্ষীসমূহ তিলে তিলে বাছিয়া নিবার জন্য "উসূলে হাদীছ" নামে বিশেষ শাস্ত্র এবং তাহার ধারাগুলি প্রয়োগের জন্য "আসমাউর রেজাল" নামে আর একটি বিশেষ শাস্ত্র বিরাট বিরাট গ্রন্থাবলী আকারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১ম খণ্ডের দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং কোন সংবাদ হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইলে সেখানে ইহা ইতিহাসে উল্লেখ নাই এইরূপ অজুহাত পেশ করা জঘন্য ধরনের অন্যায় হইবে।

আলোচ্য মো'জেযার ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফসহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ দর্শকের সাক্ষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে। তদুপরি মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলীতে বিশেষতঃ সীরাত তথা নবুয়তের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষীগণ আমাদের নবীর এই মহান মো'জেযা এই বলিয়া উপেক্ষা করিতে চায় যে, ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না– ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা। তাহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে, সেই আমলে আরবের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষাহীন দেশে ইতিহাস সংগ্রহের স্বপ্ন কেহ দেখে নাই এবং সংবাদপত্র বা অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহির্বিশ্বের যোগসূত্র সেখানে মোটেই ছিল না।

তাহারা আরও বলেন, চন্দ্র এমন বস্তু যে তাহা বিশ্বের প্রত্যেক স্থান হইতে দেখা যায়। অতএব চন্দ্রের উপর এরূপ পরিবর্তন আসিয়া থাকিলে বিশ্ববাসী তাহা অবশ্যই বিশেষ কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিত এবং ইতিহাসে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা কোন জ্ঞানশূন্য বোকাকে ধোকা দেওয়া ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখে ইহা মাকড়সার জালস্বরূপ। চিন্তা করুন– (১) চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত বিশ্বের সকল দেশে এক সঙ্গে হয় না। এক দেশে যখন রাত্র, অপর দেশে তখন দিন; সুতরাং যেই সময় মক্কায় চন্দ্র খণ্ডিত হয় তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল; চন্দ্র দৃষ্ট ছিল না। যেরূপ এখনও চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ এক দেশে দৃষ্ট হয়; কিন্তু অনেক অনেক দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না; সংবাদপত্র মারফত এইরূপ শুনা যায়। (২) উদয় অস্তের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে সময়ের বিভিন্নতা অপরিহার্য। সুতরাং মক্কা নগরীতে যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন অনেক দেশে এমন গভীর রাত্র ছিল যে, তখন সেস্থানের লোকগণ নিদ্রামগ্ন ছিল। (৩) স্বাভাবিক আবর্তন বিবর্তনের দরুন উর্ধ্ব জগতে যেসব সাধারণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যেমন চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ যাহা হিসাবের দ্বারা পূর্ব হইতে নির্ধারিত ও প্রচারিত থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার লোকের সংখ্যাও কতই না নগণ্য; আর আলোচ্য মো'জেযাটি ত একটি আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল– যাহার কোনই পূর্বাভাস ছিল না। সুতরাং ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকগণ ত অবশ্যই তাহা অবলোকন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ বিশ্ববাসী বহু সংখ্যায় তাহার প্রতি তাকাইবে এরূপ আশা করা নিতান্তই অবান্তর। (৪) ঘটনাটি রাত্রি বেলার, তাহাও সাময়িক এবং অল্প সময়ের; ঠিক ঐ সময়ে আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর সংখ্যা কত হইতে পারে তাহ বুঝা কঠিন নহে।

এইসব বিষয়ের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্নটি বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যেভাবে ইহাকে বিশ্বজোড়া রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহা শুধু একটা ধোকার জাল মাত্র।

মক্কার পার্শ্ববর্তী দেশ-বিদেশে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নাই তাহাও নহে। মক্কার সর্দারগণ এই সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইয়া ঘটনার বাস্তবতারই সাক্ষ্য প্রমাণ পাইয়াছে। ইমাম বায়হাকী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে মসউ'দ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

انشق القمر بمكة فقالوا سحركم ابن ابى كبشة فاسئلوا السفار فان كانوا راوا ما رايتم فقد صدق فانه لايستطيع ان يسحر الناس كلهم وان لم يكونوا راوا ما رايتم فهو سحر فاسئلوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا رايناه الكفار هذا سحر مستمر -

অর্থাৎ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোযেজা মক্কায় প্রদর্শিত হইল, তখন মক্কাবাসী কাফেররা তাহা জাদু বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং পরস্পর বলিল, বিদেশ ভ্রমণ হইতে আগন্তুকদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যদি তাহারাও এই ঘটনা দেখিয়া থাকে তবে সাব্যস্ত হইবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী; সকলের উপর ত জাদুর তাসির হইতে পারে নাই; আর যদি ভিন্ন দেশের কেহই এই ঘটনা না দেখে তবে মনে করিবে, ইহা যাদু।

অতপর তাহারা বিদেশ ভ্রমণকারী আগন্তুকগণকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বলিল, হাঁ– আমরা ঐরূপ ঘটনা দেখিয়াছি। এই সব প্রমাণ পাইয়া অন্তরান্ধ কাফের সর্দারগণ মন্তব্য করিল, বস্তুতঃ ইহা অতিশয় শক্তিশালী জাদু। (যোরকানী ১–১০৯)

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটনা ভারতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত "আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়া" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الارض ويقال انه ارخ ذلك بعض بلاد الهند -

অর্থাৎ, উক্ত ঘটনা বিশ্বের অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে যে, ভারতেরও কোন কোন শহরে এই ঘটনা দৃষ্ট হওয়ার তারিখ লিখিত হইয়াছে।

পরবর্তী এক ইতিহাস লেখক ভারতস্থ "মালিবার" এলাকায় এই ঘটনা পরিদৃষ্ট হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। মালিবার রাজ্যের শাসকদের রীতি ছিল, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধরূপে রাজপুরীতে সংরক্ষণ করিত। তাহাদের লিপির মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত দেখার ঘটনাও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (তারীখে ফেরেশতা দ্রষ্টব্য)

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার বাস্তবতার প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলাম, মুসলমান ও হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইসলামের মূল উচ্ছেদকারী শত্রু, তৎকালীন আরব ও মক্কাবাসীরা কখনও মুসলমানদের এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলিয়া চ্যালেঞ্জ করে নাই। তাহারা এই ঘটনাকে জাদু বলিয়া এই ঘটনার দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার বিবরণ মিথ্যা তাহার বাস্তবতা অস্বীকার করে নাই। ঘটনার বাস্তবতা এতই উজ্জ্বল অকাট্য ছিল যে, মিথ্যা বলার এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাহাদের সম্মুখে ছিল না।*

---

* বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করিয়াছে। মানব জাতি হইতে ইসলামের বিপক্ষ দলকে বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির সুযোগ দান করিয়া তাহাদের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবের এই বিশেষ মো'জেযা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করাইয়া দিয়াছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রভাবশালী ও বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র "দৈনিক ইত্তেফাক" ১৯৮১ সালের ১৪ ও ১৭ই মার্চ সংখ্যাদ্বয়ের উপসম্পাদকীয় কলাম হইতে একটি আলোচনার মূল বক্তব্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি–

"চাঁদে অবতরণকারী (আমেরিকার) সুপ্রসিদ্ধ মহাশূন্য বিজ্ঞানী নীল আমষ্ট্রংয়ের মুসলমান হওয়ার সংবাদটা লণ্ডনের ইম্প্যাক্ট পত্রিকায় প্রায় এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল আগে স্বীয় ধর্মান্তরের এক আলোচনায় নীল আমস্ট্রংয়ের সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়াছিল, তাতেও বিজ্ঞানী নীল আর্মস্ট্রং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, চাঁদে পদার্পণ করে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চাঁদ পুরাপুরিভাবেই দ্বিখণ্ডিত।"

চন্দ্র বিজয়ী মহাশূন্যচারী নীল আর্মষ্ট্রং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন– তাঁর সেই ইসলাম গ্রহণের পিছনে কাজ করেছিল চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটিই।

প্রকাশ , নীল আর্মস্ট্রংরা চাঁদে পরিভ্রমণকালে দেখতে পেয়েছিলেন যে, চাঁদে একটি ফাটল রয়েছে। এর সম্ভাব্য প্রমাণ ও তথ্যাদি তাঁরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সব তথ্য প্রমাণ (আমেরিকার) মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র "নাসাতে" বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। দেখা গেছে, চাঁদটি একবার সত্য সত্যই দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং সেই দু'খণ্ডকে পুনরায় জোড়া

চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরণ মো'জেযার সময়কাল

এই মো'জেযাটি হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। (যোরকানী ৫-১০৮)

ইহা যিলহজ্জ চাঁদের ১২-১৩ তারিখ অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরের শেষ দিন কয়টির ঘটনা। আর হযরত (সঃ) হিজরত করিয়াছিলেন নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথম ভাগে; সুতরাং উক্ত ঘটনা নবুয়তের সপ্তম বৎসর যিলহজ্জ মাসে গণ্য করা হইলে তাহা হিজরতের পাঁচ বৎসর দুই আড়াই মাস পূর্বে সাব্যস্ত হয়।*

হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিভিন্ন কার্যে মো'জেযা প্রকাশ পাইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর কতিপয় হাদীছও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৯৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন এক সফরে বাহির হইলেন, তাঁহার সঙ্গে কিছু সংখ্যক ছাহাবীও ছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল, তাঁহার সঙ্গে পানির ব্যবস্থা ছিল না। এক ব্যক্তি একটি পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি উপস্থিত করিল। নবী (সঃ) তাহা দ্বারা অযূ করিলেন; অতপর অঙ্গুলিসমূহ ঐ পাত্রে বিছাইয়া দিলেন এবং ঐ পাত্র হইতে অযূ করিবার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন। সকলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অযূ করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় সত্তর জন ছিলেন।

১৭৯৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনাস্থিত "যওরা" নামক স্থানে ছিলেন, (নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, পানির স্বল্পতা ছিল,) হযরত (সঃ) স্বীয় হস্ত একটি পানির পাত্রে রাখিয়া দিলেন, তৎক্ষণাত তাঁহার আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ পানি দ্বারা উপস্থিত সকলে উত্তমরূপে অযূ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত ছিল।

১৭৯৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৫) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু সংখ্যক ছাহাবীর সঙ্গে এক স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অযূ করিবার জন্য নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিলেন যাঁহাদের বাড়ী-ঘর নিকটবর্তী ছিল না।

তখন হযরতের সম্মুখে একটি পাত্র উপস্থিত করা হইল, হযরত (সঃ) তাহার মধ্যে হস্ত মোবারক

দেয়া হয়েছে। "নাসার" বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার এই প্রমাণও উদ্ধার করতে পেরেছেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ১৪০০ বছর আগে। চৌদ্দশ' বছর আগে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে মহানবী (সঃ) যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, সে বিবরণ নীল আর্মস্ট্রং এর আগেই পড়েছিল। "নাসার" বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পরেই তিনি আর দেরী না করে ইসলাম কবুল করেন।

এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁর বিরূপ অভিমত কারো অজানা নয়। কিন্তু তিনিও তাঁর "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে"এ ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা বেরুখান পেরুমল এই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং মহানবীর (সঃ) কাছে গিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

* এই হিসাব মতে দেখা যায় যে, যাঁহাদের মতে হযরতের বিরুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণের বয়কট বা অসহযোগিতা নবুয়তের অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের মতানুসারে উক্ত মো'জেযা বয়কটের পূর্বে সাব্যস্ত হইবে। আর যাঁহাদের মতে বয়কট নবুয়তের সপ্তম বৎসরের প্রথম হইতেই ছিল তাহাদের মতানুসারে উক্ত মো'জেযার ঘটনা বয়কটের সময়ে সাব্যস্ত হইবে। যদিও কাফেররা হযরতের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগিতা করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্যও ইসলামের তবলীগ কার্য ক্ষান্ত করেন নাই। (আসাহুস সিয়ার ৯৪)। এবং তাঁহারা হজ্জের সময় হজ্জের অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন করিয়া থাকিতেন। (যোরকানী ১-২৭৯)

ছড়াইয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু পাত্রটি সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিতরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন, অতপর তাহা হইতে উপস্থিত সকলে অযূ করিল– তাহাদের সংখ্যা আশি জন ছিল।

১৭৯৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, মো'জেযাসমূহ আল্লাহর আযাব সম্বলিত ঘটনাই হইয়া থাকে। আমরা মো'জেযার মধ্যে লাভজনক ঘটনাও পাইয়াছি।

আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, কিন্তু পানি অতি সামান্য ছিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, একটু পানি আমার নিকট উপস্থিত কর। একটি পাত্রে অতি সামান্য একটু পানি উপস্থিত করা হইল। হযরত (সঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা আল্লাহর তরফ হইতে বরকতের পানি দ্বারা অযূ করিতে আস।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ঘটনায় দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের এই মো'জেযাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খাদ্য বস্তুসমূহ তসবীহ পড়িয়া থাকিত এবং আমরা তাহা শুনিতে পাইতাম।

১৭৯৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৬) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (তাঁহার মসজিদের মিম্বর তৈয়ার হওয়ার পূর্বে) একটি শুষ্ক খেজুর গাছের খুঁটির সহিত হেলান দিয়া জুমার খোতবা ইত্যাদি ভাষণ দিয়া থাকিতেন। মিম্বর তৈয়ার হইলে পর জুমার খোতবাদানে তিনি ঐ খুঁটি ত্যাগ করতঃ মিম্বরে দাঁড়াইলেন; তখন ঐ খেজুর কাণ্ডটি (শিশুর ন্যায় বা বাছুরহারা গাভীর ন্যায়) রোদন করিতে লাগিল (তাহার ক্রন্দন স্বর আমরা শুনিয়াছি)। অতপর হযরত (সঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকটে আসিলেন, তাহার উপর হাত বুলাইলেন (এবং আলিঙ্গন করিলেন)। তখন ধীরে ধীরে তাহার ক্রন্দন স্বর থামিয়া আসিল, যেরূপ ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দান করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ হাসান (রঃ) বর্ণনা করয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! একটি শুষ্ক কাঠ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামের প্রতি এত অনুরক্ত ও আসক্ত ছিল; তোমরা ত মানুষ– তোমাদের পক্ষে ঐরূপ হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় নহে কি?

এক হাদীছে উল্লেখ আছে, এই ঘটনা উপলক্ষে হযরত (সঃ) লোকদিগকে বলিলেন, এই শুষ্ক কাষ্ঠের ক্রন্দনে তোমাদের অন্তরে বিস্ময় সৃষ্টি হয় না কি? তখন বহু লোক সেদিকে লক্ষ্য করিল এবং ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

উক্ত খেজুর কাণ্ডটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনেক তথ্য আছে। যথা– (১) তাহাকে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে পুনঃ তোমার স্থানে নিয়া রোপণ করিয়া দেই, তুমি তাজা গাছ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে বেহেশতে রোপণ করিতে পারি, তুমি বেহেশতের মাটি ও পানিতে পুষ্ট হইয়া আল্লাহর পেয়ারা বান্দাগণকে ফল খাওয়াইবে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, সেই খেজুর কাণ্ডটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাই পছন্দ করিয়াছে।

(২) হযরত (সঃ) সাময়িক খেজুর কাণ্ডটি দাফন করাইয়া দিয়াছেন।

(৩) পরবর্তীকালে ঐ খেজুর কাণ্ডটি ছাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর হস্তগত হইয়া তাঁহারই হেফাযতে ছিল, এমনকি কালের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তাহার বিলুপ্তি সাধিত হয়। আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, দাফনকৃত খেজুর কাণ্ডটি বোধহয় মসজিদে নববীর পুনঃ নির্মাণকালে উক্ত ছাহাবীর হস্তগত হইয়াছিল।

বৃক্ষ জাতীয় খেজুর কাণ্ডের মধ্যে ক্রন্দন ও কথোপকথনের শক্তি সঞ্চার হওয়া অসম্ভব মনে করিবে না। শুধু বৃক্ষ নহে বরং সমস্ত বস্তুই আল্লাহ তাআলার তসবীহ পড়িয়া থাকে– এই সত্য পবিত্র কোরআনেই নিম্নের

আয়াতে বর্ণিত আছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ‐

অর্থ ঃ "নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তাআলার প্রশংসা পবিত্রতার গুণ গাহিয়া থাকে, অবশ্য তোমরা তাহাদের তসবীহ বুঝিতে পার না।"

অবশ্য শুষ্ক অবস্থায় উক্ত খেজুর কাণ্ডের মধ্যে সেই শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং জনসাধারণ কর্তৃক শ্রুত ক্রন্দন ও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে কথোপকথনের শক্তি তথা মানবীয় শক্তির ন্যায় শক্তি সঞ্চার হওয়া প্রিয়নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ মো'জেযা স্বরূপ ছিল।

একদা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ন্যায় বড় বড় মো'জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিল, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে মরা মানুষ জীবিত করার মো'জেযা দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তদুত্তরে উক্ত খেজুর খাম্বার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহাতে মৃতকে জীবিত করার তুলনায় অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ, এস্থলে একটি মরা কাষ্ঠে মানবীয় শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। (উল্লিখিত তথ্যসমূহ "ফতহুল বারী" হইতে উদ্ধৃত)

১৭৯৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন খৃস্টান মুসলমান হইয়াছিল, এমনকি সে পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারা এবং সূরা আলে এমরানের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লামের প্রয়োজনীয় লেখার কাজ করিত। কিছু দিন পরে সে পুনরায় খৃস্টান হইয়া গেল। সে হযরতের কুৎসা করিয়া বলিত যে, মুহাম্মদ বস্তুতঃ কিছুই জানে না, আমার লিখিত বিষয়াবলী দেখিয়াই যাহা কিছু লিখিয়াছে।

অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার লোকজন তাহাকে খৃস্টান ধর্মের রীতি অনুসারে মাটিতে দাফন করিয়া দিল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, মাটি তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার লোকজন মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিল, তাহারাই এইরূপ করিয়াছে, আমাদের লোকটিকে কবর খুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা পুনরায় অধিক মাটির নীচে তাহাকে দাফন করিয়া দিল; এইবারও ভোরবেলা পূর্বের ন্যায় মাটির উপরেই তাহার লাশ দেখা গেল। তাহার লোকজন আবার মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করতঃ যথাসাধ্য মাটির তলদেশে তাহাকে দাফন করিয়া দিল, কিন্তু এইবারও ভোরবেলা তাহাকে মাটির উপর দেখা গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এই কার্য কোন মানুষের পক্ষ হইতে নহে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী গোস্তাখীর কি পরিণতি তাহার আভাসদানে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ অপদস্থতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

১৭৯৯। হাদীছ ঃ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে পরিখা খননের সময়ে ক্ষুধার দুর্বলতায় নবী (সঃ) কাপড় দ্বারা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবু তালহা (রাঃ) (নবীজীর ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া বাড়ী আসিলেন এবং স্ত্রী উম্মে সোলায়েমকে বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়া আসিলাম- ক্ষুধার কারণে তাঁহার মুখ হইতে ভালভাবে শব্দও বাহির হয় না। তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ- আছে; এই বলিয়া তিনি কয়েকটি যবের রুটি বাহির করিলেন এবং একটি চাদর বাহির করিয়া তাহার এক অংশে ঐ রুটিগুলি লেপটাইয়া আমার বগলে দাবাইয়া দিলেন এবং চাদরের বাকী অংশ দ্বারা আমার গা ঢাকিয়া দিলেন- (আনাছ তখন বালক) এই অবস্থায় তিনি আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি মসজিদে যাইয়া হযরত (সঃ)-কে পাইলাম, তাঁহার নিকট অনেক লোক ছিল। আমি যাইয়া তথায়

দাঁড়াইলাম। হযরত (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু তাল্হা তোমাকে পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, খাদ্য দিয়া পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তখন হযরত (সঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে চল (আবু তাল্হার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য)।

এই বলিয়া সকলে রওয়ানা হইলেন। আমি তাঁহাদের সম্মুখ ভাগে পথ দেখাইয়া চলিলাম এবং আবু তাল্হা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত খবর জ্ঞাত করিলাম। আবু তাল্হা তাঁহার স্ত্রী উম্মে সোলায়েমকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অনেক লোক সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেছেন, অথচ আমাদের নিকট কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমরা তাঁহাদিগকে খাবার দিতে পারি। উম্মে সোলায়েম বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল আমাদের অবস্থা ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন (সুতরাং আমাদের চিন্তা করার আবশ্যক নাই)। আবু তাল্হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিলেন। হযরত (সঃ) আবু তাল্হা সমভিব্যাহারে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে উম্মে সোলায়েম! তোমার নিকট খাদ্য যাহা কিছু আছে উপস্থিত কর। উম্মে সোলায়েম সেই রুটি কয়টি যাহা আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন উপস্থিত করিলেন। হযরতের আদেশে রুটিগুলি খণ্ড খণ্ড করা হইল। উম্মে সোলায়েম ঐগুলির উপর কিছু ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। অতপর হযরত (সঃ) তাহার উপর কিছু পড়িয়া দোয়া করিলেন * এবং বলিলেন, লোকদের মধ্য হইতে দশ জনকে ডাকিয়া আন। তাহারা আসিয়া পেট পুরিয়া খাইলেন। অতপর আরও দশ জনকে ডাকিয়া আনা হইল, তাহারাও পেট পুরিয়া খাইলেন। এইভাবে উপস্থিত সকলেই পেট পুরিয়া খাইলেন, তাহাদের সংখ্যা বরং আশি ছিল। (তারপর হযরত (সঃ) বাড়ীর সকলকে নিয়া খাইলেন তবুও খাদ্য বাঁচিয়া গেল– তাহা পড়শীগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। (ফতহুল বারী)

আলোচ্য ঘটনা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যের আরও একটি ঘটনা ঐ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষেই ছাহাবী জাবের (রাঃ)-এর সঙ্গে ঘটিয়াছিল। তিনি মাত্র তিন জন লোকের উপযোগী খাদ্য তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া হযরত (সঃ)-কে চুপি চুপি দাওয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত (সঃ) ব্যাপকভাবে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়া জাবেরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হযরতের মো'জেযায় সেই তিন জনের খাদ্য এক হাজার লোকে খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট রহিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৭৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইমাম বোখারী (রঃ) আরও কতিপয় মো'জেযার ঘটনা সম্বলিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব হাদীছের অনুবাদ পূর্বে হইয়া গিয়াছে, যেমন– প্রথম খণ্ডের ২৩১নং, ৩৭০নং ও ৫২১ নং হাদীছ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬২ নং তৃতীয় খণ্ডের ১৪৯৭ নং ও ১৪৯৮ নং হাদীছ। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আখেরী যমানা সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত; যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ তাহা অনূদিত হইবে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আর একটি অন্যতম বিশেষ মো'জেযা হইল মে'রাজ শরীফের ঘটনা। ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বের সহিত ৫৪৮ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

মে'রাজ শরীফের বয়ান

মে'রাজ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা সোপান, যদ্দারা উর্ধ্বে আরোহণ করা যায়। মে'রাজের ঘটনা বলিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ এক ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্দেশ্য; যেই ঘটনায় হযরত (সঃ) সাত আসমান ও তদূর্ধ্বে "মহান আরশ" এবং তাহারও উর্ধ্বে বিশেষ জগত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই

---

* হযরত (সঃ) এই দোয়া পড়িয়াছিলেন بسم الله اللهم اعظم فيها البركة "আল্লাহর নামে– হে আল্লাহ! এই খাদ্যে বেশী মাত্রায় বরকত দান করুন।"

ঘটনা বা তাহার এক অংশকে আরবি ভাষায় ইসরাও* বলা হয়, যাহার অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ। এই ঘটনা রাত্রিকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কোরআনে এই শব্দেই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোন এক রাত্রিতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে জিব্রাঈল ফেরেশতার পরিচালনায় মক্কা হইতে প্রায় এক মাসের পথ বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ হইয়া তথা হইতে পর পর সাত আসমানে ভ্রমণ করেন এবং সপ্তম আসমান হইতে মহান আরশ, অতপর তাহারও ঊর্ধ্বে সৃষ্ট জগতের বহুস্তর পরিভ্রমণ করেন এবং বরযখী জগত, বেহেশত, দোযখ, লওহে মাহফুজ, বায়তুল মা'মুর, হাউজ কাওসার, সেদরাতুল মোনতাহা, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সহ আল্লাহ তাআলার কুদরতের ও তাঁহার বিশেষ সৃষ্টির বহু রকম অলৌকিক অসাধারণ বস্তু পরিদর্শন করেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দরবারে উপস্থিতি লাভ করেন, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কালাম বা কথাবার্তার সুযোগ লাভ করেন, এমনকি (অধিকাংশের মতে) স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতও লাভ করেন। ইহজগতের বাহিরে এই সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ সংঘটিত হয় এবং তথা হইতে হযরত (সঃ) প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিভ্রমণের আরম্ভ ও প্রত্যাবর্তন জাগতিক সময়ের হিসাবে ঐ রাত্রের এক অংশ মাত্র ছিল। তাঁহার পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন সম্পূর্ণ বাস্তব এবং যথার্থ সত্য ঘটনা ছিল। কোন প্রকার রূপক বা স্বপ্ন পর্যায়ের মোটেই ছিল না, অবশ্য সব কিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরত ছিল বটে।

মে'রাজ শরীফের তাৎপর্য

রসূল ও নবী মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক (Reformer)। মানুষ ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তাকে এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক। সে ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচার, ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচারের ফলাফল– প্রতিদান বা শাস্তি। ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তাহার উপর ন্যস্ত কর্তব্যাবলী, ছিন্ন হইয়া যায় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক। মানুষ এই সবকে ভুলিয়া যায়, অনেক স্থলে এই সবের অস্বীকারকারী হইয়া বসে, অনেক স্থলে এইসবের বিপরীত বিষয় গ্রহণ ও বরণ করিয়া লয়। এইসব অবস্থা মানব জীবনের কলঙ্ক ও কুসংস্কার। এইসবের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতেই রসূল ও নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকিত; তাঁহারা মানবের ইহকালীন জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য এবং পরকালীন জীবনের ফলাফল ও তথ্যাদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে মানবকে জ্ঞাত করিতেন এবং এই জ্ঞান দানের মাধ্যমেই নবী ও রসূলগণ মানব সমাজের ঐ অধঃপতনের সংস্কার সাধন করিতেন।

দুনিয়া অস্থায়ী, এইখানে মানব জাতির আবাদিও অস্থায়ী সুতরাং রসূল এবং নবীগণের সেলসেলারও শেষ সীমা রহিয়াছে। সেই সর্বশেষ রসূল ও নবী হইলেন আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রসূল আসিবে না, তাঁহার সংস্কারই কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইবে। অতএব সাধারণ নিয়মানুসারেই তাঁহার সংস্কার সর্বাধিক সুদৃঢ় ও দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক। সংস্কারকের ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় হয় তাঁহার সংস্কারের বিষয়াবলী তথা তাঁহার উক্তি এবং বক্তব্যাবলীর উপর তাঁহার নিজের বিশ্বাসের অকাট্যতা ও দৃঢ়তা অনুপাতে।

"ইস্‌রা" অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ এবং "মে'রাজ" অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণ। আলোচ্য ঘটনায় উভয় কার্যই সংঘটিত হইয়াছিল। মক্কা হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ পর্যন্ত এক মাসের পথ ত নবী (সঃ) ঐ রাত্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। ফলে সাধারণতঃ উভয় শব্দই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর কাহারও মতে ঘটনার প্রথম অংশের জন্য "ইস্‌রা" শব্দ এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য 'মে'রাজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতামতকেই সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন– একটি পরিচ্ছেদে একটি পরিচ্ছেদে 'মে'রাজ' আর 'ইস্‌রা'।

পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব বিষয় লোকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন, যেমন– আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়াছেন, আরশ-কুরসী বেহশত-দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছেন এবং নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি জ্ঞাত করিয়াছেন; এই সব কিছু তাঁহারা জ্ঞাত হইতেন ওহী দ্বারা। ওহী নির্ভুল অকাট্য হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ওহী অকাট্য নির্ভুল হইলেও তাহা শুধু শুনা পর্যায়ের; দেখা পর্যায়ের নহে। শুনা পর্যায়ের অকাট্যতা সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এবং পূর্ণ ঈমানের জন্য যথেষ্ট ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা দেখা পর্যায়ের অকাট্যতার সমতুল্য নহে; شنیده کئے بوُد مانند دیده শুনা কখনও দেখার সমতুল্য হইতে পারে না!" এই মর্মে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃতকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্য চাক্ষুষ দেখিয়া নেওয়ার দরখাস্ত আল্লাহ তাআলার দরবারে করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ চতুর্থ খণ্ডে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (reform) সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থাস্বরূপ সব কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এই বিশেষ পরিভ্রমণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ

অর্থ ঃ অতি মহান পাক-পবিত্র আল্লাহ; যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দা (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে রাত্রি বেলায় মক্কার মসজিদ হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের পথে পরিভ্রমণে নিয়াছেন, (তিনি স্বয়ং সেই পরিভ্রমণের) উদ্দেশ্য এই (প্রকাশ করিতেছেন) যে, আমি তাঁহাকে আমার (কুদরতের এবং সৃষ্টির) অনেক নিদর্শন ও অলৌকিক বস্তুনিচয় পরিদর্শন করাইব। (পারা–১৫; রুকু– ১)

এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে হযরত (সঃ) সব কিছু দেখিয়াছেন– বরযখী জগত দেখিয়াছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ যাহাদের ইতিহাস বিশ্ববাসীকে শুনাইবেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি দেখিয়াছেন; আরও দেখিয়াছেন বেহেশত-দোযখ, আরশ কুরসী, বায়তুল মা'মুর, সেদরাতুল মোনতাহা, লওহে মাফুজ, হাউজে কাওসার ইত্যাদি, এমনকি সম্ভাব্য পরিমাণে মহান আল্লাহকেও দেখিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনে অন্য এক প্রসঙ্গে হযরতের এই পরিভ্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে–

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ـ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ـ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ـ

অর্থাৎ হযরত (সঃ) সেদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌঁছিয়াছিলেন; ঐ এলাকায়ই চির বাসস্থান বেহেশত অবস্থিত। তখন (তথায় হযরতের আগমন উপলক্ষে) এক বিশেষ রকমের সজ্জা সেদরাতুল মোনতাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। (সেই এলাকায় পৌঁছিয়াও) হযরতের পরিদর্শন ও অনুধাবনশক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ সঠিক ও বিমল ছিল; পরিদর্শন ও অনুধাবনে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল না। হযরত (সঃ) তথায় স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের বহু রকম বড় বড় নিদর্শন ও বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। (পারা-২৭, রুকু-৫)

এইভাবে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসী অদৃশ্য অলৌকিক বস্তুনিচয় যাহা অন্যান্য নবীগণের পক্ষে শুধু ওহী মারফত তথা শুনা পর্যায়ের অকাট্য ছিল; মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ঐসব বস্তুনিচয় দেখা পর্যায়ের অকাট্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ফলে তাঁহার প্রচারিত ও বক্তব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁহার একীন বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক দৃঢ়; যদ্দরুন তাঁহার ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (reform) দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় হইয়াছে।

'মে'রাজ' হযরতের পক্ষে আদর সোহাগের মোলাকাত ছিল

নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ নয় বৎসরকাল হযরত (সঃ) দুঃখ-যাতনার ভিতর দিয়া কাটাইয়াছেন– দশম বৎসরে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক কষ্ট চরমে পৌঁছিল। ইহজগতে তাঁহার একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী, সাহায্য সমর্থন দানকারী চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হইল, এই বৎসরই পরম প্রতিভাশালিনী জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজারও ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত (সঃ) শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঘরে বাহিরে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেন, এমনকি হযরত স্বয়ং এই বৎসরকে عام الحزن শোকের বৎসর নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তদুপরি তায়েফ নগরীর ঘটনা ত তাঁহার ব্যথিত হৃদয়কে আরও ঘায়েল করিয়াছিল।

রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম– যাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন–

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ

অর্থ ঃ "কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট থাকে, কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে।"

আল্লাহ তাআলার এই সাধারণ নিয়মটি তাঁহার আওলিয়া– দোস্ত ও পেয়ারা বন্দাদের পক্ষে বিশেষরূপে বাস্তবায়িত হইয়া থাকে। এস্থলে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ পেয়ারা হাবীব সর্বাধিক দুঃখ-যাতনা ভোগ করিলেন, তাঁহার জীবনের সর্বাধিক ব্যথা ও আঘাতে তিনি মর্মাহত হইলেন, এই ক্ষেত্রে কি আল্লাহ তাআলা তাঁহার সেই সাধারণ নিয়ম– "কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট" বাস্তবায়িত করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন; রহমানুর রাহীম আল্লাহ তাআলা তাহাই করিয়াছেন।

দশম বৎসরে হযরত (সঃ) আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়া ব্যথা ও দুঃখ-যাতনার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। চাচা আবু তালেব ও জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজার ইন্তেকালে ত আন্তরিক ব্যথায় বিহ্বল হইয়াছিলেন, আর তায়েফের ঘটনায় বাহ্যিক দুঃখ-যাতনার চরমে পৌঁছিয়াছিলেন। এই দুই প্রকার কষ্টের প্রতিদান স্বরূপ দুই প্রকার মিষ্ট আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করিয়াছিলেন; একটি বাহ্যিক দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। বাহ্যিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল মদীনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের সংযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ– যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হযরত (সঃ) এক মস্ত বড় জাতিকে তাঁহার সাহায্য সমর্থন ও সহায়তায় সর্বস্ব উৎসর্গকারীরূপে দণ্ডায়মান পান। এমনকি অচিরেই ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহার সূচনা নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ কয়টি দিনে হইয়াছিল, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "আকাবা সম্মেলন" বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল এই মে'রাজ শরীফ। যাহা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী–রসূল, ফেরেশতা তথা কোন সৃষ্টের ভাগ্যেই জুটে নাই। নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরের রজব মাসে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমস্ত নবীগণকে হযরত (সঃ)-এর পিছনে মোক্তাদীরূপে দাঁড় করাইয়া তিনি যে তাঁহাদের সর্দার, তাহা আনুষ্ঠানিকরূপে দেখান হয়। হযরত (সঃ) এত উর্ধ্বে আরোহণ করেন যে, ঐশী বাহন বোরাকও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হযরতের সালাম-কালাম বিনিময় হয়। আল্লাহ তাআলা হযরতকে আদর সোহাগ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি কারখানার অলৌকিক অসাধারণ বস্তুনিচয় পরিদর্শন করান। এইসব ত হইল মে'রাজ শরীফের শুধু বাহ্যিক গুটিকয়েক বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত (সঃ) মে'রাজ শরীফের মাধ্যমে কি অসীম মর্যাদা যে লাভ করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া কোথায় যে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বুঝা ও বুঝান মানুষের পক্ষে বস্তুতঃ সম্ভব নহে। কবি ঠিকই বলিয়াছেন–

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ ـ بعد از خدا بزرگ توئى قصه مختصر ـ

অর্থ ঃ "তাঁহার প্রশংসা ও বাস্তব মর্যাদার বিবরণ দান সম্ভবই নহে; সংক্ষেপে এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত করা বাঞ্ছনীয় যে, তিনি খোদা নহেন– খোদার পরের মর্তবাই তাঁহার।

মে'রাজ শরীফের তারিখ

যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান-চর্চা ও বিদ্যা-চর্চার ধারা পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে সাহিত্য ও কাব্য ব্যতিরেকে আর কোন জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চার রীতি ছিল না বলিলেই চলে। এমনকি তাহাদের পক্ষে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। তাহারই সংলগ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; তখন হইতে আরবের মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা পুরাদমে চলিতে আরম্ভ করে, তাঁহারা আল্লাহর বাণী কোরআন এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণিত বিষয়াবলী তথা হাদীছ কণ্ঠস্থ করত তাহা প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তখনকার রীতি ছিল, মূল বিষয়বস্তু ও ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করত; সংরক্ষণ করা। ইতিহাসবেত্তাদের রুচিসম্মত প্রত্যেকটি ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত না। তাঁহাদের বিবৃতিতে অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনারও সঠিক কোন তারিখের বর্ণনা দেখা যায় না। তাঁহারা তাহার গুরুত্বও দিতেন না; বস্তুতঃ তাহা মূল বিষয় ও ঘটনার ন্যায় গুরুত্ব পাওয়ার বস্তুও নহে।

পরবর্তী যুগে যখন বিশেষতঃ ঐসব বিষয় ও ঘটনা ইতিহাসরূপে লিপিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হইল, তখন উদ্যোক্তাগণ ইতিহাসবেত্তাদের রুচি ও রীতি অনুসারে ঘটনাবলীর দিন-তারিখ স্থান নির্ধারণে তৎপর হইলেন, কিন্তু মূল ঘটনার বর্ণনাকরীদের হইতে তাহা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট খোঁজ না পাইয়া নানা প্রকার আকার ইঙ্গিত হইতে ঐসব বিষয় নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেমতে তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সারকথা– অনেক অনেক অকাট্যরূপে প্রমাণিত ঘটনার তারিখ যেমন, "মে'রাজ শরীফের" তারিখ সম্পর্কে সামঞ্জস্যবিহীন মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই মতভেদ মূল ঘটনার সাক্ষ্যদাতাগণের মধ্যে নহে, বরং মূল ঘটনার সাক্ষীগণ তারিখ বর্ণনা না করায় পরবর্তী যুগের লেখকগণ নিজেদের চেষ্টায় তারিখ বাহির করিতে যাইয়া মতভেদ করিয়াছেন এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক।

স্থানবিশেষে মূল ঘটনা বর্ণনাকারীদের বিবৃতিতেও ঐসব বিষয় নির্ধারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত (সঃ)-কে কোন্ স্থান হইতে নেওয়া হইয়াছিল, হযরত (সঃ) তখন কোন্ ঘরে বা কোন্ জায়গায় ছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, মূল ঘটনার বিবৃতিদানকারীদের বর্ণনায় কোন বিষয়ের বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সামঞ্জস্যবিহীন নহে। মে'রাজ সম্পর্কীয় স্থান সম্পর্কে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহার সামঞ্জস্য বিস্তারিত বিবরণে জানিতে পারিবেন।

মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। তবে নবুয়তের একাদশ বৎসরে হওয়াই বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। অবশ্য দ্বাদশ বৎসর সম্পর্কেও মতামত পাওয়া যায়। আর মাস ও তারিখ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত এই যে, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রি ছিল। (যোরকানী, ১–২০৮ দ্রষ্টব্য)

এই ধরনের বিষয়াবলীর তারিখ সম্পর্কে তৎপর না হওয়াই ইসলাম ও শরীয়তের দিক দিয়া উত্তম। ছাহাবী ও তাবেয়ীগণও এই সম্পর্কে তৎপরতা দেখান নাই। কারণ তাহাতে বেদআত তথা নানা প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

মে'রাজের বিবরণ

মে'রাজ শরীফের ঘটনার বিবরণ স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে। হযরত (সঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের সম্মুখে তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন। ঘটনাটি অতি সুদীর্ঘ, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অংশ উল্লেখবিহীন রহিয়াছে। সকলের বিবৃতি একত্রে দেখিলে মূল ঘটনার অনেকাংশ প্রকাশ পাইয়া যাইবে। মে'রাজ শরীফের বিবরণে ত্রিশ জন ছাহাবীর বর্ণনা বা হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে বোখারী শরীফে সাত জনের হাদীছ রহিয়াছে– যাহার সুশৃঙ্খল উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮০০। হাদীছ ঃ عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة انَّ نبيَّ اللّٰه صلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِهٖ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ مُضْطَجِعًا اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ اِلٰى هٰذِهٖ يَعْنِىْ بِهٖ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ أُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءَةٍ اِيْمَانًا فَغَسَلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ ثُمَّ اُعِيْدُ - ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضُ فَقَالَ لَهُ الْجَارُوْدُ وَهُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبَا حَمْزَةَ قَالَ اَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهٗ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِهٖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ - ....

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) মালেক ইবনে সা'সাআ'হ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেই রাত্রে আল্লাহ তাআলা পরিভ্রমণে নিয়া গিয়াছিলেন সেই রাত্রের ঘটনা বর্ণনায় ছাহাবীগণের সম্মুখে তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতীমে (উপনীত হইলাম এবং তখনও আমি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত) ঊর্ধ্বমুখী শায়িত ছিলাম, হঠাৎ এক আগন্তুক (জিব্রাঈল ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন (এবং আমাকে নিকটবর্তী জম্‌জম্ কূপের সন্নিকটে নিয়া আসিলেন)। অতপর আমার বক্ষের ঊর্ধ্ব সীমা হইতে পেটের নিম্ন সীমা পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন এবং আমার হৃদয় বা দিলটা বাহির করিলেন। অতপর একটি স্বর্ণপাত্র উপস্থিত করা হইল, যাহা ঈমান (পরিপক্ব সত্যিকার জ্ঞান বর্ধক) বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। আমার দেলটাকে (জম্‌জমের পানিতে) ধৌত করিয়া তাহার ভিতরে ঐ বস্তু ভরিয়া দেওয়া হইল এবং দেলটাকে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল (বন্ধনীর বিষয়গুলি ৪৫৫-৪০৬ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে)।

অতপর আমার জন্য খচ্চর হইতে একটু ছোট, গাধা হইতে একটু বড় শ্বেত বর্ণের একটি বাহন উপস্থিত করা হইল তাহার নাম "বোরাক", যাহার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। সেই বাহনের উপর আমাকে সওয়ার করা হইল।

ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়া জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে লইয়া নিকটবর্তী তথা প্রথম আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। ভিতর হইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল, জিব্রাঈল স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। অতপর জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? জিব্রাঈল বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ) আছেন। বলা হইল, (তাঁহাকে নিয়া আসিবার জন্যই ত আপনাকে) তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ। তারপর আমাদের প্রতি মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। গেটের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় আদম (আঃ)-কে দেখিতে পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া বলিলেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। আমার সালামের উত্তরদানে তিনি আমাকে "সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী' আখ্যায়িত করিলেন এবং খোশ আমদেদ জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। এখানেও পূর্বের ন্যায় কথোপকথন হইল এবং শুভেচ্ছা মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম; তাঁহাদের উভয়ের নানী পুরস্পর ভগ্নী ছিলেন। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহাদের পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের উত্তর প্রদানে "সুযোগ্য ভ্রাতা সুযোগ্য নবী" বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। তথায়ও পূর্বের ন্যায় কথোপকথনের পর শুভেচ্ছা–স্বাগত জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন; আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দান করতঃ আমাকে "সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী" বলিয়া মোবারকবাদ জানাইলেন।

অতপর আমাকে লইয়া জিব্রাঈল চতুর্থ আসমানের নিকটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। সেখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা স্বাগত জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় ইদ্রীস (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মারহাবা জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এই স্থানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর চলার পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ দানের সহিত দরজা খোলা হইল। আমি ভিতরে পৌঁছিয়া হারুন (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন। আমি সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের গেটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে জিব্রাঈল স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, অতপর তাঁহার সঙ্গে কে আছে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ); বলা হইল, তাঁহাকে ত নিয়া আসিবার জন্য আপনাকে পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ। তৎক্ষণাত শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। তথায় প্রবেশ করিয়া মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত করিয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মোবারকবাদ জানাইলেন।

যখন আমি এই এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলাম তখন মূসা (আঃ) কাঁদিতেছিলেন। তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কাঁদিতেছি এই কারণে যে, আমার উম্মতে বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা এই নবীর উম্মতের বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে, অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়া যুবক এবং দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন আমার পরে।

তারপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের প্রতি আরোহণ করিলেন এবং তাহার দ্বারে পৌঁছিয়া গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পূর্বের ন্যায় সকল প্রশ্নোত্তরই হইল এবং দরজা খুলিয়া শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হইল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তথায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাত লাভ হইল। জিব্রাঈল আমাকে বলিলেন, তিনি আপনার (বংশের আদি) পিতা, তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য পুত্র, সুযোগ্য নবী বলিয়া মারহাবা ও মোবারকবাদ জানাইলেন।

ثم رفيت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل اذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وذا اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبرائيل قال اما الباطنان فنهران فى الجنة واما الظاهران فانيل والفرات . ثم رفع الى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن فقال هى الفطره انت عليها وامتك . ثم فرضت على الصلوات خمسين صلوة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قال امرت بخمسين صلوة كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمسين صلوة كل يوم وانى والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لامتك . فرجع فوضع عنى عشرا فرجعت الى موسى فقال مثله فرجت فوضع عننى عشرا فرجعت الى فقال مهله فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فامرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم . قال ان امتك لاتستطيع خمس صلوات كل يوم وانى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لامتك قال سالت ربي حتى استحييت ولكنى ارضى واسلم قال فلما جاوزت نادى مناد امضيت فريضتى وخففت عن عبادى .

অর্থ ঃ অতপর আমি সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহার নিকট উপনীত হইলাম। (তাহা এক বড় প্রকাণ্ড কুল বৃক্ষবিশেষ,) তাহার এক একটা কুল "হজর" অঞ্চলে তৈয়ারী (বড় বড়) মটকার ন্যায় এবং তাহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। জিব্রাঈল আমাকে বলিলেন, এই বৃক্ষটির নাম "সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহা"। তথায় চারিটি প্রবাহমান নদী দেখিতে পাইলাম– দুইটি ভিতরের দিকে প্রবাহিত এবং দুইটি বাহিরের দিকে। নদীগুলি সম্পর্কে আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ভিতরের দুইটি বেহেশতে প্রবাহমান (সাল্‌সাবীল ও কাওসার নামক) দুইটি নদী। আর বাহিরের দিকে প্রবাহমান দুইটি হইল (ভূ পৃষ্ঠের মিসরে প্রবাহিত) নীল ও (ইরাকে প্রবাহিত) ফোরাত (নদী বা তাহাদের নামের মূল উৎস)।

তারপর আমাকে "বায়তুল মা'মুর" পরিদর্শন করান হইল। তথায় প্রতিদিন (এবাদতের জন্য) সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন (যে দল একদিন সুযোগ পায় সেই দল চিরকালের জন্য দ্বিতীয় দিন সুযোগ প্রাপ্ত হয় না)।

অতপর (আমার সৃষ্টিগত স্বভাবের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা প্রকাশ করিয়া দেখাইবার উদ্দেশে পরীক্ষার জন্য) আমার সম্মুখে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হইল– একটিতে ছিল সুরা বা মদ, অপরটিতে ছিল দুগ্ধ আর একটিতে ছিল মধু। আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। জিব্রাঈল বলিলেন, দুগ্ধ সত্য ও খাঁটি স্বভাগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ; (সুতরাং আপনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে,) আপনি সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উসিলায় আপনার উম্মতও তাহার উপর

থাকিবে।*

তারপর আমার শরীয়তে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান করা হইল। আমি ফিরিবার পথে মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী পথ অতিক্রম করাকালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ আদেশ কি লাভ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাম ওয়াক্ত নামায। মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায় আদায় করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। আমি সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এবং বনী ইস্রাঈলগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি; সুতরাং আপনি পরওয়ারদেগারের দরবারে আপনার উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও সহজ করার আবেদন করুন।

হযরত (সঃ) বলেন, আমি পরওয়ারদেগারের খাস দরবারে ফিরিয়া গেলাম। পরওয়ারদেগার (দুইবারে পাঁচ পাঁচ করিয়া) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। অতপর আমি আবার মূসার নিকট পৌছিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় পরামর্শই আমাকে দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবারও (ঐরূপে) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। পুনরায় মূসার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে এইবারও সেই পরামর্শই দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এবং (পূর্বের ন্যায়) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। এইবারও মূসার নিকট পৌছিলে পর তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম, এইবার আমার জন্য প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইবারও মূসার নিকট পৌছিলে পর আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আদেশ লাভ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও পাবন্দী করিতে পারিবে না। আমি আপনার পূর্বেই সাধারণ মানুষের স্বাভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলগণকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি। আপনি আবার পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া আরও কম করার আবেদন জানান।

হযরত (সঃ) বলেন, আমি মূসাকে বলিলাম, পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেক বার আসা-যাওয়া করিয়াছি; এখন আবার যাইতে লজ্জা বোধ হয়, আর যাইব না বরং পাঁচ ওয়াক্তের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম এবং তাহা বরণ করিয়া নিলাম। হযরত (সঃ) বলেন, অতপর যখন আমি ফিরিবার পথে অগ্রসর হইলাম তখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে একটি ঘোষণা জারি করা হইল– (বান্দাদের প্রাপ্য সওয়াবের দিক দিয়া) "আমার নির্ধারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ) বাকী রাখিলাম, (আমার পক্ষে আমার বাক্য অপরিবর্তিতই থাকিবে। ৪১৭ ও ৪৫৫ পৃষ্ঠার হাদীছ দ্রষ্টব্য) অবশ্য কর্মক্ষেত্রে বান্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করিয়া দিলাম। (অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত রহিল, কিন্তু সওয়াবের দিক দিয়া পাঁচই পঞ্চাশ পরিগণিত হইবে।) প্রতিটি নেক আমলে দশ গুণ সওয়াব দান করিব।

মে'রাজ শরীফের বর্ণনার হাদীছ বোখারী (রঃ) মে'রাজের পরিচ্ছেদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঐসব হাদীছের অনুবাদ দেওয়া হইল।

১৮০১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০) আনাছ (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, আবু যর (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিয়াছেন– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মক্কায় থাকাকালীন একদা রাত্রে আমি যেই ঘরে শায়িত ছিলাম সেই ঘরের ছাদ খুলিয়া গেল, অতপর ঐ পথে জিব্রাঈল (রাঃ) অবতরণ করিলেন। (আমাকে ঐ ঘর হইতে কা'বা গৃহের নিকটবর্তী নিয়া আসা হইল।) তারপর আমার বক্ষ খুলিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইল এবং একটি স্বর্ণ পাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা পরিপক্ক জ্ঞান ও সত্যিকার ঈমান বর্ধক বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল; তাহা আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অতপর (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) জিব্রাঈল (আঃ) আমারহাত ধরিয়া আমাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। নিকটবর্তী

* মদ ও দুগ্ধপাত্র উপস্থিত করার পরীক্ষার সম্মুখীন হযরত (সঃ) দুই বার হইয়াছিলেন। একবার প্রথমে– যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন তখন যাহার উল্লেখ সম্মুখের এক হাদীছে আসিতেছে। দ্বিতীয়বার ঊর্ধ্ব জগতে যাহার উল্লেখ এস্থানে হইয়াছে।

(তথা প্রথম) আসমানের দ্বারে পৌঁছিয়া জিব্রাঈল (আঃ) আসমানের পাহারাদারকে দরজা খুলিতে বলিলেন। তখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় পরিচয় দান করিলেন। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কেহ আছেন কি? জিব্রাঈল বলিলেন, হা- আমার সঙ্গে আছেন মুহাম্মদ (সঃ)। পাহারাদার বলিলেন, তাঁহার নিকইত (আপনাকে) পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ।

অতপর যখন আমরা ঐ আসমানে পৌঁছিলাম দেখিতে পাইলাম, একজন লোক বসিয়া আছেন- তাঁহার ডান দিকে একদল লোক এবং বাম দিকে আর একদল লোক। ঐ লোকটি যখন তাঁহার ডান দিকে তাকান তখন হাসিয়া উঠেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদিয়া উঠেন। হযরত (সঃ) বলেন, ঐ লোকটি আমাকে "সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য পুত্র" বলিয়া স্বাগত জানাইলেন এবং জিব্রাঈলের নিকট হইতে তাঁহার পরিচয়ও পাইলাম। জিব্রাঈল বলিয়াছেন যে, তিনি হইলেন আদম (আঃ); তাঁহার ডান বাম দিকের আকৃতিগুলি তাঁহার বংশধরগণের রূহ বা আত্মাসমূহ। ডান দিকেরগুলি যাহারা বেহেশত লাভ করিবে এবং বাম দিকেরগুলি যাহারা দোযখবাসী হইবে; অতএব এই কারণে তিনি ডান দিকে তাকাইলে (আনন্দে) হাসিয়া উঠেন এবং বাম দিকে তাকাইলে (অনুতাপ আক্ষেপে) কাঁদিয়া উঠেন।

১৮০২। হাদীছ ঃ عن ابن عباس وابا حبة الانصارى كانا يقولان قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ ـ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى بِىَ السِّدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَاَدْرِىْ مَاهِىَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

অর্থ ঃ আব্বাস (রাঃ) ও আবু হাব্বাহ্ আনসারী (রাঃ) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ করার পর আমাকে মহাউর্ধ্বে আরোহিত করা হইল; আমি এক সুসমতল ময়দানে পৌঁছিলাম; তথায় শুধুমাত্র কলম বা লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

অতপর আমাকে লইয়া জিব্রাঈল আরও অগ্রসর হইলেন এবং সিদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌঁছিলেন। ঐ সময় সিদরাতুল মোনতাহাকে বিভিন্ন বর্ণের রঙমালা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা যে কি ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমি তলাইয়া দেখি নাই। তারপর আমাকে বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করান হইল। তাহার গুম্বজসমূহ মুক্তা দ্বারা তৈয়ারী ছিল এবং তাহার যমীন ছিল মেশ্ক বা কস্তুরীর।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত সৃষ্ট জগত পরিচালনার ভার ফেরেশতাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি নির্দেশাবলী আসিতে থাকে। সেই সব লেখার কেন্দ্রই ছিল উক্ত সমতল ময়দান, যাহার পরিদর্শনে হযরত (সঃ) তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। সিদরাতুল মোনতাহাকে আচ্ছাদনকারী রঙমালা কি ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বয়ান মুসলিম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে, তাহা ছিল فواش من ذهب স্বর্ণদেহী পতঙ্গসমূহ।

আর এক হাদীছে উল্লেখ আছে, (মে'রাজ উপলক্ষে) বহু সংখ্যক ফেরেশতার এক দল আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করিয়াছিলেন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দর্শন লাভের। আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অনুমদিত দিয়া দিলেন, সেমতে তাঁহারা সিদরাতুল মোনতাহার নিকটে হযরতের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর ভিড় জমাইয়াছিলেন। (তফসীর রূহুল মাআ'নী, ২৭-৫১)

সম্ভবতঃ ঐ ফেরেশতাগণই স্বর্ণদেহী পতঙ্গের আকৃতিতে ঝাঁক বাঁধিয়া সিদরাতুল মোনতাহার উপর পতিত ছিলেন। তাহাই অন্য এক হাদীছে আছে- নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমি সিদরাতুল মোনতাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার তসবীহ- "ছোবহানাল্লাহ" পাঠরত দেখিয়াছি।

(তফসীর রূহুল মাআ'নী, ২৭-৫১)

এতদ্ভিন্ন নিরাকার নিরাধার আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী বা বিকাশও সিদরাতুল মোনতাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিল, যেই নূরের সামান্যতম তাজাল্লী হযরত মূসার সম্মুখে তুর পর্বতের উপর হইয়াছিল এবং তাহাই ভূমিকা ছিল আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের, যাহার আকাঙ্ক্ষা হযরত মূসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নূরের তাজাল্লীতে পর্বত স্থির থাকিতে পারে নাই, ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)ও ঠিক তাকিতে পারেন নাই, চেতনা হারাইয়া ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন নাই (বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে হযরত মূসার বয়ান)।

পক্ষান্তরে সেই নূর ও ভূমিকা দর্শনের সুযোগই এই স্থানে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করা হইয়াছিল। এস্থলে সেই নূর বিকাশের বাহক বা স্থান সিদরাতুল মোনতাহাও স্থির রহিয়াছিল এবং তাহার দর্শক মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)ও সম্পূর্ণ সুস্থ সচেতন ছিলেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা– ما زاغ البصر وما طغى তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধি শক্তি সুষ্ঠু সতেজ ছিল; বিন্দুমাত্র অতিক্রম বাতিক্রম ঘটে নাই।

তাই বলা হয়, আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ভূমিকায়ই মূসা (আঃ) স্থিরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, لن ترانى এই অবস্থায় আমার দর্শন লাভ আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মে'রাজ উপলক্ষে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধিশক্তি সতেজ সুষ্ঠু রাখিয়া আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ফলে তিনি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শনও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

হযরতের আগমন উপলক্ষে যে সিদরাতুল মোনতাহার উপর আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ হাদীছেও আছে এবং সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী (রাঃ)ও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (রূহুল মাআ'নী ২৭-৫১)

১৮০৩। হাদীছ ঃ পৃঃ ৪৮১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহ প্রশস্ততায় মধ্যম আকারের ছিল। (তিনি দীর্ঘ কায়ার শ্যামলা রংয়ের ছিলেন।) তাঁহার মাথার চুল সোজা ছিল, কোঁকড়ানো ছিল না। তাঁহার দৈহিক আকৃতি "শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায় ছিল। ঈসা (আঃ)-কেও দেখিয়াছি, তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া-বিশিষ্ট এবং রং ছিল গোরা, তিনি এমন পরিচ্ছন্ন দেখাতেছিলেন যেন এখনই গোসল করিয়া আসিয়াছেন। (তাঁহার মাথার চুল কিছুটা কোঁকড়ানো।) ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিয়াছি, আমার আকৃতি তাঁহার আকৃতির সর্বাধিক নিকটতম। তারপর আমার সম্মুখে (পরীক্ষাস্বরূপ) দুইটি পাত্রও উপস্থিত করা হইয়াছিল– একটিতে দুগ্ধ অপরটিতে সুরা বা মদ। আমাকে বলা হইয়াছিল, যেইটাই আপনার ইচ্ছা পান করুন। (তখন মদ হারাম ছিল না।) আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম এবং দুগ্ধ পান করিলাম। তখন বলা হইল, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ– দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন; (ইহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত এই ধর্ম অবলম্বন করিবে।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (সকল প্রকার গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল) মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত সেই পথের পথিক হইয়া গোমরাহ হইত। এতদ্ভিন্ন হযরত (সঃ) দোযখের প্রধান কর্মকর্তা ফেরেশতা "মালেক" এবং দাজ্জালের উল্লেখও করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলে করীমের সম্মুখে মদের পেয়ালা ও দুগ্ধের পেয়ালা উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষার ভাল মন্দ ফলাফল সম্পর্কেও ফেরেশতা জিব্রাঈল ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। ১৮০০ নং হাদীছে ভাল ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, দুগ্ধ হইল সকলের পক্ষে স্বভাবগত আকর্ষণীয় এবং অতি উত্তম বস্তু, তাহাকে সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বা প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; সুতরাং আপনি আপনার সমগ্র উম্মতের প্রধান হইয়া তাহা গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব আপনার নিম্নস্থদের তথা উম্মতগণের উপর এই হইবে যে, তাহারাও সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আলোচ্য হাদীছে তাহার

বিপরীত মন্দ ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, মদ হইল সব রকম গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল; তাহা গোমরাহী ও ব্যভিচারের পথের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছ। সুতরাং আপনি সমগ্র উম্মতের মুরব্বী ও প্রধান হইয়া যদি তাহা গ্রহণ করিতেন তবে স্বাভাবিকরূপে তাহার প্রভাব প্রতিক্রিয়া উম্মতগণের উপর এই হইত যে, তাহারাও গোমরাহীর পথের পথিক হইত।

এই ফলাফলের সূত্র অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অপরিহার্য ও বাস্তব এবং বিশেষ উপদেশমূলক। বর্তমানেও আমরা জাতীয় জীবনের শত শত ব্যাপারে উপরস্থ নেতা, কর্তা ও প্রধানদের ক্রিয়াকলাপ এবং স্বভাব-চরিত্রের যে প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখি তাহা উক্ত সূত্রের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের নেতা ও প্রধানগণ এই উপদেশের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করায় সর্বসাধারণের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের গোনাহের বোঝা তাহাদের ঘাড়েও চাপিবে।

১৮০৪। হাদীছ ঃ পৃঃ ৪৫৯) আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন, বিশ্বমুসলিমের নবীর পিতৃব্য পুত্র ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজ উপলক্ষ্যে মূসা (আঃ)-কে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন গোধুম বা শ্যামলা বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট মানুষ; তাঁহার দেহ পাকা-পোক্ত—"শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। ঈসা (রাঃ)-কেও দেখিয়াছি; তিনি ছিলেন মধ্যম কায়াবিশিষ্ট। তাঁহার অঙ্গসমূহ অত্যন্ত সাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, মাথার চুল প্রায় সোজা ছিল।

এতদ্ভিন্ন আমি দোযখের প্রধান কর্মকর্তা মালেক এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছি। এই সব ছিল বড় বড় নিদর্শনসমূহের অন্তুর্ভক্ত যাহা আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখাইয়াছেন।

বায়তুল মোকাদ্দাসে উপস্থিতি

মে'রাজের ঘটনায় হযরত (সঃ) সরাসরি মক্কা হইতে আসমানের দিকে যান নাই; মক্কা হইতে বিদ্যুৎ গতিতে বোরাকে আরোহণপূর্বক প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৮০৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৮৪) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণের রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইলে পর তাঁহার সম্মুখে দুইটি পাত্র উপস্থিত করা হইল। একটি সূরা বা মদের দ্বিতীয়টি দুগ্ধের। হযরত (সঃ) উভয় পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; (তখন মদ হারাম ছিল না, কিন্তু হযরত (সঃ) মদের, পাত্র ছুঁইলেনও না,) এবং দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। এতদ্দৃষ্টে জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আপনাকে সত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের স্বরূপ তথা দুগ্ধের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত গোমরাহী ও ব্যভিচারে পতিত হইত।

ব্যাখ্যা ঃ একই বিষয়ের পরীক্ষা সাধারণভাবেও একাধিক বার হইয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পরীক্ষাটির সম্মুখীনও হযরত (সঃ) দুই বার হইয়াছিলেন। একবার ভূপৃষ্ঠে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়া, দ্বিতীয়বার ঊর্ধ্ব জগতে পৌছিয়া সপ্তম আকাশ পার হওয়ার পর ....যাহার উল্লেখ ১৫৯৯ নং ও ১৬২০ নং হাদীছে হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মুসলিম শরীফের একটি হাদীছে এই—

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমার জন্য বোরাক উপস্থিত করা হইল। তাহার রং সাদা, গাধা অপেক্ষ বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট, তাহার পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় পৌছাইতে সক্ষম। সেই দ্রুতগামী বাহনে আমি আরোহণ করিলাম এবং বায়তুল মোক্কাদ্দাস মসজিদে পৌছিলাম। সেই মসজিদের নিকটবর্তী লোহার কড়ি বিশেষ একটি ছিদ্রযুক্ত পাথর ছিল যাহার সঙ্গে পূর্ববর্তী নবীগণ এই মসজিদে আসিলে নিজ বাহন বাঁধিয়া থাকিতেন। হযরত (সঃ)

বলেন, আমিও বোরাককে তাহার সহিতই বাঁধিলাম এবং মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়িলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) মে'রাজের রাত্রির ভোর বেলা যখন লোকদের নিকট ঘটনা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি প্রথমে ঘটনার এই অংশটুকুই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,আমি অদ্য রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়াছিলাম এবং এই রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছি* আবু জাহল ইত্যাদি কাফেররা এতটুকু শুনিয়াই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কারণ সাধারণভাবে মক্কা হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস দীর্ঘ এক মাসের পথ; আসা-যাওয়ায় দুই মাস ব্যয় হওয়া আবশ্যক। কাফেররা এই ব্যাপারে হযরতের পরীক্ষা লওয়ার জন্য কা'বা গৃহের নিকটে জমায়েত হইল এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত (সঃ) বিভ্রাটে পড়িলেন, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুঁটিনাটির খোঁজ কে লইয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহর মহিমা তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত (সঃ) তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন।

১৮০৬। হাদীছ ঃ (৬৮৪) عـن جابـر رضى الـلـه تعـالـى عـنـه انـه سَـمِـعَ رَسُـوْلَ الـلّٰـه صَـلَّـى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِى قُرَيْشٌ (حِيْنَ أُسْرِىَ بِىْ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ) قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবৃতি শুনিয়াছেন– তিনি বলিলেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) রাত্রি বেলায় বায়তুল মোকাদ্দাস পরিভ্রমণের কথা যখন আমি কোরায়শগণের নিকট প্রকাশ করিলাম এবং তাহারা অবিশ্বাস (করিয়া আমাকে পরীক্ষা) করিতে চাহিল, তখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতীমের মধ্যে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। আল্লাহ তাআলা বায়তুল মোকাদ্দাস গৃহকে আমার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। আমি কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিদর্শনসমূহ দেখিয়া দেখিয়া বর্ণনা করিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান "টেলিভিশন" যুগে এই হাদীছের বাস্তবতা অনুধাবন অতি সহজ। যদিও বায়তুল মোকাদ্দাস গৃহ মক্কা হইতে বহু দূরে এবং অনেক পাহাড় পর্বতের আড়ালে অবস্থিত, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার পক্ষে যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ কাজ মোটেই কঠিন নহে, যে কাজ মানুষ টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে করিতে পারিয়াছে।

মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (সঃ) কি কি পরিদর্শন করিয়াছেন

পূর্বের বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত (সঃ) মে'রাজ উপলক্ষে (১) আসমান, (২) পূর্ববর্তী বিশিষ্ট নবীগণ, (৩) বায়তুল মা'মুর, (৪) সিদরাতুল মোনতাহা, (৫) সুসমতল ময়দান, (৬) বেহেশত, (৭) দোযখের প্রধান কর্মকর্তা "মালেক", (৮) দজ্জাল ইত্যাদি দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন হাদীছে আরও বিশেষ বিশেষ বস্তুনিচয়ের উল্লেখ আছে। এস্থানেও কতিপয় হাদীছ "আল খাসায়েসুল কোবরা" নামক কিতাব হইতে উল্লেখ করিতেছি।

হাউজে কাওসার

(১) আনাছ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে আছে– হযরত (সঃ) বলেন, অতপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে

* কাফেরগণ উর্ধ্ব জগতের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বায়তুল মোকাদ্দাসের সঙ্গে ভালরূপেই পরিচিত ছিল, তাই হযরত (সঃ) তাহাদের সম্মুখে বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি বরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনেও কাফেরদের বিরোধিতার প্রতিবাদে শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুরই উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য সূরা নাজমে পূর্ণ ঘটনার উপরেও আলোকপাত করা হয়াছে।

সপ্তম আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় আমি একটি প্রবাহমান জলাশয়ের নিকট পৌঁছিলাম– যাহার উভয় কূলে (আমার উপভোগের জন্য) মতি, হিরা ও ইয়াকুত পাথরের তৈয়ারী কুঠি বা বাংলাসমূহ ছিল এবং ঐ নহরের মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর পাখীও ছিল; ঐরূপ সুন্দর পাখী আর কোথাও দেখি নাই। জিব্রাঈলকে বলিলাম, পাখীগুলি বড়ই সুন্দর। জিব্রাঈল বলিলেন, যেসব লোক এই সব পাখী উপভোগ করিবেন তাঁহারা অধিক উত্তম হইবেন। অতপর জিব্রাঈল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি ইহা কোন নহর? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহাই হইল "কাওসার।" আল্লাহ তাআলা যাহা শুধু আপনাকেই দান করিয়াছেন। তখন আমি অধিক আগ্রহের সহিত তাহা পরিদর্শন করিলাম। সেখানে সুসজ্জিতরূপে স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর দিয়া পানি প্রবাহমান। তাহার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক সাদা। তথায় সাজান গ্লাসগুলি হইতে আমি একটি গ্লাস লইয়া ঐ পানি পান করিলাম– তাহা মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ।

(২) আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি হাউজে কাওসারের নিকট গমনকালে জিব্রাঈল বলিলেন, ইহাই হাউজে কাওসার যাহা আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। হযরত (সঃ) বলেন, আমি তাহার মাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, তাহা অত্যধিক সুগন্ধময় কস্তুরী।

আ'রশ ঃ আবু হাম্‌রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে সপ্তম আসমানের পর আরশের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলাম তাহার খাম্বায় লিখিত আছে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

দোযখ ঃ সোহায়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মে'রাজের ঘটনায় পরীক্ষামূলকভাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহুআলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে পানি তারপর মদ ও দুগ্ধের পবিত্র পেশ করা হইল। তিনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিলেন। তখন জিব্রাঈল বলিলেন, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ ও প্রতীক বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন; এই বস্তু প্রত্যেক প্রাণীর স্বাভাবিক খাদ্য। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহা আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ভ্রষ্টতার নিদর্শন হইত এবং ঐ স্থানে বসবাসকারী হইতে বাধ্য হইতেন। এই বলিয়া ঐ প্রান্তের প্রতি ইশারা করিলেন যেই প্রান্তে জাহান্নাম অবস্থিত। হযরত (সঃ) দেখিলেন, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর লেলিহান অগ্নিশিখা উত্তেজিত আকারে উত্থিত হইতেছে।

পরজগতের বস্তুনিচয়

হোযায়ফা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলিয়াছেন, সপ্ত আসমান ভ্রমণ করা পর্যন্ত "বোরাক" সব সময়ই হযরতের সঙ্গে ছিল। অতপর হযরত (সঃ) বেহেশত দোযখও পরিদর্শন করিয়াছেন এবং আখেরাত বা পরজগতের যত বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দান করা হইয়াছে তাহার সবই পরিদর্শন করিয়াছেন। তারপর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গীবত বা পরনিন্দার আযাব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি এক দল লোকের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের হাতে সীসার তৈয়ারী বড় বড় নখ রহিয়াছে; তাহারা তাহা দ্বারা নিজেদের মুখ ও বক্ষ আঁচড়াইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? জিব্রাঈল বলিলেন, ইহা ঐ সব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্য লোকের গোশত খাইয়া থাকিবে– তথা (গীবত ও নিন্দা করিয়া) তাহাদের মান-ইজ্জত নষ্ট করিবে।

আমলহীন ওয়ায়েজ বা বক্তার আযাব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মে'রাজ উপলক্ষে আমি এমন একদল লোকের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের ঠোঁট দোযখের আগুনের তৈয়ারী কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। ঠোঁট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুনঃ গজাইয়া উঠে এবং পুনরায় কাটিয়া ফেলা হয়। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব বক্তা বা ওয়ায়েজ ব্যক্তিদের দৃশ্য যাহারা অন্যদেরকে যেসব নসীহত করিবে নিজে তাহার উপর আমল করিবে না।

সুদখোরের আযাব

(১) সামুরা ইবনে জুন্দব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি দেখিয়াছ, একটি মানুষ নদীর মধ্যে সাঁতরাইতেছে (কনারায় উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না)। পাথর মারিয়া মারিয়া তাহাকে হটাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা সুদ- খোরের অবস্থার দৃশ্য।

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি সপ্তম আকাশের উপরে দেখিলাম- তথায় ভীষণ বজ্রপাত, বিজলীর গর্জন এবং এক দল লোক দেখিলাম, তাহাদের পেট ঘরের সমান বড়- তাহার ভিতর অনেক সাপ কিলবিল করিতেছে যাহা পেটের বাহির দিক হইতে দেখা যায়। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, যাহারা সুদ খাইবে ইহা তাহাদের দৃশ্য।

বিভিন্ন গোনাহের আযাব

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) স্বয়ং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে মে'রাজের বিস্তারিত বর্ণনা দান করতঃ বলিয়াছেন- হযরত (সঃ) বলেন, প্রথম আসমানে পৌঁছিবার পর আমি একস্থানে দেখিতে পাইলাম কতিপয় দস্তরখানা বিছান আছে, তাহার উপর রান্না করা উত্তম গোশত রাখা আছে, কিন্তু তথায় উপস্থিত লোকগুলির কেহই ঐ গোশতের নিকটেও যায় না। পক্ষান্তরে নিকটেই অন্য কতিপয় দস্তরখানা রহিয়াছে যাহার উপর অতি দুর্গন্ধময় পচা গোশত রহিয়াছে, ঐ লোকগুলো তাহা খাইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট ব্যবহারের জন্য হালাল বস্তু থাকিবে, কিন্তু তাহারা সেই হালাল বস্তু উপেক্ষা করিয়া হারামে লিপ্ত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এক দল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের পেট ঘরের সমান বড়; পেট লইয়া তাহারা উঠিতে পারে না, উঠিতে চেষ্টা করিলে অধঃমুখী আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাঁহারা ফেরআ'উনের লোক লস্করদের পিছনে পিছনে যাইতেছে; অধিকন্তু পথিকদের একটি বিরাট দল তাহাদিগকে পদতলে পিষ্ট করিতেছে, তাহারা আল্লার নিকট ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা সুদ খাইবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা ভূতের আছরকৃত পাগলের ন্যায় হইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম একদল লোক তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় (মোটা ও বড় বড়); জবরদস্তিমূলক তাহাদের মুখ খুলিয়া ভিতরে পাথর প্রবেশ করান হয়। সেই পাথর

তাহাদের মলদ্বার দিয়া বাহির হয় এবং তাহারা আল্লাহ তাআলার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলির অবস্থা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল আত্মসাত করিবে। তাহারা বস্তুতঃ আগুনের অঙ্গার পেটের ভিতর ভরিবে এবং অচিরেই শাস্তি ভোগের জন্য ভয়ঙ্কর অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম একদল নারী, তাহাদের কতকগুলিকে পেস্তানে বাঁধিয়া শূন্যে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে মাথা নীচের দিকে করতঃ পা বাঁধিয়া লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা সকলেই আল্লাহ্ তাআলার নিকট ভীষণ চীৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর নারীর দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব নারীর দৃশ্য যাহারা যেনা ব্যভিচার করিবে এবং সন্তান মারিয়া ফেলিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং এক দল লোক দেখিতে পাইলাম, তাহাদের বাহু কাটিয়া গোশত বাহির করা হইতেছে এবং সেই গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান হইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অপর ভাইয়ের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে।

কর্জে হাসানা বা ধার দেওয়ার সওয়াব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি বেহেশতের দরজায় লিখিত দেখিয়াছি, দান-খয়রাতের সওয়াব দশ গুণ আর কার্জ হাসানা বা ধার দানের সওয়াব আঠার গুণ। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধার দেওয়া দান-খয়রাতের তুলনায় উত্তম কিরূপে? তিনি বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে যাঞ্চাকারী ভিক্ষা চাহিয়া থাকে, অথচ তাহার নিকট কিছুটা টাকা পয়সা আছে। পক্ষান্তরে সাধারণতঃ ধার কর্জ তখনই চাওয়া হয় যখন মানুষ অত্যধিক ঠেকে।

বিভিন্ন কার্যের পরিণাম

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি মে'রাজের ঘটনা বয়ান করতঃ বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিব্রাঈল সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এক দল লোক দেখিলেন, তাহারা জমিতে বীজ বপন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শস্য জন্মিয়া পাকিয়া যাইতেছে এবং স্বয়ংক্রিয়রূপে কাটিয়া পড়িতেছে, তাহারা স্তূপীকৃত করিতেছে এবং কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ ফসল জন্মিয়া যাইতেছে। হযরত নবী (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদকারীদের অবস্থার দৃশ্য। আল্লার রাস্তায় জেহাদকারীদের সওয়াব যে, বহুগুণে লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা ঐ পথে যাহা কিছু ব্যয় করেন তাহার সওয়াব যে, তাহাদের পরেও জারি থাকে উহারই রূপক দৃশ্য।

অতপর আর একদল লোককে দেখিলাম, যাহাদের মাথা মস্ত বড় বড় পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাল হইয়া যায়, তখন পুনরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়- তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। নবী (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব লোকের শাস্তির দৃশ্য যাহাদের মাথা নামাযের জন্য উঠিতে চাহিবে না।

অতপর একদল নর-নারীকে দেখিলেন, যাহাদের সম্মুখ ও পিছনের লজ্জাস্থানে নেকড়া ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহারা গরু-ছাগলের ন্যায় বিচরণ করিয়া দোযখের উদ্ভিজ্জ "জারী" ও "যাক্কুম" গাছ এবং কাঁকর ও পাথর ভক্ষণ করিতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের

দৃশ্য? তিনি বলিলেন, এই দৃশ্য ঐ লোকদের যাহারা স্বীয় ধন-সম্পত্তির যাকাত-সদকা আদায় না করিবে। এই শাস্তি তাহাদের সমুচিত শাস্তি, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করেন নাই।

অতপর এক দল লোক দেখিলেন, তাহাদের সম্মুখে এক পাত্রে রান্না করা গোশ্‌ত অপর পাত্রে পচা দুর্গন্ধময় কাঁচা গোশ্‌ত রহিয়াছে– তাঁহারা প্রথমটি উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পাত্র হইতে খাইতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট বিবাহিতা হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হারাম ফাহেশা নারীর নিকট রাত্রি যাপন করিবে এবং ঐসব নারীর দৃশ্য, যাহাদের হালাল স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাহারা হারাম বদমাশ পুরুষদের নিকট রাত্রি যাপন করিবে।

অতপর পথের মধ্যে একটি কাষ্ঠবিশেষ বস্তু দেখিতে পাইলেন, সেই কাষ্ঠটি পথিকদের কাপড়-চোপড় জড়াইয়া ধরিয়া ফাড়িয়া ফেলে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা পথে বসিয়া থাকিয়া পথিকদের লুণ্ঠন করিবে।

অতপর এক লোককে দেখিলেন, সে লাকড়ির এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা উঠাইতে সে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবে না, এতদসত্ত্বেও সে ঐ বোঝা আরও অধিক ভারী করিতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ লোকের দৃশ্য যাহার নিকট লোকদের বহু আমানত রহিয়াছে– যাহা আদায় করিতে সে সক্ষম নহে, কিন্তু সে আরও আমানত লাভের সুযোগ তালাশ করে।

অতপর দেখিলেন, এক দল লোকের জিহ্বা ও ঠোঁট কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে– তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইহা ভ্রষ্ট পথের প্রতি আহ্বানকারী বক্তাগণের দৃশ্য।

অতপর দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট পাথর খণ্ড, তাহা হইতে বিরাট একটি বলদ বাহির হইল এবং পুনরায় সে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সক্ষম হইতেছে না। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা ঐ লোকের দৃশ্য যাহার মুখ দিয়া কোন অসঙ্গত কথা বাহির হইয়া যায়, পরে সে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু ঐ কথা আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

তারপর একস্থানে পৌঁছিয়া অসাধারণ সুগন্ধময় শীতল বাতাসও কস্তুরীর খোশবু অনুভব করিলেন এবং মধুর সুরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই আওয়াজ বেহেশতের। বেহেশত আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভিতর স্বর্ণ-চান্দি, আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের আসবাবপত্র অনেক অনেক জমা হইয়া আছে, এখন তাহার ব্যবহারকারী প্রদান সম্পর্কে তোমার যে আশ্বাস রহিয়াছে তাহা দান কর। আল্লাহ তাআলা তাহাকে উত্তর দিয়াছেন, মোমেন মোসলমান নারী-পুরুষ তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিলাম। তদুত্তরে বেহেশত বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তারপর আর একস্থানে পৌঁছিয়া ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং ভীষণ দুর্গন্ধময় বাতাস অনুভব করিলেন। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের আওয়াজ। সে ফরিয়াদ করিতেছে– হে পরওয়ারদেগার! আযাব, কষ্ট ও দুঃখ-যাতনার সমুদয় জিনিষ আমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে জমা হইয়াছে, এখন ঐ সবের শাস্তি ভোগের পাত্র আমাকে দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাহাকে বলিয়াছেন, কাফের-মোশরেক এবং কুকর্মী ও অহঙ্কারী নারী-পুরুষ, যাহারা হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সে বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছিলেন কি?

এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরতের ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশ্রেণীর আলেমের মধ্যেই মতভেদ

রহিয়াছে। মতভেদের কারণ এই যে, এই সম্পর্কে হাঁ না উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং অকাট্য প্রমাণ কোন পক্ষেই নাই। সুতরাং পরবর্তী বিশিষ্ট এক শ্রেণীর আলেমের মত এই যে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ভ্রমণে ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ

এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিস্তারিত বিবরণ ও নির্ধারণ পাওয়া গেল না, শুধুমাত্র নিম্নে বর্ণিত দুইটি হাদীছই আমাদের খোঁজে পাওয়া গিয়াছে।

(১) শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মে'রাজ ভ্রমণের ঘটনা কিরূপ ছিল? তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিলেন–

صليت مع اصحابى صلاة العتمة بمكة معتما فاتانى جبرائيل بدابة -

অর্থ ঃ "আমি আমার সঙ্গী-সাথীগণের সঙ্গে একত্রেই রাত্রির পূর্ণ অন্ধকার সময়ের নামায (যাহা তখন পূর্ব আমলের কোন নিয়মে পড়া হইয়া থাকিত) মক্কা নগরীতেই পূর্ণ অন্ধকারে আদায় করিলাম। অতপর আমার নিকট জিব্রাঈলের আগমন হইল। (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) আমার সম্মুখে শ্বেত বর্ণের, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট রকমের একটি বাহন উপস্থিত করিয়া আমাকে তাহার উপর আরোহণ করান হইল (বিস্তারিত বিবরণ দানের পর হযরত (সঃ) বলিয়াছেন)–

ثم اتيت اصحابى قبل الصبح بمكة فاتاني ابو بكر (رضى الله عنه) فقال يارسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك فى مظانك -

অর্থ ঃ "তারপর আমি মক্কায় আমার সঙ্গী-সাথীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি ভোর হওয়ার পূর্বেই।" তখন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি ত আপনাকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই তালাশ করিয়াছি। তখন হযরত (সঃ) বায়তুল মোকাদ্দাস যাওয়ার উল্লেখ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়তুল মোকাদ্দাস ত মক্কা হইতে এক মাসের পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আবু বকর পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন।) হযরত (সঃ) তাঁহাকে বায়তুল মোকাদ্দাসের মোটামুটি অনেক নিদর্শন বলিয়া দিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) নব উদ্যমে বলিয়া উঠিলেন, বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রসূল। (তফসীর ইবনে কাসীর, ৩+১৩–১৪)

(২) হযরতের চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, মে'রাজের ঘটনার রাত্রে হযরত (সঃ) আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। হযরত (সঃ) সন্ধ্যা রাত্রের পরের নামায আদায় করিয়া শুইয়া পড়িলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে আমরা হযরতের সঙ্গে নিদ্রা হইতে উঠিলাম। প্রভাতের নামাযান্তে হযরত (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

لقد صليت معكم العشاء الاخرة كما رايت بهذا الوادى ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الان كما ترين -

অর্থ ঃ "আমি এই মক্কা নগরীতেই তোমাদের দৃষ্টির সমক্ষে এশার নামায আদায় করিয়াছিলাম, তারপর আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলাম, তথায় মসজিদে আমি নামায পড়িয়াছি, তারপর এখন তোমাদের সঙ্গেই ফজরের নামায আদায় করিলাম। (তফসীর ইবনে, কাসীর, ৩–১২)

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় দৃষ্টে ইহা বলা অবাস্তব হইবে না যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনাটি রাত্রের এক সুদীর্ঘ অংশে সংঘটিত হইয়াছিল।

মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল

১৮০৭। হাদীছ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ) قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً اُسْرِيَ بِهٖ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ -

অর্থ : পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন, "আমি যেসব অলৌকিক দৃশ্য বস্তুনিচয় আপনাকে দেখাইয়াছি– একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্য (তাহাদের নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি-না।)"

এই আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সমুদয় দৃশ্য ও বস্তুনিচয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করাই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূল (সঃ)-কে পরিদর্শন করানোর যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিদর্শন ছিল; উক্ত আয়াতে পরিদর্শনের কোন প্রকার রূপক অর্থ বা স্বপ্ন দেখার অর্থ উদ্দেশ্য নহে।)

যেই রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পরিদর্শন করানোর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচাত ভাই, যাঁহার পক্ষে স্বয়ং হযরত (সঃ) কোরআনের জ্ঞান ও দ্বীনের বুঝের জন্য বিশেষরূপে দোয়া করিয়াছিলেন– সেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বিষয়টি খোলাসারূপে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার ঘটনা। কোন প্রকারে শুধু আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন দেখার ঘটনা নহে। পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিম জমাতের ঈমান এবং আকীদা বিশ্বাসও ইহাই, যুক্তি প্রমাণে এই দাবীই গ্রহণীয়। কারণ–

(১) হযরতের পিতৃব্য-কন্যা "উম্মে হানী" যাঁহার গৃহে হযরত (সঃ) মে'রাজের রাত্রে অবস্থানরত ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এই যে, হযরত (সঃ) মে'রাজের রাত্রে আমার গৃহে শায়িত ছিলেন। পরে আমি দেখিতে পাইলাম হযরত (সঃ) গৃহে নাই, ফলে আমার নিদ্রা দূর হইয়া গেল। আমি চিন্তিত হইলাম যে, শত্রু দলের লোকেরা কোন কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে না কি। (রাত্র প্রভাতে নামাযান্তে) হযরত (সঃ) নিজেই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, রাত্রি বেলা জিব্রাঈল আসিয়া আমাকে গৃহ হইতে বাহির করেন এবং বোরাকে আরোহণ করাইয়া বায়তুল মোকাদ্দাসে লইয়া যান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনা যদি আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন হইত তবে গৃহ হইতে অন্তর্হিত হওয়ার অর্থ কি?

(২) শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণিত হাদীছে আছে, মে'রাজের রাত্রে ভোর বেলা আবু বকর (রাঃ) হযরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাত্রি বেলা কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আপনাকে তালাশ করিয়াছি। তদুত্তরে হযরত (সঃ) মে'রাজের ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

(তফসীর ইবনে কাসীর, ৩–১৪)

সশরীরে মে'রাজ না হইয়া থাকিলে হযরত (সঃ) রাত্রে নিখোঁজ হইলেন কিরূপে?

(৩) হযরত (সঃ) ভোর বেলা উক্ত ঘটনা সর্বসাধারণ্যে ব্যক্ত করিলেন এবং লোকদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গেল। হযরতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্য কাফেররা

এই ঘটনাকে বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিল। এমনকি কোন কোন নবদীক্ষিত দুর্বল বিশ্বাসের মুসলমান এই ঘটনা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কাফেরদের প্ররোচনায় ইসলাম হইতে সরিয়া পড়িল।

মে'রাজ ভ্রমণের বাস্তবতাই যদি হযরতের দাবী না হইত, তবে ঐরূপ আলোড়ন সৃষ্টির হেতু কি থাকিতে পারে? স্বপ্নে ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, সুতরাং সব রকম আলোড়ন ও দ্বিধাবোধের অবসান করার জন্য হযরতের পক্ষে শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব জাতীয় নহে, স্বপ্ন জাতীয়। ঐরূপ বলা হয় নাই, বরং বাস্তব ঘটনারূপে প্রমাণ করারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৪) ১৮০৭ হাদীছের মর্মে দেখা যায়, ঘটনার এক বিশেষ অংশ বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন সম্পর্কে হযরত (সঃ) কাফেরদের পক্ষ হইতে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; যদ্দরুন হযরত (সঃ) বিশেষভাবে বিব্রতও হইয়াছিলেন। অবশেষে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত (সঃ) উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

ঘটনা স্বপ্ন হইলে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠিত না এবং হযরতের বিব্রত হওয়ারও কোন কারণ ছিল না। ঘটনাকে স্বপ্ন বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর অবসান হইয়া যাইত।

মে'রাজের প্রতিরূপ বা স্বরূপ প্রদর্শন

১৮০৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ১১২০) عَنْ شَرِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ جَاءَهُ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُّوْحٰى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً اُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ كَذَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى احْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ بِئْرِ زَمْزَمَ .... فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

অর্থ ঃ ছাহাবী আনাছ (রাঃ) কা'বা গৃহের নিকট হইতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রাত্রি ভ্রমণের ব্যাপারে একটি বিবরণ ইহাও প্রদান করিয়াছেন যে, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা– হযরত (সঃ) হরম শরীফের মসজিদে (অন্যান্য লোকদের সঙ্গে) নিদ্রিত ছিলেন। এমতাবস্থায় (তিনি দেখিলেন,) তাঁহার নিকট তিন জন লোক আসিল। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলন, ইহাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি, উনিই তিনি। তখন তৃতীয় জন বলিল, সর্বোত্তম ব্যক্তিকে উঠাইয়া লও।

এই রাত্রির ঘটনা এতটুকু হইল– ইহার পর উক্ত আগন্তুকগণকে হযরত আর দেখিতে পাইলেন না; অবশ্য আর এক রাত্রে তাহারা পুনরায় আসিল। ঐ সময়ও হযরতের চক্ষুদ্বয় নিদ্রিত ছিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর নিদ্রিত ছিল না– অনুভূতি শক্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল। নবীগণের নিদ্রাবস্থা এইরূপই যে, চক্ষু নিদ্রমগ্ন হয়, অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।

এই রাত্রে আগন্তুকগণ আসিয়া কোন কথাবার্তা না বলিয়াই হযরত (সঃ)-কে বহন করিয়া জম্‌জম্‌ কূপের নিকট লইয়া আসিলেন। (১৮০০ নং হাদীছে বর্ণিত অনুরূপ আকাশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের দৃশ্য দেখার পর বলা হইয়াছে–) অতপর হযরতের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি হরম শরীফের মসজিদেই ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত (সঃ) ওহী মারফত প্রত্যক্ষভাবে জিব্রাঈল ফেরেশতার উপস্থিতি

দ্বারা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে খবর খবর প্রাপ্ত হইতেন। নবুয়তের পূর্বে সেই ওহীরই প্রতিরূপ বা স্বরূপ আকারে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে সত্য স্বপ্ন দেখান হইত যাহা দিবালোকের ন্যায় বাস্তবায়িত হইয়া থাকিত। নবুয়তের নিকটবর্তী ছয় মাসকাল ঐরূপ স্বপ্নের খুব আধিক্য হইয়াছিল যাহার উল্লেখ প্রথম খণ্ডে ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

তদ্রূপ মে'রাজের ন্যায় বিশেষ অলৌকিক ও অতি অসাধারণ, বরং মানুষের ধ্যান, খেয়াল ও ধারণা বহির্ভূত ঘটনা, যাহা হযরতের পক্ষে বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল, ঐ ঘটনারও অবিকল প্রতিরূপ হযরত (সঃ)-কে নবুয়তের পূর্বে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লিখিত হাদীছে সে স্বপ্নের মাধ্যমে মে'রাজের বর্ণনা হইয়াছে যাহা ভিন্ন ঘটনা, পক্ষান্তরে বাস্তব মে'রাজ ভিন্ন ঘটনা।

অনেক ধোকাবাজ লোক সর্বসাধারণকে এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মে'রাজ শরীফ স্বপ্নের ঘটনা ছিল মাত্র, বাস্তব ঘটনা ছিল না। সেই ধোকাবাজগণ উল্লিখিত হাদীছখানা দ্বারা নিজেদের দাবী প্রমাণ করিতে চাহে। তাহাদের বুঝা উচিত যে, বাস্তব মে'রাজের কোন সম্পর্ক এই হাদীছের সঙ্গে মোটেই নাই। কারণ, বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে এই হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, قبل ان يوحى اليه অর্থাৎ এই ঘটনা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা, অথচ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ত সমস্ত ঐতিহাসিক মোফাস্‌সের মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্ত, বরং বিশ্ব মুসলিমের আক্বীদা ইহাই যে, তাহা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তির পরের ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনা যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী আনাছ (রাঃ), তিনিই বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ১৮০১ এবং ১৯০২ নং হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছদ্বয়ে এমন কোন একটি অক্ষরও নাই যাহার দ্বারা মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, আলোচ্য হাদীছ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে নহে।

আলোচ্য হাদীছখানা যে বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কীয় মোটেই নহে, সে সম্বন্ধে ইমাম বোখারী (রঃ) সম্পূর্ণ একমত! তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায় যে, "ইস্‌রা ও মে'রাজ" নামে বোখারী (রঃ) বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদদ্বয়ের মধ্যে আলোচ্য হাদীছখানার কোন উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় মূল গ্রন্থের সমাপ্তির নিকটবর্তী যাইয়া অন্য এক প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীছখানা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুধু ধোকা ভঞ্জনের উদ্দেশে এই স্থানে উক্ত হাদীছখানার আলোচনায় সঠিক মর্ম উদঘাটনে বাধ্য হইয়াছ।

মে'রাজের মূল ঘটনা বাস্তব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(১) শাদ্দাদ ইবনে আওস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রেওয়ায়াতে এই বিষয়টিও উল্লেখ আছে যে, মোশরেকগণ মূল ঘটনর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি তাহার সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের পথে তোমাদের একটি সওদাগরী কাফেলার নিকট দিয়া অমুক স্থানে আমি পথ অতিক্রম করিয়াছি। তথায় তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল, অমুক ব্যক্তি সেই উটটি তাহাদের নিকট আনিয়া দিয়াছে। তাহারা (সেই পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে, সেই অনুপাতে) অমুক অমুক মঞ্জিল হইয়া অমুক দিন তাহারা মক্কায় পৌছিবে। কাফেলার সম্মুখ ভাগে গোধূম বর্ণের একটি উট রহিয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে কাল রংয়ের কম্বল বিছান এবং কাল রংয়েরই দুইটি বস্তা রহিয়াছে।

নির্ধারিত দিনে সেই কাফেররা মক্কায় পৌঁছিল এবং হযরত রসূলুল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত দেখা গেল।

(২) ১ম খণ্ড ৬ নং হাদীছ যাহার মধ্যে রোম সম্রাট হেরাকলের প্রতি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপি প্রেরণ এবং আবু সফিয়ান ও হেরাকলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে; সেই হাদীছেরই এক রেওয়ায়াতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, মিথ্যাবাদী নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার ভয়ে রোম সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে রসূলুল্লাহর মর্যাদাহানিমূলক কোন উক্তি করার সুযোগ না পাইয়া আমি তাঁহার রাত্রি ভ্রমণের কাহিনীটি রোম সম্রাটের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। আমি বলিলাম, বাদশাহ নামদার! আমি নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা জ্ঞাত করিব যাহাকে অবশ্যই আপনি মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বলিলাম, তিনি এই দাবী করিয়াছেন যে, আমাদের দেশ মক্কা হইতে বাহির হইয়া এক রাত্রে এই শহরস্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে পৌঁছিয়াছিলেন এবং সেই রাত্রেই প্রভাত হওয়ার পূর্বে মক্কা নগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই কথাবার্তার সময় বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রধান পোপ বা লাট পাদ্রী রোম সম্রাটের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, উক্ত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আমিও জ্ঞাত আছি। রোম সম্রাট পোপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট সেই ঘটনার অবগতি কিরূপে? পোপ বলিলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমার উপর; আমি নিদ্রার পূর্বে অবশ্যই দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া থাকি। আলোচ্য ঘটনার রাত্রিতে আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিতে লাগিলাম, সব দরজাই বন্ধ হইল, কিন্তু একটি দরজা কোন উপায়েই বন্ধ হইল না। এমনকি উপস্থিত লোকজনসহ মসজিদের সমস্ত খাদেমগণ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-তদবীর করিয়াও হেলাইতে পারিল না, তাহা পাহাড়ের ন্যায় অটল মনে হইতেছিল। অতপর ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনা হইল, তাহারা সব কিছু দেখিয়া বলিল, দরজার উপর দিকের চৌকাঠটি নীচে নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাত্রি বেলা দরজা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ভোরে দেখা যাইবে, এরূপ কেন হইল?

পোপ বলিলেন, দরজার উভয় কপাট খোলা রাখিয়াই আমি শয়ন কক্ষে চলিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর উক্ত দরজার নিকট উপস্থিত হইলাম (এবং দেখিলাম দরজাটি এখন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাও) দেখিলাম যে, মসজিদের এক কোণে (লোহার কড়ার ন্যায় মধ্যভাগে ছিদ্রবিশিষ্ট যে একটি পাথর ছিল এবং তাহার সেই ছিদ্র বহু দিন হইতে বন্ধ ছিল; আজ সেই) পাথরের ছিদ্র খোলা রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে বাহন বাঁধার নিদর্শন রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলিলাম, গত রাত্রিতে এই দরজাটি আখেরী নবীর আগমন উপলক্ষেই খোলা থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই নবী রাত্রে আসিয়াছিলেন এবং এই মসজিদে নামায পড়িয়া গিয়াছেন। *

(খাসায়েসে কোবরা। ১-১৭০ এবং তফসীর ইবনে কাসীর, ৩-২৩)

মে'রাজের সম্ভাব্যতা ঃ মে'রাজ শরীফ সম্পর্কে দুইটি প্রশ্নই বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে ঃ (১) সুদীর্ঘ ভ্রমণ, যাহার জন্য হাজার হাজার বৎসর আবশ্যক, কারণ এক হাদীছের বর্ণনাদৃষ্টে প্রত্যেকটি আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় এক হাজার বৎসর আবশ্যক। * এই হিসাবে সাত আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় সাত হাজার বৎসর আবশ্যক। তার ঊর্ধ্বে মহান আরশ ইত্যাদি বহু কিছুর ভ্রমণ মে'রাজের ঘটনায় হইয়াছিল,

---

* পোপের এই মন্তব্য আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতানুসারেই ছিল, কারণ পূর্বকালে নবীগণ এই বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া নিজ নিজ বাহন উক্ত ছিদ্রবিশিষ্ট পাথরের সঙ্গেই বাঁধিয়া থাকিতেন। তাহা নবীগণের ব্যবহারের জন্যই ছিল এবং দীর্ঘ ছয় শত বৎসর হইতে অব্যবহৃত থাকায় তাহার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শেষ যমানার নবীর মে'রাজ সম্পর্কেও আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ ছিল।

* পথ চলার সাধরণ নিয়মের পরিমাণ দৈনিক ১৬/১৭ মাইল হিসাবে এই নির্ধারণ অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রতিটি আকাশ এবং দুই আকাশের ব্যবধানের এই হিসাব।

এমনকি হযরত (সঃ) এই ঘটনায় তিন লক্ষ বৎসরের পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়।(তফসীর রহুল মাআ'নী, ১৫-১১)

এত বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ শুধু এক রাত্রে, বরং তাহার এক অংশে কিরূপে হইতে পারে?

(২) মহাশূন্যে বায়ুহীন অগ্নি ইত্যাদির যেসব স্তর বা মণ্ডল বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐসব অতিক্রম করা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল এবং রক্ত-মাংসে গঠিত জীব মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

পাঠকবর্গ! এই ধরনের যত প্রশ্নই সম্মুখে আসুক, সবের খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় একটি শব্দের মাধ্যমে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন- سبحان الذى اسرى "অতি মহান (সর্বশক্তিমান" সর্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে) পাক-পবিত্র যিনি, তিনি এই ভ্রমণ করাইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বর্তমান রকেটের যুগে ঐ ধরনের প্রশ্ন ত একমাত্র হাস্যাস্পদই গণ্য হইতে পারে। কারণ মানুষ এইরূপ দ্রুতযান তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে যাহা ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল তথা প্রায় এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিতে পারে *।

আল্লাহ তাআলা ত বহু পূর্বেই এর চেয়ে কত অধিক দ্রুতগামী বস্তু তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত হিসাব অনুসারেই পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৮৪৪৬ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবী তাহার বার্ষিক গতিতে প্রতি ঘণ্টায় এগার বৎসরের অধিক কালের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। আলো এবং শব্দের গতি আরো অধিক। মহান আল্লাহ তাআলা যে আরও কত কত অধিক দ্রুত গতির বস্তু ও বাহন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতে পারেন তাহার অনুভূতি আমাদের ঈমানের উপর নির্ভর করে, হিসাবের আওতায় নাও আসিতে পারে। ولا يحيطون بشئ من عمله আল্লাহ তাআলার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম পরিধি মানুষ হিসাবের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে বাহন প্রথমে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহার নাম 'বোরাক' যাহা 'বারক' শব্দ হইতে গৃহীত; তাহার অর্থ বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের গতি যে কত দ্রুত তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আকাশে এবং ইলেকট্রিক তারে প্রত্যেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। উক্ত বাহনটির দ্রুত গতি বুঝাইবার জন্যই তাহার এই নামকরণ হইয়াছে। তাহার পরে আরও বিশিষ্ট বাহন ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া হাদীছে বর্ণনা আছে।

আল্লাহ তাআলার নগণ্য সৃষ্টি মানুষ আজ শূন্যে জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষে সেই মহাশূন্য জয় করা কোন প্রকারে জটিল হইতে পারে- এরূপ ধারণা পাগলের পক্ষেও সম্ভভ কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা

মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল; সেই সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং নাসায়ী শরীফসহ অনেক হাদীছের কিতাবেই তাহা বিদ্যমান আছে। বোখারী শরীফে এই সম্পর্কে একাধিক হাদীছ উল্লেখ আছে। ১৮০০ নং হাদীছের বিবরণ অতি সুস্পষ্ট, বিস্তারিত এবং এই সম্পর্কে হেরফেরকারীদের সব রকরমের ধোঁকা ভঞ্জনে বিশেষ সহায়ক। কারণ,

* আমেরিকার গভর্নমেন্ট ২৯ জুলাই ১৯৬৪ ইং তারিখে চাঁদের ফটো লইবার জন্য ৮০৬ পাউণ্ড ওজনের "Ranger-7" নামের যেই মহাশূন্যযান চাঁদের দিকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল ছিল বলিয়া রয়টার ও এ, পি,পি, পরিবেশিত খবর ২৯ শে জুলাইর সমুদয় খবরের কাগজেই প্রকাশ হইয়াছিল। সম্মুখে আরও অনেক কিছু হইবে।

এই হাদীছ মূল বিষয়টিকে شق শাক্ক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, অর্থ বিদীর্ণ করা, যাহা একটি বাহ্যিক কার্য। সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীছের বিবৃতিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং হযরত (সঃ) স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করতঃ বিদীর্ণ কার্য সমাধার সীমা নির্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ما بين هذه الى هذه এই স্থান হইতে এই স্থান পর্যন্ত। যাহার ব্যাখ্যায় পরম্পরা ঘটনা বর্ণনাকারী বা সাক্ষীগণ বলিয়াছেন– সিনার উপরিভাগ হইতে নাভির নিম্নদেশ পর্যন্ত। হযরত (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, তৎপর আমার হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিয়া ধৌত করা হইয়াছিল। ১৮০১ নং হাদীছে এবং আরও অনেক হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, অতপর আমার বক্ষ জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। তারপর হযরত নবী (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈমান ভরা একটি পাত্র আনা হইয়াছে যদ্দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ নং হাদীছে আছে– ঈমান ও হেকমত ভরা একটি পাত্র আনিয়া আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তথ্যটির তাৎপর্য এই যে, স্বর্ণ পাত্রে করিয়া এমন কোন বস্তু আনা হইয়াছিল যাহা ঈমান ও হেকমত তথা পরিপক্ক জ্ঞানবর্ধক ছিল, যেমন নানা প্রকার টনিক বা ইনজেকশন বোতল ও শিশিতে করিয়া আনিয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহার কোনটা দর্শনশক্তি বর্ধক, কোনটা শ্রবণশক্তি বর্ধক, কোনটা হৃদশক্তি বর্ধক হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈমান ও হেকমতের উন্নতির ধাপ আল্লাহর দরবারে অসংখ্য রহিয়াছে, অতএব হযরতের পক্ষে তাহা বর্ধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

হযরত আরও বলিয়াছেন যে, অতপর হৃৎপিণ্ডটি তাহার নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'যোরকানী' নামক কিতাবে আছে, হযরতের সিনা মোবারক চাক বা বিদীর্ণ করিয়া অতপর সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম শরীফের হাদীছে ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরতের বক্ষ মোবারকে সেই সেলাইর নিদর্শন দেখিয়াছেন।

বর্তমান সার্জিক্যাল চিকিৎসা ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতির যুগে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধরনের সংশয় বা দ্বিধাবোধ যে মোটেই সঙ্গত হইবে না তাহা অতি সুস্পষ্ট।

"সিনা চাক্ বা বক্ষ বিদীর্ণ" হযরতের উপর বার বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(১) সর্বপ্রথম সিনা চাক করা হইয়াছিল বাল্যকালে চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের সময়। তখন তিনি দুধমা হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ছিলেন।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধ পান" আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই ঘটনার বর্ণনায় পাঁচখানা হাদীছ বর্ণিত আছে। (সীরাতে মোস্তফা, ১-৫৭)।

এই ঘটনার বিবরণে একটি তথ্য বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদ্বয় হযরতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে জমাট রক্তের দুইটি টুকরা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহা শয়তানের অংশ।

সিনা চাক অস্বীকারকারীগণ ঘটনার এই অংশটুকুকে সম্বল করিয়া হযরতের মর্যাদাহানীর দোহাই দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহাদের বোকামি। কারণ মানুষ হিসাবে হযরতের ভিতরে সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য মানুষের ন্যায় সব কিছুই ছিল, যেমন তাঁহার ভিতরে মল-মূত্রের ন্যায় বস্তুর সঞ্চার হইত।

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শয়তানী কাজ তথা খেলাধুলা ও অপরাধপ্রবণতায় মাতিয়া উঠে; তাহার উৎস মূল হিসাবে পরীক্ষা ক্ষেত্র ইহজগতে পরীক্ষার্থী মানুষ জাতের মানবীয় দেহের অংশ হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ঐ ধরনের একটা বস্তু থাকে। মানুষ হিসাবে হযরতের হৃৎপিণ্ডেও তাহা থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি নবী হিসাবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অঙ্কুরেই ঐ মূল উৎস নিপাত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধপান" আলোচনায় টীকার মধ্যে রহিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বার দশ বৎসর বয়সে। (৩) তৃতীয় বার নবুয়তপ্রাপ্তির সময়। (৪) চতুর্থ বার মে'রাজের ভ্রমণ উপলক্ষে– যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

প্রথম বারের বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য তাহার বর্ণনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয় যে, الشباب شعبة من الجنون সকল প্রকার উন্মাদনার সময় হইল যৌবনকাল।" এই ভয়াবহ যৌবনই আবার সব রকম বল-শক্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস। যৌবনের এই দু'ধারী ঢেউ সংযত ও সুসংহত রাখার জন্য যৌবনের সূচনার পূর্বেই বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় বারের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট; ওহী এক অসাধারণ আভ্যন্তরীণ চাপের বস্তু (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য), ঐ চাপ সামলাইবার যোগ্য শক্তি-সামর্থ্য প্রদানই ছিল এই বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য। চতুর্থ বারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ত এই রকেট যুগে নিতান্তই সহজবোধ্য। মানব দেহ ঊর্ধ্ব জগতে বিচরণযোগ্য করার জন্য রকেট আরোহীদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কত রকমে প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তাআলার অসাধারণ বিশেষ সৃষ্টি নূরের তাজাল্লীতে তুর পর্বত খান খান হইয়া গিয়াছিল পয়গম্বর মূসা (আঃ) চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে এই ভ্রমণে মহান সিদরাতুল মোন্‌তাহা ও মহান আরশের উপর উক্ত নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণ বেশী নূরের তাজাল্লী পূর্ণ চৈতন্য বজায় রাখিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে এবং সেই নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা আরও কত উর্ধ্বের মহান মহান বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিতে হইবে। সেই শক্তি-সামর্থ্যের প্রস্তুতিও ত ভ্রমণ আরম্ভে সম্পন্ন করিতে হইবে। এ সবই ছিল চতুর্থ বার বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য।*

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী তাঁহার পরে কোন নবী হয় নাই কেয়ামত পর্যন্ত হইবেও না

১৮০৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এবং আমার পরবর্তী নবীগণের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া রাখ– এক ব্যক্তি একের পর এক ইটের গাঁথুনি দ্বারা একটি সুদৃশ্য সুন্দর অট্টালিকা বা ঘর তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু তাহার এক কোণায় একখানা ইট রাখার স্থান খালি রাখিয়াছে। দর্শকগণ ঘরখানা দেখিয়া খুবই প্রশংসা করে, কিন্তু এই বলিয়া অনুতাপও প্রকাশ করিতে থাকে যে, এই স্থানে একখানা ইট রাখিয়া ঘরখানার সম্পূর্ণতা সাধন করা হইল না কেন! হযরত (সঃ) বলেন– فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

"আমি সেই অবশিষ্ট একখানা ইট; আমি সর্বশেষ নবী।"

ব্যাখ্যা ঃ সৃষ্টির সেরা মানব জাতির দ্বারা এক আল্লাহর প্রভুত্বের বিকাশ সাধন– যাহা সারা জাহান সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রতিনিধি রসূল বা নবীগণের যে বহর প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই নবী বহরকে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সুদৃশ্য অট্টালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তটি নবীগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। নবীগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত নিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে ঐক্য শৃঙ্খলে এইরূপ অবিচ্ছেদ্য ও মজবুতভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা মোটেই ছিল না, বরং তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক ছিলেন, যেরূপ কোন একটি সুদৃশ্য সৌধ বা অট্টালিকা হাজার হাজার সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ইট দ্বারা তৈয়ার হয়, কিন্তু ঐ ইটগুলি সকলে মিলিয়া একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনে এত দৃঢ়তররূপে একত্রিত হয় যে, অবশেষে এত এত সংখ্যার ইটগুলি সৌধ বা অট্টালিকা তথা একটি বস্তুতে পরিণত হইয়া পড়ে।

---

* বহু সমালোচিত আকরম খাঁ মরহুম এইসব উর্ধ্বের বিষয়াবলী হইতে অজ্ঞ থাকায় বক্ষ বিদারণের মোজেযা অস্বীকার করিতে যাইয়া তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থে যেসব প্রলাপ করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। পাঠক উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্মুখে রাখিয়া খাঁ মরহুমের অসার প্রলাপগুলির খণ্ডন বুঝিয়া নিবেন; আশা করি বেগ পাইতে হইবে না।

অতএব, যেই ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র শেরক তথা এক আল্লাহর প্রভুত্বের বরখেলাফী থাকিবে তাহা সমস্ত নবীর তরীকার পরিপন্থী সাব্যস্ত হইবে, তাহাকে কোন নবীর তরীকা বা শরীয়তরূপে মনে করা বা দাবী করা অবাস্তব ও মিথ্যা হইবে। ধারাবাহিকরূপে নবীগণের আগমন অব্যাহত থাকিয়া সর্বশেষ নবী আগমনের পূর্বে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরকাল নবী আগমন বন্ধ থাকা এবং সুদীর্ঘ সময় সেই অবশিষ্ট সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, অট্টালিকা নির্মাতা ধারাবাহিকরূপে ইটের গাঁথুনি দ্বারা সুদৃশ্য অট্টালিকা তৈয়ার করিয়াছে, শুধু একখানা ইটের স্থান খালি রহিয়াছে, দর্শকগণ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়ার কামনা ও প্রতীক্ষায় রহিয়াছে!

অবশিষ্ট সর্বশেষ নবী যে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ই ছিলেন- দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইবার জন্য হযরত (সঃ) বলিতেছেন যে, ঐ অট্টালিকায় একটিমাত্র ইটের শূন্যস্থান পূরণকারী ইটখানা হইলাম আমি।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর নবুয়তের সৌধ মধ্যে কাহারও প্রবেশের অবকাশই যে রহিল না, নবীগণের সারিতে দাঁড়াইতে পারে এমন আর কেহই যে বাকী থাকিল না, এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বীয় উম্মতকে প্রতারণার হাত হইতে রক্ষাকল্পে দৃষ্টান্ত দান শেষে হযরত (সঃ) বলিলেন, انا خاتم النبين আমি সর্বশেষ নবী।"

বোখারী শরীফ ৫০১ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীছ পূর্বে অনূদিত হইয়াছে; উক্ত হাদীছখানা বোখারী শরীফ ৭২৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ

لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِىْ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ ঃ হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমার বিশেষ পাঁচটি নাম আছে- "আমার নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং মাহী'- নিশ্চিহ্নকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফুরীর মূল উৎপাটন করিবেন এবং আমার নাম হাশের- একত্রকারী; সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে আমার পিছনে একত্রিত করা হইবে এবং আমার নাম "আ'কেব"। (মুসলিম শরীফ ২-২৬১পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছে এই নামটির তাৎপর্য উল্লেখ আছে যে, والعاقب الذى ليس بعده 'আ'কেব অর্থ সকলের পিছনে আগমনকারী- আমি এমন নবী যেই নবীর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।)

১৮১০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৯১) আবু হযম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর শিষ্যত্বে আমি রহিয়াছি। তাঁহাকে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, হযরত নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রাঈলদিগকে নবীগণ পরিচালিত করিতেন- যখন এক নবীর মৃত্যু হইত তখনই তাঁহার স্থলে আর এক নবীর আবির্ভাব হইত, কিন্তু তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না, অবশ্য আমার স্থলে খলীফা বা কার্য পরিচালনকারী দাঁড়াইবে।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি পরামর্শ দেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, প্রথমে যেব্যক্তিকে তোমরা খলীফা নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি সমর্থন বজায় রাখিয়া চলিবে, অতপর তাহার পরে যাহাকে নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি- এইভাবে পর পর নির্বাচিত খলিফাগণের হক আদায় করিয়া যাইবে। (তাহাদেরও সতর্ক থাকিতে হইবে) স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহাদের হইতে হিসাব লইবেন যে, তাহারা তোমাদের পরিচালন কার্য কিরূপ সমাধা করিয়াছিল।

১৮১১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৩) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তবুকের জেহাদে যাইবার কালে তাঁহার স্থলে আলী (রাঃ)-কে মদীনার শাসনভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আলী (রাঃ) জেহাদে যাওয়ার প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই তিনি মনঃক্ষুণ্ণরূপে বলিলেন, আমাকে আপনি

(জেহাদে অক্ষম) শিশু ও নারীদের দলভুক্তরূপে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তখন হযরত (সঃ) আলী (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দানে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (রাঃ) যেরূপ হারুন (রাঃ)-কে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আল্লাহর আদেশে তুর পর্বতে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আমার স্থানে থাকিবে। অবশ্য (তুমি হারুন আলাইহিস সালামের ন্যায় নবুয়ত প্রাপ্ত হইবে না, কারণ) الا انه ليس نبى بعدى– "আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইতে পারে না।"

১৮১২ হাদীছ ঃ (পৃঃ ১০৩৫) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নবুয়তের কোন অংশই বাকী নাই (যাহা কেহ লাভ করিতে পারে)। শুধু মোবাশশেরাত বাকী রহিয়াছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মোবাশশেরাত কি জিনিস? তিনি বলিলেন, তাহা হইল সুস্বপ্ন।

ব্যখ্যা ঃ নবীর নিকট নবুয়ত সংশ্লিষ্ট অনেক বস্তুই থাকে, যেমন– ওহী, আসমানী কিতাব, মোজেযা ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক নিম্নের বস্তু হইল "সুস্বপ্ন"।

বোখারী শরীফ ১০৩৬ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে–

رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة .

অর্থ ঃ "মোমেনগণের সুস্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ" তথা এই বস্তুটি নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের শ্রেণীভুক্তই বটে, কিন্তু নিম্নস্তরের এবং বহু দূর সম্পর্কীয়। কোন হাদীছে ইহাকে সত্তর ভাগের এক ভাগও বলা হইয়াছে। দূর সম্পর্কটা বুঝানই উভয় হাদীছের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই দূর সম্পর্কীয় বস্তুটিই বাকী রহিয়াছে যাহা মোমেনেরই লাভ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন নবুয়তের আর কোন অংশ বাকী নাই যাহা কেহ লাভ করিতে পারে। সুতরাং অন্য কাহারও নবুয়ত লাভের কোন অবকাশই নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর ছিলেন, তাঁহার পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। এই সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ কয়টি শুধু বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ভিন্ন মুসলিম শরীফ ও সেহাহ্ সেত্তাহ্র অবশিষ্ট কিতাব এবং হাদীছ-তফসীরের অন্যান্য কিতাবে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে যাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ইসলাম ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞ সকলেই একমত হইয়া স্পষ্ট ফতওয়া দিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর, তাঁহার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং কেয়ামত পর্যন্ত হইবে না– এই আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস যদি কাহারও না থাকে এবং সে অন্য কাহাকেও নবীরূপে স্বীকার করে তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের গণ্য হইবে; তাহাকে অমুসলিম বিধর্মী গণ্য করা সকল মুসলমানের পক্ষে ফরয।

স্বয়ং হযরত (সঃ)ও এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন, যাহার কারণও তিনি এক হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি বোখারী শরীফ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। হাদীছটি সুদীর্ঘ, তাহাতে এই অংশটুকু রহিয়াছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلٰثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

অর্থ ঃ "কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে যাহারা পয়গম্বর হইবার দাবী করিবে; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হইবে। এইসব প্রতারক হইতে সতর্ক করার উদ্দেশেই নবী (সঃ) এইরূপ ঘোষণা শুনাইয়া থাকিতেন, "আমি সর্বশেষ পয়গম্বর, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।"

রহমাতুল লিলআলামীন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে বিশ্ব কল্যাণ, বিশ্ব মঙ্গল ও সারা বিশ্বের জন্য করুণারূপে পাঠাইয়াছি।"

সারা জাহান আল্লাহর সৃষ্ট, নবীজীও আল্লাহর সৃষ্ট; সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই বলিয়াছেন- নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে তিনি সারা জাহানের জন্য মঙ্গল ও করুণারূপে পাঠাইয়াছেন। এই তথ্যের সৃষ্টিগত রহস্য নিশ্চয় কিছু রহিয়াছে এবং সেই রহস্যই বড় কারণ নবীজীকে রহমতুল লিল আলামীন আখ্যা দেওয়ার। এতদ্ভিন্ন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেওয়া শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন হইয়াছে সেই সব শিক্ষা নীতি এবং আদর্শ কল্যাণের জন্য মহাদান। তাহার অনুসরণ অনুকরণে অমুসলিমরা জাগতিক কল্যাণ লাভে ধন্য হইতে পারে।

নবীজীর হাজার হাজার হাদীছের মধ্যে ঐসব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের বর্ণনা রহিয়াছে। নমুনাস্বরূপ আমরা ঐ সবের সামান্য আলোচনা করিতেছি।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থা দানে রহমতুল লিলআলামীন

১। নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মহান আদর্শ-

মঙ্গল ও কল্যাণময় শাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হইল মানুষের ত্রিবিধ নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। সেই বিষয়ে নবীজীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল অতুলনীয়। তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ- বিদায় হজ্জে লক্ষাধিক মুসলমনের উপস্থিতিতে নীতি নির্ধারণী ভাষণে নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন- "মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত, এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত থাকিবে; পরস্পর কাহারও দ্বারা তাহার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হইতে পারিবে না।"- রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকিবে প্রতিটি মানুষের এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ-

পূর্বোল্লিখিত মৌলিক অধিকার ও নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগে এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার লাভে সকলে সমান অধিকারী।

বিদায় হজ্জের সমাবেশেই নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন- সকল মানুষের আদি পিতা এক আদম; অতএব মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারে সকলে সমান পরিগণিত হইবে। আরবি এবং অ-আরবি, সাদা এবং কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য হইবে না।

আভিজাত্যের গর্বে নবীজীর নিজ বংশ কোরায়শ গোত্র সর্বাগ্রে ছিল। তাই মক্কা বিজয়ের ভাষণেও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অভিজাত-অনভিজাত, উচ্চ-নীচ ইত্যাদির ব্যবধানে যে বিচার পার্থক্য প্রচলিত ছিল তাহার উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়া বিচারে সকলকে সমান সাব্যস্ত করিয়াছিলেন (তৃতীয় খণ্ড মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)।

৩। সংখ্যালঘুর প্রতি অসীম উদারতা এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা ও নাগরিকত্বের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান-

নবী (সঃ) ঘোষণা দিয়াছেন– যেব্যক্তি কোন অমুসলিম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করিবে বা তাহার প্রাপ্য কম দিবে কিম্বা তাহার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিবে অথবা তাহার মন তুষ্টি ছাড়া তাহার কোন বস্তু হস্তগত করিবে; ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কেয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদী হইব।

(মেশকাত শরীফ, ৩৫৪)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, অমুসলিম অনুগত নাগরিককে যে মুসলমান হত্যা করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। (বোখারী শরীফ ১০২১)।

৪। নিরাশ্রয়, অসহায়, এতিম বিধবা– নিঃস্বদের প্রতিপালনে রাষ্ট্রের উপর ব্যাপক দায়িত্ব অর্পণ। কথায় বা কলমে অর্পণই নহে শুধু, স্বয়ং নবীজী (সঃ) ঐ দায়িত্ব বহন করিয়াছেন এবং সকল রাষ্ট্রনায়কের উপর তাহা বর্তাইয়া গিয়াছেন।

যেব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া বা পরিশোধের ব্যবস্থাও না রাখিয়া মরিয়া যাইত, প্রথম দিকে নবীজী (সঃ) তাহার জানাযার নামায নিজে পড়িতেন না। অতপর বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে নবীজী মোস্তফা (সঃ) এক যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করিলেন, من ترك دينا اوضياعا فعلى যেকোন অসহায় ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদে ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধে অক্ষম অবস্থায় মরিয়া যাইবে কিম্বা নিরাশ্রয় এতিম বিধবা রাখিয়া যাইবে তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করা এবং এতিম বিধবার প্রতিপালন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আমার জিম্মায় থাকিবে। বায়তুল মাল সরকারী ধনভাণ্ডারের প্রথম ব্যয় বরাদ্দই ইহা। (বোখারী শরীফ)

৫। জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়ক যে জনগণের শাসক হইয়াছে সে জনগণকে পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে; জনগণের সম্পর্কে সে দায়ী থাকিবে। (বোখারী)

৬। ক্ষমতাসীন হইয়া জনগণের প্রয়োজনের আড়ালে থাকিতে পারিবে না–

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান জনসাধারণের শাসনক্ষমতায় সমাসীন হইয়া যেব্যক্তি তাহাদের অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবেন (মেশকাত শরীফ, ৩২৪)

বোখারী শরীফে আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দারোয়ান ছিল না–

৭। শাসন পরিচালকদের ন্যায়নিষ্ঠা হইতে হইবে।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দশজন লোকের উপর ক্ষমতাধিকারী ছিল তাহাকেও কেয়ামত দিবসে গলবদ্ধ শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় হাশর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। অতপর হয় তাহার ন্যায়পরায়ণতা তাহাকে মুক্ত করিবে, না হয় তাহার অত্যাচার-অবিচার তাহাকে ধ্বংসের নরকে পতিত করিবে। (মেশকাত ৩২১)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভকারী ভালবাসার পাত্র হইবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর সর্বাধিক গজবের পাত্র এবং আযাবে পতিত হইবে অত্যাচারী শাসক। (ঐ ৩২২)

৮। শাসকদের কর্তব্য জনগণের আস্থাভাজন ও প্রিয় হওয়া–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, উত্তম শাসক তাহারা যাহাদিগকে জনগণ ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে, তাহারাও জনগণকে ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে। আর নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত শাসক তাহারা যাহাদের প্রতি জনগণ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে, তাহারাও জনগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে। (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৯। ক্ষমতায় থাকিয়া জনগণের কল্যাণ মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীন হইয়া যেব্যক্তি জনগণকে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের সহিত প্রতিপালন না করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। (বোখারী শরীফ)

১০। ক্ষমতা লাভ করিয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শাসক হইয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরূপে মরিবে, আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। (মেশকাত শরীফ ৩২১)

১১। ক্ষমতা লাভ করিলে সতর্ক থাকিবে যেন জনগণের জীবন-মান সঙ্কীর্ণ না হয়–

নবী (সঃ) এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! যেব্যক্তি আমার উম্মতের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে, তুমি ঐ ব্যক্তির জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দাও। আর যেব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন যাপন সহজ করিয়া তোলে তুমি তাহার সব কিছু সহজ করিয়া দাও। (মেশকাত শরীফ, ৩২১)

কত শাসক নির্বাসিত বা কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কত শাসক সবংশে ধ্বংস হইয়া যায়; জীবন সঙ্কীর্ণ হওয়ার পরিণাম ইহজগতে এই, পরকালে আরও যে কত সঙ্কীর্ণ হইবে!

১২। কোন শাসক বা আমলা সরকারী ধন অন্যায়ভাবে ব্যয় করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লাহর তথা জনগণের সরকারী মালের অন্যায় ব্যবহার করে; কেয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য নরক নির্ধারিত। (বোখারী শরীফ)।

১৩। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও সরকারী ধন নির্ধারিত পরিমাণের বেশী ব্যয় করা হারাম।

১৪। শাসক প্রশাসকদের অবশ্যই সরল-সহজ, ভোগ-বিলাসবিহীন, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইবে।

নবী (সঃ) ছাহাবী মোআয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশের গভর্নর পদে নিযুক্ত করিয়া বিদায়কালীন উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন– বিলাসিতার জীবন যাপন সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে। আল্লাহ ভক্ত লোক বিলাসপ্রিয় হয় না। (মেশকাত শরীফ, ৪৪৯)

নবী (সঃ) মোআয (রাঃ)-কে ইয়ামনের গভর্নর মনোনীত করিলেন। তিনি যাত্রা করার পর নবী (সঃ) সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করাইলেন এবং বলিলেন, আমার অনুমতির বাহিরে কোন কিছু করিবে না। ঐরূপ ব্যয় খেয়ানত বা আত্মসাত গণ্য হইবে এবং কেয়ামত দিবসে ঐ খেয়ানতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হাশর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সতর্কবাণীর জন্য প্রত্যাবর্তন করাইয়াছিলাম; এখন নিজ কার্যস্থলে যাত্রা কর। (মেশকাত শরীফ)

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনমানের উপরই চলিবে, নিজ অবস্থার উর্ধ্বে ভোগ-বিলাসে রাষ্ট্রের ধন ব্যয় করিবে না–

নবীজীর গোটা জীবনই উক্ত আদর্শের মহাগ্রন্থ ছিল। তাঁহার বাসস্থান খেজুর গাছের খুঁটীও আড়ায় তৈয়ার। ছিল। এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়াইলে বিবি আয়েশা (রাঃ) শায়িত অবস্থায় সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহার পা গুটাইলে নবী (সঃ) সেজদা করিতে পারিতেন। এতটুকু মাত্র উঁচু ছিল যে, ১২/১৪ বৎসরের বালকের হাত সেই ঘরের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছিত। দরজায় লোমের চট লটকানো ছিল। তাঁহার গৃহের উনুনে মাসেককাল পর্যন্ত আগুন জ্বলিত না; পরিবারবর্গ খেজুর ও পানির উপর জীবন যাপন করিতেন। যখন রুটি জুটত বেশীর ভাগ যবেরই হইত, গমের রুটি এবং গোশ্‌ত কমই হইত; পাতলা চাপাতি রুটি কখনও গৃহে তৈয়ার হইত না। কাপড়ে নিজ হাতে তালি লাগাইতেন, ছেঁড়া জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন।

এইরূপে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের হাজার নজির নবীজীর জীবনে রহিয়াছে। অথচ নবীজী (সঃ) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁহার হস্তে কত কত বিজয় লাভ হইয়াছে। লক্ষ কোটি টাকা সরকারী আয় তাঁহারই হাতে বণ্টিত ও ব্যয়িত হইয়াছে। সব তিনি জনগণের মধ্যে ব্যয় করিয়াছেন। ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আদর্শাবলীর বদৌলতেই ৪ নম্বরে বর্ণিত যুগান্তকারী ঘোষণা ও বিধানটি বাস্তবায়িত করা শুধু সম্ভবই নয়, বরং সহজ হইয়াছিল। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাহারই অনুপাতে আমলাগণের মাথাভারী ব্যয়বহুল

প্রতিপালনে সরকারী ধনভাণ্ডার খালি হইয়া যায়, তাই ৪ নং বিধানের অবকাশ স্বপ্নে দেখাও ভাগ্যে জুটে না।

১৬। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও রাষ্ট্রীয় কার্যে সকলের সহিত কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া, সকলের সুখে-দুঃখে সমভাবে শরীক থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) খন্দকের জেহাদে মাসেককাল পর্যন্ত পরিখা খননে শরীক রহিয়াছেন। জরুরী অবস্থার ভয়াবহতায় অনাহারী থাকিতে হইয়াছে, ফলে কোমর শক্ত রাখার জন্য পেটে পাথর বাঁধিতে হইয়াছে; ছাহাবীগণ এক একটি পাথর বাঁধিয়াছেন, আর নবীজী (সঃ)-কে দুইটি পাথর বাঁধিতে হইয়াছে। জাবের (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীতে গোপনে দাওয়াত লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একা না খাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন। (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে খন্দকের জেহাদ দ্রষ্টব্য।) রহমতুল লিলআলামীনের কিঞ্চিত মাত্র তাৎপর্য ইহা।

১৭। দেশ রক্ষায় বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদান অগ্রভাগে থাকিতে হইবে।

একদা রাত্রি বেলা মদীনা শহরের নিকটে একটি ভীতিজনক শব্দ শ্রুত হইল। শহরের লোকজন ঘটনার অনুসন্ধানে যাইবে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণের শব্দ কিনা সেই ভয়ে তাহারা লোকজন জমা করিয়া যাত্রা করিল! এদিকে নবীজী (সঃ) ঐ শব্দ শুনার সঙ্গে সঙ্গে একাই তরবারি কাঁধে ঝুলাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সমগ্র শহরতলী এলাকা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সকলকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমাদের যাইতে হইবে না, আমি সর্বত্র দেখিয়া আসিয়াছি, ভয়ের কোন কারণ নাই।

ওহুদ এবং হোনায়ন রণাঙ্গনে নবীজীর ভূমিকা উন্নয়নকামী জাতির রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য সোনালী আদর্শরূপে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। (তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

১৮। রাষ্ট্রপ্রধান সর্বক্ষেত্রে প্রশাসক ও আমলাগণকে সততা, শান্তি ও ন্যায়ের জন্য তাগিদ করিবে। এমনকি যুদ্ধ-জেহাদের সামরিক অভিযান ক্ষেত্রেও–

নবী (সঃ) জেহাদ অভিযানে সৈন্য বাহিনীর বিদায় মুহূর্তে এই উপদেশ দিতেন– "আল্লাহর সাহায্য কামনা করিয়া আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করিও। আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিও। কোন কিছু আত্মসাত করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নাক-কান কাটিয়া শত্রুকে যাতনা দিও না, শিশু হত্যা করিও না। (মেশকাত)

১৯। যুদ্ধের জরুরী অবস্থায়ও শান্তির জন্য এবং সত্য বুঝিবার সুযোগদানে শত্রুর প্রতি উদার থাকার আদর্শ ত্যাগ করিতে নাই। শত্রুর নিধন অপেক্ষা সংশোধনকে অগ্রগণ্য করিবে–

খায়বর যুদ্ধে প্রায় মাসেককাল ভীষণ যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার পর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য যখন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্তে নবীজী (সঃ) পতাকা অর্পণ করিতেছিলেন, সেই মুহূর্তে আলী (রাঃ) দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দানে শত্রুর উপর দ্রুত ঝাঁপাইয়া পড়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে রহমতুল লিলআলামীন নবজী মোস্তফা (সঃ) আলী (রাঃ)-কে তাঁহার মনোভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে, শত্রুর অবস্থানের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ করিবে। তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণের প্রস্তাব করিবে। তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। তখনও স্মরণ রাখিবে– তোমার উসিলায় আল্লাহ তাআলা একটি মাত্র ব্যক্তিকেও সৎপথ দান করিলে তাহা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৭ নং হাদীছে)।

২০। শান্তির খাতিরে শত্রুর সহিতও আপোষ মীমাংসায় চরম ধৈর্য ও পরম উদারতা অবলম্বন করিবে–

এই বিষয়ে নবীজী (সঃ) যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নজির ইতিহাসে বিরল। হোদায়বিয়া সন্ধি উপলক্ষে বিরাট শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়াও নবীজী (সঃ) শত্রু পক্ষের অন্যায় জেদের সম্মুখে উদারতা ও

ধৈর্য-সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন– যাহা শুধু শান্তির জন্য, আপোষের জন্য ছিল।

হিজরতের ছয় বৎসর পর যখন খন্দকের যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় শত্রু শিবির ধসিয়া পড়ার পথে ছিল এবং ইসলাম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, নবীজীর সঙ্গে প্রায় পনর শতের আত্মোৎসর্গকারী দল ছিল যাঁহাদের মাত্র তিন শতই বদর রণাঙ্গণে মক্কাবাসীদের চরমভাবে পরাজিত ও পর্যদুস্ত করিয়াছিল, নবীজীর সঙ্গে এত বড় শক্তি; তিনি ঐ পনর শত লোক লইয়া আল্লাহর ঘর যিয়ারত উদ্দেশে তিন শত মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতঃ মক্কার সন্নিকটে মাত্র নয় মাইল ব্যবধানে আসিয়া পৌছিয়াছেন মক্কাবাসীরা এমতাবস্থায় আল্লাহর ঘর যিয়ারতে তাঁহাকে বাধা দিল– অগ্রসর হইতে দিবে না। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে শান্তির নবী রহমতুল লিল আলামীন দৃঢ় কণ্ঠে শপথের সহিত ঘোষণা করিলেন– আল্লাহর স্মৃতিসমূহের সম্মান ক্ষুণ্ন না হয় এরূপ যেকোন শর্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব।

যেমন ঘোষণা তেমন কার্য– সন্ধিপত্র লিখিতে বিসমিল্লাহ লেখায়, "রসূলুল্লাহ" লেখায় আপত্তি; সব আপত্তিই মানিলেন! তিন শত মাইলের পরিশ্রম নিষ্ফল করিয়া আল্লাহর ঘর যিয়ারত ছাড়াই প্রত্যাবর্তনের শর্ত সহ আরও অনেক অবাঞ্ছিত শর্ত মানিয়া লইলেন, তবুও মক্কাবাসীদের সহিত দশ বৎসর মেয়াদের "যুদ্ধ নহে" শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে)।

২১। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য গড়িয়া তোলা ও বজায় রাখার আদর্শে সচেষ্ট থাকিবে–

বিদেশী প্রতিনিবৃন্দ এবং কূটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্যগণকে নবীজী (সঃ) সম্মান ও প্রীতির উপহার দিয়া থাকিতেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় নবী (সঃ) মুসলিম জাতিকে যেসব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে, "আমি যেরূপ বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে উপহার দিয়া থাকিতাম তোমরাও সেইরূপ উপহার দিও।

২২। ক্ষমতার সর্বোচ্চে থাকিয়াও নিজ ব্যাপারে ক্ষমার আদর্শ পালন করিবে–

এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। একবার এক জেহাদের সফরে বিশ্রাম নেওয়ার অবস্থায় নবীজী (সঃ) সঙ্গীগণ হইতে ভিন্ন একা এক বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার তরবারি লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন এক বেদুঈন কাফের এই সুযোগে নবীজীর তরবারিটি হস্তগত করিয়া নবীজীর উপর তাহা তুলিয়া ধরিল। এমতাবস্থায় নবীজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চোখ খুলিয়া তাঁহার উপর তরবারি ধরা দেখিতে পাইলেন। বেদুঈন হুঙ্কার মারিয়া নবীজী (সঃ)-কে প্রশ্ন করে, আপনাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? নবীজী (সঃ) গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আল্লাহ। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হস্তে কম্পন সৃষ্টি হইয়া বেদুঈনের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। নবীজী (সঃ) তরবারি হাতে লইয়া ছাহাবীগণকে ডাকিলেন এবং বেদুঈনকে দেখাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এত বড় ঘটনা, কিন্তু নবী (সঃ) বেদুঈনকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৮৭ নং হাদীছ)।

২৩। ক্ষমতার প্রতাপে অন্যায়-অত্যাচার কখনও করিবে না।

ইয়ামান দেশের গভর্নররূপে নবী (সঃ) মোআয (রাঃ)-কে নিয়োগ করিয়া বিদায়কালে উপদেশ দানে বলিলেন, কাহারও প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম করিয়া তাহার বদ দোয়ার পাত্র হইও না। মজলুমের বদ দোয়া সরাসরি আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌছিয়া থাকে। (বোখারী শরীফ)

২৪। যুদ্ধর ক্ষেত্রেও মানুষকে বাঁচিবার যথাসাধ্য সুযোগ দিবে–

মক্কা বিজয়ের সময় শহর হইতে ১২/১৪ মাইল দূর রাত্রি যাপন করিয়া শহরে প্রবেশের জন্য যাত্রাকালে নবীজী (সঃ) তাঁহার দশ সহস্র সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন– আক্রান্ত না হইয়া আক্রমণ করিও না এবং নিরাপত্তার দ্বার অনেক সূত্রে খুলিয়া দিলেন। যথা– (১) যে অস্ত্র সমর্পণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (২) যে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৩) যে মসজিদে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৪) যে আবু সুফিয়ান সর্দারের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। (তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)

২৫। বিজিতদের উপর বিগত আক্রোশে প্রতিহিংসা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে উদার নীতি গ্রহণ করিবে–

মক্কা বিজয়ের দিনই দীর্ঘ ২১ বৎসরে জালেম শত্রুদের প্রতি নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– "তোমাদের কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত।"

২৬। চরম বিজয়ী হইয়াও পরম বিনয়ী থাকার মহান আদর্শ পালন করিবে–

মক্কা বিজয় নবীজীর জন্য মহাবিজয় ছিল, এই ক্ষেত্রেও তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, শহরে প্রবেশ কালে তিনি নতশিরে প্রবেশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহার নাক বাহনের পৃষ্ঠে ঘর্ষণ খাইতেছিল।

২৭। আইনের শাসন প্রয়োগে স্বজনপ্রীতির বিপরীত স্বজনদের উপর সর্বাগ্রে আইন প্রয়োগ করিতে হইবে

এই আদর্শে নবীজীর কার্যক্রম ছিল অতুলনীয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্ধকার যুগের রীতি নীতির উচ্ছেদ এবং ইসলামী আইনের প্রবর্তন ঘোষণায় যখন তিনি বলিতেছিলেন– বংশ, গোত্র বা অঞ্চল হিসাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত ও বেআইনী হইল, হত্যাকারী ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইবে না; তখন দৃঢ়কণ্ঠে তিনি এই ঘোষণাও করিলেন, আমার বংশ কোরায়শদের একটি খুনের প্রতিশোধ প্রাপ্য রহিয়াছে বনু হোযায়েল গোত্রের উপর। ইসলামের আইন প্রয়োগে সর্বপ্রথম ঐ প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল ঘোষিত হইল।

তদ্রূপ সুদ বাতিল ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে নবীজী (সঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমার পিতৃব্য আব্বাসের সুদী ব্যবসার সমুদয় সুদ সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত হইল (দ্বিতীয় খণ্ড বিদায় হজ্জের ভাষণ দ্রষ্টব্য)।

২৮। আইনের বিচারে আপন-পর সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, ন্যায়বিচারে আপনাদের বেলায় কঠোর থাকিতে হবে।

মক্কা বিজয়লগ্নে কোরায়শ বংশীয় এক রমণীর উপর চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হইল। ইসলামী আইনের বিচারে তাহার হাত কর্তনের ভয়ে কোরায়শগণ বিচলিত হইল; নবীজীর নিকট সুপারিশ পাঠাইল। সেই সুপারিশ প্রত্যাখ্যানে নবীজী (সঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন– মুহাম্মদ তনয়া ফাতেমার উপরও যদি চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয়, খোদার কসম বিনা দ্বিধায় আমি তাহার হাত কাটিয়া দিব।

২৯। ভোট দান, মনোনয়ন দান ইত্যাদি রাজনৈতিক নির্বাচনে সমর্থন ব্যক্তিগত স্বার্থ, আশা ও লোভ লালসার ভিত্তিতে করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শাসক নির্বাচনে ভোট বা সমর্থন দেয় নিজ স্বার্থের উদ্দেশে– তাহার স্বার্থ পূরণ করিলে সমর্থন বজায় রাখে, নতুবা সমর্থন প্রত্যাহার করে; এইরূপ ব্যক্তির উপর কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ আযাব হইবে। আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি নেক দৃষ্টি করিবেন না; তাহার গোনাহ মাফ করিবেন না।

৩০। রাষ্ট্রের ও শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্যে সংহতি বজায় রাখিবে–

নবীজী (সঃ) মুসলমানদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন– নরমে-গরমে, আনন্দে, নিরানন্দে– সর্বাবস্থায়, এমনকি নিজের অপেক্ষা অন্যের অধিক সুযোগ সুবিধা দেখিয়াও রাষ্ট্রের অনুগত থাকিবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে না। সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকিবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কাজে কাহারও নিন্দা-মন্দের পরোয়া করিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩১। অন্যায় অত্যাচার ও নৈতিকতার বিপরীত– সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে রাষ্ট্রকেও জনগণ সমবেতভাবে বাধা দান করিবে।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর নাফরমানীর কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্য চলিবে না। রাষ্ট্রের আনুগত্য শুধু মাত্র বৈধ কার্যে। (বোখারী শরীফ)

৩২। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নিজের না পছন্দ কোন কিছু দেখিলে ধৈর্য ধরিবে– সংহতি নষ্ট করিবে না। যেকোন ব্যক্তি সুসংহত ব্যবস্থা হইতে বিছিন্ন হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার জীবন অন্ধকার যুগের অনৈসলামিক জীবন হইবে। (মেশকাত শরীফ, ৩১৯)

৩৩। ক্ষমতাসীনদের অপকর্মে সমর্থন দিবে না; তাহা জঘন্য পাপ–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, পরবর্তী যুগে নানারকম শাসক হইবে, যাহারা সেই শাসকদের নৈকট্যের জন্য তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে, তাহাদের অন্যায়ের সমর্থন করিবে– ঐ শ্রেণীর লোক আমার উম্মত হইতে খারিজ। তাহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই; হাউজে কাওসারের পানি তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। (মেশকাত, ৩২২)

৩৪। শাসন ক্ষমতায় আসিবার জন্য নিজে উদ্যোগী হইবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, শাসন ক্ষমতা নিজে চাহিয়া লইও না, অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নিজের চেষ্টা ছাড়া তাহা তোমাকে অর্পণ করা হইলে তাহা পরিচালনায় আল্লাহর সাহায্য পাইবে। (বোখারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে, কিন্তু কেয়ামত দিবসে তাহা বিষম অনুতাপের কারণ হইবে। এতদ্ভিন্ন শাসন ক্ষমতার আরম্ভ অতি মিষ্ট; কিন্তু তাহার পরিণাম অতি তিক্ত। (বোখারী শরীফ)

৩৫। শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য ছুটাছুটির প্রবণতা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে শাসন ক্ষমতাকে নিজের জন্য তিক্ত গণ্য করে; অবশ্য যদি তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। (বোখারী শরীফ)

৩৬। শাসকর্তাদের সম্বর্ধনা ও মানপত্রদান ইত্যাদি প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। (বাখারী শরীফ, পৃষ্ঠা– ১০৬৪)

৩৭। শাসনকর্তাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা চাই না– তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩৮। আইন প্রয়োগ এবং শাসন পরিচালনায় কঠোরতা এড়াইয়া সহজ পন্থার এবং আইনের প্রতি জনগণকে বিতশ্রদ্ধ না করিয়া আকৃষ্ঠ করার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

নবী (সঃ) কাহারও উপর ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহাকে উপদেশ দিতেন, আইনের প্রতি লোকদেরকে আকৃষ্ঠ করিও তাহাদের মধ্যে ভয়-ভীতির নঞ্চার করিও না। সহজ পন্থার ব্যবস্থা করিও, কঠোরতা অবলম্বন করিও না। (বোখারী শরীফ)

৩৯। শুধু আইনের শাসন চালাইবে না, উপদেশদানে অধিক তৎপর থাকিবে।

নবী (সঃ) বাদী-বিবাদী উভয়কে সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশদানে বলিতেন, আমি তোমাদের বর্ণনা শুনিয়া বিচার করিব; হয়ত তোমাদের একজন অধিক বাকপটু (সে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়।)

জানিয়া রাখিও বিবরণের উপর বিচারে অপরের হক্ব পাইয়া ফেলিলেও উহা তাহার জন্য দোযখের অগ্নি হইবে (ইহা কখনও ভোগ করিবে না।) বোখারী শরীফ)

৪০। শাসনকার্য পরিচালনায় প্রশাসকদের পরস্পর সহযোগিতা প্রয়োজন, বিভেদ সৃষ্টি করিবে না।

নবী (সঃ) ইয়ামান দেশের দুই অঞ্চলে বা দুই শাখায় দুই জন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিদায়ী উপদেশে বলিয়া দিলেন– তোমরা পরস্পর সহযোগিতার সহিত কাজ করিবে, বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থার এইরূপ শত শত শিক্ষা ও আদর্শ নবী (সঃ) দান করিয়াছেন– যাহার অনুসরণে অমুসলিমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহা এড়াইয়া মুসলমানগণ অবনতির গহ্বরে পতিত হইয়াছে।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ ব্যবস্থা দানে রহমতুল লিল আলামীন

সুখ-শান্তির সমাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় সমাজের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব, একতা ও শৃঙ্খলা, পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্য-সহায়তা। আরও প্রয়োজন হয় কনিষ্ঠদের উপর জ্যেষ্ঠদের প্রভাব, কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের স্নেহ মমতা এবং শ্রেণীগত বিভেদের মূল উচ্ছেদ। আর বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জ্ঞান বিস্তারের সুব্যবস্থা। সুতরাং সুখের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমাজের লোকজনকে ঐসব গুণের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে নরমে-গরমে ঐসব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে, ঐসব গুণে গুণান্বিতরূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যেসব শিক্ষা ও আদর্শ রহিয়াছে তাহা শুধু বিরলই নহে, বিশ্ব তাহা হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞও ছিল। নমুনাস্বরূপ আমরা তাঁহার ঐ শ্রেণীর শিক্ষা ও আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করিতেছি।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– নবীজী (সঃ) কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে কখনও দুর্ব্যবহার করিতেন না, বরং কেহ দুর্ব্যবহার করিলে তাহা ক্ষমা করিতেন এবং অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, নিঃসহায় এবং এতীম বিধবাদের সহতায়তাকারী ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে আল্লাহর পথে জেহাদ করে বা সারা রাত্র নামায পড়ে, প্রতিদিন রোযা রাখে।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অপর মুসলমানের প্রয়োজন মিটাইবে। আল্লাহ তাহার প্রয়োজন মিটাইবেন। যেব্যক্তি অপর মুসলমানের একটি দুঃখ দূর করিবে, আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাহার অনেক দুঃখ দূর করিবেন। যেব্যক্তি অপর মুসলমানের মান-ইজ্জত রক্ষা করিবে, আল্লাহ তাহার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন। (বোখারী)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার হইতে ভালর আশা করা যায় এবং মন্দের ভীতি না থাকে, সেই উত্তম মানুষ। পক্ষান্তরে যাহার হইতে ভালর আশা না থাকে এবং মন্দের আশঙ্কা থাকে, সেই খারাপ মানুষ। (তিরমিযী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমানদের পরস্পর ছয়টি দাবী– (১) সাক্ষাতে সালাম করিবে, (২) আহ্বানে সাড়া দিবে, (৩) সাহায্যপ্রার্থীর উপকার করিবে, (৪) হাঁচি দিয়া আল্‌হামদু লিল্লাহ বলিলে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলিয়া দিবে, (৫) রোগে-শোকে খোঁজ খবর নিবে, (৬) মরিয়া গেল কাফন-দাফনে শরীক হইবে।(মুসলিম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) রুগীকে দেখিতে যাইতেন, জানাযার সঙ্গে গমন করিতেন, কোন দাস তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, সদ্ব্যহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম সদ্ব্যবহার নয়; যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করার নামই সদ্ব্যবহার। (মেশকাত)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; একে অন্যের প্রতি অন্যায় করিবে না, সাহায্য ছাড়িবে না, একে অন্যকে ঘৃণা করিবে না। (মুসলিম)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, দ্বীন-ইসলামের বড় কাজ হইল প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করা। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, জগদ্বাসীর প্রতি তুমি দয়ালু হও, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়ালু হইবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ না করিবে, জ্যেষ্ঠদেরকে শ্রদ্ধা না করিবে এবং সৎ কাজে আদেশ না করিবে, অন্যায় কাজে বাধা না দিবে, সে আমার উম্মত হইতে খারিজ। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আমার উম্মতের কোন লোককে খুশী করার জন্য তাহার প্রয়োজন মিটাইবে সে বস্তুতঃ আমাকে খুশি করিয়াছে; আর যে আমাকে খুশী করিয়াছে সে বস্তুতঃ আল্লাহকে খুশি করিয়াছে; যে আল্লাহকে খুশি করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য তিহাত্তরটি মাগফেরাত লিখিয়া দিবেন; তাহার একটি দ্বারাই তাহার সব বিষয়ের শুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা লাভ হইবে, আর বাহাত্তরটি দ্বারা কেয়ামত দিবসে উন্নতি লাভ হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহর আপনজন স্বরূপ। সুতরাং যে আল্লাহর বন্দাদের উপকার করিবে সে আল্লাহর প্রিয় হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, অন্যের দোষ খুঁজিও না, কাহারও নিন্দামন্দ করিও না, হিংসা করিও না, শত্রুতা বধাইও না, কাহারও দোষ চর্চা করিও না, দুনিয়া বাড়াইতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইও না, লোকদের সহিত ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিবে। (বোখারী)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সমাজের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বজায় রাখিতে যত্নবান হওয়ার পূণ্য নামায রোযা ও দান-খয়রাতের পুণ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে পরস্পরের সম্পর্ক খারাপ হওয়া সুখ-শান্তি ও দ্বীন-ঈমান সব কিছুকেই বিদায় দেয়।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অন্যের ক্ষতি চাহিবে আল্লাহ তাহার ক্ষতি করিয়া দিবেন। যেব্যক্তি অন্যের জীবন সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা করিবে, আল্লাহ তাহার জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন মোমেনকে ধোকা দেয় বা তাহার ক্ষতি করে, তাহার প্রতি অভিশাপ। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুসলমান ভ্রাতার দোষ খুঁজিয়া প্রকাশ করিবে আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিবেন এবং গৃহভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেও তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ঈর্ষা হইতে দূরে থাকিও; ঈর্ষা নেক আমল বরবাদ করিয়া দেয় যেরূপ অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ ভষ্ম করিয়া দেয়! -(আবু দাউদ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলনামা আল্লাহর হুজুরে পেশ হয় এবং ঐ সময় অনেক বান্দারই গোনাহ মাফ হয়। কিন্তু যে দুই মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বলা হয়, সদ্ভাবের প্রতি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহাদের জন্য ক্ষমা মুলতবী রাখ।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বেহেশত পাইবে না মোমেন না হইলে; মোমেন গণ্য হইবে না পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি না করিলে। আমি একটি কাজের পরামর্শ দেই, যাহা করিলে পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে- পরস্পর সালাম করার নীতি বেশী পরিমাণে প্রবর্তন কর। (মুসলিম শরীফ)

মাতৃজাতি সম্পর্কে রহমতুল লিল আলামীন

মাতৃজাতি সমাজের অর্ধাংশ এবং অর্ধাঙ্গিনী; তাহাদের প্রতি ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা এবং অন্যায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। অন্ধকার যুগে ত সমাজ নারীদের প্রতি এতই হিংস্র, নির্দয়

নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে সন্তানকে ভালবাসিত না কেহই; অনেকে তাহাকে জীবিত কবর দিয়া দিত। বর্তমান যুগ যাহাকে নারীদের রাজত্বের যুগ বলা যাইতে পারে- এই যুগে মেয়ে সন্তানের জন্মে অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। ইহা কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ নহে? নবীজী (সঃ) মেয়েদের প্রতিপালন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্তরে তাহাদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ রাখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত কতিপয় নমুনা পেশ করা হইল।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দুইটি মাত্র মেয়ের সুন্দররূপে ভরণ পোষণ ও প্রতিপালন করিবে সে বেহেশতে আমার এত নিকটবর্তী হইবে যেরূপ হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর নিকটবর্তী। (মুসলিম শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি তিনটি মেয়ে বা তিন জন ভগ্নীর প্রতিপালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে করিবে- যাবত না তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা হয়; তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। দুই জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবী (সঃ) বলিলেন, দুই জনের প্রতিপালনেও তাহাই। একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল নবীজী (সঃ) তদুত্তরেও তাহাই বলিলেন। (মেশকাত শরীফ, ৪২৩)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার নিকট কোন মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না করে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (আবু দাউদ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমার কোন মেয়ে স্বামী পরিত্যক্ত হইয়া নিরাশ্রয়রূপে তোমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার জন্য তুমি যাহা ব্যয় করিবে, তাহা তোমার জন্য সর্বাধিক উত্তম দান-খয়রাত গণ্য হইবে। (ইবনে মাজা শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতি সৃষ্টিগতভাবেই একটু বক্র স্বভাবের; পূর্ণ সোজা করিতে চাহিলে (সোজা না হইয়া) ভাঙ্গিয়া যাইবে তথা বিচ্ছেদের পাল্লায় আসিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত তোমার জীবিকানির্বাহ করিতে হইবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ- তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম ও ভাল হইয়া থাকিবে। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, নারীগণ নামায রোযা, সতীত্ব রক্ষা ও স্বামীর আনুগত্য- এই সংক্ষিপ্ত আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকট এত বড় মর্যাদা লাভ করিবে যে, বেহেশতের যেকোন শ্রেণীতে সে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করিবে। (মেশকাত, ২৮১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাহার সহধর্মিণীর সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। (তিরমিযী শরীফ)

একদা নবী (সঃ) কড়া নির্দেশ দিলেন, গৃহিণীদেরকে কেহ প্রহার করিতে পারিবে না। অতপর একদিন ওমর (রাঃ) নবীজীর নিকট প্রকাশ করিলেন, নারীগণ অত্যন্ত বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে। সেমতে নবীজী (সঃ) (প্রয়োজন স্থলে সংযমের সহিত) প্রহারের অনুমতি দিলেন। এরপর বহু সংখ্যক মহিলা তাহাদের স্বামীদের অভিযোগ নিয়া নবীজীর গৃহে ভিড় জমাইল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কঠোর ভাষায় বলিলেন, অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে; ঐরূপ স্বামীগণ মোটেই ভাল মানুষ নহে। -(আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সহধর্মিণীর সহিত যে উত্তম জীবন যাপনকারী হয় সেই উত্তম মানুষ। আমি আমার সহধর্মিণীদের সহিত উত্তম জীবন যাপন করি। (তিরমিযী শরীফ)

সত্যই নবীজী (সঃ) সহধর্মিনীদের প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার সফর অবস্থায় বিবি সফিয়া রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য উটের উপর আরোহণ করা কঠিন হইলে নবী (সঃ) নিজ উরু পাতিয়া দিলেন। সফিয়া (রাঃ) সিঁড়ির ন্যায় নবীজীর উরু মোবারকের উপর পা রাখিয়া উটে আরোহণ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একবার নবীজী (সঃ) এতেকাফে ছিলেন; সফিয়া (রাঃ) নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন; তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় নবী (সঃ) তাঁহাকে মর্যাদার সহিত বিদায় দানে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসিলেন।

আয়েশা (রাঃ) কম বয়স্কা ছিলেন। নবীজীর গৃহে নয় বৎসর বয়সে আসিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তাঁহার বাল্য বয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল যাহাদের সঙ্গে আমি বাল্যসুলভ খেলাধুলা করিতাম। নবী (সঃ) গৃহে আসিলে তাহারা লুকাইয়া যাইত; নবী (সঃ) তাহাদিগকে তালাশ করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন। তাহারা পুনঃ আমার সহিত খেলা জুড়িত। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একবার ঈদের আনন্দে খঞ্জর চালনার খেলা হইতেছিল। নবী (সঃ) আমাকে গৃহদ্বারে তাঁহার পিছনে দাঁড় করাইয়া তাঁহার কাঁধের ফাঁক দিয়া ঐ খেলা দেখাইলেন। খেলা দেখায় আমার মন ভরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন– খেলা দেখায় লালায়িত যুবতী কত দীর্ঘকাল দেখিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (সঃ) আমার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলেন; তাহাতে আমি জয়ী হইলাম। অনেক দিন পর যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছিল তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা করিলে আমি পরাজিত হইলাম। নবীজী (সঃ) তখন কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমার সেই পরাজয়ের বিনিময়ে তোমার এই পরাজয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবীজী (সঃ)-এর কী মধুর সম্পর্ক ছিল সহধর্মিণীগণের সঙ্গে! নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সহিত সময়ে খোশগল্পও করিতেন। একদা নবীজী (সঃ) বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে এক সুদীর্ঘ খোশ-গল্প জুড়িয়া ছিলেন। হাদীছটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে– "হাদীছে উম্মে যারা" নামে। এক সময় আরবের একাদশ সংখ্যক সুসাহিত্যিক মহিলা একত্র হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনায় ভাষাজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাইল। তন্মধ্যে উম্মে যারা নাম্নী মহিলা সুদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় নিজ স্বামীর সর্বাধিক বেশী প্রশংসা করিল। নবী (সঃ) আয়েশার নিকট সেই একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আয়েশা! উম্মে যারার স্বামী তাহার জন্য যেরূপ ছিল, আমি তোমার জন্য সেরূপ।

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও নবীজী (সঃ) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবীজীর আমলে দ্বীন শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র নবীজীই ছিলেন; নবীজীর সব কথা বিশেষতঃ ভাষণসমূহ শরীয়তের বিশেষ বস্তু ছিল। তাই নবীজীর ভাষণ উপলক্ষে নর-নারী নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল। জুমা ও ঈদের নামাযে নবীজী (সঃ) বিশেষ ভাষণ দিতেন; সেই ভাষণ শুনিবার জন্য সকলেই উপস্থিত হইতেন। তবে নারীগণ সকলের পিছনে থাকিতেন। একবার ঈদের খোতবা সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর নবীজী (সঃ) লক্ষ্য করিলেন, নারীদের পর্যন্ত তাঁহার কথা সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে নাই। তাই নবী (সঃ) বেলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া নারীদের অবস্থান স্থলে যাইয়া পুনঃ ভাষণ দিলেন। (বোখারী শরীফ)

আর একবারের ঘটনা– নারীগণ নবীজীর (সঃ) নিকট অভিযোগ করিল, নবীজীর মজলিসে তাহারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে না; সেমতে তাহাদের অভিলাষ অনুযায়ী নবী (সঃ) তাহাদের জন্য ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করিলেন।

স্ত্রীদের প্রতি নবীজী (সঃ) কত অধিক সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাহাদের কত বেশী মর্যাদা তিনি দিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বিদায় হজ্জের নীতি নির্ধারণী ঐতিহাসিক ভাষণে নারীদের মর্যাদা দানের কর্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন–

"নারীদের উপর স্বামীদের যেরূপ হক ও দাবী আছে, তদ্রূপ স্বামীদের উপর, স্ত্রীদেরও হক এবং দাবী আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন– নারীদের সম্পর্কে আমার বিশেষ নির্দেশ পালন করিও, তাহাদের প্রতি

সদ্ব্যবহার ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর ব্যবস্থা বজায় রাখিও। .... তাহাদিগকে তোমরা লাভ করিয়াছ আল্লাহর আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্ব ভোগ করিতে পারিয়াছ আল্লাহর বিধানের অধীনে। সেই আল্লাহর রসূল আমি, অতএব তাহাদের সম্পর্কে আমার নির্দেশ পালনে তোমরা বাধ্য।

একদা আবু বকর (রাঃ) নবীজীর (সঃ) গৃহে আসিতেছিলেন বাহির হইতে বিবি আয়েশা (রাঃ) উচ্চ স্বর শুনিতে পাইলেন– তিনি নবীজীর সহিত প্রতিউত্তর করিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ক্রোধভরে ঘরে আসিয়া আয়েশা (রাঃ)-কে এই বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন যে, এত বড় স্পর্ধা! রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আওয়াজের উর্ধ্বে তোমার আওয়াজ! আবু বকর (রাঃ) এই বলিয়া আয়েশা (রাঃ)-কে চড় মারিতে উদ্যত হইলে নবী (সঃ) আয়েশাকে আবু বকর হইতে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আবু বকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নবী (সঃ) আয়েশাকে বলিতে লাগিলেন, দেখিলে ত মিঞা সাহেব হইতে কত কষ্টে তোমাকে বাঁচাইয়াছি! (আবু দাউদ)

প্রতিবেশী সম্পর্কে নবীজী (সঃ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশত পাইবে না। (মেশকাত শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেব্যক্তি মোমেন নহে যে পেট পুরিয়া খায়, অথচ তাহার নিকটবর্তী প্রতিবেশী অনাহারী রহিয়াছে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যে লোক তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম পরিগণিত, সে আল্লাহর নিকটও উত্তম পরিগণিত। যেব্যক্তি নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম পরিগণিত, সে আল্লাহর নিকটও উত্তম পরিগণিত। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের প্রিয় হইতে চায় তাহার কর্তব্য হইবে সত্যবাদী হওয়া, বিশ্বাসভাজন হওয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারকারী হওয়া। (মেশকাত শরীফ)

এতীম সম্পর্কে নবীজী (সঃ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তথা নিঃস্বার্থভাবে এতীমের মাথায় স্নেহের হস্ত বুলায় তাহার হস্ত স্পর্শিত প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নেকী লাভ হইবে। যেব্যক্তি কোন এতীম বালক বা বালিকার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, সে বেহেশতের মধ্যে আমার অতি নিকটবর্তী হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতীমের লালন-পালনকারী ও আমি বেহেশতে এইরূপ নিকটবর্তী থাকিব, যেরূপ হাতের দুইটি আঙ্গুল। (বোখারী শরীফ)

দানশীলতায় নবীজী (সঃ)

নবীজী (সঃ) কোন সময় দানপ্রার্থীকে "না" বলিতেন না– তাঁহার এই উদার স্বভাব অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় নবীজীর পরিধেয়ের প্রয়োজন ছিল। এমন সময় এক মহিলা নবীজীর জন্য সযত্নে হাতে বুনিয়া একটি চাদর পেশ করিল। প্রয়োজনের সময়ে তাহা পাইয়া নবী (সঃ) তাহা পরিধানে ছাহাবীগণের সমাবেশে আসিয়া বসিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর! চাদরখানা আমাকে দান করুন। নবী (সঃ) গৃহে যাইয়া পুরাতন চাদর পরিধানপূর্বক নূতন চাদরখানা ঐ ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে ৬৬৭ নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

এক ছাহাবী তাঁহার ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে নবীজী (সঃ)-এর নিকট সাহায্য চাহিলে নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আয়েশার ঘরে এক ধামা আটা আছে, তাহা নিয়া যাও। ঐ ব্যীক্ত তাহা নিয়া চলিয়া গেল, অথচ নবীজী (সঃ)-এর ঘরে তাহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। (সীরাতুন নবী)

আতিথেয়তা

ইহা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক মহান আদর্শ। তিনি বলিয়াছেন, যাহার ঈমান আছে তাহার কর্তব্য মেহমানের সম্মান করা।

একদা নিরাশ্রয় লোকদের ভিড় জমিয়া গেল। নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিলেন, যাহার ঘরে দুই জনের আহার আছে, সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়া যায়। যাহার ঘরে চারি জনের আহার আছে, সে যেন যষ্ঠ জন পর্যন্ত সঙ্গে নিয়া যায়। আবু বকর (রাঃ) তিন জন মেহমান নিলেন, আর নবীজী তাঁহার গৃহে দশ জনকে নিলেন। (মুসলিম)

কোন নিরাশ্রয় আসিলে তাহার আতিথেতার জন্য প্রথমে নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে অবকাশের খোঁজ লইতেন। তাঁহার গৃহে একেবারেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে অন্যদেরকে অনুরোধ করিতেন।

নিঃসহায়দের অন্যতম একজন ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। কাহারও নিকট খাদ্য চাহিতে লজ্জা হয়, তাই শুধু ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ক্ষুধার্তকে অন্নদান সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াতের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আর্ষণ করিতে লাগিলাম; এমনকি আবু বকর এবং ওমরকেও ঐরূপ করিলাম, কিন্তু কেহই আমার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। নবী (সঃ) ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমার অবস্থা ঠাহর করিয়া ফেলিলেন এবং মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, আবু হোরায়রা! আমার সঙ্গে আস। গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা দুগ্ধ পাইলেন, যাহা কেহ হাদিয়া দিয়া গিয়াছে। আদেশ হইল মসজিদের বারান্দায় নিরাশ্রয় সকলকে ডাকিয়া আন। প্রথমে সকলকে পান করাইতে বলিলেন, অতপর আমাকে পুনঃ পুনঃ তৃপ্তির অতিরিক্ত পান করাইলেন।

নবী (সঃ) অমুসলিমের আতিখেয়তায়ও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবু বুসরা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাত্রে নবীজীর অতিথি হইয়াছিলাম! তাঁহার গৃহে যে কয়টি বকরী ছিল সবগুলির দুগ্ধ একা আমিই পান করিয়া শেষ করিলাম। নবী (সঃ) পরিবারপরিজন সহ ঐ রাত্র অনাহারেই কাটাইলেন; তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। (সীরাতুন নবী)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাতে এক কাফের ব্যক্তি নবীজীর অতিথি হইল। নবীজী তাহাকে ছাগীর দুধ দোহন করিয়া পান করাইতে লাগিলেন, সে পর পর সাতটি ছাগীর দুগ্ধ একাই পান করিয়া ফেলিল। নবীজী (সঃ) মোটেই বিরক্ত না হইয়া যত্নের সহিত তাহার সম্মুখে দুধ পরিবেশন করিয়া গেলেন। ঐ কাফের নবীজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ভোর হইতেই মুসলমান হইয়া গেল। এখন সে একটি ছাগীর দুধেই তৃপ্ত হইয়া গেল। (তিরমিযী শরীফ)

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদে নবীজী সদা সচেষ্ট থাকিতেন। এব ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য চাহিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কিছুই নাই কি? সে বলিল, শুধুমাত্র একটি কম্বল আর একটি পানি পানের পেয়ালা আছে। নবী (সঃ) তাহার সেই বস্তুদ্বয়ই আনাইলেন এবং দুই দেরহামে বিক্রি করিয়া বলিলেন, এক দেরহাম পরিবারের খরচের জন্য দিয়া আস, আর এক দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট নিয়া আস। নবী (সঃ) নিজেই ঐ কুড়ালে হাতল লাগাইয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গল হইতে জ্বালানি

কাঠ কাটিয়া বিক্রি করিবে; পনর দিন যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই– এক ধারে ঐ কাজ করিয়া যাইবে। সে ব্যক্তি তাহাই করিল এবং অচিরেই দশ দেরহাম উপার্জন করিয়া কাপড় ক্রয় করিল, খাদ্য ক্রয় করিল। নবী (সঃ) তাহাকে বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য উত্তম হইয়াছে ইহা অপেক্ষা যে, তুমি ভিক্ষা করিতে এবং কেয়ামত দিবসে তোমার চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তির নিশানা সর্বসমক্ষে ফুটিয়া উঠিত। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সম্বল থাকিতে যেব্যক্তি ভিক্ষা চাহিবে, হাশর মাঠে তাহার চেহারায় আঁচড় ও ক্ষত হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার সম্বল (এক দিনের আহার) আছে তাহার জন্য বা যাহার অঙ্গসমূহ সঠিক আছে তাহার জন্য ভিক্ষা চাওয়া হালাল নহে। –(তিরমিযী)

শ্রমের মর্যাদাদান

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাও এবং জ্বালানী কাঠের বোঝা পিঠের উপর বহন করিয়া বিক্রি কর; ইহা দ্বারা আল্লাহ তোমার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন– ইহা ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তাহার নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য নাই। (বোখারী শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের জন্য সর্বাধিক পাক-পবিত্র খাদ্য হইল তাহার নিজের উপার্জিত খাদ্য। (নাসারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরয। (মেশকাত)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইয়া শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিশোধ না করিবে, কেয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবেন। (বোখারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মজদুর দ্বারা কাজ করাইলে মজদুরের ঘাম শুকাইবার পূর্বেই তাহার মজুরি আদায় করিয়া দাও। –(মেশকাত শরীফ)

স্বভাবগত সংসারী জীবনের শিক্ষাদান

স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্য ও সন্যাস জীবনের প্রতি নবীজীর দৃঢ় অনীহা ছিল। তিনি সব সময়ই সংসারী জীবনের আদর্শ স্থাপন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ইসলামে সন্যাস জীবনের স্থান নাই। বিশিষ্ট ছাহাবী ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) সন্যাস জীবনের অনুভূতি চাহিলে নবী (সঃ) দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা তিন জন ছাহাবী তিন রকম প্রতিজ্ঞা করিলেন। একজন বলিলেন, আমি রাত্রে কখনও নিদ্রা যাইব না– সারা রাত্র নামায পড়িয়া কাটাইব। অপরজন বলিলেন, সারা জীবন রোযা রাখিব। আর একজন বলিলেন, সারা জীবন বৈরাগী হইয়া থাকিব– বিবাহ করিব না। নবী (সঃ) তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে শপথের সহিত বলিলেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে সর্বাধিক ভয় করি, তথাপি রাত্রে ঘুমাই, রোযাবিহীনও থাকি, বিবাহও করিয়াছি। আমার এই তরীকা হইতে যে বিরাগী হইবে সে আমার জমাত হইতে খারিজ গণ্য হইবে। (বোখারী শরীফ)

অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আদর্শ

শ্রমিক, মজুর, ভৃত্যদের প্রতি নিজে ত নবীজী (সঃ) দয়াবান ছিলেনই, বিশেষভাবে ইহার আদর্শ শিক্ষা

দানেও নবীজী (সঃ) বিশেষ তৎপর থকিতেন।

একজন ছাহাবী তাঁহার দাসের প্রতি কঠোরতা করিলে নবী (সঃ) তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, তুমি তাহার প্রতি যতটুকু ক্ষমতা রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা রাখেন। (বোখারী শরীফ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু যর (রাঃ) তাঁহার বৃত্যকে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলে নবীজী তাঁহাকে কঠোর ভাষায় বলিলেন, তোমার মধ্যে অন্ধকার যুগের অসভ্যতা রহিয়াছে। এই ভৃত্যগণ তোমাদেরই ভ্রাতা; আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। তোমাদের কর্তব্য অধীনস্থদের নিজেদের ন্যায় যত্নের সহিত খাওয়ানো-পরানো। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, ভৃত্য তোমার জন্য খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিলে তোমার কর্তব্য সেই খাদ্যের এক গ্রাস তাহাকেও প্রদান করা। এই খাদ্য তৈয়ার করিতে সে অগ্নি তাপ সহ্য করিয়াছে এবং নানা কষ্ট করিয়াছে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমার দাসকে তাহার সাধ্যের অধিক কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিও না। যদি সেইরূপ কষ্টের কাজ তাহার দ্বারা করাইতেই হয় তবে তোমার কর্তব্য হইবে তাহাকে সাহায্য করা। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা শিক্ষাদানে রহমতুল লিলআলামীন

পারিবারিক জীবন কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করিতে হইলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। সে সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবীজীর দেওয়া আদর্শ ও শিক্ষা অতুলনীয়। সেইসব আদর্শ ও শিক্ষার অনুসরণে সহজেই একটা সুখী পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে।

একদা নবীজী (সঃ) তিন বার বলিলেন, সে লাঞ্ছিত হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যেব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে বা তাঁহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়া তাহাদের খেদমত করিয়া বেহেশতের অধিকারী হইতে পারে নাই। (মুসলিম শরীফ)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মা পৌত্তলিক থাকাবস্থায় মদীনায় আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি আমার এই মাতার খেদমত করিব কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তাঁহার খেদমত করিবে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী শরীফ)

এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাতা-পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কিছু বাকী আছে কি? নবী (সঃ) বলিয়াছেন, হাঁ– তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে, মাগফেরাত চাহিবে, তাঁহাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরা করিবে, তাঁহাদের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের খেদমত করিবে, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের শ্রদ্ধা করিবে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন হতভাগার মাতা-পিতা যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মরিয়া যায় তবে সে যদি আজীবন তাহাদের জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আল্লাহ তাআলা মাতা-পিতার সন্তুষ্টিভাজন গণ্য করিয়া নিবেন। –(মেশকাত শরীফ, ৪২১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাবী ঐ পরিমাণ, যে পরিমাণ মাতা-পিতার দাবী সন্তানের উপর। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যাহার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করে, সাধারণতঃ তাহার স্বভাব চরিত্র ও মতবাদ অবলম্বনকারী হইয়া পড়ে। অতএব লক্ষ্য করা চাই, কিরূপ ব্যক্তির সহিত ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করা হইতেছে। (মেশকাত শরীফ, ৪২৭)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মোলায়েম ব্যবহার অবলম্বন কর; তাহা সুনাম-সুখ্যতি বর্ধক। কঠোরতা ও লজ্জাহীনতা পরিহার কর; তাহা কুখ্যাতির কারণ। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র বড় পুণ্য। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা মোমেন ব্যক্তি সমস্ত দিন রোযা ও সারা রাত্র নামাযের পুণ্য লাভ করিতে পারে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত মোমেন সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে ধোঁকাবাজ ও অসভ্যতা ফাসেক হওয়ার পরিচয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, লজ্জা-শরম দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য। (মেশকাত শরীফ, ৪৩২)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশে বিনম্র হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে ছোট মনে করিলেও লোকদের দষ্টিতে মহান গণ্য হইবে। আর যেব্যক্তি অহঙ্কার করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে হেয় ও নিচ করিয়া দিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে বড় মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইবে যে, শূকর-কুকুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত হইবে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুখ সংযত রাখিবে আল্লাহ তাআলা তাহার ইজ্জতের হেফাজত করিবেন। যেব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাহাকে আযাবমুক্ত রাখিবেন। যেব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামত দিবসে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির সওয়াব লইয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ লাগাইয়াছে, কাহারও ধন আত্মসাত করিয়াছে, কাহাকেও খুন করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে ঐ সব দাবীদারকে তাহার সমুদয় নেক বা সওয়াব বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দাবীদার শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহার নেক বা সওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে; ফলে অবশিষ্ট দাবীদারদের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপানো হইয়াছে– পরিণামে তাহাকে দোযখে ফেলা হইয়াছে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি নিজের পরকাল বিনষ্ট করিয়াছে অন্যের ইহকাল ভাল করার জন্য সে কেয়ামত দিবসে সর্বাধিক মন্দ ও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (ঐ)

যত লোক জায়েয না যায়েয চিন্তা না করিয়া নামায-রোযার খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া, নিজের পরকালের উন্নতি বিধান না করিয়া দুনিয়ায় সম্পদের উপর সম্পদ, ধনের উপর ধন বাড়াইতে থাকে সে শ্রেণীর সব লোক উক্ত হাদীছের লক্ষ্য। কারণ, অতিরিক্ত ধন-সম্পদসমূহ ত সবই অন্যের; চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক ওয়ারিসগণ হইয়া যাইবে। অথচ এই সব ধন-সম্পদ উপার্জনে নিজের দ্বীন-ঈমান বিনষ্ট ও পরকালের জীবন ধ্বংস করা হইয়াছিল।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার বেশী অনুরাগী যে হইবে তাহাকে আখেরাতের ক্ষতি করিতে হইবে; আর যে আখেরাতের বেশী অনুরাগী হইতে চাহিবে তাহাকে দুনিয়ার কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। তোমারা চিরস্থায়ী আখেরাতকে অগ্রগণ্য কর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর। অর্থাৎ আখেরাতেরই অনুরাগী হও যদিও দুনিয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। (মেশকাত শরীফ, ৪৪১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে তোমার অপেক্ষা উচ্চ এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য গেলে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে তোমার অপেক্ষা নিম্ন। (জাগতিক ব্যাপারে) সদা তোমার অপেক্ষা নিম্নদের

প্রতি দৃষ্টি রাখিও, উচ্চদের প্রতি দৃষ্টি দিও না; তাহা হইলে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগুজারী সহজ হইবে। (ঐ)

পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠুতার তাগিদ

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ছাহাবীর অতিরিক্ত রোযা, অতিরিক্ত তাহাজ্জুদ নামাযের চর্চা হইলে নবীজী তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনিলেন, এমনকি একবার স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়া তাঁহাকে ঐরূপ না করার কড়া নির্দেশ দিয়া বলিলেন– তোমার উপর তোমার জানের হক রহিয়াছে, চোখের হক রহিয়াছে, স্ত্রীর হক রহিয়াছে, এমনকি সাক্ষাত প্রার্থীরও হক রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সব হক তোমাকে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে; অতিরিক্ত নফল এবাদতে মগ্ন হইয়া ঐ সব হক্ ক্ষুণ্ন করা চলিবে না। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০২৯ নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত জীবনে রহমতুল লিলআলামীন

"নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী।" (আল কোরআন)

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা– নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের ও, কথা বার্তায় অত্যন্ত সত্যবাদী এবং, অধিক কোমল স্বভাবের ছিলেন। প্রথম দর্শনে দর্শকের উপর তাঁহার ঐশী প্রভাব পতিত হইত, কিন্তু তাঁহার সাহচর্যে ও মেলামেশায় মানুষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইত। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইত– তাঁহার পূর্বে বা পরে তাঁহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। (তিরমিযী শরীফ)

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)-এর বর্ণনা– যোহর নামায পড়িয়া আমি নবীজীর সঙ্গে চলিলাম, তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। কচিকাঁচারা তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তিনি প্রত্যেককে তাহার গণ্ডদ্বয় ধরিয়া স্নেহ দেখাইতেছিলেন। স্নেহভরে আমার গণ্ডদ্বয়ও স্পর্শ করিলেন; তাঁহার হস্ত মোবারক সুশীতল ছিল এবং এরূপ সুগন্ধময় ছিল, যেন তাহা এখনই আতরের ডিবা হইতে বাহির হইয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা নবীজী (সঃ)-কে অনুরোধ করা হইল মোশরেকদের প্রতি বদ দোয়া করার জন্য। তিনি বলিলেন, আমি বদ দোয়ার জন্য আসি নাই; আমি ত রহমত ও মঙ্গলরূপে আসিয়াছি। (মুসলিম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী (সঃ)-এর সহিত কেহ মোসাফাহা– করমর্দন করিলে অপর ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছাড়িতেন না। ঐ ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার পূর্বে তিনি মুখ ফিরাইতেন না। (তিরমিযী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ফজর নামায হইতে অবসর হওয়ার পর মদীনার গৃহ-ভৃত্যরা পানি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। (পানি তাঁহার দ্বারা বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য)। নবী (সঃ) তাহাদের প্রত্যেকের পানিতে হাত ডুবাইতেন। এমনকি প্রবল শীতের সময়ও নবীজী (সঃ) তাহাদের পানিতে হাত ডুবাইয়া থাকিতেন। (মুসলিম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একমাত্র জেহাদ ছাড়া নবীজী (সঃ) কাহাকেও কোন সময় প্রহার করেন নাই– এমনকি খাদেম, ভৃত্য বা কোন স্ত্রীকেও নয়। (ঐ)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবীজীর (সঃ) নিকট কিছু টাকা পাওনা ছিল। সে একদা ঐ টাকার তাগাদায় আসিল; ঐ সময় নবীজীর (সঃ) হাতে টাকা ছিল না, তাই তখন পরিশোধে

অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী পণ্ডিত বলিল, টাকা উসুল না করিয়া আমি যাইব না আপনাকে ছাড়িব না। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আচ্ছা– টাকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার হইতে দূরে কোথাও যাইব না। সেমতে নবীজী (সঃ) দুপুর বেলা হইতে এশার নামায পর্যন্ত ঐ ইহুদী পণ্ডিতের ধারে ধারেই থাকিলেন। এমনকি রাত্রেও সে তথায়ই থাকিল এবং নবীজী (সঃ)ও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও গেলেন না। এই অবস্থায় ফজর নামায পড়া হইলে ছাহাবীগণ ঐ ইহুদীকে ভীতি প্রদর্শন এবং চটাচটি আরম্ভ করিলেন। নবীজী (সঃ) তাহা টের পাইয়া ছাহাবীগণকে বাধা দিলে তাঁহারা বলিলেন, এই ইহুদী আপনাকে এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? তদুত্তরে নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নিষেধ করিয়াছেন কাহারও প্রতি, এমনকি কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতিও অন্যায় করিতে।

বেলা একটু বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং তাহার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিল; সে অনেক বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাম্‌সা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী (সঃ) নবী হওয়ার পূর্বের ঘটনা– নবীজীর (সঃ) সহিত আমার একটি লেনদেন হইল এবং লেনদেনের কিছু অংশ বাকী থাকিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অবশিষ্ট প্রাপ্য আমি নিয়া আসিতেছি, এস্থানেই তাহা আপনাকে অর্পণ করিব। তিনি তথায় অপেক্ষমাণ থাকিলেন যেন আমি আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বিব্রত না হই। ঘটনাক্রমে আমি তথায় ফিরিয়া আসিবার কথা ভুলিয়া গেলাম। তিন দিন পর হঠাৎ আমার ঐ কথা স্মরণ হইল; আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নবীজী (সঃ) তথায় আমার জন্য অপেক্ষমাণ আছেন। আমাকে তিনি শুধু এতটুকু বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তিন দিন যাবত আমাকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে (তুমি আমাকে না পাইয়া বিব্রত হও না কি)! –(আবু দাউদ শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দল ইহুদী নবীজীর (সঃ) নিকট আসিয়া সালাম করার স্বরে আস্‌সালামু আলাইকুমের স্থলে আস্‌সামু আলাইকুম বলিল, যাহার অর্থ আপনার মৃত্যু হউক। নবীজী (সঃ) তাহাদিগকে "অলাইকুম– তোমাদের উপর" বলিয়া উত্তির দিলেন; আর কিছুই বলিলেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি (রাগ সামলাইতে না পারিয়া পর্দার ভিতরে থাকিয়াই) বলিলাম, তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লাহর অভিশাপ ও আল্লাহর গজব। নবী (সঃ) আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখ আয়েশা! সব কাজেই নম্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন। আমি বলিলাম, আপনি শুনিলেন না তাহারা কি বলিল? নবী (সঃ) বলিলেন, আমি শুনিয়াছি এবং "ওয়া আলাইকুম– তোমাদের উপর" বলিয়া দিয়াছি। দেখ আয়েশা! সদা নম্রতা অবলম্বনে যত্নবান থাকিও; কুবাক্য, কটূক্তি কঠোরতা পরিহার করিয়া চলিও আল্লাহ তাআলা কুবাক্য কটূক্তি ভালবাসেন না। (মুসলিম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি নবীজীর মসজিদে আসিয়া হঠাৎ মসজিদের ভিতরেই এক জায়গায় প্রস্রাব করিতে লাগিল। ছাহাবীগণ তাহার প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিলে নবীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না। (হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ করায় রোগের আশঙ্কা থাকে।) অতপর ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া নবী (সঃ) তাঁহার নিকটে আনিলেন। ঐ ব্যক্তির নিজের বর্ণনা কসম খোদার! নবী (সঃ) আমাকে একটুও ধমকাইলেন না, কোন প্রকার কঠোরতা দেখাইলেন না। তিনি মোলায়েমভাবে আমাকে বুঝাইলেন, মসজিদ আল্লাহর এবাদতের ঘর, মল-মূত্র ইত্যাদি অপবিত্র ও ঘৃণার বস্তুর স্থান ইহা নহে। অতপর ঐ স্থানে পানি বহাইয়া দিলেন। (মুসলিম শরীফ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবীজীর (সঃ) নিকট তাহার প্রাপ্যের তাগাদায় আসিল এবং কঠোর ভাষায় কথা বলিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে মন্দ বলিও না; পাওনাদারের বলার অধিকার থাকে। (বোখারী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবীজীর সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। নবীজীর (সঃ) গায়ে

একখানা চাদর ছিল যাহার পাড় মোটা শক্ত ও পুরু। হঠাৎ এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া নবীজী (সঃ)-কে ঐ চাদরে জড়াইয়া অতি জোরে টান দিল এবং বলিল, জনসাধারণকে দেওয়ার যে মাল আপনার হাতে রহিয়াছে তাহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহা টানের চোটে নবীজীর (সঃ) গ্রীবার উপর চাদর পাড়ের রেখা পড়িয়া গেল। নবীজী (সঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে মাল দেওয়ার আদেশ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাইর পুত্র ছিল "আদী"। তাহারা ছিল খৃস্টান; তাহাদের গোত্র প্রভাব প্রতাপশালী ছিল, "আদী" ছিল গোত্রপতি। মুসলমানগণ তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলে আদী সপরিবারে পলায়ন করিয়া সিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার এক বৃদ্ধা ভগ্নী ছিল, সে বান্দিনীরূপে মদীনায় উপনীত হইলে নবীজীর (সঃ) করুণা ভিক্ষা চাহে। নবীজী (সঃ) তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, বরং তাহার ভ্রাতার নিকট সিরিয়ায় পৌঁছিবার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে যাইয়া ভ্রাতা আদীকে নবীজীর (সঃ) অসাধারণ অমায়িকতার কথা শুনাইলে আদী নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সদলবলে মদীনা যাত্রা করিলেন। (বিস্তারিত বিবরণ হিজরী নবম বৎসরের বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।)

উক্ত আদীর বর্ণনা– সর্বত্র বিজয়ের অধিকারী মুসলিম জাতির প্রধান– মদীনার রাষ্ট্রপতি নবী সম্পর্কে তিনি নানা ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। তিনি মদীনায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ভক্ত-অনুরক্তগণের পরিবেশে নবীজী বসিয়া আছেন। এমন সময় একজন অতি সাধারণ মহিলা আসিয়া নবীজীকে অনুরোধ করিল– দরবার হইতে উঠিয়া গোপনে তাহার কিছু কথা শুনিবার জন্য। তাহার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী তাহার সহিত দূরে গেলেন এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহিলাটির কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবীজী পরম ধৈর্যের সাথে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হাতেম পুত্র আদী বলেন, বিনয় উদারতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ রসূল। (সীরাতুন নবী)

নবীজীকে কেহ হাদিয়া-উপঢৌকন দিলে নবীজী তাহার প্রতিদান দিতেন। অন্যক্যে ও এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। "জাহের" নামীয় এক গ্রাম্য ছাহাবী গ্রাম্য বস্তু নবীজীর জন্য নিয়া আসিতেন; নবীজী তাঁহাকে শহরী বস্তু দানে বিদায় করিতেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতেন– জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা তাহার শহর।

নবীজী (সঃ) অপরিসীম অমায়িক ও মধুরতাপ্রিয় ছিলেন, তাই তিনি ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীদের সহিত কৌতুক-পরিহাসও করিতেন। উল্লিখিত ছাহাবী জাহের (রাঃ)-কে নবী মুহাম্মদ (সঃ) ভালবাসিতেন, তিনি ছিলেন অসুন্দর আকৃতির। একদা তিনি বাজারে বসিয়া কোন জিনিস বিক্রি করিতেছিলেন। নবীজী তাঁহার পিছন দিক হইতে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, তিনি পিছন দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না। প্রথমে তিনি নবীজীর (সঃ) কথা ভাবিতেও পারেন নাই; অন্য লোক ভাবিয়া বলিলেন, কে আপনি? আমাকে ছাড়িয়া দিন। অতপর নবীজী (সঃ)-কে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং যথাসম্ভব নিজের পিঠ নবীজীর বক্ষের সহিত সাধ্যমতে ঘেঁষিয়া রাখিতে যত্নবান হইলেন। নবীজী (সঃ) ঐ অবস্থায় কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই দাসীটি কে খরিদ করিবে? তখন ঐ ছাহাবী নিজের অসুন্দর আকৃতির ইঙ্গিতে বলিলেন, আমাকে বিক্রি করিতে চাহিলে অচল পাইবেন। নবী (সঃ) বলিলেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও। (মেশকাত শরীফ, ৪১৭)

নবী (সঃ) কাহারও অসুস্থতার সংবাদ পাইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। এমনকি প্রতিবেশী অমুসলিমকেও রোগ শয্যায় দেখিতে গিয়াছেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কপালে ও হাতের শিরায় হাত রাখিতেন এবং আশ্বস্ত করিতে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন– কোন ভয় নাই, কষ্টের বিনিময়ে গোনাহ মাফ হইবে। এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীরে বা যাতনা স্থানে হাত বুলাইয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

দয়ার দরিয়া নবীজী (সঃ)

দয়া ছিল নবীজীর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি দয়া প্রদর্শনে যে ভূমিকা পালন করিতেন তাহাই তাঁহার রহমতুল লিলআলামীন হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে অতিশয় দয়ালু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শত্রুর প্রতি দয়া

মানব চরিত্রে সর্বাধিক দুর্লভ বস্তু হইল শত্রুর প্রতি উদারতা, দয়া ও ক্ষমা। কিন্তু নবীজীর চরিত্র ভাণ্ডারে ঐ দুর্লভ বস্তুর অভাব ছিল না; তিনি শত্রুর প্রতিও অযাচিত অনুগ্রহ এবং উদারতা, ক্ষমা প্রদর্শনে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় আলোচনায় পরম শত্রু মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হোবার ইবনে আসওয়াদ নামক মক্কার এক মহাদুষ্কতকারী যে নবীজীর কন্যা যয়নব (রাঃ)-কে মদীনায় হিজরত করাকালে ভীষণ নির্যাতন করিয়াছিল। এমনকি সেই দুরাচারের আঘাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের উপর বহু অত্যাচারের অভিযোগ তাহার প্রতি ছিল এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল অগ্রগামী। এমনকি মক্কা বিজয়ের সময় প্রাণদণ্ডের আসামী সেও ছিল। সে নবীজীর দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রাণভয়ে ইরানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য, কিন্তু আপনার দয়া ও ক্ষমার কথা মনে পড়ায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি। রহমতুল লিলআলামীন এই অপরাধীকে রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করিলেন। (সীরাতুন নবী)

মক্কায় খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা নামক অঞ্চল। তথাকার গোত্রপতি সুমামা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ঘোষণা দিলেন– এখন হইতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা হইতে খাদ্য শস্যের একটি দানাও আর মক্কায় যাইবে না। অল্প দিনের মধ্যেই মক্কায় হাহাকার লাগিয়া গেল। বাধ্য হইয়া মক্কাবাসীরা নবীজীর দ্বারে উপস্থিত হইল। মক্কায় খাদ্যাভাবের সংবাদ শুনিয়া রহমতুল লিলআলামীনের দয়া উথলিয়া উঠিল; তৎক্ষণাত তিনি সুমামার প্রতি আদেশ পাঠাইলেন খাদ্য অবরোধ তুলিয়া দিবার জন্য। (সীরাতুন নবী)

তায়েফের ঘটনায় অসাধারণ দয়ার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। যাহারা নবীজীকে অকথ্যভাবে অত্যাচার করিয়া বেহুশ এবং প্রস্তর বর্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ দেহ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল– আল্লাহর আযাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে দয়ার দরিয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ) দোয়া করিয়াছিলেন, আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন।

এই তায়েফবাসীরাই আট দশ বৎসর পরও ইসলামের আহ্বান তীর-তরবারি ও বর্শার আঘাতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া ইসলামের প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহাদের ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত ও আহত ছাহাবীগণকে উল্লেখ করিয়া তায়েফবাসীদের প্রতি বদ দোয়ার অনুরোধও নবীজীর দরবারে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন– "আয় আল্লাহ! সকীফ (তায়েফবাসী) গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং তাহাদের বন্ধুবেশে মদীনায় হাযির কর।" অচিরেই তায়েফবাসীর ভাগ্যাকাশে সেই দোয়ার নক্ষত্র উদিত হইল– তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইয়া নবীজীর চরণে শরণ লাভে ধন্য হইল। (সীরাতুন নবী)

নবীজী (সঃ)-কে এই ধরাপৃষ্ঠে সর্বাধিক যাতনা দিয়াছে যাহারা, তাহাদের অন্যতম ছিল মোনাফেক সর্দার

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। মুসলমানদের মধ্যে কত কত ফাসাদ সে সৃষ্টি করিয়াছে! তাহার ষড়যন্ত্রে ও উস্কানিতে কত কত যুদ্ধ বাধিয়াছে, মুসলমানগণ বিপদে পড়িয়াছে! এমনকি নবীজীর মান-সম্মান ঘায়েল করার জন্য পাক-পবিত্র বিবি আয়েশার উপর জঘন্য অপবাদ গড়িয়াছে যাহা মুসিবার জন্য পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই আবদুল্লাহ আজীবন মোনাফেক রহিয়াছে; মোনাফেকীর উপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার ছিল, তাই নবীজী তাহার জানাযার নামায পড়াইতে সম্মত হইলেন। ওমর (রাঃ) আপত্তি করিলেন এবং তাহার দুষ্কৃতিগুলি এক একটা নবীজীর স্মরণে আনিয়া দিলেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন, মোনাফেকদের জন্য আপনি সত্তর বার মাগফেরাত কামনা করিলেও আল্লাহ তাহাদের ক্ষমা করিবেন না– ওমর (রাঃ) ইহাও নবীজীর স্মরণে উপস্থিত করিলেন। দয়ার দরিয়া রহমতুল লিলআলামীন ওমরকে উত্তর দিলেন, সত্তরের অধিক করিলে যদি ক্ষমার আশা হয় তবে আমি সেই চেষ্টাও করিব। (বোখারী শরীফ)

মোনাফেকের জানাযা পড়া এবং তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তখনও সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছিল না। তাই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দয়াবশে আবদুল্লাহর জানাযা পড়াইয়াছিলেন। তাহার পরেই পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল হয় এবং তাহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

শিশুদের প্রতি নবীজী (সঃ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদারতা, দয়া ও স্নেহ-মমতা এতই সম্প্রসারিত ছিল যে, শিশু–কচিকাঁচারাও তাহা উপভোগ করিত।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (সঃ) বালকদের নিকটবর্তী পথে গমন করিতে তাহাদিগকে সালাম করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একদা এক বিবাহের মজলিস হইতে কচিকাঁচারা তাহাদের মাতাদের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিল। দূর হইতে নবীজী তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে স্নেহভরে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খুবই ভালবাসি।

কোন কোন সময় নবীজী (সঃ) কোথাও হইতে মদীনায় প্রবেশকালে কচিকাঁচাদেরকে পথে দেখিলে নিজ বাহনের অগ্র-পশ্চাতে বসাইয়া লইতেন।

একদা এক ছাহাবী তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া নবীজীর সাক্ষাতে গেলেন। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় মেয়েটি তাহার শিশুসুলভ কৌতূহলবশে নবীজীর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়ত নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল। পিতা কন্যাকে ধমক দিলে নবীজী (সঃ) বারণ করিয়া বলিলেন, তাহাকে খেলিতে দাও! (বোখারী)

মৌসুমের বা কাহারও গাছের প্রথল ফল ছাহাবীগণ নবীজীর নিকট হাদিয়ারূপে নিয়া আসিতেন। নবীজী এই উপলক্ষে মদীনায় ফল ফসলে বরকতের দোয়া করিতেন। অতপর ঐ ফল কোন শিশুকে দিয়া দিতেন! –(বোখারী শরীফ)

নবীজী অনেক সময় শিশু দেখিলে আদর-স্নেহে চুম্বন করিতেন। একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিল, আমার দশটি সন্তান আছে; আমি কাহাকেও চুম্বন করি না! নবীজী (সঃ) রুষ্টতার সহিত উত্তর দিলেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন তবে আমি কি করিব?

কৃচ্ছ জীবন যাপন শিক্ষাদানে নবীজী (সঃ)

আয়েশা (রাঃ) দুম্বার লোমে বুনা গায়ে দেওয়ার একখানা কম্বল এবং তহবন্দরূপ পরিধেয় একখানা মোটা চাদর– এ কাপড় দুইখানা দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই পোশাকেই নবীজী পরপারের সফরে ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। (বোখারী)

নবীজী (সঃ)-এর বিছানা সময়ে চামড়ার ভিতরে খেজুর গাছের ছোবড়া ভরা গদি এবং সময়ে লোমের তৈয়ারী চট বা কাপড় ভাঁজ করা হইত; তাহা অধিক নরম হইত না। বিবি হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে আমি বিছানার কাপড় চারি ভাঁজ করিয়া বিছাইলাম যেন একটু নরম হয়। ভোর বেলা নবীজী (সঃ) এই নরম বিছানার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

একদা নবী (সঃ) খালি চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়াছিলেন; নিদ্রা হইতে উঠিলে দেখা গেল, তাঁহার দেহে চাটাইয়ের রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরজ করিলেন, অনুমতি দিলে আমরা বিছানা তৈয়ার করিয়া দেই। নবী (সঃ) বলিলেন, দুনিয়ার আরাম-আয়েশে আমার প্রয়োজন কী? দুনিয়ার সঙ্গে ত আমার সম্পর্ক ঐরূপ মাত্র যেরূপ কোন পথিক বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়ায় বসিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবে। (মেশকাত, ৪৪২)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত এইরূপ একটি ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

সাধারণ স্বভাবে নবীজী (সঃ)

নবী (সঃ) কখনও কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতেন না। গৃহে আসিতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করিতেন। ভক্ত-অনুরক্ত বন্ধুজনের মধ্যেও পা ছড়াইয়া বসিতেন না।

নবী (সঃ) অত্যধিক লজ্জাশীলও ছিলেন। পর্দানশীন কুমারী কী লজ্জাবতী হয়! নবী (সঃ) তদপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি অরুচিকর কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার চেহারার উপর ভাসিয়া উঠিত। (বোখারী)

গৃহের কাজকর্ম নবীজী (সঃ) নিজে করিতেন, এমনকি ছেঁড়া কাপড় জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন। বাজার হইতে সওদাপত্র নিজে বহন করিয়া আনিতেন। গৃহের বকরী দোহাইতেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার নিজ গৃহে জীবন মান এতই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাতলা চাপাতি রুটি চোখেও দেখেন নাই। নিজ গৃহে তাঁহার কোন সময় দিনে দুই বেলা তৃপ্তির সহিত রুটি জুটিত না– এক বেলা রুটি খাইলে আর এক বেলা খোরমা খাইয়া থাকিতে হইত। অনেক সময় সকাল বেলা বিবিগণের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন– খাবার কিছু আছে কি? যদি বলা হইত কিছু নাই, তবে হযরত (সঃ) এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেন, আচ্ছা! আজ আমি রোযা রাখিলাম। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! আমার জীবন যেন মিসকীনদের অবস্থায় কাটে, মৃত্যুও যেন মিসকীনদের অবস্থায় হয়, হাশর ময়দানেও যেন মিসকীনদের সঙ্গে থাকি। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই দোয়া কেন করেন? নবীজী (সঃ) বলিলেন, মিসকীনগণ ধনীদের অনেক আগে বেহেশতে যাইবে। নবীজী (সঃ) আরও বলিলেন, হে আয়েশা! মিসকীনকে খালি হাতে ফিরাইও না; খোরমার এক অংশ হইলেও তাহাকে দিও। হে আয়েশা ! মিসকীনকে ভালবাসা দিও, তাহাদের নিকটে আনিও; আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তোমাকে তাঁহার নিকটে নিবেন। (মেশকাত, ৪৪৭)

নবী (সঃ)-এর নিকট আল্লাহ তাআলা মক্কার কোন পাহাড়কে স্বর্ণের খনি বানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাঠাইলেন। নবীজী (সঃ) তখন দোয়া করিলেন আয় আল্লাহ! আমি একদিন খাইব আর একদিন না খাইয়া থাকিব। যখন খাইব তখন তোমার শোকর করিব, আর যখন অনাহারী থাকিব তখন সবর করিব। অর্থাৎ এইভাবে শোকর ও সবর উভয় রকমের বন্দেগী আদায় হইবে।

আদর্শ নেতৃত্ব শিক্ষা দানে নবীজী (সঃ)

নবীজীর (সঃ) হৃদয়ে বিবি ফাতেমার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হয় না। সেই ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ভৃত্য না থাকায় তাঁহাকে নিজ হাতে গৃহকাজ সমাধা করিতে হইত। এমনকি আটার

চাক্কি চালনায় বিবি ফাতেমার হাতে কড়া এবং পানির মশক বহনে বক্ষে নীল রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই জেহাদলব্ধ সম্পদের মধ্যে কতিপয় দাস-দাসী লাভ হইয়াছিল। এই সুযোগে আলী (রাঃ) নবীজীর (সঃ) খেদমতে একটি দাসীর আবেদন পেশ করিলেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, দেখ! এখনও সোফ্‌ফায়ে আশ্রয় গ্রহণকারী ছিন্নমূল লোকদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নাই। যাবত না তাহাদের সুব্যবস্থা হইয়া যায় তোমাদের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। (আবু দাউদ শরীফ)

আর এক সময় আলী (রাঃ) নবীজীর (সঃ) নিকট কোন আবদার করিলে বলিলেন, তোমাকে দিব আর সোফ্‌ফার নিঃসহায় ব্যক্তিরা ক্ষুধার্ত থাকিবে! এইরূপ কখনও হইতে পারে না। (সীরাতুন নবী-মোসনাদে আহমদ)

একবার নবী (সঃ) ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গলায় স্বর্ণের মালা দেখিতে পাইয়া বলিলেন- হে বৎস! লোকে যদি বলে যে, পয়গম্বরের কন্যার গলায় অগ্নির ফাঁস পড়িয়াছে- তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে কি? (নাসায়ী শরীফ)

দৈনন্দিন অবস্থায় নবীজী (সঃ)

চলাফেরা ঃ পথচলাকালে নবী (সঃ) সম্মুখপানে অবনত দৃষ্টিতে সামান্য ঝুঁকিয়া বিনয়ী আকৃতিতে হাঁটিতেন- যেন উচ্চ হইতে নিচের দিকে অবতরণ করিতেছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন, তাই দ্রুত পথ কাটিত। পা হেছড়াইয়া চলিতেন না।

কথাবার্তা ঃ নবীজী (সঃ) সুস্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে কথা বলিলেতন। তাঁহার কথা অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হইত; কথায় তিনি মানুষের মনকে সহজে জয় করিয়া নিতেন; শত্রুগণ তাঁহাকে জাদুকর বলিবার ইহাও একটি কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইলে তাহা তিন বারও বলিতেন; প্রয়োজনে বা সওয়াব লাভের ক্ষেত্র ছাড়া কথা বলিতেন না। বেশী সময় চুপ থাকিতেন- ভাবগম্ভীর অবস্থায় চিন্তামগ্ন থাকিতেন। হাসিতেন কম এবং একমাত্র মুচকি হাসিই হাসিতেন।

ভাষণ বক্তৃতা ঃ তাঁহার ভাষণ বক্তৃতা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ হইত। মাটিতে দাঁড়াইয়া, মিম্বরে আরোহণ করিয়া, বাহনের পৃষ্ঠে থাকিয়া- যখন যেরূপ অবস্থায় প্রয়োজন বা সুযোগ হইত ভাষণ দিতেন। পরকালের ভীতি প্রদর্শনে ভাষণ দিলে প্রাণ যেন তাঁহার উথলিয়া উঠিত, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, গলার স্বর গুরুগম্ভীররূপে উচ্চতর হইয়া উঠিত এবং ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় কথায় এবং আওয়াজে তীক্ষ্ণতা আসিয়া যাইত। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হইত তাঁহার সতর্কবাণী; মনে হইত যেন তিনি সকাল বা বিকাল মুহূর্তে আক্রমণে আগত শত্রু সৈন্য হইতে জাতি ও দেশবাসীকে সতর্ক করিতেছেন। বক্তৃতার জন্য মিম্বরে আরোহণ করিয়া লোকদের সম্মুখীন দাঁড়াইতেন এবং সালাম করিতেন। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উপর বৃক্তৃতা সমাপ্ত করিতেন। ভাষণদানকালে সাধারণত লাঠি বা ধনুর উপর ভর করিতেন। (যাদুল মাআদ)

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ নবীজী (সঃ) সাধারণতঃ লম্বা চাদর আকৃতির তহবন্দ পরিধান করিতেন- সাড়ে চারি হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া। "পায়জামা" সম্পর্কে সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি তাহা খরিদ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গবেষক হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেন, একাধিক হাদীছে প্রমাণিত আছে, তিনি নিজে পায়জামা পরিয়াছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁহার পরামর্শে পায়জামা পরিতেন। (যাদুল মাআদ)

গায়ে দিতে চাদর- যথা ছয় হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া; কামিজ আকারের জামাও তাঁহার প্রিয় ছিল। আবা বা জুব্বাও তিনি পরিধান পরিতেন। আস্তিনের মুখে রেশমী পাড় লাগানো চর্ম নির্মিত নওশেরওয়ানীও তিনি পরিতেন। "উত্তরী" গায়ে দিতেন, সাধারণতঃ তাহা ডোরাবিশিষ্ট ইয়ামান দেশীয় হইত। একই রংয়ের তহবন্দ ও চাদর সময় সময় পরিধান করিতেন; অনেকে তাহা লাল রংয়ের বলিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে লাল রংয়ের কাপড় নবীজী (সঃ) পরিধান করিতেন না, তাহা পরিধান করা মকরূহ;

নবীজীর (সঃ) ঐ কাপড় লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল।

মোজা (অন্ততঃ শীত মৌসুমে) স্বাভাবিকরূপেই ব্যবহার করিতেন। (যাদুল মাআদ)

অযুর সময় (শরীয়তের বিধান অনুযায়ী) মোজার উপর মসেহ করিতেন। আশি জন ছাহাবী নবীজীর (সঃ) চর্ম-মোজার উপর মসেহ করার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাথায় পাগড়ী বা আমামা বাঁধিতেন; বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার কালো রঙ্গের পাগড়ী ব্যবহারের উল্লেখ হাদীছে পাওয়া যায়।

তাঁহার জুতা চর্ম নির্মিত "না-আল' তথা সেন্ডেল আকারের ছিল।

জেহাদে ও রণাঙ্গণে তিনি লৌহবর্ম এবং লোহার শিরাবরণ ব্যবহার করিতেন।

পরিধেয়ের জন্য নবীজী (সঃ) সাদা রং বেশী ভালবাসিতেন; ধূসর বা সোনালী রংও পছন্দ করিতেন, কাল রংয়ের পরিধেয়ও ব্যবহার করিয়াছেন। পুরুষের জন্য লাল রং পছন্দ না করার প্রমাণই বেশী পাওয়া যায়। নবীজীর (সঃ) দুইখানা সবুজ রংয়ের উতরী, একখানা কাল চাদর, আর একখানা মোটা চাদর ছিল লাল রংয়ের। একখানা কম্বলও ছিল। (যাদুল মাআদ)।

খাদ্য ঃ নবীজীর (সঃ) জীবন সাধনাময় ছিল; কঠোর কৃচ্ছ্রই ছিল তাঁহার স্বভাব। সৌখিন বিলাসী খানাপিনার পরিবেশ তাঁহার গৃহে তিনি সৃষ্টিই হইতে দেন নাই। তাঁহার গৃহে চাপাতি রুটি তৈয়ার হইত না, গোশ্‌তও খুব কমই জুটিত, ময়দাও তাঁহার গৃহে দেখা যাইত না– যবের বা গমের মোটা রুটিরই ব্যবস্থা করা হইত। তাঁহার গৃহে উনুনে মাসের পর মাস আগুন জ্বলিত না– পানি ও খোরমার উপর জীবন কাটিত।

সিরকাকেই তিনি রুটি খাওয়ার জন্য তরকারী গণ্য করিতেন। অগ্নিতে পাকানো চর্বি দ্বারাও রুটি খাইতেন। পনির বা খোরমার সঙ্গেও রুটি খাইতেন। শসা জাতীয় সব্জি কাকড়ি এবং তরমুজের সহিত তাজা পাকা খেজুর খাইতেন। ছাগল বা দুম্বার সামনের রানের গোশ্‌ত তিনি বেশী পছন্দ করিতেন।

আরবের রীতি ছিল, গোশ্‌তের খণ্ড বড় বড় রাখা। খাসি-বকীর রান অনেকে আস্ত রাখিয়া দিত এবং তাহারা গোশ্‌ত অতি মোলায়েম রান্না করিত না। ঐরূপ ক্ষেত্রে খাইবার সময় বাধ্য হইয়া গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া নিতে হইত, নতুবা নবীজী (সঃ) দাঁতে কাটিয়াই খাইতেন। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় তিনি ছুরি ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, গোশ্‌ত খাইতে ছুরি দ্বারা কাটিও না। তাহা অমুসলমানদের রীতি। তোমরা দাঁতে কাটিয়া খাইও; তাহাতে স্বাদও বেশী পাওয়া যায় এবং সহজও বটে।

খাইবার সময় সাধারণতঃ উভয় ঊরু খাড়া করিয়া বসিতেন; সময়ে উভয় পা পিছন দিকে এবং গোছাদ্বয়ের উপর ঊরুদ্বয় স্থাপন করতঃ ঝুঁকিয়া বসিতেন, আর বলিলেতন, আমি বড় মানুষ নই; আল্লাহর অনুগত দাস। সুতরাং আমার খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ঐরূপেই হইবে। আসন করিয়া বা এক হাতের উপর ভর করিয়া বসিতেন না।

মেজের বা টেবিলের উপর খানা খাইতেন না; সাধারণত তিনি যমীনের উপর দস্তরখানা বিছাইয়া খানা খাইতেন। তাঁহার একটি চামড়ার দস্তরখানা ছিল। সম্মুখ দিক হইতে খানা খাইতেন। সাধারণত তিন আঙ্গুলে খাইতেন এবং খাওয়া শেষ করিয়া আঙ্গুল চাটিয়া খাইতেন। তদ্রূপ খাদ্যের পাত্রও পরিষ্কার করিয়া খাইতেন। খাওয়া বিসমিল্লাহ বলিয়া আরম্ভ করিতেন এবং সমাপ্তে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিতেন– এ সম্পর্কে বিভিন্ন দোয়া হাদীছে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ তিনি মিঠা বস্তু বিশেষতঃ মধু অধিক ভালবাসিতেন। তদ্রূপ সব্জির মধ্যে কদু বা লাউ অত্যধিক পছন্দ করিতেন।

পানীয় ঃ নবীজী মোস্তফা (সঃ) ঠাণ্ডা পানি বেশী পছন্দ করিতেন। পানি সুস্বাদু করার জন্য সময় সময় পানির সহিত দুধ মিশাইতেন, কোন সময় খোরমা বা কিশমিশ পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করিতেন। কোন সময় ছাতু বা দুধ পানিতে মিশ্রিত করিয়া শরবত পান করিতেন। দাঁড়াইয়া পান করা না পছন্দ করিতেন; বসিয়া পান করিতেন।

অভিরুচি ঃ সব কাজেই যথাসাধ্য ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। (অবশ্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে এবং মলত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিতে প্রথমে বাম পা অগ্রসর করিতেন।) মাথায় তৈল

অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যবহার করিতেন এবং একদিন অন্তর চিরুণী ব্যবহার করিতেন। চুল দাড়ি সুবিন্যস্ত রাখিতেন। সুগন্ধি ভালবাসিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

দিনের বেলা ঃ ফজর নামাযান্তে কেবলামুখী আসন করিয়া বসিয়া কিছু সময় যিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সূর্যোদয়ের পর ছাহাবীগণকে শিক্ষাদান, উপদেশদান এবং তাঁহাদের সহিত স্বপ্নের আলোচনা ইত্যাদি কথাবার্তা বলিতেন। কেহ তাঁহার দ্বারা পানি বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য আসিলে তাহা করিয়া দিতেন। বেলা একটু উপরে উঠিলে চাশতের নামায পড়িয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন। গৃহে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করিতেন, জনগণকে সাক্ষাতদান করিতেন, যাহাতে বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেন লোকদের শিক্ষাদানে, উপদেশদানে, জনসাধারণের খোঁজ-খবর গ্রহণে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সমাধানে। নামাযের সময় মসজিদে আসিয়া নামায পড়িতেন। আসরের নামায পড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং বিবিগণের প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া খোঁজ-খবর লইতেন, আলাপ করিতেন।

রাত্রি বেলা ঃ বিবিগণের প্রত্যেকের জন্য নবীজীর অবস্থান বণ্টন করা ছিল। যাঁহার ঘরে যেই দিন অবস্থান করা হইত, মাগরিবের নামায হইতে অবসর লইয়া সেই ঘরেই আসিতেন এবং রাত্রের খানাপিনা সেই ঘরেই করিতেন। এশার নামায শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন; ঘরে আসিয়া চারি রাকআত নফল নামায পড়িতেন এবং নির্দিষ্ট কতিপয় সূরা তেলাওয়াত করিতেন। অতপর যথা সত্বর শুইয়া পড়িতেন; শয়ন-শয্যার বিভিন্ন দোয়া পড়িতেন এবং বাঁ হাত গালের নীচে রাখিয়া ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। এশার পরে সাধারণতঃ কথাবার্তা পছন্দ করিতেন না। রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে জাগিয়া উঠিতেন এবং এই অবস্থার নির্ধারিত দোয়া পড়িতেন। অতপর চোখ-মুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া সূরা আলে এমরানের শেষ দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতেন। অতপর মেসওয়াক করিতেন এবং মশক হইতে পানি লইযা অযূ করিতেন। তারপর নামাযে দাঁড়ইয়া দুই দুই রাকআতে সাধারণতঃ আট রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন। কোন কোন রাত্রে একাধিকবার জাগিয়া উঠিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রভাত ঘনাইয়া আসিলে গৃহিণীকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করিয়া দিতেন। সময়ে ফযরের জামাতের পূর্বে একটু ঘুমাইতেন, সময়ে শুধু ডান পার্শ্বের উপর হেলান দিয়া আরাম করিতেন, সময়ে গৃহিণীর সহিত আলাপ করিতেন। এর মধ্যেই ফজরের সুন্নত দুই রাকআত পড়িয়া নিতেন এবং মোয়াজ্জিনের সংবাদ দানে মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

রাত্রি বেলা দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। এমনকি তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত; রসের ভারে প্যায়ের চামড়া ফাটিয়াও যাইত। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইত যে, আপনার ত কোন গোনাহ নাই; (অর্থাৎ তবে কেন এত এবাদতের কষ্ট করেন?) নবীজী উত্তরে বলিতেন, যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আমি তাঁহার শোকরগুজারী করিব নাকি?

উম্মতের সমবেদনায় নবীজী (সঃ)

উম্মতের জন্য তাঁহার যে দরদ এবং স্নেহ-মমতা ছিল। তাহা একমাত্র রহমতুল লিলআলামীনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে নফল নামায পড়াকালে নবী (সঃ) এই আয়াতে পৌঁছিলেন- اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দেন দিতে পারেন; কারণ তাহারা আপনারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন তাহাও করিতে পারেন- কাহারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হইবে না; আপনি সর্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা।" (পারা-৭, রুকু-১৬)

কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মত সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে যেই প্রার্থনা করিবেন সেই আলোচনা উক্ত আয়াতে রহিয়াছে। তাহা তেলাওয়াত করিতেই নবীজী (সঃ) নিজের উম্মতের স্মরণে ডুবিয়া পড়িলেন এবং ঐ একটি মাত্র আয়াতের তেলাওয়াতে রাত্র প্রভাত করিয়া ফেলিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার দ্বারা নবী (সঃ) সূরা নেসা তেলাওয়াত

করাইয়া শুনিতেছিলেন। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا -

"কি অবস্থা হইবে তখন যখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষীরূপে এবং আপনাকেও আপনার উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ।"(পারা- ৫, রুকু- ৬)

এই আয়াতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (সঃ) আমাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। হাশরের মাঠে নবীজীর (সঃ) উম্মতের বিপদ সম্পর্কে এই আয়াতে আলোচনা হইয়াছে- তাহা স্মরণেই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর শত শত ঘটনা হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাশরের মাঠে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আদি-অন্তের বিশ্ব মানবের তারপর স্বীয় উম্মতের কত কত উপকার করিবেন তাহার কিঞ্চিত বর্ণনা সপ্তম খণ্ডে কেয়ামত ও হাশরের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা নবীজী (সঃ)-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনার পানে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় নবীজী (সঃ) বাহন হইতে অবতরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলেন এবং দীর্ঘ সময় মোনাজাত করিলেন। অতপর সেজদায় চলিয়া গেলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া পুনরায় দীর্ঘ মোনাজাত করিলেন। আবার সুদীর্ঘ সেজদা করিলেন। এইভাবে পুনঃ পুন সেজদা ও মোনাজাত হইতে অবসর হইয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমি আমার উম্মতের মাগফেরাতের জন্য হাত তুলিতেছিলাম। এক এক বারের মোনাজাতে আংশিকভাবে আমার দোয়া কবুল হইত; আমি তাঁহার কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হইয়া শোকর আদায় করিতাম এবং পুনঃ অধিক মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করিতাম। তাই আমি পুনঃ পুনঃ মোনাজাত ও সেজদা করিয়াছি। (আবু দাউদ শরীফ)

রহমতুল লিলআলামীনের মূল তাৎপর্য

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শিক গুণাবলীর আলোচনা অতি সুদীর্ঘ। হাদীছ ভাণ্ডারে তাহার যে তথ্য ও নজির পাওয়া যায়, বহু গ্রন্থেও তাহার সঙ্কলন শেষ হইবে না। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর তথ্যাবলী রহমতুল লিলআলামীনের মূল তাৎপর্য নহে, বরং কিঞ্চিত আভাস মাত্র- তাহাও শুধু স্থুল দৃষ্টিবাদীদের জন্য। নবীজী মোস্তফা (সঃ) যে রহমতুল লিলআলামীন ছিলেন তাহার মূল তাৎপর্য ঐসব জাগতিক আদর্শ শ্রেণীর সমুদয় তথ্য হইতে বহুউর্ধ্বের; বহু উর্ধ্বের।

আল্লাহ ভোলা মানবকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া আল্লাহর পথের অন্ধকে চক্ষু দান করা, ঐ পথের বধিরকে আল্লাহর ডাক শুনানো- ইহা ছিল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন সাধনা ও সর্বদার তৎপরতা। ইহার দ্বারাই মানব তাহার চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি সুখ লাভ করিতে পারে। সুতরাং মানুষের মুখ্য কল্যাণ-মঙ্গল যাহা তাহারই জন্য নবীজীর সারা জীবন উৎসর্গীত ছিল। অন্য সকল নবীই এই কাজ করিয়াছেন; সকল নবী-রসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত ছিলেন। কিন্তু যেমন, সকল ডাক্তারই রোগের চিকিৎসা করেন, তন্মধ্যে কোন ডাক্তারকে আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্য দিয়া থাকেন সহজ-সুলভ ব্যবস্থার, কম ঔষধে, অল্প ব্যয়ে দ্রুত রুগীদের আরোগ্যের পথে নিয়া যাওয়ার অন্যান্য নবী-রসূলগণের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যও তদ্রূপই ছিল।

মানবের মুখ্য কল্যাণ ও আসল মঙ্গল চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

অর্থ ঃ "দোযখ হইতে মুক্তি ও বেহেশত লাভ- ইহাই হইল সাফল্য। দুনিয়ার জীবন ত শুধু ধোকার বস্তু।" (পারা- ৪, রুকু- ১৯)

মানবকে এই সাফল্যের যোগ্য বানাইতে নবী ভিন্ন অন্য কোন মানুষই কিছু দান করিতে পারেন না।

সকল নবী-রসূলের মধ্যে নবীজী (সঃ) মানব জাতির জন্য এই যোগ্যতার পথ সুগম ও সহজ-সুলভ করিতে সর্বাধিক বেশী কৃতকার্য হইয়াছেন। যাহার ফলে এক বা দুই লক্ষের অধিক নবী-রসূলের উম্মত সমষ্টিগতভাবে যত সংখ্যায় বেহেশতী হইবে, একা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত তাহার দ্বিগুণ সংখ্যায় বেহেশতী হইবে। তাই তাঁহার আখ্যা হইয়াছে–

রহমতুল লিলআলামীন
ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী
ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম

الشوق والحنين الى مدينة سيد المرسلين

প্রাণের আবেগ, নয়নের অশ্রু মদীনার আকর্ষণ

১৯৭৯ সনে দীর্ঘ দিন পর হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনার সুযোগ লাভ হয়। খোদার ঘর এবং হাবীবের শহর মদীনা হইতে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত থাকায় প্রাণ কাঁদিতেছিল, মনের আবেগ উথলিয়া উঠিতে ছিল। আবেগপূর্ণ প্রাণ এবং অশ্রুসজল চোখের তাগাদায় এই কাসিদা রচনা আরম্ভ হয় এবং হাবীবের দুয়ারে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত বয়েতসমূহ হৃদয়পটে জাগিয়া উঠিতে থাকে। সেই শুভলগ্নের কাসিদাটি পাঠকদের জন্য বিশেষ সওগাতরূপে পেশ করা হইল।

(١) مَنَعْتُ عُيُوْنِى عَنْ دُمُوْعٍ مُكَرَّراً ـ وَرَاوَتُّهَا عَنْ رَنَّةٍ كَىْ تَصَبَّرَا

(১) আমি আমার চক্ষুদ্বয়কে বারংবার অশ্রু বহাইতে নিষেধ করিয়াছি এবং তাহাদেরকে রোদন-ক্রন্দন হইতে বারণ করার চেষ্টা করিয়াছি, যেন ধৈর্যধারণ করে।

(٢) وَجَرَّعْتُ نَفْسِىْ حُزْنَهَا وَغُمُوْمَهَا ـ وَاَلْهَيْتُهَا عَنْهَا لِئَلاَّ تَفَكَّرَا

(২) আর নিজের মনকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হজম করাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাকে তাহা হইতে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছি, যেন সে ব্যাকুল না হয়।

(٣) وَلٰكِنَّ دُمُوْعِىْ كَالسُّيُوْلِ تَدَفَّقَتْ ـ فَصَارَتْ عُيُوْنِىْ كَالْعُيُوْنِ تَفَجَّرَا

(৩) কিন্তু নয়নের অশ্রু বন্যার স্রোতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছে; ফলে চোখযুগল ঝর্ণার ন্যায় প্রবাহমান হইয়া গিয়াছে।

(٤) وَلَيْسَ لَهَا حُبُّ الْحِسَانِ وَوُدُّهَا ـ فَمِنْ بُعْدِهَا اٰسٰى وَاَبْكِىْ تَحَسُّرَا

(৪) আমার মনে সুন্দরীদের প্রেম-ভালবাসা নাই যে, আমি তাহাদের বিচ্ছেদে দুঃখিত হইব এবং সেই অনুতাপে কাঁদিব।

(٥) وَلٰكِنَّ بِىْ حُبُّ الْمَدِيْنَةِ طَيْبَةَ ـ فَمِنْ بُعْدِهَا اٰسٰى وَاَبْكِىْ تَذَكُّرَا

(৫) হাঁ, আমার ভিতরে রহিয়াছে মদীনা তাইয়্যেবার ভালবাসা; তাহা হইতে দূরে থাকায়ই আমার দুঃখ এবং তাহার স্মরণেই আমি কাঁদি।

(٦) تَذَكَّرْتُ اٰثَارَ الْمَدِيْنَةِ طَيْبَةَ ـ فَصَارَ فُؤَادِىْ نَحْوَهَا قَدْ تَطَيَّرَا

(৬) যখন স্মরণে আসে আমার মদীনা তাইয়্যেবার নিদর্শনসমূহ; তৎক্ষণাত আমার প্রাণপাখী তৎপ্রতি উড়িয়া ছুটে।

(٧) مَدِيْنَةُ مَحْبُوْبٍ حَيَاةٌ لِّمُؤْمِنٍ ـ لِيَارِزُ اِيْمَانٌ اِلَيْهَا مُسَخَّرَا

(৭) প্রিয় নবীর মদীনা মোমেনদের জীবন; ঈমান (মোমেনকে লইয়া) তৎপ্রতি ধাবমান হয় তাহার আকর্ষণে।

(٨) يَفُوحُ بِهَا رَيَّا الْحَبِيبِ كَأَنَّهَا ـ نَسِيمُ الصَّبَاحِ جَائَتْ عَبِيرًا مُعَطَّرًا

(৮) ঐ মদীনায় প্রিয় নবীর সুগন্ধি এমনভাবে ছড়াইতে থাকে– মনে হয় সম্পূর্ণ মদীনা যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুর ন্যায় আম্বরের আতর নিয়া আসিয়াছে।

(٩) يَلُوحُ بِهَا آثَارُهُ وَرُسُومُهُ ـ فَتَجْذِبُنَا شَوْقًا الَيْهَا مُجَرَّرًا

(৯) ঐ মদীনায় উজ্জ্বল অবস্থায় বিদ্যমান আছে প্রিয় নবীর নিদর্শন ও স্মৃতিসমূহ– ঐ সবই আমাদেরকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া নেয় তাহার আসক্ত করিয়া।

(١٠) جِبَالٌ وَّآكَامٌ وَّأَرْضٌ وَّمَشْهَدٌ ـ يَقُودُ بِنَا حُبًّا الَيْهَا مُسَحَّرًا

(১০) বিভিন্ন পাহাড়, বিভিন্ন টিলা, বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন স্থান, যেখানে নবী (সঃ) পদার্পণ করিয়াছেন ঐগুলি আমাদিগকে মদীনার প্রতি আসক্ত বানাইয়া যাদুগ্রস্তরূপে টানিয়া নেয়।

(١١) وَبِيرٌ وَأَطَامٌ يُجَدِّدُ ذِكْرَهُ ـ وَمَسْجِدُ مَحْبُوبٍ تَرَاهُ مُنَوَّرًا

(১১) বিভিন্ন কূপ (যেগুলির পানি নবী (সঃ) পান করিতেন), বিভিন্ন উঁচু বাড়ী (যাহার উপর নবী (সঃ) আরোহণ করিয়াছেন–) এইগুলি নবীজীর স্মরণ তাজা করিয়া দেয়, আর প্রিয় নবীর নূরপূর্ণ মসজিদ ত দৃশ্যমান অবস্থিত আছেই।

(١٢) أَسَاطِينُهُ تُبْدِي الْحَبِيبَ خِلَالَهَا ـ يَلُوحُ بِهَا نَقْشٌ وَلَوْنٌ مُفَسِّرًا

(১) ঐ মসজিদের খুঁটিসমূহ প্রাণপ্রিয় নবী (সঃ)-কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে– যেন তিনি ঐগুলির আঁকে বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে চলা ফেরা করিতেছেন। (কোনগুলির মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল করিতেন, কোনটার নিকটে দাঁড়াইয়া খোতবা– ভাষণ দিতেন, ইহা) ব্যাখ্যাকারী চিহ্ন– রং ও নকশা তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(١٣) وَمِحْرَابُهُ يُبْدِي الْحَبِيبَ مُصَلِّيًا ـ يَقُومُ بِقُرَانٍ مُسِرًّا وَّجَاهِرًا

(১৩) ঐ মসজিদের মেহরাব প্রাণপ্রিয়কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে– তিনি যেন নামার্য পড়িতেছেন, তিনি যেন তথায় দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফ পড়েন সশব্দে বা নিঃশব্দে।

(١٤) وَمِمْبَرُهُ يَحْكِي الْحَبِيبَ مُخَاطِبًا ـ يَقُومُ عَلَيْهِ بِالشَّرَائِعِ مُخْبِرًا

(১৪) ঐ মসজিদের মিম্বার প্রাণপ্রিয়কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে– তিনি যেন তাহার উপর দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ করিতেছেন এবং শরীয়তের আদেশাবলী বয়ান করিতেছেন।

(١٥) وَرَوْضَتُهُ مِنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ بُقْعَةٌ ـ فَمَنْ يَّاتِهَا يَخْلُدْ خُلُودًا مُقَرَّرًا

(১৫) ঐ মসজিদের (চিহ্নিত করা) বেহেশতের বাগান বস্তুতই চিরস্থায়ী বেহেশতের খণ্ড বিশেষ; অতএব যেব্যক্তিই তথায় পৌঁছিতে পারিবে স্থায়ীভাবে বেহেশতী হইয়া যাইবে।

(١٦) وَقُبَّتُهُ الْخَضْرَاءُ رُوحُ قُلُوبِنَا ـ يُحِيطُ بِهَا نُورٌ عَلَى النُّورِ وَافِرًا

(১৬) ঐ মসজিদ সংলগ্নে যে সবুজ গুম্বজ রহিয়াছে– তাহা ত আমাদের অন্তরের জন্য আত্মা স্বরূপ, তাহা ঘিরিয়া রহিয়াছে অজস্র নূর।

(١٧) تُظِلُّ عَلَى خَيْرِ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا ـ وَتُحْرِزُ مَا يَعْلُو عَلَى الْعَرْشِ فَاخِرًا

(১৭) ঐ সবুজ গুম্বজই ছায়া দিয়া রহিয়াছে সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টের উপর এবং সে এমন ভূখণ্ডকে ঘিরিয়া আছে যাহা আরশের উপরও গর্ব করে।

(١٨) لَيَغْفِرُ مَنْ يَّاتِي الَيْهَا بِتَوْبَةٍ ـ وَأَنْوَارُهَا تُعْطِي لِمَنْ جَاءَ زَائِرًا

(১৮) যেব্যক্তিই তওবার সহিত ঐ গুম্বজের নিকট উপস্থিত হইবে তাহারই গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং যেই তাহার যেয়ারতে আসিবে তাহাকেই তাহার নূর দান করা হইবে।

(١٩) يَسُوقُ بِنَا حُبُّ الْمَدِينَةِ حَادِيًا ـ يَقُودُ بِنَا الْمَحْبُوبُ مِنْهَا مُسَخَّرًا

(১৯) মদীনার প্রেম যেন তারানা গাহিয়া আমাদের হাঁকাইয়া নেয়! আর প্রাণপ্রিয় যেন তথা হইতে আমাদের টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নিয়া যায়।

(٢٠) تَشَقَّقَ قَلْبِي اِذْ ذَكَرْتُ مَدِيْنَةً ـ وَسَالَتْ عُيُوْنِي بِالدِّمَاءِ تَغَزُّرًا

(২০) মদীনা স্মরণে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং নয়নযুগল বন্যার ন্যায় রক্ত বহায়।

(٢١) بُكَائِي عَلَى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ ذَرَّةٌ ـ وَاِنْ كَانَ عُمْرِي بِالْبُكَاءِ مُكَرَّرًا

(২১) মদীনার বিচ্ছেদে যতই কাঁদি তাহা অতি সামান্যই পরিগণিত হইবে, যদিও কাঁদিবার জন্য আমার বয়স কয়েক গুণ দেওয়া হয়।

(٢٢) دُمُوعِي عَلَى حُزْنِ الْمَدِيْنَةِ قَطْرَةٌ ـ وَلَوْ اَنَّهَا سَالَتْ بِحَارًا وَاَنْهُرًا

(২২) মদীনার বিচ্ছেদ-দুঃখে আমার অশ্রুর সমষ্টি এক ফোঁটা মাত্র গণ্য হইবে, যদিও আমার অশ্রু দ্বারা বহু সমুদ্র ও নদী বহিয়া যায়।

(٢٣) حَيَاتِي عَلَى هِجْرَانِهَا مِثْلُ مَوْتَةٍ ـ وَلَوْ كُنْتُ فِي النُّعْمَى وَعَيْشٍ مُخَضَّرًا

(২৩) মদীনা হইতে দূরে থাকিয়া আমার জীবন মৃত্যুতুল্য, যদিও আমি অজস্র নেয়ামতের মধ্যে এবং সুন্দর জিন্দেগীতে থাকি।

(٢٤) وَعَيْشِي عَلَى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ مُرَّةٌ ـ وَلَوْ كُنْتُ فِي رَوْحٍ وَّخَيْرٍ مُّوَفَّرًا

(২৪) মদীনা হইতে দূরে থাকায় আমার জীবন তিক্ত, যদিও আমি শত আনন্দ ও পরিপূর্ণ সুখে থাকি।

(٢٥) وَكَيْفَ اَلْتَذُّذِي بِالْحَيَاةِ مُفَارِقًا ـ مَدِيْنَةَ مَحْبُوْبٍ لَهَا الْقَلْبُ سُجِّرَا

(২৫) প্রাণপ্রিয় নবীজীর মদীনার জন্য সর্বদা অন্তরে আগুন জ্বলে; সেই মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া জীবনের স্বাদ আমি কিরূপে পাইতে পারি?

(٢٦) وَصِرْتُ اُقَاسِي مِنْ بُعْدِهَا وَفِرَاقِهَا ـ شَدَائِدَ اَشْوَاقٍ فَقَلْبِي تَكَسَّرَا

(২৬) দীর্ঘ দিন যাবত মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন ও দূরে থাকিয়া অনেক আবেগ সহ্য করিয়া যাইতে হইয়াছে, যদ্দরুন অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে।

(٢٧) وَلَمَّا اَتَيْتُ الْبَابَ بَابَ مَدِيْنَةٍ ـ خَرَرْتُ لِرَبِّي سَاجِدًا مُّتَشَكِّرًا

(২৭) তাই মদীনার দরজায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে শোকরের সেজদায় পড়িয়া গিয়াছি।

(٢٨) وَصَلْتُ اِلَى بَابِ الْحَبِيْبِ مُسَلِّمًا ـ فَصَاحَ فُؤَادِي بِالسُّرُوْرِ مُكَبِّرًا

(২৮) তারপর প্রাণপ্রিয় নবীজীর দুয়ারে সালাম পাঠ করতঃ পৌঁছিয়াছি; তখন আমার প্রাণ আনন্দে তকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিয়াছে।

(٢٩) وَقَرَّتْ عُيُوْنِي اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهِ ـ وَصَارَ فُؤَادِي مِنْ هُمُوْمٍ مُطَهَّرًا

(২৯) তাঁহার দুয়ারে পৌঁছিয়া আমার চোখ শীতল এবং মন সব চিন্তা-ভাবনা হইতে পাক-ছাফ হইয়া গিয়াছে।

(٣٠) هُمُوْمٌ وَّاَحْزَانٌ لَدَيْهِ تَبَدَّلَتْ ـ رَجَاءً وَّاٰمَالًا وَّشَوْقًا مُّكَثَّرًا

(৩০) তাঁহার নিকটে আসিয়া সব চিন্তা ভাবনা অনেক অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

(٣١) ذُنُوْبٌ وَّاٰثَامٌ لَدَيْهِ تُكَفَّرُ ـ فَيَا اَيُّهَا الْعَاصِي تَعَالَ لِتُغْفَرَا

(৩১) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সকল প্রকার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব হে গোনাহগার! এই দুয়ারে আস যেন তোমাকে ক্ষমা করা হয়।

(٣٢) اَيَا زُمْرَةَ الْعَاصِي تَعَالَوْا لِرَحْمَةٍ ـ اِلَى رَحْمَةٍ كَانَتْ مِنَ اللّٰهِ مَظْهَرًا

(৩২) হে গোনাহগারের দল! রহমত লাভের জন্য রহমতের দুয়ারে ছুটিয়া আস; যিনি আল্লাহর রহমতের বিকাশস্থল।

اِلَى رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ جَمِيْعِهِمْ ـ يَبِيْتُ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ سَاهِرًا

(৩৩) সারা জাহানের জন্য যিনি রহমত তাঁহার নিকট আস; যিনি জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা চাহিতে থাকিয়া নিদ্রাশূন্য রাত্র কাটাইতেন।

(٣٤) بِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ـ لِأُمَّتِهِ يَبْكِي لِلشَّدَائِدِ ذَاكِرًا

(৩৪) বিছানা হইতে দূরে থাকিয়া রাত্র কাটাইতেন; স্বীয় উম্মতের কঠিন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেন।

(٣٥) وَسَمَّاهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ بِرَحْمَةٍ ـ فَرَحْمَتُهُ تُرْجٰى لَدَيْهِ وَتُشْتَرٰى

(৩৫) সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন "রহমত"; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেই সৃষ্টিকর্তার রহমতের আশা করা যায় এবং লাভ হইতে পারে।

(٣٦) هُوَ الْمُرْسَلُ الْهَادِيُ اِلَى النَّاسِ رَحْمَةً ـ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا مُشْفِقًا وَّمُبَشِّرًا

(৩৬) তিনি বিশ্ব মানবের প্রতি পথপ্রদর্শক ও রহমতরূপে এবং অতি কোমল, দয়ালু, স্নেহশীল ও সুসংবাদদাতারূপে প্রেরিত।

(٣٧) نَذِيْرًا لَهُمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ يَضُرُّهُمْ ـ شَفِيْعًا لَّهُمْ عِنْدَ الْمَصَائِبِ نَاصِرًا

(৩৭) এবং সতর্ককারীরূপে মানবের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষতিকারক বস্তু হইতে, তাহাদের জন্য সুপারিশকারীরূপে এবং বিপদ ক্ষেত্রে সাহায্যকারীরূপে।

(٣٨) مَصَائِبُ دُنْيَا بِاسْمِهٖ تَتَفَتَّتُ ـ مَصَائِبُ عُقْبٰى بِالشَّفَاعَةِ لَنْ تُرَا

(৩৮) দুনিয়ার অনেক মসিবত তাঁহার নামের বরকতে দূরীভূত হইয়া যায়, আর আখেরাতের মসিবত তাঁহার শাফাআতের দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

(٣٨) شَفَاعَتُهُ تَمْحِي الذُّنُوْبَ وَاَنَّهَا ـ لَتَنْفِيْ وَاِنْ كَانَتْ مَعَاصٍ كَبَائِرًا

(৩৯) তাঁহার শাফাআত গোনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে এবং কবীরা গোনাহ হইলেও দূর করিয়া দিবে।

(٤٠) لَيَشْفَعُ فِي الْحَشْرِ لِاَهْلِ كَبَائِرٍ ـ وَيُخْرِجُ مِنْ نَّارٍ كَثِيْرًا وَاَكْثَرًا

(৪০) কবীরা গোনাহকারীদের জন্যও তিনি হাশরের দিন শাফাআত করিবেন এবং অনেককে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন।

(٤١) يَقُوْمُ مَقَامًا يَحْمَدُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ـ وَيَسْجُدُ لِلّٰهِ سُجُوْدًا مُّؤَثَّرًا

(৪১) কেয়ামত দিবসে তিনি এমন এক উচ্চস্থান লাভ করিবেন যাহার ফলে সকল মানুষ তাঁহার প্রশংসামুখর হইবে এবং তিনি (সকল মানুষের) চাহিদা পূরণ করিবেন।

(٤٢) شَفَاعَتُهُ الْكُبْرٰى تَعُمُّ جَمِيْعَهُمْ ـ لِيَشْفَعَ اِذْ جَاءَ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَا

(৪২) তাঁহার শাফাআতে কোবরার উপকারে সকল মানুষ উপকৃত হইবে। দুঃখ যাতনায় মানুষের কলিজা যখন মুখে আসিয়া যাইবে তখন তিনি শাফাআত করিবেন।

(٤٣) يَقُوْمُ اِذَا صَاحَ النَّبِيُّوْنَ خَشْيَةً ـ بِنَفْسِيْ بِنَفْسِيْ خَاشِعًا مُتَحَيِّرًا

(৪৩) নবীগণ যখন ভীত হইয়া নফ্সী নফ্সী বলিতে থাকিবেন তখন তিনি (লোকদের জন্য) বিচলিত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির জন্য বিনয়ীভাবে দাঁড়াইবেন–

(٤٤) وَيَدْعُوا الْاِلٰهَ سَاجِدًا تَحْتَ عَرْشِهٖ ـ وَيَحْمَدُهُ حَمْدًا جَدِيْدًا مُّؤَقَّرًا

(৪৪) এবং আরশের নীচে সেজদাবনত হইয়া আল্লাহকে ডাকিবেন, আল্লাহর প্রশংসা অতি উচ্চমানে নূতনভাবে করিবেন। তখন–

(٤٥) يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ ارْفَعِ الرَّاْسَ وَاشْفَعَنْ ـ تُشَفَّعْ وَسَلْنِيْ مَا تُرِيْدُ لِاَمْرًا

(৪৫) প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাকে বলিলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গৃহীত হইবে এবং যাহা ইচ্ছা বলুন; তাহা পূরণের আদেশ দিব।

(٤٦) يُسَارِعُ فِيْمَا يَشْتَهِيْ رَبُّهُ لَهُ ـ وَيُعْطِيْهِ مَا يَرْضٰى وَلَنْ يَتَاخَّرَا

(৪৬) তিনি যাহাই আবদার করিবেন পরওয়ারদেগার তাহা দ্রুত পূরণ করিবেন এবং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন পরওয়ারদেগার অবিলম্বে তাহাই দিবেন।

(٤٧) لَقَدْ حَازَ مَا قَدْ نَالَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ ـ لِأُمَّتِهٖ مِنْ دَعْوَةٍ لَنْ تُؤَخَّرَا

(৪৭) প্রভুর নিকট হইতে তিনি যে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার লাভ করিয়াছেন যাহা গৃহীত হওয়ায় মোটেই বিলম্ব হইবে না– সেই দোয়াটিও তিনি উম্মতের জন্য জমা রাখিবেন।

(٤٨) عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ الْمُكَرَّمِ ـ اَتَيْتُ لِأَحْظٰى مِنْ سَلَامِكَ حَاضِرًا

(৪৮) আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর সম্মানিত হাবীব! আমি উপস্থিত হইয়াছি আপনার দ্বারে সালাম করার সৌভাগ্য লাভের জন্য।

(٤٩) اَتَيْتُكَ مِنْ بُعْدٍ بِشَوْقٍ وَّرَغْبَةٍ ـ رَجَائِىْ كَثِيْرًا اَنْ يُّعَدَّى وَيُحْصَرَا

(৪৯) আমি বহু দূর হইতে আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি আবেগ ও বাসনা লইয়া; আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সীমা-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

(٥٠) اَتَيْتُكَ اَرْجُوْا مِنْ نَوَالِكَ وَافِرًا ـ اَتَيْتُكَ اَخْشٰى مِنْ ذُنُوْبِىْ لِتَنْصُرَا

(৫০) আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি আপনার বেশী বেশী দানের আশা নিয়া। আমার গোনাহের দরুন ভীত হইয়া আপনার সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছি।

(٥١) فَاَنْتَ لَدٰى رَبِّىْ شَفِيْعٌ مُّشَفَّعٌ ـ شَفِيْعٌ لِّكُلِّ جَاءَ عِنْدَكَ زَائِرًا

(৫১) কারণ, আপনি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট গ্রহণীয় সুপারিশকারীরূপে নির্ধারিত; আপনি প্রত্যেক যিয়ারতকারীর জন্য শাফাআত করিবেন– (ইহা আপনার ওয়াদা)।

(٥٢) يُسَارِعُ رَبِّىْ فِىْ هَوَاكَ لِحُبِّهٖ ـ فَجِئْتُكَ اَبْغِىْ مِنْ لُّهَاكَ لِأُغْفَرَا

(৫২) আমার পরওয়ারদেগার আপনার খাহেশ দ্রুত পূরণকারী, কারণ তিনি আপনাকে ভালবাসেন; তাই আমি আমার মাগফেরাতের জন্য আপনার সাহায্য কামনায় ছুটিয়া আসিয়াছি।

(٥٣) وَرَبُّكَ يَهْوٰى مَاتُرِيْدُ وَتَشْتَهِىْ ـ فَكُنْ اَنْتَ لِىْ عَوْنًا شَفِيْعًا وَّنَاصِرًا

(৫৩) আপনার প্রভু আপনার ইচ্ছা-অভিলাষ পূরণ করা ভালবাসেন। অতএব আপনি আমার জন্য সহায়, শাফাআতকারী ও সাহায্যকারী হউন।

(٥٤) ذُنُوْبِىْ وَاٰثَامِىْ كَثِيْرٌ وَّلَا اَرٰى ـ سِوَاكَ شَفِيْعًا عِنْدَ رَبِّىْ لِيَغْفِرَا

(৫৪) আমার গোনাহ ও অপরাধ অনেক; আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি দেখি না, যে আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা করার জন্য শাফাআত করিবে।

(٥٥) اَتَيْتُكَ مَجْرُوْحًا مِّنَ الذَّنْبِ هَارِبًا ـ فَكُنْ اَنْتَ لِىْ مَوْلًا طَبِيْبًا وَّجَابِرًا

(৫৫) ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়া, গোনাহ হইতে পলায়ন করিয়া আপনার দুয়ারে পৌঁছিয়াছি; আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার আহত হৃদয়ের চিকিৎসা করুন এবং পট্টি বাঁধুন।

(٥٦) اَتَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْوَرٰى لِشَفَاعَةٍ ـ وَلَنْ يُّحْرَمُ الرَّاجِىْ بِبَابِكَ طَاهِرًا

(৫৬) হে সৃষ্টির সেরা আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি শাফাআতের জন্য; আপনার পবিত্র দরবার হইতে কোন আশাবাদী বঞ্চিত যায় না।

(٥٧) ظَلَمْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَجِئْتُكَ تَائِبًا ـ وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّىْ كَرِيْمًا وَّسَاتِرًا

(৫৭) আমি নিজের উপর জুলুম করিয়া তওবা করতঃ দয়াল ও ক্ষমাকারী প্রভুর দরবারে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।

(٥٨) فَلَوْ اَنَّكَ اسْتَغْفَرْتَهٗ لِىْ وَجَدْتُّهٗ ـ رَحِيْمًا وَّتَوَّابًا لِّذَنْبِىْ غَافِرًا

(৫৮) এমতাবস্থায় যদি আপনি পরওয়ারদেগারের নিকট আমার জন্য ক্ষমার আবেদন করেন তবে আমি তাঁহার দয়া লাভ করিব, তিনি আমার তওবা কবুল করিবেন এবং আমার গোনাহ মাফ করিবেন।

(٥٩) وَهٰذَا الْوَعْدُ مِّنْ كَرِيْمٍ وَّقَادِرٍ - وَوَعْدُ كَرِيْمٍ بِالْوَفَاءِ تَقَدَّرًا

(৫৯) ইহা সর্বশক্তিমান দয়ালু প্রভুরই অঙ্গীকার; আর দয়াবানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত।

(٦٠) اَتَيْتُ بِاٰمَالٍ لَدَيْكَ كَثِيْرَةً - فَيَالَيْتَ لِيْ رُجْعٰى نَجِيْحًا وَّشَاكِرًا

(৬০) অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; খোদা করুন! আমি যেন সফলকাম ও কৃতজ্ঞরূপে প্রত্যাবর্তন করি।

(٦١) رَجَائِيْ بِرَبِّيْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةَ - فَاَرْقُدُ فِيْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرًا

(৬১) আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা– আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণপ্রিয় নবীজীর ছায়ায় চির নিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশরের মাঠেও যাইতে পারি।

(٦٢) اِلٰهِيْ عَلٰى بَابِ الْحَبِيْبِ رَجَوْتُهُ - فَهَلْ اَنْتَ تُعْطِيْنِيْهِ حَتْمًا مُّقَدَّرًا

(৬২) হে মা'বুদ! তোমার হাবীবের দুয়ারে বসিয়া এই আশা পোষণ করিলাম; তুমি কি আমাকে এই আশার বস্তু সুনিশ্চিতরূপে দান করা সাব্যস্ত করিয়া দিবে?

(٦٣) عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ الْمُعَظَّمُ - سَلَامٌ غَرِيْبٌ قَدْ اَتَاكَ مُسَافِرًا

(৬৩) হে আল্লাহর সম্মানিত হাবীব আপনার প্রতি সালাম– ইহা এক বিদেশী খাদেমের সালাম; সে অনেক দূরের পথ সফর করিয়া আপনার দরবারে হাযির হইয়াছে।

(٦٤) سَلَامٌ عَزِيْزَ الْحَقِّ عَبْدٌ اَضَرَّهُ - ذُنُوْبٌ وَّاٰثَامٌ فَجَائَكَ حَائِرًا

(৬৪) আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম; তাহাকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহার গোনাহ ও অপরাধসমূহ, তাই সে দিশাহারা হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছে।

(٦٥) فَاَنْتَ كَرِيْمٌ مَا لِفَضْلِكَ غَايَةً - فَهَلْ اَنْتَ تُؤْوِيْنِيْ لَدَيْكَ لِتَنْظُرَا

(৬৫) আপনি দয়ালু, আপনার দয়ার কোন সীমা নাই; আপনার নিকট কি আমাকে আশ্রয় দিবেন, যেন আপনি আমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন?

(٦٦) وَاَنْتَ جَوَادٌ مَالِجُوْدِكَ سَاحِلٌ - فَهَلْ اَنْتَ تُرْوِيْنِيْ اَتَيْتُكَ حَاصِرًا

(৬৬) আপনি সমুদ্রতুল্য দানবীর, আপনার দান সমুদ্রের কূল নাই; আপনি কি আমার পিপাসা দূর করিবেন? আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

(٦٧) تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ وَاشْفَعْ لِذَنْبِهِ - وَكُنْ اَنْتَ لِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَاصِرًا -

(৬৭) নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন এবং তাহার গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শাফাআত করুন এবং আপনি আমার জন্য কেয়ামত দিবসে সাহায্যকারী থাকিবেন।

(٦٨) عَلَيْكَ اُلُوْفٌ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّرَحْمَةٍ - وَاٰلَافُ تَسْلِيْمٍ مِّنَ اللّٰهِ عَاطِرًا

(৬৮) আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদ ও রহমত এবং আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে (বেহেশতের সওগাতে) সুরভিত সালাম। সালাম! সালাম!! সালাম!!!

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَبِّيْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ - فَيَا لَيْتَ لِيْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِيْ

আমি আমার প্রভুর নিকট এই আকাঙ্ক্ষাই রাখি, আমি যেন মদীনায় অবস্থান লাভ করি। হায়!! মদীনায় আমার কবরের জন্য এক হাত ভূমি ভাগ্যে জুটিবে কি?

رَجَائِيْ بِرَبِّيْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةَ - فَاَرْقُدَ فِيْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرًا

আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা– আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণ প্রিয় নবীজীর ছায়ায় চির নিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহার ছায়ায় হাশরের মাঠেও যাইতে পারি।

تمت بالخير

بسم الله الرحمن الرحيم

রহমানুর রহীম আল্লার নামে—

অষ্টাদশ অধ্যায়

ছাহাবীগণের ফজিলত (৫১৫ পৃঃ)

যাঁহারা ঈমানের হালতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বা তাঁহাকে এক নজর দেখিয়াছিলেন (এবং ঈমানের উপরই মৃত্যু হইয়াছিল) তাঁহাদিগকে ছাহাবী বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইসলামে ছাহাবীগণের গুরুত্ব সমধিক। ছাহাবীগণের এই গুরুত্ব কেন এবং কিরূপ ? তাহার একটি নজীর লক্ষ্য করুন। ইসলামের মূল কলেমা-তৌহীদের দুইটি বিষয়—(১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, (২) মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ—মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল। ঈমান-মোফাচ্ছাল-কলেমায় আছে— اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ "আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি—আল্লার প্রতি, আল্লার ফেরেশতাগণের প্রতি, আল্লার কেতাবসমূহের প্রতি এবং আল্লার রসুলগণের প্রতি···।

লক্ষ্য করুন ! আল্লাহ এবং রসুলের মধ্যস্থলে আল্লার কেতাব এবং তাহার পূর্ব্বে আল্লার ফেরেশতাগণের বিশ্বাস ও ঈমানের উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, উহাকে ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই গুরুত্বের একটি বিশেষ কারণ এই যে, ওহী ছাড়া নবী হইতে পারে না। আর ওহী এবং আল্লার কেতাব প্রেরণ একমাত্র ফেরেশতার মাধ্যমেই হয়। তাই যেখানে রসুল এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিতে হইবে সেখানে ফেরেশতাগণের প্রতিও ঈমান আনিতে হইবে। ফেরেশতার প্রতি ঈমান ছাড়া কেতাব ও রসুলের প্রতি ঈমানের অর্থই হইতে পারে না।

এই দৃষ্টান্তেই বুঝুন! আল্লার কালাম কোরআন মজিদ এবং আল্লার রসুল মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিচয় এবং তাঁহার জীবনাদর্শ বিশ্ব-মানব একমাত্র ছাহাবীগণের মাধ্যমেই লাভ করিতে পারিয়াছে। এবং আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনিত আদর্শ ও দ্বীনের ভিত্তিতে তিনি স্বয়ং নিজ পবিত্র হাতে ছাহাবীগণকে গড়াইয়া তাঁহাদের জমাত গঠন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আমল এবং বয়ান ও প্রচারের মাধ্যমেই দ্বীন-ইসলাম বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছিয়াছে।

আল্লাহ এবং রসুল হইতে দ্বীন লাভের মাধ্যম এই ছাহাবীগণের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়ার অর্থই হইবে কোরআন-হাদীছ হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়া।

ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রু ইহুদী-খৃষ্টান এবং ছদ্মবেশী মোসলমান নামধারী মোনাফেকের দল উক্ত উপলব্ধি ভালভাবেই রাখে। তাই তাহারা ছাহাবীগণের প্রতি মোসলমানদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরকে শিথিল করার নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

দ্বীন-ঈমান ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ইমাম ও হক্কানী আলেমগণ শত্রুদের ঐ কৌশল ব্যর্থ করার জন্য পূর্বের পূর্ব যুগ হইতেই ছাহাবীগণ সম্পর্কে ইসলামের (Dimand) দাবী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ছাহাবীগণ সম্পর্কে মোসলমানদের আকীদা, মতবাদ ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন; যাহাতে শত্রুরা তাহাদের অপচেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়ার ছিদ্রপথ পাইতে না পারে।

(১) ইসলামী আকীদা বা মতবাদের প্রসিদ্ধ شرح عقيدة الطحاوية কেতাবের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বাপর ইমামগণের সর্ব্বসম্মত আকীদা বর্ণনা করিয়াছেন।

لَا نَذْكُرُهُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ حُبُّهُمْ دِيْنٌ وَّاِيْمَانٌ وَّاِحْسَانٌ

"আমরা ছাহাবীগণের কাহারও গুণচর্চ্চা ব্যতীত দোষচর্চ্চা মোটেও করিতে পারিব না। ছাহাবীগণের প্রতি ভক্তি-মহব্বত রাখাই ধর্ম্ম, ঈমান ও আল্লাহনুরুক্তির পরিচয়।"

(২) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ আকীদার কেতাব شرح فقه اكبر গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

لَا نَذْكُرُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا بِخَيْرٍ

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিজন ছাহাবীরই শুধুমাত্র গুণ-চর্চ্চাই আমরা করিব; কোন ছাহাবীরই দোষ-চর্চ্চা আমরা করিতে পারিব না।"

(৩) ইসলামী আকীদা ও মতবাদ বর্ণনার প্রসিদ্ধ কেতাব "আল-মোছামারা" ৩১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

وَاعْتِقَادُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَزْكِيَةُ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وُجُوْبًا بِاِثْبَاتِ الْعَدَالَةِ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ وَالْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيْهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ

"নবীজীর স্থন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং খাঁটী মোসলেম জমাতভুক্ত সকলের সর্ব্বসম্মত মতবাদ ও আকীদা এই যে, সমস্ত ছাহাবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণকে দোষমুক্ত গণ্য করা ওয়াজেব—অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রত্যেককে ভাল ও খাঁটী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের কাহাকেও দোষী মনে করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তাঁহাদের গুণ-চর্চ্চা করিতে হইবে।"

ইসলামে ছাহাবীগণের গুরুত্ব এবং তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা হইতে বিরত থাকার অবশ্য কর্ত্তব্যকে স্বয়ং রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের ভিত্তিরূপে প্রকাশ করিতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। হাদীছ—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ

"সাবধান! সাবধান!! আল্লাহকে ভয় করিও আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে। খবরদার! খবরদার!! আমার পরে আমার ছাহাবীদেরকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করিও না। অধিকন্তু যে কেহ আমার ছাহাবীদিগকে ভালবাসিবে বস্তুতঃ সেই ভালবাসা আমার প্রতিই ভালবাসা হইবে। আর যে কেহ তাঁহাদের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করিবে বস্তুতঃ সেই খারাব ধারণা আমার প্রতি পোষণ করা গণ্য হইবে। যে কেহ তাঁহাদিগকে ব্যথা দিবে সেই ব্যথা আমাকেই দেওয়া হইবে, আর যে আমাকে ব্যথা দিবে সে যেন আল্লাহকে ব্যথা দিল। এবং যে আল্লাহকে ব্যথা দিবে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিবেন।

(তিরমিজি শরীফ)

হাদীছ— قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَنِىْ وَاخْتَارَ اَصْحَابِىْ فَجَعَلَهُمْ اَصْحَابِىْ وَاَصْهَارِىْ

وَجَعَلَهُمْ اَنْصَارِىْ وَاِنَّهٗ سَيَجِيْئُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُوْنَهُمْ

اَلَا فَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ اَلَا فَلَا تَنْكِحُوْا اِلَيْهِمْ اَلَا فَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ فَاِنْ

اَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَلَا تَدْعُوْا لَهُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ

"রসুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাছনী করিয়াছেন (নবীগণের শ্রেষ্ঠ রূপে), আমার ছাহাবীগণকেও বাছনী করিয়াছেন (নবীর পরে সমগ্র মানব-শ্রেষ্ঠরূপে)। তাহাদিগকে আমার এত ঘনিষ্ঠ বানাইয়াছেন যে, আমার শশুর-জামাতা সব তাহাদের মধ্য হইতে বানাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে আমার সাহায্যকারী বানাইয়াছেন।

হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মতগণ! তোমরা সতর্ক থাকিও—আমার পরবর্ত্তী যুগে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা আমার ছাহাবীদের প্রতি সম্মান-হানীকর কথা বলিবে। হুশিয়ার! হুশিয়ার!! এই শ্রেণীর লোকদের মেয়ে তোমরা বিবাহ করিবে না এবং তাহাদের নিকট তোমাদের মেয়ে বিবাহ দিবে না। খবরদার! তাহাদের সঙ্গে তোমরা নামাযও পড়িবে না। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য তোমরা দোয়াও করিবে না; নিশ্চয় জানিও, এই শ্রেণীর লোকদের উপর আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। (মোছনাদে ইমাম শাফেয়ী)

ছাহাবীগণের এই সব মান-মর্য্যাদা খামাকা অকারণে নিশ্চয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যে তাঁহাদের মধ্যে এমন গুণেরই সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার অনিবার্য্য ফল ছিল এইরূপ মান-মর্য্যাদা।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে অসংখ্য অলৌকিক গুণাবলী দান করিয়া বিশেষ করুণারূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরতের একটি বিশেষ গুণ ছিল তাঁহার পরশ-দৃষ্টি। যেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতে পরশপাথরে এই শক্তি ও তাছির রহিয়াছে যে, উহার মামুলী ঘর্ষণে লোহা স্বর্ণ হইয়া যায়; সেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতেই হযরতের পরশ-দৃষ্টির ক্রিয়া ও তাছিরে অল্প সময়ে মাটির মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হইয়া যাইত। হযরতের এই গুণটিরই আভাস দেওয়া হইয়াছে সুন্দর একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রথম খণ্ডের ৫ নং হাদীছে।

ক্রিয়া ও আছর গ্রহণে ক্ষেত্র ও পাত্রের যোগ্যতা তথা অক্ষুন্ন ঈমানের সহিত যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি এবং তাঁহার সাহচর্য্য লাভে সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন তাঁহাকেই ছাহাবী বলে। হযরতের পরশ-দৃষ্টির ক্রিয়ায় এইরূপ প্রতিটি মাটির মানুষই সোনার মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন।

হযরতের পরশ-দৃষ্টিতে ছাহাবীগণের মধ্যে যে গুণাগুণের সঞ্চার হইয়াছিল পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে উহার অনুভূতি দুরূহ হইলেও আল্লাহ এবং রসূলের যে সব সাক্ষ্য তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে উহার দ্বারা তাঁহাদের সেই গুণাগুণের আভাস লাভ হইতে পারে। যথা, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ....

"মোহাম্মদ আল্লার রসুল; তাঁহার ছাহাবীগণ আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি অতি কঠোর, পরস্পর অতি কোমল। তাঁহাদিগকে দেখিবে, (১) আল্লার প্রতি অতিশয় নত ও রত—রুকু-সেজদায় অবনত, (২) আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার অন্বেষণে সদা মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত, (৩) আল্লাহনুরক্তির আভা তাঁহাদের চোখে-মুখে উদ্ভাসিত। তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ (পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব) তৌরাত এবং ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রহিয়াছে।" (২৬ পাঃ ১১ রুঃ)

কোন কাজই হীনস্বার্থ বশে না করা, একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টি লাভ-উদ্দেশ্যে করা—ইহাকেই এখ্‌লাছ বা একনিষ্ঠতা বলে। এই "এখ্‌লাছ" একটি অতি মহৎ গুণ; ইহার অনুক্রম ও শ্রেণী বা পর্য্যায় এত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে যে, নিম্ন পর্য্যায়ওয়ালারা সেই উর্দ্ধ ও উচ্চ পর্য্যায়ের উপলব্ধিও করিতে সক্ষম হয় না; আর যাহাদের মধ্যে এই গুণ নাই তাহাদের ত প্রশ্নই উঠে না। এই "এখ্‌লাছ" গুণের তারতম্যে মানুষ অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের গৌরব লাভে ধন্য হয়।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচর্য্যে ছাহাবীগণের মধ্যে ঐ "এখ্‌লাছ" গুণ এত উর্দ্ধ পর্য্যায়ের বিদ্যমান ছিল যে, আমরা তাহা ব্যক্ত করিব দূরের কথা তাহা উপলব্ধি করিতেও সক্ষম হইব না। ছাহাবীগণের মধ্যে এখ্‌লাছ গুণের অসাধারণ পর্য্যায় হাসিল থাকার কারণেই তাঁহাদের বহু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও হাসিল ছিল। যথা--

হাদীছ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মত! তোমরা) আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বলিও না; তোমাদের কাহারও ওহোদ পর্ব্বৎ পরিমাণ স্বর্ণ দান-খয়রাত করা তাঁহাদের কোন একজনের মাত্র এক মুদ্দ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা উহার অর্দ্ধ পরিমাণ কোন বস্তু দানের সমানও হইতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ, মোছলেম শরীফ)

ইহা অপেক্ষা আরও অসাধারণ অতি অসাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য ছাহাবীগণের জন্য সুস্পষ্টরূপে হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে—

হাদীছ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ কানে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার পরে আমার ছাহাবীগণের (ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য) বিরোধ সম্পর্কে আবেদন করিলাম। তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওহী পাঠাইয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার ছাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্ররাজী তুল্য—কম-বেশ প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রহিয়াছে। অবশ্য কাহারও আলো কাহারও অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী; (কিন্তু অন্ধকার কাহারও মধ্যে নাই,) প্রত্যেকের মধ্যেই আলো আছে। অতএব কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বিরোধ হইলে যে কেহ তাহাদের যে কোন একজনের মত ও পথ অবলম্বন করিবে সে আমার নিকট সৎ পথের পথিকই সাব্যস্ত হইবে।

হাদীছখানা মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় আছে, এতদ্ভিন্ন আরও ৯ খানা বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে— (১) মোছনাদে আব্দ-ইবনে-হোমায়দ (২) দারমী (৩) ইবনে মাজাহ (৪) আল-আব্বারী (৫) ইবনে-আছাকের (৬) হাকেম (৭) দার-কোৎনী (৮) ইবনে-আবদুল বর´ (৯) মাদখাল-বায়হাকী।

হাদীছখানার মর্ম্ম সকল প্রকার মতবিরোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণ মছআলাহ-মাছায়েলের মধ্যে ত প্রযোজ্য আছেই; চার মজহাবের চার ইমামগণের সাধারণ মছলা-মাছায়েলে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে উহার অধিকাংশই ছাহাবীগণের মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পূর্ব্বাপর সমস্ত ইমাম ও আলেমগণের সর্ব্বসম্মত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে, চার মজহাবের প্রত্যেকটিই আল্লাহ তায়ালার নিকট হেদায়েত—সৎ ও সত্য সাব্যস্ত।

আলোচ্য হাদীছখানার মর্ম্ম ছাহাবীগণের ঐ সব বিরোধেও প্রযোজ্য যে সব বিরোধকে আমরা বৈষয়িক বা রাজনৈতিক গণ্য করিয়া থাকি। ছাহাবীগণের পরস্পর এই শ্রেণীর বিরোধে যে সব মোনাফেক গোষ্ঠী ইসলামের শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বা যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরোধমান কোন ছাহাবীর দলে গা-ঢাকা দিয়া ছিল—ঐ শ্রেণীর লোক ব্যতীত যত মোমেন-

মোছলমান কোন ছাহাবীর পক্ষকে অবলম্বন করিয়া ছিল তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট মোটেই কোন রকম অপরাধী গণ্য হইবে না, কোন প্রকারে অভিযুক্ত হইবে না। খাঁটী আন্তরিকভাবে কোন পক্ষের দাবী ও মতামতকে মোসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণজনক ভাবিয়া সেই পক্ষের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিরোধ, বিবাদ, লড়াই-যুদ্ধে যত মোসলমান ছাহাবীগণের যে কোন পক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল—কোন পক্ষের কেহই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হইবে না, কোন প্রকারে অভিযুক্ত হইবে না।

আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ সাব্যস্ত, বিরোধ ক্ষেত্রে তাঁহার দাবী ও মতামতই হক্ ও নির্ভুলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। এতদ সত্ত্বেও আবদুল্লাহ-ইবনে-ছাবার মোনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের যে সব লোক গা-ঢাকা দিয়া ষড়যন্ত্র করার বা আত্মরক্ষার জন্য আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ সমর্থনকারীরূপে তাঁহার দলে ভিড়িয়া ছিল তাহারা জাহান্নামী হইবে। পক্ষান্তরে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধীতা যে সব ছাহাবীরা করিয়াছেন; যেমন—তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)—এই সব ছাহাবী এবং যে সব খাঁটী মোমেন-মোসলমান তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দাবী ও মতামতকে মোসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণজনক মনে করিয়া—তাঁহাদের কেহই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী গণ্য হইবেন না, অভিযুক্ত হইবেন না। এই মহা সত্য আলোচ্য হাদীছেরই আওতাভুক্ত এবং ইহা বাস্তব ও প্রকৃত তথ্য; ঐতিহাসিক সত্যরূপে ইহা প্রমাণিত।

জামাল-যুদ্ধে তাল্‌হা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। আলী (রাঃ) খলীফা বরহক হওয়া অবধারিত; তাঁহার পক্ষ প্রকৃত হক্ এবং নির্ভুলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। তাল্‌হা (রাঃ) তাঁহার সহিত বিরোধ ও মতভেদ করিয়াছিলেন, এমনকি সেই বিরোধের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আল্লার রাস্তায় তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য জেহাদে শহীদ হওয়ার পূর্ণ মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। যাহার প্রমাণে চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক ঘটনা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ছাহাবীগণের এই বৈশিষ্ট্য আল্লার দান বটে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের সুফল। সেই বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহাদের ঐকান্তিক একনিষ্ঠতা তথা ঊর্দ্ধ স্তরের "এখ্‌লাছ"।

আলোচ্য হাদীছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরতের আবেদনের উত্তরে বলিয়াছেন,

أَصْحَابُكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ......لِكُلٍّ نُورٌ

"আপনার ছাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায়......তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রহিয়াছে।"

হযরতের সাহচর্য্যেই ছাহাবীগণ ঐ নূর লাভ করিয়াছিলেন। সেই নূর ও আলোই ছাহাবীগণের বিভিন্ন অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের উৎস। ঐ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই একটি ছিল চরম "এখ্লাছ"।

النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم

"আল্লাহ-প্রেম, আল্লার দাসত্ব এবং আল্লার দ্বীনের উন্নতি কামনা; রসুলের মহব্বৎ, রসুলের এত্তেবা এবং রসুলের মিশনের সাফল্য সাধন; মোসলেম জাতির শক্তির উৎস নেজামে-খেলাফতের সুষ্ঠুতা বজায় রাখা; মোসলমান জনসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা—এই সব বিষয়ে "এখ্লাছ" তথা ঐকান্তিক একনিষ্ঠতার চরম পর্য্যায় ছাহাবীগণের হাসিল ছিল। তাঁহাদের অন্তর হীন উদ্দেশ্যাবলী হইতে কত পাক-পবিত্র ছিল এবং কত উর্দ্ধের উর্দ্ধ পর্য্যায়ের এখলাছ তাঁহাদের হাসিল ছিল তাহা আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জানা ছিল নিশ্চয়। এই নির্ম্মল অসাধারণ একনিষ্ঠতার কারণে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই আল্লাহ তায়ালার নিকট মকবুল পরিগণিত। এমনকি বিরোধের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের কার্য্যধারা বিপরীত হইলেও সৎ উদ্দেশ্যে নির্ম্মল একনিষ্ঠতার দরুন কার্য্যধারার ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমার্হই নয় শুধু, বরং সৎ উদ্দেশ্য হাসিলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ছওয়াবও তাঁহারা লাভ করেন। এই শ্রেণীর ভুল-ভ্রান্তিকেই "খাতায়ে-এজ্তেহাদী" বলা হয়—যেখানে ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার্হ গণ্য হইয়া মূল উদ্দেশ্যের ছওয়াব হাসিল হয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ছাহাবীগণের মর্য্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবেও বিদ্যমান ছিল। যথা—তৌরাত শরীফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব আলোচনায় মক্কা-বিজয় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে—"তিনি দশ সহস্র পবিত্রাত্মা মহাত্মা সহ এমন অবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক অগ্নিশিখা তুল্য (জ্যোতির্ম্ময়) বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে।" মক্কা-বিজয় অভিযানে নবীজীর সঙ্গে দশ সহস্র ছাহাবী ছিলেন। তৌরাত কেতাবে ঐ ছাহাবীগণকেই কুদ্দুসী বা পবিত্রাত্মা মহাত্মা বলা হইয়াছে।

নবীগণের পরে কোন স্তরের মানুষই যে কোন একজন ছাহাবীর সমমর্য্যাদা দুরের কথা নিকটবর্ত্তী মর্য্যাদারও হইতে পারে না। এই আকিদা ও বিশ্বাস ইসলামী মতবাদরূপে ইসলামের সোনালী যুগ—ইমামগণের যুগ হইতেই প্রচলিত।

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের শাগের্দ মোহাদ্দেছ—হাদীছবেত্তা আবদুল্লাহ ইবনে-মোবারক (রঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ছাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আওলিয়াকুল শিরোমণি ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলাইহের মধ্যে কাহার মর্ত্তবা বড় ?

ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ (রঃ) অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। (১) তিনি প্রথম নম্বরের বিশিষ্ট তায়েবী ছিলেন। (২) তিনি এই উম্মতের সর্ব্বপ্রথম মোজাদ্দেদ ছিলেন। (৩) বিশিষ্ট আওলিয়াকুল শিরোমণি ছিলেন। (৪) খলীফাতুল-মোছলেমীনরূপে এত নেক ও সৎ শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে, তাঁহাকে পঞ্চম খলীফায়ে-রাশেদ অর্থাৎ আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম তুল্য শাসনকর্ত্তা গণ্য করা হইত। (৫) এই উম্মতের দ্বিতীয় মহান—ওমরে ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তুলনায় তাঁহাকে "দ্বিতীয় ওমর" বলা হইত।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ (রঃ)কে ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে পরিমাপের প্রশ্ন করা হইলে ইমাম আবদুল্লাহ-ইবনে-মোবারক (রঃ) উত্তরে বলিলেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) যেই ঘোড়ায় চড়িয়া জেহাদে গমন করিতেন ঐ ঘোড়ার পায়ের দাপটে ধূলি উড়িয়া ঘোড়ার নাকের ডগায় যে ধূলি-কণা লাগিত ঐ ধূলি-কণার মর্ত্তবা এবং মর্য্যাদাও ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলাইহের মর্ত্তবা ও মর্য্যাদার অনেক উর্দ্ধে। (মেরকাত—শরহে মেশকাত)

এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হইল, ছাহাবীগণ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস ইসলামের বিশেষ আকিদা এবং মোসলমানদের বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কারণেই অধিকাংশ হাদীছ গ্রন্থে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বিশেষ অধ্যায় উল্লেখ হয়। এমনকি বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ ও তিরমিজী শরীফ যে শ্রেণীর গ্রন্থ, উহাকে হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় "জামে" বলা হয়। যেই গ্রন্থে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের অধ্যায় না থাকিবে সেই গ্রন্থ "জামে" পরিগণিত হইবে না।

১৮১৩। হাদীছ :— عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال —

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ

يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ

وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ -

অর্থ—এ'ম্রান ইবনে হোছাঈন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যুগ ও জমাত আমার (গঠিত) যুগ ও জামাত (তথা আমার ছাহাবীগণের যুগ ।) তারপর ঐ যুগ সংলগ্ন যুগ (অর্থাৎ ছাহাবীদের হাতে গঠিত—তাবেয়ী'নদের যুগ ও জমাত ।) তারপর এই দ্বিতীয় যুগ সংলগ্ন তৃতীয় যুগ (আর্থৎ তাবেয়ী'নদের দ্বারা গঠিত—তাবয়ে'-তাবেয়ী'নদের যুগ ও জমাত ;) এই যুগটির উল্লেখ হযরত (দঃ) করিয়াছিলেন কি না—সেই সম্পর্কে বর্ণনাকারী ছাহাবী সন্দিহান রহিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলীয়াছেন—এই সব উত্তম যুগ চলিয়া যাওয়ার পর এমন যুগের সৃষ্টি হইবে যে, (লোকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পরিণামের চিন্তা মোটেই থাকিবে না, যেমন—সাক্ষ্য দানের ন্যায় দায়িত্বের কাজেও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু কোন প্রকার স্বার্থের খাতিরে,) সাক্ষী না বানাইলেও সাক্ষ্য দানে দৌড়িয়া আসিবে। খেয়ানত করিতে অভ্যস্ত হইবে, আমানতের নির্ভরযোগ্যতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিবে। আল্লার নামে মান্নত করিয়াও উহা পুরা করিবে না। (আখেরাতের চিন্তা-শূন্য ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিবে এবং আখেরাতের উন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুধু) দৈহিক মেদবহুল বা মোটা হওয়ার অভিলাসী হইবে এবং মোটা হইতে থাকিবে।

১৮১৪। **ছাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানব সমাজের মধ্যে সর্ব্বোত্তম সমাজ ও যুগ আমার (গঠিত) সমাজ ও যুগ, অতঃপর যে যুগ উহার সংলগ্ন, তারপর যে যুগ এই দ্বিতীর যুগের সংলগ্ন। তারপর এমন লোকগণ সৃষ্টি হইবে যে, (তাহাদের মধ্যে দ্বীন ও শরীয়তের মোটেই কোন প্রভাব ও মর্যাদা থাকিবে না, যেমন—আল্লার নামে কসম বা শপথ করার ন্যায় মহান কাজেরও তাহারা গুরুত্ব দিবে না ; সাক্ষ্যদান কার্য্যে কসমের আবশ্যক না থাকা সত্ত্বেও কসম ব্যবহার করিবে এবং দ্বিধাহীন ও দিশাহারা রূপের তাড়াহুড়ার পরিচয় দিবে যে,) কখনও বা সাক্ষ্যদান করিয়া কসম খাইবে, কখনও বা কসম খাইয়া সাক্ষ্য দান করিবে।

ব্যাখ্যা- কসম বা শপথ করার ন্যায় মহান কাজকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং স্বেচ্ছাচারীতার স্রোতে উহার মহত্বকে বিনষ্ট করা তথা প্রয়োজন ছাড়া কথায় কথায় বা সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে কসম ব্যবহার করা অতিশয় দোষণীয় কাজ; তাই আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ তাবেয়ী' ইব্রাহীম নখ্‌য়ী' (রঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মুরব্বীগণ কথায় কথায় কসমের বাক্য ব্যবহার করার উপর আমাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকিতেন।

বোখারী শরীফ ৪৯৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) কোন এক ব্যাপারে কসম করিয়াছিলেন, অতঃপর বহু লোকের সুপারিশে তিনি বাধ্য হইয়া কসম ভঙ্গ করেন এবং ঐ একটি মাত্র কসম ভঙ্গের দরুন আয়েশা (রাঃ) কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা চল্লিশ গুণ তথা চল্লিশটি ক্রীতদাস বা গোলাম আজাদ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। সর্ব্বদাই অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া থাকিতেন, কসম ভঙ্গের কথা স্মরণ হইলেই কাঁদিতেন।

১৮১৫। **হাদীছঃ**—(৫১৮ পৃঃ) عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ

اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ -

অর্থ— আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বলিও না; (তাঁহাদের মর্ত্তবা তোমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে।) তোমাদের কেহ যদি ওহদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে, (তাহার এত বড় দানও) ছাহাবীদের কোন এক জনের এক মুদ্দ্ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা অর্দ্ধ মুদ্দ্ মাত্র (গম বা যব) ব্যয় করার সমান হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা - এক এক জিনিষের মূল্য এক এক গুণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং সেই গুণের অনুপাতেই উহার মূল্যমান নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। নেক আমলের মূল্য এখ্‌লাছ ও লিল্লাহিয়তের মাপ কাঠিতে পরিমিত হয়। এই দিক দিয়া ছাহাবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের ছোহ্‌বতের অছিলায় এত উর্দ্ধে পৌঁছিয়া ছিলেন যে, অন্য কোন মানুষের পক্ষে তথায় পৌঁছা সম্ভবই নহে। ইহা কোন ভাবাবেগের কথা নহে, বরং বাস্তব সত্য; ছাহাবীগণের জীবন-ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) (৫১৫ পৃঃ)

"আবুবকর" তাঁহার উপনাম ছিল, আসল নাম ছিল "আবহুল্লাহ"। তাঁহার পিতার উপনাম ছিল "আবু কোহা'ফাহ" আসল নাম ছিল "ওসমান"।

পঞ্চম খণ্ডে হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের বর্ণনায় এবং হযরতের মৃত্যুর চার দিন পূর্ব্বেকার তাঁহার সর্ব্বশেষ ভাষণে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনেক ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে।

১৮১৬। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَ تَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যদি (আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য) কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে আবুবকরকে নিশ্চয়ই সেই মর্য্যাদা দান করিতাম। অবশ্য সে আমার (দ্বীনী) ভাই এবং ছাহাবী; (সেই সূত্রে তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বোচ্চে)।

১৮১৭। হাদীছ :—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আমরা লোকদের মর্ত্তবা নির্ণয় করিয়া থাকিতাম এইরূপে—সর্ব্বোচ্চে আবুবকর (রাঃ), তারপর ওমর (রঃ), তারপর ওসমান (রাঃ)।

১৮১৮। হাদীছ :—জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়ে'ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি মহিলা তাহার কোন প্রয়োজন লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাকে অন্য সময় পুনরায় আসিতে বলিলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি আসিয়া আপনাকে না পাই অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হইয়া যায় তবে আমি কি করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইও।

১৮১৯। হাদীছ : আবুদ্‌দরদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম হঠাৎ আবুবকর (রাঃ)কে দেখা গেল, তিনি আসিতেছেন এবং তিনি পথ চলিতে স্বীয় লুঙ্গির এক কিনারাকে

উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, এমনকি এক একবার তাঁহার হাঁটু খুলিয়া যাইত। হযরত (দঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের এই লোকটি কোন বিবাদের সমুখীন হইয়াছে।

আবুবকর (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আমার এবং খাত্তাবের পুত্র (ওমর)-এর মধ্যে একটু বিতর্ক হইয়াছিল এবং উহাতে আমি কিছু অতিরিক্ত বলিয়াছিলাম। তারপর আমি লজ্জিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই, (বরং ওমর রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পেছনে পেছনে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে গিয়াছেন, কিন্তু ওমর(রাঃ) তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতঃ দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।* আবুবকর বলেন,) অতএব কারণে আমি আপনার দরবারে চলিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবুবকর! আল্লাহ আয়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন—হযরত (দঃ) তিনবার এইরূপ বলিলেন।

এদিকে আবুবকর (রাঃ) চলিয়া আসার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় ব্যবহারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে না পাইয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে চলিয়া আসিলেন। তখন হযরতের চেহারা মোবারকের উপর রাগ ও অসন্তুষ্টির ধারা ফুটিয়া উঠিল, এমনকি স্বয়ং আবুবকর (রাঃ) ভীত হইয়া পড়িলেন (যে, হযরত (দঃ) ওমরের প্রতি অধিক রাগান্বিত হইয়া উঠেন না-কি!) সেমতে আবুবকর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমিই অন্যায়কারী ছিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন তোমাদের প্রতি। প্রথম অবস্থায় তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ, কিন্তু আবুবকর তখন হইতেই আমাকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় জান-মাল দ্বারা আমার সাহায্য সহায়তা করিয়াছে। তোমরা অন্ততঃ আমার খাতিরে আমার বন্ধুকে রেহায়ী দিতে পার কি? দুইবার হযরত (দঃ) এইরূপ উক্তি করিলেন। ঐদিন হইতে প্রত্যেকেই আবুবকর (রাঃ)কে কোন প্রকার উৎপীড়ন না করার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হইয়াছে।

১৮২০। হাদীছঃ—আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে "জাতুস্‌-সালাসেল" নামক অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ হযরতের খেদমতে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনার সর্ব্বাধিক প্রিয়?

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু ৬৬৮ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষদের মধ্য হইতে কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশার পিতা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার পরে? হযরত (দঃ) বলিলেন, ওমর। এইরূপে প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) পর পর কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেন।

১৮২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

"যে ব্যক্তি আত্মম্ভরিতা ও দাম্ভিকতা-প্রসূত ফ্যাসনের তাবেদারীরূপে এবং অহঙ্কার ও গরিমাজনিত ভাবাবেগে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রকে মাটিতে হেঁচড়াইবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন দৃষ্টিপাতও করিবেন না।"

এতচ্ছ্রবনে আবুবকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার পরিধেয় লুঙ্গির এক কিনারা নিচের দিকে লট্‌কিয়া যায়, অবশ্য বিশেষ তৎপতার সহিত লক্ষ্য রাখিলে উহা বারণ করা সম্ভব হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার কার্য্য (যতটুকু) নিশ্চয়ই উহা তোমার অহঙ্কার, গরিমা ও দাম্ভিকতা প্রসূত নহে।

ব্যাখ্যা—পায়ের গিঁটের নীচ পর্য্যন্ত লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি ঝুলাইয়া দেওয়ার মাছতালাহ ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা সম্মুখে পোশাক পরিচ্ছেদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। ইহা যে নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে অনেক হাদীছ তথায় উল্লেখ হইবে। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কার্য্যক্রমটা শুধুমাত্র অসাবধানতা প্রসূত সাময়িক শ্রেণীর ছিল, ফ্যাসন বা অভ্যাসগত মোটেই ছিল না।—হযরত (দঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৮২২। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি অজু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, আজিকার দিনটি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া কাটাইব। এই মনোভাব নিয়া তিনি প্রথমতঃ হযরতের মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত লোকগণ বলিল, তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া এই দিকে গিয়াছেন।

আবু মূছা বলেন, তখন আমি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত দিকে অগ্রসর হইলাম এবং লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এমনকি হযরত (দঃ) "বীরে-আরীস্" নামীয় কূপস্থিত বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া খোঁজ পাইলাম। আমি তথায় যাইয়া বাগানের গেটে বসিয়া থাকিলাম।

হযরত (দঃ) বাগানের ভিতরে পেশাব-পায়খানার আবশ্যক পূর্ণ করিয়া অজু করিলেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম তিনি ঐ কূপের কিনারায় বসিয়া আছেন এবং পায়ের গোছা উন্মুক্ত করতঃ পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন। আমি হযরতকে সালাম করিলাম এবং পুনরায় গেটের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে, আজ আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দারোয়ান হইয়া থাকিব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দরওয়াজা ধাক্কা দিলেন। ভিতর হইতে আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি তাঁহার নাম বলিলেন। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন; অতঃপর আমি হযরতের নিকট যাইয়া বলিলাম, আবুবকর অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত লাভের সুসংবাদও দান কর। আমি আসিয়া আবুবকরকে বলিলাম, ভিতরে আসুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনাকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইতেছেন। আবুবকর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাঁহার ড ন পার্শ্বে কূপের কিনারায় বসিলেন এবং হযরতের ন্যায় পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন।

আবুমূছা (রাঃ) বলেন, আমি যখন হযরতের খোঁজে বাহির হইয়াছিলাম তখন আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি অজু করিতেছেন এবং আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করিতেছেন। (যখন আমি এস্থলে হযরতের বেহেশতের সুসংবাদ দানের উদারতা দেখিতে পাইলাম তখন) আমি আমার ভ্রাতা সম্পর্কে ভাবিতে লাগিলাম যে, যদি সে আল্লাহ তায়ালার নিকট সৌভাগ্যশীল হইয়া থাকে তবে এখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এস্থানে উপস্থিত করিবেন; (এবং হযরতের মুখে বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করিয়া চির সৌভাগ্যশীল প্রতিপন্ন হইবে।) এমতাবস্থয় আর এক ব্যক্তি দরওয়াজা নাড়া দিল। আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, আমি ওমর-ইবনুল-খাত্তাব। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ওমর অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ দান কর। আমি ওমর (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইলাম। তিনি বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাঁহার বাম পার্শ্বে কূপের কিনারায় বসিলেন, পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। এইবারও দরওয়াজার নিকট বসিয়া বসিয়া আমি আমার ভ্রাতা সম্পর্কে পূর্ব্বের ন্যায় ভাবিতে লাগিলাম; এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া দরওয়াজা নাড়া দিল। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি

বলিলেন, আমি ওসমান ইবনে আফ্ফান। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে ওসমানের সংবাদ জানাইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদও দান কর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দাও যে, তিনি বালা-মুছিবতের সম্মুখীন হইবেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া ওসমান (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ শুনাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বালা-মুছিবতেরও সংবাদ জ্ঞাত করিলাম। (তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা।) অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত (দঃ) কূপের কিনারায় যে পার্শে বসিয়াছেন ঐ পার্শ্বে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া বসিবার স্থান নাই, (কারণ সেই স্থান আবুবকর ও ওমর দখল করিয়া নিয়াছেন, তাই তিনি হযরতের বরাবরে সম্মুখস্ত অপর দিকে বসিলেন।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী তাবেয়ী' সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ঘটনার দৃশ্য অনুযায়ীই তাঁহাদের কবরের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হযরতের কবর শরীফের সংলগ্নে কবরের স্থান লাভ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ওসমান(রাঃ) হযরতের কবর হইতে দূরে মদিনার সর্ব্বসাধারণের কবরস্থানে সমাহিত হইয়াছেন।

খলীফাতুল-মোছলেমীন পদে আবুবকর (রাঃ) ঃ

খলীফা পদে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন-ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে তুইটি বিষয় অবগত হওয়া সুফলপ্রদ হইবে। ১ম—খলীফা-পদে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনোনীত হওয়া সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ২য়—তৎকালীন উপস্থিত জরুরী অবস্থা ও উহার ভয়াবহতার উদ্ভব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক আবুবকরের মনোনয়ন ঃ

(১) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা খলীফারূপে মনোনীত করা সম্পর্কে এত দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকিতেন যে, তিনি অন্তিম রোগে শায়িত হইলে পর উহা লিখিতরূপে ঘোষণা জারি করিয়া দেওয়ার পর্য্যন্ত তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং সেই ঘোষণা জারির ব্যবস্থা করার জন্য আবুবকরকে ডাকিয়া আনিতে আয়েশা (রাঃ)কে আদেশও করিয়াছিলেন। অবশ্য আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া সম্পর্কে তিনি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এইরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, সেই ঘোষণা জারিকে তিনি অনাবশ্যক মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই তথ্যই নিম্নের হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

১৮২৩। হাদীছ ঃ—(৮৪৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,........ মাথা ব্যথায় আমি বলিতেছিলাম—আমার মাথা গেল ! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার অন্তিম শয্যার যাতনা প্রকাশে) বলিলেন, বরং আমার মাথা গেল !

অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়াছিলাম—আবুবকর এবং তাহার ছেলেকে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকিয়া আনি এবং (তোমাদের সাক্ষাতেই আমার পরে আবুবকর খলীফা হওয়ার) ঘোষণা করিয়া যাই ; যেন অন্য কেহ কিছু বলার সুযোগ না পায় এবং অন্য কেহ আশা করার অবকাশ না পায়। কিন্তু পরে ভাবিলাম, আল্লাহ তায়ালা অন্য কাহাকেও হইতে দিবেন না, মোসলমানগণও অন্যকে গ্রহণ করিবে না।

ব্যাখ্যা :—মোসলেম শরীফের হাদীছে নবী (দঃ) কর্তৃক ঐরূপ আদেশ করাও উল্লেখ রহিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও মোসলমানগণের নিকট নির্দ্ধারিত খলীফারূপে আবুবকরের নাম উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা আমাকে আদেশ করিলেন, আবুবকর এবং তোমার ভ্রাতাকে ডাকিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর। আমি একটি লিপি লিখিয়া দিয়া যাই। আমার আশঙ্কা হয় অন্য কোন আশাধারী আশা করিবে এবং বলিবে, আমি অগ্রাধিকারী। কিন্তু আল্লাহ এবং মোমেনগণ একমাত্র আবুবকর ব্যতীত অন্য কাউকে হইতে দিবে না। (মোশলেম শরীফ ২৭৩)

অতএব, ইহা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বয়ং হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক আবুবকর (রাঃ) খলীফা মনোনীত ছিলেন। অবশ্য যেহেতু হযরতের এই মনোভাব তাঁহার মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাই সাধারণভাবে ছাহাবাদের মধ্যে উহার প্রসার হইয়া ছিল না, তাই সাময়িকভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন মতামতের শব্দ শুনা যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা মুহূর্ত্তের জন্যও উহার উদয়ই হইত না।

(২) রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন হযরত (দঃ) মসজিদে পদার্পণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন হইতে তিনি নামাযের ইমামরূপে আবুবকরকে তাঁহার স্থলে দাঁড় করাইয়াছিলেন। এমনকি ইহার বিরুদ্ধে অনেক রকমের বুঝ-প্রবোধ ও পরামর্শকেও তিনি বিরক্তিকররূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ড ১৭৩০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ছোট ইমাম তথা নামাযের ইমামরূপে আবুবকরকে মনোনীত করিয়া বড় ইমাম তথা খলীফা হওয়ার পথকে আবুবকরের জন্য স্বয়ং হযরত (দঃ)ই সুগম করিয়া গিয়াছিলেন। ওমর ফারুক (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচিত

করার পক্ষে ছাহাবীগণের সম্মুখে এই তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (নাছায়ী শরীফ দ্রষ্টব্য)

জরুরী অবস্থা ও উহার ভয়াবহতার উদ্ভব ঃ

আরবের মধ্যে মোসলমানদের শক্তি ও আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার চতুর্দিকের প্রত্যেকটি শক্তিই মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগের দুই চার দিন পূর্ব্বেও রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা-বাহিনী প্রেরণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন হযরতের ইহজগৎ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের অভ্যন্তরেও এক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাই শুধু ছিল না, বরং সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের দৃষ্টিতেও উহা অবশ্যম্ভাবীরূপে মাথার উপর দণ্ডায়মান ছিল। এমনকি দুই চার দিনের মধ্যেই উহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল এবং আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়া প্রথম দিকেই স্বশস্ত্র অভিযান দ্বারা উহার মূল উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; যাহার বিবরণ ২য় খণ্ডে ৭৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তদুপরি মোনাফেকদের আনাগোনা ত মদিনার অভ্যন্তরে বিষাক্তময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেই ছিল। সর্ব্বোপরি গুরুতর অবস্থা যাহার আত্মপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক ছিল—উহা ছিল এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নির্ব্বাচনে মোহাজের ও আনছারদের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। এমনকি দুপুর বেলায় হযরতের ইহজগৎ ত্যাগের পরক্ষণে—বিকাল বেলায়ই মদিনা শহরের "সক্কিফা-বনু সায়েদাহ" নামক স্থানে আনছারগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জনকে খলীফা মনোনীত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আনছারগণের মধ্যেও প্রধানতম দুইটি গোত্র ছিল—"আউস" এবং "খয্‌রজ" তাঁহাদের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল এবং খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কে সেই প্রতিযোগিতার ব্যাপার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছিল।

সায়া'দ-ইবনে-ওবাদা (রাঃ) যাঁহাকে খলীফা মনোনীত করার চেষ্টা করা হইতেছিল তিনি খয্‌রজ গোত্রের সর্দ্দার, তাই আউস গোত্রীয় লোকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—২৪২)

প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনা বোধ, বরং সামান্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করিতে পারে যে, তখন কিরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল! সেই ভয়াবহ জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাড়াহুড়ার মধ্যে উপস্থিত সমাবেশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবর্জ্জিতভাবে আবুবকরের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচন ঃ

বোখারী শরীফ ৫১৮ পৃষ্ঠায় আয়েশা (রাঃ) কর্ত্তৃক একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইন্তেকালের পর ঐদিন বিকালবেলা আনছারগণ সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কেন্দ্র করিয়া "সক্বিফা-বনী-সায়েদাহ্" নামক স্থানে একত্রিত হইলেন।

আবুবকর, ওমর ও আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উদ্যত হইলেন, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তথায় সর্ব্বাগ্রে বক্তৃতা দিতে চাহিয়াছিলাম এই জন্য যে, আমি একটি বক্তব্য চিন্তা করিয়া, তৈরী করিয়া নিয়াছিলাম ; আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, আবুবকর যেহেতু ঐরূপ করিয়া ছিলেন না তাই হয়ত তাঁহার অন্তরে ঐ ধরণের বক্তব্য উপস্থিত নাই। কিন্তু আবুবকরই বক্তৃতা দানে দাঁড়াইলেন এবং তিনি অতিশয় বিচক্ষণতা সম্পন্ন বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, কোরায়েশদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচিত হইবেন এবং মদিনাবাসী আনছারদের মধ্য হইতে ওজীর বা সহকর্ম্মী হইবেন।

আনছারদের মধ্য হইতে হোবাব-ইবনুল-মোনজের (রাঃ) বলিলেন, সেরূপ হইতে পারে না, বরং মদিনাবাসী আনছারদের মধ্য হইতে একজন খলীফা হইবে এবং মোহাজের কোরায়েশদের মধ্য হইতে অপর একজন খলীফা হইবে। আবুবকর (রঃ) তাঁহার পূর্ব্ব উক্তিকেই পুনরায় দোহ্‌রাইলেন যে, কোরায়েশদের হইতে খলীফা হইবে এবং আনছারদের মধ্য হইতে সহকর্ম্মী হইবে।

আবুবকর (রাঃ) তাঁহার উক্তির উপর একটি যুক্তিও পেশ করিলেন যে, কোরায়েশগণ হইতেছেন সমগ্র আরববাসীদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র এবং সর্ব্বোচ্চ বংশীয়, সুতরাং সকলে ওমর বা আবু-ওবায়দাহ্‌কে খলীফা নির্ব্বাচিত কর। তখন ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে বলিলেন, না—না, বরং আমরা সকলে আপনাকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিব ; আপনি হইতেছেন আমাদের সকলের শিরোমণি ও সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে খলীফারূপে বরণ করিয়া নেওয়ার উপর বায়য়া'ত বা অঙ্গীকার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হাতে হাত দিয়া খলীফারূপে বরণ করিয়া নেওয়ার বায়য়া'ত বা অঙ্গিকার করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— কোরায়েশ বংশ হইতে খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ) যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা একটি বাস্তব তথ্য ত ছিলই, তদুপরি তথাকার উপস্থিত সময়ের জন্য অপরিহার্য্য পন্থাও ছিল।

খলীফা নির্ব্বাচনের শুভ ও সঠিক পন্থা এই যে, খলীফা হওয়ার জন্য এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে হইবে যে ব্যক্তি তাহার নিজ আহরিত এবং খোদা-প্রদত্ত—সর্ব্বপ্রকার গুণাবলীর পরিপ্রক্ষিতে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর সর্ব্ব-সাধারণের মনকে জয় ও বাধ্য করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই শ্রেণীর খলীফা নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিতে পারে। ইসলামী শরীয়ত খলীফা নির্ব্বাচনে বিভিন্ন গুণাবলীর শর্ত্ত নির্দ্ধারণে একমাত্র উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকেই সম্মুখে রাখিয়াছে।

আরব দেশে বংশ ও গোত্রীয় বিভিন্নতাকে এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত যে, অন্য কোন গুণ বা বিষর বস্তুকেই তদ্রূপ গুরুত্ব দেওয়া হইত না। এমনকি অন্ধকার যুগে যখন খোদা ভিন্ন অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করা হইত তখন প্রত্যেক গোত্র ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করিত; এক গোত্র অন্য গোত্রের উপাস্যকে উপাস্য বানাইত না। তাহাদের এই স্বভাব ও প্রকৃতির কারণেই ইসলাম-যুগের পূর্ব্বে সংঘবদ্ধ আকারের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আরবের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই গোত্রীয় কোন্দলের ভিতর দিয়াও সমগ্র আরব কোরায়েশ বংশকে মুকুট-মণির মর্য্যাদা দিয়া থাকিত। যেই অন্ধকার যুগে জাতিগত ব্যবস্থা ছিল বিদেশী পথিককে লুণ্ঠন করা সেই যুগেও কোরায়েশগণ স্বীয় মর্য্যাদার প্রভাবে সর্ব্বত্র নিরাপত্তা উপভোগ করিত; যাহার প্রতি পবিত্র কোরআন ছুরা কোরায়শের মধ্যেও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ইসলামী জগতে সর্ব্বপ্রথম খলীফা নির্ব্বাচনকালে কেন্দ্রীয় এলাকা মদিনার পাশাপাশি অবস্থানকারী দুইটি গোত্র আউস্ ও খয্‌রজ্—তাহাদের মধ্যে গোত্রীয় কোন্দল ক্রিয়া করিয়া উঠিতেছিল, অতঃপর অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন গোত্রগুলি যে, কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে গোত্রীয় কোন্দলে সৃষ্ট ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় এই ছিল যে, খলীফা কোরায়েশদের হইতে নির্ব্বাচন করা হউক যাঁহাদের প্রভাব এবং মর্য্যাদা সমগ্র আরবে স্বীকৃত ছিল। আবুবকর (রাঃ) স্বীয় যুক্তিতে এই তথ্যটিই তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং এই যুক্তি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি তথ্য হইতেই গৃহিত ছিল। মোসলেম শরীফ ১১৯ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِى هٰذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ

"নেতৃত্বের মর্য্যাদার জন্য জনসাধারণ কোরায়েশকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। কোরায়েশদের প্রতি জনসাধারণের এই আকর্ষণ কুফুরী তথা অন্ধকার যুগেও বিদ্যমান ছিল, ইসলামের পরেও বিদ্যামান রহিয়াছে।"

ইসলামে যেহেতু উহার সমগ্র এলাকায় একজন মাত্র খলীফা নির্ব্বাচনের আইন রহিয়াছে, এমনকি যদি সারা বিশ্ব ইসলামের করায়ত্ব হয় তবে সারা বিশ্বের জন্য একজন খলীফাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাঁহার অধীনে আরব আ'জম সকলেই থাকিবে। সুতরাং আরব-আ'জম সকলের মিশ্রিত রাষ্ট্রের খলীফা নির্ব্বাচনে উক্ত কোন্দলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে এবং উহার মোকাবিলার পন্থাও ঐ একই।

কোরায়েশদের প্রতি পূর্ব্বাপর জনসাধারণের যে একটা প্রগাঢ় আকর্ষণ রহিয়াছে সেই তথ্যটির ভিত্তিতেই হযরত (দঃ) একটি ভবিষ্যৎ সংবাদ পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন যে, اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ "খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোরাশেগণ অগ্রগণ্যতা লাভ করিবে" (মো'জামে-তবরানী)। ভবিষ্যৎ সংবাদ পরিবেশন মর্ম্মেই বোখারী শরীফ ১০৫৭ এবং ৪৯৭ পৃষ্ঠায় আর একটি হাদীছ রহিয়াছে—

إِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ -

"খেলাফত কোরায়েশদের মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পুর্ণরূপে পরাজিত করিবেন। (কোরায়েশদের এই বিশেষত্ব তাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবে) যাবৎ তাহারা দ্বীন-ইসলামকে সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে অর্জ্জন ও প্রবর্ত্তন করার দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।"

এই ভবিষ্যৎ সংবাদটি পরিবেশন করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে যে, উল্লেখিত শর্ত্ত বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত অন্য লোকদের পক্ষে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়া জাতির মধ্যে অধিক বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের সূত্রপাত করা মোটেই সমীচীন হইবে না। এই মর্ম্মেই আবুবকর (রাঃ) ও মোহাজেরগণ মদিনাবাসীদের সম্মুখে আলোচ্য তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং মদিনাবাসীগণও উহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলেন। এমনকি পরবর্ত্তীকালেও ওলামাগণ খলীফা নির্ব্বাচনে অন্যান্য যোগ্যতার সঙ্গে কোরায়শী হওয়ার শর্ত্তও আরোপ করিয়াছেন; শুধু এই সূত্রে যে, অন্যান্য সমুদয় যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটিও বিদ্যমান থাকিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং জন-সাধারণের অধিক আস্থা বিশেষরূপে কায়েম হইবে, যেহেতু কোরায়েশদের প্রতি জন-সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে আরও অধিক বিবরণ সপ্তম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিরোনামায় বর্ণিত হইবে।

আবুবকরের প্রতি অকুণ্ঠ গণ-সমর্থন ঃ

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের দিন—সোমবারের বিকাল বেলায়ই উল্লেখিত "সকিফা-বনু সায়েদাহ্" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায়

সুদীর্ঘ বিতর্কের শেষ ফলে শুধু মাত্র সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) ব্যতীত উপস্থিত সকল আনছারগণ এবং ওমর (রাঃ) ও আবু ওবায়দাহ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে খলীফারূপে বরণ করিয়া তাঁহার হাতে হাত দিয়া "বায়য়া'ৎ" বা অঙ্গিকারাবদ্ধ হইলেন এবং উক্ত সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পর দিন তথা মঙ্গলবার দিন মদিনার জন-সাধারণকে মসজিদে-নববীতে আহ্বান করা হইল। সকলে তথায় একত্রিত হইলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সম্মুখে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে বক্তৃতা দান করিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মিম্বরের উপর বসিয়া জন-সাধারণ হইতে বায়য়া'ৎ বা খলীফারূপে বরণ করার স্বীকৃতি গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। আবুবকর (রাঃ) সম্মত হইতেছিলেন না, অবশেষে অনুরোধের চাপে আবুবকর (রাঃ) মিম্বারে আরোহন করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই থাকে বসিতেন উহার নিম্নের থাকে বসিলেন। জন-সাধারণ একে একে আসিয়া তাঁহার হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ৎ বা অঙ্গিকার করিয়া গেলেন (সীরাতে মোস্তাফা ৩—২৪৩)। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বায়য়া'ৎ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ড ১৭৫৩ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার সামগ্রিক বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তাঁহার মনোনয়ন সম্পর্কে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতি উজ্জ্বল কতিপয় ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার নির্ব্বাচনও ঘরোয়া ভাবে বা নিজস্ব গঠিত কোন কলেজ বা শুধু স্বদলীয় লোকদের সমবায়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ছিল না।। বরং বিপরিত বাতাস বহনকারী একটি জন-সমাবেশে সকলের নির্ব্বাচনেই তিনি খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অতঃপর তাঁহার সমর্থনও লাভ হইয়াছিল ব্যাপক আকারে। অবশ্য নির্ব্বাচন অপেক্ষা সমর্থন ছিল তথায় অধিক এবং সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণে। নতুবা সুষ্ঠু পরিবেশ থাকিলে তখন সমর্থনের ব্যবস্থা অপেক্ষা নির্ব্বাচনের মাধ্যমে খলীফা হওয়াই ইসলামের বিধান। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টির প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

১৮২৪। হাদীছ :—(১০০৯ পৃঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেনে, তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের সর্ব্বশেষ হজ্জ সমাপনে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিনায় অবস্থান কালে একদা বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) তাঁহাকে একটি ঘটনা শুনাইলেন যে, অদ্য ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট একটি লোক এই সংবাদ দিল যে, এক ব্যক্তি বলিতেছে, খলীফা ওমর (রাঃ) ইন্তেকাল করিয়া গেলে

আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফারূপে গ্রহণ করিব এবং তাহার হাতে বায়য়া'ৎ করিব, (পরে অন্য লোকদের সমর্থন আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে।) আবুবকরের নির্ব্বাচন এইরূপে হঠাৎ ভাবেই হইয়াছিল, অতঃপর উহাই বহাল হইয়া গিয়াছিল।

এই সংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আজই বিকাল বেলা আমি এই সম্পর্কে জনগণের সম্মুখে ভাষণ দান করিব। তাহাদিগকে ঐ শ্রেণীর লোকদের হইতে সতর্ক করিব যাহারা শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচনে তাহাদের তথা জনগণের অধিকার হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! আপনি এরূপ করিবেন না। কারণ, হজ্জ উপলক্ষে পাকা-পোক্তা বুদ্ধিহীন—নিম্ন শ্রেণীর বাচাল লোকদেরও সমাবেশ হইয়াছে। এবং আপনি এখানে কোন সম্মেলন আহ্বান করিলে ঐ শ্রেণীর লোকগণই আপনার চতুষ্পার্শ্ব দখল করিয়া নিবে; এমতাবস্থায় আশঙ্কা হয় আপনি কোন কথা বলিলে তাহারা উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং উহার যথার্থতা বিবেচনা করা ব্যতিরেকেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে এবং উহার অব্যবহার বা অপব্যবহার করিবে। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন মদিনায় পৌঁছা পর্য্যন্ত; মদিনা হইল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত সম্পর্কীয় জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিজরত করিয়া তথায়ই সমাবেশিত হইয়াছেন। অতএব তথায় আপনি কেবলমাত্র জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে যে কথা বলিবেন তাঁহারা উহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা উহার সদ্ব্যবহারও করিবেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাই করিব এবং মদিনায় পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথম ভাষণেই এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে মদিনায় পৌঁছিলাম এবং জুমার দিন আমি যথাসত্বর মসজিদে উপস্থিত হইলাম। ওমর (রাঃ) মসজিদে আসিয়া মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ-ছানা ও প্রসংশা করতঃ বলিলেন, আমি কতকগুলি বিষয়বস্তু তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি; হইতে পারে ইহা আমার শেষ জীবনের ভাষণ। তোমাদের মধ্য হইতে যে আমার কথার যথার্থ ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার কর্ত্তব্য হইবে উহাকে অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর যে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া আশঙ্কা করিবে তাহার জন্য জায়েয হইবে না আমার কথাকে বিকৃত আকারে প্রকাশ করা। তোমরা সকলে লক্ষ্য করিয়া শুন!

(১) আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য দ্বীনের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানী

বা ব্যভীচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান সেই পবিত্র কোরআনেরই একটি আয়াত ছিল—যাহা আমরা তেলাওয়াত করিয়াছি, উহার মর্ম্ম ভালরূপে অনুধাবন করিয়াছি এবং উহাকে অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। সেই আয়াতের বিধানকে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—তিনি ব্যভিচারের অপরাধীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে আমরাও ঐরূপ করিয়াছি। (উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হইয়া যাওয়ার কারণে উহা বর্ত্তমানে কোরআন শরীফে লিখিত নাই।) তাই আমার ভয় হয়, আমাদের যুগের পরে কোন মানুষ এইরূপ দাবী করিয়া না বসে যে, "রজম" তথা ব্যভীচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান কোরআনে নাই। এইরূপ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করিলে লোকগণ আল্লাহ কর্ত্তৃক পবিত্র কোরআনে অবতারিত ও নির্দ্ধারিত একটি ফরজ তরক করতঃ গোমরাহ ও ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা শুরিয়া রাখ! আল্লার কেতাব পবিত্র কোরআনে রজমের বিধান প্রকৃত প্রস্তাবেই বলবৎ রহিয়াছে, (অবশ্য উহার তেলাওয়াত নাই বলিয়া লেখার মধ্যে রাখা হয় নাই।) কোন মোসলমান বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া (চারজন) সাক্ষী পাওয়া গলে বা গর্ভ (ইত্যাদি সন্দেহের কারণ) স্থলে স্বীকারুক্তি পাওয়া গেলে তাহাকে রজম করা হইবে—প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা হইবে।

(২) আরও একটি বিষয় পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান ছিল যে, কোন মোসলমান যেন স্বীয় বাপ-দাদা (তথা স্বীয় বংশ) ছাড়িয়া অন্য বাপ-দাদার (তথা অন্য বংশের) প্রতি সম্পর্কের দাবী না করে; ইহা কুফুরী সমতুল্য পাপ গণ্য হইবে।

(৩) আরও জানিয়া রাখ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন, মর্‌য়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাছারাগণ যেরূপ অতিরঞ্জিত উক্তি করিয়াছে—খবরদার! তোমরা আমার সম্পর্কে ঐ শ্রেণীর উক্তি করিও না; আমার সম্পর্কে এই ঘোষণাই তোমরা দিবে যে, আমি "আল্লার সৃষ্ট বন্দা এবং তাঁহার রসুল।"

(৪) আরও একটি অতি জরুরী খবর—

আমি সংবাদ পাইয়াছি, কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকে—ওমর ইন্তেকাল করিলে আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করিয়া তাহার হাতে বায়য়াৎ করিব।

খবরদার, খবরদার! (এইরূপ ধারণা কেহ পোষণ করিবেনা। এবং) কেহই এই ধারণার বশীভূত হইয়া প্রবঞ্চিত হইবে না যে, আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়াটা আকস্মিক ঘটনাই ছিল এবং পরে উহা বহাল ও বলবৎ হইয়া গিয়াছিল।

আবুবকরের খলীফা হওয়ার ঘটনা ঐরূপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আবুবকরকে এমন ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছিলেন যদ্বারা তাঁহাকে উহার ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমাদের মধ্যে আবুবকরের ন্যায় এমন ব্যক্তি নাই

যাহার প্রতি জনসাধারণের সর্ব্বসম্মত আকর্ষণ আছে। সুতরাং মোসলমানগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কাহাকেও খলীফা নির্ব্বাচন করা হইলে সেই খলীফা ও তাহার নির্ব্বাচনকারীর অনুসরণ তোমরা করিবে না, কারণ তাহারা উভয়ে অচিরেই প্রাণ হারাইবে। আবুবকরের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র—

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে আমাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন আবুবকর (রাঃ)। অবশ্য (তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে) মদীনাবাসী—আনছারগণ বিরোধী হইয়া গেল এবং তাহারা "সকীফা-বনু সায়েদাহ্" নামক স্থানে সকলে একত্রিত হইল। এতদ্ভিন্ন আলী (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহাদের সমর্থকগণও ঐ ব্যাপারে মত বিরোধ করিল।

এতদৃষ্টে মোহাজেরগণ আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হইল, তখন আমি আবুবকরকে বলিলাম, চলুন! আমরা আনছার ভাইদের সমাবেশে উপস্থিত হই। অতঃপর আমরা তাহাদের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলে একজন শুভাকাঙ্খী লোকের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে তাহাদের প্রস্তাবাদি শুনাইয়া বলিলেন, তথায় আপনাদের উপস্থিত হওয়ার আবশ্যক নাই; আপনাদের যাহা করিবার তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। কিন্তু আমি বলিলাম, আমরা তথায় যাইবই। (তাথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, কম্বলে আবৃত একজন লোক তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট এবং জানিতে পারিলাম, তিনি সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)—তিনি জ্বরাক্রান্ত।
অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন বক্তা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা আল্লার দ্বীনের আনছার বা সাহায্যকারী এবং ইস্লামের সৈনিক দল। পক্ষান্তরে আপনারা মোহাজেরগণ হইলেন সংখ্যালঘু দল; এখন আপনাদের কতিপয় ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে! বক্তা যখন ক্ষান্ত হইলেন তখন আমি কিছু বলিতে উদ্যত হইলাম; আমি পূর্ব্ব হইতেই একটি বক্তৃতা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং উহাতে আমি আবুবকরের সাম্ভাব্য রাগ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আবুবকর আমাকে বারণ করিয়া নিজেই বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তখন দেখিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অধিক শান্ত এবং ধীর-স্থির। আমার সাজান বক্তৃতার সব-গুলি ভাল কথা বরং আরও অধিক উত্তম কথা তিনি ভাষণে সমাবেশ করিলেন।

আনছারদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, আপনাদের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন বাস্তবিকই আপনারা তাহার অধিকারী, কিন্তু খেলাফৎ বা শাসন-ক্ষমতা একমাত্র কোরায়েশদের পক্ষেই শোভনীয়। কারণ, সমগ্র আরবের লোকগণ

বংশ-মর্য্যাদা এবং মক্কা দেশের মর্য্যাদার দরুণ তাহাদিগকে সর্ব্বোত্তম গণ্য করিয়া থাকে। সুতরাং ওমর বা আবু ওবায়দাহ—এই দুইজনের একজনকে খলীফা নির্ব্বাচতি করা আমি আপনাদের পক্ষে ভাল মনে করি।

ওমর(রাঃ) বলেন, আবুবকরের বক্তৃতার সব কথাই আমার নিকট অতি উত্তম ছিল, কিন্তু এই একটি কথা আমার নিকট অতিশয় না-পছন্দ ছিল। আমার কোন প্রকার গোনাহ না হয় এই ভাবে আমার গলা কাটিয়া ফেলা আমার নিকট তদপেক্ষা শ্রেয় যে, আমি আবুবকরের বিদ্যমান থাকাবস্থায় লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করি।

এই কথাবার্ত্তার মধ্যে মদিনাবাসী আনছারদের পক্ষ হইতে একটি লোক দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এই বিতর্কের চুড়ান্ত মিমাংসা পেশ করিতেছি এই যে, আমাদের মদিনাবাসীদের হইতে একজন খলীফা হইবে এবং কোরায়েশদের হইতে একজন খলীফা হইবে। এই কথার উপর অধিক বিতর্ক এবং হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল, এমনকি পরস্পর বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিল। তখন আমি আবুবকরকে অনুরোধ করিলাম, আপনি হাত বাড়াইয়া দিন ; আমরা আপনার হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ত ও অঙ্গিকার করতঃ আপনাকে খলীফা মনোনীত করি। আবুবকর সম্মত হইলেন এবং আমি তথায় উপস্থিত মোহাজেরগণ সহ সকলে তাঁহার হাতে বায়য়া'ত করিলাম, অতঃপর উপস্থিত আনছারগণও বায়য়া'ত করিলেন। এই ভাবে আমরা তথায় উপস্থিত প্রস্তাবিত খলীফা—সায়াদ ইবনে ওবায়দার উপর অগ্রগামী হইতে সক্ষম হইলাম। তখন উপস্থিত একজন লোক বলিয়া উঠিল, তোমরা সায়াদ ইবনে ওবায়দার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালাই করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) এই বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করিয়া বলিলেন, উল্লেখিত পরিস্থিতিতে আবুবকরকে খলীফা মনোনীত করিয়া নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত না করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তথায় অন্য কাউকে খলীফা নির্ব্বাচিত করা হইত। এমতাবস্থায় আমরাও তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিলে তাহা হইত আমাদের বিবেচিত উত্তম পন্থার সম্পুর্ণ পরিপন্থি। আর বিরোধিতা করিলে তাহা হইত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার কারণ।

(এইরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বাধ্য হইয়া মোসলমানদের হইতে পুরাপুরী পরামর্শ গ্রহণের পুর্ব্বে আবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু) অন্য কোন ব্যক্তিকে মোসলমানগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে খলীফা মনোনীত করা হইলে সেই খলীফা এবং তাহাকে মনোনয়ন দানকারীর অনুসরণ করা যাইবে না ; অচিরেই তাহারা উভয়ে প্রাণ হারাইবে।

খোলাফা-রাশেদীনের যুগে
ভোটদান-দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ঃ

সকল দেশ ও জাতির মধ্যেই ভোটাধীকার তথা ভোট দানের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নির্ব্বিচারে সকলের ভোট গ্রহণ কোন দেশেই আবশ্যকীয় গণ্য করা হয় না, বরং ঐরূপ ক্ষমতাও প্রদান করা হয় না। যেমন বর্ত্তমান গণতন্ত্রের গলাবাজদের শাসনতন্ত্রেও বাইশ বা উহার কম-বেশ বৎসর বয়সের শর্ত্ত আরোপ করিয়া কোটি কোটি মানুষকে ভোটদানের অযোগ্য করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন দেশেত আরও অধিক সঙ্কীর্ণ নীতি আরোপ করা হয়।

ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শাসন নীতিতে যেহেতু প্রেসিডেন্ট শুধু কেবল জনগণের প্রতিনিধি বা তাহাদের কার্য্য প রিচালক গণ্য হইয়া থাকেন, তাই সেই নীতিতে ভোটাধীকার সংরক্ষণে ভোটদাতাদের পরিপক্ক যোগ্যতার জন্য সেই দৃষ্টিতেই শর্ত্ত আরোপ করা হইয়া থাকে। ইস্‌লামের দৃষ্টিতে খলীফা বা প্রেসিডেন্ট শুধু জনগণের কার্য্য পরিচালকই নহেন, বরং সর্ব্বাগ্রে তিনি হইবেন মহান আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের পক্ষে আল্লার বিধান ও রসুলের আদর্শ জনগণের মধ্যে জারি ও প্রয়োগকারী। অর্থাৎ বিধানকর্ত্তা হইলেন আল্লাহ তায়ালা, আইন ও বিধান নির্দ্ধারণের সর্ব্বভৌম অধিকার হইল আল্লাহ তায়ালার এবং তিনি তাহা স্বীয় রসুলের মারফৎ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা জারিও করিয়া গিয়াছেন। এখন মোসলমানদের মধ্যে যিনি খলীফা বা প্রেসিডেন্ট হইবেন তিনি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের স্থলে তথা তাঁহাদের পক্ষে উক্ত বিধান জারি ও প্রয়োগকারী হইবেন। এই সূত্রেই ইস্‌লামী পরিভাষায় প্রেসিডেন্টকে "খলীফা" বলা হয়—খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত; তিনি হন আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের খলীফা। সুতরাং ইস্‌লামের নীতিতে ভোটদাতাদের পরিপক্ক যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে ভোটাধীকার সংরক্ষণের বেলায় আল্লার বিধান ও রসুলের আদর্শ সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং সেই আদর্শের আমলী-জেন্দেগী তথা উক্ত আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিক মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভোট-গ্রহণ কার্য্য এই দৃষ্টির উপরই পরিচালিত করা হইয়াছে।

খোলাফা-রাশেদীনগণের যুগে ইস্‌লামের কেন্দ্রীয় স্থল ছিল মদিনা-মোনাওয়ারাহ্ এবং মদিনাবাসীদের মধ্যে উল্লেখিত যোগ্যতা সর্ব্বাধিক ছিল, তাই তাঁহাদের প্রতি সকল মোসলমানদের পূর্ণ আস্থা ছিল। সেই সূত্রেই তখন মদিনাবাসীদের ভোট বিশেষতঃ তাঁহাদের সর্ব্বাধিক আস্থাভাজন লোকদের ভোটের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে এবং মোসলমানগণ বিনা দ্বিধায় উহা গ্রহণ করিয়ানিয়াছে।

আবুবকরের খেলাফৎ কাল ঃ

এসম্পর্কে পূর্ণ হিসাব নির্দ্ধারণকারীদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে—কাহারও মতে ২ বৎসর ২ মাস ২৫ দিন, কাহারও মতে ২ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, কাহারও মতে ২ বৎসর ৪ মাস। মোট কথা দুই বৎসরের অধিক প্রায় আড়াই বৎসর কাল তিনি খেলাফৎ করিয়াছিলেন।

১৩শ হিজরী সনের জোমাদাল-ওখ্‌রা মাসের ২২ বা ২৩ তারিখে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬৩ বা ৬৫ বৎসর ছিল।

ওমর-ইবনুল-খাত্তাব (রাঃ)

১৮২৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন আমি একটি কূপের কিনারায় দাঁড়াইয়া চরখির সঙ্গে লট্‌কান ডোল দ্বারা কূপ হইতে পানি উঠাইতেছি। এমতাবস্থায় আবুবকর তথায় উপস্থিত হইল এবং সে ঐ ডোলটি আমার নিকট হইতে নিজ হাতে নিয়া পানি উঠাইল, (কিন্তু বেশী উঠাইতে পারিল না,) শুধু মাত্র এক বা দুই ডোল পানি সে উঠাইল—তাহাও অতি ধীরে মন্থর গতিতে। (কিন্তু এত কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত তিনি উহা উঠাইলেন যে, তদ্দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া (তাঁহার মর্ত্তবা বাড়াইয়া) দিবেন।

তারপর ওমর তথায় পৌঁছিল এবং ঐ ডোলটি তাহার হাতে লইল। ওমরের হাতে আসিয়া ডোলটি অতি বড় আকারের হইয়া গেল এবং ওমর বিদ্যুত গতিতে অতিশয় শক্তি, বল ও বিশেষ দক্ষতার সহিত পানি উঠাইতে লাগিল—ঐরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইতে পারে এমন কোন পারদর্শী মানুষই আমি দেখি নাই। ঐভাবে ওমর এত অধিক পানি উঠাইল যে, সকল মানুষ উহা পানে তৃপ্ত হইল এবং তাহাদের যানবাহন উটগুলিও পানি পানে তৃপ্ত হইয়া শুইয়া পড়িল।

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া খেলাফত-কার্য্য পরিচালনার কাল ও অবস্থা এই স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল। হযরত (দঃ) যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছিল। আবুবকরের খেলাফত কাল এক ও দুই বৎসর কাটিয়া পূর্ণ তিনের সংখ্যায় পৌঁছিতে পারে নাই এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তনও কোন উল্লেখযোগ্যরূপে সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই এবং হযরতের ইহজগত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের উপর শত্রুদের ভয়ানক আক্রমন আশঙ্কা এবং মোসলমানদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির দরুন এক

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। আবুবকর (রাঃ) ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত এমন বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সাথে ঐসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লার নিকট বড় মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা লাভের যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে খেলাফত আসিলে পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন অনেক বড় হইয়া যায় এবং বিদ্যুৎ গতিতে উহা সম্প্রসারিত হইতে থাকে। তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল খেলাফত চালাইয়া ছিলেন এবং সুযোগ-সুবিধা এমন পাইয়াছিলেন যে, অতিশয় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ আদল-ইন্‌সাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার মধ্যে আরাম উপভোগের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

১৮২৬। ছাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ খাটের উপর রক্ষিত হইলে পর লোকজন উহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা তাঁহার জন্য দোয়া ও মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল; আমিও তাহাদের মধ্যেই ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন দিক হইতে আমার কাঁধে হাত রাখিল; ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি আলী (রাঃ)। তিনি ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর রহমত নাজিল হওয়ার দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল লইয়া আল্লার দরবারে হাজির হইবার আকাঙ্খা করিতে পারি ঐরূপ ব্যক্তি আপনার পরে আর কেহ নাই। কসম খোদার—আমি পূর্ব্ব হইতেই ধারণা করিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুদ্বয় রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গেই স্থান লাভ করিবেন। কারণ, আমি অধিক সময় হযরত (দঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি নিজের সঙ্গে আবুবকর ও আপনাকে জড়াইয়া কথা বলিতেন। যেমন—তিনি বলিতেন, আমি এবং আবুবকর ও ওমর যাইব, আমি এবং আবুবকর ও ওমর প্রবেশ করিব, আমি এবং আবুবকর ও ওমর বাহির হইব, ইত্যাদি।

১৮২৭। ছাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)। তাঁহাদের অবস্থানে পাহাড়টি কম্পিত হইয়া উঠিল; তখন হযরত (দঃ) পায়ের দ্বারা উহাকে আঘাত করিয়া বলিলেন, হে ওহোদ! স্থির থাক। তোমার উপর একমাত্র নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ শ্রেণীর লোকই রহিয়াছেন। (শহীদ বলিতে ওমর এবং ওসমান (রাঃ) উদ্দেশ্য ছিলেন।)

১৮২৮। ছাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে কায়েম হইবে? হযরত (দঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি

করিয়াছ? সে ব্যক্তি আরজ করিল, উহার জন্য আমার নিকট বিশেষ কোন পুঁজি নাই, তবে আমি খাঁটিভাবে আমার অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের মহব্বত রাখি। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি যাঁহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তুমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে।

আনাছ (রাঃ) বলেন, হযরতের এই সুসংবাদ যে, তুমি যাহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তাহার সঙ্গ লাভ করিবে—ইহা দ্বারা আমরা এত সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছি যে, অন্য কোন কিছুতে আমরা তত সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি নাই।

আনাছ (রাঃ) আরও বলেন যে, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ রাখি এবং আবুবকর ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মহব্বত রাখি; এই অছিলায় আশাকরি আমি তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে পারিব যদিও তাঁহাদের সমান আমল করিতে পারি নাই।

১৮২৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মত—বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁহারা নবী ত ছিলেন না, কিন্তু "মোহাদ্দাছ" ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক (এই যুগে) কেউ হইয়া থাকিলে ওমর হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ওহীর ন্যায় অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য ফেরেশতার আগমন, সাক্ষাৎ ও উপস্থিতি ব্যতিরেকে ফেরেশতার অন্য কোন প্রকার মধ্যস্থাতায় উর্দ্ধ জগতের কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে "মোহাদ্দাছ" বলা হয়। নবুয়তের মর্ত্তবা ইহার অনেক উর্দ্ধে, কারণ উহা (নবুয়ত) অকাট্য এবং নবীর সম্মুখে ফেরেশতার আগমন ও উপস্থিতি নবীর জন্য সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে হইয়া থাকে, অবশ্য মোহাদ্দাছ হওয়া কাশ্‌ফ্‌ ও এল্‌হাম প্রাপ্তির উর্দ্ধের মর্ত্তবা।

১৮৩০। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার বকরি-দল চরাইতেছিল, হঠাৎ বাঘ আসিয়া উহা হইতে একটি বকরি ধরিয়া নিয়া গেল। লোকটি বাঘের পেছনে ধাওয়া করিল এবং উহার মুখ হইতে বকরিটি ছিনাইয়া নিল। তখন বাঘটি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, যেই দিন হিংস্র জন্তুর রাজত্ব চলিবে এবং আমরাই এই বকরিদের মুরব্বি হইয়া দাঁড়াইব সেইদিন কে ইহাকে আমাদের হইতে রক্ষা করিবে?

ঘটনা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল (যে, বাঘ মানুষের ন্যায় কথা বলিয়াছে!) হযরত নবী (দঃ) তখন বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালা বাঘকেও বাকশক্তি দান করিতে পারেন—) ইহার প্রতি আমি ঈমান রাখি ও বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আবুবকর ও ওমর ইহার প্রতি ঈমান রাখে। (তাঁহাদের সম্পর্কে হযরতের পূর্ণ ভরসা

থাকায় তিনি নিজের পক্ষ হইতে এই কথা বলিয়া দিলেন,) অথচ তাঁহারা কেহই তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা—বাঘটি যেই সময়ের কথা বলিয়া ছিল সেই সময়টি কাহারও মতে কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়—যখন নানাপ্রকার বিভিষিকাপূর্ণ হাল-অবস্থার দরুন মানুষ দুনিয়া এবং দুনিয়ার দৌলত ও সম্পদ হইতে বীতশ্রদ্ধ ও বৈরী ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। তখন এইসব পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কোনই মনোযোগ থাকিবে না, ফলে পশুপালকে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করিবে না।

১৮৩১। হাদীছঃ—মেছওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) আততায়ীর হস্তে খঞ্জর বিদ্ধ হইয়া ভীষণভাবে আহত হইলে পর ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, হে আমিরুল-মোমেনীন! যদি ইহাতে আপনার মৃত্যু হইয়াও যায় তবুও আপনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী এবং আপনি হযরতের ছোহবতের—সাহচর্য্যতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উত্তমরূপে আদায় করিয়াছেন এবং তাঁহার বিদায়কালে তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গেও সেইরূপে চলিয়াছেন এবং তাঁহার বিদায়কালেও তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের সঙ্গী সহচারীগণের সঙ্গেও আপনি সেইরূপেই চলিয়াছেন, এখম যদি আপনি তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তবে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিবেন যে, তাঁহারা সকলেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুরাগী রহিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তুমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যতা ও তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছ উহা আমার প্রতি করুণাময় আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ কৃপা ও দান ছিল। তদ্রূপই যাহা আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছ। আর আমার মধ্যে যেই অস্থিরতা দেখিতেছ তাহা হইতেছে তোমার এবং তোমার ন্যায় সর্ব্বসাধারণ লোকদের সম্পর্কে। (অর্থাৎ যাহাদের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। ওমর (রাঃ) ভয় করিতেছিলেন যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করিতে পারিয়াছিলাম কি না? এবং এসম্পর্কে আমি আল্লার দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া বসি না কি? এই ভয়ে তিনি এতই ভীত ছিলেন যে, তিনি বলেন,) দুনিয়া ভরা পরিমাণ স্বর্ণ আমার হইলে উহাও আমি ব্যয় করিয়া দিতাম আল্লার আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—সেই আজাব আমার চোখের সামনে আসিবার পূর্ব্বেই।

১৮৩২। ছাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম ; আমরা দেখিয়াছি, হযরত (দঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া চলিতেছিলেন।

খলীফা পদে ওমর (রাঃ) ঃ

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা নির্ব্বাচিত হইতে মোটেই কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল না। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যক্তিত্ব সমস্ত মোসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবধারিত ছিল। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত সুদীর্ঘ পরামর্শের দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করতঃ ওমর (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচন করার ঘোষণাটি অছিয়তরূপে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইন্তেকালের পর মোসলমাগণ বিনা দ্বিধায় তাঁহার অছিয়তকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার খেলাফতকাল ১০ বৎসর ৪ মাস ছিল (রওজাতুল-আহাব ২—৬৬) এবং হিঃ ২৩ সনে মহরম মাসের ১লা ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বা ৫৮ বা ৫৫ বা ৫৪ ছিল।

(রওজাতুল-আহবাব ২—৫১

ওসমান-ইবনে-আফ্ফান (রাঃ)

১৮৩৩। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের—সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টি স্থিরকৃত ছিল যে, আমরা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমকক্ষ কাহাকেও গণ্য করিতাম না, তাঁহার পরেই ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরেই ওসমান (রাঃ)। তাঁহার পর অন্যান্যদের মর্ত্তবা সম্পর্কে কাহারও কোন মন্তব্য ছিল না। (ইহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর উক্তি।)

খলীফারূপে তাঁহার নির্ব্বাচন ঃ

১৮৩৪। ছাদীছ ঃ- আম্র ইবনে মাইমুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর (রাঃ) আততায়ীর হাতে আহত হইলে পর যখন তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল তখন তাঁহার কন্যা উম্মুল-মোমেনীন হাফ্ছাহ্ (রাঃ) কতিপয় মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ; আমরা পূর্ব্ব হইতে তথায় বসিয়াছিলাম ; তাঁহাদিগকে দেখিয়া অমরা তথা হইতে উঠিয়া গেলাম। তখন তাঁহারা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে আসিলেন এবং হাফ্ছাহ্ (রাঃ) কান্নাকাটা আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় এক দল পুরুষ তথায় উপস্থিত হওয়ার

অনুমতি চাহিল, সেমতে হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) আন্দর মহলে চলিয়া গেলেন; আমরা পুরুষ দল ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলাম। আন্দর মহল হইতে হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার ক্রন্দন শব্দ শুনা যাইতেছিল। উপস্থিত লোকগণ সকলেই ওমর (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার জন্য। ওমর (রাঃ) বলিলেন, কতিপয় লোক যাঁহাদের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষরূপে সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—ঐ লোকগণের তুলনায় অন্য কাহাকেও আমি এই কাজের যোগ্য মনে করি না। এই বলিয়া তিনি আলী (রাঃ), ওসমান (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাস্ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আইফ (রাঃ)—ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করিলেন। আর (লোকদের অভিপ্রায়ের উত্তরে স্বীয় পুত্র সম্পর্কে) বলিলেন, আবদুল্লাহ-ইবনে-ওমর তোমাদের পরামর্শে উপস্থিত থাকিবে, কিন্তু খলীফা হওয়া সম্পর্কে তাহার কোনই সুযোগ থাকিবে না; আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এতটুকু মাত্র সুযোগও শুধু তাঁহার মন রক্ষার্থে দিয়াছিলেন।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাস খলীফা নির্ব্বাচিত হন তবে ত ভালই, নতুবা যে-ই খলীফা নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে সায়া'দ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা। আমি যে, সায়া'দকে (কুফার গভর্ণর পদ হইতে) অপসারিত করিয়াছিলাম তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা বা খেয়ানত ও অসাধুতার কারণে করিয়াছিলাম না।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, আমার পরে যিনি খলীফা হইবেন তাঁহাকে আমি বিশেষরূপে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি যে, তিনি যেন ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার মোহাজের ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁহাদের ইজ্জত ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলেন। আর আমি তাঁহাকে আনছারগণ সম্পর্কেও বিশেষ অছিয়ত করিতেছি—যাঁহারা মোহাজেরগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এই মদিনা শহরে বসবাস করিতেছিলেন এবং এই দেশে ঈমান-ইসলামকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেই আনছারগণের ভাল কার্য্যাবলীর যেন কদর করা হয় এবং তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি যেন ক্ষমার চোখে দেখা হয়। আর আমি আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে এই অছিয়তও করিতেছি যে, তিনি যেন রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর-বন্দরের অধিবাসীদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। কারণ, ঐসব লোক হইতেছে ইসলামের সাহায্যকারী এবং (ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য) অর্থ সংগ্রহকারী এবং শত্রুদের চোখের কাঁটা। বিশেষরূপে তাহাদের সম্পর্কে খেয়াল রাখিবে যে, (রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়কালে) তাহাদের আবশ্যকাতিরিক্ত ধন না থাকিলে যেন তাহাদের

হইতে কিছু আদায় করা না হয় এবং আবশ্যকাতিরিক্ত ধন হইতেও যেন এইভাবে আদায় করা হয় যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, আমি আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে এই অছিয়তও করিতেছি, তিনি যেন পল্লী অঞ্চলের লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন; আরবের পল্লীবাসীগণ হইতেছে আরবের মূল ও খাঁটী অধিবাসী এবং ইসলামের বিশেষ সাহায্যকারী। তাহাদের সামর্থবান লোকদের হইতে কিছু আদায় হইলে তাহা যেন তাহাদেরই গরীব দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয় করা হয়। আমি তাঁহাকে আরও অছিয়ত করিতেছি—আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের (তথা শরীয়তের) বিধানমতে যাহাদের জান-মাল রক্ষার জিম্মাদারী লওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ নাগরিকত্ব প্রাপ্ত সংখ্যালঘু) তাহাদেরে নাগরীকত্বের সুযোগ-সুবিধা যেন পূর্ণরূপে প্রদান করা হয় এবং তাহাদের জান-মাল রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে এবং রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের বেলায় তাহাদের সহজ-সাধ্যের অতিরিক্ত তাহাদের উপর চাপানো যাইবে না।

তারপর যখন ওমর (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার মুরব্বিদ্বয়ের সঙ্গে দাফন করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার দাফন কার্য্য হইতে অবসর হইয়া পূর্ব্বোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) এই প্রস্তাব করিলেন যে, ছয় জনের মধ্যে একজন অপরজনকে স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করতঃ মূল বিষয়ের মীমাংসা তিন জনের উপর ন্যাস্ত করা হউক। সেমতে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা আলী (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম; তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা ওসমান (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম; সায়া'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা আবদুর রহমান (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম।

অতঃপর আবদুর রহমান (রাঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে আলী ও ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যিনি রাষ্ট্র নায়ক হইবেন না বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারেন! আমরা তাঁহাকেই রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করিব; তিনি শপথ করিবেন যে, তিনি অবশ্য মহান আল্লাহ এবং ইসলামের দৃষ্টি-তলে থাকিয়া নিজেদের মধ্যে তাহার বিবেচনা অনুযায়ী প্রকৃত সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবেন।

ওসমান ও আলী (রাঃ) উভয়েই এই প্রশ্নের উত্তরে চুপ রহিলেন। তখন আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমি নিজে রাষ্ট্রনায়ক হইব না বলিয়া স্বীকৃতি দিতেছি—এই শর্ত্তে আপনারা আমাকে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিতে পারেন কি? আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমাদের মধ্য হইতে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। ওসমান ও আলী (রাঃ) এই কথার প্রতি স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন।

*খলীফা নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ যখন আবদুর রহমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর অর্পিত হইল তখন (হইতে তিন রাত্র) সকল লোকই নিজ নিজ বক্তব্য, পরামর্শ ও ধারণা-খেয়াল তাঁহারই নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিল। এই অবস্থায়ই ঐ রাত্র কয়টি অতিবাহিত হইল। এমনকি যেই রাত্রের ভোরবেলা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইল—ঐ রাত্রে আবদুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মেস্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে আসিলেন। মেস্‌ওয়ার (রাঃ) বলেন, তিনি আমার বাড়ী উপস্থিত হইয়া গৃহ দ্বারে করাঘাত করিলেন; আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া গেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি ত নিদ্রায় আছেন! আমি কিন্তু খোদার কসম—এই রাত্র কয়টিতে বিশেষ নিদ্রা যাইতে পারি নাই। এই বলিয়া যোবায়ের (রাঃ) এবং সায়া'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আনার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাদেরকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে গভীর রাত পর্য্যন্ত গোপন আলাপ করিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ) আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন; তাঁহার ধারণা হইতেছিল, হয়ত তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন। আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন (যে, তিনি অন্য কাউকে খলীফা স্বীকার করিবেন কি-না।) অতঃপর আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে আদেশ করিলেন, ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার জন্য। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম, তিনি তাঁহার সঙ্গেও গোপন আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং ফজরের নামাযের আজান হওয়া পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা করিলেন।

ফজরের নামায শেষ হইলে পর পূর্ব্বোল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—ছয়জন মিম্বারের নিকট একত্রিত হইয়া বসিলেন এবং মদিনায় উপস্থিত সকল মোহাজের ও আনছারগণের নিকট উপস্থিতির জন্য সংবাদ দিলেন। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন এলাকার গভর্ণরগণকেও সংবাদ পাঠাইলেন, তাহারা সকলেই এইবার হজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায়ই ছিলেন।

যখন সকলে একত্রিত হইল তখন আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ)কে হাত ধরিয়া নির্জ্জনে নিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আপনার নিকটতম আত্মীয়তা রহিয়াছে এবং আপনি যে কত আগে ইসলামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও আমি অবগত আছি, সেমতে

* এখান হইতে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হইল তাহা বোখারী শরীফ ১০৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কীয় অন্য একটি রেওয়ায়াতের অনুবাদ।

আপনি আল্লাকে নিজের উপর সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করুন যে, যদি আমি আপনাকে খলীফা নির্ব্বাচিত করি তবে নিশ্চয় আপনি আদল-ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়নতার উপর সুদৃঢ় থাকিবেন এবং যদি ওসমান (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচিত করি তবে নিশ্চয় আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিবেন এবং মানিয়া নিবেন।

তারপর আবদুর রহমান (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে নির্জ্জনে নিয়া তাঁহাকেও ঐরূপ বলিলেন। এইভাবে আবদুর রহমান (রাঃ) উভয় হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কলেমা-শাহাদৎ পাঠ পূর্ব্বক ভাষণ দান আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আলী! আমি সর্ব্বসাধারণের অভিমত তলাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমি ইহাই দেখিয়াছি যে, তাহারা (খেলাফতের জন্য) ওসমানকেই সকলের উপর স্থান দিয়া থাকে, অন্য কাউকে এই ব্যাপারে তাঁহার সমতুল্য মনে করে না। অতএব আপনি মনের মধ্যে অন্য কোন ভাবধারার অবকাশ দিবেন না; এই বলিয়া আবদুর রহমান (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খলীফা-রূপে স্বীকৃতি দান স্বরূপ আমি আপনার হাতে বায়য়া'ত করিতেছি। আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আপনি আল্লার এবং আল্লার রসুলের এবং তাঁহার উভয় খলীফার অনুসরণে দৃঢ়পদ থাকিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল মোহাজের, আনসার, গভর্ণর ও সাধারণ মোসলমানগণ এক বাক্যে খলীফারূপে তাঁহার হাতে বায়য়া'ত করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদিনার সকল লোকই মসজিদে প্রবেশ করিয়া বায়য়া'ত করিলেন।*

১৮৩৫। হাদীছঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী (রঃ) বলেন, মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনুল আছওয়াদ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, কোন্ বাধার কারণে আপনি খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা ওলীদ সম্পর্কে কথা বলেন না? লোকেরা তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে।

ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইতি মধ্যে খলীফা ওসমান (রাঃ) যখন নামায পড়িতে যাইতে ছিলেন তখন আমি তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইলাম এবং বলিলাম, আপনার নিকট আমার একটি আবশ্যক আছে, যাহা আপনারই হিত সম্পর্কে। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, দেখ মিঞা! আমি তোমা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

---

* খলীফারূপে ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন যে কিরূপ গণপ্রিয় ও পাক-পবিত্র ছিল উহার বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বোখারী শরীফ শেষ খণ্ড তথা ৭ম খণ্ডের পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে। খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির যে জঘন্য মিথ্যা অপবাদের গুজব সমাজের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে—ইতিহাসের মাধ্যমে উহা খণ্ডনে উক্ত ১০০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট সঙ্কলিত হইয়াছে।

এতদশ্রবণে আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং নামায পড়িতে গেলাম। নামাযান্তে আমি তাঁহাদের নিকট গেলাম যাঁহারা আমাকে খলীফা ওসমানের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার কথা এবং খলীফা ওসমানের উত্তরও শুনাইলাম। তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি আপনার কর্ত্তব্য আদায় করিয়াছেন।

আমি তাঁহাদের সহিত বসিয়াই ছিলাম—ইতি মধ্যেই খলীফা ওসমানের পেয়াদা আমার নিকট পৌঁছিল। আমি খলীফা ওসমানের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে হিতের কথা বলিতে চাহিয়াছিলে সেই কথাটা কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য দ্বীনের বাহকরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ডাকে সাড়া দানকারীদের একজন। আপনি দ্বীনের জন্য হাব্সা ও মদিনা উভয়ের হিজরত করিয়াছেন। আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন; হযতের রীতি-নীতি আপনি দেখিয়াছেন। ওলীদ সম্পর্কে লোকেরা নানা রকম কথা বলিতেছে; আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাহার শাস্তি-বিধান করা।

ওবায়হুল্লাহ বলেন, ওসমান (রাঃ) আমাকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না; তবে হযরতের প্রচারিত এল্ম ও জ্ঞান যাহা সকলের নিকটই পৌঁছিয়া থাকে আমার নিকটও পৌঁছিয়াছে। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য ধর্ম্মের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ডাকে সাড়া দানকারীদের একজন ছিলাম। আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে নিয়া আসিয়া ছিলেন আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলাম এবং আমি দ্বীনের খাতিরে দুইবার হিজরত করিয়াছি—যেরূপ তুমি বর্ণনা করিয়াছ। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহ্বত ও সাহচর্য্য লাভ করিয়াছি। হযরতের হাতে বায়য়াত বা জীবন-পণ গ্রহণ করিয়াছি। খোদার কসম—হযরতের নিকট অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকারের বরখেলাফ কোন কাজ কখনও করি নাই। হযরত (দঃ)কে কখনও কোন ধোকা বা ফাঁকি দেই নাই। হযরতের ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সম্পর্কই বজায় রাখিয়াছি। তাঁহার পর খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও ঐরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি। তাঁহার পর খলীফা ওমরের সঙ্গেও তদ্রূপই। অতঃপর আমাকে খলীফারূপে বরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী খলীফাদের সহিত আমি এবং আমরা সকলে যেরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি—আমি কি তোমাদের হইতে ঐরূপ সম্পর্কের অধিকারী ও হক্দার নহি?

ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমি বলিলাম—নিশ্চয়। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তবে তোমাদের পক্ষ হইতে এই সব নানা রকমের কথাবার্ত্তা আমার বিরুদ্ধে হয় কেন—যাহা আমি শুনিয়া থাকি ? ওলীদ সম্পর্কে তুমি যাহা উল্লেখ করিয়াছ ইনশা-আল্লাহ অনতিবিলম্বেই আমি সে সম্পর্কে সঠিক পন্থা অবলম্বন করিতেছি। তারপর আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং ওলীদকে বেত্রদণ্ডের আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা :—৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি তথা মদ্য পানের শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ ও মোহাদ্দেছগণের মতে ৪০ বেত্রাঘাতের উপর ক্ষান্ত করা হইয়াছিল—যেরূপ বোখারী শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। আর অনেকের মতে ৮০ বেত্রদণ্ডই পূর্ণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বিরতির সহিত। কিম্বা একত্র দুইটি বেত্রের আঘাত ছিল, যদ্দরুন প্রকাশ্য সংখ্যা চল্লিশ ছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ওলীদ ইবনে ওক্‌বা (রাঃ) একজন ছাহাবী ছিলেন। তিনি ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিয়োজিত কুফার গভর্ণর ছিলেন। কুফার কতিপয় দুষ্কৃতিকারী তাঁহার বিরুদ্ধে মদ্য পানের মিথ্যা অপবাদ এমনভাবে সাজাইয়াছিল এবং ছড়াইয়াছিল যে, মিথ্যা অপবাদটাই অনেক ভাল লোকের নিকটও উহা সত্য বলিয়া মনে হইল ; অথচ ঘটনা মিথ্যা ছিল। যেমন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নামে মোনাফেকগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত মিথ্যা অপবাদ হাস্‌সান (রাঃ) হামনা (রাঃ), এমনকি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মেসতাহ্ (রাঃ)ও সত্য সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছিলেন। সর্ব্বপরি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও মহা ইতস্ততের মধ্যে দীর্ঘ একমাস কাল কাটিয়াছিলেন। এমনকি আয়েশা(রাঃ)কে ত্যাগ করার বিষয়ে চিন্তা এবং পরামার্শ গ্রহণ করিতে ছিলেন। আলী (রাঃ) আয়েশাকে ত্যাগ করার পক্ষে ইঙ্গিত দিয়া ছিলেন। যদি আকাট্য কোরআনের সুদীর্ঘ ওহী দ্বারা ঘটনার সমাপ্তি না হইত তবে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগ্যে কি ঘটিত তাহা বোখারী শরীফের হাদীছেই আভাস পাওয়া যায় (হাদীছটি সম্মুখেই আয়েশার আলোচনায় অনুদিত হইবে)। অথচ ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন ছিল।

তদ্রূপই ওলীদ-ইবনে-ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনায়ও মিথ্যা সাজানো এবং প্রচারণার দ্বারা ঐরূপ আকার ধারণ করা বিচিত্র নহে। যদ্দরুণ অনেক ছাহাবী ঘটনাকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছিলেন এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক ইতিহাসেও ঐ ঘটনা স্থান লাভ করিয়াছে। যাহার প্রভাবে অনেক ব্যাখ্যাকার মোহাদ্দেছও ঘটনাকে সত্য আকারেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা সাক্ষীও এমনভাবে গড়াইয়াছিল, ঘটনাকে আইনগত রূপ দানেও তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দুষ্কৃতিকারীরা আরও একটি জঘন্যতম এবং ঘৃণিত উদ্দেশ্যের মূলধনও

এই ঘটনা দ্বারা কুড়াইতে ছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) খলীফা ওসমানের দুর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। মোসলেম জাতির শক্র মোনাফেক শ্রেণীর একটি সুসংঘবদ্ধ দলের ক্রীড়নকরা খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির ধূয়া উড়াইতে ছিল; তাহারা এই ঘটনা দ্বারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার সুযোগ নিতে ছিল। যদ্দরুন খলীফা ওসমান (রাঃ) অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন; নামাযে যাওয়ার পথে ঐরূপ একটি বিরক্তিকর গুজবের প্রতিই খলীফা ওসমান (রাঃ) অসন্তুষ্টি ও অনিহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। অভিযোগ শুনিবার প্রতি মুলতঃ তাঁহার বৈরীভাব ছিল না, তাই নামায হইতে অবসর হইয়াই অভিযে গ শুনিবার জন্য অভিযোগকারীকে খবর দিয়া আনিলেন। এই ঘটনার সর্ব্বময় বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পাঠক! বোখারী শরীফের আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম শুধু এতটুকু যে, খলীফা ওসমানের নিকট ওলীদের নামে একটি মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল। সেই মকদ্দমার চূড়ান্ত ফয়ছালায় বিলম্ব হইতেছে ভাবিয়া অনেকের পক্ষ হইতে খলীফার নিকট ওলীদের শাস্তি দাবী করা হইলে খলীফা তাঁহার শাস্তি বিধান করেন।

বোখারী শরীফের হাদীছের এই বর্ণনাটুকু সত্য—ইহাতে অবাস্তব ও অসত্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু ঐ মকদ্দমা সত্য কি মিথ্যা ছিল? মিথ্যা হইলে কি সূত্রে খলীফা উহার উপর শাস্তি দিলেন তাহা ভিন্ন বিষয়। উহারই বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিবেন। মকদ্দমা মিথ্যা ছিল এবং উহার উপর শাস্তি বিধানের হেতু ছিল—এই সব বিষয় বোখারী শরীফের হাদীছের আওতাভুক্ত নহে।

খলীফা ওসমানের খেলাফতকাল প্রায় ১২ বৎসর ছিল। তিনি হিজরী ৩৫ সনে জিলহজ্জ মাসের ১৩ বা ১৮ তারিখে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৯ বা ৯০ বৎসর ছিল। (তারীখুল-খোলাফা ১২৫)

খলীফাতুল-মোছলেমীন আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু

তাঁহার উপনাম ছিল "আবুল হাসান"। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতদুর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, তুমি আমার অঙ্গ স্বরূপ এবং আমি তোমার অঙ্গ স্বরূপ।

ওমর (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮৩৬। হাদীছ:—এক ব্যক্তি সাহ্‌ল ইবনে সায়া'দ রাজিয়াল্লাহুর নিকট আসিয়া মদিনার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সম্পর্কে বর্ণনা করিল যে, সে মিম্বারে দাঁড়াইয়া আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর কুৎসা করিয়া থাকে। সাহ্‌ল (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করিলেন, সে কি বলিয়া থাকে? লোকটি বলিল, সে তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে, "আবু তোরাব"। (যাহার অর্থ "মাটি মাখা" ব্যক্তি।)

এতচ্ছ্রবনে সাহ্‌ল (রাঃ) হাঁসিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার ("আবু তোরাব" নাম কি কটাক্ষ করার বস্তু?) এই নাম ত স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্ত্তৃক স্নেহভরে উচ্চারিত নাম এবং আলীর নিকটও এই নামটি সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল।

অতঃপর তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান পূর্ব্বক বলিলেন, একদা আলী (রাঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হইতে (রাগান্বিত হইয়া) বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং মসজিদে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে নবী (দঃ) ফাতেমার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং আলী (রাঃ)কে খোঁজ করিলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তিনি মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত নবী (দঃ) মসজিদে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার পিঠ হইতে চাদরখানা হটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পিঠে মাটি লাগিয়া রহিয়াছে। এতদৃষ্টে হযরত (দঃ) তাঁহার পিঠ হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আদর ও সোহাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে "আবু তোরাব"! (ঘুম হইতে) উঠ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলী (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অত্যাধিক নৈকট্য ও ভালবাসার অধিকারী ছিলেন। এমনকি নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি যাহার ভালবাসার হইব আলীও তাহার ভালবাসার হইবে (তিরমিজী শঃ)।

আবুবকর, ওমর এবং ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমেরও পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই নবী (দঃ)-এর প্রতিপালনে ছিলেন।

ফাতেমা (রাঃ), হাসান ও হোসায়ন (রাঃ) এবং আলী (রাঃ)কে নবী (দঃ) নিজ পরিবার বলিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট চিহ্নিত করিয়াছিলেন। (মোসলেম শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোনাফেক ব্যক্তিই আলীকে ভালবাসিবে না এবং কোন মোমেন আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। (তিরমিজী শরীফ)

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিবে সে যেন আমাকে গালি দিল। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন—"আয় আল্লাহ! আমাকে যে বন্ধু বানাইবে আলীকেও তাহার বন্ধু বানাইতে হইবে। আয় আল্লাহ! যে আলীকে ভালবাসিবে তুমি তাহাকে ভালবাসিও; যে আলীর শত্রু হইবে তুমি তাহার শত্রু হইও।" (ঐ)

খায়বর-জেহাদে চূড়ান্ত বিজয় অভিযানের পতাকা দান উপলক্ষে নবী (দঃ) এক মহাসৌভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র আলী (রাঃ)কে বানাইয়াছিলেন যে—"আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তাঁহাকে ভালবাসেন। (তৃতীয় খণ্ড খায়বর জেহাদ দ্রষ্টব্য)

তবে মেশকাত শরীফে স্বয়ং আলী (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ আছে। আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সম্পর্কে (পয়গাম্বর) ঈসার একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা হইবে। তাঁহার প্রতি ইহুদী জাতির বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল এমনকি তাহারা (তাঁহার সম্পর্কে) তাঁহার মাতার প্রতি মিথ্যা গ্লানি করিয়াছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা তাঁহাকে এত উর্দ্ধে উঠাইয়াছে যত উর্দ্ধের তিনি নহেন। আলী (রাঃ) বলেন—আমার সম্পর্কেও দুই শ্রেণীর মানুষ ধ্বংস হইবে। এক শ্রেণী অতিরিক্ত মহব্বতের দাবীদার—আমার এমন মর্ত্তবা বয়ান করিবে যাহা আমার নাই। আর এক শ্রেণী আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষনকারী; আমার প্রতি বিদ্বেষের দরুন আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে (৫৬৫ পৃঃ)।

আলী (রাঃ) সম্পর্কে আমাদের তথা আহ্‌লে-সুন্নতের আক্কিদা এই যে, তিনি চতুর্থ খলীফা-রাশেদ-বরহক্ক। তাঁহার খেলাফতকাল প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)—এই তিন জনের পরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনি।

অবশ্য যে সব ছাহাবী বা ছাহাবীদের অনুসারীগণ তাঁহার সঙ্গে মতবিরোধ করিয়াছেন– যেমন, আশারা-মোবাশ্‌শারা তথা আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশত লাভের ঘোষণাপ্রাপ্ত দশ জনের দুই জন—যোবায়ের (রাঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) এবং নবীজীর প্রিয়তমা মোসলেম-জননী আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের অনুসারী বহু সংখ্যক ছাহাবী ও তাবেয়ী। তাঁহাদের সম্পর্কে আমরা খারাব ধারণা পোষণ করিতে পারিব না, নিন্দা-মন্দ বা দোষ-চর্চ্চার সমালোচনা মোটেই করিতে পারিব না। ঐরূপ ধারণা পোষণ বা সমালোচনা করা হইলে তাহা মস্ত বড় গোনাহ হইবে। ইহা ছাহাবীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ দ্বারা উহার প্রামাণিক আলোচনা এই অধ্যায়ের আরম্ভে করা হইয়াছে।

জা'ফর রাজিয়াল্লাহু আনহু

নবী(দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন, আকৃতি ও চরিত্রগুণে তুমি আমার অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৩৭। হাদীছঃ- আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকগণ অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ বেশী বয়ান করে। (আমার হাদীছ বেশী বয়ান করার কারণ এই যে,) আমি ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং চাকর চাকরাণী রাখার সামর্থবান হওয়ার পূর্ব্বে কোন প্রকারে পেট পুরিবার ব্যবস্থা হইলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিতাম। (তাই আমি হাদীছ শুনিবার ও স্মরণ রাখিবার সুযোগ পাইয়াছি অধিক।) আমি কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় কাঁকরময় জমিনের সঙ্গে পেটকে চাপা দিয়া থাকিতাম। কোন

কোন সময় আমি অন্য লোকদের নিকট কোরআনের কোন আয়াত জিজ্ঞাসা করিতাম এই উদ্দেশ্য যে, হয়ত এই অছিলায় কেহ আমাকে তাহার বাড়ী নিয়া খানা খাওয়াইয়া দিবে, নতুবা আমি পূর্ব্ব হইতেই উক্ত আয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।

ঐ সময় দেখিয়াছি, গরীব-মিছকীনদের পক্ষে সর্ব্বাধিক উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জা'ফর ইবনে আবু তালেব। তিনি আমার ন্যায় দরিদ্রগণকে স্বীয় গৃহে নিয়া যাইতেন এবং যাহা কিছু তৈয়ার থাকিত খাওয়াইয়া দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তাঁহার গৃহে খাবার কিছু থাকিত না তখন ঘৃত রাখিবার ছোট মশক যাহার মধ্যে ঘৃত শুধু পাত্রের সঙ্গে লাগিরা থাকার পরিমাণই থাকিত; তিনি উহাকে ফাড়িয়া ছিন্ন করতঃ আমাদের সম্মুখে রাখিতেন আমরা উহার ঘৃত চাটিয়া খাইতাম।

জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফজিলত বর্ণনায় একখানা বিশেষ হাদীছ তৃতীয় খণ্ডে "মূতার জেহাদ" বিবরণে দ্রষ্টব্য।

আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু

১৮৩৮। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিলে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা "এস্‌তেস্‌কা" তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাইতেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বলিয়া ফরিয়াদ করিতেন—হে আল্লাহ! পূর্ব্বে আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অছিলায় বৃষ্টি চাহিতাম, তুমি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিতে; এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় তোমার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি; তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। এইরূপ দোয়ার ফলে লোকগণ বৃষ্টি লাভ করিত।

ফাতেমা (রাঃ) এবং আহ্‌লে-বাইত

নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তবাসীনী রমণীগণের সর্দ্দার হইবে ফাতেমা।

১৮৩৯। হাদীছঃ— ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবুবকর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, (হে মোসলমানগণ!) তোমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ প্রকাশ কর তাঁহার আহ্‌লে-বাইত তথা তাঁহার পরিজনবর্গকে শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ করিয়া।

১৮৪০। হাদীছঃ— عن مسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّىْ فَمَنْ

اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

অর্থ—মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফাতেমা আমার (কলিজার) টুক্‌রা; যে কেহ তাহাকে (বিরক্ত করিয়া) রাগান্বিত করিবে সে বস্তুতঃ আমাকে রাগান্বিত করিবে।

হাসান ও হোসাইন (রাঃ)

১৮৪১। হাদীছ ঃ—আবু বক্‌রাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) মসজিদের মধ্যে মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, (বালক) হাসান (রাঃ) তাঁহার পার্শে বসিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) একবার লোকদের প্রতি তাকাইতেন, আর এক বার হাসানের প্রতি তাকাইতেন; এই অবস্থায় আমি হযরত (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি হাসানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আমার এই দৌহিত্র ছাইয়্যেদ—সর্দ্দার বা শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা লাভকারী হইবে এবং আশা করা যায় (কোন এক সঙ্কটাপূর্ণ সময়) তাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের দুইটি পরস্পর বিরোধী দলের মিমাংসা ও শান্তি স্থাপন করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা—এস্থলে হযরত (দঃ) হাসান (রাঃ) সম্পর্কে দুইটি ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন; উভয় ভবিষ্যদ্বানীই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ীত হইয়াছে। হাসান (রাঃ) দুনিয়াতেও মোসলেম জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্ব-মোসলেম তাঁহাকে এই মর্য্যাদার সহিতই স্মরণ করিবে, এমনকি বেহেশতের মধ্যেও তাঁহার এই মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে। হযরত নবী (দঃ)ই বলিয়াছেন— الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة। "যুবক শ্রেণীর জান্নাতবাসীদের সর্দ্দার হইবে হাসান ও হোসাইন।" মনে হয়—হযরতের এই উক্তি হইতেই "ছাইয়্যেদ" পদবীর সূত্রপাত। হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধরকে "ছাইয়্যেদ" বলা হইয়া থাকে; ছাইয়্যেদ অর্থ সর্দ্দার বা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বানীও বাস্তবায়ীত হইয়াছিল যখন মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থনকারীদের দল এবং হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থনকারীদের দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঘনঘটা মাথার উপর আসিয়া গিয়াছিল তখন সেই বিরোধের মিমাংসা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ত্যাগ ও উদারতার অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৪২। হাদীছ ঃ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে এবং হাসান (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া থাকিতেন, اللهم انى احبهما فاحبهما। "হে আল্লাহ! আমি এই দুই জনকে মহব্বৎ করিয়া থাকি তুমিও তাহাদেরকে মহব্বৎ কর।

১৮৪৩। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাঁধের উপর (বালক) হাসান (রাঃ) ছিলেন। নবী (দঃ) তখন বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি ইহাকে মহব্বৎ করি তুমিও তাহাকে মহব্বৎ কর।

১৮৪৪। **হাদীছ ঃ**—ওক্বা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, একদা আবুবকর (রাঃ) (বালক) হাসানকে কোলে উঠাইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই হাসানের আকৃতি হযরত নবী (দঃ)-এর আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আলীর আকৃতির সঙ্গে ততটা নহে। আলী (রাঃ) তথায়ই ছিলেন, তিনি হাসিতে ছিলেন।

১৮৪৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় আর কেহই ছিলেন না।

১৮৪৬। **হাদীছ ঃ**—একদা এক ব্যক্তি আবছুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ)কে এই মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিল যে, (হজ্জ বা ওমরার এহ্‌রাম অবস্থায় মাছি মারিয়া ফেলিলে কি হইবে? জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি ইরাকবাসী ছিল—যেই দেশের কারবালা ময়দানে ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে শহীদ করা হইয়াছিল। সেই ঘটনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া) ছাহাবী আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইরাক বাসীগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৌহিত্রকে খুন করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, এখন তাহারা মাছি মারা সম্পর্কে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করে! অথচ হযরত নবী (দঃ) স্বীয় দৌহিত্রদ্বয় (হাসান ও হোসাইন) সম্পর্কে বলিয়াছেন, ছুনিয়ার চিজ-বস্তুর মধ্যে আমার জন্য এই ছুইটি হইল ফুল স্বরূপ।

বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

১৮৪৭। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবুবকর (রাঃ) আমাদের সর্দ্দার এবং তিনি আমাদের আর এক সর্দ্দারকে আজাদ বা মুক্ত করিয়াছেন; এই দ্বিতীয় সর্দ্দার ছিলেন বেলাল (রাঃ)।

ব্যাখ্যা—বেলালের এই সৌভাগ্য যে, আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেলাল (রাঃ)কে নিজেদের সর্দ্দার বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকিতেন।

১৮৪৮। **হাদীছ ঃ**—কায়ছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (নবীজীর তিরোধানের পর) বেলাল (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাকে আপনার নিজের জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন তবে আমাকে আপনার নিকট থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন। আর যদি আল্লার ওয়াস্তে আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন তবে আমাকে

আল্লার রাস্তায় কাজ করার জন্য ছাড়িয়া দেন (কোথাও জেহাদে আত্মনিয়োগ করিব। কারণ, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) বিহীন মদিনায় অবস্থান করিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর স্থানকে শূন্য দেখা আমার পক্ষে সহনীয় নহে।)

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের পর বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর শোকের প্রতিক্রিয়া এত অধিক হইল যে, মদিনায় অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িল। তিনি মদিনা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত আবদার আবুবকর (রাঃ)কে জানাইলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) বেলালকে ছাড়িতে রাজী হইলেন না। বেলাল (রাঃ)কে আবুবকর (রাঃ) আল্লার ওয়াস্তে ক্রয় করিয়াই মুক্ত করিয়া দিয়া ছিলেন, বেলাল মুক্তই ছিলেন, কিন্তু বেলাল (রাঃ) নিজ হইতেই আবুবকর (রাঃ)কে স্বীয় মনীবের ন্যায়ই গণ্য করিতেন। সেমতে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হায়াত পর্য্যন্ত বেলাল (রাঃ) মদিনায় অবস্থান করিতেই বাধ্য হইলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পর আর বেলালের পক্ষে মদিনায় অবস্থান সহনীয় হইল না। অবশেষে খলীফা ওমর (রাঃ) বাধ্য হইয়া বেলালকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন। বেলাল (রাঃ) সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

১৮৪৯। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী (দঃ) আমাকে তাঁহার বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া এই দোয়া করিলেন—اللهم علمه الحكمة — اللهم علمه الكتاب। "আয় আল্লাহ! ইহাকে "হেকমত" তথা সঠিক সত্যের জ্ঞান দান কর, ইহাকে তোমার কেতাব (কোরআনের) জ্ঞান দান কর। ইমাম বোখারী (রাঃ) বলেন, "হেকমত" অর্থ সর্ব্ব বিষয়ে সঠিক নির্ভুল জ্ঞান।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)

১৮৫০। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন হযরত নবী (দঃ) অতিশয় সুচরিত্র, কোমল স্বভাব, সদাচারী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার চরিত্র অধিক উত্তম সেই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কোরআন শরীফ চার জনের নিকট হইতে হাসিল করার চেষ্টা কর—(১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, (২) সালেম, (৩) উবাই-ইবনে কায়া'ব, (৪) মোয়াজ ইবনে জাবাল।

১৮৫১। হাদীছ :—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বিশিষ্ট ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ)কে বলিলাম, এমন ব্যক্তির সন্ধান আমাদিগকে দান করুন যে ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বভাব চরিত্র ও চাল-চলনের সর্ব্বাধিক নিকটতম; আমরা তাঁহার হইতে শিক্ষা লাভ করিব। হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় কাউকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ও আদত-অভ্যাসের নিকটতম দেখি না।

১৮৫২। হাদীছ :—আবু মূছা আশয়া'রী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মদিনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গের লোক বলিয়া ধারণা করিতাম। তিনি এবং তাঁহার মাতা হযরতের গৃহে অত্যধিক আসা-যাওয়া করিতেন।

খাদিজাতুল্ কোব্‌রা (রাঃ)

১৮৫৩। হাদীছ :—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইস্রায়ীল উম্মতের সর্ব্বোত্তম নারী ছিলেন মরয়্যাম এবং (বিশ্ব জোড়া সর্ব্বোত্তম উম্মত—) আমার উম্মতের সর্ব্বোত্তম নারী খাদীজা।

১৮৫৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্য হইতে কাহারও প্রতি আমি ততদূর গায়রত (নিজকে তাহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করি নাই যতদূর গায়রত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি অনুভব করিয়াছি। অথচ আমার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছিল; এমনকি আমি হযরতের সংস্পর্শ ও সহচার্য্যতায় আসিয়াছিলাম বিবি খাদিজার মৃত্যুর দীর্ঘ তিন বৎসরকাল পরে। এতদসত্বেও তাঁহার প্রতি গায়রত অনুভবের কারণ এই ছিল যে, হযরত নবী (দঃ) তাঁহার স্মরণ ও আলেচানা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন। (হযরত (দঃ) বলিয়াছেন,) আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে একদা আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন খাদিজাকে সুসংবাদ জ্ঞাত করেন, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের যাহা একটি মাত্র শূন্য-গর্ভ মতি দ্বারা তৈরী হইবে।

হযরত (দঃ) অনেক সময় এক একটি বকরি জবাই করিয়া উহা বণ্টন করতঃ খাদিজার বান্ধবীগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়া থাকিতেন।

কোন কোন সময় আমি (বিরক্তির স্বরে) হযরত (দঃ)কে বলিতাম, মনে হয়—সারা জগতে খাদিজা ভিন্ন কোন নারী ছিলই না! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিতেন,

হে আয়েশা ! আমি তাহাকে ভুলিতে পারি না (এবং পুনঃ পুনঃ খাদিজার প্রশংসা করিয়া বলিতেন,) সে এরূপ ছিল, সে এরূপ ছিল। একমাত্র তাহারই পক্ষে আমার সন্তানাদিও রহিয়াছে।

১৮৫৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) খাদিজা (রাঃ)কে সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়াছেন বেহেশতের মধ্যে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের যাহা একটি মাত্র শূন্য-গর্ভ মতির তৈরী হইবে এবং ইহা অতি নীরব-নিরালা বিশেষ আরাম-আয়েশপূর্ণ শান্তি-নিকেতন হইবে।

১৮৫৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা জিব্রায়ীল (আঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! খাদিজা একটি পাত্রে আপনার জন্য পানাহার বস্তু নিয়া আসিতেছেন; তিনি আপনার নিকট পৌঁছিলে তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম জানাইবেন এবং বেহেশতের মধ্যে শূন্য-গর্ভ এক মতির তৈরী একটি বিশেষ সুরম্য অট্টালিকা লাভের সুসংবাদ জানাইবেন যাহা নীরব-নিরালা শান্তি-নিকেতন হইবে।

আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সোহাগ করিয়া নাম সংক্ষেপ আকারে উচ্চারণ করতঃ) বলিলেন, হে আ'য়েশ ! আমাদের নিকটে ফেরেশতা জিব্রায়ীল আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে সালাম করিতেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তদুত্তরে বলিলাম, "আ'লাইকা অ-আ'লাইহেচ্ছালামু অ-রাহ্‌মাতুহু অ-বারাকতুহু—আপনার প্রতি এবং তাঁহার প্রতি (আমার পক্ষ হইতেও) সালাম, আল্লার রহমতের দোয়া এবং মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা। আমরা যাহা দেখিতে পাই না আপনি তাহা দেখিতেছেন। (যেমন জিব্রায়ীলকে আমরা দেখিতেছি না। আপনি দেখিতেছেন।)

১৮৫৭। হাদীছ ঃ— আবু মূছা আশয়া'রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেক লোকই হইয়াছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে ঐরূপ হইয়াছে শুধু এম্‌রানের কন্যা (হযরত ঈসার মাতা) মরয়্যাম, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া এবং আয়েশা—যাঁহার মর্ত্তবা নারী জাতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চে।

১৮৫৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি, নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্ত্তবা সর্ব্বোচ্চ যেরূপ (আরব দেশে) খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদ" নামীয় খাদ্যের মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক।

বিবি আয়েশার প্রতি অপবাদ এবং আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক উহার খণ্ডন :

১৮৫৯। হাদীছ :- (৫৯৩পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিয়ম ছিল—ছফরে কোন বিবিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য তিনি লটারির ব্যবস্থা করিতেন। লটারিতে যাহার নাম আসিত তাহাকেই তিনি সঙ্গে নিতেন। সেমতে এক জেহাদের ছফরে লটারি করা হইলে আমার নাম আসিল ; আমি রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গীনী হইলাম। এই সময় ইসলামে পর্দার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং আমি উটের পৃষ্ঠে পর্দা আবৃত আসনে বসিতাম ; বিশ্রামকালের অবতরণে উহার ভিতরে রাখিয়াই সেবকগণ আমাকে ঐ আসন সহ অবতরণ করাইত এবং আরোহণ করাইত। এইভাবেই আমাদের ছফর কাটিতে ছিল ; আমরা ছফর শেষে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এবং মদিনার পথ কমই বাকি রহিয়াছে—এমতাবস্থায় আমরা রাত্রি যাপনে অবতরণ করিয়াছি। প্রভাতে যাত্রা আরম্ভের নির্দেষ প্রচারিত হইল ; এমন সময় আমার এস্তেঞ্জার (মল ত্যাগের) প্রয়োজনে আমি লোকজন হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমার গলায় হাত দিয়া দেখিলাম, গলার মালাটা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। তাই যথায় প্রয়োজন পুরণে গিয়াছিলাম তথায় ফিরিয়া আসিয়া মালাটা তালার্শ করিতে লাগিলাম। এই তালাশে আমার নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইয়া গেল। এদিকে লোক-জনদের যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেলে আমার সেবকগণ পর্দা আবৃত আমার আসনকে আমার বাহন—উটের উপর রাখিয়া বাঁধিয়াদিল। তাহাদের ধারণা, আমি ঐ পর্দার ভিতরে রহিয়াছি ; সেই যুগের মেয়েরা স্বল্প খাদ্যেই জীবন-যাপন করিত, তাহাদের দেহ মোটা হইত না। স্থতরাং পর্দা আবৃত খালি আসনটির ওজন কম হওয়ার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য গেল না ; আমিত বয়সের দিক দিয়াও ছোটই ছিলাম।

সেবকগণ আমার উটের উপর ঐ খালি আসন বাঁধিয়া উটকে চালাইয়া দিল। ময়দান হইতে সব লোকজন যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছে—ইতি মধ্যে আমার মালাটি পাইলাম। আমাদের অবতরণ ময়দানে আসিয়া দেখি, এখানে কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। এতদৃষ্টে আমি আমার যে বিশ্রামস্থান ছিল ঠিক ঐ স্থানেই আসিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, আমার উটের আসনের ভিতরে আমি নাই—ইহার অবগতি ত নিশ্চয়ই হইবে এবং আমাকে তালাশ করা হইবে ; তখন সকলে এই স্থানেই আসিবে। বসিয়া বসিয়া আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল।

ছাফওয়ান-ইবনে-মোয়াত্তাল নামক একজন ছাহাবী ছিলেন ; (যাঁহার দায়িত্ব ছিল, অবতরণ-ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বশেষে সব কিছুর খোঁজ করিয়া যাওয়া।) তিনি

আমার অবস্থানের নিকটবর্ত্তী আসিলেন এবং দূর হইতে তন্দ্রারত মানুষ-আকৃতি দেখিয়া লক্ষ্য করিতেই আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন। কারণ, পর্দার বিধানের পূর্ব্বে তিনি আমাকে দেখিয়া ছিলেন। তিনি আতঙ্কিত হইয়া ইন্নালিল্লাহে·····পড়িলেন। তাঁহার সেই পড়ার শব্দে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ওড়না দ্বারা চেহারা ঢাকিয়া নিলাম। খোদার কসম! তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই, ইন্নালিল্লাহ·········ব্যতীত তাঁহার কোন শব্দও আমি শুনি নাই। অবিলম্বে তিনি তাঁহার বাহন উটটি আমার নিকটে বসাইয়া দিলেন; আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম। তিনি উটটির নাসারজ্জু ধরিয়া হাটিয়া চলিলেন; দ্বিপ্রহর হইতেই আমরা মূল যাত্রিগণের সহিত মিলিতে পারিলাম; তাহারা বিশ্রামে অবতরণ করিয়া ছিল।

এই মাত্র ঘটনা—ইহাকে সম্বল করিয়াই অপবাদ সৃষ্টিকারীরা তাহাদের ধ্বংসের পথ ধরিল (—অপবাদ গড়াইয়া উহাকে ছড়াইতে লাগিল।) অপবাদের মূল সৃষ্টিকারী ছিল মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে-উবাই। এবং তাহার নিকট এই আলোচনা আসিলেই সে আলোচনাকারীর কথায় সায় দিত, তাহার কথার প্রতি মনোযোগ দিত এবং অপবাদকে সাজসজ্জায় গড়াইয়া তুলিত।

অপবাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণে ছাহাবী হাস্‌সান (রাঃ) ও মেছতাহ (রাঃ) এবং হামনা-বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ) সহ কতিপয় লোক ছিলেন। (পবিত্র কোরআনে আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে) আল্লাহ তায়ালা একটি দল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; এই অপবাদ গড়াইবার প্রধান নায়কছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় পৌঁছিয়া আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। এক মাসকাল আমি অসুস্থ থাকিলাম; এই সময় অপবাদকারীরা আপবাদের খুব চর্চ্চা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু উহা সম্পর্কে আমি কোনই খোঁজ রাখি না। তবে আমার অসুস্থতার মধ্যে এই বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইতেছিল যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ্যাল্লামের ঐরূপ মধুরতা দেখি না। পূর্ব্বে কোন সময় অসুস্থ হইলে তাঁহার যেরূপ মধুরতা আমি উপভোগ করিয়া থাকিতাম। এই বারের অবস্থা এই যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘরে আসিয়া সালাম করেন এবং (আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ঐ রুগীণীর কি অবস্থা? এতটুকু জিজ্ঞাসার পরেই তিনি ঘর হইতে চলিয়া জান। এই ব্যাপারটিই আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইতেছিল; মূল ঘটনার কোন খোঁজ আমার মোটেই ছিল না।

রোগ জনিত দুর্ব্বলতার অবস্থায় একদা আমি বাহ্য-ত্যাগে যাইতে ছিলাম ; এই প্রয়োজনে তখনও আমরা প্রাচীনকালের প্রথায় রাত্রি বেলায় জনশূন্য এলাকায় যাইয়া থাকিতাম। ঘর-বাড়ীর সংলগ্নে পায়খানাকে ঘৃণা করা হইত। যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে আমার জ্ঞাতি মেছতাহ (রাঃ) ছাহাবীর মাতা ছিলেন। প্রয়োজন সমাপ্তে আমি মেছতাহের মাতার সহিত গৃহপানে আসিতে ছিলাম ; তিনি তাঁহার পরিধেয় কাপড়ে পেঁচ লাগিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, মেছতাহের সর্ব্বনাশ হউক। আমি বলিলাম, আপনি কী খারাব কথা বলিলেন, বদর-জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন লোককে আপনি মন্দ বলিলেন ! তিনি বলিলেন, আপনি ত সোজা মানুষ; মেছতাহ যেই কথায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে উহার খবর ত আপনি রাখেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই কথাটা কি ? তিনি আমাকে অপবাদকারীদের সমস্ত কথা অবগত করিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই সংবাদ শুনা মাত্র আমার রোগ বহুগুণে বাড়িয়া গেল। আমি তথা হইতে গৃহে পৌঁছিলাম, ঐ সময়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও গৃহে আসিলেন এবং (ঐ সময়ের মনোভাব জনিত রীতিতে) সালামান্তে বলিলেন, তোমাদের ঐ রুগীণীর অবস্থা কিরূপ ? আমি নবী (দঃ)কে বলিলাম, আমাকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিবেন কি ? আমার ইচ্ছা—মাতা-পিতার নিকট হইতে ঘটনার বাস্তবতা অবগত হইব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। পিত্রালয়ে আসিয়া আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা ! লোকেরা আমার সম্পর্কে কি বলিয়া থাকে ? মাতা আমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, বৎসে ! এই ঘটনাকে অতি সাধারণভাবে গ্রহণ কর। কোন সুন্দরী নারী স্বামীর নিকট প্রিয়পাত্র—তাহার যদি কতিপয় সতীন থাকে তবে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে শত মিথ্যা গড়াইয়া থাকেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি অনুতাপ-দগ্ধস্বরে বলিলাম, ছোবহানাল্লাহ ! লোকেরা কি আমার নামে এই সব অপবাদ বলিয়া ফেলিয়াছে ? আমি সারা রাত্র কাঁদিয়া কাটাইলাম ; রাত্র ভোর হইয়া গেল আমার অশ্রুর বিরতি নাই এবং চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র স্পর্শ করে নাই। পরবর্ত্তী রাত্রও কাঁদা অবস্থায়ই কাটিল।

ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার এই ব্যাপারে) কোন ওহী প্রাপ্ত না হওয়ায় আলী (রাঃ) উসামা (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন ; তাঁহাদের সঙ্গে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং আমাকে ত্যাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ করিবেন। উসামা (রাঃ) আমার পবিত্রতা সম্পর্কে যাহা জানিতেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ সম্পর্কে তাঁহার অন্তরে

যে বিশ্বাস ছিল তাহা অনুপাতেই তিনি বলিলেন, আপনার বিবি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; তাঁহার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দের কোন ধারনাই আমাদের নাই। আলী (রাঃ) অবশ্য এতটুকু বলিলেন, আল্লাহ ত আপনার জন্য কোন অভাব রাখেন নাই—সে ভিন্ন আরও মহিলা অনেকই আছে। তবে পরিচারিকা বরীরাকে জিজ্ঞাসা করুন; সে মূল ব্যাপার বলিতে সক্ষম হইবে। সেমতে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বরীরা (রাঃ)কে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন সময় (আয়েশার মধ্যে) সন্দেহ জনক কোন ব্যাপার দেখিয়াছ কি? উত্তরে বরীরা (রাঃ) বলিলেন, ঐ খোদার কসম যিনি আপনাকে সত্য রস্থলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন—আমি কোন সময় বিবি আয়েশার মধ্যে দোষণীয় কোন কিছু দেখি নাই। তিনি ত এতই সরল যে, বাল্য-সুলভ স্বভাবে রুটির জন্য আটা তৈরী করিতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল আসিয়া তাঁহার আটা খাইয়া ফেলে—তিনি খবরও রাখেন না।

এই সবের পর রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লোক জনকে একত্র করিয়া ভাষণ দানে মিম্বরে দাঁড়াইলেন এবং (অপবাদ গড়াইবার ও প্রচার করিবার প্রধান নায়ক) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ভূমিকায় অসহণীয় উদ্বিগ্নের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হে মোসলমান জনমণ্ডলী! আছ কেউ—যে আমার পক্ষ হইতে একটি লোকের কোন ব্যবস্থা করিতে পার যাহার উৎপীড়ন আমার প্রতি চরমে পৌঁছিয়াছে। আমার পরিবারের প্রতি তাহার ভূমিকা আমাকে অত্যধিক ব্যথিত ও দুঃখিত করিয়াছে। খোদার কসম! আমি আমার পরিবারকে সম্পূর্ণ ভালই পাইয়াছি; তাহার কোন মন্দই আমি পাই নাই। অধিকন্তু যেই পুরুষটিকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ গড়ানো হইয়াছে তাহার সম্পর্কেও ভাল ছাড়া মন্দের কোন খোঁজই আমি পাই নাই। কোন দিন সে আমার সঙ্গ ছাড়া আমার গৃহে আসেও নাই।

নবীজীর বক্তব্যের পরেই (মদিনার "আওস" গোত্রীয় সর্দার) সায়াদ-ইবনে মোয়াজ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমি ঐ ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে পারি। যদি সে আমাদের গোত্র আওস বংশের হয় তবে এখনই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিব। আর যদি আমাদের ভ্রাতাবংশ খযরজ গোত্রের হয় তবে আপনি যাহাই আদেশ করিবেন তাহাই প্রয়োগ করিব। এই সময় খযরজ বংশীয় এক ব্যক্তি—খযরজ গোত্রের সর্দার সায়াদ-ইবনে-ওবাদাহ (রাঃ) যিনি বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় নেককার ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় বংশপ্রীতির আবেগ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রথম ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ; খোদার কসম—খযরজ বংশীয় লোককে তুমি হত্যা করিতে পারিবে না, কখনও পারিবে না (অর্থাৎ নবীজীর প্রতি অপরাধী ব্যক্তি খযরজ গোত্রীয় হইলে তাহার শিরচ্ছেদন আমরা খযরজ বংশীয় লোকেরা করিব—তুমি অন্য বংশের

লোক তাহা করিতে পারিবে না।) তোমার গোত্রীয় লোক হইলে কখনও তুমি পছন্দ করিবে না—সে (অন্য গোত্রীয় লোকের হাতে) খুন হউক। এই কথার উত্তরে প্রথম সায়াদের পিতৃব্যপুত্র উসায়েদ দ্বিতীয় সায়াদকে বলিলেন, আপনি ভুল করিতেছেন। কসম খোদার—আমরা নির্দ্বিধায় ঐরূপ ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিব ; (সে যেই গোত্রেরই হউক।) আপনি মোনাফেকদের পক্ষপাত মূলক কথা বলিয়া সেইরূপ গণ্য হইতেছেন! এইভাবে উভয় সায়াদের গোত্রদ্বয় আউস ও খযরজের মধ্যে উত্তেজনা জনিত বিতর্কের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। এমনকি উভয় দলের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছেন ; তিনি সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলে সকলেই নিরব হইয়া গেলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ও (এই গণ্ডগোলের মধ্যে) ক্ষান্ত হইয়া গেলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরবর্ত্তী রাত্রিও আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম ; চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র নাই এবং অশ্রুরও বিরতি নাই। আমার মনে হইতে ছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে।

ইতি মধ্যেই একদা আমার মাতা-পিতা উভয়ই আমার নিকট বসিয়া ছিলেন ; আমি অবিরাম কাঁদিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় মদিনাবাসী এক মহিলা আমার নিকট আসিল ; আমার অবস্থা দৃষ্টে সেও আমার সহিত কাঁদিতে লাগিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঠিক এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের মধ্যে আসিলেন এবং সালামান্তে আমার নিকটে বসিলেন। ঘটনা আরম্ভের পর হইতে ইহার পূর্ব্বে আর কোন দিন তিনি এইরূপে আমার নিকটে বসেন নাই। অথচ ঘটনা আরম্ভ হইয়াছে দীর্ঘ একমাস হইতে ; এ যাবৎ আমার এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি কোন ওহীও আসে নাই।

আজ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকটে বসিয়া কলেমা-শাহাদৎ পাঠ পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এই এই কথা আমার গোচরে আসিয়াছে। যদি তুমি এই সব অপবাদ হইতে পবিত্রা হইয়া থাক তবে অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা প্রমান করিয়া দিবেন। আর যদি তোমার দ্বারা অপরাধ হইয়াই থাকে তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তওবা কর। নিশ্চয় বন্দা অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা করিলে আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করিয়া থাকেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বক্তব্য শেষ করিলে ক্ষেদ ও ক্ষোভে আমার প্রবাহমান অশ্রু একেবারেই শুকাইয়া গেল ; এখন চোখে অশ্রুর বিন্দুও অনুভব হয় না। আমি পিতা আবুবকর (রাঃ)কে বলিলাম,

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনি বলিলেন, খোদার কসম—ইহার কোন উত্তর আমি খুঁজিয়া পাই না। তখন আমি মাতাকেও বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনিও বলিলেন, খোদার কসম—হইার কোন উত্তর আমিও খুঁজিয়া পাই না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি কম বয়স্কা মেয়ে হইয়াও নিজেই উত্তরে বলিলাম—আমি ভালভাবেই জানি, আপনারা এই সব কথা শুনিয়া অন্তরে গাঁথিয়া লইয়াছেন এবং বিশ্বাস করিয়া নিয়াছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিরপরাধা পবিত্রা ; আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি অপরাধের কোন একটু কিছু স্বীকার করি ; অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধা পাক-পবিত্রা তবে আপনারা আমার কথাকে বিশ্বাস করিয়া নিবেন। এমতাবস্থায় আপনাদের মোকাবিলায় আমার জন্য একমাত্র ঐ উক্তিই শ্রেয়ঃ যাহা ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের (ভ্রাতাগণের মিথ্যা উক্তির মোকাবিলায় তাঁহার) পিতা বলিয়াছিলেন—فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

“নিরবে ধৈর্য্য ধারণই আমার জন্য উত্তম ; তোমাদের বক্তব্যের উপর আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই সাহায্য কামনা করি।”

এই কথা বলিয়া আমি অন্য দিকে ফিরিয়া গেলাম এবং বিছানার উপর শুইয়া পড়িলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় জানেন—আমি নিরপরাধ পাক-পবিত্রা, নির্দ্দোষ এবং আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় আমার নিরপরাধ-নির্দ্দোষ হওয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এই ধারণা আমার মোটেও ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এই ব্যাপারে আল্লার কালামের আয়াত অকাট্য ওহী দ্বারা অবতীর্ণ করিবেন যাহা কেয়ামত পর্য্যন্ত মোসলমানদের মধ্যে তেলাওয়াত করা হইবে। আমি নিজকে এত বড় মর্যাদার অপেক্ষা ছোট মনে করিতাম। আমার ধারণা ছিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্বপ্ন দেখিবেন—যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ হওয়া প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার উক্ত আলোচনার বৈঠক হইতে এখনও উঠিয়া দাঁড়ান নাই, গৃহের অন্যান্য উপস্থিত লোকদের কেহই এখনও তথা হইতে সরে নাই—এমতাবস্থায়ই এবং ঐ স্থানেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার উপর ঐ সব অসাধারণ অবস্থা পরিলক্ষিত হইল যাহা ওহী অবতরণকালে হইয়া থাকে—যে, প্রবল শীতের সময়ও মুক্তার দানার ন্যায় তাঁহার ঘাম বহিয়া পড়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, বেশ কিছু সময় পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ অবস্থা কাটিয়া গেল—তখন তিনি হাসিতে ছিলেন। এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কথা এই ছিল, হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর; আল্লাহ তায়ালা তোমার পাক-পবিত্রতা এবং নির্দ্দোষ হওয়া ঘোষনা করিয়া দিয়াছেন।

এই কথা শুনিতেই আমার মা আমাকে বলিয়া উঠিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁহার সমীপে উঠিয়া দাঁড়াও। আমি (দাম্পত্য সুলভ অভিমানের কায়দায়) বলিলাম, আমি তাঁহার জন্য দাঁড়াইব না; আমি আমার এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও কৃতজ্ঞতা আদায় বা প্রশংসা করিব না।

এই ব্যাপারে সুদীর্ঘ দশটি আয়াত আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিয়া দিলেন। যাহার তর্জমা এই—"তোমাদের মধ্য হইতে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি এই অপবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। (মূল ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সে মোনাফেক ছিল—মোসলমান দলভুক্তই ছিল, আর মাত্র তিন জন ছিল যাঁহারা প্রকৃত মোসলমান ছিলেন এবং মোনাফেকের গর্হিত অপবাদকে তাঁহারা সত্য সাব্যস্ত করিয়া উহার আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। মাত্র চার জন লোকের কথায় মনে বেশী ব্যথা নিও না। এই ঘটনা ব্যথার কারণ হইলেও পরিণামের দিক দিয়া) এই ঘটনাকে মন্দ জানিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য ভাল। (ইহাতে ধৈর্য্য ধারণের ছওয়াব লাভ হইবে।) এই অপবাদে যে যতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে ততটুকু গোনাহ তাহার হইবে। আর যে উহার বড় অংশের (তথা উহা গড়াইবার) জন্য দায়ী (তথা মোনাফেক সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) তাহার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি রহিয়াছে। মোসলমান নর-নারীগণ ঐ ঘটনা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল ধারণা পোষণ করতঃ কেন বলিল না যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ? অপবাদকারীরা তাহাদের কথার উপর চার জন সাক্ষী কেন সংগ্রহ করিল না; তাহারা সাক্ষী পেশ করিতে যখন সক্ষম হয় নাই তখন ত তাহারা আল্লার নির্দ্ধারিত আইনেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত। (যে কারণে তাহাদের প্রত্যেককে ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্য যে কতিপয় খাঁটী মোমেন-মোসলমান এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারা ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিয়া আখেরাতের আজাব হইতে রেহায়ী পাওয়ার যোগ্য হইবে—ইহা খাঁটী মোমেন-মোসলমানের প্রতি আল্লার বিশেষ রহমত।) তোমাদের প্রতি যদি ইহপরকালে আল্লার মেহেরবাণী এবং রহমত না থাকিত তবে যেই অপরাধে তোমরা লিপ্ত হইয়া ছিলে উহার দরুন তোমাদের আজাব ভোগ করিতে হইত। (যেমন মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহকে আখেরাতে চিরস্থায়ী ভীষন আজাব ভোগ করিতে হইবে।) তোমরা তখনই আজাবের যোগ্য হইয়া ছিলে যখন ঐ অপবাদকে চর্চ্চা করিতে ছিলে এবং মুখে এমন কথা বলিতে ছিলে যাহার কোন

প্রমাণ তোমাদের নিকট ছিল না। তোমরা উহাকে সামান্য ঘটনা গণ্য করিতে ছিলে, অথচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় ঘটনা। হে মোমেন-মোসলমানগণ! তোমরা যখন এই অপবাদ শুনিতে পাইয়া ছিলে তখন কেন তোমরা এইরূপ বল নাই যে, আমাদের মুখে এই কথা উচ্চারণও করিতে পারিব না—আল্লার পানাহ্; ইহা ত অতি বড় অপবাদ। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে চিরকালের জন্য বিরত থাকিতে আল্লাহ তোমাদেরে উপদেশ দিতেছেন; যদি তোমরা খাঁটী মোমেন হও তবে তোমরা এই উপদেশ গ্রহণ করিবে।

সম্মুখে আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

"(ঘটনার বাস্তব তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর নবী-পত্নীগণের ন্যায়) পাক-পবিত্রা সরল প্রকৃতির খাঁটী ঈমানদার মহিলাদের প্রতি যাহারা অপবাদের কোন কথা বলিবে তাহাদের উপর নিশ্চয় ইহপরকালে আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং তাহাদের ভীষণ আজাব হইবে—যে দিন তাহাদের হাত-পা ও জবান তাহাদের কৃত কর্ম্মের সাক্ষ্য দিবে।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—(প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম—) "খবিস নারীরা খবিস পুরুষদের জন্যই জুটিয়া থাকে এবং খবিস পুরুষদের জন্য খবিস নারীগণ জুটে। আর পাক-পবিত্রা নারীগণ পাক-পবিত্র পুরুষগণের জন্যই হন এবং পাক-পবিত্র পুরুষগণ পাক-পবিত্র নারীদের জন্য হন। (এই নিয়মের দৃষ্টিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্নীগণকে বিচার কর;) তাঁহারা অপবাদকারীদের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্মল। (অপবাদের দরুন তাঁহাদের যে ব্যথা পৌঁছিয়াছে উহার বিনিময়ে) তাঁহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানের প্রতিদান রহিয়াছে।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মেসতাহ' (যিনি এই অপবাদে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন—তিনি) আবুবকরের আত্মীয় ছিলেন এবং দরিদ্র ছিলেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দ্দোষ হওয়ার বয়ান ওহী মারফত অবতীর্ণ করিলে আবুবকর (রাঃ) প্রতিজ্ঞা করিলেন, খোদার কসম—আয়েশার প্রতি এই অপবাদে অংশ নেওয়ার পর মেসতাহের (সাহায্যের) জন্য আমি কখনও আর কিছুই ব্যয় করিব না।

আবুবকরের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিবাদেও কোরআনের আয়াত নাযেল হইল যাহার মর্ম্ম এই—"সামর্থবান লোকদের কখনও উচিৎ নয় নিজ আত্মীয়কে সাহায্য না করার প্রতিজ্ঞায় কসম খাওয়া।"

উক্ত আয়াতের সমাপ্তিতে আল্লাহ তায়ালা একটি হৃদয়গ্রাহী কথা বলিয়াছেন যে—(তোমার আত্মীয় যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে; যেমন 'মেসতাহ' করিয়াছে, তবে তাহার অপরাধের কারণে তাহার প্রতি সাহায্য বন্ধ করিও না; তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং সাহায্য বহাল রাখ। যেরূপ তুমি আল্লার নিকট অপরাধ কর, কিন্তু

আল্লাহ তোমার প্রতি তাঁহার সাহায্য বন্ধ করেন না। সুতরাং তুমি তোমার অপরাধী আত্মীয়ের প্রতিও তোমার সাহায্য বন্ধ করিও না; তাহাকে ক্ষমা করিয়া সাহায্য বহাল রাখ। এই সরল যুক্তিটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রশ্নের সুরে আল্লাহ বলিয়াছেন,) "তোমার কি এই অভিলাস নাই যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল দয়াল।" অথাৎ তোমার যদি এই অভিলাস থাকে যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন এবং সাহায্য বহাল রাখেন তবে তুমিও অপরাধী আত্মীয়কে ক্ষমা করিয়া দিয়া সাহায্য বহাল রাখ—তাহার অপরাধের কারণে সাহায্য বন্ধ করিও না।

উল্লেখিত আয়াতের প্রশ্ন শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়! নিশ্চয়!! কসম খোদার—আমি অভিলাস রাখি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন।" এই উক্তি করিয়া মেসতাহের প্রতি সাহায্য পুনর্বহাল করিলেন এবং (প্রথম কসম ভঙ্গ করিয়া উহার কাফ্ফারা দানে এখন এই) কসম করিলেন যে, তাহার হইতে সাহায্য কখনও বন্ধ করিবেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (আমার এক সতিন—) বিবি যয়নবকে আমার ঘটনার তদন্তরূপে নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জান বা কি দেখিয়াছ? বিবি যয়নব (রাঃ) বলিয়াছিলেন, (মিথ্যা বলিয়া) আমি আমার চক্ষু-কর্ণ ধ্বংস করিতে চাই না; আয়েশা সম্পর্কে আমি শুধুমাত্র ভালই জানি! (আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে বিবি যয়নবই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি (বংশ ইত্যাদির গৌরবে) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা রাখিতেন। কিন্তু প্রবল খোদাভীরুতা তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সংযত থাকিতে। অবশ্য তাঁহার ভগ্নি 'হামনাহ' তাঁহার বিরোধীতা করিয়া ধ্বংসের পথিক দলে যোগ দিয়া ছিল।

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যেই পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া অপবাদ গড়ানো হইয়া ছিল—ছাফ্ওয়ান (রাঃ); তিনি বলিতেন, খোদার কসম—জীবনে কোন দিন কোন বেগানা নারীর কাপড়ে হাত লাগাই নাই। সম্মুখ জীবনে তিনি আল্লার পথে জেহাদে শহীদ হইয়া ছিলেন।

১৮৬০। হাদীছ:—(৫৯৬পৃঃ) মছরুক ইবনে আজদা' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মাতা—উম্মে-রুমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি এবং আয়েশা গৃহে বসিয়া আছি; হঠাৎ একজন মদিনাবাসীণী মহিলা আমাদের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের সর্ব্বনাশ করুন। উম্মে-রুমান তাঁহাকে এই বদদোয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমাদেরই সন্তান (যাহাকে বদদোয়া করিলাম;) সেও ঐ লোকদের মধ্যে যাহারা অপবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বিষয় ? ঐ মহিলা তদুত্তরে অপবাদের সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি এই ঘটনা শুনিয়াছেন ? সে বলিল, হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা আবুবকরও শুনিয়াছেন ? বলিল, হাঁ। তৎক্ষণাৎ আয়েশা (রাঃ) বেহোশ হইয়া পড়িয়া গেলেন ; দীর্ঘ সময় পর হুঁশ ফিরিল বটে, কিন্তু তখন তাঁহার গায়ে ভীষণ তাপে জ্বর আসিয়া গিয়াছে। অতএব আয়েশা (রাঃ)কে তাঁহারই কাপড়ে ভালভাবে জড়াইয়া দিলাম।

এই সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে ? আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ ! তাহার ভীষন জ্বর আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, বোধ হয় ঐ কথার ব্যাপারেই যাহা বলা হইতেছে। মাতা বলিলেন, হাঁ। ....

ব্যাখ্যা—আয়েশা (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম ঘটনার আভাস পাইয়া ছিলেন মেসতাহের মাতার নিকট হইতে যাহার উল্লেখ পূর্বের সুদীর্ঘ হাদীছটিতে হইয়াছে। ঘটনা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর ভীষন প্রতিক্রিয়াও হইয়াছিল, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) প্রথমবারেই পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিয়া ছিলেন কি যে, তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ কথা হইতে পারে ? প্রথমবারে নিশ্চয় এসম্পর্কে তাঁহার সংশয় উদিত হইয়াছে এবং সেই সংশয়ে মন কিছুটা হালকা হওয়ার সূচনায় ছিল। ইতি মধ্যেই আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মদিনাবাসীণী মহিলার বর্ণনায় বিশেষতঃ এই সংবাদে যে, নবীজী (দঃ) এবং পিতা আবুবকরও অপবাদ শুনিয়াছেন—আয়েশা (রাঃ) নিজকে আর সামলাইতে পারিলেন না। বেহুঁস অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং প্রশমিত জ্বর অত্যধিক প্রবল বেগে পুনঃ দেখা দিল।

১৮৬১। হাদীছ ঃ—(৫৯৭ পৃঃ) মছরুক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় তাঁহার নিকট কবি হাস্‌সান (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি কবিতার ভূমিকায় উত্তম নারীর গুণাবলীর উল্লেখে বলিলেন—"স্বভাবে পবিত্রা, চালচলনে গাম্ভীর্য্যা, নাই তাহাতে সন্দেহের অবকাশ, সরলদের প্রতি অপবাদে ভীষণ সঙ্কোচিতা।"

হাস্‌সান (রাঃ) সর্ব্বশেষ বাক্যটি (তথা সরলদের প্রতি অপবাদে ভীষণ সঙ্কোচিতা) উচ্চারণ করিলে আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনি নিজে সেইরূপ নহেন। (আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ন্যায় সরল পবিত্রাত্মার প্রতি অপবাদে অংশ গ্রহণকারী একজন ছিলেন উক্ত কবি হাস্‌সান (রাঃ) ; তাই আয়েশা (রাঃ) তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।)

মছরুক (রঃ) বলেন—আমি আয়েশা (রাঃ)কে বলিলাম, হাস্‌সানকে আপনার নিকট আসিতে দেন কেন ? আল্লাহ তায়ালা ত বলিয়াছেন, "তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি (অপবাদে) বড় অংশ গ্রহণ করিয়া ছিল তাহার বড় আজাব হইবে।" (সেমতে সাধারণ অংশ গ্রহণকারীদের সাধারণ আজাব হইবে।) আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, অন্ধতা অপেক্ষা বড় আজাব বা দুঃখ কি হইতে পারে ? (হাসসান (রাঃ) শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।) আয়েশা (রাঃ) আরও বলিলেন, হাসসান (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কাফেরদের কুউক্তির উত্তর দিয়া থাকিতেন (কাব্যের মাধ্যমে)।

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেররা কাব্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কুৎসা গাহিত ; পদ্য-পাগল আরবদের মধ্যে উহা দ্রুত প্রসার লাভ করিত। ছাহাবী-গণের মধ্যে হাস্‌সান (রাঃ) বিশিষ্ট কবি ছিলেন ; তিনি কাফেরদের গ্লানি-গাথার উত্তর কাব্যের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য নবীজীর অনুমতি চাহিলেন। নবী (দঃ) অনুমতি দিলেন, এমনকি পরে তিনি উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থনও জ্ঞাপন করিলেন এবং দোয়া করিলেন—আয় আল্লাহ ! জিব্রিল ফেরেশতা দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য কর। নবী (দঃ) স্বয়ং হাস্‌সান (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড় করাইতেন ; তিনি কাব্যে নবীজীর পক্ষ হইতে কাফেরদের কুৎসাবাদের উত্তর দিতেন এবং নবীজীর প্রশংসা প্রচার করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي — لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

"আমার পিতা, আমার মাতা, আমার সর্ব্বমান
মোহাম্মদের মান রক্ষায় করিব কোরবান।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)

নবীজীর জন্য হাস্‌সান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই সেবাকে আয়েশা (রাঃ) এত মূল্য দিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাস্‌সানের অপরাধকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসার ইহা একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া।

যোবায়ের (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফুফু-তনয় ভ্রাতা ছিলেন তিনি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নিপতি ছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশতের ঘোষনা প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন।

১৮৬২। হাদীছ ঃ—(৫২৭ পৃঃ) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী ছিল আমার বিশেষ সাহায্যকারী যোবায়ের।

১৮৬৩। হাদীছ ঃ—(৫৬৬ পৃঃ) ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে সিরিয়াস্থ) "ইয়ারমুক" এলাকায় যে জেহাদ হইয়াছিল সেই জেহাদে যোবায়ের (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ অনুরোধ করিলেন, আপনি আক্রমণাভিযান আরম্ভ করিলে আমারাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ চালনায় অগ্রসর হইতে পারিতাম। তিনি বলিলেন, আমি আক্রমণ আরম্ভ করার পরে যদি তোমরা তোমাদের এই কথা না রাখ ? তাঁহারা বলিলেন, সেরূপ আমরা করিব না।

সেমতে যোবায়ের (রাঃ) আক্রমণে এমনভাবে অগ্রসর হইলেন যে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গেলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা ছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে এইভাবে অগ্রসর হওয়ায় কেহই সাহসী হয় নাই। শত্রুদের ভিতর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহারা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ফেলার সুযোগ পাইয়া বসিল। ঐ সময় তাহারা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে তরবারির দুইটি ভীষণ আঘাত করিয়া ছিল। ঐ আঘাতদ্বয়ের মধ্য বরাবর আরও একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল—উহা লাগিয়াছিল বদর জেহাদের রনাঙ্গনে।

ঘটনার বর্ণনাদানকারী যোবায়ের-পুত্র ওরওয়া (রঃ) বলিয়াছেন, ঐ আঘাতগুলি এতই প্রশস্ত ছিল যে, শুষ্ক হওয়ার পরও তাঁহার পৃষ্ঠদেশে উহার যে গর্ত বিদ্যমান ছিল তাহাতে আমারা হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক খেলা করিয়া থাকিতাম।

ঐ যুদ্ধের দিন রনাঙ্গনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবহুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন। তিনি তখন মাত্র দশ বৎসর বয়সের ছিলেন, তাই আক্রমণাভিযানকালে তাঁহাকে একটি ঘোড়ার উপর বসাইয়া অন্য একজনের হাওয়ালা করিয়া গিয়াছিলেন।

যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যে তরবারিটি তিনি ইসলামের জেহাদে ব্যবহার করিতেন বদর-জেহাদে উহার কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঐ তরবারিটি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আবহুল্লার নিকট ছিল। আবহুল্লাহ-ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ঐ একটি তরবারি বিক্রি করা হইলে একজনে উহাকে (বরকতের জন্য) তিন হাজার দেরহামে ক্রয় করিয়া নিল।

যোবায়ের-পৌত্র হেশাম (রঃ) এই আলোচনা উল্লেখের পর অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কোন মূল্যে যদি ঐ তরবারিখানা আমি ক্রয় করিয়া রাখিতাম তবে আমার সৌভাগ্য ছিল।

১৮৬৪। হাদীছ ঃ—(৫৭০ পৃঃ) যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন— বদর রনাঙ্গনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ওবায়দা-ইবনে সায়ীদ আসিল। সে আপাদ-মস্তক

লৌহাবৃত ছিল ; চক্ষুদ্বয় ব্যতীত তাহার শরীরের কোন অংশই উন্মুক্ত ছিল না। তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়াই আমি বর্শা চালাইলাম ; বর্শা তাহার চোখেই বিদ্ধ হইয়া গেল এবং ঐ এক আঘাতেই সে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। বর্ষাটি তাহার চোখ হইতে বাহির করার জন্য তাহার মুণ্ড পদতলে চাপা দিয়া অতি জোরে বর্ষাকে টান দিলাম। বহু কষ্টে উহাকে বাহির করিলাম, এমনকি উহার ফলকের উভয় কোণ বাঁকা হইয়া মোড়িয়া গেল।

(যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কৃতকার্য্যতা তাঁহার জন্য চরম সৌভাগ্য ছিল। এমনকি উহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ) তাঁহার ঐ বর্শাখানা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া নিয়া নিজের নিকট সযত্নে রাখিয়া দিলেন। হযরতের তিরোধানের পর যোবায়ের (রাঃ) উহাকে পুনঃ নিজহস্তে নিয়া গেলেন, কিন্তু খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার হইতে উহা চাহিয়া নিয়া গেলেন। আবুবকরের তিরোধানের পর খলীফা ওমর (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) হইতে উহা চাহিয়া নিলেন। খলীফা ওমরের তিরোধানের পর খলীফা ওসমান (রাঃ) উহাকে চাহিয়া নিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিজনের যত্নে উহা সুরক্ষিত থাকিল। তাঁহাদের নিকট হইতে যোবায়েরের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে নিয়া গেলেন ; তিনি শহীদ হওয়া পর্য্যন্ত উহা তাঁহারই নিকট সযত্নে রক্ষিত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—লক্ষ্য করুন এক একটা বিশেষ নেক কার্য্যের মূল্য নবীজী (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণের নিকট কিরূপ ছিল ? একজন বড় আল্লাহদ্রোহীকে জেহাদে হত্যা করার আমালটা নবীজীর নিকট এতই সমাদৃত ছিল যে, উহার স্মৃতিচিহ্ন তিনি অতি আগ্রহের সহিত সযত্নে রাখিয়া দিলেন। বড় বড় ছাহাবীগণও উহার বরকত লাভে কত আগ্রহের সহিত যত্নবান হইলেন !

সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আম্মা বিবি আমেনার গোত্র "বনু-জোহরা" বংশেরই ছিলেন সায়াদ (রাঃ) ; এই সূত্রে নবী (দঃ) তাঁহাকে মামা বলিতেন।

হাদীছ—একদা সায়াদ (রাঃ) কোথাও হইতে আসিতে ছিলেন, তিনি নিকটে আসিলে নবী (দঃ) বলিলেন, এই দেখ—আমার মামা ; অন্য কেহ এইরূপ মামা উপস্থিত কর ত দেখি ! (তিরমিজি শরীফ)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে বেহেশতের ঘোষনা প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন তিনি।

১৮৬৫। হাদীছঃ- (১০৪ পৃঃ) জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমর কর্তৃক নিয়োজিত কুফার গভর্ণর) সায়াদ (রাঃ) সম্পর্কে কোন কুফাবাসী খলীফা ওমরের নিকট বিভিন্ন অভিযোগ করিল। এমনকি ইহাও বলিল যে, তিনি নামাযও ভালভাবে পড়াইয়া থাকেন না। ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, কোন কোন লোক আপনার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছে। এমনকি তাহারা আপনার নামায সম্পর্কেও অভিযোগ করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি ত তাহাদের নামায পড়াইয়া থাকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের অবিকল রূপে; তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ত্রুটি করি না। (যথা—) আমি নামাযের প্রথম রাকাতদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করি এবং পরবর্ত্তী রাকাতদ্বয় সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের অনুসরণে বিন্দু মাত্রও অবহেলা আমি করি না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য ; আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাও এইরূপই।

অতঃপর ওমর (রাঃ) (তাঁহার শাসনব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী তাঁহার গভর্ণর) সায়াদের সঙ্গে লোক পাঠাইয়া দিলেন ; কুফায় যাইয়া সরেজমিনে অভিযোগের তদন্ত করার জন্য। সেমতে তদন্তকারীগণ কুফার প্রতিটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া জনগণ হইতে মন্তব্য সংগ্রহ করিলেন। সকলেই সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ভাল মন্তব্য এবং তাঁহার প্রশংসা করিল। শুধু মাত্র বনু-আব্স গোত্রীয় মসজিদে উসামা-ইবনে-কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তদন্তকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনারা যখন আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তখন আমাদের বলিতেই হয়। সায়াদ জেহাদ-অভিযানে সৈন্যবাহিনীর সহিত যায় না। (গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামাল) সঠিকরূপে বণ্টন করে না। বিচারে ন্যায়ের পথে চলে না। (ঐ ব্যক্তি সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে তিনটি মিথ্যা অভিযোগ করিল।)

সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, কসম খোদার—আমিও আল্লার দরবারে তিনটি আবেদনই করিব। আয় আল্লাহ ! তোমার এই বন্দা যদি মিথ্যা বলিয়া থাকে এবং নিজের প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্যে ইহা করিয়া থাকে তবে—(১) তাহার বয়স বাড়াইয়া দিও (২) দারিদ্র বেশী করিয়া দিও (৩) এবং তাহাকে লাঞ্ছনার কাজে লিপ্ত করিও।

জাবের (রাঃ) হইতে মূল ঘটনা বর্ণনাকারী তাবেয়ী আবদুল মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, আমি নিজে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি—তাহার বয়স এত অধিক হইয়াছিল যে, উভয় চোখের ভ্রূস্থানের চামড়া চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দারিদ্রের দরুন পথে পথে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায় এবং এই অবস্থায়ও সে যুবতি মেয়েদের গায়ে হাত দেয়, তাহাদের সহিত উত্ত্যক্তজনক আচরণ করিয়া বেড়ায় (যদ্দরুন সে ভীষণ লাঞ্ছনা-

গঞ্জনা ভোগ করে)। কেহ তাহাকে এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজেই বলিত, বৃদ্ধ বয়সে স্বভাব নষ্ট হইয়াছে; সায়াদের বদদোয়া আমার উপর লাগিয়াগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত খলীফা ওমর(রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্ণরী হইতে অব্যাহতি দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—খলীফা ওমরের নীতি তাঁহার গভর্ণরগণের প্রতি অতিশয় কঠোর ছিল। তাঁহার গভর্ণরগণের প্রতি অভিযোগ আসিলে তিনি ভাবিতেন—দেশের সকল লোকের সন্তুষ্টি এই গভর্ণরের প্রতি নাই, অতএব এই গভর্ণর দ্বারা দেশবাসী সকলের শান্তি হইবে না এবং বিরোধ সৃষ্টি হইয়া যাওয়ার কারণে তাঁহার দ্বারা তাহাদের শংসোধনও সম্ভব হইবে না; সুতরাং এই দেশে অন্য গভর্ণরের প্রয়োজন। এই নীতির অনুসরণেই খলীফা ওমর (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ওমর (রাঃ) তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি সায়াদ (রাঃ)কে তাঁহার পরে খলীফাতুল-মোসলেমীন হওয়ার যোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, পরবর্ত্তী খলীফাকে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের তাকিদ করিয়াছেন এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, কোন প্রকার খেয়ানত বা দুর্নীতির দরুণ আমি সায়াদকে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারণ করিয়াছিলাম না (১৮৩৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

● অভিযোগকারী সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ছিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী—এমন সাহাবী যিনি নবী (দঃ) কর্তৃক বেহেশতের সনদ প্রদত্ত দশ জনের একজন ছিলেন; তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা-মন্দ গড়াইয়া বস্তুতঃ সে নবীজীর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছিল। তাই সায়াদ (রাঃ) ভীষণ ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি বদদোয়া করিয়াছিলেন এবং তাহার বদদোয়া অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছিল। সায়াদ (রাঃ) "মোস্তাজাবুদ-দাওয়াত" ছিলেন; তাঁহার দোয়া বিশেষরূপে আল্লার দরবারে গৃহিত হইত। এই বিষয়ে নবী (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন।

হাদীছ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বলিয়া দোয়া করিয়াছেন—"হে আল্লাহ! সায়াদ যখনই দোয়া করে তুমি তাহার দোয়া গ্রহণ করিও। (তিরমিজি শরীফ)

১৮৬৬। হাদীছ ঃ—(৫২৭ পৃঃ) সায়াদ (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের একজন। সাত দিন পর্য্যন্ত আমি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ ছিলাম। (অর্থাৎ তখন আমার জানা মতে মোসলমানের সংখ্যা মাত্র তিনজন ছিল।) আল্লার পথে তথা ইসলামের জেহাদে সর্ব্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী আমি। (ইসলামের জন্য আমার এত ত্যাগ যে,) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছি এমন অবস্থায় যে, আমাদের খাদ্য শুধু গাছের পাতা ছিল, উহা খাইয়া আমাদের মল উট ও ছাগলের মলের ন্যায় হইত—ছিন্ন ছিন্ন।

এত দিনের এবং এত কষ্টের ইসলাম আমার! এখন আসাদ গোত্রের লোক ইসলাম সম্পর্কে আমাকে মন্দ বলে! তাহাদের অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে আমার জীবনই ব্যর্থ গেল এবং সকল দুঃখ কষ্ট নিষ্ফল হইল।

সায়াদ (রাঃ) ব্যথিত হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন, কারণ আসাদ গোত্রের লোক খলীফা ওমরের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল—তাহারা বলিয়াছিল, তিনি ভালভাবে নামাযও পড়িতে পারেন না।

আনছারদের ফজিলত

১৮৬৭। হাদীছঃ—গায়লান ইবনে জরীর (রঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত "আনছার" উপাধিটা আপনারা নিজে অবলম্বন করিয়াছিলেন, না—আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, আমরা নিজেরা অবলম্বন করি নাই, বরং আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ-

ব্যাখ্যা—ইহা একটি অতি বড় সৌভাগ্যের কথা যে, মদিনাবাসী ছাহাবীগণকে দ্বীনের খেদমত ও সাহায্যের দরুণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে তাঁহাদিগকে "আনছার" তথা সাহায্যকারী জামাত নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮৬৮। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যিনি দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গল বিতরণকারী অর্থাৎ হযরত নবী (দঃ) তিনি বলিয়াছেন, লোকগণ যদি এক পথে চলে এবং আনছার ভিন্ন পথে চলে তবে আমি অবশ্যই আনছারদের পথ অবলম্বন করিব। আমি যদি হিজরতকারী না হইতাম তবে অবশ্যই আমি নিজকে আনছারদের দলভুক্ত রাখিতাম।

১৮৬৯। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আনছারদের প্রতি মহব্বৎ হওয়া মোমেনের নিদর্শন এবং আনছারদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা মোনাফেকের নিদর্শন।

যে ব্যক্তি আনছারগণকে মহব্বৎ করিবে আল্লাহ তাহাকে মহব্বৎ করিবেন। যে ব্যক্তি আনছারদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন।

১৮৭০। হাদীছঃ–আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পথের মধ্যে দুর হইতে দেখিতে পাইলেন, আনছারদের

স্ত্রী-পুত্র ও ছেলে-মেয়েগণ কোন এক বিবাহের দাওয়াত হইতে আসিতেছে। হযরত (দঃ) তাহাদের অপেক্ষায় মধ্য পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলিতেছি, নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট সর্ব্বাধিক ভালবাসার লোক—তিনবার এই কথা বলিলেন।

১৮৭১। **হাদীছ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়ছেন, একদা একটি আনছারী রমণী তাহার ছোট শিশুকে কোলে করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহার প্রয়োজনীয় কথা তাহাকে বলিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) আনছার মহিলাকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিলেন যে, নিশ্চয় তোমরা আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় লোক—দুইবার এই উক্তি করিলেন।

১৮৭২। **হাদীছ ঃ**— (৭২৮ পৃঃ) যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছেন—"হে আল্লাহ! আনছারগণকে ক্ষমা কর এবং আনছারদের ছেলে-মেয়েদেরকেও এবং আনছারদের পৌত্র-পৌত্রীগণকেও ক্ষমা কর।

সায়া'দ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)

১৮৭৩। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে এক জোড়া রেশমের কাপড় উপঢৌকন রূপে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। উহা এত মোলায়েম ছিল যে, ছাহাবাগণ উহা স্পর্শ করিয়া উহার অতিশয় কোমলতায় আশ্চার্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তখন হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহা দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? সায়া'দ ইবনে মোয়াজের জন্য বেহেশতের মধ্যে (হাত, মুখ, নাক ছাফ করার) যে রুমাল হইবে তাহাও ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী মোলায়েম ও কোমল হইবে।

১৮৭৪। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সায়া'দ ইবনে মোয়াজের মৃত্যু-শোকে আরশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)

১৮৭৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, দুইজন ছাহাবী একদা অন্ধকার রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ একটি আলো তাঁহাদের সম্মুখে সম্মুখে চলিতে লাগিল, এমনকি তাঁহারা উভয়ে যখন পৃথক পৃথক পথ ধরিলেন তখন আলোটিও বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে চলিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ)।

উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ)

১৮৭৬। ছাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উবাই-ইবনে কায়া'বকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "লাম্-ইয়াকুনিল্-লাজীনা" ছুরা তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য। উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। তখন উবাই (রাঃ) (আল্লার নিকট স্মরণীয় হওয়ার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে) কাঁদিয়া উঠিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)

১৮৭৭। ছাদীছ ঃ— সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি—তাঁহার ইহজগতে জীবিত থাকাবস্থায়ই নবী (দঃ) তাঁহাকে বেহেশতী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮৭৮। ছাদীছ ঃ— কায়স্ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদিনার মসজিদে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিলেন—তাঁহার চেহারার মধ্যে নম্রতা ও খোদা-ভীরুতা প্রকাশ পাইতে ছিল। উপস্থিত লোকজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই লোকটি বেহেশতী। তিনি মসজিদে আসিয়া সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে রওয়ানা দিলেন, তখন আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি মসজিদে প্রবেশ করিলে পর লোকজন বলিয়া উঠিল যে, এই লোকটি বেহেশতী।

তিনি বলিলেন, অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ উক্তি না করাই ভাল, অবশ্য আমি তোমাকে ইহার মূল সূত্র বলিতেছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম এবং উহা আমি হযরতের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি দেখিলাম—আমি যেন একটি অতি বড় মনোরম বাগানে আছি, বাগানের মধ্যস্থলে একটি খুঁটি জমিনে পোতা ছিল, খুঁটিটির শির অনেক ঊর্দ্ধে ছিল এবং উহার সঙ্গে একটি কড়া বা আংটা ছিল। এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, তুমি খুঁটিটির উপর দিকে আরোহণ কর। আমি বলিলাম, আমার জন্য অসাধ্য; তখন একজন সাহায্যকারী আসিয়া আমাকে আরোহণে সাহায্য করিল, ফলে আমি খুঁটিটির শির ভাগে পৌঁছিয়া গেলাম এবং আংটাটি ধরিয়া ফেলিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, খুব মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও; সেই ধরা অবস্থায়ই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নটি হযরত নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি উহার ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিলেন, বাগানটি হইল "দ্বীন-ইসলাম" এবং খুঁটিটি হইল ইসলামের মূল "ঈমান" এবং কড়াটি হইল (পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত) "ওর্‌ওয়া-ওছক্ক।"—ঈমানের শক্ত আংটা। সামগ্রিক স্বপ্নটির ব্যাখ্যা হইল এই যে, তুমি খাঁটী ভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর আছ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উহার উপর মজবুত থাকিবে। এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)।

ব্যাখ্যা—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে তাঁহার স্বপ্ন দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, তুমি সারা জীবন খাঁটী ভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর মজবুত থাকিবে; এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির বেহেশত লাভ সুনিশ্চিত; এই সূত্রেই লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)কে বেহেশতী বলিত।

ঈমান হইল দ্বীন-ইসলামের মধ্যস্থলীয় খুঁটি যাহার উপর দ্বীন-ইসলামের তাবুটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িলে মূল তাবুই ভাঙ্গিয়া পড়িবে যদিও উহার পার্শ্বস্থ খুঁটি বিদ্যমান থাকে। মধ্যস্থ খুঁটি ব্যতিরেকে পার্শ্বস্থ খুঁটি মূল্যহীন। ঈমানের মজবুত আংটা বা কড়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অতি সংক্ষেপে সুন্দর ব্যাখ্যা উল্লেখ রহিয়াছে—

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আল্লাহতে সর্ব্বস্ব বিলীন ও উৎসর্গ করিবে সে-ই হইবে ঈমানের শক্ত কড়াকে মজবুতরূপে ধারণকারী।"

আনাছ-ইবনে-নজর (রাঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দীর্ঘ দশ বৎসরের খাদেম প্রসিদ্ধ আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চাচা আনাছ ইবনে নজর (রাঃ)। ওহোদের জেহাদে তিনি অতি মর্ম্মান্তিকরূপে শহীদ হইয়াছিলেন; তীর বর্শার প্রায় নব্বইটি আঘাত তাঁহার লাগিয়াছিল; তাঁহার পরিচয় উপলব্ধি সম্ভব হইতে ছিল না। একটি আঙ্গুলের চিহ্ন দ্বারা তাঁহার ভগ্নি তাঁহাকে সেনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমুদয় আঘাত তাঁহার সম্মুখদিকে ছিল, পেছনদিকে কোন আঘাত ছিল না। রণাঙ্গনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর হওয়াকালে তিনি বলিতে ছিলেন, ওহোদ প্রান্ত হইতে বেহেশতের সুগন্ধী আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিতেছে। তিনি শহীদ হওয়ার পর তাঁহার আত্মত্যাগের ইঙ্গিত দানে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে—"মোমেনগণের মধ্যে এমনও লোক আছেন যাঁহারা আল্লার নিকট প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়াছেন।"

১৮৭৯। হাদীছঃ (৩৭২ পৃঃ) আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মহিলা ছাহাবী রুবায়্যে (রাঃ) কোন একটি মেয়ের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলায় অভিযুক্তা হইলেন। মেয়েটির অভিভাবকগণ কেছাছ বা প্রতিশোধের দাবী করিল এবং তাঁহার পক্ষ অর্থ-বিনিময় দানের প্রস্তাব করিল। কিন্তু মেয়ের পক্ষ অর্থ-বিনিময় গ্রহণ অস্বীকার করিল; তাহাদের দাবী কেছাছ তথা প্রতিশোধ গ্রহণ। উভয় পক্ষ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজ নিজ বক্তব্য লইয়া উপস্থিত হইল।

এরূপ ক্ষেত্রে বাদী পক্ষ অর্থ-বিনিময় গ্রহণে সম্মত না হইলে অভিযুক্ত প্রতিশোধ দানে বাধ্য। তাই নবী (দঃ) সেই আদেশই করিলেন। অভিযুক্তা মহিলার ভ্রাতা ছিলেন আনাছ ইবনে নজর (রাঃ); তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রুবায়্যের দাঁত ভাঙ্গা হইবে? ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদার কসম—তাহার দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোরআনের আইন ত দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ভাঙ্গিবার প্রতিশোধই ঘোষনা করে।

(কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় বন্দা আনাছের কথাই রক্ষা করিলেন; রুবায়্যের দাঁত ভাঙ্গিতে হইল না।) বাদী পক্ষ প্রতিশোধ ক্ষমা করিয়া অর্থ বিনিময় গ্রহণে সম্মত হইয়া গেল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আল্লার বন্দাগণের মধ্যে এমন এমন ব্যক্তিও আছে যাহারা আল্লার উপর ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ তায়ালা সেই কথাকে বাস্তবায়িত করিয়া থাকেন তাহার কসম ভঙ্গ হইতে দেন না।

যায়েদ-ইবনে-আম্‌র-ইবনে-নোফায়েল

এই লোকটি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে ছিল এবং হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার ইন্তেকালও হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় হযরতের নবুয়ত এবং দ্বীন-ইসলাম ধরা পৃষ্ঠে আসিয়াছিল না, তাই তিনি ইসলামের ছায়া লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের তালাশে তিনি আজীবন চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তৌহীদ তথা একত্ববাদ যাহাকে তৎকালে দ্বীনে-হানীফ বা শেরেক বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম এবং মিল্লাতে-ইব্রাহীম বা ইব্রাহীমের আদর্শ বলা হইত যথাসাধ্য সেই আদর্শের উপর থাকিয়া জীবন কাটাইয়া ছিলেন; যাহার বিবরণ সম্বলিত ঘটনাই এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদা মক্কার নিকটবর্ত্তী "বালদাহ্" নামক স্থানে যায়েদ-ইবনে-আম্‌রের সঙ্গে

কোন এক (দাওয়াতের মজলিসে) মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে গোশত জাতীয় খাদ্য পরিবেশন করা হইল। (যেহেতু খাদ্যের ব্যবস্থাকারীগণ কাফের মোশরেক ছিল যাহারা সাধারণতঃ দেব-দেবীর নামে পশু জবেহ করিয়া থাকিত, তাই) নবী (দঃ) ঐ খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর উহা যায়েদ-ইবনে-আমরের সম্মুখে পেশ করা হইল। তিনিও উহা গ্রহণ করিলেন না; তিনি পরিষ্কার বলিলেন, দেব-দেবীর নামে জবেহ্‌কৃত আমি খাই না, আমি একমাত্র আল্লার নামে জবেহকৃতই খাইয়া থাকি।

যায়েদ-ইবনে-আমর সর্ব্বদা কোরায়েশগণকে এই বলিয়া তিরস্কার কয়িয়া থাকিতেন যে, (পশু—যথা) বকরিকে সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উহার খাদ্যও তিনিই জোটাইতেছেন, আর তোমরা সেই বকরিটাকে জবেহ করিতেছ আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামের উপর! ইহা কত বড় জঘণ্য কাজ!

যায়েদ-ইবনে-আমর স্বীয় দেশ মক্কা ত্যাগ করতঃ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন সত্য ধর্ম্মের তালাশে। তথায় এক ইহুদী আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন এবং তাহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী আলেম সাহেব বলিলেন, বর্ত্তমানে আমাদের দ্বীন ও ধর্ম্ম এমন সব জিনিষের সমবায় যে, উহা গ্রহণ করিলে আল্লার গজব অবশ্যই বহন করিতে হইবে। যায়েদ-ইবনে-আম্‌র বলিলেন, আমার শক্তি থাকিতে আমি আল্লার গজব বহনে প্রস্তুত নহি; আমি ত আল্লার গজব হইতে পরিত্রাণেরই চেষ্টা করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের পরামর্শ দান করুন। তিনি বলিলেন, দ্বীনে-হানীফ অবলম্বন কর। দ্বীনে-হানীফ কি তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন! ইহুদী আলেম বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের আদর্শ—তিনি এক আল্লার উপাসক ছিলেন, তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাছরাণীও ছিলেন না। অতঃপর তিনি একজন নাছরাণী আলেমের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গেও ঐরূপ আলাপ করিলেন। নাছরাণী আলেম বলিলেন, বর্ত্তমান নাছরাণী দ্বীন অবলম্বন করিলে অবশ্যই আল্লার অভিসাপ বহন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আমার শক্তি থাকিতে আমি আল্লার অভিসপ্ত হইতে প্রস্তুত নহি—উহা হইতেই আমি বাঁচিতে চাই, অতএব আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের খোঁজ দান করুন। ঐ আলেমও তাঁহাকে দ্বীনে-হানীফ বা হযরত ইব্রাহীমের একত্ববাদের আদর্শের কথা বলিলেন। এইসব শুনিয়া যায়েদ ইবনে-আমর সিরিয়া হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং আল্লার দরবারে হাত উঠাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি ইব্রাহীমের আদর্শকেই অবলম্বন করিলাম। অতঃপর তিনি মক্কায় আসিয়া বাইতুল্লাহ শরীফের সঙ্গে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের মিথ্যা দাবীদার কোরায়েশগণকে ডাকিয়া বলিতেন, তোমরা কখনও হযরত ইব্রাহীমের আদর্শবাদী

নও ; (কারণ, তোমরা হইলে মোশরেক, আর) ইব্রাহীমের আদর্শ ছিল খাঁটী তৌহীদ বা একত্ববাদ। যায়েদ-ইবনে-আমর কাফেরদের আরও অনেক কুকৃতির সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন, যেমন—তাহাদের কেহ তাহার মেয়ে সন্তানকে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া মারিতে চাহিলে তিনি ঐ মেয়েকে উদ্ধার করিয়া নিয়া আসিতেন এবং তাহাকে লালন পালন করিতেন। অতঃপর সে বয়স্কা হইলে মেয়ের পিতাকে যাইয়া বলিতেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার মেয়ে নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার ব্যয় ভার বহন করিয়া যাইব !

ব্যাখ্যা—যায়েদ-ইবনে-আমর ইসলামের যুগ পাইয়াছিলেন না, তাই তিনি সর্ব্বাঙ্গীন মোসলমান হইতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু তিনি অন্ধকার যুগের একেশ্বরবাদী ছিলেন, সুতরাং তিনি নাজাত পাইবেন এবং বেহেশত লাভ করিবেন।

আমের ইবনে রবিয়া'হ (রাঃ) নামক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলামের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে) যায়েদ-ইবনে-আমর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি আমার জাতির ধর্ম্মের বিরোধী, আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের আদর্শপন্থী, তাঁহারা যেই মা'বুদের বন্দেগী করিতেন আমি একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করি এবং আমি ইসমাঈলের বংশীয় ভাবী নবীর অপেক্ষায় আছি। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব কাল আমি পাইব বলিয়া আশা নাই ; অবশ্য আমি তাঁহার প্রতি ঈমান রাখি, তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করি এবং সাক্ষ্য দেই যে, তিনি পয়গাম্বর। হে আমের ! তুমি যদি সেই নবীর সঙ্গ লাভ করিতে পার তবে তাঁহাকে আমার সালাম জানাইও।

আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলামের ছায়া লাভ করিয়া হযরত নবী (দঃ)কে যায়েদ ইবনে আমরের ঘটনা শুনাইলাম। হযরত (দঃ) তাঁহার সালামের উত্তর দান করিলেন, তাঁহার জন্য রহমতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে মান-গরীমার সহিত চলাফেরা করিতে দেখিয়াছি।

যায়েদ ইবনে আমর-এর পুত্র সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) একজন অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। "আ'শারা-মোবাশ্‌শারাহ্" তথা যে দশ জন ছাহাবী সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশতী হওয়ার ঘোষণা জারী করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার একজন ছিলেন এবং তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁহারই ইসলাম সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) স্বয়ং তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন (৫৪৫ পৃঃ)—

والله لقد رأيتنى وان عمر لموثقى على الاسلام قبل ان يسلم عمر

"ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে হাত-পা বাঁধিয়া প্রহার করিয়াছিলেন।"

সালমান ফারেসী (রাঃ)

হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে অতি প্রাচীনতম মানুষ ছিলেন তিনি। হযরতের ইহজগত ত্যাগের পঁচিশ বৎসর পর তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২৫০ বৎসর ছিল, কাহারও মতে ৩৫০ বৎসর ছিল। তিনি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান এলাকাভুক্ত রামহরমুজ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অগ্নিপূজক বংশের লোক ছিলেন। সত্য ধর্ম্মের তালাশে দেশ-খেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সর্ব্বশেষ নবীর আবির্ভাব কাল ও স্থানের খোজ তিনি পাইয়াছিলেন, তাই মদিনার উদ্দেশ্যে তিনি ছফর করিতেছিলেন। বিদেশী নিঃসম্বল পাইয়া তাঁহাকে দুষ্কৃতিকারীগণ ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছিল, এমনকি তিনি ক্রীতদাসরূপে দশ জনের অধিক মনীবের হস্ত-বদল হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্য এইরূপে হয় যে, তিনি এক মদিনাবাসী ইহুদীর হস্তে বিক্রিত হইয়া মদিনায় পৌঁছিতে সক্ষম হন।

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার ইতিহাস তাঁহার মুখেই বর্ণনা করিয়াছেন—

إِنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ

"(দশের অধিক—তের বা ততোধিক) মনীবের হস্ত-বদল হইয়াছিলেন তিনি।"

মোছনাদে-আহমদ ও শামায়েল-তিরমিজী কেতাবে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে। স্বয়ং সালমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি পারস্যের ইস্পাহান অধিবাসী। আমার পিতা তথাকার বড় জমিদার বা রাজা ছিলেন। আমি তাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলাম। অতিশয় আদর মমতার দরুন তিনি আমাকে নিজ গৃহে আবদ্ধরূপে রাখিয়াছিলেন, কোথাও বাহিরে যাইতে দিতেন না, আমি পূজার অগ্নি রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলাম। আমার পিতার বিশাল খামার ছিল, একদা তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ আমাকে তাঁহার খামার দেখিবার জন্য পাঠাইলেন! পথিমধ্যে আমি নাছরাণীদের একটি উপাসনালয় গির্জ্জা হইতে কিছু পাঠ করার শব্দ শুনিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলাম এবং দেখিলাম, কতিপয় নাছরাণী তথায় নামায পড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও বাহিরে আসিবার এবং লোকদেরে দেখার স্থযোগই পাইয়া ছিলাম না। তাহাদের নামায পড়া আমার নিকট খুবই ভাল লাগিল, তাই আমি আমার পিতার আদেশ ভুলিয়া গিয়া তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবদ্ধ রহিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ধর্ম্মের প্রসার কোন

দেশে ? তাহারা বলিল, সিরিয়ায়। অতঃপর আমি বাড়ী ফিরিলাম, এদিকে আমার পিতা আমার খোঁজে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ী পৌঁছিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, খামারে না যাইয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে ? আমি তাঁহাকে গির্জ্জায় উপস্থিত হওয়ার ঘটনা শুনাইলাম এবং বলিলাম যে, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমার অতিশয় পছন্দ হইয়াছে তাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায়ই কাটাইয়াছি। তিনি বলিলেন, হে বৎস! ঐ ধর্ম্মের কোন সার নাই, তোমার বাপ-দাদার ধর্ম্মই উত্তম। আমি বলিলাম, না—ঐ ধর্ম্মই উত্তম। এতদ্দৃষ্টে আমার পিতা আমার প্রতি শঙ্কিত হইয়া আমার পায়ে শিকল লাগাইয়া দিলেন। আমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি গির্জ্জার লোকদিগকে সংবাদ পাঠাইলাম যে, সিরিয়ায় যাত্রী কোন কাফেলার খোঁজ পাইলে আমাকে অবহিত করিবে। কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা আমাকে সেই খোঁজ দান করিল। যে দিন কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইবে সেই দিন আমি পায়ের শিকল খুলিয়া ফেলিয়া কাফেলার সঙ্গে পলায়ন করিলাম এবং সিরিয়ায় পৌঁছিয়া গেলাম। তথায় আমি এক প্রধান পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণের এবং তাহার খেদমতে থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার আগ্রহ জানাইলাম, সে আমাকে তাহার নিকটে রাখিল। সে অত্যন্ত জঘণ্য মানুষ ছিল—লোকদিগকে দান-খয়রাতের ওয়াজ শুনাইত। লোকজন তাহার নিকট দান-খয়রাত আনিয়া দিলে সে তাহা গরীব-মিছকীনগণকে দিত না, নিজেই সব আত্মসাৎ করিত। এইভাবে সে সাত মটকি স্বর্ণ-রৌপ্য ভর্ত্তি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। লোকজন তাহাকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করিল। আমি তাহাদিগকে তাহার অপকর্ম্ম অবহিত করিলাম এবং লুক্কায়িত স্বর্ণ-রৌপ্য দেখাইয়া দিলাম। তাহারা তাহার দুষ্কার্য্যে ক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার লাশ শূলি কাষ্ঠে লটকাইয়া প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিল। অতঃপর তাহার স্থলে অন্য একজন পাদ্রী নিয়োগ করা হইল। তিনি ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, দুনিয়ার লিপ্সাহীন, আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁহার সহিত আমার অতিশয় ভালবাসা জন্মিল। তাঁহার যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে কি আদেশ করেন ? আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব ? তিনি বলিলেন, বর্ত্তমানে খাঁটী ধর্ম্ম কোথাও নাই, সকলেই ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইরাকের "মাওসেল" এলাকায় একজন খাঁটী খৃষ্ট ধর্ম্মীয় পাদ্রী আছেন, তুমি তাঁহার নিকট চলিয়া যাইও। সেমতে আমি তথায় চলিয়া গেলাম এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইয়া আমি তাঁহার নিকটে থাকিলাম, বাস্তবিকই তিনিও ঐরূপ উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু উপস্থিত হইল। তাঁহাকে আমি ঐরূপ বলিলাম, তিনিও উক্ত

পাদ্রীর ন্যায় মন্তব্য করিলেন এবং আমাকে ইরাকেরই "নছীবীন" এলাকার এক পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদ্রীর নিকট থাকিলাম, তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি আমাকে "আমুরিয়া" নামক স্থানের পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদ্রীর নিকট থাকিলাম এবং তথায় আমি সঞ্চয়ের দ্বারা কিছু পশুপাল সংগ্রহ করিলাম। তাঁহার মৃত্যু উপস্থিতিতে তাঁহাকে অন্য কাহারও খোঁজ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার নিকট খাঁটী একটি প্রাণীরও খোঁজ নাই, যাহার নিকট আশ্রয় লওয়ার পরামর্শ আমি তোমাকে দান করিব। অবশ্য এক নূতন নবীর আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে, যিনি হযরত ইব্রাহীমের খাঁটী একেশ্বরবাদী আদর্শ নিয়া আসিবেন, আরবে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় জমি আর মধ্যস্থলে খেজুর বাগানের আধিক্য—এইরূপ একটি এলাকায় হিজরত করিয়া তথায় বসবাস করিবেন। সেই নবীর নিদর্শন এই হইবে যে, তিনি হাদিয়া বা উপঢৌকন স্বরূপ খাদ্য সামগ্রী দিলে তাহা খাইবেন, কিন্তু ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাইবেন না এবং তাঁহার স্কন্ধে "মোহরে-নবুয়ত" থাকিবে। যদি তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তুমি সেই দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করিও।

তাঁহার মৃত্যুর পর আমি কিছু দিন তথায় অবস্থান করিলাম ; অতঃপর আরবের একদল বণিকের সাক্ষাৎ হইল, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যদি আমাকে তোমাদের দেশে নিয়া যাও তবে আমি তোমাদিগকে আমার পশুপাল সব দিয়া ফেলিব। তাহারা রাজি হইল এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা "ওয়াদিল-কোরা" নামক স্থানে পৌঁছিয়া অন্যায় ভাবে আমাকে ক্রীতদাস-রূপে এক ইহুদীর নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি একজন হইতে অপরজনের নিকট বিক্রি হইতে লাগিলাম। এমনকি তের বা ততধিক মনিবের হাত-বদল হইলাম।

অবশেষে আমি এক মদিনাবাসী ইহুদীর নিকট বিক্রিত হইয়া মদিনায় পৌঁছিলাম। মদিনার এলাকা দেখিয়া আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, ইহাই ঐ স্থান যাহার কথা আমাকে পাদ্রী বলিয়াছিলেন। তখনও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে মদিনায় আসেন নাই। আমি অতি যত্নের সহিত তাঁহার প্রতিক্ষায় ব্যাকুল থাকিলাম। একদা আমি আমার মনিবের উপস্থিতিতে খেজুর গাছের উপরে কাজ করিতে ছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া আমার মনিবকে সংবাদ দিল যে, কোবা মহল্লায় মক্কা হইতে একজন লোক আসিয়াছে সে নবী বলিয়া দাবী করে। বৃক্ষের উপর হইতে আমি এই কথা শুনিতে পাইলাম এবং আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, এমনকি বৃক্ষ

হইতে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কোন প্রকারে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া মনিবকে সংবাদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মুষ্ঠাঘাত করিয়া বলিল, তুই তোর কাজে থাক, এই সংবাদের তোর আবশ্যক কি ?

আমি ত শুনিয়াই ফেলিয়াছি যে, নবী বলিয়া পরিচয় দানকারী এক ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাই বিকাল বেলা আমি কিছু খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া কোবা মহল্লায় উপস্থিত হইলাম এবং উহা হযরতের সম্মুখে পেশ করিলাম। হযরত (দঃ) উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি বলিলাম, ইহা ছদকাহ্ বা দান। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) উহা সঙ্গীগণকে দিয়া দিলেন, নিজে উহা খাইলেন না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, একটি নিদর্শন ঠিক হইল যে, তিনি ছদকাহ-খয়রাত নিজে ব্যবহার করেন না। আর একদিন আমি কিছু খাদ্য সামগ্রী তাঁহার নিকট পেশ করিয়া বলিলাম, আপনি ছদকাহ-খয়রাত ব্যবহার করেন না দেখিয়া অদ্য আমি ইহা আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিতেছি। হযরত (দঃ) নিজে সঙ্গীগণ সহ উহা খাইলেন। আমি ভাবিলাম দুইটি নিদর্শন ঠিক হইল। অতঃপর একদিন তিনি বসিয়াছিলেন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার পিছন দিকে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কাঁধের কাপড় হটাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার মোহরে-নবুয়ত দেখিলাম এবং শ্রদ্ধার সহিত চুম্বন করতঃ কাঁদিয়া উঠিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে সম্মুখে আনিলেন, আমি তাঁহাকে আমার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী শুনাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

ক্রীতদাসরূপে ইহুদীর হস্তে আবদ্ধ থাকায় স্বাধীনতার সহিত হযরতের সাহচর্য্যতা লাভ করা সম্ভব হইতে ছিল না, এমনকি বদর এবং ওহোদ জেহাদেও আমি শরীক হইতে পারি নাই। তাই হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি 'মোকাতব' তথা বিনিময় আদায়ের শর্তে মুক্তি লাভের চুক্তি করিয়া নেও। সেমতে আমি আমার মনিবের সঙ্গে আলাপ করিলে সে আমার মুক্তির জন্য দুইটি শর্ত্ত আরোপ করিল—(১) তিন বা পাঁচ শত খেজুর গাছের চারা সঞ্চয় করতঃ উহা রোপণ করিয়া ঐসব গাছে ফল আসা পর্য্যন্ত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। (২) চল্লিশ "উকিয়া" তথা ৬ সেরের অধিক পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিতে হইবে—এই দুই শর্ত্ত পূর্ণ করিলে পর আমি মুক্তি লাভ করিব বলিয়া চুক্তি হইল। হযরত (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, খেজুরের চারা প্রদান করিয়া তোমরা সকলে সালমানকে সাহায্য কর। সেমতে পাঁচটা দশটা করিয়া কতেক জনে খেজুরের চারা আমাকে প্রদান করিলেন, তিন বা পাঁচ শত খেজুর চারা জমা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, গাছ রোপণ করার গর্ত্ত তৈরী কর। অতঃপর হযরত (দঃ) তথায় আসিয়া নিজ হস্তে গাছগুলি রোপণ

করিলেন ; শুধু একটি গাছ ওমর(রাঃ) রোপণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরত এক বৎসরেই ঐ গাছগুলিতে ফল ধরিল। অবশ্য যেই গাছটি ওমর (রাঃ) রোপণ করিয়া ছিলেন উহাতে এক বৎসরে ফল না ধরায় হযরত (দঃ) উহাকে উঠাইয়া পুনঃ রোপণ করিলে পর ঐ বৎসরই উহাতে ফল আসিয়া গেল—এইভাবে প্রথম শর্ত্ত পূর্ণ হইল।

এদিকে হযরতের নিকট কোথাও হইতে মুরগির ডিমের আকার ও পরিমাণ একটি স্বর্ণ চাকা উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা সালমানকে দিয়া দাও এবং হযরত আমাকে উহা দ্বারা আমার মুক্তির শর্ত্ত পূরণ করিতে বলিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার জিম্মায় যে পরিমাণ স্বর্ণ রহিয়াছে ইহা দ্বারা ত উহার কিছুই হইবে না। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিবেন। বাস্তবিকই যখন শর্ত্ত আদায় করার জন্য উহা ওজন দেওয়া হইল তখন ইহা চল্লিশ উকিয়া পরিমাণ দেখা গেল। এইরূপে উভয় শর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল এবং আমি আজাদ ও মুক্ত হইয়া গেলাম।

পাঠকবর্গ! সত্যের সাধনায় জয় লাভের নিশ্চয়তা দেখার উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন সালমান ফারেসী (রাঃ)। বাস্তবিকই সত্যের জন্য খাঁটীভাবে সাধনা করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জয়ী করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে—وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যাহারা আমাকে লাভ করার জন্য আমার পথে সাধনা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে আমি তাহাদের জন্য অবশ্যই আমার পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথ সুগম করিয়া দিব।"

بود مورے هوس داشت که در کعبه رسید
دست بر پائے کبوتر زد و ناگاه رسید

"এক পিপীলিকা কা'বা শরীফের দ্বারে পৌঁছিবার খাঁটী আকাঙ্খা করিতেছিল ; তাহার নিকটে একটি কবুতর বসিল ; সে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। কবুতরটি উড়িতে উড়িতে কা'বা ঘরের নিকট চলিয়া গেল, পিপীলিকার আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রাঃ) এস্থলে উল্লেখিত ছাহাবীগণ ছাড়া আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণের মর্ত্তবা ও ফজিলত সম্পর্কীয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—তাল্‌হা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ), উসামা (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আম্মার ও হোযায়ফা (রাঃ), আবু-ওবায়দাহ (রাঃ), খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ), সালেম মওলা হোজায়ফা (রাঃ), মোয়া'বিয়া (রাঃ), মোয়া'জ ইবনে জাবাল (রাঃ), সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), আবু তাল্‌হা (রাঃ), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হোযাফা (রাঃ), হিন্দ বিনতে ওতবা (রাঃ)।

কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কীয় সমুদয় হাদীছের অনুবাদ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের তফছীর*

১৮৮০। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে (পবিত্র কোরআনের) ক্বেরাত-বিশেষজ্ঞ হইলেন উবাই-ইবনে কায়া'ব (রাঃ) এবং বিচার ও আইন বিশেষজ্ঞ হইলেন আলী (রাঃ)। এতদ সত্ত্বেও আমরা উবাই ইবনে-কায়া'বের একটা মতবাদের বিরোধিতা করিয়া থাকি—তিনি বলিয়া থাকেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে যে কোন শব্দ বা বাক্য একবার (কোরআনরূপে) শুনিয়াছি উহাকে কখনও ছাড়িব না। (পবিত্র কোরআনে উহাকে সর্ব্বদার জন্য বিদ্যমান রাখিবই।)

ওমর (রাঃ) উক্ত মতবাদেরই বিরোধিতা করেন এবং উহা খণ্ডনের প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا........

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে সরাসরি কোরআন শরীফের শিক্ষা লাভকারী—যাঁহাদের সম্মুখে কোরআন শরীফ নাযেল হইয়াছিল অর্থাৎ ছাহাবীগণ তাঁহাদেরই বিবৃতি দ্বারা প্রমাণিত আছে, কতিপয় বাক্যাবলী এমন আছে যাহা প্রথমে কোরআনরূপে নাযেল হইয়া ছিল, কিন্তু পরে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশক্রমেই ঐ সবের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সম্পর্কে শরীয়তের যে সব বিশেষ নির্দ্দেশাবলী রহিয়াছে তাহা ঐ সব বাক্যাবলীর উপর প্রযোজ্য থাকে নাই। যেমন নামাযের মধ্যে ক্বেরাত তথা কোরআনের কোন অংশ পাঠ করা ফরজ রহিয়াছে, সেস্থলে ঐ ধরণের বাক্যাবলী দ্বারা নামাযের সেই ফরজ আদায় হইবে না। এই শ্রেণীর বাক্যাবলী কেতাবে সংগৃহিত রহিয়াছে—(আল্-এত্ক্বান, ২—২৫ দ্রষ্টব্যঃ)

---

* পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতের তফছীর ও বিভিন্ন তথ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ঐরূপ হাদীছ বয়ান করা হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রিতরূপে গ্রন্থাকারে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে সেইরূপ প্রচেষ্টা চালান হইলে পর এই সমস্যা দেখা দিল যে, উপরোল্লেখিত শ্রেণীর বাক্যাবলী কোরআনের মধ্যে শামিল করা হইবে কি না? এক্ষেত্রে উবাই ইবনে-কায়া'ব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, কোরআনরূপে যাহা একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনা গিয়াছে কোরআনের মধ্যে তাহা সবই শামিল থাকিবে। তিনি যেন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হওয়ার বিষয়টিকেই অস্বীকার করিতেন। ওমর (রাঃ) উহারই বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, কোরআন শরীফের কোন কোন অংশ মনছুখ বা রহিত করার নীতি ছিল। অতএব যে যে অংশের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে উহা কোরআনে শামিল থাকিবে না। মূল দাবীর প্রমাণে ওমর (রাঃ) নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন—ছুরা বাকারাহ প্রথম পারা ১৩ রুকুর আয়াত—

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا........

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি কোন আয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিলে কিম্বা হৃদয়পট হইতে মুছিয়া দিলে, অবশ্যই উহার স্থলে উহা অপেক্ষা উত্তম বা অন্ততঃ উহার সমতুল্য (কিন্তু অধিক সময়োপযোগী) আর একটি প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়া থাকি। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুরই ক্ষমতা রাখেন এবং বিশ্বজোড়া আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই। আর আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের জন্য ঐরূপ বন্ধু ও সাহায্যকারী কেহ নাই। (একটি রহিত করিয়া অপরটি প্রবর্ত্তন করা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতেই হইয়া থাকে)।

তফছীর ঃ—কোন একটি সুদীর্ঘ বাণী বা প্রবন্ধের সঙ্কলক সাধারণতঃ স্বীয় বাণী ও প্রবন্ধের কোন কোন অংশ বাদ দিয়া, রহিত করিয়া বা রদ-বদল করিয়া থাকেন। এমনকি সম্পূর্ণ শুদ্ধ বিষয়ের কোন অংশ বা বাক্যকেও যে কোন সূক্ষ্ম কারণ বা শুধু স্বীয় নৈপুণ্যতাবলে পঠিত ও প্রচারিত রূপ হইতে বাদ দিয়া দেন; তখনও উহার মূল বিষয়বস্তু তাহার স্বীকৃত ও সমর্থিতই থাকে। তদ্রূপ চিকিৎসকও তাঁহার ব্যবস্থা-পত্রে এবং ঔষধ তালিকায় পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে বা স্বীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা বলে। এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় পরিগণিত; ইহার কোন সমালোচনা কখনও করা হয় না।

অসীম জ্ঞান-গুণ, নৈপুণ্য-দক্ষতা এবং দয়া ও দরদের অধিকারী মহান আল্লাহ তায়ালাও স্বীয় কালাম ও সুদীর্ঘ বাণী পবিত্র কোরআনের মধ্যে ঐ শ্রেণীর নিপুণতা

ও মানবের প্রতি স্বীয় করুণা দেখাইয়াছেন এবং সেই ধরনের রহস্যজনক সূত্রেই উহাতে কিছু রদবদল সংঘটিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।* অবশ্য মানুষের রদবদল ও পরিবর্ত্তন ত অনেক সময় অজ্ঞতা, বিভিন্ন দূর্ব্বলতা বা অসতর্কতা সূত্রের ভুল-শুদ্ধিরূপেও হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ মহান আল্লাহ তায়ালার কালামে ঐ ধরণের রদবদলেয় কোন সম্ভাবনাই নাই।

পবিত্র কোরআনে মন্‌ছুখ বা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রদবদলের প্রকার বিভিন্ন রহিয়াছে। আগ্রহশীল লোকগণ বিজ্ঞ আলেম বা তাঁহাদের রচিত জ্ঞান-ভাণ্ডার মারফৎ উহা জ্ঞাত হইতে পারেন।

উল্লেখিত আয়াতে দুইটি বস্তু রহিয়াছে—একটি হইল মন্‌ছুখ করা, এস্থলে পরিবর্ত্তিত ও প্রবর্ত্তিত উভয়টিই লোকদের গোচরে ও জ্ঞানে বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল—হৃদয়পট হইতে মুছিয়া দেওয়া, এস্থলে পরিবর্ত্তিত বিষয়বস্তু সকলের এমনকি স্বয়ং রসুলের গোচর ও জ্ঞান হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন—বর্ত্তমান ৭৩ আয়াত সম্বলিত ছুরা আহ্‌জাবটি আয়েশা (রাঃ) ও উবাই-ইবনে-কায়া'ব (রাঃ)-এর বয়ান অনুযায়ী প্রায় ছুরা-বাক্কারাহ পরিমাণ ২০০ আয়াতের ছিল। এই শ্রেণীর আরও কতিপয় তথ্য বর্ণিত আছে। (আল-এতক্বান ২—২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৮৮১। **হাদীছ :**— ওমর (রাঃ) আনন্দ প্রকাশে বলিতেন, তিন ক্ষেত্রে প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশ ও বিধান আমার অভিলাস অনুযায়ী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—

(১) হজ্জ ও ওমরা আদায়ে তওয়াফ করার পর যে দুই রাকাত নামায পড়ার বিধান রহিয়াছে সেই নামায "মকামে-ইব্রাহীম" নামক প্রস্তরটি যথায় রক্ষিত উহার নিকটবর্ত্তী আদায় করার বাসনা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলাম; ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাজেল হইল—

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"মাকামে-ইব্রাহীমকে (বিশেষ সময়ে) নামাযের স্থান বানাও।" (১ পাঃ ১৫ রুঃ)

(২) একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার নিকট ভাল-মন্দ সব রকম লোকই আসিয়া থাকে। (আপনার বিবি—) মোছলেম-জননীগণকে

---

* আয়াতের শানে-নজুল এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইসলামের বিধানপত্র পবিত্র কোরআনের কোন কোন বিষয় মনছুখ বা রদবদল হইতে দেখিয়া কাফেরগণ বিদ্রূপ করিতে লাগিল—মোসলমানদের খোদা ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, কি বিধান প্রবর্ত্তন করিবেন। এই অযৌক্তিক বিদ্রূপের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত নাযেল হইয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, এই রদবদল ভুল-ত্রুটিজনিত বা অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা প্রসূত রদবদল নহে, বরং বিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও স্নেহ-মমতা সূত্রের রদবদল।

পর্দ্দায় থাকিবার আদেশ করিলে ভাল হয়। ইতি মধ্যেই পর্দ্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযেল হইল।

(৩) বিবিগণের কাহারও কাহারও আচরণে নবী (দঃ) ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রতি নারাজ হইলেন। আমি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদের নিকট গেলাম এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিলাম যে, আপনারা এইরূপ আচরণ হইতে বিরত না থাকিলে আল্লাহ তায়ালা নবী (দঃ)কে আপনাদের স্থলে উত্তম বিবি দান করিবেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বিবির নিকট এই সতর্কবাণী লইয়া পৌছিলে তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,, হে ওমর রসুলুল্লাহ (দঃ) কি তাঁহার বিবিগণকে উপদেশ দান করিতে পারেন না? যদ্দরুন আপনি উপদেশ খয়রাত করিতে আসেন!

ইতিমধ্যেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিলেন—

عَسَىٰ رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ -

হে নবী-পত্নিগণ! "তোমাদিগকে যদি নবী তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ অচিরেই এরূপ করিতে পারিবেন যে, তোমাদের পরিবর্ত্তে উত্তম পত্নি তাঁহাকে দান করেন।" (২৮ পাঃ ১৯ রুঃ)

১৮৮২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ইহুদী-নাছারা আহলে-কেতাবগণ তাহাদের হিব্রু ভাষার তৌরাত কেতাব আরবী ভাষায় তরজমা করিয়া মোসলমানদিগকে শুনাইয়া থাকিত। সে সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে বলিলেন, আহ্লে-কেতাবদের ঐসব পঠিত বিষয়াবলী (নিজের কেতাব ও রসুলের দ্বারা সত্য প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে) সত্যরূপেও গ্রহণ করিও না এবং (মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে) মিথ্যাও বলিও না, বরং (ঐ সবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিয়া) তাহাদিগকে ঐ ঘোষণাই শুনাইয়া দাও যাহা তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে শিক্ষা দিয়াছেন। ছুরা বাকারাহ ১ম পারা ১৬ রুকুর আয়াত—

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا......

তফছীর ঃ—আহ্লে-কেতাব—ইহুদী-নাছারাগণ মোসলমাগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্ম অবলম্বনের প্রতি আকৃষ্ট করিত। তাহাদের হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আল্লাহ তায়ালা এই শিক্ষা দিয়াছেন—হে মোসলমানগণ! তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের স্পষ্ট ঘোষণা শুনাইয়া দাও যে, আমরা তোমাদের

কথার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিব না। তোমরা ত দাবী কর আল্লার প্রতি ঈমান রাখার, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের দাবী মিথ্যা। তাই তোমরা আল্লার নির্দ্দেশাবলী মান্য কর না, তাঁহার অনুগত হও না, তাঁহার সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করিয়া থাক। আমরা তোমাদের ন্যায় নহি, বরং আমরা সঠিকরূপে আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং (তাঁহার সর্ব্বশেষ রসুল মারফৎ) আমাদের নিকট যে কেতাব প্রেরণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

বিধর্ম্মীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেস্থলে বাঁচিবার সহজ উপায় ইহাই যে, সকল প্রকার inferiority complea আত্ম-হেয়তাকে এড়াইয়া মুখে, মনে এবং কার্য্যে স্বীয় খাঁটী ঈমানের ঘোষণা করিলে জ্বিন জাতীয় ও মানুষ জাতীয়—সকল প্রকার শয়তানই পালাইতে বাধ্য হইবে। দুঃখের বিষয় অধুনা আমাদের নব্য শিক্ষিত ভাইগণ বিধর্ম্মীদের মোকাবিলায় ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দিতেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও হেয়তা অনুভব করিয়া থাকেন; ইহাই তাহাদের বিভ্রান্ত হওয়ার মূল কারণ।

১৮৮৩। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া আনা হইবে, তিনি পূর্ণ আদব ও তাওআজুর সহিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে হাজির হইবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি স্বীয় উম্মৎকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তিনি বলিবেন, হাঁ। অতঃপর তাঁহার উম্মৎগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, নূহ (আঃ) তোমাদিগকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, (সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া) সতর্ককারী কোন মানুষই আমাদের নিকট আসিয়াছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার দাবীর উপর কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলিবেন, হাঁ—আমার সাক্ষী মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মৎ। সেমতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মৎগণ সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আঃ) তাঁহার উম্মৎকে সত্য ধর্ম্ম পৌঁছাইয়াছিলেন।

(এই সাক্ষ্যের উপর জেরা করা হইবে—তোমাদের যুগ ত অনেক পরের যুগ; পূর্ব্বের যুগের বিষয় বস্তু তোমরা কিরূপে জানিতে পারিলে? উত্তরে উম্মতে মোহাম্মদীগণ বলিবে, আমাদের রসুল (দঃ) আমাদিগকে এই তথ্য জ্ঞাত করিয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলাম।) রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তোমাদের উক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দান করিবেন। ইহাই হইল এই আয়াতের মর্ম্ম।

وكذلك جعلنكم امة وسطا ...

তফছীর ঃ— ছুরা বাকারাহ দ্বিতীয় পারা প্রথম রুকুর এই আয়াত—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

এই আয়াতের পূর্ব্বে আল্লাহ তায়ালা কেবলা পরিবর্ত্তনের ঘোষণা বর্ণনা করিয়াছেন। বহু শতাব্দী হইতে বনী-ইসরাইলের সমস্ত নবীগণের শরীয়তে যে কেবলা প্রচলিত ছিল, তথা বাইতুল মোকাদ্দাস আজ হইতে উহার স্থলে বাইতুল্লাহ বা কা'বা শরীফকে কেব্‌লা নির্দ্ধারিত করা হইল। বনী-ইসমাঈলের একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের জন্য এই কেব্‌লা প্রবর্ত্তিত হইল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা একটি দিকের পরিবর্ত্তন ছিল মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি বিরাট পরিবর্ত্তন ও রদবদলের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পর হইতে ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব বরং জাগতিক নেতৃত্বও বনী-ইসরাঈলদের হাতে চলিয়া আসিতেছিল। হযরত ঈছা আলাইহেচ্ছালামের যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বনী-ইসরাঈলগণ অগণিত অপরাধের শিকার হইয়াছে। তাহাদের অপরাধের কতিপয় নমুনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার পর আল্লাহ তায়ালা কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের ঘোষণা দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, নেতৃত্ববাহী জাতি বনী-ইসরাঈলগণ এই ধরনের অপরাধে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের হাত হইতে নেতৃত্ব ছিনাইয়া বনী-ইসমাঈল তথা হযরত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাহার উম্মতের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উহারই প্রভাবে সেই অপরাধী নেতৃত্ববাহীদের সর্ব্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত কেব্‌লা পরিবর্ত্তন করিয়া উম্মতে মোহাম্মদীর নিজস্ব কেব্‌লা প্রবর্ত্তিত হইল। সুতরাং কেব্‌লা পরিবর্ত্তন বিষয়টি শুধুমাত্র দিকের পরিবর্ত্তনই ছিল না, বরং ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব উহার সুদীর্ঘকালের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে আসিল—কেব্‌লা পরিবর্ত্তন বিষয়টি উহারই ইঙ্গিত, নিদর্শন ও জয়ধ্বনি।

উম্মতে মোহাম্মদীর এই বিরাট মান-মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত বহনকারী বিষয়টি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিতেছেন, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ...... অর্থাৎ—তোমাদিগকে দুনিয়াতে নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি, আবার মোহাম্মাদুর রসুলুল্লার সাহচর্য ও শিক্ষার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই নেতৃত্বের উপযোগী গুণ-জ্ঞানেরও সমাবেশ করিয়াছি। তোমাদের এই

ইহকালীন মান-মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায় পরকালেও তোমরা এক উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী হইবে। তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী (নবীগণের পক্ষে তাঁহাদের উম্মতী) লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানকারী হইবে এবং সে সম্পর্কে তোমাদের রসুল (দঃ) তোমাদের সমর্থনে সাক্ষ্য দান করিবেন, ইহা কত বড় মর্য্যাদা ও সম্মান!

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"হে মোমেনগণ তোমাদের উপর রোযা ফরজ হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের উপর ফরজ হইয়াছিল।" (২ পাঃ ৭ রুঃ)

যথা—হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের উম্মতের উপর মহরমের ১০ তারিখ তথা আশুরার রোযা ফরজ ছিল। ঐ রোযা ইসলামের প্রথম যুগে আমাদের নবীজীর উম্মতের উপরও ফরজ ছিল; রমজানের রোযা ফরজ হইলে আশুরার রোযা ফরজ থাকে নাই, অবশ্য উহার অনেক ফজীলত এখনও বাকি আছে এবং উহা ছুন্নত। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য

১৮৮৪। হাদীছ ঃ—আস্‌আছ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট আসিলেন তখন তিনি খানা খাইতে ছিলেন। আস্‌আছ (রঃ) বলিলেন, আজ ত আশুরার দিন! আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, রমজানের রোযা ফরজ হইবার পূর্ব্বে এই আশুরার রোযা (ফরজরূপে) রাখা হইত। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব তুমিও আস এবং খাওয়ায় অংশ গ্রহণ কর।

● ২ পাঃ ৭ রুঃ ১৮৪ তম আয়াতের মধ্যবর্ত্তী অংশের অর্থ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর পঠন অনুযায়ী এই—"রোযা রাখা যাহাদের শক্তির বাহিরে তাহারা ফিদ্‌ইয়া আদায় করিবে।

১৮৮৫। হাদীছ ঃ—আতা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত সুযোগ রহিত হয় নাই এখনও উহা প্রচলিত। কোন পুরুষ বা মহিলা যদি এরূপ বৃদ্ধ হইয়া যায় যে, সে রোযা রাখায় সক্ষমই নহে তবে সে প্রতি দিন রোযার বিনিময়ে এক মিছকিনকে দুই ওয়াক্ত পরিপূর্ণরূপে খাওয়াইয়া দিবে।

১৮৮৬। হাদীছ ঃ- আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধারণতঃ এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও ভাল অবস্থায় রাখ, আখেরাতেও ভাল অবস্থায় রাখিও। আর আমাদিগকে দোযখের আজাব হইতে বাঁচাইও।"

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা নবম রুকুর মধ্যে উক্ত দোয়াটি উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে শুধু হজ্জ উপলক্ষে উক্ত দোয়া করার উল্লেখ আছে। আলোচ্য হাদীছে ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বলিতেছেন, হযরত নবী (দঃ) হজ্জ উপলক্ষ ছাড়া অন্যান্য সময়েও এই দোয়া করিয়া থাকিতেন।

১৮৮৭। **হাদীছ ঃ**— নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ-ইবনে ওমর (রাঃ) (অত্যধিক আদব-তাজিম ও মগ্নতার সহিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া থাকিতেন।) কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করিলে উহা হইতে অবসর না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই বলিতেন না।

একদা আমি কোরআন শরীফ খুলিয়া তাঁহার কণ্ঠস্থ পড়া শুনিতেছিলাম। তিনি ছুরা বাক্বারাহ পড়িতে ছিলেন। যখন (نسائكم حرث لكم) এইস্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক নীতির বিপরীত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, জান কি এই আয়াত কি বিষয়ে নাযেল হইয়াছে ? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, পশ্চাৎদিক হইতে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযেল হইয়াছে।

১৮৮৮। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ প্রবাদ ছিল যে, কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিক হইতে স্ত্রী সহবাস করিলে সন্তান টেক্‌রা হয় ; উহারই প্রতিবাদে এই আয়াত নাজিল হইয়াছে—

نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم

তফছীর ঃ—ছুরা বাক্বারাহ দ্বিতীয় পারা ১২ রুকুর এই আয়াত—

نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ

প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করিয়াছেন, ঋতুকালে স্ত্রীসহবাসের ধারে-কাছেও যাইও না যাবৎ না স্ত্রী পাক হইয়া যায়। স্ত্রী ঋতু হইতে পাক হইলে পর তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পার ঐ পথে যে পথে আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে।)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য মানব-বীজ বপনের ক্ষেত্র ; সেমতে তোমরা তোমাদের বীজ-বপন ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিতে পার যে অবস্থায় বা যেদিক হইতে ইচ্ছা কর।" অর্থাৎ সহজ ও সরল তথা সম্মুখদিক ছাড়া যদি কোন অসুবিধাকে এড়াইবার জন্য পশ্চাৎদিক হইতে ব্যবহার করিতে চাও তাহাতেও কোন দোষ হইবে না।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আয়াতের মর্ম্ম শুধু দিকের স্বাধীনতা অর্থাৎ সম্মুখদিক হইতে বা পশ্চাৎ দিক হইতে উভয় দিক হইতেই অনুমতি রহিয়াছে,

কিন্তু উভয় অবস্থায়ই মূল কার্য্য-স্থান একমাত্র আল্লার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে হইবে এবং উহা হইল "জননেন্দ্রিয়"; একমাত্র উহাই মানব-বীজ বপনের স্থান। স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গেও মল দ্বারে সহবাস করা সকল ইমামগণের মতেই হারাম।

১৮৮৯। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোরআন একত্রে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধকারী) ওসমান (রাঃ)কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم......

আয়াতটি সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, এ সম্পর্কীয় অন্য একটি আয়াত দ্বারা এই আয়াতটির হুকুম মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে উক্ত আয়াতকে কোরআন শরীফে শামিল রাখা হইল কেন? ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যাহা কিছু পবিত্র কোরআনে শামিল থাকা স্থিরীকৃত রহিয়াছে উহার কোন একটি বস্তুও আমি হটাইতে পারি না।

তফছীরঃ— ছুরা বাকারাহ দ্বিতীয় পারা ১৫ রুকুর আয়াত—

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ

مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ -

"যাহারা স্ত্রীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের কর্ত্তব্য—তাহাদের স্ত্রীগণ সম্পর্কে অছিয়ত করিয়া যাওয়া যে, তাহাদিগকে যেন এক বৎসরকাল খোর-পোষের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে যেন (স্বামীর ঘর-বাড়ী হইতে) তাড়াইয়া দেওয়া না হয়।"

ইসলামের পূর্ব্বে অন্ধকার যুগে মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপর ইদ্দৎ এক বৎসরকাল ছিল এবং এ সম্পর্কে নারীদের উপর নানাপ্রকার অমানুষিক দুঃখ কষ্ট ভোগের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রথম যুগেও এই ইদ্দৎ এক বৎসরকালই ছিল। এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য দুঃখ কষ্টের কুপ্রথা সমূহকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া নারীদের মর্য্যাদা রক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখনও মিরাছ বা উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধান জারি হয় নাই। তাই এই এক বৎসরকাল থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য স্বামী কর্ত্তৃক অছিয়ত করিয়া যাওয়ার বিধান ছিল।

পরবর্ত্তীকালে উত্তরাধিকার স্বত্বের বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে পর উক্ত অছিয়তের আদেশ মনছুখ বা রহিত হইয়া যায়। যেহেতু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা স্ত্রীর প্রাপ্ত-মিরাছের দ্বারাই যথেষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন এক বৎসর কালকেও কম করিয়া ইদ্দতের সময় চার মাস দশ দিন করিয়া দেওয়া হয়। এ সম্পর্কেই এই আয়াত নাযেল হয়—

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ

بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

"যে সব স্ত্রীদের স্বামী মারা যায় তাহারা নিজকে ইদ্দতে আবদ্ধ রাখিবে চার মাস দশ দিন।"

তেলাওয়াতের মধ্যে এই আয়াতটি কোরআন শরীফে উপরোল্লেখিত আয়াতটির পূর্ব্বে রহিয়াছে; কিন্তু নাযেল হওয়ার সময় পূর্ব্বোক্ত এক বৎসরকাল বর্ণিত আয়াতটি প্রথমে নাযেল হইয়াছিল এবং চার মাস দশ দিন বর্ণিত আয়াতটি পরে নাযেল হইয়াছিল, সুতরাং নাছেখ মন্‌ছুখ হওয়ার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এক বৎসরকাল বর্ণিত আয়াতটি যেহেতু মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে তাই আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই আয়াতের বধিান ও আদেশ যখন বাকি থাকে নাই, তখন ইহাকে লেখায় এবং তেলাওয়াতে বাকি রাখা হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোরআন শরীফের আয়াত সমূহের সঙ্গে দুইটি বিষয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে—(১) আয়াতের মর্ম্ম ও অর্থ অনুযায়ী বিধান ও আদেশ-নিষেধ, (২) তেলাওয়াত তথা উহার প্রতি অক্ষরে দশ দশ নেকী হওয়া, অজু ব্যতিরেকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ হওয়া, উহা দ্বারা নামাযের কেরাত পড়া ইত্যাদি।

আলেমুল-গায়েব বিধানকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা যে কোন রহস্য সূত্রে কোন কোন আয়াতের মর্ম্ম ও বিধান বলবৎ রাখিয়াও উহার তেলাওয়াত মন্‌ছুখ ও রহিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮০ নং হাদীছে ওমর (রাঃ) এই শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কেই বলিয়াছেন যে, উহা পবিত্র কোরআনে শামিল থাকিবে না। ইহার বিপরীত কোন কোন আয়াত এই রূপও আছে যাহার মর্ম্ম ও বিধান মন্‌ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তেলাওয়াত মন্‌ছুখ হয় নাই। আলোচ্য হাদীছে এই শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কেই ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা অবশ্যই কোরআন শরীফে শামিল থাকিবে, উহার এক অক্ষরও পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। বক্ষ্যমান হাদীছের প্রশ্নজনিত আয়াতটি এই শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীর আরও কতিপয় আয়াত কোরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮৯০। হাদীছঃ—যায়েদ ইবনে-আর্‌কাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে কথা বলিয়া থাকিতাম। আবশ্যকীয় জিজ্ঞাসাবাদে পরস্পর কথা বলা হইত যাবৎ না এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ "নামাযের মধ্যে আল্লার প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুন পালনার্থে একাগ্রচিত্তে শান্ত, ক্ষান্ত, নিবৃত্ত ও নির্লিপ্তরূপে দাঁড়াও।" এই আয়াত নাযেল হইলে পর আমরা নামাযের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলা হইতে বিরত থাকায় আদিষ্ট হইলাম।

১৮৯১। হাদীছঃ একদা ওমর (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বলিতে পার কি, এই আয়াতটি কি মর্ম্মে নাযেল হইয়াছিল? ......أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিলেন, তাহা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। এই উত্তরে ওমর (রাঃ) রাগতঃ স্বরে বলিলেন, তোমরা জান, কি—জান না, তাহা বল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন! এ সম্বন্ধে আমার মনে একটা বিষয় আছে। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, নিজকে (এরূপ ক্ষেত্রে) তুচ্ছ না ভাবিয়া মনের কথা বলিয়া ফেল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতে মানুষের আমল সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আমল সম্পর্কে? বয়ঃকনিষ্ঠ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বিস্তারিতরূপে অধিক কিছু বলিলেন না। তখন ওমর (রাঃ) নিজেই অধিক বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে—কোন লোক যাহার ধন-দৌলত ছিল, সুতরাং সে সব রকম এবাদত ও নেক কাজই করিতে পারিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যে, মানব জাতির পরীক্ষার জন্য শয়তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শয়তান যখন তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন সে (খোদা প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহারে উহা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করিয়া শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে এবং) এমন এমন গোনাহ বা এই পরিমাণ গোনাহ করিয়াছে যদ্দরুন তাহার নেক আমল সমূহ বিনষ্ট বা গোনাহের আধিক্যে নিমজ্জিত, নির্ব্বাপিত এবং বেষ্টিত ও আবৃত হইয়া গিয়াছে। (ফলে কেয়ামতের নিদারুণ কঠিন দিনে—যখন মানুষ একমাত্র নেক আমলের প্রতি জীবন ধারণ ও জীবন রক্ষার স্তরে সর্ব্বাধিক প্রত্যাশী হইবে, তখন সে তাহার কৃত নেক আমলের যথার্থ ফলাফল হইতে বঞ্চিত থাকিবে—ইহা যে কত বড় দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ ও অনুতাপের বিষয় তাহা বুঝাইবার জন্যই বাহ্যিক জগতের হাল-অবস্থার সমবায়ে গঠিত একটি দৃষ্টান্ত উক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।)

ব্যাখ্যাঃ—ছুরা বাকারাহ তৃতীয় পারা চতুর্থ রুকূর আরম্ভ হইতে আল্লাহ তায়ালা ছদকাহ্ বা দান-খয়রাতের ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণনা করিয়াছেন, সঙ্গে

সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ছওয়াব লাভ করিতে হইলে দান-খয়রাতকে দুইটি জিনিষ হইতে অবশ্যই পাক পবিত্র রাখিতে হইবে—(১) "মন্ন্" উপকার ও দান-খয়রাতকে উপলক্ষ করিয়া দান-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করা, (২) "আজা"—দান-খয়রাত করিয়া উহার ঔদ্ধত্যবশে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে কষ্ট ও ব্যথাদায়ক ব্যবহার করা।

তারপর আল্লাহ তায়ালা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যদি দান-খয়রাতকে উক্ত বস্তুদ্বয় হইতে পাক পবিত্র না রাখ, তবে তোমাদের দান-খয়রাত বাতেল—নিস্ফল ও অকেজো হইয়া যাইবে। যেরূপ রিয়াকার বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যকারী ঈমানহীন অমোসলেম মোনাফেক ব্যক্তির দান-খয়য়াত বাতেল—নিস্ফল ও অকেজো হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কাফের অমোসলেমদের দান-খয়রাত বাতেল ও ফলহীন হওয়ার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি অতি মসৃণ পাথরের উপর ধূলা-বালু জমিয়াছে, (যাহার মধ্যে কোন বীজ পতিত হইলে উহা হইতে চারা জন্মা সম্ভব ছিল, কিন্তু) উহার উপর মূষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায় ঐ মসৃণ পাথরের উপর ধূলা-বালুর চিহ্নও থাকিতে পারে নাই। (তদ্রূপ কাফেররা দান-খয়রাত ইত্যাদি যে সব সৎকাজ করিয়া থাকে যাহার সুফল কেয়ামতের দিন পাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহাদের কুফুরী ও ঈমান-হীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহাদের সৎকার্য্যাবলী সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হইবে।) ফলে তাহারা তাহাদের কৃত সৎকার্য্যাবলীর কোন ফলই লাভ করিতে পারিবে না। সৎকার্য্য দ্বারা মানুষ যে বেহেশ্ত লাভ করিবে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদিগকে সেই বেহেশ্তের খোঁজও দিবেন না।

রিয়াকারী—লোক দেখানো উদ্দেশ্য এবং কুফুরীর কারণে যে দান-খয়রাত আল্লার দরবারে মকবুল ও গৃহীত হয় নাই তাহার উল্লেখিত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার পর উহার বিপরীত আল্লার দরবারে মকবুল ও গৃহীত দান-খয়রাতেরও একটা দৃষ্টান্ত আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করিয়াছেন—পার্ব্বত্য এলাকায় অতি উর্ব্বর উঁচু টিলার উপর যদি একটি বাগান থাকে এবং সময় মত পূর্ণ বৃষ্টির পানিও ঐ বাগানে বর্ষিত হয়, সেই বাগান দ্বিগুণ ফল জন্মাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ মোমেন ব্যক্তি এখলাছের সহিত আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে দান-খয়রাত করিবে এবং "মন্ন্" ও "আজা" ইত্যাদির ন্যায় দান-খয়রাত ও পরোপকার বিধ্বংসী পাপ হইতে উহাকে পাক পবিত্র রাখিবে। উহার ফলও কেয়ামতের দিন সে বহুগুণে লাভ করিবে। পক্ষান্তরে মোমেন হইয়া, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাছের সহিত দান-খয়রাত করিয়া তারপর "মন্ন্" ও "আজা" ইত্যাদি দান-খয়রাত বিধ্বংসী পাপের দ্বারা সেই দান-খয়রাতকে

নিষ্ফল ও বিনষ্ট করিয়া দিলে তাহা যে কত বড় দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হইবে তাহা বুঝাইবার জন্যও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন—

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ... فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

অর্থাৎ—এক ব্যক্তির একটি বাগান আছে, বাগানটি অতি বড় এবং উহাতে প্রবাহিত নদী-নালা রহিয়াছে। যদ্দারা উহাতে প্রচুর পরিমাণ সেচকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। উহাতে খেজুর গাছ আছে, আঙ্গুর গাছ আছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সব ফলেরই গাছ উহাতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। (বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন মউসুম, তাই প্রায় সারা বৎসরই সে বাগান হইতে উৎপন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে।) বাগানটির মালিক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছে (যদ্দরুন সে রোজী-রোজগার করিতে অক্ষম,) অথচ তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে অনেক, (তাই তাহার উপর ব্যয়ের বোঝা অধিক, কিন্তু আয়ের অছিলা তাহার জন্য ঐ বাগানটি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং ঐ বাগানটি তাহার জন্য কি পরিমাণ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়—) এমন অবস্থায় সেই বাগানটির উপর এক অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হইয়া উহাকে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। এইরূপ দুঃখ ও বেদনাদায়ক, আক্ষেপ অনুতাপের ঘটনার সম্মুখীন হওয়াকে কেহ নিজের জন্য পছন্দ করিতে পারে কি? কখনও নহে।

মোমেন ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাছের সহিত দান-খয়রাত করিলে সেই দান-খয়রাত উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন ফল-ফুল শোভিত বাগানের ন্যায়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট মোমেন ব্যক্তি তাহার সেই দান-খয়রাতের প্রচুর পরিমাণ ছওয়াব ও চিরস্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু "মন্" ও "আজা" ইত্যাদির ন্যায় দান-খয়রাত বিধ্বংসী পাপের দ্বারা সে তাহার দান-খয়রাতকে ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকিলে কেয়ামতের দিন—যে দিন মানুষের পক্ষে বাঁচিবার ও নাজাত পাইবার জন্য নেক কার্য্যাবলীর ছওয়াব ভিন্ন অন্য কোন উপায়-অছিলা থাকিবে না এবং মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগী অপেক্ষা সেই দিন দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কার্য্যাবলীর ছওয়াবের প্রতি সর্ব্বাধিক মোহতাজ ও প্রত্যাশী হইবে—সেই কঠিন দুর্য্যোগের দিনে সে দেখিতে পাইবে যে, পাপের অগ্নি-বায়ু তাহার দান-খয়রাতের সুজলা সুফলা বাগানটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। যেই বাগান হইতে তাহার প্রচুর পরিমাণ ছওয়াবের চিরস্থায়ী ফল লাভের সুযোগ ছিল উহা হইতে আজ সর্ব্বাধিক আবশ্যকের সময় এক কড়ি ফল লাভের সুযোগও তাহার নাই। এইরূপ বেদনাদায়ক দুঃখ জনক অনুতাপের

সম্মুখীন হইতে কেহই পছন্দ করিতে পারে না। সুতরং দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কার্য্য করিয়া সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন উহা ধ্বংসকারী পাপ অনুষ্ঠিত না হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ - আলোচ্য আয়াতটির পূর্ব্বাপর আয়াত সমূহ এবং ঐ সবের মূল বিষয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, উক্ত আয়াতে ছদ্‌কাহ্‌ বা দান-খয়রাত-বিশেষের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহা ধ্বংসকারী অগ্নি-বায়ূ সমতুল্য পাপ দ্বারা "মন্ন্‌" ও "আজা" পাপ-বিশেষকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—কোরআন পাকের আয়াত সমূহ শানে-নুজুল বা পূর্ব্বাপর আয়াত ও বিষয় বস্তুর বিন্যস্ততা দৃষ্টে বস্তু বিশেষ বা ক্ষেত্রবিশেষের জন্য আবদ্ধ মনে হইলেও অনেক স্থানে আয়াতের নিজস্ব মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য থাকে যাহা উক্ত আবদ্ধতামুক্ত। কোরআন পাকের মধ্যে এই শ্রেণীর আয়াতের বহু নজীর রহিয়াছে। আলোচ্য আয়াতটিও ঐ শ্রেণী ভুক্তই। বহু গুণাবলী বিশিষ্ট বাগানের দৃষ্টান্তে শুধু ছাদ্‌কাহ্‌ বা দান-খয়রাতই উদ্দেশ্য নহে, বরং সকল প্রকার নেক আমলই উদ্দেশ্য। ইহার ছওয়াব ও চিরস্থায়ী ফল মানুষ কেয়ামতের দুর্য্যোগময় দিনে লাভ করিবে। আর উহা ধ্বংসকারী অগ্নি-বায়ূর দৃষ্টান্তে শুধু "মন্ন্‌" ও "আজা'ই উদ্দেশ্য নহে' বরং সকল প্রকার গোনাহ ও পাপই উদ্দেশ্য যদ্দ্বারা নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত, বরং লুপ্তও হইয়া যায়। বক্ষ্যমান হাদীছটির তাৎপর্য্য ইহাই।

গোনাহের দ্বারা নেক আমলের ক্ষতি বিভিন্ন পর্য্যায়ে হইতে পারে—প্রথমতঃ এক শ্রেণীর বিশেষ গোনাহ আছে, যদ্দ্বারা বিশেষ নেক আমল ধ্বংস হইয়া থাকে। যেমন—"মন্ন্‌" ও "আজা" দ্বারা ছদ্‌কাহ্‌ ও দান-খয়রাতের ছওয়াব ধ্বংস হয়। "রিয়া—লোক-দেখানো উদ্দেশ্য" দ্বারাও ছদ্‌কাহ্‌, খয়রাত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাৎ ইত্যাদি নেক আমল সমূহের ছওযাব ধ্বংস হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর গোনাহ বা পাপ আছে, যদ্দ্বারা সারা জীবনের সকল প্রকার নেক আমলই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। উহা হইল কুফুরী ও শেরেক জনিত গোনাহ। এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কার্য্যেও যাবতীয় নেক আমলের ছওয়াব ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া পবিত্র কোরআন ছুরা "হুজুরাতে" ইঙ্গিত রহিয়াছে। (বয়ানুল কোরআন দ্রষ্টব্যঃ)।

তৃতীয়তঃ অখাদ্য-কুখাদ্য দ্বারা যেমন মানুষের স্বাস্থ্য, দেহ ও বল শক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে এবং সেই ক্ষতি অনেক সময় এত অধিক হয় যে, উহাকে তাহার ধ্বংস বলিয়াও আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে! তদ্রূপ সব রমক গোনাহ ও পাপের দ্বারাই সকল প্রকার নেক আমলই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে—নেক আমলের বল-শক্তি

বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। যাহার ফলে নেক আমলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ অধিক নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা—আগ্রহ বর্দ্ধিত করা, দেলের মধ্যে বিশেষ নূর ও আলোর সঞ্চার করা যাহার সাহায্যে অন্যান্য নেক আমলের দ্বার উন্মুক্ত হয়—সত্যকে দেখিবার ও বুঝিবার পথ প্রশস্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। গোনাহ ও পাপের দরুন নেক আমলের উক্ত ক্রিয়া ভয়ানকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এমনকি নেক কার্য্যের বাহ্যিক ও সাধারণ খোলসটি মুর্দ্দা লাশের ন্যায় বাকি থাকিলেও তাহার বল-শক্তি এতই ক্ষীণ হইয়া যায় যে, উহাকে তাহার জন্য ধ্বংস বলা যায়।

চতুর্থতঃ নেক আমল করার পর গোনাহ করিতে থাকিলে এবং নিয়মিত তওবার দ্বারা উহার প্রতিকার না করিলে স্বভাবতঃই গোনাহের আধিক্যে তাহার নেক আমল আবৃত ও নিমর্জ্জিত হইয়া যাইবে, ফলে আল্লাহ তায়ালার নিকট সে পাপীদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য হইবে এবং নেক আমলের সুফল তথা দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ বিলম্বিত ও বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার নেক আমল তাহার পরিত্রাণের প্রথম পর্য্যায়ে নিষ্ফল দেখা যাইবে।

১৮৯২। হাদীছঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله "তোমাদের অন্তরে যে সব খেয়াল বা ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে উহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ—আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের হইতে লইবেন।" এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী আয়াত দ্বারা ইহা মনছুখ হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ—তৃতীয় পারা ছুরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহের একটি আয়াত—

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ—তোমাদের অন্তরে ও মনে যে সব কু-খেয়াল, কু-ধারণা, কু-কথা বা খারাব ইচ্ছা জন্মে তোমরা মুখে ও কার্য্যে উহা প্রকাশ কর বা অন্তরের মধ্যেই গোপন রাখ—উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিকে ঐ সবের হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন করিবেন।

মানুষের অন্তরে স্বভাবতঃই নানাপ্রকার কল্পনা, ধারণা, খেয়াল ও ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে এমন এমন খেয়ালও থাকে যাহা মুখে প্রকাশ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায় বা গোনাহগার হয়। এমন এমন ইচ্ছাও থাকে যাহা কার্য্যে পরিণত করিলে গোনাহগার হইতে হয়। এমন এমন কুৎসিত কল্পনাও থাকে যাহা অতি জঘন্য ও গোনার কাজ—এই শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনা মানুষের অন্তরে তাহার

ইচ্ছাকৃত জন্মানো বা দীর্ঘ সময় অন্তরে স্থান প্রদত্তরূপেও হয় আবার কোন কোনটা তাহার ইচ্ছা, বা জন্মদান ও স্থান দান ব্যতিরেকেই তাহার অন্তরে স্বাভাবিক বুদবুদ (bubble) রকমে উদিত হইয়া থাকে। এমনকি এই ধরণের বুদবুদ শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনার সঞ্চার হইতে সর্ব্বদা সারা জীবন মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকা মানবের পক্ষে তাহার স্বভাবের বিপরীত ও অসম্ভব। এই সবকেও যদি গোনাহ গণ্য করা হয় এবং উহা হইতে মুক্ত থাকার আদেশ করা হয়, তবে বলিতে হইবে, মানবকে তাহার শক্তির বাহিরে অসম্ভব কাজের আদেশ করা হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে "ما فى انفسكم......يحاسبكم به الله" যত "কিছু খেয়াল, ধারণা বা কল্পনা ও ইচ্ছা তোমাদের অন্তরে আছে আল্লাহ তায়ালা সবগুলির হিসাব তোমাদের নিকট হইতে লইবেন"—এই ঘোষণার ব্যাপকতায় ঐ অনিচ্ছাকৃত বুদবুদ শ্রেণীর কল্পনাসমূহও বিচারাধীন বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তাই ছাহাবীগণ এই আয়াত নাযেল হইলে পর ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা স্বীয় ভয়-ভীতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকাশে প্রকাশ করেন।

উল্লেখিত আয়াতের শব্দার্থের ব্যাপকতা দৃষ্টে ছাহাবীগণের উপস্থিত ভয়-ভীতি অমূলক ছিল না, তাই হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে ভয়-ভীতি হইতে নিবৃত্ত না করিয়া মূল বিষয়ের সুরাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে লাভ করার ব্যবস্থা স্বরূপ তাঁহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ তাহাই করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা স্বরূপ ছাহাবীগণের পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের ভয়-ভীতি নিরসনের জন্য উল্লেখিত আয়াতের মূল উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দান কল্পে এই আয়াত নাযেল করিলে—لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "মানুষকে আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ঐ শ্রেণীর কার্য্যেই বাধ্য করেন যাহা তাহার শক্তি ও সামর্থ্যের গণ্ডীভুক্ত। অর্থাৎ একমাত্র এই শ্রেণীর কার্য্যেই মানুষের হিসাব ও বিচার হইবে।"

এই আয়াতের দ্বারা পূর্ব্ব আয়াতের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া গেলে যে, অনিচ্ছাকৃত বুদবুদ শ্রেণীর খেয়াল ও কল্পনা সমূহ হিসাব ও বিচারাধীন হইবে না।

আলোচ্য হাদীছে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আয়াতকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন, পূর্ব্ব বর্ণিত আয়াতটি এই আয়াত দ্বারা মনছুখ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ উহার মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য ব্যাপক নহে ; বরং ইচ্ছাকৃত জন্মানো বা দীর্ঘ সময় অন্তরে স্থান প্রদত্ত খেয়াল ও পাকা পোক্তা ইচ্ছা যাহা কোন প্রতিবন্ধক না হইলে কার্য্যে পরিণত হইত—একমাত্র ইহাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এবং উহাই হিসাব ও বিচারাধীন হইবে।

১৮৯৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করিলেন—

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ - فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ -

অর্থাৎ কোরআন পাকে এক শ্রেণীর আয়াত আছে যাহার অর্থ ও মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন—এই শ্রেণীর আয়াতসমূহই পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যস্থল। পক্ষান্তরে আর কিছু আয়াত আছে যাহার অর্থ বা মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন নহে। যাহাদের অন্তঃকরণ ও বিবেক-বুদ্ধি বক্র তাহারা লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ঐরূপ আয়াতগুলির কোন একটা অর্থ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ঐ শ্রেণীর আয়াত কয়টির পিছনেই পড়িয়া থাকে। (ছুরা আলে-এম্‌রান—৩পাঃ ৯রুঃ)

এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়া হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহাদিগকে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াতের পিছনে লাগিয়া থাকিতে দেখ তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখ—তাহাদিগকেই আল্লাহ তায়ালা বক্র বুদ্ধি-বিবেকধারী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে এক শ্রেণীর আয়াত আছে যাহার অর্থ, মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপে বা আল্লাহ ও আল্লার রস্থলের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্ট ও স্থিরকৃত হইয়া আছে। মানবের জীবন-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন যাহা পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্য তাহা এই শ্রেণীর আয়াত সমূহের মধ্যে রহিয়াছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ কোরআন এই শ্রেণীরই। অবশ্য গুটি কয়েক আয়াত এই শ্রেণীরও রহিয়াছে (১) যাহার সঠিক অর্থ আল্লাহ বা আল্লার রস্থল ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই। যেমন, কোন কোন ছুরার আরম্ভে বিচ্ছিন্ন হরফ সমূহ যথা—আলিফ-লাম-মীম। (২) অথবা শব্দার্থ জানা থাকিলেও নির্দ্ধারিতরূপে উহার তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহ বা আল্লার রস্থল কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয় নাই, মানব জ্ঞানেও উহা স্থির করা সম্ভব নহে। যথা, আল্লাহ তায়ালার জন্য يد—ইয়াদ্ যাহার শাব্দিক অর্থ "হাত" استوا على العرش শাব্দিক অর্থ "আরশের উপর উপবিষ্ট" ইত্যাদি বিষয়-বস্তু পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে এবং ঈসা (আঃ) সম্পর্কে كلمة الله—কলেমাতুল্লাহ, শাব্দিক অর্থ "আল্লার কলেমা" উল্লেখ আছে। এই ধরণের কতিপয় বিষয়-বস্তু কোন কোন আয়াতে উল্লেখ আছে

যাহার একটা সাধারণ শব্দার্থ জানা গেলেও সঠিক তাৎপর্য্য স্থিরকৃত নাই। এই শ্রেণীর আয়াত কয়টির সঙ্গে মানবের জীবন-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন মোটেই বিজড়িত নহে। ইহার সংখ্যাও অতি সামান্য, এতদসত্ত্বেও বক্র বুদ্ধি-বিবেকীরা এই শ্রেণীর আয়াত কয়টির পিছনে লাগিয়া থাকে ; প্রথম শ্রেণীর আয়াত সমূহ যাহা পবিত্র কোরআনের প্রায় সমগ্র অংশ এবং মানবের জীবন-ব্যবস্থা ও তাহার কল্যাণ ও পরিত্রাণ উহারই সঙ্গে বিজড়িত, তাহারা উহার আমল ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে না—ইহাই তাহাদের পরিচয় ও প্রমাণ যে, তাহাদের উদ্দেশ্য পবিত্র কোরআনকে আয়ত্ত করা নয়, বরং তাহাদের উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং অনধিকার চর্চ্চারূপে ঐ আয়াতের কোন একটা অর্থ দাঁড়া করান, অথচ উহার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন।

আলোচ্য হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মৎকে ঐ ধরণের লোক হইতেই সতর্ক করিয়াছেন—যেন তাহাদের কথা-বার্ত্তা ও যুক্তি-তর্কের প্রতি কর্ণপাত না করা হয়, তাহাদের ফাঁদে পা না রাখা হয় ;

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করা বিধেয় তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া দিয়াছেন।

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ - وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ

اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

"এই শ্রেণীর আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন। পাকা পোক্তা আলেম ও জ্ঞানীগণ (প্রথম শ্রেণীর আয়াত সমূহের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া শুধু সম্ভবরূপে কোন অর্থ ও তাৎপর্য্যের দৃষ্টান্ত দাঁড় করিতে সক্ষম হইলে তাহা করিয়াও এবং ঐরূপ সক্ষম না হইলে অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহারা) এই ঘোষণা দিয়া থাকেন যে, ইহা আল্লার কালাম। যে অর্থে ও উদ্দেশ্যে আল্লাহ ইহা নাযেল করিয়াছেন আমরা উহার উপর পূর্ণরূপে ঈমান আনিলাম—কোরআনের সমুদয় অংশই আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নাযেল হইয়াছে।"

১৮৯৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আবী মোলায়কাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোন এক গৃহে দুইটি নারী মালা গাঁথিতেছিল। হাঠৎ তাহাদের একজন চিৎকার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতের মধ্যে সুচ বিদ্ধ ছিল এবং সে তাহার অপর সঙ্গিঁনীর উপর দাবি করিতে ছিল (যে, সে-ই এই কাজ করিয়াছে। তথায় অন্য কোন লোক উপস্থিত না থাকায় সাক্ষী ছিল না।)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাহাবীর সম্মুখে এই ঘটনার বিচার পেশ করা হইলে
তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন,
লোকদের দাবি-দাওয়া যদি শুধু তাহাদের মুখের কথার উপর মানিয়া লওয়া
হয়, তবে তাহারা পরস্পর একে অন্যের জান-মাল বিনা বাধায় হরণ করিতে
সক্ষম হইবে, (সুতবাং দাবীর সঙ্গে সাক্ষী অবশ্যই হইতে হইবে, সাক্ষী না
থাকিলে বিবাদীকে কসম খাইয়া দাবী খণ্ডন করার সুযোগ দিতে হইবে। এই
ঘটনায় যেহেতু সাক্ষী নাই, তাই বিবাদিনীকে কসম দেওয়া হইবে। সে যাহাতে
মিথ্যা কসম না করে সেজন্য) তাহাকে মহান আল্লাহ তায়ালার (যাঁহার নামে
কসম খাইতে হইবে) আজাবের ভয় স্মরণ করাও এবং মিথ্যা কসমের ভয়াবহ
পারিণতির যে সতর্কবাণী পবিত্র কোরআনে আছে তাহাও তাহাকে পড়িয়া শুনাও—

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

"নিশ্চয় যাহারা আল্লার নামের শপথ ও আ'হ্দ করিয়া (মিথ্যা দাবির
মাধ্যমে) হীন মূল্যের দুনিয়ার কোন স্বার্থ সিদ্ধি করিবে আখেরাতে তাহারা কোন
মঙ্গলেরই ভাগী হইবে না এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সঙ্গে
কোন কথাই বলিবেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না এবং (তাহাদের
গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া) তাহাদিগকে পরিচ্ছন্নও করিবেন না, ফলে তাহারা
ভয়ানক কষ্টদায়ক আজাব ভোগ করিতে থাকিবে।" (৩ পারা ১৬ রুকূ)

উপস্থিত লোকগণ বিবাদীনীকে আল্লার ভয় স্মরণ করাইয়া এবং উক্ত আয়াত
পড়িয়া শুনাইয়া কসম খাইতে বলিলে সে মিথ্যা কসম পরিহার করিয়া বাদিনীর
দাবি স্বীকার করিয়া নিল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, সাক্ষ্যের
সুযোগ না হইলে কসমের সাহায্যেও সত্য প্রকাশ হইয়া যায়; এই জন্যই
হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাদীর পক্ষে সাক্ষী না
থাকিলে) বিবাদীর উপর কসম প্রবর্ত্তিত হইবে।

১৮৯৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্
তায়ালা বলিয়াছেন :—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"(হে মোহাম্মদের (দঃ) উম্মৎ বা দল !) তোমরা সর্ব্বোত্তম দল ; বিশ্বমানবের পক্ষেও তোমরা উত্তম ; তোমরা মানব সমাজকে ভাল পথে পরিচালিত করিয়া থাক এবং মন্দ পথে বাধা দিয়া থাক।" (৪র্থ পারা ৩ রুকু)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, ইসলামের কর্ম্ম-সূচী জেহাদ ফীছাবিলিল্লাহ্ মোহাম্মদী উম্মৎ বা দলের উত্তমতারই অন্তর্ভুক্ত । এই জেহাদের মাধ্যমে মোসলমানগণ (কাফের জাহান্নামী) লোকদেরে গলায় শিকল দিয়া আনে, অতঃপর ঐ লোকগণই স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করিয়া নেয় (এবং বেহেশতের অধিকারী হয়।)

ব্যাখ্যা—জেহাদ সম্পর্কে বহু সমালোচনা হইয়া থাকে, কিন্তু আবু হোরায়রা (রাঃ) যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই কর্ম্ম-সূচীটিও অতি উত্তম। যেমন ভাঙ্গা হাত-পা নির্ম্মমভাবে প্লাষ্টার করিয়া উহাতে আবদ্ধ রাখা হয়—এই প্লাষ্টার কর্ম্ম-সূচী যে, একটি উত্তম কর্ম্ম-সূচী তাহাতে সন্দেহ আছে কি ? তদ্রূপ ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততিগণকে যে, নামায-রোযা ইত্যাদি ভাল কার্য্যের জন্য তাম্বিহ-তাকিদ করিতে হয় তাহাও উত্তম কর্ম্ম-সূচীরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা শাস্তি মূলক আইন বলে মোসলমানদিগকে শরীয়তের পাবন্দী করান—ইহাও উত্তম কর্ম্ম-সূচীরই অন্তর্ভুক্ত।

১৮৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, حسبنا الله ونعم الوكيل হাছ্‌বু-নাল্লাহু ওয়া-নে'মাল্ ওয়াকীল—"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্ব্বোত্তম কার্য্য-সমাধাকারী" এই মহান বাক্যটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডলিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ বিপদকালে বলিয়াছিবেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) (এবং তাঁহার ছাহাবীগণ) ওহোদের ভয়াবহ বিপদ কালে বলিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ এই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে ঃ—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের খোদা-ভক্ততার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করিয়া আলাহ তায়ালা বলিতেছেন—"যখন প্রোপাগাণ্ডাকারী দল মোসলমানগণকে এই বলিয়া ভয় দেখাইল যে, মক্কাবাসী লোকগণ-(যাহারা তোমাদিগকে ওহোদ রণাঙ্গনে ভয়ানকরূপে ঘায়েল করিয়া গিয়াছে সেই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমশালীরা তোমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার পরিকল্পনা লইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিয়া চল।

(এই হুমকি মোসলমানদের ভীতির কারণ হইল না, বরং) তখন মোসলমানগণের ঈমানী বল অধিক বাড়িয়া গেল। তাঁহারা এই বলিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন যে, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কার্য্য-সমাধাকারী।"

ব্যাখ্যা ঃ— বিপদের সময় এই মহান বাক্যটির জপনা উত্তম। মুখে জপার সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ও সর্ব্ব-শক্তিমত্বার ধ্যানকে সুদৃঢ় করিবে এবং কার্য্যেও খোদা-ভীরুতা খোদা-ভক্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপে উল্লেখিত বাক্যের পূর্ণ সাধনা করিতে হইবে।

১৮৯৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদল মোনাফেক লোক এই ধরনের ছিল যে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোথাও জেহাদে বাহির হইলে তাহারা টালবাহানা করিয়া পিছনে থাকিয়া যাইত। এবং চাতুরী করিয়া পিছনে রহিয়া গেল, তদ্দরুণ তাহারা খুব স্ফুর্ত্তি করিত। অতঃপর নবী (দঃ) জেহাদ হইতে বাড়ী ফিরিলে তাহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের মিথ্যা বাধা-বিঘ্নের ফিরিস্তি পেশ করিত এবং মিথ্যা কসম করিত (যে, এই সব বাধা-বিঘ্নের দরুনই আমরা যাইতে পারি নাই, নতুবা আপনার সঙ্গে যাইবার জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিতেছিল ;) এইরূপ মিথ্যা ভান করিয়া তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রশংসা লাভের আশা করিত।

সেই মোনাফেকদের গোপন অবস্থা ও তাহাদের পরিণতি ব্যক্ত করিয়া এই আয়াত নাযেল হইল—

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

"যাহারা নিজেদের চাতুরী জনিত কার্য্যের উপর আনন্দিত হইয়া থাকে এবং মিথ্যা ভান করিয়া উহার উপর প্রশংসা লাভের আশা করে। মনে করিও না, তাহারা (তাহাদের গোপন অপকর্ম্মের) আজাব হইতে রেহায়ী পাইবে। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাহারও কোন চালাকি বজ্জাতি গোপন হের-ফের খাটিবে না। উহার পরিণতি হইতে রেহায়ী পাওয়া যাইবে না ; আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরের অবস্থাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত আছেন। উল্লেখিত হাদীছের তথ্যটি উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

১৮৯৮। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে জোবায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً -

আর যদি তোমাদের কাহারও ভয় হয়, এতীম মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে না, সে ক্ষেত্রে (এতীমকে অব্যাহতি দিয়া) অন্য মেয়ে বিবাহ কর—দুইজন, তিনজন এবং চারজন পর্য্যন্ত করিতে পার, কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া আশঙ্কা কর তবে শুধু একজনের উপর ক্ষান্ত হও।" (৪ পারা ১২ রুকু)

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন এতীম মেয়ে কোন মুরব্বির লালন-পালনে থাকে, মেয়েটি (উত্তরাধিকার সূত্রে) ঐ মুরব্বির ধন-সম্পত্তির মধ্যে অংশীদার এবং সুশ্রী ও রূপবতী, তাই সেই মুরব্বি নিজেই (বা তাহার ছেলের সঙ্গে বা অন্য কোন নিজের লোকের সঙ্গে) মেয়েটিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চায়, কিন্তু অন্য লোক তাহাকে যে পরিমাণ মহর দিবে সেই পরিমাণ মহর সে তাহাকে দিতে চায় না।

এইরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযেল করিয়া আল্লাহ তায়ালা সেই মুরব্বিকে নিষেধ করিয়াছেন—ঐ মেয়েকে পূর্ণ মহর না দিয়া এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মেয়েদের সমপরিমাণ মহর না দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। বরং এই অবস্থায় তাহাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, সে ঐ এতিম মেয়ে ভিন্ন অন্যত্র নিজের খাহেশ মোতাবেক কোন মেয়েকে বিবাহ করিবে।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এতিম মেয়েদের সম্পর্কে উক্ত নিষেধাজ্ঞা নাযেল হওয়ার কিছু দিন পর পুনরায় কতিপয় লোক উক্ত কড়াকড়ির কিছুটা শিথিলতার আশায় রসুলুল্লার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (ঐ শ্রেণীর) মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ব কড়াকড়ি বহাল থাকার ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযেল হইল—

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى

الْكِتٰبِ فِى يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِى لَا تُؤْتُوْنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ

وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ -

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, "তাহারা আপনার নিকট (এতীম) মেয়েদের সম্পর্কে মছ্‌আলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ঐ মেয়েদের (মহর মিরাস ইত্যাদি) সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দেশই এখনও দিতেছেন (যে, তাহাদের মিরাস পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে হইলে অন্যের ন্যায় তোমাকেও পূর্ণ মহর দিতে হইবে)। এতদ্ভিন্ন কোরআনের কতিপয় আয়াত যাহা সর্ব্বদা তোমাদের পড়া-শুনার মধ্যে আসিতেছে সেই আয়াত সমূহও তোমাদিগকে (পূর্ণ মিরাস ও মহর আদায় করার) মছ্‌আলাহ শুনাইয়া আসিতেছে—ঐ এতীম মেয়েদের সম্পর্কে যাহাদিগকে সাধারণতঃ তোমরা (ধন-সম্পদ ও রূপশ্রীর দিক দিয়া পছন্দ হইলে বিবাহ করিয়া থাক, (কিন্তু তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হক তাহাদেরে দেওনা (এই যুক্তিতে যে, তাহারা ও আমরা ত পরস্পর আপন জন।) অথচ (ধন ও রূপে কম হইলে) তাহাকে বিবাহ করা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখ, (তখন তোমাদের মনে এই সহানুভূতি জাগেনা যে, তাহারা ত আমাদেরই আপন জন ; আমরাই তাহাকে রাখিয়া নেই।) (৫ পারা ১৫ রুকু)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতীম মেয়েগণ ধনে ও রূপে কম হইলে তাহাদিগকে নিজ বিবাহে রাখা হয় না এবং তাহাদের প্রতি আপন বলিয়া দরদ দেখানো হয় না। সুতরাং যখন তাহারা ধনে ও রূপে পরিপূর্ণ হয় তখন আপন হওয়ার দোহাই দিয়া মহর পুরাপুরি না দিয়া বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

১৮৯৯। হাদীছ ঃ- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত—

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -

"মিরাসের ধন-সম্পদ ভাগ-বণ্টন করাকালে আত্মীয়-স্বজন ও এতীম-মিছকিনগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে উহার কিছু অংশ দান কর এবং কটুক্তি না করিয়া নরমভাবে তাহাদিগকে কথা বল।" (ছুরা নেছা—৪ পারা ১২ রুকু)

এই আয়াতের আদেশটি মনছুখ বা রহিত হয় নাই, এখনও উহা বলবৎ আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—বাগানের ফল সংগ্রহ করা পুকুরের মাছ ধরা ইত্যাদি উপলক্ষে দেশপ্রথারূপেও পাড়াপ্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে কিছু অংশ দেওয়ার রীতি আছে। কিছু কাল পূর্ব্বেও ইহা বেশ প্রচলিত ছিল, অবশ্য বর্ত্তমান অমঙ্গলের যুগে ইহা শিথিল হইয়া চলিয়াছে। আলোচ্য আয়াতের আদেশটি ঐ শ্রেণীর

সহানুভূতিসূচক প্রথারই অন্তর্ভুক্ত। জগতে সহানুভূতির দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে উক্ত আয়াতের আদেশটিকে মনছুখ বলা হইল; উহার প্রতিবাদেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করিয়াছিলেন। অবশ্য মিরাসের মালিক নাবালেগ উত্তরাধিকারীগণের অংশ হইতে ঐরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনের অধিকার কাহারও নাই; সে ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর উপস্থিতবর্গকে নরমভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবে।

১৯০০। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ) সমভিব্যাহারে পায়ে হাটিয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। ঐ সময় আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম; হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং অজু করিয়া আমার উপর অজুর পানির ছিটা দিলেন। তাহাতে আমার হুস ফিরিয়া আসিল। (তখনও মিরাসের বিধান প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাই) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে কি করিব? তখন মিরাস বণ্টনের আয়াত নাযেল হইল। (৪ পারা ১৩ রুকু)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ......

১৯০১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অন্ধকার যুগে এই নীতি ছিল যে, কোন মানুষ মারা গেলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার স্ত্রীরও অধিকারী হইত। সেই স্ত্রী বা তাহার মুরব্বিগণের মতামত ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকারীগণের কেহ তাহাকে বিবাহ করিয়া রাখিত বা কাহারও নিকট বিবাহ দিয়া দিত বা বিবাহহীন অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া দিত। সেই কুনীতি রদ করার জন্য পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জায়েয নহে, নারীদের উপর জবরদস্তিমূলক উত্তরাধিকার স্বত্ব স্থাপন করা। আর তাহাদিগকে প্রদত্ত মালের কিছু অংশ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।" (৪ পারা ১৩ রুকূ)

১৯০২। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমাকে কোরআন পাক পড়িয়া শুনাও ত! আমি আরজ করিলাম, আমি আপনাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইব? অথচ আপনার উপরই কোরআন নাযেল হইয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার মনে চায় অন্যের মুখে কোরআন শুনিতে। সেমতে আমি

ছুরা নেছা পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি তেলাওয়াত করিলে হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, থাম। তখন আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাঁহার দুই চোখ হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতেছে। সেই আয়াতটি এই—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا -

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا -

"কি উপায় হইবে তখন! যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের সম্মুখে (তাহাদের আল্লাহ-দ্রোহিতার উপর তাহাদের নবীগণকে) সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব এবং আপনাকে (আপনার যুগের) এই নাফরমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। (রাজ-সাক্ষী--নবীগণের বিবৃতি দ্বারা খোদাদ্রোহীগণের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা তখন শাস্তি ভোগে বাধ্য হইয়া পড়িবে।) যাহারা খোদাদ্রোহী ও রসুলের নাফরমান ছিল তাহারা সেই সময় এই আকাঙ্খা করিবে—তাহাদিগকে যদি মাটির সহিত বিলীন করিয়া দেওয়া হইত! (আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্মুখে ঐ দিন এমনভাবে সাক্ষী-সাবুদ পেশ করিবেন যে,) তাহারা কোন একটি কথাও গোপন রাখিতে পারিবে না। (ছুরা নেছা—৫ পারা ৩ রুকু

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত আয়াতে হাশর-ময়দানের একটি বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অপরাধী লোকদের নিরুপায় নিঃসহায় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং হযরতের অপরাধী উম্মতগণের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাঁহাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। এই সব বিবরণে নবী নিজকে সামলাইতে পারেন নাই, তাই কাঁদিয়া উঠিয়াছেন।

১৯০৩। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا -

"যে ব্যক্তি কোন মোসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম। তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও লা'নৎ হইবে। তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা অতি বড় আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াত সম্পর্কে লোকদের মতভেদ হইল (যে, মোসলমানকে হত্যাকারী মোসলমান হইলেও চিরকালের জন্য দোযখী হইবে—এই মর্ম্মে উক্ত আয়াতের বিবরণ মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে, না—বহাল রহিয়াছে ?) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে এই আয়াতই শরীয়তের সর্ব্ব শেষ সিদ্ধান্ত, অতঃপর ইহার পরিবর্ত্তনকারী অন্য কোন আয়াত নাযেল হয় নাই।

১৯০৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দারুল-হরব তথা শত্রুদেশের কোন অঞ্চলে এক ব্যক্তি এক দল বকরি নিয়া যাইতেছিল। তথায় উপস্থিত মোসলমান সৈনিকগণ তাহাকে পাকড়াও করিতে গেলে সে (তাহার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশার্থে) তাহাদিগকে "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিল। মোসলমান সৈনিকগণ (তাহার সালাম করাকে জান-মাল বাঁচাইবার বাহানা মনে করতঃ তাহাকে কাফের ভাবিয়া) হত্যা করিল এবং তাহার বকরি দল হস্তগত করিল। এই ঘটনা সম্পর্কেই এই আয়াত নাযেল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا - وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ - كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا - إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا -

"হে মোমেনগণ! তোমরা জেহাদের পথেও (অর্থাৎ যুদ্ধাঞ্চল এলাকায়ও কোন কাজ করিতে) খুব সতর্কতা অবলম্বন করিও। কোন ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে (যে কোন আকারে) আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহা এই বলিয়া উড়াইয়া দিও না যে, (তুমি জান বাঁচাইবার জন্য ইহা করিয়াছ,) তুমি মোসলমান নও। (মনে হয় যেন) তোমরা ক্ষণস্থায়ী জেন্দেগীর সম্পদ (বকরি দল) হস্তগত করিতে তাড়াহুড়া করিয়াছ। তোমাদের বুঝা উচিৎ, আল্লাহ তায়ালার বিধান মোতাবেকই বহু গণিমত ও ধন-সম্পদ লাভ করার সুযোগ তোমাদের জন্য রহিয়াছে। ইসলামের পূর্ব্বে অন্ধকার যুগে অবশ্য তোমরা এরূপই ছিলে (যে, জাগতিক ধন-সম্পদের জন্য বিনা দ্বিধায় মানুষ খুন করিয়া ফেলিতে,) কিন্তু (ন্যায় ও শান্তির বাহক ইসলাম তোমাদিগকে দান করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবাণী করিয়াছেন। অতএব এখন (আর তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় উশৃঙ্খলরূপে চলিও না,) সতর্কতা

অবলম্বন করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কার্য্যের খবর রাখেন। (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—কাহাকেও হত্যা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তাহার বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর বিচার একমাত্র আল্লাহই করিবেন। কারণ, তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন, অন্য কেহ সঠিকরূপে তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং প্রাণে বধ করিয়া ফেলার ন্যায় এত বড় কাজের ফয়ছালা উহার উপর অন্য কেহ করিতে পারে না।

১৯০৫। হাদীছ ঃ—জায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে সদ্য অবতারিত এই আয়াতটি লেখাইলেন—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"যে সমস্ত মোমেন ঘরে বসিয়া জীবন কাটায় তাহারা এবং যাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদ করে তাহারা—উভয়ে সমপর্য্যায় গণ্য হইবে না।"

যখন হযরত (দঃ) আমাকে এই আয়াতটি লেখাইতে ছিলেন, সেই সময় (অন্ধ ছাহাবী) আবদুল্লা ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (এই আয়াতে জেহাদে আত্মনিয়োগকারী নয়—এমন ব্যক্তির সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহার মর্য্যাদা কম বলা হইয়াছে। আমিও ত গৃহে বসিয়া থাকি, অন্ধ হওয়ার কারণে জেহাদে যাইতে পারি না।) কসম খোদার—যদি আমি জেহাদে যাইতে সক্ষম হইতাম (—আমার চক্ষু ভাল থাকিত) তবে নিশ্চয় আমি জেহাদে আত্মনিয়োগ করিতাম। তিনি অন্ধ ছিলেন, তাই এই আক্ষেপ ও অনুতাপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালা অহী নাযেল করিলেন। অহী নাযেল হওয়া অবস্থায় হযরতের উরু আমার উরুর উপর ছিল। উহা এত অধিক ভারী মনে হইতে ছিল যেন আমার উরু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কিছু সময় পরেই সেই অবস্থা দূর হইয়া গেল। এইবার উক্ত আয়াতটি এইরূপে নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"মোমেনগণের মধ্যে যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে, অথচ কোন অক্ষমতার কারণে নহে এবং যাহারা আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগ করে তাহারা উভয়ে সমপর্য্যায় গণ্য হইবে না। (ছুরা নেছা—১৩ পারা ৫ রুকু)

এইবার "غير اولى الضرر—অক্ষমতার কারণে নহে" বাক্যটি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল; অন্ধ-খঞ্জ ইত্যাদি অক্ষমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া।

১৯০৬। হাদীছ ঃ— মোহাম্মদ ইবনে আবহুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (সিরিয়ার অধিপতির বিরুদ্ধে যখন ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কায় স্বীয় খেলাফৎ কায়েম করিলেন তখন তিনি সিরিয়াস্থ শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সেই উপলক্ষে) মদীনাবাসীদের মধ্য হইতে এক দল যোদ্ধা—নির্ব্বাচন করা হইল। তাহাদের মধ্যে আমার নাম লেখা হইল। (সিরিয়ার মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে মনে দ্বিধাবোধ হইতেছিল,) আমি আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশিষ্ট শাগের্দ ও খাদেম একরেমাহ্ (রঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে ঘটনা বলিলাম। তিনি আমাকে এই যুদ্ধে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিলেন এবং (যুদ্ধ না করিয়া শুধু দলের সঙ্গে থাকিবার উদ্দেশ্যে যাওয়াও নিষিদ্ধ—তাহা বুঝাইবার জন্য) তিনি আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। হাদীছটি এই—

কিছু সংখ্যক লোক মক্কায় ইসলামাবলম্বী ছিল, তাহারা (হিজরত করে নাই,) মোশরেকদের সঙ্গেই থাকিত। এমনকি, মোশরেকগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোকাবিলায় যুদ্ধে আসিলে বাধ্য হইয়া ঐ গোপন ইসলামাবলম্বীগণও মোশরেকদের দলভুক্ত হইয়া আসিত। (মোসলমানদের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু) তাহাদের দ্বারা মোশরেকদের দল ভারী দেখাইত। এমতাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে আকস্মিক তীর বা তরবারির আঘাতে ঐ শ্রেণীর কোন ইসলামাবলম্বী নিহত হইত। তাহাদের সম্পর্কে এই সুদীর্ঘ আয়াতটি নাযেল হইল—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ - قَالُوا

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ - قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً

فَتُهَاجِرُوا فِيهَا - فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ - وَسَاءَتْ مَصِيرًا...

অর্থ—নিশ্চয় জানিও, যে সমস্ত লোকদের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতার উপস্থিতি এমন অবস্থায় হয় যে, তাহারা (হিজরত না করিয়া) নিজেদেরকে গোনাহগার সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাদিগকে ঐ ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা তত্ত্বত্তরে বলে, আমরা

স্বীয় দেশে পরাভূত দুর্ব্বল ছিলাম (তাই দ্বীনের অনেক কাজই আমরা করিতে সুযোগ পাই নাই)। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, খোদার সৃষ্ট জগৎ কি প্রশস্ত ছিল না? (ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া) তুমি অন্যত্র (যথায় তুমি আল্লার দ্বীন অনুযায়ী চলিতে সক্ষম হইতে) চলিয়া যাইতে? (তখন তাহারা নিরুত্তর হয় এবং তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়)। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে যাহা অতিশয় নিকৃষ্ট স্থান। অবশ্য বালক, নারী, অক্ষম পুরুষ—এই শ্রেণীর দুর্ব্বল লোকগণ যাহারা উপায়হীন এবং হিজরতের পথ অবলম্বনে অক্ষম তাহাদের সম্পর্কে আশা করা যায়, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল। যে কেহ আল্লার পথে দেশ ত্যাগ করিবে নিশ্চয় সে সৃষ্ট জগতে অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা অনেকই পাইবে। (৫ পারা ১১ রুকু)

ব্যাখ্যা—কোন কোন হাদীছে এই বিষয়ের আরও একটু বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মক্কায় এক দল লোক গোপনে গোপনে ইসলাম কবুল করিয়াছিল, (কিন্তু প্রকাশ্যে কাফেরদের সঙ্গেই থাকিত)। বদরের যুদ্ধের দিন কাফেররা তাহা-দিগকে মোসলমানদের বিরুদ্ধে দলভুক্ত করিয়া নিয়া আসিল এবং তাহাদের কেহ কেহ তথায় নিহত হইল। সেই নিহতদের পক্ষে ছাহাবীগণ বলিলেন, উহারা ত মোসলমানই ছিল; জবরদস্তিমূলক তাহাদিগকে মোসলমানদের বিরুদ্ধে বাহির করা হইয়াছিল—এই বলিয়া তাঁহারা তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযেল হইল।

মোসলমানগণ এই আয়াতটি লিখিয়া ঐ শ্রেণীর অবশিষ্ট লোকদের নিকট মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে না। এই সংবাদ পাইয়া ঐ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক মক্কা ত্যাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কাফেরগণ তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং নির্য্যাতন করিল। তাহারা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গেল, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযেল হইল—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ

النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ -

"কোন কোন লোক দাবি করিয়া থাকে, আমরা আল্লার উপর ঈমান আনিয়াছি। অতঃপর যখন আল্লার রাস্তায় তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন লোকদের দ্বারা প্রাপ্ত কষ্টকে আল্লার আজাবের সমান দেখে। (আল্লার আজাবের পরওয়া না করিয়া মানুষের দেওয়া কষ্ট-যাতনায় ইসলাম ত্যাগ করে। নতুবা আল্লার আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য চরম নির্য্যাতনেও ইসলামকে আঁকড়াইয়া থাকিত)।" (২০ পাঃ ১ রুঃ)

মোসলমানগণ এই আয়াতটিও লিখিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, ইহাতে ঐ শ্রেণীর লোকগণ খুবই চিন্তিত ও অনুতপ্ত হইল। অতঃপর এই আয়াত নাযেল হইল—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ -

"অবশ্য যাহারা নির্য্যাতনের পর হিজরত করিবে, তারপর সেই পথে সকল প্রকার বাধা-বিঘ্নের মোকাবিলা করিয়া চলিবে এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে—এই সব কার্য্য করিলে তোমাদের পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে ক্ষমাশীল দয়াবান হইবেন।" (১৪ পারা—২০ রুকু)

মোসলমানগণ এই আয়াতটিও মক্কায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে তাহারা আশার আলো পাইয়া হিজরত করিল। এইবারও কাফেররা তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে আসিলে, তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হইল। কেহ কেহ শহীদ হইলেন, কেহ কেহ বাঁচিয়া চলিয়া আসিলেন। (ফৎহুলবারী ৮—২১২)

এই উপলক্ষে আরও একটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে—(ইসলামী জেন্দেগী মোতাবেক চলা যায় না এমন পরিবেশ ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া না আসার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে) উল্লেখিত আয়াত নাযেল হইলে পর এক বৃদ্ধ যিনি ইসলাম কবুল করিয়া মক্কায়ই রহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি উক্ত আয়াতের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিলেন, যথা সত্বর খাটিয়ার উপর বিছানা কর। আমি উহার উপর শুইব এবং তোমরা আমাকে কাঁধে উঠাইয়া (মদীনায়) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া দিবা। তাহাই করা হইল এবং মক্কা হইতে যাত্রা করা হইল। মক্কা হইতে আড়াই মাইল দুরে তান্‌য়ী'ম নামক স্থানে পৌঁছিলে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেল। তাঁহারই ঘটনা বিবরণ দানে আলোচ্য আয়াত সংলগ্ন এই আয়াতটি নাযেল হইল—

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি হিজরত করতঃ নিজ ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তারপর মৃত্যু আসিয়া যায়, তাহার পূর্ণ ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে; আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (৫ পারা ২১ রুকু)

১৯০৭। ছাদীছ ঃ—আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের নিকট বসিয়াছিলাম, তথায় বিশিষ্ট ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ) পৌঁছিলেন এবং সালাম করিলেন। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, এমন লোকদের মধ্যেও মোনাফেকী সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর লোক পরিগণিত ছিলেন।

এই কথার উপর আসওয়াদ (রঃ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ— اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "নিশ্চয় মোনাফেকরা দোযখের সর্ব্বাধিক গভীরতার তলদেশে থাকিবে।" (অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর লোকদের যদি ঐরূপ অবস্থা হয় তবে আমাদের কি হইবে ?

অতঃপর হোজায়ফা (রাঃ) স্বয়ং তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিল (এই দিক দিয়া যে, তাঁহারা নিজ চোখে স্বয়ং আল্লার রসুলকে দেখিয়াছিলেন, রসুলের কথা শুনিয়াছিলেন, রসুলের ছোহবৎ ও সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন) এই ধরণের কোন কোন লোককেও মোনাফেকী স্পর্শ করিয়াছিল। অবশ্য তাহারা সতর্ক হইয়া তওবা করিলে পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের তওবা কবুল করিয়া পূর্ব্বের মর্ত্তবার অধিকারী করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে স্বীয় দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের উপর অভয় হওয়া চাই না। সর্ব্বদা সতর্ক থাকা চাই যেন মোনাফেকী ইত্যাদির ন্যায় কোন রোগ তাহাকে স্পার্শ করিয়া না বসে।

১৯০৮। ছাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ যদি বলে যে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত প্রচারের কোন বিষয় গোপন রাখিয়াছেন তবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ - وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ -

"হে রসুল ! আপনার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারের জন্য যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার সবটুকুই আপনি প্রচার ও প্রকাশ করিয়া দিবেন। যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি পরওয়ারদেগারের পয়গাম পরিবেশনকারী —রসুল হওয়ার কর্ত্তব্য পালনকারী সাব্যস্ত হইবেন না।" (৬ পারা ১৪ রুকু)

অর্থাৎ এই কড়া আদেশ থাকিতে কি হযরত (দঃ) কোন বিষয় গোপন রাখিবেন ?

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও—মদ, জুয়া আর পূজার মূর্ত্তি এবং লটারী—এই সবই অপবিত্র এবং শয়তানী কার্য্যের বস্তু, তোমরা এই সব বর্জ্জন করিয়া চল। ইহাতেই তোমাদের সাফল্য। শয়তান চায় যে, তোমাদিগকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করিয়া তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে; (যদ্দারা সে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটির ন্যায় বড় বড় পাপ সহজেই করাইতে সক্ষম হইবে।) আর আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামায হইতে বিরত রাখে। (আল্লাহকে ভুলিয়া গেলে সংযত জীবন যাপনের মূল চাবি-কাটিই নষ্ট হইয়া গেল। নামায ছুটিয়া গেলে কুকর্ম্ম ও অপকর্ম্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার লাগামই ছিন্ন হইয়া গেল। এইভাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে গোটা জীবনই ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। অতএব, এখন মদ ও জুয়ার ধ্বংসাত্মক অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছ এবং আমার স্পষ্ট নিষেধ শুনিয়া নিয়াছ?) এখন ত তোমরা অবশ্যই এই সব হইতে বিরত থাকিবে?" (৭ পারা ২ রুকু)

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কেই নিম্নে বর্ণিত হাদীছ খানা—

১৯০৯ হাদীছ :- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিভ আছে, শরাব বা মদ হারাম বলিয়া যেই সময় কোরআনের ঘোষনা নাযেল হইয়াছে তখন মদীনা এলাকায় পাঁচ প্রকার পানীয় মাদক দ্রব্য প্রচলিত ছিল। উহার কোন একটিও আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না।

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে বর্ণিত "خمر—খাম্‌র" শব্দটির অর্থ যাহারা আঙ্গুরের রশে তৈরী মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চায় তাহারা কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী এবং স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যাঁহার উপর কোরআন নাযেল হইয়াছিল ও আরবী ভাষা-ভাষী ছাহাবীগণ—যাঁহাদের সম্মুখে কোরআন নাযেল হইয়াছিল—তাঁহাদের সকলের ব্যাখ্যার বিরোধী ব্যাখ্যাকারী।

কারণ, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা خمر—খাম্‌র শব্দের মাধ্যমে নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ও ছাহাবীগণ উক্ত বিধান মদীনা এলাকায় প্রচলিত পানীয় মাদক দ্রব্যসমূহের উপর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঢোল-শোহরতের মাধ্যমে উহার ব্যবহার এবং লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছিলেন। ঐ সব পানীয় তৈরীর পাত্র সমূহকেও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিলেন। এমনকি ঐ সব পাত্রের সাধারণ ব্যবহারও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত হারাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকদের মালিকানায় পূর্ব্ব হইতে ঐ সব পানীয়ের যে ষ্টক মৌজুদ ছিল, ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে উহা ফেলিয়া দিয়া মদীনা এলাকার রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি সমূহকে প্রবাহিত মদের নালায় পরিণত করা হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আয়াতে মদ বা শরাবকে নিষিদ্ধ হারাম, নাপাক, অপবিত্র ও শয়তানী বস্তু ঘোষনা করিয়া এবং উহা বর্জ্জন করার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া فهل انتم منتهون— তোমরা উহা বর্জ্জন করিবে ত?” প্রশ্ন করা হইলে মদীনার ছাহাবীগণ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—انتهينا ربنا انتهينا ربنا

“হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা চিরতরে উহা বর্জ্জন করিলাম—হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা চির তরে উহা বর্জ্জন করিলাম।”

خمر—খাম্‌র শব্দের মাধ্যমে মদ বা শরাব হারাম হওয়ার বিধান কোরআনে নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হযরত (দঃ) এবং উপস্থিত ছাহাবীগণ এই সব করিয়াছিলেন। অথচ মোসলমানদের এলাকা মদীনা অঞ্চলে তখন যত প্রকার পানীয় মদ ছিল উহার মধ্যে কোনটিই আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না। সুতরাং যে কোন বস্তুতেই তৈরী হউক সকল প্রকার মদই হারাম।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়েও ঐ তথ্যেরই আরও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

১৯১০। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের মদীনা অঞ্চলে পানীয় মদ একমাত্র উহাই ছিল যাহাকে “ফজীখ্‌” বলা হইয়া থাকে (যাহা কাঁচা খেজুরের পচাই দ্বারা তৈরী হয়।)

আনাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমি (আমার মাতার দ্বিতীয় স্বামী—ছাহাবী) আবু তাল্‌হার গৃহে তাঁহার সঙ্গে কতিপয় ছাহাবীকে ঐ মদ পান করাইতে ছিলাম। এমতাবস্থায় তথায় এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং বলিল, আপনারা খবর পান নাই কি? সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্‌ খবর? সে বলিল, শরাব হারাম হওয়ার ঘোষণা হইয়াগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলে আমাকে মদের কলসগুলি ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন। ঐ একজন মাত্র লোকের সংবাদেই তাঁহারা উহা করিলেন। এ সম্পর্কে আর অধিক যোগ-জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

১৯১১। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি খলীফা ওমর (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই ভাষণ দিতে শুনিয়াছি ঃ—

হে লোক সকল! খাম্‌র—মদ বা শরাবকে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তোমরা জানিয়া রাখিও, উহা (শুধু আঙ্গুরের রশে তৈরী বস্তুতে সীমাবদ্ধ নহে। রবং উহা) সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার বস্তুতে তৈরী হইয়া থাকে, যথা—আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম ও যব। এতদ্ভিন্ন যে কোন বস্তুর মাদকাতায় হুস্‌-জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, উহাই খাম্‌র বা মদ ও শরাবের শ্রেণীভুক্ত।

১৯১২। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর (মোনাফেক) লোক ছিল যাহারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে হাসি-ঠাট্টা ও রং-তামাসারূপে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকিত। (তাহাদের দেখাদেখি কোন কোন সাদা-সিধা মোসলমান ঠাট্টা ও তামাসারূপে নয়, কিন্তু অসংগত ধরণের প্রশ্ন করিল, যেমন—) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? আর এক ব্যক্তি যাহার উট হারাইয়া গিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উটটি কোথায়? এই শ্রেণীর প্রশ্নকারীদেরকে হুশিয়ার করিয়া এই আয়াত নাযেল হয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না (যাহার মধ্যে এমন উত্তরের সম্ভাবনা থাকে) যাহা প্রকাশে তোমাদের পক্ষে খারাবী হইবে।"

(ছুরা মায়েদাহ্—৭ পারা ৪ রুকু)

ব্যাখ্যাঃ—বিভিন্ন ধরণের লোকগণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে নানা প্রকার অনাবশ্যক, বরং অসংগত প্রশ্নাবলী করিয়া বিরক্ত করিয়া থাকিত। এমনকি একদা তিনি ঐ শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর আধিক্যে উত্ত্যক্ত হইয়া মিম্বারে আরোহণ করতঃ রাগের সহিত বলিলেন, তোমরা প্রশ্ন কর। যত প্রশ্নই করিবা আমি উত্তর দিব। বিশিষ্ট ছাহাবীগণ হযরতের রাগ বুঝিতে পারিলেন। এমনকি তাঁহারা মাথা গোঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সাদা-সিধা রকমের কতিপয় ছাহাবী তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহারা হযরতের উক্তিকে প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করিয়া ঐ অসংগত শ্রেণীর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

(১) আবদুল্লাহ-ইবনে-হোযাফাহ (রাঃ) নামক এক ছাহাবী ছিলেন, তাঁহার আকৃতি স্বীয় পিতা হোযাফাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্য ছিল বিধায় ঝগড়া-বিবাদের সময় লোকগণ তাঁহাকে পিতা সম্পর্কে বিদ্রূপোক্তি করিত। বহু দিন হইতে তিনি এই ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন। আজ

তিনি সুযোগ মনে করিয়া হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পিতা কে? তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হযরত (দঃ) আমার পিতার নাম হোযাফাহ বলিয়া দিলে আর কাহারও কিছু বলিবার অবকাশ থাকিবে না।

(২) আর এক ব্যক্তি (তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল সে) জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কোথায় স্থান পাইয়াছে?

এই শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর উত্তরে এমন একটা দিকের সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহার প্রকাশ মানুষ অবশ্যই খারাব মনে করিবে। যেমন প্রথম প্রশ্নকারীকে হযরত (দঃ) তাহার পিতার নাম হোযায়ফাহই বলিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার বুদ্ধিমতী মাতা তাহাকে তাহার ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, খোদা-নাখাস্তা যদি তোমার মাতার দ্বারা কোন খারাব কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিত যাহা এত দিন গোপন ছিল তবে হযরত (দঃ) ত তোমার প্রশ্নের উত্তরে অন্য ব্যক্তির নাম বলিয়া দিতেন এবং চিরকালের জন্য সর্ব্বসমক্ষে মান-ইজ্জতের সমাধি-রচিত হইত।

দ্বিতীয় প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন—فى النار অর্থাৎ তোমার পিতার বাসস্থান দোযখে। এই বিষয়টি প্রকাশ হওয়া তাহার জন্য খারাব হইল।

আরও একবারের ঘটণা ঃ—হযরত (দঃ) এলান করিলেন, সামর্থ্যবান লোকদের উপর হজ্জ ফরজ। প্রশ্ন করা হইল, প্রতি বৎসর? হযরত (দঃ) কিছু সময় চুপ থাকিবার পর বলিলেন, না—অর্থাৎ মাত্র একবার ফরজ। এই প্রশ্নটিও অবান্তর ছিল এবং সম্ভাবনা ছিল, "হাঁ" বলিয়া দেন—তা হইলে ব্যাপারটা কত কঠিন হইয়া পড়িত! হযরতও এই বিষয়ের ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, لو قلت نعم لوجبت "যদি আমি "হাঁ" বলিয়াদিতাম তবে প্রত্যেক বৎসরের জন্যই হজ্জ ফরজ হইয়া যাইত।"

অসংগত প্রশ্ন সম্পর্কে খারাব উত্তরের সম্ভাবনা অন্ততঃ এতটুকু ত অবশ্যই থাকে যে, তিরস্কার বা রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ হইবে। যেমন এক ব্যক্তির উট হারাইয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তিও পূর্ব্বোল্লেখিত হযরতের ক্রোধজনিত সুযোগদানের কথায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমার উটটি কোথায় হারাইয়াছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিরস্কার ও রাগ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহা অবশ্যই খারাব মনে করা হইবে। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রশ্ন করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে!

বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়, নায়েবে-নবী—আলেমগণের নিকট পরীক্ষামূলক হাসি-তামাসা মূলক বা বিব্রত করার উদ্দেশ্যক অসংগত ও অনাবশ্যক প্রশ্নাবলী করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রশ্ন মোটেই করা চাইনা। আলেমগণের নিকট শরীয়তের বিধান ও আখেরাতের উন্নতির পথ পাইবার উদ্দেশ্যজনক প্রশ্নই করা যাইতে পারে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ -

তফছীর :- অন্ধকার- যুগে দুইটি কুপ্রথা ছিল—(১) দেব-দেবীদের নামে জানোয়ার ছাড়িয়া দেওয়া হইত। (২) বিশেষ বিশেষ জানোয়ার দেব-দেবীদের নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইত ও তাহাদের জন্য নিয়্যত করিয়া রাখা হইত এবং এই সূত্রে ঐ জানোয়ারকে সম্মান করা হইত। "বাহীরাহ্" "ছায়েবাহ্ "অছীলাহ্" "হাম"— এই সব বিভিন্ন নামে ঐ শ্রেণীর জানোয়ারের নাম করণ হইয়া থাকিত।

উল্লেখিত আয়াতে ঐ শ্রেণীর কুপ্রথা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ঐ ধরণের প্রথা আল্লাহ তায়ালা কখনও প্রবর্ত্তন করেন নাই, বরং উহা কাফের-মোশরেকদের গর্হিত কাজ। অবশ্য উহা দ্বারা তাহারা মিছামিছি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দাবি ও আশা করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। (৭ পারা ৪ রুকু)

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত প্রথাগুলির মূল দোষ হইল এই যে, উহা শেরেকী কাজ ; আর শেরেকী কাজ দেব-দেবীর নামে হইলেও যেরূপ পীর-পয়গাম্বর ওলী-দরবেশের নামে হইলেও তদ্রূপই। সুতরাং মোসলমান নামধারী এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে---পীর, ওলী, দরবেশ বা তাহাদের মাজারের ও ওরোসের নামে কোন জানোয়ার ছাড়া হয় কিম্বা কোন জানোয়ারকে ঐ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ঐ নামে নিয়্যত করিয়া উহার তাজিম ও সম্মান করা হয়। এমনকি উহাকে কেন্দ্র করিয়া খানা-পিনার বা গান-বাদ্যের ধুমধাম করা হয়, উহার জুলুস ও মিছিল করা হয় এই সবই শেরেকী কাজ। যেরূপ দেব-দেবীর নামে বা পীর-পয়গাম্বর, ওলী-দরবেশেয় নামে কোন জানোয়ার জবেহ করিলে তাহাও শেরেকী কাজ।

মছ আলাহ :—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামে জানোয়ার জবেহ করিলে যেরূপ উহা মৃত গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলে—নিয়্যত করিয়া রাখিলে, এই অবস্থায় উহাকে আল্লার নামে জবেহ করিলেও উহা হারাম গণ্য হইবে। ঐ জানোয়ারকে হালাল করিতে হইলে উহা জবেহ করার পূর্ব্বে অন্যের নামে নিয়্যত ও নির্দ্দিষ্ট করার কার্য্য হইতে খাঁটী তওবা করিতে হইবে। তারপরে উহাকে আল্লার নামে জবাহ করা হইলে উহা হালালহইবে। (তফছীর বয়ানুল-কোরআন দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে জানোয়ার ছাড়া বা নির্দ্ধারিত করা যে, ইসলামের বা কোন মোসলমানের কার্য্য নহে, বরং উহা জাহান্নামী কাফেরদের প্রবর্ত্তিত প্রথা— নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উহার একটি বিশেষ তথ্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১৯০৩। **হাদীছ**ঃ— আয়েশা (রাঃ) (এক হাদীছে সূর্য্যগ্রহণের নামাযের বিবরণ দান পূর্ব্বক) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায শেষ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ উভয়টিই আল্লাহ তায়ালার (অসীম ও সর্ব্বময় কুদরতের অসংখ্য) নিদর্শন সমূহের দুইটি নিদর্শন। উহা যখন তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায় তখন তোমরা (আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়ার উদ্দেশ্য) নামাযে মশগুল থাক যাবৎনা উহা অপসারিত হইয়া যায়।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, আমার এই নামায পড়াকালে আমাকে পরকালের সব কিছু দেখান হইয়াছে যাহার সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি (আমাকে বেহেশত এত নিকটবর্ত্তী দেখানো হইয়াছে যে,) আমি বেহেশত হইতে আঙ্গুরের একটি ছড়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া ছিলাম; যখন তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, আমি সম্মুখ দিকে আগাইয়া ছিলাম। ঐ সময় আমি দোযখও দেখিয়াছি, উহার অগ্নিশিখাগুলি কিল্‌বিল্ করিতেছিল; তখনই তোমরা দেখিয়াছ, আমি পিছনের দিকে হটিয়া ছিলাম। তখন দোযখের মধ্যে আমর-ইবনে (লুহা'ই) খোযায়ীকে দেখিয়াছি—তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সে ঐগুলিকে হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। সে-ই সর্ব্ব প্রথম দেব-দেবীর (তথা গায়রুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন অন্যের) নামে জীব-জন্তু ছাড়ার প্রথা চালু করিয়াছিল।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا - وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

পাপীদের কোন পাপই আল্লাহ তায়ালার অগোচরে থাকিতে পারে না—তাহা উপলক্ষ্য করিয়া উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও অবগতির অসীম ব্যাপকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। মানুষের কার্য্য-কলাপ ত একটা সাধারণ জিনিষ— "আল্লার এলম তথা তাঁহার অসীম জ্ঞান ও অবগতির আয়ত্তে রহিয়াছে—সমুদয় গায়েব তথা ভূতভবিষ্যতের অগোচর, অদৃশ্য, গোপন কার্য্য কলাপ ও রহস্যাদির ভাণ্ডারসমূহ এবং উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সেই ভাণ্ডার সমূহ বা উহার চাবিকাঠি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও অনুভূতির আয়ত্তে নাই। জলে-স্থলে—যথায় যাহা কিছু ঘটে, ঘটিয়াছে বা ঘটিবে সবই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। (নিবিড় জঙ্গলে গভীর অন্ধকারে ছোট্ট হইতে ছোট্ট) একটি পাতাও যদি ঝরে

তাহাও আল্লার অজ্ঞাতে হইতে পারে না। তাহাও আল্লাহ তায়ালা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকেন। কোন একটি ক্ষুদ্রতম দানা বা বীজ যাহা ভূগর্ভে অন্ধকারের অন্তরালে রহিয়াছে তাহা এবং যত প্রকার তাজা বা শুষ্ক বস্তু রহিয়াছে (সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জানা রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বরং) সব কিছু লওহে-মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে।" (ছুরা আন্‌য়া'ম—৭ পারা ১৩ রূকু)

মহান আল্লার গুণাবলীর অসীমতা সম্পর্কে মানুষ এতটুকুই ভাবিতে পারে—

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم - واز ہرچہ گفتہ ایم وخوا ندہ ایم

হে খোদা! তুমি সব কিছুরই উর্দ্ধে, সব কিছুরই নাগালের বাহিরে—আমাদের অনুমানের, আমাদের কল্পনার, আমাদের ধারণার, আমাদের চিন্তার এবং যতদুর আমরা বলিতে পারি, যতদুর আমরা গবেষণা করিতে পারি।

উল্লেখিত আয়াতে গায়েবের ভাণ্ডারসমূহ বা গায়েবের চাবিকাঠি সমূহ এক মাত্র আল্লাহ তায়ালারই আয়ত্তে বলা হইয়াছে; অর্থাৎ অন্য কেহই সামগ্রিকভাবে গায়েবের সকল বিষয় জানে না। তাহা বুঝাইবার জন্য নমুনা বা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে যাহা সচরাচর সকলের সম্মুখেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐগুলি যে পর্য্যন্ত গায়েব তথা অদৃশ্যের অন্তারালে থাকে সে পর্য্যন্ত কেহই উহাকে নির্দ্দিষ্ট ও সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ঐ অবস্থায়ও ঐগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত থাকেন।

১৯১৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (পবিত্র কোরআনে যে,) গায়েবের ভাণ্ডারসমূহ বা চাবিকাঠি সমূহ (বলা হইয়াছে উহার উদাহরণমালা কোরআনেই অন্যত্র বর্ণিত আছে, তাহা) পাঁচটি। যথা—(১) আগামী কাল কি হইবে, কে কি করিবে তাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ সম্যকরূপে জ্ঞাত নহে। (২) নারীদের গর্ভাশয় যাহা খালাস করিয়া থাকে (খালাস হওয়ার পূর্ব্বে) উহার পূর্ণ অবস্থা সম্যকরূপে আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত নহে। (৩) বৃষ্টি কবে এবং ঠিক কোন সময় বর্ষিবে তাহার পূর্ণ ও সঠিক তথ্য অটল, অনড় ও নির্ভুলভাবে আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত নহে। (৪) কেহই তাহার মৃত্যু কোথায় হইবে তাহা জানে না (আল্লাহ তায়ালা তাহা জানেন)। (৫) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে হইবে তাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না।

(এই প্রসঙ্গে হযরত (দঃ) এই আয়াতটি তেলয়াত করিলেন—)

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ -

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ

تَمُوتُ - إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

আল্লাই জানেন কেয়ামত সম্পর্কে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন। এবং মাতৃগর্ভে যাহা আছে তাহার পূর্ণ হাল অবস্থাও তিনিই জানেন। আর কোন ব্যক্তি নিজেও জানে না, সে আগামী কাল কি করিবে এবং কোন ব্যক্তি নিজেও জ্ঞাত নহে, তাহার মৃত্যু কোন স্থানে হইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (২১ পাঃ—ছুরা লোকমান সমাপ্তে)

ব্যাখ্যা—উল্লেখিত আয়াতে খাজানায়ে-গায়েব তথা গায়েব বা অদৃশ্য বস্তু সমূহের ও গোপন রহস্যাবলীর ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য হাদীছে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ—মাফাতেহুল গায়েব তথা খাজানায়ে-গায়েবের উদাহরণ রূপে উক্ত পাঁচটি বিষয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ; গায়েব সম্পর্কে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আর কাহারও নাই, তাহা চাক্ষুস প্রামাণিকরূপে বুঝাইবার জন্য উক্ত পাঁচটি বিষয়ের উদাহরণ অত্যন্ত উপযোগী।

(১) কেয়ামত কবে হইবে?

সমস্ত লোকই এই ধরাপৃষ্ঠে বসাবস করিতেছে, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক রাজা-বাদশা, নবী-রসুল, পীর-আওলিয়া সকলেই এই বসুন্ধরার অধিবাসী, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না ও পারে নাই—ইহার বিলুপ্তি ও পরিসমাপ্তির দিন কেনটি। নিজ গৃহের খবরই যাহার নাই সে খাজানায়ে-গায়েবের অগণিত রহস্যাবলীর জ্ঞান আয়াত্তকারী কিরূপে হইতে পারে?

(২) বৃষ্টি সম্পর্কীয় সম্যক জ্ঞান:

মানুষের এই আবাসগৃহ ভূমণ্ডলের জীবনী শক্তি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর এবং মানুষের জীবনধারণের উপকরণগুলির অস্তিত্বও সেই বৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল। এমন একটি আবশ্যকীয় বস্তু উহা এবং সকলের সম্মুখেই উহার গমণামন হইতেছে, এতদসত্বেও মানুষ উহার গোপন রহস্যগুলির সম্যক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষ নির্ভুলরূপে এতটুকুও জানে না, ঠিক কোন সময়, কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিবে *। সেই মানুষ খাজানায়ে-গায়েবকে তাহার আওতায় কিরূপে আনিতে

---

* বিজ্ঞানের এই সর্ব্বাত্মক উন্নতির যুগেও যান্ত্রিক সাহায্য যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা পূর্ব্বাভাস মাত্র। নির্ভুল সঠিক সংবাদ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা সম্ভব

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পারে? অবশ্য আল্লাহ তায়ালা উহা এবং উহার সমুদয় সৃষ্টি রহস্যও সম্যকরূপে জ্ঞাত আছেন। কেননা, তিনিই বৃষ্টির এবং উহার বর্ষণ তাঁহারই ক্ষমতা ও আদেশাধীন।

(৩) গর্ভাশয়ের সন্তান সম্পর্কীয় জ্ঞান:

গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কীয় জ্ঞান যে, উহা নর, না—নারী এবং গর্ভ খালাসে সময় বেশী যাইবে না কম তাহাও মানুষ সম্যক, সঠিক ও নির্ভুলরূপে নির্ণয় করিতে অক্ষম। বিজ্ঞানের এই জয়জয়কারের যুগেও তাহা সম্ভব হয় নই। মাতা দীর্ঘ দিন উহা বহন করিয়া থাকে সেও উহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। এত নিকটস্থ এবং এত আঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত একটি বস্তু সম্পর্কে যে মানুষ এত অজ্ঞ সেই মানুষ খাজানায়ে-গায়েবকে কিরূপে জয় করিতে পারিবে?

(৪) আগামী কল্য কি করিবে?

অপরের ত দূরের কথা নিজে আগামী দিন কি করিবে এবং আগামী দিন তাহার পক্ষে কি ঘটিবে সে সম্পর্কেও প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে মানুষ নিজের সম্পর্কেই এত অজ্ঞ সে খাজানায়ে-গায়েবকে কিরূপে জানিতে পারে?

(৫) কোথায় মৃত্যু হইবে?

প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কেই এত অজ্ঞ যে, তাহার ইহজগতের সর্ব্বশেষ অবস্থা যে মৃত্যু সেই মৃত্যু কোন্ সময় কোথায় আসিবে তাহাও সে জানে না। সেই মানুষ অসীম অসংখ্য খাজানায়ে-গায়েবের জ্ঞান জয়কারী কিরূপে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমুদয় গায়েব তথা গুণী-জ্ঞানী, বিজ্ঞানী সমগ্র মানব-দানবেরও দৃষ্টির আগোচরে ও সমগ্র সৃষ্টির অনুভূতির অন্তরালে যে রহস্যমালার অসীম ময়দান ও কূলহীন সমুদ্র আছে তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে বলিয়া পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানেই বিঘোষিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা মানব সমাজকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে—

পবিত্র কোরআন বা প্রেরিত রসুল মারফৎ আল্লাহ তায়ালা যে আদর্শ দান করিয়াছেন এবং উহাতে যে, বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যে আদেশ নিষেধ প্রদান করিয়াছেন, যে যে ভাগ-বন্টন বা সীমা রেখা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন,

---

হয় নাই, হইবেও না। এতদ্ভিন্ন এই পূর্ব্বাভাসও এলমে-গায়েব মোটেই নহে, বরং কোন বস্তুর লক্ষণ দেখিয়া উহার আগমণের ধারণা করা মাত্র, যাহা একটি অতি সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়। যেরূপ আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া বৃষ্টির আগমণ সাধারণ ভাবেই অনুভব করা হইয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে মোটা জিনিষই ধরা পড়ে। তাই এখানেও মোটা নিদর্শনের উপরই নির্ভর করা হয়। যান্ত্রিক সাহায্যে সূক্ষ্ম নিদর্শনও দেখা যায় যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তাই যন্ত্রধারীগণ সাধারণ লোকদের একটু পূর্ব্বে সংবাদ দিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়েই লক্ষণ দেখিয়া বস্তুর আগমণ অনুভবকারী।

উহার (Revise, reform) পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অবকাশ কোন সৃষ্টের জন্য থাকিতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ কোন হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত বিলয়া দৃষ্ট হইলে তাহা সৃষ্টির দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতার কারণেই হইবে। তাই উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আলেমুল-গায়েব সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশকেই মানিয়া চলিতে হইবে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ -

মানুষকে বিপদ-আপদ হইতে আল্লাহ তায়ালাই সুরক্ষিত রাখেন। মানুষ সুখে থাকিয়া আল্লাহ তায়ালাকে যেন ভুলিয়া না যায়, সেই উদ্দেশ্যে মানুষকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেরূপ রক্ষা করিতে পারেন তদ্রূপ তাঁহার নাফরমানী করিলে "তিনি ইহাও করিতে পারেন যে, তোমাদেরে ধ্বংসকারী আজাব পাঠাইয়া দেন উপরের দিক হইতে, (যেমন উপর হইতে শিলা-পাথর বর্ষণ, অগ্নিময় বজ্রপাত, অগ্নিময় বা হিম বায়ু প্রবাহণ, ঝড়, তুফান ইত্যাদি।) বা নীচের দিক হইতে, (যেমন দেশময় প্রলয়কর ভূকম্পন ও ভূধসন ইত্যাদি।) কিম্বা তোমাদের মধ্যে দলাদলী সৃষ্টি করিয়া পরস্পর ঝগরা-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত করিয়া দিতে পারেন।" (ছুরা আন্‌য়া'ম—৭ পারা ১৪ রুকু)

নাফরমানদিগকে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে পূর্ণ শাস্তি দিবেন, দুনিয়াতেও তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য এবং পরবর্ত্তী যুগকে শিক্ষা দান ও সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আজাব পাঠাইবার ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে সেই সব আজাবেরই বর্ণনা দান করা হইয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদের উম্মৎগণ নাফরমানীতে লিপ্ত হইলে তাহাদের উপর উল্লেখিত আজাব সমূহ আসিয়াছে এবং তাহারা উহাতে ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের ধ্বংসের বহু ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে পবিত্র কোরআন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) স্বীয় উম্মতের স্নেহ-মমতা তাহাদের সুখ সুবিধার আকাঙ্খা কোন ক্ষেত্রেই ভুলেন নাই। তিনি ভাবিলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রথম দুই প্রকারের আজাব আসিলে অপরাধীগণ তওবা করার ও সংশোধিত হওয়ার সুযোগ খুব কমই পায় এবং সহসা ধ্বংস হইয়া যায়—যেরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎগণ হইয়াছে। অবশ্য তৃতীয় প্রকারের আজাবটি এরূপ যে, ঐ ক্ষেত্রে

দীর্ঘ দিনের সুযোগ পাওয়া যায় এবং অপরাধীগণ সহসা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় না। তাহারা তওবার ও সংশোধনের সুযোগ পাইতে পারে।

নাফরমান অপরাধীগণকে সতর্ক করিয়া যখন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আজাবত্রয়ের বিবরণ দান করিলেন, তখন অপরাধীগণের পক্ষেও দয়াল নবীর স্নেহ মমতার ঢেউ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন—হে পরওারদেগার! আমার উম্মৎ যদি শাস্তির উপযুক্ত হইয়া পড়ে তবুও তাহাদের উপর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার আজাব পাঠাইওনা। তোমার প্রতি ধাবিত করার উদ্দেশ্যে শায়েস্তা ও সতর্ক করার প্রয়োজনে তাহাদিগকে তৃতীয় প্রকারের আজাব দ্বারা হুশিয়ার করিও, যেন তাহারা তওবা করার এবং সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরতের এই দোয়ারই বর্ণনা হইয়াছে এবং হযরতের এই দোয়া আল্লার দরবারে কবুল হইয়াছে।

১৯১৫। হাদীছ :—ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত নাযেল হওয়াকালের বর্ণনা করিয়াছেন, "عذابا من فوقكم উপরের দিক হইতে আগত আজাব" এর উল্লেখ হইলে সঙ্গে সঙ্গে হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি করজোড়ে তোমার নিকট এই শ্রেণীর আজাব হইতে পানাহ্ চাই এবং "او من تحت ارجلكم—নীচের দিক হইতে আগত আজাব"-এর উল্লেখ হইলে হযরত (দঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট এই শ্রেণীর আজাব হইতেও পানাহ্ চাই। অতঃপর —او يلبسكم شيعا— তোমাদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলী সৃষ্টি করিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত করিতে পারেন" এর উল্লেখ হইলে হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহা পূর্ব্বের দুইটি অপেক্ষা সহজ ও নরম আজাব, (যেহেতু ইহার ক্ষেত্রে তওবা ও সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।)

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল—জাতীয় অনৈক্য, বিভেদ ও দলাদলি তুচ্ছ ও অবহেলার বস্তু নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লার আজাব। জাতিগতভাবে আল্লার নারফরমানী করা হইলে আল্লাহ তায়ালা জাতিকে এই আজাবে লিপ্ত করিয়া থাকেন, তাই ইহা হইতে বাঁচিতে হইলে সম্মিলিতভাবে আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

স্মরণ রাখিবেন—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আজাব ব্যাপক আকারে সমুদয় জাতিকে সহসা ধ্বংস করিয়া দেয়। যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎদের অবস্থা হইয়াছে—তাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মৎকে রেহায়ী দিয়াছেন। কিন্তু এক জনের দ্বারা দশ জনকে সতর্ক করার জন্য স্থান বিশেষে ঐরূপ আজাব এই উম্মতের মধ্যেও আসিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি বা স্থান বিশেষে আসে; ব্যাপকরূপে আসে না।

১৯১৬। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্যই একদিন সূর্য্য তাহার অস্ত যাওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে এবং সকলেই তাহা দেখিতে পাইবে। তৎকালীন বিশ্ববাসী উহা দেখিয়া (বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তাই তখন) সকলেই ঈমান আনিবে, কিন্তু (যাহারা পূর্ব্ব হইতে ঈমানদার ছিল না, শুধু তখন ঈমান আনিয়াছে—তাহাদের ঈমান গৃহিত হইবে না। কারণ,) তখনকার সময়টিই ঐ সময় যখন ঈমান গ্রহণীয় নহে বলিয়া কোরআনের ঘোষণা রহিয়াছে—

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا

ব্যাখ্যাঃ—আল্লার কালাম কোরআন এবং আল্লার রসুল ও তাঁহার বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া বা সৃষ্টিগত সত্য-উপলব্ধি শক্তির প্রভাবে আল্লার প্রতি ইমান আনা, আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লার ভয়ে ও আখেরাতের ভয়ে পাপ হইতে তওবা করা—এই ঈমান ও তওবাই হইল যথার্থ ও ফলদায়ক এবং সেই ঈমান ও তওবাই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে আখেরাতে সকলেই ঈমান প্রকাশ করিবে। কিন্তু সেই ঈমানের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহজগৎ ত্যাগের মুহূর্ত্ত উপনীত হইলে—যখন ফেরেশতা ইত্যাদি দেখার স্বাভাবিক চক্ষু খুলিয়া যায়, তখনকার ঈমান এবং তওবাও গ্রহণীয় নহে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামত অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার কতিপয় বিশেষ নিদর্শন আছে উহা প্রকাশিত হইয়া কেয়ামতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষের পর্য্যায়ে প্রমাণিত হইয়া গেলে তখনকার ঈমান এবং তওবাও গৃহিত হইবে না এই বিষয়টিই এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে—

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ

مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا -

"যে দিন তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে (কেয়ামতের বড় বড় নিদর্শগুলির) বিশেষ নিদর্শনটি প্রকাশ হইয়া যাইবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান ফল-প্রদ হইবে না যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঈমান আনিয়াছিল না। কিম্বা (পূর্ব্ব হইতে ঈমান ছিল, কিন্তু ঈমান অবস্থায় কোন নেক আমল করে নাই—সারা জীবন গোণার কাজে নিমগ্ন ছিল, তওবা করে নাই; সেই দিন ঐ অবস্থা দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইয়াছে এবং তওবা করিয়াছে,) তাহার তওবাও কোন ফল-প্রদ হইবে না।"

(৮ পারা—ছুরা আন্‌য়াম শেষ)

এই আয়াতে যে বিশেষ নিদর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে উহারই ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীছে করা হইয়াছে—উহা হইল সূর্য্য অস্ত যাওয়ার দিক হইতে উদিত হওয়া। কেয়ামত অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাধিক ব্যাপক নিদর্শন এই যে—একদিন সূর্য্য উদিত হওয়ার দিক হইতে উদিত না হইয়া অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ঐদিক হইতে চলিয়া মধ্য আকাশে পৌঁছিবে, পূণরায় ঐ দিকে ফিরিয়া যাইবে এবং স্বাভাবিকরূপে অস্তমিত হইবে। অবশ্য অতঃপর যে কয়দিন দুনিয়া বাকি থাকিবে স্বাভাবিকরূপেই উদিত ও অস্তমিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অস্ত যাওয়ার দিক হইতে সূর্য্য উদয় হওয়া সম্পর্কে ছুরা ইয়াছীনের একটি আয়াতের তফছীরে বর্ণিত একটি হাদীছে কিছু তথ্য রহিয়াছে। নিম্নে ঐ হাদীছটি ৪৫৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

১৯১৭। হাদীছ ঃ—আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্‌দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে! কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজ্‌দা করিবে, কিন্তু তাহার সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে—যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই এই আয়াতের—

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

"(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সূর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।"

ব্যাখ্যা ঃ—সারা সৃষ্টি জগতের পক্ষে কল্যাণময় এই বিশাল সূর্য্য যাহা এই ভুমণ্ডল অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়, যাহার গুণাগুণ বা বিশালতা দৃষ্টে উহাকে এক শ্রেণীর লোক পূজনীয়রূপে বরণ করিয়াছে। আবহমান কাল হইতে সর্ব্ব সমক্ষে সুশৃঙ্খলতার সহিত সূর্য্যের গতিবিধি পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু সূর্য্য তাহার

গতিবিধিতে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাধীন নহে। তাহার জন্য নির্দ্ধারিত নিয়মের চুল পরিমাণ ব্যতিক্রমও সে করিতে পারে না। সুতরাং ইহা বাস্তবিকই মহান আল্লার একত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই বিষয়টিই আলোচ্য হাদীছে সুস্পষ্ট ভাষায় খুলিয়া বলা হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্য ও উহাদের কক্ষগুলি সহ সমুদয় সৌর-জগৎই আরশের নীচে রহিয়াছে। আরশ ত এই সবের সমষ্টি হইতে বহু বহু গুণে সুপ্রশস্ত। সুতরাং সূর্য্য প্রত্যেক অবস্থায় এবং প্রত্যেক স্থানে সদা সর্ব্বদাই আরশের নীচে রহিয়াছে। অতএব, আলোচ্য হাদীছে সূর্য আরশের নীচে যাওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, যে মহাশক্তির পরিচালন-ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে আরশ হইতে* সেই শক্তির করায়ত্ত, অধীনস্থ ও অনুগতরূপে সূর্য্য ঐ ঐ স্থানের দিকে চলিতে থাকে যে যে স্থানকে বিভিন্ন ভূখণ্ডের জন্য সেই মহাশক্তি সূর্য্যের কেন্দ্ররূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, তথায় যাইয়া সূর্য্যকে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে।

আল্লার রসুল বুঝাইতে চাহিতেছেন, আবহমান কাল হইতে যে দেখা যায়, সূর্য্য একদিক হইতে উদিত হইয়া অপর দিকে অস্তমিত হইতেছে। তাহার এই বিরাম-হীন গমনাগমন নিছক স্বেচ্ছাক্রমের ও স্বক্রিয় ভাবের নহে, বরং উহার মূলে রহিয়াছে মহান আল্লার তরফ হইতে তাহার জন্য নির্দ্ধারিত বিভিন্ন কেন্দ্র ও ষ্টেশন অতিক্রম করার আদেশ ও অনুমতি। সুতরাং প্রতীয়মান হইল যে, সূর্য্যও সেই মহাশক্তি তথা মহান আল্লার সম্মুখে একটি নগণ্য অনুগত দাসই বটে। অতএব সূর্য্যকে পূজা না করিয়া মহান আল্লাহকেই একমাত্র পূজণীয় রূপে গ্রহণ করিবে।

সূর্য্যের সেজদা-রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটা সংবাদ স্মরণ করা বিশেষ ফলদায়ক হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"বিশ্চরাচরের প্রতিটি বস্তুই নিজ নিজ কায়দায় সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার তছবীহ পাঠ (তথা গুণ-গান ও পবিত্রতা বর্ণনা) করিয়া থাকে। অবশ্য তোমরা উহাদের তছবীহ পাঠ বুঝিতে ও অনুধাবন করিতে সক্ষম নও।" (১৫ পারা —৫ রুকু)

দার্শনিক কবি মাওলানা রুমীর আর একটি তথ্যও পেশ করা হইল—

خاک و باد و آب و آتش بنده اند - با من وتو مرده با حق زنده اند

আগুন, পানি, বায়ু, মাটি সবই আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা; আমার ও তোমার পক্ষে ঐ শ্রেণীর বস্তুগুলি নির্জীব দেখাইলেও সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়লার পক্ষে ঐ সবগুলিই জীবন্ত!

---

* যেমন একটি লোক লাহোর হইতে খুলনা বা ফরিদপুরের দিকে যাত্রা করিলে বলা যাইতে পারে যে, সে ঢাকার আণ্ডারে যাইতেছে, যেহেতু খুলনা ফরিদপুর এক একটি কেন্দ্র যাহা রাজধানী ঢাকার পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত!

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ...... ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

"আর তোমরা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য—সর্ব্ব প্রকারের নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলী হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিও ঐ সবের ধারে-কাছেও যাইও না।......এই সব আদেশ-উপদেশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যেন তোমাদের কার্য্যকলাপে বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (৮ পারা ৬ রুকু)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ......

"আপনি জগৎবাসীকে জানাইয়া দিন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলীকে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। (ছুরা আ'রাফ—৮ পারা ১১ রুকু)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলী হারাম ও নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে সে সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

১৯১৮। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাল (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শালীনতা বিবর্জ্জিত নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপকে আল্লাহ তায়ালা সকলের চেয়ে অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ফাহেসাকে হারাম করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসাকে সর্ব্বাধিক ভাল বাসিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বর্ত্তমান জগতে শালীনতাহীন নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপই হইল শিক্ষা ও সভ্যতার নিদর্শন এবং উহাই হইল বিভিন্ন মহল ও জল্‌সা-জুলুসের উৎকর্ষ সৌন্দর্য্য ও উজ্জলতা বর্দ্ধণকারী। এমনকি আর্ট ও শিল্প ইত্যাদি নামের অঙ্গভঙ্গী, নৃত্য-গীত ও ফাহেসাবাজীকে জাতীয় উন্নতির উৎস বলা হইয়া থাকে। সরকারী বাজেটে মোটা মোটা অঙ্ক উহার জন্য বরাদ্দ করা হইয়া থাকে।

আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া যাহারা করে না—যাহারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী অমোসলেম তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভব বটে, এবং সাধারণতঃ আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের পক্ষে ইহজগতে উহা বরদাশ্‌ত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা মোসলমান তথা আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া করার বন্দনে আবদ্ধ তাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার ঐরূপ ঘৃণিত ফাহেসা কার্য্যাবলী অবশ্যই কলঙ্কময়! তিনি তাহাদের পক্ষে অনেক সময় উহা বরদাশত করেন না। ফলে তাহারা আল্লার গজবে নিপতিত হয়।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরা খোদা-ভক্ত মোত্তাকী পরহেজগার। কিন্তু তাহাদের ছেলে-মেয়েরা তাহাদেরই খরচায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই শিক্ষা ও পরিবেশে প্রতিপালীত হইতেছে যাহা ঐ নির্লজ্জ ফাহেসা আদৎ-অভ্যাসের মূল উৎস ও সূত্র। নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় ছেলে-মেয়েদিগকে আল্লাহ তায়ালার ঘৃণিত কার্য্যাবলী—নির্লজ্জ ফাহেসা আদৎ-অভ্যাসের আলয়ে প্রতি পালন করিয়া আল্লাহ-ভক্ত কিরূপে হওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই বিবেচ্য বিষয়।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"ক্ষমাগুণ ধারণ কর, সৎ কাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞ লোকদের (বিরক্তিজনক ব্যবহার) হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চল।"

১৯১৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে আদেশ করিয়াছেন—লোকদের অসদাচরণ ক্ষমা করার জন্য। মানবকে এই চারিত্রিক গুণ অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযেল করিয়াছেন।

১৯২০। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে নামায পড়িতেছিলাম, এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট দিয়া যাইবার কালে আমাকে ডাকিলেন। (আমি যেহেতু নামাযে ছিলাম, তাই) আমি তাঁহার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইলাম না। নামায শেষ করিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কেন আস নাই? আমি আরজ করিলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি নামায পড়িতে ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার লক্ষ্য নাই যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يا يها الذين امنوا استجيبو لله وللرسول اذا دعاكم

"হে মোমেনগণ। আল্লাহ এবং রসুল তোমাদিগকে ডাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিও" (আবু সায়ীদ বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইন্‌শা আল্লাহ্‌ এই ত্রুটি পুনরায় কখনও করিব না।)

তারপর হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে কোরআন শরীফের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছুরা কোনটি তাহা বাতলাইয়া দিব। অতঃপর নবী (দঃ) আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। মসজিদ হইতে বাহির হইবার নিকটবর্ত্তী

হইলে আমি তাঁহার ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই ছুরাটি হইল "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল-আলামীন"। যাহা বিশেষরূপে আমাকেই দান করা হইয়াছে, (অন্য কোন আসমানী কেতাবে এই ছুরা ছিল না।) এই ছুরাকেই কোরআনে-আজীম (কোরআনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অংশ) এবং সাব্‌য়েঃ মাছানী (সপ্ত আয়াতবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ পঠিত) নামে (১৪ পারা—ছুরা হেজর ৬ রুকুতে) আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

অর্থাৎ ঃ—হে মোমেনগণ! আল্লাহ এবং আল্লার রসুল যে সব বিধানাবলী ও কার্য্যাবলীর প্রতি আহ্বান করেন, বস্তুতঃ উহা তোমাদের ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে শান্তি ও সাফল্য আনয়নকারী। অতএব আল্লাহ এবং রসুল যখন তোমাদিগকে চিরস্থায়ী শান্তির জিন্দেগী দানকারী কার্য্যের প্রতি আহ্বান করেন তোমরা সেই ডাকে সাড়া দাও। (ছুরা আন্‌ফাল—৯ পারা ১৭ রুকু)

পুর্ব্বাপর বিষয়-বস্তু দৃষ্টে এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ-নিষেধকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা। সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং কোন কাজ কঠিন বোধ হইলেও বিনা দ্বিধায় উহাতে আত্মনিয়োগ করা।

আলোচ্য হাদীছে দেখানো হইয়াছে, উক্ত আয়াতের আদেশটি কত কঠোর এবং ব্যাপক! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে ডাকিলেও সেই ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল এবং উহাও এই আয়াতের বিধানভুক্ত ছিল। এমনকি নামাযরত থাকিলেও নামায ছাড়িয়া রসুলের ডাকে অবিলম্বে সাড়া দেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।

১৯১। হাদীছ ঃ—(৯ পাঃ ১৮ রুঃ ছূরা আনফাল ৩২নং আয়াত যাহার অর্থ) "একটি স্মরণীয় কথা—কাফেররা বলিল, আয় আল্লাহ! এই ইসলাম ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তোমার পক্ষ হইতে হয় তবে (ইহার বিরোধিতার শাস্তি দানে) আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর বা অন্য কোন প্রকার ভীষণ আজাব পতিত কর।"

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই উক্তিকারক মূলতঃ আবুজহল ছিল (অন্যান্যরা উহাতে সায় দানকারী ছিল।)

উহার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা পরবর্ত্তী ৩৩নং আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যাহার অর্থ—"(হে হাবীব!) আপনি তাহাদের মধ্যে থাকাবস্থায় আল্লাহ তাহাদেরে এই শ্রেণীর আজাব দিবেন না। এবং তাহাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোক

(যথা—মোমেনগণ) ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকাবস্থায়ও তাহাদের উপর এই শ্রেণীর আজাব আসিবে না।

পরবর্ত্তী ৩৪নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে বস্তুতঃ তাহারা ঐরূপ আজাবেরই যোগ্য ছিল। উক্ত আয়াতের অর্থ এই "তাহাদেরে আল্লাহ আজাব কেন দিবেন না? তাহারা ত হরম শরীফের মসজিদ হইতে (মুসলমানদিগকে) বাধা দিয়া থাকে, (যেরূপ ষষ্ঠ হিঃ সনে হোদায়বিয়ার ঘটনায় করিয়াছে; তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।) অথচ তাহারা ঐ মসজিদের বন্ধু নহে। ঐ মসজিদের বন্ধু ত একমাত্র মোত্তাকী—মোমেনগণ। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বোকা।

১৯১২। হাদীছ :—ছায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট তশরীফ আনিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ফেৎনা-ফাছাদ দুরীভূত করার জন্য আবশ্যক হইলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে আপনি কিরূপ মনে করেন—সঙ্গত কি না?

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি ফেৎনার অর্থ বুঝ কি? অতঃপর তিনি নিজেই উহার বর্ণনা দিলেন—ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে বা করিতে চাহিলে কাফেররা তাহাকে মারপিট করিত, আবদ্ধ করিয়া রাখিত, এইরূপে ইসলাম গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইত। পবিত্র কোরআনে ঐ অবস্থাকে "ফেৎনা" বলা হইয়াছে। উহা বন্ধ করার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ করিতেন। তোমরা বর্ত্তমানে ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হও এবং উহাতে ফাছাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। (পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত) "ফেৎনা" শব্দ দ্বারা উহা মোটেই উদ্দেশ্য নহে।

ব্যাখ্যা :—মোসলমানদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হইল এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত ঘটিতে লাগিল তখন ছাহাবীদের মধ্যে অনেকেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেন; তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। আর এক দল লোক ঐ অবস্থায় নিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের মতে কোন একটি দলকে সমর্থন করিয়া উহার বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের মতের সমর্থনে এই আয়াত পেশ করিতেন—وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাও যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ দুরীভূত হইয়া যায়।

উক্ত দলেরই এক ব্যক্তি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাই তিনি এই আয়াতের "ফেৎনা" শব্দের ব্যাখ্যা দান করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা এই আয়াতের

উদ্দেশ্য মোটেই নহে। এই আয়াতের তাৎপর্য্য হইল কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া যাবৎ না ইসলামে বাধা দানের ক্ষমতা লোপ পাইয়া আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৩। হাদীছ ঃ—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে (মোসলনানদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, আপনি এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেন না ?

আল্লাহ বলিতেছেন........وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

"মোসলমানদেরই ছুইটি দল পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও। (মীমাংসার বা মীমাংসা-প্রচেষ্টার পরও) যদি এক দল আর এক দলের উপর অন্যায় চালাইতে চায় তবে উক্ত দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।" (ছুরা হুজুরাত—২৪ পারা ১৪ রুকু)। অর্থাৎ মীমাংসা করিতে না পারিলে এক দলে যোগদান করিয়া অপর দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হউন।

আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, দেখ ভাই ! কোরআন শরীফে আরও একটি আয়াত আছে—........وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

"যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার শাস্তি হইবে জাহান্নাম, তথায় সে অনির্দিষ্টকাল থাকিবে এবং আল্লার গজব ও লা'নৎ তাহার উপর পতিত হইবে এবং আল্লাহ তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (৫ পা ১০ রুঃ)

আবহুল্লাহ (রাঃ) ইহাও বলিলেন, প্রথম আয়াতটি বুঝিতে কোন রকম ভুল করিয়া দ্বিতীয় আয়াতটির দরুন মোসলমানের বিরুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি হইতে বিরত থাকা আমার মতে দ্বিতীয় আয়াতটিতে ভুল করিয়া প্রথম আয়াতের দরুন ঐরূপ কাটাকাটিতে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি আর একটি আয়াত তাঁহার সামনে পেশ করিল— وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "সংগ্রাম চালাইয়া যাও যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ দুরীভূত হয়।" আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতের আদেশ মোতাবেক ত আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে কাজ করিয়াছি—যখন ইসলামের শক্তি কম ছিল। লোকদিগকে দ্বীন-ইসলামের কারণে নিপীড়িত হইতে হইত। কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে কাফেররা তাহাকে প্রাণে বধ করিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার নির্য্যাতন চালাইত। ইসলাম গ্রহণে এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকেই উক্ত আয়াতে "ফেৎনা" বলা হইয়াছে। আমরা

উক্ত আয়াতের নির্দ্দেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, যাহাতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে ইসলামে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা যেই পথ অবলম্বন করিয়াছ উহাতে ত পুনরায় ফেৎনার উৎপত্তি হইবে। (কারণ, পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে মোসলমানদের শক্তি খর্ব্ব হইয়া তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ফলে কাফেরেরা পুনরায় ইসলামে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিতে প্রবল হইয়া পড়িবে।

ঐ ব্যক্তি উক্ত বিতর্কে ব্যর্থ হইয়া অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে, আপনি ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহারা উভয়েই যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মর্য্যাদাশীল তাহা ব্যক্ত করিলেন।

১৯২৪। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযেল হইলঃ—

إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

"(হে মোসলমানগণ! কাফেরদের মোকাবিলায়) তোমাদের বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে, দুই শত কাফেরের উপর জয়ী হইতে পারিবে, (১০ পারা ৫ রুকু)। এই আয়াতের ইঙ্গিত ছিল, মোসলমান তাহাদের দশ গুণ বেশী কাফের তথা দশজনের মোকাবিলায় একজন হইলেও স্থিরপদ থাকা ফরজ হইবে পলায়ন করিতে পারিবে না। মোসলমানগণ এই বিধানটি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কঠিন বোধ করিলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা উহার পরবর্ত্তী আয়াত নাযেল করিলেন—

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا - فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ -

"এখন হইতে আল্লাহ তায়ালা (পূর্ব্বের বিধান) তোমাদের পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে সাহসের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন তোমাদের এক শত জন ধৈর্য্যশীল থাকিলে দুই শতের উপর জয়ী হইবে।" অর্থাৎ দ্বিগুণের মোকাবিলা হইতে পশ্চাদপসারণ জায়েয হইবে না। তার অধিক হইলে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করা জায়েয হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন, দশগুণ হইতে কম করিয়া দ্বিগুণ করতঃ সহজ করায় সেই পরিমাণে ধৈর্য্যশক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে মোসলমানদের যে ধৈর্য্যশক্তি ছিল এখন উহার দশ ভাগের আট ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

১৯২৫। **হাদীছ ঃ**—খালেদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পথ চলিতে ছিলাম, এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আমাকে এই আয়াতটির তাৎপর্য্য বলিয়া দিবেন কি ?

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"যে সমস্ত লোক সোনা-চান্দি (তথা ধন-সম্পদ) জমা করিয়া রাখে, উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করেনা তাহাদিগকে ভীষণ আজাবের সংবাদ জ্ঞাত করিয়া রাখুন। তাহাদের সোনা-চান্দি (বা ধন-সম্পদের মূল্য পরিমাণ সোনা-চান্দিকে পাতরূপে রূপান্তরিত করিয়া ঐগুলিকে) জাহান্নামের আগুনে গরম করা হইবে। অতঃপর উহা দ্বারা ঐ ধন-সম্পদের মালিকদিগকে দাগ লাগান হইবে—তাহাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, এই সব ধন-সম্পদ যাহা তোমরা (আল্লার রাস্তায় খরচ না করিয়া) নিজের জন্য জমা করিয়া রাখিয়া ছিলে। সুতরাং যাহা নিজের জন্য জমা করিয়াছিলে উহার মজা ভোগ কর।"

(ছুরা তওবাহ্—১০ পারা ১১ রুকূ)

এই আয়াত-মর্ম্মে বুঝা যায় নিজ ব্যয়ের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ সবটুকুই আল্লার রাস্তায় ব্যয় করিতে হইবে, নতুবা আজাব হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখে—উহার যাকাতও দেয় না, আজাব তাহারই হইবে।

আলোচ্য আয়াত নাযেল হওয়ার পরে যাকাতের (তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বাধ্যতামূলক আল্লার রাস্তায় খরচ করার) বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া ঐ যাকাতকে আল্লাহ তায়ালা অবশিষ্ট মালের পবিত্রকারী করিয়া দিয়াছেন।

১৯২৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোমেনদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটা বিশেষ গোপন আলাপ-অনুষ্ঠান হইবে। উহার বিবরণ আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (আহ্বানে তাঁহার) দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের বেষ্টনীর আড়ালে রাখিয়া তাহার গোনাহ সমূহের স্বীকারোক্তির পরীক্ষা লইবেন—আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, অমুক গোনাহ

তোমার স্মরণ আছে কি? অমূক গোনাহ তোমার স্মরণ আছে কি? ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলিতে থাকিবে, হাঁ—প্রভু! আমার এই অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবেন। ঐ ব্যক্তি মনে মনে তাহার বিপদ গণিবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছিলাম। আজিকার দিনেও আমি তোমার সব গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর (থাকিবে শুধু তাহার নেকের আমল-নামা,) তাহার নেকের আমল নামা ভাঁজ করিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইবে। (এইভাবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতে হিসাবের দিন মোমেনদের সম্পর্কে গোপনতা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে অপমান হইতে রক্ষা করিবেন)। পক্ষান্তরে অপর দল তথা আল্লাদ্রোহীদেরে সকলের সম্মুখে দেখাইয়া দিয়া (নেক-বদের) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া বেড়াইবেন—

هٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ - اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

"এই লোকগুলি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে মিথ্যা ও ভুল পথের পথিক ছিল। সকলে শুনিয়া রাখ, এই অনাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের উপর আল্লার লা'নত পতিত হইবে।" (ছুরা হুদ—১২ পারা ২ রুকু)

১৯২৭। হাদীছঃ—আবু মুছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা জালেম—অন্যায়কারীকে (পরীক্ষার স্থল দুনিয়াতে) অবকাশ দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন ধরেন এবং পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ...

"(হযরত নূহের জাতি, হযরত হুদের জাতি, হযরত ছালেহের জাতি, হযরত লুতের জাতি, হযরত শোয়ায়েবের জাতি, হযরত মুছার জাতি—এই সব জাতির ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন,) এইভাবেই তোমার প্রভু পাকড়াও করিয়া থাকেন যখন তিনি কোন স্বেচ্ছাচারী অনাচারী অঞ্চলবাসীকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁহার পাকড়াও অতিশয় ভয়ঙ্কর ও কঠোর। ইহাতে নছিহত ও শিক্ষা রহিয়াছে। ঐ লোকদের জন্য যাহারা আখেরাতের আজাবকে ভয় করে।" (ছুরা হুদ—১০ পারা ৯ রুকু)

১৯২৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মক্কায় লুকাইয়া জেন্দেগী কাটিতে ছিলেন তখন তিনি ছাহাবীগণকে লইয়া জামাতে নামায পড়া কালে সজোরে কেরাত পড়িয়া থাকিতেন। মোশরেকগণ উহা শুনিয়া কোরআনকে কোরআনের অবতরণকারীকে এবং কোরআনের বাহককে গালি দিত, তাই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিলেন—

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا -

"নামাযের কেরাত অতি জোরেও পড়িবেন না, (যাহাতে কাফেরগণ উহা শুনিয়া কোরআনকে গালি দেয়।) একেবারে আস্তেও পড়িবেন না, (যাহাতে ছাহাবীগণ শুনিতে না পারে।) উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পন্থায় পড়িবেন।

১৯২৯। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا—দোয়া করার নিয়ম এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৩০। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই শ্রেণীর অনেক লোক উপস্থিত হইবে যাহারা পার্থিব জীবনে মোটা মোটা দেহবিশিষ্ট বড় বড় পদবীধারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের ওজন (ও মর্য্যাদা) মাছির ডানা সমতুল্যও হইবে না।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীছের আয়াতটি ছুরা কাহাফের শেষ দিকের আয়াত। আয়াতের বর্ণনা হইল, পারলৌকিক জীবনে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাহারা যাহাদের ইহকালীন উদ্দম ও ভাল কাজসমূহ যদ্দ্বারা তাহারা আত্মতুষ্টিও লাভ করিয়া থাকিত—আখেরাতের সঙ্কটময় জীবনে তাহাদের ঐ সব কাজ ও আমল নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে। সেই লোকদের পরিচয় ও পরিণতি বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا -

"ঐ লোকগণ তাহারা—যাহারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শন সমূহ তথা রসুল ও কোরআনকে অস্বীকার করে এবং পরওয়ারদেগারের নিকট হাজেরী তথা হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতিকে অস্বীকার করে, ফলে তাহাদের সমুদয় আমল নিষ্ফল সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাহাদের এবং তাহাদের আমলের কোন ওজনই আমি দিব না। তাহাদের পরিণতি হইবে জাহান্নাম। এই কারণে যে, তাহারা আমার (কালামের) আয়াত সমূহকে এবং আমার রসুলগণকে উপেক্ষা ও উপহাস করিত।"

১৯৩১। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (চিরস্থায়ীরূপে) বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং দোযখীগণ দোযখে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি সাদা-কালো চিত্রাঙ্গ ভেড়ার আকৃতিতে (বেহেশত-দোযখের মধ্যস্থলে) উপস্থিত করা হইবে এবং একজন ফেরেশতা ডাকিবেন—হে বেহেশতবাসীগণ! তখন সকল বেহেশতবাসী সেই দিকে তাকাইবেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, ইহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা সকলেই বলিবেন, হাঁ—ইহা মৃত্যু। এইরূপে দোযখীদেরকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাহারাও ঐ উত্তরই দিবে। অতঃপর সকলের চোখের সামনে উহাকে জবাহ্ করা হইবে এবং ঘোষণা করা হইবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা অনন্তকাল বেহেশতের সুখ ভোগ করিতে থাকিবে, মৃত্যু আসিবে না। হে দোযখবাসী! তোমরা চিরকাল দোযখে আজাব ভোগ করিতে থাকিবে আর মৃত্যু আসিবে না। এই ঘোষনায় বেহেশতীদের আনন্দ উল্লাস বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে দোযখীদের দুঃখ-ভাবনা ও আক্ষেপ-অনুতাপ অধিক বাড়িয়া যাইবে। এই বিবরণ দান উপলক্ষে হযরত (দঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুণ—আক্ষেপ ও অনুতাপের দিন সম্পর্কে যে দিন চিরস্থায়ী শেষ ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা (আজ এই কার্য্য ক্ষেত্রে) অবহেলায় বিভোর রহিয়াছে এবং ঈমান গ্রহণ করিতেছে না। (সেই দিন ইহার পরিণাম ভোগ করিবে।") (ছুরা মরয়াম—১৬ পারা)

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত দোযখীদের অসীম আক্ষেপ-অনুতাপের ঘটনা সম্বলিত কেয়ামতের দিনকেই উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

১৯৩২। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন মানুষ এরূপ ছিল যে, (ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ)

নিকট) মদীনায় আসিয়া পড়িত। অতঃপর যদি দেখিত, তাহার স্ত্রী ছেলে সন্তান জন্ম দিয়াছে, ঘোড়া (ইত্যাদি পশু) বাচ্চা দিয়াছে (অর্থাৎ যদি জাগতিক উন্নতি দেখিত) তবে বলিত, ইসলাম ধর্ম্ম খুব ভাল ধর্ম্ম। আর যদি ঐ সব না দেখিত তবে বলিত ইসলাম ধর্ম্ম ভাল ধর্ম্ম নয়। তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দান করিয়াই এই আয়াত নাযেল হয়—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ - فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ

بِهٖ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ - خَسِرَ الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ - ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

"এক শ্রেণীর লোক এরূপ যে, তাহারা আল্লার বন্দেগী (যথা ইসলাম অবলম্বন) করে এইরূপে যেন সে (নৌকা ইত্যাদিতে আরোহণ করিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় উহাতে অবস্থানের নিয়্যতে আসে নাই বলিয়া ভিতরে বসে না,) কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে (—যে কোন মুহূর্ত্তে উহা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে)। যদি উহাতে সুযোগ-সুবিধা ও লাভ দেখিতে পায় তবে (সেই স্বার্থের জন্য) উহাতে অবিচল থাকিবে। আর কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে (তথা কোন ক্ষয়-ক্ষতি বা দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিলেই) উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। এই শ্রেণীর লোকগণ দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই হারায় এবং ইহা হইতেছে পূর্ণ ক্ষতি।" (১৭ পারা ৯ রুকু)

১৯৩৩। হাদীছঃ— ছফিয়া-বিন্‌তে-শায়বাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, পবিত্র কোরআনে আছে—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"স্ত্রী লোকদের অবশ্য কর্ত্তব্য, (গায়ের জামা দ্বারা বুক ঢাকা থাকা সত্ত্বেও ঐ অংশের বিশেষ পর্দ্দার জন্য) মাথার ওড়্‌না দ্বারা বুক দোহ্‌রারূপে ঢাকিয়া রাখিবে, (যেন উহার আকার আকৃতিও ভাসিয়া না থাকে।) (১৮ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াতটি নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান রমণীগণের মধ্যে—যাহাদের ওড়্‌নার সুব্যবস্থা ছিল না তাহারা তাহাদের চাদরের এক পার্শ্ব ছিঁড়িয়া-ফাড়িয়া ওড়্‌না তৈরী করতঃ উহা দ্বারা মাথা ঢাকিল এবং বুকের উপর দোহ্‌রা পর্দ্দাও করিল।

১৯৩৪। হাদীছঃ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত— اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ -

"(কেয়ামতের দিন ঈমানহীন লোকদের অবস্থা এই হইবে যে,) তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করা হইবে তাহাদের মুখের উপর।" (১৯ পারা ১ রুঃ)

এক ব্যক্তি উক্ত আয়াতের মর্ম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল—হে আল্লার নবী! কাফেরকে কেয়ামতের দিন মুখের উপর তাড়াইয়া নেওয়া হইবে কিরূপে? হযরত নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে দুই পায়ের উপর চালাইতেছেন। তিনি কি কেয়ামতের দিন মুখের উপর চালাইতে সক্ষম হইবেন না? ঐ ব্যক্তি বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমাদের প্রভুর শক্তিমত্ত্বার শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি, নিশ্চয় পারিবেন।

১৯৩৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্র যায়েদ-ইবনে-হারেসা (রাঃ)কে আমরা সকলেই যায়েদ-ইবনে-মোহাম্মদ—মোহাম্মদের পুত্র বলিয়া থাকিতাম, যাবৎ না এই আয়াত নাযেল হইল......ادعوهم لآبائهم

ব্যাখ্যা :—আরব দেশে পালক পুত্রকে পালনকারী পিতার পুত্র নামে আখ্যায়িত করা হইত। এই আখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি কুপ্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রতিপালিত হইত—পালনকারীর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ঐ পালক পুত্রের সমুদয় আচার ব্যবহার পুরাপুরিভাবে প্রকৃত মা ও ভাই-বোনদের ন্যায় হইয়া থাকিত। তাহাকে কোন স্তরেই বেগানা পুরুষ গণ্য করা হইত না। উত্তরাধীকার সম্পর্কেও তাহারা প্রকৃত পিতা-পুত্ররূপে গণ্য করিত। পালক পুত্র-বধূকে পালনকারী পিতার পক্ষে সম্পুর্ণরূপে পুত্র-বধূ গণ্য করা হইত। ফলে এক দিকে পুত্র-বধূর জন্য ঐ পিতাকে বেগানা পুরুষ গণ্য করা হইত না। অপর দিকে ঐ পুত্র-বধূকে পালনকারী পিতার জন্য প্রকৃত পুত্র-বধূর ন্যায় চির-হারাম গণ্য করা হইত—পুত্রের বিবাহ মুক্ত হওয়ার পরও ঐ পিতার সঙ্গে বিবাহ অবৈধ মনে করা হইত। উল্লেখিত কুপ্রথাসমূহ ইসলামে রহিত করার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে এবং ঐরূপ কঠোর ভাবে প্রতিপালিত ও প্রচলিত প্রথা কার্য্যতঃ ভঙ্গ করিয়া না দেখাইলে শুধু কথায় ভঙ্গ হইবে না।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে একটা সুযোগ আসিল—তাঁহার পালক পুত্র যায়েদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী ছিলেন জয়নব (রাঃ)। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিল। এই উপলক্ষে স্বয়ং হযরত (দঃ) পালক পুত্র-বধূ জয়নবকে বিবাহ করিয়া ঐ সব কুপ্রথার মূল উচ্ছেদের একটা সুযোগ দেখিলেন এবং সেই বিবাহ করা মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি লোক-মুখে কুৎসা রটনার ভয় করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উক্ত বিবাহ

কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলার ইঙ্গিত আসিল। এমনকি, কাহারও মতে অহি মারফৎ আল্লাহ তায়ালাই বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। পরিণামে তাহাই ঘটিল যাহার আশঙ্কা হযরত (দঃ) করিতে ছিলেন। পুত্র-বধূ বিবাহ করার বদনামীর ঝড় বহিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, বরং নানারকম অমূলক নোংরা আকথা কুকথাও মন-গড়ারূপে জড়িত হইয়া গেল। যাহা আজও শত্রুদের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব ঝড়-তুফান প্রতিরোধ কল্পে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল। প্রথমতঃ যুক্তি দেখান হইল— مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

"তোমাদের মুখ-বলা পুত্রগণকে ত সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা পুত্র বানান নাই। সুতরাং বিধি-বিধানে সে পুত্র বলিয়া কেন গণ্য হইবে? অতঃপর ঐ সব কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ কল্পে ঘোষনা দিলেন—

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"মুখ-বলা পালক পুত্রগণকে তাহাদের প্রকৃত পিতার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া ডাক, বস্তুতঃ ইহাই সত্য কথা। যদি প্রকৃত পিতার সন্ধান না করিতে পার (তবুও পালনকারী পিতার সম্বন্ধ জড়াইয়া ডাকিও না, কারণ) ঐ পুত্র ত পালনকারীর জন্য বস্তুতঃ একজন মোসলমান ভাই বা ক্রীতদাস (ইত্যাদি)।"

মছ্‌আলাহ্ঃ- শুধু মুখে মুখে কাহাকেও ছেলে বলা হইলে তাহা গোনার কাজ হইবে না বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ঐ ডাকের অছিলায় বেপর্দ্দা ও বেগানার সঙ্গে মেলামেশার গোড়া-পত্তন যেন না হইয়া বসে। যদি এইরূপ আশঙ্কা বা প্রচলন থাকে তবে ঐরূপ ডাকই নিষিদ্ধ হইবে।

১৯৩৬। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে হারেছার পরিত্যক্ত স্ত্রী জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সম্পর্কেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া এই আয়াত নাযেল হইয়াছে— تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

"(অনৈসলামিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্যে জয়নবকে বিবাহ করার) সেই পরিকল্পনা আপনি গোপন ভাবে মনে মনে পোষন করিতে ছিলেন, যাহার বিকাশ আল্লাহ তায়ালাই স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন।" (ছুরা আহজাব—২২ পারা ২ রুকু)

ব্যাখ্যাঃ—জয়নব (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লার (দঃ) ফুফুজাদ ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)-এর সঙ্গে। তিনি হযরতেরই

পালক পুত্র ছিলেন। এই বিবাহে হযরত (দঃ) মস্ত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা কাঁধে লইয়াছিলেন। জয়নব (রাঃ) ছিলন কোরায়েশ বংশীয়া এবং যায়েদ (রাঃ) তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ক্রীতদাস ছিলেন। তাই বংশের সকল লোকই এই বিবাহে অসম্মত ছিল। একা হযরত (দঃ) এই বিবাহে উদ্যোগী ছিলেন। আর সকলেই এই ব্যাপারে তাঁহার বিরোধী ছিল। কিন্তু মোসলমানদের উপর রসুলের যে মর্য্যাদা ও হক্ক সুরক্ষিত আছে উহার দ্বারা এই বিরোধও কোরআনের স্পষ্ট ঘোষনায় অবৈধ বলিয়া বিঘোষিত হইল—

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আল্লাহ এবং আল্লার রসুল কোন বিষয়ে আদেশ প্রয়োগ করিলে অতঃপর কোন ঈমানদার পুরুষ বা নারীর পক্ষে ঐ বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ করিবার কোন অবকাশই থাকে না। যে কেহ আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের নাফরমানী করিবে অবশ্যই সে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্টতায় পতিত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।" (২২ পারা ২ রুকু)

এই ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিত সকলেই বিরোধিতা ত্যাগ করিলেন এবং হযরত (দঃ) বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভাগ্যের পরিহাস—যায়েদ (রাঃ) এবং জয়নব (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে মিল-মহব্বৎ মোটেই হইল না। বাধ্য হইয়া যায়েদ (রাঃ) অচিরেই জয়নব (রাঃ)কে ত্যাগ করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু হযরত (দঃ) তাহাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া স্ত্রীকে বহাল রাখার পরামর্শ দিতে ছিলেন। উপস্থিত অবস্থা দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী দেখিলেন। তিনি এই বিবাহের গোড়ার ঘটনা স্মরণ করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বের দরুণ জয়নব (রাঃ) এবং তাঁহার সহোদরগণের মনঃদুঃখের প্রতিকার করার ভাবনা তাঁহার (হযরত) সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে হযরত (দঃ) মনে মনে একটা খেয়াল করিলেন—বিবাহ বিচ্ছেদ যখন হইয়াই যাইবে তখন জয়নবকে স্বয়ং হযরত (দঃ) নিজ বিবাহ বন্ধনে আনিয়া তাঁহাকে উম্মুল-মোমেনীন পদে ভুষিত করিবেন। এই অসাধারণ সম্মান লাভে জয়নব (রাঃ) এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের যাবতীয় মনঃদুঃখ বিদুরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) যেহেতু হযরতের পালক পুত্র ছিলেন। তাই এই ব্যবস্থা গ্রহণে হযরত (দঃ) লোকদের কুৎসার ভয় করিতে ছিলেন যে, তাহারা বলিবে, মোহাম্মদ (দঃ) পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়াছে।

এদিকে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্য আর একটি দিক দিয়া হযরতেরও অভিপ্রেত ছিল, আল্লাহ তায়ালার নিকটও বিশেষ পছন্দনীয় ছিল। আরবের কুসংস্কার—

পালক পুত্রের বধূকে আপন পুত্রের বধূ গণ্য করা; ইসলামে ঐরূপ গর্হিত নীতির স্থান নাই। তাই উহাকে কঠোর হস্তে চুরমার করিতে হইবে। ইহার জন্য স্বয়ং রসূল মারফৎ কার্য্যতঃ ঐ কুসংস্কার ধ্বংসের আরম্ভ অত্যন্ত সমীচীন ও বিশেষ পছন্দনীয় ছিল, তাই আল্লার তরফ হইতে হযরতের প্রতি আদেশ হইল জয়নবকে বিবাহ করিয়া স্বীয় গোপন মনোভাবকে কার্য্যে পরিণত করার। এমনকি, যায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজ ব্যবস্থাপনায় হযরতের সঙ্গে জয়নবের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অহী মারফৎ বিবাহের খবর দিয়া দিলেন। হাদীছে বর্ণিত আছে—জয়নব (রাঃ) হযরতের অন্যান্য বিবিগণের উপর এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, তোমাদের বিবাহ-কার্য্য তোমাদের অলী-ওয়ারিস মুরব্বিগণ সম্পন্ন করিয়াছেন, আর আমার বিবাহ আল্লাহ তায়ালা আসমানের উপরে (ফেরেশতাদের মহফিলে) সম্পন্ন করিয়াছেন।

উল্লেখিত ঘটনা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণে পবিত্র কোরআনের আয়াতও বিদ্যমান রহিয়াছে, বক্ষ্যমান হাদীছের আয়াতটি উহারই অন্তর্গত—

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ...... وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا -

অর্থাৎ—"আপনি আপনার উপকারে ও সাহায্য-সহায়তায় প্রতি পালিত যায়েদকে পরামর্শ দিতে ছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে বহাল রাখ, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ অবস্থায় আপনি মনের ভিতরে একটা বিষয় গোপন রাখিতে ছিলেন যাহা আল্লাহ পাক প্রকাশ করিয়া দিবেন। আপনি লোকদের ভয় করিতেছিলেন, অথচ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করাই শ্রেয়ঃ। তারপর জয়নব হইতে যায়েদের সম্পর্ক সমাপ্তি হইয়া গেলে আমি জয়নবকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলাম—এই উদ্দেশ্য যে, মুখ-বলা ছেলেদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর ঐ ছেলেদের পালনকারী কর্ত্তৃক বিবাহ করার ব্যাপারে অন্ধকার যুগের প্রথার যে, প্রতিবন্ধক রহিয়াছে মোমেনদের পক্ষে যেন সেই প্রতিবন্ধক আর না থাকে। এবং ঐ বধূকে মাহ্‌রাম গণ্য করার যে সব হারাম ও নাজায়েয ফল ফলিয়া থাকে ঐ সবের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আল্লাহ কর্ত্তৃক এই বিধান জারী হওয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত আয়াতে যে বলা হইয়াছে—"আপনি দিলের মধ্যে একটা বিষয় গোপন রাখিতে ছিলেন, ইহার প্রকৃত তফছীর পাঠকবর্গের সমক্ষে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল। বিশিষ্ট তফছীরকারকগণও এই তফছীরই লিখিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তথাকথিত তফছীরকারের লেখায় কতকগুলি অবাঞ্ছিত কথারও সমাবেশ দৃষ্টি গোচর হয়;

বস্তুতঃ উহা ইসলামের শত্রুদের গড়ান কাহিনী মাত্র, যাহা কোন কোন মোসলমানও নকল করিয়াছে। ঐ গুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আপবাদ মাত্র।

১৯৩৭। হাদীছ ঃ— * সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (রঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই আয়াত দুইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর—

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ... (১)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ......

"আখেরাতে নাজাত পাইবার শর্ত স্বরূপ কতিপয় গুণের উল্লেখ করতঃ বলা হইয়াছে—) এবং যাহারা এমন কোন নরহত্যা করে না যাহা না-হক এবং আল্লাহ কর্ত্তৃক হারাম করা হইয়াছে। (অতঃপর বলা হইয়াছে—) অবশ্য যাহারা তওবা করিবে, ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পূর্ব্ব কৃত গোনাহ্‌গুলি মাফ করিয়া দিয়া উহার স্থলে (নামায়ে-আমলের মধ্যে) নেক আমল সমূহ লিখিয়া দিবেন ; আল্লাহ অতিশয় দয়ালু ক্ষমাশীল।„ (১৯ পারা ৪ রুকু)

এই আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, অবৈধ খুন বা নরহত্যাকারীর জন্যও তওবা করার এবং তওবা দ্বারা ঐ গোনাহ্ মাফ হওয়ার সুযোগ আছে।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا...... [২]

"যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার মোসলমান মানুষকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল ইহাই হইবে—সে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আজাব ভোগ করিবে এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিশাপ পতিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন!" (ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, মোমেন মোসলমানকে হত্যাকারীর জন্য তওবা করিয়া গোনাহ মাফ করাইবার সুযোগ নাই। নতুবা চিরকাল দোযখ বাসের শাস্তি নির্দ্ধারিত হইবে কেন ?

সায়ীদ (রঃ) বলেন, আমি উক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আয়াত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। ছুরা ফোরকানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের নাজাতের জন্য

---

* এই হাদীছটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় এবং ৭১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হইয়াছে, উভয় স্থানের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তরজমা করা হইল।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, নরহত্যা না করা ইত্যাদির শর্ত আরোপ করিলে মক্কাবাসী কতিপয় মোশরেক কাফের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি যেই দ্বীন ও ধর্ম্মের প্রতি আহ্বান করেন তাহা খুবই ভাল। কিন্তু উহা দ্বারা আমরা ত নাজাত পাইতে পারিব না। যেহেতু আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজা করিয়াছি, ব্যভিচার করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি। এই শ্রেণীর লোকদের কথার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা উক্ত ছুরা ফোরক্কানের মূল বিষয়-বস্তুটির সহিত এই কথাটি সংযোগ করিয়া দিলেন যে—"অবশ্য যাহারা তওবা করিবে........."। সুতরাং এই ছুরা ফোরক্কানের আয়াত ঐ লোকদের পক্ষে যাহারা অমোসলেম থাকাবস্থায় নরহত্যা ইত্যাদি করিয়াছিল পরে তাহারা তওবা করতঃ ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদের পূর্ব্বকৃত নরহত্যা ইত্যাদি গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর লোকদেরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণার্থে তাহাদের জন্য উদারতা ঘোষণা পূর্ব্বক আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ...

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি লোকদিগকে জানাইয়া দিন, আমি ঘোষণা দিতেছি—হে আমার ঐ সকল বান্দাগণ! যাহারা গোনাহ করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ—তোমরা আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; (তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিলে) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (পূর্ব্বকৃত) সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (ছুরা যুমার—২৪ পারা ৩ রুকু)

পক্ষান্তরে ছুরা নেছার আয়াত তথা নরহত্যার দায়ে চিরকাল দোযখ বাসের শাস্তি ঐ লোকদের পক্ষে যাহারা মোসলমান এবং ইসলামের বিধান অবগত হওয়া সত্ত্বেও নরহত্যা করিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে ছুরা নেছার আয়াতের ঘোষনা যে—"তাহারা চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন ছুরা নেছায় বর্ণিত শাস্তি মোসলমান-হত্যা অপরাধের সমুচিত শাস্তির মূল ধারারূপে উল্লেখ হইয়াছে—শুধুমাত্র অপরাধটির কঠোরতা প্রকাশ করার জন্য। নতুবা এ স্থলে আর একটি উপধারাও আছে যাহার ফলে শরিয়ত নির্দ্ধারিত বিশেষ নিয়মে খাঁটী তওবা করিলে এই ক্ষেত্রেও দোযখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তির পথ রহিয়াছে।

১৯৩৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইহুদীদের এক বড় পণ্ডিৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে

আসিয়া বলিল, আমরা তৌরাত কেতাবে দেখিতে পাই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমুদয় আসমানগুলিকে এক আঙ্গুলের উপর, ভূমণ্ডলের স্থল ভাগকে এক আঙ্গুলের উপর, পাহাড়-পর্ব্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলের উপর, পানি ও কাঁদা তথা ভূমণ্ডলের জল ভাগকে এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্য সব সৃষ্টকে এক আঙ্গুলের উপর রাখিবেন; অতঃপর (এই সবগুলির সমষ্টিও যে আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার সম্মুখে অতি নগণ্য তাহা প্রকাশকরণার্থে ঐ বহনকারী) আঙ্গুল সমূহকে নাড়াচাড়া ও আন্দোলিত করতঃ বলিতে থাকিবেন, আমিই সর্ব্বাধিপতি আমিই সর্ব্বাধিপতি। *

ইহুদী পণ্ডিতের উক্তি সমর্থন করার ভঙ্গিতে হযরত (দঃ) হাসিয়া উঠিলেন এবং (ইহুদীগণ আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও আল্লাহ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত উক্তি করিয়া থাকে—তাহারা ওযায়ের নবীকে আল্লার পুত্র বলিয়া থাকে। আল্লার রসুলকে অমান্য করিয়া চলে ইত্যাদি ইত্যাদি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সবের উপর তাহাদের প্রতি তিরস্কার স্বরূপ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

"আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের যেরূপ মূল্য দান করা আবশ্যক কাফেরগণ ও মোশরেকগণ সেইরূপ মূল্য দিয়া চলে না।"

ব্যাখ্যা: দুনিয়ার জিন্দেগীতে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ শক্তি বা বিরাটত্ব ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আল্লাহকে ছাড়িয়া সেই সব বস্তুর পূজায় লিপ্ত হয়। কেয়ামতের দিন—যে দিন দুনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষ এক ময়দানে একত্রিত থাকিবে সেই দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ সব বস্তু-পূজারীদের অন্যায়টা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার ও ধরাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিবেন যে, ছোট, বড়, ও বৃহত্তম—যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তাঁহার অধীনে ও সর্ব্বাধিপত্বে হওয়ার দৃশ্য সর্ব্ব সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রকটিত ও রূপায়িত করিবেন এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, আজ চাক্ষুসরূপে দেখিয়া নেও সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বশক্তির অধিকারী, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমহান একমাত্র আমি। কিন্তু তোমরা আমাকে ছাড়িয়া আমার নিম্নস্থ, আমার অধীকারস্থ, আমার আধিপত্যের বস্তুকে পূজা করিয়াছিলে; তাহার শাস্তি আজ তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

---

* হাদীছটি বোখারী শরীফে তিন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ফৎহুলবারী ১৩—৩৩৮ × ৩৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্যাদি দৃষ্টে তরজমা করা হইল।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই তাহার অন্যায় অপরাধ ধরাইয়া দিয়া শাস্তি দান করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার ইহার প্রতি অটল অনড় বিশ্বাস ও আকিদা সর্ব্বদার জন্য অন্তরে নিবদ্ধ রাখিয়া বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখিত হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি সম্পর্কে এই ধারণা রাখিবে যে, আমাদের স্থুল ও সাকারে সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির খাতিরে এই সব শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সবের উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্ট ও অনুভূত অঙ্গ সমূহ কখনও নহে। এই সব অঙ্গ ত সাকার ও স্থুল দেহের বৈশিষ্ট্য; আল্লাহ তায়ালা ত নিরাকার। সুতরাং সেই অনুপাতেই এই সব শব্দের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য উহা আমাদের জ্ঞানের ও অনুভূতির এবং ধারণার ও অনুমানের উর্দ্ধে, কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি।

১৯৩৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বর্ণনা দিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র ভূমণ্ডলকে স্বীয় মুষ্ঠীতে লইবেন। আসমান সমূহকে স্বীয় ডান হাতে জড়াইবেন (—এইভাবে সমূদয় সৃষ্টের উপর স্বীয় সর্ব্বাধিপত্য রূপায়িত করিয়া) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার সর্ব্বাধিপত্য বাস্তবায়িত রূপে চাক্ষুস দেখিয়া নেও। দুনিয়াতে যাহারা ক্ষমতা ও আধিপত্যের দাবী করিত বা যাহাদিগকে ঐরূপ স্বীকার করা হইত তাহারা কোথায়?

ব্যাখ্যাঃ—দুনিয়ার জিন্দেগীতে ক্ষমতা-মদে মত্ত এবং তাহাদের চেলাদিগকে কটাক্ষ করিয়া তাহাদের অন্যায় অপরাধ ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা করিবেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তথ্যটি পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে—

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِينِهِ

سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূমণ্ডল আল্লাহ তায়ালার মুঠে হইবে এবং আসমান সমূহ তাঁহার হাতে জড়ান থাকিবে (ইহা দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া দেখাইবেন—তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, কেহ হইতে পারে না,) তিনি অদ্বিতীয়, পাক-পবিত্র এবং কাফের মোশরেকরা যত কিছুকেই তাঁহার শরীক ঠাওরাইতেছে তিনি সে সব হইতে অতি মহান, অতি উর্দ্ধে।" (ছুরা যুমার—২৪ পারা ৪ রুকু)

১৭৪০। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইস্রাফিল ফেরেশতার দ্বিতীয় শিঙ্গা-ফুঁকের পর সর্ব্ব প্রথম আমি সচেতন হইয়া মাথা উঠাইব এবং দেখিতে পাইব, মূছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় আরশের পায়া ধরিয়া আছেন। ইহা আমি বলিতে পারি না, তিনি সচেতন অবস্থায় বহাল ছিলেন বা অচেতন হওয়ার পর (আমার পূর্ব্বেই) সচেতন হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার দুইবার শিঙ্গা-ফুঁকের উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَمَن فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَن شَاءَ

اللّٰهُ - ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُم قِيَامٌ يَّنظُرُونَ

"শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে আসমান-জমিনের সকলেই অচেতন হইয়া পড়িবে (—জীবিতগণ মরিয়া যাইবে এবং মৃতগণের রূহ্ চৈতন্যহীন থাকিবে ;) অবশ্য যাঁহাদের হুশ থাকা আল্লাহই ইচ্ছা করিবেন (তাঁহাদের হুশ বহাল থাকিবে।) তৎপর দ্বিতীয়বার সেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তৎক্ষণাৎ সকলেই (জীবিত হইয়া) চৈতন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাইবে।" (২৪ পারা ৪ রুকু)

ঐ সময় যাঁহাদের হুশ থাকিবে তাঁহারা হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ। এতদ্ভিন্ন মূছা (আঃ)ও ঐ শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিনা—তাহাই আলোচ্য হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

১৭৪১। **হাদীছ** ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শিঙ্গায় উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হইবে। লোকগণ-জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা! চল্লিশ বৎসর? তিনি বলিলেন, তাহা আমি শুনি নাই ; তাহারা বলিল, চল্লিশ মাস? তিনি বলিলেন, তাহা আমি জানি না। তাহারা বলিল, চল্লিশ দিন? তিনি বলিলেন, আমি তাহাও বলিতে পারি না।

তিনি আরও বলিলেন, মানব-দেহের সর্ব্বংশই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্ন অস্থি খণ্ডটা অক্ষয় থাকিবে এবং উহা হইতেই তাহার দেহের পুনঃ নির্মান হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছে প্রকৃত প্রস্তাবেই চল্লিশের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত ছিল না। তাই আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে উহা নির্দ্ধারিত করিতে

অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য অন্য এক হাদীছ মারফৎ উহা নির্দ্ধারিত হয় যে, চল্লিশের উদ্দেশ্য চল্লিশ বৎসর। (ফৎহুল বারী—৮ × ৪৪৮)

১৭৪২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কাবা শরীফের নিকটবর্ত্তী "ছকিফ" ও "কোরায়েশ" উভয় গোত্রের তিনজন লোক একত্রিত হইল। তাহারা মেদবহুল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ছিল অতি কম। তাহাদের একজন প্রশ্ন উত্থাপন করিল, আমাদের কথাবার্ত্তা কি আল্লাহ তায়ালা শুনিয়া থাকেন ? অপর একজন উত্তর করিল, সশব্দে কথা বলিলে তাহা শুনিয়া থাকেন, আর বিনা শব্দে বলিলে তাহা শুনেন না। তৃতীয় জন মন্তব্য করিল, যদি সশব্দে বলিলে শুনেন তবে নিঃশব্দে বলিলেও শুনিবেন। (অর্থাৎ কোন প্রকার কথাই শুনেন না।) তাহাদের এই শ্রেণীর আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ - وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

"দুনিয়াতে পাপ করা কালে নিজ নিজ কান, চক্ষু, চর্ম্ম ইত্যাদি অঙ্গ সমূহের সাক্ষী থাকা হইতে লুকাইবার ও বাঁচিবার শক্তি তোমাদের ছিল না। (কারণ কোন কাজ উহাদের অসাক্ষাতে করার উপায় নাই। আর আল্লাহ ত সর্ব্ব শক্তিমান তিনি উহাদেরকে বাকশক্তি দান করিবেন। ফলে তোমাদের কার্য্যাবলীর সাক্ষী সংগ্রহ কোন কঠিন ব্যাপার নহে। এতদৃষ্টে পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকাই তোমাদের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল,) কিন্তু মনে হয় তোমাদের ধারণা এই ছিল যে, তোমাদের কার্য্যবলীর খোজ-খবর আল্লাহ তায়ালার নাই। (সুতরাং তিনি কোন কিছুকে সাক্ষী বানাইবেন কিরূপে ?) এই ধারণাই তোমাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে (যে, তোমরা বেপরওয়া ভাবে পাপ করিয়াছ। মানুষকে লজ্জা বা ভয় করিয়া পাপ করিবার সময় তাহাদের হইতে লুকাইয়াছ ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হইতে লুকাইতে পার না, তাঁহার সাক্ষীদের হইতে লুকাইতে পারিতেছ না ; তাহা লক্ষ্য করতঃ আল্লাহকে লজ্জা ও ভয় করিয়া পাপ হইতে বিরত থাক নাই।) ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ।" (২৪ পারা ১৭ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—এই আয়াতের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দানের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে—

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ - حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

"বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার দিক দিয়া একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন আল্লার দুশমনগণকে দোযখের পথে (হিসাব নিকাশের মাঠ—হাশর-ময়দানের দিকে) হাঁকাইয়া আনা হইবে, সকলকে একত্রিত ও সমবেতভাবে চালিত করা হইবে। যখন তাহারা তথায় পৌছিবে তখন তাহাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম্ম তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কার্য্যাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তাহারা নিজেদের চর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তাহারা বলিবে, আজ আল্লাহ আমাদিগকে বাকশক্তি দিয়াছেন। যিনি অন্যান্য বহু জিনিষকে বাকশক্তি দিয়া ছিলেন এবং তিনি তোমাদিগকে প্রথমেও সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং পুনরায় তাঁহার প্রতি তোমাদিগকে আসিতে হইয়াছে।" (২৪ পারা ১৭ রুকু)

উল্লেখিত বিষয়টি ছুরা ইয়াছীনের মধ্যে এইরূপে বর্ণিত আছে—

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -

"কেয়ামতের দিন আমি তাহাদের মুখের বাকশক্তি কিছু সময়ের জন্য রহিত করিয়া দিব এবং তাহাদের হাত আমার সম্মুখে কথা বলিবে, তাহাদের পা তাহাদের কার্য্যবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিবে।" ১৮ পাঃ—ছুরা নূর ৩ রুকুতে বর্ণিত আছে—

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ -

"যে দিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের মুখ, তাহাদের হাত, তাহাদের পা—তাহাদের কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে। ঐ দিন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত কর্ম্মফল পূর্ণরূপে ভোগ করাইবেন এবং ঐ দিন সকলেই উপলব্ধি করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ সঠিক বিচারক এবং প্রতিটি বিষয়ের বাস্তবরূপ প্রকাশকারী।"

উল্লেখিত তিনটি আয়াতের সমষ্টি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বদকার মানুষের বিরুদ্ধে তাহার হাত, পা, চোখ, কান, চামড়া সাক্ষ্য দিবে। এতদ্ভিন্ন এক হাদীছে বর্ণিত আছে—সর্ব্ব প্রথম সাক্ষ্য হইবে বাম পার্শের উরুর।

অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাক্ষ্যদান সম্পর্কে মোছলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা (লোকদের হিসাব-নিকাশের ও ছওয়াল-জওয়াবের সময়) এক ব্যক্তিকে ডাকিবেন এবং তাঁহার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ স্মরণ ও স্বীকার করাইয়া প্রশ্ন করিবেন, তোর কি এরূপ আকিদা ও বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইয়া হিসাবের জন্য আমার সম্মুখে আসিতে হইবে? তখন সে বলিবে, না—আমার এরূপ আকিদা ছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, فإني أنساك كما نسيتني "যেমন তুই আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছিলি, আমিও তোকে ভুলিয়া থাকিব (তোকে রহমত দান করিব না।) তারপর অন্য একজনকে ডাকিয়া আল্লাহ পাক ঐরূপ প্রশ্নই করিবেন ; সেও ঐরূপ উত্তর দিবে। আল্লাহ পাক তাহাকেও ঐরূপ বলিবেন। তারপর তৃতীয় আর একজনকে ডাকিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে সে দাবী করিয়া বসিবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর, তোমার কিতাবের উপর, তোমার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, ছদকা-খয়রাত করিয়াছিলাম—এরূপ ভাবে সে যতদুর পারে নেক আমলের দাবী করিবে। (অর্থাৎ তোমার নিকট হিসাবের জন্য হাজির হইতে হইবে এই বিশ্বাস আমার ছিল, তাই আমি এই সব করিয়াছি।) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে মোনাফেক, তাহার সব দাবী মিথ্যা। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, আচ্ছা। তুমি দাঁড়াও, তোমার মিথ্যা দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াইতেছি। সে ভাবিতে থাকিবে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দিবে? এমন সময় তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে, তোমরা সাক্ষ্য দাও। (আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন তাহা সত্বেও এরূপ করা হইবে) যেন তাহার জন্য ওজর-আপত্তির কোন পথ না থাকে (সম্পূর্ণরূপে দুষী সাব্যস্ত হইয়া মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে মোছলেম শরীফের অন্য আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কেয়ামতের দিন পাপী ব্যক্তিগণ এরূপ দাবীও করিবে যে, হে আল্লাহ! তুমিই বলিয়াছ—আমাদের উপর জুলুম করিবা না ; কাজেই আমার বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হইতে দিব না। সে মনে করিবে এইরূপ হইলে আমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবই না এবং আমার গোনাহ্ খাতার সাক্ষীও পাওয়া যাইবে না।) তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—

كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا

অর্থাৎ কেরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয়ের সাক্ষ্য ত আছেই ইহা ছাড়া আজ তোর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হইবে। এই বলিয়া তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দিবার জন্য হুকুম করা হইবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার ভাবে প্রত্যেকটি কাজের সাক্ষ্য দিবে। তারপর যখন পুনরায় তাহার বাকশক্তি খুলিয়া দেওয়া হইবে তখন সে ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, তোরা ছাই-ভস্ম হইয়া যা; তোদের মত নিমক-হারামদের জন্য আমি দুনিয়াতে কত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া তোদেরকে রক্ষা করিয়াছিলাম, পরিপুষ্ট করিয়াছিলাম।

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; কারণ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যেন মিথ্যা প্রতিবাদ ও ঝগড়া-বিবাদ করার সুযোগ না থাকে। যেমন দুনিয়াতে সাধারণতঃ হইয়া থাকে এবং আখেরাতেও কাফেরগণ প্রথমে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিবে। যেমন এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর কাফের বা মোনাফেককে যখন ডাকিয়া হিসাব লওয়া হইবে তখন সে দাবী করিয়া বসিবে, আমি যে সকল গোনার কাজ করি নাই তাহাও ফেরেশতা আমার নামে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তখন ঐ ফেরেশতা বলিবে, ওহে! তুমি অমুক দিন অমুক জায়গায় এই গোনাহ করিয়াছিলে না? সে বলিবে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কস্মিনকালেও এই গোনাহ আমি করি নাই। তখন তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। (রুহুল মায়ানী)

১৯৪৩। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কাবাসীগণকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহার কথা অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছিল। তখন হযরত (দঃ) তাহাদিগকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য এই বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ "আয় আল্লাহ! আমাকে তাহাদের মোকাবেলায় সাহায্য কর তাহাদিগকে সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষে নিপতিত করিয়া—যেরূপ দুর্ভিক্ষ ইউসুফ নবীর যুগে হইয়াছিল।" ফলে তাহাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আসিল যে, উহাতে সমুদয় চিজ-বস্তু নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অস্থি, চর্ম্ম, মৃতদেহ ইত্যাদি খাইতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা চোখে ধূঁয়া দেখিতে লাগিল। পবিত্র কোরআনে ইহারই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল—

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"আপনি অপেক্ষা করুণ ঐ দিনের যে দিন উপরের দিকে তাহাদের নজরে ধূঁয়া দৃষ্ট হইবে, সেই ধূঁয়া (দেখার কারণ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ) তাহাদের সকলকে ঘিরিয়া ধরিবে যাহা তাহাদের উপর এক কঠিন আজাব হইবে।" (২৫ পারা ১৪ রুকু)

দুর্ভিক্ষে পতিত মক্কাবাসীদের তৎকালীন সর্দ্দার আবু স্থফিয়ান হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনার বংশধর মক্কাবাসী মোজার গোত্রীয় লোকগণ ধ্বংসের সন্মুখীন। অতএব আপনি আল্লার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন—আল্লাহ যেন বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া দুর্ভিক্ষের আজাব দুরীভূত করিয়া দেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে মোজার বংশীয় লোকদের জন্য দোয়া করিতে বল (যাহারা আল্লার দুশমন) ? তুমি ত বড়ই দুঃসাহসী! শেষ পর্য্যন্ত হযরত (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন। ফলে তাহাদের অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল। এই সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ -

"আমি আজাবকে তোমাদের হইতে কিছু দিনের জন্য দুরীভূত করিয়া দিব, কিন্তু (আজাব দুরীভূত হওয়ার পর) নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের দুষ্কৃতির প্রতি) পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।"

অবস্থা তাহাই হইল। তাহারা যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ পাইল পুনরায় খোদাদ্রোহিতার ময়দানে উন্মাদ হইয়া ছুটিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পুনঃ পাকড়াও করিলেন—প্রতিশোধ গ্রহণের পাকড়ানো, তাই উহা হইতে আর তাহারা রক্ষা পাইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে এই বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে—

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

"যে দিন আমি তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে পাকড়াও করিব, সে দিন অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।" এই পাকড়াও হইয়াছিল বদরের জেহাদের দিন। (সেই দিন তাহাদের বড় বড় সর্দ্দারগণ নিহত হইয়া চির জাহান্নামী হইয়াছিল।)

১৭৪৪। হাদীছঃ-আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি কখনও পূর্ণমুখ খুলিয়া হাসিতে দেখিনাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল মুচকি হাসি দেওয়া। তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল যে, ঘনঘটা ও মেঘপুঞ্জ বা ঝড় দেখিলে তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর মলিনতা আসিয়া যাইত।

একদা আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! মেঘ দেখিলে মানুষ বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। আপনাকে দেখি—আপনি মেঘ দেখিলে চিন্তিত হইয়া পড়েন! নবী (দঃ) বলিলেন, মেঘপুঞ্জে আজাবের আশঙ্কা হইতে আমি নিশ্চিত থাকিতে পারি না। পূর্ব্ব যুগের এক জাতি আজাব বাহক মেঘপুঞ্জ দেখিয়া আনন্দে বলিয়াছিল, "এই ত মেঘমালা আসিতেছে আমাদিগকে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ—ঘটনাটি আদ জাতির; তাহারা দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষে ভুগিতেছিল। একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে কাল মেঘপুঞ্জ আসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল—"এই ত মেঘমালা আসিতেছে; আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে"। বস্তুতঃ উহা দ্বারা প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিবাত সৃষ্টি হইল এবং সাত রাত আটদিন পর্য্যন্ত ঝঞ্ঝা বহিয়া তাহাদেরে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। পবিত্র কোরআন ২৭ পাঃ ৮ রুকুতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। নবী (দঃ) এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এক হাদীছে আছে—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী (দঃ) আকাশে মেঘপুঞ্জের সঞ্চার দেখিলেই কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া উহার প্রতি তাকাইতেন এবং এই দোয়া করিতেন—اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ আয় আল্লাহ! ইহার মধ্যে যাহা কিছু অনিষ্ট আছে উহা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতঃপর পর সেই মেঘপুঞ্জ দুরীভূত হইয়া গেলে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিতেন। আর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইলে এই দোয়া পড়িতেন—اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا "হে আল্লাহ উপকারী বৃষ্টি দান করুন।" (মেশকাত শরীফ ১৩৩)

এতদ্ভিন্ন তৃতীয় খণ্ডে ১৫৮৫ নং হাদীছ খানাও এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ আছে—মেঘপুঞ্জ দেখিলে নবীজী (দঃ) বিচলিত হইয়া উঠিতেন। এবং বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তাঁহার বিচলন দুর হইত।

১৯৪৫। হাদীছ ঃ—ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ) (আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিদ্বয়—আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের কণ্ঠ-স্বর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উচ্চ হইয়া যাওয়ার কারণে।

ঘটনা এই ছিল—একদা বনী-তামীম গোত্রের এক দল লোক হযরতের খেদমতে পৌছিল। তাহাদের অভিপ্রায়ে হযরত (দঃ) সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আবুবকর (রাঃ) কা'-কা'-ইবনে মা'বাদ (রাঃ) নামক

ছাহাবীর নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না—বরং আক্‌রা-ইবনে হাবেস (রাঃ) নামক ছাহাবীকে প্রেরণ করা হউক। এতচ্ছ্রবণে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আপনার ইচ্ছাই হইল আমার বিরোধিতা করা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার বিরোধিতার প্রতি আমার মোটেও লক্ষ্য নাই। এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক বাঁধিল এবং (হযরতের সম্মুখেই) তাঁহাদের উভয়ের কণ্ঠ-স্বর উচ্চ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এই আয়াত নাযেল হইলঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ - لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! নবীর (সম্মুখে পরস্পর কথা-বার্ত্তার মধ্যেও তাঁহার) আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিতে পারিবে না। এবং নবীর সঙ্গে কথা বলিতে পরস্পর কথা বলার ন্যায় সম স্বরেও কথা বলিতে পারিবে না। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এই সব আদব-তমীযের নিয়মাধীন না চলিলে) আশঙ্কা আছে—তোমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের সারা জীবনের নেক আমল নষ্ট ও বরবাদ হইয়া যাইতে পারে। নিশ্চয় যাহারা আল্লার রসুলের সম্মুখে (এমন আদব-তমীযের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলে, এমনকি তাহাদের কণ্ঠ-স্বর অত্যন্ত মোলায়েম ও সংযত রাখে, আল্লার রহমতে তাহাদের অন্তর খাঁটী তাক্‌ওয়া-পরহেজগারীতে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের জন্য মাগফেরাত ও অতি বড় প্রতিদান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (ছুরা হুজরাত—২৬ পারা ১৩ রুকু).

এই ঘটনার ও এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর বিশেষভাবে ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কথা বলিতে এত দূর সংযত ও ছোট আওয়াজে কথা বলিতেন যে, অনেক সময় পুনঃ না বলিলে তাঁহার কথা ধরা যাইত না।

১৯৪৬। **হাদীছঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মজলিসে ছাবেত ইবনে কায়স (রাঃ) নামক ছাহাবীকে খোঁজ করিয়া পাইলেন না। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাহার সংবাদ নিয়া আসিব।

সেমতে ঐ ব্যক্তি ছাবেত ইবনে কায়সের নিকট আসিল এবং দেখিতে পাইল, তিনি ভীষণ অনুতপ্ত ও আতঙ্কগ্রস্তরূপে অবনত মস্তকে ঘরে বসিয়া আছেন ; ঘর হইতে বাহিরই হন না। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, এই নরাধমের অবস্থা খুবই খারাপ। এই নরাধমের আওয়াজ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আওয়াজ হইতে উচ্চ হইয়া থাকিত। (সৃষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক রূপেই ঐ ছাহাবীর স্বর উচ্চ ছিল।) অতএব (পবিত্র কোরআনের আয়াত অনুসারে) এই নরাধমের সমুদয় আমল নষ্ট ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

এতচ্ছ্রবণে ঐ ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সেই ছাহাবীর সমুদয় উক্তি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। (হযরত (দঃ) তাহাকে পুনঃ ঐ ছাহাবীর নিকট পাঠাইলেন)। সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট এক মহান সুসংবাদ বহন করিয়া আসেন—হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন :—

اِذْهَبْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

"তুমি তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে সুসংবাদ দাও—নিশ্চয় আপনি দোযখী হইবেন না, বরং আপনি হইবেন বেহেশতী।"*

---

* তথা কথিত মাওলানা আকরম খাঁর "মোস্তফা চরিত" দেখার দুর্ভাগ্য হইতে আল্লাহ তায়ালা বাঁচাইয়া ছিলেন এবং ঐ পবিত্র নামের অপবিত্র বই খানা পঁচা গুদামে পরিত্যক্ত হইয়া ছিল। ইদানিং দৈনিক পত্রিকা আজাদ মারফৎ উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

উহার ভূমিকায়ই ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী জঘন্যতম মিথ্যা ও ভুল উক্তি রহিয়াছে। তাহারই বাক্যে সেই কুখ্যাত উক্তিটা শুনুন—"সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ্য ছহি-বোখারী ও ছহি-মোছলেম হইতে কতকগুলি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই হাদীছ গুলির ছনদ ছহীহ হওয়া সম্বন্ধে কোন তর্কই নাই—কারণ এগুলি বোখারী ও মোসলেমের হাদীছ। ঐ হাদীছ গুলি প্রকৃত ও সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহিত হইতে পারে না।"

কি জঘন্য উক্তি! যে, বোখারী-মোছলেম শরীফেও এমন হাদীছ আছে যাহা সত্য বলিয়া গৃহিত হইতেই পারে না, অর্থাৎ ঐ হাদীছের মিথ্যা হওয়া অবধারিত।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন কি পাগলামী! আকরম খাঁ সাহেব জীবিত থাকা কালে বক্ষমান গ্রন্থেই তাহার এই শ্রেণীর অনেক উক্তির সমালোচনাই আমরা করিয়াছি, এখন তিনি তাহার কর্ম্মফল ভোগের জায়গায় পৌঁছিয়াছেন আমাদের সমালোচনার প্রয়োজন আর নাই। তবুও পাঠকদের ঈমান রক্ষার্থে তাহার পাগলামীটা ধরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

বোখারী শরীফে মিথ্যা হাদীছ আছে বলিয়া আকরম খাঁ যে সব নমুনা পেশ করিয়াছেন উহার প্রথমটিই হইল আলোচ্য হাদীছটি। এই হাদীছটি সম্পর্কে তাহার কি নির্লজ্জ উক্তি যে—"এই হাদীছটি কখনই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহিত হইতে পারে না। তাঁহার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডের অবতরণিকায় বর্ণিত রহিয়াছে।

১৯৪৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের হিসাব-নিকাশান্তে অসংখ্য ও অগণিত) দোযখীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, কিন্তু (তবুও দোযখ পরিপূর্ণ হইবে না এবং তাহার স্পৃহা কমিবে না।) সে বলিতে থাকিবে, আরও অধিক আছে কি ? এমনকি অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর স্বীয় কুদরতের এমন প্রভাব প্রয়োগ করিবেন যাহাতে দোযখের গভীরতা এবং প্রশস্ততা সংকোচিত হইয়া যাইবে। তখন সে বলিবে, যথেষ্ট হইয়াছে—যথেষ্ট হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে জাহান্নামের গভীরতা ও প্রশস্ততার বিবরণে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার পেট পুরিয়াছে কি ? সে বলিবে, আরও অধিক আছি কি ?" (ছুরা ক্বাফ—২৬ পারা)

উল্লেখিত হাদীছখানা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য্যেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৯৪৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত ও দোযখের মধ্যে বিতর্ক হইল—দোযখ বলিল, বড় বড় মানুষ যাহারা ফখর ও গর্ব্বকারী তাহারা আমার ভাগে আসিবে। তখন বেহেশত আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিল, হে পরওয়ারদেগার ! আমার ভাগে শুধু দুর্ব্বল ও নিম্নস্তরের বিবেচিত লোকগণ কেন হইবে ? তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতকে বলিয়াছেন, তুমি আমার রহমতের স্থান। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদেরকে রহমত দান করিব যাহাকে ইচ্ছা করিব। (আমার রহমতের ক্ষেত্রে কাহারও আত্মম্ভরিতা ও গর্ব্ব-ফখর কাজে আসিবে না, নম্রতার দ্বারাই উহা লাভ হইতে পারিবে।) আর দোযখকে বলিয়াছেন, তুমি আমার আজাব ও শাস্তিদানের স্থান ; তোমার দ্বারা আমি শাস্তি দান করিব যাহাকে ইচ্ছা করিব, (কাহারও প্রভাব প্রতিপত্তি উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।)

আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উভয়কে ইহাও বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেককেই এই পরিমাণ অধিবাসী প্রদান করা হইবে যে, তোমরা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অবশ্য দোযখ পরিপূর্ণ না হওয়ার দরুণ আল্লাহ তায়ালা উহার উপর স্বীয় বিশেষ কুদরত প্রয়োগ করিবেন। যদ্দরুণ সে বলিতে বাধ্য হইবে যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে—বস্তুতঃ তখন দোযখের গভীরতা ও প্রশস্ততা কমিয়া গিয়া সে ভরিয়া যাইবে। (দোযখ পূর্ণ করিবার জন্য কোন নূতন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইবে না, কারণ) আল্লাহ তায়ালা কোন জীবকে বিনা অপরাধে দোযখে

ফেলিবেন না। পক্ষান্তরে বেহেশতকে পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নূতন মখলুক পয়দা করিবেন। (তাঁহারা বেহেশতবাসী মানুষের অধীনস্থ হইবেন।)

১৯৪৯। **হাদীছ** :—আল্লাহ তায়ালা যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ -

"আপনি বিরোধীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা-ভৎ‍সনার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া চলুন এবং (তাহাদের ব্যথাদায়ক কথাবার্ত্তা ভুলিয়া থাকার সহায়করূপে আল্লার সঙ্গে সম্পর্কে দৃঢ় করার জন্য) সকাল-বিকাল স্বীয় প্রভুর গুণগানে (—নামায ও জিক্‌র-আজ্‌কারে) মশগুল হউন, বিশেষরূপে রাত্রেরও কিছু অংশে এবং প্রত্যেক নামাযের পরে প্রভুর তছবীহ—পবিত্রতার জিক্‌র করুন।" (ছুরা ক্বাফ—২৬ পাঃ)

উক্ত আয়াতের শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে প্রত্যেক নামাযের পরে তছবীহ পড়ার আদেশ করিয়াছেন।

১৯৫০। **হাদীছ** :—মসরুক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান! হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কি তাঁহার প্রভু পরওয়ার-দেগারকে দেখিয়াছিলেন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তোমার কথায় আমার শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। তুমি তিনটি বিষয় জ্ঞাত নও কি? যে তিনটি বিষয় ঘটিয়াছে বলিয়া উক্তি করিলে তাহা মিথ্যা ও অবাস্তব হইবে। (১) যে বলিবে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন তাহার কথা অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :—

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

"কোন মানুষের দৃষ্টি আল্লাহ তায়ালাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারে না, কিন্তু (সব কিছু, এমনকি) সকলের দৃষ্টিও তাঁহার আয়ত্ত্বে।" আরও একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :—

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ -

"কোন মানুষের জন্য (ইহজগতে) এই সুযোগ নাই যে, আল্লাহ তাহার সঙ্গে কালাম করেন তিন পন্থার কোন পন্থা ব্যতিরেকে—[ক] কাশ্‌ফ ও এলহামরূপে

বাণী পৌঁছাইয়া। [খ] (মানবের দৃষ্টির) অন্তরাল হইতে। [গ] ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া—যে ফেরেশতা বাণী পৌঁছাইয়া থাকেন।" * (ছুরা শূরা—২৫ পাঃ)

(২) আর যে ব্যক্তি বলিবে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আগামী দিনের অগ্রিম খবর জানিতেন তাহার উক্তিও অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এই দাবীর সমর্থনেও আয়াত তেলাওয়াত করিলেন— وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

"কোন মানুষ জানে না, সে আগামী কাল কি করিবে।

(৩) আর যে ব্যক্তি বলিবে যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) (উম্মৎগণকে পৌঁছাইবার মত) কোন বস্তু গোপন রাখিয়া ছিলেন, তাহার উক্তিও মিথ্যা এবং অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) এই দাবীর সমর্থনেও এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ - وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রসুল (দঃ)! আপনার নিকট যত কিছু নাযেল ও অবতীর্ণ করা হইয়াছে সবটুকুই আপনি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিন ; অন্যথায় আপনি আপনার রসুল হওয়ার পদের দায়িত্ব পালনকারী গণ্য হইবেন না।"

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক আল্লাহ তায়ালাকে দেখিবার প্রমাণ রূপে কথিত পবিত্র কোরআন ছুরা নজমের আয়াত— مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى "হযরত (দঃ) যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা দেখিবার সময় তাঁহার জ্ঞানশক্তি একটুও বিভ্রান্ত হইয়াছিল না।" এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى "হযরত (দঃ) তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন ছিদরাতুল-মোন্‌তাহার নিকট।" এই ধরণের আয়াত সমূহের বিষয় বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, উক্ত আয়াত সমূহে যাঁহাকে দেখিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)। ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিলেও হযরত (দঃ) তাঁহাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে শুধুমাত্র দুইবার দেখিয়াছিলেন। উহারই বর্ণনা ছুরা নজমের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন কি—না সে সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যেই মতভেদ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবীর মতে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন ; যেহেতু তাহা এই জগতের সীমার বাহিরের ঘটনা, তাই উহা সম্ভব হইয়াছিল।

---

* আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য এই যে, সামনা-সামনি দেখারূপে কথা বলা ও শুনা যেরূপ অসাধ্য যাহা উক্ত আয়াতের মর্ম্ম তদ্রূপ দেখা-সাক্ষাৎও অসাধ্য।

আয়েশা (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবীর মতে দর্শন লাভ করেন নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতও ইহাই ছিল। সেই জন্যই তিনিও ছুরা নজমের আয়াত সমূহ জিব্রাইল ফেরেশতাকে দেখা প্রসঙ্গে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯৫১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছুরা নজমের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জিব্রাইল ফেরেশতাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন—তখন জিব্রাইল ফেরেশতা ছয় শত ডানা বিশিষ্ট ছিলেন।

১৯৫২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছুরা নজমের এক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহাও বলিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) সম্মুখ দিকে আকাশের ঊর্দ্ধ কিনারায় সবুজ বর্ণের মখমল দেখিতে পাইয়া ছিলেন, যাহা এত বড় আকারের ছিল যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ মখমল হয়ত গালিচা-বিশিষ্ট ছিল যাহার উপর জিব্রাইল (আঃ) কুরছি বা আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিম্বা জিব্রাইল আলাইহেচ্ছালামের গায়ের পোষাক ছিল ঐ মখমল বা তাঁহার ডানাগুলির সৌন্দর্য্য সবুজ মখমলের ন্যায় ছিল।

১৯৫৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ক্বায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (এক শ্রেণীর মোমেনের জন্য বেহেশতের মধ্যে ফল-ফুলাদির আরাম-আয়েশ পূর্ণ মনোরম) দুই দুইটি বাগান থাকিবে। যাহার বাংলো, কুঠি ও পাত্র (ইত্যাদি ফার্ণিচার সমূহ এবং) সমুদয় জিনিষ রৌপ্যের তৈরী হইবে। অপর (এক শ্রেণীর মোমেনের জন্য) দুই দুইটি বাগান থাকিবে যাহার পাত্র সমূহ এবং সমুদয় জিনিষ স্বর্ণের তৈরী হইবে। আর বেহেশতীগণ চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে তাঁহাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের দীদার ও সাক্ষাৎ লাভ করিবেন—এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যে, প্রভু পরওয়ারদেগারের মহত্ত্বের প্রভাবময় আভা ব্যতীত মধ্যস্থলে কোন প্রকার আবরণ থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআন ছুরা রহমানের মধ্যে উক্ত দুই শ্রেণীর বাগানের উল্লেখ রহিয়াছে······ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের সম্মুখে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য দুইটি বিশেষ বাগান প্রস্তুত রহিয়াছে।········ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ "উক্ত বাগানদ্বয় অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরও দুইটি বাগান আছে·········।"

উক্ত ছুরায় উল্লেখিত দুই শ্রেণীর বাগানের তুলনা মূলক তফসীল ও ব্যবধানও ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য হাদীছে আর একটি তফসীল এবং ব্যবধান

বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর বাগানের সমুদয় চিজ-বস্তু স্বর্ণ নির্ম্মিত হইবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগানের সমুদয় চিজ-বস্তু রৌপ্য নির্ম্মিত হইবে।

প্রথম শ্রেণীর বাগানগুলি হইবে বিশিষ্ট মোমেনদের জন্য—তাঁহারা প্রত্যেকে উহার দুইটি করিয়া বাগান লাভ করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগানগুলি হইবে সর্ব্ব সাধারণ মোমেনদের জন্য, তাঁহারা প্রত্যেকে উহার দুই দুইটি বাগান লাভ করিবেন।

১৯৫৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একদা বলিলেন, আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ ঐ সব নারীদের উপর যাহারা শরীরে চিত্র বা নাম ইত্যাদি খোদাই করিয়া অঙ্কিত করার প্রতি সমাজকে প্রলুব্ধ করে বা নিজ শরীরে উহা গ্রহণ করে এবং যাহারা ললাট বা কপালের উর্দ্ধাংশ মাথার চুল উপড়াইয়া কপাল প্রশস্ত করে বা ভ্রুর লোম উপড়াইযা উহাকে সরু করে এবং যাহারা রেতি ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত ঘর্ষণ ও ক্ষয় করিয়া দাঁতকে সরু করে এবং দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর নারীগণ রূপ-সজ্জার প্রবণতায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ও গঠনের প্রাকৃতিক ও সৃষ্টিগত আকৃতি পরিবর্ত্তন ও বিকৃত করিয়া ফেলে। (রূপ সজ্জার এই অবাঞ্ছিত চাক-চিক্যের সাহায্যে তাহারা নিশ্চয়ই বেগানাদের চোখে ফুটিয়া উঠিতে চায়, সুতরাং তাহারা লা'নৎ ও অভিশাপের পাত্র।)

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি শুনিতে পাইয়া উম্মে-ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—আপনি এই ক্ষেত্রে লা'নৎ করিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহাকে লা'নৎ করিয়াছেন, আল্লার কেতাব কোরআনে যাহার প্রতি লা'নৎ করা হইয়াছে তাহার প্রতি আমি লা'নৎ করিব না কেন? এতচ্ছ্রবণে মহিলাটি বলিল, আমি কোরআন শরীফ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি, কোথাও আমি এই শ্রেণীর লা'নৎ ও অভিশাপ পাই নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি লক্ষ্য করিয়া পড়িতে তবে নিশ্চয় (দেখিতে) পাইতে। তুমি কি এই আয়াত কোরআন শরীফে পড় নাই ঃ—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রসুল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তোমরা উহাকে মজবুতরূপে গ্রহণ ও অবলম্বন কর। আর যাহা হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক।"

মহিলা বলিলেন, এই আয়াত ত কোরআন শরীফে তেলাওয়াত করিয়াছি। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতে রসুলের নিষেধাজ্ঞা হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হইয়াছে। আর উল্লেখিত কার্য্যাবলীকে রসুল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর মহিলা বলিলেন, আপনার স্ত্রীও ত ঐ কাজ করিয়া থাকে ! আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এখনই তুমি আমার গৃহে যাও এবং ভালরূপে খুঁজিয়া দেখ। মহিলা তাহাই করিলেন, কিন্তু তাঁহার দাবীর সত্যতা তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আমার স্ত্রী ঐরূপ কাজ করিলে কখনও আমার গৃহে তাহার ঠাই হইত না।

ব্যাখ্যা ঃ—বিশিষ্ট ছাহাবীগণের অন্যতম ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এস্থলে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান যুগের একটি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক। অধুনা অনেক কৃত্রিম মোসলেম নামধারীকে দেখা যায়, কোরআনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ঠিকঠিক দেখাইয়া সুন্নাহ্‌কে অস্বীকার করিতে চায়। ঈমান ও ইসলামের মূল কর্ত্তনকারী এই ব্যাধি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ও কঠোর সতর্কবাণী স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও অনেক করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, রসুলের আদেশ-নিষেধ তথা সুন্নার বরখেলাফকারী বস্তুতঃ কোরআনেরও বরখেলাফকারী।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একটি অতি মূল্যবান আদর্শও দেখাইয়াছেন। অনেক লোককে দেখা যায় তাহারা অপরকে পরহেজগারীর নছিহত করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনকে পরহেজগার বানাইবার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কটাক্ষকারিনীকে তাঁহার গৃহে যাইয়া তল্লাসী লওয়ার অনুমতি দিলেন। অধিকন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন— لو كانت كذلك ما جامعتها "আমার স্ত্রী ঐ শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকিলে, আমার নিকট তাহার ঠাই হইত না।"

১৯৫৫। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং সে অতিশয় ক্ষুধার্ত বলিয়া প্রকাশ করিল। তখন হযরত (দঃ) প্রথমতঃ নিজ গৃহে স্বীয় স্ত্রীগণের নিকট (তাহার জন্য খাদ্য চাহিয়া) সংবাদ পাঠাইলেন। নবী-পত্নিগণ সকলেই উত্তর পাঠাইলেন, আমাদের নিকট একমাত্র পানি ভিন্ন কিছুই নাই। তখন হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন, কেহ আছে কি ! এই ব্যক্তিকে অদ্য রাত্রে মেহমানরূপে গ্রহণ করিয়া লয় ? মদীনাবাসী এক ছাহাবী দাঁড়াইয়া বলিলেন, হাঁ—আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রসুলুল্লাহ ! এই বলিয়া তিনি মেহমানকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

মেহমান নিয়া আসিয়াছি। পুরাপুরীভাবে রসুলুল্লার মেহমানের খাতির-তাওয়াজু কর। মেহমানকে না দিয়া কোন বস্তু গৃহে জমা রাখিও না। স্ত্রী বলিল, গৃহে শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েদের কিছু আহার রহিয়াছে। উহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তখন ঐ ছাহাবী স্ত্রীকে বলিলেন, ঐ খাদ্যটুকুই মেহমানের জন্য প্রস্তুত কর এবং ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া দাও। আর (আমাদের ছাড়া মেহমান খাদ্য গ্রহণ করিতে চাহিবে না, কিন্তু খাদ্য অল্প—আমরা খাইলে মেহমানের পেট ভরিবে না, তাই) খাওয়ার সময় বাতি নিভাইয়া দিও।

স্ত্রী তাহাই করিল—ছেলে-মেয়েদেরকে ঘুম পাড়াইয়া দিল এবং ঐ খাদ্য মেহমানের জন্য প্রস্তুত করিয়া বাতি জ্বালাইয়া দিল। অতঃপর গৃহস্বামী মেহমানকে লইয়া খাইতে বসিলেন, তখন স্ত্রী বাতির সলিতা ঠিক করার ভান করিয়া বাতি নিভাইয়া দিল এবং অন্ধকারের মধ্যে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী হাত নাড়াচাড়া করিয়া মেহমানকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহারাও তাহার সঙ্গে খাইতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা কিছুই খান নাই। সব খাদ্যটুকু মেহমানকে খাইবার সুযোগ দিয়াছেন। এই ভাবে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী উভয়ে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর বেলা ঐ ছাহাবী হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, অমুক স্বামী ও অমুক স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রশংসায় কোরআনের এই আয়াত নাযেল করিয়াছেন :—

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - وَمَنْ يُوقَ

شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

"তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়াও নিজে না খাইয়া অপরকে খাওয়ায়; যে ব্যক্তি নিজের দেলকে বখিলী ও কৃপণতা হইতে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছে সে সফলকাম হইবেই।" (ছুরা হাশর—২৮ পারা)

১৯৫৬। হাদীছ ঃ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদ উপলক্ষে আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার বাহিরে গেলাম। ঐ সময় লোকদের মধ্যে খাদ্যের খুব অভাব পড়িল; সেই সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক সর্দ্দারকে (দুরভিসন্ধি মূলক ভাবে) এই প্রচারণা চালাইতে শুনিলাম যে, সে মদীনাবাসী আনছারগণকে পরামর্শ দিয়া বলিতেছে, "তোমরা রসুলুল্লার সঙ্গী (—মোহাজের)-গণকে কোন প্রকার সাহায্য করিও না। তোমরা তাহাদের উপর কোন খাদ্যদ্রব্য খরচ করিও না যেন তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।"

এতদ্ভিন্ন (ঐ সময় একজন মোহাজের এবং একজন আনছারী ছাহাবীর মধ্যে কিছুটা ঝগড়ার সৃষ্টি হইল * সেই সুযোগে মোনাফেক-প্রধান) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির উস্কানী দান স্বরূপ) এই দম্ভোক্তিও করিতে শুনিলাম—"এইবার মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া সবল সংখ্যাগুরু তথা দেশবাসীগণ দুর্ব্বল সংখ্যালঘু বিদেশীগণকে মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে।"

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের এই সব দুরভিসন্ধি মূলক কথাগুলি আমি আমার চাচার নিকট বলিলাম, আমার চাচা ঐগুলি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরীভূত করিলেন। সেমতে নবী (দঃ) আমাকে ডাকিলেন, আমি হযরত (দঃ)কে সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিলাম।

হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার সাঙ্গো-পাঙ্গগণকে ডাকাইলেন। তাহারা হযরতের নিদট কসম করতঃ সম্পূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করিল। (যেহেতু আমার সাক্ষী ছিল না। আর তাহারা কসম করিয়াছে, তাই আইনতঃ) আমি হযরতের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম এবং তাহারা সত্যবাদী গণ্য হইল। ইহাতে আমি এত অধিক চিন্তিত ও ব্যাথিত হইলাম যে, সারা জীবনে কখনও এইরূপ হই নাই। এমনকি, আমি বাহিরে চলা-ফেরা ছাড়িয়া দিয়া গৃহভ্যন্তরে বসিয়া গেলাম। আমার চাচা আমাকে মালামত করিয়া বলিলেন, এমন ঘটনায় কেন পতিত হইয়াছিলেন যদ্দরুণ তুমি হযরতের নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়াছ এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?

অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকগণকে মিথ্যাবাদী ঘোষনা করিয়া এবং তাহাদের ঐ সব দুরভিসন্ধির এবং উস্কানীমূলক কথার স্পষ্ট বিবরণ দান করিয়া إذا جاءك المنافقون—পূর্ণ ছুরা "মোনাফেকূন" নাযেল করিলেন তৎক্ষণাৎ হযরত নবী (দঃ) আমাকে সংবাদ দিয়া আনিলেন এবং উক্ত ছুরা আমার সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, হে যায়েদ! আল্লাহ তায়ালা তোমার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য ও ঘোষনা দিয়াছেন।

১৯৫৭। হাদীছ: - জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক জেহাদের ছফরে ছিলাম। তখন এই ঘটনা ঘটিল—এক মোহাজের কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া একজন আনছারী তথা মদীনাবাসী মোছলমানকে তাহার নিতম্বের উপর আঘাত করিল, ফলে আনছারী ব্যক্তি "হে আনছার ভাইগণ!" বলিয়া তাহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিল। অপর দিকে মোহাজের ব্যক্তি "হে মোহাজেরগণ!" বলিয়া তাহার সাহায্যের প্রতি আহ্বান করিল এবং তাহা হযরত (দঃ)ও শুনিলেন।

---

* পরবর্তী হাদীছে সেই ঝগড়ার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে।

এইরূপে দলীয় ভিত্তিতে সাহায্যের প্রার্থী হইয়া মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রতি রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় ঘৃণা ভরে বলিলেন, জাহেলিয়ত বা অন্ধকার যুগের রীতি-নীতির ডাকা-ডাকি কেন ? লোকগণ হযরতের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিল যে, এক মোহাজের এক আনছারীকে তাহার নিতম্বে আঘাত করিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ধরণের ডাকা-ডাকি পরিত্যাগ করা আবশ্যক, ইহা বড়ই ঘৃণার বস্তু।

উক্ত ঝগড়ার ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকেরও গোচরীভূত হইল (এবং ইহার দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে) সে বলিল, তাহাদের তথা মোহাজেরগণের এতই সাহস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা এই কাজ করিয়াছে ? খোদার কসম—এইবার মদীনায় ফিরিয়া যাওয়ার পর সবল সংখ্যাগুরু (তথা মদীনাবাসীগণ) দুর্ব্বল সংখ্যালঘু (তথা বিদেশী মোহাজের)গণকে তাড়াইয়া দিবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদীনায় আসার প্রথম দিকে মদীনাবাসী মোসলমানদের সংখ্যাই অনেক অধিক ছিল, অবশ্য পরে মোহাজেরগণেরও সংখ্যাধিক্য হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের এই উক্তি জ্ঞাত হইয়া ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ! আপনি আমাকে বাধা দিবেন না। আমি এই মোনাফেকের শিরচ্ছেদ করিয়া দেই। হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, সহ্য করিয়া থাক ; কেহ যেন এই কথা বলার সুযোগ না পায় যে, মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দলভুক্তকেও মারিয়া ফেলে। (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই "মোনাফেক" তথা প্রকাশ্যে মোসলমান ছিল। তাই হযরত (দঃ) তাহাকে মারিয়া ফেলার বিপক্ষে এই কথা বলিয়াছেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ দান ও মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনায় ২৮ পারার ছুরা মোনাফেকুন নাযেল হইয়াছিল, যাহার তরজমা এই—

মোনাফেকরা আপনার সম্মুখে আসিলে বলে, আমরা শপথ করিয়া বলি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিশ্চয় আল্লার রসুল। আল্লাহ ত জানেনই, আপনি নিশ্চয় তাঁহার রসুল, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী, (তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বিশ্বাস ও স্বীকার করে না যে, আপনি রসুল।) তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে থাকিয়া লোকদিগকে আল্লার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে। তাহাদের এই কুকর্ম্ম বড়ই জঘন্য। এরূপ জঘন্য কাজে তাহারা লিপ্ত রহিয়াছে এই কারণে যে, তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করিয়া (অন্তরে সর্ব্বদা কুফরী পোষণ করে এবং সুযোগ প্রাপ্তে) আবার মুখেও কুফরী প্রকাশ করে, ফলে তাহাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর সুবুদ্ধির উদয় হইবে না।

আপনি তাহাদিগকে দেখিলে তাহাদের দৈহিক আকার-আকৃতি আপনার দৃষ্টিতেও ভাল লাগিবে, তাহারা কথা বলিলে আপনিও তাহাদের কথা শুনিবেন। (তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি এবং মিঠা মিঠা কথা খুবই ভাল দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ ইসলামের ভিতর তাহারা মোটেই ঢুকে নাই—) তাহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেন কতগুলি থাম বা খুঁটি যাহার কোন অংশই মাটির ভিতরে ঢুকে নাই—কোন কিছুতে হেলান লাগান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। (এরূপ খুঁটিগুলি মোটা মোটা দেখাইলেও দাঁড়ানোর মধ্যে উহাদের কোনই শক্তি নাই, যে কোন মামুলী কারণে উহা পড়িয়া যায়। তদ্রূপ মোনাফেকদের বাহ্যিক অবস্থা ভাল দেখাইলে কি হইবে ঈমান ও ইসলামে স্থিতিশীলতার লেশ মাত্র তাহাদের নাই ; যে কোন সুযোগে ইসলামদ্রোহী কথা ও ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার কারণে তাহারা সর্ব্বদা আতঙ্কিত ও ভীত থাকে ;) কোন শব্দ শুনিলে মনে করে তাহাদের বুঝি বিপদ আসিল ! (তাই তখন মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কসমের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।)

তাহারা (আপনার মিশনের) চিরশত্রু, তাহাদের হইতে আপনি সতর্ক থাকিবেন। আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করুন ; তাহাদের বুঝ কতই না উল্টা ! যখন তাহাদিগকে বলা হয় আস—দিলে-মুখে ইসলাম ও ঈমানকে গ্রহণ করিয়া আস ! আল্লার রসুল তোমাদের পূর্ব্ব ত্রুটির জন্য আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন তখন তাহারা মাথা নাড়াইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং দেখিবেন তাহারা আত্মম্ভরিতা পূর্ব্বক ঘাড় ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা সমান ; আল্লাহ তায়ালা কস্মিনকালেও তাহাদেরে ক্ষমা করিবেন না। এরূপ নাফরমানদেরকে আল্লাহ হেদায়েতেরও তৌফিক দেন না !

ইহারাই বলিয়াছে, রসুলের দলে যাহারা আছে তাহাদের জন্য এক পয়সাও খরচ করিও না ; তবেই তাহারা দল ছাড়িয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও—আসমান জমিনের সমুদয় ভাণ্ডার আল্লার হাতে, কিন্তু মোনাফেকদের সেই বুঝ নাই।

ইহারাই বলিয়াছে, এইবারে মদীনায় পৌঁছিয়া শক্তিশালীগণ (তথা মদীনার অধিবাসী সংখ্যাগুরুগণ) দুর্ব্বলগণকে (তথা সংখ্যালঘু বিদেশী মোহাজেরদিগকে) মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে। স্মরণ রাখিও—প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিশালী হইলেন আল্লাহ, আল্লার রসুল এবং মোমেন দল, কিন্তু মোনাফেকদের সেই জ্ঞান নাই।

হে মোমেনগণ ! তোমাদের ধন-জন যেন তোমাদিগকে আল্লার ইয়াদ হইতে গাফেল—উদাসীন করিতে না পারে। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাফেল হইবে তাহার জন্য ধ্বংস অনিবার্য্য। আর তোমরা আমার প্রদত্ত ধন-সম্পদ হইতে আমার পথে ব্যয় কর ইহার পুর্ব্বে যে, কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, আর তখন সে বলিতে থাকে, প্রভু হে !

আমাকে কিছু সময়ের সুযোগ দেন না কেন যেন আমি দান-খয়রাত করিতে পারি এবং নেককারদের দলভুক্ত হইতে পারি।

আল্লাহ কখনও অবকাশ দেন না কোন জীবকে তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্য্য-কলাপের খবর রাখেন।

১৯৫৮। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বিবরণ শুনিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার "সাক" তথা তাঁহার এক বিশেষ ছিফত বিকশিত করিবেন। ইহার প্রভাবে সকল মোসলমান নারী-পুরুষ তাঁহার দরবারে সেজদাবনতঃ হইয়া পড়িবে। অবশ্য যাহারা দুনিয়াতে রিয়া তথা শুধু লোক-দেখান এবং শুধু প্রচার ও নাম-রটান উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়া থাকিত (আর যাহারা কাফের ছিল—যাহারা খোদা ভিন্ন অন্যকে সেজদা করিয়াছে) তাহারা ঐ সময় সেজদা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। তাহারা সেজদার জন্য প্রস্তুত হইবে বটে, কিন্তু তখন তাহাদের পিঠ ও কোমর আস্ত কাঠের ন্যায় হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা কলম ২৯ পারায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ - خَاشِعَةً

أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন "সাক" বিকশিত হইবে। যাহার প্রভাবে সকল মানুষ সেজদার প্রতি ধাবমান হইবে। কিন্তু (আল্লাহ-ত্যাগী নাফরমান যাহারা) তাহারা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকিবে, সব দিক দিয়াই অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে। (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) তাহাদিগকে (এক আল্লার জন্য) সেজদা করার প্রতি কত ভাবে ডাকা হইত এবং তখন তাহাদের অঙ্গ সমূহ সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। (ইচ্ছা করিলেই সেজদা করিতে সক্ষম হইত, কিন্তু তখন তাহারা সেজদা করে নাই। তাই আজ তাহাদের ইচ্ছা হইবে, কিন্তু সেজদা করার শক্তি পাইবে না, পিঠ ও কোমর কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া থাকিবে।)

১৯৫৯। হাদীছ ঃ—(ছুরা কলম ২৯ পারায় হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের জাতির কুফরীর বিবরণ দান উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কতিপয় দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—) ওয়াদ্দ্, সুয়া', ইয়াগূছ্, ইয়াউক্, নস্র্। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব নাম নূহ আলাইহেচ্ছালামের জাতির বিশিষ্ট নেককার লোকদের নাম ছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাঁহাদের সমাজের লোকগণকে এই উস্কানী দিল যে, তাঁহাদের

স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহাদের খানকায় তাঁহাদের নামে তাঁহাদের আকৃতির স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করা হউক। লোকগণ তাহাই করিল। তখন ঐ সব স্মৃতিফলকের কোন প্রকার পূজা-পাঠ করা হইত না, কিন্তু ঐ সব স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠাকারী—যাহারা উহার মূল তথ্য জ্ঞাত ছিল তাহাদের মৃত্যু হইলে পর পরবর্ত্তী অজ্ঞ লোকগণ ঐ সব স্মৃতিফলকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল এবং উহা দেব-দেবীতে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দেখাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান যুগেও আরবের বিভিন্ন গোত্রে ঐ সব দেব-দেবীর প্রচলন রহিয়াছে যথা—দৌমাতুল্-জন্দল নামক স্থানে কাল্ব্ গোত্রে "ওয়াদ্দ্", হোজায়েল গোত্রে "সুয়া", জুরুফ নামক স্থানে মোরাদ গোত্রে "ইয়াগুছ্" হাম্দান গোত্রে "ইয়াউক্", হিম্ইয়ার গোত্রে "নছ্র" নামীয় দেবতার প্রচলন এখনও রহিয়াছে।

● ৩০ পারা ছূরা "আবাছা" ১৩—১৬ আয়াত সমূহে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের পবিত্রতা ও উচ্চ সম্মান সম্পর্কে বলিয়াছেন—"(এই কোরআন লৌহে মাহফুজের) অতি সম্মানিত, উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন পাক-পবিত্র পত্রসমূহে লিপিবদ্ধ; অতি মহৎ ও মহান ফেরেশ্তা লিখকগণের হস্তে সুরক্ষিত।"

১৯৬০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং সে কোরআনের সুসংরক্ষক ও সুদক্ষ; কেয়ামতের দিন সে মহৎ ও মহান ফেরেশতা লিখকগণের তুল্য বিশেষ মর্য্যাদা লাভকারী হইবে।

আর যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং উহা তাহার পক্ষে কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে বার বার উহাকে আওড়াইতে থাকে তাহার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

১৯৬১। হাদীছ ঃ—জুন্দুব ইবনে ছুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসুস্থতা বোধ করিলেন। তাই তিনি দুই বা তিন রাত্র তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন না। (তাহাজ্জুদের মধ্যে যে, তিনি সুদীর্ঘ কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকিতেন এই দুই-তিন রাত্র তাহাও শ্রুত হইল না।) এতদ্ভিন্ন এই দুই তিন দিন ওহীবাহক জিব্রাইল ফেরেশতার আগমনও বন্ধ ছিল; (নূতন কোন ওহী-বাণী প্রচারিত হইয়া ছিল না।) এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া হযরতের প্রতিবেশিনী একটি নারী হযরতের সম্মুখে আসিয়া বলিল, হে মোহাম্মদ! আমার মনে হয়—তোমার নিকট যে ভূতটি আসিয়া থাকিত সে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুই-তিন রাত্র যাবৎ তোমার নিকট তাহার আগমনের কোন খোঁজ পাই না।

(এইরূপ কটুক্তি ও কটাক্ষ হযরতের মনে যেন আঘাত হানিতে না পারে,) তাই আল্লাহ তায়ালা স্নেহপূর্ণ ভাষায় এই ছুরাটি নাযেল করিলেন—

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ - وَمَا قَلٰى

"দিনের আলো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর শপথ—আপনার প্রভু আপনাকে ভুলেন নাই, ছাড়েন নাই এবং আপনার প্রতি বিরাগী হন নাই······।"

ব্যাখ্যা ঃ—এই নাপাক কটূক্তিকারিণী নারীটি ছিল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সর্ব্বাধিক বিদ্বেষ পোষণকারিণী হযরতের যাতায়াত পথে কাঁটা নিক্ষেপকারিণী সর্ব্ব পরিচিতা—আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে-জমীল। যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা রহিয়াছে যে, গলায় কাছি বাঁধিয়া তাহাকে ভয়ঙ্কর শিখাযুক্ত দোযখের আগুনে নিঃক্ষেপ করা হইবে। এহেন খবিস ঐরূপ বলিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

কটাক্ষের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা যে শপথ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওহী বাহক জিব্রাইলের আগমন দিবালোকের আগমন স্বরূপ এবং তাঁহার অনাগমন দিবালোকের অনাগমন তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী স্বরূপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী দৃষ্টে কেহ বলিতে পারে না, বিশ্ববাসী বিরাগভাজন হইয়া গিয়াছে, বরং দিবালোক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী উভয়টিই মানুষের পক্ষে মঙ্গল জনক।

১৯৬২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "লাম্‌ইয়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু" ছুরা তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য।

উবাই (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন ? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ। উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি রব্বুল আলামীনের দরবারে আলোচিত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি (আনন্দে) কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে পবিত্র কোরআনের বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। সম্মুখেও নং হাদীছে উল্লেখ হইবে চারজন ছাহাবী হইতে কোরআন শিক্ষা করার পরামর্শ নবী (দঃ) দিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)।

১৯৬৩। হাদীছ ঃ—পবিত্র কোরআনের আয়াত—اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

আমি আপনাকে "কাওছার" দান করিয়াছি। এই "কাওছার" সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল সমুদয় (মঙ্গল ও কল্যাণ ইত্যাদির) সুসম্পদ-ভাণ্ডার যাহা আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দান করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই বিবরণ বর্ণনাকারী সায়ীদ ইবনে জোবায়েরকে তাঁহার শাগেদ বলিল, সর্ব্বসাধারণ তো বলিয়া থাকে কাওছার হইল একটি নহর বা হাওজের নাম যাহা বেহেশতের মধ্যে আছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, ঐ হাওজটিও উক্ত সুসম্পদ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত যাহা আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে দান করিয়াছেন। (অর্থাৎ কাওছার বলিতে অনেক কিছু সম্পদই উদ্দেশ্য; সুপ্রসিদ্ধ হাওজে-কাওছার উহারই একটি।)

১৯৬৩। **হাদীছ ঃ**--জিরর্ ইবনে আবী লুবাবাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিশিষ্ট ছাহাবী উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)কে ছুরা ক্বুল্ আউ'জু বে-রাব্বিন্নাছ ও ছুরা ক্বুল্ আউ'জু বে-রাব্বিল্ ফালাক্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই প্রশ্ন আমিও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে করিয়া ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, এই দুইটি ছুরার মধ্যে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আমি যেন এই ভাবে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করি—তাহা আমি করিয়াছি।

উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) বলেন, আমরাও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মারফৎ ঐ শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারই ন্যায় আশ্রয় প্রার্থনা করিব।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। অনেকে মনে করিয়া থাকে এই ছুরা দুইটির বিষয়-বস্তুর আরম্ভেই বলা হইয়াছে, "হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি প্রভু পরওয়ারদেগারের........", অতএব ইহা হযরতের ব্যক্তিগত সম্পর্কীয় বিষয়বস্তু, অন্যদের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কেন হইবে? অথচ কোরআন পাক ত সারা বিশ্ব মানবের জন্য।

এই প্রশ্নের উত্তরই আলোচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে যে, এস্থলে আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে উপস্থিত লক্ষ্যস্থল স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন এবং হযরত (দঃ) সে অনুযায়ী আশ্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐরূপ আমল করিব। যেমন উপরস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন আদেশ করা হয়, কিন্তু সেই আদেশ তাহার উপরই নিবদ্ধ থাকে না, তাহার নিম্নস্থগণও উহার আওতাভুক্ত হইয়া থাকে। এই ধরণের ভূরি ভূরি নজির কোরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোরআন শরীফের অবতরণ ও সংরক্ষণ বৃত্তান্ত

১৯৬৫। **হাদীছ ঃ**—আবু ওসমান (রঃ) উছামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতার আগমন

হইল* এবং তিনি হযরতের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে বলিতে পার কি? উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বলিলেন, এই লোকটি হইল দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ছাহাবী।

উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) ঐ স্থান ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত খোদার কসম আমি ঐ আগন্তুককে দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ শুনিতে পাইলাম। তিনি জিব্রাইল ফেরেশতার আগমন এবং তাঁহার সংবাদ বর্ণনা করিতেছেন। তখন আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম; ঐ আগন্তুক (দেহ্ইয়া-কাল্‌বীর আকৃতিতে হইলেও তিনি) জিব্রাইল ফেরেশতা ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ফেরেশতাগণ বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিতে পারেন। অবশ্য তাঁহারা পাক পবিত্র উত্তম ও সুশ্রী আকারই ধাধণ করিয়া থাকেন। জিব্রাইল ফেরেশতা অনেক সময় ওহী নিয়া হযরতের নিকট মানুষ আকৃতিতে আসিতেন। কোন কোন সময় অপরিচিত মানুষের বেশে আসিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ দেহ্ইয়া-কাল্‌বী নামক ছাহাবীর আকৃতিতে সর্ব্ব সমক্ষে আসিয়া ওহী পৌঁছাইয়া থাকিতেন। দেহ্ইয়া-কাল্‌বী (রাঃ) অতিশয় সুশ্রী ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

১৯৬৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের নিকটবর্ত্তী আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি বেশী ওহী পাঠাইতে ছিলেন, (এই ভাবে পবিত্র কোরআন সহ দ্বীনের সমুদয় প্রয়োজন পূর্ণ করা হইয়াছে) তারপরই রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৯৬৭। হাদীছ ঃ—পবিত্র কোরআন কোরায়েশ বংশীয় আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবুবকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোছায়লেমা-কাজ্জাবের দল—ইয়ামানস্থিত ইয়ামামাহ্ দেশবাসীর সঙ্গে মোসলমানদের জেহাদ হইয়াছিল। সেই জেহাদ সমাপ্তে খলীফা আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তথায় গিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, ওমর (রাঃ)ও সেখানে উপস্থিত আছেন। আবুবকর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওমর (রাঃ) আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, ইয়ামামার জেহাদে কোরআন রক্ষক বা কোরআনের হাফেজ বহু সংখ্যায় শহীদ হইয়া, গিয়াছেন। আমার ভয় হয়, অন্যান্য জেহাদেও কোরআনের হাফেজ এই হারে শহীদ হইলে কোরআনের অনেক অংশ আমাদের হইতে ছুটিয়া

---

* ঘটনাটি পর্দার বিধান প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ছিল, কিম্বা উম্মে-ছালামাহ্ (রাঃ) একই গৃহে পর্দার আড়ালে ছিলেন।

যাইতে পারে। (কারণ তখনও সাধারণতঃ কোরআন শরীফ বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত হইয়া হাফেজদের কণ্ঠস্থরূপেই রক্ষিত ছিল। একত্রিত ভাবে লিপিবদ্ধ আকারে রক্ষিত হওয়ার আবশ্যক দেখা দিয়া ছিল না।) অতএব আমার (ওমর রাঃ) পরামর্শ এই—আপনি খলীফা হিসাবে কোরআন শরীফকে লিপিবদ্ধ আকারে একত্রিত করার নির্দ্দেশ দান করুন। আমি (আবুবকর) ওমরকে বলিয়াছি, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই কাজ করিয়া যান নাই সেই কাজ কিরূপে করা যাইতে পারে? তদুত্তরে ওমর বলিলেন, কসম খোদার এই ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম হইবে—এইভাবে ওমর আমাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া আমিও চিন্তা করিলে পর আল্লাহ তায়ালা আমারও সিনা খুলিয়া দিলেন। আমিও ওমরের ন্যায় ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করিলাম।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আপনি বুদ্ধিমান যুবক, আপনার প্রতি কাহারও কোন খারাব ধারণাও নাই এবং আপনি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব আপনি পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত খুঁজিয়া বাহির করতঃ একত্রিত করুন।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—আমাকে যদি তাঁহারা একটি পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করার আদেশ করিতেন সেই আদেশও আমার নিকট অত কঠিন মনে হইত না পবিত্র কোরআন একত্রিত করার আদেশ আমার নিকট যত কঠিন মনে হইতে ছিল। আমি বলিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যে কাজ করেন নাই আপনারা সেই কাজ কিরূপে করিতে পারেন? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) পুনঃ পুনঃ বলিলেন "এই ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম" আবুবকর (রাঃ) এই কথাটি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছিলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় আমার অন্তর-দ্বারকেও খুলিয়া দিলেন ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করার জন্য। সেমতে কোরআনের আয়াত সমূহ তালাশ করিয়া একত্রিত করিতে লাগিলাম—(প্রতিটি আয়াত বহু সংখ্যক লোকের কণ্ঠস্থরূপে প্রাপ্তির সঙ্গে লিখিত আকারে পাইবার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া, বিভিন্ন লোকদের নিকট বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত—) খেজুর ডালের বাকলে, প্রস্থর খণ্ডে (চর্ম্ম খণ্ডে, অস্থি খণ্ডে, কাষ্ঠ খণ্ডে) লেখা হইতে সংগ্রহ করিলে লাগিলাম। এইভাবে সমুদয় কোরআন চয়ন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলাম। অবশ্য ছুরা তওবার শেষ অংশ—لقد جائكم رسول হইতে رب العرش العظيم পর্য্যন্ত (যাহা মৌখিকরূপে ত বহু লোকেরই স্মরণ ছিল।* কিন্তু অধিক সতর্কতা মূলক ভাবে

---

* মৌখিক কণ্ঠস্থরূপে এই আয়াত সম্পর্কে ওমর (রাঃ) ওসমান (রাঃ) এবং স্বয়ং যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ)ও সাক্ষী ছিলেন। ফতহুলবারী ৯—১২ দ্রষ্টবঃ

লিখিত আকারেও পাইবার শর্ত অনুসরণ করা হইতে ছিল তাহা এই অংশে পুরা হইতে ছিল না। অবশেষে ইহাও লিখিত আকারে) পাইলাম আবু খোযায়মা আনছারী ছাহাবী নিকট। অন্য কাহারও নিকট ইহা (লিখিত আকারে) পাই নাই।

এইভাবে পবিত্র কোরআনের সমুদয় আয়াত লিপিবদ্ধ হইয়া গেল এবং ঐ লিখিত পবিত্র পাতা-পত্রগুলি তৎকালীন খলীফা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হেফাজতে ও রক্ষনাবেক্ষনে রহিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হেফাজতে রহিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার কন্যা উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়াল. আনহার হেফাজতে রহিয়াছিল।

১৯৬৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট ছাহাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) তখন ইরাক ও সিরিয়া বাসীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী "আরমিনিয়া" ও "আজারবাইজান" এলাকা অধিকার করার কাজে নিয়োগ করিয়া ছিলেন। ছাহাবী হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও সেই বাহিনীতে ছিলেন। (সেই বাহিনীর সিরিয়াবাসীগণ পবিত্র কোরআন এক ধরণের শব্দ ও উচ্চারণে পড়িত। ইরাকবাসীগণ এই অর্থেই, কিন্তু ভিন্ন শব্দ ও উচ্চারণে পড়িত। এই শাব্দিক ও উচ্চারণের বিভিন্নতায় তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত—একে অন্যের পঠনকে কোরআন বলিয়া স্বীকার করিত না। ফলে একে অন্যকে কাফের পর্য্যন্ত বলিত। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় দলের পঠিতই কোরআন ছিল এবং যে বিভিন্নতা ছিল তাহা অতি সামান্য ও স্বাভাবিক বিভিন্নতা ছিল—একই অর্থে শুধু শাব্দিক ও উচ্চারণের আঞ্চলিক বিভিন্নতা+।) এই বিভিন্নতা লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের দরুন হোযায়ফা (রাঃ) অতিশয় বিচলিত হইলেন। মদীনায় আসিয়া প্রথমই খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! মোসলেম জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় তাহারা যেন নিজেদের আসমানী কেতাব সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হইয়া না পড়ে*।

+ ইসলামের প্রথম যুগে একই আরবী ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতার মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রসূলুল্লাহ (দঃ) লাভ করিয়া ছিলেন যাহার বিস্তারিত বিররণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

* অর্থাৎ এই বিবাদের মূল সূত্র—আরবী ভাষার গোত্রীয় বিভিন্নতায় কোরআন তেলাওয়াত যাহার অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেওয়া হইয়া ছিল ; নবাগত মোসলমানদের সহজ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে। এখন সেই সুযোগের ততটা আবশ্যক নাই, অথচ উহার দ্বারা মস্ত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেছে। অতএব এখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক ধরণের আরবী ভাষা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হউক।

তাঁহার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ খলীফা ওসমান (রাঃ) (ওমর কন্যা—উম্মুল মোমেনীন) হাফ্ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) কর্ত্তৃক সুরক্ষিত একত্রিত কোরআন পাকের পবিত্র পাতা-পত্রগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমরা উহার কতিপয় নকল বা প্রতিলিপি তৈরী করিয়া পুনরায় উহা আপনার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিব। সেমতে হাফ্ছাহ্ (রাঃ) উহা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত কার্য্য সমাধা করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে ছিলেন (পূর্ব্ব পরিচিত) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ), সায়ীদ ইবনুল আ'ছ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারেছ (রাঃ)। তাঁহারা সেই প্রথম খলীফা আবুবকরের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত পবিত্র কোরআনের কতিপয় নকল ও প্রতিলিপি তৈরী সম্পন্ন করিলেন।

(উল্লেখিত পরিষদের মধ্যে শুধু যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) মদীনাবাসী ছিলেন। অপর তিন জনই মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় ছিলেন।) খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দিলেন, একই ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতা সূত্রে কোরআনের কোন শব্দ সম্পর্কে আপনাদের মতবিরোধ হইলে উহাকে কোরায়েশদের ভাষার অনুকরণে লিখিবেন**। কারণ পবিত্র কোরআনের মূল অবতরণ কোরায়েশদের ভাষার উপরই ছিল। (পরে অন্যান্য আঞ্চলিক শাখা-ভাষায়ও পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইয়া ছিল মাত্র।)

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিলিপি তৈরী সম্পন্ন হইলে পর (ওসমান (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) কর্ত্তৃক সংগৃহীত মূল লিপি হাফ্ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজ সংগৃহীত প্রতিলিপির এক এক খানা এক এক অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন+ এবং বাধ্যতামূলকভাবে একমাত্র উহার অনুকরণে পবিত্র

** ছাহাবী হোযায়ফাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযোগ দূর করনার্থে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি অমর কৃতি এই ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ কোরআনকে এক রকমের তথা কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া দিয়া ছিলেন এবং তাঁহার গঠিত পরিষদের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য ইহাই ছিল। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল না। যে স্থানে আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল সে সব স্থানে শুধু মাত্র কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষার অনুকরণ করা হইয়াছে। এইভাবে সম্পূর্ণ কোরআন কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষায় একত্রিত হইয়াছে—যাহা পবিত্র কোরআনের আসল রূপ ছিল। ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় আজ আমাদের হাতে পবিত্র কোরআনের সেই আসল রূপই সুরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবে।

\+ বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় একত্রিত ভাবে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফের সাত খানা প্রতিলিপি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং উহার একখানা রাজধানী মদিনায় রাখিয়া ছয় খানা যথাক্রমে মক্কা, সিরিয়া, বাহ্রাইন, বছ্রা এবং কুফায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কোরআন তেলাওয়াতের নির্দ্দেশ দান করিলেন। তৎসঙ্গে এই নির্দ্দেশও দিলেন যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা-ভাষায় লিখিত কোরআন যাহার নিকট যাহা আছে (উহা রহিত হইয়া যাওয়ায় উহার অমর্যাদা যেন না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা স্বরূপ) উহা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলা হউক।*

(পবিত্র কোরআন একত্রিতরূপে সংগ্রহের এই দ্বিতীয় অভিযানে প্রথম খলীফার সঙ্কলিত প্রতিলিপিকে আসল ও মূল হিসাবে সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। ঐ সঙ্কলনে প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের উপর অধিক সতর্কতা হিসাবে লিখিত সাক্ষ্যের শর্ত্তও অনুসরণ করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই দ্বিতীয় অভিযানেও প্রথম সঙ্কলনের প্রতিলিপির উপর পুনরায় প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষী সহ লিখিত সাক্ষ্যের শর্ত্ত অনুসরণ করা হইল। এই সম্পর্কেই) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এইবার ছুরা আহ্‌যাবের একটি আয়াত (লিখিত রূপে) কাহারও নিকট পাইতে ছিলাম না :—رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

এই আয়াতটি স্বয়ং আমারই স্পষ্টরূপে স্মরণ ছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে ইহা তেলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু উপস্থিত (লিখিত আকারে) কাহারও নিকট পাইতে ছিলাম না। অবশেষে এই আয়াতটিও খোজায়মা ইবনে ছাবেত+ আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর নিকট (লিখিত) পাইলাম।

---

* আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রতিলিপিটি তখনও মদীনায় উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট রক্ষিত ছিল। পরে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসনকালে মদীনার শাসনকর্ত্তা মারওয়ান ঐ প্রতিলিপি হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) উহা তাহাকে দেন নাই। হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট উহা ছিল। শাসনকর্ত্তা মারওয়ান পুনরায় তাঁহার নিকটও চাহিলেন। সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ প্রতিলিপিখানা মারওয়ানের হাতে অর্পণ করিলেন। মারওয়ান উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, পরবর্ত্তীকালে যেন ইহার দ্বারা কোন বিবাদের সৃষ্টি না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইল। (ফতহুলবারী ৯×১৬)

+ এই ছাহাবী "দুই সাক্ষী" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশেষ একটি ঘটনার উপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্যের ঘোষণা দিয়া ছিলেন যে, "কোন ব্যক্তির পক্ষে খোজায়মা সাক্ষ্য দিলে তাহা যথেষ্ট গণ্য হইবে।" অর্থাৎ দুইজন সাক্ষী ব্যতীত কোন দাবী প্রমাণিত হইতে পারে না। এই হইল শরীয়তের আইন ও বিধান, কিন্তু খোজায়মা (রাঃ) যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিবে সেখানে তাহার একার সাক্ষ্যই দুইজনের সাক্ষ্যের ন্যায় পরিগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ব্যবস্থাবলে অলৌকিকভাবে অবিস্মৃতরূপে উহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়া যাইত—মুখস্থ হইয়া যাইত যাহার ঘোষনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের দুই স্থানে প্রদান করিয়াছেন—

(১) ২৯ পারা ছুরা কেয়ামাহ্—......إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ "নিশ্চয় আমার জিম্মায় রহিয়াছে এই কোরআন আপনার হৃদয়ে সমাবেশ করিয়া দেওয়া এবং উহাকে আপনার মুখে পড়াইয়া দেওয়া। অতএব আমি (অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে জিব্রাইল) যখন উহা আপনাকে পড়িয়া শুনাই, তখন আপনি শুধু শুনিয়া থাকিবেন।" এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ৩০ পারা ছুরা আ'লা—سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى "আমি আপনাকে কোরআন এমন ভাবে পড়াইয়া দিব যে, আপনি আর উহা ভুলিবেন না।"

কোরআন নাযেলকারী স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পর আর কোন প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে শত শত হাজার হাজার মোসলমান কোরআনের আয়াত সমূহ মুখস্থ করিয়া লইতেন। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে এইভাবে শত শত হাজার হাজার সাক্ষী তৈয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রতিটি আয়াত লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও সুসম্পন্ন ছিল। কোরআন নাযেল হওয়ার প্রথম দিক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ওহী লেখার জন্য সুদক্ষ লেখক ছাহাবীগণ নিয়োজিত ছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী এস্থলেই একটি পরিচ্ছেদও উল্লেখ করিয়াছেন এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত ছাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হিজরতের পর তিনিই অধিকাংশ সময় এই কাজ সমাধা করিয়া থাকিতেন। তাই তাঁহার নাম ওহীলেখকরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। ফতহুলবারী ৯—১৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে ওহীলেখক বারজনের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। আবু দাউদ ও নাছায়ী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, একই সঙ্গে একাধিক ছুরার আয়াত সমূহ নাযেল হইতে থাকায় কোন আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন একজন ওহী লেখককে ডাকিয়া উক্ত আয়াত লিখিবার জন্য ছুরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ রাখা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত ছিল। সে মতে হযরত (দঃ) ঐ সময় কোরআন ভিন্ন অন্য কিছু, এমনকি তাঁহার হাদীছ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করিয়া ছিলেন যেন কোরআনের সঙ্গে অন্য কিছু মিশ্রিত হইয়া না যায়। এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফেও একটি হাদীছ উল্লেখ আছে।

এইভাবে বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণ কোরআনই স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু উহা একত্রিত বিন্যস্ত ছিল না। খেজুর ডালার বাকলে, প্রস্থর খণ্ডে, চর্ম্ম খণ্ডে এবং হাড় ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নরূপে লিখিত ছিল, উহা হইতেই মুখস্থ ও কণ্ঠস্থরূপে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পবিত্র কোরআন সুরক্ষিত ছিল। পবিত্র কোরআনের লিপিবদ্ধ আকারের মধ্যে একটু মাত্র অসম্পূর্ণতা ছিল যে, উহা বিচ্ছিন্ন আকারে ছিল—একত্রিত ছিল না। সেই অসম্পূর্ণতাটুকু দূর করার জন্যই ছিল প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযান। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর হযরতেরই জমানায় লিখিত বিচ্ছিন্ন খণ্ড সমূহকে মূল-ধন করিয়া প্রথমে খলীফা আবুবকর (রাঃ) এবং পুনরায় খলীফা ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্ব্বাধিকারী স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বা খলীফাতুল মোছলেমীনের বিশেষ তত্ত্বাবধানে একে একে—দুইবার শত শত হাজার হাজার মৌখিক সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সাক্ষ্যের সহিত প্রমাণিতরূপে যে ভাবে পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াতকে সংগ্রহ করা হইয়াছে ইহার নজীর বিশ্বের কোন জাতি তাহাদের কোন কেতাব সম্পর্কে পেশ করিতে পারিবে না। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালার যে ওয়াদা ছিল—إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমিই নাযেল করিয়াছি এই নছীহত নামা কোরআনকে এবং অবশ্য অবশ্য আমি ইহা সুরক্ষনের ব্যবস্থা করিবই।" আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁহার সেই পবিত্র ওয়াদাকেই প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং আজও সেই ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহা বহাল থাকিবে।

পবিত্র কোরআন সঙ্কলন ও সংগ্রহের দুইটি অভিযানে কতিপয় বিষয়ের পার্থক্য ছিল—প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ কোরআনকে একত্রে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত করিয়া নেওয়া; কালক্রমে যেন উহার একটি অক্ষরও বিস্মৃত হইয়া যাওয়ার অবকাশ না থাকে। তাই উহার পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সঙ্কলনে প্রতিটি ছুরাকে সুবিন্যস্ত আকারে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন লেখা হইয়াছিল, কিন্তু পরস্পর ছুরাসমূহের তরতীব ও বিন্যাসন—যে, কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল না। এতদ্ভিন্ন আরবী ভাষায় আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতার দিক দিয়াও নির্দ্দিষ্টরূপে শুধু কোরায়েশ গোত্রীয় শাখা-ভাষার অনুসরণ করা হইয়া ছিল না। উপস্থিত ক্ষেত্রে যেই আয়াত যেই শব্দ ও উচ্চারণে সম্মুখে আসিয়াছে ঐ আকারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্যও নিজ

নিজ কায়দা ও উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি বহাল ছিল, তাই ঐ সঙ্কলনের প্রতিলিপি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের আবশ্যকও দেখা দিয়া ছিল না। কারণ সে কালে সকল মানুষই কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়ায় অভ্যস্ত ছিল।

তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানতমঃ বিষয় ছিল—সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ একমাত্র কোরায়েশ গোত্রীয় আরবী ভাষার উপর স্থাপিত করা। পবিত্র কোরআন একমাত্র মক্কাবাসী কোরায়েশ গোত্রীয় আরবী ভাষায় নাযেল হইয়াছিল বটে, কিন্তু আরবী ভাষার মধ্যেই কোন কোন শব্দ উচ্চারণের বা কোন কোন অর্থের জন্য শব্দের বা কোন কোন বিষয় বুঝাইবার কায়দায় আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতা ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবাগত মোসলমানদের সুযোগ দানার্থে কোরআন তেলাওয়াত করার মধ্যে সেই বিভিন্নতা বজায় রাখার অনুমতি ছিল। এমনকি জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে কোরআন লিপিবদ্ধ করিলে, সেই বিভিন্নতার উপরই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিত।

শুধু মাত্র সুযোগ-সুবিধা জনিত উক্ত অনুমতির আবশ্যকতা পরে শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তদুপরি কালক্রমে উহার দ্বারা নানা রকম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার দ্বার প্রশস্ত হইতে ছিল যাহা দৃষ্টে প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী হোযায়ফাহ্ (রাঃ) উহা প্রতিরোধের প্রতি তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। সেই মতে খলীফা হিসাবে ওসমান (রাঃ) উহার জন্য অভিযান চালাইলেন এবং এই ব্যাপারে লক্ষাধিক ছাহাবীর মধ্যে কেহই দ্বিমত প্রকাশ করেন নাই। এই অভিযানের ফলে পবিত্র কোরআন তাহার আসল রূপ তথা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয় ভাষায় নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং শুধুমাত্র একজন ব্যতীত সমস্ত ছাহাবী বরং তৎকালীন সমস্ত মোসলমানের ঐক্যমতে তৃতীয় খলীফার আদেশক্রমে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তেলাওয়াতের সুযোগ রহিত হইয়া গেল। +

+ এস্থলে বর্ত্তমানে প্রচলিত ক্বেরাতে-সাব্‌য়া বা সাত ক্বেরাত, বরং ততোধিক বিভিন্ন ক্বেরাত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এই বিভিন্নতার সূত্র কি? যদি আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতা বলা হয়, তবে ত উহা তৃতীয় খলীফার যুগেই রহিত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় উহা আসিল কোথা হইতে? উত্তর এই যে, সাত বা ততোধিক ক্বেরাতের বিভিন্নতা মূলতঃ আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতারই এক অবশিষ্টাংশ।

পবিত্র কোরআনকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার রূপ দান খলীফা ওসমানের যুগে রহিত হইয়া গেলেও শুধু উচ্চারণ শ্রেণীর বিভিন্নতা যাহা সাধারণতঃ লেখারমধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে না, যেমন পানিকে এক অঞ্চলের লোকগণ "হানি" বলিয়া থাকে, কিন্তু লেখায় তাহারাও "পানি" লেখে। ঐ ধরণের মামুলী বিভিন্নতা তখন এবং তৎপরেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। তাহাই বিভিন্ন ক্বেরাত নামে প্রচলিত হইয়াছে।

এই অভিযানে দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল ছুরা সমূহের তরতীব বা বিন্যাসন। পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়া কালে উহার মূল বিন্যাসনের উপর নাযেল হইয়াছিল না, বরং আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক আয়াত ও ছুরা নাযেল হইতে থাকিত। লোকদের মধ্যেও পবিত্র কোরআন ঐ বিচ্ছিন্নরূপেই প্রচলিত ছিল। পরস্পর ছুরা সমূহের বিন্যাসনের বাধ্য-বাধকতা ছিল না। খলীফা ওসমান (রাঃ) দলীল-প্রমাণ, আকার-ইঙ্গিত দ্বারা মূল বিন্যাসনের যতটুকু খোঁজ লাগাইতে পারিয়া ছিলেন সেই মতে ছুরা সমূহকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত দুইটি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া সকল মোসলমানগণকে একমাত্র উহারই অনুসরণকারী বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন। সেমতে তিনি পবিত্র কোরআনের এই সঙ্কলনের প্রতিলিপি দেশে দেশে পাঠাইবারও ব্যবস্থা করিলেন।

ছুরাসমূহের বিন্যস্ততার সহিত এক রকম ভাষার উপর সমগ্র কোরআনকে একত্রিত—এক কেতাব আকারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার প্রচেষ্টা প্রথম খলীফা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে ছিল না। তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিযানে ছিল। তাই তিনিই সর্ব্বসাধারণ্যে জামেউল-কোরআন—কোরআন একত্রকারী আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১৯৬৯। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) আমাকে কোরআন পড়াইয়াছেন একই রকম ভাষার উপর। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি, (আল্লার তরফ হইতে) অধিক সুযোগ প্রদানের; তাহা তিনি করিয়াছেন। এমনকি (আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভিন্নতায় আরবী ভাষার সংখ্যাগুরু) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাত প্রকার শাখা-ভাষার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দিয়াছেন।

১৯৭০। হাদীছ :—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশারই ঘটনা। একদা আমি হেশাম নামক এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে ছুরা ফোরকান পড়িতে শুনিলাম এবং লক্ষ্য করিলাম, সে উহার কতিপয় শব্দ এমন উচ্চারণে পড়িতেছে যাহা ভিন্ন ধরণের। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে যেরূপ পড়াইয়াছেন উহার ব্যতিক্রম। তাই আমার ভিতরে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি হইল যে, তাহার নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিবার ইচ্ছা আমার হইল। কিন্তু অতি কষ্টে আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম। যখন সে নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইল তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে বক্ষস্থলের চাদরে জড়াইয়া ধরিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছুরা তোমাকে কে পড়াইয়াছে? সে বলিল, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পড়াইয়াছেন। আমি বলিলাম, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) এই ছুরা আমাকে পড়াইয়াছেন তোমার পড়া ত সেইরূপ নহে। অতঃপর আমি তাহাকে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ধরিয়া লইয়া গেলাম এবং হযরত (দঃ)কে ঘটনা জানাইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে বলিলেন, তুমি ছুরা ফোরকান পড় ত দেখি! সে তখনও ঐরূপই পড়িল যেরূপ পড়িতে আমি শুনিয়াছিলাম। তাহার পড়া শ্রবণান্তে হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ভাবেও নাযেল হইয়াছে। অত.পর হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে ওমর! তুমি পড় ত দেখি! তখম আমি ঐরূপ পড়িলাম যেরূপ হযরত (দঃ) আমাকে পড়াইয়া ছিলেন। হযরত (দঃ) এইবারও বলিলেন, কোরআন এই ভাবেও নাযেল হইয়াছে। নিশ্চয় কোরআন সাত প্রকার ভাষায় (পাঠ করার স্থযোগের সহিত) নাযেল হইয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ সহজ পন্থায় পড়িতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ— ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) কোরআন **শরীফ** হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যেই আকারে পৌঁছাইয়া ছিলেন তাহা একমাত্র মক্কাবাসী কোরায়েশ গোত্রীর ভাষাই ছিল। কিন্তু ঐ সময় হযরত (দঃ) আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন কায়দার আরবী ভাষায় তেলাওয়াত করার অনুমতিও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতেই জিব্রাইলেরই মাধ্যমে লাভ করিয়া ছিলেন। এমনকি প্রসিদ্ধ ও সংখ্যাগুরু হিসাবে সাতের অঙ্ক উল্লেখ হইয়া থাকিলেও উক্ত স্থযোগ ও অনুমতি সাতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। মূল কোরআন নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার সেই অনুমতিকে নাযেল হওয়া বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআনের মূলভাষা কোরায়েশ গোত্রীয় ভাষা বাধ্যতা মূলক করিয়া দিয়া ছিলেন। সমস্ত ছাহাবীগণ তাঁহার এই ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন; স্থতরাং ছাহাবীগণের এজমা' অনুযায়ী আরবী ভাষারই অন্য গোত্রীয় কায়দায় পাঠ করা মনছুখ বা রহিত হইয়া উহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য একই ভাষায় গোত্রীয় বিভিন্নতা দুই রকম হয়—মূল শব্দের বিভিন্নতা, যথা—একই ব্যঞ্জনকে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে "ডাটা" "ডেঙ্গা" ও "মাইরা" বলা হয়। আর এক হয় শুধু উচ্চারণের বিভিন্নতা; যথা—পানি, পান ইত্যাদিকে অঞ্চল বিশেষে হানি, হান বলা হয়। আরবী ভাষায়ও উভয় প্রকারের বিভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। ছাহাবীগণের এজমা দ্বারা প্রথম প্রকারের বিভিন্নতা কোরআন শরীফে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বিভিন্নতার অবকাশ থাকিয়া যায়। কারণ, উহা লেখায় আসে না। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় প্রকার বিভিন্নতাই "সাত ক্বেরাৎ" রূপে প্রচলিত আছে!

১৯৭১। হাদীছঃ—ইউসুফ ইবনে মাহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় ইরাকবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হে উম্মুল-মোমেনীন! আপনার কোরআন শরীফখানা আমাকে একটু দেখাইবেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্য? সে বলিল উহার তরতীব বা বিন্যাসন অনুযায়ী আমার কোরআনখানা বিন্যস্ত করিব। লোকেরা কোরআনের মধ্যে কোনরূপ বিন্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য করে না। আয়েশা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, কোরআনের ছুরা সমূহ তোমার ইচ্ছা মত আগে পিছে পড়িতে পার—ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

প্রথম দিকে কোরআনের ঐ শ্রেণীর ছুরা সমূহ নাযেল হইয়াছিল যাহাতে বেহেশত-দোযখের বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ সব বর্ণনায় লোকগণ অভিভূত হইয়া ইসলামের ছায়াতলে দৌড়িয়া আসিয়াছে। তারপর হালাল-হারামের বিধি-বিধান সমূহ নাযেল হইয়াছে। প্রথমেই যদি এই বিধান নাযেল হইত যে, মদ পান করিতে পারিবে না তবে লোকগণ বলিত, আমরা ত মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি নাযেল হইত, জেনা করিতে পারিবে না, তবে লোকগণ বলিত, আমরা জেনার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিব না (—এইভাবে লোকগণ ইসলাম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইত। তাই উল্লেখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বেহেশত-দোযখের বিবরণপূর্ণ ছুরা সমূহ প্রথমে নাযেল করা হইয়াছিল।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি যখন খেলা-ধূলায় অভ্যস্ত কম বয়স্কা মেয়ে, তখন মক্কা নগরীতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

"(কাফের দলকে সমুচিত শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া হয় না, বরং তাহাদের সমুচিত শাস্তির জন্য নির্দ্ধারিত সময় হইল পরকাল এবং পরকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ভীতিপূর্ণ দৃশ্য হইবে") (২৭ পারা ছুরা কামার)। অতঃপর হালাল-হারাম ইত্যাদি বিধি-বিধান সম্বলিত ছুরা বাকারাহ ও ছুরা নেছা ইত্যাদি নাযেল হইয়াছে যখন মদীনায় আমি হযরতের গৃহিণী হইয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ—আয়েশা (রাঃ) ঐ কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কোরআন শরীফের ছুরা সমূহের অবতরণ তরতীব ও বিন্যাসনের সহিত ছিল না, উপস্থিত প্রয়োজন অনুপাতে নাযেল হইত। সুতরাং অবতরণের মধ্যে যখন কোন নির্দ্দিষ্ট তরতীব ছিল না, তখন তেলাওয়াতের মধ্যেও তরতীবের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

প্রথম দিক দিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার এই মতামত ছিল। কিন্তু ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফৎকালে যথা সাধ্য দলীল প্রমাণ ও আকার-ইঙ্গিত দ্বারা

পবিত্র কোরআনের মূল তরতীবের খোঁজ করা হইয়াছে এবং সে অনুপাতে ছুরা সমূহের তরতীব নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অতএব উহার অনুসরণ করা উচিত।

ছাহাবীগণের মধ্যে বিশিষ্ট কারী

১৯৭২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) একদা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, তাঁহাকে ঐ দিন হইতে আমি অত্যধিক ভাল বাসি, যে দিন নবী (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, "চার জনের নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা করিতে তৎপর হও—(১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (২) সালেম (৩) মোয়াজ ইবনে জাবাল (৪) উবাই ইবনে কা'য়াব।"

১৯৭৩। হাদীছ ঃ—একদা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁহার ভাষণে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সত্তরের অধিক সংখ্যক ছুরা স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছি।

১৯৭৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ—যিনি একমাত্র মাবুদ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, পবিত্র কোরআনের প্রতিটি ছুরা সম্পর্কে আমি অবগত আছি যে, উহা কোথায় নাযেল হইয়াছে, কি বিষয়ে নাযেল হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও এখনও যদি আমি জানিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কোন বিষয় আমার চেয়ে বেশী জানেন এবং তাঁহার নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট পৌঁছিব।

১৯৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় চার জান ছাহাবী পূর্ণ কোরআন সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মদীনাবাসী—(১) উবাই ইবনে কায়া'ব (২) মোয়াজ ইবনে জাবাল (৩) যায়েদ ইবনে ছাবেত (৪) আবু যায়েদ।

কতিপয় বিশেষ আয়াতের ফজিলত

১৯৭৬। হাদীছ ঃ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত রাত্রি বেলা তেলাওয়াত করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আখেরাতের দিক দিয়া এইরূপ যথেষ্ট হইবে যে, রাত্রি বেলা অন্য কোন এবাদৎ না করিলেও সে প্রভু-ভোলা ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইবে না। দুনিয়ার দিক দিয়া এইরূপ যে, ঐ রাত্রে সে বালা-মছিবৎ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে।

১৯৭৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারে রমজান শরীফের দান-খয়রাত ও ছদকায়ে-ফেৎর ইত্যাদির খুরমা-খেজুর যাহা জমা হইয়াছিল উহা পাহারা দেওয়ার কাজে হযরত

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে নিয়োগ করিলেন। একদা রাত্রি বেলা এক আগন্তুক আসিয়া উহা হইতে তাহার বস্তা ভর্ত্তি করা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে আমাকে অনুনয় বিনয় ভাবে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি বড় দরিদ্র। অথচ পরিবার পরিজনের খরচ ও বিভিন্ন প্রয়োজনাদি অনেক বেশী। তাহার কাতরতা দেখিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রে যে তুমি আসামী ধরিয়া ছিলে তাহার ব্যাপার কি হইল ? আমি বলিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ ! তাহার সন্তান-সন্ততি ও ক্ষয়-খরচ অনেক বেশী, অথচ দরিদ্র—এই কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাহার প্রতি দয়া হইয়াছে। সে বলিয়াছে, আর আসিবে না, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, সে পুনরায় আসিবে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম, নিশ্চয় সে পুনরায় আসিবে। কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) সংবাদ দিয়াছেন যে, সে পুনঃ আসিবে। সেমতে আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। রাত্রিবেলা সে আসিয়া ঐরূপেই তাহার বস্তা ভর্ত্তি করা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। আজও সে ঐরূপ কাতরতার সহিত অনুরোধ করিল এবং বলিল, আমাকে আজ ছাড়িয়া দিন, আমি আর আসিব না। তাহার কথায় আমার অন্তরে তাহার প্রতি দয়া আসিল ; আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ভোর হইলে পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে পূর্ব্বরূপ কথোপকথন হইল। আজও হযরত (দঃ) বলিলেন, সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে, পুনরায় সে আসিবে। এই বারও আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। বাস্তবিকই সে রাত্রিবেলা আসিয়া বস্তা ভর্ত্তি আরম্ভ করিল। এইবার আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব ; তুমি প্রত্যেকবারই অঙ্গিকার কর আসিবে না ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ আস। এইবার সে বলিল, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন ; আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিব যাহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উপকৃত করিবেন। আমি উহা জানিতে চাহিলে সে বলিল, যখন বিছানার উপর শয়ন করিবেন তখন "আয়াতুল-কুরছী" প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবেন। তা হইলে সারা রাত্র আপনার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন পাহারাদার নিযুক্ত থাকিবে এবং কোন জ্বিন-ভূত আপনার কাছেও আসিতে পারিবে না। এইবারও আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ছাহাবীগণ ছিলেনই এইরূপ যে, ভাল কথার প্রতি তাঁহারা অতিশয় আগ্রহশীল ও শ্রদ্ধাবান হইতেন।

এবারের বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণান্তে নবী (দঃ) বলিলেন, সে তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত সে মিথ্যুক। হে আবু হোরায়রা! তুমি জান কি তিন দিন যাবৎ কাহার সঙ্গে তোমার ঘটনা ঘটিতেছে? আবু হোরায়রা বলিলেন না। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ছিল শয়তান (শ্রেণীর একটি জ্বিন।)

১৯৭৮। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি ছুরা কাহাফ তেলাওয়াত করিতে ছিল। তাঁহার অদুরেই একটি উত্তম ঘোড়া উহার লাগামের দুই দিকে দুইটি দড়ি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমতাবস্থায় বড় মেঘ খণ্ডের ন্যায় একটি বস্তু তাহার মাথার উপর আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; তাহাতে তাহার ঘোড়াটি লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। ঐ ব্যক্তি (ঘাব্‌রাইয়া) বিপদ মুক্তির দোয়া-দরুদ পড়িল। সকালবেলা সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে উৎসাহ প্রদান করতঃ বলিলেন, উহা ত শান্তিবাহক ফেরেশতাদের দল ছিল যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াতের দরুণ তোমার নিকটে আসিয়া ছিলেন।

১৯৭৯। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে তাহাজ্জুদের সময় কুলহু-আল্লাহ ছুরা বারংবার পাঠ করিতে শুনিল। ভোর বেলা সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ ঘটনা শুনাইল; সে যেন কুলহু-আল্লাহ ছুরাটিকে সামান্য বস্তু মনে করিতে ছিল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ছুরাটি পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ (সমতুল্য)।

১৯৮০। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ছাহাবীগণকে বলিলেন, প্রতি রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করার সামর্থ্য তোমাদের আছে কি? সকলেই উহাকে কঠিন মনে করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে যে, এই কাজ করিতে পারিবে? হযরত (দঃ) তখন বলিলেন, ছুরা কুলহু-আল্লাহু তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান।

১৯৮১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি শয়নের পূর্ব্বক্ষণে বিছানায় বসিয়া ছুরা কুলহু-আল্লাহ, কুল-আউজু বে-রাব্বিল-ফালাক্‌ ও কুল-আউজু বে-রাব্বিন-নাছ পাঠ করতঃ হস্তদ্বয়কে (মোনাজাত করার ন্যায়) একত্রিত করিয়া উহাতে ফুঁক দিতেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা যথা সম্ভব সর্ব্ব শরীর মুছিতেন—মাথা এবং মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখ দিক প্রথমে মুছিতেন। এইভাবে তিন বার করিতেন।

১৯৮২। হাদীছ :—উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাত্রি বেলা তিনি ছুরা বাকারাহ তেলাওয়াত করিতে ছিলেন, তাঁহার

ঘোড়াটি নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাঁধা ছিল, হঠাৎ উহা লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। তিনি কিছু সময় তেলাওয়াত বন্ধ রাখিলেন, ঘোড়াটিও ক্ষান্ত রহিল। অতঃপর তিনি পুনরায় তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন, ঘোড়াটিও পুনরায় ঐরূপ করা আরম্ভ করিল, আবার তিনি তেলাওয়াত ক্ষান্ত করিলেন ঘোড়াটিও ক্ষান্ত রহিল, পুনরায় তিনি তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন ঘোড়াটিও ঐরূপ করা আরম্ভ করিল। এইবার তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করতঃ তথা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কারণ ঘোড়াটির অনতিদুরেই তাঁহার শিশু পুত্র ইয়াহ্ইয়া শায়িত ছিল। তাঁহার আশঙ্কা হইল, ঘোড়াটি লাফাইয়া তাহার উপর পতিত হয় নাকি! তাই ছেলেটিকে তথা হইতে সরাইয়া নিয়া আসিলেন। তখন তিনি উর্দ্ধ দিকে তাকাইয়া একটি মেঘ খণ্ডের ন্যায় দেখিতে পাইলেন যাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপের ন্যায় অনেকগুলি আলো ঝলমল করিতেছে এবং উহা উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে, এমনকি কিছু সময়ের মধ্যে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ভোর বেলা তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কলিলেন, তুমি জান উহা কি ছিল? তিনি বলিলেন, না। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ছিল ফেরেশতাগণের একটি জামাত যাঁহারা কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিবার জন্য উহার নিকটে আসিয়া ছিলেন। তুমি যদি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকিতে তবে তাঁহারাও ভোর পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। এমনকি জন সাধারণও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত।

১৯৮৩। হাদীছ:— শাদ্দাদ ইবনে মা'কেল (রঃ) আবছল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রচলিত কোরআন শরীফে যতটুকু আল্লার কালাম রহিয়াছে হযরত নবী (দঃ) উহা ভিন্ন আল্লার কালাম আরও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন কি? আবছল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন না—প্রচলিত কোরআন শরীফ ব্যতীত আল্লার কালামরূপে আর কিছু রাখিয়া যান নাই।

(আলী রজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এক পুত্র-) মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকটও উক্ত প্রশ্ন করা হইলে তিনিও বলিলেন, না—প্রচলিত কোরআন শরীফ ব্যতীত আর কোন আল্লার কালাম হযরত (দঃ) রাখিয়া যান নাই।

ব্যাখ্যা:—এক দিকে শিয়া সম্প্রদায়, অপর দিকে ভণ্ড ফকির দল গুজব রটাইয়া থাকে, নব্বই হাজার কালাম হইতে অল্প সংখ্যাক কোরআনরূপে প্রচলিত হইয়াছে যাহা যাহেরী আলেমগণ পাইয়াছেন। অবশিষ্ট কালামগুলি আলী রাজি-য়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মারফৎ ছিনা-ব-ছিনা বাতেনী ভাবে ফকিরদের বা শিয়াদের নিকট পৌঁছিয়াছে। উল্লেখিত হাদীছটি ঐ শ্রেণীর গুজবের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ।

কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

১৯৮৪। হাদীছঃ আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মোমেন ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআন অনুযায়ী আমল করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল কমলা লেবু যাহার স্বাদও ভাল গন্ধও ভাল। আর যে মোমেন কোরআন তেলাওয়াত করে না, অবশ্য তদনুযায়ী আমল করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল খুরমা-খেজুর যাহার স্বাদ ভাল, কিন্তু উহার কোন সুগন্ধি নাই। আর যে (ঈমানহীন) মোনাফেক বা (আমলহীন) ফাছেক-ফাজের কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত হইল "রাইহানাহ্" * যাহার সুগন্ধি আছে, কিন্তু স্বাদে তিক্ত। আর যেই মোনাফেক বা ফাছেক-ফাজের কোরআন তেলাওয়াত করে না তাহার দৃষ্টান্ত মাকাল ফল যাহা দুর্গন্ধময়, তিক্ত এবং বিস্বাদও বটে।

১৯৮৫। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নবী প্রকাশ্য স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করিলে আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতি যত দূর আকৃষ্ট হন অন্য কোন বস্তুর প্রতি তত দূর আকৃষ্ট হন না।

১৯৮৬। হাদীছঃ— عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ-

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আকাঙ্খা করার মত গুণ দুনিয়াতে দুইটিই আছে। একটি হইল—ঐ ব্যক্তির গুণ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শিক্ষার সুযোগ দিয়াছেন, সে কোরআন শিক্ষা করিয়াছেন এবং নিশিথে সে (মাবুদের দরবারে) দাঁড়াইয়া (নামাযে) কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়। দ্বিতীয়টি হইল—ঐ ব্যক্তির গুণ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে দিবা-রাত্র উহা দান-খয়রাত করিয়া থাকে।

---

* "রাইহানাহ্" এক প্রকার তিক্ত ঘাস যাহার সুগন্ধি আছে, কিন্তু তিক্ত। যেমন, আতর সুগন্ধময় বটে, কিন্তু তিক্ত।

১৯৮৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا فى اثنتين رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار فسمعه جار له فقال ليتنى اوتيت مثل ما اوتى فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه فى الحق فقال رجل ليتنى اوتيت مثل ما اوتى فلان فعملت مثل ما يعمل

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াতে আকাঙ্খা করার মত বস্তু একমাত্র দুইটিই। একটি হইল—আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে কোরআন শিক্ষা করার সুযোগ দিয়াছেন এবং সে দিবা-রাত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকে। তাহার প্রতিবেশী তাহার আমল দেখিয়া বাসনা ও আগ্রহ করিয়া থাকে যে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় কোরআন দৌলত আমারও লাভ হয় এবং আমিও তাহার ন্যায় আমল করি। দ্বিতীয়টি হইল—আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তিকে ধন-দৌলত দান করিয়াছেন এবং সে উহা সৎপথে নেক কাজে অকাতরে খরচ করিয়া থাকে। তাহাকে দেখিয়া অন্য লোক আকাঙ্খা ও আগ্রহ করে যে, তাহার ন্যায় ধন-দৌলত আমারও লাভ হয় আমিও ঐরূপ আমল করি।

সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়

১৯৮৮। হাদীছ :— عن عثمان رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه -

অর্থ—ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে কোরআন শিক্ষা দেয়।

কোরআন স্মরণ রাখায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা

১৯৮৯। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل

صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআনকে স্বীয় হৃদয়পটে আবদ্ধ রাখিতে চায় তাহার অবস্থা ঐ উটের মালিকের ন্যায় যে স্বীয় উটকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চায়। উটের মালিক যদি সর্ব্বদা উহার বন্ধনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবেই উহাকে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে। আর যদি সে উহার প্রতি দৃষ্টি না রাখে, তবে (যে কোন সময় উট বন্ধন ছিন্ন করিয়া) চলিয়া যাইবে।

(তদ্রূপ কোরআন শিক্ষা করিয়া যদি সর্ব্বদা উহার চর্চ্চা করতঃ উহাকে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলে তবেই কোরআন তাহার আয়ত্তে থাকিবে অন্যথায় সে কোরআনকে হারাইয়া বসিবে।)

১৯৯০। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَالِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে ইহা বড়ই জঘন্য কথা যে, সে (তাহার নিজ ত্রুটিতে কোরআন ভুলিয়া যায় এবং) বলে—আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য তাহার নিজ ত্রুটিতে নয়, বরং অন্য কোন কিছু (ওজর বা প্রতিবন্ধক—যেমন দীর্ঘ দিনের রোগ বা অতিশয় বার্দ্ধক্য ইত্যাদি) যদি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে বাধ্য করে তবে তাহা সতন্ত্র কথা। সুতরাং কোরআনকে স্মরণ রাখার প্রতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক, (অন্যথায় তোমাকে উল্লেখিত অশুভ জঘন্য উক্তিকারী—হইতে হইবে ;) কারণ (অবহেলার দরুণ) কোরআন মানুষের হৃদয় পট হইতে এত দ্রুত ছুটিয়া যায় যে, জঙ্গলী পশুও এত দ্রুত মানুষের হাত হইতে পলায়ন করে না।

১৯৯১। হাদীছ ঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْاِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا -

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোরআন চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ রাখিও। খোদার কসম—উট উহার বন্ধন মুক্ত হইলে যত দ্রুত সরিয়া পড়ে, কোরআন তদপেক্ষা দ্রুত হাত-ছাড়া হইয়া যায় (যদি উহা আবদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাকে।)

শিশুদিগকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া

১৯৯২। ছাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় আমি দশ বৎসর বয়সেই পবিত্র কোরআনের শেষ দিকের যে অংশকে "মোফাচ্ছাল" বলে—সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করিয়া ছিলাম।

কোরআন শরীফ ভুলিয়া যাওয়া

অনেক আলেমের মতে কোরআন শরীফ ভুলিয়া থাকা কবিরা গোনাহ। (ফতহুল বারী)

কোরআন শরীফের কোন অংশ ভুলিয়া গিয়া থাকিলে উহা অবশ্যই স্মরণ করিতে তৎপর হইবে।

১৯৯৩। ছাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রি বেলা (তাহাজ্জোদ নামাযের সময়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তির কোরআন শরীফ পড়া শুনিলেন। হযরত (দঃ) তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিয়া বলিলেন, অমুক ছুরার এই এই আয়াত আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; এই ব্যক্তি তাহা আমার স্মরণে আনিয়া দিয়াছে।

পরিষ্কাররূপে খোশ-লেহানে কোরআন পড়া

১৯৯৪। ছাদীছ ঃ—ক্বাতাদাহ্ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্বেরাত কি ধরণের ছিল ? তিনি বলিলেন, হযরতের ক্বেরাত (স্থানে স্থানে) লম্বা টান্ যুক্ত ছিল (—যে স্থানে লম্বা টানের অক্ষর থাকিত সেখানে তিনি উহার যথাযথ নিয়ম রক্ষা করিয়া পাঠ করিতেন।) অতঃপর আনাছ (রাঃ) হযরতের ক্বেরাতের নমুনা স্বরূপ বিস্‌মিল্লা···হির্-রাহ্‌মা···নির-রাহী···ম্ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন (এবং তিনি মিল্লা···রাহমা···ও রাহী···কে টানিয়া লম্বা করিয়া পড়িলেন।)

১৯৯৫। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার উটের উপর বসিয়া ভ্রমন করিতে ছিলেন এবং ছুরা "ফাতাহ্" তেলাওয়াত করিতে ছিলেন—ধীরে ধীরে তরঙ্গিত স্বরে তেলাওয়াত করিতে ছিলেন।

১৯৯৬। হাদীছ :— আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহার খোশ-লেহানের প্রশংসা করিয়া) বলিতেন, আল্লাহ তোমাকে দাউদ আলাইহেচ্ছালামের সুরের ন্যায় সুর দান করিয়াছেন।

১৯৯৭। হাদীছ :— (১১২৬পৃঃ) বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী- ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ছুরা "ওয়াত্তীন" এশার নামযে পড়িতে শুনিলাম। এত সুন্দর আওয়াজ ও এত সুন্দর পড়া আর কাহারও আমি শুনি নাই।

কত দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত হইবে ?

১৯৯৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী বিবাহ করাইয়া ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সেই বধূর খোঁজ-খবর লইতেন। সেমতে তিনি বধূকে তাহার স্বামী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেন, তদুত্তরে বধূ তাঁহাকে বলিত, আমার স্বামী লোক হিসাবে অতি উত্তম ব্যক্তি, অবশ্য যাবৎ আমি তাহার বিবাহে আসিয়াছি তিনি কোন সময় আমার বিছানায় পা রাখেন না এবং আমার হাল-অবস্থার কোন খোঁজ-খবর নেন না। (তিনি সর্ব্বদা এবাদৎ-বন্দেগীতেই মশগুল থাকেন।)

দীর্ঘ কাল আমার পিতা এই অভিযোগ শুনিয়া এক দিন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন. পুত্রকে সঙ্গে নিয়া এক দিন আমার নিকট আসিও। সেমতে আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নফল রোজা কিরূপ রাখিয়া থাক ? আমি আরজ করিলাম, প্রতি দিনই রোযা রাখিয়া থাকি। হযরত (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন-খতম কিরূপ করিয়া থাক ? আমি আরজ করিলাম প্রতি রাত্রে এক খতম পড়িয়া থাকি।

হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, প্রতি মাসে শুধু মাত্র তিন দিন রোজা রাখিবে এবং (তাহাজ্জুদের নামাযে) প্রতি এক মাসে এক খতম কোরআন পড়িবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সামর্থ্য আরও অধিক আছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে প্রতি সপ্তাহে তিন রোযা রাখিবে। আমি আরজ করিলাম, আমার শক্তি আরও অধিক আছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দিন রোজাহীন থাকিয়া এক দিন রোজা রাখিবে। আমি আরজ করিলাম, আরও অধিক সামর্থ্য আমার রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তা হইলে তুমি সর্ব্বোত্তম রোজা—একমাত্র দাউদ আলাইহেচ্ছালামের রোযা রাখ—এক দিন রোযাহীন থাক এক দিন রোযা রাখ। আর (তাহাজ্জুদের নামাযে) কোরআন তেলাওয়াত সাত দিনে এক খতম পড়। (এস্থলেও শেষ পর্য্যন্ত তিন দিনে খতমের অনুমতি দিয়াছিলেন।)

আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপের সহিত বলিতেন, আমি যদি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরামর্শ মোতাবেক সহজ পথ অবলম্বন করিতাম তবে আমার পক্ষে উত্তম ছিল। কারণ এখন আমি বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি! (বার্দ্ধক্যের দরুণ কোরআন শরীফ পূর্ব্বের ন্যায় পাকা পোক্তা ভাবে মুখস্থ ছিল না,) তাই তিনি প্রতি দিন দিনের বেলা সপ্তমাংশ কোরআন প্রথমে ভালরূপে মুখস্থ করিয়া লইতেন এবং নিজ পরিজনের কাহাকেও শুনাইতেন। অতঃপর রাত্রি বেলায় ঐ অংশই তেলাওয়াত করিতেন; ইহাতে তাঁহার রাত্রি বেলার পড়ার মধ্যে কিছুটা কষ্টের লাঘব হইত।

রোযা সম্পর্কেও তিনি হযরতের পরামর্শানুযায়ী এক দিন রোযায় এক দিন রোযাহীন কাটাইতেন। যদি কোন সময় বিশেষ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেন তবে এক সঙ্গে কতেক দিন রোযাহীন কাটাইতেন। কিন্তু এক দিন পর এক দিন হিসাবে যতটা রোযা হয় উহা পরে রাখিয়া লইতেন। (উক্ত রোযা ও তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত নফল এবাদৎ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহার পরিমাণ ও সংখ্যা পুরণে এত তৎপর ছিলেন) এই কারণে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখে যে পরিমাণ এবাদৎ করা হইত হযরতের অবর্ত্তমানে উহা কম করিয়া দেওয়াকে অপছন্দ ও অশুভ মনে করিতেন।

লোক-দেখানো বা গর্ব্ব উদ্দেশ্যে কিম্বা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য কোরআন পাঠ করার পরিণতি

১৯৯৯। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি আখেরী জনানায় এক শ্রেণীর যুবক দল সৃষ্টি হইবে যাহাদের প্রকৃত জ্ঞান কম হইবে। মুখে তাহারা ভাল ভাল কথা, এমনকি কোরআন-হাদীছের বাণীই আবৃত্তি করিবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত হইবে। তাহাদের অভ্যন্তরে ইসলাম থাকিবে না। তাহারা ইসলামকে আঘাতকারী ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত দল হইবে; যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্য জীবকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায় তদ্রূপ তাহারাও ইসলামকে আঘাতকারী, ইসলাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তাহাদের ঈমান শুধু মুখেই থাকিবে, উহার কোন আছর বা প্রতিক্রিয়া তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম কয়িয়া অন্তরে পৌঁছিবে না। এই শ্রেণীর লোক যেখানে পাও হত্যা কর। যাহারা তাহাদেরে হত্যা করিবে তাহারা কেয়ামতের দিন ছওয়াব লাভ করিবে।

২০০০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যেই

এমন এক শ্রেণীর লোকের অবির্ভাব হইবে যাহাদের (বাহ্যিক অবস্থা এত ভাল হইবে যে, তাহাদের) নামাযের সম্মুখে তোমাদের নামায, রোযার সম্মুখে তোমাদের রোযা, আমলের সম্মুখে তোমাদের আমল, নগণ্য বলিয়া মনে হইবে। তাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ ঐ তেলাওয়াত তাহাদের মুখে মুখেই থাকিবে—অন্তরে উহার কোন আছর প্রতিক্রিয়া হইবে না এবং আল্লার দরবারে উহা কবুল হইবে না। সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর যেরূপ লক্ষণীয় জীবকে দ্রুত ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ; তীরের কোন অংশে উহার রক্ত-মাংসের কোন নিদর্শনও দেখা যায় না তদ্রূপ ঐ শ্রেণীর লোকগণও দ্বীন-ইসলামকে ভীষণ আঘাতকারী উহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের উদ্দেশ্য হইল মোসলমানগণকে সতর্ক করা, কাহারও শুধু মুখের কথা শুনিয়া বা শুধু বাহ্যিক আবরণ দেখিয়া তাহার ফাঁদে পা দিবে না। বর্ত্তমান যুগে উল্লেখিত বিবরণীর সাদৃশ্য কাদিয়ানী শ্রেণীর লোকদিগকে দেখা যায়। তাহাদের কথায় ও লেখায় কোরআন-হাদীছের উল্লেখ দেখা যায়, নামায রোযা কোরআন তেলাওয়াতে তাহাদিগকে মশগুল দেখা যায়, কিন্তু তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী ইসলাম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কাফের।

একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করিবে

২০০১। হাদীছ ঃ—জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মন ও দেলের পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করিও। (দীর্ঘ সময় তেলাওয়াতে মশগুল থাকার দরুণ বা অন্য কোন কারণে) মন ছুটাছুটি করিতে থাকিলে তখন ক্ষান্ত হও।

ব্যাখ্যা ঃ- দীর্ঘ সময় কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে বা অন্য কোন সাময়িক কারণে মনের একাগ্রতা না থাকিলে এবং মন ছুটাছুটি করিতে থাকিলে তখন পুনরায় মনের একাগ্রতা হাসিলের উদ্দেশ্য কোরআন তেলাওয়াত ক্ষান্ত করিবে। কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত না হওয়ায় মন না বসিলে কোরআন তেলাওয়াতে অবশ্যই মশগুল থাকিবে এবং বলপূর্ব্বক মনকে কোরআন তেলাওয়াতে বসাইতে পুনঃ পুনঃ অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবে, ক্ষান্ত হইবে না।

মছআলহ—(৭৫৬পৃঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় কান্না আসিলে উহাতে দোষ নাই। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনিবার সময় নয়ন যুগলে অশ্রু প্রবাহিত করিয়াছেন। ·········নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

——(*)——

বিংশতিতম অধ্যায়

বিবাহ ও তালাক সম্পর্কীয় বিবরণ

—(●)—

বিবাহ করা উত্তম

২০০২। ছাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবীদের মধ্যে হইতে তিন ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের নিকটে আসিয়া হযরতের এবাদৎ বন্দেগী সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে সে সম্পর্কে জ্ঞাত করা হইলে তাহারা হযরতের এবাদৎ বন্দেগীর পরিমাণকে কম মনে করিল। অবশ্য তাহারা এরূপও বলাবলি করিল যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ত পূর্ব্বাপর সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; (তাঁহার পক্ষে কম এবাদৎই যথেষ্ট।) আমাদের অবস্থা ত তদ্রূপ নয় (—আমাদের জন্য বেশী মাত্রায় এবাদৎ করা আবশ্যক।)

তাহাদের একজন বলিল, আমি সর্ব্বদা সারা রাত্রি নামায পড়িয়া কাটাইব, রাত্রিবেলা নিদ্রা যাইব না। আর একজন বলিল, সারা জীবন রোযা রাখিব এক দিনও রোযা ছাড়িব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি চিরকুমার থাকিব বিবাহ করিব না। ইতি মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এই এই কথা বলাবলি করিয়াছ! তোমরা স্মরণ রাখিও, খোদার কসম—আমি আল্লাহ তায়ালাকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকি। আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করিয়া চলি। এতদসত্ত্বেও আমি রোযাও রাখি—রোযাবিহীনও থাকি, রাত্রে তাহাজ্জুদও পড়ি—নিদ্রাও যাই এবং বিবাহ করতঃ বিবিদের সঙ্গে বসবাসও করিয়া থাকি। ইহাই হইল আমার সুন্নত তরিকা; যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরিকা ছাড়িয়া চলিবে সে আমার দলভুক্ত গণ্য হইবে না।

২০০৩। ছাদীছ ঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অবশ্যই বিবাহ করিয়া নেও; এই উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম গণ্য হইবে যে, অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

অবিবাহিত থাকা বা খাসি হইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ

২০০৪। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইয়া থাকিতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকিত না; (এরূপ ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনায় আল্লাহ নাফরমানী যেন না করিয়া বসি সেই উদ্দেশ্যে) আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, ছিন্নমুষ্ক—খাসী হইয়া গেলে ভাল হয় নাকি? তদুত্তরে হযরত (দঃ) আমাদিগকে ঐরূপ কার্য্য হইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিলেন।

২০০৫। **হাদীছ**ঃ—সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওসমান ইবনে মজ্‌উন (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিয়া ছিলেন সংসার ত্যাগী—সন্ন্যাস-জীবন-যাপন করার। কিন্তু তিনি সেই অনুমতি লাভ করিতে পারেন নাই। হযরত (দঃ) যদি তাঁহাকে উহার অনুমতি দিতেন তবে আমরা (ঐরূপ জীবন অবলম্বন করার জন্য) খাসী হইয়া যাইতাম।

২০০৬। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (বিভিন্ন দেশে) জেহাদ করিতে যাইয়া থাকিতাম আমাদের (অনেকের) স্ত্রী ছিল না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা খাসি হইয়া গেলে ভাল হয় না কি? নবী (দঃ) আমাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

২০০৭। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার যৌন উত্তেজনার আশঙ্কা হয়, অথচ বিবাহ করার সামর্থ্য আমার নাই। আমি ত নিঃসম্বল নিঃস্ব। হযরত (দঃ) আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না, চুপ থাকিলেন। আমি আমার কথা পর পর তিন বার বলিলাম। হযরত (দঃ) চুপই থাকিলেন। চতুর্থবার আবার বলিলে হযরত (দঃ) (আমার মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী উত্তর দিলেন এবং) বলিলেন, তোমার কার্য্যক্রম সবই তোমার অদৃষ্টে লিখিত রহিয়াছে; ইহা জানিবার পর এখন খাসী হইয়া যাওয়া অবলম্বন করা বা না করা তুমিই ভাবিয়া দেখ।

ব্যাখ্যাঃ—তক্‌দীর—নিয়তি বা অদৃষ্ট বাস্তব সত্য এবং উহার বাস্তবতাকে অটল অনঢ়রূপে বিশ্বাস করা ইসলাম ও ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু ইহার বাস্তবতা মানুষকে জ্ঞাত করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, কতিপয় ক্ষেত্রে সে ইহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুটা উপকৃত হয়। যেমন—কাহারও কোন

মহব্বতের বস্তু তাহার হাত-ছাড়া হইয়া গেলে স্বাভাবিক ভাবে একটা অধীরতা ও অস্থিরতার ঢেউ তাহার উপর আসিবে ; সেই ঢেউ-এর তলায় নিমজ্জিত হইয়া যেন সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করে, সে যেন তার তক্দীর ও নিয়তির উপর নির্ভর পূর্ব্বক শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িবার সুযোগ পাইয়া জীবন বাঁচাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন দীন বা দুনিয়ার কোন আশঙ্কা বা ক্ষতির ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলে তখন নানা রকম রক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক ; সেই অবস্থায় কোন শরীয়ত বিরোধী-রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইলে তখন ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আশঙ্কা সম্পর্কে তক্দীর ও নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত শরীয়ত বিরোধী কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

বলাবাহুল্য—তক্দীর বা নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে পালাইয়া থাকা বা স্বেচ্ছাচারিতার ময়দানে অগ্রসর হওয়া তক্দীর ও নিয়তির মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধিক স্ত্রী গ্রহণ

২০০৮। হাদীছ ঃ—আতা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী পত্নী উম্মুল-মোমেনীন মাইমূনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জানাযায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, দেখ—তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্নী, অতএব তাঁহাকে বহন করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। হেলাইয়া দোলাইয়া আন্দোলিত করিয়া বহন করিবে না। নেহাৎ মোলায়েমভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত বহন করিবে।

(জিবদ্দশায় নবী (দঃ) তাঁহাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নয় পত্নী ছিলেন ; সকলের প্রতি তিনি সমভাবে যত্নবান থাকিতেন। এমনকি সকলের গৃহ-নিবাসে পর্য্যন্ত সমতা বজায় রাখিতেন ; অবশ্য একজন (—তিনি নিজের হক্ আয়েশার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা ঃ—এক সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নয় পত্নী ছিল—ইহা নবীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল ; অন্য কেহ এক সঙ্গে চার স্ত্রীর অধিক রাখিতে পারে না—তাহা হারাম।

একাধিক স্ত্রী রাখা শরীয়তে জায়েয বটে, কিন্তু উহার দায়িত্ব অনেক বেশী।

হাদীছ—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল এবং সে তাহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলে নাই সে কেয়ামতের দিন অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশর-ময়দানে আসিবে। (মেশকাত শরীফ ২৭৯)

বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা

২০০৯। **হাদীছ**ঃ—আবু হোযায়ফা (রাঃ) যিনি বদর জেহাদে অংশ গ্রহণকারী একজন—তিনি সালেম (রাঃ) নামক একজন ক্রীতদাসকে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; যেমন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশিষ্ট ছাহাবী যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে পালক পুত্র বানাইয়াছিলেন।

আবু হোযায়ফা (রাঃ) সালেমকে বিবাহ করাইলেন আপন ভাইঝি হিন্দাকে। অথচ সালেম মদিনাবাসীনী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন।

অন্ধকার যুগের রীতি ছিল পালক পুত্রকে আপন পুত্রই গণ্য করা হইত। পালনকারীকেই পিতা বলা হইত (এবং তাহার স্ত্রীকে প্রকৃত মাতা গণ্য করা হইত—মাতা ও পুত্রের ন্যায়ই পরস্পর আচার-ব্যবহার চলিত।) এমনকি পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারও লাভ হইত।

যখন (২১ পাঃ ছুরা আহযাবের ৫ নং) আয়াত (যাহার আলোচনা ১৯৩৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় হইয়াছে) নাযেল হইল যে—"পালক পুত্রদিগকে তাহাদের জন্মদাতা পিতার সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাখিতে হইবে; পালনকারীর সঙ্গে শুধু ধর্ম্মীয় ভ্রাতৃত্ব বা ক্রীতদাসের সম্পর্ক থাকিবে। (অতএব পালকপুত্র পালনকারীর স্ত্রী-কন্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে বেগানা পুরুষ পরিগণিত হইবে।)

তখন আবু হোযায়ফার স্ত্রী সাহ্‌লা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন—ইয়া রস্থলাল্লাহ! আমরা ত সালেমকে আপন পুত্রই গণ্য করিতাম। (এমনকি সে আমার এবং আবু হোযায়ফার সঙ্গে একই গৃহে বসবাস করিয়া আসিতেছে। পুত্র মাতাকে যেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পারে সে আমাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া থাকে।) এখন ত পবিত্র কোরআনে (পালক পুত্র সম্পর্কে) যে আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন।

এই হাদীছের আরও ঘটনা আছে।

ব্যাখ্যা—ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছটির অবশিষ্ট অংশের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করিয়াছেন; উল্লেখ করেন নাই। আবু দাউদ শরীফে ঐ অংশ উল্লেখ আছে—"সাহলা (রাঃ) নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সমস্যার কি সমাধান আপনি দান করেন? রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি তোমার স্তনের দুধ তাহাকে পান করাইবার ব্যবস্থা কর। সেমতে তিনি সালেম (রাঃ)কে পাঁচবার দুধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে সালেম (রাঃ) তাঁহার দুধ-পুত্র গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা হইল।"

দুই বৎসরের উর্দ্ধ বয়সে সাধারণতঃ স্তনের দুধ পান করানো জায়েযও নহে এবং উহা দ্বারা দুগ্ধপান সম্পর্কীয় মাতা-পুত্রের সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আলোচ্য ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদিক দিয়া স্বতন্ত্র ছিল। রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ প্রদত্ত

বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি ঐ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন স্বরূপ এই সুযোগ প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা অন্য কোন ক্ষেত্রেই প্রযোয্য হইবে না।

● বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা দ্বীন ও ধর্ম্মের দিক দিয়া ত অপরিহার্য্য। অমোসলেমের সহিত মোসলমানের বিবাহ হইতে পারিবে না—ইহা সকল ইমামগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

হানাফী মজহাব মতে বংশের সমতাও প্রয়োজন। অবশ্য ওলী—মুরব্বীগণ যদি সমতার দাবী ত্যাগ করিয়া নীচ বংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয় তবে তাহা বৈধ গণ্য হইবে। আলোচ্য ঘটনায় সেইরূপই হইয়াছে।

সালেম (রাঃ) ক্রীতদাস ছিলেন যাহার মান অতি নিম্নে; তাঁহার সঙ্গে হিন্দার বিবাহ হইয়াছিল—তিনি ছিলেন কোরায়েশ বংশীয়া কন্যা; তাঁহার ওলী-মুরব্বিগণ ইহাতে সম্মত না হইলে এই বিবাহ বাধ্যতামুলক সুদৃঢ় হইত না।

নারীদের জন্য ভাল গুণ

২০১০। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আরববাসীদের মধ্যে কোরায়েশ বংশীয়া নারীগণ উত্তম, কারণ তাহারা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহশীলা এবং স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অধিক যত্নবান হইয়া থাকে।

২০১১। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها

ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে (সাধারণতঃ) চার প্রকার গুণের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে—তাহার ধন-সম্পত্তির প্রতি, তাহার বংশের প্রতি, তাহার রূপের প্রতি এবং তাহার দ্বীনদারীর প্রতি। তুমি কিন্তু দ্বীনদার রমণী লাভে সচেষ্ট হইও, নতুবা তুমি কপাল পোড়া।

অনিষ্ট ও ধ্বংস আনয়নকারীণী নারী

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেনঃ—

يا يها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم

"হে মোমেনগণ! তোমাদের এক শ্রেণীর স্ত্রী-পুত্র তোমাদের পক্ষে শত্রু স্বরূপ; তোমরা তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিও"। (২৮ পারা—ছুরা তাগাবুন)

যে সব স্ত্রী-পুত্র আল্লাহ তায়ালার নাফরমান সেই সব স্ত্রীপুত্র শুধু শত্রু তুল্যই নহে, বরং বস্তুতঃ তাহারা মহা শত্রু; তাহাদের মায়াজাল, তাহাদের আকর্ষণ, তাহাদের পরিবেশ পরকাল বিনষ্টকারী হয়, আল্লাহ তায়ালার গজব আনয়নকারী হয়; এত বড় ক্ষতিসাধনকারী শত্রুই পরম শত্রু ও মহা শত্রু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়াছেন। তাই স্ত্রী গ্রহণে এবং ছেলে-মেয়ের প্রতিপালন ও শিক্ষা দীক্ষায় এবং তাহাদের জীবন ধারা গড়িয়া তোলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

২০৭২। হাদীছ ঃ— عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ ঃ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে (দ্বীন বিনষ্টকারী এবং মানুষকে বিপথগামী করার বহু সূত্রই সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর ক্ষতিসাধনকারী বস্তুর মধ্যে) পুরুষদের জন্য নারীগণই হইবে সর্ব্বাধিক ক্ষতিকারিণী—পুরুষদের জন্য নারীদের সমতুল্য পথভ্রষ্টকারী ক্ষতিকারক আর কোন কিছু হইবে না।

এক সঙ্গে চার বিবাহের অধিক নিষিদ্ধ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ

"পছন্দ মোতাবেক হালাল রমণী বিবাহ করিতে পার—এক হইতে চার জন।" আল্লাহ তায়ালা একত্রে স্ত্রী গ্রহণের সীমা চার সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের তফছীরে ইমাম জয়নুল আবেদীন বলিয়াছেন, একজন পুরুষের পক্ষে দুই বা তিন বা চার জন পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ বৈধ।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন,

ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته "মা যেরূপ ছেলের জন্য হারাম, মেয়ে যেরূপ পিতার জন্য হারাম, ভগ্নী যেরূপ ভ্রাতার জন্য হারাম—চার-এর অধিক গৃহীত স্ত্রীও স্বামীর জন্য তদ্রূপ হারাম।" (৭৬৬ পৃষ্ঠা)

দুধ-মাতা ও তাহার আত্মীয়

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"তোমাদের দুধমাতাগণ যাহারা তোমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে তোমাদের জন্য হারাম এবং দুগ্ধপান সম্পর্কীয় ভগ্নীগণও তোমাদের জন্য হারাম।"

২০১৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে ছিলেন এমতাবস্থায় আয়েশা (রাঃ) একজন লোকের শব্দ শুনিতে পাইলেন সে উম্মুল-মোমেনীন হাফছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি হযরত (দঃ)কে বলিলাম, ঐ দেখুন। আপনার গৃহে প্রবেশের জন্য একজন বেগানা পুরুষ অনুমতি চাহিতেছে। তদুত্তরে হযরত (দঃ) হাফ্ছাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক দুধ-চাচার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মনে হয়—সেই ব্যক্তি হইবে। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এক মৃত দুধ-চাচার নাম উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে সে আমার নিকট আসিতে পারিত কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ আসিতে পারিত, কারণ জন্মগত সম্পর্কের দরুণ যে সব আত্মীয় মাহ্রম গণ্য হয় দুধপান সম্পর্কের দরুণও ঐ শ্রেণীর আত্মীয়গণ মাহ্রম গণ্য হইবে।

২০১৪। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে প্রস্তাব পেশ করা হইল, আপনি স্বীয় চাচা হাম্যার মেয়েকে বিবাহ করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ত আমার দুধ-ভ্রাতার মেয়ে। (হাম্যা (রাঃ) হযরতের দুধ-ভ্রাতা ছিলেন।)

২০১৫। হাদীছ :—(হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-হাবীবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আপনি আমার ভগ্নীকে বিবাহ করুন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে পরিহাস স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, (আমি আরও বিবাহ করি) ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট? তিনি বলিলেন, সন্তুষ্ট ত আছিই। কারণ, আমি আপনার স্ত্রী-পদে একা নহি, আরও স্ত্রী আছে। অতএব সৌভাগ্য লাভে অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে আমার ভগ্নী শামিল হউক তাহা আমার অবশ্যই কাম্য।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা আমার জন্য জায়েয নহে। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলিলেন, আমরা ত এরূপ আলোচনা শুনিতেছি, আপনি আবু ছালামার মেয়েকে বিবাহ করিবেন। তখন হযরত (দঃ) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মে-ছালামার উরসজাত মেয়েটি ? উম্মে-হাবিবা বলিলেন, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমতঃ ঐ মেয়েটি আমার স্ত্রী উম্মে-ছালামার উরসজাত (—তাহার প্রথম স্বামীর পক্ষের মেয়ে—সুতরাং সে আমার পক্ষে হারাম।) এতদ্ভিন্ন সে আমার দুধ-ভ্রাতার মেয়ে। ঐ মেয়েটির পিতা আবু ছালামাকে এবং আমাকে—আমাদের উভয়কে ছুওয়ায়বাহ্ দুগ্ধপান করাইয়া ছিলেন।

হযরত (দঃ) স্বীয় স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন, তোমরা কখনও উরসজাত মেয়েদেরকে বা তোমাদের ভগ্নীদেরকে আমার বিবাহের জন্য পেশ করিও না।

দুগ্ধপান দুই বৎসর বয়সের পরে হইলে ?

২০১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন। তথায় এক জন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে তথায় দেখিলে পর হযরতের চেহারার উপর কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। আয়েশা (রাঃ) তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, এই লোকটি আমার দুধ-ভাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুধ-ভাই (ইত্যাদি) বলিতে বিশেষ চিন্তা ও সতর্কতার সহিত বলিতে হইবে। দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য শর্ত হইল—মায়ের দুগ্ধ খাদ্য ও আহাররূপে গৃহীত হওয়ার (বয়সে তথা দুই বৎসর) বয়সের মধ্যে দুগ্ধ পান করা। (অন্যথায় দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না।)

২০১৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নারীদের পক্ষে বেগানা পুরুষ হইতে পর্দ্দা করার হুকুম প্রবর্ত্তীত হওয়ার পরের ঘটনা ঃ—একদা আবুল কোয়ায়েসের ভ্রাতা আফ্‌লাহ নামক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিবার অনুমতি চাহিল ; আমি তাহাকে অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলাম। সে বলিল, আপনি আমার সঙ্গে পর্দ্দা করেন ? আমি ত আপনার চাচা ! আমি বলিলাম, তাহা কিরূপে ? সে বলিল, আমার ভ্রাতা-বধূ আমার ভ্রাতার সংস্পর্শে সৃষ্ট দুগ্ধ আপনাকে পান করাইয়াছিল। আমি বলিলাম, হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে আমি অনুমতি দিব না। কারণ তাহার ভ্রাতা-বধূ আমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভ্রাতা ত আমাকে দুগ্ধ পান করায় নাই ; (সে আমার চাচা হইবে কেন ?)

অতঃপর হযরত নবী (দঃ) গৃহে তশরীফ আনিলে পর আমি তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, আমি তাহাকে অনুমতি দেই নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার চাচাকে সম্মুখে আসিবার অনুমতি দানে বাধা কি ছিল ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমাকে পুরুষ—আবুল কোয়ায়েশ ত দুগ্ধ পান করায় নাই, তাহার স্ত্রী

আমাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছে। হযরত (দঃ) পুনঃ বলিলেন "আফ্‌লাহ" তোমার চাচা তাহাকে তুমি অনুমতি দিও। এই জন্যই আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, এসব সম্পর্কের দরুণ যে সব আত্মীয় মাহ্‌রম গণ্য হয় দুগ্ধ পানের সম্পর্কেও ঐ শ্রেণীর আত্মীয়কে মাহ্‌রম গণ্য করিও।

নিষিদ্ধ বিবাহ

২০১৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—বংশ সম্পর্কের দরুণ সাত প্রকার মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম। (মা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি) আর বিবাহ-সূত্রের কারণে (ও দুধ-সম্পর্কের দরুণ) সাত প্রকার মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হয়। (দুধ-মা, দুধ-ভগ্নি, নিজের স্ত্রীর মা, ব্যবহৃত স্ত্রীর কন্যা, প্রকৃত ছেলের বিবাহিতা, নিজ স্ত্রী থাকাবস্থায় তাহার ভগ্নি, পিতা-দাদা-নানার বিবাহিতা।)

এই সব মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়া ৫ পারা ছুরা নেছার ২৩নং আয়াতে উল্লেখ আছে। সর্বশেষটি ২২নং আয়াতে আছে।

মছ্‌আলাহ ঃ শ্বাশুড়ীর সহিত ব্যভিচার করিলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়—ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইমরান ইবনে হোছায়ন (রাঃ) এবং জাবের ইবনে যায়েদ (রঃ) ও হাসান বছরী (রঃ) তাঁহারা সকলেই এই মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন।

এমনকি হানফী মজহাব মতে কামভাবের সহিত শ্বাশুড়ীর গায়ে হাত লাগাইলেই স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যায়।

২০১৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরস্পর খালা এবং বোনঝি, ফুফু এবং ভাইঝি একত্রে বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

২০২০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মেয়েকে তাহার ফুফুর সঙ্গে বা তাহার খালার সঙ্গে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

কোন ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান স্ত্রীর ফুফু বা ভাইঝিকে কিম্বা সেই স্ত্রীর খালা বা বোনঝিকে বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে সেই বিবাহ বাতেল সাব্যস্ত হইবে। অতএব তাহার সঙ্গে মেলামেশা বেগানা নারীর সঙ্গে মেলামেশার ন্যায় হারাম হইবে।

২০২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, আমরা একে অপরের নিকট স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিব এবং প্রত্যেকের নিজ কন্যা তাহার বিবাহের মহর দেওয়া হইবে না।

মোতা-নেকাহ নিষিদ্ধ

২০২২। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের সময় কোন এক উপলক্ষে পোষিত গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মোতা-নেকাহ—অস্থায়ী বিবাহকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম বোখারী (রঃ) মোতা-নেকাহের স্বপক্ষের হাদীছ বর্ণনা করিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) হইতে আলী (রাঃ) সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন যে, মোতা-নেকাহের অনুমতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল বটে, কিন্তু পরে স্বয়ং নবী (দঃ)ই উহা মনছুখ বা রহিত ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছখানা অতি চমৎকার ; হাদীছখানা আলী (রাঃ) কর্তৃক বিশেষ-ভাবে বর্ণিত। শিয়া সম্প্রদায় আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভক্ত বলিয়া দাবী করে ; অথচ তাহারা মোতা-নেকাহের পক্ষপাতি।

নেক্‌কার ব্যক্তির নিকট নারী স্বয়ং স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে

২০২৩। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তাঁহার এক কন্যা উপস্থিত ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক মহিলা উপস্থিত হইল এবং হযরতের সঙ্গে তাহার বিবাহ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে আরজ করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমাকে গ্রহণ করার আবশ্যক আপনার আছে কি ?

ঘটনা শুনিয়া আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা বলিয়া উঠিল, কি খারাপ কথা ! কি খারাপ কথা !! মেয়ে লোকটি কি বেশরম ছিল। আনাছ (রাঃ) তাঁহার মেয়েকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ঐ মেয়ে লোকটি তোর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি খায়েশ করিয়া নিজেকে তাঁহার চরণে পেশ করিয়াছিল।

২০২৪। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট একটি মহিলা উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি আমাকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের হাওয়ালা করিলাম—আপনাকে আমায় প্রদান করার উদ্দেশ্যেই আমি হাজির হইয়াছি। হযরত নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, অধিক স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা ও আবশ্যক বর্ত্তমানে

আমার নাই। তখন ছাহাবীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না থাকিলে আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দেন। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট মহরের জন্য কোন বস্তু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট কিছুই নাই। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার বাড়ী যাইয়া দেখ, কোন বস্তু পাও কি না? সে বাড়ী গেল অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোন কিছুই পাইলাম না। হযরত (দঃ) বলিলেন, পুনঃ যাইয়া তালাশ কর এবং একটি লোহার অঙ্গুরী হইলেও উহা নিয়া আস। সে পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোহার অঙ্গুরীও জুটিল না, অবশ্য আমার পরিধেয় এই লুঙ্গিটি আছে। ইহার অর্দ্ধাংশের মালিক আমি স্ত্রীকে বানাইতে পারি। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, ঐ লুঙ্গি ব্যতীত গা ঢাকিবার মত দ্বিতীয় আর একখানা কাপড়ও তাহার ছিল না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই লুঙ্গির মালিক হইয়া তাহার লাভ কি হইবে? ইহা তুমি পরিধান করিলে তাহার ভাগে কিছু থাকিবে না। আর সে পরিধান করিলে তোমার ভাগে কিছু থাকিবে না।

অতঃপর ঐ ছাহাবী হযরতের মজলিশে বসিয়া রহিল। অনেক সময় বসিয়া থাকার পর লোকটি তথা হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন হযরত (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন শরীফ কতটুকু তোমার স্মরণ আছে? সে ব্যক্তি কতিপয় ছুরার নাম গণনা করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব ছুরা মুখস্থ পড়িতে পার কি? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—যাও; তোমার নিকট পবিত্র কোরআনের যে দৌলত রহিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া (নগদ মহর ব্যতীরেকেই) এই রমণীটিকে তোমার বিবাহ-বন্ধনে দিয়া দিলান।

নিজ কন্যা বা ভগ্নীর জন্য নেক লোকের নিকট নিজেই বিবাহ প্রস্তাব পেশ করা

২০২৫। হাদীছঃ – আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতা বিশিষ্ট ছাহাবী খোনায়েছ ইবনে হোজাফাহ্ (রাঃ) মদীনায় ইহকাল ত্যাগ করিলে ওমর কন্যা হাফ্ছাহ্ (রাঃ) বিধবা হন। সেই সময়ের ঘটনা স্বয়ং ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ওসমান (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া আমার বিধবা মেয়ে হাফ্ছার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, এই সম্পর্কে চিন্তা করিব। কতেক দিন পর বলিলেন, বর্ত্তমানে আমার বিবাহ না করারই ইচ্ছা। ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর সিদ্দিকের

নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বিধবা মেয়ে হাফ্‌ছাহ্‌কে আপনার বিবাহে দিয়া দিব। আবু বকর চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তরই দিলেন না। আমি ওসমানের প্রতি যতটুকু মন-ক্ষুন্ন হইয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক মন-ক্ষুন্ন হইলাম আবু বকরের প্রতি। কিছু দিন গত হইলে পর হযরত রসুলুল্লাহ (দ.) স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে হাফ্‌ছার বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আমি হযরতের সঙ্গে হাফ্‌ছার বিবাহ দিয়া দিলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, বোধ হয় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন আমি আপনার কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে কোন উত্তর দেই নাই। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম হাঁ—অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর দেওয়ার মধ্যে বাধা ছিল। ঐ সময় আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফ্‌ছাহ্‌ সম্পর্কে আলাপ করিয়াছেন। কিন্তু আমি হযরতের গোপন কথা তখন প্রকাশ করা ভাল মনে করি নাই। যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) হাফ্‌ছাহ্‌কে বিবাহ করার ইচ্ছা ত্যাগ করিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিতাম।

ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিধবা নারীর বিবাহ প্রস্তাব নিষিদ্ধ, হাঁ—ইঙ্গিত ইশারা করা যায়

আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ .... وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ -

"বিধবা নারীদের বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলিলে বা (ইদ্দৎ শেষে বিবাহ করা সম্পর্কে) মনের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করিলে তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা ঐ নারীদের আলোচনা অবশ্যই করিবে। (তাই তিনি এই ব্যাপারে কিছু অবকাশ দিয়াছেন।) কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিবাহের পাকা পোক্তা কথা বলিও না, এবং ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ করার ইচ্ছাও করিও না; স্মরণ ও একিন রাখিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের ইচ্ছাও অবগত থাকেন। অতএব, (শরীয়ত বিরোধী ইচ্ছা পোষণ করিতে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা দয়ালু এবং সহনশীল (তাই সব ক্ষেত্রে যখন তখন ধর-পাকাড় হয় না; ইহাতে তোমরা ভুল পথে পরিচালিত হইও না। ২ পারা—১৪ রুকু)

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ইশারা ইঙ্গিতের তফছীর করতঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যেমন এরূপ বলা, আমি বিবাহ করার ইচ্ছা রাখি। আমি এক জন নেককার মহিলা লাভ করার খাহেশ রাখি!

কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রঃ) উক্ত ইশারা ইঙ্গিতের তফছীরে বলিয়াছেন, যেমন ঐ বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা যে, আমার নজরে তোমার মর্য্যাদা আছে, তোমার প্রতি আমার মনের টান আছে, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, এতটুকু বলিতে পার যে, আমার একজন স্ত্রীর আবশ্যক আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আল্লার রহমতে তুমি অচল নও—এই ধরণের কথা পুরুষের পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে। আর নারীর পক্ষ হইতেও স্বয়ং নারী বা তাহার কোন মুরব্বি ইদ্দতের মধ্যে স্পষ্টরূপে বিবাহের প্রস্তাব বা আলাপ আলোচনা করিবে না।' অবশ্য কোন পুরুষের ইশারা ইঙ্গিতের উত্তরে এতটুকু বলিতে পারে যে, আপনার কথা আমি শুনিয়া রাখিলাম।

নাবালেগ মেয়ের বিবাহ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ...... وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

"যে সব নারী ঋতু আসার সম্ভাবনার বয়স অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত রমণীর এখনও ঋতু আসে নাই—উভয়ের (তালাকের) ইদ্দৎ তিন মাস। (২৮ পারা—ছুরা তালাক)

এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ রমণীর তালাকের ইদ্দৎ বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, তাহার বিবাহেরও অবকাশ রহিয়াছে, নতুবা তালাক ও উহার ইদ্দৎ কোথা হইতে আসিবে ?

২০২৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল এবং তাঁহার রোখ্‌ছতী তথা দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে নয় বৎসর বয়সে, আর হযরতের সঙ্গে তিনি নয় বৎসর কাল অবস্থান করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। (সেমতে তাঁহার আঠার বৎসর বয়সে হযরত (দঃ) ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা :—শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বে-আইনী সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বে-আইনী বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারই নাম তাহ্‌রীফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন যাহা ইহুদী নাছারাগণ করিয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু আদি হইতেই জানেন! তাঁহার প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের নামই হইল শরীয়ত। কোন প্রকার যুক্তি বা উপকার

অপকার ইত্যাদির বুলি আওড়াইয়া শরীয়তের তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করার শামিল।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কোরআন ও হাদীছ দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমানিত করিয়াছেন। ইহাকে বে-আইনী করা বস্তুতঃ শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক তাঁহার বান্দাদের জীবন-ব্যবস্থারূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা। যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমল করিয়াছিলেন, অতএব, এই অনুমোদনকে দুষণীয় সাব্যস্ত করা রসুলের কার্য্যকে দুষণীয় সাব্যস্ত করারই শামিল!

কুমারী ও বিবাহিতা উভয়ের বিবাহে তাহাদের সম্মতি আবশ্যক

২০২৭। হাদীছ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه حدثهم

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার বিবাহ হইয়াছে এরূপ নারীকে (দ্বিতীয়বার) বিবাহ দানে তাহার স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেই এবং কুমারীকে বিবাহ দানেও তাহার সম্মতি লইতে হইবে। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, কুমারীর (মুখে সম্মতি প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিবে, অতএব তাহার) সম্মতি লাভের উপায় কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর তাহার চুপ থাকাই তাহার পক্ষে সম্মতি দান গণ্য হইবে।

২০২৮। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলিলেন, কুমারী মেয়ে বিবাহের সম্মতি মুখে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে। হযরত (দঃ) বলিলেন, (বিবাহের কথা পেশ করার উপর) তাহার চুপ থাকাই তাহার সম্মতি দান গণ্য হইবে।

২০২৯। হাদীছ :—খান্‌ছা বিন্‌তে খেজাম (রাঃ) মদীনাবাসীনী নারী ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বিবাহিতা ছিলেন, পরবর্ত্তী বিবাহকালে তাঁহার

পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিয়া দেন, অথচ তিনি সেই বিবাহে মোটেই সম্মত ছিলেন না। তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। হযরত (দঃ) সেই বিবাহ বাতিল সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

একজনের বিবাহ প্রস্তাবের উপর অপরজন সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাব রাখিবে না

২০৩০। **ছাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—একজন ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চালাইতেছে সেই ক্ষেত্রে অপর কেহ ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিবেনা। একজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে সেই ক্ষেত্রে অপর কেহ প্রস্তাব রাখিবে না। যাবৎ না প্রথম জন নিজের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া যায় অথবা সে অপর জনকে প্রস্তাব রাখার অনুমতি দেয়।

নগদ টাকা ভিন্ন অন্য বস্তুও মহর হইতে পারে

২০৩১। **ছাদীছ ঃ**—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন—একটি লোহার অঙ্গুরী (মহররূপে) দিয়া হইলেও তুমি বিবাহ কর।

বিবাহ উপলক্ষে "দুফ"* বাজান

২০৩২। **ছাদীছ ঃ**—মোয়া'ওয়েজের কন্যা রুবাইয়ে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার বাসর-রাত উপলক্ষে হযরত নবী (দঃ) আমাদের গৃহে আমার সন্নিকটে আসিয়া বসিলেন, তখন কতিপয় ছোট ছোট মেয়ে দুফ বাজাইতেছিল এবং বদরের জেহাদে আমার পুর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের শোকগাথা পাঠ করিতেছিল। তন্মধ্যে একটি মেয়ে অন্য একটি পংক্তি পড়িল যাহার অর্থ ছিল—"আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি অগ্রিম খবর জানিয়া থাকেন।" হযরত (দঃ) তাহার এই উক্তিতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা পূর্ব্ব হইতে যে শোকগাথা পাঠ করিতেছিলে তাহাই কর এই উক্তি ছাড়।

বিবাহের শর্তাবলী পূরণ করা

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, মোসলমানদের কর্ত্তব্য, স্বীয় হক্ বুঝিয়া পাইলে শর্ত্ত পূরণ করা।

---

* দুফ—এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ঢোল যাহার এক দিকে চামড়া থাকে অপর দিক খোলা থাকে।

২০৩৩। হাদীছ :— عن عقبة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَقُّ مَا اَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ

اَنْ تُوْفُوْا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

অর্থ—ওক্‌বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন রমণীকে হালাল করা উপলক্ষে যে শর্ত করা হয় সেই শ্রেণীর শর্ত্তগুলি পূর্ণ করা সর্ব্বাধিক অগ্রগণ্য।

ব্যাখ্যা :—বিবাহের সময় কন্যার পক্ষ হইতে বরের উপর যে সব শর্ত্ত আরোপ করা হইয়া থাকে ঐগুলি পূর্ণ করার প্রতিই নবী (দঃ) অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ ঐ শ্রেণীর শর্ত্তগুলি কাবিননামারূপে লিখিত হওয়া এবং ওয়াদা অঙ্গীকাররূপে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সবের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নতেরই বরখেলাফ নহে শুধু; বরং তাঁহার নির্দ্দেশেরও বরখেলাফ।

এই শ্রেণীর শর্ত্ত যদি দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপন্থী বা শরীয়ত নিষিদ্ধ না হয়, তবে তাহা পূর্ণ করিবেই। হাঁ—যদি ঐরূপ হয় তবে তাহা পূরণ করা আবশ্যকীয় নহে বা জায়েযই নহে, কিন্তু ঐরূপ শর্ত্তের স্বীকৃতি প্রদান দোষ বা গোনাহ মুক্ত হইবে না।

২০৩৪। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ

اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন নারীর পক্ষে ইহা জায়েয ও হালাল নহে যে, সে তাহার মোছলমান ভগ্নীর তালাকের দাবী করে; নিজে একা সর্ব্বাধিকারীনী হওয়ার জন্য। তাহার লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, প্রত্যেকে নিজ তক্‌দীর পরিমাণ সুখই ভোগ করিবে।

ব্যাখ্যা :—পরবর্ত্তী বিবাহ উপলক্ষে যে পূর্ব্ব স্ত্রীর তালাকের দাবী বা শর্ত্ত করা হয় সে সম্পর্কেই হযরত নবী (দঃ) এই কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বামী কর্ত্তৃক তালাক দেওয়া হইলে সেই তালাক হইয়া যাইবে অবশ্যই, কিন্তু যাহাদের দাবী ও শর্ত্তে উহা হইয়াছে তাহারা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিঘোষিত হালাল নয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার দোষে দূষী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তালাক দেওয়ার শুধু শর্ত্ত করা হইয়া থাকে তবে সেই শর্ত্ত পুরা করিবে না।

ফরাশ—বিছানার চাদর ইত্যাদি সজ্জার বস্তু মহিলাদের জন্য

২০৩৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের গৃহে ফরাশের চাদর আছে কি? আমি আরজ করিলাম, আমাদের সেইরূপ সংস্থা-সুযোগ কোথায়!

নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিলেন, তোমাদের সেইরূপ অবকাশ হইবে এবং তোমরা ফরাশের চাদর (ইত্যাদি সাজ-সজ্জার আসবাব) সংগ্রহ করিবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, বাস্তবিকই—আমারেই গৃহে আমার স্ত্রী ফরাশের চাদর সংগ্রহ করিয়াছে! আমি স্ত্রীকে বলিয়া থাকি, তোমার ফরাশের চাদরগুলি আমার সম্মুখ হইতে দুর কর। সে উত্তরে বলে, নবী (দঃ) ত ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন-ইহা তোমাদের হইবে। এই উত্তরে আমি চুপ থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ—অনাড়ম্বর সরলতা প্রিয় জীবন-ব্যবস্থাই ইসলামের নীতি। নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণের জিন্দেগী অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কালের আবর্ত্তনে মোসলমানদের মধ্যে সেই সরলতা থাকিবে না—নবী (দঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন এবং উহাকে তিনি নাপছন্দরূপেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাহাবী জাবের (রাঃ) তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন, তাই নিজ গৃহে ফরাশের চাদরের প্রতি অনীহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু উহা যেহেতু প্রয়োজনের সীমাভুক্ত ছিল এবং স্ত্রী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার বাহিক সূত্র ধরিয়া এক গুঁয়েমী করায় জাবের (রাঃ) ক্ষান্ত রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ধনী লোকেরা গৃহে যেরূপ আড়ম্বর পুর্ণ এবং অযথা ব্যয়ের সাজ-সজ্জা করিয়া থাকেন তাহা দেখিলে ভীতি সৃষ্টি হয় যে, এই অপব্যয়ের হিসাব তাঁহারা কেয়ামতের কঠিন দিনে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বরাবরে কিরূপে দিবেন?

আল্লাহ তায়ালা ত পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন—"নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

আলোচ্য হাদীছে যে সামান্য ফরাশের অবকাশ বুঝা যায় উহাকেও ইমাম বোখারী (রঃ) মেয়েলী স্বভাব-সুলভের মন রক্ষার উপর সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ—"দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য্য দৃষ্টে ফিরিয়া আসা" পরিচ্ছেদে আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর একটি ঘটনা বিশেষ আদর্শ মূলক দৃষ্টান্ত।

কনেকে বর সমীপে সমর্পণ

২০৩৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা এক বিবাহে কনেকে মদীনাবাসী বর সমীপে সমর্পণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সেই

উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তোমাদের নিকট আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা ছিল না কি? মদিনাবাসীরা আমোদ-প্রিয়।

ব্যাখ্যা ঃ— বিবাহে বর-কনের আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা করাকে ইসলাম অবকাশ দেয়। উহা যে, কি পরিমাণে হইবে তাহা ছাহাবীগণের জিন্দেগীর ইতিহাসেই পরিমিত হয়।

অধুনা বিশেষতঃ শহর-বন্দরে ধনী লোকদের বিবাহে যে সব হারাম ও অপব্যয়ের আমোদ-আনন্দ করা হয় উহা জায়েয করার জন্য আলোচ্য হাদীছকে উপস্থিত করা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের অবমাননা বই নহে। এরূপ করিলে তাহা ভিন্ন গোনাহ এবং বড় গোনাহ হইবে।

নব বিবাহিতকে উপলক্ষ করিয়া খাদ্য সামগ্রী উপঢৌকন দেওয়া

২০৩৭। হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সহিত নব বিবাহিত হইলেন। সেই উপলক্ষে (আমার মাতা) উম্মে-ছোলায়েম আমাকে বলিলেন, এই সময় আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য কিছু হাদিয়া পাঠাইলে ভাল হইত। আমিও বলিলাম, তাহাই করুন। সে মতে তিনি খুরমা, ঘি ও পনীর একত্রিত করিয়া একটি পাত্রে (ফিরনীর ন্যায়) 'পায়েস' তৈরী করিলেন এবং আমাকে দিয়া উহা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উহা লইয়া আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা রাখিয়া দাও, তারপর হযরত (দঃ) কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহাদিকে এবং এতদ্ভিন্ন যাহার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয় সকলকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাই করিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, হযরতের গৃহ আগন্তুকদের দ্বারা পরিপুর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হযরত (দঃ)কে দেখিলাম, উক্ত ফিরনীর মধ্যে স্বীয় হাত রাখিয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং দশ দশজন করিয়া আন্দরে ডাকিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) সকলকে বলিয়া দিতেন বিছ্‌মিল্লাহ বলিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাইবে। এইভাবে উপস্থিত সকলেই তৃপ্ত হইয়া খাইতে পারিল।

স্ত্রীসহবাস কালের দোয়া

২০৩৮। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে উদ্যত হইয়া যদি এই দোয়াটি পড়িয়া নেয়—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নেবনিশ্-শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্-শায়তানা মা-রাযাক্তানা।

"আল্লার নামের বরকৎ লইয়া আরম্ভ ; হে আল্লাহ্! শয়তান যেন আমার নিকট আসিতে না পারে এবং আমাদেরকে তুমি যে সন্তান দান করিবা তাহাকে শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।"

যদি এই দোয়াটি (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পড়িয়া নেয় তারপর তাহাদের এই মিলনে কোন সন্তানের জন্ম লাভ হয় তবে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

'ওলিমা' বা শাদী উপলক্ষে বরের পক্ষ কর্তৃক খানার ব্যবস্থা করা

২০৩৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বর-জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে খায়বর ও মদীনার মধ্য পথে একস্থানে তিন দিন অবস্থান করিলেন। তথায় ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে তাঁহার অনুষ্ঠিত বিবাহের রুছুমাত সম্পন্ন করা হইতে ছিল। সেই উপলক্ষে (হযরতের পক্ষ হইতে) আমি মোসলমান জমাতের সকলকে ওলিমার দাওয়াত করিয়াছিলাম। সেই দাওয়াতের মধ্যে রুটি-গোশ্ত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। হযরত (দঃ) দস্তরখান বিছাইবার আদেশ করিয়াছিলেন ; উহাতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের তরফ হইতে খুরমা, পনীর ও মাখন রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা একত্র করিয়া খাওয়া হইয়াছিল উহাই ছিল সেই ওলিমার খানা।

ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা

২০৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওলিমার দাওয়াত দেওয়া হইলে সেই দাওয়াত গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হওয়া চাই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বিবাহের দাওয়াত এবং অন্যান্য দাওয়াতে রোযা অবস্থায়ও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন।

২০৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান ভাই-এর তরফ হইতে দাওয়াত করা হইলে তাহা গ্রহণ করিও।

২০৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়া থাকিতেন, যেই ওলিমার মধ্যে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয়, গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওলিমার খানা সর্ব্ব নিকৃষ্ট খানা।

(আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিতেন, বিনা কারণে কোন মোসলমান ভাই-এর) দাওয়াত অগ্রাহ্য করা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের তরিকার পরিপন্থি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ওলিমার দাওয়াত কত দিন পর্য্যন্ত চালানো যায় এসম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাত দিন এবং উহার কম-বেশও করা যায়। কারণ ওলিমা সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে যে সব হাদীছ বর্ণিত আছে উহাতে এক দিন বা দুই দিন ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং নিজ অভিরুচি অনুযায়ী করার অবকাশ আছে।

এসম্পর্কে আবুদাউদ শঃ, নেছায়ী শঃ তিরমিজি শঃ ইবনে-মাজাহ শঃ এবং আরও কেতাবে কতিপয় হাদীছ এই মর্ম্মে বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ওলিমার ব্যবস্থা এক দিন কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় দিন ভাল এবং উত্তম ও সুন্নত, তৃতীয় দিন রিয়া—লোক-দেখানো এবং ছোম্‌আ—সুখ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি এইরূপ হীন উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

ইমাম বোখারীর উপরোল্লেখিত মতামত এই সব হাদীছের পরিপন্থি নহে। এই সব হাদীছের উদ্দেশ্য—যে ব্যক্তি লোক-দেখানো বা খ্যাতি অর্জ্জন উদ্দেশ্য বেশী দিন ওলিমার আড়ম্বর করে তাহার নিন্দা করা এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে সতর্ক করা।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলিতে চাহেন যে, ঐরূপ অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য যদি না থাকে, বরং আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদের প্রতি উদারতা বশে কিম্বা খানা খাওয়াইবার অভিরুচিতে যদি কেহ বেশী দিন ওলিমা করে তবে তাহাতে দোষ নাই।

ওলিমার খানা কোন বিবাহে বেশী কোন বিবাহে কম করা যায়*

২০৪৩। **হাদীছ ঃ—**ছাবেৎ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সম্মুখে উম্মুল-মোমেনীন জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার আলোচনা হইল। আনাছ (রাঃ) বলিলেন, হযরত নবী (দঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে ওলিমার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অন্য কোন স্ত্রীর বিবাহে হযরত (দঃ)কে সেইরূপ ওলিমার ব্যবস্থা করিতে দেখি নাই। হযরত (দঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে একটি বকরি জবেহ করিয়া ওলিমা করিয়াছিলেন।

২০৪৪। **হাদীছ ঃ—**ছফিয়া বিন্‌তে শায়বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার একজন স্ত্রীর বিবাহে শুধু মাত্র দুই মুদ্—দুই সের প্রায় যবের ছাতু দ্বারা ওলিমা করিয়াছিলেন।

---

* অর্থাৎ একাধিক বিবাহ করিলে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব, কিন্তু ওলিমা খাওয়াইবার মধ্যে ঐরূপ সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নহে।

দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া শরীয়ত বিরোধী কার্য্য দেখিলে ফিরিয়া আসিবে

● বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এক দাওয়াতে উপস্থিত হইয়া গৃহে ছবি দেখিতে পাইলেন। তদ্দরুণ তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

● ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র সালেমের বিবাহ উপলক্ষে অনেক লোককে দাওয়াত করিলেন, তন্মধ্যে অন্যান্য ছাহাবীগণের সঙ্গে ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ)ও ছিলেন। মেহমানগণকে বসাইবার জন্য একটি গৃহে উহার ভিতরের দেওয়াল পর্দা দ্বারা আবৃত করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। দাওয়াতের লোক-জন, এমনকি ছাহাবীগণও একে একে তথায় আসিয়া বসিলেন। ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ)ও তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঘরের ভিতরের দেওয়াল পর্দায় সুসজ্জিত দেখিয়া প্রবেশ করিলেন না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে মেয়ে মহলের চাপ আমাদেরকে বাধ্য করিয়াছিল। আবু আইউব (রাঃ) বলিলেন, মেয়ে মহলের চাপে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কা অন্য কাহার হইলেও আপনার সম্পর্কে ত কখনও তাহা হয় নাই; খোদার কসম—আপনাদের এখানে আমি খানা খাইব না। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। +

ব্যাখ্যা ঃ—ঘরের ভিতরে কোন আবশ্যক ব্যতিরেকে দেওয়াল বা বেড়ায় পর্দা লটকাইয়া সুসজ্জিত করা হারাম নয় বটে, যদ্দরুণ তথায় উপস্থিত অন্যান্য ছাহাবীগণ চুপ রহিয়া ছিলেন, কিন্তু উহা অনাবশ্যক আড়ম্বর হওয়ায় শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় মক্‌রূহ্‌। এই শ্রেণীর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ধারার ছয়লাব ও স্রোতে ভাষিয়াই জাতির পতন ঘটে; তাই কোন জাতির উত্থান ও উন্নতির সময় উহার কর্ণধারগণ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মোসলেম জাতির উত্থানের গোড়া-পত্তন হয় ছাহাবীগণের দ্বারা, তাই ছাহাবী আবু আইউব (রাঃ) এই শ্রেণীর মক্‌রূহ্‌ বিষয়কেও বরদাশত করেন নাই। এবং এই সামান্য ব্যাপারেও মেয়ে মহলের চাপে পুরুষের প্রাবল্য বিনষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়ায় তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং দাওয়াত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

আবু আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় জাতির কর্ণধারগণের এইরূপ কঠোরতা অবলম্বনের কারণেই মোসলেম জাতির উত্থান দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যখনই মোসলমানদের মধ্যে ঐ বিষয়ের শিথিলতা আসিয়া গিয়াছে এবং তাহারা পরানুকরণে ঐ শ্রেণীর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ধারায় লিপ্ত হইয়া চলিয়াছে তখনই তাহাদের অধঃপতন আসিয়াছে।

+ ঘটনার মূল বয়ানটি অতি সংক্ষেপে ইমাম বোখারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তরজমায় বিস্তারিত বিবরণ ফতহুলবারী কেতাব হইতে উদ্ধৃত।

নারীদের সহিত সহ ধৈর্য্য অবলম্বন করা

২০৪৫। হাদীছঃ— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ

خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ

كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ -

অর্থ—অবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নারীদের (সঙ্গে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার অবলম্বন করা) সম্পর্কে আমার অছিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ ও নির্দ্দেশ তোমরা রক্ষা করিয়া চলিও। নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম নারী—আদি মাতা-হাওয়া) পাঁজরের (উর্দ্ধতম) হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড় সমূহের মধ্যে উর্দ্ধতম হাড় খানাই সর্ব্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে তৎপর হও যে, তুমি তোমার মন মত পূর্ণ সোজা না করিয়া ছাড়িবে না) তবে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি উহাকে তোমার মন মত পূর্ণ সোজা করায় তৎপর না হও, তবে অবশ্য উহার মধ্যে একটু বক্রতা থাকিবে, (কিন্তু ভাঙ্গিবে না—আস্ত থাকিবে, তুমি উহার দ্বারা সাহায্য, সহায়তা লাভ করিয়া নিজের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।) সুতরাং পুনঃ বলিতেছি, নারীদের (সহিত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার) সম্পর্কে আমার অছিয়ত বা বিশেষ পরামর্শ ও আদেশ তোমরা রক্ষা করিয়া চলিও।

মোসলেম শরীফে বর্ণিত দুইটি হাদীছ আলোচ্য বিষয়ে অধিক স্পষ্ট, তাই উহা এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ

وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا -

"নারী তোমার মন মোতাবেক পূর্ণ সোজা হইয়া চলিবে না, অতএব উহার দ্বারা লাভবান হইতে চাহিলে উহার (স্বভাবের) বক্রতাবস্থায়ই তুমি তাহা হইতে নিজের উপকার উদ্ধার করিও। যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে চেষ্টা কর তবে তুমি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। স্ত্রীকে তালাক দেওয়াই উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ।"

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخر

"ঈমানদার স্বামী ঈমানদার স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী হইবে না। কারণ, স্ত্রীর কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট আসিলেও পুনঃ তাহার দ্বারাই এমন ব্যবহার পাইবে যাহাতে সন্তুষ্টি লাভ হইবে।"

ব্যাখ্যা:—ফল হইতে উহার বীজ বাহির করিয়া অতঃপর ঐ বীজ হইতেই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের পাঁজরের হাড় হইতে কোন প্রকার বীজ ও মূল পদার্থ বাহির করিয়া উহা হইতে আল্লাহ তায়ালা মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছে উহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের এই তথ্য প্রকাশ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে একটি বিষয়ের প্রবোধ দিতেছেন যে, যেহেতু আদি মাতার সৃষ্টি বাঁকা বস্তু হইতে, তাই মাতৃজাতি—নারীদের মধ্যে কম-বেশী বক্রতা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। যেরূপ একটি টক ফল হইতে গৃহীত বীজের বৃক্ষে এবং ঐ বৃক্ষের ফল হইতে গৃহীত বীজের বৃক্ষের ফলের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত অম্লত্ব থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

নারীজাতি পুরুষের চিরসঙ্গীনি এবং পার্থিব জীবনে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের দরুন শুধু তাহাদেরই জীবন নরকে পরিণত হয় না, বরং গোটা পরিবারের জীবনই অশান্তিময় হইয়া পড়ে। তাই এই সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং স্বামীকেই বুঝ প্রবোধ দান করতঃ তাহার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। কারণ, দাম্পত্য জীবনে অধিক ক্ষমতার অধিকারী স্বামী; যাহার হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহার ঘাড়েই দায়িত্বের বোঝাও থাকিবে। সুতরাং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বামীকে অধিক ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে চাপ দিয়াছেন এবং স্বামীর সম্মুখে এই তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

স্ত্রীর সহিত খোশ গল্প

২০৪৬। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি গল্প শুনাইলেন। কোন এক অঞ্চলের) এগারজন মহিলা একত্রিত বসিয়া পরস্পর অঙ্গিকারে আবদ্ধা হইল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করিবে—তাহাতে কোন কিছু গোপন রাখিবে না।

প্রথমে একজন তাহার স্বামীর কুৎসা করিয়া বলিল— আমার স্বামী জীর্ণ শীর্ণ উটের গোশতের ন্যায়, (অর্থাৎ তাহার মধ্যে কোন প্রকার কোমলতা ও মাধুর্য্য মোটেই নাই,) তদুপরি তাহার হইতে কোন উদ্দেশ্য হাছিল করিতে পর্ব্বত

শৃঙ্গ অতিক্রম করা তুল্য কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হয়। সহজ সুলভতার অভাবে অল্পে-তুষ্টিও জুটে না এবং মাধুর্য্যের অভাবে কষ্ট ভোগ করিতেও মনে চায় না।

দ্বিতীয় জনও তাহার স্বামীর কুৎসাই করিল যে—আমি আমার স্বামীর কোন আলোচনাই করিতে চাই না; আমার ভয় হয়, আমি তাহার সকল প্রকার দোষগুলি ব্যক্ত করা শুরু করিলে ক্ষান্ত হইতে পারিব না।

তৃতীয় জনও কুৎসাই করিল যে—আমার স্বামী অত্যন্ত বদ-মেযাজ, বদ খাছ্‌লত। আমি কিছু বলিলে তালাক দিয়া দিবে, আর চুপ থাকিলে অভাব অভিযোগে আবদ্ধ জীবন-যাপন করিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ জন বলিল, আমার স্বামী খুব শান্ত মেযাজের—গরমও নয় চেতনাহীনও নয়। তাহার জন্য ভীতও থাকিতে হয় না এবং বিষন্ন হতাশও হইতে হয় না।

পঞ্চম জন বলিল, আমার স্বামী বাহিরে ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জনশীল, কিন্তু ঘরের ভিতরে নেকড়ের ন্যায় অলস। বিশেষ চেতনাও নাই কৈফিয়ত তলবও নাই।

যষ্ঠ জন বলিল, আমার স্বামী পানাহারে রাক্ষস স্বভাবের—খাওয়ার সময় সব কিছুই খাইয়া ফেলে, পান করার সময় সবটুকুই নিঃশেষ করিয়া ফেলে। আর বিছানায় শুইলে পর হাত-পা আবদ্ধের ন্যায় জড় হইয়া পড়িয়া থাকে—প্রানাগ্নি নিরসনে হাতও ছোঁয়ায় না।

সপ্তম জন বলিল, আমার স্বামী সব দিক দিয়াই অজ্ঞ, নিষ্কর্ম্মা, নির্ব্বোধ, সর্ব্ব রোগের রোগী। এমন গোয়ার যে, মাথা ফাটাইয়া ফেলে বা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে; অনেক সময় উভয় রকমে জখমী করিয়া দেয়।

অষ্টম জন বলিল, আমার স্বামী অত্যন্ত কোমল—যেন খরগোশ এবং অত্যন্ত সুগন্ধময়—যেন জাফরান।

নবম জন বলিল, আমার স্বামী—আলীশান তাহার ইমারত, সুদীর্ঘ তাহার কায়া, দান-ছাখাওত তাহার অধিক, গৃহ তাহার সকলের মজলিস-ঘর।

দশম জন বলিল, আমার স্বামীর নাম মালেক। তাহার প্রশংসা কি শুনাইব? সে হইল সকলের উর্দ্ধে। তাহার উটগুলি গোশালার মধ্যে সংখ্যায় বেশী, কিন্তু মাঠে-ময়দানে সংখ্যায় কম, (অর্থাৎ মুসাফিরগণকে জবেহ করিয়া করিয়া খাওয়াইবার জন্য বেশীর ভাগ উটই ঘরে বাঁধিয়া রাখে।) আমোদ-স্ফূর্ত্তীর বাদ্য-বাজনা শুনিলেই উটগুলি মনে করে যে, তাহাদের আয়ু শেষ হইয়াছে।

একাদশ রমণীটি বলিল, আমার (প্রথম) স্বামীর নাম ছিল আবু জরা' তাহার প্রশংসার শেষ নাই। সে আমার কান (পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ) অলঙ্কারে বোঝাই করিয়া দিয়া ছিল এবং সুখাদ্যের আধিক্য দ্বারা আমাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিল।

সর্ব্ব দিক দিয়া সে আমার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া ছিল, এমনকি সন্তুষ্টিতে আমি তৃপ্ত হইয়া গিয়াছিলাম। আমাকে সে মরু প্রান্তের মেষপালক দরিদ্র পরিবার হইতে আনিয়া এমন ধনাঢ্য পরিবারে স্থান দিয়া ছিল যাহাদের ঘোড়া আছে উট আছে এবং শস্য-ফসল ইত্যাদির প্রাচুর্য্য। উহা আহরণের সব শ্রেণীর চাকর-মজুরও তাহাদের সর্ব্বদা বিদ্যমান। আমার প্রতিটি কথাই তাহার নিকট গৃহিত ছিল। দিনের আলো আসা পর্য্যন্ত আমি শুইয়া থাকিলেও কোন বাধা ছিল না।

আমার যে শ্বাশুরী ছিলেন তাঁহার গুণের অন্ত নাই। তাঁহার গাঁটুরী ভরা কাপড়, বস্তা ভরা খাদ্য শস্য। গৃহ তাহার অতিশয় সুপ্রশস্ত।

আমার স্বামীর অপর স্ত্রীর পক্ষে একটি ছেলে ছিল, তাহার গুণাবলীও অপরিসীম। আহার নিদ্রায় সে অতিশয় অল্পে তুষ্ট।

তাহার একটি মেয়েও ছিল, তাহার গুণাবলীও অতুলনীয়। মাতা-পিতার অতিশয় বাধ্য। ঘাগরায় আঁটেনা এমন হৃষ্টপুষ্ট। তাহার গুণাগুণ প্রতিবেশীনীদের জন্য অসহনীয়।

তাহার একটি দাসী ছিল, তাহার প্রশংসাও অনেক—সে ঘরের কথা বাহিরে নেয় না, (চুরি-ছোছামী ইত্যাদি দ্বারা) খাদ্য চিজ-বস্তুর কোন ক্ষতি করে না, ঘরে কোন আবর্জ্জনা থাকিতে দেয় না।

এই একাদশতমা রমণীটি তাহার স্বামী আবু-জরা'র প্রশংসা বর্ণনা করিয়া অতঃপর বলিল, এক সময় আবু-জরা' বিদেশ ভ্রমনে বাহির হইল, অথচ তখন দেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, (কিন্তু আমার ভাগ্য-বিড়ম্বন—) ঐ সুযোগে অন্য একটি নারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। নারীটির পূর্ব্ব স্বামীর পক্ষে দুইটি ছেলে ছিল নেকড়ে বাঘের ন্যায়, তাহারা তাহাদের মাতার সহিত খেলা করিতে ছিল। ঐ সময় আমার স্বামী আবু-জরা' তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া আমাকে তালাক দিয়া দিল।

ঐ স্বামীর পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছি। সেও সর্দ্দার শ্রেণীর, অতিশয় বাহাদুর, সে বহু রকম পশু পালের মালিক, আমাকেও সব রকমের এক এক জোড়ার মালিক বানাইয়া দিয়াছে এবং আমাকে অবাধে খাওয়া-পরার সুযোগ দিয়া রাখিয়াছে। এমনকি খাদ্য সামগ্রী আমার বাপের বাড়ীতে পাঠাইবারও অনুমতি দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রদত্ত সমুদয় সম্পদ-সামগ্রী একত্রিত করিলে তাহা প্রথম স্বামীর প্রদত্ত সম্পদের ছোট এক অংশের সমতুল্যও হইবে না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই খোশ-গল্পটি শুনাইয়া আমাকে বলিলেন, (উল্লেখিত স্বামীদের মধ্যে তুলনা মূলকভাবে একাদশ-তমা রমণীটির প্রথম স্বামী আবু-জরা' তাহার জন্য যেরূপ ছিল (আদর যত্নে) আমিও তোমার

পক্ষে তদ্রূপ। (আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ ! আপনি আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক উত্তম। হযরত (দঃ) আয়েশার উক্তির সমর্থনে রশিকতাময় একটা দিকের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উভয়ের পার্থক্য এই যে, আবু-জরা' তাহার ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়া ছিল, আমি তোমাকে তালাক দিব না। ফতহুল-বারী ৯—২৩৫ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—সতী নারীদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহারা মানবীয় সমুদয় মনোবৃত্তি ও মনের স্বাদ মিটাইবার জন্য একমাত্র স্বামীকেই অবলম্বনরূপে ব্যবহার করে। সতীত্বহারা নারীরা মানবীয় মনোবৃত্তি ও স্বাদ মিটাইবার জন্য বেগানাদের সঙ্গে রং-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা ও খোশ-গল্প ইত্যাদিতে মাতোয়ারা হইয়া থাকে। সতীত্বাবলম্বীনী নারীগণ মানবীয় মনোবৃত্তি ও স্বাদকে একেবারে মুলোচ্ছেদও করিয়া দিতে পারে না আবার বেগানার সঙ্গেও যাইতে পারে না। সুতরাং স্বামীদের কর্ত্তব্য জায়েযের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া স্ত্রীদের মানবীয় মনোবৃত্তির আগ্রহ পুরণের ব্যবস্থা ও সুযোগ প্রদান করা। উল্লেখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিবি আয়েশার সহিত খোশ-গল্প করিয়া সেই ছুন্নতই দেখাইয়াছেন।

হযরত(দঃ) যে গল্পটি শুনাইয়াছেন উহার মধ্যে মস্ত বড় শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে। নারী সমাজের মানবীয় পীপাসা কি ধরণের, স্বামীর তরফ হইতে তাহারা কিরূপ ব্যবহার পাইতে চায় তাহা তাহাদেরই মুখে এই গল্পের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার হইতে পৃথক থাকা

এসম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন ক্ষেত্রবিশেষে স্বামী স্ত্রী হইতে পৃথকভাবে ভিন্ন ঘরে থাকিতে পারে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একবার স্বীয় বিবিগণের প্রতি রাগ হইয়া ভিন্ন গৃহে দ্বিতল কক্ষে দীর্ঘ একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৭৫নং হাদীছ দ্রঃ)।

এই ব্যাপারে বোখারী (রঃ) আর একটি হাদীছের ইঙ্গিত দিয়াছেন—ঐ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রীর প্রতি রাগ হইয়া পৃথক থাকিতে হইলে একই গৃহে পৃথক বিছানায় থাকিবে ; (পৃথক গৃহে চলিয়া যাইবে না।) পবিত্র কোরআনেও এই ব্যবস্থারই ইঙ্গিত আছে। ৫ পাঃ ছুরা নেছা ৩৪ আয়াতে আছে—"স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখিলে তাহাকে নছিহৎ ও উপদেশ দান কর এবং বিছানায় তাহাকে পৃথক রাখ।"

ইমাম বোখারীর মতামত এই হাদীছ ও আয়াতের ইঙ্গিতের পরিপন্থি নহে। কারণ, অবস্থা ও পরিস্থিতির বিভিন্নতা আছে। যে ক্ষেত্রে এরূপ আশঙ্কার অবকাশ অনুভূত হয় যে, স্বামী পৃথক ঘরে অবস্থান করিলে স্ত্রী উহাকে সুযোগরূপে গ্রহণ

করিবে সেই ক্ষেত্রে কখনও পৃথক ঘরে যাইবে না। প্রয়োজন মনে করিলে বিছানা পৃথক বা একই বিছানায় বিছিন্নভাব নিয়া থাকিবে। আর যে ক্ষেত্রে এরূপ আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই, বরং পৃথক গৃহের বিচ্ছেদ যাতনা স্ত্রীকে অধিক শায়েস্তা করিবে সেইরূপ ক্ষেত্রে পৃথক গৃহে থাকায় কোন বাধা নাই।

স্বামীর উপস্থিতিতে নফল রোযা

২০৪৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী তাহার স্বামী বাড়ী উপস্থিত থাকাকালে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে নফল রোযা রাখিবে না।

২০৪৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم

وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن فى بيته الا باذنه وما انفقت من

نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه شطره

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নাই যে, স্বামীর উপস্থিতকালে সে নফল রোযা রাখে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে। কোন স্ত্রী তাহার ঘরে কোন লোককে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে না স্বামীর অনুমতি ব্যতীত। আর (স্বামীর চিজ-বস্তু হইতে) স্ত্রী যাহা দান-খয়রাত করিবে, (স্বামীর বিনা আদেশ বিনা খবরে হইলেও) স্বামী উহার অর্দ্ধেক ছওয়াব পইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ছওয়াবের সমষ্টির তুলনায় এক এক জনের ছওয়াবকে অর্দ্ধেক বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি পূর্ণ ছওয়াব।

লা'নতের পাত্রী স্ত্রী

২০৪৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى

فراشه فابت ان تجيئ لعنتها الملائكة حتى تصبح

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, স্বামী তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আসিবার জন্য ডাকিলে যদি স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়) তবে ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন।

২০৫০। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش

زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع

অর্থ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর বিছানা ত্যাগ করতঃ রাত্রি যাপন করিলে ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীর প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন যাবৎ না সে স্বামীর বিছানায় ফিরিয়া আসে।

নারীদের প্রতি বিশেষ সতর্কবাণী

২০৫১। হাদীছ:— عن اسامة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة وكان عامة

من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار

قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء

অর্থ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত পরিদর্শনকালে আমি বেহেশতের দ্বারে দাঁড়াইলাম (এবং তথাকার যে সব তথ্য আমি জ্ঞাত হইলাম সে অনুসারে) বেহেশত লাভকারীদের মধ্যে ঐ লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে যাহারা দুনিয়াতে দরিদ্রতার মধ্যে (ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত) জীবন কাটাইয়াছে; ধনিগণ ত তাহার হিসাব-নিকাশদানে আবদ্ধ থাকিবে, (তাই তাহাদের বেহেশতে প্রবেশ বিলম্বিত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা দোযখী তাহাদিগকে অবিলম্বেই দোযখে পৌঁছাইবার আদেশ করা হইবে। তদ্রূপ দোযখ পরিদর্শন-কালে আমি দোযখের দ্বারে দাঁড়া-ইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, দোযখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে।

২০৫২। হাদীছঃ— عن عمران رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ

اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ

অর্থ—এমরান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি বেহেশত পরিদর্শন করিয়াছি (এবং উহা লাভকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছি) যে, উহা লাভকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের। দোযখকেও দেখিয়াছি (ও জ্ঞাত হইয়াছি) যে, তথায় প্রবেশকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে নারীদের।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একবার স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মে'রাজ তথা উর্দ্ধ জগত পরিভ্রমনে গিয়া ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার মহান কুদরতের বহুবিধ নিদর্শন সমূহের মধ্যে বেহেশত-দোযখও পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিদ্রাবস্থায় একাধিকবার উর্দ্ধ জগত পরিভ্রমন ও বেহেশত-দোযখ পরিদর্শন করিয়া ছিলেন। নবীদের সাধারণ স্বপ্নও অকাট্য ওহী; তদ্দরুণ এই পরিভ্রমনকেও মে'রাজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের ঘটনা সেই কোনও পরিভ্রমন ও পরিদর্শনেরই ঘটনা।

স্ত্রীকে মার পিট করা

মোছলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্জ কালে আরাফার ময়দানে লক্ষাধিক লোক সমাবেশে যে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়া ছিলেন উহাতে হযরত (দঃ) বিশেষরূপে নারীদের আলোচনাও করিয়াছিলন যে—

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ

فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا

تَكْرَهُوْنَهٗ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

"হে লোক সকল! তোমরা স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লার ভয় দেলে জাগরুক রাখিও। স্মরণ রাখিও, তোমরা আল্লার নামে নিরাপত্তার ওয়াদা-অঙ্গিকারের উপর তাহা-

দিগকে করায়ত্ব করিয়াছ এবং আল্লার (নির্দ্ধারিত) কালামের সাহায্যে তাহাদের ইজ্জৎ-আবরুর অঙ্গ পর্য্যন্ত নিজের জন্য হালাল করিয়া নিতে পারিয়াছ। অবশ্য তোমাদের জন্য তাহাদের জিম্মায় এই দায়িত্ব রহিয়াছে যে, তাহারা কাহারও সঙ্গে অবৈধ মেলা-মেশা করিবে না—যাহা কখনও তুমি বরদাশত করিতে পার না। যদি তাহারা সেই দায়িত্বে অবহেলা করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য মারিতে পারিবে, কিন্তু তাহা এইরূপ কঠিন হইতে পারিবে না যদ্দারা শরীর ক্ষত কিংবা শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়। আর তাহাদের জন্য তোমাদের জিম্মায় রহিয়াছে ন্যায় পরায়ণতার সহিত খোরাক পোষাক সরবরাহ করা।"

আলোচ্য হাদীছের বিষয়-বস্তুটি পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে :—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ........اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"স্বামীর প্রধান্য রহিয়াছে স্ত্রীর উপর এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর উপর শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে। এই জন্য সৎস্বভাবা স্ত্রীগণ স্বামীর বাধ্যগত জীবন-যাপন করিয়া থাকে এবং স্বামীর অনুপুস্থিতিতেও আল্লাহকে ভয় করিয়া (স্বামীর মান-ইজ্জৎ ও ধন-সম্পদের) হেফাজত ও সুরক্ষা করিয়া থাকে। (উক্ত গুণের বিপরীত) যদি তোমরা কোন স্ত্রীর অবাধ্যতার সম্মুখীন হও, তবে প্রথমে তাহাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া নছীহত কর এবং (আরও অধিক কড়া-কড়ির আবশ্যক হইলে তাহার প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ) তাহার বিছানা ছাড়িয়া ভিন্ন বিছানায় থাক এবং (আরও আবশ্যক হইলে) তাহাদিগকে মারিতে পার। ইহাতে যদি স্ত্রী বাধ্য হইয়া যায় অতঃপর আর তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য অজুহাত তালাশ করিও না। স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ সকলের উপরে ও উর্দ্ধে।" (৪ পারা ৩ রুকু)

আবু দাউদ শরীফে আর এক খানা হাদীছ আছে :—

এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের কি হক আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার খাওয়া-পরার ন্যায় স্ত্রীরও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাকে চেহারার উপর মারিতে পারিবে না, তাহাকে গালি-গালাজ করিতে পারিবে না, (কোন ব্যাপারে রাগতঃ তাহার সংশ্রব ত্যাগ করার) আবশ্যক হইলে অবশ্যই এক ঘরের মধ্যে থাকিয়া শুধু বিছানা ত্যাগ করিবে।

২০৫৩। হাদীছ :— عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ

الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي اٰخِرِ الْيَوْمِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে যময়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও পক্ষে স্বীয় স্ত্রীকে দাস-দাসীর ন্যায় মার-পিট করা কিছুতেই সঙ্গত নহে ; কিছুক্ষণ পরেই—দিনের শেষে সে তাহার সহিত আবার মিলিত হইবে, সহবাস করিবে।

স্বামীর আদেশ হইলেও স্ত্রী শরীয়ত বিরোধী কার্য্য করিবে না

২০৫৪। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীনী এক মোসলেম নারী তাহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া ছিল ; রোগের দরুণ মেয়েটির মাথার চুল ঝড়িয়া গিয়াছে। ঐ নারীটি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমার মেয়ের স্বামী বলিতেছে, তাহার মাথায় অন্য চুল লাগাইয়া দিতে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ কাজ তুমি করিও না, কারণ ঐ কাজ যাহারা করে তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য চুল বা নকল চুল মাথায় লাগান সম্পর্কে শরীয়তের মছআলাহ কি, তাহা পোষাক পরিচ্ছেদের অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ তায়ালা বর্ণিত হইবে।

স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে নিজের হক্ক ছাড়িয়া দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ـ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

"কোন নারী যদি আশঙ্কা করে স্বীয় স্বামীর নিকট বিরাগ ভাজন ও নিস্পৃহ হওয়ার, তবে সেই স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পর মীমাংসা করিয়া নেওয়া নিন্দনীয় হইবে না ; মীমাংসা অতি উত্তম।"

আয়েশা (রাঃ) উক্ত আয়াতের মর্ম্ম বুঝাইতে যাইয়া বলেন, যেমন– কোন নারী এক স্বামীর নিকট আছে, সেই স্বামী তাহার প্রতি আকৃষ্ট নয়, ফলে সে তাহাকে তালাক দিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় ঐ নারী স্বামীর সহিত মীমাংসা কল্পে স্বামীকে বলিতে পারে যে, আপনি আমাকে তালাক দিবেন না, আমাকে আপনার নিকট রাখুন এবং অপর বিবাহও করিয়া নিন ; আপনার উপর আমার খোর-পোশের কোন দাবী থাকিবে না, এমনকি দাম্পত্ত জীবন-যাপনে সমতা রক্ষার দায়িত্ব হইতেও আপনি মুক্ত।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এইভাবে স্বীয় হক্ক ত্যাগ করিয়া হইলেও স্বামীর সঙ্গে মীমাংসায় উপনিত হওয়ার পরামর্শ দানই উক্ত আয়াতের তাৎপর্য্য।

আ'য্‌ল্ তথা গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে বীর্য্যপাত জনন্দ্রিয়ের বাহিরে করাঃ

২০৫৫। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে আমরা"আয্‌ল্"করিয়া থাকিতাম।

(অর্থাৎ ঐরূপ করা নাজায়েয হইলে কোরআন শরীফে উহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা থাকিত বা হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক উহা নিষিদ্ধ বলা হইত।)

২০৫৬। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদে শত্রু পক্ষের লোক আমাদের হাতে বন্দী হইল। (নারী বন্দীনীদের সুব্যবস্থাপনা কল্পে শরীয়ত সম্মত বৈধ সম্পর্ক সূত্রে) তাহারা আমাদের করায়ত্তে আসিলে পর আমরা নিজ নিজ প্রাপ্ত রমণীকে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে আমরা আ'য্‌ল্ করিয়া থাকিতাম। এই সম্পর্কে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) চমকিত স্বরে বলিলেন, أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ "আচ্ছা! তোমরা এরূপ করিয়া থাক? হযরত (দঃ) পূনঃ পুনঃ তিনবার এইভাবে প্রশ্ন করিলেন এবং আরও বলিলেন—

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

"কেয়ামত পর্য্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হওয়া (আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি লোক অবশ্য অবশ্য জন্ম ভাল করিবেই।"

ব্যাখ্যাঃ—যুদ্ধে বন্দীনী নারীদের জন্য ইসলাম এইটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা রাখিয়াছে। তাহাদিগকে প্রাণে বধ করার ব্যবস্থা রাখা হইলে তাহা হইত নিষ্ঠুর জংলী পশুর কার্য্যের পরিচয়। আর চিরজীবন বন্দীনীরূপে রাখা হইলে তাহা হইত তাহাদের ধ্বংসেরই নামান্তর। এতদ্ভিন্ন রাষ্ট্রের কাঁধে এক বিরাট বোঝা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকিত। আর এই আকর্ষণময়ী শ্রেণীর বিরাট দলকে দেশে ও সমাজে লাগামহীনরূপে বিচরণ করিতে দেওয়া হইলে তাহা হইত সমাজ বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর ব্যধির অপ্রতিরোধ্য বীজাণুর ছড়াছড়ি। আর বিজাতীয়া, বিদেশীণী, সহসা আগতা দলে দলে নারীগণকে দাম্পত্য পদের ন্যায় বিরাট দায়িত্বের পদে বহাল করার সুযোগ প্রাপ্তিও সহজ-সাধ্য নহে। এই সব দিক লক্ষ্য করিয়া এই নারীদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা-দীক্ষা এবং সুব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাদের প্রতি-

পালনের জন্য ইসলাম এই শ্রেণীর নারীদের পক্ষে দাম্পত্য সূত্রের ন্যায় মালিকানা সূত্রের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অর্থাৎ মাতা-পিতা বা কোন মুরব্বি ওলী কর্ত্তৃক যেরূপে কোন রমণী দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধারূপে কোন পুরুষের হস্তে অর্পিত হয় এবং তখন ঐ পুরুষের জন্য ঐ রমণীকে ব্যবহার করা হালাল হইয়া যায়, তদ্রূপ বন্দীনীরূপে আগতা নারীগণকে শাসনকর্ত্তা খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিক ভাবে মালিকানা সূত্রে আবদ্ধারূপে ঐ লোকদের হস্তে অর্পন করিবে যাহারা কষ্ট-ক্লেশের সহিত ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ স্বীয় কষ্টে অর্জ্জিত বস্তুর অধিক যত্ন নিয়া থাকে, মাগনা ও মুফ্‌ত পাওয়া বস্তুর কোন যত্ন নেওয়া হয় না। সুতরাং ঐ নারীদের সুযত্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ নারীদের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের বিরাট ব্যয় ও দায়িত্ব বহনে মালিককে আকৃষ্ট করার জন্য মালিকের পক্ষে ঐ নারীকে "কনীয" রূপে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করা ত জায়েয ও হালাল করা হইয়াছেই, এতদ্ভিন্ন তাহার হস্তান্তরের দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ গ্রহণকেও জায়েয রাখা হইয়াছে। এস্থলে শরীয়তের একটি বিধান রহিয়াছে এই যে, কোন কনীয স্বীয় মালিকের ঔরষে সন্তান জন্ম দান করিলে তাহার হস্তান্তরের অবকাশ আর থাকে না।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার বৃত্তান্ত এই ছিল যে—জেহাদ উপলক্ষে দীর্ঘ দিন বিদেশে থাকিয়া ছাহাবীদের স্বাভাবিক মানবীয় উত্তেজনার উদ্রেক অবস্থায় শরীয়ত সম্মত হালাল রমণী লাভের পর তাহা ব্যবহার করার আগ্রহ তাঁহাদের নিশ্চয়ই হইল। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা পরিবার-পরিজনপূর্ণ সংসারী ছিলেন—স্ত্রীর ন্যায় স্থায়ী বোঝা পরিবর্দ্ধনের অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না, তাই তাঁহারা ঐ রমণীদিগকে এমন ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ চাহিতেন যাহাতে তাহারা গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক হস্তান্তরের অনুপোযোগী না হইয়া পড়ে। এতদুদ্দেশ্যে গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য তাহাদের কেহ কেহ আ'য্‌ল-ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ বা কেহ ঐ ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছায় পূর্ব্বাহ্ণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) বিস্ময়ের স্বরে তাহাদের উপর প্রশ্ন চাপাইয়া উক্ত কার্য্যের প্রতি বিরাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, অতঃপর উক্ত প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতা উল্লেখ পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিলেন যে, এরূপ প্রচেষ্টা বস্তুতঃ আল্লার নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার প্রচেষ্টা স্বরূপ যাহা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুনিয়া উপায়-উপকরণের জগত ; এস্থলে উপায়-উপকরণ ব্যবহার ও অবলম্বন করা, যেমন—রোগ ও ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিকিৎসা এবং ঔষধ ব্যবহার করা, কোন বিপদ-আপদ

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা দোষনীয় নহে, বরং শরীয়তও উল্লেখিত স্থান সমূহে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের আদেশ করিয়া থাকে। অথচ ঐসব ক্ষেত্রেও তক্দীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ অবশ্যই বিদ্যমান আছে; ঐ সব ক্ষেত্রে ত আল্লার নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার নামে উপায়-উপকরণ ব্যবহার করাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ সাব্যস্ত করতঃ উহা হইতে নিরোৎসাহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রে ত উপায়-উপকরণ ব্যবহারে নিরোৎসাহিত করা হয় না।

উত্তর—সর্ব্ব ক্ষেত্রেই তক্দীর বা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারণ বাস্তবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম উপায়-উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উপায়-উপকরণরূপে কোন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আল্লারই নির্দ্ধারণে হইতে হইবে। অতএব কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপায়-উপকণরূপে কোন ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করিতে আল্লাহ তায়ালার তথা শরীয়তের সমর্থন অত্যাবশ্যক। নিজেদের মনগড়ারূপে যে কোন ব্যবস্থাকে উপায়-উপকরণের নামে গ্রহণ করা চলিবে না। যেমন, কোন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনুপান বা পথ্যের নামে কোন বস্তু গ্রহণ করিতে গেলে তাহা চিকিৎসকের নির্দ্ধারণেই হইবে—মনগড়ামতে করা অন্যায় হইবে।

আল্লাহ তায়ালা রোগ মুক্তির জন্য ঔষধকে উপায়-উপকরণের শ্রেণীতে রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রসুল (দঃ) তাহা আমাদিগকে জ্ঞাতও করিয়াছেন যে مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهٗ شِفَاءً "আল্লাহ তায়ালা যে কোন রোগই সৃষ্টি করিয়াছেন উহার জন্য প্রতিষেধকও সৃষ্টি করিয়াছেন।" (বোখারী)

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রহিয়াছে; সঠিকরূপে রোগের উপর ঔষধ পড়িলে আল্লার হুকুমে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।" (মোসলেম শরীফ)।

আবু দাউদ শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে—ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা ঔষধ ব্যবহার করিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয়—হে আল্লার বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর; আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই যাহার প্রতিষেধক তিনি দান না করিয়াছেন, অবশ্য বার্দ্ধক্যের কোন ঔষধ তিনি পয়দা করেন নাই।

তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন,

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ -

"ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা যে, তাবীজ-গণ্ডা, ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করিয়া থাকি, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকি এবং বিভিন্ন প্রকার রক্ষা-কবচ অবলম্বন করিয়া থাকি—এই সব বস্তু-ব্যবস্থা কি আল্লার তকদীর বা নির্দ্ধারণকে প্রতিরোধ করিতে পারে? হযরত (দঃ) বলিলেন, এই সব ব্যবস্থা (উপায়-উপকরণরূপে) আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃকই নির্দ্ধারিত, (অতএব ঐ দৃষ্টিতে উহা অবলম্বন করিতে হইবে।)"

পক্ষান্তরে কাহারও জন্ম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা যে, উপায়-উপকরণরূপেও সৃষ্টিকর্ত্তা বিধানকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সমর্থনীয় নহে তাহা আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বক্ষ্যমান হাদীছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কাহারও জন্ম প্রতিরোধের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা গর্ভনিরোধ প্রচেষ্টাকে উপায়-উপকরণ পর্য্যায়েও রাখেন নাই* ইহা ব্যক্ত করাই উক্ত হাদীছের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা বিভিন্ন বাক্যমালায় হযরত (দঃ) প্রকাশ করিয়াছেন। মোছলেম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে, গর্ভনিরোধ ব্যবস্থাবলম্বন প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

مَا كَتَبَ اللّٰهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا سَتَكُوْنُ

"কেয়ামত পর্য্যন্ত যত জীবকে সৃষ্টি করা আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন উহার প্রত্যেকটি অবশ্য অবশ্যই অজুদ বা অস্তিত্ব লাভ করিবেই।"

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে :—

مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ

"সব বীর্য্যেই গর্ভ হয় না, আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন উহাকে প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই থাকে না।"

আর এক রেওয়ায়েতে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইহাও উল্লেখ আছে :—

---

* সরাসরি জন্ম প্রতিরোধ বা আল্লার উপর ন্যস্ত বিষয়ের অযথা আতঙ্ক ও কল্পিত আশঙ্কার বাহানায়—যাহা সরাসরি জন্ম প্রতিরোধেরই নামান্তর—ইহা ব্যতিরেকে যদি উপস্থিত স্বাস্থ্যগত বাস্তব আবশ্যকতায় চিকিৎসক ব্যক্তিবিশেষকে গর্ভনিরোধ প্রচেষ্টার পরামর্শ দেয় তবে তাহা চিকিৎসা বিভাগীয় বিধান ভুক্ত হইবে, যাহা সতন্ত্র বিষয়।

لا عليكم ان تفعلوا فانما هو القدر

"ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে তোমার ঘড়ে কোন অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়া যাইবে না, (যাহা চাপিতে না দেওয়ার উপায় থাকে।) কারণ, উহা (তথা সন্তানের জন্ম) একমাত্র তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।"

বলা বাহুল্য উল্লেখিত উক্তির উদ্দেশ্য যে, নিষেধাজ্ঞারই নামান্তর তাহা মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন— قوله لا عليكم اقرب الى النهى "উল্লেখিত বাক্য নিষেধাজ্ঞার অতি নিকট-বর্ত্তী।" ইমাম হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, والله لكان هذا زجر "খোদার কসম—তিরস্কারও ও ভৎর্সনা প্রয়োগ করাই উল্লেখিত উক্তির উদ্দেশ্য মনে হয়।"

অবশ্য আল্লার রসুল খোলা-খোলীরূপে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতঃ ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থাকে স্পষ্ট হারাম ঘোষিত করেন নাই; তাহা করা হইলে স্বাস্থ্যগত উপস্থিত কারণে বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাদানে যে, একক ও ব্যক্তিগতরূপে ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরীয়তে জায়েয রহিয়াছে সেই অবকাশটুকুও অতিশয় সাঙ্কীর্ণ হইয়া যাইত। মোসলেম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে—

ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ اِلَّا اللّٰهُ خَالِقُهَا -

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে আ'য্‌ল-ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, কোন মানুষ ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন কেন করে? আল্লাহ তায়ালা যে জীবকে সৃষ্টি করা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাকে অবশ্যই সৃষ্টি করিবেন। হাদীছটির বর্ণনাকারী এখানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) উক্ত আলোচনার উত্তরে (কোন মানুষ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কেন করে?—এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন এবং উহার ব্যর্থতা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু) "কেহই তাহা করিতে পারিবে না" এরূপ খোলা-খোলী নিষেধাজ্ঞার শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।

হাদীছ বর্ণনা কারীর উক্ত তথ্যের মর্ম্ম ইহাই যে, স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার শব্দ ব্যবহার করিয়া হারাম বিঘোষিত করেন নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ফ্যামেলী প্লানিং-এর ন্যায় জাতিয় পরিকল্পনা ও জাতীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মরূপে বার্থ কণ্ট্রোল বা গর্ভনিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রনের অভিযান এবং আলোচ্য "আ'য্‌ল" ব্যবস্থা অবলম্বন—এই দুইটির মধ্যে আকাশ-পাতাল অপেক্ষা অধিক ব্যবধান রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে দুইটি এত বড় ব্যবধান রহিয়াছে যে, তদ্দরুণ আলোচ্য আ'য্‌লকে জায়েয এবং তথা কথিত ফ্যামিলী প্লানিং-এর বার্থ কণ্ট্রোলকে হারাম বলিলে তাহাও মোটেই অত্যুক্তি হইবে না।

প্রথম ব্যবধান—"আয্‌ল" হইল একটি নিছক এককরূপের ব্যক্তিগত কার্য্য যাহা ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মানুষ ছোট বা বড় কোন কারণে অবলম্বন করিবে, তাই হয়ত উহার প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় অসন্তুষ্টি এবং শুধু তিরস্কার ও ভৎ'সনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রকাশ্যভাবে হারাম ঘোষিত করার শব্দ ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন এবং এতটুকু অবকাশ লক্ষ্যেই কাহারও মতে আ'য্‌লকে মোবাহ বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বার্থ কণ্ট্রোল অভিযানকে জাতিয়-কর্ম্ম ব্যবস্থারূপে সমগ্র জাতিকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আর ইহা একটি সাধারণ সত্য যে, কোন একটা অন্যায় বা অপছন্দনীয় কাজ একক ও ব্যক্তিগতরূপ পর্য্যায়ে লঘু অন্যায়-অপছন্দনীয় গণ্য হইলেও উহা জাতিগত পর্য্যায়ে পৌঁছিয়া গেলে বা সে পর্য্যায়ে পৌঁছাইবার চেষ্টা করা হইলে তাহা বহু গুণ বড় অন্যায় পরিগণিত হইবে।

দ্বিতীয় ব্যবধান—বার্থ কণ্ট্রোল অভিযানের মূল কারণ হইল সারা বিশ্বে বা দেশ-বিষেশে খাদ্য ঘাটতির অগ্রিম আশঙ্কা। হিসাব-নিকাশের দ্বারা দেখান হয় যে, জন-সংখ্যা বৃদ্ধির বর্ত্তমান হার দশ বা পনর বৎসর চলিতে থাকিলে বিশ্বের বা ঐ দেশের খাদ্যোৎপাদন শক্তি খাদ্যের চাহিদা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে; ফলে সারা বিশ্ব বা ঐ দেশ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইবে। সেই ভয়েই বলা হয় বার্থ কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

এস্থলে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট দুইটি আয়াতের মধ্যেমে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার একটি নির্দ্দেশ অনুধাবন করুন। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ—

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ (১)

إِحْسَانًا - وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"হে আমার রসুল! আপনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করুন যে, তোমরা আস, আমি তোমাদিগকে পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার তোমাদের

জন্য হারাম করিয়াছেন। তোমরা কোন বস্তুকে তাঁহার শরীক সাব্যস্ত করিও না, আর মাতা-পিতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে (কখনও কোন খারাব ব্যবহার করিবে না,) আর সন্তানকে মারিয়া ফেলিও না দারিদ্র্যের কারণে ও অভাবের তাড়নায়; আমি তোমাদের রিজিকেরও জিম্মাদার এবং তাঁহাদের রিজিকেরও জিম্মাদার। (৮ পারা ৫ রুকু)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.....وَاٰتِ (٢)
ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ
الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ... وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ
وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا - اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ...وَلاَ تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ -

"তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার এই আদেশ-নিষেধগুলি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে—(১) তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা বা দাসত্ব করিবে না। (২) মাতা-পিতার সহিত সর্ব্বদা ভাল ব্যবহার করিবে। (৩) আত্মীয়দের হক তাহাদেরকে দিয়া দিবে এবং গরীব-মিছকিন, অসহায়কে সাহায্য দান করিবে। অপব্যয় করিবে না; অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। (৪) ব্যয় করার মধ্যে একেবারে কঠিনও হইও না, একেবারে এমন উদারও হইও না যে, নিঃস্ব ও অক্ষম হইয়া বসিতে হয়। (৫) নিশ্চয় তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রিজিক প্রশস্ত করিয়া দেন, যাহার জন্য ইচ্ছা কবেন রিজিক সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। তোমরা তোমাদের সন্তান মারিয়া ফেলিও না দারিদ্র্যের ভয়ে ও অভাবের আশঙ্কায়; আমি তাহাদের রিজিকের জিম্মাদার যেরূপ তোমাদের রিজিকেরও আমি জিম্মাদার।" (১৫ পারা ৩ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য আয়াতে পঞ্চম নম্বরে রিজিকের প্রশস্ততা এবং সাঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত ঘোষনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, দারিদ্র্যের ভয় ও অভাবের আশঙ্কা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বনরূপে জন সংখ্যা কমাইবার জন্য সন্তান নিধনের পথ অবলম্বন করিও না। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাস্তব তথ্যও জানাইয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের এবং ঐ সন্তানদের

সকলের রিজিকেরই ব্যবস্থাপক আমি। সুতরাং যে বিষয়ের ভার আমার উপর ন্যস্ত, তোমাদের উপর নহে সে বিষয়ের ভয় ও আশঙ্কায় তোমরা এতদুর অগ্রসর হইও না যে, সন্তান নিধন আরম্ভ কর। যেরূপ তোমাদের নিজেদের রিজিক যোগাইতে অক্ষমতার ভয় ও আশঙ্কা করিয়া তোমরা আত্মহত্যা আরম্ভ কর না বা তোমাদিগকে হত্যা করা হউক—এরূপ পরিকল্পনা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, রিজিক-দৌলৎ আল্লার হাতে, উহার ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ, এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতের ৩ ও ৪ নম্বরে ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পূর্কে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং অতঃপর ব্যয়-সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে সন্তান নিধনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিষয় আল্লার উপর ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উপায়-উপকরণের জগতে উপায় অবলম্বন করা আল্লারই বিধান, কিন্তু তাহা অবশ্যই আল্লার মর্জ্জি মোতাবেক হইতে হইবে, শুধু নিজেদের পরিকল্পনার দ্বারা উহা করা যাইবে না।

এস্থলে আরও একটি বিষয় বোধগম্য যে, বিনা অপরাধে কাহাকেও হত্যা করা মহা পাপ, ইহা একটি সাধারণ কথা এবং শরীয়তের বিধান। সন্তান নিধনও উহার আওতাভুক্ত, কিন্তু আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উহাকে ঐ দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও অপরাধ স্বাব্যস্ত করা হয় নাই,* বরং বলা হইয়াছে যে, যেহেতু রিজিকের ব্যবস্থা আল্লার উপর ন্যস্ত তাই রিজিকের অভাব আশঙ্কায় সন্তান সংহার তথা জন-সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না।

অন্ধকার যুগে আরবে এই প্রাথা ছিল যে, দারিদ্র্যের ভয়ে, অভাব-অনটনের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করিয়া থাকিত এবং এই ব্যবস্থাকে "وأد—ওয়াদ" বলা হইত। ইহা শুধু নিরপরাধীকে খুন করার অপরাধই ছিল না, বরং আল্লাহ তায়ালা যে জিনিষ নিজ জিম্মায় রাখিয়াছেন তথা রিজিক উহার অভাবের আশঙ্কা করিয়া সন্তান খুন করা ইহাই ছিল উক্ত অপরাধের বিশেষত্ব এবং এই সূত্রেই কেয়ামতের দিন নিরপরাধী হত্যার বিচার হইতে পৃথকভাবে উক্ত অপরাধের বিচার করা হইবে। ঐ শ্রেণীর হত্যাকৃত সন্তানদিগকে পৃথকভাবে উপস্থিত করিয়া হত্যাকারীদের মুখের

---

* অভাব আশঙ্কায় বা অভাবের তাড়নায় সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা যে, নর হত্যার অপরাধ হিসাবে নহে তাহার উজ্জল প্রমাণ উক্ত আয়াতদ্বয়েই বিদ্যমান রহিয়াছে। উভয় আয়াতেই নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর গণনায় উক্ত সন্তান হত্যার নিষেধাজ্ঞা উল্লেখের পরে ولا تقتلوا النفس التى حرم الله—"অর্থাৎ অন্যায়রূপে কাহাকেও হত্যা করিও না" বলিয়া ভিন্নভাবে নর হত্যার নিষেধাজ্ঞাও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং অভাব আশঙ্কায় সন্তান হত্যাকে নর হত্যা হিসাবে নিষিদ্ধ গণ্য করা মোটেই উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নতুবা উভয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করার কোন আবশ্যক ছিল না।

উপর তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের হত্যার ব্যাপারে কি অপরাধ ও অভিযোগ ছিল? কেয়ামতের দিন এই বিশেষ অনুষ্ঠানের উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে :—

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"কেয়ামতের দিনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান—যখন হত্যাকৃত সন্তানগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কি অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল?"

বলা বাহুল্য—বর্ত্তমান বার্থ কন্ট্রোল অভিযানের মূলেও ঐ অপরাধই রহিয়াছে যে, যে জিনিষটি আল্লাহ তায়ালা নিজ জিম্মায় রাখিয়াছেন অর্থাৎ রিজিক বা খাদ্য উহার অভাব আশঙ্কায় সন্তান বৃদ্ধি নিরোধের ব্যবস্থা করা হয়, যদিও এস্থলে জীব হত্যার ঘটনা নহে, কিন্তু অপরাধের মূল বিষয়টি এখানেও বিদ্যমান; এই সূত্রেই মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে :—

سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ

الْوَءْدُ الْخَفِىُّ وَهِىَ وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ

অর্থাৎ—গর্ভ নিরোধের জন্য আয্‌ল ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহা গোপন "ওয়াদ"—তথা অভাব আশঙ্কায় সন্তান নিধন। আর অভাব আশঙ্কায় সন্তান নিধনের পরিণতি কোরআনের এই আয়াতে উল্লেখ আছে—وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতে দিন উক্ত কার্য্যের বিচার উপলক্ষে বিশেষরূপে আল্লাহ তায়ালার গজব বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাইবে। ইহার কারণ এই যে, উক্ত কার্য্য যাহারা করিয়াছে বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গুণ—رَزَّاق সকলের আহার দাতা—ইহার প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বোধক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, যেহেতু অভাব প্রতিরোধের উপায়রূপেও উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন আল্লার তরফ হইতে ছিল না।*

---

* খাদ্যের অভাব আশঙ্কা যাহার দরুণ অন্ধকার যুগে সন্তান নিধন কার্য্য হইয়া থাকিত এবং উহা আল্লার গজব ও অসন্তুষ্টির বিশেষ কারণ রূপে সাব্যস্ত; উক্ত অভাব আশঙ্কার কারণে নয়, বরং অন্য কোন ওজর বা কারণে যদি এককরূপে ব্যক্তিগতভাবে আয্‌ল বা গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে তাহা ওয়াদ তথা খাদ্যাভাব আশঙ্কায় সন্তান নিধন পর্য্যায়ের অপরাধ ও গোনাহ পরিগণিত হইত না। এক হাদীছে যে, মোসলেম শরীফের আলোচ্য হাদীছের বিপরীত উল্লেখ আছে যে, আয্‌ল ওয়াদ গণ্য হইবে না—উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ইহাই।

উক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টত্যই প্রতীয়মান হইল যে, খাদ্যে অভাবের আশঙ্কা ও ভয়ে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম করা তথা জন সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধ প্রচেষ্টা—চাই উহা সন্তান নিধনের ন্যায় প্রকাশ্য বর্বর নীতির মাধ্যমে হউক বা গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থার ন্যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে হউক উভয়টিই নিষিদ্ধ এবং উভয়টিই পূর্ব্বোল্লেখিত পবিত্র কোরআনের আয়াতদ্বয়ের নিষেধাজ্ঞার মূল তাৎপর্য্যের আওতাভুক্ত।

পরিতাপের বিষয়—সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি নিরোধের ব্যাপারে অন্ধকার যুগে কাফের মোশরেক বে-ঈমানদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অর্থাৎ খাদ্যে অভাবের আশঙ্কা—যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পুনঃ পুনঃ স্বীয় ক্রোধ এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন বর্ত্তমান যুগের কাফের মোশরেকগণও ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়াই বার্থ কন্ট্রোল বা গর্ভ নিরোধ পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কাফের মোশরেকদের পক্ষে তাহা বিচিত্রও নহে মোটেই। কিন্তু মোসলমান হওয়ার দাবীদারগণও যে, সেই পরিকল্পনায় মাতিয়া উঠিয়াছে ইহাই হইল বিস্ময়ের ও পরিতাপের বিষয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে যাইয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালা শেরেক পরিহার ও এক আল্লার পূজারী হওয়ার ভূমিকা বর্ণনা করিয়াছেন যদ্দারা বুঝান হইয়াছে যে, উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা এক আল্লার পূজারী হওয়ার পরিপন্থী।

যুক্তিরূপে বর্ত্তমান জন সংখ্যা বৃদ্ধির উপর হিসাব-নিকাশের দ্বারা যে ভয়াবহ খাদ্যাভাবের আশঙ্কা দেখান হয় সেই যুক্তিও অবৈজ্ঞানিক। কারণ এই হিসাব দেখাইবার সময় ৫০ বৎসর পরের জন সংখ্যাকে ভূমির বর্ত্তমান খাদ্যোৎপাদন শক্তির পরিমাণের উপর দাঁড় করান হইয়া থাকে, অথচ এইরূপ হিসাব বিজ্ঞানের পরিপন্থী। কারণ, ইহা একটি চাক্ষুষ সত্য যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে ১০ মন খাদ্য উৎপাদিত হইত বর্ত্তমান বিজ্ঞান গবেষনায় আবিষ্কৃত রসায়নিক সার ব্যবহারে ঐ পরিমাণ জমিতেই ২০ মন পর্য্যন্ত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। বিজ্ঞানোন্নত দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে এই দাবী বাস্তব সত্যরূপে পরিলক্ষিত। এই সূত্রে এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যে সব বৈজ্ঞানিকদের গবেষনায় এই অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে যাহা না হইলে বার্থ কন্ট্রোল পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বেই সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষের শুধু আশঙ্কাই হইত না, বরং সর্ব্বগ্রাশী দুর্ভিক্ষ বাস্তবেই আসিয়া যাইত, এই সব বৈজ্ঞানিকদের পূর্ব্ব পুরুষদের আমলে যদি তৎকালীন উৎপাদন শক্তির পরিমাণের উপর ১০০ বৎসর পরের জন

সংখ্যা চা পাইয়া দিয়া খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় বার্থ কন্ট্রোল পরিকল্পনা গৃহিত এবং তাহাদের ধারণা ফল প্রসূ হইত তবে এই বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্যই জগতে জন্ম লাভের সুযোগ পাইত না।

বর্ত্তমান বার্থ কন্ট্রোল পরিকল্পনার দ্বারা দুনিয়াতে যে সব লোকের আগমন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যে, এমন এমন বৈজ্ঞানিক হইবে না যাহারা ১০ মণের ভূমিতে ২০ মণ উৎপাদনকারী সারের স্থলে ৪০ মণ উৎপাদনকারী সার আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে—তাহা কে বলিতে পারে ? বরং সেরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। ১০ মণ উৎপণ্যে যথেষ্ট এই পরিমাণ জন সংখ্যা থাকা কালে রিজিকের জিম্মাদার সৃষ্টিকর্ত্তা ঐরূপ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন না যে ১০ মণের ভূমিতে ২০ মণ উৎপাদনকারী সার আবিষ্কার করে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যখন উহার প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আবার যখন জন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা ২০ মণের স্থলে ৪০ মণ উৎপাদনকারী সার আবিষ্কারকারী বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিয়া দিবেন। যেরূপ কোন কারখানার কর্তৃপক্ষ তাহার কারখানার উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা মহান আল্লাহ তায়ালা কি তাহা করিবে না—وهو الحكيم الخبير "অথচ তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ ও নিপূন হেক্‌মতওয়ালা সূক্ষ্ম কৌশলী।

স্ত্রীদের মধ্যে ছফরের সঙ্গিনী লটারি দ্বারা নির্ণয় করা

২০৫৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন ছফরে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে হইলে সকল স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করিয়া সঙ্গিনী নির্দ্ধারিত করিতেন। এক ছফরে আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) ঐরূপে সঙ্গিনী নির্দ্ধারিত হইলেন।

আরবে সাধারণতঃ রাত্রিবেলায়ই পথ চলা হইয়া থাকে। পথ চলাকালে হযরত নবী (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে কথাবর্ত্তা বলিতেন। একদা হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমার উটের উপর বসুন আর আমি আপনার উটের উপর বসি ; একে অন্যের উটের ভ্রমন উপভোগ করিব। রাত্রে ভ্রমনকালে হযরত (দঃ) আয়েশার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার উদ্দেশ্যে তাঁহার উটের লক্ষ্য করিয়া আসিলেন, তথায় হাফ্‌ছাহ (রাঃ) ছিলেন, তাই এই রাত্রে হযরতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার সৌভাগ্যের সুযোগ হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) পাইলেন এবং আয়েশা (রাঃ) সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিলেন। (হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ)

এই উদ্দেশ্যেই বাহন বদল করিয়াছিলেন আয়েশা (রাঃ) তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে তিনি সবই উপলব্ধি করিলেন।) তাই নিজকে নিজে ভৎ'সনা করিলেন, এমনকি ভোর বেলায় বিশ্রামের জন্য একস্থানে অবস্থান করিলে আয়েশা (রাঃ) এজ্‌খের নামক ঘাস-বনে পা রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে খোদা! আমাকে দংশিবার জন্য সাপ বা বিচ্ছু পাঠাইয়া দাও। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই ব্যাপারে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোনরূপ দোষ দিতে পারিতে ছিলাম না।

ব্যাখ্যা ঃ—একাধিক বিবাহের ছুন্নতের প্রতি অনেকেই লালায়িত হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার যে, আদর্শ হযরত (দঃ) রাখিয়া গিয়াছেন সেই ছুন্নতের উপর আমলকারী দেখা যায় কোথায়? স্ত্রীদের মধ্যে ছফরের সঙ্গিনী নির্ব্বাচনে সমতা রক্ষার বাধ্য বাধকতা শরীয়তে নাই, বরং ছফরের আবশ্যক পূরণ দৃষ্টে স্বামী সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিতে পারে, কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রেও লটারির সাহায্যে সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিতেন।

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে হইবে

একাধিক স্ত্রী থাকিলে স্বামীর রাত্রি-যাপন তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা শরীয়তের বিধান। অন্যথায় একাধিক বিবাহ হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হইয়াছে। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে—

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ

اَنْ لَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"তোমাদের পছন্দ মোতাবেক দুই দুই, তিন তিন, চার চার পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পার, অবশ্য যদি আশঙ্কা কর যে, একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে এক বিবাহের উপরই ক্ষান্ত হও" (৪ পারা ১২ রুকু)

স্ত্রীদের মধ্যে খোরপোষ, আচার-ব্যবহার এবং রাত্রি যাপন ইত্যাদি স্বীয় সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়াবলীতে সমতা রক্ষা করার পর মনের টান ও অন্তরের ভালবাসা যাহা কাহারও নিজ সাধ্যের বস্তু নহে উহার মধ্যে সমতা স্থাপনে বাধ্য করা হয় নাই। তাহাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا -

"তোমরা শত ইচ্ছা করিলেও স্ত্রীদের মধ্যে (মনের টান ও অন্তরের ভালবাসার দিক দিয়া) সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া একজনের প্রতি ঝুকিয়া পড়িয়া অপরজনকে দোহুল্যমান নিরবলম্বন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিও না। আর নিজের এছ্‌লাহ্‌ বা সংশোধন ও খোদার ভয় রাখিয়া চলিলে (আল্লাহ তায়ালা ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ মাফ করিয়া দিবেন;) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু। (ছুরা নেছা—৫ পাঃ ১৬ রুঃ)

এক স্ত্রী তাহার ভাগ অপর স্ত্রীকে দিয়া দিলে

২০৫৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মুল-মোমেনীন সওদা (রাঃ) তাঁহার ভাগের দিন আয়েশা (রাঃ)কে দিয়াছিলেন; সেমতে হযরত নবী (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে দুইদিন থাকিতেন—একদিন আয়েশার নিজ প্রাপ্য, অপর দিন সওদার ভাগের দিন।

কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীর মধ্যে সমতা

২০৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত—অকুমারী স্ত্রীর উপর কুমারী বিবাহ করিলে কুমারী নব পত্নীর গৃহে স্বামী প্রথমে একাধারে সাতদিন অবস্থান করিবে; অতঃপর (সেই হিসাবেই) অন্য স্ত্রীকেও সুযোগ দান করিবে। আর কুমারী স্ত্রীর উপর অকুমারী বিবাহ করিলে প্রথমে তাহার গৃহে তিন দিন অবস্থান করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুটি শরীয়তের বিধানে ন্যায় এবং সমতা রক্ষার মধ্যেও সুব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নুতন-পুরাতন, কুমারী-অকুমারী—একাধিক সকল শ্রেণীর স্ত্রীদের মধ্যেই সমতা রক্ষা করা শরীয়তের বিধান। অথচ নব পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য এবং তাহার মন বসাইবার জন্য তাহার সহিত কিছুটা দীর্ঘ মেলা-মেশার আবশ্যক। অকুমারী যেহেতু পূর্ব্বেকারই স্বামীস্পর্শা, পক্ষান্তরে কুমারী সম্পূর্ণ স্বামী অস্পর্শা, তাই এই দুই শ্রেণীর পক্ষে উক্ত আবশ্যকতার ব্যবধানও সুস্পষ্ট। এই সব বিষয়ে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া ছুন্নত তরিকা এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট অবস্থানের দিন গণনার দিক দিয়া ত সমতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু নব পত্নীকে প্রথমে সুযোগ দান করিবে এবং সে কুমারী হইলে কম সংখ্যার বণ্টন না করিয়া সাত দিনের ভাগ নির্দ্ধারিত করিবে, আর নব পত্নী অকুমারী হইলে তিন দিনের ভাগ নির্দ্ধারিত করিবে।

দিনের বেলা ভাগ-বণ্টন ব্যতিরেকে সকল স্ত্রীর সঙ্গে মেলা-মেশা করা যায়ঃ

২০৬০। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি আছর নামায হইতে অবসর হইয়া স্ত্রীগণের প্রত্যেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিতেন এবং প্রত্যেকের নিকটেই কিছু সময় অবস্থান করিতেন।

সতিনের সম্মুখে অতিরঞ্জিত সুখভোগ প্রকাশ করিয়া ফখর করা নিষিদ্ধঃ

২০৬১। হাদীছঃ— আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক মহিলা আরজ করিল, ইয়া রস্থলুল্লাহ (দঃ)! আমার একজন সতিন আছে। আমি তাহার সম্মুখে স্বামীর পক্ষ হইতে যাহা তিনি আমাকে দেন নাই তাহা লাভের অতিরঞ্জিত আস্ফালন দেখাইলে তাহাতে গোনাহ হইবে কি? তদুত্তরে হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি এমন বস্তু লাভের আস্ফালন দেখায় যাহা সে বস্তুতঃ লাভ করে নাই সে আপাদ মস্তক মিথ্যাবাদী রূপেই পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীর প্রতি সৌহার্দ প্রদর্শনে আত্মাভিমান ত্যাগ করা

২০৬২। হাদীছঃ— আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট ছাহাবী জোবায়রের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার কোন ধন-সম্পত্তি, বান্দি-গোলাম ইত্যাদি কিছুই ছিল না। ছিল শুধু একটি ঘোড়া এবং পানি বহনের একটি উট। ঘোড়ার আহারের ব্যবস্থা করা, উটের পিঠে পানি বহন করিয়া আনা, পানি উঠাইবার জন্য ডোল সেলাই করিয়া লওয়া, রুটির জন্য আটা তৈরী করা ইত্যাদি সমুদয় কার্য্য আমাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। আমি ভালভাবে রুটি পাকাইতে জানিতাম না; আমার কতিপয় মদীনাবাসীনী পড়শী মহিলা আমার রুটি পাকাইয়া দিতেন। ঐ মহিলাগণ প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিশয় মহতী ছিলেন।

হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) জোবায়েরকে এক খণ্ড জমি দিয়াছিলেন যাহা আমাদের গৃহ হইতে প্রায় এক মাইল দূর ছিল। (ঘোড়াকে খাওয়াইবার জন্য) ঐ জমি হইতে খেজুরের দানা সংগ্রহ করিয়া আমি নিজেই স্বীয় মাথায় বহন করিয়া আনিতাম। একদা আমি খেজুর দানা মাথায় বহন করিয়া আসিতেছিলাম, পথি মধ্যে হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সঙ্গে কতিপয় মদীনাবাসী ছাহাবী ছিলেন। হযরত আমাকে তাঁহার যানবাহনে ছওয়ার হওয়ার জন্য ডাকিলেন, কিন্তু আমি বেগানা পুরুষদের সঙ্গে চলিতে লজ্জা

বোধ করিলাম এবং আমার স্বামী জোবায়রের গায়রত এবং আত্মাভিমানও আমার স্মরণে আসিল। হযরত (দঃ) আমার লজ্জা-বোধ অনুভব করিতে পারিলেন এবং পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহে আসিয়া স্বামী জোবায়রের নিকট সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলাম এবং ইহাও বলিলাম যে, আপনার গায়রত এবং আত্মাভিমানও তখন আমার স্মরণে পড়িয়াছিল। ইহা শুনিয়া জোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, (আমার আত্মাভিমান থাকিলেও) হযরতের যানবাহনে ছওয়ার হইয়া আসা অপেক্ষা তোমার মাথায় খেজুর দানার বোঝা বহন করিয়া আনার পরিশ্রম আমার নিকট অধিক কঠিন ও বেদনায়ক মনে হইতেছে।

আস্‌মা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) আমার জন্য একজন চাকর পাঠাইয়া দিলে ঘোড়ার খেদমতের কাজ হইতে আমি হাঁপছাড়ার অবকাশ পাইলাম, তিনি যেন আমাকে মুক্তি দান করিলেন।

স্বামীর সঙ্গে অভিমান করা

২০৬৩। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, কোন্ সময় তুমি আমার প্রতি উৎফুল্ল থাক এবং কোন্ সময় ভারাক্রান্ত হও তাহা আমি অনুভব করিতে পারি। আমি আরজ করিলাম, আপনি তাহা কি ভাবে উপলব্ধি করেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, উৎফুল্ল থাকা কালে কোন কথায় শপথ করিতে এইরূপ বলিয়া থাক—মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম। আর ভারাক্রান্ত হওয়াকালীন এইরূপ বলিয়া থাক—ইব্রাহীম (আলাইহেচ্ছালাম)-এর প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম।

আমি আরজ করিলাম—এই কথা সত্য, কিন্তু কসম খোদার ইয়া রসুলাল্লাহ! (অভিমান স্বরূপ—) একমাত্র আপনার নামের উচ্চারণই ত্যাগ করিয়া থাকি, (আপনার প্রতি ভক্তি-মর্য্যাদা ও মহব্বতের মধ্যে কোন পার্থক্যই আসে না।)

সন্তানের প্রতি হামদর্দি প্রকাশ

২০৬৪। হাদীছ:—মেছ্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) আবুজহলের মেয়েকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছিলেন। ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হা সেই সংবাদ জানিতে পাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনার আত্মীয়-স্বজনগণ বলিয়া থাকে যে, (আপনার মেয়েদেরকে কষ্ট দেওয়া হইলেও) আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষে হইয়া কাহারও প্রতি একটু রাগও দেখান না। ঐ দেখুন! আলী (রাঃ) আবু জহলের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন।

ইহা শুনিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন, ভাষণের আরম্ভে কলেমা-শাহাদৎ পাঠ করতঃ আবুল আ'ছ-এর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তাহার নিকট আমার এক মেয়ে বিবাহ দিয়াছিলাম। (আমি তাহাকে আমার মেয়ের জন্য কতিপয় কথা বলিয়াছিলাম; সেই উপলক্ষে) সে আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়াছে। (এখন আমি আমার মেয়ে ফাতেমা সম্পর্কে বলিতেছি যে,) নিশ্চয় ফাতেমা আমার কলিজার টুক্‌রা, তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। খোদার কসম—আল্লার রসুলের মেয়ে এবং আল্লার দুশমনের মেয়ে একই ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হইতে পারিবে না। হযরতের এই ভাষণের পর আলী (রাঃ) উক্ত বিবাহের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ ছিল যাহা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল। ৪৩৮ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী উক্ত ভাষণের আরও কতিপয় উক্তির হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে সমুদয় জল্পনা-কল্পনার অবসান হইয়া যায়। হযরত (দঃ) এই কথাও বলিয়াছিলেন—

وَإِنِّىْ لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَا تَجْتَمِعُ
بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ أَبَدًا -

"নিশ্চয় আমি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করিতে চাই না, অবশ্য এই কথা বলিতেছি যে, খোদার কসম—আল্লার রসুলের কন্যা এবং আল্লার দুশমনের কন্যা কোন সময়ই একত্র হইবে না।"

এতদ্ভিন্ন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শুধু শ্বশুরই ছিলেন না, হযরত (দঃ) তাঁহার মুরব্বিও ছিলেন। বিবাহ শাদীর ব্যাপারে মুরব্বি শুধু জায়েয এবং হালালকেই দেখেন না। মুরব্বি তাহার কনিষ্ঠদের সাংসারিক জীবন-যাপনের সুখ-শান্তি ইত্যাদি সমুদয় ব্যাপারের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন; সেই সূত্রেই উপরোল্লেখিত ভাষণে হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন যে—

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِىْ دِيْنِهَا

"ফাতেমা আমার কলিজার টুক্‌রা। আমার ভয় হয়—(আলী আবু জহলের মেয়েকে বিবাহ করিলে) ফাতেমার সঙ্গে তাহার এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, (স্বামী হিসাবে ফাতেমার উপর আলীর যে হক্ দ্বীন ও ধর্মীয়রূপে রহিয়াছে

সেই) দ্বীন ও ধর্মীয় কর্ত্তব্য পালনে ফাতেমা পদস্খলিত হইয়া পড়িবে ; (সেই ভাবে আলী ও ফাতেমার সুখের জীবন বিনষ্ট হইবে।)

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত বিবাহ প্রস্তাবে হযরত (দঃ) স্বীয় মুরব্বিয়ানা সূত্রের অধিকারও প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং ঐ ক্ষেত্রে হযরত (দঃ) তাঁহার উপর কঠোর চাপও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ঐ শ্রেণীর অধিকার এবং চাপ প্রয়োগই উল্লেখ হইয়াছে—

২০৬৫। হাদীছ ঃ—মেছ্ওয়ার ইবনে মাখ্রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন, (আবু জাহেল পারিবার—) বনী হেশাম তাহাদের মেয়েকে আলীর নিকট বিবাহ দিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিয়াছে। সেই অনুমতি আমি দিব না, দিব না, দিব না। হাঁ—তবে যদি আবু তালেবের পুত্র (আলী) আমার মেয়েকে তালাক দিয়া তাহাদের মেয়ে বিবাহ করিতে চায়। ফাতেমা আমার কলিজার টুক্রা ; তাহার দুঃখে আমি দুঃখিত হই, তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই।

গায়ের-মহ্‌রম মহিলার সঙ্গে মেলা-মেশা করা

২০৬৬। হাদীছ ঃ— عن عقبة بن عامر رضى الله عنه

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ

অর্থ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার ! বেগানা নারীদের সঙ্গে মেলা-মেশা দেখা সাক্ষাৎ করিও না। এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। স্বামীর ভ্রাতাগণ ভ্রাতা-বধূর সহিত ঐরূপ করিতে পারে কি ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, স্বামীর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ত মৃত্যু তুল্য।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বামীর ভ্রাতা শ্রেণীর আত্মীয়দের সঙ্গে মেলা-মেশা, দেখা সাক্ষাৎকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অধিক মারাত্মক বলিয়াছেন। ইহা একটি যুক্তিযুক্ত কথা, কারণ বেগানা লোকদের অপেক্ষা ঐ শ্রেণীর আত্মীয়দের বেলায় বাধা-ব্যবধান কম বা না থাকার কারণে এস্থলে শয়তানের জন্য সুযোগ-সুবিধা অধিক রহিয়াছে, তাই এস্থলে অধিক সতর্কতার আবশ্যক।

২০৬৭। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলার নিকট তাহার মাহ্‌রাম পুরুষের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন বেগানা পুরুষ (পর্দ্দা অবস্থায়ও) যাইবে না। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার স্ত্রী এই বৎসর হজ্জ করিতে ইচ্ছা করে অথচ অমুক জেহাদের সৈন্য দলে আমার নাম লেখা হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ জেহাদের ছফর মুলতবী রাখিয়া তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জে যাও, (তাহাকে একাকী ছফর করিতে দিও না।)

প্রয়োজন ক্ষেত্রে জন শূন্য নির্জনে নয় লোকদের দৃষ্টি গোচরে মহিলার প্রয়োজন শোনা যায়

২০৬৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক মদিনাবাসীণী মহিলা তাহার সন্তানগণকে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (কোন প্রয়োজনে) আসিল। নবী (দঃ) তাহার প্রয়োজন শুনিবার জন্য তাহার সহিত ভিন্নভাবে আলোচনা করিলেন। এবং তাহাকে (আশ্বাস ও সান্তনা দানে) বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা (মদিনাবাসী) আমার নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়।

নারীবৎ পুরুষ হইতে পর্দ্দা করা

২০৬৯। হাদীছ :—উম্মুল-মোমেনীন উম্মে ছালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা তাঁহার নিকটে ছিলেন। তাঁহার গৃহে একজন মোখান্নাছ—নারীবৎ পুরুষ ছিল, সে উম্মে ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভ্রাতাকে বলিল, আগামী কল্য যদি আল্লাহ তায়ালা তায়েফ নগরী মোসলমানদেরে জয় করিতে দেন, তবে আমি তোমাকে তথাকার গায়লান নামক ব্যক্তির কন্যাটিকে দেখাইব (সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুগঠনের—) তাহার পেটের চামড়ায় কুঞ্চন শোভিত—সম্মুখ দিক হইতে চারটি এবং পিছন দিক হইতে (উভয় পার্শ্বে) আটটি পরিদৃষ্ট হয়। ইহা শুনিয়া হযরত নবী (দঃ) উম্মে ছালামা (রাঃ)কে

লক্ষ্য করিয়া বিশেষ তাকীদের সহিত বলিলেন, এই ব্যক্তি কখনও যেন তোমাদের নিকট আসিতে না পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—নারীবৎ ও নারী স্বভাবের এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যাহাদের চাল-চলন আচার-ব্যবহার নারীদের অনুরূপই, এই শ্রেণীর পুরুষকে "মোখান্নাছ" বলা হয়। ইহাদের এক শ্রেণী হুঁশ-জ্ঞান বিহীন হওয়ায় শুধু বাহ্যিক অঙ্গ ও লিঙ্গের দিক দিয়া পুরুষ হইলেও তাহাদের নারীবৎ স্বভাব ও চাল চলনের ন্যায় আভ্যন্তরীন পুরুষত্ব-শক্তি ও মনোবৃত্তির দিক দিয়াও তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ হয় না। পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিকরূপে নারীর প্রতি যে শ্রেণীর আকর্ষণ থাকে তাহাদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর আকর্ষণের লেশ মাত্র থাকে না, বরং তাহারা নারীদের প্রতি সেই আকর্ষণ ও উহার মাধুর্য্যের কোন খোঁজ-খবরও রাখে না—সৃষ্টিগত ভাবেই তাহারা এই ধরণের হইয়া থাকে। তাহারা সাধারণতঃ আন্দর মহলে থাকিয়া মেয়ে মহলের কাজ করিয়া বেড়ায়। এই শ্রেণীর শুধু বাহ্যিক পুরুষদেরকে পবিত্র কোরআনে غير اولى الاربة" নারীদের হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নাবালেগ ছেলে যাহাদের মধ্যে এখনও নারীদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিই হয় নাই তাহাদের শ্রেণীতে রাখিয়া উভয়ের জন্য পর্দ্দার বিধানে শিথিলতা রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে যে মোখান্নাছের উল্লেখ হইয়াছে তাহাকে উল্লেখিত শ্রেণীর শুধু বাহ্যিক পুরুষ গণ্য করা হইত এবং হযরতের আন্দর মহলে যাতায়াতে বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু তায়েফস্থিত গায়লানের মেয়ে সম্পর্কে সে যে উক্তি ও আকর্ষণীয় অঙ্গ সৌষ্ঠবের উল্লেখ করিল তাহাতে বুঝা গেল, সে-ত غير اولى الاربة —নারীদের হইতে নির্লিপ্ত উদাসীন নহে, নতুবা সে নারীর আকর্ষণীয় গুণের খবর রাখে কেন? তাই হযরত (দঃ) আন্দর মহলে তাহার প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

স্ত্রী স্বামীর নিকট বেগানা নারীর গুণাবলী বর্ণনা করিবে না

২০৭০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলা অপর মহিলার সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া আসিয়া স্বীয় স্বামীর নিকট উক্ত মহিলার ছবি-ছুরত ও আকৃতির গুণাবলী এইরূপে বর্ণনা করিবে না যেন তাহাকে স্বামীর চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে। (ইহার দ্বারা স্বামী ঐ মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে যাহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে।)

বিদেশ হইতে বিনা খবরে হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট পৌঁছিবে না

২০৭১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পুরুষের জন্য এরূপ করা না পছন্দ করিতেন যে, বিদেশ হইতে হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়।

২০৭২। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ বেশী দিন বিদেশে থাকার পর হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইবে না। (ইহাতে স্ত্রীকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পারে যাহাতে তাহার প্রতি ঘৃনা আসিয়া যায় বা স্ত্রীর অসতর্কতা বশে সন্দেহের সূচনা হইয়া ভয়াবহ পরিণামের সৃষ্টি হইতে পারে।)

২০৭৩। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—তুমি যদি রাত্রে বাড়ী পৌঁছ তবে তৎক্ষনাৎ স্ত্রীর নিকট চলিয়া যাইও না। যাবৎ না সে ক্ষৌর ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন হয় এবং মাথা আঁচড়াইয়া কেশ পরি পাটী করিয়া নেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তোমার কর্ত্তব্য, জ্ঞান ও সতর্কতার পরিচয় দেওয়া

তালাকের বয়ান

তালাক দেওয়ার সঠিক নিয়ম ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

"হে নবী! আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমরা স্ত্রীগণকে যখন তালাক দিবে তখন ইদ্দৎ গণনার সময় (তথা হায়েজ বা ঋতু)কে সম্মুখে রাখিয়া তালাক দিও এবং (তিন হায়েজ) ইদ্দৎ বিশেষ সতর্কতার সহিত গণনা করিয়া পুর্ণ করিও।"
(২৮ পারা, ছুরা তালাক)

তালাক দেওয়ার সঠিক নিয়ম হইল—ঋতুর পর সহবাস না করিয়া পরবর্তী ঋতুর পূর্ব্বে—পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে এবং দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তালাক দিবে।

২০৭৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়া ছিলেন। ওমর (রাঃ) সে সম্পর্কে হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) পরামর্শ দিলেন যে, আবদুল্লাহকে বল, সে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া লউক। অতঃপর স্ত্রী হায়েজ আসার পর পাক পবিত্র হইলে—তখন ইচ্ছা করিলে

স্ত্রীকে রাখিয়া দিবে, আর ইচ্ছা করিলে তালাক দিবে, কিন্তু তখন সহবাস না করিয়া তালাক দিতে হইবে।

পবিত্র কোরআনে যে, বলা হইয়াছে—"ইদ্দতের সময় সম্মুখে রাখিয়া তালাক দিবে" উহার মর্ম্ম ইহাই।

হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তাহা অবশ্যই তালাক গণ্য হইবে

২০৭৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর আমার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়া ছিলাম। (আমার পিতা) ওমর(রাঃ) সে সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আলোচনা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আবদুল্লাকে বল, সে তাহার স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া লউক।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই বিবৃতি বর্ণনাকারী ব্যক্তি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কি তালাক গণ্য হইয়াছে? তিনি বলিলেন, তালাক গণ্য না হইয়া উপায় কি আছে? ইবনে ওমর যদি নিয়ম মোতাবেক তালাক দেওয়ার সুবুদ্ধি লাভে অক্ষম ও বঞ্চিত থাকিয়া থাকে সে জন্য কি প্রদত্ত তালাক গণ্য হইবে না? আমি যেরূপ তালাক দিয়াছিলাম সেই অনুসারে এক তালাক অবশ্যই গণ্য হইয়াছিল।

অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্যগত করার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাকে তালাক দেওয়া যায়

২০৭৬। হাদীছ ঃ— আবু ওসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক স্থানে দুইটি বাগান ছিল, আমরা সেই বাগান দুইটির মধ্যস্থলে যাইয়া বিশ্রাম নিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা এখানে বসিয়া থাক—এই বলিয়া হযরত (দঃ) বাগানস্থ একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। "জওনিয়া" নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে হযরতের পরিণয় হইয়াছিল। সেই মহিলাকে ঐ গৃহে উপস্থিত করা হইল। গৃহভ্যন্তরে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) তাহাকে আহ্বান করিলে সে (অবাধ্যতার উক্তি করিল, এমনকি সে) বলিল, বাদশাজাদী একজন সাধারণ লোকের স্ত্রী হইবে কেন? এতদসত্ত্বেও হযরত (দঃ) তাহার উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বলিয়া ফেলিল, "আমি আপনার হইতে আল্লার আশ্রয় চাই।" তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি মহান আশ্রয়স্থলের আশ্রয় নিয়াছ; (তুমি আমার হইতে মুক্ত—) তুমি তোমার পরিবারে চলিয়া যাও। হযরত (দঃ) গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া আবু

ওসাইদ (রাঃ)কে বলিলেন, তাহাকে এক জোড়া কাপড় দিয়া দাও এবং তাহাকে তাহার পরিবারের লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আস।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত মহিলাটির ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিল। সে সর্দারে-দুজাহানের পরিণয়ী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তাহা হারাইয়া ফেলিল। পরবর্ত্তী কালে সে সারা জীবন সেই হারানিধির অনুতাপেই কাটাইয়াছে। সারা জীবন সে নিজকে "কপাল পোড়া" বলিয়া আখ্যায়িত করিত।

তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রমান

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে সে ক্ষেত্রে তিন তালাক গণ্য না হওয়া সম্পর্কে অসমর্থিত মতবাদ বিদ্যমান থাকায় ইমাম বোখারী (রঃ) কোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রমাণিত করার জন্য এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত ও তিনটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

"(পূর্ব্ব বর্ণিত তালাক—যে তালাক সম্পর্কে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার স্বামীকে প্রদান করা হইয়াছে—) সেই তালাক দুই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। (দুই তালাক দেওয়ার পর স্বামীর অধিকার থাকে যে, পুনঃ গ্রহণ করতঃ) স্ত্রীকে সুষ্ঠুভাবে রাখিয়াও নিতে পারে কিম্বা পুনঃ গ্রহণ না করিয়া সদ্ব্যবহারে পরিত্যাগও করিতে পারে।" (২ পাঃ ১৩ রুঃ)

এস্থলে ইমাম বোখারীর বক্তব্য এই যে, তালাকের দুই সংখ্যা যখন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তখন তিন সংখ্যাও নিশ্চয় প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে ; কেননা শরীয়তের বিধানে তালাকের সংখ্যা তিন পর্য্যন্ত রাখা আছে। অবশ্য তিনের উপর কোন সংখ্যা তালাকের বিধানে নাই বলিয়া তিনের উপরের কোন সংখ্যা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, কিন্তু তিনের সংখ্যা ত বিধানের মধ্যে রহিয়াছে তবে উহা প্রবর্ত্তিত হইবে না কেন ? এতদ্ভিন্ন পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে দুই তালাক বর্ণিত হওয়ার পর তৃতীয় তালাকের এবং উহার পরিণাম ফলের বর্ণনাও রহিয়াছে ঃ—

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

"দুই এবং উপর আরও তালাক দেওয়া হইলে অন্য স্বামীর ঘর করা ভিন্ন তালাকদাতা স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী পুনঃ হালাল হইবে না।"

এই দৃষ্টিতেও ইমাম বোখারীর বক্তব্য এই যে, দুই-এর পর তৃতীয় তালাক দিলে যখন তিন তালাক এবং উহার পরিণাম ফল প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধারিত, তবে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন সংখ্যা প্রবর্ত্তিত হইবে না কেন ? অথচ একের পরে দ্বিতীয় তালাক দিলে যেরূপ দুই তালাক প্রবর্ত্তিত হয় তদ্রূপ এক সঙ্গে দুই তালাক দিলেও দুই সংখ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২০৭৭। হাদীছ ঃ—ওয়ায়মের (রাঃ) নামক ছাহাবী (স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি) আছেম (রাঃ) নামক ছাহাবীকে বলিলেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে কোন বেগানা পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে পাইলে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিতে পারে কি এবং সেই হত্যার অপরাধে কি হত্যাকারীকে প্রানদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে ? নতুবা সে তখন কি করিবে ? এই বিষয়টা তুমি আমার জন্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিও। সে মতে আছেম (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে ঐ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন।

আছেম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জিজ্ঞাসায় যেহেতু বাস্তব নির্দ্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ ছিল না, (বরং সাম্ভাব্য ও কাল্পনিকরূপে রূপায়িত প্রশ্ন ছিল, যেরূপ প্রশ্ন মুরব্বিকে করা বিশেষতঃ শরীয়তের মছআলা সম্পর্কে মোটেই শোভণীয় নহে) তাই হযরত (দঃ) তাহার প্রশ্নকে না-পছন্দ করিলেন এবং অশোভণীয় আখ্যায়িত করিলেন। আছেম (রাঃ) ইহাতে (ওয়ায়মের (রাঃ)-এর প্রতি) মনক্ষুন্ন হইলেন (যে, তাহার কথায় তিনি এমন কাজ করিলেন যাহা হযরত(দঃ) না-পছন্দ করিয়াছেন।

আছেম (রাঃ) বাড়ী ফিরিলে পর ওয়ায়মের (রাঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) কি বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে আছেম (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে ভাল কাজ দেন নাই। আপনার প্রশ্নকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম না-পছন্দ ও অশোভণীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ওয়ায়মের (রাঃ) বলিলেন, আমার পক্ষে উহা বাস্তব ঘটনা, অতএব আমি ক্ষান্ত হইব না, আমি নিজেই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিব।

সে মতে ওয়ায়মের (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) তখন জনগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। ওয়ায়মের (রাঃ) হযরত (দঃ)কে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তোমার এবং তোমার স্ত্রী সম্পর্কীয় বিধান সম্বলিত কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে ; তোমার স্ত্রীকে নিয়া আস। অতঃপর তাহারা উভয়ে পরস্পর "লেয়ান" করিল। "লেয়ান" শেষে স্বামী ওয়ায়মের বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ !

এই স্ত্রীর উপর আমি যে অপরাধের দাবী করিয়াছি উহার পর যদি আমি তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখি তবে বস্তুতঃ আমি আমার দাবীতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষ হইতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দিল।

ব্যাখ্যা ঃ—কাহারও উপর জেনার অপরাধ প্রমাণিত করিতে চার জন প্রত্যক্ষ্যদর্শী না জুটিলে সে স্থলে যাহারা জেনার তোহমত লাগাইয়াছে তাহাদের উপর "হদ্দে-কজফ্" বা আশিটি বেত্রদণ্ডের বিধান শরীয়তে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর প্রতি ঐরূপ অভিযোগ করিলে সাক্ষী জোটাইতে না পারিলে সে স্থলে শরীয়ত লেয়ানের বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে। লেয়ানের বিবরণ সম্মুখে আসিবে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা এস্থলে দেখান হইয়াছে যে, ওয়ায়মের নামক ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়ার রীতি সেই যুগেও ছিল, অধিকন্তু হযরত (দঃ)ও কোন বাধা দেন নাই।

২০৭৮। ছাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ছিল, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঐ রমণীটির বিবাহ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। তখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ রমণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, প্রথম স্বামীর সঙ্গে তাহার বিবাহ জায়েয হইবে কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—যাবৎ না দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস হয় যেমন প্রথম স্বামীর সঙ্গে হইয়াছিল।

২০৭৯। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রেফাআ'হ্ (রাঃ) নামক ব্যক্তির স্ত্রী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া প্রকাশ করিল, আমার স্বামী রেফাআ'হ্ আমাকে তালাক দিয়াছেন এবং চূড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্নকারী তালাক তথা তালাকের সর্ব্ব শেষ সীমা তিন সংখ্যার শেষ তৃতীয় তালাক প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, সে পূরুষত্বহীন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মনে হয়—তুমি প্রথম স্বামীর নিকট পুনঃ যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না যাবৎ না দ্বিতীয় (কোন) স্বামীর সহিত পরস্পর একে অন্যের স্বাদ উপভোগ কর।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে রাখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে, এই ঘটনায় তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল না, ভিন্ন ভিন্নরূপে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছিল।

পাঠক বর্গ ! উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের দ্বারা একটি বিশেষ মছআলাহ প্রমাণিত হয় এবং উহা সম্পর্কে সকল ইমামগণও এক মত। মছআলাহটি ইমাম বোখারী (রঃ)ও

৮০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিন তালাক প্রদানকারী স্বামী ঐ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে না—যাবৎ না তালাকের ইদ্দতের পর উক্ত স্ত্রীর বিবাহ অপর ব্যক্তির সহিত হয় এবং সে তাহার সঙ্গে সহবাস করে অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী হইতে তালাক পাইয়া এই তালাকেরও ইদ্দত অতিক্রম করে। দ্বিতীয় স্বামীর সহিত শুধু বিবাহের আক্‌দ যথেষ্ট নহে, সহবাস অনুষ্ঠিত হইতে হইবে এবং উভয় বিবাহ প্রত্যেকের তালাকের ইদ্দৎ পূর্ণ হওয়ার পর হইতে হইবে।

২০৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিয়া ছিলেন। (যেহেতু হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ তাই) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনঃ গ্রহণের আদেশ দিয়া ছিলেন। (এই ঘটনার বিবরণ ১৮৪৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।) অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান সম্পর্কে কেহ মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ—

لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهٰذَا -
وَلَوْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ -

"যদি তুমি (হায়েজ অবস্থায়ও স্ত্রীকে) এক বা দুই তালাক দিয়া থাক তবে (তোমার পক্ষেও ঐ কথা যে,) নবী (দঃ) আমাকে উক্ত আদেশ করিয়াছিলেন, (এক স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া নিতে হইবে।) আর যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া থাক তবে সেই স্ত্রী তোমার পক্ষে হারাম হইয়া যাইবে (—তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে না) যাবৎ না সে তুমি ভিন্ন অন্য স্বামীর ঘর করিয়া আসে।" (৮০৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীছটি আলোচ্য মছআলাহ সম্পর্কে অতিশয় সুস্পষ্ট। এতদ্ভিন্ন এই মছআলাহ সম্পর্কীয় একটি বড় বিভ্রান্তি খণ্ডনকারী। এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে সকলেই অতি জঘন্য ও নিষিদ্ধ গণ্য করিয়া থাকে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও এই কার্য্যকে কোরআন নিয়া খেলা করার অপরাধরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উহার প্রতি অতিশয় রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। এক দল লোক এই বাস্তব সত্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, একত্রে তিন তালাক যখন নিষিদ্ধ তবে উহা প্রবর্ত্তিত হইবে কেন? উল্লেখিত হাদীছটির মধ্যে নিষিদ্ধ তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রকৃষ্ট নমুনা ও প্রমাণ রহিয়াছে। হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া সর্ব্ব সম্মতরূপে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে হযরত

রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তালাককে তালাক গণ্য করিয়াছেন। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল আপনি যে, স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়া ছিলেন সেই তালাক কি তালাক গণ্য হইয়াছিল ? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—أَرَأَيْتَهُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ—বল ত দেখি! আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সুষ্ঠু পথ অবলম্বনে অক্ষম হইলে এবং বোকামি করিলে তাহাতে তালাক বাধা প্রাপ্ত হইবে কেন ?

সুতরাং এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হইবে। হাঁ—ঐরূপ তালাকদাতা নিষিদ্ধ কাজ করিয়াছে তদ্দরুণ তাহার গোনাহ হইবে এবং উহা প্রতিরোধের জন্য তাহাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতে পারে।

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মুখে তিন তালাক প্রদানকারী লোককে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহার পিঠে বেত্রাঘাত করিতেন। (ফত্‌হুলবারী ৯—৩১৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হওয়া—ইহাই পূর্ব্বাপর সকল ইমানগণের স্থির সিদ্ধান্ত। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ সকল ইমামগণ একমত যে, ভিন্ন ভিন্ন বা এক সঙ্গে—যে ভাবেই তিন তালাক দিবে তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং সেস্থলে তিন তালাক সম্পর্কীয় কোরআনের বিধান প্রযোজ্য হইবে যে, তালাকদাতা স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে না। অবশ্য যদি তাহার বিবাহ অন্য পুরুষের সঙ্গে হয় এবং সেই দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর তাহার হইতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় সে অবস্থায় প্রথম স্বামীর সঙ্গে তাহার পুনঃ বিবাহ হইতে পারে। বিশিষ্ট ইমামগণের পর উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মতামতও দেখা দিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সমর্থনহীন এবং অতি ক্ষুদ্র একটি লা-মজহাবী উপদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় আখেরী যমানার ধর্ম্মীয় বিপর্য্যয়ের স্রোতে ঐ দুর্ব্বল মতামতও ভাসিয়া আসিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সুলভ হওয়ায় উহাও এক শ্রেণীর লোকের সহায়তপুষ্ট হইয়া বহু মুখের চর্চ্চার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ বিচক্ষণ মনীষীগণের অনেকে এই দুঃখজনক অবস্থা উদ্ভবের আশঙ্কা করতঃ পূর্ব্বাহ্নেই উহার বিরুদ্ধে কোরআন-হাদীছের দলীল প্রমাণাদি সমাজের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদীছ ভিন্ন এ সম্পর্কে আরও হাদীছ বিদ্যমান আছে।

নাছায়ী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—"একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ পাইলেন যে, সে তাহার স্ত্রীকে

একত্রে তিন তালাক দিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে হযরত (দঃ) রাগান্বিত অবস্থায় লোক সমাবেশে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকাবস্থায়ই কোরআনের বিধান নিয়া খেলা করা হয় ? এমনকি (হযরতের রাগ ও অসন্তুষ্টি দৃষ্টে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে) এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! ঐ তালাক দাতাকে খুন করিয়া ফেলিব কি ?

ব্যাখ্যা ঃ—এস্থলে একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, একত্রে তিন তালাক যদি শুধু এক তালাক গণ্য হইত, তবে এখানে হযরতের ঐরূপ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কোন কারণই ছিল না ; এক তালাক দেওয়ার কোন ঘটনায় হযরত (দঃ) ঐরূপ রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কোথাও দেখা যায় না।

কোরআনের বিধান নিয়া খেলা করার অর্থ এই যে, পবিত্র কোরআন আইন ও বিধানরূপে একটা অধিকার দিয়াছে ; সেই অধিকারের ভয়াবহ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং উহার প্রতি লক্ষ্য করার যে সুযোগ রহিয়াছে তথা একত্রে তিন তালাক শেষ না করা—সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া অহেতুক উক্ত অধিকার প্রয়োগ করা। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার জন্য তিন তালাক দিয়া ফেলার কোন আবশ্যকই হয় না, সুতরাং একত্রে তিন তালাক দেওয়া কোরআনের বিধানে প্রাপ্ত অধিকার অনাবশ্যকে প্রয়োগ করাই সাব্যস্ত হয় যাহা কোরআন নিয়া খেলা করারই নামান্তর। কিন্তু খেলা করতঃ কাহারও উপর আঘাত করিলে সেই আঘাতের পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রবর্তিত হয় এবং সেই জন্যই ঐরূপ খেলা রাগ ও অসন্তুষ্টির করাণ হইয়া থাকে। আলোচ্য ঘটনায় রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকৃত বিষয়কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ), মুগিরা (রাঃ) এমরান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করিয়াছেন এবং তদ্রূপ ফতোয়া জারি করিয়াছেন।

আবু দাউদ শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া বলিল, এ নরাধম স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাগতঃ কিছু সময় চুপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা বোকামির কাজ করিয়া তারপর আসিয়া ইবনে আব্বাস—ইবনে আব্বাস বলিয়া চিৎকার করিবে! আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিয়া কাজ করিবে আল্লাহ তাহার বিপদ মুক্তির পথ

খুলিয়া দিবেন” তুমি আল্লার ভয় রাখিয়া কাজ কর নাই। তাই তোমার বিপদ মুক্তির কোন সুযোগই আমি পাইতেছি না। তুমি আল্লার নাফরমানী করিয়াছ, তোমার স্ত্রী তোমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

মোয়াত্তা-ইমাম মালেকের মধ্যেও একখানা হাদীছ আছে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে (ব্যবহার করার পূর্ব্বেই) তিন তালাক দিয়া ছিল অতঃপর সে ঐ স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করার ইচ্ছা করিল। সেমতে সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবু হোরয়রা (রাঃ)কে ঐ সম্পর্কে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উভয়েই তাহাকে বলিলেন— لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

“তুমি ভিন্ন অন্য স্বামীর ঘর করা ব্যতিরেকে তোমার জন্য ঐ স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করার কোন পথই আমরা দেখি না।” ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ত তাহাকে শুধু এক তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া ছিলাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন— أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ “একের অধিক যাহা তোমার অধিকারে ছিল তাহাও তুমি হাত হইতে ছাড়িয়া দিয়াছ।”

পাঠক বর্গ! ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্ত্তৃক সুস্পষ্টরূপে পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা এবং দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বে পুনঃ গ্রহণ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষনা করা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ, বিপক্ষ দল শুধু মাত্র দুইটি হাদীছ দ্বারা তাহাদের দাবী প্রমাণ করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম নম্বরেই হইল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ যাহা মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে এবং (প্রথম খলীফা) আবু বকরের সময়ে এবং (দ্বিতীয় খলীফা) ওমরের শাসন কালের প্রথম দুই (বা তিন) বৎসর পর্য্যন্ত তিন তালাক এক তালাক গণ্য হইত। অতঃপর ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিলেন যে, একটি কাজ যাহাতে লোকদের ভাবনা-চিন্তা ধীর-স্থিরতা অবলম্বন কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহারা (তাহা না করিয়া প্রাপ্ত অধিকার) দ্রুত শেষ করিয়া ফেলিতে অভ্যস্ত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং তাহাদের নিয়্যতের অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের কথাকে (তাহাদের সাধারণ অভ্যাস ও ইচ্ছার গতি অনুযায়ী) বাস্তবায়িত করাই শ্রেয়; সেমতে তিনি তাহাই করিলেন।

হাদীছটি মোছলেম শরীফের অপর রেওয়ায়েতে অপেক্ষাকৃত খোলাসারূপে বর্ণিত হইয়াছে—আবুছ্ ছাহবা নামক এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিল, আপনার সেই বিস্ময়কর কথাটা শুনান ত! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লামের সময়ে এবং খলীফা আবু বকরের সময়ে তিন তালাক এক তালাক গণ্য হইত নাকি? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন—তাহা হইত, কিন্তু খলীফা ওমরের সময়ে যখন জন-সাধারণ তালাকের আধিক্যে লিপ্ত ও অভ্যস্ত হইল তখন ওমর (রাঃ) তাহাদের উপর তিন তালাককে পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

পাঠক বর্গ! লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লেখিত হাদীছ খানার তাৎপর্য্য ব্যাপকরূপে তথা সকল প্রকার তিন তালাক সম্পর্কে কেহই গ্রহণ করে নাই, এমনকি বিপক্ষ দলও তাহা করিতে পারে না। নতুবা বলিতে হইবে যে, সব রকম তিন তালাকই রসুলুল্লার যমানায় এক তালাক গণ্য হইত। অথচ এইরূপ দাবী সত্য ও সম্ভাব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিলে সে স্থলে যে, তিন তালাক প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত মছআলাহ, এমমকি বিপক্ষ দলও ইহাই বলিয়া থাকে; অন্যথায় কোরআনে বিঘোষিত সুস্পষ্ট বিধানকে রক্ষা করার কোন উপায়ই তাহাদের হাতে থাকে না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লমের সময়েও এই ধরণের তিন তালাকের ঘটনা ঘটিয়া ছিল। হযরত (দঃ) বিশেষ কঠোরতার সহিত সেই তিন তালাকের পরিণাম ভোগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ উপভোগ করা ব্যতিরেকে প্রথম স্বামীর সহিত পুনঃ বিবাহ হইতে পারিবে না—যেমন ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ নং হাদীছের ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ মোছলেম শরীফে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এই হাদীছ খানার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এক বৈঠকে একই সঙ্গে তালাক প্রয়োগের শব্দ একাধারে তিন বার উচ্চারণ করার ব্যাপার। যেমন, কেহ তাহার স্ত্রীকে একাধারে বলিল, তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক। এই ধরণের বাক্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবেই দুই রকম হইতে পারে। এক হইল প্রত্যেকটি শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন তালাক প্রয়োগ উদ্দেশ্য করা যাহাকে আরবী পরিভাষায় تاسیس - তাসীস্ "প্রতিটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য গ্রহণ" বলা হয়। আর এক তাৎপর্য্য ইহাও হইতে পারে যে, প্রথম শব্দের দ্বারা তালাক প্রয়োগ করা এবং পরবর্ত্তী দুইটি শব্দ উহারই পুনঃরুক্তি মাত্র, যাহাকে আরবী পরিভাষায় "تاكيد—তাকীদ বলা হয়, অর্থাৎ একটি বাক্য উচ্চারণ করতঃ উহার উদ্দেশ্যকে জোরদার করার জন্য এবং উহার উপর স্বীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিবার জন্য ঐ বাক্যটিরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা—এই পুনঃ উচ্চারণের দ্বারা ভিন্ন অর্থ প্রয়োগ উদ্দেশ্য না করা।

এই দুই প্রকার তাৎপর্য্য সূত্রে উল্লেখিত রকমের তালাক-বাক্যের দ্বারা তালাকের সংখ্যাও দুই প্রকার হইবে। প্রথম তাৎপর্য্য হিসাবে তিন তালাক হইবে এবং

দ্বিতীয় তাৎপর্য্য হিসাবে এক তালাক হইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর তালাক প্রয়োগের জন্য তাহাকে "তোমার প্রতি তালাক" এক বারই বলিয়াছে। পরবর্ত্তী দুই বারের উচ্চারণ শুধু মাত্র স্বীয় কথার পুনরুক্তি। অবশ্য এই তাৎপর্য্য শুধু মাত্র এক বৈঠকে একাধারে উচ্চারিত বাক্যবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হযরতের যুগে এবং উহার সংলগ্ন সময় পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে খোদা ভীরুতা অত্যধিক ছিল এবং হেরফের করা তথা স্বীয় আভ্যন্তরীণ নিয়্যত ও উদ্দেশ্য গোপন বস্তু হইলেও উহাকে বিকৃতরূপে প্রকাশ করার অভ্যাস তাহাদের মোটেই ছিল না। সুতরাং ঐ যমানায় যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে এইরূপ বলিত যে, তোমার প্রতি তালাক তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক তবে সাধারণতঃ এই বাক্যের দ্বিতীয় তাৎপর্য গ্রহণ করতঃ ইহাকে এক তালাক গণ্য করা হইত। কারণ, তালাক প্রদান কার্য্য শরীয়ত বিরোধীরূপে হঠাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক না দিয়া এক তালাক প্রদান করাই খোদা ভীরুতার পরিচয়। অধিকন্তু সেই যমানার লোকগণ এইরূপ আস্থার পাত্র ছিল যে, উল্লেখিত বাক্য উচ্চারণ কালে উহার প্রথম তাৎপর্য্য উদ্দেশ্য থাকিলে সে তাহার সেই নিয়্যত ও উদ্দেশ্যকে অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবে। সুতরাং সাধারণ ভাবে উক্ত বাক্যের দ্বিতীয় তাৎপর্য্য অনুযায়ীই ফৎওয়া দেওয়া হইত।

পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী যমানায় লোকদের নৈতিকতায় দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হইলে পর দেখা গেল সাধারণতঃ লোকগণ তালাক প্রদানে খোদা ভীরুতার পরিচয় না দিয়া উপস্থিত ঝোঁকের প্রবাহে স্বীয় অধিকার ও ক্ষমতার সবটুকু দ্রুত শেষ করিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় উল্লেখিত বাক্যের প্রথম তাৎপর্য্য লোকদের সাধারণ হাভ-ভাব ও মতি-গতির উপযোগী। তাই খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলের মধ্যভাগে হালাল-হারামের ব্যাপারে সতর্কতার পন্থা গ্রহণ করতঃ ঐরূপ বাক্যকে উহার প্রথম তাৎপর্য্যের উপর স্থাপন করিয়া তিন তালাক নির্দ্ধারিত করা হয় এবং উপস্থিত সকল ছাহাবীগণ উহাতে একমত্ থাকেন, কাহারও মতানৈক্য ঘটে নাই। মোছলেম শরীফে বর্ণিত হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই গবেষণা মূলক তথ্যটিই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সার কথা এই যে—ভিন্ন ভিন্নরূপে তিন বারে তিন তালাক দেওয়া হইলে অবশ্যই তিন তালাক গণ্য হইবে, ইহা সর্ব্ব সম্মত মছআলাহ। অতএব এই শ্রেণীর তিন তালাক মোছলেম শরীফের উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্যভুক্ত নহে। তদ্রূপ তিনের সংখ্যা উল্লেখ করতঃ তিন তালাক দেওয়া হইলেও অবশ্যই তিন তালাক গণ্য হইবে, কারণ সে স্থলে ভিন্ন রকমের তাৎপর্য্যের কোন অবকাশই নাই। এই শ্রেণীর তালাক সম্পর্কে সর্ব্ব সম্মতরূপে ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ মোছলেম শরীফের আলোচ্য

হাদীছ বর্ণনাকারী আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত ও সুদৃঢ় ফতোয়া ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিন তালাক গণ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং ইহাও মোছলেম শরীফের উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্যভুক্ত হইতে পারে না। ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অভিমত যদি এই হইত যে, রস্থলুল্লার যমানায় ইহা এক তালাক গণ্য ছিল তবে স্বয়ং আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস উহার বিরুদ্ধে সারা জীবন তিন তালাকের ফতোয়া ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত কিরূপে দিতে পারেন? হাঁ—"তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক, তোমার প্রতি তালাক"—সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া একাধারে তালাকের উচ্চারণ তিন বার করা হইলে সেস্থলে দুই প্রকার তাৎপর্য্য সূত্রে দুই রকম সংখ্যার অবকাশ থাকায় যমানার লোকদের সাধারণ মতি-গতি অনুপাতে সংখ্যা নির্দ্ধারণে যে বিভিন্নতা হইয়াছে মোছলেম শরীফের আলোচ্য হাদীছে আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একমাত্র তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে লোকদের নৈতিকতার উচ্চমান দৃষ্টে একটি বাক্যের এক প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণীয় ছিল। খলীফা ওমরের যমানায় সেই নৈতিকতায় দুর্ব্বলতার সূচনা দৃষ্টে খলীফা ওমরের ন্যায় ব্যক্তি কর্তৃক ছাহাবীগণের পূর্ণ সমর্থনের সহিত উক্ত বাক্যের অপর তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের ঘোষনা প্রদত্ত হওয়ার পর, পরবর্ত্তী নৈতিকতার বিপর্য্যয়ের যুগে বিশেষতঃ বর্ত্তমান নৈতিকতা বিলুপ্তির যুগে কোন্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহা সুবুদ্ধির দ্বারাই ঠিক করা যাইতে পারে, তর্কের আবশ্যক হয় না।

এক শ্রেণীর লোক যে, উল্লেখিত দুই তাৎপর্য্য বহনকারী বাক্যের সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে তিন সংখ্যার উল্লেখ সম্বলিত বাক্য যেমন, "তোমাকে তিন তালাক দিলাম বা তোমার প্রতি তিন তালাক"—ইহাকেও জুড়িয়া দিয়া দাবী করিতে চায় যে, হযরত রস্থলুল্লার যমানায় ইহাও এক তালাক গণ্য হইত এবং ইহাও মোছলেম শরীফের আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্যভুক্ত এই দাবী নিছক বাতুলতা।

বিপক্ষ দলের শেষ দলীল হইল রুকানা বা আবু রুকানা (রাঃ) নামক ছাহাবীর হাদীছ—তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া ছিলেন। হযরত (দঃ) উহাকে এক তালাক সাব্যস্ত করতঃ স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়া ছিলেন।

এই দলীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর বিপক্ষ দলের কারসাজির দ্বারাই ধরা পড়ে। এই হাদীছ খানা ছেহাহ্-ছেত্তার একাধিক কেতাবে বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ আবু দাউদ শরীফে বিস্তারিত বিবরণ ও গবেষনা মূলক তথ্যাদির সহিত উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বিপক্ষ দলকে দেখা যায়, তাহারা সর্ব্বদা এই হাদীছ খানাকে অন্যান্য কেতাব সমূহ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আবু দাউদ শরীফে

মুল ঘটনার সার্ব্বিক তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করতঃ স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রুকানা বা আবু রুকানা বস্তুতঃ তাহার স্ত্রীকে তিন সংখ্যা উল্লেখ করতঃ তিন তালাক দিয়া ছিল না, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাহার স্ত্রীকে আরবী ভাষায় "বাত্তাহ" শব্দের তালাক দিয়া ছিল। "বাত্তাহ" শব্দের অর্থ ছিন্নকারী। এ সম্পর্কে শরীয়তের সাধারণ বিধান এই যে, এই শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান করা হইলে সে স্থলে তিন তালাকও হইতে পারে, কারণ তিন তালাক দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যায় এবং এক তালাক-বায়েনও হইতে পারে ; বাইন তালাক দ্বারাও বিবাহ অবশ্যই ছিন্ন হইয়া যায়—পুনরায় নূতন ভাবে বিবাহ করা ব্যাতিরেকে ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা যায় না। এই দুই রকম তালাকের একটিকে তালাকদাতার নিয়্যত দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হইবে—ইহা শরীয়তের প্রচলিত সাধারণ বিধান।

ঘটনার প্রকৃতরূপ যে ইহা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ হইল তিরমিজী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এই ঘটনার হাদীছে উল্লেখ আছে যে, "রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে বাত্তাহ তালাক দেওয়ার পর হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। হযরত (দঃ) তাহাকে তাহার নিয়্যত জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমার নিয়্যত এক তালাক ছিল। তাহার এই নিয়্যতের দাবীর উপর হযরত (দঃ) তাহাকে কসম দিলেন। সে কসম করিয়া বলিল যে, আমার উদ্দেশ্য উহাই ছিল।

আবু দাউদ শরীফে মূল ঘটনার আসল রূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু ইমাম আবু দাউদ (রঃ) সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন যে, সত্য বলিতে রুকানা তাহার স্ত্রীকে একমাত্র তালাকে-বাত্তাহ্ দিয়া ছিল। এই কারণে বিপক্ষ দল এই হাদীছ খানার হাওয়ালা বা বরাত দানে এমন এমন কেতাবের প্রতি ছুটাছুটি করিয়া থাকে যে সব কেতাবে মূল ঘটনার আসলরূপ প্রকাশিত নাই, বরং কোন বর্ণনাকারী হয়ত তালাকে-বাত্তার এক অর্থ তিন তালাক হওয়া সূত্রে তালাকে-বাত্তার স্থলে তিন তালাক উল্লেখ করিয়াছে। বিপক্ষ দল ঐ শ্রেণীর রেওয়ায়েতের তালাশে ব্যস্ত থাকে এবং যে-সে কেতাব হইতে উহা উদ্ধার করে। ঘটনার আসলরূপ যাহা সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ ছেহাহ-ছেত্তার কেতাব আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে উহাকে এড়াইয়া চলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— বিপক্ষ দলের সর্ব্বময় পুঁজি স্বরূপ যে দুই খানা হাদীছ তাহারা তাহাদের দাবীর প্রমাণরূপে পেশ করিয়া থাকে ঐ হাদীছ দুই খানার সঠিক তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম বৃত্তান্তের আলোচনায় দেখা গেল, উহার দ্বারা বিপক্ষ দলের দাবী প্রমাণিত হয় না। এতদ্ভিন্ন উক্ত হাদীছদ্বয়ের ছনদের মধ্যে হাদীছ শাস্ত্রীয় বিধানের যে সব বাধা বিপত্তি পরিলক্ষিত হয় ঐ শ্রেণীর বাধা বিপত্তির আমল দেওয়া

না হইলে "দারেকুৎনী" নামক কেতাবের একখানা হাদীছ পেশ করা যায়, যদ্দারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে তিন তালাক তিন তালাকই গণ্য হয়।

হাদীছ খানা এই—ইমাম হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আয়েশা নাম্নী এক স্ত্রী ছিল। আলী (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হাসান (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া উপলক্ষে তাঁহার ঐ স্ত্রী তাঁহাকে মোবারকবাদ জানাইলেন। ইমাম হাসান রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, (পিতা) আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছেন আর তুমি উল্লাস প্রকাশ করিতেছে ? তোমার প্রতি তিন তালাক। তালাকের ইদ্দৎ শেষ হইলে পর ইমাম হাসান ঐ স্ত্রীর প্রাপ্ত মহর ইত্যাদি বাবদ দশ সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। তখন সে বলিল, প্রিয় স্বামীর বিচ্ছেদের বিনিময়ে এই অর্থ নেহাত তুচ্ছ। এতচ্ছ্রবণে ইমাম হাসানের চোখে অশ্রু আসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন তিন তালাক দিলে দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করা ব্যতিরেকে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা হালাল হইবে না।" এই কথা আমার নানার মুখে আমি না শুনিয়া থাকিলে নিশ্চয় আমি এই স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতাম।

মুখে উচ্চারণ ব্যতিরেকে শুধু মনে মনে স্থির করায় তালাক হইবে না

২০৮১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা করিয়া-দিয়াছেন যাহা তাহাদের শুধু কল্পনায় আসে—যাবৎ না উহাকে কার্য্যে পরিণত করে বা মুখে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ ক্রিয়া পর্য্যায়ের বস্তু কার্য্যে পরিণত না করা পর্য্যন্ত এবং বাচনিক পর্য্যায়ের বস্তু মুখে উচ্চারণ না করা পর্য্যন্ত শুধু কল্পনার দরুন উহার গোনাহ লিখিত হইবে না এবং উহার বিধানগত ফল বা ক্রিয়াও হইবে না। সে মতে কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, মনে মনে তালাকের কল্পনা স্থির করিলে শুধু উহাতে তালাক হইবে না।

● তবে কোন গোনাহের কাজের বা কথার পরিকল্পনা মনে মনে ইচ্ছাকৃত করা বা ঐরূপ কল্পনাকে অন্তরে স্থান দেওয়া তাহা গোনাহের কাজ ; সেই গোনাহ হইবে। অবশ্য কল্পনাকে ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি না করিলে এবং উহাকে অন্তরে স্থান দিয়া না রাখিলে—শুধু বুদবুদ শ্রেণীর কল্পনার উৎপত্তিতে গোনাহ হইবে না।

তদ্রূপ কল্পনা নিজে সৃষ্টি করিয়া, বরং উহাকে বাস্তবায়িত করায় উদ্যত হইয়াও যদি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে উহার বাস্তবায়ন পরিত্যাগ করে তবে ঐ কল্পনা করার এবং ইচ্ছা করার গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, পাগল এবং বেহোশ ব্যক্তির তালাক দানে তালাক হইবে না। (তবে মাদক সেবনে জ্ঞানহারা হইয়া তালাক দিলে সেক্ষেত্রে হানফী মজহাব মতে তালাক হইবে। প্রাণের ভয় দেখাইয়া তালাক দানের বাক্য উচ্চারন করাইলে সে ক্ষেত্রেও হানফী মজহাব মতে তালাক হইবে।) ইচ্ছাহীন ভাবে ভুল করিয়া স্ত্রীর প্রতি তালাক দানের বাক্য মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে তালাক হইবে।

মছআলাহ – যদি স্ত্রীকে বলা হয়, (فارقتك) "তোমাকে ভিন্ন করিয়া দিলাম" কিম্বা বলা হয়, سرحتك "তোমাকে চলিয়া যাইতে দিলাম" এই শ্রেণীর বাক্যে তালাক উদ্দেশ্য হইতে পারে। অতএব "তালাক" শব্দ ব্যবহার না করিয়াও তালাক উদ্দেশ্যে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে বাইন তালাক হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাহিবার উত্তরে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে সে ক্ষেত্রে তালাকের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য না থাকিলেও বাইন তালাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্রোধ ক্ষেত্রে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে সে স্থলেও তালাকের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ছাড়াই বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

মছআলাহ –যদি স্ত্রীকে বলা হয়, (خلية) "তুমি খালি বা শূন্য হইয়াছ" কিম্বা বলা হয়, (برية) "তুমি বিচ্ছিন্ন" এই শ্রেণীর বাক্যেও তালাক উদ্দেশ্য হইতে পারে। অতএব তালাকের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে এইরূপ বাক্যে বাইন তালাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাহিবার উত্তরে এই বাক্য প্রয়োগ করিলে তালাকের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ছাড়াও বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

মছআলাহ– যদি স্ত্রীকে বলা হয়, "তুমি হারাম" তবে তালাকের নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই বাইন তালাক হইয়া যাইবে। (ফতোয়া শামী)

মছআলাহ–স্ত্রীকে যদি বলা হয়, "তুমি বা সে আমার ভগ্নি" ইহাতে তালাক বা স্ত্রী হারাম হইবে না।

মছআলাহ– যদি স্ত্রীকে বলা হয়, "তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও" সেই ক্ষেত্রে তালাকের নিয়্যত থাকিলে বা স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাহিবার উত্তরে ঐ কথা বলা হইলে উক্ত বাক্য দ্বারা বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

খোলা'-তালাক

আল্লাহ তায়ালা বলিযাছেন :—

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا

أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ـ

"স্ত্রীগণকে (মহর ইত্যাদি) যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ তাহা উসুল করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হালাল নহে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এরূপ আশঙ্কা বোধ করে যে, তাহাদের উপর প্রবর্ত্তিত আল্লার বিধান তাহারা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে না ; এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী নিজেকে ছাড়াইয়া নিবার জন্য মহরে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পত্তি কিছু ফেরত দেয়, তবে উহার আদান-প্রদানে তাহাদের কোন গোনাহ হইবে না। (ছুরা বাকারাহ—২ পারা)

আয়াতের মর্ম্ম এই যে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাকালে স্ত্রী হইতে কিছু উসুল করার ব্যবস্থা করুক তাহা শরীয়ত কখনও অনুমোদন করে না। এমনকি, ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং স্বামী যাহা কিছু তাহাকে প্রদান করিয়াছে উহা হইতেও কিছু উসুল করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক মিল-মহব্বৎ না হওয়ার দরুণ তাহারা উভয়েই আশঙ্কা করে যে, তাহারা দাম্পত্য জীবনের নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে পারিবে না এবং এই অবস্থার জন্য একা স্বামী দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত না হয়, তবে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে যে, স্বামী ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীকে যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছে স্ত্রী তাহা সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ প্রত্যার্পন করিয়া দেয় এবং স্বামী তাহা পাইয়া তালাক প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রীকে রেহায়ী দেয়। এই আদান-প্রদান জায়েয আছে। ইহাতে কাহারও গোনাহ হইবে না এবং এইরূপ তালাককেই খোলা'-তালাক বলা হয়।

২০৮২। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ছাবেৎ ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! ছাবেৎ ইবনে কায়েসের দ্বীনদারী এবং চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন প্রকার অভিযোগই নাই, কিন্তু আমি একজন মোসলমান হইয়া ইসলাম বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত থাকিব তাহা আমার নিকট অসহনীয়। (অর্থাৎ উভয়ের মিল-মহব্বৎ সৃষ্টি না হওয়ায় স্বামীর হক্ আমার দ্বারা আদায় হইতেছে না, যাহা ইসলাম বিরোধী কাজ।)

হযরত (দঃ) ঐ রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী (মহররূপে) তোমাকে যে একটি বাগান প্রদান করিয়াছে উহা তাহাকে প্রত্যার্পন করিবে কি ? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) স্বামীকে বলিলেন, তোমার বাগান ফেরত নিয়া নেও এবং তাহাকে তালাক দিয়া দাও। সেমতে স্ত্রী বাগানটি ফেরত দিল এবং স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দিল।

বিবাহ বিচ্ছেদে পুনর্মিলনের সুপারিশ করা

২০৮৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বরীরাহ্ নামক এক রমণী (সে ছিল ক্রীতদাসী,) তাহার স্বামী ছিল মুগীছ নামীয় এক ক্রীতদাস। (বরীরাহ্কে আয়েশা (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিলেন। বরীরাহ্ তাহার স্বামী মুগীছকে অত্যন্ত না পছন্দ করিত। সে মুক্তি লাভ করিয়া শরীয়তের বিধান মতে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করিল এবং এই সুযোগে স্বামী মুগীছকে পরিত্যাগ করিল। স্বামী মুগীছ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদের পর মুগীছের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা যেন) এখনও আমার চোখে ভাসে—মুগীছ বরীরার পেছনে পেছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইতেছে।

এতদ্দর্শনে হযরত নবী (দঃ) আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, হে আব্বাস! বরীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বরীরার উপেক্ষা বড়ই আশ্চর্য্য জনক! অতঃপর হযরত নবী (দঃ) বরীরাহকে বলিলেন, কতই না ভাল হইত যে, তুমি মুগীছকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া লইতে!

বরীরাহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করিতেছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি শুধু মাত্র সুপারিশ করিতেছি। তখন বরীরাহ বলিল, তবে হুজুর! তাহার প্রতি আমার মোটেই আকর্ষণ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—একটি ক্রীতদাসী নারী এস্থলে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে বর্ত্তমান যুগের ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগণ উহার দ্বারা শিক্ষা লাভ করিলে বড়ই উপকৃত হইবে। বরীরার সম্মুখে আল্লার রসুলের একটি প্রস্তাব আসিল, প্রস্তাবটি কোন প্রকার এবাদৎ-বন্দেগী বা পরকাল সম্পর্কীয় মোটেই নহে, বরং নিছক ব্যক্তিগত জাগতিক জীবন সম্পর্কীয়। প্রস্তাবটি বরীরার ইচ্ছা ও অভিরুচির সম্পূর্ণ বিরোধী, এমতাবস্থায় বরীরাহ জানিতে চাহিল যে, এই প্রস্তাবটি কি রসুলুল্লার আদেশ? অর্থাৎ যদি ইহা রসুলের আদেশ হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই অলঙ্ঘনীয়। বরীরাহ যখন জানিতে পারিল যে, প্রস্তাবটি আদেশ স্বরূপ নহে, সুপারিশ ও অভিপ্রায় স্বরূপ মাত্র, তখন বরীরাহ স্বীয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দিল, হযরত (দঃ)ও আর তাহাকে অধিক কিছু বলিলেন না।

বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেণীর গবেষক দল রসুলের আদেশাবলীকে এইভাবে বিভক্ত করিয়া থাকে যে, এবাদৎ বন্দেগী ও পরকাল সম্পর্কীয় বিষয়ে রসুলের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বটে, কিন্তু জাগতিক বিষয়াবলীতে যুগের তালে তাল মিলাইতে হইবে। রসুলের আদেশ সে স্থলে বাধ্যতা মূলক নহে।

এই ধরণের পার্থক্য ও ভাগ-বণ্টন নিছক ভুল এবং গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলের আদেশ চাই এবাদৎ-বন্দেগী সম্পর্কীয় হউক কিংবা সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কীয় হউক, চাই আখেরাত সম্পর্কীয় হউক বা জাগতিক সম্পর্কীয় হউক—সর্ব্বস্থলেই রসুলের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দুইটি স্পষ্ট ঘোষনা ঃ—

(১) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ

"আপনার প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম—কস্মিন কালেও তাহারা মোমেন মোসলমান সাব্যস্ত হইবে না যাবৎ না তাহারা তাহাদের সমুদয় বিরোধকে আপনার মাধ্যমে মীমাংসা করে এবং আপনার মীমাংসার পরে আপনার আদেশ ও ফয়ছালাকে অকুণ্ঠচিত্তে মানিয়া নেয়, কোন প্রকার দ্বিধা বোধ না করে।" (৫ পারা ৭ রুকু)

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আয়াতখানা অতি সুস্পষ্ট এবং ইহার শানে-নুজুলের ঘটনা দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া যায়। খালের পানি বণ্টন লইয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ লাগিয়া ছিল এবং সেই বিবাদ মিটাইতে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি আদেশ দিয়া ছিলেন, এক পক্ষ সেখানে রসুলের আদেশের প্রতি কুণ্ঠা প্রকাশ করিলে এই আয়াত নাযেল হয়। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৭নং পৃষ্ঠা ১০২ হাদীছ দ্রষ্টব্য। ঘটনাটি যে, নিছক জাগতিক বিষয় ছিল তাহা বলার আবশ্যক নাই।

(২) مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ـ

"কোন মোমেন মোসলমান পুরুষ, কোন মোমেন মোসলমান নারী কাহারও পক্ষে তাহার নিজ স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ থাকে না তাহার নিজস্ব কাজেও যখন সেই কাজে আল্লাহ কোন আদেশ দিয়া দেন এবং যখন আল্লার রসুল কোন আদেশ দিয়া দেন। যে ব্যক্তি আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিবে, আল্লার রসুলের আদেশ লঙ্ঘন করিবে নিশ্চয়ই সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে।" (২২ পারা ২ রুকু)

আলোচ্য বিষয়ে আয়াতটির মর্ম্ম অতি পরিষ্কার, ইহার শানে-নুজুলের ঘটনা দ্বারা মূল দাবী আরও পরিষ্কার হইয়া যায়। কোরায়েশ বংশীয়া রমণী যয়নব রাজি-য়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিবাহ যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়া ছিলেন। যায়েদ ইবনে

হারেছা (রাঃ) আরবের রীতি অনুযায়ী এক কালে ক্রীতদাস ছিলেন, তাই যয়নবের আত্মীয়গণ উক্ত বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই আয়াতে তাহাদের মতামতকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং রসুলের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ঘোষনা করতঃ উক্ত বিবাহকে বাধ্যতা মূলক করা হয়।

বিবাহ-শাদীর ব্যাপার নিছক জাগতিক ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেস্থলেও রসুলের আদেশকে অলঙ্ঘনীয় ও বাধ্যতা মূলক ঘোষনা করা হইয়াছে। সুতরাং রসুলের আদেশ সম্পর্কে আখেরাত ও জাগতিক, এবাদৎ-বন্দেগী ও ব্যক্তিগত ইত্যাদি—ভাগ-বণ্টন ও পার্থক্য সম্পূর্ণ অবাস্তব, গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। হাঁ— রসুলের আদেশ এবং আদেশ নয় বরং পরামর্শ বা সুপারিশ ইত্যাদি—এইরূপ তারতম্য আছে। রসুলের আদেশ ত সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষেত্রেই অলঙ্ঘনীয় ও বাধ্যতা-মূলক। আর যাহা আদেশরূপে বলেন না, বরং পরামর্শ, সুপারিশ বা শুধু একটা প্রস্তাব দান বা অভিপ্রায় জ্ঞাপনরূপে বলেন সে ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ, ইশারা-ইঙ্গিত ইত্যাদি উপায়ে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যে, ঐ পরামর্শ ও সুপারিশ বা প্রস্তাবটি রসুল (দঃ) স্বীয় মানবীয় স্বাভাবিক ধারণা বা অভিজ্ঞতা ও খেয়ালরূপে প্রদান করিয়াছেন, না আল্লার তরফ হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, রসুল (দঃ) উহা স্বীয় মানবীয় স্বাভাবিক ধারণা, অভিজ্ঞতা ও খেয়ালরূপে বলিয়াছেন সে ক্ষেত্রে মানুষের জন্য অবকাশ আছে যে, সে নিজ অভিজ্ঞতা, অভিরুচি ও মনস্তুষ্টির উপর চলিতে পারে।

যেমন বরীরাহ (রাঃ) প্রথমতঃ জানিয়া নিল যে, স্বামী মুগীছকে পুনরায় গ্রহণ করা সম্পর্কে হযরতের উক্তিটি আদেশ স্বরূপ নহে, বরং শুধু মাত্র সুপারিশ স্বরূপ এবং সুপারিশও নিজের তরফ হইতে, কারণ হযরত (দঃ) বলিলেন, انما انا شفع "শুধু মাত্র আমার তরফ হইতে সুপারিশ" তখন বরীরাহ (রাঃ) নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর চলিতে চাহিলে হযরত (দঃ)ও সে ক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দিলেন না।

এই শ্রেণীর আরও একটি ঘটনা মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে—মদীনাবাসীদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, মাদী খেজুর গাছের চুমরির ভিতরে মর্দ্দা খেজুর গাছের কিছু ফুল প্রবেশ করিয়া দিত এবং তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা খেজুর ফলনের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। হযরত (দঃ) মদীনায় আসিয়া মোসলমানগণকে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখিলেন এবং উহার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা হয় তোমরা এই কাজ না করিলেও (ফলন যতটুকু ভাল হওয়ার অবশ্যই) ভাল হইবে।" সেমতে ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর দেখা গেল ঐ মৌসুমে খেজুরের ফলন কম হইয়াছে। হযরত (দঃ) তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন :—

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِىْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔

"আমিও মানুষ শ্রেণী ভুক্তই একজন; যখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন হইতে কোন কথা বলি তখন অবশ্যই উহা পালন করিবে, আর যখন আমার ব্যক্তিগত খেয়াল অভিজ্ঞতা ও ধারণার উপর কোন কথা বলি তখন ঐ ক্ষেত্রে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, আমি মানুষ শ্রেণীভুক্তই; (মানুষের খেয়াল ও ধারণার ব্যতিক্রম হইতে পারে।)

এই বিষয়টিই অপর রেওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত আছে—انتم اعلم بامور دنياكم "তোমাদের জাগতিক বিষয়াবলী তোমরা বেশী বুঝিয়া থাক।"

আধুনিক গবেষক নামধারীগণ উল্লেখিত রেওয়ায়েতদ্বয়ের "দ্বীন" ও "দুনিয়া" শব্দ দুইটি লইয়া ভ্রান্ত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে যে, দ্বীন সম্পর্কে রসুলের আদেশ বাধ্যতামূলক আর দুনিয়া সম্পর্কে রসুলের আদেশ বাধ্যতামূলক নহে। অতঃপর দ্বীনকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতে সীমাবদ্ধ করতঃ দুনিয়াকে অতিমাত্রায় প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে এবং সুদ-ঘুষ ও ব্যবসা-বানিজ্যের হালাল-হারাম—জায়েয-নাজায়েযের বাছ-বিচার ইত্যাদিকে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সব সম্পর্কে রসুলের আদেশ, বরং কোরআনেরও আদেশ এবং শরীয়তের বিধান সমূহকে উপেক্ষা করার প্রয়াস পাইতেছে।

অথচ প্রথম রেওয়ায়েতে উল্লেখিত "দ্বীন" শব্দের উদ্দেশ্য হইল—যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে ব্যক্ত করেন—চাই উহা এবাদৎ-বন্দেগী ও আখেরাত সম্পর্কে হউক বা জাগতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে হউক; রসুল আল্লার তরফ হইতে যাহা কিছু বলেন উহাই দ্বীন। এই তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, খেজুর গাছের ঘটনা ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তি সম্বলিত তিনখানা রেওয়ায়েত ইমাম মোসলেম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হইল উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতদ্বয়। মোসলেম শরীফ কেতাবে ইমাম মোসলেমের নীতি এই যে, একই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত একাধারে বর্ণিত হইলে

---

* امر —'আম্‌র' শব্দ শাস্ত্রীয় উপভাষায় হুকুম বা আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়; বরিরার জিজ্ঞাসায় সেই অর্থই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আভিধানিক পর্য্যায়ে হুকুম বা আদেশ ভিন্ন অন্য ভাবে কোন কিছু বলা ক্ষেত্রেও "আম্‌র' শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন পবিত্র কোরআনে আছে—الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالسوء এই হাদীছে "আম্‌র' শব্দ সেই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের মূল রেওয়ায়েত ও সর্ব্বাধিক মজবুত রেওয়ায়েত যেইটি সেইটিকে প্রথমে উল্লেখ করেন। এস্থলে সেই প্রথম নম্বরে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি পাঠক সমক্ষে পেশ করা হইল। উহা দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উক্তির আসল শব্দ ও প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ভাবিত হইবে এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় রেওয়া-য়েতের "দ্বীন" ও "তুনিয়া" শব্দদ্বয়ের যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হইয়া থাকে উহা ছিন্ন করা সহজ হইবে।

প্রথম রেওয়ায়েতটিতে উল্লেখ আছে যে, মাদী খেজুর গাছের চুমরির ভিতর মর্দ্দা গাছের ফুল দিতে দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন—ما اظن يغني ذلك شيئا

"আমার মনে হয় না যে, এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ও অতিরিক্ত ফলদায়ক।" এতচ্ছ্রবনে ছাহাবীগণ ঐ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিলেন এবং ফলন কম হইল, এই সংবাদ প্রাপ্তে হযরত (দঃ) বলিলেন—

إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي

بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهٖ -

"খেজুর গাছের জন্য উক্ত ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকিলে তাহারা উহা অবলম্বন করিতে পারে। আমি কোন সময় নিজের ধারণা প্রকাশ করিয়া থাকি, সেই ধারণা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নহে। হাঁ—আমি যদি আল্লার পক্ষ হইতে তোমাদিগকে কিছু বলি তবে উহা অবশ্যই তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।"

বলা বাহুল্য—জাগতিক পর্য্যায়ের হউক বা এবাদৎ-বন্দেগী ও আখেরাত পর্য্যায়ের হউক কিম্বা ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের হউক—যে কোন বিষয়ে রসুল (দঃ) ফয়ছালা বা আদেশ প্রয়োগ করিলে বা বিধান ও আদর্শ স্থাপন করিলে তাহা অবশ্যই আল্লার তরফ হইতে হইয়া থাকে। আল্লার তরফ হইতে প্রাপ্তি ব্যতিরেকে রসুল (দঃ) কোন ফয়ছালা বা আদেশ করেন না, কোন বিধান বা আদর্শ নির্দ্ধারিত করেন না। এই মর্ম্মেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা রহিয়াছে—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

"রসুল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কিছু বলেন না—যাহা কিছু বলেন একমাত্র ওহী প্রাপ্তির দ্বারাই বলিয়া থাকেন।" এই ক্ষেত্রে বিধান ও আদর্শ ই উদ্দেশ্য।

সুদ-ঘুষ, ব্যবসা-বানিজ্যে হালাল-হারাম—জায়েয নাজায়েযের বাছ-বিচার এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালন ইত্যাদি—

সবকে আধুনিক গবেষক দ্বীনের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন না, বরং ঐগুলিকে উমুরে-দুনিয়া বা জাগতিক ও ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া রসুল তথা শরীয়তের আওতামুক্ত করতঃ উহাতে স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতে চাহিতেছেন। বস্তুতঃ উহা সম্পর্কে রসুল (দঃ) কর্তৃক যে সব আদেশ-নিষেধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে সব বিধি-বিধান বা আদর্শ নির্দ্ধারিত হইয়াছে উহা সবই আল্লার তরফ হইতে। প্রথম রেওয়ায়েতে যে—اذا حدثتكم عن الله "যখন আমি তোমাদিগকে আল্লার তরফ হইতে কিছু বলি" বলা হইয়াছে উল্লেখিত আদেশ নিষেধ, বিধি-বিধান ও আদর্শ অবশ্যই উহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে যে, উক্ত বাক্যের স্থলে—من دينكم "তোমাদের দ্বীন হইতে" বলা হইয়াছে ঐসব উহারও অন্তর্ভুক্ত। ঐসবকে আল্লার তরফ হইতে গণ্য না করা যেরূপ বাতুলতা দ্বীন গণ্য না করাও তদ্রূপ বাতুলতা।

হাঁ—কোন একটা কাজ বা উপলক্ষ সম্পর্কে মানবীয় স্বাভাবিক ধারণা ও খেয়াল বা সাধারণ অভিজ্ঞতারূপে কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ দিলে বা সুপারিশ করিলে তাহা বাধ্যতামূলক হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অভিরুচি ও বিবেক-বিবেচনার উপর চলিতে পারে। এই শ্রেণীর বিষয়াবলীকেই প্রথম রেওয়ায়েতে......ظننت ظنا "শুধু মাত্র আমার ধারণা ও খেয়াল" বলা হইয়াছে এবং উহা তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক নহে বলা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উহাকেই......بشئ من رائى "যদি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং খেয়াল ও ধারণারূপে কিছু বলি" বলা হইয়াছে এবং এই শ্রেণীর বিষয়াবলী সম্পর্কেই তৃতীয় রেওয়ায়েতে বলা হইয়াছে—انتم اعلم بامور دنياكم অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াবলীর যতটুকু সম্পর্ক মানবীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতার সহিত জড়িত, যেমন—এই মার্কেটে কিসের দোকান ভাল চলিবে, এই মৌসুমে কি মালের ব্যবসা ভাল হইবে, এই মাল কোন বাজারে বেশী চালু হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি—এ সম্পর্কে তোমাদের অভিজ্ঞতা ও বিবেচনাকে অগ্রগণ্যতা দিতে পার। উমুরে-দুনিয়া বা জাগতিক বিষয় বলিতে শুধু এতটুকুই বুঝাইতেছে। কিন্তু ব্যবসা-বানিজ্যে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের বিধি-বিধান সম্পর্কেও তোমাদের বিবেচনা অগ্রগণ্য হইবে তাহা কখনও নহে। উহা সম্পর্কে রসুলের আদেশ আল্লার তরফ হইতে এবং উহা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, উহা বাধ্যতামূলক ও অলঙ্ঘনীয়।

অমোসলেম মহিলা বিবাহ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ

"মোশরেক নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারিবে না, যাবত না তাহারা মোমেন-মোসলমান হইয়া যায়। যদিও ঐরূপ নারী তোমার পছন্দণীয় হয়।" (২পাঃ ১১রুঃ)

২০৮৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীকে কোন খৃষ্টান বা ইহুদী নারী বিবাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন—আল্লাহ তায়ালা মোসলমানের জন্য মোশরেক নারী বিবাহ করা হারাম করিয়াছেন। কোন নারী যদি ঈসা (আঃ)কে খোদা বলে (যেমন খৃষ্টানদের মতবাদ ; অথচ তিনি ছিলেন আল্লার সৃষ্ট বন্দা,) তবে উহা অপেক্ষা বড় শেরেক (অংশীবাদী) আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

ব্যাখ্যা ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর মত ও বক্তব্য এই যে, যে সব খৃষ্টান-নাছারাদের আকিদা বিশ্বাস ও মতবাদ হইল যে, হযরত ঈসা (আঃ) তথা যিশু খৃষ্ট আল্লাহ বা আল্লার ছেলে তাহারা মোশ্‌রেক—আল্লার সঙ্গে অংশী-দারবাদী। তদ্রূপ যে সমস্ত ইহুদীদের আকিদা ও বিশ্বাস এই যে, ওযায়ের (আঃ) আল্লার ছেলে তাহারাও মোশ্‌রেক। এই শ্রেণীর খৃষ্টান ও ইহুদীরা যদিও ইঞ্জিল এবং তৌরাত কেতাবের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, কিন্তু তাহারা "কেতাবী" গণ্য হইবে না। তাহারা মোশরেক দলভুক্ত ; কারণ, তাহারা হযরত ঈসা বা ওযায়ের (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালার শরীক সাব্যস্তকারী। এই শ্রেণীর খৃষ্টান-ইহুদী মহিলার সহিত মোসলমানের বিবাহ সম্পর্কে ২ পারা ১১ রুকু ছুরা বাকারার উল্লেখিত আয়াত প্রযোয্য ;যাহার অর্থ এই—"হে মোসলমান ! তোমরা মোশরেক নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারিবে না যাবৎ না তাহারা মোমেন-মোসলমান হইয়া যায়।"

৬ পারা ছুরা মায়েদার ৫ নং আয়াতে যে, বলা হইয়াছে—"তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবধারী পবিত্রাত্মা নারীদেরকে বিবাহ করা।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর মতে এই পবিত্রাত্মা কেতাবধারী একমাত্র তাহারা যাহারা আল্লাহ তায়ালার দেওয়া ইঞ্জিল কেতাব বা তৌরাত কেতাবের আসমানী ধর্ম্ম মতের উপর স্থিতিশীল এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু রূপে অটল বিশ্বাস রাখে, ঈসা (আঃ) ওযায়ের (আঃ) কাহাকেও খোদার শরীক বা খোদা গণ্য না করে। এইরূপ কেতাবধারী যেহেতু আল্লাহ-প্রদত্ব ধর্ম্ম অনুসরণে এবং ইসলামের মূল বস্তু "তৌহীদ" একত্ববাদ ও "রেসালত" হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল হওয়ার বিশ্বাস—এই দুইটির একটির উপর স্থিরপদ হওয়ায় ইসলামের অতি নিকটবর্ত্তী, তাই ঐরূপ মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল। শুধু এই আশায় যে, মোসলমান স্বামীর গৃহে ইসলামের অপর বস্তু "রেসালত" কে গ্রহন করিয়া

নেওয়া তাহার জন্য সহজ ও নিকটতম হইবে। কারণ, স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাবল্য থাকে; এই জন্যই খৃষ্টান-ইহুদী কেতাবধারী পুরুষের নিকট মোসলমান মহিলাকে বিবাহ দেওয়া কোন প্রকারেই অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টান, ইহুদী নামধারী জাতির নারীদের সহিত মোসলমানের বিবাহ মোটেই জায়েয হইবে না—হারাম হইবে। কারণ আসমানী কেতাব বা আল্লাহ প্রদত্ব ধর্ম্ম-মতের প্রতি ইহাদের কোনই আস্থা নাই—ইহারা সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী—ধর্ম্মহীন। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি ঈমান ও অটল বিশ্বাস দুরের কথা আল্লার অস্তিত্ব তথা স্বষ্টিকর্ত্তা হওয়ার প্রতিও তাহাদের বিশ্বাস নাই। স্বতরাং বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টান-ইহুদী নারীর সহিত মোসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েয হইবে না—হারাম হইবে। মাওলানা আশ্রফ আলী থানভী (রঃ) বয়ানুল-কোরআনে এবং মুফতী শফী (রঃ) মাআরেফুল-কোরআনে ছুরা মায়েদার উক্ত আয়াতের তফছীরে এই মছআলার উপর আলোকপাত করিয়াছেন।

ঈলার বয়ান

স্বামী যদি স্ত্রীকে কসমের সহিত বলে যে, খোদার কসম—আমি তোমার সহিত চার মাস (কিম্বা ততধিক) কালের মধ্যে সহবাস বা সঙ্গম করিব না; ইহাকেই "ঈলা" বলা হয়।

শরীয়তে ইহার মছআলাহ এই যে, ঐ ব্যক্তি যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিল তবে তাহার কসম ভঙ্গ হইবে যাহার কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। আর যদি সে কসমের উপর দৃঢ় থাকে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম না করে তবে এই কসমের উপর চার মাস পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্ত্রীর উপর বাইন-তালাক হইয়া যাইবে স্বামী তালাক না দিলেও ঐ তালাক হইয়া যাইবে। এই বিধান পবিত্র কোরআন ২ পারা ছুরা বাকারা ২২৬নং আয়াতে বর্ণিত আছে।

মছআলাহ—যদি ঐরূপ কসম চার মাসের কম সময়ের জন্য করে তবে সেই ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোয্য হইবে না। অবশ্য কসমে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সঙ্গম করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন পৌত্তলিক বা কেতাবী মহিলা যদি মোসলমান হইয়া যায় এবং তাহার স্বামী অমোসলেমই থাকে, সেই ক্ষেত্রে যদি তাহারা মোসলেম দেশের নাগরিক হয় তবে অমোসলেম স্বামীকে মোসলমান হওয়ার আহ্বান জানানো হইবে এবং সেও মোসলমান হইয়া গেলে উভয়ের বিবাহ বলবৎ থাকিবে। স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করিলে কাজী (বা ভারপ্রাপ্ত মোসলমান সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা

বা ইসলামী পঞ্চায়েত) দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করাইতে হইবে। আর যদি অমোসলেম দেশে উক্ত ঘটনা ঘটে এবং তাহারা তথায়ই অবস্থানকারী হয় তবে স্ত্রী মোসলমান হওয়ার পর তাহার তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করিলে তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি স্বামীকে অমোসলেম দেশে ত্যাগ করিয়া স্ত্রী মোসলেম দেশে আসিয়া মোসলমান হয় বা মোসলমান হইয়া অমোসলেম দেশ ত্যাগ করতঃ মোসলেম দেশে চলিয়া আসে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী মোসলেম দেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কাফের স্বামী হইতে তাহার বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন অমোসলেম দেশের বাসিন্দা রহিয়াছে অপর জন মোসলেম দেশের বাসিন্দা হইয়া ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তাহাদের বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

মছআলাহ ঃ—মোসলেম দেশের নাগরিক অমোসলেম নারী মোসলমান হইয়া অমোসলেম স্বামী হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে অন্য স্বামী গ্রহণ করার পূর্ব্বে তাহাকে তিন হায়েজ ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে। (শামী ২—৫৩৫)

আর যদি স্বামী-স্ত্রী অমোসলেম দেশের নাগরিক হয় এবং নারী ইসলাম গ্রহণ করিয়া তথায়ই বসবাস করে তবে অমোসলেম স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য তিন হায়েজ অতিবাহিত করিতে হইবেই। সেই তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে আর ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে না। (শামী ৫৩৭)

আর যদি ঐ নারী মোসলেম দেশে আসিয়া নাগরিক হইয়া যায় সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। এক মত্ অনুসারে সে অন্তঃসত্ত্বা হইলে ত সন্তান জন্ম পর্য্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইবে, নতুবা তাহাকে ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে না (ঐ ৫৩৮) অবশ্য এক হায়েজ কাল তাহাকে বিলম্ব করিতে হইবে। অপর মত্ অনুসারে সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সন্তান জন্ম বা তিন হায়েজ অতিবাহিত করিয়া ইদ্দৎ পালন করিতে হইবে (শামী ৫৩৭)।

স্বামীহীন অমোসলেম মহিলা মোসলমান হইলে এক হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে বিবাহ করা যাইবে পূর্ব্বে নহে।

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী ও সম্পত্তি সম্পর্কে

নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কে সকল ইমামগণের একই মত্ যে, তাহার এলাকাস্থিত তাহার সমবয়স্ক লোকদের সকলের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে মৃত গণ্য করিয়া তাহার ধন-সম্পদ ভাগ-বন্টন করা যাইবে না। ঐরূপ সকলের মৃত্যু হইয়া গেলে তাহাকে মৃত গণ্য করার নিয়মিত ফয়ছালা লাভ করার পর তাহার ধন-সম্পদ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, স্ত্রী যদি সর্ব্বদিক দিয়া ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হয় তবে উল্লেখিত রূপে স্বামীর সমবয়স্ক লোকদের সকলের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। তাহাদের সকলের মৃত্যু হইয়া গেলে স্বামীর মৃত্যু গণ্য করার নিয়মিত ফয়ছালা লাভ করিবে এবং তৎপর চার মাস দশ দিন ইদ্দৎ পালন করিয়া সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

যদি স্ত্রীর জন্য ধৈর্যধারণ মানবীয় কারণে বা অন্ন-বস্ত্রের অভাব কারণে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিম্নে বর্ণিত ফয়ছালাকারগণের নিকট ঘটনা পেশ করিবে এবং প্রমাণ করিবে যে—(১) আমার স্বামী অমুক নিখোঁজ ব্যক্তি; ইহা প্রমাণ করিবে বিবাহের সাক্ষী দ্বারা বা লোক-জনের অবগতির দ্বারা। (২) অতঃপর স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সাক্ষী-সবুত দ্বারা প্রমাণ করিবে। এতদ্ভিন্ন ফয়ছালাকারও নিজের সম্ভাব্য তালাশ-তদন্তে খোঁজ লাভ না হওয়া সাব্যস্ত করিবে। এই দুই পর্ব্ব সমাপণের পর হইতে স্ত্রীকে চার বৎসর অপেক্ষা করার ফয়ছালা দিবে। এই চার বৎসরের মধ্যেও যদি নিখোঁজ স্বামীর কোন খোঁজ লাভ না হয় তবে এই চার বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর চার মাস দশ দিন ইদ্দৎ পালন করিয়া স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে।

জানিয়া রাখিবে যে—ফয়ছালাকারের নিকট ঘটনা নিয়মিত উপস্থিত করার পূর্ব্বে নিখোঁজ হওয়ার যে পরিমাণ কালই কাটিয়া থাকুক নির্দ্ধারিত চার বৎসর কালের মধ্যে উহার গণনা হইবে না। চার বৎসরের গণনা ফয়ছালাকারের ফয়ছালার পর হইতে আরম্ভ হইবে।

অবশ্য—মহিলা যদি স্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন কাটিয়া বিবাহ ব্যতীরেকে জীবন-যাপনে অপারক অবস্থায় ফয়ছালাকারের নিকট নিখোঁজ স্বামীর বিবাহমুক্ত হওয়ার প্রার্থী হইয়া থাকে এবং ফয়ছালাকারের বিবেচনায় সাব্যস্তও হয় যে, বাস্তবিকই স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। দীর্ঘ দিন কাটিবার পর সে অধৈর্য্য ও অপারক হইয়া এখন দরখাস্ত পেশ করিয়াছে—এই ক্ষেত্রে ফয়ছালাকার সম্মুখে শুধু এক বৎসর অপেক্ষার আদেশ দিতে পারে। এই আদেশ অনুযায়ী এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তালাকের ইদ্দৎ তথা তিন হায়েজ পূর্ণ করিয়া স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রকাশ থাকে যে—উল্লেখিত সর্ব্বক্ষেত্রেই নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে ফয়ছালা করা একমাত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থার শরীয়তী কাজীরই অধিকার। অবশ্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকিলে প্রচলিত সরকার কর্তৃক কোন সরকারী মোসলমান কর্ম্মকর্ত্তা যদি এই শ্রেণীর বিষয়াদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী ফয়ছালা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত

থাকেন তবে তাঁহার ফয়ছালাও বৈধ পরিগণিত হইবে। ঐরূপ কর্ম্মকর্ত্তাও যদি না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী পঞ্চায়েত গঠিত করিতে হইবে (যাহার নিয়ম সম্মুখে বর্ণিত হইবে।) উক্ত পঞ্চায়েতের শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা নয়, বরং সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তও এই ক্ষেত্রে কার্য্যকরী পরিগণিত হইবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে—যেই যেই ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করার জন্য তাহার সমবয়স্ক সকলের মৃত্যু হইয়াছে প্রমাণিত হইতে হইবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই সমবয়স্কদের মৃত্যুর জন্য কাজী বা ভারপ্রাপ্ত মোসলমান সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা ইসলামী পঞ্চায়েতকে সম্ভাব্য খোঁজ-খবর লইতে হইবে। তদ্রূপ চার বৎসর সময় সীমার ক্ষেত্রেও ফয়ছালাকারগণকে নিজেদের তদন্ত দ্বারা এই ধারণায় পৌঁছিতে হইবে যে, তাহার খোঁজ পাওয়ার কোন আশাই নাই। ঐরূপ তদন্ত ছাড়া শুধু স্ত্রী বা তাহার গার্জিয়ানের কথার উপর রায় দান করিলে তাহা বৈধ হইবে না।

আরও প্রকাশ থাকে যে—নিখোঁজ ব্যক্তি যদি এরূপ ক্ষেত্রে বা এরূপ পরিস্থিতিতে নিখোঁজ হইয়া থাকে যে ক্ষেত্রে বা যে পরিস্থিতিতে তাহার মৃত্যুর আশঙ্কাই প্রবল; যথা—যুদ্ধ ময়দানে, মৃত্যু জনিত রোগ অবস্থায় বা জলযান ডুবির পরিস্থিতিতে নদী-সমুদ্রের ভ্রমণ অবস্থায় ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত কোন সময় সীমা নাই, বরং উপরোল্লেখিত কাজী বা ভারপ্রাপ্ত সরকারী মোসলমান কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা ইসলামী পঞ্চায়েত—তাহারা সম্ভাব্য সকল প্রকার তদন্ত-তালাশ করার পর ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর ধারণা তাহাদের নিকট প্রবল হইলে তাহাকে মৃত সাব্যস্ত করিতে পারেন এবং অতঃপর ইদ্দত শেষে তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে।

ইসলামী পঞ্চায়েত গঠন :

১। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা অন্ততঃ তিন জন হইতে হইবে।

২। প্রত্যেক সদস্য সৎ হইতে হইবে। সুদখোর, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী এবং নামায-রোযার পূর্ণ পাবন্দী করে না, এমনকি দাড়ি চাছিয়া ফেলে—এমন ব্যক্তিও এই পঞ্চায়েতের সদস্য হইতে পারিবে না।

৩। সদস্যগণ ঐ এলাকায় বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হইতে হইবে। যদি এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখিত রকমের সৎ লোক পাওয়া না যায়, তবে ঐ প্রভাবশালী লোকগণ সৎ-সাধু সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের দ্বারা ফয়ছালা করাইবে। ইহাতে তাহাদের ছওয়াব লাভ হইবে।

৪। পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্ততঃ একজন আলেম অবশ্যই থাকিতে হইবে। আলেম সদস্য পাওয়া না গেলে পঞ্চায়েতের সদস্যগণ প্রতিটি কাজ আলেমগণের

নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শরীয়ত সম্মতরূপে ফয়ছালা করিতে বাধ্য থাকিবে। এরূপ না করিলে সেই পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত কাজীর সিদ্ধান্ত তুল্য হইবে না।

৫। পঞ্চায়েত প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিখোঁজের সম্ভাব্য তালাশ-তদন্ত অবশ্যই করিবে। তাহা না করিয়া সিদ্ধান্ত নিলে সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হইবে না।

৬। তাহাদের সিদ্ধান্ত সমস্ত সদস্যের সর্ব্বসম্মত হইতে হইবে। মতভেদ হইলে এবং অধিকাংশের রায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলে সেই সিদ্ধান্তও কার্য্যকর হইবে না।

মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ) এই জটিল মছআলার গবেষণামূলক আলোচনায় একখানা কেতাব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন—"আল-হীলাতুন-নাজেযাহ্"।

মছআলাহ ঃ—স্বামী যদি নিখোঁজ না হয়—তাহার খোঁজ ও অবস্থান জানা আছে, কিন্তু সে বন্দী রহিয়াছে; এই ক্ষেত্রে তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ এবং তাহার ধন-সম্পদের ভাগ-বণ্টম ইত্যাদি কিছুই করা যাইবে না। পরবর্ত্তী সময়ে যদি তাহার খোঁজ-খবর লুপ্ত হইয়া যায় তখন সে নিখোঁজ পরিগণিত হইবে এবং পূর্ব্ব বর্ণিত ব্যবস্থাদি গৃহিত হইবে।

জেহারের বয়ান

জেহারের প্রথা ও ভাষা আরব দেশে প্রচলিত ছিল; সেই সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ২৮ পারার প্রথম কতিপয় আয়াতে বিভিন্ন বিধান বর্ণিত রহিয়াছে। আমাদের ভাষায় জেহারের একটি বাক্য হইতে পারে—

কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে বলে—"তুমি আমার মা তুল্য বা মায়ের ন্যায়" এইরূপ বলিয়া যদি তালাক উদ্দেশ্য করে তবে বাইন-তালাক হইবে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, মা যেরূপ হারাম তুমি আমার জন্য সেইরূপ হারাম তবে জেহার হইবে। এমনকি স্ত্রীর সহিত ঝগড়া ক্ষেত্রে এরূপ বলিলে নিয়্যত ছাড়াও জেহার হইবে।

যে ক্ষেত্রে জেহার হইবে সেই ক্ষেত্রে ঐ স্ত্রীর সহিত সঙ্গম এবং সঙ্গমের ভূমিকারূপী সমুদয় আচার-ব্যবহার হারাম হইয়া যায়। অবশ্য দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হারাম হয় না।

উক্ত হারাম হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হইল জেহারের কাফ্‌ফারা আদায় করা। সেই কাফ্‌ফারা হইল, রমজান মাস ছাড়া কাফ্‌ফারার নিয়্যতে একাধারে দুই মাস রোযা রাখা সঙ্গম করার পূর্ব্বে। দুই মাস পূর্ণ করার মধ্যে যে কোন কারণে একটি রোযাও যদি ভঙ্গ করা হয় তবে বিগত রোযা ব্যর্থ হইয়া পুনরায় দুই মাসের রোযা আরম্ভ করিতে হইবে। তদ্রূপ দুই মাস রোযা পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্ব্বেও রাত্রি বেলায়ও যদি জেহারকৃত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম বা উহার আচার-ব্যবহার

করে তবে তাহা হারাম কাজ হইবে এবং কাফ্ফারা বাতিল হইয়া পুনরায় দুই মাস রোযা পূর্ণ করিতে হইবে (শামী ২—৮০০)। বয়স বা স্বাস্থ্যগত কারণে যদি ঐরূপ রোযায় সক্ষম না হয় তবে ৬০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক গরীবকে তৃপ্তির সহিত দুই ওয়াক্ত আহার করাইবে। আহার করাইবার পরিবর্ত্তে ইচ্ছা করিলে ৬০ জন লোকের ছদকায়ে-ফেৎর তথা রমজানের ফেৎরা পরিমাণ বস্তু বা পয়সাও নির্দ্ধারিত নিয়ম মতে গরীবদেরকে দান করিতে পারে।

উক্ত কাফ্ফারা আদায় করার পূর্ব্বে সঙ্গম বা উহার আচার-ব্যবহার করা হারাম হইবে। যদি করে তবে হারাম কাজ করার গোনাহ হইবে—কাফ্ফারা আদায়ের পূর্ব্বে যতবারই উহা করিবে ততবারই ঐরূপ গোনাহ হইবে যাবৎ না কাফ্ফারা আদায় করে।

কাফ্ফারা আদায় না করিয়া স্ত্রীকে যদি দাম্পত্যের হক্ হইতে বঞ্চিত রাখে তবে স্বামীকে কাফ্ফারা আদায় করা বা তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হইবে।

মছআলাহ :—কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার মা" তবে সেই ক্ষেত্রে জেহার হইবে না—কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগ অত্যন্ত জঘন্য—ইহাতে গোনাহ হইবে। (শামী ২—৭৯৪)

মছআলাহ :—যে ব্যক্তি কথা বলায় সক্ষম নয়, লিখিতেও সক্ষম নয় যেমন সাধারণ বোবা ব্যক্তি; সে যদি তালাক বোধক ইশারায় তালাক দেয় এবং ইশারার সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক মৌখিক শব্দও করে তবে তালাক হইয়া যাইবে। কথা বলিতে বা লিখিতে সক্ষম ব্যক্তির শুধু ইশারায় তালাক হইবে না। এমনকি যেই বোবা ব্যক্তি লিখিতে সক্ষম তাহারও শুধু ইশারায় তালাক হইবে না।

লেয়া'নের বয়ান

জেনা বা ব্যভিচার প্রমাণিত হইলে সেস্থলে শরীয়তের বিধানে কঠোর শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। বিবাহিত হইলে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা হইবে এবং অবিবাহিত হইলে একশত বেত্রাঘাত করা হইবে। শরীয়ত সম্মত প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির উপর জেনার তোহ্মত ও অপবাদ লাগাইলে সেই অপবাদকারীর শাস্তিও অতিশয় কঠিন রাখা হইয়াছে—তাহাকে আশিটি বেত্রদণ্ড প্রদান করা হইবে এবং আজীবন তাহার কোন সাক্ষ্য কোন বিচারালয়ে গ্রহণীয় হইবে না।

কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জেনার কঠোর সাজা ভোগ করাইতে চাহিলে তাহাকে অবশ্যই কঠিন ও কষ্টার্জ্জিত বিশেষ কায়দার দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করতঃ উহা পেশ করিতে হইবে, নতুবা চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। এমনকি নিজ চোখে চাক্ষুস

দেখিয়া থাকিলেও চারজন প্রত্যক্ষ দর্শীর সাক্ষ্য পুরন করিতে না পারিলে তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে না, অন্যথায় আশিটি বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বেগানা লোকের পক্ষে এইরূপ কার্য্য সাক্ষীর অভাবে হজম করিয়া যাওয়া এবং ব্যক্ত না করা সহজ ও সহণীয় বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বেলায় তাহা সহণীয় হইতে পারে না। স্বামী নিজ চোখে স্ত্রীকে বেগানা পুরুষের সঙ্গে লিপ্ত দেখিয়া সাক্ষীর অভাবে চুপ থাকিবে এবং এই ঘৃণাকে হজম করিয়া নিবে ইহা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। তাই শরীয়ত এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সহজ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে। স্বামী স্ত্রীর উপর জেনার দাবী করিয়া সাক্ষী পেশ করিতে না পারিলে বিচারকের দরবারে স্বামী চার বার কসম করিয়া স্বীয় উক্তির সত্যতার দাবী করিবে এবং পঞ্চম বার বলিবে—স্ত্রীর উপর তাহার উক্তিতে সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ বর্ষিত হইবে। এইরূপে হলফ ও অভিশাপের বাক্য সম্পন্ন করিয়া নিলে সাক্ষী বিহীন তোহ্‌মতের দরুন যে শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে—আশিটি বেত্রদণ্ড তাহা হইতে সে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। এমতাবস্থায়ও যদি স্ত্রী জেনার কথা অস্বীকার করে তবে তাহাকেও চার বার কসম করিয়া স্বামীর উক্তি মিথ্যা বলিয়া দাবী করিতে হইবে এবং পঞ্চম বার বলিতে হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামীর দাবী সত্য হইলে (অর্থাৎ স্ত্রী জেনা করিয়া থাকিলে) তাহার উপর আল্লার গজব। স্ত্রীও যদি এই পঞ্চ-বাক্য পূর্ণ করে তবে সে জেনার শাস্তি হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। অতঃপর উক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিষা দেওয়া হইবে—এই ব্যবস্থাকেই "লেয়া'ন" বলা হয়। পবিত্র কোরআনে ১৮ পারা—ছুরা নূর প্রথম রুকুতেই এই বিধানের সুস্পষ্ট বয়ান রহিয়াছে এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক এই বিধান কার্য্যকরী করার ঘটনা ২০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কতিপয় হাদীছেও বর্ণিত হইতেছে।

মছআলাহ - বোবা ব্যক্তি ইশারার দ্বারা স্ত্রীর উপর জেনার দাবী করিলে ইমাম বোখারীর মতে সে ক্ষেত্রেও লেয়া'ন প্রবর্ত্তিত হইবে যেরূপ বোবার ইশারায় তালাক হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানিফার মতে বোবার ইশারা দ্বারা তালাক ত অবশ্যই হয়, কিন্তু লেয়া'ন হইবে না, কারণ বস্তুতঃ লেয়া'ন "হদ্দে-ক্বজফ" আশিটি বেত্রদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত যাহার প্রতিটি বিষয় অকাট্য হওয়া আবশ্যক, অথচ ইশারা অকাট্য গণ্য হয় না।

মছআলাহ ঃ—স্ত্রীর উপর জেনার তোহ্‌মত লাগাইলে যেরূপ লেয়া'ন করিতে হইবে তদ্রূপ স্ত্রীর প্রসবিত সন্তানকে যদি স্বামী তাহার ঔরসের না বলিয়া দাবী করে সে স্থলেও লেয়া'ন প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ঐরূপ দাবী সুস্পষ্টরূপে হইতে হইবে।

ঐরূপ দাবীর প্রতি ইঙ্গিত ইশারায় আভাস প্রদান করা হইলে লেয়া'ন আসিবে না, যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা—

২০৮৫। ছাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার একটি ছেলে হইয়াছে কাল বর্ণের। (অর্থাৎ আমার রং ফরসা, কাল বর্ণের সন্তান আমার ঔরষের হইবে কেন?) হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উট আছে কি? সে বলিল, হাঁ—আছে। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার (বৃদ্ধ) উটগুলি কি রঙ্গের ছিল? সে বলিল লাল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের হইতে ধূসর রঙ্গের উট জন্ম হইয়াছে কি? সে বলিল, হাঁ—হইয়াছে। হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লাল রঙ্গের উটের ঔরসে ধূসর রঙ্গের উট কোথা হইতে আসিল? সে বলিল, পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের একটা হয়ত দুসর রঙ্গের ছিল উহারই তাছীরে এরূপ হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার ছেলে সম্পর্কেও এই সম্ভাবনা আছে; তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী বংশে কেহ কাল ছিল; সেই তাছীরে এই ছেলে কাল হইয়াছে।

লেয়া'নের মধ্যে কসমের সহিত দাবী করিতে হইবে

২০৮৬। ছাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসী এক ছাহাবী তাহার স্ত্রীর প্রতি জেনার তোহমত আরোপ করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের উভয় হইতে নিজ নিজ দাবীর উপর শপথ ও কসম গ্রহণ করিলেন, অতঃপর তাহাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

স্বামী প্রথমে লেয়া'ন করিবে

২০৮৭। ছাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হেলাল ইবনে উমাইয়া তাহার স্ত্রীর প্রতি জেনার তোহমত আরোপ করিয়া ছিল। প্রথমে সে-ই অগ্রগামী হইয়া স্বীয় দাবীর উপর লেয়া'ন করিয়া ছিল। হযরত (দঃ) তাহাদের উভয়কে বলিতেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যা বলিতেছ। এখনও তওবার সুযোগ রহিয়াছে এবং তওবা করাই উত্তম। কিন্তু স্বামী লেয়া'ন করার পর স্ত্রীও দাঁড়াইল এবং লেয়া'ন করিল। (একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলা হইতে বিচ্যুত হইল না।)

লেয়া'নের পরেও স্ত্রী মহরের অধিকারিণী

২০৮৮। ছাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ স্বীয় স্ত্রীর উপর জেনার

তোহ্‌মত লাগাইলে সেস্থলে কি করা হইবে? তিনি বলিলেন, বনু-আজ্‌লান গোত্রীয় এক দম্পতির মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল—স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি জেনার তোহ্‌মত লাগাইয়াছিল, স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিতেছিল, ফলে তাহাদের মধ্যে লেয়া'ন হইল এবং পরস্পর একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দাবী করিল। সে স্থলে হযরত নবী (দঃ) তাহাদের উভয়কে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা জানেন, নিশ্চয় তোমাদের একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের কোন একজন স্বীয় দাবী ত্যাগ করতঃ তওবা করিবে কি? তাহারা উভয়ে নিজ নিজ দাবী ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। হযরত নবী (দঃ) পুনঃ তাহাদিগকে ঐরূপ আহ্বান করিলেন, এইবারও তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। তখন হযরত নবী (দঃ) তাহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের হিসাব ও বিচার আল্লার নিকট হইবে। তোমাদের একজন ত অবশ্যই মিথ্যাবাদী—এই বলিয়া হযরত (দঃ) তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং স্বামীকে বলিলেন, এই স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার বাকি থাকিল না। তখন স্বামী বলিল, আমি যে, তাহাকে (মহররূপে) আমার মাল দিয়াছি তাহা আমাকে ফেরত দিবে। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ মাল তুমি পাইতে পার না, কারণ যদি তুমি সত্যবাদীও হও (এবং স্ত্রী অপরাধিনী হয়) তবুও তুমি যে, এতদিন তাহাকে ভোগ করিয়াছ ঐ মাল তাহার বিনিময় হইবে। আর যদি তুমি তাহার উপর মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইয়া থাক তবে ত মালের দাবী আরও অধিক অসঙ্গত।

লেয়া'নের পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে

২০৮৯। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী এক দম্পতির মধ্যে লেয়া'ন পরিচালনা করার পর তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

লেয়া'ন কারিনীর সন্তান হইলে?

২০৯০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর উপর জেনার তোহ্‌মত লাগাইল এবং ঐ স্ত্রীর প্রসূত সন্তানকে তাহার ঔরসের নয় বলিয়া দাবী করিল। হযরত নবী (দঃ) তাহাদের মধ্যে লেয়া'ন পরিচালনা করিলেন, অতঃপর তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং সন্তানটিকে তাহার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—এই শ্রেণীর সন্তান পিতার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক হইবে না, এমনকি মিরাস বা উত্তরাধিকার স্বত্বেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হইবে না।

২০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনা বোখারী শরীফ ৮০০ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। তথায় এই বিষয়টিও উল্লেখ হইয়াছে যে, লেয়া'নের পর উক্ত মহিলাটির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, যেহেতু মহিলাটির স্বামী উক্ত সন্তানকে তাহার ঔরসের নয় বলিয়া ঘোষনা করিয়াছে, তাই সন্তানটি তাহার মাতার সম্পৃক্তে পরিচিত হইয়া থাকিত। এবং এরূপ স্থলে শরীয়তের বিধান ইহাই প্রচলিত যে, ঐরূপ সন্তানের মিরাস বা উত্তরাধিকারের সম্পর্ক শুধু মাত্র মাতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবে, পিতার সঙ্গে নহে।

২০৯১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এক লেয়া'নকারী দম্পতির আলোচনা হইল। তখন আ'ছেম (রাঃ) নামক এক ছাহাবী (আত্মম্ভরিতা মূলক) কোন কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি ঐ মজলিস হইতে উঠিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই পথি মধ্যে এক ব্যক্তি (—উক্ত আ'ছেমের জামাতা) তাহার নিকট অভিযোগ করিল যে, সে তাহার স্ত্রীর সহিত এক বেগানা পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে) পাইয়াছে। (অবশ্য স্ত্রী তাহা অস্বীকার করে, কিন্তু সে তাহার দাবীর উপর দৃঢ়।) তখন আ'ছেম (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, পূর্ব্বাহ্লে আমি যে দম্ভোক্তি করিয়া ছিলাম তাহারই প্রায়শ্চিত্তে আমি নিজেই এইরূপ ঘটনায় জড়িত হইয়া পড়িলাম (যে ঘটনায় লেয়া'ন ছাড়া গত্যন্তর নাই।) অতঃপর তিনি তাহাকে নিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্যক্তি হযরতের সম্মুখে তাহার দাবী পেশ করিল। ঐ ব্যক্তি ছিল গৌরবর্ণ, শীর্ণদেহ, মাথার চুল সোজা—কোঁকড়ানো নয়। আর যে বেগানা পুরুষটি সম্পর্কে তাহার দাবী ছিল সে বেগানা পুরুষটি ছিল শ্যামবর্ণ, মোটাদেহ, কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট। হযরত (দঃ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়া'ন পরিচালনা করিলেন।

উক্ত ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ দোয়া করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ! ঘটনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া দাও। স্ত্রী লোকটির সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর দেখা গেল, সন্তানটি ঐ বেগানা পূরুষের আকৃতি-বিশিষ্ট।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিলে পর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মহিলাটিই কি সে—যাহার সম্পর্কে হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, "জেনা সম্পর্কে সাক্ষী ব্যতিরেকে রজম তথা প্রস্থরাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়ার অবকাশ থাকিলে আমি নিশ্চয় এই নারীটিকে রজম করিতাম"? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই মহিলা সে নয়। সে ছিল অপর এক নারী। মোসলমান হওয়ার পরও তাহার জেনার অভ্যাস প্রকাশ পাইতেছিল (কিন্তু

নির্দিষ্টরূপের সাক্ষী প্রমাণের অভাবে রজমের বিধান প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদ করা যাইতে ছিল না।)

ব্যাখ্যা ঃ—আকৃতি ও দৈহিক গঠন ইত্যাদির নমুনা দ্বারা ঘটনা সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু উহার উপর ভিত্তি করিয়া আইন ও বিধানের দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না।

জেনার হদ্দ তথা প্রস্থরাঘাতে প্রাণদণ্ড বা একশত বেত্রাঘাত এবং হদ্দে কজফ—জেনার মিথ্যা তোহ্মত লাগাইবার শাস্তি আশি বেত্রাঘাত ইত্যাদি শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সাক্ষী-প্রমাণ আবশ্যক। শুধু আকার-আকৃতি, চাল-চলন স্বভাব-চরিত্রের আভাসের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে না। অবশ্য শাসন বিভাগ ঐরূপ ক্ষেত্রে তাম্বিহ ও সতর্ক করণ স্বরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

এ সম্পর্কে আরও একটি স্পষ্ট দলীল আছে। ইতিপূর্ব্বে যে হাদীছ খানা বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত হাদীছের ঘটনায় বোখারী শরীফ ৮০০ পৃষ্ঠায় এইবিষয়টিও বর্ণিত আছে যে, জেনার তোহ্মত ও তদ্দরুন লেয়া'ন হওয়ার পর দেখা গেল, মহিলাটি গর্ভবতী হইয়াছে। তখন হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, খর্বাকৃতি কাঁকলাসের ন্যায় লাল বর্ণের সন্তান জন্মিলে স্ত্রী সত্যবাদিনী ও স্বামী মিথ্যাবাদী মনে করিব, (কারণ স্বামী ঐ আকৃতির)। আর বড় নিতম্ব, বড় চক্ষু, কাল বর্ণের সন্তান জন্মিলে স্বামী সত্যবাদী এবং স্ত্রী মিথ্যাবাদিনী মনে করিব (কারণ জেনার তোহ্মতে জড়িত ব্যক্তি ঐ আকৃতির ছিল।) অবশেষে সন্তান দুর্ণামের আকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইল।

স্মরণ রাখিতে হইবে—আকৃতি ও বর্ণের তারতম্য প্রমাণ রূপেত কোন স্তরেই গণ্য হইবে না, শুধু একটা ধারণা করার সূত্র হইতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহাও একমাত্র ঐস্থলে যেখানে স্বামী সন্তানকে স্পষ্টরূপে তাহার ঔরসের নয় বলিয়া ঘোষনা করে। স্বামীর পক্ষের এইরূপ ঘোষনা প্রত্যক্ষ ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতেই সঙ্গত। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে স্বামীর পক্ষে এবং স্বামীর স্পষ্ট অস্বীকার ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে আকৃতি ও বর্ণের দরুন কোন দুষণীয় কথা বলা মহা অন্যায় ও জুলুম গণ্য হইবে। ২০৮৫ নং হাদীছে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইদ্দতের বয়ান

সাধারনতঃ তালাকের ইদ্দৎ হায়েজ বা ঋতু দ্বারা পালন করা হয়। যেই মেয়ের এখনও হায়েজ আরম্ভই হয় নাই কিম্বা বার্দ্ধক্যের দরুন যাহার হায়েজ বন্ধ হইয়া

গিয়াছে—এইরূপ মহিলার ইদ্দৎ তিন মাস পালিত হইবে। ইহা পবিত্র কোরআনের বর্ণিত বিধান—২৮ পাঃ ছুরা-তালাক ৪নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

গর্ভবতীর স্বামী মারা গেলে প্রসব পর্য্যন্তই ইদ্দৎ

এই মছআলাহটি কোরআন শরীফেও বর্ণিত আছে—

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"গর্ভবতীদের ইদ্দৎ ইহাই যে, সে সন্তান প্রসব করে।" (ছুরা তালাক ৪ আয়াত)

২০৯২। হাদীছ ঃ— উম্মে ছালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সোবায়য়া'হ্ নাম্নী এক রমণীর গর্ভকালে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামী-মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সে সন্তান প্রসব করে। অতঃপর আবুস-সানাবেল নামক এক ব্যক্তি ঐ রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তারপর (অন্য কাহারও সহিত বিবাহের প্রস্তুতি করিলে) তাহাকে সতর্ক করা হইল যে, তুমি দুই রকম ইদ্দতের দীর্ঘতম ইদ্দৎ অতিক্রম না করিয়া বিবাহ করিতে পার না। এই কথায় সে প্রায় দশ দিন বসিয়া থাকে; অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরনিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলে হযরত (দঃ) তাহাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— স্বামী-মৃত্যুর সাধারণ ইদ্দৎ হইল চার মাস দশ দিন। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে সে স্থলে তালাকের ইদ্দৎ হইল সন্তান প্রসব করা। স্বামী-মৃত্যুর অবস্থায়ও যদি গর্ভবতীর ইদ্দৎ সন্তান প্রসব করাকে ধরা যায় তবে তাহা চার মাস দশ দিনের কমও হইতে পারে বেশীও হইতে পারে। এই সূত্রে গর্ভবতীর পক্ষে স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দৎ সম্পর্কে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থাবলম্বন স্বরূপ কাহারও ধারণা ছিল যে, চার মাস দশ দিন এবং সন্তান প্রসব করা এই দুই প্রকার ইদ্দতের মধ্যে যেইটা দীর্ঘতম হইবে বিধবা গর্ভবতীকে সেই ইদ্দৎই পালন করিতে হইবে, উহার পূর্ব্বে সে অন্য বিবাহ করিতে পারিবে না। উল্লেখিত ঘটনায় বিধবা রমণীটিকে সেই সূত্রেই সতর্ক করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী (দঃ) উহার বিরুদ্ধে তাহাকে বিবাহের অনুমতি দানে প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, স্বামীর মৃত্যু ক্ষেত্রেও গর্ভবতীর ইদ্দৎ নির্দ্ধারিতরূপে সন্তান প্রসব করা তাহা চার মাস দশ দিনের কম দিনে হউক বা বেশী দিনে।

২০৯৩। হাদীছ ঃ— মেছওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সোবায়য়া'হ্ নামক রমণী তাহার স্বামীর মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পরই সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বিবাহের অনুমতি চাহিলে হযরত (দঃ) তাহাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন; সেমতে সে বিবাহ করিল।

ইদ্দৎ পালনকালে স্ত্রী স্বামীর গৃহেই অবস্থান করিবে

২০৯৪ হাদীছ ঃ—মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তাহার স্বামী তালাক দিয়া দিল। কন্যার পিতা আবদুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কন্যাকে স্বামীর গৃহ হইতে নিজ গৃহে নিয়া আসিল। তখন আয়েশা (রাঃ) মারওয়ানের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, (শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতে আল্লাহকে ভয় কর এবং তালাক প্রাপ্তা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে যথাসত্বর তাহার স্বামীর গৃহে ফেরত পাঠাইয়া দাও।

তদুত্তরে মারওয়ান এক কথা ত এই বলিল যে, কন্যার পিতা আবদুর রহমানকে এ বিষয়ে সম্মত করিতে পারি না। আর এক কথা এই বলিল যে, ফাতেমা-বিনতে কায়েস নাম্নী রমণীর ঘটনা আপনি অবগত নন কি? (সে বয়ান করিত যে, স্বামী তাহাকে তালাক দিলে পর স্বামীর গৃহ হইতে চলিয়া আসার অনুমতি তাহাকে হযরত নবী (দঃ) দিয়া ছিলেন।) আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এস্থলে সেই ঘটনা উল্লেখের কোন স্বার্থকতা নাই। মারওয়ান উত্তর দিল, আপনী যদি বলেন যে, ফাতেমার ঘটনায় একটি ওজর ছিল—স্বামীর গৃহবাসীদের সহিত তাহার ভীষণ ঝগড়া-বিবাদ হইত, তবে শুনুন, এস্থলেও অবস্থা তদ্রূপই।

ইদ্দৎ পালনকারীনী বিশেষ ওজরে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিতে পারে

২০৯৫। হাদীছ ঃ—ফাতেমা বিনতে কায়েস (যাহাকে স্বামী তিন তালাক দিয়াছিল এবং সে বলিয়া থাকিত যে, ইদ্দৎ পালন করাকালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে স্বামীর গৃহ ত্যাগের অনুমতি দিয়াছিলেন—সে) যে, এই বিবৃতি দিয়া থাকিত আয়েশা (রাঃ) তাহা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেন এবং তাহাকে কঠোর ভাষায় দোষারোপ করিতেন।

আয়েশা (রাঃ) মূল ঘটনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, ফাতেমা (স্বামীর সহিত) যে গৃহে বসবাস করিত উহা আশঙ্কাজনক স্থান ছিল, তাই হযরত নবী (দঃ) ফাতেমাকে তথা হইতে চলিয়া আসার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক বা দুই তালাক ক্ষেত্রে তালাকদাতা স্বামী তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে লাভ করার অধিকারী সর্ব্বাধিক

২০৯৬। হাদীছ ঃ— হাসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন মা'কেল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) ছাহাবীর ভগ্নি এক ব্যক্তির বিবাহে ছিল; সে তাহাকে এক তালাক দিয়া দিল এবং ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করার সুযোগও সে শেষ করিয়া দিল। ইদ্দৎ শেষ হওয়ার পর সে তাহাকে **পুনঃ** বিবাহ করার প্রস্তাব করিল।

ঐ মহিলার ভ্রাতা মা'কেল (রাঃ) ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার ভগ্নি তোমার বিবাহে দিয়া তোমার গৃহিণী বানাইয়া তোমাকে সম্মানিত করিয়া ছিলাম; তুমি তাহাকে তালাক দিয়া দিয়াছ, ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়ার যে সুযোগ ছিল তাহাও তুমি গ্রহণ কর নাই। এখন তুমি পুনঃ বিবাহের প্রস্তাব দিতেছ! খোদার কসম—তোমার নিকট আর সে যাইবে না।

লোকটি ভাল ছিল, মহিলাও তাহার প্রতি আকৃষ্টা ছিল। কিন্তু ভ্রাতা মা'কেল (রাঃ) তাহাদের মধ্যে অন্তরায় ছিল।

এই ঘটনা উপলক্ষেই কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—"স্ত্রীকে যদি (এক বা দুই) তালাক দাও এবং যদি ইদ্দৎ শেষ হইয়া যায়, তারপরও যদি তালাক দাতা স্বামী তাহাকে পুনঃ বিবাহ করিতে চায়—তাহাদের উভয়ের সম্মতি ক্ষেত্রে তোমরা কেহ সেই বিবাহে বাধার সৃষ্টি করিও না" (২ পাঃ ছুরা বাকারা, ২৩২ আয়াত)।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) মা'কেল (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিয়া উহা শুনাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অভিমান ক্ষোভ ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আল্লার আদেশের অনুগত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এখনই আমি ইহা সমাধা করিব। সেমতে তিনি ঐ বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

মছআলাহ—এক বা দুই তালাক সাধারণ তথা "বাইন" ব্যতিরেকে দেওয়া হইলে পুনঃ বিবাহ ছাড়া ইদ্দতের মধ্যে ঐ স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারে। ইদ্দৎ শেষ হইয়া গেলে, কিম্বা এক বা দুই তালাক বাইন দিলে ইদ্দতের ভিতরে বা বাহিরে পুনঃ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারিবে।

স্মরণ রাখিবে—এই এক তালাকের পর আবার কোন সময় দুই তালাক দিলে এবং দুই তালাকের পর এক তালাক দিলে সমষ্টি তিন তালাক গণ্য হইয়া এই স্ত্রী একে বারে হারাম হইয়া যাইবে। হালালার ক্ষেত্র ছাড়া পুনঃ বিবাহও হারাম হইবে।

স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শরীয়তী ব্যবস্থায় শোক পালন করিবে

২০৯৭। হাদীছ :—যয়নব বিনতে আবু ছালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উম্মুল মোমেনীন উম্মে হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর পিতার মৃত্যু হইল। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি স্বীয় চেহারায় সুগন্ধি লাগাইয়া বলিলেন, সুগন্ধি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না, কিন্তু আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে নারী আল্লার উপর এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তাহার পক্ষে কাহারও জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয নহে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

যয়নব বিনতে আবু ছালামাহ্ বলেন, আমি উম্মুল মোমেনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর নিকটও উপস্থিত হইয়াছি যখন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি সুগন্ধি আনিয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, এখন সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন আমার ছিল না, কিন্তু আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া ঘোষনা দিতে শুনিয়াছি—যে নারী আল্লার উপর এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তাহার পক্ষে কাহারও জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয হইবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

যয়নব বলেন, আমি উম্মুল মোমেনীন উম্মে ছালামাহ্ (রাঃ)কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, এক মহিলা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়াছে। মেয়েটির চোখে ব্যধি আছে, সেই জন্য তাহার চোখে সুরমা দেওয়া যাইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, না।* দুই তিন বারই মহিলাটি প্রশ্ন করিল হযরত (দঃ) প্রত্যেক বারই "না" বলিলেন। অবশেষে হযরত (দঃ) বলিলেন, স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন ইসলামের বিধানে মাত্র চার মাস দশ দিন রাখা হইয়াছে, অথচ ইসলাম-পূর্ব্ব যুগে কোন মহিলার স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই মহিলাকে নিকৃষ্টতম কাপড় পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে তৈল ও সুগন্ধি বিহীন অবস্থায় দীর্ঘ এক বৎসর কাল বসিয়া থাকিয়া অতঃপর কতিপয় বিশ্রী কু-প্রথা পালন করতঃ তথা হইতে বাহির হইতে হইত।

স্বামী-মৃত্যুর শোক পালনে নারী হায়েজের গোসলে গুপ্ত স্থান ধৌত করায় সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে

২০৭৮। হাদীছ ঃ— উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালনে আমাদিগকে নিষেধ করা হইত। হাঁ—স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন আবশ্যক এবং এই সময় আমরা সুরমা ব্যবহার করিতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করিতাম না, রঙ্গিন কাপড় পরিতাম না, অবশ্য ছিটাছিটা রংবিশিষ্ট কাপড় নিষিদ্ধ নহে। এতদ্ভিন্ন হায়েজ শেষে পাকী হাছিলের গোসল করিতে (হায়েজ স্থান যাহা ঘৃণা ও দুর্গন্ধময় বস্তু জড়িত ছিল উহাকে উত্তমরূপে) পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে "কোস্ত" নামক এক প্রকার সুগন্ধ বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইত।

---

* হযরত (দঃ) জ্ঞাত ছিলেন যে, এ স্থলে ব্যধি আশঙ্কাজনক নহে, অতি সাধারণ। ব্যধি আশঙ্কাজনক হইয়া সুরমা ব্যবহার অপরিহার্য্য হইলে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি আছে।

মছআলাহ—চার মাস দশ দিন শোক পালন কালে রঙ্গিন কাপড় নিষিদ্ধ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হইল সাজ-সজ্জা ও বেশ-ভূষা হইতে বিরত থাকা। অতএব ঐ শ্রেণীর নয় এইরূপ সাধারণ রঙ্গিন কাপড় পরিধানের অনুমতি আছে।

মছআলাহ—বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত স্ত্রীসুলভ সাক্ষাতের পূর্ব্বে তালাক দেওয়া হইলে সে ক্ষেত্রে যদি মহর নির্দ্ধারিত ছিল তবে স্ত্রীকে নির্দ্ধারিত মহরের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে হইবে।

আর যদি মহর নির্দ্ধারিত ছিল না তবে স্ত্রীকে মহররূপে কিছু দিতে হইবে না। কিন্তু স্ত্রীকে "মোত্আ" দিতে হইবে—ইহা পবিত্র কোরআনের নির্দ্দেশ (২ পাঃ ছূরা বাকারা ২৩৬নং আয়াত দ্রষ্টব্য)।

"মোত্আ" বলিতে মহিলাদের পূর্ণ পোশাক উদ্দেশ্য। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থা দৃষ্টে মধ্যম প্রকারের উক্ত পোশাক দিতে হইবে।

উল্লেখিত ক্ষেত্রে "মোত্আ" প্রদান করা ওয়াজেব, কারণ এই ক্ষেত্রে মহর দিতে হইবে না। অবশ্য তালাকের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মোত্আ প্রদান মোস্তাহাব যাহার উল্লেখ পরবর্ত্তী ২৪০নং আয়াতে আছে।

স্বীয় পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহনের ফজিলত

২০৯৯। হাদীছ ঃ— عن ابى مسعود الانصارى رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً -

অর্থ—আবু মসউদ আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লার আদেশকৃত দায়িত্ব পালনের) ছওয়াব হাসিলের নিয়্যত করিয়া মোসলমান ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণ করিলে উহা তাহার পক্ষে ছদকা বা আল্লার রাস্তায় দান বলিয়া গণ্য হইবে।

২১০০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন, হে আদম-তনয়! (আমার নির্দ্দেশ-পথে) তোমার অর্থ ব্যয় কর (বখীলী করিও না,) তাহা হইলে তোমার উপর আমার ব্যয় ও দান অব্যাহত থাকিবে।

২১০১। **ছাদীছ:—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ

كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাথ বিধবা, নিঃসহায় দরিদ্রের সাহায্যে সচেষ্ট থাকে তাহার মর্ত্তবা আল্লার পথে জেহাদে আত্ম নিয়োগকারীর সমতুল্য কিম্বা সারা দিন রোযা রাখে এবং সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া থাকে তাহার সমতুল্য।

পরিবারবর্গের ব্যয় বহন অতি বড় কর্ত্তব্য

২১০২। **ছাদীছ:—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَّالْيَدُ

الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ......

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম দান-খয়রাত উহা যাহার পরে স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। উপরের (তথা দানকারী) হাত নীচের (তথা গ্রহণকারী) হাত অপেক্ষা মর্য্যাদাশীল। যাহাদের ব্যয় বহন তোমার জিম্মায় রহিয়াছে প্রথমে তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ কর।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, অন্যথায় অশান্তি সৃষ্টি হইবে—স্ত্রী বলিবে আমাকে রীতিমত খোর-পোশ দাও নতুবা আমাকে তালাক দিয়া দাও আমি চলিয়া যাই। চাকর বলিবে, আমাকে খাইতে দাও এবং আমার হইতে কাজ লও। ছেলে বলিবে, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করুন, আমাকে কাহার উপর ছাড়িবেন?

পরিবারবর্গের এক বৎসরের খোরাকী জমা রাখা যায়

২২০৩। হাদীছ ঃ— বিশিষ্ট তাবেয়ী মা'মার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—সুফিয়ান ছৌরী (রঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবারবর্গের জন্য পূর্ণ বৎসর বা কতেক মাসের খোরাক জমা রাখা জায়েয আছে কি? ঐ প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত কোন তথ্য আমার স্মরণে আসিল না। অতঃপর একটি হাদীছ আমার মনে পড়িল।

ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনুনজীর ইহুদীদের বস্তি ও উহার বাগ-বাগিচা মোসলমানদের হস্তগত হইয়া বন্টিত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও উহার এক অংশের মালিক হইলেন। উহার উৎপন্ন হইতে নবী (দঃ) নিজ পরিবারবর্গের এক বৎসরের খোরাক সুরক্ষিত রাখিতেন এবং বিক্রিও করিতেন।

২১০৪ হাদীছ ঃ—মালেক ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় তাঁহার খাদেম ইয়ারফা আসিয়া বলিল, ওসমান, আবদুর রহমান যোবায়ের এবং সায়াদ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী—আপনি অনুমতি দিবেন কি? তিনি বলিলেন, "হাঁ"—এই বলিয়া অনুমতি দিলেন। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সালাম করতঃ বসিয়াছেন মাত্র, এরই মধ্যে ঐ খাদেম দ্বিতীয় বার আসিয়া ওমর (রাঃ)কে বলিল, আলী এবং আব্বাসও সাক্ষাৎ প্রার্থী তাঁহাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ—এই বলিয়া তাঁহাদেরকেও অনুমতি দিলেন।

তাঁহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সালামান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমার এবং ইহার (তথা আলীর) মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিন। ঐ সময় ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীত্রয়ও ওমর (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন, হাঁ—তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিয়া তাঁহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দিন।* তখন খলীফা ওমর (রাঃ)

---

* হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় খেজুর বাগান ছিল। হযরতের তিরোধানের পর আব্বাস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) উত্তরাধীকার স্বত্বের দাবীদার হইয়া ছিলেন, কিন্তু খলীফা আবু বকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "নবীগনের ত্যাজ্য সম্পত্তি আল্লার জন্য দান পরিগণিত হয় উহার মধ্যে মিরাস ও ভাগ বন্টন চলে না" এই হাদীছ অনুসারে আবুবকর (রাঃ) ঐ দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে পর আব্বাস (রাঃ) এবং ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উত্তরাধিকার সূত্রে আলী (রাঃ) উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে এই দাবী উত্থাপন করিলেন যে, উহা আল্লার রাস্তায় দানই পরিগণিত থাকিবে, কিন্তু উহার পরিচালন ভার আমাদের হাতে দেওয়া হউক। খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাতে রাজি হইয়া তাঁহাদের উভয়কে একত্রে ঐ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অনুরোধকারীগণকে বলিলেন, একটু থামুন। আসমান-জমিনের রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার কসম দিয়া আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবীগণ যাহা কিছু রাখিয়া যাই তাহার মধ্যে উত্তরাধীকার স্বত্ব চলে না। উহা আল্লার জন্য "দান" পরিগণিত হয়? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথা বলিয়াছেন। তৎপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও ঐরূপে কসম দিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও স্বীকার করিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্পত্তির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন, (মদীনার বনু-কোরায়জা মহল্লা এবং খায়বর অঞ্চলের ফদক এলাকা—) এই ভূ সম্পত্তিগুলিকে আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ ছাল্লাহাহু আলাইহে অসাল্লামের করায়ত্ত করিয়াছিলেন বিনা যুদ্ধে। অতএব শরীয়তের বিশেষ বিধান মতেই উহা একমাত্র হযরতের অধীকারে ছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) উহা জনগণকে না দিয়া একা গ্রাস করিয়া নেন নাই, বরং সকলের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দান করিয়াছেন। অবশিষ্ট এই বাগান কয়টি তাঁহার জন্য ছিল—তিনি উহার উৎপন্ন হইতে স্বীয় পরিবার বর্গের জন্য এক বৎসরের প্রয়োজন পরিমাণ জমা রাখিয়া দিতেন, তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা (ইসলাম ও মোসলমানদের উপকারার্থে) আল্লার ওয়াস্তে ব্যয় করিতেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সারা জীবন উক্ত সম্পত্তি এই নিয়মেই পরিচালনা করিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাঁহার বক্তব্যের উপর ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ইহা অবগত আছেন কি? তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)কে ঐরূপ কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারাও তাহা স্বীকার করিলেন। তারপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরতের তিরোধানের পর আবুবকর (রাঃ) খলীফা হইয়া বলিলেন, আমি রসুলুল্লার নায়েব এবং তাঁহারই কার্য্য পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছি, এই বলিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির পরিচালনার ভার নিজ হস্তে নিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে উহা পরিচালনায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হইতে থাকিলে এইবার তাঁহারা খলীফা ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়া এজমালীরূপে মোতাওয়াল্লী না রাখিয়া উভয়ের জন্য সম্পত্তি বণ্টন করতঃ উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইবার দাবী জানাইলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) এই সম্পত্তিকে যে কোন প্রকারে ভাগ বণ্টনের দাবী কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ তিনি আশঙ্কা করিলেন, এই সম্পত্তির উপর যে কোন উপায়ে ভাগাভাগী আসিলে অবশেষে উহা মালিকানা স্বত্বে পরিগণিত হইবে। আলোচ্য হাদীছে এই বিষয়াবলীই বর্ণিত হইতেছে।

নিয়মেই তিনি উহা পরিচালনা করিলেন। ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা তখন আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমালোচনা করিয়া থাকিতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, আবুবকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথের পথিক ছিলেন—হক্কের উপর ছিলেন।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, খলীফা আবুবকরের তিরোধানের পর আমি বলিলাম, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকরের নায়েব—তাঁহাদেরই কার্য্যপরিচালক নিযুক্ত হইয়াছি—এই বলিয়া আমি ঐ সম্পত্তির পরিচালন ভার নিজ হস্তে নিয়াছি। তখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট আসিয়াছিলেন, আপনাদের দাবী একই ছিল। আপনি (আব্বাস) স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অংশের দাবীদার ছিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পিতার অংশের দাবীদার ছিলেন। তখন প্রথমতঃ আমিও বলিয়াছিলাম যে, (আপনাদের দাবী অবাস্তব, কারণ) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের (তথা নবীদের সঙ্গে) উত্তরাধীকার স্বত্বের সম্পর্ক হইবে না; আমাদের ত্যজ্য সম্পত্তি "ছদ্‌কাহ্‌ ও দান" পরিগণিত হইবে।

অতঃপর যখন আমার ইচ্ছা হইল যে, (মালীকানা সূত্রে নয়, বরং শুধু মোতাওয়াল্লী ও কার্য্যপরিচালন সূত্রে) এই সম্পত্তি আপনাদের হস্তে অর্পন করিব, তখন আমি বলিয়াছি যে, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে এই সম্পত্তির পরিচালন ভার আপনাদের হস্তে অর্পন করিতে পারি এই শর্ত্তে যে, আপনাদের উপর আল্লার নামে শপথ ও অঙ্গিকার থাকিবে—আপনারা ইহার পরিচালনায় ঐ নীতিই অনুসরণ করিবেন, যে নীতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছিল, আবুবকরের ছিল এবং আমি খলীফা হওয়ার পর আমারও ঐ নীতি ছিল। তখন আপনারা উভয়ে বলিয়াছিলেন যে, এই শর্ত্তেই ইহার পরিচালন-ভার আমাদের উভয়কে অর্পন করুন। সে মতে আমি তাহা করিয়াছি। (তখন ভাগ-বন্টনের কোন কথাই ছিল না এবং তাহা হইতেও পারে না।) এখন আপনারা কি নূতন কোন ব্যবস্থা চাহিতেছেন? শুনিয়া রাখুন! আসমান জমিনের রক্ষাকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার কসম করিয়া আমি বলিতেছি, কেয়ামত পর্য্যন্ত আমি (ভাগ-বন্টনের) নূতন ব্যবস্থা করিব না। আপনারা যদি কাজ চালাইতে অক্ষম হন তবে ঐ সম্পত্তি পরিচালন-ভার আমার হাতে ফেরত দিয়া দেন; আমি উহার কার্য্য চালাইয়া যাইব, আপনাদের প্রয়োজন হইবে না।

স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর মাল হইতে দান করা

২১০৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মহিলা স্বীয় স্বামীর সঞ্চিত ধন হইতে

তাহার আদেশ ব্যতিরেকেও নেক কাজে খরচ করিলে সেও (স্বামীর ছওয়াবের) সমান ছওয়াব লাভ করিবে।

স্বামীর সংসারে খাটুনি খাটা

২১০৬। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে আসিলেন—আটা পিশায়ীর চাক্কী চালাইয়া তাঁহার হাতের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে। কারণ, তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, হযরতের নিকট (বাইতুল-মালের তথা মোসলমানদের মধ্যে বিতরণের) কতিপয় গোলাম আমদানী হইয়াছে। ফাতেমা (রাঃ) আসিয়া হযরত (দঃ)কে গৃহে পাইলেন না, অতএব তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া গেলেন। হযরত (দঃ) গৃহে আসিলে পর আয়েশা (রাঃ) ফাতেমার সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন।

আলী (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) রাত্রি বেলা আমাদের গৃহে আসিলেন, তখন আমরা বিছানায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ)-এর আগমনে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিলাম, হযরত (দঃ) আমাদিগকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকিতে বলিলেন এবং তিনি আসিয়া (স্নেহভরে) আমাদের দুইজনের মধ্যস্থলে বসিলেন, এমনকি তাঁহার পায়ের শীতলতা আমার পেটকে স্পর্শ করিল। এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা যেই জিনিষ (তথা গোলাম বা চাকর) চাহিয়াছ উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষের খোঁজ তোমাদিগকে দিব কি? তাহা এই যে—বিছানায় শুইবার সময়ে ৩৩ বার "ছোবহানাল্লাহ্" ৩৩ বার "আলহামদু-লিল্লাহ্" ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করিবা—ইহা তোমাদের পক্ষে গোলাম ও চাকর অপেক্ষা অধিক উপকারী হইবে।

গৃহের কাজ করা সুন্নত

২১০৭। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে থাকা কালে কি কাজ করিতেন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তখন হযরত (দঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের কাম-কাজ করিয়া দিতেন এবং আজান শুনিলে জামাতের জন্য চলিয়া যাইতেন।

অনাথ নিরাশ্রয়দের ব্যয় বহনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর

২১০৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন মৃত ব্যক্তিদেরকে জানাযার নামাযের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইত। (প্রথম দিকে তাঁহার অভ্যাস ছিল—) তিনি ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তি

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন, ঋণ পরিশোধ পরিমান অতিরিক্ত কিছু রাখিয়া গিয়াছে কি? যদি বলা হইত, হাঁ—ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছে, তবে তিনি স্বয়ং জানাযার নামায পড়াইতেন। আর যদি ঐরূপ সংবাদ দেওয়া না হইত তবে (স্বয়ং তাহার জানাযার নামায না পড়িয়া) মোসলমান দিগকে বলিতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা তোমরা পড়িয়া নেও।

অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বিভিন্ন এলাকার বিজয় দান করিলেন (এবং সেই আয়ে বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠিত করিলেন) তখন তিনি বলিলেন, মোমেন-মোসলমানদের জন্য আমি তাহাদের নিজ অপেক্ষা অধিক আপন। অতএব যে মোমেন-মোসলমান (মৃত্যুকালে অসহায় অবস্থায়) ঋণ বা নিরুপায় নিরাশ্রয় এতিম-বিধবা রাখিয়া যাইবে সেই ঋণ পরিশোধের এবং সেই নিরুপায় নিরাশ্রয়দের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর থাকিবে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তি ধন রাখিয়া গেলে উহা তাহার উত্তরাধিকারীগণেরই হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ - ঋণ বা কর্জে-হাছানা প্রদান একটি অতিশয় জনহিতকর ব্যবস্থা। দান করা অপেক্ষা ঋণ দেওয়ার উপকারিতা বেশী; কারণ সাধারণতঃ দানের পরিমান যাহা হয় উহাতে শুধু সাময়িক প্রয়োজন মিটানো যায়। দানের ক্ষেত্রে পরিমান বেশী করা কঠিন ব্যাপার। পক্ষান্তরে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিমানে বেশী দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ—যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটাইবার সুদীর্ঘ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়; এই জন্য হাদীছে ঋণের ছওয়াব দান অপেক্ষা আঠার গুণ বলা হইয়াছে। ঋণের টাকা ফেরৎ পাওয়া না গেলে ঋণ দেওয়ার ন্যায় একটি সুব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই নবী (দঃ) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। ঋণগ্রস্ত মৃতের জানাযা তিনি পড়াইতেন না—যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৪নং হাদীছেও এই বিষয়টি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নবী (দঃ) নিজের উপর তথ সরকারী ধনভাণ্ডারের উপর প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা চাপাইয়াছেন তবুও ঋণকে বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

● নবীজী (দঃ) কিছু মাত্র সরকারী আয়ের উৎস লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকারী ধন-ভাণ্ডার তথা বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠার উদ্‌বোধনী ভাষণে ইসলামের যে নীতি ঘোষনা করিয়া ছিলেন তাহা অতুলনীয়। সরকারী ধন-ভাণ্ডারের সর্ব্ব-প্রথম ব্যয়-বরাদ্দ তিনি ঘোষনা করিলেন—নিরুপায় নিরাশ্রয় সর্ব্বহারা এতিম বিধবা অনাথদের প্রতিপালন ও আশ্রয় দান, তাহাদের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার বহন। নবীজী (দঃ) রাষ্ট্রপ্রধান, স্বয়ং তিনি খেজুর পাতার ঝুপড়িতে বাস করেন, অথচ

রাষ্ট্রীয় ধন জনগণের জন্য ব্যয় করিতে এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিরাশ্রয় জনতার আশ্রয় দানের দায়িত্ব বহনে কত বড় বলিষ্ঠ ঘোষনা তিনি প্রদান করিলেন! যে—সকল এতিম-বিধবার ব্যয় বহন আমার কাঁধে নিলাম। এমনকি বাল-বাচ্চা নিয়া প্রাণ বাঁচাইবার তাকিদে ঋণের বোঝা লইয়া যে দুনিয়া ত্যাগ করিবে তাহার ঋণের বোঝাও আমার মাথায় উঠাইলাম; ঋণ দাতার ক্ষতি করা হইবে না।

প্রগতির দাবীদার বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রনায়কগণের প্রণীত বাজেট তথা সরকারী ধনের ব্যয় বরাদ্দের তুলনা নবীজীর ব্যয়-বরাদ্দ ঘোষনার সহিত করা হইলেই পার্থক্য এবং নবীজীর ঘোষনার বলিষ্ঠতা সহজে অনুমিত হইবে।

পানাহার সম্পর্কে

২১০৯। হাদীছ ঃ— ওমর-ইবনে-আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিপালনে ছিলাম। (এক বর্ত্তনে কতিপয় ব্যক্তি একত্রে) খানা খাওয়ার সময় আমি বর্ত্তনের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন দিক হইতে লোক্‌মা গ্রহণ করিতাম। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে বালক! খানা খাওয়ার সময় বিছমিল্লাহ্ বলিয়া খানা আরম্ভ করিবে, ডান হাতে খানা খাইবে এবং নিজের সম্মুখস্থল হইতে খাইবে।

ওমর-ইবনে-আবু ছালামাহ বলেন, অতঃপর আমি সারা জীবন খানা খাওয়ায় এই ছুন্নত পালন করিয়া চলিয়াছি।

২১১০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দর্জ্জি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে খানার দাওয়াত করিল। হযরতের সঙ্গে আমিও সেই দাওয়াতে গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছি, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ত্তনের চতুর্দ্দিক হইতে কদুর টুকরা সমূহ বাছিয়া বাছিয়া খাইয়া ছিলেন; ঐ দিন হইতে আমি কদু তরকারী ভাল বাসিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ—এক বর্ত্তনে একত্রে কতিপয় ব্যক্তি খানা খাইতে বসিলে সুন্নত তরিকা এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখস্থল হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। অপরের সম্মুখস্থলের দিকে হাত বাড়াইবে না। অবশ্য সঙ্গীগণ সম্পর্কে যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, ঐরূপ করিলে তাহারা মোটেই কোনরূপ অপছন্দ করিবে না, তবে ঐরূপ করা দুষনীয় নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

এক জনের পূর্ণ খানায় দুই জনের প্রয়োজন মিটিতে পারে

২১১১। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই জনের খানা তিন জনের এবং তিন জনের খানা চার জনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

ব্যাখ্যা :— এই হাদীছের উদ্দেশ্য হইল অভাবীদের সাহায্যে লোকদিগকে প্রলুব্ধ করা যে, কাহারও নিকট নিজের পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে আর একজন ক্ষুধার্ত আছে এরূপ স্থলে ঐ ক্ষুধার্তকে সঙ্গে লইয়া খাওয়া উচিত। এইরূপ করিলে আল্লাহ তায়ালা বরকত দিবেন এবং উভয়ের প্রয়োজন পূর্ণ হইবে। দুই জনের পক্ষে তৃতীয় জন এবং তিন জনের পক্ষে চতুর্থ জনের ব্যবস্থাও ঐরূপই।

মোমেন ব্যক্তি উদর পুরিয়া খায় না

২১১২। হাদীছ :— নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মিছকিন সঙ্গে না লইয়া খানা খাইতেন না। একদা আমি এক ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য ডাকিয়া আনিলাম; সে অনেক পরিমাণ খানা খাইল। পরে তিনি আমাকে বলিলেন, এই ব্যক্তিকে আর কোন দিন আমার সঙ্গে খাইবার জন্য ডাকিও না। আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—মোমেন এক উদরে খায়, আর কাফের সাত উদরে খায়।

২১১৩। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ছিল সে অনেক বেশী পরিমাণে খানা খাইত, সে ইসলাম গ্রহণ করিল, অতঃপর সে কম পরিমাণ খানা খাইত। এই ঘটনা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, মোমেন ব্যক্তি এক উদরে খায় পক্ষান্তরে কাফের সাত উদরে খাইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা :— আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, মোমেন ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক কাজেই এবাদৎ-বন্দেগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, এমনকি পানাহারের মধ্যেও সে সতর্কতা অবলম্বন করিবে যে, অতি মাত্রায় খাইলে অলসতার সৃষ্টি হইয়া এবাদৎ-বন্দেগীতে বিঘ্ন ঘটিবে সেই আশঙ্কায় সে কখনও উদর পুরিয়া পানাহার করিবে না। পক্ষান্তরে কাফেরদের সেই বালাই নাই; ভোগ-ভোজনই তাহাদের একমাত্র কাম্য তাই একজনে সাত জনের পানাহারে তৃপ্তি লাভ করে।

খানা খাইতে বসিবার নিয়ম

২১১৪। হাদীছ :— আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এক

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আসন আকারে বা হাতের উপর ভর করিয়া কিম্বা হেলান দিয়া খাইতে বসি না।

গোশ্ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাওয়া

আরবদেশে একটি বকরি সাধারণতঃ প্রায় ছয় খণ্ড করা হইত। এক একটি বাহু ও উরু এক এক খণ্ডই হইত। এইরূপ বড় বড় খণ্ড দাঁতে কাটিয়া খাওয়া অস্বাভাবিক। ঐরূপ বড় খণ্ড ছুরি-চাকু দ্বারা কাটিয়া খাওয়াতে কোন দোষ নাই।

প্রথম খণ্ডের ১৫২নং হাদীছখানা উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী দেখাইয়াছেন যে, একদা নবী (দঃ) বকরির একটি ভুনা আস্ত বাহু ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইয়া ছিলেন।

গোশতের খণ্ড বড় না হইলে এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণে-ছুরি কাঁটা ব্যবহার করা যাহা অধুনা ফ্যাসন রূপে প্রচলিত নবীজীর সুন্নত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

খাদ্য বস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি করিবে না

২১১৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কখনও কোন খাদ্য বস্তু সম্পর্কে খারাব উক্তি করিতেন না। পছন্দ হইলে গ্রহণ করিতেন, পছন্দ না হইলে গ্রহণ করিতেন না।

স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার নিষিদ্ধ

২১১৬। হাদীছ ঃ— عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, তোমরা চিকন বা মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করিও না এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে কিছু পান করিও না এবং উহার বর্তনে খানা খাইও না। কাফেরগণ দুনিয়াতে ঐ সবের দ্বারা ভোগ বিলাস করে, তোমরা আখেরাতে (—বেহেশতের মধ্যে) ঐ সব লাভ করিবে।

মধু ও মিঠা বস্তু

২১১৭। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিঠা বস্তু এবং মধু ভাল বাসিতেন।

বন্ধু-বান্ধবের জন্য বিশেষ খানা তৈরী করা

২১১৮। হাদীছ ঃ— আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু শোয়ায়েব নামক এক মদীনাবাসী ছাহাবী তাহার একটি ক্রীতদাস ছিল গোশত বিক্রয়কারী। ঐ ছাহাবী তাহার ক্রীতদাসকে বলিল, পাঁচ জন লোকে খাইতে পারে এই পরিমাণ খানা তৈরী কর; আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করিব। দাওয়াতে যাইবার সময় অতিরিক্ত একজন লোক হযরতের সঙ্গী হইল। হযরত (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন, তুমি আমাদের পাঁচ জনকে দাওয়াত করিয়া ছিলে; অতিরিক্ত একজন লোক আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে দাওয়াতে শরীক হওয়ার অনুমতি দিতে পার, ইচ্ছা করিলে অনুমতি না-ও দিতে পার। সে ব্যক্তি বলিল, হুজুর। আমার পক্ষ হইতে অনুমতি আছে।

নিম্নমানের খাদ্য বস্তুকেও ফেলাইতে নাই

২১১৯। হাদীছ ঃ— আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাত দিন আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অতিথি থাকিয়া ছিলাম। আমি দেখিয়াছি—তিনি, তাঁহার স্ত্রী এবং তাহার ভৃত্য তাহারা তিন জন সম্পূর্ণ রাত্রকে এবাদতের জন্য বণ্টন করিয়া লইয়াছেন। একজন তাহাজ্জোদ পড়িতে থাকেন তারপর তিনি অপর জনকে জাগাইয়া দেন—এইভাবে সারা রাত্র তাঁহার গৃহে তাহাজ্জোদ নামায পড়া হইতে থাকে। তাঁহার নিকট অবস্থান কালে তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—

একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণের মধ্যে খুরমা বণ্টন করিলেন। প্রত্যেকের ভাগে সাতটি করিয়া খুরমা আসিল। আমার ভাগের সাতটির মধ্যে একটি ছিল নীরস শক্ত চিটা শ্রেণীর; এইটিই আমার পছন্দসই ছিল। কারণ, উহাকে বেশী সময় মুখে চিবাইতে পারিয়াছি।

শুষ্ক খুরমা না বানাইয়া তাজা পাকা খেজুর খাওয়া

২১২০। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় এক ইহুদী ছিল—আমি তাহার নিকট খেজুর কাটিবার মৌসুমে (নির্দ্ধারিত তারিখে) প্রদান করা শর্তে খেজুর অগ্রিম বিক্রি করিয়া টাকা গ্রহণ করিতাম। মদিনার অনতি দুরে "রুমা" এলাকায় জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেজুর বাগান ছিল। এক বৎসর আমি ঐ ইহুদীকে খেজুর প্রদাণে নির্দ্ধারিত সময় হইতে বিলম্ব করায় বাধ্য হইয়া পড়িলাম।

মৌসুমের (নির্দ্ধারিত) সময় আসিলে ইহুদী আমার নিকট উপস্থিত হইল, অথচ আমি খেজুর এখনও কিছুই সংগ্রহ করি নাই। অতএব আমি তাহার নিকট পরবর্ত্তী বৎসর পর্য্যন্তের সময় চাহিলাম। সে তাহা অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সংবাদ দিলাম ; তিনি কতিপয় ছাহাবীকে বলিলেন, চল—জাবেরের জন্য ইহুদী হইতে সময় লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসি।

তাঁহারা আমার বাগানে আসিলেন এবং ইহুদীর সঙ্গে কথা বলিলেন। সে বলিল, আমি সময় দিতে পারিব না। নবী (দঃ) এই অবস্থা দৃষ্টে দাঁড়াইলেন এবং বাগানে ঘুরিয়া আসিয়া ইহুদীকে পুনরায় অনুরোধ করিলেন ; সে অস্বীকারই করিল।

এই সময় আমি কিছু তাজা পাকা খেজুর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে দিলাম। তিনি তাহা খাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বাগানে তোমার ঘর কোন্ স্থানে ? আমি তাঁহাকে উহা দেখাইলাম। তিনি তথায় বিছানা বিছাইতে বলিলেন ; আমি বিছানা বিছাইয়া দিলাম, তিনি তথায় ঘুমাইলেন। অতঃপর জাগ্রত হইলেন ; তখন আমি পুনরায় এক মুষ্টি তাজা পাকা খেজুর উপস্থিত করিলাম তিনি উহাও খাইলেন। নবী (দঃ) পুনরায় আবার ইহুদীকে অনুরোধ করিলেন ; সে প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি এইবারও দাঁড়াইলেন এবং বাগানে ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, জাবের ! তোমার বাগানে যে পরিমাণ খেজুরই আছে উহা সংগ্রহ কর এবং ইহুদীর প্রাপ্য পরিশোধ কর। সংগৃহিত খেজুরের নিকটে নবী (দঃ) দাঁড়াইয়া থাকিলেন। খেজুর এই পরিমাণ সংগৃহিত হইল যে, ইহুদীর প্রাপ্য পরিশোধ হইয়া ঐ পরিমাণই অবশিষ্ট থাকিল। (অথচ পূর্ব্বে বাগানে পরিশোধ পরিমাণ খেজুরও ছিল না।) এই বরকত দৃষ্টে আমি নবীজী সমীপে ছুটিয়া আসিলাম এবং স্বতঃস্ফুর্ত বলিলাম, (এই নূতন মোজেযা দৃষ্টে নূতন ভাবে) আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আপনি নিশ্চয় আল্লার রসুল।

আ'জওয়া নামক খেজুরের গুণ

২১২১। হাদীছ ঃ— সায়া'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি দিন ভোরে সাতটি আ'জওয়া খেজুর খাইবে—যত দিন সে উহা খাইবে ততদিন কোন প্রকার বিষ বা যাদু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারিবে না।

একত্রে খাইতে বসিলে পরস্পর সমান সমান খাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

২১২২। হাদীছ ঃ—জাবালা-ইবনে-ছোহায়েম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কতিপয় ব্যক্তি একত্রে বসিয়া খেজুর খাইতে ছিলাম। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে

ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় আমাদিগকে বলিলেন, কেহ কেহ এক সঙ্গে দুইটি করিয়া খেজুর উঠাইবে এইরূপ করিও না। হাঁ—যদি অপর সঙ্গীর অনুমতি লওয়া হয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

আঙ্গুল সমূহ চাটিয়া খাওয়া

২১২৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খানা খাওয়ার পরে হাত পরিষ্কার করার পূর্ব্বে অবশ্যই প্রত্যেকে হাত নিজে চাটিয়া খাইবে অথবা (আদর সোহাগরূপে) অন্যকেও চাটাইতে পারে।

খাওয়ার পর রুমাল ব্যবহার করা

২১২৪। হাদীছ ঃ—সায়ীদ (রঃ) ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, অগ্নিস্পর্শে তৈরী খাদ্য খাইলে নূতন অজু করিতে হইবে কি? জাবের (রাঃ) বলিলেন, না; হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় আমরা ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ খুব কমই পাইতাম; (খেজুরের উপরই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।) ঐ শ্রেণীর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ হইলে (হাত ধোয়ার পর) আমাদের ত রুমাল ছিল না তাই হাতে-পায়ে ধৌত হাত মুছিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতাম—নূতন ভাবে অজু করিতাম না।

খাওয়ার পর দোয়া

২১২৫। হাদীছ ঃ—আবু উমামাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, খাওয়া শেষে অবশিষ্ট খাদ্য বা দস্তরখান উঠাইবার সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া পড়িতেন ঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

অর্থ—পাক পবিত্র ও অফুরন্ত বহু বহু প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে প্রভু পরওয়ারদেগার! (তোমার নেয়ামত—খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আসূদা ও তৃপ্ত হইয়া অবশিষ্ট ফেরত দিতেছি, কিন্তু) ইহা হইতে কখনও অমুখাপেক্ষী হইতে পারিব না, উহাকে কখনও চিরবিদায় দিতে পারিব না, উহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিব না।

কোন কোন সময় এই দোয়াও পড়িতেন ঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُوْرٍ

অর্থ—সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লার জন্য যিনি দয়া করিয়া আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতি চিরপ্রত্যাশী এবং চিরকৃতজ্ঞ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পানাহার শেষে আরও একটি দোয়া বিভিন্ন হাদীছের কেতাবে বর্ণিত আছে ঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ -

অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন, পান করাইয়াছেন, অধিকন্তু আমাদিগকে মোসলমান দলভুক্ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—জগতের বুকে ইসলাম লাভের তৌফিক ও সুযোগ আল্লাহ তায়ালার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও এহ্‌সান। কোন এক কবি বলিয়াছে—

آدمیت دادۂ بازم مسلمان کردۂ

اے خدا قربان شوم احسان بر احسان کردۂ

হে খোদা! তুমি আমাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছ, তদুপরি মোসলমান হওয়ার সুযোগ ও তৌফিক দান করিয়াছ; আমি নিজকে তোমার চরণে বিলীন ও উৎসর্গ করিয়া দিলাম; তুমি কৃপার উপর কৃপা করিয়াছ।

এত বড় নেয়ামত ইসলাম! কিন্তু সেই নেয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শোকোর-গুজারীর প্রতি সাধারণতঃ খেয়াল ও মনোযোগ খুব কমই হইয়া থাকে। তাই দয়াল নবী স্বীয় উম্মতের জন্য পানাহারের দোয়ার সঙ্গে ইসলাম নেয়ামতের উপর শোকোর-গুজারীকে জড়াইয়া দিয়াছেন যেন উহা সর্ব্বদা সকলের মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে।

খাদ্য প্রস্তুতকারীকে খাদ্যের কিছু অংশ দেওয়া চাই

২১২৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমার খাদেম বা পরিচালক তোমার জন্য খানা নিয়া আসিলে তাহাকে তোমার সাথে বসাইয়া খাওয়াইবার মত মনোবল যদি তোমার না থাকে তবে অন্ততঃ এক-দুই লোকমা তাহাকে অবশ্যই দিবে। কারণ, এই খানা তৈরী করার সমুদয় কষ্ট ক্লেশ—আগুনের উত্তাপ ও ধুঁয়ার যন্ত্রণা সে-ই সহ্য করিয়াছে।

খাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালায় শোকোর আদায় করার ফজিলত

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আহার্য্য উপভোগকারী আল্লার শোকোর আদায় করিলে সে ঐ পরিমাণ ছওয়াবের অধিকারী হয় যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করে ঐ ব্যক্তি যে অনাহারী থাকিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক রোযা রাখিয়াছে।

আকিকার বয়ান

আকিকার সামর্থ্য না থাকিলে সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নাম রাখা ও মুখে-মিষ্টি দেওয়া

২১২৭। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল। আমি তাহাকে লইয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) তাহার নাম রাখিয়া দিলেন, ইব্‌রাহীম। অতঃপর একটি খুরমা চিবাইয়া তাহা শিশুটির মুখের ভিতর দিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য সর্ব্বাঙ্গিন বরকত ও উন্নতির দোয়া করিলেন, তারপর শিশুকে আমার নিকট দিয়া দিলেন।

২১২৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা একটি নবজাত শিশু হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোলে দেওয়া হইল। হযরত (দঃ) খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখের ভিতরে দিয়া দিলেন। শিশুটি হযরতের কোলে পেশাব করিয়া দিল ; হযরত (দঃ) পেশাব স্থানে পানি ঢালিয়া দিলেন।

২১২৯। হাদীছ ঃ—আবুবকর-তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মক্কায় থাকা কালেই (আমার ছেলে) আবদুল্লাহ গর্ভে থাকে। গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে আমি হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম এবং কোবা নগরীতে অবস্থান করিলাম, তথায় আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হইল। অতঃপর আমি তাহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিয়া আসিলাম এবং তাহাকে হযরতের কোলে রাখিয়া দিলাম। হযরত (দঃ) একটি খুরমা আনাইলেন এবং উহা চিবিয়া তাহার মুখের ভিতরে দিয়া দিলেন, অতঃপর তাহার উন্নতির জন্য দোয়া করিলেন। সে-ই ছিল মদীনার মধ্যে মোসলমানদের সর্ব্ব প্রথম নবজাত শিশু, যদ্দ্বারা মোসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া ছিল। কারণ, একটা গুজব ছড়াইয়া ছিল যে, ইহুদীরা মোসলমানদের প্রতি যাদু করিয়াছে—মোসলমানদের সন্তানাদি হইবে না।

আকিকা করা আবশ্যক

২১৩০। হাদীছ ঃ— সালমান ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আকিকা করার কর্ত্তব্যও আসিয়া পড়ে। সুতরাং তাহার পক্ষ হইতে জানোয়ার জবেহ করিবে এবং তাহার মাথা কামাইয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে।

২১৩১। হাদীছ ঃ—হাসান বছরী (রঃ) সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, শিশু আবদ্ধ থাকে আকিকার সঙ্গে। সপ্তম দিন শিশুর পক্ষ হইতে জানোয়ার জবেহ করিবে এবং তাহার মাথা কামাইয়া দিবে ও নাম রাখিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—সামর্থ্য থাকিলে আকিকা করার আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে, যেন শিশু উহার সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছে। আকিকার কাজ সমাধা করিয়া শিশুকে মুক্ত করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলিয়াছেন, (সামর্থ্য থাকা সত্বেও) সন্তানের আকিকা না করা হইলে কেয়ামতের দিন মাতা-পিতার জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করা হইবে না। (ফতহুলবারী)

সপ্তম দিন আকিকা করাই উত্তম, এমনকি প্রথম সপ্তম দিন আকিকা করা না হইয়া থাকিলে দ্বিয়ীয় বা তৃতীয় সপ্তম দিন করিবে।

রজব মাসের সম্মানে জানোয়ার জবেহ করা

২১৩২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "ফরা" ও "আতীরা" ইসলাম বিরোধী কাজ।

অন্ধকার যুগে রীতি ছিল—পালিত পশুর প্রথম বাচ্চাটিকে দেব-দেবীর নামে জবেহ করা হইত উহাকেই "ফরা" বলা হয়। তদ্রূপ রজব মাসের সম্মানেও জানোয়ার জবেহ করা হইত উহাকেই "আতীরা" বলা হয়।

জবেহ করার বয়ান

জবেহ দুই প্রকার—(১) নিয়মিত জবেহ, তাহা হইল—গলা তথা বুক ও হল্কোমের মধ্যে কোন স্থানে বিশেষ চারিটি বা চারিটির মধ্যে অন্ততঃ তিনটি রগ বিছমিল্লাহে-আল্লাহু-আকবার বলিয়া ধারাল বস্তু দ্বারা কাটিয়া দেওয়া। (২) এজতেরারী বা ঠেকা উদ্ধারের জবেহ, তাহা হইল—জীব দেহের কোনও স্থান ধারাল জিনিষ দ্বারা বিছমিল্লাহ্ বলার উপর কাটিয়া দেওয়া।

এই দ্বিতীয় প্রকার জবেহ একমাত্র ঐ স্থলেই অনুমোদিত যেখানে নিয়মিত জবেহ সম্ভব নহে, নতুবা নিয়মিত জবেহ অবশ্যই করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকার জবেহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত্ত হইল জীব-দেহের কোন স্থান বা কোন অঙ্গকে কাটিতে হইবে যাহার জন্য ধারাল বস্তু হওয়া আবশ্যক।

কাটা ব্যতীত কোন বস্তুর আঘাতে মৃত্যু হইলে বা উৰ্দ্ধ হইতে পতিত হওয়ায় মৃত্যু হইলে বা অন্য পশুর শিংএর আঘাতে মৃত্যু হইলে বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু হইলে তাহা সাধারণ মৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হারাম পরিগণিত হইবে। ইহা শরীয়তের একটি বিধান যাহা পবিত্র কোরআনে ষষ্ঠ পারা ছুরা মায়েদার প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যে কোন প্রকারের মৃত্যু উল্লেখিত কোন শ্রেণী ভুক্ত মৃত্যু হইলে সেই ক্ষেত্রে উহা সাধারণ মৃত গণ্য হইয়া হারাম পরিগণিত হইবে যেমন—

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْمَقْتُوْلَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ -

"গুলির আঘাতে মৃত সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা "মওক্‌জাহ্—আঘাতে মৃত"-এর শ্রেণীভুক্ত (যাহাকে কোরআনে হারাম বলা হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—গুলি চাই আকারে বড় হউক যেমন ধনু বা গুলাইলের গুলি, কিম্বা আকারে ছোট ছোট হউক যেমন বন্দুকের কার্তুজে ভরা গুলি সমূহ—ইহা যেহেতু ধারাল বস্তু নহে, বরং গোলাকৃতির, তাই ইহা দ্বারা শরীর কাটিবে না শুধু আঘাত লাগিবে, এমনকি ভীষণ আঘাতে ছিন্ন হইয়া রক্তও প্রবাহিত হইতে পারে; সুতরাং যে কোন প্রকার গুলির আঘাতে মৃত মৃতই গণ্য হইবে এবং হারাম হইবে, উহা কোন পর্য্যায়ের জবেহ পরিগণিত হইবে না। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই বিষয়টিই বুঝাইয়াছেন।

২১৩৩। হাদীছ ঃ— আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লোহার ফলক বিশিষ্ট লাঠির দ্বারা কৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহার ধারাল অংশের কোপে কাটিয়া থাকিলে তাহা খাইতে পারিবে। আর উহার ডাণ্ডার আঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহা মওক্‌জাহ্—আঘাতে মৃত গণ্য হইবে, উহা খাইতে পারিবে না।.........

শিকারী কুকুর দ্বারা কৃত শিকার

কুকুর ও বাজ পাখীকে শিকারী হওয়ার শিক্ষা দান করতঃ শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত শিক্ষার পরিচয় যথা রীতি দেখা যাওয়ার পর যদি উহাকে কোন জংলী পশু-পক্ষীর প্রতি বিছমিল্লাহ বলিয়া ধাবিত করা হয় এবং সে উহাকে ঘায়েল করতঃ মৃত অবস্থায় মালিকের নিকট নিয়া আসে, সে নিজে উহার কোন অংশ ভক্ষন না করে তবে উহা দ্বিতীয় প্রকার জবেহ পরিগণিত হইয়া হালাল গণ্য হইবে। কিন্তু মালিক যদি ঐ শিকারকে জীবিত পায় তবে অবশ্যই উহাকে নিয়মিত জবেহ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় তাহার হাতে জবেহ না হইয়া মরিয়া গেলে তাহা মৃত গণ্য হইবে এবং হারাম হইয়া যাইবে।

২১৩৪। হাদীছ ঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা শিক্ষিত কুকুরকে ধাবিত করিয়া থাকি জংলী পশু শিকার করার জন্য। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ কুকুর যেটাকে পাকড়াও করে তোমার জন্য (অর্থাৎ শিকার করিয়া তোমার জন্য যেমনটি তেমন রাখে—সে নিজে উহার কোন অংশ ভক্ষন না করে) সেইটাকে তুমি খাইতে পার। আমি আরজ করিলাম, যদি কুকুর উহাকে মারিয়া ফেলিয়া থাকে? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি মারিয়া ফেলে তবুও উহা হালাল হইবে।

২১৩৩নং হাদীছে উল্লেখ আছে, আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ইহাও আরজ করিলাম যে, আমরা কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার কুকুরকে যদি তুমি বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড়িয়া থাক তবে উহার কৃত শিকার খাইতে পারিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কুকুর যদি ঐ শিকারের কিছু অংশ ভক্ষন করিয়া থাকে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে উহা খাইতে পারিবে না, কারণ উহাকে কুকুর নিজের জন্য শিকার করিয়াছে তোমার জন্য শিকার করে নাই। (নতুবা সে উহা খাইত না, ইহাই তাহার শিক্ষার আসল পরিচয়।) আমি ইহাও আরজ করিলাম যে, কোন সময় একটি পশুকে শিকার করিতে আমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও শামিল হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ শিকার খাইতে পারিবে না, কারণ তুমি ত তোমার কুকুরকে বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড়িয়াছ, অন্য কুকুরকে ত তুমি বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড় নাই।

২১৩৫। হাদীছ ঃ—আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ্। আমরা ইহুদী-নাছারাদের দেশে বাস করি,

তাহাদের পাত্রে কি আমরা খাইতে পারি? আরও আরজ করিলাম, আমাদের দেশে শিকার পাওয়া যায়—আমরা তীর-ধনু দ্বারা শিকার করিয়া থাকি, শিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি এবং অশিক্ষিত কুকুর দ্বারাও শিকার করিয়া থাকি—এই সবের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে হালাল হইবে?

হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহুদী-নাছারাদের পাত্র ভিন্ন যদি অন্য পাত্র পাও তবে তাহাদের পাত্রে খাইও না, আর যদি অন্য পাত্র না পাও তবে উহাকে ধৌত (করিয়া পাক) করতঃ উহার মধ্যে খাইতে পার। আর তীর-ধনুর দ্বারা শিকার যদি বিছমিল্লার সহিত করিয়া থাক তবে উহা খাইতে পার। শিক্ষিত কুকুর দ্বারা শিকার যদি বিছমিল্লার সহিত করিয়া থাক তাহাও খাইতে পার। অশিক্ষিত কুকুরের শিকারকে যদি জবেহ করিয়া নিতে পার তবে উহা খাইতে পারিবে।

শিকার করার জন্য কুকুর পোষা

২১৩৬। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال —

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ

مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

অর্থ—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু-পালের হেফাজতকারী কুকুর বা শিকার করার কুকুর ব্যতীত, অন্য কুকুর পোষিবে প্রতি দিন তাহার নেক আমলের ছওয়াব ছুই ক্বিরাৎ পরিমাণ কমিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—"ক্বিরাৎ" নিক্তির ওজনের ক্ষুদ্রতম একটি পরিমাণ বিশেষ, কিন্তু কেয়ামতের দিন—যে দিন বিভিন্ন ক্ষুদ্র জিনিষও ফলাফলের দিক দিয়া অনেক বড় হইবে সেই কেয়ামতের দিন এক ক্বিরাতের পরিমাণ অন্য এক প্রসঙ্গে হাদীছের মধ্যে ওহোদ পাহাড় সমান হইবে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

২১৩৭। হাদীছ ঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি যে, আমরা কুকুর দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, শিক্ষা প্রদত্ত কুকুরকে যদি তুমি বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড় এবং সে তোমার জন্য শিকার করিয়া আনে তবে তাহা খাইতে পার যদিও তাহার আক্রমণে শিকার মরিয়া গিয়া থাকে। কিন্তু যদি সে উহার কিছু অংশ ভক্ষন করে তবে মনে করিতে হইবে সে উহা তোমার জন্য শিকার করে নাই, (অতএব উহা জবেহ করিতে না পারিলে

হালাল হইবে না।) আর যদি তোমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুর শরীক হইয়া শিকার ধরে (এবং ঐ শিকার মরিয়া যায়) তবে তাহা খাইতে পারিবে না।

২১৩৮। হাদীছ ঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—নবী(দঃ) বলিয়াছেন, তোমার কুকুরকে বিছমিল্লাহ বলিয়া (কোন শিকারের প্রতি) ছাড়িয়াছ, সে শিকার করিয়াছে এবং মারিয়া ফেলিয়াছে তবুও খাইতে পারিবে, কিন্তু যদি ঐ কুকুর শিকারের কিছু অংশ ভক্ষন করে তবে উহা খাইতে পারিবে না, কারণ সে উহা নিজের জন্য ধরিয়াছে। আর যদি তোমার কুকুরের সহিত অন্য কুকুর যাহাকে বিছমিল্লাহ বলিয়া ছাড়া হয় নাই, শামিল হইয়া শিকার করিয়া থাকে এবং শিকার মরিয়া গিয়াছে তবে ঐ শিকার খাইও না। কারণ তুমি জান না যে, কোন কুকুরটি শিকারকে বধ করিয়াছে।

আর যদি তুমি কোন শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়া থাক এবং তালাশে লাগিয়া থাকিয়া এক-দুই দিন পরে তুমি ঐ শিকারকে মৃত অবস্থায় পাও তবে যদি উহার মধ্যে একমাত্র তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত মৃত্যুর অন্য কোন কারণের চিহ্ন বা প্রমাণ পাওয়া না যায় তবে তুমি উহাকে খাইতে পার, আর যদি উহাকে পানিতে ডুবা অবস্থায় পাও তবে উহা খাইতে পারিবে না।

বাঁশের ফালি বা ভাঙ্গা পাথর খণ্ড ইত্যাদি যাহা দ্বারা কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত করা যায় উহা দ্বারা জবেহ হইতে পারে

২১৩৯। হাদীছ ঃ—কায়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি ক্রীতদাসী বকরির পাল চরাইতে ছিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, একটি বকরি মুমূর্ষু অবস্থায়, তখন সে একটি পাথর ভাঙ্গিয়া উহার (ধারাল কিনারা) দ্বারা ঐ বকরিটিকে জবেহ করিয়া দিল। কায়াব (রাঃ) স্বীয় লোকদিগকে বলিলেন, ইহা কেহ খাইও না যাবৎ না আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) উহাকে খাইবার আদেশ করিলেন।

মছআলাহ ঃ—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহিলারাও জবেহ করিতে পারে।

২১ ০। হাদীছ ঃ—রাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—কোন এক জেহাদের ছফরে তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাদের নিকট ছোরা-চাকু নাই (কি দিয়া জবেহ করিব?) হযরত (দঃ) বলিলেন, যে কোন বস্তু কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত করে উহা দ্বারাই জবেহ করিতে পার, নখ ও দাঁত দ্বারা হইবে না। নখ দ্বারা হাব্‌শীগণ জবেহ করে, আর দাঁত (ধারাল বস্তু নহে) উহা হাড় শ্রেণীর।

ঐ জেহাদে আমরা উট-বকরি গণিমতরূপে শত্রু পক্ষ হইতে লাভ করিয়া ছিলাম, উহা হইতে একটি উট ছুটিয়া গিয়া আমাদের হাত-ছাড়া হইবার উপক্রম হইল। (উহাকে ধরিবার মত কোন ব্যবস্থাও আমাদের নিকট ছিল না;) এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল উহাতেই তাহার দফারফা হইয়া গেল। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উট গৃহ-পালিত পশু বটে, কিন্তু অনেক সময় উহা জংলী জানোয়ারের রূপ ধারণ করিয়া বসে; এমতাবস্থায় যদি উহা হাত-ছাড়া হওয়ার পর্য্যায়ে চলিয়া যায় তবে তাহাকে এইরূপই করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত উটের ঘটনা দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এবং অন্যান্য ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ একটি জরুরী মছআলাহ প্রমাণিত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জবেহ্ দুই প্রকার—(১) নিয়মিত জবেহ্ এবং (২) এজতেরারী জবেহ্। দ্বিতীয় প্রকার জবেহ্ সাধারণতঃ একমাত্র জংলী পশু-পক্ষীর জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে। গৃহ পালিত পশু-পক্ষীর জন্য নিয়মিত জবেহই নির্দ্ধারিত, কিন্তু কোন পালিত পশু যদি পোষ-মানা ত্যাগ করতঃ জঙ্গলীরূপ ধারণ করিয়া বসে, যেমন উট ও মহিষের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় এবং ষাঁড়ের মধ্যেও কোন কোন সময় দেখা যায় যে, পোষ-মানা ছাড়িয়া দেয়, মানুষের হাতে ধরা দেয় না, বরং মানুষ দেখিলেই আঘাত করিতে আসে, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, পাগলা হইয়া গিয়াছে—এই অবস্থা সাধারণতঃ উট মহিষ ও ষাঁড় ইত্যাদি বড় জানোয়ারের ক্ষেত্রেই ধর্তব্য, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি ছোট জানোয়ারের বেলায় ধর্তব্য নহে। তদ্রূপ কোন গৃহ পালিত পশু যদি গৃহে বাসের অভ্যাস ত্যাগ করতঃ জঙ্গলী পশুর ন্যায় গৃহ মুক্ত হইয়া মানুষের নাগাল হইতে ছুটিয়া পালায় এবং মরু প্রান্তর বা নিবিড় বন-জঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতে থাকে—এই উভয় ক্ষেত্রেই সেই পালা-পোষা পশুও জঙ্গলী পশুর ন্যায় গণ্য হইবে এবং ঐরূপ অবস্থায় উহার উপর দ্বিতীয় প্রকার জবেহ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।

এতদ্ভিন্ন যদি কোন গৃহ পালিত পশু এমন বেকায়দা স্থানে পতিত হয় যে স্থান হইতে যথা সময়ে উহাকে উদ্ধার করাও সম্ভব নহে এবং ঐ স্থানে যাইয়া উহাকে নিয়মিত জবেহ করারও সুযোগ নাই, অথচ অনতিবিলম্বে কিছু করা না হইলে উহার ধ্বংস সাধিত হইবে। যেমন, কোন জানোয়ার যদি কূপের মধ্যে পতিত হয়, এমতাবস্থায় উহার উপর আবশ্যকীয় জবেহ প্রযোয্য হইবে। অবশ্য খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ধারাল অস্ত্রের আঘাতে যেন উহার মৃত্যু ঘটে, অন্য কোন কারণে নহে। যেমন, কূপের পানিতে যেন উহার নাক ডুবিয়া না থাকে। ক্ষত করিয়া জবেহের কাজ সমাধা করিতে হইবে।

আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এই ফৎওয়া দিতেন।

বিছমিল্লাহ বলিয়া জবেহ করা

কোন জীব জবেহ করাকালে বিছমিল্লাহ তথা আল্লার নাম উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। ইচ্ছাকৃত উহা এড়াইয়া গেলে ঐ জীব মৃত গণ্য হইবে—উহা খাওয়া হারাম হইবে। ইহা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধান—

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"যেই জীব জবাহ করার সময় আল্লার নাম লওয়া হয় নাই ঐ জীব খাইবে না।"

অবশ্য যদি ভুলে আল্লার নাম উচ্চারণ ছুটিয়া যায় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ভুলে আল্লার নাম উচ্চারণ ছুটিয়া গেলে উহা খাওয়ায় দোষ হইবে না।

মহিলার জবাহ করা

২১৪১। হাদীছঃ— কাআব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মহিলা (ধারাল ভাঙ্গা) পাথর খণ্ড দ্বারা জবাহ করিল। সেই সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ঐ জবাহ কৃত জীবকে খাওয়ার আদেশ করিলেন।

জব্ব্—সাণ্ডা খাওয়া

ইহা একটি পাহাড়ী জীব, গর্তের মধ্যে বাস করে পানির এলাকায় থাকে না।

২১৪২। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "জব্ব্" আমি খাই না; তবে আমি উহাকে হারামও বলি না।

২১৪৩। হাদীছঃ—খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (স্বীয় খালা উম্মুল-মোমেনীন) মাইমুনা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভাজা করা "জব্ব্" উপস্থিত করা হইল! রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার দিকে হাত বাড়াইলেন। উপস্থিত একজন নবী-পত্নী বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা খাইতে উদ্যত হইতেছেন উহা কি জিনিষ তাহা বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলেই বলিল, ইহা জব্ব্। রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ হস্ত উঠাইয়া নিলেন। খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি হারাম ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বলিলেন, না; তবে আমাদের এলাকায় ইহা নাই, অতএব উহার প্রতি আমার ঘৃণা মনে হয়। খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি উহাকে আমার সম্মুখে টানিয়া আনিলাম এবং খাইতে লাগিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার প্রতি তাকাইতে ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ– আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে, নবী (দঃ) জব্ব্ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হানফী মজহাবের আলেমগণ বলেন, এই হাদীছ অনুসারে জব্ব্ খাওয়া নিষিদ্ধ। উপরের হাদীছদ্বয় প্রথম কালের।

মছআলাহ ঃ—সাধারণ অবস্থায় একমাত্র ঐ বস্তুই খাইতে পারিবে যাহা শরীয়ত মতে হালাল। হারাম বস্তু খাইতে পারিবে না ; অবশ্য যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাধ্য হইয়া পড়ে তবে হারাম বস্তু শুধু প্রাণ বাঁচাইবার পরিমাণে খাইতে পারিবে। ইহা কোরআনের বিধান—২ পাঃ ছুরা বাকারা ১৭২,১৭৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

কোন জীবের প্রতি চানমারী করা

২১৪৪। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সঙ্গে ছিলাম, তাঁহার চলার পথে কতিপয় যুবক একটি মুরগীকে বাঁধিয়া রাখিয়া উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতঃ লক্ষ্য ঠিক করা শিখিতে ছিল। তাহারা দুর হইতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়া ছুটিয়া পালাইল। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুরগীটিকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া খোঁজ নিতে লাগিলেন, এই কাজ কে করিল এবং তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি এই কাজ করে হযরত নবী (দঃ) তাহার প্রতি লা'নৎ করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নৎ করিয়াছেন ঐ ব্যক্তিকে যে কোন প্রাণীকে জীবিত অবস্থায় কোন অঙ্গহানি করিয়া দেয়।

মোরগের গোশ্ত খাওয়া

২১৪৫। হাদীছ ঃ— যহ্দম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ছাহাবী আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বসা ছিলাম। আমাদের সম্মুখে খানা উপস্থিত করা হইল উহার মধ্যে মোরগের গোশ্ত ছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে গৌর বর্ণের একজন লোক ছিল সে ঐ খানায় শরীক হইল না। আবু মূছা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আস ! খানায় শামিল হও। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মোরগের গোশ্ত খাইতে দেখিয়াছি। ঐ লোকটি বলিল, একদা আমি মোরগকে খারাব জিনিষ খাইতে দেখায় আমার ঘৃনা জন্মিয়াছে, এমনকি আমি কসম করিয়াছি যে, আমি মোরগের গোশ্ত খাইব না।

আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, আস ! খানায় শামিল হও। তোমার কসম প্রসঙ্গে আমি তোমাকে হাদীছ শুনাইতেছি—

একদা আমি আমার গোত্রীয় কতিপয় লোকের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ছদকা-খয়রাতে আগত পশু-পাল গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিতে ছিলেন। ঐ সময় তিনি (কোন ব্যাপারে) রাগান্বিত ছিলেন, এমতাবস্থায় আমরা তাঁহার নিকট ছওয়ারী বানাইব বলিয়া জানোয়ার চাহিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে ছওয়ারী দিবেন না বলিয়া কসমের সহিত অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট তোমাদিগকে ছওয়ারীরূপে দিবার মত অবশিষ্ট কোন কিছু নাই।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই গণিমতের কতিপয় উট হযরতের নিকট পৌঁছিল। তখন হযরত (দঃ) আমাদিগকে খোঁজ করিলেন এবং আমাদিগকে পাঁচটি উট দিলেন। তথা হইতে আমরা চলিয়া আসার অনতিকাল পরেই আমি আমার সঙ্গীগণকে বলিলাল, হযরত (দঃ) (বোধ হয়) তাঁহার কসম ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই ভুলের সুযোগ গ্রহণ করিলে আজীবন আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। সেমতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পুনঃ উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি ত আমাদিকে ছওয়ারী না দেওয়ার কসম করিয়া ছিলেন, (কিন্তু পরে আমাদিগকে তাহা দিয়াছেন—) মনে হয় আপনি কসম ভুলিয়া গিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ছওয়ারী দেওয়ার সুযোগ দিয়াছেন (তাই আমি দিয়াছি। আর কসম সম্পর্কে কথা এই যে,) কোন বিষয় কসম খাওয়ার পর যখন আমি কসমের বিপরীত দিকটা উত্তম বলিয়া বুঝি তখন আমি ঐ উত্তমটাকে কার্য্যে পরিণত করি এবং কসমের কাফ্ফারা দিয়া দেই।

ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া

২১৪৬। হাদীছ ঃ— আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আমরা একবার একটি ঘোড়া জবেহ করিয়াছি এবং উহা খাইয়াছি।

২১৪৭। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের জেহাদ কালে গাধার গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ছিলেন এবং ঘোড়া সম্পর্কে অনুমতি দিয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত একটি হাদীছও অন্যান্য কেতাবে বর্ণিত আছে, অবশ্য সেই হাদীছ খানার সনদ (তথা উহা হাদীছ হওয়ার প্রমাণ) একটু দুর্ব্বল ; তাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক প্রমুখ ইমামগণ ঘোড়ার গোশ্‌তকে মকরুহ বলিয়াছেন।

গাধার গোশ্‌ত খাওয়া

২১৪৮। ছাদীছ ঃ—আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ-পালিত গাধার গোশ্‌ত হারাম বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন।

২১৪৯। ছাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল, গাধার গোশ্‌ত খাওয়া হইতেছে। পুনরায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ অভিযোগই করিল। তৃতীয়বার এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, গাধা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলা হইতেছে। এইবার হযরত (দঃ) এই ঘোষনা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দেওয়ার আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহ পালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন, কারণ উহা অপবিত্র হারাম।

এই ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে যত ডেগের মধ্যে গাধার গোশ্‌ত রান্না করা হইতে ছিল এবং উহা টগবগ করিতে ছিল এমতাবস্থায় ঐ সব ডেগ উপূড় করিয়া সব গোশ্‌ত ফেলিয়া দেওয়া হইল।

হিংস্র জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া

২১৫০। ছাদীছ ঃ— আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকল প্রকার হিংস্র জীবের গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মৃত জীবের চামড়া কাজে লাগানো

২১৫১। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার চলার পথে একটি মৃত বকরি দেখিতে পাইলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা ইহার চামড়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা কর নাই কেন? সকলেই আরজ করিল, ইহা ত মৃত! হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা শুধু খাওয়া হারাম।

২১৫২। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়ছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন; তখন বলিলেন, এই ছাগলের মালিকদের পক্ষে কোন দোষ ছিল না যদি তাহারা ইহার চামড়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মৃত জীবের চামড়া দাবাগত তথা বিশেষ কায়দায় শুষ্ক করার পর উহা ব্যবহার করা যায়।

খরগোশ খাওয়া

২১৫৩। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মার্‌রোজ-জাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশকে ধাওয়া করিলাম। সঙ্গীগণ দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া গেল। অতঃপর আমি উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং (আমার মুরব্বী) আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট নিয়া আসিলাম। তিনি উহাকে জবেহ করিলেম এবং উহার পাছের রান দুইটি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন।

কোরবানীর বয়ান

ঈদের নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করিলে কোরবানী আদায় হয় না

২১৫৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করিয়াছে তাহার সেই জবেহ শুধু নিজে খাইবার জন্য হইয়াছে (উহা কোরবানী হয় নাই।) আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে জবেহ করিয়াছে তাহার কোরবানী সঠিকরূপে হইয়াছে এবং সে ইসলামের বিধান মতে কাজ করিয়াছে।

২১৫৫। হাদীছ ঃ—জুন্দুব বাজালী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একবার ঈদের নামাযে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জামাতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করিয়াছে তাহার কোরবানী হয় নাই। তাহাকে নামাযের পর অন্য একটি পশু জবেহ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবেহ করে নাই সে (নামাযের পর) জবেহ করিবে।

এক বৎসরের কম বয়সের ছাগল কোরবানী হইবে না

২১৫৬। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোরবানীর ঈদের দিন নামাযান্তে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষন দানে বলিলেন, আজিকার দিনে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল নামায পড়া। তারপর নামায হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোরবানী করা। যে ব্যক্তি আমাদের এই নিয়ম মতে নামায পড়িয়া কোরবানী করিবে তাহার কোরবানী শুদ্ধ হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্ব্বে জবাই করিয়াছে উহা শুধু তাহার গৃহে গোশ্‌ত খাওয়ার কাজে লাগিবে, কোরবানী মোটেই গণ্য হইবে না।

এতচ্ছ্রবনে আমার মামা আবু বোরদাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি নামাযের জন্য আসিবার পূর্ব্বেই আমার কোরবানীর পশু জবাই করিয়া ফেলিয়াছি। আমি ভাবিয়াছি, এই দিন পানাহারের দিন গোশত খাওয়ার দিন; আমার গৃহে সর্ব্বাগ্রে বকরি জবাই হউক। তাই তাড়াতাড়ি আমি আমার বকরিটি জবাই করিয়া নামাযে আসিবার পূর্ব্বেই সকাল বেলার খানা আমি খাইয়াছি, পরিবারবর্গকেও খাওয়াইয়াছি এবং পড়শীদেরকেও দিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহার স্থলে তোমাকে অন্য একটি কোরবানী করিতে হইবে; উহা তোমার শুধু গোশ্‌ত খাওয়ার বকরী সাব্যস্ত হইয়াছে। মামা বলিলেন, আমার নিকট কোরবানী করার কোন পশু নাই; একমাত্র ছয় মাস বয়সের একটি মোটা-তাজা বকরি আছে যাহা সাধারন দুইটি বকরি হইতেও উত্তম—ইহা কি আমার কোরবানীর জন্য যথেষ্ট হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—উহাকে প্রথমটার স্থলে কোরবানী করিয়া দাও, কিন্তু তোমার পরে অন্য কাহারও জন্য কখনও ছয় মাসের বকরি কোরবানীতে যথেষ্ট হইবে না।

দুম্বার কোরবানী

২১৫৭। হাদীছ ঃ—ওকবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে কতিপয় ছাগল-দুম্বা কোরবানীর জন্য ছাহাবী গণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলিলেন। সেমতে বণ্টনের পর ছয় মাস বয়সের একটি দুম্বা অবশিষ্ট থাকিল। নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এইটা কোরবানী কর।

মছআলাহ ঃ—দুম্বা যদি এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, সাধারণ এক বৎসর বয়স্কের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই রূপ দুম্বা এক বৎসর বয়সের কম হইলেও উহার কোরবানী শুদ্ধ হইবে। সাধারণ ভাবে দুম্বা এক বৎসরের কম বয়সে কোরবানী হয় না। দুম্বা ভিন্ন ছাগল ইত্যাদি কোন অবস্থায়ই এক বৎসরের কম বয়সে কোরবানী হইবে না।

● কোরনানীর পশু মোটা-তাজা হওয়া উত্তম। আবু উমামা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা কোরবানীর পশু মোটা-তাজা হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিতাম; মদিনাবাসী সকলেই এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিতেন। (৮৩৩ পৃঃ)

কোরবানী নিজ হাতে জবেহ করা

২১৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাদা-কাল বিচিত্র রং বিশিষ্ট দুইটি দুম্বা কোরবানী করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, হযরত (দঃ) উহার প্রত্যেকটির মাথা পা দ্বারা দাবাইয়া বিছমিল্লাহে-আল্লাহু আকবার বলিয়া নিজ হাতে জবেহ করিয়াছেন।

● আবু মূছা আশআরী (রাঃ) তাঁহার কন্যাগণকে আদেশ করিতেন, তাহারা যেন নিজ হস্তে কোরবানী করে। (৮৩৪পৃঃ)

মছআলাহ ঃ— "বিছমিল্লাহ্" এবং "আল্লাহু-আকবর" উভয়টি উচ্চারণে জবেহ করিবে।

কোরবানীর গোশ্‌ত কত দিন খাওয়া যায়

২১৫৯। হাদীছ ঃ—ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে কোরবানীর গোশ্‌ত (মক্কা হইতে) মদীনা পর্য্যন্ত নিয়া আসিতাম।

২১৬০। হাদীছ ঃ—সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক বৎসর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষনা দিলেন, যাহারা কোরবানী করিয়াছে তাহাদের গৃহে যেন কোরবানীর গোশ্‌ত তৃতীয় দিনের পর বাকি না থাকে। পরবর্ত্তী বৎসর ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বৎসরও কি গত বৎসরের ন্যায় তিন দিনের বেশী কোরবানীর গোশ্‌ত রাখিব না ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, কোরবানীর গোশ্‌ত খাও, লোকদিগকে দাও এবং জমা করিয়াও রাখিতে পার। গত বৎসর লোকগণ অভাবে ছিল, তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা জমা না রাখিয়া লোকদের সাহায্য কর।

২১৬১। হাদীছ ঃ— ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিদেশে ছিলাম। তথা হইতে বাড়ী আসিলে পর আমার সম্মুখে গোশ্‌ত উপস্থিত করা হইল এবং বলা হইল, ইহা আমাদের কোরবানীর গোশ্‌ত। আবু সায়ীদ (রাঃ) বলিলেন, এই গোশ্‌ত আমার সম্মুখ হইতে দূরে নিয়া যাও, আমি ইহা মুখেও দিব না। অতঃপর আমি আমার ভ্রাতা আবু কাতাদার নিকট আসিলাম এবং এই কথা উল্লেখ করিলাম (যে, আমাদের ঘরে এখনও কোরবানীর গোশ্‌ত রহিয়াছে। অথচ তিন দিনের বেশী কোরবানীর গোশ্‌ত জমা রাখা নিষিদ্ধ।) তিনি বলিলেন, আপনার অনুপস্থিতে সেই হুকুম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

২১৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কোরবানীর গোশ্‌ত (বেশী দিন রাখার জন্য) নিমক দিয়া রাখিতাম। অতঃপর তাহা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পেশ করিতাম।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, তিন দিনের বেশী কোরবানীর গোশ্‌ত খাইও না। হযরত (দঃ) ইহা অলঙ্ঘনীয় আদেশরূপে বলেন নাই, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, অন্যদেরকে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া চাই।

ঈদের নামায খোৎবার পূর্ব্বে হইবে

২১৬৩। হাদীছ ঃ— আবু ওবায়দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতে ঈদের নামায পড়িয়াছি তিনি নামায পড়িয়া পরে খোৎবা দিয়াছেন এবং তিনি বলিলেন, হে লোক সকল। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই ঈদের দিনসমূহে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—রমজানের রোযার পর ঈদুলফেৎরের দিন এবং কোববানীর গোশ্ত খাওয়ার ঈদের দিন।

আবু ওবায়েদ (রঃ) বলেন, আমি খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতেও ঈদের নামায পড়িয়াছি, ঐ দিন জুমার দিন ছিল। তিনিও ঈদের নামায পড়িয়া তারপর খোৎবা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে লোক সকল! অদ্য দুইটি ঈদ একত্রিত হইয়াছে। দুর প্রান্ত হইতে আগতদের মধ্যে কেহ মদীনা শহরে থাকিয়া জুমার নামায আদায় করিয়া যাওয়ার খাহেস রাখিলে তাহা সমাধা করিয়া যাইতে পার। আবার কেহ ইচ্ছা করিলে জুমা না পড়িয়াও চলিয়া যাইতে পার—আমার পক্ষ হইতে অনুমতি আছে।

আবু ওবায়েদ (রঃ) বলেন, তারপর আমি খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামাতেও ঈদের নামায পড়িয়াছি। তিনিও নামায পড়িয়া তারপর লোকদের সম্মুখে খোৎবা দিয়াছেন।

পানীয় বস্তু সমূহের বয়ান ঃ

মদ্যপানের পরিণাম

আল্লাহ তায়ালা বরিয়াছেন ঃ—

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্ত্তি ও লটারী এ সবই অবৈধ বস্তু (এই সবের ব্যবহার) শয়তানের কাজ বলিয়া পরিগণিত, অতএব তোমরা ঐ সব পরিহার কর; তবেই তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।"

২১৬৪। হাদীছ ঃ— عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ
اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে মদ্য পান করিবে এবং উহা হইতে তওবা না করিবে আখেরাতের জীবনে সে ঐ (নামীয়) নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস, আমোদ-ফুর্তি ও আনন্দ উপভোগের যে সব বস্তুনিচয় রহিয়াছে মানুষ ঐ সবের নাম সমূহের সহিতই পরিচিত, তাই আখেরাতে ঐ শ্রেণীর যে সব বস্তুনিচয় রহিয়াছে ঐ বস্তুনিচয় কোরআন হাদীছে ঐ সব নামের মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু এস্থলে দুইটি বিষয় মনে রাখিবে—একটি এই যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের বস্তুর নাম এক দেখা গেলেও গুণাগুণের দিক দিয়া লক্ষ লক্ষ গুণের ব্যবধান রহিয়াছে। আর একটি এই যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সীমাবদ্ধ মাত্রার বাহিরে অবৈধ হওয়ায় কোন কোন বস্তু দুনিয়াতে হারাম ও নিষিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু আখেরাতে সেই সীমাবদ্ধতা না থাকায় তাহা তথায় জায়েয ও বৈধ হইয়া যাইবে। যেমন, পুরুষের জন্য স্বর্ণালঙ্কার, রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ইত্যাদি। তদ্রূপ কোন বস্তুর মধ্যে উপকারীতার সঙ্গে দীন ও দুনিয়ার দিক দিয়া কোন বিশেষ অপকারীতা থাকার দরুণ উহা দুনিয়াতে নিষিদ্ধ ও হারাম রহিয়াছে, কিন্তু আখেরাতের সেই বস্তুর মধ্যে ঐ অপকারিতা থাকিবে না এবং তথায় উহা বৈধ ও জায়েয গণ্য হইয়া ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের বস্তুরূপে ব্যবহৃত হইবে। যেমন মদ—দুনিয়াতে ইহা আমোদ-প্রমোদের বা অন্য কোন উপকারের খেয়ালে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বড় দোষ রহিয়াছে—যেই দোষ বহু পাপ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বহু অপকারিতার কারণ। তাহা হইল উহার মাদকতা দোষ, যাহার সর্ব্ব নিম্ন অপকারিতা হইল এই যে, কিছু সময়ের জন্য হইলেও মানুষের মস্তিষ্কের উপর এমন একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যদ্দারা মানুষের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় এবং ঐ সময় তাহার উপর পশুত্বের স্বভাব ছওয়ার হইয়া বসে। কারণ, মানুষের মধ্যে ত পশুত্বের স্বভাব আছেই কিন্তু তাহার অমূল্য রত্ন জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনাশক্তি ঐ স্বভাবের প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিয়া রাখে। অধিকন্তু মদ মানুষের পশুত্ব স্বভাব ও পশুত্ব শক্তির মধ্যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া দেয়। এই ধরণের বহু দোষ মদের মধ্যে রহিয়াছে যদ্দরুণ সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাকে অপবিত্র ও শয়তানী কাজের বস্তু নামে আখ্যায়িত করিয়া উহাকে হারাম ঘোষনা করিয়াছেন।

বেহেশতের অসংখ্য নেয়ামতরাশীর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ ফুর্তি উপভোগের জন্য এক প্রকার পানীয় হইবে; সাধারণ পরিচয়ের জন্য কোরআন

হাদীছে উহাকে খাম্‌র—শরাব বা মদ নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বেহেশতের আনন্দদায়ক পানীয়কে তোমাদের পরিচিত নাম খাম্‌র—শরাব বা মদ নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে শুধু পরিচয় লাভের জন্য। নতুবা দুনিয়ার পানীয় মদ ও বেহেশতের ঐ নামের পানীয়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য কর যে—

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ - لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

"উহার রং হইবে নির্ম্মল স্বচ্ছ সাদা, উহা পানে হইবে অতি সুস্বাদু। উহার মধ্যে এমন কোন ক্রিয়া থাকিবে না যদ্দরুণ মস্তিষ্কে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—মাথায় চক্র বা মাত্‌লামীর ক্রিয়া উহাতে মোটেই থাকিবে না। (২৩ পাঃ ৬ রুঃ)

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ -

"বেহেশতবাসীগণ আমোদ-স্ফূর্ত্তিস্থলে বন্ধু বান্ধবদের সহিত পানপাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে। সেই পানীয়ের মধ্যে এমন কোন ক্রিয়া থাকিবে না যদ্দরুণ মুখে অসংযত কথা আসে বা অনাচার কাজ সঙ্ঘটিত হয়।" (২৬ পারা ছুরা তুর)

আলোচ্য হাদীছে যে বলা হইয়াছে—আখেরাতের জিন্দেগীতে ঐ (মদ নামীয়) নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে—ইহার দুই অর্থ করা হইয়াছে। এক অর্থ এই যে, (এক পক্ষ কালের জন্য) ঐ নেয়ামতের স্থল বেহেশ্‌ত হইতেই বঞ্চিত থাকিবে। আর এক অর্থ এই করা হয় যে, অন্যান্য আমলের বদৌলতে বা মদ্য পানের শাস্তি ভোগের পর বেহেশত লাভ হইলেও সে তথায় ঐ নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

আঙ্গুর ব্যতীত অন্য বস্তুর সুরাও হারাম

২১৬৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা প্রথম যখন বিঘোষিত হয় তখন মদীনা এলাকায় আঙ্গুরের (অভাবের দরুণ উহার) রসে তৈরী মদের প্রচলন ছিল না।

২১৬৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) একদা মদীনার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া ভাষনে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মদ হারাম বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। উহা (সাধারণতঃ) পাঁচ প্রকার জিনিষ দ্বারা তৈরী হয়—আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম, এবং যব। বস্তুতঃ যে কোন জিনিষের মাদকতা জ্ঞান-শক্তির উপর অবরণের সৃষ্টি করে উহাই মদ বলিয়া গণ্য হইবে। (মদ হারাম হওয়া শুধু আঙ্গুরের রসে সীমাবদ্ধ নহে।)

২১৬৭। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবু ওবায়দাহ (রাঃ), আবু তাল্‌হা (রাঃ), উবাই-ইবনে-কায়াব (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণকে কাঁচা ও শুষ্ক খেজুর হইতে তৈরী সুরা পান করাইতে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উক্ত সুরা ফেলিয়া দেওয়ার আদেশ করা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিলাম।

২১৬৮। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট "বিত্‌য়া" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। উহা মধু দ্বারা তৈরী সুরা ; ইয়ামান দেশে উহা পানের প্রচলন ছিল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সে প্রসঙ্গে বলিলেন, যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করে উহাই হারাম।

শরাব বা মদ ভিন্ন নামের আড়ালে পান করার পরিণতি

২১৬৯। হাদীছ :—আবু আমের (রাঃ) কিম্বা আবু মালেক (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত হওয়ার দাবীদারদের মধ্যে এমন এমন লোকও হইবে যাহারা জেনা বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে, (নাম বদলাইয়া ভিন্ন নামের আড়ালে) মদ পান করিবে, গান বাজনায় লিপ্ত হইবে। (এই শ্রেণীর) একদল লোক কোন একটি পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি অবস্থানরত হইলে পর অপ্রত্যাশিত ভাবে রাত্রি বেলা অকস্মাৎ সেই পর্ব্বৎ তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িবে এবং অপর এক দলকে চিরজীবনের জন্য বানর ও শুকর বানাইয়া দেওয়া হইবে।

দাঁড়াইয়া পানি পান করা

দাঁড়াইয়া পানি পান করা সম্পর্কে কতিপয় হাদীছে নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রহিয়াছে। মোছলেম শরীফে এ সম্পর্কে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে—(১) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) দাঁড়াইয়া পানি পান করার উপর তিরস্কার করিয়াছেন। (২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, খবরদার! কেহ দাঁড়াইয়া পানি পান করিবে না। যদি কেহ ভুলে ঐরূপ করিয়া বসে তবে বমি করতঃ ঐ পানি ফেলিয়া দেওয়া উচিৎ। (৩) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) দাঁড়াইয়া পানি পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আনাছ (রাঃ)কে সকলে জিজ্ঞাসা করিল যে, দাঁড়াইয়া আহার করা কিরূপ ? তিনি বলিলেন উহা ত আরও জঘন্য।

পক্ষান্তরে কোন কোন হাদীছে এবং কোন কোন ছাহাবী হইতে দাঁড়াইয়া পানি পান করার বৈধতাও বর্ণিত আছে। সকল দিক দৃষ্টে হাদীছ বিশারদগণ এই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া পানি পান করা অবৈধ না হইলেও মক্রুহ ও বর্জ্জণীয়। অবশ্য ফজিলত ও বরকতের পানি দাঁড়াইয়া পান করা সর্ব্বসম্মতরূপে উত্তম। একাধিক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যম্‌যম্ কূপের পানি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছের বিষয়টিকেও উহার অন্তরভুক্ত করা হইয়া থাকে। কারণ, যেই পাত্রের পানি দ্বারা ওজু করা হয় উহার অবশিষ্ট পানি বরকতের পানি গণ্য হয়।

২১৭০। ছাদীছ ঃ—আমীরুল-মোমেনীন আলী (রাঃ) (তাঁহার রাজধানী) কুফা নগরীতে একদা জোহরের নামায পড়িয়া সর্ব্বসাধারণের বৈঠকস্থানে জনগণের অভাব অভিযোগ সমাধানে বসিলেন। এমনকি আছরের নামাযের ওয়াক্ত আসিয়া গেল, তখন পানি উপস্থিত করা হইল। আলী (রাঃ) উহা হইতে কিছু অংশ পান করিলেন এবং হাত মুখ ও পা (ইত্যাদি ওজুর অঙ্গ) ধৌত করতঃ ঐ পাত্রের অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া পান করিলেন এবং বলিলেন, লোকেরা দাঁড়াইয়া পানি পান করাকে দূষণীয় গণ্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি যাহা আমি করিলাম।

২১৭১। ছাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যম্‌যমের পানি দাঁড়াইয়া পান করিয়াছেন।

খোরমা ভিজানো পানি পান করা

২১৭২। ছাদীছ ঃ— আবু উসাইদ (রাঃ) তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। নব বধুই সেবিকা ছিলেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য রাত্রি বেলায়ই কিছু খোরমা একটি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম; (সেই পানিই নবী (দঃ)কে শরবৎ রূপে পান করানো হইয়াছিল।)

২১৭৩। ছাদীছ ঃ—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোরমা ও কাঁচা খেজুর কিম্বা খোরমা ও কিশমিশ একত্রে ভিজাইতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন ভিজাইতে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—পানীয় পানি সুস্বাদ করার জন্য আরব দেশে খোরমা খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করা হইত। এই ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল যে, পানিতে যেন মাদকতা সৃষ্টি না হয়; সেই জন্যই অনেক বেশী সময় ভিজাইয়া রাখিতে নিষেধ করা হইত এবং উল্লেখিত রূপে দুই শ্রেণীর বস্তু একত্রে ভিজাইতেও নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, উহাতে মাদকতা সৃষ্টির আশঙ্কা অধিক।

পানিতে দুধ মিশ্রিত করিয়া পান করা

২১৭৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একজন সঙ্গী সহ এক মদিনাবাসী ছাহাবীর নিকট তাহার বাগানে প্রবেশ করিলেন। ঐ ছাহাবী তখন বাগানে পানি সেচনের কাজ করিতে ছিলেন। নবী (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী ঐ ছাহাবীকে সালাম করিলেন। ছাহাবী সালামের উত্তর দানে স্বীয় মাতা পিতা নবীজীর চরণে উৎসর্গ বলিয়া আরজ করিলেন। সময়টি অত্যন্ত উত্তাপের সময় ছিল।

নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তোমার নিকট রাত্রি বেলা মশকে সুরক্ষিত পানি আছে কি ? নতুবা বাগানের এই হাউজ হইতেই পান করি। ঐ ছাহাবী আরজ করিলেন, আমার নিকট রাত্রে মশকের মধ্যে সুরক্ষিত পানি রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাগানস্থ ঝুপড়িতে গেলেন এবং একটি পাত্রে মশক হইতে পানি লইয়া উহার উপর ছাগল হইতে দুধ দোহন করিয়া দিলেন। প্রথম বার নবী (দঃ) পান করিলেন, দ্বিতীয়বার পুনরায় ঐরূপে পানীয় আনিলেন—উহা সঙ্গী ব্যক্তি পান করিল।

পানি পান করার নিয়ম

২১৭৫। হাদীছ ঃ— আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পানি পান করার সময় কেহ পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়িবে না এবং প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাবাঙ্গ ডান হাতে স্পর্শ করিবে না এবং ডান হাতে এস্তেন্জা করিবে না।

২১৭৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) দুই বা তিন শ্বাসে পানি পান করিতেন এবং তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন শ্বাসে পানি পান করিতেন।

রৌপ্য পাত্রে পানি পান করা

২১৭৭। হাদীছ ঃ—হোজায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে কিছু পান করিবে না। মোটা বা মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। এই সব বস্তু দুনিয়া বা ইহজগতে কাফেরগণ ব্যবহার করে, তোমরা ব্যবহার করিবে পরকাল বা আখেরাতে।

২১৭৮। হাদীছ ঃ—উম্মে ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করিয়া থাকে সে নিশ্চয় তাহার পেটে জাহান্নামের অগ্নি ভর্ত্তি করিতেছে।

খাদ্য ও পানির পাত্র ঢাকিয়া রাখা

২১৭৯। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাস বলিয়াছেন, রাত্রি বেলা ঘুমাইবার সময় (বিছমিল্লাহ বলিয়া) প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিও, (বিছমিল্লাহ বলিয়া) ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিও, খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢাকিয়া দিও; অন্ততঃ একটি কাষ্ঠ খণ্ড হইলেও উহার উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দিও।

২১৮০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোমায়েদ (রাঃ) নামক এক আনছারী ব্যক্তি "নকী" নামক স্থানে তাহার গৃহ হইতে একটি পাত্রে করিয়া নবী ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য দুগ্ধ নিয়া আসিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, পাত্রটি আবৃত কর নাই কেন? অন্ততঃ একটি কাষ্ঠ খণ্ডই উহার উপর আড়াআড়িভাবে রাখিতে! (৮৩৯পৃঃ)

মশকের মুখ হইতে পানি পান করা

২১৮১। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, মশকের মুখের সহিত মুখ লাগাইয়া পানি পান করা হইতে।

২১৮২। হাদীছ ঃ- আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং কাহারও দেয়ালের উপর তাহার প্রতিবেশীকে কড়ি রাখায় বাধা দানে নিষেধ করিয়াছেন।

২১৮৩। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মশকের মুখ হইতে পানি পান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বরকতের পানি বেশী পান করা

২১৮৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ঘটনা উপলক্ষে আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আছরের নামায উপস্থিত হইল, কিন্তু আমাদের নিকট সামান্য একটু পানি ভিন্ন আর পানি ছিল না। ঐ পানিটুকু এক পাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তিনি উহার মধ্যে হাত রাখিয়া হাতের আঙ্গুল সমুহ ছড়াইয়া দিলেন এবং সমস্ত লোকদেরে উহা হইতে অজু করার জন্য ডাকিলেন। আমি দেখিতে ছিলাম নবীজীর আঙ্গুলের ফাঁক হইতে পানি উথলিয়া উঠিতেছে। সকল লোক ঐ পানি হইতে অজু করিল এবং পান করিল।

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আমার সাধ্য মতে পেট পুরিয়া ঐ পানি পান করিলাম। কারণ, বুঝিয়া ছিলাম যে, এই পানি অতি বরকতের পানি। আমরা চৌদ্দ বা পনর শত লোক সেখানে ছিলাম।

রোগ ব্যাধি সম্পর্কীয় বয়ান

রোগের দরুন গোনাহ মাফ হয়

২১৮৫। হাদীছ— ان عائشة رضى الله تعالى عنه قالت

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ

اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا -

অর্থ—উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানের উপর যে কোন প্রকার বালা-মছিবত আসিলে আল্লাহ তায়ালা উহার দ্বারা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন, এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলেও।

২১৮৬। হাদীছঃ— عن ابى سعيد الخدرى وابى هريرة (ض)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ

وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ -

অর্থ—আবু ছায়ীদ (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমান ব্যক্তির উপর কোন দুঃখ আসিলে, কোন কষ্ট-যাতনা আসিলে, কোন দুর্ভাবনা বা উদ্বেগ আসিলে, কোন দুশ্চিন্তা আসিলে—যে কোন প্রকার কষ্ট আসিলে এবং কোন প্রকার শোক আসিলে, এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলেও উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির গোনাহ মাফ করিয়া দেন।

২১৮৭। হাদীছঃ— عن كعب رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْاَرْزَةِ لَا تَزَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً -

অর্থ—কায়া'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির অবস্থা শস্য গাছের অবস্থারূপ। শস্য গাছকে বাতাসের ঝাপটা একবার কাত করিয়া ফেলিয়া দেয়, আর একবার (অপর দিকের ঝাপটায়) দাঁড় করিয়া দেয়—এইভাবে বিভিন্ন দিকের বাতাস উহাকে বিভিন্ন দিকে ফেলিয়া দেয় (তদ্রূপ মোমেন ব্যক্তিও বিভিন্ন রকম আপদ-বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেই থাকে।)

পক্ষান্তরে মোনাফেকের অবস্থা বৃহৎ বট বৃক্ষের ন্যায়—বাতাসের ঝাপটায় কমই আক্রান্ত হয়, কিন্তু যখন আক্রান্ত হয় তখন সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়।

২১৮৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَاِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالْاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির অবস্থা শস্য গাছের অবস্থারূপ। বিভিন্ন দিকের বাতাসের ঝাপটা উহাকে কাত করিয়া ফেলিতে থাকে, এক একবার সোজা হয় আবার কাত হইয়া পড়ে। মোমেন ব্যক্তির অবস্থাও তদনুরূপ—সে বালা-মছিবতের দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে।

পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তির অবস্থা বৃহৎ ও শক্ত বৃক্ষের ন্যায়। বাতাসের ঝাপটা উহাকে নত করিতে পারে না, কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয় তখন উহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ধ্বংস করিয়া দেন।

www.almodina.com

ব্যাখ্যা ঃ—পরীক্ষার স্থল ইহজগতে আল্লাহ তায়ালা ধরা-বান্ধা এক নিয়ম জারি না রাখিয়া বিভিন্ন নিয়ম জারি রাখিয়াছেন, নতুবা পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিত। যেমন—স্থান বিশেষে ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে শান্তির জিন্দেগী দান করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"যে কোন নারী বা পুরুষ ঈমানদার হইয়া নেক আমল করিবে আমি তাহাকে (দুনিয়াতে) শান্তির জেন্দেগী দান করিব এবং (আখেরাতে) তাহার আমলের উত্তম প্রতিফল দান করিব। (১৪ পারা—ছুরা নহ্‌ল ১৩ রুকু।)

পক্ষান্তরে নাফরমানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

"যে ব্যক্তি আমাকে ভুলিয়া থাকে তাহার জন্য সঙ্কীর্ণ জেন্দেগী হইবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব।" (১৬ পারা—ত্বা-হা ৭ রুকু)

এই অবস্থায় মোমেনের কর্ত্তব্য হইল শান্তির জেন্দেগী আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান গণ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালার শোকর-গুজারী করা, আল্লার প্রতি অধিক ধাবিত হওয়া, কোন প্রকার ফখর-গরুরীতে পতিত না হওয়া।

স্থান বিশেষে উহার বিপরীতও হয়—মোমেন ব্যক্তির উপর আপদ-বিপদ বালা-মছিবৎ অধিক সংখ্যায় আসিয়া থাকে। যেমন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় মোমেনের কর্ত্তব্য হইবে—আপদ-বিপদকে ঈমানদারের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থারূপ গণ্য করতঃ ধৈর্য্য ধারণ করা এবং পরবর্ত্তী হাদীছে বর্ণিত সুসংবাদের আশা পোষণ করা।

২১৮৯। হাদীছ ঃ— عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন (মোমেন) ব্যক্তির মঙ্গল চাহিলে তাহাকে বালা-মছিবতে পতিত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বিষয়টি পরিস্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট যদি কোন বন্দার জন্য বিশেষ মর্ত্তবা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাহার আমল তাহাকে ঐ মর্ত্তবায় পৌঁছাইতে পারে না। তবে আল্লাহ তায়ালা ঐ বন্দাকে শারীরিক বা ধন-জনের বালা-মছিবতে লিপ্ত করেন এবং (সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর ছবর ও ধৈর্য্য ধারনের তৌফিকও দান করেন।) ঐ ব্যক্তি সেই বালা-মছিবতের উপর ছবর করে এবং এই অছিলায় সে ঐ মর্ত্তবায় পৌঁছিতে সক্ষম হয়।

২১৯০। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর রোগের প্রকোপ যত কঠোর হইত ঐরূপ অন্য কাহারও উপর দেখি নাই।

২১৯১। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার জ্বর আসিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রস্থলাল্লাহ ! আপনার ত অত্যধিক জ্বর। হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আমার জ্বর আসিলে তোমাদের দ্বিগুণ জ্বর আসিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই জন্য যে, আপনার ছওয়াব দ্বিগুণ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, বস্তুতঃ তাহাই।

যে কোন মোসলমানের উপর কোন দুঃখ-যাতনা আসে, এমনকি তাহার পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হয় বা তার চেয়েও মামুলী কোন কষ্ট তাহার হয় আল্লাহ তায়ালা উহার দ্বারা অবশ্যই তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন। তাহার গোনাহ ঝরিয়া পড়ে যেরূপ (শীতের পরে) বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া থাকে।

রোগীকে দেখিতে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য

২.৯২। হাদীছ ঃ—عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا

الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ -

অর্থ—আবু মূছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্ষুধার্তকে খাইতে দাও, রোগীকে দেখিতে যাও এবং ক্রীতদাসকে মুক্ত কর।

বেহুঁশ রোগীকে দেখিবার জন্য যাওয়া

২১৯৩। হাদীছ ঃ—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি অসুস্থ হইলে পর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) পায়ে হাটিয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় পাইলেন। তখন হযরত নবী (দ) অজু করিয়া তাঁহার অজুর পানি আমার উপর বহাইয়া দিলেন, তাহাতে আমার হুঁশ ফিরিয়া আসিল। আমি হযরত নবী (দঃ)কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার সম্পত্তি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব—উহা সম্পর্কে আমি কি ফয়ছালা করিয়া যাইব? হযরত (দঃ) আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের মিরাস সম্পর্কীয় আয়াত নাযেল হইল।

মৃগী রোগীর মর্ত্তবা

২১৯৪। হাদীছ ঃ— আতা ইবনে আবু রবাহ্ (রঃ) বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিলেন, একজন বেহেশ্‌তী রমণী তোমাকে দেখাইব কি? আমি বলিলাম, নিশ্চয়। তিনি বলিলেন, ঐ যে কৃষ্ণবর্ণা রমণীটি। একদা সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে আসিয়া বলিল, আমি মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া যাই এবং তাহাতে আমি উলঙ্গ হইয়া পড়ি। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পার তাহাতে তুমি বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি দোয়া করিতে পারি—আল্লাহ তোমাকে এই রোগ হইতে মুক্তি দান করুন। এতচ্ছ্রবনে রমণীটি বলিল, আমি ছবরই করিব। অবশ্য আপনি এতটুকু দোয়া করুন যেন আমি ঐ অবস্থায় উলঙ্গ না হইয়া যাই। হযরত (দঃ) তাহার জন্য দোয়া করিলেন।

অন্ধ ব্যক্তির মর্ত্তবা

২১৯৫। হাদীছ ঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ

عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমি আমার কোন বন্দাকে যদি তাহার অতি প্রিয় বস্তু—চক্ষুদ্বয়ের বিপদে পতিত করি (অর্থাৎ সে অন্ধ

হইয়া যায়) এবং সে ঐ বিপদে ছবর করে তবে তাহার চক্ষুদ্বয়ের বিনিময়ে আমি তাহাকে বেহেশ্‌ত দান করিয়া থাকি।

রোগীর সাক্ষাতে কি বলিবে

২১৯৬। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন রোগীকে দেখিতে গেলে তাহাকে শান্তনা দান করিয়া এইরূপ বলিতেন—لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

"অস্থির হইবে না; (রোগ-যাতনার দ্বারা) ইনশা-আল্লাহ (গোনাহ মাফ হইয়া) পবিত্রতা লাভ হইবে।"

এক গ্রাম্য বৃদ্ধ সদ্যঃ মদীনায় আগত ও ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তি অসুস্থ হইল। হযরত (দঃ) তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহাকে শান্তনা দান করিয়া ঐরূপ বলিলেন। সেই ব্যক্তি হযরতের কথা খণ্ডন করিয়া বলিল, না—না, বরং ভীষণ প্রকোপের জ্বর যাহা বৃদ্ধকে কবরে নিয়া ছাড়িবে। তদুত্তরে হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তাহাই হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—বৃদ্ধ নিজেই নিজের বিপদ টানিয়া আনিল। হযরতের শান্তনা দানের উপর আস্থা আনিল না। হযরতের কথা খণ্ডন করতঃ বিপরীত উক্তি করিল। হযরত (দঃ) বিরক্তির সহিত তাহার উক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন, ফলে অনতিবিলম্বে তাহাই ঘটিল—বৃদ্ধ ঘটনার পরদিনই কবরস্থানের যাত্রী হইল।

মৃত্যু কামনা করা

২১৯৭। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ"

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুঃখ-কষ্টের দরুণ কখনও কেহ মৃত্যু কামনা করিও না। যদি সেইরূপ কিছু করিতেই হয় তবে এই দোয়া করিবে—...... اللهم احينى

"হে আল্লাহ! যাবৎ আমার পক্ষে জীবিত থাকা ভাল হয় তাবৎই আমাকে জীবিত রাখ। আর যখন আমার পক্ষে মৃত্যু মঙ্গলময় হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর।"

ব্যাখ্যা ঃ—দুঃখ-যাতনার দরুণ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু আল্লার প্রেমে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নহে।

২১৯৮। হাদীছ ঃ—কায়স ইবনে আবু হাযেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কতিপয় লোক রোগগ্রস্ত খাব্বাব (রাঃ) ছাহাবীকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি এতই অসুস্থ ছিলেন যে, পর পর সাত বার দাগ লাগানোর চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমাদের যে সব সঙ্গীগণ ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমন অবস্থায় যে, তাঁহাদের নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতে মোটেই ব্যয় হয় নাই (—তাঁহারা দুনিয়ার ধন-দৌলত ভোগ করেন নাই ; কষ্টে ক্লিষ্টে দুনিয়ার জেন্দেগী কাটাইয়া গিয়াছেন।) কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এত এত ধন-দৌলত পাইয়াছি যে, উহা রাখিবার স্থান পাইতেছি না। বাধ্য হইয়া মাটি তথা অনাবশ্যক জায়গা-জমি ও ইমারত-অট্টালিকায় ব্যয় করিতেছি।

ঐ সময় খাব্বাব (রাঃ) আরও বলিলেন, স্বীয় কষ্ট-যাতনার আধিক্যে মৃত্যুর জন্য দোয়া করা যদি হযরত নবী (দঃ) নিষেধ না করিতেন তবে অবশ্য, আমি মৃত্যু কামনা করিয়া দোয়া করিতাম।

অতঃপর আর একদিন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম। ঐদিন তিনি একটি বাগান তৈরী করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, মোসলমান ব্যক্তি তাহার সকল প্রকার ব্যয়েই ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে—এই এক প্রকার ব্যয় ব্যতীত যাহা সে মাটি তথা (অনাবশ্যক) জায়গা-জমির মধ্যে করিয়া থাকে।

২১৯৯। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَّرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَّاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কাহারও আমল তাহাকে বেহেশ্‌তের অধিকারী বানাইতে যথেষ্ট নহে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি আমলের দ্বারা

বেহেশ্‌তের অধিকারী হইতে পারিবেন না ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও না—যাবৎ না আল্লার মেহেরবাণী ও রহমত আমাকে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া নেয়। অবশ্য সাধ্যানুযায়ী ছেরাতে-মোস্তাকীম বা সৎপথের উপর থাকিয়া আল্লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

আর তোমাদের কেহ মৃত্যু কামনা করিবে না। কারণ, নেককার ব্যক্তি বেশী বয়স পাইয়া অধিক নেক কাজ করার সুযোগ লাভ করে এবং বদকার ব্যক্তি অধিক বয়স পাইয়া তওবা করার সুযোগ লাভ করে।

রোগী দেখিতে যাইয়া রোগীর জন্য দোয়া

বেহেশ্‌ত লাভের ঘোষণা প্রাপ্ত ছাহাবী সায়াদ ইবনে আবী ওক্কাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) আমাকে রোগ অবস্থায় দেখিতে আসিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত মোবারক আমার ললাটের উপর রাখিলেন, অতঃপর আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন, اللهم اشف سعدا "হে আল্লাহ! সায়াদকে সুস্থ করিয়া দিন।"

২২০০। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন রোগীর নিকট আসিলে বা কোন রোগীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে (স্বীয় ডান হাত রোগীর শরীরে বুলাইতেন এবং) এই দোয়া পড়িতেন—

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

"হে সকলের প্রভু-পরওয়ারদেগার! যন্ত্রনা ও ব্যাধি দুর করিয়া দিন, রোগ মুক্তি দান করুন; রোগ মুক্তির মালিক একমাত্র আপনিই। এমন রোগ মুক্তি দান করুন যাহার ফলে কোন প্রকার রোগ না থাকে।"

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বয়ান

রোগ ও ঔষধ

২২০১। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যত প্রকার রোগই সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। (রোগ অনুযায়ী ঔষধ ঠিকভাবে পড়িলে আল্লার আদেশে রোগ দুর হইয়া থাকে।)

পুরুষ রোগীকে নারীর সেবা শুশ্রূষা ?

২২০২। হাদীছ ঃ— রুবাইয়্যে বিন্‌তে মোয়াওয়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা (নারী ছাহাবী) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে যাইয়া থাকিতাম। আমরা তথায় লোকদের পানি পানের ব্যবস্থা করিতাম, আহতদের চিকিৎসা করিতাম, লোকদের সেবা করিতাম এবং নিহত ও আহতগণকে মদীনায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতাম।*

তিনটি জিনিষ বহু রোগের অব্যর্থ ঔষধ

২২০৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষের মধ্যে রোগ মুক্তি নিহিত রহিয়াছে—রক্ত-মোখন, মধু পান এবং তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগা, কিন্তু দাগার চিকিৎসা হইতে আমি আমার উম্মৎকে নিষেধ করিতেছি।

২২০৪। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল,

---

* পাকিস্তান-পূর্ব্ব যুগে অমোসলেমদের প্রতিপত্তিতে অবাঞ্ছিত রীতি-নীতির প্রচলন ছিল, কিন্তু তখনকার মোসলমানগণ ঐরূপ রীতি-নীতিকে নাপন্দছ করিতেন। অধুনা এক শ্রেণীর লোক ঐ সব অবাঞ্ছিত রীতি-নীতিকে বহাল তবীয়তে পাকা পোক্তারূপে কায়েম ভাবে আঁকড়িয়া থাকার পক্ষপাতি। এমনকি ঐ সব রীতি-নীতি অনৈছলামিক হওয়া সত্ত্বেও কোরআন-হাদীছের কোন একটা নজিরের বাহানা অবলম্বনে তিলকে তাল বানাইবার প্রবণতাও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন সরকারী হাসপাতাল সমূহে যুবতি রমণীদের দ্বারা নার্সিং-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। এই রীতি যে, কি জঘন্য তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু এই জঘন্য রীতিকেও ইসলামী ও শরীয়ত সম্মত বলিবার দুঃসাহস করা হইয়া থাকে এবং তাহারা হয় ত আলোচ্য পরিচ্ছেদ ও উহাতে উল্লেখিত হাদীছখানাকে তাহাদের দাবীর নজিররূপে তুলিয়া ধরিতে পারে। অথচ এই দুইটির মধ্যে তিল ও তাল অপেক্ষা অধিক ব্যবধান। কারণ, উল্লেখিত হাদীছের ঘটনা হইল যুদ্ধের জরুরী অবস্থা কালীন ঘটনা। ইসলামী রাষ্ট্রের উপর কাফের শত্রুর আক্রমণ কালে নারীদের উপরও দেশ রক্ষায় সহযোগিতা করা ফরজ হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন উহা বিশেষ আবশ্যকাধীন ছিল যে, তখন মোসলমানদের সংখ্যা সল্পতার দরুন উহার বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না ; সকল পুরুষ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও যুদ্ধের আবশ্যক পুরা হইত না। ঐরূপ প্রয়োজন-স্থলের ব্যাপার নিতান্তই ভিন্ন বিষয়। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সমালোচিত অবস্থা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

সিভিল এণ্ড মেলেটারী হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডের জন্য মহিলা নার্স এবং পুরুষ ওয়ার্ডের জন্য পুরুষ নার্স দ্বারা অত্যন্ত সন্তোষ-জনকরূপে কাজ চলিতে দেখিয়াছি।

আমার ভ্রাতার ভয়ানক দাস্ত হইতেছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে মধু পান করাও; সে তাহাকে মধু পান করাইল। (কিন্তু দাস্ত বন্ধ হইল না, তাই) সে দ্বিতীয় বার আসিয়া ঐ খবরই দিল। এইবারও হযরত (দঃ) তাহাকে ঐ কথাই বলিলেন। তৃতীয় বারও ঐ কথাই বলিলেন যে, তাহাকে মধু পান করাও। চতুর্থ বার আসিয়া সে বলিল, মধু পান করাইয়াছি, কিন্তু দাস্ত আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার কালাম সত্য, তোমার ভ্রাতার পেটে এখনও দোষ রহিয়াছে, আবার তাহাকে মধু পান করাও। এইবার মধু পান করাইলে পর সে ভাল হইয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ— পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বর্ণনা করতঃ মৌমাছির উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে মধুর উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন— فيه شفاء للناس "উহা মানুষের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ" উল্লেখিত হাদীছে হযরত (দঃ) এই আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কালজিরার উপকারিতা

২২০৫। হাদীছঃ—খালেদ ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গালেব নামক আমাদের এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ছিল। আবু আতীক (রঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা কালজিরার ব্যবস্থা কর—উহার পাঁচটি বা সাতটি দানা পিষিয়া জয়তুন তৈলের সহিত রোগীর নাকের উভয় ছিদ্রে ফোটারূপে প্রবেশ করাইয়া দাও।

আয়েশা (রাঃ) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত নবী (দঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছেন—

إِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ

"কালজিরা একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত সর্ব্ব রোগেই অব্যর্থ মহৌষধ।"

রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য

২২০৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রোগী ও শোকার্তকে "তালবীনাহ" বা "হারিরা" খাওয়ার পরামর্শ দিতেন এবং বলিতেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, "হারিরা" রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে এবং দুশ্চিন্তা লাঘব করে।

ব্যাখ্যাঃ—তাল্‌বীনাহ্ বা হারিরা এক প্রকার লঘুপাক খাদ্য যাহা আটা ও মধু পানিতে ঘোলিয়া তরলরূপে পাকান হয়।

উদ-হিন্দীর উপকার

২২০৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-কায়স্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা উদ্-হিন্দী ব্যবহার করিও ; সাত প্রকার ব্যাধিতে উহা উপকারী। শিশুদের আল্‌জিব ফুলিয়া ব্যথা হইলে উহা ঘষিয়া বা কুটিয়া পানির সহিত নাকের ভিতরে ফোটায় ফোটায় প্রবেশ করিবে এবং পাঁজরে ব্যথা হইলে ঐরূপে উহা পান করাইতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—উদ্-হিন্দী' ইউনানী শাস্ত্রীয় ভাষায় অগুরু কাষ্ঠকে বলা হয়, কিন্তু আলোচ্য হাদীছে উহা উদ্দেশ্য নহে! আর একটি বস্তু আছে যাহাকে ইউনানী শাস্ত্রে কোস্ত্‌-হিন্দী বা কোস্ত্‌-শীরীন্ বলা হয়—উহা গিরিমল্লিকা ফুল গাছের কাষ্ঠ যাহাকে বাংলা ভাষায় 'কুট' বলা হয়। এস্থলে উহাই উদ্দেশ্য বলিয়া ইমাম বোখারী ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফ ৮৫১ ও ৮৫২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতদ্বয়ে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আভিধানিক অর্থ সূত্রে এই উদ্দেশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণই, কারণ 'উদ্' অর্থ কাষ্ঠ এবং 'হিন্দী' অর্থ ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয়। অগুরু কাষ্ঠ যেরূপ সাধারণতঃ পাক-ভারতের সিলেট অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ কুট্‌ও সাধারণতঃ পাক-ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

রক্ত-মোক্ষন ব্যবস্থা অবলম্বন

২২০৮ হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ)কে এক ব্যক্তি রক্ত-মোক্ষন কার্য্যের মজুরী ও পারিশ্রমিক প্রদান ও গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। আবু তায়বা নামক এক ক্রীতদাস হযরতের রক্ত-মোক্ষন করিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহার পারিশ্রমিক প্রায় সাত সের পরিমাণ খাদ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। তদুপরি তাহার মালিকদের নিকট সুপারিশ করিয়া তাহার উপর ধার্য্যকৃত আয়ের পরিমাণে লাঘব করিয়া দিয়াছিলেন এবং হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য রক্ত-মোক্ষন চিকিৎসা-ব্যবস্থা অতি উত্তম......।

২২০৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) একদা এক রোগীকে দেখিতে গেলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রোগীর নিকট হইতে যাইব না যাবৎ না সে রক্তমোক্ষন করায়। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, রক্ত-মোক্ষন চিকিৎসায় আরোগ্য রহিয়াছে।

২২১০। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা মাথা ব্যথার দরুন এহ্‌রাম অবস্থায় মাথায় রক্ত-মোক্ষন করিয়াছিলেন।

ব্যঙের ছাতার গুণ

২২১১। হাদীছ ঃ—ছায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যঙের ছাতা 'মন্ন্' তুল্য ; উহার রস চোখের জন্য ভাল ঔষধ।

ব্যাখ্যা ঃ—'মন্ন্' মরু অঞ্চলের এক প্রকার বৃক্ষ হইতে নির্গত মিষ্ট খাদ্য বস্তু। বনী-ইস্রাইলগণ শাস্তি ভোগ স্বরূপ মরুভূমি তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর আবদ্ধ জীবন-যাপন কালে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কৃপাবলে তাহাদের জন্য অস্বাভাবিক আকারে উহা জোটাইয়া ছিলেন। কোন প্রকার ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতিরেকেই তাহারা উহা লাভ করিত। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে প্রথম পারায় বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীফ চতুর্থ খণ্ড হযরত মূছার বয়ান দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ব্যঙের ছাতা একটি খাদ্য বস্তু যাহা মন্নের ন্যায় বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে তোমরা জোটাইতে পার। উহার আরও একটি গুণ এই যে, উহার রস চক্ষু রোগের অব্যর্থ ঔষধ। অবশ্য হাদীছে বর্ণিত গুণাগুণ একমাত্র সাদা বর্ণীয়টার জন্য, আর যেইটা কাল হয় সেইটা বিষাক্ত।

জ্বর উপসমের ব্যবস্থা

২২১২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ হইতে সৃষ্ট ; অতএব উহাকে পানির সাহায্যে দমাইয়া দাও।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জ্বর হইলে বলিতেন, আজাব দুর করার ব্যবস্থা কর।

২২১৩। হাদীছ ঃ—আবুবকর-তনয়া আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট জ্বরাক্রান্তা কোন মহিলাকে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহার জন্য দোয়া করিতেন এবং হাতে পানি লইয়া তাহার গায়ের জামার কোন ফাক দিয়া উহা তাহার গায়ে বহাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের জ্বরকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করার পরামর্শ দিয়া থাকিতেন।

২২১৪। হাদীছ ঃ—রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—জ্বরের মূল জাহান্নামের উত্তাপ হইতে। স্থতরাং উহাকে পানির সাহায্যে ঠাণ্ডা কর।

২২১৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জাহান্নামের উত্তাপ হইতে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব পানির সাহায্যে উহাকে ঠাণ্ডা কর।

ব্যাখ্যা ঃ—জাগতিক গরম ও তাপ হইতে জ্বরের উৎপত্তি দেখা যায়, কিন্তু জাগতিক গরম ও উত্তাপের মূল কেন্দ্র হইল জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ যে গরমের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া থাকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে উহাই ভূমণ্ডলে ছড়াইয়া তাপ ও গরমের সৃষ্টি করে। প্রথম খণ্ডে ৩২৭নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

জ্বরের সময় পানি ব্যবহার একটি সাধারণ ব্যবস্থা, এমনকি ঢাকা সিভিল এণ্ড মেলেটারী হাসপাতালে দেখিয়াছি—অতি মাত্রায় উত্তাপের সহিত জ্বর আসিলে ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীর সম্পূর্ণ শরীর বরফ দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয়। আর জ্বর অবস্থায় মাথায় পানি দেওয়া ত একটি অবধারিত নিয়ম। অবশ্য পানি ব্যবহারে বিশেষ নিয়ম পালন বা কোন উপসর্গের আশঙ্কায় রোগীকে পানি ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত রাখা একটি সতন্ত্র কথা।

কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে

কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ -

অর্থ—হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যাধি ছোঁয়াচে বা সংক্রামক শ্রেণীর নাই—কোন রোগ সম্পর্কে ঐরূপ আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করিবে না। অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্নরূপেও কিছু নাই—ঐরূপ আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করিবে না। পেঁচা সম্পর্কে যে সব অলীক ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে উহারও কোন বাস্তবতা নাই। ছফর মাসকে অশুভ মনে করা ইহারও মোটেই কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য কুষ্ঠ রোগী হইতে দুরে থাকিও যেরূপ বাঘ-ভল্লুক হইতে দুরে থাকার চেষ্টা করিয়া থাক। (৮৫০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের প্রথম বাক্য لَا عَدْوٰى "কোন ব্যাধি সম্পর্কে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক হওয়ার আকিদা ও বিশ্বাস রাখা নিষিদ্ধ" এবং সর্ব্বশেষ বাক্য فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ "কুষ্ঠ রোগী হইতে দুরে থাকিও" এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা নাই। কারণ, কোন রোগ বা ব্যাধিকে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক বিশ্বাস না করার উদ্দেশ্য এই যে—কোন ব্যাধি সম্পর্কে এরূপ আকিদা পোষণ করিবে না যে, এই ব্যাধিগ্রস্থের সংস্পর্শেই অন্য মানুষ আক্রান্ত হইয়া যায়, উহার জন্য আল্লার সৃষ্টিরও আবশ্যক হয় না। আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে শুধু সংস্পর্শের দরুনই উক্ত ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া যায়।

মূল বিষয় এই যে, দুনিয়ার সমুদয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এমনকি যে সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে আমরা আবহমান কাল হইতে বিভিন্ন কার্য্যকারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া আসিতেছি ঐ সবের জন্ম এবং অস্তিত্বও প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকারণের দ্বারা নহে, বরং স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লার সৃষ্টিতে হইয়া থাকে। দৃঢ়তার সহিত অটল অনড়রূপে এই আকিদা ও বিশ্বাস রাখাই ইসলামের শিক্ষা।

প্লেগ, কুষ্ঠ ইত্যাদি কতিপয় রোগ সম্পর্কে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে মোশরেকেদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যে ধারণা বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান পূজারীদের মধ্যেও দেখা যায় যে, এই সব রোগ ছোঁয়াচে ও সংক্রামক। অর্থাৎ এই রোগগ্রস্থ রোগীর সংস্পর্শেই অন্য লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যায় আল্লার সৃষ্টির তোয়াক্কা রাখে না। এই ধরণের আকিদা ও বিশ্বাস ইসলাম বিরোধী। আলোচ্য হাদীছে ঐ শ্রেণীর সংক্রামকতাকেই অলীক ও অবাস্তব বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে কোন রোগ ছড়াইবার দরুন তদ এলাকার বায়ু-বাতাস ও পানি ইত্যাদি দুষীত হওয়ায় দুষীত বায়ু-বাতাসে ও দুষীত পানির দরুন বা কোন রোগীর সংস্পর্শের দ্বারা উক্ত রোগের দুষীত পদার্থ স্পর্শকারীর দেহে প্রবেশ করার দরুন রোগাক্রান্ত হওয়ার শুধু আশঙ্কা, তাহাও কেবল বাহ্যিক উপকরণের পর্য্যায়ে করা যাইতে পারে, কিন্তু এই উপকরণ এবং উহার দরুন রোগের উৎপত্তি একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্ব্বময় ক্ষমতাধিকারী আল্লার সৃষ্টিতেই হইতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা রোগ সৃষ্টি করিয়া না দিলে হাজার উপকরণেও রোগ সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

সার কথা এই যে, রোগের আক্রমণ একমাত্র আল্লার সৃষ্টিতেই হইতে পারে ইহার উপর দৃঢ়তার সহিত অটল বিশ্বাস ও আকিদা রাখিতে হইবে। হাঁ—মহামারী এলাকার দুষীত বায়ু-বাতাস ও পানি বা রোগের দুষীত পদার্থ রোগের পক্ষে শুধু মাত্র বাহ্যিক কারণ গণ্য হইবে।* এই সূত্রেই আলোচ্য হাদীছে কুষ্ঠ রোগীর

---

* এই শ্রেণীর বাহ্যিক কারণ সমূহকে ইসলামী পরিভাষায় এক বচনে سبب সবব্'' এবং বহু-বচনে "اسباب—আস্‌বাব" বলা হয়। সব রকম সবব্ই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করাতে সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব সববের মাধ্যমে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে তাহাও আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করিলেই সৃষ্টি হইতে পারে অন্যথায় নহে। তাই পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালাকে "مسبب الاسباب—মোসাব্বেবুল-আস্‌বাব" অর্থাৎ সকল কারণের মহাকারণ ও তথা সকল কারণের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং কারণ সমূহের মাধ্যমে সংঘটিত বস্তু সমূহেরও সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়।

বিজ্ঞান শুধু বাহ্যিক কারণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ইসলাম তাহাকে কারণের কারণ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথ দেখাইয়াছে। অতএব ইসলাম বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং বিজ্ঞানের পক্ষে অধিক উন্নতির পথ প্রদর্শক।

স্পর্শে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং অন্য হাদীছে প্লেগের মহামারী এলাকায় আগমনে নিষেধ করা হইয়াছে। বোখারী শরীফ ৮৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, চর্ম্ম রোগাক্রান্ত উটের মালিক যেন তাহার উট ঐ ব্যক্তির উটের সঙ্গে একত্রে না রাখে যাহার উট সুস্থ।" এই সব নিষেধাজ্ঞা নিছক এইরূপ যেরূপ জ্বরাক্রান্তকে ঠাণ্ডা বস্তু ব্যবহার করা হইতে এবং বদহজমের রোগীকে গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করা হইতে নিষেধ করা হইয়া থাকে। ×

অন্ধকার যুগে, বিজ্ঞান পূজারীদের ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার ধারণা আর ইসলাম অনুমোদিত শুধু বাহ্যিক কারণ গণ্য করা উভয়ের মধ্যে বিরাট দুইটি ব্যবধান আছে।

(১) ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতায় বিশ্বাসীগণ রোগের সৃষ্টি ও জন্মকে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে মনে করেন না, বরং সংক্রামকতার দ্বারাই রোগের উৎপত্তি ও জন্ম বলিয়া ধারণা করে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা এই যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা, আর বাহ্যিক কারণ শুধু অছিলা মাত্র। অছিলার ক্ষমতায় কোন বস্তুর জন্ম হয় না, জন্ম হয় আল্লার সৃষ্টিতে। এই জন্যই মহামারী এলাকায় এবং সংক্রামকতার ক্ষেত্রেও হাজার হাজার লোককে রোগমুক্ত দেখা যায়। তাহাদের বেলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রোগের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই তাহারা মুক্ত রহিয়াছে। নতুবা ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতায় বিশ্বাসীদের মতে রোগের সৃষ্টি কারক যাহা তাহা ত সকলের জন্যই বিদ্যমান। ↑

× এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী ও কুষ্ঠ রোগের সংক্রামকতা যদি নিছক বাহ্যিক কারণ পর্য্যায়ের হইয়া থাকে তবে হাদীছ শরীফে শুধু এই দুইটি রোগের সংশ্রব এড়াইবার আদেশ কেন করা হইল, অথচ আরও বহু রোগের অনেক অনেক বাহ্যিক কারণ রহিয়াছে উহা সম্পর্কেত হাদীছে বিশেষ কোন আলোচনা দেখা যায় না। উত্তর এই যে, প্লেগ ও কুষ্ঠ এই দুইটি রোগ সম্পর্কে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক হওয়ার আকিদা ও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাই স্বাভাবিকরূপে এস্থলে মানুষের মনে দুর্ব্বলতা আসিবে। এতদ্ভিন্ন উক্ত রোগদ্বয়ের সংস্পর্শে যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে সেই রোগীর বা অন্যান্যদের পক্ষে অন্ধকার যুগের আকিদা ও বিশ্বাস কবলীত হইয়া ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাই হাদীছে এই দুইটি রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কারণ, অন্য কোন রোগ সম্পর্কে সেইরূপ আকিদার প্রচলন নাই।

↑ ইহা একটি বিরাট প্রশ্ন যাহা চাক্ষসরূপে প্রমাণিত। এই প্রশ্ন এড়াইবার জন্য বিজ্ঞান পূজারীদের নিছক কাল্পনিক সমূদ্রে হাতড়াইতে হয়, কিন্তু ইসলামের শিক্ষামতে উত্তর সহজ।

(২) আর একটা ব্যবধান কার্য্য ক্ষেত্রে এই দেখা দিবে যে, সংক্রামকতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে রোগীকে অস্পৃশ্য ভাবিবার প্রবণতা দেখা দিবে। এমনকি তাহার প্রতি মানবতার হক আদায় করিতেও বাধার সৃষ্টি হইবে। ফলে রোগীর প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা এবং মরিয়া গেলে তাহার দাফন-কাফন কার্য্য পর্য্যন্ত ব্যহত হইবে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষা ও আকিদা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক অর্থাৎ এই ভাবিয়া যে, আল্লাহ তায়ালা আমার ভিতর রোগ সৃষ্টি না করিলে আমি কস্মিন কালেও আক্রান্ত হইব না—এই বিশ্বাস লইয়া প্রয়োজনীয় সব কাজেই অগ্রসর হওয়া সহজ হইবে।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহার নজীর স্থাপন করিয়াছেন। ইবনে মাজাহ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে— ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা হযরত রসুলুলাহ (দঃ) এক কুষ্ঠ রোগীকে হাত ধরিয়া নিজের খাবার বর্ত্তনে এক সঙ্গে বসাইলেন, এবং বলিলেন, খানা খাও ; আমি আল্লার উপর ভরসা করিতেছি এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি।"

অথচ কুষ্ঠ রোগীর সংশ্রবকে রোগাক্রান্তির সম্ভাব্য বাহ্যিক কারণ গণ্য করিয়া হযরত (দঃ) সাধারণ ভাবে উহা এড়াইয়া চলার পরামর্শ দিয়াছেন এবং নিজেও সাধারণতঃ এড়াইয়া চলিয়াছেন। মোছলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, "একদা সাক্বিফ্ গোত্রের এক দল লোক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল! (হযরত (দঃ) তাহাদের প্রত্যেককে বায়য়াৎ—হাতে হাত দিয়া দ্বীন-ইসলামের অঙ্গীকার করার সুযোগ দিলেন, কিন্তু) তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল, তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, (দুর হইতেই) আমি তোমার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া নিলাম, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

এস্থলে হযরত (দঃ) বাহ্যিক কারণকে উহার শ্রেণীমত মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন যে, উহাকে সৃষ্টিকারীর মর্য্যাদা দিওনা,* সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা—তাঁহার সৃষ্টি ব্যতিরেকে হাজার

* এখানেই একটি প্রশ্নের মিমাংসা হইয়া গেল—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে কুষ্ঠ রোগী হইতে দুরে থাকার আদেশ করা হইয়াছে, অথচ ইবনে-মাজাহ শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সূত্রে দেখা যায় স্বয়ং হযরত (দঃ) কুষ্ঠ রোগীকে এক বর্ত্তনে নিজের সঙ্গে বসাইয়া খানা খাওয়াইয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে উভয়টির গড়মিল পরিদৃষ্ট হয়। উহার মিমাংসা এই যে, দুরে থাকার আদেশটি রোগাক্রান্তির বাহ্যিক কারণ হওয়া দৃষ্টে এবং ইহার ক্ষেত্রে হইল সাধারণ অবস্থা। আর সঙ্গে বসাইয়া খাওয়ান হইল প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টে যে, শুধু

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাহ্যিক কারণেও কোন কিছুর উৎপত্তি ও জন্ম হইতে পারে না। অতএব মানবতার হক্ ও ইসলামী কর্ত্তব্য পালনের প্রয়োজন ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করিতে হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া আল্লার উপর ভরসা ও নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক অগ্রসর হইও।

যে কোন রোগের উৎপত্তির মূল একমাত্র আল্লার সৃষ্টি। আল্লার সৃষ্টির কথা এড়াইয়া ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার কথা যে, সাধারণ দৃষ্টিতেও অচল তাহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি সহজ ও সরল পন্থায় নিম্নে বর্ণিত হাদীছে বুঝাইয়াছেন।

২২১৬। হাদীছ :— ان ابا هريرة رضى الله تعالى قال

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ

أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ إِبِلِيْ تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ

فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছোঁয়াচে বা সংক্রামকতার দ্বারা কোন রোগের উৎপত্তি বা জন্ম হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিবে না—ইহার কোন বাস্তবতা ও ভিত্তি নাই। ছফর মাসকে অশুভ মনে করিবে না। পেঁচা সম্পর্কে যে সব কথা প্রচলিত রহিয়াছে উহারও কোন বাস্তবতা বা ভিত্তি নাই। ইহা শুনিয়া এক গ্রাম্য ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! অনেক সময় আমার উট দল কোন এক পশু-চরণ এলাকায় থাকে; আমার উটগুলি পূর্ণ সুস্থ ও সুন্দর থাকে—জংলী হরিণের ন্যায় দেখায়। অতঃপর তথায় কোন একটি চর্ম্ম রোগী উট আসে এবং আমার সুস্থ উটগুলির সঙ্গে থাকে, ফলে আমার উটগুলিও চর্ম্ম রোগাক্রান্ত হইয়া যায়।

হযরত (দঃ) তাহার বক্তব্যের (মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার ধারণায় প্রথম চর্ম্ম রোগী উটটির সংস্পর্শে ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতারূপে তাহার সুস্থ উটগুলি

বাহ্যিক কারণে রোগ সৃষ্টি হইতে পারিবে না—সর্ব্বময় স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্ব্বশক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে। অতএব বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

অবশ্য এরূপ বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করার জন্য শরীয়ত দুইটি ক্ষেত্রেই অনুমতি দিয়া থাকে। একটি হইল যদি কামেল তাওয়াক্কুল তথা আল্লার উপর অনড় অটল সুদৃঢ় ভরসা ও নির্ভর স্থাপনকারী হয়। আর একটি হইল যদি মানবতার কর্ত্তব্য ও ইসলামী হুকুম তথা রোগীর সেবা শুশ্রূষা বা কাফন-দাফন ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়।

রোগাক্রান্ত হইয়াছে—এই ধারণার) উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টিকারী কে?

অর্থাৎ একটির মধ্যে রোগ অপরটি হইতে আসিয়াছে; তবে এই ছেল্‌ছেলার সর্ব্ব প্রথমটির মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী কে? যিনি উহার মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী তাঁহাকেই সর্ব্ব ক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টিকারী বিশ্বাস করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বাক্য তথা—ولا صفر ইহার অর্থ যাহা করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও একটি অর্থ ইহার করা হইয়া থাকে যে, "ছফর" এক প্রকার পেটের রোগ যাহাকে অন্ধকার যুগে অত্যধিক সংক্রামক বলিয়া গণ্য করা হইত। ইমাম বোখারী (রঃ) এই দ্বিতীয় অর্থকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

প্লেগ ইত্যাদি মহামারী রোগ সম্পর্কে

২২১৭। হাদীছ :— اسامة بن زيد يحدث سعدا رضى الله عنهما

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهٖ بَعْضُ الْاُمَمِ ثُمَّ بَقِىَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَتَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَتَاْتِى الْاُخْرٰى فَمَنْ سَمِعَ بِاَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِاَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِّنْهُ ـ

অর্থ—উছামা (রাঃ) আবু সায়ীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা প্লেগ রোগের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বস্তুতঃ ইহা অতীত কালের কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লার তরফ হইতে প্রেরিত আজাব ছিল। (এই রোগের মহামারীতে সেই সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার পর) উহারই অবশিষ্ট ধরা-পৃষ্ঠে রহিয়া গিয়াছে যাহা কোন সময় লুক্কায়িত থাকে কোন সময় প্রকাশ পায়। কোন অঞ্চলে এই রোগ বিস্তারের সংবাদ জ্ঞাত হইলে তথায় যাইবে না এবং স্বীয় অবস্থান অঞ্চলে এই রোগের মহামারী দেখা দিলে উহা হইতে পলায়ন উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইবে না—(এই ভাবিয়া যে, এই স্থান হইতে চলিয়া গেলে ঐ রোগ হইতে বাঁচা যাইবে অন্যথায় বাঁচা যাইবে না। ১০৩২ পৃঃ)

২২১৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফৎ কালে একবার মদীনা হইতে সিরিয়া উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 'সার্‌গ' নামক স্থানে পৌঁছিলে পর সিরিয়া এলাকার সর্ব্বাধিনায়ক ছাহাবী আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তাঁহার বিশিষ্ট সঙ্গীগণ সহ খলীফা ওমরের নিকট

উপস্থিত হইয়া তঁাহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের মহামারী দেখা দিয়াছে। ওমর (রাঃ) তখন মোহাজের ছাহাবীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করিয়া মহামারীর সংবাদ তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করতঃ তথায় উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইল। এক দল বলিলেন, আপনি সিরিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া মদীনা হইতে আসিয়াছেন, এখন (মহামারীর ভয়ে উদ্দেশ্য স্থলে না পৌঁছিয়া) ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। অপর দল বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী এবং মোসলেম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি আপনার সঙ্গে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে মহামারীর মুখে উপস্থিত করিয়া দিবেন তাহা আমরা ভাল মনে করি না।

ওমর (রাঃ) উভয় দলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং মদীনাবাসী ছাহাবা— আনছারগণকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহারাও মোহাজেরগণের ন্যায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদেরকেও চলিয়া যাইতে বলিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোরায়েশ বংশীয় ঐ লোকগণ যাঁহারা মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে ইসলামের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মুরব্বি শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গেকে ডাকিয়া আন। তাঁহারা সমবেত হইলেন এবং সকলে একমত হইয়া পরামর্শ দিলেন যে, আপনি আপনার সঙ্গীগণকে নিয়া মদীনায় ফিরিয়া যান। তাঁহাদিগকে মহামারীর মুখে উপস্থিত করিবেন না। সেমতে ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিয়া দিলেন, ভোর হইলেই আমি মদীনার পথে রওয়ানা হইব আমার সঙ্গীগণকেও রওয়ানা হইতে হইবে। তখন ছাহাবী আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আল্লার তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ হইতে পালাইতে চান? * ওমর (রাঃ) আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ)কে আশ্চার্য্যন্বিত স্বঃরে বলিলেন, তুমি ভিন্ন অন্ন কেহ এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে, (কিন্তু তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শোভা পায় না।) এই বলিয়া ওমর (রাঃ) প্রশ্নের উত্তর দানে বলিলেন, হাঁ—আমরা আল্লার এক তকদীর (নির্দ্ধারণ) হইতে আল্লারই অপর তকদীরের (নির্দ্ধারণের) প্রতি যাইতেছি।

---

* অর্থাৎ সিরিয়ায় মহামারীর সংবাদে তথায় যাওয়া হইতে বিরত থাকা এবং মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা মনে হয় মহামারী কবলিত হওয়ার আশঙ্কা ও ভয়ের কারনে হইতেছে। অথচ যাহা কিছু হয় সবই তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী হয়, এমতাবস্থায় মহামারী এলাকায় যাওয়া হইতে বিরত থাকা বস্তুতঃ তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ হইতে পলায়ন করা।

(অর্থাৎ সিরিয়ায় পৌঁছিলে তাহা আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণেই হইত এবং এখন মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তনও আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণেই হইতেছে।↑ কার্য্য ক্ষেত্রে কোন একটি দিক বাস্তবায়িত হওয়ার পরই তাহা তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ সাব্যস্ত হইবে—বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব্বে কোন দিককেই তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণরূপে সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নে মানুষ নিজ বিবেক বুদ্ধির দ্বারাই স্বীয়-কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিবে। এই তথ্যটি বুঝাইবার জন্য ওমর (রাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন—

বল ত! তুমি যদি তোমার উট চরাইবার জন্য কোন ময়দানে যাও যাহার একটি প্রান্ত সবুজ-শ্যামল অপর প্রান্ত ঊষর। উহার যে প্রান্তেই তোমার উট বিচরণ করাইবা তাহা আল্লার তরফ হইতে তকদীর ও নির্দ্ধারণ অনুযায়ীই হইবে। (কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে তুমি নিজ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা কোন্ প্রান্ত নির্ব্বাচন করিবা? সবুজ-শ্যামলা প্রান্তই নির্ব্বাচন করিবা, নতুবা বোকা বরং অপরাধী সাব্যস্ত হইবা। অবশ্য এই নির্ব্বাচন বাস্তবায়িত হওয়ার পর সাব্যস্ত হইবে যে, ইহাই আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণ ছিল, অতএব তোমার নির্ব্বাচন আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীরের বিরোধী বা উহার বাহিরে নহে।

↑ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কাজই আল্লার তকদীর তথা আল্লার নির্দ্ধারণ মোতাবেক হইয়া থাকে, অবশ্য সেই নির্দ্ধারণ বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও জানা থাকে না। অতএব তকদীর একটি শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও আকিদা সম্পর্কীয় বিষয়, যদ্দারা মানুষ আপদ-বিপদ আসিয়া গেলে পর ছবর ও ধৈর্য্য ধারণের পথ পায় এবং আবশ্যক স্থলে ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়াও জীবন বিপন্নের পথে অগ্রসর হইতে বাধা মুক্ত হইতে পারে।

কার্য্য ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা একটা দিক নির্ণয় করতঃ সে দিকে অগ্রসর হইবে—মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই বিধানই রাখিয়াছেন। সেই দিক নির্ণয় শরীয়ত বহির্ভূত হওয়াও অপরাধ এবং তকীরের বুলি আওড়াইয়া হাত-পা গুটাইয়া থাকাও অপরাধ।

দিক নির্ণয় মানুষের বুদ্ধি-বিবেক দ্বারাই হইবে এবং কার্য্য ক্ষেত্রে উহার বাস্তবায়নও তাহার প্রাপ্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির দ্বারাই হইবে যদ্দরুন সে ঐ কার্য্যের মজা বা সাজা ভোগ করিবে। অবশ্য কার্য্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়ার পর সাব্যস্ত করা যাইবে যে, তকদীর বা আল্লার নির্দ্ধারণ এইটাই ছিল। ওমর (রাঃ) তাহাই বলিয়াছেন যে, আমরা এক তকদীর হইতে অপর তকদীরের প্রতি যাইতেছি অর্থাৎ সিরিয়ায় যাওয়া বাস্তবায়িত হইলে তাহাও আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীরই সাব্যস্ত হইত এবং মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন বাস্তবায়িত হইলে তাহাও আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীরই সাব্যস্ত হইবে। কার্য্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব্বে যেহেতু আল্লার নির্দ্ধারণ ও তকদীর সম্পর্কে কাহারও কিছু জানা থাকে না, তাই কার্য্যের ফল ভোগের ব্যাপারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

দৃষ্টান্তটি দ্বারা ওমর (রাঃ) বুঝাইয়া দিলেন যে, সিরিয়ার পথে অগ্রসর হওয়া বা মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তন করা উভয়টির কোন্‌টি আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণ তাহা কাহারও জানা নাই, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা আমাদিগকে উহার একটি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সেমতে আমরা মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তনকে নির্ব্বাচন করিয়াছি, ইহা বাস্তবায়িত হইলে ইহাই আল্লার তরফ হইতে তকদীর ও নির্দ্ধারণ সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে সিরিয়ায় যাওয়া বাস্তবায়িত হইলে তাহাও আল্লার তকদীর ও নির্দ্ধারণই সাব্যস্ত হইত—এই তথ্যকেই ওমর (রাঃ) প্রকাশ করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের এই নির্ব্বাচন আল্লার তকদীর হইতে পলায়ন তথা আল্লার তরফ হইতে নির্দ্ধারিত তকদীরের বিরোধী বা উহার বাহিরে নহে, বরং সম্ভাব্য এক তকদীর হইতে অপর তকদীরের প্রতি ধাবিত হওয়া মাত্র। আমরা যে, মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এই প্রত্যাবর্ত্তনও আল্লার নির্দ্ধারণ বা তকদীরের কারণেই হইতেছে।*)

খলীফা ওমর (রাঃ) এই আলোচনা দ্বারা মদীনা পানে প্রত্যাবর্ত্তনকে বৈধ প্রমাণিত করিতেছিলেন—ইতি মধ্যে বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আপনাদের এই বিতর্কের বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ এল্‌ম তথা শরীয়তের বিধান সম্বলিত একটি সুস্পষ্ট হাদীছ আমার জানা রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিলেন—

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ -

অর্থ—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, কোন অঞ্চলে প্লেগের সংবাদ পাইলে তথায় যাইও না। এবং কোন অঞ্চলে অবস্থান কালে তথায় প্লেগ ছড়াইয়া পড়িলে প্লেগ হইতে পলায়নের খেয়ালে তথা হইতে বাহির হইও না।

---

* পাঠক বর্গ! স্মরণ রাখিবেন, শরীয়ত বিরোধী দিকে অগ্রসর হইয়া নিজকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য তকদীরের ছুতা ধরা নিষ্ফল, বরং গোনাহ ও নাজায়েয। পক্ষান্তরে শরীয়ত সম্মত দিক নির্ব্বাচনে অযথা প্রশ্ন এড়াইবার জন্য বা সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাব্য কষ্ট-যাতনার উপর ধৈর্য্য ধারণের উদ্দেশ্যে তকদীরের কথা তুলিয়া ধরায় দোষ নাই, বরং এরূপ ক্ষেত্রে বাধামুক্ত হওয়ার একটি বিশেষ অবলম্বনই হইল তকদীরের প্রতি ঈমান।

(খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত এই হাদীছের পূর্ণ অণুকূলে ছিল। কারণ, তিনি সিরিয়ায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তথায় প্লেগের সংবাদ পাইয়াছিলেন।) হাদীছের অণুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক হইয়াছে দেখিয়া তিনি আল্লার প্রশংসা করিলেন এবং মদীনা পানে যাত্রা করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—প্লেগ বা মহামারী এলাকায় বাহির হইতে আগমণকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু অন্ধকার যুগের বা বিজ্ঞান পূজারীদের ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার বিশ্বাস ও আকিদা এই নিষেধাজ্ঞার কারণ নহে। ঐরূপ ধারণা ও আকিদা যে সম্পূর্ণ অলীক ও নিষিদ্ধ তাহা একাধিক হাদীছে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। আলোচ্য নিষেধাজ্ঞাটি শুধু মাত্র সতর্কতার ব্যবস্থা স্বরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই সূত্রে যে, মহামারী ছড়াইবার দরুন তদ অঞ্চলের বায়ু-বাতাস ও পানি দুষিত হয় এবং দুষিত বায়ু-বাতাস ও পানি রোগ সৃষ্টিকারী নয় বটে, কিন্তু উহা রোগের জন্য বাহ্যিক কারণের পর্য্যায় ভুক্ত। তাই কার্য্যকারণের জগতে শরীয়ত উহাকে সতর্কতা মুলক ব্যবস্থা অবলম্বন শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছে—তাহাও শুধু এমন ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে উহার ঐরূপ মর্য্যাদা দেওয়ায় মানবীয় কর্ত্তব্য ও ইসলামী হক্ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। যেমন, মহামারী এলাকায় বাহির হইতে জন-সাধারণের আগমন না হইলেও উক্ত এলাকাবাসীদের জীবন-যাপন ইত্যাদি ব্যাপার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে উক্ত বাহ্যিক কারণকে মর্য্যাদা দেওয়া হইলে ঐরূপ আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে শরীয়ত উহাকে কোন মর্য্যাদা দেওয়ার আদেশ করে নাই, বরং উহাকে উপেক্ষা করিয়া মূল সৃষ্টিকর্ত্তা স্বাধীন ও সর্ব্বশক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা ও নির্ভর স্থাপন করার পন্থা অবলম্বনের আদেশ করিয়াছে। এই সূত্রেই মহামারী এলাকা হইতে পলায়নে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে দুষিত বায়ু-বাতাস ও পানি ইত্যাদি বাহ্যিক কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সতর্কতা মুলক ভাবেও তদ এলাকা পরিত্যাগ করার জন্য শরীয়ত পরামর্শ দিলে বা উৎসাহ প্রদান করিলে, বরং নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করিলে মহামারী এলাকা হইতে পলায়নের হিরিক পড়িয়া বিভিন্ন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। যথা—

(১) তদ এলাকায় ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি হইবে। (২) এলাকাবাসীদের চলিয়া যাওরার ফলে রোগীদের সেবা শুশ্রূষা এবং মৃতদের কাফন-দাফন ইত্যাদি মানবীয় কর্ত্তব্য ও ইসলামী হক্ নষ্ট হইবে। (৩) এলাকার সব লোক অপসারিত নিশ্চয়ই হইবে না, এমতাবস্থায় অধিকাংশ লোক পলায়ন করিয়া গেলে অবশিষ্টদের জীবন-যাপন শুধু কঠিনই নহে, দুষ্কর হইয়া পড়িবে। এতগুলি অনিষ্টের সম্মুখে একটা বাহ্যিক কারণের প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে না, বরং উপেক্ষা করাই যুক্তি সঙ্গত।

সার কথা এই যে, দুষিত বায়ু-বাতাস ইত্যাদি বাহ্যিক কারণের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাই, উহা শুধু একটি বাহ্যিক কারণ বটে, তাই উহা একটি দুর্ব্বল জিনিষ ; অতএব যে ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই সেই ক্ষেত্রে ত উহার প্রতি লক্ষ্য করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং এই সূত্রেই মহামারী এলাকায় সাধারণ আগমনে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, বহিরাগমনের সাময়িক বাধায় বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। তদ্রূপ কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে সাধারণ মেলামেশায় বাধা দেওয়া হইয়াছে, কেননা দুরে দুরে থাকিয়াও তাহার সেবা শুশ্রূষার কাজ চলিতে পারে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত দুর্ব্বল জিনিষ—বাহ্যিক কারণকে উপেক্ষা করার পথ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সূত্রেই মহামারী এলাকা হইতে পলায়নকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।* অবশ্য ইহা ওলামাদের এক জামাতের অভিমত। অপর জামাতের অভিমত এই যে, তদ এলাকা পরিত্যাগ সম্পর্কেও দুষিত বায়ু-বাতাস ও পানি ইত্যাদিকে রোগের জন্য বাহ্যিক কারণ গণ্য করিয়া সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার তথা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু শর্ত্ত এই যে, আকিদা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় রাখিতে হইবে যে, রোগ সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্ব্বশক্তির অধিকারী—তিনি মহামারী এলাকার মধ্যেও রোগ মুক্ত রাখিতে পারেন এবং অন্যত্রও রোগাক্রান্ত করিতে পারেন। ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতাকে রোগ সৃষ্টিকারী মনে করা হারাম ও ঈমানের পরিপন্থী। আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা এরূপ অবস্থায়ই প্রযোজ্য এবং এইরূপ ধারণার বশীভুত হইয়া তদ এলাকা পরিত্যাগ করাকেই রোগ হইতে পলায়ন করা বলা হইয়াছে। আকিদা ও বিশ্বাসকে একমাত্র আল্লার দিকে সুদৃঢ় রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু-বাতাসের জন্য অন্যত্র যাওয়া রোগ হইতে পলায়ন করা নহে এবং ইহা নিষিদ্ধও নহে।

মছআলাহ :—(১) মহামারী এলাকা হইতে কোন বিশেষ আবশ্যক বশতঃ বা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোথাও যাওয়া জায়েয আছে ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। (২) ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতাকে রোগ সৃষ্টিকারী মনে করিয়া মহামারী এলাকা হইতে চলিয়া যাওয়া হারাম ও ঈমানের পরিপন্থী ইহাতেও কাহারও দ্বিমত নাই। (৩) রোগ সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা—আল্লার সৃষ্টি করা ব্যতিরেকে সংক্রামকতায় রোগ সৃষ্টি হইতে পারে না এই আকিদা ও বিশ্বাস অনড় অটলরূপে সুদৃঢ় রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু-বাতাসের উদ্দেশ্যে মহামারী এলাকা ছাড়িয়া

---

* মাওলানা থানভীর বাওয়াদেরুন্-নাওয়াদের কেতাব হইতে এই তথ্য সংগৃহীত।

অন্যত্র যাওয়া সম্পর্কে ওলামাদের দ্বিমত রহিয়াছে।× এক জামাত আলেমের মত এই যে, এইরূপ যাওয়া জায়েয নহে—ইহাও আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত—ইহাও কবিরা গোনাহ।↑ আর এক জামাত আলেমের মত এই যে, এরূপ যাওয়া জায়েয আছে, আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা শুধু ২নং অবস্থায় প্রযোজ্য। ৮৫২ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতের ইঙ্গিত দানে একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

২২১৯। হাদীছ:— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন মোসলমানের মৃত্যু প্লেগ রোগে হইলে সে শহীদের মর্ত্তবা লাভ করিবে।

কোন রোগ ছোঁয়াচে বা স্পর্শক্রামী হওয়ার ধারনা অবাস্তব—ইহা বিশ্বাস করিবে না

২২২০। হাদীছ:— ان عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِى الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

অর্থ—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন রোগ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক হয় না, কোন ব্যাধি সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা করা নিষিদ্ধ।

কোন বস্তু অশুভ অলক্ষ্মী হওয়ার ধারণাও ভিত্তিহীন; কোন বস্তু সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা পোষণ করিবে না। অশুভ অলক্ষ্মী হওয়ার যদি বাস্তবতা থাকিত তবে স্ত্রী, ঘোড়া এবং বাড়ী—এই তিন জিনিষের মধ্যে তাহা হইত।

অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ত এই তিন জিনিষের মধ্যেও অলক্ষ্মী-অশুভতার কিছু নাই; তবে এই বস্তুত্রয় অবলম্বনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন উহা ত্রুটিজনিত হইয়া ক্ষতির কারণ না হয়। অন্য জিনিষের ক্ষতি এড়ানো সহজ, এই তিন জিনিষের ক্ষতি এড়ানো কঠিন, যেহেতু ইহার প্রত্যেকটি সর্ব্বদার জীবনসঙ্গী।

× ফতহুলবারী ১০—১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য —

↑ "বাওয়াদেরুন্-নাওয়াদের" মাওলানা থানভী দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য হাদীছের প্রথম বাক্যটির বিস্তারিত আলোচনা "কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে" পরিচ্ছেদের আরম্ভে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। অশুভ-অলক্ষী" সম্পর্কীয় বাক্যটির বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে জেহাদ অধ্যায়ে ঘোড়া সম্পর্কীয় আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।

মহামারী এলাকায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকার ফজিলত

২২২১। হাদীছ :— عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها

سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَاَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِى بَلَدِهٖ صَابِرًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, প্লেগ রোগের সূচনা আল্লার আজাবরূপে ছিল। এখনও যাহাদের প্রতি আল্লাহ উহা প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঈমানদারদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালা উহাকে রহমত বানাইয়া দিয়াছেন। (মোমেন ব্যক্তি উহার দ্বারা শহীদের মর্ত্তবা লাভ করিয়া থাকে।)

সুতরাং আল্লার যে বান্দা নিজ এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে পর তথায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্থিরপদ থাকিবে—মনে-প্রাণে এই কথা গাঁথিয়া রাখিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাই তাহার উপর বর্ত্তিবে সে অবশ্যই শহীদের সমান মর্ত্তবা লাভ করিবে।

ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গে

২২২২। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ..........

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নজর লাগার প্রতিক্রিয়া (বাহ্যিক কারণ পর্য্যায়ে) একটি বাস্তব জিনিষ।

২২২৩। হাদীছ — عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজর লাগার ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক করার পরামর্শ দিয়াছেন।

২২২৪। হাদীছ ঃ— عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ

অর্থ—উম্মে ছালামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গৃহে একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলেন—তাহার মুখমণ্ডলে যেন ঝাঁজ লাগিয়াছে। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, মেয়েটিকে ঝাড়-ফুঁক করাও; তাহার উপর নজর লাগিয়াছে।

২২২৫। হাদীছ ঃ— عن الاسود قال سألت عائشة رضى الله عنها

عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব রকম বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়াছেন।

২২২৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক শ্রেণীর ঝাড়-ফুঁকে এইরূপ বলিয়া থাকিতেন—

تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا -

"আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের এক জনের থুথু (মিশ্রিতরূপে ব্যবহার করা হইতেছে এই উদ্দেশ্যে যে,) আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের ইচ্ছা ও আদেশে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।"

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে, কাহারও দেহে ফুলা-ফাটা বা ক্ষত শ্রেণীর কোন ব্যাধি থাকিলে উহার ঝাড়-ফুঁক হযরত নবী (দঃ) এরূপে করিতেন যে, স্বীয় শাহাদৎ আঙ্গুলে থুথু লাগাইয়া উহার সঙ্গে একটু মাটি জড়াইয়া নিতেন এবং উহাকে ব্যাধিস্থানে লাগাইতেন এবং উল্লেখিত দোয়াটি পড়িতেন।

২২২৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কাহাকেও ঝাড়-ফুঁক করিলে ডান হাত তাহার উপর বুলাইতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ

إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا -

অর্থ—হে সর্ব্বজনীন প্রভু-পরওয়ারদেগার! ব্যাধি দূর করিয়া আরোগ্য দান করুন যেন ব্যাধির নাম-নিশান বাকি না থাকে। আপনি ভিন্ন অন্য কোথাও হইতে আরোগ্য লাভ হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্যাধি হইলে ব্যাধি স্থানে হাত বুলাইবে এবং উক্ত দোয়া পড়িবে।

মন্ত্র-তন্ত্রের ধার না ধারিয়া আল্লার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কোল করার ফজিলত

২২২৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মজলিসে আসিয়া বয়ান করিলেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ এবং তাঁহাদের উম্মতের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সেই উপলক্ষে দেখিয়াছি, কোন নবী চলিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে মাত্র একজন লোক রহিয়াছে, কাহারও সঙ্গে দুইজন লোক রহিয়াছে, কোন নবীর সঙ্গে এক দল লোক রহিয়াছে, কোন কোন নবী চলিয়াছেন যাঁহার সঙ্গে দল ও জামাত অপেক্ষা কম লোক রহিয়াছে, কাহারও সঙ্গে একজনও নাই। আবার দেখিতে পাইলাম, আকাশ-জোড়া এক বিরাট জামাত আসিতেছে; তখন আমি ভাবিলাম, ইহারা আমার উম্মত হইবে, কিন্তু আমাকে জ্ঞাত করা হইল, ইহারা হইতেছে মূছা (আঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণ। অতঃপর আমাকে বলা হইল, আপনি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করুন। তখন আমি আকাশ-জোড়া আর একটি বিরাট জামাত দেখিতে পাইলাম। ঐ সময় আমাকে অন্যান্য দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে বলা হইল। আমি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দিকে আকাশ-জোড়া বিরাট বিরাট জামাত দেখিতে পাইলাম। আমাকে বলা হইল, এই সবের সমষ্টি আপনার উম্মত। ইহাদের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে যাহারা বিনা-হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। এতটুকু বলার পরেই হযরত (দঃ) স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং

মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত (দঃ) উক্ত সত্তর হাজার লোক সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা দিলেন না।

ছাহাবাদের মধ্যে উহা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। তাঁহারা বলিলেন, আমরা (সর্ব্বপ্রথম) আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসুলের এত্তেবা ও তাবেদারী গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ঐ সত্তর হাজার আমরা হইব, অথবা আমাদের জীবনের একাংশ যেহেতু অন্ধকার তথা কুফুরী যুগে কাটিয়াছে তাই আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যাহারা ইসলামের হালতেই জন্ম নিয়াছে তাহারা হইবে।

উক্ত জল্পনা-কল্পনার খবর হযরত নবী (দঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন—

هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"তাহারা ঐ শ্রেণীর লোক যাহারা কোন কিছুকে অশুভ-অমঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করে নাই, মন্ত্র-তন্ত্রের ধার-ধারে নাই, আগুনে পোড়া লোহার দাগ লাগান ব্যবস্থার চিকিৎসা গ্রহণ করে নাই। সর্ব্বদা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কোল ও ভরসা করিয়াছে।"

ঐ সময় ওকাশাহ্ (রাঃ) নামক ছাহাবী আরজ করিলেন, হুজুর। আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ আমাকে ঐ সত্তর হাজারের একজন করেন। হযরত (দঃ) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! ওকাশাহ্কে উহাদের দলভুক্ত করিয়া দিন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ঐরূপই আরজ করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, এই দোয়ার সৌভাগ্য ওকাশাহ্ তোমার পূর্ব্বেই নিয়া গিয়াছে।*

ব্যাখ্যা :—তপ্ত লৌহাদি দ্বারা দাগাইয়া চিকিৎসা করা আবশ্যকস্থলে জায়েয আছে বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া যথা সাধ্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা বা আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করা উত্তম। এ-সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্পষ্ট উক্তি হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—হযরত (দঃ) এই ব্যবস্থা উপকারী হওয়া বিশেষ জোরের সহিত বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন, وانهى امتى عن الكى "আমি আমার উম্মতকে দাগানের ব্যবস্থা হইতে নিষেধ করি।" অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা নাজায়েয শ্রেণীর নহে, বরং পছন্দিত না হওয়া শ্রেণীর। বোখারীর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে—وما احب ان اكتوى "দাগ লাগানকে আমি পছন্দ করি না।" পছন্দিত না হওয়ার কারণরূপে আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, শরীরে আগুনে পোড়া দাগ লাগান একটি অশুভ কাজ।

---

* ওকাশাহ্ (রাঃ) যেই অন্তরে কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ঐ দোয়া পাইবার উপযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী লোকটির অন্তর হয় ত সেই শ্রেণীর হইতে পারে নাই, শুধু দেখাদেখি বলিয়াছিল, তাই হযরত (দঃ) তাহার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়াছেন।

মন্ত্র-তন্ত্র যদি অনৈছলামিক বাক্যাবলীর দ্বারা হয় তবে ত উহা সুস্পষ্ট নাজায়েযই বটে। আর যদি ইসলামিক বাক্যাবলী, এমনকি কোরআন-হাদীছের দ্বারাও হয় তবুও উহার আধিক্য পছন্দনীয় নহে বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার দ্বারা সমাজে এই ব্যাধি সৃষ্টি হয় যে, কোরআন-হাদীছের মূল উদ্দেশ্য তথা আমল করা হইতে দূরে সরিয়া ঐ অমূল্য ধনকে নগণ্য ঝাড়-ফুঁকের কাজের জন্য রাখে। অথচ কোরআন-হাদীছ নাজেল হওয়ার উদ্দেশ্যের গণ্ডির ভিতর ঐ ঝাড়-ফুঁকের কোন স্থানই নাই।

মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে তিরমিজি শরীফে ও নেছায়ী শরীফে একখানা হাদীছ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে —

مَنِ اكْتَوٰى اَوِاسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ -

"যে ব্যক্তি দাগ লাগায় বা মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেয় সে তাওয়াক্কোল তথা আল্লার উপর ভরসা স্থাপন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।"

মন্ত্র-তন্ত্র, এমনকি জায়েয শ্রেণীর ঝাড়-ফুঁক এবং ঔষধ-পত্রাদির চিকিৎসা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। ঔষধকে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা রোগের চিকিৎসার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—উহা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ দান; তিনি বান্দাদিগকে রোগের চিকিৎসার জন্য উহা দান করিয়াছেন। অতএব উহা অবলম্বন করা সাধারণ ক্ষেত্রে তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী নহে।

পক্ষান্তরে মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক, এমনকি যদি উহা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারাও হয় উহা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে না যে, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতকে ঝাড়-ফুঁকের জন্য নাজেল করিয়াছেন। অতএব ইহা ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করা পর্যায়ের নহে এবং ইহা সাধারণ ক্ষেত্রেও তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী গণ্য হইতে পারে।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা-হিসাবে বেহেশ্‌ত লাভকারীদের সংখ্যা সত্তর হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আলেমুল-গায়েব আল্লার ওহী দ্বারা পরিচালিত রসুলের উক্তির উপর কিছু বলা অনধিকার চর্চ্চা বৈ নহে। কাহারও মতে এই সংখ্যার উল্লেখ সীমাবদ্ধতার অর্থে নহে, বরং সংখ্যার আধিক্য বুঝাইবার জন্য। অন্য এক হাদীছ দ্বারা আরও অনেক অধিক সংখ্যা প্রমাণিত হয়।

কোন বস্তুকে অশুভ অলক্ষ্মী মনে করা

২২২৯। **হাদীছ**:— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—কোন কিছুকে অশুভ অমঙ্গল বা কুলক্ষণ গণ্য করিও না—ঐরূপ ধারণা অলীক ও ভিত্তিহীন। হাঁ—শুভ লক্ষণ গণ্য করা ভাল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভ লক্ষণ কি রূপ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, (যেমন—) তোমাদের কেহ (কোন পরিস্থিতিতে তাহার পক্ষে যাহা ভাল ঐরূপ) ভাল অর্থ বোধক কোন শব্দ শুনিতে পায়।

২২৩০। **হাদীছ ঃ**— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدْوٰى وَلَاطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا

الْفَالُ الصَّالِحُ اَلْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছোঁয়াচে ও সংক্রামকতার কোন ভিত্তি নাই কোন কিছুকে অশুভ কুলক্ষণ মনে করাও ভিত্তিহীন। অবশ্য ভাল অর্থ বোধক কোন বাক্য শুনিয়া উহাকে শুভ লক্ষণরূপে গণ্য করা ভালই।

গণক-ঠাকুর সম্পর্কে

২২৩১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোক হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট গণক-ঠাকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাদের কথার কোনই মূল্য নাই। জিজ্ঞাসাকারীগণ আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! তাহাদের কথা অনেক সময় ঠিক হইতে দেখা যায়। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, (প্রকৃত ঘটনা এই যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে ফেরেশতাগণ উর্দ্ধ জগতে যে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকেন উহা হইতে) দুষ্ট জ্বিনগণ দুই-একটি বাক্য লুকোচুরি করিয়া শুনিয়া আসে। অতঃপর ঐ জ্বিন তাহার সঙ্গে সম্পর্কধারী গণক-ঠাকুরের কানে ঐ বাক্য পৌঁছাইয়া দেয়। গণক-ঠাকুর উহার সঙ্গে শতটা মিথ্যা কথা মিশাল দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—দুষ্ট জ্বিনদের উর্দ্ধ জগতের দিকে যাইয়া ফেরেশতাদের আলোচনা শুনিবার সুযোগ একটি অতি বিরল সুযোগ। অতঃপর তথা হইতে কোন কথা নিয়া বাঁচিয়া আসা ততধিক বিরল। কারণ, নক্ষত্র জাতীয় উল্কা নিক্ষেপ করিয়া ঐরূপ ঘটনা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা আদিকাল হইতেই প্রবর্ত্তিত ছিল, অধিকন্তু হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের পর ঐ ব্যবস্থাকে

অত্যধিক জোরদার করা হইয়াছে।* সুতরাং এই যুগে ঐরূপ লুকোচুরির সুযোগ যে কত দুর বিরল হইবে তাহা সহযেই অনুমেয়। অতএব এই পর্য্যায়ের বিরল ও নগণ্য এক-তুইটা কথার দ্বারা ত গণকের ব্যবসা চলিতে পারে না, তাই সে উহার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মনগড়া কথা মিশাল দিয়া চালু করে। ঐ এক-তুইটা কথা যাহা জ্বিনের মারফৎ পাইয়া ছিল উহা ঠিক হইতে দেখা যায় যাহার সুনামে শতটা মিথ্যা অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও চাপা পড়িয়া থাকে এবং ঐ এক-তুইটা সত্যের বদৌলতে গণক ঠাকুরের ব্যবসা চলিতে থাকে।

উল্লেখিত তথ্যটি হইল গণক-ঠাকুরের এক-তুইটা কথা সত্য হওয়ার সূত্র, কিন্তু গণক-ঠাকুরের কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাহার নিকট যাওয়া হারাম হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে তাহাকে ভবিষ্যদ্বানীর অধিকারী তথা আলেমুল-গায়েব গণ্য করার অর্থ বুঝায় যাহা শেরেকী গোনাহ।

যাতু সম্পর্কে

২২৩২। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মদীনার বনী-যোরায়েক গোত্রীয় লবীদ নামক মোনাফেক এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর যাতু করিয়াছিল। যাহার প্রতিক্রিয়া হযরতের উপর এরূপ হইয়াছিল যে, কোন করণীয় কাজ সম্পর্কে হযরতের এরূপ মনে হইত যেন ঐ কাজ তিনি করিয়া নিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সেই কাজ করেন নাই। (এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দীর্ঘ ছয় মাস কাটিল,) এমনকি একদা রাত্রিবেলা হযরত (দঃ) আমার গৃহেই ছিলেন, কিন্তু ঐ দিন তিনি পুনঃ পুনঃ দোয়া করিলেন। তারপর নিদ্রা হইতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া বলিলেন, হে আয়েশা! শুন, আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করিষাছেন এবং আমি যাহা জানিতে চাহিয়া ছিলাম তাহা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন।

তুই জন লোক আসিয়া একজন আমার মাথার দিকে অপরজন পায়ের দিকে বসিয়া ছিল। এমতাবস্থায় লোক তুইটি আমার সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্নোত্তর করিল—

প্রশ্ন—এই ব্যক্তির কি রোগ হইয়াছে?

উঃ—তাঁহাকে যাতু করা হইয়াছে।

প্রঃ—কে যাতু করিয়াছে?

উঃ—লবীদ-ইবনে-আ'ছাম—মোনাফেক এবং ইহুদীদের দোস্ত।

---

* এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রঃ—কি বস্তুর সাহায্যে যাছ্ করিয়াছে ?

উঃ—চিরণীর ভগ্নাংশ ও আঁচড়ানে ছিন্ন চুল।*

প্রঃ—ঐ সব বস্তু কোথায় পোঁতা হইয়াছে ?

উঃ – ঐ সব বস্তু মর্দ্দা খেজুর গাছের ফুলের খোলসে ভর্ত্তি করিয়া জার্‌ওয়ান নামক অন্ধ কূপে পাথরের নীচে পোঁতিয়া রাখা হইয়াছে। (কূপটি হযরত (দঃ)কে ঐ স্বপ্নে দেখানও হইয়াছিল।)

অতঃপর হযরত (দঃ) কতিপয় ছাহাবীকে সঙ্গে নিয়া ঐ কূপের নিকটে পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, এইটাই ঐ কূপ যেইটা আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে। উহার পচা পানির রং মেন্ধী ভিজান পানির ন্যায় ছিল এবং কূপটি যেই বাগানে অবস্থিত সেই বাগানের খেজুর গাছগুলিও ভূতের মাথার ন্যায় বিশ্রী দেখাইতেছিল। হযরত (দঃ) কূপ হইতে ঐ সব জিনিষ বাহির করাইলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! বিপরীত যাছুর সাহায্যে আপনার উপর কৃত যাছ্ রদ করার ব্যবস্থা করিলেনে না কেন ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আরোগ্য দান করিয়াছেন, এখন এই ব্যাপারে লোকদের মধ্যে চর্চ্চা ছড়াইবার পন্থা অবলম্বন করাকে আমি পছন্দ করি না। অতঃপর হযরত (দঃ) ঐ কূপটিকে ভরাট করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল ছিলেন, কিন্তু তিনিও মানুষ ছিলেন। মানবীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁহার উপর প্রবর্ত্তিত হইত। যেমন—নিদ্রার ক্রিয়া তাঁহার উপর হইত, রোগের ক্রিয়া তাঁহার উপর হইয়াছিল। কিন্তু রসুল হওয়ার পদ-মর্য্যাদায় এবং দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে এই শ্রেণীর সব রকম ক্রিয়া হইতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অবশ্যই হেফাজত করিতেন। যেমন—তাঁহার উপর নিদ্রার ক্রিয়া অবশ্যই হইত, কিন্তু যে কোন সময় তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইতে পারে তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ব করিতে না পারিলে নবুওতের দায়িত্ব পালনে বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে, তাই আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার চোখের উপর ত নিদ্রার ক্রিয়া হইবে, কিন্তু তাঁহার মন-মগজের উপর এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর কোনরূপ ক্রিয়া হইবে না। অতএব নিদ্রাবস্থায়ও ওহী অবতীর্ণ হইলে তিনি তাহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি, সংরক্ষণ ও আয়ত্ব করিতে পারিতেন। সকল নবীদের

---

* এতদভিন্ন ঐ সবের সাথে এক খণ্ড ধনুকের গুণ বা রজ্জুও ছিল যাহার মধ্যে এগারটি গিরা দেওয়া ছিল। (ফৎহুল বারী)

জন্যই আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাই নিদ্রার দরুণ নবীদের অজু ভঙ্গ হইত না। এই তথ্য বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

তদ্রূপ এস্থলেও যাতুর দরুন তাঁহার উপর প্রতিক্রিয়া ছিল বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর কোন প্রতিক্রিয়া আদৌ ছিল না যদ্দ্বারা নবুওতের পদ-মর্য্যাদায় এবং উহার দায়িত্ব পালনে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার উপর ঐ যাতুর ক্রিয়া শুধু মাত্র একটুকু ছিল যে, একটা কাজ না করিয়াও মনে হইত যেন করিয়াছেন এবং একটা কাজ করার পরেও এরূপ ধারণা হইত যেন করেন নাই। এতটুকু ক্রিয়াও সব রকম কার্য্য সম্পর্কে ছিল না। বোখারী শরীফ ৮৫৮ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ বর্ণিত আছে উহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, ঐ প্রতিক্রিয়াটুকুও শুধু মাত্র স্ত্রী-সঙ্গম সম্পর্কীয় ব্যাপারে হইয়া থাকিত। এই পর্য্যায়ের প্রতিক্রিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মোটেই নহে, কিছুটা অস্বস্তির কারণ ছিল মাত্র। দীর্ঘ ছয় মাস কাল উদ্বেগ ভোগের পর উল্লেখিত ঘটনা ঘটে এবং এই উপলক্ষেই কোরআন শরীফের তুইটি ছুরা—ক্বুল্ আউ'জু বি-রাব্বিল্ ফালাক্, ক্বুল্ আউ'জু বি-রাব্বিন্ নাছ নাযেল হয়। উক্ত ছুরাদ্বয়ের এগারটি আয়াত; বর্ণিত আছে, যাতুর বস্তুসমূহের মধ্যে যে এগারটি গিরা সম্বলিত এক খণ্ড ধনুকের গুণ বা রজ্জু ছিল উক্ত ছুরাদ্বয়ের এক একটি আয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি গিরা খসিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে ছুরাদ্বয়ের তেলাওয়াত শেষ করার সাথে সাথে গিরাগুলিও সব খুলিয়া গেল এবং হযরত (দঃ) বন্ধনমুক্তি লাভের ন্যায় তৎক্ষণাৎ স্বস্তি লাভ করিলেন।

মছআলাহ :— যাতু করা হারাম, কিন্তু যাতু হইতে মুক্তি লাভের জন্য যাতু শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন করা জায়েয আছে। অবশ্য শরীয়ত বিরোধী মন্ত্র-তন্ত্র বা ঐরূপ কোন কার্য্য অবলম্বন করা যাইবে না।

হযরত (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা

২২৩৩। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) খয়বর জয় করার পর তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় (ইহুদীদের চক্রান্তে এক ইহুদী নারীর পক্ষ হইতে) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে রন্ধিত বকরির গোশ্ত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। (হযরত (দঃ) উহার একটি টুক্রা খাওয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন সময় আল্লার কুদরতে ঐ গোশ্তের টুক্রা হযরত (দঃ)কে বিষের সংবাদ জ্ঞাত করিয়া দিল এবং হযরত (দঃ) তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিলেন।) অতঃপর হযরত (দ.) উক্ত এলাকার ইহুদীগণকে একত্রিত করার আদেশ করিলেন। তাহাদিগকে একত্রিত করা হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি কথা

জিজ্ঞাসা করিব, তোমরা আমাকে সঠিক সত্য উত্তর দিবে কি? তাহারা বলিল, নিশ্চয়। সেমতে হযরত (দঃ) (প্রথমতঃ তাহাদের জবানের সত্যতা জ্ঞাত হওয়ার জন্য) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের (বংশের) আদি পিতা কে ছিল? তাহারা উত্তরে একজনের নাম উল্লেখ করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাদের আদি পিতা ত অমুক ব্যক্তি ছিল। তখন তাহারা বলিল, আপনার কথাই ঠিক। অতঃপর পুনরায় হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি পুনঃ একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবে ত? তাহারা বলিল, নিশ্চয়—যদি মিথ্যা বলি তবে আপনি তাহা ধরিয়া ফেলিবেন যেমন প্রথম উত্তরে ধরিয়াছেন।

এইবার হযরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরকবাসী কাহারা হইবে? তাহারা বলিল, আমরা কিছু দিন নরকে বাস করিব, অতঃপর আপনার দল আমাদের পরিবর্তে নরকবাসী হইবে। হযরত (দঃ) তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোমরাই তথায় লাঞ্ছিতরূপে চিরকাল থাকিবে, আমরা কখনও তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হইব না।

তারপর হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আর একটা কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবে ত? তাহারা বলিল, হাঁ। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই বকরির গোশ্‌তে বিষ মিশ্রিত করিয়াছ কি? তাহারা বলিল, হাঁ। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমরা এই কাজ করিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা ভাবিয়াছি—যদি আপনি নবুওতের মিথ্যা দাবীদার হইয়া থাকেন তবে (এই বিষে আপনার দফারফা হইবে এবং) আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিব। আর আপনি প্রকৃত নবী হইয়া থাকিলে বিষ আপনার ক্ষতি করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—নরকবাসী সম্পর্কে ইহুদীরা যে মন্তব্য করিয়াছিল উহা তাহাদের জাতিগত বদ্ধমূল মিথ্যা আকিদা ও অমূলক বিশ্বাস ছিল। পবিত্র কোরআনেও তাহাদের এই আকিদা ও বিশ্বাসের সমালোচনা রহিয়াছে, আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً - قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ - أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - بَلَى مَنْ

كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

ইহুদীদের অপরাধ গণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, তাহাদের আর একটি অপরাধ এই যে, "তাহারা দাবী করিয়া থাকে, দোযখ আমাদিকে স্পর্শ করিবে না, হাঁ—অল্প কয়েক দিন হয় ত আমাদের দোযখে থাকিতে হইবে।"*

তাহাদের দাবীর অবাস্তবতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে বলিতেছেন, "আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, এই দাবী সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কোন ঘোষণা ও ওয়াদা-অঙ্গীকার লাভ করিয়াছ কি যাহার বরখেলাফ আল্লাহ করিবেন না ? না—দলীল-প্রমাণ ছাড়াই তোমরা নিজেরাই আল্লার উপর একটা কথা চাপাইয়া দিতেছ ?

তোমাদের জন্য দোযখ নিষিদ্ধ নহে, তোমরাও দোযখে যাইবে ; (দোযখে যাওয়া ও বেহেশ্‌তে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নির্দ্ধারিত আইন এই—) যাহারা পাপ করিয়া পাপে ডুবিয়া যাইবে তাহারা হইবে নরকবাসী তাহারা তথায় চিরকাল থাকিবে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে এবং নেক আমলসমূহ করিবে তাহারা হইবে বেহেশ্‌তবাসী, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। (১ পাঃ ৯ রুঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিষ প্রয়োগকারিণী মূল অপরাধিনী নারীটির প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ হযরত (দঃ) ঐ নারীটির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরতের সঙ্গে ঐ খাদ্য গ্রহণে আরও তিনজন ছাহাবী শরীক ছিলেন ; তন্মধ্যে বিশ্‌র-ইবনে-বরা (রাঃ) নামক ছাহাবী বিষাক্ত গোশ্‌তের কিছু অংশ গলধঃ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ফলে তাঁহার উপর বিষের ক্রিয়া হইয়াছিল এবং চিকিৎসা বিফল হইয়া তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ বিচার প্রার্থী হইলে পর হযরত (দঃ) ঐ নারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বিষের কিছু অংশ হযরতের পেটেও প্রবেশ করিয়াছিল, অবশ্য উহার কোন উপস্থিত প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না। কিন্তু সময় সময় অন্য উপসর্গের সঙ্গে উহারও প্রতিক্রিয়া দেখা দিত, এমনকি মৃত্যু শয্যার রোগকালীন ঐ প্রতিক্রিয়া এত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল যে, উহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কারণ হয় এবং হযরত (দঃ) শহীদের মর্ত্তবা লাভ করেন। বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে।

---

* তাহারা বলিয়া থাকিত যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ধোকায় পড়িয়া চল্লিশ দিন গো-শাবকের পুজা করিয়াছিল সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে আমাদেরকে চল্লিশ দিন দোযখে থাকিতে হইবে, নতুবা আমরা ত নবীর জাত—নবীর বংশ আমরা তাতেই পার হইয়া যাইব, আমাদেরকে দোযখ স্পর্শ করিতে পারিবে না। সম্মুখে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আইন ও নীতি ঘোষণা করিয়া দিয়া তাহাদের ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন।

বিষ পানে আত্মহত্যার পরিণতি

২২৩৪। ছাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه

فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما

فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها فى بطنه فى نار

جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাহাড় (ইত্যাদি কোন উঁচু স্থান) হইতে নিজকে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে সে দোযখের আগুনের মধ্যে ঐরূপে নিজকে পাহাড় হইতে ফেলিতে থাকিবে—পাহাড়ে চড়িয়া তথা হইতে নিজকে ফেলিবে, আবার চড়িবে আবার ফেলিবে, আবার চড়িবে আবার ফেলিবে। (যাবৎ না তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় দোযখে থাকিয়া) সে সব সময়ই ঐরূপ করিতে (এবং উর্দ্ধ হইতে পতিত হওয়ার যাতনা ভোগিয়া যাইতে) বাধ্য হইবে।

আর যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দোযখের আগুনের মধ্যে তাহার হাতে বিষ থাকিবে সে উহা পান করিতে থাকিবে, (যাবৎ না তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় সে দোযখে থাকিয়া) সব সময়ই বিষ পান করতঃ উহার যন্ত্রনা ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।

আর যে ব্যক্তি কোন লৌহ-অস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করিবে দোযখের আগুনের মধ্যে তাহার হাতে লৌহ-অস্ত্র থাকিবে। (যাবৎ না তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় সে দোযখে থাকিয়া) সব সময় ঐ অস্ত্র দ্বারা নিজ পেটকে ঘায়েল ও আঘাত করিতে থাকিবে।

পোষাক-পরিচ্ছদের বয়ান

শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা ব্যতিরেকে যে কোন ক্ষেত্রে পোষাক-পরিচ্ছদকে বর্জ্জন করার রছম বা প্রথা পালন করা যে একটি গর্হিত কাজ উহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে একটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ধকার যুগে

কাফের মোশরেকগণ কা'বা শরীফের তওয়াফ করা কালে পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করতঃ উলঙ্গ হইয়া যাইত—এই শ্রেণীর গর্হিত কার্য্যের প্রতি নিন্দা ও কটাক্ষ্য করতঃ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ -

"আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, কে হারাম করিয়াছে আল্লাহ প্রদত্ত শোভাদানকারী লেবাছ-পোষাককে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বন্দাদিগকে দান করিয়াছেন ?"

অর্থাৎ লেবাছ-পোষাক হইল আল্লার নেয়ামত এবং আল্লার একটি দান, কোন স্থানে উহা বর্জ্জন করিতে হইলে শুধু মনগড়া রছম-রীতির অনুসরণে উহা বর্জ্জন করা যাইবে না। সেরূপ করিলে তাহা স্বষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিপরীত কার্য্য হইবে।

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا فِىْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَّلَا مَخِيْلَةٍ -

"আল্লার নেয়ামত—আহার্য্যকে আহার কর, পাণীয়কে পান কর, পরিধেয়কে পরিধান কর—অবশ্য অপব্যয় ও অহঙ্কারের পর্য্যায়ে নহে।"

অর্থাৎ তুমি আল্লার বন্দা; আল্লার দান পানাহার ও লেবাছ-পোষাককে আল্লার তথা শরীয়তের নিয়ম ব্যতিরেকে বর্জ্জন করিতে পার না। নতুবা তাহা আল্লার নেয়ামতকে উপেক্ষা করার শামিল হইবে যাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও পক্ষে সমীচীন নহে।

পরিধেয়কে পায়ের গিঁঠের নীচে করার ভয়াবহ পরিণতি

২২৩৫। হাদীছ :— عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি করিবেন না ঐ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি বড়মানুষী ও গরিমা বশে স্বীয় পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলে।

২২৩৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

"যে ব্যক্তি স্বীয় পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলে, বড়মানুষী ও গরিমা বশে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না।

এতচ্ছ্রবনে আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার (সেলাই বিহীন) লুঙ্গির এক কিনারা (সময় সময় *) ঝুলিয়া পড়ে যদি না আমি বিশেষরূপে যত্নবান হই এবং লক্ষ্য রাখি (যাহা সব সময় দুষ্কর)। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনিত তাহাদের ন্যায় নন যাহারা বড়মানুষী ও গরিমা বশে ঐরূপ করে।

২২৩৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি করিবেন না ঐ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি গরিমা করিয়া বড়মানুষী দেখাইবার জন্য স্বীয় লুঙ্গি হেঁচড়াইয়া চলে।

ব্যাখ্যা ঃ—শারীরিক গঠনের দরুন পরিধেয় কাপড় ঝুলিয়া পড়িলে সে স্থলেও কাপড় পায়ের গিঁঠের নীচে যেন যাইতে না পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য ঐরূপ অবস্থায় অলক্ষ্যে ঝুলিয়া পড়িলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু লক্ষ্য হওয়ার সাথে সাথে কাপড় গিঁঠের উপর উঠাইয়া নিতে হইবে।

বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত পরিধেয় কাপড় পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া দেওয়া বা ঝুলাইয়া রাখা নিষিদ্ধ ↑; যদিও অহঙ্কার গরিমা ও বড়মানুষীর খেয়াল অন্তরে উপস্থিত না দেখা যায়। কেননা, এই রীতি ও ফ্যাসনের উৎপত্তি উহা হইতেই। এক হাদীছে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্যটি উল্লেখ করিয়াছেন। মেশকাত শরীফে** আবু দাউদ শরীফ হইতে সেই হাদীছ খানা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

* ফত্‌হুল বারী ১০—২০৯

↑ এই বিধান একমাত্র পুরুষদের জন্য। নারীদের জন্য পায়ের পাতা আবৃত রাখাই কর্ত্তব্য—এই মছআলাহ অন্য হাদীছে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

** باب فضل الصدقة

এক নবাগত ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। হযরত (দঃ) স্বীয় উপদেশাবলীর মধ্যে এই কথাও বলিলেন—

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ -

"পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হইতে খুব সতর্কতার সহিত বিরত থাকিও, কারণ এই অভ্যাসটা অহঙ্কার গরিমা ও বড়মানুষী গণ্য হয় যাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত নারাজ ও অসন্তুষ্ট।"

ফত্‌হুল বারী ১০ম খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠায় আরও দুই খানা হাদীছ এই বিষয়ে আছে—

(১) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

وَإِيَّاكَ وَجَرَّ الْإِزَارِ فَإِنَّ جَرَّ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ -

"বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিধেয় কাপড় হেঁচড়াইয়া চলা হইতে বিরত থাকিও। কারণ, কাপড় হেঁচড়াইয়া চলা অহঙ্কার ও গরিমার মধ্যে শামিল।"

(২) আম্‌র(রাঃ) নামক ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাতে আসিলেন। ঐ ছাহাবীর পরিধেয় কাপড় ঝুলান ছিল। তিনি হযরতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমার পায়ের গোছা সরু (তাই উহা পূর্ণ ঢাকিয়া রাখার জন্য কাপড় ঝুলান হইয়াছে।) হযরত (দঃ) বলিলেন—

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرُو إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلَ -

"আল্লাহ যে জিনিষকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন উহাই উত্তম ; নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া রাখে।"

উল্লেখিত তথ্যের মর্ম্মই এই যে, অহঙ্কার ও গরিমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা সীমাবদ্ধ নহে, বরং কোন প্রকার বাস্তব ওজর ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃত পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া বা ঐরূপ থাকিতে দেওয়াই নিষিদ্ধ ; যদিও অহঙ্কার ও গরিমার ভাব উপস্থিত না থাকে। এই কারণেই অনেক হাদীছে মূল "এস্‌বাল" তথা পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলানকেই নিষিদ্ধ এবং দোযখের আজাব ভোগের কারণ বলা হইয়াছে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি—

২২৩৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِي النَّارِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পায়ের গিঁঠদ্বয়ের নীচে পরিধেয় কাপড় ঝুলাইয়া দিলে দোযখের আজাব ভোগ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মূল এস্‌বাল সম্পর্কে আরও হাদীছ বর্ণিত আছে—নেছায়ী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ اِلَى مُسْبِلِ الْاِزَارِ -

"হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঐ লোকদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করেন না যাহারা পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া দেয়।"

আবু-জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَلْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَاهُ وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهٗ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ -

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তিন প্রকার লোকের প্রতি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কোন সহানুভুতি হইবে না এবং তাহাদেরে ক্ষমা করতঃ তাহাদের পবিত্রতা সাধন করিবেন না; তাহাদিকে ভীষণ আজাব ভোগ করিতে হইবে। (১) যে ব্যক্তি দান করিয়া উহার খোঁটা দেয়, (২) যে ব্যক্তি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁঠের নীচে ঝুলাইয়া দেয়, (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় বিক্রয় দ্রব্যকে মিথ্যা কসমের দ্বারা চালু করিতে চায়।"

এই সব হাদীছের মধ্যে পায়ের গিঁঠের নীচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলাইয়া দেওয়ার উপরই আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি এবং দোযখ ও আজাবের উল্লেখ রহিয়াছে।

অহঙ্কার ও গরিমার উল্লেখ নাই। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের রীতিও বিভিন্ন হাদীছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। মোসলেম শরীফে আছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ اِزَارِىْ اِسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِرْفَعْ اِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُّ فَمَا زِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اِلَى اَيْنَ فَقَالَ اَنْصَافُ السَّاقَيْنِ -

"আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতে ছিলাম। আমার পরিধেয় লুঙ্গি ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার লুঙ্গি উপরের দিকে উঠাইয়া পর। আমি লুঙ্গিকে একটু উপরে উঠাইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী পরিমাণ উঠাও। আমি বেশী পরিমাণ উঠাইলাম এবং ঐ দিন হইতে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি অবলম্বন করিলাম। কোন কোন লোক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, লুঙ্গি কতটুকু পরিমাণ উঠাইয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন পায়ের গোছার মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত।

নেছায়ী শরীফে হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ اِلَى اَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ

فَاِنْ اَبَيْتَ فَاَسْفَلُ فَاِنْ اَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَاحَقَّ

لِلْكَعْبَيْنِ فِى الْاِزَارِ -

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্রের শেষ সীমা পায়ের গোছা ও উহার মাংসপিণ্ডের মধ্য ভাগ। যদি তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পার তবে আরও একটু নীচে নামাইতে পার, তাতেও সন্তুষ্ট না হইলে গোছার শেষ সীমা পর্য্যন্ত। কিন্তু পায়ের গিঁঠদ্বয়ের কোন অংশের উপরই পরিধেয় বস্ত্র আসিতে পারিবে না।"

ফত্‌হুল বারী (১০—১১) কেতাবে আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ) হইতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে—

إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه

وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار

"মোমেন ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র গোছাদ্বয়ের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত থাকিবে। অবশ্য গিঁঠদ্বয় পর্য্যন্তও রাখিতে পারে—তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু আরও অধিক নীচে গেলে দোযখের আজাব ভোগ করিতে হইবে।"

● ইমাম বোখারী একটি পরিচ্ছেদে প্রমান করিয়াছেন যে, নবী (দঃ) পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁঠের উপরে রাখিতেন।

২২৩৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতের কোন) একজন লোক মাথা আঁচড়াইয়া (সাজ সজ্জার সহিত) এক রঙ্গের জোড়া পোষাক পরিধান পূর্ব্বক গর্ব্ব ও গরিমাভরে চলিতে ছিল ; হঠাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জমিনে ধসাইয়া দিলেন। সে কেয়ামত পর্য্যন্ত ধসিতে থাকিবে।

২২৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি মাটিতে হেঁচড়াইয়া চলিতে ছিল, তাহাকে জমিনে ধসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেয়ামত পর্য্যন্ত সে ধসিতেছে।

হযরতের ব্যবহারিক কাপড়

২২৪১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইয়ামান দেশের তৈরী ডোরাযুক্ত সবুজ রঙ্গের এক প্রকার কাপড় ছিল—উহাকে বেশী পছন্দ করিতেন।

২২৪২। হাদীছ ঃ—আবু বোর্দাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) মোটা কাপড়ের একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিধানে এই কাপড় দুই খানা ছিল যখন তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পুরুষের জন্য তসর বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করা

২২৪৩। হাদীছ ঃ—আবু ওসমান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আজারবাইজানে থাকাকালে আমাদের নিকট খলীফা ওমরের পত্র পৌঁছিয়াছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অবশ্য দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতঃ (হযরত নবী (দঃ)) দেখাইয়াছেন যে, এই পরিমান ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন কাপড়ের মধ্যে রেশমী সূতার বুনান ডোরা বা রেশমী কাপড়ের সঞ্জাব দেওয়া হইলে ঐ কাপড় ব্যবহার জায়েয আছে। অবশ্য উহা দুই আঙ্গুল অন্য হাদীছ দৃষ্টে চার আঙ্গুল চওরার অধিক হইতে পারিবে না।

২২৪৪। হাদীছ ঃ—আবু ওসমান (রঃ) বলিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পত্রে ইহাও ছিল—

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا

إِلَّا مَنْ لَمْ يَلْبَسْ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُ ـ

"হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি ইহজগতে রেশমী কাপড় পরিধান করিবে সে আখেরাতে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

২২৪৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَّلْبَسَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

"যে ব্যক্তি ইহজগতে রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে সে অবশ্য অবশ্যই আখেরাতে উহা হইতে মাহ্‌রুম ও বঞ্চিত থাকিবে।

২২৪৬। হাদীছ ঃ— ছাবেৎ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) খোৎবার মধ্যে বলিয়াছেন—

قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا

فَلَنْ يَّلْبَسَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

"মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহজগতে রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে সে আখেরাতে নিশ্চয় উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

২২৪৭। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

"ইহজগতে রেশমী কাপড় একমাত্র ঐ ব্যক্তিই ব্যবহার করিবে আখেরাতে যাহার কোন প্রকার নেয়ামত লাভের সুযোগই হইবে না।"

২২৪৮। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) মাদায়েন এলাকায় ছিলেন; একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে পানি পান করাইতে বলিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহার জন্য রৌপ্যের তৈরী পাত্রে পানি নিয়া আসিল; তিনি ঐ পানির পাত্রটি তাহার উপর ছোড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, ইহা তাহার উপর নিক্ষেপ করার একমাত্র কারণ এই—আমি তাহাকে এইরূপ পাত্রে পানি দিতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু সে বিরত থাকে না।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(পুরুষের জন্য) স্বর্ণ-চান্দি এবং মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় ব্যবহার করা—দুনিয়াতে ইহা কাফেরদের জন্য। আমাদের জন্য ইহা পরকালের জীবনে হইবে।

২২৪৯। হাদীছ ঃ— عن حذيفة رضى الله تعالى عنه

قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اَوْ اَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

অর্থ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন—স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করিবে না, মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করিবে না এবং উহার উপর বসিবে না।

২২৫০। হাদীছ ঃ— عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه

قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ -

অর্থ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, লাল বর্ণের রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন ব্যবহার করিতে এবং তসর কাপড় ব্যবহার করিতে।

২২৫১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যোবায়ের (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)কে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের শরীরে চর্ম্মরোগ ছিল (সূতী কাপড়ে জ্বালা-যন্ত্রনা হইত।)

● ইমাম বোখারী (রঃ) ৮৬৮ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, নবী (দঃ) পোশাক-পরিচ্ছদে এবং বিছানা ইত্যাদিতে আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন করিতেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের ৭৫নং হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছেন।

নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার জায়েয

২২৫২। ছাদীছ :—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা আমাকে এক জোড়া কাপড় দিলেন যাহা (সম্পূর্ণ বা নাজায়েয পরিমাণে মিশ্রিত) রেশমী ছিল। আমি উহা পরিধান করিয়া বাহির হইলাম—যদ্দরুন হযরতের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমি ঐ কাপড় জোড়াকে ফাড়িয়া মেয়েদের পরার উপযোগী বানাইয়া দিলাম।

২২৫৩। ছাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কন্যা উম্মে-কুলছুম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পরিধানে রেশমী চাদর দেখিয়াছেন।

নূতন কাপড় পরাইয়া কিরূপ দোয়া করিবে

২২৫৪। ছাদীছ :—একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কতকগুলি চাদর লোকদেরে দান করার জন্য উপস্থিত করা হইল। উহাতে একটি পশমী কাল রঙ্গের চাদর ছিল। হযরত (দঃ) সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কাহাকে দিব ? সকলেই চুপ রহিল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, উম্মে-খালেদ (বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাতিন)কে নিয়া আস। তাহাকে আনা হইলে হযরত (দঃ) ঐ চাদরটি নিজ হস্তে তাহাকে পরাইয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন—ابلى واخلقى "(আল্লাহ তোমাকে সুদীর্ঘ আয়ু দান করুন ;) এই কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরাণ হইয়া যায়—ইহার পরে আরও কাপড় পরার সুযোগ যেন তুমি পাও।"

পুরুষের শরীরে জাফ্‌রান দ্বারা রঙ্গ লাগান

২২৫৫। ছাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পুরুষের শরীর জাফ্‌রান দ্বারা রঙ্গীন করা নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— জাফ্‌রানে রঞ্জিত কাপড়ও পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

জুতা পায় দেওয়া সম্পর্কে

২২৫৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ

بِالْيُمْنَى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা প্রত্যেকে জুতা পায়ে দেওয়ার সময় ডান পা হইতে আরম্ভ করিবে এবং খুলিবার সময় বাম পা হইতে আরম্ভ করিবে—ডান পা জুতা পরার সময় প্রথমে হইবে এবং খোলার সময় শেষে হইবে।

২২৫৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ

وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ শুধু এক জুতা পায়ে দিয়া চলিবে না—উভয় পা খালি রাখিবে বা উভয় পায়ে জুতা পরিবে।

অঙ্গুরী বা আংটি সম্পর্কে

২২৫৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন (সিল-মোহর কার্য্যে ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রথমতঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিয়া থাকিতেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উহাকে বর্জ্জন করিলেন এবং বলিলেন, সর্ব্বদার জন্য ইহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম।

(হযরতের দেখাদেখি কোন কোন লোক স্বর্ণ আংটি বানাইয়া ছিল, হযরত (দঃ)কে বর্জ্জন করিতে দেখিয়া) সকলেই উহা বর্জ্জন করিল।

ব্যাখ্যা :—শরীয়তে পুরুষের জন্য স্বর্ণ আংটি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত আংটি ব্যবহৃত হইয়া ছিল। অতঃপর উহা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্বর্ণ অঙ্গুরী নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রথম খণ্ডে ৬৫১নং হাদীছে উল্লেখ আছে।

২২৫৯। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আংটি ছিল রৌপ্য নির্ম্মিত যাহার উপরিভাগও রৌপ্যই ছিল।

২২৬০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার হস্তেই থাকিত। অতঃপর আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে আসিল, (যখন তিনি খলীফা বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন)। তারপর উহা খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে আসিল এবং তারপর খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে আসিল। ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত হইতে উহা "আরীস্" নামক কূপে পড়িয়া গিয়াছিল। উহার উপর অঙ্কিত করা ছিল—"মোহাম্মাদোর-রসুলুল্লাহ্"।

২২৬১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি আংটি তৈরী করিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন, আমি একটি আংটি তৈরী করিয়াছি এবং উহার উপর একটি বিশেষ বাক্য অঙ্কিত করিয়াছি। অন্য কেহ নিজ আংটিতে ঐ বাক্য অঙ্কিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি লিপি ও দাওয়াতনামা প্রেরণ করিবেন উহার জন্য সিল-মোহর আবশ্যক—সেই প্রয়োজনে হযরত (দঃ) প্রথমে একটি স্বর্ণ আংটি তৈরী করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পুরুষের জন্য স্বর্ণ আংটি ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় হযরত (দঃ) উহা পরিত্যাগ করিয়া আর একটি রৌপ্য আংটি তৈয়ার করিলেন। উহার উপর সিল-মোহরের বাক্য এক লাইনে "মোহাম্মাদ", এক লাইনে "রসুল" আর এক লাইনে "আল্লাহ"—এই ভাবে "মোহাম্মাদোর-রসুলুল্লাহ" বাক্য অঙ্কিত করা ছিল। ঐ আংটি হযরতের হস্তে থাকিত হযরত (দঃ) প্রয়োজন স্থলে উহা দ্বারা সিল-মোহর করিতেন।

হযরতের তিরোধানের পর ঐ আংটি খলীফা আবু বকরের হস্তে আসিল, তিনি সরকারী কাগজ-পত্রে উহার দ্বারাই সিল-মোহর করিতেন। খলীফা হিসাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে কার্য্য পরিচালকরূপে তিনি ঐ সিল-মোহর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পর খলীফা ওমর (রাঃ) উহা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পর খলীফা ওসমানের হস্তে ঐ আংটি আসিল।

একদা ওসমান (রাঃ) মদীনার নিকটস্থিত "আরীস্" নামক কূপের পারে বসিয়া ঐ আংটি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে ছিলেন, হঠাৎ উহা ঐ কূপে পড়িয়া গেল। কূপের সমুদয় পানি শুষ্ক করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত আংটির তল্লাশি চালান হইল, কিন্তু উহা আর পাওয়া গেল না।

মছআলাহ ঃ—মহিলাদের জন্য স্বর্ণের অঙ্গুরী ব্যবহার করা জায়েয আছে। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার স্বর্ণের অঙ্গুরী ছিল। (৮৭৩ পৃঃ)

শিশুদের গলায় মালা পরানো

২২৬২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদীনার কোন এক বাজারে হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। হযরত (দঃ) যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন আমিও তাঁহার সাথে ছিলাম। হযরত (দঃ) বাড়ী আসিয়া শিশু হাসান (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, দুষ্ট কোথায়? দুষ্ট কোথায়? হাসানকে ডাকিয়া আন। তখন শিশু হাসান হাটিয়া আসিতে ছিল; তাহার গলায় (পুতি বা লং ফুলের) মালা ছিল। হযরত (দঃ) হাসানের প্রতি হাত বাড়াইলেন, হাসানও হযরতের প্রতি হাত বাড়াইল এবং উভয়ে অপরকে জড়াইয়া ধরিল। হযরত (দঃ) হাসানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهٗ -

"হে আল্লাহ! আমি তাহাকে ভালবাসি; আপনিও তাহাকে ভালবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসিবে তাহাকেও ভালবাসুন।"

মছআলাহ ঃ—পুরুষের জন্য যে জিনিষ ব্যবহার নিষিদ্ধ যেমন স্বর্ণ অলঙ্কার বা সাড়ে চার মাষার অধিক রৌপ্য অলঙ্কার—তাহা শিশু ছেলেদিগকে ব্যবহার করানও নিষিদ্ধ। যাহারা উহা শিশুকে ব্যবহার করাইবে এবং যাহারা শিশুর গার্জিয়ান থাকিবে তাহারা গোনাহগার হইবে।

নারীবেশী পুরুষ এবং পুরুষবেশীনী নারী

২২৬৩। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال

لَعَنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সব পুরুষদের প্রতি লানৎ করিয়াছেন যাহারা নারীবেশী হয় এবং ঐ সব নারীদের প্রতি লানৎ করিয়াছেন যাহারা পুরুষবেশীনী হয়।

গোঁফ, নখ ইত্যাদি কাটিয়া ফেলা

২২৬৪। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ

وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফেৎরতের মধ্যে (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবগত কার্য্যাবলীর মধ্যে বা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল নবীর চিরাচরিত রীতি-নীতির মধ্যে) পরিগণিত—(১) নাভির নিম্নস্থলের লোম কামাইয়া ফেলা, (২) নখ কাটিয়া ফেলা, (৩) গোঁফ কাটিয়া ফেলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— উল্লেখিত হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর কার্য্যক্রম ইমাম বোখারী (রঃ) ৮৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন—

"আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মোচ এত মিহি করিয়া কাটিতেন যে, ঐ স্থানের চামড়া দৃষ্ট হইত এবং তিনি ঠোঁটদ্বয়ের উভয় পার্শ্বসংলগ্ন লোমও কাটিতেন বা নিম দাড়ির উভয় পার্শ্ব ছাটিয়া কাটিয়া রাখিতেন।"

২২৬৫ হাদীছ ঃ— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ

وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি ফেৎরতরূপে পাঁচটি কাজকে উল্লেখ করিয়াছেন—(১) খাৎনা বা মোসলমানী করা, (২) নাভির নীচে ক্ষুর ব্যবহার করা, (৩) মোচ কাটা, (৪) নখ কাটা, (৫) বগলের লোম উপরাইয়া ফেলা।

দাড়ি লম্বা রাখা

২২৬৬। হাদীছ ঃ— عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا

اللِّحَى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِ اعْتَمَرَ

قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ اَخَذَهُ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মোসলমানগণ! তোমরা কাফের-মোশরেকদের রীতি পরিহার করিয়া চলিও—তোমরা দাড়ি বেশী পরিমাণ রাখিও এবং মোচ যথা সম্ভব কাটিয়া ফেলিও।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন হজ্জ বা ওমরা সমাপ্ত করিতেন তখন (চুল কাটার সঙ্গে) দাড়িকে মুষ্ঠি বদ্ধ করিয়া মুষ্ঠির নীচে যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা কাটিয়া ফেলিতেন।

২২৬৭। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোচের বিলুপ্তি কর এবং দাড়িকে লম্বা হইতে দাও।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এ সম্পর্কে আরও দুইটি হাদীছ উল্লেখ যোগ্য—

(১) عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا

الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোচ ভালরূপে কাটিয়া ফেল এবং দাড়ি ঝুলাইয়া বা লট্‌কাইয়া রাখ—অগ্নি পূজকদের রীতি বর্জ্জন করিয়া চল। (মোসলেম শরীফ)

(২) عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من

الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية........

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দশটি কাজ ফেৎরতের মধ্যে শামিল—(১) মোচ কাটা (২) দাড়ি লম্বা রাখা……(মোসলেম শরীফ)

'ফেৎরত' শব্দের দুই অর্থ—(১) সৃষ্টিগত স্বভাব, যেই স্বভাবের উপর আল্লাহ তায়ালা মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (২) পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের চিরাচরিত রীতি। উভয় অর্থ দৃষ্টে উল্লেখিত হাদীছের মর্ম্ম এই যে, মোচ কাটা ও দাড়ি রাখা ইত্যাদি দশটি কার্য্যের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এই কাজগুলি সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক মানবের জন্য সৃষ্টিগত স্বভাবরূপে নির্দ্ধারিত। ইহার জন্য

ভিন্ন কোন দলীলের প্রয়োজন নাই। ক্ষুধা দূর করার জন্য আহার করা আবশ্যক, পিপাসা দুর করার জন্য পানি পান করা আবশ্যক; এই আবশ্যকতা প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হয় না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তদ্রূপ পুরুষের মোচ কাটা দাড়ি রাখা এমন একটি প্রয়োজনীয় কাজ যাহার প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্তে ভিন্ন কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যক হয় না। কিম্বা যেহেতু ইহা আল্লাহ প্রেরিত আদর্শ-মানব পয়গাম্বরগণের চিরাচরিত রীতি ও আদর্শ, তাই উহা পালনের জন্য আর কোন দলীল প্রমাণের আবশ্যক নাই।

পাঠক বর্গ! দাড়ি সম্পর্কীয় হাদীছ সমুহে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যনীয়। প্রথম এই যে—এই সব হাদীছে শুধু দাড়ি রাখার আদেশই নহে, বরং পূর্ণ এবং লম্বা দাড়ি রাখার আদেশ করা হইয়াছে। তিনটি শব্দের মাধ্যমে দাড়ি রাখার আদেশ হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে—(১) "اعفاء—এ'ফা" অর্থ চুল ইত্যাদিকে লম্বা হইতে দেওয়া—তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখা। (২) "ارخاء—এর্খা" অর্থ লট্‌কাইয়া বা ঝুলাইয়া রাখা। (৩) "توفير—তওফীর" অর্থ পূর্ণ ও বেশী হইতে দেওয়া।

উল্লেখিত শব্দ সমূহের মাধ্যমে দাড়ি রাখার আদেশের তাৎপর্য্য ইহাই যে, দাড়ি রাখিবে এবং উহাকে ছাটিয়া-কাটিয়া ছোট করিবে না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটি হাদীছ তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا

হযরত নবী (দঃ) স্বীয় দাড়ির লম্বা দিক এবং পার্শ দিক হইতে কিছু অংশ ছাটিতেন। "من" শব্দটি আরবী ভাষার বিধান মতে স্পষ্টরূপেই বুঝাইতেছে যে, নগণ্য অংশই ছাটার মধ্যে আসিত। দাড়িকে সুবিন্যস্ত করার আবশ্যক পরিমাণই ছাটিতেন মাত্র, উহার অধিক নহে।

দাড়ি বেশী ও লম্বা এবং ঝুলাইয়া ও লট্‌কাইয়া রাখার আদেশের সঙ্গে কিছু অংশ ছাটার সামঞ্জস্যতা বিধান দৃষ্টে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকের দাড়ি উহার স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখিলে যতটুকু লম্বা হইবে উহার শুধু নগণ্য অংশ বাকি রাখার পন্থা অবলম্বন করা হইলে তাহা নিশ্চয়ই দাড়ি রাখার আদেশ সম্পর্কীয় প্রত্যেকটি হাদীছেরই বরখেলাফ হইবে।

তদুপরি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে যাঁহারা দেখিয়াছেন—যাঁহারা হযরতের আদর্শ অনুসরণে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সেই ছাহাবীগণের আমল ও নীতি এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ গণ্য হইবে। দাড়ি রাখার সীমা ও পরিমাণ

সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীর আমল যাহা শুধু গতানুগতিক ভাবে ছিল না, বরং সতর্কতা ও যত্নের সহিত সীমা নির্দ্ধারণরূপের ছিল—আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা, আবছল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমল ২২৬৬নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি দাড়িকে মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া মুষ্ঠির নিম্নের অংশ ছাটিয়া ফেলিতেন। এইরূপ আমলই ওমর (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে। (ফত্‌হুল বারী ১০—২৮৮)

দ্বিতীয় লক্ষ্যনীয় বিষয়টি এই যে, দাড়িকে পূর্ণ ও লম্বা এবং লট্‌কাইয়া ও ঝুলাইয়া রাখার নির্দ্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এই রীতি ও নিয়ম পালনের মাধ্যমে তোমরা অমোসলেম মোশরেক ও মজুছীদের রীতি-নীতি পরিহার করিয়া চল। এই প্রসঙ্গে বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ তফছীর-কার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) লিখিয়াছেন, "তৎকালে মোশরেক মজুছীরা দাড়ি ছাটিয়া-কাটিয়া ছোট করিয়া রাখিত এবং তাহাদের কেহ কেহ দাড়ি সম্পূর্ণ কামাইয়াও ফেলিত। সুতরাং দাড়ি সম্পূর্ণ কামাইয়া ফেলা যেরূপ ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী তদরূপ দাড়িকে ছাটিয়া-কাটিয়া বিশেষ পরিমাণ হইতে ছোট করিয়া ফেলাও ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

খেজাব ব্যবহার করা

২২৬৮। হাদীছ ঃ—আবছল্লাহ ইবনে মওহাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে একটি পানির পেয়ালা দিয়া উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইল। (তাঁহার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় চুল একটি রৌপ্য কৌটায় সুরক্ষিত ছিল।) কোন লোকের উপর বদ-নজরের ক্রিয়া বা কোন রোগের আক্রমণ হইলে তাঁহার নিকট পানির পাত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকিত। (তিনি পানিতে ঐ চুল ডুবাইয়া দিতেন এবং রোগী আরোগ্য লাভের জন্য সেই পানি ব্যবহার করিত।) আমি সেই কৌটার মধ্যে তাকাইয়া দেখিয়াছি। চুল কয়টি লাল রঙ্গের ছিল।

২২৬৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَايَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদী-নাছারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাহাদের রীতি বর্জ্জন করিয়া চলিও।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে চুল দাড়ি রং করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই ; এতদৃষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং বা কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলিয়াছেন। কিন্তু মোসলেম শরীফের এক হাদীছে কালো খেজাব নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেমগণ উহাকে নাজায়েয বলিয়াছেন।

উভয় হাদীছের সামঞ্জস্য বিধান কল্পে এক শ্রেণীর আলেমগণ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব জুহরীর বিবৃতি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه والاسنان تركناه

"আমরা কালো খেজাব ব্যবহার করিতাম যাবৎ চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হইত। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন আসিয়া যাইত এবং দাঁতও খসিয়া পড়িত তখন কালো খেজাব বর্জ্জন করিতাম।" (ফত্‌হুল বারী ২০—২৯২)

ছাহাবীগণের মধ্যে সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাছ (রাঃ) ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) হাসান (রাঃ) এবং হোসাইন (রাঃ) কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলিতেন।

চুল কাটা সম্পর্কে

২২৭০। ছাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "কাযা" নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—"কাযা" ছেলে-মেয়েদের মাথার চুল কাটার এক প্রকার ফ্যাসন যাহা সেই কালে প্রচলিত ছিল। মাথার সম্মুখ ভাগে এবং দুই পার্শে তিন খণ্ড চুল রাখিয়া বাকি চুল কামাইয়া ফেলা হইত ; হযরত (দঃ) উহা নিষেধ করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য লাভের কতিপয় অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা

২২৭১। ছাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লার লা'নৎ ঐ নারীদের প্রতি যাহারা মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করিয়া কেশের পরিমাণ বেশী দেখাইবার ব্যবস্থা অবলম্বনে সমাজকে প্রলুব্ধ করে কিম্বা নিজে উহা অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়। এবং আল্লার লা'নৎ ঐ নারীদের প্রতি যাহারা শরীরে চিত্র বা নাম উৎকীর্ণ করিয়া অঙ্কিত করার প্রতি সমাজকে প্রলুব্ধ করে কিম্বা নিজে উহা গ্রহণ করে।

২২৭২। হাদীছ ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসিনী একটি মেয়ে বিবাহ হওয়ার পর সে রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার মাথার চুল উঠিয়া গেল। তাহার মুরব্বিগণ কৃত্রিম চুল মিশ্রনে তাহার মাথায় কেশ বেশী দেখাইবার ব্যবস্থাবলম্বনের ইচ্ছা করিয়া উহা সম্পর্কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা লা'নৎ করিয়াছেন ঐ নারীদের প্রতি যাহারা কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করিয়া মাথার কেশ অধিক দেখাইবার ব্যবস্থা গ্রহণে প্রলুব্ধ করে কিম্বা নিজে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২২৭৩। হাদীছ ঃ—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মহিলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার মেয়ের মাথায় এক প্রকার ঘা হইয়াছে যাহাতে তাহার মাথার চুল ঝরিয়া গিয়াছে। মেয়েটি আমার বিবাহিতা; তাহার মাথায় অন্যের চুল মিশাইয়া দিতে পারি কি? নবী (দঃ) বলিলেন, একজনের মাথার চুল অপর জনের মাথায় মিশাইবার কাজ যে করে এবং যাহার মাথায় মিশানো হয়—উভয়ের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ।

২২৭৪। হাদীছ ঃ— আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বীয় শাসনকালে হজ্জ উপলক্ষে মদীনা শরীফে আসিয়া একদা সর্ব্বসাধারণের সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহ রক্ষী পুলিশের হাতে

এক গুচ্ছ কৃত্রিম চুল ছিল, উহা তিনি নিজ হাতে লইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? (তাঁহারা এইরূপ বিষয়ে লোকদিগকে কেন নছিহত করে না ?)

আমি হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)কে ইহা হইতে (অর্থাৎ কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা হইতে) নিষেধ করিতে শুনিয়াছি এবং ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, বনী-ইস্রাঈলদের নারীগণ যখন এই কৃত্রিম চুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিল তখনই তাহাদের ধ্বংস ও পতন আসিয়াছিল।

২২৭৫। হাদীছ ঃ— সায়ীদ ইবনে মোছাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) মদীনায় তাঁহার সর্ব্বশেষ ছফরে আসিয়া তিনি আমাদের মধ্যে ভাষণ দানকালে এক গুচ্ছ কৃত্রিম চুল হাতে নিয়া বলিয়াছিলেন, ইহুদীগণ ছাড়া অন্য কেহ ইহা ব্যবহার করে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না।

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ চুল ব্যবহার করাকে "মিথ্যা" আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছ সমূহে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে—(১) শরীরে চিত্র বা নাম উৎকীর্ণ ও অঙ্কিত করা, (২) কৃত্রিম উপায়ে মাথার কেশ বেশী করা। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একখানা হাদীছ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে—সেই হাদীছ খানা ইমাম বোখারী (রঃ) পুনঃ এস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছে অপর দুইটি বিষয়ও লা'নৎ এবং অভিশাপের কারণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—(৩) ললাট বা কপালের উর্দ্ধদেশে মাথার চুল উপড়াইয়া কপাল প্রশস্ত করা, (৪) রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘর্ষণ করতঃ দাঁত সরু করিয়া দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করা।

কোরআন-হাদীছে যে কার্য্যের প্রতি লা'নৎ বা অভিসাপের উল্লেখ হয় উহা অতি বড় গোনাহ গণ্য হইয়া থাকে। সে মতে শরীরে চিত্র বা নাম উৎকীর্ণ করা অতি বড় গোনাহ এবং ইহা কোন প্রকার পার্থক্য ও তারতম্য ব্যতিরেকে নারী-পুরুষ সকলের জন্য বড় গোনাহ। ঐ গোনাহের তওবা সম্পন্ন হওয়ার জন্য উক্ত অঙ্কণ দুরীভুত করার সার্বিক চেষ্টা আবশ্যক। এমনকি শুধু অঙ্গহানি হইতে বাঁচিয়া ঘা ও জখমের মাধ্যমে হইলেও তাহা করিতে হইবে। (ফত্‌হুল বারী, ১০—৩০৬)

কৃত্রিম চুল ব্যবহার করাও বড় গোনাহ, কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ে তারতম্যের অবকাশ থাকায় সেই তারতম্যে ইমামগণের মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। কৃত্রিম চুল দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইল মানুষেরই ছিন্ন কেশ বা চুল, আর এক

হইল মানুষের চুল নয়, বরং অন্য কোন রঙ্গিন বস্তু। ইমাম মালেক (রঃ) উভয় প্রকারের বস্তুই আসল কেশের সহিত জড়াইয়া কৃত্রিম উপায়ে কেশ অধিক দেখানকে নাজায়েয বলিয়াছেন। ইমাম শাফী (রঃ) মানুষের ছিন্ন চুল মাথায় ব্যবহার করা সমানভাবেই নাজায়েয বলিয়াছেন, কিন্তু চুল ভিন্ন অন্য রঙ্গিন বস্তু কেশরূপে ব্যবহার করা বিবাহিতাদের পক্ষে জায়েয এবং অবিবাহিতাদের পক্ষে নাজায়েয বলিয়াছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, মানুষের ছিন্ন চুল হইলে তাহা উভয়ের জন্য নাজায়েয এবং চুল ভিন্ন অন্য জিনিষ হইলে তাহা উভয়ের জন্য জায়েয। (আওজাযুল্ মাছালেক, ৬—৩২৮)

সারকথা এইযে, কৃত্রিম চুল ব্যবহার করাকে আলোচ্য হাদীছে লা'নতের কারণ বলা হইয়াছে, এস্থলে মানুষের ছিন্ন চুল ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার উদ্দেশ্য, কিন্তু চুল ভিন্ন অন্য রঙ্গিন বস্তুও উহার অন্তর্ভুক্ত কি না—সে সম্পর্কে ইমামগণের মতানৈক্য আছে।

ললাট বা কপালের চুল উপড়ান এবং দাত ঘর্ষণকেও এক শ্রেণীর আলেমগণ আলোচ্য হাদীছের বাহ্যিক ব্যাপকতা দৃষ্টে ব্যাপক আকারেই বড় গোনাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন (ফতহুল বারী ১০—৩১০)। কোন কোন আলেম স্বামীর সম্মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশ এবং বেগানাদের সম্মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশের তারতম্য করিয়াছেন এবং আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুকে বেগানাদের উদ্দেশ্যের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। (ফতওয়া শামী ৫—৩২)।

পাঠক বর্গ! ফেক্কাহ্ শাস্ত্র হইল আইন ও বিধান পর্য্যায়ের বস্তু। তাই সেখানে উপস্থিত অপরাধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় এবং উল্লেখিত শাস্তির সহিত সেই অপরাধের সাধারণভাবে সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট না হইলে অপরাধকে কঠোরতম করার জন্য ভিন্ন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা হয়। পক্ষান্তরে কোরআন ও হাদীছে শুধু আইন ও বিধানের সাঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতেই কথা বলা হয় নাই, বরং পাক পবিত্র মানুষ ও পাক পবিত্র সমাজ গঠনের জন্য সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছ সমূহ উহারই নমুনা।

বিলাস বহুল প্রসাধনীর ছড়াছড়ি ও রূপ-সজ্জার এরূপ প্রবণতা যে, সৃষ্টিগত ভাবে যে জিনিষ লাভ হয় নাই কৃত্রিম উপায়ে হইলেও উহার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ ধরনের ছড়াছড়ি ও প্রবণতা অবশ্যই বেগানা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, ঐ হাদীছখানাকে ইমাম মোসলেম আলোচ্য হাদীছ সমূহের সংলগ্নে বর্ণনা করিয়া উল্লেখিত তথ্যটিই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

দুই শ্রেণীর জাহান্নামী লোক যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে মোসলেম সমাজে পরিদৃষ্ট হয় নাই, হযরতের যমানার পরে মোসলেম

সমাজেও তাহাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, উক্ত হাদীছে ঐ শ্রেণীদ্বয়ের বিবরণ দানে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনায় হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَاِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

দ্বিতীয় প্রকার জাহান্নামী "ঐ নারীগণ যাহারা কাপড় পরিহিতা অবস্থাও উলঙ্গ,* (রূপ-সজ্জা ও অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা) লোকদেরে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হয়। তাহাদের (কৃত্রিম কেশে বোঝাই কবরী-বিশিষ্ট) মাথা উটের কুঁজের ন্যায় দেখায়। তাহারা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না, এমনকি তাহারা বেহেশ্‌তের ঘ্রানও পাইবে না যাহা বহু বহু দুরের স্থান হইতেও পাওয়া যাওয়ার উপযোগী।"

কৃত্রিম রূপ-সজ্জার প্রবণতা যে, কেন উদয় হয় এবং সেই প্রবণতা যে, কত রকম অভিশাপময় নির্লজ্জ সাজ-গোজ জোগাইয়া আনে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা হযরত (দঃ) এই হাদীছে দিয়াছেন। এবং এই সূত্রেই যে অত্র পরিচ্ছেদের মূল হাদীছ সমূহে বর্ণিত কৃত্রিম সাজ-সজ্জাগুলি লা'নতের কারণ তাহা বুঝাইবার জন্যই ইমাম মোসলেম (রঃ) উক্ত হাদীছ সমূহের সংলগ্নে এই হাদীছটিকে উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাদের সম্মুখে বাস্তব রূপ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব সর্ব্বদা বিকশিত তাহাদেরকে দেখাইবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় না। হইলেও দুই চার বার মাত্র হইতে পারে; উহা অভ্যাসে পরিণত হয় না।

ধার করা কৃত্রিম উপায়ে হইলেও রূপ-সজ্জা ও অঙ্গ ভঙ্গির প্রদর্শণী করিতে হইবে এই প্রবণতা সমাজকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া নেয়। কারণ, প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য না হইলে কৃত্রিম রূপ-সজ্জার প্রবণতা আসিবে কেন? আর রূপ-সজ্জা প্রদর্শণীর প্রথম পদক্ষেপেই বে-পর্দ্দা বেহায়া নির্লজ্জ হইতে হইবে এবং এই পথে সমাজে জঘন্যতম ব্যভিচার ছড়াইবে যাহা সমাজের নৈতিক পতন। অধিকন্তু সময় সময় সমাজের নৈতিক পতনে আল্লাহ পাকের গজবের লীলা প্রকাশ পাইয়া সমাজের বাহ্যিক পতন তথা ধ্বংসও ঘটিয়া যায়। বনী-ইস্রাঈলদের নারীগণ কৃত্রিম

* "কাপড় পরিহিতা অবস্থায়ও উলঙ্গ" এই বাক্যে রূপ সজ্জার রূপসীদের নির্লজ্জ দৃশ্যকে সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। মিহি বস্ত্র পরিধান করা এবং আট-সাট পোশাক পরিয়া আকর্ষণীয় অঙ্গ সমূহের গঠণ ফুঠাইয়া তোলা উলঙ্গ হওয়ারই নামান্তর।

রূপ-সজ্জার প্রদর্শণীতে লিপ্ত হওয়ায় গোটা বনী-ইস্রাঈল সমাজের পতন ও ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছিল—সেই ইতিহাসের প্রতিও হযরত (দঃ) ২২৭৪ নং হাদীছে ইঙ্গিত দান করিয়াছেন।

সার কথা এই যে, কৃত্রিম রূপ-সজ্জায় মত্ত নারীগণ সাধারণতঃ উহা প্রদর্শণীর প্রবণতায় লিপ্ত থাকে। তাই আলোচ্য হাদীছসমূহে কোন প্রকার তারতম্য না করিয়া সমানভাবে ঐ শ্রেণীর নারীদের প্রতি লা'নৎ করা হইয়াছে এবং সমাজে যেন এই কৃত্রিম রূপ-সজ্জার সূত্রপাতই না হইতে পারে তাহার জন্য সতর্কতা-মুলকভাবে কঠোরতাই অবলম্বন করা হইয়াছে।

ফটো বা ছবি সম্পর্কে

২২৭৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) একদা মদীনার এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহের উপর দিক দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ছবি অঙ্কনকারী ছবি আঁকিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আমি নিজ কানে শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (ছবি অঙ্কনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া থাকেন—) আমি যেরূপ আকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকি যে ব্যক্তি উহার তুলনায় আকৃতি বানায় সেই ব্যক্তির ন্যায় অপরাধী আর কেহ নাই—এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা একটি ক্ষুদ্র দানা বা চীনা সৃষ্টি করুক ত দেখি!

২২৭৭। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (জীবের) ছবি বানাইবে কেয়ামতের কঠিন সময়ে তাহাকে বলা হইবে, এই ছবির মধ্যে আত্মা দান কর। সে তাহা কখনও পারিবে না, (ফলে আজাব ভোগ করিবে।)

ফটো বা ছবি প্রস্তুতকারীগণ আজাব ভোগ করিবেঃ

২২৭৮। হাদীছঃ— قالت عائشة رضى الله تعالى عنها

قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِّىْ عَلٰى سَهْوَةٍ لِّىْ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهٗ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি স্বীয় গৃহের তাকের উপর একটি পর্দ্দা লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলাম, ঐ পর্দ্দাটি ছবিযুক্ত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পর্দ্দাটিকে ফাড়িয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিগণ সর্ব্বাধিক কঠিন আজাব ভোগ করিবে যাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ গুণ ও ছেফৎ—আকৃতি দান কার্য্যের তুলনা অবলম্বন করে। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, অতঃপর আমি ঐ পর্দ্দার খণ্ডগুলি দ্বারা গদি ও আসন তৈরী করিলাম।

২২৭৯। হাদীছ ঃ—মছরুক (রঃ) একদা এক ব্যক্তির ঘরের বারান্দায় ছবি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি—

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ

“নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তায়ালার নিকট তথা আখেরাতে সর্ব্বাধক কঠিন আজাব ছবি তৈরীকারকদের হইবে।”

২২৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহারা কোন প্রাণীর ছবি তৈরী করে পরকালে তাহাদেরে আজাব ও শাস্তি দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা (দুনিয়াতে) যে সব আকৃতি বানাইয়াছিলে ঐ সবের মধ্যে আত্মা দান কর। (আত্মা দানে তাহারা অক্ষম, তাই আজাব ভোগ করিবে।)

ছবি প্রস্তুত ও অঙ্কনকারীদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ ঃ

দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৭২ নম্বরে যে হাদীছ খানা অনুদিত হইয়াছে উক্ত হাদীছ খানা ইমাম বোখারী (রঃ) অত্র পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার মধ্যে বিশেষরূপে এই বাক্যটি বর্ণিত আছে— ولعن المصور “রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছবি অঙ্কনকারীর প্রতি লানৎ বা অভিশাপ করিয়াছেন।”

ছবিযুক্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলা ঃ

২২৮১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের মধ্যে ছবিযুক্ত বস্তু রাখিতেন না ; ঐরূপ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

পূর্ব্বে অনুদিত ২২৭৮ নং হাদীছটিও এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

ছবিযুক্ত বিছানায় না বসা এবং যে ঘরে ছবি আছে সেই ঘরে প্রবেশ না করা ঃ

২২৮২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একটি গদি বা আসন ক্রয় করিয়া আনিয়া গৃহে রাখিলেন, উহাতে ছবি ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহের দরওয়াযায় পৌঁছিলেই তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পতিত হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন না, দরওয়াযায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার চেহারার রং পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন— আমি আরজ করিলাম, স্বীয় গোনাহ হইতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করিতেছি, আমার কসূর কি হইয়াছে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, এই গদিটি কেন ? আমি আরজ করিলাম, আপনি উহার উপর বসিবেন এবং বিছানারূপে ব্যবহার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ
الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ -

"তুমি কি জাননা যে, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যেই ঘরে ছবি থাকে এবং যে ব্যক্তি ছবি বানাইবে (আঁকিয়া বা যে কোন উপায়ে) তাহাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হইবে এবং (তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ) বলা হইবে, যেই অকৃতি তুমি বানাইয়াছ উহার মধ্যে জীবন দান কর ত দেখি !

যে ঘরে ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না ঃ

২২৮৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত জিব্রিল (আঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করার অঙ্গিকার করিলেন। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন না। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন জিব্রিল (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার প্রতি মনক্ষুণ্ণতার কথা উল্লেখ করিলেন। জিব্রিল (আঃ) হযরতের নিকট বলিলেন, إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

"আমরা কখনও প্রবেশ করি না ঐ গৃহে যেই গৃহে ছবি থাকে এবং ঐ গৃহেও না যেই গৃহে কুকুর থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ—এই ধরণের একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রিল (আঃ) কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময় সাক্ষাৎ করা সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ওয়াদা করিলেন। নির্দ্ধারিত ঐ সময় উপস্থিত হইল, কিন্তু জিব্রিল (আঃ) আসিলেন না। হযরত (দঃ) মনক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার বার্ত্তা বাহকগণ ত ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। অতঃপর খাটিয়ার নীচে একটি কুকুর শাবকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি (ঘৃণার স্বরে) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! এইটা ঘরে ঢুকিল কোন সময়? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন খোদার কসম—ইহার সম্পর্কে আমি কিছুই জ্ঞাত নহি।

হযরত (দঃ) তৎক্ষণাৎ উহাকে বাহির করার আদেশ করিলেন (এবং নিজ হস্তে পানি লইয়া ঐ স্থানটি ধৌত করিয়া দিলেন)। অতঃপর জিব্রিল আলাইহেচ্ছালামের সাক্ষাৎ হইল। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি সাকাৎ করিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, আমি সেই অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আসেন নাই। জিব্রিল (আঃ) বলিলেন, কুকুর-শাবকটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক ছিল।

"আমরা ঐ গৃহে প্রবেশ করি না যেই গৃহে কুকুর থাকে এবং ঐ গৃহেও না যেই গৃহে ছবি থাকে।

২২৮৪। হাদীছ ঃ— عن عبد الله انه سمع ابن عباس يقول

سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবু তাল্‌হা (রাঃ)-এর মুখে শুনিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না ঐ গৃহে যেই গৃহে কুকুর আছে এবং ঐ গৃহেও না যেই গৃহে চিত্র ও ছবি আছে।

ব্যাখ্যাঃ—"تماثيل—তামাছীল" শব্দটি বহু বচন, উহার এক বচন হইল "تمثال—তেমচাল"। কামুস্ ইত্যাদি আরবী অভিধান দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তেমছাল অর্থ صورة—সুরত অর্থাৎ ছবি—অঙ্কিত হউক যেমন চিত্র বা গঠিত হউক যেমন মূর্ত্তি। যাহারা সার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য কোন অর্থ করে তাহাদের মতামত আরবী অভিধান বিরোধী এবং নিম্নে বর্ণিত স্পষ্ট হাদীছের বিরোধী। এতদ্ভিন্ন ২২৭৮ এবং ২২৮২ নং হাদীছদ্বয়েরও বিরোধী।

২২৮৫। হাদীছ :—বুস্‌র ইবনে সায়ীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং ওবায়দুল্লাহ (রঃ) আমাদের উভয়ের সম্মুখে ছাহাবী যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) ছাহাবী আবু তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ "যেই গৃহে ছবি আছে সেই গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"

বুস্‌র (রঃ) বলেন, যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) রোগাক্রান্ত হইলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ী গেলাম। তাঁহার গৃহে ছবিযুক্ত একটি পর্দা দেখিতে পাইলাম। তখন আমি আমার সঙ্গী ওবায়দুল্লাহকে বলিলাম, তিনি ত ছবি না রাখা সম্পর্কে আমাদিগকে হাদীছ শুনাইয়া ছিলেন।

এতচ্ছ্রবনে ওবায়দুল্লাহ (রঃ) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, উক্ত হাদীছে তিনি এই বাক্যও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কাপড়ের মধ্যে যদি গাছ-পালা কিম্বা লতা-পাতার ছবি থাকে তবে তাহা নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত।

মছআলাহ :—কোন জীবের ছবি ভিন্ন গাছ-পালা, লতা-পাতা ইত্যাদির ছবি দুষণীয় নহে। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১৮ নং হাদীছ খানা সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২১তম অধ্যায়

মানবীয় সভ্যতা বা ইসলামী আদর্শ

ইহা একটি বিরাট অধ্যায়। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) পৃথক একখানা কেতাবও লিখিয়াছেন, উহাতে তিনি এ সম্পর্কে বহু বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান গ্রন্থেও যথেষ্ট বিষয়াবলী উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার অধিকাংশ বিষয়াবলী সম্পর্কীয় হাদীছেরই অনুবাদ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। যথা—মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। জেহাদে যাইতে হইলেও মাতা-পিতার অনুমতি লওয়া। মাতা-পিতার খেদমত করিয়া যাওয়া। মাতা-পিতার নাফরমানী কবিরা গোনাহ—উহা পরিহার করা। মাতা-পিতা অমোসলেম পৌত্তলিক হইলেও তাহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। মাতা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে তবুও তাহার খেদমত করা। অমোসলেম পৌত্তলিক ভ্রাতার প্রতিও সদ্ব্যবহার করা। রক্তের সংশ্রব আছে এমন আত্মীয়দের হক্ আদায় করা। ছোট শিশু অন্যের হইলেও তাহার বিরক্ত সহ্য করা এবং তাহাকে আদর-স্নেহ করা। শিশুকে কোলে বসান। শিশুকে উরুর উপর বসান। ঈমানের জযবায় পরিবার পরিজনের সঙ্গে মধুর জীবন-যাপন করা। অনাথ-বিধবাদের সাহায্যে তৎপর হওয়া। গরীব-মিছকীনদের সাহায্যে তৎপর হওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া করা। প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া যদিও সামান্য বস্তু হয়। প্রতিবেশীদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনে বাড়ীর সদর দরওয়াজার নিকটবর্ত্তিতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দান করা। সব রকম সদ্ব্যবহার অযাচিত ভাবে করা। সুচরিত্র ও দানশীলতা অবলম্বন করা এবং কৃপনতাকে ঘৃণা করা। প্রয়োজনীয় গৃহ-কার্য্য সম্পাদনে কুণ্ঠিত না হওয়া। লোক-জনের প্রীতি লাভ হইলে তাহা আল্লার দান গণ্য করা। কাহাকেও মহব্বৎ করা আল্লার মহব্বতে উদ্বুদ্ধ হইয়া। কাহারও পরিচয় দানে তাহার কোন অবস্থার উল্লেখ করা, কিন্তু তাহার কুৎসা বা নিন্দাজনক বিষয় উল্লেখ না করা। গীবৎ তথা কাহারও অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা দোষ বর্ণনা না করা। ভাল লোকের প্রশংসা করা। যাহাদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইবে তাহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। চোগলখোরী কবিরা গোনাহ—উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা। মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কাহারও দুর্ণাম রটিতে দেখিয়া তাহাকে সংবাদ দিয়া দেওয়া। সম্মুখে কাহারও প্রসংশা না করা। কাহারও প্রসংশায় ততটুকুই বলা যতটুকু জানা আছে।

যে কাজে কোন খারাপ বিষয়ের চর্চ্চা ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে উহা হইতে বিরত থাকা—চাই সেই খারাপ বিষয়ের সম্পর্ক কোন মোসলমানের সঙ্গে হউক বা কাফেরের সঙ্গে হউক। দ্বীনের কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাহারও সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বন্ধ করা। দ্বীনের ব্যাপারে অপরাধী ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করা। বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাওয়া। সাক্ষাতের জন্য যাইয়া (বন্ধুর মন রক্ষার্থে) তথায় খানা খাওয়া। আগন্তুকদের সহিত সাক্ষাৎ কালে ভাল লেবাছ-পোশাকের ব্যবস্থা করা। হাসিবার স্থলে মৃদু-হাসা। দুঃখ যাতনা এবং রাগে ও রোগে ধৈর্য্য ধারণ করা। (অযথা) কাহারও মুখের উপর তিরস্কান না করা। আল্লাহ বিরোধী কার্য্যের মোকাবিলায় ক্রোধান্বিত হওয়া এবং কঠোর হওয়া। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কোমলতা অবলম্বন করা। মেহমানের দাবী আছে—ইহা লক্ষ্য রাখা। মেহমানের জন্য পানাহারের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গৃহ স্বামীকে মেহমানদের সঙ্গে খাইবার অনুরোধ করা। কথাবার্ত্তায় বড়কে অগ্রাধিকার দান করা। কাল যুগ বা সময়কে দোষী না করা—উহাকে মন্দ না বলা। উত্তম নাম গ্রহণ করা। মন্দ নাম বর্জ্জন করা। মন্দ নাম থাকিলে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ভাল নাম রাখা। অশ্চার্য্যান্বিত হইলে সে স্থলে ছোবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহু আকবর বলা।

কাহারও গৃহে প্রবেশের পুর্ব্বে অনুমতি লাভের ভুমিকা গ্রহণ করা যথা—সালাম করা। সালাম আল্লাহ তায়ালার একটি নামও আছে সে মতে এই শব্দটির মর্য্যাদা দান করা। ছোট বড়কে সালাম করিবে। সালামের চর্চ্চা অধিক করা। পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা। গৃহভ্যন্তরে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর সালাম করা। প্রেরিত সালাম পৌঁছাইয়া দেওয়া। মোসলেম অমোসলেম মিলিত মজলিসেও মোসলমানদিগকে সালাম করা। কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির সহিত সালামের আদান প্রদান না করা যাবৎ না তাহার তওবার লক্ষণ প্রকাশ পায়—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, মদ্য পানকারীকে সালাম করিও না। অমোসলমদের সালামের উত্তরে সালাম ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন কায়দায় উত্তর প্রদান করা। দলীয় সর্দারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। মোছাফাহা করা। উভয় হস্তে মোছাফাহা করা—বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাম্মাদ ইবনে ফায়েদ সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও মোহাদ্দেছ আবদুল্লাহ ইবনে মোবাররকের সঙ্গে উভয় হস্তে মোছাফাহা করিয়াছিলেন। মোয়ানাকাহ করা। মুরব্বির আহবানে সঙ্গে সঙ্গে নতশিরে সাড়া দেওয়া। মজলিসের মধ্যে কোন এক জনকে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে না বসা। কাহারও গোপন কথা প্রকাশ না করা। রাত্রি বেলা ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করা। বয়স বেশী হইয়া গেলেও খত্‌না করা। শরীয়তের কাজে বাধা সৃষ্টি করে এরূপ খেলা-ধূলা হইতে বিরত থাকা।

এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই সব পরিচ্ছেদে যে হাদীছ সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ঐ সব হাদীছের অনুবাদ বিভিন্ন স্থানে হইয়া গিয়াছে। উল্লেখিত বিষয়াবলী ছাড়া আলোচ্য অধ্যায়ে আরও কতিপয় বিষয় রহিয়াছে, হাদীছের অনুবাদের সহিত ঐ সবের বর্ণনা করা হইতেছে—

মাতার সহিত সর্ব্বাধিক সদ্ব্যবহার করা

২২৮৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহার পাইবার বেশী অধিকারী কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তারপরও তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) এইবারও বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তারপর? হযরত (দঃ) এইবার বলিলেন, তারপর তোমার পিতা।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায় সন্তানের উপর পিতার হক্ অপেক্ষা তিনগুণ বেশী হক্ মাতার।

মাতা-পিতাকে মন্দ না বলা

২২৮৭। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কবিরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাধিক বড় গোনাহ এই যে, মানুষ স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি লান-তান গালি-গালাজ করে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হে আল্লার রসুল! মানুষ নিজের মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে কি রূপে? হযরত (দঃ) বলিলেন, (সরাসরি নিজের মাতা-পিতার উপর গালি প্রয়োগ না করিলেও এইরূপ হইয়া থাকে) যে, একজন মানুষ অপর কোন মানুষের পিতাকে গালি দেয় ঐ ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) এই ব্যক্তির পিতাকে গালি দিয়া থাকে। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয় এবং সেই ব্যক্তি এই ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়।

● মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হইয়া থাকে। এই বিষয়ে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১১২৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

মাতা-পিতার অবাধ্যতা কবিরা গোনাহ

২২৮৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত—(১) আল্লার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া (৩) মিথ্যা কসম খাওয়া।

রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা

২২৮৯। হাদীছ ঃ— ان جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه

سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অর্থ—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, রক্তের সম্পর্ক রহিয়াছে ঐরূপ আত্মীয়দের আত্মীয়তা যে ব্যক্তি ছেদন করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

২২৯০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ

لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَاَنْ يُّنْسَاَ لَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার কামনা থাকে রিজিকের মধ্যে প্রশস্ততা লাভ করা এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম অর্জ্জন করা সে যেন ছেলা-রহমী করে তথা রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলে।

২২৯১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার খাহেস থাকে রিজিকে প্রশস্ততা লাভ করার এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম অর্জ্জন করার তাহাকে ছেলা-রহমী বজায় রাখিতে হইবে।

২২৯২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের রুহ্ পয়দা করিয়া সারিলে পর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা (আল্লার কুদরতে) আকৃতি ধারণ করিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল, মানুষ আমাকে

ছেদন করিবে তাহা হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে আমি রক্ষা-কবচ লাভের জন্য দাঁড়াইয়াছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তুমি কি আমার এই ঘোষনায় সন্তুষ্ট হইবে যে—যেই ব্যক্তি তোমাকে বজায় রাখিয়া চলিবে তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় থাকিবে এবং যেই ব্যক্তি তোমাকে ছেদন করিবে তাহার সঙ্গে আমি আমার সম্পর্ক ছেদন করিব? সে বলিল, হে পরওয়ারদেগার! এরূপ ঘোষনা হইলে নিশ্চয় আমি সন্তুষ্ট আছি। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তোমার জন্য আমি এই ঘোষনা বলবৎ করিয়া দিলাম।

২২৯৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালার নাম) "রহ্মান" হইতেই "রাহেম" শব্দ (যাহার অর্থ—রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা) গৃহিত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলিয়া-দিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিবে আমার রহমতের সম্পর্ক তাহার সহিত বজায় থাকিবে। আর যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্ককে ছেদন করিবে আমি তাহার সঙ্গে আমার রহমতের সম্পর্ক ছেদন করিব।

২২৯৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাহেম শব্দ (যাহার অর্থ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা; আল্লার নাম "রহমান"-এর) একটি শাখা; (তাই আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষনা—) যে ব্যক্তি উহাকে বজায় রাখিয়া চলিবে আমার রহমতের সম্পর্ক তাহার সঙ্গে বজায় থাকিবে, আর যে ব্যক্তি উহাকে কাটিয়া ফেলিবে তাহার হইতে আমার রহমতের সম্পর্ক কাটিয়া ফেলিব।

২২৯৫। হাদীছ ঃ—আম্র ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে এই কথা ঘোষনা করিতে শুনিয়াছি—

اِنَّ اٰلَ اَبِىْ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَائِىْ اِنَّمَا وَلِيِّىَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আমার বাপ-দাদার বংশধর হওয়ার ভিত্তিতে কেহ আমার বন্ধু নহে, আমার বন্ধু হইলেন আল্লাহ এবং নেককার মোমেনগণ।" (তবে নবী (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন—)

অবশ্য বাপ-দাদার বংশধরদের সঙ্গে আমার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রহিয়াছে; আমি সেই আত্মীয়তার হক্ আদায় করিয়া যাইব।

প্রতিদানের দ্বারা আত্মীয়তার হক, আদায় হয় না

২২৯৬। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنِ

الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিদানের দ্বারা বস্তুতঃ আত্মীয়তা রক্ষাকারী গণ্য হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মীয়তা রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি যে আত্মীয়তা ছিন্নকারীর সঙ্গেও আত্মীয়তা জুড়িয়া রাখে।

সন্তান-সন্ততিকে আদর স্নেহ করা—চুমা দেওয়া বুকে জড়াইয়া ধরা

২২৯৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় শিশু পৌত্র হাসান (রাঃ)কে চুমা দিলেন। আক্‌রা' ইবনে হাবেস (রাঃ) নামক ছাহাবী তথায় উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন, আমার দশটি সন্তান আছে একটিকেও কোন দিন চুমা দেই নাই। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, من لا يرحم لا يرحم "যাহার অন্তরে রহম নাই আল্লার তরফ হইতেও তাহার প্রতি রহম হয় না।"

২২৯৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক বেদুইন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পৌঁছিল। সে বলিল, আপনারা শিশু-দেরে চুমা দিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু তাহা করি না। তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন—

اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اِذَا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

"আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরকে বে-রহম বানাইয়া দিয়া থাকিলে আমি কি কিছু করিতে পারি ?

২২৯৯। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কতিপয় যুদ্ধবন্দী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পৌঁছিল। তাহাদের মধ্যে একটি মহিলা ছিল তাহার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। সে তাহাদের দলের মধ্যে কোন শিশু দেখিলেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিত এবং বুকে তুলিয়া দুধ পান করাইত। (পুত্র-হারা মহিলাটি এইভাবে তাহার শিশু পুত্রকে খোঁজ করিতে ছিল, এমতাবস্থায় সে একটি শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিল এবং প্রাণ ভরিয়া দুধ পান করাইল। শিশুর প্রতি তাহার স্নেহ মমতার দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া) নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন :—

أَتُرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلَّا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا

"তোমরা কি ধারণা কর—এই মহিলাটি তাহার সন্তানকে আগুনে ফেলিয়া দিতে পারিবে? ছাহাবীগণ সকলেই বলিলেন, না। ফেলিবার অবকাশ থাকিলে সে কখনও ফেলিবে না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, খোদার কসম—এই মহিলাটি তাহার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহশীলা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বন্দাদের প্রতি তদপেক্ষা অনেক বেশী স্নেহশীল।"

খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান নিধন হইতে বিরত থাকা

২৩০০। **হাদীছ**:—عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه—

قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন গোনাহ সর্ব্বাধিক বড়? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা অথচ একমাত্র আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তারপর কোন্‌টা? হযরত (দঃ) বলিলেন, সন্তান বধ করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সঙ্গে খাইবে (এবং তাহাতে অভাব আসিয়া যাইবে।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপরে কোন্‌টা? হযরত (দঃ) বলিলেন, (তোমার প্রতিবেশী যে স্বীয় আব্‌রু-ইজ্জৎ রক্ষার ব্যাপারে তোমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে—সেই) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।

ব্যাখ্যা:— অভাবের ভয়ে সন্তান বধ করার অপরাধের ধারায় মূল অপরাধ প্রাণ বধ করা নহে। অপরাধের এই ধারাটি পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত রহিয়াছে। সেই আয়াতে প্রাণ বধ করার অপরাধ ভিন্ন ভাবে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অভাবের ভয়ে সন্তান বধ করার অপরাধ বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা—نحن نرزقهم واياكم "আমিই তাহাদের রেজেকের ব্যবস্থা করিব যেরূপ তোমাদের রেজেকের ব্যবস্থাও আমিই করিয়া থাকি" বলিয়া সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন যে,

এই অপরাধের ধারায় মুল অপরাধ হইল মানব সন্তানের জন্মে অভাবের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হওয়া, নতুবা উল্লেখিত বাক্যটি সংযোজনের কোন অর্থই হয় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "আয্‌ল তথা গর্ভ নিরোধ উদ্দেশ্যে বীর্য্যপাত জনন্দ্রিয়ের বাহিরে করা" পরিচ্ছেদে ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এতিমের লালন-পালন করা

২৩০১। হাদীছ ঃ— سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ

هٰكَذَا وَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطٰى -

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় হস্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙ্গুলদ্বয়কে মিলিতভাবে দেখাইয়া বলিয়াছেন, আমি এবং অতিমের প্রতিপালনকারী বেহেশ্‌তের মধ্যে এইরূপে থাকিব।

অনাথ বিধবার সাহায্য করা

২৩০২। হাদীছ ঃ—ছাফওয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বিধবাদের এবং গরীবদের সাহায্য সহায়তাকারীর ছওয়াব ঐ ব্যক্তির সমান যে ব্যক্তি আল্লার পথে জেহাদে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে বা যে ব্যক্তি প্রতি দিন রোযা থাকে এবং প্রতি রাত্র নামায পড়িয়া কাটায়।

সকল মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা

২৩০৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতে ছিলাম, আমাদের সহিত এক গ্রাম্য ব্যক্তিও ছিল, সে নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে এইরূপ বলিল—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا

"হে আল্লাহ! আমাকে এবং মোহাম্মদ (দঃ)কে তোমার রহমত দান কর আমাদের সঙ্গে অন্য কাউকে শামিল করিও না।"

(সে মনে করিল যে, শরীকান বেশী হইলে ভাগে কম পড়িবে।) হযরত (দঃ) নামাযের সালামান্তে ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একটি সুপ্রশস্ত বস্তুকে তুমি সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছ। (অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে সকলকেই শরীক কর তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না, কারণ আল্লাহ তায়ালার রহমত ও দান অতি প্রশস্ত।)

২৩০৪। হাদীছ ঃ— نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ جَسَدِهٖ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى

অর্থ—নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর দয়া ও কৃপা প্রদর্শনে এবং মায়া-মমতা প্রদর্শনে এবং একে অন্যের ব্যাথায় ব্যথিত হইয়া সাহায্যে ছুটিয়া আসার ব্যাপারে একটি দেহের ন্যায় হইতে হইবে। একটি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হইলে দেহের সমুদয় অঙ্গেই নিদ্রাহীনতা ও জ্বর আসিয়া যায়।

২৩০৫। হাদীছ ঃ— جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

অর্থ—জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (আল্লার বন্দাদের প্রতি) দয়া না করে তাহার প্রতি (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) দয়া করা হয় না।

প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করা

২৩০৬। হাদীছ ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা জিব্রিল ফেরেশতা (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) আমার উপর চাপ দিয়া আসিতেছেন, এমনকি আমার ধারণা হইল—প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বা উত্তরাধীকারী সাব্যস্ত করিয়া দিবেন।

২৩০৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতেও ঐরূপ বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিবেশীর

সহিত সদ্ব্যবহারের জন্য জিব্রিল ফেরেশ্তা সর্ব্বদা আমাকে চাপ দিয়া আসিতেছেন, এমনকি আমার ধারণা হইল, প্রতিবেশীকে ওয়ারেস সাব্যস্ত করিয়া দিবেন।

প্রতিবেশীর কোন অশান্তি সৃষ্টি না করা

২৩০৮। ছাদীছ ঃ— আবু শোরায়হ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া উঠিলেন—

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ

"খোদার কসম সে মোমেন নহে, খোদার কসম সে মোমেন নহে, খোদার কসম সে মোমেন নহে। হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ ব্যক্তি ইয়া রসুলাল্লাহ। হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহার দ্বারা অশান্তির ভয় হইতে নিরাপদ নহে।

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া

২৩০৯। ছাদীছ ঃ—আবু শোরায়হ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি নিজ চক্ষুদ্বয় দ্বারা তাকাইয়া আছি এমতাবস্থায় আমার নিজ কানে আমি হযরত (দঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قِيْلَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ) وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

"যে ব্যক্তি আল্লার উপর ঈমান রাখে এবং আখেরাতের সমুদয় বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে তাহার কর্ত্তব্য হইবে প্রতিবেশীকে সম্মান করা। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ঈমান রাখে এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাহার কর্ত্তব্য হইবে মেহমানকে সম্মান করা যাবৎ মেহমান আদর আপ্যায়ন পাইবার অধিকারী। হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার সীমা কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, এক দিন এক রাত্র, (এই সময়ে মেহমানকে সাধ্যানুযায়ী বিশেষ সমাদর করিতে হইবে।

মেহমান ইহার অধিক অবস্থান করিলে) তিন দিন পর্য্যন্ত সাধারণ জেয়াফৎ বা মেজবানীর ন্যায় ব্যবস্থাই যথেষ্ট হইবে। এর অতিরিক্ত অবস্থান করিলে তখনকার পানাহার মেহমানকে দান-খয়রাত করার ন্যায় গণ্য হইবে। আর মেহমানের জন্য এত দিন অবস্থান করা হালাল হইবে না যাহাতে গৃহস্বামী কষ্ট বোধ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ঈমান রাখিবে এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে ভাল কথা বলা নতুবা চুপ থাকা।

২৩১০। **হাদীছ ঃ—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাহার কর্ত্তব্য হইবে মেহমানকে সমাদর করা। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমান রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে ভাল কথা বলা কিম্বা চুপ থাকা।

প্রতিটি ভাল ব্যবহারে ও ভাল কথায় দান-খয়রাতের ছওয়াব হয়

২৩১১। **হাদীছ ঃ—** জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেকটি ভাল কথায় ও ভাল ব্যবহারে দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।

মিষ্ট ভাষী হওয়া

আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিষ্ট ভাষী হওয়া দান-খয়রাত করার সমতুল্য নেক কাজ।

২৩১২। **হাদীছ ঃ—** আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোযখের উল্লেখ পূর্ব্বক উহা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং দোযখের ভয়ঙ্কর অবস্থার

আলোচনায় তাঁহার চেহারা মোবারক কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। হযরত (দঃ) দুই তিন বার ঐরূপ করিলেন, তারপর বলিলেন—

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"শুধু মাত্র এক খণ্ড খুরমা দান-খয়রাত করার সামর্থ থাকিলে তাহা করিয়াও দোযখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর। যদি ততটুকু সামর্থ্যও না থাকে তবে অন্ততঃ মিষ্ট ভাষী হইয়া সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখ।

প্রত্যেক কাজে নম্রতা অবলম্বন করা

২৩১৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দল ইহুদী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হইল এবং তাহারা (সালাম করার সূরে) বলিল, السام عليكم (আস্সামু আ'লাইকুম—বলিল যাহার অর্থ হইল—তোমার মৃত্যু আসুক)।

আয়শা (রাঃ) বলেন, আমি তাহাদের কথা যথার্থরূপে ধরিয়া ফেলিলাম, তাই আমি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্রোধের সহিত বলিলাম, عليكم السام واللعنة "তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক এবং লা'নত বর্ষিত হউক।" রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

مَهْلاً يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ

"হে আয়েশা। ক্ষান্ত ও শান্ত হও ; সর্ব্বক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা কোমলতাকে পছন্দ করেন।"

আয়শা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি শুনিয়াছেন কি—তাহারা কি বলিয়াছে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও সমুচিত উত্তর দিয়াছি—আমি বলিয়াছি, عليكم "যে জিনিষ আমার উপর আসিবার জন্য বলিয়াছ তাহা তোমাদের উপর পতিত হউক।"

(হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার কথা তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবে, তাহাদের কথা আমার উপর ক্রিয়া করিবে না। (মোছলেম শরীফ)

মোসলমানদের পরস্পর সাহায্যকারী হওয়া

২৩১৪। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ

"মোমেনগণ পরস্পর পোক্তা ইমারত ইত্যাদির ন্যায়, যাহার এক অংশ অপর অংশের শক্তি যোগাইয়া থাকে—এক অংশ অপর অংশকে মজবুৎ করিয়া থাকে। অতঃপর হযরত (দঃ) এক হাতের আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেখাইলেন। অর্থাৎ ইমারতের গাথুনিতে এক ইট অপর ইটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইটসমূহ যেভাবে পরস্পর সাহায্যকারীরূপে একত্রিত হয় এবং মজবুৎ দেয়াল বা ইমারতে পরিণত হয়। মোমেনগণকে সেইরূপ হইতে হইবে।

ভাল কাজে সুপারিশ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً

سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করিবে সে ঐ ভাল কাজের ছওয়াব হইতে এক অংশের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করিবে সেই খারাপ কাজের গোনাহের এক বোঝা তাহাকেও বহন করিতে হইবে।"

২৩১৫। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোন ভিক্ষুক বা সাহায্য প্রার্থনাকারী আসিলে তিনি নিকটস্থ লোকদিকে বলিতেন—

اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهٖ مَا شَاءَ

"এই ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া সম্পর্কে আল্লার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তিনি স্বীয় রসুলের (আমার) মুখে বলাইবেন, কিন্তু তোমরা তাহার জন্য আমার নিকট সুপারিশ কর—সর্ব্বাবস্থায়ই তোমরা তাহাতে ছওয়াব পাইবে।"

গালি-গালাজ ও বদ-মেযাজী হইতে বিরত থাকা

২৩১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিল। হযরত (দঃ) দুর হইতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, এই লোকটি কতই না জঘন্য। অতঃপর সে হযরতের নিকট আসিয়া বসিলে হযরত (দঃ) তাহার সঙ্গে সহাস্যে মিশিলেন এবং উদার ও কোমল ব্যবহার দেখাইলেন। ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ার পর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! দূর হইতে লোকটিকে দেখিয়া আপনি

তাহার সম্পর্কে এই এই বলিয়াছেন অতঃপর তাহার সঙ্গে সহাস্যে মিশিলেন এবং উদার ব্যবহার দেখাইলেন ! হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আয়েশা ! তুমি আমাকে বদ-মেযাজ গালি-গালাজকারী কখনও দেখিয়াছ কি ? হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهٖ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি জঘন্য গণ্য হইবে ঐ ব্যক্তি যাহার বদ-মেযাজীর ভয়ে মানুষ তাহার সঙ্গে মেলামেশা করে না।"

ব্যাখ্যা :—মূল ঘটনা সম্পর্কিত ব্যক্তি জগন্য শ্রেণীর মোনাফেক ছিল। তাহার প্রকৃত অবস্থা লোকদিগকে জ্ঞাত করার প্রয়োজনে তাহার খারাবি ও মন্দ দিকটা প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে ব্যবহারে উদারতা অবলম্বন করা হইয়াছে—ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল স্বভাব ছিল। অন্যথায় সে এবং তাহার নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য লোকও হযরত (দঃ)কে বদ-মেযাজ গণ্য করিয়া তাঁহার হইতে দূরে থাকিত—ইহা আল্লার নিকট অপছন্দনীয়।

কাহারও প্রতি ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ না করা

আল্লাহ তায়ালা পাক কালামে বলিয়াছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ - وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ - بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ - وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

"হে মোমেনগণ ! তোমাদের কেহ কাহারও প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবে না ; হইতে পারে—যাহার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হইতেছে, (আল্লাহ তায়ালার নিকট) তাহার মর্য্যাদা বিদ্রূপকারী অপেক্ষা অধিক। তোমাদের নারীগণকেও বিশেষরূপে নিষেধ করা হইতেছে—তাহারাও একে অন্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবে না ; যাহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে (আল্লাহ তায়ালার নিকট) তাহার মর্য্যাদা বিদ্রূপকারিনী অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। আর তোমরা পরস্পর খোটা দিয়া বা কটাক্ষপাত করিয়া কথা বলিবে না এবং কাহারও প্রতি কুৎসাজনক খেতাবী নাম প্রয়োগ করিবে না।

এই সব ফাছেকী কাজ, ঈমানদার হওয়ার পর ফাছেকী কার্য্যের নাম-নিশান থাকাও অতি জঘন্য। যাহারা এই শ্রেণীর কার্য্য হইতে তওবা না করিবে তাহারা মহাপাপী ও অন্যায়কারী। (২৬ পারা—ছুরা হুজ্‌রাত ১ রুকু)

২৩১৭। হাদীছ ঃ—আবছুল্লাহ ইবনে যম্‌আ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—কেহ যেন কাহারও প্রতি ঐরূপ বস্তুর দরুণ না হাঁসে যে বস্তু তাহা হইতেও প্রকাশ হইয়া থাকে। (যেমন, কাহারও বায়ু নির্গত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাঁসাহাঁসি করা চাই না ; বায়ু সকলেরই নির্গত হয়।)

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কেহ স্বীয় স্ত্রীকে উট বা গরু-ছাগলের ন্যায় কিরূপে মার-ধর করে ? অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই আবার তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিতে হয়।

কাহারও প্রতি কু-উক্তি না করা

২৩১৮। হাদীছ ঃ— عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ

وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ

অর্থ—আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে— তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাছেক বা কাফের বলিলে যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ফাছেক কাফের না হয় তবে অবশ্যই ফাছেক কাফের হওয়ার সমতুল্য গোনাহ সেই ব্যক্তির উপর পড়িবে যে বলিয়াছে।

চোগলখোরী না করা

"এক জনের নামে কোন কথা অন্য এক জনের নিকট লাগান" ইহাকেই চোগলখোরী বলে। ইমাম বোখারী (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কবিরা গোনাহ।

২৩১৯। হাদীছ ঃ—হাম্মাম ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ছিলাম, এক ব্যক্তির নামে তাঁহার নিকট অভিযোগ করা হইল যে, সে খলিফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট লোকদের নামে দুর্ণাম করিয়া থাকে। সেই উপলক্ষে হোজায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন—

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লালকে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না।"

দুমুখা হওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা চাই

২৩২০। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

عِنْدَ اللّٰهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্ব্বনিকৃষ্ট মানুষ ঐ ব্যক্তিকে দেখিবে যে ব্যক্তি এক দলের সম্মুখে এক ধরণের কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গি নিয়া আসে এবং অপর দলের সম্মুখে অন্য ধরণের কথাবার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গি নিয়া যায়।

সন্দেহ পোষণ ও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে বিরত থাকা

২৩২১। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ

الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا

تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সন্দেহ করা হইতে বিরত থাক ; কারণ, সন্দেহ (অবাস্তব হইলে তাহা) নিশ্চয় মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। লোকদের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইও না এবং লোকদের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিয়া বেড়াইও না। কাহারও প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখিও না। পরস্পর বিচ্ছেদ ভাব প্রদর্শন করিও না। তোমরা সকলে ভাই ভাই এক আল্লার বন্দারূপ ধারণ কর।

ব্যাখ্যা :—কাহারও প্রতি অহেতুক ও ভিত্তিহীন সন্দেহ পোষণ করা না-জায়েয। আর বিভিন্ন কার্য্য-কলাপ ও আলামত বা নিদর্শন পাওয়ার সন্দেহ আসিয়া গেলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত সন্দেহ পর্য্যায়ের বিষয়কে মুখে বলা বা কার্য্যে ও আচরণে প্রকাশ করা না-জায়েয।

অবশ্য কাহারও সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাহার মুরব্বিকে তাহার সন্দেহ জনক আচরণের সংবাদ দেওয়া বা কোন দুষ্কৃতিকারীর দুষ্কৃতি হইতে অন্য লোকদেরকে বাঁচাইবার জন্য তাহার সন্দেহ জনক আচরণ লোকদেরকে জ্ঞাত করা জায়েয আছে। এইরূপ স্থলে জায়েয হওয়ার অবকাশ বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াচেন এবং এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন—

২৩২২। হাদীছ ঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا - وَقَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই জন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা আমাদের দ্বীন-ইসলামের কোনো কিছু জানে বলিয়া আমার ধারণা হয় না।

লায়ছ নামক বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, ঐ দুই ব্যক্তি মোনাফেক ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ— ফত্‌হুলবারী কেতাবে উক্ত হাদীছ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, এই ধারণা ও সন্দেহ না-জায়েয পর্য্যায়ের নহে। কারণ, এস্থলে ঐ মোনাফেক ব্যক্তিদ্বয়ের দুষ্কৃতি হইতে লোকদিগকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাহাদের অবস্থা প্রকাশ করা হইলাছিল। না-জায়েয সন্দেহ হইল শুধু নিন্দা করার জন্য কাহারও সম্পর্কে সন্দেহ করা বা সন্দেহের কথা প্রকাশ করা।

২৩২৩। হাদীছ ঃ— قال انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও প্রতি কেহ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে না, কাহারও প্রতি কেহ হিংসা করিবে না, পরস্পর বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন আচরণ করিবে না। তোমরা সকলে এক আল্লার বান্দা—ভাই ভাই হইয়া থাকিবে। কোন মোসলমানের পক্ষে জায়েয হইবে না যে, স্বীয় মোসলমান ভাই হইতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করতঃ তিন

দিনের বেশী সালাম-কালাম বন্ধ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ মানবীয় দুর্ব্বলতার দরুণ মনোবেদনা হজম করা অসহনীয় হইলে তিন দিনের জন্য উহার প্রতিক্রিয়া ধারণ জায়েয আছে, কিন্তু তিন দিনের অতিরিক্ত নহে।)

কোন গোনাহ করিলে তাহা লোকদের নিকট বলিয়া বেড়াইবে না

২৩২৪। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের প্রত্যেকই ক্ষমার্হ। কিন্তু ঐ লোকদের গোনাহ মাফ করা হইবে না যাহারা গোনাহ্ করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ তায়ালার ভয় হইতে নির্ভীক ও নির্ভয় হওয়ার বড় পরিচয় হইল ইহা যে, কোন ব্যক্তি হয়ত রাত্রি বেলা কোন গোনাহ বা অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার সেই অপকর্ম্মকে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আল্লার তরফ হইতে হয় নাই, ফলে উহা গুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে নিজেই ভোর বেলা লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায় যে, আজ রাত্রে আমি এই এই করিয়াছি।

(অপকর্ম্ম ও গোনাহ করার পর অন্তরে অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টির আবশ্যক ছিল এবং আল্লাহ তায়ালা যে, তাহাকে পাপের অবস্থায় পাকড়াও করিয়া লোক সমক্ষে অপমাণিত করেন নাই, তাহাকে তওবা করার সুযোগ দিয়াছেন—ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার কর্ত্তব্য ছিল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু সে উল্টা —) আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়কে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন সে তাহা ফাঁস করিয়া দিতেছে।

অহঙ্কারী হইবে না

২৩২৫। হাদীছ ঃ— عن حارثة بن وهب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر

অর্থ—হারেছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে বেহেশতী লোকদের পরিচয় জ্ঞাত করিতেছি— তাঁহারা হয় নম্র স্বভাবের, লোকদের নিকটও নম্র বলিয়া পরিগণিত। (নম্রতার দরুণ দুর্ব্বল দেখাইলেও আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা এত বড় মর্ত্তবাওয়ালা যে—)

আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ হইবে বলিয়া কসম খাইয়া বসিলে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম কার্য্যে পরিণত করিয়া দিয়া থাকেন।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, তোমাদিগকে দোযখী লোকদের পরিচয়ও বলিয়া দিব—তাহারা হয় কঠোর স্বভাবের অহঙ্কারী।

২৩২৬। **ছাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এতই কোমল প্রকৃতির ছিলেন যে, মদীনাবাসী কোন একজন ক্রীতদাসীও তাহার সাহায্যের জন্য হযরত (দঃ)কে হাত ধরিয়া নিয়া যাইতে চাহিলে তিনি তাহার উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছিয়া যাইতেন।

কোনও মোসলমান ভাই হইতে বিচ্ছেদ-ভাব অবলম্বন করিবে না

২৩২৭। **ছাদীছ ঃ**— عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

অর্থ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা জায়েয নহে যে, স্বীয় মোসলমান ভাই হইতে সম্পর্ক ছেদন অবস্থায় তিন দিনের অধিককাল অতিক্রম করে—উভয়ের সাক্ষাৎ হইলেও একে অপর হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। তাহাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট উত্তম পরিগণিত হইবে যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ করিয়া প্রথমে অপর জনকে সালাম করে।

কাহারও বাড়ি বেড়াইতে গেলে তাহার গৃহে আহার গ্রহণ করা

২৩২৮। **ছাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক মদীনাবাসী ছাহাবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তিনি আহারও করিলেন। অতঃপর যখন তথা হইতে চলিয়া আসার ইচ্ছা করিলেন তখন ঐ গৃহের এক স্থানে বিছানার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। সেমতে একটি চাটাই সামান্য ধৌত করিয়া তথায় বিছান হইল। হযরত (দঃ) উহার উপর নামায পড়িলেন এবং ঐ গৃহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন।

সত্যবাদী হইবে, মিথ্যা হইতে বিরত থাকিবে

২৩২৯। হাদীছ ঃ— عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا -

অর্থ—আবদুল্লা ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সত্যবাদিতা নেক আমলের প্রতি পরিচালিত করে এবং নেক আমল মানুষকে বেহেশতে পৌছায়। নিশ্চয় মানুষ সত্যের উপর অবিচল থাকিয়া সত্যবাদী আখ্যা লাভ করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ মানুষকে দোযখে পৌঁছায়। নিশ্চয় মানুষ মিথ্যায় অভ্যস্ত হইয়া আল্লার দরবারে মিথ্যাবাদী বলিয়া লিখিত হইয়া যায়।

আদর্শবান হওয়া কর্ত্তব্য

২৩৩০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লা ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্ব্বোত্তম বাণী হইল আল্লার কেতাব কোরআন শরীফ এবং সর্ব্বোত্তম আদর্শ হইল, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ।

অন্যের দুর্ব্যবহারের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্য্য অবলম্বনকারীগণকে বেহিসাব প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে।"

২৩৩১। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যাথাদায়ক দুর্ব্যবহারের উপর ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ তায়ালার ন্যায় কেহ করিতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ তায়ালার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে তাহাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা পানাহার দান করেন, সুখে-সুস্থতায় রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্যের ব্যথাদানের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা ইহা মহান আল্লাহ তায়ালার গুণ। মানুষের কর্ত্তব্য এই গুণে গুণান্বিত হওয়ায় যত্নবান হওয়া।

কোন মোসলমানকে কাফের বলিবে না

২৩৩২। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার মোসলমান ভাইকে কাফের বলিলে উহার পরিণতি উভয়ের এক জনের উপর অবশ্যই বর্ত্তিবে।

২৩৩৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার মোসলমান ভাইকে কাফের বলিলে উহার পরিণতি তাহাদের উভয়ের এক জনের উপর অবশ্যই বর্ত্তিবে।

অর্থাৎ—যাহাকে কাফের বলা হইয়াছে সে যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই সেইরূপ হইয়া থাকে তবে ত কাফের শব্দ প্রয়োগকারীর কথা ঠিকই হইয়া গেল, অন্যথায় ঐরূপ বলার অতি বড় গোনাহ যে বলিয়াছে তাহার উপর পতিত হইবে।

ক্রোধ সংবরণ করা

২৩৩৪। হাদীছ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ

اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মল্ল যুদ্ধে বিজয়ী প্রকৃত বীর পুরুষ নহে, প্রকৃত বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখিতে সক্ষম হয়।

২৩৩৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমাকে কিছু নছিহত করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ক্রোধ হইতে বিরত থাক। ঐ ব্যক্তি বার বার নছিহত করার অনুরোধ করিতে ছিল হযরত (দঃ) বার বারই তাহাকে বলিতে ছিলেন—لا تغضب "ক্রোধ হইতে বিরত থাক।"

লজ্জা-শরম অবলম্বন করা

২৩৩৬। হাদীছ ঃ— এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে; একদা তিনি এই হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "লজ্জা-শরম সম্পূর্ণই কল্যাণময়।"

ইহা শুনিয়া বোশায়র ইবনে কায়াব নামক এক ব্যক্তি বলিল, দর্শন শাস্ত্রে লিখিত আছে—কোন কোন লজ্জা-শরমে মানুষের মধ্যে গাম্ভীর্য্যের গুণ সৃষ্টি হয়, কোন কোন লজ্জা-শরমে মানুষের মধ্যে ধীরস্থিরতার গুণ সৃষ্টি হয় (আবার কোন কোন লজ্জা-শরমে মানুষের মধ্যে দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়।)

এই ব্যক্তির উক্তিতে ছাহাবী এমরান (রাঃ) ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লার রসুলের কথা শুনাইতেছি, আর তুমি উহার মোকাবিলায় (মানব রচিত) দর্শন পুস্তকের কথা দেখাইতেছ ?

অর্থাৎ—আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের কথা ও উক্তি যে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে সেস্থানে উহার উপরই চূড়ান্ত মিমাংসা হইবে। অন্য কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা চলিবে না। অন্য কোন কিছু উহার বিরোধী হইলে তাহা বর্জ্জনীয় ও লজ্ঘনীয় হইবে এবং বুঝিতে হইবে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উক্তির বিরুদ্ধে যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই ভুল। যেমন আলোচ্য বিষয়ে সেই ভুলটা সহজে ধরাও যায়। কেননা লজ্জা-শরম এমন একটা গুণের নাম যাহা মানুষেন জন্য অন্যায় বা অশোভনীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বা অন্য যে কোন প্রভাবে ন্যায় ও কর্তব্য কাজে বাধা বা সৎ সাহসের অভাব সৃষ্টি হইলে তাহা লজ্জা-শরমের আওতাভুক্ত নহে, বরং উহা নিছক দূর্ব্বলতা (Inferiarify complex)।

সাধারণ প্রচলিত দৃষ্টিতে হয়ত ইহাকেও লজ্জা-শরম বলা হয় এবং সেই সূত্রেই হয়ত আলোচ্য ঘটনায় দর্শন পুস্তকের উদ্ধৃতিতে কোন কোন "লজ্জা-শরমে দূর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়" বলা হইয়াছে, কিন্তু এই দর্শনের ভিত্তি হইল প্রচলিত ভুলের উপর। আর আল্লার রসুল যাহা বলিয়াছেন তাহাই হইল সঠিক, সত্য ও বাস্তব।

২৩৩৭। হাদীছঃ— আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই তথ্যটি পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদের হইতেও বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে যে, কাহারও লজ্জা-শরম রহিত হইয়া গেলে সে প্রবৃত্তির বশে সব কিছুই করিতে পারে।

সহজ পন্থা অবলম্বন করা ও কঠিন পন্থা এড়াইয়া চলা

২৩৩৮। হাদীছঃ— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا سَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, লোকদের জন্য সহজ সরল পন্থা অবলম্বর কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন

করিও না। লোকদের মধ্যে শান্তি ও আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা কর, ঘৃনা ও অনাস্থা সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ পন্থা অবলম্বন করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—দ্বীনের প্রতি আহ্বান ও তব্‌লীগের ব্যাপারে এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম প্রয়োগ ও প্রবর্ত্তন তথা ইসলামী বিধি-নিষেধের দ্বারা শাসন পরিচালন সম্পর্কে উল্লেখিত আদেশগুলি করা হইয়াছে। তব্‌লীগের সময় দ্বীনকে লোকদের সম্মুখে এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিবে যাহাতে লোকেরা দ্বীনকে সহজ ও সরল মনে করে কঠিন বোধ না করে। তদ্রূপ ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনকালে দ্বীনের অনুশাসনগুলি লোকদের উপর যথা সাধ্য সহজ ও সরল পন্থায় প্রয়োগ করিবে, কঠিন পন্থায় নহে। দ্বীনের বিষয়গুলি লোকদিগকে বুঝাইতে এবং তাহাদের উপর উহা প্রয়োগ করিতে এরূপ পন্থা ও ব্যাবস্থা অবলম্বন করিবে যাহাতে লোকগণ দ্বীনকে শান্তির বস্তু বোধ করে, দ্বীনের প্রতি তাহাদের ঘৃনা না জন্মে।

বলা বাহুল্য, দ্বীনের হুকুম-আহকাম পূর্ণরূপে জারী করার জন্যই এই সব ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ; সুতরাং যদি এই সব নির্দ্দেশের পরিপ্রেক্ষীতে দ্বীনের হুকুম-আহ্‌কামের ছাট-কাট করা হয় তবে তাহা বোকামিই হইবে। যেমন, যদি কোন মিকচার ঔষধে তিক্ত অংশ থাকে, তবে শিশু রোগীকে উহা সহজে খাওয়াইবার জন্য নানারূপের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, কিন্তু সহজ করার জন্য তিক্ত অংশকে বাদ দেওয়া হয় না।

দ্বীনের হুকুম পালন করা আবশ্যক, কিন্তু উহা পালন করাইতে সহজ পন্থা ছাড়িয়া কঠিন পন্থা অবলম্বন করা এবং সেই কঠিন পন্থা লোকদের উপর চাপাইয়া দেওয়া মোটেই সমীচীন নহে। ইহাই উল্লেখিত হাদীছের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য। উহারই একটি নজীর নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

২৩৩৯। হাদীছ ঃ—আযরাক ইবনে কায়েছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা একটি শুষ্ক খালের কিনারায় নামায পড়িতে ছিলাম। ঐ সময় ছাহাবী আবু বরযা (রাঃ) একটি ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া তথায় পৌছিলেন এবং ঘোড়াটি রাখিয়া তিনিও নামাযে শরীক হইলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার ঘোড়াটি ছুটিয়া দুরে চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নামায ছাড়িয়া ঘোড়ার পিছনে ছুঠিলেন এবং উহাকে ধরিয়া আনিলেন। অতঃপর পুনরায় নামায পড়িয়া নিলেন।

আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। সে ছাহাবী আবু বরযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, ঐ বৃদ্ধ মিঞাকে দেখ—তিনি ঘোড়ার জন্য নামায ছাড়িয়া দিয়াছেন। আবু বরযা (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হযরত রসুলুল্লা (দঃ) দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেহ আমাকে কোন বিষয়ে মালামত করে নাই। (উপস্থিত ঘটনার কটাক্ষকারী অযথা কঠোরতার দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিয়াছে।) আমার বাড়ী অনেক দূরে ; আমি নামায

ভঙ্গ না করিলে আমার ঘোড়া আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইত। ফলে আমি সারা রাত্রেও বাড়ী পৌছিতে সক্ষম হইতাম না। অতঃপর আবু বরযা (রাঃ) উল্লেখ করিলেন, তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহবতে ও সাহচর্য্যে রহিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) দ্বীনের ব্যাপারে সরল ও সহজ পন্থা অবলম্বনের কত বেশী পক্ষপাতি ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—নামায আদায় করা ফরজ উহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে, কিন্তু এই নামায আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতাও অবলম্বন করা যায় যে, যে কোন প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভয়-ভীতির আশঙ্কাই হউক না কেন কোন অবস্থাতেই নামায ভঙ্গ করিয়া যাওয়া যাইবে না। আবার সহজ পন্থাও অবলম্বন করা যায় যে, ক্ষয়-খতি বা পেরেশানী হইতে পারে এইরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইলে নামায ভঙ্গ করতঃ সেই কাজ সমাধা করিয়া অতঃপর পুনঃ নামায আদায় করিবে। শরীয়তের মাছআলাহ দ্বিতীয় ব্যবস্থাকেই অনুমোদন করে এবং মূল পরিচ্ছেদে বর্ণিত সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য ইহাই।

লোকদের সঙ্গে মেলামেশা রাখিবে

আবদুল্লাহ ইবনে মস্‌উদ (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকদের সঙ্গে মেলামেশা রাখিও, কিন্তু তোমার দ্বীনকে তাহাদের দ্বারা ঘায়েল হইতে দিওনা। অর্থাৎ মেলামেশা বা বন্ধুত্বের খাতিরে বা চাপে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে শরীক হইও না।

২৩৪০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেও অত্যধিক মেলামেশা রাখিতেন। এমনকি আবু ওমায়ের নামে আমার একটি ছোট ভ্রাতা ছিল; সে একটি নোগায়ের পাখী পোষিয়া রাখিয়া ছিল। একদা পাখীটি মরিয়া গেলে হযরত (দঃ) আমার ভ্রাতাকে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু ওমায়ের তোমার নোগায়ের কি হইল ?

২৩৪১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল—তাহাদের সঙ্গে আমি নেকড়ার তৈরী খেলার বউ দ্বারা খেলা-ধুলা করিতাম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলে আমার বান্ধবীগণ দৌড়িয়া পালাইত। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে খোঁজ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন; আমরা পুনঃ খেলা আরম্ভ করিতাম।

অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে

২৩৪২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি এক ছিদ্র হইতে দুইবার দংশিত হয় না।

অর্থাৎ মোমেনের জন্য হুশিয়ার হওয়া এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। একবার এক স্থানে ধোকা খাইলে পুনরায় তথায় ধোকা খাইবে না।

মেহমানকে খাতির আপ্যায়ণ করিবে

২৩৪৩। হাদীছ ঃ—ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি আমাদিগকে কোথাও কোন প্রয়োজনে পাঠাইয়া থাকেন, পথি মধ্যে আমরা কোন লোকেদের মেহমান হইতে বাধ্য হই, কিন্তু তাহারা আমাদের মেহমানদারী করে না, এরূপস্থলে আমাদিগকে কি করার পরামর্শ দেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা ঠেকায় পড়িয়া কোন লোকদের মেহমান হইলে যদি তাহারা তোমাদের মেহমানদারী করে তবে ত তাহা সাদরে গ্রহণ কর। আর যদি তাহারা তোমাদের প্রয়োজন পুরন না করে, তবে মেহমানের জন্য সাধারণভাবে যে পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণ সামগ্রী তাহাদের নিকট হইতে উসুল কর।

ব্যাখ্যা ঃ—মেহমানের খাতির আপ্যায়ণ করা যে, কতদুর জরুরী ও আবশ্যক সে সম্পর্কে "প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া" পরিচ্ছেদে দুই খানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে সেই আবশ্যকতাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উহা মেহমানের জন্য গৃহস্বামীর উপর একটি প্রাপ্য হক্‌ স্বরূপ—যাহা তাহাকে আদায় করিতেই হইবে। যদি কোন গৃহস্বামী ঐ হক্‌ আদায় না করে এবং বিদেশী মেহমান প্রাণ বাঁচাইতে লাচার হইয়া পড়ে তবে সে ঐ হক্‌ উসুল করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

অবাঞ্ছিত কাব্য বর্জ্জন করিবে; জ্ঞান ও নছিহতের কাব্য জায়েয আছে

কবিগণ সাধারণতঃ যে সব অবাঞ্ছিত কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে উহারই নিন্দা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ -

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا وَّانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

"কাব্যের পথের পথিক ভ্রষ্ট লোকগণই হইতে পারে ; দেখ না ! তাহারা কিরূপে সর্ব্বপ্রকার কল্পনার ময়দানে দুরদুরান্তের দিকে ছুটিয়া বেড়ায়। কথায় যাহা বলে কার্য্যে তাহা কিছুই করে না, অবশ্য যাহারা পাকা ইমানদার নেককার, আল্লাহকে স্মরণ রাখায় অভ্যস্ত এবং মজলুম হইয়া অপবাদের প্রতিউত্তরে কবিতা রচনা করে (তাহারা সাধারণতঃ ঐ সব নিন্দনীয় স্বভাব সমুহ এড়াইয়া চলিয়া থাকে ; তাই তাদের কাব্য জায়েয পরিগণিত হইবে।)

২৩৪৪। হাদীছ :— عن ابى ابن كعب رضى الله تعالى عنه اخبره

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمة

অর্থ—উবাই ইবনে কায়াব(রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন কাব্যে জ্ঞানের কথাও থাকে (উহা দুষনীয় নহে)।

২৩৪৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অন্ধকার যুগের "লবীদ" নামক একজন কবি যিনি পরে মোসলমানও হইয়াছিলেন তাহার কাব্যের প্রসংশা করিয়া) বলিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে বড়ই সত্য কথা বলিয়াছে লবীদ—

الا كل شئ ما خلا الله باطل — (وكل نعيم لا محالة زائل)

"নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী (এবং যত প্রকার ভোগ-বিলাসের সামগ্রীই থাকুক সবই বিদায় গ্রহণকারী।)"

হযরত (দঃ) অন্ধকার যুগের আরও একজন কবি উমাইয়্যা ইবনে ছলতের কাব্যেরও প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, তাহার কাব্য ইসলামী ভাবধারার খুবই নিকটবর্ত্তী ছিল।

২৩৪৬। হাদীছ :—ওরওয়াহ্ (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (আরবেয় কাফেররা যখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কুৎসা রটাইয়া কবিতা ছড়াইতে লাগিল তখন) ছাহাবী কবি হাচ্ছান (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উহার প্রতিউত্তরে কাফেরদের দুর্ণামে কবিতা রচনার অনুমতি চাহিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মক্কার কাফেররা আমারই বংশধর—তাহাদের দুর্ণাম করিয়া আমাকে কিরূপে বাঁচাইবে ? হাচ্ছান (রাঃ) বলিলেন, কাব্যের মধ্যে কৌশলে আপনাকে এমনভাবে দুর্ণাম হইতে বাহির করিয়া নিব যেরূপ রুটি তৈরীর আটার মধ্যে একটা চুল থাকিলে সেই চুলটিকে আটা হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, উহার গায়ে একটুও আটা জড়ান থাকে না।

ওরওয়াহ্ (রঃ) বলেন, একদা আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বসিয়া হাচ্ছান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কোন বিষয়ে মন্দ বলিতে ছিলাম।

আয়েশা (রঃ) আমাকে তাহাতে বাধা দিলেন এবং বলিলেন, হাচ্ছান (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে কাফেরদের কুৎসা রটানোর প্রতিউত্তর দানে উহা প্রতিহত করিতেন; (ইহা হাচ্ছানের একটি বিশেষ কীর্ত্তি।)

২৩৪৭। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) একদা তাঁহার ওয়াজের মধ্যে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লেখ করতঃ বলিলেন, একদা হযরত নবী (দঃ) ছাহাবী কবি আবদুল্লা ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রসংশা করিয়া বলিলেন, তোমাদের এক ভাই আছে সে কবিতার মধ্যে অশ্লীল কথা বলে না, তাহার কবিতা এই শ্রেণীর—

وَفِينَا رَسُولُ اللّٰهِ يَتْلُو كِتَابَهُ — إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ

"আমাদের মধ্যে আল্লার রসুল বিদ্যমান রহিয়াছেন যিনি অন্ধকার চিরিয়া প্রভাতের আলো ফুটিয়া বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লার কেতাব তেলাওয়াতে দাঁড়াইয়া যান (ফজরের নামাযের মধ্যে।)

أَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوبُنَا — بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٌ

"তিনি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া হেদায়েতের পথ দেখাইয়াছেন; ফলে অন্তর হইতে আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি যে, তিনি যাহা কিছু বলেন সবই বাস্তব।"

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ — إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

"মানুষের মধুর নিদ্রার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গের সময় উপস্থিত হয়—কাফেরদের শয্যা যখন তাহাদের বোঝায় ভারাক্রান্ত থাকে সেই সময় আল্লার রসুলের দেহ তাঁহার শয্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।"

২৩৪৮। হাদীছঃ— বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মদীনায় ইহুদী গোত্র বনী-কোরায়জার নজীরহীন বিশ্বাস-ঘাতকতার বিরুদ্ধে সমর অভিযানকালে) হাচ্ছান (রাঃ)কে বলিলেন, এই বিশ্বাসঘাতক কাফেরদের দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা কর; ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল (আঃ) তোমার সাহায্যে আছেন।

আল্লার জেকের, এলম শিক্ষা, কোরআন তেলাওত ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া কবিতায় মগ্ন হইবে না

২৩৪৯। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنْ يَّمْتَلِىَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ

قَيْحًا خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِىَ شِعْرًا

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও অভ্যন্তর কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা পূঁজে পরিপূর্ণ হওয়া উত্তম।

২৩৫০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّمْتَلِىَ جَوْفُ الرَّجُلِ

قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهٗ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِىَ شِعْرًا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও অভ্যন্তর পূঁজে পরিপূর্ণ হইয়া পঁচিয়া যাউক ইহাও কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

আল্লার মহব্বতে অপরকে মহব্বৎ করা

২৩৫১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি লোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি নেককার শ্রেণীর লোকদেরে ভালবাসে, কিন্তু আমলের দিক দিয়া সে ব্যক্তি ঐ লোকদের সম শ্রেণীর হইতে পারে নাই—এরূপ ব্যাক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

"তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন—اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ "কোন ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোকদেরকে ভালবাসিবে কেয়ামতের দিন সে তাহাদের সঙ্গী হইবে।"

২৩৫২। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল—ঐরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে যে নেককার শ্রেণীর লোকদেরে ভালবাসে, কিন্তু আমলের দিক দিয়া সে তাহাদের সম শ্রেণীর হইতে পারে নাই। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, (কেয়ামতের দিন) মানুষ ঐ শ্রেণীর লোকদের দলভুক্ত হইবে যে শ্রেণীর লোককে সে ভালবাসে।

২৩৫৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেয়ামত কবে আসিবে? হযরত (দঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি করিয়াছ? উত্তরে লোকটি আরজ করিল—অধিক নামায, রোযা, দান-খয়রাতের দ্বারা কেয়ামতের জন্য প্রস্তুতি করিতে পারি নাই, কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের মহব্বৎকে মজবুতরূপে আঁকড়াইয়া আছি। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহাদেরকে ভালবাস পরকালে তুমি তাহাদেরই দলভুক্ত হইবে।

আনাছ (রাঃ) বলেন, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের জন্যও কি এই নিয়ম? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তোমরাও তদ্রূপই। আমরা এই কথা শুনিতে পাইয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলাম।

আনাছ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত (দঃ) মুল জিজ্ঞাসা— কেয়ামত কবে আসিবে এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিলেন যে, ছাহাবী মুগিরা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ছেলে—আমার সম বয়স্ক বালক নিকট দিয়া যাইতে ছিল। তাহার প্রতি ইশারা করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, এই বালকটি বাঁচিয়া থাকিলে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই (তোমাদের) কেয়ামত আসিয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ভালবাসা সম্পর্কে যে নিয়ম এই হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে তাহা ছাহাবীদের জন্য অত্যধিক আনন্দের কারণ হইয়াছিল; যেহেতু ছাহাবীদের মহব্বৎ ছিল আল্লার রসুলের সঙ্গে। তদ্রূপ ছাহাবা, তাবেয়ীন তাবে-তাবেয়ীন প্রভৃতি নেককার শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে যাহাদের ভালবাসা থাকিবে তাহাদের জন্যও এই হাদীছের তথ্যটি আনন্দের বস্তু। পক্ষান্তরে যাহারা ইসলামের দাবীদার হইয়া ইহুদ-নাছারা শ্রেণীর লোকদের প্রতি ভালবাসা রাখিবে তাহাদের জন্য এই তথ্য ভয়াবহও বটে।

কেয়ামত কায়েম হওয়া সম্পর্কে যে তথ্য হযরত (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন উহার ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তাহার মৃত্যু হইতেই কেয়ামত কায়েম হইয়া যায়। সেমতে আলোচ্য হাদীছের মুল প্রশ্নকারী ব্যক্তির বয়স এবং উপস্থিত লোকদের বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত (দঃ) একটি বালকের সঙ্গে তুলনা করতঃ বলিলেন, এই বালকটি বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তোমাদের কেয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। কারণ, এই বালকটির বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান বয়স্কদের মৃত্যু অবধারিত।

কথাবার্ত্তায় অশুভ বাক্য ব্যবহার করিবে না

অন্যের প্রতি দূরের কথা, নিজের বেলায়ও অশুভ অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই।

২৩৫৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এইরূপ বলিবে না যে, আমার

মন-মেজাজ খবিস হইয়া গিয়াছে। হাঁ—(মন-মেজাজ ভাল না লাগিলে) এইরূপ বলিবে যে, আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

কাল, যুগ বা সময়কে গালি দিবে না

২৩৫৫। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান যুগ ও সময়কে গালি দেয়। অথচ সময়ে ও যুগে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা আমিই ঘটাইয়া থাকি। (সুতরাং কাহারও উপর কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে সে যদি উহার জন্য সময়কে গালি দেয় তবে সেই গালি আমার উপর পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন সময় আমারই সৃষ্ট—) দিবা রাত্রির গমনাগমন আমারই কুদরতে হয় (এবং ইহারই নাম সময়।)

খারাব জিনিসকে ভাল নামের আখ্যা দিবে না

ঘৃণার যোগ্য খারাব জিনিষের উপর ভাল আখ্যা প্রয়োগ করা হইলে সমাজের মধ্যে ঐ জিনিষের প্রতি ঘৃণা থাকে না, ফলে মানুষ উহাতে লিপ্ত হয় এবং উহাকে খারাবও মনে করে না—ইহা অতি ভয়ঙ্কর; হালাল-হারামের ক্ষেত্রে এইরূপ হইলে ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। যথা—অধুনা সূদকে ইন্টারেষ্ট বা "লাভ" বলা হয়। তদ্রূপ লটারি জাতীয় জুয়াকে "পুরস্কার" বলা হয়। ইহা অতিশয় ভয়ঙ্কর; সূদ এবং জুয়া অকাট্য হারাম—পবিত্র কোরআনে উহাকে হারাম ঘোষনা করা হইয়াছে। এই হারাম বস্তুদ্বয়কে "লাভ" ও "পুরস্কার" আখ্যা দেওয়ায় ইহার প্রতি মোসলমান সমাজেরও ঘৃণা থাকে না। এমনকি উক্ত আখ্যার কারণে ইহা যে, হারাম তাহাও ধ্যান-ধারণায় থাকে না। অথচ হারামকে হালাল গণ্য করিলে ঈমান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়।

অন্ধকার যুগে কাফেররা "মদ" কে অতিশয় ভালবাসিত এবং ভালবাসার প্রতীক-রূপে মদকে এবং মদের মূল উৎস আঙ্গুরকে "করম" নামে আখ্যায়িত করিত। "করম" শব্দের অর্থ "সম্মানে বিজয়ী"; এই আখ্যার দ্বারা মদের সুনাম সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং উহার প্রতি ঘৃণা থাকে না। তাই ইসলামে মদকে হারাম করা হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) মদের জন্য ঐ নামের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়া দিলেন। আদর্শ জাতি গঠনে লক্ষ্য কত সূক্ষ্ম রাখিতে হয়!

২৩৫৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মোসলমানগণ! তোমরা আঙ্গুরকে (এবং আঙ্গুরের রসে তৈরী মদকে) "কর্‌ম" নামের আখ্যা দিও না। লোকেরা উহাকে "কর্‌ম" বলে, কিন্তু (এই ঘৃণিত হারাম বস্তু এই উত্তম নামের যোগ্য নহে। বস্তুতঃ) এই নামের যোগ্য মোমেনের দেল (যাহা ঈমান রত্নের পাত্র)।

আর (কোন কারণে উদ্‌বিগ্ন হইয়া) যুগ বা যমানা ধ্বংস হউক—এরূপ বলিও না। কারণ, যুগ বা যমানায় যাহা কিছু ঘটে তাহা এক মাত্র আল্লাহ তায়ালাই ঘটাইয়া থাকেন।

ভাল অর্থের নাম রাখিবে

২৩৫৭। হাদীছ ঃ—মোছাইয়্যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার নাম "হাযান" (যাহার অর্থ শক্ত বা কঠিন)। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার নাম "সাহ্‌ল" (যাহার অর্থ নম্র)। তিনি বলিলেন, আমার বাবা আমার যে নাম রাখিয়াছেন সেই নাম আমি পরিবর্ত্তন করিতে চাই না। মোছাইয়্যেব-পুত্র সায়ীদ (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত নামের পরিণামে আমাদের সকলের মধ্যে কাঠিন্য রহিয়াছে।

নাম পরিবর্ত্তন করা

২৩৫৮। হাদীছ ঃ—আবু ওসাইদ (রাঃ) তাঁহার শিশু পুত্রকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে উপস্থিত করিয়া হযরতের উরুর উপর রাখিলেন। হযরত (দঃ) শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে নাম বলা হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, বরং তাহার নাম "মোনজের" রাখ। সেই দিন হইতে তাহার নাম মোনজের হইয়া গেল।

২৩৫৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি মেয়ের নাম ছিল "বার্‌রাহ" (যাহার অর্থ গোনাহ হইতে পাক পবিত্র)। লোকেরা বলিত, সে উক্ত নামের দ্বারা নিজের গর্ব প্রকাশ করে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "যয়নব" রাখিলেন (যাহার অর্থ মোটা-তাজা)।

নবীগণের নামে নাম রাখা

২৩৬০। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার একটি ছেলে হইল, আমি তাহাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলাম। নবী (দঃ) তাহার নাম রাখিলেন ইব্রাহীম এবং খুরমা চিবাইয়া তাহার মুখে দিলেন, তাহার মঙ্গলের জন্য দোয়াও করিলেন।

খারাব নাম

২৩৬১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে (হিসাব নিকাশের সময়) আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ ব্যাক্তির নাম নাপছন্দ গণ্য হইবে যে ব্যক্তি "রাজাধিরাজ" নাম অবলম্বন করে।

ব্যাখ্যা ঃ—"সকল বাদশার বাদশাহ" বস্তুতঃ এই আখ্যার যোগ্য একমাত্র মহান আল্লাহ। এইরূপ আখ্যা যে ব্যক্তি নিজে অবলম্বন করে নিশ্চয় সে অতি বড় অহঙ্কারী, তাই সে আল্লাহ তায়ালার কোপের পাত্র।

বৃথা ঢিল ছোড়িবে না

২৩৬২। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বৃথা ঢিল ছোড়িতে দেখিয়া নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বৃথা ঢিল ছোড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা শিকার করা বা শত্রুকে ঘায়েল করা যায় না; অথচ অনেক ক্ষেত্রে কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে বা চোখে আঘাত লাগায়।

অতঃপর আবহুল্লাহ (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকেই আর একদিন ঢিল ছোড়িতে দেখিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে হাদীছ শুনাইলাম যে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঢিল ছোড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, ; আর তুমি ঢিল ছোড়িয়া থাক। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলিব না।

হাঁছিদাতা আল্‌হাম্‌ছু লিল্লাহ বলিবে

২৩৬৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে ছুই ব্যক্তি হাঁছি প্রদান করিল। হযরত (দঃ) তন্মধ্যে একজনের জন্য "ইয়ারহামু-কাল্লাহ্‌—আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজিল করুন" বলিয়া দোয়া করিলেন, অপর জনের জন্য তাহা করিলেন না। হযরতের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ ব্যক্তি "আলাহাম্‌ছু লিল্লাহ" বলিয়াছে (তাই তাহাকে দোয়া করিয়াছি) আর এই ব্যক্তি তাহা বলে নাই।

হাই দেওয়া ভাল নয়

২৩৬৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ

التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُشَمِّتَهُ

وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِذَا

قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা (বন্দাদের পক্ষে) হাঁছি দেওয়াকে পছন্দ করেন এবং হাই দেওয়াকে নাপছন্দ করেন। হাঁছিদাতা আলহাম্‌দু লিল্লাহু বলিলে যে কোন মোসলমান তাহা শুনিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে সেই হাঁছিদাতাকে "ইয়ারহামু কাল্লাহ" বলিয়া দোয়া করা। পক্ষান্তরে হাই দিতে দেখিলে শয়তান সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং হাই আসিতে চাহিলে যথা সাধ্য উহার প্রতিরোধ করিবে। হাই আসার সঙ্গে মুখ বড়রূপে খুলিয়া হা......করিয়া আওয়াজ করিলে তাহাতে শয়তান আদম-সন্তানের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—হাঁছি মানুষের মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, শরীরের মধ্যে স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে ; ইহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা উহাকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই জড়তা ও অলসতার পরিচয় যাহা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই আল্লাহ তায়ালা উহাকে নাপছন্দ করেন, আর শয়তান উহাতে সন্তুষ্ট হয়।

হাঁছি দাতার সঙ্গে দোয়ার আদান প্রদান

২৩৬৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ হাঁছি দিলে তাহার কর্ত্তব্য হইবে "আলহাম্‌দু লিল্লাহ" বলা এবং অপর মোসলমান ভাই-এর কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে "ইয়ারহামু কাল্লাহ—আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজেল করুন" বলিয়া দোয়া করা। এই দোয়ার উত্তরে হাঁছিদাতা তাহার জন্য দোয়া করিবে—ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছলেহ্‌ বালাকুম —আল্লাহ তোমাকে সৎপথের পথিক করুন এবং সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি দান করুন।

কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا - ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে প্রবেশ করিও না যাবৎ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং প্রথমে গৃহবাসীকে সালাম কর। এই ব্যবস্থা তোমাদের জন্য উত্তম; তোমাদের উচিৎ এই ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।" (১৮ পারা ৯ রুকু)

সালাম দানের নিয়ম

২৩৬৬। হাদীছ:— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পায়ে হাটিয়া যাইতেছে তাহাকে সালাম করিবে যে যান-বাহনের আরোহী। এবং যে ব্যক্তি বসিয়া আছে তাহাকে সালাম করিবে যে হাটিয়া যাইতেছে। আর ছোট দল সালাম করিবে বড় দলকে।

২৩৬৭। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছোট বড়কে সালাম করিবে। পথচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম করিবে এবং ছোট দল বড় দলকে সালাম করিবে।

ব্যাখ্যা:—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে সালাম প্রাপ্তির সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে। এই নিয়মের বিপরীত—সালাম পাওয়ার হক্‌দার ব্যক্তি যদি প্রথমে সালাম দেয় তবে উহা তাহার জন্য অধিক সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

নারীদের জন্য পর্দা ব্যবস্থা

পর্দা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য শক্তি ব্যয় করা অবান্তর। কারণ পাক-পবিত্র, শান্তি ও শৃঙ্খলাময় সমাজ গঠনে পর্দা ব্যবস্থার সুফল, বরং প্রয়োজন জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। এমনকি ইসলামের প্রভাবে এই সুব্যবস্থা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যেই ইউরোপবাসী এই ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিবার যুক্তি ও প্রেরণা মোসলমানদের মধ্যে রপ্তানী করিয়া ছিল তাহাদেরও কোন কোন সুস্থ মস্তিষ্ক

সম্পন্ন ব্যক্তি পর্দ্দা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ঐ ইউরোপবাসীদের শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশীয় অনেকে নিজেদের ছেলে-মেয়ে ও পরিবারবর্গের মধ্যে পর্দ্দাহীনতায় সৃষ্ট শত শত লজ্জা ও অপমানের ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও যদি পর্দ্দার যৌক্তিকতা উপলব্ধি না করে তবে তাহাদেরই দুর্ভাগ্য।

যাহাদের যুক্তি ও আইনে অবিবাহিত যুবক যুবতির অবৈধরূপে হইলেও স্বীয় যৌন পিপাসা নিবারণ করা এবং যে কোন নারীর সম্মতির সহিত তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করা অপরাধ নহে তাহাদের হইতে পর্দ্দা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধির আশা করা অবান্তর। সুতরাং যুক্তি তর্কের পথে না যাইয়া এস্থলে শুধু আল্লার আইন এবং রসুলের আদর্শের ভিত্তিতেই পর্দ্দা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হইবে।

পর্দ্দা ব্যবহার বিরুদ্ধবাদীদের দৌরাত্ম্য এতই অধিক যে, তাহাদের মুখে অনেক সময় এইরূপ দাবীও শুনা যায় যে, কোরআন-হাদীছে পর্দ্দা-বিধানের অস্তিত্ব নাই। এইরূপ মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদেই ইমাম বোখারী (রঃ) এই আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদটিকে "পর্দ্দা ব্যবস্থার আয়াত" শিরনামা দিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ইহা দ্বারা দেখাইতে চাহেন যে, কোরআন শরীফে সুদীর্ঘ একখানা আয়াত রহিয়াছে যাহাকে আয়াতে-হেজাব বা পর্দ্দা-বিধানের আয়াত বলা হয়। অর্থাৎ ঐ আয়াতখানা নাযেলই হইয়া ছিল পর্দ্দার বিধান প্রবর্ত্তনের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ الْحِجَابِ - ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"হে মোমেনগণ! নবীর গৃহে তোমরা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিও না। অবশ্য খানার দাওয়াত (ইত্যাদি) উপলক্ষে অনুমতি প্রাপ্তে প্রবেশ করিতে পার, কিন্তু এমন ভাবে নয় যে, খানা তৈয়ার হওয়ার পূর্ব্বেই অপেক্ষমানরূপে যাইয়া বসিয়া থাক। হাঁ—খানার প্রতি আহ্বান পাইলে পর গৃহে প্রবেশ করিও। অতঃপর খানা খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তথা হইতে চলিয়া আসিও; তথায় কথা বার্ত্তায় লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিও না। ঐ সবের দ্বারা নবী (দঃ) বিব্রত ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তোমাদের সঙ্গে লজ্জা বোধে কিছু বলেন না। (নবী (দঃ) ত নিজ সম্পর্কীয় ব্যাপার হওয়ায় এখানে কিছু বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন,) কিন্তু হক্ কথা বলিয়া দিতে আল্লাহ তায়ালা কোন দ্বিধা বোধ করেন না, তাই তিনি পরিস্কার বলিয়া দিলেন।

আর এখন হইতে নবীর বিবিগণের (সম্মুখে যাওয়া বা বিনা প্রয়োজনে কথা বলা ত দূরের কথা, তাঁহাদের) নিকট কোন আবশ্যকীয় বস্তু চাহিতে হইলেও পর্দ্দার

আড়াল হইতে চাহিবা। নারী ও পুরুষের মন পাক-সাফ থাকার পক্ষে এই ব্যবস্থাই অধিক কার্য্যকরী।" (২২ পারা ৪ রুকু)

এই আয়াতকে ছাহাবীগণের যুগ হইতেই "আয়াতে-হেজাব" বা পর্দ্দা-বিধানের আয়াত বলা হইয়া থাকে। ওমর (রাঃ), আনাছ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ এই আয়াতকে আয়াতে-হেজাব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত ঘটনায় ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঐরূপ উক্তিটি রহিয়াছে।

পর্দ্দার বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়ার পুর্ব্বে হযরতের বিবি—উম্মুল মোমেনীনগণ লোক সমাবেশেও হযরতের দরবারে যাতায়াত করিয়া থাকিতেন। সেই সম্পর্কে একদা ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার দরবারে ভাল-মন্দ সব রকম মানুষই আসিয়া থাকে, অতএব উম্মুল-মোমেনীনগণকে পর্দ্দায় থাকার নির্দ্দেশ দিলে ভাল হইত। ইতি মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা আয়াতে-হেজাব (পর্দ্দার বিধান প্রবর্ত্তনকারী উক্ত আয়াত) নাযেল করিলেন।

২৩৬৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদিনায় পৌঁছিলেন তখন আমার বয়স দশ বৎসর। হযরতের মদিনায় অতিবাহিত জীবনকাল—সুদীর্ঘ দশ বৎসর একাধারে আমি তাঁহার খেদমত করিয়াছি। আয়াতে-হেজাব বা পর্দ্দা-বিধানের আয়াত আমার সম্মুখেই নাযেল হইয়াছে; আমি উহা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছি। এই জন্যই উবাই-ইবনে কায়া'বের ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী উহা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

উম্মুল-মোমেনীন যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহ-জীবন আরম্ভ করার প্রথম দিনই এই আয়াতটি নাযেল হয়। উম্মুল-মোমেনীন যয়নবের সঙ্গে হযরত নবী (দঃ) প্রথম রাত্রি উদযাপন করিয়া সেই উপলক্ষে সকাল বেলা লোক দিগকে দাওয়াত করিলেন। লোকজন দাওয়াতে উপস্থিত হইল। (সে কালে পর্দ্দার বিধান ছিল না, তাই নব বধু যয়নব (রাঃ) যে গৃহে ছিলেন তথায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই খানা-পিনার জমাত করা হইয়া ছিল। খানা-পিনা শেষে সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু দুই-তিন জন লোক তাহারা তথায় কথাবার্ত্তার আসর জমাইয়া বসিয়া রহিল। (ঐ সময় হযরতের অভিপ্রায় এই ছিল যে, লোকজন সকলে তথা হইতে চলিয়া গেলে তথায় যয়নব (রাঃ)ও নিরবে থাকিবেন এবং হযরতও কাজের অবসরে একটু আরাম করিবেন, কিন্তু ঐ দুই-তিন জন লোক তথায় বসিয়া থাকায় তাহা সম্ভব হইতে ছিল না। (স্বয়ং হযরত তাহাদিগকে গৃহ ত্যাগ করিতে বলিবেন ইহাতেও হযরত (দঃ) লজ্জা

বোধ করিতে ছিলেন। তাই) হযরত (দঃ) নিজেই তথা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম যেন ঐ লোকগণও বাহির হইয়া যায়। এই অবসরে হযরত (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া সালাম-কালামের আদান প্রদান করিলেন। অতঃপর ভাবিলেন, যয়নবের গৃহের ঐ লোকগণ হয়ত তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া হযরত (দঃ) যয়নবের গৃহের দিকে ফিরিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে আছি, কিন্তু দেখা গেল ঐ লোকগণ এখনও তথায়ই বসা রহিয়াছে। তাই হযরত (দঃ) গৃহে প্রবেশ না করিয়া পুনরায় আয়শার গৃহে চলিয়া আসিলেন, আমিও হযরতের সহিত চলিয়া আসিলাম। আবার হযরত (দঃ) ঐ লোকগণ চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া যয়নবের গৃহের দিকে আসিলেন আমিও হযরতের সঙ্গে আসিলাম। এইবার দেখা গেল, বাস্তবিকই তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তখন হযরত (দঃ) বিবি যয়নবের গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পেছনে গৃহে প্রবেশের জন্য উদ্যত হইয়া আছি। হযরতের এক পা গৃহ দ্বারের ভিতরে আর এক পা বাহিরে এমতাবস্থায় (অকস্মাৎ) হযরত (দঃ) আমার ও তাঁহার মধ্যে পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন। (আমি গৃহে প্রবেশ করা হইতে বিরত রহিলাম) এবং জানা গেল পর্দ্দা-বিধানের আয়াত নাযেল হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে যে আয়াতের কথা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখিত আয়াতখানাই—যাহা ২২ পারা ছুরা আহযাবের ৭ রুকুতে রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ আয়াতখানার মধ্যে একটি বিশেষ আদেশে সুস্পষ্টরূপে "حجاب হেজাব" তথা "পর্দ্দার বিধান" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, নবীর স্ত্রীগণ যাঁহাদেরকে উম্মুল-মোমেনীন বা সমস্ত মোমেনগণের মাতা গণ্য করা ও বলা হইয়া থাকে তাঁদের বেলায়ও পর্দ্দা-বিধান মান্য করিয়া চলিতে হইবে। এমনকি "তাঁহাদের নিকট কোন প্রয়োজনের বস্তু চাহিতে হইলে পর্দ্দার আড়াল হইতে চাহিতে হইবে।" আদেশটির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই আদেশের অতি সহজ ও সরল এবং স্বাভাবিক একটি যুক্তিও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ذلك اطهر لقلوبكم و قلوبهن "এই ব্যবস্থা তোমাদের অন্তর এবং তাঁহাদের অন্তর উভয়ের অন্তরের পাক-পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।" এই কথাটির দ্বারা দুইটি অতি জরুরী বিষয়ের সুরাহা হইয়া যায়।

প্রথমটি এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রীগণের অন্তরের পবিত্রতা এবং তাহাদের প্রতি দৃষ্টিকারীর অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যদি পর্দ্দা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তবে অন্যান্য নারীগণের পক্ষে পবিত্রতা রক্ষার জন্য পর্দ্দা-ব্যবস্থার হাজার, বরং লক্ষ গুণ অধিক প্রয়োজন হইবে না কি? সুতরাং এই

আয়াতের দ্বারা সাধারণভাবে নারী সমাজের জন্য পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশ প্রমাণিত হওয়া তদ্রূপই যেরূপ—فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما "মাতা-পিতার প্রতি কটু বাক্য বা ধমক ও তিরস্কার প্রয়োগ করিবে না।" এই আয়াতের দ্বারাই মাতা-পিতাকে গালি না দেওয়ার ও তাঁহাদেরকে মার-পিট না করার আবশ্যকতা কটু বাক্য ও তিরস্কার প্রয়োগ না করার আবশ্যকতা অপেক্ষা লক্ষ গুণ বেশী প্রমাণিত হয়।

কোরআন-হাদীছ দ্বারা এইরূপে কোন আদেশ প্রমাণিত হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় دلالة النص "দালালাতুন্-নছ্" বলা হয়। এইরূপে প্রমাণিত আদেশ সরাসরি স্পষ্টরূপে উল্লেখিত আদেশের তুলনায় অধিক কঠোর হইয়া থাকে। যেরূপ মাতা-পিতার প্রতি কটু বাক্য ও তিরস্কার প্রয়োগ না করার আদেশ অপেক্ষা গালি-গালাজ ও মার-পিট না করার আদেশ অধিক কঠোর। তদ্রূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রীগণ সম্পর্কে পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশ অপেক্ষা সমস্ত নারী সমাজের পক্ষে পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশ অধিক কঠোর হইবে।

দ্বিতীয়টি এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই পর্দ্দা-ব্যবস্থা শিথিল বা পরিত্যাগ করার সমালোচনার উত্তরে মনের স্বচ্ছতা ও অন্তরের পবিত্রতার উল্লেখ করিতে শুনা যায়। এই আয়াতের নির্দ্দেশ হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। এস্থলে এক দিকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ যাঁহাদের পবিত্রতা সম্পর্কে কোন মোসলমানের সংশয় থাকা সম্ভব নহে এবং পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট বয়ান وازواجه امهاتهم অনুযায়ী তাঁহারা হইতেছেন সকল মোসলমানের মা। অপর দিকে ছাহাবীগণ যাঁহাদের পবিত্রতাও তদ্রূপই। এরূপ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা পর্দ্দা-ব্যবস্থা পালনের আদেশ করিয়াছেন।

সরাসরি মোসলেম সমাজকে লক্ষ্য করতঃ পর্দ্দার আদেশ না করিয়া আল্লাহ তায়ালা যে, প্রত্যক্ষ ভাবে রসুলের বিবিগণ এবং ছাহাবীদের মধ্যে পর্দ্দা-ব্যবস্থা পালনের আদেশ করা পূর্ব্বক মোসলেম সমাজকে পরোক্ষ ভাবে উহার আদিষ্ট করিয়াছেন—এই নীতি অবলম্বনের বিশেষ তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, কেহ যেন পর্দ্দা-ব্যবস্থা এড়াইবার জন্য মনের স্বচ্ছতা এবং অন্তরের পবিত্রতার বুলি আওড়াইতে অবকাশই না পায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত আয়াতের দুই রুকু পূর্ব্বে নারী সমাজের জন্য পর্দ্দায় থাকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আদেশ সম্বলিত আরও এক খানা আয়াত রহিয়াছে—

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ...... اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ।

"হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা নিজ নিজ ঘরের ভিতরেই থাকিবে, পূর্ব্বেকার অন্ধকার যুগে নারীগণ যেরূপে প্রকাশ্যে বেড়াইয়া থাকিত তোমরা ঐরূপ বেড়াইবে না। আর নামায আদায়ে তৎপর থাকিবে, যাকাৎ দানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং আল্লার রসুলের ফরমাবরদারী করিয়া চলিবে। হে নবীর গৃহিনীগণ! আল্লার ইচ্ছা তোমাদিগকে অপবিত্রতা হইতে দুরে রাখা এবং পূর্ণ পাক পবিত্র রাখা।"

এই আয়াতেও প্রত্যক্ষে হযরতের বিবিগণকে সম্বোধন করিয়া আদেশ করতঃ পরোক্ষে মোসলেম সমাজের সকল নারীগণ সম্পর্কে এই সকল আদেশ-নিষেধের কঠোরতাই আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করিয়াছেন। নামায ও যাকাতের আদেশ যেরূপ সকলের জন্যই রহিয়াছে এবং অন্ধকার যুগে নারীদের বে-পর্দ্দা ভাবে প্রকাশ্যে চলা-ফেরা মোসলেম সমাজের কোন নারীর জন্যই জায়েয হইতে পারে না, নতুবা উহাকে পূর্ব্বেকার অন্ধকার যুগের কার্য্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত না; সুতরাং ইহা প্রত্যেক মোসলেম নারীর জন্যই নিষিদ্ধ। তদ্রূপ নিজ নিজ ঘরে থাকার আদেশও সকল নারীদের পক্ষেই প্রযোয্য। তদুপরি এই আয়াতেও সেই পাক-পবিত্রতার কথা বলা হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণকে পাক-পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে ঘরে থাকার আদেশ করা হইলে অন্যান্য নারীদের পক্ষে সেই আদেশ অবশ্যই অধিক কঠোর ভাবে প্রযোয্য হইবে।

নারীদের জন্য পর্দ্দা-ব্যবস্থার আদেশের আরও একটু বিস্তারিত বিবরণ ১৮ পারা—ছুরা নূর ৪ রুকুতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ........

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"হে রসুল! আপনি মোমেন পুরুষদেরে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত রাখে (বেগানা মহিলা দেখার প্রবণতায় দৃষ্টিকে বিচরণ করিতে না দেয়) এবং স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে হেফাজত করে (ব্যভিচারে লিপ্ত না করে।) মোমেন মহিলাগণকেও বলিয়া দিন, তাহারাও যেন স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত রাখে (বেগানা পুরুষ দেখার প্রবণতায় দৃষ্টিকে বিচরণ করিতে না দেয়) এবং স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে হেফাজত করে (ব্যভিচারে লিপ্ত না করে।) আর মহিলাগণ তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারিবে না। (নারীর দৈহিক সৌষ্ঠব হইল সৃষ্টিগত সৌন্দর্য্য যাহার প্রতি স্বভাবতঃ পুরুষের আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে, আর তাহার সাজ-সজ্জা হইল উপার্জিত সৌন্দর্য্য—উভয় প্রকার সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করিতে পারিবে না।) অবশ্য যতটুকু সৌন্দর্য্য (আকস্মিক বা বাধ্যগতরূপে) প্রকাশ পায়; (উহাকে

গোনাহের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে)। এতদ্ভিন্ন মহিলাগণ অবশ্যই তাহাদের ওড়না ঝুলাইয়া রাখিবে স্বীয় বক্ষের উপর। (বক্ষ জামায় আবৃত থাকা সত্ত্বেও উহার উপর ওড়নার উভয় দিক ঝুলাইয়া দিয়া উহার উপর অধিক আবরণ সৃষ্টি করিবে।)

আর মহিলাগণ কোন মানুষের সম্মুখেই তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে না। শুধু মাত্র স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজের সন্তান, স্বামীর সন্তান, ভ্রাতা, ভ্রাতার সন্তান-সন্ততি, ভগ্নির সন্তান-সন্ততি, নিজের মহিলাবর্গ, ক্রীতদাসী, হুস-জ্ঞান ও অনুভূতির অভাবে নারীদের প্রতি আকর্ষণ বিহীন পুরুষ যাহারা পরের গৃহভৃত্যরূপেই জীবন-যাপন করিয়া থাকে এবং ঐ সকল বালক যাহারা এখনও নারীদের গোপন লালিত্যের কোন খোঁজ বা অনুভূতিই রাখে না—এই সকল লোকদের হইতে সৌন্দর্য্য লুকাইবার প্রয়োজন নাই।" দাদা, নানা ও চাচা পিতার শ্রেণীতে শামিল এবং মামু ভ্রাতার ন্যায় এই শ্রেণীভুক্ত।

পাঠকবর্গ! الا ما ظهر منها "অবশ্য যতটুকু সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ প্রকাশ পায় উহাতে গোনাহ হইবে না" এই বাক্যটির তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ হইতে দুইটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। একটি ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট; উহাতে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশই নাই, আর একটি ব্যাখ্যা দৃষ্টে ভুল ধারণার সূত্রপাত হইয়াছে তাই উভয় ব্যাখ্যাই বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা উত্তম।

১। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) উহার উদ্দেশ্য স্থির করতঃ বলেন—

كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها وما يبدو من اسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لان هذا لا يمكنها اخفاءه

"যতটুকু সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ প্রকাশ পায়, যেমন—আরবের মহিলাগণ সাণারণতঃ (বাহিরে যাইতে হইলে) বড় একটি চাদর দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র আবৃত করিয়া নিত (যেরূপ বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে বোরকা—ইহাও একটি সাজের জিনিষ।) এতদ্ভিন্ন হাটিবার সময় পরিধেয় বস্ত্রের নিম্ন অংশ ঐ চাদরের (বা বোরকার) আবরণ মুক্ত থাকে; এই চাদর এবং পরিধেয় বস্ত্রের এই নিম্ন অংশ প্রকাশ হওয়ার দরুন নারীগণ গোনাহগার হইবে না, কারণ এতটুকু প্রকাশ না করিয়া গত্যন্তর নাই।"

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত বিবৃতি অনুযায়ী মহিলাদের চেহারা ও হাত সহ সম্পূর্ণ দেহ এবং উহার সাজ-সজ্জা পর্দ্দার অন্তরভুক্ত যাহা বেগানা (তথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত লোকগণ ব্যতিত অন্য) লোকদের হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। শুধু মাত্র বোরকা শ্রেণীর চাদর এবং

পরিধেয় বস্ত্রের নিম্ন অংশ প্রকাশ হওয়া ক্ষমার্হ। (তদ্রূপ আকস্মিক কোন কারণে—যেমন বাতাস ইত্যাদির কারণে যদি কোন সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহাও ক্ষমার্হ।) তাবেয়ী হাসান বছরী এবং মোহাম্মদ ইবনে সীরীনের মতও ইহাই। (তফছীর ইবনে কাছীর, ৩—২৮৩)

২। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফছীর এরূপ করিয়াছেন। الا ما ظهر منها "অবশ্য যে সৌন্দর্য্য সাধারণ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে" ইহার উদ্দেশ্য চেহারা ও হাতের কব্জি এবং তৎসংলগ্ন সাজ-সজ্জা।

এই ব্যাখ্যার দরুন অনেকে বলিয়া থাকে, মহিলাদের জন্য বেগানা লোক হইতে হাত-মুখ ঢাকিয়া রাখার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের এই কথা ঠিক নহে।

এস্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, পুরুষের দেহ ঢাকা সম্পর্কে শুধু একটি বিধান তাহা হইল "ছতর—নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখা।" পক্ষান্তরে মহিলাদের দেহ ঢাকা সম্পর্কে দুইটি বিধান রাহিয়াছে—একটি হইল ছতর দ্বিতীয়টি হইল হেজাব বা পর্দ্দা।

ছতরের অঙ্গ ও সীমা দর্শক ব্যতিতও আবৃত রাখা আবশ্যক, অবশ্য যদি শরীয়ত কোন প্রকার তারতম্যের অবকাশ দেয় বা স্থান বিশেষে অনুমতি দেয় তবে তাহা ভিন্ন কথা। এতদ্ভিন্ন ছতরের সীমা ও অঙ্গসমূহ আবৃত রাখা নামাযের একটি অন্যতম ফরজ; উহার কোন একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশ অনাবৃত হইলে নামায শুদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে পর্দ্দার অঙ্গ দর্শকদের হইতে আবৃত রাখা আবশ্যক, সাধারণ ভাবে আবৃত রাখা আবশ্যক নহে এবং উহা আবৃত রাখা নামাযের ফরজও পরিগণিত নহে; উহার সম্পূর্ণ টুকুও অনাবৃত হইলে নামায অশুদ্ধ হইবে না।

মহিলাদের ছতর হইল এই অঙ্গ সমূহ—(১।২) উভয় রান হাটু সহ (৩।৪) উভয় পায়ের গোছা পায়ের গিঁঠদ্বয় সহ (৫।৬) উভয় নিতম্ব (৭) জননেন্দ্রিয়, উহার আশ-পাশ সহ (৮) গুহ্য বা মলদ্বার, উহার আশ-পাশ সহ (৯।১০) পেট ও পিঠ উভয় পার্শ সহ (১২।১৩) উভয় স্তন (১৪) মাথা (১৫) চুল (১৬।১৭) উভয় কান (১৮) ঘাড় (১৯।২০) উভয় কাঁধ (২১।২২) উভয় বাহু কনুইর গিঁঠ সহ (২৩।২৪) উভয় হাত কব্জির গিঁঠ সহ। এই চব্বিশটি অঙ্গ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নারীদের ছতর। ইহার কোন একটি অঙ্গের চতুর্থাংশ নামাযের মধ্যে উন্মুক্ত হইলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গ—(১) চেহারা বা মুখমণ্ডল (২।৩) উভয় হাতের কব্জি (৪।৫) উভয় পায়ের পাতা ছতরের মধ্যে শামিল নহে; ছতর হিসাবে এই অঙ্গসমূহকে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক নহে এবং নামাযের মধ্যে এই সব উন্মুক্ত থাকিলে নামাযের ক্ষতি হইবে না।

ছতর পরিগণিত চব্বিশটি অঙ্গ নামাযের মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই সমভাবে ছতর গণ্য হইবে যাহা ঢাকিয়া রাখা ফরজ, কিন্তু আন্দর মহলে চলা-ফেরার মধ্যে ছতরের সীমানায় তারতম্য করা হইয়াছে—পেট, পিঠ এবং নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত অঙ্গ সমূহকে আবশ্যকীয় ছতর গণ্য করা হইয়াছে, আর অন্য অঙ্গগুলিকে মোস্তাহাব ছতর গণ্য করা হইয়াছে।

এই হইল নারীদের ছতর সম্পর্কীয় বিবরণ। নারীদের জন্য আর একটি সতন্ত্র বিধান রহিয়াছে হেজাব বা পর্দ্দা-ব্যবস্থা ; উহার সীমানা নারীর সম্পুর্ণ দেহ। পর্দ্দার বিধানে হাত-মুখ ইত্যাদি নারী দেহের অঙ্গ সমূহের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। হাঁ—দর্শকদের হিসাবে তারতম্য রহিয়াছে যে, মাহ্‌রম তথা যাহাদের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম তাহাদের সম্মুখে পর্দ্দা আবশ্যক নহে।* মাহ্‌রম ব্যাতীত অন্য সকল প্রকার অত্মীয় এগানা-বেগানা সকল পুরুষ হইতে পর্দ্দা করা ফরজ। মোট কথা এই যে, ছতরের বিধানে ত কতিপয় অঙ্গের তারতম্য রহিয়াছে—হাতের কব্জি, পায়ের পাতা ও চেহারা ছতরের সীমানার অন্তরভুক্ত নহে, কিন্তু পর্দ্দার বিধানে কোন অঙ্গের তারতম্য নাই, সমস্ত অঙ্গই উহার সীমানাভুক্ত। অবশ্য এখানে দর্শকের তারতম্য রহিয়াছে যে, মাহ্‌রমদের বেলায় এবং আয়াতে উল্লেখিত অন্যান্যদের বেলায় পর্দ্দার আবশ্যক নহে অন্য সকলের বেলায়ই পর্দ্দা আবশ্যক।

আলোচ্য আয়াতে নারীদের শরীর ও সজ্জাকে ঢাকিয়া রাখার কর্ত্তব্য সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ রহিয়াছে। প্রথমটি হইল—

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“নারীগণ তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে না, অবশ্য যতটুকু সাধারণতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে উহা মাফ করা হইবে।” এস্থলেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) “যতটুকু সাধারতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে” ইহার ব্যাখ্যায় উভয় হাতের কব্জি ও চেহারা উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্যান্য ইমামগণ উভয় পায়ের পাতাকেও এই সঙ্গে শামিল করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অঙ্গের তারতম্য ছতরের বিধানে আছে পর্দ্দার বিধানে নাই, সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য হইবে ছতরের বিধান—পর্দ্দার বিধান নয়।

দ্বিতীয় অংশের নিষেধাজ্ঞা হইল—

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ...

* অবশ্য স্থান বিশেষে কোন প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টির আশংকা হইলে সে স্থলে অবশ্যই বেগানা পুরুষের ন্যায় ব্যবহার রাখিতে হইবে।

"নারীগণ তাহাদের কোন সৌদর্য্য প্রকাশ করিবে না স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজ সন্তান-সন্ততি, স্বামীর সন্তান-সন্ততি, নিজের ভ্রাতা, ভ্রাতার সন্তান-সন্ততি ভগ্নির সন্তান-সন্ততি......ব্যতীত অন্য কাহারও সমক্ষে।" এই নিষেধাজ্ঞায় কোন অঙ্গের তারতম্য করা হয় নাই—সমুদয় অঙ্গ ও উহার সজ্জাকেই প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাঁ—দর্শকের তারতম্য করা হইয়াছে যে, মাহ্‌রমগণকে, স্বামীকে, নিজেদের মহিলাগণকে, নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অনুভুতি বিহিন পুরুষদেরকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরকে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দর্শকের তারতম্য পর্দ্দার বিধানে রহিয়াছে। এই বিধানে কোন অঙ্গেরই তারতম্য করা হয় নাই—কোন অঙ্গকেই বাদ দেওয়া হয় নাই, অতএব যে ক্ষেত্রে পর্দ্দার আদেশ সে ক্ষেত্রে হাত-মুখ ইত্যাদি সমুদয় অঙ্গেরই পর্দ্দা করিতে হইবে।

সার কথা এই যে—ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها এবং ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن...... উভয় নিষেধাজ্ঞাকে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) পর্দ্দা-বিধানের জন্য বলিয়াছেন, তাই তিনি "الا ظهر منها" "অবশ্য যতটুকু প্রকাশ পাইয়া থাকে" বলিয়া যে পরিমাণকে নিষেধাজ্ঞা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে উহার ব্যাখ্যায় কোন অঙ্গ উল্লেখ করেন নাই। কারণ নারীর কোন অঙ্গই পর্দ্দা-বিধান হইতে বাদ নাই, সব অঙ্গই পর্দ্দার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উহার ব্যাখ্যায় নারীদের সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করার বস্ত্র ইত্যাদিকে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটিকে ত পর্দ্দা-বিধানের জন্য নিয়াছেন, কিন্তু প্রথম নিষেধাজ্ঞাটিকে তিনি ছতর-বিধানের জন্য বলিয়াছেন; তাই তিনি "الا ما ظهر منها" দ্বারা যে পরিমাণ নিষেধাজ্ঞা হইতে বাদ পড়িয়াছে উহার ব্যাখ্যায় উভয় হাতের কব্জি এবং মুখমণ্ডলকে উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ এই সব অঙ্গ নারীদের ছতর বহির্ভুত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যাখ্যা যে, একমাত্র ছতর-বিধানের দৃষ্টিতেই হইয়াছে উহার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁহারই নিজের বর্ণনা যাহা তিনি স্বীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন। তফছীর ইবনে জরীর কেতাবে বর্ণিত আছে—

حدثنى على قال حدثنى عبد الله قال حدثنى معاوية عن على عن ابن عباس قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهر فى بيتها لمن دخل من الناس عليها

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) إلا ما ظهر منها—অবশ্য যতটুকু সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে" ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহা হইল মুখমণ্ডল, চোখের সুরমা, হাতের মেন্দি ও অঙ্গুরী। নারীগণ এই সব অঙ্গ ও উহার সজ্জা আন্দর মহলে ঐ শ্রেণীর লোকদের সম্মুখে যাহারা আন্দর মহলে যাতায়াতের অধিকারী (অর্থাৎ যাহাদের ক্ষেত্রে পর্দ্দার আদেশ নাই) তাহাদের সম্মুখে অনাবৃত রাখিতে পারে।"

এই বর্ণনায় স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হাত ও চেহারা নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত হওয়া একমাত্র আন্দর মহলের জন্য—যেখানে পর্দ্দার প্রয়োজন নাই।

পাঠকবর্গ! নারীদের দেহ ঢাকিয়া রাখা সম্পর্কে ছতর হইল আইন পর্য্যায়ের ও বিধানগত নির্দ্ধারিত সীমানা, তাই উহার ভিত্তিতে কথা বলা হইলে সেই ক্ষেত্রে কোন প্রকার আনুসাঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া শুধু আইনের দৃষ্টিতে হুকুম বয়ান করা হইবে। পক্ষান্তরে পর্দ্দার বিধান হইল পাক-পবিত্র সমাজ গঠনের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা; এই ক্ষেত্রে শুধু শুষ্ক আইনের উপর চোখ বন্ধ করিয়া রাখিলে উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না, বরং ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সুদুর প্রসারী দৃষ্টি ভঙ্গির এবং সেই দৃষ্টিতে যদি কোন আনুসাঙ্গিক সাধারণ ভাবেই জড়িত থাকে তবে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন হুকুম বয়ান করা হইবে না, বরং ঐ বিজড়িত আনুসাঙ্গিকের সহিত যে হুকুম হইতে পারে তাহাই বর্ণনা করা হইবে।

নারীদের চেহারা, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা এই অঙ্গ গুলিকে ছতরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, নতুবা সর্ব্বদা কাজে-কর্ম্মে তাহাদের পক্ষে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইত এবং নামাজ ফাছেদ হওয়াকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর হইয়া পড়িত। ঐসব অঙ্গকে ছতর বহির্ভূত রাখায় আন্দর মহলের কাজ-কর্ম্ম ও চলা-ফেরায় এবং নামাজের মধ্যে নারীদের জন্য আছানী হইয়াছে।

ফেকাহ্ শাস্ত্র আইনের শাস্ত্র, তাই সাধারণতঃ কোন কোন ফেকার কেতাবে ছতরের সীমার উপর ভিত্তি করিয়া শুধু শুষ্ক আইনের দৃষ্টিতে এইরূপ মছআলাহ লেখা হইয়াছে যে, বেগানা পুরুষও নারীর চেহারা এবং হাতের কব্জি দেখিতে পারে। এই মছআলার সুত্র ও উদ্দেশ্য ইহাই যে, যেহেতু এই সব অঙ্গ ছতরের অন্তর্ভুক্ত নহে তাই ছতর হিসাবে ইহা ঢাকিয়া রাখার আবশ্যক নাই। কিন্তু নারীদের পক্ষে দেহ ঢাকা সম্পর্কে শুধু ছতরের বিধানই নহে, তাহাদের জন্য পর্দ্দার বিধানও রহিয়াছে। কোরআন-হাদীছ শুধু শুষ্ক আইনের সমবায়ই নহে, বরং পাক-পবিত্র সমাজ গঠনের প্রতিই লক্ষ্য অধিক, তাই কোরআন-হাদীছে ছতর অপেক্ষা পর্দ্দা-বিধানের বয়ানেই অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য ফেকার কেতাবেও পর্দ্দার মছআলাহ ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে এই আকারে যে, "শাহ্ওয়াত উদিত হওয়ার আশংকা বা সম্ভাবনাও যদি থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে নারীর চেহারা সহ যে কোন অঙ্গ দেখা হারাম এবং ঐরূপ স্থলে নারীর চেহারা সহ যে কোন অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা হারাম।"

ফেকা শাস্ত্রের মুল প্রতিপাদ্য—আইনের চুল-চেড়া দৃষ্টিতে দেখা না হইলে শাহ্ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা বা সম্ভাবনাকে শর্তরূপে উল্লেখ করতঃ মছআলাহকে উহার সঙ্গে জড়িত করার আবশ্যক হয় না। বরং মূল মছআলাহই এইরূপ দাঁড়ায় যে, (১) মাহ্রম (২) কাম ভাবের অনুভূতি বিহীন পুরুষ (৩) নারীদের প্রতি আকর্ষণের খোঁজ রাখে না এরূপ বালক—এই তিন প্রকার পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন বেগানা (স্বামী নয় এরূপ) পুরুষের সম্মুখে কোন নারীর চেহারা বা কোন অঙ্গ প্রকাশ করা হারাম। কারণ "শাহ্ওয়াত" অর্থ হইল নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ বা নরের প্রতি নারীর আকর্ষণ। এই আকর্ষণ একটি স্বভাব-বস্তু, তাই সাধারণতঃ কোন পুরুষ কোন রমনীর আঁচ অনুভব করিলেই পুরুষের মনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। একবার নজরে আসিলে সেই নজরকে দীর্ঘ করার বা পুনঃ পুনঃ নজর করার লিপ্সা হয় এবং নজরে স্বাদ অনুভব হয়।

এই শাহ্ওয়াত নর-নারীর স্বভাবগত, বরং জন্মগত জিনিষ। একমাত্র মা-বোন বা তৎশ্রেণীর সৃষ্টিগত সম্পর্কধারিণী তথা যাহাদের মধ্যে বিবাহ চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঐরূপ মাহ্রামের স্থলে সেই আকর্ষণ স্বাভাবিকরূপেই স্তিমিত এবং কাম ভাবের অনুভুতি বিহীন পুরুষের মধ্যে সেই আকর্ষনের অস্তিত্বই নাই, আর বালকের মধ্যে সেই আকর্ষণ এখনও পয়দা হয় নাই। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত সকলের মধ্যেই শাহ্ওয়াত বা অন্ততঃ হঠাৎ শাহ্ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং উল্লেখিত তিন শ্রেণীর পুরুগ ব্যতীত স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষের বেলায়ই নারীদের অন্য চেহারা বা যে কোন অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা হারাম হইবে। এই হারাম হওয়ার হুকুমকে শাহ্ওয়াতের আশঙ্কা-শর্ত্তের সহিত জড়িত করার আবশ্যক নাই। কারণ, উল্লেখিত তিন শ্রেণীর পুরুষ ব্যতীত শাহ্ওয়াতের আশঙ্কা বিহীন পুরুষ আছে কোথায়? "হঠাৎ শাহ্ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা" কথাটির প্রতি ভালরূপে লক্ষ্য করিলে উক্ত দাবীর ব্যাপকতা সম্পর্কে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথম আয়াত—পর্দ্দা-বিধানের আয়াতখানা কত সুস্পষ্ট যে, ছাহাবীদের ন্যায় পবিত্রাত্মার লোকদের হইতেও মোমেনগণের মাতা—নবী-পত্নিগণকে পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে। কারণ, ছাহাবীগণ যতই পবিত্রাত্মার হউন না কেন, কিন্তু তাঁহারাও ত পুরুষ এবং পুরুষের মধ্যে

শাহ্‌ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন কতিপয় হাদীছ এস্থলে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নর-নারীর মধ্যে কত আশঙ্কাময় অবস্থা বিরাজমান। অতএব কোন বেগানা পুরুষই হঠাৎ শাহ্‌ওয়াত উদিত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত নয়। যথা—

(১) اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নারী জাতি আড়ালে থাকার বস্তু ; আড়াল হইতে নারী বাহির হইলেই শয়তান তাহার প্রতি উকি মারে।"

অর্থাৎ কোন নারী আড়াল হইতে বাহির হইলে শয়তান তৎপর হইয়া উঠে লোকদিগকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে।

(২) اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নারী শয়তানের আকৃতিতে সম্মুখে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে চলিয়া যায়।"

অর্থাৎ নারী কাহারও সম্মুখে আসিলে শয়তান তাহার নজরে ঐ নারীর আকৃতি ফুটাইয়া তোলে যেন সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর চলিয়া গেলেও শয়তান তাহার হৃদয় পটে ঐ নারীর আকৃতির রেখাপাত করিয়া রাখে।

(৩) لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمِنِّىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمُ

"হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামীর অনুপুস্থিতিতে নারীদের নিকটে যাইও না ; কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত চলা-চলের পথে চলিতে সক্ষম। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনার বেলায়ও কি শয়তান ঐরূপ সক্ষম ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার বেলায়ও সক্ষম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য শয়তানের মোকাবেলায় বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যাহার ফলে আমার উপর তাহার কোন প্রতিক্রিয়া চলে না।"

অর্থাৎ রক্ত যেরূপ মানুষের চোখে, মস্তিষ্কে এবং অন্তরে চলা-চল করিয়া থাকে শয়তানও এই সবের ভিতরে পৌঁছিতে সক্ষম। তাই যে কোন মানুষ যতই পাক-পবিত্র হউক না কেন, কিন্তু শয়তানের প্রচেষ্টায় হঠাৎ তাহার মধ্যে শাহ্‌ওয়াত উদিত হইতে পারে। শুধু নবীগণ যেহেতু নিষ্পাপ তাই তাঁহারা আল্লার বিশেষ

ব্যবস্থায় ঐ আশঙ্কা হইতে মুক্ত, কিন্তু অন্য আর কোন মানুষ তদ্রূপ নহে, সুতরাং পর্দ্দার হুকুম সর্ব্বত্রই সমান হইবে।

(৪) لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

"হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একাকী কোন নারীর সঙ্গে নরের সাক্ষাৎ হইলেই শয়তান তাহাদের তৃতীয় জন হয়।"

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে শাহ্ওয়াত বা আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে শয়তান সচেষ্ট হয়।

বোখারী (রঃ) মূল কেতাবের ৯২০ পৃষ্ঠায় দুইটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বছরীর ভ্রাতা সায়ীদ (রঃ) হাসান বছরী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমোসলেম নারীগণ (রাস্তা-ঘাটে) বক্ষ ও মাথা খুলিয়া চলাফেরা করে এমতাবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? হাসান বছরী (রঃ) বলিলেন, তোমার কর্ত্তব্য হইল, নিজের দৃষ্টিকে ফিরাইয়া রাখা—তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। তুমি আল্লাহ তায়ালার এই আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে—

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم......

"হে রসূল (দঃ)! আপনি ঈমানদার পুরুষগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে নীচু রাখে—সংযত রাখে এবং জননেন্দ্রিয়কে (ব্যভিচার হইতে) হেফাজত করিয়া রাখে। ঈমানদার মহিলাগণকেও বলিয়া দিন, তাহারাও যেন স্বীয় দৃষ্টি নীচু রাখিয়া চলে এবং ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকে।"

(২) আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:—

و يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور

"আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারী চোরা দৃষ্টিও জ্ঞাত থাকেন এবং অন্তরের মধ্যে যাহা লুক্কায়িত থাকে তাহাও জ্ঞাত থাকেন।" النظر إلى ما نهى الله عنه খেয়ানতকারী দৃষ্টির তফছীর করা হইয়াছে—আল্লাহ তায়ালা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহার প্রতি চোরা দৃষ্টি করা।

ইমাম যুহ্‌রী (রঃ) বলিয়াছেন, এখনও সাবালীকা হয় নাই, এরূপ রমণীর কোন অঙ্গ দেখিবার প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ।

অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও ঘরের ভিতর বাহির হইতে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ

২৩৬৯। হাদীছ ঃ— সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘরের ভিতর একটি ছিদ্র পথে তাকাইল। তখন হযরতের হাতে মেদ্‌রা * নামক একটি যন্ত্র ছিল যদ্বারা হযরত (দঃ) মাথা চুলকাইতে ছিলেন। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি যদি ভাবিতাম, তুমি আমার ঘরের ভিতর নজর করিবে তবে আমি এই মেদ্‌রাটি দ্বারা তোমার চোখে আঘাত করিতাম। ঘরের ভিতর নজর পড়িবে বলিয়াই ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হইয়াছে।

২৩৭০। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি (দরওয়াজার ফাঁক দিয়া) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘরের ভিতরে তাকাইল। হযরত (দঃ) একটি ছোট বর্শা হাতে লইয়া তাহার দিকে আসিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন—আমি যেন এখনও দেখিতেছি, হযরত (দঃ) সুযোগ খুঁজিতেছেন তাহার চোখে আঘাত করার জন্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জেনা

২৩৭১ হাদীছ ঃ— عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنٰى اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْ يُكَذِّبُهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম-তনয়গণ যে যতটুকু জেনার অংশে লিপ্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহা (অবশ্যই জ্ঞাত থাকিবেন, বরং পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন, এমনকি সে অনুসারে তাহা) লিখিয়া রাখিয়াছেন, (আল্লার লেখা ভুল হয় না—) যাহার পক্ষে যতটুকু লেখা আছে সে ততটুকু অবশ্যই করিয়া থাকে; (সেই অনুসারে সর্ব্ব বিষয় অগ্রিম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাহা জানেন। এমনকি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জেনার অংশগুলি এই—)

---

* কাঠের বা লোহার হাতল যাহার অগ্রভাগে চিরুনির দাঁতের ন্যায় কতিপয় দাঁত থাকে উহা দ্বারা চুলকানোর কাজ করা হয় এবং সময় সময় মাথাও আঁচড়ানো হয়।

চোখের জেনা হইল দৃষ্টি, মুখের জেনা হইল কথাবার্ত্তা, অতঃপর মনে খাহেস ও আকর্ষণ উদিত হয় (তাহা অন্তরের জেনা,) তারপর জননেন্দ্রিয় সেই খাহেস ও আকর্ষণকে কার্য্যে পরিণত করে (যাহা জেনার সর্ব্ব শেষ পর্য্যায়,) অথবা মনের খাহেস ও আকর্ষণকে সে প্রত্যাখ্যান করে। (যাহাতে জেনার চরম পর্য্যায় হইতে বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু জেনার ভূমিকা অবলম্বনে তথা দৃষ্টিপাত ইত্যাদির দরুণ গোনাহ হইবে। কারণ এই ভূমিকা কামভাবকে উত্তেজিত করিবে এবং এস্থলে বা অন্যত্র জেনার চরম পর্য্যায়ে লিপ্ত হইবে।)

পুরুষের প্রতি নারীদের দৃষ্টি করা

২৩৭২। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমার প্রতি এতদুর স্নেহ-মমতা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি যে, একদা তিনি আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা পর্দ্দা করিয়া রাখিতে ছিলেন এবং আমি ঐ হাবশী লোকদেরকে দেখিতে ছিলাম যাহারা মসজিদের ভিতর জেহাদের অস্ত্র চালনার কলাকৌশল ও ক্রীড়া দেখাইতে ছিল। ক্রীড়া দেখিয়া যাবৎ না আমি নিজে উদবেগ বোধ করিয়াছি হযরত আমার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তোমরাই অনুমান কর, তামাশা দেখার লালায়িতা কিশোরী কত দীর্ঘ সময় তামাশা দেখিলে সে উদবেগ বোধ করিতে পারে। (বোখারী শরীফ ৭৮৮ পৃষ্ঠা)

মছআলাহঃ—পুরুষের প্রতি পুরুষের জন্য যেরূপ দৃষ্টি জায়েয অর্থাৎ নাভী হইতে হাটু পর্য্যন্ত ব্যতিরেকে সমুদয় শরীরের প্রতিই দৃষ্টি করিতে পারে ; পুরুষের প্রতি নারীর জন্যও ঐরূপ দৃষ্টি জায়েয। কারণ, পুরুষের দেহ আবৃত করা সম্পর্কে একমাত্র ছতরের বিধানই রহিয়াছে পর্দ্দার-বিধান নাই। কিন্তু কোন নারী শাহ্ওয়াত বা আকর্ষণের সহিত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা হয় হারাম ; তাই সাধারণ ভাবেও পুরুষের প্রতি বিনা কারণে নারীর দৃষ্টিপাত করাকে মকরুহ বলা হইয়াছে। এ সম্পর্কে তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনাহ (রাঃ) এবং উম্মে ছালামাহ (রাঃ) বসিয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) উম্মুল-মোমেনীনদ্বয়কে পর্দ্দার আড়ালে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। উম্মে ছালামাহ (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি ত অন্ধ—আমাদিগকে দেখিতে পায় না। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা দুই জনও কি অন্ধ ? তোমরা কি তাহাকে দেখিতে পাও না ?

অবশ্য যদি বেগানা পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত সরাসরি উদ্দেশ্য না হয়, বরং নারী কোন প্রয়োজনীয় বা জায়েয বস্তু দেখিতে যাইয়া তাহার নজর পুরুষের প্রতি পড়ে তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। যেরূপ শরীয়ত অনুমোদিতরূপে পর্দার সহিত কোন নারী বাহিরে চলিয়াছে, তাহার পথ দেখার সময় অবশ্যই পথিক পুরুষদের উপর নজর পড়িবে তাহা জায়েয আছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত ঘটনাও তদ্রূপ। জেহাদে অস্ত্র চালনার ক্রীড়া দেখা জায়েয, তাহা দেখিতে যাইয়া পুরুষদের প্রতি নজর পড়িয়াছে তাই ইহা জায়েয। অবশ্য যে কোন ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতি দৃষ্টির দরুণ শাহ্ওয়াত বা আকর্ষণ উদয়ের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকিলে সে ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত হারাম হইবে। আর নিষ্প্রয়োজনে সাধারণ দৃষ্টিও মকরুহ।

অনুমতি চাহিবার ক্ষেত্রে তিন বারের অধিক অপেক্ষা করিবে না

২৩৭৩। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আমাদের মদীনাবাসী ছাহাবীদের এক মজলিসে বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, ছাহাবী আবু মূছা (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে হতভম্বের ন্যায় দেখাইতে ছিল। তিনি ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, অদ্য আমি খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহ-দ্বারে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাহিয়াছিলাম—একে একে তিন বার অনুমতি চাহিয়াছি, কিন্তু কোন জবাব পাই নাই, অবশেষে আমি চলিয়া আসিয়াছি। ওমর (রাঃ) ঘরের ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে মগ্ন ছিলেন। যথাসত্বর সেই কাজ হইতে অবসর হইয়াই তিনি আমাকে খোঁজ করিয়াছেন এবং না পাইয়া আমাকে লোক মারফৎ ডাকিয়া আনিয়াছেন এবং আমি যে, চলিয়া আসিয়াছি উহার কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। আমি উত্তরে বলিয়াছি, তিন বার অনুমতি চাহিবার পরও যখন অনুমতির উত্তর পাই নাই তখন আমি চলিয়া গিয়াছি! কারণ, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লম বলিয়াছেন—

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

"তোমাদের কেহ কাহারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি তিন বার চাহিবার পরও যদি অনুমতি না পায় তবে তথা হইতে ফিরিয়া আসিবে।"

আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিলে পর খলীফা ওমর (রাঃ) আমার নিকট ইহার সাক্ষী তলব করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে কেহ হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে উক্ত হাদীছ শুনিয়াছেন কি? এতচ্ছ্রবনে উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) বলিলেন,

এই হাদীছ সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দানের জন্য আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠকে আপনার সঙ্গে পাঠাইব ; (যাহাতে প্রমাণিত হইবে যে, এই হাদীছ আমাদের সকলেই জ্ঞাত আছে।)

মুল হাদীছ বর্ণনাকারী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ঐ মজলিসে আমিই সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলাম, তাই আমিই তাঁহার সঙ্গে যাইয়া খলীফা ওমর (রাঃ)কে জানাইলাম, বাস্তবিকই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা বলিয়াছেন। অতঃপর খলীফা ওমর (রাঃ) অনুতপ্ত স্বঃরে বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটা নির্দ্দেশ আমি অজ্ঞাত রহিয়াছি ? ব্যবসা বাণিজ্যের লিপ্ততাই আমার এই অজ্ঞতার কারণ।

ব্যাখ্যা ঃ—একজন ছাহাবী কর্ত্তৃক একটি হাদীছ বর্ণনা করার পর খলীফা ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক উহার উপর সাক্ষী তলব করার তাৎপর্য্য সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম বোখারী (রঃ) কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

"اراد عمر التثبت لا ان لا يجيز خبر الواحد"

অর্থাৎ হাদীছ সম্পর্কে শুধু একজন ছাহাবীর বর্ণনা যাহাকে পরিভাষায় খবরে-ওয়াহেদ বলা হয় উহা গ্রহণীয় না হওয়া এই সাক্ষী তলবের কারণ নহে, বরং এই হাদীছটি অজ্ঞাত থাকার কারণে খলীফা ওমর (রাঃ) নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন ; যেমন মুল হাদীছের বর্ণনায় ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনুতাপের স্পষ্ট উক্তি উল্লেখও রহিয়াছে। তাই তিনি নিজে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে দেখিতে চাহিয়াছেন যে, একাধিক ব্যক্তি যেই হাদীছ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লল্লোহু আ্যলাইহে অসাল্লামের মুখ হইতে শুনিয়াছে আমি ওমর তাহা শুনি নাই।

এই সাক্ষী তলবের উপর ছাহাবী উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) কটাক্ষ করিলে স্বয়ং খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। (ফতহুলবারী)

ছোট বালকদেরকে ছালাম করা

২৩৭৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি কতিপয় বালকের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন ; তখন তিনি ঐ বালকদেরকে ছালাম করিলেন এবং বর্ণনা করিলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়া থাকিতেন।

মোসলেম-অমোসলেম মিশ্রিত দলকে সালাম করা

এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য কোন ভিন্ন রকম সালাম নাই। সাধারণ সালামই এস্থলেও ব্যবহৃত হইবে, তবে সালামের লক্ষ্য শুধু মোসলমানদিগকে করিতে হইবে।

২৩৭৫। ছাদীছ ঃ—উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসুস্থ সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)কে দেখিবার জন্য যাইবেন। হযরত (দঃ) একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়াছেন এবং (বালক) উসামা (রাঃ)কে ঐ বাহনের উপরই পেছনে বসাইয়াছেন। হযরত (দঃ) একটি বৈঠকের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন ; যেই বৈঠকে (ভাবী মোনাফেক সর্দ্দার) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বসিয়াছিল। তখনও (মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠাকারী) বদরের যুদ্ধ হয় নাই এবং আবদুল্লাহ মোসলমানদের দলভুক্ত হয় নাই। ঐ বৈঠকে মোসলমান, পৌত্তলিক ও ইহুদী সব রকম লোকই ছিল, এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ও ছিলেন। হযরত (দঃ) ঐ বৈঠকের নিকটে গেলেন ; গাধার পদচারণে ধূলা উড়িলে দুষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ স্বরূপ) নাকে কাপড় ধরিয়া বলিল, ধূলা উড়াইবেন না।

হযরত (দঃ) তথায় ছালাম করিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া বাহন হইতে অবতরণ করিলেন। আর সকলকে আল্লার দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং কোরআন তেলাওত করিয়া শুনাইলেন। এই সময় দুষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (হযরত (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিল,) মিঞা সাহেব ! আপনার কথাগুলি সত্য হইলে ত খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু আমাদের বৈঠকস্থলে এই সব বলিয়া আমাদেরে কষ্ট দিবেন না। আপনার বাড়ীতে চলিয়া যান ; যে কেহ আপনার নিকটে যাইবে তাহাকে এই সব শুনাইবেন।

দুষ্টের এই কথার প্রতিবাদে তথায় উপস্থিত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি আমাদের প্রত্যেক বৈঠকে তশরীফ আনিবেন এবং এইরূপ আহ্বান জানাইবেন ; আমরা ইহা ভালবাসি। পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সহিত মোসলমানদের বিরাট ঝগড়া তথায় বাঁধিয়া গেল, এমনকি সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে চুপ করাইলেন এবং বাহনে আরোহণ করিয়া অসুস্থ সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট পৌঁছিলেন।

নবী (দঃ) সায়াদ (রাঃ)কে দুষ্ট আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কথাবার্ত্তাগুলি শুনাইলেন। সায়াদ (রাঃ) অনুরোধ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করুণ—মনে কোন কষ্ট নিবেন না। খোদার কসম—আল্লাহ তায়ালা মদীনার এলাকায় আপনার যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন ইহার পূর্ব্বক্ষণে এই অঞ্চলের সকলের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে এই সমগ্র অঞ্চলের প্রধান মনোনীত করিয়া রাজমুকুট তাহার শিরে পরিধান করানো হইবে এবং সর্দ্দারীর পাগড়ী তাহাকে প্রদান করা হইবে।

কিন্তু আপনার প্রাধান্য দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রাধান্যকে বানচাল করিয়া দিয়াছেন, তাই আপনার প্রতি তাহার ভীষণ আক্রোশ ও বিদ্বেষ এবং সেই আক্রোশ ও বিদ্বেষেই সে আপনার সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

মছআলাহঃ—নিজ গৃহে পুরুষ মহিলার মধ্যেও সালামের আদান-প্রদান করিবে। অবশ্য বেগানা এবং যাহাদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তার অনুমতি নাই সেই ক্ষেত্রে নহে।

মছআলাহঃ—দুরে অবস্থিত কাহারও নিকট অন্যের মাধ্যমে ছালাম পৌঁছান যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে বলিতে হইবে—অমুক আপনার নিকট সালাম বলিয়াছেন।

মছআলাহঃ—ফাছেক, গোনাহে লিপ্ত এইরূপ ব্যক্তি তওবা না করা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সালামের আদান-প্রদান হইতে বিরত থাকা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বলিয়াছেন শরাবখোরকে সালাম করিও না।

দেশের অনুগত অমোসলেম সালাম করিলে তাহার উত্তর

২৩৭৬। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ইহুদী তোমাকে সালাম করিলে উত্তরে তুমি শুধু "আলাইকা" বলিবে। কারণ, তাহারা অনেক সময় "আচ্ছালামু আলাইকুম" এর স্থলে "আচ্ছামু আলাইকুম" বলিয়া থাকে—যাহার অর্থ তোমাদের উপর মৃত্যু। ("আলাইকা" অর্থ তোমার উপর; এই ক্ষেত্রে এই উত্তরই সমোচিত।)

২৩৭৭। **হাদীছ**ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদ-নাছারাগণ তোমাদিগকে সালাম করিলে উত্তরে শুধু "আলাইকুম" বলিবে।

মছআলাহ— ইহুদী-নাছারানী অমোসলেমের প্রতি লিপি লিখিতে উহাতে এইরূপ সালাম লিখা যায়—"আচ্ছালামু আলা মানিত্তাবায়াল-হুদা" সত্যের অনুসারীর প্রতি সালাম।

মছআলাহ— সম্মানিত আগন্তুকের অভ্যর্থনায় সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাওয়া উত্তম। মদীনার বিশিষ্ট গোত্র "আউস" বংশের সর্দ্দার উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)কে একটি ঘটনা উপলক্ষে নবী (দঃ) ডাকাইয়া ছিলেন। তাঁহার আগমন হইলে নবী (দঃ) উপস্থিত লোকজনকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সর্দ্দারের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হও।

মোছাফাহা করা

কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তবুকের জেহাদে গিয়াছিলেন না ; যেই কারণে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং আল্লাহ তায়ালারও অত্যন্ত বিরাগ-ভাজন হইয়া ছিলেন। এমনকি দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত নবী (দঃ) সহ সকল মোসলমানের কথাবার্ত্তা এমনকি সালাম এবং তাঁহার সালামের উত্তর দানও নিষিদ্ধ হইয়া ছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৫৬৯ নং হাদীছে রহিয়াছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর তাঁহার তওবা আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়াছে বলিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হয়।

তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত সুসংবাদ প্রাপ্তে আমি মসজিদে উপস্থিত হইলাম ; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তথায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতী হওয়ার ঘোষনা প্রাপ্ত বিশিষ্ট ছাহাবী তালহা (রাঃ) দৌড়িয়া আসিয়া আমার সঙ্গে মোছাফাহা করিলেন এবং আমার তওবা কবুলের সংবাদে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হওয়ায় আমাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিলেন ।

২৩৭৮। হাদীছ ঃ—কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ মোছাফাহা করিয়া থাকিতেন কি ? তিনি বলিলেন হাঁ।।

উভয় হস্তে ধরা

"মোছাফাহা" পরিচ্ছেদের সঙ্গেই বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং প্রমাণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রঃ) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারকের সঙ্গে তাঁহার উভয় হস্তে মোছাফাহা করিয়াছেন ।

দ্বিতীয় আরও একটি দলীল উল্লেখ করিয়াছেন—যেই দলীলটি উপরের মোছাফাহা পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছেন। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হস্ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তদ্বয়ের মধ্যে থাকাবস্থায়ই তিনি আমাকে (নামাযের) আত্তাহিয়্যাত শিক্ষা দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লেখিত বর্ণনা ও ঘটনা যে, মোছাফাহার ঘটনা ছিল তাহা ইমাম বোখারীর আলোচনায় সুস্পষ্টই প্রতিয়মান হইল। নতুবা তিনি এই বর্ণনাকে মোছাফাহার পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিতেন না (আর দুই হস্তে মোছাফাহার আকার ইহাই হয় যে, প্রত্যেকের

এক জনের হাত অপর জনের দুই হাতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) নবীজির সহিত মোছাফাহা করার এই আকারই বর্ণনা করিয়াছেন।

● ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রঃ)কে মক্কা শরীফে দেখিয়াছি—হাদীছের ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রঃ) তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহার সহিত মোছাফাহা করিলেন উভয় হস্তে। (হাশিয়া ৯২৬ পৃঃ)

● মোয়া'নাকা তথা পরস্পর কোলাকুলি করাও ছুন্নত।

পরিচয় দান ক্ষেত্রে শুধু "আমি" বলা চাই না

২৩৭৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলাম; আমার মরহুম পিতার ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। আমি হযরতের গৃহ দ্বারে করাঘাত করিলাম। হযরত (দঃ) আন্দর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি উত্তরে বলিলাম "আমি"। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও আমি; তিনি যেন আমার উত্তরকে নাপছন্দ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—"আমি" বলিয়া উত্তর দানকে নাপছন্দ করার একটি সরল যুক্তির প্রতিও হযরত (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, "তুমি কে?" এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল পরিচয় অবগত হওয়া। উহার উত্তরে "আমি" বলিলে সরলভাবে উহার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, কারণ "আমি" বলিয়া প্রত্যেকেই নিজকে ব্যক্ত করিতে পারে, অথচ পরিচয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

একত্রিত তিন জনের মধ্যে এক জনকে বাদ দিয়া অপর দুই জন গোপন আলাপ করিবে না

২৩৮০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন জন সঙ্গী হইলে একজনকে ছাড়িয়া অপর দুই জন গোপন আলাপ করিবে না।

● এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই যে, ঐরূপ করিলে তৃতীয় সঙ্গী মনক্ষুণ্ণ হইবে এবং এই ভাবিবে যে, তাহারা দুই জন বোধ হয় আমার সম্পর্কে কিছু বলিতেছে। অবশ্য যদি ঐরূপ কোন আলাপ করার প্রয়োজন হয় তবে তৃতীয় সঙ্গীর অনুমতি লইয়া সেইরূপ করিতে পারে।

তিনের অধিক সঙ্গী হইলে দুই জনে গোপন আলাপ করিতে পারে

২৩৮১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যদি শুধু তিন জন সঙ্গী হও তবে এক জনকে বাদ দিয়া অপর দুই জন গোপন আলাপ করিবে না যাবৎ না আরও লোক মিলিত হয়। নতুবা তৃতীয় সঙ্গী মনক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ রহিয়াছে।

রাত্রি বেলা শুইবার সময় গৃহে আগুন রাখিবে না

২৩৮২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, শুইবার সময় গৃহে আগুন থাকিতে দিবে না।

২৩৮৩। হাদীছ ঃ— আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা মদীনা এলাকার একটি বাড়ী উহাতে লোক-জন থাকাবস্থায় আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। সেই সংবাদ অবগত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আগুন তোমাদের শত্রু, অতএব নিদ্রার পূর্ব্বে আগুন অবশ্যই নির্ব্বাপিত করিবে।

খত্না করানো

২৩৮৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—পাঁচটি কাজ পূর্ব্বতন নবীগণ হইতে ছুন্নত রূপে প্রচলিত। (১) খত্না করা (২) নাভির নিচের লোম চাঁচিয়া ফেলা (৩) বগলের লোম উপড়াইয়া ফেলা (৪) মোচ কাটা (৫) নখ কাটিয়া ফেলা।

২৩৮৫। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধান সময়ে আপনার বয়স কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন, আমার ঐ সময় খত্না হইয়া গিয়াছে। আরবের লোকেরা কিছু বয়স্ক হইলে পর খত্না করাইত।

——(০)——

২২তম অধ্যায়

দোয়ার বয়ান

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমার নিকট দোয়া কর ; আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।"

দোয়ার একটি বিশেষ বিভাগ হইল এস্তেগফার—আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দ্বীন-দুনিয়ার কামিয়াবির জন্য এস্তেগফার একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে—

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا

"তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে এস্তেগফার—স্বীয় গোনাহ-খাতার ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চয় তোমাদের পরওয়ারদেগার অতিশয় ক্ষমাকারী। তিনি তোমাদের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদের ধনে-জনে উন্নতি দান করিবেন, তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচার ব্যবস্থা করিবেন এবং নদী-নালার ব্যবস্থা করিবেন। (ছুরা নূহ্ ২৯ পারা)

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ..........

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

"মোত্তাকীদের পরিচয়—যাহারা কোন অবৈধ কাজ করিলে বা কোন গোনাহ করিয়া স্বীয় ক্ষতি সাধন করিলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে ; আল্লাহ ভিন্ন গোনাহ মাফকারী

কেহ নাই। আর তাহারা স্বীয় কৃত গোনাহের উপর জমিয়া থাকে না এবং গোনাহের বিষময় ফল সম্পর্কে তাহারা সচেতন। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য প্রতিদান হইল, তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে ক্ষমা এবং বেহেশ্‌ত যাহার বাগ-বাগিচার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত থাকিবে। তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে। যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের প্রতিদান কতই না উত্তম হয়।" (৪পাঃ ৪রুঃ)

সায়্যেদুল-এস্তেগফার

২৩৮৬। হাদীছঃ—শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সায়্যেদুল-এস্তেগফার তথা সকল প্রকার এস্তেগফারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এস্তেগফার এই যে, বন্দা অত্যন্ত কাকুতি মিনতির সহিত কাতর স্বরে আল্লার দরবারে এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ـ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ـ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ـ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ ـ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ; তুমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। তুমি ভিন্ন আর কেহ মাবুদ ও মকছুদ নাই। আমাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, আমি তোমারই বন্দা এবং গোলাম ও দাস। আমি আমার শক্তি-সামর্থের সবটুকু ব্যয় করিয়া তোমার নিকট প্রদত্ত ওয়াদা-অঙ্গিকারের উপর দৃঢ় থাকিব ↑। আমার কৃত কর্ম্মের কুফল ভোগ করা হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি যে, তোমার অজস্র নেয়ামতরাশি ভোগ করিয়া বাঁচিতেছি তাহা আমি নতশিরে স্বীকার করিতেছি। আমি যে, অপরাধ করিয়া বসি তাহাও আমি স্বীকার করিতেছি। হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।"

↑ পবিত্র কোরআনে ৯ পারা ছুরা আরাফ ১২৭ আয়াতে সমগ্র মানব হইতে একটি অঙ্গিকার গ্রহণের ইতিহাস স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্মরণ করাইয়াছেন। সেই অঙ্গিকার এবং ইসলামের কলেমা—কলেমা তৈয়্যেবাহ্ ও কলেমা শাহাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আনুগত্যের ওয়াদা-অঙ্গিকার প্রতিটি মোসলমানই প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর অঙ্গিকারসমূহই এস্থলে উদ্দেশ্য।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলা এই এস্তেগফার অন্তরের একীনের সহিত পড়িবে এবং ঐ দিনে সন্ধা হইবার পূর্ব্বে মারা যাইবে সে বেহেশতবাসী হইবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা উহা পড়িবে এবং ঐ রাত্রে ভোর হইবার পূর্ব্বে মারা যাইবে সে বেহেশতবাসী হইবে।

অধিক এস্তেগফার করা

২৩৮৭। হাদীছ:— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলিতেন, আমি প্রতি দিন সত্তর বার হইতে অধিক আল্লার দরবারে এস্তেগফার এবং তওবা করিয়া থাকি।

তওবার বয়ান

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন:—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন তথা তওবা কর সত্যিকার খাঁটী ও খালেছ তওবা।"

২৩৮৮। হাদীছ:—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি গোনাহকে এত ভয়ঙ্কর মনে করিয়া থাকে যে, গোনাহ সংঘটিত হইয়া গেলে তাহার অবস্থা এইরূপ হয়—সে যেন একটি পাহাড়ের তল-দেশে আছে এবং পাহাড়টি তাহার উপর ধ্বসিয়া পড়িবে আশঙ্কা করিতেছে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গোনাহকে এত তুচ্ছ ও হাল্‌কা মনে করে যেন একটি মাছি তাহার নাকের সামনে উড়িতেছে হাত নাড়া দিলেই উহা দূর হইয়া যাইবে।

অতঃপর আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বন্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ তায়ালা পথ-হারা বন্দাকে পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি বিপদ-সঙ্কুল পথে ভ্রমন কালে বিশ্রাম স্থানে অবতরণ

করিয়াছে। তাহার খাদ্য ও পানীয় সব কিছু তাহার যান-বাহনের পিঠের উপর বাঁধা রহিয়াছে, ক্লান্তি অবস্থায় স্বীয় মাথা মাটির উপর রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রা আসিয়া গিয়াছে। চক্ষু খোলার পর সে দেখিতে পাইল, তাহার যান-বাহনটি তাহার সমুদয় সম্বল সহ নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিয়াও উহার কোন খোঁজ পাইল না ; অবশেষে মরুভূমির ভীষন উত্তাপের মধ্যে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হইয়া পুনরায় সে মৃত্যুর অপেক্ষায় শুইয়া পড়িল। কিছু সময় পর নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল, তাহার যানবাহনটি সব কিছু সহ তাহার নিকট দণ্ডায়মান। এই সময় ঐ ব্যক্তি কিরূপ সন্তুষ্ট হইবে ? বন্দার তওবা কালে আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

২৩৮৯। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ

مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِىْ اَرْضِ فَلَاةٍ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দার তওবা কালে এত অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, কোন ব্যক্তি বিশাল মরু প্রান্তে স্বীয় যানবাহন হারাইবার পর উহাকে হঠাৎ পুনরায় পাইয়াও ঐরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

শুইবার সময় দোয়া

২৩৯০। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, শুইবার জন্য প্রস্তুত হইলে প্রথমতঃ নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিবে, অতঃপর ডান কাতে শুইয়া এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ

اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجٰى

مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি আমাকে তোমার সোপর্দ করিয়া দিলাম, আমার লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছি, আমার ভাল-মন্দ সব কিছু তোমারই

হাওয়ালা করিয়াছি, আমি তোমারই উপর নির্ভর স্থাপন করিয়াছি; তোমারই দানের প্রতি আমি লালায়িত এবং তোমার ভয়েই আমি ভীত। তোমার প্রতি ধাপিত হওয়া ছাড়া তোমার আজাব হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় নাই—আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। আমি তোমার প্রেরিত কেতাবের উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই দোয়া পড়িয়া শয়নের পর যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু হইয়া যায় তবে ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু সাব্যস্ত হইবে। অবশ্য এই দোয়া শয়নের পূর্ব্বে সর্ব্ব শেষ বাক্য হইতে হইবে।

মুল হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বরা (রাঃ) বলেন, দোয়াটি শুদ্ধরূপে মুখস্ত করিয়া নেওয়ার জন্য আমি হযরত (দঃ)কে পড়িয়া শুনাইবার সময় আমি بِنَبِيِّكَ শব্দের স্থলে بِرَسُوْلِكَ বলিলে হযরত (দঃ) বাধা দান করিয়া বলিলেন, না—"بِنَبِيِّكَ" বল।

২৩৯১। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রি বেলা শুইবার সময় (ডান) হাত (ডান) গালের নীচে রাখিয়া এই দোয়া পড়িতেন—اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"আয় আল্লাহ! তোমারই নামের উপর আমি মরিব এবং তোমারই নামের উপর আমি জীবন কাটাইব।"

আর নিদ্রা হইতে জাগিয়া হযরত (দঃ) এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি আমাকে মৃত্যু তুল্য নিদ্রায় নিমগ্ন করার পর পুনরায় জীবিত ও জাগ্রত করিয়া উঠাইয়াছেন। (বাস্তব মৃত্যুর পরও এইরূপে) পুনঃ জীবিত হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।

২৩৯২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ শুইবার জন্য বিছানায় আসিলে পরিধেয় লুঙ্গি দ্বারা হইলেও বিছানাকে (সেলাই বিহীন) লুঙ্গির ভিতর দিকের সাহায্যে ঝাড়িয়া ফেলিবে, কারণ তাহার দৃষ্টির অগোচরে অন্য কিছু উহাতে অবস্থান করিতে পারে। অতঃপর এই দোয়া পড়িবে—

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا

وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

"হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! তোমার নামের উপরই আমার বাহু বিছানায় রাখিলাম এবং তোমারই সাহায্যে উহাকে উঠাতে সক্ষম হইব। এই নিদ্রার ভিতরই যদি আমার জানকে তুমি রাখিয়া দাও তবে আমার জানের প্রতি তোমার করুণা বর্ষন করিও, আর যদি তুমি আমাকে উহা ফেরৎ দেও তবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ ঐরূপই করিও যেরূপে তুমি তোমার নেককার বন্দাদেরে করিয়া থাক।"

রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ কালের দোয়া

২৩৯৩। হাদীছ:— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আমার খালা উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলে পর তাঁহার দোয়া সমূহের মধ্যে এই দোয়াটি ছিল—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا (وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّفِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا *) وَعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّسَارِىْ نُوْرًا وَّفَوْقِىْ نُوْرًا وَّتَحْتِىْ نُوْرًا وَّاَمَامِىْ نُوْرًا وَّخَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا

"আয় আল্লাহ! আমার দিলে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার কানে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার শিরায় নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার মাংসে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার রক্তে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার চুলে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার চামড়ায় নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার জবানে নূর সৃষ্টি করিয়া দাও, আমার আত্মায় নূর সৃষ্টি করিয়া দাও। আমার ডানে-বামে, উপরে-নীচে, সামনে-পেছনে নূর মোতায়েন রাখ এবং আমাকে নূর দান কর।

ব্যাখ্যা:— শুদ্ধ এবং সত্য তথা হককে নূর বা আলো আখ্যা দেওয়া হয়, আর অশুদ্ধ এবং মিথ্যা তথা বাতেলকে জুলমত্ বা অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়। এই আলো ও অন্ধকার চর্ম্ম চক্ষুর পক্ষে নহে বটে, কিন্তু মানবাত্মার পক্ষে উহা প্রকৃত পক্ষেই আলো ও অন্ধকার। কেননা, শুদ্ধ ও সত্যের মধ্যেই আত্মা স্বীয় উন্নতির পথ দেখিতে পায় এবং সেই উন্নতির পথে সে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে পারে।

---

* বন্দনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যাবলী অন্য কেতাবে উল্লেখ আছে। 'মোনাজাতে মকবুল' দ্রষ্টব্য।

সৃষ্ট জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ ও সত্য হইল সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎ তথা তাঁহার বাস্তব গুণাবলীর সুদৃঢ় উপলব্ধি ও জ্ঞান। এই জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ হইলে পর মানব তাহার সমগ্র অঙ্গ-প্রতঙ্গ সহ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ঝুকিয়া পড়িতে শুধু আকৃষ্টই হয় না, বরং সম্পুর্ণরূপে বাধ্য হইয়া পড়ে এবং তাহার সব শক্তিগুলিই সৃষ্টিকর্ত্তার ফরমাবরদারী ও আনুগত্যে এবং সর্ব্বস্তরে তাঁহার সন্তুষ্টি ভাজন কার্য্যে নিয়োজিত ও ব্যয়িত হইয়া থাকে। মানবের অঙ্গসমূহের ও শক্তিসমূহের এই নিয়োজনকেও নূর বলা হয়। কেননা, ইহা প্রকৃত নূর তথা সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফতেরই প্রতিক্রিয়া। এতদ্ভিন্ন মানুষ উক্ত নিয়োজনে সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিলে তাহার সম্মুখে অনেক অনেক অনাবিষ্কৃত রহস্য আবিষ্কৃত ও উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তাই উক্ত নিয়োজনকে নূর বলা হয়।

সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎ এবং তাঁহার আনুগত্যে আত্মনিয়োগকে যে, নূর বা আলো আখ্যা দেওয়া হয় এই আখ্যার বাস্তবতাও কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাইবে—যে দিন পোল-ছেরাৎ পার হওয়াকালে সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎহীন এবং তাঁহার আনুগত্যহীন নাফরমানগণ অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকিবে আর ঐ মা'রেফৎ ও আনুগত্যের বাহকগণ সম্মুখে এবং ডানে-বামে নূর ও আলো লাভ করিবে—সেই আলো এই চর্ম্ম চোখের পক্ষেও প্রকাশ্য আলো হইবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :—

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

.........هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন প্রত্যেকেই দেখিতে পাইবে ঈমানদার নর-নারীগণের সম্মুখে এবং পার্শে নূর ও আলো ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, আজ তোমাদের প্রতি বেহেশতের সুসংবাদ—যাহার বাগ-বাগিচার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহমান থাকিবে। তোমরা চিরকালের জন্য উহা লাভ করিবে—ইহাই হইল বড় সাফল্য। ঐ দিন মোনাফেক নর-নারীগণ ঐ ঈমানদারগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করুন ; আমরা আপনাদের আলোর সাহায্য লইব। ঈমানদারগণ উত্তরে বলিবেন, আমরা এখন অপেক্ষা করিতে পারি না—তোমরা পেছনের দিকে আলোর সন্ধান কর। (এই কথাবার্ত্তার অবস্থাই মোমেনগণ পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করতঃ বেহেশত-প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিবে।) সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীর আড়াল হইয়া যাইবে যাহার ভিতর দিক রহমতের স্থান বেহেশত এবং বাহির দিক আজাবের স্থান দোযখ। ঐ সময়

মোনাফেকরা আক্ষেপ করতঃ মোমেনদের প্রতি চিৎকার করিয়া বলিবে, আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সঙ্গী সাথী ছিলাম না? মোমেনগণ উত্তরে বলিবেন, বাহ্যিকরূপে তোমরা আমাদের সঙ্গী সাথী ছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া ছিলে। সত্য দ্বীন ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাউক এই অপেক্ষায় ছিলে, সত্য দ্বীনের প্রতি সন্দিহান ছিলে, আর তোমাদের অবাস্তব কামনা বাসনা তোমাদিগকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়া ছিল এবং ধোকাবাজ শয়তানও তোমাদিগকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় রাখিয়া ছিল—এই অবস্থায়ই তোমাদের উপর আল্লার আদেশ তথা মৃত্যু আসিয়াছে।

আজ তোমাদের ন্যায় কোন কাফেরের জন্যই জীবন বিনিময় দানেরও সুযোগ নাই, তোমাদের ঠিকানা দোযখই হইবে। সর্ব্বদার জন্য উহা তোমাদের ঠিকানা হইবে—বড়ই জঘন্য স্থান উহা।" (২৭ পারা ছুরা হাদীদ)

সৃষ্টিকর্ত্তার মা'রেফৎ এবং তাঁহার ফরমাবরদারীকে যে অর্থে নূর বা আলো আখ্যা দেওয়া হয় সেই অর্থেই উহার বিপরীত—সৃষ্টিকর্ত্তার গুণাবলী হইতে অজ্ঞতা এবং তাঁহার নাফরমানীকে জুলমত বা অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর নূর ও জুলমত বা আলো ও অন্ধকারই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে এই আয়াতের মধ্যে—

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ

অর্থাৎ মোমেনগণ আল্লার সাহায্যে জুলমত বা অন্ধকারকে এড়াইয়া বা বর্জ্জন করিয়া নূর তথা আলোর প্রতি আসে এবং আসিতে থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরগণ শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রভাবে নূর বা আলোকে এড়াইয়া বা বর্জ্জন করিয়া জুলমত তথা অন্ধকারের দিকে আসে এবং আসিতে থাকে। (৩ পারা ১ রুকু)

এই নূর বা আলোর পরিধি অতিশয় সুবিশাল ও সুপ্রসস্ত। মোমেন ব্যক্তি যে, এই পরিধির ভিতর থাকে বা প্রবেশ করে তাহা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই সে ধাপে ধাপে উন্নতিও লাভ করিতে থাকে—তাহার মা'রেফৎ তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর উপলব্ধি ও জ্ঞান ধাপে ধাপে সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৈহিক ও আভ্যন্তরীন সমুদয় শক্তি ও সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে ও তাঁহার সন্তুষ্টি আহরণে ব্যয়িত ও নিয়োজিত হইতে থাকে।

এই উন্নতি লাভে আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে সদা সাহায্য দান করিয়া থাকেন—ইহাই উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য্য এবং আলোচ্য দোয়ার মধ্যে উক্ত নূরেরই ভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে যে—হে আল্লাহ! তোমার মা'রেফতের নূর দ্বারা আমার দেলকে ভরিয়া দাও এবং তোমার আনুগত্য লাভের নূর আমার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় এবং সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভরিয়া দাও। আমার সব কিছুই যেন তোমার সন্তুষ্টি আহরণে ব্যয়িত হয়।

এতদ্ভিন্ন শয়তান এই পণ করিয়াছে যে, মানবকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সে তাহার চেষ্টা চালাইবে। পবিত্র কোরআনে শয়তানের উক্তি বর্ণিত আছে—

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

শয়তান আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ইহজগতের সময়কাল পরিমাণ দীর্ঘায়ু মঞ্জুর করাইবার পর সে বলিয়াছে—যেহেতু আমি এই আদমের দরুনই পথহারা বরং সর্ব্বহারা হইলাম, তাই আমি এই আদমজাতের জন্য ছেরাতে মোস্তাকীম বা সত্য পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইব। তদুপরি তাহাদিগকেও সর্ব্বহারা করার জন্য "তাহাদেরে আক্রমন করিব—তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, পেছন দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে।" (৭ পারা আ'রাফ ২ রুকু)

শয়তান মানুষকে চার দিক হইতে আক্রমন করার হুমকি দিয়াছে। আলোচ্য দোয়ায় আল্লার রসুল তাঁহার উম্মৎকে নিজ নিজ ছয় দিকের জন্য আল্লার নূর ভিক্ষা চাওয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, হে আল্লাহ! তোমার মা'রেফৎ ও আনুগত্যের নূর আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে, উপরে-নীচে সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া রাখ—যে দিকে আমি নজর করি সে দিকেই যেন আমি তোমাকেই দেখি, তোমার গুণাবলীই যেন আমার চোখে ভাসিয়া উঠে, ফলে আমি যেন তোমার আনুগত্যে অধিক বিলীন হইয়া পড়ি। এই নূর আমার সঙ্গে থাকিলে সর্ব্ব দিক হইতেই শয়তানের আক্রমন প্রতিহত হইবে।

আল্লার মা'রেফতে অলঙ্কিত একজন বুজুর্গ কি সুন্দর বলিয়াছেন:—

نظر کو ادھر جدھر دیکھتا ہوں — تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا

"যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সে দিকেই একমাত্র তোমাকেই দেখিতে পাই, আমার দৃষ্টিতে তুমি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

শয়নকালের তছবীহ

১৩৯৪। ছাদীছ:— আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ফাতেমা (রাঃ) গম পেষার চাক্কি চালাইবার দরুণ তাঁহার হাতে ফোস্কা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাই একদা তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে একজন দাস বা চাকর লাভ করার জন্য গেলেন। হযরত (দঃ)কে গৃহে পাইলেন না, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বলিয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) গৃহে আসিলে পর আয়েশা (রাঃ) সব বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

আলী (রাঃ) বলেন, উক্ত সংবাদে হযরত (দঃ) আমাদের গৃহে আসিলেন, তখন আমরা বিছানায় শুইয়াছিলাম। হযরত (দঃ)কে দেখিয়া আমি শোয়া হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু (হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি তোমার অবস্থায়ই থাক। হযরত (দঃ) আমার ও ফাতেমার মধ্যস্থলে বসিলেন, এমনকি তাঁহার সুশীতল পাদ্বয় আমার বক্ষ স্পর্শ করিল—আমি আমার বক্ষে শীতলতা অনুভব করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এমন জিনিষ শিক্ষা দিব যাহা তোমাদের জন্য দাস ও চাকর হইতে উত্তম হইবে। তোমরা যখন শুইবার জন্য বিছানায় আসিবে তখন ৩৪বার* "আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার "ছোব্‌হানাল্লাহ্" ৩৩ বার "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" পড়িবে। এই আমল তোমাদের পক্ষে দাস বা চাকর লাভ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম হইবে।

গভীর রাত্রে দোয়া করা

১৩৯৫। ছাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

انَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ

---

* বোখারী শরীফের অধিকাংশ ছাপায় "৩৩" লেখা আছে, কিন্তু ফৎহুলবারী কেতাবে যে বোখারী শরীফ ছাপা আছে উহাতে "৩৪" লেখা রহিয়াছে এবং ফৎহুলবারী কেতাবে ব্যাখ্যার মধ্যেও বিশেষ দৃঢ়তার সহিত "৩৪"ই লিখিয়াছেন এবং "৩৪"ই শুদ্ধ। কেননা মোসলেম শরীফেও ৩৪ উল্লেখ আছে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তায়ালার (বিশেষ করুণা-ভাণ্ডারের) অবতরণ হয় সর্ব্ব নিম্ন আকাশের উপর। (জগদ্বাসীদের উপর করুণা বর্ষনের জন্যই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থা হয়।)

আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা দিতে থাকেন, আছে কেউ আমাকে ডাকে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব? আছে কেউ যে আমার নিকট চায় আমি তাহাকে দান করিব? আছে কেউ যে আমার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? (এই শ্রেণীর বহু রকম আহ্বান ও ঘোষনা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রচারিত হইতে থাকে।)

নামাজের পরে জেকের করা ও দোয়া

২৩৯৬। ছাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা দরিদ্র শ্রেণীর ছাহাবীদের একটি দল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ধনী লোকগণই আখেরাতের বড় মর্ত্তবা ও বেহেশতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হইল! হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরূপে? তাঁহারা বলিলেন, কারণ ধনী লোকগণ আমাদের সমান নামায পড়িয়া থাকেন, জেহাদ করিয়া থাকেন, তদুপরী তাঁহারা তাঁহাদের অতিরিক্ত মাল আল্লার রাস্তায় খরচ করিয়া থাকেন; আমাদের মাল নাই আমরা খরচও করিতে পারি না। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিব যদ্দারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্ত্তীগণের সমান হইতে পারিবে এবং পরবর্ত্তীদের হইতে অনেক বেশী অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবে। তোমাদের এই আমল অবলম্বন করা ব্যতিরেকে অন্য কেহই তোমাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না।

প্রতি নামাযের পর দশ বার "ছোব্‌হানাল্লাহ্" দশ বার "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্" দশ বার "আল্লাহু আকবার" পড়িবে।

২৩৯৭। ছাদীছঃ— মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ মাবুদ হইতে পারে না। তিনি এক—অদ্বিতীয়, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি দান করিলে সেস্থলে কেহ কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং আপনি দান না করিলে কেহ দিতে পারে না। আপনার সাহায্য না হইলে কোন ভাগ্যবানের ভাগ্য কোনই উপকারে আসে না।

দোয়ার মধ্যে এক মিলের শব্দ গাঁথায় ব্যাপৃত হইবে না

২৩৯৮। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার বিশিষ্ট শাগেদ এক্‌রেমা (রঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, লোকদিগকে ওয়াজ নছিহত শুনাইও প্রতি সপ্তাহে একবার। তাহাতে যদি সন্তুষ্ট না হও তবে দুই বার। আরও বেশীর ইচ্ছা হইলে শুধু তিন বার মাত্র। পবিত্র কোরআনকে লোকদের বিরক্তির কারণ বানাইবে না।

কোথাও লোকদের নিকট আসিলে যাবৎ তাহারা তাহাদের কথাবার্ত্তায় লিপ্ত আছে তাহাদের নিকট ওয়াজ-নছিহতের কথা বলিবে না। এরূপ করিলে তাহাদের বিরক্তি আসিতে পারে, বরং তুমি চুপ থাক; যদি তাহারা তোমাকে কথা বলিতে অনুরোধ করে, তবে তোমার কথাও শুনাও, কিন্তু তাহাদের আগ্রহ পরিমাণ। আর দোয়া করা কালে এক মিলের শব্দ গ্রথনে ব্যাপৃত হইবে না। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও তাঁহার ছাহাবীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি—তাঁহারা এইরূপ করিতেন না।

দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উঠানো সুন্নত। দোয়ার জন্য কেব্‌লামুখী হওয়া শর্ত্ত নহে।

দোয়ার মধ্যে দৃঢ়তার সহিত আল্লার নিকট চাহিবে

২৩৯৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট পোক্তাভাবে চাহিবে। এইরূপ বলিবে না—হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে দাও। প্রকৃত প্রস্তাবেত আল্লাহ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করেন—তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে এমন কেহ নাই।

২ ০০। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এইরূপ দোয়া করিবে না যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে ক্ষমা কর, তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে রহম কর। বরং দৃঢ়তার সহিত আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিবে। বাস্তবে ত ইহা আছেই যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র নিজ ইচ্ছায়ই সব কিছু করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে এমন কেহ নাই।

দোয়ার ফলাফল লাভে তাড়াহুড়া করিলে সেই দোয়া কবুল হয় না

২৪০১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ

يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যক এই যে, সে যেন তাড়াহুড়া না করে, তথা এইরূপ বলিয়া বা ভাবিয়া দোয়া ক্ষান্ত না করে যে—কতবার দোয়া করিলাম, কিন্তু কবুল হইল না অর্থাৎ ফল পাইলাম না।

বালা-মছিবতের সময়ে দোয়া

২৪০২। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপদ-বিপদ ও বালা-মছিবতে আক্রান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় এই দোয়া পড়িয়া থাকিতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

"আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তিনি অতি মহান অতি ধৈর্য্যশীল। আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তিনি সমস্ত আসমান সমগ্র জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা; এমনকি মহান আরশের সৃষ্টিকর্ত্তা মালিক-মোখ্‌তার এবং পরিচালক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী তিনিই।"

২৪০৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ

الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

"আয় আল্লাহ। আমি তোমার আশ্রয় চাই বালা-মছিবতের যাতনা হইতে, দুর্ভাগাক্রান্ত হওয়া হইতে, দুঃখ-জনক অদৃষ্ট হইতে এবং ঐরূপ অবস্থা হইতে যাহা দেখিয়া শত্রু সন্তুষ্ট হয়।"

কাহাকেও কোন শাস্তি প্রদান করিলে তাহার জন্য দোয়া

২৪০৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ (اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ) فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهٗ (اَوْ اٰذَيْتُهٗ اَوْ لَعَنْتُهٗ اَوْجَلَدْتُّهٗ) فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهٗ (زَكٰوةً وَّرَحْمَةً وَّاَجْرًا) وَّقُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

"হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ (যাহার মধ্যে ক্রোধ-রিপু রহিয়াছে,) অতএব যে কোন মোমেন-মোসলমানকে আমি মন্দ বলি বা কষ্ট দেই বা লান্-তান্ করি বা মার-পিট করি উহাকে তাহার জন্য সংশোধনকারী এবং তোমার রহমত ও ছওয়াবের অছিলা এবং কেয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভের অছিলা বানাও।"

ফেৎনা তথা দ্বীন-ঈমানের ক্ষতি সাধন করে এইরূপ সব কিছু হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৪০৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা লোকগণ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনেক বেশী প্রশ্ন করিল যাহাতে হযরত (দঃ) বিরক্তি অনুভব করিলেন। এবং তিনি রাগান্বিত হইয়া মিম্বারে আরোহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, যে যত পার জিজ্ঞাসা কর; আমি উত্তর দিতে থাকিব।

আনাছ (রাঃ) বলেন, এই সময় আমি এদিক-ওদিক নজর করিয়া দেখি সকলেই কাপড়ের আড়ালে মাথা গুঁটিয়া কাঁদিতেছে। হঠাৎ এক ব্যক্তি (যাহার পিতা ছিল হোযায়ফা (রাঃ), কিন্তু) তাহাকে বিবাদের সময় লোকগণ সে তাহার পিতার ঔরসের নয় বলিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত; (কারণ, তাহার পিতার আকৃতির সহিত তাহার আকৃতির মিল ছিল না।) সেই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা

---

* আলোচ্য দোয়াটি বোখারী শরীফে অসম্পূর্ণ উল্লেখ হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী শব্দগুলি অন্যান্য রেয়ায়েত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। (ফতহুলবারী ১১—১৩৪)

করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার পিতা কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার পিতা (প্রকৃত প্রস্তাবেই) হোযায়ফা (রাঃ)।

(যাহারা হযরতের রাগ উপলব্ধি করে নাই তাহারা হযরতের ঘোষনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করিয়া এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন করিল, কিন্তু বুদ্ধিমানগণ তাহাতে অধিক বিচলিত হইতে ছিলেন, এমনকি) ওমর (রাঃ) হযরতের রাগ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন—

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ

"আমরা এক আল্লাহকে প্রভু-পরওয়ারদেগার রূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট আছি, অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না। ইসলামকে দ্বীন ও ধর্ম্ম তথা জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট আছি, অন্য কোন মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না। মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রসুল রূপে গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট আছি, অন্য কাহারও আদর্শের প্রতি নজর করিব না। আমাদের এই দ্বীন ও ঈমানের ক্ষতি সাধন করিতে পারে এমন সব কিছু হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

ঐ ঘটনার দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিলেন, আজ ভাল ও মন্দ উভয়ের দৃশ্যাবলী আমি দেখিতে পাইয়াছি—এইরূপ আর কখনও দেখি নাই। বেহেশত এবং দোযখ উভয়কে আমি এত সুস্পষ্ট এবং নিকটতমরূপে দেখিতে পাইয়াছি যে, উহা যেন এই সম্মুখস্থ দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত।

শত্রুর প্রাবল্য, ভাবনা-চিন্তা, অলসতা ও নিষ্কর্ম্মন্যতা, ভীরুতা, কার্পণ্য এবং ঋণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৪০৬। **হাদীছ**:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়া থাকিতাম। আমি হযরত (দঃ)কে বহুবার এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ

وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই—সব রকম দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হইতে, নিষ্কর্ম্মন্যতা হইতে, অলসতা হইতে, কৃপণতা হইতে, ভীরুতা হইতে ঋণের বোঝা হইতে এবং আমার উপর লোকদের প্রাবল্য ও ভীতি হইতে।"

কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৪০৭। হাদীছ ঃ—উম্মে-খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি।

২৪০৮। হাদীছ ঃ—সায়াদ (রাঃ) পাঁচটি বস্তু হইতে আশ্রায় প্রার্থনা করা শিক্ষা দিতেন এবং উহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ

اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই—কৃপণতা হইতে, আশ্রয় চাই ভীরুতা হইতে, আশ্রয় চাই লাঞ্ছনাজনক বার্দ্ধক্যের বয়স হইতে, আশ্রয় চাই দুনিয়ার ঐসব বিষয়-বস্তু ও ঘটনাবলী হইতে যদ্দারা দ্বীন-ঈমানের ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং আশ্রয় চাই—কবরের আজাব হইতে।"

জীবন-মরণ সর্ব্বাবস্থার জন্য ভ্রষ্ঠতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা

২৪০৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি—নিষ্কর্ম্মন্যতা হইতে অলসতা হইতে, ভীরুতা হইতে, অধিক বার্দ্ধক্য হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি ইহজীবনে দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকারক বিষয়ের সম্মুখীন হওয়া হইতে এবং মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর—কবরের ছওয়াল-জওয়াব কালে দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকারক বিষয়াবলী হইতে।"

গোনাহ ও জরিমানা এবং দজ্জাল ইত্যাদি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা

২৪১০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ - اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই—অলসতা হইতে, অধিক বার্দ্ধক্য হইতে, গোনাহে লিপ্ত হওয়া হইতে, ঋণ ও ক্ষতিপুরণ ইত্যাদির বোঝা হইতে, কবরের পরীক্ষার কুফল ও কবরের আজাব হইতে। পরীক্ষামুলকভাবে যে তুনিয়াতে দোযখের পথও খোলা রহিয়াছে সেই পরীক্ষার কুফল ও দোযখের আজাব হইতে। ধন-দৌলতের দ্বারা যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষার কুফল হইতে এবং দারিদ্রের দ্বারা যে পরীক্ষা হয় উহার কুফল হইতেও আশ্রয় চাই। আর আশ্রয় চাই, তুষ্ট দুরাচার দজ্জালের দ্বারা যে পরীক্ষা হইবে সেই পরীক্ষার কুফল হইতে।

"হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা আমার হইতে ধুইয়া ফেল বরফের ও শিলের পানির দ্বারা ↑। আমার অন্তরকে সমস্ত গোনাহ-খাতা হইতে পরিচ্ছন্ন করিয়া দাও যেরূপ সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। এবং আমাকে গোনাহ হইতে দুরে রাখ ঐরূপ যেরূপ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম একটি হইতে অপরটি দুরে রহিয়াছে।

জাগতিক ভাল লাভের দোয়া করা

২৪১১। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়াটি অনেক বেশী পড়িয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আল্লাহ—আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাকে তুনিয়াতেও আখেরাতেও ভালায়ী দান করিও এবং আমাকে দোযখের আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।"

↑ গোনাহের পরিণাম ও পরকালীন আকৃতি দোযখের আগুন। আর অগ্নি নির্বাপণে অধিক ঠাণ্ডা পানিই শ্রেয়, তাই এস্থলে বরফের ও শিলের পানির উল্লেখ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একটি বিশেষ এস্তেগফার

২৪১২। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়া থাকিতেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ
ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

"হে প্রভু-পরওয়ারদেগার ! মাফ করিয়া দাও আমাকে আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ এবং অজ্ঞতা প্রসূত গোনাহ এবং জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছাকৃত আমি যে সমস্ত কাজের মধ্যে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করিয়াছি—সেই গোনাহ। এতদ্ভিন্ন ঐ সব গোনাহ যাহা আমি জানি না, কিন্তু তুমি জান।

হে আল্লাহ ! আমাকে মাফ করিয়া দাও আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, ইচ্ছাকৃত গোনাহ, অজ্ঞতা প্রসূত গোনাহ, ঠাট্টারূপের গোনাহ—সকল প্রকার গোনাহই আমার মধ্যে আছে।

হে আল্লাহ ! আমাকে মাফ করিয়া দাও, যাহা কিছু গোনাহ পূর্ব্বে করিয়াছি, যাহা পরে করিরাছি এবং যাহা গোপনে করিয়াছি, যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি। তোমার সাহায্যেই উন্নতি লাভ হয় এবং তোমার সাহায্য হারাইলেই অবনতি আসে। তুমি সর্ব্ব শক্তিমান।"

বিভিন্ন জিক্‌রের ফজিলত

২৪১৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক দিনে এক শত বার এই জিক্‌র করিবে সে দশটি ক্রীতদাস আজাদ করার সমান ছওয়াব লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত আরও এক শত নেকী তাহার জন্য লেখা হইবে এবং তাহার এক শত গোনাহ মুছিয়া ফেলা হইবে। আর এই জিক্‌র তাহার জন্য সারা দিন শয়তান হইতে সুরক্ষিত থাকার সুব্যবস্থা হইবে এবং কোন ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা উত্তম আমলকারী গণ্য হইতে পারিবে না, অবশ্য যদি কেহ এই জিক্‌র তার চেয়ে বেশী করে। জিক্‌রটি এই—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই ; তাঁহার কোন শরীক নাই। সব অধিকার একমাত্র তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান।"

২৪১৪। **হাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক দিনে এক শত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়িবে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে যদিও উহা সমূদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।

২৪১৫। **হাদীছ**ঃ—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের জিক্‌র (তথা অন্তরের অন্তস্থল হইতে স্মরণ ও মুখে জপনা) করে এবং যে ব্যক্তি সেই জিক্‌র না করে তাহাদের উভয়ের মধ্যে ঐরূপ পার্থক্য যেরূপ পার্থক্য জীবিত ও মৃতের মধ্যে।

২৪১৬। **হাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নিযুক্ত করা এক দল ফেরেশতা রহিয়াছেন যাঁহারা আল্লার জিক্‌রে মশগুল লোকদের তালাশে ঘোরিয়া বেড়াইতে থাকেন। কোথাও আল্লার জিক্‌রে মশগুল লোকদেরে দেখিতে পাইলেই তাঁহারা পরস্পর ডাকা-ডাকি করিয়া তথায় একত্রিত হন এবং ঐ লোকদেরে ঘিরিয়া ফেলেন। ঐ ফেরেশতাদের প্রতিটি দলেই তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, ঐ লোকদেরে ঘিরিয়া একত্রিত হওয়া কালে তাঁহাদের জমাত জমিন হইতে আসমান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা যিনি নিজেই তাঁহাদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞাত আছেন, তবুও তাঁহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার এই বন্দাগণ কি বলিতেছে? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার পবিত্রতার গুণ গাহিতেছে, শ্রেষ্ঠত্বের গুণ গাহিতেছে, আপনার প্রশংসার ধ্বনি দিতেছে এবং আপনার মাহাত্ম জপনা করিতেছে।

হযরত (দঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তখন ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ বন্দাগণ কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না—তাহারা আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, যদি তাহারা আমাকে দেখিয়া থাকিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনাকে দেখিতে পাইলে আপনার আরও অধিক বন্দেগী করিত, মাহাত্মের জপনা করিত পবিত্রতার গুণ গাহিত।

হযরত (দঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা আমার নিকট কি চায়? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার নিকট বেহেশত ভিক্ষা চায়। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি বেহেশত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না—তাহারা বেহেশত দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, বেহেশত দেখিলে তাহারা কিরূপ করিত? ফেরেশতাগণ বলেন, তাহা হইলে তাহারা বেহেশতের আকাঙ্খী আরও অধিক হইত এবং উহা লাভের চেষ্টা আরও অধিক করিত এবং তাহাদের অভিলাস আরও অধিক হইত।

হযরত (দঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরও জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ বস্তু হইতে তাহারা বাঁচিতে চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, দোযখ হইতে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি দোযখ দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না—তাহারা দোযখ দেখে নাই। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, দোযখ দেখিলে তাহারা কিরূপ করিত? ফেরেশতাগণ বলেন, তাহা হইলে তাহারা দোযখকে আরও অধিক ভয় করিত এবং দোযখ হইতে বাঁচিবার আরও অধিক চেষ্টা করিত।

তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে বলেন, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছি। ঐ সময় এক ফেরেশতা বলেন, তথায় একজন লোক ছিল; বস্তুতঃ সে তাহাদের জমাতে শামিল ছিল না, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে তথায় আসিয়া ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এই জমাতের লোকগণ এতই আদরণীয় যে, তাহাদের সংস্রবে যে আসে সে বঞ্চিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই নাম

২৪১৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই তথা এক কম এক শত (গুণ-বাচক) নাম রহিয়াছে। তাঁহার কোন দোসর নাই—জোড়া নাই—তিনি বেজোড়, বেজোড়কে তিনি বেশী পছন্দ করেন। যে কোন ব্যক্তি ঐ সব নামকে আয়ত্ব করিবে সে বেহেশত লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালার গুণ-বাচক নামসমূহ আয়ত্ব করার অর্থ ঐসব নামকে উহার মর্ম্ম সহকারে হৃদয়-পটে অঙ্কিত রাখা, দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি গুণের যে প্রতিক্রিয়া বন্দার জীবনে হওয়া প্রয়োজন সেই প্রতিক্রিয়া স্বীয় জীবনে সৃষ্টি করা।

সমাপ্ত

بسم الله الرحمن الرحيم
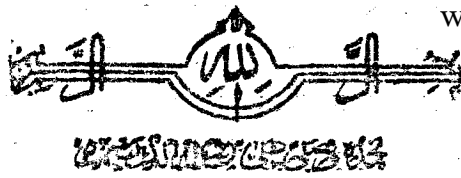
পরম দয়ালূ দয়াময় আল্লার নামে

২৩শ অধ্যায়

হৃদয় গলানো উপদেশমালা

---(●)---

স্বাস্থ ও সুযোগের অপচয় করিবে না

২৪১৮। হাদীছঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ

مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুইটি বিশেষ নেয়ামত বা আল্লার দানকে অধিকাংশ লোকেই হেলায় হারাইয়া থাকে। উহাকে কাজে লাগায় না, ফলে উহার অপচয় হয়- (১) স্বাস্থ ও সুস্থতা এবং (২) অবসর ও অবকাশ।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মুল্য

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন —

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ......وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা জানিয়া বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ, দুনিয়ার জেন্দেগী (যদি আখেরাতের আমল বিহীন হয় তবে উহা) শুধু এই কতিপয় জিনিষের সমবায় মাত্র—(শৈশবে) খেলা-ধুলা, রং-তামাশা, (যৌবনে) ফ্যাসন ও

সাজ-সজ্জার পারি-পাট্য, পরস্পর গর্ব্ব-গরিমা। আর (বার্দ্ধক্যে) ধন-জনের আধিক্য। (অথচ এই সবই অতীব ক্ষণস্থায়ী—এই সবের বাহার মাত্র কিছু দিন থাকে। অতঃপর উহার অবসান হইয়া যায়।) যেরূপ—মেঘমালার বর্ষণে কৃষকের আনন্দদায়ক শস্য-ফসলের শ্যামলতা; (ক্ষেত-খামারের সমুদ্রে যেন সবুজ তরঙ্গ বহিতে থাকে, কিন্তু সেই শ্যামলতা মাত্র কতক দিনের।) তার পরেই উহা শুষ্ক হইয়া যায় এবং সকলেই উহাকে জরদ বর্ণের দেখিতে পায়, অবশেষে উহা খর-কুটায় পরিণত হয়। (দুনিয়ার জেন্দেগী যে সব জিনিষের সমবায় ও সমষ্টি ঐ সব এই শ্রেণীরই ক্ষণস্থায়ী।) পক্ষান্তরে (আখেরাতের সব অবস্থাই চিরস্থায়ী।) আখেরাতে রহিয়াছে ভীষণ আজাব বা আল্লার তরফ হইতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (এই উভয়টিই হইবে চিরস্থায়ী অনন্ত অসীম।) প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার জেন্দেগী হইল শুধু ধোঁকার বস্তু। অতএব তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও প্রভু-পরওয়ারদেগারের মাগফেরাত লাভের প্রতি এবং (তাঁহার সন্তুটি লাভের স্থান) জান্নাতের প্রতি—যাহার পরিমাপ আসমান-জমিন তুল্য। আর উহা তৈরী হইয়া আছে ঐ লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলদের প্রতি ঈমান আনিয়াছে—তাহাদের জন্য উহা আল্লার বিশেষ দান হইবে। যাহাকে উহা দান করা আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন দিয়া থাকিবেন। আল্লার দান ও করুণা অতিশয় বড়। (২৭ পারা ছুরা হাদীদ)

২৪১৯। হাদীছ ঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

অর্থ—সাহ্ল (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—বেহেশতের (এক নলও নয়) শুধু এক চাবুক পরিমাণ জায়গা সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমুদয় ধন-সামগ্রী হইতে মুল্যবান। এবং আল্লার রাস্তায় তথা আল্লার দ্বীনের কাজে শুধু সকাল বেলা বাহির হওয়ার কিম্বা বিকাল বেলা বাহির হওয়ার মূল্য সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন-সামগ্রীর মুল্য হইতে অধিক। (অর্থাৎ উহার ছওয়াব সমগ্র জগতের সমুদয় ধন-সামগ্রী দান-খয়রাত করা অপেক্ষা অধিক।)

দুনিয়ার সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিবে ?

২৪২০। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا

كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ —اِذَا اَمْسَيْتَ

فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ

لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيٰوتِكَ لِمَوْتِكَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমাকে তাঁহার কথার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী করণার্থে) আমার উভয় কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, দুনিয়ার মধ্যে এরূপ থাক যেন তুমি একজন বিদেশী মুছাফির, বরং তুমি যেন একজন পথিক।↑

এই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আজিকার দিনের বিকাল বেলায় নিশ্চয়তার সহিত এই আশা পোষণ করিও না যে, তুমি আগামী কাল ভোরে জীবিত থাকিবে এবং ভোর বেলায় নিশ্চয়তার সহিত এই আশা পোষণ করিও না যে, বিকাল বেলা তুমি জীবিত থাকিবে। (তোমাকে যে কবরে যাইতে হইবে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চল*)।

আর সুস্থ সবল থাকাকালে এবাদৎ-বন্দেগী বেশী পরিমাণে কর এই ভাবিয়া যে, অসুস্থতায় তাহা করিতে পারিবে না এবং জেন্দেগী থাকিতে ঐ আমল কর যাহা মৃত্যুর পরে কাজে আসে।

↑ অর্থাৎ বিদেশী মুছাফির কোন শহরে উপস্থিত হইলে তথায় যদিও স্থায়ী বাড়ী ঘর তৈরী না করে, কিন্তু অন্ততঃ অস্থায়ীভাবে হইলেও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন পথিক পথ ভ্রমনে সেইরূপ ব্যবস্থাও করে না।

অপর এক হাদীছে পথিক হওয়ার দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এরূপ যে, পথিক পথ ভ্রমন কালে কোন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে উহা ত্যাগ করিয়া পুনঃ ভ্রমন আরম্ভ করে।

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্য কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। (ফৎহুল বারী)

দীর্ঘ আশা পোষণ সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"দোযখ হইতে পরিত্রাণ এবং বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ যাহাকে প্রদান করা হইয়াছে সে-ই সফলতা লাভ করিয়াছে ; দুনিয়ার জেন্দেগী ত শুধু মাত্র ধোকার বস্তু।"

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন —

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ -

"কাফেরগণ যখন সত্যের প্রতি আসেই না তখন তাহাদের জন্য অনুতাপ অনুশোচণা ত্যাগ করুন। তাহাদিগকে খাওয়া-পরা, আরাম-আয়েশের দীর্ঘ আশা লইয়া অচেতন ভাবে সময় কাটাইতে দিন, অচিরেই তাহারা (তাহাদের কর্ম্মের পরিণাম) উপলব্ধি করিতে পারিবে।"

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন :—

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ

مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا

فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ

"দুনিয়া অগ্রসর হইতেছে গমনে এবং আখেরাত অগ্রসর হইতেছে আগমনে। উভয়েরই এক একটি দল রহিয়াছে। তোমরা আখেরাতের দলভুক্ত হইয়া থাক, দুনিয়ার দলভুক্ত হইও না। স্মরণ রাখিও—এই জেন্দেগী কর্ম্মের জেন্দেগী, হিসাব-নিকাশের জেন্দেগী নহে। এবং আখেরাত হিসাব-নিকাশের জেন্দেগী, কর্ম্মের জেন্দেগী নহে।"

২৪২১। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমাদিগকে একটি বিষয় বুঝাইবার জন্য) চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট একটি রেখা আঁকিলেন এবং উহার মধ্য ভাগে আর

একটি সরল রেখা আঁকিলেন যাহার দীর্ঘতা ঐ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট রেখার বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আর এই সরল রেখার যে অংশ বেষ্টনীর ভিতর রহিয়াছে (উভয় দিক হইতে) উহার প্রতি ধাবমান ছোট ছোট কতকগুলি রেখাও আঁকিলেন।

অতঃপর (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুঝিয়া নেওয়ার জন্য) বেষ্টনীর ভিতর আবদ্ধ রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহা হইল মানুষ, আর এই পরিবেষ্টনকারী রেখা হইল মানুষের বয়স-কাল যাহা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আর বেষ্টনীর বাহিরে যে রেখা রহিয়াছে উহা হইল মানুষের দীর্ঘ আশা। আর মধ্যবর্ত্তী রেখাটির প্রতি ধাবমান ছোট ছোট রেখাগুলি হইল মানুষের জীবন সংহারক আপদ-বিপদ, রোগ-শোক। এইগুলি পর পর এক একটি মানুষকে আঘাত হানিতে থাকে। (শেষ পর্য্যন্ত যে কোন একটির কবলে তাহার ইহ-জীবনের অবসান ঘটে। এমনকি ঐ সবের সবগুলা এড়াইতে পাড়িলেও বার্দ্ধক্যের দরুণ জীবনীশক্তি নিঃশেষ হওয়াকে মানুষ কোন রকমেই এড়াইতে পরের না।)

২৪২২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষকে একটি বিন্দুরূপে কেন্দ্র করিয়া উহার নিকটে ও দুরে কতিপয় রেখা অঙ্কন করতঃ নিকটবর্ত্তী একটি রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহা যেন মানুষের জীবনকালের শেষ সীমা। আর দুরের একটি রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, এই পর্য্যন্ত হইল মানুষের আশা। সুতরাং মানুষ তাহার আশা পোষণ করিতেই থাকে, কিন্তু সেই আশা পর্য্যন্ত পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার নিকটবর্ত্তী রেখা তথা জীবনকালের শেষ সীমা উপস্থিত হইয়া পড়ে (এবং তাহার মৃত্যু আসিয়া দাঁড়ায়।)

ষাট বৎসর বয়সের সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সব ওজরই শেষ হইয়া যায়

২৪২৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَى امْرِئٍ

اَخَّرَ اَجَلَهُ اِلَى سِتِّيْنَ سَنَةً

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ওজরেরই অবকাশ আল্লাহ তায়ালা রাখেন নাই, যাহার বয়স ষাট বৎসর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

দোযখীরা দোযখের মধ্যে চিৎকার করতঃ বলিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার ! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া পুনঃ আমল করার সুযোগ দান করুণ ; আমরা পূর্ব্বেকার খারাব আমল ত্যাগ করিয়া নেক আমল করিব ।

তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, "আমি তোমাদিগকে এই পরিমাণ বয়স দিয়াছিলাম নয় কি যে বয়সের সুযোগে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে ? এতদ্ভিন্ন তোমাদের নিকট বিভিন্ন সতর্ককারীও আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা কাহারও সতর্ক করণে কর্ণপাত কর নাই। (সুদীর্ঘ সুযোগকে হেলায় নষ্ট করায় এবং শত শত সতর্ককারীর সতর্ককরণকে উপেক্ষা করায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তোমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার কর না।) সুতরাং আজাব ভোগ করিতে থাক। সেমতে এই দুরাচাররা কোন সাহায্যকারী পাইবে না।" (২২ পারা ১৬ রুকু।)

জাহান্নামী কাফেরগণ চিরস্থায়ী আজাব ভোগের অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার এক কারণ ইহাই যে, এই দুরাচাররা প্রকৃত প্রস্তাবেই এরূপ যে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ হাজার সুযোগ দেওয়া হইলেও তাহারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে না। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে এই কথা ভালরূপেই জানেন। পবিত্র কোরআনেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ - وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"আশ্চর্য্যজনক অবস্থা হইবে তখন, যখন নাফরমানদিগকে দোযখের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, আমাদের অতীব আকাঙ্খা যে, আমাদিগকে দুনিয়ায় পুনঃ পাঠান হউক—এইবার আমরা আল্লার নিদর্শন ও আদেশাবলী অস্বীকার করিব না এবং আমরা মোমেন হইয়া যাইব। (তাহাদের এই উক্তি বাস্তবায়ীত হওয়ার নহে,) বরং তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গিয়াছে ঐ বস্তু

যাহাকে তাহারা পূর্ব্বে স্বীকার করিত না—উপেক্ষা করিত (তথা আখেরাত।) প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহাদিগকে পুনঃ সুযোগ দানার্থে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় নিশ্চয় তাহারা ঐ নিষিদ্ধ ও বিদ্রোহীতার কার্য্যেরই পুনারাবৃত্তি করিবে। (সুতরাং বর্ত্তমান উক্তিতে) নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। (৭ পারা ৯ রুকূ)

সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার এই বিবৃতি অনুসারে বলা যাইতে পারে, কাফের মোশরেক—দ্বীন অস্বীকারকারী ও উপেক্ষাকারীদের অপরাধ সাধারণ দৃষ্টিতে শুধু তাহাদের বয়স সীমায় সীমাবদ্ধ দেখিলেও বস্তুতঃ উহা সীমাবদ্ধ নহে। তাহারা অসীম সময়ের সুযোগ পাইলে অসীম কালই এই অস্বীকার, উপেক্ষা ও বিদ্রোহীতার মধ্যেই জীবন কাটাইবে। সুতরাং চিরস্থায়ী আজাব তাহাদের পক্ষে সমীচীনই হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ৬০।৭০ বৎসরের সুযোগকে হেলায় নষ্ট করিয়াছ। কাল চুল সাদা হওয়া, শক্ত দাঁত খসিয়া পড়া, যৌবনের বাহার চলিয়া গিয়া বার্দ্ধক্য নামিয়া আসা এবং চোখের সামনে দিবা-রাত্র, সমসাময়িক লোকদের মৃত্যু ; এতদ্ভিন্ন রসুল, কোরআন ও উপদেশ দান-কারীদের সতর্ককরণ—এই প্রকারের শত শত সতর্ককারীদের সতর্ককরণকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছ যে, অস্বীকার, উপেক্ষা ও বিদ্রোহ তোমাদের মজ্জাগত ; তোমাদেরে পুনঃ দুনিয়ায় পাঠাইলেও তোমরা উহাই করিবে। সুতরাং তোমরা চিরঅপরাধি, অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আজাব ভোগ করিতে থাক।

২৪২৪। হাদীছ:— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ

شَابًّا فِىْ اِثْنَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, বৃদ্ধের অন্তর দুইটি জিনিষে যুবক থাকে। একটি হইল দুনিয়ার মহব্বৎ, দ্বিতীয়টি হইল দীর্ঘ আশা।

২৪২৫। হাদীছ:— قال انس رضى الله تعالى عنه قال

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبُرُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ

اِثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُوْلُ الْعُمُرِ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের বয়স বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে অপর দুইটি জিনিষের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে— (১) ধন-দৌলতের মহব্বৎ ও স্পৃহা (২) দীর্ঘায়ুর আকাঙ্খা।

শোকস্থলে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ছবর করার ফল

২৪২৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

انَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ مَا لِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ

عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়া থাকেন, আমি আমার বন্দার কোন মহব্বতের বস্তু উঠাইয়া নিলে পর সেই বন্দা যদি তখন ছওয়াবের আশায় ধৈর্য্য ধারণ করে তবে সে আমার নিকট উহার ফলে বেহেশ্‌ত লাভ করিবেই।

জাগতিক জাঁকজমক এবং উহাতে প্রতিযোগিতা করা হইতে সাবধান থাকা

২৪২৭। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের পক্ষে সর্ব্বাধিক ভয়ের বস্তু আমি ইহাকে মনে করি যে, আল্লাহ তায়ালা বাহির করিয়া দিবেন তোমাদের জন্য জমিনের সমুদয় সম্পদ। জিজ্ঞাসা করা হইল, জমিনের সম্পদ (বাহির হইলে ভয়ের কারণ) কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, দুনিয়ার জাঁকজমক (হইল ভয়ের কারণ, যাহার আধিক্য সম্পদের আধিক্যেই হইবে।)······

এস্থানে আরও একটি হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যাহার অনুবাদ তৃতীয় খণ্ডে ১৪০৮ নম্বরে হইয়াছে। উক্ত হাদীছে নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের ভয় আমি করি না; আমি ভয় করি যে, দুনিয়ার আধিক্য ও প্রশস্ততা তোমাদের লাভ হইবে, তোমরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে উহার প্রতি অগ্রগামী হইবে এবং উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে।

দুনিয়ার চাকচিক্যে ধোকা খাইবে না

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا - ولا يغرنكم بالله الغرور - ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا - انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحب السعير -

"হে লোক সকল! (কবর, হাশর ইত্যাদি) যে সব অনুষ্ঠানের সংবাদ আল্লাহ (তাঁহার কালাম বা রসুল মারফত) দান করিয়াছেন তাহা নিশ্চয় বাস্তব। অতএব এই নিকৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী জীবন যেন তোমাদেরে ধোঁকায় ফেলিতে না পারে। এবং ধোকাবাজ শয়তান যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরে ধোঁকায় ফেলিতে না পারে (যে, গর্হিত বস্তুকে আল্লার নৈকট্যের সূত্র ধারণা করায় বা আল্লার ক্ষমার আশা দিয়া নাফরমানী কাজে তোমাকে নির্ভীক বানাইয়া দেয় কিম্বা নিরাশ বানাইয়া তোমাকে আল্লাহ হইতে দুরে নিয়া যায় ইত্যাদি।)

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; তাহাকে শত্রুই গণ্য কর। শয়তান তাহার দলকে এমন কাজের দিকে আহ্বান করে যাহার পরিণামে তাহারা দোযখী হয়। (২২ পারা ১৩ রুকু)

নেক লোকদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিবে

২৪২৮। হাদীছ:— عن مرداس رضى الله تعالى عنه

قال النبى صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة

অর্থ—মেরদাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নেক লোকগণ এক এক করিয়া দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতে থাকিবে। জবের আটা চালনী দ্বারা ছাঁকিলে যেরূপ আটার উত্তম অংশ নীচে পড়িয়া যায় এবং শুধু মাত্র ভূষী বা চোকলা চালনীর উপর থাকে; তদ্রূপ নেক লোকগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষ হইয়া ভূপৃষ্ঠে শুধু মাত্র চোকলার ন্যায় নিকৃষ্ট লোকগণ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে; আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অস্তিত্বের কোন পরওয়াই করিবেন না। (তাহাদের উপরই কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কায়েম হইবে।)

ধন-দৌলত একটি পরীক্ষার বস্তু উহা সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :—

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমাদের ধন ও জন তোমাদের পক্ষে পরীক্ষার জিনিষ; (যে ব্যক্তি এই সবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তথা এই সবের মোহ কাটাইয়া উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় রাখিতে পারিবে তাহার জন্য) আল্লাহ তায়ালার নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে। (২৮ পারা ১৫ রুকু)

২৪২৯। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ধিক তাহাদের প্রতি যাহারা টাকা-পয়সার গোলাম হয়, কাপড়-চোপড়ের গোলাম হয়, (এমনকি তাহাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি শুধু ঐ সবের উপরই নির্ভর করে—) ঐ সব পাইলেই সন্তুষ্ট, ঐ সব না পাইলে সন্তুষ্টি নাই।

ব্যাখ্যা :—মানুষের কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক অবস্থা এই যে, তাহার চিন্তা-ভাবনার গতি এবং অন্তরের টান ও আকর্ষণ আখেরাতের প্রতি হইবে। তাহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মূল বস্তু আখেরাত হইবে। তাহার মন-মগজে আখেরাতের উন্নতির চিন্তাই হইবে অধিক। দুনিয়ার লাভ-নোকছান তাহার সম্মুখে আখেরাতের মোকাবিলায় দ্বিতীয় নম্বরে তথা পেছনে থাকিবে—এই হইল ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে উহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ মন-মগজে ও চিন্তা-ভাবনায় দুনিয়া সর্ব্বাগ্রে ও প্রথম নম্বরে থাকা, চেষ্টা-তদবীরের বেলায় দুনিয়া সর্ব্বাগ্রে থাকা, তালাশে-অন্বেষণে দুনিয়া সর্ব্বাগ্রে থাকা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মূল বস্তু দুনিয়াকে সাব্যস্ত করা তথা দ্বীনের ক্ষতি হইলে ততটুকু অসন্তুষ্টি নাই যতটুকু অসন্তুষ্টি দুনিয়ার ক্ষতি হইলে আসে—এই শ্রেণীর স্বভাব দ্বীনহীন কাফের লোকদের হইতে পারে। পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তায়ালা এই তথ্যটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কাফেরদের স্বভাব ও পরিচয় উল্লেখ করতঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

অর্থাৎ কাফেরদের অবস্থা ও স্বভাব হয় এইরূপ যে, আমাকে স্মরণ রাখা হইতে, আমার নছিহতকে গ্রহণ করা হইতে অচেতন ও বিমুখ হইয়া থাকে এবং তাহাদের তৎপরতা, তাহাদের লক্ষ্য দুনিয়ার জেন্দেগীর প্রতিই; দুনিয়ার জেন্দেগীই তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুঝ-ব্যবস্থার শেষ সীমা। (২৬ পারা ছুরা নজম)

আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্যও উহাই যে, আখেরাতের প্রতি যাহাদের তৎপরতা নাই, লক্ষ্য নাই—দুনিয়ার ধন-সম্পদই যাহাদের কাম্য, লক্ষ্য ও সন্তুষ্টি এবং যাহাদের তালাশ ও অন্বেষণ একমাত্র দুনিয়ার ধন-সম্পদ তাহাদের প্রতি ধিক্‌কার।

২৪৩০। হাদীছ :— ابن عباس رضى الله تعالى عنه يقول

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আদম সন্তানের কাহারও দুই ময়দান ভরা ধন-সম্পদ মৌজুদ থাকিলেও সে (তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া) তৃতীয় ময়দান ভরার অভিলাষী হইবে। একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের পেটকে ভরিতে পারে। অবশ্য কেহ যদি আল্লার প্রতি ধাবিত হয় তবে আল্লাহ তাহাকে গ্রহণ করেন। (অর্থাৎ যদি কেহ দুনিয়ার লিপ্সা ত্যাগ করিয়া আল্লার সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষী হয় তবে তাহার প্রতি আল্লার রহমতের দৃষ্টি হয়, সে ঐরূপ ঘৃণিত স্বভাব হইতে রক্ষা পায়।)

● মানুষের পেট একমাত্র মাটিই ভরিতে পারে এই বাক্যের উদ্দেশ্য মানুষের সীমাহীন লিপ্সার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থাৎ মাটির নীচে যাওয়াই তাহার পেট ভরিতে পারে তথা মৃত্যু আসিলেই তাহার লিপ্সার সমাপ্তি হইতে পারে অন্য কোন উপায়ে নহে।

২৪৩১। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কার মসজিদে-হারামে **মিম্বারের** উপর দাঁড়াইয়া ভাষণ দান কালে বলিয়াছেন, হে লোক সকল! **হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু** আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন, আদম সন্তানকে এক ময়দান ভরা স্বর্ণ প্রদান করা হইলে সে আর এক ময়দান ভরা স্বর্ণ লাভের অভিলাষী থাকিবে। দ্বিতীয় ময়দান প্রদান করা হইলে তৃতীয় ময়দান লাভের অভিলাষী থাকিবে। একমাত্র মাটিই মানুষের পেট ভরাইতে পারে, অবশ্য যে আল্লার প্রতি ধাবিত হয় আল্লাহ তাহাকে গ্রহণ করেন।

২৪৩২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোন আদম সন্তানের এক ময়দান ভরা স্বর্ণ লাভ হইলে সে আরও তুই ময়দানের অভিলাষী হইবে। তাহার মুখ একমাত্র মাটির দ্বারাই ভর্ত্তি হইতে পারে। অবশ্য যে আল্লার প্রতি ধাবিত হয় আল্লাহ তাহাকে গ্রহণ করিয়া নেন।

দুনিয়ার আকর্ষনীয় বস্তুসমূহ সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ......

"নারী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জিভূত স্বর্ণ-রৌপ্য (তথা নগদ ধনরাশি) উত্তম ঘোড়া (তথা ভাল যানবাহন যথা গাড়ী), পশু পাল (তথা বিভিন্ন রকম সম্পদ) এবং ক্ষেত-খামার (তথা স্থাবর সম্পত্তি)—এই সব লোভনীয় বস্তুনিচয়ের ভালবাসা মানুষের জন্য আকর্ষণীয়। (অর্থাৎ মানুষ এই সব বস্তুর ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া উহার জন্য আল্লার নাফরমানী করিতেও দ্বিধা করে না।)

অথচ এই সবই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী ব্যবহারের বস্তু মাত্র। আর একমাত্র আল্লার নিকটই উত্তম পরিণাম। আপনি বলুন, তোমাদিগকে এমন বস্তুর খোঁজ দিব কি যাহা ঐ বস্তু নিচয় হইতে উত্তম?

যাহারা সংযত জীবন-যাপন করে তাহাদের জন্য তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট বেহেশতের বাগ-বাগিচাসমূহ রহিয়াছে যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহমান রহিয়াছে। তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তথায় পবিত্রাত্মা পরিণীতাগণ থাকিবে, আর থাকিবে তাহাদের জন্য আল্লার সন্তুষ্টি। আল্লাহ জ্ঞাত আছেন সকল বন্দাদের সম্পর্কে।

সংযত জীবন-যাপনকারী তাহারা যাহারা বলিয়া থাকে, প্রভু হে! আমরা ঈমান গ্রহণ করিয়াছি; আমাদের সমুদয় গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং দোযখের আজাব হইতে বাঁচাই রাখিবেন। তাহাদের পরিচয় এই যে—তাহারা ধৈর্য্যশীল, সত্যপরায়ণ, আল্লার হুজুরে বিনম্র এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী"। (৩ পারা ১০ রুকু)

● উক্ত আয়াতে যেই সব বস্তুকে আকর্ষনীয় বলা হইয়াছে ঐ সব বস্তু সম্পর্কে ওমর (রাঃ) এইরূপ দোয়া করিতেন—"আয় আল্লাহ। যে সব জিনিষকে তুমি আমাদের জন্য আকর্ষনীয় বানাইয়াছ আমরা উহার দ্বারা আনন্দিত না হইয়া পারি না, কিন্তু—আয় আল্লাহ! তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই, আমি যেন ঐ বস্তুনিচয়কে সঠিক পথে ব্যয় করিতে সক্ষম হই।

যে মাল আখেরাতের জন্য ব্যয় করা হয় উহাই নিজস্ব

২৪৩৩। হাদীছ:—قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজস্ব ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারী আত্মীয়-স্বজনের ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে? ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাসিয়া থাকি। হযরত (দঃ) বলিলেন, জানিয়া বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ ধন-সম্পদই নিজস্ব যাহা আখেরাতের জন্য ব্যয় করিয়াছ, আর যাহা জমা রাখিয়াছ উহা উত্তরাধিকারী আত্মীয় স্বজনের মাল।

দুনিয়ার ধনী আখেরাতে দরিদ্র হইবে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন:—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ -

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা দুনিয়ার জেন্দেগী এবং উহারই জাঁকজমক, চাক-চিক্য লাভ করা হয় আমি ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে এই দুনিয়ার মধ্যেই তাহাদের চেষ্টা-তদবীরের ফলাফল পুরাপুরীরূপে দিয়া শেষ করিয়া দেই— জাগতিক ফলাফল লাভে তাহারা বঞ্চিত থাকে না (যদি তাহাদের পক্ষে এই ফলাফল লাভের প্রতিবন্ধক কিছু না থাকে)।

এই শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যে আখেরাতে দোযখ ভিন্ন আর কিছুই জুটিবে না। এই দুনিয়াতে তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে (এমনকি যদিও উহা বাহ্যিক নেক আমলও হয়) সবই বরবাদ হইয়া যাইবে এবং যাহা কিছু করিতে থাকিবে ঐ সবও নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন হইবে।" (১২ পারা ২ রুকু)

এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) পূর্ব্বের অনুদিত এক খানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে উল্লেখ আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার ধনীগণই কেয়ামতের দিন বেশী দরিদ্র হইবে। ঐ শ্রেণীর ধনী ব্যতীত যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধন দান করিয়াছেন এবং সে ঐ মাল তাহার চতুর্দিকে (আল্লার সন্তুষ্টি লাভের স্থানে) ব্যয় করিয়াছে, ঐ মাল দ্বারা নেক কাজ করিয়াছে। এস্থলে দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬০ নং হাদীছখানা উল্লেখ হইয়াছে।

ধন সঞ্চয় অপেক্ষা আল্লার পথে ব্যয়ে অধিক আগ্রহশীল ও সন্তুষ্ট হইবে

২৪৩৪। হাদীছ ঃ — আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার লাভ হয় তবে নিশ্চয় আমি আনন্দ পাইব ইহাতে যে, তিনটি দিন অতি বাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই যেন উহার কোন অংশও আমার নিকট সঞ্চিত না থাকে ; অবশ্য শুধু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতিত।

প্রকৃত ধনাঢ্যতা

আল্লাহকে ভুলিয়া যাহারা শুধু দুনিয়াতে লিপ্ত হয় তাহাদের অনেকে ধন-জনের আধিক্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

بَل لَّا يَشْعُرُونَ

"তাহারা কি মনে করিয়া থাকে—আমি যে, তাহাদের ধনে-জনে বাড়াইতেছি ইহা আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য দ্রুত মঙ্গল ও কল্যান সাধন! (তাহা নহে,) বরং তাহারা অনুভব করে না (যে, তাহাদের যাতনা ভোগের এবং ব্যাতিব্যস্ত থাকার উহা এক ফাঁদ মাত্র।)" (১৮ পাঃ ৪ রুঃ)

ঐ শ্রেণীর ধনীরা বাস্তবিকই যাতনা ভোগে থাকে। তাহাদের জন্য একটি সাধারণ যাতনা এই যে, ধন বেশী হইলেও তাহাদের তৃপ্তি লাভ হয় না। ফলে তাহারা সর্ব্বদা ব্যাতিব্যস্ত থাকে এবং যাতনা ভোগ করে। মানসিক শান্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে।

এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই নবী (দঃ) বলিয়াছেন—"আদম-তনয়ের জন্য দুই প্রান্তরপূর্ণ ধন থাকিলে সে তৃতীয়টি পূর্ণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাহার উদর একমাত্র মাটিই পূর্ণ করে। (অর্থাৎ কবরে যাওয়ার পরই তাহার লিপ্সার অবসান হয়)। অবশ্য কিছু সংখ্যকের প্রতি আল্লার সাহায্য থাকে— (তাঁহারা ঐ রূপ হয় না।)

উল্লেখিত হাদীছ দৃষ্টে আয়াতের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট যে, মনের তুষ্টি না থাকায় ধনবানদের শান্তি লাভ হয় না। অতএব ধনের ধনী অপেক্ষা মনের ধনীই প্রকৃত ধনী।

২৪৩৫। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রকৃত ধনাঢ্যতা ধন-সম্পত্তির আধিক্য দ্বারা লাভ হয় না; প্রকৃত ধনাঢ্যতা হইল অন্তরের ধনাঢ্যতা।

দারিদ্রের ফজিলত

২৪৩৬। হাদীছঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াচেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতে ছিল। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁহার নিকট বসা আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তিকে তোমরা কিরূপ গণ্য করিয়া থাক? সে বলিল, এই লোকটি অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক। খোদার কসম—এই ব্যক্তি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করিলে অবশ্যই তাহার প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবে, সুপারিশ করিলে অবশ্যই গ্রহণীয় হইবে।

এই বক্তব্য শ্রবণে হযরত (দঃ) চুপ থাকিলেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি হযরতের নিকট দিয়া যাইতে ছিল, তাহার সম্পর্কেও হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার সে মন্তব্য করিল, এই লোকটি মোসলমানদের মধ্যে একজন দরিদ্র লোক; কোথাও তাহার বিবাহের প্রস্তাব কেহ গ্রাহ্য করিবে না, তাহার সুপারিশ কেহ গ্রহণ করিবে না, তাহার কথার কেহ কোন মূল্য দিবে না।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ (প্রথম) ব্যাক্তির স্থায় লোক জগৎ ভরা হইলেও তাহাদের অপেক্ষা এই (দ্বিতীয়) একজন লোকই উত্তম।

২৪৩৭। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত সম্পর্কে আমি অবগতি লাভ করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি; উহার অধিকাংশ অধিবাসী এমন লোকগণ হইবে যাহারা পার্থিব জীবনে দরিদ্র ছিল। দোযখের অবগতিও লাভ করিয়াছি; তাহাতে দেখিয়াছি, উহার অধিকাংশ অধিবাসী হইবে নারী।

ছাহাবীগণের জেন্দেগীর নমুনা

২৪৩৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই—সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, অনেক সময় আমি ক্ষুধার জ্বালায় পেটকে মাটির সঙ্গে চাপা দিয়া থাকিতাম এবং কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিতাম।

একদা আমি লোকদের চলাচল পথে বসিয়া গেলাম, আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে কোরআন শরীফের একটি আয়াত জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি যেন আমার অনাহারী হওয়ার ইঙ্গিত পাইয়া আমাকে আহারে তৃপ্ত করেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেন—আমার উদ্দেশ্য পুরণ করিলেন না। অতঃপর ওমর (রাঃ) সেই পথে যাইতে লাগিলেন, তাঁহাকেও আমি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও চলিয়া গেলেন আমার উদ্দেশ্য পূরণ করিলেন না। অতঃপর হযরত (দঃ) যাইতে লাগিলেন এবং মুস্কি হাসি হাসিলেন। হযরত (দঃ) আমার চেহারা দেখিয়া আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন—হে আবু হোরায়রা! আমি আরজ করিলাম, গোলাম উপস্থিত আছি—ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার গৃহে আস—এই বলিয়া হযরত (দঃ) নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন। আমি তাঁহার পেছনে চলিলাম; হযরত (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম হযরত (দঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন।

হযরত (দঃ) গৃহে এক পেয়ালা দুধ দেখিতে পাইলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুধ কোথা হইতে আসিল ? গৃহবাসীগণ বলিল, অমুক ব্যক্তি এই দুধ আপনাকে হাদিয়া দিয়াছে। হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন—আবু হোরায়রা ! আমি আরজ করিলাম, গোলাম হাজির আছি—ইয়া রসুলুল্লাহ ! হযরত (দঃ) বলিলেন, ছোফ্‌ফা-বাসীগণকে ডাকিয়া নিয়া আস। ছোফ্‌ফাবাসীগণ সকল মোসলমানদের মেহমান ছিলেন। তাঁহারা মসজিদের বারিন্দায় রাত্রি যাপন করিতেন, তাহাদের বাড়ী-ঘর পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না, তাঁহাদের ব্যয়ভার বহনেরও কেহ ছিল না। হযরতের নিকট কোন দান-খয়রাত আসিলে হযরত (দঃ) তাহা সম্পূর্ণই তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, আর হাদিয়া আসিলে হযরত (দঃ) উহার কিছু অংশ নিজে রাখিতেন এবং অবশিষ্টাংশ তাঁহাদেরকে দিয়া দিতেন।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন এই এক পেয়ালা দুধের জন্য ছোফ্‌ফাবাসীগণকে ডাকিয়া আনা আমার মনঃপুত হইল না। আমি ভাবিলাম, এই পরিমান দুধ ছোফ্‌ফাবাসীদের সংখ্যানুপাতে কি ? এই দুধ আমি একা পান করিয়া বল-শক্তি লাভ করিতে পারিলে তাহাই শ্রেয়ঃ হইত। পক্ষান্তরে তাহারা সকলে উপস্থিত হইলে ত হযরত (দঃ) নিজ স্বভাবানুযায়ী আমাকেই আদেশ করিবেন প্রথমে ইহা তাহাদের মধ্যে বন্টন করার জন্য ; অবশেষে আমার ভাগ্যে এই দুধ হইতে কি জুটিবে ? কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমি ছোফ্‌ফাবাসীদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে ডাকিলাম, তাঁহারা হযরতের গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন ; হযরত (দঃ) অনুমতি দিলেন। তাঁহারা গৃহে আসিয়া বসিলেন। হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন—আবু হোরায়রা ! আমি আরজ করিলাম, গোলাম হাজির আছি—ইয়া রসুলাল্লাহ ! হযরত (দঃ) বলিলেন, দুধের পেয়ালা নিয়া তাহাদেরকে পান করাও। আমি তাহা আরম্ভ করিলাম এবং একের পর এক—প্রত্যেককেই তৃপ্তি সহকারে পান করাইলাম। তাঁহারা সকলে তৃপ্ত হওয়ার পর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌছিলাম। হযরত (দঃ) পেয়ালা হাতে নিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং মুস্কি হাসি হাসিলেন। আর বলিলেন, আমি ও তুমিই বাকি ! আমি আরজ করিলাম, হাঁ—আমরাই বাকি রহিয়াছি।

হযরত (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি বস এবং দুধ পান কর, আমি বসিয়া পান করিলাম। হযরত দঃ) বলিলেন, আরও পান কর, আমি পুনঃ পান করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বার বার আরও পান কর বলিতে ছিলেন, অবশেষে আমি আরজ করিলাম, খোদার কসম—আমার পেটে আর জায়গা নাই।

অতঃপর দুধের পেয়ালা হযরতের হস্তে দিলাম। হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন এবং বিছমিল্লাহ বলিয়া অবশিষ্ট দুধ পান করিলেন।

মধ্য পন্থায় নেক আমলে আত্মনিয়োগ করা

২৪৩৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বলিলেন—

"তোমাদের কাহাকেও তাহার আমল নাজাত বা মুক্তি দিতে পারিবে না।" ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনাকেও নয় ইয়া রসুলাল্লাহ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমাকেও আমার আমল নাজাত দিতে পারিবে না যদি না আল্লার রহমত আমাকে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া নেয়। অবশ্য তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে থাক এবং আল্লার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। আর সকালে বিকালে ও শেষ রাত্রির অন্ধকারে এবাদতের অভ্যাস কর এবং মধ্য পন্থায় নেক আমলে আত্মনিয়োগ করিয়া চল, উদ্দেশ্য স্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—অতিশয় চতুর শয়তান যখন কাহারও অন্তরে এবাদৎ-বন্দেগীর স্পৃহা দেখিতে পায় এবং সে বুঝিতে পারে যে, বাধা দিয়া এই স্পৃহাকে দমন করা যাইবে না তখন সে তাহাকে এত অধিক পরিমাণের এবাদতে আকৃষ্ট করে যাহা তাহার নিকট অচিরেই এক অসাধ্য বোঝারূপে পরিগণিত হইবে এবং সে নিজেই হাত-পা গুটাইয়া বসিবে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা এই যে, একেবারে কমও নয় আবার অতি অধিকও নয়—বরং মধ্য পন্থার পরিমাণে এবাদৎ অবলম্বন করিবে যাহা সর্ব্বদা আমল করিয়া যাওয়া সহজ সাধ্য হয়।

২৪৪০। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে থাক এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর (যে, উহার দ্বারা তোমরা আল্লার রহমত লাভ করিতে পারিবে এবং আল্লার রহমতের অছিলায়ই বেহেশ্‌ত লাভ হইবে।) নিশ্চয় জানিয়া রাখিও শুধু আমল কাহাকেও বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারে না। +

+ বেহেশত এক অসীম অফুরন্ত ও অসংখ্য নেয়ামতরাশির মহল। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের অল্প সংখ্যক আমল দ্বারা উহা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। উহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতেই লাভ হইতে পারে। অবশ্য আল্লার রহমত পাওয়ার জন্য আমলের আবশ্যক। আমলের দ্বারা আল্লার সন্তুষ্টি হাসিল হইবে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করুণা ও কৃপা এবং রহমত দ্বারা বেহেশত দান করিবেন।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনিও আপনার আমল দ্বারা বেহেশতের অধিকারী হইতে পারিবেন না? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও বেহেশত লাভ করিতে পারিব না যাবৎ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপাদ-মস্তক তাঁহার মাগফেরাত—ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আবৃত করিয়া নেন।

২৪৪১। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছেরাতে-মোস্তাকীম সোজা পথ তথা দ্বীন-ইসলামের উপর চলিতে থাক। এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিয়া যাইতে থাক। (এই সাধনায় বিরামহীন হইতে হইবে; কোন স্তরেই আমলকে পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া শিথিল হইবে না।) বিশ্বাস রাখিও তোমার আমল (যত পরিমাণেরই হউক উহা অসীম নেয়ামত-ভাণ্ডার) বেহেশতের অধিকারী তোমাকে বানাইতে পারিবে না। জানিয়া রাখিও, যে আমল সর্ব্বদা আদায় করা হয় উহাই আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয় যদিও পরিমাণে কম হয়। (কারণ, দীর্ঘ দিনের অল্প পরিমাণের সমষ্টিও দুই-চার দিনের অধিক পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।)

ব্যাখ্যাঃ—কোন মানুষ তাহার দীর্ঘ জীবনের আমলকে অধিক দেখিয়া পর্য্যাপ্ত ভাবিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ এবাদতের অসাধারণ ছওয়াব ও ফজিলত কোরআন-হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা—লাইলাতুল-কদরের এবাদত এবং চাশ্‌তের নামায এবং বিভিন্ন জিকির ও দোয়া। এই সব দৃষ্টে ছওয়াবের জমা (Credit) অনেক বেশী মনে করিয়া কোন কোন লোক শিথিল হইতে চায়। তাহারা বোকা; তাহারা শুধু (Credit) বা জমার হিসাবই দেখে, (Debit) বা ভোগ করিয়া ফেলা ও উঠাইয়া ফেলার হিসাবের প্রতি লক্ষ্যই করে না। অথচ হাদীছে ইহাও আছে—মানুষের শরীরে ও অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যতগুলি জোড়া আছে, প্রতি দিন প্রভাতে (ঘুম হইতে উঠিয়া দীর্ঘ সময় ঐগুলি অচল থাকার পর যখন চলমান দেখে তখন) উহার প্রত্যেকটির বিনিময়ে এক একটি ছদ্‌কা দান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

(মেশকাত শরীফ, ১১৬)

এতদ্ভিন্ন পানি, বাতাস, আহার ইত্যাদি অসংখ্য নেয়ামত মানুষ ভোগ করিতেছে। সারা জীবনের এবাদতে একটি নেয়ামতের হক্‌ও ত আদায় হইবে না। অতঃপর বেহেশত হইল চিরস্থায়ী, উহার নেয়ামত হইল অসীম অগণিত। মানুষের বয়স যাহা নিতান্তই সীমিত সময়; এই সময়টুকুর সামান্য এবাদৎ ঐ অসীম চিরস্থায়ী অগণিত নেয়ামতরাশির বিনিময় হইতে পারে কিরূপে? তাই বলা হইয়াছে, কাহারও আমল তাহাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারে না। এমনকি উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে নবী (দঃ) নিজের সম্পর্কেও বলিয়াছেন,

আমার সারা জীবনের আমলও আমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারিবে না—একমাত্র আল্লাহই যদি আমাকে আপাদমস্তক তাঁহার মাগফেরাত ও রহমতে নিমজ্জিত করিয়া নেন, তবেই আমি বেহেশতে যাইতে পারিব।

অবশ্য আল্লার মাগফেরাত ও রহমত একমাত্র আমলের অছিলায়ই লাভ হইতে পারিবে—ইহা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত নিয়ম ও বিধান। সীমীত ও অপর্য্যাপ্ত আমলের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত লাভ হইবে। এবং সেই অসীম রহমতে বেহেশত লাভ হইবে। অতএব বেহেশত লাভে আমলের বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। এবং এই সূত্রেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, বেহেশতবাসীগণকে আল্লাহ তায়ালা (Thanks) ও ধন্যবাদ দানে বলিবেন—

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "এই বেহেশত তোমাদেরে দান করা হইল তোমাদের আমলের বদৌলতে।" ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "তোমাদের আমলের প্রতিদানে তোমারা বেহেশতে প্রবেশ কর।"

২৪৪২। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন্ প্রকার আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয়? নবী (দঃ) বলিলেন, যেই আমল সর্ব্বদা করা হয়—যদিও পরিমাণে কম হয়। তোমাদের জন্য সহজ-সাধ্য পরিমাণ আমলই তোমরা অবলম্বন করিও।

২৪৪৩। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষ করিয়াই মিম্বারে আরোহণ করিলেন। এবং মসজিদের সম্মুখস্ত দেওয়ালের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, তোমাদেরকে লইয়া এই নামায পড়ার সময়েই বেহেশত-দোযখের দৃশ্য আমাকে এই দেওয়ালের নিকটবর্ত্তী দেখানো হইয়াছে। ভাল এবং মন্দের এই দৃশ্যের তুলনা আর কখনও দেখি নাই।

ব্যাখ্যা :—নামাযের মধ্যে এই দৃশ্য দেখাইবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বেহেশত লাভ করিতে হইলে এবং দোযখ হইতে মুক্তি চাহিলে নেক আমল সর্ব্বদা করিয়া যাইতে হইবে।

আজাবের ভয় এবং রহমতের আশা উভয়ের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে

বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ (রঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি আমার পক্ষে সর্ব্বাধিক চিন্তার কারণ :—

لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ

اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইহুদ-নাছারা কেতাবধারীগণকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—"যাবৎ না তোমরা তৌরাত ইঞ্জিল কেতাব এবং আল্লাহ প্রদত্ত সমুদয় বিষয়াবলীকে পূর্ণরূপে আমল ও প্রতিষ্ঠা কর তাবৎ তোমরা দ্বীনের কোনও স্তরে আছ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।"

আমাদের বেলায় কোরআন সম্পর্কেও ঠিক এই বিধি-বিধানই প্রযোজ্য হইবে।

২৪৪৪। **হাদীছ:—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ

يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهٗ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ

فِىْ خَلْقِهٖ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَّاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ

مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ

اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَاْمَنْ مِنَ النَّارِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা যখন "দয়া" সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উহাকে একশত ভাগরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর উহার নিরানব্বই ভাগকে তিনি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন, শুধু এক ভাগ (পশু-পক্ষী, মানব-দানব ইত্যাদি) সমুদয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন (যাহার প্রতিক্রিয়ায় মাতা-পিতা নিজ সন্তানের প্রতি এবং আত্মীয়-স্বজন পরস্পর দয়া ও স্নেহ মমতা করিয়া থাকে।)

আল্লাহ তায়ালার নিকট দয়া ও কৃপা যে পরিমাণ রহিয়াছে কাফের ব্যক্তি যদি উহার উপলব্ধি করিতে পারিত তবে সেও বেহেশত লাভের আশা ত্যাগ করিত না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার নিকট আজাবের ব্যবস্থাও এরূপ রহিয়াছে যে, মোমেনও যদি উহার উপলব্ধি করিতে পারে তবে সেও দোযখ হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—মোছলেম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সৃষ্ট জীবকে প্রদত্ত এই এক ভাগ দয়াও আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য উঠাইয়া লইবেন এবং পূর্ণ একশত ভাগ দয়া ও রহমত লইয়া আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রতি রহমত ও দয়া প্রদর্শন করিবেন।

দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্য্য ধারন করা তবুও আল্লার নিষিদ্ধ কাজ না করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ - لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ - وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ - اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

"আপনি আমার কথাটি বলিয়া দিন—হে আমার বন্দাগণ যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছ! তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগরকে ভয় করিয়া জীবন যাপন করিও। যাহারা ভাল কাজ করিবে তাহারা ইহজগতেও ভাল ফল লাভ করিবে। আল্লার জমিন সুপ্রসস্ত ; (ভাল কাজ করায় কোথাও বাধা থাকিলে অন্যত্র সুযোগস্থলে চলি যাও। আল্লার নাফরমানী হইতে বাঁচিবার জন্য কষ্ট করিতে হইলে তাহা অবশ্যই কর। উহাতে কুণ্ঠিত হইও না ; স্মরণ রাখিও—) নিশ্চয় যাহারা (আল্লার নাফরমানী পরিহার করিয়া চলায় দুঃখ-কষ্টের উপর বা লোভ সংবরণ করায়) ধৈর্য্য ধারণকারী হইবে আল্লাহ তাহাদের প্রতিদান পূর্ণ ও বেহিসাব দিবেন।" ২৩পাঃ ১৬রুঃ

● ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, "জীবনের সুখ-শান্তির শর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছবর ও ধৈর্য্যকেই পাইয়াছি।"

ধন-জনের সল্পতা ক্ষেত্রেও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা থাকিলে সুখ-শান্তি আছে। পক্ষান্তরে ধন-জনের প্রাচুর্য্যতার মধ্যে থাকিয়াও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা না থাকিলে সুখ-শান্তি ভাগ্যে জুটে না।

আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কোল বা ভরসা করা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করিবে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হইবেন।"

২৪৪৫। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتى
سبعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى
ربهم يتوكلون

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা-হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহাদের মধ্যে এই গুণ কয়টি হইবে—মন্ত্র-তন্ত্র, তাহারা গ্রহণ করিবে না। কোন বস্তুকে অশুভ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ মাত্রায় ভরসা স্থাপনকারী হইবে।

মুখকে সংযত রাখা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

"মানুষ যে কোন বাক্য মুখের বাহির করে উহা সংরক্ষণের জন্য ফেরেশতা তাহার নিকট মোতায়েন থাকে।"

২৪৪৬। হাদীছ :— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لى ما بين لحييه
وما بين رجليه اضمن له الجنة

অর্থ—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কথা মতে দুইটি বস্তুকে সংযত রাখার দায়িত্ব পালন করিবে আমি তাহার জন্য বেহেশত লাভের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। (১) উভয় চোয়ালের মধ্যবর্ত্তী বস্তু (অর্থাৎ জবান। জবানকে সংযত রাখিবে খাওয়ার ব্যাপারে এবং কথার ব্যাপারে।) (২) উভয় রানের মধ্যবর্ত্তী বস্তু (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়কে। উহাকে সংযত রাখিবে ব্যভিচার হইতে।)

২৪৪৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد يتكلم بالكلمة

مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, মানুষ অসংযত ভাবে—(তাৎপর্য্য ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি) লক্ষ্য না করিয়া এমন কথা বলিয়া ফেলে যদ্দরুণ সে দোযখের মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুরত্বের গভীরতায় পতিত হয়।

২৪৪৮। **ছাদীছ** :— عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ কোন সময় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ভাজন বাক্য বলে—হয় ত সে উহার প্রতি মনোযোগও দেয় নাই, তবুও আল্লাহ তায়ালা উহার বদৌলতে তাহার মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা অনেক বেশী বাড়াইয়া দেন।

পক্ষান্তরে কোন সময় মানুষ আল্লার অসন্তুষ্টির বাক্য বলিয়া ফেলে—সে হয় ত উহার প্রতি লক্ষ্যও করে নাই, কিন্তু উহার দরুণ সে দোযখে পতিত হইয়া যায়।

আল্লার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা

২৪৪৯। **ছাদীছ** :— হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এক উম্মতের এক ব্যক্তি স্বীয় আমল সম্পর্কে খারাব ধারণা পোষণ করিত (তাহার চেতনা ও অনুভূতি ছিল যে, তাহার আমল খারাব)। তাই সে তাহার পরিবারের লোকদিগকে বলিল, আমি মরিয়া গেলে আমার দেহকে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দিন সমুদ্রের মধ্যে উহা ছড়াইয়া দিও। পরিবারের লোকজন তাহাই করিল।

আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দেহের সমুদয় অংশকে একত্রিত করিলেন এবং পুনঃর্জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কার্য্য তুমি কেন করিয়াছিলে? সে আরজ করিল, একমাত্র আপনার ভয়-ভীতির দরুণই আমি এরূপ করিয়া ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি (দয়া পরবশ হইয়া) তাহার ক্ষমা করিয়া দিলেন।

২৪৫০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পূর্ব্ববর্ত্তী এক উম্মতের একজন লোকের আলোচনা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে যথেষ্ট ধন-জন দান করিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু যখন নিকটবর্ত্তী তখন সে তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তোমরা পিতারূপে কেমন মনে কর? তাহারা বলিল, অতি উত্তম! সে বলিল, তোমাদের এই পিতা আল্লার দরবারে ভাল পরিগণিত কোন কাজই করে নাই। অতএব সে আল্লার দরবারে পৌঁছিলে আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই আজাব দিবেন। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর আমার দেহকে আগুনে পোড়াইবে, আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেলে পর উহাকে পেষণ করিবে। তারপর প্রবল ঝড়ের দিন উহাকে (অর্দ্ধাংশ সমুদ্র এলাকায় এবং অর্দ্ধাংশ স্থল এলালায় ↑) বাতাসে উড়াইয়া দিবে। খোদার কসম—সে তাহার পুত্রদের হইতে খুব পাকা-পোক্তা রূপে এই অঙ্গীকার নিয়া নিল। পুত্রগণ অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করিল এবং তাহাকে ঐরূপে ঝড়োয়া বাতাসে উড়াইয়া দিল।

(আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রকে আদেশ করিলেন, ঐ ব্যক্তির সমুদয় অংশকে একত্রিত করিয়া দেওয়ার এবং স্থলভাগকেও আদেশ করিলেন; ↑) অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ আসিল, "হইয়া যাও" তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি জীবিত হইয়া দাঁড়াইল।

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার বান্দা! তুমি ঐরূপ করিয়াছিলে কেন? সে উত্তর করিল, (আপনি ত সব কিছুই জানেন;) আমি একমাত্র আপনার ভয়ে ভীত হইয়া ঐরূপ করিয়া ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহার প্রতি রহমত ও দয়া করিয়াছেন (এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন ↑।)

● আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে উপস্থিত করায় চোখের অশ্রু বহিলে উহার মর্ত্তবা অনেক বেশী। প্রথম খণ্ডে ৪০০নং হাদীছে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া অশ্রু বহাইয়াছে সে কেয়ামত দিবসে কঠিন হাশর মাঠে আল্লার রহমতের ছায়া লাভ করিবে।

উম্মতের প্রতি হযরতের দরদ

২৪৫১। হাদীছ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه قال
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ كَمَثَلِ

↑ ↑ ↑ তিনটি বন্ধনীর বিষয় বস্তু ১১১৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ

فَالنَّجَاءَ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهٗ طَائِفَةٌ فَاَدْلَجُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ

طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ كَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَا

جِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মহাসংবাদ তথা কেয়ামতের সংবাদ এবং তথায় আল্লার আজাব হইতে পরিত্রাণ দানকারী দ্বীন লইয়া মানব সমক্ষে ঝাপাইয়া পড়ার দৃশ্যে) আমার এবং আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীনের দৃষ্টান্ত এরূপ—এক ব্যক্তি স্বীয় জাতির নিকট দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, শত্রু বাহিনী আমাদের প্রতি ধাওয়া করিয়াছে—আমি নিজ চোখে দেখিয়া আসিলাম; আমি তোমাদের জন্য আসন্ন বিপদের চরম সতর্ককারী; তোমরা বাঁচিবার জন্য অতি তাড়াতাড়ি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। ঐ ব্যক্তির সতর্কবাণী ও তাহার পরামর্শ অনুসরণ করিয়া এক দল লোক ব্যতিব্যস্ততা ও তাড়াহুড়া ব্যতিরেকে—সময় থাকিতে রাত্রির অন্ধকারেই সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে চলিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা শত্রুর হাত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে। অপর এক দল লোক তাহারা সতর্ককারীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছে, তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই এবং নিজ স্থানেই রহিয়া গিয়াছে; ফলে ভোর হইতে না হইতেই তাহারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং শত্রু বাহিনী তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

যাহারা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং আমার আনিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছে, আর যাহারা আমার বিরোধিতা করিয়াছে এবং আমার আনিত সত্য দ্বীনকে মিথ্যা বলিয়াছে—উভয় দলের অবস্থা উল্লেখিত দুই শ্রেণীর লোকদের অবস্থানুরূপ।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশ্ব-মানবের জন্য পর-জীবনের আসন্ন আজাব—কবরের আজাব, দোযখের আজাব হইতে সতর্ককারী এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী। যাহারা তাঁহার সতর্কবাণী ও আহ্বানের অনুসরণ করিবে এবং ইহ-জীবন থাকিতেই রক্ষা ব্যবস্থা তথা দ্বীন-ইসলাম অবলম্বন করিবে তাহারা আজাব হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছে, তাঁহার আহ্বানে

কর্ণপাত করে নাই; পর-জীবনের প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা অনন্ত আজাবে পরিবেষ্ঠিত হইয়া পড়িবে।

২৪৫২। হাদীছঃ— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه انه

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلى ومثل الناس

كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه

الدواب التى تقع فى النار يقعن فيها وجعل ينزعهن ويغلبنه

فيتقحمن فيها فانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون فيها

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, মানব জাতির প্রতি আমার যেরূপ দরদ তাহার দৃষ্টান্ত এই—এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে, আগুনের আলো যখন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তখন ফরিং ও বিভিন্ন পোকা যেগুলি অগ্নি-আলোর মাতোয়ালা ঐ আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল। আর ঐ ব্যক্তি ফরিং ও পোকাগুলিকে থামাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয় এবং ঐগুলি আগুনে পড়িতে থাকে।

(হযরত (দঃ) বলেন, হে মানব! তোমাদের ও আমার অবস্থাও তদ্রূপই—) আমি তোমাদের কোমর জড়াইয়া ধরি; তোমরা যেন দোযখে পতিত না হও, কিন্তু তোমরা বলপূর্ব্বক ছুটিয়া যাইয়া দোযখে পতিত হইতে থাক।

অর্থাৎ যেই কার্য্যাবলীর দরুণ দোযখে যাইতে হয় ঐরূপ কার্য্যাবলী হইতে বিরত থাকার জন্য আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদা বুঝাইতে থাকি, কিন্তু তোমরা বিরত থাক না—আমার কথা উপেক্ষা করিয়া তোমরা ঐ সব কাজে লিপ্ত হও।

মানুষের সম্মুখে ভয়ঙ্কর অবস্থা আগত

২৪৫৩। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم

قليلا ولبكيتم كثيرا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মানুষের সম্মুখে মৃত্যুর পর যে ভয়ঙ্কর অবস্থা আগত

তাহা সম্পর্কে) আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে খোদার কসম— তোমরা হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী।

২৪৫৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দিলেন—তাঁহার সেই ভাষণের ন্যায় ভাষণ আর কখনও শুনি নাই। হযরত (দঃ) সেই ভাষণে বলিয়া ছিলেন, আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে, তবে খোদার কসম—তোমরা হাসিতে কম কাঁদিতে বেশী।

আনাছ (রাঃ) বলেন, এতচ্ছ্রবণে রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ নিজ নিজ মুখমণ্ডল কাপড়ের আড়ালে নিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দোযখে যাওয়ার কাজগুলি অতিশয় লোভনীয়

২৪৫৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দোযখকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে চিত্তাকর্ষক কার্য্যাবলীর দ্বারা এবং বেহেশতকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে রুচি বিহীন কার্য্যাবলীর দ্বারা।

অর্থাৎ যে সব কাজ করিলে দোযখে যাইতে হয় সেই সব কাজ শয়তান ও নফ্ছ তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সাধারণতঃ স্থরোচক ও চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিকৃত রুচি ও নকল আকর্ষণ ত্যাগী হইতে পারিলেই দোযখ হইতে বাঁচা সম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে বেহেশত লাভের জন্য সে সব আমলের আবশ্যক সেইগুলি নফ্ছ ও মানব-প্রবৃত্তির নিকট তিক্ত বোধ হইয়া থাকে। অবশ্য নফ্ছ ও শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া রুহ বা আত্মাকে নফ্ছের উপর প্রবল ও প্রধান বানাইয়া নিতে পারিলে তখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বিপরীত হইয়া যায়; মানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তাহাই কাম্য।

বেহেশত-দোযখ মানুষের অতি নিকটে

২৪৫৬। হাদীছ ঃ— عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنْ

شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাদুকার ফিতা পায়ের যত নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক মোসলমানের জন্য বেহেশত ততোধিক নিকটবর্ত্তী এবং দোযখও তদ্রূপই।

অর্থাৎ বেহেশত এবং দোযখ উভয়টিই মানুষের অতি নিকটবর্ত্তী তথা মানুষেরই আমলের ফলাফল।

জাগতিক ব্যাপারে নিজ হইতে নিকৃষ্টের প্রতি নজর করা চাই

২৪৫৭। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও যদি নিজের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী বা উন্নত দেহের অধিকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন স্তরের মানুষের প্রতি দৃষ্টি করিবে।

নেক বা বদের ইচ্ছা উদিত হইলে?

২৪৫৮। হাদীছঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه قال ان الله

تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم

يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبها

الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة

ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان

هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালা হইতে হাদীছ-কুদ্‌সীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নেক ও বদের ফিরিস্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; অতঃপর (শরীয়তের মাধ্যমে) উহা বর্ণনাও করিয়া দিয়াছেন। এখন কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি নেক আমলের ছওয়াব লিখিয়া দেন। আর যদি নেক কাজের ইচ্ছা করিয়া উহাকে কার্য্যেও পরিণত করে তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ দরবারে তাহার জন্য ঐ একটি নেক আমলের ছওয়াব দশ হইতে সাত শত গুণ, বরং আরও অনেক অধিক গুণ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখেন।

পক্ষান্তরে কেহ কোন গোনাহের কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত না করিলে তাহার জন্য পূর্ণ একটি নেক আমলের ছওয়াব লিখিয়া রাখেন। আর যদি ইচ্ছা করিয়া উহা কার্য্যেও পরিণত করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মাত্র একটি গোনাহ লিখিয়া রাখেন।

ছোট ছোট গোনাহ হইতেও বাঁচিতে হইবে

২৪৫৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এক শ্রেণীর গোনাহের কার্য্য করিয়া থাক—যেগুলি তোমাদের দৃষ্টিতে চুল অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম দেখায়, কিন্তু হযরত নবী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় আমরা ঐ শ্রেণীর গোনাহকেও মানুষের পক্ষে ধংসকারী গণ্য করিতাম। (এবং সেই দৃষ্টিতেই উহা হইতে বিরত থাকিতাম।)

নেক আমলের ছওয়াব ভোগ করা শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল, অতএব শেষ অবস্থা সম্পর্কে শঙ্কিত ও সতর্ক থাকা চাই

অর্থাৎ কেহ সারা জীবন বহু নেক কাজ করিয়া শেষ জীবনে এমন কোন গোনাহ করিল যাহাতে সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হইয়া গেল ঐ ব্যক্তি তাহার নেক আমলের ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।

তৃতীয় খণ্ডে ১৩৩৮ নং হাদীছে এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে। সে জেহাদের মধ্যে অনেক বিরত্বের কাজ করিয়াও উহার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইল তাহার শেষ অবস্থা এই হইল যে, আত্মহত্যায় তাহার মৃত্যু হইল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবী (দঃ) তাহাকে দোযখী বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন।

অতএব মানুষকে জীবনের শেষ অবস্থার জন্য শঙ্কিত ও সতর্ক থাকিতে হইবে।

অসৎ লোকের সঙ্গ অপেক্ষা একা থাকা উত্তম

প্রথম খণ্ডে ১৮নং হাদীছে উল্লেখ আছে যে, দ্বীন রক্ষার্থে লোক-জনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতে নির্জ্জন বাস অবলম্বন করা উত্তম।

লোকদেরকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কাজ করা

২৪৬০। হাদীছ ঃ—জুন্দুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ

"যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা (উহার পরিণামে দুনিয়াতে বা আখেরাতে) তাহার কুখ্যাতি ছড়াইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা (উহার পরিণামে দুনিয়াতে বা আখেরাতে) তাহার সেই দোষ লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন।"

যে ব্যক্তি সাধনা করিয়া নিজেকে আল্লার গোলামীতে নিয়োজিত রাখিবে

২৪৬১। হাদীছ ঃ—মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাথে একই উটে আরোহিত ছিলাম। আমি তাঁহার পেছনেই ছিলাম; উভয়ের মধ্যে হাওদার খুঁটা ভিন্ন আর কোন কিছুই ছিল না। হযরত (দঃ) আমাকে "হে মোয়াজ" বলিয়া ডাকিলেন। আমি বলিলাম, হাজির আছি—ইয়া রসুলুল্লাহ এবং তাবেদারীর জন্য প্রস্তুত আছি। কিছু সময় চলার পর হযরত (দঃ) পুনরায় ডাকিলেন; আমিও ঐরূপ উত্তর দিলাম। আবার কিছু সময় চলিলেন এবং তৃতীয় বার আমাকে ডাকিলেন এবং আমি ঐ উত্তরই দিলাম। (এইভাবে তিনবার আমার মনোযোগকে আকৃষ্ট করিয়া) অতঃপর বলিলেন, তুমি কি জান, আল্লার হক্ বা দাবী তাঁহার বন্দাদের উপর কি? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভালরূপে জানেন।

হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার হক্ তাঁহার বন্দাদের উপর এই যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই গোলামী করিবে; তাঁহার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করিবে না। (অর্থাৎ এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুরই গোলামী করিবে না।)

আবার কিছু সময় চলিলেন এবং পুনরায় আমাকে ডাকিলেন—হে মোয়াজ! আমি বলিলাম, উপস্থিত আছি—ইয়া রসুলুল্লাহ! এবং তাবেদারীর জন্য প্রস্তুত আছি। এইবার বলিলেন, বন্দাগণ যদি উক্ত দাবী পুরণ করে তবে আল্লার উপর

বন্দাদের দাবী কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভালরূপে জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার উপর বন্দাদের হক্ এই হইবে যে, তিনি তাহাদিগকে আজাব দিবেন না। (আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় উহাকে নিজের উপর বন্দাদের দাবীরূপে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।)

ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া চলিবে

২৪৬২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আরোহণের একটি উট ছিল—উহার নাম ছিল "আজ্বা"। উটটি সর্ব্বদাই সর্ব্বাগ্রে থাকিত; একদা এক বেদুইন একটি উটে চড়িয়া আসিতে ছিল, হযরতের আজ্বা উট সেই উটটির পেছনে পড়িয়া গেল। তাহাতে মোসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইল এবং বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, আজ্বা উট পেছনে পড়িয়া গেল! সেই উপলক্ষে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, তিনি কোন জিনিষকে ঔদ্ধত্যের পর্য্যায়ে উঠিবার সুযোগ দিলে তাহাকে পতিত করিয়া থাকেন। (সুতরাং নিজে নিজেই ছোট তথা বিনয়ী হইয়া থাকা ভাল। তাহাতে আল্লার দয়ার দৃষ্টিই হইতে থাকিবে।)

আল্লাহকে ভালবাসিবার পরিচয়

২৪৬৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ

وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا

اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَيَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ

فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ

يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنْ

اِسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ اَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِىْ عَنْ

نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শক্রতা বাধায় তাহার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ হইতে যুদ্ধের ঘোষণা রহিয়াছে।

আর আমার বন্দার জন্য আমার নৈকট্য লাভ করিতে সর্ব্বাধিক প্রিয় ও পছন্দিত বস্তু উহাই যাহা আমি তাহার উপর ফরজ করিয়া দিয়াছি। এবং আমার বন্দা বিভিন্ন নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি করিয়া যাইতে পারে। এমনকি সে আমার প্রিয় পাত্র হইয়া যায়; ফলে আমি তাহার কান হইয়া যাই যদ্দারা সে শ্রবণ করে। তাহার চক্ষু হইয়া যাই যদ্দারা সে দেখে। তাহার হাত হইয়া যাই যদ্দারা সে ধরিয়া থাকে। তাহার পা হইয়া যাই যদ্দারা সে চলিয়া থাকে এবং সে আমার নিকট কিছু চাহিলে অবশ্যই আমি তাহাকে উহা দিয়া থাকি। আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে আশ্রয় দেই।

আর একটি কথা এই যে, আমি কোন কাজ করিতে ইতঃস্তত করি না যেরূপ ইতঃস্তত মোমেনের রুহ—জান কবজ করিতে করিয়া থাকি। এস্থলে ইতঃস্ততের কারণ এই যে,। মোমেন (স্বাভাবিকরূপে) মৃত্যুকে তিক্ত বোধ করে এবং তাহার তিক্ততার কাজকে আমি অপ্রিয় গণ্য করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ— শরীয়ত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ফরজ-ওয়াজেব পূর্ণরূপে আদায় করা ব্যতীত অন্য কোন উপাই নাই যদ্দরা মানুষ আল্লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে—ইহা আল্লার ঘোষণা। হাঁ—ফরজ-ওয়াজেব আদায় করার সঙ্গে নফল এবাদৎ করিলে তদ্দারা নৈকট্য লাভে অধিক উন্নতি হয়। এমনকি বন্দা আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পাত্র ও প্রিয়পাত্র হওয়ার মর্ত্তবা লাভ করিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পাত্র ও প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচয় ও প্রতিক্রিয়া এই যে, সেই মর্ত্তবায় পৌঁছিলে মানুষের নিজ সত্তা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়—তাহার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার আল্লার সন্তুষ্টির কাজে নিবদ্ধ হইয়া যায়। তাহার নিজস্ব সন্তুষ্টির কাজে কোনটিই ব্যবহৃত হয় না; হাঁ—এই অর্থে তাহার সন্তুষ্টির কাজেও ব্যবহৃত হয় যে, সে তাহার সন্তুষ্টির সবটুকুই আল্লার সন্তুষ্টিতে বিলীন করিয়া দিয়াছে। ফলে, সে তাহার চক্ষু দ্বারা ঐ জিনিষকেই দেখে যাহা দেখিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, যাহা দেখিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইবেন উহার দিকে সে তাহার চক্ষুকে ব্যবহারই করে না—একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিই তাহার চক্ষুর পরিচালক। এই বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীছে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই। তাহার প্রতিটি অঙ্গ ও শক্তিই ঐরূপ হইয়া যায়।

বন্দা যখন ঐরূপে আল্লাহতে বিলীন হইয়া যায় তখন আল্লাহও তাহার প্রতিটি আব্দারই রক্ষা করেন—যাহা চায় তাহা দেন, যাহা হইতে আশ্রয় চায় তাহা হইতে আশ্রয় দেন।

● মোমেনের রুহ কবজ করিতে আল্লার ইতঃস্তত করার অর্থ—

মানুষ তাহার শত্রু বা বিদ্রোহীকে ঘায়েল করিতে যাইয়া তাহাকে বিনা দ্বিধায় ঘায়েল করিয়া থাকে। কিন্তু যদি নিজের প্রিয়পাত্র আদর-স্নেহের পাত্রকে কোন কারণে ঘায়েল করার আবশ্যক হয় যেমন তাহার দেহে অস্ত্রোপাচার আবশ্যক হয় বা তাহাকে খাত্না করিতে হয় তখন তাহার দ্বিধা বোধ ও ইতঃস্ততের সীমা থাকে না। অবশ্য এই দ্বিধা বোধ ও ইতঃস্ততার অর্থ এই হয় না যে, অস্ত্রোপাচার বা খাত্নার কাজ বন্ধ রাখা হয়। কাজ ত নিশ্চয়ই করা হয়, কিন্তু চতুর্দিক দিয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে ঐ প্রিয়পাত্রের কষ্ট কম হয়, ব্যথা কম হয়, অশান্তি কম হয়, যতটুকুও হয় উহারও চিহ্ন মুছিয়া ফেলার সর্ব্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। মোমেনের রুহ কবজ করা কালে মোমেনের শান্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক চেষ্টা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে। মোমেনের রূহ কবজ করার জন্য ফেরেশতা দলকে বিশেষ আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় আকৃতি ও সাজ-সজ্জায় পাঠান হইয়া থাকে। ফেরেশতাগণ আসিয়া মোমেনের রুহকে বিশেষ সমাদর সম্ভাষনের সহিত আহ্বান করিয়া থাকেন। সর্ব্বোপরি কথা এই যে, মোমেনের চিরআকাঙ্খিত বেহেশত তাহাকে ঐ সময় খোলা চোখে দেখান হইয়া থাকে—সে বেহেশতের নেয়ামত সমূহ অবলোকন করিতে থাকে, তাহার জন্য সৃষ্ট হুরগণের আহ্বান পাইতে থাকে। এই ধরণের বহু আনন্দ উৎফল্লের ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে মোমেনের রুহ কবজ করা হয়। ফলে তাঁহার রুহ এত সহজে বাহির হইয়া আসে যেমন পানি ভরা মশকের মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলে উহা হইতে পানি বহিয়া পড়ে এবং শুধুমাত্র মামুলী আঘাতের ন্যায় অতি সামান্য ও মুহূর্ত্তের কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরের রুহ কবজ করার অবস্থা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত যাহার বিবরণ দানেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

মোমেনের রুহ কবজ করিতে তাহার আরামের এবং তাহার কষ্ট যাতনা লাঘবের সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে—ইহাই উল্লেখিত তথ্যের তাৎপর্য্য। যেরূপ আদরের ছেলেকে খাত্না করাইবার সময় স্নেহশীল পিতা খুবই ইতঃস্তত করিয়া থাকেন। যার ফলে পিতা ছেলের পক্ষে আবশ্যকীয় খাত্না ত করান, কিন্তু তাহার আরাম ও কষ্ট-যাতনা লাঘবের বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কেয়ামত নিকটবর্ত্তী

২৪৬৪। হাদীছ ঃ— عن سهل رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة هكذا ويشير باصبعيه فيمدهما

অর্থ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আবির্ভাব ও কেয়ামত উভয়টির ব্যবধান শুধুমাত্র এই দুইটি আঙ্গুলের ব্যবধান স্বরূপ—মধ্যাঙ্গুল ও শাহাদতের আঙ্গুল।

অর্থাৎ মধ্যাঙ্গুল্যের সামান্য একটু পেছনেই রহিয়াছে শাহাদতের আঙ্গুল তদ্রূপ আমার আবির্ভাবের সামান্য পরেই কেয়ামতের অনুষ্ঠান হইবে।

এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত বিষয়-বস্তুর অবিকল এইরূপ হাদীছ আনাছ (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

২৪৬৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কোন কোন সময় শিক্ষা-দীক্ষাহীন গ্রাম্য ব্যক্তিগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, কেয়ামত কবে কায়েম হইবে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) কোন একটি বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, এই বালক বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তোমাদের কেয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রত্যেকের মৃত্যুই তাহার পক্ষে কেয়ামতের আরম্ভ। কারণ, তখন হইতেই পরকালের অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইয়া যায়, তাই হযরত (দঃ) প্রশ্নকারীদের বয়সের তুলনায় অতি কম বয়সের বালকের প্রতি ইশারা করিয়া বলিতেন, এই বালকের বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই তোমার শ্রেণীর লোকদের কেয়ামত আসিয়া যাইবে। অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়া যাইবে যাহা তোমাদের পক্ষে কেয়ামতের প্রথম পদক্ষেপ।

কেয়ামতের পূর্ব্বে অস্তের দিক হইতে সূর্য্যের উদয়

২৪৬৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع

الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا اجمعون فذلك

حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত কায়েম হইবে না যাবৎ না সূর্য্য তাহার অস্তের দিক হইতে উদিত হয়। যখন তাহা সংঘটিত হইবে এবং সকল লোকই তাহা অবলোকন করিবে তখন সারা বিশ্ববাসীই ঈমান গ্রহণ করিয়া নিবে। কিন্তু ঐ সময়টি সেই সময় যে (সময় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই ঘোষণা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, এই) সময়ের পূর্ব্বের ঈমানহীনগণের পক্ষে তখনকার ঈমান কোন ফলদায়ক হইবে না। এবং এই সময়ের পূর্ব্বেকার তওবাহীনের পক্ষে তখনকার তওবা কোন ফলদায়ক হইবে না।

কেয়ামত নিশ্চয় কায়েম হইবে এবং এমন দ্রুত ও আকস্মিকরূপে কায়েম হইবে যে, হয় ত ক্রেতা ও বিক্রেতা—দুইজন লোক একখানা কাপড় খুলিয়া লইয়াছে—তাহাদের বিক্রি সম্পন্ন করার বা কাপড় খানা পুনঃ ভাজ করিবারও অবকাশ পাইবে না, ইতিমধ্যেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

আরও শুন! কোন ব্যক্তি স্বীয় গাভীর দুগ্ধ দোহাইয়া লইয়াছে, উহা পান করিবার অবকাশ পাইবে না—ইতিমধ্যেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে। আরও শুন! কোন ব্যক্তি স্বীয় হাউজের প্ল্যাষ্টার করিয়াছে উহাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

আরও শুন! এক ব্যক্তি স্বীয় লোক্‌মা মুখের নিকটে নিয়াছে উহা খাইবার সুযোগ পাওয়ার পূর্ব্বেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

নেক লোকের সংখ্যা হ্রাস পাইবে

২৪৬৭। হাদীছ:— ان عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الناس كالابل

اَلْمِائَةِ لَاتَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً

অর্থ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একশত উটের মধ্যে বাহন উপযোগী একটি উটও পাওয়া যায় না (—মানুষের অবস্থাও তদ্রূপই শতের মধ্যে ভাল মানুষ একজন পাওয়াও দুষ্কর।)

আল্লার সঙ্গে মিলনকে যে ভালবাসে আল্লাহ তাহার মিলনকে ভালবাসেন

২৪৬৮। হাদীছঃ—ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন:—

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ

"যাহার নিকট আল্লার মিলন প্রিয়, আল্লার নিকটও তাহার মিলন প্রিয়। পক্ষান্তরে যাহার নিকট আল্লার মিলন অপ্রিয় আল্লার নিকটও তাহার মিলন অপ্রিয়।

এতচ্ছ্রবণে আয়েশা (রাঃ) বা হযরতের অন্য কোন স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন যে, আমাদের সকলেই ত মৃত্যুকে অপ্রিয় ভাবিয়া থাকে! (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই আল্লার সঙ্গে মিলন হয়, সুতরাং মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করা আল্লার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করারই শামিল, অথচ মৃত্যুকে আমাদের সকলেই অপ্রিয় গণ্য করিয়া থাকে।) তদুত্তরে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন:—

لَيْسَ ذَاكِ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهٖ فَلَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهٗ فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهٖ فَلَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهٗ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ

"স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করা সূত্রে আল্লার মিলন অপ্রিয় সাব্যস্ত হওয়া এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। এস্থলে যাহা উদ্দেশ্য তাহা এই যে—মোমেন ব্যক্তির যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাহাকে আল্লার সন্তুষ্টি ও আল্লার নিকট তাহার আদর-সমাদর, মান-মর্য্যাদার সুসংবাদ শুনান হইয়া থাকে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার

নিকট তাহার সম্মুখ জীবন অপেক্ষা কোন বস্তুই প্রিয় বলিয়া গণ্য হয় না। এবং তখন সে আল্লার সঙ্গে মিলনকেই মনে প্রাণে ভালবাসে, আল্লাহও তাহার মিলনকে ভাল বাসেন। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তির যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাহাকে আল্লার আজাব ও শাস্তির পরওয়ানা শুনাইয়া দেওয়া হয়, সেই সময় তাহার সম্মুখ জীবন তাহার নিকট সর্ব্বাধিক বিষ তুল্য অপছন্দনীয় গণ্য হয় এবং সে আল্লার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করে আল্লার নিকটও তাহার মিলন অপ্রিয় গণ্য হয়।

২৪৬৯। ছাদীছ ঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

অর্থ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে মিলনকে প্রিয় গণ্য করিবে আল্লাহও তাহার মিলনকে প্রিয় গণ্য করিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় গণ্য করিবে আল্লাহও তাহার মিলনকে অপ্রিয় গণ্য করিবেন।

মৃত্যুর পর ঃ

২৪৭০। ছাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখ দিয়া একটি জানাজা যাইতে লাগিল। উহাকে লক্ষ্য করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন—

مستريح ومستراح منه

"সে নিজে শান্তি পাইয়াছে বা তাহার হইতে শান্তি লাভ হইয়াছে।"

ছাহাবীগণ এই বাক্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, নেককার বন্দার মৃত্যু হইলে সে দুনিয়ার ক্লান্তি শ্রান্তি ও অবসাদ হইতে এবং দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করতঃ আল্লার রহমতের আশ্রয়ে যাইয়া শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মানব-দানব, জল-স্থল, বট-বৃক্ষ, পশু-পক্ষী সবই তাহার উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পায়—শান্তি লাভ করে।

ব্যাখ্যা ঃ— বদকার মানুষ সাধারণতঃ সকলের জন্যই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার বদকারীর অশুভ প্রতিক্রিয়ায় অনাবৃষ্টি, দুর্য্যোগ দুর্ভোগ ইত্যাদির দ্বারা দুনিয়ার সকল সৃষ্ট জীবেরই অশান্তি ঘটিয়া থাকে।

২৭৭১। হাদীছ :— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ মরিয়া যাওয়ার পর তাহার কবর পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীর জিনিষ তাহার সঙ্গে যায়। তন্মধ্যে একটি জিনিষ তাহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকে অপর দুই জিনিষ (তাহাকে দাফন করিয়া) ফিরিয়া আসে। তাহার সঙ্গে যায় তাহার আত্মীয়-স্বজন, তাহার কিছু মাল (যেমন—চাটি-পাটি ও চাঁদর ইত্যাদি লাশ বহনের ছামান) এবং তাহার আমল। অতঃপর তাহার আত্মীয়-স্বজন ও মাল তাহাকে রাখিয়া চলিয়া আসে, আর তাহার আমল তাহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকে।

ইস্রাফীল ফেরেশতার শিঙ্গার ফুঁক

এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব কিছুই সৃষ্ট, আল্লাহ তায়ালা ইহজগতে কোন জিনিষকেই স্থায়ী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—সব সৃষ্টিই অস্থায়ী, এই সবের বিলুপ্তি অবধারিত। এক সঙ্গে সব সৃষ্টি ফানা তথা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে উহাকেই বলে কেয়ামত বা মহাপ্রলয়।

কেয়ামতের প্রথম ধাপ হইল প্রলয় এবং উহারই দ্বিতীয় ধাপ হইল পুনরুত্থান। এই উভয়টিই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও তাঁহার আদেশে হইবে যাহা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় স্বেচ্ছাধীন নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী উক্ত দুইটি মহাকার্য্যের জন্যও একটি সাধারণ বাহ্যিক সূত্র ও মাধ্যম রাখিয়াছেন—সেইটি হইল ফেরেশতা ইস্রাফীল আলাইহেচ্ছালামের শিঙ্গার ফুঁক।

অসংখ্য ফেরেশতাদের মধ্যে চার জন বিশিষ্ট ফেরেশতারই একজন হইলেন হযরত ইস্রাফীল (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা শিঙ্গাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর ইস্রাফীল (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়া ঐ শিঙ্গা তাঁহার হাওয়ালা করিয়াছেন। তিনি ঐ শিঙ্গা লইয়া সর্ব্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। প্রথমবার আল্লার আদেশে ঐ শিঙ্গায় ফুঁক দিলে মহাপ্রলয় আসিয়া যাইবে—আসমান-জমিন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, পাহাড়-পর্ব্বত ধুলিবৎ এবং তুলাবৎ হইয়া বিলীন

হইয়া যাইবে। সমস্ত জীব মরিয়া যাইবে। এমনকি মৃত্যুর ফেরেশতা স্বয়ং আজরাইল (আঃ)ও মরিয়া যাইবেন। শিঙ্গায় ফুঁকদাতা ফেরেশতা ইস্রাফীল (আঃ)ও মরিয়া যাইবেন এবং পূর্ব্বাপর সকল মৃতদের আত্মাগুলি অচেতন হইয়া পড়িবে। অতঃপর দীর্ঘকাল পরে আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ইস্রাফীল (আঃ)কে জীবিত করিবেন এবং শিঙ্গা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ফুঁক দিতে আদেশ করিবেন। এই ফুঁকের ফলে নূতন রূপে আছমান-জমিন সৃষ্ট হইয়া হাশরের মাঠ তৈরী হইবে এবং পূর্ব্বাপর সকল মৃত জীবিত হইয়া হাশরের মাঠের দিকে ধাবিত হইবে, তখন হইতেই মানুষকে অমর জীবন দান করা হইবে।

শিঙ্গা-ফুঁক সম্পর্কে ৬ষ্ঠ খণ্ড তফছীর অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিজী শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأُذُنَ

مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ

"আমি আনন্দের জীবন কিরূপে যাপন করিতে পারি? অথচ শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মুখে লইয়া কান পাতিয়া ফুঁক মারার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।"

এতদ্ভিন্ন পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতেও এই বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

(১) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ....... لَا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ

"যখন শিঙ্গায় একবার ফুঁক দেওয়া হইবে এবং (তদ্দ্বারা) সমগ্র ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্ব্বতকে স্থিতিহীন করিয়া দেওয়ার ফলে ঐ সব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ঐ দিন সেই মহা প্রলয়ের ঘটনা ঘটিয়া যাইবে—আকাশ ফাটিয়া উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ফেরেশতাগণ উহার কিনারায় থাকিবেন। প্রভু পরওয়ারদেগারের আরশকে আট জন ফেরেশতা নিজেদের উপর বহন করিয়া রাখিবেন। ঐ দিন সকল মানবকে পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিত করা হইবে। কাহারও কোন বিষয় গোপন থাকিবে না। যাহার আমলনামা ডান হাতে আসিবে সে আনন্দের সহিত সকলকে তাহার আমলনামা পাঠ করিবার আহ্বান জানাইবে। এবং বলিবে, আমি ত পূর্ব্ব হইতেই হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাসী ছিলাম, ফলে সে শান্তির জীবন লাভ করিবে—বেহেশতে বাস করিবে। যাহার অসংখ্য ফল ফলাদি নিকটে নিকটে থাকিবে। তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইবে, আমোদ-ফুর্তির পানাহার উপভোগ করিতে থাক—তোমার ঐ সব আমলের বদৌলতে যাহা তুমি পূর্ব্ব জেন্দেগীতে করিয়াছ।

পক্ষান্তরে যাহার আমলনামা বাম হাতে আসিবে সে অনুতপ্ত হইয়া বলিবে, আমার আমলনামা না পাইলেই ভাল হইত এবং আমার হিসাব না জানিলেই ভাল হইত ! কত ভাল হইত যদি আমার সেই মৃত্যুতেই আমার সমাপ্তি হইয়া যাইত ! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসিল না ! আমার ক্ষমতাও থাকিল না ! ফেরেশতাদিগকে তাহার সম্পর্কে আদেশ করা হইবে—ইহাকে পাকড়াও কর, গলায় ফাঁদ লাগাইয়া দাও এবং দোযখে প্রবেশ করাও। তারপর সত্তর গজ লম্বা এক শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়া দাও। এই ব্যক্তি মহান আল্লার প্রতি ঈমান রাখিত না, গরীব-মিছকিদের খাওয়াইবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিত না। আজ এখানে কেহই তাহার বন্ধু হইবে না এবং তাহার কোন খাদ্য জুটিবে না দোযখীদের লহু-পুঁজ ইত্যাদি ব্যতিরেকে—যাহা একমাত্র গোনাহগারগণ ভক্ষণ করিয়া থাকিবে।"

(২) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ......وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

"শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইলে পর পরস্পর আত্মীয়তা বিদ্যমান থাকিবে না। পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ থাকিবে না। যাহাদের নেকের পাল্লা ভারি হইবে তাহারাই সফলতা লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যাহাদের সেই পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই ঐ দল যাহারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তাহারা চিরকাল দোযখে বাস করিবে—আগুন তাহাদের চেহারাকে জিহ্বা মারিতে থাকিবে ; তাহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তিরস্কার করিবেন তোমাদেরে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত না ? এবং তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকিতে ! তাহারা বলিবে, হে প্রভু ! আমাদের বদ্‌বখ্‌তি ও দুর্ভাগ্য আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল এবং বাস্তবিকই আমরা ভ্রষ্টের দল ছিলাম। হে প্রভু ! আমাদিগকে এই দোযখ হইতে বাহির করিয়া (পুনঃ সুযোগ) দিন ; যদি আমরা পুনরায় ঐরূপ করি, তবে আমরা ক্ষমাহীন অপরাধী হইব।

আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বলিবেন, লাঞ্ছিত হইয়া এই দোযখেই চিরকালের জন্য থাক। আমার নিকট কোন কথাই বলিবা না। আমার এক শ্রেণীর বন্দা আমাকে ডাকিয়া বলিত, প্রভু হে ! আমরা ঈমান আনিয়াছি ; আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদেরকে দয়া কর ; তুমি সর্ব্বোত্তম দয়ালু। তোমরা সেই বন্দাদের প্রতি উপহাস করিতে, বিদ্রূপ করিতে, সেই উপহাসে ও বিদ্রূপে মগ্ন থাকায় আমাকে স্মরণ করার সময় হইত না। আজ আমি সেই বন্দাদের ধৈর্য্যের ফল দান করিয়াছি—তাহারাই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা ঐ অপরাধীগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা তুনিয়াতে কত বৎসর বসবাস করিয়া ছিলে? তাহারা বলিবে মাত্র এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ—আমাদের ত পুর্ণ স্মরণ নাই; গণনাকারীগণকে জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, (তোমাদের উত্তর অবাস্তব হইলেও) প্রকৃত প্রস্তাবে তুনিয়ার জিন্দেগী অল্প সময়েরই ছিল; কতই না ভাল হইত যদি তখন তোমরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে! তোমরা ত ধারণা করিয়া ছিলে, আমি তোমাদিগকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে না।"

(১৮ পারা—ছুরা মোমেনুন)

(৩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ........

"আর (প্রথমবার) শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে আসমানসমূহে এবং জমিনে যত জীব রহিয়াছে সবই অচেতন হইয়া পড়িবে (—জীবিতরা মরিয়া যাইবে, মৃতের আত্মা বেহুঁশ হইয়া থাকিবে) শুধুমাত্র তাহারা ব্যতীত যাহাদের সম্পর্কে আল্লার ইচ্ছা হয় (অচেতন না হওয়া। তাঁহারা হইলেন আরশ বহনকারী আট জন ফেরেশতা।)

তারপর (দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে (সকলের চেতনা ও জীবন ফিরিয়া আসিবে এবং মৃতদের আত্মা ও দেহের সম্মিলন হইয়া) অকস্মাৎ সকলেই দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং হতবাক হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। ভূমণ্ডল (পুনঃ অস্তিত্বে হাশরের ময়দান রূপ ধারণ করিয়া উহা) স্বীয় প্রভুর নূরে আলোকিত হইয়া উঠিবে। সকলের আমলনামা উপস্থিত রাখিয়া দেওয়া হইবে। পয়গাম্বরগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের (আমল অনুসারে) ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হইবে না। সকলকেই নিজ নিজ আমলের ফলাফল পুর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা সকলের আমল সম্পর্কে ভালরূপ জ্ঞাত আছেন। (ফয়ছালার মোটামুটি দৃশ্য এই হইবে—)

আল্লাহদ্রোহীগণকে শ্রেণী বিভক্ত রূপে জাহান্নামের প্রতি হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। যখন তাহারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছিবে তখন জাহান্নামের ফটক খোলা হইবে এবং জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট তোমাদেরই স্বজাতীয় আল্লার দ্বীনের বার্তাবাহকগণ আসিয়া ছিলেন না কি—যাহারা তোমাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশ-নিষেধগুলি পড়িয়া শুনাইতেন এবং এই দিনের আগমন সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিতেন? তাহারা উত্তরে বলিবে, হাঁ—আসিয়া ছিলেন, কিন্তু (আমরা

তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আল্লাহদ্রোহী হইয়া রহিয়াছিলাম এবং) আল্লাহ-দ্রোহীদের উপর আজাবের আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামের ফটকের ভিতরে প্রবেশ কর চিরকালের জন্য। সার কথা এই যে, আল্লার বিধান লঙ্ঘনকারী স্বৈরাচারীদের জন্য জঘন্য কারাগার রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা আল্লার ভয়-ভক্তির জীবন যাপনকারী ছিল তাহাদিগকে শ্রেণী বিভক্তরূপে বেহেশতের পথে নিয়া আসা হইবে। যখন তাহারা বেহেশতের নিকটে পৌঁছিবে এবং বেহেশতের গেট তাহাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই খুলিয়া রাখা হইয়াছে তখন তাহাদিগকে বেহেশতের প্রহরীগণ বলিবেন, আচ্ছালামু আলাইকুম; সৌভাগ্যশালী আপনারা—আসুন! চিরকালের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করুন।" (২৪ পারা—ছুরা যুমার সমাপ্তে)

(৪) وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ...... لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে ফলে আমি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব এবং সেই দিন বিদ্রোহীগণের সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থিত করা হইবে; যাহাদের চক্ষু আমাকে স্মরণ করার নিদর্শন হইতে আড়ালে ছিল এবং আমাকে স্মরণ করার বিষয়বস্তু হইতে তাহাদের কান বধির ছিল।" (১৬ পারা—ছুরা কাহাফ ১১ রুকূ)

(৫) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .... وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ...... فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ

"কাফেরগণ বিদ্রূপ করিয়া বলে, মহা প্রলয়ের সংবাদটা কবে বাস্তবায়ীত হইবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন,) তাহারা একটি ভীষণ শব্দের (শিঙ্গার প্রথম ফুঁকের) প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যাহা তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে আকস্মিকরূপে—তাহাদের জাগতিক ব্যতিব্যস্ততার মধ্যেই। যাহার ফলে তাহারা নিজ নিজ অবস্থায় ও নিজ নিজ স্থানেই ফানা ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কেহ কোন অন্তিম অনুরোধ করার বা নিজ পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগও পাইবে না।"

(তারপর দ্বিতীয়বার) আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে হঠাৎ তাহারা কবর হইতে উঠিয়া স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের (নির্দ্ধারিত হিসাবের স্থান হাশর-ময়দানের) দিকে দ্রুত চলিতে থাকিবে। তখন তাহারা অনুতপ্ত হইয়া বলিবে,

আমাদের ত আর উপায় নাই ! আমাদিগকে কবর হইতে কে বাহির করিয়া আনিল ? উহাই ত সেই মহাসংবাদ যাহা আমাদের দয়াল প্রভু আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং রসুলগণ সত্য সংবাদই পেঁছাইয়া ছিলেন।

শুধু মাত্র একটি ভীষণ আওয়াজ (শিঙ্গার ফুঁক) হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ সকলকে আমার দরবারে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইবে।" (২৩ পাঃ ছুরা ইয়াছীন)

(৬) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ....

"শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে—সেই দিনটি ঐ দিন যে দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে। ঐ দিন প্রত্যেকটি মানুষ হাশর-ময়দানের দিকে আসিবে—তাহার সঙ্গে তাহাকে তাড়া করার জন্য একজন ফেরেশতা এবং তাহার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আর একজন ফেরেশতা থাকিবেন। (আল্লাহ তায়ালা বলিবেন,) এই দিনটির অবহেলায় তুমি বিভোর ছিলে ! আজ আমি তোমার চোখের পর্দ্দা দুরীভুত করিয়া দিয়াছি—আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সব কিছু চাক্ষুস দেখিতেছ !"

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ

"সে দিন লোকগণ বাস্তব একটি শব্দ শুনিতে পাইবে সেই দিনই কবর হইতে হাশর-ময়দানের দিকে বাহির হওয়ার দিন।"

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ

"যে দিন মাটি ফুড়িয়া তাহারা হাশর-ময়দানের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে—এইরূপে সকলকে একত্রিত করা আমার পক্ষে কঠিন নহে।" (২৬ পারা ছুরা কাফ)

(৭) فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ ......

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে ঐ দিনটি আল্লাহদ্রোহীদের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও কঠিন হইবে।" (২৯ পারা ছুরা মোদ্দাচ্ছের)

(৮) أَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ...... فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ...... هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ

"(কাফেরগণ কেয়ামতকে অস্বীকার পূর্ব্বক বলিয়া থাকে,) আমরা মরিয়া মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব কি ? এবং আমাদের

পূর্ব্ব পুরুষগণ (যাহারা বহু পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে) তাহারাও কি পুনরুজ্জীবিত হইবে ? আপনি বলিয়া দিন হাঁ—এবং তখন তোমরা লাঞ্ছিত হইবে। ঐ ঘটনা শুধু মাত্র একটি ভীষণ গর্জ্জনের মাধ্যমে সংঘটিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ সকল লোকজন জীবিত হইয়া (হতভম্বের ন্যায়) দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে এবং কাফেরগণ বলিবে, আমাদের ত আর বাঁচিবার উপায় নাই ; ইহাইত প্রতিফল ভোগের দিন।"

(২৩ পারা ছুরা ছাফ্‌ফাত)

(৯) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ........ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

"কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে—যে দিন সারা বিশ্বকে প্রকম্পিত করিয়া দিবে একটি বিশেষ প্রকম্পনকারী (তথা শিঙ্গার প্রথম ফুঁক)। তারপরেই আসিবে পরবর্ত্তী ঘটনা (তথা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক।) সে দিন অনেকের দেল ধড়ফড় করিতে থাকিবে, তাহাদের চক্ষু অবনমিত থাকিবে।

(দুনিয়ার জীবনে) কাফেরগণ বলিয়া থাকে, আমরা ছিন্ন-ভিন্ন হাড়ে পরিণত হওয়ার পরও পুনরুজ্জীবিত হইব কি ? তাহারা বিদ্রূপ করিয়া বলে, তবে ত আমাদের পুনর্ব্বারের জীবন বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে ! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

তোমাদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ঘটনা শুধু মাত্র একটি হুঁঙ্কারের মাধ্যমে সংঘটিত হইবে—সঙ্গে সঙ্গে সকল লোকজন হাশর-ময়দানের ভূপৃষ্ঠে আসিয়া যাইবে। (৩০ পারা—ছুরা নাযেয়াত)

এইরূপে শিঙ্গার ফুঁকদ্বয়ের বিষয়বস্তু বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের অগণিত স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কেয়ামতের বিভিন্ন তথ্য

২৪৭২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র ভুমণ্ডলকে মুঠার মধ্যে লইবেন এবং আসমানসমুহকে দক্ষিণ হস্তে লেপটাইয়া লইবেন। অতঃপর বলিবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি—সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আমি। (দুনিয়াতে যাহারা অধিপতি হওয়ার দাবী করিত ক্ষমতার গর্ব করিত আজ তাহারা কোথায় ? ১১০২ পৃঃ)

● এই বিবরণের আরও এক খানা হাদীছ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ ষষ্ঠ খণ্ডে হইয়াছে।

২৪৭৩। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (এক সময় হাশর-ময়দানের) সমগ্র ভূমণ্ডলটি (আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে) একটি (সুখাদ্য সুস্বাদু) রুটি হইয়া যাইবে। (উহা অতিশয় বিশাল ও বৃহত হওয়া সত্বেও) মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার কুদরতের হস্ত উহাকে ঐরূপ নাড়াচড়া করিবে যেরূপ তোমাদের কেহ দস্তরখানের উপর তাহার সম্মুখস্থ খাদ্য রুটিকে নাড়াচড়া করিয়া থাকে। উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে আগত লোকদের আতিথ্য ও মেহমানদারী করিবেন।

এই আলোচনা শেষ হইতে না হইতেই এক ইহুদী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। সে হযরত (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামতের দিন বেহেশতে আগত লোকদের আতিথ্য ও মেহমানদারী কি হইবে তাহা আপনাকে জ্ঞাত করিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বল! ইহুদী ব্যক্তি বলিল, সমগ্র ভূমণ্ডল একটি রুটি হইয়া যাইবে—হযরত (দঃ) পূর্ব্বেক্ষণে যেই তথ্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন সে ঐ তথ্যই বয়ান করিল। তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি তাকাইলেন এবং হাসিলেন। এমন কি তাঁহার মুখের দাঁত দৃষ্ট হইল। তারপর ঐ ইহুদী ব্যক্তি বলিল, বেহেশতে আগত লোকদের (রুটি খাওয়ার) তরকারি কি হইবে তাহাও আমি জ্ঞাত করিব। তাহাদের তরকারি হইবে গরু এবং মাছ—এত বড় বৃহত মাছ যাহার কলিজার ছোট অংশটি সত্তর হাজার লোক খাইতে পারিবে+।

ব্যাখ্যা ঃ—হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পর সমস্ত লোক হাশর-ময়দান হইতে পোল-ছেরাতের উপর আসিয়া যাইবে এবং বেহেশতী ও দোযখী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। দোযখীগণ পোল-ছেরাতের উপর হইতে নিম্নস্থ জাহান্নামে পতিত হইবে, আর বেহেশতীগণ পোল-ছেরাৎ পার হইয়া বেহেশত এলাকায় আসিয়া পৌঁছিবে। সমস্ত লোকজন পোল-ছেরাতে আসিলে হাশর ময়দান খালি হইয়া যাইবে তখনই আল্লাহ তায়ালা ঐ রুটি তৈরি করিবেন এবং বেহেশতের আগত লোকগণ পোল-ছেরাত পার হইয়া সর্ব্ব প্রথম আল্লার তরফ হইতে ঐ রুটির জেয়াফৎ খাইবেন।

হাশর-ময়দানের মাটি বস্তুত ইহজগতেরই মাটি যাহা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁকের দ্বারা পুনরুত্থিত হইবে। মাটির মধ্যেই দুনিয়ার শত শত সুস্বাদু বস্তুর স্বাদের মুল পদার্থ রহিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিচিত্রময় কুদরতের হস্তে যখন বিভিন্ন স্বাদের

+ ইহুদী ব্যক্তি এই সব তথ্য তাহাদের আসমানী কেতাব হইতে জ্ঞাত হইয়া ছিল। তাহারা তাহাদের কেতাবের মূল বিষয়বস্তু বিকৃত করিয়া ছিল, কিন্তু সাধারণ বিষয়াবলীর কিছুটা শুদ্ধও ছিল।

আকর ভুমণ্ডলকে রুটিতে রূপান্তরিত করার জন্য সামগ্রীকরূপে রিফাইন করিয়া নিবেন এবং উহা দ্বারা স্বীয় ভালবাসার বন্দা বেহেশতী মোমেনগণকে স্বাগতমঃ জানাইবার জেয়াফতের রুটি তৈরী করিবেন, তখন উহা যে কি স্বাদের হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

২৪৭৪। হাদীছ ঃ—সাহ্ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বাপর সমস্ত লোককে (হাশর-ময়দান নামীয়) এমন একটি ভূমণ্ডলে একত্রিত করিবেন যাহা ময়দার রুটির ন্যায় উঁচু-নীচুহীন সুসমতল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। উহাতে কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানা-চিহ্ন থাকিবে না।

২৪৭৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন পূর্ব্বাপর সমস্ত লোককে হাশর-ময়দানে একত্রিত করা হইলে পর (তাহাদের আমলের পরিপ্রেক্ষিতে) তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

(কেয়ামতের পুর্ব্বক্ষণে যখন দুনিয়াতে চতুর্দিকে অশান্তির অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে এবং সিরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অশান্তির অগ্নি কম হইবে। তখন যে তৎকালীন লোকগণ নিজ নিজ আবাস ভূমি ত্যাগ করতঃ সিরিয়ার দিকে ছুটিবে তখনও সেই লোকগণ তিন শ্রেণীর হইবে—) এক দল তাহারা প্রথম সুযোগেই অশান্তি হইতে পলায়ন করতঃ শান্তির আশা নিয়া ধীরস্থিরতার সহিত সিরিয়া অঞ্চলে পৌঁছিবে। তারপর (যখন চতুর্দিক হইতে সিরিয়া অঞ্চলে গমনের হিড়িক পড়িয়া যাইবে এবং যান-বাহন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে, এমনকি বিরাট একটি বাগান-বাড়ীর বিনিময়ে একটি উট প্রাপ্তি দুষ্কর হইয়া উঠিবে তখন) দুই জন এক উটে, তিন জন এক উটে, চার জন এক উটে, এমনকি দশ জন পর্য্যন্ত মাত্র একটি উটের সাহায্যে (পালাক্রমে হইলেও সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকগণ—তাহারা যান-বাহনের অভাবে বা যে কোন কারণে তখনও নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে রহিয়া গিয়াছে; আল্লার কুদরতে ঐ সব অঞ্চলকে পরিবেষ্টিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে। এই) অবশিষ্ট লোকগণকে সেই অগ্নি (সিরিয়ার দিকে) হাঁকাইয়া নিয়া যাইবে। সকাল, বিকাল, দুপূর—সর্ব্বদার জন্যই সেই অগ্নি তাহাদের পেছনে লাগিয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের প্রথম অংশে কেয়ামতের দিনের অবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তথায় সমস্ত মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে—পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ বর্ণিত আছে—

২৭ পারা ছুরা ওয়াক্বেয়া'হ্, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের বাস্তবতা বয়ান পূর্ব্বক বলেন, وكنتم ازواجا ثلثة "তোমরা (তথা পূর্ব্বাপর সারা বিশ্বের লোকগণ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে।" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে সেই তিন শ্রেণীর বিবরণ দান করিয়াছেন—

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ - وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَآ اَصْحٰبُ

الْمَشْئَمَةِ - وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ - اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ

"এক শ্রেণী হইবে যাহারা সাধারণ ভাবে আমল-নামা ডান হাতে পাইবে; তাহাদের অবস্থা বেশ ভালই হইবে (—এই শ্রেণী হইল সাধারণ মোমেন-মোসলমান নেককারদের।) আর এক শ্রেণী হইবে যাহারা আমল-নামা বাম হাতে পাইবে; তাহাদের অবস্থা ভয়াবহ হইবে (—এই শ্রেণী হইল আল্লার নাফরমানগণের)। আর এক শ্রেণী হইবে যাঁহারা অতি উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন হইবেন, তাঁহারা (ডান হাতে আমল-নামা পাইবেন এবং তৎসঙ্গে) আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের অধিকারী হইবেন (—এই শ্রেণী হইল নবী ছিদ্দীক, ওলী ও কামেল মোত্তাকী পরহেজগারগণের। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের অবস্থার বিবরণ দান করিয়াছেন।)

বক্ষমান হাদীছের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য্য বয়ানের পূর্ব্বে মূল বিষয়টা গোড়া হইতে উপলব্ধি করিতে হইবে।

হাশরের ময়দান বস্তুতঃ এই জগৎ-পৃষ্ঠেই অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু ইহার পুনরোত্থানের পর। পদ্মা ইত্যাদি ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী নদীর তীরে যাহাদের বসতি তাহারা দেখিয়া থাকে, যে সব বস্তি ও গ্রাম নদীর ভাঙ্গনে পতিত হয় কতেক বৎসর পর ঐ সব বস্তি বা গ্রামের স্থানটি চর আকারে পুনঃ উত্থিত হয় এবং তাহা শুধু বালুকাময় ময়দানরূপের হয়; পূর্ব্বেকার উঁচু-নিচুর কোন চিহ্ন উহাতে থাকে না। কিন্তু সেটেলমেণ্টের রেকর্ড অনুসারে এলাকাটি নির্দ্ধারিত অবশ্যই হইতে পারে।

ঠিক তদ্রূপই এই ভূমণ্ডলের অবস্থা। কেয়ামত তথা ইস্রাফীল ফেরেশতার শিঙ্গার প্রথম ফুঁকের দ্বারা সমুদয় আসমান-জমীন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর আল্লাহ তায়ালা ইস্রাফীল (আঃ)কে পুনঃ জীবিত করিবেন এবং দ্বিতীয় বার তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তদ্দ্বারা এই জগতের ভূমণ্ডলটিই ঐ বালূ চরের ন্যায় পুনঃ উত্থিত হইবে, উহার উপর বর্ত্তমান অবস্থার চিজ বস্তুর কোনরূপ চিহ্নও থাকিবে না। কিন্তু উহার আঞ্চলিক সীমার পূর্ব্ব রেকর্ড বহাল থাকিবে এবং

হাশর-ময়দানের জন্য সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের আবশ্যক হইবে না, বরং একটি অঞ্চলই যথেষ্ট হইবে। সেমতে বিভিন্ন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বর্ত্তমান সিরিয়ার অঞ্চলটিই পুনঃ উত্থানে হাশর ময়দান হইবে।

যেহেতু সমস্ত মানুষ পুনঃ উত্থানে সিরিয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হাশর-ময়দানে একত্রিত হইবে, তাই ইহজগতের সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তে তথা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে আল্লাহ তায়ালা অন্ততঃ তৎকালীন অবশিষ্ট সমস্ত লোকজনকে সেই সিরিয়া অঞ্চলে একত্রিত হইতে বাধ্য করিবেন। যাহার ব্যবস্থা এই হইবে যে, বিশ্বের চতুর্দিকে অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। শুধু সিরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কিছু কম অশান্তি হইবে, তাই বিশ্বের চতুর্দিক হইতে লোকগণ নিজ নিজ আবাস ভুমি ত্যাগ করতঃ সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে। ঐ অবস্থায়ও যাহারা সিরিয়ার দিকে না আসিবে তাহাদিগকে হাঁকাইয়া আনিবার জন্যই আল্লাহ তায়ালার কুদরতী আগুনের আবির্ভাব হইবে। সেই আগুন আরব সাগরের এডেনস্থিত সমুদ্র-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এই সকল তথ্য বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

তৎকালীন অবস্থারই একটি বিষয়ের উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

২৪৭৬। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দান কালে এই তথ্য প্রকাশ করিলেন—

اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً "كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ"

"সমস্ত মানব হাশর ময়দানে একত্রিত হইবে, এই অবস্থায় যে সকলেই খালি পা, বস্ত্রবিহীন খাতনাবিহীন হইবে। পবিত্র কোরআনেও উহার ইঙ্গিত রহিয়াছে— আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যেই অবস্থার উপর প্রথম দুনিয়াতে পয়দা করিয়া ছিলাম, পুনরুজ্জিবীতও সেই অবস্থার উপরই করিব।"

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন— কেয়ামতের দিন সমস্ত মখলুকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামকে কাপড় পড়ান হইবে।

২৪৭৭। **হাদীছ ঃ**— اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ

عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ

فَقَالَ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذٰلِكَ

অর্থ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সমস্ত মানুষ খালি পা, বস্ত্রবিহীন খাত্না-বিহীনরূপে হাশর ময়দানে জমায়েত হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নারী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গরূপে একত্রিত হইবে এবং একে অন্যকে উলঙ্গ দেখিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তখনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হইবে যে, সেই বিষয়ের প্রতি কাহারও লক্ষ্য করার অবকাশই থাকিবে না।

২৪৭৮। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাবুর ভিতর বসিয়া ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতবাসীদের মোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশ তোমরা হইবে। ইহাতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা আরজ করিলাম হাঁ—আমরা সন্তুষ্ট আছি।

হযরত (দঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তৃতীয়াংশ হইবে। ইহাতে অধিক সন্তুষ্ট আছ কি ? আমরা আরজ করিলাম, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আশা রাখি, তোমরা বেহেশত লাভকারীদের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক হইবে।

এ সম্পর্কে আরও তথ্য তোমরা জানিয়া রাখ যে, মোসলমান ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না। আর (দুনিয়ার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সারা বিশ্বের সর্ব্বমোট জন সংখ্যার মধ্যে অমোসলেমদের মোকাবিলায়) মোসলমানদের পরিমান তদ্রূপ যেরূপ সম্পূর্ণ কাল রঙ্গের একটি ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা লোম বা সম্পূর্ণ লাল রঙ্গের একটি ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল লোম।

অর্থাৎ একটি ষাঁড়ের শরীরে সমস্ত লোম কাল এবং শুধু একটি মাত্র লোম সাদা হইলে সে স্থলে যেরূপ অধিক কাল লোমের মোকাবিলায় একটি সাদা লোম হইয়া থাকে মানব সংখ্যার মধ্যেও সেরূপ অধিক সংখ্যার অমোসলেমের মোকাবিলায় এক এক জন মোসলমান।

ব্যাখ্যা :—সর্ব্বমোট জন সংখ্যার মধ্যে সমষ্টিগত দোযখী অমোসলেমদের মোকাবিলায় বেহেশতী মোসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। তবুও সেই নগণ্য সংখ্যক বেহেশতী মোসলমানদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতই অর্দ্ধেক হইবে, আর হযরত আদম (আঃ) হইতে ঈসা (আঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত নবীগণের উম্মৎ হইতে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক হইবে—হযরত (দঃ) এই আশা পোষণ করিতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আশা ও আকাঙ্খাকে অধিক পরিমাণে বাস্তবায়ীত করিবেন বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। সে মতে অন্য এক হাদীছে হযরত নবী (দঃ) সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার উম্মৎ বেহেশত লাভকারীদের মোট সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হইবে।

২৪৭৯। ছাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন, সর্ব্ব প্রথম আদম (আঃ) কে ডাকা হইবে, তখন আদম (আঃ) তাঁহার বংশধর সমস্ত মানব গোষ্টির মুখামুখী-রূপে আসিয়া দাঁড়াইবেন। লোকদিগকে জ্ঞাত করা হইবে, এই তোমাদের আদি পিতা আদম। সঙ্গে সঙ্গে আদম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের পূর্ণ আনুগত্য নিবেদন করিবেন। তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বলা হইবে, আপনি নিজেই নিজের সন্তানদের মধ্য হইতে জাহান্নামীদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া দিন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে প্রভু-পরওয়ারদেগার ! কি পরিমাণ সংখ্যা বাছনীর মধ্যে আসিবে ? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, প্রতি শতে নিরানব্বই জন।

এতচ্ছ্রবণে ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। নিরানব্বই জন জাহান্নামের জন্য বাহির করা হইলে বেহেশতের জন্য আর আমাদের অবশিষ্ট কি থাকিবে ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, পূর্ব্বাপর নবীগণের উম্মতের সমষ্টি সংখ্যার মোকাবিলায় ত আমার উম্মতের সংখ্যা নগণ্য—যেমন কাল ষাঁড়ের শরীরে একটি সাদা লোম।

অর্থাৎ জাহান্নামীদের সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন, কিন্তু উহার বেশীর ভাগ পূর্ণ করার জন্য অন্যান্য উম্মতের লোক যথেষ্ট রহিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে আল্লাহদ্রোহী জাহান্নামীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। পক্ষান্তরে বেহেশতীদের মধ্যে এই উম্মতের লোক অধিক সংখ্যায় থাকিবে।

২৪৮০। ছাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে ডাকিবেন। আদম (আঃ) উপস্থিত হইবেন এবং স্বীয় আনুগত্য নিবেদন করিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, দোযখী দলকে বাছিয়া বাহির করুন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, দোযখী দলের পরিমাণ কি ? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই।

হযরত (দঃ) বলেন, ঐ সময়ই পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনার দৃশ্য বাস্তবায়ীত হওয়ার সময়—

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم

بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ -

"কেয়ামতের দিন এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে যদ্দরুণ সমস্ত গর্ভবতীদের গর্ভপাত হইয়া যায় এবং ঐ দিন তুমি সমস্ত লোকদেরকে মাতাল

দেখিতে পাইবে; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মাতাল হইবে না, কিন্তু আল্লার আজাব এত ভীষণ হইবে যাহার ভয়ে তাহারা মাতালরূপী হইয়া যাইবে।"

হযরতের এই বয়ান ছাহাবীদের নিকট অতি কঠিন বোধ হইল; তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! হাজারের মধ্যে বেহেশতী মাত্র একজন হইবে, সেই একজন আর আমাদের কে হইবে? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, (তোমরা সাধারণ মানব জাতি ভিন্ন "ইয়াজুজ-মাজুজ" নামীয় আর এক শ্রেণীর মানব রহিয়াছে, যাহারা সকলেই অমোসলেম দোযখী। তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সেই) ইয়াজুজ-মাজুজের (সঙ্গে তোমাদের জাতীয় অমোসলেমদেরে যোগ করিয়া মোট) সংখ্যার মোকাবিলায় মোসলামানদের সংখ্যা দেখা হইবে। (অমোসলেমদের সংখ্যার অনুপাতে সমস্ত মোসলমানগণ) হাজারে একজনই দাঁড়াইবে। (সুতরাং সমস্ত মোসলমানই বেহেশতে যাইবে এবং তাহাতে ইয়াজুজ-মাজুজ সহ সকল মানুষের মধ্যে হাজারে একজন বেহেশতী এবং নয় শত নিরানব্বই জন দোযখী হইবে।)

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা (অর্থাৎ আমার উম্মৎ) মোট বেহেশতীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে। মুল হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এতচ্ছ্রবণে আমরা খুশীতে আল্লার প্রশংসা করিলাম এবং তকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীদের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক হইবে। অথচ তোমরা লোক সংখ্যার দিক দিয়া পূর্ব্বাপর উম্মৎগণের সমষ্টি সংখ্যার অনুপাতে তোমাদের সংখ্যা এতই নগণ্য—যেন একটি কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা লোম।

অর্থাৎ লোক সংখ্যার দিক দিয়া এই উম্মতের সংখ্যা সমস্ত উম্মৎগণের সমষ্টি সংখ্যার মোকাবিলায় নগণ্য হইলেও বেহেশতের অধিক আসন এই উম্মৎগণই লাভ করিবে, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎগণের মধ্যে নেককারের সংখ্যা কম ছিল।

ব্যাখ্যাঃ—পবিত্র কোরআন ১৭ পারা ছুরা হজ্জের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ ......

"হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারকে ভয় কর; নিশ্চয় কেয়ামত দিবসে ভীষন ও ভয়াবহ প্রকম্পন হইবে। যেই সময় ঐ প্রকম্পন তোমরা দেখিবে তখন (আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটিবে—যাহাতে মানুষের মধ্যে

এমন আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি হইবে যে তখন শিশুকে দুগ্ধ দানকারীনী মাতা এবং গর্ভধারীনী মহিলা তথায় থাকিলে) দুগ্ধ দানকারীনী দুগ্ধ পোষ্যাকে ভুলিয়া যাইবে এবং গর্ভধারীনীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। এবং ঐদিন তুমি সমস্ত লোকদেরকে মাতাল দেখিতে পাইবে, অথচ তাহারা মাতাল নহে, কিন্তু আল্লার আজাব অতি ভীষন ; (যাহা দৃষ্টে লোকদের হুঁশ-জ্ঞান লোপ পাইয়া যাইবে।)

অর্থাৎ এই দিনের ভয়াবহ আজাব হইতে মুক্তি চাহিলে তোমাদেরকে আল্লার ভয়-ভক্তি জনিত জীবন যাপন করিতে হইবে। উল্লেখিত দিনের আর একটি ভয়াবহ ঘটনার আলোচনাই বক্ষমান হাদীছে রহিয়াছে।

২৪৮১। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ দিনের একটি অবস্থার বর্ণনা দান করিয়াছেন যে দিনটির উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে—

إِنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"সমস্ত লোকদিগকে এক ভীষণ দিনের জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হইবে—যে দিন মানুষ সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট হিসাব দানের জন্য দণ্ডায়মান হইবে।"

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ দিন কোন কোন লোক তাহার অর্দ্ধ কান পর্য্যন্ত ঘর্মে ডুবা অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

২৪৮২। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন হাশর-ময়দানে মানুষের ঘাম এই পরিমাণ বাহির হইবে যে, জমিনের ভিতর সত্তর হাত পর্য্যন্ত উহা শোষিত হইয়াও জমিনের উপর যাহা থাকিবে তাহা কোন কোন ব্যক্তির কান পর্য্যন্ত পৌঁছিবে।

২৪৮৩। হাদীছ ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে নরহত্যার হিসাবই সর্ব্ব প্রথম হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কেয়ামত-দিবসে পরস্পর অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুমের বিচার হইবে। এই ক্ষেত্রে তুইটি ধারায় বিচার হইবে—একে অন্যের উপর জুলুম-অত্যাচার করায় আল্লার বিধান লঙ্ঘন তথা নাফরমানী ও গোনাহ হইয়াছে ; উহার বিচার হইবে। আর যাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে তাহাকে অন্যায়কারী হইতে প্রতিশোধ প্রদান করা হইবে। এই সম্পর্কে তুইটি হাদীছ এস্থলে উল্লেখ আছে ; দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৭৭ এবং ১১৮৩ নম্বরে উহার অনুবাদ হইয়াছে।

২৪৮৪। হাদীছ :— عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ

رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ (وَلَا حِجَابٌ يَسْتُرُهُ) فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ

مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا

قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ

وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

অর্থ :—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে (তাহার আমলের হিসাব-নিকাশ উপলক্ষে) সরাসরি আল্লাহ তায়ালার কথা-বার্ত্তা হইবে। তাহার এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে দোভাষী বা উকিল থাকিবে না, কোন আড়ালও থাকিবে না। এমতাবস্থায় সে তাহার ডান দিকে তাকাইবে, কিন্তু স্বীয় কৃত আমল ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না, বাম দিকে তাকাইবে সেই দিকেও কৃত আমল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সম্মুখ দিকে তাকাইবে সে দিকে চোখের সামনে দোযখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিবে না; অতএব দোযখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর এক খণ্ড খেজুর দান করিয়া হউক বা কাহাকেও একটি ভাল কথা বলিয়া হউক।

অর্থাৎ দোযখ হইতে বাঁচিবার একটি প্রধান সম্বল হইল দান-খয়রাত যদিও উহা সামান্য বস্তুর হয়—যেমন এক খণ্ড খেজুর-খুরমা। তাহাও যদি না যুটে তবে মানুষের উপকারে মুখের ভাল কথা ব্যয় করিলেও দান-খয়রাতের ছওয়াব হইবে।

২৪৮৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, আমার উম্মৎ হইতে সত্তর হাজার লোকের একটি দল বেহেশতে প্রবেশ করিবে; তাহাদের নূরানী চেহেরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিবে।

বেহেশ্‌ত-দোযখের বয়ান

২৪৮৬। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ

وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ

فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمْ

অর্থ— আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীদের বেহেশতে এবং দোযখীদের দোযখে যাওয়ার সর্ব্বশেষ অবস্থায় মৃত্যুকে (একটি জীবের আকৃতিতে) বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থলে দাঁড় করান হইবে। অতঃপর উহাকে জবেহ করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা অমর হইয়াছ; তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। এবং হে দোযখবাসীগণ! তোমরাও অমর হইয়াছ, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তখন বেহেশতবাসীগণের আনন্দ উল্লাস অধিক হইয়া যাইবে এবং দোযখবাসীদের হুঃখ-ভাবনা অধিক হইয়া যাইবে।

২৪৮৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আহ্বান করিবেন, হে বেহেশতবাসীগণ! তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ আল্লার হুজুরে উপস্থিতি ও আনুগত্য নিবেদন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ কি? তাহারা উত্তর করিবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না। আপনি ত আমাদিগকে এত নেয়ামত দান করিয়াছেন যাহা আর কাউকে দান করেন নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদিগকে আরও অধিক উত্তম বস্তু দান করিব। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আরও অধিক উত্তম বস্তু কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তাহা হইল তোমাদের জন্য আমার এই ঘোষণা যে, সর্ব্বদার জন্য তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি রহিল—আমি তোমাদের প্রতি কখনও নারাজ ও অসন্তুষ্ট হইব না।

২৪৮৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কাফেরদিগকে শাস্তি ও আজাব বেশী ভোগ করাইবার জন্য তাহার দেহকে অতিশয় প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি এক একজন) কাফেরের কাঁধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ হইবে।

২৪৮৯। **হাদীছ** :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে (বেড়াইবার উদ্দেশ্যে স্নিগ্ধ ছায়ার জন্য) এত বড় একটি **সুপ্রশস্ত বৃক্ষ** আছে, যাহার ছায়া তলে অতিশয় দ্রুতগামী উত্তম ঘোড়াকে একশত বৎসর দৌড়াইয়া উহা শেষ করা যাইবে না।

২৪৯০। **হাদীছ** :—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, **বেহেশতের নিম্ন-স্তরের** লোকগণ উহার উর্দ্ধতন মহল সমূহেকে ঐরূপ দেখিবে যেরূপ তোমরা আকাশের পূর্ব্ব বা পশ্চিম কিনারায় উদিত নক্ষত্রকে দেখিয়া থাক।

ব্যাখ্যা :— বেহেশতের শ্রেণী বিভক্তিতে উহার মহল সমূহ উর্দ্ধে ও নিম্নে হইবে। কিন্তু নিম্নস্থ মহলবাসীদের মনে কোন প্রকার আক্ষেপ অনুতাপ হইবে না, যেরূপ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কেহ এক তালা-বিশিষ্ট বাড়ীকে অধিক পছন্দ করিয়া থাকে, দশ বিশ তালা-বিশিষ্ট উঁচু দালানের প্রতি তাহার কোনই স্পৃহা থাকে না।

২৪৯১। **হাদীছ** :—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক দোযখ হইতে শাফায়াত বা সুপারিশের দ্বারা বাহির হইয়া আসিবে, (লোহা অনেক সময় আগুনে পুড়িয়া নরম হইয়া যায় তদ্রূপ) তাহাদের শরীর কচি কাক্‌ড়ির ↑ ন্যায় হইয়া যাইবে।

২৪৯২। **হাদীছ** :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক দোযখের মধ্যে কিছু কাল আজাব ভোগের পর তাহাদেরে দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করান হইবে, তাহারা বেহেশতীদের মুখে "জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ লাভকারী" নামে আখ্যায়িত হইবে।

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত লোকগণ তাহারা যাহাদের খাঁটী ঈমান ছিল, কিন্তু তাহাদের গোনাহও ছিল এবং সেই গোনাহ মাফ হওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, ফলে তাহারা দোযখে গিয়াছে—এই শ্রেণীর লোকগণ বিভিন্ন শাফায়াৎ বা সুপারিশের দ্বারা দোযখ হইতে বাহির হইয়া বেহেশত লাভ করিতে থাকিবে।

এই শ্রেণীর লোকগণকে জাহান্নামী তথা জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ লাভকারী আখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার প্রতীক এবং নিদর্শনরূপে প্রকাশ করা।

↑ "কাক্‌ড়ি" শসার ন্যায় এক প্রকার তরকারী, উহা শসা হইতেও অধিক লম্বা ও নরম হয় এবং বাঁকা-কোঁকা হইয়া থাকে।

২৪৯৩। হাদীছ— عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ عَلٰى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ كَمَا

يَغْلِى الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ

অর্থ—নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক কম আজাব ঐ ব্যক্তির হইবে যাহার তুই পায়ের তলায় দোযখের আগুনের তুইটি অঙ্গার রাখিয়া দেওয়া হইবে; যাহার দরুণ তাহার মাথার ভিতর মগজ পর্য্যন্ত টগ্‌বগ্‌ করিবে যেরূপ মুখে ঢাকনা-বিশিষ্ট ডেকের ভিতর রন্ধণীয় বস্তু টগ্‌বগ্‌ করিয়া থাকে।

২৪৯৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে পূর্ব্বাহ্লে তাহাকে তাহার দোযখের ঐ স্থান দেখাইয়া দেওয়া হইবে যে স্থানে সে বদকার হইলে যাইতে বাধ্য হইত। ইহা দেখিয়া সে অধিক শোকর-গুজারী করিবে। তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তি দোযখে যাইবে পূর্ব্বাহ্লে তাহাকে তাহার বেহেশতের ঐ স্থান দেখাইয়া দেওয়া হইবে যে স্থান সে নেক্‌কার হইলে লাভ করিত; ইহা তাহার পক্ষে অত্যধিক অনুতাপ ও তুঃখের কারণ হইবে। (৯৭২পৃঃ)

কেয়ামত দিবসে শাফায়াতের বয়ান

২৪৯৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (হাশর-ময়দানে সমস্ত লোককে একত্রিত করা হইবে হিসাবের জন্য। হিসাবের অপেক্ষায় সেখানে) মোমেনগণও আবদ্ধ থাকিবে, যদ্দরুণ তাহারা বিচলিত হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা পরস্পর বলিবে, আমাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে সুপারিশ লাভের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত; তিনি যেন আমাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান অশান্তির অবস্থা হইতে শান্তি দান করিতেন। এই বলিয়া তাহারা আদম আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে এবং বলিবে, হে আদম! আপনি সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে (মাতা-পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে) সরাসরি স্বীয় কুদরতের

হস্তে পয়দা করিয়াছিলেন, আপনাকে বেহেশতে স্থান দান করিয়াছিলেন, ফেরেশতাদিগকে আপনার প্রতি সেজদাবনত করিয়াছিলেন, সমস্ত জিনিষের এলম ও জ্ঞান আপনাকে দান করিয়াছিলেন; আপনি আমাদের জন্য প্রভুর দরবারে সুপারিশ করুন—আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদিগকে এই স্থানের অশান্তি হইতে শান্তি দান করেন। আদম (আঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই; সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কৃত অপরাধের উল্লেখ করিবেন—তিনি যে, আল্লার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন, তোমরা নূহ আলাইহেচ্ছালামের নিকট যাও; তিনিও (এক হিসাবে *) বিশ্ববাসীর পক্ষে প্রথম নবী ছিলন।

লোকগণ নূহ আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে এবং তাহাদের আবেদন পেশ করিলে তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নহি। তিনি তাঁহার অপরাধও উল্লেখ করিবেন—তিনি যে আল্লার দরবারে একটি আবেদন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই আবেদন এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তুমি যে বিষয় অজ্ঞ সে বিষয়ে আমার নিকট আবেদন করিও না↑। অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন যে, তোমরা হযরত ইব্রাহীমের নিকট যাও তিনি "খলীলুল্লাহ" তথা পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার দোস্ত ছিলেন।

লোকগণ ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে এবং তাহাদের নিবেদন পেশ করিলে তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের কাজের উপযুক্ত নহি; তিনি তাঁহার তিনটি কথার উল্লেখ করিবেন—যেই তিনটি কথাকে তিনি মিথ্যা মনে করেন। ⁑ অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন, তোমরা হযরত মূছার নিকট যাও, তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বন্দা ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে তওরাৎ কেতাব দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সঙ্গে সরাসরি কালাম করার তথা কথা বলার নৈকট্য তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

লোকগণ মূছা আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের কাজের উপযুক্ত নহি; তিনি তাঁহার অপরাধ উল্লেখ করিবেন—তিনি যে, এক কিবতিকে হত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন, তোমরা হযরত

---

* নূহ আলাইহেচ্ছালামের যমানায় মহাপ্লাবনে সারা বিশ্ব ধ্বংস হইয়া দুনিয়া পুনঃ আবাদ হওয়ার পর মানব জাতির প্রতি সর্ব্বপ্রথম নবী হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামই ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহার বংশ হইতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ।

↑ সেই আবেদনটি ছিল মহাপ্লাবন কালে তাঁহার পুত্র কেনান সম্পর্কে। বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ড হযরত নূহের বয়ান দ্রষ্টব্য।

⁑ কথা তিনটির বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ড হযরত ইব্রাহীমের বয়ান দ্রষ্টব্য।

ঈসার নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বন্দা ছিলেন, বিশিষ্ট রস্থল ছিলেন, তিনি আল্লাহ তায়ালার (বিশেষ কায়দায় প্রেরিত)** রুহ ছিলেন, তিনি (অসাধারণরূপে*** সরাসরি) আল্লার কলেমা (তথা "কুন্" শব্দের আদেশ দ্বারা পয়দা হইয়া) ছিলেন।

লোকগণ ঈসা আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে, তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের কাজের উপযুক্ত নহি +। তোমরা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার এমন প্রিয় বন্দা যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বাহ্লেই তাঁহার আগের-পাছের সব গোনাহ মাফ বলিয়া ঘোষনা দিয়া দিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলেন, লোকগণ তখন আমার নিকট আসিবে। (আমি তাহাদিগকে বলিব, আমি তোমাদের কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব, আমি তোমাদের কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব।) সেমতে আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করিব, আমাকে অনুমতি দান করা হইবে। আমি আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়িয়া যাইব। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে সেজদায় রাখিবেন। অতপর বলিবেন, হে মোহাম্মদ! আপনি সেজদা হইতে উঠুন, আপনার বক্তব্য পেশ করুণ; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে, আবেদন পেশ করুন; যাহা চাহিবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

হযরত (দঃ) বলেন, তখন আমি সেজদা হইতে মাথা উঠাইব এবং আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ—গুণগান ও প্রশংসা করিব, যাহা আল্লাহ তায়ালা ঐ সময়ই

** পিতার মাধ্যম ব্যাতিরেকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তাঁহার রুহকে জিব্রিল ফেরেশতার মারফৎ পাঠাইয়াছিলেন, জিব্রিল ফেরেশতা ফুৎকারের দ্বারা সেই রুহকে মরয়্যম বিবির গর্ভে পৌঁছাইয়াছিলেন।

*** মানুষ বরং জীব মাত্রই তাহার দেহ আল্লার কুদরত ও আদেশে পিতা-মাতার বীর্য্যের দ্বারা পয়দা হইয়া থাকে, কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের দেহ ঐরূপে পিতা-মাতার বীর্য্যে পয়দা হয় নাই, বরং তাঁহার দেহ মাতৃগর্ভে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির আদেশ "কুন্—হইয়া যাও" শব্দের দ্বারা পয়দা হইয়াছিল।

+ হযরত ঈসার (আঃ) নিজের কোন ত্রুটির উল্লেখ এখানে নাই, কিন্তু এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এই সময় এতটুকু বলিবেন যে, عبدت من دون الله "এক আল্লার বন্দেগী না করিয়া আমার পূজাও করা হইয়াছিল।" অর্থাৎ খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ—স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লার পুত্র বা তিন খোদার এক খোদা বলিয়া থাকে; এ-সম্পুর্কে তাঁহার কোন অপরাধ নাই, তবুও তিনি এর জন্য লজ্জা বোধ করিবেন, অনুতপ্ত হইবেন।

আমাকে শিক্ষা দিবেন। (তখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুপারিশে হিসাব আরম্ভ হইবে এবং হাশর ময়দানের উপস্থিত কষ্ট যাতনা সমাপ্তির সূচনা হইবে। এই সুপারিশের দ্বারা দুনিয়ার আদি-অন্তের সমস্ত লোকই লাভবান হইবে এবং সন্তুষ্ট হইবে। তাই তাহারা ঐ সময় মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রসংশা-মুখর হইবে। ইহাই হইল মাকামে-মাহমুদ—তথা সারা বিশ্বের জনগণের প্রশংসা ভাজন হওয়া মর্য্যাদার একটি বিকাশ। এই শাফায়াৎ বা সুপারিশকে শাফায়াতে-কোব্‌রা বা বড় সুপারিশ বলা হয়, যেহেতু এই সুপারিশ সারা বিশ্বের জনগণের পক্ষে হইবে।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুপারিশ এখানেই সমাপ্ত হইবে না। এর পরে আসিবে শাফায়াতে-ছোগরা তথা স্বীয় উম্মতের পক্ষে সুপারিশের বহর—তাঁহার ঈমানদার গোনাহগার উম্মতগণ যে, দোযখে যাইবে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে পৌঁছাইবার জন্য। উহারই বর্ণনা দান করতঃ হযরত (দঃ) বলেন—)।

তারপর আবার আমি শাফায়াৎ করিব (আমার গোনাহগার উম্মতকে দোযখ হইতে বাহির করার জন্য।) তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য একটি সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বলিবেন, আপনি যান্ (এবং এই শ্রেণীর লোকগণকে দোযখ হইতে বাহির করুণ) তখন আমি আল্লার দরবার হইতে চলিয়া আসিব এবং ঐ শ্রেণীর লোকগণকে দোযখ হহতে বাহির করিয়া বেহেশতে পৌঁছাইব। তারপর আবার আমি আমার প্রভুর দরবারে ফিরিব এবং অনুমতি প্রর্থনা করিব। অনুমতি পাইয়া আমি পৌছিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। প্রভু-পরওয়ারদেগার যত সময় ইচ্ছা আমাকে সেজদায় রাখিবেন। অতঃপর বলিবেন, হে মোহাম্মদ। সেজদা হইতে উঠুন এবং আবেদন পেশ করুণ; গ্রহণ করা হইবে, সুপারিশ করুণ মঞ্জুর করা হইবে, যাহা চাহিবেন দেওয়া হইবে। আমি সেজদা হইতে উঠিব এবং আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের ছানা-ছিফৎ ও প্রসংশা করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। অতঃপর আমি শাফায়াৎ করিব, তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিব এবং ঐ সীমার লোকগিদকে বেহেশতে পৌছাইব। আবার তৃতীয় বার আমি (আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য) আমার প্রভুর দরবারে ফিরিব এবং অনুমতি প্রর্থনা করিব। অনুমতি পাইয়া আমি পৌঁছিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। আমার প্রভু-পরওয়ার-দেগার যত সময় ইচ্ছা আমাকে সেজদায় রাখিবেন, অতঃপর বলিবেন, হে মোহাম্মদ! সেজদা হইতে উঠুন, নিবেদন পেশ করুন মঞ্জুর করা হইবে, সুপারিশ করুন

গ্রহণ করা হইবে, যাহা চাহিবেন দেওয়া হইবে। আমি সেজদা হইতে উঠিব এবং প্রভু-পরওয়ারদেগারের ছানা-ছিফৎ ও প্রসংশা করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। অতঃপর শাফায়াৎ করিব, তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য একটি সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, আমি তথা হইতে চলিয়া আসিয়া ঐ সীমার লোকদিগকে বেহেশতে পৌঁছাইব।

এইভাবে ঈমানদার-গোনাহগারগণকে দোযখ হইতে বাহির করা হইতে থাকিবে। অবশেষে দোযখে একমাত্র তাহারাই থাকিয়া যাইবে যাহারা কোরআনের ঘোষনা অনুযায়ী চিরজাহান্নামী সাব্যস্ত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— বোখারী শরীফ ১১১৮ পৃষ্ঠায় এই হাদীছ খানা বর্ণিত হইয়াছে। তথায় এই সীমা নির্দ্ধারণের বিষয়টির কিছু তফসীল উল্লেখ আছে—হযরত (দঃ) বলেন, সেজদা হইতে উঠিয়া আমি বলিব, হে পরওয়ারদেগার! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি যান এবং যাহার দেলে জবের দানা পরিমান ঈমান আছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করুন। দ্বিতীয় বারও সেজদা হইতে উঠিয়া হযরত (দঃ) বলিবেন, আমার উম্মত! আমার উম্মত!! এইবার আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার দেলে চীনা বা সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করুন। তৃতীয় বারও সেজদা হইতে উঠিয়া হযরত (দঃ) বলিবেন, আমার উম্মত! আমার উম্মত!! এইবার আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার দেলে সরিষার দানা অপেক্ষা ছোট আরও অধিক ছোট তার চেয়েও ছোট দানা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করুন।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে—তারপর আমি চতুর্থ বারও প্রভুর দরবারে ফিরিব এবং সেজদাবনত হইব, আল্লার ছানা-ছিফৎ ও প্রসংশা করিব। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে মোহাম্মদ! সেজদা হইতে উঠুন' নিবেদন পেশ করুন, মঞ্জুর করা হইবে, যাহা চাহিবেন দেওয়া হইবে, শাফায়াৎ করুণ গ্রহণ করা হইবে। এইবার আমি বলিব, (দোযখ হইতে বাহির করার) অনুমতি আমাকে প্রদান করুন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে (কালেমা-তায়্যেবা—) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু······কে গ্রহণ করিয়াছে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার ইজ্জৎ—বড়ায়ী ও মহানত্বের কসম—আমি নিশ্চয় দোযখ হইতে বাহির করিব প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু······গ্রহণ করিয়াছে।

২৪৯৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! কেয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতের দ্বারা

সর্ব্বাধিক উপকৃত কোন ব্যক্তি হইবে ? হযরত (দঃ) বলিবেন, আমার এই ধারণাই ছিল যে, তুমি সর্ব্বাগ্রে এই তথ্যের হাদীছ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যেহেতু হাদীছের প্রতি আমি তোমাকে অত্যাধিক লালায়িত ও আকৃষ্ট দেখি। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিবেন—

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ

"কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াৎ দ্বারা পূর্ণ উপকৃত হইবে একমাত্র ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি অন্তরে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু······কে গ্রহণ করিয়াছে।"

অর্থাৎ সায়্যেদুল-আম্বিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শাফায়াৎও ঈমান ব্যতিরেকে নাজাতের কাজে আসিবে না।

২৪৯৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে তাঁহার একটি দোয়া অবশ্যই কবুল ও গ্রহণ করার নিশ্চয়তা দিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুত দোয়ার উদ্দেশ্য করিয়া নবী দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

সকল নবীগণ তাঁহাদের সেই প্রতিশ্রুত সুযোগের উদ্দেশ্য করিয়া দোয়া করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা তাঁহাদের জন্য কবুল হইয়াছে। কিন্তু আমি আমার জন্য প্রতিশ্রুত সুযোগের দোয়াকে কেয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াৎ উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া দিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—বন্দাদের দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করিয়া থাকেন ; নবীগণের দোয়াত সাধারণতঃ কবুল হওয়ার কথাই । কিন্তু ইহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন দয়া পর্য্যায়ের মাত্র—অকাট্যরূপের নির্দ্ধারিতভাবে প্রতিশ্রুত পর্য্যায়ের নহে।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম এই যে, নির্দ্ধারিতভাবে প্রতিশ্রুত পর্য্যায়ে অকাট্যরূপে গৃহিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক নবীকে যে কোন একটি দোয়ার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক নবী তাঁহার সেই সুযোগটি দুনিয়াতেই বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন! নবীজী মোস্তফা (দঃ) বলেন, আমি সেই বিশেষ সুযোগকে উদ্দেশ্য করিয়া দুনিয়ার জীবনে কোন দোয়া করিনাই। সুতরাং আমার সেই সুযোগ ব্যায়িত হয় নাই, আমি ইচ্ছা করিয়াই উহাকে জমা রাখিয়া দিয়াছি। পরকালে কেয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াৎ বা সুপারিশ উপলক্ষে আমি আমার এই সুযোগ ব্যবহার করিব।

আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ ও পোল-ছেরাতের বয়ান

২৪৯৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পারিব কি? হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, পূর্ণিমার রাত্রে মেঘ বিহীন আকাশে চাঁদ দেখিতে কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় কি? তাহারা বলিল, না ইয়া রসুলাল্লহ! হযরত (দঃ) পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, মেঘ বিহীন পরিষ্কার আকাশে সূর্য্য দেখিতে তোমাদের জন্য কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় কি? সকলেই উত্তর করিল, না ইয়া রসুলাল্লাহ! তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা কেয়ামতের দিন ঠিক এইরূপেই বিনা বাধা-বিঘ্নে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে পাইবে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত লোকদিগকে একত্রিত করিবেন। (তাহাদের হিসাব-নিকাশ হইবে। ভাল-মন্দ সব লোকই একত্রিত থাকিবে) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যে লোক যাহার এবাদৎ করিয়াছে তাহাকে তাহার পথ অনুসরণ করিতেই হইবে—তাহার সঙ্গে অবশ্যই তাহাকে যাইতে হইবে। সেমতে যাহারা সূর্য্য-পূজা করিত তাহারা সূর্য্যের পেছনে চলিবে তথা সূর্য্য যে স্থানে পৌঁছিবে সেও সেই স্থানে যাইতে বাধ্য হইবে। যাহারা চাঁদের পূজা করিত তাহারা চাঁদের পেছনে চলিতে বাধ্য হইবে। যাহারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিত তাহারা সেই সেই দেব-দেবীদের পেছনে চলিতে বাধ্য হইবে—তথা উহারা যথায় পৌঁছিবে তাহারাও তথায় পৌঁছিতে বাধ্য হইবে।

(পবিত্র কোরআন ও সুস্পষ্ট হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে—যে সব দেব-দেবীর পূজা করা হয় বা পাথর, মাটি, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মূর্ত্তি বা যে কোন বস্তুকে পূজা করা হয় ঐ সব, এমনকি চন্দ্র-সূর্য্যকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে—শাস্তি দানের জন্য নয়, বরং তাহাদের পূজকগণকে এক সঙ্গে দোযখে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্য ↑। সেমতে উপরোল্লেখিত ঘোষণা অনুযারী আল্লাহ ভিন্ন অন্য যে কিছুর পূজকগণ সকলেই দোযখে পতিত হইবে।)

তখন শুধুমাত্র এক আল্লার বন্দেগীকারীদের দল অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সেই দলের নামধারী মোনাফেকরাও থাকিবে (যাহারা চিরজাহান্নামী। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে খাঁটি ঈমানদার-গোনাহগারগণও থাকিবে যাহাদের অনেকে অস্থায়ীরূপে দোযখে যাইবে। সুতরাং ঐ সময় এই দলের পরীক্ষাও হইবে যে—)

↑ আর যাহারা কোন দেব-দেবী বা মুর্ত্তী পূজা করে নাই, কোন পয়গাম্বরকে আল্লার শরীক বানাইয়াছে—যেমন ইহুদীগণ হযরত ওযায়ের (আঃ)কে, নাছারাগণ ঈসা (আঃ)কে আল্লার শরীক বলিয়া থাকে, তাহাদের বর্ণনা পরবর্ত্তী হাদীছে উল্লেখ হইতেছে।

তখন ঐ দলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সাক্ষাৎ-দান করিবেন এবং বলিবেন, আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। কিন্তু (সেই সাক্ষাৎ দান তাঁহার এমন গুণাবলীর সহিত হইবে, যাহা ঐ সব গুণাবলী হইতে ভিন্ন যে সব গুণাবলী সম্পর্কে কোরআন-হাদীছের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান রহিয়াছে। ফলে) তাহারা ঐ দর্শনে আল্লাহ তায়ালার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করিবে না। তাহারা বলিবে, আমরা এই স্থানেই থাকিব যাবৎ না আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ পাইলে আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এমন গুণাবলীর সহিত সাক্ষাৎ দান করিবেন যে সব গুণাবলীর সহিত তাহারা পরিচিত; আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বীকার করিবে, হাঁ—আপনি আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! অতঃপর ঐ দল আল্লাহ তায়ালার (আদেশের) অনুসরণে চলিতে থাকিবে। (এখনও ঐ দলের মধ্যে মোনাফেক ও বদকারগণ গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে, তাই) তখন জাহান্নমের উপর পোল-ছেরাৎ কায়েম করা হইবে।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বপ্রথম পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করিব। ঐ সময় (সকল মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। কাহারও মুখে কথা ফুটিবে না,। একমাত্র রসুলগণই কথা বলিবেন। রসুলগণের বাক্যও ঐ সময় শুধু এই হইবে— اللهم سلم سلم! হে আল্লাহ! রক্ষা করুণ! রক্ষা করুণ!!

জাহান্নামের মধ্যে অসংখ্য আঁকড়া থাকিবে যাহার বক্র মাথা সা'দান কাঁটার ন্যায় হইবে। তোমরা দেখিয়াছ ত, সা'দান কাঁটা কি সাংঘাতিক রকমের হয়? সকলেই আরজ করিল, হাঁ—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা সা'দান কাঁটা দেখিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, জাহান্নামের আঁকড়াগুলির বক্র মাথা সেই সা'দান কাঁটার ন্যায় হইবে, অবশ্য জাগতিক সা'দান কাঁটার তুলানায় জাহান্নামের আঁকড়ার বক্র মাথা যে কত গুণ বেশী বড় হইবে তাহা আল্লাহই জানেন। জাহান্নামের উপরিস্থ পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করা কালে ঐ আঁকড়া সমূহ (স্বয়ং ক্রিয়ারূপে) বিভিন্ন লোককে তাহাদের আমল অনুপাতে টানিয়া ধরিবে। কেহ বা তাহার বদ-আমলের দরুণ সেই টানে জাহান্নমে পতিত হইবে। কেহ বা হোঁচট্ খাইয়া পড়িবে, কিন্তু রক্ষা পাইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত লোকদের মধ্যে বিচার-পর্ব্ব শেষ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া কোন কোন দোযখীকেও*

---

* ইহারা ঐ সব ঈমানদার লোকগণ যাহারা গোনাহের শাস্তি ভোগের জন্য অস্থায়ীরূপে দোযখে গিয়াছে।

দোযখ হইতে বাহির করার ইচ্ছা করিবেন তখন (বিভিন্ন শাফায়াত ও সুপারিশের ফলে) তিনি ফেরেশতাগণকে (ঐ সব লোক স্তরে স্তরে দোযখ হইতে বাহির করিবার আদেশ করিতে থাকিবেন। এমনকি অবশেষে) আদেশ করিবেন, যে সব লোক আল্লার সহিত কোন কিছুকে শরীক করে নাই—যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্...... (কলেমা-তাইয়েবার ঈমান) গ্রহণ করিয়া ছিল সেই সব লোককে দোযখ হইতে বাহির কর! ফেরেশতাগণ ঈমানদার লোকগণকে দোযখের মধ্যে সেজদার নিশান দ্বারা (সহজে) চিনিতে পারিবেন; দোযখের অগ্নি মোমেনের সমস্ত শরীরকে ভস্ম করিতে পারিবে, কিন্তু সেজদার অঙ্গ সমূহে কোন ক্রিয়া করিতে পারিবে না; দোযখের আগুনের জন্য আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারের সেজদার অঙ্গগুলিকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

ঐ সমস্ত লোককে দোযখ হইতে এমন অবস্থায় বাহির করা হইবে যে, তাহারা আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাই তাহাদের উপর মাউল-হায়াৎ—জীবনী শক্তিময় পানি প্রবাহিত করা হইবে; যেই পানির প্রবাহনে তাহারা অতিশয় সুন্দর জীবন লাভ করিয়া উঠিবে—যেরূপ বাদলা ঘাসের মুল পলিমাটির মধ্যে (সোনালী রং ধারণ করিয়া) অঙ্কুরিত হয়। এই পর্য্যায়ের বিচার-বিবেচনাকেও আল্লাহ তায়ালা সমাপ্তি করিবেন। শুধুমাত্র একটি লোক অবশিষ্ট থাকিবে—সেই লোকটিই হইবে দোযখীদের মধ্যে সর্ব্বশেষ বেহেশতে প্রবেশকারী।

এই লোকটিকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া দোযখের কেনারায় বসাইয়া রাখা হইবে—লোকটির মুখ দোযখের দিকে থাকিবে। লোকটি দোয়া করিবে, হে প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমার মুখের দিকটা দোযখ হইতে ফিরাইয়া দিন; দোযখের দুর্গন্ধ আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া ফেলে এবং উহার অগ্নি শিখা আমাকে পোড়াইয়া ফেলে। সে আল্লার দরবারে এই দোয়াই করিতে থাকিবে যত সময় দোয়া করা আল্লার ইচ্ছা থাকে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করা হইলে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ত নাই যে, তুমি আরও কিছু চাহিয়া বস? সে ব্যক্তি বলিবে, তোমার ইজ্জতের কসম—ইহা ভিন্ন আমি আর কিছু চাহিব না। এই বলিয়া সে আল্লার দরবারে বহু রকমের ওয়াদা-অঙ্গীকার প্রদান করিবে যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তাহার মুখের দিক দোযখ হইতে ফিরাইয়া দিবেন। যখন সে বেহেশতমুখী হইবে এবং বেহেশত দেখিতে পাইবে তখন আল্লাহ যত সময় তৌফিক দেন সে চুপ করিয়া থাকিবে। তারপর বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতের দরওয়াজা পর্য্যন্ত আগে

বাড়াইয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি না আমার নিকট ওয়াদা-অঙ্গীকার করিয়াছ যে, কখনও আর অন্য কিছু চাহিবে না—কতই না অঙ্গীকার ভঙ্গকারী তুমি? তখন সে হে প্রভু! হে প্রভু!! বলিয়া দোয়া করিতেই থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সম্ভাবনা নাই ত যে, তোমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করা হইলে তুমি আবার অন্য কিছু চাহিবে? সে বলিবে, না না—তোমার ইজ্জতের কসম, ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহিব না। এই কথার উপর সে যত ইচ্ছা ওয়াদা-অঙ্গিকার প্রদান করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশতের দরওয়াজা পর্য্যন্ত আগে বাড়াইয়া দিবেন। যখন সে বেহেশতের দরওয়াজায় দাঁড়াইবে তখন বিশাল বেহেশত তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিবে এবং বেহেশতের অগণিত নেয়ামতরাশি ও ভোগ-বিলাশের সামগ্রী সমুহ সে দেখিতে পাইবে।

এই বারও সে যত সময় চুপ থাকা আল্লাহ তাহার অদৃষ্টে রাখিয়াছেন, চুপ থাকিবে। অতঃপর সে নিবেদন করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি আমার নিকট কত কত ওয়াদা-অঙ্গীকার করিয়াছ—তুমি আর কিছু চাহিবে না? হে আদম-তনয়! তুমি কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। কতই না অঙ্গীকার ভঙ্গকারী তুমি! ঐ ব্যক্তি বলিবে, প্রভু হে! আমি আপনার রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া কপাল-পোড়া হইতে চাই না—এই বলিয়া সে দোয়া করিতেই থাকিবে। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। যখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন তখন তাহাকে বলিবেন, যাও—বেহেশতে প্রবেশ কর।

ঐ ব্যক্তি বেহেশতে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, তোমার যত যত আরজু-আকাঙ্খা হইতে পারে সব তুমি প্রকাশ কর। ঐ ব্যক্তি তাহার আরজু-আকাঙ্খা প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহা পাইবার দরখাস্ত করিবে। তদুপরি আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে অনেক কিছু আরজু-আকাঙ্খা স্মরণ করাইয়া দিবেন—ইহাও চাও, উহাও চাও, এমনকি আর কোন আশা আকাঙ্খা বাকী থাকিবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাকে তোমার সমুদয় আশা আকাঙ্খা সামগ্রী দেয়া হইল এবং আরও ঐ পরিমাণ অধিক দেওয়া হইল।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নামক ছাহাবী এই হাদীছের বর্ণনা শ্রবণকালে এস্থলে বলিয়া উঠিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আমি পুর্ণরূপে স্মরণ রাখিয়াছি, একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—"উহার দশ গুণ অধিক তোমাকে দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এই ব্যক্তি হইবে সর্ব্ব শেষ বেহেশতে প্রবেশকারী।

২৪৯৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, দোযখ হইতে বাহির হইয়া বেহেশতে প্রবেশকারীদের সর্ব্বশেষ লোকটির অবস্থা আমি ভালরূপে জ্ঞাত আছি। সে হইবে এমন এক ব্যক্তি যে, হামাগুড়ি খাইয়া দোযখ হইতে বাহির হইবে (—একবার সে একটু চলিতে সক্ষম হইবে আবার হোঁচট্ খাইয়া পড়িবে এবং আগুন তাহাকে লেপ্‌টিয়া ও জড়াইয়া ধরিবে, অবশেষে সে দোযখ অতিক্রম করিয়া আসিতে সক্ষম হইবে। দোযখ অতিক্রম করিয়া আসার পর সে দোযখের প্রতি তাকাইয়া বলিবে, কত বড় মহান মহান তিনি—যিনি আমাকে দোযখ হইতে নাজাত দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এত বড় নেয়ামত দান করিয়াছেন যে, ঐরূপ দান আগের-পাছের কোন ব্যক্তিকেই করেন নাই।)

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। সে বেহেশতে আসিলে পর তাহার মনে হইবে, বেহেশত যেন পরিপূর্ণ। সে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিবে, হে পরওয়ারদেগার! বেহেশত ত পরিপূর্ণ দেখিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর। এইবারও তাহার ধারণা হইবে বেহেশত যেন পরিপূর্ণ। সে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! বেহেশত ত পরিপূর্ণ। আল্লাহ বলিবেন, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর, তোমাকে সমগ্র জগৎ পরিমাণ আরও উহার দশ গুণ অধিক পরিমাণ বিশাল ও বিস্তীর্ণ বেহেশত প্রদান করা হইল। সে ব্যক্তি বলিবে, আপনি সকল বাদশার বাদশাহ, আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছেন?

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এই বয়ানের সময় আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি এমন ভাবে হাসিয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার মুখের ভিতরের দাঁত দেখা গিয়াছে। তখন সকলেই বলাবলি করিল যে, এই হইবে সর্ব্ব নিম্ন বেহেশতী ব্যক্তির মর্য্যাদা!

ব্যাখ্যাঃ—বেহেশতে প্রবেশকারী সর্ব্বশেষ ব্যক্তির অবস্থা পূর্ব্বোল্লেখিত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছেও বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীছের বিবরণ একটু বিস্তারিত, তথাপি দোযখের কিনারা হইতে বেহেশতের দরওয়াজা পর্য্যন্ত পৌঁছার বিবরণটা ঐ হাদীছেও সংক্ষিপ্ত। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আলোচ্য হাদীছটি মোসলেম শরীফেও আছে। তথায় এই বিষয়টির বিবরণ এইরূপ রহিয়াছে—

দোযখের কিনারা হইতে অনতি দুরে একটি বৃক্ষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন সে বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্ত্তী করিয়া

দিন। আমি উহার ছায়ায় আশ্রয় নিব এবং উহার নিকটস্থ প্রবাহমান পানি পান করিব। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাকে এই সুযোগ প্রদান করিলে হয়ত তুমি আরও চাহিবে। সে বলিবে, না—ইয়া পরওয়ারদেগার! সে অঙ্গীকার করিবে যে, অন্য আর কিছু সে চাহিবে না। পরওয়ারদেগারও তাহাকে এই ব্যাপারে ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন। যেহেতু সে এমন এক জিনিষ দেখিতেছে যাহা দেখিয়া সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী পৌঁছাইয়া দিবেন।

অতঃপর তথা হইতে অনতি দুরে আর একটি বৃক্ষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে। উহা আরও অধিক উত্তম। উহা সম্পর্কেও সে পূর্ব্বের ন্যায় আবেদন-নিবেদন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়া ছিলে, আর কিছু চাহিবে না। এইবারও সে ওয়াদা-অঙ্গীকার দিবে এবং তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তৃতীয় আর একটি বৃক্ষ বেহেশতের দরওয়াজার নিকটবর্ত্তী তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে, যে বৃক্ষটি প্রথমোক্ত উভয়টি হইতে উত্তম। উহা সম্পর্কেও তাহার সেই আবেদন-নিবেদন পেশ হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেও পূর্ব্বের ন্যায় বলা হইবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ তৃতীয় বৃক্ষের নিকটও পৌঁছাইবেন। তথায় যাইয়া সে বেহেশতবাসীদের সুমধুর আওয়াজও শুনিতে পাইবে। তখন সে আরজ করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতের মধ্যেই পৌঁছাইয়া দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদম-তনয়! তোমার হইতে আমার জন্য রেহাই পাইবার উপায় কি? তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি সমগ্র দুনিয়ার দ্বিগুণ বিশাল বেহেশত তোমাকে দান করি? তখন ঐ ব্যক্তি বলিবে, হে প্রভু আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করেন? অথচ আপনি ত সারা জাহানের প্রভু!

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এই বয়ানের সময় হাসিয়া পড়িলেন এবং শ্রোতাগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কেন হাসিলাম। শ্রোতাগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন হাসিলেন? তিনি বলিলেন, এই বয়ান কালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও হাসিয়া ছিলেন এবং ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসিলেন? হযরত (দঃ) বলিয়া ছিলেন যে—"আপনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার হইয়া আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করেন?" এই কথা উপলক্ষে রাব্বুল আলামীনের হাসির পরিপ্রেক্ষিতেই আমি হাসিয়াছি এবং তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি তোমার সঙ্গে রহস্য করি না, বরং আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে সক্ষম।

২৫০০। হাদীছঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পারিব কি? হযরত (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, মেঘ বিহীন পরিষ্কার দিনে সূর্য্য দেখিতে তোমাদের কোন বাধা-বিঘ্ন হয় কি? আমরা উত্তর করিলাম, না। হযরত (রাঃ) বলিলেন, তদ্রূপ কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিতেও কোন বাধা-বিঘ্ন থাকিবে না।

অতঃপর হযরত (দঃ) (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ দর্শনের বর্ণনা দান পূর্ব্বক) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, যে দল যাহার পূজা করিত সেই দলকে তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। সেমতে ছলীব বা ক্রুশ পূজকগণ ক্রুশের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইবে। দেব-দেবীর পূজারীগণ দেব-দেবীদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইবে—এইরূপে প্রত্যেক পূজণীয় বস্তুর সহিত উহার পূজকগণ যাইতে বাধ্য হইবে (এবং ঐ সব পূজণীয় বস্তু যেহেতু দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে তাই উহাদের পূজকগণও দোযখে যাইতে বাধ্য হইবে)। অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে ঈমানের দাবীদার দল—যাহাদের মধ্যে মোনাফেক ও গোনাহগারগণও থাকিবে এবং কিছু সংখ্যক কেতাবধারী কাফের (—ইহুদ-নাছারাদের এক দল লোক যাহাদের পূজণীয় ছিল নবী বা পয়গাম্বর, তাহারা অন্য কোন স্থূল বস্তুর পূজক ছিল না, অথচ নবী ত আর দোযখে যাইবেন না, তাই ঐ লোকদিগকে দোযখে নেওয়ার অন্য ব্যবস্থা করা হইবে যে—) তারপর জাহান্নামকে (হাশর-ময়দানের নিকটে) আনা হইবে। দুর হইতে উহা মরীচিকার ন্যায় দেখা যাইবে। তখন ইহুদীগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহাকে মাবুদ গণ্য করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আল্লার পুত্র ওযায়েরকে (যিনি বস্তুতঃ একজন নবী ছিলেন) মাবুদ গণ্য করিয়া থাকিতাম। তাহাদিগকে বলা হইবে— তোমরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী-পুত্র নাই। এখন তোমরা কি চাও? (সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময় তাহাদের উপর ভয়ানক পিপাসা চাপাইয়া দেওয়া হইবে তাই) তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পানি পান করান। (তাহাদের সম্মুখে দোযখ মরীচিকার ন্যায় পানিরূপ দেখা যাইবে;) তাহাদিগকে বলা হইবে, ঐ স্থানে যাইয়া পানি পান কর। তখন তাহারা ঐ স্থানে যাইবে এবং দোযখে পতিত হইবে।

তারপর নাছারাগণকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার বন্দেগী করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা আল্লার পুত্র মসীহ্-এর এবাদৎ করিয়াছি। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী-পুত্র নাই। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা কি চাও? (তাহাদেরও ঐ অবস্থা এবং) তাহারাও বলিবে, আমরা পানি চাই। তাহাদিগকেও (ঐ দোযখের দিকে দেখাইয়া) বলা

হইবে ঐ পানি পান কর। তাহারাও তথায় যাইয়া দোযখে পতিত হইবে। এখন অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে শুধু এক আল্লার বন্দেগীর দাবীদার দল যাহাদের দলে মোনাফেক ও গোনাহগার লোকগণ গা-ঢাকা দিয়া থাকিবে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা বসিয়া আছ কেন? সব লোক ত চলিয়া গিয়াছে? তাহারা উত্তর করিবে, ঐ লোকগণ হইতে আমরা দুনিয়াতেই ভিন্ন ছিলাম। অথচ দুনিয়াতে ত তাহাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজনও ছিল। আজ ত সেই প্রয়োজনও নাই। আমরা এখানে এক ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনিতে পাইয়াছি যে, প্রত্যেক দলকে তাহাদের মা'বুদের সঙ্গে যাইতে হইবে; সুতরাং আমরা আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের অপেক্ষায় আছি।

হযরত (দঃ) বলেন—তখন ঐ লোকদের আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ হইবে। প্রথম দর্শনে তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তায়ালার এমন গুণাবলীর বিকাশ হইবে যাহা ঐ গুণাবলী হইতে ভিন্ন যে সব গুণাবলী পূর্ব্ব হইতে তাহারা জ্ঞাত রহিয়াছে। (অতঃপর দ্বিতীয়বার দর্শন লাভ হইবে এই দর্শনে এমন গুণাবলীর বিকাশ হইবে যাহা সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে তাহারা জ্ঞাত। এইবার যখন) ঘোষণা হইবে আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা—প্রভু-পরওয়ারদেগার, তখন তাহারা স্বীকৃতি পেশ করিবে, হাঁ—আপনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগার। (এতটুকু ব্যতীত সাধারণ ভাবে) ঐ দিন আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথন নবীগণেরই হইবে।

তারপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের জ্ঞানে প্রভু-পরওয়ার-দেগারের কোন বিশেষ গুণের পরিচয় আছে কি? তাহারা বলিবে, হাঁ—আছে; তাহা হইলে "সাক্" +। তখন সেই গুণ ও ছিফতের বিকাশ হইবে যাহার প্রভাবে (সকলেই সেজদার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং) খাঁটি মোমেনগণ ত অনায়াসে আল্লার দরবারে সেজদাবনত হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যাহারা শুধু লোক-দেখানো এবং লোক-শুনানো উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়া থাকিত—ঐ দিন তাহাদের প্রত্যেকেই সেজদা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে; সেজদা করার জন্য প্রস্তুত হইবে, কিন্তু তাহাদের পীঠ ও কোমরের হাড়গুলি জমাট বাঁধিয়া একখানা কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া যাইবে।

+ "সাক্" হইল আল্লাহ তায়ালার একটি ছিফৎ বা বিশেষ গুণ যাহার বিকাশ ইহ-জগতে হয় নাই বলিয়া আমরা উহার কোন ব্যাখ্যা উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহি। অবশ্য পবিত্র কোরআন ২৯ পারা ছুরা নূনের মধ্যে উহার এবং উহা সম্পর্কে এই বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে যে—"কেয়ামতের দিন যখন "সাক্" গুণ বা ছিফতের বিকাশ হইবে তখন (উহার প্রতিক্রিয়ায়) সকলেই সেজদার প্রতি আকৃষ্ট হইবে (এবং সেজদাবনত হইবে) কিন্তু যাহারা মোনাফেক

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তারপর পোল-ছেরাৎকে আনা হইবে এবং দোযখের উপর উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! পোল-ছেরাতের অবস্থা কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা (গোনাহগারদের পক্ষে) ভীষণভাবে পাছাড় খাওয়ার স্থান, আছাড় খাওয়ার স্থান। উহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোহার আঁকড়া লট্‌কানো থাকিবে এবং অতি প্রশস্ত প্রশস্ত কাঁটা থাকিবে যে সবের বক্র মাথায় বড়শির ন্যায় উল্টা কাঁটাও থাকিবে যেরূপ নজদ অঞ্চলের সা'দান কাঁটা হইয়া থাকে। (ঐ সব আঁকড়া ও কাঁটাগুলি আল্লার হুকুমে স্বয়ংক্রিয়রূপে বিভিন্ন লোককে বাঁধাইতে থাকিবে।) পক্ষান্তরে সৎ ও কামেল মোমেনগণ ঐ পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করিবে—কেহ বা চোখের পলকের ন্যায় দ্রুতগতিতে, কেহ বা বিজলীর ন্যায়, কেহ বা বাতাশের ন্যায় কেহ দ্রুতগামী ঘোড়া বা উটের ন্যায়। সারকথা এই যে, ঐ পোল-ছেরাৎকে এক শ্রেণীর লোক ত সম্পূর্ণ ছহীহ্-সালামত ও অক্ষত আবস্থায় অতিক্রম করিবে (—ইহারা হইলেন নেককার মোমেনগণ)। আর এক শ্রেণীর লোক (উহারা উভয় পার্শ্বের আঁকড়া ও কাঁটা সমুহের দ্বারা) ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রেহায়ী পাইবে এবং পার হইয়া যাইবে (—ইহারা হইল অল্প-স্বল্প গোনাহ করিয়াছে এমন মোমেনগণ।) আর এক শ্রেণীর লোককে ত (আঁকড়া ও কাঁটার সাহায্যে) জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে (—ইহারা হইল চির জাহান্নামী মোনাফেকগণ এবং অস্তায়ী সাজা ভোগী বদকার মোমেনগণ।) এনমকি পোল-ছেরাৎ অতিক্রমকারীদের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তি হিঁচড়ানো অবস্থায় পার হইবে।

অতঃপর নেককার মোমেনগণ যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহারা গোনাহগার মোমেন ভাইদের জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লার দরবারে এত জোরদার দাবী পেশ করিবে যে, তোমাদের কেহ নিজের সুস্পষ্ট প্রাপ্যের জন্য আমার নিকট ঐরূপ জোরদার দাবী পেশ করে না। তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের ভাইগণ—আমাদের সঙ্গে তাহারা নামায পড়িয়া থাকিত, আমাদের সঙ্গে রোজা রাখিয়া থাকিত, আমাদের সঙ্গেই বিভিন্ন আমল করিয়া থাকিত (তাহারা গোনাহের কারণে দোযখে পতিত হইয়াছে—আমরা তাহাদের নাজাতের জন্য সুপারিশ পেশ করিতেছি।) তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ মোমেনগণকে বলিবেন,

---

ছিল তাহারা তখন সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা তখন অবনত দৃষ্টি লইয়া অপমাণ ও লাঞ্ছনায় পরিবেষ্টিত থাকিবে। দুনিয়াতে তাহাদিগকে খাঁটিভাবে আল্লার সেজদা করার প্রতি আহ্বান জানান হইত এবং তখন তাহারা সক্ষমও ছিল (তবুও তাহারা সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া ছিল; ফলে ঐ দিন তাহারা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না।)"

তোমরা যাও এবং যাহার দেলে দীনার—স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ ঈমান দেখ তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। গোনাহের কারণে যে মোমেনগণ দোযখে যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের চেহারা আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। (অতএব ঐ মোমেনদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইবে।) সুপারিশকারী মোমেনগণ গোনাহগার মোমেনদের নিকট আসিয়া দেখিবে, (গোনাহের পরিমাণ হারে) কাহারও কাহারও উভয় পা দোযখের আগুনে, কাহারও অর্দ্ধ গোছা পর্য্যন্ত আগুনে। তাহারা যাদেরকে উল্লিখিত সীমার অন্তরভুক্ত পাইবে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিবে। তারপর পুনরায় আল্লার দরবারে ফিরিবে এবং শুপারিশ করিবে। এই-বার আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহাদের দেলে অর্দ্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখ তাহাদিগকে বাহির কর। ঐ সীমার ভিতরে যাহাদিগকে পাইবে তাহাদিগকে বাহির করিবে এবং আবার আল্লার দরবারে ফিরিবে। এইবার আল্লাহ তয়ালা বলিবেন, যাহার দেলে অণু পরিমাণ ঈমান দেখ তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। তাহারা তাহাই করিবে—অণু পরিমাণ ঈমান আছে এরূপ সকলকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবে।

এই ভাবে নবীগণ, ফেরেশতাগণ, এমনকি নেককার মোমেনগণও গোনাহগার মোমেনগণকে দোযখ হইতে বাহির করার জন্য সুপারিশ করিবে এবং বাহির করিবে! অতঃপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, সকলেই সুপারিশ করিয়াছে শুধু আমার সুপারিশ (তথা অন্যের সুপারিশ ব্যতিরেকে শুধু আমার দয়া ও রহমতের দ্বারা অণু হইতেও কম পরিমাণের ঈমানদারকে বাহির করা) বাকী রহিয়াছে! এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই দয়া ও রহমত দ্বারা একবার বাহির করিবেন, তাহাতে এক দল লোক বাহির হইবে যাহারা আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে বেহেশতের দরওয়াজায় প্রবাহিত একটি নহর বা খালের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইবে; ঐ খালের পানি জীবনী-শক্তিবাহী পানি। ফলে তাহারা (অতি সুন্দর রং-রূপের নব-জীবন লাভ করতঃ) ঐ খালের উভয় কিনারা বহিয়া উঠিবে যেরূপ বাদলা ঘাসের মুল পলি মাটির মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

ঐ লোকগণ উক্ত নহর হইতে মতির ন্যায় উজ্জল হইয়া বাহির হইবে। তাহাদের ঘাড়ের উপর সীল মোহর দ্বারা চিহ্নিত করা হইবে। বেহেশতবাসীগণ তাহাদিগকে "ওতাকাউর-রহমান—পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার মুক্ত দল" আখ্যা দান করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দুনিয়া হইতে আখেরাতের প্রতি প্রেরিত কোন প্রকার নেক আমল ও ভাল কাজ ব্যতিরেকেই (শুধু মাত্র অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম পরিমাণ খাঁটি ঈমানের অছিলায়) বেহেশতে পৌঁছাইবেন।

তাহাদের প্রত্যেককে বেহেশতের মধ্যে বলা হইবে, যে পরিমাণ তোমাদের দৃষ্টি ও ধারণায় আসিতে পারে সেই পরিমাণ এবং তৎসঙ্গে আরও তত পরিমাণ অধিক তোমাদিগকে দেওয়া হইল। (১১০৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই শেষ শ্রেণীর লোকদের ঈমান ছিল, কারণ ঈমান ব্যতিরেকে কাহারও নাজাত হইতেই পারে না। কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ ঈমান ভিন্ন সারা জীবনে কোন প্রকার একটি নেক আমলও তাহারা করে নাই, ফলে তাহাদের ঈমানের আলো ও নিশান এত ক্ষীণ যে, নেককার মোমেনগণ নবীগণ এমনকি ফেরেশতাগণ পর্য্যন্ত উহার খোঁজ পান নাই। একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তায়ালাই উহা জ্ঞাত ছিলেন; আল্লাহ তায়ালা ত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম জিনিষও জ্ঞাত থাকেন। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ঃ—

وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ ঃ—কোন একটি বীজ (বট ইত্যাদির গোটার ভিতর বীজগুলি কত সূক্ষ্ম হয় উহার একটি বীজ) মাটির ভিতরে অন্ধকারে থাকিলে তাহাও আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত সুদীর্ঘ হাদীছদ্বয়ে হযরত (দঃ) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ দর্শনের বিবরণ দান করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীছে আল্লাহ তায়ালার আরও বিভিন্ন দর্শনের বিবরণ রহিয়াছে।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতী লোকগণ বেহেশতে পৌঁছিবার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের অতিরিক্ত আর কিছুর খাহেস আছে কি? তাহারা বলিবে, আপনি আমাদিগকে উজ্জ্বল ও নূরানী চেহারা দান করিয়াছেন, বেহেশতে স্থান দিয়াছেন, দোযখ হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন। (আমাদের আর কি খাহেস থাকিতে পারে?)

হযরত (দঃ) বলেন, মানব চোখে আল্লাহ তায়ালাকে দেখার যে অসম্ভাব্য রহিয়াছে ঐ মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালা তাহা দুর করিয়া দিবেন এবং তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে খোলা চোখে দেখিতে সক্ষম হইবে। বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ তায়ালার সেই দর্শনকে সর্ব্বাধিক ভালবাসার নেয়ামত গণ্য করিবে।

অতঃপর হযরত (দঃ) কোরআন শরীফের এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিলেন— لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ "যাহারা দুনিয়াতে ঈমান

আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে আখেরাতে তাহাদের জন্য অতি সুন্দর বেহেশত রহিয়াছে এবং তৎসঙ্গে আরও একটি অতিরিক্ত জিনিষ তাহারা লাভ করিবে।"

প্রকাশ থাকে যে, সেই অতিরিক্ত জিনিষটি হইল বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দিদার বা দর্শন লাভ।

তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে পৌঁছার পর নিজ নিজ আমল অনুপাতে শ্রেণী লাভ করিবে। অতঃপর এক সপ্তাহ পরিমাণের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইবে। তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভ করিবে—তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তায়ালার আরশ বিকশিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার দর্শন তাহাদের লাভ হইবে—(এই অনুষ্ঠান) বেহেশতে একটি বিশেষ বাগানে অনুষ্ঠিত হইবে। সেই অনুষ্ঠানে বেহেশতবাসীদের জন্য তাহাদের শ্রেণী অনুপাতে বিভিন্ন মূল্যমানের আসন নির্দ্ধারিত করা হইবে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দর্শন লাভ করিতে পারিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তোমরা কি সূর্য্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে কোন প্রকার সন্দেহের সম্মুখীন হইয়া থাক? আমরা বলিলাম, না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তদ্রূপ সন্দেহাতীত ভাবেই তোমরা তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ঐ অনুষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সামনাসামনি কথাবার্ত্তা বলিবেন। এমনকি এক ব্যক্তিকে (রহস্যালাপরূপে) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! ঐ দিন স্মরণ আছে কি—যে দিন তুমি এই এই বলিয়াছিলে? ত্রই বলিয়া আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের দুনিয়ায় থাকাকালীন কতিপয় অসঙ্গত বিষয়ের উল্লেখ কবিবেন। ঐ ব্যক্তি বলিবে, হে পরওরারদেগার! আপনি ত আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হাঁ—আমার ক্ষমার ফলেই ত তুমি এই মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ। অতঃপর তাহাদের উপর এক খণ্ড মেঘমালা আসিয়া এমন খোশবু দ্বারা গোলাবপাশী করিবে যাহার তুলনা হয় না।

ঐ অনুষ্ঠান শেষে তথা হইতে সকলেই একটি মেলায় আসিবে। তথায় বেহেশতবাসীদের পরস্পর মেলামেশা হইবে এবং নানাবিধ নেয়ামত সামগ্রী তথা হইতে তাহাদের সঙ্গে বহন করিয়া নিয়া আসা হইবে। বেহেশতের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের সহধর্ম্মীণীগণ তাহাদিগকে স্বাগতম জানাইয়া বলিবে—আপনারা ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী রূপস হইয়া আসিয়াছেন! তাঁহারা বলিবেন, আমরা

আজ আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের মিলন লাভ করিয়াছি উহারই বদৌলতে আমাদের এই পরিবর্ত্তন।

তিরমিজী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট উচ্চ মর্য্যাদাধিকারী ব্যক্তিগণ প্রতি সকাল-বিকাল দুই বার আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের সুযোগ পাইয়া থাকিবে। (কম মর্ত্তবার লোকগণ সেই সুযোগ নিজ নিজ আমল অনুপাতে লাভ করিয়া থাকিবে।)

আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, আবু রযীন (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ! আখেরাতে আমাদের প্রত্যেকেই কি স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া দেখিতে সক্ষম হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি আরজ করিলাম, তাহা কিভাবে হইবে— এরূপ কোন নমুনা আছে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবু রযীন! পূর্ণিমার চাঁদ তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া দেখিতে সক্ষম হও না কি? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ত আল্লাহ তায়ালার একটি সৃষ্ট বস্তু, আর আল্লাহ ত অতি মহান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

ইবনে মাজাহ শরীফের একখানা হাদীছ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণ অসংখ্য নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন-যাপন প্রতিষ্ঠা করার পর আকস্মিকরূপে এক দিন তাহাদের উপর একটি নূর বা আলোর বিকাশ হইবে। তাঁহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পাইবেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে এইরূপে সালাম করিবেন—السلام عليكم يا اهل الجنة "হে জান্নাতবাসীগণ তোমাদের প্রতি সালাম।"

পবিত্র কোরআনেও এই বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে—سلام قولا من رب رحيم "দয়াল প্রভুর তরফ হইতে (বেহেশতবাসীদের) মৌখিক সালাম লাভ হইবে।"

ঐ সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবেন। তাঁহারাও আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিবেন এবং যাবৎ এই দর্শনের সুযোগ তাঁহাদের থাকিবে তাবৎ তাঁহারা কোন নেয়ামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না।

২৫০১। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দয়া ও মমতা আল্লাহ তায়ালা (সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহাকে) এক শত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজে ব্যবহার করার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। শুধুমাত্র এক ভাগ সৃষ্টি জগতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। (এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ঐ এক ভাগকে

বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।) উহারই ক্রিয়ায় সৃষ্টিজগত পরস্পর দয়া ও মমতার ব্যবহার করিয়া থাকে। এমনকি একটি ঘোড়া (ঐ দয়া ও মমতার এক অংশ হইতে যে বিন্দু লাভ করে উহারই ক্রিয়া এত বড় যে, ঘোড়াটির পায়ের নীচে উহার বাচ্চা পতিত হইলে দয়া ও মমতা বশে শত কষ্ট করিয়াও সে তাহার পা উঠাইয়া রাখে এই আশঙ্কায় যে, বাচ্চাটি আঘাত পায় নাকি!

হাওজে-কাওছারের বয়ান

২৫০২। হাদীছ :—আছ্মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে হাওজে-কাওছারের কিনারায় যাইয়া অবস্থান করিব। আমি অপেক্ষায় থাকিব আমার নিকট পানি অন্বেষণকারীদের। এমতাবস্থায় এক দল লোকের গতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে—আমার নিকটে তাহাদিগকে পৌঁছিতে দেওয়া হইবে না। তখন আমি বলিব, তাহারা আমার উম্মৎ (তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হউক;) তখন আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে বলা হইবে, আপনার ত জানা নাই—তাহারা আপনার দিকে মুখ করতঃ পিছপায়ে পশ্চাদের দিকে চলিয়াছে।

অর্থাৎ বাহ্যিকরূপে আপনার দিকে মুখকারী তথা আপনার আনুগত্য দেখাইত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আপনার অনুসারী ছিল না, বরং আপনার দিকের বিপরীত দিকে তাহারা চলিয়াছে। সুতরাং তাহারা আপনার নিকট আসিতে পারে না।

এই অবস্থা মানুষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই এই হাদীছের রাবী বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে-আবী-মোলায়কা (রঃ) সর্ব্বদা এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় চাই, পশ্চাদের দিকে চলা হইতে এবং ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া হইতে।"

২৫০৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নেই হাওজে-কাওছারের কিনারায় পৌঁছিব। তোমাদের তথা আমার উম্মতের আকৃতির এক দল লোক আমার দৃষ্টিগোচর হইবে—এমনকি আমি পানির পেয়ালা তাহাদিকে দেওয়ার প্রস্তুতি নিব। এমতাবস্থায় আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের গতি (দোযখের দিকে) ফিরাইয়া দেওয়া

হইবে। তখন আমি বলিব, হে পরওয়ারদেগার! তাহারা আমার দল। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি জানেন না—তাহারা আপনার (দুনিয়া ত্যাগের) পরে আপনার প্রদত্ত সুন্নত-তরীকার বিপরীত কত রকম পন্থা আবিষ্কার করিয়া ছিল।

২৫০৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আখেরাতে) তোমাদের সম্মুখে এমন একটি হাওজ আসিবে যাহা 'জারবা' ও 'আজরুহ্' অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের সম পরিমাণ প্রশস্ত।

২৫০৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার হাওজের প্রশস্ততা (সিরিয়ার) আয়লা অঞ্চল হইতে ইয়ামানের সানা শহর পর্য্যন্ত ব্যবধানের পরিমাণ। উহার মধ্যে পানি পান করার কাপ বা পেয়ালা আকাশের নক্ষত্র পরিমাণ সংখ্যায় রহিয়াছে।

২৫০৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার হাওজ এক মাস চলার পথ পরিমাণ প্রশস্ত, উহার পানির রং দুধ অপেক্ষা অধিক শুভ্র এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুবাসিত, উহার কাপ বা পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র পরিমাণ। যে ব্যক্তি এক বার উহার পানি পান করিবে চিরকাল তাহার পিপাসা লাগিবে না।

২৫০৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমি যখন বেহেশত পরিভ্রমন করিতে ছিলাম তখন আমি একটি নহর দেখিতে পাইলাম—যাহার উভয় কিনারায় গম্বুজ আকারে খোদাই করা এক মতির তৈরী শান্তিশালাসমূহ রহিয়াছে। আমি জিব্রাইল (আঃ)কে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, ইহাই ত হাওজে-কাওছার যাহা আপনার প্রভু আপনাকেই খাছভাবে দান করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, উহার কাঁদা হইল অতিশয় সুগন্ধিময় কস্তুরী।

২৫০৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক দল লোক যাহারা আমারই উম্মতের আকৃতির হইবে হাওজে-কাওছারের কিনারায় আমার নিকটবর্ত্তী আসিবে। এমনকি আমি তাহাদিগকে আমার উম্মতরূপে চিনিতে পারিব, এমতাবস্থায় আমার সন্নিকটে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের গতি জাহান্নামের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, ইহারা ত আমার উম্মৎ! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি জানেন না, আপনার দুনিয়া ত্যাগের পরে ইহারা (আপনার তরীকা বা আদর্শ ছাড়িয়া অন্য) কত রকম তরীকা ও অনুকরণীয় গড়াইয়া ছিল।

২৫০৯। ছাদীছ ঃ—সাহ্ল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নেই হাওজে-কাওছারের কিনারায় পৌঁছিব। আমার সন্নিকটে পৌঁছিতে যে সক্ষম হইবে সে-ই উহার পানীয় পান করিবে। একবার উহার পানি যে পান করিবে চিরকাল তাহার পিপাসা লাগিবে না। এক দল লোক আমার নিকটে আসিবে যাহাদিগকে আমি (আমার উম্মৎরূপে) চিনিতে পারিব, তাহারাও আমাকে চিনিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিকে আমার হইতে দুরে হটাইয়া দেওয়া হইবে। আমি বলিব, ইহারা ত আমার উম্মৎ! উত্তরে বলা হইবে, আপনি জানেন না, আপনার দুনিয়া ত্যাগের পরে ইহারা কি সব পন্থা গাড়াইয়া ছিল! আমি বলিব, দুরে হঠাও! হাঁকাইয়া নিয়া যাও ঐ সব লোককে যাহারা আমার পরে আমার তরীকা ও আদর্শকে বিকৃত করিয়াছে।

২৫১০। ছাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হাওজে-কাওছারের কিনারায় অবস্থান কালে এক দল লোক আমার দিকে অগ্রসর হইবে; এমনকি আমি তাহাদিগকে আমার উম্মৎরূপে গণ্য করিব। তখন এক জন মানুষ (আকৃতি ফেরেশতা) যাইয়া তাহাদিগকে বলিবে, ঐ দিকে চল। আমি জিজ্ঞাসা করিব তাহারা কোন দিকে যাইবে? সে বলিবে খোদার কসম—দোযখের দিকে তাহাদের যাইতে হইবে। আমি বলিব, তাহাদের এই অবস্থা কেন? সে বলিবে, আপনার পরে তাহারা আপনার দিকেই মুখ রাখিয়া পিছপায়ে পশ্চাদে চলিয়াছে*।

* অর্থাৎ বাহ্যিকরূপে আপনার উম্মতে রহিয়াছে; কার্য্যতঃ আপনার বিরুদ্ধে চলিয়াছে।

আবার এক দল লোকের সঙ্গে ঐরূপ করা হইবে এবং তাহাদের সম্পর্কে ঐরূপই বলা হইবে। ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে রেহায়ী পাইতে খুব কমই দেখিব।

তক্‌দীরের বয়ান

তক্‌দীরের মূল তাৎপর্য্য হইল, আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম ও জ্ঞান, অর্থাৎ মানুষ তাহার প্রাপ্ত স্বায়ত্ব শাসিত স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছার দ্বারা পরবর্ত্তীকালে যাহা করিবে বা তাহার উপর বিভিন্ন কারণে অথবা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইবে অনাদি কাল হইতে আল্লাহ তায়ালা তাহা জ্ঞাত আছেন। এমনকি লৌহে-মাহ্‌ফুজ সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির নামে নামে ঐসব তথ্য লিখিয়াও রাখিয়াছেন, কিন্তু মানুষের স্বায়ত্ব শাসন-ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে খর্ব্ব করেন নাই; ঐ সব কার্য্যাবলী যখন বাস্তবায়ীত হইবে তখন তাহার সেই ক্ষমতা ও ইচ্ছার মাধ্যমেই হইবে।

বুঝিবার জন্য সামান্য একটি নমুনা—রেলওয়ে টাইম টেব্‌ল। এক বৎসর বা ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক গাড়ীর প্রত্যেক ষ্টেশনে নির্দ্ধারিত সময়ে গমনাগমন বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত, লিখিত ও ছাপান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে ইঞ্জিন চালকের স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছা খর্ব্ব হয় না, বরং তাহার ইচ্ছায়ই গাড়ী পরিচালিত হইয়া প্রতি ষ্টেশনে পৌছিতে থাকে। অবশ্য মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য ও সংকীর্ণ, তাই সেই জ্ঞানে উৎপাদিত টাইম টেবেলে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম ও জ্ঞান ত ঐরূপ নহে, তাই সেই জ্ঞানে উৎপাদিত লৌহে-মাহ্‌ফুজের লেখার ব্যতিক্রম ঘটে না; ইহাও আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম ও জ্ঞানের কামাল—পরিপূর্ণতা। ইহাতে মানুষের স্বায়ত্ত্ব শাসন-ক্ষমতা ও ইচ্ছা খর্ব্ব হয় না। বিশেষতঃ সে যখন কার্য্য করার পূর্ব্বে উহা সম্পর্কে আদৌ কোন খোঁজ রাখে না। সুতরাং উহার দ্বারা তাহার ইচ্ছা খর্ব্ব হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই সম্পর্কে অধিক বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫১১। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! বেহেশতী ও দোযখী কি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিল, তবে মানুষ আমল কেন করিবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রত্যেকে উহার উপযোগী আমলই করিয়া থাকে যাহা তাহার (কর্ম্মফলরূপে) সৃষ্টির প্রথম হইতেই আল্লার জানা রহিয়াছে।

অর্থাৎ—কে বেহেশতের আমল করিয়া বেহেশতে যাইবে, কে দোযখের আমল করিয়া দোযখে যাইবে তাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার এল্‌ম ও অগ্রিম জ্ঞানে জানা রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহার বিবরণ কাহারও জানা নাই। তাই প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছায়ই আমল করিয়া থাকে এবং তাহার আমল উক্ত অবগতির পরিচয় বহন করে।

২৫১২। হাদীছ ঃ—হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দান করিলেন—কেয়ামত পর্য্যন্ত দুনিয়াতে যত উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটিবে হযরত (দঃ) সেই সব ঘটনা উক্ত ভাষণে বর্ণনা করিয়াছেন। যে স্মরণ রাখিয়াছে স্মরণ রাখিয়াছে এবং যে ভুলিয়া গিয়াছে ভুলিয়া গিয়াছে।

অনেক সময় কোন ঘটনা আমার চোখের সামনে প্রকাশ পায় যাহা হযরতের সেই ভাষণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন ঘটনা দেখার পর তাহা আমার স্মরণে আসিয়া যায়। যেরূপ কাহারও পরিচিত একজন লোক তাহার হইতে দূরে ছিল বলিয়া সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় স্মরণ হইয়া যায়।

২৫১৩। হাদীছঃ— আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা আমরা (মদীনা শরীফের কবরস্থান—জান্নাতুল-) বাকীর মধ্যে একটি জানাজার সহিত ছিলাম। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় তশরীফ আনিলেন এবং বসিয়া পড়িলেন। আমরাও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। হযরতের হস্তে একখানা ছোট লাঠি ছিল। তিনি মাথা নত করিলেন এবং (কোন বিষয়ে চিন্তামগ্ন ব্যক্তির ন্যায়) ঐ লাঠি দ্বারা মাটি খোঁচিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, যত মানুষ পয়দা হয় প্রত্যেকের জন্য লিখিয়া রাখা হয় যে, তাহার স্থান বেহেশতে বা দোযখে এবং ইহাও লিখিয়া রাখা হয় যে, সে বদকার হইবে বা নেককার হইবে। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! তবে আমরা (চেষ্টা করিয়া নেক) আমল করা ছাড়িয়া দিয়া সেই লেখার উপরই ভরসা করিয়া থাকি না কেন? আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নেককারের দল ভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত থাকিবে সে নেককারদের আমলের প্রতিই (বাধ্যগতরূপে) ধাবিত হইবে। (চেষ্টা করার আবশ্যক কি?) আর যে ব্যক্তি বদকারের দলভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত থাকিবে সে বদকারের আমলের প্রতিই (বাধ্যগতরূপে) ধাবিত হইবে।

তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন—لا اعملوا فكل ميسر (চেষ্টা ছাড়িয়া হাত-পা গুটাইয়া) সেই লেখার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিও না। নেক আমলের চেষ্টা করিয়া যাইতেই হইবে। (ইহাই আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও বিধান,) অবশ্য প্রত্যেকের সাধ্যে ঐ লেখাই জোটিয়া আসিবে—যে ব্যক্তি নেককারদের দলভুক্ত সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার সাধ্যে নেককারের আমলই জোটিবে, আর যে ব্যক্তি বদকারদের দলভুক্ত সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার সাধ্যে বদকারদের আমলই জোটিবে।

এই তথ্যের সমর্থনে যহরত (দঃ) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—...... فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى "(আল্লার এল্‌মে ও লৌহে-মাহ্‌ফুজের লেখায়) যাহার এই আমল সাব্যস্ত হইয়া আছে যে, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা ব্যয় করিয়া দান-খয়রাত করিবে পরহেজগারী অবলম্বন করিবে, কলেমা তায়্যেবার প্রতি ঈমান আনিবে আমি তাহার জন্য জোটাইয়া ও জোগার করিয়া দিব ঐ সব মঙ্গল ও কল্যাণের আমল এবং সুগম করিয়া দিব তাহার জন্য মুক্তির পথ। পক্ষান্তরে যাহার এই আমল সাব্যস্ত হইয়া আছে যে, সে (নিজের স্বায়ত্ত্ব শাসিত শক্তি ও ইচ্ছা ব্যয় করিয়া) কৃপণতা করিবে, আল্লার বিধানকে উপেক্ষা করিবে কলেমা তায়্যেবাকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমি জোটাইয়া ও যোগাড় করিয়া দিব ঐ দুঃখ-কষ্টের আমল এবং তাহার জন্য খুলিয়া দিব ধ্বংসের পথ।

তকদীরে যাহা আছে মান্নত দ্বারা তাহাই পূর্ণ হয়

২৫১৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهٗ وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ اِلَى الْقَدْرِ قَدْ قُدِّرَ لَهٗ فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِىْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِىْ مِنْ قَبْلُ

অর্থঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মান্নত মানুষকে এমন কোন জিনিষ আনিয়া দিতে পারে না যাহা তাহার জন্য (আল্লার তরফ হইতে) নির্দ্ধারিত ছিল না। হাঁ—মান্নত মানুষকে ঐ জিনিষের প্রতিই পৌঁছায় যাহা তাহার জন্য নির্দ্ধারিত করা ছিল। ফলতঃ মান্নতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কৃপণের মাল বাহির করিয়া থাকেন—কৃপণ মান্নত সূত্রে মাল খরচ করিয়া থাকে যাহা সে মান্নত ব্যতিত খরচ করিত না।

● প্রকাশ থাকে যে, অতি ফজিলতের একটি বাক্য আছে যাহার ছওয়াবে বেহেশতে অসংখ্য নেয়ামতের ভাণ্ডার লাভ হইবে (তৃতীয় খণ্ডে ১৪৯৭নং হাদীছ দ্রঃ।)

বাক্যটি এই— لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এই মহান বাক্যের মর্ম্মও তকদীর নামীয় তথ্যই। কারণ, উহার অর্থ—"কোন কিছু হইতে বাঁচিবার উপায় এবং কোন কিছু লাভের বা করিবার শক্তি নাই আল্লার নির্দ্ধারণ এবং সাহায্য ব্যতিরেকে"।

হযরত আদম ও মূছার একটি বিতর্ক

২৫১৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বর্ণনা শুনিয়াছি যে, একদা আদম (আঃ) ও মূছা (আঃ) বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। মূছা (আঃ) আদম আলাইহেচ্ছালামের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, হে আদম (আঃ)! আপনি আমাদের আদি পিতা (আপনাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ বিশেষ কুদরত বলে মাতা-পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি পয়দা করিয়া বেহেশতে রাখিয়া

দিয়া ছিলেন + আপনি নিজ ত্রুটির দরুণ তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই ভাবে) আপনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং বেহেশত হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়াছেন।

আদম (আঃ) বলিলেন, হে মূছা! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিশেষভাবে মর্য্যাদাবান করিয়াছেন—তিনি আপনার সঙ্গে সরাসরি কালাম করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশেষ কুদরত বলে লিখিত আকারে তৌরাত কেতাব আপনাকে দান করিয়াছেন। সেই কেতাব লৌহ-মাহ্‌ফুজের মধ্যে আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেই লিখিত হইয়া ছিল। আপনি কি সেই তৌরাতে এই বিবরণটি পাইয়াছেন, "আদম তাহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশের বরখেলাফ কাজ করিয়া ফেলিল, ফলে সে ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী গণ্য হইল*"? মূছা (আঃ) বলিলেন, হাঁ—এই বিবরণ পাইয়াছি। আদম (আঃ) বলিলেন,) আপনি আমার উপর এমন একটি কাজের জন্য দোষারোপ করিতেছেন, যাহা আল্লাহ তায়ালা (লৌহে-মাহ্‌ফুজে) আমার জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন—আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে? এই পয়েন্টে আদম (আঃ) জয়ী হইলেন মূছা আলাইহেচ্ছালামের উপর।

ব্যাখ্যা ঃ—এই বিতর্ক আলমে-বরযখ তথা আখেরাত-জগতের প্রথম স্তর বা বিভাগে অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, এই বিতর্ক আল্লার দরবারে অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। মূল তরজমা বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয় বস্তুগুলিও মোসলেম শরীফ হইতে গৃহিত।

এই ঘটনার একটি বিষয় শুদ্ধ ও সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া নেওয়া আবশ্যক। এই ঘটনায় হযরত আদম (আঃ) স্বীয় অপরাধ খণ্ডনের জন্য আল্লার অগ্রিম লেখা তথা তক্‌দীরকে পেশ করিয়াছেন। অথচ ইহা ইসলামের বিধান পরিপন্থী—

+ যদি আদম (আঃ) বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুনিয়াতে না আসিতেন, বেহেশতেই থাকিতেন তবে আদমজাত মানব সমাজও তথায় থাকিত।

* এই বিবরণটি পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে; তৎসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। কোরআনের আয়াত—

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ - ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

"আদম তাহার প্রভুর আদেশের বরখেলাফ কাজ করিয়া ফেলিলেন। ফলে তিনি ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী গণ্য হইলেন। অতঃপর (তিনি তওবা করায়) তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করতঃ গ্রহণ করিয়া নিলেন। তাঁহার তওবা কবুল করিয়া নিলেন এবং তাঁহাকে চির সৎ পথের পথিক বানাইয়া দিলেন। (১৬ পারা ১৬ রুকু)

এইরূপ অজুহাতে কাহারও অপরাধ খণ্ডিত হইতে পারে না। সুতরাং অপরাধ খণ্ডনে হযরত আদমের উক্ত পন্থা অবৈধ বলিয়া ধারণা হইতে পারে।

এই অভিযোগের উত্তর বুঝিবার জন্য তক্‌দীর সম্পর্কীয় মছআলাহ জ্ঞাত হওয়াই যথেষ্ট। তাহা এই যে—রোগ-শোক আপদ-বিপদ ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা-তদবীর ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরীয়তেরই আদেশ ও বিধান। ঐ অবস্থায় তক্‌দীরের বুলি আওড়াইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থাবলম্বন করা হইতে এবং চেষ্টা-তদবীর হইতে হাত-পা গুটাইয়া থাকাকে সাধারণভাবে শরীয়ত ও ইসলাম মোটেই অনুমোদন করে না। কেহ এরূপ করিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে তিরস্কার ও ভৎর্সনার পাত্র। কিন্তু সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা-তদবীর করার পরও বিপদ প্রতিরুদ্ধ হইল না, বিপদ আসিলই ঐ সময় যদি কেহ এই বিপদগ্রস্ত হওয়ার দরুণ তিরস্কার ও ভৎর্তনা করে তবে তাহার উত্তরে এবং সাধারণ ভাবেও ঐ অবস্থায় ধৈর্য্য লাভের জন্য তক্কদীরকে তুলিয়া ধরা অনুমোদিত নহে, বরং কর্ত্তব্যই বটে। বিপদগ্রস্ত হইলে "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" পড়ার তাৎপর্য্য ইহাই যে, আমাদের সকলের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যখন যে অবস্থার সৃষ্টি করিবেন উহা এড়াইবার উপায় নাই।

তদ্রূপ—গোনাহ ও অপরাধ করিয়া গোনাহ মাফ হওয়ার যে ব্যবস্থা শরীয়তে রহিয়াছে তথা খাঁটিভাবে তওবা করা, আল্লার দরবারে কান্না-কাটা করা—এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরা এবং তদ্দরুণ নিজকে নির-পরাধ গণ্য করা বা ক্ষমার্হ গণ্য করা—এই সবকে শরীয়ত মোটেও অনুমোদন করে না, বরং উহা আর একটি বড় গোনাহ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ গোনাহ করিয়াছে অতঃপর সে যথারীতি তওবা করিয়াছে, আল্লার দরবারে যথাসাধ্য কান্না-কাটা করিয়াছে, এমতাবস্থায়ও যদি কেহ ঐ গোনাহকে উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি কটাক্ষ করে তবে তাহা খণ্ডন করার জন্য সে তক্কদীরকে তুলিয়া ধরিতে পারে।

আদম আলাইহেচ্ছালামের ব্যাপারটা তদ্রূপই। তিনি অপরাধ করিয়া এমন তওবা করিয়া ছিলেন, যাহার তুলনা হয় না। দীর্ঘ তিন শত বৎসর কাল আল্লার দরবারে কাঁদিয়া ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার তওবা কবুল করিয়া তাঁহার মর্ত্তবা বাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া ঘোষনাও দিয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার উপর কটাক্ষ করিলে পর তাহা খণ্ডনের জন্য তক্কদীরকে তুলিয়া ধরা মছআলাহ অনুযায়ীই হইয়াছে ইহা দোষনীয় নহে।

এস্থলে বিশেষরূপে লক্ষ্য করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয় এই যে—

অপরাধ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হযরত আদমের প্রতি কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল এবং প্রশ্ন করা হইয়াছিল—

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

"আদম ও হাওয়ার প্রভু-পরওয়ারদেগার তাহাদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়া ছিলাম না? এবং বলিয়া ছিলাম না যে, শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু?" তখন আদম (আঃ) নিজকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরেন নাই, বরং সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ স্বীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কান্না-কাটা আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহারা উভয়ে এ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন:—

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা অপরাধ করিয়া নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছি, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর তবে আমরা নিশ্চয়ই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হইয়া যাইব।"

● "আল্লার দানে কেহ বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না"। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রতি নামাযের পর একটি বিশেষ জিক্‌র বা দোয়া পড়িতেন—উহাতে এই সত্যের উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি প্রথম খণ্ডে ৪৮৩ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে।

● তক্‌দীর অপরিবর্ত্তনীয়, তবুও দুর্ভাগ্য এবং অদৃষ্টে লেখা অনিষ্টকর বস্তু হইতে আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। নবী (দঃ) স্বয়ং এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডে ২৪০৩ নং হাদীছের দোয়া দ্রষ্টব্য। উক্ত হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ঐ দোয়া করিয়া থাকিতেন এবং ৯৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীছেই উল্লেখ আছে, নবী (দঃ) উম্মতকেও ঐ দোয়া করার আদেশ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ছুরা ফালাকের মধ্যে অনেক রকম অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

● মানুষ তাহার ইচ্ছাকে প্রয়োগ করায়ও স্বায়ত্ত (Self Saffient) নহে— যে কোন মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালার কুদরত তাহার ইচ্ছা প্রয়োগে অন্তরায় হইতে পারে। আল্লাহ মানুষের ইচ্ছাকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। সম্মুখে ২৫১৯নং হাদীছে নবী (দঃ) কর্ত্তৃক আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত আছে—"যিনি অন্তরের (ইচ্ছা ও গতির পরিবর্ত্তন সাধনকারী"। পবিত্র কোরআনে পারা ছুরার আয়াতেও উল্লেখ আছে যে, "আল্লাহ তায়ালা মানুষ এবং তাহার মনের মধ্যে অন্তরায় হইয়া থাকেন।"

● আমরা একমাত্র উহারই সম্মুখীন হইব যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য লিখিয়া দিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডের ২২২১ নং হাদীছে এই সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া চলার ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআন ১০ পারা ছুরা তওবার ৫১ নং আয়াতে এই সত্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

কসম ও মান্নতের বয়ান

আল্লার নামের কিম্বা আল্লার কোন ছেফত বা গুণের শপথকেই শরীয়তের বিধানে কসম গণ্য করা হয়। কসমের গুরুত্ব অনেক বেশী; পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উহার আলোচনা করা হইয়াছে—

(১) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"নিশ্চয় যাহারা আল্লার নামে (মিথ্যা) কসমের দ্বারা নগণ্য লাভ (তথা দুনিয়ার ধন-সম্পদ) হাসিল করে তাহারা আখেরাতে আল্লার নেয়ামতের কোন অংশই পাইবে না। কেয়ামতের দিন (তাহারা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ কবলিত থাকিবে—) আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কোন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (দয়ার) দৃষ্টি করিবেন না এবং (স্বীয় মাগফেরাতের দ্বারা গোনাহ হইতে) তাহাদিগকে পাক-পবিত্রও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব রহিয়াছে। (৩ পারা ১৬ রুকু)

(২) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

"আল্লার নামে (মিথ্যা) কসম করিয়া নগণ্য বিনীময় (তথা দুনিয়ার লাভ) হাসিল করিও না।"

২৫১৬। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবুবকর (রাঃ) কোন প্রকার কসমকেই ভঙ্গ করিতেন না। কিন্তু যখন পবিত্র কোরআনে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দানের বিধান নাযেল হইল, তখন তিনি বলিলেন—এখন হইতে কোন কসম খাওয়ার পর উহা ভঙ্গ করার দিকে সুফল দেখিলে আমি কসম ভঙ্গ করতঃ সেই সুফলের কাজ করিয়া নিব এবং কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিয়া দিব।

২৫১৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, কাহারও নিজের পরিবারবর্গের (হক নষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয় এমন) কোন কসমকে আঁকড়াইয়া থাকা অধিক গোনাহ এই তুলনায় যে, সে উহা ভঙ্গ করিয়া আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কাফ্‌ফারা দিয়া দেয়।

২৫১৮। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিজনের (হক্ নষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয়—এমন) কোন কসমের উপর জমিয়া থাকে সে অতি বড় গোনাহগার—যে গোনাহের ব্যাপারে কাফ্ফারাও কোন ফলদায়ক হয় না।

২৫১৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কোন কিছু অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে) সাধারণতঃ এইরূপ কসম করিতেন "কিছুতেই নহে; কসম ঐ খোদার, যিনি অন্তরসমুহের (ইচ্ছা ও গতির) পরিবর্ত্তন সাধনকারী।"

২৫২০। হাদীছঃ—আশেয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মোহাম্মদের উম্মত! খোদার কসম—তোমাদের সম্মুখ জীবনের কঠিন সমস্যাবলী সম্পর্কে) আমি যাহা জানি যদি তোমারা তাহা জান্তে এবং লক্ষ্য কর্তে তবে হাসিতে কম কাঁদিতে বেশী।

২৫২১। হাদীছঃ আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, হযরত (দঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া ছিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট সব কিছু হইতে অধিক প্রিয় শুধু মাত্র আমার নিজের জীবন ব্যতিরেকে।

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ইহা যথেষ্ট নহে—শপথ করিয়া বলিতেছি ঐ আল্লার যাঁহার হাতে রহিয়াছে আমার প্রাণ—যাবৎ না তোমার জান-জীবন অপেক্ষা আমি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হই যথেষ্ট হইবে না। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ—খোদার কসম! এখন আপনি আমার নিকট আমার জান-জীবন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে ওমর! এখন ঠিক হইয়াছে।

২৫২২। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি কাফেলার মধ্যে চলা কালে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পৌঁছিলেন। ওমর (রাঃ) স্বীয় পিতার নামে কসম খাইতে ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সতর্ক হও—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন যে, তোমরা বাপ-দাদার নামে শপথ কর। যাহাকে শপথ করিতে হয়, সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নামে শপথ করে, নতুবা চুপ থাকে।

২৫২৩। হাদীছঃ— ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য নিষেধ করিয়াছেন, বাপ-দাদার নামে কসম খাওয়া।

ওমর (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—যেই দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়াছি, ঐ দিন হইতে আর আমি সেইরূপ কসম খাই নাই—নিজের বক্তব্যেও নয় কাহারও কথা নকল করিতেও নয়।

২৫২৪। ছাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি (ভুল বশতঃ অন্ধকার যুগের ন্যায় কোন দেব-দেবীর নামে কসম খাইলে—যাহা ইচ্ছাকৃত হইলে কুফর ও শেরেক গণ্য হইত, যেমন) লাত্ বা ওজ্জার নামে কসম খাইলে সে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্······ঈমানের কলেমা দোহরাইয়া লইবে।

২৫২৫। ছাদীছ ঃ—ছাবেত ইবনে জাহ্হাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর দ্বীন-ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া কাফেরী দ্বীন ভুক্ত হইয়া যাইবে বলিয়া উক্তি করিলে সে তাহার উক্তি অনুরূপই গণ্য হইবে।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিলে, যেই পন্থায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে সেই পন্থায় তাহাকে দোযখের মধ্যে আজাব দেওয়া হইবে। কোন মোমেনের প্রতি লা'নৎ করিলে, তাহাকে হত্যা করার সমান গোনাহ হইবে। তদ্রূপ কোন মোমেনকে কাফের বলিলে তাহাকে হত্যা করার সমান গোনাহ হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি যদি এরূপ বলে যে, "আমি যদি এইরূপ করিয়া থাকি বা এখন যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে আমি ইহুদী বা নাছরাণী বা হিন্দু বা কাফের" এবং এই কথা সে নিজকে মিথ্যাবাদী জানিয়াও বলিয়াছে তবে তাহার উপর বাহ্যিক কাফ্ফারার বিধান নাই বটে, কিন্তু সে মস্ত বড় গোনাহগার হইবে, এমনকি কোন কোন ইমামের মতে সে বাস্তবিকই কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি সে কাফের হওয়ার উপর রাজি হইয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে তবে সে অবশ্যই কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি সে ভুল বশতঃ নিজকে সত্যবাদী জানিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবেও সে গোনাহ হইতে পূর্ণ রেহায়ী পাইবে না, কেননা এইরূপ কথার দ্বারা কাফের হওয়াকে হাল্কা গণ্য করা বুঝায়।

আর যদি এরূপ বলে যে, "আমি যদি এরূপ করি তবে আমি কাফের" এবং অতঃপর যদি সে ঐ কাজ করে তবে তাহাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। তত্বপরি সে গোনাহগারও হইবে, এমনকি যদি কাফের হওয়ার উপর রাজি হইয়াই ঐ কাজ করিয়া থাকে তবে সে কাফেরই হইয়া যাইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে আরও একটি জরুরী মছ্আলাহ বর্ণনা করিয়াছেন—"যদি আল্লাহ চান্ এবং তুমি চাও বা আমি চাই তবে এরূপ হইবে" বা "যাহা আল্লাহ চাহিবেন এবং আপনি চাহিবেন তাহা হইবে"—এইরূপ আল্লাহ তায়ালার সমানে অন্যের নাম জড়িত করিয়া বলা জায়েয নহে। হাঁ—এইরূপ বলা জায়েয আছে, "আমি আল্লার উপর ভরসা করি তারপর আপনার অছিলার আশা রাখি।"

২৫২৬। ছাদীছ ঃ— বরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে কসমকারীর কসম পুরণে সাহার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।

২৫২৭। ছাদীছ ঃ— কোরআন শরীফে আছে—

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ اَيْمَانِكُمْ

"লগ্ও" কসমের জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কোন শাস্তি আরোপ করিবেন না।

এই "লগ্ও কসম" সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, ইহা হইল ঐ কসম যাহা মানুষ সাধারণ কথা-বার্ত্তার মধ্যে (বস্তুতঃ কসমের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু নিজের উক্তির দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্য) ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন—কসম খোদার এরূপ নহে বা কসম খোদার এইরূপই।

ব্যাখ্যা ঃ—কসমের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য অতীত বা বর্ত্তমান কালের বিষয় সম্পর্কে কসম হইলে তাহাকে "লগ্ও" বলা হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের জন্য কসম ব্যবহার করা হইলে যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন (হানফী মজহাব মতে) নিয়মতান্ত্রিক কসমই সাব্যস্ত হইবে এবং উহা ভঙ্গ করিলে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ভুল বশতঃ কসম ভঙ্গ হইয়া গেলে, তাহাতে কাফ্ফারা দিতে হইবে না। হানফী মজহাব মতে ভুল বশতঃ কসম ভঙ্গ হইলেও কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন বস্তু সম্পর্কে কসম করিয়াছে, অথচ সেই বস্তু এখন তাহার নাই। হানফী মজহাব মতে তাহার কসম সাব্যস্ত হইয়া যাইবে এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ বস্তু লাভ করিয়া সে কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে। যেমন—এক ব্যক্তি কসম খাইয়াছে, সে উট দান করিবে না। ঐ সময় সে কোন উটের মালিকও নয়। পরবর্ত্তী কালে সে কোন উটের মালিক হইয়া সেই উট দান করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন গোনাহের কাজ করার উপর কসম খাইলে সেই কসমও সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু ঐ গোনাহের কাজ করিবে না, বরং কসম ভঙ্গ করিয়া কাফ্‌ফারা দিবে।

মছআলাহ ঃ—রাগ বশতঃ কসম খাইয়া বসিলেও কসম সাব্যস্ত হইবে এবং উহা ভঙ্গ করিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

২৫২৮। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)। এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরও আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি অত্যধিক বদান্য ও উদার ছিলেন। এদিকে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার অভ্যাস ছিল, তিনি কিছু জমা রাখিতেন না। আল্লার দান যাহা কিছু লাভ হইত (উহার অবশিষ্ট) সবই দান-খয়রাত করিয়া দিতেন। তাহা দৃষ্টে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এক দিন বলিলেন, তাঁহার হাত বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা উত্তম হইবে। এই কথা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভীষণ ক্রোধের কারণ হইল— তিনি বলিলেন, আমার হাত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ? আমি আল্লার নামে মান্নত (তথা কসম) করিলাম, ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কখনও কথা বলিব না +।

এই ব্যবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এমনকি তিনি কোরায়েশ বংশীয় অনেক লোকদের দ্বারা এবং বিশেষরূপে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মামা বংশের লোকদের দ্বারা সুপারিশ করাইলেন। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিতেন এবং বলিতেন, এই ব্যাপারে আমি কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করিব না। আমি আমার মান্নত (তথা) কসম ভঙ্গ করিব না। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা চলার পর বিশিষ্ট ছাহাবী

+ আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের মুরব্বি ছিলেন এবং দান-খয়রাতের প্রতি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সেই কাজে বাধা দান করিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত দিয়াছিলেন এবং যেই কথা তিনি বলিয়া ছিলেন আয়েশা (রাঃ) তাঁহার সেই কথাকে বে-আদবী গণ্য করিয়া ছিলেন। তাই মুরব্বি হিসাবে এছলাহ ও সংশোধন উদ্দেশ্যে আয়েশা (রাঃ) এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। নতুবা সাধারণ ভাবে কোন মোসলমানের সহিত তিন দিনের অধিক রাগতঃ কথা-বার্ত্তা বন্ধ রাখা জায়েজ নহে।

মেছ্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রাঃ) এবং আবত্থর রহমান (রাঃ) (তাঁহারা হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মামা বংশ বনু জোহ্‌রার লোক ছিলেন। হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়তার দরুণ আয়েশা (রাঃ) ঐ বংশের প্রতি বিশেষ সহানুভুতিশীলা ছিলেন। আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন, খোদার কসম দিয়া আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি, আপনারা আমাকে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। একদা ঐ ছাহাবীদ্বয় আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)কে তাঁহাদের চাদরের আড়ালে লুকাইয়া নিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ ছাহাবীদ্বয় দরওয়াজার বাহির হইতে সালাম করিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আয়েশা (রাঃ) অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা সকলেই প্রবেশ করিব? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ— সকলেই প্রবেশ করুন; তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাদের সঙ্গে আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) রহিয়াছেন।

পূর্ব্বেই ঐ ছাহাবীদ্বয় আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)কে বলিয়া দিয়া ছিলেন। আমরা আপনাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিব। আপনি সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার ভিতর চলিয়া যাইবেন ×। সেমতে সকলে গৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পর্দ্দার ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং আয়েশা (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও অণুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার বাহির হইতে ঐ ছাহাবীদ্বয়ও আয়েশা (রাঃ)কে অনুরোধ করিতে ছিলেন—আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাঁহার নিবেদন গ্রহণ করার জন্য। এবং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে, মোসলমানের পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কোন মোসলমানের পক্ষে জায়েয নাই অপর মোসলমান ভাই হইতে তিন দিনের বেশী বিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া থাকা—ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে ছিলেন।

সকলেই যখন আয়েশা (রাঃ)কে ঐ সব কথা স্মরণ করাইয়া প্রবল অনুরোধ জানাইতে ছিলেন তখন তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদিগকে স্মরণ করাইতে ছিলেন, আমি মান্নত (তথা কসম) করিয়াছি—যাহা অতিশয় কঠোর বস্তু। কিন্তু ঐ ছাহাবীদ্বয় নাছোড়্‌-বন্দা হইয়া লাগিয়া রহিলেন। অবশেষে আয়েশা (রাঃ) আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কথা বলিলেন এবং তাঁহার কসম ভঙ্গের দরুণ

× আয়েশা (রাঃ) আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আপন খালা হইতেন।

কাফ্ফারা স্বরূপ (একটি ক্রীতদাসের স্থলে) চল্লিশটি ক্রীতদাস আজাদ ও মুক্ত করিলেন। তা সত্ত্বেও আয়েশা (রাঃ) যখনই তাঁহার কসম ভঙ্গের কথা স্মরণ করিতেন এমন ভাবে কাঁদিতেন যে, অশ্রুতে তাঁহার ওড়্না ভিজিয়া যাইত। (মূল কেতাবের ৪৯৭ ও ৮৯৭ পৃষ্ঠায়)

২৫২৯। হাদীছ ঃ— যাহ্দাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার খানা বা আহার্য্য উপস্থিত করা হইল—উহার মধ্যে মোরগের গোশ্ত শামিল ছিল। তাঁহার নিকট একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ছিল। তিনি তাহাকে খানায় শরীক হওয়ার আহ্বান করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি মোরগকে এক বস্তু খাইতে দেখিয়াছি যাহাতে উহার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। ফলে আমি কসম করিয়াছি—মোরগের গোশ্ত খাইব না। আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, তুমি উঠিয়া আস, আমি তোমাকে এই শ্রেণীর কসমের একটি হাদীছ শুনাইব—

একদা আমি আমাদের গোত্রের আরও কতিপয় লোকের সহিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা তাঁহার নিকট জেহাদে যাওয়ার যান-বাহন চাহিলাম। ঐ সময় হযরত (দঃ) কোন ব্যাপারে ক্রোধান্বিত ছিলেন ; সেই প্রতিক্রিয়ায় হযরত (দঃ) শপথ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আমি যান-বাহন দিব না ; আমার নিকট সেই ব্যবস্থাও নাই।

অনতিবিলম্বেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট গণিমতরূপে হাছিলকৃত কতিপয় উট উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) আমাদিগকে স্মরণ করিলেন এবং দশটি উট আমাদিগকে প্রদাণ করার আদেশ দিলেন—উটগুলি বেশ মোটা তাজা উঁচু উঁচু ছিল। আমরা ঐ উটগুলি নিয়া কত দুর আসার পর ভাবিলাম, আমরা কি কাজ করিলাম ! হযরত (দঃ) কসম করিয়া ছিলেন, আমাদিগকে যান-বাহন দিবেন না, ঐ সময় তাঁহার নিকট যান-বাহন দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। তারপর এখন তিনি আমাদিগকে যান-বাহন দিলেন ; আমারাও তাঁহার কসম ভুলিয়া যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিলাম। ইহাতে কখনও আমাদের মঙ্গল হইবে না। সেমতে আমরা হযরতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম এবং আরজ করিলাম, আমরা যখন আসিয়া ছিলাম এবং যান বাহন চাহিয়া ছিলাম, আপনি আমাদিগকে যান-বাহন দিবেন না বলিয়া কসম করিয়া ছিলেন এবং আপনার নিকট সেই ব্যবস্থা ছিলও না। মনে হয়—আপনার কসম আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদিগকে যান-বাহন আমি দেই নাই, বরং আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যান-বাহন দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ আমি কোন বিষয়ে কসম করিয়া যদি বুঝিতে পারি, উহার বিপরীতটা উত্তম সেস্থলে আমি কসম ভঙ্গ করতঃ উত্তম কাজটা করিয়া নেই এবং কসমের কাফ্‌ফারা দিয়া দেই।

মছআলাহ ঃ— কোন ব্যক্তি যদি কসম করে, আজ আমি কথা বলিব না। অতঃপর সে নামায পড়ে বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে বা তছবীহ্ পড়ে—জিক্‌র-আজকার করে তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যদি সে তাহার নিয়্যতে ঐ সবকেও কথা বলার মধ্যে শামিল গণ্য করিয়া থাকে তবে কসম ভঙ্গ হইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন কাজ এক মাস না করার কসম খাইয়াছে। যদি মাস উনত্রিশ দিনের হয় তবে সেস্থলে কসম উনত্রিশ দিনের জন্যই গণ্য হইবে। কিন্তু এরূপ গণ্য হওয়ার শর্ত হইল এই যে, কসম মাসের প্রথম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যদি কসম মাসের প্রথম হইতে না হইয়া থাকে তবে এক মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনেই গণ্য করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ— ছালন্‌-তরকারী বা ব্যঞ্জন খাইবে না কসম করিলে সেস্থলে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণের ভাষায় যে সব জিনিষকে বুঝায় তাহাই সাব্যস্ত হইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন বিষয়ে কসম করিতে উক্ত বিষয়কে যে শব্দের দ্বারা আবৃত্ত করিয়াছে, সর্ব্ব সাধারণের ভাষা সূত্রে ঐ শব্দের যে অর্থ হয় সেই অর্থের ব্যতিক্রম কোন অর্থ কসমকারী উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সেই উদ্দেশ্য ও দাবী গ্রহণীয় হইবে। কিন্তু সেই অর্থ অবশ্যই উক্ত শব্দের আওতাভুক্ত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি ঐ কসমের সঙ্গে অন্য লোকের কোন হক সম্পৃক্ত থাকে, তবে সেস্থলে সাধারণ ভাষার অর্থের ব্যতিক্রম নিয়্যত গ্রহণীয় হইবে না। তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তি কসমকারীকে কসম খাওয়াইয়া থাকে সেস্থলেও কসমকারীর নিয়্যত মূল্যহীন হইবে। কসম দাতা যে অর্থ বুঝিবে সেস্থলে তাহাই ধর্ত্তব্য হইবে।

মছআলাহ ঃ—কেহ যদি কোন হালাল জিনিষকে নিজের জন্য হারাম বলিয়া উক্তি করে, যেমন—যদি কেহ বলে, মাছ আমার জন্য হারাম; আমি মাছ খাইলে হারাম খাইব বা যদি আমি অমুক কাজ করি তবে আমার জন্য ভাত খাওয়া হারাম ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ঐ জিনিষ তাহার জন্য হারাম হইবে না, কিন্তু তাহার ঐ উক্তি কসম গণ্য হইবে যাহা ভঙ্গ করিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

যদি এমন কোন হালাল বিষয় সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে, যাহা না করা শরীয়ত অনুযায়ী অবৈধ। যেমন মাতা-পিত, বরং কোন মোসলমান ভাই সম্পর্কেও যদি বলে যে, তাহার সঙ্গে কথা বলা আমার জন্য হারাম—এইরূপ উক্তি কসম গণ্য হইবে, কিন্তু সেই উক্তি ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য—তাহা ভঙ্গ করতঃ কাফ্ফারা আদায় করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ঐরূপ উক্তি যদি কোন নাজায়েয বস্তু সম্পর্কে করে, যেমন কোন মদ-খোর ব্যক্তি বলিল, মদ পান করা আমার জন্য হারাম এবং এই উক্তির দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হইল মদ পরিত্যাগ করার সঙ্কল্পকে দৃঢ়রূপে প্রকাশ করা কিম্বা যদি এইরূপ বলে যে, আমি অমুক কাজ করিলে আমার জন্য মদ্য পান করা হারাম হইবে এবং এই উক্তি দ্বারা ঐ কাজ না করার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য হয়। কিম্বা যদি কেহ এইরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তির ঘরে তামাক খাওয়া আমার জন্য হারাম এবং এই উক্তির দ্বারা ঐ ব্যক্তির ঘরে তামাক না খাওয়ার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করা উদ্দেশ্য হয়—এই শ্রেণীর উক্তিও কসম গণ্য হইবে যাহা ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। হাঁ—ঐরূপ বস্তুকে নিজের জন্য হারাম উক্তি করিয়া শুধু শরীয়তের মছআলাহ ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হইলে, সে ক্ষেত্রে এই উক্তি কসম গণ্য হইবে না।

কেহ যদি যে কোন রূপে স্বীয় স্ত্রীকে হারাম বলিয়া উক্তি করে তবে তাহা কসম গণ্য হইবে না, বরং স্ত্রীর প্রতি বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

(ফতোয়া শামী ২—৭৬১, ৭৭২)

মছআলাহ ঃ— কেহ যদি স্বীয় সমুদয় মাল ছদকারূপে বা আল্লার নামে মান্নতরূপে দিয়া দেওয়ার উক্তি করে, তবে সেস্থলে হানফী মজহাব অনুযায়ী ফত্ওয়া নিম্নরূপ—

মাল দুই প্রকার—(১) যে শ্রেণীর মালে যাকাৎ ফরজ হইতে পারে, যেমন নগদ টাকা, সোনা-চান্দি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল। (২) যে শ্রেণীর মালে যাকাৎ ফরজ হয় না, যেমন বাড়ী-ঘর, ব্যবহার্য্য মাল-ছামান ও ক্ষেত-ক্ষামার। উল্লেখিত উক্তির দরুণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল দান-খয়রাত করার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মাল যাহা কিছু উপস্থিত তাহার মালিকানায় থাকিবে সবই দান-খয়রাত করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল হইতে বা অন্য কোন অছিলায় এমন সম্বল তাহার না থাকে যদ্দ্বারা তাহার পরিবার পুনঃ রোজগার করা পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারে তবে সেই পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর মাল হইতেও নিজ খরচের জন্য রাখিতে পারিবে। কিন্তু রোজগার করিয়া যখন সামর্থবান হইবে তখন ঐ পরিমাণ মাল দান-খয়রাত করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— কাহারও নিকট যদি কোন ব্যক্তি তাহার সমুদয় মাল ছদকাহ্ করা সম্পর্কে পরামর্শ বা সম্মতি চায় তবে সেস্থলে তাহাকে তাহার মালের তৃতীয়াংশ ছদকাহ্ করার পরামর্শ দিবে। যেমন ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়া ছিলেন, امسك عليك بعض مالك فانه خير لك "কতেক মাল তোমার নিজের জন্য রাখিয়া দাও—ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয়।"

আবু দাঊদ শরীফের হাদীছে আছে—কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তাঁহার সমুদয় মাল ছদকাহ্ করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, হযরত (দঃ) তাহাকে নিষেধ করিলেন। তারপর তিনি অর্দ্ধেক মালের কথা বলিলেন, হযরত (দঃ) তাহাও নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি তৃতীয়াংশের কথা বলিলে হযরত (দঃ) তাহাতে সম্মতি দান করিলেন।

আর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়াছেন, তোমার মালের তৃতীয়াংশ ছদকাহ্ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। (ফতহুলবারী ১১—৪৮৫)

মান্নত ব্যতিরেকেই আল্লার রাস্তায় খরচ করা উত্তম, অবশ্য মান্নত করিলে তাহা পূর্ণ করিবে

২৫৩০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মান্নত মানিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন, মান্নত তক্‌দীর তথা আল্লার নির্দ্ধারণকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, অবশ্য উহা দ্বারা বখীল বা কৃপণের মাল বাহির হয়।

নাজায়েয কাজের মান্নত

২৫৩১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজের মান্নত করিবে যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী রহিয়াছে সে ব্যক্তি অবশ্যই সেই ফরমাবরদারীর কাজ সম্পন্ন করতঃ মান্নত পূর্ণ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লার নাফরমানির কাজের মান্নত করিবে সে (হাজার মান্নতের দরুণও) আল্লার নাফরমানির কাজে কখনও লিপ্ত হইবে না।

মছআলাহ ঃ—নাজায়েয কাজের মান্নত করা হইলে, সে ক্ষেত্রে হানফী মজহাব মতে হুকুম নিম্নরূপ—

নাজায়েয কাজ দুই প্রকার—(১) মূল কাজ নাজায়েয নহে, বরং কোন আনুষাঙ্গিকের কারণে নাজায়েয হইয়াছে—সেস্থলে মান্নত শুদ্ধ গণ্য হইবে এবং মান্নত পুরা করিতে নাজায়েযের কারণ বাদ দিয়া মূল কাজ আদায় করিবে। যেমন—যদি

মান্নত করা হয়, ঈদের দিন রোযা রাখিবে। ঈদের দিন রোযা রাখা জায়েয নহে। কিন্তু মূল জিনিষ তথা রোযা নাজায়েয নহে; ঈদের দিন বিজড়িত হওয়ায় নাজায়েয হইয়াছে। সুতরাং এই মান্নত শুদ্ধ হইবে এবং ঈদের দিন ছাড়িয়া অন্য কোন এক দিন রোযা আদায় করিবে। আদায় না করিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

(২) মুল কাজই নাজায়েয, যেমন মদ পান করা, কাহাকেও খুন করা। এইরূপ কাজের মান্নত করা হইলে সেই মান্নত শুদ্ধ হইবে না।

মান্নত আদায় করার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে

২৫৩২। হাদীছ ঃ— সায়াদ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই মর্ম্মে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার মাতার জিম্মায় একটি মান্নত ছিল। তিনি তাহা আদায় করার পূর্ব্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। হযরত (দঃ) সায়াদ (রাঃ)কে তাঁহার মাতার পক্ষে উহা আদায় করার ফৎওয়া প্রদান করিলেন। সেমতে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, মৃতের জিম্মায় কোন হক্ থাকিলে, তাহা আদায় করার জন্য উত্তরাধিকারীগণ প্রচেষ্টা চালাইবে।

মছআলাহ ঃ কোন ব্যক্তি মান্নত আদায় করার পূর্ব্বে মরিয়া গেলে সেস্থলে দেখিতে হইবে, মান্নত কি প্রকারের ছিল। যদি ধন-সম্পত্তির দ্বারা আদায় করা শ্রেণীর ওয়াজেব মান্নত হয় তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা আদায়ের অছিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজেব এবং সে ক্ষেত্রে মালের তৃতীয়াংশ হইতে তাহা আদায় করা উত্তরাধিকার-গণের উপর ওয়াজেব হইবে। অছিয়ত না করিলে আদায় করা ওয়াজেব হইবে না বটে, কিন্তু বালেগ ওয়ারেসগণের পক্ষে তাহা আদায় করা কর্ত্তব্য। আর যদি মান্নত শারীরিক এবাদৎ শ্রেণীর হয় এবং শরীয়তে উহার বদল নির্দ্ধারিত থাকে যেমন নামায, রোযা—প্রতি নামায ও প্রতি রোযার ফিদ্ইয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইহা আদায়ের অছিয়ত করাও ওয়াজেব এবং উত্তরাধিকারীগণ তাহা আদায় করিবে। আর যদি বদল না থাকে তবে তাহা আদায়ের কোন পন্থা নাই।

মছআলাহ ঃ— অন্যের মালিকানাভুক্ত কোন বস্তু সম্পর্কে সরাসরি মান্নত করিলে—যেমন, ঐ গরুটি ছদকাহ্ করিব মান্নত করিলাম, অথচ ঐ গরুর মালিক অন্য ব্যক্তি, তবে সেই মান্নত শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য মালিক হওয়ার উপর বা মালিকানার কোন সূত্রের উপর শর্ত্ত রাখিয়া মান্নত করা হইলে—যেমন, ঐ গরুটির মালিক আমি হইতে পারিলে বা ঐ গরুটি আমি খরিদ করিলে উহা ছদকাহ্ করিব মান্নত করিলাম। এই মান্নত শুদ্ধ হইবে এবং তাহার শর্ত্ত পূর্ণ হইলে মান্নত আদায় করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি কাফের থাকাবস্থায় মান্নত করিয়া ছিল, মোসলমান হওয়ার পর সেই মান্নত আদায় করা তাহার উপর ওয়াজেব হইবে না ; হাঁ—আদায় করা উত্তম। তদ্রূপ পাগল থাকা বা নাবালেগ থাকা অবস্থায় মান্নত করিয়া ছিল ; ভাল হওয়ার পর বা বালেগ হওয়ার পর সেই মান্নত আদায় করা ওয়াজেব হইবে না। (বদায়ে' ৫—৮১)

২৫৩৩। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জুমার নামাযের) খোৎবা দান কালে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, সে দাঁড়াইয়া আছে, বসে না। হযরত (দঃ) তাহার দাঁড়াইয়া থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগণ বলিল, এই ব্যক্তি আবু ইস্রায়ীল নামীয়। সে মান্নত করিয়াছে—"দাঁড়াইয়া থাকিবে বসিবে না, রৌদ্রে থাকিবে ছায়া গ্রহণ করিবে না—কথা বলিবে না, সর্ব্বদা রোযা রাখিবে।"

হযরত নবী (দঃ) লোকদিগকে বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে, আর রোযার মান্নত যেন পূর্ণ করে।

মছআলাহ ঃ—যে সব কাজ কোন প্রকার এবাদৎ শ্রেণীর নহে ঐরূপ কাজের মান্নত শুদ্ধ হয় না, যেমন—কথা না বলা, ছায়া গ্রহণ না করা, দাঁড়াইয়া থাকা।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা রোযা রাখার মান্নত করিলে, তাহাকে যথা সাধ্য সেই মান্নত অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে। শুধু রমজানের ঈদ ও কোরবানীর ঈদ এবং উহার পরবর্ত্তী তিন দিন—এই পাঁচ দিন আর মহিলাগণ হায়েজ-নেফাছের সময় রোযা রাখিবে না। অবশ্য যদি অক্ষম হইয়া পড়ে তবে প্রত্যেক দিনের রোযার জন্য ফিদ্‌য়িয়া আদায় করিতে হইবে।

২৫৩৪। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইল, এক ব্যক্তি প্রতি দিন রোযা রাখার মান্নত করিয়াছে—সে ব্যক্তি ঈদের দিন কি করিবে ? তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শই সর্ব্বত্র অনুসরণীয়। হযরত (দঃ) ঈদের দিনে রোযা রাখিতেন না এবং রোযা রাখার অনুমতিও দিতেন না।

২৫৩৫। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি মান্নত করিয়াছি, যত দিন বাঁচিয়া থাকি প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার রোযা রাখিব। এই বৎসর কোরবানীর ঈদ ঐ দিনে পড়িয়াছে—এখন কি করিতে হইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লার আদেশ মান্নত পূর্ণ করা আর শরীয়তের নিষেধ ঈদের দিন রোযা রাখা।

ঐ ব্যক্তি স্পষ্টরূপে তাহার করণীয় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ উত্তরই দিলেন, অতিরিক্ত আর কিছু বলিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাহার মান্নত তাহার জিম্মায় থাকিবে ঐ দিন রোযা না রাখিয়া রোযা শুদ্ধের কোন দিনে উহার কাজা করিবে।

মিথ্যা কসম করিবে না এবং দুনিয়ার স্বার্থে কসম ভঙ্গ করিবে না

মিথ্যা কসম করার পরিণতি সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৭০ নং হাদীছ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বিশেষভাবে মিথ্যা কসমের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে উক্ত হাদীছে পবিত্র কোরআন ৩ পাঃ ১৬ রুকুর ৭৭নং আয়াতখানার আলোচনাও রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন (১৪ পাঃ ১৯ রুকুতে) এই সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে। যথা—

وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُوا اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا -

"তোমরা (আল্লার নাম বিজড়িত করিয়া) কসমকে দৃঢ় করার পর উহা ভঙ্গ করিও না; অথচ (আল্লার নামকে মধ্যস্ত করিয়া) তোমরা আল্লাহকে তোমাদের (কথার) উপর সাক্ষী বানাইয়াছ।" وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

"আল্লার নামে অঙ্গীকার করিয়া উহার বিনিময়ে (তথা উহাকে ভঙ্গ করিয়া) হীন উদ্দেশ্য হাসিল করিও না।"

কসমের কাফ্‌ফারার বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন :—

فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ - فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ - ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ - وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ -

"(ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কীয় কসম ভঙ্গ করা হইলে) উহার কাফ্‌ফারা হইল, দশ মিছকীনকে খানা দান করা—স্বীয় পরিবারের মধ্যে প্রচলিত খানার মধ্যম

শ্রেণীর খানা। কিম্বা, দশ মিছকীনকে কাপড় দান করা, কিম্বা একটি ক্রীতদাস আজাদ করা। যে ব্যক্তি ঐ তিনিটির কোন একটিরও সমর্থ না রাখিবে, সে তিন দিন রোযা রাখিবে। কসম করিয়া ভঙ্গ করিলে, এই কাফ্‌ফারা তোমাদিগকে আদায় করিতে হইবে। তোমরা কসমের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। (৭ পাঃ ১ রুঃ)

দশ মিছকীনকে নিজ ঘরে খাওয়াইতে হইলে, তুই ওয়াক্ত অন্ততঃ মধ্যম শ্রেণীর খানা পেট পুরিয়া খাওয়াইতে হইবে। আর দশ মিছকীনের প্রত্যেককে তুই ওয়াক্ত খাওয়াইবার পরীবর্ত্তে প্রত্যেককে ছদকায়ে-ফেৎর পরিমাণ পয়সা বা বস্তু দান করিলেও চলিবে।

মছআলাহ:—কসমের সঙ্গে "ইন্‌শা আল্লাহ" বলা হইলে সেই কসম ফসকিয়া যাইবে—উহার জন্য কাফ্‌ফারা দেওয়া আবশ্যক থাকিবে না। কিন্তু যদি কসম ফসকানোর জন্য "ইন্‌শা আল্লাহ" বলা না হয়, বরং শুধু আল্লার নামে বরকত হাছিল করা বা কথাকে অধিক দৃঢ় করা উদ্দেশ্য হয়, তবে সেস্থলে "ইন্‌শা-আল্লার" সঙ্গেও কসম বহাল থাকিবে।

মছআলাহ:— কসমের কাফ্‌ফারা হানফী মজহাব মতে কসম ভঙ্গের পরে আদায় হইতে হইবে। কসম ভঙ্গের পূর্ব্বে আদায় করা হইয়া থাকিলে উহা কাফ্‌ফারা গণ্য হইবে না।

কসমের গুরুত্ব

২৫৩৬। হাদীছ:— ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট নবী (দঃ) এবং আবু বকরের পরে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)ও তাঁহার প্রতি সর্ব্বাধিক উপকারী জন ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এতই দানশীলা ছিলেন যে, তাঁহার নিকট অতিরিক্ত কোন বস্তু জমা থাকিতে পারিত না। তাঁহার নিকট যাহা কিছু আসিত তিনি তাহা দান করিয়া ফেলিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে কোন কিছু প্রদান করিলেন; উহা সম্পর্কে (আয়েশা (রাঃ) তাঁহার স্বভাব-কর্ম্ম করিলে) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার হস্ত বন্ধ করা দরকার। তিনি এই স্বভাব হইতে বিরত না থাকিলে আমি তাঁহার দান অপ্রোযোজ্য বলিয়া ঘোষনা করিব।

আয়েশা (রাঃ) ঐ কথার সংবাদ পাইয়া ভীষণ রাগ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের কি নিজে এই কথা বলিয়াছে? লোকেরা বলিল, হাঁ। তখন আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লার নামে আমার কসম—ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কখনও কথা বলিব না। এই কসমের কারণে যখন বহু দিন

উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিল তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) অনেক রকমের সুপারিশ ধরিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি এই ব্যাপারে কখনও সুপারিশ গ্রহণ করিব না এবং আমার কসম ভঙ্গ করিব না।

এই অবস্থায় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইলে আবদুল্লাহ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাতুল বনু-যোহরা বংশীয় লোকদের শরণাপন্ন হইলেন। কারণ, আয়েশা (রাঃ) নবীজীর আত্মীয়তার খাতিরে তাঁহাদের প্রতি অতি সদয় ও কোমল ছিলেন। সেমতে তিনি ঐ বংশীয় মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, যে ভাবেই হউক আপনারা আমাকে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকটে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তিনি আমার বিচ্ছেদের উপর কসম করিয়া থাকিবেন ইহা জায়েয হইবে না। তাঁহারা উভয়ে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে চাদরের আড়ালে করিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনায় বলিলেন, আমরা প্রবেশ করিতে পারি কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আসুন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা সকলেই আসিব কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সকলেই আসুন; তিনি জানিতেন না যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। (এতদিন আবদুল্লাহ তাঁহার নিকটে যাওয়ার অনুমতিই লাভ করিতে পারেন নাই। এবং সম্পর্কে আপন খালা হইলেও অনুমতি ব্যতিরেকে নিকটে যাওয়া বেয়াদবী।) গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাইয়া তাঁহারা সকলে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ (রাঃ) পর্দ্দার ভিতরে চলিয়া গিয়া (আপন খালা—) আয়েশা (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)ও ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করার ও তাঁহার সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিতে ছিলেন—আপনি ত জানেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিচ্ছেদ অবলম্বন করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং এক মোসলমান অপর মোসলমান হইতে তিন দিনের অতিরিক্ত সালাম-কালাম বন্ধ রাখিবে তাহা জায়েয নহে। তাঁহারা উভয়ে এই ভাবে আয়েশা (রাঃ)কে উপদেশ ও গোনাহের কথা শুনাইতে ছিলেন, আর তিনি তাঁহাদেরকে তাঁহার কসম স্মরণ করাইতে ছিলেন এবং কাঁদিতে ছিলেন। আর বলিতেছিলেন, আমি ত কসম করিয়াছি—কসম ত অতি বড় জিনিস। তাঁহারা উভয়ে নাছোড়-বন্দারূপে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেই লাগিলেন; অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কথা বলিলেন। তাঁহার কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারার জন্য (একটি গোলাম আজাদ করিলেই হইত,

কিন্তু) আবদুল্লাহ (রাঃ) দশটি গোলাম বা ক্রিতদাস তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আয়েশা (রাঃ) ঐ দশটি গোলাম ত আজাদ করিলেনই, তদুপরি নিজের পক্ষ হইতে আরও গোলাম আজাদ করিয়া চল্লিশ সংখ্যা পূর্ণ করিলেন। এইভাবে একটি কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা চল্লিশ গুণ আদায় করার পরও এই কসম ভঙ্গের কথা মনে পড়িলেই আয়েশা (রাঃ) এত কাঁদিতেন যে, তাঁহার ওড়না ভিজিয়া যাইত। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, কসম করার সময় কোন কার্য্যের উল্লেখ করিলে ভাল হইত যে—এখন কসম ভঙ্গ না করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদনে কসম হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম। (৮৯৭ এবং ৪৯৭ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— যে সব হাদীছের উল্লেখ পরস্পর বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে রহিয়াছে এই সব হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্তেও আয়েশা (রাঃ) বিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত হাদীছ সমুহের উদ্দেশ্য হইল—জাগতি কারণে পস্পপর রেষারেষির দরুন ঐরূপ বিচ্ছেদ অবলম্বন করা হারাম। কিন্তু দ্বীনের কোন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশে বিচ্ছেদ অবলম্বন করায় দোষ নাই। আরেশা (রাঃ) এই ক্ষেত্রে তাহাই ভাবিয়া ছিলেন যে, দান-খয়রাত করায় তাঁহাকে বাধা দানের কথা বলা হইয়াছে, তাই তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বিচ্ছেদ ঘোষনা করিয়া ছিলেন।

এই সম্পর্কে মছআলার বিবরণ ষষ্ঠ খণ্ড ২৩২৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

ওয়ারিসী তথা উত্তরাধিকার স্বত্বের বয়ান

মিরাসের ভাগ বন্টন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ আয়াতে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন ঃ—

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ .... وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

অর্থ ঃ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দ্দেশ দিতেছেন, তোমাদের সন্তানদের মিরাস সম্পর্কে—(পুত্র ও মেয়ে উভয় প্রকার সন্তান থাকিলে) এক এক পুত্রের অংশ দুই মেয়ের অংশের সম পরিমাণ হইবে। আর যদি সন্তান শুধু মেয়েই থাকে (সংখ্যায় দুই বা) দুই এর অধিক হইলেও তাহারা সকলে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে—পিতার পরিত্যক্ত মাল-সম্পত্তি হইতে। আর যদি মেয়ে সন্তান শুধু মাত্র একজন থাকে তবে সে অর্দ্ধেক পাইবে↑।

↑ পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে বিশেষ বিশেষ ওয়ারিসদের অংশ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে শরীয়তে নির্দ্ধারিত মিরাসের অন্যান্য বিধান বলবৎ করা হইবে।

মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতা তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ পাইবে—যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে। আর যদি তাহার কোন সন্তান না থাকে (একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নিও না থাকে*) শুধু মাতা-পিতাই তাহার ওয়ারিস হয়, তবে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাইবে (অবশিষ্ট পিতার জন্য হইবে।) পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির (মাতা-পিতার সহিত তাহার) একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নিও থাকে তবে (ভ্রাতা-ভগ্নিগণ মিরাস পাইবে না বটে, কিন্তু তাহাদের দরুণ মাতার অংশ কম হইয়া যাইবে—) মাতা ষষ্ঠাংশ পাইবে এবং অবশিষ্ট পিতা পাইবে। এই বণ্টন মৃত ব্যক্তির স্বীয় কৃত অছিয়ত বা তাহার ঋণ পরিশোধ করার পর হইবে।

তোমাদের পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে নিকটতম তাহা তোমরা সঠিকরূপে জানিতে পার না। (অথচ তোমাদের উপর মিরাস বণ্টন ছাড়িয়া দিলে তোমরা উহার উপরই ভিত্তি করিবে।) সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অংশ-নির্দ্ধারণ সম্পন্ন করা হইয়াছে; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বদর্শী।

আর তোমাদের স্ত্রীগণের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে তোমরা অর্দ্ধেক পাইবে যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; তাহাদের কোন সন্তান থাকিলে তোমরা চতুর্থাংশ পাইবে, তাহাদের কৃত অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পর।

আর স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে চতুর্থাংশ পাইবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী অষ্টমাংশ পাইবে—তোমাদের কৃত অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পর।

আর যদি মৃত ব্যক্তি এমন কোন পুরুষ বা নারী হয় যাহার পিতা, দাদা এবং কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান নাই—আছে এক মা-শরীক ভ্রাতা বা ভগ্নি, তবে সেই ভ্রাতা বা ভগ্নি ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর ঐ শ্রেণীর ভাই-বোন একাধিক হইলে এক তৃতীয়াংশ তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে↑; ক্ষতিকারক নিয়ম বিরোধী নয় এরূপ অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধ করার পর। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জ্ঞাত থাকেন, তিনি ধৈর্যশীল। (পারা ৪ রুকু ১৩)

আর যদি ঐরূপ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয় এবং তাহার সহোদরা বা বৈমাত্র ভগ্নি একজন থাকে তবে সেই ভগ্নি অর্দ্ধেক পাইবে। যদি ঐ শ্রেণীর ভগ্নি দুই বা ততধিক থাকে তবে তাহারা সকলে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে +।

---

* শুধু একজন ভ্রাতা বা ভগ্নি থাকিলে সেস্থলে মাতার অংশ পূর্ণ তৃতীয়াংশই থাকিবে।

↑ এস্থলে নারীপুরুষের ভেদাভেদ হইবে না এবং দুই বা ততধিক যতই হউক এক তৃতীয়াংশ সকলের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টিত হইবে। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐরূপ মৃত ব্যক্তি যদি নারী হয় এবং তাহার (ভগ্নি না থাকে, বরং) সহোদর বা বৈমাত্র ভাই থাকে, তবে সেই ভাই মৃত ভগ্নির সমুদয় সম্পত্তির মালিক হইবে (—এক ভাই থাকিলে একাই সব পাইবে একাধিক ভাই থাকিলে তাহারা সমুদয় সম্পত্তি সমান ভাবে বন্টন করিয়া দিবে, অবশ্য একাধিক ভ্রাতার মধ্যে যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয় প্রকার ভ্রাতা থাকে, তবে শুধু মাত্র এক বা একাধিক সহোদর ভ্রাতাই মিরাস পাইবে বৈমাত্র ভাই পাইবে না * ।

যদি ঐরূপ মৃত নারী বা পুরুষের ঐ শ্রেণীর ভাই-বোন মিশ্রিত থাকে (—দুই বা ততধিক) তবে তাহারা সমুদয় সম্পত্তি বন্টন করিয়া নিবে—ভ্রাতা ভগ্নির দ্বিগুণ পাইবে। (এস্থলেও এক বা একাধিক সহোদর ভ্রাতা থাকিলে বৈমাত্র ভাই-বোন বঞ্চিত হইবে। আর যদি ভাই বোনদের মধ্যে সহোদরা বোন থাকে সহোদর ভাই না থাকে তবে সে স্থলে বিভিন্ন তফসিল রহিয়াছে।) (পারা ৬ রুকূ ৪)

২৫৩৭। হাদীছ :— যাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রোগ শয্যায় পতিত হইলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া আমাকে দেখিবার জন্য পায়ে হাটিয়া আসিলেন। তাঁহারা যখন আমার নিকট পৌঁছিলেন তখন আমি বেহুঁশ ছিলাম। তাই হযরত (দঃ) অজু করিয়া অজুর পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। তাহাতে আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমার ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে আমি কি ফয়ছালা করিব ? হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর মিরাসের আয়াত নাযিল হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— মিরাস বন্টন সম্পর্কে প্রশ্ন করা সত্বেও হযরত (দঃ) ওহীর অপেক্ষা করিয়াছেন এবং মিরাস বন্টনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বয়ান করিয়া দিয়াছেন। সেই বয়ানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন, তোমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে তোমরা সর্ব্বদিক লক্ষ্য রাখিতে অক্ষম এবং ভবিষ্যতের অবস্থাও মোটেই জানিতে পার না। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বদর্শী। তাঁহার ভূত-

---

+ ঐরূপ মৃত পুরুষের যদি ভগ্নি না থাকে, বরং সহোদর বা বৈমাত্র ভাই একজন থাকে তবে সে একাই সমুদয় সম্পত্তি পাইবে। আর যদি একাধিক ভাই থাকে তবে ভাইগণ সমুদয় সম্পত্তি সমান ভাবে বন্টন করিয়া নিবে, অবশ্য সহোদর ভাই থাকিলে বৈমাত্র ভাই বঞ্চিত হইবে।

* ঐরূপ মৃত নারীর যদি ভাই না থাকে সহোদরা বা বৈমাত্র বোন একজন থাকে তবে সে অর্দ্ধেক পাইবে, আর যদি দুই বা ততধিক ঐ শ্রেণীর বোন থাকে তবে বোনগণ দুই তৃতীয়াংশ বন্টন করিয়া নিবে।

ভবিষ্যতের ব্যাপক জ্ঞান দর্শনের দ্বারা স্বয়ং মিরাস বণ্টনের অধ্যায়গুলি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন মানবের জন্য উহাই মঙ্গলময়।

মিরাস বণ্টন সম্পর্কে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের এই ভূমিকায় ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন এবাদৎ-বন্দেগীর অধ্যায়গুলি যেরূপ বাধ্যতামুলক এবং আইন পর্য্যায়ের—যেমন, বার মাসে এক মাস রোযা ফরজ তাহাও রমজান মাসে নির্দ্ধারিত এবং জাকাতের নেছাব দুই শত দেরহাম, জাকাতের পরিমাণ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং নামাযের মধ্যে ফজর দুই রাকাত, জোহর চার রাকাত, আছর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, এশা চার রাকাত এবং প্রত্যেক রাকাত নামাযে এক রুকু দুই সেজদা ইত্যাদি। শরীয়তের এই সব অধ্যায়গুলি যেরূপে বাধ্যতা মূলক তদ্রূপ মিরাস বণ্টনের অধ্যায়গুলিও জাকাত ইত্যাদির ন্যায় এবাদৎ পর্য্যায়ের বাধ্যতা মূলক, এস্থলে মানবীয় জ্ঞান-দর্শন ও মছ্‌লেহাত বা কল্যাণ কামনার প্রবনতায় কোন প্রকার (এম্যানমেণ্ট) সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা উন্নয়নের অবকাশ নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বদর্শী রহমানুর-রহীম সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার মছলেহত-বীনী ও কল্যাণ কামনার উর্দ্ধে মানবীয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-দর্শনের কল্যান কামনা যাইতেও পারে না। আমরা হয়ত দুই চার দিকের দৃষ্টি প্রসূত এবং উপস্থিত বা নিকটতম অস্থায়ী ঘটনাবলীর প্রভাব প্রসূত ভাবাবেগের প্রবণতায় কোন ব্যবস্থাকে কল্যাণকর ভাবিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বদিকের দৃষ্টি ও ভূত-ভবিষ্যতের সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কল্যাণকর হইবে তাহার নিশ্চয়তা ত দুরের কথা উহার সম্ভাবনাও নাই! কারণ মানবীয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞান দর্শনের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে না।

এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ বর্ণনা করার পর ফরায়েজের তথা মিরাস বণ্টনের নির্দ্ধারিত বিধানকে শিক্ষা করার গুরুত্ব বয়ানের একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। সেই পরিচ্ছেদে বিশিষ্ট ছাহাবী ওক্‌বা ইবনে আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই বিশেষ একটি সতর্কবাণীও বর্ণনা করিয়াছেন—

تعلموا قبل الظانين অর্থাৎ মানবীয় জ্ঞান-দর্শন প্রসূত বিষয় অকাট্য হয় না—উহা শুধু মাত্র ধারণা ও অনুমান শ্রেণীর হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান যাহা কোরআন ও রসুল মারফৎ পাওয়া যায় উহা হয় অকাট্য। এক যুগে এরূপ লোকদের আবির্ভাব হইবে, যাহারা স্বীয় সংকীর্ণ জ্ঞান-দর্শন প্রসূত তথা ধারণা ও অনুমানের মাপ-কাঠিতে কথা বলিবে এবং তাহাই লোকদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে। খাঁটি ঈমানদারদের কর্ত্তব্য ঐ শ্রেণীর লোকদের

মতবাদ প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানসমূহ মজবুত রূপে শিক্ষা করিয়া রাখা।

ফরায়েজ তথা মিরাস বণ্টনের বিধান শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা হাদীছ শরীফেও বিশেষরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ফরায়েজ শিক্ষা কর; উহা দীন শিক্ষার অর্দ্ধাংশ এবং ঐ শিক্ষাটিই আমার উম্মত হইতে সর্ব্বাগ্রে ছিন্ন হইবে। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, ফরায়েজ শিক্ষা কর; উহা দীন-ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। (ফতহুলবারী)

সন্তানের মিরাস মাতা-পিতা হইতে

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন মৃত পুরুষ বা মহিলার সন্তান শুধু একটি মেয়ে আছে—সেই মেয়ে পিতা বা মাতার সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইবে। আর যদি দুই বা ততধিক শুধু মেয়ে থাকে তবে তাহারা সকলে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি ঐ মেয়েদের সহিত একটিও ছেলে থাকে তবে "জবীল-ফুরুজ"—কোরআনে নির্দ্ধারিত অংশের অংশিদার কেহ থাকিলে তাহার নির্দ্ধারিত অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সব মেয়ের এক গুণ, ছেলের দ্বিগুণ—এই হিসাবে বণ্টন করিতে হইবে।

মেয়েদের মিরাস

কোরআন এবং হাদীছ অনুসারে মেয়েরাও ছেলেদের ন্যায় মাতা-পিতার মিরাসের অধিকারিনী হইবে। অবশ্য তাহাদের প্রাপ্য ছেলেদের অপেক্ষা কম হইবে।

২৫৩৮। হাদীছঃ— আছওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলেই ছাহাবী মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ইয়ামান দেশের শাসনকর্ত্তা ও শিক্ষক হইয়া আসিলেন। আমরা তাঁহার নিকট একটি মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলাম—এক ব্যক্তি তাহার এক মেয়ে এবং এক ভগ্নি রাখিয়া মারা গিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহার মেয়েকে দিলেন; অপর অর্দ্ধেক ভগ্নিকে দিলেন।

পুত্রের সহিত নাতির মিরাস

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, নাতি মিরাস পাইবে যদি মৃত ব্যক্তির একজনও পুত্র সন্তান না থাকে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد........

ولا يرث ولد الابن مع الابن.

"সন্তানের সন্তান মৃত ব্যক্তির সন্তানের ন্যায় গণ্য হইবে—পুত্র পুত্রের ন্যায় মেয়ে মেয়ের ন্যায়—যদি তাহাদের সঙ্গে কোন পুত্র বিদ্যমান না থাকে। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বিদ্যমান থাকিলে তাহার পুত্রের (বা মেয়ের) সন্তানগণ ওয়ারেস হইবে না।"

২৫৩৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহাদের জন্য শরীয়তে অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে সেই নির্দ্ধারিত অংশ দিতে হইবে। অতঃপর অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিবে তাহা মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্ত্তী (এক বা একাধিক) পুরুষ পাইবে।

ব্যাখ্যাঃ— আলোচ্য হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ অতিশয় সুপ্রশস্ত যাহা ফরায়েজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট হইতে জানা যাইবে। নিজে নিজে ইহার দ্বারা কোন মছআলাহ ফয়ছালা করা যাইবে না।

আলোচ্য হাদীছের তথ্যটির একটি সরল দৃষ্টান্ত—যেরূপ, কোন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, ছেলে ও নাতি রহিয়াছে। স্ত্রীর জন্য ছেলে থাকাবস্থায় অষ্টমাংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহা তাহাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সব ছেলে পাইবে, নাতি কিছুই পাইবে না। কারণ, নাতি অপেক্ষা ছেলে অধিক নিকটবর্ত্তী।

অধিক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি যদি পুরুষ না হইয়া নারী হয়, তবে উহার মছআলাহ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ।

মছআলাহঃ—পুত্র সন্তান বিদ্যমান থাকিলে নাতি মিরাস পায় না, কিন্তু যদি পুত্র সন্তান না থাকে, বরং শুধু মেয়ে থাকে তবে তাহার সঙ্গে পুত্রের পুত্র নাতি এমনকি নাতির পুত্রও মিরাস পাইবে। যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, স্ত্রী, এক মেয়ে, এক পুত্রের পুত্র থাকিলে পিতা ষষ্ঠাংশ, মাতা ষষ্ঠাংশ, স্ত্রী অষ্টমাংশ, মেয়ে অর্দ্ধাংশ পাইবে এবং অবশিষ্ট নাতি পাইবে। নাতির সঙ্গে পুত্রের মেয়ে নাতিন থাকিলে সেই নাতিনও অংশ পাইবে এবং নাতি ও নাতিন পরস্পরের মধ্যে নরের জন্য নারীর দ্বিগুণ নিয়মে ভাগ হইবে। মৃত ব্যক্তির দুই বা ততধিক মেয়ে ও পুত্রের পুত্র নাতি থাকিলে সে ক্ষেত্রে মেয়েগণ সমভাবে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে, এবং অবশিষ্ট নাতি পাইবে।

মেয়ের সঙ্গে পুত্রের মেয়ে নাতিনও মিরাস পায় যদি মেয়ে একজন থাকে। উপরোল্লেখিত অবস্থায় এক মেয়ের সঙ্গে পুত্রের মেয়ে নাতিন থাকিলে সে ষষ্ঠাংশ পাইবে।

২৫৪০। হাদীছঃ— একদা কোন এক ব্যক্তি ছাহাবী আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে এই মছআলাহটি জিজ্ঞাসা করিল যে, কোন এক মৃত ব্যক্তির এক মেয়ে, এক

নাতিন—ছেলের মেয়ে এবং এক ভগ্নি রহিয়াছে। আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, মেয়ে অর্দ্ধেক এবং ভগ্নি অর্দ্ধেক পাইবে (অর্থাৎ নাতিন কিছুই পাইবে না)। তিনি জিজ্ঞাসাকারীকে ইহাও বলিলেন যে, মছআলাহটি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা কর, আশা করি তিনিও আমার মতামত সমর্থন করিবেন।

সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল এবং তাঁহাকে আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মন্তব্যও জ্ঞাত করা হইল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আমিও যদি তাঁহার ঐ মত্ পোষণ করি, তবে তাহা আমার পক্ষে ভ্রান্তি পরিগণিত হইবে। উক্ত অবস্থার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আমি সেই নির্দ্দেশ ব্যক্ত করিতেছি। হযরত নবী (দঃ) ঐরূপ অবস্থায় মেয়ের জন্য অর্দ্ধাংশ, নাতিনের জন্য ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্ট ভগ্নির জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলেন। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একাধিক মেয়ের জন্য যে, দুই তৃতীয়াংশ পবিত্র কোরআনের নির্দ্ধারণ রহিয়াছে তাহা পূর্ণ করার জন্য মেয়েকে অর্দ্ধাংশ দেওয়ার পর ষষ্ঠাংশ নাতিনকে দেওয়া হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই মতামত ও বয়ান আবু মূছা (রাঃ)কে জ্ঞাত করা হইলে, তিনি তাঁহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনার্থে বলিলেন, এত বড় বিজ্ঞ আলেম তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকাবস্থায় আর কোন মছআলাহ আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐরূপ অবস্থায় যদি দুই মেয়ে থাকে তবে নাতিন কিছুই পাইবে না। যেহেতু দুই মেয়ে পূর্ণ দুই তৃতীয়াংশ পাইয়া যাইবে। অবশ্য যদি নাতিনের সহিত এই অবস্থায় নাতিও থাকে, তবে ভগ্নি বঞ্চিত হইয়া যাইবে এবং দুই মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ নাতি ও নাতিনের মধ্যে নরের জন্য নারীর দ্বিগুণ হারে বন্টিত হইয়া যাইবে।

নাতি-নাতিন সম্পর্কে অংশ প্রাপ্তির উল্লেখিত বিবরণ একমাত্র পুত্রের সন্তান-সন্ততির পক্ষেই প্রযোজ্য। মেয়ের সন্তান-সন্ততিগণ সাধারণরূপে অংশীদার হয় না। যে ক্ষেত্রে অংশীদার হইতে পারে তাহার বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েজের বিধান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

দাদার মিরাস

পিতা জীবিত থাকিলে দাদা মিরাস পাইবে না। পিতা জীবিত নাই, দাদা জীবিত আছে—এই অবস্থায় দাদা পিতার স্থলে গণ্য হইয়া মিরাসের অধিকারী হইবে। আবু বকর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ হইতে এই মছআলাহ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)ও ইহাই বলিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মিরাস

২৫৪১। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাধারণ ভাবে ছেলেই সমস্ত মিরাসের অধিকারী হইত। পিতা-মাতার জন্য অছিয়ত করা জরুরী ছিল, যে পরিমাণ অছিয়ত করা হইত তাহারা সেই পরিমাণ পাইত; অবশিষ্ট শুধু মাত্র ছেলে পাইয়া থাকিত। পরবর্ত্তী যুগে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছা অনুসারে ঐ নিয়ম রহিত করিয়া ভিন্ন নিয়ম প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক কোরআনের আয়াত নাযেল করিয়াছেন এবং সেই আয়াতে মেয়েকেও মিরাসের অধিকারিণী বানাইয়াছেন, অবশ্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাইবে। আর মাতা-পিতার প্রত্যেকের জন্য (ছেলে থাকিলে) ষষ্ঠাংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আর স্ত্রীর জন্য (মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকিলে) অষ্টমাংশ এবং (সন্তান না থাকিলে) চতুর্থাংশ, আর স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকিলে) অর্দ্ধাংশ এবং (সন্তান থাকিলে) চতুর্থাংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বংশ ও ঔরস্য সম্পর্ক একমাত্র বৈধ সম্পর্ক-ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হইতে পারে. ব্যভিচার দ্বারা ঐ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না

২৫৪২। ছাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) ছাহাবীর (কাফের) ভ্রাতা ওৎবা মৃত্যু-মুখে স্বীয় ভ্রাতা বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ (রাঃ)কে অছিয়ৎ করিয়া গিয়াছিল যে, মক্কার যাম্‌আ নামক (কাফের) ব্যক্তির ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানটি (ব্যভিচার সঙ্গমের মাধ্যমে) আমার বীর্য্যে জন্ম। (সুতরাং সে আমার গোলাম; অন্ধকার যুগে ব্যভিচার দ্বারাও ঔরস্য সাব্যস্ত হইত। আমি ত মরিয়া যাইতেছি; মক্কায় ত তোমার জাতি মোসলমানদের বিজয় হইবে, তখন আমার ভ্রাতা হিসাবে) তুমি ঐ গোলামটিকে হস্তগত করিয়া নিও।

সেমতে মক্কা মোসলমানদের জয় হইলে পর সায়াদ (রাঃ) ঐ গোলামকে হস্তগত করিয়া লাইলেন এবং দাবী করিলেন, ইহা আমার ভ্রাতার সন্তান; (ক্রীতদাসীর গর্ভজাত হওয়ায় গোলাম হইয়াছে।) ভ্রাতা আমাকে তাহার সত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। (উক্ত ক্রীতদাসীর মালিক) যামআর পুত্র "আব্দ" ঐ দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দাবী করিল, সে ত আমার ভ্রাতা; আমার পিতার ঔরসে তথা তাহার দাসীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছে।

বিরোধমান উভয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, হে আব্দ! সে তোমার ভ্রাতাই সাব্যস্ত। সন্তান বৈধ

সম্পর্কীয় ঔরসেরই গণ্য হয়, ব্যভিচার দ্বারা তাহা হয় না—ব্যভিচারীর ভাগ্যে ত প্রস্তরাখাত।

(উক্ত বিধান মতে বিরোধস্থল ছেলেটি যমআর পুত্র সাব্যস্ত হইল। নবী পত্নি ছওদা (রাঃ) যম্‌আর দুহিতা ছিলেন; সে মতে ঐ বিধানানুসারে ছওদা (রাঃ) ঐ ছেলের ভগ্নি হইলেন। কিন্তু) নবী (দঃ) ছওদা (রাঃ)কে ঐ ছেলের সহিত পর্দ্দা করার আদেশ করিলেন; যেহেতু তাহার আকৃতি ব্যভিচারী ওৎবার সহিত সামঞ্জস্যময় ছিল। ছওদা (রাঃ) মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও ঐ ব্যক্তিকে দেখা দেন নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তানের বংশ উক্ত সম্পর্কধারী স্বামী হইতেই সাব্যস্ত হইবে যদি কোন অকাট্য বাধা না থাকে। যথা—বিবাহ সম্পাদনের পর ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান জন্মিয়াছে; সেই সন্তান উক্ত বৈবাহিক সম্পর্কের জন্ম সাব্যস্ত হইবে না এবং ঐ স্বামীর বংশের সাব্যস্ত হইবে না। এই বাধা না থাকিলে ঐ স্বামীর ঔরস্য সাব্যস্ত হইবে যদিও স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মিলন প্রকাশ্যে প্রমাণিত না হয়। এমনকি স্বাভাবিক ভাবে মিলনের সম্ভাব্যতা পরিদৃষ্ট না হইলেও সেই ক্ষেত্রে বংশ ও ঔরস্য স্বামীর সহিত সম্পৃক্ত হইবে। যথা প্রাপ্তবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী দুরদেশে চলিয়া গিয়াছে—উভয়ের মিলন দেখা যায় নাই; ছয় মাস বা ততধিক সময় পর সন্তান জন্মিয়াছে। এই সন্তানের বংশ ও ঔরস্য ঐ স্বামী হইতেই পরিগণিত হইবে যদি না স্বামী অস্বীকার করে। স্বামী অস্বীকার করিলেও স্ত্রী যদি ঐ স্বামীর ঔরস্য হওয়ার দাবী করে তবে স্বামীর অস্বীকারেও তাহার ঔরস্য বাতিল গণ্য হইবে না—যাবৎ না "লেয়ান" করে। লেয়ানের বিবরণ ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আকৃতির দ্বারা ঔরস্য প্রমাণ করা

হানফী মজহাব মতে পিতা সন্তানের ঔরস্য অস্বীকার করিলে শুধু আকৃতির দ্বারা ঔরস্য প্রমাণিত হইবে না। তদ্রূপ আকৃতির গরমিলের দরুণ সন্তানের ঔরস্য অস্বীকার করা কিম্বা উহার দরুণ কোন প্রকার কটাক্ষ করা একেবারে হারাম।

২৫৪৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে আসিলেন—তাঁহার মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা ছিল। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি জান কি! মোযাজ্জায মোদ্‌লাজী আসিয়া ছিল এবং উছামা ও যায়েদকে দেখিয়াছিল। তাহারা উভয়ে মাথা পর্য্যন্ত চাদরে আবৃত অবস্থায় শুইয়া ছিল—শুধু তাহাদের পদদ্বয় উন্মুক্ত ছিল। মোযাজ্জায বলিয়াছে, এই পদযুগল একটি অপরটির অংশবিশেষ।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্র ছিলেন যায়েদ (রাঃ), আর তাঁহার পুত্র ছিলেন, উছামা (রাঃ)। উভয়ই নবীজীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের আকৃতিতে গরমিল ছিল—যায়েদ(রাঃ) গৌর বর্ণের ছিলেন, আর উছামা(রাঃ) ছিলেন কৃষ্ণ বর্ণের। মোনাফেক-কাফেররা নবীজীর মনে ব্যথা দেওয়ার জন্য উক্ত গরমিল দেখাইয়া যায়েদ (রাঃ) ও উছামার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে কটাক্ষ করিত।

আরবে এক শ্রেণীর লোক হইত যাহারা পিতা-পুত্র শেনাক্ত করায় বিজ্ঞ পরিগণিত হইত। এবং ঐ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও সাব্যস্তকে অতিশয় মূল্য দেওয়া হইত। মোযাজ্জায মোদলাজী ঐ শ্রেণীর অন্যতম ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার সাব্যস্ত ও সিদ্ধান্তে কাফের-মোনাফেকদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই নবীজী (দঃ) এই ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছেন। যায়েদ ও উছামার প্রকৃত সম্পর্ক ত সপ্রমাণিত ছিলই।

বন্দী ব্যক্তি ওয়ারেস হইলে

শত্রুর হাতে কোন মোসলমান যদি বন্দী হইয়া পড়ে, যাহার খোঁজ ও ঠিকানা জানা আছে, তাহার মুক্তির কোন ব্যবস্থা ও আশা না থাকিলেও মিরাসের মধ্যে তাহার প্রাপ্য অংশ জমা রাখিয়া দিতে হইবে। তাহাকে বাদ দিয়া অন্যান্য ওরায়েসগণ সমুদয় মিরাস বন্টন করিয়া নিতে পারিবে না। অবশ্য যদি তাহার খোঁজ ও ঠিকানা জানা না থাকে, তবে সে নিখোঁজ গণ্য হইবে, যাহার জন্য শরীয়তে বিস্তারিত বিধান রহিয়াছে।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) এই ফরমান জারী করিয়া ছিলেন যে, বন্দী ব্যক্তি কোন অছিয়ত করিলে বা তাহার গোলাম ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিলে এবং তাহার ধন-সম্পদের মধ্যে সে কোন প্রকার কার্য্য প্রয়োগ করিলে তাহা প্রযোজ্য হইবে, যাবৎ সে ইসলাম ধর্ম্ম বদলাইয়া না ফেলে। (আর যদি খোদানাখাস্তা সে শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া ইসলাম ত্যাগ করতঃ মোরতাদ্ হইয়া যায় তবে সে মৃতের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি ওয়ারেসগণের মধ্যে বন্টিত হইয়া যাইবে ; ঐ ধন-সম্পত্তির উপর তাহার কোন কার্য্যই প্রযোজ্য হইবে না।

মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে মিরাস প্রবর্ত্তিত হইবে না

২৫৪৪। **হাদীছ** ঃ— عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

অর্থ ঃ—উছামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমান কাফেরের ওয়ারেস হইতে পারিবে না এবং কাফের মোসলমানের ওয়ারেস হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—অধিকাংশ ছাহাবা তাবেয়ীন ও ইমামগণের অভিমত এই হাদীছ মোতাবেকই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য ছাহাবীদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট ছাহাবী মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাবেয়ীগণের মধ্য হইতে হাসান বছরী (রঃ), আলী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর ছেলে মোহাম্মদ (রঃ), হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ছেলে ইমান জয়নাল আবেদীনের পুত্র ইমাম বাকের প্রমুখগণ ভিন্ন দলীল সূত্রে এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, কাফের মোসলমানের ওয়ারেস হইবে না, কিন্তু মোসলমান কাফেরের ওয়ারেস হইয়া সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

'হুদূদ' তথা শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিভিন্ন শাস্তির বয়ান

জেনা বা ব্যভিচার, মদ্য পান, চুরি, ডাকাতি এবং কোন মোসলমানের উপর জেনার অপ্রমাণিত তোহমত লাগান—এই সব অপরাধের জাগতিক শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন। এই শ্রেণীর শাস্তিকেই "হদ্দ" বহু বচনে "হুদুদ" বলা হয়। এই সব শাস্তি ইহজগতে আইনগত ভাবে বলবৎ হইবে। ইহা ভিন্ন উক্ত অপরাধসমূহের পরকালীন শাস্তিও রহিয়াছে যাহা খণ্ডনের একমাত্র পথ হইল খাঁটী তওবা।

কতিপয় গোনাহ সম্পর্কে সতর্কবাণী

২৫৪৫। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِىْ الزَّانِىْ حِيْنَ

يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ

السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ

فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যভিচারী জেনাকারী যখন ব্যভিচার ও জেনায় লিপ্ত হয় সে তখন পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি স্বীয় লক্ষ্য উপস্থিত রাখিয়া ব্যভিচার ও জেনায় লিপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যভিচার ও জেনায় লিপ্ত হয়, সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন উপস্থিত থাকে না। এবং যখন কেহ মন্থ পান করে সে তখন পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি লক্ষ্য বিদ্যমান রাখিয়া মন্থ পান করিতে পারে না। অর্থাৎ মন্থ পানকারী যখন মন্থ পান করে তখন সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান থাকে না। এবং চোর যখন চুরি করে সে তখন পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান রাখিয়া চুরি করিতে পারে না। অর্থাৎ চোর যখন চুরি করে তখন সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান থাকে না। এবং কোন ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি স্বীয় লক্ষ্য বিদ্যমান রাখিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্য দিবা লোকে ডাকাতি করার ন্যায় মহা পাপে লিপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন ঐরূপ জঘন্য পাপে লিপ্ত হয় তখন সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান থাকে না।

ব্যাখ্যা ঃ—"পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে না" এই বলিয়া আলোচ্য হাদীছের দুই প্রকার অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হাদীছটির ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ রহিয়াছে এবং আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া উভয় অর্থই উচ্চ মানের। প্রথম অর্থ অনুযায়ী হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য হইল—লোকদিগকে সতর্ক করা যে, এই সব গোনাহ ও পাপের দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য হইল—এই শ্রেণীর মহা পাপসমূহ হইতেও বাঁচিবার একটি অমোঘ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া যে, যখনই ঐরূপ কোন পাপের আকর্ষণ তোমাকে মোহমান করিয়া তোলে তখনই তুমি স্বীয় ঈমানকে বিবেকের সামনে উপস্থিত কর, ঈমানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—আল্লার প্রতি ঈমান, আল্লার আদেশ-নিষেধের প্রতি ঈমান, এই সব গোনাহের আজাবের প্রতি ঈমানকে উপস্থিত করিয়া ধ্যানকে উহার উপর নিবদ্ধ কর। এরূপ করিলে তুমি পাপ হইতে বিরত থাকিবে, সে দিকে অগ্রসর হইবে না, তুমি নিজেই নিজেকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইবে।

২৫৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করাকালে মোমেন থাকাবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। চোর চুরি করাকালে মোমেন

থাকাবস্থায় চুরিতে লিপ্ত হয় না। এবং মদখোর মদ্য পানকালে মোমেন থাকাবস্থায় মদ্য পান করে না, তদ্রূপ মোমেন থাকাবস্থায় হত্যা কার্য্য করে না। (১০০৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত বাক্যদ্বয়ের দুইটি অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইমাম বোখারী (রঃ) আর একটি তৃতীয় অর্থও ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জেনাকারী ব্যাভিচারী যখন জেনায় লিপ্ত হয়, তখন সে তাহার ভিতর ঈমানের নূর ধারণকারী থাকিয়া জেনায় লিপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ জেনাকারী যখন জেনায় লিপ্ত হয়, চোর যখন চুরি করে, শরাবখোর যখন শরাব পান করে, ডাকাত যখন ডাকাতি করে, তাহাদের অভ্যন্তরে তখন ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে না। তাহাদের ভিতর হইতে ঈমানের নূর বাহির হইয়া যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—ينزع عنه نور الايمان "ঐ শ্রেণীর গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ভিতর হইতে ঈমানের নূর বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া হয়।"

ঈমানের নূর বাহির হইয়া যাওয়া যে, কোন প্রকার রূপক বা উপঅর্থে নহে, বরং বাস্তবেই তাহা হয়—দৃঢ়তার সহিত উহা বুঝাইবার জন্য একটি বাহ্যিক দৃষ্টান্তও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ১০০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—

قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الايمان منه قال هكذا وشبك بين اصابعه ثم اخرجها فان تاب عاد اليه هكذا وشبك بين اصابعه

অর্থাৎ—আলোচ্য হাদীছখানা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে। তাঁহারই বিশিষ্ট খাদেম ও শাগের্দ একরেমা (রঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উল্লেখিত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান কিরূপে তাহার হইতে বাহির করিয়া নেওয়া হয়—কিরূপে উহা বাহির হয়? তদুত্তরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় এক হাতের আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের ফাঁকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া অতঃপর উহা টানিয়া বাহির করতঃ বুঝাইলেন যে, এই আঙ্গুলগুলি যে ভাবে অপর হাতের আঙ্গুল সমূহ হইতে বাহির হইল, ঠিক এইরূপেই উক্ত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অভ্যন্তর হইতে ঈমান (তথা ঈমানের নূর) বাহির হইয়া আসে—এস্থলে কোন প্রকার রূপক বা উপঅর্থ উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য যদি ঐ ব্যক্তি কৃত গোনাহ হইতে খাঁটী তওবা করে তবে ঈমান (তথা ঈমানের নূর) পুনঃ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেও ইবনে আব্বাস (রাঃ) পুনরায় এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়া ঈমানের নূর পুনঃ তাহার অভ্যন্তরে ফেরিবার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, উল্লেখিত গোনাহ সমূহের দরুণ মূল ঈমান বিলুপ্ত ও একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না বটে, কিন্তু ঈমানের নূর ও উহার জ্যোতি ছিন্ন হইয়া যায়। ঈমানের নূর একটি অমূল্য রত্ন; এই নূর ইহজগতে মোমেনের থাকে যদ্দ্বারা সে আখেরাতের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য পায়। পরজগতে সেই নূর প্রকাশ্যরূপে মোমেনের সাথী হইবে— যখন ময়দান হাশর হইতে পোল-ছেরাত অতিক্রম কালে ভীষণ অন্ধকার নামিয়া আসিবে। যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم ......

هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন প্রত্যেকে দেখিতে পাইবে, মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাগণের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডানে (-বামে) ধাবমান রহিয়াছে। তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলা হইবে, আজ তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ—যাহার বাগ-বাগিচা ও মহলের অভ্যন্তরে প্রবাহমান নহরসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। তথায় তোমরা চিরকাল থাকিবে—ইহা অতি বড় সাফল্য। যে দিন মোনাফেক নর-নারীগণ মোমেনগণকে বলিবে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন! আমরা যেন আপনাদের নূরের আলো লাভ করিতে পারি। তাহাদিগকে বলা হইবে পেছনের দিকে ফিরিয়া যাইয়া আলোর সন্ধান কর। এই সময় অনতি বিলম্বে (মোমেন ও মোনাফেক) উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়াল আসিয়া যাইবে। যাহার অভ্যন্তর দিকে রহিয়াছে রহমত-ভাণ্ডার তথা বেহেশত এবং বহির্ভাগে রহিয়াছে আজাব-কেন্দ্র তথা দোযখ। তখন মোনাফেক দল চিৎকার করিয়া মোমেনগণকে বলিবে, আমরা কি তোমাদের সাথী ছিলাম না? (অর্থাৎ দুনিয়াতে ত আমরা তোমাদেরই সাথী ছিলাম। আজ আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতেছ কেন?) মোমেনগণ তদুত্তরে বলিবেন, প্রকাশ্যে ত তোমরা আমাদের সাথী ছিলে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা নিজকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার মধ্যে রাখিয়া ছিলে। সত্যের বাহকগণ বিলুপ্ত হউক সেই অপেক্ষায় ছিলে। দ্বীনের প্রতি সন্দিহান ছিলে এবং নানা প্রকার কাল্পনিক আশা আকাঙ্খা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। আল্লার হুকুম তথা মৃত্যু তোমাদের উপর আসিয়া পড়া পর্য্যন্ত তোমরা এ সবের মধ্যেই বিভোর ছিলে এবং ধোকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ সম্পর্কেও ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়া ছিল (যে, আল্লাহ

তায়ালা তোহাদিগকে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন করিবেন না, হিসাব হইলেও তথায় তোমাদের রীতি-নীতিই গ্রহণীয় হইবে—ইত্যাদি। যেহেতু তোমরা বাস্তবে এই সব অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে) অতএব আজ তোমাদের ন্যায় শুধু বাহ্যিক মোমেন মোসলমান নামধারীদের বাঁচিবার উপায় নাই। এমনকি প্রাণ বিনিময় দেওয়া সম্ভব হইলে তাহাও তোমাদের হইতে গ্রহণ করা হইবে না। যেরূপ প্রকাশ্য কাফেরদের হইতেও গ্রহণ করা হইবে না। তোমাদের ঠিকানা দোযখই হইবে। উহাই তোমাদের চিরসাথী—কতই না জঘন্য বাসস্থান উহা।

(২৭ পারা ছুরা হাদীদ)

ঈমানের এই নুর ও জ্যোতি উল্লেখিত গোনাহ সমূহের দরুণ ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে সেই ঈমানের অবস্থা তদ্রূপই হইয়া যায় যেরূপ আভা, দীপ্তি, জ্যোতি ও উজ্জলতা বিহীন মুক্তা ও মতি যাহাকে কানা মুক্তা বলা হয়। ইহা মূলতঃ মুক্তাই বটে, কিন্তু উহার মুল্যমান হইল প্রতি তোলা ১০, ২০ বা ৩০ টাকা। পক্ষান্তরে যে মুক্তার আভা দীপ্তি ও জ্যোতি রহিয়াছে শ্রেণী বিভেদে উহার মূল্যমান প্রতিটি দানা ১০০, ৫০০, ১০০০, এমনকি লক্ষ্য টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। নূরওয়ালা ঈমান ও নুরহীন ঈমান উভয়ের মূল্যমানের পার্থক্য আল্লাহ তায়ালার নিকট এবং আখে-রাতের বাজারে আরও অধিক হইবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, ঐ গোনাহ সমূহের দ্বারা ঈমানের নূর ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সব গোনাহ হইতে খাঁটি তওবা করিলে ঈমানের নুর পুনঃ ফিরিয়া আসে। এই তথ্য ১০০৬ পৃষ্ঠায় আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এইরূপে উল্লেখ আছে যে— والتوبة معروضة بعد অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর গোনাহের দরুণ ঈমানের নুর বা ঈমানের পূর্ণতা ছিন্ন হওয়ার পরও তওবার সুযোগ বিদ্যমান থাকিবে।

মদ্য পানের শাস্তি

২৫৪৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদ্য পানের শাস্তি দানে খেজুর-ডালের লাঠি এবং জুতা দ্বারা প্রহার করিয়াছেন। খলিফা আবু বকর (রাঃ)ও মদ্য পানে ৮০ বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়াছেন।

২৫৪৮। হাদীছঃ— ওক্‌বা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নোয়ায়মান নামক ব্যক্তি বা তাহার পুত্রকে মদ্য পানের অপরাধীরূপে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির করা হইল। তখন হযরত (দঃ) গৃহে উপস্থিত লোকদিগকে আদেশ করিলেন, তাহাকে প্রহার করিবার। হাদীছ

বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, সেমতে লোকগণ তাহাকে প্রহার করিল—তাহাকে জুতা দ্বারা খেজুরে-ডালের লাঠি দ্বারা প্রহার করা হইল। প্রহারকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

২৫৪৯। ছাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইল—সে মদ্য পান করিয়া ছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সেমতে আমাদের কেহ তাহাকে হাত দ্বারা, কেহ জুতা দ্বারা, কেহ (দড়িরূপে পাকান মোটা) কাপড় দ্বারা প্রহার করিল। অবশেষে একজন লোক ঐ ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক" ; তখন হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা এরূপ কথা বলিও না—শয়তানকে সাহায্য করিও না।

অর্থাৎ শয়তান চায় মোসলমানকে দুনিয়া-আখেরাতে লাঞ্ছিত করিতে। তোমার বদ্‌দোয়াও তদ্রূপই যে, আল্লার তরফ হইতেও সেই ব্যবস্থাই হউক। অতএব তোমার এই বদ্‌দোয়া বস্তুতঃ শয়তানের সাহায্য করা হইল।

২৫৫০। ছাদীছ ঃ—সায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে এবং আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎকালে এবং ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের প্রথম যুগে এই নিয়ম ছিল যে, মদ্য পানকারী উপস্থিত করা হইত অতঃপর (শাস্তিদানের আদেশ মোতাবেক) আমরা তাহাকে হাত দ্বারা, জুতা দ্বারা, (দড়িরূপে পাকান মোটা) চাদর দ্বারা প্রহার করিয়া থাকিতাম। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎকালের শেষ দিকে তিনি উক্ত অপরাধের শাস্তি চল্লিশটি বেত্রাঘাত নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অতঃপর যখন লোকদের নৈতিকতার আরও অবনতি ঘটিল, তখন তিনি আশি বেত্রাঘাত আইন করিয়া দিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মদ্যপানের অপরাধে শাস্তি বিধান স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ছিল। এমনকি মদ হারাম বিঘোষিত হওয়ার পর প্রথম দিকে এই অপরাধের শাস্তি বিধানে এত দুর কঠোরতা ছিল যে, এক ব্যক্তিকে ঐ অপরাধের দরুণ তিন বার পর্য্যন্ত সাধারণ শাস্তি প্রদান করা হইবে। সেই ব্যক্তি চতুর্থ বার ঐ অপরাধ করিলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ

فَاِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর। অতঃপর যদি সে চতুর্থবার ঐ অপরাধ করে তবে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর।"

নেছায়ী শরীফেও ঐরূপ দুই খানা হাদীছ রহিয়াছে—

(১) হাদীছ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি মদ্য পান করিলে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, দ্বিতীয় বার পান করিলে দ্বিতীয় বার বেত্রদণ্ড প্রদান কর, তৃতীয় বার পান করিলে তৃতীয় বার বেত্রদণ্ড প্রদান কর, চতুর্থ বার পান করিলে তাহাকে কতল কর—প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত কর।

(২) হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নেশা পান করিলে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, দ্বিতীয় বার নেশা পান করিলে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, তৃতীয় বার পান করিলে তৃতীয় বার বেত্রদণ্ড প্রদান কর। চতুর্থ বার সম্পর্কে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ—তাহার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল।"

এই বিশেষ কঠোরতা তথা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হযরতের সময়কালেই রহিত হইয়া গিয়া ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের প্রহার করার বিধান হযরতের সময় কালেও প্রবর্ত্তিত ছিল। হযরতের আমলে বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদানও হইয়া ছিল। যাহা মোসলেম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ-কালে যখন ইসলাম দুরদুরন্ত পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং ইসলামে দীক্ষিত লোকদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ বিশেষতঃ মদ্য পানের অপরাধ-সংখ্যাও বাড়িয়া যায়। এদিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে এই অপরাধের শাস্তির মাত্রা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রবর্ত্তিত ছিল না, তাই তখন বিশেষ বিশেষ লোকদের তরফ হইতে মদ্য পানের শাস্তির মাত্রা ও পরিমাণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য খলীফাতুল-মোসলেমীনকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। সেমতে খলীফা ওমর (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের সহিত পরামর্শ করেন।

ছাহাবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে মদ্য পানের অপরাধে প্রদত্ত শাস্তির ঘটনাবলীর মধ্যে হযরতের কার্য্যক্রম হইতে নিম্ন লিখিত দুইটি বিষয় উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন—

(১) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদ্য পানের অপরাধে দুই জুতা দ্বারা চল্লিশটি প্রহার করিয়াছেন।

(২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা মদ্য পানের এক অপরাধীকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল, হযরত (দঃ) তাহাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন, সেমতে দুইটি খেজুর-ডাল দ্বারা তাহাকে চল্লিশ বার আঘাত করা হইল। (তাহাবী শরীফ)

উক্ত উভয় ঘটনায় দুই চল্লিশ যোগে আশিটি আঘাতের সুত্র পাওয়া যায়; এই শ্রেণীর বিভিন্ন সুত্র ধরিয়া ছাহাবীগণ সকলে এক মত হইলেন যে, মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। ছাহাবীগণের এইরূপ সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তকেই "اجماع صحابه—এজ্‌মায়ে ছাহাবাহ্‌" বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে কোরআন ও ছুন্নার পরই এজ্‌মার স্থান এবং ছাহাবীদের এজ্‌মা সর্ব্বোচ্চ। ছাহাবীগণের সেই এজ্‌মার ভিত্তিতেই খলীফা ওমর (রাঃ) মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাতের বিধান বলবৎ করিয়া ছিলেন। শরীয়তে অনেক মছআলাহই ছাহাবীদের এজ্‌মা দ্বারা অলঙ্ঘণীয়রূপে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, ইহাও তদ্রূপ অলঙ্ঘণীয়।

২৫৫১। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে একদা এক ব্যক্তিকে হযরতের নিকট উপস্থিত করা হইল—লোকটির নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং তাহার ডাক-নাম ছিল "হেমার" যাহার অর্থ "গাধা"। সে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পর্য্যন্ত হাসাইয়া থাকিত। এক বার মদ্য পানের অপরাধে হযরত (দঃ) তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় বার মদ্য পানের অপরাধে তাহাকে উপস্থিত করা হইল, হযরত (দঃ) তাহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন; তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, তাহার উপর আল্লার লা'নৎ, কত বার তাহাকে অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হইল!

ঐ সময় হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা কেহ তাহাকে লা'নৎ করিও না; খোদার কসম—আমার জানা মতে সে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি মহব্বৎ রাখে।

২৫৫২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, চোরের প্রতি আল্লার লা'নৎ। (প্রথমতঃ) ডিম বা দড়ি (ইত্যাদি ছোট ছোট বস্তু) চুরি করে (এবং ধীরে ধীরে বড় বড় জিনিষও চুরি করে) ফলে তাহার হাত কাটা যায়।

ব্যাখ্যা :—ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে দেখাইয়াছেন যে, যত বড় অপরাধীই হউক ব্যক্তি বিশেষকে লা'নৎ করা চাই না। হাঁ— ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নয়, বরং শুধু অপরাধীর শ্রেণী উল্লেখ করিয়া লা'নৎ করিলে তাহাতে দোষ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে কতিপয় জরুরী বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তিসমূহ শুধু শাস্তিই নহে; উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে।

(২) মোসলমান সর্ব্বাঙ্গে নিরাপদে থাকিবে। কেহ তাহার উপর কোন আঘাত করিতে পারিবে না। কিন্তু শরীয়তের শাস্তি মূলক বিধান তাহার উপর অবশ্যই প্রয়োগ করা হইবে এবং অপরের প্রাপ্য হক্ তাহার হইতে অবশ্যই আদায় করা হইবে।

(৩) হদ্দ্ তথা শরীয়তের শাস্তিমূলক বিধান অবশ্যই জারী ও প্রয়োগ করিতে হইবে এবং আল্লার বিধান লঙ্ঘনকারীকে অবশ্যই শায়েস্তা করিতে হইবে।

(৪) শরীয়তের শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগে বড়-ছোট, ইতর-ভদ্র উচ্চ-নীচ ইত্যাদি কোন প্রকার শ্রেণী-বিভেদের পার্থক্য করা চলিবে না।

(৫) শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ রহিতের জন্য শাসনকর্ত্তাদের নিকট সুপারিশ করাও অতি দোষনীয়।

এই সব বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সব হাদীছের তরজমা যথা স্থানে করা হইয়াছে।

চোরের শাস্তি

চোরের হাত কাটা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"কোন পুরুষ বা নারী চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া ফেল, ইহা তাহার কৃত কর্ম্মের শাস্তি (অর্থাৎ এই শাস্তি অপহৃত মালের বিনিময়ে নহে, বরং অপহরণ কর্ম্মের শাস্তি) এবং ইহা আদর্শ শাস্তি যাহা এই অপরাধ দমনের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নির্দ্ধারিত। আল্লাহ সর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী হেকমতওয়ালা।" (১০ রুকু—ছুরা মায়েদাহ)

২৫৫৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সিকি-দীনার বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ মাল চুরি করিলেও তাহাতে হাত কাটা হইবে।

২৫৫৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে একটি ঢালের মূল্যমানের বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা হইত (উহার কমে নহে)।

২৫৫৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কাটিয়া ছিলেন। ঢালটির মূল্য ছিল তিন দেরহাম।

ব্যাখ্যা ঃ—কম পক্ষে কি পরিমাণ মূল্য-মানের বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা হইবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ দশ দেরহাম (দুই তোলা রৌপ্য-মূল্য অপেক্ষা একটু বেশী) এবং সর্ব্ব নিম্ন তিন দেরহাম (তিন চতুর্থাংশ তোলা রৌপ্য-মূল্য অপেক্ষা একটু বেশী) উভয় মূল্যমান সম্পর্কেই হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। ইসলামে প্রথম ও পরবর্ত্তী যুগের ব্যবধানে স্বয়ং শরীয়ত নির্দ্ধারণকারী রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া ছিল। কিন্তু কোনটি আগে ও কোনটি পরে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তাই এস্থলে ইমামগণের মতভেদ হইয়াছে। হানফী মজহাব মতে সর্ব্ব নিম্ন মূল্যমান হইল দশ দেরহাম।

মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বরং স্বাভাবিক জীবন-যাপন বিনষ্টকারী চুরি কার্য্যের ন্যায় বর্ব্বরোচিত জুলুম অন্যায় ও অপরাধ দমনে শরীয়ত হাত কাটার ন্যায় কঠোর শাস্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। শাস্তি যেহেতু কঠিন তাই উহা প্রয়োগ করিতে দলীল প্রমাণও সর্ব্ব দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ মুক্ত হইতে হইবে। সেমতে শরীয়ত-বিশেষজ্ঞগণ বিধান রাখিয়াছেন যে, الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات অর্থাৎ "হদ্দ" তথা শরীয়ত নির্দ্ধারিত অলঙ্ঘণীয় শাস্তি এবং "কেছাছ" তথা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ড বা অঙ্গহানীর বিনিময়ে অঙ্গহানী—এই শ্রেণীর শাস্তিসমূহ ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যে সব ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ দেখা যায়।"

দশ দেরহাম মূল্যমানের বস্তু চুরির দরুণ হাত কাটা সম্পর্কে কোন হাদীছ দৃষ্টেই সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, তিন দেরহাম সম্পর্কীয় হাদীছ মোতাবেকও দশ দেরহাম স্থলে হাত কাটা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে, কিন্তু তিন দেরহাম মূল্য-মানের বস্তু চুরির দরুণ হাত কাটার ব্যাপারে দশ দেরহাম সম্পর্কীয় হাদীছ দৃষ্টে

সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ যদি ইহা শরীয়তের সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে তবে তিন দেরহাম স্থলে হাত কাটা যাইতে পারে না, সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মছআলাহ এরূপ বলিয়াছেন যে, দশ দেরহাম মূল্য-মানের বস্তু চুরি স্থলে হদ্দ্ তথা শরীয়ত নির্দ্ধারিত হাত কাটার শাস্তি প্রদান করা হইবে, আর তদপেক্ষা কম মূল্যমানের বস্তু চুরি স্থলে অন্য কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক শাস্তি প্রদান করা হইবে।

● চোরের জন্য হাত কর্ত্তন ইহজগতের শাস্তি ; পরকালের আজাব হইতে মুক্তি ও নাজাৎ পাইতে হইলে তওবা করিতে হইবে।

ডাকাতি, লুণ্ঠন ও ছিনতাই-এর শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا........وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

"যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের (দেওয়া মানবীয় জান-মালের নিরাপত্তার বিধানের) বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত হয় এবং ডাকাতি ও রাহাজানি করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ফছাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহাদের সমোচিত শাস্তি ইহাই যে, তাহাদিগকে কতল করা হইবে (যদি তাহারা মাল লুণ্ঠনের সুযোগ না পাইয়া মানুষ খুন করিয়া থাকে।) বা শূলদণ্ড দেওয়া হইবে (যদি খুন ও লুণ্ঠন উভয়ই করিয়া থাকে।) বা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কাটিয়া দেওয়া হইবে (যদি খুন না করিয়া শুধু লুণ্ঠন করিয়া থাকে।) বা দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে (যদি খুন বা লূণ্ঠন কোন কিছু করার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া যায়।) এই শাস্তি তাহাদের জন্য শুধু দুনিয়ার লাঞ্ছনা, এতদ্ভিন্ন তাহাদের জন্য আখেরাতের ভীষণ আজাবও রহিয়াছে। (ছুরা মায়েদাহ্, ৯ রুকু)

● ডাকাতের শাস্তি যাহা উল্লেখ হইয়াছে উহার সহিত শাসনতান্ত্রিক উপ-কারিতার উদ্দেশ্যে অন্যান্য কঠোরতাও অবলম্বন করা যায়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ অপরাধী একটি বিশেষ দলকে ডাকাতির শাস্তি দান কালে তাহাদের অপরাধের বিভিন্ন দিক দৃষ্টে নানারকম কঠোরতা প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের ১৫০৬ নং হাদীছের ঘটনা দ্রষ্টব্য।

জেনা ও ব্যাভিচার মহাপাপ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"ব্যাভিচারের কাছেও যাইও না ; উহা বড়ই নির্লজ্জ কাজ এবং অতি জঘন্য পন্থা।"

বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করিলে তাহার শাস্তি "রজম"— প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা

২৫৫৬। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) একজন নারীকে জুমার দিন জেনার অপরাধে "রজম" তথা প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দান করতঃ ঘোষণা করিয়া ছিলেন—আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরিকা ও আদর্শ অনুযায়ী এই নারীকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দিলাম।

২৫৫৭। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীকারোক্তি করিল, সে জেনা করিয়াছে এবং এই স্বীকারোক্তি সে চার বার করিল। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে রজম করার আদেশ করিলেন। সেমতে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা হইল। লোকটি বিবাহিত ছিল। (১০০৭ পৃঃ)

২৫৫৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল, হযরত (দঃ) তখন মসজিদে ছিলেন। ঐ ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিল, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি জেনা করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) তাহার দিক হইতে চেহারা ফিরাইয়া নিলেন। ঐ ব্যক্তি পুনঃ হযরতের বরাবর দিকে আসিয়া বলিল, আমি জেনা করিয়া ফেলিয়াছি। এইবারও হযরত (দঃ) ঐরূপই করিলেন, এমনকি ঐ ব্যক্তি হযরতেব সম্মুখে চার বার স্বীকারোক্তি করিল।

তাহার স্বীকারোক্তি যখন চার বার পুর্ণ হইয়া গেল, তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলামী ও উম্মাদনার কোন রোগ তোমার মধ্যে আছে কি ? সে বলিল, না। তুমি কি বিবাহিত ? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত নবী (দঃ) উপস্থিত লোকজনকে আদেশ করিলেন, তাহাকে নিয়া যাও এবং "রজম" কর।

ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে রজম করার মধ্যে আমিও শামিল ছিলাম। আমরা তাহাকে ঈদগাহের ময়দানে রজম করিয়া ছিলাম। যখন তাহার উপর প্রস্তরের আঘাত আরম্ভ হইল তখন সে দৌড়িতে লাগিল, আমরাও দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তরময় ময়দানে তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিলাম এবং প্রস্তরের আঘাতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

হযরত নবী (দঃ) তাহার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিলেন এবং তাহার জানাযাও তিনি পড়িলেন। (১০০৮পৃঃ)

২৫৫৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মায়েজ ইবনে মালেক (রাঃ) যখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (জেনার স্বীকারোক্তি নিয়া) উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) (তাহার স্বীকারোক্তির যথার্থতা যাঁচাইয়ের উদ্দেশ্যে) তাহাকে বলিলেন, তুমি হয়ত শুধু চুম্বন করিয়াছ বা আলিঙ্গন করিয়াছ কিম্বা কাম ভাবের সহিত দৃষ্টি করিয়াছ? মায়েজ (রাঃ) ঐ শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়েই না ইয়া রসুলাল্লাহ! বলিয়া উক্তি করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে স্পষ্ট শব্দে জেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়েজ (রাঃ) তাহা স্বীকার করিল। এইরূপ সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (দঃ) তাহাকে রজম করার আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত তিনটি হাদীছে বর্ণিত ঘটনা একটিই এবং এক ব্যক্তিরই—তাহারই নাম মায়েজ (রাঃ)। তিনি একজন ছাহাবী ছিলেন, তিনি হাজ্জাল নামক ছাহাবীর গৃহে আশ্রিত ছিলেন। উক্ত গৃহ-স্বামীর এক দাসীর উপর পাশবিক কার্য্যে একদা মায়েজ (রাঃ) লিপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

পাঠক পাঠিকা! জেনা একটি জঘন্য গোনাহ ও মহা পাপ, তাহা ছাহাবী মায়েজ (রাঃ) দ্বারা সংঘটিত হইয়া ছিল। তদ্রূপ অপর একজন গামেদ গোত্রীয় নারী ছাহাবীর দ্বারাও এই পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। তাঁহাদের দ্বারা এই পাপ কার্য্য হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তে যাহা করিয়া ছিলেন, উহার নজির ইতিহাসে বিরল এবং তাঁহাদের সেই প্রায়শ্চিত্ত এক মহান আদর্শরূপে হাদীছের কেতাব সমূহে কেয়ামত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। এতদ্ভিন্ন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহবৎ বা সাহচর্য্য যে, মানব-অন্তরে খোদাভক্তি ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি করার কিরূপ মহাশক্তিশালী পরশপাথর ছিল তাহারও নমুনা উক্ত ছাহাবীদ্বয়ের প্রায়শ্চিত্তের ঘটণায় প্রকাশ পায়। ঘটনার বিবরণ ইমাম মালেকের মোয়াত্তা কেতাব এবং ছেহাহ্ ছেত্তার হাদীছ সমূহে এইরূপ বর্ণিত আছে—

মায়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা ঃ

মায়েজ (রাঃ) জেনা করিয়া ছিলেন, উহার কোন সাক্ষী ছিল না, কিন্তু এই পাপের ভয় তাঁহার অন্তরে এক অসহনীয় অগ্নিরূপ ধারণ করিল। তিনি আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই হতভাগা জেনা করিয়াছে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ব্যতিত অন্য কাহারও নিকট তুমি ইহা প্রকাশ করিয়াছ কি? মায়েজ (রাঃ) বলিলেন, না। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন তবে তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা কর এবং আল্লাহ তায়ালা ইহা গোপন থাকার যে সুযোগ তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহা গোপনই রাখ; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বন্দার তওবা কবুল করিয়া থাকেন।

এই কথায় মায়েজের অন্তরে শান্তি আসিল না; তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলেন। তিনিও তাঁহাকে ঐরূপই বলিলেন, যেরূপ আবু বকর (রাঃ) বলিয়া ছিলেন; এইবারও মায়েজের অন্তরে শান্তি আসিল না। অবশেষে তিনি পাগলপারা হইয়া তাঁহার গৃহ-স্বামীর পরামর্শে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই হতভাগা জেনা করিয়াছে; يا رسول الله طهرني হে আল্লার রসুল আমাকে পাক পবিত্র করুন। يا رسول الله اني زنيت فاقم علي كتاب الله ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি জেনা করিয়াছি; আমার উপর আল্লার কোরআনের হুকুম জারি করুন। يا رسول الله اني قد ظلمت نفسي وزنيت واني اريد ان تطهرني "ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি—আমি জেনা করিয়াছি। আমার আকাঙ্খা আপনি আমাকে পাক-পবিত্র করিবেন। এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামের হাতে হাত রাখিয়া বলিলেন, اقتلني بالحجارة —পাথর মারিয়া আমাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলুন।

হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه "ধিক্ তোমার প্রতি—চলিয়া যাও এবং আল্লার নিকট তওবা-এস্তেগফার কর। এই বলিয়া হযরত (দঃ) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তারপর পুনরায় হযরতের নিকট আসিয়া ঐরূপই বলিলেন। এইবারও হযরত (দঃ) তাঁহাকে ঐরূপে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু মায়েজ (রাঃ) তৃতীয় বার আবার হযরতের দরবারে আসিয়া ঐরূপ বলিলেন। এই বারও হযরত (দঃ) তাহাকে হাঁকাইয়া দিলেন। এমনকি কেহ তাঁহাকে এই বার সতর্কও করিয়া দিল যে, তুমি চতুর্থ বার স্বীকারোক্তি করিলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করিবেন। কিন্তু কোন ভয়-ভীতিই মায়েজ (রাঃ)কে নিবৃত্ত ও ক্ষান্ত করিতে পারিল না, তিনি চতুর্থ দিন আবার হযরতের দরবারে আসিয়া ঐরূপই বলিলেন।

এইবার হযরত (দঃ) তাহার দিকে লক্ষ্য দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, فيما اطهرك—কি ব্যাপারে তোমাকে পাক করিব? মায়েজ (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, من الزنا "জেনার পাপ হইতে আমাকে পাক করিবেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে এই কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উন্মাদ ? তিনি বলিলেন, না। হযরত (দঃ) যাঁচাই করিলেন, তিনি কোন নেশা পান করিয়াছেন কিনা, এমনকি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ শোঁখিয়া দেখিল, তাহাতে কোন নেশা-বস্তুর দুর্গন্ধ পাওয়া গেল না। হযরত (দঃ) তাঁহার বাড়ীর লোকদের নিকট যাঁচাই করিলেন তিনি উন্মাদ কি না। সকলেই স্বাক্ষ দিল সে সম্পূর্ণ সুস্থ। হযরত (দঃ) ইহাও জ্ঞাত হইলেন যে, তিনি বিবাহিত। অতঃপর হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি "রজম" তথা প্রকাশ্যে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করার আদেশ প্রদান করিলেন।

সেমতে তাঁহাকে ঈদগাহের খোলা ময়দানে নিয়া যাওয়া হইল এবং তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করা হইল। সর্ব্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তর বর্ষিতে লাগিল। প্রস্তর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে ওমর (রাঃ), জাবের (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তরের আঘাতে মায়েজ (রাঃ) স্বাভাবিকরূপে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার কোন উক্তি মুখে উচ্চারণ করেন নাই। অথচ তিনি তাঁহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিলে শরীয়তের বিধান মতে তাঁহার প্রাণ-বধ কার্য্য স্থগিত হওয়া স্থিরকৃত ছিল এবং প্রস্তর বর্ষণে বিরত থাকিতে সকলেই বাধ্য হইত। মায়েজ (রাঃ) স্বীয় জানের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জেনার পাপ হইতে পবিত্রতা লাভ করা। সেই লক্ষ্য অর্জ্জনে তিনি তাঁহার প্রাণ বিসর্জনে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। ছুটাছুটির মধ্যেই একটি পাথর তাঁহার কর্ণমুলে আঘাত করিলে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের গোড়ায় ডান কাতে স্বীয় বাহুর উপর শুইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তর বর্ষিতে ছিল। হঠাৎ একটি উটের মাথার বিরাটকায় হাড় তাঁহাকে ভীষণভাবে আঘাত করিল, তাহাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। "রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আরজাহু—হে আল্লাহ! তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

মায়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আত্মবিসর্জ্জনের পর তাঁহার সম্পর্কে লোকদের মুখে উভয় রকম মন্তব্যই আলোচিত হইল। এক দল বলিল, মহা পাপে পাপী হইয়া মারা গিয়াছে, অপর দল বলিল, মায়েজের তওবা অপেক্ষা উত্তম

তওবা আর হইতে পারে না। ঘটনার তিন দিন পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

استغفروا لماعز بن مالك . لقد تاب توبة لو قسمت على امة لوسعتهم

"তোমরা সকলে মায়েজের জন্য ক্ষমার দোয়া কর; সে এমন তওবা করিয়াছে যে, তাহার তওবা সমাজের সকল লোকদের উপর বন্টণ করিয়া দিলে সকলের গোনাহ মাফের জন্য উহা যথেষ্ট হইবে।" হযরতের আদেশ মতে ছাহাবীগণ সমবেতভাবে তাঁহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন।

হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন—قد غفرله وادخل الجنة "তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" فقد رأيته ينخضخض فى انهار الجنة "আমি তাহাকে বেহেশতের নহর সমূহে আনন্দে অবগাহণ করিতে দেখিয়াছি" لا تشتمه . لهو عند الله اطيب من ريح المسك "তাহাকে মন্দ বলিও না; সে আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশ্‌ক বা কস্তুরীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" لقد رأيته بين انهار الجنة ينغمس "আমি তাহাকে বেহেশতের নহরে আনন্দে ডুবাইতে দেখিয়াছি।"

গামেদ গোত্রীয় নারীর ঘটনা ঃ

নবম হিজরী সনের ঘটনা—এই নারীটিও মায়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পাগলপারা হইয়া উপস্থিত হইল এবং يا رسول الله انى قد زنيت فطهرنى ইয়া রসুলাল্লাহ; আমি জেনা করিয়াছি; আপনি আমাকে পাক পবিত্র করুন।" হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, চলিয়া যাও এবং আল্লার নিকট তওবা-এস্তেগফার কর। তদুত্তরে মহিলাটি বলিল, মনে হয় আপনি আমাকে এড়াইতে চান যেরূপ মায়েজকেও প্রথমে এড়াইতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু আমার ব্যাপার অতি জটিল; জেনার দ্বারা আমি গর্ভবতী হইয়াছি। তাহাকেও হযরত (দঃ) তিন বার ফিরাইয়া দেওয়ার পর যখন সে চতুর্থ বারও স্বীকারোক্তি করিল, তখন হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গর্ভ অবস্থায় তোমার কিছু করা যাইবে না। তুমি চলিয়া যাও এবং ক্ষান্ত থাক যাবৎ না সন্তান প্রসব কর। দীর্ঘ দিন পর তাঁহার একটি ছেলে সন্তান প্রসব হইল। তিনি সন্তানটিকে নেকড়ায় জড়াইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন—আমি সন্তান প্রসব করিয়া সারিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখনও তুমি চলিয়া যাও এবং সন্তানকে দুগ্ধ পান করাও। দুগ্ধ পানের সময় কাল অতিক্রম হইলে পর শিশুর হাতে এক টুক্‌রা রুটি খাইতে

দিয়া তাহাকে নিয়া মহিলাটি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন! দুগ্ধ পান করাইয়া সারিয়াছি—শিশুটি এখন খাদ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন চলিয়া যাও এবং শিশুটিকে কাহারও আশ্রয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। অতঃপর শিশুটিকে একজন মোসলমানের লালন-পালনে প্রদান করা হইল।

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও মহিলাটি তাঁহার স্বীকারোক্তির পুনঃ বিবেচনা করার প্রতি মোটেই কোন লক্ষ্য করিলেন না। অথচ তিনি যদি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবারও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতেন, তবে তাহার উপর রজম তথা প্রাণে বধ করার আদেশ বলবৎ হইত না। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বীকৃতির উপর অটল রহিলেন। সেমতে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি রজম তথা প্রকাশ্যে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করার আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার জন্য বুক পর্য্যন্ত একটি গর্ত্ত করা হইল এবং তাঁহার শরীর কাপড়ে আবৃত করিয়া কাপড় গাঁথিয়া ঐ গর্ত্তে তাঁহার বুক পর্য্যন্ত পুতিয়া দেওয়া হইল। তখনও সময় ছিল যে, তিনি তাঁহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও তিনি তাহা করেন নাই। অবশেষে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণের নির্দ্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকজন তাহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিল, তিনি নির্ব্বাকে প্রস্তর আঘাতে মৃত্যু বরণ করিলেন।

তাহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণকালে ছাহাবী খালেদ (রাঃ) তাঁহার মাথায় একটি পাথর মারিলে রক্তের ছিঁটা খালেদের গায়ে পড়িল এবং খালেদ (রাঃ) তাঁহাকে মন্দ বলিয়া উঠিলেন। হযরত (দঃ) খালেদের মন্দ বলা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, মুখ সংযত রাখ! যাঁহার হাতে আমার জান তাঁহার কসম—মহিলাটি এমন তওবা করিয়াছে যে, যে কোন মহাপাপী ঐরূপ তওবা করিলে তাহার মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে।

মহিলাটির লাশ নিয়া আসা হইল এবং হযরত (দঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লার নবী! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়িলেন, অথচ সে জেনা করিয়া ছিল? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন—

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم
وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى

"মহিলাটি যে তওবা করিয়াছে উহা যদি মদীনাবাসীদের উপর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের পাপীর সংখ্যা সত্তর হইলেও সকলের পাপ মোচনে উহা যথেষ্ট হইবে। এরচেয়ে অধিক তওবা আর কি হইতে পারে যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছে।"

পাঠক পাঠিকা! উল্লেখিত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। অনেক সময়ই মানুষ ভাবাবেগে প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু বিপদের সম্মুখে বা দীর্ঘ ব্যবধানে সেই ভাবাবেগ মুছিয়া যায়। মায়েজ (রাঃ) খোলা মাটে প্রস্তর-বাণে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। পাপের ভয়ে তাঁহার অন্তরে অনুতাপের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ছিল সেই অগ্নি শিখা হাজার হাজার প্রস্তর বর্ষণেও মোটেই নির্ব্বাপিত হয় নাই, তাই স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিবেচনা তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই।

গামেদ গোত্রীয় মহিলাটির ঘটনা ত আরও আশ্চার্য্যজনক; তাঁহার জেনার ঘটনা ও উহার স্বীকৃতির পর দীর্ঘ প্রায় চার বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহার অনুতাপের অগ্নি প্রশমিত হয় নাই। এমনকি অবশেষে তাঁহার শরীরে কাপড় গাঁথিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার জন্য গর্ত্ত করা হইল, সেই গর্ত্তে তাঁহার বুক পর্য্যন্ত পোতা হইল—এই সব দৃশ্যও তাঁহার মনকে তাঁহার দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা ও লক্ষ্যবস্তু হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তাই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে দিকে তিনি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

খোদার ভয়, পাপের ভয়, পাপের দরুণ অনুতাপ-অনুশোচনা এবং পাপ করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা খোদাকে রাজি করার দৃঢ় পণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উক্ত ঘটনাদ্বয় অপেক্ষা উত্তম উদাহরণ আর কি হইতে পারে? ছাহাবীগণ যে সত্যের মাপকাঠি—সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহারা আদর্শ ও সত্যের দিশারী উল্লেখিত ঘটনাদ্বয় তাহারই দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের হইতে আদর্শ গ্রহণে শুধু তাঁহাদের পাপ দেখিলে চলিবে না। বরং পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন—এই ক্ষেত্রে উহারই আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই সব পাপের ক্ষেত্রেও তাঁহারা নিশ্চয় সত্যের মাপকাঠি এবং অতি উত্তম আদর্শ।

মছআলাহ ঃ—জেনা সাক্ষী সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষীর সাধারণ সংখ্যার নিয়মের ব্যতিক্রমে চার জন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আবশ্যক। তদ্রূপ স্বীকৃতি সূত্রে জেনা সাব্যস্তের জন্যও স্বীকারকারী চার বৈঠকে চার বার স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি করিবে—তবেই তাহা "হদ্দ্" তথা নির্দ্ধারিত শাস্তির জন্য গ্রহণীও হইবে।

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তা বিচারক, জেনার স্বীকৃতি তিন বার (পর্য্যন্ত এড়াইবার চেষ্টা করিবে। এমনকি স্বীকারকারীকে "তাল্‌কীন" তথা তাহার স্বীকৃতিকে অন্য দিকে অন্য অর্থে নিবার জন্য প্ররোচিত করিবে।

মছআলাহ ঃ—চার বার স্বীকার করার পর শাস্তি আরম্ভের পূর্ব্বে বা শাস্তি ভোগের মধ্যে যদি একবারও স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা বলে, তবে হদ্দ্ তথা

নির্দ্ধারিত শাস্তি মওকুফ হইয়া যাইবে। এমনকি যদি মুখে প্রত্যাহার না করিয়া শাস্তি হইতে পলায়ন করিতে চায় এবং সেই পলায়ন শুধু শাস্তির আঘাত জনিত স্বাভাবিক ছুটাছুটি না হয় বরং স্বীকৃতি এড়াইবার পলায়ন হয়, তবে তাহাকে পলায়ন করার সুযোগ নিশ্চয় দিতে হইবে। অবশ্য সাক্ষী সূত্রে প্রমাণিত জেনার শাস্তি হইতে কোন প্রকার পলায়নের সুযোগই দেওয়া হইবে না।

মছআলাহ :—হদ্দ্ প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে সর্ব্ব সমক্ষে জারি করিতে হইবে। পুরুষকে রজম করার ক্ষেত্রে তাহাকে আবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা করিবে না। মহিলাকে রজম করার বেলায় তাহার গায়ে কাপড় জড়াইয়া গাঁথিয়া দিবে যেন বেপর্দ্দা না হইয়া পড়ে, এমনকি বুক পর্য্যন্ত মাটি গর্ত্তে পুতিয়া নেওয়া উত্তম।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে আরও দুইটি ঘটনায় রজম হইয়াছিল। একটি ঘটনার হাদীছ এস্থানেও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার তরজমা দ্বিতীয় খণ্ডে ১১২৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

• এক ব্যক্তির পুত্র কাহারও গৃহভৃত্য ছিল, সে গৃহস্বামীর স্ত্রীর সহিত জেনা করে। গ্রামের লোকজন তাহার উপর এক প্রকার কাফ্ফারা ধার্য্য করিয়া ঘটনার মীমাংসা করিয়া দেয়। অবশেষে সেই ঘটনা হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলে, হযরত (দঃ) সেই কাফ্ফারার মীমাংসা নাকচ করিয়া কাফ্ফারার বস্তু ভৃত্যের পিতাকে ফেরৎ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, আমি আল্লার কোরআন মোতাবেক এই ঘটনার ফয়ছালা করিব। অতঃপর হযরত (দঃ) ভৃত্যকে একশত বেত্র দণ্ড এবং এক বৎসর নির্ব্বাসনের শাস্তি প্রদান করেন, যেহেতু সে অবিবাহিত ছিল। আর গৃহস্বামীর স্ত্রীর নিকট তদন্তের জন্য লোক পাঠান হইলে, সে জেনার ঘটনা স্বীকার করিয়া নেয়। তাহার স্বীকৃতির উপর হযরত নবী (দঃ) তাহাকে রজম করার আদেশ প্রদান করেন। সেমতে তাহাকে রজম করা হয়।

আর একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—

২৫৬০। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে এক দল ইহুদী তাহাদের একটি পুরুষ ও একটি নারীকে নিয়া উপস্থিত হইল; উক্ত পুরুষ ও নারীটি জেনা করিয়াছে। নবী (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জেনাকারীদের প্রতি কিরূপ করিয়া থাক? তাহারা বলিল, আমাদের আলেমগণ মুখে কালি মাখাইয়া উভয়কে বিপরীত মুখীরূপে গাধার পিটে ছওয়ার করিয়া ঘুরাইবার শাস্তি আবিস্কার করিয়াছেন, সেমতে আমরা তাহাদের মুখে কালি মাখিয়া দেই এবং মারপিট করি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেতাব তৌরাতে রজমের বিধান পাও নাই কি? তাহারা বলিল, ঐরূপ কোন বিধান তৌরাতে আমরা পাই নাই।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) (যিনি পূর্ব্বে বিশিষ্ট ইহুদী আলেম ছিলেন, তিনি) বলিলেন, তোমরা মিথ্যাবাদী; তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তৌরাত নিয়া আস এবং উহা পড়িয়া দেখ। ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাদিগকে তৌরাত নিয়া আসিতে বলুন। সেমতে তৌরাত উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তাহাদের একজন শিক্ষক তৌরাত শিক্ষা দিয়া থাকিত সে রজমের আদেশ সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াতখানাকে হাতের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া শুধু উহার উপর-নীচের বিষয়গুলি পাঠ করিতে লাগিল—রজমের আয়াত পাঠ করিল না।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ঐ পাঠককে বলিলেন, তোমার হাত উঠাও—এই বলিয়া তিনি তাহার হাত টানিয়া নিলেন এবং তাহার হাতের নীচে যে, রজমের আদেশ আয়াত ছিল তাহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তখন তাহারা স্বীক'র করিল, হাঁ—ইহা রজমের আদেশ সম্বলিত আয়াত। সেমতে হযরত (দঃ) সেই জেনাকার পুরুষ ও নারীকে রজম করার আদেশ প্রদান করিলেন। মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্থানেই তাহাদের উভয়কে একত্রে রজম করা হইল। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, রজম করার সময় আমি দেখিয়াছি, পুরুষটি নারীটিকে স্বীয় দেহ দ্বারা ঢাকিয়া প্রস্তরাঘাত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতে ছিল। (১০০৭ পৃঃ)

২৫৬১। ছাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই বংশ ও ঔরস্য সাব্যস্ত হইতে পারে; ব্যভিচারের দ্বারা তাহা হইবে না। ব্যভিচারীর ভাগ্যে ত প্রস্তরাঘাত রহিয়াছে।

২৫৬২। ছাদীছ ঃ— ছোলায়মান শায়বানী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি রজম জারী করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত কর্ত্তৃক রজম জারী করা ছুরা-নূর নাযেল হওয়ার পূর্ব্বে না পরে? সে সম্পর্কে তিনি বলিলেন, এই বিষয়টি আমি তলাইয়া দেখি নাই। (১০০৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ— এস্থলে ছুরা-নূর সম্পর্কীয় প্রশ্নটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেননা ছুরা-নূরের মধ্যে জেনার শাস্তি একশত বেত্রদণ্ড উল্লেখ রহিয়াছে। তাই প্রশ্নকারী জানিতে চাহিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক রজম জারী করা ছুরা-নূর নাজেল হওয়ার পরে কি না। নতুবা বলা যাইতে পারে যে, রজমের আদেশ ছুরা নূরের আয়াত দ্বারা মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) উক্ত বিষয়টির প্রতি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করেন নাই। তাই তিনি সরলতার সহিত বলিয়া দিয়াছেন, আমি উহা

তলাইয়া দেখি নাই। নতুবা প্রশ্নটির উত্তর অতি সুস্পষ্ট যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক রজম জারী করা ছুরা-নূর নাযেল হওয়ার পরেই ছিল—তাহাতে দ্বিধা বোধের কোন অবকাশই নাই। কারণ ইহা অবধারিত যে ছুরা-নূর ষষ্ঠ হিজরী সন বা তাহারও পূর্ব্বে নাযেল হইয়া ছিল; এদিকে ২৫৫৮নং হাদীছ দৃষ্টে দেখা যায়, মায়েজের ঘটনা আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে ঘটিয়া ছিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) সপ্তম হিজরী সনে মদীনায় আসিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন গামেদ গোত্রিয় নারীর প্রতি হযরত (দঃ) রজমের আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন যাহা নবম হিজরীর ঘটনা।
(আওয়াজুল-মছালেক ৬—১৩)

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত কালেও একজন মহিলা জেনার স্বীকারোক্তি করিয়া ছিল। সে তাহার স্বীকৃতির উপর অটল থাকিলে, খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে রজম করার আদেশ দিয়া ছিলেন এবং রজম করা হইয়াছিল।

ছুরা-নূরে একশত বেত্রদণ্ডের আয়াত যখন নাযেল হইয়া ছিল, তখনও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার ঘোষণা দানের সময় এক শত বেত্রদণ্ড অবিবাহিতের জন্য এবং বিবাহিতের জন্য রজম উভয়ের ঘোষণা প্রদান করিয়া ছিলেন। যাহার বিবরণ এই যে, ছুরা-নূরে জেনার হদ্দ্ তথা নির্দ্ধারিত শাস্তির বিধান নাযেল হওয়ার পূর্ব্বে ছুরা-নেছার মধ্যে মোসলমানদের স্ত্রীগণের বিভিন্নমুখী মছআলাহ বর্ণনার মধ্যে কাহারও স্ত্রী জেনা করিলে কি করিতে হইবে সে সম্পর্কে একটি আয়াত নাযেল হয়—

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ

اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে, তাহাদের ব্যাভিচার চার জন পুরুষ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত কর। সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করিলে পর ঐ নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ করিয়া দাও—তাহারা অন্তরীণাবস্থায়ই কাল কাটাইবে যাবৎ না তাহাদের মৃত্যু আসিয়া যায় বা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য অন্য কোন বিধান করিয়া দেন।”

মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযেল হইত, তখন তাঁহার উপর শ্রান্তি

ভাব পরিলক্ষিত হইত এবং চেহারা মোবারক ক্লান্তরূপ ধারণ করিত। একদা তাঁহার উপর ওহী নাযেল হইল এবং ঐ অবস্থার আবির্ভাব হইল। অতঃপর যখন ঐ অবস্থা দুরীভুত হইয়া গেল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন—

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ

مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"আমার নিকট হইতে শিখিয়া নেও, আমার নিকট হইতে শিখিয়া নেও—আল্লাহ তায়ালা ব্যাভিচারিনী নারীদের জন্য বিধান করিয়া দিয়াছেন। অবিবাহিত লোকের জন্য একশত বেত্রদণ্ড এবং এক বৎসরের নির্ব্বাসন, আর বিবাহিত লোকের জন্য একশত বেত্রদণ্ড এবং রজম।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত ঘোষণাকে ছুরা-নূরের আয়াত নাযেল হওয়া উপলক্ষেই সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(তফছীর ইবনে কাছীর ১—৪৬২)

সুতরাং ছুরা-নূরের মধ্যে যদিও শুধু বেত্রদণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হওয়াও অতি সুস্পষ্ট। এই সূত্রেই সমস্ত ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মোসলমানের এজমা ও এক মতের সিদ্ধান্ত এইযে, ছুরা-নূরে উল্লেখিত একশত বেত্রদণ্ড শুধু কেবল অবিবাহিতের জন্য, আর বিবাহিতের জন্য রজম।

এতদ্ভিন্ন খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে সর্ব্ব সমক্ষে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত উক্তি করিয়াছিলেন যে, ছুরা-নূরের বর্ত্তমান বেত্রদণ্ড বিধানের আয়াতের সঙ্গে রজম-বিধানের আয়াতও ছিল যাহা আমরা তেলাওয়াত করিয়া থাকিতাম। পরবর্ত্তীকালে হযরতের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক উহার তেলাওয়াত বা পঠন রহিত হইয়াছে। কিন্তু উহার হুকুম বলবৎ রহিয়াছে বিধায় রসুলের মাধ্যমে তাহা জারী রাখা হইয়াছে। নিম্ন বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে এই তথ্যটিই বয়ান করা হইয়াছে।

২৫৬৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফাতুল মোসলেমীন ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ভয় হয় জমানা বা কালের বিবর্ত্তনে এমন লোকের আবির্ভাব হইবে, যাহারা বলিবে—কোরআন শরীফে রজমের বিধান আমরা পাই না। ফলে তাহারা আল্লাহ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত একটি ফরজ বিধান যাহা আল্লাহ তায়ালা (কোরআন শরীফে) নাযেল করিয়া ছিলেন, তাহা তরক করিয়া গোমরাহ হইয়া যাইবে।

খবরদার—হুশিয়ার ! তোমরা স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় রজমের বিধান ইসলামের মধ্যে একটি সত্য বাস্তব ও স্থায়ী বিধান—ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে বিবাহিত হইয়া জেনা করে এবং তাহা সঠিক প্রমাণের দ্বারা বা গর্ভ (ইত্যাদির দরুণ স্বীকৃতির) দ্বারা প্রমাণিত হয়। (১০০৮ পৃঃ)

২৫৬৪। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফাতুল মোছলেমীন ওমর (রাঃ) তাঁহার জীবনের সর্ব্ব শেষ যে হজ্জ করিয়াছিলেন, সেই হজ্জের সময় আমিও তাঁহার সহগামীদের একজন ছিলাম। জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে আমরা মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর প্রথম জুমার দিন আমি জুমার আউয়াল ওয়াক্তেই মসজিদে উপস্থিত হইলাম। আজ ওমর (রাঃ) এমন এক ভাষণ দান করিলেন যাহা তিনি খলীফা হওয়া অবধি আর কখনও দেন নাই। (হজ্জ সমাপন কালে মিনার মধ্যে স্বয়ং ওমর (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া এইরূপ ভাষণ দানের কথা ঘোষণা করিয়া ছিলেন।)

ওমর (রাঃ) মসজিদে আসিয়া মিম্বারে উপবেশন করিলেন। মোয়াজ্জেনের আজান শেষ হইলে পর ওমর (রাঃ) দাঁড়াইলেন। এবং আল্লার ছানা-ছিফত করতঃ বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য একটি ভাষণ দিব। যাহার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান কারিয়াছেন। আমি জানি না—হইতে পারে ইহা আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত-সন্নিকটবর্ত্তী ভাষণ। যে ব্যক্তিই ইহা সঠিকরূপে উপলব্ধি ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে সে-ই যেন ইহাকে তাহার সাধ্যানুযায়ী অন্যের নিকট পৌঁছাইতে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যাহার আশঙ্কা হয় যে, সে ইহাকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই তাহার জন্য আমি অনুমতি দেই না—সে মিছামিছি কোন কথা আমার পক্ষ হইতে বয়ান করে। (এই বলিয়া ওমর (রাঃ) এক সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন—

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَّقُوْلَ قَائِلٌ وَاللّٰهِ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَالرَّجْمُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ......

"আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সত্য ও খাঁটি দ্বীনের বাহক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার উপর কোরআন নাযেল করিয়া ছিলেন। আল্লাহ যে কোরআন নাযেল করিয়া ছিলেন, উহারই মধ্যে রজমের বিধান সম্বলিত আয়াতও ছিল—আমরা উহা তেলাওয়াত করিয়াছি, উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছি, উহা কণ্ঠস্থ করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম জারী করিয়াছেন, তাঁহার পরে আমরাও রজম জারী করিয়াছি।

আমার আশঙ্কা হয় যমানার দীর্ঘ ব্যবধানে, এমন এমন লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা বলিবে, কোরআনের মধ্যে আমরা রজমের আয়াত পাই না। ফলে তাহারা আল্লার নাযেল কৃত একটি ফরজ তরক করিয়া গোমরাহ ও ভ্রষ্ট হইবে। অথচ রজম আল্লার কোরআনেরই বর্ণিত ও চলমান জিনিষ ঐ ব্যক্তির জন্য যে বিবাহিত হইয়া জেনা করে, চাই পুরুষ হউক বা নারী হউক—যখন উহা সঠিক সাক্ষে প্রমাণিত হয় বা গর্ভ ইত্যাদির দরুণ স্বীকারোক্তি করে।"

অতঃপর ওমর (রাঃ) আরও একটি বিষয়ের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন, যাহা পবিত্র কোরআনে নাযেল হইয়া ছিল এবং উহার মর্ম্ম-বিধান বলবৎ রহিয়াছে। কিন্তু ঐ আয়াতের তেলাওয়াত বা পঠন রহিত হইয়া গিয়াছে। তারপর খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কীয় বিষয়ে কতিপয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ভাষণ শেষ করিলেন। (১০০৯ পৃঃ)

জিলহজ্জ মাসের শেষ ভাগে মদীনায় আসিয়া ওমর (রাঃ) এই ভাষণ দিলেন এবং ঐ মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে রজমের বিধান সম্পর্কে যে আয়াতটির ইঙ্গিত রহিয়াছে, ইমাম মালেকের "মোয়াত্তা" কেতাবে আয়াতটি পূর্ণাঙ্গে বর্ণিত আছে। ঐ কেতাবের বিবরণ এই—

খলীফা ওমর (রাঃ) হজ্জ সমাপনান্তে মিনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আব্‌তাহ্ বা মোহাচ্ছাব ময়দানে অবস্থানরতঃ সময় উর্দ্ধমুখী শয়ন অবস্থায় উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করতঃ কাতর ও করুণ স্বঃরে বলিলেন—

اللهم كبرت سنى وضعفت قوتى وانتشرت رعيتى فاقبضنى
اليك غير مضيع ولا مفرط

"আয় আল্লাহ ! আমি বয়োবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছি ; আমার শক্তি সামর্থ ক্ষীণ হইয়াছে, আমার পরিচালনাধীন লোক সংখ্যা সুদুর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ! এমতাবস্থায় আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ব্বে তোমার নিকট উঠাইয়া নেওয়ার আরজ করিতেছি।"

সেই হজ্জ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে এক ভাষণ দান করিলেন। তিনি বলিলেন—হে সুধীগণ! শরীয়তের আদর্শগুলি এবং করজগুলি তোমাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তোমাদিগকে স্বচ্ছ পথের উপর দাঁড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদি তোমরাই পথচ্যুত হইয়া পড়—জন সাধারাণকে সেই পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া এদিক-ওদিক বিভ্রান্ত করিয়া নিয়া চল।

অতঃপর তিনি বলিলেন, খবরদার হুশিয়ার! রজমের আয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্তি হইতে তোমরা সতর্ক থাকিও। কোন ব্যক্তি যেন এরূপ না বলে যে, আমরা ত আল্লার কোরআনে জেনার দুই প্রকার শাস্তি উল্লেখ পাই না—(শুধু বেত্র-দণ্ডই উল্লেখ পাই—রজম উল্লেখ পাই না।) নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম জারী করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার পরে রজম জারি করিরাছি। আমার জানের মালিক খোদার কসম—যদি লোকদের এই অপবাদের আশঙ্কা না হইত যে, ওমর কোরআন শরীফ লেখার মধ্যে অতিরিক্ত লিখিয়াছে + তবে আমি নিশ্চয় রজমের এই আয়াত লিখিয়া দিতাম—

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ

ইমাম মালেক (রঃ) সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ অর্থ বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিতা নারী। অর্থাৎ "বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিতা নারী জেনা করিলে তাহাদিগকে অবশ্যই রজম কর।"

জেল্‌হজ্জ মাসে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত দোয়া ও ভাষণ এবং সেই জেল্‌হজ্জ মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শাহাদতের ঘটনা ঘটিয়া গেল।

+ আলোচ্য আয়াতটির তেলাওয়াত বা পঠন রহিত হইয়া যাওয়ায় উহা সাধারণ-ভাবে কোরআন শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না, উহা নামাযের মধ্যে পাঠ করা জায়েয হইবে না ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে উহা লোকদের লক্ষ্য হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে, তাই ওমর (রাঃ) ভিন্নরূপে হইলেও কোরআনের সঙ্গে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু হয়ত অজ্ঞ লোকগণ ইহাকে একটি অপবাদের ভিত্তি বানাইবে, অথচ ইহা কোন অবশ্য করণীয় কাজ নহে, তাই তিনি ঐরূপে লিপিবদ্ধ করা হইতে বিরত রহিয়া ছিলেন।

অবিবাহিত লোক জেনা করিলে তাহার শাস্তি এক শত বেত্রদণ্ড

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

„জেনাকারীণী নারী এবং জেনাকার পুরুষ তাহাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লার দ্বীনের এই বিধান প্রয়োগ করিতে তোমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি কোনরূপ মায়া-মমতা আসা চাই না যদি তোমরা আল্লার প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক। আর তাহাদের এই শাস্তি মোসলমানদের এক বিরাট জন-সমাবেশ সমক্ষে হওয়া চাই (১৮ পারা ছুরা নূর)।” পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শাস্তি অবিবাহিতদের জন্য।

২৫৬৫। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ কানে হযরতের মুখে শুনিয়াছি—তিনি অবিবাহিত জেনাকারীর প্রতি এক শত বেত্রদণ্ড এবং এক বৎসর নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

২৫৬৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অবিবাহিত জেনাকারীর জন্য নির্দ্ধারিত বেত্রদণ্ডের সঙ্গে এক বৎসর নির্ব্বাসনের ফয়সলা করিয়াছেন।

ক্রীতদাসী জেনা করিলে

২৫৬৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ক্রীতদাসী যদি জেনা করে এবং তাহা প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর অতঃপর তাহাকে আর লাঞ্ছিত করিও না। দ্বিতীয় বার আবার জেনা করিলে আবার তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, লাঞ্ছনা করিও না। তৃতীয় বার জেনা করিলে আবার তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর এবং তাহাকে মেষ লোমের রজ্জু তথা সামান্য বস্তুর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল ; (যাহাতে সে তাহার বন্ধুদের হইতে ছিন্ন হইয়া যায়।)

ব্যাখ্যা ঃ— ক্রীতদাস-দাসীর জন্য জেনার শাস্তি শুধু এক প্রকারই তথা বেত্রদণ্ড এবং তাহাও অর্দ্ধেক তথা পঞ্চাশ বেত্রাঘাত ; ইহা কোরআনেরই নির্দ্দেশ—ছুরা-নেছা পঞ্চম পারা দ্রষ্টব্য।

কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও লিপ্ত পাইয়া তাহাকে খুন করিয়া ফেলিলে

২৫৬৮। হাদীছ :—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) উক্তি করিলেন, আমি আমার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে দেখিতে পাইলে সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ তরবারীর ধারাল দিক দিয়া কোপ মারিব। তাহার এই উক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরে পৌছিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা হয় ত সায়াদের গায়রত—আত্মাভিমান জনিত ঘৃণা দেখিয়া আশ্চার্য্যন্বিত হইবা, কিন্তু আমার গায়রত (তথা খারাব নির্লজ্জ কাজের প্রতি ঘৃণা) আরও বেশী। এবং ঐরূপ কাজের প্রতি আল্লাহ তায়ালার গায়রত ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা অনেক বেশী ; তজ্জন্যই আল্লাহ তায়ালা গোপন ও প্রকাশ্য সকল প্রকার ফাহেসা—নির্লজ্জ কাজ-কর্ম্মকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, ওজর-আপত্তির অবকাশ খণ্ডন সর্ব্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকটই অধিক প্রিয় ; তজ্জন্যই আল্লাহ তায়ালা সতর্ককারী ও সুসংবাদ-দানকারী রসুলগণকে পাঠাইয়াছেন। প্রসংশাও সর্ব্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকটই অধিক প্রিয়, তাই উহার জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :— আলোচ্য হাদীছে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ; ভুমিকায় ছাহাবী সায়াদের যে উক্তি উল্লেখ হইয়াছে যে তিনি স্বীয় স্ত্রীর সহিত প্রাপ্ত লিপ্ত ব্যক্তিকে কোন প্রকার মামলা-মোকাদ্দমা ব্যতিরেকেই স্বয়ং তরবারীর আঘাতে খুন করিয়া ফেলিবেন—এই উক্তি হযরতের গোচরিভুত হইলে পর হযরত (দঃ) উহার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই, বরং সমর্থনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়, এতদুদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য মছআলার মিমাংসা দিতে বিরত রহিয়াছেন, কারণ মূল মছআলার মধ্যে বিভিন্ন ইমামগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। অধিকন্তু এ-সম্পর্কে বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়েও ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে।

অধিকাংশ ইমামগণের মোটামুটি অভিমত এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে জেনা বা উহার ঘনিষ্ট কার্য্য-কলাপে লিপ্ত দেখিতে পাইলে সে ঐ পুরুষকে খুন করিয়া ফেলিতে পারে এবং স্ত্রীকে ঐ কার্য্যে সম্মত পাইলে তাহাকেও খুন করিতে পারে—এইরূপ খুন করা জায়েয ; তজ্জন্য তাহার কোন

গোনাহ হইবে না। কিন্তু প্রশাসনিক আইনের বিচার হইতে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে। শাসন পরিচালনকারীদের নিকট ধরা পড়িলে সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা তাহাকে সাব্যস্ত করিতে হইবে যে বাস্তবিকই সে তাহাদিগকে ঐরূপ লিপ্ততার অবস্থায় খুন করিয়াছে। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার দাবী সত্য হয়, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণও পেশ করিতে না পারিলে তাহার গোনাহ হইবে না বটে, কিন্তু অপরাধি প্রমাণিত হয় নাই এরূপ ব্যাক্তিকে খুন করার আইনগত ধারা মতে উহার শাস্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অবশ্য খুন কৃত ব্যক্তি যদি এমন শ্রেণীর লোক হয় যে ফাহেসা কাজে পরিচিত বা খুনকারী ব্যক্তির দাবীর যথার্ততার আকার-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে খুনের এক নম্বর শাস্তি প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে দুই নম্বর শাস্তি দিয়্যাত তথা নির্দ্ধারিত আর্থিক প্রাণ-বিনিময় আদায়ে বাধ্য করা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, জেনা বা উহার ঘনিষ্ঠ কার্য্য কলাপে লিপ্ত রহিয়াছে—একমাত্র ঠিক ঐ অবস্থায় থাকা পর্য্যন্তই তাহাকে খুন করার অনুমতি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অপরাধী অপরাধ করিয়া সরিয়া পড়িলে অতঃপর তাহাকে খুন করা জায়েয হইবে না। তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথই গ্রহণ করিতে পারে—যাহার জন্য সাক্ষী প্রমানের প্রয়োজন রহিয়াছে, অবশ্য স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী না থাকিলেও লেয়ানের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ শাস্তি বা দণ্ডাদেশ

২৫৬৯। হাদীছ :—আবু বোরদাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন—আল্লাহ তায়ালার কোন হদ্দ্ তথা শরীয়ত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত শাস্তির কোন ধারা ব্যাতিরেকে সাধারণ ক্ষেত্রে দশ সংখ্যার অধিক বেত্রাঘাত করিবে না।

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা নির্দ্ধারিত বিধান নহে, বরং ইহা শুধু সাধারণ ক্ষেত্রসমুহে ক্রোধের উচ্ছাস সংযত রাখার ব্যবস্থারূপে বলা হইয়াছে। শরীয়ত-নির্দ্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শয়রীয়তী বিচারের বিজ্ঞ বিচারক অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে শাস্তি সমুচিত গণ্য করিবেন সেই শাস্তিই তিনি দিতে পারিবেন।

এক হাদীছে আছে—এক মোসলমান অপর মোসলমানকে "ইহুদী" বলিয়া গালি দিলে উহার বিচারে গালিদাতাকে বিশ বেত্রদণ্ড দিবে। এবং কোন ব্যক্তি তাহার মহরম আত্মীয়ার সহিত জেনা করিলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দিবে। (মেশকাত শঃ ৩১৭)

আরও এক হাদীছে আছে, এক ব্যক্তি তাহার সৎমাকে বিবাহ করিয়া ছিল। নবী (দঃ) তাহার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার এবং তাহার মুণ্ড কাটিয়া নিয়া আসিবার জন্য একজন ছাহাবীকে পতাকা হাতে দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। (ঐ ২৭৪)

● কোন ব্যক্তি শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তির অপরাধ করে বলিয়া তাহার অবস্থা দৃষ্টে ধারণা হয়। কিন্তু নিয়মিত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না; সেইরূপ ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত শাস্তিত প্রয়োগ করা যাইবে না। অবশ্য অনির্দ্ধারিত সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে।

"হদ্দে-কজফ" তথা কাহারও প্রতি জেনার তোহমত লাগাইয়াছে তদ্দরুণ শাস্তি

শাস্তির এই বিধানটিও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمٰنِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا - وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ -

"যাহারা জেনার তোহমত লাগায় সতী নারীদের প্রতি, অতঃপর চার জন সাক্ষী উপস্থিত করিতে সক্ষম না হয় তাহাদিগকে আশি ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান কর এবং কখনও আর কোন ক্ষেত্রে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না; এই লোকগণ ফাছেক পরিগণিত।" (১৮ পারা ছুরা নূর)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ....

"নিশ্চয় যাহারা সাদাসিধা ঈমানদার সতী নারীদের উপর জেনার তোহমত লাগায় তাহাদের প্রতি আল্লার অভিসাপ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। আর তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ভয়ানক আজাব যাহা ঐ দিন বলবৎ হইবে যে দিন তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের জবান, তাহাদের হাত-পা তাহাদের কৃত কর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ঐ দিন তাহাদিগকে তাহাদের ভোগণীয় প্রতিফল আল্লাহ তায়ালা পুরাপুরিরূপে প্রদান করিবেন।"

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে নারীদের উল্লেখ রহিরাছে, বস্তুতঃ কোন পুরুষের প্রতি জেনার তোহমত লাগাইলে উহার বিধানও ইহাই। কিন্তু এই

আয়াতসমূহ এবং এই বিধানটি নাযেল হওয়ার যে উপলক্ষ্য ছিল তাহা ছিল আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘটনা—যাহার বিস্তারিত বিবরণ বিবি আয়েশার আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই সূত্রেই সমুদয় বিবরণে প্রকাশ্যে নারীদের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু বিধান নারী-পুরুষ সকলের পক্ষেই সমান।

আয়াতের মধ্যে সতী নারী বলিতে ঐ শ্রেণীর নারী উদ্দেশ্য যাহার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা জেনা প্রমাণিত হয় নাই এবং জেনার সুস্পষ্ট নিদর্শন—পিতাহীন সন্তান বহনকারীণীও সে নহে। এই শ্রেণীর যে কোন নারীকে তোহমত লাগাইলে তথায় আলোচ্য বিধান কার্য্যকরী হইবে।

প্রাণে বধ করা বা অঙ্গহানী করার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا......

"যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত খুন করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম; সেই জাহান্নামে তাহাকে বহুকাল থাকিতে হইবে। আর তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিশাপ। এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।"

২৫৭০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোমেন মোসলমান ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের প্রদত্ত্ব নিরাপত্তা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়া যাইবে যাবৎ না সে কোন অন্যায় খুন করে।

২৫৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সব অপরাধে জড়িত হইলে পর রেহায়ী পাইবার কোন উপায় থাকে না অন্যায়রূপে খুন করা উহার অন্যতম একটি।

২৫৭২। হাদীছ — عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম অন্যায় খুনের বিচার করা হইবে।

২৫৭৩। হাদীছ ঃ—মেক্‌দাদ (রাঃ) যিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বদরের জেহাদে উপস্থিত ছিলেন—তিনি একদা জিজ্ঞাসা করিলেন,

ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন কাফেরের সঙ্গে আমার লড়াই বাঁধিল; আমরা উভয়ে তরবারীর লড়াই আরম্ভ করিলাম। ঐ কাফের ব্যক্তি তাহার তরবারীর আঘাতে আমার একটি বাহু কাটিয়া ফেলিল, অতঃপর সে আমার হইতে বাঁচিবার জন্য একটি বৃক্ষের আশ্রয় নিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আল্লার দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তাহার এই উক্তির পর আমি তাহাকে তরবারীর আঘাত করিতে পারি কি? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—এখন তুমি তাহাকে কতল করিতে পার না।

ছাহাবী পুনরায় বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! সে আমার একটি বাহু কাটিয়া ফেলিয়াছে; তারপর ঐ উক্তি করিয়াছে—এমতাবস্থায়ও কি আমি তাহাকে কতল করিতে পারি না? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—তাহাকে কতল করিতে পার না। যদি তুমি তাহাকে খুন কর তবে সে ঐ উক্তি করার পূর্ব্বে যেরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধী ছিল (বিদ্রোহী কাফের হওয়ার কারণে;) তদ্রূপ তুমি এখন প্রাণদণ্ডের অপরাধী হইয়া যাইবা (নাজায়েজ খুনের কারণে)।

২৫৭৪। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অন্যায় হত্যার যত ঘটনা ঘটিবে প্রত্যেক ঘটনার জন্য হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের পুত্র হাবীলের উপর গোনাহের এক বোঝা পতিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—ভাল বা মন্দ কাজের বুনিয়াদ ও ভিত্তি যাহার দ্বারা স্থাপিত হইবে যত দিন ঐ কাজের ছেল্‌ছেলা জারি থাকিবে উহার ছওয়াব বা গোনাহের এক অংশ সেই ভিত্তি স্থাপনকারীর পক্ষেও বর্ত্তিবে, ইহা স্পষ্ট হাদীছ দ্বারা প্রমাণীত। অন্যায় ভাবে হত্যা করা ইহজগতে সর্ব্বপ্রথম কাবীল দ্বারা সংঘাটিত হইয়াছিল—সে তাহার অবৈধ স্বার্থোদ্ধারের জন্য স্বীয় ভ্রাতা হাবীলকে হত্যা করিয়া ছিল যাহার ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। (৬ পারা ৮ রুকু)

সুতরাং কেয়ামত পর্য্যন্ত অন্যায় হত্যার যে ছেল্‌ছেলা জারি থাকিবে উহার প্রত্যেকটির গোনাহের এক বোঝা কাবীলের উপর বর্ত্তিবে।

২৫৭৫। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মোসলমান অপর মোসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে মোসলমান জমাতে শামিল নহে।

ইচ্ছাকৃত অন্যায় হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ড

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ...

"হে মোমেনগণ ! তোমাদের উপর ফরজরূপে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে নর-হত্যার ব্যাপারে "কেছাছ" তথা খুনের বদলে খুন করার বিধান। সেমতে (ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র ইত্যাদি ব্যাপারে কোন প্রকার পার্থক্য না করিয়া) আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইলে (সর্ব্বাবস্থায়) হত্যাকারী আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করা হইবে এবং ক্রীতদাসকে হত্যা করা হইলে (সর্ব্বাবস্থায়) হত্যাকারী ক্রীতদাসকেই হত্যা করা হইবে, কোন নারীকে হত্যা করা হইলে (সর্ব্বাবস্থায়) হত্যাকারিণী নারীকেই হত্যা করা হইবে।"

ব্যাখ্যা :—অন্ধকার যুগে খুনের বদলে খুন করা হইত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ইতর-ভদ্রের পার্থক্য করা হইত। উচ্চ বংশের কোন আজাদ মুক্ত ব্যক্তি নিচ বংশের কোন আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিলে সেস্থলে হত্যাকারী উচ্চ বংশীয় আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত না, বরং তাহার পক্ষ্য হইতে প্রদত্ত্ব একজন ক্রীতদাসকে হত্যা করা হইত। আবার নিচ বংশের কোন ক্রীতদাস উচ্চ বংশের ক্রীতদাসকে হত্যা করিলে সেস্থলে হত্যাকারী ক্রীতদাসের গোত্র হইতে একজন আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত। নিচ বংশের কোন নারী উচ্চ বংশের নারীকে হত্যা করিলে উচ্চ বংশের নারীর প্রতিশোধে নিচ বংশের একজন পুরুষকে হত্যা করা হইত। এইরূপ ব্যবধানের দ্বারা তাহারা গোত্রীয় উচ্চ-নিচতার বৈষম্য প্রকাশ করিয়া থাকিত। কিন্তু অপরাধের বিচার ও ইনসাফে বৈষম্যের ভেদাভেদ ন্যায়ের পরিপন্থি ; সুতরাং উক্ত নীতির উচ্ছেদ করতঃ ইসলামের বিধান আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইল যে, হত্যাকৃত ব্যক্তি নিচ বংশের হইলেও হত্যাকারী উচ্চ বংশীয় আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করা হইবে, আর হত্যাকৃত ব্যক্তি উচ্চ বংশীয় ক্রীতদাস বা নারী হইলেও সেস্থলে হত্যাকারী ক্রীতদাস ও নারীকেই হত্যা করা হইবে ; উচ্চ-নিচতার ভেদাভেদে কোন প্রকার ব্যতিক্রম করা চলিবে না।

মছআলাহ :—হত্যা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ধারাল অস্ত্র বা তদ্রূপ অন্য কিছু (যেমন, ধারাল বা চোখা বাঁশ ইত্যাদি যে কোন বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র কিম্বা আগুণ) দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য ও ইচ্ছা করিয়া আঘাত করিয়াছে এবং সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ হত্যার ক্ষেত্রে "কেছাছ" তথা খুনের বদলে খুনের বিধান প্রবর্ত্তিত হইবে। উল্লেখিত অস্ত্র ও বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু যাহার আঘাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে যেমন বড় লাটি, বড় পাথর ইত্যাদি দ্বারা

হত্যা করিলে বা অন্য কোন মারণ উপায়ে হত্যা করিলে—যেমন, পানিতে ডুবাইয়া, গলা টিপিয়া, দীর্ঘ দিন পানাহার বন্ধ রাখিয়া বা উর্দ্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া—যে অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষ বাঁচেনা ঐরূপ যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ হত্যা করিলে সেস্থলে শুধু মাত্র ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ব্যতিত সকল ইমামগণ, এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহের প্রধান দুই শাগের্দ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)ও কেছাছ প্রয়োগের আদেশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এস্থলে কাফ্‌ফারা ও কঠোর দিয়তের বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ শাস্ত্রে রহিয়াছে।

ছোট লাঠি, ছোট পাথর ইত্যাদি যাহার আঘাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটেনা ঐরূপ বস্তুর দ্বারা ইচ্ছাকৃত আঘাত করায় মৃত্যু ঘটিলেও হানাফী মজহাব ও শাফী মজহাব মতে তথায় কেছাছ প্রবর্ত্তিত হইবে না। কাফ্‌ফারা ও দিয়ত দিতে হইবে, অবশ্য যদি ঐরূপ আঘাত এত অধিক হয় যাহাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিতে পারে তবে শাফী মজহাব মতে কেছাছ হইবে। ইমাম মালেকের মতে ছোট-বড় লাঠি বা পাথর ইত্যাদির আঘাত বা যে কোন উপায়ে ইচ্ছাকৃত হত্যা সংঘটিত হইলেই সেস্থলে কেছাছ প্রবর্ত্তিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, কেছাছ প্রয়োগের ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মারণ উপায়ের যে তারতম্য করিয়াছেন তাহা শুধু ইহজগতে শাসনতান্ত্রিক পর্য্যায়ের। পরকালীন গোনাহের ক্ষেত্রে সকল ইমামগণ একমত যে, যদি হত্যার ইচ্ছায় আঘাত না করিয়া থাকে, বরং শুধু প্রহারের ইচ্ছায় আঘাত করিয়া ছিল এবং এরূপ বস্তুর দ্বারা এই পর্য্যায়ের আঘাত করিয়া ছিল যাহাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটেনা তবে ত শুধু প্রহার করার গোনাহ হইবে, হত্যা করার গোনাহ হইবে না। পক্ষান্তরে যদি হত্যা করার ইচ্ছায়ই আঘাত করিয়া ছিল এবং তাহাতে হত্যা সংঘটিত হইয়াছে তবে ছোট লাঠি ছোট পাথর ইত্যাদি যে কোন বস্তুর আঘাতে বা যে কোন উপায়ে হউক, এমনকি বিধানগত দৃষ্টিতে তথায় কেছাছ প্রবর্ত্তিত না হইলেও আল্লাহ তায়ালার নিকট ইচ্ছাকৃত হত্যার গোনাহ অবশ্যই হইবে।

(ফত্‌ওয়া শামী ৫—৪৬৮)

ইচ্ছাকৃত হত্যার গোনাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এইরূপ ঘোষনা করিয়াছেন—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মোসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম—সে ব্যক্তি জাহান্নামে এত দীর্ঘকাল থাকিবে যে তাহা যেন চিরকাল এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিসাপ। তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা অতি বড় আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (৪ পাঃ ১০ রুঃ)

মছআলাহ ঃ— আজাদ ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যা করিলে বা ক্রীতদাসকে আজাদ ব্যক্তি হত্যা করিলে বা নারীকে পুরুষ হত্যা করিলে, পুরুষকে নারী হত্যা করিলে, পুরুষকে পুরুষ হত্যা করিলে—এ সব ক্ষেত্রেও অবশ্যই কেছাছের বিধান প্রযোয্য হইবে।

মছআলাহ ঃ— মৃতের ওলীগণ হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দিলে বা অর্থ বিনিময়ের উপর মীমাংসা করিয়া নিলে কেছাছ রহিত হইয়া যাইবে। এমনকি কতিপয় ওলীগণের একজনও যদি ক্ষমা করিয়া দেয় বা অর্থ বিনিময় গ্রহণ করে তবুও কেছাছ রহিত হইয়া যাইবে এবং অপর ওলীগণ নির্দ্ধারিত অর্থ দণ্ডের অংশ পাইবে।

২৫৭৬। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান ব্যক্তি যে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু-মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" স্বীকারোক্তি করে ঐরূপ ব্যক্তির প্রাণ নাশ কোন ক্রমেই বৈধ ও হালাল হইতে পারে না তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতিরেকে। (১) খুনের বদলা খুন (২) বিবাহিত হইয়া জেনা করা (৩) দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ মোসলমান সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া।

২৫৭৭। ছাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলদের শরীয়তে কেছাছ গ্রহণ বাধ্যতামুলক ছিল। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালা অন্য সুযোগও দিয়াছেন যে, হত্যাকৃত ব্যক্তির ওলী কেছাছ ক্ষমা করতঃ অর্থ বিনিময় গ্রহণ করিতে পারে—فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ আয়াতে এই সুযোগকেই বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই অর্থ বিনিময় উসুল করিতে ভদ্রোচিত উপায় অবলম্বন করা চাই এবং উহা আদায় করিতেও ভাল পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২৫৭৮। ছাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه *

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট অতিশয় ঘৃনিত—(১) পবিত্র মক্কা নগরীর হরম শরীফে নাফরমানীকারী। (২) অন্ধকার যুগের কোন প্রথা মোসলমানদের মধ্যে চালু করার প্রচেষ্টাকারী। (৩) অন্যায় ভাবে কাহাকেও হত্যা করার সুযোগ সন্ধানী।

২৫৭৯। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কবীরা তথা বড় গোনাহ সমূহের মধ্যে অন্যতম এইগুলি। (১) আল্লার শরীক সাব্যস্ত করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া (৩) মানুষ হত্যা করা (৪) কসম করিয়া মিথ্যা কথা বলা।

মছআলাহ ঃ— হত্যা-অপরাধ সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হইতে হইলে দুই সাক্ষী যথেষ্ট এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হইতে হইলে শুধু এক বার স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হইবে।

মছআলাহ ঃ— পুরুষ কর্তৃক নারীকে হত্যা করা হইলে কেছাছ সূত্রে পুরুষকে প্রাণদণ্ড দান করা হইবে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ঐরূপ এক ঘটনায় পুরুষকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

মছআলাহ ঃ—যদিও অপরাধ পূর্ণরূপে প্রমাণিত থাকে তবুও আইনগত বিচার ব্যতিরেকে নিজেই কেছাছ প্রয়োগ করা যাইবে না।

ইচ্ছা বিহীন হত্যার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً...

"কোন মোসলমানের এই কাজ হইতে পারে না যে, সে কোন মোসলমানকে হত্যা করে—একমাত্র অনিচ্ছাকৃত হত্যা ব্যতিরেকে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা বিহীনরূপে কোন মোসলমানকে হত্যা করিবে তাহার শাস্তি এই যে, সে (কাফ্‌ফারা আদায় করিবে তথা) একটি ঈমানদার ক্রীতদাস বা দাসী আজাদ করিবে এবং হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারেছগণকে দিয়ত প্রদান করিবে; অবশ্য যদি তাহারা তাহা মাফ করিয়া

দেয়। কিন্তু যদি হত্যাকৃত ব্যক্তি মোমেন হইয়া কাফের শত্রু-দেশের অধিবাসী হয় তবে শুধু (কাফ্‌ফারা তথা) মোমেন ক্রীতদাস বা দাসী আজাদ করিতে হইবে। আর যদি ঐরূপ হত্যাকৃত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমোসলেম অনুগত নাগরিক কিম্বা মিত্র বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত শ্রেণীর হয় তবে তাহার উত্তরাধিকারীগণকে দিয়ত আদায় করিবে এবং (কাফ্‌ফারা তথা) একটি ঈমানদার ক্রীতদাস বা দাসী আজাদ করিবে। যদি (কাফ্‌ফারা প্রদানের জন্য) ক্রীতদাস-দাসী সংগ্রহ করা না যায় তবে (হত্যাকারী দিয়ত আদায় করার সাথে কাফ্‌ফারার জন্য ক্রীতদাস-দাসী আজাদ করার পরিবর্ত্তে) ধারাবাহিকরূপে দুই মাস রোজা রাখিবে; আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তওবা স্বরূপ এই (কাফ্‌ফারার) বিধান দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ ও হেকমতওয়ালা। (৪ পাঃ ১০ রুঃ)

ভিড়ের চাপে বা অজ্ঞাত ঘাতক কর্ত্তৃক কোন লোক নিহত হইলে

যে কোন পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট লোকের দ্বারা কাহারও প্রাণ নাশ হইলে সেস্থলে উহার সমুদয় জিম্মাদারী ও প্রতিকার ঐ লোকের উপরই প্রবর্ত্তিত হইবে এবং বিভিন্ন ধারা ও উপধারার দৃষ্টিতে উহার বিচার বিবেচনা করা হইবে। আর যদি হত্যাকারীর নির্দ্ধারণ বা সন্ধান পাওয়া না যায় তবে সে স্থলেও ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার অধিকারী একজন লোকের প্রাণ-বিনাশ বিফল ও প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে দেওয়া হয় না এবং উহা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা উপধারা রহিয়াছে। ঐরূপ একটি বিষয়ই ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন একটি লোক ভিড়ের চাপে নিহত হইয়াছে, কিন্তু কাহার চাপে নিহত হইল সঠিকরূপে ঐরূপ ব্যক্তিদের নির্দ্ধারণ সম্ভব হয় নাই কিম্বা একটি লোক ঘাতকের দ্বারা নিহত হইয়াছে, কিন্তু ঘাতককে নির্দ্ধারিত করা সম্ভব হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, সেই হত্যা কিরূপ স্থান বা এলাকায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যদি কোন গ্রাম, বস্তি ও মহল্লার, বিশেষ পথে, ঘাটে, মাঠে, মসজিদে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে ঐ বস্তি, গ্রাম ও মহল্লাবাসীগণকে 'দিয়ত" তথা এই হত্যার বিনিময় আদায়ে বাধ্য করা হইবে। তদ্রূপ যদি ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্বের হাট-বাজারে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহার দিয়ত মালিকদের হইতে আদায় করা হইবে। আর ঐরূপ মালিকানা সত্ত্ব বিহীন হাট-বাজার বা বড় সড়ক ও রাস্তা যাহাতে বিভিন্ন গ্রাম ও মহল্লার লোক সমভাবে চলাচল করিয়া থাকে বা আ'ম জামে

মসজিদ যেখানে বিভিন্ন এলাকার লোক নামাযে আসিয়া থাকে এবং তাহা কোন আবাসিক এলাকা ও মহল্লা সংলগ্নও নহে—এইরূপ স্থানে যদি ঐরূপ হত্যা অনুষ্ঠিত হয় তবে উহার দিয়ত বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডার হইতে আদায় করা হইবে। (ফত্ওয়া শামী ৫—৫৫৬)

এইরূপ অজ্ঞাত হত্যা ক্ষেত্রে লাশ প্রাপ্তির স্থান ও এলাকার বিভিন্নতা দৃষ্টে মছআলার বহু রকম শাখা প্রশাখা রহিয়াছে—যাহা ফেকার কেতাব সমূহে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

অঙ্গহানীর বিভিন্ন মছআলাহ

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কামড় দিয়াছে, আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি কামড় ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে কামড় দাতার দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেস্থলে দাঁত ভাঙ্গার বিনিময় দিতে হইবে না।

মছআলাহ ঃ— দাঁতের অনিষ্ট সাধনের শাস্তি সম্পর্কীয় মছআলার শাখা প্রশাখাও অনেক বেশী। এ সম্পর্কে মুল ধারা পবিত্র কোরআনেই বিঘোষিত রহিয়াছে—والسن بالسن "দাঁতের বিনিময়ে দাঁত" অর্থাৎ এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আঘাতে অপর ব্যক্তির দাঁত উচ্ছিন্ন করিয়াছে এস্থলে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে তথা আঘাতকারীর ঐ শ্রেণীর দাঁত উচ্ছিন্ন করা হইবে।

অবশ্য ফেকাহ শাস্ত্রবীদগণের এতটুকু মতভেদ বর্ণিত আছে যে, কাহারও মতে উক্ত আঘাতকারীর দাঁতকে সমুলে উচ্ছিন্ন করা হইবে এবং কাহারও মতে উক্ত ব্যবস্থা আশঙ্কাজনিত হওয়ায় রেতি দ্বারা ঘষিয়া তাহার দাঁত মাংস পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি আঘাতের দরুণ দাঁত উচ্ছিন্ন না হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে তবে সকলেই একমত যে, মুল দাঁতের ভাঙ্গা অংশের পরিমাণে আঘাতকারীর দাঁত ঘষিয়া দেওয়া হইবে। ইহাও উল্লেখ আছে যে, যদি কম বয়সের ব্যক্তির দাঁত উচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে পুনঃ দাঁত গজাইবার অপেক্ষা করা হইবে। যদি তাহার দাঁত পুনঃ গজাইয়া উঠে তবে আঘাতকারী হইতে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে না, শুধু বিচারকের বিবেচনা পরিমাণ আঘাতের বিনিময় ও চিকিৎসার ব্যয় আদায় করিতে হইবে।

আর যদি ইচ্ছা বিহীন আঘাতে দাঁত উচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিম্বা ইচ্ছাকৃত আঘাতেই দাঁত উচ্ছিন্ন না হইয়া কার্য্য অনপোযুগী হইয়া রহিয়াছে বা ঐ দাঁত ভাঙ্গিয়া কিম্বা কাল হইয়া মুখের শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে তবে সে ক্ষেত্রে কেছাছ হইবে না, দিয়ত আদায় করিতে হইবে। দিয়ত তথা ক্ষতিপুরণ প্রতি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট বা ১৩২৷ তোলা তথা /৷৷৶১৷ এক সের দশ ছটাক সোয়া তোলা রৌপ্য

কিম্বা উহার মূল্য বা ১৮৬ তোলা স্বর্ণ কিম্বা উহার মূল্য। দিয়তের পরিমাণে ছোট বড় দাঁতের কোন তারতম্য নাই; অবশ্য নারীদের দাঁতের দিয়ত উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ হইবে।

আর ইচ্ছা বিহীন আঘাতে যদি দাঁত কিছু অংশ ভাঙ্গা যায় যাহাতে উহা কার্য্য অনপোযুগী হয় নাই এবং মুখের শ্রীও নষ্ট হয় নাই তবে উহার ক্ষতিপূরণ বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী হইবে।

মছআলাহ ঃ—আঙ্গুল কর্ত্তন বা বিনষ্ট করার শাস্তিরও বিভিন্ন ধারা উপধারা রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আঘাত করিয়া অপর ব্যক্তির আঙ্গুল সম্পূর্ণ বা আংশিক কাটিয়া ফেলিয়াছে—যদি আঙ্গুলের কোন জোড়স্থলে কাটিয়া থাকে তবে আঘাতকারী হইতে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে তথা তাহার ঐ আঙ্গুল ঐ জোড় হইতে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি ইচ্ছা বিহীন আঘাতে আঙ্গুল কাটিয়া যায় কিম্বা যে কোন প্রকার—ইচ্ছাকৃত বা ইচ্ছা বিহীন আঘাতে যদি আঙ্গুল ছিন্ন না হইয়া পঙ্গু তথা কার্য্য অনপোযোগী হইয়া যায় তবে প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়ত তথা ক্ষতিপূরণ দশটি উট বা ২৬২॥ তোলা তথা /৩৷২॥ তিন সের এক পোয়া আড়াই তোলা রৌপ্য কিম্বা উহার মূল্য বা ৩৭॥ তোলা স্বর্ণ কিম্বা উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে। নারীদের আঙ্গুলের দিয়ত উহার অর্দ্ধ, অবশ্য হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল এবং বড় আঙ্গুল ও ছোট আঙ্গুলের কোন তারতম্য নাই—সকলের দিয়তই সমান।

২৫৮০। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء
يعنى الخنصر والابهام

অর্থ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, উভয়টি সমান।

অর্থাৎ উভয়টি পরস্পর এবং অন্যান্য আঙ্গুলের ন্যায় দিয়তের পরিমাণে সমান সমান বিবেচিত হইবে; যদিও আঙ্গুলের মধ্যে ছোট-বড়, মোটা-চিকন রহিয়াছে।

মছআলাহ ঃ—পূর্ণ আঙ্গুলের দিয়ত ক্ষেত্রে ছোট-বড় প্রত্যেকটি আঙ্গুলই সমান বিবেচিত হইবে, কিন্তু যদি কোন আঙ্গুলের একটি গিরা কাটে তবে দুই গিরার আঙ্গুল হইলে—যেমন বৃদ্ধাঙ্গুল, প্রতি গিরায় পূর্ণ আঙ্গুলের দিয়তের অর্দ্ধাংশ এবং তিন গিরার আঙ্গুল হইলে প্রতি গিরায় দিয়তের তৃতীয়াংশ দিতে হইবে।

কতিপয় লোক কর্তৃক এক জন নিহত বা আহত হইলে

২৫৮১। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি বালক কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে নিহত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সানা শহরবাসী সকলে যদি এই হত্যায় শামিল হইত তবে আমি তাহাদের সকলকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতাম।

ব্যাখ্যা :— মুল ঘটনার প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ)ও সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে ইয়ামানস্থিত সানা শহরের এক ব্যক্তি তাহার একটি ছেলেকে তাহার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যায় ; ছেলেটি তাহার অপর স্ত্রীর পক্ষ হইতে ছিল। সে বিদেশে চলিয়া গেলে তাহার স্ত্রী অপর এক ব্যক্তির সহিত অবৈধ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে এবং তাহারা উভয়ে ঐ বালক ছেলেকে নিজেদের জন্য বিপদের কারণ ভাবিয়া তাহাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তাহারা উভয়ে এবং অপর এক ব্যক্তি ও গৃহভৃত্ত—এই চার জন একত্রে গোপনে বালকটিকে মারাত্মকরূপে আঘাত করিয়া হত্যা করে এবং থলিয়ায় ভর্তি করিয়া লুকাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং আসামীগণ ধৃত হয়। এই ভাবে একটি হত্যায় চার জন আসামী হত্যাকারী বলিয়া প্রমাণিত হয়। সেই উপলক্ষে খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সানা শহরবাসী সকলে যদি এই হত্যাকাণ্ডে শামিল হইত তবে আমি তাহাদের সকলকেই প্রাণদণ্ড দিতাম।

মছআলাহ :— কতিপয় ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে একত্রে আঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছে, প্রত্যেকের মারনাস্ত্র কেছাছ প্রয়োগ শ্রেণীর এবং প্রত্যেকের আঘাত এরূপ যে সাধারণতঃ উহা হত্যার জন্য যথেষ্ট—এই ক্ষেত্রে আঘাতকারী প্রত্যেককেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

মছআলাহ :—কতিপয় ব্যক্তি একত্রে এক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছে ; প্রত্যেকের আঘাত ভিন্ন ভিন্ন এই পর্য্যায়ের নহে যাহাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে আঘাতগুলি হত্যায় পরিণত হইয়াছে—এই ক্ষেত্রে দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত প্রাণ-বিনিময় দিতে হইবে।

মছআলাহ :—যদি কাহারও আঘাত হত্যাজনক এবং অপর ব্যক্তিদের আঘাত সাধারণ ছিল তবে শুধু হত্যাজনক আঘাতকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অন্যান্যদের শাস্তি হইবে, কিন্তু প্রাণদণ্ড নহে।

মছআলাহ :—এক ব্যক্তির কোন একটি অঙ্গ কর্ত্তনে যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রে শামিল হয় সে ক্ষেত্রে অঙ্গ কর্ত্তনের কেছাছ প্রযোয্য নহে, যদিও তাহারা ইচ্ছাকৃত

ঐ কাজ করিয়া থাকে। বরং উক্ত অঙ্গের দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত অর্থ বিনিময় তাহাদের হইতে সম ভাবে বণ্টন করিয়া আদায় করা হইবে। হানফী মজহাব মতে মুল মছআলাহ ইহাই, অবশ্য শাফী মজহাব মতে ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করার ক্ষেত্রে অপরাধীগণ প্রত্যেকেরই অঙ্গহানী ঘটাইয়া কেছাছ গ্রহণ করা হইবে।

(ফত্ওয়া শামী ৫—৪৮০)

উক্ত মছআলাহ অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টিও যে, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে দুই জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছে, সে মতে শরীয়তের বিধান অনুসারে কাজীর বিচারে তাহার হাত কাটা হইয়াছে। অতঃপর সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের অবাস্তবতা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ ব্যক্তি চুরির অপরাধ-মুক্ত সাব্যস্ত হইয়াছে; ফলে সাক্ষীদ্বয় ঐ ব্যক্তির হাত কর্ত্তনকারী সাব্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের উভয়কে হাত কর্ত্তনের ক্ষতিপুরণ দানে দিয়ত আদায় করিতে হইবে। হাতের দিয়ত পঞ্চাশটি উট বা ১৩১২॥ তোলা তথা ।৬।৵২॥ ষোল সের এক পোয়া দুই ছটাক আড়াই তোলা রৌপ্য কিম্বা উহার মূল্য বা ১৮৭॥ তোলা তথা /২।/২॥ দুই সের এক ছটাক আড়াই তোলা স্বর্ণ কিম্বা উহার মুল্য। ইহা পুরুষের হাতের দিয়ত; মহিলার হাতের দিয়ত ইহার অর্দ্ধ।

সাক্ষীদ্বয় ভুল বশতঃ সাক্ষ্য দিয়া থাকিলে এই দিয়ত তথা অর্থ বিনিময়ের ক্ষতিপুরণ পরিশোধ করিবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকে তবুও এই অর্থ বিনিময়ের ক্ষতিপুরণই জাগতিক বিচারে তাহাদের উপর বর্ত্তিবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা এবং ইচ্ছাকৃত এক ব্যক্তির এত বড় ক্ষতি সাধন করার গোনাহও তাহাদের উপর চাপিয়া থাকিবে। এমনকি ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করার ক্ষেত্রে তাহাদের অপরাধের পরিমাণ ও জঘন্যতা দৃষ্টে শাসনকর্ত্তা বা বিচারপতি আবশ্যক বোধে সাক্ষীদ্বয়ের হাত কাটিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহা মুল বিধানের শাস্তিরূপে নয়, বরং পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শাসনতান্ত্রিক পর্য্যায়ের অতিরিক্ত শাস্তিরূপে হইতে পারিবে; যাহার জন্য সেইরূপ বিশেষ পরিস্থিতির আবশ্যক হইবে; সর্ব্ব ক্ষেত্রে উহা প্রযোয্য হইবে না।

বোখারী (রঃ) খলীফা আলী (রাঃ) হইতে যে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন হানফী মজহাব মতে উহার তাৎপর্য্য ইহাই (বদায়ে উছ্ছানায়ে ৬—২৯৯)।

ঘটনাটি এই—

খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট এক ব্যক্তির উপর চুরির অভিযোগে দুই জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিল। সেমতে আলী রাঃ) অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কাটার আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইল।

তারপর ঐ সাক্ষীদ্বয় আর এক ব্যক্তিকে হাজির করিয়া বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ভুল করিয়াছিলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে চোর এই ব্যক্তি। আলী (রাঃ) সে ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সাক্ষ্য আমি আর গ্রহণ করিব না এবং তোমাদের উপর আমি প্রথম ব্যক্তির জন্য হাত কর্ত্তনের দিয়ত বলবৎ করিলাম। যদি আমার নিকট প্রমাণীত হইত যে, তোমরা প্রথম বার ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ছিলে, তবে আমি এখন তোমাদের প্রত্যেকের হাত কাটিয়া দিতাম।

মছআলাহ ঃ—চড়-চাপড় বা চপেটাঘাত, খামচি বা নখের আঁচর এবং ছড়ি, লাঠি, বেত বা চাবুকের আঘাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেছাছ তথা সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বা দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত অর্থ বিনিময় আদায়ের ব্যবস্থা নাই। এই সব ক্ষেত্রে আছে তা'যীর তথা শাসনতান্ত্রিক শাস্তি ; যাহা নিয়মতান্ত্রিক বিচারপতি ক্ষেত্র, পাত্র, ঘটনা ও পরিস্থিতি ইত্যাদি সমুদয় দিক লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবেন।

অবশ্য যদি কেহ ঐরূপ ক্ষেত্রে নিজেই নিজকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিয়া দেয়—সম পরিমাণ আঘাতের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বা কাজী তথা নিয়মতান্ত্রিক বিচারপতি ক্ষেত্রবিশেষে স্বীয় বিবেচনায় যথাসম্ভব সমপর্য্যায়ের আঘাত মারার আদেশ প্রদান করেন তবে তাহা সতন্ত্র কথা। এই শ্রেণীর বিচার বা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগদানকে শুধু আভিধানিক অর্থে কেছাছ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা বিধানগত কেছাছ নহে।

এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) যে কতিপয় ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঐসব ঘটনায় কেছাছ শব্দের ব্যবহার উল্লেখিত শ্রেণীর শুধু আভিধানিক অর্থ পর্য্যায়েরই বটে। উক্ত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এই—

খলীফা আবু বকর (রাঃ) একদা এক ব্যক্তির বিরক্তিকর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে একটি চড় মারিলেন, পরে তিনি নিজেই তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার হইতে চড়ের কেছাছ বা প্রতিশোধ আদায় কর, ঐ ব্যক্তি অভিভূত হইয়া মাফ করিয়া দিল।

খলীফা ওমর (রাঃ) এক বার মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একদা একটি বৃক্ষের আড়ালে প্রস্রাব করিতে বসিলেন, ঠিক ঐ অবস্থায় এক ব্যক্তি তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে জবানবন্দির সুযোগ না দিয়াই শাস্তি প্রদান করিলেন ? তৎক্ষণাৎ খলীফা ওমর (রাঃ) ঐ চাবুকটি ঐ ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি আমার

হইতে প্রতিশোধ নিয়া নেও। ঐ ব্যক্তি তাহা করিতে অস্বীকার করিল, ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্যই তোমাকে করিতে হইবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার কানে কানে কিছু বলিল (কোন অপরাধের স্বীকারুক্তি করিল।) খলীফা আলী (রাঃ) দণ্ড প্রয়োগে নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তিকে বাহিরে নিয়া বেত্রদণ্ড প্রদান কর। অতঃপর দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ করিল, দণ্ড প্রয়োগকারী নির্দ্ধারিত সংখ্যার অধিক তিনটি আঘাত করিয়াছে। দণ্ড প্রয়োগকারীও তাহা স্বীকার করিল। খলীফা আলী (রাঃ) তাহাকে আদেশ করিলেন, এই বেত্র দ্বারা তুমিও তাহাকে তিনটি আঘাত কর। অধিকন্তু দণ্ড প্রয়োগকারী কর্ম্মচারীকে খলীফা আলী (রাঃ) শাসাইয়া দিলেন যে, শাস্তি প্রায়োগকালে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অতিক্রম করিবে না।

কাজী শোরায়হ্ রহমতুল্লাহে আলাইহের নিকট একদা এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমাকে আপনার চাপরাসী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করিয়া দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাপরাসীকে ডাকিয়া ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, লোক জন আপনার উপর ভিড় জমাইতে ছিল তখন আমি এই ব্যক্তিকে চাবুক দ্বারা একটি আঘাত করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে শোরায়হ্ (রঃ) বিচার করিলেন—ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমিও তাহাকে চাবুক দ্বারা একটি আঘাত কর।

কাজী শোরায়হ্ (রঃ) কোন এক ঘটনায় শুধু খামচি বা নখের আঁচরের প্রতিশোধ গ্রহণেরও আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন।

"কাসামাহ" তথা অজ্ঞাত হত্যার কেছাছ হইতে মুক্তির জন্য কসমের ব্যবস্থা

কোন গ্রাম, মহল্লা বা বাড়ী অথবা কোন প্রতিষ্ঠান এলাকায় কাহারও হত্যাকৃত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু হত্যাকারীর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এবং হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের পক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট কাহারও প্রতি অভিযোগ পেশ করাও সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের হত্যাকাণ্ড প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে পারে না। তাই ঐ এলাকা, বাড়ী বা প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের উপর ঐ হত্যার দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত অর্থ বিনিময় পাইকারীরূপে ধার্য করা হইবে। কারণ, এইরূপ দুষ্কৃতি হইতে নিজ নিজ এলাকাকে হেফাজত করা এলাকাবাসীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ; তাহারা এই কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। ইহা শরীয়তের মুল বিধান, অবশ্য এই মছআলার বিস্তারিত

বিবরণ ও শাখা প্রশাখা অনেক কিছুই রহিয়াছে যাহা ফেকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। একজন পুরুষের দিয়তের পরিমাণ এক শত উট বা ২৬২৫ তোলা তথা ৮২৮/ বত্রিশ সের তিন পোয়া এক ছটাক রৌপ্য অথবা উহার মূল্য কিম্বা /৪॥৶ সাড়ে চার সের তিন ছটাক স্বর্ণ অথবা উহার মূল্য। মহিলার দিয়ত উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ।

এই বিরাট অঙ্কের দিয়ত ধার্য্যের পূর্ব্বে এলাকাবাসীগণকে এই প্রমাণও দিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ এই হত্যায় জড়িত নহে। কেননা, যদি তাহারা হত্যা করিয়া থাকে এবং সেই হত্যা ইচ্ছাকৃত ছিল তবে সে ক্ষেত্রে কেছাছ তথা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ড; অর্থ বিনিময়ের কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং অর্থ বিনিময়ের পূর্ব্বে তাহাদের হত্যাকারী না হওয়ার প্রমাণ দিতে হইবে। সেই প্রমাণের জন্য শরীয়ত এই ব্যবস্থা করিয়াছে যে, হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ এলাকাবাসীদের হইতে পঞ্চাশ ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিবে। তাহারা কাজির দরবারে প্রত্যেকে এইরূপে শপথ করিবে—

والله ما قتلته ولا علمت له قاتلا

"খোদার কসম—আমি তাহাকে হত্যা করি নাই এবং তাহার হত্যার সঙ্গে জড়িত কোন লোকের খোঁজও আমি জানি না।" এইরূপে পঞ্চাশ জনকে পঞ্চাশটি কসম খাইতে হইবে, এমনকি যদি ঘটনা কোন গৃহে হইয়া থাকে এবং গৃহ স্বামীদের সংখ্যা পঞ্চাশে না পৌঁছে, তবে ঐ কম সংখ্যক লোককেই পুনঃ পুনঃ কসম দিয়া কসমের সংখ্যা পঞ্চাশ পূর্ণ করিতে হইবে। সেমতে যদি শুধু গৃহ-স্বামী একাই ঐরূপ কসমের পাত্র হয় তবে তাহাকেই পঞ্চাশ বার কসম খাইতে হইবে। এইরূপে কসম খাইলে এলাকাবাসীগণ হত্যার দায় হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু নিজ এলাকাকে এরূপ দুষ্কৃতি হইতে হেফাজত না করার অপরাধে তাহাদের উপর পাইকারীরূপে দিয়ত ধার্য্য করা হইবে। এই ব্যবস্থাকেই "কাসামাহ্" বলা হয়।

২৫৮২। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার গোষ্টির কতিপয় ব্যক্তি খায়বর দেশে গিয়াছিল। তাহারা তথায় পৌঁছিয়া বিভক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহারা তাহাদের এক জনকে কোন এক স্থানে নিহত অবস্থায় দেখিতে পায়। তখন তদস্থানীয় ইহুদী অধিবাসীগণকে তাহারা বলিল, তোমরাই আমাদের লোককে হত্যা করিয়াছ। তাহারা বলিল, আমারা হত্যা করি নাই এবং হত্যাকারীর খোঁজও আমরা জানি না।

নিহত ব্যক্তির সঙ্গিগণ হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা খায়বর গিয়াছিলাম, তথায় আমাদের এক জনকে নিহত অবস্থায় পাই। (যে ব্যক্তি অভিযোগ পেশ করিতেছিল

সে ছিল আগন্তুকদের মধ্যে কনিষ্ঠ, তাই) হযরত (দঃ) বলিলেন, মুরব্বিদেরকে কথা বলিতে দাও। (অতঃপর মুরব্বি শ্রেণীর দুই ব্যক্তি ঘটনা ব্যক্ত করিলে পর হযরত (দঃ) খায়বরবাসী ইহুদীদের প্রতি এই মর্ম্মে এক লিপি প্রেরণ করিলেন— اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب "খায়বরবাসী ইহুদীগণ তাহাদের আওতায় নিহত ব্যক্তির দিয়ত প্রদান করিবে, অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষনা করা হইবে।)"

হযরত (দঃ) অভিযোগ দায়েরকারীগণকে বলিলেন, তোমরা হত্যাকারী সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করার চেষ্টা কর। তাহারা বলিল, আমাদের কোন সাক্ষী নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে খায়বরবাসী ইহুদীগণ তাহাদের উক্তির উপর কসম খাইবে। অভিযোগকারীরা বলিল, আমরা ইহুদী সম্প্রদায়ের কসমের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সেমতে (খায়বরবাসীদের হইতে কাসামার নিয়ম অনুযায়ী কসম ত লওয়া হইল না, কিন্তু) রসুলুল্লাহ (দঃ) হত্যার ঘটনা প্রতিক্রিয়াহীন যাওয়াকে অবৈধ ও অসঙ্গত গণ্য করতঃ (খায়বরবাসীদের উপর দিয়ত ধার্য্য করিলেন। অবশ্য তাহাদের প্রতি উদারতা বশে নিজের তরফ হইতে) ছদকা তথা বায়তুল-মালের (পঞ্চাশটি উট ক্রয় করিয়া সাহায্য স্বরূপ তাহাদিগকে প্রদান করতঃ সর্ব্ব মোট) এক শত উট দ্বারা দিয়ত আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— তরজমার ভিতর বন্ধনীর মধ্যে কতিপয় বিষয় সংযোগ করা হইয়াছে—(১) "খায়বরবাসীদের উপর দিয়ত ধার্য্য করার কঠোর আদেশ সম্বলিত লিপির মর্ম্ম" এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বোখারী শরীফ ১০৬৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, মুল দিয়ত হযরত (দঃ) হত্যাকাণ্ডের স্থান খায়বরবাসীদের উপরই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

(২) "খায়বরবাসীদের হইতে কাসামার নিয়ম অনুযায়ী কসম লওয়ার প্রস্তাব হযরত (দঃ) করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই কসম লওয়া হয় নাই।" ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। ফেকার কেতাবে বিধান রহিয়াছে, কাসামার নিয়ম অনুসারে বিবাদী পক্ষের উপর কসম প্রয়োগ করার জন্য বাদী পক্ষের তরফ হইতে বিবাদী পক্ষের উপর কসমের দাবী করিতে হইবে এবং কসম চাহিতে হইবে, নতুবা কসম প্রয়োগ করা হইবে না। আলোচ্য ঘটনায় বাদী পক্ষ বিবাদী পক্ষের কসম মোটেই দাবী করে নাই, বরং তাহাদের কসমের প্রস্তাবও গ্রহণ করে নাই।

(৩) "দিয়ত আদায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) যে সাহায্য করিয়া ছিলেন তাহা তিনি ছদকা তথা বাইতুল-মাল হইতে নিজের অর্থে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন।" ইমাম নববী প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ ১০৬৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতের ন্যায় অনেক রেওয়ায়েতের

একটি বাক্য فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده—"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দিয়তের সাহায্য নিজ তরফ হইতে প্রদান করিলেন" এর পরি-প্রেক্ষিতে উপরুক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) "হযরতের সাহায্য মুল দিয়তের অর্দ্ধাংশ পঞ্চাশটি উট ছিল মাত্র, বাকি অর্দ্ধাংশ দ্বারা দিয়তের পরিমাণ একশত উট পূর্ণ করা বিবাদী পক্ষ খায়বরবাসীদের উপরই প্রবর্ত্তিত ছিল।" এই তথ্যটি নেছায়ী শরীফের এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (২—২০৬)—

فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم واعانهم بنصفها

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত হত্যার দিয়ত খায়বরবাসীদের উপর পাইকারী ভাবে বন্টন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং হযরত (দঃ) দিয়তের অর্দ্ধাংশ দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিলেন।"

হত্যার ব্যাপারে মিথ্যা কসমের পরিণতি

একটি বিশেষ ঘটনা—আরবের হোজায়েল গোত্র তাহাদের একজন অবাঞ্ছিত লোককে নিদাবী ঘোষিত করিয়াছিল। (অন্ধকার যুগে কোন গোত্রের এক জনের অপরাধের প্রতিশোধ অন্যদেরকেও ভোগ করিতে হইত, তাই নিজ গোত্রের অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রতি সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। এমনকি কোন ব্যক্তিকে আয়ত্তের বাহিরে মনে করিলে গোত্রের লোকগণ তাহার সম্পর্কে নিদাবীর ঘোষনা জারি করিয়া দিত। ঐরূপ ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে গোত্রের অপর লোকগণ উহার জন্য দায়ী হইত না, আবার তাহাকে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিলে তাহার জন্য গোত্রীয় লোকগণ কোন দাবীও করিতে পারিত না—অন্ধকার যুগে এই প্রথা ছিল।)

হোজায়েল গোত্র কর্ত্তৃক নিদাবী ঘোষিত ব্যক্তি একদা রাত্রি বেলা বত্‌হা নামক স্থানে কোন একটি ইয়ামানী পরিবারের গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহের একজন লোক টের পাইয়া তাহার প্রতি তরবারীর আঘাত করিল; সেই আঘাতে ঐ ব্যক্তি নিহত হইল। তখন হোজায়েল গোত্রের লোক জন আসিয়া হত্যাকারী ইয়ামানীকে ধরিয়া ফেলিল, ঘটনাটি হজ্জের মৌসুমে মক্কায় ঘটিয়া ছিল। অন্ধকার যুগেও ওমর (রাঃ) মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য হইতেন; ঘটনার বিচারের জন্য উপস্থিত তাঁহার নিকটই ইয়ামানী ব্যক্তিকে নিয়া আসা হইল এবং হোজায়েল গোত্রীয় লোকদের পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাবী করা হইল যে, এই ব্যক্তি আমাদের একজন লোককে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী ব্যক্তি প্রতিশোধ খণ্ডনের জন্য দাবী করিল, ইহারা ঐ ব্যক্তিকে নিদাবীরূপে ঘোষিত করিয়া ছিল,

সুতরাং ইহারা তাহার হত্যার প্রতিশোধের দাবী করিতে পারে না। হোজায়েল গোত্রীয় লোকগণ মিথ্যারূপে ঐ কথা অস্বীকার করিয়া বলিল, আমরা উহাকে নিদাবীরূপে ঘোষনা করি নাই।

এখন হত্যার বিচার ন্যাস্ত হইল এই কথার উপর যে, ঐ ব্যক্তিকে নিদাবী ঘোষনা করা হইয়া ছিল কি না। বাদী পক্ষ নিদাবী ঘোষনা করা অস্বীকার করিতে ছিল, তাই তাহাদিগকে কাসামার নিয়ম অনুযায়ী বলা হইল, তোমাদের পঞ্চাশ জন এই বিষয়ের উপর কসম খাইবে যে, ঐ ব্যক্তিকে নিদাবী ঘোষনা করা হইয়া ছিল না। তখন তাহাদের উপস্থিত উনপঞ্চাশজন লোক ছিল তাহারা ঐ বিষয় কসম খাইল। তাহাদের অপর একজন লোক সিরিয়া হইতে তথায় আসিয়া ছিল, পঞ্চাশ পূর্ণ করার জন্য তাহাকে কসম খাইতে বলা হইল। সে মিথ্যা কসম খাইতে ভয় করিয়া এক হাজার দেরহাম—রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাহার স্থলে অপর ব্যক্তিকে কসমের জন্য দিয়া দিল। এইরূপে পঞ্চাশ জনের কসম দ্বারা নিদাবীর ঘোষনা বাতিল সাব্যস্ত হইলে হত্যাকারী খুনের বদলে শাস্তি প্রাপ্ত হইল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ভ্রাতার হাতে অপরাধীকে অর্পন করা হইল। ভ্রাতা অপরাধী সহ মিথ্যা কসমে জড়িত লোকদের সঙ্গে পথ চলিতে ছিল। নখ্‌লা নামক স্থানে পৌঁছিলে বৃষ্টি বর্ষন আরম্ভ হইল; তাহারা সকলে একটি পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিলে হঠাৎ গর্তটি ধ্বশিয়া পড়িল এবং মিথ্যা কসমকারী পঞ্চাশজন সকলেই চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা এবং তাহার হস্তে ধৃত আসামী এই দুই জনের উপর চাপা পড়িল না, তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হইল। কিন্তু একটি পাথর তাহাদের পেছনে ধাওয়া করিল এবং (মিথ্যা দাবীতে জড়িত) নিহত ব্যক্তির ভ্রাতার পায়ে আঘাত করিয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং দীর্ঘ এক বৎসর সেই আঘাতে ভুগিয়া সেও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। (১০১৯ পৃঃ)

গৃহভ্যন্তরে উঁকি মারার দরুণ চক্ষু কানা করিয়া দিলে ?

২৫৮৩। হাদীছ ঃ- আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, যদি কেহ তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি মারিয়া তোমার ঘরের অভ্যন্তর দেখে এবং তখন তুমি ঢিল ছোড়িয়া তাহার চক্ষু কানা করিয়া ফেল তবে তাহাতে তোমার গোনাহ হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত অপরাধে লিপ্তাবস্থায় ঢিল ছোড়িয়াছে এবং তাহাতে চক্ষু কানা হইয়াছে, ইহাতে গোনাহ হইবে না। শাফী মজহাব মতে জাগতিক বিচারেও তাহার কোন দণ্ড হইবে না। হানফী মজহাব মতে এই মছআলার বিবরণ নিম্নরূপ—

কাফের-হরবী তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক নয় এরূপ কাফের ব্যতিত অন্য সকল মানুষের জান-মাল অঙ্গপ্রতঙ্গ, এমনকি শরীরের চামড়াটুকুর পর্য্যন্ত নিরাপত্তার বিধান ইসলামী শরীয়তে অতিশয় কঠোরতার সহিত পালন করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে অনেক সুস্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে, তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এই ক্ষেত্রে চক্ষুর ন্যায় একটি অঙ্গহানীর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতামুলক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি উক্ত অপরাধে লিপ্তাবস্থায়ই তাহাকে চক্ষু ছেদনকারী ঢিল মারা হইয়াছিল ইহা প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে এই প্রমাণও দিতে হইবে যে, ঐরূপ ঢিল মারা ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করার আর কো'ন উপায় ছিল না। বিচারকের নিকট এই বিষয়টি প্রমাণিত হইলেই এ ক্ষত্রে দণ্ড মৌকুফ হইবে, (আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম ইহাই।) অন্যথায় নিরাপত্তা বিধানের হাদীহসমুহ দৃষ্টে চক্ষুহানীর দণ্ড প্রয়োগ করা হইবে। (ফত্ওয়া শামী ৫—৪৮৪)

গর্ভ পাতনের শাস্তি

অর্থাৎ গর্ভবতীকে আঘাত করিয়াছে বা এমন কোন ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি সন্তান জীবিত ভুমিষ্ঠ হইয়া মারা যায় তবে একজন সবল সুস্থ মানুষকে হত্যা করার দিয়তের পরিমাণ দিয়ত আদায় করিতে হইবে এবং নর-হত্যার দরুন শরীয়তে যে কাফ্ফারা নির্দ্ধারিত আছে তাহাও আদায় করিতে হইবে এবং কোরআনে বিঘোষিত নর-হত্যার গোনাহও হইবে। আর যদি সন্তান মৃতই গর্ভচ্যুত হয় তবে সেস্থলে সন্তান পুরুষ হউক বা নারী উভয়ের জন্যই এক "গোর্‌রা" তথা একটি ক্রীতদাস বা একটি ক্রীতদাসী দিতে হইবে, কিম্বা পুরুষের দিয়ত পরিমাণের বিশ ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ, চান্দি বা উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে এবং গোনাহও হইবে। এমনকি যদি গর্ভবতী মাতা স্বয়ং কোন প্রকার আঘাত করিয়া বা ঔষধ ব্যবহার করিয়া কিম্বা অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া গর্ভপাত ঘটায় অথবা সন্তানের পিতা ঐরূপ কর্ম্ম করে তবে সেস্থলেও অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে এবং ঐরূপ গোনাহগার হইবে।

যে গর্ভ বা ভ্রূণ মানব দেহের পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে নাই, শুধু কেবল মাথা গঠিত হইয়াছে উহার হুকুম-আহকামও পূর্ণ দেহের ন্যায়ই। অবশ্য যদি দেহের কোন অংশই আকার ধারণ না করিয়া থাকে, শুধু কেবল রক্তপিণ্ড বা মাংসপিণ্ড হয় তবে উহার ক্ষতিপূরণ বিচারকের বিবেচনার উপর ন্যস্ত হইবে।

(ফত্ওয়া শামী ৫—৫১৯)

২৫৮৪। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হোজায়েল গোত্রীয় দুই জন মহিলা (ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া) একজন অপর জনকে ভীষণ আঘাত করিল; যাহাতে আঘাতপ্রাপ্তা মহিলার গর্ভপাত হইয়া গেল। সে ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি "গোর্‌রা" তথা একটি ক্রীতদাস বা একটি ক্রীতদাসী প্রদানের ফয়ছালা করিয়া ছিলেন।

২৫৮৫। হাদীছঃ— একদা খলীফা ওমর (রাঃ) কোন মহিলার গর্ভপাত ঘটানের শাস্তি সম্পর্কে ছাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তখন মুগিরা (রাঃ) বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গোর্‌রা তথা একটি ক্রীতদাস বা একটি ক্রীতদাসী প্রদানের ফায়সালা করিয়া ছিলেন।

ছাহাবী মোহাম্মদ ইবনে মাছলামাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐরূপ একটি ফয়সালা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম।

ছোট বালকদের দ্বারা খেদমত করানো

অপরের বালক ছেলেদের দ্বারা তাহাদের অভিভাবকের অনুমতি না লইয়াও এমন ব্যক্তি কাজ লইতে পারে যাহার সঙ্গে ঐরূপ কাজ লওয়ার অনুমতির সম্পর্ক স্বাভাবিক রূপেই থাকে। যথা—ঐ বালকদের শিক্ষক বা অভিভাবকদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ। এইরূপ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকিবে—যেই শ্রেণীর বালকদের সম্পর্কে দ্বিধা থাকিবে অভিভাবকের অসন্তোষের তাহাদের দ্বারা কাজ করাইবে না।

নবী-পত্নি উম্মে সালামা (রাঃ) একদা মক্তবের শিক্ষকগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—তাঁহার উন পেঁজিবার উদ্দেশ্যে বালকদেরকে পাঠাইবার জন্য। তিনি শিক্ষকগণকে সতর্ক করিয়া দিলেন, অভিজাত শ্রেণীর বালকদেরকে পাঠাইবে না; (দাস শ্রেণীর বালকদেরে পাঠাইবে)।

অভিজাত শ্রেণীর বালকদের সম্পর্কে দ্বিধা থাকে যে, এই বালকদের দ্বারা কাজ করাইতে তাহাদের অভিভাবকের সন্তুষ্টি না-ও থাকিতে পারে। তাই উম্মে-সালামা (রাঃ) সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকের সুস্পষ্ট অনুমতি থাকিলে দ্বিধার প্রয়োজন নাই। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

২৫৮৬। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদিনায় পৌঁছিলেন তখন আমার অভিভাবক—(মাতার স্বামী) আবু তাল্‌হা (রাঃ) আমার হাতে ধরিয়া নিজের সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! "আনাছ" অতি হুশিয়ার ছেলে—সে আপনার সেবা করিবে।

সেমতে আমি বাড়ীতে ও ভ্রমনে সর্ব্বদা নবীজীর খেদমত ও সেবা করিয়াছি। (নবী (দঃ) এতই মধুর স্বভাব ও সহানুভূতিশীল ছিলেন যে,) দীর্ঘ দশ বৎসর সর্ব্বদার সেবাকালে কোন দিন তিনি কোন কাজের উপর আমাকে ধমক দিয়া বলেন নাই যে, এই কাজ এইরূপ কেন করিলে? বা কোন কাজ না করার উপর তিনি বলেন নাই যে, ইহা এইরূপে কেন কর নাই?

পশুর দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হইলে

২৫৮৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বোবা জাত পশুর অপরাধের ক্ষতিপুরণ নাই। খনি খুদাই করাকালে কেহ আহত বা নিহত হইলে উহারও কোন ক্ষতিপুরণ নাই। কূপ খুদাই করাকালে কেহ আহত বা নিহত হইলে উহার কোন ক্ষতিপুরণ নাই। অবশ্য ঐরূপ খুদাই করিয়া ভূগর্ভে খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলে উহার এক পঞ্চামাংশ বাইতুল-মালকে দিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—বোবা জাত পশুর দ্বারা সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে মোটামুটি মছআলাহ এই যে, যে সব ক্ষেত্রে অপরাধ নিছক পশুরই হয় একমাত্র সে ক্ষেত্রেই ক্ষতিপুরণ না আসিবার বিধান প্রযোয্য হইবে। যেমন—(১) কোন পশু উহার সঙ্গে আরোহী নাই, পরিচালক নাই, উহাকে কেহ কোন প্রকার উস্কানী দেয় নাই—সে নিজ গতিতে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকরূপে চলিয়া কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (২) কোন পশু উহার উপর আরোহী রহিয়াছে বা উহার সঙ্গে পরিচালক রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চালনায় ক্ষতি সাধিত হয় নাই, বরং পশু স্বীয় অতিরিক্ত ক্রিয়ার আঘাতে ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং সেই ক্রিয়া আরোহী বা পরিচালকের আয়ত্তের বাহিরে। যেমন, পথ চলা কালে পশু পেছনের পা দ্বারা লাথি মারিয়া বা লেজ দ্বারা ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৩) আরোহী বা পরিচালক পূর্ণরূপে পশুকে শান্ত ও স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত করিতে ছিল, এমতাবস্থায় পশুটি উশৃঙ্খল হইয়া চালকের প্রতিরোধ ভেদ করতঃ কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৪) কোন ব্যক্তি কেরায়ারূপে তাহার পশুর উপর সোয়ারী বহন করিয়া নেয়, চালকের কোন অপরাধ ও ত্রুটি ব্যতিরেকে পশুর উপর হইতে আরোহী পতিত হইয়া নিহত হইয়াছে—এইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ বর্ত্তিবেনা।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ দানের বিধানও রহিয়াছে। যথা—(১) কাহারও পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, যেমন সর্ব্ব সাধারণের পথে আরোহী বা পরিচালক পশুকে চালাইয়া নিয়াছে সেই চলনে সম্মুখ বা পেছনের পায়ে পিষ্ট হইয়া, কিম্বা পশুর মাথার আঘাতে, কিম্বা তাহার কামড়ে, কিম্বা তাহার ধাক্কায়

কোন ক্ষতি সাধিত হইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে আরোহী বা পরিচালককে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (২) পশুকে কেহ হাঁকাইয়াছে, সেই পশুর গতিতে হাঁকানোর প্রতিক্রিয়া থাকা কালীন কোন ক্ষতি সাধিত হইলে যে ব্যক্তি হাঁকাইয়া ছিল তাহাকে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (৩) পশু পেছনের পা দ্বারা লাথি মারিয়া ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু সেই লাথি মারা আরোহী বা পরিচালকের ক্রিয়াজনিত ছিল—যেমন, তাহার লাগাম টানিবার বা ফিরাইবার কারণে উত্তেজিত হইয়া লাথি মারিয়াছে, কিম্বা সেস্থলে আরোহী বা পরিচালকের কোন ত্রুটি হইয়াছে, যেমন—আরোহী বা পরিচালক পশুকে পথে এমন স্থানে দাঁড় করাইয়াছে যে স্থানে পশু দাঁড় করাইবার জন্য নির্দ্ধারিত নহে এবং সেই অবস্থায় লাথি দ্বারা ক্ষতি করিয়াছে, এই সব ক্ষেত্রেও আরোহী বা পরিচালককে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (৪) পশুকে কেহ উস্কানী দিয়াছে তাহাতে পশু লাথি মারিয়া বা উশৃঙ্খল হইয়া কোন ক্ষতি সাধন করিয়াছে, তখন উস্কানীদাতাকে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে, অবশ্য উস্কানীদাতার ক্ষতি করিলে উহার ক্ষতিপুরণ আসিবে না। (৫) পশুর উপর কোন আরোহী বা মাল ছিল—অতি বেগে পরিচালনার দরুন বা অন্য কোন পরিচালন-ত্রুটিতে সোয়ারী পড়িয়া গিয়া নিহত হইয়াছে বা কোন ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে পরিচালককে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (৬) কাহারও কুকুর দংশন করে, পশু গুঁতা মারে—যে কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃকও মালিককে জ্ঞাত করার পরেও যদি মালিক তাহার কুকুর বা পশুকে নিয়ন্ত্রিত না করে তবে তাহাকেও ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে।

বোবাজাত পশুর দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে উভয় ধরণের বহুবিধ ক্ষেত্র ও স্থান রহিয়াছে যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমোসলেম নাগরিককে হত্যা করিলে

২৫৮৮। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا

অর্থ—আবছুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমোসলেম নাগরিককে হত্যা করিবে সে বেহেশতের খুশবু হইতেও বঞ্চিত থাকিবে। অথচ বেহেশতের খুশবু এরূপ জিনিষ যাহা সুদূর চল্লিশ বৎসরের পথ হইতেও অনুভব হইয়া থাকে।

মছআলাহ ঃ— অনুগত অমোসলেম নাগরিককেও হত্যা করা মহাপাপ যদিও সে কাফের। এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাব মতে জাগতিক শাস্তির বিধানেও সে একজন মোসলমানের সমান গণ্য হইবে। এবং কোন মোসলমান ব্যক্তি তাহাকে কেছাছের উপযোগীরূপে হত্যা করিলে বিচারে সেই মোসলমানকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হইবে। অবশ্য যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক বা নিরাপত্তার ভিসা বহনকারী না হয়, বরং বিদ্রোহী দেশের কাফের হয় তবে তাহাকে হত্যা করিলে সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না। যে হাদীছে কাফেরকে হত্যা করায় মোসলমানকে প্রাণদণ্ড না দেওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে উহার তাৎপর্য্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীই।

অমোসলেমকে হত্যা করার দণ্ডে মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দান

২৫৮৯। হাদীছ ঃ— আবু জোহায়ফা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোরআন ভিন্ন ওহীর অন্য বিশেষ কোন কিছু আপনার নিকট আছে কি? তিনি শপথ করিয়া উহা অস্বীকার করতঃ বলিলেন, যেই মহান আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি—কোরআন ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ এলম আমার নিকট নাই। কোরআনেরই জ্ঞান যাহা আল্লাহ মানুষকে দিয়া থাকেন তাহা আছে, আর আছে এই একখানা লিপির বিষয়বস্তু। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত লিপিতে কি আছে? তিনি বলিলেন, উহাতে আছে—বিশেষ শ্রেণীর হত্যা বা অঙ্গহানীর বিনিময়-পণের বিধান এবং মোসলমান বন্দীকে কাফেরদের হস্ত হইতে (ধন-বল ব্যয় করিয়া) মুক্ত করিয়া আনার ফজিলত। আর এই কথা যে, কোন মোসলমানকে অমোসলেম-হত্যার দরুণ প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ— অমোসলেম হত্যার দায়ে মোসলমানকে প্রাণদণ্ড না দেওয়ার যে কথা এস্থানে উল্লেখ হইল ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ভিন্ন অন্য ইমামগণের মত ইহাই। যে—দেশী-বিদেশী, অনুগত-অননুগত যে কোন শ্রেণীর অমোসলেমকেই কোন মোসলমান ব্যক্তি হত্যা করিলে সেই ক্ষেত্রে মোসলমান ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না। অবশ্য কোন জিম্মী তথা—দেশীয় অনুগত অমোসলেম নাগরিককে হত্যা করা হইলে সেই ক্ষেত্রে হত্যার বিনিময়-পণ অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) উল্লেখিত হাদীছের বিষয়বস্তুকে জিম্মী তথা দেশীয় অনুগত নাগরিক ভিন্ন অন্য অমোসলেমদের ক্ষেত্রের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জিম্মী অমোসলেম হত্যাকারী মোসলমানকে মোসলমান হত্যাকারীর

ন্যায়ই প্রণদণ্ড দেওয়া হইবে। কারণ দেশের অনুগত নাগরিক অমোসলেম হইলেও সে তাহার জান-মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তা মোসলমান নাগরিকদের সমানই লাভ করিবে।

"মোর্‌তাদ" তথা ইসলাম-ত্যাগী কাফের সম্পর্কেঃ

দ্বীন-ইসলাম পরিত্যাগকারীকে "মোর্‌তাদ্‌" বলা হয়—চাই সরাসরি পরিত্যাগ করা হউক বা এমন কোন আকিদা ও বিশ্বাস অবলম্বন করা হউক বা এমন কোন কার্য্য করা হউক কিম্বা এমন কোন উক্তি করা হউক যদ্দ্বারা দ্বীন-ইসলামের স্বীকৃতি ভঙ্গ হইয়া যায়। যেমন, কোরআন কিম্বা হাদীছের দ্বারা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণীত কোন আকিদাকে প্রত্যাখ্যান করা বা ঐরূপ কোন আকিদার বিপরিত আকিদা অবলম্বন করা, কোরআন কিম্বা হাদীছের দ্বারা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণীত কোন শরীয়তের হুকুমকে অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করা উহার প্রতি বিদ্রুপ করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলা ও গণ্য করা, দ্বীন ইসলামের মূল—আল্লাহ, আল্লার কোরআন, আল্লার রসুল সম্পর্কে অপমানজনক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক, উপেক্ষা ও অবজ্ঞাজনক বা বিদ্রুপাত্তক উক্তি করা, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সর্ব্ব শেষ নবী গণ্য না করা, এমন কোন কাজ করা যাহা একমাত্র কাফেরগণই করিয়া থাকে বা একমাত্র কাফেরের পক্ষেই উহা করা সম্ভব হইতে পারে। যথা—দেব-দেবীকে সেজদা করা, (নাউজু বিল্লাহ) পবিত্র কোরআন শরীফ পায়খানায় নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে দিলের আকিদা শুদ্ধ থাকিলেও বিনা ওজরে ঐরূপ কার্য্য করিলে বা উক্তি করিলে কাফের মোর্‌তাদ্‌ হইয়া যাইবে। এমনকি বিনা ওজরে হাসি-ঠাট্টারূপে করিলেও ঐ হুকুমই বলবৎ করা হইবে বলিয়া ইমামগণ মত্‌ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক, অবশ্য যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঐরূপ কাজ বা উক্তি করিতে বাধ্য হয় এবং দিলের ঈমানকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় রাখিয়া শুধু বাহ্যতঃ উহা করিয়া ফেলে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার দিলের অবস্থাকে কবুল করিয়া বাহ্যিক কার্য্যটা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

মোরতাদ্‌ সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, ইসলাম পুনঃ গ্রহণের সুযোগ দানার্থে তাহাকে তিন দিন অবকাশ দেওয়া হইবে এবং আবদ্ধ রাখিয়া ইসলামের জন্য বুঝ-প্রবোধ দেওয়া হইবে। যদি ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তবে পুরুষ হইলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে, আর মহিলা হইলে তাহাকে কতল করা হইবে না, ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন করা পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ রাখিয়া শাস্তি প্রদান করতঃ ইসলামের জন্য বাধ্য করা হইবে। (ফত্‌ওয়া শামী—৩)

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ইমাম জুহ্‌রীর মতে মহিলা মোরতাদকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে।

জবরদস্তিমুলক কোন কাফেরকে মোসলমান করার নীতি ইসলামে নাই, কিন্তু মোসলমানকে কাফের হইয়া যাওয়ার সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হইবে না—কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে হইবে। ইহা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বাভাবিক আইন। সুতরাং মোরতাদকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যুক্তি সঙ্গতই বটে।

২৫৯০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কবিরা গোনাহগুলি কি কি? তদুত্তরে হযরত নবী (দঃ) সর্ব্বপ্রথম বলিলেন, শেরেকী গোনাহ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, তারপর মাতা-পিতার নাফরমানী করা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, তারপর মিথ্যা কসম—বিশেষতঃ মিথ্যা কসম দ্বারা অন্যের কোন জিনিষ হস্তগত করা।

২৫৯১। হাদীছঃ— عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে আমরা যে সব পাপ করিয়া ছিলাম উহার খেসারত আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহাকে ইসলাম-পূর্ব্ব পাপের খেসারত ভুগিতে হইবে না। আর যে ব্যক্তি মোনাফেকীরূপে ইসলাম প্রকাশ করিবে সে পূর্ব্বের ও পরের সব পাপেরই আজাব ভোগ করিবে।

মোর্‌তাদ্ হইলে তাহার সমুদয় নেক আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ

اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"মোসলমানদের মধ্য হইতে যাহারা ধর্ম্ম-চ্যুত হইবে এবং কুফরি অবস্থায়ই মরিবে তাহাদের সমুদয় আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে—তুনিয়ার দিক দিয়াও আখেরাতের দিক দিয়াও এবং তাহারা হইবে দোযখী। চিরকাল তাহারা দোযখবাসী হইয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—তুনিয়ার দিক দিয়া আমল বিনষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, সে দীর্ঘ দিন মোসলমান নেক আমলকারী থাকা সত্ত্বেও মোর্‌তাদ্ হওয়ার কারণে তাহার জানাযা পড়া হইবে না, মোসলমানদের কবরস্থানে তাহাকে দাফন করা যাইবে না এবং মোর্‌তাদ্ সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোসলমান স্ত্রীর বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি ওয়ারেসদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাকে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিলে উহার বিচার হইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর আখেরাতের দিক দিয়া বিনষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, সারা জীবন লক্ষ লক্ষ নেক আমল করিয়া থাকিলেও উহার উপর বিন্দু মাত্র ছওয়াব সে পাইবে না এবং সাধারণ কাফেরদের ন্যায় চিরজাহান্নামী হইবে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ

وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"যাহারা আল্লার সঙ্গে কুফুরী করিবে ঈমান গ্রহণের পর—ঐ লোক ব্যতীত যে অপারগ হইয়া বাহ্যতঃ উহা করিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর সুদৃঢ় রহিয়াছে ঈমানের উপর; অবশ্য যাহারা খোলা অন্তরে কুফুরি অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের উপর আল্লার গজব এবং তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।"

(১৪ পারা—১৪ রুকু)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا

كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا

"নিশ্চয় যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়া অতঃপর কুফুরী করিবে, তারপর পুনরায় ঈমান গ্রহণ করিয়া আবার কুফুরী করিবে এবং কুফুরীর উপরই জীবন কাটাইয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার মোটেই করিবেন না যে, তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দেন এবং তাহাদের নাজাতের পথ করিয়া দেন।"

মোর্‌তাদ্‌কে হত্যা করা হইবে

২৫৯২। ছাদীছঃ একরেমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা আলী (রাঃ)-এর নিকট একদল লোককে উপস্থিত করা হইল যাহারা (আলী (রাঃ)কে খোদা বলিয়া) জিন্দীক মোর্‌তাদ্ হইয়াছিল। আলী (রাঃ) তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া দিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া বলিলেন, আমি শাসনকর্ত্তা হইলে তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইতাম না। কারণ, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন—তোমরা আল্লার আজাব তথা আগুণে পোড়াইবার শাস্তি কাহাকেও প্রদান করিও না। অবশ্য আমি তাহাদিগকে হত্যা করিতাম, কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করিবে তাহাকে কতল করিয়া ফেল।

২৫৯৩। ছাদীছঃ— আবু বোরদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু মূছা (রাঃ) এবং মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্ত্তা বানাইয়া পাঠাইয়া ছিলেন। ইয়ামান দেশ দুইটি এলাকায় বিভক্ত ছিল, (তাই এক এক এলাকার জন্য এক একজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।) তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ এলাকার দায়িত্বে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের নীতি ছিল—একজন অপর জনের এলাকার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় অবশ্যই পরস্পর সাক্ষাৎ ও সালাম-কালাম করিয়া যাইতেন।

একদা মোয়াজ (রাঃ) আবু মূছার নিকট দিয়া যাইতে তাঁহার সাক্ষাতে আসিলেন। দেখিলেন, আবু মূছা (রাঃ) বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে অনেক লোকের ভিড়, আর এক ব্যক্তিকে উভয় হস্ত ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। মোয়াজ (রাঃ) আবু মূছা (রাঃ)কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইহুদী ছিল, পরে মোসলমান হইয়া ছিল ; এখন সে ইসলাম ত্যাগ করতঃ পুনরায় ইহুদী (তথা মোর্‌তাদ) হইয়া গিয়াছে। মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে প্রাণদণ্ড না দিলে আমি আপনার নিকট অবতরণ করিব না। আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্যই তাহাকে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে, আপনি অবতরণ করুন। মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, প্রথমে তাহার প্রাণদণ্ড কার্য্যকারী করুন, তারপর আমি অবতরণ করিব। আবু মূছা (রাঃ) প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন ; তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে তাহাজ্জোদ নামায সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। আবু মুছা (রাঃ) বলিলেন, প্রতি রাত্রে আমি পর পর একাধিক বার জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জোদ নামাযে কোরআন শরীফ তেলাওত করিয়া থাকি। মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, আমি নিদ্রার অংশে নিদ্রা পূর্ণ করিয়া জাগ্রত হই এবং আল্লাহ প্রদত্ত তৌফিক অনুযায়ী তাহাজ্জোদ নামাযে কোরআন তেলাওত করি। তাহাজ্জোদ নামাযে যেরূপ ছওয়াবের আশা রাখি তদ্রূপ নিদ্রায়ও ছওয়াবের আশা রাখি। (কারণ, তাহাজ্জোদ নামাযের জন্য স্বাস্থ-বল ঠিক রাখার নিয়্যতেই নিদ্রা যাওয়া হয়।)

ইসলামের কোন ফরজ হুকুম মান্য করিতে অস্বীকার করিলে মোর্‌তাদ্ হইবে ; ঐরূপ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগের পর খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে এক দল লোক ইসলামের কলেমা ও ইসলামের সমুদয় হুকুম-আহকামের স্বীকৃতির উপর থাকিয়া শুধু কেবল যাকাতকে এন্‌কার করিয়াছিল—যাকাত আদায় করা ফরজ তাহা মান্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। তাহাদিগকে মোর্‌তাদ্ কাফের গণ্য করতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হইয়াছিল।

প্রকাশ থাকে যে, ফরজ-ওয়াজেব ভিন্ন কোন সুন্নতও যদি আকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত থাকে, তবে সেইরূপ সুন্নতকেও সুন্নত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। উহা সুন্নত হওয়া অস্বীকার করিলে বা উহার প্রতি এনকার ও বিদ্রূপ করিলে কাফের সাব্যস্ত হইবে। যেমন--মেছওয়াক করা সুন্নত, যাহা বহু সংখ্যক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। উহা সুন্নত হওয়া অস্বীকার করিলে কাফের সাব্যস্ত হইবে। (এক্‌ফারুল-মোলহেদীন)

আল্লার রসুলকে মন্দ বলিলে

মছআলাহ :—আল্লার রসুলকে মন্দ বলিলে মোর্‌তাদ্ হইয়া যাইবে। এমনকি কোন কোন ফকীহ আলেমের মতে যদি সে পরে তওবা করে এবং খাঁটী তওবা হয় তবে হয়ত আখেরাতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু জাগতিক বিচারে তওবা করার পরও তাহাকে শাস্তি স্বরূপ কতল করিয়া দেওয়া হইবে। আর কোন জিম্মী তথা অমোসলেম অনুগত নাগরিক ঐরূপ করিলে তাহাকে বিদ্রোহী গণ্য করিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি অস্পষ্ট ভাষায় তাহা করে তবে প্রমাণের অভাব হেতু প্রাণদণ্ড মৌকুফ থাকিবে, যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা—

২৫৭৪। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী ব্যক্তি হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া গমনকালে (সালামের ভান করিয়া "আচ্ছালামু আলাইকা" বলার পরিবর্ত্তে) "আচ্ছামু আলাইকা" বলিল (—"আচ্ছালামু শব্দের স্থলে "আচ্ছামু" শব্দ বলিল—যাহার অর্থ 'মৃত্যু' ; অর্থাৎ আপনার উপর মৃত্যু পতিত হউক।) হযরত (দঃ) তাহার উত্তরে বলিলেন, আলাইকা—তোমার উপর। অতঃপর হযরত (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি সে কি বলিয়াছে ? সে বলিয়াছে, আচ্ছামু আলাইকা। ছাহাবীগণ বলিলেন, তাহাকে কতল করিয়া দিব কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। অবশ্য ইহুদ-নাছারাগণ তোমাদিগকে সালাম করিলে (যেহেতু তাহারা সালামের ভান করিয়া অনেক সময় আচ্ছামু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাই) তোমরা উত্তরে বলিয়া দিও আলাইকুম—তোমাদের উপর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মোর্‌তাদের যে সংজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইসলমামের কলেমা ইত্যাদির পূর্ণ স্বীকারোক্তি বরং নামায-রোযা ইত্যাদির পাবন্দীর সহিতও মানুষ মোর্‌তাদ শ্রেণীর কাফের হইতে পারে (এক্‌ফারুল-মোলহেদীন)। উপরোল্লেখিল পরিচ্ছেদদ্বয়ে ইমাম বোখারী (রঃ) উহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, ইসলামের কলেমা ইত্যাদির স্বীকারোক্তির সহিত কেহ কোন ফরজ হুকুমকে অস্বীকার করিলে সে মোরতাদ কাফের সাব্যস্ত হইবে। তদ্রূপ ইসলামের স্বীকৃতি কর্ত্তনকারী কোন কাজ করিলে, যেমন—হযরত নবী (দঃ)কে মন্দ বলিলে ঐরূপ ব্যক্তি মোরতাদ কাফের সাব্যস্ত হইবে।

কলেমার স্বীকৃতি ও নামায-রোযার পাবন্দির সহিত যাহারা বিভিন্ন কারণে মোরতাদ গণ্য হয় এই শ্রেণীর কোন কোন মোরতাদকে ইসলামের পরিভাষায় বিশেষ বিশেষ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যেমন—

(১) মোল্‌হেদ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের দাবী ও ইসলামের কলেমা ইত্যাদির স্বীকারোক্তি করিলেও কোরআন-হাদীছ বা ইসলামী মতবাদের কোন বিষয়ে গর্হিত ব্যাখ্যার আড়ালে গোঁজামিল হেরফের ও বিতর্কের আশ্রয় লইয়া ইসলামের কোন সুস্পষ্ট মতবাদের পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করে (ফয়জুল বারী ৪—৪৭৩)। যেমন—কোন ব্যক্তি ইসলামের কলেমা স্বীকার করে নামায-রোযার পাবন্দী করে কোরআন পাকও তেলাওয়াত করে, কিন্তু সে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর অন্য কাহাকেও নবী বলিয়া বিশ্বাস বা স্বীকার করে—এইরূপ ব্যক্তি "মোল্‌হেদ" নামীয় মোরতাদ কাফের সাব্যস্ত হইবে। কারণ, ইসলামের একটি সুস্পষ্ট মতবাদ এই যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) খাতেমুন-নাবীয়্যীন

তথা সর্ব্বশেষ নবী ; তাঁহার পরে কোন প্রকারের কোন নূতন নবী আসিবেন না। তদ্রূপ যদি কেহ যাকাত ফরজ না হওয়ার মত পোষণ করে. ইত্যাদি।

(২) জিন্দীক্—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের সব কিছুই স্বীকার করে কিন্তু ইসলামের সুস্পষ্ট মতবাদ বা হুকুম-আহকামের কোন একটির এরূপ ব্যাখ্যা করে যে ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়তে বিদ্যমান ব্যাখ্যার তথা ছাহাবীদের, তাবেয়ীদের এবং পূর্ব্বাপর মোসলেম জন সমাজে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত গরমিল ব্যাখ্যা। যেমন কোন ব্যক্তি ইসলামের রোকন "ছালাত" তথা নামাযকে স্বীকার করে, কিন্তু ছালাতের এরূপ আজগুবী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে যাহাতে রুকু-সেজদা নাই, কোরআন তেলাওয়াত নাই– মোসলেম সমাজে প্রচলিত নামাযের কোন কিছুই নাই। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে খাতেমুন-নাবীয়্যীন স্বীকার করে, কিন্তু খাতেমুন-নাবীয়্যীনের এরূপ আজগুবী ব্যাখ্যা করে যাহাতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে অন্য নবীর আবীর্ভাবেও উহা ক্ষুণ্ণ না হয়। কোন ব্যক্তি বেহেশ্ত-দোযখকে বিশ্বাস করে, কিন্তু বেহেশ্তের ব্যাখ্যা করে শুধু কেবল আত্মার আনন্দ এবং দোযখের ব্যাখ্যা করে শুধু কেবল আত্মার অনুতাপ ও পরিতাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। (ফয়জুল বারী, ৪—৪৭২, এক্ফারুল মোল্হেদীন)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) মোল্হেদ শ্রেণীর মোরতাদ কাফেরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের হুকুম বয়ান করিয়াছেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

মোল্হেদ শ্রেণীর মোরতাদের মধ্যেই একটি বিশেষ দল রহিয়াছে "খারেজী ফের্কা"। মোসলেম সমাজে আবিভূ'ত সর্ব্ব প্রথম বিভ্রান্ত গোমরাহ্ ভ্রষ্ট ফের্কা বা উপদলই ছিল এই খারেজী ফের্কা। খারেজী ফের্কার ভ্রষ্টতার কাহিনী সুদীর্ঘ এবং মোসলমানদের ক্ষতি সাধনে ও দ্বীন-ইসলামের মুলে কুঠারাঘাত হানায় তাহাদের জঘন্য ভূমিকা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং উহার ইতিহাস সুবিস্তীর্ণ। বক্ষমান কেতাবের পরিশিষ্টে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেই ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা হইবে। এই উপদলটির প্রতি অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশার্থে ইমাম বোখারী (রঃ) মোলহেদ শ্রেণীর মোরতাদ কাফেরের বয়ান-পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে উহার নাম উল্লেখ করিয়া উহার বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ছয়টি হাদীছ বয়ান করিয়াছেন এবং ৬২৪ পৃঃ হইতে আরও একখানা হাদীছ অনুবাদে শমিল করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছসমূহে মোসলমানদের মধ্যে আবিভূ'ত একটি বিশেষ দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ রহিয়াছে। সেই দলটি ইসলামের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধনকারী, ইসলাম বহিভূ'ত দল

বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে এবং ঐ দলটির প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতিশয় ক্রোধ ও কোপের প্রকাশও রহিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) ঐ হাদীছসমূহকে খারেজী ফের্কার আলোচনায় উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উল্লেখিত হাদীছসমূহে বর্ণিত উপদলটি এই খারেজী ফের্কাই। খারেজী ফের্কার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

ইসলামের তৃতীয় মহান ব্যক্তি ও তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসনকালে হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেকীরূপে মোসলেম সমাজে শামিল হইয়াছিল এবং সে নূতন পুরাতন মোনাফেকদেরকে একত্রিত করিয়া মোসলমানদের ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রসবাদী দল গঠন করিয়াছিল। এই দলটিই খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অপবাদ ও অপপ্রচারে লিপ্ত হইয়াছিল। ধোকা দিয়া তাহারা অনেক মোসলমানকেও দলে ভিড়াইয়াছিল। খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে নিজেদের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য তাহারা প্রকাশ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্‌লে-বাইত বিশেষতঃ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মহব্বৎ ও পক্ষাবলম্বনের ঘোষণা করিয়াছিল। আর তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলীফাদ্বয় আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)—এই তিন জনের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচারে লিপ্ত ছিল। এই পর্য্যায়ে উক্ত দলটির নাম করা হইত রাফেজী ফের্কা। রাফেজী অর্থ বিশৃঙ্খলাবাদী—আনুগত্য ত্যাগী। তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-তান্ত্রিক খলীফা ওসমানের আনুগত্য ত্যাগ করায় তাহাদিকে উক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই দলটিই হিজরী ৩৫ সনে খলীফা ওসমানকে হত্যা করিতে কৃতকার্য্য হইয়া পরবর্ত্তী খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গায়ে পড়িয়া এমন সব কেলেঙ্কারী করে যাহাতে আলী (রাঃ)ও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এবং ঐ সব কেলেঙ্কারীর ফলে মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ, সংশয় এবং দ্বিধা বিভক্তি অনিবার্য্যতঃ সৃষ্টি হইয়া পড়ে। তারপর তাহারা সুপরিকল্পিতরূপে মোসলমানদের সেই বিভেদ জিয়াইয়া রাখার ষড়যন্ত্র অবিরাম চালাইয়া যাইতে থাকে। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার নীতির প্রতিবাদী আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও মায়াবিয়া (রাঃ)—এই প্রতিপক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও বিরোধ অবসানের ব্যবস্থা বহু বারই সম্পন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ দলটির জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে প্রত্যেক বারই তাহা বানচাল হইয়া গিয়াছে ; যাহার ইতিহাস অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। যেহেতু আলী রাজিয়া-ল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে বস্তুতঃ তাহাদের কোন মহব্বতই ছিল না, শুধু কেবল

মোসলমানদের মধ্যে থাকিয়া মোসলমানদের পরস্পর বিরোধ জিয়াইয়া রাখার উদ্দেশ্যেই আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে তাহারা গা-ঢাকা দিয়া ছিল। তাই ৩৭ হিজরী সনে যখন আলী (রাঃ) এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে "তাহ্‌কীম" তথা উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দুই জন বিশিষ্ট ছাহাবীর সালিসী দ্বারা সমুদয় বিরোধের চিরঅবসান ঘটাইবার সুব্যবস্থা এমন দৃঢ়রূপে সম্পন্ন করা হইল যে, উহা বানচাল করার কোন অবকাশই উক্ত দলটির জন্য রহিল না; তখন তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াতের গহিত ব্যাখ্যা করিয়া আলী (রাঃ)কে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিল (নাউজু বিল্লাহে মিন্ জালেকা)।

সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরকাল ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা তাহারা প্রায় বার হাজার লোক নিজেদের দলে ভিড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর রাজধানী কুফার অনতি দুরে "হারুরা" নামক স্থানে তাহারা উক্ত সালিসী ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরূদ্ধে এক সম্মেলন করিল। উক্ত সম্মেলনে তাহারা শুধু আলী (রাঃ)কেই নয়, বরং তাহাদের মতামত বিরোধী সমুদয় মোসলেম সমাজকে কাফের সাব্যস্ত করিল*। তাহারা মোসলমান-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং মোসলমানদের ধন-জন লুণ্ঠন করার সিদ্ধান্তও নিল, যেরূপ সাধারণ কাফেরদের বিরুদ্ধে করা হয়।

তাহাদের এই জঘন্য আকিদা ও মতবাদ সূত্রেই অবশেষে তাহারা একযোগে আলী (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে হত্যা করার গোপন যড়যন্ত্র করিল এবং নির্দ্ধারিত একই তারিখে উক্ত তিন জনের উপর আক্রমণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘাতক নিয়োগ করিল। ফজরের নামাযে উপস্থিতির পথে আক্রমণ করা হইল। আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) অসুস্থতার দরুণ ঐ তারিখে নিজ গৃহে নামায আদায় করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি নামায পড়াইবার জন্য মসজিদে আসিতেছিলেন, তিনি ঘাতকের আক্রমণে নিহত হইলেন—এইরূপে আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) রক্ষা পাইলেন। মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর আক্রমণ হইল তিনি গুরুতররূপে আহত হইলেন, কিন্তু চিকিৎসার অছিলায় তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। আলী

---

* বর্ত্তমান যুগে যেরূপ কাদিয়ানী ফের্কা; তাহাদের গহিত নবী মির্জ্জা গোলাম আহমদকে অস্বীকারকারী সমুদয় মোসলেম সমাজকে তাহারা কাফের বলিয়া থাকে।

রাজিয়াল্লাহু আনহুর আঘাত এরূপ ভীষণ ছিল যে, কোন প্রকার চিকিৎসাই ফলদায়ক হইল না, তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। তাঁহার ঘাতকের নাম ছিল আবদুর রহমান ইবনে মোলজেম খারেজী।

এই উপদলটি পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যার আড়ালে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী আরও অনেক মতামতের জন্মই দিতেছিল। এই পর্য্যায়ে উক্ত দলটির নাম করা হইয়াছিল "খারেজী ফের্কা" খারেজী অর্থ দল ত্যাগী। দীর্ঘ দিন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দলে ভিড়িয়া থাকিয়া তাঁহার দল ত্যাগ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের এই নাম করা হইয়া ছিল।

এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইল যে, রাফেজী ফের্কা ও খারেজী ফের্কা উভয় ফের্কারই মূল এক; তাহা হইল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী দল। এই সূত্রেই উক্ত উভয় দলকেই খারেজী নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইতিহাসের মূল গ্রন্থ সমূহে উভয় ফের্কাকেই খারেজী আখ্যায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই অর্থেই খারেজী ফের্কার উল্লেখ করিয়াছেন।

খারেজী ফের্কার মধ্যে যাহারা মোনাফেক ছিল তাহারা ত আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম কাফের সাব্যস্ত রহিয়াছেই। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মোনাফেকগণ জাহান্নামের সর্ব্বাধিক গভীর তলদেশে অবস্থান করিবে।" কিন্তু জাগতিক বিধি-বিধানে মোনাফেকগণ মোসলমানই গণ্য হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের দলে অনেক লোক এমনও ছিল যাহারা পূর্ব্ব হইতে মোনাফেক ছিল না—মোসলমানই ছিল, কিন্তু ঐ মূল খারেজী মোনাফেকদের প্ররোচনায় তাহারা খারেজীদের ইসলাম বিরোধী মতবাদগুলি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ছাহাবীগণের বিরুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মতে খারেজী ফের্কার গর্হিত মতবাদ ও পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দৃষ্টে ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অধিকাংশ ইমামগণ খারেজী ফের্কাকে মোরতাদ—ইসলাম ত্যাগী কাফের সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, খারেজী ফের্কা মোলহেদ শ্রেণীর একটি উপদল। মোলহেদ হইল—যাহারা কোরআন-হাদীছ বা ইসলামী কোন বিষয়ের অপব্যাখ্যার আড়ালে ইসলামের কোন সুস্পষ্ট মতবাদের পরিপন্থী মতবাদ অবলম্বন করে।

খারেজী ফের্কার লোকেরা সর্ব্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের যে আয়াত ও যে বিষয়ের অপব্যাখ্যার আড়ালে আলী (রাঃ) এবং তাঁহার পক্ষীয় ও বিপক্ষীয়

ছাহাবীগণকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া নিজেরাই কাফের হইয়াছিল তাহা ছিল এই যে, পবিত্র কোরআনে ঘোষণা রহিয়াছে—ان الحكم الا لله "ফয়ছালা করার অধিকার একমাত্র আল্লার জন্য।" পবিত্র কোরআনে আরও আছে—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

"যাহারা আল্লার কোরআন দ্বারা ফয়ছালা না করিবে তাহারা নিশ্চয়ই কাফের।" সুতরাং কোরআন ভিন্ন অন্য কিছুকে সালিস নিয়োগ করা কুফুরী। অতএব আলী (রাঃ) এবং উভয় পক্ষের সমস্ত ছাহাবী তাবেয়ী ও মোসলেম সমাজ ৩৭ হিজরী সনে আপসের বিরোধ মীমাংসার জন্য মানুষকে সালিস নিয়োগ করিয়া কাফের হইয়া গিয়াছেন।*

খারেজী ফের্কা ও মোল্‌হেদগণের বিরুদ্ধে জেহাদ করা

ইসলামের দাবী এবং ইসলামের কলেমার স্বীকৃতির সাথে যাহারা কোন বিতর্কের আড়ালে ইসলামের সুস্পষ্ট মতবাদ পরিপন্থী কোন মতবাদ অবলম্বন করে তাহাদিগকে মোলহেদ বলা হয়। তাহারা মোর্‌তাদ্—ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত। এইরূপ কোন দল বা শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ আকার ধারণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হইবে, অবশ্য যদি তাহারা কোন ভুলের বশীভুত হইয়া ঐরূপ মতবাদ অবলম্বন করিয়া থাকে তবে তাহাদের সেই ভুল নিরসনের চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐরূপ সর্ব্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদের পথ গ্রহণ করা হইবে। আর ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের প্রতি মোর্‌তাদের বিধান বলবৎ করা হইবে।

---

* আলী (রাঃ) তাহাদের এই গর্হিত মতবাদ ও অপব্যাখ্যার সহজ ও সরল উত্তর প্রদানে তাহাদিগকে বুঝাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন যে আকৃতিতে রহিয়াছে তাহা হইল—কাগজের উপর কালি দ্বারা লেখা আরবী অক্ষরের সমবায়ে গঠিত শব্দাবলীর সমষ্টি আয়াতের সমাবেশ। এই শব্দাবলীর সমষ্টি আয়াতনিচয় কোন প্রকার জীব নহে যাহা স্বয়ং কোন ফয়ছালা বা রায় দান করিতে পারে। বরং কোন মানুষ ঐ কোরআনকে অনুসরণ করিয়া উহা অনুযায়ী ফয়ছালা ও রায় দান করিবে—অন্য কোন প্রভাবে ফয়ছালা ও রায় দান করিবে না। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য্য।

৩৭ হিজরী সনের সালিসী প্রস্তাবে তাহাই করা হইয়াছে যে, দুইজন ছাহাবী কোরআন সম্মুখে রাখিয়া উহা অনুযায়ী উভয় পক্ষের বিরোধের ফয়ছালা করিয়া দিবেন। সুতরাং এই সালিসী প্রস্তাব বস্তুতঃ কোরআনের ফয়ছালা ও রায় দানেরই স্বাভাবিক আকার, কোরআনের ফয়ছালা ও রায় বাদ দেওয়া নহে। (বেদায়াহ-ওয়ান-নেহায়াহ)

২৫৯৫। হাদীছ ঃ— একদা আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন আমার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি, তখন হয়ত বাকচাতুরী—কথার মারপেঁচ অবলম্বন করি। কারণ, বিরোধীদের মোকাবিলায় কূটনীতি বিশেষ ফলপ্রসূ, কিন্তু যখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন হাদীছ বর্ণনা করি তখন উহা অবশ্যই হুবহু অবিকল সুস্পষ্টরূপের হইয়া থাকে। কসম খোদার— আমি আসমান হইতে জমিনে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে ধ্বংস হইয়া যাই উহাও আমার নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় যে, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে কোন কথা জাল করি—তিনি যাহা বলেন নাই তাহা হাদীছরূপে বর্ণনা করি।

আমি নিজ কানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, আমার সময়কাল শেষ হওয়ার পরে* অচিরেই একটি উপদলের আবির্ভাব হইবে, সেই দলের লোকগুলি কাঁচা বয়স ও কাঁচা বুদ্ধির হইবে। মানুষের নিকট উত্তম পরিগণিত কথা তাহারা বলিবে। তাহাদের ঈমান (শুধু মুখে থাকিবে—ঈমানের তাছির অন্তরে মোটেই হইবে না, এমনকি তাহাদের ঈমান) তাহাদের হলকোমের নীচে নামিবে না। তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে যেরূপ কোন জীবের প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর জীবটিকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তদ্রূপ তাহারাও দ্বীন-ইসলাম ছেদন করতঃ উহা হইতে বহির্ভূত হইবে।

ঐ শ্রেণীর লোকদিকে যথায় পাও তাহাদিগকে হত্যা করিবে, কারণ তাহাদেরকে হত্যা করার বহু ছওয়াব রহিয়াছে যাহা হত্যাকারী কেয়ামতের দিন লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—"মানুষের নিকট উত্তম পরিগণিত কথা তাহারা বলিবে" অর্থাৎ মুখে তাহারা ভাল ভাল কথা বলিবে, কিন্তু সেই ভাল কথার আসল তাছীর তাহাদের আমলে ও কার্য্য-কলাপে মোটেই হইবে না। অধিকন্তু তাহারা ঐ ভাল কথা তাহাদের ইসলাম বিধ্বংসী খারাব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করিবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে ঐ শ্রেণীর একটি তথ্য উল্লেখও করিয়াছেন—

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللّٰهِ وَقَالَ اِنَّهُمْ اِنْطَلَقُوْا اِلٰى

اٰيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

---

* মোসলেম শরীফের এক হাদীছ উল্লেখ আছে— سيكون بعدى من امتى

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খারেজী ফের্কার লোকদেরকে আল্লার সৃষ্টির মধ্যে জঘন্যতম গণ্য করিতেন। এবং তিনি বলিয়াছেন, ঐ ফের্কার লোকেরা কাফেরদের সম্পর্কে অবতারিত আয়াত সমূহকে মোমেন মোসলমানদের উপর প্রয়োগ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যে কথাটি বলিয়াছেন ইহা খারেজী ফের্কার একটি বৃহত্তম অপকর্ম্ম এবং ভয়ঙ্কর মতবাদ। এই অপকর্ম্মের দ্বারাই তাহারা অসংখ্য ছাহাবী এবং সাধারণ মোসলমানগণকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল। মোসলমানগণকে, এমনকি বড় বড় ছাহাবীগণকে হত্যা করিয়াছিল, বিজয়ের সুযোগে তাহাদের মতবিরোধী মোসলমানদের ধন-সম্পত্তি লুট করিয়াছিল এবং সেই মোসলমানদের পরিবার-পরিজনকে যুদ্ধবন্দী করিয়া কাফেরদের ন্যায় গোলাম বান্দী বানাইয়াছিল।

আলোচ্য হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উল্লেখিত দলের লোকদিগকে হত্যা করার জন্য মোসলমানদের প্রতি নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। মোসলেম শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে স্বয়ং নিজের সম্পর্কে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد "আমি তাহাদের আবির্ভাবের সময়কাল পাইলে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়া খোদাদ্রোহী অভিশপ্ত আ'দ জাতির ন্যায় ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্মূল করিয়া দিতাম।" মোসমলম শরীফেরই আর এক হাদীছে এবং ২৫৯৯ নং হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود "আমি তাহাদের আবির্ভাবের সময়কাল পাইলে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়া খোদাদ্রোহী অভিশপ্ত ছামূদ জাতির ন্যায় ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্মূল করিয়া দিতাম।"

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিনিচয়ের মধ্যে আ'দ ও ছামূদ জাতিদ্বয়ের অভিশাপ ও কলঙ্কময় ইতিহাস অত্যন্ত জঘন্য এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে যে ভাবে সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন তাহার কাহিনীও অতি ভয়ঙ্কর। সুতরাং উক্ত জাতিদ্বয়ের তুলনা ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে পরিমাণ ক্ষেদ ও ক্ষোভের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা অতি সুস্পষ্ট।

২৫৯৬। হাদীছঃ—দুইজন লোক ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হারুরিয়াহ্ ফের্কা সম্পর্কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে কিছু শুনিয়াছেন কি? আবু সায়ীদ (রাঃ) বলিলেন, "হারুরিয়াহ্" নাম উল্লেখ করিয়া হযরত (দঃ) কিছু বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না, অবশ্য আমি হযরত নবী (দঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি—এই উম্মতের মধ্যে এমন একটি

দল দেখা দিবে যাহাদের (বাহ্যিক অতি-ভক্তির রূপ এমন হইবে যে, তাহাদের) নামাযের সম্মুখে তোমাদের (তথা খাঁটী মোসলমান জন সাধারণের) নামাযকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা কোরআনও তেলাওয়াত করিবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলকুমের নীচে উতরিবে না। (অর্থাৎ অন্তরে উহার কোন তাছীর থাকিবে না।)

তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে ছিন্ন ও বহির্ভূত হইবে ঠিক সেইরূপে যেরূপে শিকারের প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর অতিশয় দ্রুতগতিতে শিকারটিকে ভেদ করিয়া এমনভাবে বাহির হইয়া যায় যে, ঐ জীবটির রক্ত মাংসের কোন চিহ্ন সেই তীরের মধ্যে নজরে আসে না—উহার ফলার মধ্যেও নয়, হাতলের মধ্যেও নয়, হামি বা লৌহ বন্ধনীর মধ্যেও নয়। অবশ্য হাতলের নিম্নভাগে লৌহ বন্ধনীর মধ্যে হয়ত কিছু নিদর্শনের সন্দেহ মাত্র হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—"হারুরিয়াহ্" ফের্কা খারেজী ফের্কারই আর এক নাম। কুফা নগরী অঞ্চলে একটি বিশেষ বস্তির নাম "হারুরা"। খারেজী ফের্কার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রথম ও অন্যতম সম্মেলন ঐ বস্তিতে হইয়া ছিল, তাই খারেজী ফের্কাকে এই নামের আখ্যাও দেওয়া হয়।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এস্থলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ দলটি এই উম্মতের মধ্যে দেখা দিবে ; হযরত (দঃ) এরূপ বলেন নাই যে, ঐ দলটি এই উম্মত হইতে দেখা দিবে বা বাহির হইবে।

ছাহাবী আবু সায়ীদ (রাঃ) "মধ্যে" ও "হইতে" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে, উক্ত দলটি মোসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অন্তর্ভুক্ত ছিলও না, বরং ঐ দলের প্রতিষ্ঠাতাগণ হইবে পাক্কা মোনাফেক—যাহাদের অবস্থা এই হয় যে, বস্তুতঃ তাহারা বেদ্বীন কাফের থাকিয়াই বাহ্যতঃ মোসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। এই ভাবে তাহারা মোসলমানদের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু মোসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকে না, কাফেরই থাকে। অতঃপর যখন বাহ্যতঃও স্বীয় কার্য্য-কলাপ দ্বারা ইসলাম বহির্ভূত হয় তখন ত তাহাদের কাফের হওয়া প্রকাশই হইয়া পড়ে। মোনাফেকদের এই অবস্থা পবিত্র কোরআনে কি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

"মোনাফেক দল তোমাদের মজলিসে আসিয়া বলে, আমরা ঈমান আনিলাম ; বস্তুতঃ তাহাদের অবস্থা এই যে, তাহারা আসিয়াও ছিল কুফরীর সাথে চলিয়াও যায় কুফরীর সাথে।" অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সব সময়ই তাহারা কাফের।

এস্থলেও তদ্রূপই যে, মোসলমানের দলে শামিল হওয়ার পর তাহারা ইসলামকে ছেদন করতঃ উহা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে, এর পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন মোসলমানদের দলে শামিল হইয়াছিল তখনও তাহারা কাফের ছিল; শুধু বাহ্যতঃ মোনাফেকীরূপে মোসলমানদের সাথে শামিল ছিল।

সার কথা এই যে, পূর্ব্বাপর সব সময়ই ঐ দলের প্রতিষ্ঠাতাগণ ইসলাম হইতে বহির্ভূত, মোসলমানদের সহিত শামিল হওয়া শুধু মোনাফেকীরূপে।

তাহাদের ইসলাম বহির্ভূত হওয়াকে প্রত্যেক হাদীছেই যে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে তাহা অতিশয় তাৎপর্য্য পূর্ণ। দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, সজোরে নিক্ষিপ্ত অতি দ্রুতগামী তীর শিকার প্রাণীকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তীর বাহির হইয়াছে, এবং ঐ প্রাণীটির ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইয়াছে। খারেজী ফের্কা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও ইহাই যে, তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের হইতে বাহির হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও মোসলমানদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইবে।

২৫৯৭। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) একদা হারুরিয়াহ্ ফের্কার উল্লেখ করতঃ বলিলেন, (এই শ্রেণীর ফের্কা সম্পর্কে) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে তদ্রূপ বহির্ভূত যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর লক্ষ্য বস্তুকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

২৫৯৮। হাদীছ :— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গণিমত তথা জেহাদে বিজীত মাল লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ বনী-তমীম গোত্রীয় আবদুল্লাহ নামক শীর্ণ কোমর-বিশিষ্ট একটি লোক বলিয়া উঠিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ন্যায় ভাবে বণ্টন করুন (আপনি ন্যায় অবলম্বন করেন নাই)। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোর কপালে ধ্বংস—আমি ন্যায় অবলম্বন না করিলে আর কে তাহা করিবে? ওমর (রাঃ) উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই (মোনাফেকের) গর্দ্দান কাটিয়া ফেলি।

হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও; ভবিষ্যতে তাহার একটি ইতিহাস সৃষ্টি হইবে—তাহার সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হইবে যেই দলের লোকগুলি (বাহ্যিক দৃশ্যে এমন মুছল্লি-মোত্তাকীন দেখাইবে যে,) তাহাদের নামায দৃষ্টে তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ গণ্য করিবে, তাহাদের রোযা দৃষ্টে তোমরা তোমাদের রোযাকে তুচ্ছ গণ্য করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে ঐরূপ বহির্ভূত হইবে যেরূপ শিকারের প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর

শিকারটিকে এমন দ্রুত গতিতে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায় যে, রক্ত-মাংসের কোন চিহ্ন উহার (কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি গতি সোজা থাকার জন্য গোড়ায় লাগান) পালখেও পাওয়া যায় না, ফলায়ও পাওয়া যায় না, লৌহ বন্ধনীতেও পাওয়া যায় না, হাতলেও পাওয়া যায় না—এত দ্রুত গতিতেই উহা বাহির হইয়াছে যে, প্রাণীটির শরীরে প্রবাহমান রক্ত বা উহার ভুঁড়ি ভরা আবর্জ্জনা ঐ তীরকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ঐ দলের একটি পরিচয় এই যে, দলের মধ্যে একটি লোক হইবে যাহার এক হাত পঙ্গু—শুধু কনুই পর্য্যন্ত থাকিবে এবং ঐ পঙ্গু হাতটির মাথায় স্তনের বোঁটার ন্যায় ঝুলান একটি মাংসখণ্ড থাকিবে। মোসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির মুহূর্ত্তে ঐ দলটি আত্মপ্রকাশ করিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু সায়ীদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আমি উক্ত বিবরণ নিজ কানে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখ হইতে শুনিয়াছি এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আলী (রাঃ) (তাঁহার খেলাফৎকালে ঐ দলটির বিরুদ্ধে জেহাদ করিয়া) তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। নিহত লাশগুলির মধ্য হইতে উক্ত ব্যক্তির লাশ বাহির করা হইয়াছিল যাহা পূর্ণরূপে হযরত নবী (দঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—মুল হাদীছের অনুবাদে বর্দ্ধিত প্রথম বন্ধনীদ্বয়ের বিষয়বস্তু মোসলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি মোনাফেক ছিল, কারণ ওমর (রাঃ) যে, তাহাকে মোনাফেক বলিয়াছেন, হযরত (দঃ) উহা খণ্ডন করেন নাই।

মোসলেম শরীফের হাদীছে আরও উল্লেখ আছে, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)ও ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থী হইয়াছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকেও নিষেধ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছে আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) খারেজী ফের্কার পরিচয় ও উহার বাস্তবতা সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন মোসলেম শরীফে একাধিক হাদীছে স্বয়ং আলী (রাঃ) হইতেও ঐরূপ বয়ান উল্লেখ রহিয়াছে। আলী (রাঃ) বয়ান করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত দলটির পরিচয় বর্ণনায় বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি লোক হইবে কৃষ্ণ বর্ণের, তাহার একটি হাত পঙ্গু—কনুইর নিম্ন অংশ বিহীন, উহার অগ্র ভাগ স্তনের বোটার ন্যায় হইবে, তাহার উপর কতিপয় সাদা লোম থাকিবে।

হারুরিয়াহ্ বা খারেজী ফের্কার আবির্ভাব হইলে আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে এক রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন। সেই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর পক্ষের মাত্র দুইজন শহীদ হইয়াছিলেন। আর খারেজী দলের এত অধিক সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছিল যে, তাহাদের মৃতদেহের স্তূপ জমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ শেষে খলীফা আলী (রাঃ) বলিলেন, পঙ্গু হাতওয়ালাকে তালাশ করিয়া বাহির কর, কিন্তু ঐরূপ কোন লাশ পাওয়া গেল না। তখন আলী (রাঃ) বলিলেন, এই দলের পরিচয়ে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মিথ্যা বলেন নাই, আমিও মিথ্যা বর্ণনা করি নাই, অতএব ভালরূপে তালাশ কর। এই বলিয়া স্বয়ং আলী (রাঃ) লোকদেরকে সঙ্গে লইয়া উহার খোঁজ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি পতিত জায়গায় কতকগুলি লাশের স্তূপ দেখা গেল। আলী (রাঃ) ঐ লাশগুলি স্থানান্তরের আদেশ করিলেন। ঐরূপ করা হইলে সমস্ত লাশের তলদেশে সেই পঙ্গু হাতওয়ালার লাশ পাওয়া গেল। তখন খলীফা আলী (রাঃ) তকবীর ধ্বনী দিয়া বলিলেন, (পরিচয় বর্ণনায়—) আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন এবং রসুল (দঃ) তাহা সঠিকরূপে পৌঁছাইয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, হিজরী ৩৮ সনে "নহ্‌রওয়ান" স্থানে আলী (রাঃ) খারেজীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাইয়াছিলেন।

২৫৯৯। হাদীছঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আলী (রাঃ) ইয়ামান দেশ হইতে (ওয়াসিলকৃত বাইতুল-মালের প্রাপ্য) কিছু পরিমাণ অপরিশোধিত স্বর্ণ চামড়ার থলি ভরিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মাল সম্পূর্ণটাই চার জন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া দিলেন। একজন ছাহাবী এই সম্পর্কে উক্তি করিলেন যে, আমরা এই মাল পাইবার অধিক যোগ্য ছিলাম। এই উক্তির সংবাদ নবী (দঃ) জ্ঞাত হইলেন এবং (লোকদিগকে একত্রিত করিয়া) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করিয়াছেন; সকাল-বিকাল আমার নিকট (তাঁহার তরফ হইতে) ওহী আসিয়া থাকে। তোমরা আমাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য কর না কি?

এই সময় এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল—যাহার চোখদ্বয় গভীরস্থ ছিল, গণ্ডদ্বয় স্ফীত ছিল, ললাট উঁচু ছিল, দাড়ি ঘন ও মাথা মুড়া ছিল এবং পরিধেয় বস্ত্র গোছের মধ্যবর্ত্তী ছিল। সে (ভীষণ বেয়াদবী করিয়া) বলিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদাকে ভয় করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, পোড়া কপাল তোর! দুনিয়ার বুকে আমি কি খোদাকে সর্ব্বাধিক ভয় করিয়া থাকি না?

অতঃপর ঐ লোকটি তথা হইতে সরিয়া পড়িল। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ঐ লোকটার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া দেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে ত বোধ হয়—নামায পড়ে। খালেদ (রাঃ) বলিলেন, কত নামাযী শুধু মুখে ইসলামের দাবী করে যাহা অন্তরে নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অন্তর ছেদ করিয়া ভিতর ভেদ করিয়া দেখার জন্য আমাকে আদেশ করা হয় নাই। অর্থাৎ বাহ্যিক ইসলামের দাবীর দ্বারা জাগতিক নিরাপত্তার অধিকার লাভ হইয়া যায়। মোনাফেক দলের অবস্থা তাহাই; এই ব্যক্তিও মোনাফেকই ছিল।

লোকটি তথা হইতে সরিয়া পড়িলে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহারই সম্প্রদায়ে এমন দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা মধুর স্বরে কোরআন তেলাওত করিবে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে উহার কোন তাছীর হইবে না। তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে এইরূপ বহির্ভূত হইবে যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর শিকারকে ভেদ করিয়া পূর্ণ রূপে বাহির হইয়া যায়।

মনে পড়ে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন, আমি যদি ঐ দলের সময়কাল পাইতাম তবে আমি তাহাদিগকে ব্যাপক হারে হত্যা করিতাম। যেরূপে আল্লাহ ব্যাপক আজাব নাযেল করিয়া ছমূদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। (৬২৪ পৃঃ)

২৬০০। ছাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে হোনায়ফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি ইরাকের দিকে হাত তুলিয়া ইশারা করতঃ বলিলেন, ঐ অঞ্চল হইতে এমন একটি দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলকুমের নীচে উতরিবে না। তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর শিকার প্রাণীকে ছেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা :— হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সতর্কতাপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণরূপে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর মূল উদ্দেশ্য খারেজী ফের্কার দলটিই ছিল যাহাদিগকে হারুরিয়াও বলা হইত। হযরত (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত উক্ত দলের সমুদয় পরিচয় ও নিদর্শনই খারেজী ফের্কার মধ্যে বাস্তবায়িত দেখা গিয়াছে। এই ফের্কার মুল কেন্দ্র ছিল ইরাকস্থিত কুফা এলাকা। এই এলাকায়ই "হারুরা" নামক বস্তিতে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম ও অন্যতম সম্মেলন ৩৭ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল; উক্ত সম্মেলনেই তাহারা সুসঙ্গবদ্ধ দলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

২৬০১। ছাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় আসিবে না যাবৎ না পরস্পর যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে এমন দুইটি দল যাহাদের উভয়ের দাবী ও উদ্দেশ্য একই।

(উক্ত দল দুইটির বিবাদের সুযোগে আর একটি দল আত্মপ্রকাশ করিবে। যে দলটি দ্বীন-ইসলাম বহির্ভূত হইবে। এই দলটিকে প্রথমোক্ত দলদ্বয় হইতে যে দলের লোকেরা হত্যা ও নিধন করিবে সেই দল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী হইবে হক্ ও ন্যায়ের।)

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী শরীফের শরাহ্ ফত্হুলবারী কেতাব ১২—২৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়টি আলোচ্য হাদীছেরই অংশরূপে উদ্ধৃত আছে। এই হাদীছের পূর্ণ বিবরণে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে—

একটি হইল খারেজী ফের্কার সম্যক পরিচয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যাহা অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের উপর বর্ত্তিয়াছে। খারেজী ফের্কার মুল ব্যক্তিবর্গ যথা—আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা, গাফেকী ইবনে হর্‌ব ইত্যাদি লোকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানদার ছিল না, তাহারা ছিল মোনাফেক। খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে তাহারা গা-ঢাকা দিয়া মোসলমানদের দলভুক্ত হইয়া পড়ে এবং মোসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলার মূল উৎস নেজামে খেলাফৎ তথা সুশৃঙ্খল সুসঙ্গবদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর কুঠারাঘাত করার চেষ্টায় লাগিয়া যায়। সেমতে তাহারা খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অবাস্তব কুৎসা এবং তাঁহার শাসন-কার্য্য পরিচালনায় অলিক ও মনগড়া দুর্ণাম ছড়াইতে থাকে। তাহাদের ষড়যন্ত্র ও কলা-কৌশল শেষ পর্য্যন্ত সফলতা লাভ করে। এমনকি খলীফা ওসমান (রাঃ) তাহাদের সৃষ্ট ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলার কবলে পতিত হইয়া তাহাদেরই দলের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ গৃহে শহীদ হন।

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার পর ঐ মোনাফেক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল এই সত্য ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ সরাসরি খলীফা হইতে চাহিলে তাহাকে মোসলেম জাতি কখনও গ্রহণ করিবে না; তাই তাহারা আর এক ষড়যন্ত্র করিল। পরবর্ত্তী খলীফা আলী (রাঃ) নির্ব্বাচিত হওয়া সুনিশ্চিত ছিল; তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই ব্যাপারে তাহাদের জবরদস্তিমূলক ও স্বার্থজনিত মোড়লগিরী এবং ষড়যন্ত্রের দ্বারা শাসনযন্ত্রে তাহাদের বড় বড় পদ দখল করিয়া নেওয়ার দরুন ভাল কাজে মন্দ পরিণতি রূপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যাহার ফলে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ছাহাবা কেরামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গে এক জামাত ভাবিতেছিলেন যে, অসৎ লোকদের দ্বারা যে ঘটনা ঘটিয়াছে উহার জঘন্যতা ত সুস্পষ্ট, কিন্তু যথাসত্বর শাসনকর্ত্তা খলীফার স্থান পূর্ণ করতঃ

খেলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বারাই বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হইতে পারে। আলী (রাঃ) খলীফা নির্দ্ধারিত হইয়াছেন; অবিলম্বে তাঁহার খেলাফতকে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করা হউক। অপর পক্ষে তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের সঙ্গে এক জামাত বলিতেছিলেন—অসৎ লোকদের ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে নেজামে-খেলাফৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর মদিনায় তাহাদেরই প্রাধান্য ও বিদ্রোহ জনিত ঘোলাটে পরিস্থিতিতে এবং হজ্জের দরুন বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের অনুপস্থিতিতে খেলাফত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং উহার কর্ম্মকর্ত্তা দলের পুরো ভাগ দখল করিয়া রাখিয়াছে ঐ অসৎ লোক দল যাহারা ইসলামের শক্তির উৎস নেজামে-খেলাফত ধ্বংস করার পরিকল্পনা লইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে হত্যা করিয়াছে। তাহারা শক্তিশালী হইলে ত আলী (রাঃ)কেও তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে। এই কাঠামোর খেলাফত দ্বারা ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোচ্ছেদ সুষ্ঠুরূপে হইতে পারিবে না। কারণ, ষড়যন্ত্রকারীরা এই কাঠামোতে এমন ব্যবস্থা রাখার প্রয়াস পাইয়াছে যাহাতে তাঁহাদেরে শায়েস্তা করা যাইবে না। সুতরাং উক্ত কাঠামোর খেলাফতের স্থলে নেতৃস্থানীয় সকল মোসলমানদের পরামর্শে গঠিত কাঠামোর খেলাফতের প্রয়োজন।

এই পক্ষের বিরোধিতার মূল লক্ষ্য ছিল—খলীফা হত্যাকারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দল কর্ত্তৃক খেলাফত কাঠামোতে বড় বড় পদ ও স্থান দখল করা। খেলাফত কাঠামো হইতে এই দস্যুদলের বিতাড়নই ছিল তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই তাঁহারা উহাদের শাস্তির দাবী লইয়া দাঁড়াইলেন।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত-কাঠামোতে সন্ত্রাসবাদী দল তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত জবরদস্তিমূলকভাবে এবং গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিল। তাই তালহা, যোবায়ের, মোয়াবিয়া ও আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষের ভয় হইতে ছিল যে, সন্ত্রাসবাদী দস্যু দলের শাস্তি এবং বিতাড়নের পূর্ব্বে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি দিলে এই খেলাফত-কাঠামোতে বড় বড় পদের দখলদার সন্ত্রাসবাদী খেলাফত ধ্বংসকারীদের অধিকতর সুবিধা হইয়া যাইবে এবং তাহাদের শক্তিশালী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। খেলাফত-কাঠামোতে ঐ দস্যুদলের দখল অবস্থায় আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ তাঁহারা বুঝিতেছিলেন—খেলাফত ধ্বংসযজ্ঞের নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করা। কাজেই তাঁহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতির পূর্ব্বে হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তির দাবীর উপর দৃঢ় থাকিলেন।

সার কথা—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা এই ছিল যে, প্রথমে সর্ব্বস্বীকৃত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে শান্তি স্বশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক, তারপর খলীফা হত্যাকারীদের বিচার হইবে। পক্ষান্তরে তালহা, যোবায়ের, আয়েশা ও মোয়াবিয়া (রাঃ)গণের ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে হত্যাকারীদের বিচার করিলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়িবে ফলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং নেজামে-খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সহজ সাধ্য হইবে।

এই নীতিগত মতবিরোধটি খুবই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ঐ অসৎ কুচক্রী লোকগণ প্রাধান্যের অধিকারী ছিল; তাহারা সর্ব্বদা ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অপর পক্ষের উপর আলী (রাঃ) দ্বারা চাপ প্রয়োগ করাইতে আরম্ভ করিল। অপর পক্ষ নব প্রতিষ্ঠিত খেলাফত-কাঠামোর সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ পদসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পদে ঐ অসৎ লোকদের দখল দেখিতেছিলেন এবং তাঁহাদের যে ধারণা ছিল—এই খেলাফত কাঠামো দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না, কারণ ষড়যন্ত্রকারী মূল অপরাধীরা এই খেলাফত-কাঠামোতে পদাধিকার লাভের প্রয়াস পাইবে। সেই ধারণা বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের নীতিতে অধিক মজবুত হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী অসৎ কুচক্রী লোকগণ আলী (রাঃ)কে বাধ্য করিল বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে। এইরূপে ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী অসৎ লোকগুলি ছাহাবা কেরামের নিছক নীতিগত বিরোধটাকে ধাপে ধাপে যুদ্ধে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইল। সেই অবস্থায়ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছাহাবা কেরামের উভয় পক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া এক হইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হওয়ার মুহূর্তে ঐ অসৎ কুচক্রী লোকগণ উহাকে বানচাল করিয়া দিয়াছে, যাহার বিবরণ সুদীর্ঘ ও অতিশয় হৃদয় বিদারক। উহারই আলোচনা করা হইবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে।

অসৎ লোকদের ষড়যন্ত্রে নীতিগত বিরোধ সামরিক বিরোধে পরিণত হওয়ার পর ঘটনা প্রবাহে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ ছিফ্‌ফীনের রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ছিল। এই সময় বিশিষ্ট ছাহাবী আম্‌র ইবনুল আ'ছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা হইয়াছিল—ঐ সময় পর্য্যন্ত উক্ত দুষ্কৃতিকারীরা সাধারণভাবে আলী (রাঃ)এর পক্ষে গা-ঢাকা দিয়াছিল। এই আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা-মুহূর্তে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতেও বাহির হইয়া গেল। এত দিন তাহারা শুধু ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার পর তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের পক্ষের ছাহাবীগণকে

গালি-গালাজ করিত, খারাব বলিত। এখন তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও ঐ পন্থা অবলম্বন করিল এবং ইসলামের সাধারণ আকিদা ও বিধানের বরখেলাফ কতিপয় আকিদা ও মতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক উভয় পক্ষ ছাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে একটি তৃতীয় দল সৃষ্টি করিয়া ইরাক অঞ্চলের কুফা এলাকাস্থিত "হারুরা" নামক স্থানে প্রায় বার হাজার লোকের সম্মেলনরূপে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিল। এবং কুফা-বছরা তথা ইরাকের মধ্যে তাহাদের কেন্দ্র কায়েম করিয়া তাহাদের ভ্রষ্ট মতবাদ ও উহার কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিল। ঐ সময় তাহাদের বিরুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর দলই রুখিয়া দাঁড়ায় এবং আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এমনকি ৩৮ হিজরী সনে "নাহ্‌রওয়ান" নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ তাহাদের বহু সংখ্যক সদস্য হত্যা করিতে সমর্থ হয়। আলোচ্য হাদীছে উক্ত খারেজী ফের্কার পরিচয়ে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই সব ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলী (রাঃ) এবং তাল্‌হা, যোবায়ের, আয়েশা ও মোয়াবিয়া (রাঃ) এই দুই পক্ষের মধ্যে খলীফা নির্ব্বাচনে নীতিগত বিরোধ সৃষ্টি হইয়া ছিল, কিন্তু উভয় দল ইসলামের গণ্ডিভুক্ত, বরং মোসলমানদের শীর্ষস্থানীয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দাবী এবং উদ্দেশ্যও একই ছিল—মোসলমানদের শক্তি, শান্তি ও শৃঙ্খলার হৃত উৎস সুষ্ঠু নেজামে-খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। দুষ্কৃতিকারীরা উভয় দলের সেই নীতিগত বিরোধের মূহূর্ত্তে দল গঠন করে এবং ইরাকস্থ কুফা এলাকায় ভিন্ন দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে; তাহারাই ছিল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তৃতীয় দল।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইল ছাহাবা কেরামের বিরোধমান পক্ষদ্বয়ের কার্য্যক্রমের সুষ্ঠুতা নির্ণয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) উভয় পক্ষকে দাবী ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সমপর্য্যায়ের ঘোষনা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহাই ছিল—উভয়ের দাবী ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম এবং মোসলমানদের শক্তি, শান্তি ও সুশৃঙ্খলার হৃত উৎস সুষ্ঠু নেজামে-খেলাফৎ পুনরুদ্ধার করা।* অতঃপর হযরত (দঃ) উভয় পক্ষের চুলচেরা মাননির্ণয়ের নিদর্শনেরও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যাহার বিস্তারিত বিবরণ এই—

---

* তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের পক্ষ যে, ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যাকারীদের বিচার দাবী করিতেছিলেন, উহা একটি বাহ্যিক শ্লোগান ছিল মাত্র এবং মূল দাবী উদ্ধারের পথ হইতে বাধা ও প্রতিবন্ধক অপসারণ ছিল মাত্র। তাঁহাদের আসল দাবী ও উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠু নেজামে-খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা করা যাহার মধ্যে ষড়যন্ত্রকারী মোনাফেক অসৎ লোকদের কোন হাত না থাকে, বরং তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ছেরাতে মোস্তাকিম তথা প্রকৃত হক্ ও ন্যায় পর্য্যায়টা মানুষের কার্য্যাবলীর প্রতি ক্ষেত্রেই আছে এবং উহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমিত আকারের সূক্ষ্ম পর্য্যায়। ছোট-বড় সর্ব্ব-প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিই উহার পরিপন্থী। অথচ নিষ্পাপ পয়গাম্বরগণ ব্যতীত অন্য কেহই সম্পুর্ণরূপে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হইতে পারে না। স্বয়ং হযরত (দঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন—استقيموا ولن تحصوا "অর্থাৎ তোমরা পূর্ণ মাত্রায় ছেরাতে-মোছতাকীমের উপর থাকিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবে, অবশ্য এই চেষ্টার সফলতায় পূর্ণতা লাভ তোমাদের সাধ্যে জুটিবে না; তথাপি তোমরা হাত-পা ছাড়িয়া দিবে না—আজীবন এই চেষ্টায় রত থাকিবে; এই চেষ্টায় রত থাকাই তোমাদের জীবনের সাফল্য।"

মানুষ সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত থাকিতে পারে না বলিয়াই হেদায়েত তথা সৎ পথের সীমা কিছুটা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে যে, হক্ ও ন্যায়ের নিকটবর্ত্তী থাকাকে হেদায়েত গণ্য করা হইয়াছে। হযরত (দঃ) উপরোক্ত হাদীছেই বলিয়াছেন—ولكن سددوا وقاربوا অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম তথা ছেরাতে-মোছতাকীমের সমুদয় পর্য্যায়কে তুমি জয় করিয়া ফেলিবে ইহাত তোমার সাধ্যে জুটিবে না, কিন্তু তোমাকে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বাত্মক চেষ্টায় যথাসাধ্য হক্ ও ন্যায়ের ধারে ধারে, নিকটে নিকটে থাকিয়া চলিতে হইবে। এই নিকটবর্ত্তিতায় যে যত অগ্রে হইতে পারিবে তাহার মর্য্যাদা ততটুকু বেশী হইবে। পক্ষান্তরে হক্ ও ন্যায় হইতে দুরে সরিয়া পড়াই হইল "দ্বালালত" —গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।

আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, উভয় পক্ষের যে পক্ষ তৃতীয় দলটিকে হত্যা ও নিধন করিবে সেই পক্ষ হক্ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী তথা অধিক হেদায়েত ও সৎপথের অধিকারী গণ্য হইবে।

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, ঐ দল নিধনকারী পক্ষকে হক্ ও ন্যায়ের নিকটবর্ত্তী বলা হয় নাই যদ্দ্বারা অপর পক্ষ হক্ ও ন্যায় হইতে দুরে তথা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীওয়ালা সাব্যস্ত হইতে পারে। বরং ঐ দল নিধনকারী পক্ষকে হক্ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী বলা হইয়াছে, যদ্দ্বারা অপর পক্ষও হক্ ও ন্যায়ের মূল নিকটবর্ত্তীতায় শামিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই পক্ষও হেদায়েত বা সৎ পথের আওতাভুক্ত প্রমাণিত হইল। কারণ, হক ও ন্যায়ের কম বা বেশ নিকটবর্ত্তীতা—উভয়ই হেদায়েত ও সৎপথ।

(تطهير الجنان واللسان — فى حاشية الصواعق المحرقة)

আহ্‌লে-সুন্নত-ওয়াল-জামাতের আকিদা ইহাই যে, উক্ত উভয় পক্ষই হেদায়েতের উপর অধিষ্ঠিত ছিল, কোন পক্ষই ভ্রষ্ট ছিল না। ভ্রষ্ট ও গোমরাহ্ হইল ঐ তৃতীয়

দলটি যাহারা উক্ত উভয় পক্ষ হইতে ছিন্ন ও ভিন্ন ছিল; যাহাদের হত্যা ও নিধনের প্রতি রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত পক্ষদ্বয় হইল আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ এবং অপর দিকে আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ। এই পক্ষদ্বয়ের প্রথম পক্ষ তথা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ উক্ত তৃতীয় দলটির বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—৩৮ হিজরী সনে সামরিক অভিযান চালাইয়া নাহ্‌রওয়ান যুদ্ধে তাহাদের বিপুল সংখ্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের বাহ্যিক তৎপরতা কমিয়া গেলেও তাহারা গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতেছিল, যাহার ফলে তাহাদেরই এক ঘাতকের হাতে আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার পর মোয়াবিয়া (রাঃ) এই খারেজী দলকে হত্যা ও পর্য্যুদস্ত করেন। সুতরাং এই হাদীছে বর্ণিত মর্তবার অধিকারী মোয়াবিয়া (রাঃ)ও বটেন। (تطهير الجنان و اللسان) বিস্তারিত বিবরণ এই—

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শহীদ হওয়ার পর তাঁহার পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হাসান (রাঃ)। এই সময় আবার সেই আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা ইত্যাদি কুচক্রী মোনাফেক ও অসৎ লোকদের ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসবাদী দলটি যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বালোচিত উভয় পক্ষ হইতে ছিন্ন ও ভিন্ন ছিল তাহারা গা-ঢাকা দিয়া হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে মিশিয়া পড়ে এবং তাহাদের চিরাচরিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ময়দান পর্য্যন্ত টানিয়া আনে। কিন্তু মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অকৃত্রিম আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এবং হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিচক্ষণতার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অভিযানের পরিবর্ত্তে স্থায়ী মীমাংসা হয়।

দ্বন্দ্ব ও কলহের পরিবর্ত্তে মীমাংসার প্রতি মোয়াবিয়া (রাঃ)এর অকৃত্রিম আগ্রহ ও হাসান (রাঃ)এর প্রচেষ্টা কিরূপ ছিল বোখারী শরীফ ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছে উহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। হাদীছটি এই—

২৬০২। হাদীছ:—বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী-পুত্র হাসান (রাঃ) পর্ব্বত মালার ন্যায় বৃহৎ সৈন্য দল লইয়া মোয়াবিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। তখন আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে (তাঁহার মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য) বলিলেন, (আমাদের পক্ষেও) এত বড় বিশাল সৈন্য বাহিনী দেখিতেছি, যাহাকে পরাস্ত করা যাইবে না, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া শেষ করিবে।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা আম্র ইবনুল আ'ছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কথা অপেক্ষা উত্তম ছিল (—তাঁহার ইচ্ছা ছিল সংঘর্ষ এড়াইয়া মীমাংসা করা)। সেমতে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমার দল অপর দলকে এবং অপর দল আমার দলকে হত্যা করিলে উভয় পক্ষের মোসলমানদের দুরাবস্থার উপায় কি হইবে? তাহাদের অনাথ নিরাশ্রয় বিধবা-এতীমদের উপায় কি হইবে?

অতঃপর মোয়াবিয়া (রাঃ) কোরায়েশ বংশের আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের—এই দুই ব্যক্তিকে হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা তাঁহার নিকট যাইয়া মীমাংসার প্রস্তাব পেশ করুন, মীমাংসার জন্য যাহা কিছু বলিতে হয় বলুন; আপনারা তাঁহাকে মীমাংসার জন্য অনুরোধ করুন।

তাঁহারা উভয়ে হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন, মীমাংসার কথা বলিলেন এবং উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন।

হাসান (রাঃ) বলিলেন, আমরা (দানবীর) আবদুল মোত্তালেবের গোষ্টি—টাকা-পয়সা নাড়া-চাড়া করায় (ও দান-খয়রাত করায়) আমরা অভ্যস্ত। মোসলমান সম্প্রদায় বর্ত্তমানে গৃহ-যুদ্ধে রক্তাক্ত অবস্থায় রহিয়াছে (তাহাদের জন্য বিপুল টাকা-পয়সার দান-খয়রাত আবশ্যক)।

মীমাংসার জন্য আগত ব্যক্তিদ্বয় বলিলেন, (গৃহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরে আপনার ইচ্ছামতে সাহায্যার্থে) মোয়াবিয়া (রাঃ) এত এত ধন-সম্পদ আপনার বরাবরে পেশ করার অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং আপনার নিকট মীমাংসা-ভিক্ষা চাহিয়াছেন।

হাসান (রাঃ) বলিলেন, এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব কে নিবে? ঐ ব্যক্তিদ্বয় বলিলেন, উহার সর্ব্বময় দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন হাসান (রাঃ) যত রকম শর্ত্তই উল্লেখ করিয়াছেন ঐ ব্যক্তিদ্বয় উহার প্রত্যেকটির জন্য মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতে জামিন হইয়াছেন।

অবশেষে হাসান (রাঃ) মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ মীমাংসা সম্পন্ন করিলেন।

মূল হাদীছ বর্ণনাকারী তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) ইমাম হাসান (রাঃ) কর্ত্তৃক উক্ত মীমাংসা সম্পাদনকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

"আমি ছাহাবী আবু বকরা (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি—তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আলী-

পুত্র শিশু হাসান (রাঃ) হযরতের পার্শ্বে বসা ছিলেন; ঐ অবস্থায় হযরত (দঃ) একবার লোকদের প্রতি আর একবার বালক হাসানের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছিলেন, আমার এই পৌত্র মোসলমানদের সর্দ্দার। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা মোসলমানদের দুইটি বৃহৎ বৃহৎ দলের মধ্যে মীমাংসা করাইবেন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) যে তথ্যের উল্লেখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাসান (রাঃ) কর্ত্তৃক উক্ত মীমাংসা সম্পাদন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ছিল স্বয়ং হাসান (রাঃ)ও সেই তথ্যের উল্লেখ করিয়া থাকিতেন।

বর্ণিত আছে—হাসান (রাঃ) উক্ত মীমাংসা সম্পন্ন করাকালে তাঁহার পক্ষের কিছু লোক তাঁহাকে বলিল, আপনি আমাদের মুখ কালা করিয়া দিয়াছেন। তদুত্তরে হাসান (রাঃ) উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর হাদীছটি পেশ করিয়া বলিলেন, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অবশ্যই বাস্তবায়িত করিব—আমি মীমাংসাকে চরম পর্য্যায়ে পৌঁছাইবই পৌঁছাইব। (ফয়জুল বারী, ৩—৩৯৮)

এই মীমাংসার সময়ও কুচক্রী দল নিজেদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া মীমাংসাকে বানচাল করার চেষ্টায় মাতিয়া উঠে, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মুখুস ফেলিয়া হাসান (রাঃ)কে কাফের বলিয়া উঠে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতঃ স্বয়ং তাঁহার ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালাইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু হাসান (রাঃ) অতিশয় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি কুচক্রীদের কার্য্যকলাপে ভীত হওয়ার পরিবর্ত্তে স্বীয় মীমাংসা-পরিকল্পনার উপর অধিক দৃঢ় হইয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতঃ চিরতরে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া দিলেন। তিনি নেজামে-খেলাফতের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর ন্যস্ত করতঃ তাঁহাকে খলীফাতুল-মোসলেমীনরূপে গ্রহণ করিয়া নিলেন।

এইবার মোয়াবিয়া (রাঃ) সুযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগ্রহ ও আকাঙ্খা—ঐ তৃতীয় দলটির হত্যা ও নিধন কার্য্যের প্রতি পুর্ণ মনোযোগ দিলেন এবং বিক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত ভাবে ঐ দলের লোকদিগকে হত্যা করতঃ সেই দলকে নিপাত করিতে সমর্থ হইলেন। এই ভাবে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ আমলে কুচক্রী দল পুর্ণরূপে নিষ্পেষিত হওয়ায় মোসলমানগণ স্বস্তির নিঃশ্বাসই নয় শুধু, বরং তাঁহার খেলাফৎ কালের সুদীর্ঘ সময় পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা উপভোগ করিল।

পাঠক বর্গ! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আলোচ্য হাদীছের "হক্ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী" বাক্যের মর্ম্ম অনুযায়ী আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ এবং

আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ—উভয় পক্ষই হেদায়াত ও সৎ পথের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং বাস্তবও তাহাই। কারণ, উভয় পক্ষই খাঁটী ও অকৃত্রিমভাবে চাহিতে ছিলেন যে, নেজামে-খেলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক এবং ইসলামের উন্নতি ও গৌরব পুনঃ উদ্ধার হউক।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক হওয়া সত্ত্বেও আনুষাঙ্গিক কারণে বিরোধ হওয়া বিচিত্র নহে। যথা এস্থানে লক্ষাধিক ছাহাবীগণের বিশিষ্ট দশ জন "আশারা-মোবাশ্‌শারা" হইতে তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের সঙ্গী হাযার হাযার ছাহাবীগণের নিকট আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নীতি সম্পর্কে এই অভিযোগ ছিল যে—বিশৃঙ্খলার মুল, সন্ত্রাসবাদী, খলীফা ওসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব হইতেছে। অধিকন্তু তাহারা বড় বড় পদ দখলের সুযোগ পাইতেছে। পরন্তু এই পরিস্থিতিতে পরস্পর ভুল বুঝা-বুঝির সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই শাস্তির দাবীদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইতেছে। এমনকি মদীনা হইতে সৈন্য বাহিনী লইয়া সুদূর বছরায় যাওয়া হইয়াছে।* যদ্দরুন অতি সহজেই সংঘর্ষ বাঁধা সম্ভব হইয়াছে। এই সব ঐ মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীদের কারসাজিতেই হইয়া ছিল, কিন্তু তাহারা গা-ঢাকা দিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ভিড়িয়া ছিল।↑

আলী (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের অঙ্কুরে সন্ত্রাসবাদীদের উপর ক্ষমতা ও প্রাবল্য রাখিতেন না বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দৃষ্টে বিপক্ষ দল তাঁহার শক্তি সঞ্চারের ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ পাইতেছিলেন; যদ্দরুন ঘাতকদের শাস্তির দাবী তাঁহারা ত্যাগ করিতেছিলেন না। ফলে উত্তরোত্তর উভয় পক্ষের হানাহানি দানা বাঁধিয়া উঠিল এবং ঐ মোনাফেক কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে পরস্পর দুইটি মর্ম্মান্তিক সংঘর্ষে উভয় পক্ষে রক্তের স্রোত বহিল।

---

* মদীনা হইতে বছরা অভিমুখে যাত্রায় অধিকাংশ মদীনাবাসী বিরূপভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ) প্রবলরূপে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ)

↑ পরিশিষ্টে জামাল-যুদ্ধের ইতিহাসে দেখিতে পাইবেন, আলী (রাঃ) সন্ত্রাসবাদী খলীফা ওসমানকে হত্যাকারী দলকে নিজ সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কত জোরদার ঘোষনা দান করিয়া ছিলেন। এবং কত আগ্রহের সাথে পরস্পর মিমাংসার ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কুচক্রিদের কারসাজিতে কিরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

তদ্রূপ আশরা-মোবাশ্‌শারা হইতে স্বয়ং আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী হাযার হাযার ছাহাবীগণের নিকটও আয়েশা, তালহা, যোবায়ের ও মোয়াবিয়া (রাঃ)-গণের নীতি সম্পর্কে এই অভিযোগ ছিল যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-সম্মতরূপে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী শক্তিশালী খলীফা হওয়ার সুযোগ তাঁহারা প্রদান করিতেছেন না; যাহার ফলে বিশৃঙ্খলা উপশমের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা সম্ভব হইতেছে না।

উভয় পক্ষের এই মতবিরোধ সম্পর্কে অধিকাংশ ইমামগণের ভাষ্য এই যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মত্‌ই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং বেশী শক্তিশালী ছিল। আলোচ্য হাদীছেও যেই পক্ষকে হক্‌ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী বলা হইয়াছে ঐ পক্ষ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষই সাব্যস্ত। এবং আলী (রাঃ) খলীফা-বর্‌হক ছিলেন।

তবে ছাহাবীগণের কোন পক্ষকেই আমরা দোষী ও অপরাধী ত বলিতে পারিবই না; তাঁহাদেরকে মন্দ জানা বা তাঁহাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার নিকটও তাঁহাদের উভয় পক্ষের কোন পক্ষই অপরাধী গণ্য হইবেন না—বাস্তবে যদি কোন পক্ষের মতামতে ত্রুটি হইয়াও থাকে। কারণ, ইসলামের ভালায়ী ও উন্নতির প্রকৃত ও বাস্তব আন্তরিক উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উভয় পক্ষের অসাধারণ একনিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থতা এতই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল যে, উহার প্রভাবে কার্য্যক্রম ও কর্ম্ম-ব্যবস্থার ভুল-ত্রুটি আল্লার নিকট মার্জিত ও ক্ষমার্হ।

মুল উদ্দেশ্য শুদ্ধ সঠিক ও হক্‌ হওয়ার পর একনিষ্ঠতার সহিত উহা হাসিলের চেষ্টা-তদবির ও উপায় অবলম্বনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন; ইহাকেই বলা হয় "খাতায়ে-ইজতেহাদী ক্ষমার্হ।" কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত খেয়াল রাখিতে হইবে যে, মূল উদ্দেশ্যের সুষ্ঠুতা এবং স্বীয় কার্য্যের একনিষ্ঠতা শুধু মুখের দাবীর পর্য্যায়ে মূল্যহীন; আন্তরিকতার পর্য্যায়েই হইল উহার মূল্য। আর যিনি ক্ষমা করিবেন তথা আল্লাহ তায়ালা তিনি হইলেন সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী।

ছাহাবা কেরামের পরস্পর বিবাদের দ্বারা মোসলমানদের রক্ত ক্ষয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বিবাদের দরুন ছাহাবীদের বিবাদমান কোন পক্ষই দ্বীন, ঈমান, ছওয়াব ও আল্লার নিকট মর্য্যাদাবান থাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই—ইহা আল্লার রসুলের ছাহাবীদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ছাহাবীদের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহাদেরই একটি বিশেষ গুণের কারণে ছিল। সেই গুণটি ছিল নিয়্যত তথা উদ্দেশ্যের চরম বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মল সুষ্ঠুতা এবং উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় অবলম্বনে নিষ্কলুষ এখ্‌লাছ ও একনিষ্ঠতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই গুণটির দরুনই মানুষ তাহার নীতির মধ্যে ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়াও ক্ষমার্হ গণ্য হয়।

রসুলের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচার্য্যের বদৌলতে উক্ত গুণটি ছাহাবীদের যে পর্য্যায়ে লব্ধ ও হাসিল ছিল সেই পর্য্যায়টা অন্যদের জন্য শুধু হাসিল করাই অসাধ্য ও অসম্ভব নহে, বরং উহার উপলব্ধি এবং অনুভূতিও অসাধ্য। এই কারণেই ছাহাবীদের উভয় পক্ষ তাঁহাদের আপসের বিবাদে শুধু কেবল ক্ষমার্হই ছিলেন না, বরং সমালোচনার ঊর্দ্ধেও বটেন। ইহা শুধু আমাদের কথা বা ভাবাবেগ নহে, বরং সর্ব্বস্বীকৃত সত্য।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব যুগের হাফেজে হাদীছ—লক্ষ হাদীছ কণ্ঠস্থকারী, বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) ফত্‌হুল বারী ১৩—২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "রসুলের সুন্নতপন্থীগণ সকলে এক মত্‌ যে, ছাহাবীদের আপসে কলহ-বিবাদের দরুন যে কোন ছাহাবীর সমালোচনা নিষিদ্ধ ; যদিও সূক্ষ্ম দলীল প্রমাণাদির সার্ব্বিক গবেষণার প্রেক্ষিতে নির্দ্দিষ্ট এক পক্ষকে ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। কারণ, ছাহাবীগণ একমাত্র ইজ্‌তেহাদের উপরই বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন ; পরন্তু খাতায়ে-ইজ্‌তেহাদী ক্ষমার্হ।"

ছাহাবা কেরামের পক্ষদ্বয়ের বিরোধ নিছক নীতিগত ছিল এবং উহা নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল, তাই উহা ছিল সম্পূর্ণ ক্ষমার্হ। এই নীতিগত বিরোধকে যাহারা যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত করিয়াছিল তাহারা ছিল ঐ তৃতীয় দল। এই দলের হোতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা ছদ্মবেশী-মোসলেম মোনাফেক ইহুদী এবং তাহার সহকর্ম্মী ছিল অন্যান্য নূতন-পুরাতন মোনাফেক গোষ্ঠি। আর তাহাদের সঙ্গে ভিড়িয়া গিয়াছিল স্বার্থান্বেষী মোসলমান যাহাদের অধিকাংশই ছিল ঐ সব মোসলমান যাহারা দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাতা-রাতি হাজার হাজার লাখ লাখের সংখ্যায় মোসলমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ইসলাম গ্রহণীয় ছিল অবশ্যই, কিন্তু নবীর পরশ-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত ঐ সব লোকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ইসলামী গুণাবলীর পরিপক্কতা মোটেই বিদ্যমান ছিল না। ফলে তাহারা সহজেই সন্ত্রাস-বাদীদের খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কতিপয় খান্দানী মোসলমানও ছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একজনও ছাহাবী ছিলেন না।

সার কথা এই যে, ছাহাবা কেরামের আমলে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল ঐ সবের জন্য দায়ী ও অপরাধী ছিল সেই তৃতীয় দল যাহাদেরকে হত্যা করার প্রতি হযরত (দঃ) মোসলেম সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। যাহাদেরকে হযরত (দঃ) সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত বলিয়াছেন, যাহাদের প্রতি হযরত (দঃ) অতিশয় ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই তৃতীয় দলটির জঘন্য দুষ্কৃতির সংখ্যা অনেক, যাহার মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—

১। প্রথম ধাপে তাহারা দলগতরূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া মোনাফেকী ভাবে মোসলমানদের মধ্যে থাকে এবং মোসলমানদের সুদৃঢ় সংহতি বিনষ্ট করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অলিক ও ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগের বহর পরিচালিত করে। এমনকি, গোয়েবলী প্রোপাগাণ্ডা ও পরিকল্পিত প্রচারণার মাধ্যমে অলিক ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগগুলিকেও সত্যের সারিতে দাঁড় করিতে প্রয়াস পায়।

২। দ্বিতীয় ধাপে এক বিশেষ সুযোগে, অর্থাৎ পবিত্র হজ্জের মৌসুমে—যখন সাধারণভাবে মোসলমানগণ বিশেষতঃ রাজধানী মদীনার অধিকাংশ মোসলমান সুদুর মক্কায় চলিয়া গিয়াছিল, তখন ঐ দুর্ব্বৃত্তরা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাহাদের দলীয় সন্ত্রাসবাদী লোকদিগকে হজ্জে গমনের ভান করিয়া রওয়ানা করিয়া দেয়। অনন্তর মক্কায় যাওয়ার পরিবর্ত্তে পরিকল্পিতরূপে মদীনার অদুরে সমবেত হইয়া একযোগে মদীনার উপর হামলা চালায় এবং অবরোধ সৃষ্টি করিয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলে।

৩। তৃতীয় ধাপে তাহারা তাহাদের আত্মরক্ষা ও স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও মোড়লগিরী খাটাইয়া এমন একটি কাজকে ঘোলাটে করিয়া দেয় যাহা স্বাভাবিক ভাবেই হইত এবং তাহাতে কোনই বিশৃঙ্খলা আসিত না। কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইত না বলিয়া তাহারা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও মোড়লগিরী খাটায় এবং ভাল কাজকে খারাব করে। মদিনা যেহেতু তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, তাই এই কর্ত্তৃত্ব ও মোড়লগিরীতে তাহাদেরে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এমনকি স্বয় আলী (রাঃ) তাহাদের এই ভূমিকার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্বেও তাহাদেরে বাধা দানে সক্ষম হন নাই। ঐ কাজটি ছিল আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা হওয়া।

স্বাভাবিকভাবে খলীফা-নির্ব্বাচন হইলে আলী (রাঃ)ই খলীফা হইতেন, কিন্তু সেই অবস্থায় শাসন-যন্ত্রে উক্ত সন্ত্রসবাদীদের মোটেই কোন দখল থাকিত না, বরং তাহাদের আত্মরক্ষাই সম্ভব হইত না—তাহারা ধরা পড়িয়া যাইত। এই জন্য নিজেদের রক্ষা উদ্দেশ্যে তাহারা উক্ত কাজকে নিজেদের কর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে। এই ব্যাপারে তাহাদের সুযোগও ছিল উত্তম যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা নির্ব্বাচনে জনগণের সাড়া পাওয়া যাইবে।

বাস্তবে হইলও তাহাই—তাহারা মাত্র দুই দিনের মধ্যে আলী (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচন করিয়া নেওয়ার জন্য অবরুদ্ধ মদিনায় ভীষন চাপের সৃষ্টি করিল। মদিনায়

উপস্থিত ছাহাবী ও মোসলমানগণের অধিকাংশের সমর্থনে আলী (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হইলেন বটে, কিন্তু জবরদস্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা ও সামরিক ক্ষমতা উভয় ক্ষমতার চাবি কাঠি দুষ্কৃতি দল নিজেদের হাতে রাখিয়া দিতে প্রয়াস পাইল।*

এই অবস্থা দৃষ্টে—

× উক্ত সমর্থনকারীগণের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ছাহাবী যথা—আশারা-মোবাশ্শারা ভুক্ত তাল্হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) অবরুদ্ধ মদিনা হইতে পালাইয়া মক্কায় চলিয়া যান এবং সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

× মদিনায় উপস্থিত ছাহাবীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথম ধাপে সমর্থন দানে অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন না, তাঁহারা সমর্থন দান হইতে বিরত থাকেন।

× মক্কায় অবস্থিত এবং অন্যান্য এলাকার অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীও সমর্থন দানে বিরত থাকেন এবং তাঁহারা শর্ত্ত আরোপ করেন যে, প্রথমে খলীফা হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

এই ছাহাবীগণের মূল ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল সন্ত্রাসবাদীদের উপর। শাসনযন্ত্রে তাহাদের দখল দেখিয়াই তাঁহারা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁহারা ভাবিতে ছিলেন যে, খেলাফত-কাঠামোর বর্ত্তমান অবস্থায় আলী (রাঃ)কে খলীফারূপে স্বীকৃতি দিলে তাঁহার খেলাফত বা সরকারের অগ্রভাগ দখলকারী সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষমতার আওতায় পড়িয়া খেলাফত ধ্বংসযজ্ঞের নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বনে বাধ্য হইতে হইবে। সন্ত্রাসবাদীরা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সরকারের বেশীর ভাগ ক্ষমতা ষড়যন্ত্রমূলক দখল করিয়া নিয়াছে। কাজেই এখন বসিয়া থাকিলে মোসলমানদের শান্তি এবং ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

এই জন্যই তাঁহারা সন্ত্রাসবাদীদের বিচারের দাবী করিতে ছিলেন। তাহাদের বিচার করা হইলে তাহাদের মুখুস খুলিয়া যাইবে, সরকারের মধ্য হইতে তাহাদের দখল ছুটিয়া যাইবে এবং তাহাদের দল বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

---

* এই পরিস্থিতি ও অবস্থা আলী (রাঃ) অনুভব ও অনুধাবন করিতে ছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা ছাড়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ও সমর্থনে খাঁটী মোসলমানদের যে শক্তি ছিল তাহা উহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। স্বয়ং খলীফা আলী (রাঃ) ওজর পেশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"আমরা তাহাদের (সন্ত্রাসবাদীদের) হর্ত্তাকর্ত্তা নহি, তাহারাই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা।" (কামেল ৩—১০০) এই জন্যই আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে সকলের সমর্থন ও ঐক্য দাবী করিতে ছিলন।

আলী (রাঃ) নিজেও সন্ত্রাসবাদীদের এই ষড়যন্ত্র জনিত দখল আঁচ করিতে ছিলেন, কিন্তু তিনিও ত অবরুদ্ধ মদিনায় সন্ত্রাসবাদীদের চাপ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তাহাদের চাপের মোকাবিলা করার কোন অবকাশ যদি তাঁহার থাকিত তবে খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করা সন্ত্রাসবাদীদের জন্য সম্ভবই হইত না এবং আলী (রাঃ) ঐ পরিস্থিতির খেলাফত গ্রহণও করিতেন না।

যেভাবেই হউক মদিনায় উপস্থিত ছাহাবী ও মোসলমানদের অধিকাংশের সমর্থনে খেলাফতের দায়িত্ব আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর আসিয়া গেলে সেই দায়িত্ব পালন করা তাঁহার ফরজ হইয়া গেল। বিশেষতঃ তখন তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কোন প্রকারেই খলীফা মনোনীত হন নাই বা দাবীও করেন নাই। এই সময় তিনি খলীফার দায়িত্ব পালন না করিলে মোসলমানগণ খলীফাহীন হইয়া পড়ে। তাই তিনি স্বীয় পদে ও দায়িত্ব পালনে স্থির থাকিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখিতে সচেষ্ট থাকিলেন।

খলীফা আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সমর্থনকারী ছাহাবীগণ ভাবিতে ছিলেন যে, সকলের সমর্থন ও ঐক্যের দ্বারা খেলাফত শক্তিশালী হইয়া দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক ; তারপর সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দান সম্ভব ও সহজ হইবে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ যেহেতু সন্ত্রাসবাদী দল শুধু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পক্ষের সঙ্গেই মিশিয়া ছিল এই শাসনযন্ত্রের বড় বড় পদ দখল করিয়া ছিল, তাই বিপক্ষ দল এই পক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন বেশী। এই পর্য্যায়ে মোসল-মানদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া গেল।

সন্ত্রাসবাদীরা যেহেতু ভালভাবেই বুঝিতে ছিল যে, এই বিরোধ মিটিয়া গিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলেই তাহাদের আর রক্ষা থাকিবে না। তাই তাহারা গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা বিরোধ জিয়াইয়া রাখায় সচেষ্ট থাকিল।

৪। চতুর্থ ধাপে ঐ সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ যাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত-কাঠামোতে কারসাজি দ্বারা সামরিক ও বেসামরিক সরকারী ক্ষমতার চাবিকাঠি হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিল—তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া এমন চাপ সৃষ্টি করে যাহাতে উল্লেখিত মোসলমানদের দুইটি দলের নীতিগত বিরোধ সামরিক বিরোধে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ সন্ত্রাসবাদীদেরই অত্যন্ত জঘন্য ষড়যন্ত্রের দ্বারা পর পর দুইটি ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই পর্য্যায়ে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপটি বিশেষ একটি অমূলক ছুতা অবলম্বনে ছাহাবীদের উভয় দল হইতে ছিন্ন হইয়া মোনাফেকীরূপে মোসলমানদের মধ্যে থাকিয়া তৃতীয় দল আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় ধাপে মোসলমানদের মধ্যে দুইটি দল সৃষ্টি হওয়া এবং চতুর্থ ধাপে সন্ত্রাসবাদীদের তৃতীয় দলরূপে আত্মপ্রকাশ করা। ইহাই তাৎপর্য্য আলোচ্য হাদীছের এই ভবিষ্যদ্বাণীটির—يخرجون على حين فرقة من الناس "তাহারা আত্মপ্রকাশ করিবে মোসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগে।"

বলা বাহুল্য—যেই বিরোধকে চরম পর্য্যায়ে টানিয়া নিয়া সন্ত্রাসবাদী দলটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সেই বিরোধের জন্মও তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ছিল এবং সেই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া যত রকম জটিলতা ও কেলেঙ্কারী সৃষ্টি হইয়াছিল সবের গোড়ায়ই ছিল ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটি। একমাত্র তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ছাহাবাদের শেষ যুগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ঝড় বহিয়াছিল। তাই তাহাদের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই অগ্রিম ক্রোধ ও আক্রোশ ছিল যাহা তিনি পূর্ব্বোল্লেখিত হাদীছ সমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য সন্ত্রাসবাদী দলটির এই সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অতিশয় হৃদয় বিদারক ও প্রামাণিক ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায়। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেই বিবরণ ও ইতিহাসই বর্ণিত হইবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে।

পরম পরিতাপের বিষয়—মোসলমানদের শিক্ষিত সমাজেরও বিরাট অংশ উক্ত সন্ত্রাসবাদী দলটির ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এবং সেই অজ্ঞতার ফলেই তাহারা এক ঈমান বিধ্বংসী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আছে—তাহারা অনেক অনেক কেলেঙ্কারীর জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে—যাহা হারাম এবং কবিরা গোনাহ।*

---

* বহু কথিত চিন্তাবিদ ও প্রসিদ্ধ লেখক জনাব মৌদুদী সাহেব তাঁহার নিজের প্রস্তুত একটি প্রবন্ধের দ্বারা উক্ত ব্যাধিকে আরও ব্যাপক ও দুরারোগ্য করার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে ঈমানদার ঐতিহাসিককে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয় যে, মৌদুদী সাহেব উহাতে ছাহাবা কেরামের যুগের অনেক কেলেঙ্কারীর বর্ণনাই দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটির উল্লেখ সমগ্র প্রবন্ধের কোন এক স্থানেও নাই। পক্ষান্তরে তিনি সমস্ত কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী করিয়াছেন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গকে।

এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে দুঃখের সীমা থাকে না। মৌদুদী সাহেব পূর্ব্বাপর মোসলেম মনীষী সমুদয় ইমাম ও আলেমগণের ঐক্যমত ও এজমা'কে উপেক্ষা করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীর প্রতি কঠোর দোষারোপ ও কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এমনকি সেই কুখ্যাত প্রবন্ধের পরিশিষ্টে ছাহাবীদের উক্ত কার্য্যক্রমকে খাতায়ে-ইজ্‌তেহাদী হওয়ারও বিরোধিতা করিয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মোলহেদ ও জিন্দিক শ্রেণীর মোরতাদগোষ্ঠি সাধারণতঃ ইসলাম এবং কোরআন ও হাদীছের প্রতি স্বীকৃতি দানকারী হয়। এমনকি তাহারা তাহাদের ভ্রষ্টতাপূর্ণ মতবাদের সপক্ষে মিথ্যা ও অপব্যাখ্যার সাহায্যে কোরআন-হাদীছ হইতে সূত্র এবং প্রমাণও পেশ করিয়া থাকে। যেমন আলী (রাঃ) এবং বহু ছাহাবীদের বিরুদ্ধে খারেজীদের একটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। তদ্রূপই বর্ত্তমান যুগে কাদিয়ানী ফের্কাকেও দেখা যায় তাহাদের গহিত নবীর নবুয়তের সপক্ষে কোরআন-হাদীছ হইতে প্রমাণ ও সূত্র পেশ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে ত এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাবই হইয়া গিয়াছে, এমনকি ইসলামের নামে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইয়াছে যাহার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী বহু মতবাদ ও কার্য্যাবলীর সপক্ষে অপব্যাখ্যার সাহায্যে কোরআন-হাদীছ হইতে সূত্র ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়; যেন মোসলেম সমাজের ঈমানী চেতনা ও ইসলামী জয্‌বা ঐসব ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া না উঠে।

ইসলাম বিরোধী মতবাদে নিমজ্জমান ভ্রষ্টগণ কর্ত্তৃক কোরআন-হাদীছ হইতে ঐরূপ ফাঁকিবাজীর সাহায্য গ্রহণ কুফরীর গহ্বর হইতে পরিত্রাণের জন্য মোটেই ফলদায়ক হইবে না।

এস্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় অতিশয় সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাহা এই যে, অপব্যাখ্যার দ্বারা স্বীয় কুমতলব বা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে কোরআন-হাদীছ হইতে প্রমাণ ও সূত্র কুড়ানো—শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জঘন্য। পক্ষান্তরে সাধারণ ভাবে কোরআন-হাদীছের কোন বিষয় বুঝিতে ভুল করিয়া কোন ভুল মত পোষণকারী হইলে ভুল নিরসনের ব্যবস্থা সাপেক্ষে উহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে।

কিন্তু অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা আর বুঝিতে ভুল করা সাধারণ দৃষ্টিতে এই দুইটির পরস্পর পার্থক্য উজ্জ্বল না হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য অতি বিরাট। এই সত্য তথ্যটি বুঝাইবার জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) রকমারি মোরতাদ কাফেরের বর্ণনা দান করিয়া পরে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন—

মৌদুদী সাহেব ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ খলীফা ওসমান (রাঃ) নিহত হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং খলীফা ওসমানকেই আসামী ও অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বজন প্রীতির দরুন মোসলমান জন-সাধারণ তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। এই পর্য্যায়েও ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটি মৌদুদী সাহেবের চোখে ধরা পড়ে নাই; মোসলমান জনগণকেই খলীফা ওসমান-হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে উক্ত প্রবন্ধের এই শ্রেণীর অসংখ্য লজ্জাকর অবাস্তব তথ্যাবলী হইতে নমুনা স্বরূপ কতিপয় তথ্যের সমালোচনাও ইনশা-আল্লাহ তায়ালা করা হইবে।

"তাবীল" তথা ভুল বুঝের কতিপয় নজীর

অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় এবং উভয়ের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য বিষ ও তিক্ত পানির পার্থক্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যকার বাহ্যিক সামান্যতম সাদৃশ্যের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীগণ মতলব সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়।

একটি হইল "তাহ্‌রীফ" আর একটি হইল "তাবীল"। তাহ্‌রীফ অর্থ—কোরআন-হাদীছের কোন শব্দ, বাক্য বা কোন সুস্পষ্ট বিষয়কে কিম্বা শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট বিধানকে অপব্যাখ্যার দ্বারা বিকৃত করা। যেরূপ পূর্ব্বাপর গোম্‌রাহ ফের্কাগুলির কার্য্যাবলীর মধ্যে দেখা গিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগেও ইসলামকে (Modernize) যুগের সামঞ্জস্যে আধুনিক করার প্রচেষ্টাবলীতে দেখা যায়। সেই সব প্রচেষ্টাকারীগণ তাহাদের পরিকল্পিত ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ইসলাম পরিপন্থী কার্য্যাবলীকে কোরআন-হাদীছের এবং ইসলামের পোশাক পরাইতে ইসলামের ঐরূপ বিকৃতি সাধনের দ্বারাই প্রয়াস পায়।

তাহারা যে, কোরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে সেই ব্যাপারে তাহাদের অবস্থা এইরূপ মোটেই নহে যে, আল্লার রসুলের ছাহাবীগণের এবং তাঁহাদের তাবেয়ীগণের মাধ্যমে পরম্পর মোসলেম সমাজে ইসলামের যে শ্বাসত রূপ ও আকৃতি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারা সেই ইসলামেরই অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলে, কিন্তু ঘটনাচক্রে কোরআন-হাদীছ অধ্যয়নে তাহারা কোন বিষয় বুঝিতে ভুল করিয়াছে। বরং তাহাদের প্রকৃত অবস্থা এই যে—প্রথম হইতেই তাহারা কোন ইসলাম পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে এবং উক্ত মতবাদের পরিকল্পনা তাহাদের মনে গাঁথা থাকে। কিন্তু উহা প্রকাশ করার সময় বা প্রকাশ করার পরে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ইসলামী জয্‌বায় পরিপূর্ণ মোসলেম সমাজের বিদ্রোহের ভয়ে কোরআন-হাদীছ ও ইসলামী বিধানের অপব্যাখ্যা পূর্ব্বক উহাকে নিজেদের পূর্ব্ব-পরিকল্পিত মতবাদের সামঞ্জস্যরূপ দান করিয়া থাকে। এক কথায়—তাহাদের মতবাদ ও পরিকল্পনা কোরআন-হাদীছের নিয়ন্ত্রণে গঠিত এবং ইসলামের ছাঁচে ঢালাই করা হয় না, বরং কোরআন-হাদীছকে তাহাদের মতবাদ ও পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণে ব্যাখ্যা করা হয় এবং ইসলামকে তাহাদের মতবাদ ও পরিকল্পনার ছাঁচে ঢালাই করার প্রচেষ্টা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর অপচেষ্টাকারীদের সম্পর্কেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

من قال فى القران برايه واصاب فقد اخطا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণে কোরআনের ব্যাখ্যা করে—যে ব্যক্তি কোরআনের (Instruction) নির্দ্দেশ অনুসারে স্বীয় মতবাদ

স্থির করে না, বরং স্বীয় মতবাদের (Instruction) নির্দ্দেশ অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করে; শাব্দিক অর্থে ঐ ব্যাখ্যা শুদ্ধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভুল ও অশুদ্ধ পরিগণিত। (মেশকাত শরীফ)

"তাবীল" হইল উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। পরিকল্পিত মতবাদের পায়রবীরূপে নয়, বরং সাধারণ ভাবে কোন একটা ভুল বুঝের কারণে ভুল মতবাদ পোষণ বা ভুল পন্থা গ্রহণকে তাবীল বলা হয়।

"তাহ্রীফ" তথা কোরআন-হাদীছ বা ইসলামের বাস্তবরূপের বিকৃতি সাধন দ্বারা কেহ মোরতাদ-কাফের হওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, বরং ঐরূপ বিকৃতি সাধনও বিশেষ কুফরী। পক্ষান্তরে তাবীলের দরুন অন্ততঃ কাফের-মোরতাদ হওয়া হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। সুতরাং "তাহ্রীফ" ও "তাবীলের" প্রতিক্রিয়ার উক্ত পার্থক্য সূত্রে উভয়টি বিরাট ব্যবধানের জিনিষ। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টির বিভিন্নতাজনক পার্থক্য নির্ণয় করার সুস্পষ্ট নিদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টি সদৃশ বলিয়া মনে হয়। হাঁ—"ভুল করা" এবং "বিকৃত করা" উভয়টির পার্থক্য বিভিন্ন নজীরের সাহায্যে সহজেই ধরা যাইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে ভুল বুঝের নজীর সম্বলিত কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছগুলি পূর্ব্বে যথা স্থানে অনূদিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুনঃ ঐ হাদীছ সমূহের অনুবাদ করা হইল না। অবশ্য ঐ শ্রেণীর নজীর দৃষ্টে এবং প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহ্রীফ এবং তাবীল উভয়ের মধ্যে যেসব পার্থক্য আলেমগণ দেখাইয়াছেন সংক্ষেপে উহা উল্লেখ করা হইল—

কোরআন-হাদীছের কোন শব্দ বা বাক্য কিম্বা ইসলামের কোন বিষয়বস্তু ও মতবাদ সম্পর্কে কোন বিশেষ ব্যাখ্যাকে "তাবীল" তখনই বলা যাইতে পারে যখন—(১) ঐ ব্যাখ্যাটি কোরআন-হাদীছের বাক্য ও শব্দের সঙ্গে আভিধানিক অর্থ ও ভাষাগত সমুদয় আবশ্যকাদির সামঞ্জস্য রক্ষাকারী হয়। অন্যথায় ঐ ব্যাখ্যাকে "তাহ্রীফ" বলা হইবে; "তাবীল" বলা যাইবে না। (২) ঐ ব্যাখ্যাটি জরুরীয়াতে-দ্বীন তথা ইসলামের কোন সুস্পষ্ট বিধান বা মতবাদকে ক্ষুন্নকারী না হয়; অন্যথায় ঐ ব্যাখ্যা "তাহ্রীফ" গণ্য হইবে। (৩) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে, ছাহাবীদের আমলে পবিত্র কোরআনের যে আয়াতের বা যে হাদীছের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কিম্বা ইসলামের কোন বিধান বা মতবাদের যে (Defination) সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল উক্ত ব্যাখ্যায় সেই অর্থ ও সংজ্ঞার কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, অন্যথায় ঐ ব্যাখ্যা "তাহ্রীফ গণ্য হইবে। (৪) উক্ত ব্যাখ্যার মর্ম্ম বা কোন একটি আনুষাঙ্গিক বিষয়ও যেন কোরআন, হাদীছ, এজ্‌মা বা ফেকার সুস্পষ্ট মছআলার বরখেলাফ না হয়; নতুবা সেই ব্যাখ্যা "তাহ্রীফ" গণ্য হইবে।

ভয়ে বাধ্য হইয়া কোন কাজ করিলে

ভয় দেখাইয়া কুফরী কাজ বা কুফরী কথায় বাধ্য করা হইলে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

(১) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"যে ব্যক্তি কুফরী করিবে আল্লার প্রতি—ঐ শ্রেণীর লোক ব্যতিরেকে যাহাকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর সুদৃঢ় রহিয়াছে ঈমানের প্রতি ; অবশ্য যাহার অন্তর দ্বিধাহীন হইয়া গিয়াছে কুফরীর প্রতি তাহার উপর আল্লার গজব ও ক্রোধ পতিত হইবে এবং তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে।" (১৪ পারা—২০ রুকু)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে কোন কুফরী কাজ করে, যেমন মূর্তি বা দেব-দেবীর প্রতি সেজদা করিতে হয় বা কোন কুফরী কথা বলিতে হয়—যদি ঐরূপ কাজ করা কালেও তাহার অন্তর সুদৃঢ় থাকে ঈমানের প্রতি তবে সে ক্ষমার্হ গণ্য হইবে। আর যদি দ্বিধাহীনরূপে সে কুফরী কাজ করে, কুফরী কথা বলে তবে সে মোরতাদ কাফের পরিগণিত হইবে এবং সে আল্লার গজবের পাত্র হইবে। তাহার জন্য ভীষণ আজাব রহিয়াছে।

(২) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً

"মোমেনগণ মোমেনদের ছাড়া কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না। যে কেহ ঐরূপ করিবে, আল্লার সঙ্গে তাহার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য যদি তোমরা কেহ কাফেরদের হইতে প্রাণ বাঁচাইবার ও রক্ষা পাইবার কৌশল স্বরূপ তাহা কর, তবে উহা ক্ষমার্হ হইবে।" (৩ পারা—১১ রুকু)

অর্থাৎ কাফেরের সহিত প্রকৃতভাবে বন্ধুত্ব করা কুফরী কাজ। কোন মোসলমান তাহা করিলে তাহার ঈমান নষ্ট হইবে, কিন্তু প্রাণের ভয়ে বাধ্য হইয়া রক্ষা পাইবার কৌশল স্বরূপ শুধু বাহ্যিক বন্ধুত্ব দেখাইলে তাহা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে।

(৩) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ......

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ......فَأُولَٰئِكَ عَسَى

اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ـ

"নিশ্চয়—ফেরেশতাগণ এক শ্রেণীর লোকের রুহ্ কবজ করিবেন এমন অবস্থায় যে, তাহারা ইসলাম বিহীন জীবন যাপনের অপরাধী। ফেরেশতাগণ ভর্ৎসনা স্বরূপ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তাহারা উত্তর করিবে, আমরা আমাদের দেশে দুর্ব্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন—আল্লার সৃষ্ট ভূমণ্ডল কি সুপ্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করতঃ হিজরত করিতে? আখেরাতে এই শ্রেণীর লোকদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম যাহা অতিশয় জঘন্য বাসস্থান। অবশ্য যে সব দুর্ব্বল পুরুষ-নারী বা বালক-বালিকা হিজরত করার ব্যবস্থাবলম্বনে অক্ষম এবং হিজরত করার কোন উপায়ই তাহাদের নাই—আশা করা যায় এই লোকদেরে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল।" (৫ পাঃ—১১ রুঃ)

অর্থাৎ কোন দেশে কোন পরিবেশে দ্বীন-ইসলামের আরকান-আহ্‌কাম আদায় করা অসম্ভব হইলে, সেই ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরকান-আহ্‌কাম ত্যাগ করিয়া সেই দেশে ও সেই পরিবেশে থাকা যাইবে না, বরং সেই পরিবেশকেই ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাকেই হিজরত বলা হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে হিজরত করা ফরজ। এমনকি ইসলামের আবির্ভাব যুগে যখন মোসলমানদের জন্য মক্কায় ইসলামী জীবন যাপনের অবকাশ ছিল না, মদীনায় উহার অনুকুল পরিবেশ ছিল, তখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসা ব্যতিরেকে কাহারও ইসলাম গ্রহণই হইত না। এইরূপ অপরিহার্য্য ফরজ কাজ হিজরতও যদি কেহ নিরুপায় ও অক্ষম হওয়ার দরুণ আদায় করিতে না পারে তবে সে ক্ষমার্হ গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কোন মানুষ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় ও আশঙ্কার দরুণ কোন কাজ করিয়াছে—এই কথা শরীয়তের বিধানে তখনই বলা যাইতে পারে যখন—

(ক) তাহার প্রতি এমন কোন কষ্ট যাতনা বা ক্ষয়-ক্ষতির হুম্‌কী আসে যাহা স্বভাবতঃই মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে। (খ) ভীতি প্রদর্শনকারী স্বীয় হুম্‌কী কার্য্যে পরিণত করিতে পূর্ণ শক্তিমান। (গ) অনতিবিলম্বে হুম্‌কী বাস্তবায়িত হওয়ার উপক্রম দেখা যায়। (ঘ) উক্ত হুম্‌কীর কবল হইতে নিজকে বাঁচাইবার কোন পথ ও সুযোগ না থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিময় ভয় ও আশঙ্কা আবার দুই প্রকার ঃ

(১) এমন ভয় ও আশঙ্কা যাহা উপেক্ষা করার কোন অবকাশই মানুষের জন্য থাকে না। এই শ্রেণীর ভয় ও আশঙ্কা শুধু দুইটি ক্ষেত্রেই হইতে পারে—(ক) নিজ প্রাণের ভয়, যেমন যদি বলা হয় যে, এই কাজ না করিলে তোমাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব। (খ) নিজের কোন অঙ্গহানির ভয়, যেমন যদি বলা হয়, এই কাজ না করিলে তোমার হাত, পা, নাক-কান কাটিয়া ফেলিব। এতদ্ভিন্ন এরূপ প্রহার বা যাতনার হুম্‌কী যাহার দ্বারা সাধারণতঃ প্রাণ বধ বা অঙ্গহানি ঘটিবার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহাও এই শ্রেণীরই গণ্য হইবে। ধন সম্পত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুম্‌কীও এই শ্রেণীভুক্ত।

(২) এমন ভয় ও আশঙ্কা যদ্দরুণ মানুষ ভীত ও বাধ্য হয় সত্যই, কিন্তু প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা কম। এই শ্রেণীর ভয় ও আশঙ্কা নানাপ্রকারে হইতে পারে—(ক) সন্তান, মাতা-পিতা বা রক্তের সম্পর্কধারী কোন আত্মীয়কে হত্যা করার বা তাহার অঙ্গহানি ঘটাইবার হুম্‌কী। (খ) তাহার নিজকে বা উল্লেখিত কোন লোককে বেদম প্রহারের হুম্‌কী, কিম্বা দীর্ঘকাল আবদ্ধ বা কারারুদ্ধ রাখার হুমকী।

এই দুই প্রকার ভয় ও আশঙ্কা অপেক্ষা ক্ষীণ কোন ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন হইলে, উহা বিপদ বটে এবং উহার হুম্‌কী প্রদানকারী জালেম অত্যাচারী গোনাহগার হইবে বটে, কিন্তু বিধানগতভাবে ঐরূপ ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন ব্যক্তির কার্য্যকলাপের উপর উহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না। ঐ অবস্থায়ও তাহার কার্য্যকলাপ সাধারণ অবস্থার ন্যায় গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে উল্লেখিত দুই প্রকার ভয় ও আশঙ্কার কারণে বিধানগত ভাবেই বিভিন্ন রকমের গভীর প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে যাহার বিবরণ এই—

(১) ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী কোন কাজ; যেমন, কুফুরী বাক্য বলা বা মূর্ত্তি ও দেব-দেবীর সামনে মাথা নত করা—এই শ্রেণীর কোন কার্য্যের জন্য দ্বিতীয় প্রকার ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন হইলে, সেস্থলে বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করিয়া নিবে, ঐ কার্য্য করা জায়েয হইবে না। আর যদি প্রথম প্রকার ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন হয় তবে অন্তরে ঈমানের পরিপক্কতাকে উপস্থিত রাখিয়া শুধু বাহ্যিকরূপে ঐ কার্য্য করিয়া নিলে তাহা জায়েয হইবে।* কিন্তু যদি ঈমানের মহামায়ায়

* এই অবস্থায়ও একটি বিষয়ে সচেষ্ট হইবে, তাহা এই যে, যদি কুফুরী কথা বলিতে বাধ্য হয় তবে যথাসাধ্য এমন শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করিবে যাহার মধ্যে কুফুরী বিহীন অর্থেরও অবকাশ থাকে এবং অন্তরে সেই অর্থেরই নিয়্যত রাখিবে। আর যদি কুফুরী কাজে বাধ্য হয় সেস্থলেও নিয়্যতের মধ্যে কুফুরী পরিহার করিয়া চলিবে। যেমন, দেব-দেবীর সম্মুখে সেজদা করিতে বাধ্য হইলে সেস্থলেও আল্লাহকে সেজদা করার নিয়ত উপস্থিত রাখিবে। এমনকি যদি মোহাম্মদ নাম লইয়া গালি দিতে বাধ্য হয় তবে সেস্থলে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (দঃ)কে উদ্দেশ্য না করার এবং অন্য কোন মোহাম্মদ উদ্দেশ্য করার নিয়্যত উপস্থিত রাখিবে। (শামী ৫—১১৪)

ঐ কার্য্য না করিয়া বিপদকেই বরণ করিয়া নেয় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট অসীম ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

(২) আর যদি কোন অকাট্য হারাম বস্তু খাইতে বা পান করিতে বাধ্য হয় যেমন শূকরের মাংস খাইতে বা মদ্য পান করিতে বাধ্য হয়, তবে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে যে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কা, এমনকি যে কোন একজন মোসলমান ভাইকে হত্যা করার হুমকীর দরুণও ঐ হারাম বস্তু হালাল হইয়া যাইবে। হানফী মজহাব মতে কোন মোসলমান ভাইকে হত্যা করার ভয় কিম্বা দ্বিতীয় প্রকারের ভয় ও আশঙ্কার দরুণ উহা জায়েয হইবে না। আর প্রথম প্রকার ভয় ও আশঙ্কার দরুণ উহা শুধু জায়েযই নহে, ওয়াজেব হইয়া পড়িবে। যদি উহা গ্রহণ না করিয়া নিহত হয় তবে অতি বড় গোনাহগার হইবে। অবশ্য যদি কোন কাফেরের সম্মুখে ইসলামের প্রতি মোসলমানদের অনুরোক্তির দৃঢ়তা দেখাইয়া সেই কাফেরকে হেয় ও পরাজিত করার উদ্দেশ্যে হারামকে গ্রহণ না করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তবে গোনাহ হইবে না বরং ছওয়াব হইবে।

(৩) অপর কোন মোসলমানকে হত্যা করিতে বা তাহার অঙ্গহানি ঘটাইতে বাধ্য করা হইলে প্রথম বা দ্বিতীয় যে কোন প্রকারের ভয় ও আশঙ্কাই হউক না কেন তাহাতে উহা করা জায়েয হইবে না। যদি প্রথম বা দ্বিতীয় প্রকার বিপদ হইতে নিজকে রক্ষা করার জন্য অপরকে হত্যা বা তাহার অঙ্গহানি করিয়া ফেলে তবে সে গোনাহগার হইবে, কিন্তু উহাতে প্রাণদণ্ড বা অঙ্গের বিনিময়ে অঙ্গহানির শাস্তি আসিলে সেই শাস্তি বাধ্যকারীর উপর প্রবর্ত্তিত হইবে।

(৪) কোন পুরুষ জেনা বা ব্যাভিচার করিতে বাধ্য হইলে যে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কাই হউক না কেন তাহার জন্য জেনা করা জায়েয হইবে না। যদি সেই অবস্থায় জেনা করে তবে গোনাহগার হইবে, কিন্তু প্রথম প্রকার ভয় ও আশঙ্কার স্থলে তাহার উপর "হদ্দ্" তথা জেনার নির্দ্ধারিত শাস্তি জারি হইবে না। আর দ্বিতীয় প্রকার ভয় ও আশঙ্কার স্থলে তাহার উপর সেই শাস্তিও প্রয়োগ করা হইবে।

কোন মহিলা জেনা করিতে বাধ্য হইলে, যদি ভয় ও আশঙ্কা প্রথম প্রকারের হয়, তবে তাহার জন্য উহা জায়েয হইবে। আর যদি ভয় ও আশঙ্কা দ্বিতীয় প্রকারের হয়, তবে জেনার সুযোগ প্রদান জায়েয হইবে না। যদি দেয় তবে গোনাহগার হইবে, কিন্তু তাহার উপর "হদ্দ্" বা নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে না।

খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। খলীফা ওমরের একজন দাস সরকারী ধন-ভাণ্ডারের একটি দাসীর সঙ্গে

বলপুর্ব্বক জেনা করিয়াছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার সেই দাসকে জেনার হদ্দ্ তথা শরীয়তে দাস-দাসীর জন্য নির্দ্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত করেন—পঞ্চাশ ঘা বেত্রদণ্ড এবং ছয় মাসের জন্য দেশান্তরিত করার শাস্তি প্রদান করেন। আর দাসীটিকে খালাস দেন।

(৫) যে সকল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া শরীয়তের বিধানে ইচ্ছা-অনিচ্ছা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতেই সম্পন্ন হইয়া যায়, যেমন বিবাহের ইজাব বা বন্ধনকে কবুল ও গ্রহণ করা, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া—এই ক্ষেত্রে হানফী মজহাব মতে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কার বাধ্যতাই প্রতিবন্ধক হইবে না। সর্ব্বক্ষেত্রেই বিবাহ ও তালাক প্রযোজ্য গণ্য হইবে। অবশ্য বাধ্যকারী জালেম গোনাহগার হইবে। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে ঐরূপ তালাক ও বিবাহ বাতিল গণ্য হইবে। এমনকি যে কোন মোসলমানকে মারিয়া ফেলার হুম্‌কী দেখাইয়া তালাক বা বিবাহের সম্মতি গ্রহণ করা হইলে পরিণামে সেই তালাক ও বিবাহও বাতিল গণ্য হইবে।

(৬) যে সকল ক্রিয়া শুদ্ধ ও সম্পাদিত হওয়ার জন্য শরীয়তের বিধানে উক্ত ক্রিয়া স্বেচ্ছা প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক, যেমন—কোন জিনিষ খরিদ করা, বিক্রি করা, কাহাকেও দান করা, কাহারও জন্য কোন স্বীকারোক্তি করা বা স্বীকৃতি প্রদান করা ইত্যাদি। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে যে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কা, এমনকি কোন মোসলমান ভাইকে মারিয়া ফেলার হুম্‌কীর দরুণও ঐ শ্রেণীর কোন ক্রিয়া সাধন করিলে তাহা বাতিল গণ্য হইবে। হানফী মজহাব মতে উহা বাতিল গণ্য হইবে না বটে, কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা দুরীভূত হওয়ার পর উহা বহাল রাখা, না রাখা পূর্ণরূপে বাধ্যকৃত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হইবে—বাতিল করিয়া দিলে বাতিল হইয়া যাইবে, আর বহাল রাখিলে বহাল থাকিবে।

হিল্লা করা

"হিল্লা" অর্থাৎ আইন ও বিধানগত কোন কর্ত্তব্যকে এড়াইবার জন্য বা কোন উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করা যদ্দারা আইন ও বিধান ভঙ্গ ব্যতিরেকেই উক্ত কর্ত্তব্যকে এড়ান যায় বা আইন ও বিধানের মারপেঁচ দ্বারাই ঐ উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া আসে। এইরূপ হিল্লা করা বৈধ কি না এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে উহার ফলাফল প্রযোজ্য কি না—তাহাই এই শিরোনামার উদ্দেশ্য।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মত্ এই যে, কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রকার হিল্লা করা জায়েয নহে এবং তাহা করা হইলে উহার ফলাফল শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রযোজ্য নহে। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের মত্ এই যে,

আইন ও বিধানের ধারা উপধারার সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল (Judicial vieue) আদালতী দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র সমান। অর্থাৎ আদালতের দৃষ্টিতে আইন ও বিধানের ধারা-উপধারার ফলাফল প্রত্যেকেই লাভ করিবে; যদিও কেহ সেই ধারা-উপধারার আওতাভুক্ত হওয়ার সুযোগ হিল্লা ও কৌশল দ্বারাই হাসিল করিয়া থাকে। সুতরাং শরীয়তের আদালত বিভাগীয় নিয়ম মতে হিল্লার ক্ষেত্রেও আইনগত ফলাফল প্রযোজ্য হইবে। অবশ্য হিল্লা অবলম্বনকারীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার দোষী-নির্দ্দোষী হওয়ার ফয়ছালা করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হিল্লাযুক্ত মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঐ সবের বিবরণ দেওয়া হইল—

(১) শরীয়তের বিধানে যাকাত একটি বিশেষ ফরজ। শরীয়তের বিধানেই যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত্ত রহিয়াছে এবং সেই সব শর্ত্তের ভিত্তিতে যাকাত ফরজ না হওয়ার বিভিন্ন উপধারাও শরীয়তে আছে। কোন ব্যক্তি যাকাত ফরজ হয়—এই পরিমাণ ধনের ধনী হইয়াও এমন কোন কৌশল অবলম্বন করিল যদ্দরুণ যাকাত ফরজ হওয়ার কোন একটি শর্ত্ত ব্যাহত হওয়ায় উপধারা মতে ঐ ব্যক্তি যাকাতের আওতামুক্ত সাব্যস্ত হয়, সে ক্ষেত্রে ইমাম বোখারীর মতে ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ থাকিয়া যাইবে। ইমাম আবু হানিফার মতে আদালতের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি উপধারার ফল ভোগ করিবে অর্থাৎ যাকাত উসুলের আইনগত চাপ তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু যদি কৃপণতা ও বখিলী বশে, শুধু কেবল ধন-লিপ্সার উদ্দেশ্যে সে ঐরূপ হিল্লা ও কৌশল অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোষী ও অপরাধী গণ্য হইবে।

(২) "(pre-emptio) শোফা-হক্" শরীয়তের বিধানেও একটি আইনগত দাবী। কোন ব্যক্তি যদি সেই দাবীর সুযোগ নষ্ট করার জন্য হিল্লা বা কৌশল অবলম্বন করে। যেমন—একটি জমি যাহা বস্তুতঃ দশ হাজার টাকা মূল্যমানের। জমির মালিক উহা এমন এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, যে ঐ জমির প্রতিবেশী নহে; অথচ অপর এক ব্যক্তি সেই জমির সংলগ্ন প্রতিবেশী আছে। সুতরাং ঐ প্রতিবেশীর শোফা-হক্ তথায় বিদ্যমান। কিন্তু জমির মালিক ঐ প্রতিবেশীর নিকট বিক্রি করিবে না বিধায় সে শোফা-হকের দাবী বানচাল করার উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বন করিল যে, দশ হাজার টাকা মূল্যমানের সেই জমির মূল্য বিশ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করিল। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে বিশ হাজার টাকা মূল্যের উপর উক্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিল। জমির মালিক মূল্য গ্রহণের সময় শুধু ৯৯৯৯ টাকা গ্রহণ করিল এবং নিদ্ধারিত মূল্যের অবশিষ্ট ১০,০০১ টাকা

নগদ না লইয়া উহার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় এমন একটি বস্তু গ্রহণ করিল যাহা বস্তুতঃ মাত্র এক টাকা মূল্যের। এই ভাবে সে তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যের অঙ্ক ২০,০০০ হাজার পূর্ণ করিল এবং মিথ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকেই ক্রেতার উপর প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু ১০,০০০ হাজার টাকাই বর্তিল। এই অবস্থায় প্রতিবেশী ব্যক্তি যদি উক্ত জমির উপর শোফা-হকের দাবী করিতে চায় তবে তাহাকে অবশ্যই পূর্ণ ২০,০০০ হাজার টাকা দিতে হয়। কারণ আসল মূল্য ত তাহাই নির্দ্ধারিত ছিল। আর ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, প্রতিবেশী ব্যক্তি দশ হাজার টাকা মূল্যমানের জমি বিশ হাজার টাকায় লইবে না। এই ভাবে তাহার শোফা-হকের দাবী প্রতিহত হইবে।

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মত্ এই যে, প্রতিবেশী ব্যক্তি বিশ হাজার টাকায় ঐ জমি ক্রয়ে সম্মত না হইলে আদালতের রায়ে তাহার শোফা-হক্ বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু জমির মালিক যদি বিনা কারণে তাহাকে তাহার শোফা-হক্ হইতে বঞ্চিত করার এই হিল্লা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে তবে সে অবশ্যই দোষী ও অপরাধী গণ্য হইবে এবং অপরের হক নষ্ট করার গোনাহে গোনাহগার হইবে। আর যদি প্রতিবেশী ব্যক্তির কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে ঐরূপ করিয়া থাকে, তবে ঐরূপ হিল্লা ও কৌশল করায় তাহার কোন গোনাহ হইবে না।

(৩) হিল্লা করা প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি অতিশয় নাজুক মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই—এক ব্যক্তি কোন মহিলার প্রতি আসক্ত, কিন্তু মহিলাটি তাহার সহিত বিবাহে সম্মত হয় না। ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে লাভ করার জন্য এই হিল্লা ও কৌশল করিল যে, মহিলাটির উপর স্বীয় স্ত্রী হওয়ার দাবী করিয়া ইসলামী শাসনের বিচারক বা জজ তথা কাজির নিকট মামলা দায়ের করিল। এবং অমন ভাবে সাজাইয়া সাক্ষীও পেশ করিল যাহাতে কাজি তাহার পক্ষে রায় দিয়া দিল যে, উক্ত মহিলাটি ঐ ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী। ফলে মহিলাটি ঐ ব্যক্তির গৃহিণী হইতে বাধ্য হইয়া পড়িল।

এ ক্ষেত্রে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহ আলাইহের মত্ এই যে, মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা সাক্ষী বিজড়িত এই হিল্লা ও কৌশল হারাম ছিল। সেই হারাম হিল্লায় অধিকৃত গৃহিণীর সহিত সহবাসও অবৈধ হারাম হইবে। ইমাম আবু হানিফার মত্ এই যে, মিথ্যা মোকদ্দমা করা হারাম ও ভয়াবহ আজাবের কবিরা গোনাহ হইয়াছে। মিথ্যা সাক্ষী প্রদান এবং মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করাও হারাম ভয়াবহ আজাবের কবিরা গোনাহ হইয়াছে। কিন্তু কাজির রায়ে অধিকৃত গৃহিণীর সহিত সহবাস বৈধ হইবে। উক্ত সহবাসের সন্তান বৈধ হইবে—জারজ হইবে না। এস্থলে ইমাম আবু হানিফার যুক্তিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বলেন,

ইসলামী শাসনের জজ তথা কাজীকে বিধানগতরূপে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সুতরাং কাজির রায়ে যেরূপ বিবাহ ভাঙ্গিতে পারে তদ্রূপ স্থান বিশেষে তাঁহার রায়ে উহা গড়িতেও পারিবে। অতএব যেভাবে দুইজন সাক্ষীর সহিত তৃতীয় ব্যক্তি নর-নারীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন গড়িয়া দেয়, তদ্রূপ আলোচ্য ঘটনায় কাজির রায়কে উক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন সৃষ্টিকারী গণ্য করা হইবে এবং মামলার সাক্ষীদ্বয়কে সেই বিবাহের সাক্ষী গণ্য করা হইবে। ইমাম আবু হানিফার এই যুক্তিযুক্ত মতামতটি কতই না সুফলদায়ক! ইহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইলে উক্ত পুরুষ ও তাহার প্রাপ্ত গৃহিণীর পরবর্ত্তী সারা জীবনের আচার ব্যবহার ও সহবাস হারামকারীতে পরিণত হইবে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি জারজ গণ্য হইয়া পরবর্ত্তী বংশধরই কলুষিত হইয়া পড়িবে।

স্বপ্ন ও উহার তা'বীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে

সুস্বপ্ন বিশেষতঃ নেক লোকদের সুস্বপ্ন একটি উত্তম বস্তু। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় ঘনাইয়া আসিলে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য ওহীর আগমন আরম্ভের পূর্ব্বাভাস ও সূচনায় ছিল সত্য ও বাস্তব সুস্বপ্ন। ছয় মাসকাল সুস্বপ্নের আগমণ হইতে থাকার পরই হযরত (দঃ) হেরা-গুহায় প্রত্যক্ষরূপে ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)এর মারফৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া নবুয়ত লাভ করিয়াছিলেন।

সুস্বপ্ন যে প্রকৃত প্রস্তাবে নবীদের বহু সংখ্যক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এবং নবীর সুন্নতের তাবেদার নেক লোকগণ নবীর সেই বৈশিষ্ট্যটি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে বর্ণিত হাদীছের বিবরণ দান করা হইয়াছে।

২৬০৩। হাদীছঃ— عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নেক লোকদের সুস্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ—সুস্বপ্ন যে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি, শুধু সেই সত্যটি বিশেষ জোরের সহিত বুঝাইবার জন্য উহাকে নবুয়তের একটি ভাগ বা অংশ বলিয়া

আখ্যায়িত করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশিষ্ট্যতা বুঝানই একমাত্র উদ্দেশ্য ; ভাগ বা অংশ হওয়ার বাস্তবতা উদ্দেশ্য নহে। তাই অংশের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই এবং বিভিন্ন হাদীছে অংশের মান নির্ণয়ে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। কোন হাদীছে পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, কোন হাদীছে সত্তর ভাগের এক ভাগও বলা হইয়াছে। অবশ্য আলোচ্য হাদীছে যে, ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হইয়াছে উহার একটি বাহ্যিক সূত্র আছে। তাহা এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়ত কাল ছিল তেইশ বৎসর এবং তাঁহার নিকট সুস্বপ্নের আগমন ছিল ছয় মাস। তেইশ বৎসরের তুলনায় ছয় মাস ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগই বটে।

আর একটি বিষয় এস্থলে বিশেষরূপে অনুধাবণ করিতে হইবে। তাহা এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবেও যদি শুভ স্বপ্ন নবুয়তের একটি অংশ হয়, তবুও উহা লাভ করিয়া কেহ নবুয়তের পদ লাভ করিতে পারে না। যেরূপ ক্লাস ওয়ান টু, থ্রি— এইগুলি গ্রেজুয়েশনের এক একটি প্রাথমিক অংশই বটে ; গ্রেজুয়েশন লাভ করিতে হইলে, ঐ সব ক্লাস অবশ্যই অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু সে জন্য কেহ ওয়ান, টু, থ্রি, ক্লাস পড়িয়াই গ্রেজুয়েটের পদাধিকারী হইতে পারে না।

এই হাদীছের তাৎপর্য্য তদ্রূপই যেরূপ অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে— হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীদের ত্যাজ্য সম্পদ হইল এল্‌ম। যে ব্যক্তি সেই এল্‌ম হাসিল করিয়াছে, সে অতি মূল্যবান রত্ন লাভ করিয়াছে।" নবীর ত্যাজ্য সম্পদ এল্‌ম হাসিল করিয়া কেহ নবীর পদ লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সুস্বপ্ন নবুয়তের অংশ হইলেও উহা দ্বারা কেহ নবুয়তের পদাধিকারী হইতে পারে না।

২৬০৪। হাদীছ ঃ— ওবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

২৬০৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

স্বপ্ন দেখিলে কি করিবে?

২৬০৬। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, তোমাদের কেহ সন্তুষ্টকারী সুস্বপ্ন দেখিলে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়া তাঁহার দরবারে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিবে। কারণ, ঐ শ্রেণীর স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে দেখান হয় এবং ঐরূপ স্বপ্ন বর্ণনা করা যায়।

আর পছন্দ নয় এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে উহার খারাবী হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ঐ শ্রেণীর স্বপ্ন শয়তানের তরফ হইতে দেখান হইয়া থাকে। ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া কাহারও নিকট উহা ব্যক্ত করিবে না; তাহা হইলে ঐ দুঃস্বপ্নের কোন ক্ষতি তাহার হইবে না।

২৬০৭। হাদীছ ঃ— আবু সালামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন স্বপ্নের দরুণ মানসিক চিন্তায় আমি অসুস্থ হইয়া পড়িতাম। একদা আমি ছাহাবী আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে শুনিলাম—তিনি বলিতে ছিলেন, আমিও কোন কোন স্বপ্ন দেখিয়া এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িতাম। একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিলাম, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে দেখান হয়। ঐরূপ পছন্দের স্বপ্ন কেহ দেখিলে, একমাত্র বন্ধু-বান্ধব ছাড়া অন্য কাহারও নিকট উহা বর্ণনা করিবে না। আর নাপছন্দের কোন স্বপ্ন দেখিলে ঐ স্বপ্নের অশুভ পরিণতি ও শয়তানের দুরভিসন্ধি হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এবং তিনবার (বাম দিকে) থুথু দিবে ঐরূপ স্বপ্ন কাহারও নিকট বর্ণনা করিবে না (এবং মনে পূর্ণ বিশ্বাস বাঁধিয়া রাখিবে যে,) এই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

২৬০৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন। কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের সময় ঘনাইয়া আসিলে মোমেনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত দেখা যাইবে। কারণ, (ঐ সময়ে মোমেনের অধিকাংশ স্বপ্নই আল্লার তরফ হইতে হইবে এবং) মোমেনের স্বপ্ন (যাহা আল্লার তরফ হইতে হয় উহা) নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর যে বস্তু নবুয়তের অংশ হয়, উহা মিথ্যা হয় না।

এস্থলে আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী—স্বপ্ন-শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার—(১) স্বীয় আভ্যন্তরীণ ভাব, চিন্তা, প্রলাপ বা স্নায়ুবিক ও মস্তিষ্কের কোন অবস্থায় সৃষ্ট বুদবুদ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া সমূহ। (২) শয়তানের কুপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা আনয়ণকারী ঘটনা বা দৃশ্যাবলী। (৩) আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রেরিত শুভ ইঙ্গিত। সুতরাং স্বপ্নে অশুভ কোন কিছু দেখিলে তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না এবং উঠিয়া যাইয়া নামায পড়িবে।

২৬০৯। হাদীছ ঃ— আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সুস্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে

দেখান হয়। আর দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে দেখান হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখিবে যাহা পছন্দ নয় সে বাম দিকে তিন বার থুথু দিবে এবং শয়তান হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলে ঐ দুঃস্বপ্নের দরুণ তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না।

হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন, শয়তান আমাকে দেখার স্বপ্ন দেখাইতে সক্ষম নহে।

স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা দিলে বাস্তবে কোন ক্ষতি হয় না

২৬১০। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, একদা এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, অদ্য রাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। একটি মেঘখণ্ড মধু এবং ঘি বর্ষন করিতেছে, জনমণ্ডল প্রত্যেকে উহা নিজ নিজ হস্তে সংগ্রহ করিতেছে—কেহ বেশী কেহ কম। আরও দেখিয়াছি, একটি রজ্জু ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত; আপনি উহা ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন। আপনার পরে আর এক ব্যক্তি ধরিলেন; তিনিও আকাশে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পরে আর এক ব্যক্তি উহাকে ধরিলেন; তিনিও আকাশে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পরে আর এক ব্যক্তি উহা ধরিলেন; তখন উহা ছিন্ন হইয়া গেল, অতঃপর তাঁহার জন্য রজ্জুটিকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

স্বপ্নটি ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আবুবকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার চরনে উৎসর্গ—আমাকে সুযোগ দিন; আমি এই স্বপ্নটির ব্যাখ্যা দিব। নবী (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—ব্যাখ্যা করুন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মেঘ খণ্ড হইল দ্বীন-ইসলাম, মধু ও ঘৃত যাহা বর্ষিত হইয়াছে তাহা হইল পবিত্র কোরআনের মহাস্বাদময় বিষয়বস্তু; উহার জ্ঞান কেহ বেশী লাভ করে কেহ কম। আর আকাশ হইতে জমিন পর্য্যন্ত রজ্জুটি হইল—সেই মহাসত্য (ইসলামের নীতি ও আদর্শ) যাহার উপর আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত। উহাকে আপনি সুদৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উহার বদৌলতে উচ্চ আসনে পৌঁছাইবেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উহাকে ধারণ করিবেন, তিনিও উহার বদৌলতে উচ্চ আসনে পৌঁছিবেন। তাঁহার পরে আর এক ব্যক্তি উহাকে ধারণ করিবেন এবং তিনিও উহার বদৌলতে উচ্চাসনে পৌঁছিবেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উহাকে ধারণ করিবেন, তখন উহা ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা তাঁহার জন্য সংযুক্ত করা হইবে এবং তিনিও উহার বদৌলতে উচ্চাসনে পৌঁছিবেন।

আবু বকর (রাঃ) স্বপ্নটির এই ব্যাখ্যা দান করিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমার মাতা পিতা আপনার চরনে উৎসর্গ—বলুন, আমি ঠিক বলিয়াছি, না—ভুল করিয়াছি? নবী (দঃ) বলিলেন, কিছু অংশ ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু কিছু অংশে ভুল করিয়াছেন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদার কসম—আপনি আমার ভুলগুলি ব্যক্ত করিয়া দিবেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কসম দিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাহা আবু বকর (রাঃ) প্রদান করিয়াছিলেন উহাতে ভুল ছিল বলিয়া স্বয়ং নবী (দঃ) বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ব্যাখ্যার দরুণ স্বপ্নের পরিণতি ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর হওয়ার কোন বাস্তবতা নাই।

কোন কোন হাদীছ দ্বারা এরূপ ধারনা আসে যে, স্বপ্নের ফল উহার ব্যাখ্যা অনুপাতে হইয়া থাকে। এবং বন্ধু বা জ্ঞানী ছাড়া অন্য কাহারও নিকট স্বপ্ন বলিতে নাই। অর্থাৎ শত্রু বা বোকা লোক হয়ত খারাব ব্যাখ্যা দিবে; তাহাতে ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে পারে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইতে চাহেন যে, ঐ শ্রেণীর হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, কোন অশুভ ব্যাখ্যা শুনিলে স্বাভাবিক ভাবে স্বপ্ন-ওয়ালার মনের উপর একটা খারাব প্রতিক্রিয়া হইবে। মনস্তাত্তিক দিক দিয়া ইহা ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর; ইহাতে মানসিক বিভ্রাট ও দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়। ইহা ভিন্ন স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা বাস্তব কোন কুফল সংঘটিত হয় না।

● আলোচ্য স্বপ্নটির ব্যাখ্যায় আবু বকর (রাঃ) কি ভুল করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গকে যখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ই এড়াইয়া গিয়াছেন তখন উহা আবিষ্কার ও নির্দ্ধারিত করণে আমাদের হাতড়ানি নিশ্চয় অবাঞ্ছনীয় হইবে।

হযরত (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিলে

২৬১১। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَآنِىْ فِى الْمَنَامِ

فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি আমাকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিবে অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পারিবে এবং শয়তান আমার আকৃতি অবলম্বন করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় ত এই হাদীছের মর্ম্ম বাস্তবায়িত হওয়া অতি সুস্পষ্ট ছিল যে, কোন ব্যক্তি হযরতের সাক্ষাৎ হইতে দুরে থাকাবস্থায় হযরত (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিলে তাহার জন্য সুসংবাদ ছিল যে, অচিরেই সে হযরতের সাক্ষাতে পৌছিতে সক্ষম হইবে। পরবর্ত্তী কালের জন্যও ইহার মর্ম্ম বাস্তবায়িত হওয়ার অবকাশ আছে। কেয়ামতের দিন হযরতের সঙ্গে তাহার এক বিশেষ ধরণের সাক্ষাৎ হইবে যাহা সাধারণ ভাবে অন্যদের ভাগ্যে জুটিবে না।

২৬১২। ছাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رانى فى المنام فقد رانى

فان الشيطان لا يتكون بى

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে বস্তুতঃ সে আমাকেই দেখিয়াছে। কারণ, শয়তান আমার আকার আকৃতি ধারণ করিতে সক্ষম নহে।

২৬১৩। ছাদীছ ঃ— قال ابو قتادة رضى الله تعالى عنه

قال النبى صلى الله عليه وسلم من رانى فقد راى الحق

অর্থ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (স্বপ্নে) আমাকে দেখিয়াছে সে বাস্তবই দেখিয়াছে।

২৬১৪। ছাদীছ ঃ— عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول من رانى فقد راى الحق

فان الشيطان لا يتكون بى

অর্থ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন—যে ব্যক্তি আমাকে (স্বপ্নে) দেখে সে বাস্তবই দেখিল, কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণে সক্ষম নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছসমূহের সুসংবাদটি অতিশয় সৌভাগ্যের বস্তু। বিশিষ্ট আলেমগণের মতে এই সুসংবাদ শুধু মাত্র ঐ ক্ষেত্রে যেখানে হযরত (দঃ)কে

তাঁহার এরূপ আকার আকৃতিতে দেখা হয় যে আকার আকৃতি হাদীছের মাধ্যমে ছাহাবীদের বর্ণনায় তাঁহার বলিয়া প্রমাণিত আছে। অবশ্য অনেক অনেক আলেমগণ এই শর্ত আরোপ করেন না। তাঁহারা শুধু এতটুকু বলেন যে, যে আকার আকৃতিতেই দেখা হউক, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীনরূপে উপলব্ধি ও বিশ্বাস হওয়া চাই যে, হযরত (দঃ)কে দেখিতেছে।

স্বপ্ন সম্পর্কে বিবিধ তথ্য

● একমাত্র নবীগণের স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কোন স্বপ্ন আইন ও বিধানগত প্রমাণ সাব্যস্ত হইতে পারে না। অবশ্য যদি বিভিন্ন লোকের স্বপ্ন দ্বারা কোন একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যত্নবান হওয়া উত্তম। যেমন বিভিন্ন ছাহাবীগণ লাইলাতুল-কদরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেকের দেখা তারিখই রমজান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে ছিল বিধায় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

২৬১৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোককে লাইলাতুল-কদরের রাত্রি স্বপ্নে দেখান হইল। প্রত্যেকের পরিদৃষ্ট তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সব তারিখগুলি রমজান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে মতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা লাইলাতুল-কদর লাভ করার জন্য রমজানের শেষ সাত রাত্র এবাদত-বন্দেগীতে বিশেষ তৎপর থাক।

● সাধারণতঃ মোসলমান এবং নেক লোকদের স্বপ্নই ফলিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অমোসলেম ফাছেক-ফাজের দুষ্ট লোকের স্বপ্নও ফলিয়া থাকে। যেরূপ পবিত্র কোরআনে হযরত ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের কাহিণীতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে—

হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় থাকা কালে তথায় দুই জন কয়েদী দুইটি স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল, তাহার মাথায় রুটির বোঝা এবং পাখীর দল তাহার মাথা হইতে সেই রুটি ঠোক্‌রাইয়া খাইতেছে। অপর জন দেখিল, সে আঙ্গুর ফল হইতে রশ বাহির করিতেছে।

হযরত ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় মহতী মানুষের প্রতি জেলখানার সকলেই আকৃষ্ট ছিল। তাই ঐ কয়েদীদ্বয় তাঁহার নিকট আসিয়া নিজ নিজ স্বপ্ন ব্যক্ত করিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে এবং শুলিকাষ্ঠে তোমাকে হত্যা করা হইলে পর পাখীর দল তোমার মাথার মগজ ঠোক্‌রাইয়া খাইবে। অপর ব্যক্তিকে বলিলেন, বিচারে

তুমি মুক্তি পাইবে এবং স্বীয় মনীবের জন্য আঙ্গুরের সুরা সংগ্রহের চাকুরী পাইবে। তাহাদের উভয়ের স্বপ্নের ফলন ঐরূপই ফলিয়া গেল। তাহারা উভয়েই অমোসলেম এবং অপরাধী আসামী ছিল।

● বিশ্বকোষের চাবি প্রাপ্তি-স্বপ্নের ফল—

২৬১৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকে ব্যাপক অর্থের সংক্ষেপ বাক্য বলার বিশেষ শক্তি দেওয়া হইয়াছে। শত্রুর উপর ভয়-ভীতি পতিত হওয়ার বিশেষ প্রভাব দান করিয়া আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করা হইয়াছে।

গত রাত্রে আমি নিদ্রায় ছিলাম, স্বপ্নে আমাকে বিশ্বকোষের ছাবিগুচ্ছ দেওয়া হইল—উহা আমার হস্তগত করিয়া দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বয়ান করিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই স্বপ্ন দেখিয়া দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। হে মোসলমানগণ! এখন তোমরা সেই স্বপ্নের ফল আহরণ করিতেছ।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে তাঁহার খলীফাদের আমলে বিশেষতঃ খলীফা ওমর (রাঃ) এবং খলীফা ওসমানের আমলে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রদ্বয় রোম ও পারস্যের পতন ঘটিয়াছিল। উক্ত রাষ্ট্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে মোসলমানদের করতলগত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সমুদয় ধন-ভাণ্ডার মোসলমানদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। মোসলমানদের হাতে উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের পতন বস্তুতঃ তৎকালীন বিশ্বের সমুদয় রাষ্ট্রেরই পতন ছিল এবং ইহাই যে, হযরতের আলোচ্য স্বপ্নের ফলন ছিল তৎপ্রতিই আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার মন্তব্যে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছের প্রথম বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই কেতাবের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, সুদীর্ঘ এক মাসের পথের দূরত্বে থাকিয়া শত্রু ভীত ও প্রকম্পিত হইত। কিন্তু হযরতের এই বৈশিষ্ট্যটি হিজরী পঞ্চম সালে অনুষ্ঠিত খন্দকের জেহাদের পরে লাভ হইয়াছিল। তাই ইহার পূর্ব্বে ত শত্রুগণ হযরতকে আক্রমণ করার জন্য মদীনার দিকে চলিয়া আসিত, কিন্তু ইহার পরে আর ঐরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

● রূপক আকৃতি ছাড়াই কোন বস্তু হুবহু স্বপ্নে পরিদৃষ্ট হইতে পারে—

২৬১৭। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অদ্য রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি—আমি যেন কাবা শরীফের নিকটে উপস্থিত। তথায় এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম—যাহার শরীর অতি সুন্দর শ্যামল, মাথায় অতি সুন্দর বাবরি আঁচড়াইয়া রাখিয়াছে, (এই মাত্র যেন গোসল খানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাই অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং) মাথা হইতে পানি ঝরিতেছে। ঐ ব্যক্তি দুইজন লোকের কাঁধে ভর করিয়া কাবা শরীফের তওয়াফ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই ব্যক্তি কে? বলা হইল, তিনি মরয়্যাম-পুত্র ঈছা মছীহ্ (আঃ)।

অতঃপর আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যাহার মাথার চুল অতিশয় কোঁকড়ানো, ডান চক্ষুটা এরূপ দোষল—যেন চোখের তারাটা বাহির হইয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই ব্যক্তি কে? বলা হইল সে কানা-দজ্জাল।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই স্বপ্নে ঈসা (আঃ)কে যে আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন উহা তাঁহার বাস্তব রূপই ছিল এবং কানা-দজ্জালকে যে আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন উহাই তাহার আকৃতি হইবে।

● এই অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন কতিপয় বস্তু স্বপ্নে দেখার তা'বীর বা ফলাফল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যথা—(১) দুগ্ধ পান করার ফল—এলম তথা দ্বীন ও ইসলামের জ্ঞান লাভ হওয়া। (২) গায়ে জামা দেখার ফল—জামার পরিমাপে দ্বীনের প্রভাব হওয়া। (৩) সবুজ বাগান দেখার অর্থ স্থান বিশেষে বেহেশত। (৪) মজবুত কড়া বা আংটা ধরিয়া থাকার ফল—দ্বীন-ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা। (৫) বেহেশতে প্রবেশ করার ফল—নেক্‌কার হওয়া। (৬) লোহার আংটায় পা আবদ্ধ দেখার অর্থ—দ্বীন ও ধর্ম্মে দৃঢ়পদ হওয়া। (৭) গলায় ফাঁদ দেখার অর্থ—পরিণাম অশুভ হওয়া। (৮) কাহারও জন্য প্রবাহমান নদী-নালা দেখার অর্থ—ঐ ব্যক্তির আমল এরূপ হওয়া যাহার ছওয়াব সর্ব্বদা জারী থাকিবে। (৯) কূপ হইতে পানি উঠাইয়া লোকদিগকে পান করানোর অর্থ—তাহার দ্বারা লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা হইবে। (১০) কোন বস্তু উড়িয়া যাইতে দেখার ফল—উহার বিলুপ্তি। (১১) কোন প্রকার মহামারী এলাকা হইতে কুৎসিত বিশ্রী নারীকে বাহির হইয়া যাইতে দেখার অর্থ—সেই মহামারী ঐ অঞ্চল হইতে স্থানান্তরিত হওয়া। (১২) তরবারি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অর্থ—নিজের দল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

স্মরণ রাখিতে হইবে, উল্লেখিত স্বপ্ন সমূহের যে যে অর্থ বর্ণিত হইল, তাহা স্থান বিশেষে হযরত (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বস্থানে উহাই হইবে তাহার

বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ, স্বপ্নের ব্যাপারে নানারূপ সূক্ষ্ম তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে একই বস্তু এবং একই শ্রেণীর স্বপ্নের বিভিন্ন তা'বীর বা অর্থ দাঁড়াইয়া থাকে এবং ঐসব তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলের জন্য সহজ সাধ্য নহে।

ভয়ভীতির স্বপ্ন দেখিয়াও যদি সেই স্বপ্নের মধ্যেই সান্ত্বনাও পাওয়া যায় তবে উহা সুস্বপ্নই

২৬১৮। **ছাদীছ ঃ**-* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমার ঘর-সংসার ছিল না। আমি মসজিদেই শুইয়া থাকিতাম।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ বিভিন্ন স্বপ্ন দেখিয়া হযরতের নিকট উহা ব্যক্ত করিতেন। হযরত (দঃ) আল্লার ইচ্ছায় ঐ সবের ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। আমি মনে মনে ভাবিতাম এবং নিজকে তিরস্কার করিতাম যে, তোর মধ্যে সৌভাগ্য থাকিলে তুইও এই লোকদের ন্যায় স্বপ্ন দেখিতে পাইতে।

একদা আমি শুইবার সময় এই দোয়া করিয়া শুইলাম—হে আল্লাহ! আপনার নিকট যদি আমার জন্য সৌভাগ্য থাকে, তবে আমাকে স্বপ্ন দেখাইবেন যেন আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে উহার ব্যাখ্যা লাভ করিতে পারি। এই বলিয়া আমি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম এবং স্বপ্নে দেখিলাম, আমার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের হাতেই লোহার গুর্জ্জ বা গদা রহিয়াছে। তাঁহারা আমাকে সঙ্গে নিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি দোয়া করিতে ছিলাম—হে আল্লাহ। আমি জাহান্নাম হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর আরও একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার হাতেও একটি লোহার গদা। তিনি আমাকে বলিলেন, ভয় পাইও না; তুমি ভাল মানুষ—কতই না ভাল হইত যদি তুমি বেশী করিয়া নামায পড়িতে!

অতঃপর ফেরেশতাগণ আমাকে সঙ্গে নিয়া জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং আমাকে জাহান্নামের সম্মুখে নিয়া দাঁড় করাইলেন। উহার চতুষ্পার্শ্ব কূপের ন্যায় উঁচু, কূপের পার্শ্বস্থ খুঁটির ন্যায় উহারও চতুর্দিকে অনেক খুঁটি আছে এবং প্রতি দুইটি খুঁটির মধ্যস্থলে লোহার গদা হাতে এক একজন ফেরেশতা দাঁড়াইয়া আছেন। উহার মধ্যে অনেক লোক—মাথা নীচের দিকে পা উপরের দিকে

---

* এই হাদীছ খানা অত্র অধ্যায়ে তিন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে, উহার সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তরজমা করা হইয়াছে।

শিকলে বাঁধা অবস্থায় ঝুলান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কোরায়েশ গোত্রীয় কতিপয় লোককে আমি চিনিতেও পারিলাম।

তারপর ফেরেশতাগণ আমাকে তথা হইতে ডান দিকে লইয়া চলিলেন। আমার হাতে যেন এক খণ্ড রেশমের কাপড় রহিয়াছে। আমি বেহেশতের যে কোন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা করি ঐ রেশমখণ্ড আমাকে নিয়া উড়িয়া চলে।

এই স্বপ্ন আমি (আমার ভগ্নি—উম্মুল-মোমেনীন) হাফ্‌ছার নিকট বর্ণনা করিলাম এবং তিনি উহা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বর্ণনা করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার ভ্রাতা আবছুল্লাহ নেক্‌কার মানুষ; সে তাহাজ্জোদ নামায বেশী পড়িলে বড় ভাল হইত। সেই দিন হইতে আবছুল্লাহ (রাঃ) বেশী পরিমাণে তাহাজ্জোদ নামায পড়িতেন।

মিথ্যা স্বপ্ন বয়ান করা

২৬১৭। হাদীছ:— عن ابى عباس رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف

ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم

وهم له كارهون او يفرون منه صب فى اذنيه الآنك يوم القيمة

ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ

অর্থ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যারূপে এমন স্বপ্ন বর্ণনা করে যাহা সে দেখে নাই; কেয়ামতের দিন তাহাকে বাধ্য করা হইবে দুইটি জবের দানায় গিড়া লাগাইবার জন্য। (অন্যথায় আজাব হইবে;) কিন্তু দুইটি জবের দানায় গিড়া লাগানো সম্ভবই হইবে না, (ফলে তাহার আজাব ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।)

যে ব্যক্তি অন্য লোকের গোপন কথা শুনিতে তৎপর হয়, অথচ তাহারা ইহাতে অসন্তুষ্ট অথবা তাহারা অপর হইতে পালাইয়া কথা বলিয়াছে। কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির উভয় কানে সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করে কেয়ামতের দিন তাহাকে বাধ্য করা হইবে তাহার তৈরী ছবির মধ্যে আত্মা দেওয়ার জন্য, কিন্তু সে আত্মা প্রদানে সক্ষম হইবে না, (ফলে ভীষণ আজাব ভোগ করিতে থাকিবে)

২৬২০। **হাদীছ ঃ—** عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افرى الفرى

ان يرى عينيه مالم تريا

অর্থ— আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্ব্বাধিক বড় মিথ্যা—যাহা দেখে নাই তাহা দেখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা।

এই অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা এই সব বিষয়ও প্রমাণ করিয়াছেন—(১) রাত্রি কালের স্বপ্ন এবং দিনের বেলার স্বপ্ন উভয়ই সমপর্য্যায়ের। (২) পুরুষের স্বপ্ন এবং নারীর স্বপ্ন উভয়ই সমপর্য্যায়ের। (৩) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সর্ব্বপ্রথম যাহা দেওয়া হইবে তাহাই ফলিবে—এরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই; উহা ভুলও হইতে পারে!

এই উক্তির দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) তুর্ব্বল সাক্ষ্যে প্রাপ্ত অপর একটি হাদীছের খণ্ডন করিয়াছেন। হাদীছটির মর্ম্ম এই যে, "কোন স্বপ্নের সর্ব্বপ্রথম যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে তাহাই ফলিবে।" এই হাদীছ খানা প্রাপ্তির সাক্ষ্য ও সূত্র তুর্ব্বল, ইহার বিপরীত মজবুত সাক্ষ্য ও সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী প্রমাণ করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম ব্যাখ্যা ভুল হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, স্বপ্ন যে-সে লোকের নিকট বলিতে নাই। কারণ, প্রথমই যদি ঐ স্বপ্নের কোন অপব্যাখ্যা কানে আসে তবে উহা ভুল হইলেও মনের মধ্যে তদ্দারা একটা অশান্তি ও তুর্ব্বলতা সৃষ্টি হইতে পারে যাহার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

ফেৎনা-ফসাদ—বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রাতুর্ভাবের উপর আলোকপাত ঃ

২৬২১। **হাদীছ ঃ—** সায়ীদ ইবনে আম্র (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসিয়া ছিলাম, মারওয়ানও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিলেন—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন, আমার উম্মতের ভীষণ ক্ষতির সূচনা হইবে কোরায়েশ বংশীয় কাঁচা বয়স্ক যুবক শাসনকর্ত্তাদের হাতে।

ইহা শুনিয়া মারওয়ান বলিয়া উঠিলেন, ঐরূপ যুবক শাসকগণ আল্লার লা'নতের উপযুক্ত। আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিলেন, হযরতের বিস্তারিত বয়ান মারফৎ আমি সেই যুবক শাসকদের পরিচয় এত সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছি যে, ইচ্ছা করিলে আমি তাহাদের বংশ বিবরণও বর্ণনা করিতে পারি।

ব্যাখ্যা:—উল্লেখিত যুবক শাসকদের প্রথম ব্যক্তি ছিল এজীদ। তাহার শাসন আমলে মোসলমানদের পাথিব উন্নতি অনেকই হইয়াছিল। বহু দেশ জয় হইয়াছিল এবং মোসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহু গুণে বাড়িয়া ছিল। কিন্তু তাহার নিজের ফাছেকী কার্য্যকলাপ, চরিত্রহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা, অপকর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন এবং শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার মোসলেম জাতির নৈতিকতার পতনই নয় শুধু, বরং ধ্বংসের সূচনা করিয়াছিল। রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসকগোষ্ঠীর ফাছেকী কার্যকলাপ, অন্যায় আচরণ তাহার হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। আর শাসকগোষ্ঠী স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতি পরায়ণ ও ন্যায়-অন্যায়ে অন্ধ হইলে উহার তাছির সমগ্র জাতির উপর পড়িয়া থাকে এবং উহাই জাতির নৈতিক ধ্বংস। আর সেই নৈতিক ধ্বংসই কালক্রমে বাহ্যিক ধ্বংসে পরিণত হয়।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এজীদ দুর্নীতি পরায়ণ শাসকরূপ ধারণ করিয়াছিল তদ্দরুণ ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর কোন গ্লানি আসিতে পারে না। কারণ, গণ-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান নিঃস্বার্থভাবে জাতির কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় যদি তাঁহার উত্তরাধীকারী মনোনীত করেন তবে উহা গণ-সমর্থন সাপেক্ষে অনৈসলামিক গণ্য হয় না। এজীদের প্রাথমিক জীবন যাহা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে ছিল তাহা ত্রুটি পূর্ণ ছিল না। তাহার বীরত্ব, অদম্য সাহস এবং ইসলামী যোশ তখন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পরবর্ত্তীকালে স্বীয় উম্মতের একটি দুর্গম অভিযানের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলিয়াছিলেন, সেই অভিযানে অংশ গ্রহণকারী সকলেই মগফুর তথা জীবনের সমস্ত গোনাহ হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে। ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, সেই অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন এই এজীদ। ছাহাবীগণও এজীদের সেই অভিযানকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এমনকি আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ন্যায় প্রবীণ বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ হযরতের সুসংবাদ দৃষ্টে ক্ষমার্হদের দলভুক্ত হওয়ার অভিলাষে এজীদের অধীনে উক্ত অভিযানে শরীক হইয়াছিলেন।

মানুষ আলেমুল-গায়েব নয়, তাই সে তাহার কার্য্যের উপস্থিত অবস্থার জন্য দায়ী। কোন রকম উপস্থিত ত্রুটি না থাকিলে ভবিষ্যতের অবস্থার জন্য কেহ দায়ী

হয় না। মোয়াবিয়া (রাঃ)এর সম্মুখে মোসলেম সমাজে ইসলাম বহির্ভূত খারেজী ফের্কার আবির্ভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই খলীফা ওসমান (রাঃ) ও খলীফা আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। ইহার বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। ঐরূপ ফের্কার প্রাদুর্ভাব যে, মোসলমানদের জন্য কত বড় ক্ষতিকর তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাদের প্রাদুর্ভাব দমনের গুরুদায়িত্ব এড়াইবার জন্যই খলীফা হাসান (রাঃ) খেলাফতের বোঝা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপরে ন্যাস্ত করিয়া নিজে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। মোয়াবিয়া (রাঃ) সেই দায়িত্ব পালনে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এই খারেজী ফের্কার প্রাদুর্ভাব দমনকারীর জন্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনেক সুসংবাদও বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বয়ং সেই সুসংবাদে ধন্য হইয়া তাঁহার পরে অদম্য সাহস ও বীরত্বের অধিকারী এজীদকে ঐ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ভাবিয়া ছিলেন এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাময় পরিস্থিতির মধ্যে মোসলেম সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার ভিত্তিতেই তিনি এজীদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোণীত করিয়াছিলেন।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ত্তমানে এজীদ দুশ্চরিত্র ও অনাচারী ছিল না এবং এজীদ তাঁহার ছেলে—এই প্রভাবে তিনি তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোণীত করেন নাই। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিজ মুখের উক্তিতে লক্ষ্য করুন। একদা তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রদত্ব ভাষনের মধ্যে বলিলেন—

اللهم ان كنت تعلم انى وليته لانه فيما اراه اهل لذلك فاتمم له ما وليته وان كنت وليته لانى احبه فلا تتمم له ما وليته

البداية والنهاية ج ٨ -

"হে আল্লাহ এজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নে তুমি যদি জান যে, আমি তাহাকে যোগ্যতম পাত্র পাইয়াই পরবর্ত্তী খলীফা পদের জন্য মনোনয়ন দান করিয়াছি তবে আমার এই কার্য্যকে তুমি সুসম্পন্ন কর। আর যদি এই মনোনয়ন দানে সে আমার পুত্র হওয়ার ভালবাসার বিন্দু মাত্র প্রভাব থাকিয়া থাকে, তবে তুমি এই মনোনয়ন কখনও বাস্তবায়িত হইতে দিও না।" বিশিষ্ট ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তরের নির্ম্মলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাও গুরুতর অন্যায় হইবে।

এজীদকে পরবর্ত্তী খলীফা হওয়ার মনোনয়ন দানে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতে জবরদস্তি করা এবং ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করার যে সব অলীক কাহিনী ইতিহাসরূপে সচরাচর বর্ণিত দেখা যায় উহা সম্পূর্ণ গর্হিত। এই সব ইতিহাসরূপী মিথ্যা কাহিনী খারেজী ফের্কার জন্ম দেওয়া। পরবর্ত্তী যুগে এই সব মিথ্যা বিবরণ ভাল লোকদের সঙ্কলনে ও রচনাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে—তাহা অতীব দুঃখজনক হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ইতিহাস নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানুষ আলেমুল-গায়েব হয় না। মোয়াবিয়া (রাঃ) এজীদের দ্বারা মোসলেম সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ আশা করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা মোসলমানদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধিতও হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে সে স্বেচ্ছাচারী, অনাচারীও হইয়াছিল। তাহার হইতেই মোসলেম সমাজের নৈতিক অবনতিই নয় শুধু, বরং নৈতিক বিকৃতির সূচনা হইয়াছিল এবং ঐ অবনতি ও বিকৃতিই পরে এই উম্মতের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

মোসলেম সমাজের অবনতি ও বিকৃতি এবং ধ্বংসের সূচনা যে এজীদের আমল হইতে আরম্ভ—এর পূর্ব্ব হইতে নয়; তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) সর্ব্বদা দোয়া করিতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ৬০ হিজরী সনের আরম্ভ হইতে।" বস্তুতঃ ৬০ হিজরী সন হইতেই এজীদ ক্ষমতাসীন হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন। তিনি ৬০ হিজরী সনের পূর্ব্বেই ৫৭, ৫৮ বা ৫৯ হিজরী সনে ইহজগত ত্যাগ করেন।

২৬২২। হাদীছঃ উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাস্থ একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তথা হইতে নীচের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, একটি দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তোমরা কি তাহা দেখিতেছ? ছাহাবীগণ বলিলেন, আমরা ত কিছু দেখিতেছি না। হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি দেখিতেছি, বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা তোমাদের গৃহগুলিকে ঘিরিয়া লইতেছে।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে কালক্রমে মোসলেম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিবে। ঐসব ঘটনাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মোসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মদীনার ঘরে ঘরেও দেখা দিবে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে উহারই অগ্রিম চিত্র হযরত (দঃ) দেখিতেছিলেন। তাহাই সতর্ক করণরূপে উপস্থিত উম্মতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬২৩। **ছাদীছ** ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ

وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ

اَيُّمَا هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামত ঘনাইয়া আসিলে এই সব অবস্থার সৃষ্টি হইবে—) সময় দ্রুতগামী মনে হইবে। কাজ কম হইবে। কৃপণতা ও কাঠিন্য লোকদের স্বভাবে পরিণত হইবে। উৎকণ্ঠাজনক অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাব হইবে। হত্যাকাণ্ডের আধিক্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—সময় দ্রুতগামী মনে হওয়ার অর্থ—সময়ের বরকত থাকিবে না, সময়ের অনুপাতে কাজ হইবে না এবং সময়ের অপচয়ের অনুভূতিও হইবে না। সুতরাং সময়ের ফল তথা কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে একটি দিন যেন একটি ঘণ্টার ন্যায়, একটি সপ্তাহ একটি দিনের ন্যায়, একটি মাস একটি সপ্তাহের ন্যায়, একটি বৎসর একটি মাসের ন্যায় মনে হইবে। কাজ কম হওয়ার অর্থ এইযে, মানুষের মধ্যে বেশী ও বড় বড় কথা বলার প্রবণতা দেখা দিবে, কিন্তু কাজ করার মনোবল হইবে অতি ক্ষীণ।

২৬২৪। **ছাদীছ** ঃ— عن عبد الله وابى موسى رضى الله عنهما

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَاَيَّامًا يَنْزِلُ

فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এবং আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে একটা যুগ এরূপ আসিবে যখন দ্বীনের অজ্ঞতা অতিশয় বাড়িয়া যাইবে। দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং খুনাখুনি বৃদ্ধি পাইবে।

২৬২৫। **ছাদীছ** ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে খুনাখুনির যুগ আসিবে। তখন দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম থাকিবে না। অজ্ঞতা বাড়িয়া যাইবে। যাহাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে তাহারা হইবে মানব সমাজের সর্ব্বাধিক ও জঘণ্যতম মানুষ।

২৬২৬। **হাদীছ ঃ**—যোবায়ের ইবনে আদী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তৎকালীন (অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা) হাজ্জাজ সম্পর্কে জনগণের প্রতি তাহার অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর; নিশ্চয় জানিও, যেই সময়টা অতিবাহিত হইয়া যায় পরবর্ত্তী সময় তদপেক্ষা অধিক খারাব আসিবে—যাবৎ না প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে পৌঁছিবে। এই তথ্য আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন শাসনকর্ত্তার অন্যায় অত্যাচার যদি ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে হয় এবং তাহার দ্বারা দেশের ও দশের সার্ব্বিক উন্নতি ব্যাহত না হইয়া সেই উন্নতি দ্বীন-দুনিয়ার দিক দিয়া উর্দ্ধ মুখীই থাকে সে ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার খাতিরে ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয়।

অতীত সময় অপেক্ষা আগত সময় অধিক খারাব হওয়া মোসলমানদের পক্ষে শুধু দুনিয়ার জিন্দেগীতেই সীমাবদ্ধ। তাহাও দুনিয়ার সাধারণ অবস্থারূপে এই উক্তি করা হইয়াছে। ক্ষেত্র বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম না হওয়া অবধারিত নহে।

২৬২৭। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ

مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ

السَّاعِىْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই নানারকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিবে। (ঐ সবের সহিত যাহার সম্পর্ক যতই কম হইবে সে ততই উত্তম গণ্য হইবে—) উহার প্রতি তাকাইবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা বসা ব্যক্তি উত্তম। উহার প্রতি যে পা বাড়াইবে তাহার অপেক্ষা শুধু দাঁড়াইয়া আছে ঐরূপ ব্যক্তি উত্তম। উহার প্রতি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা ধীর পদক্ষেপকারী উত্তম।

ঐ ঘটনাবলীর প্রতি যে তাকাইবে উহা তাহাকেই জড়াইয়া লইবে। অতএব যে ব্যক্তি উহা হইতে দূরে থাকিবার কোন আশ্রয় পাইবে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে সেই আশ্রয় গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর কালক্রমে মোসলেম সমাজের মধ্যে মোনাফেক—রাফেজী ও খারেজী ফের্কাদের দ্বারা পরস্পর যে রক্তক্ষয়ী বিরোধ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় আলোচ্য হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম লক্ষ্যস্থল উহাই। উক্ত ফের্কাদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ তায়ালা পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

২৬২৮। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সকলেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে ভাল তথা ছওয়াব ও শান্তির বিষয়াবলী সম্পর্কে খোঁজ নিয়া থাকিত। আর আমি খোঁজ নিতাম মন্দ তথা গোনাহ ও অশান্তির বিষয়াবলী সম্পর্কে; এই ভয়ে যে, ঐ শ্রেণীর কোন বিষয় যেন আমাকে পাইয়া না বসে।

সেমতে একদা আমি বলিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা অন্ধকার, অজ্ঞতা, পাপাচার ও সকল প্রকার খারাবীর মধ্যে নিমজ্জমান ছিলাম। তৎপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে সত্যের আলো—শান্তি ও শিষ্টতার আকর এই ইসলাম দান করিয়াছেন। সেই ইসলামের আলো ও শিষ্টতা আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার পর আবার কি মন্দের প্রাবল্য ও অন্ধকারের ঘনঘটার প্রাদুর্ভাব হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি আরজ করিলাম, সেই মন্দের অন্ধকার যাইয়া পুনঃ শিষ্টতার আলো আসিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন আসিবে, কিন্তু উহাতে ধূয়াঁ মিশ্রিত থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ধূয়াঁর উদ্দেশ্য কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, মোসলেম সমাজে এমন সব লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা আমার তরীকা ও নীতি ছাড়া অন্য নীতিও অবলম্বন করিবে। তাহাদের কোন কোন কাজ ভালও দেখিতে পাইবে এবং কোন কোন কাজ মন্দও দেখিতে পাইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই শ্রেণীর শিষ্টতার পর পুনঃ মন্দের প্রাবল্য হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহাদের অবস্থা এরূপ যে, তাহারা যেন জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়াইয়া সকলকে উহারই প্রতি ডাকিতেছে। তাহাদের ডাকে যে সাড়া দিবে তাহারা তাহাকে জাহান্নামে ফেলিবে।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! ঐ শ্রেণীর লোকদের পরিচয় আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, (বহিরদৃশ্যে তাহারা খাঁটী মোসলমানদের হইতে কোন ভিন্ন ধরণের হইবে না—) তাহারা মোসলমানদেরই বংশধর হইবে। মুখে মুখে তাহারাও ঐ কথাই বলিবে যাহা মোসলমানগণ বলিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! ঐ শ্রেণীর লোকদের আবির্ভাবের যুগ যদি আমাকে পাইয়া বসে তবে আমার কর্তব্য সম্পর্কে আপনার আদেশ ও

পরামর্শ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, খাঁটী মোসলমানদের জমাতকে এবং মোসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত ইমাম বা নেতাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, যদি ঐ সময় খাঁটী মোসলমানদের সংঘবদ্ধ কোন জমাত ও প্রতিষ্ঠিত কোন নেতা না থাকে তবে কি করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, খাঁটী মোসলমানদের সংঘবদ্ধ জমাত বা দল না থাকিয়া অন্য যত দলই থাকুক সব দল হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন থাকিবে। গাছের শিকড় কামড় দিয়া থাকিতে হইলেও ঐসব হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সচেষ্ট এবং মৃত্যু আসা পর্য্যন্ত এই অবস্থার উপরই সুদৃঢ় থাকিবে।

ব্যাখ্যা :—এই অস্থায়ী জগতের একটি স্বাভাবিক অবস্থা—ভালর পরে মন্দ, সৎ-এর পরে অসৎ, শিষ্টতার পরে দুষ্টতার আবির্ভাব ও প্রভাব হইয়া থাকে। এই গমনাগমন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে ভাল, সৎ ও শিষ্টতার ক্ষয়, অবনতি ও হ্রাসপ্রাপ্তি এবং অসৎ, দুষ্টতা ও মন্দের উন্নতি ও বিস্তার লাভই সাধারণ ভাবেও পরিলক্ষিত হইবে। এবং শেষ ফলেও তাহাই হইবে ; ইহার বিপরিত অবস্থা দেখা গেলে তাহা অতি সাময়িক হইবে। এই অবস্থা যে মোসলেম সমাজেও দেখা দিবে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবাণীই আলোচ্য হাদীছে করিয়াছেন।

ভাল-মন্দের এই গমনাগমান ও অবর্ত্তন-বিবর্ত্তন পুর্ব্বেও হইয়াছে, সম্মুখেও হইতে থাকিবে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পরে মোসলেম সমাজে প্রথম যে, এই পরিবর্ত্তন দেখা দিবে উহা সম্পর্কে হযরত (দঃ) তিনটি ধাপের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—(১) মন্দের আবির্ভাব, (২) মন্দের ধূয়াঁ যুক্ত ভালর পুনঃ প্রবর্ত্তন, (৩) অধিক মন্দের প্রাদুর্ভাব।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে উক্ত তিনটি ধাপের নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) যে মত ব্যক্তি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে হয়।

হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেক রূপে ইসলামের নাম গ্রহণ করিয়া মোসলেম সমাজে প্রবেশ করে এবং মোসলমানদের শক্তি, সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ সবের মূল—মোসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় খেলাফত দুর্গের উপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র আঁটিতে থাকে। তখন খলীফা ছিলেন ওসমান (রাঃ)। তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদের ঝড় বহাইতে সেই মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র সফল হয়। এই ভাবে হযরতের পর সর্ব্ব প্রথম মোসলেম সমাজে মন্দের সূচনা হয়। সেই মন্দের স্রোতেই খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হন এবং মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার

সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী দল যাহারা পরবর্ত্তী ইতিহাসে "রাফেজী" ফের্কা নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাদের প্রাবল্য কিছু দিন প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান থাকে। এমনকি পবিত্র মদীনাকেও সে প্রাবল্য ঘিরিয়া ফেলে এবং উহার দ্বারা বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা মদীনার ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। যেই অবস্থার অগ্রিম ইঙ্গিত ২৬২২ নং হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সব ঘটনাবলীই আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত পরিবর্ত্তনের প্রথম ধাপ তথা পূর্ণ ভালর পর মন্দের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

তারপর অচিরেই রাফেজী ফের্কার সৃষ্ট ঐ মন্দের স্রোতকে বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়। খলীফা আলী (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম ঐ ফের্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাদের কোমর ভাঙ্গিয়া দেন। প্রথমে তাহারা তাঁহারই দলে গা-ঢাকা দিয়া থাকে এবং গোপন ষড়যন্ত্র ও কূটনীতি দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়; এমনকি তাহারা গোপনে বিরাট দল সৃষ্টি করতঃ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই পর্য্যায়ে তাহাদিগকে ইতিহাসে খারেজী ফের্কা নামে অবিহিত করা হয়। খলীফা আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিরাট সংখ্যাকে হত্যা করেন এবং তাহাদের প্রাবল্য স্তিমিত করিয়াদেন। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা হইয়া উক্ত খারেজী ফের্কাকে ভীষণ ভাবে পদদলিত করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে মোয়াবিয়া (রাঃ) কোন কোন এলাকায় কঠোর ব্যক্তিকে গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন এবং তাহারা অন্যায় অত্যাচার চালায়— যেমন, কুফার গভর্ণর যেয়াদ। আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত দ্বিতীয় ধাপ তথা মন্দের পর ধূয়াঁযুক্ত ভালর উদ্দেশ্য এই আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমল। তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ সময়ে খলীফা বরহক হইয়া রাফেজী ও খারেজী ফের্কার সৃষ্ট ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির স্রোতের মুখে বাঁধার সৃষ্টি করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর আমলেও মন্দের ধূয়াঁ মিশ্রিত থাকে যে, রাফেজী ফের্কার সন্ত্রাসবাদীগণ গা-ঢাকা দিয়া মোনাফেকী করিয়া তাঁহার দলে ভিড়িয়া থাকে এবং তাহারা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির ছোবল মারিতে থাকে। মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলেও মন্দের ধূয়াঁ মিশ্রিত থাকে যে, তাঁহার কোন কোন শাসনকর্ত্তা দুষ্টের দমনে শিষ্টদের উপরও অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়—যেমন, কুফার শাসনকর্ত্তা যেয়াদ।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে মোসলমানদের এক কেন্দ্রিক শাসন কায়েম থাকে। কিন্তু খারেজী ফের্কার সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও ভিন্ন

শাসন কায়েমের অপচেষ্টার ঘটনা পর পর হইতেই থাকে। আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত তৃতীয় ধাপ তথা মন্দের ধুয়া মিশ্রিত ভালর পর মন্দের প্রাদুর্ভাব ও জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী লোকদের কথা বলিয়া খারেজী ফের্কার সন্ত্রাসবাদ-মূলক কার্য্যকলাপ ও ষড়যন্ত্র এবং এই দলের অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহীগণের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (ফতহুল বারী, ১৩—৩০)

রাফেজী ফের্কার ও খারেজী ফের্কার সৃষ্ট ফেৎনা-ফাসাদের ইতিহাস ইনশা-আল্লাহ তায়ালা অত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

২৬২৯। হাদীছ:—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদেরে দুইটি তথ্য শুনাইয়া ছিলেন। উহার একটির যথার্থতা আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, অপরটি দেখার অপেক্ষায় আছি।

প্রথমটি হইল আমানতদারী—দায়িত্ববোধ, শিষ্টতা ও নৈতিকতা গুণের উৎপত্তি এবং উহার প্রসার সম্পর্কে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমানতদারী গুণটি মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগত ভাবেই রহিয়াছে। অতঃপর কোরআন ও হাদীছের শিক্ষায় উক্ত গুণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। (ফলে কোরআন হাদীছের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক মোসলমান উক্ত গুণে গুণান্বিত হইয়াছিল।)

দ্বিতীয় তথ্যটি হইল উক্ত গুণের হ্রাসপ্রাপ্তি ও বিলুপ্তির বর্ণনা সম্পর্কে। (অর্থাৎ কোরআন-হাদীছের শিক্ষা ও সাধনায় উক্ত গুণের চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ বিস্তারের পর পারিপার্শ্বিক দোষে এবং উক্ত গুণ বিনষ্টকারী রিপুর প্রভাবে যে, উক্ত গুণের দ্রুত ক্ষয় ও বিলুপ্তি হইবে তাহার বর্ণনা দানে।) হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (উক্ত গুণের ক্ষয় ও বিলুপ্তি এত দ্রুত সাধিত হইবে যে,) কোন কোন লোক দিনের শেষ বেলা পর্য্যন্ত আমানতদারী গুণের ধারক ও বাহক ছিল, (কিন্তু দুষিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুসমূহের কোন রিপুতে আক্রান্ত হইয়া) রাত্রি যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উক্ত গুণ ক্ষীণ হইয়া যাইবে—তাহার দিল ও অন্তরের অন্তস্থল হইতে আমানতদারী গুণ উঠিয়া যাইবে। অর্থাৎ খাঁটী অন্তরে উক্ত গুণের প্রতি তাহার আকর্ষণ থাকিবে না। চর্ম্মের উপরে যেরূপ তিল হয় (যাহার কোন মুল মাংসের ভিতরে থাকে না) তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির দিলের উপরে উপরে আমানতদারীর শুধু একটু রং বাকি থাকিয়া যাইবে; (দিলের ও মনের ভিতরে আমানতদারীর প্রতি কোন টান বা আকর্ষণ মোটেই থাকিবে না।)

পরের দিনে তাহার উক্ত গুণের অবশিষ্টাংশের আরও অবনতি ঘটিবে। (চর্ম্ম-তিলের স্থায়িত্ব ও মজবুতী আছে, আগুনে পোড়া ফোস্কার কোনই স্থায়িত্ব নাই।

গতকল্য যে ব্যক্তি আমানতদারী-গুণের অবশিষ্টাংশ তিলের ন্যায় ছিল যাহার মূল ছিল না, শুধু উপরে উপরে বাহ্যিক রং রূপে ছিল, কিন্তু মজবুত ছিল ;) আজ রাত্রি যাপনের সঙ্গে সঙ্গে দিলের উপরের সেই রংটুকুও অতি ক্ষণস্থায়ী ফোস্কার ন্যায় হইয়া যাইবে। যেরূপ একটি অগ্নি-আঙ্গার পায়ের উপর গড়াইয়া দিলে ফোস্কা ফুলিয়া উঠিবে যাহার ভিতরে কোন মজবুত বস্তু থাকে না, ফলে উহা অতি ক্ষণস্থায়ী হয় এবং অচিরেই উহার বিলুপ্তি ঘটে। তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির আমানতদারী-গুণের অবশিষ্ট রংটুকু ক্ষণস্থায়ী হইয়া অচিরেই বিলুপ্ত হইবে। এই ভাবে সমস্ত লোকই আমানতদারী বিহীন হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পর লেনদেনের আদান-প্রদানের কাজ করিবে বটে, কিন্তু কেহই কোন কাজ আমানতদারীর সহিত করিবে না।

আমানতদার লোকের এত অভাব পরিলক্ষিত হইবে যে, কোন কোন গোত্রে ও বংশে হয়ত একজন আমানতদার ব্যক্তির খবর শুনা যাইবে মাত্র।

আমানতদারী বিলুপ্ত হইয়া মানুষের ভাবধারাই পাল্‌টিয়া যাইবে। যাহার ভিতরে আমানতদারী ও ঈমানদারীর লেশ মাত্র থাকিবে না (—দাগাবাজী, ধোকাবাজী প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা জালিয়াতীর দ্বারা যে ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধিতে পটু হইবে) তাহাকেই বলা হইবে, কি বুদ্ধিমান! কি চালাক চতুর! কি সাহসী!

প্রথম তথ্যটির যথার্থতা হোযায়ফা (রাঃ) পূর্ণরূপেই দেখিয়াছিলেন। উহার বর্ণনা দানে তিনি বলেন, এক যুগ আমাদের উপর এরূপ গিয়াছে যে, যে কোন লোকের সঙ্গে লেনদেন আদান-প্রদানের কাজ-কারবার বিনা দ্বিধায় করিয়াছি। সে লোক মোসলমান হইলে তাহার ইসলাম ও আমানতদারীই তাহাকে আমার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করিত। আর অমোসলেম হইলে আমনতদার শাসন পরিচালকদের প্রভাব প্রাপ্য হক্ আদায়ে বাধ্য করিত।

দ্বিতীয় তথ্যটির বাস্তবতার পূর্ণরূপ যদিও হোযায়ফা (রাঃ) দেখিতে পান নাই, উহার শুধু অপেক্ষাই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহার আরম্ভ ও সূচনা তিনি দেখিয়াছেন। উহার বর্ণনা দানে তিনি বলেন, প্রথম অবস্থার যুগ শেষ হইয়া আমানতদার লোকের সংখ্যাল্পতা এই পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, গণা-বাছা কতিপয় লোক ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গে লেনদেন আদান-প্রদানের কাজ করিতে সাহস হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে "আমনতদারী" বলিতে শুধু মানুষের পরস্পর আদান-প্রদানের বা কাজ-কারবারে বিশ্বস্ততা কিম্বা গচ্ছিত বস্তুর ব্যাপারে বিশ্বস্ততাই উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে আমানতদারীর উদ্দেশ্য হইল—দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ও শিষ্টতার সমষ্টি এমন একটি গুণ যাহার প্রভাবে অন্যের যে কোন হক্ প্রাপ্য

বা দায়িত্ব নিজের উপর আসিলে মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত্তরূপে—নিজ হইতে তাহা আদায় করিতে উদ্‌গ্রীব হইবে। তদুপরি এস্থলে অন্যের হক্‌ বলিতে শুধু অন্য মানুষের হক্‌ ও প্রাপ্যই উদ্দেশ্য নহে, বরং সর্ব্বাগ্রে স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তার হক্‌ এবং সেই হক্‌ আদায়ের দায়িত্বও উদ্দেশ্য। সুতরাং এই আমানতদারীর প্রধান প্রতিক্রিয়াই হইবে ঈমান ও ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি এবং তাঁহার মহা বাণী ও মহান প্রতিনিধির প্রতি শুধু বিশ্বাস স্থাপনই নয়, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে সেই বিশ্বাসকে কার্য্যতঃ গ্রহণ করা। সেই গুণটির উন্নতি ও উৎকর্ষেই মানুষ ইসলামের সমুদয় অনুশাসন তথা সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তার আদেশ-নিষেধাবলীর অনুগত হইতে বাধ্য হয়।

দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ও শিষ্টতার এই গুণ যাহাকে আমানতদারী বলা হইয়াছে এই গুণটি একমাত্র মানবেরই বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে এই গুণটি নাই। মানুষের উপর ঈমান ইসলাম ও সমুদয় ফরজ-ওয়াযেবের দায়িত্ব ন্যস্ত করার মূলেও রহিয়াছে এই গুণটিই।

সৃষ্টির গোড়াপত্তনে মানবের সম্মতি ও অভিপ্রায় অনুসারেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে এই গুণটি রাখিয়াছেন। মানুষ এই গুণের বাহক হওয়ার কারণেই বেহেশত লাভের চাবিকাঠি ঈমান ইসলাম ও ফরজ-ওয়াযেবের বোঝা তাহার কাঁধে চাপান হইয়াছে—যেই বেহেশতের লালসায়ই মানব আমানতদারী গুণের বাহক হইয়াছিল। ফল ভোগ করিতে চাহিলে উহার দায়িত্বের বোঝা অবশ্যই উঠাইতে হয় এবং বোঝা বহনে স্বীকৃতির পর উহা বহন না করিলে শুধু ফল ভোগ হইতেই বঞ্চিত থাকে না, তাহাকে শাস্তিও ভোগ করিতে হয়। ঈমান ইসলামের বোঝা বহন হইতে পলায়নকারীর সেই শাস্তিই হইল দোযখ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টির পূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিবরণ দান করিয়াছেন :—

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ....

"(বেহেশতের যোগ্যতা দানকারী ঈমান ইসলাম এবং উহার কর্ত্তব্যাবলীর দায়ী সাব্যস্ত হওয়ার মূল ভিত্তি—) আমানতদারী প্রস্তাব বহনের প্রশ্ন সপ্ত আকাশ, ভূমণ্ডল ও পাহাড়সমূহের সম্মুখেও আমি রাখিয়া ছিলাম। উহারা সকলেই তাহা বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং উহার দায়িত্বকে ভয় করিয়াছিল। কিন্তু মানব উহাকে বহন করিয়াছিল। (২২ পারা—ছুরা আহ্‌যাব শেষ রুকু)

শেখ ফরিদ আত্তার (রঃ) কাব্যে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

کردۂ بارا مانت را قبول — ازکشیدن پس نباید شد ملول

আমানতদারী গুণ বহনে স্বীকৃতি দিয়াছ ; এখন উহার দায়িত্ব পালনে মোটেই গড়িমশি করা চাই না।”

স্মরণ রাখিবেন ! আমানতদারীর উক্ত গুণটি সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষের মধ্যেই থাকে এবং ঐ গুণটি মানুষের অন্যান্য সৃষ্টিগত শক্তি ও গুণাবলীর ন্যায় পরিপুষ্টকারী অবলম্বনের সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষতিকারক পরিবেশ বা বিনষ্টকারী ব্যাধির আক্রমণ বা শত্রুর আক্রমণ দ্বারা উহার অবনতিও ঘটিয়া থাকে। এমনকি ধীরে ধীরে বিলুপ্তও হইয়া যায়। যেমন মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগত ভাবে চলনশক্তি রহিয়াছে। শিশু অবস্থায় তাহাকে হাটা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে এবং ঐ শক্তির পরিপুষ্টকারী খাদ্য সামগ্রী শিশুকে খাওয়াইতে থাকিলে অবিলম্বেই সে হাটিতে শিখিবে। আরও উন্নতি করিয়া সে দৌড়াইতে সক্ষম হইবে। নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা ৫।১০ মাইল অতি দ্রুত বেগে দৌড়িতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে এমন পরিবেশে রাখা হয় যেখানে তাহার হাটিবার সুযোগ মোটেই নাই বা কোন ব্যাধির আক্রমণে তাহার পা শুকাইয়া যায় কিম্বা শিশুকাল হইতেই পদদ্বয় বাঁধিয়া রাখা হয় তবে সে হাটিতে শিখিবে না। ধীরে ধীরে তাহার সৃষ্টিগত চলনশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

তদ্রূপ কোরআন-হাদীছের শিক্ষা লাভ, উক্ত শিক্ষার পরিবেশ এবং ঐ শিক্ষার রঙ্গে রঞ্জিত সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সৃষ্টিগত আমানতদারী গুণের অপরিসীম উন্নতি লাভ হইয়া থাকে ; যেরূপ হইয়াছিল ছাহাবী তাবেয়ী, তাব্‌য়ে-তাবেয়ীগণের। পক্ষান্তরে কোরআন-হাদীছের আলোহীন অন্ধকার যুগ ও পরিবেশের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া ঐ সৃষ্টিগত আমানতদারী গুণ মোটে উদ্ভাসিতই হইতে পারে না। তদ্রূপ উদ্ভাসিত হওয়ার পর বিপরীত প্রভাব বা ক্ষতিকর ব্যাধির আক্রমণে দুর্ব্বল হইতে থাকে, এমনকি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পর্য্যায়ে আসিয়া যায়। আলোচ্য হাদীছে আমানতদারী গুণের মূল উৎস বর্ণনা করার পর উহার উন্নতি ও অবনতির এই সব স্তরের প্রতিই আলোকপাত করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মন্দের প্রাবল্যের যুগে মোসলমানের কর্ত্তব্য হইবে মন্দ লোকদের সঙ্গে আদান-প্রদানের আচার-অনুষ্ঠান যথা সাধ্য পরিহার করিয়া চলা। যেমন, ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) তাঁহার যুগে মন্দের সূচনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

গণা-বাছা কতিপয় আমানতদার ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও সহিত কোন আদান-প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

এ সম্পর্কে আর একখানা হাদীছের প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ছাহাবীকে একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র! তুমি যদি ভাল লোকদের অতীত হওয়ার পর মন্দ লোকদের পরিবেশে পতিত হও যাহাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আমানত-দারীর অভাব হইবে এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধ সৃষ্টির দরুণ একে অন্যের বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে, তবে তুমি কি করিবে? ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি এই ব্যাপারে আমাকে কি পরামর্শ দেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, যতটুকু ভাল দেখিবে উহা গ্রহণ করিবে এবং মন্দকে বর্জ্জন করিবে। আর ঐরূপ পরিবেশে নিজকে মন্দ হইতে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা করিবে; অপরের প্রতি তাকাইবে না। (ফতহুল-বারী ১৩—৩২)

ফেৎনা-ফাছাদকারীদের দলের সঙ্গেও থাকিতে নাই

২৬৩০। **ছাদীছ ঃ—** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসিবার পরেও) কিছু সংখ্যক মোসলমান নিজেদের ইসলামকে লুকাইয়া রাখিয়া মোশরেকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিত। এমনকি মোশরেকরা যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিত তখন ঐ মোসলমানরাও তাহাদের দলের সঙ্গে থাকিত।

কোন সময় ঐ শ্রেণীর কোন লোকের উপর মোসলমানদের তীরের বা তরবারির আঘাত লাগিয়া যাইত এবং সে নিহত হইত। ঐরূপ লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنْفُسِهِمْ ..... أُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ

"যে সমস্ত লোকের আত্মা নিবার জন্য ফেরেশতাগণ আসেন তাহাদের ঐরূপ অবস্থায় যে, তাহারা (মোশরেকদের দলের সঙ্গে থাকিয়া) নিজেদেরই ক্ষতিকারক অপরাধে লিপ্ত—তাহাদেরে ফেরেশতাগণ ধমক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা (দ্বীনের বিধি-বিধান পালনে) কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা বলিবে, দেশে আমরা দুর্ব্বল ছিলাম। (তাই সবলদের কারণে আমরা দ্বীন পালন করিয়া চলিতে সক্ষম হই নাই।) ফেরেশতাগণ তাহাদেরে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, আল্লার জগত কি সুপ্রসস্ত ছিল না—যে, তোমরা অন্যত্র হিজরত করিয়া যাইতে? ঐ শ্রেণীর লোকদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। (৫ পাঃ ১১ রুঃ)

ফেৎনা-ফাছাদ ও বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলার প্রাবল্য কালে পল্লীনিবাস অবলম্বন করা

২৬৩১। হাদীছ ঃ—ছাহাবী সালামাতুবনুল আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী ৭৪ সালের ঘটনা, তৎকালীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা—) হাজ্জাজ আমার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি হিজরত হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মদীনা ত্যাগ করিয়া পল্লী-বাস অবলম্বন করিয়াছেন; সালামা (রাঃ) বলিলেন, না, না—আমি হিজরত হইতে ফিরি নাই, কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে (পরিস্থিতি দৃষ্টে) পল্লী-বাস অবলম্বনে অনুমতি দিয়াছিলেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী এজীদ ইবনে আবু ওবায়দ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলেম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ায় হইতেই সালামাতুবনুল আক্ওয়া (রাঃ) মদীনা শহর ত্যাগ করিয়া পল্লী অঞ্চল রাবাযায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, সন্তানাদিও হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট জীবনকাল তথাই অতিবাহিত করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন।

২৬৩২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মসজিদে মিম্বারের এক পার্শ্বে পূর্ব্বদিক মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, সতর্ক থাকিও! (যত প্রকার ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে সব) ফেৎনার স্রোত এই দিক হইতে আসিবে—যে দিকে সূর্য্য উদিত হয়—যে দিকে শয়তানের শিং উঁচু হয়।

২৬৩৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—"হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়া এলাকায় বরকত ও উন্নতি দান কর, আমাদের ইয়ামান এলাকায় বরকত ও উন্নতি দান কর। উপস্থিত লোকগণ আরজ করিল, আমাদের নজ্‌দ এলাকায় (বরকত ও উন্নতি দানের উল্লেখ করুন।) হযরত (দঃ) পুনঃ ঐ সিরিয়া ও ইয়ামান এলাকারই উল্লেখ করিয়া বরকত ও উন্নতির দোয়া করিলেন। এই বারও উপস্থিত লোকগণ নজ্‌দ সম্পর্কে আরজ করিল। তৃতীয় বার হযরত (দঃ) বলিলেন, নজ্‌দ এলাকায় ত ফেৎনা-ফাছাদ সৃষ্টি হইবে এবং তথায় ভয়ঙ্কর ভূকম্পনের হিড়িক পড়িবে। ইহাও (পূর্ব্বাঞ্চলের) একটি এলাকা যথায় শয়তানের শিং উঁচু হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কেয়ামতের পূর্ব্বে যত সব ফেৎনা-ফাছাদ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐসব মদীনা হইতে পূর্ব্বাঞ্চল সমূহেই সৃষ্টি হইবে। নজ্‌দ অঞ্চল মদীনার পূর্ব্ব দিকেই অবস্থিত। উহাও ঐসব ফেৎনা-ফাছাদের একটি বিশেষ কেন্দ্র হইবে।

খোদায়ী আজাব ও বালা-মছিবতে মৃত্যু হইলে ?

২৬৩৪। হাদীছ ঃ— ابن عمر رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায়ের উপর আল্লার আজাব নাযেল হইলে, তাহাদের (ভাল-মন্দ) সকলের উপরই সেই আজাব আসিতে পারে। কিন্তু আখেরাতে পুনঃজীবনকালে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুপাতে বিভক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন কোন সময় পাপ ও গোণাহের দরুণ আল্লার আজাব আসিয়া থাকে। কোন অঞ্চলে যদি সেইরূপ গোণাহের আধিক্যের দরুণ আল্লার আজাব আসে এবং তথায় কিছু সংখ্যক নেক্‌কার লোকও থাকে, তবে সেই নেক লোকদিগকে উক্ত আজাব হইতে বাঁচাইয়া নেওয়া নীতিগত ভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন নাই। বরং ইহজগতে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নীতি ইহাই যে, ভাল-মন্দের বাছ-বিচার ব্যতিরেকেই উক্ত আজাবের ধ্বংসলীলা চলিতে পারে। এই মর্ম্মে আলোচ্য হাদীছের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহজগতে আল্লার আজাব ও খোদায়ী বালা-মছিবত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুধু নিজের নেক্‌কারী যথেষ্ট নহে, দেশকেও নেককার বানাইতে হইবে। অন্যথায় দেশে পাপের প্রাবল্যের দরুণ আজাব আসিলে তথায় অবস্থানকারী স্বল্প সংখ্যক নেককারগণও সেই আজাবের গ্রাসে পতিত হইতে পারে, বরং সেইরূপ হওয়াই আল্লার স্বাভাবিক নিয়ম—ইহার বিপরীত কোথাও কোন কিছু ঘটিলে তাহা অলৌকিক গণ্য হইবে।

পাপের প্রাবল্যের দরুণ আগত আজাবে নেককারদেরও পতিত হওয়ার শুধু সম্ভাবনা এবং আখেরাতের হিসাবে উহা আজাব ও শাস্তি পরিগণিত না হইয়া রহমত গণ্য হওয়া শুধু তখনই যখন তদঞ্চলীয় নেককারগণ শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্ত্তিত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তথা নেক কাজের তবলীগ ও বদ কাজের প্রতিরোধ চেষ্টায় কোন প্রকার ক্রুটি না করে এবং বদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভুমিকা গ্রহণে অবহেলা না করে। অন্যথায় উক্ত নেককারদের সেই আজাবে পতিত হওয়া শুধু সম্ভব ও স্বাভাবিকই নহে, বরং ঐ আজাব তাহাদের পক্ষেও বিধানগত শাস্তি গণ্য হয় এবং কেয়ামতের দিনও তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে—

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"তোমরা" ঐ আজাব হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যে আজাব শুধু কেবল পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেই ঘায়েল করিবে না।" অর্থাৎ সেই আজাব ঐ লোকদেরকেও ঘায়েল করিবে যাহারা পাপে লিপ্ত নহে, কিন্তু তাহারা পাপের প্রতিরোধ চেষ্টাও চালায় নাই। সে ক্ষেত্রে পাপের দরুণ আজাব আসিলে সেই আজাব ঐ লোকদেরকেও আজাবরূপেই ঘায়েল করিবে। (৯ পারা ছুরা আন্‌ফাল)

এতদ্ভিন্ন এ সম্পর্কে চারিটি হাদীছও উল্লেখ যোগ্য।

(১) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে সব লোক বদ কাজ দেখিয়া উহা প্রতিরোধের চেষ্টা না করে অচিরেই আজাব তাহাদেরকে গ্রাস করিয়া নিবে। (ফতহুল বারী ১৩—১৫)

(২) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন একটি শহর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে নির্দ্দেশ দিলেন—অমুক শহরকে উহার অধিবাসীদের সহ উল্টাইয়া দাও। জিব্রাঈল আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে আপনার অমুক বন্দা রহিয়াছে যে এক পলকের জন্যও আপনার নাফরমানী করে নাই। তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সহ সকলের উপর শহরটিকে উল্টাইয়া দাও। কারণ, আমার নাফরমানীর প্রতি কোন সময় তাহার ভ্রুও কুঞ্চিত হয় নাই। (বায়হাকী)

(৩) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেশে যখন বদ কাজ চলিতে থাকে তখন যাহারা উপস্থিত থাকিয়াও উহার বিরোধিতা করে তাহারা তথায় অবস্থানকারী হইয়াও উহা হইতে পৃথক গণ্য হয়। আর যাহারা তথায় উপস্থিত না থাকিয়াও সম্মতি দেখায় তাহারা দূরে থাকিয়াও উহার মধ্যে শামিল গণ্য হয়। (আবু দাউদ)

(৪) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন মোসলমান—তাহার দেশে শরীয়ত বিরোধী কাজ হইতে দেখিল তাহার কর্ত্তব্য হইবে বলপূর্ব্বক উহার প্রতিরোধ করা। সেই সামর্থ্য না থাকিলে মুখে প্রতিরোধ করিবে। ততটুকু সুযোগও যদি না থাকে, তবে অন্তরে উহার প্রতি ঘৃণা রাখিবে এবং সুযোগ প্রাপ্তে উহা প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প রাখিবে—ইহা ঈমানের সর্ব্বশেষ স্তর, ইহার পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানেরও কোন স্তর নাই। (মোসলেম শরীফ)

পক্ষান্তরে বদকারের সঙ্গে বসবাসকারী যে সব নেককারগণ বদের প্রতিরোধে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে আদায় করিয়া থাকে বা যে সব ক্ষেত্রে নেক-কারগণ সাময়িকভাবে বদকারদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়—যেমন, হাটে-মাঠে পথে-ঘাটে বা যানবাহনে একত্রিত নেক-বদ লোকগণ—তাহাদের সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীছে

বলা হইয়াছে যে, পাপের পরিণামে আজাব আসিলে আজাবের ধ্বংসলীলা হইতে ঐ নেক লোকদিগকে বাঁচাইয়া নেওয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নাই, বরং আজাবের করাল গ্রাসে তাহারাও পতিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিধান আলোচ্য পরিচ্ছেদের মূল হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আজাবের ধ্বংসলীলায় ভাল-মন্দের বাছ-বিচার না হওয়া পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ। পারলৌকিক জীবনে ভাল-মন্দের তারতম্য অবশ্যই হইবে। পাপাচারী দুনিয়াতে আগত আজাবে ধ্বংস হইয়া আখেরাতেও আজাবে আবদ্ধ হইবে। আর নেককার দুনিয়ার আজাবের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া মৃত্যু বরণ করার পর আখেরাতে স্বীয় নেক আমলের বিনিময় অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করিবেন। অধিকন্তু আকস্মিক ধ্বংসলীলায় ডুবিয়া মরা, পুড়িয়া মরা, চাপায় মরা, কলেরায় মরা ইত্যাদি শহীদী মৃত্যুর কোন সূত্র পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে তাঁহারা শহীদের মর্ত্তবাও লাভ করিবেন। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতও তাঁহারা লাভ করিবেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীছ—আলী (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দেশে পাপাচারের প্রাবল্য দেখা দিলে দেশবাসীর উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আজাব নাযেল করেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাদের মধ্যে নেককার থাকিলেও? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। অবশ্য পুনর্জীবনকালে সেই নেককারগণ আল্লার রহমত লাভ করিবেন। (ফতহুল বারী ১৩—৫১)

মোসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ সৃষ্টি কালে স্বীয় পরিবার পরিজনকে উহা হইতে কঠোরভাবে বিরত রাখিবে

২৬৩৫। **হাদীছ**ঃ— নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীরা যখন শাসনকর্ত্তা এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তখন বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে হাদীছ শুনাইলেন—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি। কেয়ামত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের (পরিচয় ও সর্ব্ব সমক্ষে লাঞ্ছনার) জন্য এক একটি ঝাণ্ডা থাকিবে।

তারপর তিনি বলিলেন, আমরা এই ব্যক্তির (তথা শাসনকর্ত্তা এজীদের) আনুগত্যের শপথ দান করিয়াছি আল্লাহ এবং আল্লার রসূলের বিধান মোতাবেক। আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিধানমতে কাহাকেও আনুগত্যের শপথ প্রদানের পর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ন্যায় বড় বিশ্বাসঘাতকতা আমি আর অন্য কিছুকে মনে করি না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ এজীদের আনুগত্য ভঙ্গ করিবে ও বিদ্রোহে শামিল হইবে তাহার ও আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে।

ক্ষমতা লোভী দ্বন্দ্বকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এবং তাহাদের হইতে পৃথক থাকা

২৬৩৬। হাদীছ ঃ— আবুল মেনহাল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সিরিয়ার যেয়াদ-পুত্র (ওবায়দুল্লাহ) ও মারওয়ান শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টায় দাঁড়াইল। এতদ্ভিন্ন বছরা অঞ্চলেও খারেজী দল ক্ষমতা লাভের চেষ্টার প্রয়াস পাইতেছিল। এই সময় আমি আমার পিতার সহিত ছাহাবী আবু বরজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (নিকট তাঁহার) বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার কাঁচা গৃহের ছায়ায় বসিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্মুখে বসিলাম এবং আমার পিতা তাঁহার হইতে কথা বাহির করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে আবু বরজা (রাঃ)! লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? তদুত্তরে তাঁহার মুখে সর্ব্বপ্রথম যাহা শুনিলাম তাহা ছিল এই—

আমি আল্লার নিকট এই বিষয়ের ছওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখি যে, আমি কোরায়েশ বংশীয় কোন কোন গোত্রের কার্য্যকলাপের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি পোষণ করি। হে আরববাসী! তোমরা যেরূপ গোমরাহী, দুর্ব্বলতা ও লাঞ্ছনার মধ্যে ছিলে, তাহা তোমরা জান। আল্লাহ তায়ালা দ্বীন-ইসলাম ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় তোমাদিগকে যেই আসনে সমাসীন করিয়াছেন তাহাও তোমরা দেখিতেছ।

দুঃখের বিষয়—এই দুনিয়ার লোভ তোমাদের পরস্পর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সিরিয়ায় যে ব্যক্তি ক্ষমতা লাভের জন্য দাঁড়াইয়াছে। খোদার কসম, সে একমাত্র দুনিয়ার লোভেই বিবাদ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাহারও বাস্তব মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিতে নাই

২৬৩৭। হাদীছ ঃ— ওবায়দুল্লাহ ইবনে যেয়াদ আসাদী বর্ণনা করিয়াছেন, তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) যখন (আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত-কাঠামোর বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) বছরায় গেলেন তখন আলী (রাঃ) তাঁহার সমর্থক বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)কে কুফায় পাঠাইলেন। তাঁহারা উভয়ে কুফার জামে মসজিদের মিম্বারে উঠিয়া হাসান (রাঃ) মিম্বারের উপরের ধাপে বসিলেন এবং আম্মার (রাঃ) নীচের ধাপে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আয়েশা (রাঃ) বছরায় গিয়াছেন। কসম

খোদার—নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি বিশ্ববাসী সকলের পয়গাম্বরের স্ত্রী—ইহজগতেও এবং পরকালেও। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে তোমাদের পরীক্ষার বস্তু বানাইয়াছেন। দেখা যাইবে, তোমরা আল্লার বিধানের পায়রবী কর (অর্থাৎ নির্ব্বাচিত খলীফার অনুগত হও) না—আয়েশার পায়রবী কর।

২৬৩৮। **হাদীছ**ঃ— আবু ওয়ায়েল (রঃ) বর্ণনা করিরাছেন, আলী (রাঃ) তাঁহার সমর্থক সংগ্রহের জন্য আম্মার (রাঃ)কে কুফায় পাঠাইলেন। তখন বিশিষ্ট ছাহাবী আবু মূছা (রাঃ) এবং আবু মসউদ (রাঃ) আম্মারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি বিরোধের ব্যাপারে এতদঞ্চলে আসিয়াছেন—আপনার ইসলাম গ্রহণ পরে এই কাজটি অপেক্ষা অধিক অপছন্দণীয় আপনার আর কোন কাজ আমরা দেখি নাই। আম্মার (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন। এই বিরোধে হস্তক্ষেপ করা হইতে আপনারা দূরে রহিয়াছেন—আপনাদের ইসলাম গ্রহণের পর আমি এই কাজটি অপেক্ষা অধিক অপছন্দণীয় আর কোন কাজ আপনাদের দেখি নাই। এই কথোপ-কথনের পর ধনাঢ্য আবু মসউদ (রাঃ) স্বীয় সঙ্গী আবু মূছা এবং বিরুদ্ধবাদী আম্মার (রাঃ)—এই উভয়কে এক এক জোড়া নূতন কাপড় দিলেন এবং একত্রে জুমার নামাযে হাজির হইলেন।

ব্যক্তিগত মর্য্যাদা স্বীকার করিয়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ বিবেক অনুযায়ী চলা যায়

২৬৩৯। **হাদীছ**ঃ— হারমালাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উসামা (রাঃ) আমাকে (কিছু সাহায্যের জন্য) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন এবং বলিয়াদিলেন, আলী (রাঃ) তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—উসামা কেন আমার সমর্থন হইতে নিরপেক্ষ রহিয়াছে ? তুমি তাঁহাকে উত্তরে বলিবা— উসামা বলিয়াছেন, আপনি বাঘের মুখে থাকিলে সেখানেও আমি আপনার সঙ্গে অবস্থান করা পছন্দ করিব। কিন্তু খেলাফত নিয়া বিরোধের ব্যাপারটা আমার বুঝে আসে নাই।

হারমালাহ (রঃ) বলেন, আলী (রাঃ) কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না। আমি হাসান (রাঃ), হোসাইন (রাঃ) এবং জাফর-পুত্র আবদুল্লার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা দুইটি উট বোঝাই করিয়া সাহায্য দ্রব্য দিয়া দিলেন।

মোসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ মোনাফেকদের দ্বারা সৃষ্টি হয় *

২৬৪০। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ের মোনাফেকদের অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের মোনাফেকরা অধিক জঘন্য ও ক্ষতিকর। কারণ, সেই মোনাফেকরা (বস্তুতঃ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য ইসলাম প্রকাশ করিয়া) অন্তরে মোনাফেকী লুকাইয়া রাখিত। আর এই মোনাফেকরা (মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া ইসলাম প্রকাশ করে এবং) সর্ব্বদা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাই করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের মোনাফেকরাও মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানী ছিল এবং কোন কোন সময় তাহা সৃষ্টির প্রয়াসও পাইত, যাহার নজীরও কোরআন হাদীছে পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বাপর সকল মোনাফেকের স্বভাবই মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি করা। হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, হযরতের যুগের মোনাফেকদের ইসলাম প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত আত্মরক্ষা আর পরবর্ত্তীকালে মোনাফেকদের ইসলাম প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্যই হয় মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি করা। অতএব ইহারা মোসলেম সমাজের পক্ষে অধিক জঘন্য ও ক্ষতিকর। ইহাদের হইতে সতর্কতা অবলম্বনেও অধিক তৎপর হইতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের সময় অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালে মোনাফেকগণ কর্ত্তৃক মোসলেম সমাজকে ঘায়েল করার তৎপরতা ও উহার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। কারণ, হযরতের যমানায় মোনাফেকগণ অন্তরে মোনাফেকী লুক্কায়িত রাখিয়া ইসলাম প্রকাশ করা সত্ত্বেও ওহী মারফৎ তাহাদের দল নির্দ্দিষ্ট ছিল। হযরত (দঃ) পূর্ণরূপে এবং মোসলমানগণও বহুলাংশে তাহাদেরকে চিনিতেন। সুতরাং তাহাদের তৎপরতা অপেক্ষাকৃত কম হইত এবং যাহা কিছু হইত উহার প্রতিক্রিয়া সামান্য ও সাময়িক হইত। পক্ষান্তরে হযরতের পর মোনাফেক দলকে অকাট্যরূপে চিনিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং মোসলেম সমাজে গা-ঢাকা দিয়া বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টির পথ তাহাদের জন্য সুগম হইয়া গিয়াছে। হযরতের পরে মোনাফেকগণ কিরূপ মারাত্মক ভাবে মোসলেম সমাজকে ঘায়েল করার প্রয়াস পাইয়াছে উহার সামান্য

---

* উপরোল্লেখিত পাঁচটি পরিচ্ছেদের হাদীছ সমুহ বোখারী শরীফ ১০৫২ ও ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু শিরোনামাগুলি নির্দ্দিষ্টরূপে ইমাম বোখারী উল্লেখ করেন নাই উহা অনুবাদকের।

নমুনা পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) এই তথ্যটির প্রতিও নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২৬৪১। হাদীছ ঃ— হোযায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, একমাত্র হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে মোসলমানদের মধ্যে মোনাফেক দল চিহ্নিত ও নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তীকালে (উহার কোন ব্যবস্থা থাকে নাই, সুতরাং মোনাফেক নামে কোন দল চিহ্নিত ও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব, প্রকাশ্য অবস্থাসূত্রে) কাফের বা মোসলমান এই দুই দলই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার পরে ওহী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কাহাকেও অকাট্যরূপে মোনাফেক বলিয়া চিহ্নিত ও নির্দ্দিষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই। অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজে মোনাফেক থাকিবেই। কাহারও দ্বারা প্রকাশ্যে কোন কুফর অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে কাফের গণ্য করা হইবে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কুফরী না করিয়া অন্তরে মোনাফেকী লুকাইয়া রাখিলে সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অবশ্য মোনাফেক কাফের সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু জাগতিক পর্য্যায়ে তাহার প্রকাশ্য অবস্থা দৃষ্টে তাহাকে মোসলমানই গণ্য করিতে হইবে। এই জন্যই হযরতের পরবর্ত্তী সময়ে খাঁটী মোসলমানগণকে মোনাফেকদের সম্পর্কে অনেক বেশী সতর্ক থাকা আবশ্যক। এই হুসিয়ারীই উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য।

কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শন

২৬৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় আগ্রহ করিয়া বলিবে, আমার স্থান এই কবরের ভিতরে হইলে ভাল হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—কালক্রমে মানব জীবনে যে বিভীষিকাময় অশান্তির করাল ছায়া নামিয়া আসিবে উহারই ভবিষ্যদবাণী এই হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মীয় জীবনের বিপর্য্যয় সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

২৬৪৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, অধঃপতন প্রবাহে কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এরূপ অবস্থাও সৃষ্টি হইবে যে, দৌস গোত্রীয় নারীরা "জুল-খালাছাহ" নামক দেবী-মূর্ত্তির পূজা-প্রদক্ষিনে লিপ্ত হইবে। জুল-খালছাহ অন্ধকার যুগে দৌস গোত্রের বিশেষ পুজণীয় মূর্ত্তি ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন। সময় থাকিতে কাজ করিয়া যাও। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে যত্নের সহিত কাজে লাগাও। প্রতিটি পরবর্ত্তীকাল পূর্ব্ববর্ত্তীকাল অপেক্ষা সংকীর্ণ ও সঙ্কটময়; সুতরাং অধিক সুযোগের বৃথা আশায় সময় না হারাইয়া দ্রুত গতিতে উপস্থিত সময়কে কাজে লাগাইতে থাক ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর সতর্কবাণী মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى

كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا -

"আমল ও কাজ করিয়া চল বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আগে আগে যাহা রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় ঘনীভূত হইয়া আসে। (শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে,) অনেক লোক সকালে মোমেন থাকিবে, বিকালে কাফের হইয়া যাইবে। বিকালে মোমেন থাকিবে সকালে কাফের হইয়া যাইবে। পার্থিব ধন-সম্পদের বিনিময়ে স্বীয় দ্বীন ও ধর্ম্মকে বিক্রি করিবে।"

২৬৪৪। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এইরূপ হইবে যে, কাহ্‌তান গোত্রীয় একটি লোক শাসন-ক্ষমতা দখল করিবে এবং লাঠির জোরে লোকদিকে বশ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কাহ্‌তান গোত্র ইয়ামানের অধিবাসী। সেই গোত্রের একটি লোকের উল্লেখই এই ভবিষ্যদবাণীতে রহিয়াছে। হাদীছের মূল তাৎপর্য্য এই যে, কেয়ামতের পূর্ব্বে বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। উহার মধ্যে ইহাও একটি যে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শাসন ক্ষমতা দখল ও পরিচালনের পরিবর্ত্তে অভ্যুত্থান ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও পরিচালনের হিড়িক পড়িয়া যাইবে। তন্মধ্যে এই কাহ্‌তানী ব্যক্তির নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে, এই লোকটির অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল অবশ্যই কেয়ামতের পূর্ব্বে বাস্তবায়িত হইবে।

২৬৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে অবশ্যই হেজাজ অঞ্চলের কোন এক স্থানে ভুগর্ভ হইতে অগ্নি উত্থিত হইবে যাহার আলোতে সিরিয়াস্থ বছরা (হুরাণ) শহরে অবস্থিত উটের গর্দ্দান পর্য্যন্ত দৃষ্টি-গোচর হইবে।

ব্যাখ্যা :— কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের আলামত ও নিদর্শনরূপে বহু রকম অস্বাভাবিক ঘটনা ও বস্তু প্রকাশ পাইবে—যে সমস্তের বয়ান হাদীছে রহিয়াছে। তন্মধ্যে অগ্নি উত্থিত হওয়াও একটি। অগ্নি উত্থিত হওয়ার দুইটি ভবিষ্যদবাণী হাদীছে বর্ণিত আছে। একটি মোছলেম শরীফের হাদীছে—হোযায়ফা ইবনে আসীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী (দঃ) আমাদিগকে কেয়ামতের আলোচনা করিতে দেখিয়া বলিলেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দশটি আলামত অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইবে।......

উক্ত হাদীছে দশটি নিদর্শনের বয়ানে একটি এই نار تخرج من قعر عدن "(আরব সাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত উপকূলবর্ত্তি শহর) ইডেনের নিকট সমুদ্রগর্ভ হইতে আগুন বাহির হইয়া লোকদিগকে হাঁকাইয়া চলিবে।" এই ঘটনা কেয়ামতের অতি সন্নিকট সময়ে ঘটিবে। এই আগুণ উত্থিত হওয়ার স্থান হইল ইয়ামান এবং উহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইবে।

অগ্নি উত্থিত হওয়ার দ্বিতীয় ভবিষ্যদবাণী বর্ণিত হইয়াছে মূল আলোচ্য হাদীছে। এই আগুন উত্থিত হওয়ার স্থান হইল হেজাজ এবং ইহা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইবে। এই অগ্নির ভবিষ্যদবাণী সম্পর্কে আলোচ্য আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছ ছাড়া ইমাম বোখারী (রঃ) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতেও একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের (বড় বড় আলামতগুলির) প্রথম আলামত হইল একটি আগুন যাহা লোকদিগকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে হাঁকাইয়া নিবে। বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) লিখিয়াছেন এই ভবিষ্যদবাণীর ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ৬৫৪ হিজরী সনের জমাদিউছ্ছানী মাসের তিন তারিখ বুধবার রাত্রে এশার নামাযের পর মদীনা শহরের বাহিরে প্রস্তরময় এলাকার ভূগর্ভ হইতে আগুন উত্থিত হইয়া ছিল। ভীষণ এক ভূমিকম্প হইয়া সেই আগুন বাহির হইয়া ছিল এবং মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাত্র হইতে শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রজ্জলিত ছিল। (ফতহুল বারী ১৩—৬৮)

২৬৪৬। **হাদীছ :—** আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে অচিরেই এমন একটি দিন আসিবে যে দিন ফোরাদ নদীর কূল শুখাইয়া পর্ব্বৎ আকারে এক স্বর্ণ-খনি আবির্ভূত হইবে। তথায় উপস্থিত কেহ যেন উহা ছুঁইতেও না যায়।

ব্যাখ্যা :— উল্লেখিত স্বর্ণ-খনি স্পর্শ না করার নিষেধাজ্ঞার কারণটা মোসলেম শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট হইয়া যায়। সেই রেওয়ায়েতে

আলোচ্য ভবিষ্যদবাণীর সহিত আরও একটি ভবিষ্যদবাণী উল্লেখ আছে যে, فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى اكون انا الذى انجو “উক্ত স্বর্ণ-খনির জন্য লোকদের মধ্যে রক্তারক্তি চলিবে এবং শতকরা নিরানব্বই জন নিহত হইবে; প্রত্যেকেরই ধারণা হইবে, আমি হয় ত সফলকাম হইব।

২৬৪৭। ছাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে অবশ্যই এই ঘটনাগুলি ঘটিবে। (১) দুইটি সুবৃহৎ দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইবে তাহারা উভয় দল একই সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার দাবীদার। (২) বিভিন্ন সময়ে এমন এমন মিথ্যাবাদী জালিয়াতের আবির্ভাব হইবে যাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে, সে আল্লার রসুল—তাহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ত্রিশে দাঁড়াইবে। (৩) দ্বীনের এল্‌ম বিলুপ্ত হইবে। (৪) ভূমিকম্পের আধিক্য হইবে। (৫) সময় দ্রুতগামী মনে হইবে—সপ্তাহ, মাস ও বৎসরগুলি যেন পরস্পর নিকটবর্ত্তী তথা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট মনে হইবে। (৬) বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। (৭) মারামারী খুনাখুনির আধিক্য হইবে। (৮) ধন-দৌলতের প্রাচুর্য হইবে—ধনের গড়াগড়ী ও ছড়াছড়ী হইবে, এমনকি দান-খয়রাত গ্রহণকারীর তালাশে ধনীগণকে খুবই ব্যস্ত হইতে হইবে। কাহাকেও টাকা-পয়সা নিতে বলা হইলে সে বলিবে, এখন আমার কোন প্রয়োজন নাই। (৯) মানুষ উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী করায় পরস্পর গর্ব্ব ও প্রতিযোগীতা করিবে। (১০) জীবিত মানুষ মৃতের কবর সন্নিকটে চলাকালে আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিবে, আমার স্থান কবরের ভিতরে হইলে ভাল হইত। (১১) সূর্য্য তাহার অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। যেই সময় এই ঘটনা ঘটিবে এবং লোকগণ উহা প্রকাশ্যে অবলোকন করিবে উহাই সেই সময়টি যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তখন ঐ লোকদের ঈমান কবুল হইবে না যাহারা ইহার পূর্ব্বে ঈমান গ্রহণ করে নাই এবং ঐ লোকদের তওবা কবুল হইবে না যাহারা ইহার পূর্ব্বে তওবা করে নাই।

কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া পড়িবে। দুই ব্যক্তি কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হইয়া তাহা সম্পন্ন করার বা ভাজ করিয়া রাখার পূর্ব্বেই কেয়ামতের প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে। কেহ তাহার দুগ্ধবতি জানওয়ারের দুধ দোহাইয়াছে উহা পান করার পূর্ব্বেই প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে। কেহ তাহার পানিরচৌবাচ্চা তৈরী করিতেছে উহার পানি পান করার পূর্ব্বেই প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে। কেহ খাদ্য-গ্রাস মুখের নিকটে উঠাইয়াছে উহা খাইবার পূর্ব্বেই প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কেয়ামতের পূর্ব্ববর্তী অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর অন্যতম একটি ঘটনা। সূর্য্যের সাধারণ অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হওয়া। এই ঘটনার প্রতি পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে — ৮ পারা ৭ রুকু দ্রষ্টব্য। ঘটনার বিবরণ এই যে, ঈদুল-আজহার মাস—জিলহজ্জ চাঁদের দশ তারিখের পর অকস্মাৎ কোন একটি রাত্র অতিশয় দীর্ঘ হইবে; মানুষ শুইতে শুইতে অতিষ্ট হইয়া পড়িবে, পশুপাল মাঠে-ময়দানে যাওয়ার জন্য চিৎকার করিতে থাকিবে। এই বিভীষিকাময় অবস্থায়ই সেই রাত্রটি সাধারণ তিন রাত্রের সমপরিমাণ হওয়ার পর গ্রহণযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ক্ষীণ আলো লইয়া সূর্য্য উহার অস্তের দিক হইতে উদিত হইবে এবং মধ্য-আকাশ বরাবর আসার পূর্ব্বাহ্নে পুনঃ অস্তমিত হওয়ার দিকেই যাইয়া অস্তমিত হইবে। শুধু এক দিন এইরূপ হইয়া তারপর সূর্য্য স্বাভাবিকরূপেই উদিত ও অস্তমিত হইতে থাকিবে। (বেহেশ্‌তি জেওর ৭—৪৮)

কেয়ামতের পূর্ব্ববর্তী অপর ঘটনা—"সময় দ্রুতগামী মনে হওয়া" ইহার দুইটি কারণ হইবে। (১) সময়ের পরিমাণে কাজ হইবে না—এক মাসে এক সপ্তাহের মাত্র কাজ হইবে, ফলে কাঁজের প্রতি দৃষ্টিপাতে মাস সপ্তাহ তুল্য মনে হইবে। (২) প্রত্যেকের সম্মুখে চরম বিশৃঙ্খলা ও লিপ্ততা বিরাজমান থাকিবে; যাহার ব্যতিব্যস্ততায় মানুষ সময়ের গতি-গমনের প্রতিও লক্ষ্য রাখার ফুরছুত্‌ পাইবে না। কেহ মনে করিতেছে—আজ সোমবার, অথচ সোম মঙ্গল বুধবার অতীত হইয়া আজ বৃহস্পতিবার আসিয়া গিয়াছে। কেহ মনে করিতেছে, এইটা চৈত্র মাস, অথচ চৈত্র মাস অতীত হইয়া বৈশাখ মাসও শেষ প্রায়।

দজ্জালের আলোচনা

২৬৪৮। হাদীছ ঃ—মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দজ্জাল সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি যত বেশী জিজ্ঞাসা করিয়াছি অন্য কেহ এত বেশী জিজ্ঞাসা করে নাই। একদা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, দজ্জাল দ্বারা তোমার কি ক্ষতি হইতে পারিবে? আমি আরজ করিলাম, লোকেরা বলে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকিবে (—অর্থাৎ পানাহার সামগ্রীর প্রাচুর্য্য তাহার নিকট থাকিবে এবং উহার লালসে মানুষ তাহার দলভুক্ত হইয়া গোমরাহ হইবে; সেই ভীতিই আমার মনে জাগে।)

হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা দজ্জালকে এতটুকু মূল্য দেন নাই যে, তোমার ন্যায় পাকা-পোক্তা মোমেনকেও সে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পায়।

২৬৪৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জন-সমাবেশে ভাষণ দানে

দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফত বর্ণনার পর দজ্জালের উল্লেখ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ

فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবীও নিজ নিজ উম্মতকে দজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিব, যাহা কোন নবীই তাঁহার উম্মৎকে বলেন নাই। (মিথ্যাবাদী দজ্জাল খোদায়ী দাবী করিবে; তাহার সেই দাবী মিথ্যা হওয়ার শত শত প্রমাণের মধ্যে সহজ সরল সুস্পষ্ট একটি প্রমাণ এই—) জানিয়া রাখিও যে, দজ্জালের চক্ষু দোষী হইবে—আর মহান আল্লাহ তায়ালা হইলেন (সর্ব্ব দোষমুক্ত, নির্দ্দোষ—) তাঁহার দর্শন শক্তিও দোষ-ত্রুটি মুক্ত।"

২৬৫০। হাদীছঃ— عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

অর্থ—দজ্জালের ডান চক্ষু এরূপ দোষল হইবে যে, উহা যেন আঙ্গুর গুচ্ছের একটি বহির্ভূত আঙ্গুর।

ব্যাখ্যাঃ—সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষু যে আকারে চক্ষু কোটরে সুসমঞ্জস থাকে দজ্জালের মূল চক্ষুটা বা উহার পুতলিটা তদপেক্ষা অধিক বহির্মুখী স্ফীত হইবে, কিন্তু এই চক্ষুটির দৃষ্টিশক্তি থাকিবে। তাহার অপর চক্ষুটি সম্পর্কে মোছলেম শরীফে একটি হাদীছ আছে—

ان الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة

"দজ্জালের একটি চক্ষু হইবে লেপা-পোছা—ঐ চোখের কোটর পুরু চামড়া বা বর্দ্ধিত মাংসে আবৃত হইবে।" দৃষ্টিশক্তির কোন বস্তুই ইহাতে থাকিবে না। এই সূত্রেই দজ্জালকে কানা-দজ্জাল বলা হয়।"

২৬৫১। হাদীছঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতেছি। হঠাৎ দেখি,

একটি লোক শ্যাম বর্ণের, মাথার লম্বা চুলগুলি সোজা—অকুঞ্চিত, মাথা হইতে পানি ঝরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকটি কে ? উপস্থিত সকলেই বলিল, মরয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ)। তারপর অন্য দিকে তাকাইয়া আর একটি লোক দেখিতে পাইলাম—মোটা দেহী, লাল বর্ণ, মাথার চুল কুঞ্চিত, চোখ দোষল—একটা চোখ আঙ্গুর-গুচ্ছের বহির্ভূত আঙ্গুরটির ন্যায়। লোকেরা বলিল, এইটা হইল দজ্জাল। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, সে ছিল খোজায়া গোত্রের ইবনে-কাতান নামক ব্যক্তির সাদৃশ।

২৬৫২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে দজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

২৬৫৩। **হাদীছ ঃ**— হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দজ্জালের সহিত শীতল পানি এবং আগুন উভয়টিই থাকিবে, কিন্তু তাহার শীতল পানি প্রকৃত প্রস্তাবে হইবে আগুন এবং আগুন হইবে শীতল পানি।

ব্যাখ্যা ঃ—মোছলেম শরীফে এক হাদীছে আছে—

معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار

"দজ্জালের সহিত একটি বেহেশত ও একটি দোযখ থাকিবে। তাহার বেহেশত প্রকৃত প্রস্তাবে দোযখ হইবে এবং তাহার দোযখ প্রকৃত প্রস্তাবে বেহেশত হইবে।"

অপর এক রেওয়ায়েতে বেহেশত-দোযখ বলিতে উহার রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া উল্লেখ রহিয়াছে—

معه مثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار

"দজ্জালের সহিত বেহেশত স্বরূপ একটি বস্তু থাকিবে এবং দোযখ স্বরূপ একটি বস্তু থাকিবে। যে বস্তুটিকে সে বেহেশত বলিবে সেইটি প্রকৃত প্রস্তাবে হইবে দোযখ।"

এই সব তথ্যের সারমর্ম এরূপ বলা যাইতে পারে যে, মোটা-মুটি ভাবে দজ্জালের নিকট সুখ-শান্তির একটি ব্যবস্থা এবং দুঃখ-যাতনার একটি ব্যবস্থা উভয়টিই থাকিবে। দজ্জাল স্বীয় তাবেদারগণকে তাহার সুখ-শান্তির ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান করিবে, আর তাহার বিরুদ্ধবাদীগণকে দুঃখ-যাতনার ব্যবস্থায় নিক্ষেপ করিবে। দজ্জালের প্রদত্ত সুখ-শান্তির ব্যবস্থার পরিণাম যে, আখেরাতে দোযখ হইবে তাহা

অবধারিত। পক্ষান্তরে তাহার শাস্তি ও নির্য্যাতনের পরিণাম যে, আখেরাতে বেহেশত হইবে তাহাও আশ্বাসিত। এতদ্ভিন্ন হইতে পারে—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে পাথিব দিক দিয়াও দজ্জালের প্রদত্ত সুখ-শান্তির ব্যবস্থায় দুঃখ-কষ্ট হইবে এবং দুঃখ-যাতনার ব্যবস্থায় সুখ-শান্তি বিরাজ করিবে। যেরূপ নমরূদের ভয়াবহ অগ্নি কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সুশীতল বস্তুর সুখ-শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

২৬৫৪। হাদীছ :— عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِىٌّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلَا اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রেরিত নবীই স্বীয় উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। (সে যে মিথ্যাবাদী উহার একটি সহজ প্রমাণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। সে খোদা হওয়ার দাবী করিবে, অথচ) সে হইবে কানা—দোষী-চোখবিশিষ্ট, আর তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা কানা নন—তিনি সর্ব্ব-দোষমুক্ত।

আরও জানিয়া রাখিও, দজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে—কপালে লিখিত থাকিবে "কাফের"।

ব্যাখ্যা :—বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ আছে, দজ্জালের কপালে আরবী ভাষায় খচিত কাফের শব্দটি প্রত্যেক মোসলমান—যে দজ্জালের দলে না ভিড়িবে সে পড়িতে পারিবে। এমনকি যে অশিক্ষিত লেখা-পড়া জানে না সেও উহা পড়িতে সক্ষম হইবে বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (ফতহুল বারী ১৩—৮৫)

প্রকৃত প্রস্তাবে দজ্জালের আবির্ভাব দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ ভাগে কেয়ামতের অতি সন্নিকটে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে আল্লাহ তায়ালা দজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আবির্ভাবের সময় অবহিত করেন নাই, তাই তাঁহারা নিজ নিজ উম্মৎকে সতর্ক করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে আমাদের পয়গাম্বর সর্ব্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে তদ্রূপ শুধু দজ্জালের আবির্ভাবের বিষয় অবহিত করা হইয়াছিল, আবির্ভাবের সময়কাল অবহিত করা

হয় নাই। এই কারণেই মোছলেম শরীফের এক হাদীছে হযরতের এই উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست
فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي عليكم……

“দজ্জালের আবির্ভাব যদি আমার জীবদ্দশায় হয় তবে তাহাকে পরাস্ত করার ব্যবস্থা আমিই করিব ; তোমাদের কিছু করার প্রয়োজন হইবে না। আর যদি আমার অবর্ত্তমানে তাহার আবির্ভাব হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ; সেই অবস্থায় তোমাদের জন্য আমার স্থলে আল্লার সাহায্য কামনা করি। যাহারা দজ্জালের সম্মুখে পতিত হইবে তাহারা যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করে।”

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কেয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘনাইয়া আসার সাথে সাথে জগতে বিভিন্ন অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনা ঘটিবার ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—(১) অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে সূর্য্য উদিত হওয়া। যাহার বিবরণ ২৬৪৭ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। (২) ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্টির আবির্ভাব, যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে। (৩) দাব্বাতুল-আরদ বা ভূ-ভেদী জন্তুর আবির্ভাব। পবিত্র কোরআন ২০ পারা ২ রুকুতে ইহারও সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হইবে একটি অতি অস্বাভাবিক জীব। ইহার আকৃতি হইবে চতুষ্পদ জন্তুর, জন্ম হইবে উদ্ভিদের ন্যায় ভূ-ভেদী। মক্কাস্থিত ছাফা পাহাড় ভূকম্পনে ফাটিয়া জন্তুটি বাহির হইবে (বেহেশতি জেওর ৭—৪৯)। সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্যজনক বিষয় যাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, ঐ জন্তুটি লোকদের সহিত মানুষের ন্যায় কথা বলিবে। তাহার বক্তব্যের একটি অতি সত্য কথা পবিত্র কোরআনে এই উল্লেখ আছে—

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

সে অভিযোগ করিয়া বলিবে, “মানুষ আল্লার কুদরতের নিদর্শন সমূহের প্রতি একিন, বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়িয়া দিয়াছে।” (২০ পারা ২ রুকু)

দজ্জাল ঐ শ্রেণীর অস্বাভাবিক বস্তুনিচয়েরই একটি। তাহার হাল-অবস্থা এবং যাদু ও নজর-বন্দীর ঘটনাবলী অতিশয় অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হইবে। দজ্জাল অর্থ অতিশয় জালিয়াত। তাহার জালিয়াতি আরম্ভ হইবে নবুয়তের দাবী হইতে। অতঃপর খোদায়ী দাবীও সে করিবে। সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্ত্তী

পথ বহিয়া দজ্জালরূপে তাহার আবির্ভাব-অভিযান আরম্ভ হইবে। চতুর্দিকে বিভীষিকা ও বিপর্য্যয় ছড়াইয়া সে বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সে ইহুদী সম্প্রদায়ের হইবে এবং সকল ইহুদীই তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন বেদ্বীন এবং শুধু নামের মোসলমান শ্রেণীর বহু লোক তাহার দলে ভিড়িবে। যাদুর সাহায্যে বিভিন্ন রকম অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী সে দেখাইবে। যথ.—

(১) দজ্জালরূপে আবির্ভাবের পর দুনিয়ায় তাহার জীবনকাল দিনের হিসাবে ৪০ দিন হইবে। কিন্তু উহার মধ্যে একটি দিন এক বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। তারপরের দিনটি এক মাস পরিমাণ এবং তারপরের দিনটি এক সপ্তাহ পরিমাণ হইবে। অবশিষ্ট দিনগুলি স্বাভাবিক পরিমাণের হইবে। এক বৎসর ও এক মাস ও এক সপ্তাহ পরিমাণের দিনগুলিতেও স্বাভাবিক রকমের দিবা-রাত্রির গমনাগমন হইতে থাকিবে, কিন্তু যাদুর সাহায্যে নজর-বন্দীর দরুণ মানুষের দৃষ্টিতে তাহা উদ্ভাষিত হইবে না। ফলে দীর্ঘ এক বৎসর, এক মাস ও এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মানুষের চোখে দিনের আলোই দেখা যাইবে। এই সূত্রেই ঐ দিনগুলিতে শুধু একদিনের নামায পাঁচ ওয়াক্ত যথেষ্ট হইবে না, বরং স্বাভাবিক সময়ের পরিমাণ করিয়া এক বৎসর, এক মাস ও এক সপ্তাহের নামাযই আদায় করিতে হইবে বলিয়া মোছলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

(২) যে সব সম্প্রদায় তাহার অনুগত হইবে এবং তাহাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে সে তাহাদের এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষাইবার জন্য আকাশকে আদেশ করিবে। সেই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিবে, ফলে সেই এলাকায় শষ্য-ঘাসের প্রাচুর্য্য হইবে, পশুপাল অধিক মোটা-তাজা হইয়া বেশী বেশী পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে যে সম্প্রদায় তাহার ডাকে সাড়া দিবে না তাহাদের এলাকায় অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, ঘাসের অভাবে পশুপাল ধ্বংস হইয়া যাইবে, লোকগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

(৩) পাহাড় পর্ব্বত বন-জঙ্গল ইত্যাদি পতিত এলাকা অতিক্রম কালে দজ্জাল ভূখণ্ডকে আদেশ করিবে—সমস্ত খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার বাহির করিয়া দাও। সেমতে ভূগর্ভ হইতে সমুদয় খনিজ দ্রব্য উথলিয়া উঠিবে।

(৪) দজ্জালের বিভীষিকাময় অভিযানকালেই হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতরণ করিবেন। দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করিয়া দামেশ্‌ক শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক মসজিদের মিনারের উপর তিনি অবতরণ করিবেন। সিরিয়া অন্তর্গত "লুদ্দ্" নামক স্থানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের হস্তে নিহিত হইবে। (মোছলেম শরীফ)

দজ্জালের অসাধারণ যাদু-শক্তির আরও একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে প্রত্যক্ষ করুন।

২৬৫৫। হাদীছঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের সম্মুখে দজ্জাল সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। হজরতের বয়ানে এই ঘটনাটিও উল্লেখ ছিল যে, দজ্জাল মদীনায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে আসিবে, কিন্তু উহা তাহার জন্য অসাধ্য। মদীনায় প্রবেশের প্রতিটি দ্বার ও পথ তাহার জন্য আল্লার তরফ হইতে রুদ্ধ হইবে। তাই সে মদীনার নিকটস্থ একটি লোনা ভূমিতে অবস্থান করিবে। মদীনা শহর হইতে তাহার প্রতি একটি লোক ছুটিয়া আসিবে। লোকটি তৎকালীন বিশ্বের উত্তম ব্যক্তিদের একজন। তিনি বলিবেন—

اشهد انك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুই সেই দজ্জাল যাহার বিবরণ রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

তখন দজ্জাল তাহার দলের লোকদিগকে বলিবে, আমি যদি এই ব্যক্তিকে মারিয়া পুনঃ জীবিত করিয়া দিতে পারি তবুও কি আমার (খোদা হওয়া) সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে? দলের লোকেরা বলিবে, না। তখন দজ্জাল ঐ লোকটিকে হত্যা করিবে এবং তৎপর তাঁহাকে জীবিত করিবে। তখন সেই লোকটি বলিবেন, তোর (দজ্জাল হওয়া) সম্পর্কে পূর্ব্বে এত সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট উপলব্ধি আমার ছিল না যেরূপ এখন হইয়াছে। তখন দজ্জাল পুনরায় ঐ লোকটিকে হত্যা করিতে চাহিবে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তাহার হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ—মদীনা শহরে দজ্জাল কেন প্রবেশ করিতে পারিবে না সে সম্পর্কে কতিপয় সুস্পষ্ট হাদীছ অত্র গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মদীনার ফজিলত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

দজ্জাল একজন উত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করার যে ঘটনা আলোচ্য হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে উহার আরও বিবরণ মোছলেম শরীফে বর্ণিতে আছে। যথা—ঐ লোকটি হইবেন খাঁটী দ্বীনদার, মদীনাবাসী। মদীনা শহর হইতে বাহিরে আসিলে পর দজ্জালের সৈন্যদলের সহিত ঐ লোকটির সাক্ষাত হইবে। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি আমাদের খোদার (তথা দজ্জালের) প্রতি ঈমান রাখ না কি? লোকটি বলিবেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কে খোদা তাহা ত অতি সুস্পষ্ট। তখন ঐ সৈন্য দলের লোকেরা বলিবে, তাহাকে হত্যা কর। আবার কেহ কেহ বলিবে, তোমাদের খোদা (দজ্জাল) নিষেধ করেন নাই—তিনি ভিন্ন অন্য কেহ যেন

কাহাকেও হত্যা না করে ? সেমতে তাহারা ঐ লোকটিকে দজ্জালের নিকট উপস্থিত করিবে। দজ্জাল তাঁহাকে প্রহারের আদেশ করিবে। তাঁহাকে প্রহার করা হইবে। দজ্জাল পুনরায় তাঁহাকে পাকড়াও করিবার ও প্রহার করিবার আদেশ করিবে। প্রহারের ফলে তাঁহার পেট ও পিঠ চেপ্টা হইয়া যাইবে। অতঃপর দজ্জাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছ কি ? ঐ লোকটি বলিলেন, তুই মিথ্যাবাদী কানা-দজ্জাল। তখন তাঁহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলার আদেশ করা হইবে। তাঁহাকে মাথার তালু হইতে চিরিয়া দুই পায়ের দুই অংশকে বিভক্ত করিয়া দূরে দূরে রাখা হইবে। তারপর দজ্জাল উক্ত খণ্ডদ্বয়ের মধ্য দিয়া পায়চারি করিবে এবং বলিবে, ক্বুম্—উঠিয়া দাঁড়াও। তৎক্ষণাৎ ঐ নিহত লোকটি জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িবে।

অতঃপর দজ্জাল পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে কি ? তিনি বলিবেন, তোর (দজ্জাল হওয়া) সম্পর্কে আমার উপলব্ধি আরও সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি সমবেত লোক সমক্ষে সকলকে বজ্রকণ্ঠে আহ্বান করিয়া এই ঘোষণাও দিবেন, "হে লোক সকল ! এ-ই মিথ্যাবাদী কানা-দজ্জাল। যে কেহ তাহার দলভুক্ত হইবে জাহান্নামী হইবে এবং যে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে সে বেহেশতী হইবে।*

তিনি আরও বলিবেন, হে লোক সকল ! (তোমরা ভয় পাইও না ;) সে আমার পর অন্য কোন মানুষের প্রতি এরূপ করিতে পারিবে না। তখন দজ্জাল ঐ ব্যক্তিকে জবাই করার জন্য ধরিয়া আনিবে, কিন্তু তাঁহার গলায় অস্ত্র চলিবে না এবং তাঁহাকে সে হত্যা করিতে পারিবে না। তখন দজ্জাল তাঁহাকে তাঁহার হাত-পা ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। তিনি তথায় এরূপ শান্তি লাভ করিবেন যেন তিনি বেহেশতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

হযরত রসুলুল্লহ (দঃ) এই লোকটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট অতি বড় শহীদের মর্ত্তবা লাভ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— দজ্জালের সমুদয় ব্যাপারই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। উপরে তাহার সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে সবই তাহার দজ্জালরূপে আবির্ভূত হওয়ার পরের অবস্থা। তাহার পূর্ব্ববর্তী হাল-অবস্থাও অত্যন্ত রহস্যজনক।

পবিত্র কোরআন ও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্ঠি—তাহাদের আবির্ভাব কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে হইবে, কিন্তু ঐ গোষ্ঠির জন্ম ও অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠে বহু পূর্ব্ব হইতে আছে বলিয়াও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ

* এই প্রথম ঘোষণাটি ফতহুল বারী কেতাবে উল্লেখ আছে—১৩—৮৮ দ্রষ্টব্য।

রহিয়াছে। ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্টির জন্মকাল হইতে তাহাদের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত এই বিরাট গোষ্টি জগতেরই এক নিখোঁজ প্রান্তে জগতবাসীর দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করিতেছে। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী তাহারা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবে।

(পবিত্র কোরআন ১৬ পারা ছুরা কাহাফ ও ১৭ পারা ছুরা আম্বিয়া দ্রষ্টব্য)

মোছলেম শরীফের এক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, দজ্জালের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও পূর্ব্ব হইতে দজ্জাল ভূপৃষ্ঠের এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে লোকালয়ে তাহার আবির্ভাব হইবে। একজন বিশিষ্ট ছাহাবী তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে সামুদ্রিক ছফরে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এক অজ্ঞাত নামা দ্বীপে পৌঁছিয়া ছিলেন। তিনি তথায় দজ্জালকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া ছিলেন। তিনি সেই তথ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জ্ঞাত করিলে পর হযরত (দঃ) তাহা সমর্থন করিয়াছেন। এমনকি এক বিশেষ ভাষণে হযরত (দঃ) তাহা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। মোসলেম শরীফের উক্ত হাদীছের তরজমা নিম্নে দেওয়া হইল।

ফাতেমা বিন্‌তে কায়েস (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম হিজরতকারী লোকদের মধ্যে একজন নারী ছাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে একজন আহ্বানকারী নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিতে লাগিল। আমি জমাতে উপস্থিত হইয়া পেছনের কাতারে নারীদের সঙ্গে শামিল হইলাম। নামাযান্তে হযরত (দঃ) হাসিমুখে মিম্বারে যাইয়া বসিলেন এবং সকলকে বসিয়া থাকার আদেশ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—আমি কেন তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি তাহা জান কি? আমি একটি বিশেষ ঘটনা শুনাইবার জন্য তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি।

তামীম দারী নামক একজন নাছরানী খৃষ্টান, আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং আমাকে তাহার একটি ঘটনা শুনাইয়াছে। তাহার বর্ণনা ঐ তথ্যের পূর্ণ সমর্থক যাহা আমি তোমাদিগকে কানা-দজ্জাল সম্পর্কে বলিয়াছি। তাহার ঘটনাটি এই যে, সে অন্যান্য ত্রিশজন লোকের সহিত একটি সামুদ্রিক নৌকার যাত্রী ছিল। দীর্ঘ এক মাস কাল দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সমুদ্র তরঙ্গের হানাহানিতে নৌকাটি পথচ্যুত হইয়া একটি অপরিচিত দ্বীপে উপনীত হইল—তখন সূর্য্যাস্তের সময়। নৌকার সহিত একটি ডিঙ্গা ছিল, লোকেরা উহাতে বসিয়া দ্বীপে অবতরণ করিল। তথায় তাহাদের সাক্ষাত হইল একটি জন্তুর সহিত—উহার দেহ লোমে এমনভাবে আবৃত যে, উহার অগ্র-পশ্চাৎ স্থির করা যায় না। লোকেরা চমকিত হইয়া বলিল, তুই কে? জন্তুটি বলিল, আমি জাছ্‌ছাছাহ্ অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহকারী।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কি তথ্য সংগ্রহকারী? সে বলিল, ঐ কুড়ে ঘরে একটি লোক আছে, তাহার নিকট চল; তোমাদের সংবাদাদির ব্যাপারে তাহার বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে।

ঐ লোকদের সহিত তামীম দারীও ছিলেন, তিনি বলেন, আমরা যখন মানুষের সংবাদ শুনিলাম তখন আমরা দ্রুত কুড়ে ঘরের দিকে চলিলাম। তথায় একটি বিরাট কায়-বিশিষ্ট মানুষ দেখিতে পাইলাম। মানুষটি অতিশয় কঠিন ও শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ—তাহার হস্তদ্বয় ঘাড়ের সহিত এবং পা উরুর সহিত লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ। আমরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমার সংবাদ পাইবার স্থানেই তোমরা উপস্থিত হইয়াছ; আগে তোমাদের পরিচয় বল। উত্তরে বলিলাম, আমরা আরবের অধিবাসী। আমরা কিভাবে উক্ত দ্বীপে এবং তৎপর তাহার কুড়ে ঘরে পৌঁছিয়াছি সেই বিবরণও বলিলাম। ঐ লোকটি আমাদের নিকট কতিপয় নিদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করার পর আরবের নবীর আবির্ভাব সম্পর্কেও প্রশ্ন করিল। আমরা বলিলাম, মক্কায় তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি মদীনায় অবস্থান করিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, আরবরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, যুদ্ধ বিগ্রহের পর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল অধিবাসীই তাঁহার অনুগত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম।

অতঃপর সে নিজ পরিচয় দানে বলিল, আমি হইলাম কানা-দজ্জাল। অচিরেই আমাকে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে। আমি বাহির হইয়া সকল দেশ ভ্রমন করিব, শুধু মাত্র মক্কা ও তায়বা নগরদ্বয়ে প্রবেশ করিতে পারিব না। উক্ত নগরীদ্বয়ে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা থাকিবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বিবৃতির এই পর্য্যায়ে লাঠি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করতঃ বলিলেন, এই সেই "তায়বা" এই সেই "তায়বা"। তায়বা মদীনারই অপর নাম। অতঃপর হযরত (দঃ) উপস্থিত লোকদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তমীম দারীর এই বর্ণনায় আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি। কারণ, দজ্জাল এবং মক্কা মদীনা সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম উহার পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে উক্ত বর্ণনার সহিত।

● আলোচ্য ঘটনার দ্বীপটি সম্পর্কে ঘটনার বর্ণনা দানকারী তমীম দারী কোন সঠিক তথ্য দানে সক্ষম হন নাই, হযরত (দঃ)ও উহাকে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। মদীনা হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া মোসলেম শরীফের এক হাদীছে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন মাত্র।

দজ্জালের জন্ম সম্পর্কে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে ইহুদী সম্প্রদায়ে একটি বালক জন্মিয়া ছিল—যাহার মধ্যে দজ্জালাকৃতির অনেক নমুনা বিদ্যমান থাকায় ছাহাবীদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনকি অনেকে তাহাকে দজ্জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিতেন। সে "ইবনে-ছাইয়্যাদ" নামে পরিচিত ছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সঠিক অবস্থা ওয়াকেফহাল হওয়ার চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং নিকট হইতে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) উক্ত তথ্য সম্বলিত একটি হাদীছ ১৮১, ৪৩১ এবং ৯১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

২৬৫৬। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্য কতিপয় ছাহাবীর সহিত ইবনে ছাইয়্যাদ নামীয় বালকটির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যেই একস্থানে তাহাকে অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলায় লিপ্ত দেখিতে পাইলেন। ইবনে ছাইয়্যাদ তখন সাবালক প্রায়।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে অকস্মাৎ তাহার পিঠে করাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "আমি আল্লার রসুল" ইহার স্বীকৃতি ও বিশ্বাস তোর আছে কি ? সে হযরতের প্রতি তাকাইয়া বলিল, আমি এতটুকু বলিতে পারি যে, আপনি অশিক্ষিত আরবদের রসুল। অতঃপর সে হযরত (দঃ)কে পাল্টা প্রশ্ন করিল, আপনি কি স্বীকার করেন, আমি আল্লার রসুল ? তখন হযরত (দঃ) তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আল্লার উপর এবং আল্লার প্রকৃত রসুলগণের উপর আমার ঈমান রহিয়াছে।

হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন শ্রেণীর আগন্তুক তোর গোচরে আসিয়া থাকে ? সে বলিল, সত্য-মিথ্যা বাস্তব-অবাস্তব মিশ্রিত তথ্যবাহীর আগমন আমার নিকট হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, মিথ্যার সংমিশ্রনে গড়ান তথ্যাবলীই তোর নিকট সরবরাহ করা হইয়া থাকে ; (ইহা হইল দুষ্ট জ্বীনদের কাজ।)

অতঃপর ইবনে ছাইয়্যাদের আসলরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য হযরত (দঃ) বলিলেন, তোর পরীক্ষার্থে আমি আমার মনে একটি কথা উপস্থিত করিয়া গোপন রাখিলাম। (তোর যদি গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার ক্ষমতা থাকে তবে তাহা ব্যক্ত কর।

নবী (দঃ) ঐ সময় ছুরা দোখানের আয়াত—يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ তাঁহার মনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আয়াতটিতে একটি শব্দ ছিল "দোখান"। ইবনে ছাইয়াদ পূর্ণ আয়াতটি ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইবে তাহাত অতি দুরের কথা; সে দোখান শব্দটিও ব্যক্ত করিতে পারিল না।;) শুধু কেবল বলিল "দোখ্"।

হযরত (দঃ) তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, এতটুকুই তোর ক্ষমতার শেষ সীমা। ইহা অতিক্রম করার শক্তি তোর হইতে পারে না।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! ইহার শিরোচ্ছেদের অনুমতি আমাকে দিবেন কি? আপনি বাধা দিবেন না, আমি তাহার শিরোচ্ছেদ করিয়া দেই। উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি সে প্রকৃত প্রস্তাবেই দজ্জাল হইয়া থাকে, তবে তাহাকে হত্যা করা তোমার দ্বারা হইবে না। (দজ্জালের হত্যাকারী হযরত ঈসা (আঃ) নির্দ্ধারিত রহিয়াছেন।) আর যদি সে দজ্জাল না হয় তবে তাহাকে হত্যা করায় কোন লাভ নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হযরত (দঃ) পুনরায় এক দিন ছাহাবী উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সমভিব্যহারে ইবনে ছাইয়্যাদের বাসস্থান খেজুর বাগানের দিকে রওয়ানা হইলেন। বাগানে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) খেজুর গাছের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) ইবনে ছাইয়্যাদের অগোচরে তাহার কথা-বার্ত্তা শুনিবার গোপন চেষ্টা করিতেছিলেন। ঐ সময় ইবনে ছাইয়্যাদ স্বীয় বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া বিড়বিড় করিতে ছিল। তাহার মাতা হযরত (দঃ)কে গাছের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ফেলিল। সে ইবনে ছাইয়্যাদকে সতর্ক করিয়া বলিল, এই যে—মোহাম্মদ আসিয়া গিয়াছেন। ইবনে ছাইয়্যাদ তৎক্ষণাৎ নীরব হইয়া গেল। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহার মাতা তাহার বিড়বিড় বন্ধ না করিলে সে উহাতেই স্বীয় বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিত।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ বর্ণনা করিয়া দজ্জালের উল্লেখ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিতেছি। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন, এমনকি নূহ (আঃ)ও তাঁহার উম্মতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। দজ্জাল মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণে এমন একটি কথা আমি তোমাদিগকে বলিব যাহা কোন নবী তাঁহার উম্মতকে বলেন নাই।

তোমরা জানিয়া রাখিও, দজ্জাল (খোদায়ী দাবী করিবে, অথচ) তাহার চোখ হইবে দোষল—আর আল্লাহ তায়ালা হইলেন সর্ব্ব দোষমুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ—ইবনে ছাইয়্যাদ সম্পর্কে গুজব ছড়াইয়া ছিল যে, সে গোপন কথা বলিয়া দিতে পারে। সেই গুজবের অবাস্তবতা প্রমাণ করার ব্যবস্থাই হযরত (দঃ) অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহা সার্থক হইয়াছিল। হযরত (দঃ) নিজের মনে একটি আয়াত উপস্থিত করিয়া ইবনে ছাইয়্যাদকে উহা ব্যক্ত করার চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন। ইবনে ছাইয়্যাদ তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইয়াছিল। পূর্ণ আয়াতটির শুধু একটি শব্দের দুইটি অক্ষর মাত্র বলিতে পারিয়াছিল। ইহা দ্বারাই তাহার মিথ্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।

ইবনে ছাইয়্যাদের অবস্থার গোপন রহস্য এই ছিল যে, তাহার সহিত শয়তান শ্রেণীর জ্বীনের গাঢ় সম্পর্ক ছিল। সৃষ্টিগত ভাবে জ্বীন জাতির ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারা মানুষের আভ্যন্তরিক পয়তে পয়তে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। শিরায় শিরায় চলিতে পারে বলিয়া ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

মানুষ তাহার অন্তরে কোন কিছু উপস্থিত করিলে অন্তরের উপর উহার ছায়া সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তাহা হয় ত স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হয় না। কোন জ্বীন কাহারও অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়া তাহার অন্তরের উপর ঐ শ্রেণীর কোন অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ছাপ্ দেখিয়া কিছু বলিলে তাহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হইবে না; নিতান্ত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণই হইবে। হযরতের পরীক্ষার মাধ্যমে ইবনে ছাইয়্যাদের সেই রূপটাই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। হযরতের অন্তরে উপস্থিত পূর্ণ আয়াতের শুধু একটি শব্দের দুইটি মাত্র অক্ষর সে ধরিতে পারিয়াছে যদ্দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, শয়তান শ্রেণীর জ্বীনের খেলাই হইল ইবনে ছাইয়্যাদের সর্ব্বময় পুঁজি। তাই হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দুই অক্ষর শ্রেণীর অসম্পূর্ণ খোঁজ লাভের মধ্যেই তোর সর্ব্বময় দৌরাত্ম্য সীমিত। ইহার অধিক ক্ষমতা তোর নাই।

ইবনে ছাইয়্যাদের সহিত যে, শয়তান শ্রেণীর জ্বীনের সম্পর্ক ছিল মোসলেম শরীফের এক হাদীছে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ما ترى তোর নজরে কি দৃষ্ট হয়? সে উত্তরে বলিয়াছে, ارى عرشا على الماء আমি পানির উপর সিংহাসন দেখিয়া থাকি। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, ترى عرش ابليس على البحر তোর ঐ দেখা বস্তুটি হইল সমুদ্র বুকে ইবলিসের সিংহাসন। (মোছলেম শরীফ ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

পানির উপর ইবলিসের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার কথা এই হাদীছ ছাড়া মোসলেম শরীফের আরও একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে—যাহা মেশকাত শরীফের ১৮ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ রহিয়াছে। জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইবলিসের দুষ্কৃতি অভিযানের বর্ণনা দানে বলিয়াছেন, ইবলিস পানির উপর তাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া চুতুর্দ্দিকে তাহার দল-বলকে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া থাকে। তারপর ইবলিস কর্ত্তৃক সিংহাসনে বসিয়া স্বীয় দল-বলের নিকট হইতে তাহাদের কার্য্যের রিপোর্ট গ্রহণের বিবরণ হযরত (দঃ) বয়ান করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইবনে ছাইয়্যাদের উল্লেখিত বিবরণ তাহার শৈশব কালের। সেই কারণেই তাহার অত্যন্ত ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তিকে হযরত (দঃ) সহ্য করিয়া গিয়াছেন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বয়স্ক হওয়ার পর ত সে মোনাফেকরূপে হইলেও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবস্থা এতই ঘোলাটে ছিল যে, তাহাকে প্রত্যক্ষকারী ছাহাবীগণ পর্য্যন্ত তাহার সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নিজের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—এক সময় আমরা হজ্জ বা ওমরা করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কায় যাইতে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ইবনে ছাইয়্যাদও ছিল। আমরা রোদ্রের উত্তাপ সময়ে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করিলাম। সকলেই এক একটা গাছের ছায়া-তলে চলিয়া গেল। ইবনে ছাইয়্যাদ ও আমি একত্রে থাকিয়া গেলাম। ইহাতে আমি বিচলিত হইলাম, কারণ ইবনে ছাইয়্যাদ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে নানারকম কথা চলিতে ছিল। ইবনে ছাইয়্যাদ তাহার আসবাবপত্র নিয়া আসিয়া আমার আসবাবপত্রের সঙ্গে রাখিল। তখন আমি ভান করিয়া তাহাকে বলিলাম, উত্তাপ অনেক বেশী, সুতরাং তুমি ভিন্ন গাছের ছায়ায় চলিয়া গেলে ভাল হইত। সে তাহাই করিল। কিছু সময় পর সে আমাকে পান করাইবার জন্য বকরির দুগ্ধ নিয়া আসিল। আমি বলিলাম, এত গরমের সময় দুগ্ধ পান করিব না। এরূপ বলার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তাহার হাত হইতে কিছু গ্রহণ করাকে আমি এড়াইতে চাহিয়া ছিলাম।

সেই সময়ে ইবনে ছাইয়্যাদ আমাকে বলিল, হে ভাই আবু সায়ীদ! লোকদের কথা-বার্ত্তায় আমার মনে চায়, কোন বৃক্ষের সঙ্গে দড়ি লটকাইয়া গলায় ফাঁসি দিয়া মৃত্যু বরণ করি। অন্য লোকদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত অজানা থাকিলেও আপনারা ত মদীনাবাসী ছাহাবী—আপনাদের পক্ষে তাহা অজানা থাকা চাই না। আপনারা ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহ ভাল-ভাবেই জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন নাই—দজ্জাল কাফের হইবে? আমি ত মোসলমান।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন নাই—দজ্জাল নিঃসন্তান হইবে ? আমি আমার ছেলেকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছি।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন নাই—দজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না ? আমি মদীনায় থাকি এবং এখন মক্কাপানে যাইতেছি।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তাহার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিয়া যাইতেছিল যে, তাহার দজ্জাল হওয়া সম্পর্কে যত কিছু বলা হয় সব অবাস্তব। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিল, খোদার কসম—আমি দজ্জালকে চিনি, তাহার মাতা-পিতাকে চিনি, তাহার জন্মস্থান জানি এবং এখন সে কোথায় আছে তাহাও অবগত আছি। তখন আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম, চিরকালের জন্য তোর কপালে ছাই-ভস্ম।

তাহাকে কেহ ইহাও জিজ্ঞাসা করিল, তুমি দজ্জাল হওয়া পছন্দ কর কি ? সে বলিল, যদি আমাকে তাহা বলা হয় তবে আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিব না। (মোসলেম শরীফ ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

ইবনে ছাইয়্যাদের সর্ব্বশেষ খবরও রহস্যাবৃত। কাহারও মতে তাহার মৃত্যু মদীনায়ই হইয়াছিল এবং সাধারণভাবে জন-সাধারণ তাহার মৃত্যু অবলোকন করিয়াছিল। কিন্তু আবু দাউদ শরীফে ছাহাবী জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এজীদের শাসন আমলে মদীনার উপর এজীদ বাহিনীর এক পৈশাচিক আক্রমণ হইয়াছিল যাহা ইতিহাসে "হার্‌রা অভিযান" নামে প্রসিদ্ধ। সেই ঘটনায় মদীনার অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছিল। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, ইবনে ছাইয়্যাদ সেই ঘোলাটে অবস্থায় নিখোঁজ ও উধাও হইয়াছে।

সেমতে ইহাও হইতে পারে যে, ইবনে ছাইয়্যাদ প্রকৃত দজ্জাল ছিল না, অন্যান্য নিহত লোকদের ন্যায় সেও ঐ ঘটনায় নিহত হইয়াছে। আর ইহাও হইতে পারে যে—দজ্জালকে হত্যাকারী হযরত ঈসা (আঃ) যেরূপ বহু কাল পূর্ব্বেই দুনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সাধারণ্যে বসবাস করিয়াছিলেন ; অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করিয়া জীবিতাবস্থায় জগদ্বাসীর দৃষ্টির অন্তরালে আসমানে রাখিয়া দিয়াছেন ; কেয়ামতের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত সময়ে দুনিয়ার বুকে পুনরায় তাঁহার আগমন হইবে। তদ্রূপ দলজ্জালও দজ্জালরূপে তাহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে দুনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ইবনে ছাইয়্যাদ নামে বসবাস করার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানব চোখের অগোচরে গুম করিয়া কোনও অজ্ঞাত দ্বীপে বা পর্ব্বত গুহায় আবদ্ধ রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহার আবদ্ধ জীবনের অগ্রিম মেছালী বা রূপক দৃশ্যই তামীম দারী (রাঃ) দেখিয়া ছিলেন ;

যাহার বিবরণ মোছলেম শরীফ হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেয়ামতের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত সময়ে দজ্জালরূপে পুনরায় দুনিয়ার বুকে তাহার আবির্ভাব হইবে। এই সূত্রে কতকগুলি জটিলতার মীমাংসাও সহজ হইয়া যায়।

মোছলেম শরীফ হইতে উদ্ধৃত আবু সায়ীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছে স্বয়ং ইবনে ছাইদ্যাদের মুখে তাহার দজ্জাল হওয়ার বিরুদ্ধে কতিপয় দলীল উল্লেখ হইয়াছে। আলোচিত বক্তব্য অনুযায়ী ঐ সবের খণ্ডন সহজ হইয়া যায় যে, সে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, সে প্রকাশ্যে কাফের হইবে ইত্যাদি—এই সব শুধু কেবল দজ্জালরূপে পুনঃ আবির্ভাবকালের বিষয়। এই কারনেই তাহার সকল যুক্তি উপেক্ষা করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেন যে, নিশ্চয় ইবনে ছাইয়্যাদ দজ্জাল। ওমর (রাঃ) স্বয়ং হযরতের সম্মুখে কসম খাইয়া বলিয়াছেন, ইবনে ছাইয়্যাদ নিশ্চয় দজ্জাল এবং হযরত (দঃ) সেই কথার উপর চুপ রহিয়াছেন। এই মর্ম্মে বর্ণিত একটি হাদীছ বোখারী শরীফ ১০৯৩ পৃষ্ঠায় আছে—

২৬৫৭। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাম্মদ ইবনুল-মোনকাদের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে দেখিলাম—তিনি আল্লার নামে কসম করিয়া বলিতেছেন, নিশ্চয় ইবনে ছাইয়্যাদ দজ্জালই বটে। আমি বলিলাম, এই বিষয়ের উপর আপনি আল্লার নামে কসম করিতেছেন! তিনি বলিলেন, তাহাতে ভয় কি ? আমি ওমর (রাঃ)কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এই বিষয়ের উপর কসম করিতে শুনিয়াছি এবং হযরত (দঃ) তাঁহার এই কসমে বাধা দেন নাই।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যায়

শাসন ক্ষমতার উৎস

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ—

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"তোমরা আনুগত্য অবলম্বন কর আল্লার, অনুগত্য অবলম্বন কর রসূলের এবং তাঁহাদের যাঁহারা তোমাদের মধ্যে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।"

ব্যাখ্যা ঃ—মানুষের ফরমাবরদারী ও আনুগত্য লাভের মর্য্যাদা ও অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। মানবের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার এবং মানবকে শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই রহিয়াছে যিনি

মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। মানবের জন্য জীবন-ব্যবস্থা ও শাসন-বিধানের মূল নীতিরূপে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বাণী পবিত্র কোরআন দান করিয়াছেন এবং স্বীয় প্রতিনিধি বা রসুল প্রেরণ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের মূল নীতি ও ধারাসমূহ ছাড়াও রসুল (দঃ) কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খুঁটি-নাটি বিষয়াবলী ও উপধারা এবং বিশেষ ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লার তরফ হইতে অকাট্য ওহী মারফত প্রাপ্ত হইয়া মানবের উপর শাসন পরিচালন করিবেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এই তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ

"আমি আপনার প্রতি সত্যে পরিপূর্ণ মহান কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি; যেমতে আপনি মানবগণের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ের বিচার-মীমাংসা করিবেন ঐ পন্থায় যে পন্থা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছেন।" (ছুরা নেছা, ১৫ রুকু)

আল্লার প্রেরিত সেই কেতাব হইল "কোরআন" এবং আল্লাহ কর্ত্তৃক রসুলকে প্রদর্শিত বিষয়-বস্তু সমূহই হইল "সুন্নাহ্"। সুতরাং মানবকে শাসন করার একমাত্র অবলম্বন হইল কোরআন ও সুন্নাহ্। আর ভূপৃষ্ঠে মানবের উপর শাসন পরিচালনের একমাত্র অধিকারী হইলেন রসুল; আল্লাহ কর্ত্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত হওয়া হিসাবে। রসুল যেহেতু স্বয়ং আল্লার মনোনীত ও প্রেরিত এবং আল্লাহ কর্ত্তৃক নিষ্পাপরূপে সৃষ্ট, তাই রসুলের ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না—তিনি ত ক্ষমতা ও অধিকারের মূল মালিকের মনোনীত ও প্রেরিত। অতএব রসুলের আনুগত্য বস্তুতঃ মূল মালিকের আনুগত্যই গণ্য হইবে। কোরআনে এই তথ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে—مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ "যে কেহ ফরমাবরদারী করিয়া চলে রসুলের সে ত বস্তুতঃ আল্লারই ফরমাবরদারী করিয়া থাকে।" (ছুরা নেছা, ১১ রুকু)

ভূপৃষ্ঠে রসুলের আগমনধারা বিদ্যমান থাকাবস্থায় মানব-শাসনের জন্য অন্য কোন চিন্তারই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সর্ব্বশেষ রসুল—তাঁহার পরে আর কোন রসুল আসিবেন না। এই ক্ষেত্রে আবশ্যক হইয়াছে, রসুলের পর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত হওয়া। কারণ, শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগ ও পরিচালন নির্দ্ধারিত দায়িত্বধারী ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে (পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলদের উপর শাসন কার্য্য পরিচালন করিতেন নবী বা রসুলগণ; এক নবী অতীত হওয়ার পর আর এক নবী তাঁহান স্থলে আসিতেন। আমার পরে আর

কোন নবীর আগমন হইবে না; হাঁ—আমার (পরে শাসন কার্য্য পরিচালনের জন্য) স্থলাভিষিক্ত হইবে। (৪৯১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং রসুলের পরবর্তী শাসন-ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মানুষই স্বয়ং-কর্ত্তা মালিক-মোখ্‌তার শাসক নহে, বরং সে শাসন ক্ষমতার মূল কর্ত্তা রসুলের স্থলাভিষিক্ত। তাই ইসলামী পরিভাষায় রাষ্ট্র নায়ককে "খলীফা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "খলীফা" অর্থ স্থলাভিষিক্ত ; এই সূত্রেই প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)কে "খলীফাতু-রসুলিল্লাহ্" রসুলুল্লার স্থলাভিষিক্ত বলা হইত।

এখানেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মূল বিষয়-বস্তুর মীমাংসা হইয়া যায় যে, শাসন-ক্ষমতার মূল অধিকারী মালিক হইলেন সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এবং মূল কেন্দ্র হইলেন আল্লার রসুল। সুতরাং শাসন ব্যবস্থার মূল অবলম্বন হইবে আল্লার প্রেরিত বাণী কোরআন এবং রসুলের হাদীছ বা সুন্নাহ্।

উল্লেখিত মীমাংসা সূত্রে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আরও দুইটি জরুরী বিষয় সপ্রমাণ হইয়া যায়। একটি হইল শাসকের মর্য্যাদা। যেহেতু বৈধ শাসক প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং রসুলের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী এবং অনুসরণ করিয়া চলা যেরূপ ফরজ তদ্রূপ বৈধ শাসকের আনুগত্য, ফরমা-বরদারী এবং অনুসরণ করিয়া চলাও ফরজ বা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর একটি বিষয় হইল শাসকের গুরুদায়িত্ব। কোন শাসক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিয়া সে পৈত্রিক স্বত্বের উত্তরাধিকারী হয় না, বরং রসুলের স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং রসুলের যে মূল দায়িত্ব ছিল—মানবের দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ কামনা ও উহার ব্যবস্থা করা, শাসককে সেই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই বহন করিতে হইবে। অন্যথায় আল্লাহ ও আল্লার রসুলের নিকট তাহাকে অভিযুক্ত ও অপরাধী হইতে হইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামার আয়াত দ্বারা শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির সূত্র-পরম্পরার ইঙ্গিত দান করার পর উল্লেখিত জরুরী বিষয়দ্বয়ের জন্য দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

২৬৫৮। হাদীছ :— سمع ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ

اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى

وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِى

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) শুনিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়াছে—আমার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে সে আল্লার অনুগত ও ফরমাবদার হইয়াছে—(অর্থাৎ বান্দার উপর সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী আবশ্যক। সেই আনুগত্য ও ফরমাবরদারী আদায় করার পথ হইল আমার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করা। আমার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করিলেই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করা সাব্যস্ত হইবে।) তদ্রূপ যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিবে সে আল্লার নাফরমান সাব্যস্ত হইবে।

আর যে ব্যক্তি বৈধ শাসনকর্ত্তার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়াছে সে আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়াছে। (অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে বা আমার পরে আমার অনুগত ও ফরমাবরদার সাব্যস্ত হওয়ার পথ হইল আমার নীতি অনুসারী শাসনকর্ত্তার অনুগত ও ফরমাবরদার হওয়া।) আর যে ব্যক্তি বৈধ শাসনকর্ত্তার নাফরমানী ও বিরোধিতা করিবে সে আমার নাফরমানী ও বিরোধিতাকারী সাব্যস্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এস্থলে যে, শাসনকর্ত্তার আনুগত্য রস্থলের আনুগত্য ও শাসনকর্ত্তার বিরোধিতা রস্থলের বিরোধিতা সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহা দুইটি শর্ত্ত সাপেক্ষ। একটি হইল বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া। বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির একমাত্র পথ হইল রস্থল প্রদত্ত সূত্রে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া। সৃষ্টিগত ভাবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মনোনয়ন প্রাপ্ত রস্থলই যেরূপ ভূপৃষ্ঠে মানবের উপর শাসন পরিচালনের একমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন; তদ্রূপ রস্থল প্রদত্ত সূত্রে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিই রস্থলের পরে শাসন পরিচালনের অধিকারী হইতে পারেন। নতুবা শাসন ক্ষমতার প্রকৃত মালিক সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূত্র-পরম্পরা ছিন্ন হইবে।

হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে স্বীয় জীবনের শেষ শয্যায় দুইটি সূত্রের ইঙ্গিত দান করিয়া ছিলেন। একটি হইল তাঁহার মনোনয়ন আর একটি হইল মোমেনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাক্যগুলি এই ছিল—

لقد هممت ان ارسل الى ابى بكر او ابنه فاعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ثم قلت يدفع الله ويأبى المؤمنون -

* মোছলেম শরীফের রেওয়ায়েতে الا ابابكر উল্লেখ আছে। (২—২৭৩)

"আমি ইচ্ছা করিয়া ছিলাম, আবু বকরকে সংবাদ দেই; কিম্বা তাহার সঙ্গে মিলিত হই এবং তাহার মনোনয়ন চূড়ান্ত করিয়া দেই, যেন কাহারও কিছু বলার বা কাহারও কোনরূপ আশা করার অবকাশই না থাকে। পরে ভাবিলাম আবু বকর ভিন্ন আর কাউকে আল্লাহ্ তায়ালাও গ্রহণ করিবেন না এবং মোমেনগণও অন্য কাউকে নির্ব্বাচন করিবে না।" (বোখারী শরীফ ১০৭২ পৃষ্ঠা)

হযরতের এই উক্তিতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইল যে, শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির বৈধ উপায় দুইটি। একটি হইল মোমেনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া, আর একটি হইল রসুল (দঃ) কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়া ↑।

অপর শর্ত্ত হইল মানবের উপর শাসন পরিচালনের একমাত্র অবলম্বন কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক শাসন পরিচালনা করা। যেই শাসনকর্ত্তার মধ্যে এই শর্ত্ত দুইটি বিদ্যমান তাহারই ক্ষেত্রে হযরতের এই উক্তি যে, শাসন-কর্ত্তার আনুগত্য বস্তুতঃ আমার আনুগত্য এবং শাসনকর্ত্তার বিরোধিতা বস্তুতঃ আমার বিরোধিতা।

আলোচ্য হাদীছের শব্দ "اميرى—আমার শাসনকর্ত্তা" এস্থলে "আমার" বলিবার তাৎপর্য্য উক্ত শর্ত্তদ্বয়ই। উক্ত শর্ত্তদ্বয় সম্বলিত শাসনকর্ত্তা প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত এবং ইহাই "আমার শাসনকর্ত্তা"-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য। (ফতহুল বারী ১৩—৯৫)

২৬৫৯। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের অনেকেই উপরিস্থ; এবং প্রত্যেক উপরিস্থই স্বীয় অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

↑ বৈধভাবে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসনকর্ত্তার মনোনয়ন সম্পর্কে আলোচনা পরে বিবৃত হইবে।

রাষ্ট্রপ্রধান লোকদের উপর শাসনকর্ত্তা ও উপরিস্থ; সে জিজ্ঞাসিত হইবে তাহার শাসিত লোকদের সম্পর্কে। গৃহকর্ত্তা উপরিস্থ হয় স্বীয় পরিবারবর্গের; সে তাহার পরিবারবর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। গৃহকর্ত্রী উপরিস্থ হয় স্বামীর অন্দর মহলের এবং তাহার সন্তানগণের; সে জিজ্ঞাসিত তাহাদের সম্পর্কে। মানুষের ভৃত্য বা কর্মচারী উপরিস্থ হয় স্বীয় মালিকের মাল-সম্পদের; সে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

স্মরণ রাখিও—তোমাদের প্রত্যেকেই উপরিস্থ এবং প্রত্যেক উপরিস্থ তাহার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) শাসনকর্ত্তার বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। হাদীছটির মর্ম্ম এই যে, মানুষের উপর তাহার নিজস্ব পরিবারবর্গের ব্যাপারে যে শ্রেণীর গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে—সারা দেশবাসীর ব্যাপারে সেই শ্রেণীর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে শাসনকর্ত্তার উপর। স্ত্রীর উপর স্বামীর সন্তান-সন্ততি ও তাহার অন্দর-মহলের সর্ব্বময় রক্ষণাবেক্ষণের যেরূপ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে—সারা দেশবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের সেইরূপ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে শাসনকর্ত্তার উপর। একজন ভৃত্য খাদেম বা কর্মচারীর উপর যেরূপ দায়িত্ব রহিয়াছে স্বীয় মনীবের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের—ঠিক তদ্রূপই শাসনকর্ত্তার উপর দায়িত্ব রহিয়াছে সারা দেশবাসীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের।

শাসনকর্ত্তা তাহার এই গুরুদায়িত্ব যথাযথ পালন না করিলে দুনিয়াতেও সে অভিযুক্ত এবং আখেরাতেও সে অভিযুক্ত। আল্লার দরবারে তাহার অন্যান্য আমলের সহিত এই গুরুদায়িত্ব পালনের হিসাবও দিতে হইবে।

খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনে আইনগত কাঠামোর দুইটি বিশেষ ধারা

২৬৬০। **হাদীছ** :— قال معاوية رضى الله تعالى عنه

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر فى قريش

لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين

অর্থ :— মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, খেলাফত বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ কোরায়েশ বংশের মধ্যেই থাকিবে—যাবৎ এই বংশের লোকগণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলামের ধারক ও বাহক থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ তাহাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হইলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পরাস্ত ও অপদস্ত করিবেনই।

২৬৬১। হাদীছ :— قال ابن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খেলাফত বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ কোরায়েশদের মধ্যে থাকিতে হইবে যাবত মানব গোষ্টির দুই ব্যক্তিও বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা :—বিশ্ব-মোসলেম-জাতীয় স্বার্থের সুদৃঢ় দুর্গ গঠনে সুচিন্তিত এক মহা প্রকল্প ছিল বিশ্ব-নবীর সম্মুখে।

যে প্রকল্প বাস্তবায়নের বদৌলতে কয়েক শতাব্দি পর্য্যন্ত মোসলেম জাতি সারা বিশ্বের উপর প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারকারী ছিল।

যেই প্রকল্পের ফাটল হইতেই মোসলেম জাতির দুর্ব্বলতা ও হেয়তার সূচনা হইয়াছে।

যেই প্রকল্প পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ার ফলেই বর্ত্তমান বিশ্ব-মোসলেম জাতি সর্ব্বহারা, সর্ব্বস্বান্ত ও মৃত্যু কবলিত হইয়া পড়িয়াছে।

যেই প্রকল্প পুনরুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাশীল মোসলেম নেতৃবৃন্দ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া গিয়াছেন।

যেই প্রকল্পটির জন্য আজও বিশ্ব-মোসলেম হাহাকার করিতেছে, তাহাদের উর্দ্ধতন মহল ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু তাহা গড়িয়া উঠিতেছে না। ফলে মোসলেম সমাজের দুর্দ্দিনের নিশিও প্রভাত হইতেছে না।

সেই প্রকল্পটি হইল মোসলমানদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় "প্যান-ইসলাম-ইজম" তথা বিশ্বের সমুদয় মোসলেম সমবায়ে এক কেন্দ্রিক সংযুক্ত মোসলেম-রাষ্ট্র স্থাপন।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশ্বে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত মোসলেম রাষ্ট্রের কোন বিধান বা কাঠামো নাই; সেখানে আছে এক কেন্দ্রিক সম্মিলিত মোসলেম রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধান। উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয় সেই কাঠামোর একটি ধারা বা সুপারিশ। এবং সেই দৃষ্টিতে উক্ত ধারা ও সুপারিশটি খুবই যুক্তিযুক্ত। যাহার বিশ্লেষণ এই—

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-মহাদেশগুলির দুর-দুরান্তের মোসলেম এলাকা সমূহ একত্রে গুটাইয়া এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র রূপায়নে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচন অত্যন্ত জটিল বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রতিটি শাখার আন্তরিক আনুগত্য

অপরিহার্য্য; উহা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের উন্নতি ত দুরের কথা শান্তি-শৃঙ্খলাও কায়েম হইতে পারে না। সংখ্যাধিক্য বা ভোটের জোরে আন্তরিক আনুগত্য লাভ হইতে পারে না, অথচ পূর্ব্বালোচিত প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য আন্তরিক আনুগত্যের প্রয়োজন অনেক বেশী।

এক কেন্দ্রিক মোসলেম-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনের আইনগত কাঠামোর উল্লেখিত ধারা ও সে সম্পর্কে হযরতের উক্ত সুপারিশ সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটি লাভের চেষ্টারই একটি পদক্ষেপ। বিশ্বের সকল দেশ সকল অঞ্চল ও সকল এলাকার মোসলমানদেরই জাতিগত ও স্বভাবগত বিশেষ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা রহিয়াছে কোরায়েশ বংশের প্রতি—যাহা আন্তরিক আনুগত্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক। শুধু মাত্র এই কারণেই হযরত (দঃ) স্বীয় উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনারূপে উক্ত সুপারিশ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি শর্তও আরোপ করিয়া দিয়াছেন— ما اقاموا الدين "যাবত কোরায়েশ বংশের লোকগণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলামের ধারক ও বাহক থাকে।" দ্বীন-ইসলাম বলিতে শুধু নামায-রোযার পরহেজগারীই উদ্দেশ্য নহে, বরং ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, পূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতাও অবশ্যই উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কীয় এক হাদীছে স্পষ্টরূপেই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে— ما اذا حكموا فعدلوا "যাবত কোরায়েশ বংশের লোকগণ তাহাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার পূর্ণ অনুসরণ করে।"

(ফতহুল বারী ১৩—৯৭)

এই শর্তের সহিত রাষ্ট্রপ্রধানের নির্ব্বাচন কোরায়েশ বংশ হইতে করা হইলে সে ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্ব্বলতা—আঞ্চলিকতাবাদের প্রতিক্রিয়া যে বহুলাংশে বিদুরিত হইবে তাহা একটি বাস্তব সত্য এবং সেই দৃষ্টিতেই উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের উক্ত সুপারিশ।

২৬৬৮। হাদীছঃ—আবু বক্‌রাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, জামাল-যুদ্ধের সময়ে আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) একটি উক্তি দ্বারা। হযরত নবী (দঃ) যখন জানিতে পারিলেন, পারস্যবাসী তাহাদের পরলোকগত শাসনকর্তা কেছ্‌রার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে তখন হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন—

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً

"ঐ জাতির উন্নতি হইবে না যে জাতি তাহাদের শাসন-কার্য্য পরিচালন ভার কোন নারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছে। (১০৫৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা :— কেন্দ্রিয় শাসনকর্ত্তা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনের জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদের আইনগত কাঠামোর দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিই অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হইতে হইবে।

মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা। স্রষ্টা স্বীয় সৃষ্ট বস্তুর খুঁটি-নাটি সমুদয় বিষয় সর্ব্বাধিক বেশী জ্ঞাত থাকেন—এই সত্য সম্পর্কে কাহারও দ্বিমতের অবকাশ নাই।

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁহার বাণী পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"পুরুষগণ কর্তৃত্বের অধিকারী নারীদের উপর এই কারণে যে, (সৃষ্টিকর্ত্তা) আল্লাহ তায়ালাই এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব, মর্য্যাদা ও অগ্রাধিকার দান করিয়াছেন।" (৫ পারা ৬ রুকু)

নারীদের উপর পুরুষের এই সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার শুধু কেবল একটা পারস্পারিক সন্মান ও শ্রদ্ধার দিক দিয়াই নহে, বরং মানুষের মধ্যে দৈহিক ও আভ্যন্তরীণ যতগুলি শক্তি বা শক্তির কেন্দ্র রহিয়াছে সব গুলিরই পরিমাণ, কাঠামো ও উপাদানের মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে নারীদের উপর। বিজ্ঞানের বিকাশ এই সত্যকে প্রত্যক্ষরূপ দান করিয়াছে।

যদিও এক-দুই জন ভাবাবেগ-পরাভুত বৈজ্ঞানিককে নারী-পুরুষে শক্তি-স্বামর্থের সমতার পক্ষে পাওয়া যায়, কিন্তু বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিকরূপে খ্যাতি সম্পন্ন তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমতই নয় শুধু, বরং তাঁহারা গবেষণা মূলক হিসাব-নিকাশ ও পরিমাপের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্টিগত ভাবেই নারী-পুরুষের মানবীয় শক্তি-স্বামর্থে বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর এন্‌সাইক্লোপীডিয়া তথা বিশ্বকোষ গ্রন্থে নারী-পুরুষের শক্তি স্বামর্থের ব্যবধান দেখাইতে নারীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। নারী ও পুরুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই একরূপ মনে হয় সেগুলির মধ্যেও ব্যবধান প্রমাণে অনেক রকম তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। (physiology) দেহতত্ত্ব শাস্ত্রের গবেষণা অনুযায়ী নারী-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বহু উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্বারা নারী-পুরুষের শক্তি-স্বামর্থের ব্যবধান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নিম্নে ঐ সব আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দৈহিক শক্তির ব্যবধান ঃ বিশ্বকোষের গ্রন্থকার লেখেন, "নারীর তুলনায় পুরুষের দৈহিক অবস্থা বহুগুণ বেশী শক্তিশালী।" এই দাবীটি এতই সত্য যে, ইহার জন্য দলীল প্রমাণের আবশ্যক হয় না। এই দাবীর বাস্তবতা মানব শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নহে। হায়ওয়ান-জানোয়ার পশু-পক্ষীর মধ্যেও মাদীর উপর নরের প্রাবল্য ও শক্তির আধিক্য এবং অপ্রতিহত আধিপত্য হইয়া থাকে। ইহা প্রমাণের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিব আবশ্যক হয় না, প্রাত্যহিক চাক্ষুষ ঘটনাবলীই যথেষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রামান্য কথা এই যে, মাদী অপেক্ষা নরের মাংস বহুগুণ বেশী শক্তিশালী ও বলদায়ক। আমাদের মুখের ভাষাও এই সাক্ষ্য বহন করে; গাভীর নর তথা ষাঁড় বা দামড়াকে এই অর্থেই "বলদ" বলা হয়—"বলদ" অর্থ বলদায়ক। রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ-লতা—যেমন অগুরু, খেজুর, কলা ইত্যাদি গাছের মধ্যেও নর-মাদী রহিয়াছে এবং স্বাভাবিক শক্তির দিক দিয়া মাদী গাছের তুলনায় নর গাছ অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

মাংসপেশীর অবস্থায় ব্যবধান ঃ প্রফেসার ডক্টর ড্য ফরিনি বিশ্বকোষ গ্রন্থে ইহাও লিখিয়াছেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার সমষ্টিগত দৃষ্টিতে দেখা যায়, নারীর মাংসপেশী ও পুরুষের মাংসপেশী উভয়ের ব্যবধান এত অধিক এবং ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়া প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা এত দুর্ব্বল যে, এইগুলির স্বাভাবিক শক্তিকে তিন ভাগ করা হইলে দুই ভাগই পুরুষের পক্ষে পড়িবে এবং নারীর পক্ষে পড়িবে শুধু এক ভাগ। মাংসপেশীর দ্রুত সঞ্চালন-গতি এবং সংকোচনের ব্যাপারেও ঐ একই অবস্থা। নারীর তুলনায় পুরুষের মাংসপেশী চলনগতিতে দ্রুততর এবং ক্রিয়ায় অধিকতর শক্তিশালী।

দেহের পরিমাপে ব্যবধান ঃ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, পুরুষের গড়পড়তা উচ্চতার তুলনায় নারীর গড়পড়তা উচ্চতা ১২ সেন্টি-মিটার (প্রায় পাঁচ ইঞ্চি) কম। এই পার্থক্য দেশ-জাতি নির্ব্বিশেষে ভদ্র-অভদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান।

দেহের ওজনে ব্যবধান ঃ পুরুষের গড়পড়তা ওজন ৪৭ কিলোগ্রাম কিন্তু নারী-দেহের গড়পড়তা ওজন ৪২½ কিলোগ্রামের অধিক হয় না। অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা নারী দেহের ওজন প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম (পাঁচ সের) কম। বলা বাহুল্য—নারী-পুরুষের বয়সের গড়পতায় ও এই হারের পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

মানসিক অবস্থার ব্যবধান ঃ বিশ্বকোষের গ্রন্থকার দেহতত্ত্ব শাস্ত্রের গবেষণা অনুযায়ী নারী দেহের সূক্ষ্ম আলোচনার পর গোটা আলোচনার সারমর্ম উদ্ধার করিয়া বলেন, দেহ তৈরীর উপাদান সমূহের সংমিশ্রন নারীর বেলায় এইরূপ

হইয়াছে যাহাতে নারীর অনুভূতি শক্তির মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও তীক্ষ্ণতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ফলে নারীর অনুভূতি শক্তি যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ায়ই অতি দ্রুত এবং অতি মাত্রায় প্রভাবিত হইয়া পড়ে— যেরূপ অবস্থা শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর নিয়ম হইল—দুঃখ-কষ্টের কোন ব্যাপার ঘটিলে তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে শুরু করে, আর খুসির কিছু দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া লাফাইতে আরম্ভ করে। নারীর অবস্থাও অনেকটা তেমনই—অনুভূতি প্রভাব ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর দ্রুত প্রভাবিত ও আক্রান্ত হইয়া থাকে। অনুভূতি উদ্রেককারীর বিষয়াবলী নারীর হৃদয়পটে এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, সে ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পর্ক থাকে না। এই কারণেই নারীদের মধ্যে ধীরস্থিরতার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এই কারণেই যে কোন কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে নারীগণ স্থিরপদ থাকিতে পারে না।

পুরুষের মগজের তুলনায় নারীর মগজে অনুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টীর ও উত্তেজনা-শক্তির কেন্দ্রের সংগঠন অধিকতর শক্তিশালী। এই একটি বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারী অগ্রগামিনী বটে, কিন্তু ইহা নারীর জন্য অশুভই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, অনুভূতি-প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও উত্তেজনার আধিক্যের পরিণামে নারী বিবেক-বুদ্ধির কোঠায় পঙ্গু হইয়া থাকে।

বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রফেসার ঘু ফরিনি অনুভূতি-প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও উত্তেজনার আধিক্যে নারী-পুরুষের ব্যবধানের উল্লেখ করিয়া বলেন, "এই ব্যবধানটা উভয় শ্রেণীর অন্য কতকগুলি সুস্পষ্ট ব্যবধানের সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুরুষের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তির প্রখরতা অধিক, আর নারীর মধ্যে চঞ্চলতা ও উত্তেজনার স্বভাব প্রবল।

প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর প্রোডন লিখিয়াছেন, পুরুষের তুলনায় নারীর তত্ত্বজ্ঞান, বরং বুদ্ধির অষ্টবিধ গুণ যেগুলিকে "ধীগুণ" বলা হয় ঐ পরিমাণই দুর্ব্বল যে পরিমাণ নারীর মূল জ্ঞান-বুদ্ধি পুরুষের তুলনায় দুর্ব্বল!

হৃৎপিণ্ড Heart ঃ মানব-প্রাণের মূল কেন্দ্র হইল হৃৎপিণ্ড। নারী এবং পুরুষের এই হৃৎপিণ্ডেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে—পুরুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনায় নারীর হৃৎপিণ্ড ৬০গ্রাম ছোট এবং অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা ও লঘুভার হইয়া থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ এ ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে—শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে কারবনিক এসিডের

(Carbonic acid —অঙ্গারাম্ল) যে সব অণুকণা বহির্গত হয় তাহা আভ্যন্তরিণ তাপের দরুণ বায়ুতে রূপান্তরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় নির্গত হয়। এই অভিজ্ঞতার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে, পুরুষ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১১ ড্রাম কারবন জ্বালাইয়া ফেলে; পক্ষান্তরে নারী প্রতি ঘণ্টায় কিঞ্চিতাধিক ছয় ড্রাম মাত্র জ্বালাইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হয়, পুরুষের তুলনায় নারী-দেহের মূল আভ্যন্তরিণ তাপও (Animal heat) খুবই কম—অর্থাৎ অর্দ্ধেকের সামান্য বেশী মাত্র।

মগজ বা মস্তিষ্ক—Brain ঃ মানবের মধ্যে বোধশক্তির মূল কেন্দ্র হইল মগজ। উহারই স্বল্পতা ও প্রাচুর্য্য এবং শক্তি ও দুর্ব্বলতার উপর বোধশক্তির প্রখরতা ও ক্ষীণতা নির্ভরশীল। দেহতত্ত্ব শাস্ত্রের (Physiology) সর্ব্ববাদী সম্মত একটি মৌলিক কথা এই যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রখরতা ও দুর্ব্বলতার মূল উৎস হইল তাহার মগজ। আহ্‌মক ও বোকাদের মগজ খ্যাতনামা বুদ্ধিমান-জ্ঞানীদের মগজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হইয়া থাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতায় প্রতিপন্ন হইয়াছে— যে সকল লোক তাহাদের জীবনে বোকা ও নির্বোধ বলিয়া খ্যাত ছিল তাহাদের মগজ ওজনে কোন ক্রমেই ২৩ আউন্সের (প্রতি আউন্স) ২॥ তোলা হিসাবে ৫৭২ তোলার) অধিক হয় নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা সাধারণভাবে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং উন্নত চিন্তাশীল বলিয়া স্বীকৃত হইতেন তাঁহাদের মগজ ওজন করা হইলে উহা ৬০ আউন্সেরও (তথা ১৫০ তোলারও) বেশী দেখা গিয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের (Psychology) পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ চিন্তা করিলে মগজ বা মস্তিষ্কের ব্যাপারেও নারী একান্ত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, নারীর মগজ এবং পুরুষের মগজের মধ্যে ধাতুগত ও আকৃতিগত বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। বোকা-নির্বোধ বলিয়া খ্যাত নয় এমন ২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করার সুযোগে দেখা গিয়াছে, সর্ব্ববৃহত মগজটির ওজন ৬৫ আউন্স এবং ক্ষুদ্রতম মগজটির ওজন ৩৮ আউন্স। পক্ষান্তরে (ঐ শ্রেণীর) ২৯১ জন নারীর মগজ ওজনের সুযোগে দেখা গিয়াছে— সর্ব্বাধিক বড় মগজটি ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে ছোট মগজটি ৩১ আউন্স। এই অভিজ্ঞতা সূত্রে প্রতিপন্ন হয় যে, গড়পড়তা পুরুষের মগজ অপেক্ষা নারীর মগজের ওজন ৯ আউন্স কম।

এতদ্ব্যতীত নারীর মাথার মগজে ঢেউ ও উহার রেখাগুলির প্যাঁচের সংখ্যা পুরুষের মগজ অপেক্ষা অনেক কম এবং নারীর মগজের আবরণগুলির ব্যবস্থাপনাও পুরুষের মগজ অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ এই পার্থক্যটি নারী-পুরুষের গুণাবলীর ব্যবধান ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ গণ্য করিয়াছেন। তদ্রূপ নারী ও

ও পুরুষের মগজের স্নায়ুমণিতেও বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। স্নায়ুমণিই হইল বোধশক্তির মূল উৎস; সুতরাং এই ব্যবধানটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ে ব্যবধান : মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক-শক্তির (Intellectual side বা merit) ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির সূত্র হইল পঞ্চ-ইন্দ্রিয়। এই জন্যই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু গণ্য করা হয়। সেই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। ডক্টর নেকোলাস্ ও ডক্টর বেলী প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারীর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় পুরুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের তুলনায় অত্যন্ত দুর্ব্বল; উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

নাসিকা বা ঘ্রাণশক্তি : পুরুষের ঘ্রাণশক্তি সহজেই যে পরিমাণ ঘ্রাণ অনুভব করিতে পরে উহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ঘ্রাণ হইলে তবে নারী তাহা অনুভব করিতে পারে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে—হাল্কা ব্রসিক এসিডের গন্ধ নারী $\frac{১}{২০০০০}$ অনুপাতে এবং পুরুষ $\frac{১}{১০০০০}$ অনুপাতে অনুভব করিতে পারে। নারীর ঘ্রাণশক্তি দুর্ব্বল হওয়ার পক্ষে ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কর্ণ ও জিহ্বা বা শ্রবণেন্দ্রিয় ও আস্বাদন-ক্ষমতা : বিশ্বকোষ গ্রন্থে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এই শক্তিদ্বয়ের ব্যাপারেও নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে।

ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয় : এ সম্পর্কেও ডক্টর লম্বোরোযার এবং সেজি প্রমুখ পণ্ডিত প্রফেসারগণের সর্ব্ব সম্মত অভিমত এই যে, পুরুষের তুলনায় নারীর স্পর্শেন্দ্রিয় খুবই দুর্ব্বল।*

পাঠাকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন—পবিত্র কোরআন সৃষ্টিকর্ত্তার এই ঘোষণা করিয়া ছিল—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ :—সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব, মর্য্যাদা ও অগ্রাধিকার দান করিয়াছেন; তদ্দরুণ পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। চিরসত্য কোরআনের বিজ্ঞপ্তি "নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব" ইহার বিশ্লেষণ ও বাস্তবতা প্রকাশের জন্য পবিত্র কোরআনের শত্রুকেই কি ভাবে খাটানো হইয়াছে! এবং যুগে যুগে যে, চিরসত্য কোরআনের

* মিশরে জন্ম, ইউরোপের বহু ভাষা-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফরিদ ওয়াজদির নারী-গবেষণার বিশেষ গ্রন্থ "আল-মার্‌আতুল-মোছলেমাহ"—যাহার উর্দ্দু অনুবাদ করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ—সেই গ্রন্থ হইতে উল্লেখিত সমুদয় তথ্য উদ্ধৃত।

বাস্তবতার বিজয় ধ্বনিই রণিত হইয়া থাকে উহার এই নমুনাটি কত উজ্জ্বল নমুনা! বর্ত্তমান যুগের পরম পূজনীয় বস্তু হইল বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণই সারা জীবনের হাতড়ানি ও গবেষণার দ্বারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন পবিত্র কোরআন পূর্ব্বেই তাহা প্রচার করিয়া রাখিয়াছে।

স্থষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা নারীর উপর পুরুষের স্থষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রশাসনিক ব্যাপারে এই ব্যবধানের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন—সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এই বিধান ঘোষণা করিয়াছেন—

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ - فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ

"তোমাদিগকে পুরুষদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হইতে হইবে।" শরীয়তের বিধানে সাধারণতঃ শুধু মহিলার সাক্ষ্য বা একজন পুরুষের সহিত একজন মহিলার সাক্ষ্য পর্য্যাপ্ত গণ্য হয় না।

নারীর এই স্থষ্টিগত দুর্ব্বলতা ও নারীর উপর পুরুষের স্থষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনে আইনগত কাঠামোরূপে আলোচ্য হাদীছের এবং ইসলামের এই সুপারিশ যে, রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছটি সম্পর্কে মোজাদ্দেদ মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ গবেষণা মূলক সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করিয়াছেন। উহার সারমর্ম্ম এই যে, এই হাদীছের সুপারিশ ও বিষয়-বস্তু একজন স্বাধীন সার্ব্বভৌম একনায়কতন্ত্রীয় প্রেসিডেন্সিয়াল কিম্বা ঐ শ্রেণীর রাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। সংখ্যাধিক পুরুষদের সমবায়ে গঠিত পার্লামেন্টের অধীন পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা অধীনস্ত দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে এই হাদীছের বিষয়-বস্তু প্রযোয্য নহে। মোজাদ্দেদ থানভী (রঃ) তাঁহার এই ব্যাখ্যার সপক্ষে বিভিন্ন দলীল প্রমাণের সহিত এই সরল যুক্তিও পেশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য হইল এককভাবে নারীর হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হওয়া। পক্ষান্তরে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনব্যবস্থায় শাসনের মূল ক্ষমতা ও ভার ন্যস্ত থাকে পার্লামেন্টের উপর; রাষ্ট্রপ্রধান এককভাবে শাসনের অধিকারী হয় না। তদ্রূপ অধীনস্ত রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধানও মূল শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয় না। (এমদাদুল-ফতাওয়া ২—৯৯ দ্রষ্টব্য)

শাসনকর্ত্তার আনুগত্য অতিশয় জরুরী যাবৎ শরীয়ত বিরোধী কাজ না হয়

২৬৬৩। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ

عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَاْسَهٗ زَبِيْبَةٌ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা শাসনকর্ত্তার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিও এবং তাঁহার অনুগত থাকিও—অত্যন্ত ছোট মাথা-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ হাবশী লোককেও যদি তোমাদের উপর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুগত থাকা অতিশয় জরুরী। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে যদি কোন নিকৃষ্ট লোকও কার্য্যরত থাকে তাহারও সহযোগিতা করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য চালাইয়া যাও, যাবৎ না কোন স্তরে শরীয়ত বিরোধিতার প্রশ্নের সম্মুখীন হও।

২৬৬৪। হাদীছ ঃ—ওবাদাহ্ ইবনে ছামেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। হযরতের হাতে হাত দিয়া আমরা যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম উহার মধ্যে ছিল—আমরা আনুগত্যের উপর থাকিব শান্তির পরিবেশেও অশান্তির পরিবেশেও, সুদিনেও, দুর্দিনেও এবং পশ্চাতে রাখিলেও। সেই অঙ্গীকারে ইহাও ছিল যে, কোন পদে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে ক্ষমতা ছিনাইবার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইব না। অবশ্য যদি সুস্পষ্ট রূপে খোদাদ্রোহিতা পাও—যাহা সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের দলীল তোমার নিকট বিদ্যমান থাকে (সেস্থলে আনুগত্য প্রত্যাহার করা চলিবে)। (১০৪৫ পৃষ্ঠা)

২৬৬৫। হাদীছ ঃ—ওছায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা মদীনাবাসী এক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি চাকরি দিয়াছেন, আমাকে চাকরি দিলেন না ! তাহাকে যেরূপ চাকরি দিয়াছেন আমাকেও চাকরি দিন।

হযরত (দঃ) ঐ ছাহাবীকে বলিলেন, আমার পরে (প্রকৃত প্রস্তাবেই) তোমাদের উপর অন্যদের অগ্রগামীতা দেখিতে পাইবে। ছবর করিয়া থাকিও যেন হাওজে-কাওছরে আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পার। (৫৩৫ পৃষ্ঠা)

২৬৬৬। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ اَمِيْرِهٖ شَيْئًا يَكْرَهُهٗ فَلْيَصْبِرْ

فَاِنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার শাসককে কোন কিছু অন্যায় করিতে দেখিলে, সে স্থলে তাহাকে ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হইবে। (এরূপ ক্ষেত্রে শুধু এককভাবে শাসনকর্ত্তার আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না,) কারণ (এককভাবে) যে কোন ব্যক্তি সংহতি ছিন্ন করিয়া এক বিঘতও সরিয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়—সেই মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যু পরিগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—অন্যায়ের সমর্থন না করা বা দেশের ও সমাজের সংহতি বিনষ্ট না করিয়া অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করা, অন্যায়ের পরিবর্ত্তে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবী করা, অন্যায় ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা ইত্যাদি—এই সব আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য নহে।

আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য হইল—নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তার কোন একটি অন্যায়-ত্রুটি দেখিয়াই এককভাবে তাহার আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া তাহার উচ্ছেদের চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। ইহাতে সাধারণ জীবন যাত্রা ব্যহত হয়, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট হয়, তাই ইহার বিরুদ্ধে হুসিয়ারি উচ্চারণ করা হইয়াছে। অবশ্য শাসনকর্ত্তা যদি প্রকাশ্য খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় সে স্থলে প্রতিটি ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় তাহাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা।

২৬৬৭। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ

فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযতর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানের কর্ত্তব্য হইল, শাসনকর্ত্তার অনুসরণ ও আনুগত্য—পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সর্ব্ব বিষয়েই; যাবৎ না তাহাকে শরীয়ত

বিরোধী কাজের আদেশ করা হয়। অবশ্য যদি শরীয়ত বিরোধী কাজের আদেশ করা হয় সে ক্ষেত্রে মোটেই অনুসরণ ও আনুগত্য নাই।

২৬৬৮। হাদীছঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা একটি সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করিলেন। একজন মদীনাবাসী ছাহাবীকে তাহাদের আমীর বা প্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং উক্ত বাহিনীর লোকদিগকে তাঁহার আনুগত্যের কথা বলিয়া দিলেন।

পথি মধ্যে সেই আমীর দলের লোকদের প্রতি কোন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) কি তোমাদিগকে আমার আনুগত্যের আদেশ করেন নাই? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমার অলঙ্ঘনীয় আদেশ—তোমরা খড়ি জমা করিয়া আগুন জ্বালাইবে এবং সকলে সেই আগুনে প্রবেশ করিবে। দলের লোকগণ আগুন জ্বালাইল এবং আগুনে ঝাপ দিবার প্রস্তুতি লইয়া একে অন্যের প্রতি তাকাইতে লাগিল। তখন কেহ কেহ বলিল, আমরা (দোযখের) আগুন হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাবেদারী অবলম্বন করিয়াছি, অতএব আগুনে আমরা প্রবেশ করিতে পারি কি? এই ইস্ততের মধ্যেই আগুন নিভিয়া গেল এবং আমীরের ক্রোধও প্রশমিত হইয়া গেল।

এই ঘটনা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আলোচনা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, দলের লোকগণ আগুনে প্রবেশ করিলে আগুন হইতে আর পরিত্রাণ পাইত না। (অর্থাৎ এই আগুনে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যার গোনাহের শাস্তিতে দোযখের আগুন ভোগ করিতে হইত।)

হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন, উপরিস্থের আনুগত্য একমাত্র শরীয়ত সম্মত কাজেই সীমাবদ্ধ।

ক্ষমতা লাভের প্রার্থী হইবে না

২৬৬৯। হাদীছঃ— عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ

الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا

عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا

অর্থ—আবছুর রহমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন, হে আবছুর রহমান! ক্ষমতা লাভের প্রার্থী হইও না। প্রার্থী হইয়া ক্ষমতা লাভ করিলে (আল্লার সাহায্য হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া) তোমাকে উহার দায়িত্ব পালনে একা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী না হইয়া উহা প্রাপ্ত হইলে (আল্লার তরফ হইতে) উহার দায়িত্ব পালনে তোমার সাহায্য করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য হাদীছটি দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত পরিচ্ছেদ ভিন্ন অপর একটি পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়াও করা চাই না।

ক্ষমতা লাভের লোভ করা

২৬৭০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ

وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা অচিরেই ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে এবং অচিরেই কেয়ামতের দিন ক্ষমতাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগের ও অপদস্ত হওয়ার কারণ হইবে। ক্ষমতার ছুগ্ধ পানের দিনগুলা কতই না মনোরম এবং সেই ছুগ্ধ ছুটিবার সময়টা কতই না ছুঃখজনক!

২৬৭১। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম, আমার সঙ্গে আমার গোত্রীয় ছুই জন লোকও ছিল। তাহাদের একজন বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাদিগকে শাসন-ক্ষমতা পদে কোথাও মনোনীত করুন। অপর জনও ঐরূপই বলিল। হযরত (দঃ) বলিলেন—

اِنَّا لَا نُوَلِّىْ هٰذَا الْاَمْرَ مَنْ سَأَلَهٗ اَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"আমরা ঐরূপ ব্যক্তিকে এই শ্রেণীর কোন পদে মনোনীত করি না যে উহার প্রার্থী হয় বা তৎপ্রতি লালায়িত হয়।"

শাসনকর্ত্তা জনগণের হিতাকাঙ্খী না হইলে

২৬৭২। হাদীছ ঃ— قال معقل رضى الله تعالى عنه

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه

الله رعية فلم يحطها بالنصيحة لم يجد رائحة الجنة

অর্থ—বছরার গভর্ণর ওবায়তুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মা'ক্বেল (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার মৃত্যু শয্যায় দেখিতে আসিলেন। তখন মা'ক্বেল (রাঃ) গভর্ণরকে বলিলেন, আপনাকে একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি।

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন বন্দাকে আল্লাহ তায়ালা কিছু সংখ্যক লোকের উপর শাসন-ক্ষমতা দান করিলে যদি সে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের সহিত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা না করে, তবে তাহার ভাগ্যে বেহেশতের খুশ্‌বুও জোটিবে না।

২৬৭৩। হাদীছ ঃ—হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ছাহাবী মা'ক্বেল (রাঃ)কে তাঁহার রোগ-শয্যায় দেখিতে আসিলাম। বছরার শসনকর্ত্তা ওবায়দুল্লাহও তখন তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মা'ক্বেল (রাঃ) বলিলেন, আপনাকে আমি (আজও) একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি—

ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم

الا حرم الله عليه الجنة

“যে কোন শাসনকর্ত্তা মোসলমানদের কিছু সংখ্যক লোকের উপর শাসন-ক্ষমতা লাভ করে, অতঃপর তাহার মৃত্যু এমতাবস্থায় হয় যে, সে ঐ লোকদের প্রতি (স্বীয় দায়িত্ব পালনে) শঠতা ও প্রতারণাকারী ছিল—এইরূপ প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার জন্যই আল্লাহ তায়ালা বেহেশতকে হারাম করিয়া দিবেন।

জনগণকে সঙ্কীর্ণ জীবনে পতিত করার কুফল

২৬৭৪। হাদীছ:— قال جندب رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ......وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ........

অর্থ— জুন্দুব (রাঃ) লোকদিগকে নছিহত করতঃ বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, ...যে ব্যক্তি লোকদেরকে সঙ্কীর্ণ জীবন—দুঃখ-কষ্টে ও দুর্ভোগে পতিত করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কেয়ামতের দিন দুর্ভোগে নিপতিত করিবেন।

লোকেরা বলিল, আমাদিগকে আরও উপদেশ দান করুন। জুন্দুব (রাঃ) বলিলেন, (মৃত্যুর পর) মানুষের পেটই সর্ব্বাগ্রে বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয়, অতএব, যথাসাধ্য হালাল খাইতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মানুষের জন্য বেহেশত লাভের অতি বড় প্রতিবন্ধক হইল অন্যায়রূপে রক্তপাত করা, সুতরাং অন্যায়ভাবে সামান্যতম রক্তপাত করা হইতেও যথাসাধ্য বিরত থাকায় যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রোধাবস্থায় বিচারের রায় প্রদান করিবেন না

২৬৭৫। হাদীছ:—ছাহাবী আবু বকরাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র সিজিস্তানের কাজি তথা বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ক্রোধাবস্থায় কখনও বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায় দান করিও না। আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

"বিচারকের জন্য ক্রোধাবস্থায় বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায় প্রদান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"

শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্ত্ত

সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের উপর তিনটি কর্ত্তব্য বলবৎ করিয়াছেন।

১। প্রবৃত্তির অনুসারী না হওয়ার স্বভাবে পরিপক্ক হইতে হইবে।

২। হক্ ব্যবস্থা গ্রহণে মানুষের ভয় না করায় সুদৃঢ় হইতে হইবে।

৩। কোন প্রকার স্বার্থের সম্মুখে আল্লার বিধান বিসর্জন না দেওয়ার স্বভাবে অটল হইতে হইবে।

হাসান বছরী (রঃ) উক্ত তিনটি শর্তের প্রমাণে পবিত্র কোরআনের দুইটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

(১) يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى......بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে ভুপৃষ্ঠে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছি; তোমাকে লোকদের মধ্যে সত্য ও খাঁটী বিচার মীমাংসা করিতে হইবে। আর তুমি প্রবৃত্তির বশে কোন কাজ করিও না, অন্যথায় প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লার পথ হইতে বিচ্যুৎ করিয়া দিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায় তাহাদের জন্য কঠোর আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে, যেহেতু সে হিসাব-নিকাশের দিনকে ভুলিয়া গিয়াছে।"

(২) اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ......وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ

"আমি তাওরাত কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। উহাতে ছিল সত্যের আলো ও সত্য পথের সন্ধান। উহা দ্বারা বিচার-মীমাংসা করিতেন খোদাভক্ত নবীগণ, আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য। এই কারণে যে, তাঁহাদের উপর আল্লার কেতাব তাওরাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল এবং তাঁহারা উহার উপর অঙ্গিকারাবদ্ধ ছিলেন।

("হে উম্মতে মোহাম্মদীগণ! তোমাদের উপরও আল্লার কেতাব পবিত্র কোরআনের বেলায় সেই দায়িত্ব রহিয়াছে।) সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না—আমাকে ভয় কর এবং কোন স্বার্থের খাতিরে আমার বিধানকে বিসর্জন দিও না। যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানমতে বিচার-মীমাংসা না করিবে তাহারা নিশ্চয় কাফেরে পরিগণিত হইবে।"

দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যটি ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য অত্যন্ত কঠোর যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরে খোদার ভয় পোষণ করেন। কারণ, মানুষের ভুল-ভ্রান্তিও

হইতে পারে, অথচ উক্ত বাক্যে গয়রহ ভাবেই বলা হইয়াছে—যে কেহ আল্লার বিধানমতে বিচার-মামীংসা না করিবে সে কাফেরে পরিগণিত হইবে।

হাসান বছরী (রঃ) পবিত্র কোরআনের বর্ণিত একটি ঘটনা দ্বারা এই ভয়-ভীতির নিরসন করিয়াছেন যে, "ইজ্‌তেহাদ" তথা কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট ফয়ছালাহ পাওয়া যায় না এইরূপ ঘটনায় শরীয়ত সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে সার্ব্বিক চেষ্টা দ্বারা কোন মীমাংসা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে ভুল-ত্রুটি হয় তবে তাহা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে। পবিত্র কোরআনের উক্ত ঘটনাটি হইল এই—হযরত সোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের পিতা হযরত দাউদ আলাইহে-চ্ছালামের আমলে এক ব্যক্তির শস্যশ্যামল ক্ষেতে রাত্রি বেলায় অন্যের বকরিপাল প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্ষেতের মালিক হযরত দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নিকট বকরিওয়ালার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিল। এইরূপ ঘটনার বিচার আসমানী কেতাবে স্পষ্টরূপে না পাইয়া হযরত দাউদ (আঃ) ইজ্‌তেহাদ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বাদীর ক্ষতির পরিমাণ এবং বকরির মূল্য সমান সমান, তাই বাদীকে ক্ষতিপূরণ দানার্থে তিনি এই রায় দিলেন যে, বিবাদী তাহার বকরিপাল বাদীকে দিয়া দিবে।

দাউদ-পুত্র সোলায়মান (আঃ) এই বিচার অবগত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট এই ঘটনার ভিন্ন একটি উত্তম মীমাংসা আছে। তিনি ইজ্‌তেহাদ করিলেন এইরূপে যে, বিবাদীকে তাহার বকরির মালিকানা হইতে বঞ্চিত না করিয়াও বাদীর ক্ষতিপূরণ করা যায়। পিতা দাউদ (আঃ) তাঁহাকে তাঁহার মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উভয় পক্ষকে স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত করা হউক যে—বিবাদী তাহার নিজ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে বাদীর বিনষ্ট ক্ষেতের সেবা করিয়া যাইবে এবং যাবৎ না ঐ ক্ষেত পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে বাদী বিবাদীর বকরি-পাল নিজ দখলে রাখিয়া দুগ্ধ ভোগ করিয়া যাইবে। বিনষ্ট ক্ষেত পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলে বাদী তাহার ক্ষেত বুঝিয়া নিবে এবং বিবাদী তাহার বকরি ফেরত পাইবে।

দাউদ (আঃ) এই ইজ্‌তেহাদের সমর্থনে নিজের ইজ্‌তেহাদ ত্যাগ করিয়া এই রায় বহাল করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত ঘটনার আলোচনায় নিম্নে বর্ণিত আয়াত উল্লেখ হইয়াছে—

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ - فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

"দাউদ ও সোলায়মানের একটি ঘটনা—তাঁহারা উভয়ে একটি ক্ষেত সম্পর্কে বিচার করিতেছিলেন। উক্ত ক্ষেতে অপর লোকদের বকরিপাল প্রবেশ (করিয়া উহার ক্ষতি সাধন) করিয়াছিল। আমি তাহাদের ঘটনায় বিচার নিরীক্ষণকারী ছিলাম। অনতিবিলম্বে আমি ঐ ঘটনার সুষ্ঠু মীমাংসা সোলায়মানকে বুঝাইয়া দিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি (দাউদ ও সোলায়মান) উভয়কেই বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছি।" (১৭ পারা ৬ রুকু)

উক্ত আয়াতের বাক্য "আমি ঐ ঘটনার সুষ্ঠু মীমাংসা সোলায়মানকে বুঝাইয়া দিলাম" এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মানের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার মীমাংসাকে আল্লাহ স্বীয় প্রদত্ত বলিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, তাঁহার মীমাংসাই আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দণীয় ছিল। হযরত দাউদের রায় দানে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বরং তাঁহার প্রতিও প্রশংসামূলক ও সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—আমি উভয়কেই বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছি।

কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট মীমাংসা ও ফয়ছালাহ পাওয়া যায় না এইরূপ ঘটনায় শরীয়তের সাম্ভাব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে সার্ব্বিক চেষ্টায় কোন মীমাংসার উদ্ভাবনে যদি অজ্ঞাত সারে কোন ভুল-ত্রুটি হয় এবং সেই ভুল ধরা না পড়ায় উহার সংশোধনও না হয় তবুও সেই ভুল-ত্রুটি ক্ষমার্হ গণ্য হয়। বরং সে ক্ষেত্রেও ইজতেহাদের অর্থাৎ শরীয়তের সাম্ভাব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা স্বীয় এল্‌ম খাটাইয়া চেষ্টা ও পরিশ্রম করার ছওয়াবও হইবে।

এই মর্ম্মে ইমাম বোখারী (রঃ) ১০৯২ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন— "বিচারক বা প্রশাসক সঠিক পন্থায় ইজতেহাদ করিলে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ নির্দ্ধারণে ভুল হইলেও ছওয়াবের অধিকারী হইবে।" এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছখানাও বর্ণনা করিয়াছে—

২৬৭৬। হাদীছ :— عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه

انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم

فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر -

অর্থ—আম্‌র ইবনুল আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি শুনিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—বিচারক বিচার-কার্য্যে (প্রয়োজন ক্ষেত্রে) ইজতেহাদ করিয়া নির্ভুল মীমাংসার উদ্ভাবন করিতে পারিলে

সেস্থলে (ইজতেহাদের পরিশ্রম এবং নির্ভুল মীমাংসা প্রদান উভয়টির জন্য) দুইটি ছওয়াব লাভ করিবে। আর যদি মীমাংসা নির্দ্ধারণে ভুল হয় তবুও (ইজতেহাদ করার পরিশ্রমের) একটি ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ খলীফাতুল মোসলেমীন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) বলিয়াছেন—শাসক শ্রেণীর প্রতিটি লোকের মধ্যে এই পাঁচটি গুণের সমাবেশ প্রয়োজন; উহার একটির অভাবও শাসকের জন্য জঘন্যতম কলঙ্ক। (১) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে হইবে। (২) অতিশয় সহিষ্ণু ও সহনশীল হইতে হইবে। (৩) পাক পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রে চরিত্রবান হইতে হইবে। (৪) সুদৃঢ় ও অটল হইতে হইবে। (৫) বিজ্ঞ আলেম জ্ঞানী ও জ্ঞানান্বেষী হইতে হইবে।

শাসকদের ভাতা

এই পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন—(১) সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে শাসকদের ভাতা বা বেতন জায়েয আছে কি না ? (২) সেই ভাতা বা বেতনের পরিমাণ কি হইবে।

ভাতা বা বেতন গ্রহণ করা সম্পর্কে অতি সামান্য মতভেদ থাকিলেও ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অধিকাংশ ইমামগণের মত, এই যে, শাসকদের জন্য সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে ভাতা বা বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। এই সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি উদ্ধৃতি ও একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্ধৃতিটি হইল এই যে, খোলাফায়ে-রাশেদীন আমলের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাজী শোরায়হ্ (রঃ) শাসন ও বিচার বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং তজ্জন্য বেতনগ্রহণ করিতেন।

২৬৭৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের সাক্ষাতে আসিলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি—আপনি জনগণের কার্য্য পরিচালনের সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু বেতন দেওয়া হইলে তাহা গ্রহণ করেন না! আমি বলিলাম, হাঁ—আমি বেতন গ্রহণ করি না। খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করায় আপনার উদ্দেশ্য কি ? আমি বলিলাম, আমি বহু সংখ্যক ঘোড়ার মালিক, ক্রীত দাসের মালিক, আমার আর্থিক অবস্থা ভাল। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, জনগণের কার্য্যটা আমার তরফ হইতে জনগণের জন্য দান ও সেবা পরিগণিত হউক।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি এরূপ করিবেন না। আমিও ঐরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম যেরূপ ইচ্ছা আপনি পোষণ করেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে

সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে আমার প্রাপ্য দিয়া থাকিতেন ; আমি বলিতাম, আমার চাইতে অভাবীকে দিয়া দিন। একদা হযরত নবী (দঃ) আমাকে কিছু অর্থ দান করিলেন ; আমি আরজ করিলাম, আমার চাইতে অভাবীকে দান করুন। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাকে নিজ সম্পদে পরিগণিত কর, অতঃপর দান করিয়া দাও। যাজ্ঞা ও লালসার পন্থা ছাড়া অন্য কোন (হালাল) পন্থায় যে সম্পদ আসে তাহা গ্রহণ করিও এবং যাহা না আসে তাহার পেছনে নিজকে উৎকণ্ঠিত করিও না—ব্যাকুল বানাইও না।

● শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বেতন-ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি উদ্ধৃতি এবং একটি নজীর উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধৃতিটি হইল এই—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, অভিভাবক স্বীয় খাটুনীর পারিশ্রমিক পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করিতে পারে। স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) স্বীয় উক্তিটির মর্ম্ম পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াও বলিয়াছেন যে, এতিমের অভিভাবক সম্পর্কে যে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "অভিভাবক দরিদ্র হইলে ন্যায়পরায়ণতার সহিত ভাতা গ্রহণ করিতে পারে।" ইহার ব্যাখ্যা এইযে, অভিভাবক এতিমের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিলে তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া পড়িবে, এরূপ দরিদ্র হইলে সেই অভিভাবক এতিমের মাল হইতে স্বীয় ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু সেই ভাতা তাহার খাটুনির পারিশ্রমিক পরিমাণ হইবে। (ফতহুল বারী ১৩—১২৮)

এই ব্যাপারে অনেক আলেমের মত এই যে, অভাবী অভিভাবকের ভাতা তাহার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পরিমাণ হইবে, কিন্তু এই ভাতা সে তখনই গ্রহণ করিতে পারিবে যখন সে এতিমের রক্ষণাবেক্ষণে খাটুনি খাটে এবং এই কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখে। অধিকাংশ আলেমের মত্ এই যে, তাহার খাটুনির পারিশ্রমিক এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন এই দুই-এর মধ্যে যেইটা কম হইবে সেই পরিমাণ ভাতাই গ্রহণ করিতে পারিবে উহার উর্দ্ধে নহে। (তফছীর ইবনে কাছীর)

শাসন-কার্য্য পরিচালকদের বেতন-ভাতার বয়ানে এতিমের অভিভাবকের উল্লেখ এই জন্য হইয়াছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারী ধনভাণ্ডারের মালিক শাসকগোষ্ঠি নহে যে, তাহারা উক্ত ধনভাণ্ডারকে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত ব্যয় করিবে। বরং উক্ত ধনভাণ্ডারের মালিক আল্লাহ তায়ালার বিধানমতে দেশের জনগণ। আর রাষ্ট্রনায়ক ও তাহার সহকর্ম্মিগণ ঐ ধনভাণ্ডারের আমানতদার—রক্ষণাবেক্ষণকারী, যেরূপ হয় এতিমের অভিভাবক। সুতরাং রাষ্টনায়কদের সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারের সহিত ঐরূপই হইবে যেরূপ সম্পর্ক এতিমের ধন-সম্পত্তির সহিত এতিমের অভিভাবকের হইয়া থাকে—যাহার বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"এতিমের অভিভাবক যদি স্বচ্ছল হয় তবে তাহার পক্ষে এতিমের মাল হইতে ভাতা গ্রহণে বিরত থাকাই উত্তম +। আর যদি সে দরিদ্র হয় তবে সে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত ভাতা গ্রহণ করিতে পারে।"

হাদীছ শরীফে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা উহার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমার প্রতিপালনে এতিম রহিয়াছে। আমি তাহার মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে পারি কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, ভাতা গ্রহণ করিতে পার ন্যায়পরায়নতার সহিত—অর্থাৎ এতিমের মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিয়া নিজের সম্পদ বাড়াইতে পারিবে না। এবং নিজের ধন বাঁচাইবার জন্যও উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। (তফছীর মাজহারী)

শাসন কর্ত্তৃপক্ষের ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) যে নজীর পেশ করিয়াছেন তাহা হইল ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতা এবং দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতা।

খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা দৃষ্টে এই প্রকাশ পায় যে, তাঁহার জন্য বৎসরে ৬০০০ দেরহাম মঞ্জুর করা হইয়া ছিল। বর্ত্তমান প্রচলিত মুদ্রায় উহার মূল্য হয় ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ মাসিক ১২৫ টাকা ছিল খলীফা আবু বকরের জন্য নির্দ্ধারিত ভাতার পরিমাণ। কিন্তু তিনি তাহাও পূর্ণ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার পরিবারের ব্যয় বহনে নিজস্ব সম্পত্তির উৎপন্ন ব্যয় করিয়া যে পরিমাণ ঘাটতি পড়িত সেই পরিমাণই তিনি ভাতা গ্রহণ করিতেন। সেমতে তাঁহার গৃহিত ভাতার পরিমাণ ছিল বৎসরে ২৫০০ দেরহাম—বর্ত্তমান মুদ্রায় ৭২৪ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ৫২ টাকা।

(এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬৪)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম খলীফার ভাতার পরিমাণ ছিল এই। তদসঙ্গে উক্ত খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যুকালের দুইটি অছিয়তও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

(১) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় বলিলেন, আমার স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি তদন্ত করিয়া দেখ—আমি খলীফা হওয়ার

+ ধনী অভিভাবকের ভাতা গ্রহণ হইতে বিরত থাকা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আদেশ মূলক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে মোফাচ্ছেরগণ ইহাকে সৌজন্য মূলক আদেশ সাব্যস্ত করিয়াছেন। (তফছীরে আহমদী দ্রষ্টব্য)

পূর্ব্বেকার বিষয়-সম্পত্তির উপর কোন কিছু বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলে তাহা আমার পরবর্ত্তী খলীফার নিকট জমা দিয়া দিও। সেমতে তদন্ত করিয়া দেখা গেল, তাঁহার ব্যবহারে দুইটি জিনিষ তাঁহার পূর্ব্বের ধন-সম্পদের অধিক পাওয়া যায়। একটি হইল ছেলে-মেয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ক্রীতদাস, আর দ্বিতীয়টি হইল খেজুর বাগানে পানি দেওয়ার জন্য একটি উট। খলীফার অছিয়ত অনুযায়ী উক্ত বস্তুদ্বয় পরবর্ত্তী খলীফা ওমরের নিকট জমা দিয়া দেওয়া হইল। ওমর (রাঃ) উহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ আবু বকরের প্রতি রহমত বর্ষিত করুন; তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী শাসকদেরকে কঠিন সাধনার ছবক দান করিয়া গিয়াছেন।

(ফতহুল বারী ৪—২৪৩)

(২) আয়েশা (রাঃ) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার মৃত্যু মুহূর্ত্তে অছিয়ত করিলেন, তোমরা হিসাব করিয়া দেখ, আমি খলীফা মনোনীত হওয়ার পর ভাতারূপে কি পরিমাণ অর্থ সরকারী ধনভাণ্ডার বাইতুল-মাল হইতে গ্রহণ করিয়াছি। উহার বিনিময়ে আমার অমুক স্থানের খেজুর বাগানটি প্রদত্ত হইল। (এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬২)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতার পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া সম্পর্কে তাঁহার একটি ঘোষনাই যথেষ্ট। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—আল্লার মাল (তথা বাইতুল-মাল) বা সরকারী ধনভাণ্ডার ক্ষেত্রে আমি নিজকে এতিমের অভিভাবক রূপে পরিগণিত করিব। যদি আমি উহাকে এড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হই তবে উহাকে স্পর্শও করিব না। আর যদি প্রয়োজনে বাধ্য হই তবে উহা হইতে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত ভাতা নিব।

এই উক্তির তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিব— কি কি জিনিষ আমি সরকায়ী ধনভাণ্ডার হইতে নিজের জন্য হালাল গণ্য করিব। হজ্জ এবং ওমরা করার জন্য একটি যান-বাহন, শীতের জন্য এক জোড়া এবং গরমের জন্য এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র। আর আমার এবং আমার পরিবারবর্গের খোরাকী—কোরায়েশ বংশীয় একজন মধ্যবিত্ত মানুষের খোরপোশের ন্যায়—উচ্চমানেরও নয় অথবা একেবারে নিম্নমানেরও নয়।

(এলাউছ্-ছুনান ১৫— ৬২)

এস্থলে খলীফা ওমরের শেষ জীবনের একটি অছিয়তও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় পুত্র বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ। আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, আমার মৃত্যুর

পর আমাকে দাফন করিয়া তোমার মাথা ধুইবার পূর্ব্বেই আমার একটি জমি ৮০,০০০ দেরহামে বিক্রি করিবা এবং তাহা বাইতুল-মাল—সরকারী ধনভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবা।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) খলীফা ওমরকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই পরিমাণ ধন আমি স্বীয় হজ্জ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে বাইতুল-মাল হইতে ব্যায় করিয়াছি।

তিনি আরও বলিলেন, হে আউফ-পুত্র! ওমরের আকাঙ্খা এই যে, যেই অবস্থায় সে জনগণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ছিল সেই অবস্থায়ই যেন উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। আমার একমাত্র বাসনা, আমি আল্লার দরবারে উপস্থিত হইলে পর জনগণ সামান্য দাবী দ্বারাও যেন আমাকে অভিযুক্ত করিতে না পারে। (এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬৫)

এই আলোচনায় খলীফা ওমরের ভাতার পরিমাণ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল। তিনি দশ বৎসর খলীফা ছিলেন এবং সর্ব্ব মোট ভাতা ছিল ৮০,০০০ দেরহাম; প্রতি বৎসরে ৮০০০ দেরহাম তথা ২০০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে ১৬৬ টাকার কিছু বেশী।

শাসনকর্ত্তার সাক্ষাতে তাঁহার প্রশংসা করিয়া অসাক্ষাতে সমালোচনা করা

২৬৭৮। হাদীছ ঃ—কতিপয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট প্রকাশ করিল, আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তার সাক্ষাতে উহার বিপরীত কথা বলিয়া থাকি যাহা তাহার অসাক্ষাতে বলি। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা (—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ) এই কার্য্যকে মোনাফেকী গণ্য করিয়া থাকি।

শাসন পরিচালক নিয়োগে অজ্ঞ লোকদের সমালোচনায় কর্ণপাত না করা

২৬৭৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক অঞ্চলে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং উহার অধিনায়ক মনোনীত করিয়া ছিলেন, যায়েদ-পুত্র উসামা (রাঃ)কে। তাঁহার অধিনায়কত্বের সমালোচনা করা হইল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, উসামার অধিনায়কত্বের সমালোচনা তোমরা করিতেছ। ইতিপূর্ব্বে তাহার পিতা যায়েদের অধিনায়কত্বেও সমালোচনা করিয়া ছিলে। খোদার কসম—যায়েদ অধিনায়ক হওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং সে আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল। তাহার পর উসামা আমার নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়।

রাষ্ট্রপ্রধান তাঁহার পরামর্শ-পরিষদ এবং গুপ্ত নৈকট্যধারী লোক রাখিতে পারেন অবশ্য তাহাদের একান্তই সৎ ও নিষ্ঠাবান হইতে হইবে

২৬৮০। **হাদীছ**ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যে কোন নবীকে পাঠাইয়াছেন এবং যে কাহাকেও (শাসনকর্ত্তারূপে) খলীফা হওয়ার সুযোগ দান করিয়াছেন—তাহাদের প্রত্যেকেরই গোপন পরামর্শদাতা হইয়াছে। তাহা দুই শ্রেণীর হয়—এক হয় সৎ ও ভাল পরামর্শদাতা ; যে ভালকাজের পরামর্শ দেয়, ভাল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর এক হয় অসৎ ও খারাব পরামর্শদাতা ; যে অসৎ কাজের পরামর্শ দেয় খারাব কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ঐরূপ অসৎ পরামর্শের ক্রিয়া ও খারাব আকর্ষণ হইতে যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করেন তিনি অবশ্যই নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ—গোপন পরামর্শদাতার উভয় শ্রেণীই দুই সম্প্রদায় হইতে হইয়া থাকে। মানুষ সম্প্রদায় হইতে ত হইয়া থাকেই—যাহাদের ভাল শ্রেণী শাসনকর্ত্তা ও নেতৃবর্গকে সদা সৎ পরামর্শ দান ও ভাল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা হয় খারাব শ্রেণীর তাহারা শাসনকর্ত্তা ও নেতৃবর্গকে সদা বিভ্রান্ত করিতে থাকে—অসৎ পরামর্শ দিয়া থাকে, অসৎ কাজের পরিকল্পনা পেশ করিয়া সেই দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। সুতরাং শাসনকর্ত্তা ও নেতৃবর্গের বড় কর্ত্তব্য ও ফরজ হইবে পরামর্শদাতা মনোনয়ন বা গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে ও থাকিতে হইবে যেন কোন অসৎ স্বার্থপর লোক তাঁহার পরামর্শদাতা হওয়ার সুযোগ না পায়। বক্ষমান পরিচ্ছেদ এবং আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য ইহাই।

গোপন পরামর্শদাতার দ্বিতীয় সম্প্রদায় হইল ফেরেশতা ও শয়তান। ফেরেশতা হইলেন সৎ পরার্শদাতা, ভাল কাজের আকর্ষণ সৃষ্টিকারী। আর শয়তান হইল অসৎ পরামর্শদাতা অসৎ কাজের আকর্ষণ সৃষ্টিকারী। এই সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ মানুষের অভ্যন্তরে হইয়া থাকে।

শাসনকর্ত্তা বা নেতৃবর্গ যদি প্রথম সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ভাল ও সৎ গ্রহণ করেন তবে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৎ পরামর্শদাতা তথা ফেরেশতার পরামর্শ দানের ও আকর্ষণ সৃষ্টির প্রভাব শক্তিশালী হয়, প্রাবল্য লাভ করে। ফলে সেই শাসনকর্ত্তা ও নেতা সৎ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে প্রয়াস পায়। পক্ষান্তরে শাসনকর্ত্তা বা নেতা যদি প্রথম সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা অসৎ গ্রহণ করে তবে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অসৎ পরামর্শদাতা তথা শয়তানের পরামর্শ দানের ও আকর্ষণ

সৃষ্টির প্রভাব ও প্রাবল্য বেশী হয় এবং সেই শাসনকর্ত্তা ও নেতা অসৎ কার্য্য অসৎ পরিকল্পনা এবং অসৎ ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ ও অগ্রসর হইতে থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবীগণের ক্ষেত্রেও খারাব পরামর্শদাতার দ্বিতীয় সম্প্রদায় তথা শয়তানের অবকাশ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু নবীগণ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার রক্ষা ব্যবস্থায় সুরক্ষিত থাকেন—যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছেই রহিয়াছে।

এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছও রহিয়াছে—

আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার একজন সঙ্গী জ্বিন সম্প্রদায়ের (তথা শয়তান) আর একজন সঙ্গী ফেরেশতা সম্প্রদায়ের থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সঙ্গেও ঐরূপ ছুইজন আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেও ঐরূপ ছুইজন রহিয়াছে। তবে আমার সঙ্গে জ্বিন সম্প্রদায়ের যে রহিয়াছে তাহার প্রতিরোধে আল্লাহ তায়ালা আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, ফলে সে আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে—আমি তাহার হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ; আমাকে সে বিপথগামী করার প্রয়াস পায় না।

রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের শপথ কিরূপ হইবে

২৬৮১। ছাদীছ ঃ—ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া এইরূপ অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, আমরা আপনার আদেশ-নিষেধ গ্রহণে ও অনুসরণে পূর্ণ অনুগত থাকিব—সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়। আর উপযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা প্রাপ্তির বিরোধী হইব না। হক্ ও আদর্শের উপর দৃঢ় পদ থাকিব—যথায়, যে অবস্থায় থাকি। আল্লার সন্তুষ্টির কাজে কাহারও নিন্দার পরওয়া করিব না।

২৬৮২। ছাদীছ ঃ— আবছুল্লাহ ইবনে দীনার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মারওয়ান-পুত্র আবছুল মালেক যখন রাষ্ট্রপ্রধানরূপে সকলের সমর্থন পাইল তখন আমি ছাহাবী আবছুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আবছুল মালেকের প্রতি সমর্থন প্রকাশে এইরূপ লিখিয়া ছিলেন— আমি আল্লার বান্দা আবছুল মালেক আমীরুল-মোমেনীনের যথাসাধ্য আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদর্শ অনুসরণের শর্ত্তে। আমার পুত্রগণও এই প্রতিজ্ঞা করিতেছে।

রাষ্ট্রপ্রধান কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা

রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগে ইসলাম উভয় পদ্ধতি সমর্থন করিয়া থাকে—(১) জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচন। (২) প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-তান্ত্রিক রাষ্টপ্রধান কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়ন।

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিনিয়োগে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল লোকদের আস্থা ভোট লাভ করার প্রয়োজনও রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বিনিয়োগ বিশেষতঃ নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা ও পাত্রের গুণাবলীর মাপ-কাঠিতে হইতে হইবে; অন্য কোন প্রভাবে নহে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا حَتّٰى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি মোসলমানদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের উপর কাহাকেও শাসক নিয়োগ করে স্বজন-প্রীতি বশে; তাহার উপর আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ। আল্লাহ তায়ালা তাহার ফরজ-নফল কোন এবাদৎই কবুল করিবেন না, পরিণামে তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইবেন। (তারগীব-তারহীব)

রাষ্ট্রপ্রধান কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান বিনিয়োগে কিরূপ নিষ্কলুষ একনিষ্ঠতা আবশ্যক খলীফা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফারূপে ওমরের মনোনয়ন দানে উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে যে, খলীফা আবু বকর (রাঃ) তাঁহার জীবনের শেষ এক দিন আনছার ও মোহাজেরদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের সহিত পরামর্শ করিলেন— ওমর (রাঃ)কে পরবর্ত্তী খলীফা মনোনীত করা সম্পর্কে। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, আমাদের মধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই। তখন আবু বকর (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে এইরূপ লিখিতে বলিলেন—বিছমিল্লাহির রহমানির রহীমঃ আবু কোহাফা-পুত্র আবু বকরের একটি বিশেষ নির্দ্দেশ-নামা তাহার দুনিয়া ত্যাগের প্রাক্কালে জীবনের শেষ দিনে এবং আখেরাতে প্রবেশকালের সর্ব্বপ্রথম দিনে—যে সময়ে অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হইয়া যায়, অর্দ্ধ বিশ্বাসী পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া যায়, মিথ্যাবাদীও সত্যবাদী হইয়া যায়। হে লোক সকল! আমি তোমাদের উপর খাত্তাব-পুত্র ওমরকে আমার পরবর্ত্তী খলীফা মনোনীত করিয়াছি; তোমরা সকলে তাঁহার আনুগত্য ও বশ্যতা অবলম্বন করিবে। পরবর্ত্তী খলীফা মনোনয়ন দানে আমি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের ক্ষেত্রে, দ্বীন-ইসলামের ক্ষেত্রে, আমার ও তোমাদের ক্ষেত্রে কল্যাণ ও

মঙ্গলের প্রচেষ্টায় বিন্দু মাত্র ত্রুটি করি নাই। এখন ওমর যদি ন্যায় অবলম্বন করে তাহা হইবে তাহার সম্পর্কে আমার ধারণা ও অবগতির প্রকৃত রূপ। আর যদি সে উহার ব্যতিক্রম করে তবে প্রত্যেকের ন্যায় তাহাকে নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে মনোনীত করায় আমি একমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গলই কামনা করিয়াছি এবং উহারই চেষ্টা করিয়াছি। আমি গায়েবের খবর জ্ঞাত নহি। (আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,) অন্যায়কারীরা অচিরেই জ্ঞাত হইয়া যাইবে তাহাদের পরিণাম কি ঘটে। তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লার রহমতের দোয়া।

অতঃপর উক্ত নির্দ্দেশ নামাকে সীলমোহরের ছাপ লাগান হইল। তারপর আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে নির্জনে ডাকিয়া আনিলেন, তাঁহাকে যাহা বলিবার বলিলেন। ওমর (রাঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলে পর আবু বকর (রাঃ) আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি যাহা করিলাম একমাত্র মঙ্গল ও কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করিলাম। আমি জন-সাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ভয় করিয়া দ্রুত তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম যাহা আপনি জ্ঞাত রহিয়াছেন। আমি জনগণের হিতের খুব ভালরূপে চিন্তা করিয়াছি, তারপর এমন ব্যক্তিকে তাহাদের উপর শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়াছি যে তাহাদের পক্ষে উত্তম ও মজবুত এবং তাহাদের মঙ্গল কামনায় অতিশয় লালায়িত।

হে আল্লাহ! আমার প্রতি আপনার নির্দ্ধারিত বস্তু (মৃত্যু) উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। জনগণকে আপনারই হাওয়ালা করিলাম; তাহারা আপনারই বন্দা, আপনারই করতলগত। তাহাদের শাসকদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন, তাহাদের শাসকদেরকে আপনার প্রকৃত খলীফা বানাইয়া দিন এবং জনগণকে তাহাদের মঙ্গলকামী বানাইয়া দিন। (নেব্‌রাছ—শরহে আকায়েদ গ্রন্থে তারীখুল-খোলাফা হইতে উদ্ধৃত)

তারপর আবু বকর (রাঃ) তাঁহার নির্দ্দশ-নামাকে জন সমক্ষে প্রকাশ করিলেন এবং নির্দ্দেশ-নামায় লিখিল ব্যক্তির প্রতি আস্থা প্রকাশের জন্য বলিলেন। সেমতে সকলেই পূর্ণ আস্থা স্থাপন তাহা করিল। এই ভাবে সর্ব্ব সম্মতরূপে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনোনয়ন প্রতিষ্ঠিত হইল। (শরহে আকায়েদ)

২৬৮৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ)কে (তাঁহার অন্তিমকালে) অনুরোধ করা হইল, আপনি আপনার পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করিবেন না—কি? তিনি বলিলেন, যদি আমি মনোনীত করিতে চাই তবে তাহা করিতে পারি; আমার চেয়ে উত্তম যিনি তথা আবু বকর (রাঃ) তিনি মনোনীত করিয়া ছিলেন। আর যদি মনোনীত না করিতে

চাই তাহাও করিতে পারি ; আমার ছেরতাজ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) (আনুষ্ঠানিকরূপে কাহাকেও) মনোনীত করিয়া যান নাই।

অতঃপর উপস্থিত লোকগণ খলীফা ওমরের প্রশংসা করিতে লাগিল। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লার রহমতের আশাও রহিয়াছে, আজাবের ভয়ও রহিয়াছে। শাসন ক্ষমতার দায় হইতে সমান সমান থাকিয়া রেহায়ী পাই—এতটুকুই আকাঙ্খা রাখি ; পুরস্কৃত না হই, অভিযুক্তও না হই। তিনি আরও বলিলেন, জীবনকালে এই দায়িত্ব বহন করিয়াছি, মৃত্যুর পরেও সেই বোঝা আমার কাঁধে থাকিবে তাহা আমি চাই না। (অর্থাৎ পরবর্ত্তী খলীফা আমি মনোনীত করিয়া গেলে উহার দায়িত্ব আমার উপর থাকিয়া যায়।)

প্রতিনিধীত্বশীল লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচন

২৬৮৪। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে খলীফা নির্ব্বাচন করা সম্পর্কীয় ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষণ শুনিয়াছেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনের ঘটনা—আবু বকর (রাঃ) চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই বলেন না। ওমর (রাঃ) মসজিদের মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং কলেমা শাহাদৎ পাঠ করিয়া ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন, আমার আশা ছিল, আমরাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ব্বে মরিব, তিনি আমাদের পরেও জীবিত থাকিবেন। যদি ইহাই সাব্যস্ত হইয়া থাকে যে, মোহাম্মদ (দঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তবুও আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মধ্যে স্বীয় নুর ও আলো (তথা পাক কালাম—কোরআন) বিদ্যমান রাখিয়াছেন ; উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকেও পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। আর আবু বকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশিষ্ট সহচারী, এমনকি ছৌর পর্ব্বৎ গুহায়ও তিনি তাঁহার সহিত দ্বিতীয় জন ছিলেন। তিনি আপনাদের শাসন কার্য্যের জন্য মোসলমানদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাধিকারী। অতএব আপনারা সকলে তাঁহার হাতে হাত দিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। ইতিপূর্ব্বে বনু-সায়েদা গোত্রের বৈঠকঘরের সম্মেলনে বিশিষ্ট লোকগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এইবার মসজিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ হইতে আনুগত্যের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত হইল। ওমর (রাঃ) অতিশয় পীড়াপীড়ি করিয়া আবু বকর (রাঃ)কে মিম্বারে উপবেশন করিতে বাধ্য করিলেন এবং লোকগণ তাঁহার হাতে আনুগত্যের শপথ করিল।

শাসন-ক্ষমতা সম্পর্কে হযরতের ভবিষ্যদবাণী

২৬৮৫। **হাদীছ :**—জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে (দীর্ঘ দিন মোসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিবে ;) বার জন শাসনকর্ত্তা নিশ্চয়ই হইবে—তাহাদের প্রত্যেকই কোরায়েশ বংশীয় হইবে।

ব্যাখ্যা :—বিভিন্ন হাদীছে আলোচ্য ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঙ্গে আরও কতিপয় বাক্য সংযুক্ত আছে, যথা—বার জন শাসনকর্ত্তার আমলে দ্বীন-ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী থাকিবে। বার জন শাসনকর্ত্তার আমলে মোসলমানদের অবস্থা সমৃদ্ধ সুষ্ঠু ও উন্নত হইবে। বার জন যাহাদের প্রত্যেকই সর্ব শ্রেণীর লোকের আস্থা ভাজন হইবে—এই বারজন শাসনকর্ত্তার সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বীন-ইসলাম কায়েম থাকিবেই।

আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। একটি এই যে, উল্লেখিত শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা বার জনই হইবে, অধিক হইবে না—হাদীছের উদ্দেশ্য ইহা নহে, বরং উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত শ্রেণীর শাসনকর্ত্তার সংখ্যা বার হইতে কম হইবে না। সুতরাং ঐ শ্রেণীর শাসনকর্ত্তার সংখ্যা বার হইতে অধিক হওয়া এই হাদীছের পরিপন্থী নহে।

এই বার জন শাসনকর্ত্তার উদ্দিষ্ট কে কে এবং তাঁহারা সব অতীত হইয়া গিয়াছেন, না—ইমাম মেহদী (আঃ) এই সংখ্যার একজন—এই সব বিষয়ের প্রতি হাদীছে কোন ইঙ্গিত নাই। বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকারগণ আলোচানা করিয়াছেন, কিন্তু মতানৈক্য অনেক বেশী।

দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মোসলমানদের অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধময় থাকা উক্ত বার জন শাসনকর্ত্তার শাসনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া হাদীছের উদ্দেশ্য নহে। উক্ত শাসনকর্ত্তাদের সময়ে মোসলমানদের অবস্থা অবশ্যই উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে হাদীছের উদ্দেশ্য এতটুকুই। অতএব আরও অধিক কাল এবং অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদের আমলেও মোসলমানদের অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধময় হওয়া এই হাদীছের পরিপন্থী নহে।

শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মছআলাহ

মছআলাহ :—শাসনকর্ত্তা বা বিচারকের দারোয়ান রাখা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দারোয়ান ছিল না।

ইহা সত্য যে, হযরত নবী (দঃ) পেশাদার দারোয়ানরূপে কাহাকেও নিযুক্ত রাখেন নাই। ইহাও সত্য যে, কতিপয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়—বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাহাবী হযরতের জন্য দারোয়ানীর কাজ করিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে আলেমগণের মত, এই যে, দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বা অন্য কোন প্রয়োজনে দারোয়ান রাখা জায়েয আছে। অথচ শুধু কেবল আত্মশ্লাঘা বশে দারোয়ান রাখা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ জনগণের ফরিয়াদ আর্তনাদ পৌঁছাইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, বিঘ্ন ও বিলম্বের কারণ হয় এই পর্য্যায়ের বা এই শ্রেণীর দারোয়ান রাখা শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের জন্য হারাম।

১। হাদীছ :— হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে কোন শাসক বা প্রশাসক অভাব-অভিযোগের ফরিয়াদী এবং সঙ্কটাপন্ন বিপদগ্রস্ত লোকদের হইতে স্বীয় দরওয়াজা বন্ধ রাখিবে আল্লাহ তায়ালা উক্ত শাসক ও প্রশাসকের আপদ-বিপদ ও সঙ্কট উদ্ধারে রহমতের দরওয়াজা আবদ্ধ রাখিবেন। (তিরমিজী শরীফ)

২। হযরতের ঘোষণা—যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জনগণের অভাব-অতিযোগ হইতে আড়ালে থাকে আল্লার রহমতও তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

প্রশ্ন :—কোন ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং বিচারক অবগত রহিয়াছে এমতাবস্থায় সাক্ষী প্রমাণ ব্যতিরেকে বিচারক স্বীয় অবগতির উপর বিচার ও রায় দান করিতে পারে কি ?

উত্তর :—যে সব দণ্ড নিছক "হক্কুল্লাহ্" অর্থাৎ যে অপরাধের দণ্ড শরীয়তে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং সরকার কর্ত্তৃক সেই দণ্ড প্রয়োগে শুধু কেবল বিধান মোতাবেক অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক—নির্দ্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ কোন মানুষের দাবী উত্থাপনের উপর নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ নহে। যেমন, জেনা বা ব্যভিচারের দণ্ড এক শত বেত্রাঘাত কিম্বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এবং মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। এই শ্রেণীর কোন দণ্ডের আদেশ দান করা শুধু বিচারকের অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া হইতে পারে না—বিধানগত প্রমাণ অবশ্যই বিচারালয়ে উপস্থিত পাইতে হইবে। হাঁ—ঐ শ্রেণীর অপরাধ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানগত প্রমাণের অভাব অবস্থায় বিচারক স্বীয় অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহার বিবেচনা অনুযায়ী শাসন রক্ষার উপযোগী কোন শাস্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। এই মছআলায় পূর্ব্বাপর সকল ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণই এক মত—তাঁহাদের মতভেদ নাই।

পক্ষান্তরে যে সব বিষয় নিছক হক্কুল্লাহ্ নহে, বরং উহার সহিত হক্কুল-এবাদের সম্পর্কও রহিয়াছে—যেমন, পরস্পর মানুষের দাবী-দাওয়া কিম্বা কোন মানুষকে হত্যা করার বা অঙ্গহানি করার কিম্বা কাহারও প্রতি অপ্রমাণিত জেনা তথা ব্যভিচারের গ্লানি আরোপ করার দণ্ড। এই সব ক্ষেত্রে ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণের মতভেদ রহিয়াছে। যেই যুগে সমাজের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা, আমানতদারী, খোদাভীরুতা ও খোদা-ভক্তি বিদ্যমান ছিল; বিশেষতঃ বিচারকের মধ্যে সততা, সাধুতা, একনিষ্ঠতা এবং দায়িত্ব-বোধ ও বিচার-কার্য্যের পবিত্রতার উপলব্ধি পূর্ণ বিদ্যমান ছিল—সেই যুগের ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণের মত এই যে, উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে বিচারক স্বীয় অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া রায় দান করিতে পারেন। পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ যখন হইতে সমাজেও দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিচারকের মধ্যেও সাধারণভাবে স্বার্থপ্রীতি স্বজনপ্রীতি পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি প্রসার লাভ করিয়াছে, তখন হইতে ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণ উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহেও সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া শুধু বিচারকের স্বীয় অবগতির উপর রায় দানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতঃ বলিয়াছেন, বিচারক শুধু কেবল হক্কুল-এবাদ সম্পর্কে স্বীয় অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিতে পারেন যে ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির সংশয়-সন্দেহের লেশ মাত্র না থাকে।

মছআলাহ ঃ—বিচারক যদি কোন ঘটনার সাক্ষী হন তবে তাঁহার বিচার কার্য্যে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহিত নহে। হাঁ—অপর বিচারকের এজলাসে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে। ছাহাবীদের যুগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিচারক কাজী শোরায়হ্‌কে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, আমার বিচারে আমি সাক্ষী হইতে পারিব না। তুমি অন্য বিচারকের নিকট বিচারপ্রার্থী হও আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সাক্ষ্য দিব।

মছআলাহ ঃ—বিচারক ও শাসক ঘুষ-রেশওয়াত মুক্ত থাকার জন্য কাহারও হইতে হাদিয়া—উপঢৌকন, উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অবশ্য রক্তের সম্পর্কধারী আত্মীয় ও এরূপ বন্ধু-বান্ধব হইতে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন যাহারা এই পরিমাণ হাদিয়া বিচারক ও শাসক হওয়ার পূর্ব্বেও তাঁহাকে দিয়া থাকিত। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদেরও যদি তাঁহার এজলাসে বিচার চলিতে থাকে তবে তাহাদের হাদিয়াও গ্রহণ করিবেন না।

বিশেষ দাওয়াত যাহা বিচারক বা শাসকের জন্য ব্যবস্থা করা হয় তাহাও হাদিয়ার ন্যায়ই। অবশ্য যদি সাধারণ দাওয়াত হয় যেমন বিবাহ-শাদী ইত্যাদি

উপলক্ষের দাওয়াত, তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অপরিচিত লোকের এবং যাহার বিচার চলিতেছে ইহাদের কোন দাওয়াতই গ্রহণ করিবেন না।

(শামী ৪—৪৩৯ × ৪৩৩)

মছআলাহ ঃ—সর্দার প্রথাকে শরীয়ত অনুমোদন করিয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে উহা প্রচলিত ছিল। অবশ্য সর্দারদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে! এক হাদীছে আছে—সর্দার প্রথা একটি শুদ্ধ ব্যবস্থা বটে, সমাজের জন্য সর্দারদের প্রয়োজন আছে। অবশ্য সর্দারগণ দোযখী হইবে। আর এক হাদীছে আছে—"সর্দারদের জন্য ওয়ায়েল দোষখ।"

সাধারণভাবে সর্দারগণ অত্যাচারী এবং জুলুম-অন্যায়ের অনুসারী হইয়া থাকে, সেই দৃষ্টিতেই এই সব সতর্কবাণী। ন্যায়পরায়ণ নিষ্ঠাবান সর্দারদের জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই।

মছআলাহ ঃ—অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার সম্পর্কে তফসীল নিম্নরূপ—

যে সমস্ত বিষয় নিছক হক্কুল্লাহ যথা জেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি এবং মদ্য পানের দণ্ড এই সবের বিচার অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর হইতে পারে না। আর হক্কুল-এবাদ তথা মানুষের দাবী-দাওয়ার বিচারে বিবাদী উপস্থিত না হইলে সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ ইমামগণের মতে বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বিচার হইতে পারে। ইমাম আবু হানিফার মতে বিচারক অনুপস্থিত বিবাদীর পক্ষে কোন একজন উকিল attorney নিযুক্ত করিয়া হইলেও বিবাদী পক্ষের বক্তব্য শুনিবার যথা সম্ভব ব্যবস্থা করিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সেইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া বিচার করিয়া দিলে সেই বিচারও প্রযোজ্য হইবে। (শামী ৪—৫৭০)

মছআলাহ ঃ—মিথ্যা সাক্ষী বা অন্য যে কোন কারণে বিচারকের বিভ্রান্তি ঘটায় এক জনের হক্ক অপর জনকে দেওয়ার রায় প্রদত্ত হইলে প্রাপকের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হালাল হইবে না যদিও জাগতিক আইনের বিচারে সে উহার অধিকারী হইয়াছে—ইহা সকল ইমামগণের সর্ব্বসম্মত মছআলাহ। অবশ্য কোন বস্তু সম্পর্কে নয়, বরং শুধু ইজাব-কবুল—বন্ধন বা ছেদন সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে যদি ঐরূপ বিভ্রান্তির দরুন বিচারক বাস্তবের বরখেলাফ রায় দান করেন এবং সেই বিচারক ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিচারক তথা কাজী হন, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে সে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় দানের কারণে অবাস্তবই বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেমন—এক ব্যক্তি কোন এক স্বামী বিহীন মহিলার উপর বিবাহের দাবী করিয়া দুইজন মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দিল

এবং কাজী বিবাহের রায় দান করিলেন। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের মধ্যে বিবাহ তথা ইজাব-কবুল হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতে কাজীর রায়কে ইজাব-কবুলের বন্ধন স্বরূপ সাব্যস্ত করিয়া উক্ত মহিলাকে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী গণ্য করা হইবে এবং বাস্তবেই সে স্ত্রী গণ্য হইবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের সমুদয় আচার-ব্যবহার শুদ্ধ ও জায়েয হইবে। অবশ্য মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা সাক্ষ্যের কবিরা গোনাহ্ নিশ্চয় হইবে।

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তা ক্ষেত্র বিশেষে কাহারও ধন-সম্পত্তি বিক্রি করিতে পারেন। যেমন, কোন ব্যক্তি তাহার ধন-সম্পত্তির সম পরিমাণ বা অধিক ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছে এবং তাহার ওয়ারেছগণ সেই ঋণ পরিশোধ করিতে রাজী নহে। এরূপ ক্ষেত্রে শাসনকর্ত্তা ঐ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার সম্পত্তি বিক্রি করিতে পারেন।

মছআলাহ ঃ—অধিক মামলাবাজ লোক আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির প্রতি শাসন কর্ত্তৃপক্ষের কড়া দৃষ্টি রাখা চাই।

মছআলাহ ঃ–শাসনকর্ত্তা বা বিচারক যদি কোরআনের বা সুন্নার কিম্বা এজমা তথা ফেকার সর্ব্ব সম্মত মছআলার পরিপন্থী রায় দান করেন সেই রায় গ্রহণীয় হইবে না। অবশ্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপর বিচারকের মাধ্যমে উহাকে নাকচ করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তাকে জনগণের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থায়ও চেষ্টা করা চাই। লোকদের মধ্যে মীমাংসার জন্য আবশ্যক হইলে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বিরোধের ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইবেন।

মছআলাহ ঃ—আমলা বা কেরাণী নিয়োগ করিতে দায়িত্বশীল বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান দেখিয়া নিয়োগ করা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কর্ত্তব্য।

মছআলাহ ঃ–শাসনকর্ত্তা তাঁহার আমলাদের প্রতি এবং কাজী তথা প্রশাসক তাঁহার কর্ম্মচারীদের প্রতি কোন লিপি প্রেরণ করিলে তাহা গৃহিত হইবে যদিও কোন সাক্ষীর ব্যবস্থা না থাকে।

আর যদি এক এলাকার বিচারপতি প্রয়োজন বশতঃ অপর এলাকার বিচারপতির নিকট কোন মামলার রায় বা সাক্ষ্যের ব্যাপারে লিপি প্রেরণ করেন, তবে ইমাম বোখারীর মতে তাহাও সাক্ষী ব্যক্তিরেকেই গৃহিত হইবে; এমনকি খুনের মামলা সম্পর্কে হইলেও তাহা গৃহিত হইবে। ইমাম আবু হানিফার মতে কেছাছ তথা

প্রাণদণ্ড এবং হদ্দ্ তথা শরীয়তের নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট চারটি শাস্তি সম্পর্কীয় মামলার ব্যাপারে কাহারও কোন লিপি গৃহিত হইবে না। অন্য শ্রেণীর মামলা সম্পর্কীয় লিপি একমাত্র সাক্ষীর সহিত গৃহিত হইতে পারে।

মছআলাহ ঃ—শাসক বা প্রশাসকের পক্ষ হইতে কোন বিষয় তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী যথেষ্ট। তদ্রূপ অধিকাংশ ইমামগণের মতে প্রয়োজন স্থলে দোভাষীও একজন যথেষ্ট। কাহারও মতে দুইজন দোভাষী আবশ্যক; যেরূপ সাক্ষী অন্ততঃ দুইজন হওয়া আবশ্যক।

মছআলাহ ঃ—সরকারী আমলাদের কার্য্যাবলীর তদন্ত পরিচালনা রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ কর্ত্তব্য।

মছআলাহ ঃ—রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় উপদেষ্টা বোর্ড রাখিতে পারেন।

মছআলাহ ঃ—শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাহাকেও সমর্থন (Support) করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ মতে—যে ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থবশে কাহারও প্রতি শাসনকর্ত্তা হওয়ার সমর্থন দেয়, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

মূল হাদীছের বাক্য দৃষ্টে ইহাও সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনী ভোটের সমর্থন এবং ক্ষমতা লাভ যথা মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet) গঠনের সমর্থন কিম্বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনের সমর্থন এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়ই উক্ত হাদীছের প্রথম লক্ষ্য।

আকাঙ্খা ও বাসনা পোষণ করা

মানুষ সাধারণতঃ দীর্ঘাকাঙ্খী হইয়া থাকে। মানবের আশা তাহার জীবন অপেক্ষা অধিক লম্বা হয়। কোন কোন হাদীছে মানবের এই স্বভাবটির প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন বস্তুর আকাঙ্খা ও আশা পোষণ করা প্রশংসনীয়ও বটে। ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে ঐ শ্রেণীর বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খার বর্ণনাই দান করিবেন।

এই ছোট অধ্যায়টিতে বর্ণিত হাদীছ সমূহের অনুবাদ যথাস্থানে হইয়া গিয়াছে। নিম্নে অত্র অধ্যায়ের বিশেষ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

১। শহীদি-মৃত্যুর আকাঙ্খা ও বাসনা করা জায়েয ও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ মৃত্যু কামনা করা সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু শহিদী-মৃত্যুর বাসনা রাখা জায়েয আছে। স্বয়ং হযরত (দঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন—

لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى

ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ

"আমার আকাঙ্খা ও বাসনা এই যে, আমি আল্লার রাস্তায় শহীদ হই অতঃপর পুনর্জীবিত হই ; আবার শহীদ হই অতঃপর পুনর্জীবিত হই ; আবার শহীদ হই অতঃপর পুনর্জীবিত হই এবং আবার শহীদ হই।

২। কোন নেক কাজের বাসনা করা জায়েয। অর্থাৎ শুধু কেবল পার্থিব উন্নতির দৃষ্টিতে উত্তরোত্তর বিভিন্ন বাসনা পোষণ করিতে থাকা মোবাহ এবং জায়েয বিষয় সম্পর্কে হইলেও মোসলমানের পক্ষে উহা নিন্দনীয়। কিন্তু নেক কাজের কামনা ও বাসনায় কোন ক্ষতি নাই ; বরং উহাতে ছওয়াব হইবে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, স্বয়ং হযরত (দঃ) এরূপ কামনা করিয়াছেন যে, ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার হইলে তিন দিন অতিক্রম হওয়ার পূর্ব্বেই আমি উহা দান-খয়রাত করিয়া দিতাম।

৩। কোরআন তেলাওয়াত বা দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম কিম্বা দান-খয়রাত ইত্যাদি যে কোন নেক কাজ সম্পর্কে কাহারও প্রতিযোগিতায় তাহার সমকক্ষতার বাসনা পোষণ করা জায়েয, বরং এখলাছ ও নির্ম্মল অকৃত্রিমতার প্রেক্ষিতে উহা ছওয়াবেরও অছিলা হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে পার্থিব উন্নতি ও ধন-দৌলত সম্পর্কে ঐরূপ প্রতিযোগিতাজনিত বাসনা ধ্বংসের কারণ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন ব্যক্তি কোনআনের শিক্ষা লাভ করিয়া দিবা-রাত্র উহা তেলাওয়াত করিতে থাকে ; তাহাকে দেখিয়া এরূপ বাসনা করা যে, আমি তাহার ন্যায় হইতে পারিলে আমিও ঐরূপ আমল করিতাম যেরূপ সে করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ধনের অধিকারী হইয়া ন্যায় ও ছওয়াবের ক্ষেত্রে ব্যয় করে তাহাকে দেখিয়া বাসনা করা যে, এইরূপ ধন আমার থাকিলে আমিও এইভাবে খরচ করিতাম—এই শ্রেণীর কামনা ও বাসনা প্রশংসনীয় +।

+ এক ব্যক্তি স্বপ্নে ইব্রাহিম আদহাম (রঃ)কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় মর্তবাই দান করিয়াছেন, তবে আমার মর্তবা আমার এক পড়শীর মর্তবাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ঐ পড়শীর আমল এই ছিল যে, তিনি আমার এবাদৎ-বন্দেগী ও দান-খয়রাত দেখিয়া কাঁদিত এবং এই বাসনা করিত যে, ইব্রাহিম আদহামের ন্যায় সুযোগ পাইলে আমিও তাঁহার ন্যায় আমল করিতাম। তাঁহার এই অকৃত্রিম আবেগ ও বাসনার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আমল সম পরিমাণ মর্তবা দান করিয়াছেন।

৪। কোন কোন বস্তু যাহা নিষিদ্ধ নয়, তবুও উহার কামনা ও বাসনা পোষণ করা নিষিদ্ধ। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

পুরুষের মিরাস (উত্তরাধীকার স্বত্বের অংশ) নারীর তুলনায় দ্বিগুণ, পুরুষের সাক্ষ্য নারীর সাক্ষ্যের দ্বিগুণ শক্তিমান এবং পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে নারীর সাক্ষ্য গৃহিতই নহে—অনেক ক্ষেত্রেই নারীর উপর পুরুষের এইরূপ মর্য্যাদা রহিয়াছে। ইহা দৃষ্টে কোন কোন নারী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে নারী না হইয়া পুরুষ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করিল। সেই উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় যাহার ব্যাখ্যা এই যে—মানবের কোন কোন শ্রেণী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দান হিসাবে কোন মর্য্যাদা দিয়াছেন; অপরদের সেই মর্য্যাদার অভিলাষী হওয়া চাই না। অর্থাৎ স্বীয় আমল ও চেষ্টা-তদবীরে নয়, বরং নিছক খোদা প্রদত্ত কোন মর্য্যাদা কাহারও হাসিল থাকিলে অপরের জন্য উহার কামনা ও বাসনা করা নিষিদ্ধ। যেমন—নবী হওয়া, পুরুষ হওয়া ইত্যাদি।

মৃত্যু কামনা করাও নিষিদ্ধ। অবশ্য হাদীছেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা ও দুর্ভোগ-দুর্যোগে অতিষ্ট হইয়া মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আল্লার প্রেমে মত্ত হইয়া আল্লার মিলন আকাঙ্খায় মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ নহে।

৫। শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও সংঘর্ষ কামনা করা চাই না। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জেহাদের তৌফিক কামনা করা ত ভাল কথা—উহা নেক কাজের বাসনা গণ্য হইবে। কিন্তু শত্রুর সহিত যুদ্ধে ও সংঘর্ষে পতিত হওয়ার অবস্থা কামনা করিতে নাই। সংঘর্ষ না বাঁধিয়া ভয়-ভীতির দরুন শত্রু উপস্থিত না হয়—এইভাবেও মোসলমানদের বিজয়লাভ ও উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব। এমনকি যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ছাড়াই এরূপ ক্ষেত্রে মোসলমানগণ জেহাদের ছওয়াবত লাভ করিয়া থাকে। যেরূপ পবিত্র কোরআনে আলোচিত স্বয়ং হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক পরিচালিত ঐতিহাসিক তবুকের জেহাদে হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ীর অবতারণা করা এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা আল্লাহ তায়ালার নিকট শান্তি কামনা করা চাই। হাঁ—সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেলে তখন সর্ব্বময় ত্যাগের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, তখন কোন প্রকার অবহেলা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে না। ইহাই হইল জেহাদের তৌফিক কামনার অর্থ; আর মৃত্যু যাহা মানুষের জন্য অপরিহার্য্য সেই মৃত্যু যথায়-তথায় না হইয়া এইরূপ ক্ষেত্রেই হউক ইহাই শহীদি মৃত্যু কামনার অর্থ। শহীদি মৃত্যুর বাসনা রাখিবে, কিন্তু সরাসরি

শত্রুর সংঘর্ষ কামনা করিবে না। উক্ত বাসনার জন্য এই কামনা আবশ্যকও নহে। ইহা শয়তানের কর্ম্ম তৎপরতার সুযোগ করিয়া দেয়। (ফতহুলবারী ১৩—১৯২)

ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে হযরত নবী (দঃ) "যদি" (অর্থে আরবী لو "লাও") শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব "যদি" শব্দের ব্যবহার সর্ব্বক্ষেত্রে পরিহার্য্য নহে।

এ সম্পর্কে তারতম্যের ব্যাখ্যা এই যে—কোন বাহ্যিক কার্য্যকারণকে উপলক্ষ্য করিয়া "যদি" শব্দ ব্যবহার করা, যেমন—যদি অমুক ডাক্তার আনিতাম, তবে আমার ছেলে মারা যাইত না, বা তবে রোগ সারিত।" "যদি এরূপ ব্যবস্থা করি তবে এই ফল হইবেই" ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তা, তাঁহার ইচ্ছার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারকে এবং তকদীরকে উপেক্ষা করার অর্থ "যদি" শব্দের ব্যাবহার ত সম্পূর্ণ হারাম, বরং কুফুরী মতবাদের শামিল। মানুষের মধ্যে এইরূপ ভাবধারা সৃষ্টি করাই শয়তানের প্রচেষ্টা। আর আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তা ও তাঁহার ইচ্ছার প্রাধান্য এবং তকদীরের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও একিন রাখিয়া শুধু কেবল বাহ্যিক কার্য্যকারণ পর্য্যায়ের অর্থে "যদি" শব্দ ব্যবহার করা মূলতঃ জায়েয, কিন্তু উহার আধিক্য ভাল নহে। কারণ, এইভাবে বাহ্যিক কার্য্যকারণের বুলি বলিতে থাকিলে উহার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যাইবে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ তায়ালার শক্তি, ইচ্ছা এবং তকদীরের প্রতি আস্থা ও একীন ক্ষীণ হইয়া আসিবে। এই অবস্থাটাই শয়তানের কাম্য এবং এই অবস্থার সূত্রপাত হয় বারংবারের "যদি" হইতে। ইহাই অর্থ, হাদীছের এই বাক্যের যে—"যদি" শয়তানের কর্ম্ম-তৎপরতার সুযোগ করিয়া দেয়।

পক্ষান্তরে কার্য্যকারণ ক্ষেত্রে নয়, বরং শুধু কেবল ভাষাগত তাৎপর্য্যে এক বিষয়ের উপর অপর বিষয়কে স্থাপন করার অর্থে "যদি" ব্যবহার করায় কোন দোষ নাই। যেমন—এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যদি সকল লোক এক পথে এবং আনছার তথা মদীনাবাসী ছাহাবীগণ অন্য পথে চলে, তবে আমি আনছারদের পথে চলিব। আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন বোধ না করিতাম তবে মেছওয়াক করা ফরজরূপে আদেশ করিতাম।

এই শ্রেণীর কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন, এরূপ অর্থে "যদি" শব্দ ব্যবহার করায় কোন দোষ নাই। পক্ষান্তরে "যদি" শব্দের ব্যবহার হইতে সতর্ককারী হাদীছ সমূহের উদ্দেশ্য হইল কার্য্যকারণ ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার।

মানবের কর্ত্তব্য হইল—স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বা আবশ্যক ও প্রয়োজন মিটাইতে বৈধ চেষ্টা-তদবীর সবই অবলম্বন করিবে; ইহা আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্দেশ। কিন্তু মন-মগজ ও ধ্যান-ধারণা এবং আস্থা ও নির্ভর, একিন ও বিশ্বাস সবকেই আল্লার শক্তিমত্তা ও তাঁহার ইচ্ছার প্রাধান্যের প্রতি এবং তকদীরের প্রতি রুজু ও নিবদ্ধ রাখিবে। তৎসঙ্গে উহার বিপরীত বাক্যাবলী হইতে জবান এবং মুখকেও সংযত রাখিবে।

একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত সংবাদ সম্পর্কে

এই ক্ষুদ্রতম অধ্যায়টিতেও ইমাম বোখারী (রঃ) যে কয়টি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ হাদীছসমূহের অনুবাদ যথাস্থানে করা হইয়াছে। এই অধ্যায়টিতে শুধু একটি বিষয় বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, তাহা এই—

সাক্ষ্য দুই প্রকার। এক হইল—বিচারালয়ে একজনের দাবী অপর জনের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাক্ষ্য। দ্বিতীয় হইল—সংবাদ আদান-প্রদানের সাক্ষ্য। প্রথম প্রকার সাক্ষ্যের জন্য সাক্ষীর সত্যবাদিতার সহিত নির্দ্ধারিত সংখ্যা তথা কমপক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া আবশ্যক। শত সত্যবাদী সাক্ষী হইলেও উক্ত সংখ্যার কম সাক্ষীর দ্বারা কোন দাবী আইনের দৃষ্টিতে প্রমাণিত গণ্য হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের জন্য সংখ্যার প্রয়োজন নাই। একজন সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্যেই সংবাদকে সত্য বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের জন্য যে, সংখ্যার প্রয়োজন নাই—একজন সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, ইহা প্রমাণ করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। কতিপয় বিশেষ নজীর ও কতিপয় হাদীছের ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) উহাই প্রমাণ করিয়াছেন। যথা—আজান, রোযা ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কীয় সংবাদে ইসলামের বিধান মতে এবং সচরাচরও একজন সত্যবাদী সাক্ষী যথেষ্ট পরিগণিত হয়।

আজান দ্বারা নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিতি-সংবাদ অবগত করা হয় এবং একজন লোকের আজানই যথেষ্ট গণ্য করা হয়। নামাযের মধ্যে একজন মোকাব্বেরের তকবীর শুনিয়াই উহার উপর আমল করা হয়। রোযার ইফতারের জন্য এবং ছেহরীর সময় শেষ হওয়ার জন্য একজন লোকের আজানের উপর নির্ভর করা হয়। শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে একজন ওয়ায়েজ, একজন মুফতি, একজন আলেমের কথার উপর নির্ভর করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক এক রাজা-বাদশার নিকট এক একজনকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, কোন একজনকে

কোথাও কোন দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন বা প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন—এই সব ক্ষেত্রে সেই একজনের কথা ও সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করার মধ্যে যে ছনদ তথা পরম্পরা ধারাবাহিক সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় সেই সাক্ষ্যও দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে শামিল। তাই উহাতে একজন সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট। হাদীছের সাক্ষ্যে একাধিক সাক্ষীর প্রয়োজন নাই এবং পুরুষ হওয়ারও আবশ্যক নাই। একজন গ্রহণীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট বটে। অবশ্য হাদীছ শাস্ত্রে সাক্ষী গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যে সব শর্ত ও ধারা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে উহা দৃষ্টে এরূপ বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, ঐ শ্রেণীর একজন সাক্ষী সাধারণ সত্যবাদী দশ জন সাক্ষী অপেক্ষাও অধিক নির্ভরশীল। উক্ত শর্ত ও ধারা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কোরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া থাকা

২৬৮৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রাক্কালে ওমর (রাঃ) তাঁহার পূর্ব্বেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বারে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রসুলের জন্য তোমাদের মধ্যেকার পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকটস্থ নেয়ামত সামগ্রীকেই অধিক পছন্দ করিয়াছেন। (তাই রসুল (দঃ)কে তোমাদের নিকট হইতে উঠাইয়া নিয়াছেন।)

তোমরা ঐ কেতাবকে আঁকড়াইয়া থাক যে কেতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের রসুলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তবেই তোমরা ঐ পথ লাভ করিতে পারিবে যেই পথ আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রসুলকে দান করিয়া ছিলেন।

২৬৮৭। হাদীছ ঃ—আবু বরযাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পথভ্রষ্ট ছিলে ; আল্লাহ তায়ালা দীন-ইসলাম ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দ্বারা তোমাদের উন্নতি দান করিয়াছেন। (সুতরাং তোমাদের উন্নতির স্থায়িত্ব ঐ পথেই নিবদ্ধ ; অন্য কোন পথে তোমাদের উন্নতি হাসিল হইতে পারে না।) তোমরা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত তথা তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে।

● ইবনে আ'উন (রঃ) বহুবার বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষকে আমি নিজের জন্য এবং আমার ভাই-বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকি। (১) রসুলের সুন্নতকে সকলে সযত্নে শিক্ষা করিবে এবং উহার অন্বেষণ করিবে। (২) পবিত্র

কোরআনকে সকলে গভীরভাবে বুঝিবে এবং উহার অনুসন্ধান করিবে (৩) লোকদের মধ্যে শুধু কেবল ভাল কথাই প্রচার করিবে।

২৬৮৮। হাদীছ ঃ—শায়বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয়—কা'বা শরীফের ভিটার মধ্যে ভূগর্ভে যে সোনা-চান্দি পোঁতা রহিয়াছে উহা বাহির করিয়া গরীব মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এরূপ করার অধিকার আপনার নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ? আমি বলিলাম, আপনার মুরব্বিদ্বয়—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ইহা করেন নাই।

ওমর (রাঃ) নতশিরে বলিলেন, সত্যই—তাঁহারা দুই জন অবশ্যই অনুসরণীয়।

২৬৮৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,* সর্বোত্তম গ্রন্থ আল্লার কেতাব—কোরআন। সর্বোত্তম আদর্শ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ। আর (আল্লার কেতাব—কোরআন ও রসুলের আদর্শ সুন্নাহ ব্যতীত—) গর্হিত বিষয়াবলী নিশ্চয় খারাপ ও মন্দ।

স্মরণ রাখিও—(কোরআন ও সুন্নার মধ্যে) যত কিছুর ভয় দেখান হইয়াছে ঐ সব নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হইবে ; উহা প্রতিরোধের ক্ষমতা তোমাদের নাই।

২৬৯০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের সকলই বেহেশতে যাইতে পারিবে—এন্‌কার ও অস্বীকারকারী ব্যতীত।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, অস্বীকারকারী কে ? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য অবলম্বন করিয়া চলিবে সে বেহেশতে যাইবে ; আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিবে সে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হইবে।

২৬৯১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রা অবস্থায় তাঁহার নিকট কতিপয় ফেরেশতা আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, নবী সাহেব ত নিদ্রামগ্ন। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তাঁহারা পরস্পর বলিলেন, এই বন্ধুবর নবী সাহেবের একটি দৃষ্টান্ত আছে উহা তাঁহার সমক্ষে আলোচনা করা হউক।

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, তিনি ত নিদ্রিত। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তাঁহারা আলোচনা করিলেন,

---

* ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বস্তুতঃ ইহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন। (ফতহুলবারী ১৩—২১৩ দ্রষ্টব্য)

তাঁহার দৃষ্টান্ত এরূপ—যেরূপ এক ব্যক্তি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই গৃহে লোকদিগকে দাওয়াত খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং একজন লোককে চতুর্দিকে দাওয়াতের আহ্বান জানাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে। অতএব, যাহারা ঐ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিবে তাহারা ঐ গৃহে প্রবেশ করিবে এবং দাওয়াতের খানা খাইতে পারিবে। আর যাহারা ঐ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিবে না তাহারা ঐ গৃহে প্রবেশও করিবে না এবং খানা খাওয়ারও সুযোগ পাইবে না।

আগন্তুক ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, বন্ধুবর নবী সাহেবের সমক্ষে দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দান করা হউক যেন তিনি বুঝিতে পারেন। তাহাদের মধ্যে এক জন্য বলিলেন, তিনি ত ঘুমন্ত। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তারপর তাঁহারা ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিলেন, (গৃহকর্ত্তা হইলেন আল্লাহ তায়ালা, আর) গৃহ হইল বেহেশত (যাহার মধ্যে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রী রহিয়াছে।) আর আহ্বানকারী হইলেন মোহাম্মদ (দঃ)।

যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিবে তাহারা আল্লাহ তায়ালার দাওয়াতে সাড়া দানকারী সাব্যস্ত (হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তথাকার অফুরন্ত নেয়ামত-সামগ্রী লাভকারী) হইবে। আর যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারী হইবে তাহারা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত (হইয়া বেহেশত হইতে বঞ্চিত) হইবে।

অতএব মোহাম্মদ (দঃ) হইলেন দুই শ্রেণীর লোকদের বিভক্তকারী—এক শ্রেণী যাহারা বেহেশত লাভ করিবে অপর শ্রেণী যাহারা বেহেশত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

(হযরত (দঃ) জাগ্রত হইয়া এই ঘটনা ছাহাবীদের নিকট ব্যক্ত করিয় ছেন। ফতহুল বারী ১৩—২১৬)

২৬৯২। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের পরামর্শ পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন—হোর´ ইবনে কায়স (রাঃ)। একদা তাঁহার চাচা ওয়ায়না (রাঃ) তাঁহার অতিথি হইলেন। তিনি ভ্রাতষ্পুত্র হোর´ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি ত শাসনকর্ত্তা খলীফার নৈকট্যধারী; আমার জন্য তাঁহার সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করিতে পার কি? হোর´(রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার জন্য অনুমতি লাভের চেষ্টা করিব। অনুমতি প্রাপ্তে ওয়ায়না (রাঃ) খলীফা ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন— হে খাত্তাবের পুত্র! খোদার কসম—আপনি আমাদেরকে উদারভাবে দান করেন না।

এবং ন্যায়ের সহিত বিচার করেন না। (উক্ত ছাহাবী গরম মেজাজের ছিলেন ; হয় ত কোন ভুল তথ্যের উপর রাগান্বিত হইয়া ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অবাস্তব অভিযোগের দরুন) ওমর (রাঃ) ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে অভিযুক্ত করার ইচ্ছা করিলেন।

এই সময় হোর (রাঃ) (খলীফা ওমরের ক্রোধ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"ক্ষমা করা অবলম্বন করুন, সৎ অবলম্বনের আহ্বান করুন! আর অজ্ঞদের দোষ-ত্রুটি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলুন।"

এই উক্তিকারক ব্যক্তি একজন অজ্ঞই বটে।

খোদার কসম—পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওত করিতেই খলীফা ওমর (রাঃ) উহার মর্ম্মের উপর ক্ষান্ত হইয়া গেলেন, আর অগ্রসর হইলেন না। খলীফা ওমরের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মহান আল্লার কেতাবের সম্মুখে জড় ও অচল হইয়া পড়িতেন।

২৬৯৩। ছাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিলে আমাকে ঐ অবস্থায়ই থাকিতে দিও। (ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কোন শর্তের বন্ধন সৃষ্টি করিও না।)

তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতের এই কাজ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে যে— তাহারা তাহাদের নবীকে প্রশ্ন করিয়া শর্তের বন্ধন সৃষ্টি করার পর সেই শর্তের উপর আমল না করিয়া নবীর কথা অমান্য করিয়াছে।

সুতরাং আমি যখন কোন বস্তু হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করি তোমরা উহা হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাক। আর যখন কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন নিজের সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিয়া উহার উপর আমল কর।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে নবী (দঃ) আদেশ কিম্বা নিষেধ করিলে উহা নিশ্চয় এতটুকু স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইবে যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে কোন প্রকার জটিলতার উদ্ভব না হয় এবং উহা দুর্বোধ্য না হয়। অবশ্য উহা শর্তহীন ও ব্যাপক আকারের হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন শর্ত বা সীমাবদ্ধতার প্রশ্নের অবতারণা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

যেমন হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। বিশেষ এক ব্যাপারে মূছা (আঃ) তাঁহার ছাহাবীগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, তোমরা একটি গরু জবেহ কর। আদেশটি নিতান্তই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল; যে কোন গাভী জবেহ করাতেই উহার বাস্তবায়ন ছিল। কিন্তু তাহারা প্রশ্ন করিল, কি বয়সের গাভী হইতে হইবে? মূছা (আঃ) বলিলেন, বুড়াও নয়, কচিও নয়—মধ্যম বয়সের। এখনও আদেশটি স্পষ্ট ছিল—যে কোন গাভী এই বয়সের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাহারা প্রশ্ন করিল, গাভীটি কি রঙ্গের হইতে হইবে? মূছা (আঃ) বলিলেন, খুব চকমকা হলদে রঙ্গের হইতে হইবে।

এইরূপে ব্যাপক আকারের আদেশ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করাকে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, প্রশ্নের দ্বারা এইরূপ শর্ত ও সীমাবদ্ধতার সঙ্কীর্ণতা আসিয়া যাইতে পারে।

আলোচ্য হাদীছটি যে উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও এই শ্রেণীর একটি প্রশ্নই ছিল। মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণ দানে বলিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করিয়াছেন; তোমরা হজ্জ সমাপন কর। ঐ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে হইবে কি? হযরত (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া চুপ থাকিলেন। ঐ ব্যক্তি প্রশ্নটি তিনবার দোহ্‌রাইল। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি "হাঁ" বলিতাম তবে প্রতি বৎসরই হজ্জ ফরজ হওয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইত; কিন্তু সাধারণ ভাবে উহা সাধ্যকর হইত না; অথচ সে ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর হজ্জ না করিলে মস্ত বড় গোনাহ হইত। এই কথার পরই হযরত (দঃ) আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করিলেন।

এই শ্রেণীর অনাবশ্যক, অহেতুক ও বাড়াবাড়ি জনিত প্রশ্নাবলী হইতে সতর্ক করণার্থে এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার কতিপয় হাদীছ পূর্ব্বে অনূদিত হইয়াছে, অবশিষ্ট দুইটি হাদীছ এই—

২৬৯৪। **হাদীছ ঃ**—عن سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا

مَنْ سَأَلَ عَنْ شَئٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

অর্থ ঃ—সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির অপরাধ অনেক বড় যে ব্যক্তি এমম কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে যাহা হারাম করা হইয়াছিল না। কিন্তু তাহার প্রশ্নের দরুন উহা হারাম হওয়ার হুকুম আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—হারাম না হওয়া ও হওয়া ইহা শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে। মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রশ্নের পূর্ব্বে লোকদের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে সুযোগ ও স্বাধীনতা এবং করা না-করার অধিকার ছিল—আমলের ময়দান সুপ্রশস্ত ছিল ; প্রশ্নের কারণে সেই সুযোগ স্বাধীনতা ও প্রশস্ততা রহিত হইয়া সঙ্কীর্ণ ও বাধ্যতামূলক হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর প্রশ্ন মস্ত বড় অপরাধ।

২৬৯৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, অযথা কোন বিষয়ের জন্য বাড়াবাড়ি করিতে আমাদিগকে (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) নিষেধ করা হইয়াছে।

কাল, যুগ, দেশ ও পরিবেশ নির্ব্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত মানব কল্যাণের জন্য রসুলুল্লার আদর্শ ও শিক্ষা প্রযোজ্য ও যথেষ্ট

ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং বর্ত্তমান যুগের একটি অতি অবাঞ্ছিত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বিশেষ গুরুত্বের সহিত এই সম্পর্কীয় ঘোষণা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

যাহারা হযরতের সেই ঘোষণার খবর রাখে না বা উহার প্রতি লক্ষ্য করে না একমাত্র তাহারাই এরূপ অবাঞ্ছিত প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকে যে—

অধুনা জগতের অনেক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, রসুলের যুগ বহু পেছনের যুগ। বর্ত্তমান যুগে যাহা প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান যুগে যে সব সমস্যাবলী আছে সেই যুগে তাহা ছিল না। সুতরাং সেই যুগের আদর্শ বর্ত্তমান প্রগতিশীল যুগের

জন্য যথেষ্ট হইতে পারে না। পুরাতন যুগের আদর্শ দ্বারা বর্তমান যুগের চাহিদা মিটিতে পারে না।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছটি কতইনা সুস্পষ্ট এবং মনে হয় যেন এই হাদীছের প্রথম বাক্য ও ঘোষণাটি এই রকম প্রশ্নেরই খণ্ডন ও প্রতিরোধ স্বরূপ ছিল।

২৬৯৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের* মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যক্ত ও রচনা করার এক অসাধারণ শক্তি প্রদান করিয়া আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

শত্রুরা দূরদুরান্তে থাকিয়া আমার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবে—এইরূপ প্রভাব দান করিয়া আল্লার তরফ হইতে আমার বিশেষ সাহায্য করা হইয়াছে।

একদা আমি নিদ্রায় স্বপ্নে দেখিয়াছি, বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আনুষ্ঠানিকরূপে উহা আমার হস্তে অর্পন করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছটি এস্থলে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে! এই মর্মে পূর্ণ হাদীছ মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে যাহা এই—

عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ

اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْمَغَانِمُ وَجُعِلَتْ

لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَّمَسْجِدًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَّخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ

"আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সমস্ত নবীগণের উপর আমাকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ঃ—(১) ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যক্ত ও রচনা করার এক অসাধারণ শক্তি আমাকে দান করা হইয়াছে। (২) শত্রুরা আমার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিবে এরূপ প্রভাব দ্বারা

* "কালেম" "কলেমাহ" শব্দের বহুবচন। কলেমাহ্ সাধারণতঃ শব্দকে বলা হয়, কিন্তু বাক্য অর্থেও উহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া আল্লামা সুয়ূতী উল্লেখ করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যেমন—কলেমাহ্ তাইয়্যেবাহ্। ইহার উদ্দেশ্য-বস্তুটি শব্দ নহে, বরং পূর্ণ বাক্য।

আমার সাহায্য করা হইয়াছে। (৩) গণিমত তথা জেহাদে বিজীত সম্পদ আমার (উম্মতের) জন্য হালাল করা হইয়াছে। (৪) ভূপৃষ্ঠকে আমার (উম্মতের) জন্য অবাধে নামাযের উপযোগী ও (তায়াম্মুমের মাধ্যমে) পবিত্রতা লাভের উপযোগী করা হইয়াছে। (৫) সারা বিশ্বের লোকদের প্রতি আমি প্রেরিত হইয়াছি। (৬) নবীগণের আগমন আমাতেই শেষ করা হইয়াছে।"

মোসলেম শরীফের এই হাদীছে দুইটি বিষয় অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। একটি এই—ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এই গুণগুলি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা একমাত্র তাঁহাকেই দান করা হইয়াছিল। হযরত (দঃ) ভিন্ন অন্য কোন নবীকেও উহা দান করা হয় নাই। সুতরাং উল্লেখিত গুণাবলী শুধু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যই নহে, বরং গভীর ও সুদুর প্রসারী ফলাফল এবং সাফল্যের ভিত্তিও বটে।

আলোচ্য গুণাবলীর সর্ব্বপ্রথম গুণ—اعطيت جوامع الكلم। "ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যক্ত ও রচনা করার অসাধারণ শক্তি আমাকে দান করা হইয়াছে।" এই গুণটির সাফল্য ইহাই যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এরূপ আদর্শ ও বিধি-বিধান সঙ্কলনে ও স্থাপনে সিদ্ধ ও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যাপক ও সীমাহীনরূপে কাল-যুগ, দেশ-পরিবেশ ও ভাষা-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বক্ষেত্রে মানব কল্যাণের জন্য শুধু যথেষ্টই নহে, বরং সর্ব্বোত্তমও বটে। এই তথ্যটি মোসলেম শরীফের হাদীছের অপর তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়টির দ্বারা অধিক পাকাপোক্ত হয়।

ঐ অপর তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়টি এই যে, উক্ত হাদীছে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে—(১) আমি বিশ্বমানবের সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। বোখারী শরীফ ৪৮ পৃষ্ঠার হাদীছে এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"আমার পূর্ব্বে প্রত্যেক নবী শুধু মাত্র তাঁহার জাতির প্রতি প্রেরিত হইতেন, কিন্তু আমি ব্যাপকভাবে সকল মানবের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। (২) আমার উপর নবীর আগমন শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বস্তুতঃ প্রথম বৈশিষ্ট্যটি অপরিহার্য্য। কারণ, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যখন দেশ-পরিবেশ, ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল বিশ্বমানবের জন্য নবী এবং কাল-যুগ নির্ব্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত সকল যুগের

জন্য নবী ; সুতরাং তিনি যে আদর্শ ও বিধি-বিধান সঙ্কলন ও স্থাপন করিবেন দেশ-পরিবেশ, ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্ব যুগের উপযোগী ও কল্যাণ সাধনকারী হইতে হইবে। তাই সর্ব্ব জ্ঞানী, সর্ব্ব শক্তিমান, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে جوامع الكلم তথা ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যাবলীর মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান সঙ্কলন ও রচনার এক অসাধারণ শক্তি দিয়াছিলেন—যাহা আল্লাহ তায়ালা অন্য কোন নবীকেও প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের জন্য এই গুণের প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাঁহাদের নবুয়ত ব্যাপক ছিল না এবং তাঁহারা সর্ব্বশেষ ও কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্ব যুগের জন্য নবী ছিলেন না।

এতদৃষ্টে মূল প্রশ্নের উত্তর এই হইল যে, সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্ব্বত, বায়ু-বাতাস, আগুন-পানি ইত্যাদি হাজার হাজার প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহা সৃষ্টির আদি হইতে দুনিয়ার অন্ত পর্য্যন্ত দেশ-পরিবেশ, ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের এবং সর্ব্ব যুগের উপযোগী ও কল্যাণসাধনকারী। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে এমন এক মহাশক্তি দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শ ও বিধি-বিধান দুনিয়ার অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্ব যুগ ও সকল পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণ সাধনকারী।

সুতরাং জগতের অন্য যে কোন আদর্শ বা বিধি-বিধানের সহিত হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বিধি-বিধানকে তুলনা করা বস্তুতঃ সাধারণ প্রদীপের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যকে তুলনা করা অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যহীন।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বিধি-বিধান সম্পর্কে এই দাবী শুধু ভাবাবেগের প্রবণতা নহে, বরং বাস্তব। কিন্তু উহার গবেষণা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা আবশ্যক। "বৃক্ষের নাম ফলে পরিচয়"।

রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যাবলীও অনুসরণীয়

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগত ভাবে কোন কাজ করিলে যদি সেই কাজ হযরতের জন্য সীমাবদ্ধ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হয় তবে উহা অন্যের জন্য অনুকরণীয় হইবে না। যেমন, এফ্‌তার ও ছেহরী ব্যতীরেকে লাগালাগি ৩ ৪ দিন রোযা রাখা। হযরত (দঃ) এরূপ করিতেন, কিন্তু অন্যদেরকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যদি সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ না থাকে তবে উহা অনুসরণীয় হইবে। অবশ্য যদি একান্তই প্রমাণিত হয় যে, হযরত (দঃ) উহা শুধুমাত্র স্বীয়

দেশ ও পরিবেশের আচার-ব্যবহাররূপে করিয়াছেন, তবে উহার অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে না। কিন্তু হযরতের অনুকরণরূপে উহার আমল করিলে বরকত ও ছওয়াব অবশ্যই হইবে। আর যদি শুধু দেশ ও পরিবেশের আচার-ব্যবহাররূপে করা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হয় তবে উহা হযরতের আদর্শরূপে অনুসরণীয় সুন্নত গণ্য হইবে।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) রসুলের আদর্শে অতিক্রম, ব্যতিক্রম, বিতর্ক ও বিচ্যুতি হইতে সতর্ক করিয়াছেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ এই—

● দ্বীন-ইসলামের কোন নেক কাজেও রসুলের নির্দেশিত আদর্শ অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও পরিহার্য্য। যেমন—রোযা রাখা একটি নেক কাজ; দিনের বেলায় রোযার সহিত রাত্রি বেলায়ও পানাহার বর্জ্জন করিয়া পরবর্ত্তী দিনেও রোযা রাখা—এই ভাবে দুই-তিন দিনের লাগালাগি রোযা রাখায় সাধারণ দৃষ্টিতে অধিক ছওয়াব হওয়ার কথা। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে এইরূপ রোযা রাখিতেন, কিন্তু অন্যদেরকে এইরূপ রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরতের দেখাদেখি যাহারা এইরূপ রোযা আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের প্রতি হযরত (দঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শরীয়তে এই ভাবের রোযাকে লোকদের জন্য মক্‌রূহ্ তাহ্‌রিমী সাবাস্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর সীমা অতিক্রমকেই ইমাম বোখারী (রঃ) "التعمق" তথা মাত্রাতিরিক্ত গভীরতায় যাওয়ার চেষ্টা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

● কোন বিষয়ে রসুলের কথার অপেক্ষা না করিয়া বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, কিম্বা রসুলের কোন কথার মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এই শ্রেণীর বিতর্ককেই ইমাম বোখারী "التنازع" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন একবার হযরতের নিকট বনী-তমীম গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসিল। হযরত (দঃ) তাহাদের অনুরোধে তাহাদের জন্য একজন শাসন পরিচালক নিযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঐ মজলিসে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা উভয়ে ঐ পদের জন্য এক একজনের নাম প্রস্তাব করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইল।

এ ক্ষেত্রে রসুলের কথার অপেক্ষা না করিয়া নিজের প্রস্তাব আনয়ন করার এবং বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রতি ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া সরাসরি পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আগে আগে কথা বলিও না। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন এবং জানেন।" (ছুরা হুজ্‌রাত)

রসুলের কথার আগে আগে কথা বলা এবং বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রতি পবিত্র কোরআনের কটাক্ষপাত এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে, আলোচ্য ঘটনা বর্ণনার হাদীছে এই বাক্য উল্লেখ আছে— كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر "দুইজন সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি—আবু বকর ও ওমর ধ্বংসের নিকটবর্ত্তী হইয়া গিয়াছিলেন।"

রসুলের কোন কথার মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করা সম্পর্কেও একটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহকাল ত্যাগের রোগ-শয্যায় একদা মসজিদে যাইতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। লোকজন নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত অবস্থায় হযরতের অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ সময় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন— مروا ابابكر فليصل بالناس "আবুবকরকে বল—লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য।" তখন আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) হযরতের ঐ কথা কাটিবার চেষ্টা করিলে হযরত (দঃ) তাঁহাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

রসুলের আগে আগে কথা বলা বা রসুলের কথায় বিতর্কের সৃষ্টি করা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনকালের পরেও এইরূপে হইতে পারে যে, মানুষ কোন একটা বিষয়ের সম্মুখীন হইয়া উহা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছ হইতে কোন আলো পাওয়ার অপেক্ষা ও চেষ্টা না করিয়া নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিম্বা কোরআন-হাদীছের আদর্শ পাওয়ার পর উহাতে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই উভয়টিই ভ্রান্ত পন্থা যাহা মানব-জীবনে বিপর্য্যয় টানিয়া আনে।

● মোমেনের জন্য কল্যাণকর অবস্থা হইল এই যে, রসুলের যে সব আদর্শের চর্চ্চা বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সব আদর্শের উপর স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করিবে এবং যদি কোন এরূপ বিষয়ের সম্মুখীন হয় যাহা সম্পর্কে রসুলের আদর্শ তথা শরীয়তের বিধান জ্ঞাত নহে তবে উহা সম্পর্কে দ্বীনের আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইবে এবং আমল করিবে। মানব জীবনকে পরিপূর্ণরূপে আদর্শবান করার জন্য উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ই যথেষ্ট।

দ্বীনের বিষয়াবলী ও মছ্‌লা-মছায়েল লইয়া অনাবশ্যক হাতড়ানি এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পরিহার্য্য। ইহাকেই ইমাম বোখারী (রঃ) "والغلو فى الدين" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যেরূপ অনেককে দেখা যায়, সে যেই বিষয়ের সম্মুখীন নহে এবং যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহাকে বাধ্য করে নাই সেই শ্রেণীর বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া বেড়ায়—ইহা অবাঞ্ছীয় ও পরিহার্য্য। হাদীছ শরীফে আছে, একদা ছাহাবী আছেম ইবনে আদী (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা

করিলেন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে লিপ্ত দেখিতে পাইয়া তাহাকে হত্য করিয়া ফেলে তবে সেই হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিবেন কি ?

এ ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনায় আমলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা ছিল না, বরং শুধু কেবল একটা প্রশ্নই প্রশ্ন ছিল। এই শ্রেণীর প্রশ্নের প্রতি হযরত নবী (দঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন এবং উহাকে দোষণীয় গণ্য করিলেন।

● যে কোন ক্ষেত্রে রসুলের আমল বা আদর্শ বিদ্যমান থাকিলে সেস্থলে অন্য কোন নীতি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ইহাকেই ইমাম বোখারী (রঃ) "البدع" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা "বেদ্‌য়াত" শব্দের বহুবচন।

অবশ্য সাধারণত ইসলামী পরিভাষায় "বেদ্‌য়াত"-এর অর্থ আরও একটু প্রশস্ত। যথা—যে কাজ দ্বীন বা ধর্ম্মীয় হওয়ার কোন দলীল নাই এবং দলীলে প্রমাণিত ধর্ম্মীয় কোন কাজের জন্য উহা নির্ভরস্থল অথবা উপকারী ও সাহায্যকারীও নহে—সেই রকম কাজকে দ্বীন বা ধর্ম্মীয় গণ্য করা হইলে কিম্বা উহাকে দ্বীন ও ধর্ম্মীয়রূপ দান করা হইলে তাহাকেই "বেদ্‌য়াত" বলা হয়। এই শ্রেণীর কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখাইলেও ইসলামের বিধানে উহা বর্জ্জনীয়। হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যেই কাজ দ্বীন-ইসলামের গণ্ডির মধ্যে শামিল নহে উহাকে দ্বীন-ইসলাম ভুক্ত গণ্য করা হইলে তাহা বর্জ্জনীয়।"

দ্বীন-ইসলামের গণ্ডির মধ্যে শামিল হওয়ার অর্থ—ঐ কাজটি সরাসরিরূপে দ্বীন বা ধর্ম্মীয় হওয়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, কিম্বা ঐ কাজটি দলীলে প্রমাণিত দ্বীন ও ধর্ম্মীয় অন্য কোন কাজের নির্ভরস্থল হয় অথবা উহার জন্য উপকারী ও সহায়ক হওয়া সাব্যস্ত হয়।

● পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রসুলের আদর্শ ভিন্ন অন্য আদর্শ তথা কোরআন-হাদীছের নীতি ছাড়া অন্য নীতি যাহাকে "বেদ্‌য়াত" বলা হইয়াছে উহা অবলম্বন করা যেরূপ নিষিদ্ধ তদ্রূপ উহার প্রতি সমর্থন দানও নিষিদ্ধ। ঐরূপ কার্য্যকলাপ বা নীতির সমর্থনকারীর প্রতি হাদীছে কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গর্হিত নীতি অবলম্বন করিবে, অথবা উহার সমর্থনকারী হইবে তাহার প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ—আল্লার তরফ হইতে, ফেরেশতাদের

তরফ হইতে এবং সকল মানুষের তরফ হইতে। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ফরজ বা নফল কোন প্রকার এবাদৎ-বন্দেগীই কবুল করিবেন না।

এই হাদীছখানা যদিও পবিত্র মদীনা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন যে, মদীনার উল্লেখ শুধু বিশেষভাবে হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গর্হিত নীতি অবলম্বনকারী ও সমর্থনকারীর প্রতি এই কঠোর বাণী সকল দেশ ও পরিবেশের জন্যই। ইমাম বোখারী (রঃ)ও তাঁহার এই পরিচ্ছেদে উক্ত কঠোর বাণীকে শুধু মদীনার জন্য নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ব্যাপক আকারে সকল দেশ ও পরিবেশের জন্যই উল্লেখ করিয়াছেন।

২৬৯৭। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শরীয়তের অবকাশ জনিত কোন একটি কাজ করিলেন। কিছু সংখ্যক লোক অবকাশের সুযোগ এড়াইয়া কঠোরতা অবলম্বনের উদ্যোগী হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ পাইয়া (তাহাদের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিশেষ) ভাষণ দান করিলেন।

(ভাষণ আরম্ভের নিয়ম অনুযায়ী) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কিছু সংখ্যক লোকের বুদ্ধিতে কী ঢুকিল ? তাহারা ঐ সুযোগ ও অবকাশকে এড়াইয়া চলে যাহাকে আমি গ্রহণ করিয়াছি। খোদার কসম—আমি আল্লাহকে তাহাদের অপেক্ষা অধিক চিনি এবং অধিক ভয় করিয়া থাকি।

কোরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করিয়া বিবেক ও যুক্তির অবতারণা করা অতি জঘন্য

২৬৯৮। হাদীছ ঃ—ছাহাবী সাহ্‌ল ইবনে হোনায়েক (রাঃ) বলিয়াছেন, হে মোসলমানগণ! তোমরা দ্বীন-ধর্ম্মের ব্যাপারে স্বীয় বিবেকের প্রতি সন্দিহান থাকিও। (উহার উপর নির্ভর করিয়া চলিও না, উহার ভ্রান্তি অবধারিত। মানুষের বিবেকের ভ্রান্তির একটা সুস্পষ্ট নজির প্রত্যক্ষ কর।)

ষষ্ঠ হিজরী সনে মক্কাবাসী কাফেরদের সহিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্ধি হইয়াছিল—যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধি উপলক্ষে আবু জন্দল নামক ব্যক্তির এক হৃদয় বিদারক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

আবু জন্দল (রাঃ) একজন মক্কাবাসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কাফের পিতা,-মাতা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ভীষণ কষ্ট-যাতনার মধ্যে বন্দী জীবন কাটাইতেছিলেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)

চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবীগণ সহ ওমরার জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়া মক্কা হইতে মাত্র দশ মাইল ব্যবধানে হোদায়বিয়া নামক ময়দানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা হযরত (দঃ)কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতেছিল।

অবশেষে উভয় দলের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সাব্যস্ত হইল। এখনও উহা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছে নাই, এমতাবস্থায় ঐ আবু জন্দল (রাঃ) শৃঙ্খল বন্ধন সহই মোসলমানদের মধ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার পিতাই ছিল কাফের পক্ষে সন্ধি-চুক্তির নায়ক; সে হঠ্ করিল যে, আবু জন্দলকে প্রত্যর্পণ না করিলে সন্ধি হইবে না। আবু জন্দল (রাঃ) কাফেরদের হস্তে অর্পিত হওয়ার আশংকায় মোসলমানদের নিকট রোদন করিতেছিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন বিকল্প ব্যবস্থায় উপায় করিতে না পারিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের জন্য আবু জন্দল (রাঃ)কে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করিলেন।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী সাহ্‌ল ইবনে হোনায়েক (রাঃ) বলেন, উক্ত হৃদয় বিদারক ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিল আমাদের সকলের বিবেক। অবশ্য রসুলের সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয় বিধায় আমরা বিবেকের দ্বারা রসুলের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

পরবর্ত্তী ঘটনা প্রবাহে প্রতীয়মান হইয়াছে এবং পবিত্র কোরআনের—
انا فتحنا لك فتحا مبينا আয়াতের ইঙ্গিতেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরতের সিদ্ধান্তই সঠিক ও সমচীন ছিল এবং লোকদের বিবেক যাহা বুঝাইতে ছিল উহাতে মারাত্মক ভ্রান্তি ছিল।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অত্র গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে হোদায়বিয়ার সন্ধি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরবর্ত্তী কতিপয় পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পরিচ্ছেদগুলির হাদীছ সমূহ পূর্ব্বে অনুদিত হইয়াছে, তাই এস্থলে শুধু পরিচ্ছেদগুলির মূল বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

● হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নীতি ছিল—যে সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার নিকট ওহী আসে নাই সেই শ্রেণীর কোন বিষয়ের প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইলে তদুত্তরে তিনি হয় ত সাময়িক ভাবে বলিয়া দিতেন, আমি জানি না; অথবা ওহী প্রাপ্তির অপেক্ষায় নিরুত্তর থাকিতেন। ওহীলব্ধ জ্ঞানের সূত্র না ধরিয়া শুধু বিবেক ও যুক্তির প্রবণতায় কোন বিষয়ের মীমাংসা প্রদান করিতেন না। এমনকি, আল্লার তরফ ইইতে ওহী প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া ইজতেহাদ (তথা কোন দলীলের সহিত সূক্ষ্ম সংযোগ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মীমাংসা স্থির) করিতেও অগ্রসর হইতেন না।

এই শ্রেণীর বহু দৃষ্টান্ত হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, হাদীছ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভূপৃষ্ঠের কোন্ খণ্ড উত্তম ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি জামি না। এই বলিয়া চুপ থাকিলেন* এবং (প্রশ্নকারীকে) বলিলেন, তুমি চুপ করিয়া থাক যাবৎ না জিব্রাঈলের আগমন হয়। ঐ ব্যক্তি চুপ করিয়া থাকিল। ইতি মধ্যেই জিব্রাঈল (আঃ) আসিলেন। হযরত (দঃ) জিব্রাঈল (আঃ)কে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রাবল (আঃ) বলিলেন, যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে জিজ্ঞাসাকারী হইতে অধিক কিছু জ্ঞাত নহে। তবে আমি মহামহিম পরওয়ারদেগারের নিকট জিজ্ঞাসা করিব। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ) ! আজ আমি পরওয়ারদেগারের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম যে, অন্য কোন দিন এত নিকটবর্ত্তী হই নাই। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিব্রাঈল ! এই নৈকট্য কতটুকু ছিল ? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আমার সম্মুখে নূর জাতীয় সত্তর হাজার পর্দ্দা ছিল (—ইহার অধিক ছিল না)। প্রভু-পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, মসজিদ হইল ভূপৃষ্ঠের উত্তম ভূখণ্ড এবং বাজার হইল ভূপৃষ্ঠের নিকৃষ্ট ভূখণ্ড।

ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই পরিচ্ছেদে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল—একদা হযরত নবী (দঃ)কে প্রশ্ন করা হইল রূহ্ বা আত্মা কি জিনিষ ? হযরত (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া চুপ থাকিলেন। ইতি মধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইল—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ - وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

“কেহ কেহ আপনাকে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে ; আপনি বলিয়া দিন—রূহ্ বা আত্মা (কোন প্রকার ধাতু ও উপাদান ব্যতিরেকে) আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশে তৈরী একটি বস্তু। তোমাদেরকে শুধুমাত্র অতি সামান্য জ্ঞান-বিন্দুই দেওয়া হইয়াছে। (১৫ পারা ১০ রুকু) অর্থাৎ—তোমাদের জ্ঞান-বিন্দু অতি ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল ; উহা দ্বারা একমাত্র উপাদানে তৈরী বস্তুনিচয়ই বুঝিবার অবকাশ রহিয়াছে। রূহ্ বা আত্মা ঐ শ্রেণী হইতে বহু উর্দ্ধে— উহা কোন প্রকার উপাদানে তৈরী বস্তু নহে, উপাদান ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার

---

* ফতহুলবারী ১৩—২৪৭ এবং মেশকাত শরীফ উভয় কেতাবে এই হাদীছখানার বর্ণনা দৃষ্টে সমষ্টিগতভাবে অনুবাদ করা হইল।

"কুন্—হইয়া যাও" আদেশে সৃষ্ট বস্তু। অতএব, মানবীয় জ্ঞানে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে অধিক কিছু বুঝিবার অবকাশ নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হইল—ছাহাবী জাবের (রাঃ) রোগ শয্যায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দেখার জন্য আসিলেন এবং অজু করতঃ তাঁহার উপর অজুর পানি ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার চেতনা আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! (উত্তরাধিকারীদের জন্য) আমার মাল-সম্পত্তি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিব? হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না। ইতি মধ্যেই মিরাস তথা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পরিত্যক্ত মাল-সম্পত্তি বণ্টনের বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হইল।

পাঠকবৃন্দ! এই পরিচ্ছেদ এবং উহার দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা সতর্ক করা হইয়াছে যে, কোন একটা বিষয় সম্মুখে আসিলেই তাড়াহুড়া করিয়া শুধু বিবেক ও যুক্তির পুঁজি লইয়াই উহার মামীংসায় অগ্রসর হওয়া চাই না। এইরূপ করা একান্তই রসুলের আদর্শ ও ইসলামের নীতির পরিপন্থী। যে কোন বিষয়ের মীমাংসায় আল্লাহ এবং আল্লার প্রেরিত প্রতিনিধি তথা রসুলের দেওয়া বিধান অর্থাৎ শরীয়তের প্রতি অবশ্যই ধাবিত হইতে হইবে। শরীয়ত হইতেই মীমাংসা লাভের অপেক্ষা ও চেষ্টা করিতে হইবে। স্বীয় জ্ঞান-বিদ্যায় যদি শরীয়তের মীমাংসা খুজিয়া বাহির করা না যায়, তবে পরিষ্কারভাবে "আমি জানি না" বলিয়া নিজের অক্ষমতা স্বীকার পূর্ব্বক মীমাংসা দানে বিরত থাকিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া—উহার ধার না ধারিয়া শুধু বিবেক ও যুক্তির উপর নির্ভর করা যাইবে না।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান ঐ ব্যক্তিই করিতে পারে যাহার সে বিষয় এল্‌ম (তথা শরীয়তের জ্ঞান) রহিয়াছে। সেই বিষয়ে যাহার এল্‌ম নাই তাহার কর্ত্তব্য হইল উহার মীমাংসাকে আল্লার উপর ন্যস্ত করা। সুষ্ঠু জ্ঞানের পরিচায়ক ইহাই যে, কাহারও কোন বিষয় সম্পর্কে এল্‌ম না থাকিলে সে উহার মীমাংসা আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যস্ত করে। (বোখারী শরীফ ৭১০ পৃঃ)

আল্লার উপর মীমাংসা ন্যস্ত করার অর্থ আমাদের ক্ষেত্রে হইল—আল্লার বাণী পবিত্র কোরআন এবং আল্লার প্রতিনিধি রসুলের ছুন্নাহ বা হাদীছ এই দুইটি মহাসত্যের উপর ন্যস্ত করা।

● হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা-নীতিও এই ছিল যে, তিনি ওয়াজ-নছিহত তা'লীম-তবলীগের মাধ্যমে নারী-পুরুষদেরকে শিক্ষা দিতেন—

সে ক্ষেত্রেও হযরত (দঃ) যথাসম্ভব আল্লার দেওয়া বিষয়াবলীর শিক্ষা দিতেন; বিবেক-যুক্তি প্রসূত বিষয়বস্তু অপেক্ষা আল্লাহ্-প্রদত্ত বিষয়বস্তুরই অধিক গুরুত্ব তিনি দিতেন।

বান্দা হিসাবে মানুষের পক্ষে উল্লেখিত নীতিই বাঞ্ছনীয়। অনেক লোককে ওয়াজ-নছিহতের মধ্যেও আল্লার এবং আল্লার রসুলের কোরআন-হাদীছ অপেক্ষা নিজের যুক্তি-প্রমাণ ও বিষয়-বিবৃতির প্রতিই অধিক ব্যাপৃত দেখা যায়। ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কেয়ামত পর্য্যন্ত সকল দেশ ও পরিবেশেই মোসলমানদের জন্য সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা দানে কোরআন ও সুন্নাহ্ই হইল একমাত্র অধিকারী (Authority)। কোন বিষয় সম্পর্কে কোরআন-সুন্নার মধ্যে মীমাংসা পাওয়া না গেলে সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য কোরআন-সুন্নার বিধানেই অপর দুইটি জিনিষকেও মীমাংসাদানকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। একটি হইল—"এজ্‌মা" তথা সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্ত। অপরটি হইল—"ইজ্‌তেহাদ" অর্থাৎ যে বিষয়ের সুস্পষ্ট মীমাংসা কোরআন-সুন্নার মধ্যে পাওয়া না যায় ঐ বিষয়টিকে শরীয়ত তথা ইসলামী বিধি-বিধানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোরআন-সুন্নার কোন মীমাংসার আওতাভুক্ত করার প্রচেষ্টা ও গবেষণা। যে ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ বা এজ্‌মা' ইহার কোনটিরই মীমাংসা পাওয়া না যায় সেইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা-লব্ধ মীমাংসাও গৃহিত হয়—ইহাকেই সাধারণ কথায় ফেক্বাহ্ বলা হয়।

● ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে কতিপয় পরিচ্ছেদে এজ্‌মা' এবং ইজ্‌তেহাদ সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনার প্রারম্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বিষয়টি এই—

এজ্‌মা' অর্থ সর্ব্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত; অতএব, প্রশ্ন আসে যে, কোন্ শ্রেণীর লোকের সম্মতি এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য? তদ্রূপ—ইজ্‌তেহাদ অর্থ কোরআন-সুন্নার মীমাংসার আওতাভুক্ত করার প্রচেষ্টা ও গবেষণা। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, সেই প্রচেষ্টা ও গবেষণা কিরূপ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ও শোভনীয়। এই প্রশ্নের উত্তরই ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এজ্‌মার জন্য যে শ্রেণীর লোকের সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য এবং ইজ্‌তেহাদ যেই শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব ও শোভনীয় তাঁহারা হইলেন ঐ সমস্ত লোক যাঁহারা হযরতের এই ভবিষ্যবাণীটির সৌভাগ্যের পাত্র। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তাঁহারা সর্ব্বদা হকের উপর দৃঢ়-পদ থাকিবে। কেয়ামত পর্য্যন্ত এই দলটি হকের উপর প্রবল থাকিয়া চলিবে।

এই ভবিষ্যদবাণীর হাদীছটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রেণীর দলটি হইল এল্‌মওয়ালাদের শ্রেণী ও দল। অর্থাৎ যাঁহারা কোরআন ও হাদীছের এল্‌ম রাখেন। এল্‌ম বলিতে কোরআন-হাদীছের শুধু কেবল সাধারণ জ্ঞান—বিশেষতঃ তরজমা ও অনুবাদের (Translution) সাহায্যে আহরিত ধার করা জ্ঞান বা কতিপয় অংশ বিশেষের সীমিত জ্ঞান মোটেই যথেষ্ট ও উদ্দেশ্য নহে। মূল (Original) কোরআন ও হাদীছ হইতে সরাসরি উহার জ্ঞান হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা ও আভিধানিক সকল প্রকার শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সুদীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে আদ্যোপান্ত পবিত্র কোরআনের এবং হাদীছ শাস্ত্রের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানই হইল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

ইজ্‌তেহাদের জন্য এই শর্ত্তের উল্লেখ বস্তুতঃ ইজ্‌তেহাদের ব্যাপারে বাস্তব প্রয়োজনের তাকিদেই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ মোসলমানদের জন্য নীতি নির্দ্ধারক হইল একমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্। যদ্দরুন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নার মীমাংসা পাওয়া না যায় একমাত্র সে ক্ষেত্রেই ইজ্‌তেহাদের অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং আদ্যোপান্ত কোরআন-সুন্নার পূর্ণ জ্ঞান এবং কোরআন-সুন্নার সমুদয় মীমাংসাবলীর জ্ঞান সম্মুখে উপস্থিত থাকা ইজ্‌তেহাদের জন্য অপরিহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ও বুঝিয়া রাখা চাই যে, শুধু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা মীমাংসা স্থির করার নাম ইজ্‌তেহাদ নহে ; বরং কোরআন-সুন্নার কোন স্পষ্ট মীমাংসার আওতাভুক্ত করতঃ প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা উদ্ভাবনের নাম হইল ইজ্‌তেহাদ। এত বড় দায়িত্বের জন্য কোরআন-সুন্নার কিরূপ বিস্তীর্ণ ও সুপ্রশস্ত বাস্তব জ্ঞানের আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়।

মূল (Original) কোরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ বুঝিতে সক্ষম নয়, তরজমা ও অনুবাদের উপর নির্ভরশীল ; অথবা কোরআন-সুন্নার শুধু কেবল বিভিন্ন অংশ বিশেষের জ্ঞানই শেষ সীমা—এই শ্রেণীর ধার করা বা আংশিক জ্ঞানের পুঁজি লইয়া যাহারা ইজ্‌তেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তাহাদের কার্য্য অনধিকার চর্চ্চা বৈ আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর অনধিকার চর্চ্চার অভিলাসীদের সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্ত্তী একটি পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঐ শ্রেণীর লোকদের অস্তিত্ব মোসলেম সমাজের জন্য আল্লার আজাব ও বিপদ বটে।

তারপর একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে ইজ্‌তেহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন—বিচারক দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হন ; তাঁহাকে নিত্য নূতন ঘটনার বিচার করিতে হয়। বিচার কার্য্য সমাধানে ইজ্‌তেহাদের প্রয়োজন হইলে বিচারককে অবশ্যই আল্লাহ-প্রদত্ত

তথা কোরআন বা আল্লার প্রতিনিধি রসুলের হাদীছের মীমাংসার আওতাভুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য আবশ্যক হইলে বিচারককে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, কিম্বা কোন এল্‌মওয়ালার সাহায্যের আশ্রয় লইতে হইবে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আওতাভুক্তি ছাড়া অন্য যে কোন সূত্র ধরিয়া মীমাংসা দেওয়া হইলে তাহা অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইবে। পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা—

(১) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

"যাহারা আল্লাহ-প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ্ না দেয় তাহারা নিশ্চয়ই কাফের।"

(৩) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"যাহারা আল্লাহ-প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ্ না দেয় তাহারা নিশ্চয়ই অন্যায়কারী স্বৈরাচারী।"

(৩) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ্ না দেয় তাহারা নিশ্চয়ই ফাছেক—স্বেচ্ছাচারী।"

আল্লার কেতাব ও রসুলের আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া যুক্তি ও বিবেকের উপর চলা বস্তুতঃ অমোসলেমদের অনুকরণ

২৬৯৯। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অনুতাপ ও আক্ষেপ স্বরূপ ভবিষ্যদবাণী করতঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে আমার উম্মতগণ তাহাদের পূর্ব্বেকার যুগের প্রচলিত প্রথা ও প্রচলনের পূর্ণ অনুকরণ করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যে দিকে এক বিঘত অগ্রসর হইয়াছিল আমার উম্মতও সেই দিকে পূর্ণ এক বিঘত অগ্রসর হইবে, যে দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়াছিল আমার উম্মতও সেই দিকে পূর্ণ এক হাত অগ্রসর হইবে।

কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বলিতে পারস্য ও রোমবাসী অমোসলেমদেরকে উদ্দেশ্য করিতেছেন কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (প্রাচীনকাল হইতে প্রাবল্যের অধিকারী একমাত্র তাহারাই) তাহারা ভিন্ন আর কে আছে?

২৭০০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আমার উম্মতগণ! তোমরা বিঘতে বিঘতে, গজে গজে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতদের আদৎ-অভ্যাসের ও চাল-চলনের অনুকরণ করিবে। এমনকি তাহারা যদি (কোন উদ্দেশ্যে) সাণ্ডার গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তোমরা উহারও অনুসরণ করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! (আমরা কি অনুসরণ করিব—) ইহুদী নাছারাদের? হযরত (দঃ) বলিলেন, আর কাহাদের?

ব্যাখ্যা ঃ—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও আচার-অনুষ্ঠানে মোসলমানগণ অন্ধকার যুগের জাতিনিচয় যথা পারস্য ও রোমকদের অনুকরণ করিবে। আর দ্বীন-ধর্ম্মের অনুশাসন এবং রসুল ও আসমানী কেতাবের ব্যাপারে মোসলমানগণ অভিশপ্ত ও ভ্রষ্ট ইহুদ-নাছারাদের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। হযরত (দঃ) অনুতাপ, আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশার্থে উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে এই ভবিষ্যদবাণী করিয়াছেন এবং ইহা কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের আলামত বা নিদর্শন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

● পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) অধিক সতর্ক-করন উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লার কেতাব ও রসুলের আদর্শ উপেক্ষা করিয়া অন্য কোন নীতির প্রচলন করিলে তাহা কুপ্রথা এবং ভ্রষ্টতা পরিগণিত হইবে। সেইরূপ নীতির আহ্বায়ক অসংখ্য পাপের ভাগী হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতখানা উল্লেখ করিয়াছেন—

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

আল্লাহ তায়ালা এক শ্রেণীর পাপীদের উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহারা কেয়ামতের দিন নিজেদের পাপের বোঝাত বহন করিবেই, "তদুপরি ঐ লোকদের পাপের (সমপরিমাণ) বোঝাও বহন করিবে যাহাদেরকে তাহারা ভ্রষ্টতায় নিপতিত করিয়াছিল।" (১৪ পারা ৯ রুকু)

১০৯২ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী একটি পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিয়াছেন, যদি কোন সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা বা বিচারক ইজ্‌তেহাদ করেন এবং অজ্ঞাতসারে সেই ইজ্‌তেহাদে উদ্ভাবিত মীমাংসা রসুলের দেওয়া বিধানের পরিপন্থী হইয়া পড়ে তবে উক্ত ইজ্‌তেহাদ বাতিল গণ্য হইবে।

● অতঃপর আর এক পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইজ্‌তেহাদের জন্য সর্ব্বপ্রথম শর্ত্ত হইল—যে

বিষয়ে ইজ্‌তেহাদ করা হইবে উহা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছের কোন মীমাংসা অপ্রাপ্য হইতে হইবে। এই শর্ত্ত দৃষ্টে ইজ্‌তেহাদ করার পূর্ব্বে কোরআন-হাদীছের সুবিস্তীর্ণ অন্বেষণ আবশ্যক। এই পর্য্যায়ে পবিত্র কোরআন অপেক্ষা হাদীছের ক্ষেত্রে অধিক পরিশ্রম ও ব্যপক অন্বেষণের প্রয়োজন। কারণ, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহ এরূপ নহে যে, সমুদয় হাদীছ সর্ব্ব সমক্ষে সকলের গোচরীভূত হয়। হযরতের হাদীছ তথা হযরতের কথা-বার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা সব ছাহাবার উপস্থিতিতে হইত না। অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিতগণের সংখ্যা স্বল্পই হইত। এতদকারণেই বড় বড় ছাহাবীও কোন কোন হাদীছ অজ্ঞাত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, কাহারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া একবারে সাড়া না পাইলে দ্বিতীয় বার, দ্বিতীয় বারেও সাড়া না পাইলে তৃতীয় বার চাহিবে; এই বার সাড়া না পাইলে ফিরিয়া আসিবে। ওমর (রাঃ) এই হাদীছটি জ্ঞাত ছিলেন না, বহু দিন পরে ইহার খোঁজ পাইয়া তিনি উহার অন্বেষণ চালাইয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইজ্‌তেহাদের জন্য হাদীছ সম্পর্কে সুপ্রশস্ত জ্ঞান এবং সুদীর্ঘ অন্বেষণ আবশ্যক।

● আর এক পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছের সংজ্ঞা প্রশস্ত করতঃ বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরে বা অগোচরে তাঁহার সময়ে ব্যাপকভাবে কোন কাজ হইয়াছে, কিন্তু হযরতের তরফ হইতে উহাতে অসম্মতি প্রকাশ বা খণ্ডন করা হয় নাই—ঐরূপ কাজ শরীয়ত সম্মত হাদীছ বলিয়া গণ্য হইবে। হযরত (দঃ) ভিন্ন অন্য কাহারও বেলায় ঐরূপ গণ্য হইবে না।

● এই ক্ষেত্রে আর একটি জরুরী বিষয়ের পরিচ্ছেদ ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে—ইহুদ খৃষ্টানদের নিকট অসমানী কেতাব নামে যাহা প্রচলিত আছে উহার কোন কিছুই তোমরা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসাও করিবে না। উহার সঙ্গে তোমরা কোন সম্পর্কই রাখিবে না। কারণ, প্রথমতঃ—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবে তাঁহার শরীয়ত দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় শরীয়ত মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—তৌরাত ও ইঞ্জিল নামে পবিত্র আসমানী কেতাব ছিল বটে, কিন্তু হযরত মূছা ও হযরত ঈসার তিরোধানের পর সেই কেতাবদ্বয়কে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তৌরাত, ইঞ্জিল বা বাইবেল নামে যাহা বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মনগড়া রচনার সংমিশ্রনে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অতএব উহার কোনই মূল্য নাই। এই তথ্যই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

২৭০১। **হাদীছ**ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট (ধর্ম্মীয় কোন বিষয়) তোমরা কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে পার? অথচ তোমাদের আসমানী কেতাব যাহা তোমাদের নবীর প্রতি প্রেরিত হইয়াছে উহা আল্লার প্রেরিত বিষয়াবলীর সর্ব্বাধিক নূতন। এবং তোমরা উহাকে সম্পূর্ণ খাঁটিরূপে পাঠ করিতে পারিতেছ; উহাকে কেহই মিশ্রিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

পক্ষান্তরে ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা (পবিত্র কোরআনে) বলিয়া দিয়াছেন, তাহারা আল্লার দেওয়া কেতাবকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারা নিজ হাতের লেখাকে কেতাবে মিশ্রিত করিয়া উহাকে বিকৃত করিয়াছে। এবং অতি সামান্য দুনিয়ার স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে ঐ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত কেতাবকেই আল্লার কেতাব বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

(পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে) যে খাঁটী জ্ঞান তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে উহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে—তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইতে? কসম খোদার—তাহাদের একটি লোককেও ত দেখি না, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতি অবতারিত কেতাব (কোরআন) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে!

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এক হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সরাসরি সুস্পষ্টরূপে নিষেধ করিয়াছেন—তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট (ধর্ম্মীয়) কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে না।

এই হাদীছখানা ইমাম বোখারী (রঃ) ছনদহীন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কেতাবে ইহা ছনদের সহিত বর্ণিত আছে। (ফতহুলবারী ১৩—২৮৬ দ্রষ্টব্য)

● পরবর্ত্তী এক পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন—ইসলামের বিধান ও শরীয়ত মতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিষেধাবলী হারাম হওয়া অর্থে এবং আদেশাবলী ফরজ-ওয়াজেব হওয়া অর্থে পরিগণিত হইবে। অবশ্য যদি সেই অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়ার অপর কোন দলীল পাওয়া যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

● কোরআন-হাদীছকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া থাকার আলোচনা সমাপ্তে সর্ব্বশেষ একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) "আপসে পরামর্শ করা" সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পরামর্শ করা ইসলামের একটি বিশেষ নীতি। আখেরাতে আল্লার নেয়ামত ও প্রতিদান লাভকারীগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে—وامرهم شورى بينهم "তাঁহারা আপসে পরামর্শ করিয়া কাজ করিয়া থাকেন" (২৫ পাঃ ৫ রুঃ)।

এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিও পরামর্শ করার নির্দ্দেশ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে—وشاورهم فى الامر "কাজ করিতে মোসলমানদের সহিত পরামর্শ করুন।"

ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কতিপয় ঘটনার আলোকে দেখাইয়াছেন যে, পরামর্শ করা উত্তম বটে, কিন্তু আল্লাহ বা আল্লার রসুলের সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট আদেশ বা নিষেধ বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে পরামর্শের কোন অবকাশ থাকিবে না। আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সিদ্ধান্তকে এড়াইবার অবকাশ কাহারও জন্য নাই।

ওহোদের জেহাদ উপলক্ষে মদিনা শহর হইতে বাহিরে ময়দানে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর ছাহাবীগণ বিপরীত পরামর্শ দিয়া ছিলেন, কিন্তু রসুল (দঃ) তাহা গ্রহণ করেন নাই।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরেও ছাহাবা-তাবেয়ীগণের শাসনকর্ত্তাগণ ওলামা-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন—এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য যাহা সম্পর্কে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ নাই। ঐরূপ ক্ষেত্রে জনগণের জন্য সহজ সাধ্য দিক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হইত। কিন্তু যেই ক্ষেত্রে কোরআন বা ছুন্নার সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান—সেইরূপ ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম করার কোন উদ্যোগই তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না।

খলীফা আবু বকর (রাঃ) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালইয়া ছিলেন। উহার বিপরীত পরামর্শ দেওয়া হইলে তিনি অভিযানের পক্ষে হাদীছের প্রমাণ পেশ করিয়া উক্ত পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) আলেমগণের পরামর্শ-পরিষদ গঠন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কোরআনের ফয়ছালার উপর তিনি সর্ব্বদা দৃঢ়পদ থাকিতেন।

তৌহিদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা খণ্ডন

ইহাই বোখারী শরীফের সর্ব্বশেষ অধ্যায়। তৌহীদ যাহা ইসলাম ও ঈমানের মূল বস্তু উহা সম্পর্কে বিশেষ একটি ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডনই হইল এই অধ্যায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জাহ্‌মিয়া নামে ইসলামের দাবীদার একটি ভ্রষ্ট দল ছিল। তাহাদের মতবাদ এই যে, "আল্লাহ" যে একটি সত্তা সেই সত্তাটি শুধুমাত্র সত্তাই বটে—উহার সহিত কোন গুণেরও সম্পর্ক নাই। তাহাদের ধারণা এই যে, ঐ সত্তার সহিত অন্য কোন বস্তুর সম্পর্ক ও সংমিশ্রণ বিশ্বাস করিলে তাহা হইবে শেরক বা অংশীবাদ যাহা তৌহীদ ও একত্ববাদের পরিপন্থী।

তাহাদের ভ্রান্তির মূল হইল, তাহাদের বিশ্বাস– আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী আল্লাহ হইতে ভিন্ন জিনিষ; বস্তুতঃ ইহা একেবারেই ভুল। আল্লার গুণাবলী আল্লাহ হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে। সুতরাং "আল্লাহ" যে সত্তা সেই সত্তায় গুণাবলীর অস্তিত্বে শেরক সাব্যস্ত হইতে পারে না।

ইমাম বোখারী (রঃ) অত্র অধ্যায়ে তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উহা খণ্ডনের জন্য যুক্তি-তর্কের আশ্রয় না লইয়া কোরআন-সুন্নার দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং পবিত্র কোরআন হইতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও বহু সংখ্যক হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন গুণাবলী প্রমাণ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা মোসলমান হওয়ার দাবীদার। সুতরাং তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য কোরআন-হাদীছই যথেষ্ট।

এই অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ তথা এই পবিত্র গ্রন্থ বোখারী শরীফের সর্ব্বশেষ হাদীছটি এবং আর একটি হাদীছ ব্যতীত অত্র অধ্যায়ের সমুদয় হাদীছেরই অনুবাদ যথাস্থানে হইয়াছে। অতএব, প্রথমে সমগ্র অধ্যায়ের সারমর্ম্ম বর্ণনা করা হইবে, তারপর অননূদিত হাদীছ দুইটির তরজমা করা হইবে।

এই অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) আল্লাহ তায়ালার তিন প্রকার গুণাবলী সম্পর্কে কোরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন। এক প্রকার—যে সব গুণাবলীর উপর আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম কোরআন-হাদীছে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সব গুণবাচক নামসমূহই ইসলামে "আস্‌মায়ে-হুসনা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে আছে, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا "আল্লার সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রহিয়াছে; ঐ সব নামের দ্বারা তোমরা আল্লাহকে ডাক।" আরও আয়াতে আস্‌মায়ে-হুস্‌নার উল্লেখ রহিয়াছে। এই আস্‌মায়ে-হুস্‌না সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন; হাদীছটি ষষ্ঠ খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় অনূদিত হইয়াছে। উক্ত হাদীছে আস্‌মায়ে-হুস্‌নার সংখ্যা ৯৯ বলা হইয়াছে যাহার নির্দ্ধারণও তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে। ঐ সংখ্যা শুধু কেবল উক্ত হাদীছে বর্ণিত ফজিলত হাসিলের জন্য নির্দ্দিষ্ট। উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে, ঐ ৯৯ নামকে মনে-মুখে সংরক্ষণ ও স্বীয় জীবনে প্রতিফলনকারী বেহেশত লাভের অধিকারী হইবে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম ৯৯ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নহে। পবিত্র কোরআনেই উক্ত ৯৯ নাম ছাড়া আরও বহু নাম ব্যবহৃত রহিয়াছে। আরও

বর্ণিত আছে যে, তৌরাত কেতাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এক হাজার নাম অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। (তফছীরে মাজহারী, ৩—৪৯১)

ইমাম বোখারী (রঃ) অত্র অধ্যায়ে এই প্রকার নাম হইতে শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

(১) আল্লাহ তায়ালা "আহাদ" অর্থাৎ এক—অদ্বিতীয়। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরণ করাকালে বলিয়াছিলেন, ঐ দেশবাসীর প্রতি তোমার সর্ব্বপ্রথম আহ্বান এই হওয়া চাই যে, তাহারা যেন আল্লার একত্বের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনের সুপ্রসিদ্ধ ছুরা এখ্লাছ আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের বর্ণনায় নাযেল হইয়াছে...... قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "আপনি এই ঘোষণা দিয়া দিন যে, মহান আল্লাহ এক – অদ্বিতীয়। আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন; সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি (সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন, কিন্তু) জন্ম দেন না এবং (তিনি স্বয়ম্ভু— স্বয়ং সত্তা নিজেই অস্তিত্ববান; কাহারও হইতে) জনম নেন নাই। তাঁহার সমকক্ষ কেহ হইতে পারে না।"

(২) আল্লাহ তায়ালা "রহমান" তথা অসীম দয়াল। পবিত্র কোরআনে আছে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

"আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ নামেও ডাকিতে পার কিম্বা রহমান নামেও ডাকিতে পার। যে নামেই ডাক উভয় ডাকই শুদ্ধ হইবে; যেহেতু তাঁহার অনেক (গুণবাচক) নাম রহিয়াছে।"

(৩) আল্লাহ তায়ালা "রাজ্জাক" অর্থাৎ সকল প্রাণীর আহার দাতা।

(৪) আল্লাহ তায়ালা "মতিন" অর্থাৎ মজবুত, শক্ত ও সুদৃঢ়; তাঁহার অস্তিত্বে বিলুপ্তির সম্ভাবনা বা অবকাশ নাই। পবিত্র কোরআনে আছে—

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ "একমাত্র আল্লাহই হইলেন সকলের আহার দাতা, শক্তিমান, মজবুত—শক্ত ও সুদৃঢ়।

(৫) আল্লাহ তায়ালা "আলেমুল-গায়ব" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানী—এমনকি আমাদের পক্ষে যাহা অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির নাগালের বাহিরে তাহাও তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا

আল্লাহ তায়ালাই গায়েবের জ্ঞান রাখেন। অন্য কাহাকেও তাহা জ্ঞাত করেন না, অবশ্য তিনি তাঁহার মনোনীত কোন রসুলকে যতটুকু অবহিত করিতে চাহেন, শুধু ততটুকুই ওহী মারফত অবহিত করেন।"

(৬) আল্লাহ তায়ালা "জাহের" অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অবস্থার অবগতি রাখেন।

(৭) আল্লাহ তায়ালা "বাতেন" অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর আভ্যন্তরিন ও গোপন অবস্থার অবগতি রাখেন। পবিত্র কোরআনে আছে—

هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ—"আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি বস্তুর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অবস্থা যেরূপ জানেন তদ্রূপ উহার আভ্যন্তরিক ও গোপন অবস্থাও জানেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।" এই নামদ্বয়ের ব্যাখ্যা অন্য রকমও করা হয়।

(৮) আল্লাহ তায়ালা "সালাম" অর্থ তিনি সর্ব্বদোষ-ক্রুটিমুক্ত বা তিনি শান্তির আকর।

(৯) আল্লাহ তায়ালা "মোমেন" অর্থ তিনি নিরাপত্তা বিধানকারী। পবিত্র কোরআনের ছুরা হাশরে এই দুই নামেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

(১০) আল্লাহ তায়ালা "মালেক" তথা সকল বাদশার বাদশাহ। পবিত্র কোরআনে আছে, مَلِكِ النَّاسِ—বিশ্ব মানবের বাদশার বাদশাহ। হাদীছ শরীফেও বর্ণিত আছে, কেয়ামতের মহাপ্রলয়ে সব কিছুর লয় সাধিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ধ্বনিত হইবে—انا الملك اين ملوك الارض এখন প্রকাশ হইয়া গেল, একমাত্র আমিই বাদশাহ; দুনিয়ার বাদশাহগণ এখন কোথায়?

(১১) আল্লাহ তায়ালা "আজীজ" তথা মহান।

(১২) আল্লাহ তায়ালা "হাকীম" তথা হেক্‌মতওয়ালা—সুদক্ষ ও সুকৌশলী। পবিত্র কোরআনে আছে, وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "আল্লাহ তায়ালাই হইলেন মহান ও হেক্‌মতওয়ালা।

(১৩) আল্লাহ তায়ালা "হক" তথা বাস্তব। অস্তিত্বের দিক দিয়া একমাত্র আল্লার অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব। কারণ তিনি নিজেই অস্তিত্ববান স্বয়ম্ভু তাঁহার

অস্তিত্ব অন্যের প্রদত্ত নহে, অন্যের উপর নির্ভরশীলও নহে; তাই তাঁহার অস্তিত্ব চিরাগত ও অনাদি-অনন্ত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অস্তিত্ব অকাট্য; সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ উহাতে নাই। উপাস্য হওয়ার দিক দিয়াও বাস্তব ও প্রকৃত (Real) তিনিই; অন্যান্য যাহাদের পূজা করা হয়, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পূজনীয় নহে—তাহারা পূজনীয় হইতেও পারে না।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) গভীর রাত্রে তাহাজ্জোদের জন্য ঘুম হইতে উঠিয়া একটি সুদীর্ঘ দোয়া পাড়িতেন। সেই দোয়া হইতে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়া আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণ দেখাইয়াছেন। বাক্যটি এই—أَنْتَ الْحَقُّ হে আল্লাহ! তুমি সত্য ও বাস্তব—প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তিত্ববান একমাত্র তুমিই; তোমার অস্তিত্বে এবং বাস্তবতায় সংশয়-সন্দেহের অবকাশই নাই।

(১৪) আল্লাহ তায়ালা "ছামী—سَمِيعٌ" সব কিছু শোনেন। তাঁহার শ্রবণশক্তি সর্ব্বব্যাপী ও অসীম এবং চিরাগত ও অনাদি-অনন্ত।

(১৫) আল্লাহ তায়ালা "বাছীর" সব কিছু দেখেন। তাঁহার দর্শনশক্তি সর্ব্বব্যাপী ও অসীম এবং চিরাগত ও অনাদি-অনন্ত।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে—আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতে বা আল্লার গুণগান করিতে কিম্বা আল্লার নিকট দোয়া করিতে উচ্চ স্বরের বা চিৎকারের প্রয়োজন নাই। এই কথা বুঝাইতে যাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যাঁহাকে ডাক (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা) তিনি বধির নন, অনুপস্থিত দূরবর্ত্তীও নন। তিনি سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন এবং তিনি তোমাদের নিকটবর্ত্তী।

এতদ্ভিন্ন ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি সূক্ষ্ম প্রমাণের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। তাহা এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক শিক্ষা দেওয়া অসংখ্য দোয়ার মধ্যে বন্দার তরফ হইতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধনের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে; অথচ আল্লাহ তায়ালা যদি বন্দার ডাক ও দোয়া না শোনেন তবে সম্বোধনের কোন অর্থ হয় না।

(১৬) আল্লাহ তায়ালা "ক্বাদের" তথা ক্ষমতাবান ও শক্তিমান—তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন উহাই কার্য্যে পরিণত করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন; কাহারও জন্য উহাকে প্রতিরোধ করার অবকাশই থাকে না।

পবিত্র কোরআনে এই ছেফৎ বা গুণটির বর্ণনায় অনেক আয়াতই বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—قُلْ هُوَ الْقَادِرُ "আপনি বলিয়া দিন, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও ক্ষমতাবান।"

(১৭) আল্লাহ তায়ালা "মোকাল্লেবুল-কুলুব" তথা সকলেরই মনের গতি পরিচালনকারী। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীবের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ তাহার অন্তর বা মনের যেই ইচ্ছা ও খেয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই ইচ্ছা ও খেয়ালের জন্মদাতা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনকারী হইলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি যখন যাহার মনের গতি যেরূপ করিতে চান করিয়া দেন। পবিত্র কোরআনে এই গুণটির উল্লেখ রহিয়াছে।

গোঁড়া ও হঠকারী কাফেরদের প্রতি আল্লাহ তাঁহার অভিশাপরূপে বলিয়াছেন,

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

"ঐ কাফেরদের দৃষ্টির এবং অন্তরের গতি আমি ফিরাইয়া রাখিব যেরূপ তাহারা আমার কোরআন আগমনের আরম্ভে উহার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে নাই। আর আমি তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যতায় উদভ্রান্ত থাকিতে দিব।"

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অঙ্গীকারোক্তি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রকাশার্থে শপথ করিলে আল্লাহ তায়ালার বিশেষভাবে এই গুণবাচক নামটি উল্লেখ করতঃ বলিতেন— لا ومقلب القلوب "অন্তরের গতি পরিবর্ত্তন কারীর শপথ—এরূপ নহে।"

(১৮) আল্লাহ তায়ালা "খালেক" অর্থাৎ স্রষ্টা ও নির্মাতা।

১৯) আল্লাহ তায়ালা "বারী" অর্থাৎ নির্মিতকে নিখুঁত পর্য্যায়ে আনয়নকারী।

(২০) আল্লাহ তায়ালা "মোছাওয়্যের" অর্থাৎ ছুরত, গঠন বা আকৃতি ও রূপ দানকারী। পবিত্র কোরআনে আছে, هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

"তিনি (আল্লাহই) সৃজনকর্ত্তা, নিখুঁতরূপ দানকারী এবং গঠন ও আকৃতি প্রদানকারী।"

আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত তিনটি গুণ পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী, কিন্তু ধারাবাহিক। উক্ত পর্য্যায়ত্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তিনটি গুণবাচক নামের তাৎপর্য্যে একটি সরল কথা এই যে, আমরা দেখি—মানবীয় শিল্প বা কল-কারখানার উৎপাদনে একটি উৎপন্ন বস্তু এক হাতে প্রস্তুত হয়, অপর হাতে ঘষিত ও মাজিত হইয়া নিখুঁত হয়, আর এক হাতে পূর্ণ গঠন ও আকৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানায় প্রত্যেকটি স্তরের কর্ম্মকর্ত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। এক আল্লাহ সৃষ্টিকর্ত্তা "খালেক", নিখুঁতকারক "বারী", গঠন ও আকৃতি দানকারী "মোছাওয়্যের"।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মানুষের নির্ম্মাণ-কার্য্যে উল্লেখিত পর্য্যায়ত্রয় পরস্পর কম-বেশ সময় সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার সৃজন-কার্য্যে উক্ত পর্য্যায়ত্রয়ের জন্য সময় সাপেক্ষতার প্রয়োজন মোটেই নাই। আল্লাহ তায়ালার সৃজন-কার্য্যে সমুদয় পর্য্যায়ের সমষ্টি মুহূর্ত্তে সাধিত হইতে পারে—উহাতে সময়ের প্রয়োজন হয় না।

অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহের দ্বিতীয় প্রকার গুণাবলী হইল—যাহা আসমায়ে-হুসনা ছাড়া। অর্থাৎ উহার উপর আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম ব্যবহৃত নাই; পরন্তু ঐ সব গুণাবলী মোতাশাবেহাতের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে ব্যবহৃত এমন সব শব্দাবলী যাহার সাধারণ অর্থ অত্যন্ত সরল, কিন্তু নিরাকার নিরাধার অসীম অতুলন মহামহিম আল্লাহ তায়ালার বেলায় সেই সব শব্দের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভবই নহে। আর আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে উহার অর্থের স্থির তাৎপর্য্য ও সুষ্ঠু ব্যাখা আমাদের ব্যুৎপত্তির নাগালের বাহিরে। এই শ্রেণীর সাতটি গুণাবলীর উদ্ধৃতি অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

মোতাশাবেহাত সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ছুরা আল-এমরানের প্রারম্ভে দুইটি কথা সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। উহার প্রতি প্রত্যেক মোমেন-মোসলমানের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একটি কথা হইল—যাহারা মোতাশাবেহাতের ব্যাখ্যার পেছনে পড়ে এবং উহাতে মাথা ঘামায় তাহারা ভ্রষ্ট। দ্বিতীয় কথা হইল—মোতাশাবেহাত শ্রেণীর যাহা কিছু কোরআন-হাদীছে উল্লেখ আছে ঐ সবের যথার্থতায় পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমানের উপর ক্ষান্ত হওয়াই জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয়।

( ) আল্লাহ তায়ালার "ওয়াজ্‌হ্"। পবিত্র কোরআনে আছে—

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ "আল্লার ওয়াজহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুই লয়শীল"।

হাদীছ শরীফে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি দোয়ায় একাধিক বার বলিয়াছেন, أَعُوذُ بِوَجْهِكَ "হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াজহ্-এর আশ্রয় চাই।" "ওয়াজহ্" শব্দের আভিধানিক অর্থ চেহারা।

(২) আল্লাহ তায়ালার "আ'ঈন"। পবিত্র কোরআনে আছে—আল্লাহ তায়ালা মূছা আলাইহেচ্ছালামের প্রতি স্বীয় করুণা বিকাশে বলিয়াছেন, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي "আমার আ'ঈনের ছায়ায় আপনাকে গড়িয়া তোলা হইবে।" আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের নৌকা বা জাহাজ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا "আমার আ'ঈনের ছায়ায় উহা চলিতে লাগিল।" আ'ঈন শব্দের আভিধানিক অর্থ চক্ষু।

(৩) আল্লাহ তায়ালার "য়্যাদ"। পবিত্র কোরআনে আছে—ইবলিস হযরত আদম (আঃ)কে সেজদা করার আদেশ অমান্য করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন— مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "আমার য়্যাদদ্বয়ে যাঁহাকে পয়দা করিয়াছি তাঁহাকে সেজদা করিতে তোর জন্য কি বাধা ছিল ?" এতদ্ভিন্ন বোখারী (রঃ) একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ তায়ালার "য়্যাদ" উল্লেখ আছে। "য়্যাদ" শব্দের আভিধানিক অর্থ হাত।

(৪) আল্লাহ তায়ালার "য়্যামীন"। হাদীছ শরীফে আল্লাহ তায়ালার "য়্যামীন" উল্লেখ আছে। "য়্যামীন" শব্দের আভিধানিক অর্থ দক্ষিণ হস্ত।

(৫) আল্লাহ তায়ালার "এছ্‌বা"। এ স্থানে বর্ণিত একটি হাদীছে আল্লাহ তায়ালার এছ্‌বা' উল্লেখ আছে। এছ্‌বা' শব্দের আভিধানিক অর্থ আঙ্গুল।

(৬) আল্লাহ তায়ালার "সাক্‌"। ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে আল্লাহ তায়ালার "সাক্‌" উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআন ২০ পারা ছুরা কলমেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। "সাক্‌" শব্দের আভিধানিক অর্থ পায়ের গোছা বা নালা তথা গোড়ালির উপরের অংশ।

(৭) আল্লাহ তায়ালার "ক্বদম"। ১১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছে আল্লাহ তায়ালার "ক্বদম" উল্লেখ আছে। "ক্বদম" শব্দের আভিধানিক অর্থ পা।

প্রিয় পাঠক ! উল্লেখিত সাতটি শব্দ কোরআন-হাদীছে আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহৃত আছে। এই শব্দ সমূহের অর্থও অতি সরল ও সুস্পষ্ট, কিন্তু ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য্য আকিদা ও অকাট্য মতবাদ এই যে, এই সব শব্দের যে অর্থ সচরাচর আমরা বুঝি ও দেখি ; নিরাকার নিরাধার মহামহিম আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ঐ অর্থ কস্মিনকালেও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এতদকারণে এই শব্দাবলীর তাৎপর্য্য সম্পর্কে ইমামগণের দুই রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটি হইল—ঐ সব মূল শব্দের বা উহা সম্বলিত বাক্যের রূপক-অর্থ কিম্বা উপঅর্থ ধরা হয়। আর এক ব্যাখ্যা—এই সব শব্দের রূপক-অর্থ, উপঅর্থ ইত্যাদি কোন প্রকার অর্থ না হাতড়াইয়া শুধু কেবল এই আকিদা ও বিশ্বাস স্থাপন করিবে যে, উক্ত শব্দাবলীর যে অর্থ ও উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে ও দৃষ্টির গোচরে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তার সহিত উহার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই ; বরং এই সব শব্দাবলীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এমন বিভিন্ন গুণ বা ছেফৎ উদ্দেশ্য যাহা সেই মহান সত্তার উপযোগী।

উল্লেখিত সাতটি শব্দ সবই সাধারণ ও সচরাচর অর্থে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝাইয়া থাকে। সেই প্রচলিত অর্থ আল্লাহ তায়ালার বেলায় উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কোরআন-হাদীছে উহার উল্লেখ থাকায় উপরোল্লেখিত কোন একটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লার নামের সহিত সম্পৃক্ত হইবে। এই প্রসংঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) আরও কতিপয় ব্যবহারিক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

[ক] কতিপয় বিশেষ্যপদ যাহা সাধারণভাবে সৃষ্টের জন্য ব্যবহৃত, কিন্তু কোরআন-হাদীছে আল্লাহ তায়ালার জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন— ذات অর্থ "সত্তা"। এক হাদীছে এই শব্দটি আল্লাহ তায়ালাকে উদ্দেশ্য করিয়া উল্লেখ হইয়াছে। তদ্রূপ نفس অর্থ "নিজ"। পবিত্র কোরআনে আছে, وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ "আল্লাহ তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন তাঁহার নিজ হইতে।" এক হাদীছে আছে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট-জগৎকে সৃষ্টি করার পর—

كتب فى كتابه وهو يكتب على نفسه "নিজের উপর লিখিতে যাইয়া স্বীয় লিপিতে লিখিয়াছেন—আমার গজব অপেক্ষা আমার রহমত বেশী হইবে। উক্ত লিপিখানা আরশের উপর রক্ষিত রহিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন ইমাম বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ইঙ্গিতে প্রমাণ করিয়াছেন, شئ (অর্থ "বস্তু") শব্দও আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলা যায়।

[খ] আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার বিধায় তিনি অবশ্যই দিক-মুক্ত তিনি দিকের সহিত সীমাবদ্ধ নহেন। এতদসত্বেও "দিক" বোধক অব্যয়পদ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে ব্যবহৃত আছে। যেমন—

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ "(কালেমা-তায়্যেবাহ—আল্লার জিকির ও দোওয়া ইত্যাদি) সুবাক্য সমূহ আল্লার দিকে উত্থিত হয়।" অপর এক হাদীছে আছে, একমাত্র হালাল মালের দান-খয়রাতই আল্লার দিকে উত্থিত হইয়া থাকে।

পবিত্র কোরআনে আরও আছে—وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

অর্থাৎ—নেককারদের চেহারা কেয়ামতের দিন আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইবে, স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের দিকে তাকাইবার ও দৃষ্টিপাতের সৌভাগ্য লাভকারী হইবে।

আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার ও দিক-মুক্ত। এতদসত্বেও কেয়ামতের দিন নেককারগণ আল্লাহ তায়ালাকে সুস্পষ্টরূপে তৃপ্তির সহিত দেখিতে পাইবেন। আলোচ্য আয়াতের মর্ম্ম ইহাই এবং এই মর্ম্মে বহু হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে। এ সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করা ঈমান ও ইস্লাম পরিপন্থী।

[গ] কোন কোন ক্রিয়াপদ যাহার অর্থ শুধু শরীরী ও দেহধারী বস্তুর জন্যই খাপ খায়, কিন্তু কোরআন-হাদীছে উহা আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন—اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

اسْتَوٰى "ইস্‌তাওয়া" অর্থ উপবেশন ও আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আয়াতের অর্থ হয়—দয়াল প্রভু আরশের উপর উপবেশন করিয়া আছেন। এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআন—৮, ১১ ও ১৬ পারায় আছে। আর এক হাদীছে আছে—

يَنْزِلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا......

يَنْزِلُ "য়্যান্‌যেলু" অর্থ অবতরণ করিয়া থাকেন। তাই হাদীছের অর্থ—প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আলীশান প্রভু-পরওয়ারদেগার সর্ব্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন…। হাদীছখানা অত্র গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে।

উপবেশন তথা আসন গ্রহণ করা এবং অবতরণ করা— এই সব ক্রিয়াপদের যে অর্থ ও রূপ মানবীয় ধ্যান-ধারণায় রহিয়াছে তাহা একমাত্র শরীরী ও দেহধারী বস্তুর সহিত খাপ খাইতে পারে। আর শরীর ও দেহ ত সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ; সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এই সবের ঊর্দ্ধে—নিরাকার নিরাধার। অতএব আল্লাহ তায়ালার বেলায় এই শ্রেণীর ক্রিয়াপদের তাৎপর্য্যে পূর্ব্বাপর ইমামগণের দুই প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়। এক হইল—ঐ শ্রেণীর ক্রিয়াপদের বাক্যকে কোন সংগতিপূর্ণ রূপক-অর্থে বা উপঅর্থে গ্রহণ করা। যেমন, عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى বাক্যের মর্ম্ম এই বলা হয় যে, সমস্ত সৃষ্ট জগৎ পরিচালন-ব্যবস্থায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে যত (Circular—) আদেশ-নিষেধ, ফরমান বা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ঐ সবের (Circulaton—) প্রচার ও ঘোষনা হয় আরশ হইতে। সৃষ্ট জগতের নিয়ন্ত্রণকারী এবং উহার প্রতিপালন ও পরিচালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার ফরমান সমূহের ঘোষণা ও প্রচার যেহেতু আরশ হইতে হইয়া থাকে, তাই রূপকভাবে বলা হইয়াছে—আরশ যেন আল্লাহ তায়ালার উপবেশন-স্থল। কিম্বা যেরূপ উপঅর্থ হিসাবে বলা হয় সলীম কলীমের উপর সওয়ার হইয়া আছে — এস্থলে সওয়ার হওয়ার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নহে, বরং উপঅর্থ উদ্দেশ্য যে, কলীম সম্পূর্ণরূপে সলীমের অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন। উক্ত আয়াতের মধ্যেও "اسْتَوٰى" উপবেশনের তদ্রূপ উপঅর্থই উদ্দেশ্য। সমুদয় সৃষ্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সকলের উপরের বস্তু হইল আরশ। সেই আরশকে সম্পূর্ণরূপে মহামহিম আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ

ও নিয়ন্ত্রণাধীন বলা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমুদয় জগৎকে আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রণাধীন বুঝান হইয়াছে। এই ভাবেই আল্লাহ তায়ালার অবতরণ করার রূপক-অর্থ যথা—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ (Special) দৃষ্টিপাত উদ্দেশ্য। কিম্বা উহার উপঅর্থ, যথা—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত অবতরণ উদ্দেশ্য।

আলোচ্য ক্রিয়াপদ সমূহের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যাহা অধিকাংশ ইমামগণের অভিমত, তাহা এই যে, এই সব ক্রিয়াপদের শাব্দিক অর্থ যাহা সকলের জানা তাহাই, কিন্তু সেই অর্থ বাস্তবায়নের আকার-আকৃতি ও রূপ আমাদের ধ্যান-ধারণায় ও গোচরে যাহা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালার বেলায় মোটেই উদ্দেশ্য নহে। বরং আল্লাহ তায়ালার নিরাকার, নিরাধার, অতুলন, অসীম ইত্যাদি গুণাবলীর সংগতি ও সামঞ্জস্যে উহার বাস্তবায়ন যাহা হইতে পারে তাহাই উদ্দেশ্য—উহা আমাদের বিদিতও নহে বোধগম্যও নহে, কিন্তু উহার যথার্থতার প্রতি পূর্ণ পাকা-পোক্তা ঈমান আমাদের রহিয়াছে।

এক ব্যক্তি الرحمن على العرش استوى আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিভ্রান্তি ছড়াইবার উদ্দেশ্যে স্বনামধন্য ইমাম মালেক (রঃ)কে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে তিনি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট উত্তর করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "الاستواء উপবেশন" —ইহার অর্থ অজানা নহে, (আল্লাহ তায়ালার বেলায়) ইহার প্রকৃত অবস্থা বোধগম্য নহে, উহার যথার্থতায় ঈমান রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য ; ইহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও হাতড়ানি বেদয়া'ৎ বা ভ্রষ্টতা—এই বলিয়া প্রশ্নকারীকে তাড়াইয়া দিলেন। (তফছীরে মাজহারী ৩—৪০৬)

উল্লেখিত শ্রেণীর ক্রিয়াপদও মোতাশাবেহাতের অন্তর্ভুক্ত। মোতাশাবেহাত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যে সতর্কবাণী আছে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহের তৃতীয় প্রকার গুণাবলী হইল—যাহা আসমায়ে-হুসনার মধ্যে নাই, অর্থাৎ উহার উপর আল্লাহ তায়ালার কোন গুণবাচক নাম ব্যবহৃত নাই, কিন্তু উহা মোতাশাবেহাত ভুক্তও নহে ; যথা—

(১) "ছিফতে-তাক্ওরীন্" অর্থাৎ অস্তিত্ব দান-ক্ষমতা। এই গুণটির বহিঃপ্রকাশই হইল খালেক, বারী, মোছাওয়্যের ইত্যাদি বহু গুণাবলী। এই গুণটিরই বিকাশ-সূত্র হইল আল্লাহ তায়ালার আদেশ-বাণী "كن কুন্"—হইয়া যাও। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টির উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে। যথা—ছুরা নহল, ৫ রুকু ; আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

"আমি যখন কোন বস্তুর হওয়া ইচ্ছা করি তখন আমার আদেশ-বাণী "কুন্"-এর সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইয়া যায়।" ছুরা ইয়াছীনে আছে—

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বস্তুর হওয়া ইচ্ছা করেন তখন কেবল মাত্র তাঁহার আদেশ-বাণী "কুন্"-এর সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইয়া যায়।" এমনকি আল্লাহ তায়ালার আদেশ-বাণীর সন্মুখে কোন বস্তুর অস্তিত্ব কোন প্রকার উপাদান উপকরণের অপেক্ষা করে না এবং উহার উপর নির্ভরও করে না। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-কাজ উপাদান উপকরণের মাধ্যমেও হয় বটে, কিন্তু উহার উপর নির্ভরশীল নহে। যেমন আল্লাহ তায়ালা রূহ্ বা আত্মাকে কোন উপাদান উপকরণ ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় আদেশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে আছে—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي -

"লোকেরা আপনাকে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলিয়া দিন, রূহ্ বা আত্মা আমার প্রভুর শুধু আদেশে সৃষ্ট বস্তু। তোমাদিগকে ত জ্ঞানের সামান্য বিন্দুই দান করা হইয়াছে।" (উপাদান উপকরণ ব্যতীত সৃষ্টি করা তোমাদের অনুভূত না-ও হইতে পারে।) (১৫ পারা, ১০ রুকু)

প্রাথমিক পর্য্যায়ের সমুদয় সৃষ্টি, এমনকি সকল শ্রেণীর উপাদান উপকরণ সমূহ শুধু আল্লাহ তালালার আদেশ-বাণীতেই সৃষ্ট।

(২) "মাশ্য়্যাত ও এরাদা" অর্থাৎ ইচ্ছা-ক্ষমতা। বহু আয়াত ও হাদীছে এই গুণটির উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

"হে আল্লাহ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর রাজত্ব দিয়া থাক এবং যাহার হইতে ইচ্ছা কর রাজত্ব ছিনাইয়া লও। আর যাহাকে ইচ্ছা কর সম্মান দিয়া থাক এবং যাহাকে ইচ্ছা কর অপমান কর।"

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

অর্থাৎ—কোন কাজ সম্পর্কে কস্মিনকালেও বলিও না যে, আমি আগামী কাল নিশ্চয় হইয়া করিবই ; হাঁ -এরূপ বল যে, আল্লার ইচ্ছা হইলে (আমি করিব)।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"আপনি হেদায়েত দিতে পারেন না যাহাকে ভালবাসেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দিতে পারেন যাহাকে ইচ্ছা করেন।"

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ সরল পন্থা চাহেন, তোমাদের জন্য কঠিন পন্থা চাহেন না।

(৩) "ছিফতে-কালাম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মোতাকাল্লেম—বাকপতি। অবশ্য আল্লার কালাম তথা বাণী ও কথা আল্লাহ তায়ালার নিরাকার নিরাধার অতুলন সত্তার সহিত সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষাকারী। আমাদের শ্রবণে ও ধ্যান-ধারণায় বাণী ও কথার যে রূপ ও আকার রহিয়াছে আল্লার কালাম উহার উর্দ্ধে।

আল্লাহ তায়ালার কালাম সম্পর্কে বোখারী (রঃ) বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

(১) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ......

"আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের কালাম লিখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে নিশ্চয় সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে ; প্রভু-পরওয়ারদেগারের কালাম শেষ হইবে না—যদিও আমরা উপস্থিত করি অতিরিক্ত আরও সমুদ্র।"

(১৬ পারা ছুরা কাহাফ)

এই বিষয়েরই আরও একটি আয়াত আছে—

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ...

"সারা জগতের বৃক্ষগুলি যদি কলম হয় এবং এক সমুদ্রের সহিত অতিরিক্ত সাত সমুদ্র যোগ (করিয়া কালি তৈরী) করা হয় (এবং সেই সব কলম ও কালি দ্বারা আল্লার কালাম লেখার প্রয়াস পাওয়া যায়, তবে এতসব কালি-কলমও নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু) আল্লার কালাম শেষ হইবে না।

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা যদি স্বীয় মহত্ত্ব, মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের এবং তাঁহার গুণাবলীর ও জ্ঞান ভাণ্ডারের বিবরণ দান করিতে থাকেন (যেরূপ আসমানী

কেতাবসমূহে কিছু কিছু রহিয়াছে।) তবে জগৎ-জোরা বৃক্ষগুলিকে কলম বানাইয়া এবং অতিরিক্ত অসংখ্য সমুদ্র সহ সমুদয় সমুদ্রকে কালি বানাইয়া লিখিতে থাকিলে ঐ সমস্ত কলম ও কালি সব নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লার কালাম ও বর্ণনা শেষ হইবে না! (তফছীর ইবনে কাছীর ২—৫৫১)

(২) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) ফেরেশতাদের সঙ্গে বিশেষতঃ জিব্রাঈল আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কালাম প্রমাণ করিয়াছেন।

(৩) কতিপয় হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কালাম হইবে।

(৪) ইহজগতেই আল্লাহ তায়ালা হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে কালাম করিয়াছেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে।

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا "আল্লাহ তায়ালা মূছা আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং বাস্তবিক পক্ষেই কালাম করিয়াছেন।" একাধিক হাদীছেও এই বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

(৫) আল্লাহ তায়ালা বেহেশতবাসীদের সঙ্গে কালাম করিবেন। সেই কালামের বিভিন্ন বর্ণনাও বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

(৬) ধরাপৃষ্ঠে আমাদের সম্মুখেও পবিত্র কোরআনরূপে আল্লাহ তায়ালার কালাম বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আল্লার সত্তা নিরাকার; বস্তুতঃ আল্লার গুণাবলীও তদ্রূপ নিরাকার—তথা মানবীয় জ্ঞান-বোধের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্দ্ধে। এই তথ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দুই শ্রেণীর লোক গোমরাহ্ ও ভ্রষ্ট হইয়াছে। এক শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে জাহ্মিয়া ফের্কা—যাহারা আল্লার সমুদয় গুণাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে সব রকম গুণাবলী-শূন্য ধরিয়া লইয়াছে। মো'তাজেলা ফের্কাও যে পেঁচের কথা বলে তাহা আল্লাহ তায়ালার ছেফৎ বা গুণাবলী অস্বীকার করারই নামান্তর। তদুপরি তাহারা আল্লাহ তায়ালার ছেফতে-কালামকে সরাসরি অস্বীকারই করিয়াছে।

আর এক শ্রেণী—যাহারা কোরআন-হাদীছে উল্লেখিত আল্লার গুণাবলী বর্ণনার শব্দ সমূহকে উহার সাধারণ অর্থে এবং সেই অর্থের প্রচলিত রূপ ও আকারকেই আল্লার বেলায়ও স্থির করিয়া আল্লাহকে শরীরী ও দেহধারী সাব্যস্ত করিয়াছে।

কোরআন-সুন্নার আদর্শবাদী ইমামগণ উভয় শ্রেণীর ভ্রষ্ট ফের্কার বিরুদ্ধে এই আকিদা ও মতবাদ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, আল্লার গুণাবলী নিশ্চয়ই আছে।

আল্লাহ গুণাবলী-শূন্য নহেন। আর কোরআন-হাদীছের মাধ্যমে আল্লার যে সব গুণাবলীর অবগতি লাভ হইয়াছে, যেমন—আল্লাহ তায়ালার শ্রবণ, আল্লাহ তায়ালার দর্শন, আল্লাহ তায়ালার কালাম; এই সব গুণাবলী যে সব শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে ঐ শব্দসমূহের প্রচলিত অর্থের সাধারণ রূপ এবং উহা বাস্তবায়িত হওয়ার আকার-আকৃতি শরীরী ও দেহধারীর বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বেলায় ঐ সব শব্দের মাধ্যমে শুধু মূল গুণাবলীই উদ্দেশ্য; ঐ সবের সাধারণ রূপ ও প্রচলিত আকার-আকৃতি মোটেই উদ্দেশ্য নহে।

যেমন, سمع—শ্রবণ, بصر—দর্শন ইহা মানবীয়, বরং সৃষ্ট জীবের গুণও বটে এবং আল্লাহ তায়ালার গুণরূপেও কোরআন-হাদীছে উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয়ের سمع—শ্রবণের ও بصر—দর্শনের মধ্যে ঐ ব্যবধানই আছে যে ব্যবধান সৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে রহিয়াছে। আল্লার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই—

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
وز هرچه گفته اند شنیده ایم و خوانده ایم

"হে খোদা! তুমি অতি মহান ও অতি ঊর্দ্ধে—আমাদের চিন্তা, অনুমান, ধারণা ও কল্পনা হইতে। যে যাহা কিছু বলিয়াছে, যাহা কিছু আমরা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি সব হইতে ঊর্দ্ধের ঊর্দ্ধে তুমি।" এই সত্য কোরআনেরই উক্তি—
ليس كمثله شئ وهو السميع البصير "কোন কিছুর সহিতই তাঁহার (আল্লার) তুলনা হইতে পারে না; অবশ্য তিনি শুনেন এবং দেখেন।" অর্থাৎ আল্লার শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি গুণ রহিয়াছে, কিন্তু সেই শ্রবণ ও দর্শনকে আমাদের শ্রবণ ও দর্শনের তুলনায় ধারণা, কল্পনা বা অনুমান করা মারাত্মক ভুল ও ভ্রষ্টতা।

আমরা সৃষ্ট এবং শরীরী ও দেহধারী। দৈহিক অঙ্গের সাহায্যে আমাদের শ্রবণ, দর্শন ও কালাম বা কথা হয়। আর মহামহিম আল্লাহ হইলেন স্রষ্টা; তিনি শরীর, দেহ, অঙ্গ ইত্যাদি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলীর বহু ঊর্দ্ধে, ঐ সবের মুখাপেক্ষিতা হইতেও পাক-পবিত্র। ইহাই উদ্দেশ্য পূর্ব্বাপর ইমামগণের এই উক্তির—
له سمع لا كسمعنا وبصر لا كبصرنا "আল্লাহ তায়ালার শ্রবণগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শ্রবণ আমাদের ন্যায় কর্ণের মাধ্যমে এবং উহার সাহায্যে ও নির্ভরতায় নহে। তাঁহার দর্শনগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দর্শন আমাদের ন্যায় চোখের মাধ্যমে এবং উহার সাহায্যে ও নির্ভরতায় নহে।

আল্লাহ তায়ালার কালাম সম্পর্কেও ঠিক এ-ই তথ্য এবং এ-ই তাৎপর্য্য। পবিত্র কোরআন যে আল্লার কালাম তাহাও উল্লেখিত তথ্যাবলীর সহিত

সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য এ সম্পর্কীয় সামঞ্জস্য-বিধান সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের অন্তর্নিহিত। ইমাম বোখারী (রঃ) উহার প্রতি ইঙ্গিতও প্রদান করিয়াছেন। আমরা অত্র আলোচনা পূর্ব্বাপর ইমামগণের সর্ব্বসম্মত একটি আকিদা ও মতবাদের উপর ক্ষান্ত করিলাম যে—القرآن كلام الله غير مخلوق অর্থাৎ—পাক পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম; উহা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট (তথা শুধু কেতাবই) নহে।

একটি হাদীছে-কুদ্‌ছী

রসুল (দঃ) যাহা বলিয়াছেন—আল্লার তরফ হইতে ওহী প্রাপ্তে বলিয়াছেন। কোরআনেরই বর্ণনা—وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُّوحٰى

"রসুল (দঃ) প্রবৃত্তি বশে কিছু বলেন না; যাহা বলেন ওহী প্রাপ্ত হইয়াই বলেন।" এই হিসাবে সব হাদীছই আল্লার তরফ হইতে বলিতে হইবে; তবে সাধারণতঃ হাদীছ বর্ণনার সূত্র হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্তই ক্ষান্ত হয়, আল্লাহ তায়ালা হইতে বর্ণিত বলিয়া উল্লেখ থাকে না। কিন্তু কোন কোন হাদীছে উহা আল্লাহ তায়ালা হইতে বর্ণিত বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ হাদীছকেই "হাদীছে-কুদ্‌সী" বলা হয়। হাদীছে-কুদ্‌সীর বিষয়-বস্তু আল্লার তরফ হইতে, আর উহার পাঠ (Reabing বা এবারত) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাচনিক, কিন্তু উহা আল্লার উক্তি আকারে বর্ণিত। এখানেই হাদীছে-কুদ্‌সী ও কোরআনের পার্থক্য; পবিত্র কোরআনের বিষয়-বস্তু ও পাঠ (Reabing বা এবারত) উভয়ই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে।

২৭০২। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَأَنَا مَعَهٗ إِذَا ذَكَرَنِىْ فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَأٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَأٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—(২) আমার বান্দা আমার প্রতি যেই ধারণা পোষণ করে আমি তাহার সঙ্গে সেই ব্যবহারই করি। (২) আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তাহার সঙ্গী হই। (৩) আমার বান্দা যদি আমাকে স্মরণ করে একাকী, আমিও তাহাকে স্মরণ করি একাকী। যদি সে আমাকে স্মরণ করে লোক সমাবেশে, তবে আমি তাহাকে স্মরণ করি তদপেক্ষা উত্তম সমাবেশে। (৪) আমার বান্দা যদি আমার প্রতি অগ্রসর হয় এক বিঘত, আমি তাহার প্রতি অগ্রসর হই এক হাত ; যদি সে অগ্রসর হয় এক হাত, আমি অগ্রসর হই এক বাঁও। (৫) আমার বান্দা আমার প্রতি হাটিয়া আসিলে আমি তাহার প্রতি দ্রুত ছুটিয়া আসি।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম উক্তিটিকে অনেক ব্যাখ্যাকার ব্যাপক অর্থে না লইয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। যথা—[ক] মোমেন মৃত্যু উপস্থিতির সময় দিলের সহিত আল্লার প্রতি যে ধারণা রাখিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সেই ধারণা বাস্তবায়নে বিশেষ দৃষ্টি দান করিবেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—"তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যুকালে অবশ্যই আল্লার প্রতি ভাল ধারণা রাখিবে।" [খ] দোয়া করার সময় আল্লার প্রতি বান্দার ধারণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়। বান্দার ধারণায় যদি দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা থাকে, তবে আল্লার বিশেষ দৃষ্টি সেই দিকেই হইবে। পক্ষান্তরে বান্দা নিজেই যদি স্বীয় দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি আশান্বিত না হয়, তবে ঐ দোয়ার প্রতি আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিপাত করিবেন না। এক হাদীছে আছে—আল্লার নিকট দোয়া করিতে উহা কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা রাখ। [গ] তওবা করার সময় উহা কবুল হওয়ার ব্যাপারেও তদ্রূপ আল্লার প্রতি বান্দার ধারণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। [ঘ] এস্তেগফার তথা আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সময়ও ক্ষমা পাওয়া সম্পর্কে আল্লার প্রতি বান্দার ধারণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। [ঙ] যে কোন এবাদৎ উহার সাধারণ নিয়ম ও শর্তের সহিত সম্পাদন করিয়া উহার নিয়মিত ছওয়াব বা বিঘোষিত ফজিলত লাভের ব্যাপারে আল্লার প্রতি বান্দার ধারণাও অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। যেমন, দান-খয়রাতে দানের পরিমাণ অপেক্ষা দশ হইতে সাত শত গুণ বেশী ছওয়াবের নীতি শরীয়তে রহিয়াছে। ৯ই জিলহজ্জ তারিখের রোযার দ্বারা দুই বৎসরের গোনাহ মাফ হওয়ার ফজিলত হাদীছে বিঘোষিত রহিয়াছে। এই শ্রেণীর আমল করিয়া বান্দা ঐ ছওয়াব লাভে আল্লার প্রতি পূর্ণ আশান্বিত থাকিলে তাহার সৌভাগ্য। আর যদি সে ঐ পরিমাণ ছওয়াবকে অতিরিক্ত মনে করে তবে সে আল্লার তরফ হইতে সেই ব্যবহারই পাইবে। (ফতহুলবারী ১৩—৩২৯)

কোন কোন ব্যাখ্যাকার আলোচ্য উক্তিটিকে বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট না করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রযোয্য বলিয়াছেন। সেমতে উক্তিটির উদ্দেশ্য হইবে, আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা প্রবল রাখার প্রতি বান্দাকে আকৃষ্ট করা।

প্রকাশ থাকে যে, সর্ব্বক্ষেত্রে বা বিশেষ ক্ষেত্রে—যে ভাবেই এই উক্তিকে প্রয়োগ করা হউক ইহার দ্বারা বিভ্রান্তির অবকাশ নাই। এস্থলে "ধারণা" বলিতে একমাত্র উদ্দেশ্য—যে ধারণা বান্দার দেল ও অন্তরের অন্তস্থলে সৃষ্ট ও উত্থিত হয়। আর ইহা বাস্তব সত্য যে, কাজ না করিয়া ফল লাভের আশা স্বাভাবিকভাবেই দেলে ও অন্তরে স্থান পায় না। হাঁ—মুখে স্থান পাইতে পারে—মুখের দ্বারা আশা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু উহা মানুষের নিকটও বাতুলতা গণ্য হয়; অন্তর্যামী আল্লার নিকট ত ঐরূপ আশা-প্রকাশ গজবের কারণ হইবে। যেরূপ পবিত্র কোরআনে ছুরা মরইয়াম ৫ রুকুর একটি আয়াতে এক ব্যক্তির সমালোচনা উল্লেখ আছে। আছ ইবনে-ওয়ায়েল নামক এক কাফের ব্যক্তি কোন প্রসঙ্গে বলিরাছিল, আমি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইলে তখনও প্রচুর ধন-জন প্রাপ্ত হইব। ঐ ব্যক্তির উক্ত আশাবাদীতার খণ্ডনে এই আয়াত নাজেল হয়—

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ......

অর্থঃ—ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, অথচ বলে—(মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইলে) আমাকে ধন-জনের প্রাচুর্য্য দেওয়া হইবে! সে কি গায়েবের খবর জানিয়াছে, কিম্বা আল্লার তরফের কোন অঙ্গীকার পাইয়াছে? কখনও নহে। আমি তাহার এই কথা লিখিয়া রাখিতেছি। (মৃত্যুর পর) তাহার আজাব বাড়াইতেই থাকিব। তাহার কথাগুলি আমার নিকট জমা থাকিবে। সে শূন্যহাত সাথীহীন অবস্থায় আমার নিকট আসিবে।

যাঁহারা এবাদৎ ও আমল করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এরূপ হন যে, তাঁহারা অতি ভয় ও আতঙ্কের দরুন আমলের ফলাফল লাভেও এবং সাধারণভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিও হতাশাগ্রস্ত, নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকেন। আর এক শ্রেণীর লোক হন—যাঁহারা আমলের বেলায় অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, আমলে ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সদা সঙ্কিত এবং ভয়ে প্রকম্পিত থাকেন, আল্লার ভয়ও অন্তরে রাখেন, কিন্তু আমলের ফলাফল লাভের প্রতি এবং আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রতি আশান্বিত থাকেন। এমনকি চেষ্টার পরেও আমলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গেলে তাহাতেও তাঁহারা হতাশ হন না,

নিয়মিত সংশোধন করিয়া আশাকে অক্ষুন্ন রাখেন। আলোচ্য উক্তিতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাহাদের আশা পুরণের ভরসা দান করিয়াছেন। শরীয়তে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থাই অগ্রগণ্য। প্রথম শ্রেণীর অবস্থাটা অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল; ইহাতে মানুষ অনেক সময় সন্তপ্ত হইয়া আমল ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বহারা হয়, আল্লার প্রতি সম্পুর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ে—যাহা কুফুরী গোনাহ।

দ্বিতীয় উক্তির ব্যাখ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ শুধু মৌখিক জিক্‌র তথা আল্লার নাম জপাই নহে, বরং অন্তরেও আল্লার নাম, আল্লার মহত্ব, আল্লার ভয়-ভক্তি উপস্থিত দাখা উদ্দেশ্য↑, কাজে ও কথায় আল্লার আনুগত্য, ফরমাবরদারী ও দাসত্ব বিকাশের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার প্রমাণ দেওয়াও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা সঙ্গী হওয়া উক্তির উদ্দেশ্য আল্লার বিশেষ রহমতের ছায়া লাভ হওয়া (ফতহুলবারী ১৩—৩২৯)। বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করিলে আল্লাহ সেই বান্দার সঙ্গী হন—ইহার একটি বাস্তব ক্রিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে—
الا بذكر الله تطمئن القلوب "জানিয়া রাখ—আল্লার জিক্‌রে তথা আল্লাহকে স্মরণ করিলে দেলের শান্তি, মনের সোয়াস্তি ও স্থিরতা লাভ হয়।" আল্লার স্মরণে আল্লাহ সঙ্গী হওয়ার ইহা একটি বড় লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া।

তৃতীয় উক্তিটির মর্ম্ম এই যে, আল্লার স্মরণ ও জিক্‌রের বদৌলতে মানুষের জন্য দুনিয়াতে আত্মিক, বরং পার্থিব উন্নতি এবং সাফল্য রহিয়াছে। আখেরাতেও বেহেশতী সওগাত এবং নেয়ামতরাশীর প্রতিদান রহিয়াছে। সেই প্রতিদান দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, বান্দা যদি আমাকে নির্জনে একাকী স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে একাকী স্মরণ করিব। অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য প্রতিদান তাহাকে আমি স্বয়ং পৌঁছাইব, অন্যের মাধ্যমে নয়। এমনকি আখেরাতে তাহাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে ছওয়াব ও নেয়ামত নির্দ্ধারিত রাখেন তাহাও গোপন রাখেন, কাহাকেও জ্ঞাত হইতে দেন না। যেরূপ সে তাহার আমল—আল্লাহকে স্মরণ করা লুক্কায়িত ভাবে করিয়াছে কাহাকেও জ্ঞাত হইতে দেয় নাই।

↑ এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে :—কেয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লার রহমতের ছায়া লাভ করিবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বর্ণনায় উল্লেখ আছে—رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه "যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহকে স্মরণ করিয়াছে, যাহাতে তাহার চোখদ্বয়ের অশ্রুধারা বহিয়াছে।" অন্তরে এরূপ মহব্বৎ ও ভয়-ভক্তির সহিত আল্লার স্মরণ হওয়া চাই যাহাতে চোখে অশ্রুধারা নামিয়া আসে—এইরূপ স্মরণই আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য।

আর বান্দা যদি আমাকে লোক সমক্ষে স্মরণ করে, তবে আমি তাহাকে তদপেক্ষা উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি ; অর্থাৎ—তাহার প্রশংসা এবং প্রতিদানের চর্চা ও আলোচনা ফেরেশতাদের মধ্যে করি। (মেরকাত, ৫—৫১)

জানিয়া রাখিবে ঃ—প্রকাশ্য জিক্‌র গুপ্ত জিক্‌র অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কোন ইঙ্গিত-ইশারা অত্র হাদীছে নাই। এখানে শুধু এতটুকুই উদ্দেশ্য যে, আল্লার জিক্‌র ও স্মরণে বান্দা যে পন্থায় স্বাদ ও আনন্দ পায় আল্লাহ তায়ালা তাহার সেই স্বাদ ও আনন্দে ব্যঘাত ঘটান না। এমনকি তাহাকে উহার প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারেও সেই পন্থাই বজায় রাখেন (ফয়জুলবারী ৪—৫১৮)।

বিষয়টির খোলাসা এই যে, মহব্বৎ ও ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রেমিকদের দুই রকম অবস্থা দেখা যায়। কোন সময় প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত নীরব ও লুক্কায়িত নিবিড় প্রেম গড়িতে স্বাদ পায় ; প্রেমাস্পদের জপনা, প্রেমাস্পদের ধ্যান একাকী নিরালায় করিতে আনন্দ পায়। আবার কোন সময় প্রেমিক প্রেমাস্পদের জপনা, প্রেমাস্পদের আলোচনা প্রকাশ্যে ও লোক সমক্ষে করিতে উৎফুল্ল হয়।

আল্লার মহব্বৎ ও ভালাবাসারও ঐ উভয় অবস্থাই দেখা যায়। অনেক আল্লার ওলী এমন গুজরিয়াছেন যাঁহাদের সারা জীবনেও তাঁহাদের আল্লাহ-প্রেম লোকদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা প্রকাশ্য দেখায় সাধারণ মোসলমানরূপে জীবন-যাপন করিয়াছেন ; আল্লার জপনা, আল্লার ধ্যান, আল্লাহ-প্রেমের কার্য্যাবলী গোপন রাখিয়াছেন।

আল্লার ওলীগণের এক শ্রেণী এইরূপও আছেন যাঁহারা দিবা-রাত্রের বিভিন্ন অংশে নিরিবিলি জনশূন্য অবস্থায় আল্লার ধ্যান ও জপনা করিলেও আল্লার বান্দাদেরকে আল্লাহ প্রেম শিক্ষা দান কর্ত্তব্যের তাকিদে আল্লাহ-প্রেমের অনেক কাজ তাঁহারা সাধাণতঃ প্রকাশ্যে লোক সমক্ষে করিয়া থাকেন।

আলোচ্য উক্তিতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ঐ উভয় শ্রেণীর অবস্থার উপরই করুণা প্রদর্শনের কথা বলিতেছেন যে, বান্দা যে পন্থায় আমার প্রেম-নিবেদনে স্বাদ ও আনন্দ পায় আমি তাহাকে সেই পন্থাপোযোগী প্রেম-বিনীময় দান করি ; যেন তাহার স্বাদে ও আনন্দে ব্যাঘাত না ঘটে। এক কথায়—আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রেমিকের সহিত প্রেম-বিনীময়ে প্রেমিক-বান্দার মনের স্বাদ ও আনন্দের পন্থায়ই বিনীময় ও প্রতিদান দিয়া থাকেন। বান্দা যে পন্থায় স্বাদ ও আনন্দ পায় সেই পন্থাতেই আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকেন। নির্দ্ধারিতরূপে এক পন্থাকে অগ্রগণ্যতা না দিয়া আল্লাহ তাঁহার সন্তুষ্টিকে বান্দার মনস্তুষ্টির সামঞ্জস্যে পরিচালিত করেন।

চতুর্থ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য বান্দা আমল ও চেষ্টা করিলে আমল ও চেষ্টায় যে পরিমাণ নৈকট্যের উপযোগী সে হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে প্রতিদান ও রহমত স্বরূপ উহার কয়েক গুণ বেশী নৈকট্য দান করেন।

পঞ্চম উক্তিটিতে এক হাদীছে আরও উল্লেখ আছে যে, বান্দা আমার প্রতি দ্রুতবেগে আসিলে আমি তাহার প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হই। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আল্লার নৈকট্য লাভে বান্দার আমল ও চেষ্টা ধীর ও মন্থর হইলেও আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমতে বান্দাকে অধিক ও দ্রুত নৈকট্য দান করেন।

মোসলেম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আল্লাহ তায়ালার আরও একটি অশেষ রহমতের উক্তি উল্লেখ আছে—

وَمَنْ لَقِيَنِى بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً لَا يُشْرِكُ بِىْ

شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"কোন ব্যক্তি শেরেকী গোনাহ হইতে পূর্ণরূপে বাঁচিয়া অন্য গোনাহ জগতজোড়া পরিমাণ লইয়াও আমার দরবারে উপস্থিত হইলে আমি সেই পরিমাণেই ক্ষমা লইয়া তাহার প্রতি সাড়া দিব।"

এই উক্তির উদ্দেশ্য হইল—গোনাহের আধিক্যে নিরাশ হওয়া কিম্বা গোনাহ করিয়া অতিরিক্ত ভয়ে আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া হইতে বান্দাকে রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত করা পূর্ব্বক বলিতেছেন, অনেক বেশী পরিমাণ গোনাহ লইয়াও আমার দরবারে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আমার নিকট তওবা করতঃ ক্ষমা প্রার্থী হইলে আমি বান্দার প্রতি তদ্রূপ বেশী পরিমাণ ক্ষমাই প্রদর্শন করিব। অবশ্য শেরেকী গোনাহ চিরতরে বর্জ্জন করতঃ পূর্ণ ইসলাম গ্রহণ না করিয়া শত কান্নাকাটি করিলেও শেরেকী গোনাহ ক্ষমা করা হইবে না—ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিধান।

এই উক্তির উদ্দেশ্য গোনাহ করার ব্যাপারে অভয় দান করা নহে, বরং গোনাহ করিয়া ফেলিলে সে ক্ষেত্রে আশ্বাস দান পূর্ব্বক তওবার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং নৈরাশ্য হইতে রক্ষা করা উদ্দেশ্য।

বোখারী শরীফের সর্ব্বশেষ হাদীছ

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার মহান গ্রন্থের সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদ ঐ বিষয়ের প্রমাণে রাখিয়াছেন যাহা মানব জীবনের সর্ব্বশেষ পরিণতি। তাহা এই যে,

মানবের সমুদয় আমল বা কার্য্যাবলী নেক ও বদ—দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের পরিমাপ ও ওজন করা হইবে এবং সেই পরিমাপের ভিত্তিতে ইহজীবনের কর্ম্মের ফলাফল অসীম অনন্ত পরকালে ভোগ করিবে। এই পরিমাপের যন্ত্রটিকে পবিত্র কোরআনে পাল্লা বলা হইয়াছে। হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, উহার উভয় দিকের দুইটি পাল্লা হইবে এবং নিক্তির কাঁটাও হইবে। কিন্তু উহার পূর্ণ আকৃতি কি হইবে এবং আমল বা কর্ম্মের ন্যায় অস্পৃশ্য ও অধাতব বস্তু কিরূপে পরিমাপ করা হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

উল্লেখিত পরিমাপ ও ওজনে প্রথম ঈমান ও কুফরের ওজন হইবে, যাহা মানবের নাজাত পাওয়া না-পাওয়ার মূল চাবিকাঠি। এক পাল্লা হইবে ঈমানের, অপর পাল্লা হইবে কুফরের। ঈমান ও কুফর একত্রিত হইতে পারে না—ঈমান তথায়ই থাকিতে পারে যথায় কুফর মোটেও না থাকে, আর যথায় কুফর থাকে তথায় ঈমান আসেই না। সুতরাং পরিমাপ ও ওজনের এই ধাপে মোসলমানের বেলায় এক পাল্লায় ঈমান থাকিবে, অপর পাল্লা খালি ও শূন্য থাকিবে; ফলে তাহার ঈমানের পাল্লা ভারি হইবে, কুফরের পাল্লা হাল্‌কা হইবে। মোনাফেক, ঈমানহীন ইসলামের দাবীদার ও কাফেরের বেলায় এক পাল্লায় কুফর হইবে অপর পাল্লা শূন্য হইবে। ফলে তাহাদের কুফরের পাল্লা ভারী হইবে, ঈমানের পাল্লা হাল্‌কা হইবে। সুতরাং কাফের-মোনাফেকগণ ওজনের এই ধাপেই চিরজাহান্নামী সাব্যস্ত হইবে। পবিত্র কোরআন ১৮ পারা ৬ রুকুতে আয়াত আছে—

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ -

"যাহাদের (ঈমানের) পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম। আর যাহাদের (ঈমানের) পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারা হইবে নিজের হাতেই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত ও চিরজাহান্নামী।"

আয়াতে "চিরজাহান্নামী" বলায় এই পরিমাপ কুফর ও ঈমানের মধ্যে হওয়া নির্দ্ধারিত; যেহেতু কুফরই চিরজাহান্নামী হওয়ার একমাত্র কারণ।

মোসলমানগণ ওজনের এই ধাপে চিরজাহান্নামী হওয়ার অভিসাপ হইতে অব্যহতি লাভের সফলতার পর দ্বিতীয় ধাপে তাহাদের আমল বা ভাল-মন্দ কর্ম্মের ওজন হইবে। এমনকি মৌখিক কথা-বার্ত্তা, মন-মগজের ধ্যান-ধারনাও এই ওজনের

আওতায় আসিবে। এই পরিমাপে এক পাল্লায় নেক আমল হইবে অপর পাল্লায় বদ আমল হইবে। যাহার নেকের পাল্লা ভারী হইবে সে-ই ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া সরাসরি বেহেশতে পৌঁছিবে এবং ভারী হওয়ার তারতম্যের ভিত্তিতে বেহেশতে শ্রেণী-বন্টন হইবে। পক্ষান্তরে যাহার বদ আমলের পাল্লা ভারী হইবে তাহার বদ আমল যদি কোরআন-হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন বিশেষ সূত্রে ক্ষমা প্রাপ্ত না হয় তবে বদ আমলের দরুন দোযখে যাইবে, কিন্তু তাহার দোযখবাস অস্থায়ী হইবে। এই শ্রেণীর লোকগণ কোরআন-হাদীছে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ সুযোগের দ্বারা দোযখ-বাসের মেয়াদ কর্ত্তন বা গোনাহ অনুপাতে দোযখবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরকালের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করিতে থাকিবে। পবিত্র কোরআন ১৭ পারা ৪ রুকূর আয়াতে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে—

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَاِنْ

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا - وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ -

"কেয়ামতের দিন আমি ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করিব; সেমতে কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না। কাহারও একটি সরিষা বীজ পরিমাণ নেক বা বদ আমল থাকিলে তাহাও উপস্থিত করা হইবে। আমি পূর্ব্বাপর সকলের হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।"

কেয়ামতের দিন পরিমাপ ও ওজন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে ৮ পারা ছুরা আ'রাফের প্রথমে এবং ৩০ পারা ছুরা আল্‌-ক্বারিয়াতেও আয়াত রহিয়াছে।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ - فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ

بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ -

"ঐ দিন (তথা কেয়ামতের দিন মানুষের নেক-বদ আমলের) ওজন করা বাস্তব ও সত্য কথা। সেমতে যাহাদের নেকীর পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যাহাদের নেকীর পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারাই হইবে ঐ দল যাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে আমার আয়াতসমূহের সহিত অন্যায় করিয়া।" (৮ পাঃ)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ - وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ -

"যাহার নেকের পাল্লা ভারী হইবে সে সফলকাম হইবে এবং শান্তির জীবন লাভ করিবে। আর যাহার নেকের পাল্লা হাল্‌কা হইবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে— তাহার ঠিকানা হাবিয়া দোযখে হইবে।" (৩০ পারা)

৩০ পারা ছুরা জুল্‌জিলাতে উল্লেখ আছে—

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

"কেয়ামতের দিন দলে দলে মানুষ নিজ নিজ আমল দেখিবার জন্য চলিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ আমল করিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবে।"

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পরিমাপ ও ওজনের সময় সবই উপস্থিত থাকিবে। অতি ছোট নেক আমলও উপেক্ষিত হইবে না এবং অতি ছোট বদ আমলও লুক্কায়িত থাকিবে না। এইভাবে ওজনের পর নেকের পাল্লা ভারী ও হাল্‌কা হওয়ার তারতম্যে পরিণাম নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, পাল্লা ভারী ও হাল্‌কা হওয়া শুধু নেক-বদের সংখ্যার ভিত্তিতেই হইবে না। একটি কবিরা গোনাহ তওবা না করিলে সমস্ত নেকের উপর ভারী হইতে পারে। একটি সাধারণ গোনাহ আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির বিশেষ কারণাধীনে অনেক ভারী হইতে পারে। কোন গোনাহের বিষক্রিয়া এরূপ হয় যে, উহার দরুন অনেক নেক আমল বিনষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হয়। তদ্রূপ নেক আমলের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সন্তুষ্টির বিভিন্ন কারণাধীনে এক একটি নেক আমলের ওজন দশ হইতে সাত শত গুণ বরং তদপেক্ষাও বেশী হইবে। এতদ্ভিন্ন নেক আমলের দ্বারা গোনাহ বিলুপ্ত হইতে থাকে। কোন কোন সাধারণ তথা মোস্তাহাব নেক আমল ওজনে অনেক ভারী হইবে। এইরূপ একটি জিক্‌রের উল্লেখই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। এই জিক্‌রটিকে মন-মুখের জিক্‌ররূপে, সর্ব্বদার জন্য অবলম্বন করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বস্তু।

২৭০৩। হাদীছ :—* عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ

"سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ"

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন—দুইটি বাক্য আছে যাহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করিতে সহজ ও হালকা, কেয়ামতের দিন নেকের পাল্লায় অতি ভারী। সেই বাক্যদ্বয় হইল—

ছোব্‌হা'নাল্লাহে ওয়া বে-হামদিহী, ছোব্‌হা'নাল্লাহিল্‌ আ'জীম।

"আমি আল্লাহ তায়ালার পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখি এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রসংশা করি। মহামহিম আল্লাহ নিষ্কলুষ ও নিষ্কলঙ্ক—(এই আমার জপনা।)

● মহান প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার প্রসংশা ও শুকুর আদায় করা আমাদের সাধ্যের উর্দ্ধে। হাদীছ শাস্ত্রের মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষী মোসলমান ভাইদের নিকট পৌঁছাইবার যেই সুযোগ তিনি আমাদেরে শুধু নিজ কৃপায় দান করিয়াছিলেন একমাত্র তাঁহার কৃপাই উহাকে সমাপ্তে পৌঁছাইল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ - وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

সমাপ্ত

---

* বোখারী শরীফের মূল হাদীছ গণনাকারীগণ ২৬০২ সংখ্যা বলিয়াছেন। আমাদের অনুবাদে কিছু সংখ্যক হাদীছ একাধিক বার ভিন্ন ভিন্ন নম্বরে উল্লেখ হইয়াছে—যাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরও হইয়াছে। কিন্তু পাঠকদের উপকারার্থে আমরা উহা একাধিক স্থানেই রাখিয়া দিয়াছি, তাই আমাদের অনুবাদে হাদীছ সংখ্যা কিছু বেশী হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার অসীম প্রশংসা এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম। বাংলা বোখারী শরীফ সপ্তম খণ্ড উহার পরিশিষ্ট সহ বাংলাদেশের মোসলেম সমাজে দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রচারিত হইয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণকালে অধমকে আল্লাহ তায়ালা জীবিত রাখিয়াছেন। এই জীবন-নেয়ামতের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার এবং সুযোগ লাভেরও আল্লাহ তায়ালা নিজ কৃপায় অধমকে তৌফিক দিয়াছেন।

পরিশিষ্টের "উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু" শিরোনামার বক্তব্য পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, নবীজী মোস্তফা (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—তাঁহার অনতিকাল পরেই মোসলেম নামধারী একটি বিশেষ দল বা ফের্কার আবির্ভাবের কথা। নবী (দঃ) এই ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন যে, ঐ দলটির দ্বারা দ্বীন-ইসলাম ও মোসলেম সমাজের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হইবে। তাই ঐ দলের প্রতি নবী (দঃ) কোপ-ক্রোধও অতিমাত্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, নাগালে পাইলে তিনি তাহাদেরে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করিয়া দিতেন। মোসলেম সমাজকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাদের ধ্বংস সাধনের প্রতি। উহার উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম জারি করিয়া একটি পরিচ্ছেদ তাঁহার এই মহাগ্রন্থে লিখিয়াছেন।

নবীজী মোস্তফার ছাহাবীগণের যুগেই সেই দলটির আবির্ভাব হইয়াছিল। চতুর্থ খলীফায়ে-রাশেদ আলী (রাঃ) ঐ দলটির বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করিয়া নবীজী প্রবর্ত্তিত বিধান সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাহাদের নিধনকার্য্যে নবীজী মোস্তফার উৎসাহ-দানকে পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত করেন। তাঁহার পরে খলীফা হাসান (রাঃ) কর্ত্তৃক অর্পিত খেলাফত লাভ করিয়া খলীফা বরহক মোয়াবিয়া (রাঃ) ঐ দলের নিধনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁহার পরে ঐ দলের অবশিষ্ট চিহ্নও মুছিয়া যায় এবং তাহারা যেন পুনঃ মাথাচাড়া দিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থাও তিনি তাঁহার সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

এইরূপে ঐ দলটির ধ্বংস সাধন হইলেও তাহাদের দুইটি অশুভ চিহ্ন মোসলেম সমাজের দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকরনে প্রচলিত রহিয়াছে। একটি হইল তাহাদের জঘন্য উদ্দেশ্য হাসিলের পক্ষে সহায়ক কিছু গঠিত জাল হাদীছ।

অপরটি হইল তাহাদের সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত মিথ্যা এবং অপবাদের বহর যাহাকে গোয়েবলী প্রচারণার দ্বারা তাহারা ইতিহাসের রূপ দান করিয়াছিল। তাহাদের এই দুইটি অপকৌশলের বিষময় ক্ষয়-ক্ষতি সুদুর প্রসারী।

মোসলেম সমাজের কর্ণধার মনীষীবৃন্দ যুগে যুগে ঐ বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়াছেন—জাল হাদীছগুলির জাল হওয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, মিথ্যা ইতিহাসকে প্রামাণিকরূপে খণ্ডন করিয়া সত্য ইতিহাস উদ্ধার পূর্ব্বক বড় বড় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিষের শত প্রতিষেধক আবিষ্কার হইয়া থাকিলেও আশীবিষের ক্ষয়-ক্ষতি হইতে রেহায়ী পাওয়া যায় কি?

কোন কুচক্রী যদি অসদুদ্দেশ্যে বা নূতন আবিষ্কারকরূপে প্রসিদ্ধি লাভের মানসে ঐসব মিথ্যা হাদীছ কুড়াইয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে, তবে সে অনেক ক্ষেত্রে তাহার হীন উদ্দেশ্যে সাফল্যের মুখ দেখিতে পারিবে। "চিন্তাবিদ" "চিন্তানায়ক" "গবেষক" "সমাজ সংস্কারক" ইত্যাদি খেতাব লাভ করিতে পারিবে! তদুপরি "অমুকের চিন্তাধারা বিশ্বকে দিয়েছে নাড়া" ইত্যাদি আকাশচুম্বি শ্লোগান নিজের নামে দেয়ালে দেয়ালে সুশোভিত করার প্রয়াস পাইবে। পরিণামে সে সমাজকে বিভ্রান্ত করার এক স্থায়ী প্রকৌশলী হইয়া যাইবে। এবং "জাল্লা ও আজাল্লা"—নিজেও ভ্রষ্ট হইল, অপরকেও বিভ্রান্ত করিল—এই সত্যের লা'নৎ ও অভিশাপে পতিত হইবে।

ইহা অমূলক ভীতি ও অগ্রিম আশঙ্কা নহে; আমাদের সম্মুখেই এই অঘটন ঘটিয়াছে।

ছাহাবীগণ সম্পর্কে মোসলেম জাতির প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করিয়া এবং পূর্ব্বাপর সকল মহামনীষীগণের মতামত, সিদ্ধান্ত ও গবেষণাকে কটাক্ষ করতঃ বর্জন করিয়া শুধু ঐ ফের্কা ও দলের গর্হিত মিথ্যা ইতিহাসের ভিত্তিতে জনৈক ব্যক্তি খলীফা ওসমান (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবীর কুৎসা-চর্চ্চার স্থায়ী সঙ্কলনের জন্ম দিয়া ফেলিয়াছে।

এতদিন ঐসব গর্হিত মিথ্যা ইতিহাসগুলি ইতিহাস নামের কথা-উপকথারূপে বিনা বিচারে সব কিছুর ক্যালেক্টারস্ বা সংগ্রহকারীদের খাতাপত্রের নিভৃত কোণে পড়িয়াছিল। মোসলেম মনীষীবৃন্দ সকলেই ঐগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন ও মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া পরিত্যক্ত গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন। "সমাজ সংস্কারক" এবং "নূতন চিন্তাবিদ" আখ্যা লাভের এক অভিনব ব্যবস্থা হিসাবে ঐ ব্যক্তি খলীফা ওসমান (রাঃ) সহ অনেক বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের গ্লানি-চর্চ্চার ঐসব গর্হিত মিথ্যা বর্ণনাগুলি রং-পলিসের সহিত বিশেষ সংকলনরূপে প্রচার করিয়াছে।

নবীজী মোস্তফার কোপ-ক্রোধ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র খারেজী দলের অশুভ চিহ্নের বিষময় প্রক্রিয়ার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সূত্রে বক্ষ্যমাণ পরিশিষ্টের মধ্যে ঐ ব্যক্তি এবং তাহার কুখ্যাত সঙ্কলনের সমালোচনা ও খণ্ডন বিশেষ ভাবে হইয়াছে।

ঐ ব্যক্তি সুসম্বদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠক। তাহার সমালোচনাকে তাহার দলের রোকন, মোত্তাফেক—উপনেতা ও সদস্যগণ বরদাস্ত করিতে পারে নাই; তাহাদের আঁতে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। অথচ খলীফা ওসমান (রাঃ) ইসলামের স্তম্ভ চতুষ্টের এক স্তম্ভ, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সহচর এবং বিশেষ সম্পর্কধারী ঘনিষ্ঠ। অতএব তাঁহার মান-মর্য্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা সকল মোসলমানের নিকট সমর্থনীয় এবং আদরণীয় হওয়া ঈমান ও ইসলামের স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু দলীয় একাত্মতা ও অধীনতা মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়। সেই অন্ধতা বশেই ঐ দলীয় কোন কোন ক্ষুদে নেতা এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের গ্লানি প্রচার ও দোষ-চর্চ্চা যেই দলের দলীয় কর্ম্মসূচীর বিশেষ অংশ সেই দলের সদস্য ব্যক্তি এই নগণ্য অধমের কুৎসা করিবে তাহাতে বিচিত্রের কি আছে? তদুপরি বাংলা বোখারী শরীফ সপ্তম খণ্ড ও পরিশিষ্টের প্রথম সংস্করণে ঐ কুৎসাকারী কিছু সুযোগও পাইয়াছে। কারণ, চতুর্থ খলীফা-রাশেদ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আকিদা বর্ণনা করার কোন আলোচনা উহাতে করা হয় নাই। অধিকন্তু আনুষাঙ্গিক আলোচনা হইতে পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন, বরং চাতুর্য্যের সহিত খণ্ডিত আকারে কোন কোন বাক্যাবলীকে বিকৃত রূপ দানের অবকাশ পাইয়াছে। এবং সাধারণ জন-সমক্ষে উহাকে তুলিয়া ধরিয়া অধমকে খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপক্ষ এবং তাঁহার খেলাফৎ অস্বীকারকারী রূপে রূপায়িত করার প্রয়াস পাইয়াছে।

যাহারা ইহা করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা নেহাৎ মামুলী কাজ; তাহাদের গুরু যিনি, তিনি ত খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় মাহানকে মিথ্যা চার্জসিটের দ্বারা খেলাফৎ বিতাড়নের আসামী সাব্যস্ত করিয়াছে। সেই দলের সদস্যরা অধমের ন্যায় সামান্য মানুষকে মিছামিছি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শুকুর যে, উক্ত কুৎসার ধূম্রজাল ছিন্ন করতঃ কুৎসাকারীদের মুখে চুন-কালী দেওয়ার সুযোগ অধমকে আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ

সম্পর্কে সুস্পষ্ট আক্বিদা বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল। আর যে সব বাক্যাবলীর দ্বারা কোন প্রকার হেরফের এবং কর্ত্তন ও বিছিন্ন আকারে হইলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ ছিল উহার সংশোধন ও বাস্তব রূপ দান এমনভাবে করিয়া দেওয়া হইল যাহাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ বন্ধের আশা করা যায়।

বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ বন্ধের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা হইল, ইহার পরেও যদি কেহ কোন ছিদ্র আবিষ্কারে সক্ষম হয় এবং তাহা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কারণ, মানুষ ভুল-ক্রুটির সমষ্টি। তবে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ সম্পর্কে অকাট্য আক্বিদা চুড়ান্তরূপে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হওয়ার পর যদি কোথাও কোন উক্তি বা বাক্যে উহার বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয় তবে তাহা মানবীয় ভুল-ক্রুটিই গণ্য করিতে হইবে। সংশোধনের সুযোগ দানার্থে অবহিত করার অনুরোধ সর্ব্বদার জন্য থাকিল।

একটি উজ্জ্বল পার্থক্য

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ও অপবাদ সঙ্কলনের সমালোচনাই পরিশিষ্টে রহিয়াছে এবং তিলে তিলে ঐসব মিথ্যা দোষারোপ ও অপবাদের খণ্ডন প্রামাণিকরূপে করা হইয়াছে। প্রতিটি মিথ্যা ও অপবাদকে ইতিহাস দ্বারা মিথ্যা ও অপবাদ হওয়া প্রমাণ করা হইয়াছে।

ঐ কুখ্যাত সঙ্কলকের পদলেহীরা পরিশিষ্টে বর্ণিত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের কোন একটিরও উত্তর দান বা খণ্ডন করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায়ও তাহারা তাহাদের গুরুকে কোন একটি মিথ্যা হইতে চুল পরিমাণ হটাইতে প রিয়াছে কি ? বা অন্ততঃ নিজেরা তাহার মিথ্যার ধূম্রজাল হইতে হটিতে পারিয়াছে কি ?

আশ্চর্য্যের বিষয়—ঐ কুখ্যাত সঙ্কলনে ব্যথিত হইয়া মোসলেম বিশ্বের খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দ সঙ্কলককে সতর্ক করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্কলনে পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করিাছেন, কিন্তু তাহার টনক নড়ে নাই। অবশেষে তাঁহারা সমাজকে ঐ সঙ্কলক হইতে সতর্ক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরিশিষ্টের শেষ ভাগে ঐরূপ তিনজন মহা মনীষীর সতর্কবাণী ও মন্তব্যের উদ্ধৃতি ইনশা-আল্লাহ তায়ালা পেশ করা হইবে। তাঁহারা পাক-ভারত-বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় সর্ব্ববরণীয় মহান এবং মোসলেম জাতির অন্যতম জাতীয় দিশারী। তাঁহারা হইতেছেন—(১) হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ) মুফতী-আজম পাকিস্তান। (২) শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেব সাহারণপুরী, মোহাজেরে মদনী। (৩) হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী।

পক্ষান্তরে আমরা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অলীক সমালোচনারও মূল্য দিয়াছি। বক্তব্য প্রকাশের সংক্ষিপ্ততা বা প্রকাশ-ভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যার আড়ালে কিম্বা শব্দার্থের বিভিন্নতার সুযোগ লইয়া, এমনকি মূল বক্তব্য ছাটকাটের মাধ্যমে সমালোচনার যোগ্যরূপে গড়াইয়া দোষারোপের পুঁজি সংগ্রহকারীকেও আমরা উপেক্ষা করি নাই।

ঐ শ্রেণীর সমালোচনার মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্য খোলাফায়ে-রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত সম্পর্কে এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের মর্য্যাদা এবং তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমাদের মতবাদ ও আকিদা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

অতীত ও বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমরা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা নিজের স্বার্থেই শত্রু-মিত্র, হিতাকাঙ্খী ও ঈর্ষাপরায়ন প্রত্যেক শ্রেণীয় সমালোচকেরই মর্য্যাদা ও মূল্য দান করিব এবং সমালোচনার দ্বারা উপকৃত হইতে যত্নবান হইব।

আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি—চতুর্থ খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত বরহক্ক বিশ্বাস করা সম্পর্কে এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা, আকিদা ও মতবাদ আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দিলাম। ইহার বিপরীত আমাদের কোন ভুল আমাদেরকে অবহিত করিলে সানন্দে আমরা উহার সংশোধন করিব। উহার জন্য বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা বা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় ব্যয় করিতে হইবে না।

বক্ষমান পরিশিষ্টের সমালোচনায় যাহাদের আঁতে ঘা লাগিয়াছে তাহাদের গুরু সাহেব যদি এইরূপ সৎ সাহস দেখাইতে পারিতেন তবে তাঁহার সম্পর্কীয় সমালোচনা চিরতরে মুছিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু তিনি ত পূর্ব্ববর্ত্তী মহামনীষী-গণকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং এই যুগের মনীষীগণকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ক

নির্দ্বিধা ও নিঃসংশয়ে আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রত্যেক মোসলমানের এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আলী (রাঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনের চতুর্থ জন—চতুর্থ খলীফা-রাশেদ ছিলেন। অবশ্য যে সব ছাহাবীগণ তাঁহার খেলাফতকে স্বীকৃতি দানে বিরত ছিলেন, যথা—তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ)—যাঁহারা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা লাভ করিয়াছিলেন বেহেশতী হওয়ার এবং আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী

ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁহারা আমাদের সমালোচনার ঊর্দ্ধে এবং বিধানগত ভাবেও তাঁহারা নির্দ্দোষ।

একই রোগী সম্পর্কে দুইজন এম, আর, সি, পি সার্টিফিকেটধারী ডাক্তার নিজ নিজ যুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করিলে ডাক্তারদ্বয় সম্পর্কে যে ধারণা বিধেয়, উল্লেখিত ছাহাবী-পক্ষদ্বয় সম্পর্কেও আমাদের ধারণা তদ্রূপই। উভয় পক্ষ যোগ্যতা ও একনিষ্ঠতার সহিত নিজ নিজ যুক্তিতে মোসলেম জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় খেলাফত-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা ও একনিষ্ঠতা সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত্ পোষণের অবকাশ দানে যথেষ্ট ছিল।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত বরহক ও শুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমাদের পক্ষে দ্বিধার অবকাশ এই জন্য নাই যে, আলী (রাঃ) খেলাফতের পূর্ণ যোগ্যতা-সম্পন্ন ছিলেন এবং মদীনায় খলীফা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অধিক সংখ্যক নির্ব্বাচনকারী যে ভাবেই হউক তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করিয়াছিলেন। তখন বা তাঁহার জীবদ্দশায় পরেও তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কেহ খেলাফতের দাবীদারই ছিলেন না। কারণ, সকলেই আলী (রাঃ)কে খলীফা হওয়ার পূর্ণ যোগ্যই গণ্য করিতেন। বিরোধের কারণ ছিল ভিন্ন, যাহার বিবরণ "খারেজী দলের ইতিহাস, খারেজী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ, আলী (রাঃ) ও অপর ছাহাবীগণের বিরোধ" আলোচনায় মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এবং বিস্তারিত বিবরণ বক্ষমান পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন।

ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা নিষিদ্ধ

বাংলা বোখারী শরীফ ষষ্ঠ খণ্ডের আরম্ভেই এই বিষয়ে বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের আক্বিদা এবং পূর্ব্বাপর মোসলেম মনীষী ইমামগণের সর্ব্বসম্মত মতবাদ ইহাই যে, আমাদের জন্য ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা জায়েয নহে।

ইহা আমাদের অকাট্য আক্বিদা—মতবাদ ও বিশ্বাস। ইহার বিপরীত কোন শব্দ বা বাক্য যদি আমাদের কথায় বা লিখায় পরিলক্ষিত হয় তবে তাহা আমাদের ভুল সাব্যস্ত করিতে হইবে। ঐরূপ ভুল আমাদিগকে জ্ঞাত করিলে আমরা তাহা সংশোধন করিব এবং ভুল জ্ঞাতকারীর চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

কোন ছাহাবীর প্রতি কোন একটা দূষণীয় শব্দ প্রয়োগ করা অপেক্ষা এক হাজার বার নিজের ভুল স্বীকার করা উত্তম।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

বাংলা বোখারী শরীফ সপ্তম খণ্ডে ২৫৯৪ নং হাদীছের আলোচনায় খারেজী ফের্কা নামক একটি বিশেষ মোরতাদ বা ভ্রষ্ট দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত হাদীছের পরিচ্ছেদ পরে সেই খারেজী ফের্কা সম্পর্কে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) খারেজী ফের্কার বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম বয়ান করিয়াছেন। সেই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ছয়টি হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বিশেষ ফের্কা বা দলের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া ঐ দলটি সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ দলটির প্রতি হযরত (দঃ) ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত (দঃ) ঐ দলের লোকদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, তাহারা মোসলমান অপেক্ষা উত্তম নামায আদায়কারী, উত্তম রোযা পালনকারী এবং উত্তম আকারে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী হইবে। এতদসত্ত্বেও হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা হইবে ইসলাম হইতে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। (২) দৃষ্টান্তের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বুঝাইয়াছেন যে, তাহারা দ্বীন-ইসলামকে ভীষণভাবে ঘায়েল করিবে এবং উহার বিরাট ক্ষতি সাধন করিবে। (৩) তাহাদেরে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার নিকট এতই পছন্দণীয় যে, তাহাদের হত্যাকারীকে কেয়ামতের দিন বিশেষ ছওয়ার দান করা হইবে। (৪) তাহাদের কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি এবাদত-বন্দেগী আল্লার নিকট আদৌ কবুল হইবে না। (কারণ, তাহারা মোনাফেক তাহাদের এই সব এবাদত হইবে মোনাফেকীরূপে)। (৫) তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করার জন্য হযরত (দঃ) নির্দ্দেশ দিয়াছেন। (৬) হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে পাইলে এমন ভাবে নিধন করিতাম যেরূপ আল্লাহ তায়ালা আ'দ ও ছমূদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত ফের্কা বা দলটি যে, খারেজী ফের্কাই তাহাও ঐ হাদীছসমূহে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত রহিয়াছে। পাঠকবৃন্দ! এই মুহূর্ত্তে সপ্তম খণ্ড বোখারী শরীফের ২৫৯৪ নং হাদীছের পরিচ্ছেদ হইতে ২৬০০ নং হাদীছ পর্য্যন্ত বিশেষ মনযোগের সহিত পাঠ করিয়া ঐ হাদীছ কয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিবেন।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, এই ফের্কা বা দলটির প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এত ক্রোধ ও কোপ কেন ছিল? হযরতের যমানায় যে মোনাফেক দল বিদ্যমান ছিল তাহাদের প্রতিও ত হযরত (দঃ)কে এত কোপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তরের জন্য অত্র পরিশিষ্ট লেখা হইল। ইহাতে খাজেরী দলের জঘন্যতম বড় বড় অপরাধ সমূহ, মোসলেম জাতির প্রতি তাহাদের কুঠারাঘাত এবং মোসলেম সমাজকে বিধ্বস্ত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রামাণিক ইতিহাস বর্ণনা করা হইবে। খারেজী দলের সেই ইতিহাসই হইবে উক্ত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর। প্রথমে তাহাদের ইতিহাসের মোটামুটি আভাস দেওয়া হইতেছে, পরে উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

(১) এই খারেজী দলই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা ও মিথ্যা অপবাদের ইতিহাস গড়াইয়াছে।

(২) তাহারাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মোসলেম জাতির শান্তি, শৃঙ্খলা ও শক্তির মূল উৎস নেজামে-খেলাফৎ বা সর্ব্বসম্মত, ঐক্যতাপূর্ণ সুদৃঢ় খেলাফৎ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে।

(৩) ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র মূলকভাবে তাহারা খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ায়।

(৪) তাহারাই খলীফা ওসমান (রাঃ)কে নির্ম্মমভাবে শহীদ করে।

(৫) তাহারা খলীফা ওসমানকে শহীদ করার পর গোপন ষড়যন্ত্র চালাইয়া ছাহাবীগণ সহ সমগ্র মোসলেম জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টি করে।

(৬) ইতিহাসের সর্ব্বাধিক হৃদয় বিদারক ঘটনা—"জামাল-যুদ্ধ" যাহার ফলে মোসলমানদেরই দুই পক্ষে দশ হাজার লোক শহীদ হইয়াছিলেন একমাত্র এই খারেজী দলের জঘন্য ষড়যন্ত্রেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(৭) তাহারাই প্রথমে গা-ঢাকা দিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মিশিয়া থাকে এবং শক্তি সঞ্চয়ের পর তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে।

(৮) শক্তি সঞ্চয়ের পর দলবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহারা তাহাদের মতবাদ বর্জ্জনকারী সমুদয় মোসলমানকে, এমনকি চার খলীফা সহ ছাহাবীগণকেও কাফের সাব্যস্ত করে। সেমতে তাহারা সুযোগ বুঝিয়া মোসলমানদের উপর আক্রমণ, হত্যা এবং লুণ্ঠন চালায়।

(৯) তাহারাই গোপন আক্রমণে আলী (রাঃ)কে শহীদ করে।

(১০) সর্ব্বাধিক জঘন্য ও স্থায়ী অপরাধমূলক কাজ তাহাদের ইহাও ছিল যে, তাহারা তাহাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খলীফা ওসমানের এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও গর্হিত অভিযোগ গোয়েবলের ন্যায় এমনভাবে ছড়ায় ও প্রচার করে যে, ঐ সব মিথ্যা ও গর্হিত বিষয়বস্তুগুলি

সাধারণ্যে সত্যে পরিণত হইয়া যায়। এমনকি ইতিহাস-সঙ্কলক যাহাদের নীতি হইল, প্রচলিত বর্ণনা বিবৃতি ও বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ (Collection) করা; বাছনী (Selecton) করা তাহাদের কাজ নহে—তাহাদের সঙ্কলিত ইতিহাস গ্রন্থেও সেই সব মিথ্যা ও গর্হিত অপবাদগুলি স্থান পায়। এই ভাবে তাহারা ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়াস পায়। অধিকন্তু তাহারা ইতিহাস বিকৃতির উপর ক্ষান্ত হয় নাই; তাহারা তাহাদের গর্হিত অপবাদের সমর্থন ও সূত্ররূপে অনেক অলিক কথা হাদীছ আকারেও জাল করিয়া প্রচার করে।

তাহাদের এই অপরকর্ম্মটির বিষ-ফল ছিল সুদুর প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী। এমনকি পরবর্ত্তী কালে যখন তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী ও তাঁহার বর্ণিত নিদর্শন সমূহের সাহায্যে তাহাদিগকে চিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, তখন হইতে তাহাদের নিধন-কার্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথম হযরত আলী (রাঃ) তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাদের উপর ধারাবাহিক হত্যা কার্য্য চালাইয়া তাহাদের দলকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছিলেন।

এইভাবে তাহাদের দল ধ্বংস হয়, কিন্তু খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের নামে তাহাদের গোয়েবলী প্রচারণায় সৃষ্ট মিথ্যার বহর ইতিহাস-গ্রন্থাবলীতে থাকিয়া যায়। যাহা দ্বারা আজও বহু লোক বিভ্রান্ত হইতেছে। অধিকন্তু কেহ কেহ ঐ সব ইতিহাস কুড়াইয়া প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমে সমাজ বিভ্রান্ত হওয়ার স্থায়ী ও সহজ ব্যবস্থা করিতে সুযোগ পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা নামে পরিচিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জনাব আবুল-আ'লা মৌদুদী সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হালে মৌদুদী সাহেব উর্দ্দু ভাষায় ৩৫১ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক জন্ম দিয়াছেন। পুস্তকটির বিষয়বস্তু হইল—"মোসলেম সমাজ হইতে খেলাফত-তন্ত্র বিতাড়নকারী অপরাধীদেরে সেনাক্ত করা।" পরম পরিতাপের বিষয়, মৌদুদী সাহেব উক্ত অপরাধের প্রথম নম্বর আসামী সাব্যস্ত করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুই তনয়ার জামাতা খলীফা ওসমান (রাঃ)কে। এতদভিন্ন খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অভিযুক্ত করার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মী অনেক ছাহাবীর নামে মিথ্যা অপবাদ গড়াইয়াছেন এবং অতিরঞ্জিতভাবে দোষারোপ করিয়াছেন। মৌদুদী সাহেব তাঁহার এই সেনাক্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ঐ সব ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদসমূহের উপর যেইগুলিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গড়াইয়া ছিল ইসলাম ও মোসলমানদের চিরশত্রু কুখ্যাত খাজেরী দল তাহাদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—তথা মোসলমানদের খেলাফৎ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করার জন্য। মৌদুদী সাহেব খারেজী দলের জন্ম দেওয়া অপবাদ ও অপপ্রচারগুলি কুড়াইয়াই

ক্ষান্ত হন নাই, ঐ সব পূতি-পচাগুলিকে স্বীয় পাণ্ডিত্যের রংপালিশ দ্বারা সাজাইয়া আকর্ষণীয় রূপ দান করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার পুস্তকটি কুখ্যাত খারেজী দলের মুখপাত্রের ভুমিকা পালন করিয়াছে।

আমাদের দুঃখ-বেদনা, খেদ ও ক্ষোভের সীমা থাকে না ইহা দেখিয়া যে, প্রবীণ মৌদুদী সাহেব তাঁহার সমুদয় জ্ঞান ও গবেষণা (Stuby এবং Research) কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীর দোষ-কুড়ানো ও দোষ-চর্চ্চায়ই খতম করিয়াছেন। কিন্তু ইসলাম ও মোসলেম বিদ্বেষী কুখ্যাত খারেজী দলের খোঁজ সমাজকে দেওয়ার কোন উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। ছাহাবীদের আমলের কেলেঙ্কারীর ইতিতাস সমাজে ছড়াইতে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের সর্ব্বময় পুঁজি ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব কেলেঙ্কারীর মূলে যে পঞ্চম বাহিনীটি ছিল—সমাজের নিকট তাহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার কোন প্রচেষ্টাই তিনি করেন নাই।

আরও একটি বিষয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে—খাজেরী দল তাহাদের মিথ্যা অপবাদের পক্ষে কিছু সংখ্যক হাদীছ জাল করার প্রয়াস পাইয়া ছিল বটে এবং তাহাদের গর্হিত ভিত্তিহীন অপবাদগুলিকে "গোয়েবলী" প্রচারণার দ্বারা ইতিহাসের রূপ দানে কৃতকার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোসলেম উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা ও রহমতে ঐ সব রোগ-বীজাণুর প্রতিষেধক লাভের উত্তম সুযোগও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সব জাল হাদীছ শুধু (Collector) সংগ্রহকারীদের গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়া থাকিলেও জাল হাদীছের একটি সংখ্যাও ছনদের কষ্টি পাথরে (Selector) বাছনকারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং কেহ যদি কেবল সংগ্রহ-কারীদের ঝোলা হইতে শুধু পূতি-পচা কুড়ায় তবে তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। ইতিহাসের বেলায়ও তদ্রূপ—আমাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলি খারেজীদের প্রচারিত বিকৃত ইতিহাসের উপরই ক্ষান্ত নহে। উহাতে সত্য ইতিহাসের আলোও পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। অতএব যদি কেহ ইতিহাস গ্রন্থাবলী হইতে পচা-গান্দা বিকৃত ইতিহাসই বোকচা বাঁধিয়া নিয়া আসে এবং সমাজে উহার দুর্গন্ধ ছড়ায়, তবে লা'নৎ ও অভিশাপের ভাগী সে-ই হইবে। তাহার এই খোড়া কৈফিয়ত কেহই শুনিবে না যে, আমি যাহা কিছু কুড়াইয়াছি সবই ইহিতাস হইতে আহরিত।

মৌদুদী সাহেবের উক্ত পুস্তকে তাঁহার ভুমিকা ঠিক এইরূপই। তিনি উহাতে ইতিহাস গ্রন্থাবলীর হাওয়ালা—রেফাসেন্স (Reference) বা বরাতের বহর সাজা-ইয়াছেন, যাহা দেখিয়া সাধারণভাবে মানুষ অধিক বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু তাঁহার বোকচায় সমাবেশ কৃত সবই যে, খারেজী দলের খন্দক হইতে নির্গত পূতি-পচা তাহা লক্ষ্য করিলে ঐ সব রেফাবেন্সের কোন মূল্যই থাকে না।

মৌহুদী সাহেব তাঁহার পুস্তকে খলীফা ওসমান (রাঃ) ভিন্ন আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণকে ঘায়েল করিয়াছেন এবং উহার জন্যও মাল-মশল্লা সংগ্রহ করিয়াছেন খারেজীদের দোকান হইতেই। খারেজী দলের উদ্দেশ্য ছিল—খলীফা ওসমান (রাঃ)কে বদনাম করিয়া মোসলমানদের সুখ সমৃদ্ধি ও শক্তির উৎস খেলাফৎ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করা এবং বড় বড় ছাহাবীগণকে অপবাদ দ্বারা ঘায়েল করিয়া ছাহাবীদের প্রতি মোসলমানদের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করতঃ মোসলমানদের দ্বীন-ঈমানকে শিথিল করিয়া দেওয়া। আর মৌহুদী সাহেবের উদ্দেশ্য হইল—পূর্ব্বাপর ইমামগণের মতের বিপরীত তিনি যে একটি মতবাদ গড়াইয়া রাখিয়াছেন যে, "ছাহাবীগণ মোসলমানদের জন্য আদর্শ নহেন"; ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা করিয়া ঐ কুখ্যাত মতবাদের প্রতি জনমতকে আকৃষ্ট করা।

খারেজী দল এবং মৌহুদী সাহেব উভয়ের কুমতলব সিদ্ধির পথ রুদ্ধ করিতে হইলে তাহারা বিভিন্ন ছাহাবীর প্রতি যে যে অপবাদের কর্দ্দম ছুড়িয়াছে উহার প্রত্যেকটির ধুম্রজাল ছিন্ন করিয়া সত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু পরিশিষ্টকে সংক্ষেপ করার তাকিদে নমুনা স্বরূপ শুধু কেবল খলীফা ওসমানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা হইবে। অবশ্য প্রথমে ছাহাবা-শ্রেণী সম্পর্কে মোসলমানদের কর্ত্তব্যের উপর আলোকপাত করা হইবে। তারপর ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হইবে। অতঃপর খারেজী দলের উৎপত্তি এবং তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যকলাপের ইতিহাস বর্ণনা করা হইবে—যাহার মধ্যে খারেজী দলের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং ক্ষোভ ও কোপের মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে। তারপর খলীফা ওসমানের প্রতি আরোপিত বিভিন্ন অপবাদ খণ্ডন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে খারেজী দলের মুখপাত্র মৌহুদী সাহেবের উক্ত কুখ্যাত পুস্তকের কিছু উদ্ধৃতি দেখাইয়া উহার অসারতা প্রমাণ করা হইবে।

وما علينا الا البلاغ

আমাদের দায়িত্ব হইল—সত্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে মোসলমানদের কর্তব্য

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে অসংখ্য অলৌকিক গুণাবলীর সহিত বিশেষ করুণারূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরতের একটি বিশেষ অলৌকিক গুণ ছিল তাঁহার পরশ-দৃষ্টি। যেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতে পরশ পাথরে এই তাছীর আছে যে, উহার মামুলী ঘর্ষণে লোহা স্বর্ণ হইয়া যায় সেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতেই রসুলের পরশ-দৃষ্টির তাছীরে অল্প সময়ে মাটির মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হইয়া যাইত।

হযরতের এই অলৌকিক গুণটিকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা এক হাদীছে বুঝান হইয়াছে—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسلة

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বসন্তের স্বর্ণ-ফলানো মলয় বায়ু অপেক্ষা অধিক ও দ্রুত জীবনীশক্তি সঞ্চারণকারী ছিলেন।" (বোখারী শরীফ)

তাছীর গ্রহণে ক্ষেত্র ও পাত্রের যোগ্যতা তথা অক্ষুণ্ণ ঈমানের সহিত যে ব্যক্তি রসুলুল্লার পরশ-দৃষ্টি এবং সাহচর্যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই ছাহাবী বলে।

হযরতের পরশ-দৃষ্টিতে ছাহাবীদের মধ্যে যে গুণাগুণের সঞ্চার হইয়াছিল পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে তাহার অনুভূতি দুরূহ হইলেও আল্লাহ এবং রসুলের যে সব সাক্ষ্য তাঁহাদের জন্য রহিয়াছে উহার দ্বারা তাঁহাদের সেই গুণাগুণের ক্রিয়া ও ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। যথা, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا -

"মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল। আর তাঁহার ছাহাবীগণ কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর এবং পরস্পর কোমল। তাঁহাদিগকে দেখিবে—আল্লার প্রতি খুব নত, রুকু-সেজদা রত, আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার অন্বেষণে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। আল্লার প্রতি অনুরাগের আভা তাঁহাদের চোখে-মুখে উদ্ভাসিত। তাঁহাদের এই গুণাবলীর বর্ণনা তৌরাত এবং ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রহিয়াছে। (২৬ পাঃ ১১ রুঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه

"আমার ছাহাবীদিগকে মন্দ বলিও না ; তোমাদের কেহ ওহোদ পর্ব্বত পরিমাণ স্বর্ণ দান-খয়রাত করিলেও তাঁহাদের মাত্র এক মুদ্দ (চৌদ্দ ছটাক) বা তার অর্দ্ধ পরিমাণ (কোন বস্তু) দানের সমান হইতে পারিবে না।" (বোখারী ও মোসলেম)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন—الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي "আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে—আমার পরে তোমরা তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিও না।" (মেশঃ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন—

اولئك اصحب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما......اختارهم الله لصحبة نبيه......

"ঐ সকল লোক—মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ এই উম্মতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ছিলেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ ছিল সর্ব্বাধিক সৎ-সাধু ও নির্ম্মল। তাঁহাদের এল্‌ম ও জ্ঞান ছিল সর্ব্বাধিক গভীর, তাঁহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি ছিল সরল। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিশিষ্ট পয়গাম্বরের সাহচর্যের জন্য এবং স্বীয় দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাছিয়া নিয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে। সুতরাং হে মোসলেম সমাজ! তোমরা তাঁহাদের ক্ষেত্রে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলিও। (মেশকাত শরীফ)

ছাহাবীদের জীবন-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ছাহাবীদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল—

ছাহাবী তাল্‌হা (রাঃ) তিনিও খলীফা ওসমানের শহীদ হওয়ার পর আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণকারীদের একজন ছিলেন। ছাহাবীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত মতাবলম্বীগণ তাঁহার কার্য্যকে অন্যায়ের মধ্যে শামিল করিয়া থাকে। একজন সাধারণ লোকের কার্য্যবিধির সহিত তুলনার দৃষ্টিতে উহাকে অন্যায় বলার সুযোগও রহিয়াছে। মৌহুদী সাহেব ত এই ব্যাপারে তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর জঘন্যতম আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যবিধি এতই মকবুল ছিল যে, এই অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে তাঁহার আত্ম-বিসর্জনকে আল্লাহ তায়ালা শহীদ হওয়ার সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, যাহার প্রমাণ ইতিহাসে রহিয়াছে—

তাল্‌হা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপক্ষে বছরার রণাঙ্গনে শহীদ হইয়া ছিলেন এবং বছরায়ই সমাহিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বহু দিন পর এক ব্যক্তি একাধারে তিন রাত্র স্বপ্নে দেখিল—তাল্‌হা (রাঃ) তাহাকে বলিতেছেন, حولوني من قبري فقد اذاني الماء "আমার বর্ত্তমান কবর

হইতে আমাকে সরাইয়া নেও, পানির দরুণ আমার কষ্ট হয়।" বছরার তৎকালীন শাসনকার্ত্তা ছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট স্বীয় স্বপ্ন ব্যক্ত করিল। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় বছরার লোকগণ দশ হাজার দেরহামে একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া তাল্‌হা (রাঃ)কে তথায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিল। তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দেহ কবর হইতে বাহির করা হইলে দেখা গেল—বাস্তবিকই (নিকটবর্ত্তী একটি ঝরণার) পানিতে তাঁহার দেহের অংশ বিশেষ পানি-ভিজা সবুজ হইয়া গিয়াছে। واذا هو كهيئته يوم اصيب "এবং দেখা গেল, তাঁহার দেহ অপরিবর্ত্তিত রূপে ঠিক ঐ অবস্থায়ই রহিয়াছে যে অবস্থায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ-ওয়াননেহায়াহ, ৭—২৪৭)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, কাফেরদের বিরুদ্ধে একমাত্র দ্বীন ইসলামের জন্য একনিষ্ঠতার সহিত জেহাদে প্রাণ বিসর্জন দিলে যে মর্ত্তবার শহীদ হওয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাল্‌হা (রাঃ)কে সেই মর্ত্তবাই দিয়াছেন। অথচ মৌদুদী সাহেব তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর উক্ত কার্যক্রমকে জাহেলিয়ত তথা অন্ধকার বা কুফুরী যুগের কার্য্য বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন—কত বড় ধৃষ্টতা!

এস্থলে অন্ধকার যুগের কার্য্যক্রমের উল্লেখ ত একমাত্র ঈমানহীন লোকের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবেত এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মোসলমানের একনিষ্ঠতা যাহা হইতে পারে তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠতা যে উহা অপেক্ষাও কত উর্দ্ধে ছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাঁহার কার্য্যক্রমের সূক্ষ্ম বিশুদ্ধতা এবং অন্তরের একনিষ্ঠতা যে পরিমাণ পরিপক্ক ও অসাধারণ ছিল তাহা ব্যক্ত করা ত দুরের কথা উহার পরিমাপও আমাদের পক্ষে সহজ নহে; তুলনা মূলকরূপের কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে—

আলী (রাঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ ছিল এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মুখে না হইলেও অন্তরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে—দলগত বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পুরা করা, দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা বা কোন স্বার্থের সুযোগ লাভ করা—ইত্যাদি। পক্ষান্তরে তাল্‌হা (রাঃ) এবং তৎপক্ষীয় ছাহাবীদের অভ্যন্তর যে ঐ শ্রেণীর হীন উদ্দেশ্যাবলী হইতে কত পাক-পবিত্র ছিল তাহা বিতর্কে প্রকাশ করা না গেলেও আল্লার নিকট লুক্কায়িত ছিল না।

আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও ভাষায় উক্ত ছাহাবীগণের স্বচ্ছ উদ্দেশ্য ও নির্ম্মল একনিষ্ঠতার বাস্তবরূপ প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নহে, তবুও নিম্নে তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের চেষ্টা করা হইল—

খারেজী দলের ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারিবেন, হিজরী ২৫ সনে ছদ্মবেশে মোসলমান দলভুক্ত হইয়াছিল এক ইহুদী মোনাফেক যাহার নাম আবদুল্লাহ

ইবনে সাবা। সেই জঘন্য মোনাফেকের ষড়যন্ত্রে নূতন-পুরাতন মোনাফেক গোষ্ঠির সংযোগে মোসলমানদের শক্তি শান্তি ও শৃঙ্খলার উৎস—সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক খেলাফৎকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে একটি গুপ্তদল সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপে তাহাদেরই ঘাতকদলের হাতে খলীফা ওসমান (রাঃ) নির্ম্মমভাবে শহীদ হন। এই গুপ্ত দলটির জঘন্য উদ্দেশ্য যে কত সুদুর প্রসারী ও সুপরিকল্পিত ছিল তাহার সামান্য আঁচ করা যায় ইহা দ্বারা যে, তাহারা খলীফা ওসমানকে শহীদ করিয়া প্রথমতঃ মোনাফেকীর সহিত গা-ঢাকা দিয়া থাকে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে তাহাদেরই সুসঙ্গবদ্ধরূপে গঠিত ঘাতক দল এক যোগে আলী (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আম্‌র ইবনুল আছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর ফজর নামাযের সময়ে গুপ্ত আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। সেই আক্রমণে আলী (রাঃ) শহীদ হন, মোয়াবিয়া (রাঃ) ভীষণভাবে আহত হন এবং আম্‌র ইবনুল আছের স্থলে অপর এক ব্যক্তি শহীদ হন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা এই সন্ত্রাসবাদী দলটির বিস্তারিত ইতিহাস পর্য্যালোচিত হইবে।

উক্ত সন্ত্রাসবাদী মোনাফেক উপদল কর্ত্তৃক খলীফা ওসমানের হত্যার দরুণ মোসলেম সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির উৎস সুপ্রতিষ্ঠিত-খেলাফৎ বিধ্বস্ত হওয়ার পর দেখা গেল, পরবর্ত্তী খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচনে ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটি জবরদস্তি মূলক গায়ে পড়িয়া মোড়লগিরী ও মাতব্বরী করিতেছে। আরও দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ করা গেল যে, ঐ সন্ত্রাসবাদীগণ ছদ্মবেশে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে রহিয়াছে—যাহা স্বয়ং আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরও ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির পরিপন্থী ছিল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ মদিনায় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনে সাহস পাইতেছিলেন না। এমনকি তৎসম্পর্কে তাঁহাকে বলা হইলে, তিনি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করতঃ বলিলেন—"তাহাদের বিরুদ্ধে কিরূপে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, অথচ তাহারা আমাদের আয়ত্তে নহে, আমরাই তাহাদের আয়ত্তে" (তারীখে কামেল, ৩—১০০)। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ঐ পরিস্থিতিতে তাঁহার উপর ন্যস্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করিয়া যাওয়াই মোসলেম সমাজের জন্য কল্যাণমূলক ছিল, তাই তিনি এই পথেই অগ্রসর হইলেন।

এই পরিস্থিতিতে তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) যাঁহারা আশারা-মোবাশ্-শারাহ্ তথা ইহজীবনেই আল্লার রসুল কর্ত্তৃক বেহেশতের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত দশজন

ছাহাবীর অন্যতম দুইজন ছিলেন। তাঁহারা একমাত্র মোসলেম সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে খেলাফৎ বিধ্বস্তকারী সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাবমুক্ত শক্তিশালী খেলাফত কাঠামো প্রতিষ্ঠার সাহসে বুক বাঁধিয়া সন্ত্রাসবাদী দল কবলিত মদীনা ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া গেলেন। তথায় আয়েশা (রাঃ)কে ঐ উদ্দেশ্যে দৃঢ়পদ পাইলেন। আরও অনেক ছাহাবী ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং সকলেই উক্ত সন্ত্রাসবাদী উপদলটির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতঃ নেজামে-খেলাফৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ঝাপাইয়া পড়িলেন। সিরিয়া অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া (রাঃ)ও এই উদ্দেশ্য লইয়া দাঁড়াইলেন।

মোনাফেকদের চিরাচরিত স্বভাব "মান্-না-মান্ ম্যাঁয় তেরা মেহ্‌মান" রূপে ঐ মোনাফেকগোষ্ঠি সন্ত্রাসবাদী দলটি আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়ায় গোটা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাঁধে। কিন্তু তাঁহাদের মূল লক্ষ্যস্থল ছিল, সুপ্রতিষ্ঠিত খেলাফৎ ধ্বংসকারী সন্ত্রাসবাদী দলটিকে উৎখাত করিয়া সুষ্ঠু খেলাফৎ-কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে তাল্‌হা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য—স্বচ্ছ একনিষ্ঠতা, ও আল্লার সন্তুষ্টি লাভের নির্ম্মল স্পৃহাকে এত সুদৃঢ় ও সুকঠিনরূপে আঁকড়িয়া রহিয়াছিলেন যে, তাহা একমাত্র রসুলের পরশ-দৃষ্টিতে তৈরী ব্যক্তিদের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আলী (রাঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) উভয় পক্ষই আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মোসলেম সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার যে অনাবিল অকপট একনিষ্ঠতার ধারক ছিলেন উহারই দ্বারা তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত মর্য্যাদাবান হইয়াছেন যে, পরস্পর বিরোধের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের উভয় পক্ষকে শহীদ হওয়ার সর্ব্বোচ্চ মর্ত্তবা দান করিয়াছেন।

এই সূক্ষ্ম কিন্তু বাস্তব ও সুগভীর তথ্যটিকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা আগুণ নিয়া খেলা শুরু করেন তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য দার্শনিক কবি মাওলানা রুমীর একটি দর্শন স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ভাষা-জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতার দরুণ উহার বাংলা ব্যাখ্যায় অসমর্থ হইয়া কবির মূল উক্তিটি উদ্ধৃত করা হইল মাত্র। নিজে না বুঝিলে কোন দার্শনিক আলেমের সাহায্য গ্রহণ করিবেন—

کار پاکان را قیاس از خود مگیر — گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر

অন্য রূপে যাহা অধিক উপভোগ্য—

کار پاکان را قیاس از خود مگیر — گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر
شیر ان باشد که مردم میدرند — شیرآن باشد که مردم میخورند

এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল আল্লার রসুলের ছাহাবীগণ সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও মোসলমানদের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেওয়া যে, ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা দোষ কুড়ানো ত দূরের কথা তাঁহাদের কোন বিষয়কে হাল্‌কা ও সাধরণ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহাদের সমলোচনা করাও জঘন্য কাজ। স্বয়ং ছাহাবীদের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ছাহাবী নয় এমন ব্যক্তিকে ছাহাবীর সমালোচনা হইতে বিরত রাখিয়াছেন; এই বলিয়া যে, তিনি ত আল্লার রসুলের ছাহাবী—তিনি আল্লার রসুল হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ৫২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা মোয়াবিয়া (রাঃ) এশার নামাযান্তে বেতের নামায এক রাকাত পড়িলেন। তাঁহার নিকটেই ছাহাবী ইবনে আব্বাসের খাদেম দাঁড়াইয়া ছিল। সে ইবনে আব্বাসের নিকট আসিয়া ঐ কথা উল্লেখ করিলে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাকে বলিলেন—دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم "খবরদার! তুমি তাঁহার সমালোচনা করিও না, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী।"

ছাহাবীগণকে পরস্পর সমালোচনা বা দোষারোপ করিতে দেখিয়া ছাহাবী নয় লোকদের দুঃসাহসী হইয়া কখনও সেই আগুন হাতে নেওয়া চাই না। যেরূপ শাহাজাদাগণকে পরস্পর মারামারি করিতে দেখিয়া শাহাজাদা নয় ব্যক্তি কোন শাহাজাদার উপর হাত উঠাইলে তাহাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অধুনা—ঈমান শিথিলতার যুগে মোসলেম সমাজের এক বিরাট অংশই এই ব্যধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ছাহাবীদের যুগে সৃষ্ট কেলেঙ্কারীর জন্য ছাহাবা কেরামকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা করে বা অন্ততঃ নিজ বিবেকে তাঁহাদিগকে দোষী গণ্য করিয়া থাকে। মোসলেম সমাজে এই ব্যধির প্রাদুর্ভাব আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সৃষ্ট খারেজী দলের আর একটা বিরাট সাফল্য। কারণ, তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল মোসলমানদের ক্ষতি সাধন করা। মোসলমানদের জন্য পার্থিব ক্ষতি অপেক্ষা তাহাদের প্রাণবস্তু দ্বীন-ইসলাম ও ঈমানের ক্ষতি অনেক বড়।

দ্বীন-ইসলাম ও ঈমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তায়'লার তরফ হইতে ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল মারফৎ। এই ধাপে উহার বাহক ছিলেন একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কেন্দ্র করিয়া একটি সমাজ কায়েম হয়। উক্ত সমাজই সেই দ্বীন-ইসলাম ও ঈমানকে নিজেদের মধ্যে বিস্তার করিয়াছে এবং বিশ্ববাসীর সম্মুখে উহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই সমাজটির আসল গোড়াই ছিলেন ছাহাবা-কেরাম যাঁহাদেরকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) সরাসরিরূপে শুধু শিক্ষা দানই নয়, বরং পুরাপুরি গঠন করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রসূলের উপর চারিটি দায়িত্ব চাঁপাইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা—يتلو عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة (১) আল্লার কেতাবের আয়াতগুলি পাঠ করিয়া শুনাইবেন। (২) লোকদের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন করিবেন। (৩) আল্লার কেতাবের তালীম তথা ব্যাখ্যা ও শিক্ষা দিবেন। (৪) ঐ ব্যাখ্যা ও শিক্ষার শুধু ব্যবহারিক জ্ঞানই নয়, বরং (Practical Traning) কার্য্যপদ্ধতি-অভ্যাসও করাইবেন।

আল্লার রসূলের উক্ত দায়িত্ব চতুষ্টয় সরাসরি সম্পাদনের ক্ষেত্র ও পাত্র ছিলেন একমাত্র ছাহাবা-কেরাম। সেই ছাহাবা-কেরামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, জ্ঞান-বিবেকে, মনে-মুখে, সিনায় সিনায় এবং নৈতিক চরিত্রে চড়িয়াই আল্লার রসুল কর্ত্তৃক বিতরিত দ্বীন, ইসলাম ও ঈমান পরবর্ত্তী মোসলমানদের পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তাঁহাদের দ্বারাই দ্বীন ও ইসলাম একটি সুষ্ঠরূপ ও সুবিন্যস্ত আকার ধারণ করিয়া পরম্পরা আমাদের পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছে।

যেই সমাজাটির মাধ্যমে আল্লার রসূলের পরিবাহিত দ্বীন, ইসলাম ও ঈমান আমাদের পর্য্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হইয়াছে, উহার আসল গোড়া এবং মূল ভিত্তি হইল ছাহাবা-কেরাম। তাঁহাদের প্রতি যদি মোসলমানদের আস্থা শিথিল ও নড়বড়ে হয়, তাঁহাদের নৈতিকতার প্রতি মোসলমানগণ বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের দ্বীন এবং ইসলামও শিথিল হইয়া পড়িবে। এই বাস্তব সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব্বাপর ইমামগণ "আকায়েদ" তথা ঈমানের ভিত্তিমূল নির্দ্ধারক শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন— حبهم دين وايمان واحسان "ছাহাবীদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বীন, ঈমান ও পরিপক্ক ইসলামের জন্য অপরিহার্য্য বস্তু।"

لا نذكر احدا منهم الا بخير لا مجتمعين ولا منفردين

"আমরা ছাহাবীদের কাহারও সুনাম ভিন্ন বিরূপ আলোচনা করিতে পারিব না—তাঁহাদের একক ভাবেও নহে, সমষ্টিগতভাবেও নহে।"

পক্ষান্তরে মোসলমানদের পরম শত্রু এবং ক্ষতি সাধন চেষ্টায় নিমগ্ন আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের খারেজী দল মোসলমানদের মধ্যে কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করিয়া পার্থিব ক্ষতি সাধনের পর ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মোসলমানদের প্রাণবস্তু দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের ক্ষতি সাধন ব্যবস্থায় অধিক তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা ছাহাবীগণের নামে মিথ্যা অপবাদও গড়াইয়াছে অসংখ্য। ঐ সব অপবাদের প্রভাবে যাহারা ছাহাবীদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয় তাহারা বস্তুতঃ আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক ও তাহার খারেজী দলের ইতিহাস জ্ঞাত নহে। তাহারা শুধু ঐ মোনাফেক দলের অপবাদ,

অপপ্রচার এবং বিকৃত মিথ্যা ইতিহাসগুলিই শুনিতে পাইয়াছে। সত্য ও খাঁটী ইতিহাস উদ্ধার করিয়া ঐ বিকৃত ইতিহাস খণ্ডন করিতে পারে সেই পরিমাণ (Stuby) জ্ঞান-চর্চ্চা, সেই পরিমাণ (research) গবেষণা তাহারা করে নাই। ঐ শ্রেণীর অনেকের হয়ত ঐরূপ Stuby ও research করার ক্ষমতাও নাই। অবশ্য সেই ক্ষমতার অভাবে তাহাদিগকে মোটেই ক্ষমার্হ গণ্য করা হইবে না। কারণ, ঈমানের দাবী ও তাগিদ ইহাই ছিল যে, ইতিহাস—যাহাতে আছে শুধু বর্ণনা; বর্ণনার উপর নির্ভরশীল সাক্ষ্য প্রমাণ নাই। সুতরাং উহা দ্বারা ছাহাবীদের ন্যায় পাক-পবিত্র মানুষের প্রতি দোষারোপ করা যাইবে না; যেহেতু আল্লার তরফ হইতে ঈমান ও ইসলামকে বহন করিয়া আনিয়াছেন যিনি, তথা রসুলুল্লাহ (দঃ) তিনিই ছাহাবীদের প্রতি দোষারোপ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ছাহাবীগণ রসুলের পরশ-দৃষ্টিতে গড়ানো ছিলেন। এই হাকিকত ও সত্যের মর্য্যাদা ইতিহাস অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। ইতিহাস সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত। ইতিহাস আমরা গ্রহণ করি না এমন নহে, কিন্তু ছাহাবীদের ইতিহাস আলোচনা করিতে ইতিহাস-ময়দানে সুগভীর গবেষণা ও সবিশেষ দুরদর্শিতার আবশ্যক। সেই সৌভাগ্য যাহার হইবে সে নিশ্চয়ই প্রতিজন ছাহাবীর নৈতিক চরিত্রকে পাক-পবিত্রই দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত লোকদের দ্বীন-ঈমানের জন্য একটি বিশেষ রক্ষাকবচ এই যে, ছাহাবীদের সম্পর্কে তাঁহাদের মর্য্যাদার পরিপন্থি ইতিহাস বা দুর্ব্বল ছনদে হাদীছ আকারের কোন কথা গ্রহণ করা হইবে না। বিশেষতঃ যখন মোসলমানদের পরম শত্রু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠি মোসলমানদের ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে ছাহাবীদের ইতিহাস বিকৃত করিয়াছে এবং মিথ্যা অপবাদ ও জাল অপপ্রচারকে ইতিহাসের ও হাদীছের রূপ দান করিয়াছে।

ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) রসুলুল্লার যুগ হইতেই তাঁহার এক লক্ষ্য ছাহাবীদের মধ্যে ওসমান (রাঃ) সকলের ঐক্যমতে আবুবকর ও ওমরের লাগালাগি মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদ্যমানেই আমরা ছাহাবীগণের মর্ত্তবা নির্ণয়ে এইরূপ নির্ধারণ করিয়া থাকিতাম— আবুবকর (রাঃ) তারপর ওমর (রাঃ) তারপরই ওসমান (রাঃ)। (বোখারী ৫১৬)

(২) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মতি ও সমর্থনযুক্ত ইঙ্গিতেই আবুবকর ও ওমরের পরে খেলাফতের জন্য নির্দ্ধারিত ব্যক্তি ছিলেন ওসমান (রাঃ)। জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অদ্য রাত্রে এক নেক্‌কার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছেন—আবুবকর আল্লার রাসুলের সঙ্গে বাঁধা, আবু

বকরের সঙ্গে ওমর বাঁধা এবং ওমরের সঙ্গে ওসমান বাঁধা রহিয়াছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, এই স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, এই বন্ধনের ব্যাখ্যা হইল দ্বীন-ইসলামের খেলাফৎ। আর যে নেক্‌কার লোকটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)। (মেশকাত শরীফ ৫৬৩)

আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, আজ প্রভাত-পূর্ব্বক্ষণে আমি দেখিতে পাইলাম—আমাকে যেন কতগুলি চাবির গোছা এবং দাঁড়ি-পাল্লা দেওয়া হইল। অতঃপর এক পাল্লায় আমাকে রাখা হইল অপর পাল্লায় আমার সমস্ত উম্মৎকে রাখা হইল—এইরূপে ওজন করা হইলে আমার পাল্লা অধিক ভারী হইল। তারপর আমার স্থলে আবুবকরকে ওজন করা হইল তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপর ওমরকে ওজন করা হইল তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপর ওসমানকে ওজন করা হইল তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপরে পাল্লা উঠাইয়া নেওয়া হইল। (মোছনাদে আহমদ—বেদায়া, ৭—২০৪)

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন (মদিনায়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হইতেছিল তখন প্রথমে হযরত (দঃ) একখানা পাথর রাখিলেন, অতঃপর আবুবকর (রাঃ) একখানা পাথর রাখিলেন, অতঃপর ওমর (রাঃ) একখানা পাথর রাখিলেন, তারপর ওসমান (রাঃ) একখানা পাথর রাখিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, هم امراء الخلافة من بعدى "এই ভাবেই তাহাদের দ্বারা আমার পর খেলাফতের আসন পূর্ণ হইবে।" (বেদায়াহ ৭—২০৪)

আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতকগুলি কাঁকর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে তছবীহ পড়িল, অতঃপর আবুবকরের হাতেও তছবীহ পড়িল, অতঃপর ওমরের হাতেও, তারপর ওসমানের হাতেও পড়িল। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, هذه خلافة النبوة "ইহা হইল নবুয়ত পর্য্যায়ের খেলাফতের নিদর্শন।" (বেদায়াহ ৭—২০৪)

সুধী সমাজ লক্ষ্য করিবেন! খলীফা ওসমানের খেলাফৎ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সমর্থিত ছিল, বরং তাঁহার স্বপ্নত আল্লার তরফ হইতে ওহী বলিয়া সাব্যস্ত। অধিকন্তু হযরত (দঃ) ওসমানের খেলাফৎকে নবুয়ত পর্য্যায়ের খেলাফৎ সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, আর ১৪০০ বৎসর পর মোহুদী সাহেব ওসমান (রাঃ)কে সেই খেলাফৎ বিতাড়ণের প্রথম আসামী সাব্যস্ত করিয়াছেন!

(৩) ওসমান (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—প্রত্যেক নবীরই এক একজন বিশেষ বন্ধু ছিল; আমার জন্য সেই বন্ধু হইল ওসমান। (মেশকাত শরীফ ৫৬১)

আর এক হাদীছে আছে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ওসমান (রাঃ)কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, انت وليي في الدنيا ووليي في الاخرة "দুনিয়াতে তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আখেরাতেও তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু।" (বেদায়াহ ৭—২১২)

(৪) হযরত ওসমানের প্রথমা স্ত্রী নবী-তনয়া রুকাইয়া (রাঃ) মৃত্যু হইলে পর একদা হযরত (দঃ) ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, এখনই জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা আমার নিকট সংবাদ নিয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা উম্মে-কুলসুমকে রুকাইয়ার সম পরিমাণ মহরে তোমার সহিত বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার যদি চল্লিশটি মেয়েও থাকিত পর পর প্রত্যেককে আমি ওসমানের সাথে বিবাহ দিতাম। (বেদায়াহ ৭—২১২)

(৫) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং জিব্রিল (আঃ) ফেরেশ্‌তা পর্য্যন্ত ওসমান (রাঃ)কে অধিক লজ্জা করিয়া চলিতেন। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আবুবকর (রাঃ), অতঃপর ওমর (রাঃ) তারপর ওসমান (রাঃ) উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) আবুবকর ও ওমরের আগমণে সংযত হওয়ায় তৎপর হইলেন না। কিন্তু ওসমানের আগমণে হযরত (দঃ) পরিধেয়ে অত্যন্ত সংযত হইলেন। আয়েশা (রাঃ) এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة "আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি অধিক লজ্জা-শরম প্রদর্শন করিব না কি যাহার ক্ষেত্রে ফেরেশ্‌তাগণ পর্য্যন্ত লজ্জা-শরম করিয়া থাকেন?" (মোসলেম শরীফ)

খারেজী দলের উৎপত্তি ও তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যকলাপের ইতিহাস

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে খলীফা আবুবকর ছিদ্দীকের আমলে ইসলাম পরিত্যাগের একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা মোসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি মস্ত বড় হুমকি ছিল। কিন্তু উহা ছিল সাময়িক এবং উপস্থিত পরিবর্ত্তনের সুযোগে সৃষ্ট ঘটনা। অধিকন্তু ঐ ঘটনার শত্রুগণ ছিল প্রকাশ্য শত্রু, মোসলমানদের মুখামুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ শত্রু। সুতরাং ঘটনা ভয়াবহ হইলেও উহার পরিসমাপ্তি ও অবসান সম্ভব হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মোসলমানদের ভিতরে থাকিয়া ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত হানার ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী দল সৃষ্টি করার সুযোগ ঐ আমলে ছিল না। ঐ আমলে

মোসলেম জাতির মধ্যে মোনাফেকের অস্তিত্ব থাকিলেও জনসাধারণ মোসলমান প্রথম দিকেত সবই ছিলেন ছাহাবী তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টিতে গড়ান সোনার মানুষ। খলীফা আবুবকরের আমলে বরং খলীফা ওমরের প্রথম সময়কাল পর্য্যন্ত নূতন মোসলমানের আগমণ হইলেও তাহাদের উপর ছাহাবীদেরই সুদৃঢ় সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ প্রাবল্য ও প্রভাব ছিল।

খলীফা ওমর ফারুকের প্রথম সময়কাল যাওয়ার পর পারস্য, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ জয় হইল। মোসলমানদের মধ্যে বহু বহু গুণ আধিক্য হইল এমন লোকদের যাহারা দেশ বিজয়ের হিড়িকে রাতারাতি হাজার হাজার লাখ লাখের সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইল। এই লোকগণ আল্লার রসুলের পরশ দৃষ্টি হইতে ত বঞ্চিত ছিলই, তদুপরি ইসলামের গুণাবলীতে অপরিপক্কও ছিল। তাহাদের মধ্যে যে কোন ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করতঃ আশাতীত ফসল লাভ করা মোটেই কষ্টকর ছিল না। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ হিড়িকে মোসলমানদের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে মোনাফেকদেরও সংখ্যাধিক্য ঘটে।

এই পরিস্থিতির যখন যৌবনকাল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তথা খলীফা ওসমানের খেলাফতের দ্বিতীয় বৎসর হিজরী ২৫ সনে মোসলমানদের সমাজে আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়া এমন একটি দুর্দান্ত ও ধুরন্ধর লোক ঢুকিয়া পড়ে যে নূতন-পুরাতন মোনাফেকদেরে নেতৃত্ব দানে যথেষ্ট হয়। সে ছিল ইয়ামান দেশের 'সানা' নিবাসী ইহুদী-বাচ্চা। তাহার পিতার নাম 'সাবা' এবং মাতার নাম 'সাওদা'; এই সূত্রেই ইতিহাসে সে 'ইবনে-সাওদা' বা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা না'মে পরিচিত।

হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের পর তাঁহার দ্বীনকে বরবাদ করার জন্য সেণ্টপল নাম ধারণ করিয়া এক ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেক হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের উম্মৎ তথা নাছারাদের মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং একা তাহার ষড়যন্ত্রে নাছারাদের দ্বীন চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া যায়। ঈসা (আঃ) আল্লার পুত্র, যাহারা তাঁহাকে আল্লার পুত্র গণ্য করিবে পিতার নিকটে তাহাদের সমুদয় পাপ মোচনের জন্য তিনি শুলিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ইত্যাদি গর্হিত আকিদা দ্বারা ইহুদী-বাচ্চা সেণ্টপলই নাছারাদের দ্বীনকে এবং তাহাদের আসমানী কেতাবকে বিকৃত করিয়াছিল। এইভাবে সেই ইহুদী-বাচ্চা হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের সঙ্গে ইহুদীদের চিরকালীন শত্রুতা সিদ্ধ করিয়াছিল।

মোহাম্মদী উম্মতের ইহুদী-বাচ্চা আবদুল্লাহ ইবনে সাবাও উম্মতে মোহাম্মদীর সঙ্গে তাহার জাতির চিরকালীন শত্রুতা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য লইয়া মোনাফেকীর সহিত মোসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বীন কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে, তাঁহার আসমানী কেতাব

পবিত্র কোরআন অবিকৃত আসল রূপে অক্ষুন্ন থাকিবে, ইহা সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালারই সিদ্ধান্ত। তাই সেন্টপলের দ্বারা নাছারাদের দ্বীন ও আসমানী কেতাবের যেই অবস্থা হইয়া ছিল আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোসলমানদের দ্বীন ও কোরআনের সেই অবস্থা স্বষ্টি করিতে ত সক্ষম হয়ই নাই। কিন্তু নূতন-পুরাতন মোনাফেকগোষ্ঠিকে একত্রিত করিয়া, স্বার্থান্বেষীদেরকে সঙ্গে ভিড়াইয়া সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করতঃ মিথ্যার বহর ছড়াইতে এবং মোসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত করিতে সে প্রয়াস পাইয়াছিল। বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দল ঐ সম্পর্কীয় মিথ্যার বহর পুথি-পুস্তকাকারে এমনভাবে ছড়াইয়া দিয়া ছিল যে, পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকগণ পর্য্যন্ত সেই সব মিথ্যার গুজব এবং পুথি-পুস্তক দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন নাই। কেহ যদি ঐ দলের মিথ্যার বহরের নমুনা প্রত্যক্ষ করিতে চান, তবে মীর মোশাররাফ হোসেন কর্তৃক সঙ্কলিত দীর্ঘকালের উপন্যাস "বিষাদ সিন্ধু"-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। উক্ত উপকথার অন্যতম নায়ক মোহাম্মদ হানিফা নামক ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যকলাপের এই বিরাট কলেবরের উপন্যাসটি যে আদ্যোপান্ত সবই অলিক ও শুধু কল্পনা তাহা বলা বাহুল্য। এমনকি মোহাম্মদ হানীফা নাম এবং তাহার বলিয়া সঙ্কলিত সমুদয় কার্য্যাবলীর বিবরণই শুধু কল্পনা মাত্র।

আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী গোপন দলের গোড়া পত্তনের পর তাকাইতে ছিল, মোসলমানদের কোন অঙ্গে আঘাত হানিলে, অধিক ক্ষতি সাধিত হইবে। সেমতে তাহারা সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটাই বাছিয়া নিয়াছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) হুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার পর মোসলমানদের শক্তি, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উত্তরোত্তর বাড়িতে ছিল। এমনকি খলীফা ওসমানের আমলে গাজিদের ভাতা জন প্রতি একশত দেরহাম বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। রোযাদারদের ইফতারী ভাতাও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল (বেয়াদাহ, ৭—১৪৮)। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও এতদুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, খলীফা ওমর ফারুকের আমলে আরবের স্থল যোগাযোগের এলাকাসমূহ জয় করার পর তাঁহার সিরিয়াস্থ গভর্ণর মোয়াবিয়া (রাঃ) সামুদ্রিক পথেও জেহাদ সম্প্রসারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অনুমতি পাইয়াছিলেন না। খলীফা ওসমানের খেলাফত আমলের চতুর্থ বৎসর হিজরী ২৮ সনে পূর্ণোদ্যমে নৌবাহিনী গঠন করতঃ রোমানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ নৌ-জেহাদে 'কবরছ'— সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করা হইয়াছিল।

মোনাফেকগোষ্ঠী ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে ছিল যে, মোসলমানদের এত উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির উৎস হইল তাহাদের সুষ্ঠু সুদৃঢ় একতা ও শৃঙ্খলা যাহার একমাত্র মূল হইল তাহাদের নেজামে-খেলাফৎ তথা সর্ব্বসম্মত ঐক্যতাপূর্ণ

সুদৃঢ় খেলাফৎ-ব্যবস্থা। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এই নেজামে-খেলাফতের প্রতি। সেমতে সুশৃঙ্খল, সুদৃঢ় নেজামে-খেলাফৎকে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা লইয়া স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বছরা, কুফা, সিরিয়া ও মিশর এলাকায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। তাহার ষড়যন্ত্র মূলক ছুটাছুটির নমুনা স্বরূপ ইতিহাসের কতিপয় উদ্ধৃতি বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) সিরিয়ার ঘটনা—আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়ায় পৌঁছিল। তথায় বিশিষ্ট ছাহাবী আবুজর গেফারী (রাঃ) থাকিতেন। তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় দুনিয়া ত্যাগী মানুষ। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাঁহাকে তথাকার শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্ররোচিত করিল যে, (বায়তুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের) ধন-সম্পদকে মোয়াবিয়া আল্লার ধন-সম্পদ বলিয়া থাকে এবং এইভাবে মোয়াবিয়া উহা হইতে মোসলমান জনসাধারণের নাম মুছিয়া উহা নিজের কুক্ষিগত করিতে চায়। সরল প্রকৃতির আবুজর (রাঃ) তাহার কথায় উত্তেজিত হইয়া মোয়াবিয়ার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আপনি কেন জনসাধারণের মালকে আল্লার মাল বলিয়া থাকেন ? মোয়াবিয়া (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন—আমরা সবাই কি আল্লার নই ? আমাদের সব মাল-দৌলত কি আল্লার নয় ? সমুদয় সৃষ্ট কি আল্লার নয় ? সর্ব্ব ক্ষমতাই কি আল্লার নয় ? আবুজর (রাঃ) প্রতিউত্তরে উহাই বলিলেন যে, আল্লার মাল না বলিয়া মোসলমানদের মাল বলিতে হইবে।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়ায় অবস্থানরত ছাহাবী আবুদ্দরদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিল। তিনি তাহাকে প্রথম পদক্ষেপেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—من انت ! اظنك والله يهوديا "তুই কে ? কসম খোদার—আমার ধারণা হয়, তুই কোন ইহুদী-বাচ্চা।"

তারপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিল। তিনিও তাহাকে বুঝিতে পারিলেন এবং পাকড়াও করিয়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত করতঃ বলিলেন, কসম খোদার—এই দুষ্টই আবুজর (রাঃ)কে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়াছে।

এই ছিল সূচনা মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আবুজর গেফারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির। মোয়াবিয়া (রাঃ) সমুদয় ঘটনা খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। উত্তরে ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে লিখিলেন—ان الفتنة قد اخرجت خطمها وعينيها الخ "নিশ্চয় ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা নাক উঁচু করিয়াছে এবং চক্ষু মেলিয়াছে; এখন একমাত্র পথ হইল—স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে নিয়োজিত থাকিবে

এবং ঘা আঁচড়াইবে না। আবুজরকে খাতির-তাওয়াজো করতঃ পথের সম্বল ও সাথী সঙ্গে দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। (তবরী, ৩—৩৩৫)

(২) বছরার ঘটনা—বছরা এলাকায় একটি লোক ছিল হোকাময় ইবনে জাবালাহ্। সে ছিল অতি বড় দুর্দান্ত চোর ও ডাকাত; পারস্য অঞ্চলে যাইয়া চুরি-ডাকাতি ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়াইত। খলীফা ওসমানের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হইল, তিনি বছরার গভর্ণরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বছরা শহর-সীমানার মধ্যে ঐ লোকটির গতিবিধি আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক বছরায় আসিয়া ঐ লোকটির বাড়ীতে অবস্থান করিল এবং তথায় আরও কতিপয় লোককে এক গোপন বৈঠকে একত্রিত করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সাঙ্কেতিক ভাষায় একটি কার্য্য-পরিকল্পনা পেশ করিল। বৈঠকে তাহার পরিকল্পনা গৃহিত হইল এবং ঐ লোকগণ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তাহার পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিল।

বছরার গভর্ণর গোপনসূত্রে এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ দুষ্ট স্বীয় সঠিক পরিচয় গোপন করিয়া বলিল, আমি একজন কেতাবধারী অমোসলেম, ইসলামের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মিয়াছে; আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিতে চাই। গভর্ণর তাহাকে বলিলেন, তোমার এই সব কথা আমার মনে লাগে না। তুমি এই এলাকা হইতে বাহির হইয়া যাও। সে মতে সে বছরা হইতে কুফায় চলিয়া আসিল। তথা হইতেও বহিষ্কৃত হইয়া মিশরে অবস্থান করিল। "এবং তথা হইতে বছরা ও কুফাবাসীদের সঙ্গে সর্ব্বদা তাহার পত্র বিনিময় হইতে থাকে এবং গুপ্তচর মারফৎও যোগাযোগ রক্ষা হইতে থাকে।" (তারীখ-তবরী, ৩—৩৬৮)

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা কুফা-বছরা হইতে বহিষ্কৃত হইলেও উভয়স্থানে খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দল তৈরী করিয়াছিল। ৩৪।৩৫ হিজরী সনে যখন মিশর হইতে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী দল মদিনার প্রতি ধাওয়া করিয়া ছিল। তখন কুফা-বছরা হইতেও এক এক দল সন্ত্রাসবাদী তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ছিল। সেই হোকায়ম ইবনে জাবালাহ্ই বছরার সন্ত্রাসবাদীদের নেতৃত্ব করিতেছিল। (তবরী, ৩—৩৮৬)

খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বছরা ও কুফায় আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দলের ষড়যন্ত্র ধরাও পড়িতে থাকে। এমনকি ৩৩* হিজরী সনে সন্ত্রাসবাদমূলক প্রচারণার দরুন কুফা হইতে মালেক আশ্‌তারসহ ৯।১০ জন সন্ত্রাসবাদী নেতা বহিষ্কৃত হয় এবং বছরা হইতেও অনুরূপ দল বহিষ্কৃত হইয়াছিল। (বেদায়াহ্, ৭—১৬৬)

আবহুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দলের রোকন তথা মূল কর্ত্তা ছিল নূতন-পুরাতন মোনাফেকগণ এবং তুইজন খান্দানী মোসলমানও তাহাদের মোত্তাফেক্ বা সমর্থক সাজিয়াছিল। একজন মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর, অপর জন মোহাম্মদ ইবনে আবু হোজায়ফা। এই তুইজন ছাহাবী-তনয় হইলেও শিশুকালেই তাহারা পিতৃহীন হইয়াছিল। মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের বিধবা মাতাকে আলী (রাঃ) বিবাহ করিলে, সে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকটই লালিত-পালিত হয়। সে খলীফা ওসমানের এত বড় শত্রু হইয়া দাঁড়ায় যে, যে কতিপয় ঘাতক খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া ছিল, মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর তাহাদের এক জন ছিল। খলীফা ওসমানের প্রতি তাহার শত্রুতার তুইটি মাত্র কারণ ছিল—একটি ছিল স্বীয় স্বার্থের লালসা, আর একটি ছিল খলীফা ওসমান (রাঃ) এক ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে রায় দিয়া ছিলেন। যদ্দরুন সে তাঁহার প্রতি ক্রোধ ও কিনা অবলম্বন করে। (কামেল, ৩—৯২)

মোহাম্মদ ইবনে আবু হোজায়ফা পিতৃ বিয়োগের পর ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিপালনে থাকে। সে খলীফা ওসমানের নিকট চাকুরী চাহিলে, তিনি তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। যদ্দরুন সে খলীফা ওসমানের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। (কামেল, ৩—৯২)

আবহুল্লাহ ইবনে সাবা ছাহাবীদের মধ্য হইতে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)কে প্রভাবান্বিত করিতেও সফলকাম হইয়া ছিল। হিজরী ৩৫ সনের প্রথম দিকে খলীফা ওসমান (রাঃ) দেশের অবস্থা তদারক করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তদন্তকারীরূপে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি আম্মার (রাঃ)কে মিশর এলাকায় পাঠাইয়া ছিলেন। তথায়ই ছিল আবহুল্লাহ ইবনে সাবার দলের কেন্দ্রীয় দফতর। সকল তদন্তকারী নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া মদিনায় ফেরৎ আসিলেন। কিন্তু আম্মার (রাঃ) এত বিলম্ব করিলেন যে, তাঁহার সম্পর্কে কোন তুঃর্ঘটনার আশঙ্কা করা যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার সম্পর্কে সংবাদ আসিল যে—قد استماله قوم وانقطعوا اليه منهم عبد الله بن سوداء الخ "তাঁহাকে একটি বিশেষ দল প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই দলের অন্যতম ব্যক্তিগণ হইল—আবহুল্লাহ ইবনে সাবা, খালেদ ইবনে মোলজেম, সূদান ইবনে হোমরান, ও কেনানাহ ইবনে বিশর।" (কালেম, ৩—৭৮)

আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী খারেজী দলের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য বস্তুই ছিল মোসলমানদের খেলাফৎ-ব্যবস্থা ধ্বংস করা। ঐ সময় খলীফা ছিলেন ওসমান (রাঃ), সুতরাং তিনি তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল হইলেন। এই

দলটি আবির্ভাবের পূর্ব্বে ওসমান (রাঃ) কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসেই রহিয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাচনের যে ইতিহাস বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে এবং ষষ্ঠ খণ্ডে খলীফা ওসমানের আলোচনায় অনুদিত হইয়াছে; উহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ষড়যন্ত্রকারী খারেজী দল তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অতিরঞ্জনকেই বড় অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে এবং উহার দ্বারাই সন্ত্রাসবাদ কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা খলীফাতুল-মোসলেমীন ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করিতে থাকে। অধিকন্তু খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অভিযুক্ত করার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মী অনেক ছাহাবীর নামেও মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া অতিরঞ্জিতরূপে তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা ছড়াইতে থাকে। ইতিহাস হইতে এই শ্রেণীর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাঠ করিবেন। তাহারা মিথ্যাকে এরূপ ব্যাপকভাবে এবং পুথি-পুস্তকাকারে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিল যে, তাহাদের মিথ্যা অপবাদগুলি ইতিহাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি অনেক ইতিহাস লিখক যাহারা ঘটনার সব রকম বিবরণকে শুধু সংগ্রহ ও ক্যালেক্সন করাই স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করেন তাহারা ত ঐরূপ ব্যাপক প্রচারণার প্রভাবে বিনা দ্বিধায় ঐ সব মিথ্যা বর্ণনাকেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর যাহারা সতর্কতা অবলম্বনকারী সংযত লিখক তাহারাও অন্ততঃ "লোকেরা বলে" ইত্যাদি দায়িত্ব এড়ানো মূলক পন্থায় হইলেও ঐ শ্রেণীর অনেক বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দল ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছে। অবশ্য সত্য-মিথ্যা বাছনির ও সিলেক্সনের মাপকাঠি আল্লাহ তায়ালা এস্থলেও বিদ্যমান রাখিয়াছেন এবং এরূপ ক্ষেত্রেই সুষ্ঠ বা বক্র বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী শুধু ইতিহাস বিকৃতির উপরই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা তাহাদের মনগড়া অপবাদ ও অভিযোগের সপক্ষে বড় বড় তাবেয়ী যথা ইমাম জুহরী এবং বড় বড় ছাহাবী যথা খলীফা ওমর (রাঃ) স্বয়ং খলীফা ওসমান (রাঃ) প্রমুখের নামে মিথ্যা ও জাল বর্ণনা হাদীছ আকারে প্রচার করিয়াছিল। কাহারও মৃত্যুর পরে তাঁহার নামে মিথ্যা ও জাল বর্ণনা প্রচার করাত খারেজী দলের জন্য নিতান্ত সহজ ছিল। তাহারাত খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বড় বড় ছাহাবীদের নামে তাঁহাদের জীবদ্দশায়ই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্র দেশে দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিল। এ সম্পর্কে ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য—

وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان على وطلحة والزبير يدعون الناس الى قتال عثمان ونصر الدين وانه اكبر الجهاد اليوم

"সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ হইতে মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্র ছড়ান হইল মদীনাবাসী ছাহাবীদের নামে—বিশেষতঃ ছাহাবী-শ্রেষ্ঠ আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখের নামে। ঐ সব মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্রে লোকদিগকে খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছিল। এই কাজকে দ্বীন ইসলামের সাহায্য ও খেদমত বলা হইয়াছিল এবং ঐ যুদ্ধকে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। (বেদায়হ, ৭—১৭৩)

বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ, মোফাচ্ছের, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর এই মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্রের আলোচনা উপলক্ষে অতি দৃঢ়তার সহিত একটি মূল্যবান তথ্যও পেশ করিয়াছেন। উক্ত তথ্য দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদী দল মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্রগুলির প্রচারণা এরূপ ব্যাপকভাবে চালাইয়াছিল যে, উহা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল এবং ইতিহাস গ্রন্থেও স্থান লাভ করিয়াছে। ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ মোহাদ্দেছ মোফাচ্ছের আল্লামা ইবনে কাছীর অভিযোগ করিয়া লিখিতেছেন—

ذكر ابن جرير من هذه الطريق ان الصحابة كتبوا الى الآفاق من المدينة يامر الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه

"ইতিহাসবিদ ইবনে জরীর তবরী পর্য্যন্ত তাহার ইতিহাসগ্রন্থে ছনদের সহিত এই বর্ণনা লিখিয়া দিয়াছেন যে—খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিবার জন্য লোকদিগকে আদেশ করতঃ মদিনা হইতে ছাহাবীগণ প্রচাপত্র লিখিয়া চতুর্দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর ইহা উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিতেছেন—

وهذا كذب على الصحابة انما كتبت كتب مزورة عليهم

"অথচ ঐসব প্রচারপত্র ছাহাবীদের নামে মিথ্যা প্রচারণা ছিল মাত্র এবং ঐ প্রচারপত্রগুলি মিথ্যা ও জালরূপে ছাহাবীদের নামে গড়াইয়া লিখা হইয়াছিল।" (বেদায়াহ, ৭—১৭৫)

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী দল মোসলমান দলভুক্ত থাকিয়া সজোরে নিক্ষিপ্ত দেহ ভেদকারী দ্রুতগামী তীরের ন্যায় মোসলেম সমাজের

যে সব অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়াছিল এস্থলে উহার কতিপয় নমুনা পেশ করা হইবে—

১। মদীনার উপর অতর্কিত আক্রমণে অবরোধ সৃষ্টি করিয়া খলীফায়ে-রাশেদ ওসমান (রাঃ)কে নির্ম্মমভাবে শহীদ করা।

২। পরবর্ত্তী খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচনে নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে অবৈধ শক্তির জোরে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা নস্যাৎ করিয়া জবরদস্তি মূলক মোড়লগিরী মাতব্বরী ও কর্ত্তৃত্য প্রয়োগের দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

৩। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে ছাহাবীদের নীতিগত বিরোধকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক বিরোধে পরিণত করা এবং সেই সূত্রে সৃষ্ট সংঘর্ষসমূহের প্রতি ক্ষেত্রে মোসলমানদের মীমাংসা ও মিলন প্রচেষ্টাকে অতি জঘন্যরূপে বানচাল করা।

৪। মোসলমানদের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ সৃষ্টির সুযোগ লাভের জন্য মোনাফেকী ফন্দি-ফেরেবের মাধ্যমে গা-ঢাকা দিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দলে ভিড়িয়া থাকার পর আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং গোপন ঘাতকের সাহায্যে আলী (রাঃ)কে শহীদ করা।

খারেজী দল কর্ত্তৃক মদীনা অবরোধ ও খলীফা ওসমান (রাঃ)কে হত্যাঃ

হিজরী ৩৫ সনে যখন হজ্জের মওসুম নিকটবর্ত্তী এবং রাষ্ট্রের সমুদয় এলাকার মোসলমান মক্কার ছফরে ব্যতিব্যস্ত—অনেকে যাত্রা করিয়া গিয়াছে, অনেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। এই সুযোগে হজ্জের মাস—শাওয়াল মাসের শেষের দিকে ছয় শত হইতে এক হাজার সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী মিশর হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের নেতৃত্ব করিতেছিল আবদুর রহমান ইবনে আদীছ, কেনানাহ ইবনে বিশর, সুদান ইবনে হোমরান, কাতীরা ইবনে কোলাম। আর তাহাদের সর্ব্বাধিনায়ক ছিল গাফেকী ইবনে হরব; وكان معهم ابن السوداء "আর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ত তাহাদের সঙ্গে ছিলই। কুফা হইতেও অনুরূপ একটি দল যাত্রা করিল; তাহাদের অন্যতম নেতা ছিল আশ্‌তার নখ্‌য়ী। বছরা হইতেও একটি দল যাত্রা করিল; তাহাদের নেতা ছিল সেই দাগী দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত হোকায়ম ইবনে জাবালাহ। এই সন্ত্রাসবাদীদের সহিত মদিনার অন্য কোন এলাকার জনসাধারণের কোনই সম্পর্ক ছিল না। জনসাধারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইলে তাহাদের যাত্রা নিশ্চয়ই বাধা প্রাপ্ত হইত। এই সম্পর্কে ইতিহাসের স্পষ্ট সাক্ষ্য—

وكان المصريون لا يطمعون فى احد من اهل المدينة......

"সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনাবাসী কাহারও সমর্থনের আশা করিতে পারিতে ছিল না শুধুমাত্র তিনজন ব্যতীত—যাহাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের যোগাযোগ ছিল—মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর, মোহাম্মদ ইবনে হোযায়ফা ও ইবনে ইয়াসের।
(তবরী, ৩—৩৮৯)

মিশর, কুফা ও বছরা হইতে আগত সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনার নিকটবর্ত্তী জু-খশব ও জু-মারওয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া মদিনাবাসীদের সমর্থন জোগাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন—

لقد علم الصالحون ان جيش ذى المروة وذى خشب ملعونون
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

"সৎ লোকগণ সকলেই জানেন, জু-মারওয়া ও জু-খশব স্থানে যে দলটি একত্রিত হইয়াছে তাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ প্রাপ্ত।" সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনাবাসীদের সমর্থন হইতে নিরাশ হইয়া গেল। এদিকে সিরিয়া, কুফা ও বছরা ইহতে খলীফার সাহায্যার্থে মোসলমান লশকর রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছে সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সন্ত্রাসবাদীগণ জিল্‌কদ মাসের শেষভাগে (বেদায়াহ, ৭—৮০) হঠাৎ মদিনা আক্রমণ করিয়া মদিনার নিয়ন্ত্রন দখল করিয়া নিল এবং খলীফা ওসমানের বাসভবন অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন মদিনার অধিকাংশ লোকই হজ্জ সমাপনে মক্কায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনায় ঘোষণা দিল, আমাদের প্রতি যে হস্তক্ষেপ না করিবে একমাত্র তাহার জন্যই নিরাপত্তা। তাহাদের মোকাবিলায় মদিনাবাসীদের শক্তি অপর্য্যাপ্ত, তাই তাঁহারা নিস্তব্ধ থাকিলেন।

সন্ত্রাসবাদীগণ অবরুদ্ধ খলীফা-ভবনে কোন প্রকার পানাহার বস্তু প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। সেই পরিস্থিতিতে খলীফা ওসমান (রাঃ) গোপনে আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং নবী-পত্নিগণের নিকট খবর পাঠাইলেন যে, সন্ত্রাসবাদীগণ আমাদিগকে পানি হইতেও বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে। আপনারা একটু পানি পৌঁছাইবার চেষ্টা করুন। সে মতে সর্ব্ব প্রথম আলী (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ত্রাসবাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কার্য্য মোসলমানত দূরের কথা কাফেরদের কার্য্যের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। তোমরা অন্ততঃ পানাহার ত বন্ধ করিও না; কাফেরগণও ত শত্রুকে বন্দী করিয়া তাহাকে পানাহার দিয়া থাকে!

সন্ত্রাসবাদীগণ তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় নবী-পত্নী উম্মুলমোমেনীন উম্মে-হাবিবা (রাঃ) একটি পানির পাত্র লুকাইয়া লইয়া খচ্চরে আরোহণ করতঃ তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীগণ এমন দুর্ব্যবহার করিল যে, তিনি ভীষণ ভাবে আহত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। লোকজন তাঁহাকে কোন প্রকারে ফেরত আনিল। এইসব সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাল্হা ও যোবায়ের (রাঃ) হতাস হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর ওসমান (রাঃ) স্বয়ং স্বীয় গৃহ-ছাদে উঠিয়া সন্ত্রাসবাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মোসলমানগণ মদিনায় হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদের সুপেয় মিঠা পানির ব্যবস্থা ছিল না। তাই হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন "বীরে-রুমা"—রুমা নামক মিঠা পানির কুপটি উহার ইহুদী মালিক হইতে ক্রয় করতঃ মোসলমানদের জন্য দান করিয়া বেহেশ্ত ক্রয় করিয়া নিবে এমন ব্যক্তি কে আছে? সেই সময় আমিই নিজস্ব মাল দ্বারা উহা ক্রয় করতঃ ওয়াক্ফ করিয়াছিলাম*! আজ আমাকে উহার এক ফোঠা পানি হইতেও বঞ্চিত রাখিয়াছ! এইভাবে ওসমান (রাঃ) সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিল না। খলীফা ওসমানের বাড়ী সংলগ্ন একটি বাড়ী হইতে গোপনে কিছু পানি সরবরাহ করা হইত।

(কামেল, ৩—৮৭)

এই অবরোধ অবস্থায় সন্ত্রাসবাদীগণ খলীফা ওসমানের পদত্যাগ দাবী করে, কিন্তু তিনি তাহা করিতে অক্ষম; যেহেতু তাঁহার প্রতি এই ব্যাপারে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুস্পষ্ট কড়া নির্দেশ প্রতিবন্ধক ছিল—

হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, হে ওসমান! আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাইবেন। লোকেরা যদি তোমাকে উহা খুলিয়া ফেলিতে বলে, তুমি উহা খুলিওনা। (মেশকাত, ৫৬২)

হাদীছ—অবরোধ অবস্থায় গৃহ-ছাদে উঠিয়া ওসমান (রাঃ) বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে একটি বিশেষ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, আমি উহার উপর দৃঢ় পদ থাকিব। (তিরমিজি শরীফ—মেশকাত, ৫৬২)

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (রঃ) ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তিনি আসিলে পর হযরত (দঃ) তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিলেন এবং তাঁহার উভয় স্কন্ধে হস্তদ্বয় স্থাপন পুর্বক বলিলেন, হে ওসমান! অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে একটি

---

* এখনও সেই কুপ বিদ্যমান আছে, উহাকে "বীরে ওসমান" ওসমানের কূপ বলা হয়।

জামা পরাইবেন, যদি মোনাফেকগণ তোমার নিকট উহা খুলিয়া ফেলার দাবী জানায়, তবে তুমি কিন্তু উহা খুলিও না—এমনকি তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইবে। হযরত (দঃ) এই কথা তিন বার বলিলেন। (মোছনাদ আহমদ—বেদায়াহ, ৭—২০৭)

খলীফা ওসমানের পদত্যাগ দাবীকারীগণ যে মোনাফেকের দল তাহা হাদীছে স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবেও ঐ দাবীর মুলে ছিল মোনাফেক খারেজী দল।

তারপর জিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ শুক্রবার দিন মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং পূর্ব্বোল্লেখিত মিশর, কুফা ও বছরার সন্ত্রাসবাদী নেতাগণসহ ১৩ ব্যক্তি কেহ বা বাড়ীর দেওয়াল টপকিয়া, কেহ বা বাড়ীর বাহির দরজা পোড়াইয়া খলীফা ওসমানের গৃহে প্রবেশ করিল।

ليس فيهم احد من الصحابة ولا ابنائهم........

“তাহাদের মধ্যে একজনও ছাহাবী বা ছাহাবী-তনয় ছিল না একমাত্র মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর—সে ছাহাবী তনয় ছিল।” (বেদায়াহ, ৭—১৮৫)

ঐ সময় ওসমান (রাঃ) নামাযে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নামায বাদ তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন। পবিত্র কোরআন শরীফ তাঁহার সম্মুখে ছিল। তিনি বার বার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিতে লাগিলেন—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

“খাঁটী মোমেনদেরকে যখন বলা হইল যে, শত্রু দল তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি সমবেত করিয়াছে; তাহাদিগকে ভয় কর। তখন তাঁহাদের ঈমান অধিক মজবুৎ হইয়া গেল এবং তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট ও অতি উত্তম কার্য্য-নির্ব্বাহক।”

এই সময় সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহী দলের এক পাষাণ্ড খলীফা ওসমানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া এমন ভীষণভাবে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল যে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর উপস্থিত হইয়া তাঁহার দাড়ি ধরিয়া এত জোরে ঝাঁকুনি দিল যে, তাঁহার দাঁতে দাঁতে আঘাত লাগার শব্দ শোনা গেল। ওসমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, যেই দাড়ি তুমি ধরিয়াছ উহাকে তোমার পিতাও সম্মান করিতেন। তোমার পিতা কখনও

ঐস্থানে হাত লাগাইতেন না, যেস্থানে তুমি হাত দিয়াছ। এতচ্ছ্রবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর লজ্জিত হইয়া পিছনে হটিয়া গেল। অতঃপর এক ব্যক্তি একটি খেজুর ডালা নিয়া আসিল এবং খলীফা ওসমানের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিল, তাঁহার মাথার রক্তে সম্মুখস্থ কোরআন শরীফ রঞ্জিত হইয়া গেল। মিশরীয় সন্ত্রাসবাদী নেতা গাফেকী ইবনে হর্‌ব যাহার হাতে মদীনার নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল—সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডলে সজোরে আঘাত করিল এবং পবিত্র কোরআনকে পদাঘাত মারিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সরাইতে চাহিল। কিন্তু কোরআন শরীফ ঘূর্ণায়মানভাবে খলীফা ওসমানের সম্মুখে অবস্থিত রহিল। আর এক সন্ত্রাসবাদী নেতা তাঁহার বুকের উপর বসিয়া বর্শা দ্বারা নয়টি আঘাত করিল। অবশেষে মিশরীয় সন্ত্রাসবাদী নেতা সুদান ইবনে হোমরাণ তরবারী নিয়া তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইল; তখনই খলীফা ওসমানের স্ত্রী নায়েলাহ হাত দ্বারা প্রতিরোধ করিতে গেলে তাঁহার আঙ্গুল-সমূহ কাটিয়া গেল। সেই তরবারীর আঘাতেই ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ খলীফাতুল-মোসলেমীন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুই তনয়ার জামাতা ৮০ হইতে ৯০ বৎসর বয়সে ১৮ জিলহজ্জ জুমআর দিনের শেষ ভাগে শাহাদতের শরবৎ পান করতঃ ইহজগত ত্যাগ করিলেন। তাঁহার রক্ত তাঁহার সম্মুখস্ত কোরআন শরীফের যেই আয়াতটির উপর সর্ব্ব প্রথম পতিত হইয়াছিল তাহা ছিল এই— فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم "অচিরেই তোমার শত্রুদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ্ তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবেন; তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।"

সন্ত্রাসবাদীরা খলীফাতুল-মোসলেমীনকে শহীদ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, তাঁহার গৃহের সব কিছু লুণ্ঠনও করিল। এই সব বর্ণনা ঐসব ইতিহাস গ্রন্থেরই যাহার উপর নির্ভর করিয়া মৌদুদী সাহেব তাঁহার কুখ্যাত পুস্তককে নির্ভুল সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—(বেদায়াহ্, ৭—১৮৮)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—যে দিন খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন, সেই দিন সকাল বেলা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অদ্য আমি হযরত নবী (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়াছি। হযরত (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন, হে ওসমান! আজ তুমি আমাদের নিকট ইফ্‌তার করিবে। সে মতে তিনি ঐ দিন রোযা রাখিয়া ছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ই দিনের শেষ ভাগে শহীদ হইয়া-ছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—১৮২)

পূর্ব্বের দিনও একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—তাহাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, গত কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি যেন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার নিকট আবু বকর এবং ওমরও বসা

ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন তুমি চলিয়া যাও; আগামী কল্য নিশ্চয় তুমি আমাদের নিকট আসিয়া ইফ্‌তার করিবে।(")

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওসমানের অবরোধ কালে আমি তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, হে ভাই! আমি স্বপ্নে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই দরওয়াজার নিকট দেখিয়াছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওসমান! শত্রু দল তোমাকে অবরোধ করিয়াছে? আমি বলিলাম—হাঁ। তাহারা তোমাকে পিপাসাগ্রস্ত রাখিয়াছে? আমি বলিলাম—হাঁ। তখন হযরত (দঃ) এক ডোল পানি আমাকে দান করিলেন। আমি প্রাণ ভরিয়া উহা পান করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি যদি চাও তবে আমি তোমার সাহায্য করিতে পারি। আর যদি ইচ্ছা কর তবে আমাদের নিকট আসিয়া ইফ্‌তার করিতে পার। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরতের নিকট যাইয়া ইফ্‌তার করাকেই গ্রহণ করিয়াছি। (বেদায়াহ, ৭—১৮২)

অবরোধ অবস্থা সৃষ্টির পূর্ব্বে মদীনায় গভর্ণর সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্য-কলাপে শঙ্কিত হইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, আপনি সিরিয়ায় চলুন। তথাকার অধিবাসীগণ আপনার পূর্ণ অনুগত। ওসমান (রাঃ) তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

لا ابيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان كان فيه قطع خيط عنقى

"আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সান্নিধ্য কোন মূল্যেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি—যদিও আমার গর্দ্দান কাটা যায়।"

অতঃপর তিনি তাঁহার হেফাজতের জন্য ফৌজ পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন—لا اضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم
"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পড়শী—মদীনাবাসীদিগকে আমি সঙ্কটের সম্মুখীন করিতে চাই না।" (কামেল, ৩—৭৯)

অবরুদ্ধ অবস্থায়ও ছাহাবী মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) খলীফা ওসমান (রাঃ)কে পরামর্শ দিয়াছিলেন, আপনি আপনার বাড়ীর পেছন দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ুন এবং মক্কায় বা সিরিয়ায় চলিয়া যান। তখনও তিনি বলিয়াছিলেন, সিরিয়াবাসীগণ বাস্তবিকই প্রসংশার পাত্র এবং তথায় মোয়াবিয়া রহিয়াছে—
فلن افارق دار هجرتى ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم

"কিন্তু আমি আমার হিজরত-স্থান এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সান্নিধ্য কিছুতেই ত্যাগ করিব না।" (বেদায়াহ, ৭—২১০)

এই নির্ম্মল ও স্বচ্ছ প্রকৃতির খলীফাকে সুদীর্ঘ বার বৎসর খেলাফত পরিচালনার পর আশীতীত বয়সে ঐরূপ নির্ম্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্টির সন্ত্রাসবাদী খাজেরী দল।

মৌদুদী সাহেব এই কেলেঙ্কারীর আসামী সেনাক্ত করিতে যাইয়া সন্ত্রাসবাদী খারেজী দল সম্পর্কে একটি অক্ষরও ব্যয় করিলেন না। পক্ষান্তরে ঐ কেলেঙ্কারীর আসামী খলীফা ওসমান (রাঃ)কে সাব্যস্ত করার জন্য কুখ্যাত সঙ্কলনের শতাধিক পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী খলীফা নির্ব্বাচণে বিদ্রোহী খারেজী দলের কেলেঙ্কারী

সন্ত্রাসবাদী দল খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে এক ধাপ সাফল্য লাভের পর, এখন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবন বাঁচাইবার জন্য রক্ষা-কবচেরও আবশ্যক বোধ করিল। উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার সুবর্ণ সুযোগ এবং রক্ষা-কবচ লাভের সুযোগ, এই উভয়ের জন্য তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচণের কথা ত চিন্তাই করিতে পারিতে ছিল না। যেহেতু ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদীতায় তাহারা সাফল্য অর্জ্জন করিলেও জন-সাধারণ মোসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সুতরাং তাহারা ভিন্ন একটি বিকল্প-ব্যবস্থা চিন্তা করিল।

তাহারা শাসন-ক্ষমতায় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব এবং খেলাফত-কাঠামোতে তাহাদের দখল ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যবস্থা করিল। পরবর্ত্তী খলীফা হওয়ার অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আলী (রাঃ)। খলীফা হওয়ার জন্য তাহারা তাঁহার নামই প্রস্তাব করিল। ইহাতে তাহাদেরও সুবিধা হইল যে, জনসাধারণের উপস্থিত ক্ষোভ প্রসমিত হইল এবং খলীফা নির্ব্বাচনে লোকদের সাড়া পাওয়া গেল অধিক।

কিন্তু মদিনা যেহেতু তাহাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল, তাই তাহারা জবরদস্থি মূলক তাহাদের আসল উদ্দেশ্য তথা শাসন-ক্ষমতায় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব এবং খেলাফত-কাঠামোতে তাহাদের পূর্ণ দখল তাহারা প্রতিষ্ঠিত রাখিল।

আলী (রাঃ) সহ মদিনার বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ তাহাদের এই কারসাজি আঁচ করিতে ছিলেন। তাই তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐরূপ পরিস্থিতিতে এবং তাহাদের প্রস্তাবে খেলাফত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে ছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের ঐ অসৎ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য এই ব্যাপারে তাড়াহুড়াও করিল এবং জঘন্যরূপে বল প্রয়োগও করিল। এসম্পর্কে ইতিহাসের কতিপয় উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন—

(ক) খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর মদীনার শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনকারী ছিল সন্ত্রাসবাদী নেতা গাফেকী ইবনে হরব। সে খলীফা ওসমানকে শহীদ করার অন্যতম আসামী ছিল। এই সময় তাহারা খলীফা মনোনীত করার জন্য লোক তালাশ করিতে ছিল, কিন্তু পাইতে ছিল না। এমনকি আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)ও ঐ অবস্থায় খলীফা মনোনীত হওয়াকে এড়াইয়া থাকিতে ছিলেন। (তবরী, ৩—৪৫৪)

(খ) সন্ত্রাসবাদীগণ মদীনবাসীকে ডাকিয়া বলিল—

اجلناكم يومين فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا
وطلحة والزبير واناسا كثيرا نغشى الناس عليا......

"তোমাদিগকে দুই দিনের সময় দেওয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি মনোনয়ন করিবে। অন্যথায় পর দিন আমরা আলী, তাল্‌হা, যোবায়ের সহ বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়া ফেলিব। এরূপ জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিতে লাগিল।" (তবরী,—৩—৪৫৬)

(গ) লোকজন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের শপথ গ্রহণ করিলে, তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)কে ডাকিয়া আনা হইল। তাল্‌হা (রাঃ) ইতস্তত: প্রকাশ করিলে কুফা হইতে আগত সন্ত্রাসবাদী নেতা খলীফা ওসমান-হত্যার অন্যতম আসামী মালেক আশতার তৎক্ষনাৎ তরবারী উত্তোলন করতঃ তাল্‌হা (রাঃ)কে বলিল...... والله لتبايعن او لاضربن به ما بين عينيك "খোদার কসম—আলীকে খলীফা গ্রহণের শপথ না করিলে, এখনই তরবারী দ্বারা মাথা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। তখন তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, তবে ত কোন অবকাশই নাই—এই বলিয়া তিনি শপথ করিলেন এবং যোবায়ের (রাঃ)ও শপথ করিয়া নিলেন।" (তবরী, ৩—৪৫১)

(ঘ) তাল্‌হা (রাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন, আলী (রাঃ)কে খলীফা গ্রহণের শপথ করিয়াছি, এমন অবস্থায় যে, সন্ত্রাসবাদীদের তরবারী আমার মাথার উপর ছিল। সায়াদ (রাঃ) বলেন, বস্তুতঃই তরবারী মাথার উপর থাকা না জানিলেও ইহা জানি যে, তাঁহার শপথ জবরদস্তিমূলক নেওয়া হইয়াছে। (তবরী, ৩—১৫৩)

(ঙ) খলীফা ওসমান-হত্যার অন্যতম আসামী বছরা এলাকার দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ও সন্ত্রাসবাদী নেতা হোকায়ম ইবনে জাবালাহ্ যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকেও শপথ গ্রহণে বাধ্য করিল। স্বয়ং যোবায়ের (রাঃ)

বলেন, এক ডাকাত আমার নিকট আসিয়াছিল, ফলে আমি শপথ নিয়াছি এমতাবস্থায় যে, আমার গর্দ্দানের উপর ভীষণ চাপ ছিল। (তবরী, ৩—১৫৭)

অবরুদ্ধ মদিনায় শাসন-ক্ষমতা দখলকারী সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদের এইরূপ চাপ ও বল প্রয়োগের মধ্যে তাহারা খলীফা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিল। অবরুদ্ধ মদিনা যেহেতু তখন তাহাদেরই শাসন ও নিয়ন্ত্রনে ছিল; সুতরাং জবরদস্তি এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাহারা শাসন-ক্ষমতায় নিজেদের নিয়ন্ত্রন ও বড় বড় পদ এবং খেলাফত-কাঠামোতে তাহাদের পূর্ণ দখল রাখার প্রয়াস পাইল।

এইতথ্য কোন কল্পিত ভাবধারা নহে, বরং ইহা বাস্তব সত্য। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও এই বাস্তবকে আঁচ করিয়া থাকিতেন। খলীফা আলী (রাঃ) কোন এক উপলক্ষে বলিয়াছেন—"আমরা তাহাদের (সন্ত্রাসবাদীদের) হর্ত্তাকর্ত্তা নহি, তাহারাই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা।" (কামেল, ৩—১০০)

সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খলীফা নির্ব্বাচনে বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাড়াহুড়া করিয়াছে, শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবী-জমাতের অনপুস্থিতিতে অবরুদ্ধ মদিনায় নির্ব্বাচন পরিচালনা করিয়াছে। তৎকালীন বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য কোন অঞ্চলের লোকদের মতামতের তোয়াক্কা করে নাই। বিশেষতঃ মক্কা এলাকা—যথায় হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র এলাকার এমনকি মদিনারও শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীবর্গ সমবেত ছিলেন তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া থাকাবস্থায় এই নির্ব্বাচন পরিচালনা করিয়াছে।

নির্ব্বাচনে এই সব কেলেঙ্কারী না করিলে সন্ত্রাসবাদীদের বাঁচাই কঠিন হইত। তাই তাহারা শুধু নিজেদের রক্ষাকবচ হিসাবে এই কেলেঙ্কারীময় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

মৌদুদী সাহেব এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সন্ত্রাসবাদীগণ ইহা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে ছিল। তাই তাহারা অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ মদীনার মধ্যেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়কে নস্যাৎ করিয়া, এমনকি স্বয়ং আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতেরও বিরুদ্ধে খলীফা নির্ব্বাচনে অত্যধিক তাড়াহুড়া করিল। এই ব্যাপারে ইতিহাসের সাক্ষ্য শুনুন—

قالوا ان نحن رجعنا الى امصارنا بقتل عثمان من غير امرة اختلف الناس فى امرهم ولم نسلم فرجعوا الى على فالحوا عليه واخذ الاشتر بيده فبايعه وبايعه الناس

"সন্ত্রাসবাদীগণ ভাবিল, আমরা যদি ওসমানকে হত্যা করার অপরাধ নিয়া খলীফা নির্দ্ধারিত না করিয়াই নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাই, তবে লোকদের মধ্যেও

বিরোধ সৃষ্টি হইবে এবং আমরাও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। সেমতে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিল। এমনকি কুফার সন্ত্রাসবাদী নেতা মালেক আশ্‌তার ঐ সময়ই আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে খলীফা মনোনয়নের শপথ করিয়া নিল, তারপর অন্য লোকগণ শপথ করিল। (বেদায়াহ, ৭—২২৬)

আলী (রাঃ) নবীজী মোস্তফার ছাহাবীগণের বিশিষ্টের বিশিষ্ট ছিলেন এবং চার মহানের অবশিষ্ট একজন ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার তুলনা ছিল না। তিনি উপস্থিত পরিস্থিতির সমুদয় দিক বিচার বিবেচনা করিয়া মোসলমানদের কল্যান ও মঙ্গল কামনার দৃষ্টিতে অবশেষে খেলাফত গ্রহণ করিলেন। মদিনায় উপস্থিত মোসলমানগণের অধিকাংশের নির্ব্বাচনেই তিনি খলীফা হইলেন। সমুদয় কেলেঙ্কারী ও আপত্তির বিষয়াবলী আঁচ করা সত্বেও তিনি এই পথেই অগ্রসর হইলেন। উপস্থিত পরিস্থিতিতে তিনি উহাকেই মোসলমানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যান ধারনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশাছিল যে, মোসলমানগণ সকলে তাঁহাকে স্বীকৃতি দিলে সন্ত্রাসবাদীদেরকে শায়েস্তা করা মোটেই কঠিন হইবে না।

সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জবরদস্তি মূলক সর্ব্বপ্রকার কেলেঙ্কারী করিয়াছে। এবং তাহারা বড় বড় পদ তাহাদের দখলে রাখিয়াছে, খেলাফত-কাঠামোর পুরোভাগে তাহাদের স্থান রাখিয়াছে। এমনকি খলীফা আলী (রাঃ) স্বয়ং নিজেকে তাহাদের সম্মুখে লা-চার নিরুপায় অনুভব করিতেন।

এই সব কেলেঙ্কারীর এক বিন্দুর জন্যও আলী (রাঃ) দোষী ছিলেন না—এই ব্যাপারে আমাদের কাহারও কোন দ্বিধা থাকিলে আমাদের ঈমানের উপর ভীষন আঘাত আসিবে।

এই সব একমাত্র সন্ত্রাসবাদীদেরই দুষ্কৃতি ছিল যাহা তাহারা নির্ব্বাচনী কেলেঙ্কেরীর সুযোগে লাভ করিতে পারিয়াছিল। এবং তাহারা শুধু কেবল নিজেদের স্বার্থে খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে জবরদস্থি মূলক গা-ঢাকা দিয়া ছিল।

সন্ত্রাসবাদীরা জবরদস্তি ও ষড়যন্ত্রমূলক ঐ সব দুষ্কৃতি ও কেলেঙ্কারী করিয়া খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে গা-ঢাকা দিয়া থাকায় মোসল-মানদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া গেল।

১। অনেকে এই নির্ব্বাচনের প্রতি সমর্থন দানে বিরত থাকিলেন।

২। বিশিষ্ট ছাহাবী তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) সমর্থন দানের পরও অবরুদ্ধ মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন এবং সমর্থন প্রত্যাহার করিলেন।

বিশিষ্ট ছাহাবী মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) সহ আরও অনেক ছাহাবী গোপনে মক্কায় চলিয়া গিয়া ছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—২২৮)

৩। মক্কায় সমবেত শীর্ষস্থানীয় ছাহাবী-তাবেয়ীগণও উক্ত নির্ব্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

৪। তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট এলাকা সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া (রাঃ)ও এই নির্ব্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এই সব ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল একমাত্র দুষ্কৃতী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত ছাহাবীগণ যাঁহাদের ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল খলীফা হত্যাকারী দুষ্কৃতী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি—যাঁহাদের অগ্রভাগে ছিলেন আয়েশা (রাঃ) আশারা-মোবাশশারা হইতে তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)। এই সব বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধ দেখাইয়াছেন মৌদুদী সাহেব।

এই সব ছাহাবীবর্গকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য মৌদুদী সাহেব ধূঁয়া তুলিয়াছেন যে, পুর্ব্ব হইতেই মদিনা খেলাফত নির্ব্বাচনের কেন্দ্র ছিল, অতএব এই কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আয়েশা (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।

উল্লেখিত শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণ যাঁহাদের দ্বীন ঈমান ও ইসলাম এবং ধর্ম্মীয় জ্ঞান ও এখ্‌লাছ-একনিষ্ঠতা কোটি কোটি মৌদুদীই নয় শুধু, আমাদের ন্যায় বিশ্বের মোসলমানদের অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। চৌদ্দশত বৎসরের ব্যবধানে জন্মিয়া তাঁহাদের কার্য্যক্রমের উপর অপরাধের রায় প্রদান করা—ইহাই মৌদুদী সাহেবের সঙ্গে আমাদের মৌলিক মতবিরোধ। এবং ইহাকেই সর্ব্বসম্মত রূপে নিষেধ করিয়াছেন পূর্ব্বাপর ইমামগণ এবং জাতীয় মনীষীবৃন্দ যাহার প্রামাণিক ও বিস্তারিত আলোচনা বাংলা বোখারী শরীফ ষষ্ঠ খণ্ডের আরম্ভে করা হইয়াছে।

সুধীবৃন্দ! প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বের পরিস্থিতি যাহা ঐ সব ছাহাবীবর্গের সম্মুখে ছিল আমাদের সম্মুখে তাহা নাই—এমতাবস্থায় কিরূপে আমরা তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিতে পারি?

মৌদুদী সাহেব মদিনায় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার আইনের পেঁচ দেখাইয়া উহার বিরোধীতার উপর অপরাধের রায় দিয়াছেন। পূর্ব্বাপর খলীফা নির্ব্বাচনের কেন্দ্র মদিনাই ছিল যাহার যুক্তিও মৌদুদী সাহেব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছাহাবীগণের দৃষ্টিতে যদি নিম্নে বর্ণিত আপত্তির কারণসমূহ থাকিয়া থাকে তবে উহাকে কি অপরাধ বলা হইবে? যথা—

১। পূর্ব্বেকার খলীফা নির্ব্বাচনের কেন্দ্র মদিনাই ছিল বটে, তবে প্রথমতঃ ঐ সব নির্ব্বাচনে কোন কেলেঙ্কারী, জবরদস্তি ও বিরোধ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচনসমূহ মদিনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও অন্যান্য অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতের যাচাইও অবশ্যই করা হইয়া ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য নির্ব্বাচনে খলীফা হত্যাকারী মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীগোষ্টি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উপায় করার জন্য গায়ে পড়িয়া কেলেঙ্কারী ও জবরদস্তি করিয়াছে—যাহার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। এবং ইহার কারণেই এই নির্ব্বাচনে বিরোধও সৃষ্টি হইয়াছে। মদিনার ভিতরেই অনেকে (হয় ত কোন কৌশলে) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিয়া ছিলেন। "বেদায়াহ-ওয়ান্নেয়াহ" ইতিহাস গ্রন্থের ৭ম খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ আঠার জন বিশিষ্ট ছাহাবীর নাম উল্লেখ রহিয়াছে। আর মদিনা ছাড়া অন্যান্য এলাকার মতামতের ত কোনই তোয়াক্কা করা হয় নাই।

২। পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচন মোছলেম-শিরোমণি ছাহাবীগণের প্রাণকেন্দ্র মদিনার সকল অধিবাসীগণের উপস্থিতিতে হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য নির্ব্বাচনকালে মদিনার অধিকাংশ অধিবাসীই হজ্জ উপলক্ষে মদিনার বাহিরে মক্কায় ছিলেন।

৩। পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচন যথা—খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন পূর্ণ ধীরস্থিরতার সহিত অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে হইয়া ছিল। যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে এবং বোখারী শরীফের ষষ্ঠ খণ্ডে ১৮৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে আলোচ্য নির্ব্বাচনে মদিনার শাসন নিয়ন্ত্রনকারী বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী দল উদ্দেশ্য প্রণোদিত অবস্থায় যে তাড়াহুড়া করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণের উদ্ধৃতি ইতিহাস হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

৪। আলোচ্য নির্ব্বাচনকালে মদিনা সম্পূর্ণরূপে খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রনে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামেরই অপর কেন্দ্র মক্কা এলাকায় বিশেষভাবে তখন হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র অঞ্চলের বিশিষ্ট ছাহাবী ও তাবেয়ীবর্গ সমবেত ছিলেন এবং তাঁহারা তথায় অপেক্ষারত ছিলেন। এমনকি দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাগম তথায় অধিক হইতে ছিল। এবং তথায় বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের কোন পাত্তাই ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা তাড়াহুড়া করিয়া জবরদস্তিমূলক তাহাদের অবরুদ্ধ মদিনায়ই নির্ব্বাচন করিয়া নিল।

এমতাবস্থায় তৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছাহাবীগণের এক পক্ষ যদি ভাবিয়া থাকেন যে, এই নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দিলে তাহা খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের সুযোগ-সুবিধাকে সুদৃঢ় করার নামান্তর হইবে। কারণ, এই স্বীকৃতি

শুধু একা খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি স্বীকৃতি হইবে না। বরং পুর্ণ খেলাফত-কাঠামোর প্রতিই স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে। অথচ ঐ খেলাফৎ-কাঠামোর পুরোভাগ ত দখল করিয়া নিয়াছে বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা। সেমতে সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদের বিতাড়ন-পূর্ব্বে এই নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দান তাঁহারা মুলতবী রাখিয়াছেন—যাহাকে মোটেই অস্বাভাবিক এবং দোষণীয় বলা যায় না।

সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদেরে বিতাড়নের উদ্দেশ্যেই হয়ত ঐ বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ উক্ত নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দান মুলতবী রাখিয়া খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহীদের বিচারের দাবী কার্য্যকরী করার জন্য আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। কারণ, তাহাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হইলেই হয় তাহারা পলায়ন করিবে না হয় ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি মুলতবীকারীগণ সকলেই, এমনকি মোয়াবিয়া (রাঃ)ও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে পাল্টা খেলাফতের দাবী না করিয়া খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়া দিতে ছিলেন যে, আলী (রাঃ) সন্ত্রাসবাদী খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহীদের বিচার ও শাস্তি বিধান করিয়া দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা তাঁহার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করিব—ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

মোয়াবিয়া (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। নিজের অপেক্ষা তাঁহাকেই খলীফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। (বেদায়া-ওয়ান-নেহায়া ৭—৫৭ × ৫৯ দ্রষ্টব্য)

মোয়াবিয়া (রাঃ) নিজেই বলিয়াছেন—

ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه - فليقدنا من قتل عثمان فانا
اول من بايعه من اهل الشام

"আমরা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি খলীফা ওসমানের হত্যার কোনই দোষ দেই না। আলী (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীদিগকে শাস্তি বিধান করিলে আমি মোয়াবিয়া সিরিয়াবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার খলীফা হওয়া বরণ ও স্বীকার করিব।" (বেদায়া-ওয়ান-নেহায়া ৭—৬৫)

সুধী পাঠক! স্বচ্ছ হৃদয় ও নির্ম্মল অন্তরে চিন্তা করুন উল্লেখিত ধরনের বাস্তব আপত্তির কারণ দৃষ্টে উক্ত ঐতিহাসিক সত্য ভাবধারা নিয়া যদি বিরোধীতা করা হইয়া থাকে তবে উহাকে কি ঐ শ্রেণীর ছাহাবীবর্গের পক্ষে অপরাধ বলা যাইতে পারে?

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিও মোটেই কোনরূপ দোষারোপ করা যায় না—করিলে তাহাও অবশ্যই ঈমান বিনষ্টকারী হইবে। কারণ, আলী (রাঃ) অবশ্যই সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদের প্রতি ভীষন ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু তাহাদের বিচার করনে এবং দণ্ড দানে তিনি সুযোগের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদেরে শায়েস্তা করা ও দণ্ড দেওয়ার জন্য মোসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন। অতএব যেই নির্ব্বাচন হইয়াছে উহার প্রতি একতাবদ্ধ রূপে স্বীকৃতী প্রদান করা হইলে পরে সন্ত্রাসবাদীদের বিচার দণ্ড ও বিতাড়ন সবই সম্ভব ও সহয হইবে। তাই তিনি বিচারের আগে স্বীকৃতির দাবী করিতে ছিলেন।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই নীতি, এই ভাবধারা এই কর্ম্ম-পদ্ধতিকেও মোটেই দোষারোপ করা যায় না। তাঁহার দাবী ও নীতিও নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মুখস্থ জটিল পরিস্থিতির সামঞ্জস্যেই ছিল। প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পরে আমাদের ন্যায় লোকেরা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় মহানের কার্য্য-ধারাকে কিরূপে দোষারোপ করিতে পারে? বরং তৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দাবীকে শক্তিশালী গণ্য করা হইয়া থাকে।

সার কথা—উল্লেখিত বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ এবং আলী (রাঃ) উভয়পক্ষই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। উভয়ের নীতিও তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিতে সঠিক শুদ্ধই ছিল। কার্য্য-পদ্ধতিতে যে গরমিল ছিল তাহা অচিরেই মিমাংসায় পৌঁছিয়া যাইত—যাহা শত শত রাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়াও বার বার নিকটবর্ত্তী আসিতে ছিল। কিন্তু জাতির অদৃষ্টের পরিহাস—ধুরন্ধর সন্ত্রাসবাদীরা অতি সন্তর্পনে উভয় পক্ষের মধ্যে এমন বিষবাষ্প ছড়াইতে থাকে যাহার ফলে শুধু কর্ম্ম-পদ্ধতির মতবিরোধটা যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিণত হইয়া যায়।

ছাহাবী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য যে, একমাত্র সন্ত্রাসবাদীরাই দায়ী উহার জাজ্বল্যমান প্রমান লিপিবদ্ধ ইতিহাস হইতে "জামাল" যুদ্ধের বয়ানে দেখিতে পাইবেন। যাহা প্রতিটি মোসলমানের অন্তরকে এমনভাবে ছেদন করে যে, তাহা সহ্য করার মত নহে।

পাঠক বৃন্দ! ইতিহাসের সুস্পষ্ট (reference) হাওয়ালার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি ভাল রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তাহাতে আঁচ করিতে পারিবেন যে ছাহাবীদের যুগে সৃষ্ট কেলেঙ্কারীর মূলে খারেজী মোনাফেকদের কি জঘন্য ষড়যন্ত্র ছিল। পক্ষান্তরে ছাহাবা কেরামের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ ছিল। তাঁহাদের মিলন-চেষ্টাকে সর্ব্বদাই অতি জঘন্যরূপে বানচাল করা হইয়াছে।

জামাল-যুদ্ধের ইতিহাস :

সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়া এবং আলী (রাঃ) খলীফা মনোনীত হওয়ার ৪।৫ মাস পরেই বছরায় মোসলমানদের দুই পক্ষে সামরিক সংঘর্ষ হইয়াছিল—যাহা "জঙ্গে-জামাল" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। উহাতে উভয় পক্ষে বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবী সহ দশ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়া ছিলেন। সেই ঘটনার এক পক্ষে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত ২০ হাজার লোক ছিল। অপর পক্ষে আয়েশা (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ৩০ হাজার লোক ছিল। (বেদায়াহ, ৬—২৩)

উভয় পক্ষের সাক্ষাতের বহু পূর্ব্বেই পথি মধ্য হইতে—

بعث على رسولا الى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما الى الالفة والجماعة ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف

"আলী (রাঃ) ছাহাবী কা'কা ইবনে আম্‌র (রাঃ)কে বছরা পানে অপর পক্ষের প্রধান—তাল্‌হা ও যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার নিকট পাঠাইলেন; পরস্পর মহব্বৎ ও একতা বজায় রাখার আহ্বান জানাইয়া এবং বিরোধ ও বিভক্তির বিষময় ফলের প্রতি সতর্ক করিয়া।"

উক্ত ছাহাবী বছরায় উম্মুল-মোমেনীন আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ)কেও তথায় ডাকিয়া আনিয়া বিরোধ অবসান সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। আয়েশা (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীগণকে শাস্তি দানের কথা উল্লেখ করিলে কা'কা (রাঃ) সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া বলিলেন—

انما اخر قتلة عثمان الى ان يتمكن منهم

"আলী (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীগণকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে শুধু এই জন্য বিলম্ব করিতেছেন যে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

ان هذا الامر الذى وقع دواؤه التسكين فاذا سكن اختلجوا

"যে ঘটনা ঘটিয়াছে উহার ঔষধ হইল, শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা; শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলেই উক্ত অপরাধীগণকে নিপাত করিয়া দেওয়া হইবে।"

فقالوا قد اصبت واحسنت فارجع فان قدم على وهو على مثل رأيك صلح الامر

"এতচ্ছ্রবণে আয়েশা (রাঃ) এবং তালহা ও যোবায়ের (রাঃ) সকলেই বলিলেন, আপনি সঠিক কথা বলিয়াছেন এবং ভাল বলিয়াছেন, আলী (রাঃ) যদি এই মতের উপর থাকেন তবে বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।"

فرجع الى علي فاخبره فاعجبه ذلك واشرف القوم الصلح......
وارسلت عائشة......انما جائت للصلح ففرح هؤلاء وهؤلاء

"কা'কা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত আলোচনার সংবাদ প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সমস্ত মোসলমানগণ বিরোধ নিষ্পত্তির আশা করিতে লাগিলেন। আয়েশা (রাঃ) ব্যক্তিগত ভাবেও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বার্ত্তা পাঠাইলেন যে, তাঁহার আগমণ একমাত্র বিরোধ অবসানের জন্য। এই অবস্থায় উভয় পক্ষে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।" ......وقام علي في الناس خطيبا

"আনন্দমুখর পরিবেশে আলী (রাঃ) স্বীয় লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি ভাষণ দান করিলেন। ভাষণের মধ্যে তিনি অন্ধকার যুগের অবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক ইসলামের দ্বারা যে সৌভাগ্য, পরস্পর যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব লাভ হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর আবূ বকর (রাঃ) তাঁহার পর ওমর (রাঃ) তাঁহার পর ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর আমলের শান্তি ও শৃঙ্খলার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান ঘটনা প্রবাহের প্রতিও ইঙ্গিত দান করিলেন। এই ভাষণে তিনি এক শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিয়া বলিলেন—

اقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من انعم الله عليه بها وعلى الفضيلة
التي من الله بها وارادوا رد الاسلام والاشياء على ادبارها

"এক দল লোক নিজেদের জন্য দুনিয়ার উন্নতি চায় এবং আল্লাহ যাহাদিগকে দুনিয়ার উন্নতি দিয়াছেন তাহাদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে। তাহারা ইসলাম এবং মোসলমানদের সমুদয় বিষয়কে অবনতির দিকে নিয়া যাইতে চায়।"

এই ভাষণে আলী (রাঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোভাবের আভাষ দান বলিলেন,

الا اني مرتحل غدا فارتحلوا ولا يرتحل معي احد اعان
على قتل عثمان بشيء من امور الناس

"আমি আগামী কল্য এস্থান হইতে যাত্রা করিব, তোমরাও যাত্রা করিও। কিন্তু আমার সহিত ঐরূপ এক ব্যক্তিও আসিও না যে খলীফা ওসমান (রাঃ)কে হত্যার ব্যাপারে কোনও প্রকারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।"

মোসলমানদের এই আনন্দ-হিল্লোল ও সৌভাগ্য-পূর্ণিমা মুহূর্ত্তে সেই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর আসল রূপ প্রকাশকারী ভূমিকা ইতিহাসের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করুন—

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالاشتر النخعى وشريح وعبد الله بن سبأ وغلاب وغيرهم فى الفين وخمسمائة وليس فيهم صحابى ولله الحمد

"আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষণের পর তাঁহার সঙ্গীগণের নেতৃস্থানীয় একটি বিশেষ দল, যেমন—আশতার নখ্য়ী, শোরায়হ্ এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও গাল্লাব এবং আরও অনেকে একত্রিত হইল। তাহাদের সঙ্গে দুই হাজার পাঁচ শত লোক ছিল। আল্লার শোকর যে, উহাদের মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী একজনও ছিলেন না।"

এই দলটিই ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী দলের সমষ্টি। তাহারাই খলীফা ওসমানের হত্যা-সংশ্লিষ্ট দল। তাহারা ছদ্মবেশে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দলে মিশিয়া রহিয়া ছিল। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষণে তাহারা নিজেদের বিপদ গণিল, তাই তাহারা ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শে বসিয়াছে। তাহাদের সলা-পরামর্শের বিবরণ ইতিহাসের মুখে শুনুন—

فقالوا ما هذا الرأى...... وقد قال ما سمعتم غدا يجمع عليكم الناس وانما يريد القوم كلهم انتم فكيف بكم وعددكم قليل فى كثرتهم........

"তাহারা বলিল, আলীর ভাষণে যে অভিমত ব্যক্ত হইল কি ভয়ঙ্কর সেই অভিমত! তিনি যাহা বলিয়াছেন তোমরা সকলেই তাহা শুনিয়াছ। উভয় পক্ষের সকল লোক সমবেত ভাবে তোমাদের উপর আগামী কল্য আক্রমণ চালাইবে। সকলের আক্রোশ একমাত্র তোমাদের প্রতি। তোমাদের প্রাণ রক্ষার কি উপায় আছে—যখন তোমাদের সংখ্যা তাহাদের অধিক সংখ্যার অনুপাতে খুবই নগণ্য ?"

খলীফা ওসমানের হত্যার অন্যতম অপরাধী আশতার নখয়ী দাঁড়াইয়া বলিল, আমাদের সম্পর্কে তাল্‌হা ও যোবায়রের অভিমত ত পূর্ব্বেই জানা ছিল। আলীর অভিমত অদ্যকার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানা ছিল না। আলী যদি অপর পক্ষের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হয় তবে নিশ্চয় সেই মীমাংসা আমাদের মৃত্যুদণ্ডের উপরই

হইবে। পরিণাম যখন ইহাই হইবে, তখন পূর্ব্বাহ্নেই আমরা আলীকে ওসমানের স্থানে পৌঁছাইয়া দেই (তথা হত্যা করিয়া ফেলি)। এই মন্তব্যে তাহারা নীরব রহিল। কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। তখন আসল মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার এই অভিমত অত্যন্ত ক্ষতিকর; আলীকে আমরা হত্যা করিয়া ফেলিলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। কারণ ওসমানকে হত্যাকারী দল—আমাদের সংখ্যা মাত্র আড়াই হাজার; তাল্‌হা ও যোবায়রের সঙ্গীদের প্রতিরোধ করার কোন শক্তিই তোমাদের নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের আক্রোশ একমাত্র তোমাদের প্রতি।

গাল্লাব নামক ব্যক্তি বলিল, আমরা আলীর দল ত্যাগ করিয়া কোন এক এলাকায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করি। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ তোমাদিগকে থাবাইয়া মারিয়া ফেলিবে।

ثم قال ابن السوداء قبحه الله يا قوم ان عزكم في خلطة الناس

فاذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس

ولا تدعوهم يجتمعون

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবা —আল্লাহ তাহার মুখ কালা করুন— সর্ব্ব শেষে বলিল, হে সঙ্গীগণ! তোমাদের লোকগণ জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া আছে। (তোমরা বিচ্ছিন্ন হইবা না, বরং) যখনই উভয় পক্ষের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে, তখনই তোমরা যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিবে এবং আক্রমণের সূচনা করিয়া দিবে; তাহাদিগকে বিরোধ মীমাংসার জন্য একত্রিত হওয়ার সুযোগই দিবে না।"

ইহা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দলের ষড়যন্ত্রমূলক প্রথম পরামর্শ। পরদিন প্রভাতেই আলী (রাঃ) বিরোধ মীমাংসার দৃঢ় আশা লইয়া বছরা পানে যাত্রা করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না।

وسار طلحة والزبير ومن معهما للقائه

"এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীগণ সহ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা ও সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হইলেন।"

ثم بعث على الى طلحة والزبير يقول انكنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الامر فارسلا اليه في جواب رسالته انا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو

من الصلح بين الناس

"আরও একটি শুভ লক্ষণ এই যে, আলী (রাঃ) তাল্‌হা ও যোবায়রের নিকট এই বলিয়া দুত পাঠাইলেন যে, যদি আপনারা এখনও ঐ সিদ্ধান্তের উপর থাকিয়া থাকেন যে সিদ্ধান্ত আমার প্রথম প্রেরিত দুত কা'কা ইবনে আমরের উপস্থিতিতে সাব্যস্ত হইয়া ছিল, তবে সর্ব্ব প্রকার উস্কানী মুলক কার্য্য বারণ রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন; যেন, আমরা একত্রে বসিয়া বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে চিন্তা করিতে পারি। এই সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) উত্তর পাঠাইয়া দিলেন যে, আমরা সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের উপর অটল রহিয়াছি। উভয় পক্ষের এই বার্ত্তা বিনিময়ে সকলের অন্তরেই শান্তি ও স্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।"

(বেদায়াহ, ৭—২৩৮)

উভয় পক্ষ বছরায় মিলিত হওয়ার পর আলী (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) একত্রে বসিয়া স্থির করিলেন যে, বিরোধের অবসান ও সামরিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। সেমতে আলী (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) নিজ নিজ লোকদের মধ্যেও উহা প্রচার করিয়া দিলেন—

فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التى اشرفوا عليها والصلح وبات الذين اثاروا امر عثمان بشر ليلة وقد اشرفوا على الهلكة وباتوا يتشاورون ليلتهم فاجتمعوا على انشاب الحرب فى السر

"উভয় পক্ষের মোসলমানগণ মীমাংসা ও শান্তির আশা নিয়া এমন স্বস্তির সহিত রাত্রি কাটাইলেন যাহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই। পক্ষান্তরে যাহারা খলীফা ওসমানের ব্যাপারে মিথ্যা প্রচারণা চালাইয়া ছিল তাহারা অত্যন্ত অস্বস্তির রাত্রি কাটাইল; তাহাদের চোখে মৃত্যুর ছবি ভাসিতে ছিল। তাহারা রাত্রে গোপন পরামর্শে স্থির করিল যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইয়া দিবে।"

فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم فخرجوا متسللين وعليهم الظلمة فقصد مضريهم الى مضريهم وربيعتهم الى ربيعتهم ويمنهم الى يمنهم......

فوضعوا فيهم السلاح ....

"ঐ দুষ্কৃতিকারীগণ পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রভাতের অন্ধকারেই সকলের অজ্ঞাতে সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহাদের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকেরা নিজ নিজ গোত্রীয় উভয় পক্ষের মোসলমানদের উপর অন্ধকারের মধ্যেই আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসিল।" (কামেল, ৩—১২৪)

এই ভাবে আড়াই হাজার দুষ্কৃতিকারী যখন অন্ধকারের মধ্যে উভয় পক্ষের লোকদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিল, তখন তাল্‌হা ও যোবায়র রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ মনে করিল যে, আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে, তাই তাহারা অস্ত্র ধারণ করতঃ রণে লিপ্ত হইয়া পড়িল। অপর দিকে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষও মনে করিল যে, তাল্‌হা ও যোবায়েরর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে, তাই তাহারাও অস্ত্র ধারণ করিয়া রণে অবতীর্ণ হইল।

فثار كل فريق الى سلاحه ولبسوا اللامة وركبوا الخيول ولا يشعر
احد منهم ما وقع الامر عليه فى نفس الامر

"এইভাবে উভয় পক্ষের লোকগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে রণ ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রকৃত প্রস্তাবে দুষ্কৃতিকারীগণ যে কুকর্ম করিয়াছে তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারিলেন না। (বেদায়াহ, ৭—২৩৯)

وقامت الحرب على ساق وقدم وتبارز الفرسان وجالت الشجعان
فنشبت الحرب وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع على عشرون
الفا والتف مع عائشة نحوا من ثلاثين الفا فانا لله وانا اليه
راجعون - والسبائية اصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون
عن القتل ومنادى على ينادى الا كفوا الا كفوا فلا يسمع احد

"উভয় পক্ষের যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে বিশ হাজার এবং অপর পক্ষে ত্রিশ হাজার মোট পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল। আল্লাহ মুখ কালা করুন আবদুল্লাহ ইবনে সাবার—তাহার সন্ত্রাসবাদী দল এই সুযোগে বিরামহীনরূপে দ্রুত বেগে হত্যাকাণ্ড চালাইয়া যাইতে লাগিল। আলী (রাঃ) অবস্থা শান্ত করার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা "হে লোক সকল ক্ষান্ত হও—হে লোক সকল ক্ষান্ত হও" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কার চিৎকার কে শুনে?

(বেদায়াহ, ৭—২৩৯)

وتقدمت عائشة وناولت كعب بن سوار مصحفا وقالت ادعهم
اليه وذلك حين اشتد الحرب وحمى القتال فلما تقدم كعب
بن سوار بالمصحف يدعو اليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين

وكان عبد الله بن سبا واتباعه بين يدى الجيش يقتلون من قدروا عليه لا يتوقفون فى احد فلما رأوا كعب بن سوار رافعا المصحف رشقوه بنبلهم فقتلوه

"যুদ্ধের প্রবল উত্তেজনার সময় আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ থামাইবার সর্ব্বশেষ চেষ্টা এই করিলেন যে, বছরার কাজী কায়াবকে পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে দিয়া পাঠাইলেন। তিনি লোকদের মধ্যে কোরআন শরীফ উত্তোলন পূর্ব্বক সকলকে এই পবিত্র কালামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন। কাজী কায়াব কোরআন শরীফ নিয়া অগ্রসর হইলে অপর পক্ষের অগ্রবর্তী অংশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই অগ্রবর্তী দলটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এবং তাহার সন্ত্রাসবাদী দল—যাহারা এই সুযোগে প্রাপ্ত প্রতিটি লোককে হত্যা করিয়া যাইতেছিল। কাহারও জন্য তাহাদের তরবারি থামিতে ছিল না। তাহারা কাজী কায়াবকে কোরআন শরীফ উত্তোলনকারী রূপে দেখিতে পাইয়া সকলে একযোগে তাঁহার প্রতি এমন ভাবে তীর বর্ষণ করিল যে, তিনি স্ব স্থানেই নিহত হইয়া রহিয়া গেলেন।"

(বেদায়াহ, ৬—২৪২)

পঞ্চাশ হাজার লোকের ভীড় ও তুমুল হৈ-হল্লা এবং উহার মধ্যে আড়াই হাজার মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত ঘাতকদের বিরামহীন কারসাজী ও ষড়যন্ত্র এই অবস্থায় শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য নেতৃবৃন্দ ছাহাবা কেরামের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে উভয় পক্ষের দশ হাজার লোকের খণ্ড-বিখণ্ড দেহ-স্তুপের উপর রণ-ঝঙ্কার স্তব্ধ হইল।

দুঃখ-বেদনায় জর্জ্জরিত আলী (রাঃ) উভয় পক্ষের শহীদানদের জানাযা পড়াইয়া দাফন কার্য্য সমাধা করিলেন এবং শোকবিহ্বল কণ্ঠে স্বীয় পুত্র হাসান (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ليت اباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاما "এই দিনের ২০ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়া গেলে ভাল ছিল!"

উত্তরে হাসান (রাঃ) বলিলেন, يا ابت قد كنت انهاك عن هذا "আব্বাজন। আমি আপনাকে প্রথম অবস্থায়ই এই ব্যাপারে বাধা দিয়াছিলাম।"

আলী (রাঃ) বলিলেন, يا بنى انى لم أر ان الامر يبلغ هذا "হে পুত্র! ইহার পরিণতি যে এই হইবে তাহা ধারণাও করি নাই।" (বেদায়াহ, ৭—২৪০)

সুধী পাঠক! শান্ত পরিবেশে, সুস্থির মস্তিষ্কে নির্ম্মল ও স্বচ্ছ অন্তকরণে ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি গভীর ভাবে অনুধাবণ করুন এবং চিন্তা করুন—ছাহাবীদের আমলে মোসলমানদের মধ্যে যে সব কেলেঙ্কারী ঘটিয়াছে উহার মূলে কি ছিল এবং সেই কেলেঙ্কারীর প্রকৃত অপরাধী কাহারা ছিল?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পঞ্চম বাহিনী আবছুল্লাহ ইবনে সাবার দল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ছাহাবীগণ কেন তাহাদের ফাঁদে পড়িলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, অনেক সময় মৌখিক যুক্তি অতি সরল মনে হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে যে অভিজ্ঞতা হাসিল হয় উহার জ্ঞান মৌখিক যুক্তির জ্ঞান অপেক্ষা অধিক সরল ও স্পষ্ট হয়। মৌখিকরূপে এই প্রশ্ন ত অতি সুস্পষ্ট যে, ষড়যন্ত্রের ফাঁদে কেন পড়িলেন ? কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মোনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে মানুষ স্বেচ্ছায় পড়ে না, বরং নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

ভারতবর্ষের উপর মোসলমানদের সাত শত বৎসরের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়াপত্তনে মীর জাফরের ভূমিকা স্মরণ করা হউক। সিরাজদ্দৌলা এবং তাঁহার বিপুল সংখ্যক পূর্ণ অনুগত আমলাগণ মীর জাফরের ষড়যন্ত্র-ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। যদ্দরুণ পলাশীর রণাঙ্গণে ভারতবর্ষে মোসলেম আধিপত্যের সমাধি রচিত হইয়া ছিল—তাহা কি সিরাজ ও তাঁহার অনুগত আমলাগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিল ?

এই ঘটনায় ত শুধু একজন মীর জাফর ছিল, যাহার ষড়যন্ত্রে সাত শত বৎসরের আধিপত্য ও স্বাধীনতার কবর তৈরী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ছাহাবীদের আমলে কেলেঙ্কারী সৃষ্টির গোড়ায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) মীর জাফর ছিল। ছাহাবা কেরাম মানুষ হিসাবে আড়াই হাজার মীর জাফরের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করিতে না পারিলেও আল্লার রহমতে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ নৈতিকতার দ্বারা মোসলেম জাতির স্বাধীনতা ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। ছাহাবা কেরামের অতুলণীয় বৈশিষ্ট্যের ইহা একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মোসলমানদের স্বাধীনতা হরণে ইংরেজ বণিকগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী লোভী শত্রু সেই যুগেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ছাহাবা কেরাম তাঁহাদের বলিষ্ঠ নৈতিকতার দ্বারা সেই লোভীদের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—যাহার একটি নমুনা ইতিহাস হইতে পেশ করা হইতেছে ?

মোসলমানদের সীমান্তবর্ত্তী প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু রোম সম্রাট যাহাকে মোয়াবিয়া (রাঃ) বারংবার আক্রমণ চালাইয়া নিস্তেজ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেই রোম সম্রাট আলী ও মোয়াবিয়ার বিরোধকালে মোসলমানদের কোন এক সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাকে লিখিলেন—

والله لئن لم تنته وترجع الى بلادك يا لعين لاصطلحن انا وابن عمى عليك ولاخرجنك من جميع بلادك ولاضيقن عليك الارض بما رحبت

"রে পাপিষ্ঠ মরদুদ! যদি তুই তোর দুরভিসন্ধি হইতে বিরত না থাকিস এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিস তবে এখনই আমি আপন জন আলীর সহিত সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটাইয়া সম্মিলিত অভিযানে তোকে তোর দেশ হইতেও বিতাড়িত করিব এবং সুপ্রশস্ত ভূপৃষ্ঠ তোর জন্য সঙ্কীর্ণ করিয়া দিব।"

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই হুমকী রোম সম্রাটের নিকট পৌঁছার সাথে সাথে সে তল্পী গুটাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। (বেদায়াহ, ৮—১১৯)

ইতিহাস হইতে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী খারেজী দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদ মূলক কার্য্যকলাপের বর্ণনা এখানেই ইতি দেওয়া হইল। বিভিন্ন হাদীছে তাহাদের পরিচয় এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে সব তথ্য ও ভবিষ্যৎবাণী বর্ণিত রহিয়াছে তাহা (অত্র ৭ম খণ্ডের ২৫৯৪নং হইতে ২৬০১নং হাদীছ পর্য্যন্ত) গভীর ভাবে অনুধাবন করুন।

অত্র পরিশিষ্টের আর একটি মূল বিষয় ছিল—বর্ত্তমান যুগে খারেজী দলের মুখপাত্রের ভূমিকা পালনকারী মোহ্দী সাহেব রচিত যে পুস্তক ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ছাহাবীবর্গের প্রতি ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদের নির্লজ্জ আক্রমণ চালাইয়াছে উহার খণ্ডন এবং সত্য ইতিহাস উদ্ধার করা। পাঠক সমক্ষে এখন তাহা পেশ করা হইবে। পূর্ব্বাহ্নে একটি তথ্য পেশ করা হইতেছে।

অনেক সময় ঈমান ধ্বংসকারী নানারূপ মুখ-চর্চ্চা ও গুজব সমাজে ছড়াইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে সৎসাহসী লোকদের ভূমিকা হয় সত্যের দ্বারা সেই মুখ-চর্চ্চা ও গুজবের প্রতিরোধ ও খণ্ডন করা। খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ছাহাবীদের বিরুদ্ধে খারেজী দল কর্ত্তৃক মিথ্যা অপবাদের অভিযানে সৃষ্ট বিষাক্ত গুজব ও মুখ-চর্চ্চা কিছু অবশিষ্ট যদি সমাজে থাকিয়া থাকে তবে উহার বিরুদ্ধে সৎসাহসী লোকের ভূমিকা গ্রহণ করাই শ্রেয়। খারেজী দলের আবির্ভাব ও তাহাদের সৃষ্ট পরিস্থিতির পর মোহাম্মদী উম্মতের কর্ণধারগণ তাঁহাদের এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপেই পালন করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে যুগে যুগে মোসলেম সমাজের অনেক মনীষীবৃন্দ ওসমান (রাঃ) ও ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে রটানো সমুদয় কেলেঙ্কারীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাগোষ্ঠীর সমুদয় অপবাদের খণ্ডন তাঁহারা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহারা বড় বড় কেতাবও প্রনয়ন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

(১) হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর কোরআন-হাদীছ ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞ কাজী (Gnstice) আবু বকর-ইবনুল আরবী রচিত "আল-আওয়াছেম-মিনাল্ ক্বাওয়াছেম" (ঈমান বিধংসী বিষয়াবলী হইতে রক্ষা পাইবার সুদৃঢ় দুর্গ।)

(২) সপ্তম শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী বিদ্যা-বিশারদ হাফেজ ইবনে তাইমিয়া প্রণীত "মেনহাজুছ্-ছুন্নতিন্-নববীয়াহ্ ফী নক্‌জে কালামিশ্ শীয়ীয়াহ" (শীয়া—খারেজী ফের্কার অপবাদ খণ্ডনে নবীর ছুন্নত তরীকার সরল পথ।)

(৩) দ্বাদশ শতাব্দীর মহা মনীষী শাহ ওলিউল্লাহ দেহ্‌লভীর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আজীজ প্রণীত "তোহ্‌ফা এছ্‌না আশারিয়া" (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সাবার গঠিত রাফেজী ফের্কা যাহারা কালক্রমে বারটি উপদলে বিভক্ত হইয়াছিল তাহাদের শুভ বুদ্ধি আনয়নের জন্য বিশেষ সওগাত।)

এই সব মনীষীবৃন্দ বিশ্ব-মোসলেম বরণীয়। কোরআন-হাদীছ ও ইতিহসে তাঁহাদের অধ্যয়ন, জ্ঞান-গবেষণা ও ব্যক্তিত্ব বিশ্ব বিখ্যাত। সেই তুলনায় মৌদূদী সাহেবের অধ্যয়ন ও জ্ঞান-গবেষণা অনু পরিমাণও কি না সন্দেহ।

পরম পরিতাপের বিষয়, মৌদূদী সাহেব ঐ মনীষীবৃন্দের উক্ত মহতী প্রচেষ্টাকে এবং মোসলেম উম্মতের জন্য তাঁহাদের হিতৈষী সাধনাকে "খলীফা ওসমানের পক্ষে ওকালতী" আখ্যা দিয়া উহার প্রতি অপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু উপেক্ষাই নয়, বরং তাঁহার পুস্তকের ৩২০ পৃষ্ঠায় "وکالت کی بنیادی کمزوری" "ওকালতীর ভিত্তিগত (Funbamental) দুর্ব্বলতা" শিরোনামার দ্বারা ঐ সব সৎ প্রচেষ্টা ও হিত সাধনার অবমাননা করিয়াছেন।

কেহ স্বীয় বাপ-দাদা—বংশের গণ্য-মান্য মুরব্বিগণের হিত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা ও অবমাননা করিলে সে ব্যক্তি বংশের মধ্যে কমিনা সাব্যস্ত হয়। মোসলেম জাতির বাপ-দাদা ও মুরব্বি হইলেন পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দ ও জাতিয় সাধকগণ। সাধনাময় জীবনে তাঁহারা জাতির জন্য যে সব ব্যূহ তৈরী করেন এবং হিতকারী ব্যবস্থা রাখিয়া যান উহাকে যে মানুষ উপেক্ষা ও অবমাননা করে সেও নিশ্চয়ই ঘৃণ্য ও হেয় সাব্যস্ত হইবে।

মৌদূদী সাহেব উক্ত মনীষীবৃন্দের মহতী প্রচেষ্টা ও হিতৈষী সাধনাকে ওকালতী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার পর নিজের বাহাদুরী ঝাড়িয়াছেন যে, "আমি উক্ত মনীষীবৃন্দের ওকালতীর ধার না ধারিয়া সরাসরি ইতিহাসের আশ্রয় নিয়াছি এবং এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্তসমূহে পৌঁছিয়াছি।"

গণ্য-মান্য মুরব্বি উপেক্ষা করিয়া কোন মানুষ অগ্রসর হইতে চাহিলে তাহার ভাগ্যে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে সুন্দর গাধাই জুটে—মৌদূদী সাহেবের তাহাই ঘটিয়াছে। যখন তিনি শিরোমনি মনীষীদের উপেক্ষা করিয়া ইতিহাস ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

তখনই তাঁহার কপাল পুড়িয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর গর্হিত যে সব অপবাদ ও অপপ্রচার মুখ-চর্চ্চায় এবং সোনাভান, গাজী-কালু, ছয়ফল মুল্লুক, শহীদে কারবালা ও বিষাদ-সিন্ধুর ন্যায় ভিত্তিহীন পুথি-পুস্তকাকারের প্রচার পত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের নিভৃত কোণে স্থান পাইয়া ছিল; সুন্দর গাধারূপে ঐগুলিকেই মৌদুদী সাহেব পছন্দ করিয়াছেন। ফলে নিজেও অভিশাপের তলায় পতিত হইয়াছেন, ভক্তদের জন্যও সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা সমাজকে রক্ষা করুন। আমীন !!

খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগসমূহের যাচাই হাদীছ ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে

পাঠকবৃন্দ! মৌদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় খলীফা ওসমানের প্রতি মনোবিকার উদ্‌গিরণের উদ্বোধনে যেই কথা বলিয়াছেন, উহা হইতেই তাঁহার বিভ্রান্তি আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—تغیر کا آغاز ہوا অর্থাৎ "খলীফা ওসমান হইতে পরিবর্ত্তন ও নীতি-চ্যুতি আরম্ভ হইল।" এই ধারণা নিছক ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। প্রকৃত প্রস্তাবে—فتنہ کا آغاز ہوا অর্থাৎ খলীফা ওসমানের আমলে মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী দল সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা সন্ত্রাস-বাদমূলক ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই মোনাফেকদের ষড়যন্ত্রের প্রধান অস্ত্রই ছিল মিথ্যা অপবাদ ও গর্হিত অভিযোগের ব্যাপক প্রচার। খলীফা ওসমানের প্রতি নীতি-চ্যুতির অভিযোগটা বস্তুতঃ ঐ সব মিথ্যা অপবাদ ও গর্হিত গুজবের উপরই স্থাপিত, যাহার বিস্তারিত প্রমাণ ইতিহাস হইতে সম্মুখে পাইবেন। এস্থলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ভবিষ্যৎবাণী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। এই সব ভবিষ্যৎবাণীর হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হয় যে, খলীফা ওসমানের শাসনে বিন্দুমাত্র নীতি-চ্যুতি ছিল না। হাঁ—মোনাফেকদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ছিল।

১। হাদীছ:—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ফেত্‌না তথা সন্ত্রাসবাদমূলক বিশৃঙ্খালা সৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী করিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, أادرکہا—আমি কি সেই ফেতনার যুগ পাইব? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। অতঃপর ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পাইব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। তারপর ওসমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পাইব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যস্থল তুমিই হইবে। (মোছনাদ-বাজ্জার—বেয়াদাহ ৭ × ২০৭)

খলীফা ওসমানের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থায় নীতি-চ্যুতি মোটেই হয় নাই। বরং তাঁহার আমলে এই ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তবায়িত হইয়াছিল। হিজরী ২৪ সনে ওসমান (রাঃ) খলীফা হইলেন, হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা—ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেক মোসলমানদের সমাজে শামিল হইল। মোসলমানদের মধ্যে তাহার শিকড় গাড়িয়া লওয়ার পর চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া সন্ত্রাসবাদী দল ও ঘাটি তৈরী পূর্ব্বক তাহার দলের যে Prospectas বা আনুষ্ঠানিক ঘোষনাপত্র সে প্রকাশ করিয়া ছিল উহার মূল বিষয়ই ছিল এই—

ان عثمان اخذها بغير حق فانهضوا فى هذا الامر فحركوه
وابدؤوا بالطعن على امرائكم

"ওসমান অন্যায়রূপে জবরদস্তি পূর্ব্বক খেলাফত দখল করিয়াছে। তোমরা উঠ এবং আন্দোলন গড়িয়া তোল। তোমাদের উপর নিয়োজিত শাসন পরিচালকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া আন্দোলনের সূচনা কর।" (তারীখ তবরী, ৩—৩৭৯) এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা সম্মুখে আসিবে।

২। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নির্জন পরিবেশ উদ্দেশ্যে একটি বাগানের ভিতরে যাইয়া বসিলেন এবং আমাকে বাগানের প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। তথায় আবু বকর (রাঃ) উপস্থিত হইয়া হযরতের নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর। অতঃপর ওমর (রাঃ) আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কেও বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর। তারপর ওসমান (রাঃ)ও আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর—বালা-মছিবত, আপদ-বিপদের সহিত। এতচ্ছ্রবণে ওসমান (রাঃ) বাগানে প্রবেশ করিলেন তাঁহার (মুখ নিঃসৃত) উক্তি ছিল—اللهم صبرا—الله المستعان "আল্লার নিকটই সাহায্য কামনা করি, হে আল্লাহ! ছবর ও ধৈর্য্যের শক্তি দান করিও।" (বোখারী-মোসলেম)

৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফেতনা তথা সন্ত্রাসবাদমূলক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন এবং বলিলেন—সেই ফেতনা উপলক্ষে ঐ মস্তকাবৃত লোকটি মজলুম ও অন্যায়রূপে নিহত হইবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই মস্তকাবৃত লোকটির প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি ওসমান (রাঃ)। (তিরমিজি)

ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ সাক্ষ্যের ভবিষ্যৎবাণী আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে কতিপয় হাদীছ সম্মুখে আসিতেছে।

পাঠকবৃন্দ! উল্লেখিত হাদীছসমূহ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ইতিহাস দৃষ্টে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া যায় যে, খলীফা ওসমানের সময়ে ফেতনা তথা সন্ত্রাসবাদমূলক ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়া ছিল। মৌদুদী সাহেব যাহা বলিয়াছেন—"খলীফা ওসমানের দ্বারা খেলাফত-তন্ত্রের নীতি-চ্যুতি ও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ছিল।" তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। পরন্ত এখান হইতেই খলীফা ওসমানের প্রতি মৌদুদী সাহেবের বিষোদ্গার আরম্ভ হইয়াছে।

খলীফা ওসমানের প্রাত স্বজন-প্রীতির ভিত্তিহীন অভিযোগ ঃ

অধুনা শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশ যাহারা ইসলামী ইতিহাস শত্রুদের অনুবাদ বা শত্রুদের সংগৃহিত ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিরাছে; ইসলামী ইতিহাসের Original বা মূল ভাণ্ডার হইতে উহা আহরণ করিতে পারে নাই। সচরাচর তাহাদের অধিকাংশের মুখেই উপরোক্ত অভিযোগটা শোনা যায়। এতদ্ভিন্ন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর মিথ্যা Propagnba—অপপ্রচারের সংঘবদ্ধ অভিযানে ইতিহাস সঙ্কলকদের শুধু (Callection) সংগ্রহ পর্য্যায় ঐ অপবাদ ও অপপ্রচারটা সঙ্কলনভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি কোন কোন বিশিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান ও এল্‌মের অধিকারী যাঁহারা নির্ভরশীলও বটেন, কিন্তু তাঁহারা Selection—গ্রহণ পর্য্যায়ে বা আস্থা স্থাপন পর্য্যায়ে নহে, বরং শুধু কথিত আছে ইত্যাদি পর্য্যায়ে স্থান বিশেষে প্রসঙ্গক্রমে ঐরূপ সঙ্কলন হইতে কোন কোন বর্ণনা উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে মুখ-চর্চ্চায় খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা অধুনা কথিতরূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহার মূলে কোন সত্যতা মোটেই নাই। আছে শুধু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী—খারেজী দলের অপপ্রচার। মৌদুদী সাহেব ঐসব অপপ্রচারকেই মূলধন করিয়া এই কুখ্যাত অভিযোগ-টাকে ঐতিহাসিক সত্যেরূপে দাঁড় করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"নিঃসন্দেহে ইহা (অর্থাৎ স্বজন-প্রীতি) খলীফা ওসমানের (Police) নীতি ও কার্য্য-পদ্ধতির একটা ভ্রান্ত ধারা ছিল।" মৌদুদী সাহেবের এই

ঊর্দ্ধত্যপূর্ণ উক্তি হাদীছেরও পরিপন্থি, ইতিহাসেরও পরিপন্থি। প্রথমে এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করা হইল—

১। হাদীছ ঃ—একদা সিরিয়ায় কতিপয় ব্যক্তি এক সমাবেশে ভাষণ দান করিলেন, যাঁহাদের কতেক জন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীও ছিলেন। তন্মধ্যে মোর্‌রাহ ইবনে কায়াব (রাঃ) দাঁড়াইরা বলিলেন, নিজ কানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ (বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে) শুনা না থাকিলে আমি কথা বলিতাম না।

একদা হযরত (দঃ) ফেতনা তথা ষড়যন্ত্রমূলক বিশৃঙ্খলার কথা বর্ণনা করিলেন এবং উহা যে, অতি দুরে নহে তাহাও উল্লেখ করিলেন। এমন সময় মস্তকাবৃত একটি লোক নিকটবর্ত্তী পথে যাইতে ছিলেন। হযরত (দঃ) সেই লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সেই সময় হেদায়েতের উপর সুদৃঢ় থাকিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি লোকটির প্রতি ছুটিয়া গেলাম ; দেখিলাম, তিনি ওসমান (রাঃ)। আমি তাঁহার চেহারা হযরতের প্রতি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উদ্দেশ্য কি এই লোকটি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। (তিরমিজি শরীফ—বেদায়াহ, ৭×২০৯)

২। হাদীছ ঃ— আবছুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন ফেতনা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে সেই সময় তুমি কি করিবে ? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল যাহা আমার জন্য পছন্দ করেন। হযরত (দঃ) তখন একটি লোককে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ ব্যক্তির সঙ্গী হইয়া থাকিও ; সে এবং তাহার সঙ্গীগণ ঐ সময় হক তথা সঠিক নীতির উপর দৃঢ় পদ থাকিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি ঐ লোকটির পেছনে ছুটিলাম এবং তাহাকে দুই কাঁধে ধরিয়া হযরতের প্রতি তাহার মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উদ্দেশ্য কি এই ব্যক্তি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি ছিলেন ওসমান (রাঃ)। (তিরমিজি, ফিল্‌বাব—বেদায়াহ, ৭—২০৯)

৩। হাদীছ ঃ—আবছুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তিনটি সময়ের ফেতনা হইতে যে ব্যক্তি বাঁচিবে সে প্রকৃত প্রস্তাবেই বাঁচিয়া গেল। (১) আমার মৃত্যু উপলক্ষে (২) দজ্জালের আবির্ভাব উপলক্ষে (৩) একজন খলীফার নিহত হওয়া উপলক্ষে, যিনি ধৈর্য্য ধারণকারী এবং হক ও ন্যায় নীতির উপর দৃঢ়পদশীল হইবেন ; প্রতি ক্ষেত্রে তিনি হক তথা ন্যায় ও সঠিক নীতির পরিচয় দান করিবেন। (ছনদের সহিত বেদায়াহ, ৭—২১০)

৪। হাদীছ:—কায়াব ইবনে ওজরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফেতনা সৃষ্টির আলোচনা করিলেন এবং উহা যে, অতি নিকটবর্ত্তী উহা যে, অতি ভয়াবহ আকারের হইবে তাহাও উল্লেখ করিলেন। ঐ সময় চাঁদরে আবৃত একটি লোক যাইতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখাইয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই ফেতনার সময় ঐ লোকটি হক্ব ও ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি ঐ লোকটির প্রতি দ্রুত ছুটিয়া গেলাম এবং তাঁহার বাহুদ্বয় ধরিয়া হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই ব্যক্তিই কি আপনার উদ্দেশ্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। সেই লোকটি ছিলেন ওসমান (রাঃ)। (মোসনাদ আহমদ— বেদায়াহ, ৭ - ২১০)

সুধী সমাজ! লক্ষ্য করুন—উল্লেখিত হাদীছসমূহে আল্লার রসুলের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, খলীফা ওসমানের আমলে যাহা ঘটিয়া ছিল উহা ফেতনা তথা ষযড়ন্ত্রমূলক ও সন্ত্রাসবাদমূলক বিশৃঙ্খলাই ছিল এবং সেই ফেতনার ব্যাপারে খলীফা ওসমান (রাঃ) মোটেই দোষী ছিলেন না। তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার নীতি-চ্যুতি ঘটে নাই। তিনি কোন ভ্রান্ত নীতিতে পরিচালিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন হক্ব, হেদায়েত তথা নির্ম্মল সুষ্ঠু সটিক ন্যায় নীতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে মৌহুদী সাহেব খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অত্যন্ত নগ্ন ভাষায় ভ্রান্ত নীতির অনুসারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। চতুর মৌহুদী সাহেব মোসলমানদের ঈমানী অনুভূতি (Sense) ও চেতনাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন······ پالیسی کا یہ پہلو অর্থাৎ খলীফা ওসমানের নীতির শুধু এই একটা দিক ভ্রান্ত ও গলদ ছিল। উক্ত ফাঁকির ফন্দিটাকে পূর্ণ রূপ দান পূর্ব্বক গাল ভরিয়া খলীফা ওসমানের প্রশংসা করতঃ বলিয়াছেন, তাঁহার নীতির ঐ একটা দিকই ভ্রান্ত ছিল, বাকি সবই ছিল ঠিক।

মৌহুদী সাহেব আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া খলীফা ওসমানের প্রতি যে আঘাত হানিয়াছেন তাহা একটি হইলেও উহা অতি বড়। খলীফা ওসমানের নীতির ভ্রান্তি যাহা মৌহুদী সাহেব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা হইল—নিজ বংশের লোকদিগকে সরকারী পদ বড় ও বেশী দেওয়া এবং বাইতুল মাল (সরকারী ধন-ভাণ্ডার) হইতে নিজ বংশীয় লোকদিগকে বেশী দেওয়া। (কুখ্যাত পুস্তক ৯৯ পৃঃ, উহার উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধের "সরকারী পদ সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ খণ্ডনের" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই দুইটি দোষ যে, গণতন্ত্রী শাসকদের পক্ষে কত বড় হীন দোষ তাহা সকলেই অবগত আছেন। আর ইসলামের বিধানে ত ভয়াবহ কুফল উহার জন্য রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

"যে ব্যক্তি জনসাধারণের উপর কর্তৃত্বের সুযোগে সরকারী পদ প্রদানে স্বজন-প্রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। তাহার ফরজ বা নফল কোন প্রকার এবাদৎই কবুল করিবেন না" (মূল গ্রন্থ ৭খণ্ড"রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা"পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মৌহুদী সাহেব খলীফায়ে-রাশেদ ওসমান (রাঃ) যাঁহার পক্ষে আল্লার রসুলের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী রহিয়াছে যে, তিনি হক ও হেদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাকে ঐ দুষ্ট দোষে দোষী এবং ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

মৌহুদী সাহেব মোসলমানদের ঈমানী (Sense) চেতনাকে ভয় করিয়া খলীফা ওসমানের পক্ষে দুই-চারটা বাক্য ব্যয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত করা স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর গঠিত অপবাদকে রূপ-সজ্জা দানে তিনি অভিযোগকে জোরদার করার সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

এমনকি মৌহুদী সাহেব তাহার কুখ্যাত পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায় খলীফা ওসমানের স্বজন-প্রীতির তথ্যাটা অতীব দুঃখের সহিত উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"এই স্বজন-প্রীতির শেষ ফল এই হইল যে, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইল এবং উহাতে শুধু তিনি শহীদই হইলেন না, বরং গোত্রীয় ঈর্ষার নিস্তেজ অগ্নি পুনরায় লেলিহান হইয়া উঠিল। যাহাতে দগ্ধ হইয়া পূর্ণ খেলাফত-তন্ত্রই ভস্মিভূত হইয়া গেল।" অর্থাৎ গোটা খেলাফৎ ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে অপরাধী হইলেন খলীফা ওসমান (রাঃ); তাঁহার স্বজন-প্রীতির পরিণামেই তিনিও শহীদ হইয়াছেন এবং খেলাফৎও ধ্বংস হইয়াছে। এই জঘন্য মন্তব্যের অসারতা প্রমাণে ইহার বিশ্লেষণই যথেষ্ট। যথা—

মৌহুদী সাহেবের এই মন্তব্যে কয়েকটি দাবী উদ্‌ঘাটিত হয়। (১) খলীফা ওসমানের শহীদ হওয়া সহ তাঁহার আমলের সমুদয় কেলেঙ্কারীর জন্য তাঁহার স্বজন-প্রীতির দোষই মূল কারণ ছিল। (২) খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ ঘটিয়া ছিল। (৩) সেই বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণই খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ছিল। (৪) খলীফা ওসমানের শহীদ হওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী অর্থাৎ আলী (রাঃ) ও তাঁহার সমর্থনকারী হাজার হাজার ছাহাবী ও তাবেয়ী এবং তাঁহার বিপক্ষ আয়েশা (রাঃ), তালহা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও তাঁহাদের সমর্থনকারী হাজার হাজার ছাহাবী ও তাবেয়ী তাঁহাদের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব গোত্রীয় ঈর্ষায় সৃষ্ট ছিল। এই দাবীগুলি মৌহুদী সাহেবের নিজের জন্ম দেওয়া। কারণ, এই শ্রেণীর কোন তথ্যের আবিষ্কারে ইতিহাসের একটি শব্দেরও সমর্থন পাওয়া যায় না। মৌহুদী সাহেবও এই মন্তব্যের উপর কোন রেফারেন্স দিতে পারেন নাই।

এতদ্ভিন্ন চতুর্থ দাবীটি ত ইসলামী আকিদা ও ভাবধারারই পরিপন্থী। এস্থলে পরিশিষ্টের "ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে মোসলমানদের কর্ত্তব্য" শিরোনামা পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন ; বুঝিতে পারিবেন, ঐরূপ ধারণা কি জঘন্য ! অপর দাবী তিনটিও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবের পরীপন্থী এবং ইতিহাসেরও পরিপন্থী। ৩৬৭ পৃষ্ঠায় "খারেজী দলের ষড়যন্ত্র-মূলক কার্য্যকলাপের ইতিহস"শিরোনামার বর্ণনায় প্রামাণিকরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী খারেজী দলই সমুদয় কেলেঙ্কারীর মূল ছিল এবং তাহারাই খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ছিল। তাহারা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অকস্মাৎরূপে এই কুকীর্ত্তিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়া ছিল। রাষ্ট্রের চৌদ্দ আনা জনসাধারণ ছিল মোসলমান, সেই মোসলমান জনগণের কোন বিদ্রোহ বা সম্পর্ক খারেজী দলের এই কার্য্যের পেছনে ছিল না। সন্ত্রাসবাদী খারেজী দল সম্পূর্ণ আতর্কিতে কাজ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে পারিয়া ছিল। এই তথ্যের বিস্তারিত ও প্রামাণিক ইতিহাস উক্ত শিরোনামায় পাঠ করিয়াছেন, এস্থলে উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন। বিশেষতঃ প্রথম দাবীটি ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী এবং হাদীছের সম্পুর্ণ পরিপন্থী। "খলীফা ওসমান সম্পর্কে অভিযোগের যাচাই হাদীছ ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে" শিরোনামায় বর্ণিত হাদীছ সমূহ পাঠ করুন।

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কোন ত্রুটিই কোন কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী ছিল না, বরং সব কিছুরই মূল কারণ ছিল খারেজী দলের ষড়যন্ত্র। এই দাবীর সমর্থনে। ইতিহাসে আরও বহু তথ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

হিজরী ৩৪ সনে ঐ মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী ঘাতক দলটি পূর্ণ যৌবন-উন্মাদনার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ঐ সময় তাহারা যে দলীয় Manifesto ইস্তাহার এবং Prospectus অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিয়াছিল তাহাই মূল ঘটনাকে প্রকাশ করিতে যথেষ্ট। এ সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় ইতিহাসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে জরীর তবরী বর্ণনা করিয়াছেন—

ثم قال لهم بعد ذلك انه كان الف نبى لكل نبى وصى وكان
على وصى محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء
ثم قال بعد ذلك ومن اظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى
الله عليه وسلم ووثب على وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتناول امر الامة ثم قال لهم بعد ذلك ان عثمان اخذها بغير
حق وهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهضوا فى هذا

الامر فحركوه وابدؤوا بالطعن على امرائكم واظهروا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس ......

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাহার দল গঠনের পর লোকদিগকে বলিল, এক হাজার নবী এমন গুজরিয়াছেন যাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ "ওছী" বা খলীফা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেমতে আলী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের "ওছী"। অতঃপর বলিল, মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী ; তদ্রূপ আলী সর্ব্বশেষ "ওছী"। আরও বলিল, সর্ব্বাধিক অন্যায়কারী ও স্বেচ্ছাচারী ঐ ব্যক্তি যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিয়ত ও নির্দ্ধারণকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। সে রসুলুল্লার অছীর উপর প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উম্মতের শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অতঃপর আরও বলিল, ওসমান অন্যায় ভাবে খেলাফৎ দখল করিয়াছে। রসুলুল্লার অছী ও খলীফা হইতেছেন আলী। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা এই ব্যাপারে উঠ, জাগ এবং আন্দোলন গড়িয়া তোল। তোমরা সর্ব্বপ্রথমে তোমাদের শাসনকর্ত্তা গভর্ণরদেরকে দোষী বলিয়া প্রচার কর। তোমরা প্রকাশ্যে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করিয়া বেড়াইও। ইহাতে তোমরা লোকদেরকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইবে ; তোমরা লোকদিগকে এই আন্দোলনের প্রতি আহ্বান জানাও।"

এই পরিকল্পনা প্রদান করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাহার প্রচারকগণকে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দিল। বিভিন্ন শহরে যে সব সন্ত্রাসবাদী ছিল তাহাদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে ষড়যন্ত্র চালাইল। তাহারা শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষ গড়াইয়া প্রচারপত্র বিলি করিতে আরম্ভ করিল। শহরে শহরে এই শ্রেণীর প্রচারপত্র আদান-প্রদানে সমগ্র দেশে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। (তারীখ তবরী ৩—৩৭৯)

ইতিহাসবিদ ইবনে কাছীর লিখিতেছেন—

ثم يقول وقد كان اوصى الى على بن ابى طالب فمحمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ثم يقول فهو احق بالامرة من عثمان معتد فى ولايته ما ليس له فانكروا عليه .. فافتتن به بشر كثير من اهل مصر وكتبوا الى جماعات من عوام اهل الكوفة والبصرة فتمالئوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا ان يجتمعوا فى الانكار على عثمان وارسلوا اليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته اقربائه وذوى رحمه وعزله كبار الصحابة فدخل هذا فى قلوب كثير من الناس

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বলিতে লাগিল, মোহাম্মদ (দঃ) আলীকে ওছী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী। আলী সর্ব্বশেষ ওছী। অতএব আলী ওসমান অপেক্ষা খেলাফতের অধিক হক্কদার এবং ওসমান অন্যায়রূপে খেলাফৎ দখল করিয়াছে। খলীফা হওয়ার তাহার কোন হক্ক নাই। সুতরাং হে লোক সকল তোমরা ওসমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার এই অপপ্রচারে মিশরের অনেক লোক বিভ্রান্ত হইয়া গেল। তাহারা কুফা ও বছরার দলগুলির প্রতিও পত্র লিখিল। পরস্পর পত্রালাপের দ্বারা সকলে একমত হইয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল যে, তাহারা ওসমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে এক যোগে কাজ চালাইয়া যাইবে। তাহারা খলীফা ওসমানের নিকটও এক দল লোক পাঠাইল। তাহারা তাঁহার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিল। তাঁহার সম্মুখেও উল্লেখ করিল যে, তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে চাকরীর সুযোগ বেশী দিয়া থাকেন এবং বড় বড় ছাহাবীগণকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দলের এই অপপ্রচারে অনেক লোকের ভিতরেই বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইল। (বেদায়াহ, ৭—১৬৮)

খলীফা ওসমানের আমলে আবির্ভূত ফেতনা বা বিশৃঙ্খলার মূলে যে, খলীফা ওসমানের কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি মোটেই ছিল না, বরং উহার মূলে শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদিতাই ছিল, ইতিহাসে উহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। হাদীছ-তফছীরের এমাম বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ দামেস্ক অধিবাসী ইবনে কাছীর, যিনি মৌদুদী সাহেব অপেক্ষা খলীফা ওসমানের আমলে সৃষ্ট সমুদয় ঘটনাস্থলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন এবং সময়ের দিক দিয়াও ৬০০ বৎসরের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রত্যক্ষ করুন—

هؤلاء ممن يؤلب عليه ويمالئ الاعداء في الحط والكلام فيه وهم
الظالمون في ذلك وهو البار الراشد رضي الله عنه

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দলের উল্লেখ করিয়া এমাম ইবনে কাছীর বলিতেছেন, "সন্ত্রাসবাদীগণই খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে লোকদিগকে সংঘবদ্ধ করিত এবং তাহারাই তাঁহার দোষ-চর্চ্চা ও ক্ষতি সাধনে জোট বাঁধিয়া ছিল। পক্ষান্তরে খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পাক পবিত্র ন্যায় ও সঠিক নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।" (বেদায়াহ, ৭—১৬৬)

আরও লক্ষ্য করুন! মৌদুদী সাহেব ১৪০০ বৎসর পর তদন্ত ও গবেষণা চালাইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ সমুদয় ঘটনার উপস্থিত সময়

কালেও তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই তদন্তে বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের দ্বারা সমুদয় এলাকার সংবাদ ও রিপোর্ট সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সেই রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপে খলীফা ওসমানের অনুকুলে ছিল। কোথাও জন-সাধারণ মোসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার অভিযোগও পাওয়া যায় নাই—বিদ্রোহত দুরের কথা। ইতিহাস-সাক্ষ্যে সেই তদন্তের রিপোর্ট প্রত্যক্ষ করুন—

হিজরী ৩৫ সালের প্রথম দিকে মদীনাবাসীগণের নিকট বিশেষতঃ তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট খলীফা ওসমান (রাঃ) পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি নির্ভরশীল বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিয়া তথাকার অবস্থা জ্ঞাত হউন। সেমতে ওসমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোহাম্মদ ইবনে মাছলামাহকে কুফায়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্রের ছেলে এবং হযরতের বিশিষ্ট প্রিয়পাত্র উছামা (রাঃ)কে বছরায়, আম্মার ইবনে ইয়াছের (রাঃ)কে মিশরে, খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে সিরিয়ায় এবং বিভিন্ন এলাকায় আরও অনেককে তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র মিশরে প্রেরিত আম্মার (রাঃ)ই তদন্ত শেষে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব করিয়াছিলেন*। তদন্ত কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ সকলেই যথা সময়ে তদন্ত-কার্য্য সমাধা করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রকাশ্য জন-সমাবেশে বলিলেন—

ايها الناس ما انكرنا شيئا ولا انكره اعلام المسلمين ولا عوامهم وقالوا جميعا الامر امر المسلمين الا ان امراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم

"হে লোক সকল! আমরা কোথাও কোন অভিযোগ শুনিলাম না এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে বিশিষ্ট মোসলমানগণ বা সর্ব্ব-সাধারণ মোসলমানগণ কেহই কোন অভিযোগ রাখে না। তদন্তকারীগণ ইহাও স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, জন-সাধারণ মোসলমানদের প্রত্যেক কাজেই তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম রাখিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহে নিয়োজিত থাকেন।"
(তবরী, ৩—৩৭৯)

এই তদন্তের পর পরই খলীফা ওসমান (রাঃ) একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন উহার বিষয়বস্তু এবং প্রতিক্রিয়া খলীফা ওসমানের নির্ম্মল পবিত্রতাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করে। উহা সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা এই—

* যাহার কারণ "খারেজী দলের উৎপত্তি ও ইতিহাস" শিরোনামার বৃত্তান্তে বর্ণিত হইয়াছে।

ওসমান (রাঃ) প্রতি শহরে শহরে ঘোষনাপত্র পাঠাইয়া দিলেন—"আমি প্রতি বৎসর হজ্জ উপলক্ষে আমার সহকর্ম্মী গভর্ণরদের উপস্থিতিতে তাহাহের কার্য্যক্রমের যাচাই করার ইচ্ছা করিয়াছি। যখন হইতে আমি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছি জাতীকে আমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিতে উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছি। সেমতে আমার উপর বা আমার কোন সহকর্ম্মীদের উপর কোন দাবী উত্থাপন করা হইলে, তাহার দাবী আমি পুরণ করিয়া দিব।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রের কোন বস্তুর উপর জনসাধারণের অগ্রে আমার বা আমার বাল-বাচ্চার কোন হক নাই। রাষ্ট্রের সব কিছু জনসাধাণের জন্য।

মদীনাবাসীগণ আমাকে জ্ঞাত করিয়াছে, এক দল লোক গালি-গালাজ ও মার-ধর করার পথ অবলম্বন করিয়াছে। কি জঘন্য যাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া গালি দেয় বা লুকাইয়া লুকাইয়া মার-ধর করে। রাষ্ট্রীয় কোন হক সম্পর্কে কাহারও কোন দাবী থাকিলে সে যেন হজ্জ উপলক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হয় এবং তাহার হক আমার হইতে বা আমার সহকর্ম্মী হইতে, উসুল করিয়া নেয়—যে এলাকার হকই হউক। কিম্বা তাহারা যেন মাফ করিয়া দেয়; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারীকে পুরস্কার দান করিবেন।" সমগ্র এলাকায় এই ঘোষনাপত্রের যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল সে সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য এই—

فلما قرئ فى الامصار ابكى الناس ودعوا لعثمان قالوا
ان الامة لتمخض بشر

"এই ঘোষনাপত্র শহরে শহরে পাঠ করা হইলে, ইহার মর্ম্ম লোকদেরকে কাঁদাইয়া ফেলিল এবং লোকগণ হাত উঠাইয়া ওসমানের জন্য প্রাণ-ঢালা দোয়া করিল। সকলেই বলিল, জাতীর মধ্যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক গজাইয়া উঠিয়াছে।"
(তবরী ৩—৩৮০)

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং ঘোষনাপত্রের বিষয়বস্তু ও উহার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়া দেয় যে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীগণ ছাড়া সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের কোন অভিযোগই ছিল না। না খলীফা ওসমানের প্রতি, না তাঁহার সহকর্ম্মী গভর্ণরদের প্রতি। হাঁ—মোনাফেকগণ এবং সন্ত্রাসবাদীগণ মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা দোষ-চর্চ্চার একটা রব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়া ছিল। এই সবের মধ্যে বাস্তবতা মোটেই ছিল না।

এই সত্যের স্বপক্ষে ইহাও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মোসলমানদের প্রাণ-কেন্দ্র রাজধানী মদীনার বুকে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি

অভিযোগের ছড়াছড়ি ছিল না। কোন প্রকার বিদ্রোহও ছিল না। খলীফা ওসমানের সঙ্গে বিতর্ক, তাঁহার শাহাদৎ বা হত্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে যত কিছু বিশৃঙ্খলা মদীনায় ঘটিয়াছে সবই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক ও তাহার স্বষ্ট দলের সন্ত্রাসবাদী লোকগণ মিশর, বছরা ও কুফা হইতে একযোগে মদীনায় আমদানি হইয়া স্বষ্টি করিয়া ছিল। মদীনাবাসীগণ ঐ সব ঘটনার সহিত জড়িত থাকা ত দুরের কথা, বরং হিজরী ৩৪ সনে প্রথমবার যখন খলীফা ওসমানের সঙ্গে বিতর্কের জন্য সন্ত্রাসবাদী দল মিশর, বছরা ও কুফা হইতে মদীনার প্রতি ধাওয়া করিয়াছিল এবং সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা ও শক্তি মদীনাবাসীদের শক্তি অপেক্ষা অধিক ছিল না, তখন মদীনাবাসীগণ আগন্তুক সন্ত্রাসবাদী দলের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোর মনোভাব দেখাইয়া ছিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের বাহ্যিক মোসলমান-দল-ভুক্তির প্রতি নজর করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমার ঘোষনা না করিলে ঐ সময় মদীনাবাসীদের হাত হইতে সন্ত্রাসবাদীদের রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "সরকারী ধন-ভাণ্ডার সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ খণ্ডন" শিরোনামার বৃত্তান্তে বর্ণিত হইবে। খলীফা ওসমানকে শহীদ করার ঘটনায় মদীনাবাসীদের ভূমিকা ত পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

সুধী পাঠক! আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দলীয় ইস্তাহার ও আনুষ্ঠানিক ঘোষনাপত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে মৌদুদী সাহেবের আনিত স্বজন-প্রীতির অভিযোগ বস্তুতঃ ঐ মোনাফেক দলের স্বষ্ট অভিযোগই। উহার অবাস্তবতা ইতিহাসের সাক্ষ্যেই সংক্ষেপে অবগত হইয়াছেন। সম্মুখে উহার মিথ্যারূপ আরও বিস্তারিতভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

মোনাফেক দলের ইস্তাহার ও ঘোষনাপত্রে আরও একটা জঘন্য অভিযোগের উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য বা মৌদুদী সাহেবের দুর্ভাগ্য যে, তিনি উহার উল্লেখ করেন নাই। সেই অভিযোগটি হইল খলীফা ওসমানের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া সম্পর্কে—যে, তিনি অন্যায় ভাবে জবরদস্তি মূলক খেলাফতের গদি দখল করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে মোনাফেকগণ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছে। অধিকন্তু মোনাফেকরা ইহাও বলিয়াছে যে, স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে খেলাফতের উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন। মোনাফেকদের এই সব দাবী শুধু প্রমাণহীনই নহে, বরং জাজ্বল্যমান মিথ্যাও বটে। স্বয়ং আলী (রাঃ)ও এইরূপ কোন বিষয়ের উল্লেখ কখনও করেন নাই। কোন একজন ছাহাবীর গোচরেও এইরূপ কোন তথ্য ছিল না। খলীফা ওসমান (রাঃ) সহ তিন জন খলীফার নির্ব্বাচনে ঐরূপ কোন তথ্য

কেহই উল্লেখ করেন নাই, আলী (রাঃ)ও খলীফা নির্ব্বাচনে জনগণের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। মোনাফেক দল বস্তুতঃ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিও অনুরাগী ছিল না। তাহারা তাঁহার নামকে শুধুমাত্র প্রতারণামূলক ব্যবহার করিয়াছিল। মোসলমানদের খেলাফত-ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমে বর্ত্তমান খলীফার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইলে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম লইয়া দাঁড়াইতে হইবে—একমাত্র সেই হিসাবেই মোনাফেক দল আলী (রাঃ)এর নাম ব্যবহার করিতে ছিল। এক্ষেত্রে খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন-বৃত্তান্ত ছহীহ হাদীছ এবং ইতিহাসের মাধ্যমে উল্লেখ করা মোনাফেকদের অপবাদ খণ্ডনে বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইবে, খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে কিরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল।

খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ ঃ

দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) ঘাতকের হাতে ভীষণ ভাবে আহত হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফা নির্ব্বাচনের জন্য তিনি নিজেই বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের মধ্য হইতে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্ব্বাচনী কমিশন গঠন করিলেন। খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর উক্ত কমিশন তাঁহাদের প্রথম বৈঠকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিজেদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট সদস্য আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর খলীফা নির্ব্বাচনের ভার ন্যাস্ত করিলেন। তিনি দিবা-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদের মতামত যাচাই করিলেন। সর্ব্বসাধারণ মোসলান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, নেতৃস্থানীয় প্রশাসক শ্রেণী ইত্যাদি সকলের মতামতই তিনি একক ভাবে ও একত্রিত ভাবে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে সংগ্রহ করিলেন। এমনকি পর্দ্দানশীন মহিলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় শিক্ষার্থীদের মতামতও খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বিভিন্ন এলাকার শহর ও গ্রাম হইতে আগন্তুকদের মতামতও যাচাই করিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) একনিষ্ঠভাবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতঃ বিরামহীনরূপে লোকদের মতামত যাচাই, বুদ্ধি জিবীদের সহিত পরামর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লার নিকট এস্তেখারা ও দোয়ার মধ্যে চার দিন ব্যাপৃত থাকিলেন। তাঁহার এই অক্লান্ত ও সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলাফল ইতিহাসবিদগণ এক বাক্যে ইহাই লিখিয়াছেন যে—

فلم يجد احدا يعدل بعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه

"ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমতুল্য কাহাকেও গণ্য করা যায়, এই রূপ আভাস তিনি কোথাও পাইলেন না।" (বেদায়াহ-ওয়ান-নেহায়াহ ৭—১৪৬)

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অছিয়ত ছিল—

فاذا مت فتشاوروا ثلاثة ايام وليصل بالناس صهيب ولا
يأتين اليوم الرابع الاو عليكم امير منكم

"আমার মৃত্যুর পর (নির্ব্বাচনী কমিশন) তিন দিন পর্য্যন্ত ছলা-পরামর্শ করিবে। এই তিন দিন মসজিদে-নববীতে নামাযের ইমামত ছোহায়েব (রাঃ) করিবেন। অতঃপর আমার মৃত্যুর চতুর্থ দিন আসিলে ঐ দিন অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচন সম্পন্ন করিবে।" (তবরী ৩—২৯২)

সেমতে চতুর্থ দিনের রাত্রের শেষ ভাগে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ঐ আমামা ও পাগড়ী স্বীয় মাথায় বাঁধিলেন, যে আমামা হযরত রসুলুলাহ (দঃ) নিজ হস্তে তাঁহার মাথায় বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন। তিনি মোহাজের ও আনছার সকলকে একত্রিত করার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত সামরিক বাহিণীর অধিনায়কগণ যাঁহারা হজ্জ উপলক্ষে ঐ সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকেও একত্রিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর তিনি ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) সহ মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন। ফজরের আজান দেওয়া হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ লোকে লোকারণ্য। নামাযান্তে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) আলী (রাঃ)ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নরূপে কথা বলার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বারে আরোহণ করিয়া ভাষণ দান করিলেন—

فتشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا على انى قد نظرت فى امر
الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا

"আবদুর রহমান (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফতের পর বলিলেন, হে আলী! আমি সকল শ্রেণীর লোকদের মতামত যাচাই করিয়াছি। আমি তাহাদের মধ্যে এরূপ আভাস পাই নাই যে, তাহারা খেলাফতের জন্য কাহাকেও ওসমানের সমতুল্য গণ্য করে +। সুতরাং আপনি মনক্ষুন্ন হইবেন না।"

(বোখারী শরীফ ১০৭০ পৃষ্ঠা)

\+ ইহা খলীফা ওসমানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে প্রধান নির্ব্বাচনী কমিশনার ছাহাবীর সাক্ষ্য যাহা বোখারী শরীফে বর্ণিত।

তারপর আবহুর রহমান (রাঃ) ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরা অবস্থায় উর্দ্ধপানে তাকাইয়া তিন বার বলিলেন—

اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد

"হে আল্লাহ! তুমি শুনিও এবং সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ! তুমি শুনিও এবং সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ। তুমি শুনিও এবং সাক্ষী থাকিও।"

اللهم انى قد خلعت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبة عثمان

"হে আল্লাহ! আমার কাঁধে যেই দায়িত্ব ছিল তাহা আমি সম্পন্ন করতঃ ওসমানের কাঁধে বোঝা উঠাইয়া দিলাম।" এই বলিয়া সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচনী কমিশনার আবহুর রহমান (রাঃ) ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাতে হাত দিয়া তাঁহাকে খলীফা গ্রহণের শপথ করিলেন। তারপর সমস্ত লোক ওসমান (রাঃ)কে খলীফা গ্রহণ করার শপথ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আলী (রাঃ) সেই শপথ করিলেন ↑।" (বেদায়াহ, ৭—১৪৭)

বিশ্ব-ইতিহাসের এইরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা ছিল খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন। ইহা দ্বারা খারেজী দলের অপপ্রচারের জঘণ্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

প্রিয় পাঠক! খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি স্বজন-প্রীতির অভিযোগ যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষ্য ও অনেক অনেক হাদীছের পরিপন্থী এবং এই অভিযোগের মূল সূত্র যে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী মোনাফেক দলের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার, সুস্পষ্ট ইতিহাসের মাধ্যমে তাহা আপন'রা অবগত হইলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষ্যের পরিপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রকারী শত্রুদের মুখের প্রচারণা হিসাবে ঐ অভিযোগটার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হওয়া প্রতিটি মোসলমানের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় মৌহুদী সাহেব সেই স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবকে বাছিয়া লইয়াছেন। আরও অধিক দুঃখের বিষয় যে, মৌহুদী সাহেব সন্ত্রাসবাদী মোনাফেকদের মিথ্যার বেসাতিকে

↑ গ্রন্থকার ইবনে কাছীর (রাঃ) এস্থলে ইহাও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শুদ্ধ ইহাই যে, আলী (রাঃ) বিনা বাক্য ব্যয়ে ঐ সময়ই ওসমান (রাঃ)কে খলীফা গ্রহণ করার শপথ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবিদ যেমন ইবনে জরীর তবরী ইহার ব্যতিক্রম বর্ণনা বয়ান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা শুদ্ধ নহে।

বোখারী শরীফ ৫২৫ পৃষ্ঠায়ও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবহুর রহমান (রাঃ) শপথ করার পর ঐ বৈঠকেই আলী (রাঃ) শপথ করিয়া ছিলেন।

বোক্‌চা বাঁধিয়া ক্ষান্ত ও শান্ত হইয়া রহিলেন ; উহা খণ্ডনের ভূরিভূরি তথ্য যাহা ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে ঐ সবের প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন না। খলীফা ওসমানের প্রতি স্বজন-প্রীতির অভিযোগ খণ্ডনে আরও অকাট্য প্রমাণ ইতিহাস ভাণ্ডারে প্রত্যক্ষ করুন।

স্বজন-প্রীতির অভিযোগের দুইটি শাখা—একটি হইল বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডার হইতে নিজ আত্মীয়বর্গকে অধিক প্রদান করা। অপরটি হইল সরকারী পদ বড় বড় এবং অধিক নিজ আত্মীয়গণকে দেওয়া। উভয়টির খণ্ডন ইতিহাসের মাধ্যমে, সরল ও সুস্পষ্ট যুক্তির আলোতে ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখান হইবে।

সরকারী ধন-ভাণ্ডার সম্পর্কে স্বজন-প্রীতির অপবাদ খণ্ডন ঃ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে সর্ব্ব সমক্ষে মদীনাবাসীগণকে সাক্ষী করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতিতে স্বয়ং খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত অপবাদের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ইতিহাস হইতে পূর্ণ ঘটনার বিবরণের সহিত সেই উত্তরই পাঠক সমক্ষে পেশ করা হইতেছে—

হিজরী ৩৪ সনের ঘটনা—মদীনার বাহিরে দূর দুরান্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচারের খবরাখবর জ্ঞাত হইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ) মদীনায় গভর্ণর সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণ মদীনায় পৌঁছিলেন। সন্ত্রসাবাদীগণ প্রদেশসমূহে গভর্ণরদের অনুপস্থিতির সুযোগে বিদ্রোহ সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিল। সেই পরিকল্পনা বানচাল হওয়া এবং সন্ত্রাস-বাদীদের পরবর্ত্তী কার্য্যক্রমের বিবরণ ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত রহিয়াছে।

ولما رجع الامراء لم يكن للسبائية سبيل الى الخروج.....

وكاتبوا اشياعهم من اهل الامصار ان يتوافوا بالمدينة......

“গভর্ণরগণ মদীনার সম্মেলন হইতে দ্রুত নিজ নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে প্রদেশসমূহে বিদ্রোহ সৃষ্টির অবকাশ থাকিল না। তখন তাহারা নিজেদের সহকর্ম্মী ও ক্রীড়নকগণকে পত্র মারফৎ আর এক পরিকল্পনা জ্ঞাত করিল। একযোগে সকলে মদীনায় উপস্থিত হইয়া মূল উদ্দেশ্য সাধন সম্পর্কে পথ খুঁজিবে। পরিকল্পনায় তাহারা ইহাও প্রকাশ করিল যে, বাহ্যিকভাবে তাহারা সদুপদেশ প্রদান করিয়া বেড়াইবে এবং খলীফা ওসমান (রাঃ)কে বিভিন্ন প্রশ্ন করিবে। যাহাতে ঐ বিষয়গুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায় এবং খলীফা ওসমানের উপর অভিযোগ রূপে দাঁড়ায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদী আবহুল্লাহ ইবনে সাবার দল বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মদীনায় একত্রিত হইল। ওসমান (রাঃ) তাহাদের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মদীনাবাসী দুই জন লোককে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। এই লোক দুইটির উপর কোন ব্যাপারে খলীফা ওসমান (রাঃ) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহারা হকের সামনে নত হইয়া ছবর করিয়া ছিল, খলীফার বিরুদ্ধে কোন শত্রুতায় মাতিয়া উঠে নাই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীগণ এই লোক দুইটিকে দেখিয়া তাহাদেরে খলীফার বিরুদ্ধে সহজে কাবু করিতে পারিবে মনে করিল এবং নিজেদের পরিকল্পনা এবং মূল ইচ্ছা তাহাদের নিকট খুলিয়া বলিল।

ব্যক্তিদ্বয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, من معكم على هذا من اهل المدينة "তোমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে মদীনাবাসীদের কে কে তোমাদের সঙ্গে আছে? তাহারা বলিল, ثلاثة نفر "তিন জন"। ব্যক্তিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, هل الا "আর কেহ আছে কি? তাহারা বলিল, لا—"না"। ব্যক্তিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, তা হইলে এত বড় কাজ তোমরা কিরূপে করিবে? তাহারা বলিল, আমাদের পরিকল্পনা এই যে, কতিপয় বিষয়ের অভিযোগ আমরা খলীফার উপর দাঁড় করিব। এই অভিযোগগুলির বীজ আমরা অনেক লোকের অন্তরে বপন করিয়া রাখিয়াছি। এখন মদীনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সেই লোকদের নিকট যাইয়া বলিব যে, আমরা মদীনায় যাইয়া খলীফা ওসমানের উপর অভিযোগগুলি পূর্ণরূপে স্থাপন করিয়া আসিয়াছি। তিনি অভিযোগের কারণগুলি ত্যাগ করিলেন না তওবাও করিলেন না। এইভাবে লোকদিগকে খলীফার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিয়া পুনরায় আমরা অধিক শক্তি সহকারে হজ্জ করার ভান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিব এবং অতর্কিতে মদীনা চড়াও করিয়া খলীফাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিব। সে অবস্থায় হয় তিনি পদত্যাগ করিবেন—না হয় আমাদের হাতে প্রাণ হারাইবেন।

উক্ত ব্যক্তিদ্বয় তাহাদের নিকট হইতে খলীফা ওসমানের নিকট আসিয়া সব কিছু জ্ঞাত করিলেন। ওসমান (রাঃ) হাসিলেন এবং দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ! এই লোকদিগকে (তাহাদের নাপাক ইচ্ছা হইতে) তুমিই বাঁচাইয়া রাখ, নতুবা তাহারা হতভাগা হইবে। অতঃপর ওসমান (রাঃ) কুফা ও বছরা হইতে আগন্তুক ঐ সন্ত্রাসবাদীগণকে মসজিদে ডাকাইলেন। নামাযের আজান হইল। সন্ত্রাসবাদীগণ খলীফা ওসমানের সম্মুখে মিম্বারের নিকটবর্ত্তী বসিলে উপস্থিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ খলীফাকে ঘিরিয়া বসিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) হাম্দ-ছানার পর ভাষণ দান পূর্ব্বক উপস্থিত সকলকে সন্ত্রাসবাদীদের সমুদয় বিষয়

জ্ঞাত করিলেন এবং ঐ ব্যক্তিদ্বয় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিল। তখন মদীনাবাসীগণ এক বাক্যে বলিলেন—

اقتلهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله فاقتلوه

"এদেরকে হত্যা করুন। কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য বা অপর কাহারও জন্য লোকদের শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকাবস্থায় ক্ষমতা দখলের প্ররোচণা চালাইবে, তাহার উপর আল্লার লা'নৎ বর্ষিবে এবং তোমরা তাহাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে।" কিন্তু খলীফা ওসমান (রাঃ) তাহাদের প্রতি উদারতা দেখাইয়া বলিলেন—

بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا ولا نحاد احدا حتى يركب حدا او يبدى كفرا ان هؤلاء ذكروا امورا قد علموا منها مثل الذى علمتم الا انهم زعموا انهم يذاكرونها ليوجبوها على عند من لا يعلم

"আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিব, গ্রহণ করিব এবং আমার সৎ প্রচেষ্টা তাহাদেরে বুঝাইব। আমি কাহাকেও প্রাণদণ্ড দিব না—যাবৎনা সে প্রাণদণ্ডের অপরাধ করে বা প্রকাশ্যে কুফরী করে। এই লোকগণ এমন কতিপয় অভিযোগ আনয়ণ করিয়াছে যাহা সম্পর্কে তাহারাও তদ্রূপই জ্ঞাত আছে যেরূপ তোমরা জ্ঞাত আছ। অবশ্য তাহারা বলিয়াছে যে, অভিযোগগুলি আমার সম্মুখে উল্লেখ করিবে—এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা এই সম্পর্কে জ্ঞাত নহে ঐরূপ লোকদেরে আমার উপর ঐ সব অভিযোগ সাব্যস্ত বলিয়া তাহারা বুঝাইবে।"

অতঃপর ওসমান (রাঃ) সুদীর্ঘ বিবৃতিতে তাহাদের অভিযোগগুলির উত্তর এবং স্বীয় কতিপয় সৎ প্রচেষ্টার বর্ণনা দান করিলেন। প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান (রাঃ) স্বীয় উক্তির উপর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্য চাহিতেন। তাঁহারাও এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেন এবং চিৎকার করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের প্রাণদণ্ডের দাবী করিতেন। স্বজন-প্রীতির সম্পর্কেও অনেক বিষয়ের উত্তর দিলেন। পূর্ণ বিবৃতির উদ্ধৃতি অনেক লম্বা, তাই নমুনা স্বরূপ শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে। তিনি বলিলেন—

وقالوا انى أحب اهل بيتى واعطيهم فاما حبى فانه لم يمل معهم على جور احمل الحقوق عليهم واما اعطاؤهم فانى ما اعطيهم فمن مالى ولا استحل اموال المسلمين لنفسي ولا لاحد من الناس

ولقد كنت اعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى ازمان رسول الله صلى الله......

"তাহারা অভিযোগ করিয়া থাকে, আমি আমার আপন জনকে অধিক ভালবাসি এবং তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আপন জনের সঙ্গে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু কোন অন্যায় ব্যাপারে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা হয় না। বরং তাহাদের প্রাপ্য হক আমি তাহাদেরকে পৌঁছাইয়া দেই।

আর তাহাদেরকে অধিক দিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব মাল হইতে দিয়া থাকি। মোসলমানদের মাল তথা সরকারী ধনভাণ্ডারকে আমি আমার জন্য এবং আমার কোন ব্যক্তির জন্য হালাল মনে করি না। রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে এবং আবুবকর ও ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমার আমলেও আমি আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব মাল হইতে ভাল ভাল এবং বড় বড় দান করিয়া থাকিতাম। অথচ ঐ সময় ত বয়স হিসাবে আমার জন্য ধনদৌলতের প্রতি স্পৃহার সময় ছিল। আর এখন আপন পরিজনের মধ্যে আমার বয়স সর্ব্বাধিক। আমার বয়স শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে ; এমতাবস্থায় আমি আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব যাহা কিছু ছিল তাহা আপন জনগণকে দিয়া দিয়াছি—তাহাতে বেঈমানগণ নানা রকম কথা বলে।"

এই বক্তৃতার মধ্যে ওসমান (রাঃ) উক্ত নিজস্ব দান ও ব্যয়ের জন্য সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে কোন কিছু গ্রহণ না করার প্রমাণে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

وانى قد وليت وانى اكثر العرب بعيرا وشاءا فمالى اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجى اكذلك قالوا اللهم نعم

"আমি যখন খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়াছি তখন আমি আরবের সর্ব্বাধিক বড় ধনী ছিলাম। আরবের মধ্যে সব চেয়ে বেশী উট-বকরী আমার ছিল। এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার হজ্জের জন্য রক্ষিত দুইটি উট ছাড়া অতিরিক্ত একটি উট বা একটি বকরীও নাই। ওসমান (রাঃ) স্বীয় এই উক্তির উপর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্য চাহিলেন—ইহাই কি প্রকৃত অবস্থা নয়? তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে আল্লাহকে হাজির-নাজির উল্লেখ করতঃ বলিলেন, হাঁ—ইহা বাস্তব সত্য।"

খলীফা ওসমানের এই বক্তৃতা বর্ণনাকারী এই তথ্যও প্রকাশ করিয়াছেন যে—

وكان عثمان قد قسم ماله وارضه فى بنى امية وجعل ولده كبعض من يعطى

"ওসমান (রাঃ) নিজস্ব সমুদয় ধন ও সম্পত্তি নিজ বংশের লোকদের মধ্যে ভাগ বন্টন করিয়া দিয়া ছিলেন↑। এমনকি স্বীয় পুত্র-কন্যাকে দানকৃত লোকদের সম শ্রেণীর করিয়া দিয়া ছিলেন।

এই বিবৃতির পর সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি মদীনাবাসীদের মনোভাব সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য—

ولانت حاشية عثمان لأولئك الطوائف وابى المسلمون الا قتلهم وابى الا تركهم

"সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর মন নরম ছিল, আর মোসলমানগণ এক বাক্যে তাহাদের প্রাণদণ্ড দাবী করিতে ছিলেন, কিন্তু ওসমান (রাঃ) তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার উপরই দৃঢ় থাকিলেন।" (তবরী ৩—৩৮৪)

খলীফা ওসমান (রাঃ) এই মোনাফেক দলের ষড়যন্ত্র অবগত ছিলেন না।—তাহা নহে, কিন্তু তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করেন নাই; এই কারণে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত মোসলমানদের নীতিই ছিল মোনাফেকদিগকে বরদাশ্‌ত ও সহ্য করিয়া যাওয়া এবং তাহাদের উপর তরবারী ব্যবহার না করা। হযরতের আমলে কত সময় কত মোনাফেকের মোনাফেকী-ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় ওমর ফারুক প্রমুখ ছাহাবীগণ তাহাদের গর্দ্দান কাটিয়া ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। হযরত (দঃ) কখনও উহার অনুমতি দেন নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণঘাতি শত্রু মোনাফেক-সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলামের ও মোসলমানদের এবং স্বয়ং হযরতের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধনে কত শত ষড়যন্ত্রই না—করিয়া ছিল এবং সুস্পষ্টরূপে পবিত্র কোরআনের আয়াত ও ছুরা নাজেল হইয়া তাহার দলের অপরাধ সাব্যস্তও করিয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার দলে তিন শতের অধিক লোক ছিল। ওহী মারফৎ তাহাদের সকলের পরিচয় হযরত (দঃ)কে জ্ঞাত করা হইয়া ছিল। কিন্তু হযরত (দঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করেন নাই। তরবারী ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনাও তিনি সর্ব্বদা

↑ নিজস্ব মাল দান করা কালে নিজের বংশ এবং আত্মীয়-স্বজনই অগ্রগণ্য, ইহাই ইসলামের বিধান এবং ছুন্নত তরীকা। এমনকি জাকাত-ছদকা যাহা গরীবদের হক সে স্থলেও শরীয়ত মতে জাকাতের পাত্র নিজ আত্মীয় গরীবই অগ্রগণ্য।

প্রত্যাখ্যান করিতেন। প্রথম খলীফার এবং দ্বিতীয় খলীফার আমলেও ঐ নীতিই চলিয়া ছিল। ইতিপূর্ব্বে মোনাফেকদের দলবদ্ধ ভাবে মোসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহারের কোন নজীর পরিদৃষ্টও হয় নাই। খলীফা ওসমান (রাঃ) সেরূপ আশঙ্কা দৃঢ়ভাবে মোটেই উপলব্ধি করেন নাই। সুতরাং তিনি সন্ত্রাসবাদী মোনাফেকদের ব্যাপারে নির্ভীক চিত্তে হযরত (দঃ), খলীফা আবু বকর ও খলীফা ওমরের নীতির উপরই অটল রহিলেন। কারণ, বিষয়টি ছিল অতিশয় জটিল—যে, ইসলামের কলেমা-তৌহীদের স্বীকৃতি ঘোষনাকারীদের উপর তরবারী ব্যবহার করা—যাহা রসুলুল্লাহ(দঃ) করেন নাই এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফাদ্বয়ও করেন নাই। ইহা যে, কত বড় বাধা কত বড় চিন্তার বিষয় তাহার গুরুত্ব বর্ত্তমান ক্ষমতা ও গদির মোহান্ধতার যুগে উপলব্ধি করা না হইলেও খলীফা ওসমান (রাঃ) উহার গুরুত্ব খুবই উপলব্ধি করিতেন এবং সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয় মনে করিতেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে মোনাকেকগণ সর্ব্ব শেষ মুহূর্ত্তে সকলের ধারণা ও চিন্তার বহু উর্দ্ধে যে পন্থা ও শক্তি ব্যবহার করিয়া ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে একটি নূতন বিষয় ও নূতন সমস্যা ছিল। এই শ্রেণীর কোন ঘটনার উৎপত্তি হযরতের আমলে বা খলীফা আবু বকর ও খলীফা ওমরের আমলে মোটেই হয় নাই। আর খলীফা ওসমান ত ইহাতে প্রাণই হারাইলেন। সুতরাং এই শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের কোন ছুন্নত বা ইসলামী নীতি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ আমল হইতে গ্রহণ করার উপায় ছিল না। ইতিপূর্ব্বে এই সম্পর্কে চিন্তা করারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এই সমস্যাটি ছিল মোসলেম জাতির প্রতি ভয়াবহ হুমকি। এরূপ ক্ষেত্রেও যদি তরবারী ব্যবহার না করার নীতি চালান হয় তবে গোটা মোসলেম জাতিই মোনাফেকদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হইতে বাধ্য হইবে, অতএব নূতন ভাবে এই সমস্যার সমাধানের চিন্তার আবশ্যক হইল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল বা প্রত্যক্ষ কার্য্য ধারা হইতে উহার সমাধান পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই তাঁহার বাণী হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথম খলীফা আলী(রাঃ) ঐরূপ পরিস্থিতিতে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করেন। তিনি এই মোনাফেকের দল—খারেজী ফের্কার উপর তরবারী চালাইয়া তাহাদিগকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করেন।

প্রিয় পাঠক! বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধনভাণ্ডার সম্পর্কে স্বজন-প্রীতির অপবাদ যে, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তীহীন ছিল স্বয়ং খলীফা ওসমানের বিবৃতি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইল। খলীফা ওসমানের এই বিবৃতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে সর্ব্বসমক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) স্বীয় উক্তির উপর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত বিবৃতি ও উহার পূর্ণ ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মৌদুদী সাহেব মোসলেম সমাজের সম্মুখে উক্ত বিবৃতির কোনও আভাস না দিয়া শুধু কেবল মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীদের অপপ্রচারে সৃষ্ট মতবাদকেই বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করিয়াছেন।

মৌদুদী সাহেব শুধু এই স্থানেই নয়, বরং তাহার ৩৫৫ পৃষ্ঠার কুখ্যাত পুস্তকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মান অধিপতি হ্যার হিটলারের প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী হ্যার গোয়েবলের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, মিথ্যাকেও যদি বার বার বলা হয় তবে লোকের নিকট উহা সত্যে পরিণত হইয়া যায়।

সরকারী পদ সম্পর্কে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ খণ্ডন ঃ

স্বজন-প্রীতির অভিযোগের দ্বিতীয় শাখা—নিজ আত্মীয়গণকে সরকারী পদ বেশী ও বড় বড় দান করা। এ সম্পর্কে স্বয়ং খলীফা ওসমানের অনেক বিবৃতি ইতিহাসে বিদ্যমান আছে, যাহার বিরাট সংগ্রহ পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দের গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে। কিন্তু মৌদুদী সাহেব তাঁহাদের মহতী প্রচেষ্টাকে খলীফা ওসমানের পক্ষে ওকালতী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন এবং মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীদের অপপ্রচার বা সেই অপপ্রচারে সৃষ্ট মতবাদ প্রচারের জয়ঢাক সাজিয়াছেন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমরা উক্ত অভিযোগ খণ্ডনে অতি সরল ও অধিক ক্রিয়াশীল আর একটি তথ্য ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিয়া পাঠক সমক্ষে রাখিতেছি। বহু কথিত ও চিন্তাবিদ নামে প্রচারিত মৌদুদী সাহেব যদি এই তথ্যটি উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার ভ্রান্ত মতবাদের পরিবর্ত্তনে অনেক সাহায্য লাভ হইত। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য খণ্ডনের উপায় কি আছে যে, তাঁহার আবির্ভাব যেন একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলের সমর্থনের জন্যই।

তথ্যটি হইল এই ঃ—শাসন পরিচালনের ভার আঞ্চলিক বা বিভাগীয় পর্য্যায়ে যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকে খেলাফততন্ত্রের ভাষায় তাঁহাদিগকে "আমেল" বলা হয়। খেলাফততন্ত্রে সরকারী বড় পদ বলিতে "আমেল" পদকেই বুঝায়। এই পদকেই মৌদুদী সাহেব "গভর্ণর" পদ বলিয়াছেন ; প্রচলিত ভাষায়ও তাহাই হয়। মৌদুদী সাহেবের অভিযোগ হইল—খলীফা ওসমানের আমলে গভর্ণর বা আমেলের পদ তিনি তাঁহার আত্মীয়দেরকে বেশী দিয়াছেন। মৌদুদী সাহেব স্বীয় পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় ঐরূপ কতিপয় আমেলের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! খলীফা ওসমান (রাঃ) নিজ আত্মীয়বর্গকে আমেলের পদ অধিক দিয়াছিলেন—এই কথা সত্য বা মিথ্যা তাহার বিচারে লম্বা-চৌড়া দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইহার সত্য-মিথ্যা হওয়ার যাচাই অতি সহজ সরল ও অকাট্য-

রূপে ইহার দ্বারাই হইয়া যাইবে যে, খলীফা ওসমানের সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের খেলাফৎ আমলে কতজন লোক আমেল তথা শাসন-কার্য্য পরিচালক পদের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর তন্মধ্যে খলীফা ওসমানের আপন জনের সংখ্যা কি ছিল এবং তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা কিরূপ ছিল? আদমের সন্তান সকলের মধ্যেই পরস্পর আত্মীয়তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু অভিযোগের সৌধ ঘনিষ্টতার উপরই দাঁড়াইতে পারে। আত্মীয়গণের সংখ্যা ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ইতিহাস হইতে আহরণ করা হইলে আপনা আপনিই মৌদুদী সাহেবের ধূম্রজালে ঢাকা মিথ্যা ও কুখ্যাত অভিযোগের মুখস খুলিয়া যাইবে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করা কালে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কার্য্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার আমেল ছিলেন—১। আবদুল্লাহ ইবনুল হজরমী (রাঃ) ২। কাসেম ইবনে রবিয়াতা ছকফী (রাঃ) ৩। ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) ৪। আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়া (রাঃ) ৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) ৬। সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ) ৭। আবদুল্লাহ ইবনু সায়াদ ইবনে আবী সারাহ (রাঃ) ৮। মোয়াবিয়া (রাঃ) ৯। আবদুর রহমান ইবনু খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ১০। হাবীব ইবনু মাছলামাহ (রাঃ) ১১। আবুল আ'ওয়ার (রাঃ) ১২। আলকামাহ ইবনুল হাকীম (রাঃ) ১৩। আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস (রাঃ) ১৪। আবুদ্ দরদা (রাঃ) ১৫। আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) ১৬। জাবের ইবনু ফোলান (রাঃ) ১৭। সেমাক আনছারী (রাঃ) ১৮। কা'কা ইবনু আমর (রাঃ) ১৯। জরীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) ২০। আশয়াছ ইবনু কায়েস (রাঃ) ২১। ওতায়বা ইবনু নাহ্হাস (রাঃ) ২২। মালেক ইবনু হাবীব (রাঃ) ২৩। নোসায়ের (রাঃ) ২৪। সায়ীদ ইবনু কায়েস (রাঃ) ২৫। সায়েব ইবনু আফ্রা (রাঃ) ২৬। হোবায়েশ (রাঃ) ২৭। ওক্বা ইবনু আমর (রাঃ) ২৮। যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ)। (তবরী, ৩—৪৪৬, কামেল, ২—৯৫) ২৯। কায়েস ইবনু হোবায়রা—তূস এবং নিশাপুরের আমেল। ৩০। আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ—সিজিস্তানের আমেল। ৩১। এমরান—মকরানের আমেল। ৩২। ওমায়ের ইবনু ওসমান ইবনে সায়াদ—পারস্যের আমেল। ৩৩। ইবনু কোনায়দার কোশায়রী—কেরমানের আমেল। (কামেল, ৩—৫১)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় এই ব্যক্তিবর্গও আমেল হইয়া ছিলেন—৩৪। হিজরী ২৪ সনে কুফার আমেল সায়াদ ইবনু আবী ওক্কাছ (রাঃ) ৩৫। হিঃ ২৫ সন পর্য্যন্ত আজারবাইজনের আমেল ওত্বা ইবনুল ফারকাদ (রাঃ) ৩৬। হিজরী ২৫ সনে কুফার আমেল ওলীদ ইবনু ওকবাহ (রাঃ) ৩৭। হিজরী ২৬ সনে উন্দুলুসের আমেল আবদুল্লাহ ইবনু নাফে ইবনে আবদুল কায়েস। ৩৮। হিজরী ২৭ সন পর্য্যন্ত মিশরের আমেল আম্র ইবনুল আ'ছ (রাঃ)।

হিজরী ২৯ সনে পরিস্থিতির প্রয়োজনে পারস্যের বিভিন্ন এলাকার জন্য এবং খোরাসানের বিভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমেল নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। পারস্যের এলাকা সমূহে—৩৯। হরম ইবনু হাইয়্যান ইয়াশকুরী ৪০। হরম ইবনু হাইয়্যান আবদী ৪১। খিরবীত ইবনু রাশেদ ৪২। তরজুমান হোজায়মী ৪৩। মেনজাব ইবনু রাশেদ। খোরাসানের এলাকা সমূহে—৪৪। আল-আখ্‌নাফ ৪৫। হাবীব ইবনে কোর্‌রাহ ৪৬। খালেদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে মোহায়ের ৪৭। আমীর ইবনে আহ্‌মার। (কামেল, ৩—৫০)

পাঠকবৃন্দ! আপনারা শুনিয়া বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইবেন, আর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলের অপপ্রচারে বা মৌদুদী সাহেবের ঢাক পিটানিতে যাহারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহারা ত বিশ্বাসই করিবে না—কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জের সহিত বলিতেছি যে, সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের খেলাফত আমলে ৪৭ জন আমেল বা কর্ম্মকর্ত্তার মধ্যে খলীফা ওসমানের আত্মীয় শুধু মাত্র পাঁচ জন ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জন তাঁহার নিজ বংশের—তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোত্র কোরায়েশ গোত্রের শাখা উমাইয়া বংশের; খলীফা ওসমানের সঙ্গে বহু দুর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। আর দুই জন তাঁহার বংশের ছিলেন না, শুধু মাত্র দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা তাঁহার সঙ্গে ছিল। প্রথমোক্ত তিনজন হইলেন—(১) মোয়াবিয়া (রাঃ) (২) ওলীদ ইবনু ওকবাহ্ (রাঃ) (৩) সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ)। অপর দুই জন হইলেন—(৪) আবদুল্লাহ ইবনু আমের (রাঃ) (৫) আবদুল্লাহ ইবনু সায়াদ ইবনে আবী ছারাহ (রাঃ)।

সুধী সমাজ! এখন ৪৭-এর মধ্যে তিনের পরিমাণ লক্ষ্য করুন এবং মৌদুদী সাহেবের কুখ্যাত পুস্তকে ৯৯ পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতির বিচার করুন—

خلیفہ اس امر کا پابند ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کریگا مگر بد قسمتی سے خلیفۂ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں معیار مطلوب قائم نہ رکھ سکے انکے عہد میں بنی امیہ کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطئے دیے گئے

"খলীফা ওমরের নির্দ্দেশ ছিল, পরবর্ত্তী খলীফা বাধ্য থাকিবেন, তিনি নিজ বংশের সহিত কোন বিশেষ প্রীতিজনক ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এই ব্যাপারে সন্তোষজনক (Balance) সামঞ্জস্য বা সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে (তাঁহার বংশ) উমাইয়া বংশের লোকদিগকে বেশী পরিমাণে বড় বড় সরকারী পদ এবং সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে সম্পদ দান করা হইয়াছে।"

সুধীবৃন্দ ! খলীফা ওসমানের প্রতি মৌদুদী সাহেবের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ অপবাদ মূলক উক্তি সম্মুখে রাখিয়া আর একটি তথ্য জ্ঞাত হইলে অধিক মর্ম্মাহত হইবেন যে, মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানের বদনামী রটাইতে কি ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন ! সেই তথ্যটি হইল একটি সত্য ইতিহাস—খলীফা ওসমানের উমাইয়া বংশের উক্ত তিন জন আমেলের মধ্যে দুই জনই ছিলেন বহু পূর্ব্ব হইতে স্বয়ং খলীফা ওমর কর্ত্তৃক নিয়োজিত। তাঁহাদের নিয়োগ খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক ছিল না, বরং খলীফা ওমর কর্ত্তৃক ছিল। এতদ্ভিন্ন ৪৭ জন আমেলের মধ্যে যে পাঁচ জন আমেল খলীফা ওসমানের আত্মীয় ছিলেন তাঁহাদের আত্মীয়তার সূত্রের দূরত্ব অনুধাবন করিলে জ্ঞানী মাত্রই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এত দূরের আত্মীয়তা অভিযোগের কারণ হইতে পারে না। বরং শুধু খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অভিযুক্ত করার জন্যই শত্রুগণ কর্ত্তৃক খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া খোঁজ করতঃ উহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পাঁচ জনের জীবন-ইতিহাস পর্য্যালোচনায় আরও বহু তথ্যের উদ্ঘাটন হইবে ; যদ্দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক ও তাহার সমর্থকদের মুখ আপনা আপনিই কালা হইয়া যাইবে। ধারাবাহিকরূপে উক্ত পাঁচ জনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হইতেছে—

মোয়াবিয়া (রাঃ) ঃ

মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে দুই শ্রেণীর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। এক শ্রেণীর হইল—মোয়াবিয়া (রাঃ) কর্ত্তৃক খলীফা ওসমানের হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তির দাবী উত্থাপন সম্পর্কে। বস্তুতঃ ইহাই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মৌদুদী সাহেবের আক্রোশের বড় কারণ। এই আক্রোশেই তিনি বে-সামাল হইয়া পুস্তকের ১২৪ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বহু অকথ্য কথার সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা সমালোচনার জন্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধের আবশ্যক। আমরা এস্থানে উল্লেখিত পৃষ্ঠাগুলি হইতে কতিপয় নমুনার উদ্ধৃতি দিব।

খলীফা ওসমানের হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি-দাবী সম্পর্কে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে মৌদুদী সাহেবের চার্জ্জসিটে এই তিনটি অভিযোগও রহিয়াছে—(১) হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল না। সুতরাং কর্তৃপক্ষের উপর তাহাদের শাস্তির কোন দাবী উঠিতেই পারে না। অতএব এই দাবী বেআইনী এবং অন্ধকার যুগের রীতির অন্তর্ভুক্ত। (২) মোয়াবিয়া (রাঃ) হত্যাকৃত খলীফা ওসমানের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী তথা নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ছিলেন না। সুতরাং খলীফা ওসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা বা তাহাদের

শাস্তি-দাবী করার অধিকার মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ছিল না। অতএব তাঁহার এই কার্য্য বেআইনী ও শরিয়ত বিরোধী ছিল। (৩) মোয়াবিয়া (রাঃ) এই দাবী করেন নাই যে, আলী (রাঃ) তাহাদিগকে শাস্তি দান করুক, তাঁহার দাবী ছিল, তাহাদিগকে আমার হাওয়ালা করা হউক; আমি তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দিব। মোয়াবিয়ার এই দাবী অন্যায় ও অযৌক্তিক ছিল।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে এই চার্জ্জ-সিটের ব্যাপারে মৌদুদী সাহেব সাধারণ জ্ঞান পরিপন্থী এবং দিবালোকের ন্যায় সত্য ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিয়াছেন। প্রথম দুইটি অভিযোগ নিছক ভুল। কারণ, যে কোন নরহত্যার মোকদ্দমা দায়ের করা না হইলেও আসামীদিগকে শাস্তি দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। এমনকি কেহ বাদী না হইলেও গভর্ণমেন্ট বাদী হইয়া আসামীদের শাস্তি বিধান করিতে হইবে। শাসন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে গড়িমশি করিলে জন-সাধারণ উহার দাবী উত্থাপন করিতে পারিবে না—এরূপ কোন যুক্তিও নাই, শরীয়তের মছআলাহও নাই।

কেছাছ—খুনের বদলে খুনের মছআলাহ সম্পর্কে নিকটবর্ত্তী ওলীর দাবী শর্ত্ত রহিয়াছে; মৌদুদী সাহেব সেই মছআলাহ দ্বারা মতলব সিদ্ধির ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ঘোর অজ্ঞতার পরিচয়। লক্ষ্য করুন, আলী (রাঃ)কে এই সন্ত্রাসবাদী দলেরই সদস্য আবদুর রহমান ইবনে মোলজেম শহীদ করিয়াছিল এবং আসামী ধরা পড়িলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। অথচ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকটবর্ত্তী ওলীদের মধ্যে তাঁহার পুত্র আব্বাস নাবালেগ ছিলেন। কেছাছের বিধানে অনেক ইমামের মতে ইহা একটি অন্তরায়। কিন্তু কোন প্রকার অপেক্ষা ব্যতিরেকেই আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এ সম্পর্কে আলেমগণ লিখিয়াছেন—لانه كان قتله حدا لا قصاصا "অর্থাৎ এই প্রাণদণ্ড কেছাছ-রূপে ছিল না, বরং বিদ্রোহের সাজা ছিল।" (বেদায়াহ-ওয়ান-হেয়াহ, ৮—১৫)

মানুষের অল্প বিদ্যা অনেক সময় বোকামীর কারণ হইয়া পড়ে। আলোচ্য বিষয়ে মৌদুদী সাহেবের সেই অবস্থাই হইয়াছে। সাধারণ হত্যার ক্ষেত্রে কেছাছের বিধানে যে সব শর্ত্ত আবশ্যক খলীফা ওসমানের হত্যার ঘটনায়ও তিনি তাহাই হাঁকিয়াছেন। অথচ ইহা সাধারণ হত্যা ছিল না, ইহা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহজনক হত্যাকাণ্ড; ইহার মছআলাহ সাধারণ হত্যার মছআলাহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তৃতীয় অভিযোগটি যে, কি মিথ্যা অভিযোগ তাহাও ইতিহাসের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করুন। আলী (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে আনুগত্যের আহ্বান জানাইয়া

বিশিষ্ট ছাহাবী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী আমর-ইবনুল-আছ (রাঃ)কে এবং সিরিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক উহার উত্তর দিয়া ছিলেন। সেই উত্তরের মর্ম্ম ইতিহাসে এরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

"তাঁহারা আনুগত্যের অঙ্গীকার দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন যাবৎ না আলী (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীগণকে প্রাণদণ্ড দান করেন বা আসামী-গণকে তাঁহাদের হাওয়ালা করেন, যেন তাঁহারা প্রাণদণ্ড দানে সমর্থ হন।"

(বেদায়াহ, ৭—২৫৩)

ইতিহাসের এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই দেখা যায়, মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মূল দাবী ইহাই ছিল যে, আলী (রাঃ) অপরাধীগণকে শাস্তি প্রদান করেন। এই ইতিহাস হইতে চোখ বন্ধ করিয়া মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি নিজে শাস্তি প্রদানের দাবী করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার অন্যায় ছিল। এই অভিযোগটা কিরূপ সত্যের অপলাপ তাহা পাঠকেরই বিচার্য্য।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আক্রোশ ত্যাগ করার জন্য মৌদুদী সাহেব যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেন তবে ভাল হইত যে, খলীফা ওসমানের হত্যার অপরাধীগণের শাস্তির দাবী একা মোয়াবিয়া (রাঃ)ই করিয়া ছিলেন না। বরং সিরিয়া এলাকায় বিশিষ্ট ছাহাবী আমর-ইবনুল-আছ (রাঃ) এবং আরও ছাহাবীগণ সহ তথাকার সমস্ত মোসলমানগণেরই এই দাবী ছিল। এতদ্ভিন্ন উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এবং আশারা-মোবাশ্শারাহ হইতে তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) সহ আরও বহু ছাহাবী এবং কুফা ও বছরা এলাকার অগণিত মোসলমানেরই এই দাবী ছিল।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে মৌদুদী সাহেবের দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগগুলি হইল তাঁহার খেলাফত-আমলের কার্য্যবিধি সম্পর্কে। সেই সব অভিযোগ খণ্ডনের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেশ করা হইতেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী মোনাফেকগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত খারেজী দলের ঘাতক কর্ত্তৃক আলী (রাঃ) শহীদ হইয়া গেলেন। আর তাঁহার বড় ছেলে হাসান (রাঃ) তাঁহার স্থলে খলীফা নির্ব্বাচিত হইলেন। হাসান (রাঃ) অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, তাঁহার দ্বারা মোসলমানদের

দুইটি বিরোধমান পক্ষের মধ্যে মীমাংসা ও বিরোধের অবসান হইবে (বোখারী শরীফ)। হাসান (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার কাজ অগ্রসর হইল। হাসান (রাঃ) এবং তাঁহার সমর্থক কুফা ও ইরাকবাসী মোসলমান, আর অপর দিকে মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহার সমর্থক সিরিয়াবাসীগণ—এই উভয় পক্ষের মধ্যেও আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র দ্বারা রক্তক্ষয়ী বিরোধ সৃষ্টি হইতে ছিল। সেই বিরোধের অবসান চেষ্টায় হাসান (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করিলেন। উহাতে সন্ত্রাসবাদী দলটি চিরাচরিতরূপে মোসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের প্রমাদ গণিল এবং তাহারা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও ক্ষেপিয়া উঠিল। এমনকি এক সময় তাহারা তাঁহার উপর আক্রমণও করিয়া বসিল এবং তাঁহার সব কিছু লুণ্ঠন করিয়া নিল। এতদৃষ্টে হাসান (রাঃ) মোসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং অধিক তৎপর হইলেন। মোসলমানদের সর্ব্বনাশকারী এই মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী পঞ্চম বাহিনীকে দমাইবার কাজে মোয়াবিয়া (রাঃ)কেই একমাত্র উপযুক্ত মনে করিয়া হাসান (রাঃ) খেলাফতের পদ তাঁহার পক্ষে ত্যাগ করিলেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে এই পদে মোয়াবিয়া (রাঃ)কে বসাইলেন ও বরণ করিলেন। এইভাবে হিজরী ৪১ সনে মোয়াবিয়া (রাঃ) হাজার হাজার ছাহাবা সম্বলিত মোসলেম সমাজের সর্ব্বসম্মত খলীফা নির্ব্বাচিত হইলেন। সমগ্র মোসলেম সমাজের মুখে এবং ইতিহাসেও ঐ বৎসরটিকে "عام الجماعة—ঐক্যের বৎসর" বলা হইয়াছে। (বেদায়াহ, ৮—২১)

ঐক্যমতপূর্ণ সর্ব্বসম্মত খেলাফত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মোয়াবিয়া (রাঃ) ঐ মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী বাহিনীকে দমন করাই নিজের প্রথম কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। বিশেষতঃ উক্ত দলের আবির্ভাব সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাইয়া হস্ত উত্তোলন করতঃ ইরাকের দিকে ইশারা করতঃ বলিয়াছিলেন, ঐ অঞ্চল হইতে তাহাদের আবির্ভাব হইবে (বোখারী শরীফ)। বস্তুতঃ ঘটিয়া ছিলও তাহাই। ইরাকের কেন্দ্রীয় এলাকা বছরা ও কুফাই উক্ত সন্ত্রাসবাদী দলটির তৎপরতার ঘাটি ছিল। মোয়াবিয়া (রাঃ) সেই বছরা ও কুফায় সন্ত্রাসবাদ কার্য্যকলাপ বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। এই কঠোরতা ছাড়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দীর্ঘ ২০ বৎসর খেলাফত আমলের অবস্থা ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতেই আঁচ করা যায়—

"মোয়াবিয়া (রাঃ) হিজরী ৪১ সনে সর্ব্বসম্মতরূপে খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকাকালে বহিঃশত্রুদের এলাকায় জেহাদ পূর্ণোদ্যমে জারী ছিল, আল্লার কলেমা তথা ইসলামের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল, চতুর্দিক হইতে শত্রুপক্ষের বিজিত ধন-সম্পদের সমাগম ছিল, তাঁহার সময়ে মোসলমানগণ শান্তি এবং ন্যায়-পরায়ণতার মধ্যে দিন কাটিতে ছিল এবং দয়া ও ক্ষমা উপভোগ করিতে ছিল।" (বেদায়াহ, ৮—:১৯)

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মোয়াবিয়া (রাঃ) উক্ত মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী দলটির বিরুদ্ধে যেরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে আদা-জল খাইয়া লাগিয়া ছিল। খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে তাহারা তাহাদের যে স্বাভাবিক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল অর্থাৎ মিথ্যার বহর ছড়াইয়া দেওয়া—সেই অস্ত্রই তাহারা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধেও অধিক ধারালরূপে বিরামহীনভাবে চালাইয়া গেল। সেই সব প্রচারণা গোয়েবলের প্রচার-বিজ্ঞান অনুসারে ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল। মৌদুদী সাহেব কুখ্যাত পুস্তকের ১৪৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেই সব মিথ্যা আমদানি করিয়াই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘনিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ছাহাবী এবং আল্লার প্রেরিত কালামে-পাকের ওহী লিখকরূপে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যন্ত জঘন্যভাবে কালিমা লেপন করিয়াছেন। এরূপ কুকীর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। এই কলির যুগে আরও দুই-এক জন সৈয়দ সাহেব তাহাদের পুথি-পুস্তকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে কলঙ্কিত করার দুই-চারটা কথা লিখিয়াছেন বটে। কিন্তু সৈয়দ মৌদুদী সাহেব সেই সব সৈয়দ সাহেবানদের সমুদয় কোশেশের সমষ্টিকেও ছাড়াইয়া গিয়া আরও অধিক অগ্রসর হওয়ার কোশেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সৈয়দ সাহেবানরা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর বিধায় তাঁহার বিপক্ষ মোয়াবিয়ার গ্লানি প্রচার করিয়া তাঁহারা নিজ বংশের হক আদায় করিতেছেন তবে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কারণ সৈয়দ বংশের জ্যেষ্ঠ গোড়া হাসান (রাঃ) নিজেই মোয়াবিয়া (রাঃ)কে খলীফা বানাইয়া এবং বরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুরই ন্যায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অপর এক চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি হাদীছ বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, বেতের নামায সম্পর্কে এক ব্যক্তি মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি কটাক্ষ করিলে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন— دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم "তাঁহার সমালোচনা করিও না; তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী।"

সৈয়দ সাহেবানরা যদি এই সতর্কবাণীটি অনুসরণ করিতেন তবে উহা তাহাদেরও মঙ্গল ছিল এবং সমাজেরও তাহাতেই মঙ্গল হইত।

দ্বীন-ঈমানহীন, ন্যায় ও সততাবিহীন শাসকগোষ্ঠী বা জুলুমবাজদের এই নীতি দেখা যায় যে, মানুষের চোখে ধূল দিয়া, আইনের আড়ালে বিপক্ষকে হেস্তনেস্ত করার জন্য তাহার বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা চার্জ্জসিট বা অভিযোগপত্র সাজান হইয়া থাকে। পরম পরিতাপের বিষয় - মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে ঠিক সেই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী মোনাফেক দলের অপবাদ ও অপপ্রচার কুড়াইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে সাত দফা অপবাদের চার্জ্জসিট বা অভিযোগপত্র সাজাইয়াছেন। উহা যে কি সব অতিরঞ্জিত মিথ্যা উক্তি ও গর্হিত কথার সমবায় তাহা ইতিহাস-প্রমাণের সহিত বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে, এই বিষয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যাই বক্ষমান প্রবন্ধের মূল পৃষ্ঠা সংখ্যা হইতে অধিক হইয়া যাইবে। +

এই প্রবন্ধে মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে শুধু একটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে। তাহা এই যে—খলীফা ওসমানের গভর্ণরদের মধ্যে মোয়াবিয়া (রাঃ)ও একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন খলীফা ওসমানের খান্দান তথা উমাইয়া বংশের। এই সূত্রে মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ প্রমাণে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওসমানের ৪৭ জন গভর্ণরের মধ্যে তিন জন আত্মীয় গভর্ণরের একজন। কিন্তু খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা শুধু এই ছিল যে, তাঁহাদের উভয়ের দাদার পিতা এক ছিল। অর্থাৎ উভয়ের বংশ চতুর্থ পোশ্‌তে মিলিত ছিল। অন্য কোন ঘনিষ্ঠতার খোঁজ আমরা পাই নাই। অথচ শুধু আর এক পোশ্‌ত পরেই তাঁহার বংশ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশের সহিত মিলিত এবং তিনি হযরতের আপন শ্যালক ছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে পবিত্র কোরআনের ওহী লিখক মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে একদা ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিয়াছিলেন—

يا محمد اقرأ على معاوية السلام واستوص به خيرا فانه
امين الله على كتابه ووحيه ونعم الامين

\+ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) এই আলোচনায় একখানা পুস্তক সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন—"ভুল সংশোধন" উহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ সঙ্কলন।

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! মোয়াবিয়াকে সালাম জানাইবেন, তাঁহার মঙ্গলের প্রতি বিশেষ নজর রাখিবেন। তিনি আল্লার কেতাব ও আল্লার ওহীর উপর আল্লার নিযুক্ত আমানতদার এবং উত্তম আমানাতদার।" (বেদায়াহ, ৮—১২০)

এস্থলে আমরা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিরিয়ার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে খলীফা ওমরের ভূমিকার এবং খলীফা ওসমানের কার্য্যক্রমের একটা ফিরিস্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি। ইহা দ্বারা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পদ প্রাপ্তির ব্যাপারে খলীফা ওসমানের অপরাধের পরিমাণ সহজেই ধরা যাইবে।

হিজরী ১৩ সন খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের সর্ব্বশেষ বৎসর। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সিরিয়া অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সিরিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র দামেশ্‌ক জয় হওয়ার মুহূর্ত্তে খলীফা আবু বকর (রাঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন। এদিকে দামেশ্‌ক জয় হইল। সিরিয়ার সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক আবু ওবায়দা (রাঃ) দামেশ্‌ক এলাকার শাসন পরিচালনার জন্য মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে তথাকার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। ইহা খলীফা আবু বকরের অভিপ্রায় এবং ওয়াদা-অঙ্গীকারও ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ)ও এই মনোনয়ন সমর্থন করিলেন। অতঃপর সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক সিরিয়ার অন্য এলাকার দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং দামেশ্‌কের গভর্ণর এজিদ ইবনে আবুসুফিয়ান সমুদ্র উপকুলবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সমূহ—বেরুত, ছায়দা, আরকা ইত্যাদির প্রতি অভিযান পরিচালনা করিলেন। ঐ সব অভিযানের অগ্রগামী অধিনায়ক রূপে মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ৩০।৩৩ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে তিনি খলীফা আবু বকরের আমলে প্রসিদ্ধ জেহাদ জঙ্গে-ইয়ামামায় উপস্থিত ছিলেন এবং মোছায়লামা-কাজ্জাবকে নিহত করায় তিনিও শরীক ছিলেন অতঃপর তাঁহার কার্য্যস্থল সিরিয়ায়ই ছিল।

(বেদায়াহ ৮—১১৭, কামেল ২—২৯৬)

মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই মোয়াবিয়ার প্রতি খলীফা ওমরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। হিজরী ১৪ সনে তিনি দামেশ্‌কের গভর্ণরকে লিখিলেন, সিরিয়াস্থ কায়সারিয়ায় মোয়াবিয়াকে সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত করিয়া অভিযান পরিচালিত কর। খলীফা ওমর নিজেও মোয়াবিয়া (রাঃ)কে পত্র লিখিলেন—"আমি তোমাকে কায়সারিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত করিলাম; তুমি তথায় রওয়ানা হইয়া যাও এবং ঐ দেশবাসীর মোকাবিলায় আল্লার দরবারে সাহায্য কামনা কর ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লার রহমতে মোয়াবিয়া (রাঃ) সেই দেশ জয় করিতে সক্ষম হইলেন। (কামেল ২—৩৪৬)

হিজরী ১৭ সনে খলীফা ওমর (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে উর্দ্দুন তথা বর্ত্তমান জর্দ্দানের গভর্ণর নিয়োগ করেন; তখন দামেশ্কের গভর্ণর ছিলেন মোয়াবিয়ার ভ্রাতা এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)। (কামেল ২—৩৭৫)

হিজরী ১৮ সনে সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী দেখা দেয় এবং দাশেক্কের গভর্ণর এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান ইন্তেকাল করেন।

فلما مات يزيد بن ابى سفيان وجاء البريد الى عمر بموته رد
عمر البريد الى الشام بولاية معاوية مكان اخيه يزيد

"খলীফা ওমরের নিকট দামেশ্কের গভর্ণর এজিদের মৃত্যু সংবাদ যে দুত বহন করিয়া নিয়া আসিয়া ছিল সেই দুতের নিকটই খলীফা ওমর (রাঃ) মৃত গভর্ণর এজিদের স্থলে তাঁহারই ভ্রাতা মোয়াবিয়ার নিয়োগপত্র দিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন (বেদায়াহ ৮—১১৮)। আর মোয়াবিয়া স্বীয় স্থান জর্দ্দানের গভর্ণর পদে শোরাহবীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ)কে নিয়োগ করিলেন। (কামেল ২—৩৯২)

এই বৎসর প্লেগ মহামারীতে সিরিয়ায় ২৫০০০ লোক মারা যায়। দেশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রোমানদের মধ্যে সিরিয়ার মোসলমানদের উপর আক্রমণের লালসা মাথাচারা দিয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন প্লেগ মহামারীতে নিশ্চিহ্ন পরিবার সমূহের বিষয়-সম্পত্তি নিয়া সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং সিরিয়াস্থ শাসন পরিচালকগণ খলীফা ওমর (রাঃ)কে সিরিয়া সফরের আহ্বান জানান। খলীফা ওমর বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের পরামর্শে সিরিয়া পৌঁছিলেন। খলীফা ওমর সিরিয়ায় পৌঁছিয়া তিনি তথাকার সীমান্ত পথসমূহ বন্ধ করিয়া সীমান্তের ঘাটিসমূহের পুনঃর্গঠন করিলেন। ঐ দেশের সমুদয় এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া জর্দ্দানের নূতন গভর্ণর শোরাহবীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ)কে অন্যত্র সরাইয়া দিয়া জর্দ্দানের গভর্ণরও মোয়াবিয়া (রাঃ)কেই করিলেন। এই উপলক্ষে খলীফা ওমর (রাঃ) একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছিলেন যে—

انى لم اعزله عن سخطة ولكنى اريد رجلا اقوى من رجل

"শোরাহবীল ইবনে হাসানাহকে তাঁহার কোন ক্রুটি বা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া আমি তাহাকে অপসারণ করি নাই, বরং তদপেক্ষা অধিক মজবুত ও প্রজ্ঞাশীল একজন গভর্ণর আমি চাহিয়াছি।" (কামেল ২—৩৯৩)

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা ওমর ফারুকের নজরে মোয়াবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক প্রজ্ঞাশীল এবং মজবুত গভর্ণর ছিলেন। সেই জন্যই খলীফা ওমর কর্ত্তৃক মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্রুত পদোন্নতি হইয়া ছিল। হিজরী ১৪সনে সর্ব্বপ্রথম ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহাকে কায়সারিয়া অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত

করেন। অতঃপর ১৭ সনে তিনি তাঁহাকে উর্দ্দুনের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তারপর ১৮ সনের প্রথম দিকে তাঁহাকে উর্দ্দুনের গভর্ণর হইতে উন্নীত করিয়া দামেশ্কের গভর্ণর করেন এবং ঐ বৎসরেরই শেষ দিকে খলীফা ওমর (রাঃ) স্বয়ং সিরিয়ার সমুদয় এলাকা পরিদর্শন করিয়া আবশ্যক বোধে দামেশ্ক তথা সিরিয়ার সাথে উর্দ্দুন এলাকাও মোয়াবিয়ার শাসনাধীনে প্রদান করেন।

فاجتمع لمعاوية الاردن ودمشق "মোয়াবিয়ার শাসনে উর্দ্দুন এবং দামেশ্ক একত্রিত হইয়া গেল।" (কামেল ৩—৫৮)

এইভাবে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দৃষ্টে খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ তাঁহার শাসন ভুক্ত হইতে থাকে। এমনকি হিজরী ২১ সনে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনে সিরিয়ার সমুদয় সীমান্তবর্ত্তী এলাকা সহ আরও পাঁচটির অধিক প্রদেশ প্রদান করা হয়—

وكان معاوية على البلقاء والاردن وفلسطين والسواحل
وانطاكية وغير ذلك

"হিজরী ২১ সনে মোয়াবিয়ার শাসনে সিরিয়ার এই সব এলাকা ছিল—বল্কা, উর্দ্দুন, ফেলিস্তিন উপকূলবর্ত্তী সমুদয় এলাকা, আন্তাকিয়া এবং আরও অন্যান্য।" (বেদায়াহ ৭—১১৩, কামেল ৩—৯, তবরী ৩—২২৭)

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে—উল্লেখিত ইতিহাস গ্রন্থসমুহেই উক্ত হিজরী ২১ সনে তৎকালীন বৃহত্তম সিরিয়ার অপর পাঁচটি এলাকা—দামেশ্ক, হেমছ, হুরান, কান্নসীরীন, আল্জাযায়ের এই এলাকাগুলির গভর্ণর ওমায়ের ইবনে সায়াদ আনছারী (রাঃ) বর্ণিত রহিয়াছে এবং এই প্রমাণও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে যে, স্বয়ং খলীফা ওমর (রাঃ) ওমায়ের ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া তাঁহার এলাকাগুলি মোয়াবিয়া (রাঃ)কে অর্পণ করিয়াছিলেন* এই উপলক্ষেও খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে এমন মন্তব্য করিয়াছিলেন যাহা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত হওয়ার যোগ্য।

---

* এস্থলে ইতিহাসবিদ ইবনে আছীরের অপর একটি বর্ণনা দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার বর্ণনা এই—খলীফা ওমরের মৃত্যু বৎসর হেমছ ও কন্নসীরীনের গভর্ণর ওমায়ের ইবনে সায়াদ (রাঃ) ছিলেন। অতঃপর ওমায়ের (রাঃ) অসুস্থতার দরুণ খলীফা ওসমানের নিকট ইস্তিফানামা পেশ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গে ফিরিয়া আসার আবেদন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছেহাহ-ছেত্তার হাদীছ গ্রন্থ তিরমিজি শরীফে বর্ণিত আছে—

لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى معاوية قال الناس عزل عمر عميرا وولى معاوية فقال عمر لا تذكروا معاوية الا بخير فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به

"খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) যখন ওমায়ের ইবনে সায়াদকে সিরিয়াস্থ এলাকা সমূহের গভর্ণর পদ হইতে অপসারিত করিয়া উহার শাসন ভার মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিলেন, তখন লোকদের মধ্যে ইহার সমালোচনা হইল যে, ওমর (রাঃ) ওমায়ের (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া তাঁহার ক্ষমতা মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিয়ছেন। এই সমালোচনার উত্তরে খলীফা ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিলেন, মোয়াবিয়ার সুনাম ভিন্ন বিরূপ সমালোচনা কেহ করিবে না। আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে মোয়াবিয়া সম্পর্কে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—আয় আল্লাহ! মোয়াবিয়ার দ্বারা হেদায়েত সম্প্রসারিত করিয়া দাও।"

আর এক হাদীছে আছে—খলীফা ওমর (রাঃ) যখন মোয়াবিয়া (রাঃ)কে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলেন তখন লোকদের মধ্যে সমালোচনা হইল যে, ওমর (রাঃ) কম বয়সের একটি যুবককে শাসনকর্ত্তা বানাইয়াছেন। তদুত্তরে ওমর (রাঃ) দৃপ্ত স্বরে বলিলেন, মোয়াবিয়াকে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করায় তোমরা সমালোচনা

করিলেন। খলীফা ওসমান তাঁহার আবেদন গ্রহণ করতঃ হেমছ ও কন্নসীরীন মোয়াবিয়ার শাসনাধীনে দিলেন। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আল্‌কামা যিনি ফিলিস্তিনের গভর্ণর ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর খলীফা ওসমান (রাঃ) ফিলিস্তিনকেও মোয়াবিয়ার শাসনে দিয়া দিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেই পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, হিজরী ২১ সনে খলীফা ওমরের সময় ফিলিস্তিন অন্যান্য প্রদেশের সহিত মোয়াবিয়ার শাসনেই ছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসবিদের বর্ণনার সমন্বয় সাধনে বলা যাইতে পারে যে, ২১ হিজরীর পর ওমায়ের (রাঃ) অপসারিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতা মোয়াবিয়া (রাঃ)কে অর্পণ করা হইয়াছিল। অতঃপর পুনরায় পাঁচটি হইতে শুধু দুইটি তথা হেমছ ও কন্নসীরীন এলাকাদ্বয়ের শাসন ওমায়ের (রাঃ)কে দেওয়া হইয়াছিল এবং খলীফা ওসমানের আমলে উহা হইতে তিনি ইস্তিফা দিলে পুনরায় মোয়াবিয়া (রাঃ)কে দেওয়া হয়, কারণ খলীফা ওমরের আমলে একবার এই এলাকাদ্বয় মোয়াবিয়ার অধীনেই ছিল। তদ্রূপ ফিলিস্তিন হিজরী ২১ সনে মোয়াবিয়ার শাসনে ছিল। অতঃপর উহাকে ভিন্নরূপে আব্দুল রহমান ইবনে আলকামার শাসনে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় উহাকে মোয়াবিয়ার শাসনে দেত্তয়া হয়, কারণ পূর্ব্বেও উহা তাঁহারই শাসনে ছিল।

করিতেছ ? আমি তাহার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এইরূপ দোয়া করিতে শুনিয়াছি—اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به ।

"আয় আল্লাহ ! মোয়াবিয়াকে হেদায়েত প্রাপ্ত ও হেদায়েত দানকারী বানাইয়া দাও এবং তাহার দ্বারা হেদায়েত সম্প্রসারিত কর। (বেদায়াহ, ৮—১২২)

খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) হিজরী ১৭ সনে মোয়াবিয়া (রাঃ)কে গভর্ণর নিয়োগ করার পর জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসরকাল তাঁহাকে সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকার গভর্ণর রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং ক্রমান্বয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রশস্ত করতঃ সিরিয়ার বহু সংখ্যক এলাকাকে তাঁহার অধীন করিয়াছিলেন। তিনি মোয়াবিয়া (রাঃ)কে প্রজ্ঞাশীল মজবুত গভর্ণর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনাকে তিনি পছন্দ করিতেন না এবং ঐরূপ সমালোচনার উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ দ্বারা মোয়াবিয়ার ফজিলত প্রমাণিত করিয়াছেন।

সুধী সমাজ ! উল্লেখিত ইতিহাসের দীর্ঘ আলোচনা সম্মুখে রাখিয়া বিচার করুন মোয়াবিয়ার ক্ষেত্রে খলীফা ওসমানের স্বজন-প্রীতির অপরাধ কি হইতে পারে ? খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দৃষ্টে দীর্ঘ আট বৎসর কাল একাধারে সিরিয়ার গভর্ণর পদে বহাল রাখিয়া ছিলেন এবং খলীফা ওমরের অছিয়ত দৃষ্টে তাঁহার মৃত্যুর পর আরও এক বৎসর সেই পদে বহাল থাকার অধিকারী ছিলেন। খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) বৃহত্তম শত্রুর সীমান্ত দেশ সিরিয়ার জন্য একমাত্র মোয়াবিয়াকেই যোগ্য ও আবশ্যকীয় গণ্য করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় খলীফা ওসমানও মোয়াবিয়ার কার্য্যদক্ষতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অধিক অভিজ্ঞতা দৃষ্টে যদি আরও এগার বৎসর তাঁহাকে তাঁহার পদে বহাল রাখিয়া থাকেন তবে তাহা কি অপরাধ হইতে পারে ? যদি ইহা অপরাধ হয় তবে ত এই অপরাধের প্রথম আসামী ওমর (রাঃ) সাব্যস্ত হইবেন।×

× মৌহুদী সাহেব খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের প্রচেষ্টাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ত খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অবাস্তব অপবাদই রটাইয়া ছিল, আর মৌহুদী সাহেব সেই মিথ্যা অপবাদকে দাঁড় করাইবার জন্য সত্য ইতিহাসকে গোপন করাই নয় শুধু বরং সত্য ইতিহাসের বিপরীত ইতিহাস গড়াইয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

খলীফা ওমরের পুত্র বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওসমানের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর অপবাদ মূলক অভিযোগ দৃষ্টেই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

لقد عتبوا على عثمان اشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه

"এক শ্রেণীর লোক খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে এমন এমন কার্য্যকে অভিযোগ-রূপে রটাইয়াছে যাহা খলীফা ওমর করিলে কখনও উহাকে অভিযোগ গণ্য করা হইত না। (এস্তিয়াব)

ওলীদ হইনে ওকবাহ (রাঃ) ঃ

খলীফা ওসমানের উপর স্বজন-প্রীতির অপবাদ চাপাইবার জন্য তাঁহার ৪৭ জন আমেলের মধ্যে মৌদুদী সাহেব দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি হইলেন ছাহাবী ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)। তিনি উমাইয়া বংশের ছিলেন, কিন্তু খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার বংশ মিল অনেক দুরের ছিল। তাঁহার দাদার দাদা খলীফা ওসমানের দাতার পিতা ছিলেন।

তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অন্য একটু আত্মীয়তাও ছিল। পাঠকবর্গ উহার বিবরণও শুনুন এবং উহার দ্বারা স্বজন-প্রীতির বিচার করুন! ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) খলীফা ওসমানের শুধু মা সম্পর্কীয় ভাই ছিলেন—অর্থাৎ তাঁহার মাতার বিবাহ অপর এক স্বামীর সহিত হইয়া ছিল, সেই স্বামীর পক্ষে ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ মাতার দিক দিয়া ওলীদ ইবনে ওকবাহ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। হযরতের আপন ফুফুর মেয়ে ছিলেন ওলীদের মাতা। এই সূত্রেই স্বয়ং খলীফা ওসমান (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ওলীদ ইবনে ওকবাহ মাতার দিক দিয়া আমার আত্মীয় বটে, কিন্তু মাতার দিক দিয়া ত সে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)এরও ঘনিষ্ঠ। (আল-আওয়াছেম)

তিনি তাহার কুখ্যাত পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠায় কি ধৃষ্ঠতাপূর্ণ মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন যে, খলীফা ওমর মোয়াবিয়াকে শুধু দামেশ্‌কের গভর্ণর করিয়াছিলেন। অথচ বেদায়াহ, তবরী, কামেল-ইবনে আছীর সমুদয় ইতিহাস গ্রন্থেই লেখা রহিয়াছে--হিজরী ২১ সনে খলীফা ওমর মোয়াবিয়াকে সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সমুদয় উপকূলবর্ত্তী এলাকা এবং আরও ছয়টি প্রদেশের একক গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য এলাকার গভর্ণর ওমায়ের (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া তাঁহার সমুদয় ক্ষমতাও মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিয়াছিলেন। উহার সুদীর্ঘ আলোচনা ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে পাঠ করিয়াছেন।

ওলীদ ইবনে ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে খলীফা ওসমানের বংশীয় সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার দুরত্ব অনুধাবনের পর তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও লাভ করুন। ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন ছাহাবী ছিলেন। স্বয়ং হযরত (দঃ) তাঁহাকে বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের জন্য লোকদের নিকট হইতে যাকাত, ওশর ইত্যাদি ওসুল করার আমেল বা কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) ওলীদকে আলজাযায়েরের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে এক বাক্যে সমস্ত ইতিহাস লিখকগণ যে কয়টি সংক্ষিপ্ত বাক্য লিখিয়াছেন এস্থলে উহার উদ্ধৃতিই যথেষ্ট—

كان احب الناس.....خمس سنين وليس على داره باب

"তিনি তাঁহার শাসিতদের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিলেন এবং জনসাধারণের প্রতি সর্ব্বাধিক সদয় ছিলেন। পাঁচ বৎসর কাল তিনি কুফায় এইভাবেই শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমনকি তাঁহার গৃহে দরওয়াজা ছিল না—জনসাধারণের জন্য তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত।" (তবরী ৩—৩২৫)

খলীফা ওসমানের বংশের লোক তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার মিল তিন পোশ্‌ত পূর্ব্বে; অথচ আর এক পোশ্‌ত পূর্ব্বে—আবদ-মনাফ পোশ্‌তে তাঁহার বংশ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশে মিলিত হয়। খলীফা ওসমানের সামান্য আত্মীয়তাও তাঁহার সহিত ছিল। কিন্তু তাহাছিল শুধু মাতার দিক দিয়া। অথচ মাতার দিক দিয়া তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই শ্রেণীর একজন লোককে দেখাইয়া খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ করা কিরূপ ধৃষ্টতা তাহা পাঠক সমাজেরই বিচার্য্য।

আর অলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)কে গভর্ণর করায় যদি তাঁহার ব্যক্তিগত কোন ক্রুটির দরুণ অপরাধ হয় তবে সেই অপরাধের প্রথম আসামী হইবেন খলীফা ওমর; তিনি ওলীদ (রাঃ)কে হিজরী ১৭ বা ১৯ সনে আলজাযায়েরের মোসলেম এলাকার গভর্ণর নিয়োগ করিয়াছিলেন+। (তবরী ৩—১৫৭)

+ এস্থলে খলীফা ওসমান বিদ্বেষী মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের কতই না চেষ্টা করিয়াছেন! অবশেষে কোন গোঞ্জায়েশ না পাইয়া কুখ্যাত পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় এতটুকু লিখিয়া ছাড়িয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) ওলীদকে অতি ছোট একটি পদ তথা ছোট এলাকার গভর্ণরী দান করিয়াছিলেন, খলীফা ওসমানের অপরাধ এই যে, তিনি ওলীদকে কুফার ন্যায় বড় প্রদেশের গভর্ণর বানাইয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চার ভয়াবহ ব্যধিগ্রস্ত মৌদুদী সাহেব ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার মদ্য পানের একটি ঘটনা ইতিহাসের পাতা হইতে আবৃত্ত করিয়া এক গুলিতে দুই শিকার করিয়াছেন। ওলীদ (রাঃ)কে ত নিহত করিয়াছেন এবং খলীফা ওসমানকে আহত করিয়াছেন—এইভাবে যে, তিনি একজন মদখোরকে আত্মীয়তার দরুণ গভর্ণরী পদ দান করিয়াছিলেন। (نعوذ با لله—আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।)

খুশীর বিষয় মৌদুদী সাহেব তাহার এইগুলির আঘাত হইতে খলীফা ওমর (রাঃ)কে বাঁচাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ওলীদ কুফা এলাকার গভর্ণর থাকাকালীন তাহার মদ্য পানের অভ্যাস প্রকাশ পায়।" অর্থাৎ খলীফা ওমর যখন ওলীদকে আলজাযায়েরের গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন তখন এই বদ অভ্যাস তাহার ছিল না বা উহা প্রকাশ পায় নাই।

ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চার ব্যধি মৌদুদী সাহেবকে তাহার শেষ মঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, তাই তাঁহার জ্ঞান-চক্ষুর সাথে সাথে চর্ম্ম-চক্ষুও অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নতুবা যে সব ইতিহাস-গ্রন্থ হইতে তিনি মদ্য পানের ঘটনা কুড়াইয়াছেন ঐ সব গ্রন্থেই নিম্নে বর্ণিত তথ্যগুলিও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু এই অভিশাপ খণ্ডনের উপায় কি আছে যে, তাঁহার চক্ষু যেন পয়দাই হইয়াছিল ছাহাবীদের দোষ কুড়াইবার জন্য ?

মৌদুদী সাহেবেরই শ্রদ্ধার পাত্র তারীখ-তবরী (৩—৩২৭ ⁄ ৩৩০) হইতে কতিপয় তথ্য উদ্ধৃত করা হইতেছে—উহা দ্বারাই উক্ত ঘটনার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

কুফা নগরে আবু যবীর, আবু মোয়ারুরে' ও জুন্দুব নামীয় এক শ্রেণীর লোক ছিল— يحقدون له مذ قتل ابنائهم ويضعون له العيوب "যাহারা ওলীদ

মৌদুদী সাহেবের বিশ্রী কুশেশের আরও নমুনা দেখুন! লিখিতেছেন, খলীফা ওমর তাঁহার খেলাফতের শেষ সময়ে ওলীদকে আলজাযায়েরের গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন। কি ডাহা মিথ্যার পরিবেশন! তাঁহাকে গভর্ণর নিয়োগের সন—হিজরী ১৭ বা ১৯ সন খলীফা ওমরের খেলাফতের মধ্যবর্ত্তী সময় ছিল এবং আলজাযায়ের ঐ বৎসরই জয় করা হয়।

ইতিহাস-তথ্য ত মিথ্যা পরিবেশন করিয়া ওলীদকে হেয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আলজাযায়েরের মোসলেম অধ্যুষিত প্রদেশ ছোট হওয়ার দাবীও যদি ঐ শ্রেণীরই হয় তবে ত সব কোশেশই বৃথা যাইবে। আর যদি এই দাবীটা বিশ্বাসও করা হয় যে, খলীফা ওমরের দেওয়া গভর্ণরীটা ছোট ছিল, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সময়ে কিছু রদবদল হইলেও ইতিহাসের বর্ণনা (কামেল ৩—৪২) মতে ওলীদ ১৭ বা ১৯ সনে আলজাযায়েরের গভর্ণর হইয়া খলীফা ওমরের খেলাফৎকাল এবং তাঁহার পরও ২৫ সন পর্য্যন্ত গভর্ণর ছিলেন। এই দীর্ঘ কাল গভর্ণর থাকিয়া অভিজ্ঞতার কিছু উন্নতি সাধন কি তিনি করিতে পারিয়া ছিলেন না, যদ্দরুণ খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক তাঁহাকে উন্নতি দেওয়া সমীচীন গণ্য হইতে পারে ?

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহার দোষ গড়াইয়া থাকিত। উহার কারণ এই ছিল যে, তিনি তাহাদের কতিপয় পুত্র-পরিজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।”

প্রাণদণ্ড দানের ঘটনা এই :—একদা রাত্রি বেলা কুফা নগরে কতিপয় যুবক এক ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি করার জন্য ঢুকিয়া পড়ে। গৃহস্বামী চিৎকার করিল এবং তরবারী লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চোরেরা তাহাকে খুন করিয়া ফেলিল। উক্ত বাড়ীর সম্মুখস্ত বাড়ীতে বসবাস করিতেন মদীনার বিশিষ্ট ছাহাবী আবু শোরায়হ্ (রাঃ)। তিনি এবং তাঁহার পুত্র গৃহ-ছাদে শুইয়া ছিলেন; পরশীর চিৎকারে তাঁহারা জাগ্রত হইয়া সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। আসামীগণ ধৃত হইয়া মোকদ্দমা চলিলে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবু শোরায়হ্ (রাঃ) এবং তাঁহার পুত্র সাক্ষ্য দিলেন। শাসনকর্ত্তা ওলীদ (রাঃ) ঘটনার সমুদয় বিবরণ খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসামীদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ওলীদ (রাঃ) প্রকাশ্য ময়দানে তাহাদের প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী করিলেন।

এতদ্ভিন্ন জুন্দুব নামীয় ব্যক্তির একটি অপয়াধে খলীফা ওসমানের আদেশ মতে ওলীদ (রাঃ) তাহাকে শাস্তি দিয়া ছিলেন। যদ্দরুণ তাহার দলীয় লোকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া মদীনায় পৌঁছিল এবং খলীফার নিকট ওলীদের অপসারণ দাবী করিল। খলীফা ওসমান (রাঃ) তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। (কামেল ৩—৫০)

তাহারা মদীনা হইতে বিমুখ হইয়া ফেরত আসিলে কুফা নগরে ওলীদের বিরুদ্ধবাদী যত লোক ছিল সকলে তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইল এবং কোন একটা বিষয় স্থির করিল; আবু যবীর এবং আবু মোয়ার্‌রেও তাহাদের সঙ্গে ছিল।

فقدما على عثمان ومعهما نفر ...... ممن قد عزل الوليد

“তাহারা দুইজন মদীনায় খলীফা ওসমানের নিকট আসিল। তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই দলের কতিপয় লোক ছিল যাহাদিগকে ওলীদ (রাঃ) তাহাদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।” সঙ্গী লোকগণ ওলীদের উপর মদ্যপানের দাবী করিল এবং ঐ আবু যবীর ও আবু মোয়ার্‌রে সাক্ষ্য দিল। অনেক ইতঃস্ততের পর পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য খলীফা ওসমান (রাঃ) ওলীদের প্রতি মদ্যপানের শাস্তি বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে গভর্ণর পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন।

এই প্রসঙ্গে খলীফা ওসমানের দুইটি কথা তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওলীদ (রাঃ) বলিলেন—

يا أمير المؤمنين أنشدك الله فو الله أنهما لخصمان موتوران

“আমীরুল-মোমেনীন! আপনাকে আল্লার দোহাই দিতেছি—কসম খোদার, সাক্ষীদ্বয় দণ্ডিত পুত্র-শোকে আমার পরম শত্রু।” উত্তরে ওসমান (রাঃ) বলিলেন—

لا يضرك ذلك انما نعمل بما ينتهى الينا فمن ظلم فالله ولى

انتقامه ومن ظلم فالله ولى جزائه

"মিথ্যা সাক্ষ্য তোমার প্রকৃত ক্ষতি করিতে পারিবে না ; আমাদের নিকট যেরূপ সাক্ষ্য পৌঁছিবে আমরা সে অনুযায়ী কাজ করিব। অবশ্য যে অন্যায়কারী আল্লাহ তাহার হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং যাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে আল্লাহ তাহাকে প্রতিফল দানকারী।" ওসমান (রাঃ) আরও বলিলেন—

نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا اخى

"আমরা সাক্ষী অনুযায়ী শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করিব, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত হইবে, অতএব হে ভ্রাতা! তুমি ধৈর্য্য ধর।"

খলীফা ওসমানের বুঝ-প্রবোধে ওলীদ (রাঃ) ধৈর্য্যের সহিত বেত্রদণ্ড বরণ করিতে লাগিলেন। আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ যাঁহারা বেত্রদণ্ড প্রয়োগে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মদ্যপানের শাস্তি ৮০ বেত্রদণ্ডের স্থলে ৪০ বেত্রাঘাতেই ক্ষান্ত ছিলেন বলিয়া কোন কোন হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান এই সব তথ্য মৌদুদী সাহেবের চোখেও খোঁচা দিয়াছে মনে হয়। কিন্তু তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী দলের গর্হিত অপবাদ সমূহের খণ্ডন লিখিতে না জানিলেও মুছিতে জানেন অবশ্যই। সেমতেই তিনি মদ্য পানের ঘটনা খুব সাজাইয়া লেখার সাথে সাথে উল্লেখিত তথ্য সমূহের পাশ কাটাইয়া যাওয়ার জন্য টিকার মধ্যে এতটুকু ওকালতী করিয়া গিয়াছেন যে, "ঘটনার সাক্ষীগণকে নির্ভরশীল গণ্য করা না হইলে খলীফা ওসমান এবং উপস্থিত ছাহাবীগণ বেকায়দায় পতিত হইবেন যে, তাঁহারা ঐরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর দণ্ড দানের সিদ্ধান্ত কিরূপে করিলেন?"

অর্থাৎ সাক্ষীগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণযোগ্য না হইলেও খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক বেত্রদণ্ড দানের আদেশকে বৈধ ও কায়দা মাফিক বানাইবার জন্য উল্লেখিত তথ্যাবলী হইতে চোখ বুজিয়া সাক্ষীগুলিকে গ্রহণ করার সুপারিশ করিয়াছেন। মৌদুদী সাহেবের উদ্দেশ্য হইল—ইতিহাস জঙ্গলের নিভৃত কোন্ হইতে মদ্যপানের যে ঘটনা তিনি জন সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন উহাকে সত্য গণ্য করিয়া ওলীদ (রাঃ)কে মদখোর সাব্যস্ত করা, যদিও উহার সাক্ষী প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণযোগ্য নহে।

মৌদুদী সাহেবের জানা উচিৎ যে, ওলীদ (রাঃ)কে দণ্ড প্রদান বৈধ হওয়ার জন্য ইতিহাসের উক্ত তথ্যাবলী অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। খলীফা ওসমান (রাঃ) নিজেও সাক্ষীদের শত্রুতা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে—

ذكر من يعرف عثمان ممن قد عزل الوليد عن الاعمال

"ঐ লোকগুলি সম্পর্কে খলীফা ওসমান জ্ঞাত ছিলেন যে, তাহারা ঐ লোক যাহাদেরকে ওলীদ (রাঃ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।"

কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করার নিয়মতান্ত্রিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার নিকট উক্ত সাক্ষীদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল যেরূপ একটি বদকার নারী সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছিলেন—لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها "সাক্ষী ব্যতিরেকে জেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করার অবকাশ থাকিলে, আমি ঐ নারীটির উপর তাহা প্রয়োগ করিতাম।" হযরতের এবং সকলের জানা ছিল, ঐ নারীটি জেনাকারিণী। কিন্তু নির্দ্ধারিত প্রমাণের অভাব ছিল। তদ্রূপ আলোচ্য ঘটনায় সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হওয়া জানা ছিল, কিন্তু উহার উপর নিয়মতান্ত্রিক প্রমাণের অভাব ছিল। তাই উহার উপর দণ্ড দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার দ্বারা ঘটনার বাস্তবতা সাব্যস্ত হইবে না এবং প্রকৃত মিথ্যা সত্য গণ্য হইবে না।।

এতদ্ভিন্ন সন্ত্রাসবাদীগণ ঐ মিথ্যা ঘটনাকে এমন ভাবে প্রচার করিয়াছিল যে, তাহারা আড়ালে থাকিয়া সুধী সমাজকে উহাতে জড়িত করিয়া দিয়া ছিল; যেরূপ করিয়াছিল কোরআনে বর্ণিত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের দল। তাহারা নিজেরা আড়ালে থাকিয়া গহিত মিথ্যা ঘটনার প্রচারণা সারা মদীনায় ছড়াইয়া দিয়া ছিল। এমনকি বিশিষ্ট ছাহাবী হাস্‌ছান (রাঃ), মেস্‌তাহ (রাঃ) এবং স্বয়ং হযরতের শালী হাম্‌নাহ (রাঃ) ঐ অপবাদে পূর্ণরূপে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। পরিস্থিতি এমন জটিল আকার ধারণ করিয়া ছিল যে, দীর্ঘ এক মাসকাল হযরত (দঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে সম্পর্ক ছিন্নরূপে কাটাইয়া ছিলেন। আয়েশা (রাঃ)কে ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিতে ছিলেন। সর্ব্বশেষ মূহূর্ত্তে যদি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্রতার পক্ষে অকাট্য ওহী কোরআন শরীফের সুদীর্ঘ বর্ণনা আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ না হইত তবে ঐ মোনাফেকদের প্রচারণার উৎপীড়নে হযরত (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে ত্যাগও করিতে পারিতেন। অতি আশ্চার্য্যের বিষয়—অপবাদের উৎপত্তি এবং উহার প্রচারণা সব কিছুই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের কার্য্য ছিল। পবিত্র কোরআনেও ঘটনার মূলরূপে তাহার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে, কিন্তু সে এমন আড়ালে থাকিয়াই ঐ মিথ্যাকে ছড়াইয়া ছিল যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে ধরা না পড়ায় মিথ্যা অপবাদের শরীয়তী শাস্তি হদ্দে-কজফ ৮০ বেত্রদণ্ড তাহার উপর প্রয়োগ করা যায় নাই। অথচ কতিপয় সুধী মোসলমান—হাস্‌ছান (রাঃ), হামনাহ (রাঃ) যাঁহারা তাহারই প্ররোচনায় মাতিয়া ছিলেন তাহাদের প্রত্যেকেরই ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইয়া ছিল।

ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনায়ও ঠিক তদ্রূপই ঘটিয়া ছিল। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী এবং ওলীদের শত্রুদল ঘটনাকে সাজাইয়া এমন ভাবে প্রচার করিয়াছিল যে, উহাতে মদীনার সুধী সমাজও ব্যাপক ভাবে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং তাঁহারা খলীফা ওসমান (রাঃ)কে এই ব্যাপারে অতিশয় উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) ঘটনাকে গভীর ভাবে তদন্ত করার জন্য দণ্ড প্রয়োগে বিলম্ব করিতে ছিলেন ইহাকেও সন্ত্রাসবাদীগণ খলীফার বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগের ধূম্রজাল সৃষ্টির অবলম্বন রূপেই ব্যবহার করিয়াছিল; এই ধূম্রজাল সুধী সমাজেও বিস্তার লাভ করিতে ছিল। সুতরাং খলীফা ওসমান (রাঃ) ঘটনার অবসানই উত্তম মনে করিলেন এবং দণ্ড প্রদান যেহেতু ওলীদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই তাঁহাকে বুঝ-প্রবোধ দান করিয়া সাক্ষ্যের বাহ্যিক রূপকেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক স্বজন-প্রীতির মিথ্যা অপবাদ নিরসনে এইরূপ মহতী প্রচেষ্টার নজীর খলীফা ওসমানের পক্ষ হইতে অনেকই পাওয়া যায়।

ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত ঘটনার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীগণের মিথ্যা প্রচারণায় মাতান সুধী লোকগণও খলীফা ওসমান (রাঃ)কে কিরূপ উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত করিতে ছিলেন তাহার কিছু নমুনা বোখারী শরীফ ৫২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছ দ্বারা আঁচ করা যায়। হাদীছটি বাংলা বোখারী শরীফ পঞ্চম খণ্ড ওসমান (রাঃ) এর আলোচনায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত ঘটনার বিকৃত প্রোপাগাণ্ডার দরুণ অত্যধিক উত্ত্যক্ত, উৎপীড়িত ও বিব্রত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ফেৎনা-ফাসাদের অবসান উদ্দেশ্যে দণ্ড দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ! আপনারা সকলে হয় ত জানেন না, কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, কুফা নগরের কতিপয় দুষ্কৃতী দ্বারা ওলীদ (রাঃ)র বিরুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে এবং ওসমান (রাঃ) বাহ্যিকরূপে উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়া ওলীদ (রাঃ)কে বরখাস্ত করিয়াছেন—কুফার বুকে এরূপ ঘটনা ইহাই প্রথম নহে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলেও তাঁহার গভর্ণর বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাছ (রাঃ) যিনি আশারা-মোবাশ্‌শারার তথা এক লক্ষ ছাহাবীদের শীর্ষস্থানীয় দশ জনের একজন ছিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধেও কুফার দুষ্কৃতিকারীরা খলীফা ওমরের দরবারে জুলুম-অন্যায়ের অভিযোগের সাথে এই অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি ভাল ভাবে নামায পড়িতেও জানেন না।

সায়াদ (রাঃ) তাহাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে ভীষণ মনঃক্ষুন্ন হইয়া বলিয়া ছিলেন—আমি প্রাথমিক মোসলমানদের পঞ্চম মোসলমাম। আমরা দ্বীন-ইসলামের খেদমতে গাছের পাতা খাইয়া মুখে ঘা করিয়া ফেলিয়া ছিলাম। ইসলামের জন্য

জেহাদে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী আমি। ওহোদের জেহাদে আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ। আর এখন কুফার বনু-আসাদ গোত্রীয় লোকগুলি আমার উপর অভিযোগ আনে যে, আমি ভালরূপে নামাযও পড়িতে জানি না! এবং তাহারা ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে আমার বদনাম করিয়া থাকে! তবে ত আমার পোড়া-কপাল এবং জীবনের সব কিছুই বৃথা।

খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিলেন। এই ঘটনা ইতিহাস-গ্রন্থে এবং হাদীছ গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। বোখারী শরীফেও একাধিক জায়গায় বর্ণিত রহিয়াছে।

শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ দাঁড় করিয়া তাঁহাদিগকে হেস্ত-নেস্ত করা—ইহা কুফাবাসীদের নিরারোগ্য ব্যধি ছিল। হিজরী ২১ সনে তাহারা সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় শ্রদ্ধেয় শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে এই পন্থা অবলম্বন করে। অতঃপর ২২ সনে বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াছের (রাঃ) গভর্ণরের বিরুদ্ধেও তাহাই করে। তারপর বিশিষ্ট ছাহাবী আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপরও সেই অস্ত্রই ব্যবহার করে। এমনকি খলিফা ওমর (রাঃ) ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়েন—কুফার গভর্ণর কাহাকে বানাইবেন। বিশিষ্ট ছাহাবী মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) খলীফা ওমর (রাঃ)কে চিন্তিত অবস্থায় মসজিদে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন যে বিষয় আপনাকে এরূপ চিন্তাযুক্ত করিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই অতিশয় জটিল বিষয় হইবে! ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিব ? কুফাবাসী এক লক্ষ লোক তাহারা কোন শাসনকর্ত্তার উপরই সন্তুষ্ট থাকে না এবং কোন শাসনকর্ত্তাই তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অতঃপর ছাহাবীদের সাথে দীর্ঘ পরামর্শ করার পর উক্ত মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ)কেই কুফার গভর্ণর মনোনীত করিলেন। (বেদায়াহ ৭—১২৬)

এত বড় বড় ছাহাবীদের ন্যায় একই প্রকারে যদি ওলীদ (রাঃ) খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ও অপসারিত হইয়া থাকেন। তবে তাহাতে ওলীদের ও খলীফা ওসমানের মর্য্যাদার কত দুর লাঘব হইতে পারে তাহা সুধী সমাজের বিচার্য্য।

এই আলোচনায় আর একটি অভিযোগের খণ্ডন হয়। উহাও আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দল কর্ত্তৃকই প্রচারিত এবং মৌদুদী সাহেব কর্ত্তৃক রং-রসের সহিত কুখ্যাত পুস্তকে বর্ণিত যে—ওসমান (রাঃ) সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছের ন্যায় ছাহাবীকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্থলে আত্মীয় ওলীদকে বসাইয়া ছিলেন।

এস্থলে চিন্তা করা আবশ্যক—সায়াদ (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন বটে, কিন্তু খলীফা ওসমানের ন্যায় মুরব্বি তাঁহাকে অপসারিত করিলে তাহাতে দোষ কি হইতে পারে? খলীফা ওমর এই সায়াদ (রাঃ)কেই হিজরী ২১ সনে এই কুফার গভর্ণরী হইতেই অপসারিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সায়াদ (রাঃ) অপেক্ষা বেশী সুপ্রসিদ্ধ, স্বয়ং রসুল (দঃ) কর্তৃক আল্লার তলোয়ার আখ্যায়ীত ইসলামের অজেয় বীর খালেদ ইবনে ওলীদকেও খলীফা ওমর বরখাস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সায়াদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর অপসারণ খলীফা ওসমানের প্রতি দোষারোপের বস্তু হইতে পারে না। অবশ্য ইহার আর একটা দিক আছে, সেইটা হইল—নিজ আত্মীয় ওলীদকে উক্ত পদে বসাইবার জন্য সায়াদ (রাঃ)কে অপসারিত করা। মৌদুদী সাহেব লেখার ভাব-ভঙ্গি দ্বারা পাঠকবর্গকে ঐ দিকেই টানিয়া নেওয়ার কোশেশ করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার বিবেক-বুদ্ধির বক্রতার পরিচয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দলের ভাবধারা ত এরূপ হইতে পারে, কারণ তাহারা ত আদা-জল খাইয়া লাগিয়া ছিল ইসলামের নেজামে-খেলাফত ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে—খলীফা ওসমান (রাঃ)কে ঘায়েল করার জন্য। সুতরাং তাহারা যদি তিলকে তাল বানাইয়া না লইবে তবে খলীফা ওসমান (রাঃ)কে আঘাত কি দিয়া করিবে? কিন্তু কোন প্রকৃত মোসলমানের ভাবধারা ত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ঐরূপ হইতে পারে না। অধিকন্তু সায়াদ (রাঃ)কে অপসারণের সুস্পষ্ট সূত্রও সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে—

কুফার শাসন কার্য্যের গভর্ণর ছিলেন সায়াদ (রাঃ), আর বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের গভর্ণর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)। সায়াদ (রাঃ) বাইতুল-মাল হইতে ব্যক্তিগত কাজে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যুগে সরকারী তথা জন-সাধারণের অর্থ ও স্বার্থকে পদ বা গদির প্রভাব দ্বারা পদদলিত করিতে দেওয়া হইত না। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বাইতুল-মালের অর্থ উসুল করিতে সায়াদ (রাঃ)এর প্রতি চাপ প্রয়োগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইল। সায়াদ (রাঃ)এর মেজাজে অত্যন্ত গরমী ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) স্থান ত্যাগ করতঃ সাময়িক ভাবে ঝগড়ার অবসান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু ঐ ঝগড়া উভয়ের সমর্থকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। খলীফা ওসমান (রাঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সায়াদ (রাঃ)কে তথা হইতে সরাইয়া আনিলেন। (কামেল ৩—৪২)

সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ) ঃ

খলীফা ওসমানের দীর্ঘ ১২ বৎসর খেলাফত আমলে শাসনকার্য্য পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ৪৭ জন আমেলের মধ্যে যে তিন জন মাত্র খলীফা ওসমানের উমাইয়া বংশের ছিলেন সেই তিন জনের তৃতীয় জন হইলেন—সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ)। কিন্তু উভয়ের বংশ মিল এত দূরের ছিল যে, তাঁহার দাদার দাদা খলীফা ওসমানের দাদার পিতা ছিলেন। ইহা ভিন্ন উভয়ের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তার খোঁজ আমরা ইতিহাসে পাই নাই। ইতিহাসে আছে, তিনি দানশীলতা এবং নেককারী পরহেজগারীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। (এছাবাহ্)

তিনি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার নেককারী পরহেজগারীর সুনামে তাঁহাকে মদীনায় পাঠাইবার জন্য সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়াকে লিখিয়া পাঠান। তিনি মদীনায় পৌঁছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন; খলীফা ওমর (রাঃ) নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে পর পর দুইটি বিবাহ করাইয়া ছিলেন।

খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রথম তিনিই তবরস্তানের প্রতি অভিযান পরিচালিত করেন। সেই অভিযানে তাঁহার অধীনে হাসান (রাঃ), হোসাইন (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ), হোযায়ফা (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণ জেহাদ করিয়াছিলেন। (কামেল ৩—৫৪)

তিনি এতই শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, হিজরী ৩৪ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী দল তাহাদের বিভিন্ন এলাকার সদস্যদিগকে চিঠি-পত্রের দ্বারা এই কথার উপর উত্তেজিত করিয়া দিয়া ছিল যে, খলীফা ওসমানের আমেল বা শাসন-পরিচালকগণকে ভীষণ ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা হউক এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হউক। সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম কেন্দ্র কুফায়ই সর্ব্ব প্রথম উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ীত করার ব্যবস্থা গৃহিত হয়।

শাসনকর্ত্তা সায়ীদ (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারেই মদীনায় গভর্ণর সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কুফার সন্ত্রাসবাদী দল এই সুযোগেই তাহাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ীত করে। সায়ীদ (রাঃ) মদীনা হইতে স্বীয় কার্য্যস্থল কুফায় রওয়ানা হইয়াছেন, আর ঐ দিকে কুফার সন্ত্রাসবাদী দল জোর প্রচারণা চালাইয়া কিছু লোক সংগ্রহ করতঃ তাহাদেরকে লইয়া কুফার অদুরে "জোরআহ্" নামক স্থানে প্রতিরোধ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে এবং সায়ীদ (রাঃ)কে কুফায় প্রবেশে বাধা দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সায়ীদ (রাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া পথি মধ্য হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসেন এবং খলীফা ওসমান (রাঃ)কে সব ঘটনা অবগত করতঃ

বলেন যে, সন্ত্রাসবাদীগণ আমার স্থলে আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে গভর্ণর চায়। সেমতে ওসমান (রাঃ) তৎক্ষণাৎ আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করিলেন। সেই উপলক্ষে খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার সর্ব্বশেষ নীতিও ঘোষনা করিলেন—

والله لا نجعل لاحد عذرا ولا نترك لهم حجة ولنصبرن كما امرنا حتى نبلغ ما يريدون

"খোদার কসম কাহারও জন্য কোন ওজরের অবকাশ রাখিব না। কাহারও জন্য কোন কথার ফাঁক ছাড়িব না এবং আমি আমার প্রতি (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) আদেশ অনুযায়ী ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া যাইব, যদিও আমাকে ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হয় যাহা সন্ত্রাসবাদীগণ ইচ্ছা করিতেছে" (তবরী ৩—৩৭২)। তিনি সন্ত্রাসবাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া কুফাবাসীদের প্রতি একটি লিপিও প্রেরণ করিলেন—

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فقد امرت عليكم من اخترتم واعفيتكم من سعيد......

"বিছমিল্লাহের রাহমানির রাহীম। অতঃপর—আমি তোমাদের পছন্দণীয় ব্যক্তিকেই তোমাদের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলাম এবং তোমাদিগকে সায়ীদের শাসন হইতে অব্যাহতি দিলাম। খোদার কসম—আমি আমার মান-সম্মানকেও তোমাদের জন্য বিলীন করিয়া যাইব, আমার ধৈর্য্যের শেষ বিন্দু তোমাদের জন্য ব্যয় করিব এবং সর্ব্বশক্তি দ্বারা তোমাদের সংশোধন ও উপকারের চেষ্টা করিব। তোমরা এমন যে কোন জিনিষ পছন্দ করিবে যাহা প্রদানে আল্লার নাফরমানী না হয়, তাহা অবশ্যই আমার নিকট দাবী করিয়া এবং এমন যে কোন জিনিষ না পছন্দ করিবে যাহা বর্জ্জনে আল্লার নাফরমানী না হয় তাহা হইতে অবশ্যই নিষ্কৃতি চাহিবে। আমি তোমাদের পছন্দের কাজই করিয়া যাইব; যাহাতে তোমাদের জন্য আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার অবকাশ না থাকে।"

খলীফা ওসমান (রাঃ) কুফাবাসীদের প্রতি বিশেষরূপে এই লিপি প্রেরণ করার পর অন্যান্য এলাকায়ও এইরূপ লিপি প্রেরণ করিলেন। (তবরী ৩—৩৭৫)

এই পর্য্যন্ত সেই তিন জন গভর্ণরের আলোচনা শেষ হইল যাঁহাদের বংশগত সম্পর্ক ছিল খলীফা ওসমানের সঙ্গে—১। মোয়াবিয়া (রাঃ) ২। ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) ৩। সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ)। আরও দুই জন বিতর্কমূলক গভর্ণর আছেন যাঁহাদের বংশগত কোন সম্পর্ক খলীফা ওসমানের সঙ্গে ছিল না, অবশ্য

আত্মীয়তার সম্পর্ক খলীফার সহিত ছিল—একজন আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ), অপর জন আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)। কিন্তু পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের আত্মীয়তা কোন শ্রেণীর ছিল? তারপর বিচার করিবেন, সেই আত্মীয়তার দরুণ বিশেষতঃ ৪৭ জনের মধ্যে শুধু ২।৪ জন ঐ শ্রেণীর আত্মীয়তাধারী হওয়ায় খলীফা ওসমানের প্রতি স্বজন-প্রীতির দোষারোপ করা কতটুকু ন্যায় সঙ্গত! দুঃখের বিষয়—মৌদুদী সাহেব সেই পাইকারী দোষারোপের উপর ভিত্তি করিয়া নেজামে-খেলাফত বিতারণের অপরাধের প্রথম অপরাধী ওসমান (রাঃ)কে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন—এইরূপ করা ঈমানদারী হইয়াছে কি?

আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ)ঃ

তিনি খলীফা ওসমানের মামাতো ভাই ছিলেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হযরতের ফুফাতো ভ্রাতার ছেলে ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মোহাদ্দেছগণের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) অতিশয় দানশীল, বীরপুরুষ এবং "মাইমূন" তথা বিশেষ বরকতওয়ালা মানুষ ছিলেন। তাঁহার বরকতওয়ালা হওয়ার মূলে ছিল—তিনি নবজাত শিশু অবস্থায় তাঁহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ত আমার আকৃতির। হযরত (দঃ) তাঁহার জন্য আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ স্বীয় মুখের থুথু তাঁহার মুখে দিলেন। নবজাত শিশু আবদুল্লাহ ইবনে আমের হযরতের থুথু গিলিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিলেন, তাহার কখনও পানির অভাব হইবে না। হযরতের এই শুভবাণীর বরকত তিনি চিরকাল ভোগ করিয়া গিয়াছেন—তিনি যখন যে কোন স্থানে পানি বাহির করার চেষ্টা করিলেই তথায় পানি বাহির হইয়া আসিত।

খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে যৌবন বয়সেই বছরার গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন। বছরার শাসন আমলে তিনি অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ খোরাসান, সিজিস্তান, কেরমান ইত্যাদি জয় করিয়াছিলেন এবং পারস্যেরও অবশিষ্ট এলাকা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল আক্রমনেই পারস্যের সর্ব্বশেষ রাজা ইয়াজদ্‌জরদ পলায়ন ও ছুটাছুটির মধ্যে বিপন্ন অবস্থায় নিহত হইয়াছিল। ইহার জন্য আল্লার শোকর-গুজারী স্বরূপ তিনি নিশাপুর হইতে এহ্‌রাম বাঁধিয়া বিভিন্ন বিজয় ও ইয়াজদ্‌জরদের নিহত হওরার সুসংবাদ বহন করতঃ মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। (এছাবাহ ২—৭১)

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী দল এস্থানেও সেই পুরাতন কায়দায়ই খলীফা ওসমানের প্রতি দোষারোপ করিয়াছে যে, আবু মূছা আশয়ারীর

ন্যায় প্রবীণ ছাহাবীকে অপসারিত করিয়া স্বীয় মামাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে বছরার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগের বীজ আবিষ্কার করিয়াছিল উক্ত সন্ত্রাসবাদী দল। আর তাহাদেরই ১৪০০ বৎসর পরের জয়ঢাক মৌদুদী সাহেব উক্ত অভিযোগকে রং-পালিশ দ্বারা সাজাইয়াছেন।

এই অভিযোগ খণ্ডনে আমাদের বক্তব্য ঐরূপই যাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হিজরী ১৭ সনে খলীফা ওমর (রাঃ) কর্তৃক বছরার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার খেলাফতের শেষ—২৩ সন পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। শুধু ২২ সনে অল্প কালের জন্য তিনি কুফার গভর্ণর হইয়াছিলেন। তারপর খলীফা ওসমান (রাঃ)ও তাঁহাকে ঐ পদে ২৯ সন পর্য্যন্ত বহাল রাখিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘ ১২ বৎসর কাহারও মতে আরও তিন বৎসর অধিক কাল একই পদে থাকার পর বছরা সংলগ্ন পারস্যের বিজিত এলাকা সমূহে সামরিক সঙ্কট দৃষ্টে খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে সরাইয়া তাঁহার স্থলে নবীন বীরপুরুষ আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ)কে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ-বদলীর স্বর্ণ-ফলন ইতিহাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত রহিয়াছে। খলীফা ওসমানের বিদ্বেষীগণ এই নিয়োগ-বদলীকে তাঁহার কুৎসা রূপে প্রচার করিয়া থাকে। অথচ ঘটনার পাত্র ও বদলীর ক্ষেত্র আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) স্বয়ং এই নিয়োগের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিদায় ভাষণে তিনি বছরাবাসীকে বলিয়াছেন—

يا تيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالات والعمات

"আমার স্থলে তোমাদের জন্য একজন তরুণ বীরপুরুষ আসিতেছেন। বিপদ-সঙ্কুল সমস্যার দুর্গে ঢুকিয়া পড়িতে এবং উহা জয় করতঃ বাহির হইয়া আসিতে তিনি খুবই পটু। তাঁহার মাতা-পিতা উভয়ের বংশই অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত।" (তবরী ৩—৩১১)

খলীফা ওসমানের ন্যায় মুরব্বি এইরূপ ক্ষেত্রে আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া থাকিলে তাহাতে খলীফার প্রতি দোষারোপের কি আছে? খলীফা ওমর (রাঃ) কত বার কত শাসনকর্ত্তাকে বরখাস্ত করিয়াছেন। আর যদি বলা হয় যে, নিজের মামাতো ভাইকে গদিতে বসাইবার জন্যই আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে বরখাস্ত করা হইয়াছিল তবে তাহা এমন ভাবধারার পরিচায়ক হইবে যাহা একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দলীয় লোকের জন্যই শোভা পাইতে পারে। এই নিয়োগ-বদলী সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের যে বর্ণনা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাও অতি সুস্পষ্ট ; নিম্নে উহা উল্লেখ করা হইল।

খলীফা ওমরের আমলে পারস্যের অনেক এলাকা জয় হইয়াছিল। তথাকার রাজশক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়া ছিল বটে, কিন্তু রাজাকে পাকড়াও করা সম্ভব হইয়াছিল না। সে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করতঃ মোসলমানদের উপর অতর্কিতে গেরিলা আক্রমণ চালাইত ; যদ্দরুণ পারস্যে মোসলমানগণ ভীষণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন ছিল। এই সঙ্কট এড়াইবার জন্য একমাত্র পথ ছিল বছরা হইতে পারস্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা। বছরার গভর্ণর আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সের ছিলেন। তাই বছরার লোকদের মধ্যেও তাঁহার বদলীর আগ্রহ ছিল (তবরী ৩—৩১৯)। বছরা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শঃ বিদ্রোহ দেখা দিয়া থাকিত তাহা দমনের জন্য সামরিক চাপ প্রয়োগে যেরূপ উত্তেজনা ও উদ্দীপনা বছরাবাসীগণ শাসন-কর্ত্তার মধ্যে দেখিতে চাহিত আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বার্দ্ধক্যতার দরুণ তাহাদের সেই চাহিদা পূর্ণ হইত না। ঐরূপ একটি ঘটনায় اتوا عثمان نا ستعفو ٤ منه। "বছরাবাসীগণ খলীফা ওসমানের নিকট আসিয়া আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বদলী দাবী করিল।" (কামেল, ৩—৪৯)

এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খলীফা ওসমান (রাঃ) কোন প্রকার অসন্তুষ্টি ব্যতিরেকে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে গভর্ণরী হইতে সরাইয়া আনিয়া নবীন ও তরুণ বীর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বরকত বহনকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ)কে বছরার গভর্ণর নিয়োগ করিলেন। এই নিয়োগ-বদলীর যে স্বর্ণ-ফল ফলিয়াছে সুধী সমাজকে তাহা যে কোন ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়ার অনুরোধ জানাই ; তাহাই খলীফা ওসমানের প্রতি এই প্রসঙ্গে অপবাদের সমুচিত জবাব হইয়া যাইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবু সারাহ্ (রাঃ)

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৪৭ জন আমেলের মধ্যে তাঁহার বংশীয় তিন জন ছাড়া দুই জন মাত্র তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। উহারই দ্বিতীয় জন আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)। তিনি খলীফা ওসমানের দুধ ভাই ছিলেন মাত্র। অন্য আর কোন আত্মীয়তা বা বংশীয় সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে মোটেই ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীগণ এতটুকু সুযোগকেও ছাড়ে নাই। খলীফা ওসমানের স্বজন-প্রীতির প্রমাণে তাঁহাকেও দাঁড় করিয়াছিল এবং মৌদুদী সাহেব ত এই ব্যাপারকে খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিরাট অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) স্বজন-প্রীতির দোষে কি পরিমাণ দোষী ছিলেন তাহা বিরুদ্ধবাদীদের এই সব প্রমাণের ওজন দ্বারাই সুধী সমাজ পরিমিত করিতে পারেন। বংশের কোন

সম্পর্ক নাই, রক্তের কোন সম্পর্ক নাই, মাতা-পিতা সূত্রের কোন সম্পর্ক নাই; দুগ্ধ পানের দরুণ শুধু মাত্র বিবাহ ক্ষেত্রে হালাল-হারামের একটা শরীয়তী মছআলার উদ্ভব হয়। নতুবা ২ × ২॥ বৎসর বয়ঃ-সীমার ভিতর উভয়ে কোন এক মহিলার দুধ পান করিয়াছে—শুধু এতটুকুর দ্বারা কত বড় আত্মীয় বা কত বড় ঘনিষ্ঠ সাব্যস্ত হইতে পারে তাহা সুধী সমাজেরই বিচার্য্য। বিরুদ্ধবাদীদের বোক্‌চায় যদি স্বজন-প্রীতির কোন মজবুত দলীল থাকিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই মাকড়সার সুতার ন্যায় দুর্ব্বলতম সম্পর্ক লইয়া ঢাক পিটাইবার পথ অবলম্বন করিত না।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিয়োগ সম্পর্কে পুরাতন অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা যায়। কেহ বলিতে পারে যে, খলীফা ওসমান (রাঃ) প্রবীণ ও বিশিষ্ট ছাহাবী আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ)কে মিশরের গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিয়া তদস্থলে স্বীয় দুধ ভাইকে নিয়োগ করিলেন।

এই অপবাদ ও গর্হিত অভিযোগের উত্তরে আমরা ইতিহাসকেই দাঁড় করিব। আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে মিশর হইতে অপসারিত করার হেতু ও কারণ কাহাকেও গড়াইয়া লইতে হইবে না, ইতিহাসেই উহা বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে ইতিহাসের দুইটি উদ্ধৃতি পেশ করা হইতেছে—

(১) لما ولى عثمان اقر عمرو بن العاص على عمله وكان لا يعزل احدا الا عن شكاة او استعفاء

"ওসমান (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ)কে তাঁহার পদে বহাল রাখিলেন। খলীফা ওসমানের নীতি ছিল—কোন প্রকার অভিযোগ বা পদত্যাগ ব্যতিরেকে তিনি কাহারও অপসারণ করিতেন না।"

(২) كان سبب ذلك ان الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص فجعلو يعملون عليه حتى شكوه الى عثمان لينزعه عنهم ويولى عليهم من هو الين منه فلم يزل ذلك دأبهم........

"আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে মিশরের গভর্ণরী হইতে অপসারণের কারণ এই ছিল যে—মিশরের এক দল লোক খলীফা ওসমানের আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্নবাদী ছিল। গভর্ণর আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ) তাহাদিগকে কোন্‌-ঠাসা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সুতরাং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপর হইল, এমনকি তাহারা খলীফা ওসমানের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল এবং মিশর

হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিল। তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার অপেক্ষা নরম ও কোমল প্রকৃতির কোন লোককে তথায় নিয়োগেরও দাবী জানাইল। তাহাদের এই দাবী চলিতেই লাগিল। অবশেষে খলীফা ওসমান (রাঃ) আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ)কে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না করিয়া তাঁহাকে নামায ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ক গভর্ণর এবং তাঁহারই ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে সামরিক ও রাজস্ব ইত্যাদির গভর্ণর নিয়োগ করিলেন। অতঃপর ঐ বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকগুলি উভয় গভর্ণরের মধ্যে চুকলিখোরী করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিল। এমনকি তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অশোভণীয় বাক্‌বিতণ্ডা পর্য্যন্ত হইয়া গেল। এই পরিস্থিতি দৃষ্টে খলীফা ওসমান (রাঃ) আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে লিখিয়া পাঠাইলেন—لا خير لك فى المقام عند من يكرهك فاقدم الى
"যাহারা আপনাকে চায় না তাহাদের মধ্যে আপনার থাকা উত্তম হইবে না, অতএব আপনি আমার নিকট চলিয়া আসুন।" (বেদায়াহ ৭—১৭০)

গভর্ণর আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ) খলীফা ওসমানের পক্ষে এবং তাঁহারই হিতে কাজ করিয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণকে সম্পূর্ণরূপে কোন্‌ঠাসা করিয়া রাখিতে ছিলেন। কিন্তু ওসমান (রাঃ) এতই মোখলেছ ও একনিষ্ঠ খলীফা ছিলেন যে, নিজের কোন হিতের জন্যও ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করা বিশেষতঃ নিজের জন্য কাহাকেও কোন প্রকার হেরাস করা পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি মিশরীয় বিচ্ছিন্নবাদীদের অভিযোগ এবং তাহাদের দাবীর প্রতিও মনোযোগী হইয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ সম্পর্কে বিশেষ একটি আকর্ষণীয় বিষয় এই ছিল যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার বহু এলাকা জয় করিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকা অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। সেই অভিযানে তাহার অধীনে মদীনারও অনেক মোজাহেদ ছিলেন—

وفيهم جماعة من اعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس وغيره

"তাঁহার অধীনে বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ছিলেন—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আরও অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।" (কামেল ৩—৪৫)

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) খলীফা ওমরের আমলেও "ছায়ীদ" এলাকার গভর্ণর ছিলেন (এছাবাহ ২—৩০৯) এবং আফ্রিকার বিজিত এলাকা সমূহে এক বৎসরের অধিক কাল গভর্ণর ছিলেন (কামেল ৩—৪৬×৪৭)। এমতাবস্থায় আফ্রিকারই একটি দেশ মিশরের গভর্ণর তাঁহাকে বানান হইল—ইহাতে খলীফা

ওসমানের কি দোষ হইতে পারে তাহা সুধী সমাজেরই বিচার্য্য। ইতিহাসের এই সব তথ্য দৃষ্টে এরূপ বলা কি অত্যুক্তি হইবে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক এবং তাহার সন্ত্রাসবাদী দলের একমাত্র কাজই ছিল খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষারোপ করা। তাই অগত্যা তাহারা অন্যায়রূপে কতকগুলি অভিযোগ গড়াইয়া লইয়াছে। দুঃখের বিষয় মৌদুদী সাহেব তাহাদেরই অন্ধ অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যথায় ইতিহাস-পাতায় উল্লেখিত তথ্য সমূহ তাহার নজরে ভাসিল না কেন ? বাস্তবিকই حبك الشئ يعمى ويصم "অন্তরে যাহা বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানাইয়া দেয়।"

মৌদুদী সাহেব ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবু সারাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে এস্থলে দুইটি দোষ উল্লেখ করিয়াছেন—যাহার উদ্ধৃতিও আমরা মহাপাপ মনে করি। কিন্তু খণ্ডনের জন্য উহার আলোচনা অবশ্যই করিতে হইতেছে। মনে হয়, মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানকে দোষী সাব্যস্ত করাটাকে নিজের ঈমানের অঙ্গরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া নিয়াছেন। তাই উহার জন্য এত কোশেশ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সব কোশেশ অন্যায়রূপে পরিচালিত এবং আলোচ্য কোশেশটা ত এত জঘন্য যে, ইহার দ্বারা ঈমান পূর্ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে ধ্বংস হইতে বাধ্য। একটি দোষের বর্ণনা মৌদুদী সাহেবেরই ভাষায় শুনুন—

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پرجن لوگون
کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردون سے
بھی لپٹے ہوئے ہون انہین قتل کردیا جائے یہ انہین سے ایک تھے

"মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) কতিপয় ব্যক্তির নামে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহারা কাবা শরীফের গেলাফ ধরিয়া থাকিলেও তাহাদেরকে কতল করিয়া ফেলিবে—ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিবেন, ঐ ব্যক্তিগণ সেই সময় অবশ্যই কাফের ছিল এবং তাহারা ইসলামের শত্রুতায় অত্যন্ত কঠোর ছিল বলিয়া হযরত (দঃ) সদ্য বিজিত মক্কা শহরে দ্রুত শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তনের জন্য এই অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, সাধারণ নগরবাসীদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন, আর যে সব লোকদের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল প্রথম হইতেই তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডের ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন ; যাহাতে তাহারা আত্মগোপনেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বিঘ্ন সৃষ্টির অবকাশ না পায়। সামরিক অভিযানে বিজিত এলাকায় এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অতি স্বাভাবিক।

কোন ছাহাবী সম্পর্কে ইসলাম পূর্ব্বের—কুফরী সময়ের কোন অবস্থা উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা যে কি জঘন্য তাহা সুধী সমাজেরই বিচার্য্য। যদি কেহ ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি রসুলুল্লার মাথা কাটিয়া আনার জন্য উন্মুক্ত তরবারী নিয়া ঘুরিয়া ছিলেন, অতএব তাঁহাকে ক্ষমতায় বসান দাষণীয়। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ যে, তিনিই দায়ী ওহোদ রণাঙ্গণে মোসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য; যথায় মোসলমানগণ এবং রসুলুল্লাহ (দ) সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও আঘাত কবলিত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে কোন পদ দান করা অপরাধ; এই শ্রেণীর অভিযোগ কোন ঈমানদার বরদাশ্‌ত করিবে কি? স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা দিয়াছেন—الاسلام يهدم ما كان قبله "ইসলামের পূর্ব্বে যত অপরাধ ও গোনাহ থাকে ইসলাম গ্রহণ ঐ সবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।"

মক্কা-বিজয় দিনের উক্ত আদেশে যে ১২।১৩ জনের নাম ছিল তাহাদের প্রায় সকলেই উপস্থিত আত্মগোপনে প্রাণ বাঁচাইয়া বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ নিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইসলামের অন্যতম গৌরব আবু জাহ্‌ল-পুত্র একরেমা (রাঃ)ও ছিলেন। এই সব ছাহাবীদের বিরুদ্ধে কাহাকেও—কোন ছাহাবীকে বা তাবেয়ীকে বা কোন মোসলমানকে জনাব মৌদুদীর ন্যায় অভিযোগ করিতে শুনা যায় নাই। হাঁ—আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলীয় কোন কোন মোত্তাফেকের মুখে ঐরূপ অভিযোগ আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) সম্পর্কে—তাহাও শুধু খলীফা ওসমানের বিরোধিতার ক্ষেত্রে শুনা গিয়াছে (কামেল)। মৌদুদী সাহেব সেখান থেকেই এই পচা-গন্ধ কুড়াইয়াছেন এবং গুরুদের হইতে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আর একটি অভিযোগের জন্ম দিয়াছেন। উহাও তাঁহারই এবারতে শুনুন—

اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد
مرتد ہو چکے تھے

"আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ত মোসলমান হওয়ার পর মোরতাদ হইয়া গিয়াছিলেন।"

মৌদুদী সাহেব খোদার ভয় রাখেন কিনা এস্থলে তাহাও সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। একজন ছাহাবী সম্পর্কে এত বড় গুরুতর কথাকে এরূপ গোলমাল ভাবে উল্লেখ করা কতই না জঘন্য! সাধারণ পাঠক এই বর্ণনার মর্ম্ম কি বুঝিবে? মূল ঘটনা এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) মক্কা বিজয়ের বহু পূর্ব্বে একবার মোসলমান হইয়া কিছু দিন পর ইসলাম ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়কালে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করতঃ চিরজীবন ইসলামের খেদমতেই

কাটাইয়াছেন। সুতরাং এই অভিযোগের ঘটনাটাও ইসলাম-পূর্ব্বেরই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ এই আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে কাজ করিয়াছেন (কামেল ৩—৪৫)। কেহই তাঁহার এই সমালোচনা করেন নাই। তাঁহারা ত তাঁহার সম-সাময়িক ছিলেন। মৌদুদী সাহেব ত ১৩০০ বৎসর পরে জন্মিয়াছেন।

ছাহাবা-তাবেয়ীগণ এই শ্রেণীর কোন ইসলাম-পূর্ব্ব অবস্থার কারণে কোন ছাহাবীর অযোগ্যতার ধারণাও করিতেন না। পূর্ব্বালোচিত আল্‌কামাহ ইবনে ওলাছাহ (রাঃ) ত মক্কা বিজয়কালেই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করতঃ খলীফা আবু বকর ছিদ্দীকের আমলে মোরতাদ—ইসলাম ত্যাগী হইয়া গিয়া ছিলেন। তারপর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে "হুরান" এলাকার গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—১৪২)

খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে আরও কতিপয় অভিযোগ

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নীতির ভুল প্রতিপন্ন করিতে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ভিত্তিহীন অভিযোগ আমদানী করার শালীনতাহীন অপরাধ মৌদুদী সাহেব অনেকই করিয়াছেন। এযাবৎ ঐ সবের সংক্ষেপ সমালোচনাই করা হইল। তদুপরি তিনি আরও কতিপয় অসঙ্গত অভিযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেইগুলি তাঁহার প্রলাপ বৈ আর কিছু নহে। ঐগুলির সমালোচনাও পাঠক সমক্ষে পেশ করা হইতেছে—

(১) মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া (রাঃ), সায়ীদ ইবনুল আ'ছ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) এই চার জন গভর্ণরের শাসিত এলাকাগুলিকে একত্রে যোগ করিয়াছেন। তারপর ভৌগলীক পাণ্ডিত্যে আস্ফালান দেখাইয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই সব গভর্ণরদের শুধু যোগ্যতা ইহার জন্য যথেষ্ট ছিল না যে, খোরাসান হইতে উত্তর আফ্রিকা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা একই খান্দানের গভর্ণরদের হাতে দিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত সমুদয় এলাকা ঐ চার জন গভর্ণরের হাতে দিয়া ছিলেন—ইহাও তাঁহার নীতির একটা ভুল ধারা; যেহেতু ঐ গভর্ণরগণ একই খান্দানের ছিলেন।

কি দৌরাত্ম! ১৩০০ বৎসর পর প্রায় ৫০০০ মাইল দুরে থাকিয়া মৌদুদী সাহেব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় খলীফা ওসমান (রাঃ)কে ভুল নীতি গ্রহণে অভিযুক্ত করিলেন—ইহা কিরূপ অনধীকার চর্চ্চা সেই বিচার সুধী সমাজই করিবেন। আমরা

দেখাইতে চাই, এ ক্ষেত্রেও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্যের উপর অভিযোগটার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। কারণ, "খান্দান" অর্থ বংশ—একই খান্দান অর্থ এক বংশ। অথচ যে চার জন গভর্ণরের এলাকাকে মৌহুদী সাহেব একত্রে যোগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় জন—আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবু সারাহ (রাঃ) যাঁহার বদৌলতে মৌহুদী সাহেব স্বীয় যোগের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের নাম উল্লেখ করার সুযোগ পাইয়াছেন, কারণ তিনি মিশরের গভর্ণর ছিলেন। আর চতুর্থ জন—আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) যাঁহার বদৌলতে খোরাসানকে যোগ করার সুযোগ পাইয়াছেন, কারণ তিনি খোরাসান সহ বৃহত্তম বছরার গভর্ণর ছিলেন—এই দুই জন পরস্পর বা অপর দুই জনের বা খলীফা ওসমানের এক বংশীয় কখনও ছিলেন না। এই ব্যাপারে মৌহুদী সাহেব যে কোন চ্যালেঞ্জে পরাজিত হইতে বাধ্য হইবেন। আর যদি দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ শুধু দুগ্ধ পানের সম্পর্ক এবং মাতার ভ্রাতার নছবের সম্পর্কের দরুণ খলীফা ওসমানের মাধ্যমে সকলকে এক খান্দান ধরা হয়, তবে ত সব কিচ্ছাই খতম। কারণ "খান্দান" শব্দের এই বিশাল বিস্তীর্ণ অর্থে আল্লার রসুল (দঃ), তাঁহার খলীফা আবু বকর (রাঃ), তাঁহার উত্তরাধিকারী ওমর (রাঃ) বরং আলী (রাঃ) সহ আদম সন্তানের বিরাট অংশ খলীফা ওসমানের খান্দান ভুক্ত হইয়া যাইবেন। তাহাতে মৌহুদী সাহেব চক্ষু বন্ধ করিয়া যোগ-বিয়োগ দেওয়া ব্যতিরেকেই অভিযোগ খাড়া করার অবকাশ পাইয়া যাইবেন যে, খলীফা ওসমানের খান্দানই পূর্ব্বাপর এবং সর্ব্বত্র ক্ষমতা দখল করিয়াছিল।

(২) মৌহুদী সাহেব মোয়াবিয়া (রাঃ), ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) এই তিন জনের ব্যাপারে খলীফা ওসমানের উপর আরও একটা এমন হীন অভিযোগ দাঁড় করিয়াছেন যাহা তাঁহার সমস্ত কুকীর্ত্তিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। উক্ত ছাহাবীত্রয় সম্পর্কে মৌহুদী সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহারা তোলাকার মধ্যে শামিল ছিলেন; অর্থাৎ মক্কা বিজয় কালে তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তথ্যের উপর মৌহুদী সাহেব তাঁহার কুখ্যাত পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, এত বিলম্বে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন ওসমান (রাঃ) তাঁহাদিগকে চাকুরীর উন্নতি দিয়াছিলেন।

পাঠক! এই অভিযোগের আসল আবিষ্কারক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের খারেজী দল। তাহারা মুলতঃ উক্ত তিন জনকে গভর্ণরী পদ দেওয়ার উপরই উক্ত অভিযোগ খাড়া করিয়াছিল। সেই অভিযোগ খণ্ডনে বলা হইত যে, উক্ত গভর্ণরত্রয়ের মধ্যে শুধু মাত্র একজন—আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) ব্যতীত অপর দুই জনকে ত ওমর (রাঃ)ই গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন।

চতুর মৌহুদী সাহেব উক্ত খণ্ডন ও জবাবটাকে কাটাইয়া যাওয়ার জন্য শিষ্য হইয়া গুরুদের কথার (Revise) সংশোধন করিয়াছেন যেন খলীফা ওসমান অভিযুক্ত হন এবং খলীফা ওমর উহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। তিনি অভিযোগটাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقاء میں سے تھے

"খলীফা ওসমান তোলাকাদিগকে চাকুরীর উন্নতি দিয়া ছিলেন।"

সুধী সমাজ বিচার করিবেন, যাহাদেরকে গভর্ণরী পদ দেওয়া অপরাধ ছিল না, পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদেরকে বহাল রাখা এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণে উন্নতি দেওয়া কি অপরাধ হইতে পারে? এরপর মৌহুদী সাহেব দুঃসাহসী হইয়া আরও অধিক জঘন্য একটি মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবাদ আছে— دروغ گورا حافظہ نباشد অর্থাৎ "অবাস্তব কথা দ্বারা যাহারা কাজ ফতেহ করিতে চায় তাহাদের কথায় গড়মিল থাকিবেই।" মৌহুদী সাহেব প্রথম ধাপে অযৌক্তিক পার্থক্যের দ্বারা হইলেও মুল অভিযোগটাকে Revise—সংশোধন করিরাছেন যাহাতে অভিযোগটার আঁচ খলীফা ওমরের গায়ে না লাগে। কিন্তু এই পৃষ্ঠায়ই দ্বিতীয় ধাপে তিনি ঐ তোলাকাদের সম্পর্কে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও জঘন্য আক্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন যাহা ১৪০০ বৎসরের মধ্যে কোন মোসলমান করে নাই। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকও বলিতে সাহসী হয় নাই। সেই উক্তির দ্বারা মৌহুদী সাহেব খলীফা ওসমানের সঙ্গে খলীফা ওমরকেই নয় শুধু—খলীফ আবু বকরকেও ভীষণভাবে ঘায়েল করিয়াছেন। কি দুঃসাহস! কি দৌরাত্ম্য। কি জঘন্য উক্তি!—

اسلامی تحریک کی سربراہی کے لئے یہ لوگ موزوں نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وتربیت سے انکو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کا ذہن اور سیرت وکردار کی پوری

قلب ماہیت ہوجاتی

"ইসলামী আন্দোলনের অধিনায়কত্বের জন্য এই লোকগুলি (তথা যাঁহারা মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক ছাহাবী হইয়াছিলেন) উপযোগী গণ্য হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা ঈমান আনিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য ও সুশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ঐ পরিমাণ সুযোগ তাঁহারা পাইয়া ছিলেন না যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞান-বিবেক, চরিত্র ও কার্য্যধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত।"

সাবাস—মৌদুদী সাহেব! কি পূতি-গন্ধের উদ্‌গিরণ আপনি করিলেন তাহা বোধ হয় আপনার অনুভূতি আঁচ করিতে পারে নাই। তবে শুনুন—

(১) ছাহাবা কেরামের যে তারতম্যের উপর আপনার মনগড়া রায় প্রদান করিলেন ইহার কোন প্রমাণ আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মোসলমানের উক্তিতে দেখাইতে পারেন কি? "কচু গাছ কাটিতে কাটিতে মানুষ ডাকাতে পরিণত হয়।" আপনার ভূমিকা কি তদপেক্ষা জঘন্য নয়? এক যুগ পূর্ব্বে আপনি একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন "ছাহাবীগণ সত্যের মাপকাটি নহেন"। দ্বিতীয় ধাপে আপনি কতকগুলি অসত্য ও অবাস্তব ইতিহাসের হাওয়ালা বা রেফারেন্সের আড়ালে ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চা করিলেন। তৃতীয় ধাপে আপনি কোন প্রকার হাওয়ালা ও রেফারেন্স ব্যতিরেকেই দলীলহীন একটা অলীক রায় ছাহাবাদের সম্পর্কে জাহির করিলেন—ইহা কত বড় জঘন্য দুঃসাহস।

(২) মনে হয়—আল্লার রসুলের ছাহাবীগণকে আপনি আপনার ভক্তদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং নিজের সাহচর্য্যের দ্বারা রসুলের সাহচর্য্যকে পরিমাপ করিয়াছেন। নতুবা মক্কা বিজয়ের সময়ে যাঁহারা মোসলমান হইয়াছিলেন—তাঁহারা সুদীর্ঘ ২ বৎসর কাল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচর্য্যের অমোঘ মৃতসঞ্জীবনী লাভের সুযোগ পাইয়া ছিলেন। তবুও আপনি তাঁহাদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন? ইহা কতই না জঘন্য!

(৩) দুই বৎসর সাহচর্য্য যথেষ্ট না হইলে কি পরিমাণ সময়ের সাহচর্য্য দ্বারা ছাহাবীগণ আপনার রায়ে ইসলামী আন্দোলনের অধিনায়কত্বের যোগ্য হইতে পারেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া দিলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতাম। কারণ, অযোগ্যতার সময়-পরিমাণ যদি আরও কিছু বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে তবে ত ইসলাম-আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) এবং আরও অনেক যাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরাট মোজেযা গণ্য করা হয়, ঐ শ্রেণীর অনেক ছাহাবীই আপনার দলীল-প্রমাণহীন অলীক রায় অনুসারে অধিনায়কত্বের যোগ্যতা হারাইবেন; যেহেতু তাঁহারা মক্কা বিজয়ের বেশী পূর্ব্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না। ইহা কি কোন মোসলমান বরদাশ্‌ত করিবে?

(৪) খলীফা ওসমান (রাঃ)কে ঘায়েল করার জন্য ১৩০০ শত বৎসর পর ছাহাবীদের যোগ্যতার এই মাপকাঠি আপনি গড়াইয়াছেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ), ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)কে আপনার গড়ান মাপকাঠি দ্বারা অযোগ্য ঘোষণা করতঃ খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা

আনহুর প্রতি দোষারোপ করিতে প্রয়াশ পাইয়াছেন যে, তিনি এই সব অযোগ্যদিগকে নিজ বংশের হওয়ায় চাকুরীর উন্নতি দিয়া ছিলেন।

এই বিষাক্ত রায় সাব্যস্ত করাকালীন আপনি লক্ষ্য করেন নাই যে, এই অপরাধে খলীফা ওমর (রাঃ) প্রথম অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন ? কারণ উক্ত তিন জনকে বহু পূর্ব্বেই খলীফা ওমর (রাঃ) গভর্ণরী পদ দিয়া ছিলেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)কে একাধারে আট বৎসর গভর্ণর রাখিয়া জীবনের শেষ মূহূর্ত্তে আরও এক বৎসর সুযোগ দানের অছিয়ত করিয়া গিয়া ছিলেন। মক্কা বিজয় কালে ইসলাম গ্রহণ কারী আরও অনেককে ওমর (রাঃ) গভর্ণর করিয়াছিলেন, যেমন—দামেশকের প্রথম গভর্ণর এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়কালে মোসলমান হইয়াছিলেন। তিনি ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক দামেশ্‌কের গভর্ণর মনোনীত হইয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন (বেদায়াহ, ৭—৯৫)। আলকামাহ্‌ ইবনে ওলাছাহ্‌ (রাঃ)ও মক্কা বিজয়কালের মোসলমান ছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে "হুরান" এলাকার গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন এবং সারা জীবন তিনি তথায়ই ছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—১৪২)

আপনার জন্ম দেওয়া মাপকাঠির পরিমাপে অযোগ্য গভর্ণর মনোনয়নের অপরাধ ওসমান (রাঃ)কে ছাড়াইয়া শুধু খলীফা ওমরের উপর ক্ষান্ত হইবে না। সেই অপরাধে রসুলুল্লার খলীফা আবু বকরও জড়িত হইবেন। কারণ দামেশকের প্রথম গভর্ণর এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের নিয়োগ একা খলীফা ওমরের দ্বারাই হইয়াছিল না, এই নিয়োগ সম্পর্কে খলীফা আবু বকর (রাঃ) ওয়াদাদ্ধ ছিলেন (বেদায়াহ, ৭—২৪)। সুতরাং এই নিয়োগে খলীফা আবু বকর জড়িত ছিলেন ; অথচ এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা-বিজয় সময়েই মোসলমান হইয়াছিলেন। মৌদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তকের প্রতি আলেম সমাজের ধিক্‌কার ও ঘৃণা দেখিয়া উহার সঙ্গে সংযোজনীও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তথায় ৩২৫ পৃষ্ঠায় তিনি বিড়ালের মল ঢাকার ন্যায় তাঁহার আলোচ্য এই অবাঞ্ছিত উক্তির দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাও সপূর্ণ ব্যর্থ কোশেশ। এইবার তিনি বলিয়াছেন—

مگر یہ پالیسی نہ حضور کی تھی اور نہ شیخین کی کہ سابقین
اولین کے بجائے اب ان لوگوں کو آگے بڑھایا جائے اور مسلم معاشرے
اور ریاست کی رہنمائی و کار فرمائی کے مقام پر یہ فائز ہوں

"হুজুরের এবং আবু বকর ও ওমরের এই নীতি ছিল না যে, প্রথম দিকে যাঁহারা মোসলমান হইয়াছিলেন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে এই লোকদেরকে (যাঁহারা

মক্কা বিজয়কালে মোসলমান হইয়াছিলেন) উন্নতি দেওয়া হউক এবং মোসলেম সমাজের ও রাষ্ট্রীয় অধিনায়কত্বে কোন পদে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হউক।"

কাহারও হইতে কোন ভুল তথ্য নিঃসৃত হইয়া পড়িলে সেস্থলে ভুল স্বীকার করিয়া নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় একটি মিথ্যাকে দাঁড় করিয়া রাখার জন্য দশটা মিথ্যা পরিবেশন করিতে হইবে। মৌদুদী সাহেব সেই ফাঁদেই পড়িয়াছেন। একটি ভুল মন্তব্য পরিবেশনের পর মুখ ঢাকিবার জন্য যে অজুহাত দিয়াছেন তাহাও ডাহা মিথ্যা, ইতিহাসের পরিপন্থী।

সিরিয়ার প্রাণকেন্দ্র দামেশ্‌ক অঞ্চল মোসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম জয় করিতে চলিয়াছেন, ঠিক তখনই খলীফা আবু বকর (রাঃ) উহার গভর্ণর-পদের জন্য এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষে ওয়াদা করিলেন। দামেশ্‌ক বিজয় মুহূর্ত্তে তিনি ইহজগত ত্যাগ করার পর খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার ওয়াদাকে অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিলেন এবং এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে দামেশ্‌ক অঞ্চলের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সর্ব্বপ্রথম গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। অথচ এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা-বিজয় সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন (বেদায়াহ, ৭—৯৫)। এতদ্ভিন্ন খলীফা ওমর (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে দীর্ঘ আট, বরং নয় বৎসর কাল সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর রাখিয়াছিলেন। হিজরী ২১ সনে তিনি একযোগে সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ উপকূলবর্ত্তী এলাকা সহ ছয়টি প্রদেশের একক গভর্ণর খলীফা ওমরের পক্ষ হইতে ছিলেন; মোয়াবিয়া (রাঃ)ও মক্কা-বিজয় সময়ের মোসলমান ছিলেন। ইতিহাসের এই সব তথ্য হইতে অন্ধ ব্যক্তিরাই মৌদুদী সাহেবের উক্ত সংযোজনীর বক্তব্যকে সমর্থন করিতে পারে।

আগে-পরের ছাহাবীদের তারতম্যে আবুবকর ও ওমরের যে নীতির দাবী মৌদুদী সাহেব করিয়াছেন ইতিহাসের আলোচনায় উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নীতিও উহাই ছিল বলিয়া তিনি দাবী করিয়াছে। এস্থলে মৌদুদী সাহেব এই হাদীছটি স্মরণ করিলে ভাল হইত—

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন বিষয়কে মিথ্যারূপে আমার বলিয়া উল্লেখ করে সে যেন জানিয়া রাখে, তাহার শেষ ঠিকানা জাহান্নামে।"

মৌদুদী সাহেবকে ছাহাবীগণ সম্পর্কে তাঁহার অবৈধ ভূমিকা হইতে সংযত হওয়ার অনুরোধ করিতে অসংখ্য আলেম-ওলামার প্রচেষ্টা ব্যয়িত এবং ব্যর্থ হইয়াছে। পরিশিষ্টের ভূমিকায় যুগ-বরণীয় তিনজন মহা মনীষীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদানের কথা বলা হইয়া ছিল। পরিশিষ্টের সমাপ্তিতে তাহাই পেশ করা হইতেছে—

মৌদুদী সাহেব সম্পর্কে

হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী (রঃ) মুফতি-আজম পাকিস্তান-এর সর্ব্বশেষ মতামত

[লিখিত একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। অতঃপর ঐ বক্তব্য "জাওয়াহেরুল-ফেকাহ" নামক কেতাবে প্রকাশিত হইয়াছে।]

প্রশ্ন ঃ— হযরত আকদাছ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী সাহেব মুফতি আজম পাকিস্তান! আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

নিবেদন এই যে, জনাব অবগত আছেন যে, এই অধম টেণ্ডুল্লাইয়ার দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ফতওয়া দান কার্য্যের দায়িত্বে রহিয়াছে। এখানে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নাদি আসিয়া থাকে। অনেক সময় এই প্রশ্নও আসিয়া থাকে যে, মৌদুদী সাহেব এবং তাঁহার অনুসারী দল "আহ্‌লুছ-ছুন্নতে-অল-জমায়াত" সম্প্রদায়ের তরিকার উপর আছেন কি না? এবং চার মজহাব হইতে কোন্ মজহাবের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক? এবং তাহাদের ইমামতীতে নামায পড়ার হুকুম কি?

আর তাহাদের সম্পর্কে যে, প্রসিদ্ধ—"ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে তাহাদের ধ্যান-ধারনা পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দের বিপরীত"—এই কথার বাস্তবতা কতটুকু? কোন কোন লোক আপনার পুরাতন কোন লেখার ভিত্তিতে আপনার সম্পর্কে বলিয়া থাকে যে, আপনি তাহাদের মতামতের সমর্থক—ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত কি? ইতি—সালাম

আহকার— **মোহাম্মদ অজীহ**
দারুল-উলুম, টেণ্ডুল্লাইয়ার
সিন্ধু (পাকিস্তান)

বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম

উত্তর ঃ—মাওলানা মৌদুদী সাহেব এবং জমাতে-ইসলামী সম্পর্কে আমার নিকটও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রশ্ন আসিয়াছে। সেই পূর্ব্বকালে তাঁহার সম্পর্কে আমার যাহা কিছু জানা ছিল—আমার জানা-মতে আমি ঐ সময় ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি; যাহার কোন কোনটা প্রকাশিতও হইয়াছে। ঐ সব উত্তর-মালা এখন সংগ্রহ করা সম্ভব নহে।

তবে ইতিমধ্যে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ পাঠ করার সুযোগ আমার হইয়াছে এবং তাঁহার কিছু নূতন রচনাবলীও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচনাবলীর সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং তাঁহার দলের অবস্থাসমূহ বেশী করিয়া দেখার সুযোগও আমার হইয়াছে। এই সব অভিজ্ঞতার সমষ্টি দ্বারা তাঁহার সম্পর্কে আমার যে সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা আমি অবিকলভাবে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। আমার পূর্ব্বেকার লেখাসমূহ যদি আমার এই নূতন লেখার অনুরূপ দেখা যায় তবে ত উহা ঠিকই থাকিবে। আর যদি পূর্ব্বের কোন লেখা আমার এই নূতন লেখার ব্যতিক্রমের হয় তবে পূর্ব্বের লেখাকে মনছুখ—পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে) এখন হইতে আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমাত্র নিম্নে বর্ণিত লেখাকেই নির্ভরযোগ্য গণ্য করিতে হইবে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে—

● মওলানা মৌদুদী সাহেবের মূল ভ্রান্তি এই যে, তিনি "আকায়েদ ও আহকাম" —ইসলামী মতবাদ ও মছআলা-মছায়েল সম্পর্কে নিজস্ব ইজতেহাদের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহার ইজতেহাদ পূর্ব্ববর্ত্তী আলেম সম্প্রদায়ের ব্যতিক্রমে হয়।

● অথচ আমার জানা মতে ইজতেহাদের শর্ত্তসমূহ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান নাই।

● এই মূল ভ্রান্তির কারণে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক বিষয় ভুল এবং আহলে-ছুন্নত আলেম সম্প্রদায়ের মতের বিপরীত বিদ্যমান রহিয়াছে।

● এতদ্ভিন্ন তিনি স্বীয় রচনাবলীতে পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণের উপর, এমনকি ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের উপরও "তান্‌কীদ" তথা ভুল ধরার যে ভাব-ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিতান্তই গলৎ—ভ্রান্তি।

● বিশেষতঃ "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ*" প্রবন্ধে কতিপয় ছাহাবায়ে-কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুমকে শুধু তান্‌কীদই নয় বরং তাঁহাদিগকে তিরস্কার, ভৎর্সনা ও নিন্দা-মন্দের তীর দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে।

● আর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই বিষয়টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইলেও তিনি নিজ কথার উপর যেরূপ গোঁড়ামি প্রদর্শনের ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আহ্‌লে-ছুন্নত-অল-জমাতের আলেম সম্প্রদায়ের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

● এতদ্ভিন্ন তাঁহার সব রচনাবলীরই প্রতিক্রিয়া পাঠকদের উপর বেশীর ভাগই এইরূপ অনুভূত হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দের প্রতি আস্থা থাকে না। আর আমাদের মতে এই আস্থাই দ্বীন-ধর্ম্মকে সুরক্ষিত রাখার বড় প্রাচীর। কেহ এই প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পূর্ণরূপের ভাল নিয়্যত এবং এখ্‌লাছ ও একনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত ভুলে এবং ভ্রান্ত পথে পতিত হইয়া যাইতে পারে।

---

* এই প্রবন্ধটিরই সমালোচনা অত্র পরিশিষ্টে করা হইয়াছে।

হাঁ—ইহা সত্য যে, হাদীছ অস্বীকারকারী, কাদিয়ানী বা স্বেচ্ছাচারী শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা আমার মতে ঠিক নহে। ঐ শ্রেণীর লোকেরা ত সূদ, জুয়া, মদ ইত্যাদি ইসলামের সুস্পষ্ট হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার জন্য কোরআন-হাদীছের বিকৃতি সাধন করিয়া থাকে। ইহার বিপরীত তাঁহার রচনাবলী ঐ শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে এবং তাহাদের উপকার হইয়াছে। শুধু এতটুকু কথাই আমি বলিয়া আসিতেছি। আমার এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া যদি কেহ বলে যে, আমি মৌদুদী সাহেবের ঐ সব মতামতের সমর্থনকারী যাহা তিনি পূর্ব্বাপর ওলামা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিয়াছেন, তবে তাহা একেবারেই ভুল এবং অবাস্তব কথা হইবে।

● যদিও জমাতের গঠনতন্ত্রে মাওলানা মৌদুদী সাহেব এবং জমাতে-ইসলামী ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত। এবং আইন-কানুনের দৃষ্টিতে মাওলানা মৌদুদীর উপর যাহা প্রয়োগ করা যায় তাহা জমাতে ইসলামীর উপর প্রযোজ্য হওয়ার বাধ্য বাধকতা নাই। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে জমাতে ইসলামী মাওলানা মৌদুদীর রচনাবলীকে শুধু কেবল নিজেদের শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই। বরং উহাকে তাহাদের কার্য্যের ভিত্তি এবং প্রোগ্রামও বানাইয়া রাখিয়াছে। তদুপরি প্রতি ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে, তাহারা ঐসব রচনাবলীর বিরোধীতাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিয়া থাকে*।

● ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জমাতে ইসলামীর সদস্যরা ঐসব মতবাদ ও রচনাবলীর সহিত সম্পূর্ণ একমত। যদি কেহ সত্যই এইরূপ হন যে, ঐ ধরণের বিষয়ে মৌদুদী সাহেবের বিরোধী হন এবং আহ্‌লে-ছুন্নত আলেম সম্প্রদায়ের মতামতকে উহার বিরুদ্ধে সঠিক সত্য গণ্য করেন তবে তাঁহার উপর অভিযোগ আসিবে না।

● নামায সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, ইমাম এইরূপ ব্যক্তিকে বানানো উচিৎ যে, আহ্‌লে-ছুন্নতের অনুসারী হয়। অতএব যাহারা মৌদুদী সাহেবের ঐসব বিষয়ের সঙ্গে একমত হয় তাহাকে স্বেচ্ছায় ইমাম বানান জায়েয ও দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি তাহাদের পেছনে কোন নামায পড়িয়া থাকে তবে সেই নামায শুদ্ধ গণ্য হইবে।

বন্দা মোহাম্মদ শফী

১২ রবিউল-আউআল ১৩৯৫ হিজরী

[জাওয়াহেরুল-ফেকাহ, ১—১৭০]

---

* লক্ষ্য করুন! মৌদুদী সাহেবের "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" রচনাটি অতি জঘন্য এবং ইসলাম ও মোসলমানদের পক্ষে কলঙ্কময় রচনা। সমস্ত আলেম সম্প্রদায় ইহার প্রতি ক্ষুব্ধ। ইহার বিরুদ্ধে প্রামাণিক সত্য তথ্যাবলী এই পরিশিষ্টে সঙ্কলন করায় বাংলা দেশের জমাত ইসলামী মার্কা খুদে নেতা যাহাদেরে "তেনা" বলিলে অত্যুক্তি হয় না তাহারা পর্য্যন্ত এই পরিশিষ্টের প্রতি ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

মৌদুদী সাহেব সম্পর্কে

মাওলানা জাকারিয়া সাহেব মোহাজেরে-মদনী, শায়খুল-হাদীছ
মাদ্রাসা মাজাহেরে-উলুম, সাহারন পুর (ইণ্ডিয়া)

"ফেৎনায়ে-মৌদুদিয়ত" (মৌদুদী-ধ্যান ধারনার দ্বারা দ্বীন-ঈমানের বিপর্য্যয়) নামীয় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে অতি সংক্ষিপ্ত কতিপয় উদ্ধৃতি মাত্র।

● শায়খুল-হাদীছ সাহেব একজন মৌদুদীভক্তকে লিখিয়াছেন---আপনার সমাবেশে প্রত্যেকেই জোর গলায় বলিয়াছে---(বিরুদ্ধবাদী) লোকেরা (মৌদুদী সাহেবের) রচনাবলী পাঠ করে না, শুধু শুনা কথার উপর ভিত্তি করিয়া রায় দান করে।

শায়খুল-হাদীছ সাহেব বলেন—ঐ উক্তি আমাকে বাধ্য করিয়াছে ; আমি তাঁহার রচনাবলীকে গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করায় অনেক সময় ব্যয় করিয়াছি। উহা পাঠে আমি যতই অগ্রসর হইয়াছি ততই স্তম্ভিত হইয়াছি । আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি যে, ঐ রচনাবলীর গর্হিত মতবাদসমুহকে কি করিয়া আপনি সহ্য করিলেন !

● দ্বীনীয়াৎ বা ধর্ম্মীয় বিষয়াবলী---বিশেষতঃ ইজতেহাদ এবং তাছাওফ বা ছুফীবাদ এবং পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দের জীবন-সাধনার গবেষণাসমুহের ব্যাপারে আমার এতটুকু ত জানা ছিল যে, মৌদুদী সাহেব ঐ সবের বিরোধী। কিন্তু আমি কখনও ভাবি নাই যে, উহার (তথা তাছাওফ ও পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দের) বিরুদ্ধে যখন তিনি কলম ধরেন তখন তিনি নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যান। তাঁহার জ্ঞান-বোধে ইহাও থাকে না যে, আমি কাহার বিরুদ্ধে কলম চালাইতেছি !

● মৌদুদী সাহেবের রচনাবলী পাঠ করার বিষময় ফলের উল্লেখে তিনি বলেন—"উহার অতি ছোট একটি হইল—পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দ এবং ইসলামের কর্ণধারগণের সম্মানে আঘাত ও বেয়াদবী করা। যথা—"হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মধ্যে খলীফা হওয়ার যোগ্যতা ছিল না।" (মৌদুদী সাহেবের কুখ্যাত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" সঙ্কলনের সারই হইল এই তথ্য।)

শায়খুল-হাদীছ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে মৌদুদী সাহেবের কতকগুলি বড় বড় কুকীর্তির প্রামাণিক আলোচনাও করিয়াছেন। যথা—

● মৌদুদী সাহেবের রচনাবলীর সর্ব্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু আমি দেখিয়াছি, পবিত্র কোরআনের মন-গড়া তফছীর। তাঁহার নিজের কথায়ই উহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁহার "তান্‌কিহাত" পুস্তিকায় বলেন—"কোরআন এবং ছুন্নতে-রসূলের শিক্ষা সকলের আগে ও উপরে। কিন্তু তফছীর ও হাদীছের পুরাতন ভাণ্ডার হইতে নয়।"

● মৌদুদী সাহেবের রচনাবলীতে দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিশেষ বস্তু হইল, দ্বীন এবং এবাদৎ-বন্দেগীর প্রতি উপহাস। আর দ্বীনের আলেমগণের সম্মানে আঘাত।

মৌদুদী সাহেব সম্পর্কে

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) প্রথম দিকে মৌদুদী সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মৌদুদী সাহেব রচিত কুখ্যাত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে পর মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ভীষণভাবে মর্মাহত হইলেন এবং শোকাভিভূত অপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইলেন।

তিনি তাঁহার আকর্ষণ ও ভালবাসার হক আদায় করিয়া মৌদুদী সাহেবকে তাঁহার এই রচনার সংশোধন করিবার অনুরোধ অতিশয় হৃদয় গ্রাহীরূপে করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। এই বিষয়ে তিনি একাধিক পত্র লিখিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন।

মাওলানা শামছুল হক (রঃ) একাধিকবার মৌদুদী সাহেবের সঙ্গে এই বিষয়ের জন্য সাক্ষাৎ করিয়া মৌখিক অনুরোধেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি স্বীয় দেশবাসীকে এবং জাতিকে মৌদুদী সাহেব হইতে সতর্ক করিয়া তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ সঙ্কলন "ভুল সংশোধন" নামে সম্পাদিত করেন।

● "ভুল সংশোধন" লিখিবার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি উক্ত সঙ্কলনের ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যেহেতু জনাব মৌদুদী সাহেব শরীয়তের বিধান অনুসারে প্রথমে কতগুলি জরুরী কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন এই জন্যই আমার সমর্থনে ও উৎসাহ দানে আমার বহু দোস্ত মৌদুদী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জমায়াতে যোগদান করিয়াছেন, রোকন হইয়াছেন। এখন যেহেতু মৌদুদী সাহেবের কতগুলি কাজ ইসলামের বুনিয়াদী অছুলের মূলে আঘাত হানিয়াছে, এই জন্য সেই সমস্ত ভাইদেরে সত্য কথা জানাইয়া দেওয়া আমার উপর ফরজ হইয়া পড়িয়াছে। এই ফরজ আদায়ের জন্য আমি কলম ধরিতে বাধ্য হইতেছি। (তাই সংশোধনের উক্ত সঙ্কলন বাংলা ভাষায় রচিত।)

● ছাহবীগণ সম্পর্কে মৌদুদী সাহেবের বিষোদ্গারের প্রথম ধাপের বর্ণনায় তিনি উক্ত সঙ্কলনের ৮—৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

মধুর নামে বিষ—জনৈক ভদ্রলোক পরোপকার এবং লোক সেবার নামে সকলের বাড়ীতে সকলে যাহাতে অতি সহজে সুমিষ্ট ফল খাইতে পারে সেই জন্য সকলেকে বলিলেন যে, আমি তোমাদের বাড়ীতে সুমিষ্ট লেংড়া আমের বীজ লাগাইয়া গেলাম। আসলে ঐ ফলটি ছিল তিক্ত বিষাক্ত বিষবৃক্ষের বিষফল—লেংড়া আম নয়। কিন্তু আমার মত স্থুল দর্শী অজ্ঞ যারা তারা মনে করল যে, খুব ভাল হইল যে, আমরা সহজে সুমিষ্ট লেংড়া আমের ফল খাইতে পারিব। ঐ ভদ্রলোক দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন।

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو-

১। আল্লাহর রছুল ব্যাতীত সত্যের মাপকাঠি আর কাহাকেও মানা যাইবেনা।

২। রছুলে-খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করা যায় না।

৩। রসুলে-খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও জেহেনী গোলামী অর্থাৎ নির্বিচারে অনুকরণ অনুসরণ করা যাইবে না। (দস্তুরে-জমাতে ইসলামী ৪ পৃঃ)

কথা কয়টি কত সুন্দর ! আমরা মনে করিলাম—শেরক-বেদয়াতের সব অন্ধকার দুর হইয়া গেল, তৌহিদের আলোতে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সুক্ষ দর্শী অন্তঃ-দৃষ্টি সম্পন্ন আলেমগণ বুঝলেন—মনে হয় এতে যেন কি তিক্ত বিষাক্ত বিষ মাখানো আছে। বছর তিরিশেক পরে যখন ঐ গাছ শাখা প্রশাখা ফুল পাতা ছাড়িল তখন আমরা যাহারা স্থুল দর্শী ছিলাম তাহারাও বুঝিলাম ইহা ত লেংড়া আম নয়, ইহা তিক্ত বিষাক্ত বিষ-বৃক্ষের বিষ-ফল। বিষ-বৃক্ষও সাধারণ বিষ বৃক্ষ নয়, যাহা মানুষের দৈহিক জীবন নাশ করে, বরং ইহা এমন বিষ-বৃক্ষ যাহা মানুষের রুহানী জেন্দেগী ধ্বংস করে এবং মূল ঈমানকে বিনষ্ট করে।

সেই বিষ-বৃক্ষ কি ? সেই বিষ-বৃক্ষ অর্থাৎ অতি গোপনে অতি সন্তর্পনে ছাহাবায়ে কেরামের উপর থেকে বিশ্বাস উঠাইয়া দেওয়া। আর ছাহাবাদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই কোরআন হাদীছ থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া এবং কোরআন হাদীছ থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই ঈমান হারা হইয়া চির-জাহান্নামী হওয়া। এই জন্যই এই বিষ-বৃক্ষকে মূল ঈমান ধ্বংসকারী বলা হইয়াছে।

● ছাহাবীগণ সম্পর্কে মৌদুদী সাহেবের জঘন্য কীর্তির বর্ণনায় হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) উক্ত সঙ্কলনের ১১—১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

সর্ব শ্রেণীর সাহাবার উপর মৌদুদী সাহেবের জঘন্য হামলা

এই ভদ্রলোক জানিয়া বুঝিয়া অথবা না জানিয়া—চারী শ্রেণীর ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুমদের সব শ্রেণীর উপরই আঘাত হানিয়াছেন, কোন শ্রেণীকেও রেহাই দেন নাই। চারি শ্রেণী (১) নিম্ন (২) মধ্যম (৩) উচ্চ (৪) সর্বোচ্চ। নিম্ন শ্রেণীর হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাঁহার উপরে মধ্য শ্রেণীর হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ), তাঁহার উপরে উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত আশারায়ে-মোবাশ্‌শরা—হযরত তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহাদের উপরে আশারায়ে-মোবাশ্‌শরার মধ্যেও সর্ব উর্দ্ধ শ্রেণীর খোলাফায়ে-রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপরও মৌদুদী সাহেব আঘাত হানিতে লজ্জা করে নাই।

সাধারণতঃ এই অনুপাতে ছাহাবা (রাঃ) দের দর্জ্জা নির্ণয় করা হইয়াছে যে, যিনি যত অধিক কাল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহবতের নেয়ামত হাছেল করিয়াছেন এবং উম্মতের প্রতি ও ইসলামের প্রতি অধিক দরদ হাছেল করিতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক দর্জ্জা পাইয়াছেন।

● ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চায় মৌহুদী সাহেবের ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় অত্যন্ত ব্যথা প্রকাশে মাওলানা শামছুল হক (রঃ) উক্ত সঙ্কলনের ৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

একটু গভীর ভাবে ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এবং পুরা ইতিহাস রিসার্চ করিলে দেখা যায় যে, ছাহাবায়ে-কেরামের উপর দোষারোপের মিথ্যা ও জাল ইতিহাসের গোড়া পত্তন কতগুলি কাট্টা শিয়া, ছাবায়ী, মিথ্যাবাদী রাফেজী, ইত্যাদি ইসলাম ও খেলাফত ধ্বংসকারীদের জাল বর্ণনায় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কারসাজিতে ভরপুর রহিয়াছে। আর ইহাদের পদানুসরণ করিয়াই ইসলামের চিরদুশমন ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির মানস-পুত্র হিট্টি, নিকোলসন ইত্যাদি পাদ্রী ঐতিহাসিকেরা ঐ মিথ্যারই অনুসরণ করিয়াছেন।

মৌহুদী সাহেবও যে ইসলামের শত্রুদের আমদানীকৃত মিথ্যা ইতিহাসের অনুসরণে ছাহাবাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ইতিহাস রচনা করিবেন এই আশা আমাদের কষ্মিণ কালেও ছিল না। আমাদের আশা ছিল যে, তিনি মিথ্যার রদ করিয়া সত্য খাঁটী ইতিহাস সমাজের সামনে পেশ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেন যে তাহাদের স্রোতে ভাসিয়া গেলেন তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের হৃদয়ে ব্যথা পাই।

● ইসলামের শত্রু খারেজী দলের গঠিত ইতিহাসরূপী মিথ্যার পায়রবী করিতে করিতে মৌহুদী সাহেব নিজেও মিথ্যার কিরূপ কারিগর হইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত দানে মাওলানা শামছুল হক (রঃ) একজন ছাহাবী সম্পর্কে মৌহুদী সাহেব কতগুলি মিথ্যা গড়াইয়াছেন—নমুনা স্বরূপ উহার বর্ণনা দিয়াছেন।

খারেজী দলের দ্বারা ছাহাবীগণের মধ্যে সর্ব্বাধিক আঘাত পাইয়া ছিলেন খলীফা ওসমান (রাঃ)। তিনি তাহাদের মিথ্যার ষড়যন্ত্রে শুধু বদনামই হইয়া ছিলেন না, তাহাদের সৃষ্ট বিদ্রোহে প্রাণও হারাইয়া ছিলেন। প্রায় তাঁহার সমপর্য্যায়েই তাহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন মোয়াবিয়া (রাঃ)। তাহারা তাঁহার প্রতিও প্রাণ-নাশক আক্রমণ করিয়াছিল; উহাতে তিনি ভীষণ আহত হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মিথ্যা অপবাদ তাঁহার উপর সর্ব্বাধিক আরোপ করিয়া তাঁহার বদনাম বেশী করিয়াছে। এমনকি একজন উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন ছাহাবী হওয়ার যে সম্মান তাঁহাকে দান করা মোসলমানদের

উপর ওয়াজেব সেই সম্মান দানেও অনেকে উদাসিন। খারেজী দলের ঠিক সেই ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন জনাব মৌহুদী সাহেব। মৌহুদী সাহেব তাঁহার কুখ্যাত প্রবন্ধে এই দুই জনের সমালোচনা ও দোষ-চর্চ্চাই মূল বিষয় রাখিয়াছেন এবং আনুষাঙ্গিকরূপে অন্যান্য অনেক ছাহাবীকে দোষী করিয়াছেন।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি খারেজী দলের ভূমিকায় মৌহুদী সাহেব যে সব মিথ্যা অপবাদ গড়াইয়াছেন মাওলানা শামছুল হক (রঃ) উহার অনেকগুলিরই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নমুনা স্বরূপ কতিপয় দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি দিতেছি। যথা—

● (১) মৌহুদী সাহেবের কেতাব খেলাফত ও মুলুকিয়াতের ১৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে লিখিতেছেন ঃ—

مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رضی نے
کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام
کی خلاف ورزی کی - کتاب وسنت کی رو سے پورے مال غنیمت
کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہئے اور باقی
چار حصہ اسی فوج میں تقسیم کئے جانے چاہئے جو لڑائی میں
شریک ہوئی ہو - لیکن حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت
میں سے چاندی سونا انکے لئے الگ نکال لیا جائے پھر باقی مال
شرعی قاعدہ کے مطابق تقسیم کیا جائے -

অর্থাৎ গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) কোরআন ও সুন্নার প্রকাশ্য হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কোরআন ও সুন্নার হুকুম এই যে, সমস্ত মালে গণীমতের ১/৫ এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করিতে হইবে এবং বাকী ৪/৫ চারি-ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া প্রথমে তাঁহার নিজের জন্য সোনা-চান্দি পৃথক করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট মাল শরীয়তের বিধান অনুসারে ভাগ করার হুকুম দিয়াছেন।"

আমি বলিতেছি—এই কথাগুলি সম্পূর্ণ জাল এবং অসত্য কথা। আমি আরও চ্যালেঞ্জ করিতেছি, শুধু মৌহুদী সাহেব কেন, তাঁহার অন্যান্য সাহায্যকারী বন্ধুরা সম্মিলিতভাবেও কেয়ামত পর্য্যন্ত এই কথার কোন বিশ্বস্ত দলিল পেশ করিতে পারিবেন না। ইহা মৌহুদী সাহেবের ছাহাবার প্রতি বদগোমানী ছাড়া আর কিছুই না। মৌহুদী সাহেবের বদগোমানীর নজির দেখুন ঃ—

তিনি বেদায়া-নেহায়ার হাওয়ালা দিয়া হযরত মোয়াবিয়াকে মিথ্যা দোষারোপ করার অপচেষ্টা করিয়া নিজের ব্যক্তিগত রায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া কোরআন হাদীছের সম্পূর্ণ খেলাফ করিয়াছেন। এবং এই কথার সমর্থনের জন্য মৌদুদী সাহেব বেদায়া-নেহায়ার থেকে বলেন, হযরত মোয়াবিয়া গণীমতের মালের মধ্য হইতে সোনা-চান্দি নিজের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছিলেন। অথচ দুঃখের বিষয় মৌদুদী সাহেবের এই উদ্ধৃতিটি বেদায়া-নেহায়ার কেতাবের ৮ম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় যে স্থান হইতে লইয়াছেন সেই স্থানেই মৌদুদী সাহেবের উদ্ধৃতিটির কেবল পরেই لبيت المال অর্থাৎ "সরকারী ধনাগারের জন্য, জন-সাধারণের সম্পত্তির জন্য" শব্দটি বহাল তবিয়তে রহিয়াছে—যাহার দ্বারা জনাব মৌদুদী সাহেবের বদগোমানীর জন্য পেশকৃত বাক্যটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। অথচ মৌদুদী সাহেব এই لبيت المال শব্দটি অতি সন্তর্পনে হজম করিয়া গিয়াছেন। এখানে বাক্যটির মধ্যে لبيت المال শব্দটির অর্থ যে সরকারী ধনাগার এবং জন-সাধারণের সম্পত্তি একথা তো সকলেরই জানা আছে। কাজেই এই শব্দটির উল্লেখ করিলে মৌদুদী সাহেবের কু-ধারণার সোনা-চান্দির মহলটি যে মাঠে মারা যাইত এবং পবিত্রাত্মা মহাত্মা হুজুরের (দঃ) সাথীদের প্রতি কোন প্রকারই যে বদগোমানী করিয়া ফজিলত হাছেল করা যাইত না; এটা মৌদুদী সাহেব যখন নিজে আরবী ভাষায় জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন তখন হয়ত নিশ্চয়ই ভালভাবে বুঝিয়াছেন।

এই জন্যই আমরা জনাবের সোনা-চান্দির মছআলার মধ্যে لبيت المال (সরকারী ধনাগারের জন্য) শব্দটিকে অনুপস্থিত দেখিতেছি। অথচ অতীব দুঃখের বিষয় যে, মৌদুদী সাহেবকে এই বুদ্ধিটি কে দিল যে, যে কেতাব মৌদুদী সাহেবের নিকট আছে তাহা অন্য কাহারও নিকট থাকিবে না, বা আরবী ভাষায় لبيت المال (লে বায়তিল মাল) শব্দটির যে কি অর্থ তাহা কোন আল্লার বান্দা বুঝিতে পারিবে না। মৌদুদী সাহেবের এই সত্যটি তো অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, এখনও কওমের মধ্যে এমন সহস্র সহস্র আল্লার বান্দা রহিয়াছেন যাহারা পেটের জন্য, ভোগের জন্য, বা পদের জন্য নয়—খালেছ আল্লার জন্যই, আল্লার দ্বীনের হেফাজতের জন্যই যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া আল্লার মনোনীত আরবী ভাষাকে হৃদয়ে গাথিয়া রাখিয়াছেন। এমন দিবালোকে পুকুর চুরির মেছাল আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌদুদী সাহেব মুসলিম সমাজকে উপহার দিবেন এই ধারণা আমাদের কোন দিনই ছিল না।

আমরা যদি প্রকাশ্যভাবে لبيت المال শব্দটি দেখিতে নাও পাইতাম এবং খলীফা নিজের জন্য মাল জমা করার কথা বলিয়াছেন লেখা দেখিতে পাইতাম

তবুও কোন পাগলে এই কথা বিশ্বাস করিত না যে খলীফা ইহা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করিতে রাখিতে বলিয়াছেন। কেননা এই কথা সকলেই জানে যে খলীফ নিজেই বায়তুল মালের রক্ষক, কাজেই নিজের জন্য বলিলেও বায়তুল মালের কথাই বুঝা যাইত। আমরা আশ্চর্যান্বিত না হইয়া পারি না যে একজন মুসলমান জ্ঞানী ভদ্রলোক কি ভাবে একটা বেহুদা কথাকে টানিরা খিঁচিয়া কাট্ ছাট্ করিয়া উদ্দেশ্য মূলক ভাবে একজন আল্লার রসুলের সাথীর উপরে দোষ চাপাইতে অপচেষ্টা করিতে পারেন? এর দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ছাহাবায়ে কেরামদের উপর মৌহুদী সাহেবের ভক্তি ও মহব্বত কত ঠুনকো ও অন্তঃসার-শুন্য এবং তিনি আখেরাতের ব্যাপারে কত উদাসীন এবং ইমানের প্রতি কত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর।

গণীমতের মালের বন্টন ব্যাপারে আমরা হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে এই বলিতে পারি যে, তিনি এই মাল নিজের জন্য কখনও লইতে পারেন না, লনও নাই! এই মাল তিনি বায়তুল-মাল তথা সর্ব্ব-সাধারণের জন্যই জমা করার হুকুম দিয়াছিলেন! কেউ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারে যে, বায়তুল-মালে সমস্ত গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ যাইবে, শুধু সোনা-চান্দির দ্বারা বায়তুল-মালের এক পঞ্চমাংশ কেন পূরণ করা হইবে? যাহা পুর্ব্ববর্তী খলীফারা করেন মাই।

সুধী পাঠকের এই কথা জানা উচিত যে, বায়তুল মালের সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী নহে, আর তাহার মালিকও ব্যক্তি-বিশেষ নহে, এই জন্যই যে বস্তু অধিক স্থায়ী এবং সংরক্ষণে সহজ, নষ্ট হওয়ার কোনই ভয় থাকে না তাহাই বায়তুল-মালে রাখা যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) জমানায় বায়তুল-মালের এক পঞ্চমাংশে এত মাল জমা হইত যে যদি উট, বকরী এবং অন্যান্য অস্থায়ী মাল বায়তুল-মালে দাখিল করা হইত তবে তাহা রাখিতে রাজধানীর একটা বিরাট জায়গা একোয়ার করার প্রয়োজন হইত, অথচ এই অস্থায়ী মাল সংরক্ষণও দুস্কর হইত। তখনকার দিনে জন-সাধরণের আথিক অবস্থা এতই ভাল ছিল যে যাকাৎ নেওয়ার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এই কারনেই হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এজতেহাদ করিয়া এই চমৎকার বিধানের দ্বারা বায়তুল-মালে সোনা-চান্দি জমা রাখিয়াছেন, ইহা সুন্নতের খেলাফ নহে।

কোরআন হাদীছ এবং এজমায়ে ছাহাবার ভিত্তিতে হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল-মাল সম্বন্ধে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে নিয়ম জারী করিয়া গিয়াছেন, হযরত ওসমান, হযরত আলী ও হযরত মোয়াবিয়া তাঁহারা কেহই সেই নিয়মের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেন নাই। অবশ্য দরকার বশতঃ এজতেহাদ করিয়া বাড়াইয়াছেন বটে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) পূর্ববর্তী খলীফাগণের নীতিকে

(সুন্নতকে) আদর্শকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ বলেন, তবে তাহা কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য নহে, যাবত না তাহা ছহীহ্ দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণ করিবেন। কিন্তু মৌদুদী সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ হযরত মোয়াবিয়ার প্রতি তাঁহার ছুয়েজনের (কু-ধারণার) কারণেই দোষারোপ করিয়াছেন। এটা তাঁহার ইসলামের শত্রুদের গোপন শত্রুতামূলক লিটারেচর বা ইতিহাস পড়ার কারণেও হয়তো হইতে পারে। এই জন্যই হয়ত তিনি হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে অন্যায়ভাবে বায়তুল-মালে হস্তক্ষেপ করার মত জঘন্য মন্তব্য করিতে দুঃসাহস করিয়াছেন। এটা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই জন্য বলিতেছি যে, যে কেতাবের হাওয়ালা দিয়া মৌদুদী সাহেব এই অসহনীয় মন্তব্য করিতে দুঃসাহস করিয়াছেন সেই "বেদায়া নেহায়া" কেতাবের ৮ম জেলদের ২৯ পৃষ্ঠায়ই لبيت المال শব্দটি তো পরিষ্কারভাবে আছেই। যাহার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র দোষারোপ করারও সুযোগ থাকে না।

তদুপরি নিম্ন ঘটনাটি পাঠ করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের মৌদুদী সাহেব হামেশা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তাঁহার কু-ধারণার কারণে যে গবেষণায় মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক পবিত্র ছিলেন। ঘটনাটি আল্লামা ইবনে হজর মাকী তাঁহার জগৎ বিখ্যাত কেতাব "তাত্হীরুল জেনান অল-লেছান" এর ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু জন-সাধারণের মধ্যে আম্‌রে বিল মারূফ এবং নেহী আনেল মোনকারের امر بالمعروف نهى عن المنكر (বাক স্বাধীনতার) সৎ সাহস আছে কিনা এইটা পরীক্ষার জন্য দামেস্কের শাহী মসজিদে জুমার খোৎবায় ঘোষণা দিলেন—

انه (معاوية) خطب يوم الجمعة فقال انما المال مالنا والفيئ فيئنا فمن شئنا منعناه فلم يجبه احد ثم خطب يوم الجمعة الثانية فقال ذالك فلم يجبه احد ايضا ففعل فى الثالثة كذالك فقام رجل فقال كلا انما المال مالنا والفيئ فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه الى الله تعالى باسيافنا فرضى فى خطبته ثم لما وصل منزله ارسل للرجل فقالوا هلك ثم دخلوا فوجدوه جالسا معه على سريره فقال لهم ان هذا احيانى احياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من بعدى امراء يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة وانى تكلمت اول جمعة

فلم يرد على احد فخشيت ان اكون منهم ثم فى الجمعة الثانية
فلم يرد على احد فقلت انى منهم ثم تكلمت فى الجمعة الثالثة
فقام هذا الرجل فرد على فاحيانى احياه الله تعالى -
تطهير الجنان واللسان صف ٢٧

অর্থাৎ—একদা জুময়ার খোৎবায় মেম্বরের উপর বসিয়া সমস্ত জন-সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ঘোষণা দিলেন—"রাষ্ট্রের বায়তুল-মালের সমস্ত সম্পত্তি আমার। আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব না; ইহাতে টু শব্দটি করিবার কাহারও অধিকার নাই। এইরূপ বলায় কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর দ্বিতীয় জুময়ায় আবার উপরোক্ত ঘোষণা দিলেন, কিন্তু তখনও কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। পুনরায় তৃতীয় জুময়ায় আবার একই ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিলেন; তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেলেন এবং খলীফার কথার প্রতিবাদ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, সাবধান! রাষ্ট্রের বায়তুল-মালের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের জন-সাধারণের, ইহাতে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার আপনার কোনই অধিকার নাই। ইহার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে আমরা আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান মতে তলোয়ারের দ্বারাই তাহার মিমাংসা করিব। হযরত মোয়াবিয়া খোৎবা শেষ করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং ঐ লোকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল "এই লোকের আজ আর রক্ষা নাই"। অতঃপর লোকেরা কৌতুহলী হইয়া খলীফার গৃহে গমন করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে সেই লোকটি খলীফার সহিত একই আসনে বসিয়া আছেন। তখন হযরত মোয়াবিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি আমাকে বাঁচাইয়াছে; আল্লাহ তায়ালা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখুন। কেননা, আমি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমার পরে এমন একদল শাসনকর্তা হইবে যাদের অন্যায় কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস পাইবে না, তাহারা এমনভাবে দোজখে প্রবিষ্ট হইবে যেমন করিয়া বানরের দল একের পিছে এক একদিকে ধাবিত হয়। (ইহা পরীক্ষার জন্য) আমি প্রথম জুময়ায় একটি ঘোষণা দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই উহার প্রতিবাদ করে নাই; উহাতে আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে হয়ত আমি এই দলভুক্ত হইয়া পড়ি নাকি? অতঃপর দ্বিতীয় জুময়ায় আবার একই ঘোষণা দিলাম, তখনও কেহই উহার প্রতিবাদ করিল না; তখন আমি মনে করিলাম—হায়! নিশ্চয়ই আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর তৃতীয় জুময়ায় আমি আবার সেই ঘোষণা দিলাম, তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধাচণ করিয়া আমার কথার কঠোর প্রতিবাদ

করিয়া আমাকে রক্ষা করিল, বাঁচাইল। সুতরাং আমি আল্লার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, হযরত মোয়াবিয়া এই ঘোষণাটি এই জন্য দিয়াছিলেন না যে, তিনি বায়তুল-মালের একচ্ছত্র মালিক হইবেন বা কোরআন হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বায়তুল-মালের উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া জন সাধারণের সম্পত্তি হইতে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিবেন। বরং লোকের মধ্যে জামানার পরিবর্তনের কারণে হুজুরের আসল সুন্নত আম্‌রে-বিল-মারূফ-নাহী আনেল-মোন্‌কারের অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের এবং অন্যায়কে অপসারণ করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করিয়া ন্যায়ের পথে অটল অচল থাকিবার পূর্ণ প্রেরণা ও সৎসাহস আছে কি না; যাহার সহায়তায় দেশের শাসনকর্তাদেরও ন্যায়ের পথে থাকা অতি সহজসাধ্য হয় এবং ন্যায়ের উপর থাকিতে বাধ্য হয়—এই গুণটা পরীক্ষা করার জন্যই এই ঘোষণাটি দিয়াছিলেন। এ'কথার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার সত্যতা, ন্যায় নিষ্ঠতা, নির্লোভতা নিঃস্বার্থতা এবং শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সাথে ইহাও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল যে, হযরত মোয়াবিয়ার প্রতি আমাদের আহলে সুন্নত অল-জামায়াতের নেক ধারণা অবাস্তব নয় মোটেই, বরং অধিকতর মজবুত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব সত্য। আর জনাব মৌদুদী সাহেবের বর্ণনা সম্পূর্ণ কুধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উদ্ধৃতিটি একেবারেই অসম্পূর্ণ। আমরা যেহেতু কাহারও মনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকগণ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ইহা একেবারেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—মৌদুদী সাহেবের ইতিহাসজ্ঞানও কত অপক্ক—শত্রুদের থেকে ধার করা ও মনগড়া! এবং ছাহাবায়ে কেরামদের প্রতি তাঁহার আকিদা কত মারাত্মক এবং ধারণা কত খারাপ! সমাজে যখন এই আকিদা ছড়াইবে তখন কি বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াই না সৃষ্টি হইবে। ব্যাপারটা যেহেতু আখেরাতের ব্যাপার, ধর্মের এবং ঈমানের ব্যাপার এই জন্যই আমরা জন-সাধারণকে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া নিজেদের ধর্ম ঈমান এবং আখেরাতের হেফাজত করিতে বলিতেছি এবং মৌদুদী সাহেবের বাক-পটুতায় এবং ভাষা-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম ঈমান এবং পরকাল বরবাদ না করিতে সাবধান করিতেছি।

● (২) মৌদুদী সাহেবের খেলাফত ও মুলুকিয়াত কেতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে শত্রুদের শিখান কথা গাহিয়া বলিতেছেন—

ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ
شروع ہوئی کہ وہ خود اور انکے حکم سے انکے تمام گورنر خطبوں

میں بر سر منبر حضرت علی (رض) پر سب و شتم کی بوچھار کرتے تھے
حتی کہ مسجد نبوی میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی -

"অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) জমানায় আর একটি ঘৃনিত জঘন্য বেদয়াত এই শুরু হইয়াছিল যে, মেম্বরের উপর বসিয়া তিনি নিজে এবং তাঁহার গভর্ণরগণ হযরত আলীর উপর নিন্দা কুৎসার বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন। এমন কি মসজিদে নববীর মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লার (দঃ) মেম্বরের উপর বসিয়া ঠিক রওজা শরীফের সামনে হুজুরের পরমপ্রিয় পাত্রকে গালি দেওয়া হইত।"

আমরা মৌদুদী সাহেবকে মনে করিয়াছিলাম যে, তিনি একজন দক্ষ ইতিহাস-বেত্তা; বিশেষ করিয়া ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান রাখেন। কিন্তু তিনি যে ছাহাবায়ে-কেরামগণের সম্পর্কে এমন ভুল জাল এবং সাজান গোছান মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বর্ণনা সমাজের সামনে পেশ করিয়া আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার অপপ্রয়াস পাইবেন ইহা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। তিনি একটা জামাতের আমীর বা পরিচালক; বহু লোকে তাঁহার তত্ত্ব ও তথ্যের হাওয়ালা দিয়া কথা বলিতে পারে, কাজেই তাঁহার কথার দ্বারা সমাজের যত অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে তদ্রূপ তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি ভুল হইলে, প্রবঞ্চনাপূর্ণ হইলে উহার দ্বারাও সমাজ তত অধিক বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হইয়া গোমরাহীতে পতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই দিকে মৌদুদী সাহেব বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া দুইজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া—আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইহিয়ার এবং হেসাম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ছায়েবে কালবির বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া একজন পবিত্রাত্মা মহাত্মা বিচক্ষণ ছাহাবীর উপর এমন জঘন্যতম হামলা ও দুঃসাহসিক আঘাৎ করিবার অপঃপ্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ তিনি 'তারিখে তাবারীর' হাওয়ালা দিয়াছেন, সেই তারিখে তাবারীর লেখক মুহাম্মদ ইবনে জরীর (محمد ابن جرير) পরিষ্কার ভাবে উহা উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কিভাবে একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া একজন বিচক্ষণ ছাহাবীর উপর মিছা-মিছি হামলা চালাইয়াছে। ইমাম ইবনে জরীর শুধু এতটুকুই দেখাইতে চাহিয়াছে যে, শত্রুরা ইসলামের মুখোষ পরিয়া ইসলামের উপর, ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ছাহাবায়ে-কেরামদের উপর কি ভাবে অতি সন্তর্পনে আঘাৎ হানিবার অপচেষ্টা করিয়া থাকে। তিনি নিজে কোন মন্তব্যই করেন নাই, শিয়া মিথ্যা বাদীরা কি ভাবে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা

করিয়া কি ভাবে ছাহাবায়ে-কেরামের বদনাম করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখাইয়া দিয়া আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিয়াছেন মাত্র ; যাহাতে আমরা এই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের বেড়াজালে আটকা না পড়ি।

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قاريه او يستشنعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا وانما اتي من قبل بعض ناقليه الينا وانا انما ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا - مقدمة تاريخ الطبري ص—٨ *

অথচ মৌদুদী সাহেব যাচাই বাছাই করে কেবলমাত্র দুই একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়ার রেওয়ায়েতকেই (বর্ণনাকেই) তিনি কিভাবে পছন্দ করিয়া লইলেন এবং অন্য সমস্ত ছহীহ্ রেওয়ায়েত (বর্ণনা) বাদ দিয়া এই মিথ্যার সহিত নিজের দায়িত্বে আপন কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া হুজুরের মহৎপ্রাণ ছাহাবীর উপর কলঙ্ক লেপনের দুঃসাহস করিলেন—এটা তিনিই ভাল ভাবে জানেন। তিনি যদি এটা না জানিয়া এবং না বুঝিয়া আপন কল্পনার ঘোড়া ছুটাইয়া থাকেন তবে এটা হইবে তাঁহার ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী পবিত্র সমাজ সম্পর্কে চরম অনভিজ্ঞতা এবং চরম দীনতারই পরিচয় মাত্র। আর যদি তিনি জানিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এইরূপ মারাত্মক পদক্ষেপ করিবার সাহস পাইয়া থাকেন তবে এটা হইবে তাঁহার ইসলাম এবং মোসলেম সমাজের সহিত চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চণারই পরিচয় মাত্র। মোসলেম সমাজ তাঁহাকে ইসলামের ও মোসলমানদের হিতৈষী গণ্য করার পরিবর্তে ইসলমের মূলচ্ছেদকারী গোপন শত্রুদের গোপন হাতিয়ারের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া ধারণা করা ছাড়া অন্য কোন পথ পাইবে না। এ কথা সকলেরই জানা উচিৎ যে ইসলামের ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মূল ভিত্তি প্রত্নতত্ত্ববিদদের আনুমানিক ধারণা বা বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তির ভিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়।

---

* মৌদুদী সাহবের রেফারেন্স "তারীখে-তাবারী" সঙ্কলক উহার ভূমিকায় সতর্কবাণী রাখিয়া গিয়াছেন যে—"আমার গ্রন্থে এমন বর্ণনাও থাকিবে যাহাকে পাঠক ঘৃণা করিবে, শ্রোতা উহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইবে। উহার সত্যতার কোনই সূত্র নাই, উহার বাস্তব কোন অর্থও নাই। ঐরূপ ক্ষেত্রের জন্য স্মরণ রাখিবে যে, উহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কোন বর্ণনাকারের বর্ণনার শুধু সংগ্রহরূপে আমরা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি।

(ভূমিকা—তারীখে তাবাবী ৮ পৃঃ)

ইসলামের ইতিহাস বা অন্য যে কোন ইতিহাসই হউক না কেন ইহার সত্যতা মাপের ও যাচাইয়ের একমাত্র মূল-কাঠি, বুনিয়াদ ও ভিত্তি কোরআন ও হাদীছ। এই ভিত্তির মাপ-কাঠিতে যে ইতিহাস বা দর্শনকে আমরা সঠিক পাইব তাহাকেই আমরা সত্য এবং খাঁটী বলিয়া গ্রহণ করিব, অম্লান বদনে মানিয়া লইব। অন্যথায় যে ইতিহাস এবং যে দর্শনকে আমরা এই মূল-নীতির বিরুদ্ধে পাইব তাহাকেই জাল, মিথ্যা এবং ধোকা বলিয়া নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইব, ইহাই আমাদের সত্য-মিথ্যা বাছাইয়ের মূল তুলাদণ্ড। কিন্তু পরিতাপের বিষয়--জানি না, মৌদূদী সাহেব কি ভাবে একজন পবিত্রাত্মা মহাত্মা ছাহাবী সম্পর্কে এমন সব জাল বর্ণনা ও মিথ্যা মন্তব্যের আশ্রয় নিলেন যাহা দলিল প্রমানাদি ত দূরের কথা স্বাধারণ জ্ঞানেও নর্দ্দমায় নিক্ষেপের উপযুক্ত। মৌদূদী সাহেবের এতটুকু চিন্তা করিবারও অবকাশ হইল না বা সুযোগ পাইলেন না যে, যে ছাহাবী হইতে একশত ত্রিশখানা ছহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে—যাহার উপর আমাদের দ্বীন ও ঈমান নির্ভরশীল, সেই মহাত্মা সম্পর্কে এমন ঘৃনিত মিথ্যাবাদী শিয়ার মন্তব্য কি ভাবে দলিল হিসাবে পেশ করা যায় যাহা একজন ইসলামের শত্রুর দ্বারাও সম্ভব বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি না। এবং সেই সঙ্গে নিজের কু-ধারণা প্রসূত খেয়ালী মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া সমাজের সামনে জগতের দরবারে হযরত মোয়াবিয়াকে হেয় দোষীরূপে চিত্রিত করিবার অপচেষ্টা করিতে মৌদূদী সাহেবের লজ্জা করা উচিৎ ছিল।

যে মিথ্যাবাদীর উপর নির্ভর করিয়া মৌদূদী সাহেব এতবড় জলিলুল-কদর ছাহাবী সম্পর্কে এমন জঘন্য মন্তব্য করিতে সাহস পাইয়াছেন সেই হাদীছ জালকারী মিথ্যাবাদী রাবী, ধোকাবাজ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত সর্বজনমান্য ইমামগণ কি মন্তব্য করিয়াছেন নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল : "আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহ্ইয়া" এবং তাহার শিষ্য "হেশাম কলবী" সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁহার বিখ্যাত কেতাব মেনহাজুস্-সুন্নার তৃতীয় জেলদের ১৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :

اكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها
الكذابون المعروفون بالكذب مثل ابى مخنف لوط بن يحى
ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبى وامثالهما من الكذابين
وهو من اكذب الناس هو شيعى يروى عن ابيه وابى مخنف
وكلاهما متروك كذاب وقال ابن عدى ابوه ايضا كذاب وقال
الزائدة والليث وسليمان التيمى هو كذاب وقال يحيى ليس

بشئ كذاب ساقط وقال ابن حبان وضوح الكذب فيه اظهر من ان يحتاج الى الاغراق فى وصفه - منهاج السنة ص — ١٩ *

এতদ্ভিন্ন আল্লামা জালালুদ্দীন ছুয়ূতী উক্ত রাবী—বর্ণনাকারদ্বয়কে অতি বড় মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ("আল-লাআলীল-মছনূআ" ১—৩৮৯)

আল্লামা শামছুদ্দীন—ইবনে-খাল্লাকান বলিয়াছেন, "হেশাম কলবী" আবদুল্লাহ ইবনে ছাবার দলের লোক ছিল। (ওফিয়্যাতুল-আ'ইয়ান, ৩—৪৩৭)

আল্লামা জাহাবী (রঃ)ও তাহাকে আবদুল্লাহ ইবনে ছাবার দলের বলিয়াছেন।
(মীযানুল-এতেদাল ২—৮২)

● (৩) মৌহুদী সাহেব তাহার খেলাফত ও মুলুকিয়াত কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়ার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া লিখিতেছেন :

حضرت معاویہ (رض) نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کرے جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دیں کہ حضرت علی (رض) ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں چنانچہ وہ صاحب پانچ گواہ تیار کرکے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان (رض) کو قتل کیا ہے -

তরজমা : হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করিলেন যে, তিনি যেন কিছু সংখ্যক মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিয়া তাহাদের দ্বারা শামবাসীদের সামনে এই সাক্ষ্য দেওয়াইয়া দেন যে, হযরত আলী (রাঃ)ই হযরত ওসমান (রাঃ) কে হত্যা করিয়াছেন। সেই সূত্রে সেই লোকটি পাঁচজন

---

* ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলিতেছেন—"(মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে) বেশীর ভাগ দোষ-বর্ণনাই এই শ্রেণীর—যাহাকে মিথ্যাবাদীগণ ও মিথ্যা বর্ণনায় খ্যাত ব্যক্তিগণ বর্ণনা করিয়া থাকে। যথা—আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া, আর হেশাম ইবনে মোহাম্মদ কল্‌বী এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্য মিথ্যাবাদীগণ।

এই "হেশাম" মানুষের মধ্যে অদ্বিতীয় মিথ্যাবাদী, শিয়া। সে তাহার পিতা হইতে এবং আবু মেখনাফ হইতে নানা বিবরণ বর্ণনা করে। ঐ দুইজন উভয়ই মিথ্যুক সর্ব্ব-বর্জ্জণীয়।

(বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ) ইবনু আদী বলিয়াছেন, হেশাম মিথ্যাবাদী এবং হেশামের পিতাও মিথ্যাবাদী। (বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ) ইয়াহইয়া বলিয়াছেন, হেশাম মানুষই নয়, মিথ্যাবাদী, সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জণীয়।

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ ইবনে-হেব্বান বলিয়াছেন, হেশামের মধ্যে মিথ্যা এরূপ প্রকট যে, উহার বিবরণ দানের প্রয়োজন নাই।

মিথ্যা সাক্ষী বানাইয়া আনিল, তাহারা সর্ব্ব সমক্ষে এই সাক্ষ্য দিল যে, হযরত আলীই হযরত ওসমান (রাঃ)কে কতল করিয়াছেন"।

পাঠক। লক্ষ্য করুন, হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) উপর মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইতে গিয়া মৌদুদী সাহেব নিজের আসল রূপটিকেই সমাজের সামনে একেবারেই জাহের করিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা, এই জাতীয় নোংড়া মিথ্যা-বেসাতির ভাণ্ডার খুজিতে গিয়াই তিনি দুনিয়ার যত আস্তাবল আস্তাকুড় ড্রেন আর নর্দ্দমার গলিত ঘৃণিত পুতিগন্ধময় ময়লার স্তুপ জমা করিবার চিন্তায় লাগিয়া গিয়াছেন। কারণ লক্ষ কোটি গুণের মধ্যেও মিথ্যা-মিথ্যি দোষের গন্ধ অনুসন্ধান করার দক্ষতা ও পারদর্শীতা অর্জন করিতে যে ভাইয়েরা অভ্যস্ত তাদের জন্য গুনকে দোষ দেখা বা তাবিল-তুবিল করিয়া গুণের মধ্যে দোষের রূপ বাহির করাটা কিছুমাত্র মুশকিল না হইলেও কোন সত্যান্বেষী সুধী ব্যক্তির জন্য ইহা শোভনীয় নয় মোটেই।

মৌদুদী সাহেবকে যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, তিনি এই আজগুবী তোহমতের পিছনেই লাগিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সহযোগীতায় আহ্‌লে হকদের কেহই অগ্রসর না হইলেও শিয়া, ছাবায়ী, রাফেজী, খারেজী এবং অরিয়েণ্টালিষ্ট পার্টির সহযোগীরা হয়ত সর্বপ্রকারের সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত করিয়াই তাঁহার সাহায্যে সহানুভবতার পরিচয় দিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৌদুদী সাহেবের এই আজগুবী চাঞ্চল্যকর কথাটির মূল উদ্যোক্তা কারা? কোথা থেকে কিভাবে তিনি এই ঈমানধ্বংসী তোহতমটির সন্ধান লাভ কারলেন? এবং কোন বলে তিনি এটা সমাজের সামনে উপহার দেওয়ার দুঃসাহস করিলেন? এবং কোন ধরণের মনোবৃত্তির কারণে এই সব সামগ্রীপ্রাপ্তি তাহার জন্য সহজসাধ্য হইয়াছে? কোন্ সব বন্ধুরা তাঁহার এই কাজে সহায়ক হইয়াছেন? এই রহস্যের দার উদঘাটন করিতে আমাদের বিপুল অর্থ-কষ্ট, যথেষ্ট মানসিক-শ্রম ও শারিরীক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। মৌদুদী সাহেবের (রেফারেন্স) হাওয়ালাকৃত "এস্তিয়াব" ইত্যাদি কেতাবের হাজার হাজার পৃষ্ঠার লক্ষ লক্ষ লাইনের মধ্যে মৌদুদী সাহেবের মতের সমর্থনের বর্ণনাগুলির সন্ধান যেখানেই আমরা করিয়াছি সেইখানেই সর্ব্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ইহা ইসলামদ্রোহী ঈমান ধ্বংসকারী মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ কাট্টা শিয়া রাফেজী খারেজী ও আবদুল্লাহ বিন ছাবার গোষ্ঠীতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ দেখিয়াছি। সেখানে কোন সত্যান্বেণকারীর নাম-গন্ধও পাওয়া যায় নাই। মৌদুদী সাহেবের প্রধান মুরব্বী পাঁচজন মিথ্যাসাক্ষী সম্পর্কীয় বর্ণনার উদ্যোক্তা "নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী" যে, একজন প্রথম নম্বরের কাট্টা শিয়া রাফেজী দলভুক্ত কাট্টা মিথ্যাবাদী—এ কথাটি বিশ্বের দরবারে বিশেষ করে কোরআনি সাহিত্যে ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতমও জ্ঞান যাহারা রাখেন

তাঁহাদের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট উজ্জল। মোসলেম বিশ্বের সকল যুগের সকল কালের সকল শ্রেণীর সকল সুধীবৃন্দই এই কথা জানেন যে, নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজী দলভুক্ত। ইসলামের এবং মোসলমানদের তথা আহলে-সুন্নত-অল-জামায়াতের মূল মেরুদণ্ড ছাহাবায়ে-কেরামদের বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিই ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির ভক্তদের মত ছাহাবাদের খুটিনাটি মিথ্যাদোষ রচনায় এবং দোষ রটনায় লিপ্ত ছিল এবং সাধারণ লোক এমনকি শিয়া রাফেজী খারেজী মিথ্যাবাদীরাও জানে যে, নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের মধ্যে সকলের ওস্তাদ মিথ্যাবাদী।

وفى ميزان الاعتدال للعلامة الذهبى ج ٤ ص ٢٥٣ نصر بن المزاحم الكوفى رافضى جلد تركوه قال العقيلى شيعى فى حديثه اضطراب وخطاء كثير وقال ابو خيثمة كان نصر بن مزاحم كذابا وقال ابو حاتم واهى الحديث متروك -

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, মৌদুদী সাহেবের দ্বারা আমরা সত্য খাটি ইতিহাস লেখার আশা করিয়াছিলাম এবং এই জন্যই আমরা তাঁহার অনেক কথা ও কাজের সমর্থনও করিয়া আসিতে ছিলাম। এই আশায় যে হয়ত তাঁহার দ্বারা গায়ের-ইসলামীদের মোকাবেলায় ইসলামের অনেক খেদমত হইবে। কিন্তু তিনি যে এমন ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসী কাজ—যে কাজে নিদারুন প্রাণঘাতি শত্রুরাও কম সাহস পাইয়াছে সেই কাজে অগ্রসর হইবেন এটা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তিনি তাঁহার কাজে, ভাষায় যাহা প্রমান দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে এটা ইসলামের পরম শত্রু ছাবায়ী পার্টিরই একমাত্র কাজ, অথবা সেই পার্টিরই সংগৃহিত বিষ-বৃক্ষের তত্বাবধানকারী রাফেজী খারেজী ও মোস্তাশ্রেকীন ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির বা তাদের শাগরেদদেরই গা-ঢাকা রূপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যথায় তিনি যে "استيعاب—এস্তিয়াব" কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন সেখানে এস্তিয়াবের লেখক قيل শব্দের দ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে এই কথার জাল সাক্ষীর আমি মোটেই সমর্থক নই। অধিকন্তু তিনি এই জাল সাক্ষীর কথার উল্লেখ করিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এইরূপ কথা ইসলামের শত্রুরা ছাড়া অপর কেহই বলিতে পারে না। কাজেই এই শত্রুর কথা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার এবং ইহা হইতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তিনি তাঁহার কেতাবের ভূমিকায় এই কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি সত্য-মিথ্যা যাচাই ব্যতিরেকে সব রকমের বর্ণনাই নকল করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে কোন কথা অকাট্য সত্যের বিরুদ্ধে হইলে উহা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত

করিতে হইবে এবং ঐ মিথ্যা বর্ণনাকারীর বর্ণনার জন্য ঐ মিথ্যাবাদীই দায়ী হইবে, আমি দায়ী হইব না। কেননা আমি সত্য-মিথ্যার যাচাই বাছাই করি নাই। কোন মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বর্ণনা তাহার গান্দা আকিদারই জলন্ত সাক্ষ্য বহন করে—ইহাও সত্য পন্থীদের জানা দরকার ; কাজেই আমি সত্য-মিথ্যা সকল বর্ণনাই জমা করিয়া দিলাম।

আমাদের দুঃখ এই জন্যই যে, যে কথা মিথ্যাবাদী নছর ইবনে মুজাহেম মেনকারীর বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে এবং যাহা সর্ববাদী সম্মতরূপে মিথ্যায় ভরপুর এইরূপ কথাকে একজন কওমের খেদমতের দাবীদার কিভাবে দলিল হিসাবে পেশ করিতে পারেন ? বিশেষ করিয়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ) পবিত্রাত্মা মহাত্মা ছাহাবীর (রাঃ) উপর তোহমত বা মিথ্যা দোষারোপ করিতে গিয়া মৌদুদী সাহেবের মত একজন লোক যাহার ইতিহাস-জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভাল ধারণা ছিল তিনি এমন মিথ্যাবাদী ছাবায়ীর কথাকে দলিল হিসাবে সমাজের সামনে পেশ করিয়া হাসির খোরাকী জোগাড় দিবেন একথা আমাদের কল্পনা করিতেও লজ্জা এবং দুঃখ বোধ হইতেছে।

ইসলামের সত্য ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা সকলেই জানেন যে, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হযরত আলীর প্রতি হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার কোন অভিযোগ আনায়নের চেষ্টা কোন দিনই করেন নাই। বরং সর্বদাই তিনি হযরত আলীর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিজের চেয়ে হযরত আলীকেই খলীফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং হযরত আলী (রাঃ) জীবিত থাকা কালীন কোন দিনই বিভিন্ন লোকের হাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও নিজেকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। বহু সংখ্যক ছহীহ্ রেওয়ায়েতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ বেদায়া-নেহায়া কেতাবের ৭ম জেলদের ২৫৭—৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে ; বরং মোয়াবিয়া (রাঃ) নিজেই ঘোষণা দিতেছেন। ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به -

অর্থাৎ "আমি হযরত আলীর প্রতি হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কোনই দোষ দেই না।" হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আরো স্পষ্ট ঘোষণা দেন যে—

فليقدنا من قتلة عثمان فانا اول من بايعه من اهل الشام البداية ٧٥

হযরত আলী-রাজিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদিগকে—ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী নেজাম ধ্বংসকারীদিগকে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলে "আমি মোয়াবিয়া সর্ব্ব প্রথমে হযরত আলীর নিকট বায়য়াত (তাঁহাকে খলীফা স্বীকার করার দীক্ষা গ্রহণ) করিব।"

● (৪) মৌদুদী সাহেব হযরত মোয়াবিয়ার উপর দোষারোপ করিয়া খেলাফৎ ও মুলুকিয়াত কেতাবের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে—

حضرت معاویۃ اپنے گورنروںکو قانون سے بالاتر قرار دیا اور انکی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے انکار کردیا۔

অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়া তাঁহার গভর্ণরদিগকে আইনের উর্দ্ধে স্থান দিতেন এবং শরীয়ত মোতাবেক তাঁহাদের জুলুম অত্যাচারের বিচার করিতে অস্বীকার করিতেন।

কথা কয়টি মৌদুদী সাহেবের কু-ধারণা প্রসূত অজ্ঞতারই পরিচয়। কেননা তিনি তোহমত লাগাইবার জন্য যে উদ্ধৃতিটি পেশ করিয়াছেন উহার মধ্যেই তাঁহার নিজের ভুলের উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইত যদি তিনি এবারতটি সম্পুর্ণ নকল করিতেন। তিনি এবারতটি পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে পাঠক ইহার মধ্যে হযরত মোয়াবিয়ার গুণপনারই পূর্ণ পরিচয় পাইতেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) শরীয়তে-মোকাদ্দাসার উপর কেমন অটল অচল ছিলেন এবং তাঁহার গভর্ণরগণ সামান্য অপরাধ করিলেও তিনি তাহা-দিগকে শরীয়ত অনুযায়ী কেমন কঠোর শাস্তি দিতেন—উদ্ধৃতিটি তাহাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জনাব মৌদুদী সাহেবের মিথ্যা দোষারোপ প্রমাণ করিবার একটি কথাও ঐ এবারতে নাই। মৌদুদী সাহেবের দেওয়া এবারতটির সম্পুর্ণ বিবরণ এই :—

একদা বছরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে গায়লান বছরার শাহী মসজিদে ভাষণ দিতেছিলেন। এক ব্যক্তি বাগাওতী করিয়া মসজিদে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া গভর্ণরের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। ইহা পরিষ্কার রাষ্ট্রদ্রোহীতা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? গভর্ণর ইহাকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহীতা মনে করিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাইয়া হাত কাটাইয়া দেন। এই ঘটনার পর উক্ত লোকটির বংশের লোকগণ ভাবিল, খলীফার গভর্ণরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় মসজিদের মধ্যে আমাদের লোক এতবড় বিদ্রোহের কাজ করিয়াছে ; এই কথা খলীফার কর্ণগোচর হইলে আমাদের প্রতিও খলীফার সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সকলে গভর্ণরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সুপারিশ করিল যে, জনাব আপনি আমাদিগকে মেহেরবানী করিয়া এই কথাটা লিখিয়া দেন যে, বিদ্রোহীকে আপনি বিদ্রোহের কারণে হাত কাটেন নাই। বরং কেবল মাত্র সন্দেহের কারণে কাটিয়াছেন—যে, হয়ত বিদ্রোহ করিতে পারে ; তাহা হইলে আমরা খলীফার এই সন্দেহ হইতে বাঁচিয়া যাইব বলিয়া আশা রাখি। গভর্ণর দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে এই কথাটি লিখিয়া দিলেন। অতঃপর ঐ সমস্ত লোক চক্রান্ত করিয়া ঐ লেখাটি লইয়া হযরত মোয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া গভর্ণরের প্রতি হদ জারীর জন্য আবেদন জানাইল। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাদের এই চক্রান্তের খবর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। তিনি ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য মনে করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীয়তের কানুন অনুসারে বিচারকের ভুলের কারণে বিচারককে দণ্ডিত

করা যায় না। এই জন্যই হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) গভর্ণরের উপর শরীয়তের বিধান মতে হদ-কেছাছ তো জারী করিতে পারিলেন না। কিন্তু যেহেতু গভর্ণর বিচারে ভুল করিয়াছে, এই ভুলের জন্য গভর্ণরকে সাথে সাথে বরখাস্ত করিয়া বছরার জন্য নূতন গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া ঐ ব্যক্তির হাত কাটার বদলে তাহাকে দিয়ত দিয়া দিলেন।

অথচ মৌদুদী সাহেব নিজের উদ্ধৃতির মধ্যে এই গভর্ণরের বরখাস্তের কথাটি— وعزل عبد الله بن غيلان একেবারেই বাদ দিয়া দিয়াছেন, যাহাতে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) গভর্ণরদিগকে আইনের উর্দ্ধে স্থান দিতেন এই মিথ্যা কথাটি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু আফছোছ! মৌদুদী সাহেবের এই কথাটি অবশ্যই জানা উচিৎ ছিল যে, ইতিহাসের কেতাবগুলির এবারতগুলি শুধু জনাব মৌদুদী সাহেবের মতলব হাছেলের জন্যই লেখা হয় নাই। মৌদুদী সাহেব কি ইহাই মনে করেন যে, নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য ছাট-কাট করিয়া তিনি যে এবারতটুকুর উদ্ধৃতি দিবেন তাহা ছাড়া বাকী সমস্ত এবারত তাঁহারই খাতিরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে বা কোন একজন লোকও ঐ কেতাবগুলির আরবী এবারত বুঝিতে সক্ষম হইবে না। কারণ, উক্ত কেতাবের এবারত অন্য লোকে বুঝিলে তো গভর্ণরের বরখাস্তের কথা বাহির হইয়া পড়িবেই এবং হযরত মোয়াবিয়া যে গভর্ণরদের বিচার করিতে গিয়া বিন্দুমাত্র খাতির করিতেন না তাহাও প্রমাণিত হইবে। কাজেই উক্ত কেতাবগুলির এবারত যতটুকু মৌদুদী সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন ততটুকুই রাখিতে হইবে কিম্বা অবশিষ্টটুকু আমাদের একেবারেই হয়ত দেখা চলিবে না বা ভুলিয়া যাইতে হইবে। কেননা, তাহা না হইলে আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌদুদী সাহেবের ছাহাবাদের প্রতি বদগোমানি যে কিছুতেই প্রমাণিত হইবে না।

মৌদুদী সাহেবের কেতাবের এবারতের উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করার এবং ছাট-কাট করিয়া সত্যকে গোপন করার অভ্যাস নূতন নয় এবং তিনি যে কথার মাঝখানে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করিয়া মতলব হাছেল করিতে ওস্তাদ তাহাও অনেকেই অবগত আছেন।

তিনি যে এই বিষয় ওস্তাদ একথা আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু এই ওস্তাদী যে তিনি আল্লার নবীর একজন শাগেরদ কাতেবে-ওহী—হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের বিশ বৎসরের বিশ্বস্ত গভর্ণর এবং প্রায় অর্দ্ধ বিশ্বের সমস্ত মানুষের বিশ বৎসরের প্রাণ প্রিয় খলীফা মোয়াবিয়ার (রাঃ) উপর মিথ্যামিথ্যি চালাইবেন তাহা কোন মোসলমান আশা করে নাই। অথচ মৌদুদী সাহেব ইসলামের খেদমতের নাম নিয়া এহেন জঘন্য কাজে হাত দিয়াছেন। অধিকন্তু সমস্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের প্রমাণ-লব্ধ বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অবিশ্বস্ত মিথ্যাবাদী শিয়া, রাফেজীদের উদ্ধৃতির দ্বারা ঐ সমস্ত মহাত্মাদের উপর আঘাত হানিয়া বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।

(৫) খেলাফত ও মুলুকিয়াত কেতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :—

اس دور کی تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیریہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ازادی سلب کرلیگئی......

অর্থাৎ "এই জমানার (তথা হযরত মোয়াবিয়ার শাসন আমলের) পরিবর্তনের মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন এই ছিল যে হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বারা মোসলমানদের থেকে আম্‌রে-বিল-মা'রূফ, নাহী-আনেল-মোনকার করার অর্থাৎ হক কথা বলার বাক স্বাধীনতা ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়া মোসলমানদের হক কথা বলার স্বাধীনতাকে হরণ করিয়া লইয়া ছিলেন।" মৌদূদী সাহেবের এই দাবীটির কোনই ভিত্তি নাই। কেবলমাত্র আপন সন্দেহযুক্ত কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি এত বড় কু-উক্তি করিতে সাহস করিয়াছেন। তাঁহার এই কু-ধারণার স্বপক্ষে তিনি কোনই বিশ্বস্ত দলিল পেশ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) যে, আম্‌রে-বিল-মা'রূফ, নাহী-আনেল-মোন্‌কারের নীতি জেন্দা রাখাকে বড় ফরজ মনে করিতেন এবং মনে প্রাণে ভাল বাসিতেন ইহার প্রমাণ হযরত মোয়াবিয়ার জীবনে ভুরি ভুরি রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নমূনাস্বরূপ পাঠকদের খেদমতে আমরা মাত্র একটি ঘটনা পেশ করিতেছি। ইহা পাঠ করিলেই সুধীপাঠক জানিতে পারিবেন যে, মোয়াবিয়া (রাঃ) সৎ-কাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করাকে কত বড় উচ্চ মর্য্যাদার ফরজ মনে করিতেন। ঘটনাটি বিখ্যাত মোহাদ্দেস ইবনে হাজর হায়ছমি মাক্কী তাঁহার মশহুর تطهير الجنان واللسان কেতাবের ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (যাহা পূর্ব্বেও এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে):

وانه (معاويه) خطب يوم الجمعة وقال انما المال مالنا والفئى فيئنا فمن شئنا منعناه فلم يجبه احد (الى آخر القصه) -

অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়া দামেস্কের শাহী মসজিদে একদিন জুমুয়ার খোৎবায় জলদ গম্ভীরস্বরে ঘোষনা দিলেন যে, রাষ্ট্রের বায়তুল-মালের সমস্ত সম্পত্তি আমার; ইহাতে অন্য কাহারও কোন অধিকার নাই; আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব, আর যাহাকে ইচ্ছা হয় না দিব—আমার এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও কোন হক নাই। খলীফার এই কথার কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। দ্বিতীয় জুমুয়ায়ও তিনি এই ঘোষনা করিলেন, কিন্তু কেহ প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর তৃতীয় জুমুয়ায় যখন তিনি উক্তরূপ ঘোষনা করিলেন তখন একটি লোক দাঁড়াইয়া খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা দিলেন যে, দেখুন! "এই রাষ্ট্রের বায়তুল-মালে আপনার ব্যক্তিগত কোনই অধিকার নাই। ইহার একমাত্র মালিকানা অধিকার

আমাদের জন-সাধারনের ; আমাদের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে তলওয়ারের দ্বারাই ইহার চূড়ান্ত ফয়ছালা করিব।”

এই কথা শুনিবার পর হযরত মোয়াবিয়া স্বাভাবিক ভাবে খোৎবা, নামাজ শেষ করিয়া গৃহে গমন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন সমস্ত লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহার আজ আর রক্ষা নাই। অতঃপর লোকেরা খলীফার গৃহে গমন করিয়া দেখিল যে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং খলীফার সহিত একই আসনে বসিয়া আছে। হযরত মোয়াবিয়া ঐ ব্যক্তির দিকে ইশারা করিয়া উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—দেখ, এই ব্যক্তিই আমাকে বাঁচাইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। আমি আল্লার কাছে দোয়া করি—আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বাঁছাইয়া রাখুন। কেননা, আমি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, ‘তিনি বলিয়াছেন, আমার পরে এমন একদল শাসনকর্তা হইবে যাহাদের অন্যায় কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস পাইবে না। এইরূপ শাসনকর্তারা এমনভাবে দোজখে প্রবিষ্ট হইবে যেমন করিয়া বানরের পাল একের পিছনে এক সারিবদ্ধ ভাবে একদিকে ধাবিত হয়।” ইহার পরীক্ষার জন্যই আমি প্রথম জুমুয়ায় একটি ঘোষনা দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করে নাই; ইহাতে আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, হয়ত আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর দ্বিতীয় জুমুয়ায় ঐ একই ঘোষনা দিলাম; তখনও কেহই ইহার প্রতিবাদ করিল না, আমি তখন মনে করিলাম—হায়! নিশ্চয়ই আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর আবার যখন আমি ঐ ঘোষণা দিলাম তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রতিবাদ করিয়া আমাকে রক্ষা করিল আমাকে বাঁচাইল। সুতরাং আমি আল্লার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করেন!

সুধী পাঠক! হযরত মোয়াবিয়ার ন্যায়-নিষ্ঠতা খওফে-খোদা (অন্তরে খোদার ভয়) হুজুরের (দঃ) কথার প্রতি মর্য্যাদা দান ও আমর্‌বেল-মা'রুফ, নাহী-আনেল-মোনকারের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণের পরিচয় তো দেখিলেন; এখন আপনারাই বিচার করিয়া বলুন আমাদের মৌহুদী সাহেবের খেয়ালী পোলাউ পাকাইবার কি ফযিলত থাকিতে পারে। তাঁহাকে আমরা একজন ভাল লোক বলিয়াই মনে করিতাম, কিন্তু তিনি ছাহাবায়ে-কেরামের প্রতি এইরূপ ভিত্তিহীন অবাস্তব শত্রুর শিখান মিথ্যা কথার পুনারাবৃত্তি করিয়া সমাজকে গান্দা করিবার অপচেষ্টায় মিছামিছি অবতীর্ণ হইবেন এ কথা পূর্বে আমরা ধারণাও করি নাই।

● কোন কোন ঘটনা এরূপ ছিল যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর প্রশ্নের কারণ হইতে পারিত। আমাদের সৌভাগ্য ছিল

যে, ছাহাবীগণের মধ্য হইতেই বড় বড় মুরব্বিগণের দ্বারা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মুখে ঐ সব প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এবং মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রশ্নের এমন সন্তুষ্টজনক উত্তর দিয়াছেন যাহাতে মুরব্বি ছাহাবীগণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট এবং শান্ত ও ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছেন। সেই সব প্রশ্নোত্তর ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

মৌদুদী সাহেব ঐ সৌভাগ্যের স্থলে দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি দোষারোপের বোঝা ভারি করিবার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করিয়াছেন যাহা কোন দুঃসাহাসী জালিয়াত ব্যক্তিই করিতে পারে। তিনি জঘন্য ও বিবৎস মন্তব্যের সহিত ঐ শ্রেণীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মোয়াবিয়া (রাঃ)কে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অথচ ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রদান করিয়া ছিলেন, যেই উত্তরে বিশ্ববরণীয় মুরব্বি ছাহাবীগণ সন্তুষ্ট এবং শান্ত ও ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে ঐ সব উত্তর বিদ্যমান থাকা সত্তেও মৌদুদী সাহেব উহার প্রতি নিজেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, সমাজকেও উহার কোন খোঁজ দেন নাই।

মাওলানা শামছুল হক (রঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ শ্রেণীর দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একটি মোয়াবিয়া (রাঃ) কর্ত্তৃক রাজকীয় শান-সওকৎ বা জাক-জমক পূর্ণ জীবন অবলম্বন। মৌদুদী সাহেব ইহাকে সম্বল করিয়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি জঘন্য কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আর একটি হইল—"হোজ্‌র ইবনে আদী" নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ত মৌদুদী সাহেব আকাশ ভাঙ্গিয়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মস্তকে ছুড়িয়াছেন।

মোয়াবিয়া (রাঃ)এর প্রতি জাক-জমকপূর্ণ জীবন-যাপনের অভিযোগ এবং তাহার জবাব

নিম্নের ঘটনাটি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতের ও তানার অধিনে হযরত মোয়াবিয়ার গভর্ণরীর জামানায় সংঘটিত হইয়াছিল। একবার হযরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন দেশের গভর্ণরদের কার্য্যাবলী তদন্ত করিতে শামদেশে গিয়া উপস্থিত হন। তখন হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট কেহ কেহ এই অভিযোগ করিল যে "হযরত মোয়াবিয়া দরবারে জাক-জমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া আসেন এবং দরজায় দারোয়ান রাখেন, যে কারণে জন-সাধরণের দরবারে পৌঁছিতে বাঁধার সৃষ্টি হয়।" এই অভিযোগ পাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কোড়া হাতে লইয়া হযরত মোয়াবিয়ার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন এবং বলিলেন, তোমাকে পায়ে হাটিয়া মদীনা যাওয়ার শাস্তি দেওয়া দরকার। কৈফিয়তে হযরত মোয়াবিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে খলীফার গোসা শুধু

প্রশমিতই হইল না অধিকন্তু তিনি হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে এমন তারিফ করিলেন যাহাতে হযরত মোয়াবিয়ার শত্রুদের মুখে চুন-কালিই মাখিয়া গেল।

মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর মধ্যকার প্রশ্ন-উত্তর নিম্নরূপ হইয়াছিল।

لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه معاوية فى موكب عظيم فلما دنا من عمر قال له انت صاحب الموكب قال نعم يا امير المؤمنين قال هذا حالك مع ما بلغنى من طول وقوف ذوى الحاجات ببابك ؟ قال هو ما بلغك من ذالك - قال ولم تفعل هذا ؟ قد هممت ان آمرك بالمشى حافيا الى بلاد الحجاز قال يا امير المؤمنين انا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة فيجب ان يظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز الاسلام واهله ويرهبهم به - فان امرتنى فعلت وان نهيتنى انتهيت...... فقال عمر لحسن مورده ومصادره جشمناه ما جشمناه (بداية نهاية ج ٨ ص ١٢٤) وفى قصة اخرى فقال عمر (فى حق معاوية) والله ما رأيت الا خيرا وما بلغنى الا خير - بداية ج ٨ ص ١٢٠

অর্থাৎ—"খলীফা হযরত ওমর হযরত মোয়াবিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, হে মোয়াবিয়া! তুমি এত শান-শওকতের সঙ্গে থাক এবং দরজায় দারোয়ান রাখ অথচ জরুরতমন্দ লোকেরা আসিয়া তোমার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে; দারোয়ানের কারণে সহজে তোমার দরবারে পৌঁছাইতে পারে না। ইহা হইলে আমার মতে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া দরকার যে, তোমাকে পায়ে হাটিয়া দামেস্ক হইতে মদিনা যাইতে হইবে। অগ্নিপুরুষ আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমরের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া হযরত মোয়াবিয়া নির্ভয়ে গম্ভীরভাবে বলিলেন—হে আমিরুল-মো'মেনীন! আমি এমন দেশে এমন শহরে অবস্থান করিতেছি যেখানে শত্রুদের অর্থাৎ রোম সম্রাটের পক্ষ হইতে অনেক গুপ্তচর থাকে। এই জন্য আমি মনে করি যে, গভর্ণরের এমনভাবে থাকা উচিৎ যাহাতে ইসলাম এবং মোসলেম জাতির শান-শওকত প্রকাশ পাইয়া শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

আমি আমার ব্যক্তিগত শানের জন্য নয়, ইসলামের জন্যই এইরূপ করি। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন তবে করিব, অন্যথায় করিব না। মোয়াবিয়ার উত্তর শুনিয়া দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ খলীফাকে বলিলেন—ইয়া আমিরুল মো'মেনীন! যুবকটি কত সুন্দর উত্তর দিয়াছে। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার কর্ম ও চিন্তা-ধারার সৌন্দর্য্যপূর্ণ দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার কারণেই আমি এতবড় গুরুদায়িত্বের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়াছি।"

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে তিনি এমন একটা বিশেষ বিভাগ খোলেন যে বিভাগের একমাত্র কাজ ছিল রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত হাজতমন্দ অভাবী লোক আছে তাহাদেরকে খলীফার দরবারে হাজির করিয়া দেওয়া ; যাহাতে স্বয়ং খলীফা সকলের অভাবকে দুর করিয়া দিতে পারেন এবং অভাবে বা বিনা বিচারে কেহ থাকিয়া না যায়। البداية والنهاية ج ٨ ص ١٢٧ ।

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) এই সব নীতিগুণ ও তাকওয়ার ফলে মরোক্কো হইতে কাবুল পর্য্যন্ত তিনটি মহাদেশব্যাপী বিশাল দেশে পূর্ণ ইসলামী নেজামের আইন শৃঙ্খলা জারী হইয়াছিল। এবং তিনি বহিঃশত্রু হইতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রজাদের উপর পূর্ণ পিতৃ বাৎসল্য, উদারতা, বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া এমন খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু দেশ জয় হওয়ার সাথে সাথে দেশের ভিতর এমন শান্তি এবং শৃঙ্খলা কায়েম হইয়াছিল যাহার নমুনা জগতের বুকে পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার আর দেখা যায় নাই। এবং হযরত মোয়াবিয়ার যুগে কোথাও এমন একটা নমুনাও কেহ দেখাইতে পারে নাই যে, একটি প্রজার উপর কোথাও কোন অবিচার অত্যাচার হইয়াছে বা কোথাও একটি নাগরিকেরও অন্নবস্ত্রের বা গৃহের অভাবে সামান্য কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণমনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিয়া ঐতিহাসিক জাষ্টিস আমীর আলীও হযরত মোয়াবিয়ার এইসব মহৎ গুণাবলী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

On the whole Mabia's rule waes prosperous and peaceful at home and saccessfull abroad. (History of sarasean page 82)

এতবড় ব্যক্তিত্বের এবং মহৎগুণাবলীর অধিকারী যে মহাত্মা, যাঁহার সম্পর্কে হযরত ওমরের (রাঃ) মত সিংহ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস, হযরত ওমায়ের ইবনে ছায়াদ আনছারীর মত মানুষ বিরুদ্ধপার্টির লোক হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য তো করেনই নাই অধিকন্তু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। এমনকি উমাইয়া বংশ তথা হযরত মোয়াবিয়ার বংশের প্রাণঘাতী শত্রুপক্ষ প্রবল প্রতাবান্বিত আব্বাসিয়া খলীফাদের জামানায়ও রাজধানী শহরের প্রত্যেক মসজিদেই লিখিত ছিল—خير الناس بعد على معاوية হযরত আলীর (রাঃ) পরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণে গুণান্বিত শ্রেষ্ঠগুণশালী শাসনকর্তা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)। এমন মহামানবের গীবৎ করার Back biting করার মত দুঃসাহস মৌদুদী সাহেব কিভাবে করিলেন, এটা তিনিই ভাল জানেন।

বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের মাথা যাহার সামনে নত ; শ্রদ্ধেয় মৌদুদী সাহেব তাঁহার মত পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া আপন অন্তরের বিষকেই প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন ; আপন পলিদ কল্পনা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া জাতির

গলায় কলঙ্কের মালা পরাইতে অপচেষ্টা করিয়াছেন। হযরত মোয়াবিয়ার নিষ্কলুষতার উপর কালিমা লেপন করিতে গিয়া আপন চেহরাকেই মৌদুদী সাহেব কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যদি ছাহাবায়ে-কেরামের দোষ খোঁজার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতেন, ছাহাবায়ে-কেরামের দরজার গুরুত্ব যদি বুঝিতেন, ছাহাবায়ে-কেরামের মর্তবার শান যদি মৌদুদী সাহেবের হৃদয়ে জাগ্রত থাকিত তবে কিছুতেই এইরূপ জঘন্য কাজ তাঁহার কলমের দ্বারা প্রকাশ পাইত না!

হোজ্‌র্ ইবনে আদীর কতলের ঘটনা

ইমাম বোখারী প্রমুখ ইমামগণের মতে হোজ্‌র ইবনে আদী ছাহাবী ছিলেন না। যদিও মোহাম্মদ ইবনে ছা'দ, ইবনে আবদুল বার প্রমুখ ইমামগণের মতে তিনি একজন ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের প্রশ্ন অনেক পুরাতন প্রশ্ন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার (রাঃ) সঙ্গে হযরত মোয়াবিয়া যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন (পর্দার সহিত কথা বলিয়াছেন।) তখন যেহেতু জামানা ছিল সৎ সাহসের এবং আম্‌রেবেল-মারূ'ফ এবং নাহী-আনেল-মোনকারের; কাজেই মা আয়েশা হযরত মোয়াবিয়াকে সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্ন করিয়াছেন—"মোয়াবিয়া তুমি হোজ্‌র্ ইবনে আদীর কতলের কি জবাব দিবা? উত্তরে মোয়াবিয়া বলিয়াছেন, মা! "আমাদের উভয়েরই আল্লার দরবারে হাজির হইতে হইবে। আল্লার দরবারেই এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইবে। অতএব আপনি আমাকে এবং হোজ্‌র্ ইবনে আদীকে আল্লার দরবারে মীমাংসার জন্য ছাড়িয়া দিন।"

যে কোন খোদা-ভীরু মোমেনের জন্য এর চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কথা আর কি হইতে পারে? এই জন্য মা আয়েশার প্রশ্নের জবাবে হযরত মোয়াবিয়া এই কথাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং মা আয়েশাও এই জবাবটি হযরত মোয়াবিয়ার ন্যায়-নিষ্ঠতার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। হযরত মোয়াবিয়া আরও বলিয়াছেন—

انما قتله الذين شهد وا عليه - (البداية والنهاية ج ٨ ص ٥٣)

অর্থাৎ—তাহার বিরুদ্ধে বাগাওয়াতের এত পরিমাণ সত্য সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, আমি তাহাকে শরীয়তের আইন অনুসারে কতল করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এ কথার প্রচুর পরিমাণে সাক্ষ্য পাইয়াছি যে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ছাবায়ী, খারেজী, রাফেজী ফেৎনা ইরাকে শক্তিশালী হইতেছিল। এমনকি ইহারও প্রমাণ আছে যে, হযরত হাছান (রাঃ) হযরত মোয়াবিয়াকে খেলাফত সোপর্দ করিয়া দেওয়ায় হোজ্‌র্ ইবনে আদী তাঁহাকে (হাছানকে) লা'ন তা'ন করিয়াছে।

قتل واحد خير من قتل مائة الف (بداية نهاية ج ٨ ص ٥٤)

অর্থাৎ—এখন হয়ত একজনকে কতল করিলেই দেশের মধ্যে ফেৎনা-ফাসাদ দুর হইয়া পূর্ণ শান্তি ফিরিয়া আসিবে, নতুবা এই একজনকে কতল না করিলে

পরে লক্ষ লক্ষ জনকে কতল করিলেও দেশে পূর্ণ শান্তি ফিরাইয়া আনা যাইবে না। এই জন্যই হোজ্‌র্‌ ইবনে আদীর কতল সংঘটিত হইয়াছে।

হোজর ইবনে আদীকে কতল করিয়া ফেৎনার মূলোচ্ছেদ করা না হইলে কত লোক এই ফেৎনায় জড়িত হইয়া পড়িত এবং সে জন্য কত লোক যুদ্ধে নিহত হইত তাহার ইয়াত্তা কে করিবে? এ কথাটাকেই হযরত মোয়াবিয়া সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

قتله احب الى من ان اقتل معه مائة الف* (بداية نهاية ج ٨ ص ٥٠)

روى احمد بن حنبل..... يا ام المؤمنين - انى وجدت قتل رجل فى صلاح الناس خير من استحيائه فى فسادهم+ (بداية ج ٨ ص ٥٥)

এই জন্যই মা আয়েশা হযরত মোয়াবিয়াকে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্নটি যেহেতু মা আয়েশার সম্মুখে শেষ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং মৌদুদী সাহেব এই প্রশ্নটি না তুলিলেও পারিতেন। তিনি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা কোরআন-হাদীছের আদৌ-বিরোধী হয় নাই বা ইহার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার উপর আদৌ কোন দোষ আরোপ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌদুদী সাহেব যেহেতু ছাহাবাগণের দোষচর্চ্চা এবং দোষ-চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জন্য তিনি হোজ্‌র্‌ ইবনে আদীর পুরাতন প্রশ্ন যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত আরও কতিপয় সম্পূর্ণ মিথ্যা ভীত্তিক বিষয় জুড়িয়া দিয়াছেন।

মৌদুদী সাহেব বলিয়াছেন যে, জল্লাদ হোজ্‌র ইবনে আদী এবং তাহার সাথীদিগকে কতল করার পূর্বে হযরত মোয়াবিয়ার পক্ষ হইতে না কি এই কথা বলা হইয়াছিল যে, "তোমরা যদি হযরত আলীকে গালী দিতে স্বীকার কর তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে"। এই কথা একেবারেই জাল এবং ইহা ধোকাবাজ মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহিয়ার মিথ্যা কল্পিত জাল বর্ণনা যাহাকে সম্বল করিয়া মৌদুদী সাহেব এই উদ্ভট উক্তি করিয়াছেন। এমন কথার কোনই ভিত্তি নাই। ইহা শুধু মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজীদের কারখানারই পচা গুদামজাত দুর্গন্ধময় মালের নমুনা মাত্র। মৌদুদী সাহেব কিভাবে এমন জালিয়াতদের মিথ্যা কথার তাহ্‌কিক না করিয়া ইহাকে একজন ছাহাবীর বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে পেশ করিতে সাহস করিলেন ইহা আমাদের কল্পনার বাহিরে।

---

* অর্থাৎ এক হোজর ইবনে আদীকে প্রাণদণ্ড দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করাকে এড়াইয়া যাওয়া আমার নিকট শ্রেয় মনে হইয়াছে।

+ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করিয়াছেন—মোয়াবিয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে ইহাও বলিয়াছিলেন, হে উম্মুল-মোমেনীন! একজনকে প্রাণদণ্ড দিয়া সকল মানুষের মঙ্গল সাধন করা উত্তম—ঐ একজনকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সকলের অমঙ্গল করা অপেক্ষা।

মৌদুদী সাহেব আরও ভিত্তিহীন কথা এই বলিয়াছেন যে, "হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) উপর হযরত হাছান বছরী চারিটি দোষ আরোপ করিয়াছেন"। এটা নিশ্চয়ই হাছান বছরী মৌদুদী সাহেবের কানে কানে বলিয়া যান নাই! নিশ্চয়ই তিনি কোন মাধ্যম সূত্রে এ কথাটা পাইয়াছেন।

এখন কথা হইল এই যে, সেই মাধ্যম সম্পর্কে মৌদুদী সাহেব একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, আমি কাহার বা কাহাদের বর্ণনা চোখ বুজিয়া দলিল হিসাবে গ্রহণ করিতেছি? বা ইহাও কি মৌদুদী সাহেবের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, এই বর্ণনাটি যদি মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজীদের জাল বর্ণনা হয় তবে ইহার পরিনাম কত সাংঘাতিক হইবে? অথবা ইহাও কি মৌদুদী সাহেবের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, এই মিথ্যার দ্বারা মিথ্যামিথ্যি রসুলুল্লার পবিত্রাত্মা ছাহাবীদের প্রতি কলঙ্ক লেপন করিলে আল্লার দরবারে কি জবাব দেওয়া যাইবে? রসুলুল্লার পবিত্রাত্মা সাথীদের উপর কলঙ্ক লেপন করিতে গিয়া মৌদুদী সাহেব যে মিথ্যার ডিপো সংগ্রহে লাগিয়াছেন ইহার দ্বারা তিনি নিজেকেই কলঙ্কিত করিয়াছেন।

এখন শুনুন, যে মিথ্যাবাদীর বর্ণনা কুড়াইয়া মৌদুদী সাহেব আপন ভাণ্ডারকে অপবিত্র করিয়াছেন, সে হইল একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুৎ ইবনে ইয়াহিয়া; যাহা সমস্ত বিশ্বস্ত আছমাউর-রেজালের কিতাবে স্পষ্টভাবে লেখা রহিয়াছে। যাদের ভিতরে বিন্দুমাত্র খোদাভীতি আছে তাহারা কিছুতেই এত বড় একটা মিথ্যুকের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহার মিথ্যা কথাকে না হযরত হাছান বছরির মুখে তুলিয়া দিতে পারে; না হযরত হাছান বছরির দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার উপর কথাটা মিথ্যামিথ্যি লাগাইবার দুঃসাহস করিতে পারে।

সন্দেহ ভঞ্জন

মৌদুদী সাহেব সম্পর্কে মাওলানা শামছুল হক (রঃ) হইতে যে সব উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হইল উহা তাঁহার সঙ্কলন "ভুল সংশোধন" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহিত।

উক্ত পুস্তিকা মৌদুদী সাহেবের মুখোশ খুলিয়া দিতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাই মৌদুদীভক্তগণ ভীষণ ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত। উহার আঘাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার এক অভিনব পন্থা তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে।

পাপের বোঝা—কুখ্যাত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" প্রবন্ধ হইতে তওবা-এস্তেগফার মৌদুদী সাহেব দ্বারা যদি তাহারা আদায় করিতে পারিত তবে তাহারা অভিশাপ হইতে সহজেই মুক্তি পাইত। কিন্তু তাহারা উহা না করিয়া উল্টা "ভুল সংশোধন" পুস্তিকাকে অস্বীকার করিতে প্রয়াস পায়। "ভুল সংশোধন" পুস্তিকার অকাট্য দলীল প্রমাণের একটি অক্ষরও খণ্ডনের ক্ষমতা তাহাদের হয় নাই। তবে তাহাদের কোন কোন ক্ষুদে

নেতা উক্ত পুস্তিকা মাওলানা শামছুল হক (রঃ)-এর সঙ্কলন হওয়াকে অস্বীকার করে। তাহাদের এই অভিনব পন্থাবলম্বন দৃষ্টে একটি গল্প মনে পড়ে এবং হাসি আসে।

এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্বের দাবী করিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল— "নিতম্ব" বা পাছার আরবী কী? উত্তরে নিতম্বের আরবী বলিতে অক্ষম হওয়ায় সে মুখ বাঁচাইবার জন্য বলিয়া উঠিল—আরবদেশে মানুষের নিতম্ব হয় না, তাই উহার আরবী শব্দ নাই। মৌদুদীভক্তরা এই ক্ষেত্রে মুখ বাঁচাইবার সেই কৌশলই অবলম্বন করে।

বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও আলেম সম্প্রদায়ের দুইটি অন্যতম কেন্দ্র মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহের কর্ম্মস্থল ছিল। (১) ঢাকা, জামেয়া কোরআনিয়া—লালবাগ মাদ্রাসা এবং (২) ফরিদপুর—গওহার ডাঙ্গা, দারুল উলুম—খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা। মাওলানা শামছুল হক (রঃ) "ভুল সংশোধন" পুস্তিকা সঙ্কলনে সুদীর্ঘ গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আলেম-ওলামার সাথে আলোচনা করিয়া থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার এই সঙ্কলন সম্পর্কে শত শত আলেম সাক্ষী রহিয়াছেন।

নিম্নে আমরা শুধু মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহের সর্ব্বদার কর্ম্মস্থল দুইটি কেন্দ্রীয় মাদ্রাসার সর্ব্ববরণীয় বিশিষ্ট সাতজন বুজুর্গ আলেমের সাক্ষ্য প্রকাশ করিয়া দিলাম। মৌদুদীভক্ত নেতা বা তেনারা যাহাই বলুক, কিন্তু মোসলমানগণ উক্ত সাক্ষ্যে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আশ্বস্ত হইবেন। সাক্ষ্যের অবিকল প্রতিলিপি এই—

মৌদুদী সাহেব সঙ্কলিত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" নামীয় পুস্তিকার বিরুদ্ধে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) একখানা পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন—যাহা "ভুল সংশোধন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা জানি—এই পুস্তিকা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমতুল্লাহে আলাইহেরই সঙ্কলিত ও রচিত। স্বাক্ষর—

(১) মুহাম্মদ উল্লাহ (হযরত হাফেজজী হুজুর—খলীফা হযরত থানবী (রঃ), ঢাকা)
(২) হেদায়েতুল্লাহ (প্রিন্সিপাল ও মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া, লালবাগ—ঐ
(৩) আবদুল মোয়েজ (খতীব বাইতুল মোকার্‌রাম—মুফতী ও মোহাদ্দেছ লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা)
(৪) আবদুল মজীদ ঢাকুবী (মোহাদ্দেছ লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা)
(৫) আবদুল আজিজ (মোহতামেম সাহেব—গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর)
(৬) আবদুল মান্নান (শায়খুল-হাদীছ গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর)
(৭) আবদুল মোক্তাদের (মোহাদ্দেছ গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর)

১৯৭৮ ইং মার্চ্চ মাসে মুদ্রিত—যখন সমস্ত সাক্ষীগণ জীবিত রহিয়াছেন এবং সাক্ষ্যের মূল লিপি ও দস্তখত আমাদের নিকট সুরক্ষিত আছে।